# সাইমুম সিরিজ

## আবুল আসাদ

www.saimumseries.com

# ইবুক সম্পর্কে কিছু কথা

সম্মানিত পাঠক,

আসসালামু আলাইকুম

সাইমুম সিরিজকে অনলাইনে টেক্সট আকারে আনার লক্ষ্য নিয়ে ২০১২ সালের ১৭ই আগস্ট গঠন করা হয় সাইমুম সিরিজ-ইউনিকোড প্রোজেক্ট (SSUP) গ্রুপ। তারপর বিভিন্ন ব্লগে ও ফেসবুকে প্রোজেক্টের জন্য স্বেচ্ছাসেবক আহ্বান করা হয়। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসেন একঝাক স্বেচ্ছাসেবক এবং এই স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে গঠিত হয় সাইমুম সিরিজ-ইউনিকোড প্রোজেক্ট টীম। টীম মেম্বারদের কঠোর পরিশ্রমে প্রায় ৮ মাসে সবগুলো সাইমুম অনলাইনে আসে। মহান আল্লাহ সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন।

SSUP টীমের পক্ষে
**Shaikh Noor-E-Alam**

**ওয়েবসাইটঃ** www.saimumseries.com

**ফেসবুক পেজঃ** www.facebook.com/SaimumSeriesPDF

**ফেসবুক গ্রুপঃ** www.facebook.com/groups/saimumseries

# SSUP প্রোজেক্টের টীম মেম্বার

(নামের ডানপাশে ব্রাকেটে INDEX নাম্বার)

1. Shaikh Noor-E-Alam (1)
2. Ismail Jabihullah (2)
3. Rabiul Islam (3)
4. AMM Abdul Momen Nahid (4)
5. Rubel Hasan Mon (5)
6. Foysal Ahmad (6)
7. Iftikhar Tariq (7)
8. Abdullah Mohammad Choton (9)
9. Mohammad Rayhan (10)
10. Md. Samsuzzaman (11)
11. Kamrul Alam (12)
12. Gaziur Rahman (13)
13. Abdullah Al Mamun (14)
14. Rashel Ahmed (15)
15. Mustafijur Rahaman (16)
16. Khondakar Moniruzzaman (17)

17. Salahuddin Nasim (18)
18. Osman Gani (19)
19. A.S.M Masudul Alam (20)
20. Jahedul Islam (21)
21. Munjur Morshed (23)
22. Anisur Rahman (25)
23. Mostaque Ahmad (28)
24. Sabuz Miah (29)
25. Muhammad Shahjahan (30)
26. Umayir Chowdhury (31)
27. Asma Jahan (32)
28. Ridwan Mahmud (33)
29. Bondi Beduyin (34)
30. Syed Murtuza Baker (35)
31. Towhidur Rahman (37)
32. Rasheduzzaman Rasel (39)
33. Ataus Samad Masrur (41)
34. Md Nazmul Islam (42)

35. Md. Jafar Ikbal Jewel (43)
36. Mahfuzur Rahman (44)
37. Shabbir Ahmad (45)
38. Tuhin Azad (48)
39. S A Mahmud (50)
40. Omar Faruk (52)
41. Sk.Tariquel Islam (53)
42. Nazrul Islam (54)
43. Esha Siddique (55)
44. Boshir Ahmed Sohel (56)
45. Mostafizur Rahman (57)
46. Saif Mahdee (58)
47. Arif Rahman (61)
48. Mohammod Amir (62)
49. Tabassum Jannat (64)
50. Ashrafuj Jaman (66)
51. Nabil Mahmud (70)
52. Meah Imtiaz Zulkarnain (71)

53. Sharmeen Sayema (72)
54. Muhammad Nawajish Islam (74)
55. Zareen Firdegar Chowdhury (75)
56. Md Raihan (76)
57. Monirul Islam Moni (78)
58. Sohel Sharif (79)
59. Hassan Tariq (80)
60. Gazi Salahuddin Mamun (81)
61. Hafizul Islam (82)
62. Tariq Faisal (83)
63. Mohammad Ahsanul Haque Arif (85)
64. Akramul Haq Farhad (86)
65. Abu Taher (88)
66. Tareq Samsul Alam (89)
67. Mohammed Ayub (90)
68. Nazmus Sakib (91)
69. Mohammed Sohrab Uddin (93)
70. Kayser Ahmad Totonji (94)

71. Emrul Hasan (95)
72. Lahin New (96)
73. Sumon Mujib (97)
74. Ariful Islam Salim (98)
75. Ferdous Al Quraeshi (99)
76. Sagir Hussain Khan (100)
77. Zahir Raihan (101)
78. Ek phota Shisir (104)
79. Masud Khan (105)
80. Abir Tasrif Anto (106)
81. Amir Omar (107)
82. Amin Islam (109)
83. M-g Mustafa (111)
84. Jamirul Haqe (112)
85. Elias Hossain (113)
86. Mohammad Shameem (114)
87. Shariful Seeman (115)
88. Md Rashed (116)

89. Hm Zunaid (117)
90. Tamanna Chowdhury (118)
91. Ahsan Bandarban (121)
92. Shakir Ahmed Junnun (122)
93. Md Amdadul Haque Swapan (123)
94. Selina Akhter (124)
95. Sharwat Kabir Safin (125)
96. Sohel Shazuli (126)
97. Misbah Ahmad Chowdhury Fahim (127)
98. Neehon Forid (128)
99. Mujtahid Akon (129)
100. Fulel Porosh (130)
101. Maruf Matin (133)

# সাইমুম-১

# অপারেশন তেলআবিব-১

## আবুল আসাদ

# ১

ডাইরীর সাদা বুক। খস্ খস্ শব্দ তুলে এগিয়ে চলেছে একটি কলমঃ

'... সিং কিয়াং-এর ধুসর মরুভূমি। দূরে উত্তর দিগন্তের তিয়েনশান পর্বতমালা কালো রেখার মত দাঁড়িয়ে আছে। অর্থহীনভাবে শুধু চেয়ে থাকি চারিদিকে। কোন কাজ নেই। জীবনের গতি যেন আমাদের স্তব্ধ হয়ে গেছে। আজ ক'দিন হল যুগ-যুগান্তরের ভিটে মাটি ছেড়ে আমরা ৫ হাজার মুসলমান আশ্রয় নিয়েছি আমাদের জাতীয় ভাইদের কাছে এ সুদূর মরুদ্যানে। অত্যাচারীর চকচকে রক্ত পিপাসু বেয়নেট আর রাইফেলের গলিত সীসা ছিনিয়ে নিয়েছে আমাদের বহু ভাই বহু বোনকে। চোখে আর কারো পানি নেই। শুকিয়ে গেছে অশ্রুর ধারা।

মরু-ঘেরা এ দূর্গম মরুদ্যানে এসে আমাদের যারা একটুখানি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল, ভুল ভেঙ্গে গেল তাদের অচিরেই। একদিন সকালে উঠে শুনলাম এদেশের সে ফেরাউন বাহিনীও এগিয়ে আসছে এদিকে। আব্ব চিৎকার করে বললেন, 'আমরা বাঘের মুখ থেকে খসে কশাই এর হাতে পড়েছি। আমাদের মাতৃভূমি তুর্কিস্তানের একখন্ড ভূমিতেও আজ আমাদেরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দিবে না শয়তানরা। বুঝলাম আব্বার সহ্য নিঃশেষ হতে চলেছে।

আব্বার আয়োজন শুরু হ'ল যাত্রার। নারী আর শিশুদের চোখের পানিতে ভারি হয়ে উঠল মরুভূমির শুষ্ক বাতাস। এবার শুধু আমরাই নই, মরুদ্যান ও আশে পাশের আরো ৪৫ হাজার মুসলিম নর নারীর উদ্বাস্তু মিছিল এসে শামিল হল আমাদের সাথে।

আমার চার বছরের ভাই ইউসুফ এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমরা আবার কোথায় যাব ভাইজান! বাড়ী গেলে সেই মানুষরা যে আবার মারবে আমাদের? আমি অভয় দিয়ে বললাম, 'না ভাই আমরা বাড়ী যাচ্ছি না।'

কিন্তু কোথায় যাচ্ছি বলতে পারলাম না। কোথায় যাব আমরা? তাজিকিস্তান কিংবা উজবেকিস্তান। সেতো আর এক সিংকিয়াং। অবশেষে সবাই বুক ভরা আশা নিয়ে তাকালো দক্ষিণের দিকে। উচ্চারিত হলো ভারতের নাম- মুহাম্মদ বিন কাসিমের এ ভারত, মাহমুদ, বাবর, ঈসা খাঁ, টিপু, তিতুমীরের এ ভারত।

মরুভূমির সাদা বালুর উপর দিয়ে এগিয়ে চলল ছিন্নমূল মানুষের আদিগন্ত মিছিল। পিছনে পড়ে রইল সহস্র শতাব্দির স্মৃতি বিজড়িত মাতৃভূমি সিংকিয়াং। কেন এমন হ'ল? কি করেছি আমরা? শুধু তো স্বাধীনভাবে বাঁচতে চেয়েছি। মানুষের এ চাওয়া তো চিরন্তন। মুসলমান হওয়ার অপরাধে কি এ অধিকার আমাদের থাকবে না?

কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল। ধীরে ধীরে তিব্বতের দিকে এগিয়ে চলেছি আমরা। হঠাৎ একদিন কয়েকটি সামরিক বিমান খুব নীচু দিয়ে আমাদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল গোটা কাফেলায়। তাহলে কি ওরা এখনো পিছু ছাড়েনি আমাদের?

মরুভূমির নিঝুম-নিস্তব্ধ রাত। বাতাসের একটানা শোঁ শোঁ নিঃশ্বাস নিস্তব্ধতার মাঝে তরঙ্গ তুলছে শুধু। উপরে লক্ষ কোটি তারার মেলা। কাফেলার পরিশ্রান্ত পথিকরা কেউ জেগে নেই বোধ হয়। হঠাৎ উত্তর দিগন্ত থেকে ভেসে এল কয়েকটি জেট ইঞ্জিনের ভয়ঙ্কর শব্দ। তারপর বুম! বুম! বুম......

চিৎকার ছুটোছুটি আর্তনাদে গভীর রাত্রির নিশুতি প্রহর ভেঙ্গে পড়ল টুকরো টুকরো হয়ে। ঘুম ভেঙে গেল আমার। বিছানায় উঠে বসেছি। বোবা হয়ে

গেছি যেন। আব্বার চিৎকার ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেলাম। নিজের চোখকে বিশ্বাস হয় না আমার। কি বিভৎস সে দৃশ্য! আব্বার তাবু জ্বলছে। টলতে টলতে আব্বা ইউসুফকে টেনে নিয়ে আসছেন। ইউসুফের কোমর থেকে পিছন দিকটা নেই, কয়লার মত হয়ে গেছে ওর শরীর। একটি অস্ফুট চিৎকারই শুধু আমার মুখ থেকে বেরুল ...।

যখন জ্ঞান ফিরল, বেলা হয়ে গেছে তখন অনেক। আব্বার দিকে চোখ পড়তেই দেখলাম অত্যন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে তিনি আমায় ডাকছেন। আমি কাছে যেতেই তিনি বললেন ‘মুসা, কাফেলা নিয়ে যত সত্ত্বর পার এখান থেকে সামনে এগিয়ে যাও। মনে .....?

আমি বাধা দিয়ে বললাম, এ সব কি বলছেন আব্বা? আপনি ভাল হয়ে যাবেন। আব্বা ম্লান হাসলেন। বললেন, তাঁর ডাক এলে কেউ সে ডাকে সাড়া না দিয়ে কি পারে মুসা?

একটু থেমে তিনি বললেন, মুসা, ইউসুফ নাই; দুঃখ করো না। পৃথিবীর সমস্ত নিপীড়িত শিশুর মাঝে তোমার ইউসুফকে খুঁজে পাবে। তোমার মা, বাবা নেই বলে কখনো ভেবনা, পৃথিবীর নির্যাতিত মানষের মধ্যে তোমার মা-বাবাকে খুঁজে পেতে চেষ্টা করো।’ অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে পড়ল আব্বার কণ্ঠ। আব্বার মুখ থেকে অস্ফুটে তাঁর কথা বেরিয়ে এল, মনে রেখ মুসা; শুধু সিংকিয়াং এর মুসলমানদের একার এ দূর্দশা নয়, পৃথিবীর কোটি কোটি তোমার ভাই-বোন এমনিভাবেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। আরও মনে রেখ, তোমার এ মজলুম মুসলিম ভাই বোনদের অশ্রু মোছানোর দায়িত্ব, তাদের অবস্থার পারিবর্তন আনার দায়িত্ব তোমাদের মত তরুণদের। তোমরা স্রষ্টার নির্দেশগুলোর আর তোমাদের গৌরবময় ইতিহাসকে সর্বদা সামনে রেখো। খালেদ, তারিক, মুসা, মুহাম্মদ বিন কাসিমের তলোয়ার যেদিন তোমরা আবার হাতে তুলে নিতে পারবে, দেখবে সেদিন আল্লাহর সাহায্য কত দ্রুত নেমে আসে তোমাদের উপর।

আব্বা তাঁর নিঃসাড় দুর্বল হাত দিয়ে আমার অশ্রু মোছানোর ব্যর্থ চেষ্টা করে বললেন, মুসা, অশ্রু তো মুসলমানদের জন্য নয়। তোমরা সেই জাতি যারা হাত কেটে গেলে পা দিয়ে পতাকা ধরে রাখে। পা কেটে গেলে দাঁত দিয়ে পতাকা

ধরে রাখে। আমি অশ্রু মুছে বললাম, আব্বা আমি আর কাঁদব না। দোয়া করুন - ঘরের কোণে বসে কাপুরুষের মত যেন না মরি।

চারিদিকে চেয়ে দেখলাম, গতকাল যারা দুনিয়ার আলো বাতাসে বিচরণ করেছে, তাদেরই হাজার হাজার বিকৃত লাশে মরুভুমির বুক কালো হয়ে উঠেছে। শত শত পোড়া তাঁবুর খন্ড খন্ড অংশ ছিটিয়ে, ছড়িয়ে পড়ে আছে। শত শত এতিম শিশুর সব হারানোর কান্না চারিদিকে মাতম তুলেছে। আবার যখন আব্বার দিকে চাইলাম, চোখ দু'টি তাঁর বুজে গেছে। চোখ দু'টি আর কোনদিন চাইবে না পৃথিবীর দিকে। একটি অবরুদ্ধ উচ্ছ্বাস যেন ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে চাইল আমার সমগ্র হৃদয়কে। চারিদিক থেকে অন্ধকার এসে সংকীর্ণ করে দিতে চাইল আমার পৃথিবীকে। দাঁতে দাঁত চেপে শক্ত হতে চেষ্টা করলাম আমি।

কাঁধের উপর একটি কোমল স্পর্শে চমকে উঠলাম। ফিরে দেখলাম 'ফারজানা'। শুভ্র গন্ড দু'টি চোখের পানিতে ভেসে যাচ্ছে তার। অশ্রু-ধোয়া কালো চোখ দু'টিতে কি নিঃসীম মায়া। এমন নিবিড়ভাবে ফারজানাকে কোনদিন আমি দেখিনি। ফারজানা সিংকিয়াং এর প্রধান বিচারপতি আমির হাসানের কন্যা।

আমি বললাম, ফারজানা কোন দুঃসংবাদ নেই তো? সে বলল, আমরা ভাল আছি। আব্বা আপানাকে আমাদের তাঁবুতে ডেকেছেন।

মরু সূর্য তখন আগুন বৃষ্টি করছে। আমি জানতাম, ফারজানাদের ছোট্ট একটি তাঁবু। আমি বললাম, চারিদিকে চেয়ে দেখো ফারজানা, তাঁবুর ছায়া আমরা কতজনকে দিতে পারব। যা হোক এদিকের একটা ব্যবস্থা করা যাবেই। তুমি যাও ফারজানা। আমি চাচাজানের সাথে পরে দেখা করব।

আমরা আমাদের দশ হাজার ভাই বোনকে মরু বালুর অনন্ত শয্যায় ঘুমিয়ে রেখে এগিয়ে চললাম সামনে। একদিন গোধূলী মুহুর্তে আমরা পৌঁছুলাম তিব্বত সীমান্তে। দেখলাম তিব্বত সরকার সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছে। জানলাম সিংকিয়াং এর মাটি যাদেরকে আশ্রয় দিতে পারেনি তিব্বতের মাটিতেও তাদের পা রাখবার কোন জায়গা নেই। ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত ছিন্নমূল বনি আদমের কোন আবেদন নিবেদন কোন কাজে এল না। আশা ভঙ্গের চরম হতাশায় মৃত্যুর স্তব্ধতা নেমে এল কাফেলা ঘিরে।

এবার কোথায় যাব আমরা? উত্তরে মৃত্যু হাতছানি দিয়ে ডাকছে, দক্ষিণে তিব্বত সীমান্তের দুর্ভেদ্য দেয়াল। আশার একটি ক্ষীণ আলোক বর্তিকা তখন জ্বলছে-কাশ্মীর হয়ে আফগানিস্তান। পথ অত্যন্ত দুর্গম। কিন্তু উপায় নেই তবু।

হিমালয়ের ১৮ হাজার ফিট উঁচু বরফ মোড়া মৃত্যু-শীতল পথ ধরে আফগানিস্তানের দিকে যাত্রা শুরু হল আমাদের। দিন, মাস গড়িয়ে চলল। পার্বত্য পথের কষ্টকর আরোহণ অবরোহণ নিঃশেষ করে দিল মানুষের প্রত্যয়ের শেষ সঞ্চয়টুকু। তার উপর দুঃসহ শীত। প্রতিদিনই শত শত পরিশ্রান্ত মানুষের উপর নেমে আসতে লাগলো মৃত্যুর হিমশীতল পরশ। দুর্বল বৃদ্ধ, কোমল দেহ নারী, অসহায় শিশুরাই প্রধান শিকারে পরিণত হল এর। সবার মত ফারজানার বৃদ্ধ পিতাকেও একদিন হিমালয়ের এক অজ্ঞাত গুহায় সমাহিত করে আমরা এগিয়ে চললাম সামনের দিকে। ফারজানার অবস্থাও হয়ে উঠেছে মর্মান্তিক। তার আব্বার মৃত্যুর পর সে পাষাণের মত মৌন হয়ে গেছে। বোবা দৃষ্টির শূন্য চাহনির মাঝে কোন ভাবান্তরই খুঁজে পাওয়া যায় না। ওর একটি হাত ধরে আমি পাশাপাশি চলছিলাম। কয়েকদিন পর হাত ধরে নিয়ে চলাও অসম্ভব হয়ে উঠতে লাগল। ভীষণ জ্বর উঠল ফারজানার। পা দু'টি আর উঠতে চায় না ওর।

সেদিন গভীর রাত। ঘুমিয়ে পড়েছে বোধ হয় সবাই। জ্বরের তীব্র ব্যাথায় ফারজানা কাতরাচ্ছে; একটু দূরে বসে অসহায়ভাবে সে দৃশ্য দেখছি আমি। হিমালয়ের নিঃসীম মৌনতার মাঝে ফারজানার অস্ফুট কাতরানি তীব্র আর্ত বিলাপের মত আমরা সমগ্র হৃদয়কে ক্ষত বিক্ষত করে দিচ্ছে। আমি ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে ওর মাথার পাশে বসলাম। ধীরে ধীরে হাত বুলালাম ওর আগুনের মত ললাটে। ওর দুর্বল দু'টি হাত উঠে এল। তুলে নিল আমার হাত ওর দু'হাতের মুঠোয়। তারপর হাত মুখে চেপে ধরে বাঁধ ভাঙা নিঃশব্দ কান্নায় ভেঙে পড়ল ফারজানা। আমি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললাম, কেঁদোনা ফারজানা, কষ্ট এতে আরও বাড়বে।

ফারজানা বলল, আমাকে ভুলাতে চেষ্টা করো না। আমি জানি, আমার সময় ঘনিয়ে এসেছে। তারপর একটু থেমে ধীরে ধীরে বলল, মুসা ভাই, সজ্ঞানে কখনও কোন পাপ করেছি বলে মনে পড়ে না। তুমি কি আমাকে আশ্বাস দিতে

পার-অমর জীবনের সেই জগতে আবার আমি তোমাকে খুঁজে পাব। আব্বার কাছে বলেছিলাম, কাঁদব না। কিন্তু চোখের পাতা দু'টি সহসা ভারি হয়ে উঠল। আমি বললাম, একথা শুধু তিনিই জানেন ফারজানা। তবে বলতে পারি আমি- তিনি তাঁর বান্দার কোন একান্ত কামনাকেই অপূর্ণ রাখেন না।

ফরজানা যেন গভীর পরিতৃপ্তির সাথে চোখ বুজল। অস্ফুটে তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল, আল্লাহই তো আমাকে সবচেয়ে ভালো জানেন। চোখ দু'টি আর খুললো না ফারজানা। কোনদিনই তা আর খোলার নয়।

হিমালয়ের বুক চিরে দীর্ঘ পথ চলার পর আমরা যখন আফগান সীমান্তে পৌঁছলাম, ৫০ হাজার মানুষের মধ্যে আমরা তখন বেঁচেআছি মাত্র ৮৫০ জন......।

খস্ খস্ শব্দ বন্ধ হল।

হঠাৎ থেমে গেল কলমটি!

টেবিলের একপাশে রাখা একটি ক্ষুদ্র যন্ত্রে হঠাৎ লালবাতি জ্বলে উঠল। আর সেই সাথে অয়্যারলেস গ্রাহকযন্ত্র থেকে 'ব্লিৎস ব্লিৎস' শব্দ ভেসে এল। আহমদ মুসা লেখা থামিয়ে ডাইরীটা বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল। প্রায় সাড়ে ছ'ফুট লম্বা লোকটি। মধ্য এশিয়ার ঐতিহ্যবাহী তুর্কি স্বাস্থ্য দেহে। সকল প্রকারের কষ্ট এবং যে কোন প্রতিকূল অবস্থা মোকাবিলার যোগ্যতা দিয়ে যেন আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন একে। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। চোখ দু'টি উজ্জ্বল এবং দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ। শান্ত দর্শন মুখাবয়বে অনমনীয় ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট ছাপ। এ লোকটি বিশ্বের সবচেয়ে বেশী আলোচিত এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মাথা ব্যথা। সাইমুমের মধ্যমনি। মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া এবং উত্তর ককেশিয়া থেকে তানজানিয়া পর্যন্ত সুবিস্তৃত মুসলিম সমাজের প্রতিটি মজলুম মানুষ তার নাম গর্বের সাথে স্মরণ করে এবং স্বাধীন দেশ আর স্বাধীন জীবনের স্বপ্ন দেখে। আহমদ মুসা উঠে গিয়ে অয়্যারলেসের কাছে বসল। বলল, আহমদ মুসা স্পিকিং।

ওপার থেকে একটি কণ্ঠ ভেসে এল, 'আমি ফারুক আমিন বলছি।'

-কি খবর বল।

-বাংলাদেশ সিক্রেট সার্ভিস একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমাদের দিয়েছে। আমি এক্ষুণি আসতে চাই।

- এস। ৪০১১ অপারেশনের খবর?

- পনর মিনিট হল ফিরেছে। জেরুজালেমে ক্ষেপনাস্ত্র ঘাঁটি তৈরীর সাধ ওদের অনেক দিনের জন্য মিটে গেছে। মাউন্ট গুলিভিয়রের ক্ষেপণাস্ত্র বেদিটি ধূলা হয়ে গেছে প্রচন্ড ডিনামাইটের বিষ্ফোরণে। আর ইহুদী ক্ষেপণাস্ত্র বিশারদ মাইকেল শার্পের দেহটিও উড়ে গেছে তার সাথে।

মুহূর্তের জন্য আহমদ মুসার চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, বিজয়ী ভাইদের আমার সালাম দাও ফারুক। আর শোন-কোন প্রকার আত্মতৃপ্তির অবকাশ আমাদের নেই। লক্ষ্য আমাদের বহুদূর পথ অত্যন্ত দূর্গম। এ পর্যন্ত যা আমরা করেছি তার চেয়ে ভবিষ্যতে যা আমাদের করতে হবে তা হাজারো গুণ বেশী। আচ্ছা , তুমি এস।

এবার অয়্যারলেসটির কাঁটা ঘুরিয়ে আর একটি চ্যানেল তৈরী করল। নতুন ঠিকানায় কয়েকবার যোগাযোগ করতে চেষ্টা করল। সফল হলো না। উঠে দাঁড়ালো আহমদ মুসা। ভ্রুদু'টি তার কুঞ্চিত হয়ে উঠল। টেলিফোনটি তুলে নিয়ে একটি পরিচিত নাম্বারে ডায়াল করে বলল, শফিক তুমি একটু উপরে এস।

আহমদ মুসা খস্ খস্ করে একটি কাগজে লিখলঃ

''হাসান তারিকের অয়্যারলেস অস্বাভাবিকভাবে নীরব।

সে কোথায় খোঁজ নাও। এখন নয়, আগামিকাল ভোর পাঁচটায় আমাকে হেডকোয়ার্টারে পাবে।''

একটু পরেই নীল বাতি জ্বলে উঠল ঘরে। পর্দা ঠেলে প্রবেশ করল শফিক। সামনের চেয়ারটায় বসতে ইংগিত করল আহমদ মুসা। তারপর চিঠিটি ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, পররাষ্ট্র দফতরের ঠিক বিপরীতে রাস্তার উত্তর পার্শ্বে ৩২২ নং বাড়ী। বাড়ীটিতে ঢুকে সোজা তিন তলায় উঠে যাবে। তাঁর এ চিঠি। সাবধানে যেয়ো।

# ২

আম্মানের অভিজাত এলাকার একটি দ্বিতল বাড়ী। চারপাশে কোন বাড়ী নেই। আট ফুট উঁচু দেয়ালে ঘেরা বাড়ীটি। বাড়ীর বাইরের সব আলো নিভানো হলেও রাস্তার সরকারী আলোতে বাড়ীর উত্তর দিকের সম্মুখ ভাগটা উজ্জ্বল। রূপালী রং করা লোহার গেটে আলো পড়ে চিক চিক করছে।

আহমদ মুসার চিঠি নিয়ে গেট দিয়ে ধীর পদে বেরিয়ে এল শফিক। গাড়ী ষ্টার্ট নিতেই শফিক চকিতে একবার পিছনে ফিরে দেখল, কালো রংএর একটি ল্যান্ড রোভার পাশের অন্ধাকারের বুক থেকে বেরিয়ে এল তাদের পিছনে। সন্দেহ সম্পর্কে নিশ্চত হবার জন্য শফিক ড্রাইভারকে ফুলস্পীডে গাড়ী ছাড়তে বলল, ড্রাইভার আপত্তি জানিয়ে বলল, এ আঁকা বাঁকা রাস্তায় এর চেয়ে বেশী স্পীড দেওয়া সহজ নয় সাহেব।

শফিক ড্রাইভারের চোখের সামনে সাংকেতিক চিহ্ন তুলে ধরে বলল, এর প্রয়োজন আছে ড্রাইভার। ড্রাইভার সাইমুমের সাংকেতিক চিহ্ন দেখে মাথা ঝাঁকিয়ে একটি সশ্রদ্ধ সালাম জানিয়ে বলল, এ গাড়ীকে এবং আমাকে এখন থেকে নিজের মনে করুন জনাব।'

শফিক রিয়ারভিউয়ে চোখ রেখে বলল, তোমার মত কি এমনি করে সবাই ভাবে ড্রাইভার?

-সবাই আরও সুন্দর করে ভাবে। আমার মত হতভাগ্য আর কেউ নেই। একমাত্র পেট পূজা ছাড়া জাতির এই সংকট মুহূর্তে আমার দ্বারা কিছুই হল না।

শফিক ড্রাইভারের পিঠে একটি হাত রেখে বলল, কে বলল কিছু করছ না ভাই? তোমাদের সমর্থন আর ভালোবাসাই তো আমাদের শক্তি ও প্রেরণা যোগাচ্ছে।

শফিক রিয়ারভিউ থেকে চোখ সরিয়ে বলল, পিছনের গাড়ীটি আমাদের অনুসরণ করছে ড্রাইভার।

ড্রাইভার একবার চিন্তিত মুখে 'রিয়ারভিউ' এর দিতে তাকিয়ে বলল, শহরের প্রতিটি গলি কুজো পথ আমার নখদপর্ণে, যদি বলেন তো ৫ মিনিটে ওদের এড়িয়ে বেরিয়ে যাব, আমরা।

- না তা হয় না ড্রাইভার। শত্রুকে পিঠ দেখানো আমাদের ঐতিহ্যের বিপরীত। সাইমুমের কোন সদস্যই শত্রুকে জীবিত রেখে সামনে এগোয় না। তুমি সামনের গাছটার কাছে মোড় ঘুরবার সময় গাড়ির গতি একটু কমিয়ে দিবে। আমি নেমে গেলে তুমি গাড়ী চালিয়ে যাবে। সুলতান সারাহ উদ্দিন রোডের মুখে আমার জন্য অপেক্ষা করো।

গাছটির কাছে একটু অন্ধকার মত জায়গায় খোলা দরজা দিয়ে চলন্ত গাড়ী থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল শফিক। পিছনে তাকিয়ে আশ্বস্ত হল সে। পিছনের গাড়ীর হেড লাইট এখনো অনেক পিছনে। নিশ্চিন্ত মনে পকেট থেকে একটা হ্যান্ড গ্রেনেড বের করে সেফটিপিন ঠিক করে রাখল। অন্য হাতে রিভলভার।

সামনের গাড়ী লক্ষ্য করে পিছনের গাড়ীটি নিশ্চিন্তে এগিয়ে যাচ্ছে। গাছের নীচে একটি পাথরের আড়ালে লুকিয়ে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে শফিক।

গাড়ী গাছের সমান্তরালে আসতেই সাইলেন্সার লাগানো রিভলভার থেকে ধীরে সুস্থে প্রথম গুলিটি ছুঁড়লো সে। দুপ করে মৃদু শব্দ উঠল। প্রচন্ড শব্দে পিছনের একটি টায়ার বার্ষ্ট করল। কিছুদূর যেয়ে থেমে গেল গাড়ীটি।

শফিকের ধারণা সত্য হ'ল। সাধারণ টায়ার বার্ষ্ট মনে করে গাড়ীর দু'ধারের দরজা খুলে দু'জন বেরিয়ে এল। একজন বেঁটে ধরণের। নাক চেপ্টা, মুখ গোল, রং হলুদ একবার চাইলেই বোঝা যায় চীনা লোক। আর একজন লম্বা। রং সাদা। দু'জনের পরনে কালো প্যান্ট, কালো কোট। ওরা টায়ার পরীক্ষা করেই চমকে উঠল। মুহূর্তে হাত পকেটে চলে গেল ওদের। কিন্তু দেরী হয়ে গেছে তখন। শফিকের রিভলভার দু'বার মৃদু শব্দ করে উঠল। ঢলে পড়ল দু'টি দেহ।

শফিক দ্রুত চলে গেল ওদের কাছে। পকেটে রিভলভার, সিগারেট কেস, লাইটার, হাত বোমা ছাড়া অন্য কোন কাগজ পত্র পেলনা।

গাড়ীতে একটি সাব মেশিনগার, একটি চামড়ার ছোট এটাচি কেস পড়ে ছিল। কোন তথ্য পাওয়া যেতে পারে মনে করে এটাচি কেসটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল শফিক।

চলে যাবার আগে মোড়ে ডিউটিরত পুলিশকে দু'টি লাশের কথা জানিয়ে তাড়াতড়ি ওগুলোর ব্যবস্থা করার জন্য বলে গেল।

শফিককে পাঠিয়ে দেবার পর আহমদ মুসা অস্থিরভাবে কিছুক্ষণ পায়চারী করল। কি যেন সমাধান খুঁজছে সে মনে মনে। কোন কাজে হঠাৎ করে কোথাও চলে যাওয়াও হাসান তারিকের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তাই বা কি করে হয়? এখন রাত ১২টা। তার এখানে পৌঁছবার কথা ছিল ১১ টায়। তাছাড়া সবচেয়ে আশ্চর্য তার অয়্যারলেসের নীরবতা। তাহলে........ভাবতেই চোখ দু'টি জ্বলে উঠল মুসার। প্রতিশোধের আগুন যেন তাতে ঠিকরে পড়ছে। পরে ধীরে ধীরে সে চোখ নেমে এল অদ্ভুত এক তন্ময়তা। জানালা দিয়ে বাইরে চলে গেল তার চোখ। অন্ধকার দিগন্তের কাল পর্দা ছাড়িয়ে তিবেক, হিন্দুকুশ, কারাকোরাম পর্বতমালা পেরিয়ে ছুটে গেল তার মন। পূর্ব্ব তুর্কিস্তানের কানশু এলাকার একটি সুন্দর জনপদে। কি হাসি -আনন্দ আর সমৃদ্ধি ভরা দিনগুলো। মরুভূমির একখন্ড দুরন্ত হাওয়ার মতই তারা ঘুরে বেড়াত চারিদিকে। কাঁটার ঝোঁপে সারাদিন চলত লুকোচুরি খেলা। রাতের বেলা বাবার উষ্ণ কোলে বসে আকাশের তারার দিকে চেয়ে কত গল্প শুনত। শুনতে শুনতে জগৎ পেরিয়ে মন চলে যেত আর এক জগতে। অন্ধকার গোটা পৃথিবী। একজন মহাপুরুষ এলেন আরব দেশে। তাঁর হাতে নেমে একখন্ড আলো। অনেক ঘূর্ণাবর্ত আর ঝড়ের মাঝেও তা ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। তার এক খন্ড এসে ছড়িয়ে পড়ল তুর্কিস্তানেও। অনেক সময় গল্প শেষ না করেই বাবাকে উঠকে হত। মসজিদ থেকে ভেসে আসতো বড় চাচাজনের এক পশলা মিষ্টি সুর। বুঝতো না সে এক বর্ণও কিন্তু ভাল লাগতো খুব। এমনি করে দিন চলে এসেছিল, চলতও এভাবেই কিন্তু সাজানো গোছানো এক জীবনে এল ঝড়। পিছনে অবশিষ্ট থাকল রক্ত, হাহাকার জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে থাকা আহমদ মুসার মুখ কি এক অব্যক্ত বেদনায় আর দৃঢ়তায় শক্ত হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে সে বলল, 'মধ্য এশিয়া সিংকিয়াংএ, ফিলিপাইনে, ফিলিস্তিনে, ইথিওপিয়ায়,

চাদে মুসলমানদের উপর যে নির্যাতন তোমরা চালাচ্ছ তার হিসাব অবশ্যই দিতে হবে। তোমার 'সিয়াটো' সেন্টো, ন্যাটো' গড়তে পারো, 'ওয়ারস' চুক্তি করতে পারো, কিন্তু আমরা কিছু করতে গেলেই তা হবে 'ফ্যানাটিক' আর 'গোড়ামি'?

জানালার পাল্লা দু'টো টানতে গিয়ে নীচের চোখ পড়তেই চমকে উঠল আহমদ মুসা। বাইরে প্রাচীরের পাশে বিড়ালের চোখের মত এক টুকরো ক্ষীণ আলো হঠাৎ জ্বলে উঠে নিভে গেল। পেন্সিল টর্চ নয়তো। সচকিত হয়ে উঠল আহমদ মুসা। অন্ধকারের জন্য বিশেষভাবে তৈরী বাইনোকুলার চোখে লাগাল দ্রুত। বাইরের অন্ধকার অনেকটা স্বচ্ছ হয়ে উঠল। দেখা গেল হুক লাগানো দড়ি বেড়ে একটি ছায়ামূর্তি প্রাচীরে উঠে বসেছে। কালো পোশাকে আবৃত সর্বাঙ্গ। ছায়ামূর্তিটি ধীরে ধীরে নামল নীচে। তারপর দেয়ালের পাশ ঘেঁষে শিকারী বিড়ালের মত এগিয়ে এল ধীরে নিঃশব্দ গতিতে।

প্রস্তুত হয়ে মুসা নেমে এল নীচে। সিঁড়ির মুখে সুইচ বোর্ডের পাশে একটি খামের আড়ালে দাঁড়াল সে।

নিঃশব্দ পায়ে ছায়ামূর্তিটি উঠে এল বারান্দায়। তাকে এক খন্ড জমাট অন্ধকার ছাড়া কিছু বুঝবার উপায় নেই। প্রায় দশ বারো হাতের মধ্যে সে চলে এসেছে। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো ছায়ামূর্তি। আহমদ মুসা বাম হাতের বুড়ো আঙ্গুলের সুইচে চাপ দিয়ে ডানহাতে রিভলভার ধরে বের হয়ে এল আড়াল থেকে। ঘটনার আকস্মিকতায় ছাড়ামূর্তিটি মুহূর্তের জন্য বিহ্বল হয়ে পড়ল। রিভলভারের নলটি স্থির লক্ষ্যে তুলে ধরে মুসা বলল, নিশানা আমার প্রায়ই ভুল হয় না, ফেলে দিন রিভলভার। বোম হাতের পেন্সিল হেডেড রিভলভারটিও ফেলে দিন।

ছায়ামূর্তিটি স্থির নিষ্কম্প চোখ দু'টি আহমদ মুসার চোখে কি যেন পাঠ করল। তারপর একটু দ্বিধা করে হাতের দু'টি অস্ত্র ছেড়ে দিল মেঝেয়।

পাশে মানুষের একটি ছায়া নড়ে উঠতে দেখে চমকে উঠল আহমদ মুসা। প্রায় ছিটকে এক পাশে শুয়ে পড়ল সে। সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে দুপ্ করে একটি শব্দ হল,তীব্র আর্তনাদ করে পড়ে গেল সামনের লোকটি। আহমদ মুসার রিভলভারও গর্জে উঠল। কিছু বুঝবার আগেই পিছনের লোকটির হাত থেকে রিভলভার ছিটকে পড়ে গেল। বাম হাতটি উপরে তুলতে চেষ্টা করল লোকটি।

আহমদ মুসা গর্জে উঠল। হাত নামিয়ে নাও, নাহলে দ্বিতীয় গুলিটি এবার হাত নয় হৃদপিন্ড ভেদ করে বেরিয়ে যাবে।

আদেশ পালন করল লোকটি। তার ডান হাত থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরে পড়ছিল এ সময় বাইরের গেটে গাড়ী দাঁড়ানোর শব্দ হল। উৎকর্ণ হয়ে উঠল আহমদ মুসা। কিন্তু রিভলভারের নল তার একটুও নড়ল না। বাইরে থেকে একটি পরিচিত সংকেত এল, আহমদ মুসা তার উত্তর দিতেই কয়েক সেকেন্ডর মধ্যে সেখানে হাজির হল ফারুক। এসেই বলল, ঠিক, আমার কান ভুল শোনেনি, যা ভেবেছিলাম তাই।

ওসব এ্যানালেসিস পরে করো ফারুক। আগে আমাদের এ মেহমানটির পকেট থেকে দ্বিতীয় রিভলবারটি বের করে নাও। সাবধানে হাত দিও পকেটে হয়তো আরো কিছু থাকতে পারে।

রাত তখন একটা। আহমদ মুসা আর ফারুক আমিন মুখোমুখি একটি টেবিলে বসে। আহমদ মুসার সামনে ছোট্ট একটি চিরকুটঃ

“A quite new element. WRF is active - Amman being their target at present - two alpin at trouser band as a “v” make their identity”

ধীরে ধীরে চিরকুট থেকে মুখ তলে আহমদ মুসা বলল, ইহুদীদের ‘মোসাদ’ আর পশ্চিমা সি, আই, এ, এর সাথে এসে জুটল কে আবার এই WRF? কি চায় ওরা? ফারুকের দিকে চেয়ে মুসা বলল, আমাদের আজকের মেহমান কোন দলের খোঁজ নিলে ফারুক?

ফারুক বলল, হ্যাঁ, WRF। ট্রাউজারের ব্যান্ডে ‘ভি’ আকারের দু’টো পিন দেখেছি।

ঘড়ির দিকে চেয়ে আহমদ মুসা বলল, সময় বেশী হতে নেই। তাছাড়া ওর ব্যবস্থা এখনই প্রয়োজন - কোন ব্যাপারকেই - বিশেষ করে এসব বিপদজনক বোঝা বেশীদূর টেনে নেওয়া ঠিক নয়। কিন্তু তার আগে চল পরীক্ষা করা যাক লোকটিকে।

ডিপ নীল আলো চারদিকে। বক -সাদা দেয়াল সে আলো প্রতিফলিত হয়ে স্বপনের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। আধ -শোয়া অবস্থায় ইজি চেয়ারে পড়ে থাকা লোটির ডান বাহু থেকে পেন্টাখল ইনজেকশনের সূচ ধীরে ধীরে টেনে বের করল। তারপর মৃদু হেসে আহমদ মুসা বলল, বেশ কিছু একটু ক্লান্তি, একটু একটু ঘুম ঘুম ভাব বোধ করবেন মিনিট খানেক তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে। আগের সবগুলো কথা মনে পড়বে। আর বলতেও কোন কষ্ট হবে না।

লোকটির চোখ বুজে গিয়েছিল। আহমদ মুসা একটি চেয়ার টেনে নিয়ে তার সম্মুখে বসল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, - চোখ খুলুন, আমার চোখেন দিকে দেখুন। আস্তে আস্তে চোখ খুলে গেল লোকটির। আহমদ মুসা বলল, আপনার নাম কি?

-মিখাইল ইয়াকুবভ।

-আপনি কোন দেশী?

-ইউক্রাইনি।

-কিন্তু দেখে তো তুর্কী মনে হয়?

-আমার পিতা - মাতা নাকি তুর্কী ছিলেন।

-ছিলেন কেমন?

-আমি সাইবেরিয়ার শিশু উদ্বাস্তু শিবিরের মানুষ।

-আপনার পিতা মাতা কি তাহলে মুসলমান ছিলেন?

-জানি না। তবে সেই উদ্বাস্তু শিবিরে আমর ট্রেনিং গ্রহণ কালে একবার অদ্ভুত এক বৃদ্ধ আমাকে বলেছিলেন যে, ১৯১৭ এর অক্টোবর বিপ্লবের পরে যে সব তুর্কী মুসলমানদের কে সাইবেরিয়ার চালান করা হয়েছিল, আমি তাদেরই কোন এক জনের সন্তান।

-এখন আপনি কি মনে করেন নিজের পরিচয় সম্বন্ধে?

-পূর্ব পরিচয়ে আমার প্রয়োজন নেই।

-আচ্ছা WRF কি?

-World Red Forces বিশ্ব কম্যুনিস্ট আন্দোলনের অগ্রবাহিনী।

-আপনি কি এর সদস্য?

-হ্যাঁ।

-কেন আপনি এখানে এসেছিলেন আজ?

-বহুদিন ধরে WRF আপনাকে খুঁজছে। আমাদের উপর নির্দেশ ছিল আপনাকে হত্যা করার অথবা সম্ভব হলে ধরে নিয়ে যাবার।

-সাইমুমের প্রতি আপনাদের এ শুভ দৃষ্টি কেন?

-সাইমুম বিশ্ব কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের নাম্বার ওয়ান এনিমি।

-WRF এর কেন্দ্র কোথায়? কাদের নিয়ে গঠিত?

-এর নির্দিষ্ট কোন কেন্দ্র নেই। কেন্দ্রীয় কাউন্সিল যখন যেখানে থাকে সেখানেই এর কেন্দ্র। WRF কমিউনিষ্ট শক্তিগুলোর সম্মিলনে গঠিত একটি বেসরকারী সংস্থা।

-আবার কোথায় কিভাবে WRF কাজ করছে?

-আমি জানি না। শুধু এটকুই জানি, মুসলিম দেশগুলোকে এজন্য বিভিন্ন ইউনিটে ভাগ করা হয়েছে।

-আজকে এখানের খোঁজ কে দিয়েছে আপনাদের?

-আমি জানি না। আদেশ পালন করেছি শুধু।

-আদেশ কোত্থেকে এসেছে?

-আল কবির রোডের ২৩৩ নং বাড়ীর একটি ঘরে রক্ষিত কাঠের বাক্স থেকে নির্দেশ লিখিত চিঠি পেয়েছি?

-হাসান তারিককে চিনেন?

-নাম শুনেছি।

-গত ১০ ঘন্টা থেকে তার খোঁজ নেই। তার সম্বন্ধে কিছু জানেন?

-যে টুকুর সাথে আমরা সংশ্লিষ্ট তার বেশী কোন কিছুই আমাদের জানতে দেওয়া হয় না।

যেন অসীম ক্লান্তিতে চোখ দু'টি আবার বুজে আসছিল। ফারুকের দিকে তাকিয়ে মুসা বলল, এবার সরিয়ে নিয়ে যাও। হ্যাঁ এদের পূর্ব - পুরুষদের ঐতিহ্যের কথা একে স্মরণ করিয়ে দিয়ে একবার শেষ সুযোগ দিবে।

# ৩

কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার চারিদিকে। দুর্গম পার্বত্য পথ। পশ্চিম দিক থেকে জর্দান নদীর স্পর্শ চিহ্নিত ঠান্ডা হাওয়া এসে গায়ে শীতল স্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছে। নদীর পূর্ব তীরের বিভিন্ন স্থানে অস্পষ্ট আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। ওগুলো জর্দান সীমান্তরক্ষীদের ছাউনি। জর্দান নদীর ওপারে থেকেও ইসরাইলের বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ ঘাটির ক্ষীণ আলোক রেখা দেখা যাচ্ছে।

পার্বত্য পথ ধরে ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে চারটি ছায়ামূর্তি। একজন কৃষ্ণাঙ্গ। মাথায় ছোট ছোট কোঁকড়ানো চুল, ঠোঁট পুরু, মুখ লম্বাটে, বিশাল সুগঠিত দেহ। এর নাম আবু বকর সেনৌসি। দ্বিতীয় জন তীর্গ রোদ - পোড়া লাল মুখ, সযত্ব রক্ষিত দাড়ি। এর নাম আবদুর রহমান। এরা হলেন UMLLA (United Muslim Liberation League of Africa ) এর প্রতিনিধি।

তৃতীয় জন প্রায় সাড়ে ছ'ফুট উঁচু। রং হলদে, তুর্কী টুপি মাথায়, মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। চোখে মুখে ক্ষীপ্রতার ভাব সব সময় পরিস্ফুট। ইনি হলেন তুরস্ক থেকে আগত তুর্কিস্থান আযাদ আন্দোলনের নেতা মোস্তফা আমিন চুগতাই। এরা এসেছেন আজকে সাইমুমের পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা কমিটির বিশেষ বৈঠকে তাদের আবেদন নিয়ে। আর চতুর্থ ব্যক্তি সাইমুমের সদস্য আবদুর রশিদ তাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন।

আবদুর রশিদকে খুব চিন্তান্বিত মনে হচ্ছিল। সে হঠাৎ চুগতাই -এর দিকে চেয়ে বলল, আচ্ছা জনাব আমিন, হাসান তারিক চিঠি দেওয়ার পর আপনাকে কি মুখে কিছু বলেনি?

আমিন চুগতাই দ্রুত অথচ অত্যন্ত শান্ত কন্ঠে জবাব দিল, হাসান তারিককে অত্যন্ত ব্যস্ত মনে হচ্ছিল, চিঠি দিয়ে ৫ মিনিটের বেশী অপেক্ষা করেনি।

আমি তাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করতেও সংকোচ বোধ করেছি। আজ ভোরে জনাব আলি এফেন্দির কাছে তাঁর নিখোজের খবর শুনে হতবাক হয়েছি।

আজ বুঝতে পারছি, তার অস্বাভাবিক অস্থিরতাকে আমাদের অনুসরণ করা উচিৎ ছিল।

কিছুক্ষণ পথ চলার পর নীচে পাহাড়ের ঢালুতে অসংখ্য আলো দেখা গেল। ওগুলো আকাশের ছায়াপথের ন্যায় উত্তর দিকে এগিয়ে এক সরল রেখার মত। আবদুর রশিদ ওদিকে আঙ্গুল নির্দেশ করে বলল, ইহুদী বর্বরতার সাক্ষ্য দেখুন। নিজের দেশ, নিজের সকল সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে একটুকরো কুঁড়েঘড়ে পশুর মত এরা বাস করছে বছরের পর বছর ধরে। বাস্তুহারা এ লক্ষ লক্ষ মুসলমান জাতিসংঘের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল বিশটি বছর ধরে। অনাহার, অখাদ্য, অপুষ্টি ও অচিকিৎসায় মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে তারা ক্রমশঃ। কিন্তু এদের আর্তক্রন্দন আর মুমূর্ষ চিৎকার বিশ বছরেও জাতিসংঘের কানে পৌঁছেনি। বলতে বলতে থামল আবদুর রশিদ। তারপর আবার বলল, কিন্তু অপেক্ষার দিন শেষ হয়েছে, ধৈর্য্যের সকল বাদ ভেঙ্গে গেছে। আমরা মানুষের উপর নির্ভর করে খেশারত দিয়েছি বহু। আর নয়। অস্ত্র তুলে নিয়েছি এবার আমরা দু'টো পথ আমাদের সামনে হয় শহীদ না হয় গাজী।

আমিন চুগতাই বলল, জনাব রশিদ, আপনাদের উদ্বাস্তুদের মধ্যে শিক্ষা ও সংগঠনের কোন ব্যবস্থা ছিল না বলেই জানি, কিন্তু এমন বিস্ময়করভাবে সংগঠিত হতে পারলেন কেমন করে আর এমন ট্রেনিংইবা পেলেন কোথা থেকে?

আবদুর রশিদ মৃদু হেসে বলল, আমাদের শিক্ষা ও সংগঠন সম্বন্ধে আপনার ধারণা কিছুটা সত্য, কিন্তু সবটুকু সত্য নয়। যে সময় হাজার হাজার আহত ও ছিন্নমূল মানুষের স্রোত জর্দান, সিরিয়া, ইরাক আর সিনাইয়ে প্রবেশ করে, তখন আমাদের বিশ্রামের জন্য মাটির শয্যা, খাওয়ার জন্য কুপের পানি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমাদের এ চরম দুর্দিনে অনেকেই আমাদের সাহায্য করেছিল, কিন্তু সেদিন অদ্ভুত একদল কর্মী ভাইদের আমরা একান্ত করে আমাদের পাশে পেয়েছিলাম। মা'র কাছে গল্প শুনেছি। শুনতাম মা প্রায়ই বলতেন, মদিনার আনসারদের আল্লাহ আমাদের জন্য পাঠিয়েছেন। এদের আপনারা সকলেই আজ চিনেন-ইখওয়ানুল মুসলিমুন। ইখওয়ান ভাইরা সেদিন শুধু আমাদের জন্য চিকিৎসা, খাদ্য আর তাঁবুরই ব্যবস্থা করেছিলেন না। উদ্বাস্তু পল্লীগুলোকে বিভিন্ন

ইউনিটে ভাগ করে প্রত্যেকটিতে একটি করে শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছিল দীর্ঘমেয়াদী সামরিক ট্রেনিং এর ব্যবস্থা। শিবিরগুলিতে ইখওয়ান কমীরা শিক্ষক ও উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁরা বলতেন বলে শুনেছি, বিশ্ব -রাজনীতিতে অনুন্নত ও অন্তর্দ্বন্দ্বে মুসলিম দেশগুলো যে ভাবে মার খেয়ে যাচ্ছে, তাতে ফিলিস্তিনের মুক্তির জন্য তাদের সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করা যেতে পারে না। ফিলিস্তিনের প্রকৃত মুক্তি অকুতোভয় মুসলিম তরুণদের বেসরকারী সংগ্রামেই অর্জিত হবে।' আজকের সাইমুমের জন্ম হয়েছিল সেদিন আমাদের ইখওয়ান ভাইদের হাতহে। হয়ত অনেক আগেই তেলআবিবের প্রাসাদ শীর্ষ থেকে ইহুদী - পতাকা ভুমধ্যসাগরে ডুবে যেত, কিন্তু হঠাৎ করে আমাদের আশার আলোক বর্তিকা রাগুগ্রস্থ হল। ইখওয়ান নেতা হাসানুল বান্না মিশরের রাজপথে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেলেন। হঠাৎ আমিন চুগতাই এর কনুই এ গুতা খেয়ে সম্মুখে তাকিয়ে রশিদ দেখতে পেল, পাহাড়ের অন্ধকার গুহা থেকে আলোক সংকেত হল নির্দিষ্ট নিয়মে কয়েকবার। সে তার সাথীদের জানাল আমরা প্রথম চেকপোষ্টে এসে গেছি। কয়েক গজ সামনে দেখা গেল উদ্ধত মেশিন গান হাতে পথ রোধ করে দাড়িয়ে আছে দু'টি ছায়ামূর্তি।

আবদুর রশিদ বিচিত্র স্বরে একটি শীষ দিয়ে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে গোটা দেহ কালো কাপড়ে আবৃত একজন বিশালকায় প্রহরী একটি প্লেটে করে কতগুলি কাঠের অক্ষর এনে আবু বকর সেনৌসির সামনে তুলে ধরল। সেনৌসি তার থেকে W অক্ষরটি তুলে নিল। অমনি লোকটি রিভলভার নামিয়ে ছালাম দিয়ে হ্যান্ডশেক করল সকলের সাথে। প্রথম চেকপোষ্ট পেরিয়ে এল ওরা।

বিস্মিত আমিন চুগতাই প্রশ্ন করল, কি ব্যাপার?

আবদুর রশিদ হেসে বলল, তিন নম্বরে আপনার পালাও আসছে। ঘাটিতে ঢোকার জন্য এ ধরনের টেষ্টে আপনাকেও উত্তীর্ণ হতে হবে। চিন্তিত আমিন চুগতাই বলল, কিন্তু আমি তো এ সংকেত জানতে পারিনি হাসান তারিক আমাকে ...........।

-তা আমি বুছলাম। কিন্তু এ ব্যাপারে আমি আপনার মতই অজ্ঞ। দেখা যাক, আমি মুসা ভাইকে জানিয়েছি আপনার কথা।

আরও কয়েক মাইল কষ্টকর আরোহন-অবতরণের পর তারা দ্বিতীয় চেক পোষ্টে পৌঁছল। সেখাসে আগের মত করেই প্লেটে কতগুলো কাঠের অক্ষর আনা হল আব্দুর রহমানের সামনে। তা থেকে তিনি A অক্ষরটি তুলে নিলেন।

তৃতীয় চেকপোষ্ট গিয়ে আমিন চুগতাই প্রহরীদের হাতে আটকা পড়ে গেল। হেড কোয়ার্টার থেকে নূতন নির্দেশ না আসা পর্যন্ত তাদেরকে ওখানে অপেক্ষা করতে আদেশ করা হল।

প্রায় পনর মিনিট পর আহমদ মুসার বিশেষ নির্দেশে আমিন চুগতাইকে ছাড়া হল।

আম্মান থেকে ১২ মাইল উত্তরে জর্দান নদী থেকে ২০ মাইল পূর্বে একটি সংকীর্ণ পার্বত্য উপত্যকার পাশে পর্বত গাত্রের কয়েকটি গোপন প্রকোষ্ঠ আলোকিত হয়ে উঠেছে। পর্বত গুহার চতুর্দিকে মাইলের পর মাইল ধরে 'সাইমুম' মুক্তি সেনার ঘাঁটি ও পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র ছড়িয়ে আছে। এখান থেকে পরিচালিত গেরিলাভিযান ইসরাইলের ইলাত থেকে গাজা, হাইফা থেকে জেরুজালেম পর্যন্ত ইহুদী সম্রাজ্যবাদীদের সুখনিদ্রাকে চিরতরে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। রাতের অন্ধকারে রাইফেল নিয়ে পাহারায় বসতেও তাদের বুক আজ দুরু দুরু করে। যেন তার বুঝতে পারছে, হিসাবের দিন আসন্ন। প্যালেষ্টাইনী মুসলমানদের প্রতিটি ফোটা রক্তের শোধ আজ তাদের দিতে হবে।

উজ্জ্বল প্রকোষ্ঠগুলির একটিতে বিরাট এক গোল টেবিলের চারদিকে চেয়ার পাতা। ঘরের প্রতিটি চিনিস ঝকঝক তকতক করছে। টিবিল ঘিরে ১০ টি চেয়ার। ৮ জন লোক বসে আছে। এক পাশের দু'টি চেয়ার তখন ও খালি - একটি হাসান তারিকের অপরটি মেজর জেনারেল আলী এফেন্দির। হাসান তারিক নিখোঁজ। আর আলী এফেন্দী এখনো পৌঁছুতে পারেনি। সাইমুমের তিনজন সদস্য ছাড়াও যারা আজকের বৈঠকে এসছে, তারা হলো আফ্রিকার দু' জন, তুরষ্ক থেকে একজন। UMLLA কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের পাঠানো রিপোর্ট পড়ছিলেন আফ্রিকার অন্যতম প্রতিনিধি আবদুর রহমান। এ শীতের রাতেও তার কপালে জমে উছেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। আহমদ মুসার মুখ নিচু। তন্ময়তার কোন অতল গভীরে যেন হারিয়ে গেছে সে। আবদুর রহমান তাঁর রিপোর্টে বলছিলেনঃ -

‘‘আফ্রিকার মোট ৩২২০ মিলিয়ন মানুষের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা হল ১৯৪ মিলিয়ন। আর বহিরাগত ঔপনিবেশিক খৃষ্টানদের নিয়ে মোট খৃষ্টান জনসংখ্যা হল ৪৭ মিলিয়ন। এ খৃষ্টানরা দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে রয়েছে। এ অঞ্চলের কোন মুসলিম দেশেই এদের সংখ্যা ১৫% এর বেশী নয়। অথচ এ সামান্য সংখ্যক হয়েও তারা স্বগোত্রীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহায়তায় ইথিওপিয়া, চাঁদ, মালি, নাইজেরিয়া, তানজানিয়া, ঘানা, সিয়েরলিওন, ডাহোমী, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক, আপার ভোল্টা, আইভরি কোষ্ট, সেগোল প্রভৃতি মুসলিম দেশে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ আর নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। এসব দেশে শিক্ষার দ্বার মুসলমানদের জন্য প্রায় অবরুদ্ধ। অবশ্য কোন মুসলিম সন্তান যদি একান্তই কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কখনও ঢুকবার সুযোগ পায়, তাহলে তাকে মুসলমান নাম বদল করে খৃষ্টান নাম গ্রহণ করতে বাধ্য হন এবং অবশেষে খৃষ্টানই হয়ে গেছেন। অর্থনৈতিক কায়কারবার ব্যাবসায় বাণিজ্যের সব সুযোগই খৃষ্টানদের কুক্ষিগত। রাজনীতি ক্ষেত্রে মুসলমানরাতো অস্পৃশ্য। এভাবে সর্বমুখী শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় পড়ে মুসলমানদের অস্তিত্ব আজ নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে, এসব কিছুর উপরে রয়েছে আবার রাজনৈতিক নির্যাতন। মাত্র কিছুদিন আগে চাদের লিবারেশন ফ্রন্টের সহস্র সহস্র কর্মীকে অমানুষিক যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। ইথিওপিয়ার মুক্তিযোদ্ধাদেরকে হত্যা করে গাছে গাছে লটকিয়ে রাখা হয়েছিল যা দেখে নিরপেক্ষ বিদেশীরাও চোখের পানি রোধ করতে পারেনি। জাঞ্জিবারের মুসলিম জননেতা কাশিম হাঙ্গা, আলি মহসিন, সালাম বাম্ব, ইবনে সালেহ্ আবদার জুমা, খাতির মুহাম্মদ সামত, জুমা আলই, আমিরাল আল্লারখিয় বছরের পর বছর ধরে কারাগারে যন্ত্রণা ভোগ করেছে। শুধু তাঞ্জানিয়ার কারাগারেই নয়, এমনই সহস্র সহস্র নরনারী আফ্রিকার বিভিন্ন কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে মৃত্যুর প্রহর গুনছে।

আমরা ঠেকে ঠেকে বুঝেছি এবং একথা আমরা নিশ্চিতভাবে আজ বিশ্বাস করি যে, ভিক্ষা করে সুবিচার আদায় করা যাবে না কিংবা আন্তর্জাতিক ন্যায় বিচারের মহড়াও এসব নির্যাতিত মানুষের কোন কাজে আসবে না। মজলুম

মানুষের মুক্তির একমাত্র পথ -সংগ্রাম। এ সংগ্রামকে লক্ষ্যের পথে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আমাদের আবেদন ৫ টিঃ

(১) দীর্ঘ মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক সাহায্য।

(২) মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র - শস্ত্রের সরবরাহ।

(৩) আহত মুক্তিযোদ্ধাদের যথাযথ আধুনিক চিকিৎসার ব্যবস্থা।

(৪) মুক্তিযোদ্ধাদের শিক্ষা ও ট্রেনিং এর জন্য উপদেষ্টা প্রেরণ।

(৫) সাইমুম কর্তৃক নির্যাতিত মানুষের মুক্তি আন্দোলন গুলোর নেতৃত্ব গ্রহণ।

সুদীর্ঘ দশ পৃষ্ঠাব্যাপী লিখিত রিপোর্ট শেষ করলেন আবদুর রহমান। কয়েক মুহূর্ত সবাই চুপচাপ। ধীরে ধীরে টেবিলে রাখা আফ্রিকার একটি বিশেষ মানচিত্র থেকে মুখ তুলল আহমদ মুসা। আর লিবিয়া ও চাদের পর্বতমালাকে আপনাদের প্রধান ও স্থায়ী ঘাঁটি হিসেবে মনোনীত করেছেন কোন কারণে? এর চেয়ে সমুদ্র কুলবর্তী কোন স্থানকে নির্বাচন করলে যুক্তিযুক্ত হতো না কি?

আহমদ মুসার প্রশ্নের উত্তর দিতে এগিয়ে এলেন আবু বকর সেনৌসি। তিনি বললেন এর কারণ তিনটি। প্রথম কারণ উভয় স্থানই অত্যন্ত দুর্গম এবং যে কোন বিরূপ মনোভাবাপন্ন শত্রু রাজধানী থেকে বহুদূরে। শুধু স্থান দুটি ভৌগলিক দিক দিয়ে দুর্গমই নয়, এর চারিদিকে হাজার হাজার মাইল জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন পার্বত্য আর বেদুঈন গোত্র। তারা আমাদের বন্ধু এবং আমাদের সংগ্রামী শক্তির বিশিষ্ট অঙ্গ।

দ্বিতীয় কারণ ¬এখান থেকে অতি সহজেই বিভিন্ন আফ্রিকান মুসলিম দেশের সাথে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রাখা যাবে।

তৃতীয় কারণ – অস্ত্র-পাতির সরবরাহও এখানে নিরাপদ হতে পারবে। বন্ধুদেশ সুদানের পথে, লোহিত সাগরের পথে সহজেই আমরা কোন সরবরাহ পেতে পারি। আর উত্তরদিকে ভূমধ্যসাগরের পথে সাইরেনিকা ও লিবিয়া মরুভূমির মধ্য দিয়ে সকল রকমের সরবরাহ নিরাপদে আসতে পারে। সাইরেনিকার নির্জন ও দুর্গম সমুদ্রতীর এবং এর গভীর পার্বত্য বনাঞ্চল এ কাজের খুবই অনুকুল। সাইরেনিকার আরব বেদুঈনদের অমূল্য সাহায্য আমরা

এ কাজে পাব। বেদুঈনরা সাম্রাজ্যবাদীদেরকে মজ্জাগত ভাবে ঘৃণা করে। ইতালীয় কোম্পানীদের উপনিবেশী নির্যাতনের কথা বেদুঈনরা আজও ভুলে নাই। আজও সাইরেনিকা আর লিবিয়ার পথেঘাটে প্রান্তরে নির্যাতনের সাক্ষর জীবন্ত হয়ে আছে। বেদুঈনদের পানি কষ্ট দিয়ে মেরে ফেলার জন্য যে অসংখ্য কূপ সিমেন্ট দিয়ে বুজিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তা আজ ও তেমনি আছে। লিবিয়া ও সাইরেনিকার বহুস্থানে ধ্বংস হয়ে যাওয়া এমন বহু জনপদ পাওয়া যাবে যেগুলো একমাত্র পানির অভাবে বিরাণ হয়ে গেছে। ঘাঁটি হিসাবে 'কুফরা' আর লিবিয়ার মরুভূমির দক্ষিণ সীমান্তের পর্বতমালাকে নির্বাচনের আর একটি বড় কারণ হল, আজও এ অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ মুসলিম বৃদ্ধ ও তরুণদের মনে সেনৌসী আন্দোলনের আদর্শ ও আবদুল করিম রিনফের জ্বালাময়ী প্রেরণা রূপকথার মত হলেও জীবন্ত হয়ে আছে।

আহমদ মুসার চোখ দু'টি খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। সে বলল, আপনাদের দূরদৃষ্টি অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আমি বিশ্বাস করি বিজয় আপনাদের সুনিশ্চিত। আপনাদের পিছনে সেনৌসী আন্দোলনের ঐতিহ্য রয়েছে, আবদুল করিম রিফের প্রেরণা রয়েছে, আর রয়েছে, হাসানুল বান্নার সংগঠন ও আত্মত্যাগের শিক্ষা।

মোস্তফা আমিন চুগতাই বললেন, তিনি রিপোর্ট এখনও শেষ করতে পারেননি, রিপোর্ট তিনি সমাপ্তি অধিবেশনে পেশ করবেন।

রিপোর্ট অধিবেশন তখনকার মত স্থগিত হল। আহমদ মুসা টেবিলের পাশে একটি বোতাম টিপে ধরল। কিছুক্ষণ পর একজন লোক প্রবেশ করে ছালাম জানাল। মুসা বলল - আলি এফেন্দির কোন খবর নেই?

-জি না।

-আমরা কন্ট্রোল রুমে যেতে চাই, তুমি জামিলকে বলে সত্তর ব্যবস্থা কর।

তারপর সকলের দিকে ফিরে হেসে বলল, ভাই আমিন চুগতাই জানতে চেয়েছেন কিভাবে আমরা ইসরাইলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হচ্ছি। তার জন্যই এ ব্যবস্থা। আবু বকর সেনৌসি মৃদু হেসে বলল, আমরা আমিন ভাই এর কাছে এজন্য কৃতজ্ঞ।

পাহাড়ের কয়েকটি অন্ধকার আকাবাঁকা গলি পেরিয়ে আটটি ছায়ামূর্তি ত্রিকোণ একটি জায়গায় এসে দাঁড়াল। জায়গাটি স্বল্প পরিসর। একটি প্রকান্ড পাথর উত্তর দিক থেকে এসে মাথার উপর ছাদের মত আড়াল সৃষ্টি করেছে, তারা ওখানে পৌঁছাতেই উত্তর পশ্চিম কোণ থেকে একটি পাথর সরে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক সন্ধানী আলো এসে তাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিল। আহমদ মুসা সবাইকে নিয়ে সে উন্মুক্ত পথ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল। আবার পূর্বের মতই সে গলি পথ শুরু হল। দু'ধারে পাহাড়ের দেয়াল। অন্ধকারে কিছুক্ষন চলার পর এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল আহমদ মুসা। পাশে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় প্রথমে তিনটি জোরে এবং পরে পাঁচটি আস্তে টোকা দিল। টোকা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় বিশ গজ উপরে একটি ম্লান নীল বাল্ব জ্বলে উঠল।

আহমদ মুসা পুনরায় প্রথমে পাঁচটি ও পরে তিনটি টোকা দিল নির্দিষ্ট জায়গায়। এবার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আটটি দড়ির মই নেমে এল নিচে। ঢাকনীর বিপ্লব পরিষদের মওলানা ফারুক হেসে বললেন, আবার একি ট্রেনিং এ পাল্লায় ফেল্লেন?

পাহাড় দেশের মানুষ হয়ে আমাদের এ ক্ষুদে পাহাড়কে আর লজ্জা দিবেন না মওলানা। হেসে আহমদ মুসা জবাব দিল।

দড়ির মইগুলি নেমে এল। সেগুলোতে উঠতেই মুহূর্তে তাদেরকে উপরে নিয়ে এল। তারা একটি কংক্রিটের ছাদে গিয়ে দাঁড়াল। ছাদটি বিরাট প্রশস্ত। ছাদে উঠে দাঁড়াতেই এক ঝলক ঠান্ডা বাতাস এসে গায়ে হিমেল পরশ বুলিয়ে গেল।

জর্দান নদীর এ সওগাত। রাত্রির অন্ধকার না থাকলে দেখা যেত কিছু দূর দিয়ে রূপালী ফিতার মত জর্দান নদী বয়ে যাচ্ছে। আহমদ মুসা সবাইকে নিয়ে ছাদটি পেরিয়ে একটি সিঁড়ি মুখে প্রবেশ করল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল মওলানা ফারুক, আবু বকর সেনৌসি ও আবদুর রহমানের মুখ। তারা দেখল সিঁড়ির প্রান্তে হাসি মুখে দু'হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিশ্ব মুসলিম সম্মেলনের বিশিষ্ট কর্ণধার আশিন আল - আজহারী এবং বিশ্ব মুসলিম কংগ্রেসের সামরিক বিশেষজ্ঞ আবদুল্লাহ অতিথিদেরকে জড়িয়ে ধরল আনন্দে।

সকলে মিলে আবার তারা চলতে শুরু করল। আবু বকর সেনৌসিদের বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি। আহমদ মুসা তাদের তিকে চেয়ে হেসে বলল - জনাব আমিন আল আজহারী সাইমুমের পরিকল্পনা বিভাগের প্রধান এবং জনাব আবদুলাহ আমর এ বিভাগের প্রধান উপদেষ্টা।

তারা সকলে পার্শ্বস্থ একটি প্রায়ান্ধকার কক্ষে প্রবেশ করল। দরজা দিয়ে বাহির থেকে এক টুকরো আলো এসে বৃহৎ লম্বা টেবিলটির একাংশ আলোকিত করেছে। তারা লম্বা টেবিলটির দক্ষিন পার্শে গিয়ে তারপর দরজাটি ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যেতেই অল্প আলোর রেশটুকুও মিলিয়ে গেল। ঘরটি হয়ে গেল সম্পূর্ণ অন্ধকার।

আহমদ মুসার গম্ভীর কণ্ঠ শুনা গেল। সে বলল, বিজ্ঞ ইহুদী মুরুব্বিদের পরিকল্পিত বহু বছর ধরে গড়ে তোলা বিশ্বজোড়া ইহুদী চক্রান্তের বিষফল ইসরাইলের বিরুদ্ধে কিভাবে আমরা অগ্রসর হচ্ছি তা এবার আপানদেরকে বুঝিয়ে দিবেন জনাব আমিন আল - আজহারী।

আমিন আল আজহারী টেবিলের উপর দু'টি কনুই রেখে সামনের দিকে এইটু ঝুকে বসলেন তাঁর শান্ত কন্ঠে শোনা গেল - সাইমুমের মূল পরিকল্পনার বিষয়ে কিছু বলার আগে প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা বলা দরকার। আরব দেশগুলোর লক্ষ্যগত অনৈক্য, বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে দুর্বলতা এবং সামরিক ক্ষেত্রে পরনির্ভরশীলতার জন্য আজও ইহুদীদের হাত থেকে আরবভূমি মুক্ত করতে পারা যায়নি। এ পরিস্থিতিতে নিয়মিত পদ্ধতিতে যুদ্ধ করে ইহুদীদের উৎখাত করা যাবে না। তাদের পিছনে রয়েছে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় শক্তি জোট। আরব ভূমিকে মুক্ত করতে চাইলে এবং কয়েক যুগ ধরে মুসলমানদের উপর কৃত সকল জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে হলে ইসরাইলকে ভিতর থেকে আঘাত হেনে টুকরো টুকরো করে ফেলতে হবে। এ ধারণার উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে সাইমুম। সাইমুমের পরিকল্পনাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। কথাগুলো বলে থামলেন তিনি একটু। আবার বললেন - চেয়ে দেখুন সামনে।

সবাই সামনে তাকাল। কোথায় যেন খুট করে একটু শব্দ হল দেয়ালের কাল সীমান্ত রেখায় ইসরাইলের একটি বিরাট মানচিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠল। তারপর মানচিত্রের বিভিন্ন স্থানে ফুটে উঠল অসংখ্য নীল বিন্দু।

আমিন আল-আজহরী শুরু করলেন, ইসরাইলের মানচিত্রে যে নীল বিন্দুগুলো দেখছেন ওগুলো ইসরাইলের গ্রাম। গুনে গুনে দেখুন ওদের সংখ্যা ২৩৯৯ টি হবে। প্রত্যেকটি গ্রামে ৭ সদস্যের একটি করে বিপ্লবী ইউনিট প্রতিষ্ঠা করেছি আমরা। ইউনিটের অধিকাংশ সদস্য প্যালেষ্টাইনের ছদ্মবেশী আরব মুসলমান। সুদীর্ঘ ৬ বৎসর অবিরামভাবে কাজ করেছি আমরা এ ইউনিটগুলো প্রতিষ্ঠা করতে। প্রতিটি গ্রামের মাটির তলায় একটি করে ক্ষুদ্র অস্ত্রাগার তৈরী করেছি। পূর্বে অস্ত্রাগারগুলো প্রায় শূন্য ছিল কিন্তু গত ১৯৬৭ সালের জুন যুদ্ধের পর সিনাই মরুভূমি থেকে কুড়িয়ে পাওয়া অস্ত্র দিয়ে তা আমরা পূর্ণ করে ফেলেছি। প্রত্যেকটি অস্ত্রগারে রয়েছে দু'ডজন হাতবোমা, ৫ টি রাইফেল, ৬ টি পিস্তল ও ১টি সাবমেশিনগান। বিপ্লবী ইউনিটগুলো প্রতিষ্ঠার সময় ইসরাইলী গোয়েন্দা ও সৈন্য বিভাগের দৃষ্টি দেশের অভ্যন্তর থেকে সরিয়ে নেবার জন্য আমরা ইসরাইলের সীমান্ত এলাকায় চালিয়েছি হাজার হাজার অভিযান। ইসরাইল পাগল হয়ে উঠেছিল তার সীমান্ত নিয়ে। তাদের উন্মত্ত মানসিকতার পূর্ণ পরিচয় ফুটে উঠে ''সাইমুমের'' ঘাঁটি সন্দেহে জর্দানের ''কারামা'' আক্রমণের মধ্যে।

খুট করে আর একটি শব্দ হল। মানচিত্রে সিনাই মালভূমির অভ্যন্তরে এবং গোলান হাইট থেকে প্রায় ৫০ মাইল ভিতরে দু'টি বড় নীল আলো ফুটে উঠল। জনাব আজহারী বললেন - ইসরাইলের অভ্যন্তরে এ দু'টি আমাদের মূল সরবরাহ ঘাঁটি। দু'টি পুরান গির্জার নীচে মাটির তলায় এ দু'টি ঘাঁটি স্থাপন করা হয়েছে।

প্রথম পর্যায়ের কাজ আমাদের সমাপ্ত। মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা প্রবেশ করেছি। তার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানচিত্রে চারটি লাল বিন্দ স্পষ্ট হয়ে উঠল। জনাব আল আজহারী আবার শুর করলেন, লাল বিন্দু চারটি হল ইসরাইলের ইলাত, লুদ, তেলআবিব আর হাইফা এ চারটি স্থানে ইহুদীরা ক্ষেপনাস্ত্র ঘাঁটি স্থাপন করেছি। এ ক্ষেপনাস্ত্র ঘাঁটিগুলির আওতায় রয়েছে

হেজাযের দু'টি পবিত্র শহর। তুরস্ক আর আরব রাষ্ট্রগুলির রাজধানী এবং সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ শহর। দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল ইসরাইলের চরম আঘাত হানার ঠিক পূর্বমুহূর্তে একটি নির্দিষ্ট সময়ে ক্ষেপনাস্ত্র ঘাঁটিগুলি বিনষ্ট করে দেয়া। অবশ্য আমরা জানি ইসরাইলের কমপক্ষে ১১টি আণবিক বোমা রয়েছে কিন্তু ওগুলো ব্যবহার করতে সমর্থ হবে না ইসরাইল। কারণ তার উপর আঘাত হানা হবে ভিতর থেকে -কোন আরব রাষ্ট্র থেকে নয়। তবুও আমরা এ বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখব এবং আনবিক অস্ত্র ব্যবহারের যে কোন প্ল্যান আমরা বিনষ্ট করে দেব।

জনাব আজাহারির শেষের বাক্যটি শেষ হবার সাথে সাথে আমিন চুগতাই যেন অনেকটা সঙ্কোচ জড়িত কন্ঠে বললো, আপনাদের আপত্তি না থাকলে আমি একটি সিগারেট .........।

দ্রুত চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল আহমদ মুসার মনে। অবশেষে সে পরিস্কার গলায় বলল, না না আমাদের আপত্তি থাকবে কেন?

আমিন চুগতাই একটি সিগারেট মুখে পুরে লাইটার জ্বালল। লাইটারটি জ্বলে উঠতেই চমকে উঠল আহমদ মুসা। এক ঝলক তীক্ষ্ণ আলো আর লাইটার থেকে ভেসে আসা অতি সুক্ষ্ণ একটি পরিচিত শব্দ আহমদ মুসার দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারলো না। ইতিমধ্যে জনাব আজহারি আবার বলতে শুরু করেছেন 'দ্বিতীয় পর্যায় সমাপ্ত হবার পর একটি নির্দিষ্ট সময়ে শুরু হবে আমাদের সর্বাত্মক সংগ্রাম। ভিতর থেকে যে দুর্বার আঘাত আমরা হানব তা রোধ করার সাধ্য ইসরাইলের নেই। তার বিদেশী মুরব্বীরা তার পাশে এসে দাঁড়াবার পূর্বেই সে খতম হয়ে যাবে।

আমিন আল আজহারির কথার শেষ রেসটুকু ইথারে মিলিয়ে যাবার আগেই উজ্জ্বল সাদা আলোয় ঘরটি যেন হেসে উঠল। আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়েছিল আগেই। সে ধীরে ধীরে এগোচ্ছিল চুগতাই এর দিকে। ভাবলেশহীন মুসা। চুগতাই টেবিলের উপর হাত রেখে বসে ছিল। তার চোখ দু'টি ঘরের চারদিকে ঘুরছিল। অনুসন্ধিৎসা সে চোখে। মনে তার প্রচন্ড ঝড় - শামিল এফান ... "দেশের ইন্টারনাল সিকিউরিটির দায়িত্ব ঐ বুড়োটার উপরই তো ছিল। শুধু গাদা গাদা বেতন মেরেছে আর নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়েছে বুড়ো ... আচ্ছা দ্বিতীয়

পর্যায়ের কতদূর পৌঁছেছে এরা। পরিকল্পনা এদের নিখুঁত। ভাবতে আতঙ্ক লাগে -প্রতি গ্রামে এরা ছড়িয়ে আছে ...।

আহমদ মুসা ধীরে ধীরে একটি হাত রাখল চুগতাই এ কাঁধে । তার হাতে একটি সিগারেট। চিন্তা সূত্র ছিন্ন হয়ে গেল চুগতাইয়ের । প্রচন্ড এক হোঁচট খেল যেন সে। ভীষণ চমকে উঠল। ফিরে তাকিয়ে আহমদ মুসাকে দেখে ঠোঁটের প্রান্তে হাসি টেনে নিল। সামলে নিয়েছে সে নিজেকে। বলল, খুব চমকে দিয়েছেন তো আমাকে? আপনাদের বিস্ময়কর পরিকল্পনার রঙীন জগতে ঘুরছিলাম আমি এখনও।

- আমি দুঃখিত ভাই। বলল আহমদ মুসা। তারপর সিগারেটের একটি শলা বাম থেকে ডান হাতে নিয়ে সে বলল, আপনার লাইটারটি কি পেতে পারি? কথাটি শোনার সাথে সাথে ঠোঁটের কোনের হাসিটি দপ করে যেন নিভে গেল। এক টুকরো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মুহূর্তের জন্য আহমদ মুসার চোখে এসে স্থির হল। কিন্তু ক্ষণিকের জন্যই। তারপরই আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল মোস্তফা আমিন চুগতাই। বলল, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। বলে পকেট থেকে লাইটারটি বের করে জ্বালিয়ে আহমদ মুসার মুখের কাছে তুলে ধরল। সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে আহমদ মুসা বলল, বাঃ লাইটারটির সিষ্টেম তো খুব সুন্দর। জার্মানির তৈরী না? দেখতে পারি একটু?

মোস্তফা আমিন চুগতাই এই অবস্থার জন্য বোধ হয় প্রস্ত্তত ছিল না মোটেই। কেমন একটি বিমূঢ় ভাব চোখে মুখে ফুটে উঠল তার। সে দ্বিধাজড়িত হাতে লাইটারটি তুলে দিল আহমদ মুসার হাতে।

আহমদ মুসা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিল চুগতাইকে। দেখল একটি হাত তার কোটের পকেটে। এর অর্থ মুসার অজানা নয়। সূক্ষ্ম এক টুকরো হাসি ফুটে উঠতে চাইল তার মুখে। সে লাইটারের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়েই বুঝতে পারল, একটি শক্তিশালী ক্যামেরা সংযোজন করা আছে ওতে।

একগাল ধোয়া ছেড়ে একটু ঝুঁকে পড়ে দু'টি কনুই টেবিলে রেখে মুফতি আল আজহারির দেকে একটু তাকিয়ে মৃদু হেসে আহমদ মুসা বলল, জনাব আমিন এ সামান্য ধরনের নেশাকেও ভালো চোখে দেখেন না। তবু রক্ষে যে আজ আপানাকে একজন সাথী হিসেবে পাওয়া গেল। এ অভ্যেস আপনার কত দিনের?

শুধু আমিন আল আজহারিই নয়, আবু বকর সেনৌসি, আবদুর রহমান এবং মওলানা ফারুকসহ সকলেই আহমদ মুসার জলজ্যান্ত মিথ্যা কথা আর এ অস্বাভাবিক ব্যবহার বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেছে। আহমদ মুসা সিগারেট খায় না এটা সকলেই জানে। আহমদ মুসার এটি ছেলেমি না কোন বিশেষ অভিনয়? এ ধরনের ছেলেমি করার মতো লোক তো আহমদ মুসা নয়। তাহলে ... সকলের চোখে একরাশ বিস্ময়ভরা প্রশ্ন।

আহমদ মুসার কথায় চুগতাইকে একটু খুশী মনে হল। যেন এক খন্ড মেঘ তার মুখের উপর থেকে সরে গেল। মুফতি আমিন আল আজহারির দিকে একটু চোরা দৃষ্টিতে চেয়ে সকৌতুকে নিচু গলায় বলল, এ বদ অভ্যেসটি আমার ছোট বেলার। বন্ধুদের সংসর্গ দোষও বলতে পারেন একে।

আহমদ মুসা হেসে বলল, বন্ধুরা অনেক উপকারও করেছে আপনার। তা না হলে দেশের সেরা ফুটবল খেলোয়াড় কি হতে পারতেন আপনি।

-ভালো দিকগুলো অস্বীকার আমিও করি না। হেসে বলল চুগতাই। আহমদ মুসা আবার শুরু করল, আমার মনে হয় কি জানেন, আপনি চেষ্টা করলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মল্লযোদ্ধা হতে পারতেন। এ প্রচেষ্টা ছেড়ে দিলেন কেন?

হঠাৎ চুগতাই এ চোখ মুখ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। কি যেন বুঝতে চেষ্টা করল। মুহূর্তকাল পরে শান্ত কন্ঠে বলল, কিন্তু আপনি এ সব প্রশ্ন করছেন কেন?

আহমদ মুসা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, মোস্তফা আমিন চুগতাই -এ সাথে আপনাকে মিলিয়ে নিতে চেষ্টা করছিলাম। আমিন চুগতাই এর ডসিয়ার থেকে জানি, উনি জীবনে ফুটবলে পা রাখেননি। আর সত্যিই একজন শ্রেষ্ঠ মল্লযোদ্ধা তিনি। অথচ আপনি .......।

আহমদ মুসার কথা শেষ হবার আগেই স্প্রীং এর মত ছিটকে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল চুগতাই। কিন্তু দেরী হয়ে গেছে তখন। আহমদ মুসার ছয়ঘরা রিভলভারের চকচকে নল স্থির লক্ষ্যে চেয়ে আছে চুগতাই এর দিকে।

আহমদ মুসার গম্ভীর কণ্ঠ ভেসে এল, পকেট থেকে হাত বের করে নিন। মৃত্যু না চাইলে আত্মসমর্পণ কারাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

-মৃত্যুকে আমি ভয় করি না মুসা। কিন্তু তোমরা জীবিত থাক তাও আমার কাম্য নয়। বলে সে বিদ্যুৎ বেগে পকেট থেকে হাত বের করল, হাতে ডিম্বাকৃতির একটি গ্রেনেড।

বিমূঢ় হয়ে পড়েছে সবাই ঘটনার এ অবিশ্বাস্য আকস্মিকতায়। বেপরোয়া ঐ লোকটির দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল সবাই। তারা জানে হাতের ঐ বিশেষ হ্যান্ডে গ্রেনেডটি দিয়ে শুধু গুহার এ কয়জন মানুষই নয়, পাহাড়ের একটি অংশ সহজেই উড়িয়ে দেয়া যাবে।

কিন্তু গ্রেনেডটি ছুড়বার অবসর পেল না চুগতাই। আহমদ মুসার রিভলভার নিঃশব্দে একরাশ ধুম্র উদগিরণ করল। হ্যান্ডে গ্রেনেডটি হাতেই রইল, টেবিলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল চুগতাই - এর দেহ। ঠিক এ সময় দরজা ঠেলে প্রবেশ করল আলী এফেন্দি এবং তার সাথে সাথে মোস্তফা আমিন চুগতাই। ওদের দিকে তাকিয়ে একমাত্র আহমদ মুসা ছাড়া সকলের মুখ বিস্ময়ে হা হয়ে উঠল।

গত একরাত একদিনের কাহিনী শেষ করে চুপ করল মেজর জেনারেল আলী এফেন্দি। একটি গোল টেবিল ঘিরে সবাই বসে আছে নির্বাক হয়ে।

কথা বলল আহমদ মুসা প্রথম। বলল, পরশু দুপুরেই ইস্তাম্বুল গেছে হাসান তারিক। অথচ এত অল্প সময়ের মধ্যে হাসান তারিকের আটক থেকে শুরু করে মোস্তফা আমিনের কিডন্যাপ, একজন ইহুদি স্পাইকে নিখুঁত প্লাষ্টিক অপারেশন দ্বারা মোস্তফা আমিন চুগতাই এর পরিবর্তন কেমন করে সম্ভব হল? তাহলে আমাদের আজকের এ অধিবেশনের কথা এবং মোস্তফা আমিন চুগতাই এ এখানে যোগদানের কথা কি ওরা আগেই জানতে পেরেছিল?

আলী এফেন্দি বলল, যতদূর জানতে পেরেছি WRF এবং 'মোসাদে'র সম্মিলিত তৎপরতায় এটা সম্ভব হয়েছে। টার্কিস সিক্রেট সার্ভিস জানিয়েছে, গতকাল তুরস্ক ইরাক সীমান্ত থেকে একটি কফিন ইরান দিয়ে কাস্পীয়ান সাগরে অপেক্ষমান একটি সাবমেরিনে উঠেছে। সে কফিনের আবরণে যদি হাসান তারিককে পাচার করা হয়ে থাকে, তাহলে বলা যায়, আমাদের এ অধিবেশন

সংক্রান্ত সকল খবর ও তথ্য দিয়ে ডজখ ‘মোসাদ’কে সাহায্য করেছে, বিনিময়ে ‘‘মোসাদ’’ হাসান তারিককে তাদের হাতে তুলে দিয়েছে।

-WRF এর এ তৎপরতার কথা আরও সূত্র থেকে আমরা জানতে পেরেছি। কিন্তু বুঝতে পারছি না হাসান তারিকের উপর WRF এর এ বিশেষ আগ্রহ কেন? বলল আহমদ মুসা।

একটু চিন্তা করে আলি এফেন্দি বলল, আপনার নিশ্চয় মনে আছে, দু’ বছর আগে জর্দানে বিদেশী কূটনীতিক মার্থাল খিরভ গুপ্তচর বৃত্তির দায়ে ধরা পড়েছিলেন। একমাত্র হাসান তারিকের কৃতিত্বেই দলিল দস্তাবেজসহ খিরভ হাতে নাতে ধরা পড়ে এবং সে দুর্ঘটনার সময় বিশ্বব্যাপী বহু আলোচিত দুর্ধর্ষ গোয়েন্দা কূটনীতিক ব্রিগেডিয়ার ক্লিমোভিচ হাসান তারিকের গুলিতেই নিহত হয়েছিল। আমার মনে হয় হাসান তারিকের উপর তারই প্রতিশোধ নিতে এসেছে বেসরকারী আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট সন্ত্রাসবাদী সংস্থা WRF। খিরভ ও ক্লিমোভিচ উভয়েই যে এ বেসরকারী কম্যুনিষ্ট সংগঠন WRF এরও সদস্য ছিল, তা আমরা আজ নিঃসন্দেহে ধরে নিতে পারি।

আলী এফেন্দি থামল। ধীরে ধীরে মুখ তুলল আহমদ মুসা। মনে হল চিন্তার কোন অতল থেকে জেগে উঠল সে। বলল ধীরে ধীরে, ক্লিমোভিচকে অনুসরণ করে তার গোপন আড্ডার হানা দিয়ে একটি পরিকল্পনার দুর্বোধ্য নক্সা পেয়েছিল হাসান তারিক। কিন্তু নক্সাটি হাসান তারিক রাখতে পারেনি। সে দিনই গভীর রাতে আক্রান্ত হয়েছিল সে। ক্লিমোভিচের লাশ পেছনে রেখে তারা নক্সাটি নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। কিছুক্ষণ থামলো আহমদ মুসা। আবার শুরু করল সে, পরিকল্পনার মূল কপি আমাদের কাছে না তাকলেও এর একটি ফটো কটি আমাদের কাছে আছে। এ কথা ওরা জানে কিনা জানি না, তবে আমার মনে হয় যদি প্রতিশোধ গ্রহণই WRF এর লক্ষ্য হত, তাহলে হাসান তারিককে ধরে না নিয়ে গিয়ে হত্যা করতে পারত। কিন্তু তা তারা করেনি। এ থেকে প্রমাণ হয়, পরিকল্পনার নক্সা সম্পর্কে হাসান তারিককে তারা জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায়। হাসান তারিক পরিকল্পনার কতদূর জেনেছে, আর কেউ এর কোন কিছু জানতে

পেরেছে কিনা, ইত্যাদি জেনে না নেয়া পর্যন্ত তারা হাসান তারিককে কিছুতেই হত্যা করবে না।

-পরিকল্পনা কি সম্পর্কিত এবং আপনারা কি জানতে পেরেছেন তা থেকে? উদ্বিগ্ন কন্ঠে জিজ্ঞাসা করে মোস্তফা আমিন।

-পরিকল্পনাটির অর্থ আজও আমাদের কাছে পরিস্কার নয়। মধ্য এশিয়ার মুসলিম দেশগুলো থেকে আফ্রিকার মুসলিম অধ্যুষিত তানজানিয়া এবং মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত অধ্যুষিত মুসলিম বিশ্বের মানচিত্র। এর মাঝে অসংখ্য সাংকেতিক চিহ্ন এবং লাল ও কালো রেখার অসংখ্য সারি। সাম্প্রতিক ঘটনা থেকে নিঃসন্দেহে আমরা বুঝতে পারছি, পরিকল্পনাটি আসলে WRF এর এবং তা যদি হয়, এর অর্থ আমাদের কাছে পরিস্কার, সমগ্র মুসলিম বিশ্ব জুড়ে ওরা চক্রান্তের জাল বিছিয়ে রেখেছে। পরিকল্পনাটির নক্সাটি নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে আমাদের। কিন্তু তার আগে হাসান তারিক সম্বন্ধে আমাদের ... কথা শেষ হলো না আহমদ মুসার। ঘরে পাথরের দেয়ালে এক বিশেষ স্থানে লাল সংকেত জ্বলে উঠল। আহমদ মুসা সেদিকে তাকিয়ে বলল, আকাশে নিশ্চয় কোথাও হানাদার ইসরাইলী বিমান দেখা গেছে। আমাদের রাডারের সংকেত ওটা। আসুন বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। সবাই উঠে এল ছাদে। পশ্চিম আকাশ তখন লাল হয়ে উঠেছে।

জর্দান নদীর ওপারে বোমা ফেলেছে ইহুদিরা নিশ্চয়। বলল আহমদ মুসা।

ঘড়ি দেখে আব্দুর রশিদ বলল, আজ রাত ১২ টায় আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের একটি ইউনিট জেরুজালেমের তিন মাইল পশ্চিমে নতুন ইসরাইল ঘাঁটি আক্রমণ করেছে। মনে হয় তার দায়িত্ব পালন করে ইতিমধ্যেই নদীর ওপারে ফিরে এসেছে। ইসরাইলী বিমানগুলো মনে হয় তাদেরকেই তাড়া করে এসেছে। এসময় রাডার পর্যবেক্ষক আবদুল্লাহ মাসুদ এসে জানাল, জর্দান নদীর আড়াই মাইল পশ্চিমে আরব পল্লীর উপর বোমা ফেলেছে ইসরাইলীরা। সবাই চোখ ফিরাল লাল হয়ে ওঠা দিগন্তের দিকে। ঐ লাল আগুন কত অসংখ্য নারী পুরুষ আর অসহায় শিশুর রক্ত চুষে নিল কে জানে। কারো মুখে কোন কথা

জাগলো না। বোধ হয় সবার মনে একই প্রশ্নঃ এ অগ্নি পরীক্ষা আর কতদিন চলবে? এ কোরবানীর শেষ হবে কবে?

# ৪

রাতের তেলআবিব। রাস্তার জন সমাগম কমে গেছে। পিচ ঢালা কালো মসৃণ রাস্তা। পাশে সরকারী বিজলি বাতিগুলো আলো আঁধারীর সৃষ্টি করেছে। বাতাস গায়ে লাগে না, কিন্তু কেমন যেন একটু ঠান্ডার আমেজ অনুভূত হয়। সাগর ভেজা বাতাসের স্বাদ এতে অনেকটা। এ বাতাসে নরম ঘুমের পরশ অনুভব করা যায়।

এক অভিজাত আবাসিক এলাকা। কদাচিত দু'একটি বাড়ির জানালা দিয়ে আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। এ এলাকার রাস্তায় লোকের চলাচল প্রায় নেই বললেই চলে। ডি,বি, রোড। মাঝে মাঝে দু'একটা গাড়ী চোখ ধাঁধিয়ে তীব্র গতিতে ছুটে চলে যাচ্ছে। ডি,বি, রোড থেকে একটা ছোট রাস্তা বেরিয়ে কিছু দক্ষিণে গিয়ে শেষ হয়েছে। রাস্তাটি যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে সুন্দর একাট দু'তালা বাড়ী।

দূরের কোন একটি পেটা গড়িতে ঢং ঢং করে ১২টা বেজে গেল। ধীরে ধীরে একটা কালো রং এর গাড়ী এসে অন্ধকারে দাঁড়ানো বাড়ীটির গেটে এসে থামল। কালো পোশাক দেহ ঢাকা এক ছায়ামূর্তি গাড়ী থেকে নেমে এল।

ঠক্ ঠক্ ঠক্। বন্ধ জানালার শক্ত কবাটে ধীরে ধীরে তিনটি শব্দ হল।

ছায়ামূর্তিটি বাড়ীটির সম্মুখের বাগানটি পেরিয়ে নীচের তলার একটি বন্ধ জানালার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। ছায়ামূর্তিটির তর্জ্জনী আবার শব্দ করল বন্ধ জানালার গায়ে - ঠক্ ঠক্ ঠক্।

ধীরে ধীরে এবার জানালার একটি পাল্লা খুলে গেল ভিতরে জমাট অন্ধকার। অন্ধকারের ভিতর থেকে একটি হাত বেরিয়ে এল, ছায়ামূর্তিটি সে হাতে তুলে দিল ভাজ করা এক টুকরো কাগজ। সঙ্গে সঙ্গে জানালাটি আবার বন্ধ হয়ে গেল। জানালাটি বন্ধ করে দিয়েই কর্ণেল মাহমুদ দোতলার ব্যালকনিতে উঠে

এল। আকাশ থেকে একটি বড় উল্কা পিন্ড খসে পড়ল। মনে হল উল্কাটি যেন সামনের ২২তলা দালানটির ছাদের উপর এসে নামল। ব্যালকনি থেকে ডি,বি, রোড়ের মোড় পর্যন্ত দেখা যায়। মাহমুদ দেখলো কাল গাড়ীটি ছোট রাস্তা পেরিয়ে ডি,বি, রোডে গিয়ে পড়ল। গাড়ীটির পিছনে রক্তাভ আলো দু'টি ক্রমে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। মাহমুদ সেখানে থেকে দৃষ্টি ফিরাতে গিয়েও পারল না। দেখল ছোট রাস্তা পেরিয়ে আর একটি গাড়ী গিয়ে ডি,বি, রোডে পড়ল।

চমকে উঠল মাহমুদ। বিদ্যুৎ খেলে গেল মনে -অনুসরণ। তর তর করে সে নেমে এল সিঁড়ি দিয়ে। গ্যারেজ থেকে গাড়ী বের করে খোলা দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এল। ডি,বি, রোডে যখন কর্ণেল মাহমুদের গাড়ী বেরিয়ে এল, তখনও দীর্ঘ পথের প্রান্তে অনুসরণকারী গাড়ীটির পিছনের রক্তাভ আলো দেখা যাচ্ছে। কর্ণেল মাহমুদের ছোট্টগাড়ীটি তীব্র গতিতে ছুটে চলল। সামনের অনুসরণকারী গাড়ীটির স্পীড ছিল মাঝারী গোছের। অল্প সময়ের মধ্যেই কর্ণেল মাহমুদের গাড়ীটি অনুসরণকারী গাড়ীটির দুশো গজের মধ্যে এসে পড়ল। কিছুক্ষণ চলার পর সামনের গাড়ীটির স্পীড হঠাৎ বেড়ে গেল। কর্ণেল মাহমুদও তার গাড়ীর স্পীড বাড়িয়ে দিল। মাহমুদ বুঝতে পারল সামনের অনুসরণকারী গাড়ীটি তাকে সন্দেহ করেছে। মাহমুদ ভেবে খুশি হল যে গাড়ীটি হয়তো এবার সামনের সাইমুমের গাড়ীটির অনুসরণ পরিত্যাগ করে অন্য পথ ধরবে। কারণ দু'দিক থেকে আক্রান্ত হওয়ার পরিস্থিতি সে সৃষ্টি হতে দিবে না, কিন্তু অল্পক্ষণেই ভুল ভেঙ্গে গেল মাহমুদের। সে দেখলো সমান গতিতে গাড়ীটি সামনের গাড়ীটির অনুসরণ করে যাচ্ছে। সামনের অনুসরণকারী গাড়ী থেকে মাহমুদরে গাড়ীর দুরত্ব কমপক্ষে দু'শ গজের মত। আর সে গাড়ী থেকে তার সামনের গাড়ীটির দূরত্ব কমপক্ষে একশত গজ। এ সময় গাড়ীর রিয়ারভিউ এ চোখ পড়তেই চমকে উঠল মাহমুদ, দেখলো পিছন থেকে পাশাপাশি জ্বলন্ত চোখের মত দু'টি অগ্নিপিন্ড তার দিকে ছুটে আসছে। মুহূর্তে মাহমুদের কাছে বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে গেল। বুঝতে পারল সামনের অনুসরণকারী 'মোসাদের' (ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থা) গাড়ীটি বেতারে চতুর্দিকে খবর পাঠিয়েছে। পিছনের মত সামনে থেকেও হয়তো অনুরূপভাবে গাড়ী তাদের দিকে ছুটে আসছে। মুহূর্তে তার করণীয় ঠিক করে নিল

কর্ণেল মাহমুদ। দেখতে দেখতে গতি নির্দেশক গাড়ীর কাঁটা ৫০ থেকে ৯০ এ গিয়ে পৌঁছল। মোসাদের গাড়ী সাইমুমের যে গাড়ীটি অনুসরণ করছিল, তা একই গতিতে চলছিল। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই তেলআবিবের সাইমুম প্রধান কর্ণেল মাহমুদরে গাড়ী মোসাদের গাড়ীটির সমান্তরালে গিয়ে পৌঁছল। মাত্র কয়েক সেকেন্ড, কর্ণেল মাহমুদরে গাড়ী থেকে একটি ডিম্বাকৃতি বস্তু তীব্র বেগে ছুটে গিয়ে মোসাদের গাড়ীটিকে আঘাত করল। সঙ্গে সঙ্গে প্রচন্ড বিস্ফোরণের শব্দ হল। ততক্ষণে কর্ণেল মাহমুদের গাড়ী তার সহকর্মীটির গাড়ীর সমান্তরালে গিয়ে পৌঁছল। কর্ণেল মাহমুদ একবার পিছনে ফিরে দেখল, মোসাদের গাড়ীটিতে আগুন জ্বলছে। পিছনের অনুসরণকারী গাড়ীটিও তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তার মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠলো। কর্ণেল মাহমুদ ও তার সহকর্মীর গাড়ী পাশাপাশি সমান গতিতে এগিয়ে চলছে। সামনেই ভিক্টোরী স্কোয়ার। এখানে পশ্চিম দিক থেকে হায়কল এভিনিউ উত্তর দিক থেকে গোলান রোড এবং পূর্ব থেকে ডি,বি, রোড এসে মিশেছে। হায়কল এভিন্যুকে দক্ষিণ পার্শ্বে এবং গোলান রোডকে পূর্ব পার্শ্বে রেখে ইসরাইলীরা এখানে গড়ে তুলেছে স্বাধীন ও সার্বভৌম ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্টার স্মারক স্তম্ভ। স্মৃতি স্মারক কেন্দ্রটিতে স্মরক স্তম্ভ ছাড়াও আছে সুপরিকল্পিতভাবে সাজান সুন্দর বাগান, বিশ্রামাগার, পাঠাগার এবং জাতীয় ইতিহাসের এক প্রদর্শনী কেন্দ্র। সর্বসাধারণের জন্য এ কেন্দ্রটি সর্বদা উন্মুক্ত থাকে।

কর্ণেল মাহমুদের গাড়ী ভিক্টোরী স্কোয়ারে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে তার নজরে জড়ল পশ্চিম দিক থেকে চারটি অগ্নি গোলক ছুটে আসছে। উত্তর দিকে গোলান রোডের দিকে তাকিয়েও একই দৃশ্য নজরে পড়ল কর্ণেল মাহমুদের। কর্ণেল মাহমুদ মুহূর্তের মধ্যে তার কর্তব্য স্থির করে নিল। গাড়ীর ডান দিকের দরজা খুলে চলন্ত গাড়ী থেকে ছিটকে নেমে পড়ল সে। তারপর চোখের নিমিষে ভিক্টোরী স্কোয়ারের পাঁচিল টপকে সে ভিতরে ঢুকে পড়ল। কর্ণেল মাহমুদের চালকহীন গাড়ীটি প্রায় গজ পঞ্চাশেক দুরে গিয়ে এক লাইট পোষ্টের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে উল্টে গেল। কিছু দূর গিয়ে কর্ণেল মাহমুদের সহকর্মীর গাড়ীটিও থেমে গেল। ইতিমধ্যে তিন দিক থেকে মোসাদের গাড়ী ভিক্টোরী স্কোয়ারে এসে পড়েছে। এই সময় গাঢ়

কাল সামনের রাস্তাঘাট আচ্ছন্ন হয়ে গেল। মোসাদের কুকুরদের কাচকলা দেখিয়ে তার সহকর্মীও সরে পড়তে পেরেছে বলে কর্ণেল মাহমুদ একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। কর্ণেল মাহমুদ ভিক্টোরী পার্কের আরও অভ্যন্তরে ঢুকে গেল। সে জানত মোসাদের লোকেরা কিছুক্ষণের মধ্যেই গোটা ভিক্টোরী পার্ক চষে ফেলবে। তার আগেই পার্ক থেকে সরে পড়তে হবে। কর্ণেল মাহমুদ সুইমিং পুলের পাশ দিয়ে উত্তর দিকে এগুচ্ছিল, এমন সময় পাশের বিশ্রামাগার থেকে ধ্বস্তাধ্বস্তি তারপর নারী কন্ঠের চাপা চীৎকার শুনতে পেল সে। দ্রুত সে ওদিকে এগুলো। দেখতে পেল একটি নগ্ন প্রায় নারী দেহের উপর একটি লোক চেপে বসেছে। নারীটি মুক্তি পাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কিন্তু তার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হচ্ছে। কর্ণেল মাহমুদ কক্ষে প্রবেশ করল। পায়ের শব্দ থেকেই লোকটি উঠে দাঁড়িয়েছে। মাহমুদের দিকে নিবদ্ধ চোখ দু'টি তার হিংস্রতায় জ্বলছে। মাহমুদকে লক্ষ্য করে সে বলল, বেরিয়ে যা কুকুর, নইলে... উত্তেজনায় সে কথা শেষ করতে পারল না।

মাহমুদ এক নিমিষে লোকটির আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করে বুঝলো লোকটি তৃতীয় কোন অমানুষ। সে শান্ত কন্ঠে বলল, 'বেরিয়ে যাব কিন্তু তোমাকে নিয়ে।' লোকটি পকেটে হাত দিতে যাচ্ছিল। মাহমুদ এর অর্থ বুঝে। সে এক লাফে লোকটির নিকটবতী হল। লোকটি পকেট থেকে হাত বের করবার আগেই মাহমুদের প্রচন্ড একটি লাথি গিয়ে তার তলপেটে পড়ল। কোঁথ করে একটি শব্দ বেরুল লোকটির মুখ দিয়ে। তার সাথে গোটা দেহটি তার সামনের দিকে বেঁকে গেল। পর মুহুর্তে আর একটি প্রচন্ড ঘুষি গিয়ে পড়ল লোকটির চোয়ালে। এবার নিঃশব্দে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। কর্ণেল মাহমুদ এতক্ষণ পরে প্রথমবারের মত মেয়েটির মুখের দিকে তাকাল। মেয়েটি ইতিমধ্যে পোশাক ঠিক করে নিয়েছে। অবিন্যস্ত স্বর্ণাভ চুল কপালের একাংশ ঢেকে রেখেছে। নীল চোখ দু'টি থেকে আতংকের ঘোর তখনও কাটেনি। ইহুদীদের স্বভাবজাত উন্নত নাসিকার নীচে পাতলা রক্তাভ ঠোঁট দু'টি তার কাঁপছে। প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা শ্বেত স্বর্ণাভ মেয়েটি অদ্ভুত সুন্দরী। মাহমুদ কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু বাইরে পদশব্দ শুনে সে থেমে গেল। পকেট থেকে রিভলভার বের করে সে দ্রুত দরজার আড়ালে সরে গেল এবং ইঙ্গিতে সে মেয়েটিকে বসে পড়তে বলল, দরজার ফাঁক

দিয়ে মাহমুদ দেখলো, দু'জন লোক ঘরের কিছুদূর সামনে দিয়ে সুইমিং পুলের পূর্ব পাশ দিয়ে ঘুরে আবার দক্ষিণ দিকে চলে গেল। মাহমুদ মনে মনে হাসল, সাইমুমের লোক যে ভিক্টোরী পার্কের বিশ্রামাগারে আশ্রয় নিয়ে মোসাদের লোকের হাতে পড়ার মত বোকামী করবে না - ইসরাইলী গোয়েন্দাদের এই স্বাভাবিক বিশ্বাসই তাকে আজ এক অঘটন থেকে বাঁচাল। কর্ণেল মাহমুদ ফিরে দাঁড়িয়ে মেয়েটিকে বলল, দেখনু আমি একটা এ্যাকসিডেন্ট করেছি, 'পুলিশের লোক আমার পিছু নিয়েছে, আমাকে এখনই সরে পড়তে হবে। আপনি পুলিশের সাহায্যে বাড়ী ফিরতে পারেন।' বলে মাহমুদ বাইরের দিকে পা বাড়াতে যাচ্ছিল।

মেয়েটি ডাকল,শুনুন।

মাহমুদ ফিরে দাঁড়াল। মেয়েটি বলল, বাগানে আমার গাড়ী আছে। চলুন গাড়ীতে যাবেন। মাহমুদ বলল, এখন এখান থেকে গাড়ীতে যাওয়া আমার পক্ষে নিরাপদ নয়। তাহলে আমাকে পৌঁছে না দিয়ে আপনি যেতে পারেন কেমন করে? গাড়ী নিয়ে যাবেন, কোন বিপদ আপনার হবে না। কোন বিপদের ভয় না করেই তো হোটেল থেকে বাড়ীতে পথে বেরিয়ে ছিলাম, কিন্তু বিপদ তো হল। একটু থেমে মেয়েটি বলল,আমার সঙ্গে গাড়ীতে চুলন। আমি নিশ্চিত আশ্বাস দিতে পারি, পুলিশের লোক আমার গাড়ী সার্চ করবে না। দু'জন ঘর থেকে বেরুল। বাগানের এক অন্ধকার কোণে রাখা গাড়ী নিয়ে তারা খোলা গেট দিয়ে রাস্তায় বেরুল।

গাড়ী পূর্ণ গতিতে গোলান রোড ধরে উত্তর দিকে এগিয়ে চলল। দু'জনেই চুপচাপ। মাহমুদ তখন অন্য চিন্তা করছে। তাকে দেওয়া চিরকুটটি সে এখন ও পড়তে পারেনি। তাতে জরুরী কোন নির্দেশ থাকলে গুরুত্বপূর্ণ সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

গাড়ী চালানোর ফাঁকে মেয়েটি ইতিমধ্যে কয়েকবার মাহমুদের দিকে তাকিয়েছে। সুন্দর শান্ত দর্শন লোকটির অদ্ভুত বলিষ্ঠ গড়ন। ঐ শান্ত দর্শন দেহে যে অবিশ্বাস্য রকমের সাহস ও বিদ্যুৎ গতি রয়েছে, তা সে নিজ চোখেই দেখেছে। চোখ মুখ থেকে প্রতিভা তার যেন ঠিকরে পড়ছে। সবচেয়ে আশ্চর্য মাহমুদের নির্বিকার ভাব।

নির্জন রাজ পথের উপর দিয়ে তীর বেগে গাড়ী এগিয়ে যাচ্ছে। সামনে একটি মোড়। গাড়ী থামানোর লাল সংকেত জ্বলে উঠল। সাদা পোশাকধারী পুলিশ হাত উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। গাড়ী তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। মেয়েটি গাড়ী থেকে মুখ বের করল। সে কিছু বলার আগেই পুলিশ স্যালূট দিয়ে গাড়ীর সামনে থেকে সরে দাঁড়াল। গাড়ী আবার ছুটে চলল। মেয়েটি এবার মুখে একটু হাসি টেনে কর্ণেল মাহমুদের দিকে চেয়ে বলল, কেমন ভয় পাননি তো?

মাহমুদ বুঝলো মেয়েটি সরকারী মহলে শুধু সুপরিচিতাই নয়, সম্মানিতাও। উত্তরে বলল, বেকায়াদায় পড়লে ভয় না পায় কে?

মাহমুদ আবার চুপচাপ। গড়ীর বাইরে আলো আঁধারের খেলা। নির্জন রাতের নিঃশব্দ পরিবেশের মধ্যে মৃদু স্পন্দন তুলে এগিয়ে চলছে গাড়ী। মেয়েটি স্টিয়ারিং হুইলে হাত রেখে সামনে তাকিয়ে আছে। মনে তার চিন্তার ঝড় পাশে বসা এই লোকটি কে? টাকা, প্রশংসা ও সুন্দরী নারীদেহের প্রতি লোভ মানুষের চিরন্তন। এই লোকটি কি সব কিছুর উর্ধ্বে? এতক্ষণের মধ্যে লোকটি তার পরিচয় এমন কি নামটি পর্যন্ত জিজ্ঞেস করেনি। ডেভিড বেনগুরিয়ানের সুন্দরী মেয়ে এমিলিয়া কোন যুবকের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে না - এমন কথা অবিশ্বাস্য। শুনেছি, অর্থ সুনাম ও নারীদেহের মোহ যে কাটিয়ে উঠতে পারে, সে লোক অতি মানব। মেয়েটি আবার মাহমুদের দিকে তাকায়। সেই প্রশান্ত মুখ, সামনে প্রসারিত সেই অচঞ্চল দৃষ্টি।

গাড়ী এসে এক বিরাট প্রাসাদ তুল্য বাড়ীর ফটকে দাঁড়াল। বাড়ী দেখে মাহমুদ চমকে উঠল। এ যে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী এবং ইসরাইলী রাষ্ট্রের অন্যতম কর্ণধার ডেভিড বেনগুরিয়ানের বাড়ী। মেয়েটি সাম্পর্কে মাহমুদের মনে নতুন আগ্রহের সৃষ্টি হল। মুহুর্তের জন্য মেয়েটির দিকে মাহমুদ তার চোখ দু'টি তুলে ধরল। মেয়েটি কি তাহলে ডেভিড বেনগুরিয়ানের কেউ? সরকারী মহলে সম্মানিতা হবার কারণ তাহলে কি এইটিই? মাহমুদকে তাকাতে দেখে মেয়েটি বলল, বাড়ী এসে গেছি?

বাড়ীর ফটক খুলে গেল। মাহমুদ কিছু বলার আগেই ছুটে গিয়ে গাড়ী বারান্দায় দাঁড়াল।

মেয়েটি গাড়ী থেকে নেমেই গাড়ীর পাশ ঘুরে এসে দরজা খুলে দিল।

মাহমুদ গাড়ী থেকে বেরিয়ে মেয়েটির দিকে আর এক পলক তাকিয়ে মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে বলল, এবার আসি।

মাহমুদ যাবার উদ্যোগ করতেই মেয়েটি পথ আগলে দাঁড়িয়ে বলল, দয়া করে একটু বসবেন, অন্ততঃ এক কাপ চা খাবেন চলুন। আমার জরুরী কাজ আছে, ক্ষমা করুন আমাকে। বলল মাহমুদ।

মেয়েটি এক মুহূর্ত থামল। তারপর ধীরে গম্ভির কন্ঠে বলল, আপনি যে উপকার আমার করেছেন সে ঋণ অপরিশোধ্য। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ... মাহমুদ বাধা দিয়ে বলল, মানুষের প্রতি মানুষের যে দায়িত্ব, তার বেশিকিছু আমি করিনি। বলেই মাহমুদ গেটের দিকে পা বাড়াল।

- শুনুন, আপনার পরিচয় দয়া করে কি বলবেন? মেয়েটির কন্ঠে এবার অনুনয়ের সুর।

মাহমুদ ফিরে দাঁড়িয়ে একটু হেসে বলল, আমরা সামান্য ব্যক্তি, দিবার মত কোন পরিচয় আমাদের নেই। তবে বেঁচে থাকলে দেখা হবে, এখন আসি।

ডেভিড বেনগুরিয়ানের গেট পেরুবার আগেই মাহমুদ একবার ঘড়ির দিকে তাকাল। রাত ১ টা। মাহমুদের মন আনচান করে উঠল। কিছুক্ষণ আগের পাওয়া চিঠিটি তার এখনও পড়া হয়নি। জরুরী কোন সংবাদ বা নির্দেশ তাতে থাকতে পারে। চলতে চলতেই মাহমুদ বাম পকেট থেকে চিঠিটি বের করে একবার তাতে চোখ বলাল। সাইমুমের সাংকেতিক অক্ষরে লেখাঃ

“আগামী সতের তারিখে ওসেয়ান কিং জাহাজে ইসরাইলের জন্য ইউরেনিয়াম, হেভিওয়াটার ও অন্যান্য আনবিক গবেষণার বহু মূল্যবান মাল মসলা আসছে। জাহাজটি রাত নয়টায় জাফা বন্দরে ভিড়বে। রাত এগারটায় জাহাজে প্রীতিভোজের অনুষ্ঠান।’’

চিঠি পড়ে মাহমুদ মনে মনে তারিখ গুনল। আজ পনের তারিখ, হাতে সময় মাত্র দু’দিন। মাহমুদ গেটে আসতেই গেটম্যান গেট খুলে দিয়ে স্যালুট করে দাঁড়াল।

# ৫

সূর্য তখনো উঠেনি। রক্তিম পূর্বাকাশ। মাহমুদ কোরআন পড়া শেষ করে উঠে দাঁড়াল। তারপর ড্রেসিং রুমে প্রবেশ করে, কিছুক্ষণ পর ধনী ইহুদী ব্যবসায়ীর সাজ পরে বেরিয়ে এল এবং পশ্চিমের ব্যালকনিতে ইজি চেয়ারে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

জাফা বন্দরে মাহমুদের এটি একটি নতুন আস্তানা ভূমধ্যসাগরের তীরে পাঁচতলা এই বাড়ী। ইজি চেয়ারে অর্ধশায়ীত মাহমুদ পলকহীন দৃষ্টিতে ভূমধ্যসাগরের নীল জলরাশির দিকে চেয়ে ছিল। দূরে পশ্চিম দিগন্তে একটি জাহাজের চিমনি দেখা যাচ্ছিল। ধীরে ধীরে পশ্চিম দিগন্তে তা মিলিয়ে গেল। জাহাজটির সাথে যেন মাহমুদের মনটিও ছুটে গেল দীগন্ত পেরিয়ে জীব্রালটার অতিক্রম করে। জিব্রালটার - জাবালুৎ তারিকের কথা মনে পড়তেই মাহমুদের মন ছুটে গেল চৌদ্দ শ' বছর আগের একটি ঘটনার দিকে। সিপাহসালার তারিক সাতশ' সৈন্য নিয়ে শত্রু অধ্যুষিত স্পেনের মাটিতে নামলেন। তারপর পুড়িয়ে দিলেন ফেরবার একমাত্র উপায় নৌযানগুলো। তাদের সামনে রইল সুসজ্জিত অগণিত শত্রু সৈন্য আর পেছনে তরঙ্গ - বিক্ষুব্ধ সমুদ্র। আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় সম্পর্কে কি দৃঢ় প্রত্যয়। মুসলিম সিপাহসালার তারিকের এ আত্মপ্রত্যয় অবাস্তব ছিল না। শীঘ্রই সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক মুসলমানদের হেলালী নিশান স্পেনের সীমানা পেরিয়ে ফ্রান্সের প্রান্তদেশ পারেনিজ পর্বতমালার বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ইসলামের জয় বার্তা ঘোষনা করল। শুধু কি তাই? মুসা আর তারিককে যদি দামেস্কের দরবারে ফিরিয়ে না আনা হতো, তাহলে 'ওয়াশিংটন আরভিং এর ভাষায়, ''আজ প্যারিস ও লন্ডনের গীর্জাসমূহে ক্রসের বদলে হেলালী নিশানই শোভা পেত।'' এই ভূমধ্যসাগরের প্রতিটি ইঞ্চি স্থানে একদিন মুসলমানদেরই হুকুম চলত। কিন্তু আজ? মাহমুদের মন বেদনায় ভরে যায়, যে স্পেনকে মুসলমানরা আট শত বছর ধরে গড়ে তুলল আপন করে, সেই স্পেনে আজ

মুসলমানদের সাক্ষাত মিলে না। তারা বিধ্বস্ত ও বিতাড়িত। কিন্তু কেন এই পতন? ইতিহাস মুসলমানদের দুর্বলতা আত্মকলহকেই এর জন্য দায়ী করেছে। কিন্তু এই আত্মকলহ আর দুর্বলতা এল কোত্থেকে? সে কি আদর্শচ্যুতি থেকে নয়? মাহমুদের মনে পড়ে যায় একজন লেখকের কথা, ''মুসলমানরা আপন উসূল এবং ইসলামী জোশ হতে যখন দূরে সরে পড়ল, তখন খোদা তাদের এ নিয়ামত কেড়ে নিলেন। এরই ফলে আবার একদিন খৃষ্টান শক্তি সেই বিজয়ী মুসলমানদের উত্তরাধিকারীদেরকে এসব দেশ হতে এমনই ভবে বের করে দিল যে, সে সব দেশের মুসলমানদের নামের আর কোন চিহ্নই থাকল না।'' পূর্বসুরীদের ভুল কি আমরা শুধরে উঠতে পেরেছি? মাহমুদ ভেবে চলে। যদি পারতাম, তাহলে ক্ষুদ্র ইসরাইলের হাতে এমন করে আমরা মার খাব কেন? আফ্রিকা আর এশিয়ার বিভিন্ন দেশে মুসলমানরা এমনই করে নির্যাতীতই বা হতে থাকবে কেন? মধ্য এশিয়া, ফিলিপাইন, সাইপ্রাস, ইরিত্রিয়া, চাঁদ, নাইজেরিয়া, মোজাম্বিক প্রভৃতি দেশের মজলুম মানুষের আমানুষিক দুর্দশা মাহমুদের মনকে ভারি করে তুলে। প্রশ্ন জাগে তার মনে, এদের মুক্তি কত দূরে? মুসলিম তরুণরা কি জাগবে না? তারা কি এগিয়ে আসবে না মজলুম মানুষের মুক্তির জন্য? আমাদের চেষ্টা কি বৃথা যাবে?

এই সময় ধীর পায়ে নাস্তা নিয়ে সেখানে প্রবেশ করল আফজল। আফজল এই বাড়ীর প্রহরী, দারোয়ান, রাধুনী, পরিবেশক সবকিছু। পায়ের শব্দে মাহমুদের চিন্তা সূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। মাহমুদ পিছনে ফিরে আফজলকে দেখে মৃদু হেসে বলল, আজকে নাস্তা খুব সকাল সকাল মনে হচ্ছে না?

-সকালেই তো জনাবের কোথাও বেরুবার কথা ছিল।

মাহমুদের মনে পড়ে গেল, আগামীকালের 'ওসেয়ান কিং' জাহাজের প্রোগ্রামের ব্যাপারে অনেক কাজ আছে বাইরে। যেমন করে হোক সহজ উপায়ে ওসেয়ান কিং জাহাজের ভোজসভায় প্রবেশের একটি পথ করে নিতেই হবে। গভীর রাত পর্যন্ত মাহমুদ এইবষয় নিয়ে চিন্তা করছে, কোন সহজ পথ সে খুঁজে পায়নি। হঠাৎ এ সময় এমিলিয়ার কতা মনে পড়ে গেল মাহমুদের। ওসেয়ান কিঙ জাহাজের প্রীতিভোজে কাদের নিমন্ত্রণ করা হবে? সে প্রীতিভোজ থেকে ডেভিড

বেনগুরিয়ানের পরিবার কি বাদ পড়তে পারে? মাহামুদের মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠল। নাস্তা শেষ করে মাহমুদ আফজলকে বলল, এখন আর বাইরে যাচ্ছি না, তুমি ডিকশনারীটা বের কর। ডিকশনারী ডসিয়ারের ছদ্মনাম। নাস্তা শেষ করে রুমালে মুখ মুছতে মুছতে সে উঠে দাঁড়াল। প্রবেশ করল তার ষ্টাডি রূমে।

ডসিয়ারের পাতা উলটিয়ে বের করল এমিলিয়ার নাম। তার পুরো নাম 'পলিন ফ্রেডম্যান' এমিলিয়ার অভ্যেস আচরণ সম্পর্কে বিবরণীকার লিখেছেন, উঁচু মহলে অবাধ গতি। অত্যন্ত মিশুক। কিন্তু আত্মমর্যাদা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতেন। মুক্তি ও সৌন্দর্যের পূজারী। গোঁড়া জাতীয়তাবাদীদের সাথে তার কোন মিল নেই। ... হোটেল বারগুলো তার কাছে ড্রইং রুমের মতো। সাগর বেলার দি মিষ্টী হোটেলে তাকে রাত ৯ টার পরে প্রায় প্রতিদিনই দেখা যায় ''।

মাহমুদ ডসিয়ারের পাতা বন্ধ করল। মনে মনে বলল, খোদা সহায় হলে আজ দি মিষ্টীতে আবার এমিলিয়ার সাথে দেখা হবে। রাত ন'টা। দি মিষ্টী'র বলরুম। বিরাট হলঘর। অর্ধেক চেয়ার টেবিল এখনও খালি পড়ে আছে। দরজা থেকে পরিস্কার চোখে পড়ে এমন একটি চেয়ারে মাহমুদ বসে আছে। এমিলিয়া তখনো আসেনি। মাহমুদের স্বভাব শান্ত মনে কোন চাঞ্চল্য নেই বটে, কিন্তু মনে তার প্রশ্ন জাগছে, সে আসবে কি?

অবশেষে পরম লগ্নটি এল। বলরুমের দরজায় এসে মুহূর্তের জন্য দাঁড়াল এমিলিয়া। লাল পোশাকে এমিলিয়াকে অদ্ভুত সুন্দরী মনে হচ্ছে। মাহমুদ চোখ সরিয়ে নিল। ইচ্ছা মাহমুদের আগ্রহ যাতে প্রকাশ না হয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পরে চোখ তুলে মাহমুদ দেখল, কয়েক টেবিল সামনে একটি খালি টেবিলে এমিলিয়া এসে বসেছে। এমিলিয়ার দিকে তাকাতে গিয়ে হঠাৎ তার সাথে চোখাচোখি হয়ে গেল। চোখাচোখি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্প্রিং এর মতো এমিলিয়া উঠে দাঁড়াল। মাহমুদ ঈষৎ হেসে উঠে দাঁড়াল। এমিলিয়া মাহমুদের পাশে এসে বলল কেমন আছেন? আপনাকে দেখে যে কতো খুশি হয়েছি তা বোঝাতে পাবো না। বলে মাহমুদের সামনের চেয়ারে এমিলিয়া বসে পড়ল। বলল, আপনার টেবিলে একটু বসতে পারি?

-এ ধরনের বৃটিশ এটিকেট কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে খুবই খারাপ, অভদ্রতা সূচক।

-যেমন? এমিলিয়া ঈষৎ হেসে বলল।

-যেমন আমাদের এই ক্ষেত্রে। 'আপনার টেবিলে কি একটু বসতে পারি' বললে কি আপনি খুশি হতেন? বিশেষ করে সম্পর্ক যেখানে ঘণিষ্ঠতর সেখানে ... ... মৃদু হেসে কথা অসম্পূর্ণ রেখে মাহমুদ চুপ করল।

-সত্যই তাই। এ ধরনের ফর্মালিটি আমার কাছে খুবই পীড়াদায়ক। একটু থেমে এমিলিয়া বলল, কি অর্ডার দেব বলুন, হুইস্কি, জিন, ভারমুখ।

-আমি মদ খাই না।

-সত্যি? বলে বিস্ময়ের সাথে মাহমুদের দিকে চোখ তুলল এমিলিয়া।

-সত্যি। আপনার নিশ্চয় অসুবিধা করলাম।

-অসুবিধা নয়। কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি। এই সমাজে এটা কম বিস্ময়ের কথা নয়। বলে এমিলিয়া ওয়েটারকে ডেকে দু'বোতল কোকা কোলার অর্ডার দিল। মনে হল পরিচিত ওয়েটার কিছুটা বিস্মিত হলো। ওয়েটার চলে গেলে মাহমুদ বলল, 'বোধ হয় আজকের সন্ধ্যা আপনার আমি নষ্ট করলাম।'

-কৃত্রিম আনন্দের উৎসের চেয়ে অকৃত্রিম আনন্দের উৎসই কি বেশী সুখকর নয়? মুখ টিপে হেসে বলল এমিলিয়া।

-উৎসটি যদি অকৃত্রিম হয় তবেই।

-উৎসটিতে যেহেতু কৃত্রিমতা নেই, তাই ওকথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

-না পরখ করেই কি এত বড় সার্টিফিকেট দেয়া চলে

-পরখ করতে কত সময় লাগে বলুন?

ইতিমধ্যে ওয়েটার দু'বোতল কোকো কোলা এনে দিল। কোকা কোলা পান করতে করতে তাদের অনেক আলাপ হলো মাহমুদ অনুভব করল, মেয়েটির মধ্যে তীব্র আকর্ষণী শক্তি রয়েছে, আর রয়েছে মানুষকে আপন করে নেবার এক অদ্ভুত ক্ষমতা। মাহমুদের মনে পড়েছে 'ওসেয়ান কিং' জাহাজের অনুষ্ঠানের কথা কিন্তু প্রাসঙ্গিক কোন আলোচনা না তুলে তা জেনে নেয়া যাবে না। কিন্তু এসব কিছুর পূর্বে মেয়েটির সাথে আরো কিছু ঘনিষ্ঠতর হতে হবে।

মাহমুদরা ঠান্ডা পানীয় ছাড়া আর কিছুই খেল না। জিন, হুইস্কি, ভারমুখ প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের দামী মদের ফেনিল উচ্ছ্বাসে তখন হল ঘরটি পূর্ণ। প্রায় প্রতিটি টেবিলেই একটি যুগল মুখোমুখি। তাদের প্রকৃত সম্পর্ক কি, তা করো জানার উপায় নেই। কিন্তু যে সম্পর্কই থাক, আজ এ হল ঘরে এ চত্তরে এক সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে তারা। তাদের ইচ্ছার সামনে বাধ সাধবার কেউ নেই। ঐ যে সামনের শ্বেতাংগ তরুণ যুগলটি। শ্বেতাংগিণীর ঠোঁটের লিপষ্টিক শ্বেতাংগটির ঠোঁটকে ও রঞ্জিত করেছে। প্রত্যেকের চোখেই আদিম নেশা।

এমিলিয়া বলল, এমন সুস্থ চোখে কখনো কোন দিন আমি হল ঘরের এ পরিবেশকে দেখিনি। মদ আমাকে মাতাল করে না বটে, কিন্তু নেশায় কাতিয়ে দেয়।

এই সময় হলের উজ্জ্বল আলো নিভে গিয়ে ম্লান নিলাভ আলোতে ভরে গেল হল ঘরটি। হলের কোণের ষ্টেজ থেকে ইংরেজী সুরে বাজনা বেজে উঠল। প্রতিটি যুগল হাত ধরাধরি করে উঠে নাচের জন্য হলের মাঝখানে গিয়ে জমা হতে এমিলিয়া তার ডান হাত মাহমুদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, চলুন।

মাহমুদ এমিলিয়ার হাত ধরে উঠে ধরে উঠে দাঁড়াল। এই স্পর্শের জন্যই হোক বা মাহমুদের নৈতিকতা বোধে আঘাত লাগার জন্যই হোক মাহমুদের হাত যেন কেমন কেঁপে উঠল। এই কম্পনই এমিলিয়ার মধ্যে সংক্রামিত হলো। তার দেহের জাগল শিহরণ। মাহমুদের দিকে চেয়ে মুখ টিপে একটু হাসল এমিলিয়া।

নাচ শুরু হল। নেচে চলছে সবাই। মাহমুদরাও নাচছে। এমিলিয়ার তপ্ত নিঃশ্বাস মাহমুদের গলায় এসে লাগছে। দু'টি দেহের মধ্যে যে ব্যবধান, তা বেশী কিছু নয় মোটেই। দু'জনেই দু'জনের দেহের উত্তাপ অনুভব করতে পারে। আর মানুষ যদি ফেরেশতা না হয়, তাহলে এ উত্তাপ নারী পুরুষের হৃদয়ে রোমাঞ্চ জাগাবেই। মাহমুদ জানে, মানুষ মানুষই, ফেরেশতা নয়। এ কারণেই আল্লাহ স্বামী-স্ত্রী ছাড়া অন্য নারী পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও মেলামেশার একটি সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সীমারেখাতিক্রম করলে সামাজিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে। মদের টেবিল আর এই বল নাচের মঞ্চ কত স্বামী স্ত্রীর বিচ্ছেদ এবং কত কুমারীর কুমারীত্বের অপকৃত্যুর যে উৎস তার ইয়ত্তা নেই। তবুও এটা চলছে

চলবে। মাহমুদের চিন্তা স্রোতে বাধা পড়ল। এমিলিয়া ফিস ফিস করে বলল, তোমাকে কেমন উদাসীন দেখাচ্ছে। কিছু ভাবছ? ভালো লাগছে না বুঝি?

মাহমুদ এমিলিয়ার চোখে চোখ রেখে বলল, ভাবছি আজকে আমিই বোধ হয় সবচেয়ে বেশী ভাগ্যবান।

-কেন?

-ডেভিড বেনগুরিয়ানের নাতনী এমিলিয়াকে আমার চেয়ে নিবিড় করে কে পেয়েছে আজ? এমিলিয়া মাহমুদের কাঁধে মৃদু চাপ দিয়ে বলল, কথাটা কিন্তু সৌজন্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল।

-মাফ চাচ্ছি।

-মাফ চাইলেই বুঝি কথা উঠে গেল?

-তাহলে কি করব?

-কিছু করার দরকার ... এমিলিয়ার কথা শেষ হলো না। বিজলি বাতি নেভে গেল। হল ভরে গেল নিকষ কালো অন্ধকারে। মাহমুদরা থেমে গেছে। বাজনা কিন্তু তখনো বেজে চলেছে। বোঝা গেল এ আলো নিভে যাওয়া অস্বাভাবিক।

পরমুহূর্তেই ঘোষকের কণ্ঠ শোনা গেলঃ ভদ্র মহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ, আমরা দুঃখিত যে, যান্ত্রিক গেলিযোগের জন্য আলো নিভে গেছে, এক মিনিটের মধ্যেই আলো ব্যবস্থা হচ্ছে। মনোযোগ নিজের দিকে কেন্দ্রীভূত হতেই মাহমুদ অনুভব করল, এমিলিয়া মাহমুদের বুকে মুখ গুঁজে রয়েছে এবং দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছে তাকে। মাহমুদ তার অভিনয়ের এ পর্যায়ে এসে কেঁপে উঠল অপরাধ বোধের এক তীব্র খেলায়।

কট করে একটি শব্দ হল, তারপর আলো জ্বলে উঠল আবার। এমিলিয়া আগেই সরে দাঁড়িয়েছিল। মুখ তার আনত, আরক্ত। কিন্তু মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল। মুখ তুলে হেসে মাহমুদকে বলল, চলুন এবার যাওয়া যাক।

দু'জন হাত ধরাধরি করে হোটেল থেকে বেরিয়ে এল। মাহমুদের হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বলল এমিলিয়া, কোলাহল ভাল লাগছে না, চলুন পার্কে যাই।

-কোন পার্ক?

-ভিক্টোরিয়া।

গাড়ীতে উঠে মাহমুদ ড্রাইভিং সিটে বসে গাড়ী ষ্টার্ট দিতে দিতে বলল -

পার্কটা বড় কুলক্ষণে। এমিলিয়া মাহমুদের কাছে সরে এসে তার কাঁধে মাথাটি হেলান দিয়ে বলল, কিন্তু ঐ পার্কটিতেই তোমার সাথে আমার সাক্ষাত!

-তা বঠে। মাহমুদ অনুচ্চ সুরে বলল। তার মনে তখনো ঝড়। ওসেয়ান কিং জাহাজে যাবার উপায় কি? এমিলিয়ারা কি আমন্ত্রিত সেখানে? ওদের সাথে ওখানে প্রবেশের কোন পথ করা যায়? পার্কে এসে তারা একটি ছায়া ঘেরা জায়গা দেখে বসে পড়ল। আকাশে তখন নবমীর চাঁদ। সামনের গাছটিকে আলোকিত করেছে। মাহমুদের কোলে মাথা রেখে এমিলিয়া শুয়ে পড়েছে। মাহমুদের একটি হাত এমিলিয়ার দু'হাতের মুঠোয়।

ধীরে ধীরে এমিলিয়া বলল, দানিয়েল। তুমি হয়তো ভাবছ মেয়েটি কি নির্লজ্জ। কিন্তু বিশ্বাস করো তুমি, তুমি আমাকে মাতাল করেছ। মদও কোনদিন আমার আমিত্বকে এমন করে কেড়ে নিতে পারেনি। বল নাচে অংশ নিয়েছি অসংখ্যবার, কিন্তু কোন পুরুষ আমাকে তার বুকে টানতে পারেনি। তুমি কি যাদু জান দানিয়েল?

-যাদু নয় এমিলিয়া, নারী পুরুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ। বলল মাহমুদ।

-আমি এটা মানিনা পুরুষের সাথে অনেক মিশেছি। কিন্তু এমনতো হয়নি। প্রথম সাক্ষাতের দিন থেকেই আমি বারবার হারিয়ে ফেলছি নিজেকে।

-এটা হয়তো স্রষ্টার ইচ্ছা এমিলিয়া। বলে কিন্তু মাহমুদ নিজেই চমকে উঠল? একি, এমিলিয়ার জীবনের সাথে সে কি তাহলে জড়িয়ে যাচ্ছে না? চাঁদ আর একটু পশ্চিমে সরে গেল। চাঁদের যে আলোটুকু ছিলো, তা সরে গেল। যতই সময় যাচ্ছে মাহমুদের মন উদ্বেগে ভরে ইঠছে ওসেয়ান কিং জাহাজের ব্যাপারটা নিয়ে। কিভাবে সে কথাটা তুলতে পারে? হঠাৎ মাথায় তার একটা বুদ্ধি খেলে গেল। মাহমুদ কোল থেকে এমিলিয়ার মাথা তুলে নিল। বলল, কাল রাত্রের খানা আমার ওখানে খাবে এমিলিয়া?

-তুমি বললে যাবো অবশ্যই। কিন্তু কাল সন্ধ্যায় একটি পার্টি আছে, আব্বা কাল সকালে বিলেতে যাচ্ছেন বলে তিনি যেতে পারছেন না। তাই আমার যাওয়া সেখানে জরুরী ছিল।

মাহমুদ বলল -কোথায় পার্টি জানতে পারি কি?

-নিশ্চয়ই, 'ওসেয়ান কিং' জাহাজে। তুমি বরং চল না দানিয়েল সেখানে আমার সাথে?

-মাহমুদের গোটা শরীর শীর শীর করে উঠল। মনে মনে আলহামদু লিল্লাহ উচ্চারণ করল। মুখে বলল, আমি কি সেখানে অনাহূত হব না?

-নিশ্চয় না। আব্বা যাচ্ছেন না, মা অসুস্থ। আমি ইচ্ছামত সাথী নিতে পারি। নিমন্ত্রণ পত্রও আছে সে রকম। মাহমুদ মুখটি একটু নিচু করে বলল, ঠিক আছে আমার আপত্তি নেই। এমিলিয়া? কিন্তু আমার ওখানে যাচ্ছ কবে তুমি?

-এমিলিয়া মুখটি উঁচু করল। এমিলিয়ার ঈষৎ কম্পনরত ঠোঁট দু'টি মাহমুদের মুখের কাছাকাছি এল। মাহমুদ মুখ উঁচু করল। এমিলিয়া তার মুখটি আবার নামিয়ে নিয়ে বলল, আমি যত কাছে আসছি তুমি তত সরে যাচ্ছ দূরে।

-আরো কাছে টানতে চাই হয়তো। বলল মাহমুদ।

-আমি জানি দানিয়েল, বুঝি। কিন্তু তোমার চরিত্রের এ পবিত্রতাই আমাকে মুগ্ধ করেছে সবচেয়ে বেশী। এমিলিয়ার কথাগুলি গম্ভীর। দূরের কোন পেটা ঘড়িতে ১২টা বেজে গেল। মাহমুদ বলল, চল আজ উঠা যাক। দু'জনই উঠে দাঁড়াল। এক ঝলক দমকা বাতাস এসে ঝাউ গাছে শোঁ শোঁ শব্দ তুলল। চারিদিক নিঝুম নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে নিঃশব্দে ছুটে চলা মোটর কারের ভেঁপুর নীরবতার মাঝে কম্পন তুলছে শুধু। মাহমুদরা হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে এল পার্ক থেকে।

# ৬

গভীর রাত। মাহমুদ তখনো তার টেবিলে বসে। চারিদিক নিঝুম -নিস্তব্ধ। রাস্তার বিজলি বাতিগুলি চাঁদের আলোয় ফিকে মনে হচ্ছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে সে। দূরে ভূমধ্যসাগরের জলরাশির উপর চাঁদের এক মায়া রাজ্যের সৃষ্টি করেছে। মাহমুদ সেদিকে তাকিয়ে আছে ঠিকই কিন্তু মনে তার চিন্তার ঝড়। সে মনে মনে 'ওসেয়ান কিং' জাহাজের দৃশ্যটা কল্পনা করে নেয়। কাপ্তান কক্ষ, ইঞ্জিন রুম, ফুয়েল ট্যাঙ্ক, বহনকৃত মালপত্রের সেল, ষ্টাফদের কক্ষ, প্রশস্ত উন্মুক্ত ডেক প্রভৃতি নিয়ে জাহাজ। জাহাজটি ধ্বংস করার জন্য ফুয়েল ট্যাঙ্কে বিষ্ফোরণ ঘটাতে হবে। ইউরেনিয়াম ও আণবিক গবেষণার অন্যান্য মাল-মসলা যাতে সরিয়ে নেবার কোন সুযোগ না পায় সেজন্য সেখানেও দ্রুত আগুন ধরাবার ব্যবস্থা করতে হবে। এবং এসব কাজ অবশ্যই জাহাজে পৌঁছার পর ভোজ অনুষ্ঠানের আগেই সম্পন্ন করতে হবে। পরিকল্পিত সময়ে বিষ্ফোরণের জন্য ডেজিচেইনের ব্যবহারই উপযুক্ত বিবেচনা করল সে। ডেজিচেইনের একপ্রান্তে জুড়ে দেয়া যাবে ডেটানেটর। ডেটোনেটরের সাথে ইচ্ছামত সময়ের টাইম ইগনেটর ব্যবহার করা যায়। সেফটীপিন তুলে নেবার পর টাইম ইগনেটরে নির্দিষ্ট সময়ে বিষ্ফোরণ ঘটে থাকে। মাহমুদ চিন্তা করল, ১১টা ভোজ, ১২টা বাজার আগে নিশ্চয়ই তা শেষ হয়ে যাবে। সোয়া বারটায় বিষ্ফোরণ ঘটাতে চাইলে ২ ঘন্টা সময়ের টাইম ইগনেটার ব্যবহার করলেই চলতে পারে। কিন্তু সে আবার ভাবল, ডেজিচেইন পাততে গিয়ে যদি বাধা কিংবা অস্বাভাবিক কিছুর মোকাবিলা করতে হয়, তাহলে দু'ঘন্টা পর্যন্ত ডেজিচেইন পেতে রাখা নিরাপদ হবে না, কারণ এ সময়ের মধ্যে অনুসন্ধান হতে পারে এবং ডেজিচেইন তাদের চোখে পড়ে যেতে পারে।

সুতরাং সিদ্ধান্ত নিল, ১১টা থেকে ১১ -১৫ মিনিটের মধ্যেই বিষ্ফোরণ ঘটাতে হবে। এতে অবশ্য ঝুঁকি আছে। তার এবং এমিলিয়ার নিরাপত্তার প্রশ্ন আছে। এ ঝুঁকি তবু নিতে হবে।

‘ওসেয়ান কিং’ জাহাজের ডেকে যখন মাহমুদরা পা রাখল, তখন ১০টা বেজে ২৯ মিনিট হয়েছে। আজকের এ প্রীতি ভোজ ইসরাইলী স্বরাষ্ট্র বিভাগ কর্তৃক ইসরাইলী পারমাণু বিজ্ঞানী এবং ইসরাইলের জন্য আণবিক গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ মালমসলা ও যন্ত্রপাতি বহনকারী ওসেয়ান কিং জাহাজের ক্যাপটেন ক্রুদের সম্মানে আয়োজিত। অবশ্য এ ভোজ এমিলিয়াদের মত বাছাই করা কিছু অতিথিদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

জাহাজে উঠবার সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে ইসরাইলী স্বরাষ্ট্র বিভাগের একজন উর্ধ্বতন কর্মচারী ও জাহাজের ক্যাপটেন অতিথিদের সম্ভাষণ জানাচ্ছেন। মাহমুদ ও এমিলিয়া ওদের সাথে করমর্দন করে উপরে উঠে গেল। মাহমুদ লক্ষ্য করল, স্বরাষ্ট্র বিভাগীয় অফিসার মিঃ গ্রিনবার্জ ও ক্যাপ্টেন মিঃ আদ্রে সাইমনের পিছনে আর একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। তিনি হলেন ইসরাইলী আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগ ‘সিন বেথের’ সহকারী পরিচালক মিঃ হফম্যান। মাহমুদের ছোঁটের কোণে এক টুকরো বাঁকা হাসি খেলে গেলে।

টেবিল আর চেয়ার দিয়ে সুন্দর করে ডেক সাজানো হয়েছে। আমন্ত্রিত অতিথিদের অনেকেই এসে গেছেন। কেউ কেউ জাহাজের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে চন্দ্রালোকিত সাগরের শোভা দেখছেন। আর অবশিষ্টরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বসে জটলা করছেন। মাহমুদ এমিলিয়াকে নিয়ে গোটা ডেকটা একবার চক্কর দিলো। সশস্ত্র কোন প্রহরীকে উপরে দেখা গেল না। মাহমুদ ভবল, নিশ্চয় তাহলে ভিতরে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ সময় মাহমুদ লক্ষ্য করল একটি প্লেটে To Lavatory লিখে জাহাজের অভ্যন্তরে নামবার সিঁড়ির দিকে তীর এঁকে দেয়া হয়েছে। মাহমুদের মুখ খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে এমিলিয়াকে নিয়ে জাহাজের সামনের প্রান্তে রেলিং এর পার্শ্বস্থিত একটি চেয়ারে এসে বসল। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল ১০ টা ৩২ মিনিট বেজে গেছে। মাহমুদ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বাথরুম থেকে একটু আসি।

মাহমুদের পরনে চকলেট সুট। পায়ে ক্রেপসু। মাহমুদ সিঁড়ি দিয়ে ডেক থেকে নিচে নেমে এল। ভিতরে কিন্তু বাইরের মত উজ্জ্বল আলো নেই। মাহমুদ সিঁড়ি থেকে নেমে যেখানে এসে দাঁড়াল, সেখান থেকে জাহাজ লম্বালম্বি দীর্ঘ করিডোর, দু'পাশে কেবিন-কার্গো কেবিন। মাহমুদ করিডোরে দাঁড়াতেই একজন ষ্টেনগানধারী প্রহরী মাহমুদকে জিজ্ঞাসা করল -ল্যাভেটরী স্যার?

-হাঁ। মাহমুদ বলল।

-আসুন। বামে কয়েক পা এগিয়ে একটি বন্ধ ঘর দেখিয়ে দিল। মাহমুদ হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলল। তারপর পিছন ফিরে দেখল, প্রহরীটি পিছন ফিরে কয়েক পা এগিয়েছে। মাহমুদ দেখল, করিডোরে আর কেউ নেই। তারপর পকেট থেকে একটি রুমাল ও শিশি বের করে বিড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে প্রহরীর দেক এগুতে লাগল। নিকটবর্তী হয়ে অত্যন্ত দ্রুত বাম হাত দিয়ে লোকটির কন্ঠনালি চেপে ধরল, অন্য হাতে ক্লোরোফরম সিক্ত রুমালটি লোকটির নাকে চেপে রাখল। কয়েকবার কোক কোক শব্দ করার পর তার দেহটি নিস্তেজ হয়ে এল। ষ্টেনগানটি হাত থেকে পড়ে গিয়ে ঠক করে একটি শব্দ হল। মাহমুদ তার দেহটি টেনে নিয়ে গিয়ে ল্যাভেটরী ও কার্গো কেবিনের মাঝের সরু গলির মধ্যে রেখে দিল। স্থানটি একটু অন্ধকার। সেখানে একটি সোফাও দেখল মাহমুদ। বুঝল প্রহরীরা এখানে বসে বিশ্রাম নেয়।

মাহমুদের হাতে সাইলেন্সার লাগানো নিভলবার। মাহমুদ ইঞ্জিন রুমের সিঁড়িতে পা রাখতে যাবে, এমন সময় পেছন থেকে শব্দ ভেসে এল, 'হ্যাঁন্ডস আপ'।

মাহমুদ হাত উঁচু করে দাঁড়িয়ে পড়ল। মাহমুদ তার পিঠে রিভলভারের ভারী স্পর্শ অনুভব করল। মাহমুদ আশু কর্তব্য ভেবে নিল, তারপর এক ঝটকায় বসে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গেই পিছনে দাঁড়ানো লোকটির দু'টি পা ধরে সামনে মারল হেচকা টান। লোকটি কাত হয়ে পড়ে গেল। রিভলভার ও ছিটকে গেল তার হাত থেকে। বজ্র মুষ্টিতে চেপে ধরল কণ্ঠনালি। মাত্র কয়েক মুহূর্ত। তারপর নিস্তেজ হয়ে এলো লোকটির দেহ। মাহমুদ তাড়াতাড়ি লোকটিকে টেনে এনে ইঞ্জিন রুমের এক কোণে গুঁজে রেখে দিল। লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে মাহমুদ

চমকে উঠল। একি? মিঃ হফম্যান? উজ্জ্বল হাসিতে মাহমুদের মুখ ভরে গেল। অগণিত মুসলিম বাস্তত্যাগী আর বহু সাইমুম কর্মীর রক্তে রঞ্জিত ইসরাইলী গোয়েন্দা এই হফম্যানের হাত। এতদিনে সব লীলা অবসান হলো শয়তানের।

মাহমুদ দ্রুত ইঞ্জিন রুমের পাশ দিয়ে জ্বালানি সঞ্চয় কক্ষে প্রবেশ করল এবং দ্রুত কাজে লেগে গেল। তিনটি বৃহদাকার ট্যাঙ্ক। সৌভাগ্যক্রমে ট্যাঙ্কগুলি ঈষৎ উঁচু সারিবদ্ধ কতগুলি ইস্পাত বেজের উপর রাখা। মাহমুদ দ্রুত ডেজিচেইন পেতে তার মাথায় ডেটোনেটর ও টাইম ইগনেটর জুড়ে দিল। প্রত্যেকটি ট্যাঙ্কের জন্য দু'টি করে ডেজিচেইন পাতল মাহমুদ। তারপর ফিরে এল আবার ইঞ্জিন রুমে। সেখান থেকে উঠে এর পূর্বের করিডোরে। করিডোরে কেউ নেই। মাহমুদ বুঝল প্রহরী ও জাহাজের ক্রুরা সবাই নিশ্চিন্তে ভোজ সভার অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছে। মাহমুদ কার্গো কেবিনে ডেজিচেইন পাতার বিষয় বিবেচনা করে দেখল। কিন্তু এর প্রয়োজন হবে বলে মনে হলো না মাহমুদের।

এবার নিশ্চিন্ত হয়ে সে প্রবেশ করল ল্যাভেটরীতে। বেশ করে হাত মুখ ধুয়ে বেরিয়ে এল সেখান থেকে। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল ১০ টা বেজে ৪৭ মিনিট। মাহমুদ ভবল, এমিলিয়া নিশ্চয় এই দেরীতে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে।

মাহমুদ সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল। সোজাসুজি এমিলিয়ার কাছে না গিয়ে রেলিং এর ধারে গিয়ে দাঁড়াল। সে লক্ষ্য করল, সে এখনো এমিলিয়ার দৃষ্টিতে পড়েনি।

সাগরে চাঁদের স্থির প্রতিবিম্বের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মাহমুদ। স্থির চাঁদের ঐ আলোক শিখা মাহমুদের মনকে টেনে নিয়ে গেল জর্দানের পাহাড় আর তার পাশ্বের উপত্যকা ভূমিতে। সেখানে তাঁবু আর কুঁড়ে ঘরে বাস করছে অগণিত মানুষ - মজলুম মানুষ। ঐ মজলুম মুসলমানদের জন্য আমরা এ পর্যন্ত কি করতে পেরেছি? সময় যতই গেছে ইসরাইল তার বিষাক্ত থাবাকে আরও সুদৃঢ়, আরও সুবিস্তৃত করেছে। এমিলিয়া এসে মাহমুদের পাশে দাঁড়াল। মাহমুদের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বলল, কি স্বপ্ন দেখছ?

মাহমুদ চমকে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই মুখে ফুটিয়ে তুলল মৃদু হাসির রেখা। বলল, ভাবছি এই সাগর আর এ তারকা খচিত নিকষ কালো আকাশের

অসীমত্বের কথা। আমরা কত ক্ষুদ্র। এই সাগর ঐ অসীম আকাশ আর এই বিচিত্র পৃথিবীর মালিক স্রষ্টা না জানি কত মহাশক্তিশালী। শান্ত ও অনুচ্চস্বরে বলল স্রষ্টাকে তুমি মহাশক্তিশালী মনে কর দানিয়েল?

-আমার স্বীকার করা বা না করার সাথে এর সম্বন্ধ নেই এমিলিয়া। মহা সৃষ্টির মাঝে যে তার মহাশক্তির সাক্ষ্য নিহিত। স্রষ্টাকে তুমি অস্বীকার করতে পারো এমিলিয়া?

-কিন্তু স্রষ্টাকে মানতে গেলে ধর্মকে মানতে হয়। আর ধর্মকে মানতে গেলে দেখ না কত ফ্যাসাদ।

-যেমন?

-কোন ধর্ম মানবো, ইহুদী না খৃষ্টান, না মোহামেডান? এত সংঘর্ষ আর বৈপরীত্য কেন?

-বৈপরীত্য নেই এমিলিয়া। মুসা, যিশু খৃষ্ট আর মোহাম্মদ এর মূল শিক্ষা একই। ব্যবহারিক ক্রিয়া কর্মের মধ্যে পার্থক্য আছে শুধু এই পার্থক্যকে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন ও সংশোধনের সাথে তুলনা করা যায়।

-কিন্তু এটা স্বীকার করে নিলে যে ইসলামকে মানব সমাজের জন্য শেষ ও অনুসরণীয় একমাত্র জীবন বিধান বলে মেনে নিতে হয়?

-কিন্তু যা সত্য, তাকে আমরা অস্বীকার করব কেমন করে?

-এটা গুরুতর কথা দানিয়েল? এত সহজে এমন কথা তুমি বলতে পার না। যাক। আজ ধর্মের কি সত্যই কোন প্রয়োজন আছে বলে তুমি মনে কর?

-ধর্মের অর্থ জীবন পদ্ধতি। সুতরাং এ ভূমন্ডলে মানুষের জীবন যত দিন থাকবে ধর্মের প্রয়োজনও ততদিন থাকবে।

-জীবন পদ্ধতি আমরা নিজেরাই গড়ে নিতে পারি।

-তা পারি। এ ধরনের জীবন পদ্ধতি ফেরাউন, নমরুদ, সাদ্দাদ গড়ে তুলেছিল। প্লেটো, রুশো, ভল্টেয়ার মানুষের জন্য নতুন জীবন পদ্ধতির দিক নির্দেশ করেছিল। হেগেল, কার্ল মার্কস মানব সমাজের জন্য ঐতিহাসিক বস্তুবাদের আলোকে নতুন জীবনদর্শনের রূপরেখা এঁকে গেছে এবং সে মোতাবেক লেনিন, মাওসেতুং এর নেতৃত্বে রাশিয়া ও চীনে সর্বাত্মক বিপ্লবও

সাধিত হয়েছে। গণতন্ত্রের উপর ভিত্তিশীল এক নয়া সমাজ পদ্ধতি (অবশ্য প্রকৃত পক্ষে এটা প্রাচীন গ্রীসিয় সমাজ সভ্যতার নবতর সংস্করণ) পশ্চিমা দেশগুলোতে চালু আছে কিন্তু এগুলোর কোন একটিও কি রাষ্ট্র, সমাজ ও ব্যক্তি জীবনে শান্তির সন্ধান দিতে পেরেছে? শ্রেণী স্বার্থের ধ্বজা তুলে সাম্যবাদের নামে সমাজবাদী দেশগুলো কি জনতাকে দাসে পরিণত করেনি? আর পুঁজিবাদী দেশগুলোতে ব্যক্তিস্বার্থ ও ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে লুণ্ঠন শোষণের অবাধ সয়লাব কি বয়ে যাচ্ছে না? অশান্ত অস্থির মানুষকে ঘুমের বড়ি খেয়ে ঘুমোতে হয় কোন কারণে?

-কিন্তু স্রষ্টার নির্দেশিত জীবন পদ্ধতি সব সমস্যার সমাধান করবে, তার নিশ্চয়তা কি?

-আচ্ছা এমিলিয়া সাপের কোন জিনিসকে আমরা ভয় করি?

-বিষ দাঁতকে?

-আচ্ছা সাপের বিষ দাঁতকে যদি উপড়ে ফেলা হয়, তাহলে সে আর কোন ক্ষতি করতে পারে কি?

-না পারে না। এমিলিয়া হাসল। বলল, কিন্তু মানুষের বিষদাঁত তুমি পাবে কোথায়?

-মানুষের বিষদাঁত তার স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বার্থপরতা। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে সকল প্রকার বিপর্যয়, অশান্তি ও অনর্থের মূল কারণ মানুষের স্বার্থপরতা ও স্বেচ্ছাচারিতা। স্বার্থপরতা অন্যায়ের বাহন আর স্বেচ্ছাচারিতা তার অমোঘ অস্ত্র।

-কিন্তু এ বিষদাঁতকে তো ভাঙ্গা যায় না।

-ভাঙ্গা যায় না, কিন্তু এর বিলুপ্তি ঘটানো সম্ভব। মানুষ যখন এক স্রষ্টার সার্বভৌম ক্ষমতার কাছে সত্যিকার ভাবে মাথা নত করে তখন তার স্বেচ্চাচারিতা ও স্বার্থপরতার কোন সুযোগই আর থাকে না। সে সত্যিকারভাবে তখন স্রস্টার দেয়া বিধানবলীর প্রতিপালণকারী ও প্রয়োগকারী হয়ে দাঁড়ায়।

এমিলিয়া এক দৃষ্টিতে মাহমুদের দিকে তাকিয়ে ছিল। তার মুগ্ধ দৃষ্টি যেন আনন্দে নাচছে। সে বলল, আমার দেখা, আমার পরিচিত জনস্রোতের মাঝে তুমি

সত্যই ব্যতিক্রম দানিয়েল। তুমি কখনো কঠিন বস্তুবাদী আবার কখনো কঠোর ভাববাদী। তুমি আসলে কি দানিয়েল?

-আমি একজন মানুষ। হাসল মাহমুদ।

এমিলিয়াও হাসল। কিছু বলতে যাচ্ছিল। এমন সময় ক্ষুদ্রকার ডেকমাইক থেকে ঘোষিত হল, লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান আপনাদের স্ব স্ব আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সবাই গিয়ে আসন গ্রহণ করল। মাহমুদ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল রাত এগারটা বাজতে এক মিনিট বাকী।

রাত ১১ টা বেজে গেছে। আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ইসরাইলের বিজ্ঞান ও কারিগরি মন্ত্রী এ্যারোন কোপল্যান্ড তার আসন গ্রহণ করেছেন। ১১ টা বাজার সাথে সাথে ইসরাইলী অণুবিজ্ঞানী মিঃ মরিস কোহেন এবং মিঃ মোসে সারটক এসে আসন গ্রহণ করলেন।

১১ টা ১ মিনিট বাজল। মিঃ এ্যারোন কোপল্যান্ড উঠে দাঁড়ালেন উপস্থিত আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, উপস্থিত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আজ আমাদের জন্য এক পরম খুশীর দিন। আমাদের পিতৃভূমি ইসরাইল এক নতুন যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। আমাদের সমরশক্তিতে পরমাণু বিজ্ঞানের আশির্বাদ লাভের জন্য আমরা এতদিন পরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করেছি। আমাদের বিজ্ঞান ও আমাদের কারিগররা পারমাণবিক কৌশল আয়ত্ব করেছে অনেক আগে, কিন্তু নিজস্ব গবেষণাগার স্থাপনের কোন সুযোগ আমরা পাইনি। এতদিনে সে সুযোগ আমরা লাভ করতে যাচ্ছি। সুতরাং আজকের এদিন আমাদের বিজ্ঞানী, আমাদের জনসাধারণ, আমাদের সরকার এবং আমাদের বিদেশের শুভানুধ্যায়ীদের জন্য মহা আনন্দের সওগাত বয়ে এনেছে। আমরা এ নিশ্চয়তা আজ সবাইকে দিতে পারি সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন আমরা আমেরিকা ও রাশিয়ার মত ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালেষ্টিক মিসাইলের অধিকারী হবো।

শ্রোতমন্ডলি করতালি দিলেন। একটু থেমে মন্ত্রী মহোদয় আবার শুরু করলেন, পিতৃভূমির যে অংশটুকুর উপর আমরা অধিকার লাভ করেছি, তা নিয়ে

আমরা কেউই সন্তুষ্ট নই, সন্তুষ্ট থাকতে পারি না। হেজাযের ইয়াসরেব নগরী ( আল মদিনা ) থেকে তুরস্কের আলেকজান্দ্রিয়া প্রদেশ এবং ভূমধ্যসাগর ও নীল নদের সীমা থেকে ইউফ্রেটিস-তাইগ্রিস নদীর মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত আমাদের পিতৃভূমির উপর আমরা যে কোন মূল্যেই হোক অধিকার কায়েম করবো। এজন্য চাই আরো শক্তি - আরো শক্তি ( আবার তুমূল করতালি কিন্তু মাহমুদের হাত দু'টিই শুধু নড়ল না )।

১১ টা ৭ মিঃ অনুষ্ঠানে শেষ হলো। খাবার প্রস্ততি শুরু হল। সবাই নিজের কোলের উপর রুমাল বিছিয়ে নিচ্ছেন। মাহমুদের মন চঞ্চল হয়ে উঠল। আর তিন মিনিটের মধ্যেই প্রথম বিষ্ফোরণ ঘটার কথা। আল্লাহ কি দয়া করবেন? তার মিশন কি সফল হবে। বলদর্পী সাম্রাজ্যবাদী রক্ত পিপাসু ইহুদীদের আশার এ দীপশিখাকে কি সে নিভিয়ে দিতে পারবে? সকলের সামনে স্যুপ পরিবেশিত হয়েছে। চামচ দিয়ে স্যুপ নাড়ছে সবাই। চামচ দিয়ে ধীরে ধীরে মুখে তুলছে স্যুপ। সবার মত মাহমুদের মুখেও স্যুপ উঠছে। কিন্তু তার মন আশা নিরাশার তরঙ্গঘাতে অশান্ত চঞ্চল। ১১ টা ৯ মিঃ ৩০ সেকেন্ড। জাহাজ প্রচন্ডভাবে কেঁপে উঠল। প্রচণ্ড বিষ্ফোরণের শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাট অগ্নিপিন্ড আকাশের দিকে উঠে গেল। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল খাবার টেবিলে। স্যুপের পিয়ালা অনেকের কাত হয়ে পড়ে গেছে ইতিমধ্যেই। সবাই উঠে দাড়িয়েছে। ভীত আতঙ্কগ্রস্থ সবাই। মাহমুদ তার কর্তব্য আগেই ঠিক করে রেখেছিল। এমিলিয়াকে বলল, এস আমার সাথে। বলে সে ছুটলো ডেক থেকে জেটিতে নামবার সিঁড়ির দিকে। জাহাজ কাঁপছে। প্রথম বিষ্ফারণের ফলে উৎক্ষিপ্ত অগ্নিপিন্ড নিচে নেমে জাহাজে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল। সিঁড়ির মুখে গিয়ে মাহমুদ এমিলিয়াকে বলল, হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে আমার পিঠে উঠ।

এমিলিয়ার মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। সে কাঁপছে। মাহমুদের আদেশ পালন করল সে। অভ্যস্ত মাহমুদ দ্রুত কম্পমান সিঁড়ি দিয়ে জেটিতে নেমে এল। জেটিতে পা রাখার সাথে সাথে আর একটি বিষ্ফারণের শব্দ হল। মাহমুদ পিছনে ফিরে দেখল, জাহাজের বিজলি বাতি নিভে গেছে। কিন্তু বিষ্ফোরণের ফলে উৎক্ষিপ্ত আগুন জাহাজকে আলোকিত করে তুলছে। সেই আলোতে দেখা গেল

জাহাজের একটা অংশ সম্পূর্ণ উড়ে গেছে। দ্বিতীয় বিস্ফোরণের অগ্নিপিন্ড জাহাজে ছড়িয়ে পড়ায় জাহাজের স্থানে স্থানে আগুন জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। মাহমুদ এমিলিয়াকে নিয়ে জেটি থেকে আর একটু দূরে সরে এল। মাহমুদ দেখল আরো কয়েকজন মানুষ সিঁড়ি দিয়ে জেটিতে নেমে এল। আর একটি বিস্ফোরণ ঘটল এ সময়। মনে হল জাহাজটি যেন একদিকে কাত হয়ে গেল। অপেক্ষকৃত ছোট আরও অনেকগুলি বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল। জাহাজের অন্যান্য কয়েক স্থান থেকেও আগুনের লেলিহান শিখা দেখা যেতে লাগল। দূরে ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ীর ঘন্টাধ্বনি শোনা গেল। মাহমুদ ও এমিলিয়া গাড়ীতে গিয়ে বসল। মাহমুদ গাড়ি ছেড়ে দিল। পোর্ট রোড ধরে গাড়ী তীব্র গতিতে পূর্বদিকে এগিয়ে চলছে। তেলআবিব অনেক দূরের পথ। লম্বা রাস্তা। মাহমুদের দৃষ্টি সামনে প্রসারিত। তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পেরে তার মন তৃপ্ত। এ তৃপ্তির মাঝেও তার মনে একটি কাঁটা বিধছে। এবার এমিলিয়ার সাথে তার অভিনয়ের ইতি করতে হবে। কিন্তু শুধুই কি তা অভিনয় ছিল? মনের কোথায় যেন বেদানার সুর বাজছে তার। এমিলিয়া তার পরিচয় পেলে কি ভাববে তাকে? কালকেই গোয়েন্দা পুলিশ এসে এমিলিয়াকে ব্যস্ত করে তুলবে। বিনা অপরাধে বেচারী কষ্ট পাবে। এমিলিয়া একটু কাত হয়ে একটি হাত মাহমুদের পিছনে সোফার উপর প্রসারিত করে একটি হাত মাহমুদের কাঁধে রেখে মুখটি মাহমুদের কাঁধে গুঁজে রেখেছে। এক সময় ধীর কন্ঠে সে বলল, দানিয়েল, একবার তুমি আমাকে নৈতিক মৃত্যু থেকে বাঁচিয়েছ, আবার আজ তুমি আমাকে দৈহিক মৃত্যুর হাত তেকে বাঁচালে। জীবন দিয়েও এ ঋণ শোধ করতে পারব না আমি দানিয়েল। মাহমুদের গোটা দেহে একটি শিহরণ খেলে গেল। কিন্তু কোন উত্তর দিল না মাহমুদ। কি উত্তর দেবে সে? যে তার জীবনকে জাতির জন্য উৎসর্গ করেছে, সে কেমন করে একজন ইহুদী তরুণীর এ আত্ম নিবেদনকে গ্রহণ করবে? মাহমুদ ধীরে ধীরে বলল, কাল সকালে পুলিশ আসবে। আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করবে তারা। কি জবাব দিবে তুমি?

-কেন পুলিশ আসবে?

-আসবে।

-কেন আসবে?

-ধর যদি আসেই?

-আমি তোমার ঠিকানা বলে দেব, তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব।

-পুলিশ আমাকে খুঁজে পাবে না।

-কেন? কোথাও চলে যাচ্ছ তুমি? বলে সোজা হয়ে বসল এমিলিয়া। মাহমুদ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর এমিলিয়ার প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়েই বলল, পুলিশকে আমাদের পরিচয়ের আসল ঘটনাটির কথা জানাবে তাহলে আমাদের বন্ধুত্বের কারণ তারা বুঝবে এবং তোমার কোন দোষ হবে না।

-পুলিশ কেন তোমার সন্ধান করবে? কেন দোষ দিবে আমাকে তারা? এমিলিয়ার কন্ঠে উদ্বগ।

-ওসেয়ান কিং' জাহাজ ধ্বংসের জন্য আমাকেই দায়ী করবে তারা।

-কেন তা করবে? তুমি ও কাজ করতে যাবে কোন কারণে? মাহমুদ মুহূর্তের জন্য এমিলিয়ার মুখের দিকে তাকাল। তার লাবণ্যভরা মুখটি উদ্বিগ উত্তেজনায় যেন কাঁপছে। ওর কোমল হৃদয়ে আঘাত দিতে কষ্ট লাগছে মাহমুদের। তবু সত্য ঘটনা তাকে বলতেই হবে মাহমুদ গম্ভীর কন্ঠে বলল, 'ওসেয়ান কিং' জাহাজের ফুয়েল ট্যাংকে আমি বিস্ফোরণ ঘটিয়েছি এমিলিয়া।

-তুমি? এমিলিয়ার কণ্ঠ আর্ত চিৎকারের মত শোনাল। বিস্ময় উত্তেজনায় এমিলিয়ার মুখ হা হয়ে গেছে। সে বির্বাক দৃষ্টিতে আকিয়ে আছে মাহমুদের দিকে।

-মাহমুদ আবার এমিলিয়ার দিকে চাইল। তার মুখে ফুটে উঠল হাসির রেখা। কিন্তু তা যেন তাসি নয়, কান্না। বলল, জানি এমিলিয়া তুমি বিস্মিত হয়েছ। হয়তো ভাবছও আমি কেমন করে অমন খুনী হতে পারলাম। কিন্তু তুমি জান না, 'ওসেয়ান কিং' জাহাজে যে অগ্নিকুন্ড তুমি দেখেছ, তার চেয়েও অনেক বড় অগ্নিকুন্ড আমার হৃদয়ে জ্বলছে। শুধু আমার হৃদয়ে নয়, ফিলিস্তিন থেকে বিতাড়িত আমার মত লক্ষ লক্ষ আরব মুসলমানের হৃদয়ে এ আগুন অমনি জ্বলছে।

-তুমি আরব? তুমি মুসলমান? এমিলিয়ার কণ্ঠ আর্তনাদ করে উঠল।

-হাঁ এমিলিয়া, আমি মুসলমান।

-বিস্ময় বিস্ফারিত এমিলিয়ার চোখ। গভীর বেদনায় শক্ত নীল হয়ে উঠেছে এমিলিয়ার শুভ্র গন্ডদেশ। গোলাপের মত ঠোঁট দু'টি তার কাঁপছে। বিহ্বল

দৃষ্টিতে মুহূর্ত কাল মাহমুদের দিকে চেয়ে থাকল। তারপর ভেঙ্গে পড়ল কান্নায়। উপুড় হয়ে হাঁটুতে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে সে। মাহমুদের দৃষ্টি সামনে প্রসারিত। জন বিরল প্রশস্ত রাস্তা। তীব্র গতিতে এগিয়ে চলেছে কার্ডিয়াক। মাহমুদ এবার এমিলিয়ার দিকে চাইল, কাঁদুক, কাঁদা উচিত। চোখের পানিতে ধুয়ে মুছে যাক মাহমুদে সব স্মৃতি।

খোলা প্রশস্ত গেট দিয়ে ডেভিড বেনগুরিয়ানের বারান্দায় প্রবেশ করল গাড়ী। মাহমুদ গাড়ী থেকে নেমে পাশ ঘুরে এসে গাড়ীর দরজা খুলে ধরে বলল, নেমে এস। এমিলিয়া মুখ তুলল। অশ্রু ধোয়া মুখ তার। দু'একটি অবিন্যস্ত চুল মুখে এসে পড়েছে। অশ্রুতে ভিজে গেছে সে গুলোও। কঠিন আঘাতে যে চোখে অশ্রু আসে না, মাহমুদের সে চোখ দু'টিও ভারী হয়ে উঠল। এমিলিয়া বেরিয়ে এসে মাহমুদের পাশে দাঁড়াল। নতমুখী এমিলিয়া। দু'জনই নির্বাক। প্রথমে কথা বলল মাহমুদ। বলল, পরিচয় গোপন করার জন্য এবং তোমাকে এমন করে আঘাত দেয়ার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী এমিলিয়া। তুমি যদি আমাকে ভুল না বুঝ, তাহলে আমাকে ক্ষমা তুমি করতে পারবে।

এমিলিয়া নীরব। কোন কথা বলল না। মুখও তুলল না সে।

মাহমুদ আবার বলল, আর যদি প্রতিশোধ নিতে চাও তাহলে আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দাও। আমি রাজী আছি।

এমিলিয়া যেন পাথর হয়ে গেছে। কোন উত্তর এল না তার কাছে থেকে। যেন অলক্ষ্যে একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল মাহমুদের বুক থেকে চোখের কোণও বোধ হয় ভিজে এল তার বলল সে, তাহলে আসি এমিলিয়া, পারলে ক্ষমা করো।

দু'হাত মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল এমিলিয়া। মাহমুদ কয়েক পা এগিয়ে ছিল। ফিরে এল আবার। এমিলিয়ার মুখ তুলে ধরে ডাকল এমিলিয়া।

-দানিয়েল। বলে মাহমুদের হাত জড়িয়ে ধরে বাঁধ ভাঙ্গা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল এমিলিয়া।

আর দানিয়েল নায় এমিলিয়া। আমার নাম মাহমুদ। ধীর স্বরে বলল মাহমুদ।

এমিলিয়া কেঁদেই চলল। মাহমুদের হাত এমিলিয়ার চোখের পানিতে ভিজে গেল।

মাহমুদ বলল, মুখ তোল কথা বল এমিলিয়া।

এমিলিয়া ধীরে ধীরে মুখ তুলল। অবিন্যস্ত চুল আর অশ্রু ধোয়া এমিলিয়াকে দেখে মনে হচ্ছে, কি এক প্রচন্ড ঝড় বয়ে গেছে এমিলিয়ার উপর দিয়ে। তার নীল শান্ত চোখে কি নিঃসীম মায়া বলল সে, আবার কবে দেখা হবে?

শক্ত একটি প্রশ্ন। মাহমুদ বলতে চাইল। স্রোতে ভাসা পানার মত নিরুদ্দিষ্ট আমাদের জীবন। কোন আবর্ত কোথায় কখন আমাদের নিয়ে যাবে তা আমরাও জানি না। কিন্তু কথা বাড়াতে চাইল না মাহমুদ। বলল, যদি কোথাও দূরে চলে না যাই তাহলে দেখা হবে।

-আর যদি দূরে চলে যাও? অবরুদ্ধ কান্নায় কাঁপতে লাগল এমিলিয়ার ঠোঁট দু'টি।

-একটি যাযাবর জীবনের জন্য তুমি অপেক্ষা করবে এমিলিয়া?

এমিলিয়ার দুই গন্ড বেয়ে আবার নেমে এল অশ্রুর দু'টি ধারা। বলল সে, কোন কথা নয় কথা দাও তুমি আসবে?

-কথা দিলাম আসব।

-বেশ। বলে এমিলিয়া মাহমুদের হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, এ সময় এ অঞ্চলে কোন ট্যাক্সি পাবে না, হেঁটে যাবে কেমন করে? চল আমি তোমাকে রেখে আসব। মাহমুদ ম্লান হাসল। বলল, এতক্ষণ তোমাদের গোয়েন্দারা হয়ত আমার সন্ধানে ছুটে আসছে। তোমাকে আর কোন বিপদে জড়াতে চাই না এমিলিয়া।

-কিন্তু তোমার বিপদের কথা তুমি ভাবছ না কেন?

-বিপদ আমাদের নিত্য খেলার সাথী। কোন চিন্তা করো না তুমি। আর আমাকে হেঁটে যেতে হচ্ছে না, তোমাদের গেটের বাইরে আমার জন্য গাড়ী অপেক্ষা করছে। বলে মাহমুদ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, আসি এমিলিয়া। খোদা হাফেজ।

-আচ্ছা এস। কম্পিত কন্ঠে বলল এমিলিয়া।

মাহমুদ কয়েক কদম এগিয়ে আবার পিছনে ফিরে চাইল। দেখল, এমিলিয়া একটি হাত গাড়ীর উপর ঠেস দিয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। গাড়ি বারান্দায় ম্লান আলো তার চোখের পানিতে প্রতিবিম্বিত হয়ে চিক চিক করছে। হৃদয়ের কোথায় যেন মোচড় দিয়ে উঠল মাহমুদের। তার যাত্রা পথের দিকে চোখ দু'টি বুজে এল মাহমুদের। উচ্চারিত হল তার কন্ঠেঃ রাববানা আজআলনা মুসলিমাইনিলাকা (প্রভু আমার, তোমার কাছে আত্মসমর্পণকারী মুসলমানদের মধ্যে আমাদের সামিল কর)।

পরদিন সকালে অনেক বেলা করে ঘুম থেকে উঠল এমিলিয়া। অনেক রাত্রে ঘুমিয়েছে সে। রাত্রেই এসেছিল নিরাপত্তা পুলিশরা। নাইট ক্লাবের মৌখিক পরিচয় ছাড়া মাহমুদ সম্বন্ধে আর কোন কিছুই জানে না বলেই জানিয়েছে এমিলিয়া তাঁদের। এমিলিয়ার বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই বলেই তার হয়ত কোন পীড়াপীড়ি করেনি আর।

শয্যায় উঠে বসেই সে দেখতে পেল পাশের টিপয়ে রাখা সেদিনের সংবাদপত্র। কাগজটি হাতে নিয়ে চোখ বুলোতেই সে দেখতে পেল, ওসেয়ান কিং জাহাজের খবরটি লিড ষ্টোরি হয়েছে। সে পড়ল, ওসেয়ান কিং জাহাজের ভয়াবহ অগ্নিকান্ডঃ

অণূ বিজ্ঞানী মিঃ মরিস কোগেনসহ পাঁচজনের মৃত্যুঃ

২ জন নিখোঁজঃ ১০ জন আহতঃ সমুদয় কার্গো ভস্মিভূত। পরে ওসেয়ান কিং জাহাজে অগ্নিকান্ডের সময় ও পূর্ণ বিবরণ দিয়ে পরিশেষে লিখেছে ''এই অগ্নিকান্ডে ইসরাইলের ৫০০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের মহা মূল্যবান যন্ত্রপাতি ও মালপত্র সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়েছে। সবচেয়ে ক্ষতি অণূ বিজ্ঞানী মিঃ মরিস কোহেনের মৃত্যু। তিনি ইসরাইল বিজ্ঞানাকাশের সূর্য এবং আমাদের জাতীয় জীবনের এক অমূল্য রত্ন ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে পরমাণু বিজ্ঞানে আমাদের দেশ যে অনেক দূর পিছিয়ে গেল, তা বলাই বাহুল্য। এক বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে যে ওসেয়ান কিং জাহাজে ৫০ মিলিয়ন ডলারের পারমাণবিক গবেষণা সরঞ্জাম বোঝাই ছিল। এই মহামূল্যবান গবেষণা সরঞ্জামের বিনষ্টি আমাদের জাতীয় অগ্রগতির জন্য কত মর্মান্তিক, তা সহজেই অনুমেয়। ওসেয়ান কিং জাহাজের

ঘটনায় নিহতদের মধ্যে আরো রয়েছেন, জাহাজের ক্যাপটেন জন টমসন এবং নিরুদ্দিষ্টদের মধ্যে আরো রয়েছে ইসরাইলী গোয়েন্দা বিভাগের সহকারী প্রধান মিঃ হফম্যান। জানা গেছে, ভোজ অনুষ্ঠানের কিছু পূর্বে থেকেই তাঁকে জাহাজের ডেকে দেখা যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে যে, দুষ্কৃতিকারীদের সাথে সংঘর্ষে তিনি নিহত হয়েছেন।

সাইমুদের নাশকতাকারীরা জাহাজের ফুয়েল ট্যাংকে বিষ্ফোরণ ঘটিয়ে জাহাজে আগুন ধরিয়েছে বলে জানা গেছে, সংগৃহীত তথ্যের বরাত দিয়ে আমাদের নিরাপত্তা পুলিশ বিভাগ জানাচ্ছেন, আমন্ত্রিত অতিথির ছদ্মবেশে সাইমুমের জনৈক নাশকাতাকারী জাহাজে প্রবেশ করেছিলো।''

এমিলিয়া রুদ্ধ নিঃশ্বাসে খবর পড়া শেষ করল। বৈজ্ঞানিক মিঃ মরিস কোহেন এবং মি হফম্যানের মৃত্যু হয়েছে? এমিলিয়ার স্নায়ুতন্ত্রী দিয়ে এক হিম শীতল স্রোত বয়ে গেল। কি নিষ্ঠুরতা? কিন্তু পরক্ষনেই তার মানস দৃষ্টিতে ভেসে উঠল মাহমুদের মুখ আর তার কথাঃ ''এমিলিয়া তুমি জান না, ওসেয়ান কিং জাহাজে যে অগ্নিকান্ড তুমি দেখেছ, তার চেয়েও অনেক বড় অগ্নিকুন্ড আমার হৃদয়ে জ্বলছে। শুধু আমার হৃদয়ে নয় ফিলিস্তিন থেকে বিতাড়িত লক্ষ লক্ষ আরব মুসলমানদের হৃদয়ে এ আগুন এমনিভাবে জ্বলছে।'' এমিলিয়ার মনে পড়ল, তাইতো আমরা ইহুদীরা বিভিন্ন দেশ থেকে এসে ফিলিস্তিনী মুসলমানদের সহায় সম্পদ দখল করেছি, তাদেরকে তাদের পিতৃ পুরুষের ভিটা বাড়ী থেকে উচ্ছেদ করেছি। আর যুগ যুগ ধরে মুক্ত আকাশের নীচে বৃষ্টি রোদের মধ্যে তাবুতে অমানুষিক জীবন যাপন করছে তারা। এমিলিয়ার আরো মনে পড়ল হত কালকের ভোজসভার বিজ্ঞান বিষয়ক মন্ত্রী মিঃ এ্যারোন কোপল্যাডের ভাষণঃ 'হেযাজের ইয়সবরিব নগরী (মদিনা শরিফ) থেকে তুরস্কের আলেকজান্দ্রিয়া প্রদেশ এবং ভূমধ্যসাগর ও নীলনদের মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত আমাদের পিতৃভূমির উপর আমরা যে কোন মূল্যেই হোক অধিকার কায়েম করব।'' ইসরাইলের এ ঘোষণা এ লক্ষ্যতো কোন আত্মরক্ষাকারী জাতি বা দেশের কথা নয়। এ যে সাম্রাজ্যবাদী দেশের আগ্রাসী নীতি। এ লক্ষ্য যদি অর্জিত হয়, তাহলে ঐ বিশাল ভূখন্ডের কোটি কোটি মুসলমানের ভাগ্যে কি ঘটবে? তারা কোথায় যাবে?

এতদিন এমিলিয়ার ধারণা, ছিল, ইসরাইলীরা আত্মরক্ষায় সচেষ্ট। কিন্তু আজ তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল, ঘৃণ্য সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা নিয়ে তার দেশ শক্তি বৃদ্ধি করছে। আর ফিলিস্তিন ও আরব মুসলমানরাই যথাযথভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা আর আত্মরক্ষার জন্য সংগ্রাম করেছে। ওসেয়ান কিং জাহাজের অগ্নিকান্ড যদি তাদের সেই সংগ্রামের অংশ হয়, তাহলে তাকে নিষ্ঠুর বলা যাবে কোন যুক্তিতে? মাহমুদকে নির্দোষ করতে পেরে গভীর প্রশান্তিতে বলে গেল এমিলিয়ার মন।

# ৭

এমিলিয়াদের গেট পেরিয়ে ফুটপাতে দাঁড়াতেই কালো রং এর একটি 'মরিস করোনা' এসে মাহমুদের সামনে দাঁড়াল। ভিতর থেকে মুখ বাড়াল আফজল পাশা। জাফা বন্দর থেকে সারাটা পথ আফজল পাশা মাহমুদের অনুসরণ করে এসেছে। এই নির্দেশই ছিল তার প্রতি। জাফা বন্দরের যে আস্তানায় আমরা ইতিপূর্বে মাহমুদ ও আফজলকে দেখেছি সেটা আপতত বন্ধ থাকবে।

মাহমুদ গাড়ীতে উঠে বসলে গাড়ী ছুটে চলল প্রশস্ত আলকেনান রোড ধরে দক্ষিণ দিকে। গাড়ীতে বসেই মাহমুদ পোশাক পাল্টে নিল। প্রথমেই কথা বলল মাহমুদ। বলল, শেখা জামালকে জানিয়েছ?

শেখ জামাল তেলআবিবের ৩ নং আস্তানার পরিচালক। এ আস্তানাটি দক্ষিণ তেলআবিবের বাজার সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত। এ আস্তানাতেই মাহমুদ এখন যাচ্ছে।

গাড়ী এবার ডেভিড পার্ক ঘুরে স্যামুয়েল রোড ধরে পূর্ব দিকে এগিয়ে চলল। তিন মিনিট চলার পর গাড়ী দক্ষিণ দিকে মোড় নিয়ে সেন্ট সলোমন রোড ধরে ছুটে চলল দক্ষিন দিকে। সেন্ট সলোমন রোড যেখানে এসে খাড়া পূর্ব দিকে মোড় নিয়েছে সেই মোড়ের উপর রাস্তার দক্ষিণ পাশে শেখ জামালের আস্তানা। দোতলা বাড়ী। নিচের তলায় ফলের দোকান। উপর তলায় থাকে জামাল। আরও দু'টি ঘর পশ্চিম দিকে রয়েছে। এর একটি দৃশ্যত রান্নাঘর আরটি ষ্টোর রুম হিসেবে ব্যবহার হয়। কিন্তু রান্নাঘরটি ভ্রাম্যমান সাইমুম কর্মীদের একোমোডেশন এবং নিচের তলার ষ্টোর রুমটি অস্ত্রাগার ও ট্রেনিং কক্ষ। স্থানীয় সাইমুম ক্যাডেটদের মধ্যে অস্ত্র বিতরণ করার পর অস্ত্রাগারটির অবশিষ্ট সবকিছু তেলআবিবের মূল ঘাঁটিতে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। ইসরাইলে কর্মরত সাইমুম ইউনিট গুলোকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করার পর সর্বক্ষেত্রে একই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ এবং জরুরী মুহূর্তে নির্দেশ গ্রহণের জন্য

যোগাযোগ রক্ষা করা ছাড়া আর আস্তানার সাথে স্বয়ং সম্পূণ সাইমুম ইউনিটগুলোর কোন রকমের সম্পর্ক নেই। ইসরাইলের বাসিন্দা আরব মুসলমানদের ৯৭ হাজার পুরুষ এবং ৮২ হাজার মহিলা সাইমুমের 'জয় নয়, মৃত্যু' মন্ত্রে দীক্ষিত। এদের নিয়েই গঠিত হয়েছে সাইমুমের হাজার হাজার ইউনিট। বিভিন্ন ঘাটি থেকে আস্তানাসমূহের মাধ্যমে এ ইউনিটগুলোর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। ইসরাইলের এসব আরব বাসিন্দারা ইসরাইলীদের সাথে মিলে মিশে শান্তিপূর্ণ ও নিরীহ জীবন যাপন করছে আর সর্বাত্মক অভ্যুত্থানের সেই দিনটির জন্য অতন্দ্র চোখে অপেক্ষা করছে। সর্বাত্মক অভ্যুত্থানের প্রস্তুতির পূর্বে কোন অপারেশনে ইসরাইলের আরব বাসিন্দাদের ব্যবহার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এমন কি ইসরাইলে কর্মরত সাইমুমের ১০ হাজার কর্মীর প্রতি এ নির্দেশ রয়েছে যে, বিপদ মুহূর্তেও তারা কোন আরব মুসলমানের সাহায্য কিংবা আশ্রয় প্রার্থনা করবে না। সংরক্ষিত এবং গুরুত্বপূর্ণ শক্তি ইসরাইলের আরব মুসলমানদেরকে সকল সন্দেহের উর্ধ্বে রাখাই সাইমুম প্রধান আহমদ মুসার লক্ষ্য।

সেন্ট সলোমন রোড চলে গেছে সরল রেখার মত দক্ষিণ দিকে। সামনেই মোড় দেখা যাচ্ছে। আস্তানার দু'তলা গৃহটিও চোখে পড়ছে। আস্তানার দ্বিতলের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল মাহমুদ। আফজল পাশাকে তৎক্ষণাৎ গাড়ী থামতে ইংগিত করল সে। আস্তানার দ্বিতলের ঘরটিতে নীকষ বেগুনি রং এর আলো জ্বলছে। সাইমুমের কোড অনুসারে এই আলো বিপদের সংকেত। শেখ জামালের কিছু হয়েছে, নয়তো সে অস্বাভাবিক কিছু সন্দেহ করেছে।

মাহমুদ গাড়ী থেকে নেমে পাশের গলিতে আফজলকে অপেক্ষা করতে বলে ডান পাশের ফুটপাত ধরে এগোল। গাছের ছায়ায় ঈষৎ আলো আঁধারের সৃষ্টি করেছে। মাহমুদের কাছে এটা আর্শিবাদ হয়ে দেখা দিল। সেন্ট সলোমন রোড যেখানে পূর্বদিকে মোড় নিয়েছে, সেখান থেকে আর একটি লেন পশ্চিম দিকে চলে গেছে। গলিটির মুখে এক ধারে প্রকান্ড একটি গাছ। নিচে বেশ অন্ধকার। পাতার ফাঁক দিয়ে কোথাও কোথাও চাঁদের আলো নেমে এসেছে অন্ধকারের বুক চিরে। তারই একটি আলোক রেখায় একটি গাড়ীর উইন্ড শিল্ড

মাহমুদের চোখে পড়ল। সে ভাল করে তাকিয়ে দেখতে গেল, অন্ধকারের মধ্যে একটি গাড়ী দাঁড় করানো রয়েছে মাহমুদ হামাগুড়ি দিয়ে গাড়ীর দিকে এগুলো। পকেট থেকে পেন্সিল টর্চ বের করে নাম্বার প্লেটে দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল সে। এ যে ইসরাইলেল সিকুইরিটি ব্রাঞ্চ 'সিনবেথ' এর তেলআবিব শাখার প্রধান মিঃ চেচিনের গাড়ী। শিকারি বিড়ালের মতো ধীরে ধীরে মাহমুদ গাড়ীর সামনের দিকে এগুলো। গাড়ীতে কেউ নেই। ওরা কি তাহলে আস্তানার ভিতরে ঢুকেছে? পেন্সিলটর্চটি আর একবার জ্বেলে মাহমুদ গাড়ীটি পরীক্ষা করল। সামনের সীটের উপর সে নোট বুক পেল। তাড়াতাড়ি সে নোট বুকখানা পকেটে পুরে সরে এল গাড়ীর কাছ থেকে। তারপর কি মনে করে সে আবার ফিরে গেল গাড়ীর কাছে। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে বের করল ডিম্বাকৃতি একটি বস্তু - টাইম বম। ধীরে ধীরে সেফটিপিন খুলে নিয়ে তা রেখে দিল সামনের সীটের নীচে। তারপর সরে এল সেখান থেকে।

মাহমুদ আফজলের কাছে ফিরে এল। বলল, সিনবেথ এর লোক এসেছে। তাদের সংখ্যা এক থেকে চার এর বেশী হবে না। গোপনে আস্তানা পরীক্ষা করা ওদের লক্ষ হতে পারে। তা যাই হোক শেখ জামালের চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি তারা। সে একাই যথেষ্ট হবে। শেখ জামালের কেশাগ্রও তারা স্পর্শ করতে পারবে না। সব চিহ্ন মুছে ফেলে সে এককক্ষণে সরে পড়েছে।

উপর তলার ঘরে রাখা আলমারির মধ্যে দিয়ে নীচের তলায় ফলের দোকানে নামবার সিঁড়ি আছে। ফলের দোকানের বসবার বেদিটি একটি সুড়ঙ্গের মুখে রয়েছে। সে সুড়ঙ্গ দিয়ে আস্তানার গ্যারেজে পৌঁছা যায় এবং সেখান থেকে গাড়ী নিয়ে অথবা পিছনের দরজা দিয়ে যে কোন মুহূর্তে সরে পড়া সম্ভব। সুড়ঙ্গে নামবার পর বসবার বেদিটি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। সুতরাং 'সিনবেথ' এর পক্ষে তা খুঁজে পাওয়া খুব সহজ হবে না।

গাড়ীতে উঠে বসতে বসতে মাহমুদ বলল, 'সিনবেথ' এর মিঃ চেচিন সাহেবের জন্য ফাঁদ পেতে রেখে গেলাম। খোদা করেন শিকার ধরা পড়বে। বলে আফজলের দিকে চেয়ে মাহমুদ বলল, এবার ঘরে ফিরে যাই চল। শেখ জামালকে হয়তো ওখানে পাব আমরা।

ইসরাইলের প্রতিটি শহরে ও উল্লেখযোগ্য স্থানে সাইমুমের একটি করে মূল ঘাঁটি রয়েছে। এখানে 'ঘর' বলতে মাহমুদ তেলআবিবের মূল ঘাঁটিকেই ইংগিত করেছে। ঘাঁটি ছাড়াও ঐ সমস্ত স্থানে রয়েছে কয়েকটি করে আস্তানা। এই আস্তানা গুলির ভূমিকা এ্যাকোমোডেশন ও তথ্য সরবরাহের মধ্যে সীমাবদ্ধ। গাড়ী সেন্ট সলোমন রোড ধরে উত্তর দিকে এগিয়ে চলল। মাহমুদ গভীর চিন্তায় নিমজ্জিত। ওসেয়ান কিং জাহাজের ঘটনা সিনবেথবে ক্ষ্যাপা কুকুরের মত করে তুলেছে, কিন্তু মাহমুদ ভেবে পাচ্ছে না, সিনবেথ তাদের এ আস্তানার সন্ধান পেল কি করে?

তেলআবিবের শহরতলী এলাকা। তাই বলে ঘিঞ্জি বস্তি এলাকা নয়। অভিজাত আবাসিক এলাকা। পারিল্পনা করে সাজানো ইসরাইলের অনেক মাথাওয়ালা এবং বৈদেশিক মিশনের বাড়ীগুলি এ অঞ্চলেই। মাহমুদের গাড়ী এসে এক বিরাট অট্টালিকার সামনে দাঁড়াল। কাল পাথরে তৈরী বাড়ীর সামনে সাদা মার্বেল পাথরে খোদাই করা। বাড়ীটির নাম 'গ্রীণলজ'। বাড়ীটির সামনে বিরাট একটি সাইন বোর্ড 'দানিয়েল এন্ড কোং'। বাড়ীটিকে ঘন ছায়াদার নানা গাছ যেন চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। মাহমুদ স্থানটি পার হতেই ভিতরে নীল আলো জ্বলে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল দরজা।

গ্রীণলজের একটি ইতিহাস আছে। ফিলিস্তিন বিভক্ত হবার পূর্বে অর্থাৎ ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইল প্রতিষ্ঠিত হবার আগে আহমদ শরিফ নামে একজন আরব মুসলমান এই গ্রীণলজের এবং সংলগ্ন বিস্কুট ফ্যাক্টরীর ছিল। ১৯৪৪ সালে উলম্যান নামে একজন ইহুদী তার অধীনে বিস্কুট ফ্যাক্টরীতে চাকরি নেয়। বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতার গুণে সে আহমদ শরিফের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয় এবং ফ্যাক্টরীর সহকারী কর্মাধ্যক্ষ পদে উন্নীত হয়। তারপর এল ১৯৪৮ সালের ঝড়ো দিনগুলো। ইহুদীরা ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করল এবং আরব মুসলমানদেরকে উচ্ছেদের অবাধ অধিকার লাভ করল সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে। বৃদ্ধ আহমদ শরিফ নিহত হলেন। তাঁর ছয় ছেলে এবং আত্মীয় স্বজন রাতের অন্ধকারে জর্দান উপত্যকার দিকে পালিয়ে গেল। কিন্তু আহমদ শরিফের নয় বছরের ছেলে মাহমুদ ছিল সেদিন রোগশয্যায় মুমূর্ষ অবস্থায়। উলম্যান বহু কষ্টে আহমদ শরিফের এই

ছেলেটিকে স্বজাতির হিংস্র গ্রাস থেকে রক্ষা করে। ১৯৪৮ সালের পর উলম্যান গ্রীণলজ এবং সন্নিহিত ফ্যাক্টরীর মালিক হয়ে যায়। কিন্তু উলম্যান তার মৃত প্রভুর প্রতি বিশ্বসঘাতকতা করতে পারেননি। সে মাহমুদের ইহুদী নাম দেয় 'দানিয়েল' এবং তার নামেই ফ্যাক্টরীর নামকরণ হয় এবং বাড়ীটির মালিকানা সত্ত্বও তার নামেই লিখিত হয়। মাহমুদ সবার কাছে উলম্যানের পুত্র বলে পরিচিত হলেও প্রকৃত ইতিহাস মাহমুদ জানত। তাঁর পিতার রক্তাক্ত জামা-কাপড় এখনও তার বাক্সে সযত্নে রক্ষিত। মৃত্যু পর্যন্ত উলম্যান কখনও মাহমুদকে প্রভাবিত কিংবা তার জীবনকে কোন দিক থেকে নিয়ন্ত্রিত করতে চায়নি। মাহমুদ ছোটবেলায় ইখওয়ানুল মুসলিমুনের কর্মী তোফায়েল বিন আবদুল্লাহর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করে। কৈশোরে সে মুসলিম যুব আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। তারপর মজলুম মানুষের মুক্তি আন্দোলন সাইমুমে সে যোগদান করে। 'দানিয়েল এন্ড কোং' এর ভার এখন সে একজন ম্যানেজারের হাতে ছেড়ে দিয়ে সংগঠনের কাজে ঘুরে বেড়ায়। সবাই ধারণা করে, ধনী ইহুদীর একমাত্র সন্তান এমন একটু ছন্নছাড়া হতে পারে বৈকি। মাহমুদের বাড়ীই এখন তেলআবিবস্থ সাইমুমের মূল ঘাঁটি। এখানে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন রেডিও রিসিভার ও ট্রান্সমিটার রয়েছে। বাড়ীর পিছনে উঁচু দেয়াল ঘেরা বাগানে রয়েছে তেল, আবিব ও সন্নিহিত অঞ্চলের অস্ত্রাগার। অবিবাহিত মাহমুদের বাড়ীতে রয়েছে ৮ জন মানুষ। এর মধ্যে তিনজন রেডিও ইঞ্জিনিয়ার, চারজন প্রহরী। এদেরই একজন বাজার ও রান্না বান্নার কাজ করে থাকে। এরা সকলেই সাইমুমের অভিজ্ঞ কর্মী।

রাত ১ টা মাহমুদ শোবার জন্য শয্যায় উঠে বসেছে। হঠাৎ তার খেয়াল হল মিঃ চেচিনের গাড়ী থেকে পাওয়া ডাইরীর কথা। উঠে গিয়ে পকেট থেকে ডাইরিটা নিয়ে টেবিলে গিয়ে বসল। ডাইরীটা খুলতেই একটি ভাজ করা কাগজ বেরিয়ে এল। কাগজটি তুলে নিয়ে চোখের সামনে মেলে ধরল। ফটোষ্ট্যাট করা একটি চিঠিঃ

প্রেরকঃ - চেয়ারম্যান, সংযুক্ত ফিলিস্তিন জনফ্রন্ট ও ফিলিস্তিন গণতন্ত্রী জনফ্রন্ট, আম্মান, জর্দান।

প্রাপকঃ পরিচালক, মোসাদ জেরুজালেম, ইসরাইল।

নিম্ন স্বাক্ষরকারী আপনার অবগতি ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংযুক্ত ফিলিস্তিন জনফ্রন্ট ও ফিলিস্তিন গণতন্ত্রী একবিংশ কংগ্রেসের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের অনুলিপি আপনার সমীপে পাঠাইতেছে।

সিদ্ধান্ত

১। যেহেতু সংযুক্ত ফিলিস্তিন জনফ্রন্ট ও ফিলিস্তিন গণতন্ত্রী জনফ্রন্ট কার্ল মার্কস নির্দেশিত সমাজবাদে বিশ্বাসী, সেইহেতু এই ফ্রন্ট ইসরাইল রাষ্ট্রের সাথে ধর্ম সাম্প্রদায়ভিত্তিক শত্রুতামূলক সকল আচরণ পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছে।

২। এই সংযুক্ত ফ্রন্ট জর্দান, সিরিয়া, ইরাক, মিসর প্রভৃতি দেশের প্রতিক্রিয়াশীল জনগোষ্ঠী ও সরকারকে প্রধান শত্রু বলিয়া মনে করে এবং এদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকেই এই ফ্রন্ট আশু কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেছে।

৩। এই ফ্রন্ট তাদের সংগ্রামে ইসারাইল রাষ্ট্রের সাহায্য কামনা করিতেছে বিনিময়ে এই ফ্রন্ট প্রতিশ্রুতি দান করিতেছে যে, এই ফ্রন্ট ইসরাইল বিরোধী সরকার ও সাইমুমের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সবরকম তথ্য পরিবেশন করিবে।

৪। ইসরাইল সরকারের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য এই ফ্রন্টের প্রধান জর্জ বাহাশকে ক্ষমতা প্রধান করিতেছে।

জর্জ বাহাশ<br>
চেয়ারম্যান<br>
সংযুক্ত ফিলিস্তিন জনফ্রন্ট<br>
ও ফিলিস্তিন গণতন্ত্রী জনফ্রন্ট

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে চিঠি পড়া শেষ করল মাহমুদ। তার দেহের প্রতি অণু পরমাণুতে যেন এক প্রচন্ড লাভাস্রোত বয়ে গেল। লৌহ হৃদয়ও তার কেঁপে উঠল। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল তার। কি নিদারুণ বিশ্বাসঘাতকতা! দেশ ও

জাতির বুকে কি নিষ্ঠুর ছুরিকাঘাত। ও! ওরা ‘মার্কস এর অনুসারী অন্যজাত, ইহুদীদের পয়সার দালাল। চোখের কোণ ভিজে উঠতে চাইল মাহমুদের। জর্জ বাহাশদের সুপরিকল্পিত শয়তানীর কবলে পরে তাদেরই অসংখ্য ভাই তাহলে আত্মঘাতি পথে পা বাড়ালো?

সাইমুমের তেলআবিবস্থ ৩ নং আস্তানার পতন তাহলে ওদের এই বিশ্বাসঘাতকতার পরিণতি? ওরাই তাহলে মোসাদের মাধ্যমে সিনবেথদের লেলিয়ে দিয়েছে। কথাটা মনে হতেই বিদ্যুৎ স্পর্শের মত চমকে উঠল মাহমুদ। তাহলে তেলআবিবের মতই সাইমুমের ৫০০ টি আস্তনা তো বিপদের সম্মুখীন? বিভিন্ন শহরে অবস্থিত সাইমুমের মূল ঘাঁটিগুলোর সন্ধান জনফ্রন্ট জানে না বটে, কিন্তু প্রতিটি শহরের ১ টি করে আস্তানার ঠিকানা ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থার মধ্যে সম্পাদিত পারস্পরিক চুক্তি মোতবেক জনফ্রন্টকে জানান আছে। মাহমুদ তাড়াতাড়ি ডাইরীটা বন্ধ করে চিঠি হাতে করে ছুটলো রেডিও রুমের দিকে।

ব্যস্ত সমস্ত হয়ে মাহমুদকে ট্রান্সমিশন রুমে ঢুকতে দেখে রেডিও অপারেটর ইবনে রায়হান বলল, জরুরী কোন কিছু জনাব?

-হ্যাঁ। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে মাহমুদ বলল, সব ঠিক আছে তো?

-হ্যাঁ। উত্তর দিল রায়হান।

আর কোন কথা না বলে মাহমুদ নিজেই ট্রান্সমিশন যন্ত্রের পাশে বসে গেল। রায়হান পাশে সহযোগিতা করতে লাগল তার। ট্রান্সমিটারের কাঁটা ঘুরিয়ে সুইচ টিপে জেরুজালেমের মূল ঘাঁটির সাথে সংযোগ করল মাহমুদ।

-০০১। মারুফ আল কামাল?

-হাঁ, বলছি।

-জরুরী - জরুরী- জরুরী ‘আমাদের সহযোগী জ, ফ, প্রতিষ্ঠান আমাদের প্রতিযোগী কোম্পানীর সাথে হাত মিলিয়েছে। জ, ফ, কোম্পানীর সাথে সম্পর্কিত আমাদের খুচরা বিক্রির দোকানটি বন্ধ করে দিয়ে মালপত্র গোডাউনে ফেরত আনো।

-আচ্ছা আর কিছু?

-না, বলে মাহমুদ কট করে লাইন বন্ধ করে দিয়ে বিভিন্ন এ্যাংগেলে ট্রান্সমিটারের কাঁটা ঘুরিয়ে সুইচ টিপে ঐ একই ধরনের মেসেজে মাসাদা, খান ইউনুস, বীরশিন, হাইফা, আমাদোদ, ইম কাফে, শারম আল শেখ, ইলাত, গাজা, নাবলুস প্রভৃতি শহরের ঘাঁটিগুলোতে প্রেরন করল। তারপর পশ্চিম সিনাই এর রাফা, আল আরিস, কোয়ানতারা, মিতলা গিরিপথ, বীর লাহফান, ববেল লিবনি, আবু আখিলা পিতসানা, বীর গিফ গাফা প্রভৃতি মধ্য সিনাই এর খান জামিল, বীর আলনাফে, বীর আমন, বীর কাছেম, বীর সালেম প্রভৃতি, পূর্ব সিনাই ও সিনাই পর্বত মালার ওয়াদি গালাফা, আবু দোজানা, জেবেল উল ফজল, জেবেল কহর প্রভৃতি, জেরুজালেম অঞ্চলের বীর আসির, তেলবায়ত, রামাত রাহেল, আলাতের উত্তর অঞ্চলীয় নেগিভের আউত, সিরটি, আলখারগা, আতসান জেজারিল ভ্যালির আল ফাসের, আর ওবেদি, হারার হুলেহ ভ্যালির আল-খাজাল, আল-আলামিন এবং গোলান হাইটের আল কুইনিত্রা ও আল বেনিয়াস ঘাঁটিতে সে মেসেজের প্রথম অংশ পাঠিয়ে দিল। জনবিরল এইসব অঞ্চলের ঘাঁটি কিংবা আস্তানার সন্ধান জনফ্রন্টকে জানানো হয় নাই, কারণ এসব অঞ্চলের কোন ঘাঁটি বা আস্তানার পতন ঘটলে নতুন করে তা প্রতিষ্ঠা করা এসব অঞ্চলে খুবই কঠিন।

ঘেমে উঠেছে মাহমুদ। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে গেছে তার। রাত তখন সাড়ে তিনটা। ইসরাইলের সব ঘাঁটিতে সংবাদ পাঠান শেষ করে ট্রান্সমিটারের কাঁটা ঘুরিয়ে আম্মানস্থ হেড কোয়াটেরের সাথে সংযোগ করল মাহমুদ।

-১০০০?

-হাঁ কে আপনি?

-০১১, মাহমুদ! আপনি?

-আবদুল্লাহ আমিন।

মেসেজ রেকোর্ড করুন, বলে মাহমুদ মিঃ চেচিনের ডাইরীতে প্রাপ্ত সমস্ত চিঠিটা সাইমুমের বিশেষ কোডে পাঠিয়ে দিল।

কপালের ঘাম মুছে মাহমুদ উঠে দাঁড়াল। রায়হানের দিকে চেয়ে হেসে বলল মাহমুদ বিস্মিত হয়েছো রায়হান? ভুলে যাচ্ছে কেন, আবদুল্লাহ বিন ওবাই এর জন্মতো যুগে যুগে হবে। বলে মাহমুদ বের হয়ে এল ট্রান্সমিশন রুম থেকে।

তখন রাত ৩টা ৪৫ মিঃ। মাহমুদ তার ঘরে ফিরে গিয়ে টেবিলে বসল, মিঃ চেচিনের ডাইরীটা আবার মেলে ধরল চোখের সমনে। গভীর রাতের নিঝুম প্রহর। মাহমুদ হাত ঘড়ি থেকে ক্ষীণ কম্পন জাগছে বাতাসে -টিক, টিক, টিক - বয়ে চলেছে সময়।

# ৮

রাত তিনটা পয়ঁতাল্লিশ মিনিটা। তেলআবির থেকে মাহমুদের পাঠান মেসেজের প্রতি চোখ বুলিয়ে থেকে বিদ্যুৎ স্প্রিংএর মত উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

মনে হল কি এক তীব্র বেদনায় তার সারা মুখমন্ডল নীল হয়ে গেছে। কিন্তু ধীরে ধীরে সে ভাব তার কেটে গেল আর চোখ দু'টি জ্বলে উঠল। মুখমন্ডল হয়ে উঠল শক্ত। কয়েকবার অস্থিরভাবে পায়চারি করল সে। তারপর দেয়ালে টাঙ্গানো জর্দানের মানচিত্রের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের উপর তার দৃষ্টি স্থির হয়ে দাঁড়াল। জেবেল আল শামছ -সংযুক্ত জনফ্রন্টের হেড কোয়ার্টার। ওরা আজ এক মিটিং এ এসেছে। ভালো হল পাওয়া যাবে এক সঙ্গে। কিন্তু জর্জ বাহাশ নেই। গেছে উত্তর ভিয়েতনাম সফরে। ওর জন্য দন্ড তোলা রইল।

আহমদ মুসা চেয়ারে গিয়ে বসল। বাম পাশের এক সুইচে মৃদু চাপ দিল। কিছুক্ষণ পরে পাশের কক্ষ থেকে আহমদ মুসার সেক্রেটারী আলি বিন সাকের এসে হাজির হল। আহমদ মুসা বলল, জাফর যুবায়ের ও ইউসুফকে তৈরী হতে বলো। জীপ রেডি আছে কিনা দেখো। এহসান সাবরিকে এখনি আমার কাছে আসতে সংবাদ দাও।

সাইমুমের এ্যাকসন স্কোয়াডের আম্মানস্থ অধিনায়ক এহসান সাবরি আহম্মদ মুসার কক্ষে প্রবেশ করল। আহম্মদ মুসা দাঁড়িয়ে ছিল। এহসান সাবরিকে বসতে বলে সেও চেয়ারে গিয়ে বসল। আহমদ মুসা এহসানকে জনফ্রন্টের ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে বলল, আমি জেবেল আল শামছ এ যাচ্ছি। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ১০০ জন মুজাহিদ নিয়ে তুমি এস। তুমি ৫০ জন মুজাহিদ নিয়ে বাব উল মাশরেক নিয়ে জেবেল যাবে এবং তালাবের নেতৃত্বে অন্য ৫০ জনকে বাব-উল-শেমাল দিয়ে প্রবেশ করতে বলবে। বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। এহসানও

উঠল। এহসান সাবরি বের হয়ে যেতেই আলি বিন শাকের ঘরে ঢুকলো। বলল, সব রেডি জনাব।

আহমদ মুসা কোন কথা না বলে আলির হাতে একটি চিঠি দিয়ে বলল, ‘মেসেজটি জেবেলে আমাদের হেড কোয়ার্টারে ইবনে সাদের কাছে এখনি পৌছে দিবে। বাদশাহ আবুল হিশামের (জর্দানের বাদশাহ) কাছে এ মেসেজ পাঠানো হয়েছে। অন্যান্য সকল আরব রাষ্ট্র প্রধানের কছে এ মেসেজ অবিলম্বে পৌঁছাতে হবে। ইবনে সাদ হেড কোয়ার্টারে প্রধান রেডিও বার্তা প্রেরক।

জাফর, যুবায়ের ও ইউসুফ অপেক্ষা করছিল। আহমদ মসা গাড়ীতে উঠতেই গাড়ী ছেড়ে দিল। সাইমুমের নাইট অপারেশনের কালো রংয়ের বিশেষ ইউনিফর্ম তাদের পরিধানে। দু’টি করে রিভলভার ছাড়া অন্যকোন অস্ত্র নেই তাদের কাছে।

আম্মান থেকে যে মহা সড়ক উত্তর দিকে গেছে,সেই সড়ক দিয়ে তীর বেগে ছুটে চলেছে আহমদ মুসার গাড়ী। রাতের নিস্তব্ধ প্রহর। জমাট অন্ধকার চারিদিকে। চাঁদ নেই তারার মেলা বসেছে আকাশে।

আহমদ মুসা ভাবছে, সাবধান হবার সুযোগ না দিয়েই ওদের কছে পৌছতে হবে। তাই যথা সম্ভব রক্তপাত ও সংঘর্ষ এড়াতে হবে। প্রহরীদেরকে নিঃশঙ্ক করার জন্যই মুসা নিরস্ত্র অবস্থায় এসেছে।

আম্মান থেকে ৭০ মাইল দূরে জেবেল আল শামছের পূর্ব দিকের প্রবেশ মুখ বাব -উল -মাশরেকের সন্নিকটবর্তী হল মুসার গাড়ী। গাড়ীর হেড লাইটের আলো বাব -উল -মাশরেকে গিয়ে পড়েছে। ষ্টেনগান উচিয়ে প্রহরীরা দাঁড়িয়ে আছে দেখা যাচ্ছে। দ্বিধাহীন গতিতে আহমদ মুসার গাড়ী গিয়ে ওদের সামনে থামল। গাড়ী থামাতেই ওরা দাঁড়াল চারিদিক থেকে। গাড়ী থেকে ওরা চারজনই নামল। আহমদ মুসাকে দেখে জনফ্রন্টের প্রহরীরা পিছিয়ে দাঁড়াল কয়েক পা। উচিয়ে ধরা ষ্টেনগান নেমে পড়ল তাদের। ঘটনার আকস্মিকতায় ওরা যেন বিহবল। আহমদ মুসা বলল, বাজাজ ডেকেছে, জরুরী কাজ আছে ।

আবদুর রহমান বাজাজ সংযুক্ত জনফ্রন্টের সেক্রেটারী জেনারেল। প্রহরীরা পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করল, তারপর পথ ছেড়ে দুই পাশে সরে

দাঁড়াল তারা। আহমদ মুসার গাড়ী এগিয়ে চলল। পথে আরও দু'জায়গায় দাঁড়াতে হল, কিন্তু কোন অসুবিধা হল না তাদের। প্রহরীরা কোনই সন্দেহ করতে পারেনি। আহমদ মুসা ভাবল জনফ্রন্টের ঊর্ধ্বতন কর্তা ব্যক্তিদের ষড়যন্ত্রের বিষয় বোধ হয় এ বেচারাদের পুরোপুরি অবহিত করা হয়নি। হয়তো বা আদৌ জানান হয়নি। তাছাড়া কর্তা ব্যক্তিদের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের বিষয়টি সম্পূর্ণ বুঝে উঠা এ সরল মুসলিম যুবকদের পক্ষে খুব সহজনয়। সুতরাং বিষয়টির প্রয়োজনীয় গুরুত্ব সম্পর্কে তারা কিছুটা অবচেতন থাকবে - সেটাই স্বাভাবিক। সর্বোপরি মুক্তিফ্রন্টের সকল অঙ্গ দল, এমন কি আরব রাষ্ট্রগুলোর উপর সাইমুমের আহমদ মুসার প্রভাবের বিষয় তারা অবহিত আছে।

গাড়ী ছেড়ে দিয়ে অসমান গিরি পথ দিয়ে আহমদ মুসারা হেঁটে চলছিল।

জেবেল আল শামছের গুহার মুখে একটি চৌকোণ পাথুরে বাড়ী। সুদৃঢ় দেয়ালের মাঝখানে ভিতরে প্রবেশের একটি মাত্র পথ। গেটে দু'জন ষ্টেনগানধারী প্রহরী। আহমদ মুসা ও তার অনুচররা শান্ত ও প্রসন্নমুখে সেখানে এসে দাঁড়াল। দূরে থাকতেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রহরীদ্বয় তাদের পরীক্ষা করছিল। কি ভাবল তারা, নিজেদের স্থারে একটু নড়ে চড়ে দাঁড়াল। আহমদ মুসা স্বাভাবিক দ্রুত কন্ঠে বল মিটিং শেষ হয়নিত?

-জি না, একজন প্রহরী জবাব দিল।

-বাজাজ আমাদের ডেকেছেন।

একটু অপেক্ষা করতে হবে আপনাদের জনাব। বলে প্রহরীটি দরজার বাম পাশের দেয়ালে রক্ষিত সুইচ বোর্ডটি উপরে ঠেলে ধরল। সুইচ বোর্ডটি উপরে উঠে গেলে নিচে দেয়ালের সমান্তরাল করে বসিয়ে রাখা একটি কাল বেজের উপর ক্ষুদ্র একটি সাদা বোতাম দেখা গেল। বোতমে চাপ দিতেই ইস্পাতের ভারি দরজাটি নিঃশব্দে খুলে গেল।

একজন প্রহরী খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আহমদ মুসা ইউসুফকে একটি সংকেত দিয়ে, জাফর ও যুবায়েরকে নিয়ে খোলা দরজা পথে ভিতরে ঢুকে পড়ল। প্রহরীটি কয়েকপদ এগিয়ে ছিল মাত্র। পেছনে পদশব্দ শুনে ফিরে তাকাল। কিন্তু ততক্ষণে যুবায়েরের রিভলভার তার কপাল লক্ষ্যে উঠে

এসেছে। ভয়ে মুখ তার বিবর্ণ হয়ে গেল। জাফর দ্রুত গিয়ে তার নাকে ক্লোরফর্মের রুমাল চেপে ধরল।

এদিকে ইউসুফ অপর প্রহরীটির কাছ থেকে ষ্টেনগানটি কেড়ে নিয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়েছে জাফরের মত একই উপায়ে।

একটি ষ্টেনগান নিয়ে ইউসুফকে গেটে থাকতে এবং অপরটি নিয়ে যুবায়ের ও জাফরকে আসতে বলে আহমদ মুসা দ্রুত মিটিং রুমের দিকে চলল।

সংযুক্ত জনফ্রন্টের সেক্রেটারিয়েটে বসেছে মিটিং। প্রবেশের দরজাটি বন্ধ ছিল না, ভেজানো ছিল মাত্র। দরজাটি ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করল আহমদ মুসা।

একটি প্রকান্ড সেক্রেটারিয়েট টেবিল ঘিরে বসে আছে ১১ জন মানুষ। একটি রিভলভিং চেয়ারে বসে আছে আবদুর রহমান বাজাজ। তার সামনে বিরাট একটি ফাইল। তার পাশের বড় রিভলভিং চেয়ারে বসে আছে জনফ্রন্টের সহ সভাপতি আবদুল করিম হাসুনা। জর্জ বাহাশের অনুপস্থিতে সেই আজকের মিটিং এর সভাপতি। সেক্রেটারিয়েট টেবিলটির অন্য পাশে গোল হয়ে বসে আছে সংযুক্ত জনফ্রন্টের কার্যকরী কমিটির নয় জন সদস্য। দরজা খোলার শব্দে চোখ ফিরাল তারা দরজার দিকে। আহমদ মুসাকে দরজায় দাঁড়ানো দেখে বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে পড়ল সবাই। তাদের বুদ্ধির উপর দিয়ে যেন হিম শীতল এক স্রোত বয়ে গেল। কিন্তু আবদুর রহমান বাজাজ ও আবদুল করিম দ্রুত সামলে নিল নিজেকে। তারা দু'জনেই পকেটে হাত দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা হেসে বলল, আব্দুর রহমান, আবদুল করিম পকেট থেকে আর হাত বের করো না। লাভ হবে না কোনও। বাইরে মোতায়েন তোমাদের সব লোক ধরা পড়েছে, সবদিক ঘিরে ফেলা হয়েছে তোমাদের এ ঘাঁটি।

আহমদ মুসার কথাগুলো শান্ত কিন্তু দৃঢ়। হৃদয়ের প্রতিটি তন্ত্রীতে তা যেন আঘাত করে। নিরস্ত্র আহমদ মুসার এ কথাগুলো যেন সম্মোহিত করল ওদের। আবদুর রহমান কিংবা আবদুল করিম কারুরই হাত পকেট থেকে বের হলো না। মনে হল, আহমদ মুসার কথা তারা অবিশ্বাস করেনি।

জাফর ও যুবায়ের এসে ঘরে ঢুকল। আহমদ মুসা বলল, জাফর ওদের সব অস্ত্র নিয়ে নাও। পাঁচমিনিটের মধ্যে ওদের সকলকে বাঁধা হয়ে গেল। আহমদ মুসা এগিয়ে গিয়ে বাজাজের ফাইলটি তুলে নিল। ফাইলের দিকে মুহূর্তকাল তাকিয়ে বলল, সাইমুমের অবস্থান সমূহের তথ্য যোগাড় করছ কার জন্য বাজাজ, তোমার প্রভু ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রীর জন্য? বলে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকায় বাজাজের দিকে। তারপর বলল, ইসরাইলকে যে সব তথ্য সরবরাহ করেছ, তার ফাইল কোথায়? বাজাজ কোন উত্তর দিল না। আহমদ মুসা বলল, সময় নষ্ট করো না বাজাজ। তুমি তো জান কথা কেমন করে বলাতে হয়, সে পদ্ধতি আমার জানা আছে।

এই সময় পূর্ব ও উত্তর দিক থেকে ভারী মেশিনগানের শব্দ শোনা গেল। মাত্র মিনিট দেড়েক। তারপর সব নীরব।

বাজাজ বলল, টেবিলের ড্রয়ারের তলায় বোতাম আছে। বোতামে চাপ দিলে টেবিলের নিচে মেঝের কিছু অংশ সরে যাবে, সেখানে পাবে একটি আয়রণ সেল্ফ, তাতে সব পাবে।

আহমদ মুসা জনফ্রন্টের সদস্য সাবির জামালের দিকে চেয়ে বলল, তুমি বোতামে চাপ দাও। সত্যই টেবিলের নিচে আয়রণ সেল্ফ পাওয়া গেল এবং তাতে পাওয়া গেল এক স্তুপ ফাইল। ফাইলগুলোর হেডিং একবার পরীক্ষা করল আহমদ মুসা। এহসান সাবরি এসময় ঘরে প্রবেশ করল।

-সংবাদ কি এহসান? আহমদ জিজ্ঞাসা করল।

-ওরা সকলে আত্ম-সমর্পন করেছে জনাব। বলল এহসান সাবরি।

-বেশ, তুমি রক্তক্ষয় এড়াতে পেরেছ। শয়তানরা তো আমাদের মধ্যে আত্মঘাতি সংঘর্ষ লাগিয়ে আমাদের দুর্বল করতে চায়।

কিছুক্ষন হাসল আহমদ মুসা। তারপর বলল, আমরা এদের নিয়ে চলে যাচ্ছি। তুমি গোটা ঘাঁটি সার্চ্চ করে ওদের নিয়ে এস।

১১ জন বন্দীকে নিয়ে, জাফর, যুবায়ের ও ইউসুফ আহমদ মুসার সাথে আম্মানের ঘাঁটিতে ফিরে এল। আহমদ মুসা তাঁর চেয়ারে এসে বসতেই আলি সাবের এসে জানাল বাদশাহ তাঁর খোঁজ করেছিলেন।

আহমদ মুসা তার পাশে সাদা রং এর টেলিফোনটি তুলে নিল।

-হ্যালো, আহমদ মুসা বলছি।

-আচ্ছালামু আলায়কুম, আবুল হিশাম বলছি।

-ওয়াআলায়কুম ছালাম। জনাব কি আমার খোঁজ করেছিলেন?

-জি, হাঁ। আপনার পাঠানো মেসেজ পেয়েছি। মারাত্মক সংবাদ। শাহ সউদ মিসরের আনোয়ার রশিদ

-জ্বি হাঁ। সব আরব রাষ্ট্র প্রধানের কাছে মেসেজটি পাঠানোর নির্দেশ আমি সংগে সংগে দিয়েছি।

-যাক, আমার ভার লাঘব করেছেন। আচ্ছা জনফ্রন্ট সম্বন্ধে কি চিন্তা করছেন?

-সংযুক্ত জনফ্রন্টের হেড কোয়াটার থেকে এইমাত্র এলাম। জর্জ বাহাশ ছাড়া জনফ্রন্টের কার্যকরী পরিষদের সবাইকে বন্দী করেছি। তাদের হেড কোয়ার্টারের অন্যান্য লোকজনও ধরা পড়েছে। যথসম্ভব দ্রুত জনফ্রন্টের লোকদের গ্রেপ্তার করার জন্য সাইমুমের সব ঘাঁটিতে নির্দেশ পাঠিয়েছে।

-আবদুর রহমান বাজাজ ও আবদুল করিম হাসুনার খবর কি? হাঁ, ওরা ধরা পড়েছে।

আলহামদুলিল্লাহ্ আল্লাহ আপনানের হাত কে আরো শক্তি শালী করুন।

-দোয়া করুন জনাব, ফিলিস্তিনের মুক্তি যেন আল্লাহ ত্বরান্বিত করেন এবং বিশ্বের মজলুম মানুষের মুক্তির যেন এটা হয় শুভ পদক্ষেপ।

-আল্লাহ সহায়। তিনি সর্বশক্তিমান।

-জনাব, সংযুক্ত আরব কমান্ড এবং নিখিল আরব নিরাপত্তা কাউন্সিলের শীর্ষ বৈঠকের কতদূর?

-সব ঠিকঠাক, তারিখ নির্দিষ্ট করার বাকী আছে।

-আসছে পবিত্র রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখের মধ্যে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলে ভালো হয়।

-দোয়া করুন। রাখি এখন।

-আচ্ছা, খোদা হাফেজ।

-খোদা হাফেজ। টেলিফোন রেখে রিভলভিং চেয়ারেটিতে গা এলিয়ে দিল আহমদ মুসা। ক্লান্তিতে গোটা শরীর ভেঙ্গে আসছে। পূর্বের জানালা দিয়ে আসা স্নিগ্ধ বাতাস খুব ভালো লাগছে তার। ঘুমে জড়িয়ে আসতে চাইছে চোখ। হঠাৎ চারদিকের নীরবতা ভেঙ্গে মোয়াজ্জিনের কণ্ঠ শোনা গেল। আম্মানের শাহী মসজিদের উঁচু মিনার থেকে ভেসে আসছে আজান। আজানের মধুর ধ্বনি কেঁপে কেঁপে মিলিয়ে যাচ্ছে নিঃসীম নভোমন্ডলের ইথার কণায়। মোয়াজ্জিন ডাকল, হায়া আলাচ্ছালাহ। আহমদ মুসার মন মুহূর্ত ছুটে গেল জেরুজালেমের মুসলিম জনপদে। ওরা কি এই ধ্বনি এমনি করে শুনতে পাচ্ছে? মসজিদুল আকসার মিনার থেকে মোয়াজ্জিন কি এ আহবান জানাতে পারছে নিরুদ্বেগ চিত্তে? চোখের কোণ ভিজে উঠল আহমদ মুসার। ফিলিস্তিনী মজলুম ভাইদের মুক্তির সোনালী দিগন্ত আর কত দূরে? তেলআবিব, হাইফা, জেরুজালেম, ইলাত হেব্রন, গাজা প্রভৃতি শহরের মসজিদের মিনার শীর্ষ থেকে কবে মোয়াজ্জিনের এমনি স্বাধীন কণ্ঠ শোনা যাবে? সুবেহ সাদেরকের স্বর্গীয় স্পর্শে পূর্ব দিগন্ত শুভ্র হয়ে উঠেছে। আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল অজু করার জন্য।

# ৯

জেবেল আলনুর। সাইমুমের হেড কোয়ার্টারের বিচার কক্ষ। প্রধান কাজী শেখ আলী কুতুব কাজীর আসনে সমাসীন। জনফ্রন্টের সদস্যদের বিচার আজ। জনফ্রন্টের মোট পাঁচ হাজার সদস্য ধরা পড়েছে এবং নেতৃবৃন্দের মধ্যে জর্জ বাহাশ ছাড়া সকলেই বন্দী হয়েছে।

আবদুর রহমান বাজাজ এবং আবদুল করিম হাসুনাসহ ২৭ জন জনফ্রন্ট কর্মকর্তা আসামীর কাঠগড়ায় দন্ডায়মান। বাদী মুসলিম জনগণের পক্ষে সাইমুম প্রধান আহমদ মুসা। বাদীর পক্ষ থেকে আরজি পেশ করতে এলেন আহমদ খলিল। তিনি বললেন, আসামী জনফ্রন্টের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বাদী পক্ষের আরজ এই যে,

১। আসামীরা মুসলিম মিল্লাত থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে সম্পূর্ণ ভিন্ন মতাদর্শের দুশমনদের আনুগত্য স্বীকার করেছে;

২। আসামীরা তাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠান ও আরব রাষ্ট্র সমূহের সাথে সম্পাদিত চুক্তির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ;

৩। আসামীরা মুসলিম জনগণের শত্রু ইসরাইলের সাথে আঁতাত করে নিম্নলিখিত বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করেছে;

(ক) ফিলিস্তিনী জনগণের আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামরত সাইমুমের ইসরাইলস্থ গোপন আস্তানাগুলোর ঠিকানা ইসরাইলকে সরবরাহ করেছে;

(খ) সাইমুম ইসরাইলের গোপন সামরিক তথ্যাদি সংগ্রহ করছে, এই খবর ইসরাইলকে জানিয়েছে;

(গ) মুসলিম নরনারীর ছদ্মবেশে যে সমস্ত ইহুদী মুসলিম পরিবারে জড়িত থেকে ইসরাইলের জন্য গোয়েন্দাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, সাইমুম তাদের খুঁজে বের করছে, একথা ইসরাইলকে জানিয়েছে এবং নতুন করে গোয়েন্দা চক্র স্থাপনের জন্য সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

৪। আরবের মুসলিম জনগণ, আরব রাষ্ট্র এবং সাইমুমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রমূলক কাজের সিদ্ধান্ত আসামীরা গ্রহণ করেছে। পরিশেষে আহমদ খলিল বলল বাদী পক্ষের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য আপনার কাছে প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র ও নথিপত্র পেশ করা হয়েছে।

কাজীর পক্ষ থেকে আসামীদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলো, বাদীর অভিযোগ তারা স্বীকার করে কিনা। আবদুর রহমান বাজাজ কাজীর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে জানাল, আমাদের বিচার করবার কোন ক্ষমতা আপনাদের আইনের নেই।

-'আপনাদের আইন' বলতে আসামী মুসলিম আইন বুঝিয়েছেন কি? কাজী আলী কুতুব জিজ্ঞাসা করলেন।

কাজীর প্রশ্নটির কোন জবাব আবদুর রহমান বাজাজ দিল না।

আবদুর রহমান বাজাজের কথাই উপস্থিত সকল আসামীর কথা কিনা কাজী সাহেব জানতে চাইলেন। আসামীরা সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।

কাজী আলী কুতুব গভীর অভিনিবেশ সহকারে কিছুক্ষণ সম্মুখের নথিপত্র নাড়াচাড়া করলেন। তারপর কলম তুলে নিলেন হাতে।

তিনি ঘোষণা করলেনঃ আসামীদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত এবং প্রমাণিত অভিযোগ অনুযায়ী আসামীগণ দুই ধরনের অপরাধে অপরাধী। প্রথমতঃ মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে শত্রুদের সাথে যোগ দিয়েছে। অপরাধের প্রকৃতি হিসাবে প্রথম অপরাধটি প্রধান এবং দ্বিতীয় অপরাধ প্রথম অপরাধের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া মাত্র। এই দিক দিয়ে আসামীদের একটিই মূল অপরাধ এবং তা হলো, ইসলামের আনুগত্যের অস্বীকৃতি এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের বিরুদ্ধে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, ইসলামের ইতিহাসে তার জলন্ত প্রমাণ রয়েছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) এর মৃত্যুর পর আরবের কতিপয় সুযোগ সন্ধানী ব্যক্তি ইসলামের আনুগত্য অস্বীকার এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করে। চরম প্রতিকূল পরিস্থিতি স্বত্ত্বেও আমিরুল মোমিনিন হযরত আবুবকর (রাঃ) ইসলামের প্রশ্নে কোন আপোস কনসেশনের বিষয় নীতি বিরুদ্ধ ঘোষণা করে বিদ্রোহী মুরতাদদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ইসলামের আনুগত্যে পুনরায় ফিরে না এসেছ এমন প্রতিটি বিদ্রোহীকে

হত্যা করা হয়েছে। অর্থাৎ মৃত্যুদন্ডই হলো ইসলামের আনুগত্য অস্বীকারকারী বিদ্রোহীদের একমাত্র শাস্তি। ইসলামী সংবিধানের নির্দেশও তাই। আমাদের বর্তমান আসামী অর্থাৎ জনফ্রন্টের বিদ্রোহী আসামীদের বেলায়ও এই আইনই প্রযোজ্য। তারা অনুতপ্ত হয়ে যদি ইসলামের আনুগত্যে পুনরায় ফিরে আসে, তাহলে তাদের প্রথম অপরাধ ক্ষমার যোগ্য। এক্ষেত্রে তাদের দ্বিতীয় অপরাধের শাস্তি হিসেবে ফিলিস্তিনের সার্বিক মুক্তি না আসা পর্যন্ত তাদেরকে কারাগারে আটক থাকতে হবে। আর যদি ইসলামের আনুগত্যে ফিরে আসতে অস্বীকার করে তাহলে মৃত্যুই হবে তাদের শাস্তি। রায় ঘোষণা শেষ হতেই আসামীর কাঠগড়া থেকে সংযুক্ত জনফ্রন্টের ওয়ার্কিং কাউন্সিলের সদস্য আবদুল্লাহ ওয়াসিম এবং হাসান তালাত উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমরা আমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত। আমরা আমাদের ভুল বুঝতে পেরেছি। আমরা ইহুদীরের অর্থের প্রলোভনে পড়ে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ও মজলুম ফিলিস্তিনীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকাতা করেছিলাম। আমারা মার্কসের সমাজ দর্শনকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বিকল্প মনে করতে পারি না। আমরা আমাদের পদস্থলনের জন্য রাববুল আলামিন আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থী। তিনি দয়া করে আমাদের ক্ষমা করুন।

কাঠগড়ার অপর পঁচিশ জন আসামী মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইল। আসামীদেরকে কাঠ গড়া থেকে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। পরে জনফ্রন্টের পাঁচ হাচার আসামী মুজাহিদের বিশজন প্রতিনিধিকে এনে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হলো। তাদের বিরুদ্ধেও ঐ একই অভিযোগ এবং কাজী আলী কুতুব ঐ একই রায় ঘোষণা করলেন। জনফ্রন্টের সদস্যরা শান্তচিত্তে ও নতমস্তকে অভিযোগ ও রায় শ্রবণ করলো। রায় ঘোষণা শেষ হলে, আসামী পক্ষ থেকে এক জন বলল, বাদী পক্ষ থেকে যে অভিযোগ সমূহ উত্থাপন করা হছেয়ে, আমরা বন্দী দশায় এসে তা জানতে পারলাম। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য হলো, বিভিন্ন ভালো দিকের কথা আমাদের বলা হতো। কিন্তু আমাদের কর্তৃপক্ষ যে ইসলামের গন্ডী থেকে বেরিয়ে গিয়ে মার্কসের দর্শন গ্রহণ করেছেন, আমরা তা অবহিত নই। আমাদের নেতৃবৃন্দ যে আমাদের শত্রুদেশ ইসরাইলের সাথে আতাঁত করেছেন আমাদের ভ্রাতৃপ্রতিষ্ঠান সাইমুম এবং আমাদের সাহায্যকারী আরব রাষ্ট্র সম্পর্কে

বিভিন্ন গোপন তথ্য সরবরাহ করেছেন, আরব রাষ্ট্রসমূহ ও সাইমুমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রস্ততি নিচ্ছেন, আমরা সে সম্পর্কে ঘূনাক্ষরেও কিছু জানি না। এমন কি ইসরাইলস্থ জনফ্রন্টের ঘাঁটি সমূহের কর্মকর্তারাও সংস্থার নেতৃবৃন্দের পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত নয়। নেতৃবৃন্দ সরাসরি ইসরাইল রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে যোগাযোগ করেছেন। সাইমুমের আস্তানা সমূহের ঠিকানাও আমাদের নেতৃবৃন্দ সরাসরি ইসরাইল নেতৃবৃন্দকে জানিয়েছেন। আমরা সজ্ঞানে কোন অপরাধ করিনি। ষোল তারিখ রাতে এক জরুরী বার্তায় আমাদেরকে জানানো হয় যে, সাইমুমের সাথে আমাদের মতান্তর দেখা দিতে পারে, বিভিন্ন স্থানে ওদের অবস্থান, ওদের সংখ্যা ওদের কার্যকলাপ ও কার্যপদ্ধতির বিশদ বিবরণ হেড কোয়ার্টারে পৌঁছাও এবং কোন কাজে ওদের সহযোগিতা করো না। এ নির্দেশ ছাড়া ইসরাইলসস্থ আমাদের সহকর্মীদেরকে অতিরিক্ত আর একটি নির্দেশ দেওয়া হয় এবং তা হলো - ষোল তারিখ রাতেই তারা যেন সমস্ত পুরাতন ঘাঁটি ছেড়ে দেয়। এ নির্দেশ আমাদের প্রতিও ছিল, আমাদের জন্য পুরাতন ঘাঁটি ছেড়ে দেবার সময় নির্দিষ্টি ছিল ১৮ তারিখ সন্ধ্যায় জেবেল আল-শামছের আমাদের হেড কোয়ার্টারও অন্যত্র স্থানান্তরিত হতো। কিন্তু এ পরিকল্পনার ১২ ঘন্টা আগেই সাইমুম তাদের সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিতে এগিয়ে যায়। আমাদের এই বক্তব্যের আলোকে মহামান্য আদালত সমীপে বন্দী ৫ হাজার মুজাহিদের তরফ থেকে আমাদের আরজ, আমরা নির্দোষ। আমরা জ্ঞানতঃ আমাদের রসূল (সঃ) এবং আমাদের ধর্ম ইসলামের বিরুদ্ধে কোন বিদ্রোহ করিনি এবং এ ধরনের কোন পরিকল্পনাও করিনি। আমরা আমাদের ভ্রাতৃ প্রতিষ্ঠান সাইমুম এবং কোন আরব রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জ্ঞানতঃ কোন ষড়যন্ত্রে যোগ দেইনি কিংবা এ ধরনের কোন ইচ্ছাও পোষণ করিনি।

জনফ্রন্টের ৫ হাজার মুজাহিদ বেকসুর খালাস হয়ে গেল। পরে তারা সাইমুমের সঙ্গে এক সাথে কাজ করার জন্য শপথ গ্রহণ করল। আহমদ মুসা তাদেরকে রাজনৈতিক শিক্ষা ও সামরিক ট্রেনিং গ্রহণের জন্য সউদী আরবের আল-আসির এলাকার একটি পাঠিয়ে দিল। সাইমুমের রাজনৈতিক শিক্ষার মধ্যে ইসলামী শিক্ষা, ইসলামী জীবন দর্শনের সার্বজনীনতা এবং জগতের অন্যান্য মতাদর্শের পরিচয় শামিল রয়েছে। সাইমুমের সদস্য হওয়ার জন্য এই জ্ঞানলাভ

অপরিহার্য। এই কড়াকড়ি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে আহমদ মুসা বলেন, এই জ্ঞানটুকু ছাড়া এক জন মুসলমান তার আত্ম পরিচয় লাভ করতে পারে না। আত্ম পরিচয়ই যে পেলো না, সে নিজের এবং দুনিয়ার অপর কারও কোন উপকার করতে পারে না।

# ১০

তেলআবিব সেক্রেটারীয়েট ভবনের প্রতিরক্ষা বিভাগ। বিরাট সিটিং রুম। কাল কার্পেটে মোড়া মেঝে। সোফা দিয়ে সুন্দর করে সাজানো ঘর। মাঝখানের সোফাটিতে বসে আছেন প্রধানমন্ত্রী স্যামুয়েল শার্লটক, তাঁর ডান পাশের সোফাটিতে রয়েছে ডেভিড বেঞ্জামিন এবং বাম পাশে আছেন এস্কোল। তারপর একে একে বসেছেন নিরাপত্তা ও কাউন্টার ইনটেলিজেন্স কার্যক্রমের জন্য দায়ীত্বশীল ‘সিনবেথ’ এর প্রধান জেনারেল শামিল এরফান,বিদেশে গোয়েন্দা কর্ম পরিচালসার প্রতিষ্ঠান ‘মোসাদ’ প্রধান মেজর জেনারেল লুইস কোহেন,মিলিটারী ইনটেলিজেন্স বিভাগ‘শোরুত মোদিন’এর প্রাধন জেনারেল মরদেশাই হড, রাজনৈতিক তথ্যাদির গোয়েন্দা কর্ম পরিচালনার প্রতিষ্ঠান ‘রিসুত’ এর প্রধান ইসাক রিজোক। ডেভিড বেঞ্জামিনের ডান পাশে বসেছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোশে হায়ান এবং ইসরাইল সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ইসরাইল তাল। এ ছাড়া উপস্থিত আছেন ইসরাইল পার্লামেন্টের তিনজন প্রতিনিধি সদস্য।

ইসরাইলের সুপ্রীম সিকিউরিটি কাউন্সিলের এ বৈঠকে সভাপতিত্ব করছেন প্রধানমন্ত্রী স্যামুয়েল শার্লটক। তিনি ধীরে ধীরে বললেন, ‘‘ইসরাইলের সুসন্তান উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ, বিগত কিছু দিনের ঘটনা প্রবাহ আমাদের জন্য বিশেষ উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে তেলআবিবের নিরাপত্তা প্রধান মিঃ চেচিনের মৃত্যু, ওসেয়ান কিং জাহাজের ভয়াবহ র্দুঘটনা এবং জেরুজালেম ও ইলাতের ক্ষেপনাস্ত্র ঘাঁটির সর্বাত্মক ক্ষতি সাধন শুধু সামরিক দিক দিয়ে উদ্বেগের নয়, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ভিত্তিকে ও দুর্বল করে দিয়েছে। দেশের ভিতরে এবং বাইরে আমরা তীব্র সমালোচনা সম্মুখীন হয়েছি। ইসরাইলের সুমান ক্ষুণ্ন হয়েছে অনেকখানি। এখানেই শেষ নয়, এক দুর্যোগের কালো মেঘ আমাদের পৃতিভূমিকে গ্রাস করতে আসছে। আমাদের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী

এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করবেন। মোশে হায়ান নড়ে চড়ে বসলেন। ফাইলটি নেড়ে চেড়ে সামনে ধরলেন। তাঁর গম্ভীর কন্ঠে ধ্বনিত হলো ‘‘ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের তথ্য সরবরাহকারী এজেন্সি সমূহ যে সব তথ্য সরবরাহ করছেন, যা আমার সামনে উপস্থিত আছে তার আলোকে বলতে হচ্ছে, সম্প্রতি পরিস্থিতির বিরাট পরিবর্তন হয়েছে। পরিস্থিতি ভয়াবহ মোড়া নিয়েছে। আপনারা জানেন, ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বহুপূর্ব থেকে একটি সুপরিকল্পিত ব্যবস্থার অধীনে ইহুদী তরুণ তরুণীরা আরব রাষ্ট্রসমূহে মুসলিম নামের ছদ্মবেশ নিয়ে মুসলমান হিসেবে বাস করছিল। আরব রাষ্ট্রসমূহের সামরিক ও বেসামরিক তথ্য সরবরাহের এরাই ছিল উৎস। এরা

নিজের জীবন বিপন্ন করে হলে ও দায়িত্বপালন থেকে পিছ পা হয়নি। ‘কামাল আমিন তাবিজ’ নামের ছদ্মবেশে এলিস কোহেন সিরীয় সেনা বাহিনীর যে তথ্যাদি সরবরাহ করেছিল, আপনারা তা জানেন। স্বীকার করতে হয়, তারই দেয়া তথ্যের উপর নির্ভর করে আমাদের সেনাবাহিনী ১৯৬৭ সালে গোলান হাইট দখল করতে পেরেছিল। এলিস কোহেনের মত হাজার হাজার ইসরাইল সন্তান পিতৃভূমির জন্য তথ্যাদি সরবরাহ করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে। কিন্তু গভীর দুঃখ ও বেদাসান সাথে আমি আপনাদের জানাচ্ছি যে, মিসর থেকে জর্দান ও সিরীয়ার মধ্য দিয়ে লেবানন পর্যন্ত আমাদের যে স্পাই রিং ছিল, তা আজ ধবংসহয়ে গেছে। এই স্পাই রিং এ কার্য্যরত তিন হাজার ইহুদী যুবক, তিন হাজার পাঁচশত ছাব্বিশ জন ইহুদী নারী নিখোঁজ হয়েছে। এদের অনেকের লাশ পরে পাওয়া গেছে কিন্তু অধিকাংশের লাশ ও পাওয়া যায়নি। এছাড়া ‘মোসাদ’ এবং ‘শেরুত মোদিন’ এর ৫১ জন সুদক্ষ গোয়েন্দা কমী গত দু’বছরে প্রাণ দিয়েছে সীমান্তের ওপারে। সীমান্তের ওপারের এলাকা আমাদের জন্য অন্ধকার হয়ে গেছে।

এ অবস্থায় আমরা WRF (World Red Forces) এর সহযোগিতায় ফিলিস্তিন সংযুক্ত জনফ্রন্ট ও গণতন্ত্রী জনফ্রন্টের বন্ধুত্ব অর্জন করতে পেরেছিলাম এবং তাদের সহযোগিতায় নতুন ‘স্পাই রিং প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলাম, কিন্তু সে প্রচেষ্টা ও আমাদের ব্যর্থ হয়েছে। সংযুক্ত জনফ্রন্টের চেয়ারম্যান জর্জ বাহাশ ছাড়া ফ্রন্টের সব নেতৃবৃন্দই ধরা পড়েছেন এবং তাদের ৫ হাজার মুজাহিদ বন্দী

হয়েছে। আমরা সংবাদ পেয়েছি, নেতৃবৃন্দের দু' জন ছাড়া সকলেরই মৃত্যুদন্ড হয়েছে এবং বন্দী মুজাহিদরা ক্ষমা লাভ করে সবাই সাইমুমে যোগ দিয়েছে।

আমরা জনফ্রন্ট সূত্রে জানতে পেরেছিলাম, সাইমুমের অসংখ্য কর্মী ইসরাইলের অভ্যন্তরে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে। সাইমুমের কিছু আস্তানার সন্ধান আমরা পেয়েছিলাম, কিন্তু কোন ফল হয়নি। অদৃশ্য কোন সংকেতে ওরা

যেন হাওয়া হয়ে গেছে। এই পর্যন্ত বলে মোশে হায়ান চুপ করলেন। রুমাল দিয়ে কপালের ঘামটুকু মুছে নিলেন তিনি।

পার্লামেন্ট সদস্য মিঃ রোজন বার্জ্জ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,''আমাদের সুপরিকল্পিত গোয়েন্দা কার্যক্রমের এতবড় বিপর্যয় কেমন করে সম্ভব হলো? মাননীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী অলৌকিক কিছু বিশ্বাস করাতে চাইবেন নাতো?

মোশে হায়ান আবার বললেন,''অলৌকিক কিছু ঘটে নাই বটে, কিন্তু অলৌকিক ভাবেই আমাদের 'স্পাই রিং' বিধ্বস্ত হয়ে গেছে, আর এটা সম্ভব হয়েছে ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থা সাইমুমের দ্বারা। এই প্রতিষ্ঠানই আমাদের বন্ধু প্রতিষ্ঠান জনফ্রন্টকে উৎখাত করেছে।

-এই সাইমুম কারা? ২৪ বছরে আরব রাষ্ট্রগুলো যার সন্ধান করতে পারেনি তারা তার ধবংস সাধন করলো কেমন করে? অপর একজন পার্লামেন্ট সদস্য মিঃ সিমমন উত্তেজিতেভাবে প্রশ্নটি করলেন।

মোশে হায়ান বললেন,''ইসরাইল থেকে বিতাড়িত মুসলিম মোহাজের নিয়ে এই সাইমুম গঠিত। চীনের সিংকিয়াং থেকে বিতাড়িত আহমদ মুসা এই সংগঠনের প্রধান। ইখওয়ানুল মুসলিমুনের কর্মীরা এ সংগঠনের বিভিন্ন দায়িত্বে রয়েছে। ইখওয়ানুল মুসলিমুনের স্বেচ্ছাসেবকরা এ সংগঠনের মূল শক্তি। ১৯৩৮ সালের যুদ্ধ অগ্রবর্তী ঘাঁটিগুলোতে মিসরীয় বাহিনীর পাশে অত্যন্ত সক্রিয় যে শত্রু ভয়হীন স্বেচ্ছাসেবকদের দেখেছিলাম আমরা, এরা তাদেরই উত্তরসূরী।

মোশে হায়ান থামলে জেনারেল শামিল এরফান বললেন, ওরা অত্যন্ত বিপদজনকে। মনে পড়ছে আমার সেই যুদ্ধের কথা আমি তখন ইষ্টার্ণ কমান্ডের দায়িত্বে ছিলাম। খবর এল, জেরুজালেমের পার্শ্ববতী 'সুর বাহির এ ঘাঁটি করে একদল মুসলিম সৈন্য সামনে এগুবার চেষ্টা করছে। ধূর্ত ও কুশলী সেনানায়ক

লেঃ কর্ণেল এরিক স্যারনকে 'আমি এক ব্রিগেড সৈন্য দিয়ে সেখানে পাঠালাম। স্যারন কিন্তু 'সুর বাহির' আক্রমণ না করে ৫০ মাইল দক্ষিণে মিসরীয়ে বাহিনীর ডিভিশন পোষ্ট 'বির সুবীরে'র দিকে চলে গেল। পরে আমি তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দিয়েছিলঃ

''আমার সুর বাহির আক্রমণ করি নাই, কারণ সেখানে ইখওয়ানুল মুসলিমুনের এক বিরাট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী মোতায়েন ছিল। ইখওয়ানুল মুসলিমুনের স্বেচ্ছাসেবকরা নিয়মিত সৈন্যবাহিনী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের সাধারণ সৈন্যের মত এরা যুদ্ধকে আদেশ সাপেক্ষ নিছক এক দায়িত্ব মনে করে না বরং এ যুদ্ধ এদের কাছে এক ধর্মীয় আবেগের ফল এবং হৃদয়ের একাগ্রতা তারা এ যুদ্ধে নিয়োজিত করে। এ দিক দিয়ে তারা ইসরাইলের জন্য সংগ্রামরত আমাদের সৈন্যবাহিনীর সাথে তুলনীয়। কিন্তু পার্থক্য এই যে, আমরা আমাদের আবাসভূমি জাতীয় রাষ্ট প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করছি, আর ওদের কামনা হলো মৃত্যু। শুধু মৃত্যু ভয়হীন নয়, মৃত্যু কামনাকারী এসব মানুষকে আক্রমণ করা হিংস্র বন্যজন্তুর মিছিলে হামলা চালানোর শামিল। আমি এই ঝুঁকি এড়াতে চেয়েছিলাম। তাদের ধর্মীয় আবেগ উদ্দীপ্ত হবার সুযোগ দেয়াকে আমরা উচিত মনে করি নাই। তাদের সে আবেগ অন্যদের মধ্যেও সংক্রমিত হতে পারত যার ফলে ষোল আনা লাভ হতো তাদেরই আর সর্বনাশ হতো আমাদের।'' জেনারেল একটু থামলেন। তারপর আবার শুরু করলেন, ''আমি আমার এ উদাহরণের দ্বারা কিন্তু সাইমুমের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণকে নিরুৎসাহ করতে চাইনি বরং তারা যে কত বিপদজনক তাই বোঝাতে চেয়েছি। সম্মিলিত আরব কমান্ড আণবিক বোমা দিয়েও আমাদের যা না করতে পারবে, এদের ধর্মীয় আবেগ আমাদের সর্বনাশ করতে পারবে তার চেয়ে বেশী। আরব রাষ্ট্রগুলোর সরকারসমুহের এবং সেনাবাহিনীর উপর সাইমুমের প্রভাব আমাদের জন্য সবচেয়ে উদ্বেগের ব্যাপার। ওরা যদি ওদের ধর্মীয় আবেগ সকলের মধ্যে সংক্রামিত করতে পারে তা হলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে তা আমরা কেউ কল্পনাও করতে পারি না।'' জেনারেল শামিল এরফান তার কথা শেষ করলেন।

জেনারেল মরদেশাই হড বললেন, ‘‘আরব সরকারসমূহ এবং তাদের সেনাবাহিনীর উপর সাইমুমের প্রভাবের সুস্পষ্ট প্রমাণ আমরা পেয়েছি। গত তিনমাসে লেবানন, সিরিয়া, জর্দান ও মিসর সরবার তাদের সেনাবাহিনীর মোট ৩০০ জন উচ্চ পদস্থ অফিসারকে বরখাস্ত ও অন্তরীণাবদ্ধ করেছে। এ ছাড়া ১৫০০ এর মতো ননকমিশনড অফিসার ও সাধারণ সৈন্যকে বরখাস্ত ও তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। এই সমস্ত উচ্চ পদস্থ ও ননকমিশনড অফিসারদের শতকরা নব্বই জনের সাথে আমাদের ছদ্মবেশী গোয়েন্দাদের সম্পর্ক ছিল। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, এটা কত নিখুঁত অনুসন্ধানের ফল। আমরা জানতে পেরেছি, সাইমুমের দেয়া তালিকা মোতাবেকই সেনাবাহিনীর ঐ সব অফিসারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা আরও জানতে পেরেছি মদ্যপান, নাইট ক্লাবে গমণ প্রভৃতিকে আরব সেনাবাহিনীর জওয়ান ও অফিসারদের জন্য অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য করা হচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে আরব সেনাবাহিনীকে নতুন নৈতিক ভিত্তির উপর গড়ে তোলা হচ্ছে। ধর্মান্ধ সাইমুমের প্রভাবেরই যে ফল এটা, তা সহজেই অনুমেয়। আপনারা জানেন, নারী, নাইট ক্লাব আর মদ গোয়েন্দা কাজের প্রধান হাতিয়ার সাইমুমকে এ তিনটির কোন একটির আওতায় আনা যায় না বলে আমাদের গোয়েন্দা কার্যক্রম দুর্ভেদ্য বাধার সম্মুখীন হয়েছে। আমরা অনুভব করছি, আরবরা এতদিনে ব্যর্থতার তাদের প্রকৃত কারণ অনুধাবন করেছে। তারা সংশোধিত হচ্ছে ও পূর্ণগঠিত হচ্ছে। আর এ পূনর্গঠন ও সংশোধনের কাজে প্রধান ভূমিকা পালন করছে সাইমুম।’’ জেনারেল হড থামলেন।

সবাই মুখ নীচু করে চুপ বসে আছে। অখন্ড নীরবতা। দেয়ালের ঘড়িটি টিক্ টিক্ করে সময় নির্দেশ করে চলেছে। ধীরে মাথা তুললেন স্যামুয়েল শার্লটক। বললেন, IIt is now all clear, another war is coming near, কিন্তু পথ কি বলুন?’’

আবার নীরবতা। নীরবতা ভঙ্গ করে পার্লামেন্ট প্রতিনিধি মিঃ সিমসন বললেন, ‘‘আমরা ১৯৬৭ সালের পুনরাবৃত্তি করব।’’ মিঃ সিমসনের কথায় ইসরাইল সশস্ত্র বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল ইসরাইল তালের ঠোঁটে মৃদু হাসির রেখা খেলে গেল। কিন্তু কিছু বললেন না। তিনি জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের

প্রধান ডেভিড বেঞ্জামিন এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন। এবার তিনি ধীরকন্ঠে বললেন,''১৯৬৭ সালে আমাদের সেনাবাহিনীর সামনে ছিল সিনাই এবং জর্দান উপত্যকার অনুকুল যুদ্ধ পরিবেশ।

দ্বিতীয়তঃ আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় স্পাই রিং বিধ্বস্ত এবং তৃতীয়তঃ আরব সেনাবাহিনীর নৈতিক উন্নতি ও তাদের সচেতনতা। সুতরাং ১৯৬৭ সালকে আবার ফিরিয়ে আনতে পারব না।'' তিনি একটু থামলেন। ধীরে ধীরে আবার শুরু করলেন, ''আমাদের সামনে আজ তিনটি পথ খোলা আছে, এর যে কোন একটি আমাদের অনুসরণ করতে হবে।

১। অবিলম্বে আমাদের যুদ্ধে নামতে হবে এবং গঠনমুখী আরব বাহিনীকে ১৯৬৭ সালের মত বিধ্বস্ত করতে হবে। কিন্তু এটা যে যুক্তিসম্মত নয়, তা আমি আগেই বলেছি।

২। অধিকৃত সব আরব এলাকা ছেড়ে দিয়ে তাদের সাথে আপোষ করতে হবে। কিন্তু আমাদের জাতির কেউই এ সিদ্ধান্ত মেনে নিবে না বিধায় এ সিদ্ধান্ত আমরা নিতে পারি না।

৩। যুদ্ধ এড়াতে হবে এবং সেই সুযোগে আরব এলাকায় আমাদের 'স্পাই রিং, পূনর্গঠিত করে একদিকে তাদের সব তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হবে অপরদিকে ভিতর থেকে তাদের মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করতে হবে। বাইরে থেকে নয় ভিতর থেকে আঘাত দিয়েই শুরু মুসলমানদেরকে পর্যুদস্ত করা সম্ভব। আপনারা জেনারেল শামিল এর ফানের বক্তব্য থেকে বুঝেছেন সাইমুমকে বাইরে থেকে আঘাত দিয়ে ওদের শক্তিকে শুধু বাড়িয়েই তোলা হবে, ক্ষতি কিছু করা যাবে না সুতরাং শক্তির পথ পরিহার করে কৌশলের আশ্রয় নিতে হবে। এজন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার। কিন্তু যুদ্ধ এড়াতে না পারলে কিছুই সম্ভব নয়। যুদ্ধ এড়াতে হলে জাতিসংঘের মাধ্যম গ্রহণ করেত হবে। জাতিসংঘের মাধ্যমে আরবদের সামনে আশার আলো জালিয়ে কালক্ষেপণ করা যেতে হবে। আমাদের সরকার এবং রাশিয়া, বৃটেন, আমেরিকা ও জাতিসংঘ চত্তরের সুযোগ্য ইসরাইল সন্তানরা এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ আছেন।''

সবাই করতালি দিয়ে ডেভিড বেঞ্জামিনের শেষোক্ত প্রস্তাবকে সমর্থন জানাল। পন্থাটির খুঁটিনাটি দিক নিয়ে আলোচনা চলল তাদের মধ্যে।

ঢং ঢং করে ঘড়িতে রাত ১১ টা বাজল। মিটিং সমাপ্ত করে সবাই উঠে দাঁড়াল। সবার মুখে হাসি কিন্তু জোর করে টেনে আনা রুটিন হাসি, তা বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না মোটেই। যুদ্ধ এড়ানোর আশা সবাই করছে, কিন্তু চাইলেই কি যুদ্ধ এড়ানো যাবে? তাছাড়া আরবদের আসন্ন সংগ্রামের প্রকৃতি কেমন হবে, তাই বা কে জানে? প্রধানমন্ত্রীর কথা সকলের মনে নতুন করে জাগছে - ''দুর্যোগের এক কালো মেঘ আমাদের পিতৃভূমিকে গ্রাস করতে এগিয়ে আসছে।''

# ১১

পরিষ্কার নীলাকাশ। উইলো গাছ আর জলপাইকুঞ্জে সকালের রোদ ঝিলমিল করছে। কোরআন শরীফ বন্ধ করে টিবিলে রেখে এসে মাহমুদ চেয়ারে বসল। সেদিনের দৈনিক কাগজ এসে গেছে, সে দেখতে পেল। কাগজটি উল্টে পাল্টে দেখতে লাগল মাহমুদ। সিংগল কলাম হেডিং এর একটি ছোট্ট খবরে মাহমুদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। ''বেনগুরিয়ান তনয়ার জন্ম বার্ষিকী।'' খবরটিতে বেনগুরিয়ান তনয়া এমিলিয়ার একবিংশ জন্ম বার্ষিকী অনুষ্ঠান সূচীর কিছু পরিচয় দেয়া হয়েছে।

এমিলিয়ার নাম মনে পড়তেই মাহমুদের স্নায়ুতন্ত্রীতে এক উত্তপ্ত স্রোত বয়ে গেল। মায়াময় নীল দু'টি চোখ বেদনাপীড়িত মুখ শুভ্রগন্ডে অশ্রুর দু'টি ধারা - বিদায় মুহূর্তের এমিলিয়া মাহমুদের মানসচোখে ফুটে উঠল। মনে পড়ল তার সেই করুণ আকুতি আবার কবে দেখা হবে?'' মাহমুদ তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেনি এ পর্যন্ত। অনেকবার মনে হয়েছে কিন্তু মাহমুদ চায়নি ফুলের মত সুন্দর ঐ জীবনটির উপর কোন সন্দেহের মেঘ নেমে আসুক - কোন অসুবিধায় পড়ুক সে। আজ ওর পরম খুশির দিন। মাহমুদ কি পারে না এই খুশির দিনে তার পাশে দাঁড়াতে। মাহমুদের ঠোঁটে ফুটে উঠল এক রহস্যময় হাসি। স্বগতঃ তার কন্ঠে উচ্চারিত হলো - পারি, কিন্তু আকাঙ্খার পরিতৃপ্তিকে জ্ঞান ও কর্তব্যের উর্ধ্বে স্থান দিতে পারি না আমি।

সা'দ আলি ঘরে ঢুকল। পায়ের শব্দে পিছনে ফিরে চাইতেই সা'দ বলল, ''হেড কোয়ার্টারের মেসেজ জনাব।''

মাহমুদ তাড়াতাড়ি হাত পেতে কাগজটি নিল। দ্রুত চোখ বুলাল কাগজটিতেঃ

World peace brigade এর অধিনায়ক মেজর জেনারেল ওয়ালটার কুট এর বিশেষ প্রতিনিধি হুগো গালার্ট গোপনে তেলআবিব আসছেন। তিনি ১১

তারিখ সন্ধ্যায় বৃটিশ রয়াল এয়ারফোর্সের বিশেষ বিমান যোগে রাত ৯ টা ২৫ মিনিটের সময় তেলআবিব নামছেন।

মাহমুদ স্মরণ করল, মেজর জেনারেল ওয়াল্টার মুটের ইহুদী নাম জেরম ইজাক রোমেন। সুইচ আর্মির প্রাক্তন অফিসার। ওয়াল্টার কুট নাম নিয়েছেন তিনি। প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক গোপন ইহুদী আন্দোলনের ইনি একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। আর হুগো গালার্ট হচ্ছেন বার্লিনের দুর্দান্ত ইহুদী জ্যাকব গ্রিমব।

এগার তারিখ অর্থাৎ আজ রাত ৯-২৫ মিনিটে হুগো গালার্ট নামছেন তেলআবিবে। মনে মনে হিসাব করলো মাহমুদ।

গভীর চিন্তায় ডুবে গেল সে। হুগো গালার্ট কি মিশন নিয়ে আসছে? কোন মেসেজ বা কোন গোপন তথ্য? তাই হবে হয়তো। কিন্তু সে সব লিখিতভাবে না মৌখিক কানে কানে। হুগো গালার্ট যখন প্রতিনিধি মাত্র তখন তার মারফতে লিখিত মেসেজ বা তথ্য আসবে, সেটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু কোন পথে এগুনো যাবে? হুগো যদি পূর্বাহ্নে তার বিপদ আঁচ করতে পারে, তাহলে সব প্রয়োজনীয় রেকর্ড নষ্ট করে ফেলবে। এজন্য এমন স্বাভাবিক পথ অনুসরণ করতে হবে যা হুগোর মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক করবে না। চিন্তা করল মাহমুদ।

মাহমুদ হিসেব করল, বিমান বন্দর থেকে তেলআবিব ৯ মাইল। মিডিয়াম স্পিড যদি ধরা যায় তাহলে এই ৯ মাইল পথ অতিক্রম করতে ৭ থেকে ৯ মিনিট সময় লাগবে। এই সময়কেই কাজে লাগাতে হবে। বহনকারী তথ্যকে হস্তান্তরের সামান্য সুযোগও হুগোকে দেয়া চলবে না। অবশ্য বিমান বন্দরেই হুগো এটা করে ফেলেন কিনা তাও দেখতে হবে।

মনে মনে পরিকল্পনার এক ছক এঁকে নিল মাহমুদ। তারপর শেখ জামাল, আফজল ও হাসান কামালকে ডেকে তাদের সাথে পরামর্শ করে।

রাত ৮ টা ৪৫ মিনিট। মাহদুদ তার কার্ডিলাক নিয়ে বের হলো। বালফোর রোড গিয়ে পড়েছে এয়ার পোর্ট রোড ধরে ছুটে চলল। এয়ারপোর্টে মাহমুদ যখন পৌঁছল তখন ৮ টা ৫৬ মিনিট।

'সিনবেথ' এর নয়া তেলআবিব প্রধান মিঃ বেকম্যান ওয়েটিং রুমের সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে একটি ম্যাগাজিনের উপর চোখ বুলাচ্ছে। মাহমুদ তার সামনের সোফাটিতে বসে পড়ল। মনে মনে ভবল, ভালই হলো। যাত্রা শুভ।

৯ টা বিশ বাজল। মিঃ বেকম্যান উঠে দাঁড়াল। সে হলের দোর গোড়ায় দাঁড়াতেই একজন লোক এসে তার সামনে দাঁড়াল। মিঃ ব্যাকম্যান তাকে কি যেন বললো, তারপর ফিরে এলো আবার। সোফা থেকে চশমা আর ম্যাগাজিনটি তুলে নিয়ে ঢুকে গেলো ভিতরে। মাহমুদ বুঝলো, রানওয়েতে হুগোকে অভ্যর্থনা জানানোর বন্দোবস্ত এটা। বেকম্যান উঠে যাবার পর মাহমুদও উঠে গিয়ে এদিক ওদিক পায়চারী করল। মাহমুদ দেখতে পেল, আফজল বিশেষ অতিথিদের দরজাটির আশেপাশেই রয়েছে। যদিও মাহমুদ স্থির নিশ্চিত যে সাধারণ যাত্রী নির্গমনের পথ দিয়ে ওরা বেরোবে না, সময় বাঁচানোর জন্য ওরা ভি আই পি'র পথই বেছে নিবে। তবু মাহমুদ অতিরিক্ত এ ব্যবস্থা করে রেখেছে।

ঠিক ৯-২৬ মিনিটে রায়াল এয়ারফোর্সের একটি বিমান রানওয়েতে ল্যান্ড করল। সিনবেথের গাড়ী দাঁড় করানো ছিল ওয়েটিং রুমের পূর্ব পার্শ্বের দরজার বামপাশে। আর মাহমুদ তার গাড়ী দাঁড় করিয়েছিল হলের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তের দরজার সামনে। ৯ - ৪০ মিনিটে একটি বোয়িং তেলআবিব থেকে যাত্রা করছে, সেজন্য যাত্রী ও তাদের বন্ধু বান্ধবদের আনাগোনায় বেশ ভীড় জমে উঠেছে।

মিঃ বেকম্যান একজন লোকের সাথে সহাস্যে কথা বলতে বলতে কর্মচারী আগমণ নির্গমনের বিশেষ দরজা দিয়ে বের হয়ে এল। লোকটির পরিধানে কালো রংএর স্যুট, হাতে সুদৃশ্য একটি এটাচী। মাথায় হ্যাট কপাল পর্যন্ত নামানো নাকের নীচে হিটলারী কায়দার গোঁফ। গল্প করতে করতে ওরা দরজার দিকে এগোলো। মাহমুদ দেখতে পেল, ওদের কয়েক গজ পিছনে আফজল এসে দাঁড়িয়েছে। আফজল ওদের পিছনে গিয়ে দরজায় মুহূর্তকাল

দাঁড়িয়ে ফিরে এল। আফজল ফেরার সাথে সাথে মাহমুদ নিজের গাড়ীর দিকে চলল। মাহমুদ গাড়ীতে উঠতে উঠতে দেখতে পেল আফজল টেলিফোন বুথের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। মাহমুদের মুখে ফুটে উঠল প্রশান্তির হাসি। পেছনের সিটে শুয়ে হাসান কামাল ঘুমের কসরত করছিল। মাহমুদকে গাড়ীতে উঠতে দেখে নড়ে চড়ে ঠিক হয়ে বসল সে।

মাহমুদের গাড়ী এয়ারপোর্ট চত্বরের দ্বিতীয় গেট দিয়ে বেরিয়ে এয়ারপোর্ট রোডে পড়ল। প্রায় ৩০০ গজ সামনে আর একটি কালো রং এর গাড়ী এয়ারপোর্ট রোড ধরে এগিয়ে চলছে। রেয়ার লাইটের আলোকে গাড়ীর নাম্বার প্লেটটি দেখে মাহমুদের ঠোঁটের কোণে হাসি খেলে গেল। তার মুখে স্বগতঃ উচ্চারিত হলো, ইন্না ছালাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহইয়ায়া ওয়া মামতি লিল্লাহে রাবিবল আলামিন (নিশ্চয় আমার উপাসনা প্রার্থনা আমার সাধনা, আমার জীবন, আমার মরণ সমস্তই বিশ্ব নিয়ন্তা রাব্বুল আলামিন আল্লাহর নামে নিবেদিত)। মাহমুদ গাড়ীর স্পিড একটু কমিয়ে দিল, কিন্তু গাড়ীটিকে চোখের আড় হতে দিল না। পিছনে সংকেত থেকে সে বুঝে নিল, ওটা আফজলের গাড়ী।

চার মাইল পথ এসেছে তারা। সামনেই রাস্তাটি বামদিকে বাঁক নিয়েছে। মাহমুদ অধীর আগ্রহে সামনে তাকিয়েছিল। অবশেষে দেখতে পেল, একটি উজ্জ্বল হেড লাইট/ সঙ্গে সঙ্গে মাহমুদ তার নিজের হেড লাইট থেকে কয়েকবার সংকেত দিল। সংকেতের উত্তর পেল সামনের তীব্রবেগে এগিয়ে আসা হেড লাইট থেকে। স্বস্তি লাভ করল মাহমুদ -শেখ জামাল ঠিক সময়ে পৌছেছে। কিছু দূরেই মোড়। শেখ জামালের গাড়ীর হেড লাইট থেকে বুঝা যাচ্ছে প্রায় মোড়ের সন্নিকটে পৌছে গিয়েছে সে। ওদিকে এগিয়ে চলা মিঃ বেকম্যানের গাড়িটিও মোড়ের সন্নিকটে পৌছে গেছে। মিঃ জামালের গাড়ীর হেড লাইটের আলোতে মিঃ বেকম্যানের গাড়ী এবার স্পষ্ট হয়ে উঠল। মাত্র মুহূর্তকয়েকের ব্যবধান। সামনে থেকে তীক্ষ্ণ এক ধাতব সংঘর্ষের শব্দ শোনা গেল। মাহমুদ চঞ্চল হয়ে উঠল। দ্রুত এগিয়ে গেল তার গাড়ী। পাশ দিয়ে প্রচন্ড বেগে শেখ জামালের পাঁচ টনি ট্রাক বেরিয়ে গেল।

মোড়ে এসে দ্রুত গাড়ী থেকে নেমে মাহমুদ দেখল, মিঃ বেকম্যানের গাড়ীটি একপাশে কাত হয়ে পড়ে গেছে। গাড়ীর ডানপাশের অংশ দুমড়ে গেছে। ড্রাইভার তার সিটের একপাশে কাত হয়ে পড়ে আছে। ধীরে ধীরে উঠবার চেষ্টা করছে সে। মিঃ বেকম্যানের কপালে আঘাতে লেগেছে, রক্ত বেরুচ্ছে। সে নিঃসাড়ভাবে পড়ে আছে। বোঝা গেল না জ্ঞান হারিয়েছে কিনা। মিঃ হুগো মিঃ বেকম্যানের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলেন, এটাচী কেসটি কিন্তু তার হাতছাড়া হয়নি। মাহমুদ গাড়ীর কাছে পৌছতেই সে উঠে বসতে চেষ্টা করল। মাহমুদ হুগোকে বলল, ''বেরিয়ে আসুন।'' বলে মাহমুদ তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেল। বের করে এনে তাকে নিজের গাড়ীর কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, ''বসুন ভিতরে গিয়ে।''

মিঃ হুগো কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠলেন। কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার হাত থেকে এটাচী কেসটি কেড়ে নিয়ে তাকে ধাক্কা দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে ড্রাইভিং সিটে গিয়ে বসতে বসতে বলল মাহমুদ, ''হাসান কামাল, মিঃ হুগোকে এবার ঘুমিয়ে দাও।

মাহমুদ বলার আগেই হাসান কামাল তার কাজে লেগে গিয়েছিল। কয়েকবার ঝটপট করলেন মিঃ হুগো, কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে এল তার দেহ।

গাড়ী ছেড়ে দিল মাহমুদ। সব কাজ সম্পন্ন করতে তার আধ মিনিটের মত সময় লাগল। আফজলের গাড়ী যখন মোড়ে পৌছল, মাহমুদের গাড়ী তখন চলে গেছে কয়েকশ গজ সামনে। আফজলের পর আরো কয়েকটি গাড়ী এসে পৌছল। একটি হৈ চৈ পড়ে গেল চারদিকে।

এই সময় মিঃ বেকম্যানের জ্ঞান ফিরে এল। চারিদিকে চেয়ে প্রথমেই সে বলল, ''মিঃ হুগো ............।'' একটু থেমে ঢোক গিলে পুনরায় সে বলল, ''গাড়ীতে আর এক জন লোক ছিল, সে কোথায়? ''

উপস্থিত কেউ এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারল না। ড্রাইভার তখনও সীটের উপর পড়েছিল। তার মাথার ও বুকে আঘাত লেগেছে। সে ধীরে ধীরে বলল, ''দুর্ঘটনার পরেই একটি গাড়ী তাকে তুলে নিয়ে গেছে।''

-তুলে নিয়ে গেছে। সে কি গুরুতর আহত ছিল? তার কণ্ঠ যেন কেঁপে উঠল।

- আমি জানি না, তবে বুঝতে পেরেছিলাম তার জ্ঞান ছিল।

আর কোন প্রশ্ন করল না বেকম্যান। চোখ বুজে মুহুর্তকয় চিন্তা করে উঠে দাঁড়াল। আঘাতের কথা সে যেন ভুলে গেছে। বলল সে, ''এখনি পৌঁছতে হবে হেড কোয়ার্টারে।''

অনেকেই তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল। মিঃ বেকম্যানকে গাড়ী এগিয়ে চলল 'সিনবেথ' এর হেড কোয়ার্টার এর দিকে। মিঃ বেকম্যানের লক্ষ্য বুঝতে পারল আফজল। মাহমুদের পশ্চাৎদিকের নিরাপত্তায় মোতায়েন আফজল এবার নিশ্চিন্ত হয়ে তার গাড়ী ছেড়ে দিল।

ওয়াইজম্যান রোডের একটি প্রকান্ড বাড়ী। বাইরে থেকে দেখতে একটি সাদমাটা ত্রিতল। কিন্তু ভিতরে গেলে বুঝা যায় বাড়ীর বিরাটত্ব। প্রকান্ড গাড়ী বারান্দা। পাঁচ ছয়টি গাড়ী খুব সহজভাবেই এখানে স্থান পেতে পারে। সব মিলে খান তিরিশেক ঘর। মেঝের তল দিয়ে বিলম্বিত এক সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে সবগুলো ঘরকে ইন্টারকানেক্টেড করা হয়েছে। পরিশেষে এই সুড়ঙ্গ পথ ওয়াইজম্যান রোডের দক্ষিন পার্শ্ব দিয়ে সমান্তরালভাবে চলে যাওয়া মরদেশাই রোডের একটি ফলের দোকানে গিয়ে শেষ হয়েছে। তেলআবিবে সাইমুমের এটা চতুর্থ আস্তানা।

মাহমুদ মিঃ হুগো গালার্টকে এই আস্তানাতে এনে তুলল। বাইরের কোন লোককে সাইমুম কখনও তাদের মূল ঘাঁটিতে নিয়ে যায় না। এমন কি দলীয় সদস্যদেরও যোগাযোগ কেন্দ্র এই আস্তানাগুলো। মূল ঘাঁটির অধিকতর নিরাপত্তার জন্যই এই ব্যবস্থা।

হুগো গালার্টকে সার্চ করা হলো। তার বৃহদাকার এটাচী থেকে পাওয়া গেল হুগোর প্রয়োজনীয় কিছু কাপড়। আর পাওয়া গেল একটা ডাইরী এবং কিছু পাউন্ড মুদ্রা। ডাইরীতে হুগোর নিজস্ব খরচ পত্রের খুঁটিনাটি এবং তার কিছু ট্যুর

রেকর্ড। ডইরীর মধ্যে পাওয়া গেল World peace Brigade এর অধিনায়ক মিঃ ওয়াল্টার কুটের নিজস্ব প্যাডের একটি চার ভাঁজ করা সাদা পাতা।

হুগোর জুতার তলা এবং তার পায়ের পাতা থেকে শুরু করে মাথার চুল পর্যন্ত সব কিছুই তন্ন তন্ন করে সার্চ করা হলো। তার পোশাকের সন্দেহজনক কোন অংশই বাদ দেয়া হলো না। অবশেষে হুগোর এটাচী কেস ফেঁড়ে ফেলা হলো, তার অতিরিক্ত কাপড় চোপড় গুলো ও পরীক্ষা করা হলো। কিন্তু কিছুই মিলল না।

কপালের ঘাম মুছে শেখ জামাল এসে চেয়ারে ধপ করে বসল। মাহমুদ চেয়ে চেয়ে দেখছিল/ শেখ জামাল বসতেই মাহমুদ মিঃ হুগোর দিকে চেয়ে বলল, ''মিঃ হুগো আপনি কি হাওয়া খাওয়ার জন্য গোপন সফরে তেলআবিব এসেছেন?''

মিঃ হুগো শুধু মিট মিট করে চাইলেন। কোন উত্তর এল না তার কাছ থেকে। মাহমুদ জানে, হুগো ওরফে জ্যাকব গ্রিমবের মুখ খোলার জন্য মুখের কথা যথেষ্ট নয়। মাহমুদ হুগোকে আর কিছু বলল না। গভীর চিন্তায় আবার ডুব দিল সে।

হঠাৎ সোজা হয়ে বসল মাহমুদ। মুখ তার খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তার মনে পড়ে গেল, লেনিন যখন জেলে ছিলেন তখন তাঁর স্ত্রী তার কাছে পড়ার জন্য ম্যাগাজিন পাঠাতো। লেনিন ম্যাগাজিনের সাদা অংশগুলোতে দুধ দিয়ে তাঁর মেসেজ লিখতেন কর্মীদের উদ্দেশ্যে। দুধের এ লেখাগুলো এমনিতে দেখা যেত না, কিন্তু পানিতে ডোবালেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠত। লেনিনের স্ত্রী তার স্বামীর কাছ থেকে ম্যাগাজিন ফেরত নিয়ে গিয়ে মেসেজগুলো উদ্ধার করে পৌঁছাতেন কর্মীদের নিকট।

কথাটা মনে হতেই মাহমুদ শেখ জামালকে নির্দেশ দিলেন এক গামলা পানি আনতে।

পানি এলে মিঃ হুগোর ডাইরী থেকে ওয়াল্টার কুটের প্যাডের চার ভাঁজ পাতাটি এনে ভাঁজ খুলে পানিতে ডুবিয়ে দিল।

সাফ্যলের আনন্দ খেলে গেল মাহমুদের মুখে। কাগজের বুকে সাদা সাঁদা অক্ষর ফুটে উঠেছে। মাহমুদ শেখ জামালকে বলল, ''তাড়াতাড়ি কাগজ কলম আনো। কাগজ বেশীক্ষণ পানিতে রাখা যাবে না।

শেখ জামাল মাহমুদের অনুসরণ করে লিখ যেতে লাগলঃ

''প্রেরক ওয়াল্টার কুট, অধিনায়ক বিশ্ব শান্তি সেনা।

-প্রাপক স্যামুয়েল শার্লটক, প্রধানমন্ত্রী, ইসরাইল।

আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, যুদ্ধ বিরতি সীমারেখার ওপারে যুদ্ধবিরতি তদারককারীদের মধ্যে আমরা কিছু ইসরাইল সন্তানকে সন্নিবিষ্ট করতে পেরেছি। 'ইরগুন জাই লিউমি'র মাধ্যমে তারা তথ্য সরবরাহ করবে। কিন্তু জরুরী পরিস্থিতিতে যোগাযোগের জন্য আমরা তাদের রেডিও মিটার পাঠালাম। বিশেষভাবে বলা হচ্ছে, কোন পরিস্থিতিতেই তাদের নাম জানার চেষ্টা করা চলবে না।

GH. 44 11. GH. 43. 07 GH. 45 33 GV. 32. 13, JZ 54; 05, GR. 47, 55. GR 44, 77, GR, 39, 17, SZ 40, 99, SZ. 38. 66, SZ. 51. 02. SZ. 47. 21, SZ 48, 81,"

ইরগুন জাই লিউমি'হচ্ছে গুপ্ত বিশ্ব ইহুদী গোয়েন্দা চক্রগুলোর একটি। মেসেজ পরিস্কার। ইসরাইলের বিধ্বস্ত স্পাই রিং এর আংশিক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা তাতে করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল ডবল ভূমিকায় অভিনয়কারী জাতিসংঘের প্রতিনিধির মুখোশ পরা প্রতিনিধিবর্গ কারা বোঝা যাচ্ছে, GH অর্থাৎ গোলান হাইট, GV অর্থাৎ হুলেহ ভ্যালি, JZ অর্থাৎ  জেজরিস ভ্যালি, GR অর্থাৎ জর্দান রিভার, SZ অর্থাৎ সুয়েজ খাল অঞ্চলে ওরা মোতায়েন আছে। মাহমুদ ভেবে দেখল শুধু রেডিও মিটার দিয়ে ওদের চিহ্নিত করা যাবে না। সুতরাং যে কোন মূল্যেই ওদের নাম জানতে হবে।

মাহমুদ উঠে গিয়ে মিঃ হুগোর একেবারে মুখোমুখি দাঁড়াল। মিঃ হুগোর চোখের মনি দু'টোতে স্থির চক্ষু নিবদ্ধ করে সে বলল, মিঃ হুগো যুদ্ধ বিরতি রেখার ওধারে যারা ইসরাইলের হয়ে কাজ করছে, তাদের নাম বলতে হবে। মিঃ হুগো নীরব। মাহমুদ বলল, অধিবেশনে না বসলে বুঝি কথা বলবেন না।

মিঃ হুগোর চোখ দু'টি চঞ্চল হয়ে উঠল। আশংকার একটি বিষাদ রেখা তার মুখের উপর দিয়ে খেলে গেলে।

মাহমুদ শেখ জামাল কে বলল, পর্দাটা সরিয়ে দাও জামাল। মি হুগো অধিবেশনের ব্যবস্থাটা একটু দেখে নিক।

ঘরে উত্তর দিকে টাঙ্গানো পর্দা সরিয়ে ফেলল জামাল। কাঠের একটি সুদৃঢ় পাটাতন, তাতে চামড়ার ফিতা লাগান। পাটাতনে শায়িত মানুষকে মজবুত করে বাঁধার কাজে তা ব্যবহৃত হয়। পাটাতনের পাশে সুইচবোর্ড। একটি ইলেকট্রিক মেগনেটো পড়ে আছে পাটাতনের উপর, তার উপর সাদা বোতাম জ্বলজ্বল করছে।

মাহমুদ ঐ দিকে অঙ্গুলি সংকেত করে বলল, ঐ তড়িৎ অধিবেশনের সাথে তোমরা তো খুব পরিচিত। আমাদের কথা বলার অভিযানের ওটা প্রথম অস্ত্র। এরপর একে একে আসবে অন্যগুলো।

মিঃ হুগো একবার চকিত দৃষ্টিতে ওদিকে চেয়ে বলল অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে কি করবে তোমরা, আমি কিছুই জানি না। কণ্ঠ তার কাঁপছে।

ওয়ার্ল্ড পিস ব্রিগ্রেডের লিঁয়াজো অফিসার মিঃ হুগো, জান কি জান না আমরা দেখব। বলে একটু থামল মাহমুদ, তারপর বলল, অমানুষিক নির্যাতন কিন্তু তোমরাই আমাদের শিখিয়েছ। এই সেদিন আলজেরিয়াতে সুসভ্য ইউরোপের তোমাদের জাত ভাইয়েরা কি করল? আলজিয়ার্সের আলবিয়ায় কোয়ার্টার আর 'সেন্টার দ্য ত্রি'র নির্যাতন কক্ষগুলোতে তোমাদের ভাইয়েরা স্বধীনতাকামী আমাদের ভাইদের উপর কি অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছে তা মনে পড়ে নাকি তোমাদের? থামল মাহমুদ। আবার বলল, পাঁচ মিনিট সময় দিলাম তোমাকে, এরমধ্যে যদি নামগুলো বলো তাহলে মুক্তির আশা করতে পারো। এখন তুমি ভেবে দেখ একদিকে মুক্তি অন্য দিকে ভয়াবহ যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে গমণ - কোনটি তুমি বেছে নেবে।

মাহমুদ বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

মি হুগো গালার্টের স্মৃতিতে নাজি কনসেনট্রেসন ক্যাম্পের ভয়াবহ ঘনাগুলোর কথা জাগরুক রয়েছে। মাহমুদের উল্লেখকৃত আলজিয়ার্সের

'আলবিয়ার' ও 'সেন্টা দ্য ত্রি'র ভয়াবহ নির্যাতন কাহিনীর সাথেও সে পরিচিত। ইলেকট্রিক সিটিং 'পাটাতন ও ১৫ মেগনেটো' 'নকল ডোবনো প্রক্রিয়া, প্রভৃতির কথা স্মরণ হতেই আৎকে উঠল মিঃ হুগো গালার্ট। প্রবল ইচ্ছা শক্তি তার ধ্বসে পড়ে গেল মুহূর্তে।

পাঁচ মিনিট পরে ফিরে এল মাহমুদ। ইলেকট্রিক সিটিংএর আর প্রয়োজন হলো না। তার কাছ থেকে জানা গেল ১৪ টি নাম। লিখে নিল মাহমুদ। তারপর পরখ করে সে দেখল ওপারের যুদ্ধ বিরতি সীমা রেখা তদারককারীদের মধ্যে এসব নাম আছে কিনা।

উঠে দাঁড়িয়ে মাহমুদ বলল, তোমাকে আমরা পাঠিয়ে দেব আমাদের হেড কোয়ার্টারে, ওখান থেকেই তোমার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। তবে মুক্তি যে এক সময় তুমি পাবে, সে নিশ্চয়তা আমরা তোমাকে দিচ্ছি।

সংগৃহীত নাম ও মেসেজটি হেড কোয়ার্টারে পাঠাবার জন্য মাহমুদ দ্রুত তার মূল ঘাঁটিতে ফিরে এল।

পরদিন বিকেলে লন্ডনের 'ইভিনিং পোষ্টে'র দু'কলাম হেডিংএর একটি সংবাদ দৃষ্টি আকৃষ্ট করলো মাহমুদের। সিরিয়া, জর্দান ও মিসর সরকার যুদ্ধ বিরতি সীমারেখা তদারককারীদের মধ্যে থেকে গোলান হাইট এলাকার মিকাইল বোরডিন, ক্লারেন্স ডিলোন, বাউন্সকভ, হুলেহ ভ্যালির রলফ বোম্যান, জেজারিল ভ্যালির ফ্রাঙ্ক কার্লসন, জর্দান নদী এলাকার মরিস চাইল্ডস, আর্নল্ড ফোষ্টার, পিটার গাবর এবং সুয়েজ খার এলাকার মিকাইল গার্ডিন, গিল বার্ট গ্রিণ ভিক্টর গ্রুজ, মার্ক গায়েন ও বিল মার্ডোর ২৪ ঘন্টার মধ্যে বহিস্কার দাবী করেছেন। আরব রাষ্ট্রসমূহের স্বার্থবিরোধী কর্ম তৎপরতার অভিযোগ আনা হয়েছে তাদের প্রতি। প্রশান্ত হাসি ফুটে উঠল মাহমুদের মুখে।

উপরোক্ত খবরের পাশে আর একটি খবরও মাহমুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ইসরাইলের সুপ্রিম নিরাপত্তা কাউন্সিলের মেম্বার ইসরাইল পার্লামেন্টের সদস্য মিঃ সিমসন স্যামুয়েল শালটক সরকারের বিরুদ্ধে আযোগ্যতার অভিযোগ এনেছেন। তিনি বলেছেন, স্যামুয়েল শার্লটক সরকারের অধীনে দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ছে এবং জাতির নিরাপত্তা বিধানকারী সংস্থাগুলো যাচ্ছে

রসাতলে। খবরটি পড়ে হাসল মাহমুদ। পতন যখন ঘনিয়ে আসে, তখন সবাই পরস্পর কাদা ছোঁড়াছুড়ি করে নিজেদের দোষ ও অযোগ্যতার কথা ঢেকে রাখতে চায় এবং এইভাবে তারা নিজেদের সংশোধন ও যোগ্যতা বৃদ্ধির পথ বন্ধ করে প্রতিপক্ষের শক্তিবৃদ্ধি ও বিজয়ে সহায়তা করে।

# ১২

ডেভিড বেনগুরিয়ানের বাড়ী। এমিলিয়ার কক্ষ। একটি ড্রইং রুম, একটি বাথরুম ও একটি বেড রুম নিয়ে এমিলিয়ার নিজস্ব জগত। গ্রীসিও মেয়ে ভোনাস এই জগতে এমিলিয়ার একমাত্র সঙ্গী ও পরিচারিকা। পিতা ও মাতা এখানে আসেন, কিন্তু সেটা কতকটা রুটিন সফরেরের মত। তেলআবিব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী এমিলিয়াকে তারা অবাধ বিচরণের সুযোগ দিয়েছেন।

রাত ৯ -৩০ মিনিট। বেশ গরম বাইরে। কিন্তু সেন্ট্রালি ইয়ার কন্ডিশন্ড এ বাড়ীতে গরমের কোন চিহ্ন নেই। এমিলিয়া পড়ার টেবিলে বসে। কিন্তু মন বসাতে পারল না বইতে। মন এলামেলো, বিশৃঙ্খল। শয্যায় গিয়ে সে শুয়ে পড়ল। চোখ বুঝে সে মনকে ভাবনাহীন করতে চাইল। কিন্তু পারছে না সে। খোঁচার মত বিঁধছে শুধু।

এমিলিয়ার মা ঘরে ঢুকলেন। মুহূর্তকাল দাঁড়িয়ে তিনি একবার পড়ার টেবিল ও একবার শায়িতা এমিলিয়ার দিকে চাইলেন। তারপর গিয়ে বসলেন এমিলিয়ার পাশে। তারপর ধীরে ধীরে তিনি এমিলিয়ার কপালে হাত রেখে বললেন অসুখ করেনি তো মা? চমকে উঠল এমিলিয়া। নিজেকে সামলে নিল সে। নিজের কপালে রাখা মায়ের হাতটি তুলে নিয়ে সে বলল, না মা অসুখ করেনি।

-এমন অসময়ে শুয়ে কেন তুমি? মায়ের কথায় তখন আশংকার সুর।

-ভালো লাগছে না কিছু, তাই শুয়ে আছি মা।

-এই ভাল না লাগাটাই তো অসুখ মা। তাছাড়া বেশ কিছুদিন থেকে দেখছি তুমি বাইরে কোথাও তেমন বের হওনা ঘরেই শুয়ে থাক। কিছুক্ষণ থামল এমিলিয়ার মা। বলল, না হয় গিয়ে একবার ইউরোপ ঘুরে এসো, এখন তো তেমন পড়াশুনার চাপ নেই।

-না মা তোমরা কিছু ভেব না। আমি ভাল আছি। ঘরে বসে পড়ি? বেড়াতে তেমন ভালো লাগছে না। হাসিতে মুখ রাঙ্গিয়ে বলল এমিলিয়া।

-তাই ভালো মা। দিনকাল ভাল যাচ্ছে না। ঘরে বাইরে শত্রু আজ। শ্বাসরোধ করতে চাইছে আমাদের।

-আচ্ছা মা শান্তি কি্সবে না? আমরা শত্রুকে বন্ধু বানাতে পারবো না?

-কেমন করে? শত্রুরা যদি শত্রুতা না ছাড়তে চায়?

-কিন্তু আমরা তো শত্রুতা ছাড়ছি না?

-কেমন করে?

-যে সব আরব মুসলমানকে আমরা তাদের ঘরবাড়ী থেকে তাড়িয়েছি, তাদেরকে ফিরিয়ে এনে যথাযোগ্য অধিকার তাদের আমরা কেন দিচ্ছি না?

-যথাযোগ্য কি অধিকার মা?

-দেশের শাসন ও আইন প্রণয়নের অধিকার।

এমিলিয়ার মা হাসল। বলল, পাগল মেয়ে, ওদেরকে দেশের শাসন ও আইন প্রণয়নের অধিকার দিলে ইসরাইললের সন্তানরা দাঁড়াবে কোথায়?

-কেন, আমরা যেহেতু সংখ্যালঘিষ্ট, তাই সংখ্যালঘিষ্টের অধিকারই প্রাপ্য।

-কিন্তু জার্মানিতে সংখ্যালঘিষ্ট ইহুদীদের অবস্থার কথা তুমি কি জান না?

-জানি। কিন্তু তাই বলে আরব মুসলমানদেরকে হিটলারের আসনে বসাবার কি কোন যুক্তি আছে মা?

-নিশ্চয়। তুমি নিশ্চয় জান, মুসলমানদের পয়গম্বর মোহাম্মদ কেমন করে ইহুদীদেরকে প্রথমে মদীনা, তারপর খায়বর, সর্বশেষ তাদের আরব থেকে বিতাড়িত করেছিল।

-কিন্তু মা, নবী মোহাম্মদ কি বিনা কারণে ইহুদীদের বহিস্কার করেছিলেন? ইসলামের নবীর সাথে তাদের সম্পাদিত চুক্তি তিনবার ইহুদীরা ভংগ করেছে এবং বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এর পর তারা মদীনা থেকে বহিস্কৃত হয় এবং খায়বরে আশ্রয় পায় কিন্তু খায়বরকে ঘাঁটি করে আবার তারা ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার পথ অনুসরণ করল, এরপর তাদের আরব থেকে বিতাড়িত করা ছাড়া উপায় ছিল কি?

-এমিলিয়ার মা আবার মুখ টিপে হাসল। বলল যে কারণে নবী মোহাম্মদ ইহুদীদেরকে বিতাড়িত করেছিল, সে কারণে আমরা ও আরব মুসলমানদের বিতাড়িত করেছি।

-কিন্তু মা উভয় স্থলে তো একরকম কার্যকারণ নেই।

নবী মোহাম্মদ পৌত্তলিকদের ধর্মান্তরিত করে স্বাভাবিক ভাবেই মদীনা ও আরবের মালিক হয়েছিলেন, মালিকানা তিনি ইহুদীদের কাছ থেকে কেড়ে নেননি। অন্যপক্ষ আমরা আরব মুসলমানদের বিতাড়িত করে তাদের দেশ ফিলিস্তীনকে আমরা ইসরাইল রাষ্ট্র বানিয়েছি।

-তোমার কথা ঠিক এমি। কিন্তু আমাদের জাতির স্বার্থে এর প্রয়োজন ছিল এবং ভবিষ্যতে থাকবে।

-এক জাতির প্রয়োজনে অপর জাতির ধ্বংস সাধন কেমন সুবিচার মা?

-রূঢ় বাস্তবতার সাথে তোমাদের পরিচয় নেই মা, অবিচার সব সময় অবিচার নয়।

-কিন্তু মা, অন্যায় করে যাদের অধিকার হরণ করা হল, তারা কি অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবে না। আমাদের প্রধানমন্ত্রী স্যামুয়েল শার্লটক রাশিয়ায় জন্মগ্রহণ করে আমেরিকায় প্রতিপালিত হয়ে হঠাৎ উড়ে এসে ইসরাইলের নিয়ামক হয়ে বসার অধিকার যদি পায়, তাহলে বংশ পরস্পরায় বসবাসকারী আরব মুসলমানরা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে তো এগিয়ে আসবেই।

-হাঁ, এটা তারা করছে।

-সুতরাং আমরা শান্তির আশা কেমন করে করতে পারি?

এমিলিয়ার মা কোন উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ গম্ভীর ভাবে থেকে পরে ধীরে ধীরে বলল সে, শান্তির সম্ভাবনা যে নেই প্রতিটি ইসরাইলীই তা জানে, কৌশল আর শক্তির বলেই তারা এদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, শক্তি ও কৌশলের আশ্রয় নিয়েই তাদেরকে টিকে থাকতে হবে। শুধু টিকে থাকাই নয়, তাদের থাবাকে আরও মজবুত ও বিস্তৃত করতে হবে। মায়ের দিকে এমিলিয়া পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়েছিল। তার মায়ের কথা সেদিন ওসেয়ান কিং জাহাজে শোনা ইসরাইলী মন্ত্রীর বক্তব্যের সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে। তাহলে প্রতিটি ইসরাইলীই

কি আরব ভূমিতে তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর। আত্মরক্ষাকারী জাতি বলে পরিচয় দানকারী ইসরাইলীদের একি বিভৎস সাম্রাজ্যবাদী রূপ। শিউরে উঠল এমিলিয়া।

এমিলিয়ার গম্ভীর আত্মস্থ ভাবের দিকে চেয়ে এমিলিয়ার মা হেসে বলল, ভালো যুক্তি শিখেছো এমি, তোমার আব্বা খুব খুশী হতেন শুনলে। কিন্তু সেন্টিমেন্ট দিয়ে সবকিছু বিচার করলে ভুল করবে। জাতির বৃহত্তর প্রয়োজন ও মঙ্গলের জন্য এমন অনেক কিছু করতে হয় যা নীতিশাস্ত্র অনুযায়ী অবিচার আর অন্যায়ের পর্যায়ে পড়ে।

এমিলিয়া বলল, এটাই যদি জাতীয় নীতি হয় মা, তাহলে হিটলারকে দোষ দেয়া যায় কেমন করে? নুরেনবার্গ বিচারের প্রহসনই বা তাহলে করা হলো কেন? জার্মান জাতির পরম সুহৃদ নাজিদেরকে অমানুষিক নির্যাতন আর শাস্তিরই বা শিকার হতে হল কেন?

-জাতীয় দায়িত্ব যখন কাঁধে আসবে, তখনই সব বুঝতে পাবে মা। বলে উঠে দাঁড়াল এমিলিয়ার মা। বলল, তাড়াতাড়ি খেতে এস।

এমিলিয়ার মা চলে গেল।

রাত ১১ টা। নাইটগাউন পরার জন্য এমিলিয়া ডেসিং রুমে ঢুকেছে। হঠাৎ ঘরের মেঝেয় কিছু পতনের শব্দ শুনতে পেল সে।

পার্টিশন ডোরে মুখ বাড়াল এমিলিয়া, মেঝেয় দাঁড়িয়ে আছে মাহমুদ। চোখাচোখি হয়ে গেল। মাহমুদের মুখে এক টুকরো হাসি।

এমিলিয়া প্রথমে বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। বিমূঢ় ভাব কেটে যেতেই তার মুখ রাঙ্গা হয়ে উঠল। সে চোখ নামিয়ে নিল।

মাহমুদ ধীরে ধীরে এগুলো এমিলিয়ার দিকে। একেবারে মুখোমুখি দাঁড়ালো এসে। বললো, কেমন আছ এমি?

কোন উত্তর দিল না এমিলিয়া। চলবার ও কথা বলবার শক্তি যেন সে হারিয়ে ফেলেছে।

কথা বলল মাহমুদ, রাগ করেছ বুঝি তুমি?

মুখ তুলল এবার এমিলিয়া। দুফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল দু'গন্ড বেয়ে তার।

-তুমি কাঁদছ এমি? নীরব অশ্রুর ঢল নেমেছে তখন তার দু'চোখে।

-তুমি কোথায় ছিলে? চকিতে মুখ তুলে প্রশ্ন করল এমিলিয়া।

-তেলআবিবেই ছিলাম।

-এখানেই ছিলে? একটু থামল এমিলিয়া। ঢোক গিলে বলল সে, আমি মনে করেছিলাম, অন্তত আমার জন্মদিনে তুমি আসবেই।

-তুমি পথ চাইবে আমি জানতাম। কিন্তু আসিনি আমি।

-আসনি কেন?

-তোমাদের গোয়েন্দারা সেদিন সারারাত আমার জন্য অপেক্ষা করেছে তোমাদের বাড়ীর চারদিকে।

চমকে উঠে মুখ তুলল এমিলিয়া। তার চোখে বিস্ময়। মাহমুদ বলল, বিস্মিত হবার কিছু নেই। সেই রাতের ঘটনার পর থেকে 'সিনবেথ' গোয়েন্দারা তোমার উপর চোখ রেখেছে আমাকে ধরার জন্য। তারা নিশ্চিত ছিল, জন্মদিনে আমি আসছিই।

-ওরা তাহলে সন্দেহ করছে আমাকে?

-সন্দেহ নাও হতে পারে। হতে পারে ওরা নিশ্চিত হতে চেয়েছিল। তোমার জন্মদিনের পর ওরা কিন্তু আর তোমাদের বাড়ীতে পাহারায় আসছে না।

-তুমি এসে ফিরে গিয়েছিলে।

-না এমি, পা বাড়ালে আমি আসতামই। তোমাদের গোয়ান্দারা আমার পথ রোধ করতে পারত না। কিন্তু আমি চাইনি অপ্রীতিকর কিছু ঘটুক চেয়েছি, কোন সন্দেহই যাতে তোমাকে স্পর্শ না করে।

-কোন পথ না পেয়ে শেষে আমাদের বাড়ীতেই পাহারা বসাতে হল। এমন অসহায় যে ইসরাইল গোয়েন্দা বাহিনী আমি ধারণা করিনি কোনদিন। বলে এমিলিয়া মৃদু হেসে বলল, তোমাকে বসতে বলিনি পর্যন্ত। বসবে চল।

মাহমুদ সোফায় গিয়ে বসল। সোফার উপর কনুই দু'টি ঠেস দিয়ে সোফার পিছনে দাঁড়াল এমিলিয়া। মাহমুদের মাথা এমিলিয়ার গায়ে অনেকটা যেন ঠেস দিল। মাহমুদ মাথাটা একটু সরিয়ে নিল।

-জানো, একটা সুখবর দিতে পারি। বলল এমিলিয়া।

-কি সুখবর? বলল মাহমুদ।

-বলব না। আগে বল বিনিময় কি হবে?

মাহমুদ বলল, কেমন সুখবর না শুনলে কেমন পুরস্কারের যোগ্য হবে কি করে বুঝব?

-কেন বলতে পার না, যা চাইবে তাই।

-বেশ যা চইবে, তাই।

এমিলিয়া কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তার দু'হাতের আঙ্গুলগুলো তখন মাহমুদের জামার কলার নিয়ে খেলা করছিল। সে ধীরে ধীরে বলল, জানো, সেদিন আমি গাজায় গিয়েছিলাম। ওখানকার মোহামেহডান বুক ষ্টোর থেকেঃ Towards understanding Islam, Rights of non Muslim in Islamic State, Islam in Theory and Practice – বই তিনটি কিনে এনেছি। এর মধ্যে Towards understanding islam বইটি শেষ করে ফেলেছি। Islam in Theory and Practice বইটি পড়তে শুরু করেছি। মাহমুদের প্রতি ধমনিতে, প্রতিটি রক্ত কণিকায় আনন্দের স্রোত বয়ে গেল। আল্লাহ তার প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন। মাহমুদ বলল, Towards understanding Islam ইসলামকে জানার জন্য প্রাথমিক স্তরের একখানা অতি উৎকৃষ্ট বই, কেমন লাগল এমি?

-বারে! ভুলে যাচ্ছ কেন? আগে আমার পুরস্কার পরে তোমার প্রশ্নের উত্তর।

-কি চাও বল। মাহমুদ বলল হেসে।

-চাইব না, তুমিই বল, কি দেবে তুমি।

-তোমার ঐ খবর আমাকে যতখানি খুশী করেছে, তার কোন তুলনা আমার জীবনে নেই এমি। তোমার একটি প্রাপ্যের কথাই আমার মনে পড়ছে। কিন্তু এ বই সামান্য।

এমিলিয়ার শুভ্র গন্ডে এক ঝকল রক্তিম স্রোত বয়ে গেল। বলল সে বলই না শুনি? মাহমুদ এমিলিয়ার দু'টি হাত তুলে নিল হাতে। ধীর গম্ভীর স্বরে বলল, ইসরাইল রাষ্টের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, ইসরাইলের এককালীন প্রধানমন্ত্রী এবং বিশ্ব ইহুদীবাদের নেতৃস্থানীয় মস্তিস্ক ডেভিড বেনগুরিয়ানের একমাত্র নাতনি এমিলিয়া তুমি। তুমি কি সব ত্যাগ করে গোঁড়া মুসলিম মাহমুদকে নিয়ে সুখী হতে পারবে।

এমিলিয়া কোন উত্তর দিল না। দু' হাতে মুখ ঢেকে কপালটা এলিয়ে দিয়েছে সোফার উপর।

মাহমুদ একটু ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল কই, উত্তর দিলে না? তার ঠোঁটের কোণায় হাসি।

-ইস আবার জিজ্ঞেস করা হচ্ছে। দিবার কথা তুমি দিয়েছ। যে নিয়েছে সে রাখুক বা ফেলে দিক তোমার কি।

-আমার কিছু নয়, কিন্তু acknowledgementবলতে একটি জিনিস আছে? হাসল মাহমুদ।

-না, তুমি নিষ্ঠুরের মত ডুব মেরে থাক, কিছু পাবে না তুমি। বলে সরে যচ্ছিল এমিলিয়া। একটি হাত ধরে তাকে আটকিয়ে তার দিকে পরিপূর্ণ দু'টি চোখ তুলে ধরে মাহমুদ বলল, একটি কঠিন জীবন তুমি বেছে নিলে এমিলিয়া। লেহিহান অগ্নিশিখার উপর দিয়ে আমাদের চলার পথ। পথের শেষ কোথায় আমরা জানি না। এমিলিয়া মাহমুদের কাছে একটু সরে আসল। কয়েক মুহূর্তের জন্য তার চোখ দুটি বন্ধ হয়ে এল। তারপর চোখ খুলে সে বলল, আজ থেকে এমিলিয়াকে তোমাদের একজন বলে মনে করো মাহমুদ। সুখে দুঃখে তাকে তোমরা তোমাদের পাশেই পাবে।

মাহমুদ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, এটাই তোমার কছে এই মুহূর্তে চাইছিলাম এমিলিয়া। বলে একটু থামল মাহমুদ। তারপর বলল, ফেরাউনী আর শাদ্দাদী শাসনের কবলে পড়ে গোটা পৃথিবী আজ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। এই

অবস্থায় প্রতিটি মুসলামানের উপর এসেছে দুর্বহ দায়িত্ব। আমি দোয়া করি মুসলিম মিল্লাতের একজন হিসাবে আল্লাহ তোমাকে তোমার দায়িত্ব পালনের তওফিক দিন।

-জানো, আজ মার সাথে অনেক তর্ক হলো।

-কি নিয়ে?

-ইসরাইল আরব সমস্যা নিয়ে।

-তুমি বুঝি আরব মুসলমানদের পক্ষ নিয়েছিলে?

-আমি ন্যায়ের পক্ষ নিয়েছিলাম। আমি বলেছিলাম, স্যামুয়েল শার্লটক রাশিয়ায় জন্মগ্রহণ করে এবং আমেরিকায় প্রতিপালিত হয়ে যদি ইসাইলের নিয়ামক হতে পারেন, তাহলে আরব মুসলমানরা ইসরাইলের শাসন ও আইন প্রণয়নের অধিকার পাবে না কেন?

-সুন্দর তোমার যুক্তি। তোমার মা কি বলেছিলেন?

-তিনি বলছিলেন, জাতির প্রয়োজনে অবিচার জুলুম সব সময় অন্যায় নয়। আমি বলেছিলাম, তাহলে হিটলার আর নাজিদেরকে আমরা দোষ দিতে পারব কোন দিক দিয়ে।

মাহমুদ এমিলিয়ার চোখে চোখ রেখেছিল। তার চোখ বিস্ময় -আনন্দে নাচছে।

এমিলিয়ার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। সে বলল, অমন করে চেয়ে থাকলে কিছু বলব না আমি।

মাহমুদ হেসে এমিলিয়ার গালে টোকা দিয়ে বলল, তুমি শুধু সুন্দরই নও এমি, তোমার যুক্তিগুলো আরও সুন্দর। ফিলিস্তিনীদের পক্ষ থেকে এমন করে এ সত্য কথাগুলো ইসরাইলীদের কানে কেউ কখনও তুলে দিতে পারেনি।

-যাও, আর কোন কথা বলব না। বলে এমিলিয়া ছুটে পালাল তার শোবার ঘরে। কিছুক্ষণ পরে এমিলিয়া প্লেটে করে মিষ্টি ও ফল অন্য হাতে এক গ্লাস পানি নিয়ে ফিরে এল। মাহমুদ বলল, রাত দুপুরে একি করছ এমি?

-কি করব সময়ে যে তোমাকে পাই না?

-সে আমার দোষ বটে।

-দোষ তোমার নয়, আমার ভাগ্যের।

-তা বটে, তানা হলে একজন নিশাচর মানুষ ভাগ্যে জুটবে কেন?

-অতএব কোন আপত্তি তো আর চলে না। হাসল এমিলিয়া।

টেবিলে প্লেট সাজিয়ে মাহমুদের সামনে এগিয়ে দিয়ে বলল, নাও আর দেরি নয়।

মাহমুদ বলল, জানি আপত্তি চলবে না। কিন্তু তোমাকেও বসতে হবে এমি। খাবার প্লেট শেষ করল দু'জনে। খাবার প্লেট সরিয়ে রেখে মাহমুদের পাশে বসল এমিলিয়া। বলল, আচ্ছা মাহমুদ, আমি পড়েছি, বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠা ইসলামের চূড়ান্ত লক্ষ্য; সুতরাং ইসলাম চরিত্রগত ভাবে সম্প্রসারণ মুখী। ইসলামের এই বৈশিষ্ট্যের সাথে সাম্রাজ্যবাদের পার্থক্য কোনখানে?

মাহমুদ বলল, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ হাসিলই সাম্রাজ্যবাদের মূল লক্ষ্য। বিজিত জাতির উপর বিজয়ী জাতির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠাই সাম্রাজ্যবাদের একমাত্র কাম্য বিষয়। অন্য পক্ষে ইসলাম এক মতাদর্শের নাম। যেহেতু বিশ্বের মানুষের জন্য বিশ্বস্রষ্ঠার এটা মনোনীত জীবন বিধান, তাই বিশ্বের মানুষের সার্বিক কল্যাণ এর মধ্যেই নিহিত। সুতরাং বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠা এর চূড়ান্ত লক্ষ্য। বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সে সানুষের কল্যাণ করতে চায় এক জাতির স্বার্থোদ্ধার বা অন্য জাতির ক্ষতি সাধন করা তার লক্ষ্য নয়। মুসলমান কখনও তার ব্যক্তিগত শাসন প্রতিষ্ঠা কিংবা মানুষকে নিজের গোলামে পরিণত করা এবং তাদের কঠোর শ্রমলব্ধ অর্থ অবৈধভাবে কেড়ে নিয়ে দুনিয়ার বুকে নিজের স্বর্গ সুখ রচনার জন্য যুদ্ধ করেনা আর মুসলমান হিসেবে এ সবের জন্যে সে সংগ্রাম ও করতে পারেনা। দুনিয়ার কোন প্রান্তের কোন দেশের বা কোন জাতির কে এসে শাসন ক্ষমতায় বসলো, তা নিয়েও কোন মাথা ব্যাথা ইসলামের নেই। ইসলাম শুধু দেখে, সে মংগলের ধর্ম ইসলামের অনুসারী কি না। বিজয়ী ও বিজেতা বলে মানুষের মধ্যে কোন বিভেদের দেয়াল তুলে দেয় না ইসলাম। মুসলমানরা যখন তাদের সংগ্রামে জয় লাভ করে, রাষ্ট্র ক্ষমতার মালিক হয়, তখন মুসলিম শাসদের উপর এক বিরাট দায়িত্ব এসে চেপে বসে। এর ফলে ঐ বেচারাদের রাতের ঘুম ও দিনের আরাম পর্যন্ত হারাম হয়ে যায়। ইসলামী

রাষ্ট্রের শাসকের চাইতে বাজারের একজন নগণ্য দোকানদারের অবস্থা অনেক ভালো হয়ে থাকে। সে দিনের বেলা খলীফা বা শাসকের চাইতে বেশী উপর্জন করে এবং রাতের বেলা নিশ্চিন্তে আরামে ঘুমাতে পারে। কিন্তু খলীফা বেচারা না তার সমান উপার্জন করার সুযোগ পায় আর না পায় রাতের বেলায় নিশ্চিন্তে ঘুমানোর অবসর। দৃশ্যতঃ সাম্রাজ্যবাদও দেশ জয় করে, কিন্তু উভয়ের প্রকৃতিতে আসমান জমিন পার্থক্য বিদ্যমান।

মাহমুদের কথাগুলো যেন এমিলিয়া গোগ্রাসে গিলছিল। বলল সে, কিন্তু এমন কল্যাণ রাষ্ট্রের নমুনা আজ কোথায় মাহমুদ?

এর হুবহু নমুনা কোথাও হয়েতো খুঁজে পাবে না এমি। মুসলমানদের আদর্শ বিচ্যুতিই এর কারণ। এই আদর্শ বিচ্যুতির ফলে শুধু কল্যাণ রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটেছে তাই নয়, নির্যাতন আর গোলামীর শৃংখল নেমে এসেছে মুসলমানদের মাথায়। কয়েক লক্ষ ইসরাইলীর হাতে আমরা মার খাচ্ছি। তুর্কিস্তান ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে আমরা গোলামী করছি অন্য জাতির। আবিসিনিয়া ও স্পেন থেকে আমাদের অস্তিত্ব মুছে গেছে। আল্লাহ যে মুসলমানদেরকে বিশ্বের মানুষকে পথ দোখানোর দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন, সেই মুসলমানরা আজ চোখ বন্ধ করে অন্যের দেখানো পথে চলছে। আবেগ উত্তেজনায় মাহমুদের কণ্ঠ যেন বুজে আসল। থামল সে। আবার বলল, আমরা এ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য কাজ করছি এমি। সাইমুমের হাজার হাজার মুসলিম তরুণ এ পথে জীবন দিতে প্রস্তুত। আমরা শুধু ফিলিস্তিনের মুক্তি নয়, মুসলমানদেরকে পুনগঠিত পুনর্জাগরিত করে তাদের উপর থেকে নির্যাতন আর গোলামীর অবসান ঘটাতে চাই ¬- প্রতিষ্ঠিত করতে চাই কল্যাণ রাষ্ট্র। থামল মাহমুদ।

এমিলিয়াও নীরব। সেও ভাবছে। কিছুক্ষণ পরে সে বলল, মতাদর্শ হিসাবে কম্যুনিজমও আন্তর্জাতিক চরিত্রের। সুতরাং ইসলামের সাথে তো সংঘর্ষ তার অবশ্যম্ভাবী?

মাহমুদ হেসে বলল, দৃশ্যত তা বোঝায় কিন্তু কম্যুনিজমের উপর দিয়ে স্বাভাবিক নিয়মে যে পরিবর্তনের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে, তাতে কম্যুনিজম রূপ নিতে যাচ্ছে পুঁজিবাদে। হেগেল থেকে মার্কস, মার্কস থেকে লেনিন, লেনিন থেকে

ষ্টালিন, তারপর বর্তমান রাশিয়ার ঘটনা পরস্পরের বিচার করলেই তা বুঝতে পাবে। চীনও এ পথই ধরেছে। সুতরাং আপাতত কিছু সংঘর্ষ হলেও কম্যুনিজম ইসলামের সাথে প্রতিযোগিতার যোগ্য নয় মোটেই।

-কিন্তু পরিবর্তন তো ইসলামেরও এসেছে। বলল এমিলিয়া।

-না এমি, পরিবর্তন ইসলামের নয়, পরিবর্তন এসেছে মুসলমানদের আচার আচরণে। কম্যুনিজমের নির্মাতা মানুষ, মানুষ তার পরিবর্তন করতে পারে। কিন্তু ইসলাম মানুষের উদ্ভাবিত নয়, সুতরাং কোন মানুষ তার পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। আরও পড়াশুনা কর এমি, বুঝতে পারবে সব। মাহমুদ থামল।

মাথা নত করে চুপ করে বসে ছিল এমিলিয়া। মাথা তুলল সে। মাথা তুলতেই মাহমুদের সাথে চোখাচোখি হয়ে গেল। আবার চোখ নামিয়ে নিল এমিলিয়া। মুখ তার রাঙ্গা হয়ে উঠেছে। বিজলী বাতির আলো রাঙ্গা মুখকে আরো সুন্দর করে তুলেছে। মাহমুদ বলল, তোমার সুন্দর ঐ মুখ মনকে স্বপনের জাগতে নিয়ে যায়, কিন্তু তোমার মনের সত্যানুসন্ধিৎসা আবার ফিরিয়ে আনে মনকে বাস্তব জগতে। স্বপ্ন আর বাস্তবের সমাহারে তুমি অপরূপ এমি।

এমিলিয়া দু'হাতে মুখ ঢেকে বলল, যাও, মানুষকে খুব লজ্জা দিতে পার। মাহমুদ হেসে বলল, যাবার সময় হল এমি। এবার সত্যিই উঠতে হবে। এমিলিয়া বলল, বারে। তোমাকে বুঝি আমি যেতে বললাম?

-না বললেও যেতে হবে।

-কিন্তু এত তাড়াতাড়ি?

-রাত এখন বারটা। ওরা খুব ভাববে।

-ওরা কারা?

-আমার সহকর্মীরা।

-তুমি এখনে এসেছ ওরা জানে?

-হাঁ জানে। আমরা কিছু গোপন করতে পারি না এমি? প্রথম দিনই আমি এ বিষয়টি আমাদের হেড কোয়ার্টারে আমাদের অধিনায়ক আহমদ মুসাকে জানিয়েছি।

-তিনি কি বলেছেন। অধীর কন্ঠে বলল এমি।

-তিনি বলেছেন, তুমি মুসলমান - একথা স্মরণ রেখে পথ চললে কোন কাজেই তোমার ভুল হবে না। থামল মাহমুদ। আবার বলল, ইসলামের প্রতি তোমার অনুরক্তির কথা শুনালে তিনি খুব খুশী হবেন।

-এ কথাও জানাবে বুঝি?

-নিশ্চয়।

-আচ্ছা তোমার সংগঠন যদি তোমাকে আমার থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিত?

-সংগঠন দ্বিমত পোষণ করতে পারে বা জাতির কোন ক্ষতি হতে পারে, এমন কোন সিদ্ধান্ত আমি নিতে পারি না, একথা আমি যেমন জানি, আমার সংগঠনও তেমনি জানে।

-আচ্ছা ধর, এমন সিদ্ধান্ত যদি নিতো।

-আমি সংগঠনের সিদ্ধান্ত মেনে নিতাম।

-এমন নিষ্ঠুর হতে পারতে? কষ্ট হত না?

-হয়তো হতো, কিন্তু জ্ঞান ও কর্তব্যের নির্দেশ সবচেয়ে বড়।

এমিলিয়া হাসল। বলল, ভাগ্যবতী আমি তাই না?

মাহমুদ বলল, তুমি ভাগ্যবতী কিনা জানি না। কিন্তু আমার যাযাবর জীবনে তোমাকে পেয়েছি এক স্নিগ্ধ আলোর মতো। যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ি, যখন দেহমন শান্তির সন্ধানে উন্মুখ হয়, তখন তোমার স্মরণ আমাকে শান্তি দেয় এমি। দেহ মনকে সজীব করে নতুন শক্তিতে।

এমিলিয়া একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলল, আমি তোমার ঠিকানা জানতে চাই না, জিজ্ঞাসাও করব না তোমাকে কোথায় পাব। কিন্তু কথা দাও, তুমি মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে যাবে। জানি তুমি ব্যস্ত। কাজ তোমাদের গুরুত্বপূর্ণ, তবু আমার অনুরোধ, উদ্বেগ যাতনায় জর্জরিত একটি হৃদয়ের শান্তনার জন্য তুমি আসবে।

-সময় পেলেই আমি আসব এমি। বলে থামল, তারপর বলল, আমার এবার যে উঠতে হয়।

-এমিলিয়া বলল, আর একটি কথা। ক্লাবে রেস্তোরায় আর যাই না। ইউনিভার্সিটির পড়াতেও মন বসাতে পারেছি না। শত চেষ্টা করেও মনকে ফিরিয়ে রাখতে পারি না তোমার চিন্তা থেকে। তুমি আমাকে কোন কাজ দাও, তোমার দেওয়া কাজ করে হয়তো হৃদয়ে শান্তি পাব।

মাহমুদ চিন্তা করল। বলল তারপর, তোমার সাহায্য পেলে আমরা সুখী হব এমি। কিন্তু হেড কোয়ার্টারের সাথে পরামর্শ না করে কোন কাজ আমি তোমাকে দিতে পারি না। থামল একটু তারপর আবার বলল মাহমুদ, তুমি মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছ এমি?

-কি মনে কর তুমি?

-ক্লাবে রেস্তেরায় যাওয়ার মত নির্লজ্জতাও যখন ছেড়ে দিয়েছ, তখন মদ তুমি খেতে পার না।

-হাঁ, তোমার সাথে বল নাচের সেই রাত থেকেই মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি মাহমুদ।

মাহমুদের মুগ্ধ ও আনন্দোজ্জ্বল চোখ দু'টি পলকহীন দৃষ্টিতে এমিলিয়ার মুখের দিকে চেয়েছিল। ধীরে ধীরে সে এমিলিয়ার একটি হাত তুলে নিতে গেল।

মাহমুদের সেই দৃষ্টির সামনে গোটা দেহ যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল এমিলিয়ার। একটা অপরাধী স্পর্শ যেন তার গোটা দেহ অবশ করে দিচ্ছে। চোখ দু'টি বুজে এল তার। কাঁপছে যেন সে।

কিন্তু মাহমুদ সচেতন হল। মন তার স্বীকার করল, সীমা লংঘন করেছে সে। এমিলিয়ার হাত স্পর্শ না করে হাত টেনে নিয়ে বলল, না এমি, আমরা সীমা লংঘন করছি, আসি আজ।

চমকে উঠল এমিলিয়া। চোখ খুলল সে। মুক তার আরক্ত হয়ে উঠল, বলল, সত্যি বলেছ মাহমুদ। সাবধান হব আমরা ভবিষ্যতে। জানালার কাছে এসে দাঁড়াল মাহমুদ। বাইরে নিকষ কালো অন্ধকার। জানালা দিয়ে নীচে তাকিয়ে আঁতকে উঠল এমিলিয়া। এই অন্ধকারে নামবে কেমন করে? তার কন্ঠে উৎকণ্ঠা।

মাহমুদ হাসল। বলল, ভেব না এমি। আমার অভ্যেস আছে দোয়া করো। আসি। খোদা হাফেজ।

-এসো, খোদা হাফেজ। হাসতে চেষ্টা করল, ঠোঁট কাপল শুধু। জানালা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল মাহমুদ। অন্ধকারে মাহমুদকে আর দেখা গেল না। এমিলিয়া দাঁড়িয়ে রইল ঐ খানে তেমনি ভাবে। চারিদিক নীরব। গোটা তেলআবিব যেন ঘুমাচ্ছে। বড় একা বোধ করল এমিলিয়া। জানালা থেকে সরে এল সে। মাহমুদের উপস্থিতির উষ্ণতা এমিলিয়া সব জায়গায় অনুভব করছে। এমিলিয়া সোফায় গিয়ে গা এলিয়ে দিল। হঠাৎ টি পয়ের উপর মাহমুদের একটি রুমাল চোখে পড়ল এমিলিয়ার। রুমালটি তুলে নিয়ে মুখে চেপে ধরল এমিলিয়া। দু'টি চোখ বুঁজে এল তার।

পরবর্তী কাহিনীর জন্য পড়ুন

# অপারেশন তেলআবিব - ২

# সাইমুম-২

# অপারেশন তেলআবিব-২

আবুল আসাদ

# ১

কায়রো। হোটেল নাইল। হোটেলের কফিখানা। কফিখানায় প্রবেশ করল আবদুল্লাহ জাবের। সাইমুমের কায়রো অপারেশন স্কোয়াডের প্রধান ইনি।

তখন সন্ধ্যা সাতটা। কফিখানা ভর্তি। সামনের একটি টেবিলে একটি সিট খালি দেখতে পেল জাবের। টেবিলের ওপাশে আর একজন লোক বসা। পরণে নীল স্যুট। শ্যাওলা রং-এর টাই। আরবীয় ধরনের লম্বাটে রোদপোড়া মুখ। কিন্তু তার ঘোলাটে লাল চোখ আর চেপ্টা নাক খুব স্বাভাবিক নয়। জাবের গিয়ে বলল, "বসতে পারি আপনার টেবিলে?"

লোকটির হাতে ছিল সেদিনকার আ-আহরাম কাগজ। কাগজটির পাতায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কলমের আঁচড়। কোনটি অনর্থক আঁচড়, কোনটি আরবী ও ইংরেজী বর্ণমালার কোন অক্ষর। কোনটি আবার কোন শব্দও হয়েছে। এমন ধরনের লোক আছে যাদের হাতে কলম যদি থাকে, কাগজ যদি পায়, আর অবসর সময়ও যদি থাকে তাহলে আর কোন কথা নেই- নিরুদ্দেশভাবে কলম তাদের চলবে। জাবের ভাবল লোকটি সেই প্রকৃতির। তার হাতে তখনও কলম ছিল। ইতস্তত কলম চালাচ্ছিল সে। কয়েকটি হিব্রু অক্ষর জাবেরের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

মনোযোগ দিয়ে পড়ে চমকে উঠল জাবের। হুগো গ্যালার্ট? নামটি তার পরিচিত মনে হচ্ছে। এই সময় লোকটি মুখ তুলে জাবেরের প্রশ্নের জবাবে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। কথা বলল না।

জাবের বসল। এক কাপ কফির অর্ডার দিল সে। কিন্তু চিন্তা তার ঘুরপাক খাচ্ছে হুগো গ্যালার্ট নাম নিয়ে। হঠাৎ তার মনে পড়ল, গোপন বিশ্ব ইহুদী গোয়েন্দাচক্র 'ইরগুণ জাই লিউমি'র একজন স্পাই হুগো গ্যালার্ট। ইসরাইলদের তথ্য সরবরাহ করতে গিয়ে সেদিন তেলআবিবে ধরা পড়েছে সাইমুমের হাতে।

কথাটা মনে হবার সাথে সাথে জাবেরের সমগ্র চেতনা সক্রিয় হয়ে উঠল। এই লোক হুগো গ্যালার্টের নাম জানল কি করে? হুগো গ্যালার্টের নাম জানে সাইমুম, ইসরাইল গোয়েন্দা এবং ইরগুণ জাই লিউমি। লোকটি সাইমুমের নয় মোটেই, তাহলে কি শেষোক্ত দল দু'টির কোন একটির? আবার মনে হলো জাবেরের, হুগো গ্যালার্ট নাম হয়ত আরো থাকতে পারে। এমনকি লোকটির নাম হুগো গ্যালার্ট-এমনও হতে পারে। কিন্তু জাবেরের মনে প্রশ্ন জাগল লোকটি হিব্রু জানল কি করে? ভাষাটা ইহুদীদের নিজস্ব এবং ওরাই ভাষাটিকে পুর্নজীবিত করে তুলছে। সুতরাং নামের ব্যাপারটিকে কো-ইনসিডেন্স ধরলেও লোকটির হিব্রু জ্ঞান স্বাভাবিক নয়।

জাবের কফির কাপ থেকে মুখ তুলল। চাইল লোকটির দিকে। টেবিলের পাশে রাখা হ্যাট তুলে মাথায় পরছে সে। কপাল ও চোখের একাংশ অস্পষ্ট হয়ে গেছে। ক্লিন-সেভড মুখ। নিচের ঠোঁট ও থুতনির মাঝামাঝি জায়গায় একটি ছোট কাটা দাগ। লোকটি কাগজ মুড়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

জাবের মুহূর্তে সিদ্ধান্ত ঠিক করে নিল। লোকটি কফিখানা থেকে বেরিয়ে যেতেই জাবেরও উঠে দাঁড়াল। কফিখানা থেকে বেরিয়ে এসে জাবের দেখল, লোকটি রিসেপশন রুমের পাশ দিয়ে লিফটরুমে গিয়ে ঢুকল। লোকটি কি তাহলে হোটেলের বাসিন্দা? ভাবল জাবের। লিফটে অনুসরণ করা সমীচীন মনে করল না সে। সন্দেহের কোন অবকাশ দিতে চায় না জাবের। সে রিসেপশন কাউন্টারের সামনে সোফায় গিয়ে বসল।

মাত্র ন'মিনিট। লোকটি ফিরে এল। লিফট-রুম থেকে বেরিয়ে কাউন্টারে এসে সে রিসেশনিস্টকে তার ঘরের চাবি দিয়ে দিল। জাবের দেখল, ৩০১ চিহ্নিত প্লাকে চাবিটি আটকিয়ে রাখল রিসেপশনিস্ট। ৩০১ সংখ্যাটি জাবের কয়েকবার উচ্চারণ করল মনে মনে।

হোটেলের দরজায় গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়াল লোকটি। একবার সময় দেখলো। তারপর বেরিয়ে গেল হোটেল থেকে।

আবদুল্লাহ জাবের যখন তার গাড়ীতে উঠে বসল, তখন লোকটির ভাড়া করা ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়েছে গাড়ীর রিয়ার লাইটে গাড়ীর নম্বর স্পষ্ট হয়ে উঠল। সাইমুম কর্মী তৌফিকের গাড়ী ওটা। ঘটনার অভাবনীয় আনুকূল্যের জন্য জাবের আল্লাহকে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করল।

নাসের এভিনিউ ধরে গাড়ী এগিয়ে চলেছে। সন্ধ্যার রাজপথ। প্রচন্ড ভীড় গাড়ীর। নাসের এভিনিউ পার হয়ে গাড়ী ফারুক এভিনিউতে পড়ল। জাবের সাইমুমের সাউন্ড-কোর্ড-এ তৌফিকের উদ্দেশ্যে সংকেত পাঠালো। কয়েক সেকেন্ড পর সামনের গাড়ী থেকে পরিচিত সংকেত এল গাড়ীর হর্ণ থেকে।

গাড়ী আতাবা-আল-খাদরায় প্রবেশ করল। কায়রো শহরের পুরাতন আর নতুন অংশের এটা সংগমস্থল। এখান থেকে ডজন খানেকেরও বেশী বড় ও ছোট রাস্তা শহরের বিভিন্ন দিকে চলে গেছে। আতাবা আল খাদরা থেকে তৌফিকের গাড়ী ইবনুল আরাবী রোড ধরে পূর্ব দিকে এগিয়ে চলল। নীল নদের তীর ঘেঁষে গওহর রোড। ইবনুল আরাবী রোড এই গওহর রোডে গিয়ে মিশেছে। তৌফিকের গাড়ী এসে গওহর রোডের উপর নীল নদের তীর ঘেঁষে নির্মিত গওহর মসজিদের পাশে দাঁড়াল। ফাতেমী বংশের খলিফা আল-মুইজের সেনাপতি গওহর এই মসজিদের নির্মাতা। তিনি কায়রো শহরেরও প্রতিষ্ঠাতা। শহরটি প্রতিষ্ঠিত হয় ৯৬৯ খৃষ্টাব্দে।

লোকটি গাড়ী থেকে নেমে তৌফিককে তার ভাড়া মিটিয়ে দিল। পকেট থেকে টাকা বের করার সময় এক টুকরো কাগজ লোকটির পকেট থেকে পড়ে গেল। তৌফিককে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার জন্য মুখ তোলায় সে এটা লক্ষ্য করতে পারলো না।

ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে সে নদীর ধারে বেঁধে রাখা 'দাহাবিয়া'র দিকে এগিয়ে গেল। 'দাহাবিয়া' বজরা নৌকা বিশেষ। নীল নদীতে ভ্রমণ, নদী পারাপার ইত্যাদি কাজের জন্য এগুলো ব্যবহৃত হয়। নদীতে ভ্রমণের জন্য বৈকালে লোকের প্রচুর ভীড় জমে। সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে তবু অনেক লোকজন দেখা যাচ্ছে। লোকটি একটি দাহারিয়ায় গিয়ে উঠল।

জাবের তৌফিকের পাশে এসে দাঁড়াতেই তৌফিক লোকটির পকেট থেকে পড়ে যাওয়া কাগজটি তার হাতে দিল। সেই হিব্রু লিখা। জাবের পড়ল,

"আজ রাত ৮-১৫ ৯নং জাজিরা-৩"

নীল নদের মধ্যে ছোট সুন্দর দ্বীপ রয়েছে। এই দ্বীপগুলোকে বলে জাজিরা। এই জাজিরাগুলোতে সুন্দর সুন্দর বাড়ী তৈরী করে বাস করছে কায়রোর ধনী অভিজাত আর বড় বড় সরকারী কর্মচারীরা। জাজিরার বাড়ীগুলো দেখতে খুব সুন্দর। প্রায় প্রতিটি বাড়ীর সামনে বাগান। বিখ্যাত বিদেশী গাছে ঘেরা বাড়ীগুলো। রাজতন্ত্রের যুগে জাজিরাগুলো আমির-ওমরাহদের বাসস্থান হিসেবে প্রায় নির্দিষ্ট ছিল। মিসরের অনেক উত্থান-পতন এবং অগণিত অঘটন সংঘটনের ইতিহাসের সাথে এই জাজিরাগুলোর নাম জড়িত। জাবের লিখাটির অর্থ করল, আজ রাত দশটায় তিন নম্বর জাজিরার নয় নম্বর বাড়ীতে একটা কিছু হচ্ছে। লোকটি জাজিরার সেই বাড়ীতেই তাহলে যাচ্ছে।

৩নং জাজিরার নয় নম্বর বাড়ী-মনে মনে সন্ধান করল জাবের। মরহুম ফিল্ড মার্শল আবদুল হাকিম আমরের বাড়ী এই জাজিরাতে। এই জাজিরাতেই মেজর জেনারেল আবুদল হাফিজ রশিদ এবং কায়রো গ্যারিসনের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং ব্রিগেডিয়ার ফখরুদ্দীন আলীর গ্রীষ্মাবাস। এছাড়াও সরকারী ও বেসরকারী আরও কয়েকজন অভিজাত পরিবার বাস করেন এই জাজিরাতে। কিন্তু জাবের ঠিক করতে পারলো না কোন বাড়ীটির নম্বর 'নয়'।

-ফিল্ড মার্শল আবদুল হাকিম আমরের বাড়ীর নম্বর কত তুমি জান তৌফিক? তৌফিকের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল জাবের।

তৌফিক তাড়াতাড়ি তার ড্রাইভিং সিটের তলা থেকে একটি ক্ষুদ্র নোটবই বের করল। নোটবই দেখে তৌফিক বলল, পাঁচ নম্বর।

-আর নয় নম্বর বাড়ী? পুনরায় জিজ্ঞেস করল জাবের।

-নয় নম্বর বাড়ী হ'ল ফখরুদ্দীন আলী সাহেবের। কিন্তু তিনি গ্যারিসনের স্টাফ কোয়ার্টারেই বাস করেন। মাস খানেক হলো বোধ হয় তিনি বাড়ীটি ভাড়া দিয়েছেন। সাইপ্রাসের ইসহাক এমিল নামের একজন ধনী ব্যবসায়ী এই বাড়ীটিতে বাস করছেন এখন।

-লোকটিকে তুমি দেখেছ?

-একবার দেখেছি। বয়স ৪৫ থেকে ৫০। মাথায় টাক। গ্রীকদের মত আরবী উচ্চারণ। মুসলমান বলে মনে হয়নি আমার কাছে।

-কেন?

-লোকটি হিব্রু জানে, অথচ তুর্কি জানে না। সাইপ্রাসে টারকিশ সাইপ্রিয়টদের সংস্পর্শে বাস করে তুর্কি জানে না-এটা অবিশ্বাস্য।

-ঠিক বলেছ তৌফিক। কিন্তু লোকটি হিব্রু জানে কেমন করে বুঝলে তুমি?

-আমি একদিন তাকে লিফট দিয়েছিলাম। ভাড়া নেবার সময় তার তর্জ্জনীর সোনার আংটিতে একটি হিব্রু অক্ষর দেখেছি।

জাবের কিছুক্ষণ চিন্তা করল। তারপর কিছুটা স্বগত স্বরেই বলল, তুমি আজ যাকে লিফট দিলে, সেও হিব্রু জানে এবং সে যেখানে যাচ্ছে সেখানেও হিব্রু জানা লোক, এর অর্থ কি তৌফিক।

-অর্থ পরিষ্কার, Another jews Conspiracy (আর একটি ইহুদী ষড়যন্ত্র)।

-কিন্তু একেবারে তা ব্রিগেডিয়ার ফখরুদ্দিন আলীর বাড়ীতে বসে?

-জি, এটা বিস্ময়কর বটে।

নীল নদের একটি ক্ষুদ্র জাজিরা। ব্রিগেডিয়ার ফখরুদ্দিন আলীর বাসভবন। বাড়ীর চারদিকে ঘেরা বাগান। বাগানের বহিঃপ্রান্ত দিয়ে কাঁটা তারের বেড়া। বাড়ীর সামনে বিরাট লোহার ফটক। সেখান থেকে বাগানের মধ্যে দিয়ে

একটি লাল শুড়কীর রাস্তা গাড়ী বারান্দায় গিয়ে ঠেকেছে। বাড়ীর দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিকে বিভিন্ন প্রকার বিদেশী গাছ লাল রং এর বাড়ীটি ঘিরে সবুজের মেলা বসিয়েছে। বাড়ীর এই অংশ অনেকটা অন্ধকার। বাড়ীর প্রধান অংশ উত্তর ও পূর্বদিকে। দক্ষিণ দিকে প্রচীর দিয়ে ঘেরা। পশ্চিম দিকে রান্না ও ভাড়ার ঘর। দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে কোন আলো দেখা যাচ্ছে না। গাছের ছায়ায় এ অংশে অন্ধকার আরো ঘনিভূত হয়ে উঠেছে।

দ্বিতলের একটি হলঘর উজ্জ্বল আলোতে ঝলমল করছে। ঘরটির দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিকে একটি করে কাঁচের জানালা। জানালাগুলো বন্ধ। সেগুলো আবার কালো পুরু কাপড় দিয়ে ঢাকা। এর ফলে ঘরের অভ্যন্তরের কথা ও দৃশ্য-দুটোরই বর্হিগমন রুদ্ধ হয়েছে। দক্ষিণের জানালার সামনে একটি বড় সোফা। এতে বসেছেন ব্রিগেডিয়ার ফখরুদ্দিন আলী এবং এসহাক এমিল। এ সোফার পূর্ব পাশে আর একটি সোফা। এটাতে বসেছে হোটেল নাইল থেকে আগত সেই লোকটি। সোফার সামনে টি পয় দু'টির উপর কফির খালি পেয়ালা পড়েছিল। বেয়ারা এসে কুড়িয়ে নিয়ে গেল। সে বেরিয়ে যাবার সময় ভালো করে দরজা এটে দিল। বেয়ারা বেরিয়ে যাবার পর ইসহাক এমিল নড়েচড়ে বসল। বলল, এবার বলুন মিঃ আলী।

ব্রিগেডিয়ার আলী বললেন, আমার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ। আলেকজান্দ্রিয়া নৌঘাঁটির ভাইস এডমিরাল আলী আশরাফ, ইসমাইলিয়া ও পোর্ট সৈয়দের সহকারী সেনাধ্যক্ষ কর্ণেল শরিফ ও আহসানের সমর্থন আমি পেয়েছি। এছাড়া কায়রো বিমান ঘাটির এয়ার কমোডর ফারুকী এবং স্কোয়ার্ডন লিডার সেলিম ও কামালও যোগ দিয়েছে আমার সাথে। আপনাদের সহযোগিতা পেলে আমি সফল হবো আশা করি।

ইসহাক এমিল পাশের সোফায় বসা হোটেল নাইল থেকে আগত লোকটির দিকে ইশারা করে বলল, এ সম্পর্কে বিস্তারিত প্রোগ্রাম নিয়ে এসেছেন মিঃ স্যামুয়েল আলফ্রেড। সবকিছু তিনিই জানাবেন।

স্যামুয়েল আলফ্রেড বিশ্ব ইহুদী আন্দোলনের গোপন প্রতিষ্ঠান 'ইরগুণ জাই লিউমি'র একজন বিশিষ্ট সদস্য। কিন্তু ব্রিগেডিয়ার আলীর কাছে তার

পরিচয় বিশ্বশান্তি পরিষদের (ওয়ার্ল্ড পিস ব্রিগেড)-এর একজন মুখপাত্র হিসেবে। ইসহাক এমিলেরও এই পরিচয় তার কাছে। ব্রিগেডিয়ার আলীকে বোঝান হয়েছে, বিশ্ব শান্তির জন্য মিসরের বর্তমান সরকারের পরিবর্তন বিশ্বের শান্তিকামীদের কাম্য। বর্তমান আনোয়ার রশিদ সরকারের পরিবর্তনে মধ্যপ্রাচ্যে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থান সম্ভব হবে বলে তাঁকে জানানো হয়েছে এবং ওয়ার্ল্ড পিস ব্রিগেড এবং বিশ্বের শান্তিকামীদের তরফ থেকে ব্রিগেডিয়ার আলীকে আশ্বাস দেয়া হয়েছে যে, রশিদ সরকারের পরিবর্তে তাকে মিসরের ক্ষমতায় আসীন করতে সব সহযোগিতা দান করা হবে। স্যামুয়েল আলফ্রেড এসেছেন ওয়ার্ল্ড পিস ব্রিগেড তথা বিশ্বশান্তি পরিষদের তরফ থেকে তার সুস্পষ্ট বক্তব্য নিয়ে।

ইসহাক এমিল থামলে স্যামুয়েল আলফ্রেড বলল, মিঃ আলী আমাকে শুধু ওয়ার্ল্ড পিস ব্রিগেডের মুখপাত্র বলেই আপনি মনে করবেন না, শান্তিকামী রাশিয়া, বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী বক্তব্যও আমিই বহন করে এনেছি। বলে স্যামুয়েল আলফ্রেড তার পকেট থেকে তিনটি চিঠি বের করে ব্রিগেডিয়ার আলীর হাতে দিলেন। চিঠিগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও রাশিয়ার প্রতিরক্ষা দপ্তরের এবং সেগুলোতে এসব দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সহি ও সীলমোহর রয়েছে।

স্যামুয়েল আলফ্রেড আবার শুরু করলেন, ১১ই রবিউল আউয়াল সন্ধ্যায় প্রধান সেনাপতি জেনারেল আবু তারিক আল জামাল এক গোপন সফরে দেশের বাইরে যাচ্ছেন, আমরা চাই তারা যেন আর কোন দিন দেশে ফিরে আসতে না পারেন।

স্যামুয়েল আলফ্রেডের কথা শেষ না হতেই ব্রিগেডিয়ার আলী প্রশ্ন করলো, তাঁরা কোথায় যাচ্ছেন ঐ দিন।

স্যামুয়েল একটু হাসল। বলল তারপর, বিশ্ব শান্তির শত্রু সাইমুম আহূত সম্মেলনে যোগ দিতে সৌদী আরবে। স্যামুয়েল থামল একটু। তারপর বলল আবার, ১১ তারিখ দিনগত রাত ও ১২ তারিখের দিনের মধ্যেই সব কাজ সম্পন্ন করতে হবে। সম্ভব হলে এর আগেও অভ্যুত্থান চলতে পারে, কিন্তু কোন ক্রমেই

তা ১২ই রবিউল আউয়াল থেকে পিছিয়ে দেয়া চলবে না। ১২ই রবিউল আইয়াল চুড়ান্ত।

ব্রিগেডিয়ার আলী বলল, রশিদ সরকারের অনুগত সামরিক অফিসারদের বিস্তৃত লিষ্ট তৈরী সম্পন্ন হয়েছে। প্রথম আঘাতেই আমরা ওদের সরিয়ে ফেলবো, তারপরের কাজ খুব কঠিন হবে না আমাদের জন্য। কিন্তু ভাবছি আমি রশিদ সরকারের বন্ধু এবং সাইমুমের প্রভাবাধীন পার্শ্ববতী আরব রাষ্ট্রগুলোর কথা। যদি ওদের সাহায্য পেয়ে ডিফেন্স তৈরী হয় আমাদের বিরুদ্ধে?

স্যামুয়েল আলফ্রেড বলল, এ চিন্তা আমরাও করেছি, কিন্তু এতে উদ্বেগের কিছুই নেই। কায়রো বেতার থেকে আপনাদের অভ্যুত্থান ও নতুন সরকার গঠনের কথা ঘোষিত হবার পর মুহূর্তেই রাশিয়া, বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইসরাইল প্রভৃতি রাষ্ট্র আপনার নতুন সরকারকে স্বীকৃতি ও সমর্থন দিবে। যদি পার্শ্ববর্তী বা বাইরের কোন দেশ সামান্য হস্তক্ষেপেরও চেষ্টা করে মিসরের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে, তাহলে নতুন সরকারের নিরাপত্তার জন্য ঐ রাষ্ট্রসমূহ এগিয়ে আসবে এবং এজন্য তারা যে কোন ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত। এমন কি আপনার সরকার যদি অভ্যন্তর থেকেও কোন মারাত্মক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়, তাহলে যে কোন সাহায্যের জন্য ইসরাইলী সশস্ত্র বাহিনী প্রস্তুত থাকবে। গত ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে পাওয়া মিসরীয় বিমান বাহিনীর প্রতীক সম্বলিত কিছু বিমান ও মিসরীয় বাহিনীর বহু ট্যাংক ইসরাইলের কাছে রয়েছে, প্রয়োজনবোধে ইসরাইল এসব আপনার সরকারের সাহায্যের জন্য নিরাপদে ব্যবহার করতে পারবে।

ব্রিগ্রেডিয়ার আলী বলল, আমি কৃতজ্ঞ থাকব আপনাদের সাহায্যের জন্য।

স্যামুয়েল আলফ্রেড বলল, সব সাহায্যের বিনিময়ে আমরা কয়েকটি শর্তের প্রতি আপনার স্বীকৃতি দাবী করছি –

(১) সাইমুমের সাথে আপনার সরকার কোন সম্বন্ধ রাখতে পারবে না এবং যাদের সাথে বা যে সরকারের সাথে সাইমুমের সম্পর্ক আছে, তাদের সাথে আপনার সরকার কোন সম্পর্ক রাখতে পারবে না।

(২) ইসরাইলের সাথে মিসর প্রতিরক্ষা চুক্তিতে যোগ দেবে।

(৩) মিসর 'ওয়ার্ল্ড পিস ব্রিগেড'-এর সদস্য হবে।

কথা শেষ করে থামল স্যামুয়েল আলফ্রেড।

ব্রিগেডিয়ার আলী কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বলল, শর্তগুলোর কোনটিই কঠিন নয় এবং ঐগুলোর সাথে আমি একমত। কিন্তু দ্বিতীয় শর্তটি জনমনের সাথে সম্পর্কিত ও সেন্টিমেন্টাল। এর বাস্তবায়ন কিছুটা সময় সাপেক্ষ হতে পারে, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও বৃটেনের সাহায্য সহযোগিতা পেলে তা কঠিন হবে না মোটেই।

স্যামুয়েল আলফ্রেড বলল, শুনে খুশী হলাম। আমরা সকলে সেই শুভ দিনটির অপেক্ষা করব।

ইসহাক এমিল তার সামনের টি পয়ের একটি সুইচে চাপ দিল। কিছুক্ষণ পরে একটি ট্রেতে করে ফরাসী লেবেল দেয়া মদের দু'টি বোতল আর কয়েকটি গ্লাস নিয়ে প্রবেশ করল বেয়ারা।

ফরাসী হুইস্কি নিয়ে যখন ওরা ব্যস্ত হয়ে পড়ল তখন দেখা গেল দক্ষিণের জানালায় একটি ছায়ামূর্তি অতি সন্তর্পণে একটি হাই সেন্সেটিভ রেডিও রিসিভার তার সমেত গুটিয়ে নিয়ে পকেটে রাখল। কাঁচের জানালার ১ বর্গফুট পরিমিত স্থান থেকে কাঁচ কেটে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। সেই পথ দিয়ে একটি হাই সেন্সেটিভ রেডিও রিসিভার ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিল। রেডিও রিসিভারের বাইরের প্রান্তে একটি রেকর্ডার সংযুক্ত ছিল।

ছায়ামূর্তিটি আর কেউ নন আবদুল্লাহ জাবের। ঘরের ভেতরের সবগুলো কথাই জাবের শুনেছে। বিস্ময় ও উত্তেজনায় সে ঘেমে উঠেছে। কি জঘন্য তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। জাবের নিশ্চিত ইসহাক এমিল এবং স্যামুয়েল আলফ্রেড দু'জনেই গোপন বিশ্বইহুদী গোয়েন্দাচক্র 'ইরগুণ জাই লিউমি'র লোক। জাবের বুঝতে পারছে,

ইহুদীদের এটা মরণ কামড়। সাইমুমের কাজ এবং পরিকল্পনাকে কোন পথে বানচাল করতে না পেরে, অবশেষে মুসলমানদের ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে শেষ রক্ষা করতে চাচ্ছে তারা। রশিদ সরকারের পরিবর্তন ঘটিয়ে পুতুল সরকারের পত্তন করে ইহুদীরা একদিকে সাইমুম আহূত আসন্ন আরব-সম্মেলনকে বানচাল করতে

চাচ্ছে, অপরদিকে ফিলিস্তিনের মুক্তি পরিকল্পনাকে নস্যাৎ করে দিতে চাচ্ছে। সাইমুমের হেড কোয়ার্টারে অবিলম্বে খবর পৌঁছানো দরকার। জাবের চঞ্চল হয়ে উঠল। প্রতিটি মুহূর্ত তার কাছে মনে হচ্ছে একযুগ।

কার্নিস বেয়ে পা টিপে টিপে জাবের পানির পাইপের দিকে এগুলো। পানির পাইপ ওখান থেকে মাত্র তিনগজ দূরে। এই তিনগজ স্থান পার হতে জাবেরের সময় লাগল পুরো সাত মিনিট।

জাবের যখন তার ঘাটিতে ফিরে এল, তখন রাত দশটা। পৌঁছেই সে বাড়ীর চিলে কোঠায় উঠে গেল। এখানে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন রেডিও ট্রান্সমিটার রয়েছে। জাবের রেডিও ট্রান্সমিটারের পাশে বসা ইঞ্জিনিয়ার আকরম ফারুকের পাশে বসে মেসেজ তৈরী করল এবং তা আকরম ফারুকের হাতে দিয়ে দিল। মেসেজটি আম্মানে সাইমুমের হেড কোয়ার্টারে পাঠাতে ৭ মিনিট সময় লাগল।

মেসেজটি পাঠানোর পরও জাবের সেই রেডিও রুমেই রইল। তার চঞ্চল চোখ বার বার রেডিও রিসিভারের উপর দিয়ে ঘুরে আসছে। তার কান দু'টি উৎকর্ণ হয়ে আছে রেডিও রিসিভার থেকে 'ঝিৎস' শব্দ শোনার জন্য। জাবের নিশ্চিত, জরুরী কোন নির্দেশ হেড কোয়ার্টার থেকে আসছে। এক মিনিট দু'মিনিট করে গত হ'ল ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট। হঠাৎ রেডিও রিসিভারে একটি লাল আলো জ্বলে উঠল এবং সাথে সাথে ভেসে এল মিষ্টি সিগন্যাল। আরও পাঁচ মিনিট গত হ'ল। রেডিও ইঞ্জিনিয়ার আকরম ফারুক একটি মেসেজ এনে জাবেরের হাতে দিল।

জাবের দ্রুত চোখ বুলাল তাতেঃ

"জাবের, প্রেসিডেন্ট আনোয়ার রশিদের সাথে কথা হল। তিনি তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি হেড কোয়ার্টারে। তুমি এখনই যাও। খোদা সহায়, তোমাদের মিলিত প্রচেষ্টা বিশ্ব-ইহুদী আর তার মুরুব্বীদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিতে পারবে। আহমদ মুসা।"

মেসেজটি পড়া শেষ করে জাবের উঠে দাঁড়াল। দ্রুত নেমে গেল নীচে।

রাত সাড়ে এগারটা। জনবিরল রাজপথ। ঘন্টায় ৮০ মাইল বেগে উর্ধ্বশ্বাসে এগিয়ে চলেছে জাবেরের কাডিলাক।

কায়রো আর্মি হেড কোয়ার্টারের প্রশস্ত গেট। উচিয়ে ধরা সঙ্গীনের সামনে এসে জাবেরের গাড়ী ক্যাচ করে এক শব্দ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। জাবের গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল, আমি আব্দুল্লাহ জাবের। সঙ্গে সঙ্গে উচিয়ে ধরা সঙ্গীনের মাথা নেমে গেল। আর পর মুহূর্তেই খুলে গেল ফটক। জাবেরের গাড়ী এগিয়ে চলল। আঁকা-বাঁকা অনেক পথ পার হয়ে হেড কোয়ার্টারের বারান্দায় এসে দাঁড়াল তার গাড়ী। গাড়ী থেকে নামতেই দেখা হল সহকারী সেনাধ্যক্ষ লেঃ জেঃ আহসান আল-জামিলের সাথে। তার চোখ মুখে উত্তেজনার ছাপ। বলল, আসুন আপনার জন্য সবাই অপেক্ষা করছেন।

তারা একটি হল ঘরে প্রবেশ করল। লোকারণ্য হল ঘরটি। বিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবিল। মাঝখানের চেয়ারটিতে প্রেসিডেন্ট আনোয়ার রশিদ বসে আছেন। তার ডান পাশে প্রধান সেনাপতি আবু তারিক আল-জামাল। প্রধান সেনাপতির ডান পাশে বিমান বাহিনী ও নৌ-বাহিনীর অধিনায়কদ্বয় বসেছেন। এছাড়া মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দ এবং সেনাবাহিনীর কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ অফিসার রয়েছেন। আনোয়ার রশিদের সামনে একটি চেয়ার খালি ছিল। সেখানে গিয়ে বসল আবদুল্লাহ জাবের।

আনোয়ার রশিদ প্রশান্ত দৃষ্টিতে চাইলেন জাবেরের দিকে। বললেন, আহমদ মুসার কাছে কিছু ইংগিত পেয়েছি মাত্র। আপনার কাছ থেকে বিস্তারিত জানার জন্য আমরা উদগ্রীবভাবে অপেক্ষা করছি।

কোন ভূমিকা না করে জাবের বলল, একজন সন্দেহজনক ব্যক্তিকে অনুসরণ করে জাজিরার একটি বাড়ীতে গিয়েছিলাম। বাড়ীটি ব্রিগেডিয়ার ফখরুদ্দীন আলীর। আমি সেখানে 'ইরগুণ জাই লিউমি'র দু'জন লোকের সাথে ব্রিগেডিয়ার আলীকে এক পরামর্শ সভায় মিলিত হতে দেখেছি। তাদের আলোচনার রেকর্ড আমার কাছে রয়েছে। রেকর্ডই আপনাদের সব বলবে। বলে জাবের পকেট থেকে ক্ষুদ্র রেকর্ডার বের করল। রেকর্ডারটির সাথে তখনও রেডিও রিসিভার সংযুক্ত ছিল। রেডিও রিসিভারটি খুলে নিয়ে জাবের রেকর্ডারটি টেবিলের উপর রাখল।

জাবের লাউড স্পিকারের সাথে জুড়ে দিলেন রেকর্ডারটি। সমগ্র হলঘরে অখন্ড নিরবতা। রেকর্ডারটি বেজে চলেছে। দু'টি কণ্ঠস্বর অপরিচিত। কিন্তু ব্রিগেডিয়ার আলীর কণ্ঠস্বরটি চিনতে পারছে ঘরে উপস্থিত সবাই। প্রেসিডেন্ট রশিদের মুখ নত। চোখের নিষ্পলক দৃষ্টি টেবিলে নিবদ্ধ। তার মুখে কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। প্রধান সেনাপতি, বিমান বাহিনী ও নৌ-বাহিনীর অধিনায়কদের ভীষণ উত্তেজিত দেখা যাচ্ছে। মন্ত্রীদের মুখমন্ডল বিবর্ণ। রেকর্ড শেষ হয়ে এল। জাবের সুইচ টিপে বন্ধ করে দিলো রেকর্ড।

কিছুক্ষণ নিরব সবাই। প্রথম কথা বলল, প্রধান সেনাপতি আবু তারিক, এবার তাহলে সবকয়টা বৃহৎ শক্তিই ইহুদীদের পেছনে এসে দাঁড়ালো।

জাবের বলল, দাঁড়াল নয় জনাব, দাঁড়িয়েছিল শুরু থেকেই। ইসরাইলকে তো ওরাই সৃষ্টি করেছে তাই ওরা ইসরাইলকে লালন করবে তা বিচিত্র নয়।

বিমান বাহিনীর তরুণ অধিনায়ক মার্শাল আব্দুল্লাহ্ সোহায়েল বলল, এ ষড়যন্ত্র রশিদ সরকারের বিরুদ্ধে নয়, এ ষড়যন্ত্র কোটি কোটি নিপীড়িত জনতার স্বার্থের বিরুদ্ধে। সুতরাং মিসর সরকারের সামরিক অফিসার হিসেবে শুধু নয়, একজন মুসলমান হিসেবে দায়িত্ব এসেছে আমাদের উপর এ ষড়যন্ত্র ধ্বংস করে দেবার। আমরা নির্দেশ চাই। তার কণ্ঠস্বর আবেগে রুদ্ধ হয়ে এল শেষের দিকে।

প্রধান সেনাপতি আবু তারিক প্রেসিডেন্ট রশিদের মুখের দিকে তাকালেন। তিনিও মুখ তুলেছেন। গম্ভীর কণ্ঠ শোনা গেল তাঁর। প্রধান সেনাপতিকে তিনি বললেন, রাত্রি ভোর হবার আগে ষড়যন্ত্রকারীদের সবাইকে এখানে হাজির করো আবু তারিক। তারপর জাবেরের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে লজ্জা দিব না আপনাদের। জাতির সেবায় আমাদের চেয়ে অনেক উর্ধ্বে আপনারা। আমি আশা করি আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সাথে আজ আপনাদেরকেও আমরা পাব।

জাবের বলল, আমাদের সমস্ত শক্তি আপনাদের সাথে থাকবে। কিন্তু একটি অনুরোধ, 'ইরগুন জাই লিউমি'র লোকদের আমাদের হাতে দিতে হবে। ওদের বিচার আমরাই করবো।

প্রেসিডেন্ট রশিদ বললেন, আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। প্রেসিডেন্ট রশিদ উঠে দাঁড়ালেন। উঠে দাঁড়ালেন সবাই।

পরদিন আল আহরাম পত্রিকায় খবর বেরুল,

“মিসরে সামরিক অভ্যুত্থানের ব্যর্থ চেষ্টা

বিগ্রেডিয়ার ফখরুদ্দীন আলীসহ আরো পঁচিশজন

সামরিক অফিসার ধৃত”

খবরে সামরিক সূত্রের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, কায়রো গ্যারিসনের জি, ও, সি, ব্রিগেডিয়ার ফখরুদ্দীন আলী মোবারকের নেতৃত্বে রশিদ সরকারকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। এ ষড়যন্ত্রের সাথে কোন কোন বিদেশী শক্তির গোপন হাত ছিল বলে খবরে উল্লেখ করা হয়েছে। খবরে বলা হয়েছে, রশিদ সরকারকে উৎখাত করে মিসরে একটি প্রো-ইসরাইলী সরকার গঠন ষড়যন্ত্রকারীদের উদ্দেশ্য ছিল।

উপরোক্ত খবরের পাশে আর একটি খবর। খবরটিতে রশিদ সরকারের বিপদ-উত্তরণে খোশ আমদেদ জানিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রধানদের কাছ থেকে বার্তা এসেছে। এদের মধ্যে প্রথমেই রয়েছে রাশিয়া, বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাম।

কায়রোর পথে ঘাটে, রেস্তোরাঁয় যখন ব্যর্থ অভ্যুত্থানের বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে, তখন আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ পাশের তিনতলা বাড়ীটির ভুগর্ভস্থ একটি কক্ষের তড়িৎ আসনে শায়িত ‘ইরগুণ জাই লিউমি’র কায়রো প্রধান ইসহাক এমিল তার স্পাই নেট ওয়ার্কের বিবরণ বলে যাচ্ছে। লিখে নিচ্ছে আবদুল্লাহ জাবের।

জাবের বলছে, কায়রো, ইসমাইলিয়া ও পোর্ট সৈয়দে তোমাদের লোকদের পরিচয় দিলে, আলেকজান্দ্রিয়ায় তোমাদের লোকদের পরিচয় এখনও দাওনি।

এমিল বলল, বিশ্বাস করুন, ওখানে আমাদের কোন লোক নেই।

জাবের বলল, আমি জানি ওখানে তোমাদের গুরুত্বপূর্ণ লোক রয়েছে। তোমাকে বলতে হবে, ভাই এ্যাডমিরাল আলী আশরাফের সাথে তোমাদের কোন লোক যোগাযোগ করেছিল?

এমিল নীরব। ইলেকট্রিক মেগনেটো আবার হাতে তুলে নিলো জাবের। বিবর্ণ হয়ে গেল ইসহাক এমিলের মুখ। বলল সে, বলব-বলছি আমি।

জাবের ফিরে এসে তার সামনে বসল। বলে চলল এমিল, আলেকজান্দ্রিয়ার হোটেল প্রিন্স-এর পরিচারিকা মিস জামিলা ও মিস রায়হানা আমাদের লোক। ওদের প্রকৃত ইহুদী নাম ইলিহ এবং ইশতার ফ্রেডম্যান। গত দু'মাস ধরে তারা চাকুরি করছে ওখানে মুসলিম মহিলার ছদ্মবেশে। 'আলি ব্রাদারস এন্ড কোং' ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের সেলসম্যান ফারুকী এবং মিস সেলিনা আমাদের পক্ষে কাজ করছে। ওদের প্রকৃত ইহুদী নাম জোসেফ পাপ এবং সিদি মার্কস। থামল এমিল।

জাবের চিন্তা করল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, ভাইস এডমিরাল আলী আশরাফের সাথে তোমাদের যোগাযোগ হয়েছিল কিভাবে? আর তোমাদের লোকেরা 'হোটেল প্রিন্স' ও 'আলী এন্ড ব্রাদার্স'-এ চাকুরিই বা পেল কেমন করে?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে কোন দ্বিধা করল না এমিল। সে বলল, আজ থেকে ছয় মাস আগে 'ইরগুণ জাই লিউমি' আমাদেরকে মিসরে প্রেরণ করে। 'ইরগুন জাই লিউমি'র পক্ষ থেকে ইসরাইলের জন্য মিসরের গোপন সামরিক তথ্যাদি সংগ্রহ করা ছিল আমাদের দায়িত্ব। আমরা জানতাম, মিসরের উর্দ্ধতন সামরিক অফিসারদের সংস্পর্শে না আসতে পারলে, এ ধরনের খবর সংগ্রহ সম্ভব নয়। আমরা এই প্রচেষ্টাই শুরু করলাম। সুন্দরী নারী এবং অর্থই ছিল আমাদের প্রধান হাতিয়ার। মিসরের অফিসারদের পেছনে আমরা যেসব সুন্দরী ইহুদী তরুণী লেলিয়ে দিয়েছিলাম মিস ইলিহ্ ও মিস ইশতার ফ্রেডম্যান ছিল তাদের অন্যতম। মিস ইলিহ্ ও মিস ইশতার ফেডম্যান মাত্র ১৫ দিনের চেষ্টায় ভাইস এডমিরাল আলী আশরাফকে শয্যা সঙ্গী করতে সমর্থ হয় এবং পরবর্তীকালে সে আমাদের মুঠায় এসে যায়। তারই সাহায্যে মিস ইলিহ্ ও মিস ইশতার জোসেফ পাপ ও সিদি মার্কস চাকরি লাভ করে।

-ব্রিগেডিয়ার ফখরুদ্দিন আলী এবং অন্যান্য সামরিক অফিসারদের ক্ষেত্রেও কি তোমাদের এই একই পন্থা কাজ করেছে? -বলল জাবের।

মিঃ ইসহাক এমিল সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।

পাশে দাঁড়ানো বিন আতীর দিকে চেয়ে জাবের বলল, এখানকার কাজ আপাতত শেষ। একে নিয়ে সেলে রাখ। খেতে দাও। হেড কোয়ার্টার থেকে নির্দেশ পেলে এর ব্যবস্থা করা যাবে। কথা শেষ করে জাবের দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে এল। প্রবেশ করল ওয়ারলেস রুমে। প্রেরক যন্ত্রের কাটা ঘুরিয়ে সে যোগাযোগ করল আলেকজান্দ্রিয়ার সাথে।

-হ্যালো। ৩২১ ইউ, এন, এ?

-হ্যাঁ। ওপার থেকে উত্তর এল।

-কে?

-ইবনে জাবীর।

-শোন, হোটেল প্রিন্স-এর মিস জামিলা ও মিস রায়হানা এবং 'আলী এন্ড ব্রাদারস কোং

-এর মিঃ ফারুকী ও মিস সেলিনাকে অবিলম্বে গ্রেফতার কর। বিমান বন্দর ও সি-পোর্ট বন্ধ। নিশ্চয় ওরা কোথাও পালাতে পারেনি। আমি বলে দিচ্ছি, গ্যারিসন কমান্ডার তোমার সহযোগিতা করবে।

অনুরূপভাবে জাবের মিসরের কয়েকটি জায়গায় সংবাদ পাঠিয়ে অবশেষে যোগাযোগ করল হেড কোয়ার্টারে আহমদ মুসার সঙ্গে। জাবেরের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে। পরিশ্রম আর উত্তেজনার স্বাক্ষর ওগুলো।

# ২

জেবেল আল-নুর। আহমদ মুসার অফিস কক্ষ। পায়চারি করছিল আহমদ মুসা। সুন্দর, প্রশস্ত কপাল তাঁর কুঞ্চিত। তীক্ষ্ণ চোখ দু'টি তাঁর মনের গভীরে আত্মস্থ। মনে তাঁর চিন্তার ঝড়। প্রায় তিন সপ্তাহ হয় ইসরাইলের পরিচিত কোড মেসেজ বন্ধ হয়ে গেছে। তার জায়গায় শোনা যাচ্ছে অপরিচিত ও দুর্বোধ্য সংকেত। ঐ দুর্বোধ্য সংকেতের পাঠোদ্ধার করা যায়নি। সাইমুমের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, সংকেতগুলো ইসরাইলের নতুন কোড মেসেজ। ওরা তাদের পুরাতন কোড মেসেজের পরিবর্তন করেছে। আরব বিশ্বে নতুন করে স্পাই রিং গড়ে তোলারই এটা হয়ত পূর্ব প্রস্তুতি। ইসরাইলের এই নতুন উদ্যোগ বান্‌চাল করে দেবার জন্য ওদের নতুন কোড মেসেজের পাঠোদ্বার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব? চিন্তা করে চলে আহমদ মুসা। একটি সহজ পথ আছে ঐ দূর্বোধ্য সংকেতগুলো পাঠোদ্ধার করার এবং তা হল ইসরাইলী কোড মেসেজের ডিসইফার যোগাড় করা। আহমদ মুসার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো এবং তার চোখে মুখে ফুটে উঠলো স্পষ্ট সিদ্ধান্তের ছাপ। সে গিয়ে চেয়ারে বসে পড়ল। তার কন্ঠে স্বগত উচ্চারিত হল, হ্যা, যেমন করেই হোক ইসরাইলের কবল থেকে তাদের ডিসাইফার যোগাড় করতে হবে। টেবিলে রক্ষিত লাল টেলিফোনটি তুলে নিয়ে আহমদ মুসা রেডিও রুমে কামালকে ডেকে বললো, তেলআবিবে লাইন নিয়ে মাহমুদকে ডাক। আমি আসছি।

কথা শেষ করে টেলিফোনের রিসিভার যথাস্থানে রেখে দিয়ে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চলল সে রেডিও রুমের দিকে। রেডিও রুমে ঢুকতেই কামাল আহমদ মুসাকে সালাম জানিয়ে বলল, মাহমুদ ভাই আসছে জনাব। আহমদ মুসা ওয়ারলেস সেটের সামনে গিয়ে বসলো। মুহূর্ত কয়েকের মধ্যেই ওপার থেকে মাহমুদের কথা শুনতে পাওয়া গেল। সালাম ও কুশলাদির পর আহমদ মুসা বললো, ইসরাইলিরা কোড বদলিয়েছে লক্ষ্য করেছ?

-জি হ্যাঁ। ওপার থেকে বলল, মাহমুদ।

-কি ভাবছ এ সম্পর্কে?

-আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় আছি।

-হ্যাঁ শোন, ওদের নয়া কোডের পাঠোদ্ধার করার সকল প্রচেষ্টা আমাদের ব্যর্থ হয়েছে। ওদের ডিসাইফার ছাড়া এর পাঠোদ্ধার সম্ভব নয়। সুতরাং ওটা তোমাকে যোগাড় করতেই হবে।

-বুঝেছি জনাব।

-যে কোন মুল্যের বিনিময়ে ডিসাইফার আমাদের চাই মাহমুদ। বর্তমান মুহূর্তে এটাই আমাদের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

-দোয়া করুন জনাব। আমি এখনি কাজ শুরু করছি।

-আল্লাহ তোমাদের সফল করুন। খোদা হাফেজ।

- খোদা হাফেজ।

আহমদ মুসা ধীরে ধীরে ওয়ারলেস রুম থেকে বেরিয়ে এলো। সামনের গলিপথটি পেরিয়ে একটি উন্মুক্ত স্থানে এসে দাঁড়াল। কাছেই পাহাড়ের একটি ছোট টিলা। আহমদ মুসা টিলায় উঠে একেবারে মাথায় গিয়ে বসলো। চারিদিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের উন্নত চুড়াগুলো। চারদিক নিস্তব্দ-নিঝুম। দক্ষিণ-পূর্বদিকের আকাশের এক জায়গায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। আহমদ মুসা বুঝল, ওটা আম্মানের আকাশ। আকাশের দিকে মুখ তুল আহমদ মুসা। জোৎস্নাহীন আকাশের তারাগুলো বেশ ভালো লাগছে দেখতে। এক সময় আদম সুরতের পায়ের নীচে লুব্ধকে এসে আটকে যায় তার চোখ। ওর আলোতে যেন সূর্যের দীপ্তী। সূর্যের মত চোখ বিদ্ধকারী তীক্ষ্নতা ওতে নেই, আছে স্নিগ্ধতা, আছে প্রশান্তি। পলকহীনভাবে আহমদ মুসা চেয়ে থাকে ওর দিকে। লুব্ধক যেন নেমে আসে তার কাছে, একেবারে কাছে। লুব্ধকের দেশে পৌঁছে যায় আহমদ মুসা। লুব্ধকের দেশ থেকে সে উর্ধ্বে চেয়ে দেখল মিট মিটে তারার আলো ভেসে আসছে উপরের উর্ধলোক থেকেও। আহমদ মুসার মনে প্রশ্ন জাগে, ঐ তারার জগতের ওপারে আবার কি আছে? উত্তর এসে তার কানে বাজল, শূন্য, শূন্য, আদি অন্তহীন মহাশূন্য। সম্মুখে পশ্চাতে, ডানে বামে, উপরে নীচে সব দিকেই অন্তহীন মহাশূন্য।

এই মহাশুন্যের নিকট অন্ধকারে তারকা সূর্যগুলো দীপ শিখা জ্বালিয়ে রেখেছে। মহাশুন্যের অন্তহীন ব্যাপকতার মাঝে আহমদ মুসা ভয়ে বিষ্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে। তার মনে প্রশ্ন জাগে, এই মহা সৃষ্টির স্রষ্টা আল্লাহর শক্তি তাহলে কত বিরাট, কত বড় বিজ্ঞানী তিনি? আহমদ মুসার হৃদয় ও মন নুয়ে পড়ে স্রষ্টার উদ্দেশ্যে। আহমদ মুসা লুব্ধকের জগৎ থেকে দৃষ্টিপাত করে নীচে-বহু নীচে দেখা যায় সূর্যকে। মহাশুন্যের নিকষ কালো বুকে সূর্যকে অতি ক্ষুদ্র এক আলোকবিন্দুর মত মনে হচ্ছে। পৃথিবীর কোন অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মানুষ? মহাশুন্যের বিশাল ব্যাপকতার মাঝে মানুষের অস্তিত্ব সত্যই কিছু আছে কি প্রশ্ন জাগে আহমদ মুসার মনে। অথচ এই মানুষই আল্লাহর বড় প্রিয় এবং আশরাফুল মুখলুকাত-সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। আল্লাহর এ কোন কুদরত। আবেগে উত্তেজনায় দু' চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে আহমদ মুসার। হযরত দাউদ (আঃ)-এর মত তার বিস্ময় বিক্ষুব্ধ চিত্ত থেকে স্বগত উচ্চারিত হয়- হে বিশ্ব নিয়ন্তা প্রভু, মনুষ্য কে যে তুমি তার বিষয় চিন্তা কর? এবং মনুষ্য সন্তানই বা কি যে তুমি তার প্রতি মনোযোগী হও?

আহমদ মুসার সেক্রেটারী আলী বেন শাকের এসে আহমদ মুসার পেছনে দাঁড়াল। অতি ধীর কন্ঠে বলল, অনেক রাত হয়েছে জনাব। খুব শীত পড়ছে। আপনার বিশ্রাম প্রয়োজন।

ধীরে ধীরে মুখ ফিরাল আহমদ মুসা। এই সময় বিরাট এক নক্ষত্র পতন হল। আহমদ মুসার দু'দন্ড বেয়ে ঝরে পড়া অশ্রু চিক চিক করে উঠল। শাকেরের দৃষ্টি এড়াল না তা। সে বিস্মিত কন্ঠে বলল, আপনি কাঁদছেন জনাব?

আহমদ মুসার মুখে ফুটে উঠলো এক টুকরো প্রশান্ত হাসি। সে বলল, এ হারানোর কান্না নয় শাকের, পাওয়ার কান্না। আমার আল্লাহকে আমি এমন নিবিড়ভাবে কোনদিন পাইনি। আকাশের দিকে চেয়ে দেখ, তারায় তারায় শুধু তাঁরই হাতছানি। নিঃসীম মহকাশের আলো আঁধারীর মাঝে তাঁরই শুধুই লুকোচুরি খেলা। বলতে বলতে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

শাকের মন দিয়ে আহমদ মুসার কথা গুলো শুনলো। কিছুই বলল না মুখে। কথা বাড়ানো উচিত নয়। তাদের প্রিয় নেতার বিশ্রাম এ সময় অত্যন্ত

জরুরী। আগে আগে চলল আহমদ মুসা, পিছনে শাকের। আহমদ মুসাকে শয়ন কক্ষে পৌঁছে দিয়ে শাকের তার ঘরের দিকে পা বাড়ালো।

তেলআবিব। মাহমুদ চিন্তান্বিত মুখে ওয়ারলেস রুম থেকে বেরিয়ে এল। মাথায় তার একরাশ চিন্তার জট। ধীরে ধীরে এসে ড্রইং রুমের সোফায় বসল। ইসরাইলীদের হাত থেকে ডিসাইফার উদ্ধার করা চাটটিখানি কথা নয়। মাহমুদ সমস্ত ব্যাপারটা একবার চিন্তা করে দেখল। ডিসাইফার হাতে পেতে হলে অনেকটা পথ তাকে পাড়ি দিতে হবে। প্রথমে তাকে খুঁজে দেখতে হবে, ডিসাইফারের খোঁজ কোন কোন ব্যক্তির কাছে পাওয়া যেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ ঐ সব ব্যক্তির মধ্যে কার কাছ থেকে ডিসাইফারের খবর বের করে নেয়া সহজ হবে, তা নির্ধারণ করতে হবে। তৃতীয়তঃ ডিসাইফার উদ্ধারের ব্যবস্থা করা। মাহমুদ গোটা পরিকল্পনাটিকে আর একবার আগাগোড়া ভেবে দেখল। তারপর প্রথম বিষয়টির প্রতি মনোনিবেশ করল সে। সে চিন্তা করে দেখল, ডিসাইফার কোন গোপন স্থানে রক্ষিত আছে, তা কাদের পক্ষে জানা সম্ভব তাদের মধ্যে প্রধান হলেন-এক, মন্ত্রি; দুই, দেশরক্ষা সেক্রেটারী; তিন, মোসাদ প্রধান এবং চার, সিনবেথ প্রধান ইত্যাদি। এদের মধ্যে দেশরক্ষা মন্ত্রীকে হিসেবের বাইরে রাখা উচিত। এখন অবশিষ্টদের মধ্যে কার নিকট থেকে তথ্য বের করা সহজ হবে? মাহমুদ ভাবল, এটা সুক্ষ্ম বিচার-বিবেচনার প্রশ্ন। ডসিয়ার আলোচনা ছাড়া এ প্রশ্নের সমাধান অসম্ভব। সোফা ছেড়ে মাহমুদ উঠে দাঁড়াল।

গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে একটি গোপন সিঁড়িপথ বেয়ে সে প্রবেশ করল ভূ-গর্ভস্থ একটি কক্ষে। রেকর্ড রুম। মাহমুদ ডসিয়ার সেকশনে গিয়ে বসল। টেনে নিল 'সিনবেথ' প্রধানের ডসিয়ার ফাইল। গভীর মনোযাগ নিবিষ্ট করে সে ফাইলটিতে। ফাইল শেষ করে হাতে তুলে নিল মোসাদ প্রধানের ডসিয়ার। শেষ করে ওটাও রেখে দিল সে ফাইল কেবিনে। দেশ রক্ষা সেক্রেটারী এরহান শার্লটকের কোন ডসিয়ার সাইমুমের এ স্থানীয় রেকর্ড রুমে নেই। এরহান শার্লটক

স্বরাষ্ট্র বিভাগ থেকে সদ্য আগত এবং স্বরাষ্ট্র বিভাগেও তার চাকুরির মেয়াদ বেশী দিনের নয়। হয়তো এ কারণেই অপ্রয়োজনীয় বিবেচনায় তার ডসিয়ারই তৈরি হয়নি। সিনবেথ প্রধানের ডসিয়ার থেকে তার যে চরিত্র পরিচয় পাওয়া গেল তা হল তিনি ঠান্ডা মাথা, নির্লিপ্ত মেজাজ, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি কর্তব্যপরায়ণ ও বিশ্বাসী। মাহমুদ ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল, এ বড় শক্ত চীজ। এ ভাঙ্গবে কিন্তু মচকাবে না। মোসাদ প্রধানও মোটামুটি একই চরিত্রের। তবে সিনবেথ প্রধান অপেক্ষা অধিকতর কূটবুদ্ধি ও হিংস্র। তাঁর চরিত্রের বড় একটি দুর্বল দিক হলো, নারীর প্রতি মাত্রাতিরিক্ত মোহ। ঘৃণায় মাহমুদের মুখ কুঞ্চিত হলো। সাইমুম এ ধরনের অস্ত্র প্রয়োগকে ঘৃণা করে। উঠে দাঁড়াল মাহমুদ। বেরিয়ে এল রেকর্ড রুম থেকে। সমস্যার সমাধান হল না। এরহান শার্লটক সম্পর্কে জানা দরকার। এমিলয়ার কাছ থেকে জানা যাবে? হঠাৎ একটি নাম তার স্মৃতির আকাশে ঝিলিক দিয়ে গেল, ‘এমিলিয়া’! নামটি স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে মাহমুদের গোটা দেহের অণুতে-পরমাণুতে বিদ্যুৎ শিহরণ খেলে গেল। আনন্দের শিহরণ খেলে গেল দেহের প্রতিটি শিরা উপশিরায়। মাহমদ অবাক হল এমিলিয়া তার দেহের অণুতে-পরমাণুতে এমনিভাবে মিশে গেছে?

হাঁ, এমিলিয়ার কাছে এরহান শার্লটক সম্পর্কে জানা যেতে পারে, কিংবা জানার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সাহায্যও সে করতে পারে। মাহমুদ সোফায় এসে বসল। হাত ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল, রাত ১টা। এমিলিয়া ঘুমিয়ে আছে। বেচারীকে এ রাতে ঘুম থেকে জাগানো কি ঠিক হবে? কিন্তু এছাড়া উপায় কি? ডিসাইফারের ব্যাপারে কালকের মধ্যে একটা সুরাহা করা তার চাই। মাহমুদ উঠে দাঁড়াল। পা বাড়াল ড্রেসিং রুমের দিকে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে মাহমুদ বেরিয়ে এল। পরনে কাল ট্রাউজারের উপর লম্বা কাল ওভারকোট। মাথায় ফেলট হ্যাট। একটু দুর থেকে দেখলে মনে হবে রাত্রিকালের টহলদারি ইসরাইলী পুলিশ।

রাত দুপুরের তেলআবিব। জনবিরল রাস্তা। দু’একটি গাড়ীর আনা গোনা চলছে। মাহমুদের গাড়ী এসে একটি পাবলিক টেলিফোন বুথের সামনে দাঁড়াল। টেলিফোন বুথে প্রবেশ করে একটি নম্বরে সে ডায়াল করল। মুখে এক টুকরো

হাসি। ও প্রান্তে টেলিফোন বেজে চলেছে। কিন্তু নো রিপ্লাই। মাহমুদ নাছোড় বান্দা। বেজেই চলছে টেলিফোন। কিছুক্ষণ পর ও প্রান্ত থেকে রিসিভার ওঠানোর শব্দ শোনা গেল। তারপর ভেসে এল একটি শব্দ হ্যালো---। নিদ্রাজড়িত কণ্ঠ। বলছে এমিলিয়া। নিশ্চিত হয়ে মাহমুদ রিসিভার রেখে দিল কোন উত্তর না দিয়েই। রাগে বিরক্তিতে এমিলিয়ার সুন্দর মুখটি এখন কেমন হয়েছে, মানস চক্ষেই আঁচ করত পারল মাহমুদ। কিন্তু বেচারীকে এভাবে না জাগিয়ে উপায় ছিল না।

এমিলিয়ার বাড়ী থেকে একটু দুরে একটি অন্ধকার গলিতে গাড়ী পার্ক করে রেখে এমিলিয়াদের বাড়ীর পেছন এসে দাঁড়াল মাহমুদ। তারপর পাচিল টপকে ভিতরে বাগানে গিয়ে পড়ল সে। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে চারিদিকটা একবার দেখে নিয়ে মাহমুদ সামনে পা বাড়াল। গিয়ে দাঁড়াল এমিলিয়া যে ঘরে থাকত, ঠিক তার নীচে। উপরে চেয়ে দেখল, এমিলিয়ার দু'টি জানালাই বন্ধ। মাহমুদ মত পরিবর্তন করল, না আজ জানালা দিয়ে নয় দরজা দিয়ে সে প্রবেশ করবে। গভীর রাত। কেউ জেগে নেই। পকেট থেকে সিল্কের কর্ড বের করে ছুড়ে মারল সে ছাদে। অভ্রান্ত লক্ষ্য। কর্ডের মাথার হুকটি বেঁধে গেল ছাদের সাইড ওয়ালে। মাহমুদ কর্ড বেয়ে উঠে গেল ছাদে। মাহমুদ খুশি হল, ছাদ থেকে নীচে নামবার সিঁড়ির দরজা খোলা আছে। সে অতি সন্তর্পণে সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। চারতলার বারান্দা। চারতলার অংশে মোট তিনটি ঘর। একটি এমিলিয়ার বেডরুম, অন্যটি ড্রয়িংরুম এবং তৃতীয়টিতে থাকে এমিলিয়ার খাস পরিচারিকা সোনি। সর্বদক্ষিণের ঘরটি এমিলিয়ার শয়নকক্ষ। শয়নকক্ষের দরজায় গিয়ে মাহমুদ দাঁড়াল। হাঁটুর নীচ পর্যন্ত নামানো মাহমুদের ওভারকোট। ফেল্ট হ্যাট মুখের অর্ধাংশ ঢেকে রেখেছে। মাহমুদ ধীরে ধীরে 'নক' করল দরজায়। একবার-দুইবার-তিনবার। তুতীয়বারের পর এমিলিয়ার কণ্ঠ শোনা গেল। 'কে?' সোনি? মাহমুদ আবার সামান্য বিরতিতে টোকা দিল। আবার এমিলিয়ার কণ্ঠঃ কে? এবার তার কন্ঠে যেন উদ্বেগ। মাত্র কয়েক মুহুর্ত, তারপর ধীরে ধীরে দরজা খুলে গেল। ভিতরে হালকা নিল আলো। উদ্যত রিভলভার হাতে দাঁড়িয়ে আছে এমিলিয়া। রিভলভারের চকচকে নল মাহমুদের বুক লক্ষ্য করে সাপের জিহ্বার মত যেন

লকলক করছে। ট্রিগারে রাখা এমিলিয়ার তর্জনিটি উত্তেজনায় কাঁপছে, যে কোন মুহুর্তে ট্রিগারে চাপ দিয়ে বসবে। চিৎকার করে এমিলিয়া কিছু বলতে যাচ্ছিল। মাহমুদ তর্জনিটি ঠোটে ঠেকিয়ে চুপ করার ইংগিত করল এবং পর মুহূর্তেই মাথা থেকে ফেল্ট হ্যাট ছুড়ে ফেলে দিল মাহমুদ। মাহমুদকে চিনতে পেরেই এমিলিয়া রিভলভার ছুড়ে ফেলে দিয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল। মাহমুদ একটু এগিয়ে এমিলিয়াকে বলল, ভয় পেয়েছ? এমিলিয়া মুখ তুলল। তার মুখে আনন্দ ও বিস্ময় দুটোই। বলল, যদি গুলী করতাম।

মাহমুদ ঘরে প্রবেশ করে বলল, কি হত আর, এভাবে মৃত্যু থাকলে মরে যেতাম।।

এমিলিয়া দরজাটি বন্ধ করে দিয়ে এসে মাহমুদের ওভারকোট-এর বোতাম খুলতে খুলতে বলল, ইস! তাহলে কি হত?

-হত আর কি, ডেভিট বেন গুরিয়ানের নাতনী তুমি। ভাবতে, এক দুস্বপ্ন দেখছিলে।

-না, আমি শুধু ডেভিড বেনগুরিয়ানের নাতনী নই। আমি আমি.........। কথা শেষ না করেই থামল, এমিলিয়া। মুখ তার আরক্ত হয়ে উঠেছে। বলল, ঐ রিভলভারের একটি গুলি আমার বুকেও ঢুকত।

-কিন্তু নিয়ম তো এ নয় এমি!

-কেন?

-তোমার জীবনের মালিক তুমি নও, তোমার স্রষ্টা আল্লাহ। সুতরাং ইচ্ছা করলেই তুমি তোমার জীবনের উপর স্বেচ্ছাচার চালাতে পার না। -এ অধিকার তোমার নেই।

-কিন্তু ঐ দুর্বহ বেদনার ভার বহন করা......।

-তবু তাই করতে হয়। শত দুঃখ বেদনার পারাবার পাড়ি দিয়ে আল্লাহর বান্দা হিসেবে তুমি তোমার জীবনকে সার্থক করে তুলবে-এটাই জীবনের স্বাভাবিক দাবী।

-বড় কঠিন এটা।

-কঠিন, কিন্তু স্বাভাবিক।

মাহমুদের গা থেকে ওভারকোট খুলে নিয়ে রেখে দিয়ে এমিলিয়া বলল, একটু বিশ্রাম নাও। তোমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। বলে সে মাহমুদকে ইজি চেয়ার এগিয়ে দিল।

মাহমুদ বলল, তুমিও বস।

-বসছি। বলল এমি। কিন্তু সে বসল না। ইজি চেয়ারের পিছনে দাড়াল এমিলিয়া। তার হাতের আঙ্গুলগুলো মাহমুদের জামার কলার নিয়ে খেলা করতে লাগল। ফিস্ ফিস্ করে এক সময় বলল, রাতে ক'ঘন্টা ঘুমাও।

-কোনদিন সারারাত, কোনদিন এক ঘন্টাও না।

-এমন করলে শরীর ভাল থাকে বুঝি?

-না থাকুক। অসুখ করলে শুয়ে থাকা যায়, পরিচর্যা পাওয়া যায়।

-কে পরিচর্যা করে?

-অসুখ করেনি কোনদিন। সামান্য যা করেছে আপন পরিচর্যায় তা সেরে গেছে। তাই বলতে পারিনে।

-যদি হয়?

-আমার সহকর্মীরা আছে।

-কেন, আমাকে ডাকবে না?

-ডাকলে তুমি যাবে?

-তোমার কি মনে হয়?

মাহমুদ কোন জবাব দিল না। পরে ধীরে ধীরে বলল, তোমাকে ডাকবার দিন এখনো আসেনি এমি। যেদিন ফিলিস্তিনী মজলুম মুসলিম ভাই বোনেরা তাদের স্বদেশ ভূমি ও তাদের বাড়ীঘর ফিরে পাবে, যেদিন তারা হারোনোর বেদনা ভুলে গিয়ে পাওয়ার আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠবে, সেইদিন আমার সংসারের রাণী সেজে যাবে আমার ঘরে। জ্বলবে আমার আঁধার ঘরে আলো। হাসি আনন্দে মুখর করে তুলবে আমার বোবা গৃহাঙ্গন। মাহমুদের কণ্ঠ ভারি হয়ে উঠল যেন ক্রমে।

-সেদিন কতদুরে মাহমুদ?

-আমি জানি না এমি।

অনেক্ষণ ধরে কেউ কোন কথা বলল না। প্রথমে নিরবতা ভাঙ্গল এমিলিয়া। বলল, এতরাতে তোমাকে কি খাওয়াই বলত?

-না, তোমাকে ওসব পাগলামি করতে দেব না। এটা সময় নয় খাওয়ার।

-ফল মিষ্টি খেতে দোষ নেই। মাত্র দু'মিনিট। আমি আসছি। একটু পর রেফ্রিজারেটর থেকে আঙ্গুর, কেক প্রভৃতি কয়েক ধরনের খাবার এনে এমিলিয়া হাযির করল। মাহমুদ এমিলিয়াকেও বসাল। খেতে খেতে মাহমুদ বলল, খুব ভয় পেয়েছিলে, না?

মুখে পুরে দেয়া কেকের টুকরা ভাল করে গিলে নিয়ে এমিলিয়া বলল, ঐ টেলিফোনটাও তাহলে তুমিই করেছিলে না?

মাহমুদ হাসতে লাগল।

এমিলিয়া বলল-ঐ ভূতুড়ে টেলিফোন পাওয়ার পরই রাত দুপুরে যদি দরজায় টোকা শোনা যায় এবং জিজ্ঞেস করেও তার কাছ থেকে যদি জবাব না পাওয়া যায়, আর দরজা খুলে যদি দেখা যায় ফেল্ট হ্যাটে মুখ ঢাকা কাল আলখেল্লা মোড়া এক মনুষ্যমুর্তি, তাহলে ভয় করবে না বুঝি? একটু থেমে সে আবার বলল, টেলিফোন ছেড়ে দিয়েছিলে কেন? বলে আসলেই পারতে।

-হ্যাঁ তোমাকে টেলিফোনে বলে-কয়ে আসি, আর তোমাদের টিকটিকি মহাশয়রা আমার অভ্যর্থনায় তোমাদের বাড়ীর গেটে দাঁড়িয়ে থাকুক।

-তা'হলে টেলিফোন করলে কেন?

-তোমার ঘুম ভাঙ্গানোর জন্য, এখানে এসে তো ডাকতে পারতাম না।

-উহ! তোমার এত বুদ্ধি।

-তোমার সাবধানতা দেখে আমি খুশী হয়েছি এমি, ভবিষ্যতেও তুমি এমনি সাবধান থেকো।

খাওয়া শেষ হয়ে গেল। মাহমুদ ঘড়ি দেখল, রাত প্রায় দু'টা। প্লেটগুলো নিয়ে উঠে দাঁড়াল এমি। মাহমুদ বলল, তোমার সাথে জরুরী কিছু কথা আছে।

এমি বলল-আসছি।

এমি প্লেটগুলো রেখে এসে সামনের চেয়ারটিতে বসে বলল-বল।

মাহমুদ তার ইজি চেয়ারটি টেনে নিয়ে এমিলিয়ার আরও কাছে গিয়ে বসল। এমিলিয়ার চোখে চোখ রেখে অতি নীচু গলায় বলল-তোমার কিছু সহযোগিতা চাই এমি।

এমিলিয়ার চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, বল, আমি রাজি।

-দেশরক্ষা সেক্রেটারী এরহান শার্লটককে তুমি চেন?

-চিনি।

-কেমন চেন?

-ভালভাবে চিনি। ওর মেয়ে, আমার ক্লাশমেট। ওদের বাসায় মাঝে মাঝে যাই। এরহান চাচাজী আমাকে খুব স্নেহ করেন।

এরহান শার্লটকের মেজাজ ও চরিত্র সম্পর্কে কিছু বলতে পার?

-সৎ, সচ্চরিত্র, কর্তব্যপরায়ণ ও বিশ্বাসী কর্মচারী বলে উনার খুব সুনাম আছে। আর মেজাজ-মেজাজ একটু খিট খিটে ধরনের বলেই আমার মনে হয়।

-কেন?

-সামান্য কারণেও ওঁকে মাঝে মাঝে আমি খুব বেশী রেগে যেতে দেখিছি।

-যেমন?

-কারও কোথাও থেকে আসতে একটু দেরী হওয়া, ইত্যাদি।

মাহমুদ আর কিছু বলল না। পাওয়া সুত্রগুলো নিয়ে চিন্তার অতলে ডুব দিল সে। চোখ দু'টি তার বুজে গেল। যা সে জানতে চেয়েছিল, তা সে পেয়েছে। শার্লটকের এ খিটখিটে মেজাজের অর্থ তাঁর প্রতিরোধ শক্তি কম। এ ধরনের লোকের কাছ থেকে ভয় দেখিয়ে কিংবা চাপ দিয়ে কথা আদায় করা যায়। ডিসাইফারের খবর শার্লটকের কাছ থেকেই যোগাড় করতে হবে। মাহমুদ চোখ খুলল। দেখল এমিলিয়া পলকহীন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। বলল মাহমুদ ভাবছিলাম এমি।

-কি ভাবছিলে?

-তোমার শার্লটক চাচাজির মুখ থেকে আমাদের একটা কথা বের করে নিতে হবে, তা সম্ভব কি না তাই চিন্তা করছিলাম।

-কি কথা জানতে পারি কি? মাফ করো, আমি নিছক জানার আগ্রহ নিয়ে এ কথা বলছি না, যদি কোন সাহায্য করতে পারি সেই উদ্দেশ্যে।

-আমি তা বুঝতে পেরেছি এমি। একটু থামল মাহমুদ।

তারপর আবার বলল, ডিসাইফার চিন?

-কোড এক্সপ্লানেশন যাতে লেখা সেই বই কিংবা কোড মেসেজের ব্যাখ্যাকারী বই তো?

-হ্যাঁ, ঠিক চিনেছ। দিন পনের হয় ইসরাইল তাদের পুরনো কোডের পরিবর্তন করে নতুন কোডের প্রবর্তন করেছে। এই নতুন কোডের যে ডিসাইফার বুক ইসরাইলের আছে সেটা আমাদের প্রয়োজন। এই ডিসাইফার কোথায় রাখা হয়েছে, সেটাই আমরা জানতে চাই তোমার চাচাজানের কাছ থেকে।

-তিনি কি বলবেন?

-সহজে কি বলবেন? বলতে বাধ্য হবেন।

-ডিসাইফারের কিছু সন্ধান বোধ হয় আমি জানি।

-জান তুমি? মাহমুদের কন্ঠে ঝরে পড়ল একরাশ বিস্ময়।

-হাঁ, আমি জানি।

মাহমুদের বিস্ময় তখনও কাটেনি। মুহূর্ত কয়েক পর সে ধীর কন্ঠে বলল, কি জান, কতটুকু জান এমি?

-না বলব না। মুখ টিপে হাসল এমিলিয়া।

-তা হলে তোমাকেই হাইজাক করতে হয় দেখছি। মাহমুদও হাসল।

-আমি রাজি। অন্তত......

-অন্তত আমার আস্তানাটা দেখতে পারবে, তাইতো? হেসে বলল মাহমুদ।

দূরের কোন পেটা ঘড়িতে রাত দু'টো বেজে গেল। মাহমুদ সচকিতভাবে ঘড়ির দিকে চাইল। বলল-না এমি আর অপেক্ষা করতে পারি না, তোমার কষ্ট হচ্ছে।

-কষ্ট? আমার হচ্ছে? একটু থামল এমিলিয়া। বেদনার্ত হয়ে উঠল তার দু'টি চোখ। বলল সে, যার অপেক্ষায় হৃদয়-মন ব্যাকুল হয়ে থাকে, তাকে পাশে পাওয়ার সৌভাগ্য কষ্টকরই বটে।

-তা নয়, আমি বলছিলাম.......

মাহমুদের কথা কেড়ে নিয়ে এমিলিয়া বলল, না আর কোন কথা নয়। তোমার সময় নষ্ট হচ্ছে। বলে সে মাহমুদের সামনে উঠে এসে তার পিছনে দাঁড়াল। দু'টি কনুই মাহমুদের ইজি চেয়ারে ঠেস দিল। এমিলিয়ার তপ্ত নিঃশ্বাস মাহমুদ স্পষ্ট অনুভব করতে পারছিল তার কানে-গন্ডে।

মাহমুদ কিছু বলতে যাচ্ছিল। এমিলিয়া তাকে বাধা দিয়ে বলল, শুন, দেশরক্ষা সেক্রেটারী শার্লটক চাচাজানের মেয়ে মারিয়া স্মার্থা আমার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। ও "মোসাদ"-এ ট্রেনিং নিচ্ছে। ওর কাছেই আমি ডিসাইফারের একটি কপি গত পরশু দেখেছি। বইটি আমাকে দেখিয়ে সে বলেছে, অতি গোপনীয় বইটি বিশেষ নির্দেশক্রমে সে মাত্র কয়েকদিনের জন্য আনতে পেরেছে। থামল এমিলিয়া।

মাহমুদ এমিলিয়ার একটি হাত ধরে টেনে নিয়ে পাশে বসাল। বলল, বইটি আমার চাই এমি এবং কালই।

-আমাকে চুরি করতে বলছ বইটি? হাসল এমিলিয়া। মাহমুদ বলল, না তোমার বান্ধবীকে আমরা বিপদে ফেলতে চাই না। তাছাড়া চুরি করলে ওরা জানতে পারবে, তাতে আমাদের খুব বেশী লাভ হবে না।

-তা হলে......?

-বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা কত হতে পারে?

-দেড়শ'র বেশী হবে না।

-আচ্ছা, তুমি যদি ওখানে গিয়ে বইটি দেখ বা পড়, তাহলে তোমার বান্ধবী আপত্তি করবে?

-না।

মাহমুদ মুহূর্ত কয়েক ভাবল। তারপর পকেট থেকে ক্ষুদ্র সিগারেট লাইটার বের করে এমিলিয়ার হাতে দিল।

এমিলিয়া বলল, এ সিগারেট লাইটার দিয়ে কি হবে?

-সিগারেট লাইটার নয়। এটা একটা ক্যামেরা। ঐ যে মাথায় ক্ষুদ্র সাদা সুইচ দেখছ, ওটাতে যতবার চাপ দিবে, উঠবে একটি করে ফটো।

-বুঝেছি, বই-এর প্রতিটি পাতার ফটো নিব আমি। হাসল এমিলিয়া।

-ঠিক, তোমার বান্ধবীর অলক্ষ্যে করতে হবে এ কাজ। পারবে না?

-তোমার নির্দেশ হলে, এর চেয়েও কঠিন কাজ আমি করব। শান্ত ও দৃঢ় কণ্ঠ এমিলিয়ার।

-নির্দেশ নয় এমি, এটা আমার অনুরোধ। সকলের তরফ থেকে আমার এ অনুরোধ। আর জান, এটা অন্যায়ও নয় এমি। ফিলিস্তিনের প্রকৃত ইহুদি বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে আমাদের কোন ক্ষোভ নেই, অভিযোগ নেই। বাস্তুহারা মুসলিম ফিলিস্তিনিরা তাদের হারানো রাষ্ট্র ফিরে পেতে চায়, যেখানে নাগরিক হিসেবে ইহুদিদেরও থাকবে সমান অধিকার।

-আমি জানি মাহমুদ। বল আমাকে কি করতে হবে।

-বলছি শুন, এই একটি লাইটার ক্যামেরায় যা রীল আছে, তাতে ৫০টি ফটো উঠবে। এ ধরনের আরও দু'টি ক্যামেরা আমরা তোমাকে পৌঁছাব। এখন বল তোমার পরিকল্পনা-কিভাবে এগুবে।

-তুমি যেমন বলবে।

-আমি তোমার মূল কর্তব্য বলে দিয়েছি। এখন তোমার নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করে কাজ করতে হবে। কোন অবস্তাতেই তোমাকে ধরা পড়া চলবে না। একান্তই যদি কোন প্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তাহলে লাইটার ক্যামেরার নীচের তলায় একটি লাল সুইচ আছে, ওটাতে চাপ দিয়ে গোটা ক্যামেরাটাই জ্বালিয়ে দিবে।

-বুঝেছি।

-তুমি যে ক্যামেরাটি পেলে ওটা ১নম্বর। ২ এবং ৩ নম্বর কাল পাবে। ক্রমিক হিসেবে ব্যবহার করবে। আচ্ছা, কাল কখন যেতে পারবে স্মার্থাদের ওখান?

-সকাল ন'টায় যাব।

-সকাল ঠিক আটটায় তোমাদের বাড়ীর গেটে ফুল-বিক্রেতা আসবে। তার কাছে থাকবে সুন্দর সুন্দর ফুলের তোড়া। তুমি দু'টি তোড়া কিনে নিবে। তারপর-তারপর কি করবে বলত? হেসে বলল মাহমুদ।

-ফুলের তোড়া ভেঙ্গে ক্যামেরা দু'টো বের করে নেবো। কিন্তু ফুলের তোড়া কি ভাঙ্গতে ইচ্ছে করবে? এমিলিয়া হাসল।

-ভাঙ্গতে হবে না। মাঝখানের মাত্র একটি ফুল তুললেই ক্যামেরা পেয়ে যাবে। থামল মাহমুদ। তারপর বলল, আবার তুমি কখন ফিরতে পারবে সেখান থেকে?

-ঠিক করে তো বলা কঠিন।

-বিকেলের আগে তো নিশ্চয়ই।

-তাহবে।

-কালকেই কিন্তু আমাদের ক্যামেরা ফিরে চাই।

-তুমি আসবে নিতে?

-আসতে বল?

-বলতে কি তা পারব? ব্যক্তিগত ভালো লাগা-না লাগার মূল্য কি কিছু আছে? এমিলিয়ার কণ্ঠ ভারী শোনাল।

মাহমুদ এমিলিয়ার চোখে চোখ রাখল। এমিলিয়া চোখ নামিয়ে নিলে। মৃদু হাসল মাহমুদ। তারপর বলল, জাতীয় কর্তব্য যেখানে মুখ্য হয়ে ওঠে, ব্যক্তি সত্ত্বা সেখানে অবশ্যই গৌণ হয়ে পড়ে। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে তা যে মুছে যায় না- একথা আজ আমি মর্মে মর্মে অনুভব করছি। জাতীয় দায়িত্বের শত কাজের ভীড়েও আমি তোমার কথা ভাবি, ভাবতে ভাল লাগে। যখন তোমার কাছে আসার প্রশ্ন ওঠে, তখন মন নেচে ওঠে আনন্দে। আমার এ ব্যক্তিগত ভালো লাগাকে মূল্য না দিয়ে পারছি কই এমি?

-ব্যক্তিসত্ত্বার এ দাবী কি অন্যায়?

-ব্যক্তি ও জাতীয় সত্ত্বা উভয়েরই সমান মর্যাদা। একটির স্বার্থে অপরটিকে অস্বীকার করা যায় না। আমার বিশ্বাস, ব্যক্তি সত্ত্বার দাবী যতক্ষণ জাতীয় নীতি-নিয়মের সীমা লংঘন না করছে, ততক্ষণ সে দাবী অন্যায় নয়। থামল মাহমুদ।

এমিলিয়া নিরব। মাহমুদ বলল, কথা বলছ না যে।

-খুব ভয় করে আমার, হয়ত কত অন্যায় করে যাচ্ছি। দেখ ছোট বেলা থেকে নিজের ব্যক্তিগত ভালো লাগা না লাগাকে বড় করে দেখার শিক্ষা পেয়েছি। তাই ভুল-ভ্রান্তিকে ক্ষমা করো।

-তুমি ইতিমধ্যে অনেক পরিবর্তন এনেছ। তুমি শুধু আমাকে নয়, আমাদের সবাইকেই বিস্মিত করেছ। থামল মাহমুদ। বলল আবার, আগামী সন্ধ্যা ৭ টায় অক্সফোর্ড বুক ফাউন্ডেশন থেকে কিছু বই নিয়ে একজন লোক এসে তোমাদের গেটে দাঁড়াবে এবং তুমি কিছু বই চেয়েছ বলে তোমাকে সংবাদ দিতে বলবে। তুমি তাকে ডেকে নেবে। ক্যামেরা তিনটি একটি থ্রিক্যাসল সিগারেট প্যাকেটে পুরে রাখবে। বুক ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি এসে বসার পর সেও একটি থ্রিক্যাসল সিগারেটের প্যাকেট টেবিলে রাখবে। সিগারেট-প্যাকেটের এক কোণে আমার হস্তাক্ষর থাকবে-CM. থ্রিক্যাসল সিগারেট প্যাকেটে যদি আমার হস্তাক্ষর দেখতে পাও, তাহলে লোকটিকে খাঁটি জানবে এবং বইপত্র দেখার ফাঁকে ঐ প্যাকেটটি তুলে নিয়ে তোমারটি রেখে দিবে।

-তোমার হস্তাক্ষর CM-এর অর্থ কি?

-কর্ণেল মাহমুদ।

-আর ইউ কর্ণেল। বিস্ময়ে এমিলিয়া চোখ দু'টি বড় বড় করল।

-কেন বিশ্বাস হয় না?

-তুমি রীতিমত তা'হলে সেনাবাহিনীর লোক? কিন্তু ....

-কিন্তু কোন্ সেনাবাহিনীর এই তো? হাসল মাহমুদ। একটু থেমে আবার বলল, থাক ওসব কথা আজ। এবার উঠি এমি। বলে উঠে দাঁড়াল মাহমুদ।

-যাচ্ছ?

-হাঁ, যাই।

-আবার কবে দেখা হবে?

-আল্লাহ জানেন।

মাহমুদ ঘর থেকে বেরিয়ে ছাদে উঠে এল। সাথে সাথে উঠে এল। এমিলিয়াও ছাদের কার্ণিশ থেকে সিল্কের কর্ড ঝুলছে। মাহমুদ গিয়ে দাঁড়াল সেখানে।

এমিলিয়া এসে দাঁড়াল মাহমুদের পাশে একান্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে। বলল, একটা কথা বলব?

-অন্তত তোমার টেলিফোন নম্বরটুকু পেতে পারি না?

মাহমুদ মুহূর্ত কয়েক চিন্তা করে বলল, আমার অপারগতার কথা তো তুমি জান এমি।

-আমি কথা দিচ্ছি, আমি কখনও টেলিফোন করব না। শুধু আমি নিশ্চিন্ত থাকতে চাই যে, প্রয়োজন হলে তোমার সাথে যোগাযোগ করতে পারব।

-তোমার অনুরোধ রক্ষা করতে না পারা আমার জন্য বড় কষ্টের এমি। কিন্তু আমি অপারগ। তুমি সব জান। আমাকে ক্ষমা করো তুমি।

এমিলিয়া মুখ নীচু করে দাঁড়িয়েছিল। কোন কথা বলল না। তেমনি মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

মাহমুদ ফিরে এমিলিয়ার মুখোমুখি দাঁড়াল। ওর চোখে অশ্রু। বোধ হয় অশ্রু গোপন করার জন্য এমিলিয়া দু'হাতে মুখ ঢাকল।

ভাব্‌ছিল মাহমুদ। ভাবছিল এমিলিয়াকে টেলিফোন নম্বর দেয়া যায় কি না। কিন্তু ভেবে দেখল, এমিলিয়াকে সকল সন্দেহের উর্ধে হলেও এ ধরনের কাজ হবে সম্পূর্ণ নীতি-বিরুদ্ধে। প্রিয়তমার চোখের পানিতে সে তার নীতি ও দায়িত্ববোধ বিসর্জ্জন দিতে পারে না। মাহমুদ বলল, বড্ড খারাপ লাগছে এমি। বিদায় বেলায় আজ তোমার চোখে অশ্রু দেখে গেলাম।

এমিলিয়া একটু হেঁট হয়ে রুমালে দু'টি চোখ মুছে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। কোন কথা বলল না।

মাহমুদ বলল, আসি এমি কথা দিয়ে যাচ্ছি, এরপর বাইরের কোন টেলিফোন থেকে মাঝে মাঝে তোমার সাথে কথা বলব। বলে মাহমুদ দোলায়মান কর্ডের দিকে এগুলো।

এমিলিয়া মাহমুদের একটি হাত চেপে ধরে বলল, কষ্ট নিও না, আমার দুর্বলতাকে ক্ষমা করো।

মাহমুদ ফিরে দাঁড়াল। এমিলিয়ার আনত মুখটিকে তুলে ধরে বলল, তাহলে হাসতে হবে। বলে হাসতে লাগল।

-জোর করে বুঝি হাসাবে তুমি। হেসে ফেলল এমিলিয়াও।

-কাঁদাবে যে হাসাবে তো সেই। আসি। খোদা করুন আগামীকালের অপারেশনে তুমি সফল হও। খোদা হাফেজ।

-খোদা হাফেজ। বলল এমিলিয়া।

মাহমুদ সিল্কের কর্ড ধরে ঝুলে পড়ল।

# ৩

সৌদি আরবের দুর্গম মরুদ্যান আল-আসির। রাত দশটা। চারিদিকের দিগন্ত প্রসারিত বালির সমুদ্রে একটি ক্ষুদ্র তিলকের মত ঘুমিয়ে আছে আল-আসির। খেজুর কুঞ্জ আচ্ছাদিত আল-আসিরের ঘুটঘুটে অন্ধকারের বুক চিরে একটি লাল আলো স্থিরভাবে জ্বলছে। ভয় করে আলোর দিকে চাইলে। যেন কাল রাত্রির বিশাল দেহ রক্তচক্ষু তুলে কাউকে শাসাচ্ছে। আল আসিরের পশ্চিম আকাশে হঠাৎ ইঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল। শব্দ নিকটতর হলো-বোঝা গেল হেলিকপ্টার লাল আলোর উপরে এসে সার্চ লাইটের আলো একবার নীচে নিক্ষেপ করল। সার্চ লাইটের আলোয় একটি দীর্ঘ রানওয়ে স্পট হয়ে উঠল। নিভে গেল সার্চ লাইট। ল্যান্ড করল হেলিকপ্টারটি। মাত্র ২৫ মিনিটের মধ্যে আরও তিনটি হেলিকপ্টার ল্যান্ড করল আল-আসিরে।

আল-আসিরের মাঝখানে খেজুর কুঞ্জে ঢাকা একটি কাল পাথরের বাড়ী। বায়তুল-আমিন-শাহ সউদের একটি অবকাশ নীড়। পারস্য উপসাগরের হিমেল বাতাস সিক্ত এই নীরব-নিঝুম মরুদ্যানে শাহ সউদ মাঝে মাঝে অবকাশ যাপন করতে আসেন। শাহ ইবনে সউদের অবকাশ নীড় এই বায়তুল আমিনেই আজ সংযুক্ত আরব কমান্ড ও আরব সুপ্রীম সিকিউরিটি কাউন্সিলের বৈঠক বসেছে। ফিলিস্তিন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্বান্ত নেয়া হবে আজ এখানে। অতি গোপন এ বৈঠক। আমেরিকা, রাশিয়া ও বৃটেনের শ্যেনদৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে আজ এখানে একত্রিত হয়েছেন বাদশাহ সউদ, মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার রশিদ, জর্দানের বাদশাহ আবুল হিশাম, লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট শিবলি সোহায়েল, মরক্কোর বাদশাহ হাসান শরীফ, সুদানের প্রেসিডেন্ট ফারুক আল নিমেরী, আলজিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আবু জাফর আবেদীন, সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হাফিজ আল-সাল্লাল এবং সংযুক্ত আরব কমান্ডের অধিনায়ক আবুল আমর আবদুল্লাহ। আর এসেছে সাইমুমের নেতা আহমদ মুসা।

কাল পাথুরে বাড়ীটির অভ্যন্তরে একটি সুসজ্জিত হলঘর। একটি গোল টেবিলের চারদিকে বসেছেন আরব নেতাগণ। সভাপতির আসনে বসেছেন শাহ সউদ। শাহ সউদের ডানপাশে বসেছেন সাইমুম প্রধান আহমদ মুসা, আর বামপাশে আনোয়ার রশিদ। শাহ সউদের সামনে একগাদা কাগজ। প্রথম নীরবতা ভঙ্গ করে কথা বললেন, শাহ সউদ। গম্ভীর কন্ঠ ধ্বনিত হলো তার, 'সম্মানিত ভ্রাতৃবৃন্দ, আমরা এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্বান্ত নেবার জন্য এখানে সমবেত হয়েছি। বায়তুল মোকাদ্দাস এবং ফিলিস্তিনের মুক্তির জন্য আমরা কোন পথ ধরব? সে পথ কি আমাদের সম্মিলিত শক্তি প্রয়োগের পথ? কিংবা বৃহৎ শক্তিবর্গের উপর চাপ সৃষ্টির পথ? অথবা কৌশলে ফিলিস্তিনে স্বয়ংক্রিয় কোন বিপ্লব সংঘটনের পথ? আশা করি এ ব্যাপারে আপনারা আপনাদের সূচিন্তিত বক্তব্য রাখবেন।' শাহ সউদ চুপ করলেন। নেমে এল নীরবতা।

এবার কথা বললেন আনোয়ার রশিদ। তিনি বললেন, ফিলিস্তিনের মুক্তির জন্য আপনি যে পথ তিনটির কথা উল্লেখ করেছেন, তারই কোন একটি পথ ধরে আমাদের এগুতে হবে। এ পথগুলোর সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে আমাদের সকলের যে ধারণা, তা একরূপই হবে বলে আমার বিশ্বাস। আমার অনুরোধ, আপনিই এ ব্যাপারে প্রথম বক্তব্য রাখবেন।

প্রেসিডেন্ট আবেদীন, বাদশাহ হাসান শরিফ, প্রেসিডেন্ট শিবলি সোহায়েল প্রমুখ উপস্থিত সকলেই আনোয়ার রশিদের প্রস্তাবকে সহাস্যে সমর্থন জানালেন।

শাহ সউদ ধীরে ধীরে মুখ তুললেন। মনে হলো একটু ভাবলেন তিনি। কাগজপত্র একটু নাড়াচাড়া করলেন। তারপর বলতে শুরু করলেন, আমরা সকলেই জানি সোভিয়েত, বৃটেন ও আমেরিকা ইহুদী শক্তির পিছনে না থাকলে ফিলিস্তিনে ইহুদী আমদানি সম্ভব হতো না, জাতিসংঘে ফিলিস্তিন বিভক্তির প্রস্তাব উঠত না, পাশও হতো না এবং ইসরাইল রাষ্ট্রও জন্মলাভ করত না। বাইরে থেকে আমরা শক্তি প্রয়োগ করে ফিলিস্তিন মুক্ত করতে পারব না। কারণ সোভিয়েত ইউনিয়ন, বৃটেন ও আমেরিকার সাথে যুদ্ধ করার মত শক্তি আমরা এখনও অর্জন

করতে পারিনি। ইসরাইলের সাথে আমাদের কয়েকটি যুদ্ধ থেকে পরিষ্কার হয়ে গেছে ও পথ আমাদের সাফল্যের পথ নয়। চাপ প্রয়োগের কথা আমরা ভাবতে পারি। তৈল-অস্ত্রের সাহায্যে আমরা সে চাপ দিয়ে আসছি। কিন্তু এ চাপেরও একটা সীমা আছে, সে সীমা আমরা অতিক্রম করতে পারি না। তৈল অস্ত্র প্রয়েগে কিছু ফল আমরা পেয়েছি, আরও কিছু ফল পেতে পারি। কিন্তু ফিলিস্তিনের মুক্তি এর দ্বারা আসতে পারে না। আর একটি পথ বাকি থাকে। সেটা হলো ফিলিস্তিনের অভ্যন্তর থেকে স্বয়ংক্রিয় বিপ্লবের মাধ্যমে ফিলিস্তিনের মুক্তি। আমার মতে ফিলিস্তিনের মুক্তির এই পথই একমাত্র সঠিক পথ। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের এই পথেই আমাদের এগুতে হবে। আমি আনন্দিত যে, সাইমুম জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সে পথ রচনা করেছে। শাহ্ সউদ চুপ করলেন।

মুহূর্ত কয়েক নীরবতা। তারপর কথা বললেন আলজিরিয়ার প্রেসিডেন্ট। তিনি বললেন, আন্তর্জাতিক দিক থেকে এ পথটি নিরাপদ। কিন্তু বিষয়টি অত্যন্ত জটিল ও সময় সাপেক্ষ।

আনোয়ার রশিদ বললেন, বিষয়টি জটিল ও সময় সাপেক্ষ অবশ্যই, কিন্ত অসম্ভব নয়। সাইমুম যে পথ ধরে এগুচ্ছে, তা একে অনেক সহজ করে দেবে।

বাদশাহ হাসান শরিফ ও প্রেসিডেন্ট শিবলি সোহায়েল নীচু স্বরে কিছূ কথা বললেন। পরে প্রেসিডেন্ট শিবলি সোহায়েল বললেন, আমরা যে পথে এগুতে যাচ্ছি, তার সাফল্যের অধিকাংশ নির্ভর করছে সাইমুমের কর্মতৎপরতার উপর। আমাদের মোহতারাম ভাই আহমদ মুসা উপস্থিত আছেন, তার বক্তব্য আমরা শুনতে পেলে আমাদের আলোচনা সহজ হতো।

শাহ সউদ মাথা নেড়ে বললেন, ঠিক। স্মিত হেসে আহমদ মুসার দিকে চাইলেন।

আহমদ মুসা বললেন, মোহতারাম শাহ্ সাহেব যে মত প্রকাশ করেছেন আমার বক্তব্যও সেটাই। আমি আনন্দিত যে, আমরা সবাই একই লাইনে চিন্তা করছি। আর সাইমুমের গোটা সংগঠন গড়ে উঠেছে এই দর্শনের উপর ভিত্তি করেই। আপনারা যে সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে আসছেন, তা অব্যাহত থাকলে আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব।

আপনারা শুনে সুখী হবেন যে, ইসরাইলের ‘ড্রুজি’ সম্প্রদায়ের সাথে আমাদের চুক্তি হয়েছে। ইসরাইলের স্থল, বিমান ও নৌবাহিনীতে ওদের ১৪ হাজারের মত লোক রয়েছে। ওদের সর্বাত্মক সাহায্য আমরা পাব। এতদিন ইসরাইলী আর্মির অভ্যন্তরে প্রবেশ ছিল অসম্ভব। আল্লাহর অনুগ্রহে এখন সে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ইসরাইলীদের ইহুদীকরণ প্রচেষ্টায় অসন্তুষ্ট ক্ষুব্ধ ‘ড্রুজিরা’ আমাদের সব রকম সাহায্য দেবে। আহমদ মুসা চুপ করল। নেমে এল নীরবতা।

নীরবতা ভাঙ্গলেন শাহ সউদ নিজে। “ফিলিস্তিনে কোন স্বয়ংক্রিয় বিপ্লব বা গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে যদি আমরা ইসরাইল রাষ্ট্রের উৎখাত করতে চাই, তাহলে ফিলিস্তিনী মুসলিম জনসাধারণের প্রতিনিধি ও মুখপাত্র হিসেবে সাইমুমের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় করতে হবে। আর তার আগে আমাদের তরফ থেকে স্বীকৃতি দিতে হবে। আমরা মুসলিম দেশগুলো যদি জাতিসংঘে প্রস্তাব আনি এবং আমাদের প্রভাব কাজে লাগাই, তাহলে সাইমুম জাতিসংঘের স্বীকৃতি লাভ করবে। ভবিষ্যতে এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি খুবই কাজে আসবে।”

মরক্কোর বাদশা শরিফ বললেন, ‘শাহ সাহেব উপযুক্ত পরামর্শ দিয়েছেন। ফিলিস্তিনে অন্তর্বিপ্লবের পরিকল্পনা যদি আমাদের সফল হয়, তাহলে ঐ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি খুবই উপকারে আসবে। অবশ্য সে বিপ্লব যদি নিছক সরকার পরিবর্তন ধরনের হয়, তাহলে ঐ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি খুব গুরুত্ববহ হবে’।

বাদশাহ আবুল হিশাম বললেন, আমরা কি আজই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিব?

প্রেসিডেন্ট হাফিজ আল-সাল্লাল বললেন, সিদ্ধান্ত আমরা আজই নিচ্ছি। কিন্তু তা আমরা ঘোষণা করব আমাদের আসন্ন রাবাত শীর্ষ সম্মেলনে এবং তারপর থেকেই সাইমুমের জন্য আমরা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ের প্রচেষ্টা চালাব।

শাহ সউদ বললেন, হাফিজ সাহেব ঠিক বলেছেন। রাবাত সম্মেলনেই আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করব। শাহ সউদ একটু চুপ করলেন। তারপর আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বললেন, লক্ষ লক্ষ নিরাশ্রয় ও দুঃখী মানুষের পক্ষ থেকে এ গুরু দায়িত আপনার উপর বর্তেছে। আমরা গর্বিত যে, সাইমুম এ দায়িত্ব

পালনে সমর্থ। আমরা এখন জানতে পারলে উপকৃত হবো যে, অন্তর্বিপ্লবের পরিকল্পনা আপনার কি হবে এবং সে ক্ষেত্রে আমাদের কি করণীয় থাকবে?

আহমদ মুসা একটু নড়ে-চড়ে বসলেন। কপালে তাঁর চিন্তার বলিরেখা স্পষ্ট। মুখটি তাঁর প্রশান্ত। চোখ দু'টি তাঁর ভাবনার কোন অতল গভীরে। ধীরে ধীরে মুখ খুললো আহমদ মুসা। বল সে, আন্তর্বিপ্লবের পথ অত্যন্ত জঠিল ও ঝুঁকিপূর্ণ। আমরা শুধু শক্তি দিয়ে ৩০ লাখ ইহুদীর কাছ থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা কেড়ে নিতে পারব না আমাদেরকে কৌশলের পথ ধরতে হবে। ইসরাইলী নেতাদের পারস্পরিক বিরোধের সুযোগ আমাদের নিতে হবে। উচ্চাভিলাষী মোশেহায়ান ক্যাবিনেট থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। ইসরাইলী আর্মির সাবেক সর্বাধিনায়াক জেনারেল রবিন রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করছেন আমরা জানি। ইসরাইল আর্মির এক বিরাট অংশের উপর এই দুইজনের প্রভাব রয়েছে। ইসরাইলের বন্ধু দেশগুলোও তাদের রাজনৈতিক উচ্চভিলাষ সম্পর্কে জ্ঞাত আছে। আমরা তাদের দু'জনকে কাজে লাগিয়ে ইসরাইলী জনগণ ও সেনাবাহিনী এবং ইসরাইলের বন্ধুরাষ্ট্রদের বিভ্রান্ত করবো। বিভ্রান্তি কাটিয়ে প্রকৃত বিষয় তারা বুঝে ওঠার পূর্বেই আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারব বলে আশা করছি। আহমদ মুসা একটু থামলেন। আবার শুরু করলেন, এর উপর আমরা যদি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাই, তাহলে ভবিষ্যতে তা আমাদের খুব উপকারে আসবে। আমরা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভের পর ইসরাইল সরকারের সাথে আপোষমূলক মনোভাব আপনাদের দেখাতে হবে। আমি যতদূর জানি, ইসরাইল স্বীকৃতির আশ্বাস পেলে তার অধিকৃত সব এলাকা সে ছেড়ে দিবে। ইসরাইলের সাথে এ ধরনের সমঝোতার পথ আপনাদের করতে হবে। আর এ সমঝোতা চেষ্টা পাবলিসিটি ওর্য়াক বেশী করতে হবে। ইসরাইল আর্মি এবং সেখানকার জনসাধারণের এক বিরাট অংশ এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে। সুতরাং ইসরাইল সরকারের এই আপোষমূলক মনোভাবের বিরুদ্ধে তারা বিক্ষুব্ধ হবে। আর আমরা এরই সুযোগ গ্রহণ করব। সোভিয়েত ইউনিয়ন, বৃটেন ও আমেরিকা আন্তরিকভাবে চায় না যে, ইসরাইল ও আরবরা পূর্ণ সমঝোতায় পৌঁছুক। সুতরাং

আমাদের সাথে আপোষমুখী ইসরাইল সরকারের বিরুদ্ধে কোন আভ্যন্তরীণ অভ্যুত্থনকে তারা কোনরূপ সন্দেহের চোখে দেখবে না। আহমদ মুসা থামলো।

প্রেসিডেন্ট শিবলি সোহায়েল কথা বললেন। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে আহমদ মুসার ডান হাতটি হাতে নিয়ে একটি ঝাঁকুনী দিয়ে বললেন, খায়ের! খায়ের!! চমৎকার বুদ্ধি, চমৎকার পরিকল্পনা। মোবারকবাদ আপনাকে।

শাহ সউদের চোখ বুজে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে তিনি চোখ খুললেন। হাঁ, পরিকল্পনা ও প্রস্তাবগুলো খুব সমীচীন, সূচিন্তিত। কিন্তু সমস্যা দেখা দেবে বিপ্লবের প্রকৃতি প্রকাশ হয়ে পড়ার পর। আমেরিকা মরিয়া হয়ে কিছু করে না বসে। অবশ্য আফ্রো-এশিয়াসহ চীন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশগুলো যদি আমাদের পাশে দাঁড়ায়, তাহলে আমেরিকা সে সাহস পাবে না। তাছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়নকে নিরপেক্ষ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে আমাদের।

আনোয়ার রশিদ ও হাফিজ আল-সাল্লাল প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠলেন, আমরা তা পারব। আমরা যদি তাকে তার প্রভাব বলয়ের অক্ষুন্নতার নিশ্চয়তা দান করি, তাহলেই এটা করতে পারব।

বাদশাহ আবুল হিশাম, ফারুক আল-নিমেরী, হাফিজ আল-সাল্লাল, শিবলি সোহায়েল প্রমুখদের মধ্যে টুকিটাকি আলোচনা চলতে লাগল। শাহ সউদ তাঁর টেবিলের সাদা বোতামে মৃদু চাপ দিলেন। তারপর বললেন, আমরা এখন নাস্তা করব। আমাদের এতক্ষণের আলোচনায় যে সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম, তা হলোঃ

(১) অন্তর্বিপ্লবের মাধ্যমে ফিলিস্তিন মুক্ত করতে হবে।

(২) সাইমুমকে ফিলিস্তিনের প্রতিনিধি হিসেবে আমরা স্বীকৃতি দেব এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় করবো।

(৩) ইসরাইল সরকারকে আমরা এমন ধরনের মৈত্রীতে আবদ্ধ করতে চেষ্টা করব, যাতে সেখানকার জনগণ ও সেনাবাহিনী বিক্ষুব্ধ হয়।

(৪) অর্থবল, লোকবল, অস্ত্রবল-যে সাহায্যই সাইমুমের প্রয়োজন পড়বে তা আমরা দিব।

শাহ সউদ থামলেন। তিনি চুপ করতেই সাউন্ড প্রুফ ঘরটির দেয়াল ফেটে একটি দরজা বেরুল। দরজা দিয়ে নাস্তার ট্রে ঠেলে প্রবেশ করল শাহ সউদের খাস বেয়ারা শরিফ ইবনে আলী আকরাম।

রাবাতের আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর। কঠোর প্রহরা চারিদিকে। দেশের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও সীমিত সংখ্যক সাংবাদিক ছাড়া বেসামরিক কোন লোকের চিহ্ন কোথাও নেই। আর মিনিট সাতেকের মধ্যেই শাহ সউদের বিশেষ বিমানটি ল্যান্ড করবে। মরক্কোর বাদশা হাসান শরিফ এবং মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন তাঁর। উর্ধতন সামরিক অফিসার ও বিমান কর্মচারীদের ইতস্তত বিচরণ করতে দেখা যাচ্ছে। ‘গার্ড অব অনার’ দেয়ার জন্য সেনাবাহিনীর একটি ইউনিট প্রস্তুত রয়েছে। সালাম গ্রহণ মঞ্চের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে বুলেট-প্রুফ সুদৃশ্য গাড়ী, ওদেরই একটি বহন করবে শাহ সউদ ও বাদশাহ হাসান শরিফকে।

আহমদ মুসা ভি, আই, পি, রুম থেকে বেরিয়ে বিমান চত্বরে একটি চক্কর দিয়ে টয়লেটের দিকে চললো। সাধারণ আরবী পোশাক তাঁর দেহে। টয়লেটে ঢুকতে গিয়ে একটি মুখের দিকে নজর পড়তেই তার চিন্তা যেন হোঁচট খেল। কাঁধে ক্যামেরা ঝোলানো একজন লোক বেরিয়ে আসছিল টয়লেট থেকে। সোডিয়াম লাইটের ধবধবে আলো লোকটির মুখের প্রতিটি রেখা যেন আহমদ মুসার কাছে স্পষ্ট করে তুলল। জোড়া ভ্রু, নাকের ডানপাশে কাটা দাগ, ঝুলে পড়া ঠোঁট, কোথায় যেন এ মুখ তিনি দেখেছেন। লোকটির পিছনে আর একজন লোক বেরিয়ে এল। এই লোকটিকে আহমদ মুসা চেনে-বাদশা শরিফের খাস ড্রাইভারদের প্রধান।

আহমদ মুসা টয়লেটে ঢুকলো। কিন্তু উড়োজাহাজের প্রফেলারের মত চিন্তা তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল-‘তাস’-এর এ সাংবাদিক ভদ্রলোকটি কে?

হঠাৎ তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল ডসিয়ার এলবামের একটি মুখ, সেই জোড়া ভ্রু, নাকের ডানপাশে কাটা দাগ, ঝুলে পড়া ঠোঁট। নাম ইসাক এলিস। ইরগুণ জাই লিউমির দুর্ধর্ষ ইহুদী স্পাই। কথাটা মনে হওয়ার সাথে সাথে গোটা শরীর রোমাঞ্চ দিয়ে উঠল আহমদ মুসার। 'ইরগুণ জাই লিউমি'র অপারেশন স্কোয়ার্ডের মধ্যমণি ইসাক এলিস এখানে? 'তাস' করেসপন্ডেন্ট সে কবে থেকে? বিজলির চমকের মত আর একটি প্রশ্ন ছুটে এল তাঁর মনে-খাস ড্রাইভার প্রধান শরীফ আলম ইসাক এলিসের পিছনে বেরিয়ে গেল কেন? শাহ ফয়সালের শাহাদতের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে যাচ্ছে না তো? কেঁপে উঠল মুসার লৌহ হৃদয়ও। আকাশে জেট ইঞ্জিনের শব্দ শোনা যাচ্ছে, ল্যান্ড করছে শাহ সউদের বিমান। টয়লেট থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলো আহমদ মুসা। ঐ তো রানওয়ে দিয়ে ছুটে আসছে শাহ সউদের বিশেষ বিমানটি। বাদশাহ হাসান শরিফ ও উর্ধতন নেতৃবৃন্দ বিমান চত্বরে এসে দাঁড়িয়েছেন মহান অতিথিকে সম্বর্ধনার জন্য। দ্রুত কাজ করছিল আহমদ মুসার মন। বিন্দু বিন্দু ঘাম তাঁর কপালে। চোখে তাঁর দৃঢ় সিদ্ধান্তের ছাপ।

টয়লেট থেকে বেরিয়ে সে সোজা গেলো সালাম গ্রহণ মঞ্চের পিছনে দাঁড়ানো আবুল আসের কাছে। আবুল আস সাইমুমের রাবাত ইউনিটের প্রধান। খুব নীচু গলায় আহমদ মুসা বলেলো, 'তাস' করেসপন্ডেন্টের দিকে নজর রেখো, ওকে আমাদের চাই-ই। ড্রাইভার শরিফ আলমকেও সন্দেহ করছি। বলেই আহমদ মুসা দ্রুত ফিরে এলো বিমানের দিকে। বিমানের খোলা দরজায় সিঁড়ি লাগানো হয়ে গেছে। পরক্ষণেই দেখা গেল, শাহ সউদ নেমে আসছেন সিঁড়ি দিয়ে। সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে বাদশাহ হাসান শরিফ। আহমদ মুসা গিয়ে দাঁড়ালেন বাদশাহর পাশে। মন তাঁর ছটফট করছিল। অবিলম্বে কয়েকটি কথা বলা দরকার বাদশাহকে। কিন্তু ফুরসৎ কই? এখান থেকে সোজা ওঁরা যাবেন সালাম গ্রহণ মঞ্চে, তারপর সেখান থেকে গাড়ীতে। কিন্তু বলতেই হবে তাঁকে কথা।

সুযোগ জুটে গেল। বিমান চত্বর থেকে ফেরার পথে শাহ্ সাহেব ও প্রধানমন্ত্রী হাস্যালাপ করছিলেন। সেই সুযোগে আহমদ মুসা বাদশাহকে বলল, এই মুহূর্তেই আপনাকে দু'টি আদেশ দিতে হবে, অত্যন্ত জরুরী।

বাদশাহ কিছুটা উদ্বেগ নিয়ে বললেন, বলুন।

পূর্ব নির্দিষ্ট গাড়ী বাদ দিয়ে সেনাবাহিনীর গাড়ী কিংবা অন্য কোন গাড়ীতে আপনাদের যাবার ব্যবস্থা করতে বলুন, ড্রাইভার শরিফ আলমকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে বলুন, আর 'তাস' করেসপন্ডেন্টকে আমরা গ্রেপ্তার করতে চাই।

-কিছু হয়েছে, কিছু ঘটেছে? এবার স্পষ্ট উদ্বেগ ঝরে পড়ল বাদশাহর কন্ঠে। তিনি প্রায় দাঁড়িয়ে পড়লেন।

-পরে সব জানতে পারবেন, আপনার রায় বলুন।

-আমি আবু আমরকে এখনই নির্দেশ দিচ্ছি। আবু আমর মরক্কোর সিকিউরিটি প্রধান।

গার্ড অব অনার শেষে সাংবাদিকদের সাথে সংক্ষিপ্ত দু'চারটি কথা বলার পর বাদশাহ হাসান শরিফ ও শাহ সউদ যখন সেনাবাহিনীর একটি গাড়ীর দিকে এগুচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় পূর্ব নির্দিষ্ট গাড়ীর পাশে এ্যাটেনশনভাবে দাঁড়ানো ড্রাইভার শরিফ আলমকে দু'জন নিরাপত্তা পুলিশ ধরে নিয়ে গেল।

বাদশাহর গাড়ী চলে যাবার পর বিমান বন্দরের বহিরাঙ্গন থেকে সাংবাদিকদের জন্য নির্দিষ্ট খোলা জিপটিও যাত্রা করল। দেখা গেল 'তাস' করেসপন্ডেন্ট আঁদ্রে শুখানভ ওরফে ইসাক এলিসও উঠে বসলেন ড্রাইভারের পাশের সিটে। সাংবাদিকদের জীপের পিছনে আর একটি ল্যান্ড রোভার ষ্টার্ট নিল। গাড়ীর পিছনের সিটে দু'জন মুকোশধারী, ড্রাইভিং সিটে আবুল আস নিজে। তাঁদের গাড়ী যখন বিমান বন্দরের গেট পার হলো, সেই সময় পিছন থেকে প্রচন্ড বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল। সালাম গ্রহণ মঞ্চের পার্শ্বে দাঁড়ানো ড্রাইভার শরীফ আলমের গাড়ীর ছাদ প্রচন্ড বিস্ফোরণে উড়ে গেছে-জ্বলছে লিমোজিনটি। আবুল আস দেখতে পেল-সামনের সাংবাদিক জিপটি থেমে গেছে। জীপ থেকে লাফিয়ে পড়লেন রয়টার এবং এ, এফ, পি'র করেসপন্ডেন্ট। ছুটছেন তাঁরা বিমান বন্দরের

দিকে দুর্ঘটনা দেখার জন্য। একটু পরে আঁদ্রে শুখানভ ওরফে ইসাক এলিসও নামলেন। আবুল আসের গাড়ীটিও সাংবাদিক জীপের পিছনে এসে থেমে গিয়েছিল। আর একটি নীল রংয়ের ভক্সওয়াগন এসে আবুল আসের গাড়ীর পিছনে থেমে গেল। আবুল আস মুখোশধারীদের একজনকে বললো, 'তুমি আমার সাথে এসো।' বলে আবুল আস গাড়ী থেকে নেমেই দেখলো, এলিস পিছনের গাড়ীটার পাশে প্রায় পৌঁছতেই দরজাটি হঠাৎ খুলে গেল, আর ঝুপ করে সে ঢুকে গেল গাড়ীর ভিতরে। সঙ্গে সঙ্গে নড়ে উঠলো গাড়ী। ব্যাপারটি বুঝে ফেলল আবুল আস। গুলী করল সে গাড়ীর টায়ার লক্ষ্য করে। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো সে গুলী। গাড়ীটির জানালা দিয়ে ডিম্বাকৃতি একটি বস্তু ছুটে এসে সশব্দে ফেটে গেল। মুহূর্তের মধ্যে গাঢ় কাল ধোয়ায় ছেয়ে গেল স্থানটি। আবুল আস তার নিজের গাড়ীও ঠাহর করতে পারলো না ধোঁয়ার সেই গাঢ় আবরণে। মুহূর্তকয় পর ধোঁয়া যখন সরে গেল, তখন পিছনের গাড়ীটির কোন অস্তিত্ব কোথাও নেই।

ইসাক এলিসকে নিয়ে এয়ারপোর্ট রোড ধরে তীব্র বেগে ছুটে চলছিল সেই নীল রংয়ের ভক্সওয়াগন। এলিসসহ মোট তিনজন আরোহী। এলিস পিছনের অন্ধকার ঢাকা পথের দিকে চেয়ে আশ্বস্ত হলো -না কেউপিছু নেয়নি। পরে পাশের লোকটির দিকে চেয়ে বলল, 'শরিফ ধরা পড়েছে রবিন।' রবিন নামক লোকটি বলল, শাহ ও বাদশাহকে অন্য গাড়ীতে দেখেই আমি তা বুঝতে পেরেছিলাম।

টাইম বোম্ব সে যথাসময়েই গাড়ীতে সেট করতে পেরেছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সব পন্ড হলো কি করে আমি তাই ভাবছি। বলল এলিস।

-আপনার পিছু নিয়েছিল ওরা কারা?

-যারাই হোক, সরকারের লোক নয়, এরাই ধরিয়ে দিয়েছে শরিফ আলমকে।

-আমার ধারণা, ওরা সাইমুমের লোক। আপনার পরিচয় শুধু ওদের পক্ষেই জানা সম্ভব।

এলিসের গাড়ীর পিছনে নিঃশব্দে ঝড়ের গতিতে ছুটে আসছিল আর একটি গাড়ী। কালো রং-এর ল্যান্ড রোভার। হেড লাইট নিভানো, তাই আগের গাড়ীর আরোহীদের কাছে গাড়ীটি অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। গাড়ীতে একজন মাত্র

আরোহী। আরবীয় পোশাক পরিধানে। কানের পাশ দিয়ে নেমে আসা রুমাল মুখের অধিকাংশ ঢেকে রেখেছে। তার পাশে পড়ে রয়েছে একটি সাব-মেশিনগান।

এলিসের গাড়ী এয়ারপোর্ট রোড ছেড়ে জনবিরল এরাবিয়ান হাইওয়েতে গিয়ে পড়ল। এই সময় সামনে থেকে আর একটি গাড়ী এসে পড়ল। তার হেড লাইটের আলোতে এলিসদের গাড়ীসহ পিছনের গাড়ীটি আলোকিত হয়ে উঠল। দূর্ভাগ্যই বলতে হবে পিছনের গাড়ীর আরোহীর। তার অস্তিত্ব সামনের গাড়ীর আরোহীর কাছে পরিস্কার হয়ে গেল। প্রমাদ গুণল পিছনের গাড়ীর আরোহী।

এলিসদের গাড়ীর গতিবেগ বেড়ে গেল। গতিবেগ বাড়ালো পিছনের গাড়ীটিও। পিছনের গাড়ীর আরোহীর চোখ দু'টি সামনের গাড়ীর প্রতি স্থিরভাবে নিবদ্ধ। মুখে তার দৃঢ় সংকল্পের ছাপ। স্পিডোমিটারের কাঁটা কাঁপছে। ৮০ পেরিয়ে কাঁটা ৯০ ছুঁই ছুঁই করছে। সামনের গাড়ীর স্পিডোমিটারের কাঁটা তখন ৮০'তে, পারছে না প্রতিযোগিতায়। পিছনের গাড়ীটি মিনিট দেড়েকের মধ্যেই ধরে ফেলল সামনের গাড়ীটিকে। আগের গাড়ীর নিকটে আসতেই এক ঝাঁক গুলী এসে পিছনের গাড়ীর গায়ে লাগল। তবু বেপরোয়া আরোহীটি তার গাড়ী এনে সামনের গাড়ীর পথ রোধ করে দাঁড়াল। থেমে গেছে এলিসদের গাড়ীও, আলো নিভে গেছে তার। গাড়ীটি থামিয়েই আরবী পোশাকের আরোহীটি সাবমেশিনগানটি নিয়ে গড়িয়ে নেমে পড়েছে নীচে। চোখ তার ইনফ্রারেড গগলস। অন্ধকার স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে তার চোখে। ঐ গাড়ী থেকে গুলীবৃষ্টি হচ্ছে। পিছনের গাড়ীর আরবীয় পোশাকের আরোহিটি কোন প্রত্যুত্তর না দিয়ে সাপের মত এগিয়ে চলেছে এলিসদের গাড়ীর দিকে। রাস্তার উত্তর পাশের ঢাল বেয়ে নিঃশব্দে এগুচ্ছিল সে। কোন প্রত্যুত্তর না পেয়ে ওপারের গুলীও বন্ধ হয়ে গেল। আরবীয় পোশাকের আরোহী দেখতে পেল, এলিসের গাড়ীর এপাশে লম্বালম্বি শুয়ে আছে একজন, হাতে তার উদ্যত স্টেনগান। মাথা ঈষৎ উঁচু করে সে চারিদিকটা একবার ভাল করে দেখার চেষ্টা করছে। পিছনের আরবী আরোহীটি গুলী করার লোভ সম্বরণ করল। বোঝা গেল গাড়ীর তিনজন আরোহীর কে কোথায়, তা সে প্রথমে জানতে চায়। গাড়ীর পিছন বরাবর গিয়ে সে থামল। অপর

দু'জনকে সে গাড়ীর পিছনে দেখতে পেল। তাদের একজন শুয়ে, হাতে তার স্টেনগান, অপরজন হাঁটু গেড়ে বসে, হাতে তার রিভলভার। হাঁটু গেড়ে বসা লোকটিই ইসাক এলিস, তা বুঝতে পারল আরবী পোশাকের আরোহী। এলিসদের সকলের দৃষ্টি সামনের আড়াআড়ি করে রাখা আরবী লোকটির ঐ গাড়ীর দিকে। গাড়ীর উত্তর পার্শ্বে গাড়ীর লম্বালম্বি শুয়ে থাকা লোকটিকে এই সময়ে গুটি গুটি গাড়ীর পিছন দিকে আসতে দেখা গেল। আরবীয় পোশাকের আরোহীটি বোধ হয় এভাবে তিনজনকে এক সঙ্গেই চাচ্ছিল। প্রশস্ত মাইল পোস্টের আড়ালে শুয়ে স্টেনগানটি বাঁ হাতে ধরে ডান হাতে রিভলভার থেকে ধীরে সুস্থে প্রথম গুলীটি ছুঁড়ল সে। আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল গুটি গুটি করে আসা লোকটি। বিদ্যুৎ গতিতে ফিরে দাঁড়িয়েছিল এলিস। একটু মাথা তুলে ফিরবার চেষ্টা করেছিল গাড়ীর পিছনে শুয়ে থাকা লোকটিও। কিন্তু আরবীয় পোশাকের আরোহীটির দ্বিতীয় গুলী তার কানের পাশ দিয়ে ঢুকে গেল একদম মাথার ভিতরে, এলিয়ে পড়ল তার মাথা আবার মাটিতে। এলিসও গুলী ছুঁড়েছিল, কিন্তু লক্ষ্যহীন সে সব। এলিস এবার সঙ্গীর স্টেনগানটি তুলে নিয়ে দৌড়ে দক্ষিণ পার্শ্বে চলে গেল। বোঝা গেল, আরবীয় পোশাকের আরোহীটি ইচ্ছা করেই তৃতীয় গুলীটি ছুঁড়ল না। বরং সে দ্রুত স্থান ত্যাগ করে ঢাল বেয়ে দৌড়ে এলিসের গাড়ীটির ওপাশে গিয়ে উঠল। দেখতে পেল সে, এলিস রাস্তার ওপাশের ঢালে নেমে যাচ্ছে। কয়েক পা সামনে গিয়ে চিৎকার করে উঠল আরবীয় পোশাকের আরোহী স্টেনগান ফেলে দাও এলি কথা শেষ হলো না তার। ঝট করে এলিস পিছনে ফিরে দাঁড়াল, কিন্তু বেপরোয়া এলিসের স্টেনগান থেকে গুলী বেরুবার আগেই আরবীয় পোশাকের আরোহীর তৃতীয় বুলেটটি এলিসের বাম কাঁধে ঢুকে গেল। স্টেনগান পড়ে গেল হাত থেকে, বসে পড়ল সে।

এলিস, এলিসের দুই সহকর্মী ও এলিসের গাড়ীটি সার্চ করে এলিসকে বেঁধে গাড়িতে তুলে নিয়ে গাড়ী ছেড়ে দিল এবার আরোহীটি। শহরের অকট্রয় পোস্টে আসতেই গাড়ীটি আটকে দিল সেনাবাহিনীর একটি ইউনিট। বুলেটের ঝাকে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া গাড়ীটি তারা ঘিরে দাঁড়াল। কিন্তু তাদের অফিসার গাড়ীর সমনে এসে আরোহীকে দেখেই চমকে উঠে স্যালুট করে সরে দাঁড়াল।

ঘিরে দাঁড়ানো সৈনিকরাও সরে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে। গাড়ীটি চলে যাওয়ার পর অফিসারটি উৎসুক সৈনিকদের জানাল, আহমদ মুসা।

নামটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে সৈনিকদের বিস্ময়াবিষ্ট চোখ অপসৃয়মান গাড়ীটির দিকে ছুটে গেল আর একবার।

আরবীয় পোশাকের আরোহীটি আহমদ মুসা। এলিসের প্রতি দৃষ্টি রাখবার নির্দেশ আবুল আসকে দিয়েও নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। তাই নিজেও পিছু নিয়েছিল তার।

এলিসকে নিয়ে আহমদ মুসা সোজা সাইমুমের রাবাত ঘাঁটিতে এসে হাযির হলো। আহমদ মুসাকে গাড়ী থেকে নামতে দেখে উদ্বেগাকুল আবুল আস ছুটে এল। কিছু বলতে যাচ্ছিল আবুল আস, কিন্তু গাড়ীর ভিতর থেকে হাত-পা বাঁধা এলিসকে পিট পিট করে চাইতে দেখে চমকে উঠে থেমে গেল সে। পরে আহমদ মুসাকে এক পাশে ডেকে বলল, শাহ এবং বাদশাহ দু'বার খোঁজ করেছেন আপনাকে। উদ্বিগ্ন তাঁরা। স্টেট গেস্ট হাউসে তাঁরা অপেক্ষা করছেন।

এলিসকে আবুল আসের হাতে সোপর্দ করে আহমদ মুসা তখনই চলল স্টেট গেস্ট হাউসের উদ্দেশ্যে।

গেস্ট হাউসের গেটে আহমদ মুসার গাড়ী পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব পালনরত অফিসার টেলিফোনে খবরটি ভিতরে পৌঁছিয়ে বাইরে এসে আহমদ মুসাকে স্যালুট করে দাঁড়াল। মুহূর্তে খুলে গেল গেট। ভিতরে প্রবেশ করল আহমদ মুসার গাড়ী। শাহ সউদ এবং বাদশাহ হাসান শরিফ দু'জনেই গাড়ী বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন। আহমদ মুসা গাড়ী থেকে নামতেই জড়িয়ে ধরলেন প্রথমে বাদশাহ এবং পরে শাহ সউদ।

বাদশাহ বললেন, আল্লাহ এক ভয়ানক দুর্ঘটনা থেকে আমাদের বাঁচিয়েছেন আপনার সাহায্যে।

শাহ বললেন, শুধু আমরা নই, শীর্ষ সম্মেলনটিও রক্ষা পেয়েছে।

-সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। স্মিত হেসে জবাব দিল আহমদ মুসা।

গাড়ীর দিকে চেয়ে ভ্রুকুঁচকে শাহ সউদ বললেন, মনে হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরলেন।

বাদশাহও গাড়ীর দিকে চেয়ে বললেন, “তাই তো!” তারপর তিনি বললেন “চলুন ভিতরে গিয়ে শোনা যাবে সব।”

স্টেট গেস্ট হাউসের সুদৃশ্য ড্রইং রুমে এসে বসলেন তাঁরা।

বাদশাহ প্রথম কথা বললেন, প্রথম চোটেই ড্রাইভার শরিফ আলম সব স্বীকার করেছে। অত্যাধুনিক টাইম বোম্বটি সাপ্লাই দিয়েছে আঁদ্রে শুখানভ।”

-আঁদ্রে শুখানভ নয়, ওর আসল নাম ‘ইসাক এলিস’ ইরগুণ জাই লিউমির দুর্ধর্ষ স্পাই।

-ইসাক এলিস! চমকে উঠলেন যেন শাহ ও বাদশাহ দু’জনেই। কিছুক্ষণ নির্বাক সকলেই।

প্রথম মুখ খুললেন বাদশাহ। বললেন, দুঃখ হচ্ছে, হাতের মুঠোয় পেয়েও আমরা তাকে ধরতে পারলাম না, আবুল আস কিন্তু চেষ্টার কোন ত্রুটি করেনি।

-আপনি খুশী হবেন, এলিস ধরা পড়েছে। তার দু’জন সাথী নিহত, সেও আহত। এইমাত্র তাকে আমি আবুল আসের হাতে তুলে দিয়ে এলাম।

-আলহামদুলিল্লাহ! ধরা পড়েছে এলিস! সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকালেন বাদশাহ আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা পূর্বাপর সব ঘটনা তাদের জানালেন। সব শুনে বাদশাহ যেন অভিভূত হয়ে পড়লেন। শাহ সউদ বললেন, আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবি করুন। মজলুম মানবতার খেদমতের জন্য আল্লাহ আপনাকে বাঁচিয়ে রাখুন।

আহমদ মুসা বললেন, ইসাক এলিসের গ্রেপ্তারের খবর গোপন রাখতে হবে। আগামীকাল শুধু এইটুকু খবর থাকবে কাগজে, ‘বিস্ফোরণের পর থেকে আঁদ্রে শুখানভের অন্তর্ধান ঘটেছে। অবশ্য কোন সাংবাদিকই এর বেশী কিছু বলতে পারবে না।

শরবত এল এ সময়। শরবত পান করার পর প্রসঙ্গান্তর ঘটল।

শাহ সউদ বললেন, এখন থেকে পনর মিনিটের মধ্যে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এখানে আসছেন।

-হঠাৎ তাঁর এ আগমন। বিস্ময় প্রকাশ করল আহমদ মুসা।

-আমার ধারণা, অনুরোধ ও হুমকি দুই-ই নিয়ে আসছেন তিনি।

-কি রকম? পূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল আহমদ মুসা শাহ-এর দিকে।

-ফিলিস্তিনের প্রতিনিধি হিসেবে আমরা যেন আগামীকালের শীর্ষসম্মেলনে সাইমুমকে স্বীকৃতি না দেই, এ অনুরোধ তিনি জানাবেন। আর ইউরোপ ও আমেরিকার প্রাণস্বরূপ তেল নিয়ে অধিক বাড়াবাড়ি করলে আরবদেরকে প্রলয়ংকারী এক যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে হবে, এ হুমকি তিনি দেবেন। থামলেন শাহ সউদ।

-'আর এ হুমকি ও অনুরোধের মূল লক্ষ্য হলো ইসরাইল রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা।' শাহ সউদের কথার সঙ্গে যোগ করল আহমদ মুসা।

-ঠিক বলেছেন আপনি। বললেন বাদশাহ।

-জবাব তো নিশ্চয় আপনারা ঠিক করে ফেলেছেন? বলল আহমদ মুসা।

-কেন, আল-আসির বৈঠকে জবাবতো আমাদের তৈরী হয়েই আছে। বললেন শাহ সউদ।

একটু থেমে শাহ সউদ আবার বললেন, তবে উপস্থাপনাটা হবে একটু আলাদা ধরনের।

-যেমন? শাহ সউদের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইল আহমদ মুসা।

-আমরা পরিষ্কার বলে দেব, ফিলিস্তিন নিয়ে আরবরা তিনবার যুদ্ধে নেমেছে, চতুর্থ যুদ্ধে তারা আর নামতে চায় না। এজন্য ফিলিস্তিনের প্রতিনিধি হিসেবে সাইমুমকে স্বীকার করে নিয়ে ফিলিস্তিন সম্পর্কিত সমস্ত দায়-দায়িত্ব তার কাঁধে ছেড়ে দিয়ে আরব রাষ্ট্রগুলো ফিলিস্তিনের ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়া থেকে অব্যাহতি পেতে চায়। আর তেল অবরোধের সাথে ফিলিস্তিন সমস্যা ও অধিকতর আরব এলাকা প্রত্যার্পণের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। সাইমুমকে স্বীকৃতি দেয়ার পর এবং ইসরাইলের নিকট থেকে অধিকৃত সব এলাকা ফিরিয়ে পাওয়ার পর ফিলিস্তিন প্রশ্ন আরবদের কাছে গৌণ হয়ে পড়বে, তৈল অবরোধের কোন প্রশ্নও তখন আর উঠবে না। আর এ কথাও আমরা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেব, ইসরাইল অধিকৃত এলাকা ফিরিয়ে দিলে ইসরাইলের সঙ্গে তাদের শান্তিচুক্তিও হতে পারে। থামলেন শাহ সউদ।

হাসি খেলে গেল আহমদ মুসার মুখে। বলল সে, আমি আশা করছি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় খুশীই হবেন।

-আবার একে new startegy মনে করতে পারেন তিনি। শাহ্ সউদ হেসে বললেন।

-তা অবশ্য পারেন। করবেনও হয়ত তিনি। কিন্তু আরব রাষ্ট্রগুলো যে ইসরাইলের ব্যাপারে কিছুটা soft লাইন নিয়েছে, এই বোধ তাকে আশ্বস্ত করবে। এর ফলে তারা পারস্পরিক আলোচনার সুফল সম্পর্কে আশাবাদী হবে।

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই বাদশাহ হাসান শরিফের লাল টেলিফোনটি বেজে উঠল। এয়ারপোর্ট থেকে টেলিফোন। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ হেনরী স্ট্রাফোর্ডকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসমাইল আবু বকর বিমান বন্দরে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁরা আসছেন।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমাকে এবার যেতে হয়। ওদিকে কিছু কাজও পড়ে আছে। এযাযত দিন।

-কাজ থাকবেই, কিন্তু এই মুহূর্তে বিশ্রাম আপনার খুব প্রয়োজন।

শাহ এবং বাদশাহ আহমদ মুসাকে গাড়ী বারান্দা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। তাঁদের সালাম দিয়ে গাড়ীতে বসল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার গাড়ী যখন পার্ক এভিনিউ অতিক্রম করছিল, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিয়ে একটি গাড়ীর মিছিল তখন স্টেট গেস্ট হাউসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

# ৪

কোড ডিসাইফার খুলে ভ্রু কুচকে উঠল সিনবেথ প্রধান ডেভিড ডোবিনের। কোড বুকটা ভালো করে নেড়ে চেড়ে দেখল পাতাগুলো কেমন আলগা আলগা। প্রতিটি পাতায় চাপ দিয়ে ফ্ল্যাট করার লক্ষণ স্পষ্ট। ডোবিন বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করল, চাপের ফলে মাঝখানের কয়েকটা পাতার পেস্টিং আঠা পর্যন্ত আলগা হয়ে গেছে। স্পষ্টই বুঝা যায়, বইটি জোর করে মেলে রাখতে গিয়েই এমনটা ঘটেছে।

কপালটাও কুঞ্চিত হলো ডোবিনের।

পাশ থেকে আরও একটি বই টেনে নিল ডোবিন। বহুল পঠিত বই। কিন্তু পাতাগুলো অসম হয়নি। বিস্ময়টা ধীরে ধীরে সন্দেহের এক কুয়াশায় রূপ নিল।

ডোবিন ভূ-গর্ভস্থ সিকুরিটি রুম থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে নিজের কক্ষে চলে এল। বিশাল টেবিলের পাশে বিশাল চেয়ারটায় বসে ডোবিন ইন্টারকমে সহকারী আইজাককে বলল, তুমি একটু এস এখানে। এক মিনিটের মধ্যেই আইজাক এসে প্রবেশ করল ডোবিনের রুমে।

আইজাককে বসার জন্যে ইঙ্গিত করে ডোবিন বলল, এ কোড ডিসাইফারটা কে নিয়েছিল?

-স্মার্থা, দেশরক্ষা সচিব এরহান শালর্টকের মেয়ে।

-ও মনে পড়েছে। কয়দিন রেখেছিল বইটা?

-৭ দিন।

-স্মার্থা মেয়েটাতো ভালো।

বলে চোখ বুজল ডোবিন। মুহূর্তকয় পরে চোখ খুলল। ডিসাইফার আইজাকের হাতে দিয়ে বলল, ডিসাইফারের পাতায় যে ফিংগার প্রিন্টগুলো আছে তা নিয়ে আস এখুনি।

বইটি নিয়ে আচ্ছা বলে আইজাক বেরিয়ে গেল।

মিনিট পনর পরে আইজাক ডোবিনের ঘরে ফিরে এল ফিংগার প্রিন্ট নিয়ে।

ঘরে প্রবেশ করতেই ডোবিন বলল, কি পেলে আইজাক?

-স্যার ডসিয়ারের সবগুলো ফিংগার প্রিন্ট পরিচিত শুধু একটি ছাড়া।

-অপরিচিত ফিংগার প্রিন্ট কত জায়গায় পেয়েছ?

-যতগুলো পাতা দেখেছি, সবগুলোতেই আছে। আর.......

-আর কি?

ডোবিনের চোখে নতুন কৌতুহল।

-কয়েকটা পাতার আমি Ray একজমিনও করেছি।

-করেছ, কি পেয়েছ তাতে?

চেয়ারে সোজা হয়ে বসল ডোবিন। তার ধারাল চোখ আইজাকের চোখে।

-সাধারণ আলো থেকে একশ গুণ বেশী শক্তিশালী এক ধরনের Ray প্রতিফলন চিহ্ন পাওয়া গেছে ডসিয়ারের পাতায়।

একপোচ কালি যেন ছড়িয়ে পড়ল ডোবিনের গোটা মুখে। এক লহমায় তার বয়সটা ১০ বছর বেড়ে গেল। চোখের ধারাল দৃষ্টি যেন নিস্তেজ হয়ে গেল। কপালের ভাজগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠল।

সে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে লাগল। পায়চারি করতে করতে আইজাকের কাছে এসে অপরিচিত সেই ফিংগার প্রিন্টটি তার কাছ থেকে নিয়ে চোখের সামনে ধরল। দেখে স্বগতঃই উচ্চারণ করল, মহিলার ফিংগার প্রিন্ট। আইজাকের হাতে ফেরত দিয়ে ডোবিন বলল, স্মার্থা ছাড়া আর কারো হাতে গেছে এই ডসিয়ার?

'না' সূচক মাথা নাড়াল আইজাক।

-তাহলে অন্য কিছু চিন্তা করার আগে স্মার্থাকেই একবার জিজ্ঞেস করতে হয় আর কারো হাতে এই ডসিয়ার পড়েছিল কি না?

একটু থামল ডোবিন। তারপর বলল, আইজাক, যাও, ড্রাইভারকে গাড়ীতে উঠতে বল। আমি দেশরক্ষা সচিবের বাসায় যাব। টেলিফোনে ওর কাছ থেকে অনুমতি নিচ্ছি।

আইজাক বেরিয়ে গেল।

ডোবিন লাল টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিল হাতে।

কোড ডিসাইফারটা এমিলিয়ার হাতেও গেছে এ কথা জেনে নিয়ে ডোবিন ছুটল এমিলিয়ার বাড়ীতে।

ডেভিড বেনগুরিয়ানের ছেলে ডেভিড সালেম সলোমন যুদ্ধে একটা পা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সেনাবাহিনী থেকে রিটায়ার করেছেন অনেক আগে। ডাকসাইটে একজন অফিসার ছিলেন তিনি সেনাবাহিনীর। এখন একজন শিল্পিপতি ব্যবসায়ী হিসেবে সকলের সম্মানের পাত্র তিনি। তাছাড়া ডেভিড বেনগুরিয়ানের ছেলে হিসেবেও তার একটা বিশেষ মর্যাদা আছে সবার কাছে।

ডোবিন সেনাবাহিনীতে ডেভিড সালেমের অনেক জুনিয়র ছিল। সালেমের ড্রয়িং রুমে বসে তার অপেক্ষা করছিল ডোবিন।

ডেভিড সালেম এসে ড্রয়িং রুমে প্রবেশ করতেই উঠে দাঁড়িয়ে স্যালুট দিল ডোবিন। বলল, স্যার অসময়ে এসেছি, এমিলিয়ার সাথে একটু কথা বলতে চাই।

ডোবিনের মুখের দিকে তাকিয়ে সালেম বলল, বস ডোবিন। তোমাকে খুব উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে।

-জি স্যার।

-ব্যাপার কি, কিছু ঘটেছে?

-আমাদের নতুন কোড ডিসাইফারটাও আমাদের হাতের বাইরে চলে গেছে বলে মনে হচ্ছে।

-হাতের বাইরে মানে শত্রুর হাতে? কপাল কুঞ্চিত হয়ে উঠল। ডেভিড সালেমের।

-শত্রুর হাতে গেছে কি না এটা এখনও স্পষ্ট নয়। এজন্যেই এমিলিয়ার সাথে এ ব্যাপারে কয়টা কথা বলতে চাই।

-এমিলিয়ার সাথে, এ ব্যাপারে?

বিস্ময় ঝরে পড়ল ডেভিড সালেমের কণ্ঠ থেকে।

-জি স্যার, কোড ডিসাইফারটা এমিলিয়ার হাতেও গিয়েছিল।

-ব্যাপারটা খুলে বলতো ডোবিন।

এবার কিছুটা উদ্বেগ ডেভিড সালেমের কন্ঠে।

সোফায় একটু নড়ে চড়ে বসে ডোবিন বলল, দেশরক্ষা সচিব এরহান শার্লটকের মেয়ে স্মার্থা মোসাদে ট্রেনিং নিচ্ছে। দেশরক্ষা সচিবের কথায় তাকে ৭ দিনের জন্যে কোড ডিসাইফারটা দিয়েছিলাম। ডিসাইফারটা ফেরত পাওয়ার পর আমরা চেক করতে গিয়ে দেখেছি, ডিসাইফারটার ফটো কপি করা হয়েছে। কার দ্বারা হয়েছে আমরা জানি না। যেহেতু কোড বইটা স্মার্থার কাছ থেকে এমিলিয়াও নিয়েছিল, তাই আমরা তাকেও কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।

উদ্বেগ ফুটে উঠল ডেভিড সালেমের চোখেও। তিনি সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা ইউনিটেও দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। তিনি জানেন, ছোট্র ঐ কোড বইটার কত মূল্য। জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নই শুধু নয়, জাতির গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের জীবন ঐ কোড বইটা। ডেভিট সালেম বলল, তুমি সাংঘাতিক খবর শোনালে ডোবিন, শত্রুরা আমাদের কোডের কপি পেয়ে গেলে সর্বনাশ। এমিলিয়াকে আমি ডেকে দিচ্ছি।

বলে ডেভিড সালেম বেয়ারাকে নির্দেশ দিল এমিলিয়াকে ডেকে আনারজন্যে।

অল্পক্ষণ পরেই এমিলিয়া এসে ড্রইং রুমে প্রবেশ করল। লাল লম্বা স্কার্ট পরা, মাথায় রুমাল।

ডেভিড সালেম বলল, এস মা।

ডোবিন এমিলিয়ার দিকে মুখ তুলে হেসে বলল, বস মা, কেমন আছ?

-ভাল। আপনি কেমন আছেন, চাচাজান?

-আছি একরকম, খুব ভাল কি থাকতে পারছি।

এমিলিয়া সোফায় তার পিতার পাশে বসল।

মুহুর্ত কয়েক সবাই চুপচাপ।

নীরবতা ভাঙ্গল প্রথমে এমিলিয়ার পিতাই। বলল, তোমার চাচা ডোবিন তোমাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করবে এমি।

বলে ডোবিনের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার কথা শুরু কর ডোবিন।

এমিলিয়া চকিতে একবার পিতার দিকে তাকাল। একটা সন্দেহ, বিশেষ করে ডোবিনকে এভাবে দেখে, তার মনে ঝিলিক দিয়ে গেল। সেই সাথে একটা শংকাও দেখা দিল তার মনে। বোধ হয় চোখে মুখে তার একটা অস্বস্থির ছাপও ফুঠে উঠল।

কিন্তু তা মুহূর্তের জন্যই। ঘটনার কথা স্মরণ করতে গিয়ে তার হৃদয়ে ভেসে উঠল মাহমুদের মুখ। প্রশান্তিতে ভরে উঠল এমিলিয়ার বুকটা। ওঁর কাজে লাগতে পেরেছে এমিলিয়া এর চেয়ে বড় তৃপ্তি তার কাছে আর কিছু নেই।

ডেভিড সালেমের কথায় ডোবিন একটু নড়ে-চড়ে বসল। একটু সামনে ঝুকে বসে জিজ্ঞেস করল, মা এমিলিয়া তুমি তো স্মার্থার কাছ থেকে কোড ডিসাইফার নিয়েছিলে তাই না? এমিলিয়া শান্তভাবে জবাব দিল, জি, নিয়েছিলাম।

-এনে ক'দিন রেখেছিলে?

-বাসায় আনিনি?

-তাহলে?

-স্মার্থার বাসায়ই আমি ওটা দেখেছি। এমিলিয়ার জবাবে ডেভিড সালেমের চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ডেভিড আবার জিজ্ঞেস করল, তুমি কি গোটা বইটা পড়েছিলে?

-হ্যাঁ গোটা বইটাই আমি দেখেছি।

ডোবিন একটু চুপ করে থাকল। তারপর মুখ তুলে তাকাল এমিলিয়ার দিকে। বলল, তুমি কি বইটার ফটো নিয়েছিলে? ডেভিড সালেমেরও স্থির দৃষ্টি এমিলিয়ার দিকে। তার চোখে কিঞ্চিত উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার ছাপ।

প্রশ্ন শুনে এমিলিয়ার মুখ একটু নীচু হলো। একটা বিমর্ষতার ছাপ ফুটে উঠল তার চোখে মুখে। বাইরে শান্ত দেখালেও বুকটা তার তোলপাড় করছিল। কি

উত্তর দেবে সে? পিতা, দাদার মর্যাদার কথা সে জানে। নিজের জন্য তার কিছু ভয় নেই, কিন্তু তার এ স্বীকৃতিতে পিতার এবং দাদার মান মর্যাদা ধূলায় লুটিয়ে পড়বে, এই কথা তার কাছে খুব বড় হয়ে উঠল। তাহলে সে কি করবে? মিথ্যা কথা বলবে? জ্বলজ্যান্ত মিথ্যা কথা সে বলবে কেমন করে? তার প্রিয়তম মাহমুদের কথা তার মনে পড়ল। এ অবস্থায় সে কি করত? নিশ্চয়ই তার মত নীতি-নিষ্ঠ মানুষের মিথ্যা বলার প্রশ্নই উঠে না। যদি তাই হয় তাহলে তার এমিলিয়া জীবনের ভয়ে, বংশ মর্যাদার ভয়ে মিথ্যা কথা বলবে কি করে? এমিলিয়া মন শক্ত করল, সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। মুখ না তুলেই ধীর কন্ঠে সে বলল, হাঁ আমি ফটো নিয়েছি?

-ফটো নিয়েছো?

ডেভিড সালেম এবং ডোবিন দু'জনের কণ্ঠই আঁৎকে উঠল।

ডেভিড সালেমের চোখে-মুখে একটা কালোছায়া নেমে এসেছে। সে বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে এমিলিয়ার দিকে। যেন তার বিশ্বাস হতে চাইছে না, এমন কন্ঠে সে দ্রুত জিজ্ঞেস করল, সত্যিই বলছ, তুমি ফটো নিয়েছ?

মুখ না তুলেই এমিলিয়া বলল, জি, আব্বা।

ডেভিড সালেম আর কোন কথা জিজ্ঞেস করতে পারল না। যেন ব্যাপারটা বুঝতে এবং আত্মস্থ হতে তার সময় লাগছে।

এই ফাঁকে ডোবিন জিজ্ঞেস করল ফটোগুলো তোমার কাছে এখন আছে?

-না, নেই।

মুহূর্তে উত্তেজনায় মুখটি লাল হয়ে উঠল ডোবিনের। চঞ্চল হয়ে উঠল সালেমের চোখ-মুখও। এমিলিয়া কিন্তু মুখ তোলেনি। যেভাবে সে মুখ নীচু করে বসেছিল, সেভাবেই বসে থাকল।

ডোবিন আবার জিজ্ঞেস করল কোথায় ফটোগুলো? এবার মুখ তুলে স্পষ্ট কন্ঠে এমিলিয়া বলল, মাহমুদ নামের একজন ওগুলো নিয়ে গেছে?

-মাহমুদ! কে সে, কোথায় থাকে? প্রায় চিৎকার করে উঠল ডোবিনের কণ্ঠ।

আমি তার নাম জানি, কোথায় থাকে জানি না।

এবার ডেভিড সালেম জিজ্ঞাসা করল, কেমন করে, কোথায় তোমার সাথে পরিচয়?

উদ্বেগে যেন ভেঙ্গে পড়তে চাইল ডেভিড সালেমের কণ্ঠস্বর।

এমিলিয়া ধীরকন্ঠে জবাব দিল, একটা দুর্ঘটনার সময় উনি আমাকে রক্ষা করেছিলেন। সেই থেকে পরিচয়। কোথায় থাকেন তার কিছুই আমি জানি না।

ডোবিন ডেভিড সালেমের দিকে একটু চেয়ে এমিলিয়ার দিকে ফিরে আবার জিজ্ঞেস করল, মা এমিলিয়া, তুমি বুদ্ধিমতি, তুমি জান ঐ কোড ডিসাইফারটি শত্রুর হাতে পড়লে ইসরাইল রাষ্ট্রের কি সর্বনাশ হয়ে যাবে। আমরা চাই তার হাত থেকে এই মুহূর্তে ওটা উদ্ধার করি। তুমি তার ঠিকানা দিয়ে আমাদের সাহায্য কর।

চোখে-মুখে এমিলিয়ার একটা অসহায়ত্বের ভাব ফুটে উঠল। বলল, চাচাজান, আমি মিথ্যা কথা বলি না। বলছি, আমি তার ঠিকানা জানিনা।

ভাবছিল ডোবিন মুখ নীচু করে। কিছুপর মাথা তুলে বলল, তার সাথে যোগাযোগ হতো কোথায়, সেটা বলো।

-তার সাথে কোন যোগাযোগ আমি কখনও করিনি। স্পষ্ট কন্ঠে জবাব দিল এমিলিয়া।

মাথা নীচু করে ভাবছিল ডোবিন। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলে ডেভিড সালেমের দিকে চেয়ে বলল, স্যার আপনার সাথে একা কথা বলতে চাই।

ডেভিড সালেমের গোটা মুখমন্ডলটা বিধ্বস্ত, বিমূঢ় ও অসহায়ভাব সেখানে। সে এমিলিয়াকে বলল, মা তুমি একটু ভিতরে যাও।

এমিলিয়া চলে গেলে ডোবিন বলল, বলুন স্যার, এখন কি করণীয়?

-আমিও ভাবছি ডোবিন। কেমন করে এ সর্বনাশ হলো বুঝতে পারছিনা।

-আমার মনে হয় স্যার, এমিলিয়া শত্রু পক্ষের গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের জালে জড়িয়ে পড়েছে।

চমকে উঠল ডেভিড সালেম। বলল, তুমি কি এ রকমটাই মনে করছ?

-আমার কাছে এখনও কিছু স্পষ্ট নয় স্যার।

ডোবিন একটু থামল, একটু দ্বিধা করল। তারপর বলল, পরিস্থিতি যতদূর গড়িয়েছে তাতে এমিলিয়াকে একবার আমাদের অফিসে যাওয়া দরকার। সকলে যাতে মূতমাইন হতে পারে এ জন্যে সকলের সামনেই তার জিজ্ঞাসাবাদ হওয়া উচিত।

মনে মনে কেঁপে উঠল ডেভিড সালেম। তার অতি আদরের একমাত্র কন্যাকে যেতে হবে সিনবেথ অফিসে। এ যাওয়ার অর্থ সে বুঝে। বুকটা তার মোচড় দিয়ে উঠল। কিন্তু সেই সাথে মনে পড়ল রাষ্ট্রের কথা, ইসরাইলী জনগণের কথা, ইহুদী স্বার্থের কথা। আরো মনে হল, অন্যের ক্ষেত্রে হলে এ পরিস্থিতিতে সে কি করত! বড় অসহায় বোধ করল ডেভিড সালেম। পিতৃমন তার কোন যুক্তিই মানতে চায় না। কিন্তু তার পিতৃস্নেহের কি মূল্য! কে এর মূল্য দিবে! সে কি ডোবিনকে বাধা দিতে পারবে? তার পিতৃত্বের অধিকার দিয়ে রাষ্ট্রের অধিকারকে সে কেমন করে ঠেকিয়ে রাখবে! ডেভিড সালেম ডোবিনের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বলল, এখনি নিয়ে যেতে চাও?

ডোবিনও ডেভিড সালেমের এই অবস্থার সামনে খুবই বিব্রত বোধ করছিল। বলল, তার আগে স্যার আপনারা এমিলিয়াকে একটু বুঝিয়ে দেখুন। মাহমুদের ঠিকানা জানালে ব্যাপারটা সহজ হয়ে যায়।

আবার কেপেঁ উঠল ডেভিড সালেমের মন। ডোবিনরা এ কঠিন পয়েন্টই ধরবে সে জানে। বলল, ঠিক আছে ডোবিন, তুমি আরেকটু বস।

বলে ডেভিড সালেম ভেতরে চলে গেল।

সালেম চলে গেলে ডোবিন টেলিফোন করল অফিসে। টেলিফোনের ওপার থেকে আইজ্যাক কথা বলে উঠল। ডোবিন বলল, আইজাক খবর খারাপ। পাখি আমাদের হাতছাড়া বলে মনে হচ্ছে। ঘটনার মূল এখন এমিলিয়া। তাকে নিয়ে আসছি।

বিস্মিত আইজাক ওপার থেকে কিছু বলতে চাইল। ডোবিন তাকে বাধা দিয়ে বলল, এখন আর কোন কথা নয়। আসি তারপর।

ডোবিন মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছিল গাড়ীর পাশে। এমিলিয়া শান্ত ও স্বাভাবিকভাবে হেটে গিয়ে গাড়ীতে উঠল। তার ইচ্ছা হচ্ছিল পিছন ফিরে একবার মাকে দেখে। কিন্তু সাহস পাচ্ছিল না। মায়ের মুখ সে সহ্য করতে পারবে না। হয়ত সে ভেঙ্গে পড়বে শেষ মুহূর্তে, আর লোকে বলবে আমি ভয়ে কেঁদেছি। তার মনে পড়ল পিতা-মাতার কান্নাজড়িত অনুরোধের কথা। আমি যেন মাহমুদের ঠিকানা বলে দিই, বলে দিয়ে নিজেকে রক্ষা করি, পিতা-মাতার মুখ রক্ষা করি। কিন্তু এ অনুরোধ এমিলিয়া রাখবে কি করে? সে তো আসলেই মাহমুদের ঠিকানা জানে না। এখানেই সবচেয়ে বেশী কষ্ট লাগছে এমিলিয়ার। পিতা-মাতা নিশ্চয়ই মনে করছেন আমি সব জানি, কিন্তু বলছি না। কিন্তু কেমন করে সে তাদের বুঝাবে যে, তাদের এমিলিয়া তাদের সাথে মিথ্যা কথা বলেনি।

ডোবিনের গাড়ী এমিলিয়াকে নিয়ে চলে গেল। এমিলিয়ার মা আইরিনা টলতে টলতে বাড়ীর ভেতরে প্রবেশ করল। চলে গেল শোবার ঘরে।

ওখানে এমিলিয়ার পিতা ডেভিড সালেম চেয়ারে বসে গালে হাত দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল। কাঁচের জানালা দিয়ে তার দু'টি চোখ কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল কে জানে।

আইরিনা তার গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠল। তুমি কোন কিছু বললে না, কেন যেতে দিলে আমার এমিলিয়াকে? কেন কেন, কেন!

ডেভিড সালেম কিছুই বলল না। যেমন বসেছিল তেমনি বসে রইল। ঠিক বোবা মানুষের মত।

আইরিনা ডেভিড সালেমের গা থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল মেঝেতে।

ডেভিড সালেম উঠে আইরিনাকে তুলে বলল, ধৈর্য ধর আইরিনা, ইহুদীরা আমরা ইসরাইলের স্বার্থকেই সবার ওপর স্থান দিয়েছি।

-মানি না এ কথা।

-মানতে হবে আইরিনা, ব্যক্তির জন্যে দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দেব কেমন করে?

-দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দেবার প্রশ্ন কেন, আমার এমিলিয়া নির্দোষ।

-তুমি বললেই তো সবাই একথা বলবে না আইরিনা!

-আমার এমিলিয়া যা জানে সত্য সত্যই সব বলেছে!

-সত্য বলেই তো আরো জড়িয়ে পড়েছে!

আইরিনা আবার ফুপিয়ে কেঁদে উঠল, না, আমি এসব কিছু বুঝি না। প্রধানমন্ত্রী তোমার পিতার লোক, তাকে তুমি বল, আমার এমিলিয়াকে ফিরিয়ে আন।

ডেভিড সালেম আইরিনাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, আমাকে এ অনুরোধ করো না, আমি এ কথা তাকে বলতে পারবো না।

এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল আইরিনা। চিৎকার করে বলল, তুমি এত নিষ্ঠুর। তুমি পিতা না? তুমি কি জান না, সিনবেথ কোন নরপশুদের আড্ডা?

বলে কান্না চাপতে চাপতে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল আইরিনা।

চেয়ারে ফিরে এল সালেম। আইরিনার শেষ কথাগুলো প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল তার অন্তরে, তুমি পিতা না? তুমি জান না, সিনবেথ কোন নরপশুদের আড্ডা?

অন্তরটা তারও হাহাকার করে উঠল। এমিলিয়ার অসহায় মুখটি ভেসে উঠল তার চোখে। দু'চোখ ফেটে তার নেমে এল অশ্রু, মাথাটা নুয়ে পড়ল টেবিলে। অবরুদ্ধ কান্নার বাঁধভাঙ্গা উচ্ছাসে কেঁপে উঠতে লাগল তার শরীর।

# ৫

ইসরাইলের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সার্ভিস 'সিনবেথ' -এর নির্যাতন সেল। অন্ধকূপের মত সেলটি। দুই হাতের বেশী প্রশস্ত নয়। পাথুরে দেয়াল। একটি মাত্র লোহার দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। কোন জানালা নেই। বহু উঁচুতে দেয়ালের ঘুলঘুলি দিয়ে একখণ্ড আলো এসে বিপরীত দিকের দেয়ালে পড়েছে। সেলের ঘুটঘুটে অন্ধকারের বুকে ঐ গোলাকার আলোক খণ্ডকে মনে হচ্ছে যেন কারও দৈত্যাকার রক্ত চক্ষু।

জ্ঞান ফিরে পেয়েছে এমিলিয়া অনেকক্ষণ। সারা গায়ে অসহ্য বেদনা। হাত ও পায়ের আঙ্গুল তীব্র যন্ত্রণায় খসে যাচ্ছে যেন। হাত ও পায়ের আঙ্গুলে সুচ ফুটানোর দুঃসহ স্মৃতি তার সামনে এল। শিউরে উঠল সে। উঃ! কি সে বর্বরতা!!

কিন্তু সব বেদনা, সব যন্ত্রণা ছাপিয়ে উঠেছে তার তৃষ্ণা গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। তৃষ্ণায় ফেটে যাচ্ছে বুক। যেন এক সাগর পানি হলেও এ তৃষ্ণা মিটবে না। দিন কি রাত বোঝা যাচ্ছে না। কোথা থেকে যেন একটা খট্ খট্ শব্দ কানে এল। ভারী বুট পায়ে কে যেন হেটে যাচ্ছে। তৃষ্ণা অসহ্য হয়ে উঠলো তার। যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল সে। তার মুখ ফেটে চিৎকার বেরুলোঃ পানি, পানি, পানি......।

এই সময় খট্ করে খুলে গেল সেলের লৌহ দরজা। প্রবেশ করল 'সিনবেথ'-এর আই, ও (Indoor Operation) বিভাগের প্রধান জন স্যামুয়েল। তার সাথে আর একজন লোক। নাম সলোমন। হাতে তার একটি জগ ও একটি গ্লাস।

পানি দেখে উন্মুখ হয়ে উঠল এমিলিয়া। তার চোখের কোণে আশার আলো চিক চিক করে উঠল। এই মুহূর্তে তার কাছে পানির চেয়ে বড় কিছু পৃথিবীতে নেই।

মিঃ স্যামুয়েল দাঁড়িয়েই বললেন, 'মিস পলিন ফ্রেডম্যান, আপনি কি মনস্থির করতে পেরেছেন?

প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে এমিলিয়া বলল, আমাকে পানি দিন।

-আমি দুঃখিত মিস পলিন, আপনি আমাদের সাহায্য না করলে আমরা কেমন করে আপনাকে সাহায্য করতে পারি? নির্বিকার কন্ঠে বলল স্যামুয়েল।

-কি সাহায্য আমি করতে পারি? আমি তো বলেছি, সাইমুমের কারও পরিচয় আমি জানি না। কোন ঠিকানা তাদের আমার জানা নেই।

-আপনি তাদের কোন খবর রাখেন না? হাসালেন মিস পলিন।

-বিশ্বাস করুন আমাকে। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল এমিলিয়া।

-আপনি আমাদের সকলের শ্রদ্ধার পাত্র জাতির অনতম প্রতিষ্ঠাতা মৃত ডেভিড বেনগুরিয়ানের নাতনি। আপনার প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আছে বলেই আপনার কাছ থেকে কথা বের করতে আমাদের এত দেরী হচেছ। কিন্তু আর দেরী আমরা করতে পারি না, আপনি আমাদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার মর্যাদা রাখেননি।

এমিলিয়া মাথা নীচু করেছিল। তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে। চোখ দিয়ে অবিরাম ধারায় নামছে পানি। সে ধীরে ধীরে চোখ মুছে ফেলল। ভাবল, এদের কাছে অনুগ্রহ ভিক্ষা করে কোন লাভ নেই, কোন কথাই এরা বিশ্বাস করবে না। যত কষ্টই হোক, মৃত্যুর সীমা পেরিয়ে তো আর কিছু ঘটবে না।

মিঃ স্যামুয়েল কিছুক্ষণ থেমে আবার বলল, আপনাকে ভাববার জন্য ১০ মিনিট সময় দিচ্ছি। এর মধ্যে আপনি আমাদের সহযোগিতা করতে রাজী না হলে ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন আপনাকে হতে হবে। তড়িৎ আসনের নাম শুনেছেন নিশ্চয়?

তড়িৎ আসনের কথা শুনতেই আতংকে শিউরে উঠল এমিলিয়ার গোটা দেহ। কিন্তু নিজেকে সামলে নিল সে। বলল, ১০ মিনিট কেন ১০ দিন সময় দিলেও আমার ঐ একই কথা মিঃ স্যামুয়েল। আমি যা জানি না তা বলতে পারব না।

কোন কথা না বলে মিঃ জন স্যামুয়েল বের হয়ে গেল। তার সঙ্গে সঙ্গে বের হয়ে গেল পানিওয়ালা সলোমন। এমিলিয়ার চোখে পড়ল, পানিওয়ালা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানে মেঝের উপর খানিকটা পানি জমে আছে -ফোঁটা ফোটাঁ করে পড়েছিল জগ থেকে। এমিলিয়া এগিয়ে গেল পানির দিকে এক সমুদ্র তৃষ্ণা নিয়ে। দরজা এই সময় বন্ধ হয়ে গেল। অন্ধকারে ডুবে গেল ঘর। এমিলিয়া

হুমড়ি খেয়ে পড়ল পানির উপর। মাটিতে ঠোঁট ঠেকিয়ে শুষে নিল পানিটুকু। গলা জিহ্বা এতে ভিজল বটে কিন্তু আরো তীব্র হয়ে উঠল তৃষ্ণার জ্বালা। মেঝে থেকে পানির শেষ চিহ্নটুকু জিহবা দিয়ে শুষে নিয়ে কান্নায় লুটিয়ে পড়ল এমিলিয়া। অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল সে। মনে পড়ল মাহমুদের কথা। সে কি জানতে পেরেছে তার এই অবস্থা। সে কি আর কোন দিন বেরুতে পারবে এই মৃত্যুপুরী থেকে? দেখতে পাবে কি আর মাহমুদকে?

বাইরে ভারি বুটের শব্দ হল। তালা খোলার শব্দ শোনা গেল। তারপর খট্ করে খুলে গেল দরজা। প্রবেশ করল সেই মিঃ জন স্যামুয়েল। দরজায় দাঁড়িয়ে থাকল আরও দু'জন। মিঃ স্যামুয়েল একই ধরনের প্রশ্ন পুনরায় আওড়ালো। আপনি কি মন স্থির করতে পেরেছেন মিস পলিন?

এমিলিয়া এই নিরর্থক প্রশ্নের কোন জবাব দিল না। মিঃ জন স্যামুয়েল পুনরায় বলল, চরম পথ বেছে নিতে আমাদেরকে আপনিই বাধ্য করলেন মিস পলিন।

-যে পথই আপনারা গ্রহণ করুন, যা জানা নেই, তা আপনারা বের করতে পারবেন না। বলল এমিলিয়া।

-এ রকম কথা আমরা বহু শুনেছি, বহু জনের কাছে। কিন্তু শেষে বলতে তারা বাধ্য হয়েছে। বলে একটু থেমে দরজায় দাঁড়ানো দু'জনকে বলল, একে নিয়ে চল অপারেশন রুমে। বলে সে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

লোক দু'টি ঘরে ঢুকতেই এমিলিয়া অতি কষ্টে স্বেচ্ছায় উঠে দাঁড়ালো। দরজার সামনে রাখা স্ট্রেচারে শুয়ে পড়ল সে। লোক দু'জন ধরাধরি করে নিয়ে চলল স্ট্রেচার।

বাইরের খোলা বাতাস বুক ভরে গ্রহণ করল এমিলিয়া। কোথায় তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তা সে জানে। এক মহা আতংক এসে তার বুকে চেপে বসতে চাইছে। মনকে হালকা করতে চাইল সে। তাকে লম্বা বারান্দা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বারান্দার পাশ দিয়ে এক ফালি নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে। নীশ আকাশের বুকে একখন্ড সাদা মেঘ কোন অজানার পথে পাড়ি জমিয়েছে। বেদনায় মোচড় দিয়ে উঠল এমিলিয়ার বুক। হায়রে মুক্ত জীবন।

হঠাৎ নীল আকাশ কোথায় হারিয়ে গেল। তাকে প্রবেশ করানো হলো একটি ঘরে, সে ঘর থেকে আর একটি ঘর। এ ঘর থেকে একটি সংকীর্ণ সিঁড়ি নেমে গেছে ভূগর্ভে। ভূগর্ভের সিঁড়ি দিয়ে এমিলিয়াকে নিয়ে পৌঁছানো হলো একটি প্রশস্ত কক্ষে। সেখানে আগে থেকেই উপস্থিতি ছিল মিঃ জন স্যামুয়েল এবং আরও দু'জন লোক। স্ট্রেচার সমেত এমিলিয়াকে রেখে বাহকরা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরটি। আসবাব বাহুল্য নেই। চারদিকে পাথরের দেয়াল। উত্তর দিকের দেয়ালে লোহার গরাদে ঢাকা একটি স্থান। মনে হলো জানালা। ঘরের ঠিক মাঝখানে কয়েক ইঞ্চি উঁচু একটি বেদীর উপর লম্বা ও সুদৃঢ় একটি কাঠের পাটাতন। পাটাতনের দু'পাশ থেকে দু'টি করে চামড়ার মোটা বেল্ট বের হয়ে এসেছে। পাটাতনের উপর পড়ে আছে একটি ইলেকট্রিক ম্যাগনেটো। জ্বলজ্বল করছে তার উপর সাদা দু'টি বোতাম। পাশেই সুইচ বোর্ড। ওদিকে একবার চেয়েই বুঝতে পালো-সেটা কি। এমিলিয়ার প্রতিটি স্নায়ুতন্ত্রী, প্রতিটি রক্ত কণিকায় যন্ত্রণার উষ্ণ স্রোত বয়ে গেল। সে মন শক্ত করতে চেষ্টা করল, মৃত্যুর পরপারে তো আর এ যন্ত্রণা পৌঁছবে না।

এই সময় মিঃ স্যামুয়েল এমিলিয়ার দিকে চেয়ে বলল, 'সময় আছে এখনও মিস পলিন। আপনি সচেতন, আপনি শিক্ষিতা। আপনার সামনে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক কষ্টের মধ্যে দিয়ে তিলে তিলে মৃত্যু, আর ক্ষমা এবং সুখ স্বাচ্ছন্দপূর্ণ জীবন। আপনি কোনটি করবেন, আপনিই ভেবে দেখুন।

এমিলিয়া মিঃ স্যামুয়েলের দিকে চেয়ে স্পষ্ট কন্ঠে বলল, সাইমুমের লোকজনদের পরিচয় ঠিকানা জানলেও আমি বলতাম কি না জানি না, তবে আমি আগেও বলেছি আবার বলছি তাদের কারও পরিচয়, ঠিকানা আমি জানি না।

সাপের মত ঠান্ডা এক হাসি টেনে নিরুত্তাপ স্বরে বলল মিঃ স্যামুয়েল, 'আমি তা জানি মিস পলিন। আমাদের আগেই বোঝা উচিত ছিল, আজকাল মেয়ে স্পাইরাই সবচেয়ে কঠিন হয়ে থাকে গত দু'দিনের অভিজ্ঞতায় আপনাকে দিয়েই এ বোধটা আমাদের মনে নতুন করে জাগল।' বলে সে উঠে দাঁড়ালো।

উঠে গরাদ-ঢাকা সেই স্থানটিতে গিয়ে দাঁড়াল। একটি ছোট্ট হাতল ঘুরিয়ে গরাদ খুলে ফেলল। উন্মুক্ত হল একটি জানালা পথ। সে এমিলিয়ার দিকে চেয়ে বলল, আসুন মিস পলিন, দেখুন।

যন্ত্র-চালিতের মত উঠে গিয়ে স্যামুয়েলের পাশে দাঁড়াল এমিলিয়া। স্যামুয়েল জানালার পাশে একটা বোতামে চাপ দিল। অমনি জানালার বাইরের অন্ধকার সরে গেল। জানালার পাশ দিয়ে চলে যাওয়া সুগভীর পয়ঃপ্রণালী স্পষ্ট হয়ে উঠল। পয়ঃপ্রণালীর দু'পাশ দিয়ে প্রশস্ত করিডোর। মিঃ স্যামুয়েল সামনের করিডোরের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'চেয়ে দেখুন।'

এমিলিয়া তাঁর ইঙ্গিত অনুসরণ করে চেয়ে দেখল, নরমুন্ডের বিরাট স্তুপ।

স্যামুয়েল বলল, আমরা এই কক্ষে সহজে কাউকে আনি না। কেউ আসলে সে আর ফিরে যায় না। ঐ নরমুন্ডের স্তুপই তার প্রমান। তড়িৎ আসন ব্যর্থ হলে ঐ নরমুন্ডের মিছিলে তার স্থান।

এমন দৃশ্যের সম্মুখীন হলে আগে সে হয়ত ভয়ে ভিমরি খেয়ে যেতো, কিন্তু আজ তার সে অবস্থা নেই। অনুভূতি তার যেন ভোঁতা হয়ে গেছে। কোন উত্তর দিল না সে মিঃ স্যামুয়েলের কথার।

মিঃ স্যামুয়েল জানালা বন্ধ করে দিল। তারপর যন্ত্রের মত দাঁড়ানো লোক দু'জন একজনকে সম্বোধন করে বলল, 'আইজাক, অধিবেশনের কাজ শুরু কর' বলে সে ঘরের চেয়ারটিতে গিয়ে বসল।

এমিলিয়ার দিকে এগিয়ে এল আইজাক। কেঁপে উঠল এমিলিয়ার বুক। আইজাকের ইঙ্গিতে যন্ত্রচালিতের মত শুয়ে পড়ল এমিলিয়া পাটাতনের উপর। থর থর করে কাঁপছে গোটা শরীর। গলা-জিহ্বা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। প্রকট হয়ে উঠল বুক-ফাটা তৃষ্ণা। এমিলিয়া স্থির করেছিল, কোন অনুরোধ কাউকে করবে না সে। কিন্তু পারল না। মুখ থেকে আপনিই বেরিয়ে গেল পানি, পানি দাও।

দু'পাশ থেকে চামড়ার বেল্ট শক্ত করে বেঁধে ফেলেছিল এমিলিয়াকে। শরীরটা পাটাতনের সাথে এক হয়ে গেছে, নড়বার শক্তি ছিল না এতটুকুও। চেয়ারে বসেই কথা ছুঁড়ে মারল স্যামুয়েল, সাহায্য করতে পারলাম না বলে দুঃখিত মিস পলিন।

এমিলিয়ার দু'চোখ থেকে কানের দু'পাশ দিয়ে নেমে এল অশ্রুর দু'টি ধারা। তার শুকনো জিহ্বা আর শুকনো ঠোঁট থেকে অস্ফুটে বেরুলো, আল্লাহ, তুমি সর্বশক্তিমান সবার উপর ক্ষমতাশালী তুমি।

এমিলিয়ার মুখে গুঁজে দেয়া হলো বড় একটি কাপড়। তার কিছু অংশ পোটলা হয়ে মুখের ভিতরে থাকলো, কিছু অংশ থাকলো বাইরে।

সকল প্রস্তুতি শেষ করে ইলেকট্রিক ম্যাগনেটোর সাথে কানেকশন নেয়া হলো সুইচ বোর্ডের। অন করল সুইচ। আইজাক ছোট্ট করে চাপ দিল ম্যাগনেটোর একটি বোতামে। গোটা দেহ হঠাৎ খিচুনী দিয়ে উঠলো এমিলিয়ার। অস্ফুট গোঙ্গানী বেরুলো মুখ থেকে। চোখ দু'টি তার বিস্ফোরিত হলো। বোতাম থেকে হাত উঠিয়ে নিল আইজাক।

দেহের খিচুনী থেমে গেল। কিন্তু গোঙ্গানী থামল না। হাঁপাচ্ছে এমিলিয়া। তার ঠোঁট কাঁপছে, চোখের পাতা কাঁপছে, থর থর করে কাঁপছে তার গোটা দেহ।

এবার বোতামে চাপ দিল আইজাক। আবার শুরু হলো সেই খিচুনী, ফুলে ফুলে উঠছে গোটা শরীর। চোখ দু'টি বিস্ফোরিত হয়ে বের হয়ে আসছে যেন। চামড়ার বেল্ট কেটে বসে যাচ্ছে শরীরে।

এমিলিয়ার শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে যন্ত্রণার এক ভয়াবহ আগুন। প্রতিটি মাংসপেশীর প্রতিটি কণিকাকে যেন কেটে কেটে পৃথক করে দিচ্ছে, আর সেই কণিকাগুলোকে ঝাঝরা করে দিচ্ছে আগুনের অসংখ্য সূঁচ।

চোখের প্রতিটি মাংস কণিকা যেন খন্ড খন্ড হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে। সর্বশক্তি দিয়ে কামড়ে ধরেছে মুখে গুঁজে দেয়া কাপড়। দাঁতগুলো কেটে বসে গেছে কাপড়ে। অসহ্য যন্ত্রণা চেতনার প্রান্তসীমায় নিয়ে গেল এমিলিয়াকে। জ্ঞান হারিয়ে ফেলল সে।

সিনবেথ হেড কোয়ার্টারের বেয়ারা সলোমন। আজ পচিঁশ বছর হলো আছে সে এই চাকুরীতে। বয়স তার এখন পঞ্চাশ। জীবনের পঁচিশ বছর সে কাটিয়েছে বীরশিবায়। বীরশিবা তার জন্মস্থান।

তৃষ্ণার্ত এমিলিয়াকে পেছনে রেখে যখন সে সেল থেকে বের হয়ে আসছিল তখন তার মন গিয়ে পড়েছিল বীরশিবায়। তার চোখে ভেসে উঠেছিল এমনি একটি দৃশ্য। প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশ বছর আগের কথা। বীরশিবা তখন একটি সমৃদ্ধ মুসলিম জনপদ। মুসলিম মহল্লারই একপ্রান্তে ছিল সলোমনদের বাড়ী। তারই ছিল বীরশিবার একমাত্র ইহুদী পরিবার। সুখে দুঃখে একাত্ম হয়েছিল তারা মুসলমানদের সাথে। হঠাৎ ওলট-পালট হয়ে গেল সব। দলে দলে এল ইহুদী। কেউ রাশিয়ার, কেউ জার্মানীর, কেউ আমেরিকার। উচ্ছেদ করা হলো মুসলমানদের। সে কি নির্মম দৃশ্য। মুমূর্ষ মানুষের কত করুণ আকুতি সে দেখেছে। মনে পড়ে সলোমনের এমনি একজন প্রতিবেশী মুমূর্ষ মানুষের মুখে পানি তুলে দিতে গিয়ে নবাগত মারমুখো ইহুদীদের হাতে সে কেমনভাবে লাঞ্চিত হয়েছিল। তার চোখের সামনেই বুক ভরা পিপাসা নিয়ে তার মুমূর্ষ প্রতিবেশী চিরতরে চোখ মুদেছিল। আজ পিপাসাকাতর এমিলিয়ার মুখ দেখবার পর তারই কথা মনে হচ্ছিল সলোমনের। সলোমন রাজনীতি করে না, রাজনীতি বোঝে না। সকল নির্যাতনের বিরোধী সে। সাধ্য থাকলে ওই ফুলের মত মেয়েটিকে সে এদের হাত থেকে বাঁচাতো। সে জানে মেঝেতে ফেলা ঐ কয়েক ফোঁটা পানি এমিলিয়ার তৃষ্ণা মেটাতে পারবে না, তবু মনকে প্রবোধ দেয়ার জন্যই সে তা করেছিল।

বারটায় ডিউটি শেষে যখন সে অফিস থেকে বেরুচ্ছিল, তখন এমিলিয়ার চিন্তা তার সারা মন জুড়ে ছিল। ডেভিড বেনগুরিয়ানের মত লোকের নাতনি কি-ই বা এমন অপরাধ করেছে। অপারেশন রুমে মেয়েটি নির্ঘাত নরপশুদের অত্যাচারে মারা পড়বে।

মরদেশাই রোডের এক বাড়ীতে বাস করে সলোমন। তার বাড়ীর পাশেই একটি ফলের দোকান। দোকানের মালিক বৃদ্ধ খলিল শেখ। সলোমনের বন্ধু। বৃদ্ধ খলিলের বাড়ী ছিল জেরুজালেমের নিকট বিরসুবিরে। তার শশুর বাড়ী ছিল বীরশিবায়। সে যেত মাঝে মাঝে সেখানে। সেই থেকেই তার সাথে সলোমনের

পরিচয়। সলোমন তার অবসর সময়ের অধিকাংশই খলিলের দোকানে আড্ডা দিয়ে কাটায়। সলোমন ফিলিস্তিনে বহিরাগত ইহুদীদের বাড়াবাড়ি কোন দিনই পছন্দ করতে পারেনি। এ বিষয়ে দু'জনের মধ্যে পূর্ণ ঐক্যমত রয়েছে। এ নিয়ে কত আলোচনা আর কত অভিজ্ঞতা বিনিময় হয় দু'জনার মধ্যে। বহিরাগত ইহুদীদের বিরুদ্ধে সলোমনের সবচেয়ে বড় অভিযোগ হলো, "ওরা বাইরে থেকে উড়ে এসে দেশের সমস্ত বড় বড় চাকুরী ও সম্পদ-সম্পত্তিতে জুড়ে বসেছে, আর মুষ্টিমেয় স্থানীয় ইহুদীরা চাপরাশী, কেরানী ও মুটে-মজুরের জীবন যাপন করছে।"

এ দিনও সলোমন অফিস থেকে ফিরে খাওয়া সেরে খলিলের ফলের দোকানে গিয়ে দেখা দিল। সলোমনকে দেখেই খলিল আগ বাড়িয়ে বলল, এস, এস, কেমন আছ?

-আর থাকা! মন বড় ভাল লাগছে না।

-কেন, কিছু হয়েছে বাড়ীতে? উদ্বিগ্ন খলিল।

-বাড়ীতে আর কি হবে, ঐ অফিসের কথাই বলছি!

-অফিসে আবার তোমার কি হলো?

-আমার আবার কি হবে? রোজ রোজ কি ঐসব দেখা যায়। আজ আবার বেনগুরিয়ানের নাতনিটিকে ধরে নিয়ে গেছে। এতটুকু এক মেয়ের উপর উঃ! কি অত্যাচার !! দু'দিন থেকে মেয়েটাকে পানিও খেতে দেয়নি।

সলোমনের কথা শুনে চমকে উঠলো খলিল। কিন্তু সামলে নিল নিজেকে। স্বাভাবিক কন্ঠে বলল, খুব মায়া হচ্ছে না?

-মায়া! সাধ্য থাকলে মেয়েটাকে নরপশুদের হাত থেকে ছিনিয়ে আনতাম।

-মানুষের অসাধ্য কিছু আছে নাকি? হেসে বলল খলিল।

-অসাধ্য কিছু নেই। আমিও তা জানি। আমিও পারি, বাঁচাতে পারি মেয়েটাকে। কিন্তু কি লাভ হবে তাতে? সিনবেথের হাত থেকে পরে সেও বাঁচবে না, আমিও বাঁচব না।

মনে মনে অধীর হয়ে উঠেছে, উত্তেজিত হয়ে উঠেছে খলিল। তবু শান্ত কন্ঠে সে বলল, তা ঠিক বলেছ। অর্থহীন ঝুঁকি নিয়ে কি লাভ?

এইভাবে খলিল ও সলোমনের মধ্যে গল্পের যে শুরু হলো, তা প্রতিদিনের রীতিমত নিরবচ্ছিন্নভাবে চল্লই কিন্তু প্রতিদিনের মত খলিল গল্পে মন বসাতে পারছিল না। এক সময় সে বলল, সলোমন তুমি বস, খবরের কাগজগুলো দেখ। আমি মিনিট পনের পর আসছি।

সলোমন বলল, আমিও উঠি খলিল, একটু স্টেডিয়ামের দিকে যাব। বেশ ভাল খেলা আছে আজ। বলত, তোমার টিকিটও কেটে রাখব।

খলিল বলল, আজ বোধ হয় সময় পাব না সলোমন।

সলোমন উঠে যেতেই খলিল ভিতরে ঢুকে গেল। পার্শ্বের ঘরে বসার একটি বেদী উল্টিয়ে একটি গোপন সিঁড়ি পথ ধরে নীচে নেমে গেল সে। খলিল সাইমুমের তেলআবিবস্থ ৪নং ঘটির একজন দায়িত্বশীল ব্যাক্তি। ওয়াজম্যান রোডের ৪নং ঘাটির সাথে একটি গোপন সুড়ঙ্গ দ্বারা সংযুক্ত। মরদেশাই রোডের এই ফলের দোকানের পরিচালনার ভার তারই হাতে রয়েছে।

গ্রীণ লজ। তার একটি কক্ষে পা এলিয়ে বসে ছিল মাহমুদ। সামনে জানালা দিয়ে জলপাই গাছের মাথার ওপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে একখন্ড নীল আকাশ। ঘন সবুজ জলপাই গাছের মাথায় যেন নীলের প্রলেপ।

কিন্তু কিছুতেই মন নেই মাহমুদের। কাল রাত থেকে সে ভাবছে। ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে সে এক অসহ্য যন্ত্রণায়। কিন্তু এ যন্ত্রণা কাউকে জানানোর নয়। এমিলিয়াকে সে ভালবাসে। এ ভালবাসাই তাকে দুর্বল করে দিচ্ছে, শুষে নিচ্ছে শক্তি ও উদ্যম। ইসরাইলী বর্বরতার হাত থেকে ওকে বের করে আনতে হলে ঝুঁকি নেয়া প্রয়োজন। কিন্তু তার এমিলিয়ার জন্য সহকর্মীদের মূল্যবান জীবনকে সে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিবে কেন?

তেলআবিবের সকল সাইমুম-সদস্যদের মধ্যেও এসেছে ভাবান্তর। এমিলিয়ার ঘটনা সকলের মনকেই পীড়া দিচ্ছে। তারা সকলেই অপেক্ষা করছে

নির্দেশের, কিন্তু পাথরের মত নীরব-নিস্পন্দ মাহমুদের কাছ থেকে কোন সাড়া তারা পায়নি।

চিন্তার অথৈ স্রোতে ডুবে গিয়েছিল মাহমুদ। পায়ের শব্দে চমকে দরজার দিকে চোখ ফিরালো সে। দেখল, রায়হান ঘরে ঢুকছে। রায়হানকে দেখে সোজা হয়ে বসে মাহমুদ বলল, কোন মেসেজ রায়হান?

-হেড কোয়ার্টার থেকে আপনার কল, মুসা ভাই কথা বলবেন।

লাফ দিয়ে উঠল মাহমুদ। খুব গুরুত্বপূর্ণ না হলে আহমদ মুসা লাইনে আসে না, মেসেজ পাঠায়। মাহমুদ দ্রুত রেডিও রুমে চলল।

সালাম বিনিময়ের পর প্রথমেই জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা, এমিলিয়ার খবর কি?

-পরবর্তী কোন খবর আর পাইনি।

-কোথায় রেখেছে তাকে?

-বোধ হয় কারাগারে।

-বোধ হয় কেন? এ খবরটুকুও নেওনি?

মাহমুদ নীরব। কি জবাব দেবে সে? কি বোঝাবে, কেমন করে সে বোঝাবে আহমদ মুসাকে। আহমদ মুসা বোধ হয় আঁচ করতে পারল মাহমুদের অবস্থা। সেও আনমনা হয়ে পড়ল। অনেক আগে ফেলে আসা এক অতীতে হারিয়ে গেল সে। হিমালয়ের এক অন্ধকার গুহায় ফেলে আসা ফারজানার মুখটি অনেকদিন পর আজ তার চোখে ভেসে উঠল। আহমদ মুসা ধীর স্বরে ডাকল, মাহমুদ!

-জি! উত্তর দিল মাহমুদ।

-তোমার দুর্বলতা ঢাকতে গিয়ে, একটি জীবনকে তুমি এক অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিবে, তা তো আমি ধারণা করতে পারিনি। তুমি কি জান না, ইসরাইলের Indoor Operation-এর শয়তানরা কত নরপশু।

কেঁপে উঠলো মাহমুদ। তার গোটা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল অসহ্য এক যন্ত্রণা। কোন জবাব দিতে পারল না সে।

আহমদ মুসা আবার বলল, শোন আমার নির্দেশ, যে কোন মূল্যে এমিলিয়াকে বাঁচাতে হবে। সে আমাদেরই একজন। তার প্রতি আমাদের দায়িত্ব আছে। আমাদের জন্য সে যা করেছে, তা আমরা কেউই ভুলতে পারিনা।

আপনার আদেশ আমরা পালন করব জনাব। ধীর কন্ঠে বলল মাহমুদ। তার চোখে মুখে দৃঢ় সংকল্পের ছাপ।

-আর শোন, আগামী ২৫শে ফেব্রুয়ারী মিসর, সিরিয়া, জর্দান ও লেবাননের সঙ্গে ইসরাইলের শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হচ্ছে। আর ২৭ শে ফেব্রুয়ারী ইসরাইলের 'সাবাত দিবস'। আজ থেকে ঠিক ১ মাস ১ দিন পর। ইনশাআল্লাহ ঐ দিনটিই হবে ইসরাইল রাষ্ট্রের শেষ আনন্দের দিন। আমি ১১ ই ফেব্রুয়ারী ইসরাইলের শেষ কৃত্যের জন্য তেলআবিব আসছি।

মাহমুদ রেডিও রুম থেকে বেরিয়ে ঘরে প্রবেশ করে দেখে শেখ জামাল বসে আছে।

-কি সংবাদ জামাল? মাহমুদ বলল।

-এইমাত্র কিছু খবর খলিলের কাছ থেকে পাওয়া গেল।

-কি খবর?

-মিস্ এমিলিয়াকে আজ সকালে সিনবেথের অপারেশন চেম্বারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গত দু'দিন তাঁর উপর নির্মম অত্যাচার চলেছে, পানিও খেতে দেয়া হয়নি।

-হুঁ! দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে একটি ছোট্ট জবাব দিল মাহমুদ। এক ঘন্টা সময় আছে, যাও প্রস্তুত হও। শেখ জামাল বেরিয়ে গেল।

# ৬

মাহমুদ তেলআবিব শহরের মিউনিসিপ্যাল মানচিত্র সামনে নিয়ে গভীরভাবে ভাবছিল।

সুরক্ষিত সিনবেথের অফিস। দক্ষিণ-উত্তর বিলম্বিত হারজেল এভিনিউ থেকে একটা সরু রাস্তা এগিয়ে গেছে পশ্চিমে। এ পথ ধরে শ' দুয়েক গজ এগুলেই নাম-সাইনবোর্ডহীন সিনবেথ অফিসের কারাগার সদৃশ্য প্রধান ফটকে পৌঁছা যায়। সরু রাস্তাটির দু'ধারের বিল্ডিংগুলো নিয়ে আধা সামরিক সিকুউরিটি মিলিশিয়াদের গেরিলা ইউনিটের অফিস। এছাড়া সিনবেথ অফিসের চার দিক ঘিরে মিনিষ্ট্রি অব হোমের নানা বিভাগের অফিস যাকে ডবল প্রটেকটেড এলাকা হিসেবে গণ্য করা হয়।

মাহমুদের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছিল। ভেবে পাচ্ছিল না সে এমিলিয়াকে উদ্ধারের পথ কি! রীতিমত যুদ্ধ ছাড়া সিনবেথ অফিসে ঢোকা এবং বের হওয়া অসম্ভব।

অন্য কোন পথ? অন্য পথ আর কি, হেলিকপ্টার নিয়ে সিনবেথ অফিসে গিয়ে হাজির হওয়া।

মাটির তলের কথা মনে হতেই বহুদিন আগে পড়া একটা নিইজের কথা তার মনে পড়ল। চাঞ্চল্যকর খবরটি ছিল দু'টি লাশ নিয়ে। বর্ষাকালে হারজেল এভিনিই-এর ড্রেন পরিষ্কার করার সময় দু'টি লাশ পাওয়া যায়। লাশ দু'টির ফটো বেরোয় পত্রিকায়। অকথ্য শারিরীক নির্যাতনের চিহ্ন ছিল তাদের শরীরে। খবরের কাগজের অনুসন্ধান রিপোর্টে বলা হয়েছিল, দু'সপ্তাহ আগে সিনবেথ লোক দু'টিকে গ্রেপ্তার করে। সিনবেথের নির্যাতনেই তারা মারা যায়। মারা যাবার পর তাদের লাশ ড্রেনে ফেলে দেয়। খবরে উল্লেখ করা হয়, এভাবে লোক হত্যা করে সিনবেথের ভুগর্ভস্থ টর্চার চেম্বার সংলগ্ন ড্রেনে লাশ ফেলে দেয়া সিনবেথের একটা পুরোনো অভ্যাস।

খবরটি মনে পড়ার সাথে সাথে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল মাহমুদের। মিউনিসিপ্যাল মানচিত্রের উপর আবার সে ঝুঁকে পড়ল।

মানচিত্রে হেড ড্রেনগুলোকে কালো এবং শাখা ও প্রশাখা ড্রেনগুলোকে নীল ও সবুজ লাইন দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। সে লক্ষ্য করল, একটি গভীর কালো রেখা হারজেল রোডের পশ্চিম পাশ দিয়ে সমান্তরালভাবে এগিয়ে গেছে। সে মেপে দেখল, হেড ড্রেনটি সিনবেথ অফিস ক্রস করে এগিয়ে গেছে। তার চোখ দু'টি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সিনবেথের ভূগর্ভস্থ টর্চার চেম্বারের সাথে তাহলে এই ড্রেনেরই একটা সংযোগ রয়েছে।

মাহমুদ নতুন এই ব্যাপারটা নিয়ে একটু চিন্তা করল। ভাবল, এই ড্রেনের পথ ধরে সিনবেথের টর্চার চেম্বারে পৌঁছা যায় কি না। গভীর চিন্তায় কপালটা তার কুঞ্চিত হলো, চোখ দু'টিও বন্ধ হয়ে এল।

একটু পরে উঠে গিয়ে লাইব্রেরী থেকে তেলআবিব শহরের 'ওয়াটার এন্ড সুয়ারেজ' ডায়াগ্রাম নিয়ে এল সে। 'সুয়ারেজ ডায়াগ্রামটা' বিস্তারিত। এতে ড্রেনগুলোর আয়তন এবং ম্যানহোলগুলোর অবয়বই সুন্দরভাবে চিহ্নিত আছে। মাহমুদ দেখল, সিনবেথ অফিসের কাছাকাছি সবচেয়ে সুবিধাজনক হল ডেভিড পার্কের ম্যানহোলটা। পার্কের বহির্দেয়ালের প্রায় গজ পাচেক ভেতরে বিরাট জলপাই গাছের তলে এই ম্যানহোল। আশে-পাশে আরও ঝাও গাছ আছে, ফুল গাছ আছে। একেবারে নির্জন জায়গা। পার্কের প্রহরীদের উপর নজর রাখতে পারলে এ ম্যানহোল নিরাপদেই ব্যবহার করা যায়।

এরপর মাহমুদ 'ডেভেলপমেন্ট অব সুয়ারেজ সিস্টেম' বইটা এনে তার উপর চোখ বুলাল। তেলআবিব লন্ডন নগরীর সুয়ারেজ সিস্টেমকেই অনুসরণ করেছে। এ সিস্টেম অনুসারে প্রশাখা ড্রেনগুলো ছাড়া হেড ও শাখা ড্রেনগুলোতে ড্রেন-বলয়ের দু'পাশে করিডোর থাকে। দু'করিডোরের মাঝখানে নালা দিয়ে বয়ে যায় ময়লার প্রবাহ। ড্রেনগুলোর সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংস্কার সুবিধার জন্যেই এই ব্যবস্থা। হেড ড্রেনগুলোর করিডোর দিয়ে খুব স্বচ্ছন্দেই মানুষ হেটে বেড়াতে পারে।

ওয়াটার সুয়ারেজ ডায়াগ্রাম হাতে নিয়েই মাহমুদ লাইব্রেরী রুম থেকে বেরিয়ে অফিসে এসে বসল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল সন্ধ্যা ৬ টা।

টেলিফোন তুলে মাহমুদ আসলামকে বলল, শেখ জামালকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দাও।

মুহূর্ত কয়েক পরে শেখ জামাল এসে ঘরে ঢুকল। মাহমুদ তাকে বসতে ইঙ্গিত করে বলল, হারজেল এভিনিউ-এর সমান্তরালে বয়ে চলা ২নং হেড ড্রেন সিনবেথ অফিসকে ক্রস করেছে। আমরা এই ড্রেনের পথেই সিনবেথ হেড কোয়ার্টার প্রবেশ করব।

থামল মাহমুদ। চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল শেখ জামালের।

মাহমুদই আবার কথা বলল। বলল যে, আমরা যদি ডেভিড পার্কের নির্জন কোণের ম্যানহোলটি ব্যবহার করি, তাহলে আধা মাইল গিয়েই আমরা পাব 'সিনবেথ হেড কোয়ার্টার।

একটু থামল মাহমুদ। তারপর বলল, সব কিছু ঠিক ঠাক করগে। আমরা রাত ৯ টায় প্রবেশ করব ২ নং হেড ড্রেনে। আসলাম ও যায়েদ রিয়ার গার্ড হিসেবে ডেভিড পার্কের ঐ ম্যানহোল পাহারায় থাকবে। আর জন দশ বারো জন লোক ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখবে পার্কের আশে-পাশে। রাত দশটায় আমাদের পরিবহন ইউনিটের সালেম ও সুলাইমান দু'টো গাড়ী নিয়ে ডেভিড পার্কে যাবে।

মাহমুদ চুপ করল।

শেখ জামাল সালাম দিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

শেখ জামাল বেরিয়ে গেলে মাহমুদ আবার সেই সুয়ারেজ ডায়াগ্রাম নিয়ে বসল। সিনবেথ হেড কোয়ার্টারের অবস্থান থেকে ডেভিড পার্কের ম্যানহোল পর্যন্ত দুরত্ব সে কম্পাস দিয়ে মাপল। মোট দুরত্ব হল এগার শ' চল্লিশ গজ। মাহমুদ টেলিফোনে আসলামকে জিজ্ঞেস করল, সর্বোচ্চ কত বড় টেপ আমাদের আছে আসলাম? আসলাম বলল, ১৭৬০ গজ।

মাহমুদের মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠল। বলল, ঠিক আছে।

বিভিন্ন সরঞ্জাম ভর্তি ব্যাগ গলায় ঝুলিয়ে গ্যাসমাস্ক পরে দড়ির মই বেয়ে ম্যানহোল দিয়ে প্রথম নামল মাহমুদ। অনেক ভেবে চিন্তে মাহমুদ বাম অর্থাৎ ড্রেনের পূর্বধারের করিডোরে নামারই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হারজেল এভিনিউ থেকে সিনবেথ অফিস এবং ড্রেনের দুরত্বের হিসেবে সিনবেথ অফিস ড্রেনের পূর্বধারেই পড়বে।

টর্চ জ্বেলে পূর্বপাশের করিডোরটা দেখে দড়ির মই থেকে করিডোরে পা রাখল মাহমুদ। টর্চের আলোতে কয়েকটা বড় ধরনের ইদুর ও মাকড়সা ছুটে পালাল। মাকড়সাগুলোর বিপুল বপু দেখে আঁৎকে উঠল সে। রক্তপায়ী মাকড়সার কথা মহমুদ পড়েছে, কিন্তু তারাতো ফিলিস্তিনে থাকে না।

মাহমুদ নামার পর শেখ জামালও নেমে এল দড়ির মই বেয়ে।

শেখ জামাল নেমে আসার পর দড়ির মই-এর সাথে টেপের এক মাথাকে বেধে দিল মাহমুদ। ১৭৬০ গজ দীর্ঘ টেপ থেকে সে ১১শ’ ৪০ গজ কেটে নিয়ে এসেছে যাতে করে ড্রেনে নেমে সিনবেথ অফিসের লোকেশন নিয়ে মাথা ঘামাতে না হয়। টেপ যেখানে গিয়ে শেষ হবে সেটাই হবে মোটামুটিভাবে সিনবেথ অফিসের লোকেশন।

টর্চ জ্বেলে তারা দক্ষিণ দিকে চলতে শুরু করল। হাতঘড়ির সাথে ফিট করা দিক নির্দেশক কম্পাসের দিকে চেয়ে দেখল তারা ঠিক দক্ষিণ দিকেই চলছে।

মাহমুদ আগে চলছে। শেখ জামাল তার পিছনে। টর্চের আলো এবং সেই সাথে মানুষের পদশব্দে নানা ধরনের পোকা মাকড় ছুটে পালিয়ে তাদের পথ করে দিচ্ছে। করিডোরের অল্প নীচ দিয়েই বয়ে যাচ্ছে নর্দমা।

‘সাপ সাপ’ বলে চিৎকার করে উঠে শেখ জামাল প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাহমুদের গায়ের উপর। টর্চ পিছনে ফিরিয়ে মাহমুদ দেখল, প্রায় ৫ গজ একটি উদ্যতফণা সাপ ছুটে আসতে আসতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল।

মাহমুদ সাইলেন্সার লাগানো রিভলভারটা তুলে ধীরে সুস্থে একটা গুলী করল। সাপটি ঝপ করে পড়ে গেল নর্দমায়।

মাহমুদ শেখ জামালকে বলল, তুমি টর্চ জ্বালিয়ে পিছনে ফিরে ধীরে ধীরে এস। তুমি পিছনটা দেখবে, আমি সামনে।

ধীরে ধীরে চলছিল তারা। হঠাৎ টেপে টান পড়ায় থামল থমকে দাড়াল মাহমুদ। বুকে ঝুলানো ব্যাগে হাত দিয়ে দেখল টেপ শেষ। তাহলে কি তারা সিনবেথের লোকেশনে পৌঁছে গেছে? ঘড়ির দিকে তাকাল মাহমুদ। দেখল ৯টা ৪০ মিনিট। ৪০ মিনিট লেগেছে তাদের ১১শ' গজ আসতে।

মাহমুদ বলল, শেখ জামাল আমরা এসে গেছি।

তারপর মাহমুদ ড্রেনের দেয়ালের দিকে ঘুরে দাড়াল। রবারের গ্লাভস খুলে হাত রাখল ড্রেনের দেয়ালে। কংক্রিটের শক্ত দেয়াল। টর্চের আলো ফেলে দেখল সিমেন্ট ঢালাই করে তৈরী, একদম সলিড। কোথাও অস্বাভাবিক কোন চিহ্ন নেই।

টেপের মাথা শেখ জামালের হাতে দিয়ে মাহমুদ বলল, তুমি এখানে দাড়াও, আমি সামনে খুঁজে দেখি। কংক্রিট কিংবা ইস্পাতের কোন দরজা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।

মাহমুদ টর্চ জ্বেলে ড্রেনের দেয়াল পরীক্ষা করতে করতে সমানে এগুলো। প্লাষ্টিকের বাটওয়ালা লোহার হাতুড়ি দিয়ে প্রায় ১ ফুট অন্তর অন্তর ড্রেনের দেয়ালে ঘা দিচ্ছিল মাহমুদ, ফাঁপা বা ব্যতিক্রমধর্মী কোন শব্দ কানে আসে কি না তা দেখার জন্যে। এভাবে প্রায় সে চল্লিশ গজ সামনে এগুলো, না কোন চিহ্ন কোথাও সে পেল না। আবার ফিরে এল মাহমুদ ঐভাবে পরীক্ষা করতে করতেই।

শেখ জামালের কাছ ফিরে আসার পর মাহমুদ সামনের মত পিছনের দিকটাও পরীক্ষা করতে এগিয়ে গেল। হতে পারে সিনবেথের অফিস তারা পিছনে ফেলে এসেছে। মাহমুদ যেমন সামনের দিকটা দেখেছে তেমনি পিছনের ৪০ গজ পরিমাণ দেয়ালও সে ঐভাবে পরীক্ষা করল। না, ইস্পাতের সলিড দেয়ালে কোথাও সামান্য পরিমাণ অস্বাভাবিকতারও চিহ্ন নেই।

ফিরে এল মাহমুদ আবার শেখ জামালের কাছে। তারা গা দিয়ে ঘাম ঝরছিল, কিন্তু তারা ছেয়েও উদ্বিগ্ন তার মনটা। তাহলে তারা কি ব্যর্থ হবে? মাপ অনুসারে তারা তো সিনবেথের অবস্থানেই পৌছেছে। না সিনবেথের দরজাটা

ওপার করিডোরে? মনের এ চিন্তাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে হল মাহমুদের কাছে। শেখ জামালকে সে বলল, তুমি এখানে দাঁড়াও আমি ওপারের দেয়ালটা পরীক্ষা করে আসি।

জামাল বলল, জনাব অনুমতি দিলে আমি দেখে আসি।

মাহমুদ হেসে বলল, না জামাল আমাকেই যেতে হবে।

বলে মাহমুদ বুকের ব্যাগ থেকে রবারের ডুবুরী পোশাক বের করে নিল। তারপর ওটা পরে নিয়ে নেমে গেল সে নর্দমায়। সাঁতরে ওপারে পার হয়ে গেল মাহমুদ।

ওপারের করিডোরে উঠে ডুবুরীর পোশাক পরেই সেই দেয়াল পরীক্ষার পালা সে শুরু করল। শেখ জামালের অবস্থানকে মাঝখানে রেখে, সামনে চল্লিশ গজ সে পরীক্ষা করল। না, সে একই দৃশ্য, সলিড কংক্রিটের দেয়াল, কোথাও কোন অস্বাভাবিকতার চিহ্নই নেই।

হতাশা এবং ক্লান্তিতে মাহমুদ ড্রেনের করিডোরে বসে পড়ে। তাহলে তারা কি দিক ভুল করেছে? না দিক ভুল হয়নি। চলার সময় ২ নং মূল হেড ড্রেন থেকে এর অন্য কোন শাখায় তো তারা ঢুকে পড়েনি? না সে ভুল তারা করেনি। তারা মোট দশটি শাখা ড্রেন পাশ কাটিয়ে মূল হেড ড্রেন ধরেই এগিয়ে এসেছে।

হঠাৎ তার মনে হল, টেপতো তাদের মিস গাইড করছে না? টেপের মাপ এবং ডেভিড পার্ক থেকে সিনবেথ হেড কোয়ার্টার পর্যন্ত যে মাপ সে সুয়ারেজ ডায়াগ্রাম থেকে নিয়েছে তা কি নিখুঁত? ডায়াগ্রামে ড্রেনের জিগ -জ্যাগকে তার কাছে তো তখন বড় বলে মনে হয়নি, কিন্তু বাস্তবে তো এই জিগ-জ্যাগ দুরত্বের ক্ষেত্রে অনেক পার্থক্য সৃষ্টি করে! মেপে দেখার সময় মাহমুদের এ কথাটা মোটেই মনে হয়নি। এই ভুলের জন্যে নিজের চুল নিজেই ছিড়তে ইচ্ছা করল মাহমুদের। কিন্তু পরক্ষণেই সচেতন হল, এ সময় অধৈর্য হলে চলবে না, সাহস হারালে চলবে না।

মাহমুদ চিন্তা করে দেখল, তার হিসেব ভুল হবার অর্থ হলো ড্রেনে প্রকৃত দৈর্ঘের চেয়ে টেপের মাপ কম হওয়া। অর্থাৎ তাদের আরও সামনে এগুতে হবে।

মাহমুদ নর্দমা পার হয়ে শেখ জামালের কাছে ফিরে এল। বলল, শেখ জামাল আমাদের আরও সামনে এগুতে হবে। শেখ জামাল বলল, চলুন জনাব, ইনশাআল্লাহ আমাদের লক্ষ্য আমরা খুঁজে পাবই।

-ইনশায়াল্লাহ' বলে মাহমুদ সামনে পা বাড়াল।

মাহমুদ এবার পাশের দেয়ালসহ চারিদিকটা ভালভাবে পরীক্ষা করেই ধীরে ধীরে সামনে এগুতে লাগল। টেপের সাথে দু'শ গজের একটা প্লাষ্টিক কর্ড বেধে তারা সামনে এগুতে লাগল।

করিডোর এবং দেয়ালের উপর টর্চের আলো ফেলে এবং হাতুড়ি দিয়ে কংক্রিটের দেয়াল ঠুকে ঠুকে সে সামনে এগুচ্ছিল। হঠাৎ এক জায়গায় করিডোরের উপর কয়েক খন্ড ইলেকট্রিকের লালরঙা তার টর্চের আলোর চিক চিক করে উঠল। মাহমুদের চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ঝুকে পড়ে তার তুলতে গিয়ে সিগারেটের একটা খন্ডও তার চোখে পড়ল। সিগারেটের খন্ডটাও সে তুলে নিল। সিগারেটের ফিল্টার দেখেই বুঝল, অত্যন্ত দামী সিগারেট। ইলেকট্রিকের তার এবং সিগারেটের খন্ডের উপর জমে ওঠা ময়লার পরিমাণ থেকে মাহমুদ বুঝল, এ দুটো জিনিষই খুব আগের নয়।

মাহমুদ বলল, শেখ জামাল আল্লাহ বোধ হয় আমাদের দয়া করেছেন। আমরা বোধ হয় মনজিলে পৌঁছে গেছি।

হঠাৎ মাথা বরাবর দেয়ালের গায়ে বর্গাকৃতি কাল একটি বর্ডার তার নজরে পড়ল। হাত দিতে গিয়েও চমকে টেনে নিল সে হাত। বুকে ঝুলানো ব্যাগ থেকে ডেটোনেটর বের করে কালো বর্ডারের মাঝখানের দেয়াল স্পর্শ করে বুঝল, ওটা সিমেন্ট রং-এর ইলেকট্রিফায়েড ইস্পাত। চারধারটা কালো রাবারের বর্ডার।

ফিস্ ফিস্ করে মাহমুদ বলল, শেখ জামাল, এটাই সেই দরজা। দু'জনেই আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল।

কিভাবে এগুবে একটু চিন্তা করল মাহমুদ। যেহেতু বিদ্যুৎ সুইচটা ভেতরে তাই বিদ্যুতায়িত এই দরজা থেকে বিদ্যুৎ ডিসকানেক্ট করার কোন উপায় নেই। এখন একটিই পথ এবং তা হলো গোটা দরজা কেটে নামিয়ে আনা। কিন্তু

ঘরের ভেতরটা নিরাপদ না করে দরজা কেটে নামানোর অর্থ শত্রুকে স্বাগত জানানো।

চিন্তা করছিল মাহমুদ। একটা রবারের নল ঢুকানো যাবে, এমন ফুটা কিভাবে ইস্পাতের এই দরজায় করা যায়? ল্যাসার বিম দিয়ে মুহূর্তে এটা করা সম্ভব। কিন্তু বিদ্যুতায়িত ইস্পাতে ল্যাসার প্রয়োগ করলে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। এটা হলে তার আসল কাজ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

আরো ভাবল মাহমুদ। অবশেষে অনেক চিন্তা করে খুব সন্তর্পণে রবারের বর্ডার এবং কংক্রিটের দেয়ালের সংযোগ স্থলে ল্যাসার রস্মি প্রয়োগ করে আধা ইঞ্চি ব্যাসের একটা ফুটো করল। ফুটো দিয়ে একটা রাবারের নল ঢুকিয়ে দিল। বিনা বাধায় নলটি ফুটখানেক প্রবেশ করায় সে বুঝল নলটি নিশ্চয় ঘরে প্রবেশ করেছে। এরপর মাহমুদ সেই রাবারের নলের প্রান্ত ফ্লাইং ক্লোরোফরমের কনটেইনারের সাথে জুড়ে দিয়ে সুইচ অন করে দিল। এক মিনিট অন করে রাখার পর সুইচ অফ করে দিল মাহমুদ।

পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করার পর মাহমুদ রাবারের বর্ডার বরাবর ইস্পাতের দরজার চারদিকে ল্যাসার বিম চালিয়ে দরজাটা কেটে ফেলল। সশব্দে ভারি দরজাটা পড়ে গেল করিডোরের ওপর। দরজার নীচের প্রান্তের সাথে একটা ইলেকট্রিকের তার যুক্ত ছিল, দরজার ভারে তার ছিড়ে গেল। বিদ্যুতায়নের উৎস ছিল ঐ তারটি। মাহমুদ তারটির মুখ টেপ দিয়ে মুড়ে দিল।

মাহমুদ মনে করেছিল ইস্পাতের দরজাটা খুললেই সিনবেথের ভূগর্ভস্থ কক্ষে প্রবেশ করা যাবে, কিন্তু তা হলো না। এ দরজার পরে চার পাচঁ গজ লম্বা একটা সুড়ঙ্গ, তারপর আরেকটা দরজা। সেটাও ইস্পাতের।

মাহমুদ শেখ জামালকে ড্রেনের করিডোরে অপেক্ষা করতে বলে সেই সুড়ঙ্গে উঠে গেল। ডেটোনেটর দিয়ে দেখল দ্বিতীয় এ দরজা বিদ্যুতায়িত নয়। তার সন্দেহ হলো, তার আগের ক্লোরোফরম এ দরজা ডিঙ্গিয়ে সরে যেতে পেরেছে কি না!

কোন সন্দেহের অবকাশ না রাখার জন্যে মাহমুদ দরজার গোড়ায় লেসার বিম দিয়ে ছোট্ট একটা ফুটো করে রাবারের নল দিয়ে ফ্লাইং ক্লোরোফরম

আবার চালান করে দিল ঘরের ভেতরে। ঘরে যদি কেউ থাকে গন্ধহীন এ ক্লোরোফরম নিমিষে তাদের ঘুম পাড়িয়ে দেবে।

ক্লোরোফরম চালান দেবার পর দু'তিন মিনিট অপেক্ষা করল মাহমুদ। তারপর ল্যাসার বিম দিয়ে দরজার এক পাশে বড় ধরনের ফুটো করল। চোখ লাগাল সে ফুটোয়, দেখল উজ্জ্বল আলোয় ঘরটি ভরে আছে। ঘরে কেউ নেই। মনটা মাহমুদের ছ্যাঁৎ করে উঠল। তাহলে তার সব চেষ্টা বৃথা যবে।

হঠাৎ তার চোখ পড়ল ঘরের একপাশে মেঝের ওপর। ভালো করে দেখা যায় না। মনে হল, মেঝের ওপর একটা তক্তপোষ। সে তক্তপোষের ওপর মানুষের মত কিছু শুয়ে আছে, কাপড় দেখে বুঝা যায়। ওকি এমিলিয়া! দেহের রক্ত তার চঞ্চল হয়ে উঠল। বুকটা তোলপাড় করে উঠল তার।

মাহমুদ তাড়াতাড়ি ল্যাসার বিম দিয়ে দরজার দুপাশটা কেটে ফেলল। তারপর দরজা একপাশে সরিয়ে রেখে ছুটে গেল ঘরে তক্তপোষের কাছে। এক পলক এমিলিয়াকে দেখে পরীক্ষা করে ছুটে গেল সে বাইরের দরজায়। দরজাটা বন্ধই ছিল, লক করে দিল মাহমুদ। তারপর দৌড়ে গিয়ে সে বিদ্যুতায়নের সেই তারটা নিয়ে এল। প্লাকটি খুলে রেখে তারের মুখ থেকে টেপ খুলে নিয়ে সেটা সে জুড়ে দিল বাইরের দরজার সাথে। তারপর প্লাকটি আবার লাগিয়ে দিল। ডেটোনেটর দিয়ে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হল যে, দরজাটি বিদ্যুতায়িত হয়েছে। খুশী হল মাহমুদ।

এবার সে ছুটে এল এমিলিয়ার কাছে। আবার নাকে হাত দিয়ে দেখল সব ঠিক আছে।

তাড়াতাড়ি সে তার বাধনগুলো কেটে তাকে গ্যাসমাস্ক পরিয়ে কাঁধে তুলে নিল।

তারপর সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে নেমে এল ড্রেনের করিডোরে।

ফিরতি যাত্রা শুরু হলো তাদের।

এক হাতে কাঁধে এমিলিয়াকে ধরে, অন্য হাতে টর্চ জ্বালিয়ে আগে আগে হাটছিল মাহমুদ। তার পিছনে শেখ জামাল, সেই আগের মত করে।

এমিলিয়কে নিয়ে এসে তেলআবিব শহরের পূর্বাঞ্চলে পার্ক ষ্ট্রীটের একটি বাড়ীতে এনে তোলা হল। বাড়ীটির সামনে সাইন বোর্ড 'দানিয়েল এ্যান্ড কোং'।

পূর্ব তেলআবিবে দানিয়েল এ্যান্ড কোম্পানীর প্রধান সেল্স ডিপো। বাড়ীটি জনৈক ইহুদীর নিকট থেকে অতি সম্প্রতি ক্রয় করেছে মাহমুদ। বাড়ীর বাইরের অংশে ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ চলে আর ভিতরের অংশ ব্যবহৃত হয় সাইমুমের হাসপাতাল হিসেবে। একজন মহিলা ডাক্তার ও একজন নার্স এমিলিয়ার দেখা শোনার ভার নিল।

জ্ঞান ফিরে পেয়েই চোখ মেলল এমিলিয়া। সুন্দর খাটে নরম ধবধবে বিছানায় শুয়ে আছে সে। লাল কার্পেট মোড়া মেঝে। সাদা রং-এর দেয়াল। খাটের পাশে সাদা টেবিলে ঔষধের শিশি ও গ্লাস। কোথায় অপারেশন চেম্বারের শক্ত মেঝে, আর কোথায় জাকজমকপূর্ণ গৃহের নরম শয্যা। স্বপ্ন দেখছে না তো সে। গায়ে চিমটি কেটে দেখল-না স্বপ্ন নয়।

এমন সময় ঘরে ঢুকল নার্স। গায়ে সাদা আরবী পোশাক। মাথায় সাদা রুমাল। এমিলিয়াকে চাইতে দেখে সে দ্রুত তার পাশে এসে নরম গলায় বলল, কেমন লাগছে?

জবাব না দিয়ে এমিলিয়া বলল, আমি কোথায়? আপনি কে?

-আপনি নিরাপদ স্থানে আছেন। বলল নার্স।

কিছু বলার জন্য মুখ হা করেছিল এমিলিয়া। হঠাৎ ঘরে প্রবেশ করল মাহমুদ।

কথা বলতে পারল না এমিলিয়া। মুখ তার হা হয়েই রইলো অভিভূতের মত চেয়ে রইল সে মাহমুদের দিকে। ঠোঁট কাঁপতে লাগল তার। অবরুদ্ধ এক উচ্ছাসে কাঁপছে সে। উচ্ছাস ছাপিয়ে নেমে এল দু'গন্ড বেয়ে অশ্রুর ধারা। মুখ কাত হয়ে পড়ল বালিশে। বালিশে মুখ গুজে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল এমিলিয়া।

নার্স অনেক আগেই বেরিয়ে গিয়েছিল।

মাহমুদ ধীরে ধীরে গিয়ে এমিলিয়ার পাশে বসল। বলল, কেদোঁ না এমি, ভয়ংকর সে দুঃস্বপ্নের ইতি হয়েছে।

কান্না বেড়ে গেল এমিলিয়ার। কান্নার বেগে কাঁপছে তার দেহ। এমিলিয়ার রেশমের মত নরম চুলে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে ইচ্ছ হচ্ছিল মাহমুদের। কিন্তু পারছিল না। বিবেকের কঠোর শাসানি তার সামনে। নতুন পরিবেশে, নতুন পরিচয়ে এমিলিয়া আজ এক মহিমাময়ী নারী। কাছে পেয়েও তাকে মনে হচ্ছে দুরে। সামান্য স্বোচ্ছাচারিতার অবকাশও তাদের মধ্যে নেই যেন আজ।

অবসাদে যেন ভেঙে পড়ছে এমিলিয়া। কান্না তার থেমে গেছে। কিন্তু মুখ তুলছে না সে।

নার্স গরম দুধ নিয়ে ঘরে ঢুকলো। মাহমুদ পাশের একটি চেয়ারে গিয়ে বসেছিল। এমিলিয়াকে দুধ খাইয়ে চলে গেল নার্স। মাহমুদ বলল, এখন উঠি এমি, সকালে আসব।

-কোথায় যাবে, আমি কোথায়? অস্ফুট প্রায় একটি প্রশ্ন।

-কেন নিজের বাড়ীতে। মাহমুদের ঠোঁটে হাসি।

এমিলিয়া কোন জবাব দিল না। চোখ দু'টি নামিয়ে নিল সে। মাহমুদ বলল, কেন বিশ্বাস হচ্ছে না?

-বিদ্রুপ করছ তুমি আমাকে মাহমুদ? এমিলিয়ার কণ্ঠ ভারি শোনাল।

-বিদ্রুপ নয়, সত্যি বলছি, আমি এ বাড়ীতে থাকি না বটে, তবে এটা আমারই বাড়ী।

এমিলিয়া কোন কথা বলল না। নীরব দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল শুধু। দৃষ্টিতে তার সে কি বিশ্বাস আর নির্ভরতা।

মাহমুদই কথা বলল আবার, তোমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা আমরা করেছি কোন ভয় নেই। একটু থেমে মাহমুদ আবার বলল, আমি তোমাকে একেবারে আমার ওখানেই তুলতে পারতাম, কিন্তু তা করিনি। তুমি তো জান, আমার শূন্য ঘরে তোমার পদধুলি পড়বে, সে সৌভাগ্যের দিন আমার এখনো আসেনি। বলেই

মাহমুদ উঠে দাঁড়াল। বলল এখানে যারা আছে যাদের তুমি দেখবে, সকলকেই নিজের লোক মনে করো। যে কোন অসুবিধার কথা তাদের জানিও।

মাহমুদ বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

এমিলিয়া অপসৃয়মান মাহমুদের দিকে চেয়েছিল। তার চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বালিশ দু'হাতে আঁকড়ে ধরে মুখ লাগালো সে বালিশে।

সেদিন এমিলিয়ার মা আইরিনা তার ঘরে এমিলিয়ার ফটো সামনে নিয়ে বসেছিল। মায়ের কয়েক ফোটা অশ্রু গিয়ে পড়েছে এমিলিয়ার বাধানো ফটোর আয়নায়। এমিলিয়া চলে যাবার পর থেকে এভাবেই কাঁদছে আইরিনা। আইরিনা সেই যে সিনবেথ অফিসে গেছে, তারপর আর কোন খোঁজ নেই তার। এতটুকুই শুধু জানা গেছে যে, তার জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। এ জিজ্ঞাসাবাদ কেমন তা ভাবতেও শিউরে উঠে আইরিনা। সেই থেকে এমিলিয়ার বাবাও বোবা হয়ে গেছে। কোন কথাই সে বলে না। আইরিনার অনেক কাদাকাটার পর গতকাল শুধু একটা কথাই বলেছিল, মেয়েটা আমার সসম্মানে মৃত্যুবরণ করতে পারুক, এর চেয়ে বেশী আর কিছু চেয়ো না আইরিনা। কিন্তু ওরা তো মারবে না, কষ্ট দেবে। এ কষ্ট দেবার টেকনিক আমরা হিটলারের কাছে শিখে এসেছি।' স্বামীর এ কথাগুলো মনে পড়ায় আবার নতুন করে কেঁপে উঠল আইরিনা, অশ্রুর ঢল নামল দু'চোখ বেয়ে।

এ সময় একটা খবরের কাগজ হাতে ঘরে প্রবেশ করল ডেভিড সালেম। কাগজের একটা খবর স্ত্রীর কাছে মেলে ধরে বলল, পড়।

চোখ মেলে স্বামীর দিকে চেয়ে খবরের ওপর চোখ নিবদ্ধ করল আইরিনা। খবরটির শিরোনাম এরূপ,

"সিনবেথের দুর্ভেদ্য অপারেশন কক্ষ
থেকে আসামীর পলায়ন"

আর খবরে বলা হয়েছে, গতকাল রাতে সিনবেথের ভূগর্ভস্থ অপারেশন কক্ষ থেকে অতি গোপনীয় রাষ্ট্রীয় দলিল পাচারের দায়ে ধৃত আসামী জনৈকা

এমিলিয়া পলায়ন করেছে। জানা গেছে, কে বা কারা ভূগর্ভস্থ ড্রেনের পথে দৃঃসাহসিক অভিযান চালিয়ে সিনবেথের অপারেশন কক্ষ থেকে তাকে উদ্ধার করে নিরাপদে পালিয়ে গেছে।.....

খবরটা পড়া শেষ না করেই আইরিনা স্বামীকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'ঈশ্বর আমাদের দেখেছেন, আমাদের মেয়েকে বাঁচিয়েছেন।'

ডেভিড সালেমের চোখেও তখন অশ্রু।

এ সময় দরজায় নক হলো।

আইরিনা স্বামীকে ছেড়ে দিয়ে বলল, ইসাকের মা এস।

পরিচারিকা ইসাকের মা ঘরে প্রবেশ করে একটা চিঠি ডেভিড সালেমের হাতে দিল।

সাদা দামী ইনভেলাপ। এ ধরনের ইনভেলাপের ব্যবহার ইসরাইলে নেই। ইনভেলাপের ওপর কারও নাম লেখা নেই। বিষ্মিত ডেভিড সালেম ইনভেলাপ ছিঁড়ে একটা চিঠি বের করল। চিঠির কাগজটিও অত্যন্ত দামী। চিঠিটি পড়ল ডেভিড সালেম,

সম্মানিত ডেভিড সালেম,

আপনাদের মেয়ে এমিলিয়া ভাল আছেন, সুস্থ আছেন। নিরাপদ মনে করলে আপনাদের কাছেই পাঠাতাম। কিন্তু তা পারছি না।

-মাহমুদ

চিঠিটি পড়ে ডেভিড সালেম বলল, কোথায় পেলে ইসাকের মা এই চিঠি?

ইসাকের মা বলল, একজন ফুলওয়ালা এই চিঠি দিয়ে গেছে। ইসাকের মা বেরিয়ে গেল।

আইরিনা চিঠিটি পড়ে মেঝেতেই সেজদায় পড়ে গেল মুসার খোদার উদ্দেশ্য।

সেজদা থেকে উঠে আবেগ জড়িত কন্ঠে বলল, বলতে পার এই মাহমুদ কে?

ডেভিড সালেম বলল, কে আমি জানি না, অনুমান করতে পারি, সাইমুমরা ছাড়া এ দেশে এত শক্তিশালী আর কেউ নেই।

একটু থেমে সে বলল, মাহমুদ যদি সাইমুমের হয় তাহলে আমাদের মেয়ে সম্পর্কে আমরা নিরাপদ থাকতে পারি।

এ সময় টেলিফোন বেজে উঠল।

ডেভিড সালেম টেলিফোন ধরলে ওপার থেকে সিনবেথ প্রধান ডোবিন বলল, স্যার আমরা আপনার সহযোগিতা চাই। এমিলিয়ার কোনও তথ্য যদি পান.....

ডেভিড সালেম ডোবিনকে কথা শেষ করতে না দিয়েই বলল তোমার কথা আমি বুঝেছি ডোবিন। আমার অবস্থা তুমি জান, পরে কথা বলব তোমার সাথে।

বলে টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে এসে আইরিনার হাত থেকে চিঠিটি নিয়ে ছিড়ে ফেলল। চিঠি ছিড়তে ছিড়তে সে বলল, বুঝলে আইরিনা ডোবিন আমার কাছ থেকে এমিলিয়ার খোঁজ চায়। ওরা ভুল করছে। আমি ইহুদী বটে' কিন্তু আমি একজন পিতাও ঐ অমানুষরা তা ভুললো কি করে।

# ৭

ইসরাইলের প্রতিটি লোকালয়-পল্লী-নগরীতে সপ্তবার্ষিক 'সাবাত' দিবসের মহা আনন্দের বারতা নিয়ে উদিত হল ২৭ শে ফেব্রুয়ারীর সূর্য। প্রতি সাত বছর পর পালিত হয় এই উৎসব। ধর্মীয় বিধান অনুসারে এই দিন অর্থকরী সকল প্রকার কাজকর্মে ব্যাপৃত হওয়া সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। কোন কাজে ব্যাপৃত হওয়া মহাপাপের কাজ তাদের জন্য। ইসরাইলের এটা সাধারণ ছুটির দিন। খেত-খামার, কল-কারখানা, অফিস-আদালত, ব্যবসায়-বাণিজ্য, দোকান-পাট সবকিছুর দরজা এদিন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকে। মহা আনন্দের বন্যায় প্লাবিত হয়ে যায় এদিন প্রতিটি ইহুদী জনপদ। এ ২৭ শে ফেব্রুয়ারীর সূর্যও সেই মহা আনন্দের বারতা নিয়ে এল ইসরাইলে।

তবে এবারের 'সাবাত' দিবস ইসরাইলের কাছে আরও তাৎপর্যময়। দু'দিন আগে ইসরাইলের সাথে আরব রাষ্ট্রসমূহের শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, সেই সাথে ইসরাইল তাদের স্বীকৃতি লাভ করেছে। অবশ্য এজন্য তাকে অধিকৃত এলাকা ছাড়াও আরো অনেকখানি ইসরাইলী এলাকা ছেড়ে দিতে হয়েছে। জেরুজালেম থেকেও তাদের হাত গুটিয়ে নিতে হয়েছে-সরে যেতে হয়েছে তাদেরকে ১৯৪৮ সালের পার্টিশন সময়ের মূল এলাকার মধ্যে। তবু বহু বছর পর আজ শান্তি ও স্বস্তি লাভ করেছে ইসরাইলিরা। তাদের মাথার উপর যে উদ্যত খাঁড়া ঝুলছিল তার ভীতি থেকে তারা আজ মুক্ত হয়েছে। তাই আজকের 'সাবাত' দিবস ইসরাইলিদের কাছে সৌভাগ্যের সূচনাকারী হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। তাই সারা ইসরাইলে আজ বাধনহারা আনন্দের বন্যা। সেনাবাহিনীর ব্যারাক হতে শুরু করে কুলি-মজুরের অঙ্গন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে এই আনন্দ।

সারাদিন ধরে চলেছে আনন্দ। ইসরাইল জন-জীবনে আজ কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, কোন আইনের বাধন যেন নেই কোথাও। সন্ধ্যার আগমনে আনন্দ উৎসব আরও জমে উঠল। তেল-আবিবের ৪১টি সিনেমা হল, ২৭টি নাট্য মঞ্চ, ১৭টি

পাবলিক হলে আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে। সৈনিক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, অফিসার প্রভৃতি সকলেই আজ এসে জমা হয়েছে এসব আনন্দানুষ্ঠানে। এছাড়াও বিভিন্ন মহল্লায় শামিয়ানা টাঙ্গিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর গ্যারিসনসমূহে তাদের নিজস্ব মিলনায়তনেও আয়োজন হয়েছে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের। ইসরাইলের সকল শহরে আজ একটিই দৃশ্য। ইহুদী-পল্লী-জনপদেও এরূপ আনন্দানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছে। দেশের এই আনন্দানুষ্ঠানে মিলিত হয়নি শুধু মুসলিম ও ডোজি সম্প্রদায়। ইহুদীদের ধর্মানুষ্ঠানের সাথে তাদের কোন যোগ নেই।

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ইসরাইলে আজ যে শীর্ষ আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে, তার স্থান হয়েছে ষ্ট্রেট এ্যাসেম্বলি হল। এখানে রাষ্ট্র প্রধান থেকে শুরু করে মন্ত্রিসভা ও পার্লামেন্ট সদস্য, উর্ধতন সরকারী কর্মচারী এবং সশস্ত্র বাহিনীর শীর্ষস্থানীয় অফিসারবৃন্দ সমবেত হয়েছেন।

গ্রীন লজের ওয়্যারলেস রুম। ওয়্যারলেসের সামনে বসেছিল আহমদ মুসা এবং মাহমুদ।

সন্ধ্যা ৭ টা পেরিয়ে গেছে। ইসরাইলের বিভিন্ন শহর ও সাইমুমের অন্যান্য আঞ্চলিক ঘাঁটি থেকে রিপোর্ট আসছে, তারা সে রিপোর্ট পরীক্ষা করছে এবং সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিচ্ছে। সিনাই অঞ্চল, জর্দান উপত্যকা ও গোলান হাইট এলাকা থেকে সকল সাইমুম ইউনিটকে ইসরাইলের অভ্যন্তরে সরিয়ে আনা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সংগঠনের সকল কর্মীকেও এনে সমবেত করা হয়েছে ইসরাইলে। ইসরাইলের বিভিন্ন ঘাঁটিতে তারা ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয় নেতৃত্বকে তারা পরামর্শ ও সহযোগিতা দান করছে। তাদের কাছ থেকে রিপোর্ট আসছে। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে আহমদ মুসা ও মাহমুদের কপালে।

ইসরাইলের সমস্ত ঘাঁটিতে সাইমুমের সকল ইউনিট প্রস্তুত। সকলের মধ্যে হালকা অস্ত্র বিতরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। চূড়ান্ত মুহূতটির জন্য অপেক্ষা

করছে সকলেই। রাত্রি দশটা এক মিনিটে মাইমুমের অপারেশন স্কোয়াড তার কাজ শুরু করবে। এর অর্ধ ঘন্টা পরে পাবলিসিটি স্কোয়াডের কাজ শুরু হবে। রাত্রি ১২ টায় রেডিও ঘোষণা করবে অভ্যুত্থানের কথা। সেই সঙ্গে শুরু হবে ডিপ্লোম্যাটিক এবং এডমিনিষ্ট্রেসন স্কোয়াডের তৎপরতা।

সকল ঘাঁটির সাথে যোগাযোগ সম্পন্ন করে ওয়্যারলেস রুম থেকে বেরিয়ে এল আহমদ মুসা। কিন্তু মাহমুদ বসে রইল ওয়ারলেস সেটের সামনে। সমস্ত মনোযোগ তার ওয়্যারলেস সেটের দিকে নিবদ্ধ।

ওয়্যারলেস রুম থেকে বেরিয়ে এসে আহমদ মুসা মিটিং রুমে প্রবেশ করল। একটি গোল টেবিল ঘিরে বসেছিল সাইমুমের রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান আমিন আল আজহারি, সামরিক পরিকল্পনা বিভাগের প্রধান আবদুল্লা আমর। জেনারেল মোশে হায়ান ও জেনারেল রবিনকে চেয়ারের সাথে শক্ত করে বেঁধে রাখা অবস্থায় দেখা গেল। তাদের চোখ বাঁধা।

আহমদ মুসা এসে চেয়ারে বসতেই আমিন আল-আজহারি তার দিকে একটি বিবৃতির খসড়া এগিয়ে দিল। গভীর মনোযোগের সাথে তাতে চোখ বুলাল আহমদ মুসা। এখানে-সেখানে কয়েকটা সংশোধন আনল। এ নিয়ে সে নিম্নস্বরে আবদুল্লাহ আমরের সাথে পরামর্শ করল। তারপর সে আমিন আল-আজহারিকে বললো, একটি ফ্রেস কপি তৈরি করুন।

আহমদ মুসা উঠে গিয়ে জেনারেল হায়ান ও জেনারেল রবিনের চোখের বাঁধন খুলে দিল। চোখের বাঁধন খুলে যেতেই ওরা পিট পিট করে সবার দিকে চোখ তুলল, দেখে নিল ঘরটাকেও একবার। আহমদ মুসা চেয়ারে এসে বসল। ততক্ষণে ফ্রেস কপি তৈরী হয়ে গেছে।

আহমদ মুসা কাগজটি হায়ানের সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, পাঠ করুন কাগজটি। কাগজটি জেনারেল রবিনকে দিয়েও পাঠ করানো হল। পাঠ করে তারা চমকে উঠল। পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে দেখল তারা সবাইকে। মোশে হায়ান বলল, এর অর্থ কি, কে আপনারা?

আহমদ মুসা বলল, পরিচয় পর্ব পরেও হতে পারবে, কিন্তু তাড়াতাড়ি মেসেজটি আমাদের রেকর্ড করানো দরকার, ওটাই আগে হোক। বলে সে ড্রয়ার

থেকে একটি ছোট্ট মাউথ পিস বের করে তার সামনে তুলে ধরল। দেশবাসীর উদ্দেশ্যে মেসেজটি একবার পাঠ করুন মিঃ হায়ান।

হায়ান বলল, আমি পাঠ করতে পারি না, আমাদের ব্লাক মেইলিং করা হচ্ছে।

আহমদ মুসা কঠিন কন্ঠে বলল, আমরা খেলা করতে বসিনি মিঃ হায়ান, সময় নষ্ট করবেন না। পাঠ করুন, অথবা মৃত্যুর জন্য তৈরী হোন। বলে আহমদ মুসা রিভলভার বের করে ডান হাতে রেখে বামহাতে মাউথ পিসটি তুলে ধরল হায়ানের সামনে। লৌহ মানব বলে কথিত এক চক্ষু বিশিষ্ট হায়ানেরও মুখ পাংশু হয়ে গেল। সে মুসার স্থির অচঞ্চল চোখে কি যেন পাঠ করল, তারপর পাঠ করে গেল মেসেজটি। জেনারেল রবিনও অনুসরণ করল হায়ানকে।

রাত্রি নয়টা তিরিশ মিনিট। উৎসব মুখর তেলআবিব নগরী। সাইমুমের ট্রাফিক ইউনিট সাধারণ পথচারীর ছদ্মবেশে শহরের রোডে মোতায়েন হয়ে গেছে। হ্যান্ড গ্রেনেড ও ষ্টেনগান সজ্জিত তারা। সেই চরম মুহূর্তটিতে যানবাহন ও পথ চলাচল সম্পূর্ণ অচল করে দেয়াই হবে তাদের কাজ। কারফিউ নিয়ন্ত্রণও করবে তারা। নির্দিষ্ট সময়ে টেলি-যোগাযোগ বিকল করে দেয়াও তাদের দায়িত্ব। ৯-৪৫ মিনিটে সাইমুম অপারেশন স্কোয়াডের কর্মীরা গণ জমায়েতের স্থানগুলোতে পজিশন নিয়ে নিল। বিশেষ করে টেষ্ট এ্যাসেম্বলী হল ও গুরুত্বপূর্ণ গভর্ণর-দফতর গুলোতে তারা অলক্ষ্য অবরোধের সৃষ্টি করে দাঁড়াল। টেলিফোন-টেলিগ্রাফ, টেলিভিশন ও বেতার কেন্দ্র এবং সেনাবাহিনীর হেড কোয়ার্টারের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হল সবচেয়ে বেশী।

ঢং ঢং করে তেলআবিবের ঘড়িতে রাত্রি দশটা বেজে গেল। পেটা ঘড়ির শেষ ঘন্টাটি বাতাসে মিলিয়ে যাবার সাথে সাথে ইসরাইল আর্মির প্রতীক আকাঁ দু'খানা জীপ সেনাবাহিনীর হেড কোয়ার্টারের বিশাল গেটে গিয়ে দাঁড়াল। গেটের দু'পাশে গার্ড রুম থেকে দুইজন মিলিটারি পুলিশ এগিয়ে এল জীপের দিকে। দুই জীপে মোট দশজন লোক ইসরাইল আর্মির পোশাক পরা। প্রত্যেকের সোলডার ব্যান্ডে অফিসারের ইনসিগনিয়া। মিলিটারী পুলিশ এক নজর তাকিয়েই ষ্ট্রেনগান নামিয়ে ফিরে চলল। তারা ফিরে দাঁড়াতেই জীপ থেকে দু'টি রিভলভার একই

সঙ্গে অগ্নিউদগীরণ করল। সাইলেন্সার লাগানো রিভলভার। কোন শব্দ হলো না। লোক দু'টিও নিঃশব্দে লুটিয়ে পড়ল গেটের গোড়ায়। জীপ দু'টি তীরবেগে ঢুকে গেল ভিতরে। ঢুকে একটি সোজা রাস্তা ধরে চলে গেল জেনারেলের অফিসের দিকে। আর একটি চলে গেল ইসরাইল আর্মির 'আরসেনাল' ফিল্ডের দিকে।

জেনারেলের অফিসমুখী জীপের নেতৃত্ব দিচ্ছিল মাহমুদ স্বয়ং। ঝড়ের গতিতে এগিয়ে চলছিল জীপ। আর মাত্র পঁয়ত্রিশ সেকেন্ড বাকি। এ সময়ে মধ্যে তাকে জেনারেলের অফিসে পৌঁছতে হবে। ঐতো দেখা যাচ্ছে জেনারেলের অফিস, তাঁর সুদৃশ্য গেট। গ্রাউন্ড ফ্লোরেই বসেন জেনারেল। কিন্তু গ্রাউন্ড ফ্লোরটি গ্রাউন্ড লেবেল থেকে প্রায় বিশ ফুট উঁচু। জেনারেলের অফিসের তলদেশে ইসরাইল আর্মির হেড অয়্যারলেস কনট্রোল কেবিন।

জেনারেলের উন্মুক্ত গেটে দেখা যাচ্ছে দু'জন মিলিটারী পুলিশ। জীপ দেখে তাদের হাতের ষ্টেনগান উঁচু হয়ে উঠল। গুলীর রেঞ্জে ওরা আসতেই মাহমুদ নির্দেশ দিল, ফায়ার। দু'টি রিভলভার একই সঙ্গে আবার অগ্নি-উদগীরণ করল। নিঃশব্দ সে গুলী। কোন চিৎকারও উঠল না নিঃশব্দে লুটিয়ে পড়ল লোক দু'টি। গেটে গিয়ে গাড়ী দাঁড়াতেই মাহমুদ লাফ দিয়ে নেমে গেট পেরিয়ে ক্ষীপ্ত পদে সিঁড়ির দিকে ছুটল। তার পিছনে আরও দু'জন। অন্য দু'জন মেশিনগান নিয়ে দাঁড়াল গেটে।

মাহমুদ সিঁড়ি ভেঙে উঠে একটি করিডোর পেরিয়ে জেনারেলের অফিসের বদ্ধ দরজার সামনে দাঁড়াল। দরজার পাশে ডান দিকে জেনারেলের সেক্রেটারীর অফিস। সে মাহমুদদের দেখে হকচকিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। তার সোলডার ব্যান্ডে কর্ণেলের ইনসিগনিয়া। মাহমুদের রিভলভার নিঃশব্দে অগ্নি বৃষ্টি করল। কানের পাশ দিয়ে ঢুকে গেল সে গুলী। টেবিলের উপরই লুটিয়ে পড়ল সে। শব্দ হল পতনের।

মাহমুদ দ্রুত দরজা ঠেলে প্রবেশ করল ভিতরে, সঙ্গী দু'জনের মধ্যে একজন দরজায় পাহারায় থাকল, আর একজন মাহমুদের সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করল।

ঘরে ঢুকে মাহমুদ দেখল, ইসরাইল সশস্ত্র বাহিনীর সহকারী অধিনায়ক জেনারেল আব্রাহাম উঠে দাঁড়িয়েছে। তার চোখে উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি, হাতে রিভলভার। কিন্তু তার রিভলভার উঠানোর সময় হলো না। মাহমুদের রিভলভার আর একবার অগ্নি উদগীরণ করল। জেনারেল আব্রাহামের কব্জি ভেদ করে তা বেরিয়ে গেল। জেনারেল আব্রাহামের বাম হাত টেবিলের নীচে নেমে যাচ্ছিল। মাহমুদের রিভলভারের আর একটি গুলী জেনারেল আব্রাহামের বাম বাহু ভেদ করল। চেয়ারে বসে পড়ল জেনারেল। মাহমুদ গর্জে উঠল, 'যেমন আছেন ঠিক তেমনি দাঁড়িয়ে থাকুন। জানি এবার লেগ বক্সের বোতাম টিপে কনট্রোল রুমে নেমে যেতে চেষ্টা করবেন। পা নড়াবার চেষ্টা করলে তৃতীয় গুলীটি এবার আপনার বক্ষ ভেদ করবে।

জেনারেল আব্রাহামকে সামনে রেখে তার পিছু পিছু মাহমুদ কনট্রোল রুমে প্রবেশ করলো। মাহমুদের পিছনে প্রবেশ করল ওয়্যারলেস ইঞ্জিনিয়ার আবদুল্লা আমিন।

আবদুল্লা আমিন মিটার ইনডেক্স অনুসরণ করে ইসরাইলের বিভিন্ন গ্যারিসনের সাথে সংযোগ-চ্যানেল প্রতিষ্ঠা করল। তারপর সে চ্যানেলগুলোকে হেড ট্রান্সমিটারের সাথে যুক্ত করল।

ওদিকে মাহমুদ প্রাক্তন দেশরক্ষা মন্ত্রী জেনারেল মোশে হায়ান ও প্রাক্তন সর্বাধিনায়ক জেনারেল রবিনের স্বাক্ষরকৃত বিবৃতি জেনারেল আব্রাহামকে দেখাল। তারপর আর একটি লিখিত বিবৃতি জেনারেল আব্রাহামের চোখের সামনে তুলে ধরে বলল, 'এবার পাঠ করুন তো জেনারেল।' বলে সে রেকর্ডার যন্ত্রের সুইচ অন করল। তারপর রিভলভারের নলটি জেনারেলের কপাল বরাবর তুলে ধরে বলল, এক আদেশ কিন্তু দু'বার করার মত সময় আমাদের নেই।

জেনারেল আব্রাহামের আহত হাত থেকে রক্ত ঝরছিল, কাঁপছিল সে। বোধ হয়ে বুঝল সে, সামনের ঐ লোকটি দু'বার আদেশ করার লোক নয়। বিবৃতিটি সে পাঠ করে গেল,

দেশের জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতাকারী পুতুল সরকারের পতন ঘটেছে। দেশপ্রেমিক শক্তি দেশের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেছে। আমার রাজনীতি-

নিরপেক্ষ সেনাবাহিনীকে সাময়িকভাবে অস্ত্র ত্যাগ করতে এবং পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে আদেশ করছি।

মেসেজটি আবদুল্লা আমিন ট্রান্সমিট করল। রাত্রি তখন দশটা এগার মিনিটি।

মেসেজ ট্রান্সমিট করার ১ম ও ২য় মিনিটে জাফা ও হাইফা নৌ-ঘাঁটি থেকে খবর এল। একই ধরনের খবর, "প্রায় সকলেই বিভিন্ন আনন্দানুষ্ঠানে যোগ দিয়েছে, ঘাঁটিগুলো প্রায় শূন্য। অজ্ঞাত পরিচয় একদল লোক ঘাঁটি দখল করেছে। ওরা কনট্রোল রুমে ঢুকতে চেষ্টা করছিল। এখন খুলে দিচ্ছি কনট্রোল রুম।" ৩য় মিনিটে তেলআবিব, লুদ, মাসাদা ও বিরশিবা বিমান ঘাঁটি থেকে খবর এল। তেলআবিব ও লুদ জানাল, "আমরা কিছু বুঝতে পারছি না। বাইরে গুলীর শব্দ শুনতে পাচ্ছি। শব্দ নিকটতর হচ্ছে ক্রমে। পাইলট ও অফিসার্স ব্যারাক শূন্য, ঘাঁটিতে রুটিন পেট্রোল শুধু কাজ করছিল।" মাসাদ ও বিরশিবা বিমান ঘাঁটি জানাল, রুটিন পেট্রোলের সাথে ছিটেফোটা সংঘর্ষ হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। সমগ্র বিমানক্ষেত্র অজ্ঞাতনামা ব্যাক্তিদের দখলে। আমরা কনট্রোল রুম ছেড়ে যাচ্ছি।'

মাহমুদ তার নিজস্ব অয়্যারলেসে এখানকার খবর এবং প্রাপ্ত অন্যান্য খবর জানিয়ে দিল গ্রীণ লজের হেডকোয়ার্টারে আহমদ মুসাকে।

মাহমুদ যখন জেনারেল অফিসের দখল নিচ্ছিল, তখন এহসান সাবরির নেতৃত্বে আর একটি দল বিদ্যুৎগতিতে আঘাত হেনে প্রহরায় নিযুক্ত এক প্লাটুন সৈন্যের প্রতিরোধ চূর্ণ করে হেড কোয়ার্টারের আরসেনাল ফিল্ড দখল করে নিয়েছিল। আরসেনাল ফিল্ড অধিকারে 'ডজি' সম্প্রদায়ের সৈন্যদের মূল্যবান সহযোগিতা পেয়েছিল এহসান সাবরি।

অপরদিকে আবদুল্লা জাবেরের নেতৃত্বে সাইমুমের এক হাজার সদস্যের একটি দল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে সেনাবাহিনীর ব্যারাকসমূহ দখল করে নিয়েছিল। অধিকাংশ ব্যারাক প্রায় শূন্য ছিল। আর্মি, পুলিশ, পেট্রোল ও উপস্থিত অন্যান্য সশস্ত্র সৈন্য কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্ন প্রতিরোধের সৃষ্টি করলেও সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ কোথাও হয়নি। ব্যারাকে তিন হাজার 'ডজি' সম্প্রদায়ের সৈনিক কোন প্রতিরোধ করেনি। রাত্রি দশটা ত্রিশ মিনিটের মধ্যে সমগ্র ব্যারাক এলাকা

সাইমুমের কর্মীসেনারা দখল করে নিয়েছিল। গ্যারিসনের এ্যাসেম্বলি হল ও ব্যারাক এলাকা থেকে রাত্রি সাড়ে দশটার মধ্যে তিন হাজার ইসরাইলি সৈন্য ধৃত হয়েছিল। শহরের ৪১ টি সিনেমা হল, ২৭টি নাট্যমঞ্চ, ১৭টি পাবলিক হল ও অন্যান্য অনুষ্ঠান এলাকা থেকে ১৭ হাজার সমরিক বাহিনীর লোকসহ মোট ৫০ হাজার ইসরাইলি যুবক গ্রেপ্তার হল। সাইমুমের ট্রাফিক ইউনিট ও লোকাল ইউনিটের হাতে গ্রেপ্তার হল আরও ১১ হাজার লোক।

রাত্রি ১০-৩০ মিনিটে তেলআবিব আর্মি গ্যারিসন থেকে সাইমুমের সাঁজোয়া বাহিনী বিভিন্ন ইউনিটে বিভক্ত হয়ে তেলআবিবের রাস্তায় টহল দিতে শুরু করল। পাবলিসিটি স্কোয়াডের কাজও তখন শুরু হয়ে গেছে। রাস্তায় রাস্তায় ঘোষণা করা হচ্ছে, ‘দেশের জনগণের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতাকারী পুতুল সরকারের পতন ঘটেছে। জনগণকে শান্তভাবে গৃহে অবস্থান করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।’

ষ্ট্রেট এ্যাসেম্বলী হলে রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে পার্লামেন্ট ও মন্ত্রী সভার সদস্য, উর্ধ্বতন সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের সকলেই গ্রেপ্তার হয়েছে। তেলআবিবের পেটা ঘড়িগুলোতে আর রাত্রি ১২টা বাজার ঘন্টাধ্বনি শোনা গেল না। রাত্রি ১২টা বাজার আগেই গোটা তেলআবিব সাইমুমের হাতের মুঠোয় এসে গেল। সাইমুমের ১০ হাজার কর্মীসেনা ভারী অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তেলআবিবে টহল দিয়ে ফিরছে।

রাত্রি এগারটা পঞ্চাশ মিনিটে আহমদ মুসা কপালের ঘাম মুছতে মুছতে গ্রীনলজের অয়্যারলেস রুম থেকে বেরিয়ে এল।

অয়্যারলেস রুম থেকে বেরিয়ে সে প্রবেশ করল মিটিং রুমে। ওখানে বসেছিল সাইমুমের উপদেষ্টা পরিষদ। আহমদ মুসা তাদের সামনে সানন্দে ঘোষণা করল, ‘ভ্রাতৃবৃন্দ, আল্লাহর হাজার শোকর, ফিলিস্তিনের প্রতিটি শহর ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে সাইমুম তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। সকল আর্মি

গ্যারিসন, হাইফা ও ওজাফা নৌ-ঘাঁটির কামানশ্রেণী এখন আমাদের দখলে। সাবমেরিন ও যুদ্ধ জাহাজগুলোকে এখন নিয়ন্ত্রণ করছে সইমুমের নৌ-ইউনিট।' দাঁড়িয়ে কথা বলছিল আহমদ মুসা।

বাইরে ষ্টার্ট নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল গাড়ী। আহমদ মুসা, আমিন আল আজহারি ও সাইমুমের ডিপ্লোম্যটিক করপসের প্রধান সোহায়েল আবদুল্লা গাড়ীতে আরোহন করলে বেতার-কেন্দ্র অভিমুখে তা যাত্রা শুরু করল।

রাত্রি ১২টা ১ মিনিট। ইসরাইল রেডিও থেকে ঘোষকের গম্ভীর কণ্ঠ ধ্বনিত হলো, 'অন্যায়, অবিচার আর জুলুমের প্রতীক ইসরাইল সরকারের পতন ঘটেছে। 'দানিয়েল এ্যারোন'-এর নেতৃত্বে নুতন জাতীয় সরকার দেশের শাসনভার গ্রহণ করেছে।' উল্লেখ্য যে, ইহুদী সমাজে মাহমুদ 'দানিয়েল এ্যারোন' নামে পরিচিত।

এই ঘোষণার পরই জেনারেল হায়ান ও জেনারেল রবিনের বিবৃতি প্রচার করা হলো। বিবৃতিতে বলা হল,

''দেশের প্রকৃত মালিক জনসাধারণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতাকারী সরকারকে উৎখাত করে এ দেশের যে নয়া সরকার, নয়া প্রশাসন ও নয়া ব্যবস্থার জন্ম হল, তার সাথে দেশের সশস্ত্র বাহিনী, দেশের জনসাধারণ এবং বিদেশে আমাদের শুভানুধ্যায়ী সকলের একাত্মতা রয়েছে। এই পরিবর্তন এই দেশ ও এই অঞ্চলের মানুষের জীবনে নিয়ে আসবে স্থায়ী শান্তি।'

বিবৃতি প্রচারের পর দানিয়েল এ্যারোন সরকারের পক্ষ থেকে কতিপয় নির্দেশ ও ঘোষণা প্রচার করা হল,

(১) পরবর্তী আদেশ না দেয়া পর্যন্ত সান্ধ্য আইন বলবত থাকবে।

(২) পরবর্তী আদেশ ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত দেশের সকল অফিস-আদালত ও কল-কারখানা বন্ধ থাকবে।

(৩) দেশের সকল নৌ ও বিমান বন্দর অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

(৪) আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে সকল বিদেশীকে দেশত্যাগ করতে হবে। সশস্ত্র বাহিনীর নিজস্ব বিমানে তাদেরকে নিকটতম কোন রাজধানীতে পৌঁছে দেয়া হবে।

(৫) বৈদেশিক মিশনের সকলকে তাদের নিজস্ব এলাকায় অবস্থান করতে বলা হচ্ছে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ তারা নিয়মিত পাবে।

(৬) দেশের বৈদেশিক ও অর্থনৈতিক নীতিসমূহ অপরিবর্তিত থাকবে। এ সম্পর্কীত পূর্ববর্তী সকল চুক্তি ও প্রতিশ্রুতিসমূহের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা হবে।

রেডিও থেকে মাঝে মাঝে উপরোক্ত বিবৃতি ও ঘোষণা প্রচার হতে থাকল। এরই মাঝে উদিত হল ২৮শে ফেব্রুয়ারীর সূর্য। এই সূর্য লক্ষ লক্ষ ফিলিস্তিনবাসীর জীবনে নিয়ে এল নতুন দিন নতুন ভবিষ্যত।

# ৮

৭ ই মার্চ। সাইমুমের অভ্যুত্থানের পর **১১** দিন পার হয়ে গেছে। এই **১১** দিনে ওলট পালট হয়ে গেছে ইসরাইলের চেহারা। দু'যুগেরও বেশী আগে যে সব ফিলিস্তিনি দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল, তারা সকলেই ফিরে এসেছে দেশে। সাইমুমের এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন স্কোয়াড নতুন প্রশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে। অফিস-আদালত ও কল-কারখানায় এবং কৃষিক্ষেত্রে ফিলিস্তিনের আদি ইহুদী বাসিন্দাদের অধিকারে কোন হস্তক্ষেপ করা হয়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যেসব ইহুদী ফিলিস্তিনে এসেছে, তাদেরকে অফিস-আদালত ও কল-কারখানা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। ফিলিস্তিনে অবাঞ্ছিত বহিরাগত হিসেবে তাদের গণ্য করা হয়েছে। ইলাতের নিকটবর্তী দুর্গম পার্বত্য এলাকার আশ্রয় শিবিরে ইসরাইলের পাঁচ লক্ষ সামরিক, আধাসামরিক ও উগ্র যুবশক্তিকে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। সাইমুম এদের কে জিম্মি হিসেবে রেখেছে। ফিলিস্তিনের জাতীয় সরকারের ওপর বাইরের ইহুদী মুরব্বীদের প্ররোচনায় বাইরে থেকে কোন আঘাত এলে এদের ওপর আঘাত হানা হবে। বিদেশী ইহুদী মুরুব্বীদের ষড়যন্ত্রের পাল্টা উত্তর হিসেবে এদের কে ব্যবহার করবে সাইমুম।

এই **১১** দিনে সাইমুম ফিলিস্তিন জাতীয় সরকারের সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছে। সাইমুমের কর্মীসেনাসহ ফিলিস্তিনের পাঁচ লক্ষ মুসলিম যুবককে নিয়ে এ সেনাবাহিনী গঠিত হয়েছে। ফিলিস্তিনকে একটি অস্ত্রাগারে পরিণত করেছিল ইসরাইলিরা। সুতরাং অস্ত্রের অভাব হয়নি। সউদি আরব, জর্দান ও লিবিয়ার বিমান বাহিনী ও নৌ-বাহিনীর অফিসার ও ক্রুদের সঙ্গোপনে ফিলিস্তিনে আনা হয়েছে। তারা ফিলিস্তিন জাতীয় সরকারের বিমান ও নৌ-বাহিনীকে পূর্ণ কর্মক্ষম করে তুলেছে। মিসর, পাকিস্তান ও ইরান থেকে আণবিক বিশেষজ্ঞদের আণবিক গবেষণা ও পরীক্ষা কেন্দ্র নেগিও মরুভূমির ডেমনায় আনা হলো।

আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হবার পর অফিস-আদালত ও কল-কারখানার কাজ শুরু করা হলো।

এরও ৭ দিন পর ডেমনার ১১টি আণবিক বোমাকে ব্যবহারোপযোগী করে তোলা হল এবং মূহূর্তের নোটিশে তা লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে পারবে এমন প্রস্তুতি সম্পন্ন হবার পর বিমান ও নৌ-বন্দর খুলে দেয়া হলো। কিন্তু অনুসৃত আভ্যন্তরীণ নীতি সম্পর্কে কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করা হলো। প্রচার নয়, দ্রুত কাজ-এই নীতি গ্রহণ করল সাইমুম নিয়ন্ত্রিত নতুন জাতীয় সরকার। ঘটনা প্রবাহের স্বাভাবিক বিকাশের ফলে যেটুকু প্রকাশ পায়, তার বেশী কিছু প্রকাশ করতে চায় না সরকার।

অভ্যুত্থানের দিন সাতেক পর চীন ও ফ্রান্সসহ অধিকাংশ আফ্রিকা, এশিয়া ও পশ্চিম ইউরোপীয় দেশের স্বীকৃতি পাওয়া গেল। তবে মুসলিম দেশগুলো বোধগম্য কারণেই ফিলিস্তিনে জাতীয় সরকার সম্পর্কে কঠোর নীরবতা পালন করছে। তাদের এই নীরবতার ফলে ফিলিস্তিন বিপ্লবের সঠিক প্রকৃতি সম্পর্কে মুসলমানদের চিহ্নিত শত্রুরা কিছু আঁচ করতে সমর্থ হলো না।

জাতিসংঘ মিশন ও বিদেশী সাংবাদিকদের রিপোর্ট থেকে ফিলিস্তিনের নতুন সরকার সম্পর্কে বাইরে যে ধারণা দাঁড়াল তা হল, ইসরাইলের নতুন সরকার একটি আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদী সরকার। ইহুদী, খৃস্টান ও মুসলমান সকলেই সেখানে সমান অধিকার লাভ করবে। ফিলিস্তিনের লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারা মুসলমান তাদের পূর্বের বাস্তু-ভিটা ফিরে পাচ্ছে। অপরদিকে লক্ষ লক্ষ বহিরাগত ইহুদী তাদের নাগরিক অধিকার হারিয়ে উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠীতে পরিণত হচ্ছে।

মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো বিশ্বের রাজধানীগুলোতে। একমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়া আফ্রিকা ও এশিয়ার প্রত্যেকটি দেশ ফিলিস্তিন জাতীয় সরকারের নীতি সমর্থন করল। অভিনন্দিত হলো সরকার। এই সময় মুসলিম দেশগুলো প্রায় এক সাথে ফিলিস্তিন সরকারকে আনুষ্ঠনিকভাবে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করল।

বৃটেন নতুন সরকারের সমালোচনা করল এবং নতুন ইহুদী উদ্বাস্তু সমস্যার দিকে জাতিসংঘের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সোভিয়েত ইউনিয়ন নীরবতা অবলম্বন করল। বোঝা গেল, কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছে সোভিয়েত সরকার।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার ঘটল আমেরিকায়। ভীষণ হৈ চৈ শুরু হলো সেখানকার ইহুদী সার্কেলে। কিন্তু ফিলিস্তিনের নতুন সরকার প্রশ্নে মার্কিন সিনেট ও কংগ্রেস ও সিনেটের একটি শক্তিশালী গ্রুপ মার্কিন ইহুদীদের ইসরাইল নীতির তীব্র সমালোচনা করল। তারা পরিষ্কার ভাবে জানাল, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আর তারা ইহুদীদের হাতের পুতুল সাজতে দিবে না। ইহুদী স্বার্থ উদ্ধারের জন্য আর তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ব্যবহৃত হতে দিবে না।" মার্কিন ইহুদীদের তারা আরও পরামর্শ দিল, হৈ চৈ করে ইহুদী উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান করা যাবে না। যেমন করে বিশ্ব ইহুদী মুরুব্বীরা ফিলিস্তিনে ইহুদী রপ্তানী করেছিল, ঠিক তেমনি ভাবেই উদ্বাস্তু ইহুদীদের সেখান থেকে ফিরিয়ে আনা উচিত। অথবা ফিলিস্তিনি আরব মুসলমানদের সেই আবাসভূমিতে বিশ্বস্ত পড়শী সেজে বসবাস করার মানসিকতা ইহুদীদের সৃষ্টি করতে হবে।

পরবর্তী বই

# আবার তেলআবিবে

সাইমুম-২.১

# আবার তেলআবিবে

আবুল আসাদ

২০০৯ সালে ইরা পাবলিকেশন্স এর আন্ডারে প্রকাশিত হয় সাইমুম সমগ্র-১। সেখানে প্রথম তিনটি বই দেয়া হয়। তার সাথে ফিলিস্তিনের উপর লেখা নতুন একটি কাহিনী আবার তেলআবিবে শিরোনামে অপারেশন তেলআবিব–২ এর পর যোগ করা হয়।

সেই আবার তেলআবিবে অংশটি এখানে দেয়া হল।

# ১

মিটিং কক্ষটি পূর্ণ। ওভাল টেবিলটির ১১টি চেয়ারের কোনটাই খালি নেই। এক্সিট দরজাগুলোর সবগুলোই বন্ধ।

ইসরাইল থেকে পালিয়ে আসা ইসরাইল সরকারের আপাতকালীন প্রবাসী মন্ত্রীসভার বৈঠক। দেয়ালে টাঙানো ইসরাইল রাষ্ট্রের মানচিত্রের নিচে বিশেষ চেয়ারটায় বসেছেন প্রধানমন্ত্রী স্যামুয়েল শার্লটন। তার ডান পাশে বসেছেন নতুন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রজার রবিন আর বাম পাশে সিকিউরিটি ও কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের (সিনবেথ) চীফ জেনারেল শামিল এরফান। এ ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে রয়েছেন বিদেশে গোয়েন্দা কর্মের (মোসাদ) প্রধান মেজর জেনারেল লুইস কোহেন, মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের (শেরুত মোদিন) নতুন প্রধান জেনারেল দানিয়েল দোরিন এবং সশস্ত্র বাহিনীর নতুন প্রধান আইজ্যাক এ্যারন।

বৈঠক শুরু হয়ে গেছে।

বৈঠকের শুরুতে নতুন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রজার রবীন বৈঠক সম্পর্কে ব্রীফ করে বলেছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে মন্ত্রীসভাকে ব্রীফ করবেন। ঘোষণা দেয়া হলো, মন্ত্রীসভার সদস্যবৃন্দ, এখন ব্রীফ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী:

আষাঢ়ের পানি ভরা মেঘের মত ভারী প্রধানমন্ত্রী স্যামুয়েল শার্লটকের মুখ। সে আগেই নড়েচড়ে বসেছিল। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর কণ্ঠ থামতেই মুখ খুলে গেল প্রধানমন্ত্রীর।

কথা শুরু করল ইসরাইল থেকে পালিয়ে আসা আপাতকালীন মন্ত্রীসভার প্রধানমন্ত্রী স্যামুয়েল শার্লটক, 'মন্ত্রীসভার সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, প্রিয় বন্ধুগণ, আপনারা ইসরাইল দখলকারী ফিলিস্তিন সরকারের ঘোষণা শুনেছেন। আমাদের ইসরাইল সরকারের অধীনে বিদেশ থেকে এসে ফিলিস্তিনে বসতি স্থাপন করা লাখ লাখ ইহুদি রাতারাতি তাদের বাড়ি-ঘর, সহায়-সম্পত্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছুর অধিকার হারিয়েছে। তারা যে দেশ থেকে এসেছে সে দেশে চলে যাওয়া তাদের দায়িত্ব বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এতবড় অন্যায়ের কেউ প্রতিবাদ করল না। শুধু বৃটেন উদ্বাস্তুদের জন্যে তার উদ্বেগের কথা জাতিসংঘকে জানিয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন একটি কথাও উচ্চারণ করেনি, যদিও সেখান থেকেই বেশি ইহুদি এসেছে ফিলিস্তিনে। সবচেয়ে বেদনাদায়ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা। সেখানে সরকারের কেউ কেউ ইসরাইলের পক্ষ নিলেও কংগ্রেস ও সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মার্কিন সরকার ইসরাইলের পক্ষ নেয়ার ঘোরতর বিরোধীতা করেছে। এমনকি লাখ লাখ ইহুদি উদ্বাস্তু হওয়া এবং তাদেরকে তাদের স্ব স্ব দেশে ফেরত পাঠানোর ভয়ংকর সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করতে তারা নারাজ। আমি সিনেট ও কংগ্রেসের সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু নেতাদের সাথে কথা বলেছি, অনুরোধ করেছি। কিন্তু তারা যেন রাতারাতিই পাল্টে গেছে। তারা বলেছে, ইসাইল রাষ্ট্র ও এক শ্রেণীর ইহুদির বাড়াবাড়ির কারণে আজ যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তাতে আমরা কিছু করতে অপারগ। এখানে প্রায় সব দেশপ্রেমিক আমেরিকানের মত হলো, একশ্রেণীর ইহুদিরা লাখ লাখ ফিলিস্তিনবাসিকেই শুধু অর্ধ সহস্র বছরের বেশি সময় ধরে উদ্বাস্তু করে রাখেনি, আমেরিকানদের ওপরও ছড়ি ঘুরাচ্ছে।

আইনানুগ আমেরিকানরা এটা মেনে নিয়েছে আইনের প্রতি শ্রদ্ধার কারণে, কিন্তু ইসরাইলকে সহায়তা করতে তারা রাজি নয়। তাদের এই চূড়ান্ত কথা শোনার পর তাদেরকে বলার আর কিছু অবশিষ্ট নেই। আমি যোগাযোগ করেছিলাম আমেরিকায় ইহুদিদের শীর্ষ প্রতিষ্ঠান 'কাউন্সিল অব জুইস এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র নেতৃবৃন্দসহ ইহুদি ধর্মীয় সমিতিগুলোর নেতাদের সাথেও। কাউন্সিলের নেতৃবৃন্দ আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। কিন্তু আমেরিকানদের যে সেন্টিমেন্ট, তাতে এই সময় কিছু করা সম্ভব নয় বলে তারা জানিয়েছে। তারা বলছে এই সময় কিছু করতে গেলে কাউন্সিল ও এসোসিয়েশনগুলো বিপদে পড়তে পারে। কিছু করা গেলেও তার জন্যে সময় চাই বলে তারা জানিয়ে দিয়েছে। ধর্মীয় সমিতির ধর্ম নেতাদের সাথে আলাপ করেছি। তারা আমেরিকানদের চেয়ে আমাদের প্রতি বেশি বিক্ষুব্ধ ও আক্রমণাত্মক। তারা নির্লজ্জের মত একথা স্পষ্ট করেই বলেছে যে, ইসরাইল ও জায়নবাদীদের রাজনৈতিক অভিলাষের কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধর্মভীরু ও নিরপরাধ ইহুদিরাও আজ বিপদের মুখে পড়েছে। ইসরাইলের পক্ষ নিয়ে তারা আর বিপদ বাড়াতে চায় না। এই হলো আমাদের স্বজাতিদেরও কথা। অর্থাৎ এখন আমাদের কোন বন্ধু নেই। সামরিক সাহায্য দূরের কথা অর্থনৈতিক সাহায্যও কারও কাছ থেকে পাওয়ার আশা নেই। আমাদের বন্ধুরাষ্ট্রসহ জাতিসংঘও একথা মনে করতে চাচ্ছে যে, ইসরাইলে যা ঘটেছে সেটা ক্ষমতার ইন্টারন্যাল পরিবর্তন। ইসরাইলে ক্ষমতা দখলকারী ফিলিস্তিন সরকার ফিলিস্তিন স্থানীয় ইহুদী ও খৃষ্টানদের সমর্থন যোগাড় করে এই ইমেজই দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিতে চাইছে। এই চালাকির প্রতি সমর্থন দিয়েই আমাদের বন্ধুরাও বলছে, ইসরাইলে ফিলিস্তিনিদের অভ্যুত্থানে বিদেশী সাহায্য বা বিদেশী সৈন্যের কোন অংশগ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তারা আরও বলছে, এই ঘটনায় আরব রাষ্ট্রগুলোও খুব উৎসাহ দেখায়নি, এমনকি তাদের কেউ স্বীকৃতিও দেয়নি ইসরাইলের ফিলিস্তিন সরকারের প্রতি। এসব যুক্তি তুলেই আমাদের বন্ধু দেশগুলো আমাদের এড়িয়ে চলতে চাচ্ছে। এই অবস্থায় যা করতে হবে আমাদেরকেই করতে হবে।

বলে থামলো আপাতকালীন ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী স্যামুয়েল শার্লটক। থেমেই আবার বলে উঠলেন, কি করতে হবে এ সম্পর্কে আপনাদের চিন্তা আপনারা বলুন।

সবার মধ্যে একটা নড়াচড়ার ভাব পরিলক্ষিত হলো। নড়েচড়ে বসল সবাই।

কিন্তু সবাই চুপ-চাপ।

মুখ খুলল প্রথমে মন্ত্রীসভার জুনিয়র সদস্য পুনর্বাসন-পুনর্গঠন মন্ত্রী ইসরাইল আবা ইবান। বলল সে, আমরা যে যুদ্ধে জেতার কথা, সে যুদ্ধে জিতিনি, দেশকে আমরা রক্ষা করতে পারিনি। এখন দৃশ্যপট পাল্টে গেছে। তারা আকারে ছোট শক্তি ছিল বলে অ্যাসেট্রিক ওয়ার (হিট এন্ড রান, গোপন তৎপরতা, ইত্যাদি) এর মাধ্যমে ওরা আমাদের পরাজিত করেছে। এখন আমরা ছোট শক্তি হয়ে পড়েছি, আর ওরা বড়। আমাদেরকে এখন 'অ্যাসিমেট্রিক ওয়ার'-এর পথ গ্রহণ করতে হবে।

থামল তরুণ মন্ত্রী আবা ইবান।

প্রধানমন্ত্রী শার্লটক অন্যদের দিকে তাকাল। সকলেই ইসরাইল আবা ইবানের যুক্তি ও মত সমর্থন করল।

সবশেষে কথা বলার পালা দেশরক্ষামন্ত্রী রজার রবিনের। তিনি কোন মত প্রকাশ না করে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে বলল, এবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলবেন।

বলতে শুরু করল প্রধানমন্ত্রী স্যামুয়েল শার্লটক, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, 'আমরা সকলে এক ভাবেই ভাবছি। আপনারা শুনে খুশি হবেন, যে যুদ্ধের কথা আপনারা বলেছেন, সেই যুদ্ধ আমরা শুরু করেছি। প্রথম আক্রমণ হিসেবে ইসরাইল দখলকারী ফিলিস্তিন প্রধানমন্ত্রী মাহমুদ ও তার স্ত্রীকে কিডন্যাপ করার সব ব্যবস্থা আমরা সম্পন্ন করেছি। আজ জেরুসালেমে ওদের মসজিদুল আকসায় শোকরানা দিবসের সমাবেশ। সেখানে ওদের প্রধান মাহমুদ সস্ত্রীক আসবে। তাকে সস্ত্রীক কিডন্যাপ করা হবে। আমাদের গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের একটা অংশ অক্ষত আছে। তারাই এগিয়ে এসেছে বড় এই দায়িত্ব পালনে। সাফল্য সম্পর্কে আমি আশাবাদী।

থামলো স্যামুয়েল শার্লটক।

ঘড়ির দিকে তাকাল। তারপর মুখ তুলে বলল, অনুষ্ঠান ঘণ্টা দুই আগে শেষ হওয়ার কথা। তার মানে আমাদের মিশন বাস্তবায়নের কাজ কমপক্ষে দু'ঘণ্টা আগে শুরু হয়েছে। কোন একটা খবর খুব শীঘ্রই আমরা পাব।

'আমিন। জিহবা আমাদের সাহায্য করুন।' প্রধানমন্ত্রীর কথার মধ্যেই সবাই এক বাক্যে এই প্রার্থনা বাক্য উচ্চারণ করল।

থেমে গিয়েছিল প্রধানমন্ত্রী স্যামুয়েল শার্লটক।

সবার প্রার্থনার কণ্ঠ থেমে যেতেই সেই তরুণ মন্ত্রী ইসরাইল আবা ইবান বলল, কিন্তু মাত্র কিডন্যাপই সাফল্য নয়, এই কিডন্যাপ দিয়ে আমরা কি করতে চাচ্ছি, এ নিয়ে আমরা নিশ্চয় কিছু ভেবেছি।

থ্যাংক ইউ ইয়ংম্যান, উপযুক্ত জিজ্ঞাসাই তোমার মনে জেগেছে।

একটু থামল প্রধানমন্ত্রী। পরমূহুর্তেই বলতে শুরু করল আবার, প্রধানমন্ত্রী দম্পতিকে জিম্মি বানিয়ে আমরা দাবি করবো: এক. ফিলিস্তিন সরকারকে ইসরাইল ত্যাগ করে জর্দান নদীর পশ্চিম তীর ও গাজা এলাকায় সরে যেতে হবে, দুই. সকল ইহুদি উদ্বাস্তুকে অবিলম্বে ইন্টারন্যাশনাল রেডক্রসের হাতে ছেড়ে দিয়ে ইসরাইলে তাদের স্ব স্ব বাড়ি ও সম্পত্তিতে ফিরে যাবার সুযোগ দিয়ে তাদের পুনর্বাসন করতে হবে এবং তিন. অবৈধ দখলদার সরকারকে স্বীকৃতি না দিয়ে আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে তাদের বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

থামল প্রধানমন্ত্রী।

কিন্তু এই ধরনের কিডন্যাপের ঘটনা ও এইসব শক্ত দাবি-দাওয়া করে আমরা আমাদের টিকিয়ে রাখব কেমন করে? ছোট্ট তোয়া দ্বীপ তখন সবার চোখে পড়ে যাবে। এই কিডন্যাপকে দুনিয়ার কেউ সমর্থন করবে না, আমাদের বন্ধুরাও নয়। এই অবস্থায় আমরা দাবি-দাওয়া করে আমরা আমাদের টিকিয়ে রাখব কেমন করে? ছোট্ট তোয়া দ্বীপ তখন সবার চোখে পড়ে যাবে। এই কিডন্যাপকে দুনিয়ার কেউ সমর্থন করবে না, আমাদের বন্ধুরাও নয়। এই অবস্থায় আমাদের দাবি-দাওয়া আদায় তো দূরের কথা, আমাদের অস্তিত্বও বিপন্ন হবে। স্যার নিশ্চয়

এটা চিন্তা করেছেন। তাই আমি কিছু বুঝতে পারছি না স্যার। বলল অর্থ বিভাগের জন্যে দায়িত্বশীল মন্ত্রী তরুণ অর্থনীতিবিদ শিমন সুলেমান।

শিমন সুলেমান থামতেই প্রধানমন্ত্রী স্যামুয়েল শার্লটক বলল, শিমন, তুমি যে পরিণতির বিষয় সামনে এনেছ, তা অবশ্যই ভাবনার বিষয় যদি কিডন্যাপের ঘটনা তোয়া থেকে আমরা ঘটাই। কিন্তু কিডন্যাপ তো আমরা করছি না। তোয়া এবং আমরা এই কিডন্যাপের সাথে জড়িত নই। কিডন্যাপের পরপরই ইসরাইলের এক ঠিকানা থেকে মিডিয়াকে জানানো হবে, 'ইসরাইল পিপল আর্মি' (আইপিএ) এই কিডন্যাপের ঘটনা ঘটাতে বাধ্য হয়েছে তিনটি ন্যায্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে। সুতরাং কিডন্যাপের দায় ইসরাইল পিপল আর্মির ঘাড়ে গিয়ে বর্তাবে। অতএব তোয়া কিংবা আমাদের কোন পরিণতি নিয়ে ভাববার কিছু নেই।

কথা বলার জন্যে হাত তুলেছিল ইসরাইলের তরুণ মন্ত্রী আবা-ইবান।

কিন্তু দেশরক্ষা মন্ত্রীর সামনে রাখা ওয়ারলেসটা 'বিপ' 'বিপ' সংকেত দিতে শুরু করল।

'এক্সকিউজ মি অল' বলে দেশরক্ষা মন্ত্রী রজার রবীন ওয়ারলেসটা তুলে নিয়ে ঘরের এক পাশে সরে গেল। তার চোখে-মুখে উত্তেজনা।

ওয়ারলেসে কোন কথা বলল না। নীরবে ওপারের কথা শুনে 'থ্যাংকস' দিয়ে ওয়ারলেস বন্ধ করে দ্রুত প্রধানমন্ত্রীর কাছে এল।

সবার দৃষ্টি দেশরক্ষা মন্ত্রীর ওপর নিবদ্ধ।

দেশরক্ষা মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে কানে কানে কিছু বলে ফিরে এসে বসল তার চেয়ারে।

প্রধানমন্ত্রীর মুখটা প্রথমে কিছুটা ম্লান হয়ে গেলেও পরে স্বাভাবিক হয়ে এল।

উদ্বেগ দেখা দিল উদগ্রীবভাবে অপেক্ষমান মন্ত্রীদের মনে। মিশন কি তাহলে ব্যর্থ হয়েছে।

মন্ত্রীদের সবার চোখ এবার প্রধানমন্ত্রীর মুখের উপর নিবদ্ধ।

প্রধানমন্ত্রী একটু নড়েচড়ে বসল।

মুখ তুলল। বলতে শুরু করল, ‘প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ, আপনাদের উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে। উদ্বেগের কিছু নেই। আমরা হানড্রেড পারসেন্ট চাই বটে, কিন্তু সবক্ষেত্রে হানড্রেড পারসেন্ট পূরণ হয় না। কিডন্যাপ মিশন আমাদের সফল হয়েছে। তবে ফিলিস্তিনের প্রধানমন্ত্রীকে আমরা পাইনি। সেদিন সে প্রার্থনা সভায় প্রধানমন্ত্রী হাজির থাকতে পারেননি। তবে প্রধানমন্ত্রী মাহমুদকে না পেলেও তাঁর স্ত্রী এমিলিয়া এবং বায়তুল আকসা মসজিদের খতিব ও ফিলিস্তিন আন্দোলনের সাইমুমের আধ্যাত্মিক নেতা শেখুল ইসলাম আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান দির ইয়াসিনি এই দু’জনকে কিডন্যাপ করা হয়েছে এবং এতক্ষণে তাদের ইসরাইলের বাইরে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে বলে আশা করা হচ্ছে।

লং লিভ ইসরাইল। মিশন সাকসেসফুল। প্রধানমন্ত্রী মাহমুদের দরকার নেই। তাঁর স্ত্রী এমিলিয়া কিংবা শেখুল ইসলাম আব্দুল্লাহকে হাতে পাওয়াই যথেষ্ট ছিল। জিহবাকে ধন্যবাদ যে, দু’জনকেই পাওয়া গেছে। এটা সোনায় সোহাগা। বলল কয়েকজন তরুণ মন্ত্রী সমস্বরে।

যে উদ্দেশ্যে কিডন্যাপ করা সেই চাপ যাতে কার্যকরী হয়, সেটাই এখন নিশ্চিত করতে হবে। ইউরোপ ও আমেরিকার প্রেসের সাহায্য আমরা পাব আশা করছি। কিডন্যাপের সমালোচনা হবে, কিন্তু সেই সাথে বিশ্বের দৃষ্টি ও মনোযোগের ফোকাস আমাদের ওপর কেন্দ্রীভূত হবে। এটাই আমরা চাই। বিশ্বের মনোযোগ আমরা আমাদের দিকে আকৃষ্ট করতে চাই। তার সাথে আমরা সমবেদনাও কিছু পাব। বলল প্রধানমন্ত্রী স্যামুয়েল শার্লটক।

ভালো ফল নির্ভর করছে দীর্ঘদিন তাদের ধরে রাখতে পারার উপর। আমরা সেটা পারছি কিনা এটাই বড় কথা। বন্দীদের কোথায় রাখা হবে, আমরা জানতে চাইবো না। কিন্তু আমরা জানতে চাচ্ছি, যেখানেই আমরা তাদের রাখি, তারা যেন পালাতে না পারে বা উদ্ধার হতে না পারে, আবার তাদের কোন বড় ক্ষতিও না হয় সবই আমরা নিশ্চিত করতে পারছি কিনা। বলল তৃতীয় একজন তরুণ মন্ত্রী।

এসব বিষয় আমরা আগেই ভেবেছি। সব ভেবেই আমরা স্থান বাছাই করেছি যার চেয়ে কোন নিরাপদ স্থান এখন আমাদের হাতে নেই।

প্রধানমন্ত্রী থামলো।

কোন সিনিয়র মন্ত্রী কথা বলছেন না। সবাই গম্ভীর। দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় তারা জানেন এমন পরিস্থিতিতে কি করতে হয়, কি হচ্ছে। তারা ভালোভাবেই অবহিত যে, তারা কি বিপদ, কি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে এবং তাদের সামনে সমস্যা কি, সম্ভাবনাই বা কি। এজন্যে তাদের মনে প্রশ্নের চাইতে ভাবনার ভাবটাই বেশি।

প্রধানমন্ত্রীর কথা শেষ হতেই চতুর্থ একজন তরুণ মন্ত্রী বলল, এক্সকিউজ মি স্যার, আমি জানতে চাচ্ছি কিডন্যাপের ঘটনা প্রকাশ হওয়ার পর বাইরের দুনিয়ার চাপ থেকে আমাদের 'তোয়া' এবং আমরা কতটা নিরাপদ থাকব? ইসরাইল সরকার যে তার অন্তবর্তীকালীন রাজধানী তোয়া দ্বীপে স্থাপন করেছে, এটা অন্তত পাশ্চাত্যের সবাই ইতিমধ্যে জেনে গেছে। কিডন্যাপের দায় বাইরের দুনিয়া আমাদের ওপর চাপানোর চেষ্টা করবে কিনা?'

জরুরি একটা বিষয় বলেছ ইয়ংম্যান, বলতে শুরু করল প্রধানমন্ত্রী, তবে এ ব্যাপারে আমাদের ভূমিকা আমরা ঠিক করেই রেখেছি। কিডন্যাপের ঘটনা প্রচার হওয়ার সাথে সাথে আমরা এ ঘটনার সাথে আমাদের সম্পর্ক থাকার কথা অস্বীকার করব। আমরা বলব, এ্যাফেকটেড হয়েছে এমন অনেক গ্রুপ আছে, তাদেরই হট হেডেড কেউ এই কাজ করেছে। কিডন্যাপাররা যে দাবি করেছে, সেসব দাবি ইসরাইল সরকার আগেই ঘোষণা করেছে। এসব দাবি অবিলম্বে পূরণ হোক, এসব দাবি পূরণে জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক মহল আমাদের সাহায্য করুন আমরা এটা চাই, কিন্তু কিডন্যাপারদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আর একটা কথা, ইউরোপ ও আমেরিকার আমাদের বন্ধু রাষ্ট্রগুলো এই বিপদে আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায়নি ঠিক, কিন্তু আমাদের আশ্রয়স্থল, বর্তমান রাজ্য ও রাজধানী তোয়া দ্বীপ রক্ষায় তারা আমাদের সাহায্য করবে। তারা এ প্রতিশ্রুতি আমাদের দিয়েছে। এমনকি তোয়ার তিন পাশে আরও কয়েকটি দ্বীপ আছে, যার সর্বমোট আয়তন দুই হাজার বর্গমাইল, এ দ্বীপেও আমাদের অধিকারের তারা গ্যারান্টি দিয়েছে। এসব দ্বীপের কোনটির ওপর সাইপ্রাস, কোনটির ওপর বৃটিশ মালিকানার দাবি ছিল। তারা সে দাবি ছেড়ে দিয়েছে। তারা এও নিশ্চয়তা দিয়েছে

যে, প্রায় তিন হাজার বর্গমাইলের দ্বীপ এলাকা নিয়ে আমরা একটা প্রবাসী ইসরাইল রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারি। সুতরাং আমাদের পায়ের তলায় মাটি আছে, আপনারা নিশ্চিত থাকুন।

থামল প্রধানমন্ত্রী।

কিন্তু স্যার যে দুই হাজার বর্গমাইলের দ্বীপমালার কথা বললেন, সেখানে তো সাইপ্রিয়ট ও বৃটিশ জনবসতি আছে, তাদের কি হবে? বলল শিমন সুলেমান।

এটা সমস্যা ছিল, কিন্তু তারও সমাধান হয়ে যাচ্ছে। সাইপ্রাস ও বৃটেন উভয়েই তাদের লোক সরিয়ে নিচ্ছে বিকল্প জায়গায়। সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই দ্বীপগুলো আমাদের দখলে আসবে। প্রধানমন্ত্রী বলল।

ধন্যবাদ স্যার দুঃখের মধ্যেও বড় একটা শুভ সংবাদের জন্যে। আরেকটা বিষয় স্যার, আমাদের এই তোয়া দ্বীপে কয়েকটা আইন-শৃঙ্খলা বিরোধী গ্রুপ আছে যারা ইহুদি বংশোদ্ভুত হলেও জাত ক্রিমিনাল। এরা ইতিমধ্যেই কয়েকটা ঘটনা ঘটিয়েছে, যাদের দ্বারা আমাদের সরকারি লোকরা পর্যন্ত আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দরকার। বলল পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন মন্ত্রী ইসরাইল আবা ইবান।

ধন্যবাদ ইবান বিষয়টা উত্থাপন করার জন্যে। ঘটনাগুলো এবং তাদের বিষয়টা জেনারেল শামিল এরফান ইতিমধ্যেই আমার নজরে এনেছেন। আমি নির্দেশ দিয়েছি তাদের ওপর চোখ রাখা এবং তাদের ব্যাপারে সব তথ্য সংগ্রহ করতে। এ্যাকশনে যাওয়ার আগে যদি তাদের সব ব্যাপার জানা যায় তবে তাদের সমূলে উপড়ে ফেলা যায়। তবে অভ্যন্তরীণ ব্যাপার নিয়ে আমাদের সকলকে ধৈর্যের সাথে এগোতে হবে। এখনই এই সময়ে ভাল-মন্দ সবার সহযোগিতা আমাদের দরকার।

এবার দেশরক্ষা মন্ত্রী রজার রবীনের ওয়ারলেস সংকেত দিয়ে উঠল।

'এক্সকিউজ মি অল' বলে ওয়ারলেস নিয়ে ঘরের এক পাশে সরে গেল।

এবারও সে ওপারের কথা শুনে কোন কথা না বলে ধন্যবাদ দিয়ে ওয়ারলেস বন্ধ করে প্রধানমন্ত্রীর কাছে সরে এল। বলল কানে কানে কিছু কথা। তারপর ফিরে এসে বসল সে তার চেয়ারে।

প্রধানমন্ত্রীর চোখে আনন্দের উজ্জ্বলতা ফুটে উঠেছে।

সবার দৃষ্টি প্রধানমন্ত্রীর দিকে।

প্রধানমন্ত্রী মুখ খুলল। বলল, প্রিয় সহকর্মী বন্ধুগণ, আমাদের মিশন সব ঝুঁকি পেরিয়ে নিরাপদ অবস্থার মধ্যে এসে গেছে। মিশন এখন জিম্মিদের নিয়ে তাদের যেখানে রাখা হবে, সেদিকে এগোচ্ছে। সবাই প্রার্থনা করুন মিশনের বাকি অংশটুকুও যেন নিরাপদ হয়।

একটু থামল প্রধানমন্ত্রী স্যামুয়েল শার্লটক। তার পরেই বলে উঠল, মন্ত্রীসভার সম্মানিত সদস্যবৃন্দ মন্ত্রীসভার আজকের বৈঠকের এখন মুলতবি হচ্ছে। সবাইকে ধন্যবাদ।

উঠে দাঁড়াল প্রধানমন্ত্রী স্যামুয়েল শার্লটক।

তার সাথে উঠে দাঁড়াল সবাই।

গাজায় সাইমুমের একটা আঞ্চলিক সম্মেলনে বক্তব্য দিচ্ছেন আহমদ মুসা।

বক্তৃতার তখন পিক আওয়ার।

হলভর্তি সাইমুমের শ্রোতা। পিনপতন নীরবতা।

পকেটের মোবাইল আবারো বেজে ওঠল আহমদ মুসার বেসুরো আওয়াজে। আরো কয়েকবার বেজেছে এর আগে। তখন এ্যাভয়েড করেছে।

এবার আর কল রিজেক্ট করল না আহমদ মুসা।

বক্তৃতা অব্যাহত রেখেই আহমদ মুসা এক হাত দিয়ে মোবাইল বের করে স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে দেখল ফিলিস্তিনের প্রধানমন্ত্রী মাহমুদের পিএস-এর টেলিফোন। কোন জরুরি খবর বা মেসেজ না থাকলে আহমদ মুসাকে তার টেলিফোন করার কথা নয়।

কল রিসিভিং বাটনে চাপ দিয়ে সবার উদ্দেশ্যে ‘এক্সকিউজ মি’ বলে আহমদ মুসা মোবাইল কানের কাছে তুলে নিল।

‘হ্যালো’ বলে আহমদ মুসা সাঁড়া দিতেই ওপার থেকে মাহমুদের পিএস ড. আব্দুল্লাহ আকরামের কম্পিত, ভাঙা কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সালাম দিয়ে বলল, স্যার, ম্যাডাম এমিলিয়া কিডন্যাপড হয়েছে, তার সাথে কিডন্যাপড হয়েছে বায়তুল আকসার মহামান্য খতিব শেখুল ইসলাম শেখ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান দির ইয়াসিনি।

বলছ কি তুমি! কখন ঘটল? কি করে ঘটল? কোথায় ঘটল? মাহমুদ কোথায়? ঝড়ের মত প্রশ্নগুলো উচ্চারিত হলো আহমদ মুসার উদ্বিগ্ন কণ্ঠে।

‘স্যার, আপনি জানেন জেরুসালেমে মসজিদুল আকসায় আজ শোকরানা দিবস উপলক্ষে দোয়ার অনুষ্ঠান ছিল। দোয়ার অনুষ্ঠান শেষে মানুষ যখন ফেরার মুখে ছিল, ম্যাডামসহ খতিব সাহেবানরা যখন গাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন, তখন অনেকগুলো বোমার বিস্ফোরণ হয়, গুলী-গোলাও হয়। এরই মধ্যে তারা কিডন্যাপড হন। বলল ড. আব্দুল্লাহ আকরাম।

মাহমুদের কি খবর, অনুষ্ঠানে তো তারও যাওয়ার কথা ছিল। আহমদ মুসা বলল।

স্যার, শেষ মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী স্যারকে প্রোগ্রাম চেঞ্জ করে জরুরি প্রয়োজনে তেলআবিবে আসতে হয়। ম্যাডাম যান ওখানে।

‘ইন্নালিল্লাহে..........., মাহমুদ এখন কোথায়? আহমদ মুসা বলল।

স্যার, উনি খবর পেয়েই হেলিকপ্টারে দ্রুত জেরুসালেমে চলে গেলেন। আপনাকে কয়েকবার চেষ্টা করে পাননি। আপনাকে সব জানানোর দায়িত্ব দিয়ে উনি চলে গেলেন। ড. আব্দুল্লাহ বলল।

ধন্যবাদ আব্দুল্লাহ, আমি এখনি জেরুসালেম রওয়ানা হচ্ছি। বলে কল অফ করে পকেটে মোবাইল রাখতে রাখতে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলল, প্রিয় ভাইয়েরা, আপনাদের প্রিয় স্বাধীনতা, আপনার প্রিয় রাষ্ট্রের ওপর শত্রুরা আঘাত হেনেছে, প্রথম আঘাত, কাপুরুষের মত আঘাত। তারা প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী ম্যাডাম এমিলিয়া এবং মসজিদুল আকসার খতিব আমাদের সকলের উস্তাদ, নেতা শেখ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমানকে কিডন্যাপ করে জেরুসালেমের অনুষ্ঠান থেকে........।

সম্মিলিত কণ্ঠে ইন্নালিল্লাহ উচ্চারিত হলো এবং ইহুদিবাদ বিরোধী গগণবিদারী শ্লোগান ওঠল হল থেকে আহমদ মুসার কথার মধ্যেই। আহমদ মুসা হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বলল, সবাই ধৈর্য ধরুন, আল্লাহর ওপর ভরসা করুন। আমি আমার কথা এখানেই শেষ করছি। আসসালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লা।

কথা শেষ করে আহমদ মুসা মঞ্চের দিকে চেয়ে বলল, আমাকে এখনি রওয়ানা হতে হচ্ছে জেরুসালেমে।

মঞ্চে নেতৃবৃন্দের সবার মুখই উদ্বেগে আশংকায় থমথমে। সাইমুমের গাজা এলাকার চীফ এবং গাজার গভর্নর উঠে দাঁড়ালো। গভর্নরই কথা বলল, অবশ্যই আপনাকে যেতে হবে স্যার। তবে হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা একটু বিলম্ব হবে স্যার। একটাই হেলিকপ্টার গাজায়, ওটা সকালে হ্যাংগারে গেছে, এতক্ষণ ঠিকঠাক হয়ে যাওয়ার কথা।

আহমদ মুসা বলল গভর্নরকে, হেলিকপ্টারের জন্যে দেরি করা যাবে না। আমার গাড়ি রেডি আছে। আমি গাড়িতেই যাচ্ছি।

গভর্নর সাইমুম চীফ যুবায়েরের দিকে চেয়ে বলল, তুমি কয়েকজনকে নিয়ে জেরুসালেমে পৌছা পর্যন্ত স্যারের সাথে থাকবে।

পেছনে বসা গাজার পুলিশ প্রধানের দিকে চেয়ে বলল, দু'জন অফিসারের নেতৃত্বে দুই গাড়ি পুলিশ দাও, তারা স্যারের গাড়ির আগে ও পেছনে থাকবে।

যুবায়ের ও গাজার পুলিশ প্রধান আব্দুল্লাহ আকিল সংগে সংগেই বেরিয়ে গেল।

'মি. গভর্নর, আমার আগে পিছে পাহারা বসিয়ে আমাকে দেখছি দুর্বল করে ফেলতে চাচ্ছেন। এত আয়োজনের মধ্যে ভিআইপি হিসেবে আমি তো ওদের চোখে পড়ে যাব। হাসতে হাসতে বলল আহমদ মুসা।

স্যার আপনার নিরাপত্তা আমাদের টপ প্রয়োরিটি। যা করছি খুবই কম। এটুকু মিনিমাম ব্যবস্থা না করে আপনাকে আমরা ছাড়তে পারি না।

জেরুসালেমের সাংঘাতিক ঘটনা ঘটার এটাই শিক্ষা। বলতে বলতে কান্নায় রুদ্ধ হয়ে গেল গভর্নরের কণ্ঠ।

আহমদ মুসা গভর্নরের পিঠে হাত রেখে সান্তনার স্বরে বলল, সব ঠিক হয়ে যাবে গভর্নর। ওদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবে। আল্লাহ আমাদের সহায়।

আল্লাহু আকবার। নিশ্চয় সর্বশক্তিমান আল্লাহই আমাদের সহায়। আপনাকে আল্লাহই পাঠিয়েছেন। আমাদের সবার আস্থার কেন্দ্র আপনি। তবু দুর্বল মন আমাদের, উদ্বেগ দূর করতে পারি না। ভারী কণ্ঠ গভর্নরের। চোখ মুছতে মুছতে কথাগুলো বলল সে।

আহমদ মুসা গর্ভনরের পিঠ চাপড়ে বলল, চলুন আমরা বের হই। দেখি, ওরা প্রস্তুত হলো কিনা।

চলুন স্যার। বলল গভর্নর।

দু'জনেই পা বাড়াল বাইরের দিকে।

# ২

আহমদ মুসা জেরুসালেমে পৌছে প্রধানমন্ত্রীর প্রশাসনিক ভবনের সামনে গাড়ি থেকে নেমেই দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে দোতলার বারান্দায় উঠে গেল।

সামনেই প্রধানমন্ত্রী মাহমুদের অফিস কক্ষ। দরজা খোলা।

আহমদ মুসা দ্রুত প্রবেশ করল অফিস কক্ষে।

প্রধানমন্ত্রীর অফিস কক্ষের সোফায় বসে ছিল আব্দুল্লাহ জাবের, আব্দুল্লাহ আমিন, এহসান সাবরী, জাফর জামিল, যুবায়ের আওয়াস, তালাত বে সবাই। সবাই এরা ফিলিস্তিন বিপ্লবের এক একটি করে স্তম্ভ, সংগ্রামের মনি-মানিক্য।

সবারই উদ্বেগ-আশংকায় মুষড়ে পড়া চেহারা।

আহমদ মুসাকে দেখেই সবাই উঠে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা সালাম দিয়েছিল।

ওরা সালাম গ্রহণ করল।

প্রধানমন্ত্রী মাহমুদ তার টেবিলে ছিল না।

মাহমুদ কোথায়? জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

কারও কাছ থেকে উত্তর এল না। সবার মুষড়ে পড়া চেহারায় ফেনিয়ে উঠেছে যেন বাধ ভাঙা আবেগ। বিপদগ্রস্ত অসহায় কোন মানুষ হঠাৎ স্বজনকে কাছে পেয়ে যেমন বাকরুদ্ধ কান্নায় ভেঙে পড়তে পারে। এদের অবস্থা তাই। এদের দু'চোখ থেকে দর দর করে নামছে অশ্রু।

এ সময় পাশের রুম থেকে মাহমুদ এসে তার অফিস কক্ষে প্রবেশ করল। আহমদ মুসাকে দেখেই ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল। সে আরও শিশুর মত কেঁদে ফেলল আহমদ মুসাকে পেয়ে।

আহমদ মুসা পিঠে হাত বুলিয়ে সান্তনার স্বরে বলল, মাহমুদ তুমিও এভাবে ভেঙে পড়েছে। তুমি না প্রধানমন্ত্রী!

মুসা ভাই, এই প্রথম কাঁদলাম। আল্লাহর পরে আপনার কাছে ছাড়া আমার তো কাঁদার জায়গা নেই। এটুকু না কাঁদলে আমি মরে যাব। মুসা ভাই সিনবেথের টর্চার সেল থেকে একদিন আমি তাকে উদ্ধার করে এনেছিলাম। দ্বিতীয়বার সে সেই টর্চার সেলে বন্দী হয়েছে আরও অনেক বেশি অপরাধ নিয়ে। আমি যে ভাবতেও পারছি না মুসা ভাই। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল মাহমুদ।

আহমদ মুসা কোন কথা না বলে তাকে ধরে নিয়ে এসে প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে বসাল। চোখ মুছে দিয়ে বলল, তুমি যা বলার বলেছ, এসব নিয়ে দ্বিতীয়বার কথা বলো না। ভুলে যেয়ো না আল্লাহ আছেন এবং তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাশালী, তোমার সিনবেথের ওপরও।

বলে মাহমুদের সামনে চেয়ারে এসে বসল।

মাহমুদ রুমাল দিয়ে মুখটা ভালো করে মুছল। আহমদ মুসার শেষ কথাগুলো তার চোখে-মুখে ঔজ্জল্যের এক তড়িৎ প্রবাহ নিয়ে এসেছে। বলল, এক্সকিউজ মি মুসা ভাই। আল্লাহ সবার ওপর ক্ষমতাশালী।

'ধন্যবাদ মাহমুদ' বলে তাকাল আহমদ মুসা সোফায় বসা আব্দুল্লাহ জাবের, এহসান সাবরীদের দিকে। বলল, তোমরাও সফল বিপ্লবের একজন করে সিপাহসালার। তোমরাও কি ভুলে গিয়েছিলে আল্লাহ আছেন তোমাদের অভিভাবক হিসেবে?

স্যরি আহমদ মুসা ভাই, অবস্থা আমাদের জ্ঞান শূন্য করে দিয়েছে। পুলিশ ও আমরা স্পটের প্রাথমিক তদন্ত সম্পূর্ণ করেছি। কোন ক্লুই পাওয়া যায়নি। অবস্থা আমাদের দিশেহারা করে দিয়েছে মুসা ভাই। বলল আব্দুল্লাহ জাবের।

আহমদ মুসা ঘুরে বসল মাহমুদের দিকে। বলল, তোমার পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ কি বলছে? কিডন্যাপাররা কতজন ছিল, কি তাদের চেহারা, কোন পথে কিভাবে এল, কিভাবে গেল, এসব ব্যাপারে বলেছে কিছু?

তাদের ধারণা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে তারা এসেছে। কয়েক গ্রুপ বোমা ফেলেছে। একাধিক গ্রুপ কিডন্যাপের কাজ করেছে। যা বোঝা যাচ্ছে, তাতে তারা ভাড়া করা ট্যাক্সিতে এসেছে, কিন্তু যাওয়ার সময় এ্যাম্বুলেন্সে করে পালিয়েছে। এ্যাম্বুলেন্সও তাদের লোকরাই এনে রেখেছিল। বোমা- বিস্ফোরণের

পর তাদের এ্যাম্বুলেন্স নিয়ে সরে পড়া সহজ হয়েছে। পুলিশ এ্যাম্বুলেন্সকে শহরের উত্তর দক্ষিণ প্রান্তে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। বলল মাহমুদ।

গুলি-গোলা শুধু ওরাই চালিয়েছে, না পুলিশও? আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

কিডন্যাপের সময় ওরা গুলী চালিয়েছে। আমাদের পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবকরাও গুলী চালিয়েছে, কিন্তু সেগুলো ফাঁকা গুলী ছিল, না পয়েন্টেড বলা মুষ্কিল। বলল মাহমুদ।

ওদের কেউ মারা গেছে? জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

মৃতের মধ্যে পুলিশ আছে, স্বেচ্ছাসেবক আছে এবং সাধারণ লোক। বিশেষ পোশাকের সন্দেহজনক কাউকে পাওয়া যায়নি। মাহমুদ বলল।

কিডন্যাপাররা বিশেষ পোশাকে ছিল বলে কোন প্রমাণ পাওয়া গেছে? বলল আহমদ মুসা।

না এরকম কেউ বলেনি। মাহমুদ বলল।

তার মানে কিডন্যাপাররা সাধারণ মানুষের পরিচিত পোশাকেই ছিল। আহমদ মুসা অনেকটা স্বগতোক্তি করল।

পরক্ষণেই আবার বলল, আমি স্পট দেখতে চাই, লাশগুলো কোথায়? জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

স্পটটা 'এ্যাজ ইট ইজ' আছে। লাশগুলোও সেভাবেই আছে। আপনার দেখার জন্যেই এভাবে রাখা হয়েছে। বলল মাহমুদ।

আহমদ মুসা আব্দুল্লাহ জাবেরদের দিকে চেয়ে বলল, চল তাহলে যাই।

বলেই মাহমুদের দিকে  ফিরে বলল, পুলিশরা তো ওখানে আছে, না?

আছে। আমিও আপনার সাথে যাব আহমদ মুসা ভাই। প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধের সুর।

'চল তোমরা নাকি আবার প্রটোকল লাগবে দেরি হবে না তো? বলল আহমদ মুসা।

ঘটনার পর প্রটোকল অনেকের জন্যেই হয়েছে, আপনার জন্যেও। ইচ্ছা করলেই আর আপনি যখন-তখন যেখানে সেখানে যেতে পারবেন না। তবে চলুন, এখন আমার এক প্রটোকলেই সবার হয়ে যাবে।

বায়তুল আকসা মসজিদের চত্বরে পৌছল সবাই।

বিভৎস দৃশ্য।

চারটি এলাকাকে কেন্দ্র করে বোমা ফাটানো হয়েছে। এমিলিয়া ও খতিবকে যে দিক দিয়ে গাড়িতে নিয়ে আসা হচ্ছিল তার দু'পাশে এবং পেছনের মূল ভেনুতে গাড়ি ও এ্যাম্বুলেন্স ছিল সেখানে।

মোট পঞ্চাশটির মত লাশ পড়ে আছে। আহতরা পুলিশ পাহারায় হাসপাতালে।

গোটা স্পটের দিকে তাকিয়ে আহমদ মুসা বলল, ঠিক বলেছে তোমার পুলিশ, ওরা অনেকগুলো গ্রুপে বিভক্ত ছিল। যারা বোমা ছুঁড়েছে, গুলী-গোলা চালিয়েছে তারা কিন্তু কিডন্যাপ করেনি। বোমা ছুঁড়ে মানুষকে প্যানিকি সরিয়ে দিয়েছে। তারপর যারা ম্যাডাম এমিলিয়া ও খতিব মহোদয়ের নিরাপত্তা দিচ্ছিল, তাদের উদ্দেশ্যে গুলী ছুঁড়ে হত্যা করে কিডন্যাপ নির্বিঘ্ন করা হয়েছে।

গুলীতে নিহত পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবকদের লাশ যেখানে পড়েছিল, সেখানে গেল আহমদ মুসা। নিহত তিনজন পুলিশ ও চারজন সাইমুম স্বেচ্ছাসেবকের লাশ সেখানে ছিল। আহমদ মুসা বলল, বোমা ফাটার পর এরাই সম্ভবত ম্যাডাম ও খতিবকে আগলে রেখে গাড়ির দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। এদেরকে হত্যা করেই তাদের কিডন্যাপ করা হয়েছে।

কিন্তু চারদিকে ঘিরে রাখা এদেরকে গুলী করতে গিয়ে ওরা ম্যাডামদেরও ক্ষতি করেনি তো! বলল এহসান সাবরী।

না এহসান, ওরা ব্রাশ ফায়ার করেনি, এলোপাথারিও গুলী ছোঁড়েনি। রিভলবার দিয়ে ওরা পয়েন্টেড গুরী করেছে। দেখ না সবারই বুক কিংবা মাথা গুলীবিদ্ধ হয়েছে। ওরা ছিল একদমই ঠান্ডা মাথার প্রফেশনাল।

বলতে বলতে আহমদ মুসা হাঁটছিল গাড়ি যেখানে ছিল সেদিকে। পথে আহমদ মুসা দুই জায়গায় দলা পাকানো তুলা কুড়িয়ে পেয়ে থমকে দাঁড়াল। তুলাগুলো নাকের কাছে নিল। যা সন্দেহ করেছিল তাই। তুলাগুলোতে ক্লোরোফর্মের গন্ধ। আহমদ মুসা দুই দলা তুলা মাহমুদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, ওদেরকে সংজ্ঞাহীন করে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। খুব চালাক ওরা।

সংজ্ঞাহীন দু'জনকে ওরা যখন ধরাধরি করে এ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন কেউ দেখলেও তাদের সন্দেহ হয়নি। ভেবেছে বোমায় আহতদের এ্যাম্বুলেন্সে নেয়া হচ্ছে। আর কিডন্যাপকারী যারা ওদের ধরাধরি করে নিয়ে গেছে তারা সাধারণ ফিলিস্তিনিদের পোশাকে ছিল অথবা পুলিশের পোশাকেও থাকতে পারে। যাই হোক ওদের পরিকল্পনা নিখুঁত ছিল।

আহমদ মুসা ঘুরে ঘুরে সব লাশই দেখল।

মঞ্চের কিছু দূর সামনে যেখানে অনেকগুলো লাশ পড়ে আছে, তাদের থেকে কিছুটা দূরে পড়ে থাকা একটা লাশ দেখছিল আহমদ মুসা। মাথায় গুলীবিদ্ধ হয়ে সে মারা গেছে। মুখের চেহারাটা প্রায় রক্তে ঢেকে গেছে। গায়ে আরবী আলখেল্লা। চিৎ হয়ে পড়ে আছে। আলখেল্লার বোতামগুলো খোলা। খোলা জায়গা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ভেতরের কলারবিহীন টি-সার্টের একটা অংশ। টি-সার্টের বুকের ওপরের সেই অংশে একটা মনোগ্রাম ষ্টিকারের ওপর তার চোখ আটকে গেল। ঝুঁকে পড়ল আহমদ মুসা। একটা ছবির ওপর রোমান হরফে ক্যালিওগ্রাফি ঢংয়ে সাইপ্রাস লেখা। আর প্রথম দৃষ্টিতে মুখ তোলা ক্যাংগারুর মত যাকে ছবি মনে হয়েছিল ওটা ছবি নয়, সাইপ্রাসের মানচিত্র। বসে পড়ল আহমদ মুসা। তার চোখে বিস্ময়, সাইপ্রাসের টি-সার্ট ফিলিস্তিনে! কোন সময়ই তো দেখা যায়নি। কিন্তু বসার পর সাইপ্রাসের নীল মানচিত্রের নিচটা ঘেঁষে ছোট হরফের লেখা চার শব্দের একটা লাইন চোখে পড়ল আহমদ মুসার। হিব্রু হরফ লেখা দেখে ভূত দেখার মত চমকে ওঠল আহমদ মুসা। হিব্রু হরফের লেখাটা হলো, 'নিউ তোয়া ইন্টারপ্রাইজ, তোয়া।' 'তোয়া দ্বীপ'টা আহমদ মুসার চোখের সামনে ভেসে উঠল। তোয়া দ্বীপের বসতির প্রায় গোটাটাই ইহুদি। আর গোয়েন্দা রিপোর্ট হলো, এই তোয়াতেই গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে ইসরাইল সরকারের অবশিষ্ট অংশ। তার মানে এই অভিযানের গোড়া তোয়ায়। তাহলে এমিলিয়াদেরকে 'তোয়া'তেই নেয়া হয়েছে! এসব চিন্তায় বুঁদ হয়ে গিয়েছিল আহমদ মুসা। তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল মাহমুদ ও আব্দুল্লাহ জাবেররা। তারা নিশ্চিত আহমদ মুসা টি-সার্টটায় গুরুত্বপূর্ণ কিছু পেয়েছে।

মুসা ভাই, গুরুত্বপূর্ণ কিছু? একটু ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করল মাহমুদ।

শুধু গুরুত্বপূর্ণ নয়, মহাগুরুত্বপূর্ণ। বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো আহমদ মুসা।

চারদিকে একবার তাকাল। জাবের, মাহমুদরা ছাড়া আশেপাশে কেউ নেই। পুলিশরা স্পটের চারদিকে ঘিরে দাঁড়ানো। মাহমুদের নিরাপত্তা প্রহরীরাও কিছু দূরে দাঁড়িয়ে।

সবার দৃষ্টি আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা নিচু কণ্ঠে বলল, এই যুবক ইহুদি। সে বন্দুকবাজদের একজন। দেখ তার আশেপাশে রিভলবার পাওয়ার কথা। বলে আহমদ মুসা চারদিকে তাকাল। বলল আব্দুল্লাহ জাবেরের দিকে তাকিয়ে, তোমরা লাশটাকে এখান থেকে সরাও দেখি।

লাশটা কয়েক হাত সরিয়ে নিল।

লাশের তলা থেকে বেরিয়ে পড়ল তার রিভলবার।

কিছু বলতে যাচ্ছিল এহসান সাবরী। আহমদ মুসা তাকে বাধা দিয়ে বলল, আমার কথা শেষ হয়নি এহসান।

'স্যরি' বলে চুপ করল এহসান সাবরী।

বন্দুকবাজ যারা ম্যাডাম এমিলিয়া ও খতিব মহোদয়কে নিরাপত্তা দানকারী আমাদের পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবকদের হত্যা করেছে, এ যুবক তাদের একজন। তবে এর রিভলবার বের করাটা একটু আগেই হয়ে গিয়েছিল এবং পুলিশ বা স্বেচ্ছাসেবকরা তাকে দেখতে পায়। ফলে পুলিশ বা স্বেচ্ছাসেবকদের গুলীতে সে নিহত হয। সে নিহত হওয়ার সময় অন্যেরা বোধ হয় একটু সময় নিয়ে একযোগে ব্যস্ত ছিল। একটু থামল আহমদ মুসা।

থেমেই আবার বলে উঠল, আমার মনে হয়, আমাদের যা জানার তা জেনে গেছি। এই যুবক 'তোয়া দ্বীপ' থেকে এসেছে। আর তোমরা জান 'তোয়া দ্বীপ' এখন কি। আমি নিশ্চিত ম্যাডাম এমিলিয়া ও খতিব মহোদয়কে কিডন্যাপ করে তোয়ায় নেয়া হয়েছে।

মাহমুদসহ সবার চোখে-মুখে আকস্মিকতার এক বিস্ময়।

যুবকটি কি তোয়া দ্বীপের? বলল মাহমুদ। তার কণ্ঠে বিস্ময় ও উদ্বেগ।

যুবকটির টি-সার্টটি সাইপ্রাসে তৈরি। সাইপ্রাস থেকে 'তোয়া' দ্বীপের একটা প্রতিষ্ঠান টি-সার্ট ইমপোর্ট করেছে। প্রতিষ্ঠানটির সিল আছে টি-সার্টটির মনোগ্রামের নিচে। আর টি-সার্টটি একেবারে নতুন। বলল আহমদ মুসা।

মাহমুদ, জাবেররা এগিয়ে গিয়ে যুবকটির টি-সার্টের মনোগ্রাম দেখল।

উঠে দাঁড়াল ওরা। বলল মাহমুদ, আহমদ মুসা ভাই ঠিক বলেছেন, যুবকটি 'তোয়া' থেকে এসেছে সেটা নিশ্চিতই বলা যায়। কিন্তু একটা প্রমাণ থেকেই কি আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারি?

এস আরও বিকল্প তালাশ করি। যদি না পাওয়া যায়, তাহলে যা পাওয়া গেছে তাকেই টার্গেট করতে হবে। আহমদ মুসা বলল।

মাহমুদ কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার ওয়ারলেসটি 'বিপ' 'বিপ' সংকেত দিয়ে ওঠল।

সে পকেট থেকে ওয়াললেসটি তুলে নিল। সালাম দিয়ে 'ইয়েস মাহমুদ' বলে কথা শুনতে লাগল ওপারের।

মাঝে মধ্যে দু'একটা প্রশ্ন ছাড়া মাহমুদ শুনেই চলল। মুখ তার অনেকখানি সহজ হয়ে এসেছে।

ওপারের কথা শুনতে শুনতেই মাহমুদ তাকাল আহমদ মুসার দিকে।

ওপারের কথা শেষ হতেই মাহমুদ আহমদ মুসার উদ্দেশ্যে দ্রুতকণ্ঠে বলল, মুসা ভাই, কথা বললাম আমাদের গোয়েন্দা প্রধানের সাথে। উনি সুনির্দিষ্ট কিছু তথ্য দিয়েছে, যা আপনার তত্বকেই সমর্থন করছে। এমিলিয়াদের ওরা মনে হচ্ছে 'তোয়া'তেই নিয়েছে।

কি তথ্য দিয়েছেন তিনি। জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য থেকে তারা জেনেছেন, জেরুসালেমের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে যেখানে এ্যাম্বুলেন্স পাওয়া গেছে, সেখানকার একজন প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, এ্যাম্বুলেন্স থেকে বেরিয়ে কয়েকজন লোক দু'জন মানুষকে ধরাধরি করে রাস্তার পাশে দাঁড়ানো এক বড় প্রাদো জীপে তুলেছে। তারপর দ্রুত উত্তর দিকে চলে গেছে। কিডন্যাপ ঘটনার এক ঘণ্টার মধ্যে প্রাদো জীপটাকে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে সামারিয়া পর্যন্ত পৌছে। যেহেতু জীপটা সামারিয়াতে

পাওয়া গেছে, তাই ধারণা করা হচ্ছে উত্তর দিকেই তারা গেছে। আমাদের গোয়েন্দা বিভাগ লেবানন গোয়েন্দা বিভাগকে অনুরোধ করেছিল তাৎক্ষণিকভাবে দেখার জন্যে যে, দক্ষিণ লেবাননে ফিলিস্তিনের কোন গাড়ি বা এ্যাম্বুলেন্স অথবা সন্দেহভাজন কোন গাড়ি বা এ্যাম্বুলেন্স তারা দেখতে পায় কিনা। সেখান থেকে দু'টি খবর পাওয়া গেছে। আমাদের সর্ব উত্তর-পূর্বের শহর ক্বিরাত শামোনা থেকে ১০ মাইল উত্তরে আমাদের বর্ডার ও লেবাননের লিতানি নদীর কাছাকাছি রাস্তার পাশে আমাদের একটি মিলিটারি ট্রাক পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। দ্বিতীয় খবর হলো, লেবাননের টায়ার বন্দরের পাশে একটা ট্রলার জেটির বাইরে একটা এ্যাম্বুলেন্স পড়ে থাকতে দেখা গেছে। এদিকে ঘটনার দুই ঘণ্টা পরের একটা তথ্য পাওয়া গেছে আমাদের সর্ব উত্তর-পূর্বের বাইরে ঐ ক্বিরাত শামোনা থেকে। পুলিশ জানিয়েছে, একটা মিলিটারি ট্রাককে তারা দ্রুত গতিতে উত্তরে সীমান্তের দিকে যেতে দেখেছে। এসব তথ্য থেকে আমাদের গোয়েন্দা বিভাগেরও ধারণা কিডন্যাপাররা এই রুটে এবং এই গাড়িগুলেই ব্যবহার করেছে এবং সাগর পথেই কোথাও তারা গেছে। থামল মাহমুদ।

আহমদ মুসা গম্ভীর। বলল, তোমাদের গোয়েন্দা বিভাগকে ধন্যবাদ কিডন্যাপারদের তথ্য যোগাড়ের ক্ষেত্রে যা সাধ্যে কুলায় তার সবটুকুই তারা করেছে। আমরা এখন নিশ্চিত ধরে নিতে পারি, তারা ট্রলার নিয়ে লেবাননের কোনো শহরে অবশ্যই যায়নি, তুরস্কে প্রবেশেরও প্রশ্ন ওঠে না, তারা অবশ্যই হয় সাইপ্রাস, না হয় সোজা 'তোয়া' দ্বীপে চলে গেছে। হতে পারে গভীর সাগরে কোন জাহাজ তাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। ট্রলার থেকে তারা সে জাহাজে উঠেছে।

একটু থামল আহমদ মুসা। ভাবল একটু। তারপর বলল, তাদের এই কিডন্যাপ অভিযান ছিল অত্যন্ত সুপরিকল্পিত এবং অনেক প্রস্তুতির ফল। তবে তাদের দুর্ভাগ্য তারা আসল লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি।

মাহমুদ এবং সবার চোখে বিস্ময়। মাহমুদেরই প্রশ্ন, একথা বলছেন কেন মুসা ভাই? এমিলিয়া এবং মহামান্য খতিব ও আমাদের নেতা শেখ আব্দুল্লাহকে তারা হাতে পেয়েছে।

মাহমুদ, মহামান্য খতিবকে তারা বিকল্প হিসেবে নিয়ে গেছে। আসল টার্গেট ওদের ফিলিস্তিনের প্রধানমন্ত্রী ও তার স্ত্রীকে একই সাথে কিডন্যাপ করা। মাহমুদ তুমি তেলআবিব চলে যাওয়ায় বেঁচে গেছ। তোমাকে না পেয়ে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে তারা বায়তুল আকসার খতিবকে নিয়ে গেছে। অবশ্য এ শিকারও তাদের জন্যে খুব বড়, এ কথা নিশ্চয় তারা এখন ভাবছে। বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই জাবের, এহসান সাবরীরা সমস্বরে বলল, ঠিক বলেছেন মুসা ভাই।

তারপর আব্দুল্লাহ জাবের বলে উঠল, নিশ্চিতভাবে এটাই তাদের ষড়যন্ত্র ছিল। তাদের অসম্ভব আয়োজন থেকেও এটা বুঝা যায়। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী কিডন্যাপড! রাষ্ট্রের মর্যাদা কোথায় গিয়ে দাঁড়াত! প্রমাণ হতো, দেশে আইন-শৃঙ্খলা বলতে কিছু নেই। প্রধানমন্ত্রীকে কিডন্যাপ করতে পারলে তাদের বোধ হয় আরো কোন পরিকল্পনা ছিল।

হ্যাঁ, আব্দুল্লাহ জাবের, তারা দেশে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টির সুযোগ নিত। এ প্রস্তুতিও হয়তো তাদের ছিল।

আহমদ মুসা একটু থামল। থেমেই আবার বলল, বিপ্লব করা যত কঠিন, বিপ্লব রক্ষা করা তার চেয়েও কঠিন। শত্রুর এই আঘাত তোমাদের এলার্ট করে দিয়ে গেল মাহমুদ।

মাহমুদের চোখে-মুখে উদ্বেগ। বলল, সব কথাই ঠিক। শত্রুরা বসে নেই, কিন্তু আমরা সাফল্যের আবেশে বসে গিয়েছিলাম। আল্লাহ তারই শাস্তি দিয়েছেন হয়তো! আল্লাহ আমাদের মাফ করুন।

একটু থেমে আবার শুরু করল, বুঝতে পারছি, আমাদের অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা এবং বাইরের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে আরও সাবধান, আরও সক্রিয় হতে হবে। অন্যদিকে কিডন্যাপারদের কবল থেকে ওঁদের মুক্ত করার জন্যে আশু পদক্ষেপ প্রয়োজন। বলুন মুসা ভাই এখন আমাদের কি কি করণীয়?

বলেই অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল মাহমুদ।

মাহমুদ তোমাকে অস্থির হলে চলবে না। শান্ত হতে হবে তোমাকে। সব ঠিক আছে, সবই ঠিক হয়ে যাবে। তুমি জান, তোমার সহকর্মীরা অভ্যন্তরীন আইন-

শৃঙ্খলার ব্যাপারে কি করতে হবে। বৈদেশিকভাবে তেমন ভয়ের কোন ক্ষেত্র নেই তুমি সেটা জান। আর কিডন্যাপারদের ডিল করার ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও, তুমি প্রধানমন্ত্রী নাহলে মাহমুদ, এ দায়িত্ব তোমাকেই দিতাম।

হঠাৎ সজল হয়ে ওঠা মাহমুদের দু'চোখ জড়িয়ে ধরল এসে আহমদ মুসাকে। দরদর করে তার দু'চোখে নেমে এল অশ্রু। এ অশ্রু আহমদ মুসার প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতার, না ব্যর্থতা, বেদনায় ভেঙে পড়ার? দু'য়েরই হতে পারে।

আহমদ মুসা মাহমুদের পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, বলেছি তো সব ঠিক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। দেখবে, আল্লাহর ইচ্ছায় তোমার এমিলিয়া এবং আমাদের বোন এমিলিয়া ও আমাদের খতিবকে সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় নিয়ে আমি শীঘ্রই ফিরে আসছি। আমার জন্যে গাড়ির ব্যবস্থা করো বৈরুত যাওয়ার।

মাহমুদ আহমদ মুসাকে ছেড়ে দিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে বলল, এখনই যাবেন?

হ্যাঁ মাহমুদ। বলল আহমদ মুসা।

ভাইয়া আপনি বৈরুত যাবেন কেন? তোয়াই যদি টার্গেট হয়, তাহলে সরাসরি তো যেতে পারেন সমুদ্র পথে। আর মনে হচ্ছে, আপনি একা যাবেন। কিন্তু আমরা কেউ আপনার সঙ্গি হতে চাই। বলল আব্দুল্লাহ যাবের।

'তোয়া'র চারদিকের সমুদ্রেই ওরা চোখ রাখবে। বিশেষ করে এদিক থেকে যাওয়া সব জাহাজ-জলযানকেই তারা সন্দেহ করবে। কিন্তু তোয়ায় পৌছতে হবে আমাদের সবার অলক্ষ্যে। আর এ ধরনের অভিযান দল বেঁধে হয় না, সুতরাং কাউকেই আমি সাথে নিচ্ছি না। আহমদ মুসা বলল।

'বৈরুত যাওয়ার জন্যে আমি হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এতে তাড়াতাড়িও যাওয়া যাবে।' বলল মাহমুদ।

মানে আমাকে ভিআইপি সাজিয়ে প্রচার করে দিতে চাও যে আমি বৈরুত গেছি! তা হবে না। আমি গাড়িতে যাব। নীরবে উঠব গিয়ে বৈরুতে। তোমাদের দূতাবাসেও যাব না। শুধু তুমি তোমাদের বৈরুত দূতাবাসে সাইমুমের যে ছেলেটা, আবু আমর, গোয়েন্দাকর্মী হিসেবে আছে, তাকে বলবে রাতে যেন সে বৈরুতের 'সি ভিউ' হোটেলে গিয়ে রেজিষ্ট্রার দেখে 'হাবিব গনজালেস' এর কক্ষে সে যায়। আমার এই মিশনে 'হাবিব গনজালেস' নামের পাসপোর্ট ব্যবহার করব। চল,

তোমার অফিসে গিয়ে আমি ফ্রেস হবো। ইতোমধ্যে আমার জন্যে একটা ভিন্নগাড়ি ঠিক-ঠাক করো। অবশিষ্ট কথা পরে বলব, চল।

বলে আহমদ মুসা চলতে শুরু করল গাড়ির দিকে।

সবাই তার পেছনে পেছনে চলল।

সাইপ্রাসের দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরের বুক চিরে এগিয়ে চলেছে আহমদ মুসার ফিশিং ট্রলার বোটটি।

আহমদ মুসা যাত্রা করেছে দক্ষিণ সাইপ্রাসের পাফোস বন্দর থেকে। বন্দরটি মূলত ফিশিং বন্দর। আহমদ মুসা আগের দিন সাইপ্রাসে এসে থেমেছিল লিমাসোল বন্দরে একজন ট্যুরিষ্টের পরিচয়ে। বৈরুত থেকে সে সাইপ্রাসের ভিসা নিয়েছিল আবু আমরকে দিয়ে দালালের মাধ্যমে। পাসপোর্টে তার হবি লেখা আছে ফিশিং ও ফরেষ্ট ট্যুরে। আহমদ মুসা লিমসোল থেকে কিছু খোঁজ-খবর নিয়ে গতকালই সড়ক পথে এসেছিল দক্ষিণ সাইপ্রাসের সর্বদক্ষিণ বন্দর শহর পাফোসে। এখানে এসে আরও খোঁজ খবর নিয়ে জেনেছিল, তোয়া উপকূল মাছ শিকারের জন্যে বিখ্যাত। সাইপ্রাস থেকেও জেলেরা মাছ শিকারে মাঝে মাঝে সেখানে যায়। অনুমতি নিয়ে ও রয়্যালটি দিয়ে সেখানে মাছ শিকার করা যায়। তবে কয়েকদিন হলো সেখানে মাছ শিকার ভীষণ কড়াকড়ির মধ্যে পড়েছে। সবাইকে মাছ শিকারের অনুমতি দেয়া হচ্ছে না। কথা বলে খুশি হলে তবেই এই অনুমতি মেলে। দ্বীপে ট্যুরিষ্টদের যাতায়াত নিষিদ্ধ করা হচ্ছে। আইনসংগত ও অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যবসায় ও চাকরির প্রয়োজন ছাড়া সাইপ্রাসবাসিরাও সেখানে যেতে পারে না।

আহমদ মুসা ভালো করে খোঁজ-খবর নিয়ে একটা ফিশিং ট্রলার কোম্পানীতে যায়। নিজের পরিচয় দিয়ে বলে যে, সে একজন পর্যটক, ফিশিং তার হবি। তোয়া উপকূলে মাছ শিকার তার বহুদিনের ইচ্ছা। তাকে ভালো ট্রলার ও সহযোগিতার জন্যে জেলে দিয়ে সাহায্য করলে এর জন্যে উপযুক্ত অর্থ দিতে সে

রাজি আছে। কোম্পানির মালিক বলে, এর জন্যে তো লাগবে অনেক অর্থ। অত্যাধুনিক ট্রলার যদি নিতে হয়, তাহলে প্রথম ফেরত যোগ্য সিকিউরিটি ডিপোজিট ৫ হাজার মার্কিন ডলার। আর প্রতি ঘণ্টায় ট্রলারের ভাড়া ১০০ ডলার করে। কমপক্ষে ৫ জন জেলে সাথে যাবে। তাদের প্রতিজনের প্রতি ছয় ঘণ্টার কর্মদিনের জন্যে লাগবে ১০০ ডলার করে। ফিশিং সরঞ্জামের ভাড়া লাগবে না। সেটা বোটের ভাড়ার মধ্যে শামিল।

খরচের হিসেব শুনে আহমদ মুসা মনে মনে বলেছিল, এর দ্বিগুণ, কিংবা কয়েকগুণ বেশি দাবি করলেও তোমরা পেতে। কিন্তু মুখে বলেছিল, ট্রলার ভাড়া ও জেলেদের পারিশ্রমিক যা আশা করেছিলাম, তার চেয়ে অনেক বেশি।

কোম্পানীর কর্তা বলেছিল, তাহলে স্যার ফিশিং আইডিয়া ছেড়ে দিন, সেটাই ভাল।

এটাই যদি আপনার শেষ কথা হয়, তাহলে আমাকে রাজি হতেই হবে। অনেক আশা করে আমি এসেছি। বলেছিল আহমদ মুসা।

ধন্যবাদ। সাংঘাতিক ফিশিং হবি তো আপনার! কিন্তু আরেকটি ব্যাপারে আপনাকে রাজি হতে হবে। সেটা হলো, তোয়া উপকূল এলাকায় বর্তমানে খুব কড়াকড়ি চলছে। আপনি যদি ফিশিং অনুমতি না পান কিংবা আপনার কোন বিপদ হয় তার জন্যে আমরা দায়ী থাকব না এবং আমরা ক্ষতিও স্বীকার করব না। দ্বিতীয়ত এক কর্মদিন অর্থাৎ ছয় ঘণ্টার ভাড়া ও পারিশ্রমিক আপনাকে সিকিউরিটি মানির সাথে অগ্রিম জমা দিতে হবে। বলেছিল কোম্পানীর কর্মকর্তা।

আপনাদের এ শর্তও আমি মেনে নিচ্ছি। তবে আমার যদি কোন বিপদ হয়, তবে সেটা আমার আত্মীয়-স্বজনকে আপনাদের জানাতে হবে। আমি নিকোশিয়ার একটা পোষ্ট বক্স নাম্বার দিয়ে যাবো। সেখানে জানালেই আমার আত্মীয়-স্বজনরা তা পেয়ে যাবে। কৃত্রিম বিনীত কণ্ঠে বলেছিল আহমদ মুসা।

এভাবে একটা আধুনিক ফিশিং ট্রলার বোট এবং ৫ জন জেলে নিয়ে যাত্রা করেছে আহমদ মুসা।

বিকেল চারটায় বোট নিয়ে পাফোস থেকে যাত্রা করেছে আহমদ মুসা। আহমদ মুসা বলেছে শেষ রাত এবং সকালেই সে মাছ ধরতে ভালবাসে। সে সন্ধ্যার মধ্যে তোয়া উপকূলে পৌছতে চায়।

পূর্ণ শক্তিতে এগিয়ে চলেছে আহমদ মুসার বোট উপকূলের দিকে।

বোটের পেছন দিকে বোটের চার ভাগের এক ভাগ জায়গায় আধুনিক কেবিন। কেবিনের মাথার উপর ফ্ল্যাগ ষ্ট্যান্ডে উড়ছে ফিশিং পতাকা।

আহমদ মুসা হাতঘড়ির দিকে তাকাল। সাড়ে ৫টা বাজে। নব্বই-একশ মাইলের মত এসেছে। আরও পঞ্চাশ-ষাট মাইল বাঁকি। তার মানে আরও এক ঘণ্টা লাগবে তোয়া উপকূলে পৌছতে। সন্ধ্যায় পৌছবে তারা তোয়া উপকূলে। এ রকম একটা সময়ই আহমদ মুসা চায়।

আহমদ মুসার পরিকল্পনা হলো, সাংঘাতিক অসুস্থ হওয়ার কথা বলে সে উপকূলে নেমে সকালে ফিরে আসার কথা বলবে। আর যদি সকালে ফিরতে না পারে, তাহলে ট্রলার যেন চলে যায়। একটা বেয়ারার চেক দিয়ে যাবে, যা ভাঙালে তাদের পাওনা পরিশোধ হয়ে যাবে।

আরও এক ঘণ্টা পার হলো।

তোয়া উপকূলে তারা এসে পৌছেছে। তোয়া দ্বীপের উত্তর উপকূলটা কালো দেয়ালের মত তাদের সামনে। তোয়া দ্বীপ থেকে কোন আলো তারা দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু উপকূলের পানিতে আলোর ছুটোছুটি দেখা যাচ্ছে। পাঁচজন জেলের যে সর্দার সে বলল, স্যার ছুটন্ত যে আলোগুলো দেখছেন, সেগুলো উপকূল গার্ডদের বোটের আলো। আমাদের বোটের আলো দেখলেই দেখবেন তারা ছুটে আসবে।

আমাদের বোটের আলো দেখে তারা বুঝবে কি করে যে, আমাদের এটা উপকূল গার্ডের বোট নয়। অন্ধকারে তো তারা আমাদের বোট দেখতে পাবে না। জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

স্যার, দেখুন ওদের ও আমাদের বোটের আলোর রংয়ে পার্থক্য আছে। দেখুন আমাদের বোটের আলোর রং সম্মোহনকারী হালকা নীলাভ। রাতে মাছ

শিকারের জন্যে এই রং খুব কার্যকরী। সব বোটের আলোই এই রংয়ের। কিন্তু ওদের বোটের আলো দেখুন স্বচ্ছ সাদা। বলল জেলেদের সর্দার।

আহমদ মুসাদের বোট তখন 'তোয়া' উপকূলের আরও কাছে চলে এসেছে।

এই সময় জেলেদের সর্দার নিকোলাস নেলসন দ্রুতকণ্ঠে বলল, স্যার দেখুন, দু'টি বোট আমাদের দিকে ছুটে আসছে। তার কণ্ঠে উদ্বেগ।

আহমদ মুসাও দেখল দু'টি আলো তীর বেগে তাদের দিকে ছুটে আসছে। আহমদ মুসা বলল, আমি সাইপ্রাসের লোক নই দেখলে তারা আমাকে কি করবে বলে মনে কর?

স্যার, তারা কথা বলে ছেড়েও দিতে পারে, জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে উর্ধ্বতন অফিসারদের কাছে নিয়েও যেতে পারে। উর্ধ্বতন অফিসাররা ছেড়ে দিতে পারে। কিন্তু স্যার, সন্দেহ হলে তারা নির্ঘাত মেরে ফেলবে। স্যার, এখনকার ওরা মানুষের বাচ্চা নয়। গত সপ্তাহ দুই ধরে এই অবস্থা হয়েছে।' বলল জেলেদের সর্দার নিকোলাস নেলসন।

আমাকে নিয়ে গেলে তোমরা কি করবে? আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

নিয়ে যাবে তারা? আমরা বুঝতে পারছি না স্যার, আপনাকে নিয়ে গেলে আমরা কি করব। আপনিই বলুন।

আমি ভয় করছি না। আমাকে নিয়ে গেলেও তারা ছেড়ে দেবে। সন্দেহের কিছু পাবে না। নিয়ে যদি যায় তাহলে তোমরা অপেক্ষা না করে চলে যেও। আমি যাবার সময় একটা চেক দিয়ে যাব, সেটা পাফোসের ব্যাংকে ভাঙিয়ে পাওনা নিয়ে নিতে পারবে। বলল আহমদ মুসা।

আপনার কথা শুনে আমারই ভয় করছে স্যার। কিন্তু আপনাকে ভীত দেখছি না? বলল জেলেদের সর্দার।

'ভয় পাব কেন? আমার কোনই অপরাধ নেই। মানুষ মানুষকে ভয় পাবে কেন?' আহমদ মুসা বলল।

আপনি ঠিকই বলেছেন স্যার। কিন্তু ওরা তো মানুষ নয়। সামান্য সন্দেহ হলেও ওরা পাখির মত গুলী করে মানুষ মারে। ভয়টা আমার এ জন্যেই। আপনি খুব ভাল মানুষ.......।

কথা শেষ না করেই বলল, স্যার ওরা এসে গেছে।

ঠিক আছে, আসতে দাও। বলল আহমদ মুসা।

এর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দু'দিক থেকে দুই পেট্রল বোট এসে আহমদ মুসাদের বোটের দু'পাশে অবস্থান নিল। দু'পাশের দু'বোট থেকে দু'হুক দিয়ে আহমদ মুসাদের বোটকে ওদের বোটের সাথে আটকে দেয়া হলো।

দু'বোট থেকে দু'অফিসার আহমদ মুসাদের বোটে উঠে এল। তাদের সাথে উঠে এল আরও দু'জন প্রহরী। তাদের হাতে উদ্যত সাব-মেশিনগান, তা তাক করা বোটের লোকদের দিকে।

বোটে উঠেই একজন অফিসার বোটের সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল, পরিচয়ের কাগজপত্র নিয়ে সার বেধে দাঁড়াও।

জেলেরাসহ আহমদ মুসা সার বেঁধে দাঁড়াল। জেলেদের সবার কাগজপত্র দেখে ওকে করে দিল। কিন্তু অফিসারটি আহমদ মুসার ফিসিং কন্ট্রাক্টের কাগজপত্র ও পাসপোর্ট দেখে বিস্ময়ের সাথে আহমদ মুসার দিকে তাকাল। বলল, জানেন না, 'তোয়া উপকূলে পর্যটকদের আসা নিষিদ্ধ হয়েছে?

আমি পর্যটক হিসেবে আসিনি, আমি এসেছি এখানে ফিশিং-এর জন্যে। বলল আহমদ মুসা।

কিন্তু নিশ্চয় আপনি জেনেছেন, সাইপ্রাসের নাগরিক ছাড়া অন্য সবার জন্যে ফিশিং এখানে নিষিদ্ধ?

আমি সাইপ্রাসের নই বটে, কিন্তু যাদের নিয়ে আমি ফিশিং এ এসেছি, সবাই সাইপ্রাসের। বোট, ফিশিং সরঞ্জাম, জেলে সবাই সাইপ্রাসের। আহমদ মুসা বলল।

কিন্তু আপনি সাইপ্রাসের নন। অন্যদের ব্যাপারে প্রশ্ন নেই।

কথা শেষ করেই অফিসারটির দিকে চেয়ে বলল, এঁকে আমাদের বেজ ক্যাম্পে নিয়ে যাও। তাঁরা জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখুক।

অফিসারটির কথা শেষ হতেই জেলেদের সর্দার নিকোলাস নেলসন বলল, স্যার, ওঁকে নিয়ে যাবেন না। আমরা ফিশিং করব না, আমরা ফিরে যাচ্ছি সাইপ্রাসে।

ওঁকে ছাড়ার ক্ষমতা আমাদের নেই। অবাঞ্ছিত কেউ আমাদের জলসীমা ও উপকূলে ধরা পড়লে, তাকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সামনে নিয়ে যেতে হবে। তারা জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, তাঁদের কাছে নামের তালিকা ও ফটোর এ্যালবাম আছে, সে সবের সাথে মিলিয়ে যা ইচ্ছে তারাই করবেন। থামল অফিসার।

থেমেই সে পুলিশ অফিসারকে উদ্দেশ্য করে বলল, ইলাম, এঁকে সার্চ করে তোমার বোটে তুলে নাও।

ইলাম নামের অফিসার এগিয়ে এল।

আহমদ মুসা নিজের থেকেই হাত তুলে দাঁড়াল।

অফিসারটি এসে আহমদ মুসার জ্যাকেট ও প্যান্টের সবগুলো পকেট সার্চ করল। কমর সার্চ করার সময় চামড়ার খাপে একটা ছুরি পেল সে।

ছুরিটি খুলে নিয়ে অন্য অফিসারটির উদ্দেশ্যে বলল, পকেটে মানিব্যাগ ছাড়া আর কিছু নেই স্যার।

ঠিক আছে তাকে বোটে তুলে নাও। বলল অফিসারটি।

আহমদ মুসা সার্চকারী অফিসারটিকে বলল, একটু সময় দিন।

বলে আহমদ মুসা পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে একটা চেক বের করে জেলেদের সর্দারের হাতে দিয়ে বলল, ব্যাংকে এটা ভাঙিয়ে আপনাদের ও মালিকের পাওনা নিয়ে নেবেন।

কথা শেষ করেই অফিসারটির সাথে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছিল। জেলেদের সর্দার নেলসন বলল, স্যার আমরা কি অপেক্ষা করব না?

না অপেক্ষা করবে না। বলল আহমদ মুসা।

আপনি ফিরবেন কি করে? জিজ্ঞাসা নেলসনের।

যারা আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন, তাদেরই দায়িত্ব হবে আমাকে আমার জায়গায় ফেরত পাঠানো। আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসা বোটে উঠলে তারপর অফিসারটি বোটে উঠে এল।

সংগে সংগেই বোট ষ্টার্ট নিল।

বোটে অফিসারসহ ওরা পাঁচজন।

আহমদ মুসাকে বোটের সামনে রেখে বোটের মাঝখানে অফিসারসহ চারজন বসল। বোটের পেছনে একজন। বোটকে সেই ড্রাইভ করছে।

বোটের মাঝখানে অফিসার ছাড়া তিনজনের হাতেই ষ্টেনগান। নির্দেশ বা প্রয়োজন হলেই ষ্টেনগানগুলোর নল উঠে আসবে এবং গুলীর বৃষ্টি সৃষ্টি করবে।

বোট দ্রুত চলছে উপকূলের দিকে।

অফিসারটি এক সময় আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, তোমাকে খুব সাহসী ও বুদ্ধিমান মনে হচ্ছে। কিন্তু তুমি এভাবে ফাঁদে পড়লে কেন?

ফাঁদে কোথায়? জিজ্ঞাসাবাদ তো তোমরা করতেই পার। আহমদ মুসা বলল।

হাসল অফিসারটি। বলল, ফাঁদ নয় ফাঁসি কাষ্টের দিকে তুমি যাচ্ছ। দুঃখের সাথে বলছি, তোমার মত অবাঞ্ছিত, অপরিচিত যারা তোয়া দ্বীপে পা রাখে, তারা আর ফিরে যায় না।

আহমদ মুসা ওদের চ্যালেঞ্জ করারই একটা পথ খুঁজছিল। সে সুযোগ পেয়ে বলল, কিন্তু তোমরা আমাকে বলেছ, তোমরা জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে আমাকে নিয়ে যাচ্ছ। এখন বলছ তোমাদের মতলব অন্যরকম। তাহলে তো আমি যাব না।

হেসে উঠল অফিসারটি। বলল, মনে হচ্ছে যাওয়া না যাওয়া তোমার হাতে?

দেখ, আমি এখনও তোমাদের বেজ ক্যাম্পে যাইনি। আমি এখনও মুক্ত।

তোমার সামনে তিনটি ষ্টেনগান আছে দেখতে পাচছ না? নির্দেশ দিলেই হা করে উঠবে তোমার দিকে, তোমাকে ঝাঁঝরা করে দেবে গুলীর বৃষ্টি।

আহমদ মুসা পা মুড়ে বসে ছিল। মুড়ানো তার ডান পা তার ডান 'হিপ'-এর বাইরে বেরিয়ে ছিল। আহমদ মুসার ডান হাতটা তার ডান পায়ের টাকনুর উপর রাখা ছিল। আর তার পায়ের মোজার ভেতর গুজে রাখা এম-১৬ এর সর্বাধুনিক মিনি সংস্করণ 'লিটল ক্যানল' রিভলবারটির বাট আহমদ মুসার ডান হাত স্পর্শ করে আছে। আহমদ মুসার ঠোঁটে ফুটে উঠেছে এক টুকরো হাসি।

সে দুটো আঙুল দিয়ে নাইলনের মোজা ইতিমধ্যেই নামিয়ে দিয়েছে। এবার 'লিটল ক্যানন'-এর বাঁটে হাত রেখে বলল, তোমরা কি করবে, আমাকে মেরে ফেলবে?

কেন, ক্ষতি কি? যে কাজটা ওরা একটু পরে করবে, সে কাজ আমরা এখন করলে ক্ষতি কি? বরং তারা খুশি হবে এই ভেবে যে, আমরা শেয়ানা হয়েছি।

কিন্তু মি. এ্যারন, শুধু গন্ডাখানেক ষ্টেনগান থাকলেই মানুষকে আটকানো যায় না।'

বলেই আহমদ মুসা রিভলবার সমেত ডান হাত বিদ্যুত বেগে সামনে এনে চারজনকে তাক করল। বলল, তোমরা ষ্টেনগান তোলার চেষ্টা করলে আর মি. এ্যারন তুমি পকেটে হাত দেয়ার চেষ্টা করলে এই 'লিটল ক্যানন' ব্রাশ ফায়ার করবে। তোমার হাতের ষ্টেনগান, হাতের রিভলবার বোটে রেখে পানিতে নেমে যাও, আমি তোমাদের মারতে চাই না।

একথা বলার সময় পেছনে ড্রাইভিং-এ বসা লোকটি তার পাশে রাখা ষ্টেনগান তুলতে যাচ্ছিল।

আহমদ মুসা এদের সাথে কথা বললেও তার চোখ পেছনের লোকটিকেও কভার করছিল।

কথা বলার মধ্যেই আহমদ মুসার 'লিটল ক্যানন' রিভলবারটির ট্রিগার সেকেন্ডের জন্যে চেপে বসল আর সামনে বসা চারজনের মধ্যে দু'জনের ফাঁক দিয়ে কয়েকটা বুলেট ছুটে গিয়ে নিখুঁতভাবে তার মাথায় আঘাত করল।

লোকটির দেহ উল্টে ঝপ করে পানিতে পড়ে গেল।

এরা চারজনই পলকের জন্যে পেছনে তাকিয়ে মরিয়া হয়ে তিনজন তাদের ষ্টেনগানের নল উপরে তুলেছিল। আর অফিসারটিও হাত দিয়েছিল পকেটে।

কিন্তু ঐ পর্যন্তই। আহমদ মুসার তর্জনি ট্রিগারের উপরেই ছিল। তা আবার চেপে বসল ট্রিগারে। আর আহমদ মুসার হাতটি রিভালবারটি ঘুরিয়ে নিল চারজনের ওপর দিয়ে।

মুহূর্তেই চারজনের দেহ ঝরে পড়ল বোটের ওপর।

আহমদ মুসা চারদিকে চেয়ে দেখল, আশেপাশে কোন পেট্রল বোটের আলো দেখা যাচ্ছে না। আর অটো সাইলেন্সারের 'লিটল ক্যানন' গুলী করার সময় সামান্য হিস হিস ছাড়া কোন শব্দ করে না।

আহমদ মুসা তার 'লিটল ক্যানন'-এর নলটা মুছে নিয়ে সেটা আর সে পায়ের মোজায় গুজল না। কাঁধের মধ্যখানে ঘাড়ের নিচে জ্যাকেটের একটা গোপন পকেটে ঢুকিয়ে রাখল। তারপর লাশগুলো পানিতে ফেলে দিল। বোটের আলো নিভিয়ে দিয়ে সে গিয়ে পেছনের ড্রাইভিং সিটে বসল। বোটের ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল। ফ্লাগ ষ্ট্যান্ডের সাথে বেঁধে রাখা ইমার্জেন্সি ফ্ল্যাগ খুলে ফেলল। তারপর ফ্ল্যাগ ষ্ট্যান্ড খুলে নিয়ে বৈঠা বেয়ে সে চলল উপকূলের দিকে।

অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে নিঃশব্দে চলল বোটটি।

পৌনে এক ঘণ্টার মত বোট চালিয়ে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে আহমদ মুসা উপকূলের গাছপালার আড়ালে পৌছে গেল।

তীরের কোথায় কি আছে, কোথায় রাস্তা, কোথায় কোথায় ওদের বেজ ক্যাম্প আছে, এ সম্পর্কে আহমদ মুসার কোন কিছুই জানা নেই। তবে একটা বিষয়ে সে নিশ্চিত, তোয়া দ্বীপের তোয়া শহরটি এবং তোয়ার শাসনকেন্দ্র যেহেতু পূর্ব উপকূলের মাঝামাঝি স্থানে, তাই বোটটি সে উত্তর উপকূলের পূর্ব অংশের কোথাও নোঙর করে স্থলপথে 'তোয়া' শহরের দিকে এগোতে চায়। উপকূলের পশ্চিমাঞ্চল ও মধ্যভাগের দুই স্থানে আলো দেখতে পেল আহমদ মুসা। ওগুলো কি কোষ্টাল গার্ডদের বেজ ক্যাম্প? যাই হোক, তার গন্তব্য এটা নয়। তাকে আরও পূর্বে এগোতে হবে।

উপকূল ধরে আরও এগোলো আহমদ মুসা।

পূর্ব প্রান্তের দিকে অনেকটাই চলে এসেছে আহমদ মুসা।

ডান পাশে উপকূলে আরো এক গুচ্ছ আলোর রেখা দেখতে পেল আহমদ মুসা। আর পূর্বে এগোনো নয়, এরই আশেপাশে তাকে নামতে হবে। তার নিশ্চিত ধারণা, ওটা যদি ওদের বেজ ক্যাম্প হয়, তাহলে সে ক্যাম্পের সাথে তোয়া সিটির সংযোগ-রাস্তাও আছে। সেই রাস্তা আহমদ মুসার দরকার।

বোট ঘুরিয়ে নিয়ে উপকূলের আলোটাকে আহমদ মুসা বামে রেখে উপকূলের দিকে এগিয়ে চলল আহমদ মুসা।

# ৩

অস্ত্র-শস্ত্রসহ বোটটাকে সামলে রেখে আহমদ মুসা প্রায় পনের মিনিট ধরে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলছে।

বোট থেকে নেমে দেড়শ' গজের মত সোজা দক্ষিণে হেঁটে আহমদ মুসা পূর্ব দিকে টার্ন নিল। তার হিসেব হলো বেজ ক্যাম্প থেকে কোন রাস্তা তোয়া সিটির দিকে গেলে, তাকে অবশ্যই প্রথমে কিছুটা দক্ষিণে এগোতে হবে, তারপর রাস্তাটা পূর্ব-দক্ষিণ কৌণিক টার্ন নিতে পারে। এই হিসেব কষেই আহমদ মুসা অল্প কিছুটা দক্ষিণে এগিয়ে সোজা পূর্ব দিকে হাঁটতে শুরু করেছে। তার অনুমান অনুসারে শ'খানেক গজ এগোলেই বেজ ক্যাম্প থেকে দক্ষিণে যাওয়া রাস্তাটাকে ক্রস করবে। কিন্তু একশ' দেড়শ' গজ এগিয়েও আহমদ মুসা রাস্তার চিহ্নও পেল না। কোন অমনোযোগিতার কারণে হয়তো সে রাস্তাটা মার্ক করতে পারেনি, হয়তো সেটা কাঁচা রাস্তা হতে পারে। আহমদ মুসা আবার ফিরে দাঁড়াল। আবার হাঁটল একশ' দেড়শ' গজ। কিন্তু রাস্তার কোন চিহ্ন নেই।

আহমদ মুসা বেজ ক্যাম্পে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

একটা গাছে উঠে সে আলো দেখে জায়গাটা মার্কিং করে সেদিকে এগোলো। পৌছল সেখানে। কিন্তু বেজ ক্যাম্প কোথায়? ওটা তো একটা পর্যবেক্ষণ টাওয়ার। তার সাথে আছে একটা জ্বালানি ডিপো। দু'টিই সদ্য নির্মিত। আহমদ মুসা বুঝল ইসরাইলীরা তোয়া দ্বীপে নতুন আস্তানা গড়ার পর তারা এই নতুন পর্যবেক্ষণ টাওয়ার ও সাপ্লাইকেন্দ্র নির্মাণ করেছে। এই কারণে এখনও রাস্তা তৈরি হয়নি। আহমদ মুসা ভাবল, তাহলে ওদের বেজ ক্যাম্প কোথায়? পেছনে ফেলে আসা দু'টিই কিংবা তাদের একটি বেজ ক্যাম্প হতে পারে? অতীত ভেবে আর লাভ নেই, মনে মনে বলল আহমদ মুসা। পেছনে ফেরার পথ নেই। তাকে সামনেই এগোতে হবে। আহমদ মুসা দ্রুত আরেকটা গাছে উঠল। লক্ষ্য, তোয়া

দ্বীপের পূর্ব উপকূলে তোয়া শহরের অবস্থানের একটা ধারণা নেয়া। শহরের বিদ্যুৎ বাতির যে ছটা আকাশে উঠে। তা দেখে এই অবস্থান স্থির করা যায়।

আহমদ মুসার চাওয়া সফল হলো। সে গাছ থেকে পূর্ব আকাশের মাঝামাঝি একটা জায়গায় আকাশে আলোর ছায়া দেখতে পেল। আহমদ মুসা অনুমান করল, গাছকে বিন্দু হিসেবে ধরে যদি সোজা পূর্বমুখী একটা সরল রেখা টানা যায়, তাহলে যে একটা সমকোণ তৈরি হয়, তারপর বেজ বিন্দু থেকে একটা রেখাকে যদি তোয়া নগরীর আলোক ছটার সাথে যুক্ত করা হয়, তাহলে বেজ বিন্দুতে ভূমি সংলগ্ন যে কোণের সৃষ্টি হয় তার পরিমাণ ৪০ ডিগ্রি অনুমান করল আহমদ মুসা। তার মানে তাকে এখান থেকে ৪০ ডিগ্রি সরল রেখা অণুসরণ করে চলতে হবে। হঠাৎ আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকাতেই আহমদ মুসা দেখল, তার কল্পিত ৪০ ডিগ্রি রেখা বরাবর ঠিক উপরে আকাশে লুব্ধক তারা, আদম সুরতের পায়ের নিচে জ্বল জ্বল করছে। লুব্ধককে ঠিক না বরারবর রেখে এগিয়ে গেলে 'তোয়া সিটি' পেয়ে যাবে আহমদ মুসা। খুশি হলো আহমদ মুসা। মাটিতে নেমে ৪০ ডিগ্রি রেখার দিক ঠিক করা তার পক্ষে সহজ হতো না।

আলহামদুলিল্লাহ পড়ে আহমদ মুসা গাছ থেকে নামল এবং বিসমিল্লাহ বলে সে যাত্রা শুরু করল।

উপকূল অঞ্চলেই বনটা গভীর। আহমদ মুসা যতই এগোতে লাগল, তখন বনটা হালকা হয়ে এল। তবে ঝোপ-ঝাড় ও ভূমির উঁচু-নিচু অবস্থা বৃদ্ধি পেল। মাঝে মাঝে পাহাড়ও সামনে এসে দাঁড়াল। আহমদ মুসা পাহাড়গুলো এড়িয়ে উপত্যকার পথে ডাইরেকশন ঠিক রেখে চলতে লাগল।

একদম নীরব মনে হলো তোয়া দ্বীপটাকে। যতটা পথ এল একটা লোকালয়ও তার চোখে পড়েনি।

আটশ' বর্গ মাইলের ছোট্ট দ্বীপ এই তোয়ার। লোক সংখ্যা ১০ হাজারের বেশি নয় শুনেছে। অধিবাসীদের প্রায় সবাই ইহুদি। পেশায় তারা জেলে। একটা বড় অংশ চোরাকারবারের সাথে জড়িত। দ্বীপটা ইসরাইলের তত্ত্বাবধানেই ছিল। এটা জানা গেছে, ইসরাইল সরকার ফিলিস্তিন থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর। এরপর তারা এই 'তোয়া' দ্বীপে এসে আসন গেড়েছে। নানা সূত্র থেকে জেনেছে

প্রায় ৭ হাজার ইসরাইলী এখন পর্যন্ত এই দ্বীপে এদের মধ্যে রয়েছে সৈনিক, সরকারি আমলা, ব্যবসায়ীসহ প্রায় সবাই। ইসরাইল সরকার, সেনাবাহিনী, আমলা ও পুলিশের উর্ধ্বতন লোকরা, যারা পালাতে পেরেছে, তারা সবাই এখানে এসেছে। এদেরকে নিয়েই এখানে একটা অস্থায়ী সরকার, ইসরাইল সেনা ও পুলিশ বাহিনী ও আমলা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে।

আহমদ মুসা আরও ঘণ্টা খানেক চলার পর হঠাৎ করেই একটা রাস্তা সে পেয়ে গেল।

রাস্তাটা পশ্চিম দিক থেকে এসেছে। কাঁচা সড়ক যাকে বলে, এ তাই।

খুশি হলো আহমদ মুসা।

রাস্তাটা যখন পূর্বদিকে এগিয়েছে, তখন ঘুরে-ফিরে রাস্তাটা তোয়া সিটিতে যাবে নিশ্চয়।

রাস্তা ধরে পূর্ব দিকে হাঁটতে লাগল আহমদ মুসা।

মিনিট পাঁচেক চলার পর একটা পাহাড় ঘুরে রাস্তাটি সমতল একটি বনজ উপত্যকায় প্রবেশ করল। তার সাথে রাস্তাটা ঘুরে গেল দক্ষিণ দিকে।

দু'দিকে গাছ-গাছড়ার সারি, মাঝখান দিয়ে এগিয়ে চলেছে রাস্তা।

দক্ষিণ দিকে বাঁক নিয়ে মিনিট দশেক চলার পর ডান দিকে একটা ফাঁকা এলাকা দেখতে পেল। প্রথম বারের মত ফসলের ক্ষেত তার নজরে পড়ল। ফসলের ক্ষেতের ওপর দিয়ে একটা ছোট পাহাড় নজরে পড়ল। পাহাড়ের গায়ে দেখা গেল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আলো। আর পাহাড়ের এ প্রান্তের গোড়ায় দেখতে পেল গুচ্ছাকার আলো। ওটা কি বাজার কিংবা রেষ্টুরেন্ট? যাই হোক, আহমদ মুসা সেখানে যাবে ঠিক করল। কি পরিচয় দেবে, কি কথা বলবে, অবস্থা বুঝে তার ব্যবস্থা করা যাবে।

বিশ-পঁচিশ গজ এগিয়ে আহমদ মুসা দেখল, সড়ক থেকে এক প্রস্ত রাস্তা ক্ষেত দু'পাশে রেখে পাহাড়ের দিকে চলে গেছে।

আহমদ মুসা সেই পথ ধরে গুচ্ছ আলো লক্ষ্য করে চলতে লাগল।

ঠিকই, আলোর গুচ্ছটা একটা রেষ্টুরেন্ট গেছে। আশেপাশে আরও কিছু দোকান-পাট আছে। সব মিলিয়ে জায়গাটা গ্রামীণ বাজারের মত।

আহমদ মুসা এগোলো রেষ্টুরেন্টের দিকে। ছয়-সাতজন লোক বসে আছে। মগে করে তারা কি খাচ্ছে।

আহমদ মুসা রেষ্টুরেন্টে প্রবেশ করলে সবাই একযোগে তার দিকে তাকাল, দু'জন বয় ও ক্যাশ কাউন্টারের লোকটিও।

আহমদ মুসা হিব্রু ভাষায় শুভেচ্ছা জানিয়ে ক্যাশ-কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে, তাকে উদ্দেশ্য করে বলল, আমি তোয়া শহরে যাচ্ছিলাম। পথে আমার গাড়ির ইঞ্জিন খারাপ হয়ে গেছে। আমি এ এলাকায় নতুন। তোয়া শহরে যাওয়ার কি ব্যবস্থা হতে পারে?

কাউন্টারের লোকটি আহমদ মুসার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকাল। তবে তার দৃষ্টিতে সন্দেহ দেখলো না, বরং দেখতে পেল কিছুটা অস্বস্তি। বলল আঞ্চলিকটানের অশুদ্ধ হিন্দিতে, এ পথ দিয়ে কোন গাড়ি গেলে একটা ব্যবস্থা হতে পারে, তারা যদি রাজি হয়। অন্যথায় হাঁটা ছাড়া কোন পথ নেই। ঘোড়ায় টানা গাড়ি মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, কিন্তু রাতে তা পাওয়া যাবে না।

আহমদ মুসা পাশের একটা টেবিলে বসতে বসতে বলল, কিন্তু খুব জরুরি, আমাকে রাতেই পৌছতে হবে। এখান থেকে তোয়া শহর কত দূর হবে?

ক্যাশ কাউন্টারের লোকটি কিছু বলার আগেই পাশের টেবিল থেকে একজন বলল, পাঁচ-ছয় কিলোমিটার হবে। তোয়া'র সরকারের কারও সাথে পরিচয় আছে?

নেই। আহমদ মুসা বলল।

তাহলে রাতে আপনি যেতে পারবেন না। খুব কড়াকড়ি ও ধর-পাকড় চলছে। বলল লোকটি।

আপনাদের কারও পরিচয় নেই। কারও নাম বলতে পারেন না। আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

না, আমরা কাউকে চিনি না। ওরা সবাই নতুন। রাতে আমাদের যাওয়াও নিরাপদ নয়। শুনেছি, আমাদের আইডি কার্ড দেবে, কিন্তু এখনও দেয়নি।

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু বাইরে গাড়ির শব্দে আহমদ মুসা সেদিকে ফিরে তাকাল। দেখল, একটা গাড়ি উন্মত্ত গতিতে এদিকে ছুটে এসে দাঁড়াল।

ঠিক এ সময় আরও দু'টি গাড়ি তীব্র গতিতে রেষ্টুরেন্টের দিকে ছুটে এল।

আগের গাড়ি থেকে একটি মেয়ে লাফ দিয়ে নেমেই 'বাঁচাও' বাঁচাও' বলে চিৎকার করতে করতে রেষ্টুরেন্টের দিকে ছুটে এল।

পেছনের গাড়ি দু'টিও আগের গাড়ির পাশে এসে দাঁড়াল। দু'গাড়ি থেকে সাত আটজন লোক নামল এবং ছুটে এল রেষ্টুরেন্টের দিকে মেয়েটির পেছনে পেছনে।

মেয়েটি ছুটে এসে যে টেবিলে ছয় সাতজন লোক বসেছিল, তার পেছনে এসে দাঁড়াল। মেয়েটি তখনও চিৎকার করে বলছে, আমাকে বাঁচান আপনারা এ গুন্ডা লোকদের হাত থেকে।

মেয়েটি অনিন্দ সুন্দরী এক তরুণী। বয়স একুশ-বাইশ। একটি ফুলকে দলিত করলে যে অবস্থা হয়, ফুলের মত সুন্দর মেয়েটিরও সেই অবস্থা। মেয়েটির সার্টটি ছেঁড়া, চুল আলু-থালু।

মেয়েটির কথিত গুন্ডারা ছুটে এসে রেষ্টুরেন্টে প্রবেশ করল।

মেয়েটি তখন চিৎকার করে কেঁদে উঠেছে, বাঁচান আপনারা আমাকে।

গুন্ডারা রেষ্টুরেন্টে ঢুকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসল মেয়েটির দিকে। তাদের একজন চিৎকার করে বলল, আমাদের এ মেয়েটি হঠাৎ পাগলের মত আচরণ করছে। তোমরা কিছু মনে করো না। আমরা ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাব।

মেয়েটিকে ধরার জন্যে এগোলো ওরা।

চিৎকার করে মেয়েটি বলল, ওদের কথা মিথ্যা। আমি ওদের চিনি না। ওরা আমার ক্ষতি করতে চায়। ওদের কথা আপনারা বিশ্বাস করবেন না। আমাকে বাঁচান আপনারা। কান্নায় ভেঙে পড়ল মেয়েটি।

রেষ্টুরেন্টে উপস্থিত লোকগুলো সবাই পাথরের মত হয়ে গেছে। কারও মুখে কোন কথা নেই। সবার চোখে-মুখেই অস্বস্তি ও ভয়।

মেয়েটিকে ওরা ধরেছে, নিয়ে আসছে চ্যাংদোলা করে। মেয়েটি চিৎকার করছে আর ফাঁদে আটকা মাছের মতো তড়পাচ্ছে।

আহমদ মুসা সবকিছু দেখছিল। তার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই যে, একটা সুন্দরী মেয়ে একাকি আসতে গিয়ে গুন্ডাদের হাতে পড়েছে। কোন রকমে সে প্রথম দফা গুন্ডাদের হাত থেকে পালিয়ে এসেছিল। তার ছেঁড়া জামা ও বিধ্বস্ত অবস্থাই তার প্রমাণ। হাত থেকে পালিয়ে আসা শিকারকে আবার তারা ধরতে এসেছে, ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

আহমদ মুসার সমগ্র হৃদয়তন্ত্রীতে একটা অসহনীয় যন্ত্রণার সৃষ্টি হলো। ভুলে গেল সে তার নিজের কথা, ভুলে গেল রাতেই তাকে তোয়া শহরে পৌছতে হবে সে কথা। তার কাছে গোটা পৃথিবীর সমান বড় হয়ে উঠল অসহায় মেয়েটির আর্তচিৎকার আর তাকে বাঁচানোর জন্যে বুক ফাটা তার আকুল আবেদন।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

আহমদ মুসার পাশ দিয়ে তারা নিয়ে যাচ্ছিল মেয়েটিকে।

যে লোকটা মেয়েটির পায়ের দিকটা ধরেছিল তার বাম কানের নিচে ঘাড়টা লক্ষ্যে ডান হাতের কারাত চালাল আহমদ মুসা।

লোকটি আহমদ মুসার দিকে তাকানোরও সুযোগ পেল না। একবার টলে উঠে আছড়ে পড়ে গেল মাটিতে।

মেয়েটির পেছন দিকটা পড়ে গেল মেঝের ওপর। মাথার দিকটা যে ধরেছিল, সে ঘুরে দাঁড়াল দেখার জন্যে কি ঘটেছে। তারও বাম কানের পাশটা আহমদ মুসার সামনে এসে গেল।

লোকটি ঘুরে দাঁড়িয়ে কিছু বুঝার আগেই আহমদ মুসার ডান হাত আবার বজ্রের মত ছুটে গিয়ে দশ কেজি ওজনের কারাত চালাল বাম কানের নিচে নরম জায়গায়।

সেও মুখ তুলে দেখারও সুযোগ পেল না। সংজ্ঞা হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

পেছনে আসছিল দু'জন লোক। তাদের একজনের হাতে উঠে এসেছে রিভলবার। রিভলবারের নল উঠে আসছে আহমদ মুসার লক্ষ্যে।

আহমদ মুসার কাছেই টেবিলে দু'টি গ্লাস ছিল। হাত ছিল তার কাছেই। চোখের পলকে গ্লাসটি নিয়ে বুলেটের গতিতে ছুঁড়ে মারল রিভলবারধারী লোকটির কপাল লক্ষ্যে।

নিখুঁত লক্ষ্য। গ্লাসটি গিয়ে বজ্রের মত আঘাত হানল লোকটির কপালে।

মুখ থেকে তার গগণ বিদারী 'আ' চিৎকার উঠল এবং তার দেহটা বেঁকে গেল পেছন দিকে।

তার শিথিল হাত থেকে রিভলবারটা পড়ে যাচ্ছিল। বাজপাখির মত আহমদ মুসা তা লুফে নিল।

পেছনের দ্বিতীয় লোকটির হাতেও রিভলবার। কিন্তু কপালে গ্লাসের ঘা খাওয়া লোকটি তার ওপর পড়ে গিয়েছিল। তাকে সামলাতে গিয়ে সে তার হাতের রিভলবার আহমদ মুসার লক্ষ্যে যথাসময়ে তুলতে ব্যর্থ হলো। সে তাড়াতাড়ি তার ডান হাতটাকে মুক্ত করার চেষ্টা করছিল। আহমদ মুসা এ সুযোগ গ্রহণ করলো। তাকে লক্ষ্য করে আহমদ মুসার রিভলবার আগেই উঠে এসেছে। শুধু তর্জনিটা চাপল ট্রিগারের ওপর। একটা বুলেট গিয়ে নিমেষে তার মাথা গুঁড়িয়ে দিল।

মেয়েটি আগেই উঠে দাঁড়িয়েছিল। ভয় ও আতংকে তখন সে কাঁপছে।

আপনি ভেতর দিকে সরে যান। ভয় নেই। আমি দেখছি। মেয়েটিকে লক্ষ্য করে বলল আহমদ মুসা।

কম্পমান মেয়েটি টলতে টলতে পেছনে সরে গেল।

মেয়েটির সাথে কথা বলার আগেই আহমদ মুসা রিভলবার তাক করেছিল সামনের তিনজনের লক্ষ্যে।

ওরা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল।

সম্ভবত ওদের কারও কাছেই রিভলবার ছিল না। আহমদ মুসার রিভলবার দেখে ওরা আহমদ মুসার দিকে এগোতে গিয়েও পিছিয়ে গেছে। দু'জনের সংজ্ঞাহীন দশা, ফাটা কপাল নিয়ে একজনের বেহাল অবস্থা এবং গুলিবিদ্ধ হয়ে আরেকজন সাথীর নির্মম মৃত্যু তারা চোখের সামনেই দেখছে।

আহমদ মুসা ওদের লক্ষ্যে বলল, দেখ অনর্থক কোন মানুষকে হত্যা করা আমি পছন্দ করি না। তোমরা যদি না মরতে চাও। আমার নির্দেশ পালন কর।

তারপর আহমদ মুসা তাকাল মেয়েটির দিকে। বলল, আপনি ওদের কাছ থেকে কিছু দড়ি যোগাড় করুন।

দড়ি যোগাড় হয়ে গেলে সেই দড়ি ওদের তিনজনের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, তুমি ওদের দু'জনকে পিছমোড়া করে বাঁধ।

লোকটি নির্দেশ পালন করল। পিছমোড়া করে ওদের দু'জনের হাত-পা বাঁধল।

ওদের বাঁধা হয়ে গেলে সংজ্ঞাহীন দু'জন ও আহত একজনকেও বাঁধতে বলল।

লোকটি বিনা বাক্য ব্যয়ে আহমদ মুসার নির্দেশ পালন করল।

বাঁধা হয়ে গেলে আহমদ মুসা নির্দেশ দিল, মৃত একজনসহ যাদের বেঁধেছ, তাদের এক এক করে পাহাড়ের গোড়ায় নিয়ে রাখ।

রেষ্টুরেন্টে যারা বসেছিল, ভীত-সন্ত্রস্ত তারা সকলেই এক এক করে রেষ্টুরেন্ট থেকে ভেগেছে। শুধু বসে আছে ক্যাশ-কাউন্টারের লোকটি এবং ওয়েটার বয় দু'জন। উদ্বেগ-আতংকে তারা কুকড়ে গেছে।

মেয়েটির মুখে এখন আগের সেই উদ্বেগ-আতংক নেই। তার চোখে এখন রাজ্যের বিস্ময়। আহমদ মুসার কাজ তার কাছে স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে। সাত জন সশস্ত্র লোককে যেখানে যেমন দরকার সেখানে আঘাত হেনে কুপোকাত করে ফেলল। তাদের অস্ত্র তাদের ওপর প্রয়োগ করল। তাদেরকেই আবার শ্রমিকের মত খাটাচ্ছে তাদের নিজেদের বাঁধার জন্যে। বাঁধা লোকগুলোকে পাহাড়ের গোড়ায় নিয়ে কি করতে চায় লোকটি।

আহমদ মুসা নির্দেশ দিয়ে মেয়েটির দিকে তাকাল। পড়ে থাকা দ্বিতীয় রিভলবারটির দিকে ইংগিত করে বলল, আপনি ঐ রিভলবারটি তুলে নিয়ে চেয়ারে বসুন, আমি পাহাড়ে গিয়ে দেখি যাতে সে পালিয়ে যেতে না পারে।

মেয়েটি সংগে সংগেই যন্ত্রের মত এগিয়ে এসে পড়ে থাকা রিভলবার তুলে নিয়ে একটা চেয়ারে বসল।

মেয়েটির উদ্দেশ্যে 'ধন্যবাদ' বলে আহমদ মুসা বাঁধা একজন লোককে কাঁধে তুলে নিয়ে পাহাড়ের গোড়ার দিকে অগ্রসর লোকটি পেছনে পেছনে চলল।

সবশেষে মৃত লোকটিকে পাহাড়ের গোড়ায় নিয়ে গেল লোকটি।

লোকটিকে নিয়ে আহমদ মুসা রেষ্টুরেন্টে ফিরে এল। বলল লোকটিকে, মেঝের রক্ত ধুয়ে মুছে দাও তুমি। তোমাদের কারণে রেষ্টুরেন্টের অনেক ক্ষতি হয়েছে। অনেক কাষ্টমার পয়সা না দিয়েই চলে গেছে।

ক্যাশ কাউন্টারের লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বলল, ওটুকু ক্ষতি কিছুই নয়। আপনি মেয়েটিকে বাঁচিয়েছেন, এজন্যে দয়াময় জিহোবা আপনার মঙ্গল করুন। আর স্যার, আমরাই রক্ত পরিষ্কার করে ফেলব। মেয়েটির উদ্ধারে আমরা তো সাহায্য করতে পারিনি। ঐটুকু কাজ করতে পারলে আমাদের ভাল লাগবে।

আহমদ মুসা দোকানিকে ধন্যবাদ দিয়ে বলল, আপনারা খুব ভালো লোক।

গুন্ডাদের সেই অবশিষ্ট লোকটি আহমদ মুসার সামনেই দাঁড়িয়েছিল। তার হাতে দুই খন্ড দড়ি।

আহমদ মুসা তার হাত থেকে দড়ি নিয়ে বলল, শুয়ে পড়, তোমাকে তুমি বাঁধতে পারবে না, আমিই বাঁধব।

আহমদ মুসা লোকটিকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল।

রেষ্টুরেন্টের লোকরা তখন মেঝের রক্ত পরিষ্কার করতে লেগে গেছে।

স্যার দু'কাপ কফি দেব আপনাদের? ক্যাশ কাউন্টারের লোকটি বিনীত কণ্ঠে বলল।

ধন্যবাদ। আমার কোন কিছু খাওয়ার মুড নেই। কিন্তু অবাঞ্চিত কাজ করতে হলো। ম্যাডামকে কফি দিতে পার। আহমদ মুসা বলল।

সংগে সংগেই মেয়েটি বলল, ধন্যবাদ। আমিও এ সময় কোন কিছু খাব না।

এখানে থানা কত দূর? ক্যাশ কাউন্টারের লোকটিকে জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

স্যার নতুন একটি পুলিশ ষ্টেশন হয়েছে কয়েকদিন আগে। সেটা এখান থেকে মাইল দুই, মানে এ জায়গা ও তোয়া সিটির মধ্যবর্তী স্থানে পুলিশ ষ্টেশনটি। বলল ক্যাশ কাউন্টারের লোকটি।

ঠিক আছে, তাহলে তোয়া যাওয়ার সময় আপনি থানায় একটা ডায়েরি করবেন, ওরা এসে লাশ ও বন্দীদের নিয়ে যাবে। মেয়েটিকে লক্ষ্য করে বলল আহমদ মুসা।

কথা শেষ করে একটা দম নিয়েই আবার বলল, আমিও তোয়া সিটিতে যাব, আপনি লিফট দিলে খুশি হবো। বলল আহমদ মুসা মেয়েটিকে।

মেয়েটি বেদনা জড়িত বিস্ময়ের সাথে আহমদ মুসার দিকে তাকাল, আপনি এভাবে কথা বলে আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন। আপনি শুধু ওদের হাত থেকে আমাকে বাঁচাননি, মুক্তই করেননি, আমাকে ওদের হাত থেকে আপনি জয় করে নিয়েছেন। এখন তো আপনি আমাকে কমান্ড করার কথা এবং আমাকে তা অবশ্যই শুনতে হবে।

আমি যেটা করেছি, আমি বিপদে পড়লে আপনিও সেটাই করতেন। আমি বিশেষ কিছু করিনি। বলল আহমদ মুসা।

আমি কিছু বলব না এর উত্তরে। আপনি দেখছি, যেমন কাজে বড়, তেমনি বিনয়েও বড়। যাক, আমার গাড়ি আছে সত্যি, আপনি সাথে না থাকলে আমি তোয়া যেতে পারব না। আমার মনে হচ্ছে, গোটা রাস্তা জুড়েই গুন্ডারা ওঁৎপেতে বসে আছে। বলল মেয়েটি।

আহমদ মুসা ধন্যবাদ দিতে যাচ্ছিল।

গাড়ির শব্দ ও হর্নে সে থেমে গেল। দু'টি গাড়ি এসে দাঁড়াল রেষ্টুরেন্টের সামনে পাহাড়ের গোড়ায়।

পুলিশের গাড়ি।

সামনের জীপ থেকে একজন অফিসার লাফ দিয়ে নামল। পেছনের গাড়িটা একটা পিকআপ। সে গাড়ি থেকে ছয় সাতজন পুলিশ নামল।

অফিসারসহ পুলিশরা এসে ঘরে ঢুকল। মেয়েটিকে দেখেই অফিসার চিৎকার করে বলল, থ্যাংক জিহোবা, মিস নিনা নাদিয়া আপনি এখানে? ওখানে

লাশ ও বাঁধা লোকগুলো কিসের জন্য? ওরা কারা? স্যারের টেলিফোন পেয়েই আমরা বেরিয়েছি। যাচ্ছিলাম যে ঠিকানা আপনি দিয়েছিলেন সেদিকে। এখানে এতগুলো গাড়ি দেখে উঠে এলাম। এক নিশ্বাসে কথাগুলো গড় গড় করে বলে গেল অফিসারটি।

মেয়েটি অফিসারকে আগেই স্যালুট দিয়েছিল। এখন অফিসারকে ধন্যবাদ দিয়ে আহমদ মুসাকে উদ্দেশ্য করে পুলিশ অফিসারের পরিচয় দিয়ে বলল, ইনি পুলিশ সুপার কোহেন কার্লম্যান। প্রথমে যখন গুন্ডাদের হাতে পড়ি, তখন অফিসে মোবাইল করতে পেরেছিলাম। পরে ধস্তাধস্তি করে পালিয়ে আসার সময় মোবাইল ও রিভলবার দুই-ই হারাই। আমার সেই টেলিফোন পেয়েই অফিস ওদের পাঠিয়েছে।

ইনি কে মিস নাদিয়া? বলল পুলিশ সুপার কোহেন কার্লম্যান।

ইনি আমাকে গুন্ডাদের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। আমি গুন্ডাদের হাত থেকে পালিয়ে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিলাম। আমাকে ফলো করে এখানে এসে ওরা আবার আমাকে ধরেছিল। আমাকে নিয়ে যাচ্ছিল ওরা। ইনি আমাকে উদ্ধার করেছেন। ওদের তিনজন সংজ্ঞাহীন, একজন নিহত এবং তিনজন আত্মসমর্পণ করেছে। থামল মিস নিনা নাদিয়া।

ও ওরাই তাহলে পাহাড়ের গোড়ায় বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে?

জি হ্যাঁ। বলল নিনা নাদিয়া।

শুনেই পুলিশ অফিসার কোহেন কার্লম্যান একজন পুলিশ সিপাইকে উদ্দেশ্য করে বলল, তোমরা কয়েকজন যাও, পাহাড়ের গোড়ায় পড়ে থাকা লোকদের পিকআপে তোল।

বলে সে আহমদ মুসার দিকে তাকাল এবং ধন্যবাদ দিল।

কিন্তু আহমদ মুসার দিকে তাকিয়েই তার চোখ যেন আটকে গেল। সে দু'ধাপ এগিয়ে আহমদ মুসার সামনে এসে দাঁড়াল। কপাল কুঁচকে গেছে পুলিশ অফিসারটির। তার চোখ দু'টো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। বলল সে আহমদ মুসার চোখের দিকে তাকিয়ে, আপনাকে পরিচিত মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, আপনার ফটো আমি

দেখেছি তেলআবিবে আমাদের ভিআইপি ডসিয়ারে। আপনার পাসপোর্ঠ, কাগজপত্র দেখি।

বলে হাত পাতল পুলিশ অফিসার।

আহমদ মুসা জ্যাকেটের ভেতরে পকেট থেকে তার পাসপোর্ট, তার ট্যুরিষ্ট ও ফিসিং ডকুমেন্ট বের করে পুলিশ অফিসারের হাতে দিল।

পুলিশ পাসপোর্টে আহমদ মুসার নাম 'হাবিব গনজালেস' দেখে তাকাল তার দিকে। বলল, আপনি খৃষ্টান?

আহমদ মুসা সরাসরি উত্তর না দিয়ে বলল, সন্দেহ আছে কি?

সন্দেহ অবশ্য নেই। কিন্তু আমার মন বলছে, ডসিয়ারের সেই ছবির নামের যেন কোথায় ফাঁক আছে। যাক, আপনি তোয়া দ্বীপে অপরিচিত এবং আইন ভংগ করে আপনি তোয়া দ্বীপে এসেছেন। সুতরাং আপনি সন্দেহজনক ব্যক্তি। আমার সাথে আপনাকে তোয়া শহরে যেতে হবে।

তার মানে আপনি তাকে গ্রেফতার করছেন। কিন্তু আমি বলেছি অফিসার, উনি আমার জীবন বাঁচিয়েছেন এবং আপনি যা বলছেন, সে অনুসারেও বড় কোন অপরাধ করেননি। শুধুমাত্র অপরিচিত বলে সন্দেহভাজন বলেই তাঁকে গ্রেফতার করা ঠিক হবে না। আমার অনুরোধ, তাকে আপনি গ্রেফতার করবেন না।

মিস নিনা নাদিয়া, আপনি ও আপনার বিভাগ আমার চেয়ে এটা ভালো জানেন যে, দ্বীপে বলতে গেলে এখন সামরিক শাসন চলছে। আমরা সবাই জরুরি আইনের অধীন। অপরিচিত লোকের ব্যাপারে এটা সিদ্ধান্ত, যেখানে যে নামে যে পরিচয়েই অপরিচিত লোক পাওয়া যাক, তাকে জয়েন্ট ইন্টেলিজেন্স সেলে পাঠাতে হবে। তার ব্যাপারে আমাদের কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার এখতিয়ার নেই। সুতরাং আমি আপনার অনুরোধ রাখতে পারছি না। জয়েন্ট সেলে তো আপনার লোকজনই থাকবে, আপনি বরং কিছু বলার থাকলে সেখানে বলবেন। আমাকে দয়া করে বিপদে ফেলবেন না। থামল পুলিশ অফিসার।

বিষন্ন হয়ে গেল নিনা নাদিয়ার মুখ। তাকাল সে আহমদ মুসার দিকে। আহমদ মুসার মুখে দেখল সে উজ্জল হাসি। আচ্ছা অদ্ভুত মানুষ তো! তাকে সন্দেহভাজন হিসেবে গ্রেফতার করা হচ্ছে, তবু তার মধ্যে কোন চিন্তা নেই, উদ্বেগ

নেই! আসলে সে জানে না আজ তোয়ায় ইসরাইলীরা কাউকে সন্দেহভাজন ভাবার অর্থ কি! এর অর্থ হলো, অপরিচিত ঐ লোকটা নিরপেক্ষ প্রমাণ হলেও চলবে না, সে যদি সবদিক থেকে ইসরাইলের বন্ধু না হয়, তাহলে তার মৃত্যু অবধারিত। এই বিষয়টা জানলে সে হাসতে পারতো না। কিন্তু আমি তো জানি না, আমি এখন কি করব, কি বলব!

মিস নিনা নাদিয়ার বিব্রত-বিষণ্ন অবস্থা দেখে আহমদ মুসা বলল, ম্যাডাম আপনি ভাববেন না। আমি তো তোয়া শহরে যেতে চেয়েছিলাম। যাওয়া তো হচ্ছে। বন্দী অবস্থায় যাচ্ছি এই আর কি!

মিস নিনা নাদিয়া আহমদ মুসার দিকে ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। কিছুই বলতে পারল না। তার চোখ দু'টি অশ্রুতে ছলছল হয়ে উঠেছে বলে মনে হলো।

আহমদ মুসা তাকালো পুলিশ অফিসারের দিকে। বলল, হাতকড়ি লাগাতে চান লাগান। আমার আপত্তি নেই।

'স্যরি' বলে আহমদ মুসার হাতে হাতকড়ি পরানোর দিকে কান না দিয়ে বলল, আপনি ক্রিমিনাল নন, সন্দেহভাজন হিসেবে গ্রেফতার করছি। সন্দেহভাজনদের হাতকড়ি পরানো হয় না।

বলে উঠে দাঁড়াল পুলিশ অফিসার। আহমদ মুসাকে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল বাইরে বেরোনোর জন্যে।

মিস নিনা নাদিয়া বিহবলের ন্যায় ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল। পুলিশ তখন বেরিয়ে গেছে। নিনা নাদিয়া তখনও দাঁড়িয়ে।

লাশ কাউন্টারের লোকটা এসে নিনা নাদিয়ার কাছে দাঁড়াল। তার চোখ-মুখও বেদনার্ত। বলল সে, লোকটাকে ধরেই নিয়ে গেল! লোকটা আসলেই খুব ভালো। দেখলেন না কেমন সে ভয়-উদ্বেগহীন। পাপি লোক এমন হয় না।

দুঃখটা এজন্যেই বেশি হচ্ছে যে, তার জন্যে কিছু করতে পারলাম না। বলল নিনা নাদিয়া।

আপনিও কি পুলিশের লোক। পুলিশ অফিসারের কথা শুনে তাই মনে হলো। বলল লোকটি।

হ্যাঁ, তবে আমি গোয়েন্দা বিভাগের লোক, একজন গোয়েন্দা অফিসার। নিনা নাদিয়া বলল।

আমরা তো শুনেছি, গোয়েন্দারা বেশি ক্ষমতাশালী। তাহলে আপনার কথা সে শুনল না কেন?

এটা ক্ষমতা বেশি-কমের ব্যাপার নয়। এটা আইনি সিদ্ধান্তের ব্যাপার। পুলিশ আইন অনুসারেই কাজ করেছে। তবে চিন্তা করবেন না আমার কাজ আমি করব।

বলে নিনা নাদিয়া ক্যাশ কাউন্টারের লোকটিকে ধন্যবাদ দিয়ে রেষ্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে পা বাড়াল।

# ৪

ঘুম ভেঙে গেল আহমদ মুসার।

ধাতব একটা ক্ষীণ শব্দ কানে আসছে।

ক্ষীণ হলেও এই শব্দেই তার ঘুম ভেঙে গেছে, বুঝল আহমদ মুসা।

ঘুম ভেঙে গেলেও চোখ খোলেনি।

বন্দী সেলে তখন তীব্র আলো। চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার মত আলো। এরকম আলোর মধ্যে চোখ বন্ধ করে রাখলেই সুবিধা। তাছাড়া শব্দটার গতি কি হয় সেটাও সে আঁচ করতে চায়। সে বুঝতে পারছে, শব্দটা তার সেলের দরজা থেকে। তার মানে দরজায় কেউ আছে। চোখ খুললেই সে জেনে যাবে, আমি জেগে আছি। শত্রু বা লোকটির টার্গেট সম্পর্কে আরও একটু না জেনে সে তার অবস্থা তাকে জানাতে চায় না।

হ্যাঁ, ওটা দরজা থেকে আসাই শব্দ।

কে হতে পারে ওখানে?

পুলিশ কর্তৃপক্ষের কেউ? কিন্তু ওরা আসবে কেন? তোয়া সিটি পুলিশের প্রধানসহ কয়েকজন অফিসার একবার তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গেছে। আহমদ মুসাকে তারা গুরুতর সন্দেহ করেছে। তার পাসপোর্ট ও কাগজপত্রকে তারা বানানো বলে মনে করেছে। তারা পরিষ্কার মন্তব্য করেছে, আমার চেহারা ও কথাবার্তার সাথে পাসপোর্ট ও কাগজপত্রের চরিত্রের মিল নেই। পুলিশ প্রধান ও গোয়েন্দা প্রধানগণ গুরুত্বপূর্ণ মিটিং-এ ব্যস্ত ছিল তারা আসতে পারেননি। তাই চূড়ান্ত জিজ্ঞাসাবাদ ও সিদ্ধান্তের ব্যাপারটা ঝুলে আছে। আসছে সকালে তার চূড়ান্ত জিজ্ঞাসাবাদ হবে। আহমদ মুসাও সেই সময়কে মুক্তি ও কাজ শুরুর মুহূর্ত হিসেবে ঠিক করেছে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় সরে পড়ার চিন্তা সে করেছিল। কিন্তু সেলের গেটে চারটি তালা এবং একটু দূরে চারজন পুলিশ পাহারা থাকায় সে চেষ্টা

আপাতত সে ত্যাগ করেছে। ভোর রাতে সে একবার উদ্যোগ নেবে, ভেবে রেখেছে। কিন্তু এর মধ্যে আবার দরজায় কে এলো?

নতুন শব্দ পেল আহমদ মুসা। সেলের দরজার হুক খোলার শব্দ।

হুক খুলে গেল দরজার।

দরজা খোলারও মোটা একটা ধাতব শব্দ হলো।

নিশ্চয় লোকটা আসছে।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করছে আহমদ মুসা। আগে থেকেই ঘাড়ের পেছনে জ্যাকেটের গোপন পকেটে রিভলবার ঢোকানো আছে।

'মি. গনজালেস, মি. গনজালেস' একটা চাপা কন্ঠের ডাক তার কানে এল। ডাকটা নারী কণ্ঠের। নিনা নাদিয়া কি?

চোখ খুলল আহমদ মুসা।

হ্যাঁ, নিনা নাদিয়াই তার দিকে ঝুঁকে পড়ে বসে আছে।

আহমদ মুসা উঠে বসল।

নিনা নাদিয়া দাঁড়িয়ে গেল। বলল, তাড়াতাড়ি আসুন। বেরোতে হবে তাড়াতাড়ি।

বলে নিনা নাদিয়া সেলের বাইরে যাওয়ার পথ ধরল।

তার সাথে আহমদ মুসাও সেলের বাইরে বেরিয়ে এল। দেখল সে, চারজন পুলিশ টেবিলে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছে।

আহমদ মুসাকে পুলিশের দিকে তাকানো দেখে নিনা নাদিয়া হেসে বলল, ওদের মদে ঘুমের ওষুধ মেশানোর ব্যবস্থা করেছিলাম।

তারা পুলিশের টেবিল অতিক্রম করে ঘর থেকে বেরোনোর করিডোরের কাছাকাছি এসে পৌছেছে, এ সময় অনেকগুলো বুটের শব্দ খুব কাছ থেকে তাদের কানে এল।

দু'জন তাকাল পরস্পরের দিকে।

আহমদ মুসা নিনা নাদিয়াকে ইংগিত করল আড়ালে সরে যাওয়ার জন্যে। সংগে সংগেই নিনা নাদিয়া পাশের দরজা দিয়ে একটা ঘরে ঢুকে গেল।

আর কিছু ভাবনা-চিন্তা করার আগেই পাঁচজন পুলিশ এসে দরজায় দাঁড়াল। তাদের হাতে ষ্টেনগান। একজন অফিসারের হাতে একটা রিভলবার।

আহমদ মুসা তাদের দেখেই মুহূর্তে ঘাড়ের পেছনে জ্যাকেটের গোপন পকেট থেকে রিভলবার বের করে তাদের দিকে তাক করে বলল, তোমরা হাতের অস্ত্র ফেলে না দিলে গুলী করব।

ওরা আহমদ মুসাকে গুলী করার মুডে ছিল না। এরকম বোধ হয নির্দেশ ছিল না। যেহেতু তারা সংখ্যায় বেশি, তাই বোধ হয় তারা মনে করেছিল, তাদের দেখেই বন্দী আত্মসমর্পণ করবে। যে লোক বন্দী হয়ে আসতে সামান্য আপত্তিও করেনি, তার কাছ থেকে এটাই আশা করা যায়। এই ধারণা থেকে পুলিশ অফিসারসহ পুলিশরা বন্দীকে দেখেই তাকে গান-পয়েন্টে আনেনি। বন্দী নিরস্ত্র হওয়াও পুলিশদের অপ্রস্তুতির কারণ ছিল।

আহমদ মুসার রিভলবার এই সুযোগ গ্রহণ করেছে।

কিন্তু আহমদ মুসার কথা ও তার উদ্যত রিভলবারের নলের প্রতি তেমন গুরুত্ব না দিয়ে আহমদ মুসা লক্ষ্যে ষ্টেনগান ও রিভলবারের নল দ্রুত তুলে নিচ্ছিল। বন্দী একটা রিভলবার দিয়ে পাঁচজন পুলিশকে গুলী করতে সাহস পাবে, তা তারা মনেই করেনি।

আহমদ মুসা যা বলেছিল তাই করল।

তার 'ব্ল্যাক ক্যানন' পুলিশ অফিসারসহ সব পুলিশের ওপর দিয়ে ঘুরে এল।

মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধান। পাঁচ পুলিশের লাশ পড়ে গেল করিডোরের ওপর।

মিস নিনা নাদিয়া বেরিয়ে............।

কথা শেষ করতে হলো না আহমদ মুসাকে। বেরিয়ে আসছিল নিনা নাদিয়া। সব কিছুই সে দেখেছে। মুহূর্তের জন্যে মুখটা বিষণ্ণও হয়ে উঠেছিল।

তবু বেরিয়ে এসেই বলল সে আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, আপনি দেখছি অসাধ্যও সাধন করতে পারেন মি. গনজালেস। সাহস, ক্ষীপ্রতা, কৌশল, লক্ষ্যভেদ সব দিক থেকেই আপনি দেখছি অদ্বিতীয়!

এসব কথার দিকে কান না দিয়ে আহমদ মুসা বলল, এখন কি করতে হবে বলুন।

আসুন। ওরা জানতে পেরেছে, সামনে দিয়ে আর বের হওয়া যাবে না। পেছন দিক দিয়ে বের হওয়ার গোপন পথ আছে, আসুন। বলল নিনা নাদিয়া।

বলে নিনা নাদিয়া দৌড়াতে শুরু করল। পেছনে আহমদ মুসা।

গভীর রাত, বিভিন্ন পয়েন্টে প্রহরী আছে। তাদের মধ্যে চাঞ্চল্য কিংবা বাড়তি সতর্কতা দেখল না। বন্দী পলায়নের খবর তারা পায়নি। তাহলে ওরা পাঁচজন জানতে পারল কি করে? পর মুহূর্তেই মনে পড়ল, ওরা বন্দীখানার নিয়ন্ত্রণ কক্ষের বাড়তি প্রহরী। সম্ভবত বন্দীসেলগুলোর দরজার সাথে এলার্ম সিষ্টেম রয়েছে বন্দীখানার কন্ট্রোল কক্ষে। আহমদ মুসার সেলের দরজা খোলার এলার্ম পেয়েই তারা ছুটে এসেছিল সেলে।

গোপন পথ দিয়ে বের হওয়ার পথে আর কোন বাধা পেল না আহমদ মুসারা। পাহারার পয়েন্টগুলো এড়িয়ে পেছনের গোপন দরজাটায় পৌছে গেল আহমদ মুসারা।

দরজাটা ডিজিটাল লকে আটকানো।

দরজার সামনে পৌছে নিনা নাদিয়া তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, এই লকই শেষ সমস্যা। এর সমাধান আমার কাছে নেই। ডিজিটাল লক ডিকোড করে খোলা না গেলে লকটা গুলী করে ভেঙে দিলেও দরজা খুলবে না।

গোপন পথের শেষ এই দরজাটা প্রায় দেড় ইঞ্চি পুরু ষ্টিলের। দরজা ভাঙার কোন প্রশ্নই ওঠে না। মিস নিনা নাদিয়া, দরজা খোলার ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিন। বলল আহমদ মুসা।

ডিজিটাল লকের সামনে গিয়ে দাঁড়াল আহমদ মুসা তারপর বলল, ওপেনার কোর্ডটা থ্রি ডিজিটের।

থ্রি ডিজিটের? কেমন করে জানলেন থ্রি ডিজিটের। কেন নয় ‘ফোর’ বা ‘ফাইভ’ ডিজিটের? বলল নিনা নাদিয়া। তার কণ্ঠে অপার বিস্ময়।

লকটা যে ডিজাইনের, যে সাইজের, তাতে এর ওপেনার কোড থ্রি ডিজিটের বেশি হওয়ার কোনই স্কোপ নেই। এই লকের নির্মাতা কোম্পানীর

বিভিন্ন কোড-ডিজিটের লকগুলো একেবারেই ভিন্ন ভিন্ন সাইজের। আহমদ মুসা বলল।

এ সাংঘাতিক একটা ইনফরমেশন। এটা জানা ছিল না। ধন্যবাদ আপনাকে। বলল নিনা নাদিয়া।

আহমদ মুসা ততক্ষণে ডিজিটাল লক নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

নিনা নাদিয়া তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা একবার তার দিকে তাকিয়ে বলল, তিন অক্ষরের সবচেয়ে প্রিয় শব্দ এখন ইসরাইলীদের কি মিস নিনা নাদিয়া?

নাদিয়া একটু চিন্তা করল। তারপর বলল, 'তোরাহ।'

'হ্যাঁ, হিব্রু ভাষায় 'তোরাহ' তিন বর্ণে লেখা হয়। তবে সব ইহুদিদের এটা প্রিয় শব্দ, শুধু ইসরাইলীদের নয়। ইসরাইলীদের আলাদা কোন প্রিয় শব্দ কি আছে?

তেমন কোন শব্দ আমি দেখছি না। একটু চিন্তা করে বলল নিনা নাদিয়া।

আমার মনে হচ্ছে সে শব্দটা 'তোয়া।'

'তোয়া' লিখতে ইংরেজিতে তিনটা বর্ণ লাগে। আর ডিজিটাল লকটা ইংরেজি বর্ণের। সুতরাং ওপেনার কোর্ডটা ইংরেজি বর্ণেই হবে। আমার মনে হয় ওপেনার কোর্ডটা 'তোয়া হতে পারে।

বলেই আহমদ মুসা ডিজিটাল লকের 'কি' গুলোর উপর আঙুল চালাতে লাগল।

'নিনা নাদিয়া'র চোখ বিস্ময়ে ছানাবড়া হয়ে গেছে। তোয়া এখন সব ইসরাইলীর মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু, সেহেতু 'তোয়া' এখন তাদের কাছে প্রিয় নামও। কিন্তু আমার তো এটা মনে পড়েনি। বাইরের একজন খৃষ্টান গনজালেসের এটা মনে হলো কেমন করে? আসলে কে এই 'হাবিব গনজালেস'? তার নামের সাথে কিন্তু তার সাহস, শক্তি, বুদ্ধিমত্তা কিছুরই মিল নেই। কে তাহলে এই হাবিব গনজালেস?

নিনা নাদিয়ার এই চিন্তার মধ্যেই আহমদ মুসা বলে ওঠল, মিস নিনা নাদিয়া, আমরা সফল। খুলে গেছে দরজা। আসুন।

বলে আহমদ মুসা দরজা খুলে বের হয়ে গেল।

আহমদ মুসার কথায় নিনা নাদিয়ার চিন্তা সূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। এরপরও মাথা থেকে তার প্রশ্নগুলো গেল না।

সে নীরবে আহমদ মুসাকে অনুসরণ করে দরজা দিয়ে বের হয়ে গেল।

নিনা বের হয়ে এলে আহমদ মুসা দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিল। সংগে সংগেই 'ক্লিক' করে দরজার লকটাও বন্ধ হয়ে গেল।

ভালো হলো লকটা তার আগের জায়গায় ফিরে গেল। কিছু বুঝতে পারবে না, আমরা এই দরজা দিয়ে পালিয়েছি। আহমদ মুসা বলল।

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা নিনা নাদিয়ার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। বলল, আমার সীমাহীন কৃতজ্ঞতা আপনার প্রতি, এ কথা বলে আপনাকে ছোট করব না। কিন্তু আরো একটা ফেভার আমি আপনার কাছে চাই।

বলুন। আপনার কাছে আমার ঋণ শোধ হওয়ার নয়। বলল নিনা নাদিয়া গম্ভীর কণ্ঠে।

আপনি এভাবে কথা বলছেন। কথা তাহলে আমার বলা হলো না। আহমদ মুসা বলল।

নিনা নাদিয়া মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, ঋণ, পরিশোধ এসব কথা বাদ। বলুন আপনার কথা।

আহমদ মুসার মুখটা গম্ভীর হয়ে ওঠল। বলল, মূল্যবান ভিআইপি বন্দীদের কোথায় রাখা হয়?

নিনা নাদিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে আহমদ মুসার দিকে তাকাল। একটু ভাবল। বলল, এমন কোন বন্দী তোয়াতে নেই। কিন্তু এ প্রশ্ন করছেন কেন?

মিস নাদিয়া, আমি দু'জন বন্দীকে খুঁজতে এসেছি। আপনার সাহায্য আমি চাই। আহমদ মুসা বলল।

কোন দুই বন্দী?

এমিলিয়া এবং বায়তুল আকসা মসজিদের ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমানকে। আহমদ মুসা বলল।

বিস্ময়ে-বিস্ফোরিত হয়ে উঠেছে নিনা নাদিয়ার দু'চোখ। তাহলে গনজালেস নামের এই লোক ফিলিস্তিন থেকে এসেছে! এর নাম তাহলে গনজালেস অবশ্যই নয়। তাহলে কে? এসব ভাবনার মধ্যেই সে বলল, আমি যেহেতু আগেই ঠিক করেছি, আপনাকে সাহায্য করব, তাই আমি দুই বন্দীর তথ্য দিয়ে আপনাকে সাহায্য করবো। কিন্তু তার আগে বলুন, আপনি কে? আপনার নামের সাথে আপনার এই পরিচয় মেলে না, এটা আমি আগেই বুঝেছি। তাহলে আপনি কে?

আপনার ধারণা ঠিক। আমি হাবিব গনজালেস নই। নামের দিক দিয়ে আমি বড় কোন পদ, পরিচয়ের মালিক নই। আমি ফিলিস্তিন সরকারেরও কেউ নই। বলতে পারেন একজন ফ্রি ল্যান্সার সেবক আমি। ধর্মের পরিচয়ে আমি মুসলমান। আমি মানুষকে সাহায্য করি। নিজের নামটা গোপন রাখতে গিয়ে আহমদ মুসাকে এভাবে অনেক কথা বলতে হলো। নিজের মুসলিম পরিচয় ও এমিলিয়াদের উদ্ধার করতে এসেছে, একথা বললেও নিজের নাম তাকে বলতে চাইলো না কারণ, আহমদ মুসা জানে নিনা নাদিয়া ইসরাইলীদের একজন গোয়েন্দা অফিসার। তারা আহমদ মুসার প্রতিই এলার্জিক বেশি। আহমদ মুসার নাম শুনলে সাহায্য পাওয়া ভন্ডুল হয়ে যেতে পারে।

'আপনি তাদের খোঁজ করতে এসেছেন। খোঁজ দিচ্ছি, তাঁদেরকে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী প্রাসাদের সিকিউরিটি জোনে বন্দী করে রাখা হয়েছে। কিন্তু খোঁজ নিয়ে আপনি কি করবেন?'

প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর কি একই প্রাসাদ? আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

হ্যাঁ, একই প্রাসাদে ওরা থাকেন। নিনা নাদিয়া বলল।

সিকিউরিটি জোনটা কোন দিকে?

'প্রাসাদের রেসিডেন্সিয়াল ব্লকে থাকেন প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী। তার চারধার ঘিরেই সিকিউরিটি জোন। এই এলাকা সার্বÿণিক ও সর্বোচ্চ পাহারার অধীন, যাতে রেসিডেন্সিয়াল ব্লক নিরাপদ থাকে। বলল নিনা নাদিয়া।

ধন্যবাদ। এই সেক্রেটারিয়েটের প্রধান গেটের বিপরীত দিকের বড় গেটটাই তো প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের গেট, তাই না? জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের লোকেশন সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাইছেন কেন? আপনি কি তাদের উদ্ধারেরও চিন্তা করছেন? আমার একটা পরামর্শ, খোঁজ নেয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকুন। ঐ দুই বন্দীর সাথে ইসরাইলীদের ভাগ্যের সবটা জড়িত। যেখানে ভাগ্যের প্রশ্ন, সেখানে মানুষ মরিয়া হয়। বলল নিনা নাদিয়া।

উত্তরে আহমদ মুসা বলতে চাইল, এমিলিয়া ও খতিব আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমানের উদ্ধারের সাথে গোটা ফিলিস্তিনি আবেগ জড়িত, তাদের মুক্তি ছাড়া অন্য কিছু ভাবার অবকাশ নেই। কিন্তু এ কথা না বলে আহমদ মুসা বলল, ধন্যবাদ আপনাকে একটা সত্য স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যে।

‘ধন্যবাদ আপনাকেও।’ বলে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, এখন রাত আড়াইটা। কোথায় যাবেন এখন আপনি?

ঠিক নেই। আমি যে কাজে তোয়া আসতে চেয়েছিলাম, সে কাজ তো হয়নি। বলল আহমদ মুসা।

বিমর্ষতা নামল নিনা নাদিয়ার চেহারায়। বলল, বুঝেছি। ইশ্বর আপনাকে হেফাজত করুন। আমি চলি।

বলে নিনা নাদিয়া হাত বাড়িয়ে দিল হ্যান্ড শেকের জন্যে।

আহমদ মুসা হ্যান্ড শেক না করে হেসে বলল, ‘মুসলিম পরিচয় দেয়ার পর আর পারছি না হ্যান্ড শেক করতে। ধন্যবাদ আপনাকে মিস নাদিয়া। আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। আমিও চলি।

আহমদ মুসা ও নিনা নাদিয়া বিপরীত দিকে হাঁটতে শুরু করল।

কয়েক ধাপ এগিয়ে নিনা নাদিয়া পেছন ফিরে আহমদ মুসার দিকে তাকাল। আহমদ মুসাকে দ্বিধাহীনভাবে সামনে এগোতে দেখল। কিন্তু নিনা নাদিয়ার মুখে প্রবল দ্বিধা-দ্বন্দের ছাপ। অন্তরে তার ঝড় বইছে। তার বুঝতে বাকি নেই গনজালেস পরিচয়ের লোকটা তোয়ায় এসেছে এমিলিয়াদের উদ্ধারের জন্যেই। কিন্তু এটা হতে পারে কি করে? এমিলিয়ারাই ইসরাইলীদের ভাগ্যের ট্রাম কার্ড এটা হাতছাড়া হলে তাদের ভাগ্যও যে শেষ হয়ে যাবে।

চোখ-মুখের দ্বন্দ্ব-বিমর্ষতা আরও বাড়ল নিনা নাদিয়ার।

আহমদ মুসা প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের পেছনে বাগানের একটা গাছের অন্ধকারে এসে বসল। পেছনের প্রাচীর টপকে আহমদ মুসা এখানে প্রবেশ করেছে। প্রাচীরের ওপারের তিনজন প্রহরী তাকে ধরে ফেলেছিল, যেন তারা তার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। তবে তাদের সামলাতে গুলীর ব্যবহার করতে হয়নি। কারাত চালিয়েই তাদের কয়েক ঘণ্টার জন্যে ঘুম পাড়ানো গেছে।

আহমদ মুসা তোয়া নগরীর স্যাটেলাইট ফটোর উপর পেন্সিল টর্সের আলো ফেলে আবার তার উপর চোখ বুলাতে লাগল।

প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ ঘিরে যে সিকিউরিটি জোন, তার মধ্যে পেছনে এই দিকটাই নিরাপদ, নিঃর্ঝঞ্ঝাট। অতএব বন্দীরা এদিকেই থাকা স্বাভাবিক। আহমদ মুসা এদিকটাই বেছে নিয়েছে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে প্রবেশের জন্যে।

আহমদ মুসা প্রেসিডেন্ট প্রসাদের স্যাটেলাইট ফটোর উপর আবার নজর বুলাতে লাগল। পেছনের দিকে নিরাপত্তার বাড়তি ব্যবস্থা হিসেবে ছোট একটা গার্ড ব্যারাক রয়েছে। ব্যারাকের পর তিন-চার গজের একটা ফাঁকা জায়গা। তারপর কাঁটাতারের বেড়া। বেড়ার পর প্রাসাদের দেয়াল।

দেয়ালের জানালাগুলোর ওপর চোখ বুলাচ্ছিল আহমদ মুসা।

আকস্মিক একটা টর্চের তীব্র আলোতে সে আলোকিত হয়ে ওঠল।

চমকে ওঠে আহমদ মুসা উপর দিকে তাকানোর বদলে আলোর বাইরে দাঁড়ানো ছায়ামূর্তির হাঁটু লক্ষ্যে মাথা সামনে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। লোকটির হাঁটুতে আহমদ মুসার মাথা প্রচন্ড শক্তিতে আঘাত হানল।

আঘাত লোকটির জন্যে অভাবিত ও আকস্মিক ছিল। সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল উপুড় হয়ে আহমদ মুসার ওপর। সাথে সাথে টর্চের আলোও নিভে গিয়েছিল।

সে পড়ে গিয়ে স্থির হওয়ার আগেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়ে অন্ধকারেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। লোকটি ওঠার চেষ্টা করছিল। আহমদ মুসা তাকে সামলানোর জন্যে সময়ক্ষেপণ করতে চাইল না। লোকটির নাগাল পেয়েই

আহমদ মুসা লোকটির কানের নিচের জায়গাটায় তার ডান হাতের দু'টি মোক্ষম কারাত চালাল। লোকটি কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়ে গার্ড ব্যারাকের দিকে এগোলো। এ গার্ডের খোঁজে অন্যেরাও এদিকে আসতে পারে। গাছের অন্ধকার থেকে বেরোনোর পর মাটিতে শুয়ে পড়ে দেহটা গুটিয়ে নিয়ে গড়িয়ে চলল গার্ড রুমের দিকে।

গার্ড রুমের সম্মুখটা প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের দিকে। পেছনে তিনটি পর্যবেক্ষণ জানালা। জানালাগুলো দেয়ালের লেভেলে বাইরে বেরিয়ে আসা। এর তিন দিকে তিনটি জানালা।

মাঝখানের জানালার নিচে গিয়ে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা। তাকালো ঘরের ভেতরে।

ছয়-সাতজন গার্ড বসে চা খাচ্ছে। সবার সামনেই একটি করে ষ্টেনগান।

একজন বলল, জনাথনের চা তো ঠান্ডা হয়ে গেল। এখনও আসছে না কেন। বাইরেটা একটু দেখতে পাঠানো হলো, কি হলো তার।

অন্য একজন বলল, তোমরা তাড়াতাড়ি চা-খাওয়া শেষ করো। আজকের রাতটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। হুকুম এসেছে, পাহারায় যেন সামান্য গাফিলতিও না হয়। ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করলে, সোজা গুলী করার হুকুম এসেছে। তোমরা তাড়াতাড়ি করো।

ঘর থেকে বের হওয়ার একমাত্র দরজা পশ্চিম দিকে। ওদেরকে ঘরে আটকাতে হবে, নয়তো শেষ করতে হবে। ওরা বেরিয়ে এলে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে ঢোকার আগেই আরেক ঝামেলায় পড়তে হবে।

আহমদ মুসা দ্রুত গুড়ি মেরে দৌড়ে গার্ড ব্যারাকের সামনে গিয়ে পৌছল। বারান্দার সিঁড়ি ভেঙে দ্রুত গিয়ে দরজার মাঝখানে দাঁড়াল।

ভেতরে সাত জনের একবারে প্রান্তের জন আহমদ মুসাকে দরজায় এসে দাঁড়াতে দেখেই সে দ্রুত দরজার আড়ালে সরে গিয়েছিল। আহমদ মুসার তা নজর এড়ায়নি।

সে দরজার আড়াল নিয়ে এগোচ্ছিল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা তার ‘ব্ল্যাক ক্যানন’ সামনের লোকদের দিকে তাক করে এক ধাপ সামনে এগিয়েই চোখের পলকে রিভলবার বাঁ দিকে ঘুরিয়ে ট্রিগার টিপেই রিভলবারের নল সামনে নিয়ে এল।

‘ব্ল্যাক ক্যানন’ গুলী করার পর একটুও শব্দ হলো না।

সাথীকে গুলী খেয়ে পড়ে যেতে দেখে ওরা পাগলের মত ষ্টেনগানগুলো পাশ থেকে তুলে নিয়ে আহমদ মুসার দিকে ঘুরতে গেল।

আহমদ মুসার নীরব কামান ‘ব্ল্যাক ক্যানন’ নীরবে গুলী বৃষ্টি করে সবার ওপর দিয়ে ঘুরে এল।

আহমদ মুসার দু’চোখ সবার ওপর দিয়ে ঘুরে এসে নিশ্চিত হয়ে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে এল।

বারান্দা থেকে নিচে মাটিতে ঝাপিয়ে পড়ে দেহটা গুটিয়ে দেহকে দ্রুত গড়িয়ে নিয়ে কাঁটাতারের বেড়ার পাশে গিয়ে স্থির হলো।

তারপর শুয়ে থেকেই জুতার গোড়ালি খুলে ভেতর থেকে রকেটাকৃতির ক্ষুদ্র ‘গামা বিমার’ (গামা রে’ উৎক্ষেপক) বের করল।

আহমদ মুসা বুঝেছে, কাঁটাতারের বেড়া বিদ্যুতায়িত করে রাখা হয়েছে। সে দেখতে পাচ্ছে তার কয়েক ধাপ পেছনে, কাঁটাতারের বেড়ার সাথে একটা বাদুড় পাখি আটকে আছে। সম্ভবত বাদুড়টা নিচু দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় বেড়ার বিদ্যুৎ তাকে টেনে নিয়েছে। আহমদ মুসা জানে ইদানিং বেড়ার বিদ্যুৎ প্রবাহটা বেশ শক্তিশালী ও আকর্ষণযোগ্য কিছু বেড়ার কাছাকাছি হলেই তাকে টেনে নেয় ধ্বংস করার জন্যে।

আহমদ মুসা গামা বিমার টর্চ হাতে নিয়ে ফায়ার লকটি অন করে বেড়ার সবচেয়ে নিচের তারটিকে লক্ষ্য করে গামা বিমারের লাল বোতামটি অন করে দিল। চোখের পলকে তারটি কেটে গেল, বিদ্যুৎ সামান্য স্পার্ক করার সুযোগ পেল না। এর উপরের তারটিও সে একইভাবে কেটে ফেলল। দু’ফুট উচ্চতা পরিমাণ ফাঁকা জায়গা তাতে সৃষ্টি হলো। এরপর আহমদ মুসা গড়িয়ে দু’আড়াই গজ পরিমাণ পেছনে গিয়ে কাঁটাতার দু’টির এ পাশটাও কেটে দিল। তার দু’টি মাটিতে পড়ে গেল।

আহমদ মুসা কাঁটাতারের খন্ড দুটি সরিয়ে দু'ফুট উঁচু এবং সাত ফুটের দীর্ঘ স্পেস দিয়ে খুব সহজে গড়িয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

ভেতরে ঢোকার পর শুয়ে থেকেই অপেক্ষা করতে লাগল।

কাঁটাতার কাটার সময় বিদ্যুৎ তরঙ্গে বিপরীত ওয়েভ সৃষ্টি হওয়া কিংবা তার কেটে পড়ার পর দুটি বিদ্যুৎ ওয়েভে যে ছেদ পড়েছে তার একটা প্রতিক্রিয়া কনট্রোল রুমের রাডারে স্পন্দিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে তারা এখনি ছুটে আসবে, এখানে।

আসলও তারা।

আহমদ মুসা তাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিল, কিন্তু সে তা টের পেল না।

তারা এল আহমদ মুসার দিক থেকে।

তারা এসে যখন আহমদ মুসার দিকে ষ্টেনগান তাক করে চিৎকার করে ওঠল, শুয়োরের বাচচা হাত তুলে উঠে দাঁড়া। তোর খেলা শেষ। যথেষ্ট ভুগিয়েছিস আমাদের।

আহমদ মুসা মাথার ওপর হাত রেখে উঠে দাঁড়াল। যেন সে মাথার পেছন দিকটা ধরে আছে।

ওরা তিনজন।

একজনের হাতে উদ্যত ষ্টেনগান। অন্য দু'জনের হাতে রিভলবার। আহমদ মুসা হাত তুলে উঠে দাঁড়ানোর পর তারা রিভলবার নামিয়ে নিয়েছে।

রিভলবারধারী একজন, তাকে বেরিয়ে আসতে বলল। আমরা কষ্ট করে ওখানে যাব কেন?

ষ্টেনগানধারী তার ষ্টেনগানের নল নেড়ে ইশারা করে বলতে লাগল বেরিয়ে এস।

আহমদ মুসার নজর ছিল লোকটার ষ্টেনগানের নলের দিকে। যে মুহূর্তেই ইশারা করতে গিয়ে ষ্টেনগানের নল নড়েছে। সে মুহূর্তেই আহমদ মুসার ডান হাত মাথা থেকে কয়েক ইঞ্চি নিচে গিয়ে জ্যাকেটের গোপন পকেটে তার 'ব্ল্যাক ক্যানন'-এর বাট ধরে চোখের পলকে তা ঘুরিয়ে এনে গুরী করল ষ্টেনগানধারীকে।

রিভলবারধারী দু'জন আহমদ মুসাকে গুলী করার জন্য তাদের রিভলবার তুলছিল দ্রুত।

ষ্টেনগানধারীকে গুলী করার পর আহমদ মুসা তার অটোমেটিক 'ব্ল্যাক ক্যানন'-এর ট্রিগার থেকে তার তর্জনী তুলল না। শুধু 'ব্ল্যাক ক্যানন'- এর নিঃশব্দ গুলীর ঝাঁক তাদের ঘিরে ফেলে।

ষ্টেনগানধারীর মত তারাও আতংকগ্রস্ত চোখ ও ঝাঁঝরা বুক নিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

আহমদ মুসা সেদিকে আর না তাকিয়ে পেছন ফিরে দৌড় দিল প্রাসাদের দিকে।

আশেপাশেও প্রহরী আছে। আহমদ মুসা তাদের নজরে পড়লে তারাও ছুটে আসবে।

একটা জানালার নিচে গিয়ে দাঁড়াল আহমদ মুসা। স্যাটেলাইট ফটোতে আগেই দেখেছিল এদিকের জানালাগুলো লোহার গরাদে ঢাকা। গরাদের পর আবার কি আছে বলা মুষ্কিল। তবে পাশ্চাত্যের নিয়ম হলো, জরুরি অবস্থা বা সিকিউরিটির অবস্থা বিবেচনা করে গরাদের পেছনে আর কিছু প্রতিবন্ধক রাখে না, যাতে জরুরি অবস্থায় বেরোনো যায়। তাই গরাদ ব্যবস্থাপনা ও গরাদকে তারা যথেষ্ট মজবুত করে।

এ জানালার গরাদ মনে হলো তার চেয়েও মজবুত। গরাদের ইস্পাত প্রায় দুই ইঞ্চি। কামানও এ গরাদের কিছু করতে পারবে না।

কিন্তু আহমদ মুসার কামান নয়, আছে 'গামা বিমার'। কামানের চেয়েও শক্তিশালী। এর শক্তিশালী অতি বেগুনি রশ্মি এসব ইস্পাতকে নিমিষে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারে।

গামা বিমারটা হাতে নিল আহমদ মুসা।

মনোযোগ দিল গরাদের দিকে।

কিন্তু পরক্ষণেই ভাবল, ভেতরে প্রবেশ করার জন্য আর একটু ভেবে নেয়া দরকার। ঢুকে সে কোন দিকে যাবে! কোন দিকে এমিলিয়াদের পাওয়া যেতে পারে।

একথা ভেবে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের স্যাটেলাইট ফটোগ্রাফটি আবার বের করল। পাশের দেয়াল ও ছাদের গঠনের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলাল। কিন্তু ছাদের লে-আউটে কোন পার্থক্য নেই। একই রকম গোটা ছাদটা। নিখুঁতভাবে দেখতে গিয়ে সব শেষে ছাদের পূর্ব দিকে দক্ষিণ পূর্ব কোণ থেকে কয়েকগজ উত্তরে ছাদের ওপর একটা ঢাকনা দেখতে পেল। এ রকম ঢাকনা গোটা ছাদের আর কোথাও নেই। ঢাকনা কি ঢেকে রেখেছে? আহমদ মুসা খুব ভালো করে দেখল, ঢাকনাটা আড়াই তিনফুটের কম নয়। আর ঢাকনাটা পূর্ব দেয়ালের সাথে লাগোয়া। এর অর্থ একটাই। সেটা হলো ঢাকনাটা একটা সিড়িমুখের ওপর। ভেতর থেকে সিঁড়ি সাধারণত দেয়াল অবলম্বন করেই ওঠে এবং বিপরীত দিকের আরেকটা দেয়ালেই সাধারণত এর শীর্ষটা স্থাপিত হয়। সুতরাং সিঁড়িমুখেই ঢাকনাটা স্থাপিত হয়েছে।

কিন্তু সিঁড়িটা এখানে কেন? সিকিউরিটি জোনে এই সিঁড়ির কারণ কি? এর অর্থ কি এটাই যে সিকিউরিটি জোনের কেন্দ্রবিন্দু এটা? জরুরি অবস্থায় ছাদ যাতে ব্যবহার করা যায়, এজন্যেই এই সিঁড়ির ব্যবস্থা। তাহলে এই এলাকারই কোথাও এমিলিয়া ও খতিব মহোদয়কে বন্দী করে রাখা হয়েছে।

এই সিদ্ধান্তে পৌছার পর আহমদ মুসা জানালার গরাদের দিকে এগোলো।

পকেট থেকে বের করে হাতে নিল ‘গামা রে’ বিমার’।

জানালা কাঁধ পরিমাণ উঁচু।

হাত যতটা উপরে তোলা যায় তুলে আহমদ মুসা জানালার ২ বর্গফুটের মত জায়গা ‘গামা রে বিমার’ দিয়ে কেটে ফেলল।

কাটা খন্ডটা বাইরে ফেলে দিয়ে লাফ দিয়ে জানালার ওপর উঠে নিচের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে জানালার ওপর রাখা দেহের ভর রেখে দেহের পেছনটা নিচে নামিয়ে দিল।

নিঃশব্দে নেমে গের সে একটা অন্ধকার ঘরের মেঝেয়।

জানালার কাটা অংশ দিয়ে বাইরের আলো এসে পড়েছে ঘরের একাংশে। তাদের ঘরের অন্য অংশের অন্ধকারও ফিঁকে হয়ে গেছে।

ঘরটা একটা বেড রুম। ঘরে চারটি বেড পাতা। কিন্তু কোন বেডেই কেউ নেই।

আহমদ মুসা একটা বেডের পাশে গিয়ে একটা হাত রেখে তাপ পরীক্ষা করল। বেডটা গরম নয়, আবার ঠান্ডাও নয়। তার মানে পনের বিশ মিনিট আগেও এখানে লোক শুয়ে ছিল। গেল কোথায় তারা? এরা নিশ্চয় গার্ড ছিল, বেডের চেহারা দেখে তাই মনে হয়। গার্ডরা রাতে এক সাথে উঠে গেছে কেন? কোন খবর পেয়ে তাদের সবাইকে কি ডিউটিতে ডাকা হয়েছে? তাহলে তার আসার খবর এরা পেয়েছে? হঠাৎ আহমদ মুসার মনে পড়ল ব্যারাকের গার্ডদের কথোপকথনের কথা। তাদেরকেও প্রহরা জোরদার করতে বলা হয়েছিল আহমদ মুসার আরও মনে পড়ল, বাউন্ডারী ওয়ালের বাইরের গার্ডরাও তারই অপেক্ষা করছিল। সব মিলিয়ে তার মনে হলো, সব কিছু মোকাবিলার জন্যে তারা প্রস্তুত রয়েছে।

আহমদ মুসা ঘরের দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এল একটা করিডোরে। তার দু'পাশেই ঘরের সারি। সবগুলোই বন্ধ। সবগুলোকেই গার্ড রুম বলে মনে হলো।

আহমদ মুসা করিডোরের পশ্চিম দিকে এগিয়ে আরেকটা অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত করিডোরে এসে পড়ল।

ফটোতে দেখা সিঁড়িঘরটা আরেকটু উত্তরে হবে। আহমদ মুসা তাই প্রশস্ত করিডোরটি ধরে উত্তর দিকে এগোতে লাগল।

কোথাও একজন লোক, কিংবা কোন দিকে কোন সাড়াশব্দও সে পাচ্ছে না। সবাই কি প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের সামনে গিয়ে মোতায়েন হয়েছে?

প্রশস্ত করিডোরটি বড় একটা ঘরের দরজায় গিয়ে শেষ হলো। কিন্তু প্রশস্ত করিডোর থেকে অপেক্ষাকৃত সরু দু'টি করিডোর দু'পাশে বড় ঘরটির ধার ঘেঁষে এগিয়ে গেল। মনে হলো করিডোর দু'টি ঘরটিকে বেষ্টন করে তৈরি। বাইরে থেকেই ঘরটিকে গোলাকার মনে হলো।

এ ঘরটাতেই কি সেই সিঁড়ি। দূরত্বের বিচারে তাই মনে হয়।

ঘরে প্রবেশ করল আহমদ মুসা।

হ্যাঁ, এই ঘরেই সেই সিঁড়িটি।

আহমদ মুসা তাকাল ঘরের চারদিকে।

তার অনুমান ঠিক, ঘরের চারদিক ঘিরেই করিডোর। ঘরের চারদিকের দরজা সাত-আটটির মত হবে। সবগুলোই হা করে খোলা। কোন দরজাই বন্ধ বা হাফ বন্ধ নেই।

হঠাৎ আহমদ মুসার মনে হলো এটা পরিকল্পিত। তাকে ফাঁদে ফেলা হয়েছে।

আহমদ মুসার এই চিন্তা শেষ হওয়ার আগেই একটা ভারী কণ্ঠ উচ্চারিত হলো। বলল, 'আহমদ মুসা তুমি ঠিকই ভেবেছ। তুমি আমাদের ফাঁদে পড়েছ। আটটি ষ্টেনগান তোমাকে ঘিরে আছে।'

থামল কণ্ঠটি।

কণ্ঠটি থামার সাথে সাথেই আট দরজা দিয়ে আটটি উদ্যত ষ্টেনগান তার দিকে এগিয়ে আসছে।

কয়েক মুহূর্ত।

আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে উদ্যত আটজন ষ্টেনগানধারী আহমদ মুসাকে ঘিরে বৃত্তের সৃষ্টি করে দাঁড়াল। বৃত্তের একটা প্রশস্ত মুখ কিন্তু থাকল। মুখটা উত্তরের প্রশস্ত দরজা বরাবর।

চারদিকে ঘেরা ৮টি উদ্যত ষ্টেনগানের মুখে 'ব্ল্যাক ক্যানন' দিয়ে আক্রমণে যাওয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার সমতুল্য। আহমদ মুসা তার রিভলবার নামিয়ে নিল।

উত্তরের প্রশস্ত দরজা পথে রাজসিকভাবে হেঁটে একজন প্রবেশ করল ঘরে। আহমদ মুসা তাকে খুব ভাল করে চিনে। সে হলো ইসরাইলের নিরাপত্তা ও কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স 'সিনবেথ'-এর প্রধান জেনারেল শামিল এরফান।

দরজায় থাকতেই সে চিৎকার করে ওঠল আহমদ মুসা তোমাকে এবার আমাদের মত করে হাতে পেয়েছি। প্রথম দর্শনেই তোমাকে গুলী করে মারার কথা, কিন্তু কয়েকটা কথা না বলে পারছি না। তুমি ইসরাইলের যে ক্ষতি করেছ, ইতিহাসে সেরকম ক্ষতি আর কেউ করতে পারেনি। তুমি আমাদের পিতৃভূমি আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছ। এখন আবার পিতৃভূমি উদ্ধার বা প্রতিশোধের

একটা অবলম্বন মানে এমিলিয়া ও খতিব আব্দুল্লাহকে কেড়ে নিয়ে যেতে এসেছ। সে আশা তোমার সফল হবে না একথা বলার জন্যেই তোমাকে এই কয়েক মুহূর্ত বাঁচিয়ে রেখেছি। আহমদ মুসা, আমি কৃতজ্ঞ আমাদের দক্ষ গোয়েন্দা অফিসার নিনা নাদিয়ার প্রতি। তুমি তার উপকার করেছিলে, তোমাকে মুক্ত করে সেও তোমার উপকারের বিনিময় হিসেবে। কিন্তু দেশপ্রেমিক নিনা নাদিয়া তুমি যে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে আসছ, এ খবর দিয়ে তোমাকে ধরার ক্ষেত্রে অমূল্য সাহায্য করেছে।

বলতে বলতে সে আহমদ মুসার সামনে এসে দাঁড়াল। আহমদ মুসার হাত থেকে তার 'ব্ল্যাক ক্যানন' রিভলবারটা কেড়ে নিয়ে দরজা দিয়ে বাইরের দিকে ছুঁড়ে দিল।

রিভলবারটি ছুঁড়ে দেয়ার পরপরই দরজার ওপারে পাথরের মেঝেয় একটা খট খট শব্দ ওঠল। শব্দটা আহমদ মুসার চোখ দু'টিকে যেন টেনে নিয়ে গেল ঐ দরজা দিয়ে ঘরের বাইরে। দেখল, নিনা নাদিয়া আহমদ মুসার রিভলবারটা তুলে নিচ্ছে।

রিভলবার তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল নিনা নাদিয়া। আহমদ মুসা তখনও তার চোখ ফিরিয়ে নেয়নি। চোখাচোখি হয়ে গেল আহমদ মুসার সাথে। আহমদ মুসা নিনা নাদিয়ার চোখে গভীর এক বিস্ময়-মোহিত দৃষ্টি দেখতে পেল। মুখটা তার ভারী, জেনারেল শামিল এরফানের কাছে নিনা নাদিয়ার যে কথা শুনল, তার সাথে নাদিয়ার এই চেহারা মেলে না।

জেনারেল শামিল এরফানের গর্জনে আহমদ মুসা তার চোখ ফিরিয়ে নিল।

জেনারেল শামিল এরফান বলছিল, আহমদ মুসা রেডি হও। মৃত্যু তোমার সামনে।

জেনারেল এরফানের রিভলবার তাক করা আহমদ মুসার দিকে।

তার তর্জনি তার রিভলবারের ট্রিগারে।

খুব আনন্দ হচ্ছে আহমদ মুসা কতদিন ধরে আমি এই ক্ষণটির জন্য অপেক্ষা করছি। তুমি আল্লাহর নাম নাও। আমি তিন পর্যন্ত গুণব। 'তিন' শব্দটিই তোমার জীবনের অন্তিম মুহূর্ত ঘোষণা করবে।

এক.... দুই.......... করে গোণা শুরু করল জেনারেল শামিল এরফান।

'দুই' বলার পর 'তি.....' উচ্চারণের সাথে সাথে একটা গুলীর শব্দ হলো। উপস্থিত গার্ডদের সবার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল আহমদ মুসার দিকে। তারা দেখতে চেয়েছিল গুলী খেয়ে আহমদ মুসার লুটিয়ে পড়ার দৃশ্য। কিন্তু তার বদলে চিৎকার শুনল জেনারেল শামিল এরফানের। গার্ডদের সবার দৃষ্টি ফিরে গেল জেনারেল শামিল এরফানের দিকে।

অন্যদিকে আহমদ মুসা গুলীর শব্দ লক্ষ্যে তাকিয়ে ছিল উত্তরের দরজা দিয়ে বাইরে। দেখল নিনা নাদিয়ার ডান হাতের রিভলবার তখনও জেনারেল শামিল এরফানের দিকে তাক করা। তার রিভলবারের নল থেকে বেরোনো বিস্ফোরণের ধোঁয়া তখনও শেষ হয়ে যায়নি।

আহমদ মুসা নিনা নাদিয়ার দিকে তাকাতেই সে তার বাম হাতের রিভলবার ছুঁড়ে দিল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা রিভলবারটি হাতে পেয়েই নিজের দেহের পেছনটা মাটিতে ছুঁড়ে দিয়েই ট্রিগার টিপে রেখেই তা ঘুরিয়ে নিল গার্ডদের আটজনের বৃত্তের ওপর দিয়ে। 'ব্ল্যাক ক্যানন'-এর গুলী বৃষ্টি সবাইকে লাশ করে মাটিতে শুইয়ে দিল।

পলকের মধ্যেই যেন ঘটনাটা ঘটে গেল।

গার্ডরা গুলীর শব্দে প্রথমে তাকিয়ে ছিল আহমদ মুসার দিকে, তারপর চিৎকার শুনে তাকিয়ে ছিল জেনারেল শামিল এরফানের দিকে। এই যে সময় নিয়েছে গার্ডরা, এরই সুযোগ গ্রহণ করল আহমদ মুসা। নিনা নাদিয়ার ছুঁড়ে দেয়া রিভলবার যখন পেল, সেটা গার্ডদের নজরেও পড়েছিল। কিন্তু তখন তারা অপ্রস্তুত। তারা কিছু করার আগেই আহমদ মুসর 'ব্ল্যাক ক্যানন'-এর তারা শিকার হয়েছে।

গুলী করা শেষ করেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়েছে।

নিনা নাদিয়া ছুটে এসেছে দরজার কাছে। বলল, আসুন, এমিলিয়ারা এদিকে বন্দী আছে।

বলেই নিনা নাদিয়া ছুটল উত্তর দিকে। বৃত্তাকার করিডোর ক্রস করে ছুটছে সে উত্তরমুখী আরেকটা করিডোর ধরে।

আহমদ মুসা ছুটে গিয়ে নিনা নাদিয়ার পাশাপাশি দৌড়াতে লাগল। দৌড়াতে দৌড়াতে বলল, ধন্যবাদ মিস নিনা নাদিয়া আমার জীবন বাঁচানোর জন্যে।

কোন উত্তর দিল না নিনা নাদিয়া।

আহমদ মুসা তাকাল তার মুখের দিকে। দেখল, তার চোখে অশ্রু, মুখ ভারী।

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল।

থমকে দাঁড়াল নিনা নাদিয়া। বলল, ফিস ফিস করে, আমরা এসে গেছি। সামনে যে দরজা, তার পরে একটা ঘর, গার্ড রুম। গার্ড রুমের পরে আরেকটা দরজা। দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলে একটা বড় হল ঘর। হল ঘরটাতে অনেকগুলো কেবিন। প্রত্যেকটা কেবিনের তিন দিকে দেয়াল, একদিকে মোটা গ্রীলের দেয়াল। তাতেই দরজা।

একটু থেমেই আবার বলে উঠল, সামনে এই যে পুরু ষ্টিলের দরজা, তা ভেতর থেকেই শুধু খোলা যায়। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দরজার স্পিকারে কথা বলতে হবে।

ভেতর থেকে ফটোও দেখবে, কথাও শুনবে। মানুষ ও তার কথা তাদের তালিকার সাথে মিললে তবেই তারা দরজা খুলবে। তালিকার সাথে না মিললে সংগে সংগে তারা এটা জানিয়ে দেবে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের নিরাপত্তা হেডকোয়ার্টারে। তাছাড়া এই দরজায় গোপন ‘বুলেট-হোল’ রয়েছে। এই বুলেট-হোল ব্যবহার করে তারা আক্রমণেও আসতে পারে।

সব শুনে আহমদ মুসা একটু ভাবল। তারপর দরজাটায় তীক্ষ্ণ নজর বুলাল। চৌকাঠের উপরের দেয়াল এবং দরজার ঠিক উপরের ছাদের দিকে সন্ধানী নজর বুলাল। কিন্তু দরজার উপরের ছাদ ও দরজার উপরের দেয়ালে

সন্দেহ করার মত সামান্য কিছুও পেল না। তাহলে দেয়ালের গায়ে সেট করা স্পিকার অথবা দরজা সংলগ্ন উপরের দেয়ালের নিচের প্রান্তের কোথাও সার্কিট ক্যামেরার চোখ কি সেট করা আছে।

চিন্তা করেই আহমদ মুসা মাটিতে বসে করিডোরের দুই পাশ দিয়ে গুটি গুটি হেঁটে দরজার মাটি সংলগ্ন কোণায় বসে দরজার উপরের মাথা সংলগ্ন দেয়ালের বটম প্রান্ত দু'পাশ থেকে পরীক্ষা করল। না, সেখানেও সন্দেহজনক কিছু নেই।

আহমদ মুসা নিশ্চিত হলো স্পিকারের সাথেই ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার চোখ সেট করা আছে।

এই উপসংহারে পৌছেই আহমদ মুসা পকেটে 'গামা রে বিমার' বের করে হাতে নিয়ে গড়িয়ে দরজার কাছে চলে এল, যাতে ক্যামেরার চোখের বাইরে দিয়ে সে দরজার গোড়ায় পৌছতে পারে।

দরজার গোড়ায় পৌছে আহমদ মুসা দরজার গা ঘেঁষে উঠে দাঁড়াতে লাগল। স্পিকার যে লেবেলে, তার ফুট খানেক নিচে পৌছে হাত ওপরে তুলে স্পিকার হোল টার্গেটে 'গামা রে বিমার'-এর বোতাম টিপে দিল।

মুহূর্তেই হাওয়া হয়ে গেল স্পিকারের অস্তিত্ব।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

দরজার উপর-নিচ বরাবর ভার্টিক্যাল দুই ধার আহমদ মুসা পরীক্ষা করতে লাগল কোথায় লক আছে তার সন্ধানে। আহমদ মুসা দেখল দরজাটির ষ্টিলের পাল্লা ডান দিকের দেয়ালের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু দরজা কভার করার পর বাম দিকের দেয়ালের ভেতরে ঢুকে যায়নি। তার মানে লকের মাধ্যমে দেয়ালের সাথে দরজা আটকে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। লক একাধিক থাকতে পারে।

কিন্তু লকের কোন চিহ্ন আহমদ মুসা দরজার গায়ে দেখতে পেল না। লককে বাইরে থেকে দৃশ্যমান করা হয়নি, সেজন্য বাইরে লক খোলার ব্যবস্থা নেই।

কিন্তু লকের অস্তিত্ব তো বের করতেই হবে। আহমদ মুসা আবার বাম দিকে দরজা ও দেয়ালের সংযোগ স্থানটা পরীক্ষা করল। কিন্তু লকের অস্তিত্ব বের করতে পারলো না। দেয়াল ও দরজার পাল্লার মধ্যেকার ফাঁকটা এতই সুক্ষ্ণ যে চোখের দৃষ্টি তার মধ্যে প্রবেশ করে না।

আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকাল নিনা নাদিয়ার দিকে। বলল, আমি করিডোরের এদিককার কয়েকটা বাল্ব নিভিয়ে দিতে চাই। আমার মনে হচ্ছে করিডোরটাকে অন্ধকার করলে দরজার লক বা লকগুলোর সন্ধান পাওয়া যাবে।

নিনা নাদিয়া গম্ভীর মুখে সপ্রশংস দৃষ্টিতে আহমদ মুসার দরজা খোলার চেষ্টাকে দেখছিল। চোখের অশ্রু এখন শুকিয়ে গেছে। কিন্তু মুঝের থমথমে গাম্ভীর্যটা যায়নি।

আপনি নেভাতে পারেন, আমার আপত্তি নেই। আহমদ মুসার প্রশ্নের জবাবে বলল নিনা নাদিয়া।

সংগে সংগেই আহমদ মুসা তার হাতের 'ব্ল্যাক ক্যানন'-এর নল উপরে তুলে একে একে চারটি বাল্বে গুলী করে গুঁড়ো করে দিল। করিডোরের এ প্রান্তটা বেশ অন্ধকারে ছেয়ে গেল।

আহমদ মুসা দ্রুত এগোলো দরজার বাম দিকের প্রান্তের দিকে।

দেয়াল ও দরজার ফাঁকের দিকে তাকাতেই আহমদ মুসা খুশি হয়ে উঠল। ফাঁক বরাবর সুক্ষ্ম আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। আলোর ভার্টিক্যাল রেখার দুই জায়গায় সে ছেদ দেখতে পেল, উপরের দিকে এক জায়গায় এবং নিচের দিকের এক জায়গায়।

নিনা নাদিয়া পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিল।

মিস নিনা নাদিয়া দরজার দুই জায়গায় লক আছে। লকগুলোর ব্যাসও দেড় ইঞ্চির মত হবে।

একটু থামল আহমদ মুসা। একটু ভাবল। বলল, মিস নাদিয়া, আমি লকগুলো কাটতে যাচ্ছি। আমি যতটুকু অনুমান করছি, তাতে লকগুলো কাটার সাথে সাথেই দরজা ডান দিকের দেয়ালে ঢুকে যাবে।

ঠিক সেই মুহূর্তে ওদের গুলীও ছুটে আসতে পারে। সুতরাং আমাদের সাবধান থাকতে হবে। বলল নিনা নাদিয়া। আগের চেয়ে অনেকখানি সহজ কণ্ঠ তার।

ধন্যবাদ মিস নাদিয়া। আপনাকে করিডোরের ডান পাশ ঘেঁষে দরজার কাছাকাছি জায়গায় শুয়ে পড়তে হবে। নিচের লকটা কাটার পর আমিও শুয়ে পড়ব। প্লিজ আপনি ওপাশে যান। বলল আহমদ মুসা।

তার মানে ওদের আক্রমণের প্রথম শিকার আপনি হতে চান। কারণ দরজা খুলতে শুরু করার সাথে সাথে ওদের আক্রমণ এ প্রান্ত দিয়েই শুরু হবে। আমার ও প্রান্ত থেকে ওদেরও আক্রমণ হবে না, দরজার ব্লক থাকায় আমিও শুরুতে কিছু করতে পারবো না। আমিও বরং এ পাশেই থাকি। বলল নিনা নাদিয়া।

প্লিজ মিস নাদিয়া, দু'জন শুরুতেই এক সাথে বিপদে পড়া যৌক্তিক নয়। আপনি প্রাথমিক টার্গেটের  বাইরে থাকলে ওদের বিরুদ্ধে আক্রমণে আসা আপনার জন্য সহজ হবে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, আমাদের দিক থেকে আক্রমণের সুযোগ দুই প্রান্ত থেকেই থাকা দরকার। বলল আহমদ মুসা।

নিনা নাদিয়া তাকাল আহমদ মুসার দিকে। আহমদ মুসার কথাগুলো এত কোমল এতটাই হৃদয়-নিসৃত যে, নিনা নাদিয়ার হৃদয়-মনকে তা নিমিষেই দখল করে ফেলল। নিনা নাদিয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে একবার তাকানো ছাড়া আর কিছুই বলতে পারল না।

নির্দেশ পালন করল নিনা নাদিয়া।

আহমদ মুসা 'গামা রে বিমার' দিয়ে দ্রুত লক কাটতে শুরু করল।

নিচের শেষ লকটি বাম হাত দিয়ে কাটার সময় ডান হাতে 'ব্ল্যাক ক্যানন' ভেতরের দিকে টার্গেট করে ট্রিগারে আঙুল রাখল।

দরজা কাটা শেষ হতেই একটা 'হিশ' শব্দ ওঠলো এবং দরজা ডান দিকে সরতে শুরু করল।

দরজা কাটা শেষ করেই আহমদ মুসা শুয়ে পড়েছিল।

দরজা যতটুকু ফাঁক হচিছল, আহমদ মুসার ‘ব্ল্যাক ক্যানন’ ততটুকুকে কভার করছিল।

কয়েক ইঞ্চি ফাঁক হতেই আহমদ মুসা তার রিভলবারের নল করিডোরের গা ঘেঁষে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

ফুট খানেক ফাঁক হওয়ার সংগে সংগেই তার রিভলবারের নল দরজার সমান্তরালে ডান দিকে ঘুরিয়েই গুলী করতে শুরু করে দিল। আহমদ মুসা রিভলবারের ট্রিগারে আঙুল চেপে রেখেই বাম দিক পর্যন্ত ঘুরিয়ে নিল।

তার রিভলবারের নল বাম দিকে আসার আগেই দরজা ডান দিকের দেয়ালে ঢুকে গেল। আহমদ মুসা দেখল, ডান দিকে গেটের তিন চার গজ ভেতরে একটা চেয়ারের ওপর একটা লাশ পড়ে আছে।

আহমদ মুসা খুশি হলো, দু’জনের একজন তাহলে সে।

বাম দিক থেকে গুলীবর্ষণ তখন শুরু হয়ে গেছে আহমদ মুসার দিক লক্ষ্য করে।

ডান দিকে গুলী শুরু হলে বাম দিকের লোকটি নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল। এখন সে আক্রমণে এসেছে।

আহমদ মুসা তার গুলী বন্ধ করে পেছনে সরে এসেছে, যাতে সে আহমদ মুসাকে টার্গেট করার জন্যে বেরিয়ে আসে।

বেরিয়ে সে এল।

নিনা নাদিয়ার টার্গেটে সে এল। এরই অপেক্ষা করছিল নিনা নাদিয়া।

নিনা নাদিয়া তার রিভলবার থেকৈ পরপর দু’বার গুলী করল।

আহমদ মুসাকে লোকেট করার জন্যে বেরিয়ে আসা দ্বিতয়ি গার্ডকে নিনা নাদিয়ার দু’টি গুলী গিয়েই আঘাত করল। লুটিয়ে পড়ল তার দেহ গেটের ভেতরের পাশে।

নিনা নাদিয়া উঠে দাঁড়িয়েছে।

আহমদ মুসাও উঠে দাঁড়াল।

দু’জনেই গেটের ভেতরে ঢুকে গেল।

ধন্যবাদ মিস নাদিয়া। আমার পক্ষে তাকে গুলী করা অসুবিধাজনক ছিল। বলল আহমদ মুসা।

নিনা নাদিয়ার মুখ উজ্জল হয়ে উঠেছে। বলল, কৃতিত্ব আপনার প্রাপ্য। গেম মেকার আপনি। আমি মাত্র ছুটে আসা বলে পা ছুইয়েছি, বল আপনাতে গোলে গেছে।

কথা শেষ করেই নিনা নাদিয়া সামনের দরজার দিকে ইংগিত করে বলল, আসুন ঐ দরজার ওপারেই ওঁরা আছেন।

ছুটল দু'জন দরজার দিকে।

দরজা ঠেলতেই খুলে গেল।

সামনের দিকটা উন্মুক্ত হয়ে গেল। চোখে পড়ল 'কেবিন বন্দীখানা' গুলো।

সামনেই পাশাপাশি দুই কেবিনে বন্দী আছে এমিলিয়া ও বায়তুল আকসার খতিব শেষ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান।

এমিলিয়া ও খতিব দু'জনেই দেখতে পেয়েছে আহমদ মুসাকে।

'ভাইয়া' বলে কেঁদে উঠল এমিলিয়া।

আলহামদুলিল্লাহ। আসসালামু আলায়কুম, আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা সালাম গ্রহণ করে প্রথমে তার দরজার লকটাকে গুলী করে ভেঙে ফেলল।

অন্যদিকে নিনা নাদিয়া গিয়ে ভেঙে ফেলেছে এমিলিয়ার কেবিনের দরজার লক।

এমিলিয়াকে ধরে বের করে আনল নিনা নাদিয়াই।

খতিব আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমানকে আগেই বের করে নিয়ে এসেছে আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার নিকটবর্তী হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল এমিলিয়া।

নিনা নাদিয়া তাকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে।

কান্নার সময় শেষ বোন। ওদিকে সবাই ভাল আছে, মুক্ত হয়েছ। তুমিও এখন সৈনিক। কোন কান্না নয়। এখন বের হতে হবে আমাদের।

বলে আহমদ মুসা তাকাল নিনা নাদিয়ার দিকে।

বুঝতে পারল নিনা নাদিয়া আহমদ মুসার চোখের ভাষা। বলল, বের হওয়ার একটা গোপন পথ আছে। কিন্তু আপনি যে দিক দিয়ে প্রবেশ করেছেন, সেই পথটাই নিরাপদ। ওদিক দিয়ে বাইরের প্রাচীর ডিঙালেই সাগর-কূলে পৌছা যাবে। সাগর কূলে গিয়ে কিছু একটা যোগাড় করতে হবে।

ধন্যবাদ মিস নাদিয়া। আপনি পথ দেখান। বলল আহমদ মুসা।

নিনা নাদিয়া চলতে শুরু করল।

তার পেছনে এমিলিয়া ও খতিব আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান।

সবশেষে আহমদ মুসা।

# ৫

একটা মিলিটার গান-বোট চলছে ভুমধ্যসাগর ধরে পূর্বে ফিলিস্তিন উপকূলের দিকে।

গান বোটের ড্রাইভিং চেয়ারে আহমদ মুসা। তার সামনে পার্টিশন আনফোল্ড করা উন্মুক্ত কেবিনে বসে আছে এমিলিয়া ও নিনা নাদিয়া পাশাপাশি। পাশেই একটু সরে বসে আছে খতিব আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান।

মিলিটারি গানবোটটি অত্যাধুনিক।

ডেকের দু'পাশেই ক্ষেপণাস্ত্র লাঞ্চার। আর কেবিনের ছাদে বিমান বিধ্বংসি কামান।

বোটটি দখল করে রাত সাড়ে তিনটায় তারা বোটে উঠেছে।

মিলিটারি বোটটি বাঁধা ছিল প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের একটা ছোট্ট গোপন জেটিতে। জরুরি অবস্থায় ব্যবহারের জন্যে এ ধরনের বোট প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের উপকূলে আরও কয়েকটি আছে।

সব সময় একজন সেনা অফিসার ও সেনা-ক্রু থাকে জরুরি অবস্থায় দায়িত্ব পালনের জন্যে।

নিনা নাদিয়াই এ বোটটা দখল করেছিল।

সে ঘাটে গিয়ে তার কার্ড দেখিয়ে সেনা অফিসার ও সেনা ক্রুকে ডাকে। তারা এলে নিনা নাদিয়া রিভলবার তাদের দিকে তাক করে বলে আপনাদের এ্যারেষ্ট করা হলো।

এ সময় আহমদ মুসা সেখানে আসে এবং তাদের দু'জনকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলে। মুখে কাপড় গুজে তাদের চিৎকার করার পথ বন্ধ করে দেয়।

আহমদ মুসা গানবোটে উঠে সব পরীক্ষা করে দেখে বলে, সব ঠিক আছে। জ্বালানিও যথেষ্ট রয়েছে। আমরা ষ্টার্ট করতে পারি।

নিনা নাদিয়া এমিলিয়াকে হাত ধরে গানবোটে তুলে দেয়। শেখ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমানকে সম্মানের সাথে বোটে তুলে নেয় আহমদ মুসা।

নিনা নাদিয়া দাঁড়িয়েছিল নিচে।

আহমদ মুসা দাঁড়িয়ে ছিল বোটে। তার পেছনে এমিলিয়া ও শেখ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান।

নিনা নাদিয়ার মুখ ভারী। চোখে-মুখে একটা বিমূঢ় ভাবও। চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল সে।

দাঁড়িয়ে কেন, উঠুন তাড়াতাড়ি। বলেছিল আহমদ মুসা।

আমি উঠব? কোথায় যাব আমি? বলেছিল নিনা নাদিয়া। ভাঙা, কান্নারুদ্ধ কণ্ঠ তার।

কেন আমাদের সাথে, আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানে! বলেছিল আহমদ মুসা।

কিন্তু এখানেই তো আমার সব। বলেছিল নিনা নাদিয়া। কাঁপছিল তার কণ্ঠ।

আহমদ মুসা একটু ভাবে। বলে 'মিস নিনা নাদিয়া, আপনি এখন আর সে নিনা নাদিয়া নন। এখানে যারা আছে, ইতোমধ্যেই তাদেরকে আপনি পরিত্যাগ করছেন। প্লিজ আপনি আসুন।

দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলেছিল নিনা নাদিয়া। কাঁদতে কাঁদতেই বলেছিল, আমি আমারই বিরুদ্ধে গিয়েছি।

না মিস নিনা নাদিয়া, বিরুদ্ধে নয়, আপনি নিজের পক্ষে কাজ করেছেন। আপনি যা করেছেন নিজের বিরুদ্ধে গিয়ে কেউ তা করতে পারে না। বলেছিল আহমদ মুসা নরম সুরে।

নিনা নাদিয়া পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল আহমদ মুসার দিকে। তারপর কোন কথা না বলে ধীরে ধীরে উঠে এসেছিল বোটে।

এখন একেবারেই স্বাভাবিক নিনা নাদিয়া।

নানা রকম গল্প চলছিল এমিলিয়া ও নিনা নাদিয়ার মধ্যে। মাঝখানে দু'একটা কথা বলছিল আহমদ মুসা।

শেখ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান ফজরের নামাযের পর তসবি নিয়ে বসেছিল। ঘণ্টা খানেক পর সহজ হয়ে বসে। মাঝে মাঝেই আহমদ মুসার সাথে কথা বলছিল সে।

এক সময় শেখ আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমানই নিনা নাদিয়াকে প্রশ্ন করল, তোমার সম্পর্কে কিছুই জানা হলো না মা।

নিনা নাদিয়া তাকাল আহমদ মুসার দিকে।

মিস নাদিয়া সম্পর্কে আমিই বলছি জনাব।

বলে আহমদ মুসা নিনা নাদিয়ার সাথে দেখা হওয়া থেকে শুরু করে প্রিজন সেলে প্রবেশ পর্যন্ত সব কথা বলল।

নিনা নাদিয়ার দিকে এমিলিয়ার বিস্ময় মিশ্রিত সম্মান ও শ্রদ্ধার দৃষ্টি।

শেখ আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে বলল, মা তুমি আল্লাহর তরফ থেকে আমাদের জন্যে সাহায্য হিসেবে এসেছ। তুমি এখন আমাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ মা। আল্লাহ তোমার মহান কাজের জন্যে অশেষ জাজাহ দান করুন।

শুভ্র চুল, শুভ্র দাড়ি এবং শক্ত দৈহিক গড়নের মানুষ শেখ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান। চোখ-মুখ থেকে পবিত্রতা যেন ঠিকরে পড়ছে। মনে স্বর্গীয় ভাব জাগায় এই চেহারা।

নিনা নাদিয়া মাথা নিচু করে বাউ করে শ্রদ্ধা জানাল শেখ খতিবকে। বলল, জনাব প্রার্থনা করুন, আমি যা ছেড়ে দিয়েছি, যা আমি গ্রহণ করেছি তা যেন আমাকে শান্তি দেয়। ভারী কণ্ঠ নিনা নাদিয়ার।

আল্লাহ তোমাকে, তোমার ইচ্ছাকে কবুল করুন মা। বলল শেখ খতিব আব্দুল্লাহ।

নিনা নাদিয়া আবার বাউ করে শ্রদ্ধা জানাল শেখ খতিব আব্দুল্লাহকে।

মিস নিনা নাদিয়া, আমার একটা কৌতুহল। বলল আহমদ মুসা।

নিনা নাদিয়া তাকাল মুগ্ধ দৃষ্টিতে আহমদ মুসার দিকে। বলল, কি কৌতূহল বলুন?

আমি আপনাকে বাঁচিয়ে ছিলাম, আমাকে আপনি বন্দী দশা থেকে মুক্ত করলেন। কিন্তু মুক্ত করার পর ধরিয়ে দেয়ার জন্যে নিরাপত্তা বিভাগকে আমার কথা বলে ছিলেন। পরে আবার মৃত্যুর মুখ থেকে আমাকে বাঁচালেন এবং এমিলিয়া ও খতিব মহোদয়কে উদ্ধার কাজে সহযোগিতা করলেন। কেন আপনি এমনটা করলেন, খুব কৌতূহল আমার এটা জানার জন্যে।

গম্ভীর হলো নিনা নাদিয়া। বলল, আপনার কৌতুহল খুবই স্বাভাবিক। আমি আন্তরিকতার সাথে আপনাকে মুক্ত করেছিলাম। কিন্তু যখন শুনলাম আপনি আমাদের বন্দীদ্বয়কে মুক্ত করতে চান এবং আমার কাছ থেকে বন্দীরা কোথায় আছে জেনে নিলেন; তখন একটা প্রতিক্রিয়া হয়েছিল আমার মনে। আমার মনে অপরাধ বোধ সৃষ্টি হয়েছিল এই ভেবে যে, আমাদের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যে দু'জন বন্দী, যাদের বিনিময়ে বড় কিছু পাব আশা করছি তাদেরকে মুক্ত করতে সাহায্য করেছি। এই চিন্তাতেই আমি বিষয়টা তৎক্ষণাৎ জানিয়ে দেয় 'সিনবেথ'-এর প্রধান জেনারেল শামিল এরফানকে। তারপর আবার আপনাকে বাঁচিয়েছি বলছেন, কিন্তু আমি তখন আপনাকে বাঁচাইনি, বাঁচিয়েছি আহমদ মুসাকে। আহমদ মুসাকে বাঁচিয়েছি, সেজন্যে বন্দীদের উদ্ধারের জন্যে আহমদ মুসাকেই সাহায্য করেছি। বলল নিনা নাদিয়া।

বিস্ময় আহমদ মুসার চোখে। অপার বিস্ময় এমিলিয়ার চোখেও। বলল সে, বুঝলামনা তোমার কথা। তুমি তাঁকে বাঁচাওনি, বাঁচিয়েছ আহমদ মুসাকে। তিনি ও আহমদ মুসা তো ভিন্ন সত্তা নন।

তা ঠিক। কিন্তু তাঁকে আমি বাঁচাতে যেতাম না যদি তার নাম আহমদ মুসা না শুনতাম। বলল নিনা নাদিয়া।

বিস্ময় সবার চোখে। আহমদ মুসার চোখেও। বলল আহমদ মুসা, নামটাকে আপনি বাঁচাতে গেলেন কেন?

নিনা নাদিয়া তার মুখ নিচু করল। বলল, আহমদ মুসা নামের সাথে আমার জীবনের একটা মর্মান্তিক স্মৃতি জড়িত।' তাই মৃত্যুর মুখে উপস্থিত তাঁর নাম যখন আহমদ মুসা শুনলাম, তখন সেই স্মৃতি এসে আমাকে পাগল করে

তুলেছিল। সব কিছু ভুলে আমি তাকেই বাঁচাতে গিয়েছিলাম এবং আক্রমণে আসার জন্যে তাকে রিভলবার সরবরাহ করেছিলাম।

খুব কৌতূহল সেই স্মৃতি সম্পর্কে, যার সাথে আহমদ মুসার নাম জড়িত। আমি কি এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারি বোন? বলল এমিলিয়া।

না জিজ্ঞেস করতে পারার মত ওটা কোন প্রাইভেট ব্যাপার নয়।

বলে থামল নিনা নাদিয়া। মাথা নিচু করল। বলল, সে আমার জীবনের এক দুর্ভাগ্যের কাহিনী। ইসরাইলে আমার জন্ম। আমি মুসলিম পিতা ও ইহুদি মাতার সন্তান। বড় হয়ে জেনেছি আমার পিতা ওমর আব্দুল্লাহ ফিলিস্তিন মুক্তি আন্দোলনের একজন আন্ডার গ্রাউন্ড কর্মকর্তা ছিলেন। আর মা ছিলেন ইসরাইল গোয়েন্দা সংস্থার একজন অফিসার। পরিকল্পনা করেই মা'কে আমার পিতার প্ল্যান্ট করা হয়। পিতার মাধ্যমে ফিলিস্তিন জনশক্তি ও নানা গোপন তথ্য যোগাড় করে ইসরাইলী গোয়েন্দা বিভাগকে সরবরাহ করাই ছিল আমার মায়ের কাজ। আমার জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই দেখেছি, মা সর্বদা আমাকে আমার পিতা থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করেছেন। শিশুকালে আমার মা আমাকে রেখেছেন ডে-কেয়ার সেন্টারে। একটু বড় হলে আবাসিক কিন্ডার গার্টেনে। আরও বড় হলে মা আমাকে পাঠিয়ে দেন তেল আবিবে। আমি তেল আবিবে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা করি। ছুটিতে বাড়ি যেতাম, তখনও দেখেছি আমি পিতার সাথে গল্প-গুজব করার মত এক্সক্লুসিভ সুযোগ পাইনি। সে সুযোগ মা আমাকে দেননি। কার্যত মা আমাকে ইহুদি হিসেবেই গড়ে তোলেন। আমার পিতা সব সময় বাইরে ব্যস্ত থাকতেন বলে এসব কোন খবর তিনি রাখতেন না, মায়ের ওপরই নির্ভর করতেন সব ব্যাপারে। আমার চিন্তা ও মন-মানসিকতা ছিল ইহুদিদের পক্ষেই। মুসলমানদের আজাদী চিন্তা আমার বিদ্রোহ বলে মনে হতো। পিতা এ সবের কিছুই জানতেন না। তিনি আমাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। আমার বেপরোয়া খরচে মা অনেক সময় রাগ করতেন। পিতা-মাকে বুঝাতেন, নাদিয়াই তো আমাদের সংসার। সংসারের সবকিছু তো তার জন্যে। ওর মনে কোন কষ্ট দিও না। পিতার এই ভালবাসাকে কোন দিনই মূল্য দেইনি।

তারপর এল সেই মর্মান্তিক দিন।

আমি সেদিন বাড়িতে ছিলাম।

পিতা শরীর খারাপ লাগছে বলে ঘুমাতে গিয়েছিলেন। মা ও আমি বসে টিভি দেখছিলাম।

মা'কে একটু অস্থির বলে মনে হচ্ছিল। একটু পরপর ঘড়ি দেখছিলেন তিনি।

এক সময় বলে উঠলেন। মা তুমি ঘুমাতে যাও। আমাকে একটু অফিসে যেতে হবে।

আমি জানতাম মা একটি তথ্যকেন্দ্রে কাজ করেন। তথ্যকেন্দ্রের কাজ ২৪ ঘণ্টা চলে। পরে জেনেছিলাম তথ্য কেন্দ্রটি আসলে গোয়েন্দা অফিস।

মা চলে গেলে আমি শুতে চলে গেলাম।

চিৎকার ও কথাবার্তায় আমার ঘুম ভেঙে গেল।

তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে গেলাম।

বাড়ির ভেতরে আমার পিতা হাত-পা বাঁধা অবস্থায়। তার উপর অমানুষিক নির্যাতন চলছে। তার দেহ রক্তাক্ত। তার হাতে পায়ের আঙুলে সুচ ফোটানো হচ্ছে। চাকু দিয়ে তার গায়ের চামড়া কেটে নেয়া হচ্ছে। একজন তাকে অবিরাম জিজ্ঞাসা করে চলেছে, 'মুসলিম কমান্ডোদের যে গোপন তালিকা তুমি আজ পেয়েছ এবং নেটওয়ার্কের যে প্ল্যান পেয়েছ, সেটা আমাদের দাও। আমরা তোমাকে ছেড়ে দেব।' অন্যদিকে আমার পিতা বলে চলেছেন, 'সে তালিকা ও নেটওয়ার্ক প্ল্যান তোমরা পাবে না। তোমরা যা ইচ্ছা কর।'

পিতার ওপর নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে চলল।

আমি ছুটে গেলাম আম্মার ঘরে তিনি আছেন কিনা দেখার জন্যে। দেখলাম তার বেড শূন্য। অর্থাৎ তিনি তখনও ফেরেননি।

আমি কি করব ভেবে পেলাম না। দেখলাম বাইরে বেরোনোর গেটে চারজন ইসরাইলী পুলিশ।

আমি গিয়ে কিছু বলতে পারবো না তা আমার কাছে পরিষ্কার। রাগ হলো পিতার প্রতিই। কেন তিনি মুসলমানদের জন্যে কাজ করেন, কেন তিনি তালিকাটা ও নেটওয়ার্ক প্ল্যান ওদের দিয়ে দিচ্ছেন না? এদিক থেকে আমার পিতাকে তারা

অপরাধী মনে করে, বিদ্রোহী ও ষড়যন্ত্রকারী বলে মনে করে। সুতরাং শাস্তি তো তারা দেবেই।

একজন চিৎকার করে উঠল, 'চেষ্টা করে লাভ নেই। হারামজাদা মুখ খুলবে না। শেষ করে দে তাকে।'

একজন ক্রুদ্ধ মানুষ ছুড়ি নিয়ে ছুটে গিয়ে আমার পিতাকে এলোপাতাড়ি কোপাতে লাগল। আরেকজন গিয়ে তার বুকে ছুরি বসিয়ে দিল।

আমি চিৎকার করে চোখ বুঝলাম। শুনতে পেলাম পিতার কণ্ঠ। তিনি সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করে বলছে, 'তোমাদের দিন শেষ ইসরাইলিরা। আহমদ মুসা এসেছে, আহমদ মুসা, আহমদ মুসা। তিনি আল্লাহর তরফ থেকে সাহায্য স্বরূপ এসেছেন। তিনি বিজয়ী হবেন; তোমরা পরাজিত হবে। শোন, তোমরা শোন, শুনে যাও, আহমদ মুসা বিজয়ী হবেন। তিনি নতুন প্রভাত আনবেন।'

এক সময় থেমে গেল পিতার কণ্ঠ।

আমি ভয়ে ভয়ে চোখ খুললাম। দেখলাম, ওরা কেউ কোথাও নেই।

নেতিয়ে পড়ে আছে আমার পিতার দেহ।

আমি ছুটে গেলাম।

পিতা তখন জীবিত নেই।

আমি আছড়ে পড়লাম পিতার রক্তমাখা বুকের উপর। হঠাৎ মনে হলো, পিতাকে আমি খুবই ভালবাসি।

কিন্তু একথা শোনার জন্যে তখন তিনি বেঁচে নেই।

কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেছে নিনা নাদিয়ার। তার দু'চোখ থেকে নীরবে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল অবিরামভাবে। এবার সে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

সবারই চোখ ভিজা। অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল আহমদ মুসার চোখ থেকেও। কে কাকে সান্তনা দেবে!

একটু পর চোখ মুছে মাথা তুলল নিনা নাদিয়া।

বলতে লাগল ভাঙা কণ্ঠে, পিতার মৃত্যুর পর আমরা স্থায়ীভাবে উঠে গেলাম তেলআবিবে। লেখাপড়া শেষ করে মায়ের তাকিদেই ইসরাইলী গোয়েন্দা বিভাগে যোগ দিলাম। মা বিয়ে করলেন একজন গোয়েন্দা অফিসারকে।

সব ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমার সৎ পিতা গোয়েন্দা প্রধানের মুখে আহমদ মুসার নাম শুনলাম, তখন ভুলে যাওয়া পিতা আমার সামনে হাজির হলেন। 'আহমদ মুসা বিজয়ী হবেন'-এই শব্দ আমার কানে বজ্রের মত বাজতে লাগল। যখন দেখলাম আমার পিতার সেই আহমদ মুসা মৃত্যুর মুখে এবং পরাজিত হতে চলেছে আমারই সৎ পিতা গোয়েন্দা প্রধান জেনারেল শামিল এরফানের হাতে, তখন আমি যেন পাগল হয়ে গেলাম। মনে হলো, আমার পিতার সেই আহমদ মুসাকে বাঁচানো, তাকে বিজয়ী করা আমার একমাত্র কাজ, পিতার দেয়া কাজ তার সন্তানের একমাত্র দায়িত্ব। মনে হলো, আমি মুসলিম মুক্তি সংগ্রামী ওমর আব্দুল্লাহরই সন্তান, আমার আর কিছু পরিচয় নেই। এই পরিচয়ের কথা মনে হতেই আমি গুলী করেছিলাম আমার সৎ পিতা জেনারেল শামিল এরফানকে। আবেগ-রুদ্ধ হয়ে থেমে গেল নিনা নাদিয়ার কণ্ঠ।

ইসরাইলের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স (সিনবেথ) প্রধান জেনারেল শামিল এরফান আপনার সৎ পিতা? বলল আহমদ মুসা। তার কণ্ঠে বিস্ময়।

হ্যাঁ। আমার পিতার মৃত্যুর এক বছর পর আমার মা তাঁকে বিয়ে করেন। বলল নিনা নাদিয়া। কণ্ঠ তার ভারী।

এমিলিয়া নতমুখী নিনা নাদিয়ার কাঁধে হাত রাখল। বলল, একটা অসম্ভব কাজ আপনি করেছেন। আপনার মা বেঁচে আছেন নিশ্চয়।

হ্যাঁ, বেঁচে আছেন। তিনি গোয়েন্দা বিভাগের একজন সিনিয়র অফিসার। আমি পেরেছি কারণ আমার সৎপিতা ও তার গোয়েন্দা বিভাগই আমার পিতাকে খুন করেছে নৃশংসভাবে। আমি সেদিন না বুঝলেও পরে বুঝেছি, আমার মা জানতেন সেদিন রাতে আমার পিতাকে হত্যা করা হবে। তাই তিনি পরিকল্পিতভাবেই বাড়ির বাইরে চলে গিয়েছিলেন।

আলহামদুলিল্লাহ। মা নাদিয়া, আল্লাহ তোমার প্রতি খুশি হোন। তারই দয়ায় তোমার আসল পরিচয়ে ফিরতে পেরেছ। এ রকম বড় ঘটনা খুব কমই ঘটে। আলহামদুলিল্লাহ। বলল শেখ খতিব আব্দুল্লাহ।

নিনা নাদিয়া শেখ খতিবকে বাউ করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাল। বলল, মুহতারাম হযরত, আমি আমার পরিচয় ফিরে পেয়েছি সবকিছু হারিয়ে। পিতার কাছে ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ আমি পাইনি। এমন হল যে, আমার মাও আমাকে কোনদিন ক্ষমা করবেন না। ভারী হয়ে উঠেছিল নিনা নাদিয়ার কণ্ঠ।

মিস নিনা নাদিয়া, সবকিছু হারানোর পর সবকিছু পাওয়ার সময় আসে, এটাই সৃষ্টির একটা নিয়ম। আহমদ মুসা বলল।

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল নিনা নাদিয়া। কিন্তু তার পকেটের মোবাইল বেজে ওঠল এই সময়।

নিনা নাদিয়া চুপ করে গিয়ে পকেট থেকে মোবাইল বের করল। মোবাইলের স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে মোবাইল আহমদ মুসার দিকে তুলে ধরে বলল, জনাব, আপনার টেলিফোন।

আহমদ মুসা মোবাইলটি নিল।

আহমদ মুসা গানবোটে উঠেই ফিলিস্তিনের প্রধানমন্ত্রী মাহমুদের কম্যুনিকেশন কক্ষে আহমদ মুসারা ফিরে আসছে এ খবর জানিয়ে তার কনট্যাক্ট পয়েন্ট হিসেবে নিনা নাদিয়ার নাম্বার দিয়েছিল। এর অল্প পরেই প্রধানমন্ত্রী কল ব্যাক করে আহমদ মুসাকে। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে ও আহমদ মুসাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলে যে, তাদের স্বাগত জানানোর জন্যে তারা আসছেন।

আহমদ মুসা সালাম দিতেই ওপার থেকে মাহমুদের কণ্ঠ পেল। বলল, আপনারা কোথায় আহমদ মুসা ভাই?

আহমদ মুসা গানবোটের ড্যাশ বোর্ডের লোকেশন চার্টের দিকে চেয়ে তাদের অবস্থানের অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ বলে দিল।

ওপার থেকে মাহমুদ বলল, আপনারা আমাদের জল সীমায় এসে গেছেন। আমরাও এসে গেছি।

অল্পক্ষণের মধ্যেই জংগী বিমান, হেলিকপ্টারের শব্দ শোনা গেল।

কয়েক মুহূর্ত পরেই আকাশে তিনটি জংগী বিমান দুটি হেলিকপ্টার দেখা গেল। ওগুলো গানবোটের উপরে টহল দিতে লাগল।

আর কিছুক্ষণ পরে এল দুটি নৌ যুদ্ধ জাহাজ।

জাহাজ দু'টি দু'দিক থেকে আহমদ মুসাদের গান বোটের দিকে এগিয়ে এল। গান বোট থেকে জাহাজে প্রথম উঠে এল শেখ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান দের ইয়াসিনি। তাকে স্বাগত জানাল প্রধানমন্ত্রী মাহমুদ।

তারপর একে একে নেমে এল নিনা নাদিয়া ও এমিলিয়া। সব শেষে জাহাজে উঠল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসাকে জড়িয়ে ধরল প্রধানমন্ত্রী মাহমুদ। কথা বলতে গিয়েও মাহমুদ কথা বলতে পারল না। আবেগে ভেঙে পড়ল তার কণ্ঠ। দু'চোখ থেকে তার নেমে এল অশ্রুর ঢল, কৃতজ্ঞতার অশ্রু, আনন্দের অশ্রু।

পাশে দাঁড়িয়েছিল এমিলিয়া, নিনা নাদিয়া। তাদের চোখেও অশ্রু টলটল করছে।

শেখ আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান আগেই বসেছেন একটা ডেক চেয়ারে। বলল ধীর কণ্ঠে, মাহমুদ কৃতজ্ঞতার অশ্রু দিয়ে আহমদ মুসাকে দুর্বল করো না। আল্লাহর সৈনিক হিসেবে যা করার সেটাই তো করেছে।

নিনা নাদিয়া তাকাল শেখ আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমানের দিকে। চোখের সামনে ভেসে ওঠল তার পিতার অন্তিম দৃশ্য। তিনি জীবন দিয়েছেন, কিন্তু মুসলিম কমান্ডোদের তালিকা ও তাদের নেটওয়ার্কের বিবরণ শত্রুর হাতে অর্পণ করেননি। তিনি আল্লাহর এমন একনিষ্ঠ সৈনিক ছিলেন! গর্বে ফুলে ওঠল নিনা নাদিয়ার বুক।

# ৬

এক মাস পরের ঘটনা। হাইফা নৌ-ঘাঁটির সদর দফতরে বসে আছে আহমদ মুসা। প্রশস্ত উন্মুক্ত জানালা দিয়ে ভূমধ্যসাগরের নীল জলরাশি দেখা যাচ্ছে। সাগর ছোঁয়া স্নিগ্ধ বাতাস তার শরীরে শান্তির পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে। আহমদ মুসা চেয়েছিল সামনে। নীল দিগন্ত রেখা পেরিয়ে হারিয়ে গেছে তার দৃষ্টি। তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে মধ্য এশিয়ার এক বিরাট জনপদ। জনমানবের চিহ্ন কোথাও নেই। জনপদের বুকের উপর গড়ে উঠেছে কার্পাস ক্ষেতের সরকারি ফার্ম। মসজিদের ধসে পড়া ভিত ঢাকা পড়েছে গভীর বনে। এ বিধ্বস্ত জাতিরই সে একজন। একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার বুক চিরে। জাতির জন্য কতটুকু কি করতে পেরেছে সে! চোখের সামনে দিয়ে সাগরের বুক চিরে ছুটে যাচ্ছিল ফিলিস্তিন জাতীয় সরকারের একটি যুদ্ধ জাহাজ। ওর বুকে পতপত করে উড়ছে পতাকা। পতাকার ছয়টি তারকা অন্তর্হিত হয়ে সেখানে স্থান পেয়েছে চাঁদ ও তারা। আহমদ মুসা ভাবল, মুসলমানদের যুদ্ধ জাহাজগুলো এমনিভাবে বিজয়ীর গর্বে ঘুরে বেড়াত একদিন সমগ্র ভুমধ্যসাগরে! সেদিন কি ফিরে আসবে? পাবে কি ফিলিস্তিনের সাইমুমকর্মীরা সে গৌরবময় দিনের পুনরুজ্জীবন করতে? তারিকের জন্ম হবে না কি আমাদের মধ্যে আর? আহমদ মুসার চোখের কোণে চিক চিক করে উঠল দুই ফোঁটা অশ্রু।

নৌ-সদর দফতরের গেটে জাতীয় সরকারের পতাকাশোভিত একটি গাড়ি এসে থামল। গাড়ি থেকে নামল ফিলিস্তিন জাতীয় সরকারের প্রধান মাহমুদ। সে হাত ধরে নামাল এমিলিয়াকে। তার সাথে নামল নিনা নাদিয়াও। সর্বাঙ্গ কাল চাদরে ঢাকা এমিলিয়া। তার পরনেও ফুল আরবীয় পোশাক। তার উপর মাথায় চাদর। এমিলিয়া ও নাদিয়া দু’জন হাত ধরাধরি করে সিঁড়ি ভেঙে ঢুকে গেল ভেতরে।

তারা রেষ্টরুমে পৌছে গেলে মাহমুদ চলে এল অফিস কক্ষে। দরজা ঠেলে প্রবেশ করে দেখতে পেল জানালা দিয়ে সাগরের দিকে চেয়ে বসে আছে আহমদ মুসা। তন্ময়তার কোন অতল গভীরে ডুবে আছে সে! চোখের কোণের দু'ফোটা অশ্রু মাহমুদের দৃষ্টি এড়াল না। সে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল আহমদ মুসার কাছে। কাঁধে একখানা হাত রেখে ডাকল, মুসা ভাই।

চোখ না ফিরিয়েই আহমদ মুসা বলল, মাহমুদ এসেছ?

জি হ্যাঁ? কি ভাবছেন মুসা ভাই অমন করে?

প্রাথমিক কাজ ফুরালো, এবার শুরু করতে হবে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ। আল্লাহর এই জমীনে আল্লাহর বান্দাদের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য খোদায়ী বিধানের প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করতে হবে এবার।

এ বিরাট দায়িত্ব। আমাদের সকলের অনুরোধ এ দায়িত্বভারও আপনি গ্রহণ করুন---- আমাদের পরিচালনা করুন মুসা ভাই।

না, মাহমুদ, আমার সিদ্ধান্তে ভুল হয়নি। তুমি পারবে এ দায়িত্ব পালন করতে। একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর বলল, আমাকে এবার যেতে হবে মাহমুদ।

কোথায়? চমকে উঠল মাহমুদ।

মধ্য এশিয়ায়?

হ্যাঁ, ভাই। তুমি তো জান, হাসান তারিককে WRF ধরে নিয়ে গেছে। ওকে উদ্ধারের সব অভিযান ব্যর্থ হয়েছে। এ দিকের কাজ আপাতত শেষ। এবার আমাকেই যেতে হবে ওদিকে। তাছাড়া ডাকছে মধ্য এশিয়া আমাকে হাতছানি দিয়ে।

মাহমুদও এমনি আশংকা করছিল। কোন কথা বলতে পারল না কিছুক্ষণ। দু'ফোটা অশ্রু নেমে এল মাহমুদের দু'গন্ড বেয়ে। বলল সে, জানি, আপনি যাবেন কিন্তু আপনি আমার মাথার উপর না থাকলে........।

মাহমুদকে কথা শেষ করতে না দিয়েই আহমদ মুসা বলল, তোমার আমার সাহায্যকারী তো কোন মানুষ নয় মাহমুদ। এই মহাবিজয় যিনি আমাদের দিলেন, তিনিই তোমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন।

ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠল টেলিফোন। আহমদ মুসা বলল, মাহমুদ টেলিফোনটা দেখ।

মাহমুদ টেলিফোনে কথা বলল, পরে আহমদ মুসাকে জানাল, প্লেন ছাড়ছে বেলা দু'টোয়।

এখন বেলা একটা। সময় তো বেশি নেই মাহমুদ। চল উঠি।

প্লে..... কেন, কোথায় যাবেন? কাঁপল যেন মাহমুদের কণ্ঠ।

আপাতত মদিনায়। সেখান থেকে যাব রিয়াদে বাদশাহ ফয়সালের কবর জিয়ারতে। তাঁর অর্ধ সমাপ্ত কাজ আমরা সমাপ্ত করেছি, তাঁর স্বপ্ন আমরা স্বার্থক করে তুলতে পেরেছি মাহমুদ। বায়তুল মোকাদ্দাস আজ মুক্ত। পবিত্র ভূমি থেকে ইহুদি পতাকা ডুবে গেছে ভূমধ্যসাগরে। জীবন দিয়ে হলেও এটিই তো চেয়েছিলেন শাহ ফয়সল। একটু থামল আহমদ মুসা। বলল আবার, রিয়াদ থেকে বাগদাদ হয়ে যাব মধ্য এশিয়ায়।

আজই, এখনি যাচ্ছেন? মাহমুদের কণ্ঠ যেন আর্তনাদ করে উঠল। সে আহমদ মুসাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'না, মুসা ভাই, এমন করে আমরা আপনাকে ছেড়ে দিতে পারি না।' তার দু'গ- বেয়ে নেমে এল সেই অশ্রুর ধারা।

আহমদ মুসা মাহমুদকে সান্তনা দিয়ে বলল, 'আবেগপ্রবণ হয়ো না মাহমুদ। বসে থাকার সময় কোথায়- অজস্র কাজ সামনে। নিপীড়িত মানবতার ক্রন্দন রোলে দেখ পৃথিবীর বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। আল্লাহর এ বান্দাদের বাঁচানোর দায়িত্ব তো মুসলমানদের।' বলেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। টেবিলে রাখা একটি ব্যাগ তুলে নিল হাতে।

আহমদ মুসার সাথে মাহমুদ এয়ারপোর্টে যেতে চাইল। কিন্তু আহমদ মুসা নিষেধ করল। বলল, 'কথা তো হলোই।'

আহমদ মুসা যখন গাড়িতে উঠে বসল নাদিয়া ও এমিলিয়া তখন গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে। তাদের পাশে মাহমুদ। তিনজনের চোখেই অশ্রু।

আহমদ মুসা ওদের দিকে চেয়ে বলল, অশ্রু মোছ মাহমুদ। কেঁদো না বোন এমিলিয়া ও নাদিয়া। মাটির মায়া, স্নেহের বাঁধনের চেয়ে একজন মুসলমানের কাছে মজলুম মানবতার ক্রন্দন অনেক বেশি মূল্যবান।

বলে আহমদ মুসা গাড়ি থেকে নামলেন। দাঁড়াল এমিলিয়া ও নাদিয়ার সামনে। বলল এমিলিয়াকে, বোন নাদিয়া এখন একা। আমি তাকে তোমার হাতে দিয়ে গেলাম।'

ফুপিয়ে কেঁদে উঠল এবার নাদিয়া।

একটু থেমে আহমদ মুসা তাকাল মাহমুদের দিকে। বলল, 'এহসান সাবরির সাথে আমার কথা হয়েছে। নিনা নাদিয়াও জানে তাকে। দু'টি জীবনকে তোমরা এক করে দিও। আমি উপস্থিত থাকতে পারবো না কিন্তু আমার দোয়া থাকবে।

কথা শেষ করেই আবার গাড়িতে উঠে বসল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার গাড়ি নড়ে উঠল। কিছু বলতে গিয়েছিল মাহমুদ। পারল না। কান্নায় ডুবে গেল কথা।

সাইমুমের কর্মীরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। সকলেই কাঁদছে। স্বজন হারানোর সে কি করুণ দৃশ্য তাদের চোখে মুখে! তাদের দিকে চেয়ে মধুর হেসে আহমদ মুসা বলল, 'তোমরা না আল্লাহর সৈনিক! কোন ব্যক্তি, কোন মাটি নয়, কাজ আর দায়িত্বই হবে তোমাদের কাছে সবচেয়ে বড়।' বড় নরম আর মমতায় ভরা আহমদ মুসার সে কথাগুলো।

সাইমুমকর্মীদের অশ্রু যেন আরও উথলে উঠল। আহমদ মুসাকে নিয়ে ছুটে চলল গাড়ি এয়ারপোর্টের পথ ধরে।

# ৭

দানবীয় গতিতে এগিয়ে চলেছে ‘প্যানামে’র বোয়িংটি। নীচে আরব সাগরের অথৈ জল। জেদ্দা ছেড়ে অনেকক্ষণ, আরব-উপদ্বীপের আদিগন্ত বালির রাজ্য আর দেখা যায় না। ইবরাহীম-ইসমাইল (আঃ)-এর স্মৃতিভূমি, মহানবী (সঃ)-এর পূর্ণ কর্মক্ষেত্র, নীল গম্বুজের দেশ শাহ ফয়সলের দেশের ওপর প্রসারিত আকুল দু’টো চোখ এবার আহমদ মুসা বিমানের অভ্যন্তরে সরিয়ে নিল।

বিমানের মধ্যভাগ দিয়ে লম্বালম্বী এক সরু গলিপথ। এর দু’পার্শ্বে সারিবদ্ধ আসন।

প্রথম শ্রেণীর বাম ধারের দ্বিতীয় সারির একেবারে বামপ্রান্তে জানালার ধারে বসেছে আহমদ মুসা।

জানালা থেকে চোখ ঘুরিয়ে ডানপাশে তাকাতে গিয়ে একটি লোকের সাথে হঠাৎ চোখাচোখি হয়ে গেল আহমদ মুসার। লোকটি বসেছে ওধারে দ্বিতীয় সারির প্রথম সিটটিতেই।

শ্বেতাংগ লোকটি। গাঢ় নীল স্যুট পরনে। লম্বাটে মুখ। খাড়া নাক। জোড়া ভ্রু। ছোট করে ছাঁটাচুল। ডান ভ্রুর নীচে চোখের মোহনায় একটি আঁচিল। সবচেয়ে লক্ষণীয় তার কুতকুতে কুৎসিত দু’টো চোখ।

চোখাচোখি হতেই লোকটি অপ্রতিভভাবে চোখ সরিয়ে নিল। মুখও ঘুরে গেল তার সেই সাথেই।

বিস্মিত হল আহমদ মুসা। লোকটি অমন করে মুখ ঘুরিয়ে নিল কেন? তার দিকে অমন করে চোরা দৃষ্টি রাখার কারণ কি লোকটির? সমগ্র অতীতকে সে একবার হাতড়িয়ে দেখল না এই মুখ সে কখনও দেখেনি। হঠাৎ তার মনে পড়ল জেদ্দার রেস্ট হাউসে তার পাশের রুমটিতে এই লোকটিকেই তো সে ঢুকতে দেখেছিল। তখন তার ছিল আরবী পোশাক-আরবী রমাল ছিল মাথায়।

সেই যে মুখ ঘুরিয়েছে লোকটি, আর ফিরে তাকালো না। আহমদ মুসার সন্ধানী মনের কোথায় যেন খচ খচ করতে লাগল।

কেবিন-মাইক থেকে ক্যাপটেনের কণ্ঠ শোনা গেল, লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান, আমরা এখন ৩৩ হাজার ফিট ওপর দিয়ে ঘন্টায় ৫৫০ মাইল বেগে এগিয়ে চলেছি। আর আধ ঘন্টর মধ্যে করাচীতে ল্যান্ড করব।

ক্যাপ্টেনের কথা শেষ হবার সাথে সাথে রোলিং টেবিলে করে নাস্তার ট্রে নিয়ে আগমন ঘটল বিমান বালাদের। স্টুয়ার্ট ককপিটের দিক থেকে নেমে এসে ফার্স্ট ক্লাস রুম হয়ে পিছনের দিকে চলে গেল।

এমন সময় সারির দু'টো আসন থেকে দু'জন লোক উঠে দাঁড়াল। দু'জনেই কালো ধরনের ঢিলা প্যান্ট ও ওভারকোট গায়ে। ওরা সামনের পার্টিসন ডোর ঠেলে অতি দ্রুত চলে গেল ককপিঠের দিকে।

এক মিনিটও অতিক্রান্ত হয়নি। ওদের একজন ফিরে এল। ডান হাতে তার রিভলভার। বাম হাতে বাঘা সাইজের একটি গ্রেনেড সেফটিফিন তুলে নেয়া।

এই সময় বিমানটি দ্রুত বড় ধরনের একটি মোড় নিল। থর থর করে কেঁপে উঠল বিমানটি। ক্যাপ্টেনের কণ্ঠ শোনা গেল কেবিন লাউডস্পীকারে, ভদ্রমহিলা, ভদ্রমহোদয়গণ, আমি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, বিমানের গতিপথ পরিবর্তন করতে আমাকে বাধ্য করা হয়েছে। মহাশূন্যের বুকে বিমানের ৯০ জন যাত্রীর মূল্যবান জীবনকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়ার চাইতে, বিমান দস্যুদের নির্দেশ পালন অধিকতর শ্রেয় বলে মনে করেছি। আমরা তাদের নির্দেশে এখন দক্ষিণে গভীর সাগরের দিকে এগিয়ে চলেছি। ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন।

যাত্রীদের মধ্যে প্রথমে মৃদু গুঞ্জন এবং পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি হল। কিন্তু তারপরই তাদের মধ্যে মৃত্যু স্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। প্রত্যেকের চোখে উদ্বেগ-আতংকের ঢেউ।

আহমদ মুসা শান্ত চোখে পার্টিশন ডোরে দাঁড়ানো লোকটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। শ্বেতবর্ণ চেহারা কিন্তু মুখাকৃতি ও দেহের মাপে লোকটি জাপানী ও ফিলিপিনোদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। লোকটি পাথরের মুর্তির মত স্থির অচঞ্চল দাঁড়িয়ে আছে।

এ বিমান-দস্যুতার কারণ কি? অর্থ লাভ, না কোন যাত্রী অপহরণের বিশেষ উদ্দেশ্য? কিন্তু কোন যাত্রীর প্রতিই তাদের মন দিতে দেখা যাচ্ছে না তো। আহমদ মুসা জেদ্দার রেস্টহাউসে দেখা সেই সহযাত্রীটির দিকে তাকাল। দেখল, সে তাকিয়ে আছে সেই বিমানদস্যুর দিকে। তার মুখে কিন্তু উদ্বেগ-আতংকের লেশমাত্র নেই, বরং কেমন একটা উন্মুখ ভাব তার চোখে। বিস্মিত হলো আহমদ মুসা।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল আহমদ মুসা। নিঃসীম নীল জলরাশি। নীল জলের নীল সীমানা নীল আকাশের সাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে। সে নীলের সীমানা পেরিয়ে হারিয়ে গেল আহমদ মুসার মন। পাকিস্তান হয়ে কারাকোরামের সিল্ক রোডের পথ ধরে সে প্রবেশ করবে মধ্য এশিয়ায়-এই ছিল তার পরিকল্পনা। কিন্তু কোথায় এখন চলেছে সে? অবশ্য কোন দুঃশ্চিন্তা তার মনে নেই। জ্ঞান ও বিবেকের রায় নিয়ে সে কাজ করে যেতে পারে, ফল তো তার হাতে নেই। আর ফলদানের যিনি মালিক তিনি সর্বজ্ঞ। সুতরাং চিন্তা কি তার!

আহমদ মুসার চিন্তা স্রোতে বাধা পড়ল। কেবিন-মাইক থেকে ঘোষিত হল, ভদ্রমহিলা, ভদ্রমহোদয়গণ! আমরা অল্পক্ষণের মধ্যেই ভারত মহাসাগরের কোন এক দ্বীপে ল্যান্ড করছি। আমি বেল্ট বেধে নেবার জন্য সকলকে অনুরোধ করছি।

আহমদ মুসা তার সন্ধানী চোখ নীচের নীল জলরাশির ওপর মেলে ধরল। আহমদ মুসা মনে মনে হিসেব করে দেখল, বিমান দু'হাজার মাইলের মত এসেছে। বিমান নীচে নামতে শুরু করেছে।

আরো দশ মিনিট কেটে গেল। অবশেষে দৃষ্টির পরিসীমায় ভেসে উঠল ছবির মত একটি দ্বীপ। ক্রমশ স্পষ্টতর হয়ে উঠল দ্বীপটি। চারদিকে অথৈ সাগর জলের মাঝে ছোট একখন্ড মরুদ্যানের মত মনে হচ্ছে দ্বীপটিকে।

চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে বিমানটি নেমে যেতে লাগল দ্বীপের ওপর, গভীর অরণ্যে আচ্ছাদিত দ্বীপ। আহমদ মুসা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল অল্প কিছু দুরত্বে পাশাপাশি দু'টি গাছের ওপর দু'টি সাদা নিশান উঠে এল। দু'টি নিশানের পাশ দিয়ে মেটে রংয়ের দীর্ঘ একটি রানওয়েও স্পষ্ট হয়ে উঠল।

ভৌতিক সে রানওয়েতে ল্যান্ড করল বোয়িংটি। বিমান দস্যুদের মত একটি চেহারার একদল লোক এসে ঘিরে দাঁড়াল বিমানটিকে। ভিতরের বিমান-দস্যুটি কিন্তু যেমন দাঁড়িয়ে ছিল, তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

কি ঘটে কি হয় রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সবাই মুহূর্ত গুণছে। বিমানের ফ্লোরে অনেক পায়ের শব্দ শোনা গেল। সাত আটজন ওরা উঠে এসেছে বিমানে। হাতে ওদের সাব-মেশিন গান। ওদের কয়েকজন এসে ঢুকল প্রথম শ্রেণীর কেবিনে। ইতিমধ্যে ককপিটের বিমান-দস্যুও এসে প্রবেশ করল এখানে। ওদের একজন বলল, ভদ্র মহিলা, ভদ্র মহোদয়গণ, "আমরা দুঃখিত যে একজন মাত্র লোকের জন্য আপনাদের কষ্ট দিয়েছি। আমরা তাকে নিয়ে যাচ্ছি। এরপর আপনারা মুক্ত।"

বক্তার দেহটি দামী কাল স্যুটে আবৃত। টাইটিও কাল। কাল টাইয়ের বুকে ধবধবে সাদা একটি সাপ আঁকা। সাপের মুখে রক্তাক্ত তিনটি 'C'। উষ্ণ এক রক্তস্রোত বয়ে গেল আহমদ মুসার গোটা শরীরে। ট্রিপল সি? সেই কুখ্যাত 'কু ক্লাক্স ক্লান' এরা, যাদের হাতের প্রাণ দিচ্ছে লক্ষ লক্ষ অশ্বেতাংগ মানুষ?

লোকটির কথা শেষ হতেই রিভলভার নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা বিমান দস্যুটি অকস্মাৎ সামনের আসনের একজন লোকের মাথায় রিভলভারের বাঁট দিয়ে আঘাত করে বলল, "হ্যালো, কালো বাজ, এখনও তোমার ঘুম ভাঙেনি, বুঝতে পারনি যম এসেছে তোমার?

'কালো বাজ' নামক লোকটি উঠে দাঁড়াল। সেও জাপানী বা ফিলিপাইনোদের মতই খাটো। কিন্তু তার নাসিকা উন্নত, নীল টানা চোখ, মাথায় ঘন কাল কোঁকড়ানো চুল।

লোকটি উঠে দাঁড়াতেই আরও দু'জন বিমান দস্যু তার দিকে এগিয়ে এল এবং তারা তাকে দু'দিক থেকে ধরে টেনে নামিয়ে নিয়ে গেল বিমান থেকে।

বিমান দস্যুদের সবাই বিমান থেকে নেমে গেল। আহমদ মুসা দেখল, জেদ্দা রেস্টহাউসে দেখা সেই কুতকুতে চোখের সহযাত্রীটিও তাদের পিছনে নেমে যাচ্ছে।

বিমান এবার মুক্ত। কেবিন-মাইকে ক্যাপ্টেন বললেন, আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে আকাশে উড়ব। বিমানের গেট বন্ধ হতে যাবে, এমন সময় কয়েকজন বিমান দস্যু, আর সেই কুতকুতে চোখের লোকটি দ্রুত ফিরে এল। বিমানে প্রবেশ করল তারা। সোজা এসে তারা দাঁড়াল আহমদ মুসার সামনে। একজন আহমদ মুসাকে বলল, আপনি নেমে আসুন।

এই অভাবিত ঘটনা আহমদ মুসাকে চমকে দিয়েছিল। সে কিছু বলার জন্য মুখ খুলতে গিয়েও চুপ করে গেল কি মনে করে। তারপর শান্তভাবে নেমে গেল বিমান থেকে তাদের সাথে।

বিমান থেকে নেমে মেটে রংয়ের রানওয়ে ছেড়ে সরু পাথরের গুড়ি বিছানো পথ ধরে তারা এগিয়ে চলল। দু'দিকেই জংগল। অপরূপ সবুজের রাজ্য এই দ্বীপটি। আহমদ মুসা ভাবল, বিচ্ছিন্ন ও বিজন এই দ্বীপে এত বিরাট, এত সুদৃঢ় রানওয়ে এল কোথা থেকে? রানওয়েটি বেশ পুরাতন। তাহলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে কোন শক্তির কি গোপন কোন বিমান ঘাঁটি ছিল এটা?

সেই সরু পথটি তাদেরকে সবুজ বৃক্ষ-লতা পরিবেষ্টিত একতলা এক সবুজ বাড়িতে নিয়ে এল। বাড়িটি একতলা হলেও বিরাট পাথরের তৈরী বাড়িটি খুবই মজবুত।

ইসপাতের দরজাওয়ালা দু'টি ঘর পেরিয়ে তারা এসে পৌঁছল এক হল ঘরে। ঘরে তখন তিনটি প্রাণী। কালো টাইয়ে সাদা সাপওয়ালা সেই লোকটি গা এলিয়ে বসে আছে সোফার পিছনে। আর কিছুক্ষণ আগে বিমান থেকে ধরে আনা 'কালোবাজ' নামক লোকটি পড়ে আছে মেঝেতে। তার নগ্ন পিঠে চাবুকের রক্তাক্ত দাগ। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে লোকটি জ্ঞান হারিয়েছে। আহমদ মুসা হল ঘরে প্রবেশ করতে করতে ভাবলো, ঐ চাবুক হয়তো তারই অপেক্ষা করছে। এক যন্ত্রণাদায়ক অনুভুতি এসে তার মনকে আচ্ছন্ন করতে চাইল। কিন্তু আহমদ মুসা আমল দিল না সে চিন্তাকে।

পায়ের শব্দে সোফায় গা এলিয়ে দেয়া সেই লোকটি চোখ খুলল। একবার আহমদ মুসার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে কুতকুতে চোখের সেই লোকটিকে বলল, এই কি আপনার আহমদ মুসা, মিঃ কোহেন?

-হ্যাঁ, মিঃ স্মিথ।

এবার মিঃ স্মিথ নামক লোকটি সরাসরি আহমদ মুসার দিকে চেয়ে বলল, সত্যিই আপনি কি সেই আহমদ মুসা? আপনি কি সাইমুমের অধিনায়ক?

-হ্যাঁ। পরিষ্কার কন্ঠে বলল আহমদ মুসা।

মিঃ স্মিথ উঠে দাঁড়িয়ে মিঃ কোহেনের দিকে চেয়ে বললেন, 'আমাদের দাবী মেনে নিলে আমরা আপনার প্রস্তাবে রাজী আছি। জানিয়ে দিন আপনার বসদের। তারপর সে চাবুকধারীদের দিকে চেয়ে বলল, এ ঘরেই এরা থাকবে, বাইরে থেকে তালা দিয়ে চাবি মিস মার্গারেটকে দিয়ে দিও। আর তোমরা চারজন বাইরের ফটক ছেড়ে কোথাও যেও না।

সবাই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। দরজা বন্ধ হল, দরজায় তালা লাগানোর শব্দ পাওয়া গেল সেই সাথে। ওপরে কয়েকটি ঘুলঘুলি এবং ঐ একটি মাত্র দরজা ছাড়া ঘর থেকে বের হওয়ার আর দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

এবার মেঝেতে পড়ে থাকা লোকটির দিকে মনোযোগ দিল আহমদ মুসা। তার মুখের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাতে তার মুখ একটু তুলে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে লোকটির চোখ দু'টিও খুলে গেল। নির্বিকার ও নিরুত্তাপ তার দৃষ্টি। আবার চোখ বুজল সে।

-এখন কেমন বোধ করছেন?

লোকটি চোখ খুলল। বিস্ময় তার চোখে। বলল সে, কে আপনি?

-বিমান থেকে আমাকেও ওরা ধরে এনেছে। 'এ ব্যাপারে আমি আপনার মতই অন্ধকারে।' বলেই আহমদ মুসা পকেট থেকে রুমাল বের করে তার পিঠের রক্ত ধীরে ধীরে মুছে দিতে লাগল।

-আমাদের অস্তিত্বই আমাদের অপরাধ।

-অর্থাৎ?

-আমাদেরকে ওরা পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলতে চায়।

-আপনার দেশ কোথায়?

-মিন্দানাও।

-ফিলিপাইনের মিন্দানাও দ্বীপে! আপনি মুসলমান?

-হ্যাঁ, আমি মুসলমান।

আহমদ মুসা চিন্তা করল। যেন কিছু মিলিয়ে নিচ্ছে সে। তারপর বলল, আপনি কি আবদুল্লাহ হাত্তা? প্যাসেফিক ক্রিসেন্ট ডিফেন্স আর্মির অধিনায়ক কি আপনিই?

-হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কে? এত কথা জানেন কেমন করে? চোখে তার একরাশ বিস্ময়।

আহমদ মুসা অপলক চোখে তাকিয়ে ছিল আবদুল্লাহ হাত্তার দিকে। তার চোখে-মুখে বিস্ময় ও আনন্দের অপূর্ব জ্যোতি। তারপর ধীরে ধীরে মুখ খুলল সে। বলল, ফুল ফুটলে সৌরভ ছোটে।

-কিন্তু আপনি কে?

-আমি আহমদ মুসা।

-কোন আহমদ মুসা। ফিলিস্তিন বিজয়ী সাইমুমের অধিনায়ক আহমদ মুসা?

-হ্যাঁ, সেই হতভাগা আমি।

দু'জনের চোখেই আনন্দের উজ্জ্বল ঢেউ। জড়িয়ে ধরল দু'জন দু'জন কে। আবদুল্লাহ হাত্তা ভুলে গেছে যেন সব বেদনা-সব যন্ত্রণা। তার দু'চোখ বেয়ে নামছে আনন্দের অশ্রু।

গভীর রাত। প্যাসেফিক শিপিং লাইনের একটি জাহাজ এসে নোঙ্গর ফেলল সেই দ্বীপে। আহমদ মুসা ও আবদুল্লাহ হাত্তাকে এনে হাত-পা বেধে ঢুকিয়ে দেয়া হল সেই জাহাজের অন্ধকার সেলে। এরপরই জাহাজ নোঙ্গর তুলল। ভারত মহাসাগরের পানি কেটে কেটে সে জাহাজ এগিয়ে চলল ফিলিপাইনের মিন্দানাও দ্বীপের দিকে।

পরবর্তী কাহিনীর জন্য পড়ুন

# মিন্দানাওয়ের বন্দী

**কৃতজ্ঞতায়ঃ**
**Mahfuzur Rahman**

# সাইমুম-৩

# মিন্দানাওয়ের বন্দী

## আবুল আসাদ

# ১

ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে চোখ খুলল আহমদ মুসা। হাত-পা নাড়তে গিয়ে একটুও পারল না। কঠিন ভাবে বাঁধা। মনে পড়ল তার, দু'জন লোক এসে প্রথমে আবদুল্লাহ হাত্তাকে একটি ইনজেকশন দিল, তারপর তাকেও একটি। তারপর কি ঘটেছে কিছুই জানে না সে। পাশ ফিরে শুতে চেষ্টা করল আহমদ মুসা। পাশ ফিরতে গিয়ে কান মেঝেতে ঠেকার সাথে সাথে একটি গুম গুম আওয়াজ তার কানে এল। কান পেতে শুনল সে। কয়েক মুহূর্ত শুনেই বুঝতে পারল, শক্তিশালী কোন ইঞ্জিনের শব্দ। পরক্ষণেই আহমদ মুসা অনুভব করল মেঝেটাও যেন মৃদু কাঁপছে। আহমদ মুসার সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠল-তাহলে সে কোন পানি জাহাজে? কোথাও পাচার করা হচ্ছে তাকে?

অনেক কষ্টে আহমদ মুসা উঠে বসল। পেট পিঠের সাথে লেগে গেছে। ক্ষুধায় জ্বলছে সারাটা পেট। একটু সরে বসতে গিয়ে হঠাৎ পায়ে কি যেন ঠেকল। সাথে ভারী কণ্ঠের একটি প্রশ্ন-কে?

-হাত্তা ভাই আপনি? উল্লোসিত কণ্ঠ আহমদ মুসার।

-একি, মুসা ভাই এখানেও আপনি আমার সাথে?

-সাথেই তো ছিলাম।

-কিন্তু এতো ভালো লক্ষণ নয়?

-কেন?

-আমি তো এগিয়ে চলেছি মৃত্যুর দিকে। আমি আপনাকে সাথী করে নিতে পারি না।

আহমদ মুসা এগিয়ে গেল হাত্তার দিকে। তার বাঁধা দুটি হাত হাত্তার হাত দুটিকে খুঁজে নিল। শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলল সে, হতাশ হয়েছেন হাত্তা ভাই? কিন্তু জীবন মৃত্যুর ফায়সালা তো এভাবে জমিনে হয়না।

-আমি জানি, এ ফয়সালা আসে আসমান থেকে। কিন্তু আমার মন যেন বলছে এ কথা।

মুহূর্তের জন্য থামল হাত্তা। তারপর বলল আবার, তুমি জানো না মুসা ভাই, দীর্ঘ পনের বছরের বিনিদ্র প্রচেষ্টা আজ ওদের সফল হয়েছে।

আহমদ মুসা চিন্তা করছিল। বলল, যতটা চিনেছি ওরা সেই কুখ্যাত ক্লু-ক্লাক্স-ক্ল্যান। কিন্তু এ শ্বেত-সন্ত্রাসবাদীরা মিন্দানাও-এ কেন?

-এখানে সে শ্বেত-সন্ত্রাস এবং খৃস্টান স্বার্থ এক হয়ে গেছে।

-কি রকম?

খৃস্টান ক্রসের প্রচারে সহায়তা দানের জন্য মিন্দানাও ও সোলো দ্বীপপুঞ্জে শ্বেত সন্ত্রাস ক্লু-ক্লাক্স-ক্ল্যান আজ এক সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে।

মুহূর্ত খানেক থেমে আবার শুরু করল আবদুল্লা হাত্তা। জর্জ বানার্ডশ'র সেই বিখ্যাত উক্তিটি আপনি নিশ্চয় জানেন যে, ''পশ্চিমারা যখন কোন দেশ দখল করতে চায়, তখন সেখানে তারা খৃস্ট ধর্মের বার্তা নিযে মিশনারী পাঠায়। স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা মিশনারী নিহত হয়। এরপর খৃস্টধর্ম রক্ষার বাহানা তুলে পশ্চিমী দেশগুলো সেখানে সসৈন্যে ছুটে যায় এবং স্বর্গের এক মহাদান হিসাবে দেশটি জয় করে নেয়।'' ঠিক এমনিই ঘটেছে মিন্দানাও ও সোলোদ্বীপপুঞ্জে। স্পেনের ক্যাথলিক উপনিবেশিকরা সেখানে কি করেছে সে দীর্ঘ ইতিহাস বাদ দিলাম। সাম্প্রতিক কালের কথাই শুনুন। আজ থেকে বিশ বছর আগে দক্ষিণ

মিন্দানাও- এর জাম্বুয়াঙ্গোতে একদল খৃস্টান মিশনারী উপস্থিত হলো। তাদের নিরাপত্তার জন্য অতি নিকটে মরো উপসাগরের কূলে নোঙ্গর করা থাকল সজ্জিত বিরাট এক রনপোত। জাহাজ থেকে মিশনারীর যখন নামত, তাদরে কোমরে ঝুলানো থাকত লম্বা চোঙওয়ালা রিভলভার। হাতে থাকত বই, বিস্কুট, সুন্দর সুন্দর সিট কাপড়। তারা জাম্বুয়াঙ্গোতে একটি বাইবেল শিক্ষার স্কুল খুলল। প্রতিদিন সন্ধায় সেখানে নাচ গানের অনুষ্ঠান ও ছবি দেখানো হতো। স্বর্ণাভ চুলের শেতাংগ তরুণীরা সেখানে নাচ গান করত। অনেকদিনের চেষ্টার পর তারা জাম্বুয়াঙ্গোর আফানি গোত্রের সর্দার শরিফ আফানিকে হাত করল। তারপর শুরু হলো জোর করে লোকদের বাইবেল স্কুলে ভর্তি, বাধ্যতামূলকভাবে ইংরেজী শিক্ষা ও লোকদের নাম পরিবর্তনের পালা। জাম্বুয়াঙ্গোর হুজুর মাখদুম (ওস্তাদ) জাফর আলী মিশনারীদের এ আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করলেন। সেই দিন রাতেই মাখদুম জাফর আলী জাম্বুয়াঙ্গোর মসজিদে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হলেন। পরদিন আফানি গোত্রের ক্রুদ্ধ লোকেরা হত্যা করল তাদের গোত্র প্রধান শরিফ আফানিকে এবং সেই সাথে পুড়িয়ে দিল বাইবেল স্কুল। তারা উপকূল থেকে তীর বৃষ্টি করল মিশনারী রনপোতের দিকে। তীরের জবাবে জাহাজ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে এল মেশিন গানের গুলী। এরপর জাহাজ থেকে কামানের গোলাবর্ষণ করে জাম্বুয়াঙ্গোর আফানি জনপদ মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া হলো। আফানিরা উপকূল থেকে অভ্যন্তর ভাগে পালিয়ে এলো।

এই ঘটনার পর থেকে শুরু হল গুপ্ত হত্যার হিড়িক। মিন্দানাও এর চারদিকে উপকূল সংলগ্ন স্থানে মিশনারী সাইনবোর্ডের আড়ালে প্রায় ২০টির মত শ্বেতাংগ ঘাটি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। শক্তির ছত্রছায়ায় ওগুলো টিকে আছে। ঐখান থেকেই দেশের অভ্যন্তরে গুপ্ত হত্যা চালানো হচ্ছে। এ পর্যন্ত ২৯৮ জন বিখ্যাত মখদুম (ওস্তাদ বা মওলানা) নিহত হয়েছেন এবং এক হাজারেরও বেশী মুর যুবক প্রাণ দিয়েছে তাদের হাতে।

কথার মাঝখানে আহমদ মুসা বলে উঠল, কি ভয়ংকর কথা। চলছে এটা এখনও হাত্তা?

-চলছে, তবে বাধাবন্ধনহীনভাবে নয়। আজ থেকে পনের বছর আগে আমরা এর মোকাবিলার জন্য প্যাসেফিক ক্রিসেন্ট ডিফেন্স আর্মি (পিসিডি়া) নামে এক গুপ্ত সৈন্যদলের সৃষ্টি করেছি। এ পর্যন্ত আমরা ওদের প্রায় ১০০ জন এজেন্ট ধরেছি। দেশের অভ্যন্তরে ওদের কাজ অনেকটা ঝিমিয়ে পড়েছে। কিন্তু ওদের ঘাটির বিরুদ্ধে আমরা কিছুই করতে পারছি না। খুবই মজবুত ঘাঁটি ওদের। ইলেকট্রিক তারে ঘেরা, আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত। স্বল্প পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রও সেখানে রয়েছে। ছোট ছোট হেলিকপ্টারও নামে ঘাঁটিতে।

-কেন? মোকাবিলার মত আধুনিক অস্ত্র পিসিডার নেই? বলল আহমদ মুসা।

-অস্ত্র এবং ট্রেনিং দুইয়েরই অভাব। অবশ্য ইন্দোনেশিয়ার জ্ঞাতি ভাইদের কাছ থেকে কিছু কিছু আধুনিক অস্ত্র আমরা পাচ্ছি, কিন্তু তা পরিমাণে ও মানে কোন দিক দিয়েই যথেষ্ট নয়। তবু পিসিডা আজ এইটুকু করতে পেরেছে যে, পিসিডার চোখ এড়িয়ে ওদের এজেন্টরা আর অবাধ বিচরণ করতে পারছে না। কিন্তু.....

আহমদ মুসা কথার মাঝখান থেকে বলে উঠলো, যে এজেন্টরা ধরা পড়েছে তাদের কি পরিচয় তোমরা জেনেছ হাত্তা ভাই?

-ক্লু-ক্লাক্স-ক্লান। ওদের প্রত্যেকের ট্রাওজার ব্যান্ডে সাদা সাপ, সাপের মুখে লাল রঙের তিনটি সি (ট্রিপলসি) দেখা গেছে। একটু থেমে আবদুল্লাহহ হাত্তা আবার বলল, যে কথা বলছিলাম। নতুন এক বিপদ দেখা দিয়েছে। ভয়ংকর সে বিপদ। প্রায় দু'মাস আগে পশ্চিম মিন্দানাও-এর সোলো সাগর উপকূলের 'নান্দিওনা' নামক জায়গায় প্রায় দু'শ' মুর (মিন্দানা ও সোলো দ্বীপপুঞ্জের মুসলমানরা মুর নামে অভিহিত) মুক্তা সংগ্রহে রত ছিল। পরে দু' শ' জনের সকলকেই উপকূল ভূমিতে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। তাদের দেহের রঙ হয়েছিল লালচে নীল। মিন্দানাওয়ের ডাক্তার কবিরাজদের কেউই এ মৃত্যুর কারণ বলতে পারেনি। এর দু' মাস পরে রাজধানী শহর দাভাও থেকে ৩০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত দাভাও উপসাগর তীরবর্তী 'লানাডেল' নামক মূর জনপদ একইভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে। ঘটনার আগের দিন সন্ধ্যায় 'লানাডেল' থেকে আসা

একজন পিসিডা কর্মী বলেছে, সেদিন সন্ধ্যায় সে দু'টি শ্বেতাংগ স্পিড বোর্টকে লানাডেলের দিকে যেতে দেখেছে। আমাদের স্থির বিশ্বাস, কোন রোগ বা নৈসর্গিক কোন ঘটনা এ মৃত্যুর কারণ নয়, নিশ্চয় ট্রিপল সি'র কোন চক্রান্ত এটা। এই দুই ঘটনার পর মিন্দানাও ও সোলো দ্বীপপুঞ্জের মানুষ উদ্বেগ-আতংকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছে।

স্বপ্নাবিষ্টের মত শুনছিল আহমদ মুসা। আবদুল্লাহহ হাত্তা থামলে সে যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠল। ধীর কণ্ঠে বলল, সেখানকার ঘাস ও গাছ পালার অবস্থা কেমন ছিল হাত্তা ভাই?

-ওগুলো পিতাভ রঙ ধারণ করেছিল। কিন্তু কোন লোকেরই প্রাণ ছিল না।

কথাটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে আহমদ মুসার চোখ দুটি বিস্ফরিত হয়ে উঠল, কপালটা হয়ে পড়ল কুঞ্চিত। মুখ থেকে এক যন্ত্রণাদায়ক শব্দ বেরুল-উঃ?

-কি হলো মুসা ভাই? ত্রস্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল হাত্তা।

-এমন ভয়ংকর কথা কানে শুনব তার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না হাত্তা।

-কেন, তুমি কিছু বুঝেছ?

-আমার ধারণা যদি সত্য হয়, তাহলে ওটা মারাত্মক ধরণের পারমাণবিক রেডিয়েশনের ফল।

তোমার ধারণা সত্য মুসা ভাই। আমি এর সূত্র সন্ধানে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইরান, মিশর এবং সর্বশেষে লিবিয়া হয়ে বাড়ি ফিরছিলাম। দেশগুলোর আণবিক বিশেষজ্ঞদের সকলেই একমত যে, এটা মারাত্মক ধরণের রেডিয়েশনের ফল। কিন্তু তাঁরা এর প্রতিরোধের কোন পথ বাতলে দিতে পারেনি, কিংবা আন্তর্জাতিক ফোরামে এর প্রতিবিধানমূলক কোন ব্যবস্থা করতেও তারা রাজনৈতিক কারণে ভয় করেছেন। থামল আবদুল্লাহহ হাত্তা।

আহমদ মুসাও ভাবনার অতল গহবরে ডুবেছিল। কথা বলতে পারল না সেও।

নিঃশব্দ রাত্রির জমাট অন্ধকারে দু'জনই নীরব। কথা বলল প্রথমে আহমদ মুসা।

-এখন কি ভাবছ তাহলে?

-সবাই ত্যাগ করলেও আল্লাহ তো আমাদের ত্যাগ করেননি আমাদের যা আছে, তাই দিয়ে আমরা প্রতিরোধ করব, যদি সফল না হই, তাহলে আমরা মৃত্যুকে বরণ করে নেব। কিন্তু তবু আমরা ক্রুসের খৃস্টবাদের কাছে মাথা নত করবো না।

থামল আবদুল্লাহ হাত্তা। বোধ হয় একটা ঢোক গিলে নিল সে। আবার বলতে শুরু করল, কিন্তু সে সুযোগ হয়ত আমি আর পাব না মুসা ভাই। বলতে বলতে কণ্ঠ তার ভারি হয়ে উঠল। বলতে শুরু করল সে আবার, ভয়ংকর রেডিয়েশনের সংবাদও হয়ত আমি আমার জাতিকে জানাবার সুযোগ পাব না। তারা হয়ত অমনিভাবে নিরুপায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে থাকবে। কান্নায় বুঁজে এল তার কথা।

-ভবিষ্যতের সবকিছুই আমাদের অজানা। আমরা হতাশ হব কেন হাত্তা। শান্তনার শান্তস্বর আহমদ মুসার কণ্ঠে। আবদুল্লাহ হাত্তা নীরব রইল। পরে ধীর কন্ঠে সে ডাকল, মুসা ভাই?

- বল।

-আমাদের উভয়ের এই সাক্ষাতের মূলে বোধ হয় আল্লাহর এক বিরাট ইচ্ছা কাজ করেছে।

-হয়তো হবে, হাত্তা।

আবদুল্লাহ হাত্তা একটু থেমে বলল, আমার দায়িত্ব আমি তোমার কাঁধে তুলে দিয়ে যেতে চাই।

এমন করে কথা বলো না হাত্তা, জীবন মৃত্যুর যিনি মালিক তিনিই সব কিছু করেন। আমি বলছি, সব কাজেই তুমি আমাকে পাশে পাবে।

আবদুল্লাহ হাত্তা একটু হাসলো। কান্নার মত করুণ সে হাসি। বলল সে, সে সৌভাগ্য আমার হলে দুনিয়ার মধ্যে আমিই হতাম সবচেয়ে সুখী ব্যক্তি। যাক সে কথা। এখন কয়েকটি কাজের কথা শুন। আমার যতদূর বিশ্বাস আমার ও তোমার অপরাধ একরূপ নয়। জাহাজ থেকে নেমে আসার পর ওদের কথোপকথন থেকে যা বুঝেছি, তাতে মনে হয় ট্রিপল সি' তাদের নিজের ইচ্ছায় তোমাকে আটকায়নি। অন্য কোন এক পক্ষের ইচ্ছা ও অনুরোধ পূরণ করছে মাত্র।

সুতরাং তুমি যেটুকু সময় হাতে পাবে, তা আমি পাব না বলে মনে হয়। যদি না পাই, তাহলে, মনে রেখ, পিসিডার গঠনতন্ত্র অনুযায়ী আমার পরে যিনি পিসিডার নেতা হবেন তার কোড নাম হবে 'রুড থানডার' সংক্ষেপে 'রুথ'। পিসিডার কাছে তোমার পরিচয় হবে 'রুথ'। পিসিডার সহকারী প্রধান যিনি রয়েছেন, তার নাম মুর হামসার। কোড 'ব্রাইট ফ্লাস' সংক্ষেপে 'বাফ'।

এই সময় বাইরে থেকে ঠক ঠক আওয়াজ ভেসে এলো। ভারি বুট পায়ে যেন কেউ আসছে। আবদুল্লাহ হাত্তার কথা মুহূর্তের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। দু'জনেই কান পেতে রইল। পদশব্দটি তাদের অতি নিকটে এসে থামলো। মনে হলো দরজার বাইরে কেউ এসে দাঁড়াল। পরমুহূর্তেই চাবি খোলার আওয়াজ পাওয়া গেল। আবদুল্লাহ হাত্তা চঞ্চল হয়ে উঠল। বলল, মুসা ভাই? কেউ যেন আসছে। শুন, মনে রেখ, মিন্দানাও-এর 'আপো পর্বত' হবে তোমার গন্তব্যস্থল।

আবদুল্লাহ হাত্তার কথার রেশ বাতাসে মিলিয়ে যাবার পূর্বেই তারেদ সামনে খুলে গেল একটি দরজা।

একটি টর্চের আলো এসে তাদের উপর পড়ল। টর্চধারী দীর্ঘাঙ্গ লোকটি উক্তি করল, 'ও' তাহলে জেগে উঠা হয়েছে?

পরিস্কার ইংরেজী কণ্ঠ। উচ্চারণে আমেরিকান ধরন আহমদ মুসার দৃষ্টি এড়ালো না।

টর্চের আলো আবদুল্লাহ হাত্তার মুখে এসে স্থির হলো।

দীর্ঘাঙ্গ কালমূর্তিটি মুখটি ফিরিয়ে কাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'রবার্ট বি কুইক।'

সঙ্গে সঙ্গে রবার্ট নামক বিশাল বপু একজন লোক এসে ঘরে ঢুকল এবং আবদুল্লাহ হাত্তাকে পাঁজা কোলা করে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

আহমদ মুসা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করছিল, এবার হয়তো তার পালা আসবে। কিন্তু এলো না। আবদুল্লাহ হাত্তাকে বের করে নিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে টর্চের আলো নিভে গেল। দরজা বন্ধেরও শব্দ শুনল। দরজা বন্ধের শব্দে ছ্যাঁৎ করে উঠলো আহমদ মুসার হৃদয়। কিছু বলার জন্য মনটা তাঁর উস-খুস করে উঠল, কিন্তু সে সুযোগ পেল না।

আবার সেই নিঃসীম ঘুটঘুটে অন্ধকারে ডুবে গেল ঘরটি। চোখ বুঁজে পড়ে থাকল আহমদ মুসা। হাত্তার জন্য মনের কোথায় যেন এ তীক্ষ্ণ বেদনা চিন চিন করে উঠছে তার। কোথায় নিয়ে গেল তাকে? এই ট্রিপল সি'র মত নৃশংস, রক্তপিপাসু, বর্বর কোন সংগঠন ভূ-পৃষ্ঠের কোথাও রয়েছে কি না সন্দেহ। এরা সভ্য সমাজের শিক্ষিত নরপশু। কিন্তু কি করবে আহমেদ মুসা। টর্চের আলোয় যতটা বুঝা গেছে ঘরটির দেওয়ালগুলো ইস্পাতের তৈরী। নিশ্চয় জাহাজের খোলের ভিতরের কোন বন্দীশালা এটি।

হাত-পা'র বাঁধনের জায়গাগুলো বেদনায় টন টন করছে। বাঁধা হাত মুখের কাছে তুলে নিয়ে দাঁত দিয়ে বাঁধন পরীক্ষা করল সে। পল্লাষ্টিকের কর্ড দিয়ে বাঁধা।

হঠাৎ আহমদ মুসার মনে পড়ল তার জুতার গোড়ালির খোপে ল্যাসার বিম টর্চ রয়েছে। ওটা ব্যবহার করে সহজেই এ বাঁধন থেকে মুক্ত হতে পারে, ঘর থেকেও সে বেরিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে পারে। কিন্তু না, এত তাড়াতাড়ি এটা করা ঠিক হবে না। আগে এদের বুঝতে হবে, জাহাজ এখন কোথায় এবং কোথায় যাচ্ছে তা জানতে হবে। তাছাড়া আবদুল্লাহ হাত্তার কথা যদি সত্য হয়, তাহলে তাকে জানতে হবে 'ট্রিপল সি' কার ইচ্ছে বা কার অনুরোধে তাকে এভাবে বন্দী করছে? তাকে নিয়ে এখন কি পরিকল্পনা এদের?

এখন দিন না রাত? জাহাজের এ খোলে বিশেষ করে এ অন্ধ কুঠরিতে দিন-রাত্রি সবই সমান। অন্ধকার এ জগতে সময়েরও কোন হিসেব নেই। হাতের ঘড়ি ওরা খুলে নিয়েছে। হাত দিয়ে পরখ করে দেখল, ডান হাতের অনামিকার আংটিটি ঠিক আছে। খুশী হল আহমদ মুসার মন।

ক্ষুধা তৃষ্ণায় অবসন্ন আহমদ মুসার চোখে কেমন তন্দ্রার ভাব এসে গিয়েছিল। দরজার চাবি খোলার ধাতব শব্দে তার তন্দ্রার ভাব কেটে গেল। ভাবল

সে, আবদুল্লাহহ হাত্তাকে নিয়ে এলো বোধ হয়। আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি উঠে বসল। মনটি প্রসন্ন হয়ে উঠল তার।

দরজা খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক আলো এসে ভাসিয়ে দিল কক্ষটি। বাইরের করিডোরটি সোডিয়াম লাইটের উজ্জ্বল আলোতে হাসছে।

দরজায় দাঁড়িয়ে একজন দীর্ঘদেহী। হাত দু'টি প্যান্টের পকেটে ঢোকানো।

হ্যাল্লো, Cased Lion কেমন আছ। বাঁকা হাসি তার চোখে-মুখে।

উত্তরের অপেক্ষা না করে মুখটি ঈষৎ ফিরিয়ে বলল, এসো ডার্লিং এই যে।

তার কথা শেষ হতেই এক তরুনী এসে দরজার মুখে দাঁড়ালো। জ্বলন্ত আগুন যেন মেয়েটি। দেহের দুধে আলতা রংগে লাল জ্যাকেট আরও অপরূপ করে তুলেছে। বব কাট চুল। টানা নীল চোখ। কিছুটা বেঁটে মেয়েটি। অনেকটা মালয়ী বৈশিষ্ট্য দেহে।

লোকটি বলল, দেখ, আমার ডার্লিং-এর তোমাকে দেখার বড় ইচ্ছা।

-চিড়িয়াখানার জন্তু বানিয়েছ কি না। নিরুত্তাপ কন্ঠ আহমদ মুসার।

-No sir, you are more then that, মেয়েটির মুখে চটুল হাসি।

-Definitely, তুমি যা করেছ, চিড়িয়াখানার জন্তুর চেয়ে তা শতগুনে অদ্ভুত। তরল রসিকতার স্বরে বলল লোকটি।

-কিন্তু ক্যাপটেন, এঁকে এমন করে তোমরা জন্তু জানোয়ারের মত করে রেখেছ কেন। তোমাদের সাথে এর কোন শত্রুতা নেই। মেয়েটির স্বর নরম।

-বললাম তো, এ হলো Cased Lion. একটু সুযোগ, কিংবা খাঁচার একটু দুর্বলতা পেলে খাঁচা থেকে পালাবে। জানো তো, তাহলে আমাদের কত ক্ষতি। কম নয় ৫০ মিলিয়ন ডলার- ৫ কোটি ডলার।

-যাই বল, আমি হলে কিন্তু আমার কাছ থেকে সামান্য সহযোগিতাও পেতনা। দু'চোখে দেখতে পারি না ওদের আমি। জানো যুক্তরাষ্ট্রকে ওরা কেমন শোষণ করছে।

আহমদ মুসা যেন ব্যাপারটা আঁচ করতে পারল। টাকার বিনিময়ে ট্রিপল সি, কি তাহলে ইহুদীদের পক্ষে কাজ করছে। ইহুদীদের হাতে তাকে তুলে দেয়াই কি এদের আসল লক্ষ্য? পরখ করার জন্য আহমদ মুসা মেয়েটিকে সরাসরি প্রশ্ন করে বলল, আপনি কি ইহুদীদের কথা বলছেন?

দু'জনেই ওরা চমকে উঠে আহমদ মুসার দিকে তাকাল। পরে লোকটি বলল, 'বুঝে ফেলেছ তাহলে, তা তোমার বুঝবার কথাই বটে।' একটু থেমে লোকটি হেসে বলল, ভয় করছে না ইহুদীদের।

-কাউকেই আমি ভয় করি না। বলল আহমদ মুসা।

-তাহলে ঘৃণা করেন? মৃদু হেসে ত্বরিত কন্ঠে বলল মেয়েটি।

-কোন মানুষকেই আমি ঘৃণা করি না।

-ওদের সাথে তাহলে শত্রুতা কেন? লোকটি বলল।

-অন্যায়ের প্রতিবাদ করা, অত্যাচারীর প্রতিরোধ করা আমার ধর্ম।

মেয়েটি মুগ্ধ চোখে তাকিয়েছিলো আহমদ মুসার দিকে। বলল, তোমার ধর্মের কথা নাকি ওটা?

-নিশ্চয়, 'তা মুরুনা বিল মারুফে ওয়া তানহাওনা আনিল মুনকার' (ন্যায়ের জন্য নির্দেশ দাও, অন্যায়ের প্রতিরোধ কর) - এটা আমার নয়, আল কোরআন-এর কথা।

এ সময় একটি ট্রে হাতে একজন লোক এসে দরজায় দাঁড়াল।

তার পিছনেই সাব মেশিনগান হাতে একজন প্রহরী।

ওদের দেখেই পূর্বোক্ত লোকটি মেয়েটিকে লক্ষ্য করে বলল, এসো স্মার্থা এবার যাওয়া যাক। খাবে এখন।

ওরা চলে গেল। মেয়েটির প্রতি লোকটির শেষ সম্বোধন আহমদ মুসার দৃষ্টি এড়ালো না। তাহলে মেয়েটি লোকটির স্ত্রী নয়?

খেতে খেতে আহমদ মুসা ভাবছিল। অনেক কিছুই তার কাছে এখন পরিস্কার। কিন্তু জাহাজ এখন কোথায়? কোথায় যাচ্ছে এ জাহাজ? হঠাৎ তার মাথায় একটি বুদ্ধি খেলে গেল। খাওয়া শেষে যখন থালা-বাসন গুছিয়ে নিচ্ছিল বেয়ারা লোকটি, তখন আহমদ মুসা বলল, দ্বিতীয় খানা আবার কবে হবে বেয়ারা।

বেয়ারা আহমদ মুসার দিকে চাইল। প্রশ্নের ধরনে বোধ হয় সে কিছুটা কৌতুক বোধ করল। বলল সে, কর্তার যখান ইচ্ছা। একটু থেমে সে বলল, কাল দুপুর নাগাদ আমরা মিন্দানাওয়ে পৌছে যাব। কাল সকালে একবার খাবার দেবার হুকুম হতেও পারে।

চট করে আহমদ মুসা প্রশ্ন করল, এখন কয়টা বাজে বেয়ারা?

-সন্ধ্যা ৭টা।

ওরা চলে গেল। আবার বন্ধ হয়ে গেল কক্ষের দরজা। সেই নিঃসীম ঘুটঘুটে অন্ধকারে ডুবে গেল আহমদ মুসা।

পেটের জ্বালা কমল। মিন্দানাও পৌছার পূর্বে ইহুদীদের হাতে তাকে হস্তান্তর করা হচ্ছে না, এ সম্পর্কেও সে নিশ্চিত। কিন্তু আবদুল্লাহ হাত্তার জন্য মনটি তার অস্থির হয়ে উঠেছে। হাত্তা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন আহমদ মুসা ইচ্ছা করেই ওদেরকে জিজ্ঞাসা করেনি।

এ কক্ষ থেকে কিভাবে বের হওয়া যায়? দরজার ইন্টারলক ল্যাসার বিম দিয়ে গলিয়ে সহজেই বের হওয়া যায়, কিন্তু এটা তাদের চোখে পড়বে সহজেই। আহমদ মুসা ওদের মনে তার সম্বেন্ধে কোন সন্দেহের উদ্রেক করতে চায় না। তাহলে?

আহমদ মুসা চিন্তা করল, নিশ্চয়ই এই ঘরের সারিতে আরও ঘর আছে এবং সে ঘরগুলোতে নিশ্চয়ই কোন লোক বাস করে না। গোডাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয় ঘরগুলো। সুতরাং পাশের ঘর দিয়ে বের হওয়াই নিরাপদ।

চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই কাজ শুরু করে দিল আহমাদ মুসা।

কি জানি কেন ওরা যাবার সময় বেঁধে রেখে যায়নি তাকে। আহমদ মুসার শান্ত ব্যবহারে ওরা বোধ হয় ওকে কিছুটা নিরাপদ বোধ করেছে।

সুতরাং আহমদ মুসার সুবিধা হলো। জুতার গোড়ালির একাংশে চাপ দিতেই উপরের অংশ এক পাশে সরে গেল। গোড়ালির খোপ থেকে দু' ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা একটি ল্যাসার বিম টর্চ বের করে নিল সে।

অন্ধকারের মধ্যে হাতড়িয়ে উত্তর দিকের দেয়ালের দরজার কাছাকাছি একটি স্থান ঠিক করে নিয়ে সে বসে পড়ল। অন্ধকারের মধ্যেই সে ল্যাসার বিমের

মাথার ক্যাপটি খুলে নিল, তারপর পরীক্ষামূলকভাবে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে পিছনের দিকের ক্ষুদ্র একটি বোতাম টিপে ধরল।

সঙ্গে সঙ্গে টর্চের পিনহেড মাথা দিয়ে চোখ ঝলসানো এক আলোকশলাকা তীরের মত বেরিয়ে এলো। উজ্জ্বল এক আভায় অনেকখানি জায়গা আলোকিত হয়ে উঠল।

আহমদ মুসা ল্যাসার বিম টর্চ ইস্পাতের দেয়ালে চেপে ধরল। মোমের মত গলে পড়তে লাগল ইস্পাত। মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে ২ বর্গফুট পরিমিত স্থানের ইস্পাত সিট কেটে সরিয়ে নিল আহমদ মুসা।

সুড়ঙ্গ পথে হাত বাড়িয়ে দেখল দেয়ালের ওপারে কোন কিছু নেই। সে মাথা গলিয়ে ওপরের ঘরে ঢুকে গেল। ঘরে কি আছে আধারে কিছুই ঠাহর করতে পারলোনা সে। ল্যাসার বিম টর্চটি মুহূর্তের জন্য আবার জ্বালালো। ঘরের অনেকখানি জায়গা আলোকিত হয়ে উঠল। সেই আলোকে দেখল, ছোট ছোট কালো বাক্সে ঘরটি ভর্তি। কৌতুহল হল তার, এমন সব ক্ষুদ্র বাক্সে কি থাকতে পারে?

একটি বাক্স হাতে তুলে নিয়ে সে ল্যাসার বিম দিয়ে ঢাকনির চারটি স্ক্রু গলিয়ে ফেলল। তাপর বাম হাতে অতি সন্তর্পণে ঢাকনি খুলে নিল। ভিতরে গোলাকৃতি লোহার সিলিন্ডার। ঠিক ছোট ফুটবলের মত। সিলিন্ডারের গায়ে এক জায়গায় একটি সুইচ বসানো। লোহার এতবড় একটি সিলিন্ডার যতটুকু ভারি হতে পারে তার চেয়ে এটা অন্তত দশগুণ বেশী ভারী। বিস্মিত হলো আহমদ মুসা। হঠাৎ আহমদ মুসার মনে হলো ট্রিপল সি'র এটা কোন বিশেষ মারণাস্ত্র নয়তো? জাহাজটি কি ট্রিপল সি'র জন্য অস্ত্রের চালান নিয়ে যাচ্ছে?

এ নুতন চিন্তার উদ্রেক হবার সাথে অপর কক্ষগুলো অনুসন্ধান করে দেখার দুর্বার ইচ্ছা জাগল আহমদ মুসার মনে।

ল্যাসার বিম দিয়ে দেয়ালে সুড়ঙ্গ কেটে পরবর্তী রুমেও প্রবেশ করল আহমদ মুসা। বিভিন্ন মিলিটার কামানের গোলায় ভর্তি সে ঘর। আহমদ মুসা দেখে বিস্মিত হলো- ১৫০ মিলিটার কামানের গোলাও সেখানে রয়েছে।

অন্য ঘরগুলোও তাহলে অস্ত্রে ভর্তি, স্থির করল আহমদ মুসা।

অতঃপর সে তৃতীয় ঘরটির সামনের দেয়াল সুড়ঙ্গ কেটে করিডোরে বেরিয়ে এলো। করিডোরটি অন্ধকারে ডুবে আছে। সে একটু দাঁড়িয়ে দিক ঠিক করে নিল। তার ঘরের ওপাশের দিক থেকে লোকেরা তার ঘরে এসেছে এবং গেছে। সুতরাং ওদিক দিয়েই জাহাজের ডেকে উঠা যাবে বলে ভাবল সে।

আহমদ মুসা তার ঘর পাশে রেখে বিড়ালের মত সামনে এগিয়ে চলল। কয়েক গজ যাবার পর হঠাৎ সামনে থেকে ভারি বুটের শব্দ এলো তার কানে। কে যেন আসছে। প্রহরী নয়তো? এখনি টর্চ জ্বাললেই তো সে ধরা পড়ে যাবে। করিডোরের দু'পাশে সারিবদ্ধ ঘর। লুকোবার কোন জায়গা নেই। আহমদ মুসা দ্রুত হেঁটে লোকটির নিকটবর্তী হতে চাইল। কিন্তু তার আগেই জ্বলে উঠল টর্চ। লোকটি তখনও চার পাঁচ গজ দূরে।

টর্চ জ্বলে উঠার সঙ্গে সঙ্গে আহমদ মুসা করিডোরে ঝাপিয়ে পড়ে ফুটবলের মত গড়িয়ে দ্রুত ছুটল লোকটির দিকে। লোকটি এমনি ভূতুড়ে কিছু আশা করেনি। সে কিছু বুঝে উঠার পূর্বেই পায়ের গোড়ালীর উপর প্রচন্ড ধাক্কা খেল। লোকটি উপুড় হয়ে আহমদ মুসার গায়ের উপরই পড়ে গেল। পড়ে গিয়েই কিন্তু লোকটি জাপটে ধরল আহমদ মুসার মাথা। লোকটি তার হাত আহমদ মুসার গলায় নামিয়ে নিচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই আহমদ মুসার প্রচন্ড ঘুষি গিয়ে পড়ল লোকটির তলপেটে। পরমুহূর্তেই লোকটির হাত পা  শিথিল হয়ে গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে।

আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি লোকটিকে টেনে এনে সেই সুড়ঙ্গ পথে কামানের গোলাপূর্ণ ঘরের মধ্যে গুজে দিল। তারপর লোকটির টর্চ ও রিভলবার কুড়িয়ে নিয়ে সে সামনে এগুলো।

টর্চ থাকায় কাজের অনেক সুবিধা হলো। টর্চ জ্বেলে গোটা করিডোরটাকে সে একবার দেখে নিল। দু'পাশে সারিবদ্ধ ঘর। মাত্র দুটি ঘর ছাড়া সবগুলো একদম সিল করা। এ দু'টি ঘরের একটিতে সে ছিল অন্যটিতে কি আছে? ওটা সিল করা নয় কেন? ওটাও কি তাহলে বন্দীশালা? আবদুল্লাহ হাত্তাকে ওখানে রাখা হয়নি তো?

আহমদ মুসা ফিরে এসে রুমটির সামনে দাঁড়াল। জুতার গোড়ালি থেকে ল্যাসার বিম টর্চ বের করে ইন্টারলক গলিয়ে প্রবেশ করল সে। ভালো করে দরজা এটে দিয়ে টর্চ জ্বালাল আহমদ মুসা।

ঘরটি শূন্য। একটি মাত্র লম্বা কাঠের বাক্স পড়ে আছে। বাক্সের ঢাকনির স্ক্রু আটা নয়-পল্লাস্টিক কর্ড দিয়ে বাঁধা। বাঁধন ছিড়ে ঢাকনা খুলে ফেলল আহমদ মুসা। বাক্সের মধ্যে টর্চের আলো ফেলেই আৎকে উঠল সে।

বাক্সের মধ্যে আবদুল্লাহ হাত্তার লাশ। চোখ দু'টি তার বিস্ফারিত। গোটা দেহ কালচে হয়ে গেছে। আহমদ মুসা হাত দিয়ে দেখল, গোটা দেহটাই তার ভীষণ শক্ত।

ইলেকট্রিক শক্ দিয়ে ওকে হত্যা করা হয়েছে-স্বগত কন্ঠে বলল আহমদ মুসা।

বিমূঢ়ভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল আহমদ মুসা লাশের দিকে চেয়ে। তারপর স্বগত কণ্ঠে বলল, ''বিদায় বন্ধু। তুমি যে দায়িত্বের বোঝা রেখে গেলে, সানন্দে আমি তা কাঁধে তুলে নিলাম। কথা দিচ্ছি যে পা আজ সামনে বাড়ালাম, একমাত্র মৃত্যু ছাড়া তাকে আর কিছুই থামিয়ে দিতে পারবে না।''

আবদুল্লাহ হাত্তার মুখ থেকে চোখ নামিয়ে ঘুরে দাড়াল আহমদ মুসা। সামনে পা বাড়াল তারপর।

# ২

যেতে যেতে আহমদ মুসা ভাবল, জাহাজটি অস্ত্র বোঝাই হয়ে যাচ্ছে মিন্দানাও। অস্ত্রগুলো ব্যবহৃত হবে মিন্দানাও এর অসহায় মানুষের বিরুদ্ধে। সুতরাং জাহাজটিকে পৌছতে দেয়া যায় না মিন্দানাওয়ের মাটিতে।

মনে মনে হাসল সে । এখন সে 'রুথ থান্ডার'- নির্মম বজ্র।

কয়েক গজ সামনে এগিয়েই বামে ঘুরে সে ডেকে উঠার সিড়ি পেয়ে গেল।

মুহূর্তের জন্য টর্চ জ্বালাল সে । সিঁড়ির মুখের দরজা খোলাই আছে দেখা গেল। খুশী হলো আহমদ মুসা।

সিঁড়ির মুখের দরজা ঠেলতে গিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল সে। উপরের ডেকে কি প্রহরী নেই? হঠাৎ এই সময় সিঁড়ির মাঝে পায়ের শব্দ শোনা গেল। আহমদ মুসা দ্রুত সিঁড়ি ছেড়ে করিডোরের দেয়ালে গিয়ে দাড়াল।

সিঁড়ির দরজা খুলে গেল। সিঁড়ির মুখে মুখ বাড়িয়ে কে একজন চাপা গলায় ডাকলঃ ব্রাডলি, ব্রাডলি?

কিছুক্ষণ থামল। বোধ হয় উত্তরের অপেক্ষা করল। তারপর ডাকল, 'কোথায় রে ব্রাডলি। মজা দেখবি তো আয়।'

কোন সাড়া না পেয়ে 'শালা ঘুমিয়েছে নিশ্চয়' বলতে বলতে লোকটি সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল। আহমদ মুসা ভাবল, যে প্রহরীটিকে সে ঘুম পাড়িয়েছে তার নামই তাহলে ব্রাডলি। এ লোকটি সে ব্রাডলির খোঁজেই আসছে।

করিডোরের মুখে দেয়ালের ভাঁজে আহমদ মুসা প্রস্তুত হয়ে দাড়িয়ে রইল। গুলী ছুঁড়ে শব্দ করা চলবে না, এটা আহমদ মুসা আগেই ঠিক করে নিয়েছিল।

লোকটি সিড়ি পথের ভাঁজ ঘুরে যখন করিডোরের মুখে পড়ল অমনি আহমদ মুসা রিভলভারের বাঁট দিয়ে প্রচন্ড এক আঘাত হানল ডান কানের নীচের ঘাড় লক্ষ্য করে।

অস্ফুট এক শব্দ বেরুল লোকটির মুখ দেয়ে। টর্চটি সশব্দে খসে পড়ল নীচে। কিন্তু আহমদ মুসা লোকটির জ্ঞানহীন দেহটি ধরে রাখল।

এ লোকটিকেও আগের মত পূর্বোক্ত ঘরে ব্রাডলির পাশে গুঁজে দিয়ে আহমদ মুসা চলে এলো। সিঁড়ি ভেঙে খোলা দরজা পথে ডকে উঠল সে। চকিতে একবার চারদিকে সে দেখে নিল। না, কেউ কোথাও নেই।

তারকাখচিত উপরের আকাশ। চাঁদ নেই আকাশে। আদিগন্ত সাগরের বুকে যেন এক বিরাট কাল চাদর বিছানো। দু'পাশে পানি কেটে বিরাট শব্দ তুলে এগিয়ে চলেছে জাহাজটি।

মনে হল কতদিন থেকে মুক্ত বাতাসের দেখা পায়নি আহমদ মুসা। বুক ভরে সে নিঃশ্বাস নিল। কত প্রশান্তি এ মুক্ত বাতাসে।

মালপত্র বহনোপযোগী মাঝারি ধরনের জাহাজ এটি। উপরে বেশ কিছু ডেক কেবিনও রয়েছে। নীচের কেবিনগুলোর সবগুলোই বন্ধ-ভিতর থেকে বন্ধ। আলো দেখা যায় না কোন কেবিন থেকেই।

উপরের একটি কেবিনের কাঁচের গরাদ দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে।

রিভলভার বাগিয়ে ধীর পদক্ষেপ আহমদ মুসা সামনে এগুলো। নীচের কেবিনগুলো থেকে উপরে উঠার এ সংকীর্ণ সিড়ি দেখা গেল। সেই সিড়ি বেয়ে সে শিকারী বিড়ালের মত নিঃশব্দে উপর উঠে গেল।

কোথা থেকে যেন চাপা কথা ভেসে আসছে? উৎকর্ণ হল আহমদ মুসা। হাঁ, দক্ষিণ প্রান্তের কোন এক কেবিন থেকে কথা ভেসে আসছে?

শব্দ অনুসরণ করে আহমদ মুসা সামনে এগুলো। একটি কক্ষের সামনে এসে দাঁড়ালো সে। দরজা ভেজানো। কি হোলে চোখ লাগিয়ে সে স্মার্থা ও ক্যাপটেনকে দেখতে পেল। স্মার্থা নাইট গাউন পরা। মাথার চুল এলোমেলো। চোখে-মুখে ভয়ার্ত ভাব। হাতে তার রিভলবার। ক্যাপটেনের পরণে সেই আগের পোশাক।

স্মার্থা বলছিল, এ দুঃসাহসের জন্য তোমাকে শাস্তি পেতে হবে ক্যাপটেন। ক্যাপটেন বলল, তোমাকে পেলে আমি মরতেও রাজি আছি। জানো কতদিন থেকে আমি তোমার দিকে চেয়ে আছি। কাল তুমি নেমে যাচ্ছ মিন্দানাওয়ে। আর সুযোগ হয়তো হবে না কোনদিন।

-আমি সরদারকে সব কথা বলবো গিয়ে। জানো এর ফল কি দাঁড়াতে পারে?

-সরদারও সাধু নয় স্মার্থা।

একটু থামল ক্যাপটেন। পরে বললো, কোন ভয় দেখিয়েই তুমি আমাকে ফিরাতে পারবে না স্মার্থা। বলে সে দু'হাত বাড়িয়ে এগুতে লাগল স্মার্থার দিকে।

স্মার্থা দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে রিভলভারটি তুলে ধরে বলল, আর এক পা এগুলে গুলী করব ক্যাপটেন।

কিন্তু কথাটি স্মার্থার মুখ থেকে শেষ হবার আগেই ক্যাপটেন ঝাপিয়ে পড়ল তার উপর। স্মার্থার হাত থেকে রিভলভার ছিটকে পড়ে গেল। স্মার্থাও পড়ে গেছে মেঝের উপর কাত হয়ে।

ক্যাপটেন তার মুখে এক হাত দিয়ে চেপে ধরে তাকে তুলে নিয়ে বিছানার উপর গিয়ে পড়ল।

স্মার্থা বোধ হয় তার হাত কামড়ে ধরেছিল। ক্যাপটেন উঃ বলে তার হাত স্মার্থার মুখ থেকে সরিয়ে নিল। কিন্তু নিজেকে মুক্ত করতে পারলো না স্মার্থা। চীৎকার করে উঠল সে।

আহমদ মুসা দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করল। ক্যাঁচ করে এক শব্দ উঠলো দরজার স্প্রিং থেকে।

দরজার শব্দে পিছনে ফিরে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে ক্যাপটেন।

ক্যাপটেন মেঝেয় পড়ে থাকা স্মার্থার রিভলভারের দিকে এগুচ্ছিলো। রিভলভারের উপর ঝুঁকে পড়েছিল সে।

আহমদ মুসার গম্ভীর কন্ঠ ধ্বনিত হলো, রিভলভারে হাত দিওনা ক্যাপটেন, হাত গুঁড়ো হয়ে যাবে।

ক্যাপটেন রিভলভারে হাত দিল না। কিন্তু চোখের নিমিষে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সাথে দেহটিকে মেঝের উপর দিয়ে গড়িয়ে ছুড়ে দিল আহমদ মুসার দিকে। তার জোড়া দুটি পা ছুটে এলো আহমদ মুসার তলপেট লক্ষ্য করে।

আহমদ মুসা ছিটকে এক পাশে সরে দাঁড়িয়েছিল। ক্যাপটেনের লাথি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় তার তার দু'টি পা আছড়ে পড়ল মাটিতে। আর কোন সুযোগ সে পেল না। আহমদ মুসার পয়েন্টেড সু'র মারাত্মক এক লাথি গিয়ে পড়ল ক্যাপটেনের তলপেটে। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে এলিয়ে পড়ল সে।

ইতিমধ্যে স্মার্থা পোশাক পরে নিয়েছে। বিমূঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিল সে। আহমদ মুসা স্মার্থার দিকে চেয়ে বলল, কিছু দড়ি পেতে পারি ম্যাডাম?

স্মার্থা কিছু না বলে সামনের কাপবোর্ড থেকে পল্লাষ্টিকের তৈরী একগুচ্ছ দড়ি এনে দিল তাকে।

ক্যাপটেনকে ভালো করে বেঁধে রেখে আহমদ মুসা স্মার্থাকে বলল, ধন্যবাদ ম্যাডাম। আমি কি আরও কিছু সাহায্য পেতে পারি আপনার?

-কি সাহায্য চান?

-এক শিশি ক্লোরফরম পেলে উপকৃত হতাম।

-ক্লোরফরম কি উপকারে আসবে?

-এটা কি ভেঙ্গে বলার প্রয়োজন করে?

-একটু ভেবে স্মার্থা বলল, আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ, কিন্তু এ কাজে তো আমি আপনাকে সহযোগিতা করতে পারি না।

আহমদ মুসা একটু হেসে বলল, হিসেবে ভুল হয়েছিল ম্যাডাম। মুহূর্তের জন্য শত্রু ভাবতে আপনাকে ভুলে গিয়েছিলাম। থামল আহমদ মুসা।

একটু থেমে আবার সে বলল, ক্যাপটেনকে আমার নিয়ে যেতে হচ্ছে। আর আপনাকে এ ঘরে বন্ধ থাকতে হবে। আশা করি বেঁধে রাখার দরকার হবে না।

কথা শেষ করে আহমদ মুসা টেবিল থেকে স্মার্থার চাবির রিং নিয়ে ক্যাপটেনকে টেনে ঘরের বাইরে চলে গেল।

স্মার্থার ঘরে চাবি এঁটে সে মুহূর্তের জন্য ভাবল, ঘটনা যতদূর গড়িয়েছে, তাতে এখন তার সামনে দু'টি পথ- প্রথমতঃ জাহাজটিকে ধ্বংস করে ফেলা, দ্বিতীয়তঃ জাহাজটিকে দখল করা।

আহমদ মুসার কাছে আপাতত দ্বিতীয়টিই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হলো। প্রথমটি হবে সবশেষের সিদ্ধান্ত।

স্মার্থার ঘরটি দক্ষিণ প্রান্তের শেষ ঘর। স্মার্থার ঘরের সামনের করিডোরটি দক্ষিণ দিক দিয়ে ঘুরে পশ্চিম প্রান্তে গিয়ে শেষ হয়েছে। আহমদ মুসা ক্যাপটেনের সংজ্ঞাহীন দেহ দক্ষিণ দিকের করিডোরে রেখে প্রথমে ওয়্যারলেস রুমে যাবে ঠিক করল।

ক্যাপটেনের দেহ দক্ষিণ দিকের করিডোরে রেখে যখন সে পূর্বের করিডোরটির মুখে পা দিয়েছে, অমনি সে দেখতে পেল, দু'জন লোক উদ্যত রিভলভার হাতে ছুটে আসছে এদিকে। আর কখন যেন করিডোরের লাইটটিও জ্বলে উঠেছে।

লোক দু'টি এসে স্মার্থার দ্বারে করাঘাত করতে শুরু করল আর বলতে লাগল, কি হয়েছে স্মার্থা দরজা খোল, দরজা খোল। আহমদ মুসা চমকে উঠল। কোন সংকেতে কি ওরা ছুটে এসেছে? স্মার্থা কি কোন গোপন চ্যানেলে বিপদ সংকেত পাঠিয়েছে?

দাঁতে দাঁত চাপল আহমদ মুসা। প্রতিটি মুহূর্ত তার জন্য এখন মূল্যবান। তার কাছে এখন স্মার্থার রিভলভারসহ তিনটি রিভলভার রয়েছে।

ছয়ঘরা আমেরিকান রিভলভারটি সে হাতে তুলে নিল। ওরা তখনও দরজায় নক করছিল। আহমদ মুসা ধীরে সুস্থে পরপর দু'টি গুলী ছুড়ল। দরজার উপরেই দু'টি দেহ লুটিয়ে পড়ল। সামনে ছুটতে গিয়ে হঠাৎ আহমদ মুসার মনে পড়ল সাইমুমের সেই তত্ত্বকথা- শত্রুকে পিছনে রেখে সামনে এগিয়ো না।

আহমদ মুসা ফিরে এসে ক্যাপটেনের সংজ্ঞাহীন দেহ ছুঁড়ে দিল পার্শ্বের বিক্ষুব্ধ সাগরের বুকে।

তারপর নিঃশব্দ গতিতে দ্রুত সে এগিয়ে চলল সিঁড়ির দিকে। আহমদ মুসার ধারণা প্রহরীরা ডেক কেবিনগুলোতেই থাকে। সুতরাং ওদের ওপরে উঠার

পথ আটকাতে হবে। সে নীচের সিঁড়ির মুখে গিয়ে পৌছল। নীচের সারিবদ্ধ ডেক কেবিনের করিডোরে এখন আলো জ্বলছে। মাঝখানের একটি কেবিনের দরজা খোলা। একজন মোটামত লোক বেরিয়ে এল দরজা দিয়ে। কাঁধে অফিসারের ইনসিগনিয়া। হাতে সাবমেশিন গান। সে দরজায় দাড়িয়ে ভিতরের কাউকে যেন লক্ষ্য করে বলল, ''স্টিফেন্স, জিমদের ফিরতে দেরি হচ্ছে কেন, গুলীর শব্দই বা কোথেকে এলো, আমি দেখে আসি। ক্যাপটেনের নির্দেশ না পেলে এলার্ম বাজিও না।'' বলে উপরে সিঁড়ির মুখের দিকে অগ্রসর হলো সে।

আহমদ মুসা উপরে উঠার সিড়ির বাঁকে দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে রইল। হাতে উদ্যত রিভলভার। লোকটি যেই সিড়ির বাঁকে এসে মোড় নিয়েছে, অমনি আহমদ মুসা রিভলভারের বাঁট দিয়ে প্রচন্ড আঘাত হানল লোকটির মাথায়। নিঃশব্দে তার দেহ গড়িয়ে পড়ল সিঁড়িতে।

তারপর সে দ্রুত নেমে এলো সিঁড়ি দিয়ে নীচে। বিড়ালের মত গুটিগুটি গিয়ে সে দাঁড়াল দরজা খোলা সেই রুমটির পাশে। দু'জনের আলাপ শুনা গেল। এই গভীর রাত্রিতে এই ধরনের জ্বালাতনে দু'জনেই বিরক্ত।

একজন বলছিল, মেয়েদেরকে কেন যে এসব কাজে সরদার টেনে আনে, আমি সেটাই বুঝি না। ওই স্মার্থা মেয়েটার প্রতি ক্যাপটেন সাহেব ও স্টুয়ার্ড বেটা দু'জনেরই চোখ পড়েছে। যতসব ঝামেলা।

অপরজন বলল, শুধু কি ক্যাপটেন আর স্টুয়ার্ড বেটা, তুমি কি চোখ বন্ধ করে আছ জন?

-চোখ খোলা থাকলেই কি লাভ বল? কত এলো, কত গেল, সে সব তো শুধু দেখেই গেলাম। ব্যাটারা মজা লুটবে কিন্তু ঠ্যালা সামলাবার বেলায় আমরা।

-কত ঠ্যালা জীবনে সামলিয়েছি জন সাহেব?

-দক্ষিণ মিন্দানাওয়ের 'লানাডেলে, রেডিয়েশন বম্ব কে পেতে রেখে এসেছিল শুনি? এই যে বম্ব আবার যাচ্ছে, এগুলো কারা পাততে যাবে বলতো, ওরা না আমরা?

-বিনিময়ে কি কিছুই মিলে না?

-কিছু ডলার ছাড়া আর কি? এই যে স্মার্থাদের নেয়া হচ্ছে ওদেরকে শত্রুদের ভোগে লাগানো হবে। হায়রে বন্ধু না হয়ে যদি শত্রু হয়ে জন্মাতাম।

এদের খোশালাপ হয়তো আরও চলতো। কিন্তু আহমদ মুসার সময় ছিল না এসব শোনার। সে ষ্টেনগান বাগিয়ে আচমকা ঘরে ঢুকে পড়ল।

ঘরে বেশ কয়েকটি চেয়ার পাতা। আর সেক্রেটারিয়েট টেবিলের পিছনেই একটি লম্বা কী বোর্ড। প্রতিটি পয়েন্টে দু'টি করে চাবি টাঙ্গানো। ওগুলো ডেক কেবিনসমূহের ইন্টারলক ও আউটার লকের চাবি।

আহমদ মুসা ওদের দিকে ষ্টেনগান উচিয়ে বলর, তোমরা হাত তুলে পিছন ফিরে দাঁড়াও। তারা হাত তুলে দাঁড়াল বটে, পিছন ফিরল না।

ষ্টিফেন্স নামক লোকটির পিছনে ছিল সুইচ বোর্ড। সে হাত তুলে ধীরে ধীরে পিছন হটে সুইচ বোর্ডের দিকে যাচ্ছিল। আহমদ মুসা বলল, সুইচ বোর্ডের দিকে গিয়ে লাভ হবে না বন্ধু, এলাম সুইচে হাত দেবার পূর্বেই তোমার লাশ খসে পড়বে মাটিতে।

ষ্টিফেন্স থমকে দাড়ালো, কিন্তু পরক্ষণেই সে দরজার দিকে চেয়ে সোল্লাসে বলে উঠল, ওস্তাদ।

আহমদ মুসার মুখে ঈষৎ হাসি ফুটে উঠল। বলল সে, আবার চালাকি? তুমি দু'বার ক্ষমা পাবে না বন্ধু। বলে সে চেপে ধরল ট্রিগার। ষ্টিফেন্স অষ্ফুট আর্তনাদ করে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল।

আহমদ মুসার মনোযোগ এই সময় স্বাভাবিভাবে ষ্টিফেন্সর দিকে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছিল। জন এই সুযোগ হাতছাড়া করলো না। ঝাঁপিয়ে পড়ল সে আহমদ মুসার উপর।

শেষ মুহূর্তে আহমদ মুসা তার দেহকে একদিকে বাঁকিয়ে নিয়েছিল। সুতরাং জনের আঘাত কিছুটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। তবু বাম পাঁজরে জনের ডান হাতের একটি মারাত্মক 'ব্লু' খেল আহমদ মুসা। আহমদ মুসা একপাশে সরে যাওয়ায় ভারসাম্য হারিয়ে জন পড়ে গিয়েছিল। আহমদ মুসাও পড়ে গিয়েছিল তার সাথে। তার হাতের ষ্টেনগানটাও ছিটকে গিয়েছিল হাত থেকে।

ডান হাতে পাঁজরটি চেপে ধরে দম বন্ধ করে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। মাথাটি তার ঝিম ঝিম করছিল।

জন পড়ে যাওয়ায় উবু অবস্থা থেকে উল্টে গিয়ে আহমদ মুসার ষ্টেনগানটি কুড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছিল। মোক্ষম সুযোগ। আহমদ মুসার ডান পা বিদ্যুতগতিতে ছুটে গেল জনের তলপেট লক্ষ্যে। মুখ দিয়ে ক্যাঁৎ করে শব্দ করে আবার লুটিয়ে পড়ল সে মেঝেতে।

আহমদ মুসা এবার তাড়াতাড়ি 'কী বোর্ড' থেকে চাবিগুলো নিয়ে নিল। প্রত্যেক চাবিতে নম্বর রয়েছে। মোট বিশটি চাবি। ডেক কেবিনগুলোতে এদের আরো অনেক প্রহরী ও লোকজন রয়েছে, ওদের বাইরে বেরুবার পথ বন্ধ করতে হবে-চাবি নিয়ে বেরুতে এটা স্থির করে নিল আহমদ মুসা। পিছনের দিকটা নিরাপদ না করে সে ওয়্যারলেস রুমে যাবে না।

ডেক কেবিনের আউটার লকের নম্বরের সাথে চাবির নম্বর মিলিয়ে আহমদ মুসা নীচের সবগুলো ডেক কেবিন বন্ধ করে দিল।

সর্বশেষে ষ্টুয়ার্ড রুমে চাবি এঁটে বাইরে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল সে। না, কোন দিক থেকে কোন শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। সে নিশ্চিত হলো নীচে আর কোন প্রহরী নেই কিংবা কোন লোকও নেই। থাকলে গুলীর শব্দে নিশ্চয় ছুটে আসতো।

রিভলবার বাগিয়ে ধরে নিঃশব্দ পায়ে সিঁড়ি বেয়ে সে উপরে উঠতে লাগল।

ওয়্যারলেস রুমে যাবার আগে ক্যাপটেনের কক্ষ সে একবার দেখে নেবে, মনে মনে ঠিক করল আহমদ মুসা।

উপরে কেউ নেই। ক্যাপটেন কক্ষের দুই পাশে আর দু'টি কক্ষ খোলা ক্যাপটেনের কক্ষ বন্ধ। ক্যাপটেন স্মার্থার ওখানে যাবার সময় বন্ধ করে গিয়েছিল তাহলে।

আহমদ মুসা জুতার গোড়ালি থেকে ল্যাসার বিম টর্চ বের করে নিল আবার। দু'মিনিটের মধ্যে খুলে গেল দরজা।

কক্ষে একটি স্টিলের আলমারী। একটি সেক্রেটারীয়েট টেবিল, একটি গদি আটা চেয়ার ও একটি সিঙ্গল খাট।

টান দিতেই ড্রয়ার খুলে গেল। ড্রয়ারে একটি চাবির রিং ও একটি দূরবীন পেল আহমদ মুসা। চাবিটি আলমারির, চিন্তা করল সে। দূরবীনটি তুলে নিতে গিয়ে ড্রয়ারের শেষ প্রান্তে একটি ডাইরি পেল সে। ডাইরীটিও তুলে নিল।

ডাইরীর মধ্যে ক্যাপটেনের বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য ও দৈনন্দিন হিসাব নিকাশ রয়েছে।

ডাইরীর পাতা উল্টাতে গিয়ে একটি চিঠি বেরিয়ে পড়ল। খামের মুখে সিল আটা। উপরের ঠিকানা চেয়ারম্যান , 'ক্লু'-ক্লাক্স-ক্লান', মিন্দানাও বেজ (দিভাও)।

আহমদ মুসা চিঠি পকেটে পুরতে পুরতে বলল, জাহাজ তাহলে ওদের মিন্দানাওয়ের দিভাও বেজে যাচ্ছে।

দূরবীনটিও পকেটে পুরলো সে। তারপর তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে ওয়্যারলেস রুমের দিকে চললো। ওপরে কোন প্রহরী চোখে পড়ল না মুসার।

জাহাজের ওয়্যারলেস কনট্রোল রুম। কক্ষটি ভিতর থেকে বন্ধ।

আহমদ মুসা দরজায় নক করল। নক করার সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে কে একজন মুখ বাড়াল। আহমদ মুসা প্রস্তুত হয়েছিল। মুখ বাড়িয়ে লোকটি কিছু বলার জন্য মুখ খুলেছে, কিন্তু কথা বেরুবার পূর্বেই আহমদ মুসার রিভলভারের বাট গিয়ে আঘাত করল তার মাথায়। দরজার উপরই সে কাত হয়ে পড়ে গেল।

এক মুহূর্ত নষ্ট করল না আহমদ মুসা। দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল।

ভিতরে হোয়েলম্যান ছাড়াও একজন ওয়্যারলেস অপারেটর এবং চীফ নেভিগেটর ছিল। যে লোকটি মুখ বাড়িয়েছিল, সে ওয়্যারলেস অপারেটর। অপারেটরকে আর্তনাদ করে পড়ে যেতে দেখে চীফ নেভিগেটর উঠে দাঁড়িয়েছিল। আহমদ মুসাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই সে দ্রুত সামনের ড্রয়ারের দিক ঝুঁকে পড়ল। আধখোলা ড্রয়ারের মধ্যে একটি কালো রিভলবার চকচক করছিল।

কিন্তু ড্রয়ার থেকে রিভলবারটি নিয়ে সে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতে পারল না, আহমদ মুসার রিভলভার নিখুঁতভাবে লক্ষ্য ভেদ করল। একটি বুলেট

লোকটির কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। লোকটির দেহ ডেস্ক থেকে মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল।

আহমদ মুসা কক্ষে প্রবেশ করার পর দরজা বন্ধ করে দিল। ষ্টিয়ারিং হোয়েলের লোকটি পাথরের মত বসে ছিল। মুখ তার ছাইয়ের মত সাদা।

আহমদ মুসা তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, শুনুন, গোটা জাহাজ আমাদের দখলে নির্দেশ মত জাহাজ না চালালে এই নেভীগেটরের মতই হবে তোমার অবস্থা।

নেভীগেটরের ডেস্ক থেকে মানচিত্র তুলে নিয়ে জাহাজের গতিপথ দেখে নিয়ে বলল, ড্রাইভার, এখন জাহাজ কোথায়?

লোকটি একবার আহমদ মুসার দিকে চেয়ে দেখল। তারপর বলল, জাহাজ এখন সেলিবিস সাগরে। জাম্বুয়াংগো প্রণালী থেকে ১০০ মাইল দক্ষিণে রয়েছে।

আহমদ মুসা কম্পাসের দিকে চেয়ে দেখল। জাহাজ উত্তর মুখে এগিয়ে চলেছে। আহমদ মুসা ড্রাইভারকে বলল, জাহাজের মুখ একটু পশ্চিম কোণে ঘুরিয়ে নাও। ব্যাছিলান প্রণালী পার হবার পর জাম্বুয়াংগ ডাইনে রেখে উত্তর দিকে যেতে হবে।

সংগে সংগে জাহাজের মুখ একটু ঘুরে গেল। ঘণ্টা তিনেক চলার পর জাহাজ সোজা উত্তর দিকে এগিয়ে চলল।

আবদুল্লা হাত্তার শেষ কথাটি মনে আছে আহমদ মুসা। তাকে আপো পর্বতে যেতে হবে। মনে হয় আপো পর্বতই পিসিডার হেড কোয়ার্টার।

মানচিত্র দেখে হিসেব করল, আপো পর্বতের উপকূল এখন তিন শ’ মাইল দূরে। আগামীকাল সকালেই জাহাজ পৌছে যাবে।

অসংখ্য চিন্তার জট আহমদ মুসার মাথায়। জাহাজে প্রতিরোধ করার মত আর কেউ নেই-এ সম্পর্কে সে নিশ্চিন্ত। কিন্তু চিন্তা সামনের ভবিষ্যত নিয়ে। পিসিডার কাউকেই সে চিনে না। জাহাজ উপকূলে নেয়ার পর সে কি করবে? পিসিডার লোকদের কি সেখানে পাওয়া যাবে? তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সে কি পারবে? তাকে বিশ্বাস করবে কি তারা?

আহমদ মুসার সম্বল তার কোড নাম- ‘রুড থানডার-রুথ’। আবদুল্লাহ হাত্তার উত্তরাধিকারীর এ অতি গোপনীয় কোডনাম একমাত্র তার মনোনীত ব্যক্তির পক্ষেই জানা সম্ভব-একথা নিশ্চিয় পিসিডার কর্মিরা সবাই জানে। তাছাড়া পিসিডার সহকারী প্রধানের প্রকৃত নাম ও ‘কোড’ নাম সে জানে। এটাও তাতে সাহায্য করবে।

আহমদ মুসার আর একটি সুবিধা হল ভাষার আনুকূল্য। মিন্দানাওয়ের প্রধান ভাষা ‘তাগালগ’ ও ‘আরবী’। তাগালগ ভাষা সে জানে না বটে, কিন্তু আরবী তার প্রায় মাতৃভাষার মত। সুতরাং মিন্দানাওয়ের মানুষের সাথে তার আরবীতে কথা বলতে কোন অসুবিধা হবে না।

আহমদ মুসার মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠল।

# ৩

আপো পর্বত শৃঙ্গের নীচে আপোয়ান উপত্যকা। উপত্যকা ও পর্বতের গাত্রদেশ ঘনবনে আচ্ছাদিত। যেন সবুজ চাদরে ঢেকে রাখা হয়েছে সবদিকটাই। উপর থেকে দেখলে তাই মনে হয়। কিন্তু সে সবুজ চাদরের নীচে উপত্যকা ও পর্বতের গাত্রদেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পাহাড়ের গা বেয়ে ঘুরে ঘুরে নেমে এসেছে রাস্তা নীচের উপত্যকায়। পথ যেখান থেকে শুরু হয়েছে, সেখানে এক পর্বত গহবরে এক পাথুরে বাড়ী। এটাই পিসিডার সদর দফতর। নীচের উপত্যকা ভূমিতে পর্বতের দেয়াল ঘেঁষে আরও অনেক সবুজ রঙের পাথুরে বাড়ী। তিনদিকে পর্বত ঘেরা চার হাজার ফুট উঁচুতে এই আপোয়ান উপত্যকাই পিসিডার প্রধান ঘাটি-রাজধানী।

সদর দফতরের অভ্যন্তরে একটি প্রকোষ্ঠ। বৈদ্যুতিক আলোয় উজ্জ্বল। ঘরের কোণে খাটিয়ায় বিছানা পাতা। এর বিপরীত দিকের কোণে একটি টেবিল। তার পাশে ঈজি চেয়ার।

ঈজি চেয়ারে এক যুবক গা এলিয়ে পড়ে আছে। চক্ষু মুদ্রিত। কপালে চিন্তার বলি রেখা। গৌর বর্ণ মুখমন্ডলে বিষাদের কালো ছায়া। তার সামনে টেবিলে এক গ্লাস দুধ। ঠান্ডা হয়ে গেছে।

যুবকটি মুর হামসার। পিসিডার সহকারী অধিনায়ক। মুর হামসারের আর একটি পরিচয় আছে সে মিন্দানাওয়ের 'মাগনদানা' রাজ বংশের রাজপুত্র। তার পূর্ব পুরষ সুলতান আবুবকর ওরফে পাদুকা মহাশারী মওলানা আস-সুলতান শরিফ আল-হাশমি বিখ্যাত সুলু সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি আনুমানিক ১৪৫০ খৃঃ সুলু দ্বীপে আগমন করেছিলেন। মিন্দানাও ও সুলু দ্বীপপুঞ্জের গ্রাম-গ্রামান্তরে ইসলামের আলো ছড়িয়েছেন তিনি। স্পেন ও পরে মার্কিনীদের বিরামহীন বিরোধীতা ও হামলা সত্ত্বেও বর্তমান শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত সুলু ও মিন্দানাও দ্বীপপুঞ্জে এই রাজবংশের হাতে মুসলমানদের স্বাধীন রাজত্বব

প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজকুমার মুর হামসার মিন্দানাও বাসীদের রক্ষার জন্য তাদের প্রতিরোধ সংগ্রামে সকলের সাথে আজ নেমে এসেছে পথে।

ধীরে ধীরে কক্ষটির দরজা খুলে গেল। উঁকি দিল একটি মুখ। যুঁই-এর মত অপরূপ শুভ্র ও পবিত্র সে মুখ। তারুণ্যের চাঞ্চল্য দু'টি চোখে।

দরজা ঠেলে সে ভিতরে ঢুকল। পাতলা একহারা গড়ন দেহের। বয়স বিশের বেশী হবে না। যৌবনের জোয়ার এসেছে দেহে। নীল গাত্রাবাস বাড়িয়ে দিয়েছে দেহের সুষমা।

ঘরে ঢুকে গল্লাসের দুধের দিকে নজর পড়তেই মেয়েটি বলল, দুধতো একটুকুও খাননি ভাইয়া?

মুর হামসার মাথা তুলল না। যেমনি ছিল তেমনি পড়ে রইল। মেয়েটি মুর হামসারের মাথার কাছে গিয়ে ধীর স্বরে বলল, বৃথাই চিন্তা করছেন ভাইয়া, দেখবেন দু' একদিনের মধ্যেই জনাব হাত্তা এসে পড়বেন।

ধীরে ধীরে চোখ খুলল মুর হামসার। বলল, বিধির বিধান বোধ হয় অন্য রকম শিরী।

-কেন?

-ইয়াসির সিঙ্গাপুর থেকে কিছুক্ষণ হলো ফিরে এসেছে।

-কি খবর এনেছে ভাইয়া?

-পিসিডার জন্য মারাত্মক দুঃসংবাদ বোন।

-কি?

-আবদুল্লাহ হাত্তাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে।

-ভাইয়া! আর্তনাদ করে উঠল শিরীর কন্ঠ। কিছুটা থেমে সে বলল, কেমন করে এটা সম্ভব হলো? কোথা থেকে?

-জেদ্দা থেকে বিমান ছাড়ার পর জেদ্দা ও করাচির মাঝ পথ থেকে বিমান কিডন্যাপ করে নিয়ে গিয়েছিল ভারত মহাসাগরের এক জনশূন্য দ্বীপে। সেখানে নামিয়ে নেয়া হয়েছে আবদুল্লা হাত্তাকে। হাত্তার পরে নাকি আরও একজন লোককেও নামিয়ে নেয়া হয়েছে। তারপর বিমান ফিরে এসেছে। মুর হামসার থামল।

কিছুক্ষণ দু'জনেই কথা বলতে পারল না। পরে শিরী জিজ্ঞেস করল, কিন্তু দ্বীপে গিয়ে কেউ কোন খোঁজ নিল না ভাইয়া?

-বিমান ফিরে আসার পর সেখানে উদ্ধারকারী এক স্কোয়াড্রন বিমান গিয়েছিল করাচী থেকে। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে তৈরী করা বিমান বন্দর এবং এক পরিত্যক্ত বাড়ী ছাড়া সেখানে আর কিছুই পায়নি।

আবার দু'জনেই নীরব। বিষাদের ছায়া দু'জনের চোখে মুখে। নীরবতা ভাঙ্গল শিরীই। বলল সে, এটা কাদের কাজ বলে অনুমান করছেন ভাইয়া?

সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের প্রতিভূ ক্লু-ক্লাক্স-ক্লানেরই কাজ এটা।

মুর হামসারের কথা শেষ হতেই টেবিলের পাশে বোর্ডে লাল সংকেত জ্বলে উঠল। মুর হামসার সোজা হয়ে বসল। বলল, শিরী তুমি আড়ালে যাও। আবার কোন বিপদ বার্তা এলো নাকি দেখি। ভারী শোনাল মুর হামসারের কথা।

-এমনভাবে ভেঙ্গে পড়লে তো চলবে না ভাইয়া? আমাদের ভরসা তো কোন মানুষ নয়! আমরা বিপদে ভয় পাব কেন?

মুর হামসার ছোট বোনটির মুখের দিকে একবার তাকিয়ে বলল, সত্যি বলেছিস বোন। একটু থেমে বলল আবার, মিন্দানাওয়ের হতভাগ্য মুসলমান সবাই যে দিন তোর মত করে ভাবতে শিখবে সেদিনই আমাদের জীবন থেকে অমানিশার অবসান ঘটবে।

শিরী ঘরের পিছন দিকের একট পর্দা ঠেলে আড়ালে চলে গেল। মুর হামসার চাপ দিল একটি সুইচে।

মুহূর্ত কয়েক পরেই খোলা দরজা দিয়ে প্রবেশ করল পিসিডার কর্মী শায়রা আলী। সে এসে ছালাম জানিয়ে মুর হামসারের সামনে দাঁড়াল। হাপাচ্ছে সে। চোখে মুখে তার উত্তেজনা।

-কি খবর শায়রা? উদগ্রীব কন্ঠ মুর হামসারের।

-আমাদের উপকূলে একটি জাহাজ ভিড়ছে।

-জাহাজ? আমাদের উপকূল রক্ষীরা................

মুর হামসারকে কথা শেষ করতে না দিয়েই শায়রা বলল, জাহাজ আমাদের উপকূলের দিকে এগিয়ে আসতেই আমাদের রক্ষীরা জাহাজ লক্ষ্য করে

গুলী ছুড়তে শুরু করে। একজন লোক জাহাজের ডেকে নেমে আসে। সে কিছু বলার জন্য এগিয়ে এসেছিল। একটি গুলি লেগে সে পড়ে যায়। আমরা দূরবীন দিয়ে তাকে বাম হাত চেপে ধরে ক্যাপটেন ব্রীজের দিকে উঠে যেতে দেখি। পরে জাহাজের মাইক থেকে তিনি বলেন, 'মিন্দানাওয়ের মুসলিম ভাইয়েরা, আমি 'রুড থান্ডার'। আমি 'ব্রাইট ফ্লাস' মুর হামসারের সাথে কথা বলতে চাই। তিনি আসার আগে কাউকে জাহাজে না উঠার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

মুর হামসার উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। সে দ্রুত কন্ঠে বলল, 'কি বললে শায়রা, তাঁর নাম কি বলেছিল?'

-রুড থান্ডার।

-আর আমার?

-ব্রাইট ফ্লাস।

দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল মুর হামসার। তার আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। মুর হামসার ভেঙে পড়ল কান্নায়।

শায়রার কাছে এ দৃশ্য অভাবিত। বিস্ময় বিমূঢ় কণ্ঠে সে বলল, জনাব আপনি..........

শায়রা কথা শেষ করতে পারলো না। মুর হামসার তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে বসল। রুমাল দিয়ে অশ্রু মুছে বলল, আবদুল্লাহ হাত্তা আর এই দুনিয়ায় নেই শায়রা! যাও তুমি। সবাইকে বল গিয়ে, তাঁর যেন কোন ক্ষতি না হয়। জাহাজের কোন ক্ষতি করো না তোমরা। আমি আসছি।

শায়রা চলে গেল। আড়াল থেকে বেরিয়ে এল শিরী। বলল সে, কি বললেন ভাইজান, জনাব হাত্তা নেই?

-নেই বোন।

-'কাল বাজ' চলে গেছে আমাদের ছেড়ে। এবার 'রুড থান্ডার' আমাদের নেতা।

-অর্থাৎ? বিস্ময় বিষ্ফরিত শিরীর দু'টি চোখ।

মুর হামসার শিরীকে বুঝিয়ে বলল, পিসিডার গোপন গঠনতান্ত্রিক কোড অনুসারে ‘কালো বাজ’ আবদুল্লাহ হাত্তার পরে যিনি নেতা হবেন। তাঁর কোড নাম হবে ‘রুড থান্ডার’।

-কিন্তু একজন অজানা অচেনা লোক এ দাবী তুলতে পারেন কেমন করে?

-সেটাই রহস্য। তাঁর কাছে গেলেই এটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমার যতদূর বিশ্বাস আবদুল্লাহ হাত্তার সাথে তাঁর দেখা হয়েছে।

আপো পর্বত। পিসিডার দরবার কক্ষ। পিসিডার পাঁচ শত নেতৃস্থানীয় কর্মী এবং কেন্দ্রীয় কমিটির ১১ জন সদস্য দরবারে উপস্থিত। মঞ্চের বাম পাশ দিয়ে নাইলনের পর্দা উড়ছে। ওপারে বসেছে মহিলা কর্মীরা।

সহকারী প্রধানের সামনে বসেছেন মুর হামসার। দলের প্রধান আবদুল্লাহ হাত্তার আসন খালি পড়ে অছে। মঞ্চের সামনে কফিনে আবদুল্লাহ হাত্তার মরদেহ। তার পাশেই একটি চেয়ারে বসেছেন আহমদ মুসা। বলে যাচ্ছেন তিনি কাহিনী। গুলীবিদ্ধ তার বাম হাতটি ব্যান্ডেজ করা। নিচ্ছিদ্র নীরবতা দরবার কক্ষে।

বিমান কিডন্যাপ থেকে শুরু করে জাহাজের সমগ্র কাহিনী শেষ করে চুপ করলো আহমদ মুসা। কাঁদছে সকলেই। গন্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে তাদের চোখের পানি। কিন্তু জাহাজ দখলের কাহিনী শুনতে শুনতে তাদের সে চোখ শুকিয়ে গেছে। সম্মোহিতের মত তারা শুনছে এক অপরূপ কাহিনী। আহমদ মুসা কথা শেষ করলেও তাই কেউ কথা বলতে পারলো না।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল মুর হামসার। আহমদ মুসার পাশে এসে দাড়ালো সে। আহমদ মুসাও উঠে দাঁড়াল। আহমদ মুসার একটি হাত তুলে নিয়ে সে কর্মীদের উদ্দেশ্য করে বলল, মিন্দানাও সোলো দ্বীপপুঞ্জের দুঃখী ভাইয়েরা, আমরা এঁকে চিনি না, জানি না। আর আমরা এর প্রয়োজনও বোধ করি না। আমরা জানি, আমাদের নেতা আমাদের মাথার মনি। মিন্দানাওয়ের অমর সন্তান

আবদুল্লাহ হাত্তা যাঁর হাতে মহা দায়িত্বের মহা ভার দিয়ে গেছেন আমরা তার আনুগত্য করব, আমারা তাঁকে প্রতি পদক্ষেপে অনুসরণ করব।

সমগ্র দরবার সমস্বরে বলে উঠল, আহমদ মুসা জিন্দাবাদ, প্যাসেফিক ক্রিসেন্ট ডিফেন্স (পিসিডা) আর্মি জিন্দাবাদ। স্বাধীন মিন্দানাও-সোলো সালতানাৎ জিন্দাবাদ।

মুর হামসার আহমদ মুসার জামার কলারের ব্যাক ব্যান্ডে পিসিডার প্রতিক ‘কালো ব্যাজ’ পরিয়ে দিল। হাত ধরে নিয়ে বসাল আবদুল্লাহ হাত্তার শূন্য আসনে।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। কর্মীদের উদ্দেশ্য করে বলল সে, মিন্দানা ও সোলো দ্বীপপুঞ্জের ভাই-বোনেরা, মরহুম আবদুল্লাহ হাত্তার লাশ সামনে নিয়ে আমি জাহাজেই শপথ নিয়েছি ক্লু-ক্লাক্স-ক্ল্যান এবং তার সাম্রাজ্যবাদী মুরুব্বিবদের হাত থেকে মিন্দানাও ও সোলো দ্বীপপুঞ্জকে রক্ষার জন্য আমি আমার জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দান করব। আমি আবার সেই শপথেরই পুনারাবৃত্তি করছি।

থামল আহমদ মুসা।

আবার শুরু করল সে, আমার পরিচয় সম্পর্কে কি বলব? আমি জাতির একজন দীন খাদেম। সমগ্র বিশ্বই আমার বাসগৃহ, আল্লাহর বড় আদরের সুষ্টি মানুষ আমার আপন জন। আমি সাইমুমকে নেতৃত্ব দিয়ে আসছি। ফিলিস্তিনের কাজ শেষ করে যাচ্ছিলাম মধ্য এশিয়ায়। কিন্তু আল্লাহ আমাকে নিয়ে এসেছেন মিন্দানাওয়ে। যতদিন না মিন্দানাওয়ের............

আহমদ মুসা কথা শেষ করতে পারল না। চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো দরবার কক্ষে। তার সাথে গুঞ্জনও।

শ্লোগান উঠল কর্মীদের মধ্য থেকেঃ ফিলিস্তিন বিজয়ী আহমদ মুসা জিন্দাবাদ, মজলুম মানবতার মহান দরদী আহমদ মুসা জিন্দাবাদ, সংগ্রামী সাইমুম জিন্দাবাদ, নয়া সাইমুম পিসিডা জিন্দাবাদ।

গভীর রাত। জাহাজ থেকে পাওয়া কাগজপত্র পরিক্ষা করে ওগুলো রেখে দিল আহমদ মুসা। জাহাজ থেকে যে অস্ত্র পাওয়া গেছে তা দিয়ে এক ডিভিশন সৈন্যকে অস্ত্র সজ্জিত করা যায়। অস্ত্রের মধ্যে দূর পালল্লার ১৫০ মিলিমিটার কামান এবং ক্ষেপণাস্ত্রও রয়েছে।

কিন্তু আহমদ মুসাকে উত্তেজিত করে তুলেছে লোহার সেই গোল সিলিন্ডার। তালিকার বক্তব্য অনুযায়ী ওগুলো 'রেডিয়েশন বম্ব'। মিন্দানাওয়ের 'নান্দিওনা'ও 'লানাডেল'- এর মুর জনপদ কি এই রেডিয়েশন বম্ব দিয়েই ধ্বংস করে দিয়া হয়েছে? এই মহা ধ্বংসের ক্ষমতা কি তাহলে তার হাতেও এলো? আঁতকে উঠল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার এ কক্ষটি মুর হামসারের কক্ষের পাশেই। মুর হামসার পাশের টেবিলেই বসে ছিল। তাঁর সামনে মিন্দানাও ও সোলো দ্বীপপুঞ্জের এক বিরাট মানচিত্র।

-মুর হামসার। ডাকল আহমদ মুসা।

-জি, মাথা ঘুরিয়ে জবাব দিল মুর হামসার।

-নীলের আতংক এবার আমরাও সৃষ্টি করতে পারি।

-নীল-আতংক? একরাশ প্রশ্ন ঝরে পড়ল মুর হামসারের কন্ঠে।

-হ্যাঁ, নীল আতংক। যে রেডিয়েশন বম্ব দিয়ে ওরা 'নান্দিওনা' ও 'লানাডেল' ধ্বংস করেছে, সে রেডিয়েশন বম্ব এখন আমাদের হাতে।

মুর হামসারের মুখে কোন কথা সরল না। শুধু বোবা সৃষ্টি মেলে সে চেয়ে রইল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা বলল, জাহাজ থেকে যে কালো বাক্সগুলো নামানো হলো, ওর মধ্যে রয়েছে লোহার গোলাকৃতি সিলিন্ডার। সে লৌহ বলের এক জায়গায় রয়েছে লাল সুইচ। অন করলেই অলক্ষ্যে ধীর গতিতে শুরু হবে প্রলয়ংকারী রেডিয়েশন। মানুষ, পশু-পাখি, গাছ-পালার জীবনে নেমে আসবে নীল আতংক-নীল মৃত্যু। এ রেডিয়েশন প্রতিরোধ করার মত কোন উপায় এখনও উদ্ভাবিত হয়নি।

-এ এক ঘৃন্য আবিষ্কার মুসা ভাই!

-তবুও এটাই আমাদের বিরুদ্ধে সর্ব প্রথম ব্যবহার করা হয়েছে বন্ধু।

-আমরা কি এর প্রতিশোধ নেব?

সেটা পরের কথা। কিন্তু আমি ভাবছি এই মারাত্মক অস্ত্র ক্লু-ক্লাক্স-ক্ল্যান পেল কেমন করে? হয় পারমাণবিক কোন রাষ্ট্র তাদেরকে এটা সরবরাহ করেছে, নতুবা তারা কোন উপায়ে পারমাণবিক কোন রাষ্ট্র থেকে এগুলো সংগ্রহ করছে। যেটাই সত্য হোক, এর একটা বিহিত হওয়ার দরকার। তা না হলে এর ব্লাক মার্কেট চলতেই থাকবে।

একটু চিন্তা করল আহমদ মুসা। তারপর বলল, 'কালকেই আমি রেডিয়েশন বম্বের ফটোসহ 'এম, পি, আই' (Muslim Press International) এর কাছে খবর পাঠাচ্ছি যে, পারমাণবিক কোন একটি রাষ্ট্রের কাছ থেকে ক্লু-ক্লাক্স-ক্ল্যান বিপুল পরিমাণ রেডিয়েশন বম্ব যোগাড় করেছে, এগুলোর দু'টি ইতিমধ্যেই মিন্দানাওয়ের মুরদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে।'

-ফল হবে কি কোন?

-নিশ্চয়। দেখবে কেমন হৈ চৈ বেধে যায়।

-আহমদ মুসা থামল। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল মিন্দানাওয়ের মানচিত্রের কাছে। ঝুঁকে পড়ল মানচিত্রের উপর। বলল, বলত কোথায় ওরা ঘাঁটি করে বসেছে।

মুর হামসার মানচিত্র দেখিয়ে বলল, উপনিবেশিক প্রভূদের কল্যানে এবং মিশনারী ও ওদের অমানুষিক অত্যাচারে মিন্দানাওয়ের উলেস্নখযোগ্য শহরের মধ্যে দিভাও, জাম্বুয়াঙ্গো, কোটাবাটো, ইলিনোয়েস, ফাগায়ান ইতিমধ্যেই ওদের দখলে চলে গেছে। এছাড়া উপকূলের আরও পনরটি জায়গায় ওরা ঘাঁটি তৈরী করে বসেছে।

-লোক সংখ্যা কত হবে মুর হামসার?

লোক সংখ্যা প্রায় দু' কোটি। এর মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা সোয়া কোটির মত। কিছু খৃস্টান রয়েছে, আর কিছু রয়েছে প্রকুতি পূজারি। কিন্তু উপনিবেশিক শাসকদের হিসাবে মুসলমানদের সংখ্যা ৪০ লাখের বেশী নয়। বিশ্ববাসির চোখ

ধূলা দিয়ে নিরুপদ্রবে মুসলমানদের হজম করে ফেলার লক্ষ্য নিয়েই তারা এ ধরনের প্রচারণা চালিয়ে থাকে।

মানচিত্রে অঙ্গুলি নির্দেশ করে আহমদ মুসা বলল, এই আপো পর্বত থেকে আমরা কিভাবে ওদের ঘাঁটিগুলোতে পৌছতে পারি?

মানচিত্রে বুঝিয়ে দেবার জন্য মুর হামসার আরও একটু সরে এলো। আঙ্গুল দিয়ে সে মানচিত্রে পথ নির্দেশ করতে গিয়ে হঠাৎ তার আঙ্গুল আহমদ মুসার আঙ্গুল স্পর্শ করল। চমকে উঠল মুর হামসার। বলল, একি! আপনার জ্বর?

বলেই সে কাছে এসে আহমেদ মুসার কপালে হাত রাখল। আগুনের মত গরম কপাল। মুর হামসারের মুখ পাংশু হয়ে গেল। বলল, এমন ভীষণ জ্বর নিয়ে আপনি বসে আছেন, বলেননি তো?

আহমদ মুসা নিজের কপালটা নিজে পরীক্ষা করে বলল, তাই তো, এতটা আমি খেয়াল করিনি।

মুর হামসার জোর করে এনে আহমদ মুসাকে শুইয়ে দিল। তার চোখের দিকে চেয়ে সে আরও আঁতকে উঠল। রক্তের মত লাল হয়ে গেছে চোখ। শোবার পর আহমদ মুসাও কেমন যেন সংজ্ঞাহীনের মত হয়ে পড়ল।

ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল মুর হামসার। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল, রাত দু'টা বাজে।

সে তাড়াতাড়ি ছুটে এলো তার ঘরে। দেখল, শিরী বসে আছে। মুর হামসার কিছু বলার আগে শিরী বলে উঠল, ওঁকে রাত জাগতে দেয়া কি ঠিক হয়েছে? উনি যে আহত, আপনারা ভুলেই গিয়েছিলেন?

কথাগুলো কানে তুলল না মুর হামসার। বলল, ভুল হয়েছে ডাক্তারকে কাছে না রেখে। তুই ওর মাথায় পানি ঢালার ব্যবস্থা কর। আমি ডাক্তারকে ডাকার ব্যবস্থা করেই আসছি।

মুর হামসার চলে গেল। শিরী তাড়াতাড়ি তার কক্ষ সংলগ্ন বাথরুম থেকে একটি বড় বালতি ও একটি প্লাস্টিক নল নিয়ে আহমদ মুসার রুমে ঢুকল। নলের মুখ বাথরুমে টেপের মুখে লাগিয়ে কল ছেড়ে দিয়ে বালতি নিয়ে সে চলে এলো আহমদ মুসার মাথার কাছে।

আহমদ মুসা অসাড়ভাবে পড়ে আছে। তার চোখ দু'টি মুদ্রিত। আহত হাতটি খাটিয়া থেকে নীচে ঝুলে আছে। মুখটি তার রক্তাভ।

শিরী ধীরে ধীরে ঝুলে থাকা হাতটি বিছানায় তুলে দিল। কোন সাড়া পেল না আহমদ মুসার। ঘুমিয়ে পড়েছে কি সে? না, এত তাড়াতাড়ি এইভাবে তো ঘুমিয়ে পড়তে পারেন না। তাহলে কি অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন জ্বরের তীব্রতায়! কথাটা মনে হওয়ার সাথে গোটা দেহে তার এক হিম শীতল স্রোত বয়ে গেল।

সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে সে কপালে হাত রাখল। স্পর্শ করেই চমকে উঠে হাত সরিয়ে নিল সে। এত গরম?

নল দিয়ে পানি এসে গেছে। তাড়াতাড়ি সে একটুখানি জলের ঝাপটা দিল আহমদ মুসার মুখে। তাপর মাথার তল থেকে বালিশ সরিয়ে নিয়ে তার দু'টি কাঁধ ধরে অতি কষ্টে তার মাথাকে আরো খাটের কিনারায় টেনে নিল। মাথার নীচে বালতি পেতে মাটিতে হাটু গেড়ে আহমদ মুসার কাছে একান্ত হয়ে বসল। ডান হাতে পানির নল ধরে বাম হাত দিয়ে মাথা ধুয়ে দিতে লাগল সে।

ছোট করে ছাঁটা চুল। ঘন আর কোঁকড়ানো। অদ্ভুত কালো রং তার। সমগ্র মাথাটা ভিজিয়ে নিতে বেশ সময় লাগল শিরীর। মাঝে মাঝে আগুনের মত কপালটাকেও সে ভিজিয়ে দিচ্ছিল। মসৃণ কপাল। দৃঢ় সংবদ্ধ চোয়াল। উন্নত নাসিকা। রক্তাভ ঠোঁট। নীচের ঠোঁটের ক্ষুদ্র একটি নীলাভ তিল অপরূপ লাগছে দেখতে।

কেঁপে কেঁপে ধীরে ধীরে খুলে গেল আহমদ মুসার চোখ। শিরী চকিতে তার চোখ দুটি সরিয়ে নিল আহমদ মুসার মুখ থেকে। কিন্তু আবার বন্ধ হয়ে গেল আহমদ মুসার চোখ দু'টি। ঠোঁট দু'টি তার ঈষৎ কেঁপে উঠল। অস্ফুট কন্ঠে বলল সে, তুমি এ কষ্ট করছ মুর হামসার?

বলে আহমদ মুসা তার ডান হাত তুলে শিরীর হাত স্পর্শ করেই চমকে উঠল। চোখ খুলে মাথা ঈষৎ বাঁকিয়ে শিরীকে দেখে জিজ্ঞেস করলো সে, কে তুমি?

আহমদ মুসার অভাবিত স্পর্শে কেঁপে উঠেছিল শিরীর গোটা শরীর। আহমদ মুসার চোখের সামনে রাজ্যের সমস্ত সঙ্কোচ ও লজ্জা এসে শিরীকে ঘিরে

ধরেছিল। তার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। নল ধরে রাখা হাতটি তার কাঁপছিলো। প্রায় অস্ফুট কন্ঠে সে বলল, আমি শিরী।

-রাজ কুমারী শিরী! মুর হামসারের বোন?

-জি।

-মুর হামসার কোথায়?

-ডাক্তারের জন্য গেছেন?

-তুমি কেন, কাউকে ডাকলেই তো পারতে?

শিরী কোন জবাব দিল না। আরও রাঙা হয়ে উঠল তার মুখ। এই সময় মুর হামসার ঘরে ঢুকল। পিছনে পিছনে ডাক্তার।

জেদ্দায় মুসলিম প্রেস ইন্টারন্যাশনাল (এম পি আই) সদর দফতরে আহমদ মুসার চিঠি পৌছার পরদিনই বড় বড় সংবাদপত্রে প্রধান শিরোণামায় খবর বেরুলঃ

**আণবিক মারণাস্ত্রের কালোবাজারী**

বেসরকারী এক সংগঠন রেডিয়েশন বম্ব ব্যবহার করছে।

খবরের কোন সুত্র উল্লেখ না করে লেখা হয়েছে, ‘‘আটলান্টিক পারের কোন একটি আনবিক দেশ থেকে বহুসংখ্যক রেডিয়েশন বম্ব তথাকার এক বেসরকারী সংগঠনের হাতে গিয়ে পৌছেছে। সংগঠনটি ইতিমধেই দু’টি বোমা ফিলিপাইনের সংঘাত সংক্ষুব্ধ একটি দ্বীপের মানুষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে। ভয়ংকর রেডিয়েশনের শিকার হয়ে প্রায় দুই হাজার আদম সন্তান নীল মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। শান্তিকামী বিশ্ব এবং ব্যাপারে আন্তর্জাতিক আণবিক কমিশনের জরুরী হস্তক্ষেপ কামনা করছে।’’

এ খবর প্রকাশিত হবার একদিন পরে বিশ্বের প্রায় সকল সংবাদপত্রে এক চাঞ্চল্যকর খবর বেরুল। খবরটি হলোঃ

## পারমানবিক মারণাস্ত্র লাপাত্তা

মার্কিন যুক্তরাষ্টের পেন্টাগণ সূত্রের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, ''মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আণবিক অস্ত্রাগার থেকে বেশ কিছুসংখ্যক ক্ষুদ্রাকৃতি রেডিয়েশণ বম্ব হাওয়া হয়ে গেছে। মনে করা হচ্ছে, সুপরিকল্পিত কোন ষড়যন্ত্র এই মারাত্মক অপহরণের কাজ সম্পন্ন করেছে। অবিলম্বে এই ষড়যন্ত্র উদঘাটনের সমূহ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে কতিপয় কংগ্রেস ও সিনেট সদস্য সমবায়ে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়েছে।

খবর পড়ে আহমদ মুসার মুখে ফুটে উঠলো এক টুকরো হাসি। ট্রিপল সি'র রেডিয়েশন বম্ব সংগ্রহের পথ বন্ধ হলো। মুর হামসারের দিকে চেয়ে আহমদ মুসা বলল, মিন্দানাওবাসীদের সামনে সেই নীল আতংক আর নেমে আসবে না। 'নান্দিওনা' ও 'লানাডেলের' ঘটনার পুনারাবৃত্তি হয়তো এর পরে আর ঘটবে না।

মুর হামসার মুখ টিপে হেসে বলল, রুড থান্ডারের প্রথম বিজয় এটা।

-বিজয় রুড থান্ডারের নয় বন্ধু। এ বিজয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের। এ ধরনের বিজয় ব্যক্তির মধ্যে সীমিত হয়ে পড়লে বা ব্যাক্তির মধ্যে সীমিত করে ফেললে তা স্বার্থদুষ্ট হয়ে থাকে এবং আর এক অন্যায়ের সৃষ্টি হয় তা থেকে। এ ধরনের রাজতান্ত্রিক ব্যক্তিবাদের কবর রচিত হয়েছে তেরশ' বছর আগেই বন্ধু।

মুর হামসার মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তার নেতার দিকে। বলল, আমাদের এতদিনের কল্পনার আহমদ মুসার চাইতে বাস্তবের আহমদ মুসা অনেক-অনেক বড়।

# ৪

আহমদ মুসা প্রায় মাসাধিকাল ধরে মিন্দানাও ও সোলো দ্বীপপুঞ্জ ভ্রমন করলো। সঙ্গে ছিল মুর হামসার। ভ্রমণকালে পিসিডা কর্মী ও মিন্দানাওবাসীদের সাথে ঘনিষ্ঠ আলাপ হলো আহমদ মুসার। এক হাতে ক্রস ও অন্য হাতে বন্দুক নিয়ে এসে জেঁকে বসা উপনিবেশিক খৃস্টান প্রভূদের বিরুদ্ধে তাদের মধ্যে সীমাহীন অসমেত্মাষ সে লক্ষ্য করলো, মুক্তির জন্য তারা অধীর। মিশনারীরা জ্ঞান বিতরণের নামে যে বিদ্যালয়সমূহ এবং চিকিৎসার নামে যে চিকিৎসালয়সমূহ খুলেছে, সেগুলো কেমন করে মিন্দানাওবাসীদের ধর্ম ও জাতীয়তার সমাধি রচনা করছে তার স্পষ্ট নিদর্শন প্রত্যক্ষ করল আহমদ মুসা। মিশনারীদের প্রেমের বাণী যেখানে মিন্দানাওবাসীদের বশ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং এর বিরুদ্ধে মিন্দানাওবাসীদের প্রতিরোধ বহ্নি যেখানে জ্বলে উঠছে সেখানে ট্রিপল সি'র বিষাক্ত থাবা গিয়ে মিন্দানাওয়ের অসহায় মানুষের ঘাড়ে চেপে বসছে। এ সবের বহু দৃষ্টান্ত আহমদ মুসা নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করলো। আহমদ মুসা অনুভব করলো, মিন্দানাওবাসীদের দুর্জয় সাহস আছে। শুধু এগুলোকে সুপরিকল্পিতভাবে কাজে লাগাতে পারলেই মিন্দানাওবাসীরা মুক্তির স্বাদ পেতে পারবে।

আহমদ মুসা মাস খানেক ধরে শুধু নিরর্থক ভ্রমণ করেই কাটালো না। পিসিডার সংগঠনকে নতুন করে সাজাল। সমগ্র মিন্দানাও ও সোলো দ্বীপপুঞ্জকে ৫০ টি অঞ্চলে ভাগ করা হলো। ফিলিস্তিন থেকে ১০০ জন অভিজ্ঞ সাইমুম কর্মীকে আনা হয়েছিল। তাদের থেকে প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য দু'জন করে পাঠানো হলো পিসিডা কর্মী এ স্থানীয় অধিবাসীদের প্রয়োজনীয় গেরিলা ট্রেনিং ও শিক্ষাদানের জন্য। আহমদ মুসা পিসিডার কেন্দ্রীয় কমিটিকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছিল যে, সামরিক শক্তি যদি জাতীয় সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক চেতনা-নির্ভর না হয় তাহলে তার প্রাণ শক্তি থাকে না। আহমদ মুসার এ পদক্ষেপের ফলে

গেরিলা ট্রেনিং শিবিরের পাশাপাশি গড়ে উঠল জাতীয় শিক্ষা জন্য জাতীয় বিদ্যালয়। নতুন উৎসাহের প্রাণ বন্যায় উদ্বেল হয়ে উঠল মিন্দানাও সোলো দ্বীপপুঞ্জের জনজীবন।

আহমদ মুসা নৌবাহিনীও গড়ে তুলল। 'ট্রিপল সি'র কাছ থেকে দখল করা জাহাজে ৫০টি মেরিন ইঞ্জিন পাওয়া গিয়েছিল। তাই দিয়ে ৫০টি বোট সজ্জিত করা হল। মিন্দানাওবাসীরা ঐতিহ্যগতভাবে দুঃসাহসী নাবিক। সুতরাং অল্প সময়ের মধ্যেই ক্ষুদ্র অথচ এক দক্ষ নৌ-ইউনিট গড়ে উঠল। যে মিন্দানাও সাগর, সোলো সাগর, মরো উপসাগর ও দাভাও উপসাগরে একদিন ক্রস পরিশোভিত মিশনারী 'ট্রিপল সি'র একচেটিয়া রাজত্ব ছিল, সেখানে আজ পিসিডার কর্মীরাও ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ পেল। আহমদ মুসা নৌ-সদর দফতর হিসেবে জাম্বুয়াঙ্গোকে মনোনীত করলো। কিন্তু যেহেতু এ সমুদ্র শহরটি ফিলিপাইন সরকারের নামে ট্রিপল সি'র দখলে, তাই আপততঃ শহরটি মুক্ত করার পূর্ব পর্যন্ত নৌ-সদর দফতর আপো-সমুদ্র সৈকতেই থাকবে।

সাংগঠনিক সফর শেষে আহমদ মুসা ও মুর হামসার গভীর অরণ্য পথে আপো পর্বতের হেড কোয়ার্টারে ফিরছিল। চলতে চলতে মুর হামসার এক সময় বলল, মুসা ভাই, আমরা পনের বছরে যা পারিনি আপনি পনেরোর দুইগুণ তিরিশ দিনে তা করে ফেললেন।

-এমন করে কথা বলো না বন্ধু, তোমাদের সবই ছিল, আমি তাতে রংয়ের পরশ বুলাচ্ছি মাত্র।

-সার্থক শিল্পি আপনি।

-কারণ আমরা মহিমাময় এক মহাশিল্পীর দাস।

মুর হামসার কথা বলল না কিছুক্ষণ। বলল পরে, এই যে দ্বন্দ্ব সংঘাত এর কি অবসান ঘটবে দুনিয়া থেকে?

-ন্যায়ের পাশে অন্যায় যতদিন থাকবে ততদিন নয়।

-ন্যায় কি অন্যায়ের মূলোচ্ছেদ করতে পারবে না?

-পারতো, যদি ইবলিস এই জমিনে না আসতো।

-তাহলে?

-অন্যায়ের প্রতিবিধান ও প্রতিরোধ সত্য ও সত্যসেবীদের শির চির উন্নত থাকবে, আল্লাহ তার বান্দাদের কাছ থেকে এটুকুই তো কামনা করেন।

-এতো এক অনির্বান সংগ্রামের মহা আহবান।

-ইবলিসের সাথে এই অনির্বান সংগ্রামের ভাগ্যলেখা নিয়েই তো বনি আদম তার যাত্রা শুরু করেছিল এই পৃথিবীর বুকে।

-এ ভাগ্যলেখা কি সকলের জন্য অবধারিত?

-নিশ্চয়ই। যারা এ সংগ্রামের পথ থেকে সরে দাঁড়াবে, যারা অন্যায়ের পদতলে সমর্পন করে দেবে নিজেকে, তারা শুধু কাপুরুষ নয়, তারা মানুষ নামের অনুপযুক্ত। এদের প্রতিই বিধাতার সীমাহীন লানত। জাহান্নাম তো এদেরই জন্য।

কেপে উঠল মুর হামসারের গোটা শরীর। আজ সে যেন প্রথমবারের মত বুঝল, কেন পর্বতের উপর কোরআন নাজিল হলে তা মহাশংকায় ধূলায় বিদীর্ণ হয়ে যেত। অনুভব করলো মুর হামসার বনি আদম এ দুরহ দায়িত্ব পালন করে বলেই আল্লাহর বড় প্রিয় সে এবং সৃষ্টি জগতের রাজ শিরোপা এ কারণেই জুটেছে তার মাথায়।

মুর হামসার আর কোন কথা বলতে পারলো না। আহমদ মুসাও নীরব। বনানীর সবুজ সাগরের বুক চিরে আপো পর্বত অভিমুখে তারা এগিয়ে চলেছে দু'টি প্রানী। মাঝে মাঝে ঘোড়ার পায়ের শব্দ উঠছে খট্ খট্ খট্।

আহমদ মুসা আগে, মুর হামসার পিছনে আবার কখনো তারা পাশাপাশি সামনে এগিয়ে চলছিল। সামনেই আপোয়ান উপত্যকা।একটি গিরীখাত পেরিয়ে ওপারে গেলেই তারা গিয়ে পৌছবে আপোয়ান উপত্যকায়।

পড়ন্ত বেলা। পশ্চিমের গিরী শৃঙ্গটির আড়ালে ঢাকা পড়েছে সূর্য। উপরে মেঘের কোলে রোদ চিকচিক করছে, কিন্তু নীচের ধরনী ঢাকা পড়েছে দৈত্যকার এক ছায়ায়।

সামনেই গিরীখাত। গিরীখাতের উপর কাঠের তৈরী একটি সেতু, সেতুটি লতা-পাতার ক্যামোফ্লেজে ঢাকা।

বামপাশে ঘুরে থুথু ফেলতে গিয়েছিল আহমদ মুসা। হঠাৎ একটি সিগারেটের কার্টুনে নজর পড়তেই সে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল এবং নেমে পড়ল ঘোড়া থেকে?

রাস্তার ধার থেকে সিগারেটের বাক্সখানা সে ধীরে ধীরে তুলে নিল। 'রেডক্লাগ' সিগারেটের বাক্স। সোভিয়েট ইউনিয়নের মিনস্কে তৈরী এ দামী সিগারেট সাধারণতঃ সোভিয়েট অফিসিয়ালসরাই ব্যবহার করে থাকে। আহমদ মুসার সমগ্র অনুভূতি জুড়ে একটি প্রশ্ন জ্বলজ্বল করে উঠলঃ মিন্দানাওয়ের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের এই অজ্ঞাত রাস্তার ধারে এই সিাগারেট এলো কি করে? সিগারেটের বাক্স উল্টিয়ে নিল আহমদ মুসা। একটি লেখার প্রতি নজর পড়তেই ভ্রু-কুঁচকে গেল তার। রুশ হস্তাক্ষর। কে যেন রুশ অংকে একটি হিসাব করেছে। ৩২০ মাইল ¸ ১০ = ৩২ ঘন্টা। আরও খুটিয়ে দেখল সে। সিগারেটের বাক্সের ধারে কিছু পরিমাণ মাটি লেগে আছে। মাটি তখনও শুকিয়ে যায়নি। আহমদ মুসা অনুমান করলো, ঘন্টা খানেক আগে কেউ রাস্তার উপর থেকে ওখানে ওটা ছুড়ে মেরেছে। সতর্ক হয়ে উঠল আহমদ মুসা। শিকারী বাঘের মত একবার সে চারিদিকে চাইল।

পাশেই মুর হামসার বোবা দৃষ্টি মেলে চেয়েছিল আহমদ মুসার দিকে। আহমদ মুসা তাকে জিজ্ঞেস করলো, এখান থেকে জাম্বুয়াঙ্গোর দুরত্ব কত হামসার?

-৩২ মাইলের মত।

-ঠিক?

-হ্যাঁ। কেন?

-কোন উত্তর না দিয়ে আহমদ মুসা আবার জিজ্ঞেস করলো, আমরা ফিরে আসছি আজ হেড কোয়ার্টারে এ কথা কেউ জানে মুর হামসার?

-জানে।

-কে?

-শিরী।

-শিরীকে তুমি কবে জানিয়েছ?

-গতকাল।

-কোন জায়গা থেকে?

-জাম্বুয়াঙ্গো থেকে।

-জাম্বুয়াঙ্গো থেকে?

-হাঁ।

আহমদ মুসার চোখ দু'টি চিকচিক করে উঠল। যেন কিছু খুঁজে পেয়েছে সে। পুনরায় সে বলল, মুর হামসার, তুমি কী জানিয়েছিলে শিরীকে?

-জানিয়েছিলাম, আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে যাত্রা করছি, পৌছব ইনশাআল্লাহ্ আগামীকাল বিকেলের দিকে।

আর কিছু বলল না আহমদ মুসা। মুহূর্তকালের জন্য চিন্তার অতল গভীরে চলে গেল সে। তারপর চোখ খুলে পুলের উপর দিয়ে সামনের রাস্তার দিকে চেয়ে সে বলল, হেড কোয়ার্টারে পৌছার জন্য এ ছাড়া আর কি দ্বিতীয় পথ নেই?

শুকনো কন্ঠে মুর হামসার বলল, না মুসা ভাই। একটু থেমে আবার সে বলল, কি ঘটছে তা কি জানতে পারি?

-নিশ্চয় বন্ধু। কিন্তু এখন নয়, আগে আমরা পৌছি।

-কিন্তু কোন পথে?

-গিরীখাত কত গভীর?

-প্রায় হাজার ফুটের মত।

-এই গিরীখাতের শেষ কোথায়?

-অনেকটা পথ ঘুরে আপোয়ান উপত্যকায় গিয়ে শেষ হয়েছে।

-চল আমরা গিরীপর্বতের পথ ধরে উপত্যকায় গিয়ে উঠবো।

আহমদ মুসা ও মুর হামসার ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে রাস্তা পিছনে রেখে গিরীপর্বতের পথ ধরল। বড় কষ্টকর এ যাত্রা। মুহূর্তের অসাবধানতায় পা ফসকে গেলে ছয় শ' হাত গভীরে গিরীর্বতের বুকে চির সমাধি লাভ হবে।

সন্ধার মধ্যেই তারা গিরীবর্তের খাড়া ঢাল পার হয়ে অপেক্ষাকৃত সমতল জায়গায় গিয়ে পৌছল। পথ চলা সহজতার হয়ে উঠল তাদের। কিন্তু সেই সাথে নেমে এলো রাত্রির কালো অন্ধকার। আকাশে চাঁদ নেই তারার আলোয় তারা পথ চলতে লাগল। মুর হামসার বলল, রাত্রিটা কোথাও বসে কাটিয়ে দিলে হয় না?

আহমদ মুসা বলল, মনে হচ্ছে নতুন এক সংকট সামনে, বসে থেকে সময় নষ্ট করার সময় নেই। এসো আজ একটু কষ্ট করি।

-আমি আমার জন্য ভাবছি না, কিন্তু আপনি অনভ্যস্ত......

-আমার জন্য ভেব না বন্ধু, কি করব এ দেহকে অত মায়া করে!

-আপনার কেউ নেই মুসা ভাই?

-কেন, উপরে আল্লাহ, তার নীচে তোমরা। আর কি চাই?

-কেন, মা, বাবা, ভাই, বোন, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা কত কি তো মানুষ চায়?

-চাইলেই সবাই কি তা পেয়ে যেতে পারে?

-কিন্তু চাওয়ার বেদনাও কি আপনার নেই?

-আমি মানুষ। মানবিক বেদনার উর্ধে আমি নই মুর হামসার। কিন্তু মানবিক দায়িত্ব ও কর্তব্য ফেলে যদি আমি সে বেদনার পশরা মেলে বসি, তাহলে চোখের জল ফেলে আর আকাংখার শূন্য রাজ্যে হাত পা ছুঁড়তেই তো দিন কেটে যাবে।

মুর হামসার আর কিছু বলল না। এই বিরাট মানুষটির লৌহ হৃদয়ের অন্তরালে একান্ত নিজস্ব এক বেদনার নির্ঝরনী বয়ে চলেছে, তা যেন মুর হামসারকেও স্পর্শ করল। পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনহীন এই মানুষটি তার হৃদয়ের আরো গভীরে যেন দাগ কেটে বসল।

মধ্যরাত পার হয়ে গেছে। আপোয়ান উপত্যকা আর বেশী দূরে নেই। দুজনে আগে পিছে ঘনিষ্ঠ হয়ে চলছিল। হঠাৎ আহমদ মুসা থেমে যাওয়ায় মুর হামসার গিয়ে তার সাথে ধাক্কা খেলো। কিছু বলতে যাচ্ছিল মুর হামসার। আহমদ মুসা তার মুখ চেপে ধরল। আঙুল দিয়ে ইষাণ কোণে ইংঙ্গিত করলো। মুর হামসার তাকিয়ে দেখল প্রায় শ' গজ দূরে হাত দু'য়েকের মত ব্যবধানে বিড়ালের চোখের মত দু'টি অগ্নিপিন্ড।

আহমদ মুসা ফিসফিসিয়ে বলল, খেয়াল কর, বাতাসে দামী তামাকের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। নিশ্চয়ই ওখানে বসে কেউ সিগারেট খাচ্ছে।

-কিন্তু কে সিগারেট খাবে ওখানে বসে?

-ওরা কারা?

-রাশিয়ান।

-রাশিয়ান? কেমন করে বুঝলে?

-মিন্দানাওয়ে কি রাশিয়ার সিগারেট আসে? আপো পর্বতের ঘাঁটিতে পিসিডার কেউ কি রাশিয়ান সিগারেট খায়?

-কখনও না।

-তাহলে আপো পর্বতে রাশিয়ান সিগারেট এলো কি করে?

মুর হামসার মুহূর্তকাল ভেবে নিয়ে বলল, আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন, কিন্তু.....

-কিন্তু, কেন ওরা আসবে, এইতো?

-আমি তাই ভাবছি।

-এর উত্তরও পাবে, এখন এস।

বিড়ালের মত গুড়ি মেরে নিঃশব্দে তারা এগিয়ে যেতে লাগল সামনে। আহমদ মুসার চোখে ইনফ্রারেড গগলস। দু'জনের হাতেই সাইলেন্সার লাগানো রিভলভার।

আহমদ মুসা দেখতে পেল দু'জন লোক একটি গুহার মুখে বসে আছে। তাদের থেকে হাতদশেক দুরে একটি পাথরের আড়ালে গিয়ে বসল আহমদ মুসা ও মুর হামসার।

লোক দু'টি নীচুস্বরে আলাপ করছিল। কি বলছিল, তা শোনার জন্য আহমদ মুসা সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করল ওদিকে। হঠাৎ মুর হামসার একটি ধাক্কা খেয়ে আহমদ মুসা একপাশে কাত হয়ে পড়ল। বিরাট একটি পাথরের খন্ড তার মাথার এক পাশ ঘেঁষে পড়ে গেল। বিরাট একটি পাথরের খন্ড তার মাথার এক পাশ ঘেষে পড়ে গেল। মাথাটি যন্ত্রনায় ঝিম ঝিম করে উঠলো আহমদ মুসার। আর একটু হলেই মাথাটা গুড়ো হয়ে যেতো একদম। পাথরটি পড়ে যাওয়ার

পরক্ষণেই একটি ’দুপ’ শব্দ শুনতে পেল এবং পিছনে একজন আর্তনাদ করে পড়ে গেল।

আহমদ মুসা মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে তাড়াতাড়ি সামনে তাকাল। দেখল লোক দু’টি উঠে দাড়িয়েছে। তাদের হাতে রিভলবার। এগিয়ে আসছে তারা। আহমদ মুসা তার রিভলভার উচু করল। সাইলেন্সার লাগানো রিভলবার থেকে নিঃশব্দে দুটি গুলি বেরিয়ে গেল। মাত্র হাত পাঁচেক দুরে লোক দু’টি হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

মুর হামসার আহমদ মুসার কাছে সরে এসে বলল, আপনার মাথার আঘাত কেমন মুসা ভাই?

-তেমন কিছু না।

একটু থেমে আহমদ মুসা আবার বলল, আমাদের চুপচাপ কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে ওদের আর কেউ আছে কিনা দেখতে হবে।

প্রায় পাঁচ মিনিট চুপচাপ কেটে গেল। কোন সাড়া শব্দ নেই কোথাও। আহমদ মুসা বলল, উঠে দাঁড়াও মুর হামসার, ওদের আর কেউ নেই এখানে। টর্চ জ্বালল আহমদ মুসা।

টর্চের আলো মুর হামসারের গুলিতে নিহত লোকটির মুখের উপর পড়তেই মুর হামসার আঁৎকে উঠে বলল, এযে, আমাদের সিকিউরিটি গার্ড শওকত আলী।

-আমি আশ্চর্য হইনি মুর হামসার। এমন না ঘটলেই আমি বিস্মিত হতাম।

কথা শেষ করে সে বলল, এস এবার আসল দু’টাকে দেখি।

টর্চের আলো ফেলে দু’জনকেই খুটিয়ে খুটিয়ে দেখল আহমদ মুসা। দুজনেই রাশিয়ান। দু’জনেরই মাঝারী ধরনের গঠন দেহের।

আহমদ মুসা সার্চ করল ওদের জুতার গোড়ালী থেকে মাথার চুল পর্যন্ত। রিভলভার, মানিব্যাগ ও কয়েক ধরনের ক্ষুদ্র অস্ত্র ছাড়া আর কিছুই ছিল না তাদের কাছে।

গুহার মধ্যে টর্চের আলো ফেলল আহমদ মুসা। দু'টি বিছানা পাতা রয়েছে। বিছানা বালিশ দেখে মুর হামসার বলল, এসব তো পিসিডার বালিশ, এখানে এল কেমন করে?

-যেমন করে শওকত আলী। বলে সে মুর হামসারের দিকে চেয়ে বলল, এখানকার কাজ আপাততঃ শেষ চল তাড়াতাড়ি হেড কোয়ার্টারে।

হেড কোয়ার্টারে যখন তারা পৌছিল, তখন রাত তিনটা। আহমদ মুসার মাথার আঘাত বেশ গুরুতরই হয়েছিল। রক্তে তার জামা কাপড় ভিজে গেছে। এক থোপ রক্ত তার মাথার চুলে জট পাকিয়ে গেছে। মুর হামসার আহমদ মুসাকে নিয়ে সোজা পিসিডার ক্লিনিকে গিযে উঠল।

ক্লিনিকে পৌছে আহমদ মুসা মুর হামসারকে বললো, তুমি যাও হামসার। আমি ব্যান্ডেজ নিয়ে আসছি। যাবার সময় আলী কাওসারকে বলে যাও তৈরী থাকতে। আমি শীঘ্রই বেরুব।

আলী কাওসার আপো পর্বতের নিরাপত্তা প্রধান।

মুর হামসার আহমদ মুসার মুখের দিকে একবার চেয়ে আর দ্বিরুক্তি করল না। নীরবে সে পথে নামল আবার। যেতে যেতে ভাবল, এমন গুরুতর আহত তবু এক এক মিনিট বিশ্রামের চিন্তা করছে না। কি ত্যাগ, কি অপূর্ব নিষ্ঠা। এমন নেতার নির্দেশে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যেতেও আনন্দ আছে।

আলী কাওসারের সঙ্গে দেখা করে মুর হামসার বাড়ী পৌছল গিয়ে। নক করল দরজায়। নির্দিষ্ট নিয়মে নির্দিষ্ট সংখ্যায়। খুলে গেল দরজা। শিরী দরজা খুলে দিয়েছে। মুর হামসারকে সহাস্যে স্বাগত জানাতে গিয়ে তার উপর নজর পড়তেই শিরী উদ্বিগ্ন কন্ঠে বলল, তোমার জামায় রক্ত কেন ভাইয়া?

মুর হামসার চকিতে একবার তার জামার দিকে চেয়ে বলল, আহমদ মুসা আহত।

-আহত? কোথায় তিনি? কন্ঠ যেন শিরীর আর্তনাদ করে উঠল। নিজের কন্ঠস্বরে যেন সেও লজ্জা পেল। সংকুচিতা হয়ে পড়ল সে। বোনের দিকে চকিতে একবার চেয়ে মুর হামসার বলল, ক্লিনিকে ব্যান্ডেজ নিয়ে উনি আসছেন।

ধীর স্বরে শিরী বলল, কি ঘটেছে ভাইয়া?

মুর হামসার জামা কাপড় খুলতে খুলতে সমস্ত ঘটনা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শিরীকে শোনাল।

শিরী কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলো না। তার চোখে-মুখে উদ্বেগ উত্তেজনা। এক সময় তার চোখ দু'টি ছলছলে হয়ে উঠল। বলল, আপনারা আসছেন, একথা আমাকে জানানোর সাথে এই ঘটনার কোন সম্পর্ক রয়েছে ভাইয়া?

-আমিও বুঝতে পারছিনা বোন?

-উনি আমাকে সন্দেহ করেছেন? শিরীর কন্ঠ ধরে এল।

মুর হামসার কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু বাইরে থেকে দরজায় নক্ করার শব্দ ভেসে এল। মুর হামসার উঠে গেল দরজা খুলে দেওয়ার জন্য।

শিরী উঠে গেল তার ঘরের দিকে। মুর হামসারের সাথে ঘরে প্রবেশ করল আহমদ মুসা। প্রবেশ করেই মুর হামসারকে বলল, তুমি একটু শিরীকে জিজ্ঞেস কর, আমরা আসব, সে কথা তার কাছ থেকে কোন ভাবে অন্যকারো কাছে প্রকাশ পেয়েছিল কিনা?

-এখানেই ওকে ডাকি?

-থাক। এই একটি মাত্রই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে এস।

মুর হামসার চলে গেল পিছন দিকের পর্দা ঠেলে শিরীর ঘরে।

শিরী আহমদ মুসার কথা শুনতে পেয়েছিল। মুর হামসার যেতেই সে বলল, আপনার অয়্যারলেস পেয়েই আমি রুনার মাকে বলেছিলাম, আগামী কাল বিকালে ভাইয়ারা আসবেন, ঘরগুলো পরিষ্কার করতে হবে, তুমি আমার সাথে থেক, 'থামল শিরী' পরে বলল, আর কাউকেতো কিছু বলিনি ভাইয়া? গলা কাঁপছে শিরীর।

মুর হামসার চলে গেল। শিরী খাটের রেলিং ধরে যেমন দাঁড়িয়েছিল, তেমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। তার বিষন্ন মুখে যে অভিব্যাক্তি, তার চেয়ে বহু গুন বেশী বেদনার ভার তার হৃদয়ে।

আহমদ মুসা মুর হামসারের কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে বলল, কাউকে ডেকে রুনার মাকে ডাকতে পাঠাও মুর হামসার। এই মুহূর্তে তাকে আমরা চাই।

-আমিই যাই মুসা ভাই।

-কিন্তু তোমার অনেক কষ্ট হয়েছে।

-আপনার শতাংশের একাংশ নয়।

-আমি আহমদ মুসা সামান্য মানুষ, কিন্তু তুমি পূর্ব এশিয়ার এক শ্রেষ্ঠ রাজ বংশের সন্তান।

-এগুলো মানুষের কৃত্রিম পোশাক, মানুষ, সে মানুষই।

বলে মুর হামসার উঠে দাঁড়াল। যেতে যেতে সে বলল, আপনি খেয়ে নিন মুসা ভাই, আমি আসছি।

মুর হামসার চলে গেলে আহমেদ মুসা তার কক্ষে চলে গেল। প্রথমেই কাপড় ছাড়ল সে। কক্ষটাকে কেমন যেন নতুন নতুন মনে হচ্ছে তার কাছে। কক্ষের চারিদিকে নজর বুলাল সে, কক্ষটিকে নতুন করে সাজানো হয়েছে। ঘরের সবকিছু সাজানো গোছানো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বক-সাদা বেডসিড নিখুতভাবে বিছানো। বালিশে নতুন কভার। মাথার পার্শ্বের টিপয়ে একগুচ্ছ রজনী গন্ধা। কাপড় চোপড় আলনায় পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখা। ডাইনিং টেবিলে খাবার ঢেকে রাখা। সবকিছুর মধ্যে আহমদ মুসা আন্তরিকতার এক নিবিড় স্পর্শ অনুভব করল।

বিছানায় গা এলিয়ে দিল সে। এক মধুর গন্ধে তার মন ভরে গেল। বালিশ বিছানায় মাখানো সেন্ট থেকে এটা আসছে অনুভব করল আহমদ মুসা। এ বিশেষ সেন্ট আরও একদিন সে পেয়েছিল। মনে পড়ল তার সেদিন অজ্ঞানাবস্থা থেকে জ্ঞান ফিরে আসার পর প্রথম এ সেন্টই তার নাকে এসেছিল। মাথার কাছে বসা ছিল শিরী। ভাবল আহমদ মুসা, এ ঘর সাজানো তাহলে শিরীর কাজ। মনে মনে হাসল সেঃ ঘরের শোভা ওরা। ঘরকে তাই এমন শোভামন্ডিত করা ওদের দ্বারাই সম্ভব।

দশ মিনিটের মধ্যে মুর হামসার ফিরে এল। সাথে রুনার মা। মুর হামসারের গৃহের একমাত্র পরিচারিকা। বয়স চল্লিশের কোঠায়।

ওদের ঘরে ঢুকতে দেখে আহমদ মুসা উঠে বসল। রুনার মাকে এক নজর খুটিয়ে দেখে নিল, সে। রুনার মার ঘুম জাগা চোখে-মুখে কেমন যেন একটা উদ্বেগ ফুটে উঠছে।

আহমদ মুসা রুনার মাকে প্রশ্ন করল ঘরের এসব কে সাজিয়েছে?

-কেন, শিরী আম্মা।

-তুমি সাথে ছিলে না?

-জি।

-তুমি জানতে আজ আমরা আসব?

-জি।

-কেমন করে জানতে?

-শিরী আম্মা বলেছিল।

-আচ্ছা রুনার মা, আমরা আজ আসব, একথা তুমি কাউকে বলেছিলে?

-বলেছিলাম।

-কাকে?

-আলী কাওসারকে।

-আলী কাওসার? কোন আলী কাওসার? আপো পর্বতের সিকিউরিটি প্রধান আলী কাওসার?

-জি।

একটু ভেবে আহমদ মুসা প্রশ্ন করল, তুমি তাকে এমনিতেই বলেছিলে, না তোমাকে সে জিজ্ঞাসা করেছিল?

-সে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, সাহেবরা কখন আসবে তুমি আমাকে বলতে পার রুনার মা?

-আর কাউকে বলোনি?

-জি না, বলিনি।

-ভেবে দেখ রুনার মা।

-গত দু'দিনে আলী কাওসার ছাড়া কারো সাথে আমার দেখাই হয়নি।

-তুমি এখন যেতে পার।

রুনার মা চলে গেল। আহমদ মুসা মুর হামসারকে জিজ্ঞাসা করল, আলী কাওসারকে তুমি পেয়েছিলে মুর হামসার?

-পেয়েছিলাম।

-ঘরে পেয়েছিলে?

-জি।

-সে ঘুমিয়ে ছিল, না জেগে ছিল?

-জেগে ছিল।

-তার পরণে ঘুমানোর পোশাক, না বাইরের পোশাক ছিল?

-বাইরের পোশাক।

একটু চিন্তা করল। তারপর বলল সে আবার, রাশিয়ানদের পুতুল হিসাবে তাহলে সে-ই এখানে কাজ করছে মুর হামসার। ওর চিন্তাধারা সম্মন্ধে জান কিছু তুমি?

-হো-চি মিন, চে-গুয়ে ভারার ভিষণ ভক্ত সে। ওদের অনেক বই আমি তার কাছে দেখেছি। থামল মুর হামসার। আবার সে বলল, কিন্তু এ ষড়যন্ত্র কি চায়?

-আমার মৃত্যু, সেই সাথে মিন্দানাওয়ের মানুষের ইসলামী চেতনার উৎখাত।

বলে আহমদ মুসা রাশিয়ানদের কাছ থেকে পাওয়া মানিব্যাগ থেকে একটি চিঠি বের করে মুর হামসারের হাতে দিল।

ব্যগ্রভাবে চিঠি হাতে নিয়ে চোখের সামনে মেলে ধরল। লেখা ছিলঃ

কমরেড উচিনভ।

তোমরা পাঠানো রিপোর্ট এখানে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।

ফিলিস্তিনের ঐ আপদ কেমন করে মিন্দানাওয়ে গেল আমরা বুঝতে পারছি না। যা হোক, মিন্দানাওয়ে ফিলিস্তিনের পুনরাবৃত্তি রোধ করতে হলে সেখানে মার্কসবাদের সফল প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে, আহমদ মুসাকে মিন্দানাওয়ের মাটি থেকে সরাতে হবে। সরাতে হবে চিরদিনের জন্য পৃথিবীর বুক

থেকে। তুমি যার সহযোগিতা পেয়েছ, তাতে সফলতার আশা আমরা করি। তুমি তাকে বলোঃ সেই হবে মিন্দানাওয়ের হো-চি-মিন।

শেষ কথাঃ দক্ষিণ ভিয়েতানাম বিজয়ের প্রধান স্তম্ভ কমরেড জেনারেল শোপিলভকে তোমার সাহায্যে পাঠালাম। তোমার এবং তার এখন একটিই কাজ হবেঃ আহমদ মুসাকে হত্যা করা।

কাগনোয়ারভিট

চেয়ারম্যান

সোভিয়েট ফার ইস্ট ইনটেলিজেন্স

সার্ভিস (ফিলিপাইন শাখা)

চিঠি পড়ে অনেক্ষণ মুখ দিয়ে কথা সরল না মুর হামসারের। অনেকক্ষণ পর সে ধীর কন্ঠে বলল, মিন্দানাওয়ের এই হো-চি-মিন কে হবে মুসা ভাই।

-আলী কাওসার।

-জাতির সাথে এত বড় বিশ্বাস-ঘাতকতা সে করল?

-মুর হামসার কিছু বলতে যাচ্ছিল। ঘড়ির দিকে চেয়ে আহমদ মুসা বলল, আর কোন কথা নয় মুর হামসার। তৈরী হয়ে নাও এক্ষুনি। কালকের সূর্যোদয়ের পূর্বেই এ বিশ্বাস-ঘাতকদের উৎখাত করতে হবে মিন্দানাওয়ের মাটি থেকে।

মুর হামসার তার কক্ষে চলে গেল। আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিল। পকেটে রিভলবার। কাঁধে ঝুলছে সাব মেশিনগান। এ ছাড়া একটি গ্যাস রিভলভারও রয়েছে তার বাম পকেটে।

সজ্জিত হয়ে মুর হামসারের ঘরে ঢুকল আহমদ মুসা। মুর হামসারের ঘর থেকে শিরী তার ঘরে যাচ্ছিল। একেবারে আহমদ মুসার মুখোমুখী পড়ে গেল সে। দৃষ্টি বিনিময় হলো দু'জনের। শিরীর অশ্রু-ধোয়া চোখ।

শিরী চলে গেল তার ঘরে। আহমদ মুসা মুর হামসারকে জিজ্ঞারা করল, শিরীর কি হয়েছে মুর হামসার। গম্ভীর কন্ঠস্বর তার।

-ঐ যে আমাদের আসার খবর সে রুনার মাকে বলেছে, এখন সে মনে করছে এটা করে বিরাট অপরাধ সে করে ফেলছে। আমি অনেক বুঝিয়েছি, তবু.....

হো হো করে হেসে উঠল আহমদ মুসা। বলল, বলো তাকে, এ ধরনের অপরাধ যারা করে, তাদের চোখে পানি থাকে না, থাকে প্রতিরোধ কিংবা প্রতিশোধের বহ্নি শিখা।

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই বাইরের কড়া নড়ে উঠল। পরিচিত সংকেত। মুর হামসার গিয়ে বাইরের গেট খুলে দিল। প্রবেশ করল আপোয়ান উপত্যকার নিরাপত্তা প্রহরী মুখতার।

মুখতার আহমদ মুসার সামনে এসে দাঁড়াল। হাপাচ্ছে সে। বলল, আমাদের আপোয়ান উপত্যকার ওপারে কাঠের ব্রীজ ধ্বসে গেছে। তার সঙ্গে গার্ড তাওছেরও মারা গেছে।

-ধ্বসে পড়েছে? তোমরা কোন বিষ্ফোরণের শব্দ পাওনি?

-তাওছের ব্রীজের মধ্যখানে পৌছার সঙ্গে সঙ্গে প্রচন্ড এক শব্দে ব্রীজটি ভেঙ্গে পড়েছে।

-সংবাদটা আলী কাওসারকে দাওনি?

-তাঁর ঘর বন্ধ। পেলামনা তাকে।

-তার ঘর বন্ধ?

-জি।

আহমদ মুসা দ্রুত দৃষ্টি বিনিময় করল মুর হামসারের সাথে। বলল, দেরী করে ফেলেছি আমরা। মুর হামসার তোমরা এস, আমি চললাম।

-কোথায় যাবেন আপনি?

-আলী কাওসারের খোঁজে।

-কোথায় পাবেন তাকে?

-পাহাড়ের সেই গুহায়। দেরী হয়ে গেলে সেখান থেকে সে ভাগবে।

আহমদ মুসা দ্রুত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। তাঁর পিছে পিছে মুর হামসার এবং মুখতারও।

আহমদ মুসা তীরের ফলার মত নেমে গেল পাহাড় থেকে। তারপর অপোয়ান উপত্যকার সমতল ভূমির উপর দিয়ে সে ছুটছে দক্ষিণ দিকে। মুর হামসাররা অনেক পিছনে পড়ে গেছে তাঁর।

অন্ধকারে হাতড়িয়ে চলছে আহমদ মুসা। টর্চ আছে হাতে, কিন্তু জ্বালাবার সুযোগ নেই। আহমদ মুসার অনুমান সত্য হলে সামনেই তার শত্রু। আলী কাওসার তাদেরকে অক্ষত দেহে ঘাঁটিতে ফেরতে দেখে ষড়যন্ত্র ফাস হওয়া সম্পর্কে নিশ্চয় সন্দিহান হয়ে পড়েছে। সুতরাং এই গুহায় তার প্রভূদের কাছে সে ছুটে আসবে সেটাই স্বাভাবিক।

পাহাড়ের সেই গুহাটি এসে পড়েছে। আর মাত্র পঞ্চাশ গজের মত। আহমদ মুসা ইনফ্রারেড গগলসটি পরে নিল। হাতে ছয়ঘরা বাঘা রিভলভার। শিকারী বিড়ালের মত হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে লাগল সে।

হঠাৎ তার মনে হল সামনের অন্ধকারটি নড়ছে। যেন এগিয়ে আসছে অন্ধকারটি। আহমদ মুসা থেমে গেল। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল সে। একটি পাথরের আড়ালে সে মাথা গুঁজে হামাগুড়ি দিয়ে বসে রইল। অন্ধকারটি তার সামনে দিয়েই যাচ্ছিল। আলী কাওসারকে সে পরিষ্কার চিনতে পারল। আলী কাওসারের পিছনে আর কাউকে না দেখে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা। পিছু নিল সে আলী কাওসারের। পিছনে পদশব্দ শুনে আলী কাওসার থমকে দাঁড়িয়েছিল। আহমদ মুসা গম্ভীর কন্ঠে বলল, ফিরতে চেষ্টা করোনা। যেমন যাচ্ছ, তেমনি এগিয়ে যাও।

কিন্তু আহমেদ মুসার কথা শেষ হবার আগেই আলী কাওসারের একটি হাত বিদ্যুৎ গতিতে উপরে উঠে এল।

আহমদ মুসা ট্রিগারে হাত রেখেই কথা বলছিল। সুতরাং আলী কাওসারের তর্জ্জনি তার ট্রিগারে চাপ দেবার আগেই আহমদ মুসার তর্জ্জনি চাপ দিল তার ট্রিগারে । একটি বুলেট আলী কাওসারের ডান বক্ষ ভেদ করল। আহমদ মুসা চেয়েছিল তার ডান হাতে গুলী করতে, কিন্তু আলী কাওসারের ডান হাতের বৃদ্ধাংগুলি ছুয়ে তা লাগল গিয়ে বুকে।

আর্তনাদ করে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল আলী কাওসারের দেহ।

মুর হামসাররা এসে পড়েছে।

টর্চের আলো জ্বলে উঠল।

রক্তে ভাসেছে আলী কাওসারের লাশ।

আহমদ মুসা ধীর কন্ঠে বলল, চেয়েছিলাম ওকে জীবন্ত ধরতে কিন্তু পারলাম না। বড্ড বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল সে।

-এ বিশ্বাস-ঘাতকদের হাত থেকে যত তাড়াতাড়ি অব্যাহতি পাওয়া যায়, ততই লাভ। মুর হামসার বলল।

-কিন্তু আলী কাওসারের মৃত্যুর সাথে সাথে আমরা এই য়ড়যন্ত্রের সাথে লিংক হারিয়ে ফেললাম। শিকড় আরো রয়ে গেল কি না!

-ষড়যন্ত্র থাকলে লিংক আমরা পাবই, যেমন এক সিগারেটের কেস থেকে এতবড় এক ষড়যন্ত্রের উদঘাটন হল। থামল মুর হামসার। বলল, সে আবার, আচ্ছা মুসা ভাই, আমি বুঝতে পারছিনা, আপনি ব্রীজের উপর দিয়ে না গিয়ে এদিকে এসেছিলেন কেন?

-রাশিয়ান সিগারেটের প্যাকেট এবং তাতে রুশ ভাষায় হস্তাক্ষর থেকে নিশ্চিত বুঝলাম, এখানে এক বা একাধিক রাশিয়ানের আগমন ঘটেছে। তারপর যথন অনুভব করলাম আজ এই সময় আমরা পৌছব এটা এখানে প্রকাশ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং সবশেষে যখন দেখলাম আমরা ব্রীজের গোড়ায় পৌছার কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত রাশিয়ানরা এখানে অপেক্ষা করে গেছে তখন বুঝলাম, নিশ্চয় কোন ফাঁদ পেতে রাখা হয়েছে আমাদের জন্য। ব্রীজটি যতটা আমি পর্যবেক্ষণ করেছিলাম সন্দেহের কিছু পাইনি। কিন্তু জানতাম এক ধরনের ম্যাগনেটিক মাইন আবিষ্কৃত হয়েছে, যার চারিদিকে সূক্ষাতিসূক্ষ তার বিছানো থাকে, মানুষের দেহ সে তার স্পর্শ করলেই মাইনে বিষ্ফোরণ ঘটে। আমার হঠাৎ মনে হয়েছিল, ব্রীজের লতা-পাতার ক্যামফ্লেজে সে রকম কোন তার জড়ানো রয়েছে। থামল আহমদ মুসা। একটু পরে বলল, আমার সন্দেহ সত্যি পরিণত হয়েছে। তাওছের ম্যাগনেটিক মাইনের তারেই জড়িয়ে পড়েছিল।

-আপনার দুরদর্শিতা এক বিপর্যয় থেকে আমাদের রক্ষা করল মুসা ভাই।

-কথাটা বড় ব্যক্তিকেন্দ্রীক হল মুর হামসার। এসব সাফল্যের কৃতিত্ব কোন ব্যক্তির নয়, সমষ্টির।

-ব্যক্তির ভূমিকার কি কোন মূল্য নেই এখানে?

-আছে, যেমন দেহের একটি অঙ্গের মূল্য। দেহেক বাদ দিয়ে অঙ্গের পৃথক কোন কৃতিত্ব নেই। সংগঠনও তেমনি দেহের মত। এখানে যদি ব্যক্তি চেতনা ও ব্যক্তি-কৃতিত্বের অহমিকা মাথা তুলে দাড়ায়, তা হলে সংগঠনের 'সীসার প্রাচীর' (বানিয়ানুম মারসুস) দেখা দেবে ফাটল।

মুর হামসার মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়েছিল তার প্রিয় নেতার দিকে। নতমুখে দাড়ানো মুখতার এবং পিসিডার কর্মীদের চোখে ঝরে পড়ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা ও বিস্ময়।

পূর্ব আকাশ তখন সফেদ হয়ে উঠছে। স্নিগ্ধ পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে সোবেহ সাদেকের বাতাস।

# ৫

ক্লু-ক্লাক্স-ক্লান পাগল হয়ে উঠেছে। জলজ্যান্ত জাহাজটি গেল কোথায়? বানিও সেলিবিসের মধ্যে দিয়ে জাহাজটি যখন মাকাসার প্রণালী পার হচ্ছিল তখনও জাহাজটি দিভাও-এর সাথে রেডিও লিংক বজায় রেখেছে। তারপর সেলিবিস সাগর থেকে জাহাজ যাবে কোথায়?

ক্লু-ক্লাক্স-ক্লান ও ইরগুন জাই লিওমির যৌথ অনুসন্ধানকারী দল গত এক মাসে সোলো সাগর, সেলিবিস সাগর, মরো উপ-সাগর ও দিভাও উপ-সাগর চষে ফেলেছে। ক্লু-ক্লাক্স-ক্লান আর কিছু নয় চায় শুধু রেডিয়েশন বম্ব। আবদুল্লাহ হাত্তাকে তো মেরেই ফেলা হয়েছে। সুতরাং জাহাজের ১০০টি রেডিয়েশন বম্ব ফিরে পেলে জাহাজ শুদ্ধ সবকিছু চুলোয় যাক ক্ষতি নেই। আর ইরগুন জাই লিউমি আঙুল কামড়াচ্ছে আহমদ মুসাকে হাতে পেয়ে হারিয়ে। একবার ওকে হাতের মুঠোয় পেলে ফিলিস্তিনের বিজয় উলল্লাসকে তারা থামিয়ে দিতে পারতো।

সুতরাং তারা হন্যে হয়ে খুঁজছে সব জায়গা। সেলিবিস সাগর থেকে মিন্দানাও পর্যন্ত কোন দ্বীপের উপকুল অঞ্চলও তারা বাদ দেয়নি। মিন্দানাও ও সোলো দ্বীপপুঞ্জের সমগ্র উপকুল তারা আতি পাঁতি করে খুঁজেছে। কিন্তু না পেয়েছে তারা জাহাজ না পেয়েছে তারা কোন সূত্র। পাবে কেমন করে? জাহাজটি আপো পর্বতে পৌছার দু'দিন পরেই আহমদ মুসার নির্দেশে উত্তর মিন্দানাওয়ের দুর্গম ও সংকীর্ণ ফাগায়ান উপসাগরে ওটাকে ডুবিয়ে ফেলা হয়েছে।

দীর্ঘ একমাস অনুসন্ধানের পর ক্লান্ত শ্রান্ত অনুসন্ধানকারী দল মিন্দানাওয়ে ক্লু-ক্লাক্স-ক্লানের হেড কোয়ার্টার দিভাওয়ে ফিরে এলো।

রিপোর্ট শুনে মিন্দানাওয়ের ক্লু-ক্লাক্স-ক্লান প্রধান মাইকেল এঞ্জেলো রাগে দুঃখে চুল ছিড়তে লাগল। রেডিয়েশন বম্ব কেলেঙ্কারী প্রকাশ হয়ে পড়ার পর ওগুলো পাওয়ার পথই শুধু বন্ধ হয়নি, সংগঠনের মাথার উপর বিপদের খাড়াও ঝুলছে। কিন্তু এত কিছু করে লাভ হলো কি? পরীক্ষামূলক দু'টি বম্ব ব্যবহার ছাড়া

আর কিছুই করতে পারলো না তারা। সব রাগ গিয়ে পড়ল অনুসন্ধানকারী দলের নেতা জন উইলিয়ামের উপর। মাইকেল এঞ্জেলা দাঁত খিঁচিয়ে বলল, অপদার্থ তোমরা। জাহাজ নিশ্চয় আছে কোথাও। রেডিয়েশন বম্বের খবর সেই জাহাজ সূত্র থেকেই খবরের কাগজে প্রকাশ পেয়েছে এবং এটা করেছে এ দেশের নেটিভ মুর শয়তানরাই। তা না হলে খবরটি এম পি আই পেল কি করে?

ক্রিং ক্রিং ক্রিং। মাইকেল এ্যাঞ্জেলোর লাল টেলিফোনটি বেজে উঠল। বিরক্তির সাথে টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিল সে।............

মাইকেল এ্যাঞ্জোলোর পাঁচ তলা ভবনটির নীচে প্রায় ১০০ গজ দূরের একটি পাইলক টেলিফোন বুথে কানে টেলিফোন এলো- কে? মাইকেল এ্যাঞ্জেলোর কন্ঠ।

-লিলিয়েভ। সোভিয়েট ফার ইস্ট ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের একটি চিঠি নিয়ে এসেছি।

-কার জন্য?

-আপনার নামে।

-আমার নামে? আমি কে?

-মাইকেল এ্যাঞ্জেলো। ক্লু-ক্লাক্স-ক্লানের মিন্দানাও প্রধান।

-আসুন।

-কখন আসব, এখনি?

-না, এখন আমি ব্যস্ত। আগামীকাল সকাল ন'টা।

-আচ্ছা। বলে টেলিফোন রেখে দিল লিলিয়েভ।

লিলিয়েভ টেলিফোনের রিসিভার রেখে দেবার সাথে সাথে একজন লোক টেলিফোন বুথের বন্ধ দরজার সামনে থেকে সরে গেল। এতক্ষণ সে দরজার ফুটায় কান লাগিয়ে কথোপ-কথন শুনছিল। লোকটি দ্রুত একটি দ্বিতল হোটেলে গিয়ে উঠল।

লোকটি আবদুল্লাহ জাবের। কায়রো থেকে তাকে এনে দিভাও-এ রাখা হয়েছে। দিভাও পিসিডা শাখার অধিনায়ক সে।

এখানে তার পরিচয়ঃ একজন নেটিভ খৃস্টান। ম্যানিলায় রেস্টুরেন্ট চালাত। উন্নতির আশায় এসেছে দিভাওয়ে। হঠাৎ সে হোটেলটি পেয়ে কিনে নিয়েছে। আবাসিক এ হোটেলটিতে মোট ২১ টি কক্ষ। এর একটিতে আবদুল্লাহ জাবের নিজেই থাকে। আবদুল্লাহ জাবের এখানে কলিন্স নামে পরিচিত। সবাই জানে লোকটি বড় আমুদে। অল্পদিনেই সে সবার সাথে সম্পর্ক পাতিয়েছে। দেড়শ' গজ দুরের ক্লু-ক্লাক্স-ক্লান হেড কোয়ার্টারের সবাই এখন তার ঘনিষ্ঠ খদ্দের।

টেলিফোন বুথ থেকে বেরিয়ে লিলিয়েভ মেয়েটাও এসে হোটেল ঢুকল। আজ ভোরে সে ম্যানিলা থেকে দিভাও এসেছে। সোজা এই হোটেলেই এসে উঠেছে সে।

লিলিয়েভ রাশিয়ান মেয়ে। কিন্তু তার দেহে জাপানী বৈশিষ্ট্যই যেন বেশী। বয়স ২৪/২৫ এর বেশী হবে না। উচ্ছ্বল যৌবনে অপরূপ লাবন্যের মোহনীয় প্রলেপ।

মিনিস্কার্ট পরে মাজা দুলিয়ে হাইহিলের গট্ গট্ শব্দ তুলে যখন লিলিয়েভ হোটেলের করিডোর দিয়ে প্রবেশ করছিল, তখনি আবদুল্লাহ জাবের স্বগতঃ কন্ঠে বলেছিল, ভদ্রে, হয় তুমি বল্লাক মার্কেটের, নয় কোন ভয়ংকর এজেন্ট, নতুবা হবে কলগার্ল।

কিন্তু কোনটি?

এই জবাব পাবার জন্যই আবদুল্লাহ জাবের চোখ রেখেছিল তার প্রতি।

কিন্তু যে জবাব পেল, তা রাতের ঘুম কেড়ে নিল। সোভিয়েট ফার ইস্ট ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের এজেন্ট দিভাওতে কেন। পশ্চিমী সন্ত্রাসবাদী সংস্থার কাছে কি চিঠি বয়ে এনেছে লিলিয়েভ? আপো পর্বতে কুপোকাত হবার পর আবার কোন চাল শুরু করেছে তারা।

শেষে মনে মনে একটি বুদ্ধি স্থির করে খুশীতে গুনগুন করে উঠল আবদুল্লাহ জাবের।

নতুন বোর্ডারদের রুমে রুমে শুভেচ্ছা সফর আবদুল্লাহ জাবেরের বিশেষ একটি অভ্যাস।

এই শুভেচ্ছা সফরে সেদিন রাত সাড়ে ন'টায় সে গিয়ে নক করল লিলিয়েভের রুমে।

কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। ভিতর থেকে চাবি খোলার খুট খাট শব্দ এল। দরজা খুলে গেল।

দরজা খুলে আবদুল্লাহ জাবেরকে দেখেই লিলিয়েভ সহাস্যে বলে উঠল, হ্যাল্লো মিঃ কলিন্স, হাউ-ডু-ইউডু আসুন আসুন।

-ও! অল রাইট লিলিয়েভ। বলতে বলতে ঘরে ঢুকল আবদুল্লাহ জাবের।

লিলিয়েভ গিয়ে সোফায় বসল। ওর গায়ে জড়ানো ছিল বড় এক তোয়ালে। ছুড়ে ফেলে দিল তা দূরে। তার গোটা দেহে এখন মাত্র দু'চিলতে কাপড় অবশিষ্ট রইল।

ঘরের চারদিকে নজর বুলাল জাবের। লিলিয়েভের সামনের টেবিলে ছিল একটি রিভলভার, একটি সিগার কেস ও একটি লাইটার। ঘরে আর বাড়তি জিনিসের মধ্যে রয়েছে একটি ব্রিফকেস ও একটি সাইড ব্যাগ।

আবদুল্লাহ জাবের সোফায় বসতে বসতে রিভলভারটির দিকে ইংগিত করে বলল, ও বস্তুটি সরিয়ে নিন মিস লিলিয়েভ, আপনার মত মনোরমার সাথে কোন ঝগড়া-ঝাঁটি আমার নেই।

খিল খিল করে হেসে উঠল লিলিয়েভ। বলল, 'ইউ আর ইন্টারেষ্টিং মিঃ কলিন্স।' বলে সে রিভলভার ছুড়ে দিল বিছানার উপর।

-এন্ড নাও মিস লিলিয়েভ কিছু একটা গায়ে জড়িয়ে নিলেই ভাল হয়।

-কেন?

-শান্ত মনে দুটো কথা বলতে পারি।

-মন অশান্ত হওয়ার কি ঘটেছে?

-তোমার অবারিত ওই উত্তাপ?

আবার সেই ঠান্ডা খিলখিল হাসি। বললো সে, সত্যিই তুমি এক প্রাণবন্ত পুরুষ মিঃ কলিন্স। কিন্তু এর পরের আবদারটা হবে কি শুনি।

-মিস লিলিয়েভ ক্লু-ক্লাক্স-ক্লানের জন্য কি সংবাদ বহন করে এনেছো?

লিলিয়েভ বিস্মিত হলো না, নড়ে চড়ে বসল। সেই ঠান্ডা হাসি তার মুখে। বলল, জানতাম এ প্রশ্ন তোমার কাছ থেকে আসবে, কিন্তু এমন সহজ আব্দার হয়ে আসবে, তা ভাবিনি। তুমি কে মিঃ কলিন্স?

-ইরগুণ জাই লিউমি'র ডেভিড আব্রাহাম। আজ একমাস ধরে কলিন্স সেজে হোটেল খুলে বসে আছি আমি।

-প্রমাণ?

-তুমি যে সোভিয়েট ফার ইস্ট ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের লিলিয়েভ তার প্রমাণ?

লিলিয়েভ কোন উত্তর দিল না। আবদুল্লাহ জাবেরের চোখে চোখ রেখে কি ভাবছিল। বলল, পাবলিক টেলিফোন বুথে তোমার আড়িপাতা আমি ধরে ফেলতে পেরেছি, কিন্তু আমাকে তুমি সন্দেহ করেছিলে কখন?

-ম্যানিলা থেকে আমাকে জানানো হয়েছিল।

-কিন্তু আমরা ক্লু-ক্লাক্স-ক্লানের জন্য যে সংবাদ বহন করে এনেছি, তা তোমরা জানতে চাও কেন?

-তার সবটুকু আমরা জানতে চাই না, হারানো জাহাজ সম্পর্কে কিছু থাকলে সেটা আমরা জানতে চাই।

-ক্লু-ক্লাক্স-ক্লানের হারানো জাহাজের সাথে ইরগুন জাই লিউমির সম্পর্ক?

জাহাজে ছিল আহমদ মুসা জাহাজের সন্ধান পেলে তারও সন্ধান মিলবে।

-কিন্তু এটা তো ক্লু-ক্লাক্স-ক্লানের কাছ থেকেও জানতে পার।

-না, আমরা আর ওদের মুখাপেক্ষী হতে চাইনে।

৫০ মিলিয়ন ডলার আমরা পানিতে ফেলে দিতে চাইনে আর।

মিটি মিটি ঠান্ডা হাসি হাসছে লিলিয়েভ। সিগারেট কেস থেকে একটি সিগারেট বের করে হাতে নিল। বলল, কিন্তু তুমি কেমন করে বুঝলে যে সোভিয়েত ফার ইস্ট ইনটেলিজেন্স সার্ভিস খয়রাতি প্রতিষ্ঠান? পায়ে হেঁটে এসে এমনি এমনি তোমার পকেটে দিয়ে যাবে খবর?

-আহমদ মুসার উৎখাতের মধ্যে আমাদের কমন ইন্টারেস্ট রয়েছে লিলিয়েভ।

-তাহালে ক্লু-ক্লাক্স-ক্লানকে এ থেকে বঞ্চিত করতে চাও কেন?

-বঞ্চিত নয়, ওদের উপর নির্ভরশীল হতে চাইনা।

-হু। বলে সিগারেটটি মুখে পুরে দিল লিলিয়েভ।

আবদুল্লাহ জাবের লিলিয়েভের চোখের দিকে মুহূর্তের জন্য চেয়ে এক ঝটকায় উঠে দাড়িয়ে লিলিয়েভের মুখ থেকে সিগারেটটি কেড়ে নিতে নিতে বলল, রিভলভারের চেয়েও বড় সিরিয়াস, এর আলপিন হেডড বুলেট।

অদ্ভুত শক্তিশালী নার্ভ লিলিয়েভের। কোন ভাবান্তর এলনা তার মধ্যে। সাপের মত ঠান্ডা সেই নিঃশব্দ হাসি দেখা দিল তার ঠোঁটে। বলল, আমি যতটা মনে করেছিলাম, তার চেয়েও বেশী চালাক তুমি। এস শত্রুতা ভুলে গিয়ে আমরা বন্ধু হই।

-কিন্তু তার আগে তোমার হাতের ঐ লাইটার ফেলে দাও। ওতে গ্যাস চেম্বার নেই কে বলবে?

লাইটারটি বিছানার উপর ছুঁড়ে দিতে দিতে লিলিয়েভ বলল, বড় শক্ত চিজ তুমি।

থামল লিলিয়েভ। একটু পরে আবার বলল, তুমি আমাকে জান, আমিও তোমাকে জানি। তুমি শক্তিমান, সুদর্শন, তীক্ষ্ণধী। তোমাকে বন্ধু হিসাবে পেলে আমি সুখী হব মিঃ কলিন্স।

চোখ দু'টি চক্ চকে হয়ে উঠেছে লিলিয়েভের।

-কিন্তু শত্রুতার কোন সুযোগ, কোন উপায়কেই তো তুমি হাতছাড়া করছ না।

লিলিয়েভ হাসল। বলল নিশ্চয়তা দাও, চিঠিটি তুমি চাইবে না।

-বন্ধুর প্রতি বন্ধুর এই কি মনোভাব।

-চিঠির সাথে আমাদের স্বার্থের প্রশ্ন জড়িত।

কত কোটি টাকা নিয়ে সোভিয়েট ইনটেলিজেন্স সার্ভিস ক্লু-ক্লাক্স-ক্লানকে জাহাজ সম্পর্কে তথ্য পরিবেশন করছে?

প্রথমবারের মত লিলিয়েভের চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল। কিন্তু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করে বলল, টাকার স্বার্থ নেই, স্বার্থটি অনেক বড়।

-কি সে স্বার্থ?

অপ্রাসঙ্গিক কিন্তু এ প্রশ্ন? এর সাথে ইরগুন জাই লিউমি'র কোন সম্পর্ক নেই।

-নিশ্চয় আছে আমরা যদি সে মূল্য দিয়ে সে চিঠি কিনে নিতে পারি?

-তা যদি সম্ভব হতো আমার আপত্তি ছিল না।

কথাটি শেষ করেই লিলিয়েভ এসে আবদুল্লাহ জাবেরের পাশে বসল। তার মসৃণ উরুটি আবদুল্লাহ জাবেরের উরু স্পর্শ করেছে। ও সোফায় হেলান দিয়ে বসেছে। দু'টি হাত দু'দিকে সোফার উপর দিয়ে প্রসারিত। শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে তার উন্নত বুকের উঠা-নামা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নীরব লিলিয়েভ।

আবদুল্লাহ জাবের বলল, দুনিয়ায় কি অসম্ভব কিছু আছে লিলিয়েভ?

লিলিয়েভ আবদুল্লাহ জাবেরকে জড়িয়ে ধরে বলল, ওসব সম্ভব অসম্ভবের কথা এখন থাক মিঃ কলিন্স। এস আমরা কিছুক্ষণের জন্য ভুলে যাই সব।

আবদুল্লাহ জাবেরের ঠোটে খেলে গেল এক টুকরা হাসি। বলল সে, এটাই তোমার শেষ অস্ত্র লিলিয়েভ?

লিলিয়েভের হাতের বাঁধন দৃঢ়তর হলো। বলল সে, আবার সেই কথা। এসো না আমরা কিছুক্ষণের জন্য চাকরির জগত থেকে দূরে সরে যাই।

আবদুল্লাহ জাবেরের বাম কাঁধে লিলিয়েভের মাথা। ওর নরম ওষ্ঠাধরের উষ্ণ স্পর্শ সে অনুভব করছে তার গলায়। এক নির্মল শুড়শুড়ি ছড়িয়ে পড়ছে গোটা দেহে। লিলিয়েভের ডান হাত জড়িয়ে রয়েছে তার গলা। আর তার বাম হাত আবদুল্লাহ জাবেরের জানুর উপর ছড়িয়ে রাখা ডান বাহুর উপর ন্যস্ত। লিলিয়েভের বাম হাতের মধ্যমায় একটি আংটি। বড় রকমের নীলাভ পাথর বসানো আংটিতে। পাথরের ঠিক মধ্যখানে সুক্ষ একটি ফুটো চোখে পড়ল আবদুল্লাহ জাবেরের। চেতনার দুয়ারে একটা কথা ঝিলিক দিয়ে গেল তার ডেথরিং-মৃত্যু আংটি।

স্পাইগার্লদের একটা মোক্ষম অস্ত্র এই ডেথরিং। আংটির পাথরে একটু চাপ পড়লেই ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে সূচের অতি তীক্ষ অগ্রভাগ। ভয়ংকর

পটাসিয়াম সাইনাইড মাখানো তাকে তার মাথায়। শেষ অস্ত্র এটা স্পাইগার্লদের। কামনার জালে বেঁধে প্রতিদ্বন্দ্বীকে সে তুলে নেয় বুকে। তারপর নায়ক যখন উন্মুক্ত কামনার অথৈ স্রোতে ভুলে যায় নিজেকে, ভুলে যায় সব কিছু। তখন আস্তে করে সে ডেথরিং চেপে ধরে তার দেহে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই খেলা সাঙ্গ হয়। প্রতিদ্বন্দ্বী ঢলে পড়ে নীল মৃত্যুর কোলে।

আবদুল্লাহ জাবের লিলিয়েভের বাম হাতটি তুলে নিল হাতে। মুখনীচু করে ফিসফিসে কন্ঠে ডাকল, লিলিয়েভ।

লিলিয়েভ কোন কথা বলল না। মুখ উচু করে ওষ্ঠাধার মেলে ধরল। ধীরে ধীরে তা এগিয়ে এল আবদুল্লাহ জাবেরের ঠোট লক্ষ্যে।

আবদুল্লাহ জাবের মুখ ঈষৎ উঁচু করে বলল, কত লোককে এই ডেথ রিং দিয়ে হত্যা করেছ লিলিয়েভ?

এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল লিলিয়েভ। এক লাফে গিয়ে রিভলভার তুলে নিল সে। চোখ ওর ধকধক করে জ্বলছে। রিভলভারের নল আবদুল্লাহ জাবেরের কপাল লক্ষ্যে চেয়ে আছে।

ঘটনাটা এমন আকস্মিকভাবে ঘটে গেল যে, আবদুল্লাহ জাবের বিস্ময় বিমুঢ় হয়ে পড়ল। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্য। সে লিলিয়েভের চোখে চোখ রেখে বলল, দেবী যে বাহুপাশ থেকে একেবারে রণভূমে? আমি খারাপ তো কিছু বলিনি।

-আমার বাহুপাশ থেকে তুমিই প্রথম জীবিত বেরিয়ে গেলে। ডেথরিং থেকে বেঁচেছো, কিন্তু এ বুলেট তোমাকে খাতির করবে না।

-কিন্তু আমার দোষটা কোথায়?

আবদুল্লাহ জাবেরের চোখে কিন্তু পলক পড়েনি। লিলিয়েভের চোখও যেন গেথে আছে তার চোখের সাথে।

আবদুল্লাহ জাবেরের সামনে একটি কাঠের টিপয়, তারপর সোফা। সোফার ওপারেই দাড়িয়ে আছে লিলিয়েভ। দুরত্ব প্রায় ৩ গজের মত। ইঞ্চি ইঞ্চি করে আবদুল্লাহ জাবের টিপয়ের দিকে এগুচ্ছিলো। টিপয় পায়ের নাগালে আসলে একবার দেখা যেত।

-তুমি চালাক, আমি স্বীকার করি। কিন্তু আমাকে ফাকি দিতে তুমি পারনি। তুমি জাননা, ইরগুণ জাই লিউমির সাথে আমাদের আগেই চুক্তি হয়ে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আবিষ্কৃত সাগর তলার ‘ঘুমন্ত ক্ষেপনাস্ত্র’ সম্বন্ধনীয় গোপন তথ্য সরবরাহের বিনিময়ে আমরা ওদের আহমদ মুসা সম্পর্কিত তথ্যাদি দিয়ে দিয়েছি। সোলো সাগর ও দক্ষিণ চীন সাগরের মধ্যবর্তী ‘পাল-ওয়াং’ দ্বীপ যদি ক্লু-ক্লাক্স-ক্লান আমাদের দিতে রাজী হয় তাহলে ওদেরকেও আমরা জাহাজ ও রেডিয়েশন বম্ব সম্পর্কিত সব খবর দিয়ে দিব।

কথা বলার সময় লিলিয়েভের চোখ আনন্দে চিক্ চিক্ করছিল।

কাঠের টিপয়টি আবদুল্লাহ জাবেরের পায়ের আওতায় এসে গেছে। কিন্তু ব্যাপারটা লিলিয়েভের দৃষ্টি এড়াল না। বলল সে, আর এক ইঞ্চি সামনে এগিও না, গুড়ো করে.....

কিন্তু কথা তার শেষ হলো না। আবদুল্লাহ জাবেরের পা বিদ্যুৎ গতিতে উপরে উঠল। এক নিখুঁত আঘাতে কাঠের ক্ষুদ্র টিপয়টি ছুটে চলল লিলিয়েভের মাথা লক্ষ্যে।

একটু সরে দাঁড়িয়েছিল লিলিয়েভ। রিভলভারের নল সরে গিয়েছিল। এই সুযোগেরই অপেক্ষা করছিল আবদুল্লাহ জাবের। সে সোফার উপর দিয়ে এক লাফে ঝাঁপিয়ে পড়ল লিলিয়েভের উপর। লিলিয়েভের তর্জ্জনি রিভলভারের ট্রিগার চেপে ধরল বটে, কিন্তু গুলী গিয়ে পড়ল দক্ষিণের দেয়ালে।

রিভলবার কেড়ে নিল আবদুল্লাহ জাবের। কিন্তু লিলিয়েভ দাঁত দিয়ে প্রচন্ড শক্তিতে কামড়ে ধরেছে তার বাম বাহু। দাঁত বসে যাচ্ছে তার চামড়া কেটে ভিতরে। লিলিয়েভের ডেথরিং এর শিতল স্পর্শ অনুভব করল আবদুল্লাহ জাবের তার বাম পাজরে। প্রচন্ড এক ধাক্কায় সে সরিয়ে দিল লিলিয়েভকে। ভীষণ যন্ত্রণা অনুভব করল জাবের তার বাম বাহুতে। বাম বাহুর খানিকটা মাংস তুলে নিয়ে গেছে লিলিয়েভ। রক্তে ভিজে গেছে লিলিয়েভের মুখ। রক্তে ভেসে যাচ্ছে আবদুল্লাহহ জাবেরের বাম বাহু।

-রক্তপায়ী ডাইনি। বলে এক প্রচন্ড লাথি মারল লিলিয়েভের তলপেটে। বসে পড়ল লিলিয়েভ। তারপর অজ্ঞান হয়ে পড়ল মেঝেতে।

লিলিয়েভের ব্রিফকেস, সাইডব্যাগসহ সমগ্র ঘর আতি-পাতি করে খুঁজল আবদুল্লাহ জাবের। কিন্তু চিঠি কোথাও পেল না। শেষে ওয়েষ্টপেপার বাস্কেটের তলায় সে পেয়ে গেল চিঠিটি।

চিঠিটি পকেটে পুরে লিলিয়েভকে বেঁধে বিছানায় শুইয়ে রেখে দরজার চাবি এঁটে বেরিয়ে এলো জাবের।

আবদুল্লাহ জাবেরের কক্ষে উৎকণ্ঠিতভাবে বসে ছিল হোরায়রা। আবদুল্লাহ জাবেরের রক্তাক্ত হাত, আর বিরাট ক্ষত দেখে চমকে উঠল সে। সে প্রশ্নবোধক দৃষ্টি মেলে ধরল আবদুল্লাহ জাবেরের দিকে।

হোরায়রা দিভাও থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরের ছানাবাও অঞ্চলের ছালেমী গোত্রের সরদার জাফর আলীর ছেলে। ১০ বছর আগে মিশনারী ও নেটিভ খৃষ্টানদের সাথে সংঘটিত এক সংঘর্ষে জাফর আলী নিহত হয়। ২৫ বছরের যুবক হোরায়রা এখন পিসিডার একজন নিষ্ঠাবান কর্মী। দিভাওয়ে সে আবদুল্লাহ জাবেরের সহকারী হিসেবে কাজ করছে।

আবদুল্লাহ জাবের হোরায়রাকে লিলিয়েভের ঘরের চাবি দিয়ে বলল, রাত বারটার দিকে লিলিয়েভকে সরিয়ে ফেলতে হবে এখান থেকে। আপাততঃ ওকে রাখতে হবে শহরের বাইরে আমাদের নুরানাও ঘাঁটিতে। তারপর মুসা ভাইয়ের নির্দেশ মোতাবেক যা হয় করা যাবে।

আর সবাইকে বলে দেবে এবং থানাতেও জানিয়ে রাখবে আমাদের ১১ নং বোর্ডার রাত্রিতে বাইরে গিয়ে আর ফিরে আসেনি।

-আচ্ছা জনাব। বলে উঠে দাঁড়াল হোরায়রা।

আবদুল্লাহ জাবের আলমারী খুলে ফার্স্ট এইডের বাক্সটি নিয়ে বাথরুমে প্রবেশ করল।

দরজা টেনে বন্ধ করে বেরিয়ে গেল হোরায়রা।

# ৬

আপো পর্বতে পিসিডার হেড কোয়ার্টার। আহমদ মুসার কক্ষ। একটি সেক্রেটারিয়েট টেবিলের পাশে রিভলভিং চেয়ারে বসে আছে আহমদ মুসা। তাঁর ডান পাশে এক বৃদ্ধ। মাথায় শ্বেত-শুভ্র বাবরি, মেহেদিরঞ্জিত দাড়ি। সফেদ পোশাক পরিধানে। তাঁর মুখমন্ডল থেকে পবিত্র এক জ্যোতি যেন ঠিকরে পড়ছে। ইনি আবু আল্-মখদুম। সোলো ও মিন্দানাও দ্বীপপুঞ্জে সবচেয়ে প্রাচীন পবিত্র কুঞ্জবন মসজিদের ইমাম। এই মসজিদের পাশেই এক সমাধিতে শুয়ে আছেন করিম আল-মাখদুম। আজ এগার শ' বছর ধরে সোলো ও মিন্দানাওবাসীদের হৃদয় নিংড়ানো ভক্তি-শ্রদ্ধার কেন্দ্র এই মাজার-এই মসজিদ। সেই সুলতান আবুবকর থেকে সোলো ও মিন্দানাওয়ের সকল সুলতানের রাজ্যাভিষেকের কেন্দ্রও এই মসজিদ- এই মাজার।

আহমদ মুসার বাম পাশে বসেছিল মুর হামসার।

পাশের আপওয়ান উপত্যকা থেকে ভেসে আসছিল আজানের সুর। উপত্যকা অধিত্যকায় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে কেঁপে কেঁপে আজানের শেষ সুরটুকুও মিলিয়ে গেল বাতাসে।

আলী আল-মখদুমের পাতলা ঠোট দু'টি নড়ে উঠল। অস্ফুটে শ্রুত হলো তাঁর কণ্ঠ ''আহ! আজ সে কত বছর আগে!! সোলো মিন্দানাও দ্বীপপুঞ্জের মানুষ তখন পশুর মত পশুর সাথে উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়াত। পূজা করত তারা জড়পদার্থের। স্রষ্টার কোন পরিচয় তারা জানত না। এমনি দিনে ১৩১১ খৃষ্টাব্দের এক সুবেহ্ সাদেক। সোলো সাগরের অথৈ জলে ভাসমান সোলো দ্বীপুঞ্জে 'সীমনুল' দ্বীপ। কাঠের উপরে লোহার পাত বসানো একটি নৌকা ঢেউয়ের তালে নাচতে নাচতে এসে ভিড়ল সেই দ্বীপে। জাহাজ থেকে প্রথমে নামলেন একজন আরব। পরে আরও কয়েকজন তাঁর চীনদেশী সাথী। সোলো সাগরের পানিতে অজু করলেন তাঁরা। তারপর সোলো ও মিন্দানাও দ্বীপপুঞ্জের ইতিহাসে প্রথম

বারের মত ধ্বনিত হলো আজানের সুর- আহ! এই সেই আজান! কিন্তু যিনি সোলো ও মিন্দানাও দ্বীপুঞ্জের মাটিতে প্রথম আজান দিয়েছিলেন, প্রথম নামাজ পড়েছিলেন, সেই অলি আল্লাহ করিম আল-মখদুম আজ নেই। আমরা তারই অধস্তন। কিন্তু.........

থামলেন আলী আল-মাখদুম। রুমালে চোখ মুছলেন তিনি। মোহমুগ্ধের মত আহমদ মুসা চেয়ে আছে তাঁর দিকে।

আবার মুখ খুললেন তিনি। তারপর গড়িয়ে গেছে কতদিন। সোলো ও মিন্দানাও দ্বীপপুঞ্জের অন্ধকার বুককে আলোকিত করে তুলল ইসলাম। মানুষকে মানুষ বানাবার সাধনায় মগ্ন হলো মুসলমানরা। আরো পরে সুমাত্রা থেকে এলেন যুবরাজ রাজাহ বরগুইবা আলী এক বিরাট নেŠবহর নিয়ে। ইসলামের শিখা উজ্জ্বলতার হলো আরও। উল্টে চললো কালের পাতা। গত হলো একশ' উনচলিস্নশ বছর। আরব ভূমি থেকে এলেন পাদুকা মহাসরি মওলানা আস সুলতান শরিফ আল হাসমি সুলতান আবু বকর। সোলো ও মিন্দানাওয়ে মুসলিম সালতানাতের সৃষ্টি হলো তাঁর হাতেই। আইনের বিধিবদ্ধকরণ, শরিয়তী ব্যবস্থা প্রবর্তন, আরবী বর্ণমালার প্রচার ও প্রসার সাধন এবং শাসন সুবিধার জন্য আঞ্চলিক বিভাগ গঠন তার হাতেই সম্পাদিত হলো। তারপর অতি নীরবে, অপরিসীম প্রশান্তিতে এগিয়ে চলল ইসলামের অগ্রযাত্রা ছ' শ' বছর ধরে।

থামলেন আলী আল্ মাখদুম। ভাবনার কোন অতল রাজ্যে তিনি হারিয়ে গেছেন। আহমদ মুসা বললেন, তারপর জনাব।

-তারপর শান্তির রাজ্যে ঘটে গেল বিপর্যয়। গলায় ক্রস দুলিয়ে আর হাতে বন্দুক নিয়ে এল খৃষ্টান পর্তুগীজ ও স্পেনীয়রা। তারপরের ইতিহাস অন্যায় আর জুলুমের বিরুদ্ধে সংঘাত আর সংঘর্ষের ইতিহাস।

একটু থামলেন আলী আল্ মাখদুম। তারপর পরিপূর্ণভাবে আহমদ মুসার দিকে চেয়ে তিনি বললেন, সংগ্রামের চুড়ান্ত পর্যায়ে তোমাকে আমরা পেয়েছি বাবা আল্লাহর মহাদান হিসেবে। আমি আশা করি, আমি দোয়া করি অলি আল্লাহ করিম আল মখদুমের দেশে আবার তুমি হাসি ফুটিয়ে তুলবে।

শেষের কথাগুলো বলতে বলতে কন্ঠ ভারী হয়ে উঠল আলী আল মখদুমের। চোখ দু'টি বুজে গেল তার।

সবাই নীরব। নীরবতা ভাঙলেন আহমদ মুসা নিজে। মুর হামসারের দিকে চেয়ে বললেন, ভাবতে বিস্ময় লাগে, এত সম্পদ এত প্রাচুর্য সত্ত্বেও সোলো ও মিন্দানাওবাসীদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয়নি।

মুর হামসার বলল, ভাগ্যের পরিবর্তন তাদের হয়েছে, তাদের অনেকের গলায় ক্রস ঝুলছে। উন্নয়নের ক্ষেত্রে আর কিছু না হোক দেশে আপনি বহু মিশনারী স্কুল ও মিশনারী হাসপাতালের সাইন বোর্ড দেখতে পাবেন। ঐসব মানুষ ধরার ফাঁদে যারা পা দিচ্ছে, তাদেরকে ফিরে পাওয়া যাচ্ছে না।

থামল মুর হামসার। আহমদ মুসা বললো, ঘৃণ্য কৌশল এটেছে ওরা। মিন্দানাওবাসীদের অন্ধকারে রেখে, অনুন্নত রেখে বিশ্ববাসীর অলক্ষ্যে তাদের হজম করে ফেলার পরিকল্পনা এটেছে ওরা।

-বিপদ শুধু একদিক থেকে নয় ভাইয়া। আমাদের অসহায়ত্বের সুযোগ গ্রহণের জন্য কমিউনিষ্ট শক্তি তৎপর হয়ে উঠেছে। আলী কাওছারের ঘটনা তাদের ষড়যন্ত্রের একটা দৃষ্টান্ত মাত্র। এছাড়া রয়েছে 'ফিলিপাইন জাতীয়তা' নামক সর্বগাসী ষড়যন্ত্রের আর এক বিষাক্ত থাবা। ত্রিমুখী সংগ্রাম আমাদরে সামনে।

থামল মুর হামসার। কিছু বলার জন্য আহমদ মুসা মুখ খুলেছিল। কিন্তু বলা হলো না। টেবিলের অয়ারলেস যন্ত্রে লাল সংকেত জ্বলে উঠল। একটানা বিচিত্র এক শব্দ উঠল যন্ত্র থেকে।

অয়ারলেস যন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়ল আহমদ মুসা। কানে তুলে নিল অয়ারলেস রিসিভার।

-আহমদ মুসা স্পিকিং।

ওপার থেকে একটি স্পষ্ট কন্ঠ ভেসে এলো, আমি আবদুল্লাহ জাবের।

-কি খবর বল! উৎগ্রীব কন্ঠ বলল আহমদ মুসা।

আবদুল্লাহ জাবের লিলিয়েভের ঘটনা সমস্তটা আহমদ মুসাকে জানাল, তারপর বলল, আমি বলছি, লিলিয়েভের সে চিঠি লিখে নিন জনাব।

আহমদ মুসা বাম হাতে ওয়ারলেস রিসিভার ধরে রেখে ডান হাতে প্যাড ও কলম টেনে নিল। সাইমুমের পরিচিত কোডে প্রেরীত চিঠিটি লিখে চলল সে-

চেয়ারম্যান
ক্লু-ক্লাক্স-ক্লান
দিভাও মিন্দানাও।

আমরা আপনাদের হারানো জাহাজ, রেডিয়েশন বম্ব এবং আহমদ মুসার সঠিক অবস্থানের পুর্ণ তথ্য অবগত রয়েছি। আমরা এসব তথ্য দিয়ে আপনাদের সাহায্য করতে পারি, যদি আপনারা আমাদের সাথে নিম্নলিখিত শর্তে রাজী হনঃ

এক, দক্ষিণ চীন সাগর ও সোলো উপসাগরের মধবর্তী পালওয়াং দ্বীপে সোভিয়েট নৌবহরের স্থায়ী ল্যান্ডিং সুযোগ থাকবে।

দুই, সোলো ও মিন্দানাও দ্বীপপুঞ্জে যীশুর রাজত্ব কায়েম হোক আপত্তি নাই, কিন্তু সেখানে প্রগতিশীল আন্দোলনের পথ বন্ধ করা চলবে না। দিভাও কারাগার থেকে প্রগতিশীল কর্মী চার্লস হ্যামিলটনকে অবিলম্বে ছেড়ে দিতে হবে।

তিন, উত্তর মিন্দানাওয়ের কাগায়ান বেজ সোভিয়েট ইয়ারফোর্সে মাত্র তিনদিনের জন্য ব্যবহারের অনুমতি চায়।

উপরোক্ত শর্তগুলো যদি ক্লু-ক্লাক্স-ক্লান ও তার পরিচালিত সেখানকার সরকার মেনে নেয় তাহলে আমাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আমরা আমাদের নিজস্ব পথ অনুসরণ করব।

কাগনোয়াভিচ
চেয়ারম্যান,
সোভিয়েট ফার
ইষ্ট ইনটেলিজেন্স সার্ভিস

চিঠি নোট শেষ করা হলে আহমদ মুসা বলল, লিলিয়েভ মিশনের ব্যর্থতায় সোভিয়েট ইনটেলিজেন্স আরও পাগল হয়ে উঠবে। আবার আসবে তারা দিভাওয়ে। তা আসুক। তুমি আজই চলে এসো কাগায়ানে। শরিফ সেখানে আছে।

তোমাদের কাজ হবে কাগায়ান বেজের কার্যধারার প্রতি নজর রাখা। আর শোন, লিলিয়েভের ব্যাগ-ব্যাগেজ এখন তোমার ১১ নং কেবিনেই তো রয়েছে?

-হ্যাঁ।

-তাহলে, লিলিয়েভের ঐ চিঠি তুমি যেখানে পেয়েছিলে, সেখানেই রেখে দাও গিয়ে। কাল সকালে ক্লু-ক্লাক্স-ক্লান নিশ্চয় সেখানে যাবে, পরে হয়তো আসবে সোভিয়েট ইনটেলিজেন্সেরও কেউ। চিঠি যেন তারা ওখানে পায়। নিরুদ্বেগে তারা তাদের প্লান নিয়ে এগোক সামনে। থামল আহমদ মুসা। একটু থেমে আবার বলল, আর কিছু বলবে জাবের।

-লিলিয়েভকে কি করব? হেড কোয়ার্টারে পাঠিয়ে দেব?

-না, এখানে স্মার্থা আছে। সবাইকে একখানে করা ঠিক হবে না। ওকে ওখানেই আটকে রাখবে।

-আচ্ছা।

-আচ্ছা রেখে দাও।

বলে লাইন কেটে দিল মুসা। তারপর ওয়্যারলেসের কাটা ঘুরিয়ে ভিন্ন এক ওয়েভলেংথে জাম্বোয়াঙ্গোতে এহসান সাবরীর সাথে যোগাযোগ করল।

ওপার থেকে এহসান সাবরীর কন্ঠ ভেসে এল- আমি এহসান সাবরী।

-আমি আহমদ মুসা।

-আদেশ করুন জনাব।

-শুধু আদেশ করার জন্যই কি তোমাদের খোঁজ নিয়ে থাকি এহসান?

-মাফ করুন জনাব। আপনি আমাদের নেতা। আদেশ তো আপনার কাছ থেকে আমরা প্রত্যাশা করি।

-আমি যেটা দিয়ে থাকি, ওটা পথ নির্দেশনা মাত্র, আদেশ নয়। আদেশের অধিকার তো একমাত্র আল্লাহরই। ইনিল্ হুকমো ইলল্লা-লিলল্লাহ'- পড়নি?

ওপারে এহসান সাবরীর মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে। বলল সে, আপনার এ নির্দেশ আমার মনে থাকবে।

শুন এহসান, মিন্দানাওয়ে আমাদের অবস্থান ইরগুন জাই লিউমি, ক্লু-ক্লাক্স-ক্লান ও সোভিয়েট ইন্টেলিজেন্স-এর কাছে অজানা নেই। এখানে ব্যর্থ হবার

পর সোভিয়েট ইন্টেলিজেন্স কাগায়ানে বেজ করে কিছু করতে যাচ্ছে। আমার মনে হয় এটা হবে ঐ ত্রিপক্ষের কোন এক যৌথ পরিকল্পনা তুমি প্রস্তুত থেকো। ওদের ওদিকে ব্যস্ততার সুযোগে আমরা জাম্বুয়াঙ্গোতে আঘাত হানব। জাম্বুয়াঙ্গো বন্দর আমাদের হাতে এলে সমগ্র সোলো সাগর ও সেলেবিস সাগরের উপর নজর রাখতে পারবো-আমাদের সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর উপকূল নিরাপদ হবে।

আর শোন, আমাদের ৫০ স্পিড বোটের সবগুলোকেই স্বল্প পাল্লার ক্ষেপনাস্ত্র সজ্জিত করা হয়ে গেছে। এর মধ্যে আমি পাঁচটিকে কাগায়ান উপসাগরে রেখে অবশিষ্টগুলোকে জাম্বুয়াঙ্গো ঘাঁটিতে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমি এর মধ্যে পাঁচটি তোমার জন্য রেখে অবশিষ্টগুলো ২টি করে সবগুলো উপকূলীয় ঘাঁটিতে পৌছে দেবে। রাতের অন্ধকারে অতি গোপনে সমাধা করবে একাজ।

-কিন্তু পেট্রোলের যে ষ্টক আছে, তা তো খুব অল্প।

-সে চিন্তা আমি করেছি। লিবিয়া থেকে ওয়েল ট্যাংকার এম,ভি, সেনুসি আসছে। ওটা এসে নোঙ্গর করবে নর্থ বোর্নিওর সান্দাকান বন্দরে। সেখান থেকে ইন্দোনেশীয় কোষ্টার পিপা ভর্তি তেল নিয়ে আসবে জাম্বুয়াঙ্গো থেকে ৭৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে জনমানবহীন জামুন দ্বীপে। সেখান থেকে তোমাকে তেল সংগ্রহ করতে হবে। নির্দিষ্ট সময় আমি তোমাকে পরে জানাচ্ছি।

-আচ্ছা।

-আর কিছু বলার আছে?

-জি না।

-রেখে দিলাম।

অয়্যারলেস ছেড়ে দিয়ে আলী আল-মখদুমের দিকে চেয়ে আহমদ মুসা বলল, হুজুর, কষ্ট দিলাম আপনাকে, অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি।

-একি বলছ বাবা, আমার ১১০ বছরের জীবনে এমন আনন্দ আমি কোনদিন পাইনি। অপরিসীম কষ্ট করছ তোমরা এ দুঃখী জাতির জন্য। আজ অমি যদি যুবক হতাম.......... কান্নায় বৃদ্ধের গলা বুঁজে এলো। থামল সে। ঢোক গিলে আবার সে বলল, আজ মনে হচ্ছে, আমার কর্ম-জীবনের দীর্ঘ ৮০টি বছর বৃথাই নষ্ট করেছি করিম আল-মখদুমের মাজারে বসে তসবি টিপে আর-হা-হুতাশ করে।

জালল্লাজালালুহুর তসবি টিপেছি বটে মাজারে বসে, কিন্তু তাঁর প্রতাপে তোমাদেরকে যেমন জাতির মুক্তির জন্য আজ পাগল করে তুলেছে, তেমন তো কোনদিন হয়নি আমার।

বৃদ্ধের দু'গন্ড বেয়ে অবিরাম ধারায় নামছিল অশ্রু। হৃদয়ের বেদনা যেন তাঁর চোখ দু'টি দিয়ে ঠিকরে পড়ছে। সে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে আহমদ মুসার হাত দু'টি ধরে বলল, তোমাদের কিছু কাজ আমাকে দাও বাবা। এ বৃদ্ধ কিছু করতে না পারলেও শত্রুদের একটি বুলেট, আর কিছু সময় তো নষ্ট করতে পারবে। আর এটাই হবে আমার জীবনের পরম সঞ্চয় তাঁর কাছে।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়ে আলী আল-মখদুমকে ধীরে ধীরে বসিয়ে দিতে দিতে পরম শ্রদ্ধাভরে বললো, যুবকদের জন্য এ প্রেরণা সৃষ্টিই আপনার আজ সবচেয়ে বড় দায়িত্ব জনাব। আহমদ মুসা বলল, তারপর আজ এই রাতে এই মুহূর্তে যে প্রেরণার উষ্ণ পরশ আপনার কাছ থেকে পেলাম, তা অক্ষয় হয়ে থাকবে আমার জীবনে। আপনার অশ্রু হয়ে নেমেছে আপনার চোখে। এ অশ্রুর মূল্য অপরিসীম। এ অশ্রুর জ্বালা যুবকদের পাগল করে। আর এ পাগল যুবকরাই পারে রক্তের সাগর পিছনে ফেলে লক্ষ্যে পৌছুতে।

বয়সের ভারে পীড়িত আলী আল মাখদুম অবসন্ন হয়ে পড়েছে চেয়ারের উপর। চোখ দু'টি তাঁর মুদ্রিত।

আহমদ মুসা মুর হামসারের দিকে চাইল। মুর হামসারের অশ্রুসিক্ত চোখে শপথের দীপ্ত শিখা। ধীর স্বরে আহমদ মুসা তাকে বলল, আজকেই জেদ্দার এমপিআই (মুসলিম প্রেস ইন্টারন্যাশনাল) হেড কোয়ার্টারে একটি চিঠি লিখ। লিখ- ইরগুন জাই লিউমি' তাদের স্বীয় স্বার্থ সংশিস্নষ্ট একটি তথ্যের বিনিময়ে সোভিয়েট ইন্টেলিজেন্সকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অত্যাধুনিক জটিল মারণাস্ত্র 'ঘুমন্ত টর্পেডো' সম্পর্কিত গোপন তথ্য পাচার করছে। আরও বলতে হবে, এই ষড়যন্ত্রের সাথে পেন্টাগনের ইহুদী মারণাস্ত্র বিজ্ঞানীদের যোগ-সাজস রয়েছে। ব্যস এইটুকুই যথেষ্ট।

-কিন্তু এ থেকে আমরা কি বাস্তব ফল লাভ করব ভাইয়া।

-সর্বোচ্চ লাভের কথা বাদ দিলাম, সর্বনিম্ন লাভ হল, এর ফলে ইহুদী স্বার্থ ও মার্কিন স্বার্থের মধ্যে অলক্ষ্যে এক ভেদরেখার সৃষ্টি হবে। ইরগুণ জাই লিউমি ও ইহুদী বিজ্ঞানীদের উপর মার্কিন গোয়েন্দারা চোখ রাখবে যার ফলে ইরগুণ জাই লিউমির পক্ষে সোভিয়েট ইন্টেলিজেন্সকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পালন করা কঠিন হবে।

হেসে উঠল মুর হামসার। বলল, ঠিক ভাইয়া, রেডিয়েশন বম্ব কেলেঙ্কারী হয়েছে, এবার 'ঘুমন্ত টর্পেডো' কেলেঙ্কারী প্রকাশ হয়ে পড়লে ইহুদী মার্কিন চীড় ধরা স্বার্থে ফাটল স্পষ্ট হয়ে উঠবে এবং পরিনামে তা সংঘাতে রূপান্তর লাভ করতে পারে।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বললো, হুজুরকে শুইয়ে দেবার ব্যবস্থা কর মুর হামসার।

# ৭

কয়েকদিন খুবই ব্যস্ত ছিল আহমদ মুসা। মিন্দানাও, সোলো, পালওয়াং ও বাসিলান দ্বীপপুঞ্জের পিসিডার প্রশাসন ইউনিটের যে ট্রেনিং এক মাস আগে শুরু হয়েছিল, তা শেষ হয়ে গেল। 'সুস্থ ও সফল জন-প্রশাসন ব্যবস্থা প্রশাসন কর্মীর চরিত্র ও দক্ষতার উপর নির্ভরশীল'- এরই অনুশীলন চলেছে ট্রেনিং শিবিরে। আহমদ মুসার পরিকল্পনা অনুযায়ী এই প্রশাসন কর্মীদেরকে তাদের স্ব স্ব অঞ্চলে গিয়ে 'আইনের উৎস আইন ও আইনের ব্যবহার' শীর্ষক শিক্ষা কোর্সে আরও ছয়মাস করে কাটাতে হবে।

ট্রেনিং কর্মিদের বিদায় দিয়ে সেদিন দুপুরে আহমদ মুসা ফিরে এলো তার কক্ষে। ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিল বিছানায়।

হঠাৎ টেবিলের ফুলদানির দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হল তার। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে বসলো।

ফুলদানির ফুলগুলো অমন শুকনো কেন? মনে হচ্ছে কয়দিন থেকে ফুল বদলানো হয়নি। এতদিনের মধ্যে এমনটি তো কখনো হয়নি?

আহমদ মুসা লক্ষ্য করল, আলনার কাপড়গুলোও বেশ অগোছালো। যে কাপড় যেভাবে সে রেখেছে, সেই ভাবেই আছে। বিছানারও সেই অবস্থা। চাদর ঠিকাভাবে পাড়া নেই। একদিকে বেশী ঝুলে আছে, অন্যদিকে কম।

এই সময় রুনার মা ঘরে ঢুকল। বলল, জনাবের খাবার তৈরী। আহমদ মুসা ওদিকে কর্ণপাত না করে বলল, ফুলদানিতে শুকনা ফুল কেন রুনার মা?

-আপা মনির অসুখ তো।

-কার শিরীর?

-জি।

-কতদিন ধরে অসুখ?

-আজ চারদিন।

-কি অসুখ?

-জ্বর।

-চারদিন থেকে জ্বর? মুর হামসারকে বাইরে পাঠালাম, সেদিনও কি জ্বর ছিল।

-মুর হামসার তো আমাকে কিছু বলেনি, সে গেল কেন? এটুকু থেমে সে বলল আবার, কি ওষুধ খাচ্ছে?

-ছোট সাহেব ডিসপেনসারী থেকে ওষুধ এনে দিতে বলে গিয়েছিলেন, এনেছি।

-জ্বর কমেনি?

-না, আরও বাড়ছেই যেন?

-রুনার মা, আমাকে এ সংবাদ কেন বলনি? আহমদ মুসার কন্ঠে কঠোরতা ঝরে পড়ল।

রুনার মা ভিত হয়ে পড়ল। ধীরে ধীরে সে বলল, আপামনিও কিছু বলেনি, আমিও বুঝতে পারিনি। মাফ করবেন জনাব।

-শিরীকে কি খেতে দিচ্ছ?

-কিছুই খায় না। মাঝে মাঝে একটু আধটু গ্লুকোজ খায়।

আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি একটি স্লিপ লিখে রুনার মাকে দিয়ে বলল, এটা নিয়ে গার্ডরুমের খলিলকে দাও। সে যেন এখনি গিয়ে ব্যারাকের হসপিটাল থেকে ডাক্তার নিয়ে আসে। আর তুমি গিয়ে ওর কাছে বস। কোথাও যাবে না। রুনার মা সিস্নপ নিয়ে বেরিয়ে গেল। আহমদ মুসা অয়্যারলেসের সামনে গিয়ে বসল। দক্ষিণ মিন্দানাওয়ে মরো উপসাগরের তীরে সাহেলী ঘাঁটির সাথে যোগাযোগ করল সে। মুর হামসার ওখানেই গেছে।

-মুখ এখনও শুকনা কেন? কোথেকে আসছো রুনার মা?

-আপনার অসুখের কথা বড় সাহেবকে জানানো হয়নি, বড় সাহেব রাগ করেছেন? শিরীর চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, আমার অসুখের কথা কেমন করে উনি জানলেন?

-আমি বলেছি।

-তুমিই তো বলেছে, তাহলে রাগ করলেন কেন উনি?

-আমি তো বলিনি, উনিই জিজ্ঞেস করেছিলেন।

-হঠাৎ কেমন করে জিজ্ঞেস করলেন উনি?

-না, উনি জিজ্ঞেস করছিলেন-রুনার মা, ফুলদানিতে শুকনো ফুল কেন?

-তুমি কি বললে?

-আমি বললাম, আপামনির অসুখ।

-তারপর?

-আমাকে বকাবকি করলেন। খলিলকে ব্যারাকে পাঠালেন ডাক্তার আনতে।

শিরী আর কিছু বললো না। চোখ বুজলো সে। তার মনে আনন্দ বেদনার ঢেউ। ওর কাছ থেকে আর কি চাই। একটু স্মরণ করেছেন, করুণা করেছেন এই তো যথেষ্ট। উনি কাছে আসবেন আমাকে দেখতে অমন দুঃসাহসিক আকাংখা কি আমার সাজে।

খলিল সংবাদ দিল ডাক্তার এসেছে। রুনার মা গিয়ে ডাক্তার নিয়ে এলো।

সব শুনে ঔষধ দিয়ে চলে গেল ডাক্তার।

পাশেই বসে রয়েছে রুনার রুনার মা। শিরী এপাশ ওপাশ ফিরছে, স্বস্তি পাচ্ছে না কিছুতেই। রুনার মা বলল, কষ্ট লাগছে আপামনি?

-না রুনার মা। একটু থেমে বলল, তুমি বসে বসে কষ্ট করছো কেন? শুয়ে আরাম করগে যাও।

-না। বড় সাহেব তোমার কাছে কাছেই থাকতে বলেছেন আমাকে। শিরী কিছু বলল না। অনেকক্ষণ পরে এক সময় ধীরে ধীরে বলল, উনি ঘরে আছেন রুনার মা?

-কে?

-তোমার বড় সাহেব?

-না, বাইরে গেছেন।

-আমি দাঁড়াতে পারব হাঁটতে পারব না। তুমি ধরে আমাকে একটু ওঁর ঘরে নিয়ে যাবে?

-কেন?

-আগে বল, পারবে কি না?

-তোমার হুকুম কোনটা না মেনেছি?

-তাহলে যাও বাগান থেকে ফুলদানির জন্য কয়েকটি গোলাপ নিয়ে এসো।

শিরী রুনার মা'র কাঁধে হেলান দিয়ে আহমদ মুসার কক্ষে গেল। দুর্বল হাতে ধীরে ধীরে ফুল সাজিয়ে রাখল। বিছানায় চাদর পাড়ার ঢং দেখে হাসল শিরী। বলল, এতদিনেও কাজ শিখলে না রুনার মা!

শিরী চাদর ঠিক করতে যাবে, এমন সময় আহমদ মুসার টেবিলের অয়্যারলেস যন্ত্রে লাল সংকেত জ্বলে উঠল, সাথে সাথে একটানা সংকেত শব্দ।

শিরী একটু দ্বিধা করল। একটু ভাবল। হয়তো কোন জরুরী মেসেজ। শিরী গিয়ে অয়্যারলেস রিসিভার তুলে নিল।

ওপার থেকে কন্ঠ ভেসে এলো, আবদুল্লাহ জাবের স্পিকিং।

-আমি শিরী বলছি। মুর হামসারের বোন।

-আমি মুসা ভাইকে চাই।

-উনি বাইরে গেছেন।

-আপনি কি মেসেজ রিসিভ করবেন? একটু দ্বিধা করলো শিরী। তারপর বলল, নিশ্চয় করব।

এই সময় আহমদ মুসা এসে দরজায় দাঁড়াল। শিরীকে অয়্যারলেসে দেখে আহমদ মুসা প্রথমে অবাক হলো। কিন্তু টেবিলের ফুলদানির দিকে চেয়ে ব্যাপারটা কিঞ্চিৎ আঁচ করতে পারলো। অলক্ষ্যে এক হাসির রেখা খেলা গেল যেন তাঁর ঠোঁটে।

ছোট্ট একটি কাশি দিয়ে ধীর পদে ঘরে ঢুকল আহমদ মুসা। চকিতে মুখ তুলল শিরী। আহমদ মুসাকে দেখেই সে উঠে দাঁড়াল। হাত থেকে পড়ে গেল অয়্যারলেস রিসিভার। অবশ হয়ে গেল তার গোটা শরীর। পড়ে যাচ্ছিল সে। আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি ধরে ফেলল তাকে। নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল তার বিছানায়।

অজ্ঞান হয়ে গেছে শিরী। মুখে তার পানির ছিটা দিল আহমদ মুসা। মিনিট তিনেকের মধ্যেই তার জ্ঞান ফিরে এলো।

এমন অবস্থার জন্য রুনার মা প্রস্তুত ছিল না। সে মেঝের মাঝখানে দাড়িয়ে কাঁপছিল। আহমদ মুসা তাকে বলল, শিরীকে একটু বাতাস কর রুনার মা, আমি ওদিকে একটু দেখি। তারপর উঠতে উঠতে শিরীকে বলল, আর একটু রেষ্ট নাও, তারপর উঠবে।

আহমদ মুসা গিয়ে রিসিভার তুলে নিল। ওদিকে আবদুল্লাহ জাবেরের উৎকন্ঠা সপ্তমে উঠেছিল। আহমদ মুসার কন্ঠস্বর পেয়েই সে জিজ্ঞেস করল, কিছু ঘটেছে জনাব?

-না কিছু ঘটেনি। অসুস্থ শিরী হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গেছে। ভাল আছে এখন। বল, কি খবর?

-আজ দুপুরে কাগায়ানে সোভিয়েট এয়ার ফোর্সের প্রতীক চিহ্নিত দু'টি মাউন্টেন ট্রান্সপোর্ট জেট ল্যান্ড করছে। কিন্তু আরোহীদের প্রত্যেকেই ইহুদী প্যারাট্রুপারস। চারজন সোভিয়েট অফিসারকে ওদের সাথে দেখা গেছে।

-প্যারাট্রুপারসদের সংখ্যা কত?

-দুই জেটে বিশজন। আরও দু'টি নাকি আছে।

-তাহলে আরও বিশজন। তুমি কি আচঁ করছ?

-আমি বুঝতে পারছি না, এই সব অত্যাধুনিক মাউন্টে জেট এখানে কেন?

হাসলো আহমদ মুসা। বলল, কারণ ঐ জেটগুলোর পক্ষেই শুধু আপো-পর্বতের অসমতল উপত্যকায় ল্যান্ড করা সম্ভব।

-বুঝেছি জনাব, অসম্ভব দুঃসাহস।

-কাজের জন্য অসম্ভব দুঃসাহসই প্রয়োজন।

একটু থেমে আহমদ মুসা আবার বলল, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ইরগুন জাই লিউমির এটা এক যৌথ ব্লিৎস-ক্রিগ-পরিকল্পনা। কিন্তু এ পরিকল্পনাকে আপো-পর্বত পর্যন্ত গড়াতে দেয়া যাবে না। আমি আসছি।

-আজই আসছেন?

-খোদা করেন ভোর হবার আগেই আমি কাগায়ানে পৌছে যাব।

আহমদ মুসা লাইন কেটে দিল। ওদিকে শিরী আহমদ মুসার বিছানায় শুয়ে লজ্জায় মরে যাচ্ছিল। গোটা দেহে অপরিচিত এক অদৃশ্য মধুর ছোঁয়াছ যেন অনুভব করছে সে। শিরীর মনে পড়ল, অয়্যারলেস টেবিল থেকে সে পড়ে যাচ্ছিল, কে যেন এসে তাকে ধরল, তারপর আর কিছুই মনে পড়ে না। ওখান থেকে তাঁকে বিছানায় আনল কে? রুনার মা? অসম্ভব তার পক্ষে। তাহলে উনি? কথাটা মনে হতেই গোটা দেহ তার থর থর করে কেঁপে উঠল। চোখ খুলে চাইবার সাধ্যও যেন নেই তার। আহমদ মুসার সবগুলো কথা সে শুনতে পাচ্ছিল, কিন্তু চোখ খুলে একবারও ওর দিকে চাইতে পারছিল না।

আহমদ মুসা অয়্যারলেস টেবিল থেকে উঠে দাড়িয়ে রুনার মাকে লক্ষ্য করে বলল, রুনার মা, শিরীর দিকে লক্ষ্য রেখ। যখন যেটা হয়, হসপিটাল থেকে ওষুধ এনে দেবে। আমি বলে যাব সবাইকে। আর মুর হামসার আজ কিংবা কালের মধ্যেই এসে পড়বে।

আহমদ মুসা বাথরুমে প্রবেশ করল। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে দেখল শিরীও নেই, রুনার মাও নেই। ঠোঁটে তার একটুকরো হাসি ফুটে উঠলো। কিন্তু মন তার কেঁপে উঠলে ভীষণ ভাবে। সজ্ঞানে কিংবা অজ্ঞানে কোন প্রশ্রয় কি সে দিয়েছে শিরীকে? না কখনও না। শিরীর সাথে তার দেখা এবং যা যা ঘটেছে সবই ঘটনা প্রবাহের স্বাভাবিক ফলশ্রুতি। এমন কতই তো ঘটতে পারে-ঘটে থাকে। তবু আহমদ মুসা মেনে নিল, সাবধান হতে হবে। সোলো রাজকুমারীর দুঃখের বোঝা যেন সে আর না বাড়ায়।

আহমদ মুসা পোশাক পরে তার সেই পরিচিত ব্যগটি তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। উঠার সময় ফুলদানি থেকে একটি গোলাপ তুলে নিল, কিন্তু পরক্ষনেই কিছুটা কম্পিত হাতে সে গোলাপটি রেখে দিল ফুলদানিতে। কিন্তু রেখে দিয়েও

স্বস্তি পেল না সে। মন যেন অতি স্পষ্ট কন্ঠে বলল, ফুলটি রেখে দিয়েই কি তুমি তোমার দুর্বলতাকে মুছে ফেলতে চাইছ? আবার কেঁপে উঠার পালা আহমদ মুসার। বিবেকের আলো যেখানে পৌছে না মনের এমন অবচেতন জগতে সে কি কোন অন্যায় করে বসে আছে তাহলে?

পা দু'টি তার থেমে গেল। উপরের দিকে চেয়ে বলল, 'প্রভূ আমার মনকে তো আমি তোমার আনুগত্য থেকে পৃথক করে রাখিনি?

তারপর সে আবার পা' দুটি চালিয়ে দিল সামনে।

# ৮

কাগায়ান শহর। কাগায়ান উপসাগর থেকে ৫০ মাইল দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত উত্তর মিন্দানাওয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর কাগায়ান।

ফিলিপাইন পরিষদের প্রাক্তন সিনেটর আববাস এ্যালেনটো কাগায়ান শহরের মানচিত্র বুঝিয়ে দিচ্ছিল আহমদ মুসাকে।

মুল কাগায়ান শহরের লোক সংখ্যা ৮ থেকে ১০ হাজারের মত। শহরতলী সমেত এর লোক সংখ্যা এখন প্রায় বিশ হাজার। কাগায়ান থেকে দক্ষিণ দিকে মাইলের পর মাইল চলে গেছে নয়নাভিরাম ধানের ক্ষেত।

কাগায়ান ছিল সুখ ও সমৃদ্ধির নগর। বিশ বছর আগেও এখানে ছিল শতকরা নববই জন মুসলমান। আমেরকিান ও পর্তুগিজ মিশনারীদের প্রলোভন ও নিপীড়নের পরও এখানে খৃস্টানদের সংখ্যা শতকরা ৫ ভাগের বেশী হয়নি। এখানে অভাব বস্তুটা ছিল মানুষের অজানা, তাই মিশনারীদের কৌশল এখানে বড় বেশী কাজে আসেনি।

কিন্তু কাগায়ানবাসীদের এই প্রতিরোধ ক্ষমতা তাদের জন্য অভিশাপ হয়ে দেখা দিল। মিশনারীদের সব কলাকৌশল ব্যর্থ হলে ঘরবাড়ী ও সহায়-সম্পত্তি থেকে তাদের উৎখাত করা হলো শক্তির জোরে। শুধু কাগায়ান নয়, দিভাও, জাম্বুয়াঙ্গো, কোটাবাটো, প্রভৃতি শহরে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো। এই উৎখাত অভিযানে ৩০০০ হাজার হতভাগ্য মুর মুসলমান নিহত হলো এবং ১০ হাজার হলো আহত। আর ৫০ হাজার মুসলমান তাদের বাড়ী ঘর, সহায়-সম্পত্তি সব কিছু হারিয়ে পথে গিয়ে দাড়াঁল। তাদের জায়গায় এনে বসানো হলো উত্তর ফিলিপাইন থেকে শ্বেতাংগ ও নেটিভ খৃস্টানদের।

-কিন্তু এসব সংবাদ তো প্রকাশ পায়নি?

-প্রকাশ পাবে কি করে, সংবাদ সরবরাহ সংস্থাগুলোর কাছে এ কোন সংবাদই নয়। মিন্দানাওবাসীদের বিদ্রোহের খবরই শুধু প্রকাশ পায়, তাদের উপর জুলুম-নির্যাতনের যে স্টিমরোলার চলছে তা প্রকাশ পায় না।

আহমদ মুসা সম্মতিসূচক মাথা নাড়াল শুধু। আববাস এলেনটো আবার বলতে শুরু করল কাগায়ানের শহরতলীতে মুসলমানদের কিছু ছিটেফোটা বসতি আজও রয়েছে।

কাগায়ান শহরের মূল আবাসিক এলাকা শহরের দক্ষিণাংশে। উত্তরাংশে কয়েকটি শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছে। এই উত্তরাংশেই সম্প্রতি একটি বিমান ক্ষেত্র নির্মিত হয়েছে। বিমান ক্ষেত্রের পশ্চিম, উত্তর ও পূর্বাংশে অসমতল বনভূমি। বিমান ক্ষেত্রটি সুদৃঢ় কাটাতার দিয়ে ঘেরা। কাটাতারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ চলছে সর্বক্ষন। এই বিমান ক্ষেত্রের দক্ষিণাংশে টারমিনাল ভবনের সামনে রানওয়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে চারটি মাউন্টেন-জেট।

থামল আববাস এ্যালেনটো। আহমদ মুসা শহরের রাস্তা ঘাটের অবস্থান নিয়ে তন্ময় হয়ে পড়ল। শহরের প্রধান রাস্তাটি শহরের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে উত্তরাংশের টারমিনাল ভবন পর্যন্ত বিসত্মৃত। এই রাস্তার ধারেই সকল সরকারী অফিস ও  গুরুত্বপূর্ণ বিল্ডিং। রাস্তাটির পূর্বনাম ছিল ‘আলনিকাদ’ রোড। কাগায়ানে যারা প্রথমে বসতি স্থাপন করেছিল, তারা এসেছিল জুলু দ্বীপের ‘বুদ আজাদ’ অঞ্চল থেকে। জুলু দ্বীপে যিনি ইসলামের আলো ছড়িয়ে ছিলেন, তিনি ‘মুহাম্মদ আমানুলল্লাহ আল-নিফাদ’ নামে অভিহিত। তাঁর নাম অনুসারেই এ রাস্তার নামকরণ করা হয়েছিল। কিন্তু রাস্তাটির নাম এখন ‘মার্কোস এভিনিউ’। কাগায়ানের মুসলিম উচ্ছেদের পরিকল্পনাকারী সেন্টজন মার্কোসের নাম অনুসারে এর নামকরণ করা হয়েছে।

আহমদ মুসা আববাস এ্যালেনটোকে জিজ্ঞেস করলেন, কাগায়ানের পাওয়ার ষ্টেশনটি কোথায়?

আববাস এ্যালেনটো দক্ষিণ কাগায়ানের একটি স্থান দেখিয়ে দিল। বলল সে, কার্কোস এভেনিউ থেকে পার্ক ষ্ট্রিট সোজা পশ্চিম দিকে চলে গেছে। এ রাস্তা

দিয়ে সিকি মাইল যাবার পর আর একটি রাস্তা পাওয়া যাবে-হোয়াইট স্ট্রিট। এ স্ট্রিটের শেষ প্রান্তে পাওয়ার স্টেশন।

-পাওয়ার ষ্টেশন থেকে মার্কোস এভেনিউতে পৌছার সোজা পথ নেই?

-আছে। আবাসিক এলাকার মধ্য দিয়ে। বড় পেচানো রাস্তা। পাওয়ার স্টেশনের পিছন থেকে বেরিয়ে এ রাস্তা আবাসিক এলাকার মধ্যদিয়ে পূর্ব দিকে এগিয়ে গেছে।

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল। বাইরে থেকে দরজায় কয়েকটি টোকা পড়ল এ সময়। আহমদ মুসা ও আববাস এ্যালেনটো উৎকর্ণ হয়ে উঠল। আবার পড়ল টোকা সেই নির্দিষ্ট নিয়মে। পরিচিত সংকেত।

আববাস এ্যালেনটো গিয়ে দরজা খুলে দিল। প্রবেশ করল শ্রমিক গোছের একজন লোক। পরণে মালয়ী ধরনের লুংগী। গায়ে শার্ট ঝুলের কামিজ। ছোট করে ছাঁটা চুল। চোখ দু'টির চাউনিতে কেমন বোকা বোকা ভাব।

আববাস এ্যালেনটো পরিচয় করিয়ে দিল- নাম আবিদ। কিন্তু কাগায়ানে জন নামে পরিচিত। সবাই জানে সে একজন নিষ্ঠাবান নেটিভ খৃস্টান। পিসিডার একজন প্রথম শ্রেণীর কর্মী আবিদ। টার্মিনাল ভবনের বহিরাঙ্গনের একটি ভ্যারাইটি স্টোরের মালিক সে। মাউন্টেন জেট সম্পর্কিত তথ্য সেই সরবরাহ করেছে।

আহমদ মুসাকে দেখিয়ে সে আবিদকে বলল, ইনি আহমদ মুসা-তোমাদের নেতা।

বিস্ময় ও আনন্দে চিক চিক করে উঠল আবিদের চোখ। সসম্ভ্রম ছালাম জানাল। আহমদ মুসা হাত বাড়িয়ে দিল। আবিদও বাড়িয়ে দিল হাত। হ্যান্ডসেক করল দু'জনে।

আববাস এ্যালেনটো বলল, এবার খবর বলো আবিদ।

আবিদ বলল, আজ সকালে মাইকেল এ্যাঞ্জেলো এসেছেন দিভাও থেকে। তার সাথে কে আর একজন এসেছেন। দীর্ঘাঙ্গ, লাল চেহারা চুলহীন মাথা, নাম-ডেভিড এমরান।

-কি বললে নাম? ব্যগ্র কন্ঠে জিজ্ঞেস করলো আহমদ মুসা।

-ডেভিড এমরান?

আহমদ মুসা বিস্মিত হলো। ধাড়ি ইহুদি ডেভিড এমরান কাগায়ানে এসেছে। 'ইরগুন জাই লিউমি'র অপারেশন বিভাগের প্রধান ডেভিড এমরান তাহলে আহমদ মুসাকে হাতে পাবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে। হাসল আহমদ মুসা। বলল সে, তারপর আবিদ?

-টার্মিনাল ভবনের পাশে ওরা একটা হাসপাতাল সাজিয়েছে। ডাক্তার আছে, নার্স আছে। বেলা একটার দিকে ৪টি মাউন্টেন জেটই পরপর সারিবদ্ধভাবে রানওয়েতে গিয়ে দাঁড়াল। মাথা থেকে পা পর্যন্ত কিম্ভুত-কিমাকার পোশাকে আবৃত লোকগুলো গিয়ে বিমানে উঠল।

আহমদ মুসা দ্রুত জিজ্ঞেস করল, মুখও আবৃত ছিল ওদের?

-জি, হাঁ। বলল আবিদ।

আবিদ আবার বলতে শুরু করল বেলা ১টার সময় জেটগুলোর টেক-অফের কথা ছিল। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে বিমানগুলো আকাশে উড়ল না। আরোহীরা সবাই নেমে এলো বিমান থেকে। আমি জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, কি যেন খবর এসেছে, তাই যাত্রা বন্ধ।

ভ্রু কুঁচকে গেল আহমদ মুসার। কিন্তু কিছু বলল না।

আবিদ আবার শুরু করল, যাত্রা বন্ধ হয়ে যাবার পর সকলের মধ্যে কেমন যেন ত্রস্ত ভাব লক্ষ্য করা গেছে। পুলিশ কর্তাদের নিয়ে দু'বার মিটিং হয়েছে বড় কর্তাদের।

আহমদ মুসা গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। সে যেন আনমনা হয়ে পড়েছে। আবিদ, মাইকেল এ্যাঞ্জেলা, ডেভিড এমরান, আর সেই কমান্ডোরা থাকছে কোথায়?

-টারমিনাল রেস্ট হাউজে।

-রেস্ট হাউজ অর্থাৎ বিমান ক্ষেত্র থেকে শহরে আসবার কয়টি পথ আছে?

-একটি মার্কোস এভেনিউ। বিমান ক্ষেত্রটি শহর থেকে একটি খাল দ্বারা বিচ্ছিন্ন। খালের উপর মার্কোস এভেনিউ-এর ব্রিজ একমাত্র সংযোগ পথ।

-ব্রিজে প্রহরী থাকে?

-না, কিন্তু আজ পুলিশ মোতায়েন দেখেছি ব্রিজে।

আহমদ মুসা ঠোঁট কামড়ে ধরল দাঁত দিয়ে। মুহূর্তখানেক চিন্তা করল সে। বলল, তারপর তুমি থাক কোথায়?

-স্টোরেই থাকি।

-বেশ তোমাকে টারমিনালের রেস্ট হাউজে ওদের দিকে নজর রাখতে হবে। আমি যথাসময়ে পৌছব। মনে রেখ, তোমার ঘরে আলো জ্বলে থাকার অর্থ তুমি নেই, কিছু ঘটেছে। আর আলো নিভানো থাকলে তার অর্থ হবে সবকিছু ঠিক আছে। আচ্ছা তুমি যাও।

আবিদ সালাম জানিয়ে চলে গেল। আহমদ মুসা গিয়ে ঘর বন্ধ করে দিল। তারপর তার ব্যাগ খুলে একটি ক্ষুদ্র বাক্স বের করলো। বাকো্রর পাশে একটি বোতামে চাপ দিতেই উপরের ঢাকনি সরে গেল। ক্ষুদ্র অয়্যারলেস যন্ত্র।

শর্ট ওয়েভ কাটা ঘুরিয়ে যোগাযোগ করলো আপো পর্বতের হেড কোয়ার্টারে।

ওপার থেকে মুর হামসারের গলা পেয়ে খুশী হলো আহমদ মুসা। বলল, মুর হামসার, তুমি কখন ফিরলে?

-ঘন্টা দু'য়েক আগে ফিরেছি।

-শিরী কেমন?

-জ্বরের কোন কমতি নেই।

-দেখ, ওর প্রতি নজর রেখ।

মুহূর্তখানেক থামল মুসা। তারপর বলল, রুনার মা কোথায়?

-কেন? এখন শিরীর কাছে।

-আমি ফেরার পূর্বে দরজার বাইরে বেরুতে দিবে না তাকে। বাইরের সকলের সাথে সব রকমের দেখা সাক্ষাত বন্ধ। দরকার হলে তাকে ঘরে বন্ধ করে রাখবে। আর এখনি ওর কাছ থেকে জেনে নাও, আমি কাগায়ানে এসেছি, এ কথা সে কাকে বলেছে। এ কথা তার কাছ থেকে বের করে নিতেই হবে।

-কিছু ঘটেছে ভাইয়া? উৎকন্ঠিত স্বর মুর হামসারের।

-আমি আপো পর্বতে নেই, আমি কাগায়ানে চলে এসেছি, এ খবর কাগায়েনে পৌছেছে বলে স্থির নিশ্চিত আমি? কিন্তু পৌছল কি করে? নিশ্চয় আপো পর্বত থেকে এ খবর এখানে জানানো হয়েছে।

-সাংঘাতিক ব্যাপার, ঘরে শত্রু..........

মুর হামসারের কথার মাঝখানেই বলে উঠল আহমদ মুসা, রুনার মা'র কাছ থেকে জেনে নিয়ে যে কোন মূল্যে আটক করবে সেই ঘরের শত্রুকে।

-আপনার নির্দেশ পালিত হবে জনাব। আর.....

কথা শেষ করলো না মুর হামসার।

-কিছু বলবে? জিজ্ঞেস করলো আহমদ মুসা।

-শিরী কিছুই খাচ্ছে না, ওষুধও নাকি বমন করে ফেলেছে আজ।

আহমদ মুসা একটু চিন্তা করলো। তারপর বলল, পুরুষ ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা তেমন ভালো হচ্ছে না, একটা কাজ করতে পার?

-কি কাজ?

-স্মার্থা ডাক্তার। স্পাই ডাক্তার হিসেবে ক্লু-ক্লাক্স-ক্লানে সে যোগ দিতে আসছিল মিন্দানাওয়ে। বন্দীখানা থেকে তাকে এনে শিরীকে দেখাতে পার।

-নিরাপদ হবে তাকে আনা?

-তোমাকে অতি সাবধানে এ কাজ করতে হবে এবং এ ব্যাপারে তোমার কারো উপর নির্ভর করা চলবে না। তুমি তাকে আনবে, তুমিই রেখে আসবে তাকে বন্দীখানায়।

-রাজী হবে সে চিকিৎসা করতে?

-তাকে বলো আমি অনুরোধ করেছি। আমার বিশ্বাস, এ অনুরোধ সে রাখবে।

কথা শেষ করে আহমদ মুসা লাইন কেটে দিল। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল আবদুল্লাহ জাবের ও শরীফ আহমদ সুরী।

কথা শেষ হতেই আববাস এ্যালেনটো গিয়ে দরজা খুলে দিল ঘরের। প্রবেশ করলো তারা দু'জনে।

-কি খবর জাবের? ব্যগ্র কন্ঠে জিজ্ঞেস করলো আহমদ মুসা।

ভিতরে একদম রণ প্রস্তুতি।

-কেমন?

-বিমান ক্ষেত্রের চারিদিকে মেশিনগানের ব্যারিকেড। রাস্তার মোড়ে মোড়ে বসানো হচ্ছে মেশিনগান। সাদা পোশাকে শহরের বিভিন্ন স্থানে কমান্ডো ইউনিট মোতায়েন করা হয়েছে। সশস্ত্র পুলিশ তো রয়েছেই।

নীরবে কথাগুলো শুনছিল আহম মুসা। কথা শেষ হলো, কিন্তু কোন মন্তব্য করলো না সে। দু'টি হাত তার পিছনে মুষ্টিবদ্ধ। চোখে মুখে ভাবনার এক ভারি পর্দা।

জাবের, শরীফ সুরী, আববাস এ্যালেনটো নতমুখে দন্ডায়মান।

আহমদ মুসা এক সময় টেবিলের কাগায়ান শহরের মানচিত্রের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। চোখ দু'টি তার মানচিত্রে নিবদ্ধ-পলক নেই তাতে। নিঃশব্দে বয়ে চলল কালের স্রোত।

স্বপ্নোত্থিতের মত মুখ তুলল আহমদ মুসা মানচিত্র থেকে। জাবেরকে লক্ষ্য করে বলল সে, মৃত্যু মুখে ঝাপিয়ে পড়বে, এমন কতজন লোক আছে তোমার?

-আপনার নির্দেশ পেলে সকলেই হাসতে হাসতে মৃত্যুর মুখে ঝাপিয়ে পড়বে।

-সবাই নয়, আমি ৫০ জন চাই।

-প্রস্তুত জনাব।

তারপর আহমদ মুসা দীর্ঘক্ষণ ধরে আবদুল্লাহ জাবের, শরীফ সুরী ও আববাস এ্যালেনটোর সাথে পরামর্শ করলো তারপর বিদায় দিল সবাইকে।

ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল, সবে সন্ধ্যে ৮টা। ৯টায় বেরুবে সে। এখনও এক ঘন্টা সময় আছে।

পরম প্রশান্তিতে বিছানায় গা এলিয়ে দিল সে।

রাত নটা। দক্ষিণে কাগায়ানের পার্ললেন ধরে দ্রুত এগোচ্ছিল একজন লোক। লম্বা চওড়া। কাল স্যুট, কাল জুতা। টাইটিও একদম নিরেট কালো। লেনের আবছা অন্ধকারে লোকটিকে মনে হচ্ছে ছায়ার মতো। মাথা নীচু করে ছায়া মূর্তিটি দ্রুত এগিয়ে চলছিল মার্কোস রোডের দিকে।

আমেরিকান কাট চুল। লাল মুখ। টিপ-টপ ভদ্রলোক। ইস্ত্রির ভাঁজে কোন খুঁত নেই। এক দৃষ্টিতেই মনে হয়, একজন সম্ভ্রান্ত বিদেশী। কোন দিকে না তাকিয়ে একমনে এগিয়ে যাচ্ছে সে!

ভদ্রলোকের হাতে একটি বড় ধরনের এটাচি। পার্ললেন পার হয়ে সে গিয়ে পড়ল মার্কোস রোডে। মার্কোস রোড ধরে সে হন হন করে এগিয়ে চলল উত্তর দিকে।

উত্তর দিকে থেকে দু'টি রক্তচক্ষু তীব্র বেগে এগিয়ে আসছে। সমগ্র রাস্তা আলোকিত হয়ে উঠেছে ছুটে আসা গাড়ির হেডলাইটের উজ্জ্বল আলোতে।

ভদ্রলোকের ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত হলো। কিন্তু দৃঢ় পদক্ষেপে সমান তালে সে এগিয়ে চলল সামনে।

ছুটে আসা গাড়িটি পুলিশের। গাড়িটির রিয়ার লাইটের নীচে জ্বল জ্বল করছে- মিন্দানাও পুলিশ।

পুলিশের জীপটি এসে ভদ্রলোকের পাশে থেমে গেল। ক্যাঁচ করে বিশ্রি এক শব্দ উঠল।

জীপে দুজন আরোহী। একজন ড্রাইভার আর অন্যজন পুলিশ অফিসার।

পাশে জীপ থেমেছে, কিন্তু ভ্রুক্ষেপ নেই ভদ্রলোকের। চলা তার থামেনি। জীপ থেকে পুলিশ অফিসারটি নেমে পড়ল।

-এই যে। ভদ্রলোককে সম্বোধন করে ডাকল পুলিশ অফিসারটি।

ভদ্রলোক থামল। পিছনে ফিরে চাইলোও। কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলো, এলো না।

পুলিশ তার কাছে এগিয়ে গেল। বলল, কে আপনি? তার মুখে বিরক্তির স্বর।

পরিস্কার ইংরেজীতে ভদ্রলোকটি জবাব দিল, ফিলিপাইন কনটিনেটাল ট্রেডিং এজেন্সির বিজিনেস রিপ্রেজেনটেটিভ -জেমস কার্টার।

ম্যনিলার কনটিনেনটাল ট্রেডিং এজেন্সি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন আমেরিকান প্রতিষ্ঠান। পুলিশ অফিসারটি স্বর কিঞ্চিত নরম করে বলল, কোথায় চলেছেন?

ইয়ারপোর্ট সুপার মার্কেটের বিজিনেস ইন্টারন্যাশনাল অফিসে।

-ডোন্ট মাইন্ড, যেহেতু দায়িত্ব, তাই আপনার ব্যাগটা আমার একবার দেখতে হবে।

ব্যগটি এগিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক বলল, বেশ, দেখুন, দেখুন।

ব্যাগ খুলে দেখল, ইলেকট্রনিকস গুডসের লিটারেচার আর ছ্যাম্পুলে ব্যাগ ভর্তি। এটা-ওটা একটু নেড়ে-চেড়ে ব্যাগটি পুলিশ অফিসার ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে দিল।

এমন সময় আর একটি জীপ এসে দাঁড়াল। বিশাল বপু একজন অফিসার উকি দিল জীপ থেকে। জিজ্ঞেসা করল, কি ব্যাপার জেম?

জেম নামক পুলিশ অফিসারটি বুটের গোড়ালি ঠুকে কড়া একটি স্যালুট দিয়ে বলল, কনটিনেনটাল ট্রেডিং এর প্রতিনিধি যাচ্ছে সুপার মার্কেটের বিজিনেস ইন্টারন্যাশনাল অফিসে।

একটু থামল। আবার বলল, চেক করেছি, ছেড়ে দিব?

-মাথা খারাপ হয়েছে, চাকুরি খোয়াবে? কনট্রোল রুমে পৌছে দাও, ছাড়া-না ছাড়া তারাই বিচার করবে।

জীপটি চলে গেল। জিমি ভদ্রলোককে উদ্দেশ্য করে বললো, চলুন মশায়, আপনাকে কনট্রোল রুমে দিয়ে আসি।

জীপে উঠতে উঠতে ভদ্রলোকটি বলল, কিছু ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে? কি ব্যাপার মিঃ জিম?

জিম বিরক্তির স্বরে বলল, ঐ কি যেন আহমদ মুসা শহরে ঢুকেছে তাই এই সতর্কতা। দেখুন মিঃ কার্টার বড় সুখে আছেন আপনারা বিজিনেস নিয়ে. আর...........

ভদ্রলোক মিঃ কার্টার কথার মাঝখান থেকে বলে উঠল, বিজিনেস ভালো লাগে আপনার?

-লাগতেই হবে। চাকুরীর নিকুচি করি। ইম্পোর্ট লাইসেন্স করেছি কয়েকটা, কিন্তু ওর ভালো-মন্দ প্যাঁচ-পুঁচ তেমন বুঝি না।

-আসুননা একদিন বিজিনেস ইন্টারন্যাশনালে, আপনাদের জন্যই তো আমরা রয়েছি।

-ঠিক বলেছেন। যেতেই হবে একদিন। কাগজ-পত্র সব নিয়ে যাব।

মিঃ কার্টার একটু চিন্তা করে বলল, দেখুন মিঃ জিম কি বিপদে পড়লাম, আমাকে আবার ফিরতে হবে সেই হোয়াইট রোডে।

-হোয়াইট রোডে কেন?

-পাওয়ার হাউজের পিছনেই আমার বাসা। রাত দশটার মধ্যে না হলে ভীষণ অসুবিধা হবে বাসায়।

-মশায়, কনট্রোল রুমে গেলে তো ছাড়বেই না আজ রাতে আর। ভীষণ কাড়াকড়ি। কি যেন খবর এসেছে তারপর থেকে কর্তারা আহার-নিদ্রা করেননি। কে কে যেন এসেছে আরও। ইয়ারপোর্টের রেস্ট রুমে বসে শুধু শলা পরামর্শ করে যাচ্ছেন।

-তাহলে?

জিম একটু চিন্তা কের বলল, উপায় একটি করা যায়। সামনের মোড়ে আপনাকে নামিয়ে দিচ্ছি, ওখান থেকে গলি পথ ধরে লেক সার্কাসের ভিতর দিয়ে পাওয়ার হাউজের পিছনে গিয়ে উঠতে পারবেন।

-ও? মিঃ জিম। চিরকৃতজ্ঞ থাকব এর জন্য আমি।

মোড়ের উপর গাড়ী এসে পড়ল। থামল গাড়ি।

মিঃ কার্টার নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। গাড়ি থেকে মিঃ জিম বলল, আবার দেখা হবে মিঃ কার্টার। বলে সে গাড়ি ছেড়ে দিল।

মোড়ে মার্কোস রোড থেকে দু'টি রাস্তা দু'দিকে বেরিয়ে গেছে। একটি পূর্বদিকে, অন্যটি পশ্চিম দিকে। পশ্চিমের রাস্তা ধরে পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলল মিঃ কার্টার। মিনিট সাতেক চলার পর একটি রাস্তা পেল সে । রাস্তাটি লেক সার্কাস

রোড থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ দিকে লেক সার্কাসের অভ্যন্তরে চলে গেছে। এই রাস্তা দিয়ে লেক সার্কাসে প্রবেশ করবে কি না ভাবছিল মিঃ কার্টার। এমন সময় একজন লোককে পেয়ে গেল সে। লোকটি লেক সার্কাসের দিক থেকে আসছিল। মিঃ কার্টার তাকে জিজ্ঞেস করলো, এই রাস্তা দিয়ে কি হোয়াইট রোডে পৌছতে পারি?

লোকটি হাঁ সূচক জবাব দিয়ে চলে গেল। মিস্টার কার্টার ঐ রাস্তা দিয়ে লেক সার্কাসে প্রবেশ করলো । রাস্তাটির আবার অনেক শাখা-প্রশাখা। প্রায় মিনিট পনর চলার পর ঠিক চলেছে কি না সন্দেহ হলো মিঃ কার্টারের। সামনে আবার রাস্তাটি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে চলে গেছে দু'দিকে।

থমকে দাড়াল মিঃ কার্টার। জন-মানবহীন পথ। পাশেই একটি বিরাট অট্রালিকা।

গানের মিষ্টি সুর ভেসে আসছে। মিঃ কার্টার উপরের দিকে চাইল। দোতালার উন্মুক্ত জানালা দিয়ে শোনা যাচ্ছে গান। পরিচিত সুর। উৎকর্ণ হলো মিঃ কার্টার, সুর স্পষ্ট হল। আলাবী বালপকীর গান।

অভিজাত খৃষ্টান এলাকার এই বাড়ী থেকে আলাবী বালপকীর আরবী গান শুনে স্তম্ভীত হলো মিঃ কার্টার। আলাবী বালপকীর গান সোলো দ্বীপপূঞ্জের মুসলমানদের প্রিয় গান। পলস্নী সংগীতের এই আলাবী বালপকীকে সেখানে আরবী সৈয়দ আল্ ফকীহ বলে মনে করা হয়। ইনি মিন্দানাও ও সোলো দ্বীপপুঞ্জের বিখ্যাত সপ্ত ভ্রাতাদের একজন। সোলোর করিম আল-মখদুমের কিছু পরে সৈয়দ আল ফকিহ সোলো দ্বীপপুঞ্জে এসেছিলেন। এই সপ্ত ভ্রাতা অর্থাৎ এই সাতজন অলি আল্লাহই আরব ভূমি থেকে ইসলামের আলো সোলো ও মিন্দানাও দ্বীপপুঞ্জে ছড়িয়ে ছিলেন । প্রায় সহস্র বছর ধরে আলাবী বালপকীর গান সোলোর গ্রাম-গ্রামান্তরে গীতে হয়ে আসছে।

কাছে কোথাও থেকে পেটা ঘড়ির আওয়াজ এলো ঢং ঢং..............।

রাত দশটা বেজে গেল। মিঃ কার্টার একবার নিজের ঘড়ির দিকে চাইল। তারপর সক্রিয় হয়ে উঠল সে।

সে গিয়ে বাড়িটির দরজায় নক করলো। একবার, দুইবার তিনবার সিঁড়ি দিয়ে কারো নেমে আসার শব্দ পাওয়া গেল। 'কট' করে সুইচ টেপার শব্দ হলো ভিতরে।

দরজা খুলে গেল। দরজায় দাঁড়িয়ে এক যুবতী। দেশীয় মেয়ে। দীর্ঘ কাল চুল-গলার দু'পাশ দিয়ে বুক বেয়ে কটিদেশ পর্যন্ত নেমে এসেছে।

চোখ মুখ দিয়ে বুদ্ধি যেন ঠিকরে পড়ছে। তার সাথে মিশেছে লাবন্য। এক কথায় অপরূপ মেয়েটি। তার সিণগ্ধ সৌন্দর্য চোখ ধাঁধিয়ে দেয় না, কিন্তু আপনার করে কাছে টেনে নেয়।

মেয়েটি স্পষ্ট কুন্ঠাহীন কন্ঠে জিজ্ঞেস করলো, কে আপনি?

-আমি একজন বিদেশী। পথ হারিয়েছি।

-কোথা থেকে আসছেন?

-ম্যানিলা থেকে।

-যাবেন কোথায়?

-হোয়াইট রোডে?

-হোয়াইট রোডে? তাহলে এ পথে এসেছেন কেন? পার্ক রোড ধরে যাওয়া উচিত ছিল আপনার।

মিঃ কার্টার কিছু বলল না।

মেয়েটিই আবার বলল, অনেক গলি-কুচো ঘুরে আপনাকে যেতে হবে হোয়াইট রোডে। থামল একটু। বলল আবার, আপনি ভিতরে একটু বসুন। আমি সংক্ষিপ্ত স্কেচ করে দিচ্ছি।

বলে মেয়েটি ভিতরে সরে দাঁড়াল। আহমদ মিঃ কার্টার গিয়ে বসল সোফাটায়। মেয়েটি সিঁড়ি ভেঙে উপরে চলে গেল।

কক্ষটি বসার ঘর। সারিবদ্ধ সোফাসেটে সাজানো। কক্ষের দেয়ালে মিন্দানাওয়ের কয়েকটি ল্যান্ডস্কেপ। মাঝখানে বড় একটি যীশুর মূর্তি। রৌপ্যের ফ্রেমে বাঁধানো। যীশুর কয়েকটি বাণীও আছে টাঙ্গানো।

মেয়েটি ফিরে এলো। স্কেচ করা একটি কাগজ তুলে দিল মিঃ কার্টারের হাতে।

মিঃ কার্টার একবার ভালো করে চোখ বুলিয়ে ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিল। তারপর উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে মেয়েটিকে বলল, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি আপনাকে?

-নিশ্চয় করতে পারেন!

-আমার ধারণা সত্য হলে, আপনি খৃষ্টান। কিন্তু আলাবী বালপকীর গান আপনি জানলেন কি করে এবং অমন ক্ষমতা দিয়ে সে গান আপনি গাইতে পারলেন কি করে?

প্রশ্ন শুনে মেয়েটির চোখ মুহূর্তের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। পরে চোখ খুলে ধীরে ধীরে মেয়েটি বলল, কেন জানবে না, কেন গাইতে পারব না, আমি কি এ মাটির মেয়ে নই?

-আমার জিজ্ঞাসা হলো, আলাবী বালপকীর মরমী সংগীত সোলোর মুসলমানদের নিজস্ব সম্পদ, কোন খৃষ্টান এটা গাইবে এটা অবিশ্বাস্য।

বেদনার একছায়া খেলে গেল মেয়েটির মুখের উপর দিয়ে। তার ফুলের পাঁপড়ির মত পাতলা ঠোট দু'টি যেন কুঞ্চিত হয়ে পড়ল কিছুটা। নতমুখী সে। কিছুক্ষণ নীরব থেকে সে বলল, বিদেশী আপনি, আলাবী বালপকীকে চিনলেন কি করে? আর এখানকার মুসলামানদের একান্ত ঘরের এ কথা আপনি জানলেন কি করে?

-বিদেশীদের পক্ষে এসব জানাকি একান্তই অসম্ভব?

-তাহলে কি আপনি মুসলমান।

-স্বীকার করছি।

-অপরাধ স্বীকারের মত হলো কথাটা। মেয়েটির পাতলা ঠোঁটের উপর দিয়ে এক টুকরো হাসি খেলে গেল।

-মিন্দানাওয়ে মুসলমান হওয়া অপরাধ নয়, তাহলে বলবেন?

মেযেটির মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। সে এক দৃষ্টিতে মিঃ কার্টারের দিকে চেয়ে আছে। খুঁটে খুঁটে দেখছে তাকে। তারপর সে বাইরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে মিঃ কার্টারের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে বলল, আপনার সত্যিকার পরিচয় কি।

-আপনি আমাকে সন্দেহ করছেন?

-হ্যাঁ

-কারণ, ম্যানিলা থেকে কোন মুসলমান এইভাবে কাগায়ান আসতে পারে না। আপনার মত বুদ্ধিমান লোক ম্যানিলা থেকে এসে কাগায়ান পথ ভুল করতে পারে না।

মিঃ কার্টার বিস্মিত দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে চেয়ে রইল। অদ্ভুত বিশ্লেষণ শক্তি মেয়েটির। সাধারণের তালিকায় এ মেয়ে পড়ে না।

আমার পরিচয় পরে হবে, আপনার পরিচয়টা কি জানতে পারি?

-নিশ্চয়। ফিলিপাইন সিক্রেট সার্ভিসের একজন অপারেটর।

-আর আমি আহমদ মুসা।

মেয়েটি সামনে দাঁড়িয়েছিল। ভূত দেখার মত অস্ফুট আর্তনাদ করে সে গিয়ে সামনের সোফায় বসল। দুহাতে মুখ ঢেকে বসে রইল বহুক্ষণ।

ঘড়ির দিকে চেয়ে আহমদ মুসা আঁতকে উঠল। রাত এগারটা। দ্রুত বলল সে, আমি এখন কি যেতে পারি?

-আপনার প্রশ্নে জবাব নিলেন না । মুখ তুলে বলল মেয়েটি। বিধ্বস্ত মুখ তার।

-আমি জবাব পেয়ে গেছি।

-কি জবাব পেয়েছেন?

-আলাবী বালপকীর এক ভক্ত তাঁর সমাজ থেকে দূরে সরে গিয়েও তাকে ভুলতে পারেনি।

আহমদ মুসার এই কথা মেয়েটির উপর যেন ভৌতিক ক্রিয়া করলো। সে অস্থির কন্ঠে বলে উঠল, না, না, না, বালপকীকে নয়, আমার মাকে ভুলতে পারিনি, মায়ের মুখ ভুলতে পারিনি, মায়ের গান, মায়ের কাহিনী ভুলতে পারিনি আমি। বলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল মেয়েটি।

রাজ্যের মমতা নেমে এসেছে আহম মুসার চোখে। অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত এই মেয়েটির দিকে সে চেয়ে আছে অনিমেষ চোখে। প্রকাশহীন এই বেদনায় যে মেয়েটি কতদিন থেকে নিষ্পিষ্ট হচ্ছে কে জানে? আজ প্রকাশের পথ পেয়ে প্রতিরোধের কৃত্রিম দুর্গ ভেঙ্গে পড়েছে খান খান হয়ে। প্রলোভনে পড়ে, অবস্থার

চাপে কিংবা বাধ্য হয়ে সত্যের আলো থেকে দূরে সরে গিয়ে কত তরুণ-তরুণী এমনিভাবে অন্তর্বেদনায় জর্জরিত হচ্ছে, কে তার খোঁজ রাখে। ভাবতে গিয়ে আহমদ মুসার চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল।

সে উঠে গিয়ে মেয়েটির মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, বোন, তোমাদের এ অবস্থার জন্য দায়ী আমাদের অধঃপতিত সমাজ, পথভ্রষ্ট ধর্মনেতা আর আহাম্মক রাষ্ট্র নেতারা। থামল আহমদ মুসা।

আবার বলল, আজ যে কত আনন্দিত আমি আমাদের এক হারানো বোনকে আমরা ফিরে পেলাম।

মেয়েটি তাড়াতাড়ি উঠে আহমদ মুসার পায়ে সালাম করে উঠে দাঁড়াল। চোখ মুছে বলল, আমার আগের নাম, সাবেরা। আমি এখন থেকে সাবেরা। বলতে বলতে কান্নায় তার কথা জড়িয়ে গেল আবার।

আহমদ মুসা বলল, সাবেরা বোন আমাকে উঠতে হয়। আর দেরী করতে পারি না।

-আপনি হোয়াইট রোডে কেন যাবেন আমি জানি, কিন্তু আমি আপনাকে যেতে দেব না। ঐ পাওয়ার হাউজ আমিই উড়িয়ে দিতে পারব।

-না, বোন। তা হয় না। তুমি আজ অশান্ত, কোন এ্যাসাইনমেন্ট আমি তোমাকে দিতে পারি না আজ।

-কাগায়ান শহরের সমস্ত শক্তি আজ আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। সমগ্র ফিলিপাইন, শ্বেতাঙ্গ আর ইহুদীরা আজ কাগায়ান শহরের দিকে চেয়ে আছে। সমগ্র কাগায়ানে জাল পেতে রাখা হয়েছে আপনাকে ধরার জন্য। আমি আপনাকে কিছুতেই যেতে দেব না এখান থেকে।

আহমদ মুসা গম্ভীর কন্ঠে বলল, আমি কে জান?

-জানি, আমাদের নেতা।

-অতএব নেতার নির্দেশ অমান্য করো না।

বলে আহমদ মুসা দরজা খুলে বেরিয়ে এলো রাস্তায়। সাবেরা হাত দু'টি উপরে তুলে বলল প্রভু হে, আজ দীর্ঘ ১৪ বছর পর তোমাকে ডাকছি প্রভূ, তুমি হতভাগা এ জাতির মহান নায়ককে হেফাজত করো প্রভু।

# ৯

হন হন করে এগিয়ে চলেছে আহমদ মুসা। একবার হাত দিয়ে সোল্ডার হোলস্টারে সে তার প্রিয় রিভলবারটি দেখে নিল।

সাবেরার স্কেচটি এমন নিখুঁত যে, বেগ পেতে হচ্ছে না রাস্তা চিনে নিতে। মৃত পুরীর মতই অলি-গলি সব নীরব-নীর্জন। এই নীরবতার মাঝে আহমদ মুসার স্টিল সোলের জুতা বিদঘুটে শব্দ তুলছে।

আর বেশী দূর নয়। স্কেচ অনুসারে শেষ লেনের শেষ মাথা প্রায় এসে গেছে।

লেনটির মাথা জুড়েই পাওয়ার হাউজ। ৮ ফিটের মত উঁচু দেয়াল। দেয়ালের উপর দিয়ে আবার তারকাঁটার জাল। তারকাঁটার জাল যে ইলেকট্রিফায়েড তা সহজেই আঁচ করা যায়।

দেয়ালের বাইরে দিয়েও সেন্ট্রি রয়েছে।

আহমদ মুসা লেনের মুখে অন্ধকার মত জায়গায় দাড়িয়ে রইল। লেনের মুখ থেকে একজন সেন্ট্রিকে দেখা যাচ্ছে। সে হাটতে হাটতে দক্ষিণ দিকে চলে গেল। আর একজন সেন্ট্রিকেও দেখা গেল। সে রাস্তার মোড় পর্যন্ত এসে আবার পশ্চিম দিকে চলে গেল। আহমদ মুসা বুঝল নির্দিষ্ট নিয়মেই এ পেট্রোল চলছে। যখন দক্ষিণের সেন্ট্রি মোড়ে আসবে, তখন এদিকের সেন্ট্রি চলে যাবে পশ্চিমে।

আহমদ মুসা লেনের দেয়ালের পাশে ব্যাগটি রেখে দিল। তারপর পকেট থেকে একটি ছোট্ট শিশি বের করে নিয়ে তা থেকে কিঞ্চিত পরিমাণ তরল পদার্থ রুমালে ঢেলে নিল। দক্ষিণের সেন্ট্রিটি মোড়ের কাছে প্রায় এসে গেছে।

আহমদ মুসা রেডি হলো। ডান হাতে রুমাল। সেন্ট্রিটি মোড়ে এসে মুহূর্তকাল দাড়িয়ে আবার দক্ষিণ দিকে যাত্রা শুরু করল।

আহমদ মুসা পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে দ্রুত তার পিছু নিল। নাগালের মধ্যে আসতেই সে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। বাম হাতে

চেপে ধরল গলা, আর ডান হাতে ক্লোরোফরম ভেজান রুমাল ঠেসে ধরলো নাকে। অস্ফুটে কয়েকবার কোঁক কোঁক করে একেবারে হাত-পা আছড়ে নিস্তেজ হয়ে পড়ল।

আহমদ মুসা দ্রুত তাকে লেনের অন্ধকারে কোণে টেনে নিয়ে এলো। তারপর তার ইউনিফরম খুলে পরে নিল নিজে। ব্যাগ থেকে প্রয়োজনীয় কয়েকটা জিনিস পকেটে পুরল। এদিকে সেন্ট্রিটি মোড়ে এসে গেছে।

আহমদ মুসা অটোমেটিক রাইফেলটি কাঁধে ফেলে ক্যাপটি কপাল পর্যন্ত নামিয়ে পাওয়ার হাউজের দেয়ালের গা ঘেষে চলতে শুরু করলো।

দেয়ালটি দক্ষিণে এসে যেখানে শেষ হযেছে সেখান থেকে পুনরায় তা বেঁকে অল্প একটু গিয়ে উঁচু বারান্দায় শেষ হয়েছে। বারান্দায় এসে মিশেছে হোয়াইট রোডও। বারান্দার সিড়ির নীচে দুই প্রান্তে অটোমেটিক কার্বাইন হাতে দু'জন দাঁড়িয়ে আছে। দক্ষিণ দিকে হোয়াইট রোডের অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। কিছু দূরে দু'টি জীপ দাড়িয়ে আছে। জীপের রং দেখে মনে হচ্ছে আর্মির।

আহমদ মুসা ফুলস্কেপ সাইজের একটি প্রিন্টেড কাগজ বের করে হাতে নিয়ে দ্রুত দৃঢ় পদক্ষেপে বারান্দার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে চলল। মনে হচ্ছে যেন জরুরী কোন কাগজ সে অফিসের ডিইটি অফিসারকে দিতে যাচ্ছে । অটোমেটিক কারবাইন হাতে দাড়ানো পুলিশ দু'জন তাকে দেখে নড়ে উঠল। কিন্তু আহমদ মুসা কাগজটি উঁচু করে অফিসের দিকে ইংগিত করে সিঁড়ি ভেঙে দ্রুত বারান্দা অতিক্রম করে অফিসে ঢুকে গেল। সে যে রুমে প্রবেশ করলো, তা একটি হলঘর। হল ঘরে কোন লোক নেই। হল ঘরের পরেই আর একটি রুম। চেয়ার টেবিল পাতা। ডিউটি অফিসার চেয়ারে বসে ঢুলছিল। আহমদ মুসা ঘরে প্রবেশ করেই দরজা বন্ধ করে দিল। শব্দ পেয়ে ডিউটি অফিসার একটু নড়ে চড়ে বসল। চোখ দু'টিও তার খুলে গেল। উদ্যত রিভলভার হাতে একজন অপরিচিত পুলিশকে তার সামনে দাঁড়ানো দেখে সে হকচকিয়ে উঠল। বসে থেকে আপনা হতেই একান্ত অনুগত্যের মত হাত দু'টি উপরে তুলল।

আহমদ মুসা বলল, হাত উপরে তোলা নয় ইঞ্জিন রুমের চাবি দাও। কোন চালাকি করো না। মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।

লোকটি কাঁপতে কাঁপতে ড্রয়ার থেকে চাবি নিয়ে ফেলে দিল টেবিলের উপর। আহমদ মুসা দ্রুত টেবিল থেকে চাবি কুড়িয়ে নিল। তারপর রিভলভার উচু করে চাপ দিল ট্রিগারে। একরাশ ধোয়া বেরিয়ে গেল নল দিয়ে। লোকটি জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল চেয়ারের উপর। তারপর চেয়ার থেকে মেঝেতে।

আহমদ মুসা দ্রুত চাবি নিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল। ভিতরের উঠান বিভিন্ন বৈদ্যুতিক সাজ সরঞ্জামে ভর্তি। উত্তর-পশ্চিম কোণে ইঞ্জিন কক্ষ। ভীষণ শব্দে ইঞ্জিন চলছে। আহমদ মুসা দ্রুত সেদিকে অগ্রসর হলো। ওদিক থেকে দু'জন লোক অফিস ঘরের দিকে আসছিল। ওরা তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী। পুলিশকে ওভাবে দ্রুত ইঞ্জিন রুমের দিকে যেতে দেখে তারা বিস্মিত কন্ঠে বলল, কি হয়েছে স্যার?

-কিছু হয়নি, তবু ইঞ্জিন রুমটা একটু চেক করে আসি। তোমরা এখানে একটু দাঁড়াও।

লোক দু'জন আহমদ মুসার ইংরেজী কথা শুনে মনে করল, নিশ্চয় উপর থেকে পাঠানো হয়েছে। তারা আহমদ মুসার নির্দেশ মত ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

আহমদ মুসা দ্রুত গিয়ে ইঞ্জিন রুমে ঢুকে পড়ল। তারপর কাজে লেগে গেল সে।

পকেট থেকে সে ডিম্বাকৃতি একটি বস্তু অতি সন্তর্পনে বের করে নিল। সৌদি অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরীতে তৈরী অত্যাধুনিক ডিনামাইট এটি। এর জন্য পৃথক কোন ফিউজের দরকার হয় না এবং আগুনেরও প্রয়োজন হয় না কোন। এ ডিম্বাকৃতি ডিনামাইটের শীর্ষদেশে চ্যাপটা ধরনের সেফটি পিন রয়েছে। পিনটি খুলে নিলেই এর ভিতরের ক্ষুদ্র অটোমেটিক রিয়্যাকটরে বিষ্ফোরণ ঘটে যায় এবং তা থেকে উৎপাদিত তাপ ক্রমে ক্রমে এমন এক পয়েন্টে উন্নতি হয় যখন গোটা ডিনামাইটটিই ফেটে পড়ে প্রচন্ড বিষ্ফোরণে। এর ধ্বংসকারী ক্ষমতা ভীষণ। প্রায় তিনশ' বর্গগজ পরিমিত স্থানের সবকিছুকে এটা ধুলায় পরিণত করতে পারে।

আহমদ মুসা সন্তর্পণে সেফটি পিন খুলে নিয়ে অতি সাবধানে তা রেখে দিল মূল ইঞ্জিনের অভ্যন্তরে নির্ভৃত এক কোণে। চট করে কারোরই তা নজরে পড়বে না।

আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি ইঞ্জিন রুম থেকে বেরিয়ে এলো। গেটে তালা লাগিয়ে চাবি ছুড়ে ফেলে দিল পাশের স্তুপিকৃত লোহা-লক্কড়ের মধ্যে। নিরাপদে ডিনামাইটটি পাততে পেরে আনন্দে গুনগুনিয়ে উঠেছিল আহমদ মুসার মন। কিন্তু গুনগুনানি তার থেমে গেল যখন দেখল যাদেরকে সে দাঁড়াতে বলে গিয়েছিল তারা সেখানেই নেই। ধক করে উঠল তাঁর মন। ওদেরকে অমন করে মায়া দেখানো তার ঠিক হয়নি। শত্রুকে  পিছনে ফেলে রেখে যাওয়াটা মারাত্মক ভুল হয়েছে তার।

দ্রুত সে ডিউটি রুমের দিকে পা বাড়াল। ডিউটি অফিসার তেমনভাবে পড়ে আছে তার চেয়ারের পাশে। কিন্তু বাইরের দিকের যে দরজা আহমদ মুসা বন্ধ করে গিয়েছিল, তা খোলা। আর বাম পাশের সংযোগ কক্ষের খোলা দরজা বন্ধ। সন্দেহের এক শীতল স্রোত বয়ে গেল তার দেহে। শির শির করে উঠল তার মেরুদন্ডদেশ। সে তাহলে ট্রাপে পড়েছে?

বাইরের খোলা দরজার দিকে দ্রুত এগোল সে। কিন্তু দরজায় পা দিয়েই দেখতে পেল, কয়েকজন দ্রুত সিড়ি বেয়ে উঠে আসছে। হাতে উদ্যত সাব মেশিন গান।

রিভলভার এক্ষেত্রে অকেজো দেখে আহমদ মুসা দ্রুত বাম হাত দিয়ে প্যান্টের বাম পকেট থেকে স্মোক বম্ব বের করে নিল। বিদ্যুৎ গতিতে তার বাম হাত উপরে উঠল। কিন্তু বম্ব ছুড়তে সে পারল না। একেবারে পেছনে পদশব্দ শুনে সে তড়াক করে পেছনে ফিরল। কিন্তু দেরী হয়ে গেছে তখন। প্রচন্ড এক আঘাত নেমে এলো তার মাথায়। জ্ঞান হারিয়ে আহমদ মুসা লুটিয়ে পড়লো মেঝেতে।

সবাই এসে ঘিরে ধরল তাকে। তাদের মধ্যে থেকে লেফটেন্যান্টের প্রতীক আটা একজন অন্য একজন অন্য একজনকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, আলবার্ট তুমি এখনি গিয়ে স্যারকে খবর দাও। জীপ নিয়ে যাও।

একটা কড়া স্যালুট দিয়ে আলবার্ট নামক লোকটি ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি ভেঙ্গে দ্রুত জীপ লক্ষ্যে এগিয়ে গেল।

হোয়াইট রোড পার হয়ে পার্ক রোড ধরে আলবার্টের গাড়ী পূর্বদিকে দ্রুত এগিয়ে চলছিল। সামনেই একটি কালভার্ট। সংকীর্ণ রাস্তা সেখানে । অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে স্পিড কমাতে হলো। এই সময় সামনে থেকে একটি গাড়িকে সে তীরবেগে এদিকে এগিয়ে আসতে দেখল। গাড়ীটির বেপরোয়া গতি দেখে প্রমাদ গুণল আলবার্ট। কালভার্টের মুখে এসে আলবার্টের গাড়ী ডেডশ্লো হয়ে গেল। সামনের গাড়ীটি তখন কালভার্টে উঠে পড়েছে। আলবার্টের গাড়ী থেমে গেছে রাস্তার কুল ঘেষে। সামনের গাড়ীটিও এসে দাঁড়াল তার গাড়ীর পাশে।

-কি ব্যাপার আলবার্ট, কোথায় চলেছ? জীপ থেকে মুখ বাড়িয়ে এক নারী কন্ঠ জিজ্ঞাসা করল।

-স্যারকে খবর দিতে।

-কি খবর?

-ও। আপনি তো জানেন না। পাওয়ার হাউজে এক শালাকে আমরা ধরেছি। আলবার্টের মুখে বিজয়ের হাসি।

-স্যারকে আবার খবর দেয়া কেন? তোমাদের সব কাজে দীর্ঘ সূত্রিতা। ওকেই তো এখনি হাজির করতে হবে স্যারের কাছে। চল ওকে নিয়ে আসব আমি।

আলবার্ট ও মেয়েটি ফিরে এলো পাওয়ার হাউজে। গাড়ী থেকে নেমেই তরতর করে সিঁড়ি ভেঙ্গে মেয়েটি উঠে গেল পাওয়ার হাউজের ডিউটি রুমের দিকে।

আহমদ মুসার জ্ঞান ফিরে আসেনি তখনও। তেমনিভাবে সবাই বসে আছে তাকে ঘিরে। মেয়েটিকে ঘরে ঢুকতে দেখে সবাই সসম্ভ্রমে উঠে দাড়ায়। ফিলিপাইন সিক্রেট সার্ভিসের বাঘা এজেন্ট মিস হেনরিয়েটাকে দেখে তারা খুশী হল।

ঘরে ঢুকে সকলের দিকে স্মিত হাস্যে চেয়ে হেনরিয়েটা বলল, তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ। তোমাদের কাহিনী আমরা পরে শুনব। একে বেঁধে তোমরা

আমার জীপে তুলে দাও। এক্ষুনি একে হেড কোয়ার্টারে পৌছাতে  হবে। অনেক কাজ আছে একে দিয়ে।

লেফটেন্যান্টের ইংগিতে দ্রুত আহমদ মুসাকে হেনরিয়েটার জীপে তুলে দেয়া হলো।

গাড়ীতে উঠতে উঠতে হেনরিয়েটা বলল, তোমাদের এ বিজয়ে হেড কোয়ার্টার অপরিসীম খুশী হবে। কিন্তু দেখো, আনন্দ যেন তোমাদের দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য না সৃষ্টি করে।

তীর বেগে ছুটে চলল হেনরিয়েটার জীপ। হোয়াইট রোড, পার্ক রোড পার হয়ে মার্কোস এভিনিউ ধরে তা এগিয়ে চলল উত্তর দিকে। মার্কোস এভিনিউ ধরে কিছু দূর যাবার পর গাড়ীটি বাম দিকে ঘুরে লেক সার্কাস রোড ধরে প্রায় মিনিট তিনেক চলার পর রাস্তা থেকে নেমে একটি অন্ধকার মত জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল।

গাড়ী থামতেই হেনরিয়েটা লাফ দিয়ে পিছনের সিটে এলো। অন্ধকারের মধ্যেই চাকু দিয়ে সে আহমদ মুসার হাত ও পায়ের বাঁধন কেটে দিল।

আহমদ মুসা গাড়ীতে উঠার পরেই জ্ঞান ফিরে পেয়েছিল। মাথা তার খসে যাচ্ছে বেদনায়। গোটা গা ঝিম ঝিম করছে। ভাবছিল সে, মেয়েটি তাকে কোথায় নিয়ে চলেছে? বাঁধন কাটতে দেখেই তার মনে একটি কথা ঝিলিক দিয়ে গেল। সে বলল, কে, সাবেরা?

-জি, জনাব, আপনি জেগে উঠেছেন? কেমন বোধ করছেন এখন?

সাবেরার প্রশ্নের দিকে কর্ণপাত না করে আহমদ মুসা বলল, আমাকে কোথায় এনেছ সাবেরা?

-আমরা এখন লেক সার্কাস রোড রয়েছি।

-এখন সময়......

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় বিস্ফোরণের এক বিরাট শব্দ শোনা গেল। গাড়িটিও কেঁপে উঠল সেই ধাক্কায়।

সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যুতিক বাতি নিভে গেল চারদিকের।

সাবেরা খুশীতে আহমদ মুসার হাত দু'টি ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বলল, সফল মিশন আপনার।

আহমদ মুসা শান্ত স্বরে বলল-সবে কাজ শুরু, খুশী হবার সময় এখনো আসেনি সাবেরা।

একটু থেমে আহমদ মুসা আবার বলল, এখন সময় কত?

-পৌণে বারটা।

-সাবেরা, গাড়ী চালিয়ে টার্মিনাল ভবনের দিকে চল।

-কিন্তু আপনার ফার্স্ট এইড না করে কিছুতেই যাওয়া যাবে না। এখনও রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

-অবাধ্য হয়ো না সাবেরা। ইয়ারপোর্ট সংলগ্ন মার্কোস এভিনিউ-এর ব্রিজ আমাদের এই মুহূর্তেই দখল করতে হবে।

আর কোন কথা না বলে সাবেরা গিয়ে স্টিয়ারিং হুইলে বসল।

গাড়ীটি সবেমাত্র লেক সার্কাস রোডে উঠে চলতে শুরু করেছে, এমন সময় শহরের দক্ষিণাঞ্চল থেকে মেশিনগানের শব্দ ভেসে এলো। শুধু এক জায়গায় নয়, গোটা দক্ষিণ কাগায়ান ট্যা ট্যা র....র....র.... শব্দে মুখরিত হয়ে উঠেছে।

প্রথমেই কথা বলল, সাবেরা। বলল, এই অবস্থায় কি আমাদের যাওয়া উচিত হবে?

-ভয় পেয়ো না সাবেরা, ওগুলো পিসিডার মেশিনগান। এতক্ষণ পাওয়ার হাউজের বিস্ফোরণের অপেক্ষা করছিল, এবার ওরা ঢুকে পড়ছে দক্ষিণের বিভিন্ন পথ দিয়ে। আমাদের গিয়ে ব্রিজ দখল করে শত্রুর সরবরাহ ও যোগাযোগের পথ বন্ধ করে দিতে হবে।

সাবেরার মুখে ফুটে উঠল সুন্দর এক টুকরো হাসি। বলল, ভয় পাব কেন জনাব, আপনার সাথে থেকে মৃত্যুবরণ করার দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করলে আমি ধন্য হব।

-এ মৃত্যু কামনার মধ্যে কোন কৃতিত্ব নেই সাবেরা, বরং এটা এক ধরনের অপরাধ।

-শহীদ হবার আকাঙ্খা কি পোষণ করে না মানুষ?

-করে হয় তো কিন্তু ওটা ভুল। শহীদ হলে বিজয় আসবে কার হাত দিয়ে? শহীদের আকাঙ্খা প্রকৃতপক্ষে শত্রুর হাতে বিজয়ের পতাকা তুলে দেবার মতই অপরাধ। সুতরাং আকাঙ্খা শহীদের নয়, গাজী হবার আকাঙ্খা পোষন করতে হবে। গাজী হবার আকাঙ্খা পুরণ করতে গিয়ে যে মৃত্যু আসবে, সেটাই শহীদের মৃত্যু, সম্মানের মৃত্যু-গৌরবের মৃত্যু।

মার্কোস এভিনিউ ধরে ঝড়ের মত ছুটে চলছিল জীপ। দু'জনেই নীরব।

আহমদ মুসা জিজ্ঞেস করলো, তোমার জীপে কোন অস্ত্র আছে সাবেরা?

-দুটো মেশিনাগান আছে। আর আছে আধা ডজনের মত হাত বোমা।

-কোথায় মেশিনগান?

-উপরে তাকিয়ে দেখুন।

আহমদ মুসা উপরে তাকিয়ে দেখল, জীপের ছাদের সাথে টাঙানো আছে দুটি মেশিনগান। জীপের ছাদের সাথে ওগুলো এমনিভাবে সেটে আছে যে, হঠাৎ করে চোখেই পড়ছে না।

মেশিনগান দু'টো নামিয়ে নিতে নিতে আহমদ মুসা বলল, মাইকেল এ্যাঞ্জেলা ও ডেভিড ইমরানকে তো তুমি চেন? সোভিয়েটের পক্ষ থেকে এখানে কে এসছে জান?

-সোভিয়েট ইনটেলিজেন্সের কমান্ডার অপারেটর এয়াগোমোভিচ।

-আপো পর্বতে কামান্ডো হামলার পরিকল্পনা সম্পর্কে কি জান?

-ওটা ইরগুন জাই লিউমি ও সোভিয়েট ইনটেলিজেন্সের নিজস্ব অপারেশন। ফিলিপাইন ইনটেলিজেন্স এখানে শুধু 'হস্ট' -এর ভুমিকা পালন করছে। অবশ্য লাভের সিংহভাগ ফিলিপাইনীদের বরাতেই আসবে।

-কেমন করে? মুসলমানেদর উথাণ এভাবে রোধ করতে পারলেই কি মিন্দানাওয়ে খৃষ্টান স্বার্থের জয় হবে? কমিউনিস্টরা চেষ্টা করবে না তাদের স্থান করে নিতে?

-এটা ক্লু-ক্লাক্স-ক্লান এবং খৃস্টান মিশনারী কর্মকর্তারা বুঝে। কিন্তু অবস্থার চাপে পড়েছে তারা। রেডিয়েশন বম্ব উদ্ধার করে পেন্টাগণকে ফেরত দিতে না পারলে বড় অসুবিধায় পড়তে হবে ক্লু-ক্লাক্স-ক্লান ও মিশনারী

কর্তৃপক্ষকে। রেডিয়েশন বম্ব কেলেংকারী প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে পেন্টাগন ও মার্কিন সরকার যন্ত্রে।

সমগ্র শহর অন্ধকারে ডুবে আছে। অন্ধকারের আলো গিয়ে পড়েছে ব্রীজে। ব্রীজের উপর দু'জন পুলিশ। দু'জনার হাতেই সাব মেশিনাগান। সাব মেশিনগান উচিয়ে দক্ষিণ দিকে চেয়ে তারা দাঁড়িয়ে আছে।

সাবেরা জিজ্ঞেস করলো কি করব জনাব?

আহমদ মুসা বলল, জীপ কার, আরোহীর কারা, তা না জেনে ওরা গুলী করবে না। তাছাড়া অবস্থার আনুকুল্যটা আমাদের দিকেই রয়েছে। আমরা ওদের দেখতে পাচ্ছি, ওরা আমাদের দেখতে পাচ্ছে না। তুমি ওদের পাশে গিয়ে গাড়ী থামাও।

আহমদ মুসা মেশিনগান রেখে দিয়ে সাবেরার রিভলভারটি তুলে নিল। সাইলেন্সার লাগানোই আছে তাতে।

গাড়ী ব্রীজের নিকটবর্তী হতেই ওরা হাত তুলে গাড়ী থামাবার ইংগিত করল। রাস্তার পুর্বধার দিয়ে গাড়ী চলছিল এবং ব্রীজের পূর্বদিকের দেয়াল ঘেষে গাড়ীটি দাঁড়িয়ে পড়ল।

গাড়ী দাঁড়াতেই পুলিশ দু'জনের একজন ছুটে এলো গাড়ীর দিকে। কিন্তু দু'তিন পা এগিয়েই সে অস্ফুট আর্তনাদ করে ঢলে পড়ল মাটিতে।

পর মুহূর্তেই দ্বিতীয় জনের উচিয়ে ধরা সংগিন থেকে ছুটে এলো এক ঝাঁক গুলি। কিন্তু সাবেরা অদ্ভুত ক্ষীপ্রতার সাথে সামনে সরিয়ে নিয়েছিল গাড়ি। গুলীর ঝাঁক গিয়ে ব্রীজের দেয়াল বিদ্ধ করল। এই অবসরে আহমদ মুসার দ্বিতীয় গুলি নিঃশব্দে লক্ষ্য ভেদ করলো। দ্বিতীয় জনও মুখ থুবড়ে পড়ে গেল ব্রীজের কংক্রিটের মেঝের উপর।

আহমদ মুসা লাফ দিয়ে জীপ থেকে নেমে পড়ল। সাবেরাও নেমে পড়ল সেই সাথে। দুজনার হাতেই দুটি মেশিনগান।

দক্ষিণ কাগায়ানে মেশিনগান ও হাত বোমা বিস্ফোরনের অবিরাম শব্দ রাতের কালরূপকে আরও ভয়ংকর করে তুলেছে।

টার্মিনালের বহিরাঙ্গন থেকে ইঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার শব্দ পেল আহমদ মুসা।

একটি নয়, একই সঙ্গে কয়েকটি ইঞ্জিন স্টার্ট নিল। আহমদ মুসা সাবেরাকে ইংগিত করে ব্রীজের দক্ষিণ প্রান্তে সরে এলো। বলল, হাত বোমা লও সাবেরা, ট্রাকের বিরুদ্ধে মেশিনগান তেমন কাজে আসবে না।

ব্রীজের উপর দ্রুত অগ্রসরমান পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। সাবেরার মেশিনগান উঁচু হয়ে উঠল। আহমদ মুসা বলল, কর কি সাবেরা, শত্রুর পায়ের শব্দ এটা নয়।

মুহূর্তকাল পরেই এসে হাজির হলো আবিদ। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, ইহুদী কমান্ডোরা ট্রাক বোঝাই হয়ে এদিকে আসছে। আর মাউন্টেন জেট তো রেডি হয়ে আছে। পালাবে না তো বড় ঘুঘুরা?

-উদ্বিগ্ন হবার কারণ নেই আবিদ। এতক্ষণে বিমান ক্ষেত্রের তিন ধারের বেড়া কাটা হয়ে গেছে। আবদুল্লাহ জাবেররা দেখ এসে পড়ল বলে।

আহমদ মুসার কথার রেশ তখনো মিলিয়ে যায়নি। বিমান ক্ষেত্রের পশ্চিম, উত্তর ও পূর্বদিকে একই সঙ্গে গর্জে উঠল অর্ধশত মেশিনগান। ফুলঝুরির মত বুলেটের বৃষ্টি নামল বিমানক্ষেত্রে।

আহমদ মুসা বলল, সাবেরা আবিদ তোমরা এখানে বস, ব্রীজ যেন কেউ পার হতে না পারে। স্মরণ রেখো, উত্তর ও দক্ষিণ কাগায়ানের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে রাখতে হবে তোমাদের।

বলে আহমদ মুসা দ্রুত ব্রীজ পার হয়ে ছুটল টার্মিনাল ভবনের দিকে। মাঝ পথে গিয়ে সে দেখল যে ট্রাকগুলো আসছিল, তা থেমে গেছে। ট্রাক থেকে জমাট অন্ধকারেরর মত মানুষগুলো নেমে টার্মিনাল ভবনের দিকে ছুটছে।

স্টেনগান ধরে রাখা আহমদ মুসার হাত নিসপিস করে উঠল। কিন্তু লোভ সম্বরণ করল সে। আহমদ মুসা ওদের একজন হয়ে ওদের পিছু পিছু চলল। একদিকে অন্ধকার, অন্যদিকে তার দেহে এখনও ফিলিপাইন পুলিশের পোশাক, সুতরাং সুবিধা হলো তার।

সকলের সাথে সেও গিয়ে দাঁড়াল রেস্ট হাউজের দোর গোড়ায়। দরজার সামনে টেবিলে একটি মোমবাতি জ্বলছে। টেবিল ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে মাইকেল এ্যাঞ্জেলো, ডেভিড এমরান ও মিঃ ইয়াগনোভিচ।

কামান্ডার ফিরে যেতে দেখে ডেভিড এমরান বলল, তোমরা তাহলে ফিরে এলে?

কমান্ডোদের মধ্যে থেকে তাদের নেতা এরিক স্যারণ বলল, পিছন থেকে আক্রান্ত হয়ে আর সামনে এগুবার কোন অর্থ হয় না স্যার।

-পিছনে ফিরেও লাভ নেই। প্রথম আঘাতেই বিমান ক্ষেত্রের প্রতিরক্ষা ভেঙ্গে পড়েছে। বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে সবাই। দেখ সবাই পালাচ্ছে।

-কিন্তু পালাবে কোন্ দিকে। ব্রীজও ওরা দখল করে আছে।

-তাহলে ফিলিস্তিনের পুনরাবৃত্তি আমরা এইভাবে স্বীকার করে নেব? খেদের সঙ্গে বলল মাইকেল এ্যাঞ্জেলো।

-স্বীকার করব কেন? কিন্তু বর্তমান অবস্থায় কাগায়ানের বিচ্ছিন্ন ও বিশৃঙ্খল শক্তিকে সংঘবদ্ধ করার কোন উপায় কি আপনার কাছে আছে মিঃ এ্যাঞ্জেলো?

এ্যাঞ্জেলো নীরব। কোন জবাব এলো না তার মুখে।

ডেভিড এমরানই আবার সখেদে বলে উঠল, ''ডিফেনসিভ ভূমিকাটাই খারাপ।'' আহমদ মুসা আপো পর্বতে ডিফেনসিভ ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে না বলে ছুটে এলো কাগায়ানে। আমরা যদি তার ট্রাপে না পড়ে আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী আপো পর্বতে আঘাত করতাম, তাহলে আহমদ মুসাই ছুটে যেত আপো পর্বতে তার ডিফেন্সের জন্য। আহমদ মুসা যে সুযোগ এখানে পেয়েছে, সে সুযোগ আমরাই সেখানে করে নিতে পারতাম। ডেভিড ইমরানের কন্ঠে অনুশোচনার সুর।

মেশিনগানের গুলী টার্মিনাল ভবনের গায়ে এসে লাগছে। একজন দৌড়ে এসে বলল, তিনটি জেট নষ্ট হয়ে গেছে। পাখা ভেংগে গেছে ওগুলোর। অবশিষ্ট একটি বিমানকে পাইলট টার্মিনাল ভবনের ছাদে নিয়ে এসেছে। ডেভিড ইমরান বলল, কয়জন আর যাওয়া যাবে ওতে।

এ্যাঞ্জেলো বলল, তাহলে সরে পড়ার সিদ্ধান্তই আমাদের নিতে হচ্ছে।

এ্যাঞ্জেলোর কথা শুনে ইয়াগনোভিচের মুখে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল। এতক্ষণে সে মুখ খুলল। বলল, টার্মিনাল ভবনকে কেন্দ্র করে আমরা যুদ্ধ

চালাতে পারি, কিন্তু ফল কি তাতে? আমাদের প্রতিরোধ শক্তির বারো আনাই শেষ হয়ে গেছে, তার সাথে গেছে অস্ত্রও। কিন্তু অস্ত্র জেটে ছিল, তাও আনা সম্ভব হলো না। তাছাড়া মূল শক্তিকেন্দ্র দক্ষিণ কাগায়ানের সাথে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। সুতরাং হিটলারী আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়ে তো লাভ নেই মিঃ এ্যাঞ্জেলো।

টার্মিনালের উত্তর দিকে বিরাট বিস্ফোরণ ঘটল। পেট্রোল ট্যাংকে আগুন ধরেছে।

কমান্ডো নেতা এরিক স্যারণ জুনিয়র বলল, আপনারা কয়েকজন বিমান নিয়ে সরে যান স্যার। আমরা গাড়ি নিয়ে ব্রীজ পেরুবার আর একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি।

বলেই সে কমান্ডোদের নির্দেশ দিল গাড়ীতে উঠার জন্য। এক সঙ্গে একটি বিদায়ী স্যালুট দিয়ে চলে গেল সাবাই।

মাইকেল এ্যাঞ্জেলা, ডেভিড ইমরান, ইয়াগনোভিচ ও পুলিশ প্রধান কিউই রেস্ট হাউজ থেকে বেরিয়ে টর্মিনালের ছাদে উঠার সিঁড়ির দিকে ছুটল। আহমদ মুসা পিছু নিল তাদের।

শুভ্র কপোতের মত দু'টি পাখা বিস্তার করে টার্মিনালের ছাদে দাঁড়িয়ে আছে মাউন্টেন জেট। দেখে মনে হচ্ছে কত শান্ত-শিষ্ঠ, কিন্তু আসলে ভীষণ ক্ষীপ্র। পাখীর মত ছোঁ মেরে চোখের নিমিষে মাটিতে নেমে যেতে পারে। পাখির মতই নিঃশব্দ তার গতি।  উঁচু-নিচু সব জায়াগাতেই সে সমান ক্ষীপ্রতার সাথে নামতে-উঠতে পারে।

পাইলট ককপিটে বসেছিল উদগ্রীবভাবে। বিমানের অটোমেটিক সিঁড়িটি নীচে নেমে আছে। উদগ্রীব পাইলট ছাদের উপর অনেকগুলো পায়ের শব্দ শুনতে পেল। ইয়াগনোভিচের পরিচিত কন্ঠস্বরও তার কানে এলো। খুশী হলো পাইলট- আসছেন ওরা। সে স্টার্ট দিল ইঞ্জিন। হালকা ধরনের হিস্ হিস্ শব্দ উঠল। টেকঅফের জন্য সম্পূর্ণ রেডি মাউন্টেন জেট।

ডেভিড ইমরান প্রথমে গিয়ে পা রাখল বিমানের সিঁড়িতে। কিন্তু দ্বিতীয় পাটি সে তুলতে পারল না। পিছন থেকে ভারী কন্ঠধ্বনিত হলোঃ বিমানে চড়তে চেষ্টা করবেন না মিঃ ডেভিড। হাত তুলে দাঁড়ান।

তারা চার জনেই ঘুরে দাঁড়াল। চার জনের চোখে মুখেই ভয় ও আতংকের চিহ্ন ফুটে উঠল। হাত তুলতে তারা বোধ হয় ভুলে গেল।

আহমদ মুসা তারার আলোকে ওদের অস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিল। বলল সে, এখনও কিন্তু নির্দেশ পালন করেননি আপনারা। কঠোর কন্ঠ আহমদ মুসার।

আহমদ মুসা কথা শেষ করার সাথে সাথে ৮টি হাতই উপরে উঠল।

তাদেরকে এমনভাবে নির্দেশ করতে পারে এ কে? প্রশ্ন কিলবিল করছে ডেভিড ইমরানের মনে।

টার্মিনাল ভবনের দক্ষিণ ব্রীজের দিকে এই সময় দুটি প্রচন্ড বিস্ফোরণের শব্দ হলো। আহমদ মুসার চোখ ছুটে গেল ঐ দিকে। ব্রীজের উপর একটি ট্রাক জ্বলছে। পরক্ষণেই মেশিনগানের একটানা শব্দ ভেসে এলো। আহমদ মুসা বলল, দেখতে পাচ্ছেন ডেভিড ব্রীজের উপর কমান্ডোদের কবর রচনার দৃশ্য? খুব আশা করেছিলেন উগান্ডার এন্টেবী দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটাবেন আপো পর্বাতে।

কৌতুহল চেপে রাখতে পারল না ডেভিড ইমরান। বলল-তুমিই কি আহমদ মুসা?

'তোমার কি মনে হয় ডেভিড? বলতে বলতে আহমদ মুসা কয়েক পা সামনে এগোল। এই সময় হঠাৎ একটি গুলী এসে আহমদ মুসার ডান বাহুর কিছুটা মাংসপেশী ছিঁড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল। অন্ধকার না হলে আহমদ মুসা দেখতে পেত বিমানের পাইলট চুপি চুপি এসে বিমানের দরজায় দাঁড়িয়েছে।

আহমদ মুসা বাম হাত দিয়ে ডান বাহু চেপে ধরে বসে পড়ল। কিন্তু স্টেনগান ছাড়েনি সে।

আহমদ মুসা বসে পড়ার সাথে সাথে ডেভিড ইমরান ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। আহমদ মুসা দেহটা বাঁকিয়ে নিয়েছিল। ডেভিড ইমরান হুমড়ি খেয়ে পড়ল আহমদ মুসার জানুর ইপর।

আহমদ মুসা বিদ্যুৎ গতিতে উঠে দাড়িয়েই কিছুটা পিছনে সরে গেল। ডেভিড উঠে দাড়িয়েছে, ওরা তিনজনই তার দিকে ছুটে আসছে। হাটু ভেঙ্গে বসে পড়ল আহমদ মুসা আবার। মাথার উপর দিয়ে একটি গুলী চলে গেল। এটাও এলো বিমানের দরজা থেকে। আহমদ মুসার ষ্টেনগান গর্জে উঠল। এক ঝাক গুলী বেরিয়ে গেল। ছুটে আসা ডেভিড ইমরান, ইয়াগনোভিচ, এ্যাঞ্জেলো ও মি: কিউই আছড়ে পড়ল ছাদের উপর।

বিমানের দরজা লক্ষ্যে আর এক ঝাক গুলী বেরিয়ে গেল আহমদ মুসার ষ্টেনগান থেকে। হঠাৎ একটি হিস্ হিস্ শব্দ শুনতে পেল সে। পালাচ্ছে পাইলট।

জেটের ককপিট লক্ষ্য করে আবার ষ্টেনগান তুলে ধরল সে। কিন্তু ককপিটের বুলেট প্রুফ গা থেকে গুলীগুলো ব্যর্থ হয়ে ঝরে পড়ল নিচে। কিন্তু ঘূর্ণায়মান ডানার ক্ষতি হলো, কিয়দংশ তার ভেঙ্গে পড়ল।

সিড়িতে পায়ের শব্দ শুনতে পেল আহমদ মুসা। তীক্ষ্ণ এক শীষ দিয়ে উঠল সে। জবাবে পদ শব্দ দ্রুত হয়ে উঠল।

ছাদে উঠে এলো ফারুক উনিতো। এখানে আবদুল্লাহ জাবেরের সহকারী সে। তার পিছনে পিছনে উঠে এলো আরও দুই তিনজন।

টর্চ জ্বেলে বিমান সার্চ করে দেখা গেল পাইলট আত্মহত্যা করেছে। ডেভিড ইমরান ও মাইকেল এ্যাঞ্জেলা নিহত। মি: কিউই ও ইয়াগনোভিচ মারাত্মকভাবে আহত। ওদের দুজনার দায়িত্ব এক পিসিডা কর্মীর হাতে তুলে দিয়ে ফারুক উনিতোকে নিয়ে আহমদ মুসা নীচে নেমে এলো। আসতে আসতে জিজ্ঞেস করল, জাবের কোথায় উনিতো?

ফারুক উনিতো প্রথমে কোন জবাব দিল না। পরে বলল, নীচে চলুন জনাব।

ফারুক উনিতোর উত্তরের ধরন দেখে আহমদ মুসার মনটি ছাৎ করে উঠল। দ্রুত নীচে নেমে এলো তারা। নীচের হল ঘরে চার পাঁচজন গোল হয়ে

দাঁড়িয়ে আছে। আহমদ মুসা সেখানে গিয়ে পৌছল। ফারুক উনিতোর টর্চ জবলে উঠল। চমকে উঠল আহমদ মুসা। জাবের রক্তে ভাসছে। মেশিনগানের গুলীতে ঝাঝরা হয়ে গেছে তার দেহ। দাঁতে দাঁত চেপে এক প্রবল উচ্ছাস রোধ করলো আহমদ মুসা। তবু চোখের দু'কোণ ফেটে নেমে এল দু'ফোটা অশ্রু।

সবাই নীরব। কথা সরছে না কারো মুখে। অতি শান্ত স্বরে এক সময় আহমদ মুসা বলল, আমার এক অংগ আজ আমি হারালাম ফারুক উনিতো। আমার এ উৎসর্গিত সৈনিক বন্ধু কোন দিন কোন কাজ থেকে পিছু হটেনি। গলার স্বরটি তার রুদ্ধ হয়ে এলো। সজল হয়ে উঠল সবারই চোখ।

আহমদ মুসা একটু পিছনে করে এলা। ফারুক উনিতোকে বলল, এসো, ব্রীজের ওখানে কি হলো দেখি।

দু'জনে এগোলো সেদিকে।

কমান্ডোদের একটি ট্রাকও পার হতে পারেনি। সবক'টিই দাড়িয়ে আছে খালি। তাদের প্রথম ট্রাকটি দাড়িয়ে আছে পুলের উপর। ভেঙ্গে কুকড়ে গেছে। ধুঁয়ায় অন্ধকার তখনও। ট্রাকের কেউই বাঁচেনি। ছড়িয়ে ছিটকে পড়ে আছে তাদের অগ্নিদগ্ধ দেহ। গুলীবিদ্ধ হয়ে মরেছে এমন লাশও ট্রাকের আশেপাশে পাওয়া গেল। সামনের ট্রাকের পরিণতি দেখেও তাহলে কমান্ডোরা মরিয়া হয়ে সামনে এগোবার চেষ্টা করেছিল।

আরো সামনে এগুলো তারা-একদম ব্রীজের দক্ষিণ প্রান্তে। ঐতো মেশিনগানের পাশে সাবেরাকে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু নড়ছে না কেন? তাদেরকে দেখেও কোন চাঞ্চল্য নেই কেন তার? তাহলে...? আর চিন্তা করতে পারলো না আহমদ মুসা। ছুটে গেল সে। না, সাবেরা নেই। তার হাতটি তখনও মেশিনগানের ব্যারেলে, কিন্তু প্রাণ নেই দেহে। দেহ তার জাবেরের মতই ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। কিন্তু শেষ নি:শ্বাস পর্যন্ত সে মেশিনগান চালিয়েছে। বিজয়ী হবার আমৃত্যু সাধনার মধ্যে দিয়ে সাবেরা এই ভাবেই শাহাদাৎ বরণ করেছে। এই মহীয়সী মহিলার বিদেহী আত্মার প্রতি সালাম জানাল আহমদ মুসা।

কিন্তু আবিদ কই ? হঠাৎ ফারুক উনিতো বল উঠল, দেখুন জনাব ট্রাকের তলায় একটি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন দেহ।

আহমদ মুসা গিয়ে ঝুঁকে পড়ল ট্রাকের নীচে। টর্চ জ্বেলে খুটে খুটে দেখলো। পুড়ে যাওয়া খন্ড-বিখন্ড নর মাংসের টুকরো। চেনার উপায় নেই। কিন্তু এ দেহ যে আবিদের সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রইল না আহমদ মুসার। ট্রাকের গতি রোধ করার শেষ পন্থা হিসেবে গ্রেনেড বুকে বেঁধে ট্রাকের তলায় সে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

এবার কিন্তু কোন দু:খ নয়, গর্বে ফুলে উঠল আহমদ মুসার বুক। এরা বিশ্বজয়ী সৈনিক। এদের দিয়ে বিশ্ব জয় করা যায়। আহমদ মুসার মন চলে গেল সুদুর অতীতের এক দু:খজনক ঘটনার দিকে। ইসরাইলের এন্টেবী অপারেশনে উগান্ডার পক্ষে আবিদ, সাবেরা ও জাবেরের মত সৈনিকের অভাব ছিল বলেই বিশ্ববাসীর কাছে লজ্জায় হেট করতে হয়েছিল মুসলমানদের মাথা।

দক্ষিন কাগায়ানের দিক থেকে দু'টি অগ্নি গোলক ছুটে আসছে। ফারুক উনিতো তার ষ্টেনগান উঁচু করে ধরলো। আহমদ মুসা বলল, উনিতো ওটা পিসিডার গাড়ী। আলোক সঙ্কেত দেখে বুঝতে পারছো না? উনিতো ষ্টেনগান নামিয়ে বলল, এখন বুঝতে পারছি জনাব।

গাড়ী এসে কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল। গাড়ী থেকে নামল শরীফ সূরী। ছুটে এলো সে আহমদ মুসার কাছে। তাকে জড়িয়ে ধরলো। বলল, আপনার জন্য উদ্বেগ উৎকন্ঠায় সকলে আমরা সারা হয়ে গেছি জনাব।

হঠাৎ হাতে ভিজা আঠালো মত কিছু ঠেকায় গাড়ীর আলোতে নিয়ে তা দেখল শরীফ সুরী। রক্ত কোথা থেকে এলো? টর্চ দিয়ে ভালো করে আহমদ মুসাকে দেখে আঁতকে উঠল শরীফ সুরী। গোটা ডান বাহুটাই তার রক্তে ভেজা। কনুই এর ইঞ্চিখানেক উপরে বিরাট ক্ষত। মাথার চুল রক্তে জট পাকানো। প্রায় আর্ত কন্ঠে শরীফ রুরী বলল, এ কি জনাব, আপনি এমনভাবে আহত, অথচ..। কথা শেষ কতে পারলো না শরীফ সুরী। একটি ঢোক গিলল সে।

আহমদ মুসা বলল, আহত আমি একা নই শরীফ। তারপর উনিতোর দিকে ফিরে বললো, সব আহতদের দক্ষিন কাগায়ানের ক্যাম্পে পাঠিয়ে দাও। আর সতর্ক থেকো। পরে আসছি। বলে সে শরীফ সুরীর সাথে গিয়ে গাড়ীতে

বসল। মাথা আর ডান বাহুটা যেন বেদনায় ছিড়ে যাচ্ছে। ঝিম ঝিম করছে। গোটা শরীর।

যেতে যেতে শরীফ সুরী বলল, দক্ষিন কাগায়ানে বড় রকমের কোন প্রতিরোধের সম্মুখীন আমাদের হতে হয়নি। ওরা মনে করেছিল আমরা হাজারে হাজারে প্রবেশ করেছি, তাই ঘাবড়ে গিয়েছিল ওরা।

-মৃত্যু ভয়কে যারা বশ করে, তারা একাই একশ' হয়ে দাঁড়ায়। ওদের মনে করাটা তাই অমুলক নয় শরীফ সুরী। ধীর স্বরে বলল, আহমদ মুসা।

তারপর দুজনেই নীরব। ঝড়ের গতিতে এগিয়ে চলেছে জীপ।

# ১০

শিরী শুয়ে আছে। কয়দিনের জ্বরে একদম শীর্ণ হয়ে গেছে সে। মাথার কাছে টেবিলের উপর কয়েকটি ওষুধের শিশি। স্মার্থার ডাক্তারির হাত মন্দ নয়। তার প্রেসক্রাইব করা ওষুধ খাবার পর থেকেই জ্বর কমতে শুরু করেছে। শিরী ও মুর হামসার স্মার্থার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। মেয়েটির ব্যবহার সত্যই ভাল। বিশেষ করে স্মার্থা আহমদ মুসাকে খুব শ্রদ্ধা করে দেখে মুর হামসার আরও খুশী। স্মার্থার মুখ থেকে আহমদ মুসার অত বেশী প্রশংসা শুনতে ভালো লাগেনি কিন্তু শিরীর। বিশেষ করে স্মার্থা যখন বলেছে যে, জীবন দিয়েও আমি তার ঋণ শোধ করতে পারবো না, তখন কথাটা শিরীর মনের কোণায় যেন খচ্ করে বিঁধেছে। শিরী মনকে শাসিয়েছেঃ ওঁকে যদি কেউ ভালো চোখে দেখে তাহলে তো খুশী হবারই কথা। আর তাছাড়া ওঁর উপর কি অধিকার আছে শিরীর। ভুল করেও কি তিনি কখনও তার প্রতি চোখ তুলে চেয়েছেন। চিন্তা এ পর্যন্ত গড়াতেই শিরীর চোখ জলে ভরে আসে। ভবিষ্যত ভাবনায় শিরীর মন উদ্বেল হয়ে উঠে। ধুলার পৃথিবীতে শুয়ে সে কি আকাশের চাঁদ ধরতে পারবে? কিন্তু কি করবে সে। সজ্ঞানে তো সে এ অপরাধ করেনি। তার হৃদয়ের কোন অপরিচিত উৎস থেকে এসেছে এ প্রেরণা। হৃদয়ের এ একান্ত চাওয়ায় কি কোন পাপ আছে? কেঁপে উঠে শিরী।

শিরীর দু'চোখের কোণায় দু'ফোটা অশ্রু টল টল করছিল।

এ সময় স্মার্থা প্রবেশ করলো ঘরে। স্মার্থাকে পৌছে দিয়ে মুর হামসার বাইরের ঘরে চলে গেল।

স্মার্থা শিরীর দিকে চেয়েই বলল, শিরী তোমার চোখে জল কেন? কাঁদছো কেন তুমি?

শিরী তাড়াতাড়ি চোখের পানি মুছে ফেলল। কিছু বলল না মুখে।

স্মার্থা তার পাশে বসল, কাগায়ান থেকে কোন খবর এসেছে?

-এসেছে।

-কি খবর?

-পিসিডা কাগায়ান দখল করেছে। মাইকেল এ্যাঞ্জেলা এবং ইরগুন জাই লিউমির ডেভিড ইমরান নিহত।

-চমকে উঠলো স্মার্থা এ্যাঞ্জেলা নিহত এক উষ্ণ স্রোত বয়ে গেল ম্মার্থার রক্ত কণিকায়। কিন্তু স্মার্থা মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, আমি কি ওদর খবর জিজ্ঞেস করেছি?

-তাহলে কি?

-আহমদ মুসার খবর।

খচ্ করে উঠল শিরীর হৃদয়ের একান্ত গোপন সেই বেদনাটা। ওর খবর দিয়ে স্মার্থার কি? মুখ ভার করে শিরী বলল, ওঁর কি খবর আমি বলব?

শিরীর একটি হাত হাতে নিয়ে স্মার্থা হেসে বলল. আমার কাছে লুকিয়ো না শিরী। আমি বুঝতে পেরেছি প্রথম থেকেই। কিন্তু নায়ক কি জানেন এটা? হেসে বলল, স্মার্থা।

-জানিনা। মুখ লাল করে বলল, শিরী

-বুঝেছি, শিরীর সুচিকিৎসার জন্য ওঁর এত গরজ কেন? তুমি ভাগ্যবতী শিরী।

শিরীর সরাটা দেহে এক উষ্ণ শিহরণ খেলে গেল। জ্বালাময় এ শিহরণে অসীম পরিতৃপ্তি। আপনাতেই তার চোখ দুটি বুজে গেল এক পরম প্রশান্তিতে। এই প্রথম স্মার্থার কথা ভালো লাগলো তার। চুপ করে রইল শিরী।

স্মার্থা আবার বলল-কই উত্তর দিলে না শিরী?

-কি?

-আহমদ মুসা কবে আসছেন।

বালিশে মুখ গুজে শিরী বলল, উনি অসুস্থ, হাসপাতালে। মাথা ও বাহুতে আঘাত পেয়েছেন উনি।

-তোমার এ দু:খে আমিও দু:খিত শিরী।

শিরী পাশ ফিরে শুয়ে বলল, তুমি আজ চিকিৎসার জন্য নয়, এসব মতলব নিয়েই এসেছ বুঝি?

-আর ওষুধ লাগবে না তোমার। ভাল হয়ে গেছ। এখন শরীরটা সারলেই হয়ে গেল।

তারপর স্মার্থা রুটিন মাফিক জ্বর চার্ট পরীক্ষা করল। হার্টের বিট দেখল। বলল, সব ঠিক আছে।

বলে বিছানা থেকে উঠে চেয়ারে গিয়ে বসল স্মার্থা। বলল, রুনার মা তো এখনও আটকা সোনিয়াকেও তো দেখছি না একটু পানি খেতাম শিরী।

শিরী বলল, ঠিক আছে আমি ডাকছি। বলে সে কলিং বেলের সুইচে চাপ দিতে গেল। স্মার্থা শিরীকে নিষেধ করলো। বলল, এই তো ডাইনিং রুম। আমিই খেয়ে আসি না। বলে সে উঠে দাড়াল।

ডাইনিং রুমের বিরাট এক ট্যাংকিতে পানি জমা থাকে। ট্যাংকে লাগানো আছে নল। নল দিয়ে পানি আসে।

স্মার্থা ডাইনিং রুমে ঢুকে তাড়াতাড়ি একটি চেয়ার টেনে নিয়ে পানির নলে এক পা দিয়ে ট্যাংক ধরে দাঁড়াল। তারপর স্কার্টের ভিতর থেকে একটি কাগজের মোড়ক বের করলো সে। মোড়কটি খুলে সাদা ধরনের অনেকগুলো পাউডার ঢেলে দিল পানির ট্যাংকিতে।

তারপর নেমে চেয়ার যথাস্থানে রেখে জগ থেকে এক গ্লাস পানি খেয়ে মুখ মুছতে মুছতে সে বেরিয়ে এলো।

মুর হামসারও ঘরে প্রবেশ করলো প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। বলল, কি দেখলেন, ওষুধ আর লাগবে?

-না, আর ওষুধের দরকার হবে না। গতকাল থেকে টেমপারেচার একদম নরমাল।

-ধন্যবাদ আপনাকে। অনেক খেটেছেন।

-চলুন। ধন্যবাদ দিয়ে আর কাজ নেই।

মুর হামসার স্মার্থাকে নিয়ে ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে বলল, আর কি করতে পারি আপনার জন্য। মুসা ভাই আসলে আপনার মুক্তির জন্য সুপারিশ করব।

স্মার্থা খপ করে মুর হামসারের একটি হাত ধরে বলল, মুক্তি আমি চাই না হামসার।

-চান না মুক্তি? বিস্মিত হয়ে তাকাল স্মার্থার দিকে।

স্মার্থা মুর হামসারের একটি হাত জড়িয়ে কাঁধে মুখ গুজে বলল, চাই না মুক্তি আমি।

মুর হামসার কেঁপে উঠল। এমন অবস্থার জন্য প্রস্তুত ছিল না সে। নারী দেহের এমন নিবিড় উষ্ণ স্পর্শ মুহূর্তের জন্য বিহবল করে তুলল মুর হামসারকে। তার জীবনে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা।

স্মার্থা আরও নিবিড়ভাবে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, বল, দেবে আশ্রয় তোমার এ বাহু বন্ধনে।

মুর হামসার সচেতন হলো। সে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, চলুন রাত হয়ে যাবে।

আবার দুজনে হাটতে শুরু করল। স্মার্থা আর কোন কথা বলল না। মুর হামসারও পাথরের মত মৌন।

উপত্যকার বন্দী খানার সেলের দরজায় স্মার্থাকে পৌছে দিল মুর হামসার। প্রহরী দরজা খুলে ধরল। স্মার্থা মুর হামসার দিকে ফিরে দাড়িয়ে বলল, আর যেতে পারব না তোমার ওখানে?

গম্ভীর কন্ঠে মুর হামসার বলল, মুসা ভাইকে আমি এটা জিজ্ঞেস করে দেখব।

সেলের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। স্মার্থা নিজেকে ছুড়ে দিল নরম বিছানার উপরে। স্বগতঃ কন্ঠে সে বলল, এরা কি মানুষ না পাথর? আতংকিত হয়ে উঠে সে। আহমদ মুসার সাইমুমের গতি বোধ হয় আর কেউই রোধ করতে পারবে না। অদ্ভুত জীতেন্দ্রীয় মানুষের দল এটা। টাকার স্তুপ, নারী দেহের কামসিক্ত উষ্ণ পরশও এদের চিত্তবিভ্রম ঘটাতে পারে না।

তবু.....। চোখ দু'টি জ্বলে উঠল স্মার্থার। তবু জাহাজ ও কাগায়ানের পরাজয়ের প্রতিশোধ আহমদ মুসার উপর নেয়া যায় কি না দেখবে সে।

গভীর রাত। শয্যা থেকে উঠে বসল স্মার্থা। চোখ মুখ হাত দিয়ে একটু রগড়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। রাতের পোশাক বদলে ফেলল সে। এ বন্দীশালায় তার নিজস্ব বলতে ছিল একটি মাত্র ব্যাগ, কিন্তু তার স্পাই ব্যাগটি আজ শূণ্য। কয়েকটি কাপড়-চোপড় রয়েছে মাত্র। তবু আপাতঃ শূন্য ব্যাগটিতেই রয়েছে তার শেষ সম্বলটুকু। স্মার্থা ব্যাগটি হাতে তুলে নিয়ে ওর তলাটা ফেড়ে ফেলল। তলার চারপ্রান্ত ঘিরে রয়েছে লোহার ফাপা নল। ব্যাগের তলাকে শক্ত ও এর আকার ঠিক রাখার জন্যই এটা ব্যবহৃত হয়েছে বলে আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয়। স্মার্থা নলগুলো খুলে নিয়ে ছোট ধরণের দু'টি পকেটে পুরল এবং অন্য দু'টি থেকে বেরুল কয়েকটি দামী ফিল্টার টিপ্ড সিগারেট। সিগারেটগুলো পকেটে পুরে ব্যাগটি ছুড়ে ফেলে দিল। তারপর টেবিলে বসে একখন্ড কাগজে লিখলঃ

আলী কাওছারের হত্যার প্রতিশোধ পরে নেয়া যাবে। এখন হাঙ্গামা করতে গেলে আমরা আপো পর্বত থেকে বেরুতে পারবো না।

কাগজটি ভাঁজ করে পকেটে পুরে উঠে দাড়াল স্মার্থা। তারপর ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগুলো। দ্বিধাহীন চিত্তে সে দরজায় করাঘাত করলো। একবার, দুইবার-কয়েকবার। দরজার চাবি খোলার শব্দ পাওয়ার পরই শুধু সে থামল।

দরজা খুলে গেল। দু'জন প্রহরী। দু'জনের একজনের হাতে উদ্যত স্টেনগান, অন্যজনের হাতে রিভলভার। তারা কোন কথা বলার আগেই স্মার্থা বলল, ক্যাপ্টেন জুমলাককে এক্ষুনি ডাকুন। খুব জরুরী।

স্মার্থার কন্ঠে উদ্বেগ। চোখে-মুখে কেমন বিভ্রান্ত ভাব। সেদিকে মুহূর্তকাল চেয়ে একজন প্রহরী অপর জনকে বলল, তুমি একে দেখো, আমি তাঁকে ডেকে আনি।

মিনিট চারেকের মধ্যেই প্রহরীটি ক্যাপ্টেন জুমলাককে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলো।

জুমলাককে দেখেই স্মার্থা প্রায় আর্ত কন্ঠে বলে উঠল, সর্বনাশ হয়ে গেছে মিঃ জুমলাক, শিরীকে ঔষধ দিতে ওল্টা-পাল্টা হয়ে গেছে। ঔষধটি খেলে তার

মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। এক্ষনি আমার যাওয়া দরকার। আপনি দু'জন প্রহরী দিন আমার সাথে।

বলতে বলতে স্মার্থা প্রায় কেঁদে ফেলল। তার চোখে আতংক। জুমলাক কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। প্রথমতঃ তার মুখে কোনই কথা সরল না। শেষে বলল সে, তাহলে আমি খোঁজ নিতে পাঠাই?

স্মার্থা চোখ মুছে বলল, তা করতে পারেন মিঃ জুমলাক, কিন্তু দেরীর জন্য কিছু ঘটলে সে দায়িত্ব তাহলে আপনাকেই নিতে হবে।

জুমলাক পড়ল মহাবিপদে। একদিকে রাত্রিবেলা বন্দীকে দু'জন প্রহরীর উপর ভরসা করে ছেড়ে দেয়া যায় না, অপরদিকে শিরীর সত্যই কিছু ঘটলে তাকেই দায়ী হতে হবে। পরিশেষে জুমলাক ভাবল, আহমদ মুসাই যখন স্মার্থাকে দিয়ে চিকিৎসার নির্দেশ দিয়েছেন , তখন স্মার্থার মধ্যে নিশ্চয় বিপদের তেমন কিছু নেই।

জুমলাক বলল, চলুন, আমিই যাচ্ছি সাথে। বলে জুমলাকে আর একজন প্রহরীকে সাথে ডেকে নিল।

তিনজনেই পর্বতের ঢাল বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। সবার আগে স্মার্থা, তারপর প্রহরীটি এবং সবার শেষে জুমলাক।

তারা পর্বতের সমতলে এসে পৌছল। দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে আর একটি রাস্তা এসে এখানে মিলিত হয়েছে। ঐ রাস্তাটি পর্বতের পশ্চিম ঢাল বেয়ে নিচে নেমে গেছে। আপো পর্বত থেকে সোলো সাগরে পৌছার এটাই পথ।

এখানে পৌছার পর স্মার্থা সবার অলক্ষে একখন্ড কাগজ ফেলে দিল হাত থেকে। পরক্ষনেই স্মার্থা হোচট খাওয়ার মত হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। লক্ষ্য করলে দেখা যেত স্মার্থা উঠার সময় দলা পাকানো এক টুকরা কাগজ তুলে নিল। সাবধানতাবশতঃ জুমলাকের রিভলভার উদ্যত হয়ে উঠেছিল স্মার্থার দিকে, কিন্তু কোন প্রকার সন্দেহ তার মনে স্থান পেল না।

তারা এগিয়ে চলেছিল। সামনেই মূল ঘাঁটি মুর হামসারের আবাস স্থল। প্রধান গেটের সামনে পৌছতেই সেখান থেকে কঠোর নির্দেশ এলো হাত তুলে

দাঁড়ানোর জন্য। দ্বার রক্ষীর অটোমেটিক কারবাইনের নল হা করে আছে তাদের দিকে। হাত তুলে দাঁড়াল তিনজন।

গেট-ক্যাম্প থেকে প্রধান দ্বাররক্ষী আহমদ জালূত তাদের কাছে এলো জুমলাক তাকে সব ঘটনা বুঝিয়ে বলল। আহমদ জালূত একবার ভ্রূ কুচকে স্মার্থার দিকে তাকাল। বলল, চল আমিও যাব।

চারজনেই চলল এবার।

ভিতরের গেটেও প্রহরী দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু জুমলাক ও আহমদ জালুতকে দেখে একপাশে সরে দাঁড়াল। দরজা একটু ঠেলতেই খুলে গেল। বিস্মিত হল জালুত। প্রহরীর দিকে প্রশ্নবোধক চোখ তুলে ধরতেই বলল, দরজা বন্ধ না করেই আজ ওঁরা শুয়ে পড়েছেন।

স্মার্থা গিয়ে তাড়াতাড়ি শিরীর ঘরে প্রবেশ করল। ওরাও তিনজন তার পিছু পিছু প্রবেশ করলো সেই ঘরে। শিরী বিছানায় পড়ে আছে। ঠিক শুয়ে থাকা নয় ওটা। দেখে মনে হচ্ছে যেন হঠাৎ করে জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়েছে বিছানায়।

স্মার্থা তাকে পরীক্ষা করলো। জুমলাক, আহমদ জালুত ও প্রহরী তিনজনেই গজ তিনেক দুরে দাড়িয়ে থেকে উদগ্রীবভাবে দেখছে স্মার্থার কাজ। তাদের চোখে-মুখে উদ্বেগ। তারা বুঝতে পারছে শিরীর একটা কিছু হয়েছে।

স্মার্থা উঠে দাড়াল। আহমদ জালুত বলল, কি দেখলেন?

স্মার্থা কোন উত্তর না দিয়ে কপালের ঘাম মুছে পকেট থেকে একটি সিগারেট বের করে মুখে পুরল, টেবিল থেকে দেশলাই নিয়ে অগ্নি সংযোগ করল তাতে। তারপর ওদের দিকে ফিরে সিগারেটে একটি লম্বা টান দিয়ে বলল, শিরী অজ্ঞান হয়ে আছে।

স্মার্থা আবার সিগারেটটি মুখে পুরল।

আহমদ জালুত কিছু বলতে গিয়েছিল। কেবল মুখ হা করেছিল সে, কিন্তু কিছু বলতে পারল না। স্মার্থার সিগারেট থেকে এক ধরনের নিলাভ ধোঁয়া তীরের মত ছুটে গেল ওদের দিকে। পরক্ষণেই তাদের তিনটি দেহই কলাগাছের মত আছড়ে পড়ল মাটিতে। সিগারেটটি আসলে মারাত্মক একটি গ্যাস পাইপ

তামাকের ক্যামোফ্লোজে ঢাকা মুখের পর্দাটি পুড়ে গেলে গ্যাস বেরিয়ে ছুটে যায় সামনে। সামনের দুই বর্গ গজ পরিমিত স্থান মুহূর্তের জন্য বিষাক্ত করে দেয়।

স্মার্থা মুহূর্তকালও নষ্ট করলো না আর। রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া কাগজ খন্ড সে মেলে ধরল চোখের সামনে। তাতে লেখাঃ ''আমি পাহাড়ের পশ্চিম ঢালে অপেক্ষা করছি দু'টি ঘোড়া নিয়ে। জাম্বুয়াঙ্গোর জন্য পেট্রোলও সংগৃহীত হয়েছে।''

তাড়াতাড়ি কাগজটি মুড়ে দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল স্মার্থা। তারপর কাঁধে তুলে নিল শিরীর সংজ্ঞাহীন দেহ। গেটে গিয়ে প্রহরীকে বলল, ছোট সাহেবও অসুস্থ। ওঁরা তাঁকে নিয়ে আসছেন। তুমি আমার সাথে এসো, শিরীকে ব্যারাকের হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

প্রহরীটি মুহূর্তকাল দ্বিধা করলো, তারপর পিছু নিল। প্রধান ফটকে গিয়েও স্মার্থা এই একই কথা বলল। মনে হয় তারাও কোন সন্দেহ করলো না। বিশেষ করে ভিতরের দ্বাররক্ষীকে সাথে দেখে তাদের মনে কোন প্রশ্নেরও উদয় হলো না। তাছাড়া আহমদ মুসার নির্দেশ মোতাবেক স্মার্থা শিরীর চিকিৎসা করছে এটাও সবাই জানত।

স্মার্থা এগিয়ে চলল শিরীকে নিয়ে। পিছনে প্রহরী। তারা পর্বতের সেই সমতলে এসে পৌছল। স্মার্থা শিরীকে কাঁধ থেকে নামিয়ে শেষে একবার পিছনে ফিরে দেখল, না ......... কেউ এদিকে আসছে না। প্রহরীটি সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বলল, কি হল চলুন তাড়াতাড়ি।

-যাই। বলে স্মার্থা পকেট থেকে সিগারেট বের করলো। সিগারেটে আগুন দিল। সেই আগর নিয়মে নিলাভ ধোঁয়া ছুটে গেল এক ফলা তীরের মত। মুহূর্তের মধ্যে প্রহরীটির হাত থেকে খসে পড়ল স্টেনগান। সেও আছড়ে পড়ল মাটিতে।

স্মার্থা শিরীকে কাঁধে তুলে নিয়ে এবার ছুটল দক্ষিণ-পশ্চিম পথ দিয়ে পাহাড়ের পশ্চিম ঢালের দিকে। ঘামে ভিজে গেছে তার গোটা দেহ। কিন্তু উপায় নেই জিরিয়ে নেবার। ক্যাপটেন জুমলাক ও আহমদ জালুতকে বেরুতে না দেখে এতক্ষণে নিশ্চয় প্রহরীদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। তারা জুমলাক ও আহমদ জালুতের খোজে গৃহে প্রবেশ করার পরই ছুটে আসবে এদিকে শিকারী কুকুরের

মত। সুতরাং যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি তাকে পৌছতে হবে আলী আকছাদের কাছে। একবার ঘোড়ায় চড়তে পারলেই হলো। আধ ঘন্টা মধ্যেই তারা পৌছে যাবে সোলো সাগরের তীরে।

কতদূরে আলী আকছাদ? আর চলতে পারে না স্মার্থা শিরীকে নিয়ে। হঠাৎ সামনেই জমাট অন্ধকারের মত মনুষ্য মুর্তিকে নড়ে উঠতে দেখে স্মার্থা থমকে দাঁড়াল। ওকি আলী আকছাদ? বলল সে, কে?

-আমি আলি আকছাদ। বলে সে এসে দাড়াল।

-কোথায় তোমার ঘোড়া?

-এই আর একটু যেতে হবে।

এবার দু'জনে ধরাধরি করে শিরীকে নিয়ে গিয়ে ঘোড়ায় তুলল। স্মার্থা শিরীকে নিয়ে এক ঘোড়ায় উঠল। আলী আকছাদ উঠল আর এক ঘোড়ায়। পর্বতের ঢাল বেয়ে সাবধানে ঘোড়া দু'টি সামনে এগিয়ে চলল। আলী আকছাদের হাতে টর্চ জ্বালাতে সাহস পাচ্ছে না সে। ওদের চোখে পড়ে গেলে নির্ঘাত মারা পড়তে হবে।

ওরা তখন পর্বতের পাদদেশে নেমে এসেছে। এ সময় পর্বতের উপরে বিপদ-ঘণ্টা বেজে উঠল। উপরে তাকিয়ে ওরা টর্চের আলোয় ইতঃস্তত ছুটাছুটি দেখতে পেল।

স্মার্থার ঠোটে ফুটে উঠল বাঁকা হাসি। আহমদ মুসা নেই। মুর হামসারের ঘুম কাল সকালের আগে ভাঙ্গবে না। ক্যাপটেন জুমলাক ও আহমদ জালুতকে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতে হবে আরও কয়েক ঘণ্টা। আর আপোয়ান উপত্যকার ব্যারাক থেকে তাদের সন্ধানে ওরা যখন পর্বতের এ প্রান্তে এসে পৌছবে, ততক্ষণ তারা অর্ধেকটা পথ পার হয়ে যাবে।

নিঃশঙ্ক চিত্তে দু'টি ঘোড়া তিনটি আরোহী নিয়ে এগিয়ে চলল সামনে। পাথরের বুকে মাঝে মাঝে শব্দ উঠল খট-খট্-খট।

# ১১

আহমদ মুসা শুয়েছিল।

ক্লান্ত সে। কাগায়ান থেকে ৩০০ কিলোমিটার পথ ঘোড়া খেদিয়ে এসেছে সে আপো পর্বতে শিরীর অপহরণের সংবাদ পেয়ে। মুহূর্তও সে নষ্ট করেনি কাগায়ানে। আহমদ মুসা এ্যালেনটোর হাতে কাগায়ানের প্রশাসনিক দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে ছুটে এসেছে এখানে। চোখ দু'টি তার বুজে আছে, কিন্তু বড় অশান্ত তার মন। পিছনের এমন আঘাত আসবে কল্পনাও করেনি কোনদিন আহমদ মুসা।

মুর হামসার আহমদ মুসার পাশেই বসেছিল। তার চোখে দুর্ভাবনার কালো ছায়া। একদিন এক রাত্রির মধ্যে বয়স যেন বিশ বছর বেড়ে গেছে মুর হামসারের।

অপহরণের কাহিনী ধীরে ধীরে সে বলে যাচ্ছিল আহমদ মুসার কাছে।

অবশেষে সে বলল, ভুল আমারই হয়েছে মুসা ভাই শেষের দিকে স্যার্থার ব্যাপারে আমি বেশ linient হয়ে পড়েছিলাম। যদি আমি তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতাম, তাহলে ডাইনিং রুমের পানির ট্যাংকে ঘুমের ঔষধ মেশানোর সুযোগ সে পেত না।

আহমদ মুসা চোখ খুলল। বলল, ভুল তোমার নয় বন্ধু। ভুল আমিই করেছি। প্রথম ভুল করেছিলাম জাহাজে ওকেও কামরায় বেঁধে রেখে না এসে। সে ভুলের জন্য অনেক প্রতিকূলতার মোকাবিলা করতে হয়েছে আমাকে। দ্বিতীয় ভুল করলাম ওর দ্বারা শিরীর চিকিৎসার নির্দেশ দিয়ে। জানি না এ ভুলের জন্য কি খেসারত দিতে হবে আমাদের।

আহমদ মুসার কথা শুনে কেঁপে উঠল মুর হামসার। অন্ধকার এসে যেন ছায়া ফেলল তার চোখে মুখে। আহম মুসার তা দৃষ্টি এড়ালো না। মুর হামসারের একটি হাত তুলে নিয়ে সে বলল, জানি, তোমার ব্যথা বুঝতে পারছি। কিন্তু ভেবনা বন্ধু। মনে রেখ, আহমদ মুসাকে ফাঁদে ফেলার জন্যই শিরীকে অপহরণ করা

হয়েছে। তারা ভেবেছে...........। আহমদ মুসা কথা শেষ করতে পারলো না। অভাবনীয় সংকোচ এসে তার কন্ঠ রোধ করে দিল।

-তারা কি ভেবেছে মুসা ভাই?

-অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে সময় নষ্ট করে লাভ নেই মুর হামসার। চলো উঠি। সবগুলো জায়গা আমাকে দেখতে হবে আর একবার। বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। মুর হামসারও উঠল। যেতে যেতে আহমদ মুসা বলল, স্মার্থা চুরি করা স্পিড বোটে চড়ে শিরীকে নিয়ে পালিয়েছে। সাথে ছিল আলী আকছাদ। প্রশ্ন হলো কোথায় গেল তারা?

আহমদ মুসা মুর হামসারকে নিয়ে শিরীর ঘরে প্রবেশ করল।

বাহুল্য বর্জিত ঘর। একটি খাট। মাথার কাছে একটি ছোট টেবিল। পাশে একটি চেয়ার। খাটের পিছন দিকের চাদর অনেক খানি নীচে ঝুলে পড়েছে।

আহমদ মুসা বলল, সংজ্ঞাহীন শিরীকে টেনে তোলার সময় চাদর এমনভাবে নীচে নেমে গেছে নিশ্চয়।

মুর হামসার দেখাল জুমলাক ও আহমদ জালুত কোথায় পড়েছিল। সেদিকে চাইতে গিয়ে খাটের কোণায় পড়ে থাকা একখন্ড দলা পাকানো কাগজের দিকে আহমদ মুসার দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো।

কৌতুহলবসে কাগজ খন্ডটি তুলে নিয়ে ভাজ ভেংগে চোখের সামনে মেলে ধরলো। কাগজের লেখার দিকে চোখ বুলাতেই চোখ দু'টি তার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'ইউরেকা' 'ইউরেকা' বলে সে চিৎকার করে উঠল।

মুর হামসার আহমদ মুসার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকাল। আহমদ মুসার এ ধরনের উচ্ছাস স্বাভাবিক নয়। উদগ্রীব কন্ঠে সে বলল, কি পেয়েছেন, কি আছে ওতে মুসা ভাই?

-শিরীর সন্ধান পেয়ে গেছি মুর হামসার।

-শিরীন সন্ধান? কোথায় শিরী?

আহমদ মুসা কাগজটি মুর হামসারের হাতে তুলে দিতে দিতে বলল, শিরীকে জাম্বুয়াঙ্গোতে নিয়ে গেছে ওরা।

মুর হামসার কাগজটির উপর নজর বুলিয়ে বলল, কাগজ তো তাই বলছে।

-আসলেও তাই। শিরীকে মিন্দানাওয়ের বাইরে নিয়ে যেতে পারেনি। ওদের ষড়যন্ত্র তেমন ডিপ রুটেড ছিল না। যদি তা হতো তাহলে ওদের জন্য জাহাজের ব্যবস্থা হতো। আলী আকছাদকে স্পিড বোট চুরি করতে হতো না। আর মিন্দানাওয়ে জাম্বুয়াঙ্গো ছাড়া তাদের আর কোন নিকটবর্তী ঘাটি আমি দেখি না।

থামল আহমদ মুসা । পরে আবার বলল, ভালই হলো মুর হাসমার।

-কি ভাল হলো?

-আমাদের জাম্বুয়াঙ্গো অপারেশন পিছিয়ে দেয়া হয়েছিল। এখন আমি নিজেই যাব জাম্বুয়াঙ্গোতে।

-মুসা ভাই?

-বলো।

-আমিও যাব জাম্বুয়াঙ্গো।

-যেতে চাও?

-যদি আপনার অনুমতি মিলে।

-আমি জানি সেখানে তুমি উপস্থিত থাকলে অনেক কাজ হবে, কিন্তু আপো পর্বত তো অরক্ষিত থাকবে। এখানকার ষড়যন্ত্রের মুলোচ্ছেদ করা গেল না এখনো। দেখ, রুনার মার মুখ থেকে কোন কথা বের করতে না পারলেও এখন বোঝা যাচ্ছে রুনার মার সাথে আলী আকছাদের কোন প্রকার যোগাযোগ ছিল। সম্ভবতঃ আলী আকছাদই কাগায়ানে খবর পাঠিয়েছে আমাদের সম্পর্কে।

-রুনার মাকে তাহলে আর কি করা যায়?

আহমদ মুসা হাসল। বলল, শিরী রুনার মাকে খুব ভালবাসে। রুনার মা'র মুখ থেকে কথা বের করার ক্ষেত্রে এই ভালবাসাই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু জাতীয় প্রয়োজনের স্থান ব্যক্তিগত ভালো লাগা না লাগার অনেক উর্ধে মুর হামসার।

মূহূর্তকাল থেমে আহমদ মুসা বলল, আমি ঘুরে আসি জাম্বুয়াঙ্গো থেকে। তার পর দেখব কি করা যায় রুনার মাকে নিয়ে।

-আপনি জাম্বুয়াঙ্গোতে কবে যাত্রা করছেন তাহলে?

-কবে নয় আজই।

-কিন্তু এই আহত শরীর নিয়ে, এইভাবে..........

-তাতে কি হলো। সময় নষ্ট করা যায় না একমুহূর্তও। ক্লু-ক্লাক্স-ক্লানের মত নরপিশাচের চক্র আর দু'টি নেই মুর হামসার। আমার উপর ওরা ক্ষেপে আছে ভয়ানকভাবে।

আহমদ মুসার কথা শুনে মুর হামসারের চোখে দু'টি উদ্বেগাকুল হয়ে উঠল। পিতৃ-মাতৃহারা ছোট বোনটি তার কোথায় কিভাবে আছে কে জানে। নরপিশাচদের হাতে যদি কিছু হয়ে যায় ওর? আর ভাবতে পারে না মুর হামসার। চোখের কোণ দু'টি তার চিক চিক করে উঠে।

আহমদ মুসা সেদিকে চেয়ে বলল, চিন্তা করো না মুর হামসার। বলেছি তো আমাকে ফাঁদে ফেলার টোপ হিসাবে শিরীকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যদিও আশঙ্কা উড়িয়ে দেয়া যায় না, তবু আমার বিশ্বাস আমাকে ফাদে ফেলার পূর্বে শিরীর গায়ে হাত তুলতে তারা সাহস পাবে না। তারা জানে এর পরিণাম কত ভীষণ হতে পারে।

কথা বলতে বলতে আহমদ মুসার চোখ দুটি জ্বলে উঠল। এক অজেয় শপথে দৃঢ় হয়ে উঠল তার মুখ।

ফিলিস্তিন বিজয়ী আহমদ মুসা পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে যেন প্রতিভাত হল মুর হামসারের চোখে। আর এর মাঝে মুর হামসার যেন খুঁজে পেল এক পরম নির্ভরতা।

পড়ন্ত বেলা। সোলো সাগরের বুকে ধূরে ধীরে নেমে যাচ্ছে সুর্য। মোটরচালিত একটি বোট মিন্দানাওয়ের পশ্চিম উপকূল ঘেঁষে তীর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে দক্ষিণ দিকে। বোটের ডেকের উপর দু'টি মাঝারী ধরনের কামান। দু'পাশে চেয়ে যেন ওরা হা করে আছে। বোটে মোট পাঁচজন ক্রু। স্টিয়ারিং হুইল

ধরে বসা ড্রাইভারের পাশে বসে আছে আহমদ মুসা। তার সামনে জাম্বুয়াঙ্গো শহরের একটি ম্যাপ। ম্যাপের পাতায় যেন ডুবে গেছে আহমদ মুসা। বামে বনানীর সবুজ সমুদ্র, আর ডাইনে সোলো সাগরের অন্তহীন জল। এরই মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলেছে আহমদ মুসার এক দুঃসাহসিক অভিযান।

পরবর্তী কাহিনীর জন্য পড়ুন

**পামীরের আর্তনাদ**

# সাইমুম-৪

# পামিরের আর্তনাদ

আবুল আসাদ

# ১

জমাট অন্ধকার। এই জমাট অন্ধকারে সোলো সাগরের কাল বুক চিরে তীব্র বেগে এগিয়ে চলেছে একটি বোট। উপরে তারার দিকে চেয়ে দিক নির্ণয় করছে ড্রাইভার। শেডে ঢাকা একটি ম্লান আলোর সামনে রাখা মানচিত্র দেখে ড্রাইভারকে মাঝে মাঝে পথের নির্দেশ দিচ্ছেন আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার চোখে ইনফ্রারেড গগলস। এক সময় আহমদ মুসা মানচিত্র থেকে মুখ তুলল। দু'টি হাত উপরে তুলে আড়ামোড়া ভেঙে আহমদ মুসা চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। চেয়ারে মাথাটা ঠেকাতেই যন্ত্রণায় আহমদ মুসার মুখ থেকে একটা 'উঃ' শব্দ বেরিয়ে এল। আহত মাথাটার কথা ভুলেই গিয়েছিলেন আহমদ মুসা। আহত মাথাটার কথা মনে পড়ার সাথে সাথে কাগায়ানের চিত্র ভেসে উঠল আহমদ মুসার চোখে। প্রশান্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল বুক থেকে। সমস্ত মুসলমানদের সবচেয়ে বিপদপূর্ণ উত্তর মিন্দানাও অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ কাগায়ান দখলে আসায় অনেক সুবিধা হয়েছে। প্রায় দেড় লাখের মত মুসলমান তাদের হারানো বাস্তুভিটায় ফিরে যেতে পারবে। একটি খোঁচা এসে লাগল আহমদ মুসার মনে। দেশের বাইরে থেকে আসা খৃষ্টানরা যারা মুসলমানদের

সহায়-সম্পদ দখল করে বসে আছে, তারা তাহলে যাবে কোথায়? কুঞ্চিত হয়ে উঠল আহমদ মুসার

ভ্রুযুগল। ভাবলেন আহমদ মুসা, ওদরে ওপর কোন অবিচার করা যাবে না। তবে যারা ভূমি দখলের রাজনীতি নিয়ে মিন্দানাওয়ে এসেছে, তাদেরকে অবশ্যই মিন্দানাও ছাড়তে হবে। আর যারা দেশের অনুগত নাগরিক হিসাবে বাস করতে চায়, তাদের যোগ্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। ওরা আমাদের ভাই না হোক, আল্লাহর বান্দা তো বটে! ওরা চিরদিনই পথ ভুলে থাকবে, একথা কে বলতে পারে? ওদের হৃদয় জয় করার, ওদের সামনে সত্য তুলে ধরার এই তো সময়! বিজিতের ওপর প্রতিশোধ না নিয়ে ওদের চিরতরে ভাই করে নেয়াই তো আমাদের কাজ -আমাদের ধর্ম।

সামনের আকাশ থেকে এক বিরাট নক্ষত্রের পতন হলো। আলোর এক বিরাট গুচ্ছ নিয়ে তা নেমে এসে সোলো সাগরের অন্ধকার বুকে কোথায় যেন হারিয়ে গেল। আহমদ মুসা চোখ থেকে ইনফ্রারেড গগলসটি খূলে বাঁ হাতে রেখে ডান হাতে চোখ দু'টি একটু রগড়ে তারকা খচিত আকাশের দিকে চোখ তুললেন। আদম সুরত গড়িয়ে পড়েছে পশ্চিম আকাশে। দীর্ঘ ছায়াপথটি সোলো সাগর পার হয়ে যেন মালয়েশিয়ার মাথার ওপর গিয়ে ঝুলে আছে। আকাশ থেকে চোখ নামাতে পারলেন না আহমদ মুসা। অদ্ভূত প্রশান্তি আছে স্নিগ্ধ তারার আলোর সজ্জিত ঐ নিরব আকাশে। পৃথিবীর কোন দুঃখ-বেদনা আর সীমার পীড়ন সেখানে নেই। আহমদ মুসার অশরীরি চোখ ছুটে চলল এক তারার জগত পেরিয়ে আর এক তারার জগতে। সেখান থেকে আরও ওপরে আর এক তারার জগতে। কিন্তু শেষ নেই এ যাত্রার- শেষ নেই ভয়াবহ নিরবতা ঢাকা ঐ মহাশূণ্যের। কোথায় সেই 'সিদরাতুল মুন্তাহা- আর কতদূরে? মহানবীর 'বুরাক' নেই, পথপ্রদর্শক জিবরাইলও তো নেই। এ মর-জগতে এ জিজ্ঞাসার জবাবও তাই আর নেই। অপরিসীম ক্লান্তি নিয়ে আহমদ মুসার চোখ দু'টি ফিরে এল মর্তের কঠিন মাটিতে।

আহমদ মুসা বাঁ হাতে রাখা ভাঙ্গা গগলসটি ডান হাতে নিয়ে পরতে যাবেন এমন সময় বোটের ড্রাইভার নূর আবদুল্লাহ বলল, 'জনাব, মনে হচ্ছে

একটা জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে'। নূর আবদুল্লাহর দৃষ্টি সামনে নিবদ্ধ। তার কণ্ঠে উদ্বেগ।

নূর আবদুল্লাহ মোটর বোটের গতি ডেড স্লো করে দিয়েছে। সামনের জমাট অন্ধকারটি একদম সামনে এসে গেছে। আহমদ মুসা সেটা ভালো করে নিরীক্ষণ করে বললেন, বোটের মুখ উপকূলের দিকে ঘুরিয়ে নাও আবদুল্লাহ্। কামানের পাশে দাঁড়ানো আবু ও সেলিমকে বললেন, দু'টো কামানের মুখই দক্ষিণ দিকে ঘুরিয়ে রাখ এবং তৈরী থাক।

নূর আবদুল্লাহ নিমেষে বোটের মুখ উপকুলের দিকে ঘুরিয়ে নিলো। কিন্তু সংগে সংগেই সামনের সেই জমাট অন্ধকারের বুক থেকে আলোর বন্যা ছুটে এল। তীব্র সার্চ লাইটের আলোতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল চারিদিক। আহমদ মুসা আলোর উৎসের দিকে একবার চেয়েই নিদের্শ দিলেন-'ফায়ার'।

আবু ও সেলিমের কামান দু'টো গর্জন করে উঠল। প্রবল এক ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল বোট। নির্ভুল নিশানা। অন্ধকারের সেই কাল জীবটির রক্তচক্ষু উড়ে গেল। আবার আঁধারে ঢেকে গেল চারদিক। কিন্তু সংগে সংগে পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর এই তিন দিক থেকে জ্বলে উঠল আরও তিনটি সার্চ লাইট। সেই সাথে ডেক মাইকে এক বিরাট গলা শোনা গেল, 'পালাবার পথ নেই মিঃ মুসা, চারদিক থেকে চারটা জাহাজ ঘিরে ফেলেছে। আত্মসমর্পণ করলে খুশী হব।'

আহমদ মুসা মুখ ঘুরিয়ে একবার চারটি জাহাজেরই অবস্থান দেখে নিলেন। দক্ষিণ এবং পূর্বে দাঁড়ানো জাহাজ দু'টির ফাঁক দিয়ে কাল জমাট অন্ধকার দেখা যাচ্ছে। ওটা উপকূল। আহমদ মুসার ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল এক টুকরো হাসি। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে স্টিয়ারিং হুইলের দিকে এগুতে এগুতে বললেন, নূর আবদুল্লাহ, তুমি একটু সরে বসো।

নূর আবদুল্লাহ পাশের সিটে সরে গেল। আহমদ মুসা স্টিয়ারিং হুইল ধরে বসলেন সিটে। সিটে জুতসইভাবে বসতে গিয়ে মাথাটা আবার ঠোকা লাগল চেয়ারের সাথে। যন্ত্রণায় মাথাটা টনটন করে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণাটা হজম করলেন তিনি। তারপর পকেট থেকে ডিম্বাকৃতি একটি জিনিস বের করে হাতে নিলেন। বাঁ হাতে ধরা স্টিয়ারিং হুইল। বোটের ইঞ্জিন বন্ধ ছিল। চাবি ঘুরিয়ে

স্টার্ট দিলেন। দক্ষিণ-পূর্ব কোণে বোটের মাথা ঘুরিয়ে নিলেন। দূরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে মনে মনে হিসেব করলেন, উপকূল দু'মাইলের বেশী হবে না। আহমদ মুসা একটু ভাবলেন, তারপর বললেন, প্রিয় সাথীরা, চোখ বন্ধ করে দৌড় দেয়ার মত করে আমাদের সামনে এগুতে হবে। অতএব, সাবধান থাকবে।

কথা শেষ করার সাথে সাথে আহমদ মুসার ডান হাত বিদ্যুৎ গতিতে ওপরে উঠল। একটি ডিম্বাকৃতি বস্তু তীব্র গতিতে ছুটে গিয়ে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে বিস্ফোরিত হলো। ধোঁয়ার এক পাহাড় সৃষ্টি হলো। বোটাটি তীব্র এক ঝাঁকুনি দিয়ে তীর বেগে ছুটে চলল সামনে। জমাট ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে বোট এগিয়ে চলেছে। চারদিকে ধোঁয়ার দেয়াল। কিছুই দেখা যায় না। মেশিনগান আর কামানের গর্জন শোনা গেল। বোটের মাথা দক্ষিণ পূর্ব কোণে ঘুরিয়ে নেবার পর আহমদ মুসা স্টিয়ারিং হুইল যেভাবে ধরেছিল সেভাবেই কঠিন হাতে ধরে রেখেছেন। একটি কামানের গোলা এসে বোটের গা ছুঁয়ে পেছনে পড়ল। বোটটি লাফিয়ে উঠে ছিটকে পড়ল সামনে। আহমদ মুসা স্টিয়ারিং হুইলের ওপর ঝুঁকে পড়ে বসেছিলেন। হাত তাঁর বিন্দুমাত্র কাঁপল না। স্থির হয়ে আবার ছুটে চলল বোট। স্পিডোমিটারের কাঁটা নব্বই-এ দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপছে। মেশিনগান ও কামান দাগার শব্দ এবার পেছন থেকে আসছে। আহমদ মুসা অনুভব করলেন জাহাজের বেষ্টনি তিনি পার হয়েছেন। উপকূলে ধাক্কা এড়াবার জন্য বোটের মুখ ডান দিকে ঘুরাতে গেলেই চার পাঁচ গজ দূরে সামনে আর একটি গোলা এসে বিস্ফোরিত হলো। আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি বোটের মাথা আবার বাম দিকে ঘুরালেন। পুনরায় বোটের মাথা ডান দিকে ঘুরাতে যাবেন এমন সময় বোটটি প্রবল ঝাঁকুনি খেয়ে কিসের ওপর যেন উঠে গেল। আহমদ মুসা স্টিয়ারিং হুইলের ওপর মুখ থুবড়ে পড়লেন। জ্ঞান হারালেন। নূর আবদুল্লাহ সহ অন্য ছয়জন ক্রু বোটের পাটাতনের ওপর শুয়েছিল। তারা গড়াগড়ি খেল। ছোট-খাট আঘাত পেলেও মারাত্মক কোন ক্ষতি হলো না তাদের।

আল্লাহর অসীম রহমত, খাড়া উপকূলে ধাক্কা না খেয়ে বোটটি সমতল উপকূলের একটি চরে উঠে এসেছে।

পেছনে দেখা গেল, বিশাল তিনটি রক্তচক্ষু উপকূলের দিকে ছুটে আসছে। দূর থেকে ছুটে আসা আলোর রেখা ইতিমধ্যেই সাদা বালুর ওপর আলোর আল্পনা সৃষ্টি করেছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওরা উপকূলে এসে পৌঁছবে।

নূর আবদুল্লাহ ইতিমধ্যেই সংজ্ঞাহীন আহমদ মুসাকে পাটাতনের ওপর শুইয়ে দিয়েছে। কপালের এক জায়গা কেটে গেছে। সারাটা মুখ তাঁর রক্তে ভেজা। মাথার পুরনো ব্যান্ডেজটিও রক্তে ভিজে উঠেছে। সে আহত জায়গা থেকেও আবার নতুন করে রক্ত ঝরতে শুরু করেছে।

নূর আবদুল্লাহ পেছনে তাকিয়ে দেখল ছুটে আসা হেড লাইট তিনটি উপকূল থেকে বেশী দূরে নয়। চর আলোকিত হয়ে উঠেছে। বোটের ওপর নিজের ছায়াও দেখতে পেল নূর আবদুল্লাহ। আর এক মুহূর্তও এখানে থাকা চলে না, নূর আবদুল্লাহ সিদ্ধান্ত নিল।

সামনে তাকিয়ে দেখল চরের পরেই বনের কাল রেখা। নূর আবদুল্লাহ সাথীদের দিকে চেয়ে দ্রুত বলল, গুলীর বাক্স,বন্দুক আর খাবার নিয়ে তোমরা সামনে জংগলের দিকে ছুটে যাও। মুসা ভাইয়ের ব্যাগ একজন নাও। বলে সে নিজে আহমদ মুসার সংজ্ঞাহীন দেহ ঘাড়ে তুলে নিল।

নূর আবদুল্লাহ দেখল সাথীরা সামনে অনেক দূর ছুটে গেছে। কিন্তু নরম বালুর ওপর দিয়ে সে খুব জোরে ছুটতে পারছে না। তাছাড়া সে ভয় করেছে, বেশী ঝাঁকুনি লাগলে আহত সংজ্ঞাহীন আহমদ মুসার আরও ক্ষতি হবে। সুতরাং সে ঝাঁকুনির সৃষ্টি না হয় এমন সাবধানে দ্রুত পা ফেলে সামনে এগুচ্ছে।

চরের মাঝখানে এসে গেছে নূর আবদুল্লাহ। হঠাৎ এ সময় পেছন থেকে গুলীর শব্দ ভেসে আসতে লাগল। তার সাথে গর্জন করে উঠল কামানও। বন প্রায় সামনে এসে গেছে। নূর আবদুল্লাহ তাঁর পা দুটোকে দ্রুততর করে তুলল। হঠাৎ একটি গুলী এসে নূর আবদুল্লাহর উরুতে বিদ্ধ হলো। হুমড়ি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল নূর আবদুল্লাহ। বালিতে মুখ গুঁজে গেছে তার। মুহূর্ত খানেক সে নিশ্চলভাবে মুখ গুঁজে পড়ে রইল। তারপর মুখ তুলল সে। ডান হাত দিয়ে মুখ চোখ থেকে বালি সরিয়ে ফেলে সামনে তাকিয়ে দেখল, হাত দুই দূরে আহমদ মুসার সংজ্ঞাহীন দেহ পড়ে আছে।

উঠতে চেষ্টা করল নূর আবদুল্লাহ, পারল না। ডান পা'টা যেন পাথর হয়ে গেছে। বৃষ্টির মত গুলী ছুটে আসছে জাহাজের দিক থেকে। নূর আবদুল্লাহ চিন্তা করল, জাহাজ থেকে বোট নামিয়ে এখানে পৌঁছতে এখনও কিছুটা দেরী আছে ওদের। এই সময়টা এভাবে ওরা গুলী বৃষ্টি করে আমাদের সরে যাবার পথ রোধ করতে চায়। আর এই সময়টুকুর সদ্ব্যবহার করে যদি আমরা আহমদ মুসাকে নিরাপদ করতে না পারি, তাহলে ওদের হাত থেকে আহমদ মুসাকে রক্ষা করা যাবে না।

নূর আবদুল্লাহ সামনে তাকিয়ে দেখল তার সাথীরা বন প্রান্তে পৌঁছে গেছে। তাদের ডাকার জন্য সে নির্দিষ্ট নিয়মে এক তীক্ষ্ণ শীষ দিয়ে উঠল। মাত্র মুহূর্তকাল, তারপরেই দেখা গেল গুলী বৃষ্টি উপেক্ষা করে পাঁচজনই ছুটে আসছে।

তারা এসে পৌঁছতেই নূর আবদুল্লাহ তাদের বলল, এক মুহূর্ত বিলম্ব নয়, তোমাদের দু'জন আহমদ মুসাকে নাও। আর তিনজন প্রাচীরের মত তাদের আড়াল করে সামনে এগিয়ে যাও। মনে রেখো, জাম্বুয়াংগো এখান থেকে বেশী দূরে নয়। একবার জংগলে ঢুকতে পারলেই নিরাপদ হওয়া যাবে। 'পিসিডা'র ভয়ে ওরা এই রাত্রে অন্ততঃ জংগলে ঢুকবার সাহস পাবে না। যাও দেরী করো না।

পাঁচজনের একজন কাসেম নূর বলল, কিন্তু আবদুল্লাহ ভাই আপনি? নূর আবদুল্লাহ বলল, আমার কথা চিন্তা করো না, জংগল পর্যন্ত পৌঁছতে পারব আমি। তোমরা যাও আমি আসছি। আহমদ মুসাকে নিয়ে ওরা চলল। নূর আবদুল্লাহ কনুই ও বাঁ হাটুর ওপর ভর করে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলল সামনে। সামনে তখন গুলী ও গোলা-বৃষ্টি চলছে। আশেপাশে নরম বালির বুকে ওগুলো এসে বিদ্ধ হচ্ছে। মাঝে মাঝে কামানের গোলা বিস্ফোরিত হয়ে বিরাট ক্ষতের সৃষ্টি করছে নরম মাটির মসৃণ বুকে।

অরণ্যের গভীর রাত। লাখো দীপ জ্বলা কালো আকাশের নীচে রাতের কালো চাদর মুড়ি দিয়ে কালো বন যেন গভীর ঘুমে মগ্ন। সেই কালো বনের আড়ালে ততোধিক কালো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে একটা মসজিদ। মসজিদের পূর্ব পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ছোট্ট একটি অপ্রশস্ত নদী। মসজিদের প্রশস্ত আঙিনা থেকে এক বাঁধানো ঘাট নদীর পানিতে নেমে গেছে। ঘাটটি ভাঙা -কোন কালের এক

পাকা ঘাটের অস্তিত্ব টিকে আছে মাত্র। ঘাটে বাঁধা আছে দু'টি স্পিড বোট। দু'টি করে চারটি কামান পাতা। ছোট নদীটি দু'পারের গাছ-গাছড়ায় প্রায় ঢেকে আছে। ওপর থেকে মনেই হয় না কোন নদীর অস্তিত্ব আছে এখানে। মসজিদ ঘিরে একটি জনবসতি পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেছে কয়েক মাইল। নদীর পূর্ব পাড়েও আর একটি অনুরূপ জনবসতি। এটিও পূর্বদিকে কয়েক মাইল পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বনের মধ্যেই মাঝে মাঝে উন্মুক্ত তৃণক্ষেত্র ও শস্যের মাঠ। এই নদী ধরে আরো উত্তরে এগুলে জাম্বুয়াংগো প্রদেশের উত্তরে দাঁড়ানো পাহাড় পর্যন্ত আরও এধরনের বেশ কয়েটি জনপদ পাওয়া যাবে। সবগুলোই মুসলিম অধ্যুষিত। ফিলিপিনো সরকারের হিসাবের খাতায় কিন্তু এদের নাম নেই। জাম্বুয়াংগো সিটি সমেত পূর্ব ও পশ্চিম জাম্বুয়াংগোর মোট লোক সংখ্যার শতকরা মাত্র ১২ জন মুসলমান। এই ভাবেই সংখ্যাগুরু মুসলমান তাদের হাতে সংখ্যালঘু জাতিতে পরিণত হচ্ছে। মিন্দানাও এর মুসলমানদের সংখ্যা যেখানে আজ ৬০ লাখেরও বেশী সেখানে আজ তারা পৃথিবীকে জানাচ্ছে মুসলমানদের সংখ্যা ১৮ লাখের বেশী নয়। খৃস্টানদের সংখ্যা বেশী করে দেখানোর জন্য কি প্রাণান্ত কৌশল তাদের।

এই জনপদের নাম মাখদুম আল-খয়েরুদ্দিন। জাম্বুয়াংগো প্রদেশের এটা অন্যতম শক্তিশালী 'পিসিডা' ঘাঁটি। বিখ্যাত আরবীয় ধর্ম প্রচারক দরবেশ খয়েরুদ্দিনের নাম অনুসারে এই জনপদের নাম হয়েছে। মসজিদটি মাখদুম খয়েরুদ্দিনের মসজিদ নামে পরিচিত। মাত্র কয়েক মাস আগে ফিলিপিনের কু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান বাহিনী এই জনপদে হামলা চালায়। তাদের বর্বর হামলায় মসজিদও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গোটা জনপদ পুড়িয়ে ফেলা হয়। কিন্তু সেদিন আজ আর নেই। আহমদ মুসার পরিকল্পনা এবং এহসান সাবরীর তৎপরতায় 'পিসিডা'র শক্তি আজ শতগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান চক্র সবখান থেকে বিতাড়িত হয়েছে। আজ তারা গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে রাজধানী জাম্বুয়াংগোয়। পিসিডার এক শক্তিশালী ঘাঁটি হিসাবে মাখদুম খয়েরুদ্দিন জনপদ আবার আজ নতুনভাবে গড়ে উঠেছে। অর্ধ ডজনের মত বিমান বিধ্বংসী কামানও রয়েছে এখন এই জনপদে।

এখান থেকে বিশ মাইল পূর্বে জাম্বুয়াংগো সিটি থেকে পাঁচ মাইল পশ্চিমে জাম্বুয়াংগো প্রদেশের প্রধান পিসিডা ঘাঁটি লেনাডেলে এহ্সান সবরী থাকেন।

তখন রাত কতটা কে জানে? পূর্ব দিগন্তের আদম সুরত পশ্চিম আকাশে গড়িয়ে পড়েছে। মসজিদের পশ্চিম পাশে কাঠের একটি সুন্দর বাড়ি। টিনের চালা দেয়া শক্ত সমর্থ বাড়িটির একটি দরজা খুলে গেল। একজন দীর্ঘাঙ্গ মানুষ বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। একহাতে টর্চ, আর এক হাতে পানির বদনা। টর্চ জ্বেলে বাড়ির উঠানটা একবার তিনি ভালো করে দেখে নিয়ে উঠানের এক প্রান্তে গিয়ে অজু করতে বসলেন। অজু সেরে আবার উঠে এলেন ঘরে, টর্চ জ্বেলে দেয়াল ঘড়িটা একবার দেখলেন, রাত তিনটা।

তাহাজ্জুদের নামাযে দাঁড়ালেন লুকমান রশিদ। লুকমান রশিদ পিসিডা'র পশ্চিম জাম্বুয়াংগো প্রদেশের অধিনায়ক। এই মাখদুম খয়েরুদ্দিন ঘাঁটি থেকে তিনি পশ্চিম জাম্বুয়াংগো প্রদেশের 'পিসিডা' (PCDA- Pacicif Crescent Defence Army) বাহিনী পরিচালনা করেন।

লুকমান রশিদের ছয় রাকাত নামায শেষ হয়েছে। আবার নামাযে দাঁড়াতে যাবেন এমন সময় তাঁর কানে কামানের গর্জন ভেসে এল। তিনি উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন, হ্যাঁ, কামান দাগার শব্দ। একাধিক কামানের গর্জন। জানালা খুলে বুঝলেন দক্ষিণ দিক থেকে কামানের শব্দ ভেসে আসছে।

লুকমান রশিদ তাড়াতাড়ি খাটিয়া থেকে নেমে মাটিতে কান রেখে শব্দ পরীক্ষা করলেন। বুঝলেন দক্ষিণ সাগরের কোণে কয়েকটি জাহাজ থেকে কামান দাগা হচ্ছে।

লুকমান রশিদ আবার এসে জায়নামাযে দাঁড়ালেন। নামায আর না বাড়িয়ে শুধু বিতরটুকু পড়ে নিয়ে নামায শেষ করলেন।

জায়নামায তুলে রেখে দেয়ালে টাঙানো সাবমেশিনগানটি কাঁধে ফেলে বেরুবার জন্য ফিরে দাঁড়ালেন। লুকমান রশিদের স্ত্রীসহ পরিবারের সবাই ততক্ষণে উঠে বারান্দায় সববেত হয়েছে। সবাই প্রস্তুত। সবার পিঠেই এম-১৬ আমেরিকান রাইফেল। এই এম-১৬ রাইফেলগুলো কু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান ও ফিলিপিনো সৈন্যদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া।

লুকমান রশিদ বের হতে হতে বললেন, জাহাজ থেকে তীরের দিক লক্ষ্য করে কামান দাগা হচ্ছে। দু'তিন মিনিটের মধ্যেই সংবাদ পেয়ে যাব। তোমরা অপেক্ষা কর। বলে লুকমান রশিদ বাড়ি থেকে বের হয়ে মসজিদে আসলেন। এসে দেখলেন, মসজিদের প্রশস্ত উঠান ভরে গেছে। সবাই সারিবদ্ধভাবে এ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কারো হাতে চাইনিজ, কারো হাতে আমেরিকান রাইফেল। মসজিদের দক্ষিণ পাশের বিরাট লম্বা ঘর খুলে দেয়া হয়েছে। ত্রিপলে ঢাকা ১৫০ ও ১০৫ এম. এম-এর বাঘা কামান ও মেশিনগানগুলোকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। নদীতে স্পিড বোট দু'টোতে ক্রুরা নির্দেশের অপেক্ষা করছে।

লুকমান রশিদ এসে পৌঁছতেই সহকারী অধিনায়ক ফারুক আলী দ্রুত তার কাছে এল। বলল, তীরে সৈন্য নামানোর কি এটা ওদের পূর্ব প্রস্তুতি জনাব?

লুকমান রশিদ মাথা নেড়ে বলল, না ফারুক, তা মনে হয় না। এ ভাবে কয়েকবার সৈন্য নামিয়ে ওরা দেখেছে, খুব কমই তারা আবার জাহাজে ফিরে যেতে পেরেছে।

তাহলে? ফারুক আলী বলল।

লুকমান রশিদ কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় অয়্যারলেস রুম থেকে জামিল এসে সামনে দাঁড়াল। বলল উপকূল আউট পোস্ট থেকে তারিক ভাই জানিয়েছেন, উপকূলের চারটি জাহাজ একটি বোটকে ঘিরে ধরে। কিন্তু বোটটি অদ্ভুত কৌশলে চারটি জাহাজের বেষ্টনি থেকে বেরিয়ে আসে। বোটের কয়েকজন লোক উপকূলে উঠে এসেছে। তাদের লক্ষ্য করে গুলী বৃষ্টি ও কামান দাগা হচ্ছে।

লুকমান রশিদের ভ্রু দুটি কুঞ্চিত হলো। দ্রুত কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ঠোঁট দুটি ফাঁক করেই হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন। সবাই সেই সাথে কান পাতল। এক মর্মবিদারী তীব্র তীক্ষ্ণ সুর এক অদ্ভুত ছন্দময় গতিতে ভেসে আসছে। এটা 'পিসিডা'র নিজস্ব মহাবিপদ সাইরেন। 'পিসিডা'র কেন্দ্রীয় কমান্ডই একমাত্র এ সাইরেন বাজাবার অধিকার রাখে।

হঠাৎ লুকমান রশিদের মনে পড়ল, বিকেলে পাওয়া এহসান সাবরীর একটি মেসেজঃ আহমদ মুসা আজ রাতে জাম্বুয়াঙ্গো আসছেন। একথা মনে পড়ার

সাথে সাথে লুকমান রশিদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি চিৎকার করে উঠলেন, ফারুক আলী, জরুরী অবস্থা ঘোষণা কর। আমি চললাম, সবাইকে নিয়ে তুমি উপকূলে এস। খোদা হাফেজ।

লুকমান রশিদ চোখের পলকে পাশের আস্তাবল থেকে একটি ঘোড়া টেনে নিয়ে এক লাফে তার ওপর উঠে বসলেন। এক অস্পষ্ট সরু পথ ধরে ঘোড়া তীরের মত এগিয়ে চলল উপকূলের দিকে।

ফারুক আলীর পাশেই আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল আবিদ আলী। সুইসাইড স্কোয়াডের অধিনায়ক সে। তার দিকে চেয়ে ফারুক আলী দ্রুত কন্ঠে বলল, তোমার স্কোয়াড নিয়ে ওঁর পেছনে যাও। আমরা আসছি। বলেই সে ছুটে গিয়ে বিউগল তুলে নিয়ে মুখে ধরল। এদিকে আবিদ ছুটল উপকূলের দিকে তার ছোট্ট বাহিনী নিয়ে।

লুকমান রশিদ ঘোড়ার পিঠে বসে অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। শিক্ষিত ঘোড়া প্রভূর ইংগিত বুঝে তীরের গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। তবু তাঁর মনে হচ্ছে ঘোড়াটা যেন ঠিকমত ছুটছে না। কিন্তু তিনি জানেন, প্রাণীটির সাধ্য এর বেশী নেই।

বন প্রায় শেষ। আর মিনিট খানেকের রাস্তা। তারপরেই বালুময় ছোট্ট বেলাভূমি। এরপরেই সাগরের নীল পানি। মর্মবিদরী সেই সাইরেন থেমে গেছে। চারদিক নিরব নিস্তব্ধ। শুধু সামনের সাগরের দিক থেকে একাধিক ইঞ্জিনের ভারী শব্দ ভেসে আসছে। লুকমান রশিদ পিঠ থেকে বন্দুকটি নামিয়ে নিয়ে ওপরের দিকে একটি ফায়ার করলেন। মাত্র কয়েক সেকেন্ড, তারপর বেলাভূমির দিক থেকে একটি ফায়ারের শব্দ ভেসে এল।

তারিকরা তাহলে পৌঁছে গেছে- মনে মনে বললেন লুকমান রশিদ। দেখতে পেলেন মাত্র একশ' গজ দূরে বালুর ওপর কয়েকজন পড়ে আছে, আর কিছু দূরে তারিক ও তাজুল মুর্তির মত দাঁড়িয়ে।

লুকমান রশিদ এক লাফে ঘোড়া থেকে নেমে দৌড়ে গেলেন বালুর ওপর পড়ে থাকা লাশগুলোর কাছে। লাগালাগি হয়ে এক সারিতে চারটি লাশ বালুর ওপর পড়ে আছে। তারা সকলেই পেছন দিক থেকে গুলীবিদ্ধ। গুলীতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে তাদের শরীর। তাদের পেছনেই পড়ে আছে আর একজন। তার হাতে

ইলেক্ট্রনিক সাইরেন ধরা। ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলটি সাইরেনের ক্ষুদ্র সাদা বোতাম থেকে একটু আলগা হয়ে গেছে মাত্র। লুকমান রশিদ ব্যাকুল ভাবে তাদের সকলকেই দেখলেন। না আহমদ মুসা নেই। লুকমান রশিদ এবার অসীম জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকালেন তারিকের দিকে।

অবনত মস্তক তারিক মাথাটা কিঞ্চিৎ উঁচু করে বলল, ওরা চার পাঁচটি বোটে করে তীরে নেমেছিল। ওরাই ধরাধরি করে একজনকে বোটে তুলে নিয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ বাকস্ফুরণ হলো না লুকমান রশিদের।  কয়েক মুহূর্ত মাথা নিচু করে থেকে ধীরে ধীরে চোখ তুললেন সাগরের দিকে। দূরে সাগর বক্ষ আলোকিত করে কয়েকটি হেড লাইট পূর্বে জাম্বুয়াংগোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এক দৃষ্টে সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন লুকমান রশিদ। তাঁর চোখে তখন আকুলতা নয়- আগুন।

তারপর চোখ নামিয়ে ফিরে তাকালেন তিনি বালুর ওপর পড়ে থাকা রক্তাপ্লুত লাশগুলির দিকে। তিনি গভীরভাবে তাদের নিরীক্ষণ করলেন এবং প্রত্যেকের স্টেনগান এবং রিভলভরের ম্যাগাজিন পরীক্ষা করলেন। একটি গুলীও তাদের খরচ হয়নি।

লুকমান রশীদ বললেন, তারিক দেখ, আত্মরক্ষার জন্য এঁরা  একটি গুলীও ছোঁড়েনি। মনে হচ্ছে সবাই মিলে এঁরা একজন কাউকে যেন আগলে বা বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তাকে আগলানোর দিকেই ছিল এঁদের লক্ষ্য, আত্মরক্ষা নয়। আত্মরক্ষা করতে চাইলে এঁরা এক জায়গায় এভাবে মারা পড়তে পারেন কিভাবে?

মুহূর্ত খানেক চোখ বুঁজে চিন্তা করে লুকমান রশিদ বললেন, হয়ত আহমদ মুসা আহত ছিলেন, চলবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। তা না হলে তাঁকে আগলানো বা বহন করার প্রশ্ন উঠবে কেন?

ফারুক আলী সব দলবল নিয়ে এসে পড়ল। উঠে দাঁড়ালেন লুকমান রশিদ। ফারুক আলীকে সব বলে নির্দেশ দিলেন, সাগরের এই বেলাভূমিতেই শহীদদের কবর দেয়ার ব্যবস্থা কর। স্বাধীন মিন্দানাওয়ের জন্য এই বেলাভূমি

হবে এক প্রেরণার প্রতীক। সেনাপতিকে, আন্দোলনের নেতাকে নিরাপদ করার জন্য দলের সকলের এমন নিঃশেষে প্রাণ বিসর্জনের নজীর আমার জানা নেই ফারুক!

একটু থেমে আবার তিনি বললেন, আমি চললাম। বোটটি ঘাঁটিতে পৌঁছাবার ব্যবস্থা করো। আমার মনে হয়, আজকে সন্ধ্যার মধ্যেই আমাদের জাম্বুয়াংগো সিটিতে পৌঁছতে হবে। আমি যাচ্ছি এহসান সাবরীর সাথে আলোচনার জন্য।

লুকমান রশিদের ঘোড়া আবার ফিরে চলল আগের সেই সরু পথ ধরে। ভোরের স্নিগ্ধ তারা জ্বল জ্বল করছে পূর্ব আকাশে। এক মনোমুগ্ধকর সংগীতের মত ফজরের আযান ভেসে আসছে 'পিসিডা'র উপকূলীয় পর্যবেক্ষণ ঘাঁটি থেকে।

# ২

জাম্বুয়াংগো বন্দর থেকে একটা রাস্তা সোজা তীরের মত এগিয়ে গেছে উত্তর দিকে। এই রাস্তা ধরে পাঁচ মাইল যাবার পর একটা উঁচু টিলার কাছে এসে দেখা যাবে রাস্তা পূর্ব দিকে বেঁকে গেছে। রাস্তাটি ছয় মাইল পূর্বে আর্মি হেড কোয়াটার্সে গিয়ে শেষ হয়েছে। আর্মি হেড কোয়াটার্স পাবার আগেই রাস্তার উত্তর পাশে একটা বিশাল বাড়ী। বাড়ীটার সামনে এর পরিচয় সূচক কোন সাইনবোর্ড নেই। বাড়ীর দেয়ালে অনেক উঁচুতে পিতলের প্লেটে খোদাই করা অক্ষরে লেখা আছে, 'ফিলিপিন আর্মির সম্পত্তি'। বাড়ীর চারদিক ঘিরে উঁচু দেয়াল। সামনে বিরাট ইস্পাতের গেট। গেটের গা ঘেঁষে পূর্ব পাশে গার্ডরুম। গার্ড রুমের একটা পর্যবেক্ষণ টাওয়ার। চব্বিশ ঘন্টাই এখান থেকে দু'টো সন্ধানী চোখ রাস্তার ওপরে নিবদ্ধ থাকে। একটু লক্ষ্য করলে পর্যবেক্ষণ টাওয়ারের ফুটো দিয়ে মেশিন গানের তেল চকচকে মাথাও দেখা যাবে। গার্ড রুম থেকে গেট খোলার একটা স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা রয়েছে। যারা বাড়ীতে ঢুকতে আসে তারা গেটের সামনে এসে এক নির্দিষ্ট নিয়মে একটি নির্দিষ্ট স্থানে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দাঁড়ায় এবং এক নির্দিষ্ট তালে হর্ণ দিতে থাকে। গার্ড সব দেখে নিঃসন্দেহ হবার পর সুইচ বোর্ডের নীল বোতামটা টিপে ধরে। গেটের ভারি ইস্পাতের পাল্লা নিঃশব্দে পাশের দেয়ালে ঢুকে যায়।

জাম্বুয়াংগোর উত্তপ্ত মধ্যাহ্ন। রাস্তার ওপাশের গীর্জার পেটা ঘড়ি থেকে ১২-টা বাজার ঘন্টা ধ্বনি এইমাত্র শেষ হলো। গার্ড রুমের বেয়ারা টম বেঞ্চিতে বসে সেদিনের দৈনিকটি নিয়ে নাড়া চড়া করছিল। হঠাৎ একটা খবরের ওপর তার চোখটা যেন আঠার মতই আটকে গেল। আটের পাতার শেষ কলমে সিংগল কলমের একটা নিউজ। নিউজের হেডিং 'দিবাও ও কোটাবাটো থেকে লোক অপসারণ'। দিবাও একটা প্রাদেশিক রাজধানী শহর, আর কোটাবাটো দক্ষিণ মিন্দানাওয়ের সামরিক ও গুরুত্বপূর্ণ শহর। খবরে বলা হয়েছে, বিদ্রোহীরা দিবাও

ও কোটাবাটোর বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বিনষ্ট এবং শহর দু'টির সামরিক ঘাঁটিতে উপর্যুপরি হামলা চালানোর পর সরকার বেসামরিক সকল শ্বেতাংগ নর নারীকে সেখান থেকে সরিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বৃহত্তম নিরাপত্তা ও সামরিক প্রয়োজনেই এটা করা হচ্ছে বলে খবরে উল্লেখ করা হয়েছে।

খবরটি পড়ে টমের ঠোঁটে একটি সূক্ষ্ম হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠল। ঝুলে পড়া গোঁফের আড়ালে থাকায় তা বাইরে থেকে দেখতে পাওয়ার মত নয়। কিন্তু চোখের ঔজ্জ্বল্যকে ভ্রুর অপর্যাপ্ত বেড়াজাল আটকে রাখতে পারলো না। এই আনন্দের ঔজ্বল্যের মধ্যে মনে হয প্রতিহিংসার আগুনও প্রচ্ছন্ন ছিল।

এই 'টম' তো টম নয়? তার পিতৃদত্ত নাম আবু সালেহ, তার পিতা হাজী আলী ইয়াসিন কোটাবাটোর একটা মাদ্রাসায় পড়াতেন। মাদ্রাসাটি তিনিই গড়েছিলেন, তিনিই সেখানে পড়াতেন। মাদ্রাসার পাশেই ছিল তাদের বাড়ী। সেই ছোটবেলা থেকেই মাদ্রাসায় ছিল তার জন্য অবারিত দ্বার। পিতার হাতেই আবু সালেহের হাতে খড়ি হয়। প্রতিদিন পড়া শেষ হবার পর তার পিতা ছাত্রদের নিয়ে গল্পের আসর বসাতেন। সেই আসরে তিনি কত যে গল্প শোনাতেন! কিভাবে নবী মুহাম্মদ এলেন, কিভাবে তিনি মানুষকে সকল অন্যায়-অবিচার যুলুম ও অজ্ঞতা থেকে মুক্ত করলেন, কিভাবে কাদের দ্বারা ইসলাম গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ল, কিভাবে কোন ভূলে শাসকের জাতি মুসলমানরা শাসিতের জাতিতে পরিণত হলো, তারপর কিভাবে পতনের অন্ধকার থেকে উঠবার প্রচেষ্ঠা শুরু হলো, ইমাম ইবনে তাইমিয়া, জামালুদ্দিন আফগানী, মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওহাব, শাহ ওয়ালীউল্লাহ প্রমূখ কিভাবে কেমন কষ্টের মধ্য দিয়ে মুসলমানদের মাঝে জাগরণের দীপ জ্বালালেন, ইত্যাকার কত গল্প তিনি করতেন। গল্প শুনতে শুনতে স্বপ্নের জগতে চলে যেত সবাই। ভাবত তারা, শীঘ্রই তারা আবার দুনিয়ায় সবার থেকে বড় হবে, সবাই তাদের হুকুম মেনে চলবে। কিন্তু হঠাৎ একদিন এই স্বপ্নের নীড়, শান্তির নীড় ভেঙে গেল। আবু সালেহের এখনও সব কথাই স্পষ্ট মনে আছে। পঁচিশ বছর আগের ঘটনা, তার বয়স দশ। সমুদ্র পথে আসা খৃস্টান

শ্বেতাংগদের সশস্ত্র সন্ত্রাস চলছিল তখন চারদিকে। বন্দুকের জোরে বন্দর এলাকায় তারা একটা কলোনীও গড়ে তুলেছিল।

একদিন শুক্রবার। জুমার আযান হয়ে গেছে। আবু সালেহের পিতা হাজী ইয়াসিন মসজিদে ঢুকছেন। তিনিই মসজিদের ইমাম। এমন সময় দুটো গাড়ী এসে দাঁড়াল। গাড়ী থেকে যারা নামলো সবাই সশস্ত্র। তারা এসে হাজী ইয়াসিনকে গাড়ীতে উঠতে নির্দেশ দিল। কিন্তু তিনি নামায শেষ না করে যেতে চাইলেন না। জোর করে তাঁকে গাড়ীতে উঠিয়ে নিয়ে গেল ওরা। সেই যে হাজী ইয়াসিন গেলেন আর ফিরে এলেন না। সেদিনই রাতে মসজিদ-মাদ্রাসা সমেত আবু সালেহদের বাড়ি ঘর সব পুড়ে গেল। লুন্ঠিত হলো তাদের সব কিছু। তার বড় বোন আকলিমাকেও ওরা ছিনিয়ে নিয়ে গেল। সব হারিয়ে পথে বসল আবু সালেহরা। সেদিন ভোরেই তারা কোটাবাটো শহর ছেড়ে জংগলে পালিয়ে গেল। রোগে-শোকে মাস তিনেক পরে আবু সালেহ'র মা মারা গেলেন। আবু সালেহ এখন নির্বান্ধব- বন্ধনহীন। মাকে কবরে শায়িত করে আবু সালেহ যখন পেছনে ফিরে দাঁড়াল তখন গোটা জগতটাই তার ফাঁকা মনে হলো। চোখ ফেটে দু'গন্ড বেয়ে নেমে এল অশ্রু। হঠাৎ তার মনে পড়ল তার আব্বার কথা, আকলিমার কথা। দু'হাতে বুক চেপে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল সে। আমি ওদের খুঁজে বের করব। তারপর সে একবার পেছনে ফিরে মায়ের কবর, আর পাশেই বাড়ি নামক পাতার ঝুপড়ির দিকে শেষ বারের মত এক নজর চেয়ে পথ ধরল কোটাবাটোর দিকে।

কোটাবাটো শহরের পথঘাট, অলিতে-গলিতে সে ঘুরে বেড়াল দিনের পর দিন। না, কোথাও তার আব্বা নেই, বোন আকলিমা নেই। সে কতদিন কত বাড়ির পেছনে, সামনের দরজায় সজল চোখে দাঁড়িয়ে থেকেছে আব্বার ডাক, বোনের গলা শোনার জন্য। চোখের পানি তার শুকিয়ে যেত, চোখ তার ক্লান্ত হয়ে পড়তো। কিন্তু তার হৃদয়ের ব্যাকুলতার ইতি ঘটত না। বন্দরের ফুটপাতে শায়িত ক্ষুধাপীড়িত জ্বরে কাতর আবু সালেহকে অজ্ঞান অবস্থায় একজন খৃস্টান ব্যবসায়ী তুলে নিয়ে গেল। সেই থেকে সে শ্বেতাংগ খৃস্টানের সার্ভেন্ট কোয়াটার্সে তার আশ্রয় হলো। নাম হলো টম। শ্বেতাংগ ব্যবসায়ী দেশে চলে যাবার সময় গার্ড রুমের এই চাকুরী জুটিয়ে দিয়ে গেছে। সে প্রায় আজ পাঁচ বছরের কথা। শুধূ

জাম্বুয়াংগো নয়, গোটা মিন্দানাওয়ের শ্বেত শাসনের নার্ভ সেন্টার এই সমরিক গোয়েন্দা ভবনের একজন অতি বিশ্বস্ত কর্মচারী টম। টমের চোখে তার বড় বোন আকলিমা এবং তার আব্বার স্মৃতি আজ অনেক ব্যাপক, অনেক বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। গোটা মিন্দানাও ও সোলো দ্বীপপুঞ্জই আজ তার পিতা ও আকলিমার রূপ পরিগ্রহ করেছে। এই ভুখন্ডের দুর্ভাগা মুসলমানদের মুক্তিই তার জীবনের একমাত্র ব্রত। এই মুক্তির লক্ষ্যে টম প্রায় বছর কয়েক আগে 'পিসিডা'য় যোগ দিয়েছে। সে উত্তর জাম্বুয়াংগোর পিসিডা ইউনিটের একজন সক্রিয় সদস্য।

'দিবাও' ও 'কোটাবাটো' থেকে সন্ত্রাসবাদী খৃস্টান বাহিনীর পিছু হটার খবর পড়ে আবু সালেহের মুখে হাসি ফুটে উঠল। খুশী মনে হিসেব করল, উত্তর মিন্দানাও থেকে ওরা বিতাড়িত হবার পথে। দক্ষিণের দিবাও এবং কোটাবাটোও ওদের এখন হাতছাড়া। এখন এ জাম্বুয়াংগোই ওদের শেষ ভরসা। কিন্তু এখানেও ওদের পায়ের তলায় মাটি নেই। শুধু হুকুমের আপেক্ষা -এক রাতেই সব খেলা সাঙ্গ হয়ে যাবে ওদের।

আবু সালেহের মাথার ওপর বেসুরো শব্দের কলিং বেল তার চিন্তাসূত্র ছিন্ন করে দিল। সে হাতের কাগজ পাশের বেঞ্চিতে ছুঁড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াল। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে দেখল, লালমুখো, টেকো মাথা গার্ড সাইমন তখনও মদ গিলছে। আবু সালেহ সামনে দাঁড়াতেই সে বলল, কি যে এসব রাবিশ একটু ও ভালো লাগছে না, একটুও নেশা ধরাতে পারছে না। জানিসরে টম, রাজকুমারীকে কোন ঘরে কোথায় রাখা হলো?

কোন রাজকুমারী? আবু সালেহের চোখে একরাশ জিজ্ঞাসা।

বেটা ন্যাকা! জানিস না মরো রাজকুমারী এখানে তশরীফ এনেছেন। আঃ কি সুন্দর নাম 'শিরী'। জানিস টম, ফারসী সহিত্যের ইংরেজী অনুবাদে আমার খুর আগ্রহ। শিরী-ফরহাদের কাহিনী আমি পড়েছি। ডেভিল মুর হামসারের এ বোনটি কাহিনীর শিরীকে হার মানায়।........

সাইমন আরো কত কি বলছিল। কিন্তু টমের মাথায় কিছুই ঢুকছিল না। তার পায়ের মাটি যেন সরে যাচ্ছে, সামনের জগৎটা যেন তার সামনে ওলট-পালট

হয়ে যাচ্ছে। পিসিডার সহকারী প্রধান মুর হামসারের বোন এখানে! কেমন করে কিভাবে ওরা নিয়ে এল? এই সাংঘাতিক সময়ে কি তার করণীয়?

সাইমন তার দিকে চেয়ে বলল, ব্যাটা, তোরও নেশা ধরল নাকি? যা, এ রাবিশগুলো সরিয়ে নিয়ে যা। বলে পা দিয়ে টিপয়টিতে দিল এক ধাক্কা। টেবিল উল্টে গিয়ে মদের বোতল আর গ্লাস বিশ্রী এক শব্দ করে টুকরো টুকরো হয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল। আবু সালেহ টেবিলটি ঠিক করে, কাঁচের টুকরোগুলো কুড়িয়ে মেঝেটা ভাল করে মুছে বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর বাথরুমে গিয়ে ভালো করে হাত পরিস্কার করে অজু করে নিল। দেখল, যোহরের নামাযের সময় এসে গেছে। সে বাথরুম থেকে বেরিয়ে গার্ড রুমে প্রবেশ করল। চেয়ারে গা এলিয়ে উর্ধমুখী হয়ে কড়িকাঠ গুণতে থাকা মেজর সাইমনকে লক্ষ্য করে সে বলল, স্যার, শোবার ঘর থেকে একটু আসি।

শোবার ঘরে ঢুকে প্রথমে দরজা তারপর সবগুলো জানালা বন্ধ করে দিল। অতঃপর জায়নামায় বিছিয়ে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াল। জায়নামায সাদা একখন্ড কাপড়। জায়নামাযের সিজদা দেবার জায়গাটা তুলো দিয়ে নরম করা। যাতে কপালে সিজাদার দাগ না পড়ে সে জন্যই এই সতর্কতা। সবার সতর্ক দৃষ্টির সামনেই তাকে গোপনে নামায পড়তে হয়। অনেক সময় আসর এবং মাগরিবের নামায কাজা করতে তাকে বাধ্য হতে হয়। কিন্তু রাতের নামাযের সাথে এ কাজাগুলো সে সেরে নেয়। তার বিশ্বাস আছে, তার অসুবিধার কথা বিবেচনা করে দয়ালু আল্লাহ নিশ্চয় তাকে মাফ করে দেবেন। সবচেয়ে তার মুস্কিল হয় রমযানের রোযা নিয়ে। মানুষের চোখকে ফাঁকি দিয়ে নামায পড়ার মত সময় করে নেয়া যায়, কিন্তু রোযা অসম্ভব। অন্যদিকে মানুষের ভয়ে রোযা না করে মুসলমান থাকা যাবে, এ বিশ্বাস তার নেই। মুসলমানরা সত্য প্রচারের জাতি, সত্য গোপন করার জাতি নয়। মুসলমানরা জীবন দিয়েছে, দেশ ত্যাগ করেছে, কিন্তু সত্যের পতাকা অবনত করেনি। বিলাল, ইয়াসার, সোহায়েব প্রমুখদের জীবন তো এ ত্যাগেরই স্বাক্ষর। আবু সালেহও সত্য গোপন করেত রাজি হয়নি। সে চাকরী ছেড়ে দিতে চেয়েছে। কিন্তু পিসিডা এ গুরুত্বপূর্ণ চাকুরি জাতির স্বার্থেই ছেড়ে দিতে নিষেধ করেছে। জাম্বুয়াংগোর ওস্তাদ ইয়হিয়া আলী তাকে বলেছেন, মাঝে মাঝে রোযা

রেখে কাজাগুলো বছরে অন্য সময়ে করে নিও। আমাদের অসহায়তা ও প্রয়োজন আল্লাহ দেখছেন, তিনি অবশ্যই মাফ করবেন আমাদেরকে। আবু সালেহ তারপর থেকে ঐভাবেই রোযা পালন করে আসছে।

আবু সালেহ নামায শেষ করে উঠতেই গেটে গাড়ির হর্ণ বেজে উঠল। থেমে থেমে বাজছিলো সেই সাংকেতিক হর্ণ। তাড়াতাড়ি সে শোবার ঘর থেকে গার্ড রুমে এল! যেমন সে প্রায়ই যায়, তেমনি আজও সে উঠে গেল পর্যবেক্ষণ টাওয়ারে। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটি সামরিক ভ্যান। সামরিক উর্দিপরা ড্রাইভারের পাশেই ব্রিগেডিয়ার র‍্যাঙ্কের জনৈক অফিসার। ভ্যানের পেছনে ছয়জন সামরিক প্রহরী। পিকআপ ভ্যানের মেঝের ওপর চোখ পড়তেই চমকে উঠলো আবু সালেহ। ওকি! লোকটির গায়ে পিসিডার ইউনিফর্ম। লোকটির মুখ দেখা যাচ্ছে না। এ সময় গাড়িটি নড়ে উঠল। ইতিমধ্যেই গেটটি খুলে গেছে। খোলা গেট-পথে এগিয়ে এল গাড়িটি। চোখের নিমেষে ভেতরে ঢুকে গেল গাড়ি। মুহূর্তের জন্য লোকটির মুখ সে দেখতে পেল। এক নজর দেখেই বুঝল, লোকটি এদেশী নয়। তাহলে? বিদেশীর গায়ে পিসিডার ইউনিফর্ম কেন?

ধীরে ধীরে পর্যবেক্ষণ টাওয়ার থেকে নেমে এল আবু সালেহ। রাজকুমারী এবং এই মুহূর্তের দৃশ্যটা এক সাথে মিলিয়ে বুঝল, একটা বড় ধরনের কিছু ঘটে গেছে। বুকটা তার ধক করে উঠল। এক অব্যক্ত যন্ত্রণা যেন ছড়িয়ে পড়ল গোটা দেহে এক অজানা আশঙ্কায়। তার মন বলল, বসে থাকার সময় এটা নয়। এই মুহূর্তে এই খবর দু'টো পিসিডা অফিসে পৌঁছানো দরকার।

জাম্বুয়াংগো বন্দরের রয়াল স্কোয়ার শহরের প্রাণকেন্দ্র। এই স্কোয়ারের পশ্চিমে সেন্ট এলিস রোড ধরে কেয়েক গজ এগুলেই টেলিফোন ভবন। তার বিশাল অয়্যারলেস টাওয়ার বলতে গেলে গোটা মিন্দানাওয়ের মুখ আর কান। বলা যায় দক্ষিণ ফিলিপিনের অয়্যারলেস যোগাযোগের রাজধানী এটা। বিশেষ করে কাগায়ান, দিবাও ও কোটাবাটোর পতনের পর ফিলিপিন সরকারের কাছে

এর গুরুত্ব আজ অপরিসীম। এ টেলিফোন ভবন এখন সামরিক যোগাযোগের কাজেই বেশী ব্যবহৃত হচ্ছে। তার নজীর টেলিফোন ভবনটির বিশাল গেটের দিকে তাকালেই আঁচ করা যায়। সেখানে আগে ছিল সাধারণ পুলিশ প্রহরী। তার জায়গায় এখন পাহারা দিচ্ছে বাহুতে টকটকে লাল ব্যান্ড বাঁধা মিলিটারী পুলিশ। টেলিফোন ভবনের গোটা চৌহদ্দিই এখন ফিলিপিনো সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। রয়াল স্কোয়ারের পূর্ব পাশে বিদ্যুৎ স্টেশন। জাম্বুয়াংগো হাইড্রোইলেকট্রিক প্ল্যান্ট থেকে বিদ্যুৎ এখানে আসে, এখান থেকেই তা ছড়িয়ে দেয়া হয় গোটা দক্ষিণ মিন্দানাওয়ে।

এই রয়াল স্ট্রিটেরই উত্তর পাশে বিশাল গীর্জা, দক্ষিণমুখী। তীরের মত সোজা বন্দর রোড দিয়ে সাগরের বাতাস এখানে এসেই প্রথমে বড় রকমের ধাক্কা খায়। গীর্জার পশ্চিম পাশ দিয়ে একটা সরু গলি। গলির পশ্চিম পাশে একটা দ্বিতল মসজিদ। মসজিদের মিনার নেই। একটা উঁচু উন্মুক্ত সোপানে দাঁড়িয়ে মুয়াজ্জিন আযান দেয়। ভালো করে লক্ষ্য করলে একটা বিধ্বস্ত মিনারের চিহ্ন সেখানে দেখা যাবে। গীর্জা যখন তৈরী হয়, তখন এ মিনার ভেঙে ফেলা হয়। উল্লেখ্য, গীর্জাটি তৈরী মসজিদের জায়গার ওপরেই। মসজিদটির সাথে যুক্ত ছিল মার্কেট, মাদ্রাসা ও ছাত্রাবাসের একটা বিরাট কমপ্লেক্স। শ্বেতাংগ খৃস্টানরা যখন জাম্বুয়াংগো দখল করে, যখন তাদের নিষ্ঠুর হত্যা ও জ্বালাও-পোড়াও অভিযানের মুখে শহরের মুসলমান ছিন্ন ভিন্ন, তখন তারা মসজিদের এ জায়গা দখল করে মার্কেট-মাদ্রাসা সব ভেংগে এখানে গীর্জা গড়ে। মসজিদের সুউচ্চ মিনার তারা ভেঙে ফেলে। কিন্তু মসজিদটি ভাঙেনি। না ভাঙার কারণ, সোনার ক্রস বুকে ঝুলানো শুভ্র কেশ শ্বেতাংগ ফাদার নাকি বলেছিল, উঁচু গীর্জার আশ্রয়ে মাথা নিচু করে পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকনা মসজিদটা। এতে গীর্জার গৌরবই বৃদ্ধি পাবে।

গীর্জা ও মসজিদের মধ্যকার গলি দিয়ে কিছুদূর এগুলে একদম গলির মাথায় একটা বিশাল সাইনবোর্ড দেখা যাবেঃ 'ফিলিপিন ওভারসীজ করপোরেশন'। ইনডেন্ট ও শিপিং এজেন্সীর সবচেয়ে বড় ফার্ম। গোটা মিন্দানাওয়ে এই ফার্মের সুনাম। কসমেটিক থেকে মিল মেশিনারী পর্যন্ত প্রায় শ'খানেক বিদেশী পণ্যের সোল এজেন্সী রয়েছে এই ফার্মের। প্রবেশ পথেই

ইস্পাতের বড় গেট। গেটের পাশে গার্ড রুমে দারোয়ান। তার পাশেই সুসজ্জিত তথ্যকেন্দ্র। সবাই প্রথমে তথ্যকেন্দ্রে যায়। তথ্যকেন্দ্র প্রয়োজন জেনে নিয়ে টেলিফোনে ভেতরের সাথে যোগাযোগ করে কোথায় যেতে হবে তার স্লিপ দিয়ে লোক ভেতরে পাঠায়।

গেট দিয়ে ভেতরে ঢোকার পর প্রথমেই একটা ছোট্ট উঠান। উঠান পেরোলেই অফিসে প্রবেশের স্বয়ংক্রিয়ং দরজা।

ত্রিতল ভবন। মনে হবে অসংখ্য রুম। কিন্তু কোন শব্দ নেই। বহু টাইপ রাইটারের অব্যাহত খটখট গুঞ্জন ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। তিনটি তলার সামনের সবগুলো রুমই কোম্পানীর বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। পেছনের অংশটা রেসিডেনসিয়াল ব্লক। প্রায় শ'তিনেক কর্মচারী অফিসে। জাম্বুয়াংগো শহরে এটাই পিসিডার হেডকোয়ার্টার্স। এখানকার সব কর্মচারীই পিসিডার কর্মী। কোম্পানীর মালিক মিঃ একিনো ওরফে হাজী উমর তার সবকিছু পিসিডার জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছেন। হাজী উমরের বাড়ি ছিল পূর্ব মিন্দানাওয়ের দিবাও শহরে। সেখানে সব হারিয়ে খালি হাতে আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে তিনি জাম্বুয়াংগো এসে আত্মগোপন করেন। তারপর নাম ভাঁড়িয়ে খৃষ্টান নাম গ্রহণ করে ইনডেন্ট বিজনেস শুরু করেন, আর সেই সাথে স্থানীয় মুসলমানদের সাথে একটা গোপন যোগযোগের কাজও শুরু করে দেন। হাজী উমরে সেদিনের সে ছোট্ট ইনডেন্ট বিজনেস আজ 'ফিলিপিন ওভারসিজ করপোরেশন'। সেই সাথে জাম্বুয়াংগো পিসিডার হেডকোয়ার্টার্সও এটা। হাজী উমরের নিরলস পরিশ্রমে জাম্বুয়াংগো এবং এই এলাকার প্রতিটি মুসলিম সংগঠিত হয়েছে। তাদের সুখ -দুঃখের সাথী হাজী উমর। হেঁটে-খেটে এবং পকেট থেকে পানির মত পয়সা খরচ করে তিনি বিভিন্ন অফিস-আদালতে মুসলিম যুবকদের চাকুরী জুটিয়ে দিয়েছেন। তার ফলে আজ সব সরকারী অফিস, পুলেশ ফোর্স, নিরাপত্তা এজেন্সী, টেলিফোন ভবন, পাওয়ার স্টেশনসহ সব জায়গায় পিসিডাকে মাকড়সার জালের মত ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব হয়েছে।

সেদিন বেলা তিনটা। ফিলিপিন ওভারসীজ করপোরেশনের রেসিডেন্সিয়াল ব্লকের একটি কক্ষ। একটা বড় টেবিল ঘিরে বসে আছে সাতজন।

জাম্বুয়াংগো অপারেশন সেলের বৈঠক। কথা বলছেন জাম্বুয়াংগোর পিসিডা প্রধান এহসান সাবরী। সবার অখন্ড মনোযোগ তাঁর দিকে।

তিনি বলছিলেন আবু সালেহের কাছ থেকে নিশ্চিত খবর পাওয়া গেল, আহমদ মুসাকে ওরা জাম্বুয়াংগো নিয়ে এসেছে। আল্লাহর হাজার শোকর যে, তাঁকে শিপে করে অন্য কোথাও নিয়ে যায়নি, যা ছিল খুবই স্বাভাবিক। তবে তাঁকে অতি শীঘ্রই এখান থেকে সরিয়ে ফেলবে, তাতে কিছুমাত্রও সন্দেহ নেই। ইরগুন জাই লিউমি এবং বিশ্ব রেড ফোর্স (W.R.F.) তাঁকে হাতে পাওয়ার জন্য হন্যে হয়ে আছে। মনে হয় মিন্দানাওয়ের কু-ক্লাক্স-ক্লান আহমদ মুসার কাছ থেকে প্রথমেই 'রেডিয়েশান বম্ব' এর খবর উদ্ধার করতে চায় বলেই সম্ভবতঃ নিজেদের হাতের মধ্যে জাম্বুয়াংগোর আর্মি ইনটেলিজেন্স হেড কোয়াটার্সে এনে তুলেছে।

একটু দম নিল এহসান সাবরী। তারপর বলল, আমরা শত্রুকে কোন সময় দিতে পারি না। আজকে রাতের মধ্যেই উদ্ধার করতে হবে আমাদের নেতাকে, সেই সাথে আজই নির্ধারিত হবে শুধু জাম্বুয়াংগোর নয়, গোটা মিন্দানাওয়ের ভবিষ্যত।

এহসান সাবরীর শেষের কথাগুলো যেন সাগর বক্ষের মতই অতলান্ত ও স্থির, বুলেটের মতই দৃঢ়-শক্তিমান। বলতে বলতে তাঁর চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

এহসান সাবরীর ডান পাশে বসা নূর আহমদ প্রথমে কথা বলল। বলল সে বোধহয় ওরাও এটা আঁচ করেছে। বন্দর এলাকায় বলতে গেলে কারফিউ এর মত। অপরিচিত সকল নৌযানের বন্দরে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। শহরগামী সবগুলো সড়ক বন্ধ। শহরের তিনদিক ঘিরে সেনাবাহিনীর ব্যারিকেড।

নূর আহমদ জাম্বুয়াংগো পিসিডা'র গোয়েন্দা ইউনিটের প্রধান। তার কথা শুনে একটু হাসলেন এহসান সাবরী। বললেন, তোমার কথা ঠিক নূর আহমদ। তবে ফাইনাল খেলার জন্য ওরা তৈরী নয়। ওরা যা করছে সেটা সতর্কতার জন্য। আহমদ মুসাকে হাতে পাওয়ার পর তাদের এটুকু সতর্কতাকে আমি খুব স্বাভাবিক বলে মনে করি। কিন্তু ওরা যা কল্পনা করেনি, সেই আঘাত

আমরা দিতে চাই। কাগায়ান, দিবাও ও কোটাবাটোর পর তাদের শক্তির শেষ শক্ত গাছটি আমরা উপড়ে ফেলতে চাই।

থামলেন এহসান সাবরী। মুখ তুলল এবার হামিদ উনিতো। উনিতো এখানে এহসান সাবরীর প্রধান সহকারী। সে বলল, পুলিশ বাদ দিলে জাম্বুয়াংগোতে ওদের সৈন্য সংখ্যা আজকের দিন পর্যন্ত পাঁচ হাজারে পৌঁছেছে।

আমরা পুলিশ ফোর্সকে তাদের সাথে ধরেই হিসেব করছি -বললেন এহসান সাবরী।

এই সংখ্যা শক্তি মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। কাগায়ান, দিবাও কোটাবাটো সহ হাজারো জায়গায়, হাজারো বার এটা প্রমাণিত হয়েছে। বিশেষ করে রাতের গেরিলা যুদ্ধে ওরা অকেজো। তার ওপর মানসিকভাবে ওরা আজ খুব দুর্বল। কথাগুলো বললেন মাইকেল সুনম ওরফে সালেম ইব্রাহিম। ইনি জাম্বুয়াংগো পুলিশের একজন উর্ধতন অফিসার। গত দশ বছর ধরে তিনি মরো মুক্তি আন্দোলনের সাথে জড়িত। তিন বছর আগে তিনি পিসিডা'য় যোগ দেন। আজ তিনি পিসিডা'র প্রথম সারির একজন নেতা।

তবু আমাদের প্রস্তুতিতে কোন দুর্বলতা আমরা রাখতে চাই না। ত্রিশটি গানবোটের আমাদের নৌ-ইউনিট রাত ন'টার মধ্যে জাম্বুয়াংগো বন্দরে এসে পৌঁছবে। তারা বন্দরে পৌঁছার আগেই কোটাবাটো এলাকার পিসিডার একটা ইউনিটকে শহরের পূর্ব প্রান্তে নামিয়ে দিয়ে আসবে। ওরা পূর্ব দিক দিয়ে শহরে ঢুকবে। আর উত্তর ও পশ্চিম দিক দিয়ে শহরে ঢুকছে লুকমান রশিদের বাহিনী। শহরে আমাদের দায়িত্ব হলো শহরের গোটা ব্যবস্থাকে অচল করে দেয়া, সেনাবাহিনীর ট্যাংক ও ভারি যানবাহনের গতিরোধের জন্য সেনা ব্যারাক থেকে বহির্মূখী সব ব্রিজ-কালভার্ট ধ্বংস করে দেয়া। এই যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে দেয়ার দায়িত্ব নিল সালেহ ইব্রাহিম। আর টেলিফোন ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নষ্ট করার দায়িত্ব নূর আহমদের। নূর আহমদের কাজ দিয়ে আজ রাত ন'টায় আমাদের অপারেশন শুরু হবে- থামলেন এহসান সাবরী। একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন, জাম্বুয়াংগো শহরের সকল পিসিডা ইউনিট এখন থেকেই এ্যাকশনের জন্য তৈরী। অন্ধকারে ডুবে যাওয়া জাম্বুয়াংগো নগরীতে অপারেশন শুরু হবার সংগে সংগে

প্রতিটি ইউনিট তাদের স্ব স্ব এলকার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেবে এবং সকল বাধা কাঠোর হাতে নির্মূল করবে।

আবার একটু থামলেন এহসান সাবরী। বোধ হয় ঢোক গিললেন একটা। তারপর টেবিলের ওপর একটু ঝুঁকে ধীরে গম্ভীর কন্ঠে বললেন, আমি সেন্ট্রাল স্কোয়াড নিয়ে যাব মিলিটারী ইনটেলিজেন্স হেড কোয়াটার্সে। আমার সাথে থাকবে হামিদ উনিতো। আমি ন'টায় ইনটেলিজেন্স হেড কোয়াটার্সের গেটে পৌঁছব। সার্বিক অপারেশন শুরুর সময়ও এটাই। তাদের কিছু অপ্রস্তুত ও কিংকর্তব্যবিমুঢ় অবস্থার আমি সুযোগ নিতে চাই।

কথা শেষ করে এহসান সাবরী নূর আহমদের দিকে তার প্রশ্নবোধক দৃষ্টি তুলে ধরলেন।

বুঝতে অসুবিধা হলো না নূর আহমদের। বলল, আমরা প্রস্তুত হচ্ছি, ইনশাআল্লাহ কোন অসুবিধা হবে না। অয়্যারলেস ভবন ও বিদ্যুৎ স্টেশনের পিসিডা কর্মীরা তাদের ডিউটি বদল করে রাতের ডিউটি নিয়েছে খবর পেয়েছি। আর আল্লাহর হাজার শোকর, মাত্র একজন ছাড়া আমাদের সব রেডিও কর্মীরই ডিউটি রাতে।

নূর আহমদের কথা শেষ হতেই সালেহ ইব্রাহিম বলে উঠলেন, আমার পুলিশ ইউনিটের কর্মীরা ও তৈরী। তাছাড়া পুলিশের ইউনিফরমও যোগাড় করেছি প্রচুর। আমার কাজের জন্য এগুলোই যথেষ্ট হবে।

এতক্ষণে কথা বললেন হাজী উমর- বন্দরে পাঁচটি সওদাগরী জাহাজ নোঙর করা আছে। নৌ ঘাঁটিতে গোটা পাঁচেক গানবোট এবং দূর পাল্লার কামানবাহী একটি যুদ্ধ জাহাজ আছে। তাছাড়া রয়েছে ডজন দুয়েক পেট্রোলবোট। আমার মতে শহরের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার আগে আমাদের গানবোটগুলোকে এ্যাকশনে নেয়া ঠিক হবে না। নৌঘাঁটি এবং উপকূলের কামান শ্রেণী হাতে পাওয়ার পর আমাদের গানবোটগুলো কাজ শুরু করলে ওদের নৌ শক্তিও আমাদের কাছ আত্মসমর্পণে বাধ্য হবে।

এহসান সাবরী বলল, এ পরিকল্পনা ঠিক আছে। তবে একটা জিনিস নিশ্চিত করতে হবে, রাত ন'টার পর কোন জাহাজই যাতে বন্দর ত্যাগ করতে না পারে।

হাজী উমর মাথা নাড়ল, ঠিক আছে। উল্লেখ্য, হাজী উমর পিসিডার বন্দর কামান্ডের প্রধান। এহসান সাবরী ঘড়ির দিকে চাইলেন। তারপর বললেন, এবার আমরা উঠি। তার আগে আসুন আমরা আমাদের মহান ভাই, আমাদের নেতা আহমদ মুসার জন্য দোয়া করি, আল্লাহ তাঁকে ভাল রাখুন। কাগায়ানে তিনি আহত হয়েছিলেন। জাম্বুয়াংগো আসার পথে সংঘর্ষে তিনি মনে হয় আরও আঘাত পেয়েছিলেন। তিনি কি অবস্থায় আছেন আমারা জানি না। বলতে বলতে এহসান সাবরীর কন্ঠ ভারি হয়ে উঠল। তিনি থামলেন। সেই সাথে সাত জোড়া হাত প্রভূর সমীপে মুনাজাতের জন্য উত্তোলিত হলো।

# ৩

জাহাজ থেকে স্ট্রেচারে তোলার সময় জাম্বুয়াংগো বন্দরেই আহমদ মুসার জ্ঞান ফিরে আসে। জ্ঞান ফিরে আসার সংগে সংগেই অনুভব করেন হাত পা তার বাঁধা। বুঝতে পারেন তিনি এখন স্বাধীন নয়। পেছনের ঘটনা একবার স্মরণ করতে চেষ্টা করেন তিনি। মনে পড়ে, জাহাজের বেষ্টনি থেকে তো তাঁর বোট বের হয়ে আসতে পেরেছিল। কিন্তু তারপর কি ঘটল? মনে পড়ে এক প্রচন্ড ধাক্কার কথা। তারপর আর কিছু মনে নেই। তাহলে তিনি ঐখানেই জ্ঞান হারান? কিন্তু সাথীরা কোথায়? মনটা তাঁর আনচান করে ওঠে। সেই সাথে মাথায় তীব্র যন্ত্রনা অনুভব করে।

একটা পিকআপ ভ্যানের ফ্লোরে এনে আহমদ মুসাকে নামানো হলো।

ঠিক নামানো তো নয়, স্ট্রেচার থেকে তাঁকে গড়িয়ে ফেলা হলো গাড়ীর মেঝেতে। মাথাটা ঠক করে বাড়ি খেল গাড়ির মেঝের সাথে। বেদনায় টন টন করে উঠল মাথাটা। গোটা শরীরে বেদনার একটা স্রোত বয়ে গেল। আহামদ মুসা ভাবলেন, তার অনুমান সত্য হলে কু-ক্ল্যাক্স ক্লানের হাতেই তিনি বন্দী। বুঝতে চেষ্ট করলেন, কোথায় এখন তিনি? চার পাশের প্রহরীদের দেখে বোঝা যাচ্ছে, এরা ফিলিপিনো আর্মির সদস্য। স্থানটা কি জাম্বুয়াংগো হবে? ভাবলেন আহমদ মুসা। জাম্বুয়াংগোর কথা মনে আসতেই ব্যথায় চিন চিন করে উঠল মনটা। শিরীকে তিনি মুক্ত করতে এসে নিজেই এখন বন্দী। মনটা তাঁর খুব দুর্বল হয়ে যাচ্ছিল অবস্থার নাজুকতায়। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর কন্ঠে নিঃশব্দে উচ্চারিত হলো, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, আমি সব ব্যাপারে তাঁর ওপরই নির্ভর করছি।

গভীর প্রশান্তি নেমে এল আহমদ মুসার মনে। গাড়ি তখন চলতে শুরু করেছে। আর কোন বন্দী যখন তার পাশে উঠল না আহমদ মুসা ধরে নিলেন বন্দী তিনি একাই। সাথীরা কি তাহলে সরে যেতে পেরেছে? অথবা তারা সবাই .....।

আর ভাবতে পারেন না আহমদ মুসা। এক অবরুদ্ধ উচ্ছাস যেন তাঁর বুকটা ভেংগে দিতে চাইল।

বোধহয় একটু তন্দ্রা এসেছিল আহমদ মুসার। একটা ঝাঁকুনিতে সম্বিত ফিরে পেলেন। দেখলেন, তাকে একটা স্ট্রেচারে তোলা হচ্ছে। দু'জন সৈনিক স্ট্রেচারটি আর্মি ইনটেলিজেন্স হেডকোয়ার্টার্সের প্রশস্ত এবং অন্ধকার একটা ঘরে নিয়ে রাখল। দরজা সশব্দে বন্ধ হয়ে যাবার সময় একটা কণ্ঠ ভেসে এলঃ ডঃ কর্নেল ফ্রেসারকে নিয়ে এস, উনি একে দেখবেন।

দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আর কোন কথা কানে এল না।

কণ্ঠটা আহমদ মুসার পরিচিত। স্মার্থার কণ্ঠ। সারা দেহে একটা উষ্ণ স্রোত বয়ে গেল আহমদ মুসার। তাহলে শিরীও এখানেই বন্দী? অজান্তেই হাত দুটি তার মুষ্টিবদ্ধ হয়ে এল। ভাবনার গভীরে চলে গেল তাঁর মন।

লুকমান রশিদ, এহসান সাবরীরা কি জানতে পেরেছে সব। কাগায়ান, দিবাও ও কোটাবাটোর পর ওদের সর্বশেষ আশ্রয় জাম্বুয়াংগো। কাগায়ান, দিবাও ও কোটাবাটোতে যেমন করে আল্লাহর সাহায্য পিসিডা অঝোর ধারায় পেয়েছে, সে সাহায্য কি তারা জাম্বুয়াংগোতেও পাবে না? সব নির্ভরতা আমাদের তার ওপর! চোখ দু'টি তাঁর গভীর প্রশান্তিতে মুদে এল।

সশব্দে সেই দরজাটি খুলে গেল আবার। সুইচ টেপার শব্দও শোনা গেল সেই সাথে। আলোতে ভরে গেল ঘরটা। প্রথম দৃষ্টিতেই আহমদ মুসার পরিস্কার মনে হলো, ঘরটা গোয়েন্দা দপ্তরের একটা অপারেশন রুম। পশ্চিম, উত্তর ও পূর্বদিকে একটি করে দরজা ও ছোট জানালা।

পশ্চিমের খোলা দরজায় দু'জন প্রহরী। হাতে সাব মেসিনগান।

দরজা দিয়ে দু'জন ঘরে ঢুকল। একজনকে মনে হল ডাক্তার। আরেকজন দীর্ঘাকৃতি, পেটা শরীর, চোখের দৃষ্টি তীব্র। ছোট করে ছাটা চুল। দু'হাত ট্রাউজারের পকেটে ঢুকানো। লোকটি আহমদ মুসার পরিচিত নয়। তবে মনে হয় বড় কর্মকর্তাদের একজন।

লোকটি এগিয়ে এসে বলল, কেমন বোধ করছেন আহমদ মুসা?

আহমদ মুসা কোন জবাব দিলেন না। হাল্কাভাবে উড়ে আসা এ বিদ্রুপবাণের জবাব দেয়ার কোন প্রয়োজনও ছিল না। আহমদ মুসা তাঁর দৃষ্টি স্থিরভাবে লোকটির দিকে তুলে ধরলেন শুধু।

লোকটি আবার মুখ খুলল। বলল, আমি জনপল, আমাকে চিনতে পারেন?

আপনি জনপল, তবে পোপ নন। কিন্তু পোপের চেয়ে বড়।

আপনি আমাদের পোপকে অসম্মান করলেন - বলল জনপল।

আমি বরং পোপকে সম্মান করেছি জনপল, বলল আহমদ মূসা ।

কেমন করে ?

পোপ স্বয়ং যা করছেন না, করতে বলছেন না, ততটা পর্যন্ত করে আপনারা খৃস্টধর্মকে কলংকিত করছেন, একথা বলে আমি পোপকে সম্মানই করছি।

আপনার ইংগিত কোন দিকে আহমদ মুসা?

আমি কি বলতে চাই কু-ক্ল্যাক্স-ক্লানের পূর্বাঞ্চালীয় বর্তমান প্রধান জনপল অবশ্যই বুঝেছেন।

ভ্রু দু'টি কুঞ্চিত হয়ে উঠল জনপলের। বলল সে, আপনি কোথায় আছেন তা বোধহয় ভুলে গেছেন আহমদ মুসা।

না ভুলে যাইনি। কিন্তু শ্বেতাংগ খৃস্টানরা তাদের ধর্ম ও বর্ণ স্বার্থের জন্যে যে শ্বেত সন্ত্রাসের আশ্রয় নিয়েছে আমি তার বিরুদ্ধে।

আমরা তা জানি আহমদ মুসা। জানি বলেই আপনি এখানে এসেছেন। একটু থামল জনপল। বোধহয় একটা ঢোক গিললো। শুরু করলো আবার, বিরুদ্ধে বলেই সেদিন কাগায়ানে হত্যা করলেন আমাদের নেতা মাইকেল এ্যাঞ্জেলোকে, এ পর্যন্ত হত্যা করেছেন আমাদের হাজার হাজার কর্মীকে এবং আমাদের অস্তিত্বের মত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের রেডিয়েশন বোমা আপনারা কুক্ষিগত করেছেন।

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠল জনপল। একটু থেমে বলল, সে বিচারে আমরা পরে আসব। তারপর ডাক্তারের দিকে ফিরে জনপল বলল, ডঃ ফ্রেসার, আপনার কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করে আপনি আসুন।

গট গট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল জনপল। ডাক্তার এগিয়ে এল আহত আহমদ মুসার দিকে। হাতে তাঁর ছুরি, কাঁচি, তুলা, ঔষধ।

আহমদ মুসা তার দিকে চেয়ে বললেন, ধন্যবাদ ডাক্তার, আসুন। মানবতাবোধ একেবারে মরেনি তাহলে? স্মার্থাকে আমার ধন্যবাদ জানাবেন।

সেই হল ঘর। একটা দীর্ঘ ও প্রশস্ত তক্তপোষের সাথে নাইলনের দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা আহমদ মুসার দেহ। তাঁর সামনে এক চেয়ারে বসা জনপল। উত্তেজিত দেখাচ্ছে তাকে। তার কপালে বিন্দ বিন্দু ঘাম। সে বলছিল, আমি জানি, আপনি সোজাভাবে কথা বলবেন না। কথা বলাবার যন্ত্রও আমাদের আছে। পাশেই বিদ্যুৎ আসন, দেখুন ছোবল দেয়ার জন্য কেমন হা করে আছে। ঐ পথে যেতে আমাদের বাধ্য করবেন না।  শুধু আমাদের বলুন, রেডিয়েশন বোমাগুলো কোথায় রেখেছেন? এটা আমাদের জানালে আর কোন প্রশ্নই আমরা আপানাকে জিজ্ঞেস করব না।

আহমদ মুসা বললেন, তোমাদের এ বিদ্যুৎ আসনকে আমি চিনি। এর ভয় দেখিয়ে রেডিয়েশন বোমার কোন খবর আমার কাছ থেকে পাবে না। নিজে বাঁচার জন্য লাখো মানুষকে মারার অস্ত্র আমি তোমাদের হাতে তুলে দিতে পারি না।

থামুন আহমদ মুসা। বাঘের মত গর্জন করে উঠল জনপল। উঠে দাঁড়াল সে। হাত দু'টি তার মুষ্টিবদ্ধ, চোয়াল দুটি মনে হচ্ছে পাথরের মত শক্ত। চোখে আগুন। অস্থিরভাবে পায়চারি করছে সে। এক সময় সে হো হো করে হেসে উঠল। হাসিটা মনে হলো চাবুকের চেয়েও তীক্ষ্ণ।

সে এসে আহমদ মুসার সামনে দাঁড়াল। বলল, তাহলে কথা বলবেন না, আহমদ মুসা? রেডিয়েশন বোমার কোন খবর তাহলে দেবেন না আমাদের? একটু থেমে বলল, জানেন আপনার শিরীও এখানে বন্দী আছে?

তুমি কি বলতে চাচ্ছ, জনপল?

কি বলতে চাই দেখাচ্ছি। বলে হাতে দু'টো তালি দিল সে। সংগে সংগে দু'জন প্রহরী সামনে এসে দাঁড়াল। জনপল তাদের দিকে ফিরে বলল, তোমরা শিরীকে নিয়ে এস।

অল্পক্ষণ পরে শিরীকে নিয়ে দু'জন প্রহরী ঘরে ঢুকল। শিরীর পরনে মরো রাজকুমারীর সেই পোষাকই রয়েছে। মলিন চেহারা। চোখ দু'টি লাল, ফোলা। কেঁদেছে অবিরাম।

আহমদ মুসাকে ঐভাবে দেখে দু'হাতে মুখ ঢাকল শিরী। টলতে লাগল তার দেহ। বসে পড়ল সে।

জনপল আবার আহমদ মুসার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, আহমদ মুসা, মরো রাজকুমারীর দিকে চেয়ে দেখ। এই মেয়েটি আপনার কি আমরা জানি। এখন বলুন এই মেয়েটিকে দুনিয়ার জাহান্নামে ঠেলে দিয়ে আপনার জেদ ঠিক রাখবেন না এ মেয়েটিকে রক্ষার জন্য আমাদেরকে রেডিয়েশন বোমার খবর দেবেন?

কেঁপে উঠল আহমদ মুসার গোটা দেহ এক অজানা আশঙ্কায়। বললেন আহমদ মুসা, তুমি কি বলতে চাও জনপল?

আমি বলতে চাই, আমি কথা শেষ করার পর এক মিনিট অপেক্ষা করব। এর মধ্যে যদি আপনি আমাদের কথায় সম্মত না হন, তাহলে এক মানুষ গেরিলার হাতে এই মরো রাজকুমারীকে তুলে দেব। আপনার চোখের সামনে সে নির্দয়ভাবে লুন্ঠন করবে মরো রাজকুমারীকে। শত চাবুকের ঘা যেন এক সাথে জর জর করে তুলল আহমদ মুসার দেহকে। মগজের প্রতিটি তন্ত্রী, মনের প্রতিটি পরতে এবং স্নায়ুর প্রতিটি কোষে যেন আগুন ধরে গেল। আহমদ মুসার লৌহ হৃদয়ও থর থর করে কেঁপে উঠল। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্য। দাঁতে দাঁত চেপে মনটাকে স্থির করলো আহমদ মুসা। বলল, জনপল, যেটাকে আমার জেদ বলছ সেটা আমার জেদ নয়, আমার দায়িত্ব।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ছিল জনপল। বলল, ৩০ সেকেন্ড পার হয়েছে আহমদ মুসা, আর ৩০ সেকেন্ড বাকী।

আহমদ মুসা শিরীর দিকে তাকালেন। দেখল শিরী তার দিকেই তাকিয়ে আছে। তার পাতলা রক্তাক্ত ঠোঁট দু'টি কাঁপছে। কিন্তু চোখে অশ্রু নেই, তার জায়গায় দৃঢ়তার এক আলোক দীপ্তি। অপার্থিব যেন সেই নূর - আলো ।

আহমদ মুসা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন, ভয়ে কোন মুসলিম কখনও আত্মসমর্পণ করেছে এমন নজীর ইসলামরে সোনালী ইতিহাসে নেই।

আহমদ মুসা বললেন, আমি তোমার প্রস্তাবে সম্মত নই, জনপল। একটু থেমে বললেন আবার, আমি এবং শিরী- আমার, তোমার এবং সকলের রব যিনি সেই আল্লাহর ওপরই নির্ভর করছি।

কি ভয়াভহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন আহমদ মুসা এখনই টের পাবেন। বলে জনপল আবার হাতে তালি বাজাল। ঘরে ঢুকল সেই প্রহরী দু'জন।

টমকে নিয়ে এসো। দ্রুত কন্ঠে বলল জনপল।

অল্পক্ষণ পরেই ঘরে ঢুকল টম নামের গেরিলা সদৃশ মানুষ। হেলে দুলে এগিয়ে এল সে। হো হো করে হেসে জনপল বলল, বহুদিন পর তোর ভাল খোরাক জুটিয়েছি টম। এদেশের একজন আনকোরা রাজকুমারী। এগিয়ে আয়!

বীভৎস এক হাসি দেখা গেল টমের মুখে। চিৎকার করে চোখ বুজল শিরী। দেহ জুড়ে এক অদম্য উচ্ছাস আছড়ে পড়ল আহমদ মুসার। প্রতিটি পেশী ফুলে উঠল তার ধাক্কায়। নির্দয় নাইলনের রাশিগুলো তাতে আরো কেটে বসে গেল মাংসপেশীর ভেতরে। টম এগুচ্ছিল শিরীর দিকে। আহমদ মুসা চোখ বন্ধ করে অন্তরের অন্তহীন আকুতি তুলে ধরলেন প্রভূর সামনে প্রভূ হে, তুমি তো এমনি অবস্থায়ই সাহায্য করেছিলে লুতকে, মুসাকে, শুয়াইবকে ...।

দ্রুত পায়ের খট খট শব্দে চোখ খুললেন আহমদ মুসা। দেখলেন স্মার্থা ঘরে ঢুকছে। ঘরের মাঝখানে এসে থমকে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল স্মার্থা, মিঃ জন, থামতে বলুন টমকে।

মিঃ জন ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, স্মার্থা তুমি কেন এখানে?

আপনার দেয়া কথা আপনি লংঘন করছেন মিঃ জন।

কি কথা?

শিরীর কোন অমর্যাদা হবে না এ শপথ আপনি আমার কাছে করেছিলেন।

হো হো করে হেসে উঠল জনপল। বলল, তুমি তো আচ্ছা ছেলেমানুষ স্মার্থা। তারপর হাসি থামিয়ে গম্ভীর কন্ঠে বলল আমার কাজের মধ্যে এসো না, যাও এখান থেকে। তারপর টমকে বলল, দাঁড়িয়ে কেন?

টমকে থামতে বলো মিঃ জন। এবার স্মার্থার কন্ঠে যেন আদেশের সুর।

না টম থামবে না। এবার জনপলের কন্ঠও তীব্র হয়ে উঠল।

টম এগুচ্ছিল। মুহূর্তে একটি হাত স্মার্থার ওপরে উঠে এল। হাতে চকচকে রিভলবার। স্মার্থার চোখে আগুন। পর পর দু'বার ধুম্র উদগীরণ করল রিভলবার। বিরাট দেহের ছোট্ট মাথাটা একেবারে গুঁড়িয়ে গেল টমের।

বিস্ময়ে হতবাক জনপল একবার ভুলূন্ঠিত টমের দিকে তাকিয়ে তড়িত ঘুরে দাঁড়াল স্মার্থার দিকে। জনপলের হাতে রিভলবার। কিন্তু জনপলের রিভলবারটি উঁচু হবার আগেই স্মার্থার রিভলবার আরো দু'বার অগ্নিবৃষ্টি করল। নির্ভূল নিশানা। গুঁড়িয়ে যাওয়া মাথা নিয়ে মিঃ জনপল হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাটিতে।

স্মার্থা রিভলবার মাটিতে ফেলে দিয়ে ছুটে গেল আহমদ মুসার কাছে। কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। অনেকটা পাগলের মতই যেন আহমদ মুসার বাঁধন খুলে দিতে শরু করল।

দরজায় দু'জন প্রহরী কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে ছিল। হন্তদন্ত হয়ে কয়েকজন এসে দরজায় দাঁড়াল। তাদের একজনের হাতে রিভলবার। তারাও প্রথমে এসে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্যই। পরক্ষণেই আগন্তুক লোকটির পিস্তল উঠে এল স্মার্থাকে লক্ষ্য করে।

দরজায় পায়ের শব্দ পেয়ে শিরী ফিরে তাকিয়েছিল। স্মার্থার দিকে রিভলবার তাক করতে দেখে শিরী 'স্মার্থা গুলী' বলে চিৎকার করে উঠে ছুটে গেল স্মার্থার দিকে। মনে হল যেন স্মার্থাকে আড়াল করতে চায় সে।

সঙ্গে সঙ্গে গুলীরও শব্দ হলো। গুলী গিয়ে বিদ্ধ করল শিরীর পৃষ্ঠদেশে। উপুড় হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল শিরী স্মার্থার ওপর। স্মার্থা দরজার দিকে এক পলক তাকিয়ে শিরীর দেহটাকে এক পাশে ঠেলে দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে কাছেই পড়ে

থাকা জনপলের রিভলবার তুলে নিল। কিন্তু আর ফিরতে পারল না। এক ঝাঁক গুলী তার দিকে ছুটে এল। হামাগুড়ি অবস্থাতেই স্মার্থার দেহটা নেতিয়ে পড়ল মেঝের ওপর।

এই সময় দূরে কোথাও প্রচন্ড বিস্ফোরণে ঘরটা কেঁপে উঠল। মুহূর্তকাল পরে আরও একটা, তারপর আরও একটা। অন্ধকারে ডুবে গেল ঘরটা। তারপর খুব কাছ থেহে এক পশলা মেশিনগানের গুলীর শব্দ কানে এল। মুহূর্তকাল বিরতি, তারপর অবিরাম শুরু হলো মেশিগানের গুলী বর্ষণ। আহমদ মুসা বুঝতে পারল, পিসিডা শহরে প্রবশ করেছ, প্রবেশ করেছে এ বাড়িতেও। আনন্দে বুকটা ফুলে উঠল, ইয়াআল্লাহ, পিসিডাকে সাহায্য কর, বিজয়ী কর। জাম্বুয়াংগো বিজয়ের মাধ্যমে আমাদের মিন্দানাও বিজয় সম্পূর্ণ কর।

শিরীর কথা মনে পড়ল। মুহূর্তে আনন্দের রেশটা মুছে গেল আহমদ মুসার। শিরীর দেহটা আহমদ মুসার পাশে এসেই পড়েছিল। কিন্তু হাত নাড়াতে পারে না সে, কোন রকম পাশ ফেরার সাধ্যও তাঁর নেই। অস্ফুটে ডাকলেন, শিরী!

কোন জবাব নেই। বুকটা কেঁপে উঠল আহমদ মুসার। তাহলে কি ....। তবু আবার ডাকলেন, শিরী! এবার স্বরটা একটু বড়। এবার ও কোন উত্তর নেই।

আহমদ মুসার মনে হচ্ছে, একটা হাল্কা কি যেন তার ডান বাহুটা আঁকড়ে আছে। কি এ বস্তু। কিন্তু তা দেখার সাধ্য আহমদ মুসার নেই। এই সময় ঘরে অনেকগুলো পায়ের ত্রস্ত শব্দ শোনা গেল। জ্বলে উঠল একটা টর্চ।

দ্রুত কন্ঠে একজন নির্দেশ দিল, তক্তা সমেত তুলে নাও আহমদ মুসাকে। ছুটে এল কয়েকজন। টর্চের আলোতে আহমদ মুসা দেখতে পেল, রক্তে ভেসে যাচ্ছে শিরীর দেহ। তার পাশেই উপুড় হয়ে পড়ে আছে সে। আর তারই একটা হাত উঠে এসে আঁকড়ে ধরে আছে আহমদ মুসার ডান বাহু। যেন একটা অবলম্বন খুঁজে পেয়েছে শিরী।

প্রহরীরা ছুটে এল। তুলে নিল তক্তা সমেত আহমদ মুসাকে। শিরীর হাতটা খসে পড়ল মেঝেতে। এই সময় মুর হামসারের মুখটা ভেসে উঠল আহমদ মুসার চোখের সামনে। আকস্মাৎ চোখ দু'টো ভারি হয়ে উঠল আহমদ মুসার।

নেমে এল দু'চোখ থেকে অশ্রুর দু'টো ফোঁটা। মন নিঃশব্দে আওয়াজ করল, পারলাম না বন্ধু তোমার কাছে তোমার বোনকে ফিরিয়ে দিতে।

গোটা বাড়ি জুড়ে তখন সংঘর্ষ। ক্রমশঃই শব্দ আরও কাছে আসছে। আহমদ মুসা বুঝল, বাড়ি নিয়ন্ত্রণ পেতে পিসিডার আর দেরী নেই। কিন্তু এরা তাকে নিয়ে ওপরে ওঠছে কেন? কি করবে এরা? হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল, এরা কি ছাদ দিয়ে পালিয়ে যাবে? ছাদে কি তাহলে হেলিকপ্টার আছে?

আহমদ মুসার অনুমান সত্য হলো। চিলেকোঠার কাছাকাছি আসতেই হেলিকপ্টারের ইঞ্জিনের পরিচিত শব্দ কানে এল। হেলিকপ্টার স্টার্ট নিয়েই ছিল। আহমদ মুসাকে নিয়ে ওঠা মাত্র হেলিকপ্টার উড়াল দিল।

সামনের সিট থেকে কে একজন বলল, আমাদের কামান্ডোরা অসাধ্য সাধন করেছ। তারা এতক্ষণ ওদের ঠেকিয়ে রাখতে না পারলে হেলিকপ্টার আনা যেত না।

এখন কি নির্দেশ থাকল আমাদের ছেলেদের ওপর? বলল আরেকজন। উত্তরে পূর্বোক্তজন বলল, কর্নেল কর্ক-ই সে সিদ্ধান্ত নেবেন। তবে মোটামুটি কথা, আমাদের ছেলেরা এখন পেছন দরজা দিয়ে সরে পড়বে।

ভারি গলায় কে একজন বলল, কোথায় সরে পড়বে, গোটা শহরটা ওদের জালের মধ্যে। দেখলে না, কেমন করে গোটা শহর একসাথে জ্বলে উঠল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ তারপর একজন বলল, কোথায় যাচ্ছি আমরা?

কাগনোয়াভিচের শিপে। খবর পেয়েছি আমাদের শিপটা বন্দরে আটকা পড়েছে।

আহমদ মুসা অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করল, যে কাগনোয়াভিচ উচিন ভর মাধ্যমে আলী কাউসারের সাথে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছিল ইনটেলিজেন্স সার্ভিস 'রিও' (Red Intelligence Organisation-RIO)- এর ফিলিপাইন শাখার প্রধান সেই কাগনোয়াভিচ?

আর্মি ইনটেলিজেন্স হেডকোয়াটার্স এতখানি সুরক্ষিত হবে তা ধারণা করেননি এহসান সাবরী। ঠিক ন'টাতেই তিনি পৌঁছে গেছেন। সঙ্গে সঙ্গে গার্ড রুম থেকে একটি গুলীর শব্দ আসে। পরক্ষণেই গেটটি খুলে যায়। আরেকটি

গুলীর শব্দ আসে এই সময় গার্ড রুম থেকে। সেই সাথে মেশিনগানের একঝাঁক গুলি আসে গেট লক্ষ্য করে। এইভাবে শুরুতেই তাদের প্রবেশ বাধাগ্রস্ত হয়।

আড়ালে থাকা সুনির্দিষ্ট অবস্থান থেকে তারা গুলী বৃষ্টি করছিল। বিস্ফোরণের পর বিদ্যুৎ চলে গেলেও তা খুব উপকারে আসেনি এহসান সাবরীর- আকাশে দ্বাদশীর চাঁদ থাকায়। এহসান সাবরীরা ওদের দেখছিল না কিন্তু ওরা তাদের ঠিকই দেখছিল। সবচেয়ে মুস্কিল হয়েছে, এই বিশাল বিল্ডিংটিতে ঢোকার একটি মাত্র প্যাসেজ এবং একটি মাত্র দরজা।

পিসিডার বেপরোয়া ইউনিট গুলী বৃষ্টির মধ্যেই এগিয়ে যায় এবং ওদের পরাভূত করে। কিন্তু প্রবেশ দরজায় গিয়ে ধাক্কা খায় তারা। কথা ছিল, আবু সালেহ এ দরজা খোলারও ব্যবস্থা করবে। কিন্তু তা হয়নি। অবশেষে দরজা বোমা মেরে উড়িয়ে দিতে হয়।

এভাবে প্রতি দরজায়, প্রতি বাঁকে বাধার সাথে যুঝে এহসান সাবরী যখন সেই হলকক্ষে গিয়ে পৌঁছলেন, তখন হল ঘর খালি। টর্চের আলোতে ব্যাকুল ভাবে তিনি লাশগুলো পরীক্ষা করলেন, না আহমদ মুসা নেই। বুকের কাঁপুনি একটু কমল তাহলে কি আহমদ মুসা সরতে পেরেছেন? চোখের কোণায় তার এক উজ্জ্বল আনন্দ ঝিলিক দিয়ে উঠল।

লাশের ওপর টর্চের আলো ঘুরাতে গিয়ে একজনের পোষাক দেখে তিনি চমকে উঠলেন। গায়ে মরো মেয়েদের ঐতিহ্যবাহী পোষাক। তার বুকটা ছ্যাত করে উঠল। শিরী নাতো? ভালো করে দেখার জন্য তিনি ঝুঁকে পড়লেন।

এই সময় একজন ছুটে এসে বলল, ছাদে হেলিকপ্টার......।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে এহসান সাবরী উঠে দাঁড়িয়ে ছুটলেন সিঁড়ি ভেঙে ছাদের দিকে। কিন্তু ছাদে গিয়ে যখন পৌঁছলেন, তখন হেলিকপ্টারটি অনেক ওপরে এবং বাড়ীর চৌহদ্দির বাইরে। হাত থেকে স্টেনগানটা খসে পড়ল এহসান সাবরীর। বসে পড়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে শিশুর মত কেঁদে উঠলেন এহসান সাবরীঃ আমার অভিযান ব্যর্থ, আমি ব্যর্থ হয়েছি, শিরী মৃত, আহমাদ মুসাকে ওরা নিয়ে গেল'।

হামিদ উনিতো এসে এহসান সাবরীর মাথায় হাত রাখল। মাথা তুলে হামিদ উনিতোকে দেখে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, আমরা পারলাম না, হামিদ। কান্নায় ভেঙে পড়ল শেষের শব্দগুলো।

হামিদ উনিতো বলল, এহসান সাবরী ভাই, কান পেতে শুনুন, গোটা জাম্বুয়াংগো নগরীতে পিসিডা'র বন্দুকগুলো আনন্দ উৎসব করছে। আমরা বিজয় লাভ করেছি। এ বিজয় দিয়ে আমরা মিন্দানাওয়ের শহরাঞ্চলগুলো থেকেও উচ্ছেদ করলাম ফ্যাসিবাদীদের অবৈধ শাসনকে।

একটু থামলো হামিদ উনিতো। তারপর বলল, এই বিজয়ের স্থপতি যিনি, তিনি এই মুহূর্তে আমাদের মাঝে নেই হয়তো, কিন্তু তিনি তো আছেন, এটাই আমাদের সান্তনা।

আবেগে রুদ্ধ হয়ে এল হামিদ উনিতোর কন্ঠও।একটু থামল হামিদ উনিতো। তারপর বলল, যেখানেই তাঁকে নেয়া হোক, বিশ্বজোড়া ইসলামী আন্দোলনের বিপ্লবী কর্মীদের চোখের বাইরে নেয়া তকে সম্ভব হবে না। আল্লাহ তাঁর নিগাহবান।

হেলিকপ্টারের শব্দ তখন ক্ষীণ হয়ে এসেছে। পশ্চিম দিগন্তে কালো এক বিন্দুর মত দেখা যাচ্ছে হেলিকপ্টারটিকে। এহসান সাবরী, হামিদ উনিতো এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সেদিকে।

# ৪

স্পাইশিপ কারকভ। জাম্বুয়াংগো থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে সোলো সাগরে ভাসছে। স্পাইশিপ হলেও রীতিমত কমব্যাট জাহাজের সব গুণ-বৈশিষ্ট তার মধ্যে আছে। বিমান বিধ্বংসী ক্ষেপনাস্ত্র, সাবমেরিনকে ডেফথ চার্জ করার মত ভয়ংকর টর্পেডো এবং তার সাথে দূর পাল্লার কামান। কারকভের উন্মুক্ত ডেকে খুব সহজেই হেলিকপ্টার উঠা-নামা করতে পারে।

স্পাইশিপ কারকভের একটি কেবিন। বিশ্ব ইনটেলিজেন্স 'রিও'র ফিলিপিন শাখার প্রধান কাগনোয়াভিচ বসে আছেন তার টেবিলে। চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুঝে ছিলেন তিনি। তার সামনে টেবিলে একটা রিপোর্ট পড়ে আছে। জাম্বুয়াগো থেকে পাঠিয়েছে কেজিবি অপারেটর। রাত ৯টা থেকে পিসিডা তার অপারেশন শুরু করেছে। অপারেশন শুরুর মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে টেলিফোন ও বেতার ভবন ওরা দখল করে নিয়েছে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঢাকা নগরীতে অভিযান চালিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই পুলিশ যোগাযোগ পথের সবগুলো ব্রিজ-সেতু তারা ধ্বংস করে দিয়েছে। সেনা ছাউনি অবরুদ্ধ। সংঘর্ষ চলছে।

কাগনোয়াভিচ চোখ খুললেন। সোজা হয়ে বসলেন। আবার চোখ বুলালেন রিপোর্টটিতে। কপাল তার কুঞ্চিত হয়ে উঠল। মনে পড়ল তার কয়দিন আগের কাগায়ান নগরীর কথা। একই নিয়ম, একই ভঙ্গী। কাগায়ানের বিস্তারিত রিপোর্ট তিনি পড়েছেন। ওদের অপারেশন যখন শুরু হয়, তখন করার কিছুই থাকে না। প্রশাসন ও প্রতিরোধের গোটা ব্যাবস্থাই ভেঙ্গে যায় মুহূর্তে। যারা জান দিতে দ্বিধা করে না তাদের সাথে কে পারবে? ফিলিস্তিনে ওরা এই শক্তির বলেই জিতেছে। জাম্বুয়াংগো নগরীর পতন ঘটলে মিন্দানাওয়ে আর পা রাখার কোন জায়গা থাকবে না খৃস্টান সরকারের। অপগন্ড কু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান নিষ্ঠুর আচরণে না মাতলে মিন্দানাও হয়তো এত তাড়াতাড়ি হাতছাড়া হতো না। কু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের কথা মনে হতেই আহমদ মুসার কথা মনে পড়ল কাগনোয়াভিচের। নড়ে চড়ে

বসল কাগনোয়াভিচ। জাম্বুয়াংগোতে সরকারের পতন ঘটলে কু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান কি আহমদ মুসাকে ধরে রাখতে পারবে, নাকি আহমদ মুসার কাছ থেকে ইতিমধ্যেই তাদের যা প্রয়োজন সেই রেডিয়েশন বোমার খবর আদায় করে নিয়েছে? শেষের কথাটা মনে জাগতেই তীক্ষ্ণ একটা অস্বস্তিতে ছেয়ে গেল কাগনোয়াভিচের মন।

এ সময় পাশের ইন্টারকমে ভেসে এল রেডিও রুম থেকে তিখনভ- এর কণ্ঠঃ স্যার, জরুরী মেসেজ আছে, আসতে চাই।

এস। উত্তর দিলেন কাগানোয়াভিচ। ইন্টারকম বন্ধ হয়ে গেল। একটু পরেই কাগজ হাতে ঘরে ঢুকল তিখনভ। নিঃশব্দে কাগজটি হাত বাড়িয়ে এগিয়ে দিল। একটু ঝুঁকে কাগজটি হাতে নিল কাগনোয়াভিচ। তিখনভ বেরিয়ে গেল।

মেসেজটিতে দ্রুত নজর বুলাল কাগনোয়াভিচ। জাম্বুয়াংগো শহরের প্রতিরোধ ভেঙে পড়েছে। কার্যত পিসিডা'ই এখন শহর নিয়ন্ত্রন করছে। একটি সামরিক হেলিকপ্টারে করে জাম্বুয়াগো'র সামরিক গোয়েন্দা প্রধান কর্ণেল ভ্যাসিলিভার ও কু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান চীফ মাইকেল ফুট বন্দী আহমদ মুসাকে নিয়ে কারকভের দিকে যাত্রা করেছে। ওরা জরুরী ল্যান্ডিং-এর সুযোগ চায়।

''স্পাইশিপ কারকভে ওরা ল্যান্ডিং সুযোগ চায়'-কথাটা ভাবতেই কপাল কুঞ্চিত হলো কাগনোয়াভিচের। সি, আই, এ- এর সাঙাৎরা কারকভে নামবে? প্রকৃতপক্ষে আহমদ মুসাকে হাতে পাওয়ার জন্য আমরা কু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানকে সহযোগিতা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানকে সহযোগিতা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কু-ক্ল্যা্ক্স-ক্ল্যানকে এবং ফিলিপিনের কোন সামরিক গোয়েন্দাকে তো আমরা স্পাইশিপ কারকভে স্বাগত জানাতে পারি না।

অস্থির ভাবে উঠে দাঁড়াল কাগনোয়াভিচ। পায়চারী করতে লাগল। হঠাৎ মুখ তার উৎফুল্ল হয়ে উঠল। আহমদ মুসাকে হাতে পাওয়ার তুলনায় এই ঝামেলা কিছুই নয়। ফিলিস্তিন বিপ্লবের নায়ক, মিন্দানাও বিপ্লবের নির্মাতা, আজকের বিশ্ব-কম্যুনিজমের এক নম্বর শত্রু আহমদ মুসাকে 'ফ্র' (FRW- World Red Forces) দীর্ঘদীন থেকে চায়। তাকে নিয়ে কু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের কি প্রয়োজন! রেডিয়েশন বোমা তার চাই এই তো!

চেয়ারে ফিরে এল কাগনোয়াভিচ। নিজস্ব কোডে দ্রুত একটা মেসেজ ড্রাফট করল। সব জানিয়ে নির্দেশ চাইল সে মস্কোর 'রিও' (RIO)- হেড কোয়াটার্সের কাছে। তারপরে ইন্টারকমে ডাকল তিখনভকে মেসেজ পাঠাবার জন্যে।

স্পাইশিপ কারকভের একটি কক্ষ। ঘুমানোর দু'টো ডিভান, সোফাসেট, এটাচড বাথসহ কক্ষটি বেশ বড়। সোফায় গা এলিয়ে বসে আছে কর্ণেল ভ্যাসিলিভার ও মাইকেল ফুট। গতকাল রাত ১১টায় হেলিকপ্টার ল্যান্ড করার পর সোজাসুজি তাদের এ ঘরে এনে তোলা হয়েছে। তারপর থেকে এখানে তারা আছে। জাহাজ বলতে তারা এই কক্ষটাকেই বুঝেছে। ব্যাপারটা তাদের জন্য বড়ই অস্বস্তিকর। আহমদ মুসা কোথায় তারা কিছুই জানে না।

কর্নেল ভ্যাসিলিভার কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল। দরজা খোলার শব্দ হল। ভেতরে প্রবেশ করল কাগনোয়াভিচ। হাসিমুখে কাগনোয়াভিচ হাত বাড়িয়ে দু'জনার সাথে হ্যান্ডশেক করে সোফায় বসতে বসতে বলল, মাফ করবেন মিঃ ভ্যাসিলি, মিঃ ফুট। গত রাত থেকে কয়েকটা জরুরী কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হয়েছে। জরুরী নির্দেশ এসেছে, ভারত মহাসাগরে যেতে হবে। তার জন্য বেশ কিছু কাজ সারতে হচ্ছে।

থামল কাগনোয়াভিচ। একটু সময় নিয়ে আবার শুরু করল, আপনাদের খুবই কষ্ট হচ্ছে, এজন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু আমি নিরুপায়। সামরিক এই জাহাজে নীতিগত কারণেই আপনাদের গতিনিয়ন্ত্রন করা হয়েছে।

না, না দুঃখের কোন কারণ নেই। ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারছি। আমরা হলেও হয়তো এটাই করতাম। বলল কর্নেল ভ্যাসিলিভার।

ধন্যবাদ। বলল, কাগনোয়াভিচ।

তারপর একটু থেমে আবার শুরু করল, মিঃ ফুট, মিঃ ভ্যসিলি আহমদ মুসাকে আপনাদের কেন প্রয়োজন?

রেডিয়েশন বোমার এখনও কোন সন্ধান আমরা পাইনি।

মিন্দানাও তো আপনাদের হাত ছাড়াই হলো, কি করবেন রেডিয়েশন বোমা দিয়ে? ঠোঁটের কোণে হাসি টেনে বলল কাগনোয়াভিচ।

একটু দ্বিধা করল মাইকেল ফুট। তারপর বলল, কিছু তো আপনি জানেনেই। রেডিয়েশন বোমাকে কেন্দ্র করে মার্কিন সরকারের সাথে কু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের একটা গন্ডগোল চলছে।

চুরি করা বোমাগুলো মার্কিন অস্ত্রাগারে ফেরত দিতে চানতো? মুখে সেই হাসিটা টেনে বলল কাগনোয়াভিচ।

কথাটা তাই। অপরাধীর মত শুনাল মাইকেল ফুটের কন্ঠ।

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। মাইকেল ফুট, ভ্যসিলিভারের মুখে-চোখে অস্বস্তি, কিছুটা অপমানেরও প্রকাশ দেখা যাচ্ছে।

কথা আবার কাগনোয়াভিচই শুরু করল। বলল, কথাটা বলে ফেলাই ভাল মাইকেল ফুট। কিছুক্ষণ আগে খবর পেলাম গতকাল 'ফ্র'-এর সন্ধানী সাবমেরিন ইউনিট রেডিয়েশন বোমাগুলো খুঁজে পেয়েছে। উদ্ধারও করেছে। একটু দম নিল কাগনোয়াভিচ। মাইকেল ফুটের চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে। সেখানে বিস্ময় ও উদ্বেগ-দুই-ই আছে।

সে দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে কাগনোয়াভিচ বলল, ভয়ের কিছু নেই মিঃ ফুট। মস্কোতে যায়নি। এইমাত্র আমাদের সরকার থেকে আমাকে জানানো হয়েছে, আহমদ মুসাকে 'ফ্র' এর হাতে ছেড়ে দিলে রেডিয়েশন বোমাগুলো আপনাদের ফিরিয়ে দেয়া হবে। শুধু পাঁচটি বোমা আমাদের কেমিকেল ল্যাবরেটরীতে যাবে। এই পাঁচটি বোমা সাগর তলে হারিয়ে গেছে বলেও কু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান পেন্টাগনের হাত থেকে রেহাই পেতে পারে।

থামল কাগনোয়াভিচ। কোন কথা যোগাল না মাইকেল ফুটের মুখে। বিমূঢ় মনে হলো তাকে। অল্পক্ষণ অপেক্ষা করে কাগনোয়ভিচ গম্ভীর কন্ঠে বলল, সিদ্ধান্ত আপনাকে দ্রুতই নিতে হবে মাইকেল ফুট। ভেবে দেখুন, আহমদ মুসা ও রেডিয়েশন বোমা দুই-ই আমাদের হাতে। কু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের মংগল চায় বলেই আমাদের সরকার এই অফার দিচ্ছে।

কথা শেষ করে কর্নেল ভ্যাসিলিভারের দিকে চাইল কাগনোয়াভিচ। একটু হেসে বলল, আপনি কিছু বলুন মিঃ ভার।

ভার আগের থেকেই রুষ্ট হয়ে উঠেছিল। কম্যুনিষ্ট অধিপত্যের প্রতি যে সহজাত ঘৃনা ছিল তা বেড়ে গিয়েছিল অনেকগুণ। হাতের মুঠোয় পেয়ে ভালোই খেলছে পুঁচকে গোয়েন্দা। অন্য সময় হলে দেখিয়ে দেয়া যেত। কিন্তু মনের কথা মনে চেপে মুখে হাসি টেনে মিঃ ভার বলল, ঠিকই বলেছেন মিঃ কাগনোয়াভিচ, আপনার জায়গায় হলে আমিও এ কথাই বলতাম।

সৈনিক সুলভই কথা বলেছেন মিঃ ভার। বলে, হেসে মুখ ফিরাল সে মাইকেল ফুটের দিকে। মাইকেল ফুট গম্ভীর। গম্ভীর কন্ঠেই সে বলল, রেডিয়েশন বোমাগলো কবে, কোথায় পাব আমরা?

ধন্যবাদ মিঃ ফুট। চোখে মুখে খুশী ঠিকরে পড়লো কাগনোয়াভিচের। আবার বলতে শুরু করল, দক্ষিণ সাগরে আমাদের সাবমেরিন বহরে রেডিয়েশন বোমাগুলো রাখা হয়েছে। আপনারা চাইলে উত্তর বোর্ণিও'র কুদাত বন্দর অঞ্চলে আপনাদের যে ঘাঁটি আছে সেখানে আগামীকালই এগুলো পেতে পারেন।

একটু থেমে মুখে একটু বাঁকা হাসি টেনে কাগনোয়াডভিচ বলল, মিন্দানাওয়ের পর ইন্দোনেশিয়াই তো আপনাদের বড় টার্গেট। বোমাগুলো সেখানে আপনারা কাজেও লাগাতে পারেন যা পারেননি আপনারা মিন্দানাওয়ে।

কাগনোয়াভিচের পক্ষ থেকে এই কঠিন বিদ্রুপ সত্ত্বেও তার প্রস্তাবে মনে মনে খুশীই হলো মাইকেল ফুট। আসলে মিন্দানাওয়ের পর সোলো ও সেলিভিস সাগরের আশে-পাশে এটাই তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটি। এক সময় এখানে পিসিডার খুবই প্রভাব ছিল। এখান থেকে মিন্দানাও ও দ্বীপাঞ্চলগুলোতে পিসিডার জন্য অস্ত্র, অর্থ, খাদ্য সবকিছুই যেত। কিন্তু ইন্দোনেশীয় সরকারের প্রভাবশালী খৃস্টানদের কাজে লাগিয়ে কৌশলে এই অঞ্চল থেকে পিসিডার সব প্রভাব উৎখাত করা গেছে। মনের খুশীটা মনেই চেপে গম্ভীর কন্ঠে মিঃ ফুট বলল, আপনার প্রস্তাব মত আগামীকালই পৌঁছে দিন।

এই সময় দরজা ঠেলে চা নিয়ে ঘরে ঢুকল বেয়ারা। টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম সাজিয়ে নিতে নিতে কাগনোয়াভিচ বলল, দু'ঘন্টার মধ্যে আমরা এখান থেকে যাত্রা করছি। যাবার পথে কুদাত বন্দরেই আমরা আপনাদের নামিয়ে দিতে চাই, কিংবা হেলিকপ্টার নিয়ে আপনারা যেখানে ইচ্ছা যেতে পারেন।

মাইকেল ফুট বলল, মিঃ ভার হেলিকপ্টার নিয়ে ম্যানিলায় ফিরে যাক। আমি কুদাত বন্দরেই নামব।

মিঃ ভার মাথা নেড়ে এই কথায় সায় দিল।

সবারই হাতে ধুমায়িত চায়ের কাপ। কিন্তু একমাত্র কাগনোয়াভিচ ছাড়া কারোরই মন ধুমায়িত কাপের দিকে নেই বলেই মেন হলো।

কারকভের খোলে ছোট একটি কক্ষে শুয়ে আছে আহমদ মুসা। শোবার ঐ একটি খাট ছাড়া আর কিছুই নেই ঘরে। এটাচড বাথ। সেন্ট্রি দেখিয়ে দিয়ে গেছে বাথরুমের টেপে খাবার পানি পাওয়া যাবে। একটা স্টিলের দরজা ছাড়া কক্ষে আর কোন জানালা নেই। সেন্ট্রাল সাপ্লাই ব্যবস্থা থেকে অক্সিজেন আসছে। না গরম না শীত অবস্থা। ভালই লাগল আহমদ মুসার। ওরা জাহাজের সেফটি সেলকে একেবারে কারাগার বানিয়ে ফেলিনি।

ডাক্তার একবার এসেছিল, ঔষধ দিয়ে গেছে। মাথার তীব্র ব্যাথাটা এখন অনেক কম মনে হচ্ছে। কিন্তু বিরাট ব্যান্ডেজের মাথাটা বেশ ভারি মনে হচ্ছে। আরও ভাল লাগল, রক্ত মাখা পোষাক ওরা পাল্টাবার সুযোগ দিয়েছে। নতুন একজোড়া প্যান্ট-সার্ট দিয়েছে পরার জন্য। মেঝের দিকে তাকিয়ে দেখল, জুতা জোড়া নেই, বদলে এক জোড়া নতুন জুতা দেয়া হয়েছে। আরও খেয়াল করল, হাতের আংটিটিও তার নেই। অর্থাৎ দেহটা ছাড়া নিজের বলতে তার এখন কিছুই নেই। মনে মনে হাসল আহমদ মুসা, জুতা, জামা-কাপড়, আংটিতে কোন অদৃশ্য রহস্য থাকতে পারে, কাগনোয়াভিচ কোন সুযোগের দ্বারই আহমদ মুসার জন্য খোলা রাখতে চায় না। শিপে আসার পর গত ১৪ ঘন্টায় একবারই মাত্র কাগনোয়াভিচ এখানে এসেছিল। ঠান্ডা গলায় সে বলে গেছে, কারকভকে যেন সে কু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের সেই জাহাজ মনে না করে এবং অবাঞ্চিত কোন কিছু করার মতলব যেন তার না হয়। সে বিরক্ত না করলে তাঁকে বিরক্ত করার কোন ইচ্ছা তাদের নেই।

কাগনোয়াভিচের চোখে চোখ রেখে আহমদ মুসা কথাগুলো শুনেছেন। কথাগুলো তার বিশ্বাস হয়েছে। তার মনে হয়েছে, কাগনোয়াভিচ তাকে বহন

করছে মাত্র, তার ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব তার নেই। সুতরাং আপাতত জীবনযাত্রা তার নিরাপদ।

আর এদের পরিকল্পনা জানার আগে কিছু করার ইচ্ছাও তার নেই। ফিলিস্তিনে কাজ শেষ। মিন্দানাওয়ের কাজও শেষ হয়েছে। গোটা মিন্দানাও এখন পিসিডার নিয়ন্ত্রনে চলে গেছে। মুর হামসারের নেতৃত্বে এতক্ষণে নিশ্চয়ই স্বাধীন 'মরো রিপাবলিক'- এর ঘোষণা হয়ে গেছে। তার আর সেখানে কোন প্রয়োজন নেই। সুতরাং এখন কিছু করার আগে চলতি ঘটনা প্রবাহকে জানতে হবে।

পাশ ফিরে শুলেন আহমদ মুসা। স্টিলের খাট, লম্বালম্বি টানা স্প্রিং-এর বেঞ্চের ওপর তোষক পাতা। খাটের স্টিলের পায়া ফ্লোরের স্টিলের মেঝের সাথে স্ক্রু দিয়ে আঁটা। পাশ ফিরে শুতেই বালিশের সাথে সেটে থাকা ডান কান দিয়ে ইঞ্জিনের ঘড়ঘড় আওয়াজ কানে এল, সেই সাথে অনুভূত হলো নতুন এক সূক্ষ্ম কাঁপুনি। আহমদ মুসা উৎকর্ণ হয়ে বুঝতে চেষ্টা করলেন। ঠিক জাহাজ এখন চলছে। কিছুক্ষন পর আরো নিশ্চিত হলেন, জাহাজ চলছে। জাহাজ ডান দিকে মোড় নিল স্পষ্ট অনুভব করলেন তিনি। কোথায় কোন দিকে চলছে জাহাজ, নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করল আহমদ মুসা। কিন্তু এখান থেকে স্থান-কাল কিছুই বুঝার উপায় নেই, এমন কি দিন রাতের পার্থক্যও নয়। তবে গত রাত ১১টা থেকে সময় যা গেছে তাতে এখন মধ্যদিন পার হবার কথা।

এ সময দরজায় ক্লিক করে একটা শব্দ হলো। খুলে গেল দরজা। মনে হলো দরজায় ইলেকট্রনিক কি সিস্টেম রয়েছে, যে ঘরে ঢোকে তার দরজা খুলতে হয় না। সুইচ রুম থেকে অপারেটর সুইচ টিপলেই দরজা খুলে যায়। কিন্তু ঠিক কোন মুহূর্তে দরজা খোলা চাই, একথা সুইচ রুম থেকে জানবে কি করে? তাহলে সব দরজা কি ইলেকট্রনিক ক্যামেরা পাহারা দিচ্ছে? সব ঘরেও কি তাই? আহমদ মুসার মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। কাগনোয়াভিচ কেন বলেছিল এটা কু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের জাহাজ নয়, তা বুঝতে পারল। বুঝতে পারল, তার এই শুয়ে থাকাটাও কনট্রোল টিভির পর্দায় তারা দেখতে পাচ্ছে। একবার ভাবল, আলো নিভিয়ে দিলে বোধ হয় তাদের চোখকে ফাঁকি দেয়া যায়। কিন্তু সুইচ কোথায়? এ ঘরের আলোর

নিয়ন্ত্রণ ও তার হাতে নেই। সুইচ থাকলেই বা কি হতো? ইনফ্রা-রেড টিভি ক্যামেরা আলো অন্ধকারের তোয়াক্কা করে না।

দরজা খুলে ট্রলি ঠেলে খাবার নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল একজন বৃদ্ধ গোছের লোক। অটুট স্বাস্থ্য। দেখলেই মনে হয় পেটা শরীর, যেন দশজন মানুষের শক্তি তার দেহে। দীর্ঘ দেহী।

লোকটি নিরস্ত্র। দরজাতেও কোন সেন্ট্রি নেই। আহমদ মুসা খেয়াল করল, শিপে আসার পর এ দরজায় কোন সময়েই সেন্ট্রির অস্তিত্ব অনুভব করেননি। রাতে খাবার, সকালে নাস্তা যারা দিয়েছে তাদেরকেও নিরস্ত্রই দেখেছেন। এদের দুঃসাহসে বিস্মিত হলেন আহমদ মুসা। কিন্তু পরক্ষণেই নিজের বোকামীর জন্য হাসি পেল আবার। টেলিভিশন ক্যামেরা যখন তাকে পাহারা দিচ্ছে, তার প্রতিটি নড়াচড়া, এমনকি তার চাহনি পর্যন্ত যেখানে তারা কনট্রোল রুমে বসে দেখছে, তখন আর তাদের চিন্তা কিসের? ট্রলিটি খাটের কাছে এনে খাবার সাজিয়ে দিল লোকটি। আহমদ মুসা উঠে বসল। দুপুরের খাবার এসেছে। এখন তাহলে কয়টা? যোহরের নামায তো পড়া হয়নি। এশার নামায সে পড়েছেন ঠিক সময় মতই। ঘুম থেকে উঠে অনুমানেই নামায পড়ে নিয়েছেন তিনি। কিবলাও ঠিক করতে পারেননি।

লোকটির হাতে ঘড়ি দেখে সময় জিজ্ঞাসা করলেন আহমদ মুসা। লোকটি মুখ তুলে আহমদ মুসার দিকে তাকাল। ভাবলেশহীন দৃষ্টি। দেহ ও মুখের গড়নের দিক থেকে লোকটি খাস রাশিয়ান। আহমদ মুসার প্রশ্ন সে বুঝতে পারেনি। বলল, আমি ইংরেজী বুঝি না।

এবার আহমদ মুসা রুশ ভাষায় প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করলেন।

বেলা ২টা। বলল লোকটি। আহমদ মুসা রুশ ভাষা জানে দেখে লোকটির মুখে প্রথমে বিস্ময়, তারপর খুশীর রেখা দেখা দিল। আহমদ মুসা আবার বলল, পশ্চিম কোন দিক, দয়া করে কি বলবেন? লোকটি মুখ তুলল। চোখে তার জিজ্ঞাসা, কিছুটা সন্দেহও। বলল, এসব প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারবো না।

দ্রুত সে খাবার সাজিয়ে দিচ্ছিল। সাজানো শেষ হলে রুমালে হাত মুছতে মুছতে বলল, পশ্চিম দিক আপনার কেন প্রয়োজন?

আমি মুসলমান। দিনে পাঁচবার নামায পড়ার জন্য কিবলা মুখী হওয়া প্রয়োজন। বলল, আহমদ মুসা।

কিবলা পশ্চিম দিকে?

কিবলা বা কাবা মক্কা নগরীতে। আর মক্কা নগরী এখান থেকে পশ্চিম দিকে।

আচ্ছা, আমি অফিসারকে আপনার কথা জানাব। বলে সে দরজা বন্ধ করে চলে গেল।

খাবারে মনযোগ দিলেন আহমদ মুসা। সাদামাটা খাবার। রুটি, গরুর গোষত, সালাদ, সুপ আর মদ। দুবেলাই মদ ফেরত দিয়েছেন তিনি। তবুও আবার দিয়েছে।

খাবার শুরু করেছেন আহমদ মুসা। এসময় আবার দরজা খোলার শব্দ হলো। দরজা খুলে ঢুকল ন্যাভাল ড্রেস পরা একজন তরুণ অফিসার। ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞাসা করল, আপনি কিছু জিজ্ঞাসা করেছেন?

হ্যাঁ, বলল আহমদ মুসা, পশ্চিম কোনদিকে?

কেন?

আমি মুসলমান। কিবলামুখী হয়ে আমাদের নামায পড়তে হয় আপনি জানেন।

অফিসারের মুখে ঠোঁটের কোণায় একটু হাসি ফুটল যেন। সে হাসিটা অবজ্ঞার, না কৌতুকের বুঝা গেল না। বলল সে, আপনার শোবার খাটটা মোটামুটি ভাবে ঘরের উত্তর দিকেই থাকবে।

ধন্যবাদ। বললেন আহমদ মুসা। অফিসারটি ততক্ষণে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। দরজা বন্ধ করে সে চলে গেল।

খাবার পর আহমদ মুসা মুখ হাত ধুয়ে অজু করে এলেন। মিনিট দু'য়েক খাটে বসে বিশ্রাম নেবার পর উঠে দাঁড়িয়ে খাবার ট্রলি ঘরের মাঝ বরাবর সরিয়ে নিলেন। বেশ অনেকখানি জায়গা বেরুল। তারপর খাটকে ডান হাতে আর দরজাকে বাঁ হাতে রেখে আহমদ মুসা নামাযে দাঁড়ালেন। মেঝের কার্পেটটা নতুন

এবং নরম। নামায এতে হবে কিনা তাঁর জানা নেই। বিকল্প কোন উপায় যখন নেই, তখন আল্লাহ রব্বুল আলামীন এ অবস্থাকে নিশ্চয় মঞ্জুর করবেন।

নামাযে দাঁড়াতে গিয়ে হাসি পেল তাঁর। আগের দু'টো নামাযে তাঁর দিক ঠিক হয়নি। দক্ষিণমুখী হয়ে নামায পড়েছেন তিনি।

যোহরের শেষ দু'রাকাত সুন্নাত নামাযে সবে দাড়িয়েছেন, কক্ষের দরজা ক্লিক করে খুলে গেল। মনে হলো কে যেন কক্ষের মধ্যে এসে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা নামায শেষ করলেন। তারপর মুনাজাত শেষ করে মুখ ফিরিয়ে দেখলেন সেই বৃদ্ধ লোকটি দাঁড়িয়ে। দেখছে আহমদ মুসার নামায।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়ে শোবার বিছানার দিকে ফিরে যেতে যেতে বললেন, ধন্যবাদ আপনাকে, অফিসার পশ্চিম দিক চিনিয়ে দিয়ে গেছে।

মনে হলো কথাগুলো তার কানে গেল না। সে ট্রে'র কাছে সরে এল। বাসন-কোসন গুছিয়ে নিতে নিতে বলল, আমার আব্বা গির্জায় যেতেন, বাইবেল ছিল আমাদের বাড়ীতে।

এখন নেই?

না।

কেন?

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সে বলল, আল্লাহ কি সত্যিই আছেন?

সুপরিকল্পিত অপরুপ এই জগৎ কি সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ নেই? পাল্টা প্রশ্ন করলেন আহমদ মুসা। কোন জবাব দিল না লোকটি। খাবার ট্রলি ঠেলে নিয়ে বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে।

আহমদ মুসার কেন জানি মনে হলো, বিশ্বাসের আগুন লোকটির মধ্য থেকে একেবারে নিভে যায়নি। কিন্তু কথা বলতে পারল না কেন? হঠাৎ তাঁর মনে হলো, পাহারাদার টেলিভিশন ক্যামেরার সাথে শব্দ গ্রাহক যন্ত্রও অবশ্যই আছে। এই সাদামাটা কথাটা এতক্ষণ বুঝতে দেরী হওয়ায় নিজের ওপর খুব রাগ হলো তার।

বিছানায় গা এগিয়ে দিলেন আহমদ মুসা। জাহাজ চলছে। সেই একটা সূক্ষ্ম কাঁপুনি বালিশে স্পন্দন তুলছে। আহমদ মুসা হিসেব কষলেন, কম্পনের

ঢেউটা পশ্চিম থেকে ছুটে আসা এবং জাহাজের একটা পাশ যখন মোটামুটি উত্তর দিকেই থাকছে, তখন পশ্চিম দিকেই এগুচ্ছে। অর্থাৎ জাহাজ এগুচ্ছে ভারত মহাসাগরের দিকে। এখন এ কথা তাঁর কাছে পরিস্কার যে, 'ফ্র'-এর গোয়েন্দা সংস্থা 'রিও' কু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান এবং ফিলিপিন সরকারকে কাঁচকলা দেখিয়েছে। এমন কি হেলিকপ্টারে করে যারা তাঁকে নিয়ে এল তারা নিশ্চয় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার অনুমতি পায়নি। হাসি পেল আহমদ মুসার, চোরের ওপর বাটপারী করেছে কে জি বি।

মালাক্কা প্রণালী পার হয়ে তীর বেগে এগিয়ে চলেছে কারকভ। কাগনোয়াভিচ তার চেয়ারে গা এলিয়ে চুরুট টানছে। সন্ধ্যার মধ্যে বোম্বে পৌঁছতে হবে। আরব সাগর সহ গোটা উত্তর-পশ্চিম ভারত মহাসাগরে 'ফ্র' নৌবাহিনীর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে উঠেছে। দক্ষিণ ইয়েমেন ও সকুত্রা দ্বীপ হাতছাড়া হবার পর মরিশাস ছিল তাদের শেষ অবলম্বন। মরিশাসে ভারতীয় প্রভাব ছিল তাদের স্বার্থের রক্ষাকবচ। কিন্তু মরিশাসের নতুন সরকার 'ফ্র' নৌবাহিনীকে শুধু বন্দর-সুযোগ দিতেই অস্বীকার করেনি, সম্পর্ক ছিন্ন করারও হুমকি দিয়েছে। ফলে ভারত মহাসাগরের এই বিশাল এলাকায় এখন 'ফ্র' নৌবাহিনীর পা রাখার জায়গা নেই। শ্রীলংকা, মালদ্বীপ, মরিশাস, সোমালিয়া, আরব উপদ্বীপ এবং পাকিস্তান যে ব্যূহের সৃষ্টি করেছে তাতে ভারতের পশ্চিম উপকূল কার্যত অবরুদ্ধ। বোম্বাই উপকূলে আন্তর্জাতিক জলসীমায় অপরিচিত সব জাহাজের আনাগোনা বেড়ে গেছে। কারকভের ওপর দায়িত্ব পড়েছে এই গোটা ব্যাপারের ওপর নজর রাখার। কারকভের আনবিক চোখকে ফাঁকি দেয়া কারো পক্ষ থেকে সম্ভব নয়। কারকভের ওপর অর্পিত আরেকটা দায়িত্ব হলো, শত্রু পক্ষ থেকে চুরি করা কোড-মেসেজকে ডিকোড করা। আর শত্রুর রেডিও অয়্যারলেস জ্যাম করে দেয়া।

আরো একটা দায়িত্ব রয়েছে, সে কথা মনে হতেই এক ধরনের রহস্যময় হাসি ফুটে উঠল। কারকভের এই শেষ মিশনটা হলো, মার্কিন এডমিরালের সাম্প্রতিক ভারত সফরের সময় ভারতীয় নৌবাহিনীর সাথে লেনদেনের কি চুক্তি হলো তার ইতিবৃত্ত খুঁজে বের করা। মর্কিনীদের সাথে মধুচন্দ্রিমার যে গোপন খায়েশ ভারত সরকারের কারো কারো মনে জেগেছে তাকে রোধ করার দায়িত্ব

পড়েছে কারকভের ওপর। এ ব্যাপারে কারকভ এক্সপার্ট। মার্কিন কোডে ভূয়া তথ্য রিলে করে সেই তথ্য ডিকোড করে ভারতকে বুঝাতে হবে যে, ভারতকে বোকা সাজিয়ে রেখে পাকিস্তান, মালদ্বীপ, শ্রীলংকাকে দিয়ে ভারতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সব প্রস্তুতি পশ্চিমীরা সম্পন্ন করেছে। তারপর দেখা যাবে ভারত পাকা ফলের মতই 'ফ্র'-এর হাতে ধরা দিচ্ছে।

পাশের কম্যুনিকেশন রেডিও থেকে ভেসে আসা একটা মিষ্টি শব্দ কাগনোয়াভিচের ভাব-তন্ময়তা ছিঁড়ে দিল। চুরুটটি তাড়াতাড়ি এ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে রেডিও'র রিসিভারটি তুলে নিল হাতে। টেলিফেনের মতই এ দিয়ে কথা বলা যায়, শুনা যায়।

রিসিভারটি কানে লাগিয়ে কাগনোয়াভিচ বলল, কারকভ থেকে কাগনোয়াভিচ, সকাল ১০ টা। ডাইনে আন্দামান।

ওপর থেকে কথা ভেসে এল, টি কে গ্রীসিন নাম্বার-৩। তাসখন্দের কোড নাম টি. কে.। আর গ্রীসিন নাম্বার-৩ ওখানকার 'রিও' চীফ।

আমি শুনতে পাচ্ছি, বলুন বলল কাগনোভিচ।

আমরা আহমদ মুসাকে কিডন্যাপ করেছি, নতুন মিন্দানাও সরকার এ অভিযোগ করেছে। এশিয়া-আফ্রিকার গোটা মুসলিম বেল্টে এ নিয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং আহমদ মুসা এখানে 'ফ্র'- এর হাতে না পৌছা পর্যন্ত ঝুঁকি আছে। ভারতেও ওদের শক্তি অনেক। সুতরাং বোম্বাই বন্দরে আহমদ মুসাকে খোলাখুলি ভাবে নামানো চলবে না।

একটু থামল গ্রীসিন। কাগনোয়াভিচ বলল, তাহলে আমাদের প্রতি কি নির্দেশ? - বলছি, গ্রীসিন বলল।

তারপর ঢোক গিলে আবার শুরু করল, বোম্বাইতে তোমরা পৌঁছবে ৭টার দিকে। আমরা আমাদের বোম্বাই কনসুলেটকে বলে দিয়েছে, কারকভ বন্দরে পৌছার সংগে সংগেই একটা বিশেষ কফিন শিপে পৌঁছবে। রাত ৯টায় এ্যারোফ্লোটের বিমান বোম্বাই থেকে ছাড়বে। সুতরাং তার আগেই যেন আহমদ মুসাকে বিমানে পৌঁছানো হয়। এই নির্দেশ আমরা কনসুলেটকেও দিয়েছি। আমাদের একজন অফিসারের লাশ এ্যারোফ্লোটে করে তাসখন্দে পাঠানো হচ্ছে,

এ খবর আমাদের কনসুলেট পোর্ট অথরটি ও প্রশাসনকে যথামসেয় জানিয়ে রাখবে। এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে থামল গ্রীসিন।

আর কিছু নির্দেশ, কমরেড? বলল কাগনোয়াভিচ।

না, আর সব তো তুমি জানই। কোন পরিস্থিতিই যাতে আহমদ মুসাকে এখানে 'ফ্র'- এর হাতে পাঠানোর পথে বাধা হতে না পারে, সে নির্দেশ আমরা আমাদের কনসুলেটকে দিয়েছি। ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র' সব রকম সাহায্য দেবে।

ওপার থেকে কথা থেমে গেল। সংগে সংগে 'কট' করে একটা শব্দ হলো। সাথে সাথে নিভে গেল লাল সংকেতটাও।

অথৈই সাগরের নীল পানি কেটে এগিয়ে চলেছে কারকভ তীরের ফলার মত। নীলের শান্ত বুকটি দু'ভাগ হয়ে দু'দিকে ভেঙে পড়ছে। এক বিরামহীন শব্দ সেখানে। নীলের বুকে বুদ্ধুদের সফেদ সারি দ্রুত সরে যাচ্ছে পেছনে, তারপর আবার এক হয়ে যাচ্ছে নীলের সাথে। বৃদ্ধ দিমিত্রি তন্ময় হয়ে গিয়েছিল সে দিকে তাকিয়ে। সূর্য তখন ২০ ডিগ্রী কোণে ঢলে পড়েছে ভারত মহাসাগরের ওপর। সরল রেখার মত সূর্যের রক্তিম শলাকা এসে চোখে লাগছে। মাথা ঘুরিয়ে একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। টেবিল থেকে কলমটি নিয়ে পকেটে পুরে বেরিয়ে এল কেবিন থেকে।

নাস্তার ট্রলিটি ঠেলে আহমদ মুসার কেবিনে পৌঁছল দিমিত্রি। তাকে প্রবেশ করতে দেখে আহমদ মুসা উঠে বসলেন।

ট্রলিটি ঠেলে আহমদ মুসার একদম সামনে এনে রাখা হলো। সেই একই নাস্তা। দু' স্লাইস রুটি। এক খন্ড মাখন। কফি।

রুটির প্লেটটি সামনে টানতে গিয়ে মনে হলো তার নিচে ভাঁজ করা একখন্ড কাগজ। চট করে তাকালেন আহমদ মুসা বৃদ্ধের দিকে। বৃদ্ধ চোখ নামিয়ে নিল।

বৃদ্ধ বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আহমদ মুসা খেতে বসলেন। বাঁ হাতে প্লেট ধরে ডান হাতে খাচ্ছেন এমন একটা ভাব দেখিয়ে সন্তর্পণে প্লেটের নিচ থেকে ভাঁজ করা কাগজটি মুঠোয় পুরলেন।

খাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়েছেন আহমদ মুসা। বৃদ্ধ দিমিত্রি ট্রলি নেবার জন্য এল। প্লেট পিরিচ গুছাতে গিয়ে প্লেটের তলা শূন্য দেখে বৃদ্ধের চোখ উজ্জ্বল দেখাল বলে আহমদ মুসার মনে হলো।

ট্রলি নিয়ে বেরিয়ে গেল দিমিত্রি। ক্লিক করে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আহমদ মুসা বসেই কাগজটির ভাঁজ খুললেন। কিন্তু খুলেই চমকে উঠে হাতের মুঠোতে তা দলা পাকিয়ে ফেললেন। ঘরে টেলিভিশন ক্যামেরার চোখ খোলা আছে তা ভুলেই গিয়েছিলেন আহমদ মুসা।

উঠে তিনি বাথরুমে গেলেন। বাথরুমের দরজা বন্ধ করে চারদিকে ভালো করে নজর বুলিয়ে দেখলেন, না এমন কোন জায়গা নেই যেখানে টেলিভিশন ক্যামেরার গোপন চোখ সেট করা যেতে পারে। একটা বাথটাব, একটা মুখ ধোয়ার বেসিন এবং একটা পায়খানার বেসিন ছাড়া আর কিছুই নেই।

আহমদ মুসা বাথটাবের ওপর বসে দলা পাকানো কাগজটির ভাঁজ খুললেন। একটি চিঠি। পড়লেন তিনি-

''সেদিন আপনার জিজ্ঞাসার জবাব দেইনি, কারণ টেলিভিশন ক্যামেরা ও সাউন্ড রেকর্ডারের কাছে ঘরের কিছুই গোপন থাকে না, আপনার মত বুদ্ধিমান লোক তা জানেন। আজ থেকে ১০/২০ বছর আগে হলে আপনার প্রশ্নের উত্তরে না বলতাম। কিন্তু আজ বয়স বাড়ার সাথে সাথে এক অসহনীয় শূন্যতা ও হতাশা অনুভব করছি, অনুভব করছি একজন সক্রিয় স্রষ্টার অস্তিত্ব ছাড়া এর কোন উপশম নেই। আজ রাত ৯টায় বোম্বাই থেকে এ্যারোফ্লোট বিমানে করে আপনাকে তাসখন্দে পাঠানো হচ্ছে। কোথাও পাঠাবার কোন মেসেজ থাকলে তা খাবার প্লেটের নিচে রাখবেন।''

এক ধরনের টিস্যু পেপারে চিঠিটি লেখা। চিঠি পড়ে মুখ ধোয়ার বেসিনে তা ফেলে দিয়ে পানির টেপ খুলে দিলেন। অজু করে নিলেন আহমদ মুসা। অল্পক্ষণ পরেই কাগজের কোন অস্তিত্ব বেসিনে আর থাকল না। তোয়ালে দিয়ে মুখ হাত মুছে বেরিয়ে এলেন তিনি।

বৃদ্ধ দিমিত্রির চিঠি নতুন দিগন্ত খুলে দিল আহমদ মুসার সামনে। তিনি তাহলে তাসখন্দ যাচ্ছেন? অজান্তেই যেন এক শিহরণ জাগল তাঁর মনে। মাতৃভুমি

সিংকিয়াংকে কতদিন দেখেনি। গোটা মধ্য এশিয়াই তো তুর্কিস্থান-তাঁর মাতৃভূমি। বিধ্বস্ত একটা জাতির আবাসভূমি মধ্য এশিয়া। নিপীড়নের কত ঝড়, কত সাইক্লোন বয়ে গেছে সেখানে। মনটা তাঁর অধীরে হয়ে উঠল। আমুদরিয়া, শিরদরিয়ার দেশ, দুর্লংঘ পাহাড়, দুর্গম মরুভূমি আর সোনাফলা উপত্যকার দেশ, দুর্ভাগা উজবেক, তাজিক, তাতার, কিরঘিজ ও কাজাখদের দেশ মধ্য এশিয়ার এক দুর্নিবার আকর্ষণ তাঁকে টানছে। হাসান তারিকের কথাও তাঁর মনে পড়ল। তাকে 'ফ্র' কোথায় রেখেছে? যেখানেই রাখুক, সে বেঁচে থাকলেই হয়।

মাগরিবের নামাযের বোধহয় কিঞ্চিৎ দেরী আছে। বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন আহমদ মুসা। চোখ দুটো বন্ধ করলেন। মনের পর্দায় তাঁর ভেসে উঠল হিন্দুকুশ আর তিয়েনশান পর্বতমালার শেষহীন সারি। তার দু'পাশে অসংখ্য মুসলিম জনপদ। যেন সব আপন জনদের তিনি দেখতে পাচ্ছেন। চোখের কোণ দুটি তাঁর ভারি হয়ে উঠল। তিনি আল্লাহ রব্বুল আলামীনের শুকরিয়াহ আদায় করলেন তাঁকে এই সুযোগ দিয়ে দয়া করার জন্য। আল্লাহ যেন তাঁর প্রতিটি মুহূর্ত এই মযলুম মুসলমানদের কাজে লাগান, এই প্রার্থনা করলেন। বৃদ্ধ দিমিত্রির কথা তাঁর মনে পড়ল। হাসি পেল একটু। মেসেজ লিখবে কিভাবে? কালি-কলম কোথায়? ভাবল আহমদ মুসা, বৃদ্ধকে বলে দেবেন সুযোগ পেলে তাঁর খবরটা মিন্দানাও অথবা ফিলিস্তিন সরকারকে সে যেন জানিয়ে দেয়। বোম্বাই-এর 'মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ' অফিসে জানালেও চলবে।

মনে হলো ঘরের আলোটা আগের চেয়ে অনেক উজ্জ্বল। সূর্য কি তাহলে ডুবল? মাগরিব নামাযের জন্য উঠে বসলেন আহমদ মুসা। নামায পড়ে উঠে দেখলেন, মেঝেতে কার্পেটের ওপর তার নিজের জামা-কাপড় পড়ে আছে। ধুয়ে পরিষ্কার করা। কে, কখন রেখে গেছে খেয়াল করেনি আহমদ মুসা।

# ৫

তাসখন্দে তখন সন্ধ্যা নামছে। একটা সোফায় হেলান দিয়ে একটা পার্টি বুলেটিনে নজর বুলাচ্ছিল উমর জামিলভ। বয়স ৩০ বছরের বেশি হবে না। খাস উজবেক চেহারা। যৌবনের দীপ্তি ঠিকরে পড়ছে চেহারা থেকে। উজবেকিস্তানে 'রিও'-এর অভ্যন্তর বিভাগের প্রধান। বয়স অনুসারে উন্নতি অনেক। বোধ হয় তার ভাল রেকর্ডই এর কারণ। উমর জামিলব কম্যুনিস্ট পার্টির যুব সংগঠনের সেন্ট্রাল কমিটির সদস্য ছিল।

নেমে আসা অন্ধকার বইয়ের অক্ষরগুলো ঝাপসা করে দিচ্ছিল। বই বন্ধ করে ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল, সূর্য ডুবে গেছে।

তাড়াতাড়ি সে উঠে দাঁড়াল। এনগেজমেন্ট আছে, তাকে বাইরে যেতে হবে, তার আগে দাদীর কাছে যেতে হবে। অনেকক্ষণ ডেকে পাঠিয়েছেন।

সিড়ি ভেঙে দু'তলায় উঠে গেল সে। একদম দক্ষিণের ঘরে থাকেন তার দাদী। নিরুপদ্রপ নিরিবিলি একটি ঘর। দরজায় একটু দাঁড়াল জামিলভ। তারপর ধীরে ধীরে নক করল। কোন সাড়া নেই। দরজার হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলে ঘরে প্রবেশ করল সে। তখনও আলো জ্বালা হয়নি ঘরে। আলোর সুইচটা টিপে দিল জামিলভ। ঘর ভরে গেল আলোতে। দেখল, ঘরের ডান পাশে পরিচিত সেই জায়গায় দাদী নামায পড়ছেন। সিজদায় ছিলেন, উঠে বসলেন। আজও লক্ষ্য করল জামিলভ, জায়নামাযটি বড্ড ছেঁড়া। জামিলভ যদিও এসব কাজ একান্তই অনর্থক মনে করে, তবু এই সেদিন সে দাদীকে বলেছে, তুমি অনুমতি দিলে একটি নতুন জায়নামায আমি এনে দেব। কিন্তু দাদী বলেছেন মক্কা শরীফ থেকে আনা এ জায়নামায তিনি ছাড়বেন না। আরও একটা শক্ত কথা দাদী সেদিন বলেছেন, তোর টাকার জায়নামাযে কি নামায হবে? দাদীর এই শক্ত কথাটা তার কোথায় যেন আঘাত করেছিল। মুহূর্তের জন্য থমকে গিয়েছিল সে। তারপর একটু ঢোক

গিলে মুখে একটু হাসি টেনে জিজ্ঞেস করেছিল, আমার টাকার দোষ কোথায়, দাদী?

দাদী চোখ তুলে তাকিয়েছিলেন। শুধু তাকিয়েই ছিলেন জবাব দেননি। মনে হয়েছিল তার চোখ দু'টি ভারি। স্নেহময়ী এ দাদীকে সে ছোটবেলা থেকে জানে। কিন্তু এই অতি পরিচিত দাদীর সেই দৃষ্টির সামনে সে সেদিন খুবই সংকোচ বোধ করেছে। আর কোন কথা জিজ্ঞেস করার সাহস তার হয়নি।

দাদী আবার সিজদায় গেছেন। কোন কিছুর প্রতিই তার ভ্রুক্ষেপ নেই। জামিলভ দেখে আসছে, নামাযের সময় দাদী অন্য মানুষ হয়ে যান। কম্যুনিজমের কট্টর ছাত্র জামিলভের মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, এটাই সেই ওপিয়াম যার কথা মার্কস বলেছে। কিন্তু একটা কথা সে বুঝতে পারেনি, অশরীরি এই ওপিয়ামের এত শক্তির উৎস কোথায়।

জামিলভ গিয়ে দাদীর খাটে বসল। পাশেই টেবিল। টেবিলের ওপরে দেয়ালে একটা কাঠের তাক। সেই তাকে দাদীর পুরানো পুস্তক, যাকে দাদী কুরআন শরীফ বলেন দাদীর নামায তখনও শেষ হয়নি। কুরআন শরীফ তাক থেকে তুলে নিল জামিলভ। অনেক পুরানো বাধাই খসে গেছে। পাতাগুলো খুব কষ্ট করেই গুছিয়ে রাখা হয়েছে তা বুঝাই যায়। আরবী ভাষায় কুরআন শরীফ। কিছু কিছু সে এখনও পড়তে পারে। মনে পড়ে ছোট বেলায় দাদীই তাকে আরবী শেখাতেন গোপনে গোপনে। কারণ এটা আববা পছন্দ করতেন না। আববা তখন তাসখন্দের পার্টি বস, তার বাড়ীতে এসব হয় তা প্রকাশ পেলে পার্টির শুধু পদ নয়, মেম্বার শিপও তার থাকবে না।

দাদী তার রুমে কুরআন শরীফ লুকিয়ে রাখতেন। সুযোগ পেলে পড়তেন, আর নাতিকে সুযোগমত কাছে পেলেই তালিম দিতে চেষ্টা করতেন। জামিলভ সেই পুরানো অভ্যাসটা একটু ঝালাই করতে কসরত শুরু করল। এমন সময় দাদীর গলা শুনা গেল, আহা, জামিল কি করছিস! বলে বয়সের ভারে ন্যুব্জ দাদী উঠে এলেন। বললেন, তুই তো অজু করিস না, বিনা অজুতে আল্লাহর কালাম ধরে নারে

দাদী জামিলভের হাত থেকে কুরআন শরীফটি নিয়ে টেবিলে রাখতে রাখতে বললেন, পড়বি তো যা অজু করে আয়।

তুমি কিছু মনে করো না দাদী, নষ্ট করার মত সময় আমার নেই। একটু মুচকি হেসে বলল জামিলভ।

সময়ের নষ্ট যে এটা নয় তা যদি তুই বুঝতিস রে।

আমি বুঝি দাদী।

কতটুকু ঝুঝিস তুই? বলতে পারিস তোর হাতের ছোট বড় পাঁচ আঙুলের যে বৈজ্ঞানিক বিন্যাস তা কবে কোন প্রকৌশলী করেছেন?

জানি, তুমি এখন আল্লাহর কথা বলবে। স্বয়ংক্রিয় এ সৃষ্টি রীতিতে আল্লাহর কি কোন প্রয়োজন আছে দাদী?

বেশী বুদ্ধিমান মনে করলে সে নাকি মুর্খ হয়ে যায়। তোরা তাই হয়েছিস। বলত দেখি, তোদের স্বয়ংক্রিয় কম্পুটারের কি কোন স্রষ্টা আছে?

জামিলভ হেসে উঠল। বলল, তর্কে তোমার সাথে পারব না দাদী। তার চেয়ে তোমার কাছে আমার একটি প্রস্তাব তোমার কুরআন তো একদমই খসে গেছে। বলত, অমি বাধাই করে এনে দিই।

কে বাঁধাই করবে?

কেন বাঁধাই-এর তো দোকান অছে।

তোমাদের বে-অজুদার বে-ঈমানাদার বাঁধাইকারদের হাতে আমি কুরআন শরীফ দেব না। কুরআন আমার এভাবেই থাক।

তোমার তো অসুবিধা হয় এতে। দাদী কোন উত্তর দিলেন না। একটু চুপ থাকলেন, মনে হয় মুহুর্ত ভাবলেন। তারপর এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, কুরআন এবং মুসলিম জাতি ভিন্ন নয়রে। তোরা আমাদের মুসলিম জাতিকে ঐ কুরআন শরীফের মত ছিন্ন ভিন্ন করেছিস বলেই আজ কুরআন শরীফের এই অবস্থা।

জামিলভ সহসা কোন উত্তর দিতে পারল না। চিরাচরিতভাবে হেসে পরিবেশেটার মোড় পরিবর্তনের কোন শক্তি তার যোগাল না। দাদীর কথাটা

বুকের কোথায় গিয়ে যেন আঘাত করেছে। কয়েকটা ঢোক গিলে সে বলল, দাদী, আমি তোমার নাতি। তুমি আমাকে আলাদা মনে করছ কেন?

দাদী কোন কথা বললেননা। ধীরে ধীরে উঠে এলেন চেয়ার থেকে। জামিলভের পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, জামিল, আমি মুসলিম, কিন্তু তোরা আমার এ সমাজকে ধ্বংস করিসনি, ধ্বংস করছিস না? তোর বাপ ছিল তাসখন্দের কম্যুনিস্ট পার্টির প্রধান। তুই বিশ্ব রেড গোয়েন্দা সংস্থা 'ফ্র'-এর একজন কর্মকর্তা। তোরা তো জানিস, কত লক্ষ মানুষের আহাজারি এই বাতাসে।

দাদী, এটা তো রাজনৈতিক প্রশ্ন। তোমার অস্বীকার করা উচিত নয়, ধর্ম শোষনের শিখন্ডী হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এখানেই তোদের ভুল। ইসলামকে তোরা জানিস না। ইসলাম শোষণ করায় না; ইসলামের অভাবেই শোষণ হয়। তুই ভালো করে শুনে রাখ, ইসলাম তো তোদের মত রাজনীতি করে না, কিন্তু তোদের রাজনীতি যখন ইসলাম করে তখনই সব সমস্যার সমাধান, সব শোষণের অবসান ঘটে। তুই এত ইতিহাস পড়িস, ইসলামী খিলাফতের ইতিহাস একবার পড় না?

উমর জামিলভ দাদীর সামনে অস্বস্তি বোধ করছিল। এ প্রশ্নগুলোর জবাব তার কাছে নেই। দাদীর এসব প্রশ্নের কোন জবাব কোন দিনই সে দিতে পারেনি। কথার মোড়টা ঘুরিয়ে নেবার জন্য সে বলল, এসব কথা থাক দাদী, তুমি কি জন্য ডেকেছ তাই বল।

বলব?

বল।

আমি শাহ-ই-যিন্দে যেতে চাই। তুই আমাকে সেখানে নিয়ে যাবি।

হঠাৎ কোন উত্তর যোগাল না জামিলভের মুখে। 'শাহ-ই-যিন্দে' সমরখন্দের একটি প্রাচীন স্মৃতি সৌধ যা এখনও টিকে আছে। বলা হয় মহানবীর (স.) খালাত ভাই কুসুম বিন আব্বাসের কবরগাহের ওপর এই স্মৃতি সৌধটি নির্মিত। আরও বলা হয়ে থাকে উজবেক অঞ্চলে ইসলামের বাণী তিনিই বহন করে আনেন। এই স্মৃতি সৌধ জিয়ারত করার প্রতি মধ্যে এশিয়ার মুসলমানদের মধ্যে একটি অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ আছে। কম্যুনিস্ট সরকার একে সুনজরে দেখে

না। যারা ওখানে যায় ‘ফ্র’-এর গোপন তালিকায় তারা ব্যাধিগ্রস্ত বলে চিহ্নিত। তাদের প্রতি নজর রাখা হয়। জামিলভ তার দাদীকে ওখানে নিয়ে যাবে, ব্যাপারটা তার জন্য বড়ই অস্বস্তিকর। কিন্তু দাদীর এই আবেদন সে ফিরিয়ে দেয় কি করে?

জামিলভ কথা বলছে না দেখে দাদী বলল, জানি তুই খুব ব্যস্ত, কিন্তু রোকইয়েভা নেই। থাকলে তোকে বলতাম না।

রোকাইয়েভা জামিলভের ছোট বোন। পদার্থ বিজ্ঞানে মস্কোতে সে উচ্চতর ডিগ্রী নিচ্ছে। একজন যুবনেত্রী সে।

রোকাইয়েভার কথা বলতেই জামিলভের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, দাদী রোকাইয়েভা দু’একদিনের মধ্যে আসছে জানিয়েছে।

দাদী ঠোঁটে একটু হাসি টেনে বলল, তাহলে বেঁচে গেলি, কেমন।

না বাঁচিনি দাদী, শাহ-ই-যিন্দে তুমি তো যাচ্ছই। ঠোঁটের কোণায় হাসি টেনে কথাটা বলল জমিল।

এর অর্থ, আমি না গেলে তুই বেঁচে যাস?

দাদী, আমাদের কম্যুনিস্ট সমাজ ব্যবস্থায় শাহ-ই-যিন্দ শুধু অর্থহীন নয়, মানুষের জন্য ক্ষতিকরও।

ঠিকই বলেছিস, কম্যুনিস্ট সমাজ ব্যবস্থার জন্য অর্থহীন ও ক্ষতিকরই এটা, কিন্তু আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় ও উপকারী।

কিছু মেন করো না দাদী, ধ্বংস হয়ে যাওয়া এই পুরাতনকে ধরে রেখে আর কি কোন লাভ আছে?

কাকে তুই ধ্বংস বলছিস জামিল, ইসলামকে? তোদের এ ধারণা ভুল। তোরা ইসলামকেও জানিস না, ইতিহাসও পড়িসনি।

থামলেন দাদী। তার দৃষ্টিটা জানালা দিয়ে বাইরে। তিনি যেন হারিয়ে গেছেন আপনার মধ্যে। দাদীর এরূপ জামিলভের খুবই ভাল লাগে।

দাদী আবার মুখ খুললেন। বললেন, তোদেরই পুর্ব পুরুষ হালাকু-চেঙ্গিস বাগদাদ ধ্বংস করে এবং মুসলিম নর-মুন্ড দিয়ে পাহাড় সাজিয়ে ভেবেছিল ইসলামকে তারা শেষ করেছে। মুসলিম পুরুষদের হত্যা করে তাদের নারীদের জয় করে এনেছিল তোদের পূর্ব পুরুষরা। কিন্তু ধ্বংসের ছাই থেকে আবার

জীবনের চারাগাছ গজাল। মাত্র কয়েক যুগের মধ্যেই গোটা মধ্য এশিয়া ইসলাম জয় করে নিল ঐ দুর্বল ও অবলা নারীদের দ্বারাই। তোর, আমার যিনি স্রষ্টা তাঁরই দেয়া জীবন ব্যবস্থা হলো ইসলাম। এ শেষ হয় না, শেষ করা যায় না একে। জামিল তোকে জিজ্ঞেস করি, এই তাসখন্দে এক তিল্লা শেখ মসজিদ ছাড়া সব মসজিদই তোরা একদিন শেষ করে দিয়েছিলি, আজকের খবর কি বলত?

দাদী চুপ করলেন। বিস্মিত জামিলভ দাদীর দিকে তাকিয়েছিল। তার দাদী এত ইতিহাস জানেন, নিষিদ্ধ এই ইতিহাস কোথায় পান তিনি। আর যুক্তিকে এমন অখন্ডনীয় করে পেশ করতে পারেন তার দাদী। দাদীর শেষ জিজ্ঞাসাটা তার কানে বাজছে! কি উত্তর দেবে সে? এই তাসখন্দ শহরে এক তিল্লা শেখ মসজিদ ছাড়া অন্য সবগুলোই শেষ করে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তা শেষ হয়ে যায়নি। ছোট বড় মিলে ইতোমধ্যেই দু'শতাধিক মসজিদকে জনমতের চাপে বাধ্য হয়েই অনুমতি দেয়া হয়েছে। এছাড়া আরও গোপন মসজিদ তো রয়েছেই।

দাদীর আবার কথা বললেন, জানি জবাব দিতে পারবি না। শোন জামিল, প্রবল এক স্রোতে তোরা গা ভাসিয়ে দিয়েছিস, কিন্তু এ স্রোত তোদের এক অকুল সাগরে নিয়ে ফেলবে, মুক্তির ডাঙ্গা কোনদিনই খুঁজে পাবি না। মুক্তি পেতে চাইলে স্রোতের মুকাবিলা করে নিজস্ব পথ রচনা করতে হবে।

দাদীর কথাগুলো জামিলভকে তীরের মত বিদ্ধ করল। চমকে উঠল জামিলভ। এতো রাষ্ট্রদ্রোহিতা! তার দাদীর মধ্যে বিদ্রোহের একি আগ্নেয়গিরি! দাদীর এ রূপের কাছে নিজেকে খুবই ছোট, খুবই দুর্বল মনে হলো। ভয়ও জাগল মনে, এই আগ্নেয়গিরির বিস্তার কতখানি? মনে হল, বয়সের ভারে কাহিল তার দাদীর মধ্যে এই যে আগুন তা যেন গোটা দেশে উত্তাল তরঙ্গে ঝলকাচ্ছে। সবুজ তরমুজের মত সমাজের দৃশ্যমান পর্দাটা ফাঁক করলেই যেন ভেতরের সেই লাল সমুদ্র দেখা যায়।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল জামিলভ। বলল, দাদী আমি এখন যাব এক জায়গায়।

বেরিয়ে এল জমিলভ। দাদীর কাছে এখন তাকে পলাতক মনে হচ্ছে। স্নেহময়ী দাদীকে ভালবাসত, সম্মান করতো, আজ তার সাথে মনে হচ্ছে ভয়ও যোগ হল।

তাসখন্দে 'ফ্র'-এর সিকিউরিটি প্রিজন। রাজনৈতিক বিভাগের একটি সেল। তখন সকাল আটটা। ব্যয়াম সেরে শুয়ে পড়েছিল হাসান তারিক। ভোরে ফজরের পর সে মিনিট তিরিশ কুরআন তিলাওয়াত করে। কুরআন শরীফ পাওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। সে মুখস্থই তিলাওয়াত করে। তারপর ঘন্টা দেড়েক ব্যায়াম করে। ব্যায়ামের পরে পাওয়া যায় নাস্তা। নাস্তা সেরে হাসান তারিক চলে যায় প্রিজন লাইব্রেরীতে। 'ফ্র' তাকে লাইব্রেরীতে সময় কাটাবার সুযোগ দেয়ায় সে কৃতজ্ঞ। অবশ্য এ সুযোগ তাকে কেন দেয়া হয়েছে সে জানে। লাইব্রেরীর যে বিশেষ বিভাগে সে যেতে পারে, সে বিভাগ পরিকল্পিত ভাবে গড়ে তোলা হয়েছে। মার্কস, এ্যাংগেলস, লেনিন এবং সমসাময়িক কম্যুনিস্ট সাহিত্যের সব বই সেখানে পাওয়া যায়। ইতিহাসের ওপর রয়েছে বিপুল বই। মানুষের ইতিহাস, দেশ ও জাতি সমূহের ওপর গ্রন্থ রয়েছে সেখানে প্রচুর। আর রয়েছে পর্ণ ম্যাগাজিনের স্তুপ। সব কিছুই কম্যুনিস্ট নিয়মে লেখা। মানুষের মগজ ও চরিত্র ধোলাইয়ের লক্ষ্য নিয়েই লাইব্রেরী সাজানো। লাইব্রেরীর পরিবেশ একেবারেই নিরিবিলি। এক পাঠকের সাথে অন্য পাঠকের দেখা না হয়, এই পাকা ব্যবস্থা সেখানে রয়েছে। এ পর্যন্ত লাইব্রেরীতে কারো দেখা পায়নি হাসান তারিক। শুরু থেকে লাইব্রেরীতে একজনেরই দেখা সাক্ষাৎ ও সান্নিধ্য পেয়েছে। সে হলো মিস আয়িশা আলিয়েভা। বয়স বাইশ-তেইশ। সুন্দরী ও অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। মস্কো ইউনিভার্সিটির একজন সেরা ছাত্রী, গোল্ড মেডেলিস্ট। মার্কসীয় তত্ব নিয়ে, পৃথিবী ও মানুষের ইতিহাস নিয়ে তার সাথে দিনের পর দিন আলোচনা হয়েছে। কোন জটিল জিনিসও অদ্ভুত দ্রুত সে হৃদয়ংগম করতে পারে, আর তা প্রকাশ করার মধ্যেও তার এক শৈল্পিক নৈপুণ্য রয়েছে। প্রথমদিকে তাকে লাইব্রেরী

পরিচালনার একজন দায়িত্বশীল মনে করেছিল হাসান তারিক, কিন্তু পরে তার কাছে পরিষ্কার হয়েছে যে, সে গোয়েন্দা বিভাগের লোক।

একটু ঝিমুনি এসেছিল হাসান তারিকের। দরজানয় কড়া নাড়ার শব্দে উঠে বসল। দরজা খুলে দেখল ভীমকায় ভিকটর দরজায় দাড়িয়ে নাস্তা নিয়ে। সাত ফিট দৈর্ঘ্যের বিশাল বপু ভিকটরকে দেখলে প্রথম দিকে তার কৌতুক বোধ হতো। কিন্তু তার ঐ ভীম দেহের মধ্যে যে একটা নরম দিল আছে তার পরিচয় পেয়ে সে অবাক হয়ে গেছে। এ পরিচয়টা একদিন এভাবে মেলে।

হাসান তারিক সকালের নাস্তা হিসাবে পায় বেশ কয়েকটা রুটি, মাখন ও ফল-মূল যার অর্ধেকটাই সে খেত না। ক'দিন এটা দেখে একদিন সে ফিসিফিস করে হাসান তারিককে বলল, স্যার, আপনি তো অর্ধেকটাও খান না। একটা অংশ কি আমি আপনার পাশের কয়েদীকে দিতে পারি? বেচারা একটা রুটি ছাড়া আর কিছু পায় না।

কিন্তু, এটা বেআইনী হবে না? প্রশ্ন করল হাসান তারিক।

হবে, কিন্তু আপনি রাজি থাকলে কেউ টের পাবে না। চারিদিকে চেয়ে ভয়ে ভয়ে কথা ক'টি বলল ভিকটর।

অপরাধী আসামির প্রতি তোমার এ দরদ কেন ভিকটর? আরেকটা খোঁচা দিল সে ভিকটরকে।

সে কাঁচু মাচু হয়ে নরম কন্ঠে বলল, ও চোর, ডাকাত নয় স্যার।

তাহলে কি?

দাগি বিদ্রোহী?

কিসের বিদ্রোহী?

'ফ্র'-এর রেড সরকারের বিপক্ষে, তুর্কি জাতির পক্ষে।

ভিকটরের কথা শোনার সাথে সাথে হাসান তারিকের শরীরে একটি উষ্ণ স্রোত বয়ে গেল। বলল, ওর নাম কি?

আজিমভ।

হাসান তারিক কিছুক্ষণ অপলকভাবে ভিকটরের দিকে চেয়ে রইল। কে এই ভিকটর? সে জিজ্ঞেস করল, তুমিও কি মুসলমান?

না, ল্যাটিভিয়ান। আমার জাতিও এখানকার তুর্কিদের মতই দুঃখী।

হাসান তারিক আর কিছু জিজ্ঞেস করেনি ভিকটরকে। আর জিজ্ঞেস করারও কিছু ছিল না। শেষের একটা কথায় সে সব বলে দিয়েছে। সেদিন থেকে ভিকটর তারিকের কাছে অন্য মানুষ- একটি বন্দী মানবাত্মা রক্তের অশ্রু ঝরছে যার অন্তর থেকে অবিরাম। আর সেদিন থেকে তারিকের নাস্তা আর খানার অর্ধেক যেত আজিমভের কাছে।

লোহার পাতের দরজার পর মোটা লোহার শিকের তৈরী দ্বিতীয় আরেকটা দরজা। এ দরজার ছোট্ট জানালা দিয়ে খাবার নিতে হয়। প্রতি দিনের মত সেদিন সে জানালা দিয়ে নাস্তা নিল। হাসান তারিক দেখল আগের মতই সেই পুরো নাস্তা। ভিকটরকে জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার আজিমভকে দাওনি?

না স্যার, আজিমভ নেই। মুখটি ভারী ভিকটরের।

কোথায়?

ফায়ারিং স্কোয়াডে। গত রাত চারটায়। শুনলাম সব দোষ নাকি সে স্বীকার করেছে।

কথা শেষ করে একটা কাষ্ঠ হসি হাসল ভিকটর। বড় একটা খোঁচা লাগল হাসান তারিকের মনে। নাস্তা ধরা হাতটা কেঁপে উঠল। বুক থেকে উঠে আসা একটা ঢেউ যেন গলায় এসে ভেঙে পড়তে চাইল।

হাসান তারিক জিজ্ঞেস করল, চিন তুমি আজিমভকে ভিকটর?

না। এটুকু জানি, 'ফ্র'-এর রেড আর্মির একজন রিটায়ার্ড মেজর সে। আফগান যুদ্ধ থেকে আসার পর সে বিদ্রোহী দলে যোগ দিয়েছে।

অর্ধেকটা নাস্তা ভিকটরকে ফেরত দেবার জন্য হাত বাড়িয়ে হাসান তারিক বলল, এগুলো খাব না, তুমি নিয়ে যাও।

না খেলে থাকবে স্যার, পরে নিয়ে যাব। আগাম ফেরত নেবার আইন নেই।

কাউকে দাও।

মাথা নিচু করে মুহূর্ত চিন্তা করে বলল, কাল থেকে দেখব স্যার। আজ থাক। তারপর একটু থেমে বলল, দেখে দেখে বুকটা পাথর হয়ে গেছে স্যার। প্রতি মাসে দশ বারটা ফায়ারিং স্কোয়াডে যায়।

ওরা কারা? জিজ্ঞেস করল হাসান তারিক।

চোর ডাকাতের কারাগার এটা নয়। সবাই ওরা বিদ্রোহী।

কি ধরনের লোক ওরা, ভিকটর?

সবাই নামী-দামী। হয় আমলা না হয় পার্টির, অথবা সেনা বা পুলিশের হোমরা-চোমরা ধরনের কেউ। কৃষক ও মোল্লা বিদ্রোহীদের কোন বিচারের প্রয়োজন হয় না। ওরা আকস্মাৎ একদিন হারিয়ে যায়।

একটা হুইসেলের শব্দ পাওয়া গেল। ভিকটর বলল, সুপার ভিজিটে বেরিয়েছে, যাই স্যার। বলে নাস্তার ট্রলি ঠেলে নিয়ে চলে গেল ভিকটর।

নাস্তা সেরে আজ তাড়াতাড়িই লাইব্রেরীতে চলে এল হাসান তারিক। মনটা তার ভাল নেই। আজিমভের কথা ভুলতে পারছে না সে। লোকটিকে সে দেখেনি কিন্তু না দেখলে কি হবে, ভাইকে তো দেখার প্রয়োজন হয় না।

লাইব্রেরীর গেটে পৌঁছতে গেট সিকিউরিটি রুটিন মাফিক লাইব্রেরী কার্ড চেক করে হাসান তারিককে তার নির্দিষ্ট কক্ষে পৌঁছে দিল। একমাত্র আলিয়েভার কক্ষ ছাড়া অন্য কোন কক্ষে যাবার অনুমিত তার নেই। নিয়ম হলো, বইয়ের ক্যাটালগ দেখে যে বই সে চাইবে সে বই তাকে এনে দেয়া হবে। আলিয়েভার কক্ষ পাশেই। কোন বইয়ের প্রয়োজন হলে তবেই সে আলিয়েভার কক্ষে যায়, তাছাড়া আলিয়েভাই তার কক্ষে আসে। খোঁজ খবর নেয়, কথাবার্তা বলে। প্রথম দিকে বাইরের কোন খবরই তার কাছ থেকে পাওয়া যেত না। কিন্তু পরে সে কিছু কিছু করে বলত-মিন্দানাওয়ে ইসলামের অভ্যূত্থানের খবর সে তার কাছ থেকেই পায়। মনে হয়েছিল খবরটায় যেন আয়িশা অলিয়েভাও খুশী হয়েছে। হাসান তারিক চট করে জিজ্ঞেস করেছিল আপনাকে তো খুশী মনে হচ্ছে।

জবাব দেয়নি আয়িশা আলিয়েভা। মুখটা তার গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। পরে অবশ্য সে বলেছিল, আপনি আনন্দিত হয়েছেন তাই আমার আনন্দ।

তাই না কি? আলিয়েভার চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করেছিল হাসান তারিক।

কেন নয়?

আয়িশা আলিয়েভাকে এতটা নীচে নামিয়ে আমি কল্পনা করতে চাই না।

কয়েকটা মুহূর্ত নিস্পলক চোখে তাকিয়েছিল আলিয়েভা হাসান তারিকের দিকে। পরে নিজের চোখটা বন্ধ করে স্বগতঃই যেন বলেছিল, সুপারম্যানরা সবাইকে সুপারম্যানই ভাবে, কিন্তু সেটা ঠিক নয়।

কিন্তু মিস আয়িশা, নিজের যা পছন্দ অন্যের জন্য তা পছন্দ করাই ইসলামের শিক্ষা।

আবারও মুহূর্তকাল চুপ থাকল আয়িশা আলিয়েভা। তারপর ধীরে ধীরে বলল, আপনার সাক্ষাৎ না পেলে একথা আমি বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু তবু জিজ্ঞেস করি, এমন মানুষ হয়তো সম্ভব কিন্তু এমন মানুষের সমাজ কি সম্ভব?

কেন সম্ভব নয়? কম্যুনিস্ট সমাজ কি একদিন সম্ভব ছিল?

হাসল আয়িশা আলিয়েভা। হঠাৎ টেবিল থেকে উঠে দাঁড়াল, এক্ষুনি আসছি। বলে সে বেরিয়ে গেল হাসান তারিকের ঘর থেকে। মিনিট খানেক পরেই আবার ঘরে ঢুকল। নিচু কন্ঠে বলল, দেখে এলাম কেউ আছে কিনা। তারপর টেবিলে বসে বলল, এবার আপনার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। কম্যুনিস্ট সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের জন্য মানুষ নয়, অমানুষ প্রয়োজন যা আজকের সমাজে প্রচুর মিলে। কিন্তু আপনার সমাজ কায়েমের জন্য সুপারম্যান প্রয়োজন।

আয়িশা আলিয়েভা কথা শেষ করল। বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হাসান তারিক তার দিকে। একি মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের গোল্ড মেডালিস্ট সেই আয়িশা আলিয়েভা! হাসান তারিক বলল, কথাগুলো কি ঠিক ঠিক বললেন?

আলিয়েভার মুখে সেই হাসি। বলল, বিশ্বাস হচ্ছে না? বিষয়টা খুব সোজা। কম্যুনিস্ট নীতিবোধ এবং মানুষ যুগ যুগান্ত ধরে যে নীতিবোধ গড়ে তুলেছে তা এক নয়। মানুষের নীতিবোধের দৃষ্টিতে কম্যুনিস্টরা অমানুষ। আগের কথা যেন একটু পাশ কাটাবার চেষ্টা করল আয়িশা আলিয়েভা।

ঠিক বলেছেন, তবে জগতে নীতিবোধ একটাই। কম্যুনিস্টদের যেটা সেটা বিচ্যুতি। মানুষের নীতিবোধের ওপর দাঁড়িয়ে থেকে কম্যুনিস্টরা যে তাদের বাঞ্ছিত সমাজ পরিবর্তন ঘটানোর কথা চিন্তা করতে পারেনি ইতিহাসের কাছে কম্যুনিজমের এটাই সবচেয়ে বড় পরাজয়। তাদের আদর্শের অবাস্তবতারও এটাই বড় প্রমাণ। থামল হাসান তারিক। তারপর বলল, সুপারম্যান বলে কোন জিনিস নেই। যেমন জড়-জগৎ, যেমন পশুকুল, পাখিকুল, তেমনি মানুষই আপনার দৃষ্টিতে সুপারম্যান। এ সুপারম্যান তৈরী কঠিন নয়। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং অবশ্যম্ভাবী যে পরকাল সে পরকালের জওয়াবদিহির সদা জারুক ভয়ই এ সুপারম্যান গড়তে পারে।

প্রথম দিকে আয়িশা আলিয়েভা পোষাক-আশাকেও ছিল আগুনের একটা নগ্ন স্ফুলিংগ। বাঁধ ভাঙা গতি ছিল সে স্ফুলিংগের। আর সম্মোহনী একটা আকর্ষণ ছিল তাতে। কিন্তু হাসান তারিক ছিল বরফের মত ঠান্ডা। সে ঠান্ডার সংস্পর্শে এসে আলিয়েভার সে সম্মোহনী আগুন একদিন নিভে গেল। হাসান তারিক আয়িশা আলিয়েভার সামনে তার চোখ সর্বদা নত করে রাখত। একদিন প্রশ্ন করল আলিয়েভা, আপনি মেয়েদের বড্ড ভয় করেন।

কেমন করে?

আপনি মেয়েদের দিকে তাকাতে ভয় পান।

না, মেয়েদের দিকে তাকাতে ভয় করি না, ভয় করি আল্লাহকে।

অর্থাৎ!

অর্থাৎ স্ত্রী এবং যাদের সাথে বিয়ে বৈধ নয় তাদের ছাড়া সবার ক্ষেত্রে চোখকে পর্দা করতে, দৃষ্টিকে সংযত রাখতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে? আর আজকাল মাথাও গায়ের ওড়না মেয়েদের উঠে গেছে। একটি মুসলিম চোখ এ নগ্নতা দেখতে অভ্যস্ত নয়।

আলিয়েভা সেদিন আর কোন কথা বলতে পারেনি। এরপর থেকে তার পোষাকের পরিবর্তন ঘটল, আচরণেও। এইভাবে আলিয়েভা একজন বন্দী মানুষের ইচ্ছার কাছে অথবা তার মনের অবচেতন অংগনে জিইয়ে রাখা নীতিবোধের কাছে কম্যুনিস্ট নীতিবোধ বিসর্জন দিতে দ্বিধা করেনি।

হাসান তারিক অনেকক্ষণ ধরে বসে আছে পড়ার টেবিলে। পড়ায় মন বসছে না। ভিকটরের দেয়া খবরের সবটা আজ তাকে সত্যিই বিচলিত করে তুলেছে। এখানকার মুসলমানরা কম্যুনিস্ট ঔপনিবেশিকদের হাত থেকে মুক্তির জন্য এই যে জীবন দিচ্ছে, তার কিছুই বহির্বিশ্ব জানতে পারছে না। কত আজিমভ জীবন দিয়েছে, আরও কত আজিমভ জীবন দেবে কে জানে! এই ভাবনার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল হাসান তারিক।

'কি ভাবছেন এত'- আলিয়েভার এই প্রশ্নে সম্বিত ফিরে পেল সে। তাকিয়ে দেখল দরজায় দাঁড়িয়ে আয়িশা আলিয়েভা। মাথায় সাদা রুমাল বাধা। সাদা উজবেকী গাউন- যা কোনদিন আর আলিয়েভা পরেনি। ঠোঁটে লিপস্টিক নেই! মুখেও রংয়ের কোন কারুকাজ নেই- সেখানে এক শুভ্রতা। সব মিলিয়ে আলিয়েভো একখন্ড শুভ্র ফুল। হাসান তারিক বলল, বাঃ, এক নতুন পোষাকে আপনাকে দেখা গেল আলিয়েভা। কখন এসেছেন?

দরজায় দাঁড়িয়ে পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে আলিয়েভা তাকিয়েছিল হাসান তারিকের দিকে। চোখের দৃষ্টিতে এক গভীর বিষণ্নতা। বলল, অনেকক্ষণ এসেছি, কি ভাবছিলেন এমন করে?

গলার স্বরটাও নতুন লাগল হাসান তারিকের কাছে। এমন নিস্তরঙ্গ কন্ঠ আয়িশা আলিয়েভার নয়। আলিয়েভার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে হাসান তারিক বলল, তোমাকে মানে আপনাকে কেমন মনে হচ্ছে যেন আজ, আসুন.....।

হাসান তারিককে কথা শেষ করতে না দিয়ে আলিয়েভা বলল, আর 'আপনি' নয় 'তুমি'।

গলাটা কেঁপে উঠল আলিয়েভার। তারপর বুকের কাছে গাউনের নিচ থেকে একটি খাম বের করে দ্রুত এগিয়ে এল হাসান তারিকের কাছে। খামটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, এটি রাখুন। আমি বিদায় নিতে এসেছি।

শেষের কথাগুলো বলতে গিয়ে তার গলা জড়িয়ে গেল। আলিয়েভার হাত থেকে চিঠি হাতে নিল হাসান তারিক। হাসান তারিক আবার জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিল তার কি হয়েছে? কিন্তু দেখল, ফুলের পাঁপড়ির মত ঠোঁট দু'টি তার কি এক অব্যক্ত বেদনায় কাঁপছে। চোখ দু'টিতে তার আমুদরিয়া-শিরদরিয়ার সব

পানি এসে যেন জমেছে। কোন কথাই সে বলতে পারছে না। মুহূর্তের জন্য চোখ বুঁজল হাসান তারিক। তারপর চোখ দু'টি নিচু রেখেই বলল, চিঠিতে কি আছে আমি জানি না। যখন চিঠি পড়ব, তখন আর তোমার কিছুই বলার সুযোগ হবে না।

একটু থামল হাসান তারিক। তারপর বলল, বড় দুঃখী আজ এই মধ্যে এশিয়ার মুসলমানরা। তুমি যা হও, যাই কর, ভুলে যেও না তুমি তাদেরই একজন। আমুদরিয়া শিরদরিয়ায় মুসলিম রক্তের যে স্রোত বইছে, ভুলে যেও না তা তোমারই স্বজনের।

শেষের কথাগুলো ভারী হয়ে উঠল হাসান তারিকের। চোখ তুলল, হাসান তারিক। দেখল, দুহাতে মুখ ঢেকেছে আলিয়েভা। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে।

হাসান তারিকের ইচ্ছে হলো বাইরে গিয়ে দেখে আসে আলিয়েভা কোথায়! কিন্তু পরক্ষণেই ভাবল, না আলিয়েভা এতক্ষণে হয়তো এ ভবনেই আর নেই।

আয়িশা আলিয়েভার দেওয়া খামটা তখনও হাতে। উল্টে-পাল্টে দেখল কোথাও কোন লেখা নেই, সাদা খাম। খামটি খোলা। চিঠি বের করে নিল খাম থেকে। চারভাঁজ করা চিঠি। খুলে পড়তে শুরু করল তারিক।

প্রিয় তারিক,

প্রিয় বলেই সম্বোধন করলাম। কারণ, আমার ফ্লাট, আমার অফিস আর আমি নিয়ে আমার যে ছোট্ট জগত সেখানে এই মুহূর্তে আপনার চেয়ে প্রিয় আর আমার কেউ নেই। আমি মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্রী, সুন্দরীও। একদিন এজন্য আমার গর্বের অন্ত ছিল না। কিন্তু আজ বুঝতে পারছি, এ দুটি জিনিসই আমার ক্ষতি করেছে সবচেয়ে বেশি।

আমার আব্বা মারা গেছেন আজ থেকে পনের বছর আগে। একটি ভাই মাত্র ছিলো। নাম আবু উমরভ।

ফ্র-এর রেড আর্মির একজন কর্নেল সে। সেই যে আফগান যুদ্ধে গেছে আর ফিরে আসেনি! কেউ বলে মারা গেছে, কেউ বলে সে মুজাহিদদের পক্ষে যোগ দিয়েছে। আমি যখন মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশানস এ প্রথম স্থান অধিকার করে পাস করলাম তখন ভেবেছিলাম শিক্ষকতার চাকুরী আমি পাচ্ছি। আর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সময় এ বৃত্তিকেই আমার পছন্দ বলে লিখেছিলাম। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরী পেলাম না। আমার একজন সহপাঠি আগেই বলেছিল, কোন তুর্কিকে এ চাকুরী দেয়া হবে না। তার কথাই সত্য হলো। পাস করার পর আমাকে ফরেন সার্ভিসে যোগ দিতে বলা হলো। সেই সাথে আমাকে জানান হলো, ফরেন সার্ভিসে যোগ দেবার আগে দু'বছর আমাকে গোয়েন্দা বিভাগে কাটাতে হবে এ বৃত্তি আমার পছন্দ নয়, কিন্তু এ কথা প্রকাশের কোন সাধ্য আমার ছিল না। বেঁচে থাকতে হলে এ আদেশ মানতে হবে।

ফ্র-এর গোয়েন্দা বিভাগে ক্যারেকটার এ্যাসাসিনেশান স্কোয়াডে আমাকে রাখা হলো। শুনলাম আমার রূপ আর বুদ্ধিই নাকি এর কারণ। বিদেশ থেকে আসা অনেক নামী-দামীদের সঙ্গ দিয়ে তাদের বাগে আনতে হবে যার জন্য রূপ আর গুণ দুই-ই প্রয়োজন। এর আগে দু'টো এ্যাসাইনমেন্ট আমি পেয়েছি। দু'টোতেই ফেল করেছি। নিজের ক্যারেকটার এ্যাসাসিনেট করতে চাইনি বলে কারো চরিত্র আমি এ্যাসাসিনেট করতে পারিনি। এই দায়িত্ব থেকে মুক্তির জন্য আমি সবিনয় অনুরোধ জানিয়েছিলাম। তার উত্তরে তারা আপনার এ্যাসাইনমেন্টটা আমাকে দিয়েছে, বলে দিয়েছে আমি যদি এ এ্যাসাইনমেন্টে সফল হই, তাহলে এ দায়িত্ব থেকে আমাকে মুক্তি দেয়া হবে এবং বিবাহ করে সংসার জীবনে প্রবেশ করতে অনুমতি দেয়া হবে। আপনাকে শয্যা সঙ্গী করাই ছিল আমার এ্যাসাইনমেন্ট। এ জন্য যে জায়গাটি নির্দিষ্ট ছিল সেখানে ছিল গোপন টেলিভিশন ক্যামরা। দিনের পর দিন বিভিন্ন ভঙ্গিতে এখানে ছবি উঠত। এ ছবিগুলো দিয়ে আপনাকে ব্ল্যাকমেইল করা হতো। এই ভাবে আপনাকে হাতের

মুঠোয় এনে, আপনাকে মুসলিম বিশ্বে আপনার সংগঠনের মধ্যে ছেড়ে দেয়া হতো কম্যুনিস্টদের বিশ্বজোড়া 'ফ্র'-এর পক্ষে গোয়েন্দাগিরির জন্য।

তাদের এ আশা আমি পূরণ করেত পারিনি। আমার রূপ যৌবন যা এই প্রথমবারের মত বিলিয়ে দিতে চেয়েছিলাম আমার নতুন জীবনের জন্য, আপনার পাথরের মত হৃদয়ে কোনই কম্পন সৃষ্টি করতে পারেনি। তৃতীয় বার ব্যর্থ হলাম আমি। এ ব্যর্থাতার নিশ্চয় ক্ষমা নেই। গতকাল আমি আমার ব্যর্থতার রিপোর্ট ডিপার্টমেন্টকে দিয়েছি। আজ সন্ধ্যায় আমাকে ডাকা হয়েছে। জানিনা কোন ভাগ্য আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

আগে হলে ভয় পেতাম বর্তমান অবস্থায়। কিন্তু ভয় না করার শিক্ষা আমি আপনার কাছ থেকে পেয়েছি। যে কোন পরিণতির জন্য আমি আজ প্রস্ত্তত। শুধু একটাই দুঃখ, পরম প্রভুর বিচার দিনের যে জগতকে আপনি বিশ্বাস করতে আমাকে শেখালেন, সেই জগতের কোন পাথেয় আমার নেই। আর একটা দুঃখ, আপনাকে আর দেখতে পাব না কোন দিন।

দুনিয়াতে আমার আর কেউ নেই। যদি কোনদিন বাইরে বেরুতে পারেন, যদি আমার ভাই বেঁচে থাকে, আর তার যদি দেখা আপনি পান, মনে যদি থাকে এই দুঃখিনীর কথা, তাহলে বলবেন একজন মুসলিম উজবেক মহিলা হিসাবেই তার বোন মৃত্যুবরণ করেছে।

আপনার-

আয়িশা আলিয়েভা

উমর জামিলভের অফিস কক্ষ। বিশাল টেবিল। রিভভিং চেয়ারে বসে আছে উমর জামিলভ। তার সামনে একটা ফাইল খোলা। ফাইলটি আয়িশা আলিয়েভার। গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ছে সে ফাইল।

গুরুতর অভিযোগ আলিয়েভার বিরুদ্ধে। তিন তিনবার তার মিশন ফেল করেছে। এটা শুধু ব্যর্থতা নয়, অবাধ্যতা বলে-এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পার্টি ও রাষ্ট্রের স্বার্থের চেয়ে সে তার বস্তাপঁচা নৈতিকতাকে বড় করে দেখেছে। এই অবাধ্যতা তাকে সকল প্রকার দায়িত্বের অনুপুযুক্ত এবং শাস্তিযোগ্য করে তুলেছে।

এই অপরাথের নির্ধারিত শাস্তি হলো, সাইবেরিয়া অথবা সুদূর কোন লেবার ক্যাম্পের (শ্রম শিবির) জীবন বরণ করে নেয়া।

কিন্তু আলিয়েভার অপরাধ আরও গুরুতর। সে শত্রুর সাথে যোগাসাজস করেছে, শত্রুর কাছে রাষ্ট্রের গোপন তথ্য ফাঁস করেছে। লাইব্রেরী কক্ষের টেলিভিশন ক্যামেরা এবং টেপ এর সাক্ষী। ফাইলে তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। ফাইলে রয়েছে আলিয়েভার সেই সর্বশেষ চিঠিও যা সে হাসান তারিককে দিয়েছিল। আলিয়েভা যখন হাসান তারিককে চিঠি দেয় এবং হাসান তারিক যখন চিঠি পড়ছিল, সবই দেখেছে সিকিউরিটি লোকরা কনট্রোল রুম থেকে। চিঠি পড়তে অর দু'মিনিট দেরী করলে চিঠি আর পড়া হতো না হাসান তারিকের। যখন চিঠিটি পড়ছিল হাসান তারিক, সিকিউরিটির লোকেরা ছুটছিল সে রুমের দিকে। চিঠি পড়ার মুহূর্তকয় পরেই তারা সেখানে গিয়ে হাজির হয়। টেপ এবং চিঠি দুই-ই মনোযোগ দিয়ে পড়ল উমর জামিলভ। পড়তে পড়তে ঘেমে উঠেছিল সে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরেও কপালে জমে উঠেছে তার বিন্দু বিন্দু ঘাম। হাসান তারিকের কথার মধ্যে বার বার তার দাদীর মুখ সে ভেসে উঠতে দেখেছে।

দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে মনটাকে শক্ত করল উমর জামিলভ। আলিয়েভার শেষ অপরাধটা অত্যন্ত গুরুতর। এ বিদ্রোহের একমাত্র শাস্তি ফায়ারিং স্কোয়াড। আর এ সুপারিশ করার দায়িত্ব তার ওপরই অর্পণ করা হয়েছে।

ইন্টারকমে নির্দেশ দিল, সাতটায় আয়িশা আলিয়েভা আসবে। এলেই এখানে পাঠাবে। ও প্রান্ত থেকে উত্তর এল, ইয়েস স্যার।

ফাইলটি বন্ধ করে চেয়ারে গা এলিয়ে দিল উমর জামিলভ। একটু রেস্ট নেবার জন্য ফাইল বন্ধ করল বটে, কিন্তু সংগে সংগে দেশের ফাইলটা খুলে গেল তার সামনে। দেশ বলতে আপাতত সে মধ্য এশিয়াকেই বুঝাচ্ছে। কি ঘটছে এখানে! প্রশাসন যাই বলুক না কেন, খবর তো আমাদের কাছে আছে। জনমত ক্রমশঃই বিগড়ে যাচ্ছে। আর যতই এ প্রবণতা বাড়ছে, শাসন ততই কঠোর করা হচ্ছে। কিন্তু ফল কি হচ্ছে তাতে? 'ফ্র'-এর কম্যুনিস্ট শাসনের সাথে এ অঞ্চলের তুর্কিদের মনের ব্যবধান ক্রমশঃই বাড়ছে। বড় ক্ষতি করেছে আফগান যুদ্ধ। যা এ অঞ্চলের মানুষ কোনদিন কল্পনা করেনি, যা সম্ভব বলে কোনদিন ভাবেনি,

আফগানদের সংগ্রাম আজ তাকেই সম্ভব প্রমাণ করে দিয়েছে। আফগানিস্তানের যুদ্ধ না বাঁধলে শত বছরেও এ চেতনা হয়তো মানুষের মনে জাগতো না।

৭টা বেজে ৫ মিনিট। দরজায় নক হলো। চেয়ারে সোজা হয়ে বসে বলল, এস। দরজায় নব ঘুরিয়ে ভেতরে ঢুকল আয়িশা আলিয়েভা। পরণে সেই পোষাক, যে পোষাকে সে হাসান তারিকের কাছে গিয়েছিল। সামনের একটা চেয়ার দেখিয়ে বলল, বস।

বসল আয়িশা আলিয়েভা।

ধীরে ধীরে আলিয়েভার ফাইল খুলল উমর জামিলভ। খুলতে খুলতে গম্ভীর কন্ঠে বলল, কি জন্য তোমাকে ডাকা হয়েছে জান?

জানি স্যার।

কি জান? আলিয়েভের দিকে না তাকিয়েই জিজ্ঞেস করল উমর জামিলভ।

আমার বিচারের জন্য।

এবার মুখ তুলল উমর জামিলভ। কি যেন সে পাঠ করতে চাইল আয়িশা আলিয়েভার মুখে। তারপর বলল, দন্ড কি তুমি স্বীকার করে নিচ্ছ?

আমার স্বীকার করা না করার কি মূল্য আছে স্যার?

আলিয়েভা তুমি অবুঝ নও। তুমি নিজের ওপর অবিচার করছ। কিছুটা ধমকের সুরেই কথাগুলো বলল উমর জামিলভ। তারপর একটু থেমে আবার বলল, মিশন তোমার ফেল করেছে, এটার ব্যাখ্যা হয়তো দেয়া যায়। কিন্তু তোমার এ চিঠির অর্থ কি আলিয়েভা? বলে চিঠিটি এগিয়ে দিল আলিয়েভার দিকে। চিঠির নজর পড়তেই চমকে উঠল আলিয়েভা। কিন্তু তা মুহুর্তের জন্য। পরে তার মুখটা আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। চোখে-মুখে দৃঢ়তার একটা চিহ্ন ফুটে উঠল।

উমর জামিলভ আলিয়েভার দিকে তাকিয়েছিল। যেন পাঠ করছিল তার মুখকে। আবার কথা শুরু করল সে, হাসান তারিকের সাথে তোমার যে কথাগুলো হয়েছিল তা কি তোমার মনে পড়ে আলিয়েভা? দেখ তারও বিবরণ এখানে আছে। বলে ফাইল থেকে পিন আঁটা কয়েক শিট কাগজ দিল আলিয়েভার দিকে।

আলিয়েভা কাগজটিতে কি আছে না দেখেই বলল, আমি সবই স্বীকার করে নিচ্ছি স্যার।

স্বীকার তো তোমাকে করতেই হবে। তোমার কোন বক্তব্য আছে কিনা তাই বল।

জামিলভের স্বরটা এবার কঠোর শুনাল। মনে হলো, আলিয়েভার এ সরাসরি কথাগুলো সে পছন্দ করছে না। যেন সে চাইছে, আলিয়েভা কারণ দর্শাও অভিযোগের। আত্মপক্ষ সমর্থন করুক।

আলিয়েভা বলল, আমি দুঃখিত স্যার, আমার কোন বক্তব্য নেই। চিঠিতে আমি যা লিখেছি সজ্ঞানেই লিখেছি, টেপে আমার যে কথাগুলো আছে তা সচেতনভাবেই বলেছি।

একটু থামল আলিয়েভা। তারপর বলল, এখনও বলতে বললে এই কথাগুলো অমন করেই আমি বলব। আমি একটি কথাও মিথ্যা বলিনি।

শত্রুর সাথে যোগসাজস এবং শত্রুকে তথ্য সরবরাহের অভিযোগ তাহলে স্বীকার করে নিচ্ছ?

আমি আমার চিন্তা ও আমার কথা এমন একজনকে জানিয়েছি যাকে আমি শত্রু মনে করি না।

তুমি গোয়েন্দা বিভাগের একজন অফিসার তা তুমি জান?

জানি, কিন্তু আমার একটা ব্যক্তিসত্ত্বাও আছে।

আমি তোমার জন্য দুঃখিত আলিয়েভা, তুমি অবুঝের মত কথা বলছ, আর নিজের সর্বনাশ ডেকে আনছ।

দুঃখিত স্যার, আমি এ দুর্বিসহ জীবন আর সইতে পারছি না। আমাদের ঈমান, আমাদের পরিচয় সবই তো কেড়ে নিয়েছেন, চরিত্রের পবিত্রতাটুকু তাও আমি রাখতে পারবো না। স্যার, এ জীবন কি কোন জীবিতের জীবন?

আবেগ রুদ্ধ হয়ে এল আয়িশা আলিয়েভার কন্ঠ। তার দিকে তাকিয়ে ছিল জামিলভ। ধীরে ধীরে তার চোখ দুটি নীচে নেমে এল । নত হল মাথা। ভাবছে সে। আলিয়েভার এ কথাগুলোর কি দন্ড তার জানা আছে, কিন্তু তার ঐ জিজ্ঞাসার

কোন জবাব তার কাছে নেই, যেমন জবাব জানা নেই তার দাদীর অনেক জিজ্ঞাসার।

ধীরে ধীরে জামিলভ বলল, আলিয়েভা বাস্তববাদী হও। বয়স তোমার কম। যদি তুমি অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা কর, তাহলে আমি চেষ্টা করব তোমার জন্য।

আলিয়েভা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। বলল, এ লাইনে এমন হৃদয় কারো আছে আমার জানা ছিল না। আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ স্যার। কিন্তু আমি কিসের জন্য অনুতপ্ত হবো, কি জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব? এক সময় আমি অন্ধ ছিলাম, চোখ ফিরে পেয়েছি। আমি আর অন্ধ হতে পারবো না স্যার।

সেই নরম সুরে আবার জামিলভ বলল, আরো ভেবে দেখ আলিয়েভা, তোমার ঐ চোখের চেয়ে জীবনটা বড় কিনা?

রুমালে চোখ মুছে আলিয়েভা বলল, স্যার, এ চোখ চোখ নয়, জীবনের মূলমন্ত্র। এর জন্য হাজার নয় লাখ লাখ মানুষ হাসিমুখে তাদের জীবন বিলিয়ে দিয়েছে, ইতিহাস তাদের কাহিনীতে ভরপুর। আমার এক ক্ষুদ্র জীবন তো কিছুই নয় স্যার।

বিস্মিত জামিলভ তাকিয়ে আছে আলিয়েভার দিকে। এ বিস্ময় দৃষ্টি তার কতক্ষণ থাকতো কে জানে। কিন্তু হলো না। টেলিফোন বেজে উঠল। লাল টেলিফোন! ত্রস্ত হাতে তুলে নিল রিসিভার। ওপার থেকে ভেসে এল উজবেকিস্তান ‘ফ্র’-এর ফার্স্ট সেক্রেটারী কোনায়েভের গলা। বলল, আলিয়েভার ফাইল কখন পাঠাচ্ছ?

অল্পক্ষণ, স্যার।

ঠিক আছে।

ওপার থেকে রিসিভার রাখার শব্দ পাওয়ার পর নিজের রিসিভার রেখে দিল জামিলভ। চেহারা তার বিমর্ষ।

কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে চুপ করে বসে থাকল জামিলভ। তারপর ধীরে ধীরে মাথা তুলে বলল, তোমার সাথে আমার কথা শেষ আলিয়েভা।

আলিয়েভা উঠে দাঁড়াল। তার সাথে উঠে দাঁড়াল জামিলভও। উঠে গিয়ে নিজ হাতে সে দরজা খুলল। আলিয়েভার সাথে সেও বেরিয়ে এসে দরজার বাইরে দাঁড়াল। অস্ফুট প্রায় স্বরে বলল, দুনিয়াতে তোমার কেউ নেই একথা ভেব না আলিয়েভা। জান না তুমি, তোমার অনেক আছে। একটু থেমে জামিলভ বলল, তোমাকে আমার দেবার মত কিছু নেই, আমার শ্রদ্ধা গ্রহণ কর।

জামিলভের কথা শুনে ঘুরে দাঁড়াল আলিয়েভা। কিছু সে বলতে যাচ্ছিল। ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে নিষেধ করল জমিলভ। আলিয়েভা কিছু বলল না। তার চোখ দু'টি মাত্র একবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। চলে গেল আলিয়েভা। নিজের চেয়ারে ফিরে এল জামিলভ। আলিয়েভার ফাইল খুলল। নোট শিট গাঁথাই আছে। কলম তুলে নিল জামিলভ। হাত বড় দুর্বল। কলম কাঁপছে। চোখটা কেমন যেন ঝাপসা হয়ে আসছে তার। হঠাৎ মনে পড়ল ফার্স্ট সেক্রেটারী এ ফাইলের জন্য বসে আছেন। আর তার সাথেই বসে আছে এক সদস্যের ট্রাইবুন্যাল। তাড়াতাড়ি কলম চালাল জামিলভ। অপরাধের গদবাঁধা বিবরণী। তারপর দন্ডাদশের সুপারিশ। লেখা শেষ করল জামিলভ। হাত থেকে কলমটিই গড়িয়ে পড়ে গলে। আলিয়েভা, তার দাদী দু'জনেরই ছবি ভেসে উঠল তার চোখের সামনে। নিষ্পাপ দু'টি মুখ। পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখের ভিজা কোণ মুছে নিয়ে ইন্টারকমে ডেকে পাঠাল পি, এ, কে। ফাইল এখুনি পাঠাতে হবে।

# ৬

পামিরের একটি ছোট্ট গ্রাম। নাম আল্লাহ বকশ। পাহাড়ের ঢালে সুপ্রশস্ত করিডোর। এই করিডোর ঘিরেই গড়ে উঠেছে গ্রামটি। পাশ দিয়েই প্রবাহিত বেগবান ছোট পাহাড়ী নদী। নদীটি নেমে এসেছে সবুজ বনানী ঢাকা পাহাড়ের মাথায় দাঁড়ানো চির বরফ ঢাকা হিন্দুকুশের শৃংগ থেকে। এই আল্লাহ বকশ গ্রামটির সংকীর্ণ পাথুরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওপর দিকে চাইলেই দেখা যাবে পাহাড়ের গায়ে ওয়ালনাট বৃক্ষের সারি।

গ্রামটি ছোট হলেও শতাধিক তাজিক মুসলিম পরিবারের বাস এখানে। প্রায় এক মাইল লম্বা গ্রামটি। বেশ পাতলা বসতি। প্রতিটি বাড়ি ঘিরেই রয়েছে বহু কষ্টে গড়া বাগান ও শস্য ক্ষেত। শুকনো সময়ে নদী থেকে সংগ্রহ করা বালু, মাটি দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে এ বাগান ও শস্য ক্ষেতগুলো। এ বাগান ও ক্ষেতগুলোতে গমসহ সালবেরী, এপ্রিকট ও পিস ফল প্রচুর পররিমানে জন্মে। তুলাও কিছু কিছু তারা উৎপাদনে করে। এ দিয়েই কাষ্টে-শিস্টে তাদের চলে যায় দিন। পরনির্ভরতা তাদের খুব কম।

গ্রামের পশ্চিম প্রান্ত থেকে একটা সংকীর্ণ গিরিপথ এগিয়ে গেছে উত্তর দিকে। পায়ে হেটেঁ কিংবা ইয়াকে চড়ে এ রাস্তায় যাতায়াত করা যায়। এ রাস্তায় মাইল পাঁচেক এগুলে ঐতিহাসিক পামির সড়কে পৌঁছা যায়। ঐতিহাসিক এ সড়কটি উজবেকিস্তানের ফারগানা থেকে প্রায় একশ মাইল উত্তর-পূর্বে রেল পথের শেষ প্রান্ত থেকে বেরিয়ে ভিয়েনশালা পর্বতামালার মধ্য দিয়ে মালার মত গোটা দুর্গম পামির অতিক্রম করে এসেছে। তারপর পশ্চিমের বকশ নদী অতিক্রম করে স্টালিনাবাদ হয়ে শিরদরিয়া পেরিয়ে উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। এই আল্লাহ বকশ গ্রামের সবচেয়ে নিকটবর্তী নগর হল স্টালিনাবাদ। পাঁচশ মাইল দূরে। মাঝখানে বকশ নদীর পানি-বিদ্যুৎ কেন্দ্র ঘিরে

আরেকটি শহুরে জনপদ পাওয়া যায়। তারও দুরত্ব এখান থেকে দু'শ মাইলের মত।

গ্রামে সব মিলে পাঁচ'শ লোকের বাস। তরুণ-তরুণীদের একটা বড় অংশ স্টালিনাবাদ, বোখারা, সমরকন্দ ও তাসখন্দের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করে। আরেকটা অংশ পশুপালন ও বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। এরা সবাই গ্রামের বাইরে থাকে। ছুটি ও অবকাশের সময়গুলো তারা গ্রামে এসে কাটায়। বাকীরা গ্রামে পিতামাতার সাথে সংসার দেখাশুনা করে।

গ্রামের একদম পূর্বপ্রান্তে আবদুল গফুরের বাড়ি। তার বয়স এখন ৭০ বছর। বেশ শক্ত-সামর্থ্য। এখনও যুবকদের মতই তিনি শক্ত পায়ে পাহাড় ডিঙাতে পারেন। গ্রামের তাজিক কবিলার প্রধান ছিলেন তিনি। তার মরহুম আব্বাও এ দায়িত্ব পালন করে গেছেন। এ কবিলার আদি নিবাস ছিল পিয়ান্দজ নদীর উপত্যকা অঞ্চলে। বোখারা, সমরকন্দ দখলকারী কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের মুক্তি সংগ্রামের সময় এলাকাটি বিধ্বস্ত হয়, জনপদ বিরাণ হয়ে যায়। সেই সময় তাঁর দাদা আবদুর রহমান তাঁর কবিলার অবশিষ্ট লোক সহ এই পাহাড়ে এসে আশ্রয় নেন। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তিনি এ কবিলার সর্দারী গ্রহণ করেন। কিন্তু তাজাকিস্তানের কম্যুনিস্ট সরকার ততদিনে এ গ্রামেও এসে পৌঁছে। গ্রামের সব যুবক তরুণরা পালিয়ে যায়। তাদের সাথে আবদুল গফুরের বড় ছেলেও পালিয়ে যায়। অনেকেই পরে ফিরে এসেছে, কিন্তু তাঁর ছেলে আর ফিরে আসেনি। গ্রামে কম্যুনিস্ট সরকার আসার পর অনেকের সাথে আবদুল গফুরকেও নিগ্রহের শিকার হতে হয়। তাঁর সর্দারী চলে যায়। কম্যুনিস্ট সরকারের তৈরী একটা রাজনৈতিক ইউনিয়ন গ্রামের সব কিছু দেখার অধিকার পায়। প্রথমে বাইরে থেকে কয়েকজনকে এনে এই রাজনৈতিক ইউনিয়নের দায়িত্ব দেয়া হয়। এখন সে ইউনিয়ন নেই। তার জায়গায় যৌথ খামারের অনুকরণে গঠিত একটা বহুমুখী সমবায় গ্রামের জীবন নিয়ন্ত্রন করে। সমবায় প্রধান আঞ্চলিক কাউন্সিলে এ গ্রামের রাজনৈতিক প্রতিনিধি ও দায়িত্ব পালন করে। হাত ঘুরে আবদুল গফুরের মেজ ছেলে আবদুল্লায়েভের হাতে আজ গ্রাম সমবায়ের দায়িত্ব এসেছে। আবদুল্লায়েভ ছাড়া আবদুল গফুরের আরও তিনটি সন্তান রয়েছে। তৃতীয় ছেলে

ইকরামভ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগরে ছাত্র। চতুর্থ ও সর্ব কনিষ্ঠ ছেলে জিয়াউদ্দিন বোখারার মীর-ই-আরব মাদ্রাসার উচ্চ শ্রেণীতে পড়ে। আবদুল গফুরের একটি মাত্র মেয়ে, মেধাবী ছাত্রী। রাষ্ট্রীয় বিশেষ স্কলারশীপ নিয়ে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগে অধ্যয়ন করছে। নাম ফাতিমা ফারহান।

রাতের আল্লাহ বকশ গ্রাম গভীর ঘুমে অচেতন। নিরব গ্রাম, নিরব বনানী, ততোধিক নিরব আদিগন্ত পাহাড় শ্রেণী। কৃষ্ণা নবমীর চাঁদ উঠেছে পূর্ব দিগন্তে। বনানীতে, পাহাড়ে আলো আঁধারের খেলা। ছোট নদীটির বুকে পাহাড়ের কালো ছায়া কালো করে তুলেছে নদীর সফেদ বুককে।

রাতের তৃতীয় যাম প্রায় শেষ। আবদুল গফুরের বাড়ির উত্তর ভিটার দক্ষিণমুখী ঘরের দরজা খুলে গলে। বেরিয়ে এলেন বৃদ্ধ আবদুল গফুর। তিনি এবং তার স্ত্রী আলিয়া এই ঘরেই থাকেন। প্রাচীরে ঘেরা বিশাল ভেতর বাড়িতে আরও পাঁচটি ঘর রয়েছে। এখানে ছেলেরা থাকে। ভেতর বাড়ির পিছন দিকে প্রাচীরের বাইরে একটু দূরে ভেড়া ও ইয়াকের আস্তাবল। আর দক্ষিণ দিকে প্রাচীরের সাথে মেহমানখানা ও বৈঠকখানা। এর পরেই বাগান, তারপর নদী। বাড়ির অন্য তিন দিক ঘিরে বিস্তৃত ক্ষেত। প্রাচীরের গায়ে মেহমান খানায় যাবার একটা দরজা রয়েছে। এছাড়া রয়েছে বাড়ি থেকে বেরুবার প্রধান ফটক। উত্তর প্রাচীরে আস্তাবলে যাবারও রয়েছে আরেকটা দরজা।

আবদুল গফুরের পর তার স্ত্রী আলিয়াও বেরুলেন ঘর থেকে। দু'জনেই তাহাজ্জুদ পড়েন। তাঁরা অজু করে আবার ঘরে চলে গেলেন। তাহাজ্জুদ নামাযের এই অভ্যাস আবদুল গফুর তাঁর পিতার কাছ থেকে পেয়েছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মত এ নামাযও তাঁর কাজা হয় না। রাতের এই যে তৃতীয় যামে তিনি উঠেন আর ঘুমান না। তাহাজ্জুদ শেষে তিনি বাগানে, নদীর ধারে কিছুক্ষণ বেড়ান। তারপর মসজিদে ফজরের জামায়াতে শামিল হন। চার পাঁচটি বাড়ি পেরিয়ে একটু পশ্চিমে এগুলেই মসজিদ। আগে মসজিদ আবদুল গফুরের বাড়ির সীমার পরেই যেখানে ফাঁকা জায়গাটা সেখানে ছিল। কম্যুনিস্টরা এ গ্রামে ঢোকার পর এ সমজিদ ভেঙে ফেলে। কয়েক বছর পর গ্রামবাসীদের চাপে তদানিন্তন

রাজনৈতিক ইউনিয়ন মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দেয়, কিন্তু আগের জায়গায় তা নির্মানের অনুমতি মেলেনি।

প্রতিদিনের মতই তাহাজ্জুদ পড়ে ঘর থেকে বেরুলেন তিনি। কিন্তু নিত্যকার মত সোজা বাইরে না গিয়ে তৃতীয় ছেলে ইকরামভের ঘরের দরজায় দাঁড়ালেন। একটু দাঁড়িয়ে নক করলেন দরজায়। তারপর ডাকলেন ইকরামভ।

অল্পক্ষণ পর ঘর থেকে আওয়াজ এল, জ্বী আব্বা।

উঠ, ভোর হয়েছে নামায পড়।

দু'দিন হলো গ্রীষ্মের বন্ধে বাড়ি এসেছে ইকরামভ ও ফাতিমা ফারহানা। কম্যুনিস্ট যুগের চলমান ধারায় মানুষ ওরা। কিন্তু যত দিন ওরা বাড়িতে ছিল পারিবারিক ও সামাজিক ঐতিহ্য তারা পুরোপুরিই মেনে চলেছে। আরবী শিক্ষার কোন সুযোগ নেই বটে, কিন্তু বাড়িতে ও গ্রামের মক্তবে তারা দোয়া-দরুদ ও কুরআন শরীফ পড়া খুব ছোট বেলাতেই শিখেছে। মসজিদে তারা বেসরকারীভাবে এখনও মক্তব চালায়। প্রথম দিকে কম্যুনিস্ট সরকার এ মক্তব বন্ধ করে দিয়েছিল। সরকারী খাতায় মসজিদটির মত এখনও বন্ধই আছে। জনমতের চাপে স্থানীয় ও আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ গোপনে মক্তবের সম্মতি দিয়েছে।

ইকরামভ ও ফারহানা তাসখন্দ ও মস্কোতে গিয়ে চলমান ধারার সাথে মিশে গেছে বটে, কিন্তু অতীতকে ভুলে যায়নি। বিশেষ করে পিতার প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসা তাদের অপরিসীম। তাই বাড়ি এলে এবং এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ে হোস্টেলের নিভৃত কক্ষে তাদেরকে অনেক সময় নামায পড়তে দেখা যায়।

দরজা খুলল ইকরামভ।

ইকরামভকে সালাম দিলেন আবদুল গফুর। লজ্জায় লাল হয়ে গেল ইকরামভ। বলল, মাফ করুন আববা, আমার ভুল হয়েছে।

দেখা হলেই সালাম দেয়া এ সমাজের এক অতি পরিচিত সামাজিকতা। কিন্তু তাসখন্দ, আর মস্কোর সমাজ একে নির্বাসন দিয়েছে। তাই এ ভুল হওয়া স্বাভাবিক। আবদুল গফুর সস্নেহে হেসে বললেন, আল হামদুলিল্লাহ, তুমি অজু কর আমি ফাতিমাকে ডাকি।

ফাতিমা ফারহানাকে ডেকে দিয়ে আবদুল গফুর বেরিয়ে এলেন বাগানে, তারপর গেলেন নদীর ধারে। নদীর তীর থেকে পাথর আর কাদায় গড়া সিঁড়ি নেমে গেছে পানিতে। ঘাটের দু'পাশটা বেড়া দিয়ে আড়াল করা যাতে মেয়েদের কাজ ও গোসল করতে কোন অসুবিধা না হয়।

ঘাটে এসে দাঁড়িয়ে ঘাটের দিকে তাকাতে গিয়ে ঘাটের পূর্ব পাশে বেড়ার দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠলেন আবুদল গফুর। একটা বড় কাঠের বাক্স বেড়ায় আটকে পানিতে দুলছে। এগিয়ে গেলেন আবুদল গফুর। নেমে গেলেন পানির কিনারে। সাত-আট ফিট লম্বা একটা কাঠের বাক্স। ভাঙা, পরিত্যক্ত নয়- একদম নতুন। হাঁটু পরিমাণ পানিতে নেমে তিনি বাক্সটিকে টানলেন। টেনে কিনারে আনলেন। বাক্সের একটা মাথা মটিতে তুললেন। বেশ ভারি।

চলে এলেন আবদুল গফুর। ইকরামভ ও ফাতিমাকে বাক্সটির কথা বলে নামাযে চলে গেলেন তিনি।

নামায পড়ে এসে দেখলেন ওরা ধরাধরি করে টেনে বাক্সটি বাগানে নিয়ে এসেছে। আবদুল গফুর আসতেই ইকরামভ বলল, আব্বা বাক্সটা কম্যুনিজমের বিশ্ব রেড সংস্থা 'ফ্র'-এর। দেখুন, পাঠানো হয়েছে বোম্বাই থেকে তাসখন্দে। পাঠিয়েছে ভারতস্থ বিশ্ব রেড সংস্থা 'ফ্র'-এর দুতাবাস।

কিন্তু বাক্সটা এখানে নদীতে এল কি করে?

ফাতিমা ফারহানা বাক্সের গায়ের লেখাগুলো দেখছিল। তখন ফর্সাও হয়ে এসেছে অনেকখানি। একটা লেখা ভালো করে দেখে বলে উঠল, এখানে দেখুন আব্বা, তারিখটা গতকালের।

অর্থাৎ গতকাল বোম্বে থেকে পাঠিয়েছে? ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন আবদুল গফুর।

অবাক লাগছে আব্বা! চিন্তান্বিত স্বরে বলল ইকরামভ।

চিন্তা করছিলেন আবদুল গফুরও। ফাতিমা ফারহানা তখনও বাক্সটি নেড়েচেড়ে দেখছিল। বলল, দেখুন আব্বা, বাক্সের এই মাথায় অনেকগুলো ফুটো।

ফুটো? চমকে উঠলেন আবদুল গফুর।

তারপর তিনি ঝুঁকে পড়ে বাক্সটি ভালো করে পরীক্ষা করলেন। তারপর বাক্সের দৈর্ঘ্যের দিকে আরেকবার নজর করলেন। চোখ বুঁজে মুহূর্তকাল চিন্তা করে বললেন, মনে হয় এর মধ্যে জীবন্ত কোন কিছু আছে, মানুষও হতে পারে।

আঁৎকে উঠল ইকরামভ ও ফাতিমা ফারজানা দুজনেই।

আবদুল গফুর গম্ভীর কন্ঠে বললেন, ইকরামভ, বাক্সের বাঁধনগুলো কেটে দাও। বাক্স খুলে ফেল।

ইকরামভ বলল, সরকারী বিমানের জিনিস খোলা কি ঠিক হবে?

আমরা কিছুই জানি না, এই খোলাটা সরকারী প্রয়োজনও হতে পারে।

বাক্স খুলছিল ইকরামভ। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিল ফাতিমা ফারহান ও আবদুল গফুর। বাক্স খোলা হলো। খুলেই আঁৎকে উঠে দু'পা পিছিয়ে গেল ইকরামভ। বলল, আব্বা মানুষ!

দ্রুত বাক্সটির ওপর ঝুঁকে পড়লেন আবদুল গফুর। সূর্য ওঠার তখনও বেশ বাকী থাকলেও ফর্সা হয়ে গেছে। ভোরের সাদা আলোয় আবদুল গফুর দেখলেন, মুখের অংশটা ছাড়া সর্বাঙ্গ পুরো স্পঞ্জে আবৃত। কালো দাঁড়িতে আবৃত সুন্দর একটি মুখ। চোখটি তার বোজা। নাকে হাত রাখলেন আবদুল গফুর। চোখটি তার উজ্জ্বল হয়ে উঠল, না লাশ নয়। জীবিত মানুষ, জীবিত আছে।

তিনি মুখ তুলে ইকরামভ ও ফাতিমার দিকে চেয়ে বললেন, মানুষটি এখনো বেঁচে আছে। বলে তাড়াতাড়ি স্পঞ্জ তুলে টেনে খুলে ফেললেন। তারপর বললেন একরামভ, এস ধর। একে মেহমান খানায় নিয়ে চল। আর ফাতিমা ফারহানার দিকে চেয়ে বলল, মা তুমি যাও, মেহমান খানার এ দিকের দরজাটা খুলে দাও।

মেহমান খানায় শুইয়ে দিলেন অজ্ঞান যুবকটিকে। ত্রিশ বছরের সুন্দর ও সুঠাম দেহী বলিষ্ঠ যুবক। কপাল ও মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা। জলপাই রংয়ের ইউনিফর্ম গায়ে। কোন দেশের কিংবা কোন জাতির পোষাক চিনতে পারলেন না আবদুল গফুর। কিন্তু চুল, রং ও দেহের গড়ন দেখে তার মনে হলো, এই দেশেরই ছেলে সে। একরাশ বিষ্ময় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ইকরামভ ও ফারহানার দিকে চেয়ে বললেন, তুর্কিস্তানেরই কোন কবিলার ছেলে আমার মনে হচ্ছে।

হঠাৎ আবদুল গফুরের নজরে পড়ল জামার কলার ব্যান্ডে ক্ষুদ্র একটা মনোগ্রামের মত। ঝুঁকে পড়ে দেখলেন, নতুন এক চাঁদের বুক ভরে জড়ানো অক্ষরে কি যেন লেখা। অক্ষরগুলো মনে হচ্ছে আরবী। চোখ দু'টি তার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ইকরামভকে বললেন, দেখতো কি লেখা এখানে?

ইকরামভ দেখে বল, না আববা, পড়া যায় না। এটা মনে হচ্ছে কোন কিছুর প্রতীক চিহ্ন-মনোগ্রাম। লেখাগুলো আরবি বলে মনে হয়।

ভাবছিলেন আবুদল গফুর। বললেন, একরামভ তুমি বাক্স, স্পঞ্জ সব কিছু বাড়ির ভেতরে নিয়ে গোডাউনে রাখ। কেউ দেখুক আমি চাই না। সরকারী লোকদের কি খবর দেয়া দরকার নয়?

সময় যায়নি ইকরামভ। লোকটার জ্ঞান ফিরে আসুক। সবই জানা যাবে। তখন প্রয়োজনীয় সব কিছুই করা যাবে।

আর কোন কথা না বলে ইকরামভ চলে গেল। আবদুল গফুর মেয়ে ফাতিমার দিকে চেয়ে একটা গাছের নাম বলে দিয়ে বললেন, সাত-আটটা পাতার রস করে নিয়ে এস। এর জ্ঞান ফিরাতে হবে।

ধীরে ধীরে চোখ খুলল আহমদ মুসা! চিৎ হয়ে শুয়েছিল। চোখ দুটি খুলতেই সামনের দেয়ালে গিয়ে চোখ পড়ল। দেয়ালে একটি ছবি টাঙানো-কাবা শরীফের ছবি। চোখ বুজলো আহমদ মুসা। মুহূর্তকাল পরেই আবার চোখ খুললেন। চোখ এবার নিজের উপর। গায়ের ওপর সাদা একটা উলের চাদর, নরম বিছানা। আবার তার চোখ দু'টি গিয়ে পড়ল সেই কাবা শরীফের ছবির ওপর। সেখান থেকে ঘরের চারিদিকে একবার চোখ বুলাতে গিয়ে ডান দিকে ঘুরতেই চোখ গিয়ে পড়ল আবদুল গফুরের ওপর। জগতে সব উৎসুক্য নিয়ে উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে থাকা কাঁচা-পাকা চুলের শক্ত সুঠাম পুরুষ। মাথায় কাজ করা টুপি, ঢিলা পোষাক- মধ্য এশিয়ার তুর্কী মুসলমানরে একটা প্রতিচ্ছবি। ভ্রু-কুঁচকে উঠল আহমদ মুসার। পাশেই বিস্ময় নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ইকরামভ ও ফাতিমা ফারহানা।

আহমদ মুসার চোখ তাদের ওপর দিয়েও ঘুরে এল, ফাতিমা ফারহানার ওপর চোখ পড়তেই চোখ নামিয়ে নিলো আহমদ মুসা। চোখ ঘুরে আবার গিয়ে পড়ল আবদুল গফুরের ওপর।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। প্রথমে মুখ খুললেন আহমদ মুসা।

ওয়া আলাইকুমুস সালাম। জবাব দিলেন আবদুল গফুর।

আবার ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল আহমদ মুসা। গ্রামের একটা কুটির বৈ নয়। কাঁচা দেয়াল, কাঁচা মেঝে। ঐ তো দরজা দিয়ে বালু পাথরের কাঁচা উঠান দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তাকে তো বাক্সে পুরে বিমানে করে তাসখন্দে আনা হচ্ছিল।

আহমদ মুসা উঠে বসতে যাচ্ছিল।  ইকরামভ তড়িৎ এসে আহমদ মুসাকে উঠে বসতে সাহায্য করল। আহমদ মুসা উঠে বসে তার দিকে চেয়ে বলল, শুকরিয়া।

ধন্যবাদ। বলল ইকরামভ।

আহমদ মুসা আবদুল গফুরের দিকে চাইল। তারপর চোখ দু'টি নিচে নামিয়ে বলল, আমি কোথায়? আপনারা কে? কেমন করে আমি এখানে এলাম?

এটা তাজিকিস্তানের একটা পাহাড়ী গ্রাম। বললেন আবদুল গফুর। তাজিকিস্তান! একরাশ বিস্ময় ঝরে পড়ল আহমদ মুসার কন্ঠে। তার চোখ দু'টি বুঁজে এল মুখটিও তার যেন রক্তিমাভ হয়ে উঠল। ঠোঁটেও কেমন যেন একটা কাঁপন।

চোখ দু'টি খুলল সে। হঠাৎ দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল তার দু'গন্ড বেয়ে। তাড়াতাড়ি মুছে নিয়ে বলল, মাফ করবেন, আমি অভিভুত হয়ে পড়েছি কি করে এলাম এখানে!

নদীতে একটা বাক্স আমরা পেয়েছি। বললেন, আবদুল গফুর।

নদীতে? বাক্স? আজ কয় তারিখ?

৪ঠা সেপ্টেম্বর। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দ্রুত উত্তর দিল ইকরামভ।

তাহলে কি ওরা আমাকে বিমান থেকে ফেলে দিয়েছে, না বিমান ক্রাশ করেছে? আহমদ মুসার একরাশ বিস্ময়।

কি হয়েছে, ঘটনা কি বলুন? বললেন আবদুল গফুর।

গত সন্ধ্যায় ওরা আমাকে বিমানে তুলেছে। আমাকে তাসখন্দে নিয়ে যাবার কথা বলে আমি জানি।

এমন সময় কিসের যেন ক্ষীণ একটা আওয়াজ ভেসে এল। সবাই উৎকর্ণ হল- জমাট বাঁধা একটা আওয়াজ।

অনেকগুলো হেলিকপ্টার এক সাথে উড়ছে। বলল আহমদ মুসা।

সবাই আহমদ মুসার দিকে তাকাল। কিসের আওয়াজ তারা এখনও তা ধরতে পারেনি।

ইকরামভ দৌড়ে বেরিয়ে গলে। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বলল, কিছুই দেখা যায় না। ততক্ষণে শব্দও মিলিয়ে গেছে।

হেলিকপ্টারের শব্দ আপনি কি করে বুঝলেন? প্রশ্ন করল ইকরামভ।

আমার কান ভুল না শুনলে ও শব্দ হেলিকপ্টারেরই। শুয়ে পড়তে পড়তে বলল আহমদ মুসা। মাথাটা তার বেদনায় ছিঁড়ে যাচ্ছে।

আপনার পরিচয় কি, কে আপনি? প্রবল উৎসুক্য ঝরে পড়ল ইকরামভের কন্ঠে।

আহমদ মুসা কথা বলার আগে কথা বলে উঠলেন আবদুল গফুর। বললেন, থাক এ প্রশ্ন এখন। উনি অসুস্থ। বলে আহমদ মুসার কাছে সরে এসে নরম গলায় বললেন, অসুস্থ বোধ করছেন?

আহমদ মুসা আবদুল গফুরের দিকে মাথা ঘুরিয়ে বলল, আপনাদের পরিচয় জানি না। কিন্তু আপনি আমার পিতার বয়সের। আপনি বলে সম্বোধন করে আমাকে লজ্জা দেবেন না।

চমকে উঠলেন বৃদ্ধ আবদুল গফুর। একটি মুখ তার চোখে ভেসে উঠল, সেই হারানো বড় ছেলে। ঠিক এই বয়সেরই ছিল। ঠিক এমনই ছিল তার সুঠাম শরীর। আনমনা হয়ে পড়লেন তিনি।

কষ্ট দিলাম আপনাকে? বলল আহমদ মুসা।

‘না বাবা’ হঠাৎ মুখ থেকে বেরিুয়ে এল বৃদ্ধের। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, বলছিলাম তুমি অসুস্থ বোধ করছ কিনা?

না তেমন কিছু নয়। মাথায় ব্যথা। গায়ে কিছু ব্যথা বোধ হচ্ছে। আবদুল গফুর ফাতিমা ফারহানার দিকে ফিরে বললেন, দেখ গরম পানি হয়েছে কি না, হলে দিয়ে যেতে বল। একটু গরম দুধও আনতে বল।

হঠাৎ আবার সেই শব্দ ভেসে এল। এবার আর ও স্পষ্ট। ইকরামভ ছুটে বেরিয়ে গেল আবার। বৃদ্ধ আবদুল গফুরও উঠানে দিয়ে দাড়ালেন। অল্পক্ষণ পর ফিরে এল সবাই।

আহমদ মুসা ইকরামভের দিকে তাকালো। ইকরামভই কথা বলল প্রথম। বলল, চারটি হেলিকপটার এসে আবার চলে গেল।

চোখ দু’টি বন্ধ হয়ে এল আহমদ মুসার পরিস্কার এখন তাঁর কাছে, বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। অজান্তেই শিউরে উঠলেন তিনি। বিধ্বস্ত বিমান থেকে তাহলে তাঁকে বহনকারী বাক্স নদীতে এসে পড়েছে!

আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করেছেন, তিনি শুকরিয়া জ্ঞাপন করলেন আল্লাহর দরবারে।

সবাই তাকিয়ে ছিল আহমদ মুসার দিকে। সবাই বুঝছে, ভাবছে আহমদ মুসা, কিছু বলবেন তিনি। আহমদ মুসা চোখ খুললেন। বললেন এ্যারোফ্লোটের একটি বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে আশেপাশে কোথাও।

একটু থামলেন আহমদ মুসা। আবদুল গফুর, একরামভ ও ফাতিমা ফারহানা সাবর চোখেই উদ্বেগ ঝরে পড়ল। একটা বিষন্নতা এসে ছড়িয়ে পড়ল সবার চোখে মুখে।

আহমদ মুসা আবার শুরু করলেন, বুঝতে পারছি, ঐ বিমান থেকেই আমাকে নিয়ে বাকা্রটি ছিটকে পড়েছে নদীতে।

‘আ’! করে একটা অস্ফুট শব্দ তুলে দু’হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল ফাতিমা ফারহানা। আবদুল গফুর ও ইকরামভের চোখও বিস্ময়ে বিস্ফারিত। কেউ কোন কথা বলতে পারলো না। কথা বললো প্রথম আহমদ মুসাই। বললেন,

পাহাড়ে পড়লে কি হত আল্লাহই জানেন। আল্লাহ যাকে রক্ষা করতে চান এভাবেই রক্ষা করেন।

ঠিক বলেছ, আল্লাহর কুদরত বলা ছাড়া এর আর কোন ব্যাখ্যা নেই। বললেন আবদুল গফুর।

এ এক চমৎকার কাহিনী হবে। বলল ইকরামভ।

ফাতিমা ফারহানার চোখ থেকে বিস্ময়ের ঘোর এখনও কাটেনি। এ সময় গরম পানি এল। আবদুল গফুর আহমদ মুসাকে বললেন, গরম পানি দিয়ে ভালো করে অজু করে নাও। নাস্তার পরে কথা বলব।

আহমদ মুসা কথা শেষ করলেন। বললেন, কিভাবে কারকভে বন্দী হলেন কিভাবে বোম্বাইয়ে আনা হল, তাসখন্দে তাঁকে চালান দেয়া হচ্ছে কিভাবে। তার সব কিছুই কারকভের বৃদ্ধের কাছে জানলেন।

আবদুল গফুর, একরামভ এবং ফাতিমা ফারহানা উদগ্রীব হয়ে শুনছিল তাঁর কথা। আহমদ মুসার কথা শেষ হয়ে কথা বলে উঠল ইকরামভ। বলল, কিন্তু বিশ্ব রেড সংস্থা 'ফ্র'-এর সাথে আপনার শত্রুতা কিসের? আপনি কে তা তো বললেন না?

ম্লান একটা হাসি খেলে গেল আহমদ মুসার ঠোঁটে। চাইল ইকরামভের দিকে। শুয়ে শুয়ে কথা বলছিল আহমদ মুসা। উঠে বসলো ধীরে ধীরে। আবদুল গফুর, ইকরামভ ও ফাতিমা ফারহানার তিন জোড়া উৎসুক চোখ আহমদ মুসার ওপর নিবদ্ধ। যেন সবাই জানতে চায় এ প্রশ্নের উত্তর।

আহমদ মুসা ধীরে ধীরে মুখ খুলল। তার শূন্য দৃষ্টি জানালা দিয়ে বাইরে নিবদ্ধ। যেন অতীতের কোন অতলে হারিয়ে গেছে। বলল, কম্যুনিস্টদের বিশ্ব রেড সংস্থা 'ফ্র'-এর সাথে কোন শত্রুতা আমার নেই। আমি এ সরকারের কোন ক্ষতি করিনি। আমার অপরাধ একটাই, আমি আমার মুসলিম জাতিকে জীবনের জীয়নকাঠির পরশে ঘুম থেকে জাগাতে চেয়েছি, পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে তাদের মুক্ত করতে চেয়েছি।

হৃদয়ের কোন তলদেশ থেকে কথাগুলো বেরিয়ে এল। আবেগ ও মমতায় মাখানো শেষের কথাগুলো বড্ড ভারী শোনাল।

তিনজনই কিছুক্ষণ নিরব। ইকরামভই আবার নিরবতা ভাঙল। বলল, আপনার পরিচয় কি, দেশ কোথায়, বলবেন কি?

আহমদ মুসা আবার চাইল ইকরামভের দিকে। ঠোঁটে আবার সেই ম্লান হাসি। বলল, আমার দেশ কোথায়, এ প্রশ্নের উত্তর কোনদিন আমি ভেবে দেখিনি মিঃ ইকরামভ। একটু থামল। তারপর বলল, কোন দেশকে আমার দেশ বলব? আমার কোন দেশ নেই। গোটা মুসলিম বিশ্বই আমার ঘর।

আবদুল গফুর ও ফাতিমা ফারহানার চোখে বিস্ময়। ইকরামভের চোখে তীক্ষ্ণ কৌতুহল।

কিন্তু কথাটা.....। কথা শেষ না করেই থেমে গেল ইকরামভ।

আহমদ মুসা বললো, বিশ্বাস করার মত নয় অবশ্যই, কিন্তু আমার জন্য এটাই বাস্তবতা। জন্ম আমার সিংকিয়াং-এ। তারপর একদিন উদ্বাস্ত্ত হয়ে ছিটকে পড়েছি বাইরে।

থামল আহমদ মুসা।

ফাতিমা ফারহানার মুখটি নিচু। ইকরামভের চোখে আরও অনেক জিজ্ঞাসা। আর বৃদ্ধ আবদুল গফুরের বুকটি তোলপাড় করছে। ফেলে আসা অতীতটা ভেসে উঠেছে তার চোখে। সব হারানো পাহাড় পর্বত, অভিমুখী উদ্বাস্ত্ত সারি চোখ বুজলেই দেখতে পান তিনি। অনেকেই তো সিমান্ত ডিঙ্গিয়ে চলে গেছে আফগানিস্তান, ইরাক, তুরস্ক ও ভারত উপমহাদেশে। তাঁর ছেলে আল্লাহ বকশ। কোথায় সে! বেচে থাকলে সে তো এখনও এমনি ঠিকানাহীন উদ্ধাস্ত্ত। বুকটি মোচড় দিয়ে উঠল বৃদ্ধের। চোখ তুলে তাকালেন আহমদ মুসার দিকে। এমন বয়সেই আল্লাহ বকশ হারিয়ে গেছে। এমনি করে জাতির জন্যই সে ঘর ছেড়েছে, সব ছেড়েছে।

আবার কথা বলল ইকরামভ। বলল সে, থাক, এ বিষয় পরেও জানা যাবে। আপনার নাম কিন্তু এখনও জানতে পারিনি।

সবাই তাকাল আহমদ মুসার দিকে মনে এ প্রশ্নটা সবারই।

আহমদ মুসা। তার নাম জানিয়ে দিল আহমদ মুসা।

নামটা শুনে ফাতিমা ফারহানা কি যেন ভাবল। তার চোখে জিজ্ঞাসা জেগে উঠতে দেখা গেল। মুখটা কিঞ্চিত আরক্ত হল তার। প্রথম কথা বলল সে, জিজ্ঞেস করল, আপনি ফিলিস্তিনে ছিলেন?

আহমদ মুসা তাকাল ফাতিমা ফারহানার দিকে। ফারহানার চোখে চোখ পড়ল। চোখ নামিয়ে নিল আহমদ মুসা।

ছিলাম। বললো আহমদ মুসা।

সাইমুমের সাথে আপনার সম্পর্ক ছিল?

বিস্মিত চোখে চাইলো আহমদ মুসা ফারহানার দিকে। বললো, ছিল।

ফাতিমার ফারহানর চোখেও বিস্ময়। একটা চাঞ্চল্যও তার চোখেমুখে। আবার প্রশ্ন করল ফাতিমা ফারহানাই, আপনি কি ফিলিস্তিন থেকে মিন্দানাও যান?

'হ্যাঁ, সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল আহমদ মুসা।

পিসিডার সাথে সেখানে আপনি কাজ করেছেন?

হ্যাঁ।

ফাতিমা ফারহানা অভিভূতের মত তাকিয়ে ছিল আহমদ মুসার দিকে।

তার চোখে যেন জগতের বিস্ময়। আহমদ মুসার বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি।

আপনি এসব জানেন কি করে? বললো আহমদ মুসা।

ফাতিমা ফারহানা একবার ইকরামভের দিকে চেয়ে বলল, সাম্প্রতিক এক সামিজদাদে (সোভিয়েত ইউনিয়নে গোপনে প্রচারিত সাইক্লোস্টাইল করা পত্রিকা) এ সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ আমি দেখেছি।

ইকরামভ ফাতিমার দিকে চেয়ে বলল, আমরা কিন্তু কিছুই বুঝলাম না, ফারহানা!

ফাতিমা ফারহানা একবার আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, আববা, ভাইয়া, ইনি ইসলামী বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছেন। আবার মিন্দানাওয়ের মুসলিম মুক্তি সংস্থা পিসিডার নেতৃত্বে ইনি ছিলেন।

সকলেরই বিস্মিত দৃষ্টি আহমদ মুসার দিকে। আহমদ মুসা বলল, সবই আপনারা জেনেছেন। আরেকটা খবরও আপনাদের দেই। গত পরশু মিন্দানাও

দ্বীপপুঞ্জ মুসলমানরা মুক্ত করেছে এবং মুসলমানদের স্বাধীন ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কিন্তু সেখান থেকে 'ফ্র' এর হাতে আপনি গ্রেপ্তার হলেন কেমন করে? জিজ্ঞেস করল ফাতিমা ফারহান।

এ বিষয়টা পরিষ্কার করতে হলে আমাকে অনেক কথাই বলতে হয়-বলে আহমদ মুসা কাগায়ানে তার আহত হওয়া থেকে শুরু করে হেলিকপ্টারে জাম্বুয়াংগো থেকে কারকভের শিপে আসা পর্যন্ত ঘটনাগুলো সংক্ষেপে বলে গেল।

কিছু বলতে যাচ্ছিল ইকরামভ। হঠাৎ প্রধান ফটক থেকে করাঘাতের শব্দ এল। ভ্রু কুঁচকে উঠল আবদুল গফুরের। অসময়ে এমন করে কে এল! সবাইকে ইংগিতে বসতে বলে আবদুল গফুর উঠে দাঁড়িয়ে যেতে যেতে বললেন, দেখে আসি।

অল্পক্ষণ পর ফিরে এল আবদুল গফুর। চিন্তিত দেখা দেল তাঁকে। বসতে বসতে বললেন তিনি, রাজনৈতিক সেক্রেটারী সাহেব এসেছিলেন। দু'টো খবর দিয়ে গেলেন। স্টালিনাবাদ থেকে আবদুল্লায়েভ জানিয়েছে তার আসতে আরও দু'দিন দেরী হবে। উল্লেখ্য আবদুল গফুরের ছেলে আবদুল্লায়েভ এখানকার গ্রাম প্রশাসক সংস্থা বহুমুখী সমবায়ের সভাপতি। একটি আঞ্চলিক সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য দু'দিন আগে স্ট্যালিনাবাদ গেছে। আজই তার ফেরার কথা।

আবদুল গফুর বললেন, দ্বিতীয় খবরটি হল রেডিওতে বলে দেয়া হয়েছে, বিধ্বস্ত বিমানের কোন অংশ কিংবা বিমান থেকে ছিটকে পড়া কোন জিনিস যদি কেউ কোথাও পায় বা দেখতে পায়, তাহলে অবিলম্বে যেন তা নিকটবর্তী কোন সরকারী প্রশাসনকে জানায়।

ইকরামভ এবং ফাতিমা ফারহান দু'জনেই এক সংগে পিতার মুখের দিকে চাইল। তাদের মুখে শংকা। আহমদ মুসার মুখে কোনই ভাবান্তর নেই।

দূর থেকে আকাশে অনেকগুলো হেলিকপ্টার ওড়ার একটা জমাট শব্দ কানে আসছে।

ইকরামভ এবং ফতিমা ফারহানা তাদের আব্বার ঘরে বসে। আবদুল গফুর বাড়ির সবাইকে তার ঘরে ডেকেছেন। অন্য কেউ এখনও পৌঁছায়নি।

মেঝেয় ভেড়ার পশমে হাতে বোনা কার্পেট। এ কার্পেটেই বসেছে ইকরামভ এবং ফাতিমা ফারহানা।

ইকরামভ ফাতিমাকে প্রশ্ন করল, যে সামিজদাদের কথা তুই ওখানে বললি, তা পেয়েছিলি কোথায়? ওগুলো তুই পড়িস নাকি?

ফাতিমা ইকরামভের দিকে এক পলক চেয়ে একটু হেসে বলল, কেন, পড়তে দোষ কি? আর পাওয়ার কথা বলছ, মস্কো ইউনিভার্সিটির মুসলিম ছাত্র মহলে ওটা নিয়মিতই বিলি হয়। কে বিলি করে কোনদিন দেখেনি, জানিনা। আংগুলে গোনা দু'চারজন ছাড়া সব মুসলিম ছাত্র ছাত্রীই এ সামিজদাদ গোপনে গোপনে পড়ে। তুমি তাসখন্দে এটা কখনও পাওনি, ভাইয়া?

দেখেছি। কিন্তু আমি ওগুলো পড়ি না। ধরা পড়লে জীবনটাই শেষ হয়ে যাবে। গতে মাসেই তো দু'জন ধরা পড়ল! ওদের সংশোধন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। সংশোধন না হলে চিরদিনের জন্য সাইবেরিয়ার দাস শিবিরে যেতে হবে।

একটু থামল ইকরামভ। তারপর আবর বলল, তুই এগুলো পড়া এখন থেকে বাদ দিবি। ধরা পড়লে আর রক্ষে থাকবে না।

কিন্তু ভাইয়া, এ ভয়টা যত বাড়ছে, ঐ সামিজদাদের জনপ্রিয়তা ততই বাড়ছে। এখন এ সামিজদাদের জন্য মুসলিম ছাত্র ছাত্রীরা অধীর ভাবে অপেক্ষা করে। আমি এমন অনেক মুসলিম স্যারকে জানি যারা এ সামিজদাদ পড়েন।

অন্যে যাই করুক তুই এসব পড়িস না।

তুমি ভেব না ভাইয়া আমি এ ব্যাপারে খুব সাবধান আছি। আমি কখনও কোনদিনই কারো সামনে এটা পড়ি না, কারো কাছ থেকে নিই না।

কেমন করে ওগুলো তোর কাছে আসে?

আসে না, আমি প্রতিমাসের পনের তারিখে লাইব্রেরীর নির্দিষ্ট একটা বইয়ের মধ্যে পাই। আমি পড়ে ওখানেই রেখে আসি।

অদ্ভুত ব্যাপার!

অদ্ভূতই ভাইয়া, একটা শক্তিশালী নেটওয়ার্ক না থাকলে এটা সম্ভব হতো না।

আমি তো এত কিছু খেয়াল করি না!

করবে কেমন করে, পড়ার বাইরে কি তুমি কিছু বুঝ?

বুঝে লাভ নেই। বেশী বুঝার ভালো পরিণতি আমি দেখি না।

অর্থাৎ?

আমি তাসখন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে আছি দু'বছর। এই দু'বছরে আমার জানা মতেই দু'শ মুসলিম ছাত্র হারিয়ে গেছে যাদের খোঁজ কেউই কোনদিন পায়নি। আর জেল ও সংশোধন ক্যাম্পে যাদের পাঠানো হয়েছে, তাদের সংখ্যা আরও বেশি।

ভাইয়া একটা কথা বলতো, এমন অত্যাচার দিয়ে গতি শীল কোন কিছুর অগ্রগতি কি রোধ করা যায়?

আমি এতকিছু বুঝি না, বুঝতে চাই না ফারহানা। তোর প্রশ্নের জবাব আহমদ মুসা ভালো দিতে পারবেন। একটু থামল ইকরামভ। তারপর বলল, আচ্ছা ফারহানা লোকটাকে তোর কি মনে হয়?

তুমি আমি তার সম্পর্কে যা ধারণা করছি, তার চেয়ে তিনি অনেক-অনেক বড়। সামিজদাদ পত্রিকায় তাকে বিশ্ব মুসলিম মুক্তি সংগ্রামের নেতা হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। তিনি ফিলিস্তিন এবং মিন্দানাওয়ে যা করেছেন তাতে আমেরিকা ও আমাদের সরকারের পিলে চমকে গেছে বলতে হবে। তার নার্ভটা দেখ? আব্বার বলা দ্বিতীয় খবরটা শুনে আমরা শংকিত হয়েছিলাম, কিন্তু দেখছ তো তাঁর চোখের পাতাটাও নড়েনি!

এ সময় আবদুল গফুর ঘরে ঢুকলেন। ইকরামভ ও ফাতিমা ফারহানাকে দেখে বললেন, তোমরা এসেছ, বেশ। যাও, তোমাদের মা আর ভাবীকে ডাক।

সবাই এসে প্রশস্ত মেঝের কার্পেটে আসন নিয়েছে। আবদুল গফুর একটা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসেছেন আর সবাই তার সামনে।

সবার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবদুল গফুর বললেন, আমাদের পিতা-পিতামহরা কোন সমস্যা দেখা দিলে সিদ্ধান্ত নিতেন গোত্রের সবাইকে ডেকে পরামর্শ করে। কিন্তু এখন সেদিন নেই। কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার প্রকৃতপক্ষে কোন স্বাধীন ক্ষমতাও আমাদের সমাজের নেই। সে যাক আজ

আমি এক সমস্যায় পড়েছি। তোমাদের পরামর্শ চাই। জিয়াউদ্দিন, আবদুল্লায়েভ ওরা কেউ নেই। আবদুল্লায়েভ থাকলে খুবই ভাল হতো। কিন্তু তার জন্য অপেক্ষা করার উপায় নেই।

থামলেন আবদুল গফুর। তারপর আবার শুরু করলেন, আকস্মিক ভাবে আমরা একজন মেহমান পেয়েছি। মেহমানকে কেমন করে পেলাম তোমরা জান। এখন সমস্যা দাঁড়িয়েছে সরকারী নির্দেশ অনুসারে এখনি তাকে সরকারের হাতে তুলে দিতে হবে, অন্যদিকে তাকে সরকারের হাতে তুলে দেয়ার অর্থ তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া। বিপদ হল, তাকে সরকারের হাতে তুলে না দিলে এটা প্রকাশ হয়ে পড়লে যেমন আমাদের পরিবারের ওপর বিপদ আসবে, তেমনি মেহমানকে, অর্থাৎ যে আমাদের শুধু মুসলিম ভাই নয়, যাঁর গোটা জীবনটাই কওমরে জন্য বিলিয়ে দেয়া, তাকে শত্রুর হাতে তুলে দেয়া আমাদের ঐতিহ্য ও ঈমানের দিক দিয়ে চরম দায়িত্বহীনতা হবে। এখন তোমরা চিন্তা করে বল, কোন সিদ্ধান্ত আমরা নেব। সবাই নিরব। সবাই মাথা নিচু করে ভাবছে যেন।

প্রথম মাথা তুলল ইকরামভ। সবার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, আব্বা যদিও মেহমানের প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও দুর্বলতা আছে, তবু তাকে সরকারের হাতে তুলে দেয়াই সংগত। সরকারের কাস্টোডি থেকেই আমরা তাকে পেয়েছি, আবার সরকারের কাছেই আমরা তাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি, এতে অন্যায় কিছু আমাদের জন্য নেই। এটা না করলে আমাদের পারিবারিক বিপদের যে আশংকা আছে, তার ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না।

থামল ইকরামভ। আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। এবার কথা বলল ফাতিমা ফারহানা। বলল সে, মেহমানের পরিচয় না জানলে ভাইয়া যা বলেছেন তা করা যেত, কিন্তু তাঁর যে পরিচয় আমারা পেয়েছি তাতে তাঁকে সরকারের হাতে তুলে না দিয়েও কি করে আমরা আমাদের পরিবারকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারি সেটাই আমাদের দেখা দরকার।

এবার কথা বলল আবদুল্লায়েভের স্ত্রী আতিয়া। বলল সে, সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আমাদেরকে বাস্তববাদী হতে হবে। এই সরকারের আইন আমাদের ভাল লাগুক বা না লাগুক, তার নির্দেশ আমাদের পছন্দ হোক বা না হোক, আমরা কিন্তু

সবই মেনে চলছি। কারণ এ আদেশ অস্বীকার করার শক্তি আমাদের নেই। এ ক্ষেত্রেও তাই, সরকারী আদেশ লংঘন করার কোন সামর্থ্য ও সুযোগ যেহেতু আমদের নেই, তাই সরকারী আদেশ মানাই ভাল।

আবদুল গফুরের স্ত্রী স্বামীর দিক চেয়ে বললেন, যেটা ন্যায়ত হয়, সেটাই করুন।

মাথা নিচু করে ভাবছেন আবদুল গফুর। সবাই নিরব। এক সময় মাথা তুললেন তিনি। কথা বললেন। স্থির এবং ধীর কন্ঠ তাঁর।

তোমাদের কথা শুনলাম! তোমরা বলেছ, যুবকটিকে আমরা সরকারের কাস্টোডি থেকে পেয়েছি, কথাটা ঠিক নয়। সে 'ফ্র'-এর কাস্টোডিতে ছিল। সুতরাং তাকে সরকারের হাতে না দেয়ায় দোষ নেই। তারপরও আমি বিষয়টা নিয়ে অনেক ভেবেছি। কিন্তু মেহমান যুবককে সরকারের হাতে তুলে দেবার চিন্তা যতবারই করতে গেছি, গোটা সত্তা আমার যেন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। যুবকটি আমাদের জাতির এক অতি মূল্যবান সম্পদ বলেই শুধু নয়, আমি ওর মধ্যে আমাদের আল্লাহ বকশকে খুঁজে পেয়েছি। বেদ্বীন শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ না করে আমাদের আল্লাহ বকশ তো জাতির জন্য এই যুবকটির মত করেই ঘর ছেড়েছে, সুখ-শান্তি সব বিসর্জন দিয়ে হারিয়ে গেছে অনিশ্চিত অন্ধকারে।

বলতে বলতে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল বৃদ্ধের। থামলেন তিনি। তাঁর দুচোখ থেকে দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

কারও চোখ শুষ্ক নেই। সবার চোখেই পানি। আল্লাহ বকশ এ বাড়ির বড় আদরের সন্তান। এ গ্রামে হিজরত করার পর এ বাড়ির প্রথম সন্তান সে। আবদুল গফুরের পিতা গ্রামের নাম রেখেছিলেন আল্লাহ বকশ। এ গ্রামে এসে প্রথম পাওয়া নতিরও আদর করে নাম রাখেন আল্লাহ বকশ। দুঃসাহসী স্বাধীনচেতা যুবক আল্লাহ বকশ আল্লাহ ছাড়া অর কোন কিছুকেই ভয় করত না।

রুমালে চোখের দু'কোণ মুছে নিয়ে আবর শুরু কররেলন আবদুল গফুর, পরিবারের বিপদের কথা আমিও চিন্তা করেছি। একটা সামাধানও বের করেছি। আমি যুবককে নিয়ে চলে যেতে চাই। পাহাড়ের ওপাশেই তো আফগানিস্তান। তোমরা জান, সীমান্তের এপারেও আমাদের তাজিক, কিরঘীজ, উজবেক ও

তুর্কমেন এলাকায় অনেক মুজাহিদ ঘাঁটির পত্তন হয়েছে। একটা আশ্রয় আমরা খুজে পাবই। 'ফ্র' এ ঘটনার কখনও খোজ পেলে তোমরা বলে দিও, আমার সাথে তোমাদের কোন সম্পর্ক নেই।

'আব্বা' বলে আর্তনাদ করে উঠল ফাতিমা ফারহানা।

ইকরামভ উঠে গিয়ে তার আব্বার হাত ধরে বলল, আব্বা আমাকে মাফ করুন। আমি আল্লাহ বকশের ভাই। কি করতে হবে আমাকে আদেশ করুন।

ইকরামভের দু'গন্ড বেয়ে নামছে অশ্রু ধারা। ঠোঁট দুটি তার দৃঢ় সংবদ্ধ। চোখে শপথের দীপ্তি।

আহমদ মুসা গভীর মনোযোগের সাথে মধ্য এশিয়ার একটি মানচিত্র দেখছিলেন। বেশ একটু রাত হয়েছে তখন। হারিকেনের হালকা আলো ঘরে। আহমদ মুসার হাতে একটি স্কেল। মাঝে মাঝে মেপে দেখছিলেন মানচিত্রের বিভিন্ন অংশ।

ফাতিমা ফারহানা একটা ট্রেতে এক গ্লাস গরম দুধ এবং কিছু ঔষধ নিয়ে ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। আহমদ মুসা টের পায়নি। মানচিত্রের ওপর ঝুঁকে আছে তাঁর মুখ। মুখটা হরিকেনে আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

আহমদ মুসার এই মনোযোগ ভাঙতে দ্বিধা করছিল ফাতিমা ফারহানা। কিন্তু আব্বা বলে গেছেন ঠিক সময়ে ঔষধ খাওয়াতে। ফাতিমা ফারহানা একটু শব্দ তুলে ট্রেটা টেবিলে রাখল। চমকে মুখ তুললেন আহমদ মূসা।

মাফ করবেন, বিরক্ত করলাম। ঔষধ খাওয়ার সময় হয়েছে। বলে দুধের গ্লাস এবং ঔষধ আহমদ মুসার দিকে এগিয়ে দিল ফারহানা।

আহমদ মুসা নিতে নিতে বললেন, ইকরামভ কোথায়?

বাইরে।

আপনার আব্বা?

জনাব, আপনি আমাকে 'তুমি' বললে খুশী হব। একটু থেমে ফারহানা বলল, কম্যুনিটি অফিস থেকে আব্বাকে ডেকে পাঠিয়েছে, তিনি সেখানেই গেছেন।

তারপর দু'জনেই চুপ। আহমদ মুসা ঔষধ খেয়ে নিলেন। আবার কথা বলল ফারহানা। বলল, মানিচত্র দেখেই কি আপনি এ অঞ্চলটা চিনে নিতে পারবেন?

যাতে পারি সে জন্যই দূরত্ব সম্পর্কে নতুন করে জানতে চেষ্টা করছি।

একটু প্রশ্ন করতে চাই।

কর।

আপনি তো ইচ্ছার বিরুদ্ধে এদেশে এসেছেন? কেমন বোধ করছেন?

কে বলল আমি ইচ্ছার বিরুদ্ধে এসেছি?

আপনি তো বন্দী হয়ে, এদেশে এসেছেন!

বন্দী হয়ে এসেছি বটে, কিন্তু হতে পারে তো তাদের দিয়ে আল্লাহ আমার মনের একান্ত আকাংখাই পূরণ করেছেন!

বুঝলাম না। আপনি কি তাহলে আপনার কর্মক্ষেত্র হিসাবে এদেশকে বেছে নিয়েছেন? গলাটা যেন একটু কেঁপে উঠল ফারহানার।

আল্লাহ রাববুল আলামীনের ইচ্ছা বোধ হয় তাই।

ফাতিমা ফারহানার গোটা শরীরে শিহরণ খেলে গেল। তার স্মরণ হলো ফিলিস্তিনের কাহিনী, মিন্দানাওয়ের কাহিনী, সেই সাথে চোখের সামনে ভেসে উঠল অতুল শক্তিধর এখানকার কম্যুনিস্ট বিশ্ব রেড সংস্থা 'ফ্র' এর বিশাল বীভৎস চেহারা। অন্তর কেঁপে উঠল ফারহানার। তার মুখে কোন কথা নেই।

আহমদ মুসা বলল, ভয়ের কিছু নেই ফারহানা। প্রতিটি কান্নার একদিন শেষ আছে। অনেক বছর ধরে এখানে মুসলমানরা কাঁদছে। কাঁদছে আর্তনাদ করছে এই পামির। আমুদরিয়া, শিরদরিয়ায় দেখবে তারই চোখের পানি। এ কান্নার ইতি হবে, হতেই হবে। নিরস্ত্র আফগানদের সাহস এবং সংগ্রাম আজ এরই শুভ বার্তা বয়ে এনেছে।

হাতের স্কেলটা দিয়ে মানচিত্রের ওপর আস্তে আস্তে টোকা দিচ্ছিলেন আর মাথা নিচু করে অনেকটা স্বগতঃ কন্ঠেই ঐ কথাগুলো বলছিলেন আহমদ মুসা। মনে হচ্ছিল হৃদয়ের কোন তলদেশ থেকে তার কথাগুলো উঠে আসছিল। ফারহানার কাছে কথাগুলো শুধু নতুন নয়, বিস্ময়কর নয়, যেন অপার্থিব একটা ব্যাপার। সে বলল, ভয়ের চেয়ে আমার কাছে বড় সম্ভাবনার ব্যাপারটা। সম্ভব কি আসলে?

তোমাদের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস আদালত, কলকারখানা ও কলেজগুলোতে মুসলিম তরুন, যুবক ও বৃদ্ধদের বুকে কান পেতে তাদের হৃদয়ের কথাগুলো শোন, তাহলে যাকে অসম্ভব মনে করছ তা অসম্ভব মনে হবে না।

আপনি এত সব জানেন কি করে? ফতিমা ফারহানার চোখে এক মুগ্ধ ঔজ্জ্বল্য।

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল। এমন সময় ঘরে ঢুকলেন আবদুল গফুর।

আব্বা, আপনি কম্যুনিটি অফিস থেকে আসছেন? জিজ্ঞেস করল ফারহানা।

'হ্যাঁ' বলে চেয়ারে এসে বসলেন। বসতে বললেন ফারহানাকেও। 'হ্যাঁ, অফিস থেকে এলাম, বলে একটু থামলেন। তারপর শুরু করলেন, আবার খবর এসেছে ওরা আগামী কাল নদী ও আশপাশের গ্রামগুলো সার্চ করবে।

আবদুল গফুরের মুখ শুকনো। ফাতিমা ফারহানার মুখটাও মুহূর্তে অন্ধকার হয়ে গলে। ইকরামভও ঘরে ঢুকল এ সময়। সেও এসেই আব্বার কাছে জিজ্ঞেস করে ব্যাপারটা জানল।

আহমদ মুসা শান্ত স্বরে বলল, বাক্স অথবা বাক্সের মধ্যকার লাশ উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত তারা স্বস্তি পাবে না, এটা আমি জানি।

আহমদ মুসা মুহূর্ত থামল। সবার চিন্তাকাতর ও মলিন মুখের দিকে একবার চাইল, তারপর বলল, আমার উপস্থিতি আপনাদের ক্ষতি করবে, ক্ষতি করতে পারে এ মুসলিম জনপদেরও, আমার বোধ হয় এটা চাওয়া ঠিক নয়।

আহমদ মুসার এ কথা শুনে চমকে উঠলেন আবদুল গফুর। আরো অন্ধকার হয়ে গেল ফাতিমা ফারহানার মুখ।

আবদুল গফুর বললেন, তোমার কথা এখনও কেউ জানতে পারেনি। আর যা ঘটবার তাতো ঘটবেই। অতীতে অনেক কিছু ঘটেছে আমরা ঠেকাতে পারিনি বাবা।

না তা হয় না, মুসলমানদের জীবন ও সম্পদকে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করি। এর ক্ষতি যতটা এড়ানো যায়, সেটাই আমাদের দেখা দরকার।

পরাধীনতার গ্লানি বহন ছাড়া এ জীবনের আর কি মূল্য আছে। এ জীবনের নিরাপত্তা চিন্তা করে কি হবে। আল্লাহ বকশের মত করে তোমাকে চলে যেতে আমি দেব না মনে রেখ।

আবদুল গফুরের শেষের কথাগুলো আবেগে রুদ্ধ হয়ে এল।

আপনার স্নেহ আমাকে অভিভুত করেছে জনাব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি চলে যাবার জন্য আসিনি। আমি স্থান পরিবর্তন করতে চাচ্ছি মাত্র।

এ কথা তুমি ঠিক বলছো বাবা?

জি হ্যাঁ।

আবদুল গফুর মাথায় জড়ানো রুমালের কোণা দিয়ে চোখের কোণ মুছে নিল। তারপর বললেন, এবার বল তোমার বৃদ্ধ পিতাকে কি করতে হবে।

আহমদ মুসা ভাবছিল। কিছুক্ষণ পর মুখ তুলে বলল, আমার কয়েকটি অনুরোধ। নদীর যেখানে আপনারা বাক্সটি ওপরে তুলেছেন, সেখানে নদীর নরম মাটির ওপর বাক্সের দাগটা মুছে ফেলবেন এবং সেখানে কিছু আবর্জনা ফেলে জায়গাটা ঢেকে দেবেন। আর আমি চলে যাবার পর এই ঘরে খাট, দরজা মেঝে ধুয়ে দেবেন যাতে কোথাও আমার হাত-পায়ের ছাপ না থাকে। বাক্সটা পুড়িয়ে দিয়েছেন, আমার পোষাকটাও পুড়িয়ে দেবেন। আমি জানি, এত কিছুর দরকার হবে না। ওদের উপগ্রহ ক্যামেরা যদি বাক্সের লোকেশন নির্দিষ্ট করতে পারতো, তাহলে এই সার্চ করার খবর গ্রামবাসীদের তারা জানাতো না, আকস্মিক এসে হানা দিত। তবু সাবধান হওয়া ভাল।

সবাই তাকিয়ে ছিল আহমদ মুসার দিকে। আবদুল গফুরের অন্তরের বেদনা তার চোখ দিয়ে ঠিকরে পড়ছে। ইকরামভ ভাবছে, ছোট খাট ব্যাপারেও কি অদ্ভুত দূরদৃষ্টি! অন্যের নিরাপত্তা প্রশ্নেও কত সতর্ক! তার চোখে সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার একটা আমেজ। দরজার চৌকাঠে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ফাতিমা ফারহানা। বাতাসে এক গোছা চুল এসে তার বাঁ চোখের একাংশ ঢেকে দিয়েছে। তার একটা আঙুল অস্থিরভাবে ওড়নার কোণাটা পেঁচাচ্ছিল, আবার খুলছিল।

আহমদ মুসা আবার কথা বলল, আজ রাতেই আমি যেতে চাই।

আজ রাতেই? শুষ্ক কন্ঠে বললেন আবদুল গফুর।

জি হ্যাঁ, আজ রাতেই।

কিন্তু তুমি তো অসুস্থ।

ও কিছু না, ভাববেন না আপনি। ঈষৎ হেসে বললো আহমদ মুসা।

মাথা নিচু হয়ে গিয়েছিল আবদুল গফুরের। বোঝা গেল ভাবছেন তিনি। কিছুক্ষণ পর মুখ তুলে স্বগত বললেন, কোথায় যাওয়া যায়। ইকরামভের দিকে ফিরে বললেন, পিয়ান্দজ নদীর উপত্যকায় আমাদের পুরোনো বসতিতে যাওয়া যায়, কি মনে কর?

যাওয়া যায়, কিন্তু ওখানে সরকারী চোখ বড় বেশী সক্রিয় আব্বা।

ঠিক বলেছ- বলে আবার ভাবনায় ডুবে গেলেন আবদুল গফুর।

এবার নিরবতা ভাঙলো আহমদ মুসা। আহমদ মুসা বললো, হোজা ওবি কাম মাজার এবং হিসার দুর্গের পবিত্র স্থানে আপনারা কখনো গেছেন?

চমকে মাথা তুললেন আবদুল গফুর! বললেন, তুমি চেন কেমন করে?

চিনি না, জানি মাত্র।

তুমি ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছ। হিসার দুর্গের মোতাওয়াল্লী মোল্লা আমীর সুলাইমান আমার পরিচিত। আমি ওখানে গেছি। ওখানকার মুসলিম জনপদটা বেশ বড়। বেচারা আমীর সুলাইমান বছর খানেক আগে ছ'মাস জেল খেটেছেন। স্থানীয় কলখজই অনেক বলে কয়ে তাঁকে ছাড়িয়ে এনেছে। ওখানে যাওয়া যায়।

কথাগুলো লুফে নিচ্ছিল আহমদ মুসা। আবদুল গফুরের কথা শেষ হতেই বলল, কেন জেল খেটেছেন? সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জন্য?

হ্যাঁ, তাই।

ঠিক আছে, ওখানেই যাওয়া ঠিক হলো।

আবদুল গফুর ইকরামভের দিকে চেয়ে বললেন, তুমি গিয়ে দুটো ইয়াক তৈরী রাখতে বল, আমরা রাত ১২টায় যাত্রা করব।

আহমদ মুসা মুহুর্ত দ্বিধা করল তারপর বলল, দুটো ইয়াক কেন?

একটা আমার ও একটা তোমার জন্য।

কিন্তু আমাকে একাই যেতে হবে তো।

বিস্ময়ে হা হয়ে গেল আবদুল গফুরের মুখ। একাই যাবে? রাস্তা চিনবে কি করে? তার ওপর রাতে। আর আমরা একা তোমায় ছাড়ব কেন?

অসুবিধা হবে না। পামির পথ ধরে আমাকে ৫০ মাইল পূর্বে যেতে হবে, তারপর নিচে উপত্যাকার দিকে মাইল পঞ্চাশেক।

আবদুল গফুর অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন আহমদ মুসার দিকে। ধীরে ধীরে বললেন, ভুলেই গিয়েছিলাম তুমি আহমদ মুসা। তুমি আর দশজনের মত নও। কিন্তু আমরা তোমাকে একা ছাড়ব কেমন করে, কিভাবে বুঝাব মনকে?

আবদুল গফুরের চোখে অশ্রু টলমল করে উঠল।

আহমদ মুসা আবদুল গফুরের হাত ধরে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি আজ যে কারণে গ্রাম থেকে সরে যাচ্ছি, ঠিক সে কারণেই আপনাদের কাউকে আমি সাথে নিচ্ছি না। আগামী কয়েকদিন ওরা পাহাড় এলাকা ঘিরে রাখবে, যাতে কেউ কিংবা কিছু বাইরে যেতে না পারে। আমার সাথে যদি আপনারাও তাদের চোখে পড়ে যান, তাহলে আপনার গোটা বসতির ওপরই বিপদ আসবে।

আবুদল গফুর রুমাল দিয়ে চোখ মুছে বললেন, বুঝতে পারছি, তুমি কত বড়, বাবা। আল্লাহ তোমাকে বিজয়ী করবেনই। কিন্তু বাবা তুমি আমাদের নিরাপত্তার কথা যতটা ভাবছ নিজের কথা কিন্তু ততটা ভাবছ না।

আহমদ মুসার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। বলল, আমি বড় কিছু নই, আমি মুসলিম সমাজের সেবক মাত্র। দোয়া করুন আমার জন্য। আর নিরাপত্তার কথা? আমার জ্ঞান ও বিবেক অনুসারে কাজ করব, বাকিটা আল্লাহ দেখবেন।

ফাতিমা ফারহানা দু'হাতে চৌকাঠ ধরে যেন তার সাথে মিশে গেছে। স্বপ্নের সম্মোহনকারী এক দৃশ্য দেখছে যেন সে। রূপকথার এক নায়ক যেন সামনে উপস্থিত।

মেহমানখানার পাশে আবদুল গফুর ও ইকরামভ ইয়াক সাজিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। গ্রাম তখন গভীর ঘুমে অচেতন। কোন আলো নেই কোথাও। কেবল আবদুল গফুরের মেহমান খানায় আলো জ্বলছে। ফাতিমা ফারহানা একটা ব্যাগে রুটি, অনেকগুলো পনির ও ফলমূল সাজিয়ে নিয়ে মেহমান খানায় ঢুকল। আহমদ মুসা তৈরী। তিনি ঐতিহ্য বাহী তাজিক পোষাক পরেছেন। মাথায় তাজিকদের কাজকার ঐতিহ্যবাহী টুপি। টুপিটা ব্যান্ডেজকে অনেকখানি ঢেকে দিয়েছে।

ফাতিমা ফারহান তাকে বলল, চলুন। দু'জনে মেহমান খানার বাইরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে পথ চলছিল।

ফারহানা বলল, একটা প্রশ্ন করতে পারি?

কর। বলল আহমদ মুসা।

আপনার কে কে আছে, পিতামাতা ভাই বোন কিংবা.....

একট আড়ষ্টতা এসে ফাতিমা ফারহানাকে কথা শেষ করতে দিল না। অন্ধকার না হলে দেখা যেত তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

আহমদ মুসা বুঝল, ফারহানার পরবর্তী শব্দটা কি যা উচ্চারণ করতে পারল না। আহমদ মুাসর ভ্রুটা কুঞ্চিত হয়ে উঠল। জবাব দিল, নেই।

একটা অনুরোধ করতে পারি?

কর।

আপনার পোষাকটা আমি না পুড়িয়ে রেখে দিতে চাই।

কেন? আগের মত ভ্রুটা কুঁচকে গেল আহমদ মুসার।

এটা একটা স্মৃতি, একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে পিসিডার অধিনায়কের এই পোষাকের।

যারা নেতাদের যাদুঘরে সংরক্ষন করে, তাদের জন্য এটা প্রয়োজন। কিন্তু আমরা ইসলামের অনুসারীরা ভিন্ন পথের যাত্রী। এখানে ব্যক্তির কোন মূল্য নেই, আসল হলো তার কাজ এবং শিক্ষা। তাই এখানে ব্যক্তি সংরক্ষিত হয় না, অব্যাহত রাখা হয় তার ভালো কাজ ও শিক্ষাকে।

অন্ধকারেই একবার চোখ তুলে চাইল ফাতিমা ফারহানা আহমদ মুসার দিকে। ভাবল, এই ব্যক্তি যে কত বড় তার ক্ষুদ্র জ্ঞান তা আন্দাজই করতে পারে না। একটা আনন্দ, তারই পাশে একটা অপরিচিত বেদনাও টন টন করে উঠল তার হৃদয়ে।

দুজনে অন্ধকারে পথ চলছিল আবদুল গফুর ও ইকরামভ যেখানে ইয়াক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে দিকে। কিছুক্ষণ দু'জনেই নিরব। এই নিরবতা ভেঙে ফাতিমা ফারহানাই আবার জিজ্ঞেস করল, আমার জন্য আপনার কোন নির্দেশ আছে?

হঠাৎ এ প্রশ্নে বিব্রত বোধ করল আহমদ ম্যুসা। কাউকে কোন নির্দেশের চিন্তাই সে করেনি। ফাতিমা ফারহানাকে কি বলবে আহমদ মুসা? অথচ প্রশ্নটা তার সঙ্গত। এতে খুশিই হল আহমদ মুসা। বলল, খুশী হলাম ফারহানা এদেশে প্রথম তুমিই পাশে এসে দাঁড়ালে। তবে নির্দেশ দেয়ার সময় এখনও আসেনি।

আনন্দে-গর্বে ফাতিমা ফারহানার ছোট্ট হৃদয়টি যেন ফুলে উঠল। শুকরিয়া জানাতে ইচ্ছা হল তার। কিন্তু মুখ খুলতে পারলো না হঠাৎ করে। আরো কিছুক্ষণ পর ফাতিমা ফারহানা বলল, ছুটি শেষ হলে আমাকে মস্কো যেতে হবে, তারপর আপনাকে কোথায় পাব?

এর উত্তরে আমি এখন দিতে পারবো না। তবে এটুকু বলতে পারি, আমার কথা তোমাদের কাছে পৌঁছবে।

দু'জনেই এসে পৌঁছল ইয়াকের কাছে। তারপর ইয়াকসহ চারজন এগিয়ে চলল গ্রামের প্রান্ত সীমায়। দাঁড়াল সেই সরু পথটির মুখে যা গিয়ে মিশেছে পামির সড়কের সাথে।

তাঁবু-কম্বলসহ একজনের জন্য যা প্রয়োজন তা দিয়ে ইয়াক সাজানো। ইয়াকের লাগাম আহমদ মুসার হাতে তুলে দিতে দিতে আবদুল গফুর বললেন,

আমাদের ভুলে থেকো না। এই বাড়ি, এই বাড়ির সবকিছু তোমার নিজের মনে করবে। কাঁপছিল বৃদ্ধের কথাগুলো।

আহমদ মুসা বলল, আমি আপনাদের কথা, এই নিরাপদ আশ্রয়ের কথা ভুলবো না। আমি সুযোগ পেলেই আসব। আমার জন্য দোয়া করুন। তারপর আহমদ মুসা ইকরামভের দিকে একটু এগিয়ে তার কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, ভাই ইকরামভ, তোমাদের কাছে জাতির অনেক দাবী। জাতির এ দাবীর কথা কখনও ভুলো না।

কেঁদে ফেলল ইকরামভ। বলল, আল্লাহ বকশের ভাই আমি, আমাকে আপনার সাথে নিন।

ইকরামভের কপাল চুম্বন করে বলল আহমদ মুসা, ভেব না ভাই, আল্লাহ আমার সাথে আছেন।

ফারহানা তার পিতার পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল। সেদিকে একটু এগিয়ে আহমদ মুসা বলল, আসি ফারহানা। বলে আহমদ মুসা ইয়াকে উঠে বসল। লাগাম টেনে ইশারা করল ইয়াককে। দুলে দুলে ধীরে যাত্রা শুরু হল ইয়াকের। অল্পক্ষণই কালো অন্ধকারের বুকে হারিয়ে গেল ইয়াক।

সবারই চোখে পানি। ফাতিমা ফারহানা বসে পড়েছিল মাটিতে। আবুদল গফুর গিয়ে তার মাথায় হাত রাখতেই কান্নায় ভেঙে পড়ল সে। আবদুল গফুর তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, কাঁদিস না মা, আমাদের চেয়ে তুই তো তাকে বেশী জানিস?

# ৭

হাসান তারিক এখন ছোট্ট একটা সেলে। একটা দরজা এবং অনেক ওপরে একটা ছোট্ট জানালা ছাড়া আর ফুটো নেই ঘরে। মেঝেতে পাতা এক কম্বল ছাড়া আর কোন উপকরণ নেই! সেদিন লাইব্রেরী থেকে ফিরে আসার পর তাকে এখানে সরিয়ে আনা হয়েছে। তিনি জানেন সর্বোচ্চ শাস্তি যাদের বরাদ্দ করা হয়, তারাই এসব সেলে আসে। ভিকটরের সাথে আগের মত কথা আর হয় না। দরজার গায়ের ছোট্ট জানালা খুলে সে খাবার দিয়ে যায়। মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে, শরীর ভাল তো স্যার! ভিকটরের চোখটাকে তখন বড় বিষন্ন দেখায়। শুকনো রুটি, শুকনো কয়েক টুকরো গোশত তার দু'বেলার জন্য বরাদ্দ। নাস্তা তিনি আর পান না। গোশত হালাল হতে নাও পারে মনে করে গোশত তিনি নেন না, শুধু রুটিই খান। ভিকটর সেই ফুটো দিয়ে চোখে একরাশ মিনতি নিয়ে বলে, স্যার এভাবে খেলে তো আপনার শরীর থাকবে না।

কম্বলে বসে একটি চিঠি পড়ছিলেন হাসান তারিক। চিঠিটা কয়েক বার পড়েছেন। আবারও পড়ছেন। আজ দুপুরে খাবারের প্যাকেটে এই চিঠি পেয়েছেন। দুই রুটির মাঝখানে অতি সাবধোনে চিঠিটি লুকিয়ে রাখা ছিল। চিঠির নিচে কারো নাম নেই। তবে সম্বোধন ও সব মিলিয়ে বুঝা যায় চিঠিটি ভিকটরের কাছ থেকেই এসেছে।

চিঠি পড়ে প্রথমে স্তম্ভিত হয়েছেন, তারপর আনন্দিত হয়েছেন। চিঠিতে বলা হয়েছে আজ রাত আটটায় আপনার দরজা খুলে যাবে। যাকে সামনে পাবেন অনুসরণ করবেন। সব ব্যবস্থাই হয়ে গেছে, এর পরও কোন বাধা আসলে তা মুকাবিলা করেই পেছনের অফিসার্স গেট দিয়ে কারাগার থেকে বেরুতে হবে। বেরিয়ে রাস্তার ওপাশে স্টার্ট নিয়ে থাকা ৭৮৬৭ নং গাড়িতে উঠে বসতে হবে।

অন্ধকার কুঠরীতে বসে সময় বুঝার উপায় নেই। তবে সময়টা আটটার কাছাকাছিই হবে। বহুদিন পর একটা এ্যাকশনের গন্ধে হাসান তারিকের

মাংসপেশীগুলো যেন সজীব হয়ে উঠেছে। এর মাঝেও একটা জিজ্ঞাসা মাঝে মাঝেই মনের কোণে উঁকি মারছে। কারা এটা করছে? আজিমভ ফায়ারিং স্কোয়াডে যাবার পর ভিকটর হাসান তারিকের দেয়া খাবার জনৈক খাদি ইসমাইলকে দিত। ভিকটরের কাছে হাসান তারিক শুনেছিলেন আজিমভকে গ্রেপ্তারের সূত্র ধরেই খাদি ইসমাইল ও আরও তিনজনেক গ্রেপ্তার করে এনেছে। অর্থাৎ তারা একই দলের লোক।

হাসান তারিক দু'রাকাত নামায পড়ে নিয়ে প্রস্তত হয়েই বসেছিলেন। দরজার তালা খোলার শব্দ কানে এল। সবগুলো ইন্দ্রীয় সজাগ হয়ে উঠল হাসান তারিকের। ধীরে ধীরে দরজা খুলে গেল। সামনে দাঁড়িয়ে ভিকটর। হাতে সেই সার্ভিস ট্রে। তাতে চায়ের কাপ সাজানো। চোখাচোখি হতেই ইশারা করে হাঁটতে শুরু করল।

দরজাটা টেনে দিয়ে তার পিছনে হাঁটতে শুরু করলেন হাসান তারিক। একটা করিডোর দিয়ে চলছিলেন তারা। করিডোরের মুখেই একজন পুলিশ দাঁড়িয়ে। মুষ্টিবদ্ধ হলো হাসান তারিকের হাত। কিন্তু না, কিছু হলো না। পুলিশকে হাসান তারিকের দিকে তাকাতে দেখেই ভিকটর বলল, হুকুম আছে। আর কিছু বলল না পুলিশ। এবার তারা ডাইনে মোড় নিয়ে আরেকটা বিল্ডিংয়ের ছায়া ধরে এগিয় চলল। দ্রুত হাঁটছে ভিকটর। হাসান তারিকও তার সাথেই আছেন।

বড় ফটক ওয়ালা একটা ঘরের সামেন গিয়ে পৌঁছলেন তাঁরা। ফটকের ওপরে লাল অক্ষরে লেখা আছেঃ 'অফিসার্স প্যাসেজ''। এখানে জানালা দিয়ে প্রথমে আইডেনটিটি কার্ড দেখাতে হয়, তারপর এখান থেকে গেট পাশ পাওয়া যায়। গেট পাশ নিয়ে ফটক দিয়ে ঘরে ঢুকতে হয়। দরজাটা ইলেকট্রনিকের। যিনি গেট পাশ দেন, তিনিই তার বাঁ পাশের কি বোর্ডে লাল বোতামটা টিপে দেন, দরজা খুলে যায়। এ ঘর পেরুলেই একটুখানি খালি জায়গা। তারপরই গেটের সাথে লাগানো গার্ড রুম। গার্ড রুমে গেট পাশ দেখালেই বোতাম টিপে গেট খুলে দেয়া হয়। ভিকটর এবং হাসান তারিক সেই ফটক ওয়ালা ঘরের সামেন পৌঁছতেই ফটকের ইলেকট্রনিক দরজা খুলে গেল। তাঁরা ঢুকতেই আবার তা বন্ধ হয়ে গেল।

হাসান তারিক দেখলেন ভেতের তিনজন লোক। হাসান তারিককে দেখে একজন এগিয়ে এল। ভিকটর পরিচয় করিয়ে দিল, ইনি খাদি ইসমাইল।

গেট পাশ দেয়া অফিসারকে হাসান তারিক তার চেয়ারের পাশেই অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখলেন। তার ডান হাতের কাছে পড়ে আছে আধ পোড়া সিগারেট। বুঝলেন, সিগারেটের সাথে কিছু খাইয়ে ভিকটর তাকে আগেই কাবু করেছে।

এতক্ষণ বহন করে আনা চায়ের ট্রেটা মেঝেয় রেখে দিয়ে ভিকটর টেবিল থেকে ৪টা পাশ তুলে নিয়ে খাদি ইসমাইলের হাতে দিতে দিতে দ্রুত বলল, তুমি চা নিয়ে গার্ড রুমে ঢোকার পর একজন গেট পাশগুলো জানালা দিয়ে গার্ডকে দেবেন। গার্ড যখন ওগুলো চেক করতে শুরু করবে, তখন দু'জনে মিলে গাডরুমের গার্ড দু'জনকে কাবু করতে হবে। গেট খোলার জন্য বোতাম টেপার দায়িত্ব আমার। ওদেরকে এ্যালার্ম বাজাবার সুযোগ দেয়া যাবে না।

ভিকটর চলতে শুরু করেছে। হাসান তারিক চলতে গিয়ে হঠাৎ ফিরে এলেন অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকা অফিসারের টেবিলে। টান দিয়ে তার ডান পাশের ড্রয়ারটা খুলে ফেললেন। চোখটা হাসান তারিকের উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হ্যাঁ, আছে রিভলভর। লোডেড। রিভলভরটি পকেটে পুরলেন হাসান তারিক। খুলে ফেললেন বাঁ পাশের ড্রয়ারও। নিকশ সাদা রংয়ের আরেকটা রিভলভর। অপেক্ষাকৃত ছোট। হাতে তুলে নিলেন। অস্বাভাবিক ভারী। ব্যারেল ও ট্রিগারের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন হাসান তারিক। এ তো ল্যাসার রিভলভর। ট্রিগার বোতামটি লাল। অর্থাৎ রিভলভরটি লোডেড। রিভলভারটি পকেটে রাখতে যাবেন এমন সময় জানালার ওপাশ থেকে পায়ের শব্দ এল। চোখ তুলতেই চোখাচোখি হলো এক পুলিশ অফিসারের সাথে। অফিসারটি চোখে বিস্ময় বিমূঢ়তা, কিন্তু তা মুহূর্তের জন্য। পরক্ষনেই সে হাত দিল পকেটে। এর অর্থ হাসান তারিক বুঝেন। সাদা রিভলভর ধরা ডান হাতটি হাসান তারিক ওপরে তুললেন। পরের অবস্থাটা চিন্তা করে নিজেই শিউরে উঠলেন হাসান তারিক। কিন্তু উপায় নেই। পুলিশ অফিসারটির চোখ ভয়ে বিস্ফারিত দেখা গেল। হাসান তারিক চোখ বন্ধ করে শাহাদাৎ আঙুল দিয়ে চাপ দিলেন লাল বোতামটায়। মাত্র দু'তিন সেকেন্ড। চোখ খুললেন হাসান তারিক।

পুলিশ অফিসারের দেহটা গড়াগড়ি যাচ্ছে। কিন্তু মাথাটা নেই। আরেকবার গোটা শরীর শির শির করে উঠল হাসান তারিকের।

মিনিটের মধ্যেই ঘটে গেল গোটা ব্যাপারটা। ভিকটর বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে ছিল এদিকে। রিভলভরটা পকেটে রেখে হাসান তারিক বললেন, ভিকটর তাড়াতাড়ি। এক্ষণি সব জানাজানি হয়ে যাবে।

ভিকটর চা নিয়ে গার্ডরুমের দিকে এগুল দ্রুত। করিডোরের মত বেশ লম্বা ঘর। কিন্তু আর কেউ নেই ঘরে। আজ উজবেকিস্তানে নতুন ফসল উঠার উৎসব। ঈদের বিকল্প আনন্দ অনুষ্ঠান হিসাবে কম্যুনিস্টরা একে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। তাই সরকারী ভাবে বিভিন্ন প্রকার আনন্দানুষ্ঠানের ব্যাপক ব্যবস্থা করা হয় এদিনে। আজ উজবেকিস্তানে সাধারণ ছুটির দিন। তাই কারাগারের অফিসেও অপরিহার্য কিছু কর্মচারী ছাড়া আর কেউ নেই। ভিকটর ঘর পেরিয়ে ফাঁকা চত্বরটায় গিয়ে নেমেছে। হাসান তারিকরা দরজা থেকে উঁকি মেরে দেখলেন, ভিকটর চায়ের ট্রে নিয়ে গার্ডরুমে প্রবেশ করছে।

হাসান তারিক খাদি ইসমাইলকে বললেন, আপনি এদের নিয়ে গার্ডরুমের সামনে গিয়ে দাঁড়ান অমি গার্ডরুমে ঢুকব।

হাসান তারিক পকেটে হাত পুরে গার্ডরুমের দিকে এগুলেন। নির্লপ্ত গতি। গার্ডরুমের জানালা দিয়ে একজন গার্ডকে তিনি দেখতে পাচ্ছেন। ভিতরে তাকিয়ে কার সাথে যেন আলাপ করছে। ভিকটরের সাথে কি? এই তো সুযোগ। হাসান তারিক গার্ডরুমের পাশ ঘুরে দ্রুত গার্ডরুমে প্রবেশ করলেন। গার্ডরুমের দরজায় পা দিয়েছেন এমন সময় তীব্র সুরে বিপজ্জনক বিউগল বেজে উঠল। চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল দুজন গার্ড। ভয়াবহ ধরনের অটোমেটিক কারবাইন টেনে নিল ওরা। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। হাসান তারিকের রিভলভর দ্রুত গতিতে দু'বার অগ্নি বৃষ্টি করল। গুঁড়িয়ে গেল দুটি মাথা। ভিকটর মুহুর্তের হন্য হতচকিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু পরক্ষণেই ছুটে গেল জানালার পাশের কি বোর্ডে। চেপে ধরল নির্দিষ্ট বোতাম।

দরজা খুলে গেল। দ্রুত গতিতেই গেট থেকে বেরিয়ে এল তারা পাঁচজন। রাস্তার ওপারে স্টার্ট নেয়া একটা জীপ। লাল রিয়ার লাইটের উপরে জ্বলছে নাম্বার-

৭৮৬৮। তারা গাড়ীর কাছে যেতেই দরজা খুলে গেল। দ্রুত গাড়ীতে উঠে বসলেন।

বিউগল কেঁপে কেঁপে তখনো বেজেই চলেছে। ভিকটর বলল, এদিকে আসার ইলেকট্রনিকের দরজা বন্ধ। এ গেটে আসার জন্য ওদের ঘুরে আসতে হবে। ততক্ষনে গাড়ীটি চলতে শুরু করেছে। মাত্র পঞ্চাশ গজ সামনেই একটা রাস্তা পশ্চিমে বেরিয়ে গেছে এ জেল রাস্তা থেকে। দ্রুত জীপটি জেলখানার পাশের এ বিপজ্জনক রাস্তা ছেড়ে ঐ রাস্তায় গিয়ে পড়ল। জেলখানার দিকে থেকে তখন অনেকগুলো পুলিশের গাড়ীর একটানা ইমারজেন্সী সাইরেন ভেসে আসছে। বিউগলের তীব্র চিৎকার ইতিমধ্যে অনেকটা নেমে গেছে।

হাসান তারিকের পাশেই বসেছিল আমির উসমান। সে বলল, ভাই হাসান তারিক, মুবারকবাদ আপনাকে। আমি অভিভূত হয়েছি। তার কথা শেষ না হতেই ভিকটর বলে উঠল, আমি স্যারকে গোবেচারা ভদ্রলোক মনে করতাম, কিন্তু তিনি তো আগুন।

হাসান তারিক এদিকে কান না দিয়ে বললেন, ওরা অয়্যারলেসে গোটা পুলিশ নেটওয়ার্ককে জানিয়ে দেবে। গাড়ি সার্চ করা শুরু করবে ওরা। আমাদরে গাড়ি ওরা দেখেনি, গাড়ীতে আমরা আছি তাও জানে না। কিন্তু তার আগেই সরে পড়তে হবে।

এবার ড্রাইভার কথা বলল। বলল সে, সামনের ব্রীজটা পার হলেই আর কোন ভয় নেই ইনশাআল্লাহ। পরের যে পুলিশ পোস্ট তার আগেই মেইন রোড ছেড়ে দিয়ে আমরা পাশে চলে যাব।

সামনে দুরে একটা লাল আলো জ্বলছে। ড্রাইভার বলল, ওটাই ব্রীজের মুখ। লাল আলো দেখে মুখটা বিষন্ন হয়ে উঠল হাসান তারিকের। চেকিং কি শুরু হয়েছে? না ওটা রুটিন ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের আলো? হেড লাইটের আলোতে ব্রীজটা এবার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। স্টিল হেলমেটওয়ালা দু'জন পুলিশ। হাতে তাদের সাব মেশিনগান। ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে হাসান তারিক বললেন থামতে বললে থামানই উচিত হবে।

কিন্তু..... কিছু বলতে শুরু করল ড্রাইভার।

হাসান তারিক তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, তাদের থামানোটা রুটিন চেকও হতে পারে, না থামলে তারা সন্দেহ করবে। তাতে ব্রাশ ফায়ারের মুখোমুখি হতে পারি আমরা।

আর যদি রুটিন চেক না হয়? বলল ড্রাইভার।

তাহলে পুলিশ দুটোর দায়িত্ব আমার। বললেন হাসান তারিক।

গাড়িটি ব্রীজের মুখে এসে পৌঁছেছে। ততক্ষণে ব্রীজের মুখের সবুজ আলো আবার জ্বলে উঠেছে। গাড়ীর ভীড় নেই বললেই চলে। চলতে শুরু করেছে গাড়ীগুলো। একজন পুলিশ অয়্যারলেসে কথা শুরু করল। আরেকজন পুলিশ ধীর গতি গাড়ীগুলোর দিকে একনজর চেয়েই চলে যেতে ইশারা করছে। হাসান তারিকদের গাড়ীও ঐভাবে চলে যাবার ইশারা পেল। ততক্ষণ প্রায় রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিল একটা কোন কিছুর। এবার হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সাদা রিভলভরটা পকেটে চালান করে দিলেন হাসান তারিক।

হাসান তারিকদের গাড়ি ব্রীজে প্রবেশ করেছে। এমন সময় অয়ারলেসে কথা বলা পুলিশটি উত্তেজিতভাবে অন্য পুলিশকে কি যেন বলল। তারপর তারা রাস্তায় ছুটে এল, বন্ধ করে দিল গাড়ীর অগ্রসরমান গতি। জানালা দিয়ে সেদিকে তাকিয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন হাসান তারিক।

শুকরিয়া আদায় করলেন সকলেই।

মাইল খানেক যাবার পর গাড়ীটি হাইওয়ে ছেড়ে দিয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট একটি রাস্তা ধরে শহরের পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তের দিকে এগিয়ে চলল। পেছনের বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। হাসান তারিক কিছুক্ষণ পেছনের দিকটা পর্যবেক্ষণ করে নিশ্চিত হলেন, না কেউ অনুসরণ করছে না।

গাড়িটি দক্ষিণ পূর্বে প্রায় মিনিট দশেক চলার পর দক্ষিণ দিকে আরেকটা বাঁক নিয়ে একটা সরু গলির মধ্যে ঢুকে গেল। একটা গ্যারেজের গেটে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়িটা। সংগে সংগে খুলে গেল গ্যারেজের গেট। ভেতরে ঢুকল গাড়ি।

গাড়ি থামতেই ছুটে এল কয়েকজন। এদিকে গাড়ি থেকে সবাই নেমে পড়লেন। প্রথমেই ড্রাইভার জড়িয়ে ধরল হাসান তারিককে।

ড্রাইভারের নাম আনোয়ার ইব্রাহিম। বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতায় সে ইব্রাহিমভ। দু'বছর আগে তাসখন্দ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সে ইতিহাসে ডিগ্রী নিয়ে বেরিয়েছে। পেশা হিসাবে নিয়েছে শিক্ষকতা। সে একটি বিদ্যালয়ের ইতিহাসের শিক্ষক। ড্রাইভিং লাইসেন্সও তার আছে। সাইমুমের তাসখন্দ ব্রাঞ্চের প্রধান।

আনোয়ার ইব্রাহিম হাসান তারিককে নিজের পরিচয় দেবার পর পরিচয় করিয়ে দিল খাদি ইসমাইলের সাথে। খাদি ইসমাইল উজবেকিস্তান সাইমুমের অপারেশন স্কোয়াডের আমুদরিয়া সেক্টরের একজন কমান্ডার। আজিমভের কমান্ডেই সে কাজ করত। আজিমভ ধরা পড়ার ১৫দিন পর সেও ধরা পড়ে যায় একজন কর্মীর সামান্য ভুলের কারণে।

হাসান তারিককে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলে উজবেকিস্তান সাইমুমের গোয়েন্দা বিভাগের দায়িত্বশীল আমির উসামনের সাথে। আনোয়ার ইব্রাহিম জানান, ভিকটরের সাথে যোগাযোগ করা এবং আজকের অপারেশনের প্ল্যানটা তারই তৈরী। আমির উসমানের বয়স ৪৫ এর মত। উজবেক পুলিশের গোয়েন্দা শাখার একজন ডাইরেক্টর হিসাবে কাজ করেছে প্রায় ১৫ বছর। স্বাস্থ্যগত কারণে অব্যাহতি নিয়েছে চাকুরী থেকে। চাকুরীর সময় থেকেই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সহায়তা দিয়ে আসছে। সরকারী চাকুরীতে যারা আছে তাদের সাথে যোগাযোগের সে একটি বড় সূত্র।

হাসান তারিক আমির উসমানকে বুকে জড়িয়ে ধরে মোবারকবাদ জানিয়ে বললেন, আল্লাহ আপনাকে আরও কাজের শক্তি দান করুন। আমির উসমান বলল, আপনার দোয়া আল্লাহ আমাদের সবার জন্য কবুল করুন।

গ্যারেজের সাথেই একটা বড় তিনতলা বাড়ি। বাড়ি এবং গ্যারেজ দুটোরই মালিক আনোয়ার ইব্রাহিম। কম্যুনিস্ট পার্টির ক্যাডারের বাইরে যে দু'চারজন ভাগ্যবান লোকের তাসখন্দে বাড়ি আছে, আনোয়ার ইব্রাহিম তাদেরই একজন। এর পেছনে একটা ইতিহাস আছে। যে ইতিহাস স্মরণ করতে লজ্জা পায়, দুঃখ পায় আনোয়ার ইব্রাহিম।

আনোয়ার ইব্রাহিমের পিতামহ আবদুল্লাহ কম্যুনিস্ট প্রলোভনে ভূলে লাল ফৌজের সহযোগী হিসেবে কাজ করে। ১৯৩০ সালে উজবেকিস্তানের এ

অঞ্চলে যৌথ খামারের প্রতিষ্ঠা হয়। মুসলিম জনসাধারণ তাদের ধ্বংসাবশিষ্ট শক্তি নিয়েই কম্যুনিস্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিরোধের চেষ্টা করে। তখন কম্যুনিষ্ট লৌহ শাসনের স্থানীয় লাঠিয়ালের ভূমিকা পালন করে আবদুল্লাহ। অবর্ণনীয় অত্যাচার চলে মুসলিম কৃষকদের ওপর। তাদের বাড়ি-ঘর, ঘোড়া এবং কৃষি জমিই শুধু কেড়ে নেয়া হয় না, তাদের স্ত্রী- কন্যাকেও দখল করা হয়। সে সময় পরাজিত অবস্থায় একজন মুসলমানের প্রতি একজন কম্যুনিস্টের বিদ্রুপ উক্তি ছিল এই রকম-

'আল্লাহর সাহায্যে আমরা তোমাদের থেকে জীবন ধারণের সব সামগ্রী নিয়েছি। এখন তোমাদের স্ত্রীদের পর্যন্ত আমরা যৌথ ব্যবস্থাধীনে আনব। এভাবে আমরা তাদের শয্যা শায়িনী করব। এভাবে পরস্পরে আমরা প্রীতি বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারব'। আবদুল্লাহকে তার কাজের পুরস্কার হিসাবে কম্যুনিস্ট সরকার এই জমি দান করে এবং বাড়ি তৈরীরও ব্যবস্থা করে দেয়। বাড়ীর এই ইতিহাস কখনও আনোয়ার ইব্রাহিমের কাছে তুললে সে বলে, দাদার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার কাজ আব্বা থেকেই শুরু হয়েছে। তিনি প্রায়ই বলতেন, আমার নাম তিনি রেখেছেন লাল ফৌজের বিরুদ্ধে মুসলমানদের স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর আনোয়ার পাশা ও ইব্রাহীম বাকেরের নাম অনুসারে। আনোয়ার পাশা লাল ফৌজের সাথে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে শহীদ হন এবং ইব্রাহিম বাকের উজবেকিস্তান ও তাজিকিস্তানের পাহাড়ে প্রান্তরে দীর্ঘদিন প্রতিরোধ যুদ্ধ চালানোর পর ১৯৩৫ সালে ধরা পড়েন এবং লাল ফৌজের হাতে শাহাদাৎ বরণ করেন। এই নাম রাখা দাদার কাজের বিরুদ্ধে আব্বার নিরব, কিন্তু অত্যন্ত শক্ত প্রতিবাদ। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারী ইতিহাস পড়েছি, কিন্তু তার পাশাপাশি আব্বার কাছে সত্যিকার ইতিহাসও পড়েছি। আব্বা গোপনে লাহোর থেকে এসব আনিয়ে নিয়েছিলেন।

গ্যারেজ এবং বাড়ীটি এখনও সরকারীভাবে আনোয়ার ইব্রাহিমের বটে, কিন্তু এর সব কিছুই আনোয়ার ইব্রাহিম সাইমুমকে দান করেছে। তিন তলার দুটি কক্ষ নিয়ে আনোয়ার ইব্রাহিম বাস করেন। এ দুটি কক্ষের উপযুক্ত ভাড়া ইব্রাহিম সাইমুমকে দেয়।

আমির উসমান হাসান তারিক সহ সবাইকে নিয়ে গ্যারেজের মধ্য দিয়ে ঢুকে পেছনের দরজা দিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করল। আমির উসমানের অফিস কক্ষে হাসান তারিক ও আমির উসমান গিয়ে বসলেন। অফিসটি দোতলায়। ঘরের বাইরে রুশ ভাষায় বিরাট একটা সাইনবোর্ড- 'অফিস অফ দি লিগাল কনসালট্যান্ট (প্রাইভেট)'।

হাসান তারিক ও আমির উসমান টেবিলে মুখোমুখি বসে। কথা বলল প্রথম আমির উসমান। বলল, আপনাকে ওরা ধরে এনেছে এটা শুরু থেকেই আমরা জানি। এদেশে আমাদের সব কর্মীই এটা জানে। কিন্তু কোথায় কিভাবে যে আছেন এটা আমাদের জানা ছিল না। অতি সম্প্রতি আমরা এ ব্যাপারে জানতে পারি।

ভিকটরের সাথে কিভাবে আপনাদের যোগাযোগ হলো?

সে একটা ইতিহাস। 'ফ্র'-এর গোয়েন্দা সংস্থা 'রিও'র তাসখন্দের অভ্যন্তর বিভাগের প্রধান উমর জামিলভ আপনার সন্ধান ইসলামিক স্টেট অব ফিলিস্তিনের মস্কোস্থ এ্যামবাসীকে জানায়। সেই সাথে জানায় সহজ শিকার হিসাবে ভিকটরের নাম। এ খবর আমরা পাওয়ার পরেই ভিকটরের সাথে যোগাযোগ করি।

'রিও'-এর একজন অফিসার এটা করল? তাঁকে আপনারা জানেন? অপার বিস্ময় হাসান তারিকের চোখে।

আমরা তাঁকে জানি না, এখনো খোঁজ নিতেও পারিনি।

আমির উসমান থামল। হাসান তারিক কোন কথা বললেন না। তার ভাবনা এখন অন্য জায়গায়। আয়িশা আলিয়েভার কথা মনে পড়ল তার। উমর জামিলভ তাসখন্দ 'রিও'ও অভ্যন্তর বিভাগের প্রধান হলে সেই তো ওখানে আলিয়েভার টপ 'বস' হবার কথা। তাহলে উমর জামিলভের হাতে কি আয়িশা আলিয়েভার ক্ষতি হতে পারে? আশার একটা আলো জেগে উঠতে চাইলো তার মনে। হাসান তারিকের কাছে আলিয়েভার লেখা চিঠি যে মুহূর্তে ওদের হস্তগত হয়ে যায়, তখন থেকেই হাসান তারিক আলিয়েভার জীবনের আশা পরিত্যাগ করেছিলেন।

হাসান তারিকের চিন্তাজাল ছিন্ন করে আমির উসমানই আবার কথা বলল। বলল সে, আজ রাতের মধ্যেই আমাদের পাহাড়ের ঘাঁটিতে পৌঁছতে হবে। গাড়ীর পথ এখন একটুও নিরাপদ নয়। পাহাড়-মালভুমির দুর্গম পথে আমাদের ঘোড়ায় চড়ে যেতে হবে। সময়ও লাগবে এর জন্য প্রচুর। আমির উসমানের কথা শেষ হতেই ঘরে ঢুকল আনোয়ার ইব্রাহিম। বলল, চলুন খাবার তৈরী।

এই মুহুর্তে এর চেয়ে বড় সুখবর আমার জন্য কিছু নেই, বলে হেসে উঠে দাঁড়ালেন হাসান তারিক। উঠে দাঁড়াল আমির উসমানও।

ঘুম ভাঙতেই উঠে বসল রোকাইয়েভা। ঘরে আলো জ্বলছে তখনও। কেউ আসেনি। তাহলে এ ঘরে ভাইয়া আসেনি? মনটা আনচান করে উঠল। ছুটল ভাইয়ার ঘরের দিকে। শূন্য ঘর। বেরিয়ে এল ঘর থেকে। দোতলার বারান্দা থেকে গেট দেখা যায়। দেখল, গেট বন্ধ। পূর্ব আকাশে শুকতারা জ্বল জ্বল করছে। এখনও বেশ অন্ধকার। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কালকের রাতের আশংকাটা আবার মনে জাগল। দাদীর ঘরে এলো রোকাইয়েভা। দাদী ফজরের নামায শেষ করে উঠে দাঁড়াচ্ছেন। রোকাইয়েভা বলল, দাদী ভাইয়া..... কথা শেষ করতে পারল না। গলাটা যেন বন্ধ হয়ে এল তার ।

চিন্তা করছিস কেন, আসবে।কত কাজে কত জায়গায় যেতে পারে।

কিন্তু টেলিফোন-ভাইয়ার টেলিফোন নিরব কেন? এমন তো কোনদিন হয়নি। ভাইয়া বাড়িতে না জানিয়ে তো কোথাও থাকেন না!

তোর ভাইয়া যে কাজ করে, অনেক সময় বলার সুযোগ নাওতো পেতে পারে?

কিন্তু তার অফিস? তিনি না পারলে অফিস তো জানিয়েছে? দাদী কোন উত্তর দিলেন না। তাঁর চোখেও চিন্তার একটা কালো ছায়া। সত্যিই উমর জামিলব এমন তো কোন দিন করেনি। সে ডিউটি পাগল সত্য, কিন্তু বাড়ীর প্রতি দায়িত্ব-

কর্তব্যে সে বিন্দুমাত্রও অবহেলা করে না। মনের এ চিন্তা চাপা দিয়ে দাদী বললেন, এখনও তো নামায পড়িসনি। যা নামায পড়ে আয়, মনটা ভালো হবে।

দাদী কুরআন শরীফ পড়ছিলেন। রোকাইয়েভা নামায পড়ে এসে তার পাশে বসল। এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠল। মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল রোকাইয়েভার। ভাইয়ার কোন খবর? ছুটে গেল সে বাইরে। একটি খাম হাতে ঘরে ফিরে এল। বন্ধ খাম। কারো নাম নেই খামে।

কে দিল? জিজ্ঞেস করলেন দাদী।

দারোয়ানকে কে যেন দিয়েছে। আপনাকে দিতে বলেছে।

পড়তো দেখি।

খাম ছিঁড়ে চিঠি বের করল রোকাইয়েভা। চার ভাঁজ করা চিঠি খুলে পড়তে লাগল সে।

চিঠি পড়তে গিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল রোকাইয়েভা। তার হাত থেকে পড়ে গেল চিঠি। বিছানায় লুটিয়ে পড়ল রোকাইযেভার দেহটা। দাদী কুরআন শরীফ বন্ধ করে টেবিলে রেখে রোকাইয়েভার পাশ থেকে চিঠি তুলে নিলেন। পড়লেন-

দাদী, আমি জামিলভের এক ভাই। জামিলভ নেই। আপনারা, আমরা কেউ কোন দিন আর তাকে খুঁজে পাব না। তাসখন্দ জেল থেকে সাইমুম নেতা হাসান তারিক, তিনজন বিদ্রোহী নেতা এবং ভিকটর নামের একজন জেল কর্মচারী পালিয়েছে। ভিকটরের সন্দেহজনক গতিবিধি রিপোর্ট হওয়ার পরেও জামিলভ তাকে সুযোগ দিয়েছে, ব্যবস্থা গ্রহণের কোন নির্দেশ দেয়নি। অর্থাৎ জেল পালানোর ঘটনার সাথে তার যোগসাজস ছিল। সুতরাং বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে জামিলভ দন্ডিত হয়েছেন।

দুঃখ করবেন না দাদী। এ দেশে জামিলভদের সারি বড় দীর্ঘ। আরও কত দীর্ঘ হবে কে জানে!

যুবায়েরভ।

চিঠি পড়া শেষ করলেন দাদী। কিন্তু মনে হচ্ছে চিঠি পড়া শেষ হয়নি তাঁর। চিঠি ঐভাবেই তাঁর হাতে ধরা। চোখ দুটি চিঠির ওপরই নিবদ্ধ। স্থির অচঞ্চল তিনি। দৃষ্টি শূন্য। যেন তিনি পাথর হয়ে গেছেন।

পল পল করে সময় কেটে গেল। পাশে বিছানায় পড়ে কাঁদছে রোকাইয়েভা। এক সময় মুখ ফিরিয়ে দাদী সেদিকে তাকালেন। দাদীর দুচোখে দুফোঁটা অশ্রু টলমল করে উঠল। রোকাইয়েভার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, কাঁদিস না বোন, আমার জামিলভ বীরের মৃত্যুবরণ করেছে। শহীদ সে। ওর জন্য গর্ব কর।

তারপর দাদী ধীরে ধীরে উঠলেন। জামিলভের কক্ষে এলেন। টেবিলের ওপর জামিলভের একটা বাঁধানো ফটো। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যখন ডিগ্রী নিয়ে বেরোয়, তখনকার তোলা। ফটোটি হাতে তুলে নিয়ে বললেন, কাজ দিয়ে প্রমাণ করে যাবি বলেই কি মুখে কিছু কোনদিন বলিসনি?

দাদীর চোখের এক ফোঁটা পানি ফটোর স্বচ্ছ কাঁচে গিয়ে পড়ল। জানালা দিয়ে আসা সকালের এক টুকরো রোদে তা জ্বল জ্বল করে উঠল।

রোকইয়েভা দাদীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। চেখের পানিতে গোটা মুখ তার ধোয়া। তার দিকে চেয়ে দাদী বললেন, জামিলভ তার পূর্ব পুরুষের মান রেখেছে। তোদের মুসলিম পূর্ব পুরষেরা জান দেয়াকে ভয় করেনি, যেদিন থেকে এ ভয় দানা বেঁধে বসল, সেদিন থেকেই আমাদের সর্বনাশের ঘোর অমানিশা শুরু।

আবার কলিং বেল বেজে উঠল। বেরিয়ে গেল রোকাইয়েভা। ফিরে এল হাতে একটি কাগজ নিয়ে। একটা সরকারী নির্দেশ পত্র। রোকাইয়েভার মুখটা যেন বেদনায় আরো নীল দেখা গেল।

কি ওটা? জিজ্ঞেস করলেন দাদী।

একটা নির্দেশ পত্র।

সরকারী নির্দেশ পত্র? কি আছে ওতে?

বিশ্বাসঘাতক জামিলভের সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তিনদিনের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে।

কান্নায় ভেঙে পড়ল রোকাইয়েভা। দাদী রোকাইয়েভাকে টেনে নিয়ে পাশে বসালেন। বললেন, মন শক্ত কর বোন। আরো অনেক কিছুর জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

একটু থামলেন দাদী। তারপর বললেন, জাতিকে ভালোবাসার বড় বড় কথা অনেক বলেছি, ভালোবাসি যে তার পরীক্ষাও তো দিতে হবে! তোর ভাই তা পেরেছে, তুই পারবি না রোকাইয়েভা?

'পারবো' বলে দাদীকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল রোকাইয়েভা।

তাসখন্দ কম্যুনিস্ট পার্টির সেক্রেটারীয়েটের কমিটি রুম। নিরাপত্তা কমিটির বৈঠক। মস্কো থেকে ছুটে এসেছেন 'ফ্র'-এর প্রতিরক্ষা প্রধান কলিনকভ, গোয়েন্দা সংস্থা 'রিও'-এর চীফ কুলিকভ এবং মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সের প্রধান সার্জি মোকলভ। এই মিটিংয়ে হাজির আছে উজবেকিস্তান ও তাজিকিস্তানের 'ফ্র'-এর ফাস্ট সেক্রেটারীদ্বয় এবং দুই রাজ্যস্থ 'ফ্র'-এর গোয়েন্দা ও পুলিশ প্রধানরা।

'রিও' চীফ কুলিকভ বলল, দেশের এই দক্ষিণাঞ্চলে সাম্প্রতিককালে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে যা আমাদের কম্যুনিস্ট ব্যবস্থাকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। এই বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্যই আজকের বৈঠক। মাননীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কলিনকভ এখন এ ব্যাপারে কিছু বলবে।

কলিনকভ নড়েচড়ে বসল। সবার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, দেশের এ অঞ্চলে সম্প্রতি এক সংগে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে যাকে খুব ছোট করে দেখা যাচ্ছে না। জামিলভ ও আলিয়েভার বিশ্বাসঘাতকতাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা মনে করতে পারছি না। তাদের বিশ্বাসঘাতকতার চরিত্র একই রকম- ধর্মীয় স্বকীয়তা বোধের উন্থান। এই উথানটা ডেনজারস। আগুনের মত তা ছড়িয়ে পড়তে পারে। বহুদিন এই চেতনা উৎখাতের জন্য আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করেছি। কিন্তু তা উৎখাত হয়নি। গোপনে গোপনে তা সজীব সবল হয়ে উঠেছে। আগে এটা তেমন একটা নজরে পড়তো না, কিন্তু তা এখন নজরে পড়ার মত প্রবল হয়েছে। এ কথাগুলো আপনাদের কারো অজানা নয়, গত দু'বছরের পরিসংখ্যান আপনাদের সবারই নজরে আছে।

একদিকে এই অবস্থা, অন্যদিকে হাসান তারিকের জেল থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং আহমদ মুসা গায়েব হওয়া আমাদের কাছে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আপনারা জানেন, হাসান তারিক সাইমুমের একজন প্রথম সারির নেতা- যারা ফিলিস্তিনে একটা অসাধ্য সাধন করেছে আর আহমদ মুসাতো ফিলিস্তিন ও মিন্দানাও বিপ্লবের নায়ক। সংগঠন গড়ে তোলার একটা যাদুকরী ক্ষমতা রয়েছে তার। এ ছাড়া গোটা মুসলিম বিশ্বে তার এমন একটা ইমেজ গড়ে উঠেছে যে, সে যেখানেই যায় একটা অপ্রতিরোধ্য আবেগ ও প্রাণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সেই আহমদ মুসা প্লেন-ক্রাশের পর রহস্যজনকভাবে গায়েব হয়ে গেছে। তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধানের পর আমরা নিশ্চিত হয়েছি, বাক্স সমেত আহমদ মুসাকে কে বা কারা উদ্ধার করেছে। বিধ্বস্ত বিমানের সব কিছুই আমরা পেয়েছি, একমাত্র ঐ বাক্স ছাড়া। বাক্স উদ্ধারের জন্য পাহাড়, উপত্যকা, নদী এবং নদী তীরবর্তী এলাকা সবই অনুসন্ধান করা হয়েছে। 'ফ্র'- এর বিশ্বাস, সে এদেশেই আছে।

সুতরাং সব মিলিয়ে আমরা একটা উদ্বেগজনক অবস্থারই আলামত দেখতে পাচ্ছি। এ অবস্থায় আমাদের করনীয় কি তা নিয়েই আজ আমরা আলোচনা করব।

কলিনকভ থামল। এবার কথা বলল মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সের প্রধান সার্জি মোকলভ। সে বলল, বর্তমান অবস্থার পেছনে আফগানিস্তানও একটা ফ্যাক্টর। এ সম্পর্কে স্যার কিছু বললে ভালো হত।

হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। বলল কলিনকভ, 'তবে এ ব্যাপারে একথা বলাই যথেস্ট যে, আমরা সেদিক থেকে একটা অকল্পণীয় বিপদের সম্মুখীন যা আপনারা সকলেই জানেন। ভাষা, বংশ ও জাতিগত একটা সাদৃশ্যের কারণে আফগানদের ভাব ও মানসিকতা শুধু নয় সেখান থেকে গেরিলা ও চরদের অনুপ্রবেশের ঘটনাও বেড়ে গেছে। তারা ব্যাপকভাবে এদেশে আশ্রয়ও পাচ্ছে।

থামল কলিনকভ। সবাই কিছুক্ষণ নিরব। তারপর প্রথমে কথা বলল কুলিকভ। বলল, ফিলিস্তিন ও মিন্দানাওয়ে সাইমুম যে পন্থা ও পদ্ধতিতে কাজ করেছে সেটা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে তাদের ব্যাপারে আমাদের কর্মকৌশল ঠিক করা হোক এটা আমাদের প্রস্তাব।

ঠিক বলেছেন। আমি এটা নোট করলাম। কিন্তু এটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। ইতিমধ্যে আমাদের কি করা দরকার?

কুলিকভই আবার কথা বলল। বলল সে, আমরা জামিলভ ও আলিয়েভার ক্ষেত্রে যে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি সেটা অব্যাহত রাখতে হবে। আমাদের মুসলিম কর্মচারীদের এ কথা বুঝাতে হবে, বিদ্রোহ তৎপরতার প্রতি বিন্দুমাত্র দুর্বলতা পেলেও তার শাস্তি মৃত্যুদন্ডের নিচে হবে না। গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক আমাদের যেটা আছে, ঠিকই আছে। শুধু অতুর্কি অফিসারের সংখ্যা এখানে বাড়াতে হবে। যারা অন্য সব কিছুর সাথে স্থানীয় গোয়েন্দা অফিসারসহ স্থানীয় সকল কর্মচারী ও দায়িত্বশীলের কাজের প্রতিও গোপনে নজর রাখবে। আফগানিস্তানের পথে আসা এবং দেশের গোপন ছাপাখানায় ছাপা ইসলামী সাহিত্যের উৎস ও প্রচার বন্ধের লক্ষ্যেও অত্যন্ত কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। একে বিদ্রোহ তৎপরতার সাথে শামিল করে এ অপরাধের জন্য মৃত্যুদন্ডেরই ব্যবস্থা করা উচিত হবে। থামল কুলিকভ।

উজবেক 'ফ্র'-এর ফার্স্ট সেক্রেটারী বলল, আমি মনে করি বর্তমান অবস্থায় এসব দমনের জন্য কঠোর শাস্তি ও মুসলিম কর্মচারী ও দায়িত্বশীলদের ওপর চোখ রাখার ব্যবস্থা করা হলেই চলবে। একটা ভীতি সৃষ্টি করা গেলেই সাধারণ মানুষের কাছে বিদ্রোহীরা আর কোন আশ্রয় পাবে না।

তাজিক 'ফ্র'-এর ফার্স্ট সেক্রেটারী চেরনেংকো মাথা নেড়ে উজবেক সেক্রেটারীর কথায় সায় দিল।

কুলিকভ বলল, উজবেক সেক্রেটারী ভালো প্রস্তাব করেছেন। আমরা স্থানীয় কর্মচারীদের অবিশ্বাস করবো না, তবে তাদের ওপর নির্ভর করবো না, এই নীতি আমাদের গ্রহণ করতে হবে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হেসে 'ফ্র'-এর প্রতিরক্ষা প্রধান কলিনকভ বললো, কুলিকভ সুন্দরভাবে একবাক্যে উজবেক সেক্রেটারীর কথাটাকে প্রকাশ করেছেন। আর আমি আনন্দের সাথে বলছি, আমাদরে বিশ্ব রেড সংস্থা 'ফ্র'- এর মনের কথাটাই আমাদের মুখে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। চিন্তার এই ঐক্যই আমাদের শক্তি। কথা শেষ করে কলিনকভ উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়াল সবাই।

# ৮

গুলরোখ রাষ্ট্রীয় খামার। পাহাড়ের পাদদেশে ১০ হাজার হেকটর জমি নিয়ে গড়ে উঠেছে এই খামার। আমুদরিয়া নদী থেকে বয়ে আসা খালের পানিই এই খামারের প্রাণ। ধীরে ধীরে পানির সরবরাহ বাড়ানো হচ্ছে, বাড়ছে সেই সাথে খামারের পরিধি।

খামারের পূর্ব পাশে পাহাড়ের গা ঘেঁষে খামারের রেসিডেন্সিয়াল ব্লক। রেসিডেন্সিয়াল ব্লকের মাঝখানে কম্যুনিটি কমপ্লেক্স। কম্যুনিটি কমপ্লেক্সে রয়েছে একটি সমাবেশ হল। এখানে নাচ, গান, নাটক গ্রুপের প্রোগ্রাম লেগেই থাকে। তার পাশে সাংস্কৃতিক স্কুল। এখানে নাচ, গান, নাটক ইত্যাদির প্রশিক্ষণ ও মহড়া চলে। পাশেই একটা লাইব্রেরী রুম। লাইব্রেরীটা কম্যুনিস্ট আদর্শ, কম্যুনিস্ট অর্থনীতি, কম্যুনিস্ট কৃষি, কম্যুনিস্ট সংস্কৃতি প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় প্রকাশনার বই দ্বারা ভর্তি। রাষ্ট্রীয় খামারের স্কুলও এই কম্যুনিটি কমপ্লেক্সে অবস্থিত। একটা খেলার মাঠও রয়েছে কম্যুনিটি  কমপ্লেক্সে। বিকেল হলেই ভীড় বাড়তে থাকে কম্যুনিটি সেনটারে। এখানে নাচ, গান, নাটক আর ভদকার স্রোতে সকলকে বুঁদ করে রাখা হয়। মেয়েদের পর্দা বিদায় করা হয়েছে বহু বছরের চেষ্টায়। তবু দেখা যায় মাথায় রুমাল বাঁধা অনেকে অবাধ মেলামেশা এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে।

কম্যুনিটি সেন্টারের দক্ষিণ পাশে তাকালেই মাঠটার ওপারে একটা বড় বাংলো দেখা যায়। ওটা গুলরোখ খামারের ডিরেক্টর মুহাম্মাদ আতাজানভের বাড়ী। আতাজানভ উজবেকিস্তানের একজন সুপরিচিত কৃষিবিদ। তাসখন্দ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষিতে ডক্টরেট নিয়েছেন। দক্ষ একজন কৃষিবিদ। পাহাড়ের অনেক উষর উপত্যকা এবং অনেক মরু মাটিতে তিনি সবুজের সমারোহ এনেছেন। এই গুলরোখ খামারের ও তিনিই স্রষ্টা। আতাজানভ উজবেকিস্তান কৃষি কাউন্সিলেরও সদস্য।

সূর্য উঠলেও ভোরের ঠান্ডা আমেজ তখনও কাটেনি। আতাজানভ তাঁর সোয়ারের ঘোড়াটা আস্তাবলে বেঁধে ঘাম মুছতে মুছতে বাড়ীতে ঢুকে গেলেন। ফজর নামাযের পর উঁচু নীচু পাহাড়ী পথে অশ্বচালনা তাঁর নিয়মিত ব্যায়াম।

নাস্তা সেরে স্টাডিরুমে এসে বসলেন আতাজানভ। আলমারীতে বইয়ের ভীড়ে লুকোনো কুরআন শরীফ বের করে একটা চুমু খেয়ে টেবিলে নিয়ে বসলেন। রুশ ভাষায় লেখা কুরআনের তাফসীর। আফগান মুজাহিদদের কাছ থেকে জোগাড় করেছেন আতাজানভ।

কুরআন পড়ছিলেন আতাজানভ। এ ঘরে অভিধান নিতে এসে মেয়ে নাদিয়া তার আব্বার কুরআন পড়া দেখে তার পাশে দাঁড়িয়ে গেল। কুরআন থেকে মুখ তুলে আতাজানভ বললেন, কিছু বলবে?

না আব্বা, এমনি দেখছিলাম।

তুমি কুরআন পড়ছো তো?

পড়ছি। আচ্ছা আববা একটা কথা, কুরআনের তাফসীর পড়তে যেয়ে দেখছি, কতকগুলো নির্দিষ্ট গুণ থাকলে তবেই সে মুসলমান হবে। তাহলে বংশগত ভাবে কি মুসলমান হওয়া যায়?

যায় না। তবে মুসলিম হয়ে জন্মাবার পর যদি সে আল্লাহকে এক মানে, রাসূলকে রাসূল মানে তাহলে তার পরিচয় মুসলিম অবশ্যই হবে, কিন্তু মুসলিম হবার সব শর্ত এতে পূরণ হবে না এবং পরকালে মুক্তিও আসবে না।

আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের ক্লাসে আদম শুমারীতে মুসলমানদের জনসংখ্যার উল্লেখ কেন নেই এই প্রশ্নের জবাবে স্যার বলেছিলেন, দেশে ক'জন মুসলমান আছে! বাপ মুসলমান হলে কি ছেলে মুসলমান হয়?

আদম শুমারীতে কাদের মুসলমান বলা হবে?

সত্যকে পাশ কাটাবার এটা একটা মতলব।মুসলমানেদর মুসলমানিত্ব নষ্ট করার ব্যবস্থাটা তো ওরাই করেছে।

আতাজানভ আবার কুরআন শরীফ পড়ায় মনোযোগ দিতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় আতাজানভের ছেলে আট বছর বয়সের আহমদ আতাজানভ দৌড়ে

এসে পিতার পাশে দাঁড়াল। আতাজানভ তাড়াতাড়ি কুরআন শরীফ বন্ধ করলেন। আহমদ বলল, এটা কি বই আব্বা?

এই একটা বই।

দেখি কি বই। বলে আহমদ বইটিতে হাত দিতে চাইল। আতাজানভ কুরআন শরীফ একটু টেনে নিয়ে বললেন, অজু না করে এ বই ধরে না! যও এখন পড়ো গে।

আহমদের আকর্ষণ যেন এতে আরো বাড়ল। বলল, কি লেখা আছে এতে, গল্প?

গল্প নয়, অনেক ভালো কথা।

কি ভাল কথা?

আল্লাহ্‌র কথা।

আল্লাহ কে?

মানুষ এবং সবকিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন।

আহমদ তার পিতার দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ের সাথে বলল, কি আব্বা, আমাদের স্যার তো বলেন, স্রষ্টা নেই। আগের মানুষ জানতো না তাই স্রষ্টার কথা বলত।

আতাজানভ বিপদে পড়ে গেলেন। এখন যদি স্রষ্টা আছেন এ কথা ছেলেকে বুঝিয়ে না দেন তাহলে ছেলের কাছে তিনি মিথ্যাবাদী হয়ে যান। আবার যদি বলা হয় স্যার ঠিক বলেননি, তাহলে আহমদের স্যার মিথ্যাবাদী হয়ে যায়। আর আহমদ নিশ্চয় ক্লাসে গিয়ে স্যারকে বলবে সে মিথ্যা কথা বলেছে। তখন ক্রুদ্ধ শিক্ষক আতাজানভের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে আসবে যে, তিনি স্কুলের শিক্ষা কারিকুলামের বিরোধিতা করছেন। আর এ অভিযোগের সাথে সাথেই আতাজানভের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা অনুসন্ধান শুরু হবে। এসব ভেবে নিয়ে আতাজানভ আহমদের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, আহমদ, এসব কথা এখন বুঝবে না, আরও বড় হও বুঝিয়ে দেব, কেমন। যাও এবার পড়ো গে।

আহমদ যেমন ছুটে এসেছিল, তেমনি ছুটে চলে গলে। নাদিয়া বলল, আব্বা, আহমদকে কুরআন শরীফের নামটা বললে কি ক্ষতি হত?

আতাজানভ বললেন, অসুবিধা এই ছিল, আমি কুরআন শরীফ পড়ি এই কথা সে ক্লাসে তার সহপাঠীদের এবং স্যারদের গিয়ে বলত। দেখ না, প্রতিদিন ক্লাসে কি হয় কেমন সে হুবুহু রিপোর্ট করে।

কিন্তু করলেই কি হত?

১০ নং ট্রাকটরের ড্রাইভারের ইয়াসিনভকে চিনতে?

কেন তার চাকুরী এবং খামার থেকে সদস্যপদ বাতিল হলো জান?

না।

গোয়েন্দা দফতরে রিপোর্ট গিয়েছিল, সে মোল্লার কাছে আরবী শিখেছে এবং কুরআন শরীফ পড়ে।

কিন্তু মোল্লারা কুরআন শরীফ পড়লে দোষ হয় না?

দোষ হয়, কিন্তু তাদের সহ্য করা হয়।

কেন?

দুটো কারণে। এক, বিশ্বকে বুঝানো যে, কুরআন শরীফ জানা এবং পড়া এখানে নিষিদ্ধ নয়। দেখনি, আমাদের খামারে একবার বাংলাদেশ থেকে একদল সফরকারী এলে তাদের সামনে মোল্লা মীর ইয়াকুবকে দিয়ে কুরআন শরীফ পড়ানো হয়েছিল? সফরকারীরা সে কি খুশী! অথচ এর একদিন আগেই ইয়াসিনভকে বরখাস্ত করে খামার থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আর দু'নম্বর কারণ হলো, মুসলমানদের মধ্যে একযোগে কোন ক্ষোভ সৃষ্টি হওয়ার কোন কারণ তৈরী না করা। মুসলমানরা এখনও মোল্লাদের ভালোবাসে, তাদের সম্মান করে এবং তাদের কথা শোনেও!

ঠিক বলেছেন আব্বা, বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি নামায গোপনে আমার রুমে পড়ি। আমি জেনেছি যারা মসজিদে নামায পড়তে যায়, কিংবা যারা প্রকাশ্যে নামায পড়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা বিধান বিভাগ এবং কম্যুনিস্ট স্টুডেন্ট লীগ তাদের একটা রেজিস্টার সংরক্ষণ করে।

আতাজানভ কিছু বলার জন্য মুখ খুলছিলেন, এমন সময় কলিংবেল বেজে উঠল। 'দেখি কে এল' বলে উঠে দাঁড়ালেন আতাজানভ। কুরআন শরীফ আলমারীতে রেখে স্টাডি রুম থেকে বেরিয়ে ড্রইং রুমে এলেন।

আতাজানভ দরজা খুললেন। গেটে দাঁড়িয়ে কর্ণেল কুতাইবা। আতাজানভ অস্ফুট কন্ঠে 'আসসালামু আলাইকুম' বলে তাঁকে স্বাগত জানালেন।

ড্রইং রুমে এসে বসলেন কর্নেল কুতাইবা। কপালে তাঁর বিন্দু বিন্দু ঘাম। পথ চলার ক্লান্তি তার চোখে মুখে।

কর্নেল কুতাইবা সাড়ে ছ'ফুট লম্বা দেহের বিশাল মানুষ, ইস্পাতের মত পেটা দেহ। মেদের সামান্য চিহ্ন দেহের কোথাও নেই। সারাদিন অসুরের মত খাটতে পারেন। কর্নেল কুতাইবার আসল নাম কর্নেল গানজভ নাজিমভ। ওয়ার্ল্ড রেড আর্মির একজন কর্নেল। চীন সীমান্তে যুদ্ধের সময় পায়ে আঘাত পান। এই আঘাতের কারণেই তাকে রিটায়ার করিয়ে দেয়া হয়। একটু খুঁড়িয়ে হাটেন। উজবেকিস্তানের খুব বড় ঘরের ছেলে নাজিমভ। তার পিতা শরীফ রশিদভ ছিলেন উজবেক সরকারের প্রধান। রিটায়ারের পর নাজিমভকে ভালো চাকুরী অফার করা হয়েছিল, তিনি যাননি। সড়ক পরিবহনের একটি হেভি ট্রাক বহরের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন। নিজেও ট্রাক চালান। তাঁর ট্রাক বহর তাসখন্দ থেকে পামিরের বলতে গেলে মাথায় অবস্থিত তাজিকিস্তানের পামির বায়োলজিক্যাল ইনস্টিটিউট পর্যন্ত যাতায়াত করে। তিনি সাইমুমের সাথে জড়িত হয়েছেন অনেকদিন। একটি ছোট্ট ঘটনা তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

নাজিমভ অত্যন্ত ভালোবাসতো তার দাদু ইমসাইল রহিমজানকে। রহিমজান তার যৌবনে যাই করুন পরে তার ভুল বুঝতে পারেন এবং ধর্মানুরক্ত হয়ে পড়েন। সবকিছু থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন জীবন-যাপন করতেন। ছেলে রশিদভ পার্টির ও রাষ্ট্রের উচ্চ পদ নিয়ে ব্যস্ত থাকায় পিতার খুব কমই খোঁজ নিতে পারত। রহিমজানও কষ্ট বোধ করতেন ছেলের কাজ কর্মে। দাদুর নিঃসঙ্গ জীবনের সাথী ছিল নাতি নাজিমভ। সেনাবাহিনীতে যাবার পরও ছুটি পেলেই নাজিমভ ছুটে আসত দাদার কাছে। ঘন্টার পর ঘন্টা কাটাতেন দাদা-নাতি গল্প করে। নাজিমভ তার দাদুর মত নামায রোযা করতো না। দাদুও তাকে কোনদিন চাপ দেয়নি। শুধু বলতো, এখন বুঝছো না, বুঝবে একদিন।

দাদুর অসুখের খবর পেয়ে নাজিমভ ছুটি নিয়ে ছুটে এসেছিল দাদুর কাছে। দাদু যেন তার পথের দিকেই তাকিয়ে ছিল। ডাক্তারের কাছে নজিমভ

শুনলো, তার দাদুর অবস্থা ভালো নয়। নাজিমভ দাদুর কপালে হাত রেখে ব্যাকুলভাবে বলল, তোমার কষ্ট হচ্ছে দাদু?

কি কষ্ট দাদু?

আমি মরে গেলে আমার দেহটাকে তো তোমরা পুড়িয়ে ফেলবে। কিন্তু আমি তো মুসলামান।

দাদু থামলেন হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারল না নাজিমভ। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল দাদুর দিকে। সে জানে দাদু কি বলতে চায়। কিন্তু কম্যুনিস্ট ব্যবস্থায় ইসলামী নিয়মে দাফন করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

দাদুই আবার কথা বললেন, জানি এসব কথা তোমাদের কাছে নিরর্থক। কিন্তু আমি তোমাদের মাফ করবো না। বলতে বলতে বৃদ্ধের গন্ড বেয়ে অশ্রুর দুটি ধারা নেমে এল। বৃদ্ধ দাদুকে জড়িয়ে কেঁদে উঠল নাজিমভ। বলল, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি দাদু, আমার সবটুকু শক্তি দিয়ে চেষ্টা করবো।

নাজিমভ তার সবটুকু শক্তি দিয়েই চেষ্টা করেছে। কিন্তু দুর্বল এক কন্ঠ শত কণ্ঠের ভীড়ে হারিয়ে গেছে। পিতা রশিদভ ধমক দিয়ে নাজিমভকে বলেছে, মুর্খের মত আচরণ করো না, বাস্তববাদী হও।

ব্যার্থ হয়েছে নাজিমভ। ব্যর্থ নাজিমভ দাদুর শেষকৃত্যানুষ্ঠানে আর থাকেনি। দাদুর দেহটাকে যান্ত্রিক দাহ-কেন্দ্রে নিয়ে যাবার জন্য যখন তৈরী করা হচ্ছিল, তখন নাজিমভ চোখ মুছতে মুছতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছিল। চলে এসেছিল নিজ কর্মক্ষেত্রে। তারপর যুদ্ধে আহত হয়ে রিটায়ার করার পর একবার মাত্র বাড়ী গিয়েছিল।

এ ঘটনা নাজিমভের জীবনে আমূল পরিবর্তন আনে। ইসলামের ওপর পড়াশুনা শুরু করেন। এখন দুঃখী মুসলিম জনগণকে মুক্ত করে ইসলামের পূর্ণ প্রতিষ্ঠাই তাঁর জীবনের লক্ষ্য। তাঁর নতুন নাম কর্নেল কুতাইবা। ইতিহাসের কুতাইবা ছিলেন মধ্য এশিয়া অঞ্চলের প্রথম মুসলিম বিজেতা।

কর্ণেল কুতাইবা এখন মধ্যে এশিয়া অঞ্চলের সাইমুমের প্রধান। আতাজানভ নাস্তা আগেই করেছিলেন। কুতাইবা নাস্তা করার পর দু'জনে বেরিয়ে পড়লেন। আতাজানভের জীপে দু'জন চেপে বসলেন। জীপ বেরিয়ে এল খামার

কমপ্লেক্স থেকে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে কুতাইবা বললেন, আমরা দু'ঘন্টায় পৌছতে পারব নিশ্চয়?

আতাজানভ মাথা নেড়ে সায় দিলেন। পাহাড়ী পথ বেয়ে এগিয়ে চলল জীপ।

গুলরোখ রাষ্ট্রীয় খামার থেকে ৮০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে পাহাড়ের ৪ হাজার ফুট উঁচুতে একটি হ্রদ এবং একটি সুন্দর উপত্যকা ঘিরে একটি পর্যটন কেন্দ্র। হ্রদের চারদিক বেষ্টন করে যে ফল ও ফুলের বাগান গড়ে তোলা হয়েছে তা দেখার মত। নাম দেয়া হয়েছে লেনিন স্মৃতি পার্ক। এই পার্ক থেকে একটা সুপরিসর উপত্যকা বেরিয়ে গেছে দক্ষিণ দিকে। এই উপত্যকায় ফলের চাষ হয়। গোটা গ্রীষ্মকালটা ভ্রমণকারীদের পদভারে জমজমাট থাকে এই পর্যটন কেন্দ্র। উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, প্রভৃতি সব অঞ্চল থেকেই ছুটি ও অবসর বিনোদনের জন্য লোক আসে এখানে। সাপ্তাহিক ছুটির দিনে ভীড় বাড়ে।

লেলিন স্মৃতি পার্ক ছাড়িয়ে উপত্যকার পথ ধরে এগিয়ে চলছিলেন আতাজানভ ও কর্ণেল কুতাইবা। উপত্যকার মাঝামাঝি জায়াগায় ঘন গাছে ঢাকা খামার বাড়ী। উপত্যকার রাষ্ট্রীয় খামারের পরিচালক আলদর আজিমভ এই খামার বাড়ীতে বাস করেন। আতাজানভের সহপাঠী ও বন্ধু এবং আতাজানভের মতই সাইমুমের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি।

আতাজানভ ও কুতাইবা খামার বাড়ীর গেটের কাছে পৌঁছে একটা নির্দিষ্ট নিয়মে নিজেদের মাথায় হাত বুলালেন। সংগে সংগে খুলে গেল খামার বাড়ীর দরজা। দরজা খুলে দারোয়ান দরজার এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে। বাজের মত তার চোখ। তার ডান হাতটা ঢিলা ওভারকোটের পকেটে। বুঝাই যায় ওখানে কি আছে।

বাড়িতে প্রবেশের পথে আরেকটা দরজা। দরজার সামনে গিয়ে দু'জনেই বিশেষ নিয়মে তাদের শাহাদাত ও মধ্যমা অঙ্গুলি ঠোঁট দ্বারা স্পর্শ

করলেন। দরজা খুলে গেল। এখানেও দরজার পাশে আরেক জন দাঁড়িয়ে, ঐ ভাবেই তার হাত ট্রাউজারের পকেটে।

দরজার পরেই চারকোণা একটি উঠান। এটাই বাড়ির বাইরের আঙিনা। আঙিনার উত্তর পাশের বারান্দার সিঁড়িতে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন আলদর আজিমভ। তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে আমির উসমান, আনোয়ার ইব্রাহিম এবং হাসান তারিক।

আলদর আজিমভ, কুতাইবা এবং আতাজানভকে হাসান তারিকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। কুতাইবা বহুক্ষণ জড়িয়ে ধরে থাকলেন হাসান তারিককে। তারপর বললেন, আমাদের অতি কাছে থেকেও অনেক কষ্ট পেয়েছেন। দুর্ভাগ্য, আমরা জানতে পারিনি।

হাসান তারিক বললেন, না, দুঃখের কিছু নেই। আল্লাহ ঠিক যখন এ খবরটা আপনাদের জানাবার তখনই জানিয়েছেন এবং আলহামদুল্লিাহ আপনারা সিদ্ধান্ত নিতে দেরী করেননি।

বারান্দা পেরিয়ে সবাই পাশের একটা রুমে ঢুকে গেলেন। সেখানে আরও ক'জন আগে থেকেই বসা ছিলেন।

এখানে একটু বলা প্রয়োজন, আলদর আজিমভের এই বাড়ী উজবেকিস্তান সাইমুমের অপারেশনাল হেড কোয়ার্টার্স। শুধু এই বাড়ী নয়, এই উপত্যকা প্রকল্পের সব লোকই সাইমুমের কর্মী। এই খামার বাড়ী ঘিরে উপত্যকায় ছড়ানো ছিটানো রয়েছে অনেকগুলো সংকেত শিবির। সবগুলোই সশস্ত্র। একেকটা সংকেত শিবির হাজার সৈন্যের বাহিনীকেও মুকাবিলা করার শক্তি রাখে। আবার বিপদের সময়ে উপত্যকা খালি করে পাহাড়ের গোপন দুর্গম পথে তারা অল্প সময়েই সীমান্তের ওপারে আফগানিস্তানে গিয়ে পৌঁছতে পারে।

কার্পেট পাতা মেঝেতে সবাই গোল হয়ে বসেছে। কুতাইবার একপাশে বসেছেন হাসান তারিক, অন্য পাশে বসেছেন আলদর আজিমভ। প্রথমে কথা বললেন কুতাইবা। বললেন, আজ একটা অতি গুরুত্ব-পূর্ণ, অতি জরুরী বিষয়ের আলোচনার জন্য এই পরামর্শ সভার অধিবেশন ডাকা হয়েছে। সে কথা বলার আগে আমি আমাদের ভাই, আমাদের মেহমান হাসান তারিক সম্পর্কে বলতে

চাই। আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি যে, তাঁর মত অভিজ্ঞ ও দক্ষ সাইমুম নেতাকে আমাদের পাশে পেয়েছি। তাঁর সম্পর্কে আপনারা সবকিছুই সামিজদাদের মাধ্যমে জেনেছেন। নুতন কিছুই বলার নেই।

থামলেন কুতাইবা। তারপর বলতে শুরু করলেন আবার, ইসলামিক রিপাবলিক অব ফিলিস্তিনের মস্কোস্থ এ্যামবেসী গতকাল আমাকে জানিয়েছে, বিশ্বজোড়া এক ছায়া সরকারের মালিক এখানকার ওয়ার্ল্ড রেড সংস্থা 'ফ্র' মিন্দানাও বিপ্লবের সময় আহত অবস্থায় আমাদের ভাই, আমাদের নেতা আহমদ মুসাকে বন্দী করে। বিমান তাঁকে নিয়ে আসে এদেশে। কিন্তু পামির এলাকায় প্লেন ক্রাশের পর তিনি হারিয়ে গেছেন। প্লেন ক্রাশে তিনি মারা যাননি, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কোথায় গেলেন তিনি, এটা এখনও এখানকার সরকার কিংবা অতুল শক্তিধর 'ফ্র' কেউই বহু চেষ্টা করেও জানতে পারেনি।

হাসান তারিক সহ সকলের মুখ হা হয়ে গেছে। বিস্ময়ে সকলের চোখ বিস্ফারিত। হাসান তারিক, আলদর আজিমভ ও আতাজানভ সমস্বরে বলে উঠলেন, আমরা স্বপ্ন দেখছি না তো, আমাদের কান যা শুনছে তা ঠিকই শুনছে তো ইত্যাদি।

শুনতে স্বপ্নের মতই লাগছে, কিন্তু বাস্তব সত্য। 'ফ্র'-এর হেলিকপ্টার ও গোয়েন্দা দল পামিরের ঐ এলাকা এখনও চষে ফিরছে।

সত্য বলে তো আমাদের বসে থাকার সময় নেই, আল্লাহ জানেন তিনি এখন কোথায় কিভাবে আছেন, বিশেষ করে আহত তিনি! বলল আমির উসমান।

তার সম্পর্কে আমরা দুই অবস্থার কথা চিন্তা করতে পারি, (এক) তিনি একভাবে লুকিয়ে আছেন, (দুই) তিনি কারও আশ্রয়ে আছেন। এই দুইটির যে কোনটি হলে, আমি তাঁর সম্পর্কে জানি, তিনি পথ বের করে আমাদের সামনে আসবেন। বললেন হাসান তারিক।

আল্লাহর কাছে আমাদের প্রার্থনা এই দু'টোর যে কোন একটিই হোক। আসুন আমরা তৃতীয় কোন বিকল্প নিয়ে চিন্তা করবো না। বললেন কুতাইবা। একটু থেমে তিনি আবার বললেন, আমাদের ক'জনকে এখনি তাজিকিস্তানের

পামির এলাকার কেন্দ্রগুলোতে পৌঁছা দরকার। তাদের সাথে নিয়ে আমাদের অনুসন্ধানে লেগে যাওয়া প্রয়োজন।

থামলেন কুতাইবা। এবার আমির ওসমান বলল, আপনিই ঠিক করে দিন কে কোথায় যাবে। আমি শুধু এখানে একটা কথাই বলব, পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর। হাসান তারিক জেল থেকে পালিয়েছেন, আহমদ মুসা হারিয়ে গেছেন। অতএব 'ফ্র' এখন ক্ষ্যাপা কুকুরের মত। অনুসন্ধানে আমাদের অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে।

আমি কি এ ব্যাপারে আপনাদের কোন কাজে লাগব? বললেন হাসান তারিক।

না। আপনি আপাতত এই হেড কোয়ার্টার্সে থাকবেন। এখানে আপনার অনেক কাজ। থামলেন কুতাইবা। তারপর বললেন, এখন বৈঠক এখানেই শেষ করছি। আমি আলদর আজিমভকে অনুরোধ করছি, আতাজানভ এবং হাসান তারিক ছাড়া সকলকে এক ঘন্টার মধ্য রওয়ানার ব্যবস্থা করে দিন, আমি প্রোগ্রাম তাদের দিচ্ছি। বলে কুতাইবা উঠে দাঁড়ালেন।

একটু পুরোনো মসজিদ, একটা মাদ্রাসা ভবন এবং আমির তাইমুরলংগের পীর সুফী আবদুর রহমানের কবরগাহ নিয়ে এখানকার হিসার দুর্গ। দুর্গ বলতে যা বুঝায় এখন তা নেই। দুর্গের একটা ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে মসজিদের দক্ষিণ পাশে। মসজিদ মাদ্রাসা সবই দুর্গের মধ্যে ছিল। মুসলমানরা কোন রকমে মসজিদ, মাদ্রাসা ও কবরগাহটা টিকিয়ে রেখেছে। মধ্য এশিয়ার মুসলমানদের পবিত্রতম স্থানগুলোর মধ্যে হিসার দুর্গ একটি। মুসলমানদের সেন্টিমেন্টের কারণেই হিসার দুর্গের মসজিদ, মাদ্রাসা ও কবরগাহে রেড সরকার হাত দিতে পারেনি।

মসজিদের দক্ষিণ পাশে ভাঙা দুর্গের পাশ ঘেঁষে মোল্লা আমির সুলাইমানের বাড়ী। তিনি সুফী আবুদর রহমানের উত্তর পুরুষ। সমজিদের ইমাম,

মাদ্রাসার মুহাদ্দিস, কবরগাহের মুতাওয়াল্লী তিনি। তিনি মুসলমানদের অসীম ভক্তি-শ্রদ্ধার পাত্র। সাইমুমের উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য তিনি।
রাত সাড়ে তিনটায় উঠেন আমির সুলাইমান। তাহাজ্জুদের নামায পড়েন, ফজরের নামায পড়েন। তারপর তাসবিহ-তাহলিল শেষে বেলা উঠলে চাশতের নামায পড়ে ঘরে ফেরেন।

সেদিন ঘরে নাস্তা করে আমির সুলাইমান আহমদ মুসার রুমে এসে বসলেন। আহমদ মুসাকে পেয়ে আমির সুলাইমান যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছেন। এখন গোটা সময়টাই তিনি আহমদ মুসার কাছে বসে কাটান। গল্প শোনেন। ফিলিস্তিন ও মিন্দানাওয়ের গল্প শুনতে শুনতে গর্বে তার বুক ফুলে ওঠে। নিজের দেশের এক সোনালী ভবিষ্যত যেন তার চোখে ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

আজ আহমদ মুসা উদগ্রীবভাবে আমির সুলাইমানের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি আসতেই আহমদ মুসা বললেন, জনাব একটা কথা বলব আপনাকে?

আহমদ মুসার কন্ঠস্বরে চমকে তাকিয়ে আমির সুলাইমান বললেন, কোন খারাপ কিছু নয় তো?

হয়তো খারাপ!

কি বলুন তো?

হিসার দুর্গের খাদেম ইয়াকুব সম্পর্কে আপনার মত কি, কেমন সে?

কেন, কিছু ঘটেছে?

বলুন, বলছি।

ছ'মাস আগে তাকে কাজে লাগিয়েছি। পিয়ান্দজের এক কলখজে চাকুরি করত। চাকুরী হারিয়ে বেকার ঘুরছিল। নামায-কালামে ভাল দেখে চাকুরী দিয়েছি।

সে এখানে আসে, না আপনি তাকে নিয়ে আসেন?

সেই আসে এখানে। তবে এইটুকু জেনেছি সে ঐ কলখজে চাকুরী করত।

আমি তাকে সন্দেহ করছি। আমি তিনদিন হলো এসেছি। প্রথম দিনেই তার চোখের ভাষা আমার মনে সন্দেহ জাগায়। গতকালের একটা ঘটনায় আমি সন্দেহ আর ধরে রাখতে পারছি না।

কি ঘটেছে গতকাল?

গতরাতে এশার পর আমি মাঠটায় পায়চারী করছিলাম। অন্ধকার রাত। আমি ফিরবার সময় ইয়াকুবের ঘরে কথা শুনলাম। ঠিক টেলিফোনে কথার মত। আমি শোনার জন্য দাঁড়াতেই কথা শেষ হয়ে গেল। আমি রাতে অনেক চিন্তা করেছি। আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয়ে থাকে তাহলে সে অয়্যারলেসে কথা বলছিল।

অয়্যারলেসে কথা বলছিল, তাহলে সরকার কিংবা 'ফ্র'- এর গুপ্তচর সে!

বিস্ময়-বিস্ফারিত তার দৃষ্টি। চোখুমখ তার লাল হয়ে উঠেছে। আমির সুলাইমান আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় আমির সুলাইমানের ছোট নাতি ছুটে এসে খবর দিল, দাদা মিলিটারি।

'মিলিটারী!' বলে চমকে উঠে দাঁড়িয়ে দরজায় এলেন আমির সুলাইমান। কিন্তু আর এগুতে পারলেন না। 'ফ্র'-এর সামরিক বিভাগের ইউনিফর্ম পরা দু'জন অফিসার এগিয়ে আসছে দরজার দিকে। এসেই আমির সুলাইমানেক লক্ষ্য করে বলল, আমরা আপনাকে গ্রেপ্তার করলাম। একটুও নড়বেন না।

'এই ঘরেই তো আপনার মেহমান থাকে' বলে রিভলভর বাগিয়ে ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল একজন অফিসার। ততক্ষণে আহমদ মুসা মেঝেয় নেমে পড়েছে। দরজায় অফিসারটির মুখোমুখি দাড়িয়ে বললো, আমিই তাঁর মেহমান।

অফিসার তার পিস্তলটি আহমদ মুসার বুক বরাবর তাক করে রেখে পিছিয়ে গেল অনেকখানি। তারপর আহমদ মুসার আপাদমস্তকে একবার নজর বুলিয়ে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে বলল, ইউ আর গ্রেট আহমদ মুসা। পাওয়া গেছে আপনাকে। বলে সে আনন্দে কয়েক রাউন্ড গুলী ছুঁড়লো আকাশে।

গুলীর শব্দে আরও দু'জন অফিসার হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল। প্রথম অফিসারটি হেসে বলল, ভয় নেই, শিকার পাওয়া গেছে। তোমরা এঁদের দু'জনকে গাড়ীতে তোল। আমি এ ঘরটা একটু দেখে আসি।

পামির সড়ক থেকে একটা রাস্তা বেরিয়ে গেছে উত্তরে হিসার দুর্গের দিকে। রাস্তাটি পাহাড়ের চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে একটা বড় উপত্যকায় থেমে গেছে। তারপর আবার তা উঠে গেছে পাহাড়ে। এই পাহাড়ি পথের শেষ প্রান্তে হিসার দুর্গ।

কুতাইবার গাড়ি পামির সড়ক থেকে হিসার দুর্গের পথ ধরে চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে এগিয়ে চলছিল। সেই বড় উপত্যকার সামনের বড় চড়াইটার মাথায় উঠেই কুতাইবা দেখতে পেল উপত্যকা থেকে একটা গাড়ি উঠে আসছে। সংগে সংগে কুতাইবা সালামভকে গাড়ি থামাতে বললেন। চোখে দূরবীন লাগিয়ে দেখলেন 'ফ্র'-এর পরিচয় চিহ্ন আকা ছয় সিটের একটা সামরিক কায়দার পিকআপ ভ্যান। 'ফ্র'-এর ভ্যান হিসার দুর্গের দিক থেকে কেন? দূরবীণে চোখে ধরেই থাকলেন কুতাইবা। গাড়ি আরো কাছে এল। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, গাড়ীর ছয়টি সিটে 'ফ্র'-এর সামরিক ইউনিফর্ম পরা ছয়জন লোক। ভ্যানটি আরো এগিয়ে এসেছে। এবার সেই অফিসারদের চেহারা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, তাদের সামরিক ইনসিগনিয়া পর্যন্ত। অফিসারদের একজন 'ফ্র'- এর কর্নেল ও একজন ক্যাপ্টেন র‍্যাংকের। অবশিষ্ট চারজান লেফটেন্যান্ট।

একটা বাঁকে এসে গাড়ীটি ডানদিকে টার্ণ নিল। এবার গাড়ীর পেছনটা সামনে এসে গেল। কুতাইবা দেখলেন ভ্যানের ফ্লোরে পড়ে আছে দুজন লোক। গাড়ীর ঝাঁকুনিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। তাদের হাত-পা বাঁধা। কুতাইবার গোটা দেহে একটা উষ্ণ স্রোত বয়ে গেল। তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল তার চোখ দু'টি। দু'জনের একজনের মুখ দেখে চমকে উঠলেন কুতাইবা। ওকি! উনি তো আমির সুলাইমান। বন্দী তিনি। তার পাশে উনি কে? চেনা নয়, মাথায় ব্যান্ডেজ। হঠাৎ একটা আশংকা মনে উঁকি দিল। উনি কি আহমদ মুসা হতে পারেন? ওরা দুরবীণের চোখ থেকে হারিয়ে গেল। গাড়ি ঘুরে গেছে। এবার গাড়ীটি সোজা উঠে আসছে চড়াই-এর দিকে।

কুতাইবা চোখ থেকে দূরবীণ নামিয়ে নিলেন। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন তিনি। সালামভকে নির্দেশ দিলেন গাড়ি একটু পিছিয়ে নাও। গাড়ি একটু পিছিয়ে এলে দুজনেই গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন। সালামভকে সব কথা বুঝিয়ে বলে

প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে চড়াই-এর মাথায় দু'জন দু'পাশের দুই পাথরের আড়ালে গিয়ে লুকালেন।

গাড়ীটি উঠে আসছে চড়াই-এর দিকে। অফিসাররা তখন খুব হালকা মুডে। কেউ ঝিমুচ্ছে, কেউ রেকর্ড প্লেয়ার থেকে ভেসে আসা ফিল্মী সংগীত উপভোগ করছে।

চড়াই ভেঙে উঠে আসা গাড়ি চড়াই-এর মাথায় এসে একটু দম নিয়েছে। ড্রাইভিং সিটে বসা অফিসারটি গিয়ার চেঞ্জ করছে। এমন সময় গাড়ীর ডান পাশে পাথরের আড়াল থেকে মুখোশ আঁটা কুতাইবা বিদ্যুৎ গতিতে বেরিয়ে এলেন। ওরা কিছু বুঝে উঠার আগেই কুতাইবার এম-ই-১০ অটোমেটিক মেশিন পিস্তলের ভয়ংকর ব্যারেলটা ড্রাইভারের পাশের জানালা দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল সামনের তিনজন অফিসারের দিকে। কুতাইবা পরিষ্কার রুশ ভাষায় বললেন, অস্ত্র হাতে নেবার কোন চেষ্টা করবেন না।

পেছনের তিনজন কুতাইবার পিস্তলের আড়ালে ছিল। এই সুযোগ তারা গ্রহণ করতে চাইল। একজন তার স্টেনগান তুলে নিয়েছিল। কিন্তু সে খেয়াল করেনি বাঁ পাশ থেকে সালামভ এসে দাঁড়িয়েছে তার জানালার পাশে। অফিসারটি তার স্টেগানের ট্রিগারে হাত দেবার আগেই সালামভের মেশিন-পিস্তল থেকে বৃষ্টির মত এক ঝাঁক গুলী বেরিয়ে গেল।

এম-ই-১০ অটোমেটিক মেশিন পিস্তল ভয়ানক এক ক্ষুদে অস্ত্র। মিনিটে ১২ শ'গুলী বেরোয় ওর ক্ষুদে ব্যারেল থেকে।

সালামভের পিস্তল যখন থামল দেখা গেল ঝাঁঝরা হয়ে গেছে পিছনের তিনটি দেহই।

গুলি ছোঁড়ার সময় যে হতচকিত একটা মুহূর্ত তার সুযোগ নিয়েছিল ড্রাইভার। সে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল কুতাইবার পিস্তল ধরা হাতের ওপর। কিন্তু কুতাইবার বজ্রমুষ্টি এতটুকুও কাঁপেনি। মাত্র সেকেন্ডের জন্য চেপে ধরেছিলেন পিস্তলের ট্রিগার। এক পশলা বৃষ্টির মত বেরিয়ে গেল গুলী। তিনটি দেহই লুটিয়ে পড়ল সিটের ওপর।

কুতাইবা এবং সালামভ দুজনেই দ্রুত উঠে গেলেন ভ্যানের ওপর। আহমদ মুসা ও আমির সুলাইমান দু'জনেই অীত কষ্টে উঠে বসেছিলেন। কুতাইবাকে দেখে 'মারহাবা' 'মারহাবা' বলে আনন্দ প্রকাশ করলেন আমির সুলাইমান।

প্লাস্টিক কর্ডের বাঁধন কেটে দিলে দুজনেই উঠে দাঁড়ালেন। কুতাইবা আহমদ মুসার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন, আমার অনুমান মিথ্যা না হলে আপনিই আহমদ মুসা, আমাদের নেতা।

আহমদ মুসা তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, না ভাই, সবাই আমরা কর্মী, আল্লাহর সৈনিক।

আনন্দের অশ্রু কুতাইবার চোখে। তিনি বললেন, এ দেশবাসীর জন্য আজ আনন্দের দিন। আল্লাহর দান আপনি আমাদের জন্য।

সবাই নেমে এলেন ভ্যান থেকে। ভ্যানটাকে ঠেলে পাশের গভীর খাদে ফেলে দেয়া হলো। চার হাজার ফিট গভীর অন্ধকার খাদে হারিয়ে গেল ৬টি লাশ সমেত ভ্যানটি।

ভ্যান থেকে পাওয়া স্টেনগান ও পিস্তলগুলো গাড়ীতে তুলে নেয়া হলো। মুছে ফেলা হলো এখানে কোন প্রকার ঘটনা ঘটার সব চিহ্ন। তারপর গাড়ি ঘুরিয়ে যাত্রা শুরু করলেন পামির সড়কের দিকে।

আহমদ মুসা বলল, খুব জোর ঘন্টা চার-পাঁচ, তার পরেই 'ফ্র'-এর লোকেরা ওদের সন্ধানে আসবে এই সড়কের দিকে।

একটু থেমে কুতাইবার দিকে চেয়ে আহমদ মুসা বলল, ওদেরকে খুঁজে না পেলে ক্ষিপ্ত হয়ে ওরা হিসার দুর্গ এলাকার বসতির ওপর অত্যাচার করতে পারে।

তা ঠিক, কিন্তু এর কোন প্রতিকার আমাদের হাতে নেই। আল্লাহ ভরসা। নির্দোষ মানুষের ওপর এই অত্যাচারই হবে ওদের পতনের কারণ।

বললেন কুতাইবা।

আহমদ মুসা আবার বলল, ‘ফ্র’-এর অত্যাচার ও আধিপত্যের বয়স অনেক হলো, বার্দ্ধক্যজনিত ভুল তার বাড়বে। আর এ ভুলগুলোই রচনা করবে আমাদের সাফল্যের পথ।

কুতাইবার হাতে ড্রাইভিং হুইল। তাঁর দৃষ্টি সামনে প্রসারিত। উজ্জ্বল এক আনন্দ সে দৃষ্টিতে। সামনে দৃষ্টি রেখেই তিনি বললেন, ভাই আহমদ মুসা, এ পথ রচনার দায়িত্ব এখন আপনার। আমরা সবাই আপনার কর্মী।

আহমদ মুসা দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে ছিলেন সামনে। তাঁর দৃষ্টি এখন এ পাহাড়ী পথের ওপর সীমাবদ্ধ নয়। মধ্য এশিয়ার পাহাড়, উপত্যকা, মরুভূমি এবং দুঃখী জনপদগুলো তাঁর চোখে ভাসছে। সেই সাথে ভেসে উঠছে এখাণে চেপে বসা দৈত্যাকায় শক্তি ‘ফ্র’-এর এক ভয়াল রূপ। চোখ বুজলেন আহমদ মুসা। ভেসে উঠল এবার তাঁর চোখের সামনে রক্ত ভেজা জনপদমালার এক দৃশ্য-রক্তাক্ত পামির। গাড়ি যেন দ্রুত প্রবেশ করছে সেই রক্তের দরিয়ায়। প্রতিটি স্নায়ুতন্ত্রী শক্ত হয়ে উঠছে আহমদ মুসার। হাত দু’টি তাঁর মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উঠেছে তাঁর অজান্তেই। চোখ খুললেন আহমদ মুসা। কোন জবাব দিলেন না কুতাইবার কথায়। তীব্র বেগে এগিয়ে চলছে তখন গাড়ি।


পরবর্তী ঘটনার জন্য দেখুন

**রক্তাক্ত পামির**

সাইমুম-৫

# রক্তাক্ত পামির

আবুল আসাদ

# ১

পামির সড়ক ধরে হিসার দূর্গের দিকে তীর বেগে ছুটে আসছিল 'ফ্র' এর একটি জীপ।

ইয়াকুবের কাছ থেকে ওয়্যারলেসে খবর পেয়ে 'ফ্র' আহমদ মুসাকে ধরার জন্য আরেকজন কর্ণেলের নেতৃত্বে একটি টীম পাঠিয়েছিল হিসার দূর্গে। 'ফ্র' জানত, হিসার দূর্গ থেকে প্রকাশ্য প্রতিরোধের কোন সম্ভাবনা নেই এবং ও টিমটাই যথেষ্ট। তবু 'ফ্র' কর্মকর্তারা আশ্বস্ত হতে পারেনি, তাই বাড়তি ব্যবস্থা হিসাবে আরেকজন কর্ণেলের নেতৃত্বে তারা এই টিমটি পাঠিয়েছে। এ টিমেও আগের মতই একজন কর্ণেল, একজন ক্যাপ্টেন এবং চারজন লেফটেন্যান্ট।

ফাঁকা পামির সড়কে জীপটি তীর বেগে এগুচ্ছে। রীতিমত কমব্যাট ধরনের জীপ। ড্রাইভ করছিল ক্যাপ্টেন। পাশে বসা কর্ণেল, তার হাতে খোলা ওয়্যারলেস। কর্ণেলের মুখ প্রসন্ন, স্বস্তির একটা তৃপ্তি চোখে-মুখে। ওরা আহমদ মুসা ও আমির সুলাইমানকে বন্দী করে ফিরে আসছে। একশ কিলোমিটার বেগে ওরা আসছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা হিসার রোড ছাড়িয়ে পামির রোডে এসে পড়বে।

ওয়্যারলেসে  ফিল্মী সংগীত ভেসে আসছে। কর্ণেলের মুখে একটা চিকন হাসি ফুটে উঠল। মনে মনে বলল, কমরেডরা বিজয়টা তো বেশ উপভোগ করছে। কর্ণেল কিছু বলতে যাচ্ছিল ক্যাপ্টেনকে। কিন্তু মুখ ফাঁক করেও আর বলা হলোনা। এক পশলা গুলির একটা জমাট শব্দ ভেসে এল ওয়্যারলেসে। মুহূর্ত কয়েক পরে আবার। চমকে উঠল কর্ণেল। গোটা শরীরটা উদ্বেগে শীর শীর করে উঠল। এলার্মের বোতামটা তর্জনি দিয়ে চেপে ধরলো বার বার। হ্যাঁ, ওপার থেকে আওয়াজ আসছে, রিং হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু কোন সাড়া নেই। তাহলে কি ... ... ... ... ...।

কেঁপে উঠল গোটা দেহটা কর্ণেলের।

কর্ণেল উদ্বিগ্ন। ক্যাপ্টেনকে সব ব্যাপার বুঝিয়ে বলল। সেই সাথে বলল, কত তাড়াতাড়ি আমরা পৌঁছতে পারি দেখ।

জীপটা যেন নতুন প্রাণ পেল। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে লাগল স্পিডোমিটারের কাঁটা। বিদ্যুৎ গতিতে এগিয়ে চলছে গাড়ী। একশ' আশিতে দাঁড়িয়ে স্পিডোমিটারের কাঁটা থর থর করে কাঁপছে।

কর্নেল কারবোর্ডের মিনি টিভি স্ক্রীনে অস্থির চোখে তাকিয়ে আছে। হিসার রোডের মোড়টা আর বেশী দূরে নয়। ঐ তো দেখা যাচ্ছে। মোড়ের কাছে এসে জীপের স্পীড কমে এল। মোড় ঘুরল জীপটি। স্পিডোমিটারের কাঁটা আবার লাফিয়ে উঠলো। মিনি টিভি স্ক্রীনের দিকে চেয়ে থাকা কর্ণেল চমকে উঠল। টিভি স্ক্রীনের কোণায় পরিস্কার একটা গাড়ীর ছবি ভেসে উঠেছে। হিসার রোড ধরে এদিকে এগিয়ে আসছে। কর্ণেল ক্যাপ্টেনকে গাড়ী দাঁড় করাবার জন্য নির্দেশ দিল।

আহমদ মুসার চোখে ছিল দূরবীন। উৎসুক চোখে সে চারিদিকে নজর বুলাচ্ছিল। সামনে আর একটা চড়াই। ওটা পার হলে নজরে পড়বে পামির রোড। একদিন মাত্র এ রাস্তা দিয়ে গেছে আহমদ মুসা। কিন্তু তাতেই মুখস্ত হয়ে গেছে গোটা পথ। আল্লা বকশ গ্রামের কথা তার মনের কোণে একবার ঝিলিক দিয়ে উঠল। এখান থেকে বেশী দূরে তো নয় গ্রামটা। একটু পশ্চিমে গিয়ে তারপর দক্ষিণে। চড়াই এর মাথায় উঠে এসছে জীপটি। হঠাৎ দূরবীনের লেন্সে একটা

সজীব জিনিস নড়ে উঠল। হাঁ একটা গাড়ী। পামির রোড ধরে এগিয়ে এসে হিসার রোডে প্রবেশ করল।

গাড়ী চড়াই থেকে সমভূমিতে নেমে এল। দূরবীনের পর্দায় চোখ আহমদ মুসার। ওকি! গাড়ীটা দাঁড়িয়ে পড়েছে কেন? কপালটা কুঞ্চিত হয়ে উঠল আহমদ মুসার। দাঁড়ানো গাড়ীটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবার দূরবীনের পর্দায়। গাড়ীটার উপর ভাল করে নজর বুলিয়ে আহমদ মুসা দূরবীনটা দিয়ে দিল কুতাইবার হাতে। কুতাইবা আহমদ মুসার ভাবান্তর লক্ষ্য করছিল। দূরবীন চোখে লাগিয়েই সে চমকে উঠল। বলল, ওটা 'ফ্র' --এর গাড়ী।

আহমদ মুসা সম্মতি সূচক মাথা নাড়লো। কর্ণেল কুতাইবা বলল, গাড়ী কি দাঁড় করাব?

-না। আহমদ মুসা বলল।

-আমাদের কি কিছু চিন্তা করাও উচিৎ নয়?

-চিন্তা করতে হবে, কিন্তু গাড়ী দাঁড় করিয়ে নয়।

-কিন্তু আর একটু এগুলেই তো আমরা ওদের নজরে পড়ে যাব।

-আমরা নজরে পড়ে গেছি কুতাইবা।

-কেমন করে?

-জীপের ছাদে দেখুন রাডার বসানো আছে। আমরা ঐ রাডারে অনেক আগেই ধরা পড়ে গেছি। এখন দাঁড়ানোর অর্থ, আমরা তাদের সন্দেহ করেছি। এতে আমাদের প্রতি তাদের তাদের সন্দেহ পাকাপোক্ত হয়ে যাবে।

-তাহলে.........

-আমরা একেবারেই স্বাভাবিক ভাবে এগিয়ে যাব, যাতে ওরা বুঝে আমরা ওদের মোটেই সন্দেহ করিনি। আমাদের ব্যাপারে ওদের সন্দেহ হ্রাস করার এটাই সহজ পথ।

হাসল কর্ণেল কুতাইবা। ধন্যবাদ, মুসা ভাই। আমি এদিকটা চিন্তা করিনি। আপনি ঠিকই বলেছেন।

ঠিক আগের স্পিডেই এগিয়ে চলল কুতাইবার গাড়ী।

'ফ্র' -এর গাড়ী আর ৫ শ' গজ দূরেও নয়। গাড়ীটা রাস্তার ডান পাশটা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। বাম পাশ দিয়ে সহজেই গাড়ী চালিয়ে চলে যাওয়া যায়। আহমদ মুসা কুতাইবাকে নির্দেশ দিল হর্ণ বাজাবারও কোন প্রয়োজন নেই, এগিয়ে যাও বাম পাশ দিয়ে। ওরা চ্যালেঞ্জ না করলে আমরা দাঁড়াবো না। আর ওরা গাড়ী থেকে নামলেই শুধু আমরা ফায়ার করব।

আর মাত্র গজ পঞ্চাশেক। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই 'ফ্র' এর গাড়ীর পাশাপাশি পৌছা যাবে। আহমদ মুসার নির্দেশ মোতাবেক রাস্তার বাম ঘেঁষে তীর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে গাড়ী।

হঠাৎ মাইক্রোফোনে পরিস্কার রুশ ভাষায় একটা নির্দেশ ভেসে এল। বলা হলো গাড়ী দাঁড় করাবার জন্য। আহমদ মুসা কুতাইবাকে বলল, ওদের গাড়ীর মুখের সমান্তরালে আমাদের গাড়ীর মুখ নিয়ে যাও, যাতে আমরা ওদের নজরে পড়ার আগে ওরা গাড়ী থেকে নামলেই আমাদের সরাসরি নজরে এসে যায়।

কুতাইবা গাড়ীকে ঠিক সেইভাবে দাঁড় করাল। দুই গাড়ীর মাঝখানে রইল কয়েকগজ ফাঁকা জায়গা।

আহমদ মুসা চকিতে একবার চারিদিকটা দেখে নিল। ষ্টিয়ারিং হুইলে রাখা কুতাইবার হাতের বাম পাশেই গাড়ীর তাকে রাখা এম-১০ রিভলবার। চকিতে পিছন ফিরে দেখল সালামভের হাতেও আরেকটি এম-১০ রিভলবার তৈরী হয়ে আছে। আহমদ মুসা বলল, আমি বাম পাশ ও সামনেটা দেখব, তোমরা ডানদিক। বলেই আহমদ মুসা 'ফ্র'--এর কাছ থেকে কুড়িয়ে পাওয়া সাব-মেশিনগানটা নিয়ে মাথা নিচু করে টুপ করে বাম পাশে নেমে পড়ল।

কুতাইবার গাড়ী দাঁড়াবার সাথে সাথেই 'ফ্র' --এর ছ'জন লোক তাদের গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ল। সবার হাতেই উদ্যত সাব মেশিনগান। দু'জন সামনেটা ঘুরে বাম পাশে ছুটে এল এবং চারজন ডান পাশের দরজার দিকে।

বোধহয় ওদের টার্গেট ছিল গাড়ীটা ঘিরে ফেলা এবং তার পর যা করবার তাই করা। এ জন্যই সাব-মেশিনগানের ট্রিগারে ওদের আঙ্গুল আছে ঠিকই, কিন্তু মনোযোগটা দেখা গেল অনুসন্ধানের দিকে। তাই কুতাইবার এম-১০ রিভলবার বিদ্যুৎ গতিতে বেরিয়ে এসে যখন অগ্নি বৃষ্টি করল, তখন তাদের সাব-মেশিনগান

মাথা তোলার চেষ্টা করল, কিন্তু আর সময় হলোনা। আহমদ মুসার সাব-মেশিনগান এবং সালামভ এর এম-১০ রিভলবারও একই সাথে গর্জন করে উঠেছিল। মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপর সব নিরব। 'ফ্র' -এর ছ'জন লোক মুখ থুবড়ে পড়েছে রাস্তায়। আহমদ মুসা উঠে এল গাড়ীতে। কুতাইবা তার দিকে চেয়ে বলল, এবার নির্দেশ?

-আপাতত কোন ঘাঁটিতে চল।

-এখান থেকে দু'শ মাইল আপার পামিরে আমাদের একটা বড় ঘাঁটি আছে, মাইল পঞ্চাশেক সামনে গেলে এই পামির রোডের ধারেই আমাদের আরেকটা ঘাঁটি।

-আপার পামিরে পেছনের দিকে আর নয়, সামনের দিকে চল।

আহমদ মুসার ঠোঁটে হাসি। কুতাইবার গাড়ী পামির রোডে উঠে আবার যাত্রা শুরু করল পশ্চিম দিকে। আধঘন্টা পর কুতাইবার গাড়ী যেখানে এসে দাঁড়াল সেটা পাহাড়ের দেয়াল ঘেরা সংকীর্ণ একটা গলি। কুতাইবা আহমদ মুসাকে বলল, জনাব এখানে নামতে হবে। সালামভ আপনাদের ঘাঁটিতে নিয়ে যাবে।

-তুমি যাবে না?

বলল আহমদ মুসা।

-এখান থেকে আরও কয়েক মাইল পশ্চিমে গাড়ীর ৩১নং রোড ষ্টেশন। ওখানে গাড়ী রেখে আসব।

-কেন, এখানে কোথাও গাড়ী লুকানো যায় না?

-যায়, কিন্তু গাড়ী ষ্টেশনে না রেখে উপায় নেই। প্রতিদিন রাত ১২ টায় ষ্টেশনে গাড়ী চেক করা হয়। পামির রোডের জন্য গাড়ী এবং গাড়ীর সংখ্যা নির্দিষ্ট। রাত ১২টা চেকিং ষ্টেশনের সব গাড়ীর সংখ্যা যোগ করে হিসাব মেলানো হয়। হিসাবে গরমিল হলে আর রক্ষা নেই। যে বহরের গাড়ীর সংখ্যা কম হবে তাকেই পাকড়াও করা হবে। সুতরাং সারাদিন যাই হোক রাত ১২ টায় গাড়ী ষ্টেশনে নিতেই হবে।

আহমদ মুসা গম্ভীর কণ্ঠে বলল, ওরা হিসেবে কোন ফাঁক রাখতে চায়নি।

আহমদ মুসা, সালামভ এবং আমির সুলাইমান গাড়ী থেকে নেমে পড়ল। কুতাইবা গাড়ী থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল, আমি আমার গাড়ী বহরের টুকিটাকি কাজ সেরে বিকেল নাগাদ ঘাটিতেঁ পৌছব। একটা সংকীর্ণ গিরিপথ ধরে ওরা সামনের পাহাড়ের দেয়ালটা পেরিয়ে একটা প্রশস্ত উপত্যকায় গিয়ে পড়ল। উপত্যকাটা উত্তর দক্ষিণে লম্বা। পাথুরে বুক। পাথরের মাঝেও সবুজের সমারোহ। থোকা থোকা কাঁটাগাছ উপত্যকার ধূসর বুকে নীল তিলকের মত। কাঁটাগাছগুলো কোথাও কোথাও মাথা ছুঁই ছুঁই করছে। এর মধ্যে দিয়েই সন্তর্পণে এগিয়ে চলেছে ওরা তিনজন। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সালামভ। সামনেই আরেকটা পাহাড়ের দেয়াল। ও দেয়ালটা পেরিয়ে গেল ওরা। পথ ক্রমেই দূর্গম হয়ে উঠল। দু’ঘন্টা চলার পর একটা পাহাড়ের দক্ষিণ ঢালে জংগল ঘেরা এক উপত্যকায় গিয়ে পৌছল ওরা। পাহাড়ের শেষ দেয়ালটার মাথায় উঠেই সালামভ একটা শীষ দিয়ে উঠল। পর পর দু’বার, দু’নিয়মে। কয়েক মুহূর্ত পরেই লম্বা একটা শীষ ভেসে এল, সালামভ আহমদ মুসার দিকে চেয়ে বলল, আমরা এসে গেছি। সব ঠিক আছে।

একটু থেমে বলল, এই দূর্গম পথে তেমন পাহারার ব্যবস্থা আমরা রাখিনি। ঘাঁটি এলাকার মুখে এটিই আমাদেরঁএকমাত্র চেক পোষ্ট। এখানে পাহাড়ের মাথায় উঠে যদি শীষ না দিতাম তাহলে সাইলেন্সার লাগানো রাইফেল থেকে কয়েকটি গুলি এসে নিঃশব্দে আমাদের বক্ষভেদ করতো।

পাহাড়ের ঢালুতে গাছের ফাঁকে ফাঁকে মসজিদের গম্বুজের মত নীল তাবু। তারা কার্পেপ মোড়া পরিপাটি করে সাজানো একটা পাহাড়ের গুহায় গিয়ে উঠল। গুহামুখে তাদের স্বাগত জানাল আলী ইব্রাহীম। সালামভ আহমদ মুসাকে পরিচয় করিয়ে দিল। পরিচয়ের পর আরেক দফা আলিংগন; কুশল বিনিময়।

খুব সম্মানের সাথে আলী ইব্রাহীম আহমদ মুসাকে নিয়ে ফরাশের এক প্রান্তে জায়নামাজ পাতা জায়গায় বসাল। বলল, মুসা ভাই, এটা আমাদের দরবারগৃহ, মেহমান খানা, মসজিদ সবই।

-আমার খুবই ভাল লাগছে। বলল আহমদ মুসা।

-কিন্তু এখানে মেহমানদারীর কিছুই নেই। সলজ্জকণ্ঠে বলল ইব্রাহিম।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ইব্রাহিম তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি একজন দায়িত্বশীল মেজবান; বিপ্লবী নও।

এবার কথা বলল সালামভ। বলল ঠিকই বলেছেন মুসা ভাই। ইব্রাহিম এখনো মনে প্রাণে একজন তাজিক কবিলার সর্দারই রয়ে গেছে।

উল্লেখ্য, আলী ইব্রাহিম এই ঘাঁটির কমান্ডের দায়িত্বে আছে। কিন্তু আসলেই সে এক তাজিক কবিলার সর্দার। এই উপত্যকা বরাবর মাইল পাঁচেক পশ্চিম দিকে গেলে প্রশস্ত এক উপত্যকায় সবুজ এক গ্রাম। নাম গুলমহল। কয়েক পুরুষ ধরে তারা এই গ্রাম, এই উপত্যকার মালিক। এক সময় তারা বোখারায় বাস কনত, লালবাহিনী বোখারায় ঢোকার পর সেখান থেকে তারা পালিয়ে এসে এই গ্রামে বসতি স্থাপন করে। আলী ইব্রাহিমের বয়স ২৫। দু'বছর আগে তার পিতা নিহত হন। হত্যাকান্ডের কোন কিনারা এখনও হয়নি। তবে সন্দেহ করা হয় 'ফ্র'-এর এজেন্টের হাতেই তিনি নিহত হয়েছেন। তার পিতা আলী আফজাল খামার দেখাশুনা ছাড়াও গালিচার ব্যবসা করত। তার এই ব্যবসায় আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ও ইরান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সূত্রেই আফগান মুজাহিদের সাথে তার একটা সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এটাই তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। একদিন 'ফ্র' এর আঞ্চলিক কম্যুনিস্ট পার্টি অফিসে তাঁর ডাক পড়ে। সেখান থেকে ফেরার পথেই তিনি নিহত হন।

পিতার মৃত্যুর পর আলী ইব্রাহিম কবিলার দায়িত্ব তার কাঁধে তুলে নিয়েছে। সাইমুমের সাথে গোপন যোগাযোগ আলী ইব্রাহিমের আগে থেকেই ছিল। পিতার মৃত্যু তাকে আরো দ্রুত ঠেলে দেয় এই পথে। এই ঘাঁটির সৃষ্টি হয়েছে তারই উদ্যোগে। প্রয়োজন হলে এই ঘাঁটিকে তার কবিলার এক্সটেনশন বরে চালিয়ে দেবার সুযোগ তার আছে। অন্যদিকে যৌথ খামার কাঠামো এবং সরকারী রাজনৈতিক কমিশনের সাথে তার রীতিমাফিক যোগাযোগ রয়েছে।

সালামভের কথায় ঈষৎ হেসে ইব্রাহিম বলল, সেই বিপ্লবী হবার যোগ্যতা আমাদের কোথায়। তবে মধ্য এশিয়ায় ধ্বংসাবশিষ্ট কবিলা সর্দারদের মধ্যে যদি সেই বিপ্লবী চরিত্রের একটা অংশও ঢোকানো যায়, তাহলে সাইমুমের বিপ্লব প্রয়াসের বড় অংশই সফল হয়ে গেল বলতে হবে। এদের ক্ষেত্রটা এতই উর্বর যে,

বীজ ফেললেই গাছ উঠে যায়। আর এরা বিপ্লবের সবচেয়ে নিরাপদ সেন্টারও হতে পারে।

-আলহামদুলিল্লাহ, সাইমুম এই বিষয়টার দিকে শুরুতেই জোর দিয়েছিল। ফলও পেয়েছে। বলল আহমদ মুসা। গুহাটির মুখ দক্ষিণ দিকে। সুন্দর ঠান্ডা হাওয়া আসছে। বাতাসে যেন তাজা পানির ছোঁয়া। আহমদ মুসা বলল, কাছেই কি পানি আছে কোথাও?

-সামনেই নদী। বলল, আলী ইব্রাহিম।

একটু যেন চিন্তা করল আহমদ মুসা। তারপর বলল,

-আল্লাবখশ গ্রাম এখান থেকে কতদূর?

-চেনেন আল্লাবখশ গ্রাম?

-হাঁ।

-কেমন করে? বিস্মিত কণ্ঠ আলী ইব্রাহিমের।

সংক্ষেপে আল্লাবখশ গ্রামের কথা বলল আহমদ মুসা। চোখ দু'টি চকচক করে উঠল আলী ইব্রাহিমের। বলল আব্দুল গফুরের ছেলে আব্দুল্লায়েভ আমার পরিচিত। প্রায়ই দেখা হয় আঞ্চলিক কনফারেন্সে। এ অঞ্চলের খুব গুরুত্বপূর্ণ কবিলা ওটা। সবচেয়ে বড় কথা হলো, এই কবিলাই শুধু আমাদের আওতার বাইরে। আল্লাবখশ গ্রামের মসজিদটির ইমাম মোল্লা নুরুদ্দিনই শুধু আমাদের লোক।

আহমদ মুসা বলল, আব্দুল্লায়েভের সাথে আমার পরিচয় হয়নি। আব্দুল গফুর তার ছেলে ইকরামভ ও এক মেয়ে ফাতিমা ফারহানার সহযোগিতা আমরা পাব।

আলী ইব্রাহিম কিছু বলতে যাচ্ছিল। এমন সময় নাস্তা এল। আলী ইব্রাহিম সেদিকে তাকিয়ে বলল, আসুন মুসা ভাই, আপনারা নিশ্চয় ক্ষুধার্ত।

কেউ আর কোন কথা বলল না। সবাই যেন এমন কিছুরই অপেক্ষা করছিল। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন নেমে এসেছে। আহমদ মুসা, সালামভ ও আলী ইব্রাহিম দ্রুত নামাজ পড়ার জন্য ঘাঁটিতে ফিরছিল। মাগরিবের সময় তখনও কিছুটা

বাকি। কিন্তু পশ্চিম দিগন্তটা পাহাড়ের আড়ালে থাকায় সময়ের তুলনায় অন্ধকারটা বেশীই মনে হলো।

সেই গুহাই নামাজের জায়গা। যখন আহমদ মুসারা গুহামুখে পৌছল, আজান হচ্ছিল তখন।

এমন সময় একজন লোককে এদিকে আসতে দেখে আলী ইব্রাহিম দ্রুত সেদিকে এগিয়ে গেল। কিছু কথা বলল তারা। তারপর তারা দু'জনেই একসাথে এগিয়ে এল। ওদের মুখের দিকে চেয়েই ভ্রু দু'টি কুঁচকে গেল আহমদ মুসার। আহমদ মুসার মনে হল, ওদের গোটা অবয়ব, এমনকি হাঁটা পর্যন্ত কি এক দুঃসংবাদ বহন করছে।

কাছে এসে দাঁড়াতেই আহমদ মুসা একরাশ জিজ্ঞাসা নিয়ে আলী ইব্রাহিমের উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকাল। আলী ইব্রাহিম বলল, ভাই কুতাইবা গ্রেফতার হয়েছেন। আর..

আহমদ মুসা আলী ইব্রাহিমকে থামিয়ে দিয়ে বলল, চল আগে নামাজ সেরে নেই।

সবাই গিয়ে নামাজে দাঁড়াল। নামাজ শেষে সবাই বেরিয়ে গেলে আহমদ মুসা আলী ইব্রাহিম এবং সেই লোককে নিয়ে বসল।

লোকটি সাইমুমের একজন তথ্য কর্মী। তার কাছ থেকে জানা গেল, কুতাইবা গাড়ী নিয়ে ষ্টেশনে ফেরার দু'ঘন্টা পরেই গ্রেফতার হয়। আকস্মিক ভাবে গোটা ষ্টেশন ঘেরাও হয়ে যায় এবং গাড়ীগুলো চেক করা হয়। উজবেক তাজিক কোন মুসলিমকেই ষ্টেশন থেকে বের হতে দেয়া হয়নি। কুতাইবার গাড়ীতে বারুদের গন্ধ পাওয়া যায় এবং রেজিষ্টার থেকে প্রমান হয় যে ঘন্টা দুই আগে গাড়ীটি হিসার দুর্গের ওদিক থেকেই ষ্টেশনে এসেছে। এর পরেই তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গাড়ীর অবশিষ্টদের তারা হন্যে হয়ে খুঁজতে শুরু করেছে। গোটা পামির রাস্তায় এখন টহল চলছে হেলিকপ্টারও টহল দিয়ে ফিরছে। খবরটি শোনার পর সবাই নীরব। আলী ইব্রাহিম এবং আহমদ মুসা দু'জনেই ভাবনার গভীরে। নিরবতা ভেঙ্গে আহমদ মুসাই প্রথমে বলল, আর কোন খবর?

বলল লোকটি, আর একটি দুঃসংবাদ আছে হিসার দুর্গের ওদের কাছ থেকেই শুনলাম, হিসার দুর্গের গোটা জনপদ পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। পুড়িয়ে মারা হয়েছে সব লোককেই। যারা বের হতে চেষ্টা করেছে মেশিনগানের গুলিতে নিহত হয়েছে। আর......

থামল লোকটি। যেন কথা বলতে পারছেনা। আহমদ মুসা তার উদ্বিগ্ন চোখ দু'টি তুলে ধরল লোকটির দিকে। বলল, বল।

এই সময় মোল্লা আমির সুলাইমান এখানে এল। লোকটি একবার চোখ তুলে তার দিকে চেয়ে বলল, 'ফ্র'-এর লোকেরা গর্বের সাথে বলছে, হুজুরের পরিবারের সবাইকে মেরে তারা বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নিয়েছে এবং তার ১৮ বছরের নাতনিকে তারা ধরে নিয়ে গেছে।

তীব্র এক খোঁচা লাগল বুকে। সেই খোঁচায় চমকে উঠল আহমদ মুসা। আল্লাবখশ গ্রাম থেকে আহমদ মুসা আশ্রয় নিয়েছিল সম্মানিত এই বৃদ্ধ মোল্লা আমির সুলাইমানের ঘরে। পিতৃস্নেহে তাকে আশ্রয় দিয়েছিল এই বৃদ্ধ। তারই ফলে তার আজ এই পরিণতি। ব্যথায় টন টন করে উঠল আহমাদ মুছার হৃদয়। যারা মারা গেছে তারা শহীদ, কিন্তু আমির সুলাইমানের নাতনিকে ধরে নিয়ে যাবার খবর আহমদ মুসার গোটা সত্তায় আগুন ধরিয়ে দিল।

আহমদ মুসা ধীরে ধীরে চোখ তুলে তাকাল মোল্লা আমির সুলাইমানের দিকে। দেখল তার সফেদ দাড়ির মতই তার মুখটা যেন প্রশান্তিতে হাসছে। সে আহমদ মুসার দিকেই তাকিয়েছিল। আহমাদ মুসার অবস্থা মনে হয় সে বুঝতে পারল। অত্যন্ত শান্ত স্বরে সে বলল। সবই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। মুমিনের বাড়ি-ঘর , সহায়-সম্পদ এবং স্ত্রী-পুত্র-পরিবার সবই তো আল্লাহ্‌র জন্যই। সুতরাং দুঃখ-দুশ্চিন্তার কিছুই নেই। আর আমার শিরীন শবনমের কথা? আল্লাহ্‌ই তার নেগাহবান।

থামল বৃদ্ধ। বৃদ্ধার এই কথা গুলো প্রশান্তির এক পরশ ছড়াল চারিদিকে। সকল অবস্থায় আল্লাহর ওপর নির্ভর করার, আল্লাহর দিকে রুজু হবার নিখাদ এক আহ্বান ছড়িয়ে দিল তার কথাগুলো।

আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করল আহমদ মুসা। তারপর বৃদ্ধাকে লক্ষ্য করে বলল, আল্লাহর সব প্রশংসা, আপনি আমাদের প্রেরনার উৎস। দোয়া করুন আমাদের জন্য। অতঃপর সেই লোকটির দিকে ফিরে বলল ওদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে?

-ওদের নিয়ে হেলিকপ্টার বখশ শহর গেছে বলে শুনেছি।

বখশ শহর বখশ নদীর হাইড্র ইলেকট্রিক কেন্দ্র ঘিরে গড়ে ওঠা একটা নতুন নগরী। আপার তাজিকিস্তানের এটাই প্রধান নগর।

আহমদ মুসা চোখ বন্ধ করে মুহূর্ত কয়েক ভাবল। তারপর আলী ইব্রাহিমের দিকে ফিরে বলল এখানকার সাইমুম সম্পর্কে তোমার পরামর্শ কি?

-আমার মতে প্রথমেই এই খবর লেনিন স্মৃতি পার্ক এবং তাসখন্দের হেডকোয়ার্টার সহ আমাদের সকল কেন্দ্রে জানিয়ে দেয়া দরকার। দ্বিতীয় কাজ ওদের উদ্ধারের উদ্যোগ। বলল আলী ইব্রাহিম। একটু থেমে আবার সে বলল কি করতে হবে আমাকে নির্দেশ করুন।

একটু চিন্তা করে আহমদ মুসা বলল, আমাদের অবিলম্বে চারটি কাজ করতে হবে। এক এই খবর হেডকোয়ার্টারসহ সকল কেন্দ্রে প্রেরণ করা। দুই উদ্ধার অভিযান। তিন হিসার দুর্গে লোক প্রেরণ, সেখানকার অবস্থা দেখা এবং কিছু করনীয় থাকলে তা করা। চার সূফী আব্দুর রহমানের মাজারসহ হিসার দুর্গের মুসলিম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং সেখানকার জনপদের উপর বর্বর আচরনের কাহিনী মধ্য এশিয়ার প্রত্যেক মুসলমানের কানে পৌছে দেয়া। চতুর্থ কাজটি সময় সাপেক্ষ। কিন্তু অন্য তিনটি কাজ এখনি করতে হবে।

-নির্দেশ করুন। বলল আলী ইব্রাহিম।

-প্রথম ও তৃতীয় কাজের দায়িত্ব তুমি নাও। আর দ্বিতীয় কাজের দায়িত্ব আমার এবং সালামভের। আমারা এখনই যাত্রা করতে চাই।

-মুসা ভাই কিছু মনে না করলে আমি একটা সংশোধনী আনতে চাই। বিনীত কণ্ঠে বলল আলী ইব্রাহিম।

-বল।

-প্রথম ও তৃতীয় কাজের দায়িত্ব সালামভ এবং আমার সহকারীর উপর ছেড়ে দেয়া যায় আর বখশ শহরের উদ্ধার অভিযানে আমি আপনার সাথে থাকলে আমার সরকারী পরিচয় উপকারে আসতে পারে।

-ঠিক আছে। বলল আহমদ মুসা।

এ সময় রাতের খানা এসে পড়লো। সবাই নীরবে সেদিকে মনোযোগ দিল। বাইরে তখন দুর্গম পাহাড়ের জমাট আন্ধকার। নিরব নিথর চারিদিক।

# ২

তাসখন্দের বেলা ৩টা। সুঁচ ফুটানো রোদ। পা দু'টি উঠতে চাইছিল না রোকাইয়েভার। ক্ষুধা এবং ক্লান্তি দুই-ই তাকে গ্রাস করতে চাইছে। ঘরের দরজা আর বেশী দুরে নয়। কিন্তু ঘরে গিয়ে দাদীকে কি খবর দেবে রোকাইয়েভা। আজও কোন কাজ তার যোগাড় হয়নি। পরিচিত সবাই যেন আজ অপরিচিত হয়ে গেছে। রোকাইয়েভা উপলব্দি করছে তার উপস্থিতিতে সবাই অস্বস্তি বোধ করেছে। এর কারন রোকাইয়েভা বুঝে। 'বিশ্বাসঘাতক জামিলভের বোন রোকাইয়েভাও আজ সন্দেহের তালিকায়। তাকে চাকুরী দেয়ার অর্থ আহেতুক এক সন্দেহের শিকার হওয়া। কেউই এ সন্দেহের শিকার হতে চায় না। তাই পরিচিত জনদের সকল দরজা তার জন্য বন্ধ। গোটা পৃথিবী তার কাছে আজ ছোট হয়ে গেছে। সরকারের সহযোগী 'ফ্র'- এর কথায় এমনটি হতোনা। ওরা বলেছিল, ভাইয়ার বিশ্বাসঘাতকতাকে কনডেম করে সরকারের কাছে একটা স্টেটমেন্ট রেকর্ড করলেই পড়াশুনার সুযোগ এবং সরকারী বাড়ী দুই-ই পাওয়া যাবে। কিন্তু রোকাইয়েভা এটা প্রত্যাখ্যান করেছে। এর পরিণতি কি সে জানত। কিন্তু যে পরিণতি হোক ভাইয়ের জীবন দেয়ার চেয়ে বড় কি? না তা নয়। সুতরাং হাসিমুখেই সে এ জীবন বরন করে নিয়েছে। তার নিজের জন্য কোন দুঃখ নেই। দুঃখ হচ্ছে দাদীর জন্য। কষ্ট সহ্যের বয়স তো আর নেই। ঘরের দরজায় এসে পড়েছে। দরজায় নক করল রোকাইয়েভা। হাত দু'টিকেও ভারী মনে হচ্ছে রোকাইয়েভার।

দরজা খুলে গেল। হাসিমুখে দাদী দাঁড়িয়ে। বিছানায় সেই জায়নামাজ এবং কোরআন শরীফ। রোকাইয়েভা বুঝল দাদী কোরআন শরীফ পড়ছিল।

দাদীর মুখে হাসি, কিন্তু দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে হাসির উপর আন্ধকার একটা ছায়া। দাদীর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখে এবং তার আধময়লা কাপড় দেখে ভেতর থেকে বেদনাটা উথলে উঠল রোকাইয়েভার। সে দাদীকে জড়িয়ে

ধরে বলল, তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে দাদী? শেষের কথাগুলো রোকাইয়েভার ভেঙ্গে পড়তে চাইলো। দাদী রোকাইয়েভার পিঠ চাপড়ে অত্যন্ত পরিষ্কার কণ্ঠে বলল, আমার কোন কষ্ট নেই বোন। গোডাউনের মত এই গরাদ ঘরে থেকে আমি যে তৃপ্তি পাচ্ছি তা এতদিন এয়ারকন্ডিশন ঘরে থেকে পাইনি।

-সত্যই বলছ, সত্যই তোমার কোন কষ্ট হচ্ছেনা দাদী?

-হ্যাঁরে হ্যাঁ। সুখত মনের জিনিস, বাইরের দুঃখ দারিদ্রের সাথে তার কোনই সম্পর্ক নেই। দাদীকে থামিয়ে দিয়ে তার মুখের উপর চোখ রেখে রোকাইয়েভা বলল এত শক্তি তুমি কোথা থেকে পাও দাদী?

-কোথা থেকে পাই? জাতির প্রতি ভালোবাসা থেকে।

আজ যুগ যুগ ধরে কম্যুনিষ্ট সরকার পশু শক্তি আমার মুসলিম ভাই বোনদেরকে যে কষ্ট দিচ্ছে তার কোন পরিমাপ নেই। সে দিকে তুমি যদি একবার চোখ মেলে তাকাও তাহলে নিজের যে কষ্ট তাকে কষ্টই মনে হবে না।

ঘরে একটি মাত্র খাটিয়া। একটা টেবিল একটা চেয়ার। সাথে একটা বাথরুম। তাদের বাড়িটি কেড়ে নিয়ে সরকার এখানে এনে তাদের তুলেছে। সরকারের ইচ্ছামত বিবৃতি না দেয়ায় হুমকি দেয়া হয়েছে। এ ঘরটিও কেড়ে নেয়া হবে এবং বিদ্রোহী হিসেবে শ্রম শিবিরে পাঠান হবে। কিন্তু এর পরও রোকাইয়েভা পারেনি তার ভাইয়াকে বিশ্বাসঘাতক বলে আভিহিত করতে।

রোকাইয়েভা খাটিয়ায় গিয়ে বসল। পাশেই টেবিল। টেবিলে প্লেট দিয়ে একটা বাটি ঢেকে রাখা। রোকাইয়েভাই এটা সকালে রেখে গিয়েছিল। মনে হচ্ছে কেউ তাতে হাত দেয়নি। মনটা আনচান করে উঠল রোকাইয়েভার। সে দ্রুত প্লেট তুলে নিল। দেখল বাটিতে একখণ্ড রুটি। এ রুটি দাদীর জন্য রেখে দিয়েছিল। দাদী রুটিতে হাত দেননি। রোকাইয়েভা দাদীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল দাদী তুমি রুটি খাওনি, না খেয়ে আছ এখন পর্যন্ত?

রুদ্ধ আবেগে গলা কেঁপে উঠল রকাইয়েভার . দাদী ধীরে ধীরে তার কাছে এসে মাথায় হাত রাখল। তারপর সস্নেহে বলল, তুই খেয়ে না গেলে কি আমি খেতে পারি?

সেদিন সকালে একখণ্ড রুটি তাদের ছিল। তারা প্রায় খালি হাতে এখানে এসে উঠেছে। পরার কাপড় ছাড়া আর উল্লেখযোগ্য কিছুই তারা নিয়ে আসতে পারেনি। কিছু রুবল ছিল, সেটা দিয়েই কয়েকদিন তারা রুটি কিনেছে। আজ সকালে রোকাইয়েভা না খেয়েই কাজের খোঁজে গিয়েছিল। দাদীকে বলে গিয়েছিল রুটিটি খাবার জন্য।

দাদীর কথা শুনে রোকাইয়েভা তাকে জড়িয়ে ধরে শিশুর মত কেঁদে ফেলল। দাদীর শুকনো চোখ দিয়েও এবার নেমে এল অশ্রুর দুটি ধারা। চোখ দু'টি মুছে নিয়ে দাদী বলল, চল বোন রুটি ভাগ করে নেই। আমি তোর জন্য অপেক্ষা করছি। আমি জানতাম তুই খালি হাতে ফিরে আসবি। কোন দরজাই তোর সামনে খুলবেনা।

দাদীই রুটি ভাগ করল। একভাগ রোকাইয়েভার হাতে দিল। রোকাইয়েভা তার খণ্ডটি দাদীর দিকে তুলে ধরে বলল। এটা তুমি নাও তোমারটা আমাকে দাও।

দাদী ম্লান হেসে বলল ঠিক আছে।

দু জনে শুকনো রুটি চিবিয়ে দু গ্লাস পানি খেয়ে নিল। এ সময় দরজায় নক হল। রোকাইয়েভা দাদীর দিকে একবার তাকিয়ে উঠে দাড়াল। দরজা খুলল। দেখল একজন ফুলওয়ালা। তাসখন্দের রাজ পথে এমন কাগজের ফুলওয়ালা অনেক পাওয়া যায়। ঘর সাজানো টেবিল সাজানোর জন্য এদের চাহিদা প্রচুর।

রোকাইয়েভা দরজা খুলে দাড়াতেই ফুলওয়ালা একটা সুন্দর ফুলের ঝাড় তার হাতে গুঁজে দিল। যেন ফরমায়েশি ফুলই সে নিয়ে এসেছে। রোকাইয়েভা মুখ খোলার আগেই ফুলওয়ালা বলল একটা নমুনা দিয়ে গেলাম, পছন্দ কিনা দেখুন বলেই সে পথ চলা শুরু করল। রোকাইয়েভা অবাক হবার চেয়ে বিরক্তই হল। দরজা বন্ধ করে দাদীর দিকে ঘুরে দাডীয়ে বলল। দেখ দাদী কি জ্বালাতন। পয়সা নিল না। কে একজন ফুলওয়ালা দিয়ে গেল।

-এমন তো হয়না কখনও। কি ব্যাপার? -বলল দাদী।

-কি জানি.. বলতে বলতে রোকাইয়েভা ফুলের গুচ্ছটি টেবিলের উপর রাখল। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকলো না, পড়ে গেল। মাটির তৈরি রঙ্গিন ফুলদানির

তলাটা কেমন উঁচু। তলাটা পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখল, টেপ দিয়ে ফুলদানীর রংগের একটি কাগজ আটকে রাখা। রোকাইয়েভা তাড়াতাড়ি ওটা খুলে ফেলল। বের হয়ে একটি ভাঁজ করা কাগজ। একটি চিঠি, তার সাথে একটি পাঁচশ রুবলের নোট।

রোকাইয়েভা এবং দাদী দুজনেই বিস্মিত। রোকাইয়েভা চিঠি পড়লঃ

রোকাইয়েভা আমার সালাম নিও। আগামী কাল প্রাভদার তাসখন্দ সন্সকরনে পি ৯১ ক্রমিক নাম্বারে একটি 'মিস্ট্রেস আবশ্যক' বিজ্ঞাপন বেরুবে। বিজ্ঞাপনে উল্লেখিত ঠিকানায় তুমি ১০ টায় পৌছাবে। বাসাটা আমির ওসমানের। দ্বিধা করবেনা। তোমার দ্বীনি ভাইদের তরফ থেকেই এই কাজের ব্যবস্থা।

ঐ ভাইদের তরফ থেকেই ৫০০ রুবল পাঠান হলো তাৎক্ষনিক খরচ মিটানোর জন্য।

ওয়াসসালাম-

'যুবায়েরভ'

রোকাইয়েভা চিঠি পড়ে দাদীর হাতে দিল। দাদীও চিঠিটি পড়ল। পড়ে বলল কে যুবায়েরভ ?

-মনে আছে দাদী ভাইয়ার মৃত্যুর খবর এই যুবায়েরভের চিঠিতেই পেয়েছিলাম।

-মনে আছে, তাইত ভাবছি কে এই যুবায়েরভ!

-আশ্চর্যের কথা। আমরা কোথায় আছি আমাদের কি প্রয়োজন সবই তার জানা আছে!

দাদী কোন উত্তর দিল না। চোখ বন্ধ করে ভাবছিলো। অনেক্ষন পরে চোখ খুলে রোকাইয়েভার দিকে চেয়ে বলল, রোকাইয়েভা, আমরা বোধহয় একা নই। কম্যুনিস্ট সরকার ও 'ফ্র' এর সমান্তরালে দেশে আরেকটা শক্তি অদৃশ্যভাবে কাজ করছে। যুবায়েরভ সে শক্তিরই প্রতিক।

দাদী থামল, আবার চোখ দুটি বন্ধ। চোখ দুটি খুলল তার অনেকক্ষন পর। দু'টি চোখ তার উজ্জ্বল। বলল, বুঝতে পেরেছি, প্রাভদার বিজ্ঞাপন তোকে একটা কাজ দেবার অধিকার সৃষ্টিরই কৌশল।

একটু থেমে আবার দাদী বলল, ওরা কি করছে, বলতে পারিস রোকাইয়েভা?

-না দাদী এদের জানিনা। কিন্তু গোপন পত্রিকা সামিজদাদ থেকে জানি, কারা একদল মানুষ এদেশের মুসলমানদের জাগরন ও মুক্তির জন্য সংগ্রাম করছে।

-সামিজদাদ কি? -বলল দাদী।

-সাইক্লোস্টাইল করা গোপন নিয়মিত পত্রিকা। ওতে থাকে এদেশের বিপ্লবী কর্ম তৎপরতার খবর, কম্যুনিস্ট সরকারের অপকীর্তি ও সন্ত্রাসের বিবরন এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ইসলামী আন্দোলনের নানা তথ্য। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে এর কয়েকটা কপি দেখেছি।

দাদীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বলল। তুই যাই বলিস, আমার খুব আনন্দ লাগছে। আমার জাতি জাগছে জেগে উঠেছে আমার জাতি। বলতে বলতে আবেগে উঠে দাঁড়াল দাদী। রোকাইয়েভা কাছে আসে, তার ঘাড়ে একটা হাত রেখে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল আমার জামি কি এদের জানত নাকি?

-জানবেনা কেন দাদী? ভাইইয়াদের কাছেই সব তথ্য আসে।

-তাহলে বলছি, আমার জামিল এদের সাথে ছিল। তাইত সে জীবন দিল।

তারপর দু'টি হাত উপরে তুলে দাদী বলল, হে আল্লাহ কম্যুনিস্ট সরকারের সহযোগিতা করে এ পরবারে যে পাপ হয়েছিল, জামিলের রক্ত দিয়ে তুমি তার করে দাও।

দাদীর দু'গন্ড দিয়ে দ'তী অশ্রুর ধারা নেমে এল। রোকাইয়েভা অপলক ভাবে তাকিয়েছিল দাদীর দিকে। হঠাৎ যেন তার মনে হোল এ কান্না তার দাদীর নয়, গোটা মধ্য এশিয়ার। আমুদরিয়া ও শিরদরিয়ায় যে অশ্রু বইছে যুগ যুগ ধরে এ যেন সেই অশ্রু। সেও দাদীর সাথে হাত তলল। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল 'আমিন'।

গভীর রাত। রোকাইয়েভা এবং দাদী গাঢ় ঘুমে অচেতন। তাদের দরজায় নক হলো ঠক ঠক ঠক। শক্তিশালী নক। ঘুম তাদের ভাঙ্গলোনা। আবার নক হলো ঠক, ঠক, ঠক।

এবার আগের চেয়ে জোরে। কিন্তু ঘুম তাদের ভাংলোনা। দাদি একটু নড়ে উঠলেন মাত্র। এবার দরজায় কারাঘাত, একবার, দুইবার, তিন.........।

চমকে উঠে বসলো দাদী। প্রথমে কিছু বুঝে উঠতে পারলোনা। তারপর যখন বুঝেত পারলো চমকে উঠলো। এত রাতে দরজায় নক করে কে?

আবার কারাঘাত হলো। দাদী রোকাইয়েভাকে জাগিয়ে দিল। সব শুনে রোকাইয়েভা আঁতকে উঠলো। এত রাতে কে আসতে পারে। না ভুল করে কেউ নক করছে এখানে। খোলা উচিৎ কিনা? একটু দরজার কাছাকাছি গিয়ে জিজ্ঞেস করল কে ?

-দরজা খুলুন। বাহির থেকে ভারি কন্ঠে উত্তর এল।

-কে আপনারা, কাকে চান? ভায়ার্ত কন্ঠ রোকাইয়েভার।

কোন জবাব এলনা। আগের সেই ভারি কন্ঠ আরো ভারি গলায় বলল, তাড়াতাড়ি খুলুন নইলে ভেঙ্গে ফেলবো।

জবাব না পেলেও রোকাইয়েভা বুঝল এরা সরকারের লোক। সরকারী লোক না হলে এমন উদ্ধত কন্ঠ আর কারোরই হতে পারে না। রোকাইয়েভা তার দাদীকে বলল ওরা সরকারের লোক না খুলে উপায় নেই। কিন্তু এই কথা বলার সাথে সাথে অন্তরটা ভীষণ কেঁপে উঠল রোকাইয়েভার। সেদিন সরকারি লোকেরা যে হুমকি দিয়ে গিয়েছিল তা মনে পড়লো। দাদী ওরা নিয়ে যেতে এসেছে।

দাদীকে জড়িয়ে ধরে কাঁপছে রোকাইয়েভা। আবার প্রবল ধাক্কা এল দরজায়। ভীত- চকিত রোকাইয়েভা যন্ত্রের মত খুলে দিল।

দুজন লোক দীর্ঘাংগ। মাথাই ফেল্ট হ্যাট। মুখটা ভালো করে দেখা যায় না। দাদী এবং রোকাইয়েভা দেখেই বুঝতে পারলো ওরা পুলিসের লোক। দরজা খুলতেই একজন সেই ভারি গলায় রোকাইয়েভাকে বলল, আপনি আমাদের সাথে আসুন।

রোকাইয়েভা দু’পা পিছিয়ে গেল ঘরের ভিতর। বলল, কোথায় যাব, কেন যাব? কাঁপছে রোকাইয়েভা।

-সময় নষ্ট করবেন না, লাভ নেই। বেরিয়ে আসুন। রোকাইয়েভা গিয়ে দাদীকে জড়িয়ে ধরল। ঢুকরে কেঁদে উঠল। বলল, আমি যাব না, আমি দাদীকে ছেড়ে যাব না। দাদী পাথরের মত। তার চোখে কোন আশ্রু নেই। যেন কোন অনুভুতিই নেই তার। দু’জনের একজন ঘরে ঢুকল। বলল সময় আমাদের নেই, মাফ করবেন আমাদের।

বলে হাত ধরে টেনে বের করে নিয়ে গেল রোকাইয়েভাকে। রোকাইয়েভা চিৎকার করে কেঁদে উঠল। বলল দাদীর কেউ নেই, দাদীকে ছেড়ে একা আমি যাবনা। দাদীকেও নিয়ে চল।

কিন্তু সেই নিস্ফল চিৎকার। নিস্ফল আবেদন নিরব রাতে একটা বড় প্রতিধ্বনিই তুলল শধু। কোন ফলই হল না।

রাস্তায় একটা কাল গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। রোকাইভাকে তারা সেখানে নিয়ে তুলল। ছোট্ট একটা হিস হিস হিস হিস শব্দ তুলে চলতে শুরু করল গাড়ী।

দু’পাশে অনেক ফ্লাটের সারি। কিন্তু একজন অসহায় নারীর আর্ত চিৎকার কোথাও কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল না। একটা কৌতুহলি মুখ কোন জানালায় উঁকি দিলোনা। একটা জানালার পর্দাও একটু নড়ল না। যেন একটা মৃত্যু পুরী। কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের এটাই বাস্তবতা। ভয় এবং প্রতি মুহুর্তের উদ্বেগ কারো মধ্যে কোন জীবনাবেগ রাখেনি, সবাইকে একটা জীবন্ত লাশে পরিনত করছে। এ লাশে যন্ত্রিক কর্মক্ষমতা আছে, কিন্তু হৃদয় নেই, কোন অনুভুতি নেই।

সে দিন নাইট ডিওটি ছিল যুবায়েরভের। যুবায়েরভ গুপ্ত পুলিশ এবং বিশ্বরেড সংস্থা ‘ফ্র’ এর রেকর্ড সেকশনের একজন কর্মী। উল্লেখ্য, কম্যুনিস্ট সরকারের গুপ্ত পুলিশ এবং বিশ্বরেড সংস্থা ‘ফ্র’ এখন মধ্য এশিয়ায় এক হয়ে কাজ করছে।

যুবায়েরভের অফিসিয়াল নাম ভিক্টর কুমাকভ। তার দেহে রয়েছে মিশ্র রক্ত মা তুর্কি উজবেক। রুশ উজবেক মৈত্রির প্রমান দিতে গিয়ে তার মা হামুদা নাজিয়ানভাকে একজন রুশকে বিয়ে করতে হয়। সেই রুশ যুবক পেট্রভের কোন

ধর্ম ছিল না। কিন্তু স্ত্রী হামুদা নাজিয়ানভার ধর্মনিষ্ঠা তাকে ধীরে ধীরে আকৃষ্ট করে এবং অবশেষে স্ত্রীর কাছে সে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। তাদের একমাত্র ছেলে যুবায়েরভ। কিন্তু পেট্রভের ধর্মবিশ্বাস যেমন গোপন ছিল, তেমনি যুবায়েরভের নাম তারা গোপন রাখে। যুবায়েরভের সরকারি নাম ভিক্টর কুমাকভ। সব সরকারী খাতায়, সরকারী ও সামাজিক মহলে সে এই নামেই পরিচিত।

যুবায়েরভ মায়ের কাছে কুরআন পাঠ ও ধর্ম শিক্ষা লাভ করেছে। ইসলামের সোনালী কাহিনী শুনেছে সে মায়ের কাছে। যুবায়েরভ মায়ের চেয়ে বড় শিক্ষক আর কাউকে মনে করে না।

রাত ১০টা থেকে ভোর ৪টা পর্য্যন্ত যুবায়েরভের নাইট ডিউটি। একজন কর্মঠ রুশ হিসাবে পরিচিত। কাজে কোন ফাঁকি না দেয়া এবং বিশ্বস্ততার জন্য সকলের প্রিয় সে। একদিকে রক্তের পরিচয়ে রুশ, অন্যদিকে কর্তব্যনিষ্ঠা এই দুই কারনে রেকর্ড সংরক্ষনের মত গুরুত্বপূর্ন বিভাগে তাকে আনা হয়েছে। জামিলের প্রানদন্ডের পর নিরাপত্তা বিভাগে যে বিশাল হয়েছে। তারপরেই যুবায়েরভ এই দায়িত্ব পেয়েছে। মধ্য এশিয়া অঞ্চলের শাস্তি প্রাপ্তরা কে কোথায়, কোথায় যাচ্ছে, কোত্থেকে আসছে এর যাবতীয় রেকর্ড এখন তার কাছে। সকল রাজনৈতিক সাজা প্রাপ্তদের ফাইলের শেষ আস্তানা এখন তার সেকশনের সেফটি ভল্টগুলো।

সাইমুমের সাথে যুবায়েরভের সম্পর্ক তার ছাত্রজীবন থেকেই। সে এখন সাইমুমের একজন প্রথম শ্রেণীর কর্মী। সাইমুমের গোয়েন্দা ইউনিটের একজন দায়িত্বশীল সে। চাকুরীর সময়টুকু ছাড়া সব সময় সে সাইমুমের কাজেই ব্যয় করে।

সেদিন রাত সাড়ে তিনটা। হাতে কোন কাজ নেই। বসে বসে ঝিমুচ্ছিল যুবায়েরভ। হঠাৎ টেবিলের লাল সংকেত জ্বলে উঠল। সেই সাথে পাশ দিয়ে ঘূর্ণায়মান স্বয়ংক্রিয় ক্যারিয়ারে কালো ফিতা মোড়া একটা লাল ফাইল এলো টেবিলে। কালো ফিতামোড়া দেখলেই মনটা আনচান করে ওঠে যুবায়েরভের। নিশ্চয় কেউ ফায়ারিং স্কোয়াডে গেল কিংবা কাউকে নিশ্চয় চালান করা হলো দাস শিবিরে। এ ফাইলটা দেখেও মনটা তার তেমনি হলো।

নিত্যদিনের মত বাম হাতে টেনে ফাইলটি কাছে নিয়ে পাশের ষ্টিল ভল্ট থেকে ফাইলের রেফারেন্স অনুসারে রেকর্ড রেজিষ্টার বের করলো। তারপর ফাইলটি খুলল যুবায়েরভ। ফাইলের শিরোনাম দেখেই চমকে উঠল সে। কিছুক্ষণের জন্য সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। এযে রোকাইয়েভার ফাইল। তাকে শ্রম শিবিরে চালান করা হলো। কিন্তু কখন? আজ বিকালেইতো .......।

ফাইলের পাতা উল্টালো যুবায়েরভ। দেখতে পেল ফাইলের ব্রিফ সামারি। আজ রাত দু'টায় গ্রেপ্তার। রাত তিনটায় কারগো প্লেনেই পাঠানো হয়েছে মস্কোর মস্কোভা শ্রম শিবিরে ওম্যান ব্রাঞ্চে।

যুবায়েরভের সমগ্র সত্তায় ঝড় বইছে। দু'চোখের কোণ তার সিক্ত হয়ে উঠল অশ্রুতে। বাঁচাতে পারলনা তারা অসহায় মেয়েটিকে। তাদের হিসাবে ভুল হয়েছে। তারা মনে করেছিল, বাড়ী ঘর সহায়-সম্পদ এবং যাবতীয় সুখ-ভোগ কেড়ে নেবার পর তাদের হিংসার পরিতৃপ্তি হয়েছে। আর কিছু না ঘটলে এই মুহূর্তে ঘাটাতে যাবেনা পরিবারটিকে। কিন্তু তাদের সব ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। নিজেকে বড় অপরাধী মনে হলো যুবায়েরভের।

দুর্বল হাতে রেকর্ড রেজিষ্টার টেনে নিল যুবায়েরভ। মস্কোভা শ্রম শিবিরে ওম্যান ব্রাঞ্চে মধ্য এশিয়া থেকে চালান হওয়াদের তালিকায় রোকাইভার নাম রেকর্ড করার জন্য সেই রেকর্ড রেজিষ্টারটি খুলল। নামের তালিকায় চোখ বুলাতে গিয়ে আরেকবার চমকে উঠল যুবায়েরভ। একি! আয়েশা আলিয়েভাকে তাহলে অবশেষে মারা হয়নি? সেও ঐ মস্কোর মস্কোভা শ্রম শিবিরে? অথচ সবাই জানে তার প্রাণদন্ড হয়েছে। মনে হয় সরকার তার মত একটা প্রতিভাকে হাত করার আশা ত্যাগ করেনি। দুঃখের মাঝেও আয়েশা আলিয়েভা বেঁচে থাকার সংবাদে যুবায়েরভ খুশি হলো।

রেকর্ড রেজিষ্টারে আয়েশা আলিয়েভার পাশেই রোকাইয়েভার নাম উঠল। রেকর্ড রেজিষ্টারটা বন্ধ করতে গিয়ে হঠাৎ মনে হলো রোকাইয়েভার দাদীর কথা। ফাইলে তাকে গ্রেপ্তারের কথা নেই। তাহলে কোথায় তিনি? চঞ্চল হয়ে উঠল যুবায়েরভের মন। ঘড়িতে দেখল যে ভোর চারটা বেজে গেছে। টেবিলের ফাইলগুলো গুটিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এল।

আফিসের গাড়ীতে সে ন্যাশনাল পার্ক পর্যন্ত এল। তারপর পার্কে একটু বেড়াবে একথা বলে সে গাড়ী থেকে নেমে এল। সে ঠিক করে নিয়েছে, এখনই একবার রোকাইয়েভার ফ্লাটে গিয়ে সে রোকাইয়েভার দাদীর খোঁজ করবে।

রোকাইয়েভার সেই ফ্লাটে দক্ষিণ তাসখন্দে ১১ নং কলোনীতে এখান থেকে হেঁটে গেলে এক ঘণ্টার পথ। কিন্তু সেখানে সে অন্ধকার থাকতেই পৌঁছাতে হবে। কিন্তু এ সময় গাড়ি পাওয়া যায় না। মুস্কিলে পড়ল যুবায়েরভ। এ সময় পাশ দিয়ে দুধ সাপ্লাইয়ের গাড়ি যাচ্ছিল। যুবায়েরভ হাত তুলে দাঁড় করাল। জিজ্ঞাসা করে জানল গাড়িটি ডেইরী ফার্মে যাচ্ছে। ১১ নং কলোনীর পাশ দিয়েই যাবে। যুবায়েরভ নিজের আইডেন্টিটি কার্ড দেখিয়ে তাকে লিফট দেবার জন্য অনুরোধ করল। সিকিউরিটি বিভাগের কার্ড দেখে ড্রাইভার এবং ইনচার্জ একদম মোমের মত গলে গেল।

যুবায়েরভ সাড়ে চারটায় গিয়ে ১১ নং কলোনীর গেটে নামল। তারপর রোকাইয়েভাদের ফ্লাট খুঁজে নিতে তার কষ্ট হলো না।

এখনো অন্ধকার। ফ্লাটের সামনে রাস্তায় একটু দাঁড়াল যুবায়েরভ। চারদিকে তাকিয়ে দেখল কেউ কোথাও নেই। রোকাইয়েভার ফ্লাটের কাছাকাছি গিয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল যুবায়েরভের। দরজা খোলা! কেন খোলা? তাহলে কি তিনি নেই? কোথায় যাবেন তিনি এই রাতে? গুম করা হয়েছে তাকে? নানা আশংকা, নানা প্রশ্নে যুবায়েরভের বুক তোলপাড় করে উঠল।

দরজায় গিয়ে দাঁড়াল যুবায়েরভ। ভেতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। যুবায়েরভ ধীরে ধীরে ডাকল 'দাদী'। কোন সাড়া নেই। যুবায়েরভ ঘরে প্রবেশ করলো। দরজা ভেজিয়ে দিল। তারপর সতর্কভাবে টর্চের আলো ফেলল ঘরে। দেখল, বিছানা খালি। টর্চের আলো মেঝেই গিয়ে পড়ল। দেখা গেল লুটোপুটি করে পড়ে আছে একটা দেহ। তাড়াতাড়ি ঝুকে পড়ল যুবায়েরভ। যুভায়েরভ খুশী হলো, চোখ খুলেছেন তিনি। ক্ষীণ কন্ঠে বললেন, কে তুমি, কি চাও? আমার রোকাইয়া কোথায়?

-দাদী, আমি যুবায়েরভ। আমি আপনাকে নিতে এসেছি।

-তুমি যুবায়েরভ। তোমার আগমন এতো দেরিতে কেন? আমার রোকাইয়েভা কোথায়? আমি কোথায় যাব?

-সব কথা বলব দাদী। কিন্তু এখনি আমাদের এখান থেকে সরতে হবে।

-কিন্তু রোকাইয়া যদি এসে এখানে আমাকে না পায়।

শেষের কথাগুলো বলতে গিয়ে কান্নায় রুদ্ধ হয়ে গেল দাদীর কন্ঠ। যুবায়েরভেরও চোখের পাতা ভিজে এল। কিন্তু সময় নেই। অন্ধকার থাকতেই এ কলোনী থেকে তাকে বের হতে হবে। যুবায়েরভ বলল, দাদী রোকাইয়েভার চিন্তা আমাদের উপর ছেড়ে দিন। আপনি উঠুন।

বলে যুবায়েরভ দাদীকে হাত ধরে টেনে তুলল। বলল, দাদী আপনি আমার কাঁধে ভর দিয়ে চলুন।

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে যুবায়েরভ বলল, ফুলের ঝাড়টি তো টেবিলের উপর, কিন্তু চিঠিটা কোথায়?

-ওটা তোষকের তলে। বলল, দাদী।

যুবায়েরভ দাদীকে একটু দাঁড় করিয়ে টেবিল থেকে ফুলের ঝাড়টি এবং তোষকের তলা থেকে চিঠিটি নিয়ে নিল। তারপর দাদীকে নিয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

কলোনীর রাস্তা দিয়ে চলতে চলতেই যুবায়েরভ ঠিক করল তার সরকারী বাড়ীর চাইতে আমীর ওসমানের বাড়ীই দাদীর জন্য হবে উপযুক্ত আশ্রয়। ওখানে ভালো সঙ্গও পাবেন তিনি।

কলোনীর গেট দিয়ে যখন সে বেরিয়ে এল তখন অন্ধকার কেটে যাচ্ছে। কিন্তু লোকজন কেউ বের হয়নি।

যুবায়েরভ রাস্তায় নেমেই একটা ট্যাক্সি ডেকে দাঁড় করাল।

# ৩

কুতাইবাকে যখন ওরা গ্রেপ্তার করে তখন তাকে সাধারণ একটা কেউকেটা তারা মনে করেছিল। কিন্তু বখশ শহরের 'ফ্র' দপ্তরে দু'ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর তারা বুঝতে পারল কুতাইবা সাধারণের তালিকায় পড়েনা। জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পাহাড়ের মত স্থির এবং পাথরের মত শক্ত সে।

তদন্তকারী অফিসার কর্ণেল সোভার্দনেজ যখন ভাবছিল কোন পথে এগুবে, তখন স্পেশাল অফিসার সরকারী একটা ফাইল এনে তার কাছে রাখল। ফাইল খুলতেই তাতে রাখা একমাত্র শিটটির দিকে তার নজর পড়ল। এইমাত্র তাসখন্দ থেকে পাঠানো কুতাইবার ফাইলের ব্রিফ সামারি। ওতে আছে কর্ণেল গানজভ নাজিমভ ওরফে কুতাইভার সামরিক ও পারিবারিক জীবনের কথা। কর্ণেল সোভার্দনেজ বিস্মিত হলো, তাসখন্দের গভর্ণরের ছেলে এবং কম্যুনিষ্ট সেনাবাহিনীর অনেক গৌরবপূর্ণ রেকর্ডের অধিকারী অফিসার অবশেষে ট্রাকবহরে শ্রমিকের কাজে গেল! ভাবল সে, মানুষ কোন নীতি ও আদর্শের প্রশ্ন ছাড়া ত্যাগ স্বীকার করতে পারেনা। সুতরাং তার মনে হল কুতাইবা সাধারণ নয়, অসাধারণ তালিকার একজন মানুষ।

কর্ণেল সোভার্দনেজ উঠে ধীরে ধীরে গিয়ে কুতাইবার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, গানজভ অহেতুক আপনি কষ্ট দিচ্ছেন আমাদের। আপনার সব পরিচয় আমাদের জানা হয়েছে। তাসখন্দের গভর্ণরের ছেলে এবং কম্যুনিষ্ট সেনাবাহিনীর একজন কৃতি কর্ণেল নিশ্চয় কোন ছোট মিশনে ট্রাক বহর পরিচালনার কাজ নেয়নি। সুতরাং অযথা সময় নষ্ট না করে বলুন, আহমদ মুসা কোথায়? আপনার সাথীরা কোথায়?

কুতাইবা মেঝেয় পড়ে ছিল। তার পা ফেটে গেছে চাবুকের ঘায়ে। চোরের মত গরু পেটা করে তার কাছ থেকে কথা আদায় করতে চেয়েছিল ওরা। চোখ বন্ধ করে পড়ে ছিল কুতাইবা।

মেজর সোভার্দনেজের কথায় কুতাইবা চোখ দুটি খুলল। বলল, আমি আবার বলছি কর্নেল, কোন সহযোগিতাই আমি আপনাদের করতে পারছি না।

কর্নেল সোভার্দনেজ ফিস ফিস করে নরম সুরে বলল, কর্নেল গানজভ, আমি ক্রিমিয়ার মানুষ। আপনাদের ব্যাথা আমি বুঝি, কিন্তু আপনার বাঁচার পথ একটাই, আমরা যা জানতে চাই সেটা বলা।

কুতাইবা হাসল। স্লান হাসি। বলল, নিছক সন্দেহের বসে যাদের পাখির মত লোক হত্যা করতে বাধে না, তাদের সম্পর্কে এসব কথা বাজারে খাটবেনা কর্নেল। তাছাড়া আমি এদের কোন সহযোগিতাই করবোনা। এমন আশা করাও সংগত নয়। আমি তাদের প্রতিপক্ষ।

একটু থামল কুতাইবা। তারপর আবার বলল, আপনাকে ধন্যবাদ কর্নেল। ক্রিমিয়দের স্বাধীন চেতনা ও সংগ্রামকে আমি শ্রদ্ধা করি।

কর্নেল সোভার্দনজের চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এসময় প্রবেশ করল কর্নেল জুকভ, বলল, কর্নেল এ পথে আর মুখ খুলবেনা। আসনে বসাতে হবে। বলে দুটি তালি বাজাল জুকভ। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করল দুজন লোক। ওদের উদ্দেশ্য করে জুকভ বলল, একে অপারেশন রুমে নিয়ে চল।

অপারেশন রুমটা পাশেই। বিরাট হলঘর। মানুষের উপর নির্যাতন চালাবার বিচিত্র সব কলাকৌশল সেখানে। কুতাইবাকে নিয়ে একটা তক্তপোষে রাখল। পায়ের কাছে বিদ্যুৎ সুইচ। আর তক্তপোষের চার ধার দিয়ে প্রায় ডজন খানেক ইস্পাতের রিং। পাশেই পড়ে আছে প্লাস্টিক কর্ড। রিং-এ দড়ি পেঁচিয়ে কুতাইবাকে ভালো করে বেঁধে ফেলা হলো।

কুতাইবা তক্তপোষের চেহারা আর চারিদিকটা দেখেই বুঝতে পেরেছিল ইলেকট্রিক শক দেয়ে নির্যাতনের আসন এটা। শক্ত করে বাঁধতে দেখে খুশিই হলো কুতাইবা। শরীরকে বাগমানানোর কিছু দায়িত্ব দড়িও নিল।

কর্নেল সোভার্দনেজ সেখানে ছিল না। কর্নেল জুকভই সব দেখা শুনা করছিল। বাঁধা হয়ে গেলে কুতাইবার পিছনটায় সুইচের কাছে গিয়ে দাঁড়াল জুকভ। সুইচে হাত রেখে বলল, মিঃ গানজভ অহেতুক আমরা কষ্ট দেয়া পছন্দ

করিনা, তুমি আমদের সহযোগিতা কর। তুমি যা কল্পনা করনা, সেই সম্মান ও মর্যাদা  তোমাকে দেয়া হবে।

কুতাইবা চোখ বন্ধ করেছিল। জুকভের কথা শুনে চোখ খুলে অত্যন্ত শান্ত ও গম্ভীর কণ্ঠে বলল, মিঃ জুকভ, আপনি এমন অবস্থায় আপনার জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে রাজি হবেন?

-'না' বলল কর্নেল জুকভ।

একটু থেমে আবার বলল, কিন্তু গানজভ আমরা তো আপনাকে জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে বলছি না, বরং জাতিকে সহযোগিতা করতে বলছি।

-আপনি যে জাতির কথা বলছেন, সে জাতি আমার জাতি নয়।

-কারা আপনার জাতি?

-মধ্য এশিয়ার, কম্যুনিস্ট কবলিত এই দেশের নির্যাতিত মুসলমানদের আমি একজন। আমি আমার এই নির্যাতিত মুসলিম জাতির মুক্তির জন্য কাজ করছি।

কর্নেল জুকভ হাসল। বলল, আপনার সাহসের প্রশংসা করি মিঃ গানজভ। বিদ্যুৎ আসনে  শুয়ে এমনভাবে কথা বলতে আমি আর কাউকে দেখিনি। কিন্তু এ সাহস দিয়ে আপনি নিজেকেই ধ্বংস করতে পারবেন, কোন লাভ হবে না।

-ধ্বংস আর লাভের সংজ্ঞাও আপনাদের থেকে আমদের আলাদা। যাকে আপনারা ধ্বংসের কাজ বলছেন, সেকাজই আমাদের কাছে সৃষ্টির। আর লাভের কথা বলছেন? নিজের জাতি, নিজের আদর্শ ও বিশ্বাসের জন্য জীবন দেয়ার চেয়ে বড় লাভের কিছু নেই আমাদের কাছে। এই লাভের প্রত্যাশাই আমরা বেঁচে থাকি। সুতরাং এই জীবন দেয়া আমাদের প্রত্যাশার মৃত্যু। কথা শেষ করে থামল কুতাইবা।

কর্নেল জুকভ যখন কথা শুরু করে, তখনই ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল 'ফ্র' এর নিরাপত্তা দপ্তরের ডাইরেক্টর ব্রিগেডিয়ার পুসকভ। তিনি নিরবে দাঁড়িয়ে গোটা কথোপকথনটাই শুনলেন।

কুতাইবা কথা শেষ করলে কর্নেল জুকভ বলল, মিঃ গানজভ আপনার মাথা ঠিক নেই। আমার দুঃখ হচ্ছে আপনার জন্য।

একটু থামল। ঢোক গিলল একটা। তারপর ইলেকট্রিক কানেকশন ঠিক করার জন্য মনোযোগ দিল। ব্রিগেডিয়ার পুসকভ দরজা থেকে কথা বলে উঠল এ সময়। বলল, জুকভ শুনলেই তো এদের দেহটাকে মেরে ফেলে লাভ নেই। এদের আঘাত করতে হবে অন্য জায়গায়। শুন আমার কাছে।

কর্নেল জুকভ উঠে দাঁড়িয়ে একটা স্যালুট ঠুকে সামনে এসে দাঁড়াল পুসকভের। পুসকভ একটু মুখ বাড়িয়ে জুকভের কানে কানে কিছু বলল। পুসকভের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বেরিয়ে গেল জুকভ। পুসকভ এগিয়ে এল কুতাইবার দিকে। তার কাছে এসে জোরে একবার পা ঠুকল মাটিতে। কুতাইবা চোখ মেলে তাকালে পুসকভ বলল, খুব শক্ত না তুমি?

কোন জবাব দিলনা কুতাইবা। পুসকভ আবার বলল, মোল্লা আমির সোলাইমানকে চিন?

-ভালো করে চিনি।

-তার মেয়ে শিরিন শবনমকে তাহলে ভাল করে চিন?

-তার কি হয়েছে?

-কেন তার কিছু হলে খারাপ লাগবে নাকি?

কোন জবাব দিলনা কুতাইবা। বুঝল রসিকতা করতে চাইছে।

পুসকভ আবার বলল, যদি বলি শিরিন শবনম এখানে, তাহলে বিশ্বাস হবে তোমার?

-তোমরা জালেমের ভূমিকায় আছ, তাকে তোমরা ধরে আনবে অসম্ভব কি? কিন্তু হিসার দুর্গের তোমরা কি করেছ?

-চিরদিনের জন্য মাতির সাথে মিশিয়ে দিয়েছি।

-সেখানকার জনপদ, মসজিদ, মাদ্রাসা, সুফী আব্দুর রহমানের কবরগাহ?

-দেখার জন্য যদি তুমি বেঁচে থাক, তাহলে তোমাদের সেই সাধের হিসার দুর্গের আর কোন চিহ্নই আর দেখতে পাবে না।

চোখ বুজল কুতাইবা। ভেসে উঠল তার সামনে হিসার দুর্গের জনপদ। কয়েক হাজার মুস্লিমের এক ঐতিহ্যবাহী জনপদ। ভাসতে লাগল তার চোখের

সামনে অনেক শিশু, নারী, বৃদ্ধের অসহায় মুখ। তার সমগ্র সত্তায় একটা যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ল। অক্ষম এক বেদনায় চোখের কোণ দু'টি তার ভিজে উঠল।

পুসকভ আবার বলল, দেখবে চল শিরীন শবনমকে।

দরজায় এসে দাঁড়ানো দু'জনকে ইশারা করল পুসকভ। তারা এসে বাঁধন খুলে দিল কুতাইবার। তারপর দু'টি হাত পিছামোড়া করে বেঁধে নিয়ে চলল। পিছনে পিছনে চলল পুসকভ। ছাদ ঢাকা উন্মুক্ত জায়গায় কুতাইবাকে নিয়ে আসা হলো। এর চারপাশে ঘিরে অনেকগুলো ঘর। কুতাইবা বুঝতে পারল, ওগুলো সবই টর্চার চেম্বার। নিকটের জাল ঘেরা ঘরটিতে কয়েকটি সাপকে ঘুরে বেড়াতে দেখল কুতাইবা। শিউরে উঠল কুতাইবা। এ সাপ দিয়ে এরা কি করে।

কুকুরের প্রচণ্ড ঘেউ ঘেউ শব্দে চোখ ফিরিয়ে দেখল ডান পাশের সেলটিতে বিরাট এক কুকুর। জিহবা বের করে ঘেউ ঘেউ করছে। তার চোখের হিংস্রতা যেন ঠিক্রে পড়ছে। হিংস্র ব্লাড হাউন্ডের কথা শুনেছে কুতাইবা। একি সেই।

উন্মুক্তে এসে দাড়িয়েই হাততালি দিল পুসকভ। সেই সাথে বলল, মিঃ গানজভ তুমি বলবেনা আহমদ মুসা কোথায়, তোমার সাথীরা কোথায়?

-আমি আমার কথা বলেছি। সংক্ষিপ্ত জবাবে বলল কুতাইবা।

-ঠিক আছে তোমাকে কথা বলাতে আমরা জানি।

এই সময় শিরীন শবনমকে সেখনে নিয়ে প্রবেশ করল জুকভ।

তাকে দেখিয়ে পুসকভ কুতাইবাকে বলল, চিন তো, এ তোমাদের পুজনীয় মোল্লা আমির সুলাইমানের আদরের নাতনী শিরিন শবনম।

শবনমের গায়ে সাদা (তুর্কি) গাউন। মাথায় তাজিক কায়দায় রুমাল জড়ানো। আঠার বছরের শবনম শুভ্র এক খন্ড ফুলের মত। কিন্তু তার মুখে আজ সেই শুভ্র হাসি নেই। তার বদলে সেখানে নীল বেদনার এক ছায়া। কুতাইবা মোল্লা আমীর সুলাইমানের বাড়ি হিসার দুর্গে বহুবার গেছে। শিরীন শবনমকে না দেখলেও তার নাম কুতাইবার কাছে পরিচিত। কুতাইবা জানে মোল্লা আমীর সুলাইমানের হৃদয়ের টুকরা এই শবনম। কুতাইবা চোখ তুলল তার দিকে। শিরীন শবনমও মুখ তুলেছিল এ সময়। চোখাচোখি হল। নীল চোখে, গভীর দৃষ্টি। তাতে ভয়ার্ত হরিণীর এক অসহায় রূপ। চোখ নামিয়ে নিল কুতাইবা।

তারপর পুসকভের দিকে ফিরে কুতাইবা বলল, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো পূজা করিনা। মোল্লা আমীর সুলাইমান আমাদের পূজনীয় নন, সম্মানিত মুরব্বী। একটু থেমে আবার কুতাইবা বলল, এই নিরপরাধ মেয়েটিকে তোমরা ধরে এনেছ কেন?

হাসল পুসকভ। বলল, ভালো লেগেছে আমাদের মেয়েটিকে। বলে হাস্তে লাগলো। হাসতে হাসতেই বলল, তবে মেয়েটিকে আমরা প্রথমে তোমাকে কথা বলানোর অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চাই।

পুসকভের ইংগিত অস্পষ্ট হলেও একটা আশংকা উঁকি দিল কুতাইবার মনে। এরা জানোয়ারের মত জঘন্য। এরা কি শবনমের শ্লীলতাকে কুতাইবার কথা বলানোর অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। হৃদয়টা কেঁদে উঠল কুতাইবার। পুসকভই আবার কথা বলে উঠল। বলল, মিঃ গানজভ চেয়ে দেখ তো কুকুরটির দিকে। থামল পুসকভ। কুতাইবা মুখ ঘুরিয়ে প্রথমে কুকুরটি, তারপর পুসকভের উপর চোখ নিবদ্ধ করল। তার মনে চিন্তার তোলপাড় , কি বলতে চায় পুসকভ।

পুসকভ মুখ খুলল, শিরীন শবনমের সুন্দর দেহটিকে যদি ঐ হিংস্র ব্লাড হাউন্ডের সেলে ঢুকিয়ে দেয়া হয়, তাহলে কেমন হয় মিঃ গানজভ।

পুসকভের পরিকল্পনা এতক্ষণে স্পষ্ট হলো কুতাইবার কাছে। কেঁপে উঠল তার হৃদয়। যন্ত্রণার এক উষ্ণ স্রোত বয়ে গেল তার গোটা দেহে।

পুসকভ আবার শুরু করল। বলল, কি ভাবছ মিঃ গানজভ। তারপর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, এক মিনিট সময় দিচ্ছি চিন্তার। এর মধ্যে মন স্থির করে যদি আহমদ মুসা ও তোমার সাথীদের খবর আমাদের জানাও তাহলে অতীতের কথা চিন্তা করে, তোমাকে আমরা মুক্তি দিব, পুরস্কৃত করব এবং বাড়তি ইনাম হিসেবে এই অপরূপ মেয়েটিকেও তোমার হাতে তুলে দিব আর যদি মুখ না খোল, তাহলে এক মিনিট পরেই দেখবে ঐ হিংস্র কুকুরের ধারাল দাঁত ও নখের আঘাতে শবনমের সুন্দর দেহটি কিভাবে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে।

থামল পুসকভ। মুখে ক্রুর হাসি। চিন্তার এক মিনিট সময় দিলাম মিঃ গানজভ , এক মিনিট পরেই আমরা ফিরে আসছি , বলে সে এবং জুকভ বেরিয়ে গেল সেখান থেকে।

কুতাইবার বুকে তখন ঝড়। তার চোখ দু'টি বন্ধ। সমগ্র সত্তা জুড়ে তার এক অব্যক্ত যন্ত্রণা। যে কোন কষ্ট, যে কোন পরিনতির জন্য সে তৈরী, কিন্তু তাদের বুজুর্গ পীর সুফী আব্দুর রহমানের বংশধর তাদের পরম সম্মানিত মুরুব্বী মোল্লা সুলাইমানের নাতনী একটি ব্লাড হাউন্ডের বন্য হিংস্রতায় ক্ষতবিক্ষত হবে তার চোখের সামনে এটা সহ্য করবে কেমন করে? আর তাকে রক্ষার যে বিনিময় তারা চায়, সেটা সে দিবে কমন করে? মধ্য এশিয়ার মজলুম মুসলমানের মুক্তির জন্য যে সংগঠন গড়ে উঠেছে তার মূল্য সে নিজের জীবনের চেয়ে লক্ষ গুন বেশী মনে কএ। এই সংগঠনের জন্য সে লক্ষবার জীবন দিতে প্রস্তুত। কিন্তু তার সমাজের অতি সম্মানিত পরিবারের একটি অসহায় নারীর উপর বন্য হিংস্রতা কিভাবে সে চোখের সামনে সহ্য করবে?

উদ্বেগ উত্তেজনার বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে কুতাইবার কপালে। ধীরে ধীরে চোখ খুলল সে। চোখচোখি হয়ে গেল শিরীন শবনমের সাথে। কিন্তু তাতে হরিণীর ভয়ার্ত রূপ আর নেই। নিঃসংশয় স্থির দৃষ্টি। রক্তের মত লাল ওষ্ঠাধর শুকনো , কিন্তু ভয়ের কোন কম্পন নেই তাতে। চোখ নামিয়ে নিল কুতাইবা।

কথা বলল শবনম। বলল, আপনি ভাববেন না। একটি জীবনের চেয়ে আমাদের সংগঠনের স্বার্থ, মধ্য এশিয়ার মজলুম মুসল্মান্দের স্বার্থ অনেক বড়। যারা জীবন দিয়ে জাতির জন্য পথ রচনা করেছে, আমাকে তাদের চেয়ে আপনি পিছনে দেখবেন না।

থামল শবনম। চোখ নামিয়ে নিয়েছে সে, চোখ তুলল কুতাইবা। তার চোখে আনন্দ এবং বিস্ময়। আনন্দ-আবেগ-বেদনার এক সমন্বয় তরল রূপ নিয়ে বেড়িয়ে এল তার চোখ দিয়ে। চোখ তুলেছে শবনমও।

-আপনার চোখে অশ্রু? শবনমের চোখে জিজ্ঞাসা উত্তাল হয়ে উঠল।

-এ অশ্রু আনন্দের, অহংকারের শবনম।

কিছু বলতে গিয়েছিল শবনম। কিন্তু পুসকভ ও জুকভ এসে সেখানে প্রবেশ করল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, এক মিনিট দশ সেকেন্ড হয়েছে। বল এখন তোমার কি মত।

-আমার কিছুই বলার নেই। আমরা তোমাদের জুলুম থেকে আল্লাহর সাহায্য কামনা করছি। ধীর কন্ঠে বলল, কুতাইবা। হা হা করে হেসে উঠল পুসকভ। বলল, তোমাদের আল্লাহ এতদিনও তো ছিলেন।

-জালেমকে তিনি একটা সময় দেন। সে সময় তোমাদের শেষ হয়ে আসছে পুসকভ। স্থির কন্ঠে জবাব দিল কুতাইবা।

কুতাইবার কথাটা পুসকভের দেহে আগুণ ধরিয়ে দিল। ক্রোধে জ্বলে উঠল সে। খাপ থেকে পিস্তল বের করে তার বাট দিয়ে উন্মত্তের মত আঘাত করল সে কুতাইবার  মাথায়।

চকিতে মাথাটা পিছন দিকে সরিয়ে নিয়েছিল কুতাইবা। তবু, আঘাতটা কপালের একপাশ ছুয়ে গেল। ছিড়ে গেল কপালের একপাশের কিছুটা অংশ। তীর বেগে বেরিয়ে এল রক্ত। সে রক্তে ভিজে গেল তার মুখমন্ডল। গড়িয়ে পড়ল বুকে।

দাঁতে দাঁত চেপে দাড়িয়ে আছে শবনম। চোখে মুখে তার রুখে দাড়াবার ভংগী, কিন্তু চোখ দিয়ে তার গড়িয়ে এল অশ্রু। পুসকভ পিস্তলটি খাপে ভরতে ভরতে বলল, জুকভ ঐ কাল নাগিনীকে ভরে দাও ব্লাড হাউন্ডের সেলে। দেখছি বড় বড় কথা কোথায় যায়।

জুকভ পকেট থেকে একহাতে চাবি বের করে অন্যহাতে ব্লাড হাউন্ডের সেলের তালা টেনে নিল। চাবি প্রবেশ করাল তালায়। ব্লাড হাউন্ড উম্মত্তের মত ঘেউ ঘেউ করছে। যেন পাগল হয়ে উঠেছে মানুষের গন্ধে। জুকভের পাশেই দাড়িয়ে আছে শবনম। চোখ মুখ পাথরের মত শক্ত। বিশ্বের কোন কিছুকেই সে যেন পরোয়া করে না।

বখশ নদীর সমান্তরালে অনেকখানি জায়গা জুড়ে 'ফ্র' এর এই নিরাপত্তা অফিস। হাইড্রোলেক্ট্রিক প্রকল্পকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই বখশ শহরটি ছোট হলেও 'ফ্র' এর অফিসটি মোটেই ছোট নয়। গোটা দক্ষিণ পুর্ব ও পুর্ব তাজিকিস্তানে কম্যুনিস্ট স্বার্থের তদারকি এবং মুসলিম উত্থানকে ধ্বংস করার কেন্দ্র হিসেবে কাজ করছে এই অফিস।

একেবারে নদীর ধার ঘেষে অফিসটি। বখশ নদীর সমান্তরালে উত্তর দক্ষিণ যে হাইওয়ে তা থেকে লাল ইটের ছোট রাস্তা বেরিয়ে প্রথমে পুর্বদিকে তারপর উত্তর দিকে বাক নিয়ে ‘ফ্র’ এর অফিসের প্রধান ফটকে গিয়ে থেমেছে।

জেলখানার মত উচু প্রাচীরে ঘেরা অফিসটি। ইস্পাতের তৈরী মজবুত ফটক। ফটকের পাশেই গার্ডরুম। গার্ডরুমের ভিতরে গেটের সুইচ। সুইচ টিপলে গেট খুলে যায়। গেট এবং প্রাচীর সারারাত আলোর বন্যায় ভেসে থাকে। তার উপর বিদ্যুতবাহী তারের বেড়াজাল দিয়ে প্রাচীর ও ফটককে দুর্ভেদ্য করে রাখা হয়েছে। অফিসটির নিজস্ব বিদ্যুৎ জেনারেটর রয়েছে এবং সেটা অফিসের ভিতরে। হাইওয়ে থেকে লাল ইটের রাস্তায় ঢোকার মুখে একটা সাধারণ গেট। ক্রেনের মত একটা স্পাতের ডিভাইডার সবসময় রাস্তার উপর পড়ে থাকে। কেউ এলে প্রথমে তাকে রাস্তার পাশের গার্ডবক্সে গিয়ে পরিচয়পত্র দেখাতে হয়। তারপর বিদ্যুৎ পরিচালিত ডিভাইডারটি উঠে যায়। সবদিক দিয়ে ‘ফ্র’ এর এই কেন্দ্রটিকে দুর্ভেদ্য করে তোলা হয়েছে। আহমদ মুসা ও আলী ইব্রাহীম এলাকাটা একবার ঘুরে দেখার পর তাদেরও এটাই মনে হলো। তাদের সাথে ছিল বখশ শহরের সাইমুমের প্রধান আলী ইমামভ।

তারা তিনজনই হাইওয়ের পাশের একটি টিলার আড়ালে বসে রাত ৯ টা থেকে লাল রাস্তাটার উপর নজর রেখেছিল। ওখান থেকে হাইওয়ের মুখে লাল রাস্তার ফটক এবং প্রধান ফটক দুই-ই দেখা যাচ্ছিল। আহমদ মুসা অতি যত্নের সাথে যে গাড়ীগুলো ‘ফ্র’ এর অফিসের ভিতর ঢুকেছে সেগুলোর প্রতিটির গতিবিধি, সামনের এবং পিছনের লাইট ওয়ার্ক এবং হর্ণ ওয়ার্ক অনুসরণ করছিল। শুরু থেকেই আহমদ মুসা লক্ষ্য করল হাইওয়ের মুখের প্রথম ফটকে সবাই নেমে গিয়ে গার্ডকে সম্ভবতঃ আইডেন্টিটি কার্ড দেখাচ্ছে। কিন্তু, মূল গেটে গিয়ে কেউই গাড়ি থেকে নামছে না। ফটকের সম্মুখে দাঁড়াবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গেটের ভারী ইস্পাতের দরজা সরে যাচ্ছে এবং গাড়ীগুলো ঢুকে যাচ্ছে ভিতরে। আহমদ মুসার বুঝতে কষ্ট হয়নি, এটা আলো সংকেত বা হর্ণ সংকেত কিংবা দুইয়েরই ফল। তারপর থেকে আহমদ মুসা গভীর মনযোগের সাথে গাড়ীগুলোর হর্ণ ওয়ার্ক ও লাইট ওয়ার্কগুলো মুখস্ত করছে। সে দেখছে, প্রত্যেকটা গাড়ীই প্রথম ফটক পার

হয়ে উত্তর দিকে টার্ণ নেবার সাথে সাথে ডানদিকের হেড লাইটটা একদমই বন্ধ করে দিচ্ছে এবং গেটের সামনে পৌছা পর্যন্ত গুচ্ছাকারে ২৭ বার হর্ণ বাজাচ্ছে। প্রতিটা গুচ্ছে থাকছে তিনটি করে হর্ন। প্রতিটি গাড়ীই গেটের সামনের রাস্তার পাশে যে লাইট পোষ্ট আছে তার বরাবর গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে দু'টি হেডলাইটের ডিস্ট্যান্ট ফ্লাশ একসাথে জ্বলে উঠে গোট ফটকটাকে আলোয় ধাঁধিয়ে দিয়ে একসাথে নিভে যাচ্ছে। তারপর হর্ণ বেজে উঠছে হারমোনিয়ামের মত একটা ছন্দময় গতিতে। এই শব্দ সংকেত বিশেষজ্ঞ আহমদ মুসার কাছে পরিচিত। শব্দ-সংকেতের কম্যুনিস্ট কোড অনুসারে এর অর্থ, আমি হাজির।

পর্যবেক্ষণ শেষ করে আহমদ মুসা বলল, আলী ইব্রাহীম, আলী ইমামভ, এস আমরা আল্লাহর  শুকরিয়া আদায় করি। মনে হয় 'ফ্র' এর এই দুর্গে ঢোকার চাবিকাঠি আমি হাত করে ফেলেছি। এখন শুধু দরকার শুধু ওদের একটা গাড়ী হাত করা।

তারপর আহমদ মুসা 'ফ্র' এর এই অফিস বিল্ডিং এর নক্সা নিয়ে বসল। উল্লেখ্য, গুরুত্বপূর্ণ এই নক্সাটি বখশ শহরের সাইমুম ঘাটিতে আগে থেকেই জোগাড় করা ছিল।

নক্সা দেখা শেষ করে আহমদ মুসা আলী ইব্রাহীম ও আলী ইমামভের সাথে পরামর্শ করল, কিছু নির্দেশ দিল। তারপর তিনজন বেরিয়ে এল টিলার আড়াল থেকে। উঠে এল তারা হাইওয়েতে। তাদের তিনজনের পরনেই তাজিক পুলিশ অফিসারের পোশাক। উল্লেখ্য, সাইমুমের সেই উপত্যকা ঘাটি থেকে আসার পথে তাজিক পুলিশের গাড়ী এবং পোশাক দখল করেই তারা বখশ শহরে পৌঁছেছে।

হাইওয়ে পেরিয়ে তারা তিনজন লাল রাস্তাটার মুখে এসে দাড়াল। আলী ইমামভকে রাস্তার মুখে দাঁড় করিয়ে রেখে আহমদ মুসা আলী ইব্রাহিমকে নিয়ে গার্ড বক্সে এল। গার্ড বক্সে তখন দু'জন দুটি চেয়ারে একটি ছোট টেবিল সামনে রেখে বসে ছিল। আহমদ মুসা গার্ড রুমের দরজায় গিয়ে দাড়াল। একজন রুটিন মাফিক পরিচয় পত্রের জন্য হাত বাড়াল। আহমদ মুসা পকেটে হাত দিল। কিন্তু, পরিচিতি কার্ডের বদলে হাতে বেরিয়ে এল এম-১০ রিভলভার। চোখ দু'টি বড়

বড় হয়ে গেল দুজন গার্ডের। আহমদ মুসা ওদের পিছন ফিরে দাঁড়াতে বলল। তারা সুবোধ বালকের মত হুকুম পালন করল।

আহমদ মুসা আলী ইব্রাহীমকে বলল, এ গরীব বেচারারা বেঁচে থাক, এদের তুমি ঘুম পাড়িয়ে দাও আলী ইব্রাহীম।

ক্লোরফরম ভেজা রুমাল দিয়ে ওদের ঘুম পাড়িয়ে দিল আলী ইব্রাহিম। তারপর ওদের বেঁধে দুজনে ধরে পাশের টিলার আড়ালে একটি খাদে ফেলে রেখে এল।

তিনজন গার্ড বক্স এ বসে অপেক্ষা করতে লাগল গাড়ির। মাত্র দশ মিনিট। একটা কার এসে রোড ডিভাইডার এর সামনে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নেমে এলো একজন সুঠাম দেহী মানুষ। এলো গার্ড রুমের দরজায়। পরিচিতি কার্ড তার হাতেই ছিল। কিন্তু আহমদ মুসাদের দিকে চেয়ে মনে হয় সে চমকে উঠল। সম্ভবত গার্ড এর পোশাকের বদলে পুলিশ পোশাকের এবং সংখ্যায় দুজনের বদলে তিন জন হওয়াই এর কারন। কিন্তু চিন্তা করার আর সে সুযোগ পেল না। আহমদ মুসার সাইলেন্সার লাগান এম-১০ পিস্তল নিরবে অগ্নি বর্ষণ করল। দরজার উপরে লুটিয়ে পড়ল লোকটি। লোকটিকে টেনে গার্ড বক্সের মধ্যে ঢুকিয়ে তিনজনে বেরিয়ে এলো গার্ড রুম থেকে। আহমদ মুসা গিয়ে গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসল। পাশে আলী ইব্রাহিম। পেছনের সিটে আলী ইমামভ।

সিটে বসে আহমদ মুসা ঘড়িটা একবার দেখে নিয়ে পিছন সিটের দিকে তাকিয়ে বলল, আলী ইমামভ এখন রাত ১১ টা। তোমার লোকেরা কয়টায় এখানে পৌঁছাবে?

-আমাদের স্পিড বোট গুলো এতক্ষণে এসে গেছে। স্থল ইউনিট ঠিক রাত সাড়ে ১১ টায় এই শহর এলাকায় পোঁছাবে। ঠিক আছে বলে আহমদ মুসা গাড়িতে স্টার্ট দিল। গেট আগেই খুলে রেখেছিল। তীর বেগে এগিয়ে চলল গাড়ি। আহমদ মুসা মুখস্ত অংকের ফরমুলার মত গাড়ির হর্ন-ওয়ার্ক ও লাইট-ওয়ার্ক করে এগিয়ে চলল গেটের দিকে।

গেটের সামনে সেই লাইট সেই লাইট পোষ্টের সমান্তরালে মুখস্ত করা একই নিয়মে গিয়ে দাঁড়াল। দুটা হেডলাইটের ডিস্ট্যান্ট ফ্লাশ আলোয় ধাঁধিয়ে দিল

গেটটিকে। তারপর হারমনিয়ামের মত ছন্দময় গতিতে হর্ন বাজাল 'আমি হাজির'।

সঙ্কেতে সে কোন ভুল করেনি। তবু ও আহমদ মুসার মন কি হয় না হয় সন্দেহের দোলায় দুলছে। প্রায় শ্বাসরুদ্ধ ভাবে সে তাকিয়ে আছে ইস্পাত এর দরজার দিকে। মনের আকুল আকুতি, ইস্পাতের দরজাটা দুলে উঠুক, সরে যাক দরজাটা।

হ্যাঁ ইস্পাতের দরজাটা দুলে উঠল। মুহূর্তে হারিয়ে গেল প্রাচীর এর গেটে। দরজা সরে গেলে গেটের ওপাশে প্রশস্ত চত্বর এবং বিশাল এক গাড়ি বারান্দা আহমদ মুসার সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

আহমদ মুসা যে স্পীডে এসে ছিল, সেই স্পিডেই গাড়ি চালিয়ে দিল। গাড়ি তীর বেগে ছুটে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়াল। দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে আহমদ মুসা মুখ ফিরিয়ে পেছন সিটের দিকে তাকিয়ে বলল, বোমা পাতার কাজ তোমার শেষ? আলী ইমামভ সম্মতি সূচক মাথা নাড়াল। তারপর গাড়ি থেকে নেমে এলো তারা তিনজন। কোমরে খাপের মধ্যে ঝুলানো তাদের এম-১০ পিস্তল। পিস্তলের বাঁটে হাত রেখে আহমদ মুসা দ্রুত উঠে এলো। তার পিছনে আলী ইব্রাহিম এবং আলী ইমামভ।

ছোট সিঁড়ির পর অভ্যর্থনা রুমের দরজা। T আকারের তিন ব্লকে বিভক্ত চারতলা এই বিল্ডিং - এর অভ্যর্থনা কক্ষটি গ্রন্থির মত। এর দক্ষিন অংশে দক্ষিণ ব্লকের সিঁড়ি, উত্তর অংশে উত্তর ব্লকের সিঁড়ি। আর ঘরের মেঝে পেরুলে ঠিক নাক বরাবর যে সিঁড়ি উঠে গেছে তা দিয়ে মাঝের মূল ব্লকে যাওয়া যায়। এ সিঁড়ি দিয়ে দোতালায় উঠে গেলে দেখা যাবে আরেকটা সিঁড়ি নিচে একতলায় নেমে গেছে। এই এক তলাতেই 'ফ্র' এর কয়েদ খানা ও টর্চার চেম্বার। এই একতলা ছাড়া গোটাটাই 'ফ্র' এর নিরাপত্তা অফিস।

অভ্যর্থনা কক্ষের দরজার বাইরে স্টেনগান হাতে একজন রক্ষী দাঁড়িয়ে ছিল। তিনজন পুলিশ অফিসারকে আসতে দেখে সে মুহূর্তকাল দ্বিধা করল। কিন্তু অবশেষে সে খুলে দিল দরজা। তারা তিনজন প্রবেশ করলে দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

অভ্যর্থনা কক্ষ শূন্য। আহমদ মুসা খাপ থেকে রিভলভার বের করে নিল। তারপর ছুটল মাঝখানে সিঁড়ির দিকে। হাতে পিস্তল বাগিয়ে আলী ইব্রাহিম এবং আলী ইমামভ আহমদ মুসার পিছে পিছে ছুটল।

দোতালায় উঠে একতলায় নামার সিঁড়ি খুঁজে নিল আহমদ মুসা। কিন্তু দেখল একতলায় সিঁড়ির দরজা বন্ধ। দরজা ভাল করে পরীক্ষা করে বুঝল বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত এই দরজা।

হতাশভাবে চারিদিকে নজর বুলাল আহমদ মুসা। না, কোথাও কোন সুইচ নেই। দরজার গা, দরজার চৌকাঠ আহমদ মুসা ভালো করে পরীক্ষা করল। না, কোথাও গোপন বোতামের অস্তিত্ব নেই। এই দিকে সময় বয়ে যাচ্ছে। অস্থির হয়ে উঠল আহমদ মুসা। না, দরজা ভাংতে হবেই। সে পকেটে হাত দিল লেজার ছুরি বের করার জন্য। কিন্তু হঠাৎ নড়ে উঠল দরজা। নীচ থেকে কেউ কি বেরিয়ে আসছে?

আহমদ মুসা রিভলভার বাগিয়ে প্রস্তুত হয়ে নিল।

দরজা খুলে গেল। দরজায় দাঁড়িয়ে মাঝারি উচ্চতার একজন সুঠাম দেহী মানুষ। আহমদ মুসার রিভলভার এর নল তার বুকে। আহমদ মুসা তাকে নির্দেশ দিল, পেছনে ফিরে নিচে নামুন।

লোকটি প্রথমে বিস্ময়ে বিমুঢ় হয়ে পড়েছিল। কিন্তু পরক্ষনেই যেন অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে গেল। নির্দেশ পালন করল সে। সিঁড়ির দরজা বন্ধ করে দিয়ে সবশেষে নেমে এলো আলি ইমামভ। সিঁড়ি যেখানে এসে শেষ হয়েছে সেখান থেকে পূর্ব দিকে এগিয়ে যাবার গোড়ায় দাড়িয়ে সেই লোকটিকে আহমদ মুসা বলল, কুতাইবা এবং শবনম কোথায়?

-কুতাইবা? আমি জানিনা। বলল লোকটি।

আলী ইব্রাহিম বলল, মিঃ গানজভ এবং শবনম কোথায়?

লোকটির মুখে যেন এক টুকরা হাসি খেলে গেল। বলল, সাহায্য আমি কেন করব?

আহমদ মুসা রিভলভার নাচিয়ে বলল, জীবনের বিনিময়ে।

-জীবনের বিনিময়ে কি এ ধরনের তথ্য দিতে আপনারা রাজি হবেন?

আহমদ মুসা বুঝল , লোকটি সময় নিতে চায় , মতলব খারাপ। আহমদ মুসার কঠোর কণ্ঠে বলল, আমরা রসালাপ করতে আসিনি, আপনাকে আমরা সময় দেবনা।

আহমদ মুসার শাহাদাৎ আঙ্গুল রিভলভারের ট্রিগারে। ট্রিগারের এর উপর আঙ্গুলের চাপ ক্রমশঃ বাড়ছে। লোকটি গম্ভীর হল। বলল, বলছি তবে জীবনের ভয়ে নয়, আমি আপনার সাহায্য করতে চাই, মিঃ গানজভ এবং শবনমের মুক্তি আমিও কামনা করি। তারপর লোকটি বলল, এই করিডোর যেখানে শেষ হয়েছে সেটা একটা হলঘর। ওখানেই তাদের পাবেন।

আহমদ মুসা বলল, চলুন আপনি আগে আগে। তার দিকে আহমদ মুসার রিভলভার তখনও তাক করা। লোকটির চোখ বলছে সে সত্য কথাই বলছে, কিন্তু এই মুহূর্তে বিশ্বাস করে আহমদ মুসা ঠকতে চায় না, সত্যের মত করে ও অনেকে মিথ্যা বলতে পারে।

করিডোর দীর্ঘ। মাঝে মাঝে অপেক্ষাকৃত সরু উত্তর-দক্ষিণ মুখী করিডোর একে ক্রস করেছে।

আগে আগে চলছে লোকটি, তার ঠিক পেছনে আহমদ মুসা। তাদের একটু পেছনে আলী ইব্রাহিম ও আলী ইমামভ। একটা ক্রস করিডোর পার হয়ে তারা গজ দশেক এগিয়েছে। এমন সময় আলী ইমামভ চাপা কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, মুসা ভাই বসে পড়ুন। বাজের মত ক্ষিপ্র আহমদ মুসা ইমামভের কথা শেষ হবার আগেই বসে পড়েছে। তার বসে পড়ার সাথে সাথেই একটা বুলেট শাঁ করে ছুটে গিয়ে আগের সেই লোকটিকে বিদ্ধ করল।

আহমদ মুসা বসেই বিদ্যুতবেগে শরীরটাকে ঘুরিয়ে নিয়েছিল। দেখল, কয়েক গজ পেছনে ফেলে আশা ক্রসিং পয়েন্টে উদ্দত পিস্তল হাতে একজন দাঁড়িয়ে। আহমদ মুসার আঙ্গুল ট্রিগারেই ছিল। শুধু হাতটি উপরে উঠাতে যা দেরি। আহমদ মুসার এম-১০ পিস্তল থেকে এক পশলা বুলেট ছুটে গেল। লুটিয়ে পড়ল লোকটার দেহ।

আহমদ মুসা ফিরে দাঁড়িয়ে দেখল, আগের সেই লোকটি মুখ থুবড়ে পড়েছে তার পায়ের কাছেই। গুলি বামে পাজর ভেদ করে চলে গেছে। কি যেন বলতে

গেল সে। আহমদ মুসা একটু ঝুঁকে পড়ল। কথা আসছেনা লোকটির মুখে। তবু সে বলতে চায় কথা। অনেক কষ্টে একটা ক্ষীন কণ্ঠ তার শোনা গেলো। আমি কর্নেল সোভার্দনজ, আমি রুশ নই, ক্রিমিয়। আমি আপনার মতই স্বাধীনতাকে ভালবাসি।

সর্ব শক্তি একত্র করে যেন কথা কটি বলল সোভার্দনজ। কথা শেষ হবার সাথে সাথে নিরব নিথর হয়ে গেলো তার দেহ।

স্বাধীনতার আকুল পিয়াসি এই মানুষটির মুখের দিকে চেয়ে মুহূর্তের জন্য আনমনা হয়ে পড়ছিল আহমদ মুসা।

তারপর এই আবার উঠে করিডোর ধরে পূর্ব দিকে ছুটল আহমদ মুসা। তার সাথে আলী ইব্রাহিম এবং আলী ইমামভ।

জুকভ চাবি ঘুরিয়ে তালা খুলে ফেলেছিল, কিন্তু তালাটা হুক থেকে তখনও খুলতে পারেনি। পুশকভ দাঁড়িয়ে মজা দেখার জন্য তৈরি হচ্ছিলো।

বোধ হয় ভাবছিল, ব্লাড-হাউন্ডটা যখন শবনমের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, তখন চেহারাটা কেমন হবে কুতাইবার। এমন সময় করিডোরের দিক থেকে গুলির শব্দ এল। চমকে উঠল পুশকভ। চমকে উঠে একবার জুকভের দিকে চাইল। তারপর খাপ থেকে রিভলভারটা হাতে তুলে নিয়ে করিডোর ও হলরুম সংযোগকারী দরজায় মুহুর্তকাল দাঁড়াল। বোধ হয় বুঝতে চেষ্টা করল উৎকীর্ণ হয়ে। দরজার খুব কাছে পায়ের শব্দ শুনে সে দরজার এক পাশে দাঁড়াল।

এই সময় দরজা প্রচন্ড এক ধাক্কায় খুলে গেল। একটা পাল্লা গিয়ে দরজার পাশে দাড়ানো পুসকভের মাথায় বেশ জোরেই ঠোকা দিল। আর দরজা প্রায় তাকে ঢেকে দিল। কুতাইবা, জুকভ, শবনম সবাই তাদের চোখের আড়ালে চলে গেল। উদ্যত রিভলভার হাতে দরজায় এসে দাড়িয়েছে আহমদ মুসা। করিডোরে গুলির শব্দ শুনেই তালা ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাড়িয়েছিল জুকভ। দরজায় আহমদ মুসাকে দেখেই পিস্তলের বাটে হাত দিলে সে। কিন্তু দেরী হয়ে দেছে। আহমদ মুসার রিভলভার থেকে এক পশলা গুলি গিয়ে ঝাঝরা করে দিল জুকভের বুক।

কুতাইবা দরজার দিকে ইংগিত করে বলে উঠল, মুসা ভাই এই দরজার আড়ালে আরেকজন।

কুতাইবার কথা তখনও শেষ হয়নি। আহমদ মুসা প্রচন্ড বেগে ঠেলে দিল দরজাটা দেয়ালের দিকে।

'আ' করে একটা শব্দ হলো। সেই সাথে একটা ভারি কিছু খসে পড়ল মাটিতে। আহমদ মুসা দরজা টেনে নিয়ে দেখল, দেয়াল ও ইস্পাতের দরজার প্রচন্ড চাপে পিষে গেছে পুসকভের দেহ। মাথা ফেটে গেছে। এই অবস্থাতেই হাত থেকে ছুটে যাওয়া পিস্তল হাতড়াচ্ছিল পুসকভ। আহমদ মুসার রিভলভার আবার গুলি বৃষ্টি করল। নিশ্চল হয়ে গেল পুসকভের দেহ।

আলী ইব্রাহিম ও আলী ইমামভ ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। দাহাতে মুখ ঢেকে ব্লাড হাউন্ডের সেলের সামনেই বসে পড়েছে শিরীন শবনম। দুহাত ছাপিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে তার। অশ্রু কষ্টের নয়, এ অশ্রু আনন্দের, এ অশ্রু মুক্তির।

আলী ইমামভ গিয়ে পিছমোড়া করে বাঁধা কুতাইবার হাতের বাঁধন কেটে দিল। কুতাইবা জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে। কুতাইবার চোখেও তখন অশ্রু। সে অশ্রু কপাল থেকে নেমে আসা রক্তের ধারাকে আরো যেন বেগবান করে দিল।

কুতাইবার কপালের ক্ষত থেকে তখনও বেশ রক্ত ঝরছিল। আহমদ মুসা ক্ষতটা বেঁধে ফেলার জন্য চারদিকে চাইল কিছু পাওয়া যায় কিনা। সেদিকে তাকিয়েছিল শবনম। সে বুঝতে পাল আহমদ মুসার ইচ্ছা। শবনম তাড়াতাড়ি মাথার রুমালটি খুলে আহমদ মুসার হাতে দিল।

'শুকরিয়া বোন' বলে রুমালটি হাতে নিল আহমদ মুসা।

কুতাইবার ক্ষতস্থানটি বেঁধে দিয়ে সে সবাইকে বলল, তোমরা সবাই ঘরের উত্তর কোণে গিয়ে দাঁড়াও। করিডোরের সাথে সংযোগকারী খোলা দরজার দিকে একবার তাকাল আহমদ মুসা। দরজাটিকেও সে বন্ধ করে দিল।

তারপর সে বলল, আর দুমিনিটের মধ্যে আমাদের গাড়ী বোমার বিস্ফোরণ ঘটবে। আমাদের এর মধ্যেই এখান থেকে সরতে হবে। আমরা পূবের এই দেয়ালের বাধা ভাঙতে পারলেই বখশ নদীতে দাঁড়ানো আমাদের বোটে গিয়ে উঠতে পারবো।

আহমদ মুসা কাঁধ থেকে বগলের নিচে ঝুলানো থলে থেকে একটা ডিম্বাকৃতি জিনিস বের করল। ওটা এ্যান্টি ওয়াল গ্রেনেড। সীমিত পরিসরে প্রচন্ড আঘাত হেনে এই গ্রেনেড যে কোন দেয়ালে একটা চার ফিট বাই ছয় ফিট গবাক্ষ সৃষ্টি করতে পারে।

আহমদ মুসা অতি সন্তর্পনে গ্রেনেড থেকে পিন আলগা করে নিয়ে ঘরের উত্তর কোণের দিকে তাকিয়ে বলল, বোন শবনম, কানে আঙ্গুল দিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বস। তারপর দেয়ালের দক্ষিণ প্রান্তে মেঝে থেকে পাঁচ ফিট উপরে ছোট ঘুলঘুলিটির নিচে দেয়ালে গ্রেনেডটি ছুড়ে মারল আহমদ মুসা। বিকট শব্দ, প্রচন্ড কাঁপুনি। ধোঁয়ায় ভরে গেছে গোটা ঘর। মাত্র কয়েক সেকেন্ড। বাইরের ঠান্ডা বাতাসে ঘর ভরে গেল, সেই সাথে কমলো ধোঁয়াও। দেখা গেল মেঝে থেকে পাঁচ ফিট উপরে বিরাট একটা গবাক্ষ। আকাশের তারা দেখা যাচ্ছে সে গবাক্ষ দিয়ে।

আহমদ মুসা বলল, কুতাইবা, তুমি প্রথম বেরিয়ে যাও। বোট ঠিক কের রাখ। শবনমকে তুলে নেবার ব্যবস্থা করবে বোটে। বলে আহমদ মুসা গবাক্ষের নিচে মেঝেতে বসে পড়ল। বলল, আমার কাঁধে উঠে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাও। ইতস্তত করছিল কুতাইবা। আহমদ মুসা তাকে একটা মিষ্টি ধমক দিল।

কুতাইবা গবাক্ষে উঠে দেখল, একদম বরাবর নয় দশ ফুট নিচেই নদীর পানি। দেয়ালের পাথরের ভিত্তি পানি থেকেই উঠে এসেছে। একটু দুরেই দুটি বোট দেখতে পেল সে। মনে হচ্ছে এগুলো এগিয়ে আসছে। কুতাইবা ঝাঁপিয়ে পড়ল পানিতে।

কুতাইবার পর শবনম। শবনম কুতাইবার মতই ইতস্তত করছিল। বলল, আমি পারবো না কাঁধে পা দিতে। আহমদ মুসা বলল, এটা নির্দেশ শবনম।

শবনম আর কোন কথা বলল না। কাঁধে উঠে গবাক্ষে উঠে বসল। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীতে। একে একে সবাই বেরিয়ে গেলে নিজে বেরিয়ে এল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা যখন ঝাঁপিয়ে পড়ছিল পানিতে, তখনই এক প্রচন্ড বিস্ফোরণে উলট পালট হয়ে গেল 'ফ্র' এর অফিস বিল্ডিং। সেই সাথে প্রচন্ড গোলাগুলিরও আওয়াজ এল চতুর্দিক থেকে। বোটে উঠতে উঠতে আহমদ মুসা

বলল, সাইমুমের ছেলেরা ঠিক সময়েই এসেছে। আলী ইমামভ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, কিন্তু মুসা ভাই, গাড়ী বোমার বিস্ফোরণ ৪০ সেকেন্ড আগে ঘটল কেন?

-হতে পারে সময় নির্ধারণে আমাদের ভুল হয়েছে অথবা হতে পারে আল্লাহর কোন মঙ্গল ইচ্ছা এর মধ্যে আছে। এই বিস্ফোরণের ফলে বলা যায় আমাদের এদিকে নজর দিতে ৪০ সেকেন্ড সময় তারা কম পেল। বলল আহমদ মুসা। গোটা বখশ শহর তখন অন্ধকার। সাইমুম কর্মীরা শহরের ভেতর ও বাইরে থেকে শহরের গোটা প্রতিরক্ষা ভেঙ্গে দিয়েছে। সাইমুম কর্মীরা এখন শহরের অস্ত্র এবং অস্ত্রাগার হাত করার কাজে ব্যস্ত।

অন্ধকারের মধ্যে নদী বেয়ে ৫টি বোট এগিয়ে চলেছে শহরের বাইরের সাইমুম ঘাঁটির দিকে। ক্লান্তিতে আহমদ মুসা গাটা এলিয়ে দিয়েছে বোটের পাটাতনে। মাথাটা ব্যথায় ঢিপ ঢিপ করছে তার। সেই পুরানো আঘাতের ব্যথাটা এখনও সারেনি।

ভেজার পর কুতাইবার কপালের ব্যান্ডেজটা আবার লাল হয়ে উঠেছে রক্তে। রক্তের একটা সোদা গন্ধ, সেই থেকে একটা অপরিচিত সুগন্ধ নাকে আসছে তার। বুঝল, সুগন্ধটা শবনমের রুমালের। ভেজার পর রুমালের একটা অংশ নাকের গোড়া পর্যন্ত নেমে এসেছে। একটু দুরেই বসে আছে শবনম। চোখটা যেন জোর করেই ওদিকে চলে গেল কুতাইবার। মনে হল শবনম এদিকেই তাকিয়ে ছিল। কুতাইবা চাইতেই সে চোখ মাটিতে নামিয়ে নিল। কুতাইবার চোখ ঘুরে চলে গেল দুর আকাশের ঐ আদম সুরতের দিকে।

হঠাৎ তার নিজ বাড়ীর সুন্দর চিত্রটা ভেসে উঠল কুতাইবার চোখে। ভাবতে ভালো লাগল তার গৃহের অমন একটা সুন্দর শান্তিময় আশ্রয়ের।

কেঁপে উঠল কুতাইবা। সে তো গানজভ নাজিমভ নয়। কুতাইবা সে। মধ্য এশিয়ার মুসলমানদের লাখো লাখো ঘরের মিছিলে ঘর বাঁধবার সুযোগ কুতাইবার কোথায়?

# ৪

মস্কো শহর থেকে তিন মাইল উত্তরে মস্কোভা নদীর একটা দ্বীপে উঁচু প্রাচীর ঘেরা বহুতল বিশিষ্ট বিশাল বিশাল এক বাড়ী। বাড়ীর প্রধান ফটকে ছোট্ট এটা সাইন বোর্ড। অনুবাদ করলে যার অর্থ দাঁড়য় মস্কোভা স্কুল অব রিহাবিলেটেশন প্রোগ্রাম। আসলে এটা একটা বন্দী শিবির। একটু ভিন্ন প্রকৃতির। পার্টির যেই সমস্ত লোক যারা প্রতিভাবান, বয়সে কম, কিন্তু আবেগ তাড়িত হয়ে কিংবা প্ররোচণায় পড়ে, পার্টি লাইন থেকে বাইরে গেছে, তাদেরকে কম্যুনিস্ট সরকার এই বন্দী শিবিরে রাখে। একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। এই সময়ের মাপটা সকলের জন্য এক রকমের নয়। কারো পাঁচ, কারো দশ বছর ইত্যাদি। কেউ সংশোধনের বাইরে বিবেচিত হলে সে হারিয়ে যায় চিরতরে। অর্থ্যাৎ, যারা বন্দী হয়ে এখানে আসে তাদেরকে হয় কম্যুনিস্ট ব্যবস্থার আনুগত্য, নয়তো মৃত্যু -এই দুটোর মধ্যে একটা বেছে নিতে হয়।

দ্বীপটির চার দিক ঘিরেই পানি। মস্কোভা নদীর ধার ঘেঁষে একটা সড়ক মস্কো নগরী থেকে বের হয়ে এই পানির ধার পর্যন্ত এসে শেষ হয়েছে। রাস্তাটা সাধারণের জন্য নয়। আসলে কম্যুনিস্ট পার্টি এবং সরকারের উচ্চ পদস্থ রাজনৈতিক ব্যক্তিদের জন্য যে অভিজাত এলাকা গড়ে তোলা হয়েছে নগরীর উত্তর অংশে, সেখান থেকেই রাস্তাটা বেরিয়ে এসেছে। সুতরাং সাধারণ নাগরিকদের এদিকে আসার কোন সুযোগই নেই। বছরের অধিকাংশ সময়ই মস্কোভা নদীতে বরফ জমে থাকে। তখন নিরাপত্তা রক্ষীরা বিশেষ ধরনের গাড়ীতেই দ্বীপের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। অন্য সময় বোট ব্যবহার হয়।

দ্বীপের সেই বাড়ীটির প্রধান ফটকে ইস্পাতের বিশাল গেট। এ গেট দিয়ে বড় বড় গাড়ী অনায়াসে ঢুকে যায়। গেট পেরুলেই যে প্যাসেজ তার দু'পাশে অনেক ঘর। এগুলো পেরুলে আরেকটি ফটক। এ ফটক পার হলে একটা প্রাচীর

ঘেরা প্যাসেজ হয়ে বাড়ীর অভ্যন্তরে বিশাল কারখানা কমপ্লেক্সে গিয়ে পৌছা যায়।

কারখানা কমপ্লেক্সটি একতলা। অনেক হলরুম এবং শতশত কক্ষ আছে এখানে। বন্দীরা সারাদিন এখানে কাজ করে, বিচিত্র সব কাজ। বন্দীদের অপরাধ ও শ্রেণী হিসেবেই তাদের কাজ নির্ধারিত হয়। এ কারখানা কমপ্রেক্সের উত্তর পাশের অংশে পুরুষদের বাস এবং দক্ষিণ অংশ মেয়েদের।

কারখানা কমপ্লেক্সের দর্শন বিভাগের একটি ছোট ঘর। ঘরে ৩টি টেবিল। ২টি টেবিলে দু'জন মেয়ে বসে। মাঝের টেবিলে আয়েশা আলিয়েভা। লোহার ছোট চেয়ারে বসে কাজ করছে সে। টেবিলে মার্কস ও লেনিনের কয়েকটা বড় বড় ভলিয়্যুম।

আয়েশা আলিয়েভার দায়িত্ব হলো তাদের ওঅর্কস-এর উপর একটা ক্রনোলোজিক্যাল কমেন্ট্রি তৈরী করা।

প্রতিদিনের জন্য পাতা সংখ্যা বরাদ্দ আছে। কম হলে শাস্তি। শাস্তির মধ্যে সর্বনিম্ন হলো খাবার বন্ধ হওয়া, শীতের কম্বল না পাওয়া, কাজের টেবিলে বসার চেয়ার না মেলা ইত্যাদি।

লিখছিল আয়েশা আলিয়েভা। ৭দিন পর পর এসে দায়িত্বশীল অফিসার কাজ নিয়ে যায়, কাজের তদারকি করে আজকে সেই সপ্তম দিন। কিন্তু ৭দিনে যে কাজ হওয়া উচিত সে কাজ হয়নি আয়েশা আলিয়েভার।

লিখতে লিখতে আয়েশা আলিয়েভা একটু থামল। কি ভাবতে চেষ্টা করল। তারপর কলমটা ছুঁড়ে ফেলে দিল আয়েশা আলিয়েভা। কি লিখবে সে, লেখা তার আসেনা। যে মতবাদ তার কাছে পঁচা, দুর্গন্ধযুক্ত, তার উপর রং চড়াবে সে কেমন করে!

আলিয়েভার বাম পাশের টেবিলে বসেছিল এক মধ্য বয়সী মহিলা ডাঃ নাতালোভা। মস্কোর লমুম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের খ্যাতিমান অধ্যাপিকা। ১৭বছর অধ্যাপনা করার পর সে এখন বলছে, মানুষ যেমন সত্য, তার ধর্ম বিশ্বাস তেমনি সত্য। ছাত্রদের সে বলেছে, এ ধর্ম বিশ্বাস থেকে মানুষকে মুক্ত করার চিন্তা অবাস্তব। আমরা এটা শত বছরের চেষ্টাতেও পারিনি। আমরা

মানুষকে বেথেলহামে যেতে দিচ্ছিনা বটে, কিন্তু লেনিনের মাযারকেই তারা বেথেলহাম বানিয়ে নিয়েছে। এই বিশ্বাসই নাতালোভার অপরাধ। এই অপরাধেই তাকে আসতে হয়েছে এই বন্দী শিবিরে। ডারউইন এবং মার্কসীয় দর্শনের অনুসরণে মানুষের অলীক বিশ্বাসের ক্রমঃবিবর্তনের উপর গবেষণা করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে নাতালোভার উপর।

আলিয়েভার কলম গড়িয়ে পড়ার শব্দে ফিরে তাকাল নাতালোভা। আলিয়েভার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু ভাবল সে। তারপর উঠে দাঁড়িযে মেঝে থেকে কলম তুলে নিয়ে আলিয়েভার দিকে বাড়িয়ে বলল নাও, পাগলামী করোনা।

-পাগলামী নয়, আমি আর পারছি না খালাম্মা।

-না, পারতে হবে, বাঁচতে হবে তোকে।

-না, এমন করে বাঁচতে চাই না, মন আমার মরে যাচ্ছে। এই জুলুমে আয়েশা আলিয়েভার চোখে পানি টলমল করে উঠল। নাতালোভার একটা মেয়ে আছে আয়েশা আলিয়েভার বয়সের। আয়েশার মধ্যে দিয়ে নাতালোভা যেন তার সেই মেয়ের চোখের পানি দেখতে পেল। মাতৃমন উথলে উঠল তার। নাতালোভা আয়েশা আলিয়েভার মাথায় হাত বুলিয়ে সস্নেহে বলল, তুই ভুল বলছিস আলিয়েভা। কোন বিশ্বাসীর মন কখনও মরে না, কেউ মারতে পারে নারে। অত্যাচার, জুলুম বিশ্বাসের আগুনকে প্রজ্জ্বলিতই করে বেশী।

থামল নাতালোভা। তারপর কলমটা আয়েশা আলিয়েভার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, মন বিশ্বাসের শক্তিতে বাঁচে, কিন্তু দেহকে বাঁচাবার জন্য খাদ্য প্রয়োজন। তুই দেহের উপর অনেক জুলুম করেছিস, আর নয়। একটু থেমে নাতালোভা বলল, তোর ডান পাশের তানিয়া মেয়েটা কয়দিন আসছেনা কোথায় গেছে বলতে পারিস?

আয়েশা আলিয়েভা মুখ তুলে নাতালোভার দিকে তাকিয়ে বলল, না, খালাম্মা।

-যেখানে গেলে মানুষ আর কোনদিন ফেরেনা, তানিয়া এখন সে জগতে। ল্যাটভিয়ার ঐ মেয়েটা তোর মতই জেদী ছিল।

নাতালোভার স্বরটা ভারী। চোখের কোণ তার ভিজে উঠেছে। আয়েশা আলিয়েভা উঠে দাঁড়াল। নাতালোভার একটা হাত ধরে সে বলল, তুমি ভেবনা খালাম্মা, তানিয়া বেঁচেছে।

হঠাৎ নাতালোভা গম্ভীর হলো। আয়েশা আলিয়েভার চোখে চোখে রেখে বলল, সবাই এভাবে পালিয়ে বাঁচতে চাইলে দেশকে বাঁচাবে কে?

আয়েশা আলিয়েভা বিস্মিত হলো। বিস্ময়ভরা চোখে নাতালোভার দিকে তাকিয়ে রইল। একি রূপ তার খালাম্মার।

তারপর ধীর কণ্ঠে বলল, দেশকে বাঁচাবার এত বড় চিন্তা তুমি করো খালাম্মা?

-কেন আমি দেশের মানুষ নই? জাতির একজন সদস্য নই?

-কিন্তু তানিয়া, আমরা আমাদের দুর্বল হাতে কি পারতাম, আর কি পারব খালাম্মা?

-কোন হাতই দুর্বল নয়। লেনিনের কাছে বিশ্বাসের শক্তি ছিলনা বলে ষড়যন্ত্র, শঠতা ও জোচ্চুরীর মাধ্যমে জনগণকে তার হাত করতে হয়েছিল। কিন্তু আমাদের বিশ্বাসের শক্তি আছে বলে আমাদের তার প্রয়োজন হবে না। রাশিয়ার ধর্মবিশ্বাস বঞ্চিত বুভুক্ষু জনগণকে বিশ্বাসের শক্তিই সংগঠিত করবে।

বিস্ময় বিস্ফোরিত চোখে আয়েশা আলিযেভা তাকিয়েছিল নাতালোভার দিকে।

নাতালোভা একটু থামর। তারপর কণ্ঠটা আরেকটু নামিয়ে ফিস ফিস করে বলল, আমি জানি, তোদের মধ্য এশিয়া জেগেছে, এই জাগরণ ক্ষীয়মান কম্যুনিষ্ট শক্তি আর রোধ করতে পারবেনা। তোদের জাগরণ ধর্মভীরু রুশদেরও জাগাবে। তাদের অন্তরে দগদগে আগুন, অনুকূল বাতাস পেলেই তা জ্বলে উঠে কম্যুনিষ্টদের ঘুনে ধরা প্রাসাদ পুড়িয়ে ছাড়বে।

একটু হাসল নাতালোভা। তারপর বলল, লেনিনের বিপ্লবে সুযোগ সন্ধানী বুদ্ধিজীবীরা শ্রমিকদের ব্যবহার করেছিল। আর সামনের বিশ্বাস অর্থাৎ ধর্ম শক্তির বিপ্লবে দরিদ্র, বঞ্চিত, শোষিত কৃষক শ্রমিকরা সামনে থাকবে, আর সুবিধাভোগী বুদ্ধিজীবীরা বাধ্য হয়েই তাদের পিছনে এসে কোরাস তুলবে।

নাতালোভা ও আয়েশা আলিয়েভা কেউই টের পায়নি রুম সুপারভাইজার গাব্রিয়ালা কখন এসে দাঁড়িয়েছে।

-ও এইভাবে সময় চুরি করা হচ্ছে। যেন হুংকার দিয়ে উঠলো গাব্রিয়ালার পুরুষালী কণ্ঠ।

গাব্রিয়ালা রুমে ঢুকে দু'জনার টেবিল থেকে দু'টি ডিউটি চার্ট তুলে নিল। তারপর আজকের নরমাল ডিউটির সাথে আরও এক ঘণ্টা যুক্ত করে চার্ট ফেরত দিল। অর্থাৎ নাতালোভা ও আয়েশা আলিয়েভাকে আজ ছুটির পরও এক ঘণ্টা করে বেশী কাজ করতে হবে। আর এই এক ঘণ্টা বেশী কাজ করার কারণে ঠিক সময়ে খেতে যেতে পারবেনা। তার ফলে আজকের রাতে তাদের ভাগ্যে খাবার নাও জুটতে পারে।

গাব্রিয়ালা আয়েশা আলিয়েভার ডান পাশের টেবিল থেকে সব বই ও কাগজপত্র নিয়ে বেরিয়ে গেল। ফিরে এল কয়েক মিনিট পরেই। হাতে লাল নতুন একটি ফাইল এবং একটি ডিউটি চার্ট। ওগুলো টেবিলে রেখে সে বেরিয়ে গেল। আয়েশা আলিয়েভা নাতালোভার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল। নাতালোভা বলল, আর একজন কেউ আসছে। অল্পক্ষন পরেই ঘরে প্রবেশ করল ষ্টেশন ডিরেক্টর ভ্লাদিমির জোসেফ। তার পেছনে পেছনে একটি মেয়ে। ঘাড় ফিরিয়ে চকিতে একটু তাকিয়েই নাতালোভা ও আয়েশা আলিয়েভা মনোযোগ দিল টেবিলে। এখানকার আইনে অন্য কেউ, অন্য কিছুর দিকে নজর দেয়া নিষিদ্ধ। পিছনের মেয়েটিকে দেখে ধক করে উঠল আয়েশা আলিযেভার বুক। যতটুকু দেখেছে, তাতে মেয়েটি তাদের তুর্কিস্তানের।

ষ্টেশন ডিরেক্টর সবাইকে যেমন বলে সেই রুটিন নির্দেশনামা দিয়ে গেল মেয়েটিকে। সবশেষে বলল, সবাইকে যেমন বলেছে। তোমার মুক্তি নির্ভর করছে তোমার এই টেবিলের কাজের উপর।

বেরিয়ে গেল ষ্টেশন ডিরেক্টর। ধীরে ধীরে মুখ তুলল আয়েশা আলিয়েভা। তাকাল মেয়েটির দিকে। মাথা নিচু করে মূর্তির মত বসে আছে মেয়েটি। বাম পাশ থেকে নাতালোভা ফিস ফিস করে আলিয়েভাকে বলল, তোর দেশী। কথা বল। আহা বেচারী!

মেয়েটা এদিকে তাকাচ্ছেই না। অবশেষে আয়েশা আলিয়েভা তাকে লক্ষ্য করে বলল, এই যে।

মেয়েটা মুখ ঘুরাল। তার সাথে চোখাচোখি হল আলিয়েভার। মেয়েটার চোখে পানি। কাঁদছে মেয়েটা।

-আমিও কেঁদেছি, আপনাকে কাঁদতে নিষেধ করব না। বলল আয়েশা আলিয়েভা।

মেয়েটা একবার মুখ তুলে পরিপূর্ণভাবে তাকাল আয়েশা আলিয়েভার দিকে। মনে হল, একজন অবলম্বন খুঁজে পাওয়ার স্বস্তি তার দৃষ্টিতে।

আয়েশা আলিয়েভা নাতালোভাকে দেখিয়ে বলল, ইনি আমাদের খালাম্মা অধ্যাপিকা নাতালোভা। তারপর একটু থেমে বলল, তোমার নাম কি?

-রোকাইয়েভা।

-মুসলিম তুমি? আনন্দ ঝরে পড়ল আলিয়েভার কন্ঠে।

-আপনি? জিজ্ঞেস করল রোকাইয়েভা।

-আমি আয়েশা আলিয়েভা।

-কোন আয়েশা আলিয়েভা? আপনার বাড়ী কোথায়?

-তাসখন্দ।

আলিয়েভার কথা শুনে উঠে দাড়াল রোকাইয়েভা। সামনে এসে দাড়াল সে আলিয়েভার। বলল, আপনি উমর জামিলভকে চেনেন?

-চিনি। তিনি আমার স্যার, বস ছিলেন।

এক ধরণের আবেগ বিহ্বলতায় অভিভুত হয়ে পড়েছে যেন রোকাইয়েভা। কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না। নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে বলল, আমি তার বোন।

রোকাইয়েভার কথা শুনে চমকে উঠল আয়েশা আলিয়েভা।উঠে দাড়াল সে। বলল,তুমি এখানে!!! স্যার কোথায়?

কোন উত্তর দিতে পারল না রোকাইয়েভা। ফুপিয়ে কাঁদতে লাগল। আয়েশা আলিয়েভা কাছে টেনে নিল রোকাইয়েভাকে। সান্ত্বনা দিয়ে বলল, কেঁদোনা বোন। বলতে হবে না বুঝেছি। বোনকে যখন বন্দী শিবিরে পাঠিয়েছে, তখন সরকারের

উচ্চ দায়িত্বশীল ভাই যে কোথায় তা আর বলতে হয় না। কিন্তু, কি অপরাধ ছিল তার?

-তিনি নাকি বিদ্রোহীদের গোপণে সহায়তা করছিলেন।

আনন্দে আয়েশা আলিয়েভার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, আমি জানতাম রোকাইয়েভা, স্যার আমাদের জাতিসত্ত্বাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন।

একটু থেমে বলল, কেঁদোনা বোন, তিনি আমার বস ছিলেন, আমি গর্ববোধ করছি।

নাতালোভা দরজায় পাহারা দিচ্ছিল রুম সুপার ভাইজারকে। শ্রম সময় আজ এক ঘন্টা বেড়েছে, আর যাতে না বাড়ে। আয়েশা আলিয়েভা থামলে রোকাইয়েভা কিছু বলতে যাচ্ছিল। হাত দিয়ে থামতে ইশারা করে নাতালোভা তাড়াতাড়ি এসে চেয়ারে বসল। সেই সাথে আলিয়েভা এবং রোকাইয়েভাও। প্রায় সাথে সাথেই রুম সুপার ভাইজার এসে দরজায় দাঁড়াল।

মস্কোভা বন্দী শিবিরের তৃতীয় তলার ডাইনিং রুম। বন্দী শিবিরের প্রত্যেক তলায় আলাদা আলাদা ডাইনিং রুম রয়েছে। প্রত্যেক তলায় প্রায় দু'শ করে মেয়ে আছে। তাদের একসাথে একত্রিত হবার জায়গা এই ডাইনিং রুম। রাতের খাবারের জন্য ওদের এক ঘন্টা সময় থাকে। খেতে সময় লাগে ১৫ মিনিট, অবশিষ্ট্য সময় তারা একত্রে গল্প করে কাটায়।

কাউন্টার থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে খাবার নিতে হয়। খাবার নিয়ে যে যার মত টেবিলে বসে খাবার খায় এবং গল্প করে। এই গল্পটা সকলের প্রিয়। ৭ টা থেকে ৫ টা এই দশ ঘন্টা খাটুনির পর এটা তাদের জন্য যেন একটা মুক্তির বাতায়ন। শ্বাসরুদ্ধকর একটা গুমোট পরিবেশে এ সময়টুকুই তারা হেসে গল্প করে জীবন ধারণের শক্তি সঞ্চয় করে।

আয়েশা আলিয়েভা সেদিন খাবার লাইনে দাঁড়িয়ে দেখল নাতালেভা, রোকাইয়েভা, আলুলিয়েভা ডান প্রান্তের একটা টেবিলে বসে গল্প করছে। আজ

খেতে আসতে আলিয়েভার একটু দেরী হয়েছে। মন ভাল লাগছে না তার। আজ সারাদিনই তার বারবার হাসান তারিকের কথা মনে পড়েছে। কারখানার কাজ থেকে গিয়ে হাতমুখও ধোয়নি সে। জানালা দিয়ে মস্কোভা নদীর দিকে তাকিয়ে ছিল সারাক্ষণ। হাসান তারিখের মুখটা বারবার তার চোখের সামনে ভেসে উঠে তাকে আকুল করে তুলছে। সে রোকাইয়েভার কাছে শুনেছে হাসান তারিক জেল থেকে বেরুতে পেরেছে। কোথায় সে এখন? তার কি মনে আছে আয়েশা আলিয়েভার কথা? আয়েশা আলিয়েভা কিন্তু তার একটি কথাও ভুলেনি। হাসান তারিক ভাবে কি এমন করে আয়েশা আলিয়েভার কথা? ওঁর হৃদয়টা তো এক দুর্ভেদ্য দুর্গ। ওখানে আমার মত এক সামান্য কেউ প্রবেশাধিকার পাবে? কিন্তু বিদায়ের সময় আয়েশা আলিয়েভা ওঁর চোখে আলো দেখেছে, একটা আবেগের স্ফুরণ দেখেছে। ওটুকুই আলিয়েভার সম্বল। আলিয়েভা ভাবে ও শেষ কথাটা বলার আগে চোখ বুজেছিল কেন? একটা আবেগকে কি সে চাপা দিতে চায়নি? শেষ কথাটা বলার সময় ওঁর গলাটা ভারী হয়ে এসেছিল কেন? ওটা কি তার বিচ্ছেদ বেদনার কান্না নয়? ভালো লাগে ভাবতে এসব আলিয়েভার। সত্ত্বা জুড়ে শিহরণ জাগে তার।

হাসান তারিকের শেষ উপদেশ ভুলেনি আয়েশা আলিয়েভা। যেখানেই থাক কাজ করতে হবে মধ্য এশিয়ার মজলুম মুসলমানদের মুক্তির জন্য। মাঝখানে সে হতাশ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু নাতালোভা তাকে আবার জাগিয়ে দিয়েছে। সে এখন বাচতে চায়। বাচতে চায় তার প্রিয় হাসান তারিকের জন্য, বাচতে চায় তার দেশজোড়া মুসলিম স্বজনদের জন্য।

লাইনের সামনে আরও চারজন আছে। তারপরই খাবার পাবে আলিয়েভা। এই লাইনে দাড়ানোই তার কাছে বড় বিরক্তিকর; ক্ষুধার সময় এটাকে একটা বড় শাস্তি মনে হয় তার কাছে।

আবার চোখ গেল নাতালোভার টেবিলে। আলুলিয়েভার সাথে আজও মারিয়া নেই কেন? ওদের গল্পে আলুলিয়েভাকে আজ তো আগের মত প্রাণবন্ত দেখাচ্ছে না?

লাইন থেকে সামনের শেষ মেয়েটি খাবার নিয়ে চলে গেল। তারপর আয়েশা আলিয়েভা। আয়েশা আলিয়েভা খাবার নিয়ে এসে বসল নাতালোভাদের টেবিলে আলুলিয়েভার পাশে। বসেই চিমটি কাটল আলুলিয়েভাকে। বলল, মারিয়া কোথায়?

-জানোনা আলিয়েভা তুমি? গম্ভীর কন্ঠ আলুলিয়েভার। শংকিত হল আলিয়েভা। বলল, না তো! কি হয়েছে ওর? কথা বলল না আলুলিয়েভা। মুহুর্তকাল নিরবতা। নিরবতা ভাঙল নাতালোভা। বলল, রাক্ষসকে মানুষ ভেট দেবার সেই গল্প আলিয়েভা। এ মাসে তিনবার সেটা ঘটল মারিয়া, নাদিয়া ও নারালোভাকে দিয়ে।

শুনেই মুখটি ফ্যাকাশে হয়ে গেল আলিয়েভার। কোন কথা যোগল না তার মুখে।

মস্কোর কম্যুনিস্ট কর্তাদের চোখ মাঝে মাঝে মস্কোভা বন্দী শিবিরের উপরে পড়ে। ওদের সরকারী প্রাসাদেই বেশ্যালয় পোষা হয়। তারপরও মস্কোভা বন্দী শিবিরের প্রতিভাবান কুমারী সুন্দরীদের প্রতি ওদের নিদারুন লোভ। এর মধ্যে ক্যারেকটার এসোসিয়েশনের মাধ্যমে 'বেয়াড়া' মেয়েদের বাগে আনার একটা লক্ষ্যও তাদের থাকে। আলিয়েভা, রোকাইয়েভা, আলুলিয়েভা সবাই নীরব। আবার কথা বলল নাতালোভাই। বলল, দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় মিটিং সিটিং উপলক্ষ্যে কম্যুনিস্ট পুজিপতিরা যখন রাজধানীতে জমায়েত হন, তখনই এ প্রবণতা বাড়ে, যেমনটা গতমাস থেকে বেড়েছে।

-এই জুলুম ওদের কারও মনেই কি কোন দাগ কাটে না? বলল, আলিয়েভা।

আলিয়েভার কথা শুনে হাসল ডঃ নাতালোভা। বলল, কম্যুনিজম শেখানোর কেন্দ্রে লুমুম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৭ বছর আমি ছাত্র পড়িয়েছি। আমি জানি ওদের মানসিকতা। কম্যুনিস্ট নেতৃবৃন্দরা নিজেদের শুধু দেশের অর্থসম্পদেরই অবিসংবাদিত মালিক মনে করে না, দেশের মানব সম্পদেরও মালিক, এই আচরণ তারা করে। যেহেতু মালিক তারা সেহেতু, যাকে যেমন ইচ্ছা তারা ব্যবহার করতে পারে। ব্যাপারটা যখন তাদের অধিকারের, তখন এর মধ্যে তারা কোন জুলুম দেখবে কেন!

আলোচনা আজ জমলো না। আলিয়েভা আর একটি কথাও বলেনি। নিষ্পাপ প্রাণোচ্ছল মারিয়া ও নাদিয়ার ভাগ্যের কথা শুনে মনটা একেবারে ভেংগে গিয়েছিল আলিয়েভার।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে সে উঠে দাঁড়াল। তার সাথে রোকাইয়েভাও উঠল। উঠে দাঁড়াল নাতালোভাও। সে আলিয়েভাকে কাছে টেনে বলল, আমি আটটায় তোমার রুমে যাব।

মস্কোভা বন্দী শিবিরের নিয়ম অনুসারে ৯ টা পর্যন্ত ঘরের দরজা খোলা রাখা যায়, দু'জনের বেশী না হলে পাশের রুমে আলাপ করাও নিষিদ্ধ নয়।

তবে রাত ৯টার পরে আর কোন দরজাই খুলবে না, কেউ করিডোরে বেরুবে না। পায়খানা প্রস্রাব তখন চলে ঘরের ভিতরে নির্দিষ্ট পাত্রে।

রাতে মাঝে মাঝেই নাতালোভা আলিয়েভার রুমে আসে। তারা দু'জনে মস্কোভা বন্দী শিবিরের বন্দীদের একটা জীবনবৃত্তান্ত তৈরী করছে। দু'জনে সারাদিনে বা কয়েকদিনে যা সংগ্রহ করে তা রাতে বসে সমন্বিত করে লিখে ফেলে। লেখা শেষ হলে এটা তারা বাইরে পাঠাবার চেষ্টা করবে।

আয়েশা আলিয়েভা চলে এল তার ঘরে। ঘরতো নয়, একটা কুঠুরী। কাপড়-চোপড় রাখার একটা আলনা, খাবার একটা পাত্র, একটা গ্লাস, আর শোবার জন্য ইস্পাতের ফ্রেমে প্লাস্টিকের একটা খাটিয়া। একটা কম্বল বিছানোর, একটা কম্বল গায়ে দেবার। এই নিয়েই তাদের সংসার। দাঁত মাজার একটা ব্রাশ আছে বটে, কিন্তু পেস্ট দুষ্প্রাপ্য। সুতরাং দাঁত মাজার জন্য তাদেরকে নানা জিনিসের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। এসব দৃশ্যমান আসবাব পত্রের বাইরে লেখার জন্য কলম, চিরকুট জাতীয় কিছু কাগজ তাদের আছে। ওগুলো তারা নানা কৌশলে লুকিয়ে রাখে।

আয়েশা আলিয়েভা গড়াগড়ি দিচ্ছিল বিছানায়। সারাদিনের ক্লান্তি ও খাওয়ার পর শোবার সংগে সংগে চোখ  জড়িয়ে আসছিল তার। চোখটা একটু ধরেছিল। এমন সময় দরজায় নক হলো। কান খাড়া করল আয়েশা আলিয়েভা। না, এটা নাতালোভার নক নয়। আবার নক হলো। একটু জোরে। বুঝা গেল, বন্দী শিবির কর্তৃপক্ষেরই কেউ।

আয়েশা আলিয়েভা উঠে গায়ের কাপড়-চোপড় ঠিক করল, তারপর খুলতে গেল দরজা। গিয়ে আবার ফিরে এল। নামাজের জন্য যে কাপড়টা সে কেবলামুখী করে বিছিয়েছিল, নামাজের পর তা আর তোলা হয়নি। এ বন্দী শিবিরে কোন প্রকার ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান মারাত্মক অপরাধ। এ অপরাধ ধরা পড়লে এমনকি তাকে সংশোধনের বন্দী শিবির থেকে দাস শিবিরে পাঠানো হতে পারে। সুতরাং সব বন্দীরাই এ ব্যাপারে খুব হুশিয়ার। আলিয়েভা দরজা থেকে ফিরে এসে জায়নামাজটি তুলে ফেলল। তারপর খুলে দিল দরজা।

দরজা খুলে দেখল, দরজায় দাঁড়িয়ে এ বন্দী শিবিরের মহিলা ব্লকের সুপার অরলোভা আলেকজায়া স্বয়ং।

প্রথমে তাকে দেখে ভয়ানক চমকে উঠল আলিয়েভা। সবাই আলেকজায়াকে শনির সংকেত বলে জানে। সাড়ে ছয় ফুটের মত লম্বা, আড়াই ফুটের মত চওড়া আলেকজায়ার ঐ বিশাল দেহটার মধ্যে অন্তর আছে বলে কেউ মনে করে না। শাসন ও শাস্তির শানিত ছুরি যেন একটা সে। তার ডাক পড়লে কিংবা কারো দরজায় সে আবির্ভূত হলে সে বুঝে নেয় তার কোন দুঃসময় এসেছে।

সেই অরলোভা আলেকজায়াকে দরজায় দেখে কোন কথা জোগালনা আয়েশা আলিয়েভার মুখে। আয়েশা আলিয়েভার কথা বলার অপেক্ষাও করলোনা আলেকজায়া। ঘরের ভেতরে প্রবেশ করল। ঘরের মেঝেয় দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকাল। ঘরের বিছানা, বালিশ, পানির কলস, আলনা সব কিছুর উপর দিয়েই তার চোখ একবার ঘুরে এল।

বুকটা দুরুদুরু করে উঠল আলিয়েভার। কোন সন্দেহ করেছে কি সে? সন্দেহজনক কোন কিছুর সন্ধান করছে কি? গত পরশু লেখা দশজন বন্দীর জীবন বৃত্তান্ত বালিশের মধ্যে আছে। বালিশটা দেখবে নাকি সে?

মূর্তির মত দরজার সামনেই দাঁড়িয়েছিল আলিয়েভা। তার দিকে ফিরে আলেকজায়া বলল, খুব কষ্ট না?

আলেকজায়ার বাজখাই গলা আজ কেমন মসৃণ মনে হলো। বিস্মিত হল আলিয়েভা। এমন করে কথা বলতে পারে আলেকজায়া! বন্দীকে কষ্ট দিয়েই যার আনন্দ, কোন বন্দীর কষ্টের উপলব্ধি তার আসল কি করে?

বিস্মিত আলিয়েভা চকিতে আর একবার মুখ তুলল আলেকজায়ার দিকে। আলেকজায়া তার মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিল। চোখাচোখি হয়ে গেল। আলিয়েভা দেখল আলেকজায়ার ছোট চোখে কেমন একটা কুৎকুতে ঔজ্জ্বল্য। ঠোঁটের কোণায় কেমন একটা ধারাল অফোটা হাসি। আলিয়েভার চোখকে তার চোখ দিয়ে যেন অনেকটা আটকে রেখেই বলল, তুমি মস্কো বিশ্ব্যবিদ্যালয়ের সেরা ছাত্রী, তুমি সুন্দরী, তুমি একটা অনাঘ্রাতা ফুল। তোমার এ কষ্টতো সাজেনা আলিয়েভা।

আলেকজায়ার এই প্রশংসা এবং কথার ঢংগে চমকে উঠল আয়েশা আলিয়েভা। কি মতলব তার, কি বলতে চায় সে।

আলিয়েভাকে আর চিন্তার সুযোগ না দিয়ে আলেকজায়া বলল, তোমার সুদিন আসছে। পার্টির সর্বোচ্চ কর্তা ফার্স্ট সেক্রেটারী স্বয়ং তোমাকে স্মরণ করেছেন। তোমার শিক্ষা জীবনের রেকর্ড তাকে খুব খুশী করেছে, তোমার সুন্দর ফটো তাকে মোহিত করেছে। থামল আলেকজায়া। আলেকজায়ার কথা বুঝতে আর বাকী রইল না আলিয়েভার। দপ করে চারদিকের আলো যেন নিভে গেল আলিয়েভার কাছে। গোটা দেহটা তার অবশ হয়ে এল। চিন্তা শক্তি ভোতা হয়ে গেল তার। সামনে আলেকজায়ার অস্তিত্ব তার কাছে বড় বলে মনে হলো না। সে দাঁতে দাঁত চেপে টলতে টলতে গিয়ে বিছানায় বসল।

আলেকজায়ার মানচিত্রের মত মুখটা খুশীতে যেন আরও বিকৃত হয়ে উঠল। মনে হলো পরিস্থিতিটাকে সে উপভোগ করছে।

এই সময় ব্যাগ হাতে ঘরে প্রবেশ করল আলেকজায়ার সহকারিনী নভোস্কায়া। সে ব্যাগ খুলে আলিয়েভার বিছানায় নতুন পোশাক ও প্রসাধনী দ্রব্য সাজিয়ে রাখল। তারপর সে বেরিয়ে গেল।

আলেকজায়া কয়েক পা এগিয়ে আলিয়েভার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, মহামান্য ফার্স্ট সেক্রেটারী ভ্লাদিমির জিভকভ আজ রাতে তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন। এই বন্দী শিবিরের আর কারও এর আগে এ ভাগ্য হয়নি। তুমি ভাগ্যবান আলিয়েভা।

থামল আলেকজায়া। তারপর হাতের ব্যাগ থেকে একটা সিকুইরিটি কার্ড বের করে আলিয়েভার পাশে রেখে বলল, এ পাশ আজ রাতে তোমার সাথে থাকবে। এর ফলে আজ রাতে তুমি সিকুইরিটির কাছে সম্রাজ্ঞীর মর্যাদা পাবে। তারপর যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াল আলেকজায়া। অনুভুতিশুন্য অভিভুতের মত বসে ছিল আলিয়েভা।

আলেকজায়া দরজায় গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, বাথরুমে তোমার জন্য গরম পানি রাখা হয়েছে। সাবান আছে। গোসল করে রাত সাড়ে ৯ টার আগে তৈরী হয়ে নাও। আমি ঠিক সাড়ে ৯টায় আসব। এবার কথাগুলো আলেকজায়ার তীক্ষ্ম ছুরির মত ধারাল। বেরিয়ে গেল আলেকজায়া।

দরজা বন্ধ করে দেবার জন্যও উঠলোনা আলিয়েভা। চার দিকের সব কিছুই তার কাছে অর্থহীন মনে হয়েছে। যেন গোটা জগৎ একটা দ্বীপ। সে দ্বীপে সে একা অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে। অসহায়ত্বের এক অসহ্য যন্ত্রণা তার সত্তাজুড়ে।

আলেকজায়া বেরিয়ে যাবার পরপরই ঘরে প্রবেশ করল নাতালোভা। নাতালোভাকে দেখেই ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল আলিয়েভা। তারপর কান্নায় ভেঙে পড়ল। নাতালোভা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে অনেক আদর করল। সান্ত্বনা দিল। তারপর কপালে একটা চুমু দিয়ে বলল, মা কাঁদিসনা, এখন কাঁদার সময় নয়।

-না আমি কাঁদতে চাই, কাঁদতে কাঁদতে মরে যেতে চাই। আমি আর এক মুহূর্ত বাঁচতে চাই না।

-অবুঝ হোসনা। আমি থামের আড়ালে দাঁড়িয়েছিলাম। সব শুনেছি। সব শুনেই আমি বলছি তোকে বাচতে হবে।

-সব শুনে কেমন করে তুমি আমাকে বাঁচতে বলছ খালাম্মা?

-সব শুনেই আমি বলছি। আমিও প্রথমে চমকে উঠেছিলাম, মনটা আমারও বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পরে চিন্তা করে এর মাঝে জীবনের ইংগিত অবলোকন করছি।

-এ জীবন কি মারিয়া, নাদিয়ার জীবন খালাম্মা? এক মিনিট বাচবোনা আমি এ জীবন নিয়ে।

নাতালোভা আলিয়েভাকে এনে বিছানায় বসিয়ে তার চোখে চোখ রেখে বলল, আলিয়েভা তুই মারিয়া, নাদিয়া নস। তোর মধ্যে আল্লাহ বিশ্বাসের যে অজেয় আগুন জ্বলছে তা তাদের মধ্যে ছিল না।

আলিয়েভা নাতালোভার চোখে চোখ রেখেই বলল, তুমি কি বলতে চাও খালাম্মা?

-আমি বলত চাই এ বন্দী শিবির থেকে বেরোবার এক সুযোগ তুই পেয়েছিস। একে মুক্তির সুযোগ হিসেবে তোর ব্যাবহার করতে হবে।

-কেমন করে? চোখটা যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল আলিয়েভার।

-কেমন করে আমি জানিনা। তবে এটুকু জানি, তুই ফার্স্ট সেক্রেটারীর মেহমান, সিকিউরিটির লোকজন তোকে বিশেষ মর্যাদার চোখে দেখবে। এর সুযোগ গ্রহণ করে ফার্স্ট সেক্রেটারীর কাছে পৌছার আগেই যে কোন উপায়ে নিজেকে তোর মুক্ত করতে হবে।

চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আয়েশা আলিয়েভার। দুনিয়ার এ জাহান্নাম থেকে মুক্তির একটা পথ যেন খুঁজে পেল সে। যে দেহ মনকে এতক্ষন তার নিঃসাড়-নির্জীব মনে হচ্ছিল তাতে শক্তির প্রবাহ যেন ফিরে এল। নাতালোভার সেই কথা 'তুই মারিয়া, নাদিয়া নস, তোর মনে আল্লাহ বিশ্বাসের অজেয় শক্তি আছে।' আলিয়েভার মনে শক্তি-সাহসের এক দিগন্ত খুলে দিল। আলিয়েভা লজ্জা পেল মনে, আল্লার সাহায্য থেকে মুখ ফিরিয়ে তার এমন ভাবে হতাশ হওয়া ঠিক হয়নি। এমন দেখলে হাসান তারিক নিশ্চয় তাকে তিরস্কার করতো। হাসান তারিকের কথা মনে হতেই বাঁচার আকাঙ্খা তার মধ্যে আরও বাড়ল।

বিছানায় পড়ে থাকা কার্ডটা দেখছিল নাতালোভা। খুশিতে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বলল, তুই সত্যিই ভাগ্যবান আলিয়েভা, আল্লাহ তোকে সাহায্য করেছেন। এ সিকুইরিটি কার্ড সবার ভাগ্যে জোটেনা। তুই ওদের কাছ থেকে খসতে পারলে কার্ড তোকে অনেক সাহায্য করবে।

তারপর দু'জনে মিলে অনেক পরামর্শ করল। নাতালোভা জানেনা তার মেয়ে কোথায় থাকে। তবু মেয়ের জন্য একটা চিঠি লিখল এবং তার মেয়েকে

সন্ধান করার কয়েকটা ঠিকানা দিল। বন্দীদের যে জীবন বৃত্তান্ত তৈরী হয়েছে, তা কিভাবে মুক্ত বিশ্বে পাঠানো যাবে, তার নির্দেশনাও দান করল নাতালোভা।

বন্দী শিবিরের ঘড়িতে সাড়ে ৮টা বাজার শব্দ অনেকক্ষণ হল হয়েছে। নাতালোভা উঠে দাঁড়াল। আলিয়েভা তাকে জড়িয়ে ধরল। আবার কাঁদার পালা। আলিয়েভা বলল, খালাম্মা আর কোন দিন তোকে দেখতে পাবনা।

আলিয়েভার দুগন্ড বেয়ে নামছে অশ্রুর বাঁধ ভাংগা স্রোত। এবার নাতালোভার চোখও শুকনো থাকলোনা। তারও দুগাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল অশ্রু। নাতালোভা বলল, না দেখা হোক, প্রার্থনা করি তুই মুক্ত জীবন ফিরে পা। তোরা যদি এই কম্যুনিষ্ট ব্যবস্থাকে আঘাত দিতে পারিস, এই জুলুমবাজির বাহুটা যদি তোরা ভেংগে দিতে পারিস, রুশ অঞ্চলের অগনিত আদম সন্তানকে যদি তোরা কমুনিজমের অমানুষিক ব্যবস্থার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার জন্য কিছুও করতে পারিস, তাহলে যেখানে থাকি, যে অবস্থায় তাকি আমার আত্না শান্তি পাবে।

নাতালোভা আলিয়েভার কপালে একটা দীর্ঘ চুমু খেয়ে বেরিয়ে গেল। নাতালোভার কয়েকফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল আলিয়েভার কপালে।

কপাল থেকে অশ্রু মুছলনা আলিয়েভা। ঘরের চৌকাঠ ধরে আলিয়েভা নাতালোভা যে পথে চলে গেছে সেই অন্ধকারে তাকিয়ে রইল। অন্ধকারে তাকিয়ে মনে পড়ল রোকাইয়েভার কথা, আলুলিয়েভা, মারিয়া, নাদিয়া, তানিয়া অনেকের কথা। রেকাইয়েভার কথা মনে হতেই মনটা তার মোচড় দিয়ে উঠল। ওর সাথে যদি দেখো হতো।

দরজা বন্ধ করল আলিয়েভা। সেই সাথে ৯টা বাজার ঘন্টা ধ্বনি হলো মস্কোভা বন্ধী শিবিরের ঘড়িতে। সাড়ে ৯টার বেশী দেরী নেই। তৈরী হবার জন্য ফিরো দাঁড়াল আলিয়েভা।

ছয় দরজার একটা বড় কার। সামনে ড্রাইভার এবং তার পাশে একটা সিট। পিছনে ২টা করে ৪টা সিট। নীচের বারান্দায় গাড়ী দাড়িয়েছিল। আলিয়েভা পৌঁছতেই ড্রাইভার ত্রস্ত হাতে মাঝের দরজাটা খুলে ধরল। ড্রাইভার মাঝারি বয়সের। খাস রাশিয়ান। রাজধানীর সরকারী ড্রাইভার রাশিয়ান না হবার প্রশ্নই ওঠেনা।

গাড়ীতে পা দিয়েই বুঝল আলিয়েভা এয়ারকন্ডিশন গাড়ী। দামী ভেলভেট মোড়া আরামদায়ক গদী। গাড়ীতে উঠে বসে দেখল পাশেই আরেকটা মেয়ে। বাইরে আলো থাকলেও গাড়ীর ভেতর অন্ধকার। কালো রঙের শেড়ে ঢাকা কাঁচ। ভাবল, মেয়েটা তার মতই একজন কি?

আলিয়েভা উকি দিয়ে পিছন ফিরে দেখল পিছনের সিটে দু'জন বসে। যতটা বুঝা গেল দুজনই পুরুষ। নিশ্চয় সিকিউরিটির লোক। সামনের দুটি সিটই খালি। ড্রাইভার তখনো সিটে আসেনি। অল্পক্ষণ পরেই ড্রাইভারের দরজা খুলে গেল। সংগে সংগে ভেতরের লাইটটা জ্বলে উঠল। সেই আলোতে পাশের মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আঁৎকে উঠল আলিয়েভা। এযে রেকাইয়েভা। রোকাইয়েভাও চমকে উঠল আলিয়েভাকে দেখে। প্রথম চমকটা দূর হযে গেলে খুশী হলো আলিয়েভা। একজন সাথী পাওয়া গেল। আর রোকাইয়েভার চেয়ে যোগ্য সাথী কেউ আর হতে পারতোনা।

আলিয়েভা দু'টি হাত তুলে প্রার্থনা করল, হে আল্লাহ তুমি হাফেজ, ক্বাদের। ইহকাল এবং পরকালের তুমিই একমাত্র অভিভাবক। আমি তোমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি।

প্রার্থনা শেষ করে আলিয়েভা হাত বাড়িয়ে একটা হাত তুলে নিল রোকাইয়েভার। হাতটা মনে হল নিঃসাড়। আলিয়েভা বুঝতে পারল, বেচার রোকাইয়েভার অবস্থা। সান্ত্বনা দেবার জন্য হাতটা তুলে নিয়ে চুম্বন করল আলিয়েভা।

তারপর একটু এগিয়ে গেল রোকাইয়েভার দিকে। কিছু কথা রোকাইয়েভাকে বলা দরকার মনে করল আলিয়েভা। গাড়ী চলতে শুরু করায় হিস হিস শো শো শব্দ হচ্ছে। কানে কানে কথা বলা যায়, কেউ শুনতে পাবেনা।

আস্তে রোকাইয়েভার মাথা একটু টেনে নিয়ে আলিয়েভা ওর কানে মুখ লাগিয়ে বলল, ভেবনা রোকাইয়েভা, ওরা আমাদের লাশ নিয়ে যেতে পারে, জীবিত নয়। মস্কোতে পৌছার আগেই হয় পালাব, না হয় মরব-হয় শহীদ নয় গাজী। এর বাইরে কিছু নয় রোকাইয়েভা। প্রস্তুত থেকে, আমাকে অনুসরণ করো এবং সাধ্যে যা কুলায় তা করো।

আলিয়েভার কথা শেষ হতেই রোকাইয়েভা আলিয়েভার একটা হাত তুলে নিয়ে জোরে চাপ দিল। এর মধ্যে দিয়ে বোধ হয় রোকাইয়েভাও তার দৃঢ় সংকল্পের কথা জানিয়ে দিল আলিয়েভাকে। খুশী হল আলিয়েভা।

গাড়ী একটু ঝাঁকুনি খেয়ে দুরে উঠল। আলিয়েভা বুঝল দ্বীপ থেকে গাড়ী ফেরি বোটে উঠেছে। বোট থেকে গাড়ী সড়কে নামার পর তিন মাইল পেরুলেই মস্কো। সব মিলিয়ে সময় পনর মিনিটের বেশী লাগবেনা। যা করার এই পনর মিনিটের মধ্যেই তাকে করতে হবে।

আলিয়েভা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল, বড় কোন সিকিউরিটি ব্যবস্থা তাদের জন্য রাখা হয়নি। দু'জন সিকিউরিটির লোক, একজন ড্রাইভার। ড্রাইভারও যে সিকিউরিটির লোক আয়েশা আলিয়েভা তা প্রথমে দেখেই বুঝতে পেরেছে। ড্রাইভারের কোমরে ঝোলানো আছে পিস্তল। আর পিছনের সিটে দু'জন সিকিউরিটির হাতে স্টেনগান।

সিকিউরিটির এই হালকা ব্যবস্থা দেখে আলিয়েভার মনে হল, অসহায় মহিলা বন্দীদের আনা-নেয়ায় তারা কোন দিনই প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়নি, অনেক দেখার পর এ রকমটা যে হতে পারে তারা বোধ হয় এমনটা এখন কল্পনাও করেনা। তাদের যে এই শিথিল চিন্তাকে আলিভেয়া তার পরিকল্পনার জন্য একটা বড় শুভ দিক বলে মনে করল।

আরেকটা স্থির বিশ্বাস আলিয়েভার আছে। সেটা হলো, তারা যেহেতু খোদ পার্টি কর্তাদের শিকার তাই সিকিউরিটির লোকেরা যতটা সম্ভব তাদের গুলি করবেনা, হত্যা করতে সাহস পাবেনা। একটা তাদের জন্য একটা বাড়তি সুযোগ। সে আরেকবার আল্লার কাছে প্রার্থনা করল, হে আল্লাহ! এ সুযোগ সদ্ব্যবহারের তৌফিক দান করুন।

কি করলে কি ঘটতে পারে সবগুলো বিষয় আয়েশা আলিয়েভা এক এক করে বিশ্লেষণ করল। তার আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হলো, উপরোক্ত সুযোগ-সুবিধা থাকার কারণে পরিস্থিতি তার অনুকুলেই থাকবে। আজ প্রথম বারে আয়েশা আলিয়েভা তার গোয়েন্দা ট্রেনিংকে মূল্যবান মনে করল। ট্রেনিং গ্রহণকালে ভালো অস্ত্র

চালনার জন্য বিশেষ অনার পেয়েছিল সে। আজ একে আল্লার মুর্তিমান রহমত বলেই তার মনে হতে লাগল।

গাড়ী ফেরী বোট থেকে নামল। শক্ত মাটির উপরে মৃদু কাঁপুনি তুলে যাত্রা শুরু করল গাড়ী।

মস্কোভো নদীর তীর ধরে গাড়ি এগিয়ে যাবে মস্কো পর্যন্ত। এখান থেকে মস্কো পর্যন্ত জায়গাটা অপেক্ষাকৃত নীচু একটা বিশাল উপত্যাকা। এখানে কোন সিভিলিয়ান বসতি নেই। বলা হয় এ এলাকায় কয়েকটা আন্ডার গ্রাউন্ড ক্ষেপনাস্ত্র সাইলো রয়েছে।

গাড়ী ফুল স্পীডে চলতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই মাইল খানেক চলে এসেছে গাড়ী। আর দেরী নয়, সিদ্ধান্ত নিল আলিয়েভা। হঠাৎ কয়েকবার ওয়াক ওয়াক করে উঠল। যেন প্রবল বমনের বেগ এসেছে তার।

-বমন করব, গাড়ী থামাও।

তার কথা শুনে মনে হল মুখ ভর্তি তার বমন।

মুখ বন্ধ করে ওয়াক ওয়াক সে করেই চলল। মনে হচ্ছে সে জোর করে বমন চেপে রেখেছে। তার দুই চোখ বিস্ফোরিত। পাশে কিংকর্তব্যবিমুঢ় রোকাইয়েভা।

ড্রাইভার কেবিন লাইট জ্বেলে দিয়েছে গাড়ির। সে আলিয়েভার অবস্থা দেখে বুঝল, হঠাৎ গাড়ীর গতিতে তার বমনের বেগ হয়েছে। গাড়ী থামাল সে। সে তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে বেরিয়ে আলিয়েভার দরজা খুলে দরজার পাল্লা ধরেই দাড়িয়ে থাকল।

আলিয়েভা বাম হাতে মুখ চেপে গাড়ি থেকে বেরুল। গাড়ীর দরজা ধরে দাড়িয়ে থাকা ড্রাইভারের পাশ দিয়ে যাবার সময় আলিয়েভা বিদ্যুৎ গতিতে তার কোমরের খাপ থেকে পিস্তল তুলে নিল এবং তুলে নিয়েই গুলি করল তার বুকে। কিছু বোঝার আগেই ড্রাইভার ঢলে পড়ল মাটিতে।

ওদিকে পেছনের দরজা খুলে একজন সিকিউরিটি সবে মাটিতে পা রেখেছে, স্টেনগান তখনও তার কোলে। আলিয়েভার পিস্তল এবার তাকে লক্ষ্য করে গুলি বর্ষন করল। লোকটি উঠতে যাচিছল। উঠা আর হলোনা, দরজার উপরেই সে ঢলে পড়ল। মুহূর্তও বিলম্ব না করে আলিয়েভা গাড়ীর পেছনের

দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। দেখল, ওদিকের দরজা খুলে বেরিয়ে যাচ্ছে ওপাশের সেই সিকিউরিটি। আলিয়েভার উদ্যত পিস্তল আবার গুলি বর্ষণ করল। লোকটির মাথায় গিয়ে আঘাত করল বুলেট। দরজার উপরেই লোকটি ঢলে পড়ল।

রোকাইয়েভা ততক্ষণে বেরিয়ে এসেছে। উদ্বেগ-উত্তেজনায় কাঁপছে সে। আলিয়েভা গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল। বলল, 'আল্লাহ আমাদের বাঁচিয়েছে রোকাইয়েভা। আয় আলস্নাহর শুকরিয়া আদায় করি।

বলে আয়েশা আলিয়েভা ঐখানেই সিজদায় পড়ে গেল। তার সাথে রোকাইয়েভাও।

সিজদা থেকে মাতা তুলেই আলিয়েভা বলল, চল এখানে আর এক মুহূর্ত নয়। সন্ধানী দল কিছুক্ষণের মধ্যেই ছুটে আসবে।

আয়েশা আলিয়েভা ঠিক করল, এই বিরান উপত্যকা ধরেই তাদেরকে পশ্চিমে এগুতে হবে। মানচিত্র তার যতদূর মনে পড়ে এখান থেকে মাইল চারেক পশ্চিমে গেলেই মস্কো লেলিনগ্রাদ রোডে তারা উঠতে পারবে। রাতেই তাদেরকে মস্কো শহরে পৌছতে হবে। আলিয়েভা এবং রোকাইয়েভা দু'জনেই মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। মস্কো শহর তাদের পরিচিত। নাতালোভার দেয়া ঠিকানা তাদের কাছে আছে। কোথাও প্রাথমিক একটা আশ্রয় তাদের মিলবেই।

যাবার আগে আলিয়েভা সিকিউরিটি দু'জনের পিস্তলও নিয়ে নিল। তারপর তাদের পকেট হাতড়িয়ে তিনজনের মানিব্যাগ বের করে তার থেকে টাকাগুলোও নিয়ে নিল। তিনজনের মিলিয়ে প্রায় কয়েক হাজার রুবল হবে। খুশী হলো আলিয়েভা।

তারপর আলিয়েভা রোকাইয়েভার হাত ধরে পশ্চিম দিকে ছুটলো।

# ৫

মস্কোতে ফিরে আসার পর ফাতেমা ফারহানা লাইব্রেরীতে আগের চেয়ে নিয়মিত। প্রতিদিন উন্মুখ হয়ে লাইব্রেরীতে যায়, তারপর সুযোগ বুঝে সন্তর্পনে গিয়ে ঐ বইটি খোলে। না, সাইক্লোষ্টাইল করা 'তুর্কিস্তান' নামের সেই পত্রিকা আগের মত আর পায়না। বইটি খুললেই তার শূন্য বুক ফাতিমা ফারহানার হৃদয়কে নিদারুন ধাক্কা দেয়।

ফাতিমা ফারহানা অস্থির হয়ে পড়ল। কেন এমন হচ্ছে? পত্রিকা কি বন্ধ হয়ে গেছে? কিংবা পত্রিকাটি তারা পৌছাতে পারছে না! না এখানকার নেট ওয়ার্ক তাদের ভেঙে গেছে? তার ছুটিতে থাকাকালে কি কোন অঘটন ঘটে গেছে এখানে?

ইত্যাকার চিন্তা ফাতেমা ফারহানাকে যেন পাগল করে তুলল। যেন সে গোটা জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। মনে হচ্ছে সে এক দ্বীপে দাঁড়িয়ে, আর সবাই তাকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে। আবেগে ক্ষোভে উপায়হীনতায় টস টস করে তার চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়ে। তার বড় আশা ছিল, ঐ 'তুর্কিস্তান' এর মাধ্যমে সে আহমদ মুসার খবর পাবে, তার নির্দেশও সে পাবে এই পথে। উনি সেদিন বলেছিলেন, যথাসময়ে নির্দেশ তিনি পৌছাবেন। কিন্তু কিভাবে? পথই যে তার সামনে বন্ধ হয়ে গেল।

অনেক সময় সে ভাবে, তার কি দোষ হয়েছে? সেদিনের অন্ধকার রাতের কথা মনে পড়ে ফাতিমা ফারহানার। সেদিন অহেতুক কোন প্রশ্ন করে কি তাকে বিরক্ত করেছে ফারহানা? বিশ্ব বিপ্লবের সিপাহসালার তিনি। তার মত ছোট মানবী তার কাছে কিছুই নয়। তার কোন দুর্বলতায় কি সেদিন তিনি রাগ করেছেন? বিদায়ের সময় নিজের অপ্রতিরোধ্য কান্নার কথা মনে পড়ল ফাতিমা ফারহানার। আমি তো কাঁদতে চাইনি। কান্না এল কেন? আমি তো ওঁকে চিনতাম না, কিন্তু মনে হলো কেন সেদিন ও আমার সব! ও চলে যাবার সময় কেন হৃদয়ের সব গ্রন্থিতে

অমন করে টান পড়ল আমার। ছিড়ে গেল কেন সব গ্রন্থি? ওগুলো তো সেদিন কান্না ছিল না, সেই রক্তাক্ত হৃদয়েরই অশ্রু ছিল ওসব।

পড়াশুনায় মন বসে না ফাতিমা ফারহানার। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশে যায়, লাইব্রেরীতে যায়, নিজের রুমে টেবিলে পড়তে বসে, কিন্তু পড়ায় মন বসাতে পারেনা।

কত চিন্তা তার মনে? আহমদ মুসা এসেছে, কাজতো এখন বাড়ার কথা, কাজ বন্ধ হলো কেন? কোন বড় অঘটন কিছু ঘটে যায়নি তো? আহমদ মুসা কোথায় কেমন আছে? সেদিন আহত অবস্থায় জ্বর নিয়ে তিনি চলে গেলেন। কিছু হয়নি তো তার? এমনটা ভাবতেই তার মন কেঁপে ওঠে। এখানে নিজের স্বার্থ চিন্তার চেয়ে জাতির স্বার্থ চিন্তাই তার কাছে বড় হয়ে ওঠে। মধ্য এশিয়ার হতভাগ্য মুসলমানদের জন্য আজ তার বড় প্রয়োজন। যুগ যুগান্তের অত্যাচারে সংগ্রামী এই জাতির ঐতিহ্যবাহী প্রতিরোধ কাঠামোর মেরুদন্ড ভেংগে গুঁড়ো হয়ে গেছে। লাখ লাখ সংগ্রামী যুবক কম্যুনিষ্ট বাহিনীর হাতে জীবন দিয়েছে। লাখো মা বোনের ইজ্জত লুণ্ঠিত হয়েছে। তুর্কিস্তান থেকে চালান দেয়া কত লাখ তুর্কি মুসলিম যুবক যে সাইবেরিয়ার সাদা বরফের তলে ঘুমিয়ে আছে, এ হিসাব কোন দিনই মিলবেনা। বিপর্যয়ের এ গোরস্তান থেকে আজ সংগ্রামের নতুন জেনারেশন মাথা তুলেছে। জেঁকে বসা কম্যুনিষ্ট ব্যবস্থা ভাষা পাল্টিয়ে, ইতিহাস পাল্টিয়ে, ধর্মশিক্ষা বন্ধ করে, চাকুরী, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও ভোগবাদী জীবনের মায়াজালে আটকিয়ে মুসলমানদের হজম করে ফেলেছে ভেবেছিল। কিন্তু তাদের আশা মিথ্যা হয়েছে। গোটা মধ্য এশিয়ার মুসলমানরা মুক্তির আশায়, মুক্ত বাতাসে স্বাধীনভাবে নিঃশ্বাস নেবার জন্য আজ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। সংগ্রামী কাফেলার যাত্রা শুরু হয়েছে। আজ তার নেতৃত্ব প্রয়োজন। ফিলিস্তিন বিজয়ী, মিন্দানাও বিজয়ী আহমদ মুসাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এদের নেতৃত্বের জন্য পাঠিয়েছেন। তিনি ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

সেদিন ফাতিমা ফারহানা লাইব্রেরীতে যাবার জন্য হল থেকে বেরিয়েছে। যাচ্ছিল সহপাঠিনী বান্ধবী কিরঘিজিস্তানের মেয়ে সুমাইয়া সুলতানাভার রুমের পাশ দিয়ে।

একটা ঢু মেরে যাবে মনে করে ঢুকে পড়ল তার রুমে। দেখল সেখানে সুমাইয়া ছাড়াও রয়েছে সুফিয়া সভেৎলানা, খোদেজায়েভা, কুলসুম ত্রিফোনভা, রইছা নভোস্কায়া এবং তাহেরভা তাতিয়ানা। এদের মধ্যে খোদেজায়েভা, তাহেরভা তাতিয়ানা উপরের ক্লাসে পড়ে। সুফিয়া সভেৎলানা নীচের ক্লাসে, আর কুলসুম ও রইছা তার সাথে পড়ে। কুলসুম তাতার মেয়ে। তাজিক মেয়ে সুফিয়া। তাহেরভার বাড়ী হলো কাজাকিস্তানে। আর বাকি খোদেজায়েভা এবং রইছা উজবেক। এরা সবাই আঞ্চলিক পার্টির বড় বড় কর্মকর্তার মেয়ে। বিলাসী জীবন এদের। সবার সাথেই ফারহানা পরিচিত।

সবাইকে এখানে একসাথে দেখে ফাতিমা ফারহানা বিস্মিত হলো, কিন্তু তার চেয়ে বেশী হলো অপ্রস্তুত। ওরা আলাপ করছিল। ফারহানার আগমনে ওদের আলাপটা হঠাৎ থেমে গেল। ওদের মুখ চোখ দেখে নিজেকে বড় অনাহূত মনে হলো তার।

তবু মুখে হাসি টেনে ফারহানা বলল, এদিক দিয়ে লাইব্রেরীতে যাচ্ছিলাম তাই একবার এলাম। চলি, তোদের ডিসটার্ব করবোনা। বলে রুম থেকে বেরুবার জন্য উদ্যত হলো ফারহানা। সুমাইয়া হেসে হাত তুলে বলল, দাঁড়া, দাঁড়া, আমরা কম পড়ি বলে কি আমাদের সাথে বসতে তোর আপত্তি?

-কোন আপত্তি নেই। কম পড়ার কথা বলছিস কেন? কম পড়েই বুঝি তোরা তোদের ডিষ্টিংশন গুলো পেয়েছিস? কৃত্রিম গাম্ভীর্য টেনে বলল ফারহানা।

-তর্ক রেখে বস না। বলল সুমাইয়া।

-না, বসবনা এখন। সবাইকে এক সংগে পেয়ে কথা বলতে লোভ হচ্ছে, কিন্তু লাইব্রেরীতে যাওয়া দরকার।

বলে সবার কাছে বিদায় নিয়ে ফারহানা বেরিয়ে এল রুম থেকে। চলল লাইব্রেরীর দিকে। কিন্তু রুমে ঢোকার সময় যে বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা তাকে পেয়েছিল তা দূর করতে পারলোনা। সে যখন ঘরে ঢুকছিল, 'আহমদ মুসা' শব্দটা তখন তার কানে আসে। এ নাম এখানে কেন? ওরা কি আলোচনা করছিল? অমনভাবে ওরা থেমে গেল কেন? ওরা কি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ফ্র' এর এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে? এটা হওয়া স্বাভাবিক। ওরা সকলেই সরকারী সুবিধাভোগীদের সন্তান। ফারহার

দুঃখ হলো মুসলিম নামের এ মেয়েদের জন্য। আবার ভেবে খুশী হলো, এদের থেকে সাবধান থাকা যাবে।

লাইব্রেরীতে এসে বসল ফারহানা। বই এবং নোটখাতা নিয়ে বসে থাকল কিছুক্ষণ। না, মন বসছেনা। কিছুক্ষণ বসে এদিক-ওদিক চেয়ে শেষ পর্যন্ত সে উঠে গেল এ বইটির কাছে। ভিতরের একটি সেলফে বিশ্ব-ভূগোলের উপর একটা পুরোনো বই। এর বহু নতুন এডিশন হয়েছে, এ পুরোনো এডিশন আর পড়েনা কেউ।

অনেকটা হতাশ ভাবেই বইটা সেলফ থেকে নামাল। বইটা খুলল সে। খুলেই চোখ দু'টি তার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'তুর্কিস্তান' নেই বটে কিন্তু একটা চিরকুট। তাতে লেখা, 'তুর্কিস্তানের বার্ষিক চাঁদা একহাজার রুবল।'

লেখাটা কয়েকবার পড়ল ফারহানা। হারিয়ে যাওয়া কিছু পাওয়ার মত আনন্দে মুখটা তার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কোটের পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে দেখল। হ্যাঁ টাকা আছে। সে এক হাজার রুবলের একটা নোট বইয়ের ঐ পাতাতেই রেখে দিল। বইটা যথাস্থানে রেখে চলে এল ফারহানা। খুশিমনে অনেকক্ষণ ধরে পড়ল, নোট করল ফারহানা। ফারহানা উঠতে যাবে এমন সময় তার সহপাঠি ইউরি অরলভ ধীরে ধীরে এল। বলল, তোমার পাশে কি বসতে পারি?

-হাঁ। সম্মতি দিল ফারহানা। যদিও মনে মনে বিরক্ত হল ভীষণ। ওর শরীর থেকে মদের গন্ধ আসছিল। অরলভ বসল। বসে চেয়ারটায় একটু হেলান দিয়ে বলল, আচ্ছা কম্যুনিটি হলে তোমাকে আজ-কাল দেখছিনা কেন?

-আমি কোন সময়ই তো নাচের আসরে যাইনি অরলভ।

-ঠিক, কিন্তু যাওনা কেন?

-এটা পড়াশুনার সময়, পড়াশুনা করে আমি সময় পাইনা। হো হো করে হাসল অরলভ। বলল, হাসালে খুব। বিনোদনের একটা সময় আছে না! তখন বুঝি কেউ পড়ে?

-বিনোদনের সংজ্ঞা বিভিন্ন জনের কাছে বিভিন্ন রকম।

-যেমন?

-যেমন আমি পড়ায় আনন্দ পাই, কেউ নাচে আনন্দ পায়।

-বিনোদনের একটা কম্যুনিষ্ট সংজ্ঞা আছে, জানত?

-জানি।

-মানোনা?

-সংজ্ঞাকে তো আইনে পরিণত করা হয়নি।

আবার হাসল ইউরি অরলভ। বলল, হাঁ ফাঁক একটা আছে। একটু থামল অরলভ। তারপর বলল, তোমাদের কি একটা ইথিকস ছিল, এমন নাচ-গান নাকি সেখানে অবৈধ। এ সন্মন্ধে তোমার মত কি?

ভেতরে ভেতরে ঘেমে উঠেছিল ফাতিমা ফারহানা। কম্যুনিষ্ট যুব সংগঠন ‘কমসমল’ এর সদস্য এই ইউরি অরলভ সে জানে। এরা বিশ্ব কম্যুনিষ্ট সংস্থা ‘ফ্র’ -এর এজেন্ট। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের পাহারা দেয়া এবং রিপোর্ট করাই এদের কাজ। বন্ধু সেজে গল্প-গুজবের মাধ্যমে এরা কথা জেনে নেয়, তারপর রিপোর্ট করে। ছাত্ররা এদেরকে পুলিশের চেয়েও বেশী ভয় করে। কারণ, পুলিশকে চেনা যায়, এদের চেনা যায় না।

-ওটাও একটা মূল্যবোধ।

-আমি জানতে চাচ্ছি তোমার মত।

-যা চালু নেই, যাকে মৃত ঘোষণা করা হয়েছে, তা নিয়ে আলোচনায় সময় নষ্ট না করে জীবিত বিষয় নিয়েই আমাদের আলোচনা করা উচিত।

-ঠিক আছে। বলল অরলভ।

তারপর একটু থেমে আবার বলল, আচ্ছা বলত ফারহানা, তোমাদের দক্ষিণাঞ্চলে নাকি বাতাস গরম?

-বুঝলাম না।

-বলছি, সে অঞ্চলে অসন্তোষ, বিক্ষোভ, বিদ্রোহ নাকি দ্রুত ছড়াচ্ছে?

মনে মনে ভীষণ চমকে উঠল ফারহানা। এসব প্রশ্ন কেন করা হচ্ছে তাকে, সে জানে। সে উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল, এসব খবর কি ঠিক? তুমি পেলে কোথায় এমন সব উদ্বেগজনক কথা?

অরলভ কোন উত্তর দিলনা। প্রসংগ পাল্টিয়ে বলল, সেখানে অসন্তোষের কি কোন কারণ আছে ফারহানা?

ফারহানার জন্য এটা একটা কঠিন প্রশ্ন। মিথ্যা না বলে কেমন করে এর উত্তর দেয়া যায়? কিন্তু কেমন করে মিথ্যা বলবে সে? দিনের আলোর মত যা সত্য তাকে মিথ্যার আবরণে সে চাপা দেবে কেমন করে? আহমদ মুসার মত জাতিগতপ্রাণ নেতারা হলে এখানে কি করতেন? ওরা তো মিথ্যা বলে নিজেদের রক্ষা করেন না। সে এ পরীক্ষায় কি করবে? মন বলছে, এসময় নিজেকে প্রকাশ করাও তার ঠিক হবে না।

ভ্রু কুঁচকে চিন্তা করার ভান করছিল ফারহানা। তারপর চেয়ারে একটু গা এলিয়ে বলল, এ ব্যাপারে তোমার চেয়ে বেশী কিছু আমি জানিনা।

এমন উত্তর দিতে পেরে খুশী হলো ফারহানা। মিথ্যা বলতে হয়নি।

-জানা দরকার ফারহানা। নিজেদের অঞ্চল সম্পর্কে জানবেনা?

-আমার পনর আনা সময় আমি লেখাপড়া নিয়ে মস্কোতেই থাকি।

আর কোন কথা বলল না অরলভ। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, দুঃখিত, তোমার পড়ার অনেক ক্ষতি করলাম।

অরলভ চলে গেল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল ফারহানা। একটু নড়েচড়ে বসল সে। তারপর হিসেব কষে দেখল ঠিকঠিক রিপোর্ট করার মত কিছু নিয়ে যেতে পেরেছে কি না। হিসেব কষে সে খুশীই হল,কিন্তু উদ্বিগ্ন হল এই ভেবে যে, এমন প্রশ্ন আর কোন সময় এদের তরফ থেকে আসেনি। ওরা কি তাহলে সব মুসলিম ছাত্রকেই আজ সন্দেহ করছে? তাই কি এমন ভাবে বাজিয়ে দেখছে তাদের? হাসিও পেল ফারহানার। এসব প্রশ্ন করে ওরা তাদের দুর্বলতাকেই প্রকাশ করছে। মুসলিম ছাত্ররা এতে উৎসাহিত হবে বেশি।

বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে ফারহানা একটু মার্কেটিংয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে সন্ধ্যা ৬টার দিকে ফিরল রুমে। কাপড়-চোপড় ছাড়ার পর অভ্যাস অনুযায়ী দরজার ভেতরের অংশে লেটার বক্স পরীক্ষা করল ফারহানা। ভাঁজ করা বড় একটা কাগজ পেয়ে তাড়াতাড়ি মেলে ধরল। বিস্ময় ভরা চোখে দেখল তার 'তুর্কিস্তান'। ফুল স্কেপ সাইজের চার পৃষ্ঠার কাগজ।

ভেবে পেল না সে, পত্রিকাটি এখানে এত তাড়াতাড়ি এল কি করে? চাঁদা পরিশোধের পর তিন ঘন্টাও যায়নি। এর মধ্যে চাঁদা পরিশোধের কথা জানল কি করে? তার হলের রুম নাম্বারই বা তাদের দিল কে? সে ভাবল, অত্যন্ত শক্তিশালী নেট ওয়ার্কেই মাধ্যমেই শুধু এটা সম্ভব।

আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল ফারহানা। তারপর দরজাটা ভাল করে বন্ধ করে সে পত্রিকা নিয়ে বসল টেবিলে।

কয়েক দিন পর-

ক্লাসের অবসরে বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ পাশে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগানে এক কোণায় বসেছিল ফারহানা। একাই এক বেঞ্চে বসে ছিল। সামনে আরও একটা বেঞ্চ। প্রায়ই সে এখানে বসে। অনেকেই থাকে। কিন্তু আজ কেউ গেছে টিভির নতুন সিনেমা দেখতে, কেউ গেছে স্পোর্টস কমপ্লেক্সে ব্যালে প্রতিযোগিতা দেখতে। পিছন থেকে সুমাইয়া, খাদিজায়েভা, তাতিয়ানা এবং রইছা চুপি চুপি ফারহানার দিকে আসছিল।

ফারহানা আসলেই চোখ বুজে বিশ্রাম নিচ্ছিল। একেবারে পিছনে এসে ঘাড়ে একটা চিমটি কেটে রইছা বলল, লক্ষণ তো ভাল নয় ফারহানা?

ফারহানা চমকে পিছন ফিরে তাকিয়ে ওদের দেখতে পেল। ওদের সাথে সাথে হেসে উঠল ফারহানাও। সে সংগে ওদেরকে একসাথে দেখে ফারহানার সেদিনকার কথা মনে পড়ল। অস্বস্তির একটা কাল মেঘও তার মনে ঘনীভূত হল। সামনে ফারহানার এক পাশে রইছা ও অন্য পাশে সুমাইয়া বসল। সামনের বেঞ্চিতে বসল খাদিজায়েভা এবং তাহেরভা তাতিয়ানা।

প্রথম কথা বলল রইছা। বলল, কখন মানুষ একা থাকতে ভালোবাসে ফারহানা।

-জানি না। বলল, ফারহানা।

-আমি জানি। বলল রইছা।

-কখন?

-যখন মানুষ প্রেমে পড়ে।

ফারহানার মুখ হঠাৎ লাল হয়ে উঠল। খাদিজায়েভা রইছাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, সময় নষ্ট করোনা রইছা। অনেক কথা আছে। তারপর গম্ভীর ভাবে বলল, তুমি কেমন আছ।

-ভাল।

-'তুর্কিস্তান' তুমি পাচ্ছ।

চমকে উঠল ফারহানা। চমকে উঠে তাকাল খাদিজায়েভার দিকে। ভয়মিশ্রিত বিমূঢ়তা এসেছে ফারহানার মধ্যে। সেদিনের সে আশংকার কথা তার মনে হল। সরকারের লোক সে মনে করেছিল এদেরকে। তার উপর সেদিন অরলভের জিজ্ঞাসাবাদ। সব মিলিয়ে নিদারুণ একটা উদ্বেগের ভাব ফুটে উঠল ফারহানা চোখে মুখে।

খাদিজায়েভা সেটা বুঝতে পারল। সে হেসে বলল, 'তুর্কিস্তান' আমরাও পাই। ভয় করোনা। আমরা সবাই একদল।

এতক্ষণে খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ফারহানার মুখ। সে খুশীতে উঠে দাঁড়িয়ে কোলাকুলি করল সবার সাথে। তারপর সে প্রশ্ন করল, সুফিয়া, সভেৎলানা এবং কুলসুম ত্রিফোনোভাও?

-তারাও আমাদের সাথে। শুধু তারা নয়, এখানকার মুসলিম ছাত্র ছাত্রীদের আঙ্গুলে গোনা কিছু ছাড়া সবাই আমরা এক সাথে। বলল খাদিজায়েভা।

ফারহানা হেসে বলল, সেদিন সুমাইয়ার রুমে তোমাদের দেখে আমি তোমাদেরকে কম্যুনিষ্টদের চর মনে করেছিলাম।

-কেন?

-আমার মনে হয়েছিল তোমরা কোন গোপন শলা-পরামর্শ করছিলে, তাছাড়া তোমাদের মুখে একটা নাম শুনেছিলাম আমি। আরেকটা কারণ ছিল, সবাই তোমরা বড় বড় পার্টি ও সরকারী কর্মকর্তার সন্তান।

খাদিজায়েভা প্রশ্ন করল, কোন নাম শুনেছিলে আমাদের মুখে?

-আহমদ মুসা।

সুমাইয়া কিছু বলতে যাচ্ছিল। তাহেরভা তাতিয়ানা তাকে বাধা দিয়ে ফারহানাকে জিজ্ঞাসা করল, বড় বড় পার্টি ও সরকারী কর্মকর্তাদের সন্তান হওয়ায় আমাদের উপর তোমার সন্দেহ হলো কেন?

-তোমরা সুবিধাভোগীর দল। তোমরা সরকারকে সহযোগিতা করবে এটাই স্বাভাবিক।

তাহলে তুমি আসল অবস্থা জান না ফারহানা, বলল তাহেরভা তাতিয়ানা, তুমি যে সুবিধাভোগীদের কথা বলছ তাদের ছেলেমেয়েরাই সবচেয়ে বেশি এগিয়ে আসছে এ আন্দোলনে। কারণ, কম্যুনিস্ট সরকারের পলিসি প্রোগ্রাম এবং তাদের সব কীর্তিকথা তাদের কাছে পরিষ্কার থাকায় তাদেরকে বোঝানো সহজ হচ্ছে। অবশ্য জীবন দেয়ার মত ঝুকিপুর্ণ কাজে শ্রমিক কৃষক এবং গ্রামাঞ্চলের কর্মীরাই এগিয়ে আসছে বেশী। থামল তাহেরভা তাতিয়ানা।

এবার কথা বলল সুমাইয়া। বলল, তুই আহমদ মুসাকে জানিস ফারহানা?

-জানি! মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল ফারহানার।

প্রায় সমস্বরেই সকলে বলে উঠল, কি জান? কেমন করে জান?

-সে এক কাহিনী।

-কি সে কাহিনী? বলল রাইছা।

সকলের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ঘিরে ধরল ফারহানাকে। ফারহানা ধীরে ধীরে গোটা কাহিনীটা বলল। শুধু বিদায় দেয়ার মুহুর্তের কথা ছাড়া। কাহিনী শেষ হলো, কিন্তু কেউ সহসা কথা বলতে পারলো না। কথা বলল প্রথমে খাদিজায়েভা। বলল, আল্লাহ্ চাইলে এইভাবেই মানুষকে বাঁচান। আমার মনে হচ্ছে ফারহানা, আল্লাহ্ তাকে হাত ধরে এনেছেন এদেশে আমাদের মধ্যে। আল্লাহ্ আমাদের আন্দোলনকে কবুল করেছেন। তা না হলে তাকে এমন এক অকল্পনীয় পথে আমাদের মধ্যে এনে দেবেন কেন?

-অন্য কোথাও, অন্য কোন মানুষের ব্যাপারে হলে এ গল্প আমি বিশ্বাসই করতাম না। সত্য ঘটনার এ এক অপরূপ রূপকথা। বলল সুমাইয়া।

-কিন্তু এ রূপকথার শুধু নায়ক আছে, নায়িকা নেই। বলল রইছা। তার চোখে একটা দুষ্টুমী।

-নায়িকা আছে। সুমাইয়া জবাব দিল।

তারপর একটু মুখ টিপে হেসে ফারহানার হাত দুটি ধরে ঝাকুনি দিয়ে বলল, নেই ফারহানা?

রইছা কিছু বলার জন্য মুখ খুলছিল। তাকে বাধা দিয়ে খাদিজায়েভা বলল, এ সব কথা তোমরা থামাও।

বিব্রত ফারহানা রক্ষা পেল। কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে তাকাল সে খাদিজায়েভার দিকে। আহমদ মুসাকে সে এসব আলোচনার অনেক উর্ধে মনে করে। তার মর্যাদা সম্পর্কে সে সচেতন। আর আশা নিরাশায় ক্ষত বিক্ষত ফারহানা তার হৃদয়ের এই স্পর্শকাতর এলাকায় একাই থাকতে চায়, কাউকে নাক গলাতে দিতে চায় না।

খাদিজায়েভা আবার মুখ খুলল। বলল, আসল কথায় আসি ফারহানা। আহমদ মুসা মধ্য এশিয়ার মুসলিম মুক্তি আন্দোলন সাইমুমের নেতৃত্ব গ্রহণের পর তার প্রথম সার্কুলার আমরা পেয়েছি। তাতে তিনি তোমার সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন, তুমি কেমন আছ, কোথায় আছ। আর মস্কোর সাইমুম ইউনিটের ছাত্রী শাখায় তোমাকে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

-তিনি জানতে চেয়েছেন আমার কথা? কথাগুলোর সাথে বন্ধ একটা আবেগ যেন বুক ফেড়ে বেরিয়ে এলো ফারহানার। বলেই কিন্তু লজ্জায় লাল হয়ে গেল সে।

রইছা কথাটা লুফে নিয়ে মুখ টিপে হেসে বলল, খুশি হয়েছিস ফারহানা?

ফারহানা নিজেকে সামলে নিয়ে গম্ভীর হলো। বলল, তার মত বিশ্ব বিপ্লবের একজন সিপাহসালারের কথায় তুই খুশী হতিস কিনা?

-অবশ্যই খুশী হতাম। তুই খুশী কিনা?

বিব্রত ফারহানাকে বাঁচিয়ে খাদিজায়েভাই আবার কথা বলে উঠল। বলল, আমাদের সংগঠনের নিয়ম অনুসারে আমরা পরোক্ষ কোন পথে একজনের কাছে ‘তুর্কিস্তান’ পৌছাই। তারপর দেখি সে নিয়মিত তা পড়ছে কিনা এবং গোপনীয়তা রক্ষা করছে কিনা। অতঃপর তুর্কিস্তান বন্ধ করে দিয়ে আমরা তার আবেগ, আন্তরিকতা, স্বভাব-চরিত্র, ইসলামী অনুশাসনের প্রতি আনুগত্য, ইত্যাদি পরীক্ষা করি। এরপর তার সাধ্য বিচার করে তার কাছ থেকে তুর্কিস্তানের জন্য টাকা চাওয়া হয়। সে যদি এ কোরবানী স্বীকার করে, তাহলে আমরা বুঝতে পারি সে

প্রত্যক্ষ যোগাযোগের পর্যায়ে এসেছে। তুমি এ পর্যায়গুলো পার হয়েছ ফারহানা। তার উপর নেতার তরফ থেকে এই সার্কুলার। আমরা তোমাকে সংগঠনের সদস্য করে নিয়েছি।

ফারহানা ঝুঁকে পড়ে খাদিজায়েভার হাত তুলে নিয়ে চুমু খেয়ে নিরব আনুগত্য জ্ঞাপন করল। খাদিজায়েভা সহ সবাই চুমু খেল ফারহানাকে।

রইছা বলল, আমার খুব ভাল লাগছে ফারহানা। তুই আমাদের নেতাকে দেখেছিস, তার সাথে কথা বলেছিস। ইয়ার্কি নয়, তোর মধ্য দিয়ে তাকে আমাদের খুব নিকটে মনে হচ্ছে। রইছার চোখ দু'টি বোজা, একটা আবেগ তার কথায়।

ফারহানার মুখ নিচু। তাহেরভা তাতিয়ানা বলল, ঠিক বলেছ রইছা। এটা আমাদেরকে কাজে উৎসাহ দেবে। খাদিজায়েভা আবার শুরু করল, সময় হাতে বেশী নেই, সার্কুলারে আরেকটা জরুরী বিষয় আছে। মস্কোভা বন্দী শিবিরে, সরকারীভাবে যার নাম মস্কোভা স্কুল অব রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রাম, আমাদের দু'জন বোন বন্দী হয়ে এসেছে। তারাও এ মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্রী ছিল। নাম আয়েশা আলিয়েভা এবং রোকাইয়েভা। দু'জনের বায়োডাটাও সার্কুলারে আছে। এদের কাছে সাধ্যমত সাহায্য পৌছানো এবং মুক্তির ব্যাপারে চেষ্টা করার জন্য এখানকার সাইমুমের সব ইউনিটকেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

তাহেরভা তাতিয়ানা বলল, মস্কোভা বন্দী শিবির সম্পর্কে তথ্য যোগাড় করা দরকার এবং এ অঞ্চলটায় একবার আমাদের যাওয়া প্রয়োজন। তারপর আমরা কর্মপন্থা নিয়ে যদি চিন্তা করি তাহলে ভাল হয়।

খাদিজায়েভা মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বলল, এস সবাই মিলে আমরা চেষ্টা করি তথ্য যোগাড়ের, আর খুব সত্ত্বর ওদিকে বেড়াবার একটা প্রোগ্রামও আমাদের করতে হয়।

সবাই মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। খাদিজায়েভা বলল, ক্লাশের সময় হয়ে গেছে। চল এখনকার মত ওঠা যাক।

সবাই উঠে দাড়াল।

ভলগা নদীর তীরে গোরকিয়াতে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র-ছাত্রী এসেছে বিনোদন সফরে। মস্কো থেকে ১০০ মাইল পূর্বে গোর্কিয়ার মনোরম পরিবেশে মুক্ত বিহঙ্গের মত আনন্দে মেতে উঠেছে ছাত্র-ছাত্রীরা। তারা উঠেছে ভলগা তীরের কম্যুনিটি রেস্ট হাউজে।

এই দলে ফারহানাও আছে। না এসে উপায় থাকেনি তার। সরকারী এই প্রোগ্রামে ‘না’ বলার সাধ্য নেই কোন ছাত্র-ছাত্রীর। তাছাড়া সেদিন বিনোদন নিয়ে ইউরি অরলভের কথা মনে আছে। না আসার পক্ষে কোন ওজর তুলতেও সাহস করেনি।

রেস্ট হাউজে প্রতি দু’জন একটা করে রুম পেয়েছে। কয়েকদিন থাকতে হবে এ বিনোদন সফরে। কেমন সঙ্গিনী পায় এ নিয়ে চিন্তা ছিল ফারহানার। কিন্তু সঙ্গী পেয়ে স্বস্তি পেল সে।

ওলগা তারই ক্লাশের মেয়ে। ওর মধ্যে একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। রুশ মেয়েরা যেমন সারাক্ষণই হৈ চৈ নিয়ে উড়ে বেড়ায়, তেমনটা সে নয়। একেবারেই অন্তর্মুখী, চুপচাপ থাকে। লাইব্রেরিতে ও দেখেছে এক কোণায় বসে লেখাপড়া করে। গতানুগতিক স্রোত থেকে তাকে আলাদাই মনে হয়। ওলগার অন্তর্মুখীতার কারণে তার সাথে অন্তরঙ্গতা হয়নি, কিন্তু সাধারণ আলাপ আছে। ওলগাকে পেয়ে খুশী হয়েছে ফারহানা।

রুম বন্টন ও গ্রুপ ঘোষণা হওয়ার পর ফারহানাকে খুঁজে নিয়ে তাকে স্বাগত জানিয়েছে ওলগা। ফারহানাও ওলগার কপালে চুমু দিয়ে নিজের খুশী প্রকাশ করেছে।

সেদিন বিকেলে গোর্কিয়ায় পৌছার পর ঐ দিনের জন্য আর কোন প্রোগ্রাম রাখা হয়নি। গোটা সময়টাই বিশ্রাম। সন্ধ্যায় খাবার খেয়ে রুমে চলে এলো ফারহানা ও ওলগা।

রুমের দু’পাশে দু’টি বেড। মাথার দিকে একটা হাফ টেবিল। টেবিলের দু’পাশে দু’টি সোফা চেয়ার। পেছনের দিকে একপাশে বাথরুম, অন্যপাশে একটা ওয়ার্ডরোব। মেঝে কার্পেটে ঢাকা। হিটার ঘরটাকে আরামদায়ক করে

রেখেছে। ওলগা বিছানায় গা এলিয়ে বলল, ফারহানা তুমি কি পছন্দ কর, পড়া না গল্প করা?

বিছানায় গা স্পর্শ করেছিল ফারহানারও। ওলগার প্রশ্ন শুনে হেসে উঠে বসে বলল, বিশ্বাস কর ওলগা, এই প্রশ্নটাই আমি তোমাকে করতে যাচ্ছিলাম।

-বেশ তুমিই আগে বল। বলল ওলগা।

-না তুমিই আগে বল। ফারহানা উল্টো চাপ দিল ওলগাকে।

ওলগা হাসল। বলল, প্রশ্নটা আমি আগে করেছি, অতএব

উত্তর জানার অগ্রাধিকার আমিই পাব। হাসল ফারহানাও। ঠিক আছে, বলল ফারহানা, তোমার সাথে গল্প করাই আমি পছন্দ করব।

-আমার কথাও এটাই। শোয়া থেকে উঠে বসে বলল ওলগা।

-বেশ তাহলে গল্প করা যাক।

-কি গল্প করা যায় বল।

একটু চিন্তা করে ফারহানা বলল, যখন ভাল লাগা লাগির কথা উঠেছে, তখন এ নিয়েই আলোচনা হোক। বল, দুনিয়ার কোন জিনিস তোমাকে আনন্দ দেয় বেশি?

শক্ত প্রশ্ন ফারহানা, বলল ওলগা। একটু চিন্তা করল। তারপর বলল, গাছ আমাকে আনন্দ দেয় সবচেয়ে বেশি।

গাছ! বিস্মিত কন্ঠ ফারহানার। বলল, এমন অদ্ভূত চয়েসের পিছনে তোমার যুক্তি কি ওলগা ?

ওলগা বলল, যুক্তি খুব সোজা। গাছ কারও কোন ক্ষতি করেনা শুধু উপকারই করে। কারো বিরুদ্ধে হিংসা, বিদ্বেষ, ষড়যন্ত্র তার নেই, পরার্থেই তার জীবন।

ওলগা থামল। ফারহানা তার দিকে তাকিয়ে ছিল, তাকিয়েই থাকল। ওলগা বলল, কি দেখছ ফারহানা?

-তোমাকেই দেখছি, আচ্ছা ওলগা, মানুষ সম্পর্কে কি তুমি হতাশ ?

-হতাশ কিনা জানি না, তবে মানুষ আজ গাছ-পালা, পশু-পাখির অনেক নীচে। বিস্মিত ফারহানা ওলগার দিকে তাকিয়েই আছে। ধীরে ধীরে বলল এই অবস্থা কি স্বাভাবিক ওলগা ?

-আমি জানিনা। বলল ওলগা।

-কারন জান কিছু এই অবস্থার ? আবার প্রশ্ন করল ফারহানা।

-উঁহু, আমি আর কোন উত্তর দেবনা, প্রশ্নতো আমারও আছে। কৃত্তিম গাম্ভীর্য টেনে বলল ওলগা।

-বেশ প্রশ্ন কর।

-আমারও ঐ প্রশ্ন, দুনিয়ার কোন জিনিস তোমাকে আনন্দ দেয় বেশী?

ফারহানা একটু হাসল। একটু ভাবল। তারপর বলল, মানুষ ভূল করে কিন্তু তা স্বীকার করে সেটা থেকে ফিরে আসে, এ বিষয়টিই আমাকে সবচেয়ে বেশী আনন্দ দেয়।

ওলগা একটু চোখ বুঝল যেন। তারপর ফারহানার দিকে তাকিয়ে বলল, এর মধ্যে বড় কথা কি আছে ফারহানা?

-মানুষ্যত্বের স্বভাবমুখী বিকাশের মূল কথাই তো এখানে নিহিত।

-মানুষ্যত্বের স্বভাবমূখী বিকাশ কি ?

-মানুষকে যে প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে তার স্বাভাবিক বিকাশ।

-একটু বুঝিয়ে বল ফারহানা।

-দেখ মানুষকে একটা নির্দিষ্ট পরিসরে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি এবং সৃষ্টিশীল ক্ষমতার অধিকারী করা হয়েছে। কিন্তু সীমিত ক্ষমতাকে সে সার্বভৌম ক্ষমতা ভেবে বাড়াবাড়ি করে, সীমালংঘন করে অন্যায়, অবিচার, শোষণ, ইত্যাদির জন্ম দেয়। মানুষ স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির অধিকারী যেহেতু তাই এ ভূল ও তার একটা নেতিবাচক প্রকৃতি, যা তার জন্য ধ্বংসকর। মানুষ যখন তার এ ভূল স্বীকার করে সত্য অর্থাৎ তার স্বভাবিক অধিকারের মধ্যে ফিরে আসে, তখন মানবতা ধ্বংসকর অবস্থা থেকে রক্ষা পায়। জুলুম, শোষণ এবং দ্বন্দ্ব সংঘাত ও হিংসা বিদ্বেষের থেকে বেঁচে যায় মানুষের সমাজ। তাই বলেছিলাম, মানুষ ভূল স্বীকার করে ফিরে আসাটা আমাকে সবচেয়ে বেশি আনন্দ দেয়।

ওলগা কোন কথা বলল না। ভাবছিল সে। ধীরে ধীরে এক সময় সে বলল, তোমার কথা কিছু কিছু আমি বুঝেছি। কিন্তু একটা বুঝতে পারছিনা তুমি বলছ মানুষ স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নয়।

-নয়তো বটেই। দেখোনা চন্দ্র, সূর্য থেকে শুরু করে সৃষ্টির সব কিছুর কেউই স্বাধীন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নয়, একটা নির্দিষ্ট অর্পিত ক্ষমতার অধিকারী মাত্র। এই সৃষ্টিরই একটি মানুষ স্বাধীন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হবে কেমন করে?

-বুঝেছি তোমার কথা ফারহানা। তুমি বলতে চাচ্ছ, চন্দ্র,সূর্য, তারকা যদি তাকে দেয়া অধিকারের সীমা লংঘন করে কক্ষপথ ছেড়ে ইচ্ছামত বিচরণ শুরু করে তাহলে যেমন আকাশ প্রকৃতিতে বিপর্যয় ঘটবে তেমনি মানুষকে দেওয়া তার 'অর্পিত ক্ষমতার' সীমা লংঘন মানব সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করে, কথাটা এই তো?

-ঠিক বুঝেছ ওলগা। আমি আরও বলতে চাই, এই বিপর্যয় সৃষ্টি যদি মানুষ না করে তাহলে মানুষ সম্পর্কে তোমার হতাশ হবার প্রয়োজন নেই। তবে তুমি ঠিক বলেছ, মানুষ যদি তার অধিকারের সীমা ডিঙিয়ে যায়, ভূলের সমূদ্রে যদি ভেসেই চলে, তাহলে সে গাছ-পালা, পশু-পাখীর চেয়েও নীচে নেমে যায়। কারণ ওগুলো তাদের দেয়া অধিকারের তিল পরিমাণও লংঘন করে না। আমাদের ধর্মগ্রন্থ বলেছে, 'আহসনে তাকরীম' -অর্থাৎ সর্বোত্তম রূপ প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, কিন্তু আবার সে তার কর্মের জন্য 'আসফালা সাফেলীন' অর্থাৎ নিকৃষ্টতম পর্যায়ে নেমে যেতে পারে। ওলগা 'আসফালা সাফেলীন' ধরনের মানুষেরাই তোমার হতাশার কারণ।

ওলগা কিছুক্ষন চুপ থাকল। তারপর বলল, তোমার সব কথাই বুঝলাম কিন্তু সৃষ্টির হাতে অর্পিত ক্ষমতার যিনি উৎস সেই 'সর্বময় ক্ষমতাধর অর্পণকারী' কে?

ফারহানা ওলগার দিকে তাকিয়ে বলল, সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ওটা। এর উত্তর আমি এখন দিতে পারবনা। এস দু'জনেই সন্ধান করি। আজ আর নয়।

বলে ফারহানা বিছানায় গা এলিয়ে দিল।

ওলগা কোন আপত্তি করলনা। কি যেন ভাবছে সে। সেও গা এলিয়ে দিল বিছানায়।

পরদিন ভোর।

বাইরে পূর্ব দিগন্তে সোবহে সাদেকের স্পষ্ট রেখা ফুটে উঠলেও তখনও বেশ অন্ধকার। ওলগা জেগে উঠেছিল। চোখ মেলে তাকাল সে। ঘরে তখন জমাট অন্ধকার। হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, না রাত নেই, ভোর হয়ে গেছে।

ফারহানার বিছানার দিকে তাকিয়ে ভাবছিল তাকে ডাকবে কিনা। হটাৎ সে দেখল মেঝেতে অন্ধকারের মধ্যে একটা জমাট অন্ধকার নড়ছে। সে তাকিয়ে থাকল। দেখল, অন্ধকারটি উঠছে, বসছে। গত রাতের কথা তার মনে পড়ল। দু'জনে শোবার অনেক পরে ফারহানা ওঠে। সে বাথরুমে যায়। কোন শব্দ হয়না। মনে হয় কাউকে সে জানতে দিতে চায় না।তারপর বাথরুম থেকে এসে সে মেঝেতে দাঁড়ায়। এই ভাবেই ওঠাবসা করে, প্রথমে ওলগা বিস্মিত হয়, ওর এই সন্তর্পন ভাব গতিতে কিছুটা ভয়ও পায়। পরে বুঝতে পারে ফারহানা ব্যায়াম করছে কিংবা প্রার্থনা করছে। রাতে শেষটা না দেখেই ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। ওলগা দেখল, ফারহানা বসেছে আর উঠছেনা। স্থির বসেই আছে। ওর কাজ শেষ হয়েছে কি?

ওলগা তার বাম হাত বাড়িয়ে বেড সুইচ টিপে দিল।উজ্জ্বল আলোয় ভোরে গেল ঘর।

ফারহানা দু'টি হাত তুলে প্রার্থনারত। সামনে থেকে আলো গিয়ে আছড়ে পড়েছে তার মুখে। সে আলোয় চক চক করে উঠল তার চোখের অশ্রু। চোখ দু'টি তার বোজা।

কাঁদছে ফারহানা? বিস্মিত হলো ওলগা! ফারহানা আস্তিক? সে প্রার্থনা করে? গতকালের আলোচনায় অবশ্য বুঝা গিয়েছিল সে ঈশ্বর মানে কিন্তু এতটা মানে সে?

ফারহানা মুনাজাত শেষ করল। হাসি মুখে উঠে দাড়াল। তারপর ওলগার দিকে তাকিয়ে বলল, তোমাকে ডিস্টার্ব করলাম বুঝি?

ওলগা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল ফারহানার দিকে। ফারহানা তার বিছানায় গিয়ে বসল। ওলগা ফারহানার দিকে তাকানো অবস্থায় ধীর কন্ঠে বলল তুমি প্রার্থনা কর বুঝি?

-হ্যাঁ।

-রাতেও বোধ হয় প্রার্থনা করেছিলে?

-হ্যাঁ, দেখছ তুমি ?

-ক’বার প্রার্থনা দিনে?

-পাঁচবার প্রার্থনা করতে হয়।

-এটাই কি বিধান ?

-হ্যাঁ

-ধর্ম বিশ্বাস এবং প্রার্থনা একটা ডিসকোয়ালিফিকেশন। তোমার ভয় করেনা ?

-করে, তাইতো গোপনে প্রার্থনা করি।

-এই তো আমি দেখে ফেললাম। আমি যদি রিপোর্ট করি?

-আমি আমার প্রার্থনা গোপন রাখতেই চেষ্টা করেছিলাম, পারিনি।

-এখন রিপোর্ট করলে কি হবে জান?

-জানি।

-এর পরও এমন ঝুঁকি নিয়ে প্রার্থনা না করলেই কি নয়?

-একমাত্র মৃত্যু এবং বেহুঁশ হয়ে পড়া ছাড়া পাঁচবার প্রার্থনা ছাড়া যাবেনা। আর এই কাজে জাগতিক কোন শক্তিকে ভয় না করতে বলা হয়েছে।

-তোমাদের মধ্যে সবাই কি এটা মানে?

-না।

-কেন?

-গতকাল আমি বলেছি না ভুল বিচ্যুতি মানুষের আছে।

কম্যুনিষ্ট শাসনাধীনে আমাদের অধিকাংশ এরই শিকার।

ওলগা চুপ। যেন অন্যমনস্ক সে। ভাবছে কিছু।

ফারহানা ঘরের আলো নিভিয়ে দিল। জানালর ভারী পর্দাটা গুটাতেই ভোরের স্বচ্ছ আলো এসে প্রবেশ করলে ঘরে।

বিছানায় ফিরে এসে ফারহানা ওলগার দিকে চেয়ে বলল, কি ভাবছ ওলগা?

-ভাবছি তোমাদের স্রষ্টার কথা। তুমি যদিও কাল আমার শেষ প্রশ্নের উত্তর দাওনি, তবু আমার কাছে পরিষ্কার। স্রষ্টাকেই তুমি সৃষ্টির হাতে অর্পিত সকল ক্ষমতার উৎস মনে কর, তিনিই সবর্ময় শক্তির অধিকারী; মানুষ নয়। তিনিই একমাত্র সাবভৌম ক্ষমতার মালিক। বল, আমি ঠিক বলেছি কিনা?

-হ্যাঁ ফারহানা বলল।

ওলগা উঠে এল বিছানা থেকে ফারহানার পাশে। তার মুখটা গম্ভীর চোখে যেন বেদনার একটা নীল ছায়া। সে ফারহানার চোখে চোখ রেখে বলল, তুমি কি আমাকে এটা বিশ্বাস করতে বল ?

-হ্যাঁ বলি। বলল ফারহানা।

-বল তাহলে, আমার মা আজ পাঁচ বছর ধরে বন্দী শিবিরে কেন? কথার সাথে সাথে ওলগার দু'গন্ড বেয়ে ঝরে পড়ল অশ্রুর দু'টি ধারা। ফারহানা ওলগার একটা হাত তুলে নিয়ে বলল, এ কি বলছ তুমি ওলগা ?

-ঠিকই বলছি, আমার মা লমুম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ডঃ নাতালোভা আজ পাঁচ বছর ধরে মস্কোভা বন্দী শিবিরে। তার অপরাধ ছিল, তিনি ধর্ম বিশ্বাসকে মানব প্রকৃতির জন্য অপরিহার্য বলেছিলেন, তিনি ধর্ম বিশ্বাসকে মানব প্রকৃতির জন্য অপরিহার্য বলেছিলেন, তিনি ধর্ম বিশ্বাসে ফিরে এসেছিলেন।

চাদরে মুখ গুজে কাঁদছিল ওলগা। অনেক দিনের অবরুদ্ধ কান্না যেন প্রকাশের পথ পেয়েছে। স্তম্ভিত ফারহানা কিছুক্ষন কথা বলতে পারলনা। এই ওলগা কি সেই ওলগা। এত বড় জমাট বেদনা নিয়ে সে ঘুরে বেড়ায়। এই জন্যই কি সে এত নিরব, এত অন্তর্মুখী।

ফারহানা ওলগাকে টেনে নিল কাছে। সান্তনা দিল অনেক। ওলগা কিছুটা শান্ত হলে ফারহানা বলল, বোন ওলগা, তুমি যে প্রশ্ন করেছ তা খুবই পুরাতন প্রশ্ন। জুলুম, অত্যাচার, অবিচার আর প্রতিকারহীন অবস্থায় মানুষ যখন অতিষ্ঠ হয়, তখন স্রষ্টা সম্পর্কে এ প্রশ্নই মানুষ বার বার করে। আমি আগেই বলেছি, ওলগা , এসব জুলুম, অবিচারের কারণ স্রষ্টার দেয়া বিধান বা অধিকার থেকে মানুষের সরে আসা। তোমার প্রশ্ন, এখানে স্রষ্টা কি করেন? কিছু করেন না কেন? স্রষ্টা অবশ্যই করেন।দেখ তুমি পৃথিবীর জালেম, অত্যাচারীদের ইতিহাস পড়ে।

তাদের কি করুণ পরিণতি হয়েছে। তবে স্রষ্টা সবাইকে একটা সীমা পযর্ন্ত সুযোগ দেন। হয়তো বলবে, যারা অত্যাচারিত হয় তাদের কি লাভ হয় এতে। লাভ ক্ষতির হিসেব যদি এ দুনিয়াতেই শেষ হয়ে যেত, তাহলে একথা ঠিক হতো। কিন্তু তা নয় ওলগা, দুনিয়ার জীবনটা স্বপ্নের মতোই সংক্ষিপ্ত, সুতরাং এখানকার দুঃখ প্রকৃতই দুঃখ নয় এবং সুখও প্রকৃত সুখ নয়, পরজগতের চিরন্তন যে জীবন সেখানকার সুখই প্রকৃত সুখ এবং সেখানকার দুঃখই প্রকৃত দুঃখ।

ক্ষণস্থায়ী দুঃখের বিনিময়ে স্রষ্টা যদি চিরন্তন সুখ দান করেন, তাহলে সেটা স্রষ্টার অবিচার নয়, করুণাই তোমাকে বলতে হবে। তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে ওলগা, যারা জালেম তারা স্রষ্টার দেয়া সীমা বা অধিকার লংঘনের জন্য শাস্তি এখানে পাচ্ছে এবং পরকালেতো পাচ্ছেই। আর যারা জালেমের অত্যাচারে অধিকার হারাল, তাদের দুঃখের সীমা এখানকার সংক্ষিপ্ত জীবন পযর্ন্তই। তুমি আমি জীবনটাকে এমন সামগ্রিক ভাবে দেখিনা বলেই সাময়িক দুঃখে হতাশ হই, ভেংগে পড়ি।

-তাহলে এই জীবনের দুঃখ-কষ্ট, জুলুম-অত্যাচারকে যে শিরোধার্য করে নিতে হয়। শুকনো কন্ঠে বলল ওলগা।

-কখনও না, যারা আল্লাহর দেয়া সীমা লংঘন করে, তাদেরকে সীমার মধ্যে রেখে সমাজকে , মানুষকে জুলুম, অত্যাচার থেকে রক্ষা করা স্রষ্টার তরফ থেকে মানুষের উপর অর্পিত একটা দায়িত্ব। এ স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন না করাও মানুষের দুঃখ কষ্টের একটা বড় কারণ। জুলুম যেমন একটা বিচ্যুতি, জুলুম মাথা পেতে নিয়ে চলাও একটা বিচ্যুতি। এই বিচ্যুতির কারনেই মানব সমাজের তাদের স্বউপার্জিত, দুঃখ-কষ্ট, জুলুম, অত্যাচার জেঁকে বসে।

ওলগা ভালো করে চোখ মুছে ফারহানার দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার কথা বুঝেছি, কিন্তু এ পথ তো বিদ্রোহের।

-স্রষ্টা এ বিদ্রোহ চান। মুসলমানদের কলেমা বিদ্রোহের আপোষহীন এক আহ্বান। এ কলেমা উচ্চারণের মাধ্যমে মুসলমানরা আল্লাহ ছাড়া সকল কর্তৃত্ব ও শক্তিকে অস্বীকার করে।

ওলগা বিস্ময় ভরা চোখে তাকিয়ে ছিল ফারহানার দিকে। বলল, তোমার কথা খুবই ভালো লাগছে ফারহানা। আমার অনেক প্রশ্নও জিজ্ঞাসার আজ তুমি সমাধান করে দিয়েছ। কিন্তু চার-পাশের বাস্তবতা আমি ভুলতে পারছি না ফারহানা। আমার মা সোভিয়েত বিজ্ঞান একোডেমীর সদস্যা ছিলেন। লেনিন পুরষ্কারও তিনি লাভ করেছেন। তাঁর বন্ধু বান্ধব ও ভক্তের সংখ্যা প্রচুর। কিন্তু মা আজ পাঁচ বছর ধরে বন্দী শিবিরে। তাঁর পক্ষে একটি কথাও কেউ বলেনি। কারো কাছে সামান্য সহানুভুতিও আমি পাই নি।

আবার চোখ দু'টি ছল ছল করে উঠল ওলগার। ফারহানা তার কাঁধে হাত রেখে বলল, কমিউনিষ্ট ব্যবস্থা মানুষের সকল স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে, সেই জন্যই এই অবস্থা। কিন্তু ওলগা, মানুষের বিবেকের এবং তাদের স্বাধীনতার চারদিক ঘিরে তারা যে বাঁধ দিয়ে রেখেছে, তা আর বেশীদিন টিকবেনা মনে রেখ।

-কেমন করে বলছ এ কথা ? ফিস ফিসে কন্ঠ তার।

-কান পেতে শোন, চোখ মেলে চারদিকে দেখ, তুমিও বলবে একথা।

কোন কথা বলল না ওলগা।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ফারহানা উঠল। বলল, ওলগা, তৈরী হও। ১৫মিনিটের মধ্যে আমাদের হল রুমে উপস্থিত হতে হবে। আজকের প্রোগ্রাম ব্রিফিং হবে সেখানে।

কয়েক দিন পর। পরদিনই ফিরতে হবে মস্কোতে। তখন বিকেল। ভল্গার তীরে যার যেমন ইচ্ছা প্রোগ্রাম চলছে। কেউ হাঁটছে, কেউ দৌড়াচ্ছে, কেউ জোড়া বেঁধে গল্প করছে।

এই কোলাহল থেকে একটু দুরে ভলগার তীরে ওলগা এবং ফারহানা বসে। দু'জনে চেয়ে বহমান ভল্গার নীল পানির দিকে। একদম শান্ত নদী। একটা ছোট পাখি এসে চকিতে এক ছোঁয়ে ঠোঁটটা পানিতে ডুবিয়ে আবার উড়ে গেল। নীল পালকে হলুদের ছোপ দেয়া তার। ফারহানা চিনেনা পাখিটাকে। ওলগাও নাম বলতে পারলোনা। ওটা নাকি সাইবেরিয়ার পাখি। এই সিজনে এদিকে আসে।

গোঁ গোঁ একটা শব্দে ওরা বামদিকে ফিরে তাকাল। দেখল একটা স্পীড বোট আসছে। সামনে এসে গেল বোটটা। শান্ত নদীর বুক চিরে এগিয়ে এল। ঢেউ এর মিছিল ছড়িয়ে পড়ছে বোটের দু'পারে। নদীর শান্ত জীবনে যেন একটা ঝড়।

বোটটা সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে। দেখেই বুঝা গেল পুলিশ বোট। সামনে বোট ড্রাইভার। পেছনে ষ্টেনগান ধারী দু'জন পুলিশ। অবশিষ্ট ডজন খানেক লোক কয়েদীর পোশাক পরা। তাদের হাতে পায়ে হালকা শিকল। বোধ হয় সরকারী কোন প্রজেক্ট তারা বিনে পয়সায় শ্রম দিয়ে এল।

ওদিকে তাকিয়ে ওলগা আনমনা হয়ে পড়েছিল। বোট যতদূর দেখা গেল তার চোখ ততদুর অনুসরণ করল। কে জানে, ঐ কয়েদীদের মধ্য দিয়ে ওলগা তার মাকেই দেখছিল কি না।

বোট চোখের আড়ালে চলে গেল। ফিরে এল ওলগার চোখ। মুহূর্তের জন্য চোখ বুজল সে। তারপর চোখ খুলে বলল, ফারহানা, কয়দিন থেকে তোমাকে একটা কথা বলব বলব মনে করছি।

কি কথা? আগ্রহে মুখ তুলল ফারহানা।

জবাব এলনা ওলগার কাছ থেকে। সে চিন্তা করছিল।

-কি কথা ওলগা?

ওলগা ফারহানার দিকে তাকাল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, তোমাকে বলতে চাই, তুমি হয়তো ওদের কোন উপকার করতে পার। তোমার জাতির লোক ওরা।

ওলগা থামল। ফারহানা উৎসুক চোখ দু'টি তার দিকে মেলে ধরল। ওলগা চোখ ঘুরিয়ে একবার দেখে নিল। তারপর ফিস ফিস করে বলল, মস্কোভা বন্দী শিবির থেকে দু'জন বোন পালিয়ে এসেছে। মা একটা চিঠি দিয়েছিলেন, ওরা আমার ওখানেই উঠেছে। এখন পর্যন্ত লুকিয়ে রেখেছি। কি করব বুঝতে পারছিনা।

সত্যই বিস্ময়ে ফারহানার চোখ দু'টি কপালে উঠল। বলল, বন্দী শিবির থেকে পালিয়ে এসেছে?

-হাঁ।

-কি বললে, ওরা আমার জাতির লোক?

-হাঁ, দু'জনেই উজবেক মেয়ে, তোমার মতই মুসলমান।

-কি নাম ওদের ওলগা?

-আয়েশা আলিয়েভা এবং রোকাইয়েভা।

নাম দু'টি শোনার সাথে সাথেই ফারহানার গোটা দেহ বিস্ময় ও আনন্দের একটা ঢেউ খেলে গেল। একটা অভাবিত আবেশ যেন তাকে আচ্ছন্ন করল। কান দু'টিকে বিশ্বাস হতে চাইলনা। তারা যে দু'জন বোনের জন্য উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছে, তাদেরকে আল্লাহ্ এমন করে তাদের হাতের কাছে এনে দিয়েছে।

বিস্ময় ও আনন্দের উচ্ছ্বাসটা চেপে গেল ফারহানা। ওদের সাথে তাদের সম্পর্কের বিষয়টা গোপন থাকাই দরকার। যেন চিন্তা করছে ফারহানা, এমন একটা টানা কণ্ঠে সে বলল, খুশি হলাম ওলগা, ওরা আমার জাতির লোক। ওদের অবস্থা জানিনা, দেখা হলে বুঝতে পারব কি করা যায় ওদের জন্য।

-ফেরার পথেই চলনা আমাদের বাসায়। সাগ্রহে বলল ওলগা।

এমন আমন্ত্রণ আসুক ফারহানা কামনা করছিল। বলল, ঠিক আছে, সেটাই ভাল হবে।

ওলগার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, জান, ওরা আসার পর থেকে আমার বুক কাঁপছে, জেল পালান এবং পলাতককে আশ্রয় দেয়া যে কত বড় অপরাধ তা তুমি জান। কিন্তু মা'র আমানত ওরা আমার কাছে। আমার নিরাপত্তার চেয়ে ওদের নিরাপত্তাকে আমি বড় মনে করি। আমি চাই, ওরা নিরাপদে দেশে ফিরে যেতে সমর্থ হক।

দিনের আলো তখন ফিকে হয়ে এসেছে। সূর্য ডুবে যাচ্ছে পশ্চিম আকাশে। কালো ছায়া নামছে ভল্গার বুকে।

রেস্ট হাউজে ফিরে যাওয়ার জন্য সবাই তৈরী হচ্ছে। উঠে দাঁড়াল ওলগা এবং ফারহানাও।

# ৬

ওলগা এবং ফারহানা রেস্ট হাউজের সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল তাদের রুমে যাবার জন্য। রাতের খাওয়া হয়ে গেছে, এখন যাওয়ার জন্য গোছ গাছ করার পালা। আজ রাতের খাওয়ার আগে সমাপনী আনুষ্ঠান শেষ হয়েছে। এখন যার ইচ্ছা আজ যেতে পারে, কাল সকালেও যেতে পারে। আজ গেলে তাকে নিজের ব্যবস্থাপনায় যেতে হবে।

ওরা দোতালায় উঠে গেছে, এমন সময় বেয়ারা গিয়ে ওলগাকে খবর দিল, স্যার তাকে তাঁর অফিসে ডাকছেন। ফারহানা চলে গেল তার রুমে। ওলগা স্যারের সাথে দেখা করার জন্য নীচে নেমে গেল।

ফারহানা গিয়ে তার বিছানায় গা এলিয়ে ওলগার জন্য অপেক্ষা করছিল। ওলগা এলেই দুজনে মিলে গোছ-গাছে লাগবে। ওলগা পনের মিনিট পরে এল। ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিল। ওলগার মুখ ফ্যাকাশে। চোখ দু'টিতে তার উদ্বেগ ও ভীতি।

ফারহানা তার দিকে চেয়ে বিস্মিত হলো। উদ্বিগ্ন ভাবে উঠে বসল সে। বলল, কিছু হয়েছে ওলগা তোমার?

কিছু উত্তর দিলনা ওলগা। নীরবে এসে তার পাশে বসল। ফিস ফিস করে বলল, গোয়েন্দা পুলিশ এসেছে আমাকে নিয়ে যাবার জন্য। বোধ হয় আমাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করবে এবং বাড়ি সার্চ করবে।

-কেন? জিজ্ঞাসা করল ফারহানা।

-ব্যাপারটা পরিষ্কার। ঐ ওরা দু'জন আমার মা'র সেকশনে এবং পাশের চেয়ারে বসে কাজ করত। সুতরাং মা'র সাথে তাদের কোন যোগশাজস থাকতে পারে। যদি থাকে আমিও তাহলে তার সাথে যুক্ত আছি। সুতরাং ওদের সন্ধানে আমার এখানে আসা স্বাভাবিক।

আয়েশা আলিয়েভা এবং রোকাইয়েভার জন্য উদ্বিগ্ন হল ফারহানা। ওলগার বাড়ী সার্চ হলেই তো ওরা ধরা পড়ে যাবে। এখন কি করবে সে। কিন্তু ফারহানা কিছু বলার আগেই আবার কথা বলল ওলগা। বলল, আমার বেশী সময় নেই ফারহানা, তোমাকে একটা দায়িত্ব দিতে চাই।

-কি দায়িত্ব? দ্রুত কণ্ঠে বলল ফারহানা।

-আমি আসার সময় ওদের দু'জনকে আমার খালার বাড়ীতে সরিয়ে রেখে এসেছি। আমার বাড়ী সার্চ করার পর, এরা তাঁর বাড়ীও সার্চ করবে। তারা সেখানে পৌঁছার আগেই তোমাকে গিয়ে ওদের সেখান থেকে সরাতে হবে। পারবে? ফারহানা খুশী হলো। আয়েশা আলিয়েভা এবং রোকাইয়েভাকে নিরাপদে সরিয়ে নেবার পথ একটা আছে জেনে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করল। ফারহানা ওলগাকে জরিয়ে ধরে বলল, চিন্তা করোনা বোন, এ দায়িত্ব আমি নিলাম।

খুশীতে ওলগার মুখটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল সে, আমার মায়ের জন্য আমি কোন দিন কিছু করতে পারব কিনা জানিনা, এদের জন্য কিছু করতে পারলেও আমি শান্তি পাব এই ভেবে যে, মায়ের দেয়া একটা দায়িত্ব পালন করেছি। তার দু'চোখে দু'ফোটা জল টল টল করে উঠল।

ফারহানা ওলগার কাঁধে একটা হাত রেখে সান্তনা দিয়ে বলল, কেঁদোনা বোন, মজলুমদেরই অবশেষে জয় হবে।

-হবে বলছ? আমার মা আবার ফিরে আসবেন?

-নিরাশ হতে আল্লাহ্ নিষেধ করেছেন। সুতরাং আমরা অবশ্যই করব।

-তোমাদের আল্লাহ্ সম্পর্কে আমি জানতে চাই ফারহানা। তোমাদের জীবন্ত ধর্ম বিশ্বাস আমার ভাল লাগে।

-বেশ তুমি জানবে।

ওলগা আর কোন কথা বলল না। তাড়াতাড়ি কাগজে খালার ঠিকানা লিখে ফারহানার হাতে দিয়ে বলল, আমার বাড়ী সার্চ করার সময়টুকু হয়তো তুমি পাবে ওদের সরিয়ে নেবার জন্য।

ফারহানা বলল, আমি সব বুজেছি ওলগা, তুমি চিন্তা করোনা। ওলগা সবে কাপড়-চোপড় গোছ-গাছে হাত দিয়েছে। দরজায় নক হলো। দরজা খুলে দিল ওলগা। দেখল, স্বয়ং স্যার দাঁড়ীয়ে। ওলগা বলল, আসছি স্যার, হয়ে গেছে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল ফারহানা। সেও স্যারকে বলল, স্যার আমিও চলে যাচ্ছি, সব ঠিক করে নিয়েছি।

মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বিষয়ক অধ্যাপক নিকোলাই ষ্টেপনাভ বলল যেতে পার, আমরা তো বলেই দিয়েছি।

একটু থামল ষ্টেপনাভ। তারপর ওলগার দিকে তাকিয়ে নীচু কণ্ঠে বলল, ভয় করোনা ওলগা, ভয় করেও কোন লাভ নেই। স্রষ্টাকে ডাক। ওলগা হাতের কাজ থামিয়ে বিস্ময়ে স্যারের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনিও ইশ্বরের কথা বলছেন?

অধ্যাপক ষ্টেপনাভ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, তোমার মা'র মত আমরা সাহসী নই, তাই উচ্চ কণ্ঠে বলতে পারিনা। কিন্তু আমরা কেউ না বললেও ঈশ্বর আছেন এবং থাকবেন।

ওলগা কিছু বলতে যাচ্ছিল। অধ্যাপক ষ্টেপনাভ বাধা দিয়ে বলল, কোন কথা নয়। তৈরী হয়ে নাও। তাড়াহুড়া করছে ওরা। এসে পড়বে হয়তো এখানেই।

ওলগা তৈরী হয়ে স্যারের সাথেই বেরিয়ে গেল। পরে ফারহানাও বেরিয়ে এল। ফারহানা নীচে এসে দেখল, একটা চকচকে গাড়ী, গাড়ী-বারান্দা থেকে বেরিয়ে গেল। গাড়ী বারান্দার এক পাশে দাঁড়ীয়ে অধ্যাপক ষ্টেপনাভ। ফারহানা বুঝল এই গাড়ীতেই ওলগা গেল। ফারহানাকে দেখে অধ্যাপক ষ্টেপনাভ বলল, কিসে যাবে?

-বিমানে সিট তো মিলবেনা, গাড়ীতেই যাব স্যার।

-একা যাচ্ছ, বিমানেই যাও। এখনই আলাপ হলো সিট একটা আছে।

খুশী হল ফারহানা। ১৫ মিনিট পর বিমান ছাড়বে। সব মিলিয়ে অন্ততঃ আধা ঘন্টা আগে মস্কো পৌছা যাবে। ফারহানা বলল স্যার আপনি একটু টেলিফোনে বলে দিন।

অধ্যাপক স্টেপানাভ বলল, তুমি যাও আমি বলে দিচ্ছি। ফারহানা গাড়ীতে যাওয়ার পরিকল্পনা বাদ দিয়ে এয়ারপোর্ট চলল। বিমানে সিট পেয়ে গেল ফারহানা। পিছনের দরজার কাছাকাছি একটা সিট পেল সে।

বিমান উড়ল আকাশে। টয়লেটে যাবার সময় ফারহানা কয়েক সারি সামনে দেখতে পেল ওলগাকে। দেখে সে চমকে উঠল। তা হলে সড়ক পথে তারা যায়নি। অথচ সে মনে করেছিল ওরা গাড়ীতেই যাচ্ছে। ব্যাপারটা চিন্তা করতেই শিউরে উঠল সে। বিমানে সে সিট না পেলে কি অবস্থা দাঁড়াত। তার মিশন নির্ঘাত ফেল। কিছুতেই সে ওদের আগে অলগার খালাম্মার বাড়ীতে পৌঁছাতে পারতো না। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল ফারহানা। আল্লাহ্ যেন বিশেষ করুনায় বিমানে আসার সুযোগ করে দিয়েছেন।

বিমান মস্কো বিমান বন্দরে এসে ল্যান্ড করল। ফারহানা ওলগাদের পিছু পিছুই নামল বিমান থেকে। বিমান বন্দর থেকে বেরুতেই একটা কার এসে তাদের সামনে দাঁড়াল। ওলগাকে ড্রাইভারের পাশে সামনের সিটে তুলে দিয়ে গোয়েন্দা অফিসার দু'জন পিছনের সিটে বসল। ওরা চলে গেলে ফারহানা ভাল চকচকে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে বেরিয়ে পড়ল। ড্রাইভার একজন মাঝারী বয়সের রাশিয়ান। ফারহানা তাকে বলল, গোর্কি রোড থেকে আমার দু'জন বান্ধবীকে নিয়ে কারকোভভ রোডে যাব।

চলতে চলতে ভাবল ফারহানা, ওলগার খালাম্মা কেমন হবে? আয়েশা আলিয়েভা এবং রোকাইয়েভা তার সাথে আসতে চাইবে কি না? সময় হাতে বেশী নেই। অনুমান সত্য হলে ওলগার বাড়ী সার্চ করার পরপরই তারা ওলগার খালাম্মার বাড়ীতে যাবে। সুতরাং মিনিট পনেরর বেশী সময় নেয়া তার কিছুতেই ঠিক হবে না।

গোর্কি রোডে ওলগার খালাম্মার বাড়ীর ঠিকানা ফারহান আবার মনে মনে আওড়ালো, বই-২১/১১।

তখন রাত সাড়ে ন'টা বাজে। ফারহানা গোর্কি রোডের ২১ নম্বর ব্লকে গিয়ে পৌছাল। গাড়ী বারান্দায় দাঁড় করিয়ে রেখে ফারহানা উপরে উঠে গেল লিফটে

চড়ে। ১১নং ফ্ল্যাট ৪তলায়। ফারহানা ১১নং ফ্ল্যাটের দরজায় গিয়ে নক করলো। একবার, দু’বার, তিনবার।

-আমি ওলগার কাছ থেকে এসেছি। আপনি কি ওলগার খালাম্মা?

-হ্যাঁ। বলল মহিলাটি।

-জরুরী কথা আছে, ভেতরে আসতে চাই।

-আসুন। বলে স্বাগত জানাল মহিলাটি।

ভেতরে ঢুকেই ফারহানা বলল, আমাকে আয়েশা ও রোকাইয়েভার কাছে নিয়ে চলুন।

ওলগার খালাম্মা আরেকবার ফারহানার দিকে তাকাল। সন্ধানী দৃষ্টি তার।

আমাকে বিশ্বাস করুন, বলে খালাম্মার ঠিকানা লেখা ওলগার হস্তাক্ষর খালাম্মার হাতে দিল। সেদিকে একবার তাকিয়ে খালাম্মা ফারহানাকে নিয়ে তার বেড রুমে গেল। ডেকে আনল আয়েশা আলিয়েভা এবং রোকাইয়েভাকে। তারা আসতেই সালাম দিয়ে বলল ফারহানা, আমি ফাতেমা ফারহানা, আমি মুসলিম তাজিক।

আয়েশা আলিয়েভা এবং রোকাইয়েভা দু’জনেই তাকে জড়িয়ে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে স্বাগত জানাল। ফারহানা খালাম্মার দিকে তাকিয়ে বলল, এই মুহুর্তে ওলগার বাড়ী সার্চ হচ্ছে, সেখান থেকে তারা এখানে আসতে পারে। আমি এদের দু’জনকে নিয়ে যেতে চাই। ওলগার মত এটাই।

সার্চ হওয়ার কথা শুনে খালাম্মার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। আতংকের একটা চায়া নামল তার চোখে। সে বলল, ওলগার এটাই মত হলে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তোমার পরিচয় কি মা, কোথায় কি ভাবে এদের নিয়ে যাবে?

ফারহানা বলল, আমি এদের বোন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

ফারহান মাথা নীচু করে খালাম্মার হাতে একটু চুমু খেয়ে বলল, চলি খালাম্মা। আর ওদিকে চেয়ে বলল, চলুন বোনেরা।

আয়েশা আলিয়েভা ফারহানাকে দেখেই তাকে বিশ্বাস করেছে। সে যাবার জন্য ঘুরে দঁড়াবার আগে খালাম্মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, ওলগাকে আমার ভালোবাসা দিবেন। কোন দিনই আপনাদের কথা ভুলবনা।

লিফট দিয়ে তিঞ্জনেই নেমে এল গাড়ী-বারান্দায়। ড্রাইভার গাড়ী খুলে ধরল। ওরা তিনজনেই পেছনের সিটে উঠছিল। তারা কেউই লক্ষ্য করলনা, আয়েশা আলিয়েভা এবং রোকাইয়েভার দিকে চোখ পড়তেই ড্রাইভারের ভ্রুটা কেমন কুঞ্চিত হয়ে উঠেছিল।

গাড়ীর দরজা বন্ধ করে ড্রাইভার তার সিটে গিয়ে বসল। ছেড়ে দিল গাড়ী।

পিছনের সিটের মাঝখানে বসেছে আয়েশা আলিয়েভা। সামনের দুই আসনের ফাঁক দিয়ে স্পিডোমিটার, গাড়ীর গিয়ার পরিবর্তন, ষ্টিয়ারিং হুইলে রাখা ড্রাইভারের দুটি হাত সবই দেখতে পাচ্ছে সে।

স্পিডোমিটারের কাঁটা ফিফটিতে। বলা যায় আস্তেই চলছে গাড়ী। এক জায়গায় এসে সামনের গাড়ী গুলো মনে হয় কোন কারনে থেমে গেল। এ গাড়ীটাও দাঁড়িয়ে পড়ল। হর্ন দিচ্ছে বার বার ড্রাইভার। এ গাড়ীর হর্ন শুনে চমকে উঠল আয়েশা আলিয়েভা। একটা নির্দিষ্ট কোডে হর্ন বাজানো হচ্ছে, এ কোড তার কাছে পরিছিত। 'ফ্র' এবং কম্যুনিস্ট সরকারের গোয়েন্দারা এই কোডে হর্ন বাজায়। ট্রেনিং-এর সময় সেও এটা শিখেছে।

তা হলে এ গাড়ী কম্যুনিস্ট গোয়েন্দা অথবা 'ফ্র' এর। এ ব্যাপারে নিশ্চিত হবার পর শিউরে উঠল আয়েশা আলিয়েভা। সে মাথা কাৎ করে ফারহানার কানে কানে বলল, এ গাড়ী আপনার ভাড়া করা নিশ্চয়?

-হ্যাঁ। বলল ফাতিমা ফারহানা।

-কোথা থেকে ভাড়া করেছেন?

-বিমান বন্দর থেকে।

-এ গাড়ী গোয়েন্দা বিভাগের।

শুনেই ফারহানা উদ্বেগের মধ্যেও একটা সান্তনা খুঁজল, আমাদের পরিচয় ও জানবে কি করে?

আয়েশা আলিয়েভা তার রিভলভার হাতে তুলে নিয়েছে। ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে। তার চোখ দু'টোকে ড্রাইভারের সিটের সমান্তরালে নিয়ে গেছে। এখন ড্রাইভারে সব কিছু সে দেখতে পাচ্ছে।

হঠাৎ সে দেখল ড্রাইভার তার পকেট থেকে একটা ছোট অয়্যারলেস সেট বের করে মুখের কাছে ধরল। সে কিছু ইনফরমেশন পাচার করবে, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হোল আয়েশা আলিয়েভা। তাহলে আমাদের চিনতে পেরেছে?

চিন্তা করার সাথে সাথে আয়েশা আলিয়েভা পায়ে ভর দিয়ে একটু উঁচু হলো এবং ড্রাইভারের ঘাড়ের বিশেষ স্থান লক্ষ করে সজোরে রিভলবারের বাঁট চালাল সে। এবং সাথে সাথেই সিট টপকে ষ্টিয়ারিং হুইল হাতে নিল। গাড়িটা একটু ঝাঁকুনি খেয়ে একটু বেঁকে গিয়ে আবার ঠিক হয়ে গেল।

ঘাড়ের বাম পাশে কানের নীচে ঠিক মোক্ষম জায়গাতেই আঘাত লেগেছিল। আঘাত লাগার সাথে সাথেই দান পাশে দলে পড়েছিল ড্রাইভার। মাথাটা সিট এবং গাড়ীর দেয়ালের পাশে দুকে গিয়েছিল। দেহের মধ্যে ভাগটা সিটের উপর ছিল। আয়েশা আলিয়েভা সেটা ঠেলে নিচে নামিয়ে দিল। ড্রাইভারের দেহটা বেঁকে সিটের পাশে এমন করে ঠেসে গেছে যে, তার পক্ষে উঠা অসম্ভব।

সিটে ভাল করে বসে গড়ীর স্পীড বাড়ীয়ে দিল সে। পিছনের সিটে বসে ফাতিমা ফারহান এবং রোকাইয়েভা কাজ গুলো দেখছিল। আলিয়েভার হাতে গাড়ীর নিয়ন্ত্রন আসার পর হাঁফ ছেড়ে বাঁচল ফাতিমা ফারহানা এবং রোকাইয়েভা।

অন্যদিকে আয়েশা আলিয়েভা ভাবছিল অন্য জিনিস। গোয়েন্দা ড্রাইভার ইতিমধ্যেই কোন অথ্য পাচার করেছে কিনা? গাড়ীতে উঠার পর যত দূর মনে পড়ে গোয়েন্দা সে সুযোগ পায়নি। তার এ চিন্তা ঠিক কি না সে বিষয়ে নিশ্চিৎ হবার জন্য সে রিয়ারভিউ -এর দিকে উদ্ভিগ্ন ভাবে তাকিয়েছিল। সে গাড়ীর স্পীড বাড়ীয়ে, স্লো করে দিয়ে বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষা করল। না, কেউ ফলো করছেনা। তা হলে সে খবর পাচার করতে পারেনি। সবে সে চেষ্টা করতে যাচ্ছিল বলে মনে হয়।

আশ্বস্ত হল আয়েশা আলিয়েভা। ড্রাইভার তার গড়ীর নম্বরটা এবং অবস্থানটা যদি হেড অফিসে দিয়ে দিতে পারত, তাহলে এতক্ষনে ওরা চারদিক থেকে এসে ঘিরে ফেলত। ওদের সে ট্র্যাপ থকে বেরুনো কঠিন হতো। আল্লাহ্ একটা বড় সাহায্য করেছেন।

মুখ ফিরিয়ে ফারহানাকে লক্ষ্য করে আয়েশা আলিয়েভা বলল, যে ঠিকানায় যাচ্ছি সেখানে ড্রাইভার এবং গাড়ী সামাল দেয়ার ব্যবস্থা আছে তো?

আয়েশা আলিয়েভা কি বলতে চায় তা ফাতিমা ফারহানা বুঝল। বলল, আছে, নিশ্চিত থাকুন।

কারকভ সড়ক আলিয়েভা চেনে। এখানে বড় বড় কর্তাদের বাস। অনুসরণ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হবার জন্য অনেকটা পথ ঘুরে আলিয়েভা জিজ্ঞেস করল, কত নম্বর।

-বি-৭০০। আরেকটু সামনে। বলে দিব আমি। বলল ফারহানা। বি-৭০০ কম্যুনিস্ট পার্টি সেন্ট্রাল কমিটির সদস্য এবং পলিটব্যুরোর সদস্য কনষ্টাইন করিমভের বাসা। তিনি সরকারী বাড়িতে থাকেন, এখানে থাকে তাঁর বড় ছেলে ফরিদভ। তাঁর বয়স ৫০ এবং মস্কো মহানগরী কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সে। আজ পাঁচ বছর ধরে সে সাইমুমেরও সদস্য। তাঁর স্ত্রী হামিদাও সাইমুমের মহিলা ইউনিটে কাজ করে। মধ্য এশিয়ার মুসলমানদের মুক্তির চাইতে তাদের বড় কামনা আর কিছুই নাই।

ফরিদভ-এর বাড়ী সাইমুম প্ল্যাটফরম হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। কারকভ রোডের অপজিটে ষ্ট্যালিন এভিনিউ। ফরিদভের বাড়ীর পেছন দিকের গোপন দরজাটা খুললে ষ্ট্যালিন এভিনিউতে দাঁড়ানো অশতিপর কূটনীতিক ফেদর বেলিকভ এর বাসায় পৌঁছানো যায়। তিনি জাতিতে রাশিয়ান, কিন্তু বিয়ে করেছিলেন তাঁর সহপাঠী এক কাজাখ মেয়েকে। দীর্ঘ কয়েক যুগ তিনি বিভিন্ন আরব দেশে কূটনৈতিক দায়িত্ব পালন করেছেন। সে সময় থেকেই তিনি একদিকে স্ত্রীর প্রভাব অন্যদিকে ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর তিনি মধ্যপ্রাচ্য থাকতেই সাইমুমের আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি আজ মস্কোর সাইমুম ব্রাঞ্চের প্রধান উপদেষ্টা। তিনি সবকিছুই ছেড়ে দিয়েছেন সাইমুমকে। তাঁর বাড়ীতেই সাইমুম মহিলা ব্রাঞ্চের অফিস। তাঁর একমাত্র নাতনী হাসনা আইরিনা মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। মহিলা ইউনিটের সে অফিস সেক্রেটারী। এই মহিলা ইউনিটের অফিসে আসার জন্য ফরিদভ এবং বেলিকভ উভয়ের বাড়ীর পথই ব্যবহার করা হয়।

ফরিদভ এর বিরাট গেট পার হয়ে আলিয়েভার গাড়ী ফরিদভের গাড়ী-বারান্দায় প্রবেশ করল। গাড়ী থামতেই ফারহানা নেমে ভিতরে গেল। কয়েক মিনিট, তারপরই ফরিদভ এবং তাঁর স্ত্রী হামিদা ফারহানার সাথে বেরিয়ে এল। গাড়ীতে চাবি দিয়ে গাড়ী থেকে নামল আয়েশা আলিয়েভা। নামল রোকাইয়েভাও। হামিদা এগিয়ে এসে প্রথমে জড়িয়ে ধরল আয়েশা আলিয়েভাকে, তারপর রোকাইয়েভাকে।

কুশল বিনিময়ের পর আয়েশা আলিয়েভা ফারহানার দিকে তাকিয়ে বলল, গাড়ী ও ড্রাইভারের বিষয় বলছেন?

ফরিদভ এগিয়ে এসে বলল, তোমরা ভিতরে যাও মা, আমি জানি গাড়ী এবং ড্রাইভার দু'টোর অস্তিত্বই আমাদের জন্য বিপজ্জনক। আয়েশা আলিয়েভার হাত থেকে চাবি নিয়ে ফরিদভ গিয়ে গাড়ীতে বসল। বেরিয়ে গেল গাড়ী।

হামিদা সবাইকে নিয়ে ভিতরে চলে গেল। হামিদার বাড়ী পেরিয়ে সেই গোপন দরজা দিয়ে মহিলা সাইমুমের অফিস অর্থাৎ-ফেদর বেলিকভের বাড়ীতে গিয়ে বসল। তাদের সাথে হাসনা আইরিনা এসে যোগ দিল। তাঁর সাথে এল কিছু বিস্কুট ও গরম দুধ।

ফাতিমা ফারহানা সবার হাতে বিস্কুট তুলে দিয়ে দুধের গ্লাস এগিয়ে দিয়ে নিজে একটা গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল, আমি গোয়েন্দা বইতে এতদিন যা পড়েছি, তা আজ নিজ চোখে দেখলাম। বোন আয়েশা যেভাবে পেছনের সিট থেকে গিয়ে ড্রাইভারকে কাবু করে সিট দখল করল তা এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। সবচেয়ে বড় কথা ড্রাইভারকে সরকারী গোয়েন্দা বলে চিনতে পারাটা আমার কাছে এখনও এক স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে।

ফারহানার কথা শেষ হতেই রোকাইয়েভা বলল, মস্কোভা বন্দী শিবির থেকে সরকারী গাড়ীতে করে সরকারী প্রসাদে আসার পথে বোন আয়েশা যে ভাবে একাই তিন সশস্ত্র রক্ষীকে কাবু করেন সেটা বোন ফারহানা জানলে আজকের ঘটনাকে কোন ঘটনাই বলতেন না।

রোকাইয়েভা থামতেই সবাই বলে উঠল, কি সেই ঘটনা।

গরম দুধে চুমুক দিতে দিতে গোটা কাহিনী বলল রোকাইয়েভা, তারপর আজকের কাহিনী শোনাল ফারহানা।

সবাই যখন আনন্দ-বিস্ময় নিয়ে আয়েশা আলিয়েভার প্রশংসায় মুখ খুলছে, তখন আলিয়েভা ধীর কণ্ঠে বলল, আপনাদের মত আমিও বিস্ময় বোধ করছি। যা করেছি তাঁর যোগ্যতা আমার নেই, আল্লাহই নিজ হাতে আমাদের সাহায্য করেছেন। সুতরাং প্রশংসা কিছু করতে হলে তারই করতে হবে।

আয়েশা আলিয়েভার কথায় সবাই চুপ করল।

ফারহানা মুখ খুলল প্রথম। বলল আয়েশা আপা ঠিকই বলেছেন। আমাদের প্রতি পদক্ষেপই আমরা এটা দেখেছি। হামিদা বলল, আল্লাহ্ আমাদের কবুল করেছেন, তারই প্রমান এটা।

একটু থেমে আবার হামিদাই বলল, আল্লাহ্র এ সাহায্য পাওয়ার যোগ্যতা যদি আমরা বাড়াতে পারি, তাহলে দেখব বিজয় আমাদের খুবই নিকটে। মধ্য এশিয়ার মানুষের সাথে কম্যুনিস্ট সরকারের মানসিক বিভাজন সম্পূর্ণ হয়ে গেছে এবং তাঁর ফলে একটা দৈহিক ভাঙ্গনও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এটা চূড়ান্ত হওয়া একটা সময়ের ব্যাপার মাত্র।

হামিদা খালাম্মা থামল। কিন্তু কেউ আর কোন কথা বলল না। সবারই শূন্য দৃষ্টি সামনে। যেন সন্ধান করছে মুক্তির সেই সোনালী দিগন্ত কতদূর।

মস্কোতে ওয়ার্ড রেড ফোর্সেস- ‘ফ্র’-এর বড় বড় মাথাগুলো কয়েক দিনে ঘেমে উঠেছে। গেল কোথায় মেয়ে দুটি। বিমান বন্দর, বাস ষ্টেশন এবং রেলওয়ে ষ্টেশনগুলোকে বলতে গেলে সিল করে দেয়া হয়েছে, মস্কো থেকে তারা বেরুতেই পারেনা। মস্কোতেই তারা আছে। ড্রাইভার সমেত ট্যাক্সি লাপাত্তা, তারপর মস্কোভা নদী থেকে তাদের উদ্ধার থেকেও যে প্রমান পাওয়া গেছে তাতে এ বিশ্বাস আরও প্রবল হয়ে উঠেছে তারা মস্কোতেই আছে। কিন্তু কোথায় আছে, প্রাণপণ চেষ্টা করেও এর কোন হদিস তারা করতে পারেনি। মস্কোভা বন্দী শিবিরে যারা আছে তাদের সবার আত্মীয় স্বজনের বাড়ী সার্চ করা হয়েছে, কিন্তু কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। মস্কোভা বন্দী শিবিরেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে, কিন্তু কিছুই বের করা যায়নি। এই ব্যর্থতাকে মস্কোর কম্যুনিস্ট পার্টির মহাশক্তিধর ফার্ষ্ট

সেক্রেটারী, যিনি দেশের সব কিছুর ভাগ্য বিধাতা, বিষয়টাকে নিজের প্রেষ্টিজের সাথে যুক্ত করে ফেলেছেন। সরকারী প্রসাদের নিরাপত্তা প্রধানকে বরখাস্ত করা হয়েছে। মস্কোর নিরাপত্তা প্রধানকে ডেকে ধমকানো হয়েছে। সব মিলিয়ে বিষয়টা নিয়ে উপর তলা এখন আগুন। মস্কোর ঘরে ঘরে সার্চ ছাড়া মস্কোর নিরাপত্তা বিভাগ আর সব কিছুই করেছে।

এ ব্যাপারগুলোর সবই সাইমুমের নজরে আছে। আয়েশা আলিয়েভা এবং রোকাইয়েভাকে বেশীদিন মস্কো রাখা ঠিক হবেনা, এটা চিন্তা করেই মস্কোর সাইমুম শাখা একটা প্লান তৈরি করেছে ওদের মধ্য এশিয়ায় পাঠাবার জন্য।

প্রতি ১৫দিনে একবার একটা বিশেষ ট্রেন মস্কো থেকে তাসখন্দ যায়। বিলাসবহুল এ বিশেষ ট্রেনটি মূলত ভ্রমণকারীদের জন্য, যারা বৈচিত্রময় ল্যান্ডস্কেপ দেখতে ভালবাসে। বিদেশীদের জন্য এ ট্রেনটি একটা বড় আকর্ষণ। যারা সোজা তাসখন্দ যেতে চায় এমন স্বদেশী যাত্রীও এতে ওঠে। এ ট্রেন্টির সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হলো মাঝখানে তেল নেবার জন্য একবার দাঁড়ানো ছাড়া আর থামে না, যাত্রি উঠানামা কোথাও আর করেনা।

নিয়ম হলো, এ ট্রেনে টিকেটের জন্য ফটো সমেত দরখাস্ত করতে হয়। দরখাস্তের পর বিশেষ টিকিট কার্ড ইস্যু করা হয়। সে কার্ডে প্যাসেঞ্জারের ফটো জুড়ে দেয়া থাকে। এই টিকিট কার্ড মূলত একটা আইডেন্টিটি কার্ডই। সাইমুম ঠিক করছিল ট্রেনেই আয়েশা আলিয়েভা ও রোকাইয়েভার জন্য নিরাপদ হবে। এর সব চেয়ে ভাল যে দিকটা সাইমুম বিবেচনা করছে সেটা হলো, সামনের তারিখে এ ট্রনের ডাইরেক্টর যিনি তিনি একজন উজবেক। নাম আবু আলী সুলেমানভ। আফগানযুদ্ধে তার দুই ছেলে মারা গেছে। যুদ্ধের শুরুতে যে উজবেক ব্রিগেডকে আফগানিস্তানে পাঠানো হয়, তাতে তার দুই ছেলে শামিল ছিল। সুলেমানভ মনে করে তার ছেলেদের জোর করে যুদ্ধে পাঠিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। লাশ পর্যন্ত সে পায়নি। সেই থেকে সুলাইমানভ কম্যুনিস্ট সরকারের উপর ভীষণ ক্ষুব্ধ। তারপরই সাইমুমের সাথে তার যোগাযোগ হয়। মুসলিম মধ্য এশিয়াকে কম্যুনিস্ট অক্টোপাস থেকে মুক্ত করার জন্য সুলেমানভ এখন একনিষ্ঠভাবে কাজ করছে। এই সুলেমানভই আশ্বাস দিয়েছে এই ট্রেন অন্য মাধ্যমের চেয়ে

অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। ট্রেনে বেশ কিছু রেলওয়ে পুলিশ থাকে। এরাই পথের সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করে। কিন্তু ভয়ংকর কিছু নয়। এরা দুরনিতিবাজ, বেশীর ভাগ সময় ঘুমিয়েই কাটায় এই বিশেষ ট্রেনটির জন্য টিকিট কার্ড ইস্যু করে রেলওয়ে বিভাগ, কিন্তু OK করে নিরাপত্তা বিভাগ।

ঠিক হয়েছে আয়েশা আলিয়েভা এবং রোকাইয়েভাদের জন্য নকল ফটো দিয়ে টিকিট কার্ড তৈরী হবে। নকল ফটোর টিকিট কার্ড যাবে নিরাপত্তা বিভাগে পাশের জন্য। সেখান থেকে পাশ হয়ে আসার পর ফটোর উপরের অংশ পাল্টে ফেলা হবে। এ কাজ রেলওয়ে দফতরে অনেক হয় পয়সার বিনিময়ে। শেষ মূহুর্তে টিকিট কার্ড বদলের ব্যাপারটা সম্ভব হয়না বলে, নতুন কাউকে এ্যাকোমোডেট করার জন্য এটা করা হয়। সেখানকার দায়িত্ব সুলেমানভ নিজেই নিয়েছে। কার্ড হয়ে গেল।

মস্কোর মহিলা ইউনিট, ছাত্রী ইউনিট সকলের কাছে বিদায় নিল আয়েশা আলিয়েভা এবং রোকাইয়েভা। গাড়ীতে করে ফাতিমা ফারহানা খাদিজায়েভা এবং হাসনা আইরিনাই তাদের পৌছে দিল দক্ষিণ মস্কোর রেল ষ্টেশনের সুলাইমানভের অফিস বারান্দায়। পৌছে দিয়ে বিদায় নিয়ে তারা ঘুরে দাঁড়াল আসার জন্য। আয়েশা আলিয়েভা ফারহানার হাত ধরে এক পাশে টেনে নিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, কিছু বলবে তাঁকে? মুখে তার দুষ্টুমির হাসি।

-কাকে? তার চোখে কিছুটা বিস্ময়।

-তাঁকে।

-কাকে?

-ইস, কাকে আবার নেতাকে।

মুখে এক ঝলক রক্তের ছোপ লাগল যেন ফারহানার। লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল তার মুখ। কিন্তু নিজকে সামলে নিয়ে গম্ভীর কন্ঠে বলল, এসব কথায় তার অবমাননা হয়, তিনি অনেক বড়।

আয়েশা আলিয়েভা ফারহানার হাত দুটি টেনে নিয়ে তাড়াতাড়ি বলল, এটা আমার একটা নির্দোষ আবেগ মাত্র। মাফ কর বোন, আল্লাহ নিশ্চয় আমাকে ক্ষমা করবেন।

ফাতিমা ফারহানা আয়েশা আলিয়েভার কপালে একটা চুমু দিয়ে বলল, আমরা দূর্বলতার উর্ধ্বে নই। সে জন্য সব সময় আমাদের আল্লাহর সাহায্য চাওয়া উচিত।

-এ দূর্বলতা কি সব সময় অন্যয়? বলল আয়েশা আলিয়েভা।

-মানব মনের এ এক স্বভাব অনুভূতি। শরীয়তের সীমা না ডিঙালে এটা অপরাধ নয় বলে আমি মনে করি।

এ সময় রেলওয়ের ষ্টেশন মাইকে তাসখন্দ ট্যুরিষ্ট এক্সপ্রেসে যাত্রীদের আসন নেয়ার জন্য অনুরোধ করা হল।

আর কথা বলল না কেউ। আয়েশা আলিয়েভা ফারহানার একটা হাত টেনে নিয়ে মৃদু চাপ দিয়ে বলল, আসি বোন, আবার দেখা হবে খোদা হাফেজ।

ফারহানাকে বিদায় দিয়ে রোকাইয়েভার হাত ধরে দু'জনে এক সাথে প্রবেশ করল সুলাইমানভের অফিসে। লংকোটে ঢাকা তাদের গোটা শরীর। মাথায় পশমের টুপি। তা কপাল এবং দু'গালের একাংশ পর্যন্ত ছাড়া গোটা দেহটাই ঢাকা।

সুলেমানভ তাদের জন্যই অপেক্ষা করছিল। তারা ঘরে ঢুকতেই সে উঠে দাঁড়াল। কাছে এসে মুখ নিম্নমুখী রেখেই বলল, আমরা প্রাইভেট দরজা দিয়ে প্ল্যাটফরমে ঢুকব। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করবে না। তবু কেউ জিজ্ঞেস করলে নতুন নাম বলবেন। আয়েশা আলিয়েভা হবেন লিলিয়েভা এবং রোকাইয়েভা হবেন নিনিয়েভা। এই নামেই টিকিট কার্ড হয়েছে। ট্রেনের গোটা সময়ে আপনারা এ নামেই পরিচিত হবেন। কথা শেষ করে ঘুরে দাঁড়াল সুলেমানভ। তারপর 'আসুন' বলে চলতে শুরু করল।

খুব স্বাভাবিক ভংগিতেই হেঁটে চলছিল। দেখলে মনে হয় তিনজন রেলওয়েরই কেউ হবেন। রেলওয়ে সিকুইরিটি ব্যবস্থার মধ্যে দিয়েই তারা চলছিল। প্রবীন সুলেমানভকে দেখে সবাই রাস্তা ছেড়ে দিয়েছে। প্ল্যাটফরমে এসে পৌঁছল ওরা। বামদিকে প্ল্যাটফরমের গেটটি দেখতে পেল আয়েশা আলিয়েভা। সেখানে বিরাট লাইন। রেলওয়ে কর্মচারীদের সাথে সিকুইরিটির একদল লোক সবার টিকিট কার্ড পরীক্ষা করছে। কার্ডের ফটোর সাথে মিলিয়ে দেখছে বিশেষ

মানুষকে। অনেকের মাথায় টুপি, হ্যাট খুলে মিলিয়ে দেখছে। বিশেষ করে মহিলা যাত্রীদের ক্ষেত্রেই এ কড়াকড়িটা  বেশী দেখা যাচ্ছে।

প্ল্যাটফরমে পাশাপাশি চলতে চলতে সুলেমানভ নিম্ন স্বরে বলল, ট্রেনে উঠার পর আপনাদের দায়িত্ব আমি অবশ্যই পালন করব। তবে কোন অসুবিধা না হোক, আমি প্রার্থনা করি।

ট্রেনে দুই সিটের বেশ কিছু রিজার্ভ বার্থ আছে। স্বস্ত্রীক এবং বিলাসী পার্টি বস অথবা বিশেষ বিদেশী কোন রাষ্ট্রীয় মেহমানের জন্য এসব বার্থ রাখা হয়েছে। সুলেমানভ এ ধরনেরই একটি বার্থ যোগাড় করেছে আয়েশা আলিয়েভাদের জন্য। ইঞ্জিনের পরে কয়েকটি লাগেজ ভ্যান। তারপর প্যাসেঞ্জার কম্পার্টমেন্টের প্রথম বার্থ সেটা। সুলেমানভ বার্থটি আয়েশা আলিয়েভা ও রোকাইয়েভাকে দেখিয়ে চলে গেল।

বার্থ দেখে দু'জনে খুশী হলো। দীর্ঘ পথ আরামেই যাওয়া যাবে। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লে ঝামেলা থেকেও বাঁচা যাবে। বিশেষ করে একপ্রান্তের ঘর হওয়ার কারণে নিরিবিলিই থাকা যাবে। ঠিক ন'টায় ট্রেন ছেড়ে দিল। ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলের মধ্যে এটা অত্যন্ত দ্রুতগামী ট্রেন। ঘন্টায় একশ' মাইল চলে। মস্কো থেকে তাসখন্দ রেলপথ দু'হাজার মাইল। সময় লাগবে বিশ ঘন্টা। মাঝখানে ট্রেন একবার থামবে। ইউরোপ থেকে এশিয়ার প্রবেশ মুখে ইউরাল পর্বতমালার গোড়ায়। ইউরাল নদীর তীরে। ইউরাল শহরে তেল নেবার জন্য। সেটা সকাল ৭টায়। তারপর একেবারে গিয়ে তাসখন্দে থামবে সন্ধ্যা ৫টার দিকে।

ট্রেন এখন ফুলস্পীডে চলছে। বার্থের দরজা বন্ধ করে দু'জন শুয়ে পড়ল। ভোর পাঁচটায় তাদের ঘুম ভাঙল। উঠে ওজু করে নামাজ পড়ল। ভালই কাটল রাতটা। সামনে একটা দিন বাকী। ট্রেনে কি আর কোন চেকিং হবে? রেল পুলিশকে তেমন ভয় নেই, কিন্তু 'ফ্র' -এর লোক কি ট্রেনে নেই? না থাকাটাই অবিশ্বাস্য। আলিয়েভা জানে কম্যুনিষ্ট সরকারের গোয়েন্দা থাকেনা এমন কোন জায়গা নেই। বিশেষ করে পাবলিক প্লেস, গণ-সমাবেশের ক্ষেত্রগুলোতে তারা না

থেকেই পারেনা। ট্রেন এমনই একটি জায়গা। এই ট্রেনে বিদেশীরা, গণ্যমান্য পার্টির বসরা থাকেন, অতএব তারা না থেকেই পারেনা।

এসব নানা কথা ভেবে আয়েশা আলিয়েভা রোকাইয়েভাকে বলল, রিভলভার কাছে রেখো, সাবধান থাকতে হবে আমাদের। দিনের আলোতে কারো নজরে পড়ে যাবার সম্ভাবনা আমাদের আছে।

এ ট্রেনে রুম সার্ভিসের ব্যবস্থা আছে। সুতরাং বাইরে না বেরুলেই চলে। তারা ঠিক করল, খাওয়া-দাওয়া সেরে আরেকবার আচ্ছা করে ঘুমাবে তারা। রোকাইয়েভা বলল, ট্রেনের কোথায় কি আছে, কারা কোথায় রয়েছে, এসব একবার দেখে নিলে হতোনা?

আলিয়েভা খুশী হয়ে বলল, ঠিক আছে রোকাইয়েভা।

ওরা বেরিয়ে গোটা ট্রেনটা একবার দেখে এল। ট্রেনের ডাইরেক্টরের রুমের পাশেই রেলওয়ে পুলিশের রুম। এরপর ট্রেনে একটা ক্যানটিন আছে। এ কয়টি বাদে অন্য সবগুলো প্যাসেঞ্জারদের জন্য ট্রেনে লম্বালম্বী দীর্ঘ করিডোর রুমগুলোর সামনে দিয়ে এসেছে। এ করিডোর দিয়েই একবার ঘুরে এল আয়েশা আলিয়েভা ও রোকাইয়েভা। অধিকাংশ রুমের দরজা বন্ধ। কারো কারো সাথে দেখা হল করিডোরে। পাঁচজন পুলিশকে পুলিশ রুমের সামনেই দেখা গেল।

ঘুরে এসে তারা নাস্তা খেতে বসল। গাড়ির গতি এ সময় কমে এল, এক সময় থেমে গেল গাড়ী। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আয়েশা আলিয়েভা সামনের দিকে তাকিয়ে দেখল সামনেই ব্রিজ--ইউরাল নদীর উপর। নদীটি ইউরাল পর্বতমালা থেকে বেরিয়ে কাস্পিয়ান সাগরে গিয়ে পড়েছে। ইউরালস্ক নগরীর নদী তীরের সামান্য অংশ নজরে আসছে। ঘরবাড়ী ও মানুষের আচার আচরণে এখানে ইউরোপীয় ধাঁচটাই মূখ্য। তবে এখানকার পল্লী জীবনে কাজাখদের অনেক বৈশিষ্ট্যই চোখে পড়ে। বহুদিন আগে আয়েশা আলিয়েভা মস্কো যাবার পথে এই ইউরালস্কে ক'দিন ছিল। গাড়ীর জানালা দিয়ে রোকাইয়েভাও একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল বাইরে, কিন্তু তার দৃষ্টি যেন এখানে নেই, কোথায় যেন হারিয়ে গেছে।

রোকাইয়েভার দিকে তাকিয়ে আয়েশা আলিয়েভা বলল, কারও কথা নিশ্চয় মনে পড়ছে রোকাইয়েভা?

-পড়ছে।

-কার কথা?

-দাদীর কথা। আর কেউ নেই আমার। জানিনা কোথায় আছেন তিনি, দেখতে আর পাব কিনা?

-ভেবনা রোকাইয়েভা, সাইমুম আমার এবং তোমার খোঁজ যখন পেয়েছে, তখন তোমার দাদী তাদের নজরের বাইরে নয়।

-ঠিক বলছব। আমার দাদীকে গিয়ে দেখতে পাব?

-আমার ধারণা মিথ্যা না হলে জুবায়েরভ তার ব্যবস্তা করেছে। এতক্ষণে রোকাইয়েভার মুখে হাসি ফুটে উঠল। টিক বলেছ। জুবায়েরভ প্রতিটি বিপদ মুহূর্তে অদৃশ্য থেকেও আমাদের পাশে দাড়িয়েছেন।

-দেখেছ তাকে?

-না।

ইচ্ছা হয়নি কখনও?

রোকাইয়েভা আলিয়েভার দিকে চেয়ে একটু ভ্রকুটি করে বলল তোমার প্রশ্নটা সরল নয়। জুবায়েরভ নিশ্চয় সাইমুমের ভালো কর্মী।

আয়েশা আলিয়েভা একটু মুখ টিপে হাসল। কোন জবাব দিল না। কথা বলল রোকাইয়েভাই আবার। বলল দেশে যাচ্ছি, তোমার কারও কথা মনে পড়ছেনা ?

-আমার কেউ নাই।

-কেউ নাই?

-নেই।

বুকে হাত দিয়ে বল, কেউ নেই? কারও কথাই তোমার মনে পডছেনা?

আয়েশা আলিয়েভা কথা বলল না। তার চোখটা উজ্জল, মুখটা কেমন আরক্তিম হয়ে উঠল। বলল, তোমার ইংগিত বুঝেছি রোকাইয়েভা, এমন কতই তো ভাবতে পারি।

-কত নয়, একটাই ভাবতে পার।

-কিন্তু সে ভাবাটা যদি অন্যায় হয়। তার প্রতি অবিচার হয়? গলাটা একটু ভারী আয়েশা আলিয়েভার।

-এ প্রশ্নের জবাব কি তোমার চাই আলিয়েভা?

আমি আর কোন কথা বলব না, বলে রোকাইয়েভার পিঠে একটা ছোট কিল দিয়ে উঠে গিয়ে বাথে শুয়ে পড়ল সে।

গাডী তখন নডে উঠেছে চলতে শুরু করেছে। রোকাইয়েভাও উঠে গিয়ে তার সিটে শুয়ে পড়ল।

ট্রেন চলছে তখন ইউরাল পার্বত্য ভুমির উপর দিয়ে। এ পার্বত্য অঞ্চল পেরুলেই তুরান সমভূমি কাজাখদের এলাকা।

ঘুমিয়ে পড়েছিল আয়েশা আলিয়েভা এবং রোকাইয়েভা দু'জনেই। দরজার ঠক ঠক শব্দে তাদের ঘুম ভাঙল। ঘুম থেকে উঠে দু'জনে দু'জনার মুখের দিকে তাকাল। উভয়েরই চোখে জিজ্ঞাসা, কে হতে পারে? টিকিট চেকার? নাকি পুলিশ? অথবা ডাইরেক্টর সুলেমানভ? আয়েশা আলিয়েভা উঠে দাড়াল। কাপড়-চোপড় ঠিক করে নিয়ে দরজার দিকে গিয়েও আবার ফিরে এল। এসে ওভার কোটটি গায়ে চাপাল সে।

দরজার খুলল আলিয়েভা। দরজার মাঝারী বয়সের সুঠাম স্বাস্থ্যের দু'জন লোক। তারা খোলা দরজা পথে ঘরে ঢুকল। আনুমতির অপেক্ষা করল না। আলিয়েভা তাদের পিছনে পিছনে এল ঘরে। ওরা ঘরের চারদিকে একবার নজর করে ওদের দু'জনের দিকে আরেকবার ভালো করে তাকিয়ে বলল আপনাদের টিকিট কার্ড দেখি।

দু জনে টিকিট কার্ড বের করে ওদের হাতে দিল। কার্ড দু'টির উপর নজর বুলিয়ে আয়েশা আলিয়েভার দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনার নাম?

-কার্ডই তো লিখা আছে। বলল আয়েশা আলিয়েভা।

তারপর ঐ লোকটিই রোকাইয়েভার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল আপনার নাম?

-নিনিয়েভা। বলল রোকাইয়েভা।

ওদের দু'জনের চোখে একটা সংশয়-সন্দেহ স্পষ্টই ধরা পড়ল আয়েশা আলিয়েভার কাছে।

ওরা পরিচিতি কার্ড নিয়ে ঘর থেকে বেরুবার জন্য ফিরে দাঁড়াল। তারপর বলল, আপনারা দু'জনে এখনি আসুন আমাদের সাথে। বলে তারা রুম থেকে বেরুল।

আয়েশা ওভারকোট পরেই ছিল রোকাইয়েভাও পরে নিল। তারপর ওদের পিছু পিছু বেরিয়ে এল রুম থেকে। আয়েশা আলিয়েভার দুটো হাত ওভারকোটের দুই পকেটে। পকেটের দু'টো হাত গিয়ে স্পর্শ করেছে সাইলেন্সার লাগানো দু'টো রিভলভারকে। সেই পুলিশ রুমে তারা এল। ওদের সাথে সাথে আয়েশা আলিয়েভা এবং রোকাইয়েভাও প্রবেশ করল সে ঘরে। পুলিশ পাঁচজন ঘরে বসে ঝিমুচ্ছিল। সেই দু'জন ওদেরকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলল। বুঝা গেল পুলিশরা অনিচ্ছা সত্বেও উঠে দাঁড়াল এবং এমন করে তাকাল যাতে মনে হল কেউ বসে মজা করবে, কেউ বাইরে দাঁড়িয়ে সময় গুনবে এতে তাদের ঘোর আপত্তি।

ওরা বেরিয়ে গেল। সাথে সাথে অটোমেটিক দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আয়েশা আলিয়েভা নিশ্চিত হল এরা রেলওয়ের নয় গোয়েন্দা বিভাগের লোক। আর দেখলেই বুঝা যায় লোক দু টি লম্পট চরিত্রের। গোয়েন্দা দু'জন গিয়ে পাশাপাশি চেয়ারে বসল। ধীরে সুস্থে মুখ খুলল একজন, আমরা আপনাদের সাহায্য করতে চাই। কথা বলার ধারাটাই কেমন কুৎসিত ধরনের, আয়েশা আলিয়েভা সে দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে জিজ্ঞেস করল কি সাহায্য ?

-আপনাদের পরিচয় আমরা জানি। দাঁত বের করে উত্তর দিল সাথের লোকটি।

-কি পরিচয় ? জিজ্ঞেস করল আয়েশা আলিয়েভা।

তাদের একজন তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দিয়ে দু'টো ফটো বের করল। বলল এই দেখুন আপনার ছবি। আপনারা মস্কুভা বন্দি শিবির থেকে... কথা শেষ না করেই লোকটা উঠে দাঁড়াল এবং একটা কুৎসিত হাসির সাথে আলিয়েভার দিকে এগিয়ে এল। আয়েশা আলিয়েভা একটু সরে দাঁড়াল। পাশের লোকটাও

উঠে দাঁড়িয়েছে। খপ করে একটা হাত ধরে ফেলেছে সে রোকাইয়েভার। রোকাইয়েভা এক ঝটকায় তার হাত খুলে নিয়েছে।

এদিকের লোকটা বলল দেখুন আপনারা আবার সেই জেলে জান তা আমরা চাইনা। যদি....

কথা শেষ না করেই লোকটা আবার এগিয়ে এল আয়েশা আলিয়েভার দিকে। ওদিকের ঐ লোকটি এক পা এক পা করে আগুচ্ছে রোকাইয়েভার দিকে। ওদের চোখে মুখে লাম্পট্যের শয়তানী নাচ।

আয়েশা আলিয়েভার দু হাত তখনও ওভার কোটের পকেটে। বিদ্যুৎ বেগে রিভলভার সমেত তার একটি হাত বেরিয়ে এল। লোকটার বুক বরাবর তাক করে বলল আর এক পা এগুলে...

মুহূর্তের জন্য লোকটির চোখ ছানাবড়া হয়ছিল। কিন্তু তার পর সে দ্রুত হাত দিল পকেটে। কিন্তু তার হাত পকেট থেকে বেরুবার আগেই আয়েশা আলিয়েভার রিভলভার অগ্নি উদগীরন করল। লোকটি ঝরে পড়ল মেঝের উপর।

গুলি করেই আলিয়েভা আপর লোকটির দিকে ঘুরে দাঁড়াল। দেখল লোকটি ঝাঁপিয়ে পড়েছে রোকাইয়েভার ওপর। রোকাইয়েভার হাতেও রিভলভার। আলিয়েভা তার রিভলভারের ট্রিগার চেপে ধরল আরেকবার। সেই সাথে রোকাইয়েভার রিভলভারও অগ্নি উদগীরন করল। লোকটা বোটা থেকে খসে পড়া পাকা ফলের মতই ঝরে পড়ল মেঝের উপর। লাফ দেয়া অবস্থাতেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মেঝেতে।

তাড়াতাড়ি রিভলভার পকেটে ফেলে তারা দরজা খুলে বেরিয়ে এল রুম থেকে। সাইলেন্সার থাকায় গুলির কোন শব্দ হয়নি। কিন্তু দরজা খোলার সাথে সাথে বারুদের গন্ধ বেরিয়ে এল।

তাদের তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে দেখে মনে হল পুলিশরা একটু কৌতুক আনুভব করল। দু'জন পুলিশ দরজার দিকে এগিয়ে এল। ঘরের ভেতর চাইতেই তাদের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। তাদের এ অবস্থা দেখে অন্য তিনজনও এসে দরজার সামনে দাঁড়াল। বিস্ময়-আতংকে হা হয়ে গেল তাদেরও মুখ।

আয়েশা আলিয়েভা এবং রোকাইয়েভা তাদের পিছনেই দাঁড়িয়ে ছিল। তারা আবার রিভলভার হাতে তুলে নিল। আয়েশা আলিয়েভা তার দুহাতে দুটি রিভলভার উঁচিয়ে চাপা স্বরে বলল ঘরে ডুকে যাও, একটু এদিক ওদিক করলে সবার মাথা উড়ে যাবে। দু জন পিছনে ফিরে তাকাল। তারপর সুড় সুড় করে সবাই ঘরে ঢুকে গেল। ঘরে ঢুকলে আয়েশা আলিয়েভা দ্রত দরজা বন্ধ করে দিল। দেখল ঘরের চাবিটা দরজাতেই ঝুলছে। দরজায় চাবি লাগিয়ে দিল সে।

মাত্র দু তিন মিনিটের মধ্যে সাংগ হয়ে গেল এসব ঘটনা। পুলিশ রুমটি পেছনের দিকের শেষ রুমে বলে এদিকে মানুষের আনাগোনা কম। আয়েশা আলিয়েভা খুশি হল। কারো চোখেই এ ঘটনা পড়েনি।

পাশেই ডাইরেক্টর সুলেমানভের রুম। তার রুম বন্ধ। আয়েশা আলিয়েভা একবার মনে করল তাকে সব কথা বলে আসে, কিন্তু পরে বল তার কিছু না জানাই ভালো। জওয়াবদিহী করতে সুবিধা হবে তার। রোকাইয়েভা বলল চল তাহলে এখন আমাদের রুমে যাই।

আয়েশা আলিয়েভা মাথা নেড়ে বলল না, আর রুমে নয়। অবশিষ্ট কয়েকঘন্টা এখানে দাঁড়িয়ে পাহারা দিয়েই কাটাতে হবে। শক্রুর শেষ হয়েছে কি না আমরা এখনও জানিনা।

ট্রেন তীব্র গতিতে এগিয়ে চলছে। অরল হ্রদকে ডান পাশে রেখে তুরান সমভূমি ধরে এগিয়ে যাচ্ছে। অরল হ্রদের পূর্ব পাশে পৌঁছে আর একশ মাইল দক্ষিণ পূর্বে এগুলেই সির দরিয়া পাওয়া যাবে। তারপর সির দরিয়ার তীর ধরেই ট্রেন চলবে প্রায় সাড়ে তিন শত মাইল। তাসখন্দের দেড়শ মাইল উত্তরে পৌঁছে ইসর দরিয়া একটু পশ্চিমে সরে গিয়ে তাসখন্দের মাইল পঞ্চাশেক দক্ষিণ দিয়ে এগিয়ে তাজিকিস্তানে প্রবেশ করবে। আর ট্রেন সোজা এগিয়ে যাবে তাসখন্দে।

বাইরে থেকে মুখ ফিরিয়ে চোখ বন্ধ করল আয়েশা আলিয়েভা। ট্রেনে তাদের উপর আর কোন আক্রমন হবে বলে মনে হয় না। অরল হ্রদের অরলঙ্ক শহর তারা পেরিয়ে এসেছে। তাসখন্দের কাছাকাছি অরিস জংশন ছাড়া মাঝখানে কিজিল ওরস নামে একটা ছোট্ট শহর আছে। কিন্তু ট্রেন থেকে ওয়ারলেস না করলে সেখান থেকে বিপদের সম্ভাবনা নেই, কারণ ট্রেন সেখানে থামেনা। আর

ওয়ারলেসতো সুলেমানভের কাছে। গোয়েন্দা দুজনের কাছেও হয়তো ওয়ারলেস ছিল, কিন্তু সেগুলো আর কোন কাজে আসছে না। এসব ভেবে খুব খুশী হলো আয়েশা আলিয়েভা।

কিন্তু এরপর কি, তার কিছুই জানে না আলিয়েভারা। শুধু এতটুকু তাদের বলা হয়েছে। ট্রেন সির দরিয়া এলাকায় পৌঁছার পর তাদের সব দায়িত্ব তাসখন্দ সাইমুমের উপর বর্তাবে। তারাই সব ব্যবস্থা করবে। বাইরের বাতাসে যেন সির দরিয়ার স্নিগ্ধ পরশ অনুভব করল আলিয়েভা। ওতে যেন নতুন জীবনের এক আশ্বাস। রোকাইয়েভা বাইরে তাকিয়েছিল। আলিয়েভাও তার দৃষ্টি মেলে ধরল বাইরে। তার চোখ দুটি খুঁজে ফিরছে সির দরিয়ার সবুজ উপত্যকা, তার রুপালী বুক।

# ৭

তাসখন্দ থেকে সত্তর মাইল উত্তরে আরিস রেলওয়ে জংশন। বেলা তখন সাড়ে তিনটা। ছোট্ট শহর আরিসের উপকন্ঠে এখানকার সাইমুম ঘাঁটিতে হাসান তারিক, আনোয়ার ইব্রাহিম, আরিসের সাইমুম প্রধান আলী খানভ জংশনের একটা মানচিত্র নিয়ে বসে। মানচিত্র বুঝিয়ে দিচ্ছে আলী খানভ। আলী খানভ আরিসের সিভিল ডিফেন্স ইউনিটের একজন ডাইরেক্টর। শেষ বারের মত পর্যালোচনা করছিল তারা আজকের অপারেশন প্ল্যানটার।

মস্কো থেকে খবর এসেছে গতরাত ৯ টায় তাসখন্দ ট্যুরিস্ট এক্সপ্রেস সেখান থেকে ছেড়ে এসেছে। আহমদ মুসার সাথে পরামর্শ করে তাসখন্দ সাইমুম সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আরিস জংশনেই আয়েশা আলিয়েভা এবং রোকাইয়েভাকে ট্রেন থেকে নামিয়ে নেয়া হবে। তাসখন্দ রেলওয়ে ষ্টেশনে এই অপারেশনকে সাইমুম বেশী ঝুঁকিপূর্ণ মনে করেছে।

আরিস রেলওয়ে জংশনে মোট ১৫ জন রুশীয় কম্যুনিস্ট অফিসার রয়েছে রেলওয়ে বিভিন্ন বড় বড় পদে। ১০০ জনের মত একটা সিকিউরিটি ইউনিট রয়েছে জংশনে। এদের মধ্যে অর্ধেক রুশ এবং অর্ধেক উজবেক ও কাজাখ মুসলিম। এখানকার উজবেক এবং কাজাখদের সংগ্রামকে সবাই পছন্দ করে। তারা হয়তো পক্ষে আসতে ভয় পাবে, কিন্তু সাইমুমের বিরুদ্ধে কিছুতেই তারা অস্ত্র ধরবে না।

এই অবস্থাকে সামনে রেখেই অপারেশন প্লান তৈরী করা হয়েছে। আরিসের পশ্চিম প্রান্তে শহর থেকে প্রায় দু'মাইল দূরে একটা আর্মি ব্যারাক আছে। সেখানে ৫০০ সৈন্যের একটা ব্রিগেড থাকে। তারা খবর পেয়ে আসার আগেই অপারেশন শেষ করার পরিকল্পনা নিয়েছে সাইমুম।

অপারেশনে নেতৃত্ব দেবে হাসান তারিক, কিন্তু সিকিউরিটি অপারেশনের দায়িত্বে থাকবে আনোয়ার ইব্রাহিম। তাকে সাহায্য করবে আলি খানভ।

ঠিক সাড়ে তিনটায় আলী খানভের ওয়ারলেস বিপ বিপ করে উঠল। সবার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, নিশ্চয় কোন খবর আছে কিজিল গুদা থেকে।

হ্যাঁ ঠিক। ওয়ারলেস থেকে কান সরিয়ে আলী খানভ বলল, কিজিল গুদার সাইমুম প্রধান জানাল তাসখন্দ ট্যুরিস্ট এক্সপ্রেস এখন তাদের শহর অতিক্রম করেছে।

সবাই খুশি হলো। হাসান তারিক বলল, সবাই দোয়া কর আমাদের বোনরা ভাল থাকুক।

তারপর আনোয়ার ইব্রাহিম ও আলী খানভের দিকে চেয়ে বলল, তোমাদের ইউনিট তো চলে গেছে ষ্টেশনে?

-হ্যাঁ।

-তাহলে চল আমাদেরও এবার উঠতে হবে। সবাই উঠে দাঁড়াল।

বাইরে দু'টো মাউন্টেন জীপ দাঁড়িয়ে ছিল। জীপগুলো সাধারণ পাহাড়ী পথে খুব সহজেই চলতে পারে। সবাই গিয়ে গাড়ীতে উঠল। একটাতে উঠল হাসান তারিক এবং দু'জন, অন্যটিতে উঠল আনোয়ার ইব্রাহিম, আলী খানভ এবং আরও কয়েকজন।

ঠিক তিনটা পয়তাল্লিশ মিনিটে হাসান তারিক ও আনোয়ার ইব্রাহিমরা ১নং প্ল্যাটফরমে প্রবেশ করল। এ রকম ৪টা প্ল্যাটফরম আছে। ৪টা প্ল্যাটফরমেই রেলওয়ে সিকুইরিটি লোকেরা ছড়িয়ে আছে। প্রত্যেকটা প্ল্যাটফরমেই ৫ জনের করে একটা সিকিউরিটি টিম টহল দিচ্ছে। টিমের নেতৃত্ব আছে একজন করে রুশ অফিসার। সাইমুমের টার্গেট এই রুশ অফিসার। সাইমুমের টার্গেট এই রুশ অফিসাররাই।

এক নং প্ল্যাটফরমের রয়েছে সিকিউরিটি অফিস। সিকিউরিটির রিজার্ভ লোকেরা এখানেই অবস্থান করে। দেখা যাচ্ছে মেস সদৃশ বিশাল হল ঘরে সিকিউরিটির লোকেরা কেউ বসে আছে, কেউ শুয়ে শুয়ে রেস্ট নেবার চেষ্টা করছে।

এক নম্বর প্ল্যাটফরমের সামনেই বিশাল যাত্রী বিশ্রামাগার। বিশ্রামাগারের দু'পাশ দিয়ে বাইরে যাবার দু'টো গেট। গেটের পরেই সড়ক। সাইমুমের দু'টো

গাড়ী প্ল্যাটফরমের উত্তর প্রান্তের অর্থাৎ বিশ্রামাগারের উত্তর পাশ দিয়ে বেরুনোর যে গেট তার মুখেই দাঁড়িয়ে আছে।

হাসান তারিক দেখল, প্ল্যাটফরমের সিকুউরিটির পাঁচ জন লোক টহল দিচ্ছে, তার মধ্যে রুশ অফিসারটি দাঁড়িয়ে আছে বিশ্রামাগারের দক্ষিণ পাশ দিয়ে যে গেট তারই কাছাকাছি জায়গায়। এখানেই যাত্রীর ভীড় বেশী হয়। যাত্রী বেশে সাইমুমের লোকেরাও পরিকল্পনা অনুসারে পজিশন নিয়েছে।

ঠিক ৪ টা ১৫ মিনিটে  তাসখন্দ ট্যুরিস্ট এক্সপ্রেস আরিস শহরে প্রবেশ করল। নিয়ম অনুসারে স্পীড তার কমে গেছে। জংশন এলাকায় পৌঁছুতে স্পীড তার আরও কমে গেল। গাড়ী এখানে দাঁড়াবে না বটে, কিন্তু ক্লিয়ারেন্স ডকুমেন্ট নেবার জন্য এটা তাকে করতে হয়।

৪টা ১৭ মিনিট। ট্রেন জংশন এলাকায় প্রবেশ করল। সংগে সংগে ১নং প্ল্যাটফরমের দক্ষিণ প্রান্তে রেল লাইনের উপর বিরাট বিস্ফোরণের শব্দ হলো।

সেখানকার রেললাইন উড়ে গেল। সিকিউরিটির লোকেরা সে দিকে ছুটল, সেই রুশ অফিসারও।

সিকিউরিটি অফিসেও তখন চাঞ্চল্য। যারা শুয়ে ছিল তারা উঠে বসেছে। যারা বসে ছিল তারাও উঠে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তারা বেরুবার সুযোগ পেল না। দেখল তারা, তাদের চোখের সামনে কয়েকজন মুখোশধারী লোক ছুটে এসে দরজা বন্ধ করে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিল। হল ঘরের দু'টো গেট, দু'টোই বন্ধ হয়ে গেল।

যেখানে বিস্ফোরণ হয়েছিল, সে এলাকা  থেকে গুলির শব্দ এল, সেই সাথে শ্লোগানঃ মুক্তির সাইমুম জিন্দাবাদ, জীবনের সাইমুম জিন্দাবাদ। গোটা প্লাটফরম এলাকা সাইমুমের দখলে চলে গেছে। বিভিন্ন দিক থেকে কিছু গুলি গোলার শব্দ এল। ষ্টেশনের কর্মচারীরা যে যেখানে ছিল সেখানেই বসে থাকল। বেরুলনা অথবা বেরুতে পারলনা। আর বাইরে যারা ছিল সাইমুমের শ্লোগান শোনার পর তারা গা ঢাকা দিল। রুশ অফিসাররা যারা প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করল তারা সাইমুম কর্মীদের গুলির মুখে পড়ল।

হাসান তারিক এবং আনোয়ার ইব্রাহিম ১ নং প্ল্যাটফরমের মাঝখানে যেখানে দাড়িয়েছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকল। পরিকল্পনা অনুসারেই ট্রেন থামানোর এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং সকলের মনোযোগের কেন্দ্র বানানো হয়েছিল দক্ষিণে প্ল্যাটফরমের বাইরের অংশকে, যাতে সিকিউরিটির দৃষ্টি সেদিকেই থাকে।

ট্রেনের ডাইরেক্টর সুলেমানভ জানত ট্রেনকে থামাতে বাধ্য করার পদক্ষেপের কথা তাই ট্রেনকে কোন বিপদে পড়তে হয়নি। বিস্ফোরণের সংগে সংগেই ট্রেনকে সামলে নিয়েছিল এবং ঠিকভাবে ট্রেনকে এনে প্ল্যাটফরমে দাঁড় করালো।

একেবারে প্ল্যাটফরমের প্রান্ত ঘেঁষে দাড়িয়েছিল হাসান তারিক ও আনোয়ার ইব্রাহিম। প্ল্যাটফরমে কোন লোক নেই। তাই ট্রেন যেমন নজরে পড়ছে, তেমনি ট্রেন থেকেও প্ল্যাটফরম নজরে পড়ছে।

ট্রেন প্ল্যাটফরমে প্রবেশ করে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। ট্রেনের করিডোরের জানালা কোনটা খোলা, কোনটা বন্ধ। কোন জানালাতেই কোন মুখ দেখছে না হাসান তারিক। চঞ্চল হয়ে উঠল সে, তাহলে কি..........

ট্রেন আরও এগিয়ে এল। প্রায় থেমে গেছে ট্রেন। ট্রেনের পেছনের শেষটা পযন্ত এবার দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ হাসান তারিক দেখল, করিডোরের জানালায় দু'টো মুখ। একজন হাত নাড়ছে হাসান তারিকের দিকে চেয়ে। ছুটে গেল হাসান তারিক সে দিকে। হাত নাড়া মেয়েটি তার মাথার হ্যাট খুলে ফেলছে, আয়েশা আলিয়েভা। চিনতে পারল হাসান তারিক।

চোখাচোখি হল। সর্বাঙ্গে একটা উষ্ণ স্রোত বয়ে গেল তার। আলিয়েভার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে হাসান তারিক করিডোরের দরজা টানাটানি করল। বন্ধ দরজায় তালা দেওয়া। এক মুহূর্ত দেরী তার সইছে না। দরজার কী হোলে গুলি করল হাসান তারিক। তারপর এক লাথিতে খুলে ফেলল দরজা। আয়েশা আলিয়েভা এবং রোকাইয়েভা নেমে এল গাড়ী থেকে।

হাসান তারিক আনোয়ার ইব্রাহিমের দিকে চেয়ে বলল, চল গাড়ীতে। তারপর আয়েশা আলিয়েভার দিকে ঘুরে বলল, এস।

তারা গেটের দিকে ছুটল। তারা দেখতে পেল, উত্তরের গেট দিয়ে কয়েকজন পুলিশ ছুটে আসছে। সাইমুমের রক্ষীরা পাশেই দাঁড়িয়েছিল। উঁচু হয়ে উঠল তাদের স্টেনগান। গেটের সামনে লুটিয়ে পড়ল পুলিশ কয়েকজন। হাসান তারিক দেখল দক্ষিন গেটের সামনেও কয়েকজন পুলিশের লাশ পড়ে আছে। এরা বিস্ফোরণ ও গুলির আওয়াজ শুনে বাইরে থেকে এসেছিল। ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারেনি। সাইমুমের পরিচয় পেলে ঐ উজবেক পুলিশেরা এভাবে আসতো না। হাসান তারিকের দুঃখ হলো ওদের জন্য। সিকিউরিটির লোকদের কাউকেই দেখা গেলনা। রুশরা নিশ্চয় সাইমুমের হাতে প্রান দিয়েছে। আরব, উজবেক, কাজাখরা ঘটনাস্থল থেকে চুপে চুপে সরে গেছে।

গাড়ি স্টার্ট দেয়াই ছিল। একটি জীপের সামনের সিটে হাসান তারিক উঠল, তারপাশে আলী খানভ। পেছনের সিটে আয়েশা আলিয়েভা এবং রোকাইয়েভা উঠে বসল।

অন্য গাড়িতে আনোয়ার ইব্রাহিম এবং অন্যান্যরা। গাড়ী নড়ে উঠল , যাত্রা শুরু করল তারা। হাসান তারিক আলী খানভকে বলল, তোমার লোকজন ফিরবে কখন ?

আলী খানভ বলল, দু নম্বর গেট এবং প্ল্যাটফরমের বাইরের গেটে তাদের গাড়ী আছে। কোন চিন্তা নেই, ওরা আমাদের পেছনে পেছনেই চলে।

গাড়ী তখন ফুলস্পিডে চলতে শুরু করেছে। হাসান তারিক আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল। কোন বড় ঘটনা ছাড়াই আল্লাহ্ তাদের সাফল্য দান করেছেন।

গাড়ী শহর থেকে বেরুবার পর একটি পার্বত্য পথে হাসান তারিকের পাশ থেকে আলী খানভ নেমে গেল। পেছনে সাইমুমের কর্মীদের যে দু টো গাড়ী আছে তারাও এখানে আলী খানভের সাথে এসে মিলিত হবে। তাদের কয়েকজন আলী খানভের সাথে এখানে থাকবে, অন্যরা ফিরে যাবে আরিসের সাইমুম ঘাটিতে। অবশিষ্টদের নিয়ে আলী খানভ এ গিরিপথ পাহারা দেবে যাতে শত্রুরা হাসান তারিকের পিছু নেবার সুযোগ না পায়।

হাসান তারিক ও আনোয়ার ইব্রাহিমের দু'টো গাড়ী আলী খানভ কে নামিয়ে দিয়ে কিরঘিজিয়ার রাজধানী ফ্রুনজের পথ ধরে ছুটল পূর্বদিকে। আসলে তাদের লক্ষ্য ফারগানা এবং তাসখন্দের মধ্যবর্তী সাইমুমের শহীদ আনোয়ার পাশা ঘাঁটি। সমরখন্দকে বাম পাশে রেখে যেখানে পামির সড়ক তাসখন্দের দিকে এগিয়ে গেছে , সেখান থেকে ৭০ মাইল পূবে এবং ফারগানা থেকে ৫০ মাইল পশ্চিমে উজবেকিস্তান ও কিরঘিজিস্তানের সংগমস্থলের দুর্গম পার্বত্য উপত্যকায় এই ঘাঁটি। আরিস থেকে তাসখন্দ হয়ে এখানে আসা যেতো, কিন্তু আরিস থেকে সোজা তাসখন্দের পথে আসা হাসান তারিক ঠিক মনে করেনি। গন্তব্য সম্পর্কে শত্রুদের বিভ্রান্ত করার জন্যই হাসান তারিক এ পথে এসেছে। ফ্রুনজের পথে মাইল পঞ্চাশেক এগিয়ে যাবার পর আরেকটা ক্যারাভান ট্রাক পাওয়া যায় যা দিয়ে পামির সড়কে পৌছা যাবে। এ পথে হাসান তারিক শহীদ আনোয়ার পাশা ঘাঁটিতে পৌছাবে ঠিক করেছে।

হাসান তারিকের গাড়ী তখনও দৃষ্টির বাইরে যায়নি। এমন সময় সেই পার্বত্য গিরিপথের এক টিলায় বসে আলী খানভ দেখল বিরাট আর্মি সাঁজোয়া আরিসের দিক থেকে এগিয়ে ছুটে আসছে।

সহকর্মীদের প্রতি সতর্ক সংকেত দিয়ে আলী খানভ টিলা থেকে দ্রুত নেমে পড়ল। তারপর দ্রুত সেই পার্বত্য পথের উপর গিয়ে উপস্থিত হলো। খুঁজে পেতে উপযুক্ত স্থান বেছে নিয়ে পর পর তিনটা রোড-মাইন পাতল। এমন জ্যামিতিক কোণ করে সেগুলো পাতল যাতে করে মিস হবার কোন ভয় রইল না।

মাইন পেতে সে রাস্তা থেকে সরে আসতে না আসতেই সেই সাঁজোয়া গাড়ী এসে পড়ল গিরিপথের মুখে। একটা পাথরের আড়ালে বসে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে আলী খানভ।

গাড়ী এসে গেছে, আর ৫০ গজ, ২০ গজ, হ্যাঁ এসে গেছে সেই কৌণিক অবস্থানে। সংগে সংগে প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ। একটা খেলনার মত উর্ধ্বে নিক্ষিপ্ত হয়ে ছিটকে পড়ল সাঁজোয়াটি । কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল এলাকাটা। ধোঁয়া যখন মিলিয়ে গেল, দেখা গেল গাড়ীটি টুকরো টুকরো  হয়ে গেছে, মানুষের কোন চিহ্ন নেই।

হাসান তারিকের গাড়ী তখন দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে। আলী খানভ প্রথম বিস্ফোরণের জায়গা থেকে অনেক পশ্চিমে গিরিপথটির মুখে আরো তিনটি মাইন পাতল একটা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে। কারণ, বাড়তি ব্যবস্থা হিসেবে এক বা একাধিক গাড়ী এই সাঁজোয়াটির পিছনে আসবে সেটাই স্বাভাবিক।

মাইন পাতা শেষ করে সাইমুম কর্মীদের নিয়ে আলী খানভ পার্বত্য উপত্যকার পথে আরিসের ঘাটির দিকে ফিরে চলল। ১৫ মিনিটও পার হয়নি। পিছন থেকে বিরাট বিস্ফোরণের শব্দ কানে এল। তারা পেছনে ফিরে দেখল গিরিপথের ঐ এলাকা থেকে কালো ধোঁয়ার কুন্ডলী উঠছে। খুশী হলো আলী খানভ, ফাঁদে আরেকটা শিকার পড়েছে। এখন হাসান তারিকের পিছু নেয়ার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন তাদের পক্ষে কঠিন হবে।

আরিস শহরে কম্যুনিস্ট সৈন্য এবং 'ফ্র' এর সামরিক ইউনিটের লোকজন গিজ গিজ করছে। ভয় এবং অপমান দু'টোই তাদের চোখে মুখে। সাইমুমের একটা চুলও তারা স্পর্শ করতে পারেনি, এই জন্যই ক্রোধটা তাদের খুব বেশী। সব ক্রোধ গিয়ে এখন পড়েছে আরিসের দেশীয় অর্থাৎ উজবেক এবং কাজাখ কর্মচারীদের উপর। উঁচু প্রাচীর ঘেরা আরিসের জেলখানায় তাদের এই জিঘাংসা বৃত্তিরই মহোৎসব চলছে কতগুলো নিরপরাধ মানুষের উপর।

সুলাইমানভকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে দু'জন গোয়েন্দা হত্যা ও রেলওয়ে পুলিশদের বন্দী করার ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অপরাধে। বলা হচ্ছে, তারই পাশের রুমে এটা ঘটেছে, সুতরাং তার যোগশাজস না থেকেই পারেনা, বিশেষ করে তার যখন কিছুই হয়নি।

বৃদ্ধ সুলাইমানভকে কথা বলানোর জন্য প্রথমে নির্মমভাবে প্রহার করা হয়েছে। চোখ বন্ধ করে মুখ বুঁজে পাহাড়ের মত সব সহ্য করেছে সে। নির্মম চাবুকের সাথে পিঠের চামড়া উঠে গেছে। বেদনায় কুকড়ে গেছে তার দেহ, নীল হয়ে গেছে মুখ। কিন্তু মুখ থেকে ওরা একটা কথাও বের করতে পারেনি।

অবশেষে তাকে নিয়ে এল বিদ্যুৎ আসনে। বিদ্যুৎ শকে বেদনায় কুকড়ে গেল তার দেহ, চোখ দু টি তার ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইল। কানেকশন সরিয়ে

তাকে বলা হলো এর পরের শকে আগের চেয়েও কঠিন অবস্থা তার জন্য অপেক্ষা করছে। যদি বাঁচতে চায় তাকে বলতে হবে সাইমুম সম্পর্কে সে কি জানে।

প্রথম শকের পরেই বৃদ্ধ সুলাইমানভের মাংসপেশিগুলো গভীর ক্লান্তি ও বেদনায় কাঁপছিল। কিন্তু চোখ তার স্থির, তাতে অদ্ভুত ঔজ্জ্বল্য। সে বলল, যে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত, তাকে শাস্তির ভয় দেখিয়ে তোমরা কি করবে? আমাদের এ দুর্ভাগা মুসলিম জাতির মুক্তির আন্দোলনের পতাকা ভূ-লুন্ঠিত ছিল অনেক দিন, তাকে আবার সাইমুম তুলে ধরেছে। আমি তাদের জন্য যদি জীবন দিতে পারি, সেটা আল্লাহর জন্যই জীবন দেয়া হবে, আমি গৌরবান্বিত হবো।

'ফ্র' মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সের প্রধান সার্জি সোকলভ পাশেই দাঁড়িয়েছিল। তার চোখ দুটি ভাটার মত জ্বলে উঠল, দেহের সমস্ত রক্ত যেন মুখে এসে জমা হলো। সে দু পা এগিয়ে এসে প্রচণ্ড এক লাথি মারল সুলাইমানভের মুখে। সুলাইমানভের বাম গাল থেকে এক খাবলা মাংস উঠে গেল লোহার কাঁটাওয়ালা বুটের আঘাতে। ঝর ঝর করে ছিটকে পড়া রক্ত প্রবাহে ভিজে গেল বিদ্যুৎ আসনের কাঠের পাটাতন।

সুলাইমানভ তার রক্ত ধোঁয়া মুখটি সোকলভের দিকে ফিরিয়ে বলল, আমার কোন দুঃখ নেই। যুগ যুগ ধরে তোমরা আমার দেশকে, আমার মুসলিম জাতিকে এ রকম পদাঘাতেই ক্ষত-বিক্ষত করেছ। আমি আজ তাদের দলে শামিল হতে পেরে আনন্দিত। তোমাদের অনেক হারাম টাকা আমার পেটে গেছে, তা এই ভাবে মাফ হয়ে গেলে আমি খুশী হবো।

চুপ কর কুকুর বলেই পাশ থেকে ভারী লোহার রোলারটি তুলে নিয়ে জোরে ছুড়ে মারল তার মুখে।

কিন্তু রোলারটি সুলাইমানভের মুখে না লেগে প্রচন্ডভাবে আঘাত করল গিয়ে তার কপালে। 'আল্লাহ' একটা শব্দই শুধু তার মুখ থেকে বেরুতে পারল। তারপর সব শেষ। থেতলে গুড়িয়ে গেছে তার মাথা। রক্তে ভেসে যাচ্ছে মেঝে।

আরিস স্টেশনের ৫০ জন সিকুইরিটির লোক এবং আরও অনেক সাধারণ কর্মচারী সহ প্রায় পাঁচশ উজবেক ও কাজাখ যুবককে গ্রেপ্তার করে এই জেলখানায় আনা হয়েছে।

গত কয়দিন ধরে তাদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চলছে। ঘন্টার পর ঘন্টা তাদের উঁচু করে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে। উত্তপ্ত ইস্পাতের চাবুক দিয়ে প্রহার করা হয়েছে, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তাদের নিষ্পেষিত করা হয়েছে। তাদের কাছে দাবী একটাই, সাইমুমের সাথে তাদের যোগশাজসের তথ্য 'ফ্র' কে দিতে হবে। বেচারারা কিছুই জানে না, কি তথ্য দেবে 'ফ্র' কে। সুতরাং তারা মার খেয়েছে আর রোদন করেছে।

অবশেষে 'ফ্র' মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সের সার্জি সোকলভ এবং 'ফ্র' এর নিরাপত্তা প্রধান কলিনকভ এসে উঁচু অবস্থা থেকে নামিয়ে সবাইকে এক লাইনে দাঁড় করিয়ে বলল, তোমাদেরকে শেষ বারের জন্য বলা হচ্ছে, তোমরা যদি সাইমুমের কোন খবর না দাও, তা হলে সবাইকে সাইমুমের সদস্য হিসেবে ধরা হবে। এবং আজ রাত ৭টা থেকে প্রতি ঘন্টায় এক একজনকে ফায়ারিং স্কোয়াডে মারা হবে। আর ইতিমধ্যে স্টেশনের ৫০ জন সিকিউরিটির দন্ডাজ্ঞা কার্যকর করা হচ্ছে।

বলার সংগে সংগে ৫০ সিকিউরিটির লোককে পিছ মোড়া করে বেঁধে কারাগারের দেয়াল বরাবর দাঁড় করানো হলো। তাদের সামনে বন্দুক নিয়ে দাড়াল আরও পঞ্চাশ জন। নির্যাতনে কয়েদীদের কান্নার সাধ্য ছিল না। তাদের চোখে উপায়হীন এক অসহায়তা।

প্রথম সংকেতের সংগে সংগে বন্দুক উচু হয়ে উঠল ফায়ারিং স্কোয়াডের। সেই পঞ্চাশ জনের মধ্য থেকে একজন বলল, আমার শেষ একটা কথা আছে, বলতে চাই।

সার্জি সোকলভের মুখটা উজ্জল হয়ে উঠল, তা হলে ওরা মুখ খুলছে। সে তার দিকে এসে বলল, তুমি বল, আমরা তোমাকে মুক্তি দেব।

-মুক্তির কথা নয়, আমার একটি প্রার্থনা আছে।

-কি প্রার্থনা? এখনও সোকলভের চোখে আশার আলো।

-কোন দিন নামাজ পড়ার সুযোগ হয়নি, শেষ সময়ে দু'রাকাত নামাজের সুযোগ প্রার্থনা করছি।

হো হো করে হেসে উঠল কলিনকভ এবং সার্জিও সোকলভ। দু'জনেই কিছু যেন ভাবল। একটা কৌতুকের হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটে। বলল, আর কে চাস তোরা এই কর্মটি করতে?

সবাই বলল, আমরাও চাই।

সবার হাতের বাধন খুলে দেওয়া হলো। কয়েকজন তায়াম্মুম করল। তাদের দেখে অন্যেরা সেই ভাবে তায়াম্মুম করল। বোঝা গেল, তারা তায়াম্মুম জানে না। জানবে কি করে? হাজার হাজার মাদ্রাসা মক্তব দেশের মাটি থেকে মুছে ফেলা হয়েছে। আরবী শিক্ষার লোক দুষ্প্রাপ্য। তার উপর কম্যুনিষ্ট আইনের কড়াকড়ি। এমন প্রার্থনা ট্রার্থনার খোজ পেলে জীবন জীবিকার দরজা বন্ধ হয়। সুতরাং জেনারেশনের পর জেনারেশন ধরে এটা চলার পর আজ বিশেষ করে বিপুল সংখ্যক যুবকের এই অবস্থা দাড়িয়েছে। অজু তায়াম্মুম তাদের অনেকে জানেনা।

কিন্তু আল্লাহ আছে, পরকাল আছে, এটা তাদের মন থেকে মুছে ফেলা যায়নি। সম্ভবত এই কারণেই আজ শেষ সময়ে আল্লাহর কাছে একবার হাজির হতে চায় ওরা।

পঞ্চাশ জন এক সাথেই নামাজে দাড়িয়েছে তারা। রুকুতে গেল।

সার্জি সোকলভ আঙুল তুলে কি যেন ইংগিত করল। সংগে সংগে পঞ্চাশটি বন্দুকের মাথা উচু হলো।

রুকু থেকে উঠে দাড়িয়েছে তারা। সিজদায় যাবার জন্যে তাদের দেহ ঝুকেছে মাত্র।

তার আগেই সার্জি সোকলভ নির্দেশ দিল, 'ফায়ার'।

পঞ্চাশটি বন্দুক এক সাথে গর্জে উঠল। সিজদার জন্য পঞ্চাশটি দেহ ঝুঁকতে যাচ্ছিল। গুলিতে পঞ্চাশটি দেহ মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সামনে। পড়ে গিয়ে পড়েই থাকল। নড়লনা কোন দেহ। সেজদা তারা দিতে পারলনা, কিন্তু এ যেন আরেক সেজদা, যে সেজদা থেকে কোন দিনই তারা আর উঠবেনা।

সার্জি সোকলভ এবং কলিনকভ দু'জনেই হো হো করে হেসে উঠল। নিবার্ক স্পন্দনহীন ভাবে দাড়িয়ে থাকা ৫০০ যুবকের দিকে চেয়ে সোকলভ বলল, মুসলমানদের আল্লাহ নাকি সর্ব শক্তিমান, দেখলি তো শক্তির জোর।

বলে আবার হো হো করে হেসে উঠল দু'জনে।

সোকলভ ঘড়ির দিকে চেয়ে বলল, আর এক ঘন্টা আছে, তোরা এদের মত মরবি না বেচে থাকতে চাস ঠিক কর। আমরা এক ঘন্টা পরে আসছি।

চলে গেল ওরা। এদিকে পাঁচশ যুবক বেচে থেকেও মরার মত। এদের অধিকাংশই চাকুরে। ছাত্রও আছে। যুব কম্যুনিষ্ট লীগ এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্যও এদের মধ্যে আছে। এরা আধুনিক জীবন যাপন করে, এদের অনেকেরই হয়তো সাইমুমকে ভালো লাগে, সমর্থনও করে হয়তো আরও অনেকে, কিন্তু সাইমুমের কিছু জানেনা এরা, কোনই সম্পর্ক নেই সাইমুমের সাথে এদের। সুতরাং এরা বুঝতে পারছেনা এদের অপরাধ কি? সুতরাং ভয়, হতাশা এদের আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। আসন্ন পরিণতির কথা ভেবে অধিকাংশই কাঁদছে, বিলাপ করছে।

এই কান্নার মধ্যে একজন বলে উঠল, ভাইসব, কেঁদে কোন লাভ নেই, কান্না আমাদের মৃত্যু ঠেকিয়ে রাখতে পারবেনা। বরং আসুন হাসিমুখে বীরের মৃত্যু বরণ করি। আমাদের পূর্ব পুরুষরা কাপুরুষ ছিলেন না, কিন্তু কম্যুনিষ্ট ব্যবস্থা আমাদের ঈমান আকিদা কেড়ে নিয়ে, জাতীয়তাবোধ কেড়ে নিয়ে আমাদের কাপুরুষে পরিণত করেছে। তাই মৃত্যুকে এমন ভয় পাচ্ছি আমরা। ভাইসব, আমাদের কোন অপরাধ নেই, একটাই অপরাধ, আমরা মুসলিম। আমরা সব বিসর্জন দিলেও জাতীয় পরিচয় বিসর্জন দেইনি। তাই সাইমুমের আমরা কেউ না হলেও আমরা অপরাধী। এটাই যদি আমাদের অপরাধ হয়, তাহলে এ অপরাধ নিয়ে আমাদের গর্ববোধ করা উচিৎ। এর জন্য যদি আমাদের মরতে হয় সে মৃত্যুকে আমাদের হাসিমুখে বরণ করা উচিত। সাইমুম আজ আমাদের সম্মানিত এবং অকুতোভয় পূর্ব পুরুষদের স্বাধীনতা ও মর্যাদার পতাকাকে ভূলুন্ঠিত অবস্থা থেকে উর্ধে তুলে ধরেছে। আমরা বাইরে থাকতে তাদের জন্য কিছু করতে পারিনি, আসুন মৃত্যুর মুখোমুখি দাড়িয়ে জাতির গৌরব সে বাহিনীর জয় ঘোষণা করি।

বলে সে তকবির ঘোষণা করল উচ্চ কন্ঠে। সংগে সংগে কারাগারের নিরবতা ভেঙ্গে পাঁচশ কন্ঠে জবাব এল, 'আল্লাহ আকবার।' সম্মিলিত কন্ঠে শ্লোগান উঠল, জীবনের সাইমুম, মুক্তির সাইমুম, জিন্দাবাদ।

কম্যুনিষ্ট কারাগারে বহু বছর, হয়তো বহু যুগ পর সম্ভবত এটাই প্রথম সম্মিলিত কন্ঠের, স্বাধীন কন্ঠের নিরুদ্বিগ্ন এবং উচ্চ কন্ঠ জীবন সংগীত। উদ্যত সংগীন হাতে একদল সৈনিক দাড়িয়ে আছে এই পাঁচশ যুবককে ঘিরে। ওরা এদেশীয় নয়। ওদের চোখে বিস্ময়। বোধ হয় ভাবছে কম্যুনিষ্ট রাজ্যেও এমন কিছু ঘটতে পারে! ওদের চোখে ভয়ও। কে জানে ওদের মধ্যে এদের মতই হারাবার বেদনা আছে বলেই এই ভয় কিনা?

শ্লোগান শেষ হলে সেই যুবকটি বলল, ভাইসব, জাতির জন্য, জীবনের জন্য, আমার ধর্মের জন্য আমিই প্রথম জীবন দিতে চাই। বলে সে মাঝখান থেকে লাইনের প্রথমে এসে দাড়াল।

এ সময় কলিনকভ এবং সার্জি সোকলভ ফিরে এল। সার্জি সোকলভ পিস্তল নাচিয়ে বলল, মরবার আগে তোদের পাখা উঠেছে। ঠিক আছে, আমি যা বলেছি সেটাই এখন হবে। বলে সে একজন রক্ষীকে বলল, লাইনের প্রথমটাকে ধরে এনে উচু মঞ্চটাতে দাঁড় করাও। আমার পিস্তলই আজকের উৎসব উদ্বোধন করবে।

রক্ষী লাইনের প্রথমে দাড়ানো সেই যুবককে ধরতে গেল। যুবক বলল, আমাকে ধরে নিতে হবে না, আমি নিজেই যাচ্ছি। সেখানে সোকলভের এক গুলি কেন হাজার গুলি আমাকে ভয় দেখাতে পারবেনা। বলে পিছ মোড়া করে বাধা সেই যুবক মাথা উচু করে বীর দর্পে মৃত্যু মঞ্চে গিয়ে উঠল। তার মুখে হাসি। ভয় ও উদ্বেগের সামান্য চিহ্নও তার চোখে নেই।

হো হো করে হেসে উঠল সোকলভ। বলল, খুব বীরত্ব দেখাচ্ছিস। মরেও তুই রক্ষা পাবিনা, তোর স্ত্রী ও ছেলে সন্তানকে আমরা শুকিয়ে মারব।

মুহূর্তের জন্য চমকে উঠেছিল যুবক। বুকটা যেন একবার মোচড় দিয়ে উঠেছিল। দুটি মেয়ের নিষ্পাপ মুখ, স্ত্রীর অসহায় ছবি তার সামনে জ্বলন্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্যই। নিজেকে সামলে নিয়ে যুবক বলে উঠল, আমার স্ত্রী ছেলে সন্তানকে আমি সৃষ্টি করিনি, আমার আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। তিনিই তাদের দেখবেন। তোমাদের উপর আমি....................।

সোলকভ যুবককে কথা বলতে দিলনা। 'চুপ' বলে হুংকার দিয়ে উঠল। তার চোখে যেন আগুন জলছে। তার পিস্তল উঁচু হয়ে উঠল। পিস্তলের ট্রিগারে তার

তর্জনি স্থাপিত হলো। চারদিক নিরব নিস্তব্ধ। পরবর্তি সেকেন্ডের ঘটনার জন্য রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে সবাই।

# ৮

বিল জোয়ান ও খুজলাং পাহাড়ের মাঝখানে সংকীর্ন সমতল এক উপত্যকা। তাজিকিস্তানের এ কিরঘিজিস্তান এবং উজবেকিস্তানের সাথে যেন গলাগলি করে আছে। এর দক্ষিন ও পূর্বদিকটা ঘিরে কিরঘিজিস্তান এবং উত্তর দিকে উজবেকিস্তান। অবস্থানের দিক দিয়ে অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ন, স্থানটা দুর্গম, কিন্তু এখান থেকে শির দরিয়া নদী এবং ফারগানা সমরকন্দ রেলপথ খুব দূরে নয়। ঐতিহাসিক পামির সড়কটিও এর পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে। ঘোড়ায় চড়ে সেখানে পৌছতে সময় বেশী লাগে না। আর ফারগানা, তাসখন্দ এবং তাজিকিস্তানের রাজধানী স্টালিনবাদের মধ্যবর্তী এ উপত্যকা অবস্থিত বলে সবার সাথে সমান ভাবে যোগাযোগ রক্ষা করা সহজ হচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা এ উপত্যকার চারদিকে যেসব পাহাড়ি কবিলা ছড়িয়ে আছে সকলেই সাইমুমের মুক্তি আন্দোলনে শরিক। সুতরাং নিরাপত্তার দিক দিয়ে নিশ্চিত। বিল জোয়ান ও খুজলং পাহাড় এবং মধ্যবর্তী উপত্যকা ঘিরে গড়ে তোলা হয়েছে সাইমুমের নতুন অপারেশন হেডকোয়াটার। এ হেড কোয়াটার আগে ছিল লেলিন স্মৃতি পার্কে। এখন সেটাকে অস্র-শস্রের সাপ্লাই কেন্দ্র এবং সাইমুম মহিলা শাখার প্রধান অবস্থান কেন্দ্র বানানো হয়েছে।

বিল জোয়ান ও খুজলাং পাহাড় এবং মধ্যবর্তী এ উপত্যকার একটা ইতিহাস আছে। কম্যুনিষ্টদের কবল থেকে মুসলিম মধ্য এশিয়াকে মুক্ত করার জন্য পরিচালিত প্রথম মুক্তি সংগ্রামের নেতা গাজী আনোয়ার পাশা ১৯২২ সালের ৪ঠা আগষ্ট এখানে এই উপত্যকাতেই শাহাদত বরণ করেন। তিনি মুসলিম মুজাহিদিনদের নিয়ে একটা মিটিং করেছিলেন, এই সময় কম্যুনিষ্ট চররা কম্যুনিষ্ট বাহিনীকে পথ দেখিয়ে এখানে নিয়ে আসে এবং আনোয়ার পাশা অতর্কিতে চারদিক থেকে আক্রান্ত হন। তিনি আত্মসমর্পন করেননি। কম্যুনিষ্ট বাহিনির বিরুদ্ধে লড়াই করে সাথীদের সমেত তিনি শাহাদত বরণ করেন। এই উপত্যকা

মুসলিম মধ্য এশিয়ার বালাকোট। সে বীর শহীদদের পবিত্র রক্তে মাখা এ ভূমিকাতেই আহমদ মুসা তাঁর অপারেশন হেড কোয়ার্টার স্থাপন করেছেন।

বিল জোয়ান পাহাড়ের এক গুহা-মুখে সদর দফতরের প্রধান তাঁবুটি অবস্থিত। গাছ-পালা তাঁবুটাকে ঢেকে রেখেছে। তাঁবুর পাশে বিরাট এক প্লাস্টিক ফলক। ফলকটিতে গাজী আনোয়ার পাশা শহীদের একটি চিঠি উৎকীর্ণ রয়েছে। চিঠিটি এই রকমঃ

'আমার সালাম গ্রহণ করুন। আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিনের অপার অনুগ্রহে আমি ভাল আছি। আপনাদের একটা অর্থহীন পত্র পেলাম। তাতে আপনারা লিখেছেনঃ

'শুরু থেকেই আপনি আপনার সকল শক্তি বোখারার বিপ্লবীদের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। কাজেই আপনার এ ত্যাগের প্রতিদান হিসেবে আমরা যখন আপনাকে একটা সামরিক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্টিত করতে যাচ্ছিলাম, তখন আপনি দায়িত্বহীন লোকের পাল্লায় পড়ে চলে গেলেন। আপনি ফিরে আসুন আপনার সকল অপরাধ ক্ষমা করা হবে।'

আমার প্রতি আপনাদের এ অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমাকে বলুন, আপনারা কি সেই তারা নন যারা কম্যুনিষ্টদের হাতে বোখারার পতন ঘটাতে সাহায্য করেছেন? জাতির বিপ্লবী শক্তির নিরপরাধ লোকদের রক্তনদী আপনারাই বইয়েছেন। আপনারাই তো আমাদের পবিত্র স্থান সমূহ, মসজিদ মাদ্রাসাকে ভূ-লুন্ঠিত করেছেন। আমাদের দরিদ্র জনগনকে বুর্জোয়া আখ্যা ব্যাপকভাবে হত্যা করেছেন। তাদের সর্বস্ব লুন্ঠন করেছেন। মাত্র ভাত-কাপড়ের লোভে রাশিয়ানদের হাতে নিজেদের ঈমান বিক্রি করেছেন। আমাদের বোখারা এখনও ধূলি ধূসরিত। দারিদ্র ও আনাহারক্লিষ্টতার বীভৎসতা চলছে সেখানে। আমি জন্মভূমির একজন মুক্ত সন্তান। জাতির জন্য লড়ছি, ভবিষ্যতেও লড়ব। জন্মভূমিকে কম্যুনিষ্ট এবং আপনাদের মত বিশ্বাসঘাতকদের হাত থেকে মুক্ত করব। বর্তমানে আমার সাথে দেড় লাখ মানুষ আযাদীর জন্য পাহাড়ে বন্দরে সর্বদা শত্রুদের সাথে লড়বার জন্য প্রস্তুত। আমরা কোন ভাড়াটিয়া সৈন্য নই, জাতির সেবক মাত্র। আমরা অচিরেই দেশকে রুশদের কবল থেকে মুক্ত করব।

আল্লাহর অনুগ্রহে আমাদের বিশ্বাস ও পথ সুস্পষ্ট। আমাদের কর্মসূচী পরিষ্কার। পল্লী নগর হতে মুসলমানরা অস্ত্রসজ্জিত হয়ে আমাদের সাথে শামিল হচ্ছে। তারা ইসলাম ও মুসলমানদের হেফাজত করতে চায়। তোমরা ও যদি দ্বীনের সৈনিক হতে চাও, তাহলে রাশিয়ানদের বিতাড়িত করার সংগ্রামে এসে যোগ দাও।'

আনোয়ার পাশা এ চিঠি লিখেছেন ১৯২২ সালে লোভ প্রলোভনে যে সব মুসলমান কম্যুনিষ্ট দলে যোগ দিয়েছিল তাদের উদ্দেশে। আহমদ মুসা বলে, গাজী আনোয়ার পাশার এ চিঠির আবেদন এখনও আছে, কম্যুনিষ্টদের বিতাড়ণ না করা পর্যন্ত থাকবেই।

বিলজোয়ান পাহাড়ের এ প্রধান তাঁবুতে আহমদ মুসা বসে। তার পাশের কক্ষেই বসে হাসান তারিক। হাসান তারিক এ অপারেশন ঘাটির ষ্টাফ প্রধান এবং কেন্দ্রিয় অপারেশন কো-অডিনেটর।

সেদিন ভোরে আহমদ মুসা এক ঘাটি সফরের জন্য বেরিয়ে গেছে। হাসান তারিক অফিসে একা। টেবিলে বসে কাজ করছিল সে। রিপোর্ট পড়ছিল সে আয়েশা আলিয়েভার। মস্কোভা বন্দি শিবির থেকে শুরু করে আরিস ষ্টেশনে পৌঁছা পর্যন্ত সব কথাই বিস্তারিত আছে রিপোর্টটিতে। একবার পড়েছে সে শুরুতে, আবার পড়ছে। আয়শা আলিয়েভার ভুমিকায় স্থম্ভিত হয়েছিল সে, আনন্দও লেগেছে তার।

হঠাৎ হাসান তারিকের মনে হল, আবার কেন সে রিপোর্ট পড়ছে। কেন ভালো লাগছে তার এটা পড়তে? একজন মহিলার জন্য ঐ ভুমিকা বিস্ময়কর বলেই কি? অস্বস্তি বোধ করছে হাসান তারিক। এ প্রশ্নের কোন সরল জবাব নেই তার কাছে। মনের অবচেতন অংগনের কোথায় যেন সংঘাত। চঞ্চল হয়ে ওঠে সে। সে কি কোন অন্যায় করেছে?

এমন সময় সাইমুমের একজন রক্ষী ঘরে প্রবেশ করে বলল, মুহতারামা আয়েশা আলিয়েভা কথা বলতে চান।

প্রথমে হাসান তারিক চমকে উঠল, তারপর মনে পড়ল, আজ আয়েশা আলিয়েভাদের লেনিন স্মৃতি পার্কের ঘাটিতে যাওয়ার কথা। মহিলা শাখাকে ওখানেই রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রোকাইয়েভাও তার সাথে যাচ্ছে। শিরিন

শবনমকেও ওখানে রাখা হয়েছে। রোকাইয়েভার সাথে তার দাদীর সাক্ষাতের ব্যবস্থা ওখানেই করা হবে। সাইমুমের একটা ইউনিট তাদেরকে ওখানেই পৌছে দেবে।

হাসান তারিক রক্ষীকে বলল, আসতে বল তাকে।

রক্ষী বেরিয়ে গেল। অল্পক্ষণ পরেই পর্দার আড়ালে পায়ের শব্দ হলো। আয়েশা আলিয়েভা এসেছে। সালাম দিল সে।

হাসান তারিকও সালাম জানিয়ে হাতের কাগজ টেবিলে রেখে সোজা হয়ে বসল, আয়েশা আলিয়েভাই প্রথম কথা বলল। বলল সে, পরামর্শ নিতে এসেছি, দোয়া নিতে এসেছি।

উল্লেখ্য, সাইমুম মহিলা শাখার সিকিউরিটি বিভাগের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আয়েশা আলিয়েভাকে। মস্কোভা বন্দি শিবির থেকে এ পর্যন্ত আয়েশা আলিয়েভা যে সাহস ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে তাতে আহমদ মুসা খুশী হয়ে তার উপর এই গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছে। আয়েশা আলিয়েভার রিপোর্টে ফারহানার কথাও ছিল। আহমদ মুসা চমৎকৃত হয়েছে ফাতিমা ফারহানার ভুমিকাতেও। আয়েশা আলিয়েভা ফাতিমা ফারহানার সালাম পৌছিয়েছিল আহমদ মুসাকে। আহমদ মুসা সালাম গ্রহণ করে বলেছিল, ও ভালো আছে তো? ওদের কাছে আমি অনেক ঋনী। পর্দার আড়ালে দাঁড়ানো আয়েশা আলিয়েভার মুখটা কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল এই কথায়। সে খুশী হয়েছিল, ফারহানার কাছে একটা ভালো চিঠি লেখার পয়েন্ট তার হলো।

হাসান তারিক তার হাতের কলমটি মৃদুভাবে টেবিলের উপর ঠুকছিল। আয়েশা আলিয়েভার কথায় উত্তরে টেবিলের উপর চোখ রেখে বলল, হেদায়েত যা দেবার আহমদ মুসা ভাই তো দিয়েছেন। আমি দোয়া করছি, আন্দোলন তোমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছে তা পালন করার তৌফিক আল্লাহ তোমাকে দান করুন। হাসান তারিক কথা শেষ করল।

ও দিকে আয়েশা আলিয়েভাও নিরব। এই নিরবতায় অস্বস্তি বোধ করছে হাসান তারিক। কিন্তু কি কথা আর বলবে সে।

পল পল করে সময় বয়ে যাছে। অসহ্য এক নিরবতার মধ্যে কেটে গেল কিছুক্ষণ। অবশেষে ওপাশে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ানোর শব্দে এই নিরবতা ভেংগে গেল। উঠে দাড়িয়েছে আয়েশা আলিয়েভা বলল সে, আসি, দোয়া করবেন। আবার সালাম দিয়ে সে বেরিয়ে গেল।

তার গলাটা ভারী মনে হল।

হাসান তারিক সালাম দিতে ভুলে গেল। এক ধরনের বিমুঢ়তায় মাথাটা তার চেয়ারে এলিয়ে পড়ল। কেন সে কথা বলতে পারলোনা? এই দুর্বলতা কেন তার? এ পরিষ্কার বিষয়টা ও নিশ্চয় ধরতে পেরেছে? বেদনায় ক্ষোভে চোখ দু'টি তার ভারী হয়ে উঠল। আর নিজেকে মনে হল খুবই দুর্বল। ভাবল সে, ও কি কষ্ট পেল মনে? তার গলাটা অমন ভারী শোনাল কেন? হাসান তারিকের মনে পড়ল আয়েশা আলিয়েভার তাসখন্দ জেল লাইব্রেরীর সে চিঠিটার কথা। এ দুনিয়ায় তার কেউ নেই, একা সে।

চেয়ার থেকে উঠে দাড়াল হাসান তারিক। বেরিয়ে এল তাবুর গেট দিয়ে। সাইমুমের ছোট কাফেলা তখন যাত্রা শুরু করেছে। সামনের দুটি ঘোড়ায় আয়েশা আলিয়েভা আর রোকাইয়েভা। বড় চাদরে ঢাকা ওদের গোটা দেহ। সামনের মুখটি একবার ফিরে তাকাল তাঁবুর দিকে। আয়েশা আলিয়েভার মুখ, হাসান তারিক তার চোখ নামিয়ে নিল তার চোখ থেকে। যখন আবার মুখ তুলল, কাফেলা চলে গেছে পাহাড়ের আড়ালে।

তাঁবুতে ফিরে আসার জন্য হাসান তারিক ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল, এমন সময় দেখল ঘোড়া ছুটিয়ে আহমদ মুসা আসছে।

আহমদ মুসা এল। সালাম বিনিময় হলো। আহমদ মুসা বলল ভেতরে চল জরুরী কথা আছে। আহমদ মুসার মুখাবয়বে চিন্তার স্পষ্ট ছাপ। আহমদ মুসা এবং হাসান তারিক দু'জনে তাঁবুর ভেতরে এসে আহমদ মুসার রুমে বসল।

চেয়ারে বসেই আহমদ মুসা কনুই টেবিলে রেখে একটু ঝুঁকে পড়ল সম্মুখে হাসান তারিকের দিকে। তার চোখে চাঞ্চল্য এবং চিন্তার সুস্পষ্ট ছাপ। বলল সে, আরিসের জেল খনায় আমাদের পাঁচশ ভাই অমানুষিক নির্যাতনের শিকার। সাইমুমকে কিছু করতে না পেরে তারা আরিস ষ্টেশনের সকল মুসলিম কর্মচারী

এবং শহরের প্রায় চারশ মুসলিম যুবককে জেলে আটকিয়ে তাদের উপর অত্যাচার করছে সাইমুম সম্পর্কে তথ্য বের করার জন্য।

একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর বলল, বল এখন আমাদের করণীয় কি?

-ওদের উদ্ধার করা দরকার। কম্যুনিষ্টরা হয় ওদের মেরে ফেলবে, নয়তো চালান দেবে সাইবেরিয়ায়। এর কোনটাই আমরা হতে দিতে পারিনা।

-ঠিক বলেছ, আরিস থেকে আলী খানও এই কথাই জানিয়েছে।

-তাহলে আমাদের তড়িৎ পদক্ষেপ নেয়া দরকার?

-আমি চিন্তা করছি, আজই একটা ইউনিট আমরা আরিসে পাঠিয়ে দেব। আরিসের সাইমুম ইউনিট তৈরী আছে। আজ রাতেই আমরা আরিস জেলখানায় আঘাত হানবো।

-অনুমতি দিলে একটা ইউনিট নিয়ে আমি এখনই আরিসে যেতে পারি। বলল হাসান তারিক।

-এই তো তুমি সেখান থেকে এলে, এবার আমি যাব মনে করছি! জবাব দিল আহমদ মুসা।

একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর বলল, আমার সাথে যাবে এমন একটা ইউনিট তুমি রেডি কর। আমরা যাতে জোহর পড়েই রওয়ানা হতে পারি।

হাসান তারিকের চোখে মুখে তখনও কিছু আপত্তির সুর। বলল, কাল কাজাখ রাজধানী আলমা-আতা থেকে আমাদের প্রতিনিধি দল আসবে। আপনি এসময় বাইরে গেলে .....।

হাসল আহমদ মুসা। হাসান তারিককে কথা শেষ করতে না দিয়েই সে বলল, সেতো আগামী কালের কথা। দোয়া কর সাইমুমের এ অভিয়ান আল্লাহ সফল করুন। ইনশাআল্লাহ ভোরেই আমরা ফিরে আসব।

'ফি আমানিল্লাহ' বলে হাসান তারিক একজন রক্ষীকে ডেকে নির্দেশ দিল আলি ইউসুফজাইকে ডেকে আনার জন্য। আলী ইউসুফজাই এই ঘাটির একজন ইউনিট কমান্ডার। আহমদ মুসার নির্দেশ মোতাবেক হাসান তারিক অভিযানের প্রস্তুতি শুরু করে দিল।

আহমদ মুসা। চেয়ারে গা এলিয়ে বসেছিল। হাসান তারিকের কথা শেষ হলে সে বলল, কুতাইবার এখানে আসা দরকার, একটা জরুরী পরামর্শের জন্য, একথা বলে দিয়েছ তো আয়েশাকে?

সলাজ হাসি ফুটে উঠল হাসান তারিকের ঠোঁটে। বলল সে, দুঃখিত একদম ভুলে গেছি মুসা ভাই।

-কেন, কোন কথা হয়নি তার সাথে? বলে যায়নি সে?

-ও দোয়া নিতে এসেছিল, আর কথা হয়নি। মুখ একটু নিচু করে বলল হাসান তারিক।

আহমদ মুসার ঠোঁটে হাসি। বলল, দোয়া করতে কথা বলতে হয়না, এজন্যই বোধয় দোয়াটা করতে পেরেছ, না?

মুখটা হাসান তারিকের লাল হয়ে উঠল লজ্জায়। আহমদ মুসার কথার কোন উত্তর না দিয়ে হাসান তারিক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি একটু ওদিকে দেখি, ইউসুফজাইকে ও পেল কিনা?

আহমদ মুসার সম্মুখ থেকে পালিয়ে গেল হাসান তারিক। আহমদ মুসার ঠোঁটে হাসি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। সে হাসিতে পিতার স্নেহ আছে, ভাইয়ের ভালবাসা আছে, বন্ধুর সমবেদনা আছে।

আরিস শহরের জেলখানা। শহরের মধ্য দিয়ে চলে যাওয়া প্রধান সড়কটি থেকে একটা সরু কংক্রীটের রাস্তা চলে গেছে উত্তরে। কিছু দুর গিয়ে একটা বড় গেটে পৌছে রাস্তাটা শেষ হয়েছে। এটাই আরিসের জেলখানা। জেলখানার চারদিক দিয়ে বাগান। নানা রকম ফুলের গাছ সে বাগানে। সব্জিও ফলানো হয় এখানে। বড় তুলার গাছও কিছু আছে। বাগানটা অপেক্ষাকৃত ছোট প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। বাগানের পরেই মুল জেল খানা। এটাও প্রাচীর ঘেরা। জেলখানার উত্তর অংশে অনেকটা জায়গা খালি। একে বলাহয় মৃত্যুমাঠ। এখানে যাদের আনা হয়, তারা আর ফিরে যায়না জেল ঘরে। পাঁচশ মুসলিম যুবকের উপর এই মুত্যু মাঠেই নির্যাতন চালানো হচ্ছে।

সূর্য ডোবার পরেই সাইমুমের ইনফরমেশন ইউনিটের লোকরা জেল খানার চারদিকে অবস্থান নিয়েছে। অপারেশন ইউনিটের লোকেরা এল সাড়ে ৭টায়।

পরিকল্পনা অনুসারে তারা জেলখানার মূল প্রাচীরের চার দিকে গাছের আড়ালে অবস্থান নিল। ইনফরমেশন ইউনিট আগেই জানিয়েছিল, জেলখানার বাগানে কোন প্রহরী নেই। বড় বড় কর্তারা জেল খানায় আসায় নিরাপত্তার ব্যবস্থা আজ জেলখানা সিকিউরিটির হাতে নেই বলেই বোধ হয় রুটিন প্রহরার বাড়তি ব্যবস্থা তারা করেনি।

ঠিক সাড়ে সাতটাতেই আহমদ মুসা, আলী খানভ এবং আরও দু'জন একটা সামরিক জীপে এসে জেলখানার বাইরের গেটে দাঁড়াল। তাদের প্রত্যেকের গায়ে সামরিক অফিসারের পোশাক। মিলিটারী হ্যাট কপালের প্রান্ত পর্যন্ত নেমে এসেছে। এ সামরিক পোশাক ও সামরিক জীপ সাইমুমের যোগাড়ে আগে থেকেই ছিল।

আহমদ মুসার আজকের পরিকল্পনা নিঃশব্দে কাজ শেষ করা। গত কয়েকদিন থেকে শহরে যথেষ্ট পুলিশ ও সৈন্যের সমাবেশ করা হয়েছে। কাজ শেষ করার আগে জানাজানি হয়ে গেলে শহর থেকে বেরুনো, বিশেষ করে এত লোক নিয়ে কঠিন হবে।

জীপের ডাইভিং সিটে ছিল আহমদ মুসা। জীপ গেটের সামনে দাঁড়াতেই সিকিউরিটি বক্স থেকে দু'জন বেরিয় এল। আহমদ মুসা দ্রুত গেট খোলার জন্য হাতের ইশারা করল। তারা মুহূর্ত দ্বিধা করল তারপর খুলে দিল বিদ্যুৎ চালিত অটোমেটিক গেট। সাঁ করে জীপটি ভেতরে ঢুকে গেল। পেছনের সিট থেকে দু'জন লাফিয়ে নামল নীচে। নেমেই ওরা সিকিউরিটি বক্সের দিকে এগুল। দেখলে মনে হবে সিকিউরিটির লেকদের তারা কিছু বলতে যাচ্ছে। পরিকল্পনা অনুসারে এ দু'জন সাইমুম কর্মীর দায়িত্ব হলো গেটের প্রহরী দু'জনকে কাবু করে সিকিউরিটি বক্স দখল এবং গেটটা সিল করে দেয়া যাতে আর কেউ ঢুকতে না পারে। অল্পক্ষণ দাঁড়াল জীপটি। তাকিয়েছিল আহমদ মুসা সিকিউরিটি বক্সের দিকে। তারপর সিকিউরিটিবক্স থেকে সাইমুম কর্মী হাত নেড়ে শুভ সংকেত দিলে আহমদ মুসার জীপ ছুটল সামনে। জেলখানার মুল গেটের সামনে রাস্তার ডান পশে প্রধান সিকিউরিটি অফিস। এ সিকিউরিটি অফিসেই রয়েছে জেলখানার

বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রন কক্ষ। এ অফিসে সর্বক্ষণ ডজন খানেক সিনিয়র নিরাপত্তা অফিসার ডিউটিতে থাকে। সবাই রুশ দেশের, দেশীয় কেউ নয়।

জীপ নিরাপত্তা অফিসটির সামনে চলে এসেছে। কাউকেই বাইরে দেখা যাচ্ছেনা। খুশী হল আহমদ মুসা।

জীপ নিয়ে অফিসের সিঁড়িতে দাঁড় করাল। লাফ দিয়ে নেমে পড়ল দু'জন দু'দিক থেকে। তর তর করে সিড়ি বেয়ে উঠে খোলা দরজায় গিয়ে দাঁড়াল আহমদ মুসা। সোল্ডার হোলস্টার থেকে এম-১০ রিভলভার সে তুলে নিয়েছে হাতে। আলী খানভ আহমদ মুসার পাশে এসে দাঁড়াল। তার হাতে এম-১০ রিভলভার।

ঘরে একটা গোল টেবিল ঘিরে বসেছিল ১২ জন সিকিউরিটি অফিসার প্রত্যেকের পাশে ষ্টেনগান রাখা। কয়েকজন তাস খেলে সময় কাটাচ্ছিল। অন্যান্যরা দেখছিল, কেউ গল্প করছিল। রিভলভার হাতে আহমদ মুসাদের দেখে টেবিলের ওপশে থেকে একজন চুপ করে টেবিলের নীচে বসে পড়ল। সংগে সংগে আলী খানভ বসে পড়ল। ওপাশে বসে ও ষ্টেনগান ঘুরিয়ে নেবার আগেই আলী খানভ এম-১০ এর ট্রিগার চেপে টেবিলের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিল। সাইলেন্সার লাগানো রিভলভার থেকে শুধু একটা যান্ত্রিক শীষ উঠল। দেহগুলো কারও টেবিলে, কারও মাটিতে গড়িয়ে পড়ল।

আলী খানভকে দরজার দাঁড় করিয়ে আহমদ মুসা গিয়ে সুইচ রুমে প্রবেশ করল। এই জেলখানার ইলেকট্রিক ডিজাইনার উজবেক বিদ্যুৎ বিভাগের একজন মুসলিম ইঞ্জিনিয়ার। এখন সাইমুমের কর্মী। তার কাছ থেকে সুইচ বোর্ডের নক্সা সে মুখস্থ করেছে। সুইচ বোর্ড দেখেই সব কিছু চিনতে পারলো। সুইচ প্যানেলের বাম দিক থেকে ৭নং সুইচের দিকে তাকিয়ে দেখল ওটা অন করা। সুইচ সে অফ করে দিল। তারপর নক্সা অনুযায়ী ৩নং মেইন সুইচের ঢাকনা খুলে ফেলে সেখান থেকে নব খুলে নিল। বন্ধ করে দিল আবার মেইন সুইচ। এবার সুইচ অন করে দিলেও জেলখানার দেয়ালের তারগুলোতে বিদ্যুৎ যাবে না। জেলখানার দেয়ালের বিদ্যুতায়িত তারগুলোকে এইভাবে অকেজো করে দেয়া ছাড়া আর

কোন লাইটে সে হাত দিলনা। অপারেশন শেষ করার আগে ওদেরকে এলার্ট হবার কোনই সুযোগ সে দিতে চায়না।

সুইচ রুম থেকে বেরিয়ে এল আহমদ মুসা। তারপর সিকিউরিটি রুমের দরজা টেনে বন্ধ করে দিয়ে আলী খানভকে নিয়ে আহমদ মুসা দ্রুত জেলখানার পূর্ব পাশের বাগানের পথ ধরে জেলখানার উত্তরের অংশে চলল। তারা চলা শুরু করতেই গাছের অন্ধকার থেকে দু'জন সাইমুম কর্মী বলল, চলুন আমরা আপনাদের অপেক্ষা করছি।

তারা জেলখানার উত্তর প্রান্তের দেয়ালের কাছে এসে পৌঁছাল। আসতে আসতে সাইমুমের ইনফরমেশন বিভাগের এ দু'জন কর্মী বলে ছিল, আজ রাত ৭টায় একসাথে অনেক গোলাগুলির শব্দ বাইরে থেকে শোনা গেছে। আহমদ মুসা জিজ্ঞেস করল সংখ্যা কত হবে?

চল্লিশ পঞ্চাশটির বেশি হবে না, তারা বলল। অর্থাৎ রাত ৭টার দিকে, আহমদ মুসা ভাবল, আমাদের চল্লিশ পঞ্চাশ জন ভাইয়ের জীবন তারা কেড়ে নিয়েছে।

ঘড়ির দিকে তাকাল আহমদ মুসা। সন্ধ্যা ৭টা ৫০মিনিট। আহমদ মুসা এদিকের গোটা প্রাচীরটা পরীক্ষা করে এল। দেয়ালের কাছ বরাবর সাইমুম কর্মীরা বসে আছে। ঠিক আটটা বাজার সাথে সাথে গলায় পিস্তল ঝুলিয়ে পঞ্চাশ জন সাইমুম কর্মী জেলখানার প্রাচীরে উঠে যাবে ঠিক করে রাখা হয়েছে। একজন সাইমুম কর্মীর উপর আর একজন দাঁড়াবে, এই দ্বিতীয় জনের কাঁধে পা রেখেই তারা পঞ্চাশজন প্রাচীর অতিক্রম করবে।

ব্যবস্থাপনা ঘুরে দেখা শেষ করে কয়েকজনকে দিয়ে দেয়ালের বিদ্যুতের তারগুলো আবার পরীক্ষা করাল, না ওগুলো মৃত। তারপর আলী খানভকে পরিকল্পনাটা আবার বুঝিয়ে দিয়ে বলল, সাইমুম কর্মীরা ভেতরে লাফিয়ে পড়ার সংগে সংগে দেয়ালের গোড়ায় পাতা দেয়াল মাইনে বিস্ফোরণ ঘটাবে। এতগুলো লোকের বাইরে বেরিয়ে আসার জন্য এটাই একমাত্র সহজ পথ।

সব বুঝিয়ে দিয়ে আটটা বাজার কয়েক মিনিট বাকী থাকতে আহমদ মুসা জেলের পশ্চিমাংশের দিকে চলে গেল। জেলখানার তিন তলার বিল্ডিং পশ্চিম

প্রাচীর যেখানে এসে শেষ হয়েছে সেখানে জেলখানার প্রাচীর এবং বিল্ডিং এর দেয়াল একসাথে মিশেছে। সে কোণা বেরাবর তিন তলার ছাদ থেকে একটা পানির পাইপ নীচে নেমে এসেছে। আহমদ মুসার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল এটা দেখে। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল ৭টা বেজে গেছে। আহমদ মুসা পানির পাইপ বেয়ে প্রাচীরের মাথায় গিয়ে বসল। ভেতরের মাঠে তার নজর গেল। পাঁচশ' যুবককে ঘিরে প্রায় পঞ্চাশজনের মত সিকিউরিটির লোক দাঁড়িয়ে আছে। ওরা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীর বরাবর। হঠাৎ নজর পড়ল সামনে। দেখল, ঈষৎ উঁচু একটা মঞ্চে একজন যুবক দাঁড়িয়ে আছে। তার হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। সামনে থেকে আর একজন পিস্তল তুলল তাকে লক্ষ্য করে। কার্ণিশের ছায়ায় প্রাচীরের উপর সে বসেছিল। দ্রুত সোল্ডার হোলষ্টার থেকে এম-১০ রিভলভারটি খুলে নিল। রিভলভার ঘুরিয়ে সে চেপে ধরল ট্রিগার। লক্ষ্য তার হাত বাঁধা যুবকের মাথার উপর দিয়ে ঐ লোকটি। এক ঝাঁক গুলি বেরিয়ে গেল রিভলভার থেকে। পিস্তল ধরা ঐ লোকটি এবং চার পাঁচ গজ পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা আর একজন ঢলে পড়ে গেল মাটিতে।

সকলের চোখ দেয়ালের এদিকে। ওদিকে সাইমুমের পঞ্চাশজন কর্মী প্রাচীর ডিঙিয়ে লাফিয়ে পড়ছে মাটিতে। মাটিতে পা দিয়েই ওরা রিভলবার তাক করছে কাছের কারারক্ষীদের লক্ষ্যে। মুহূর্তে এক সাথে পঞ্চাশটি রিভলভার গর্জে উঠল। লুটিয়ে পড়ল প্রায় পঞ্চাশটির মত দেহ।

আহমদ মুসাও লাফিয়ে পড়েছে মাটিতে। কাছেই একজন কারারক্ষী দাঁড়িয়ে ছিল। প্রথমটায় সে ভয় পেয়েছিল, কিন্তু তারপরই ষ্টেনগান ঘুরিয়ে নেবার চেষ্টা করল। কিন্তু সময়ে না কুলালে সে ষ্টেনগান গিয়েই সজোরে আঘাত করল আহমদ মুসার মাথা লক্ষ্য করে। আহমদ মুসা চোখের পলকে মাথাটা নীচে চালান করে দিয়ে পায়ে জোড়া লাথি ছুড়ে মারল তার ষ্টেনগান ধরা হাত লক্ষ্য করে। তার হাত থেকে ষ্টেনগান ছিটকে পড়ে গেল, সেও আরেক দিকে ছিটকে পড়ে গেল। আহমদ মুসা শুয়ে থেকেই হাতের রিভলভার একটু উঁচু করে ট্রিগারে চাপ দিল। ছুটে আসা দু'জন রক্ষী মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। ছিটকে পড়া সেই লোকটি উঠে আবার তার ষ্টেনগান কুড়িয়ে নিচ্ছিল। আহমদ মুসার রিভলভারের নল তার দিকে

ঘুরে এল। একটু চাপ দিল ট্রিগারে। ষ্টেনগান কুড়িয়ে নেবার জন্য সেই যে উঁচু হয়েছিল সে, আর উঠতে পারল না। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

এই সময় উত্তর দিক থেকে একটা বিস্ফোরণের শব্দ এল। সংগে সংগে জেলখানার উত্তর দেয়ালের একাংশ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে কোথায় উড়ে গেল। আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়ে নির্বাক যন্ত্রের মত মুত্যু মঞ্চে দাঁড়িয়ে থাকা যুবকটির হাতের বাঁধন খুলে দিল। বলল, আমাদের সবাইকে এখন ভাঙা প্রাচীরের পথ হয়ে বেরিয়ে যেতে হবে।

সাইমুম কর্মীরা শ্লোগান তুলেছে, জীবনের সাইমুম, মুক্তির সাইমুম, ইসলামের সাইমুম, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ।

কলিনকভ ও সাজি সোকলভ আহমদ মুসার গুলিতে প্রথমেই মারা গেছে। রক্ষীরা অধিকাংশই মারা পড়েছে। যারা দু'একজন ছিল জেলখানার ভেতর দিকে পালিয়ে যাচ্ছে। জেলখানার সর্বত্র একটা ভয়ংকার ভীতি। জেলখানার ওদিকে যে রক্ষীরা ছিল তারা কি হচ্ছে, কি করবে তা বুঝার আগেই এদিক থেকে পালানোদের মুখে পড়ে তারা আর এমুখো হবার কোন চিন্তা করলোনা।

কারা রক্ষীদের ষ্টেনগান ও পিস্তলগুলো কুড়িয়ে নিয়ে সাইমুমের কর্মীরা সেই ভাঙা প্রাচীর পথে বেরিয়ে যাচ্ছে। সবার পিছনে আহমদ মুসা।

পাঁচশ যুবককে সাথে নিয়ে প্রায় দু'শ সাইমুম কর্মী বেরিয়ে এল জেলখানা থেকে। জেলখানার উত্তর দিকের সংকীর্ণ সড়ক ধরে এক সাথে এগিয়ে চলল সকলে। শ্লোগান দিতে নিষেধ করেছে আহমদ মুসা। এতগুলো লোককে কোন ঝুঁকির মধ্যেই সে ফেলতে চায়না। তাদের অবস্থান সম্পর্কে শত্রুদের যতটা বিভ্রান্ত রাখা যায় ততই মঙ্গল।

সাইমুমের এ মৌন মিছিল শহরের আবাসিক এলাকার মধ্য দিয়ে চলছে। জেলখানার পাগলা ঘন্টা অবিরাম বাজছে। তারই মধ্যে উদ্যত ষ্টেনগান হাতে এত লোকের মিছিল দু'পাশের মানুষকে বিস্ময়-বিমুঢ় করে দিচ্ছে। জানালা খুলে ভীত-বিহ্বল দৃষ্টি তারা মেলে ধরছে এ মিছিলের দিকে। মাঝে মাঝে দু'একজন পুলিশকে দেখা যাচ্ছে। ওরা বিস্ফোরিত চোখে তাকিয়ে দেখছে, কিছুই বুঝতে পারছেনা।

শহরের উত্তর প্রান্তে জেলখানা। উত্তরে আর শহর বেশী নেই। আবাসিক এলাকাটার পরেই এক উর্বর পার্বত্য ভূমি। সাইমুমের মিছিল থামলে আহমদ মুসা বলল, আপনার নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিতে পারেন। কম্যুনিষ্ট বাহিনীর সাধ্য নেই রাতে ওরা শহরের বাইরে আসে। তারপর আহমদ মুসা আলী খানভকে বলল, খোঁজ নিন আমাদের সবাই ফিরেছে কিনা।

আহমদ মুসার পাশেই বসেছিল সেই যুবক। যুবকটি আহমদ মুসাকে বলল, কি বলে আপনার শুকরিয়া আদায় করব, আপনি আমার জীবন বাঁচিয়েছেন। আহমদ মুসা তার পিঠ চাপড়ে বলল, না ভাই, সব প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের। তিনি তোমাকে বাঁচিয়েছেন।

-ঠিক বলেছেন, সব প্রশংসা আল্লাহর। আমি যখন হাসি মুখে মৃত্যুর জন্য মঞ্চে উঠলাম, তখন ওরা আমাকে কি বলেছিল জানেন? মরেও নাকি আমি রেহাই পাবোনা, আমার স্ত্রী ছেলে-সন্তানকে ওরা শুকিয়ে মারবে।

-মানুষের জীবন-মৃত্যুর ফায়সালা একমাত্র আল্লাহই করেন; আর কেউ নয়।

-জানেন, কিছুক্ষন আগে আমরা তকবির ধ্বনি করেছি, ‘সাইমুম জিন্দাবাদ’, শ্লোগান দিয়েছি।

-সাইমুমকে ভালোবাস তোমরা?

-আগে বাসতাম না, কিছুটা ভালো মনে হতো, কিন্তু জেলখানায় গিয়ে মৃত্যুর মুখো-মুখি দাঁড়িয়ে সাইমুমকে আমরা চিনেছি, তাকে ভালবাসতে শিখেছি।

-আলহামদুলিল্লাহ। সাইমুম জাতির খাদেম।

যুবকটির চোখ দু'টি উজ্জ্বল। আবেগ যেন ঠিকরে পড়ছে। বলল সে, শুধু আমরা সাইমুম কে ভালো বাসতে শিখিনি, জাতির সত্যিকার পরিচয় আমাদের সামনে ধরা পড়েছে, আমাদের জাতিসত্তাকে আমরা খুঁজে পেয়েছি।

-তোমার নাম কি ভাই? সস্নেহে জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

-আবদুল্লাহ নাসিরভ।

কিছু বলতে যাচ্ছিল আহমদ মুসা। আলী খানভ ফিরে এল। ফিরে এসে বলল, সব ঠিক ঠাক। তারপর একটু থেমে বলল, এদের কি হবে, এরা কি করবে, এদের সম্পর্কে কিছু বলুন। বলে আলী খানভ উঠে দাড়িয়ে সকলকে বিশেষ করে

সেই পাঁচশ যুবককে লক্ষ্য করে বলল, প্রিয় ভাইয়েরা আপনাদের উদ্দেশ্যে আমাদের নেতা সাইমুমের নেতা আহমদ মুসা এখন কিছু বলবেন।

আহমদ মুসা উঠে দাড়াল। বলল, প্রিয় ভাইয়েরা, আসুন আমরা আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করি। তিনি এক লড়াইয়ে আমাদের জিতিয়েছেন এবং আমাদের পাঁচশ ভাইকে মৃত্যুর মুখ থেকে উদ্ধার করছেন। ইনশাআল্লাহ, আল্লাহর সাহায্য আমরা অব্যাহত ভাবে পাব। আমাদের এ প্রিয় মাতৃভূমিকে এবং আমাদের প্রানপ্রিয় জাতিকে কম্যুনিষ্ট কবল থেকে মুক্ত করতে পারব।

প্রিয় ভাইয়েরা, আপনারা যারা আজ জেল থেকে মুক্ত হলেন তারা আমাদের প্রাণপ্রিয় ভাই। আপনাদের সুখ সমৃদ্ধি, নিরাপত্তা আমাদের জীবনের মতই গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা যদি আমাদের সাথে জাতির মুক্তি সংগ্রামে শামিল হতে চান আমরা আপনাদের স্বাগত জানাবো। আপনারা যদি আপনাদের ঘরে ফিরে যেতে চান, আমরা আপনাদের সাহায্য করব। যথাসাধ্য চেষ্টা করব আপনাদের নিরাপত্তা বিধানের।

সবশেষে বলতে চাই, আমরা সকলে আল্লাহর বান্দাহ। তার বন্দেগী করাই আমাদের জীবনের মূল কাজ। এর উপরই আমাদের মুক্তি, আমাদের পরকালীন চিরস্থায়ী কল্যাণ নির্ভর করছে। আমাদের এই মুক্তি সংগ্রাম আমাদের বন্দেগীরই একটি অংশ। আমরা যদি আন্দোলনকে সত্যিকার অর্থেই বন্দেগীতে পরিণত করতে পারি, তাহলে আল্লাহর সাহায্য আমাদের উপর অঝর ধারায় বর্ষিত হবে এবং সমস্ত ভয় ও বাধা অতিক্রম করে আমরা সাফল্যের সিংহধারে পৌঁছতে পারব। তাই সকলের প্রতি আমার আবেদন, আসুন আমরা ভাল মুসলমান হই, আল্লাহর সব বিধি নিষেধের আমরা পাবন্দ হই এবং এইভাবে আসুন আমরা অতীতের ব্যর্থতার বিধ্বস্ত ভূমিতে বিজয়ের নিশান উড্ডীন করি।

কথা শেষ করল আহমদ মুসা।

কথা বলার জন্য উঠে দাঁড়াল সেই যুবক, আবদুল্লাহ নাসিরভ। বলল সে, আমরা অন্ধ ছিলাম, চোখ ফিরে পেয়েছি। আমরা আমাদের পতিত দশাকে বিধিলিপি ভাবতাম, সে ভুল আজ আমাদের ভেঙে গেছে। আমাদের সামনেটা জীবনের চিহ্নহীন মরুভূমি সদৃশ বিরাণ ছিল। ভাবতাম হতাশার সাগরে অন্তহীন

ভাবে সাঁতার কাটা ছাড়া আমাদের করণীয় কিছুই নেই, কিন্তু আজ আমাদের সামনে জীবনের সবুজ সংগীত বাজছে। আমরা আর আমাদের পুরনো জীবনে ফিরে যেতে চাইনা। সাইমুমের নগণ্য কর্মী হবার সুযোগ পেলে আমরা সুখী হব।

আবদুল্লাহ নাসিরভ শ্লোগান তুলল, জীবনের সাইমুম, মুক্তির সাইমুম, ইসলামের সাইমুম জিন্দাবাদ। আবদুল্লাহ নাসিরভের সংগে সংগে পাঁচশ কন্ঠে উচ্চারিত হলো এই ধ্বনি। রাতের নিরবতা খান খান হয়ে ভেঙে পড়ল শত শত কন্ঠের সে শ্লোগানে।

আহমদ মুসা আলি খানভকে বলল, আমাদের এই পাঁচশ ভাইকে আজই আমাদের ৩ নং ঘাটিতে পাঠিয়ে দাও। এদের পরিবার পরিজনদের প্রতি নজর রাখ। তাদের যেন কষ্ট না হয় , ক্ষতি না হয়।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। সবার কাছ থেকে বিদায় নিল। আবদুল্লাহ নাসিরভকে জড়িয়ে ধরে তার কপালে চুম্বন করে বলল, আবার দেখা হবে।

আহমদ মুসা এবং তাঁর ছোট কাফেলা যাত্রা শুরু করল গাজী আনোয়ার পাশা ঘাটির উদ্দেশ্যে। রাতেই পৌঁছতে হবে সেখানে, সকালেই আলমা-আতার প্রতিনিধিদল পৌঁছে যেতে পারে।

উপরে পরিস্কার আকাশ। অজস্র তারার মেলা। এই সুন্দর অন্তহীন আকাশের দিকে চাইলে আহমদ মুসা আর চোখ ফেরাতে পারে না। অত নিরবতা, অত উদারতা, অত প্রশান্তি আর কোথাও যেন নেই। এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে আহমদ মুসা দুরের ঐ আদম সুরতের দিকে কিংবা হয়তো আরও উপরে -অন্তহীন অবারিত পথে ছুটছে তার দৃষ্টি।

ধীর গতিতে পার্বত্য পথ ধরে এগিয়ে চলছে কাফেলা।

গাজী আনোয়ার পাশা ঘাটিতে আহমদ মুসা, কুতাইবা এবং হাসান তারিক একটা গোল টেবিল ঘিরে বসে। তাদের সামনে মধ্য এশিয়ার একটা মানচিত্র

খোলা। আলোচনা করছিল তারা।এমন সময় রক্ষী প্রবেশ করল ঘরে। বলল দূত এসেছে তাসখন্দ থেকে।

আহমদ মুসা বলল, নিয়ে এস। দূত এল, সালাম করল। আহমদ মুসা তাকে বসতে বলে খবর জিজ্ঞেস করল। দূত একটি চিঠি তুলে দিল আহমদ মুসার হাতে। আহমদ মুসা চিঠি খুলল, আনোয়ার ইব্রাহিমের চিঠি।

দূত বেরিয়ে গেল। আহমদ মুসা চিঠি পড়ল। আনোয়ার ইব্রাহিম লিখেছে, 'এইমাত্র টেলিফোন পেলাম গুলরোখ রাষ্ট্রীয় খামার থেকে আমাদের ভাই মুহাম্মদ আতাজানভকে 'ফ্র' এর লোকেরা ধরে নিয়ে গেছে। 'ফ্র' এর ক্রুদ্ধ লোকজন গুলরোখ খামারের সেচ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বিনষ্ট করে দিয়েছে। মানুষকে যথেচ্ছা মারধোর করেছে। আরেকটা খবর হল 'ফ্র' এর একটা বিরাট স্কোয়াড সরকারী লোকজনদের সমর্থণ পুষ্ট হয়ে পিয়ালং উপত্যকার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।'

চিঠি শেষ করে থামল আহমদ মুসা। একটু ভাবল। বলল তারপর, পিয়ালং সাইমুমের একটি আশ্রয় কেন্দ্র। সেখানে শত শত  ছিন্নমূল পরিবারকে সাইমুম আশ্রয় দিয়েছে। ওখানে আছে সাইমুমের বিশাল খাদ্য গুদাম। পিয়ালং আমাদের নিরাপদ ট্রেনিং কেন্দ্র। এর উপর 'ফ্র' কে আমরা হাত দেয়ার সুযোগ দিতে পারি না।

হাসান তারিকের দিকে তাকিয়ে আহমদ মুসা বলল, হাসান তারিক তুমিও যাও, সবাইকে প্রস্তুত করো। আমরা এখনি পিয়ালং যাব।

হাসান তারিক চলে গেল।

একটা হাসি ফুটে উঠল হাসান তারিকের ঠোঁটে। গুলরোখ তো সরকারী খামার; আমাদের নয়। ওর উপর এত রাগ কেন? বুঝা যাচ্ছে ওরা দিশেহারা হয়ে পড়েছে। এ দেশের মুসলমানদের কাউকেই আর ওরা বিশ্বাস করতে পারছে না। বিশেষ করে সেদিন আরিস রেল স্টেশন এবং আরিস জেলখানার ঘটনার পর ওরা পাগল হয়ে গেছে। কলিনকভ ও সার্জি সোকলভের মৃত্যুতে বিশ্ব-জোড়া বিশাল কম্যুনিষ্ট সংগঠন 'ফ্র' এর মর্মমূল পর্যন্ত কাঁপন ধরেছে। সাইমুমের গায়ে হাত দিতে না পেরে সাধারণ মানুষের উপর তাদের আক্রোশ বাড়ছে। কিন্তু ওদের

আক্রোশ এবার ওদেরকেই গিলে খাবে। এই মুসলিম মধ্য এশিয়া দখলের সময় অর্থ দিয়ে, পদ দিয়ে, ভুল বুঝিয়ে মুসলমানদের মধ্য থেকে অনেক বিশ্বাসঘাতক ও মুনাফিক কে সাথে পেয়েছিল। তাই মুসলিম শক্তিকে ষড়যন্ত্রমূলক ভাবে পরাজিত করা তাদের পক্ষে সহজ হয়েছিল। কিন্তু আজ পরিস্থিতি ভিন্ন। এ দেশের কাউকেই ওরা সাথে পাবেনা, বিশ্বাস করে সাথে নিতেও পারবেনা। আহমদ মুসা কুতাইবার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, তোমার একবার গুলরোখ রাষ্ট্রীয় খামারে যাওয়া দরকার। ওখানকার দুর্গত মানুষের পাশে সাইমুমকে দাঁড়াতে হবে। সে ব্যবস্থা কর। আতাজানভের পরিবারের খোঁজ নিও, তাদের জন্য কি করা দরকার করো। আতাজানভকে মুক্ত করার জন্য কি করা যায়, কোথায় সে আছে, জানিও।

কুতাইবা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি এখনি যাত্রা করছি।

আহমদ মুসা ও উঠে দাঁড়াল।

অল্পক্ষন পরেই একটা মুজাহিদ কাফেলা বেরিয়ে এল গাজী আনোয়ার পাশা ঘাঁটি থেকে। অনেক ঘোড়ার একত্র পদশব্দ একটা ছন্দ তুলছে বাতাসে। অল্প অল্প ধুলা উড়ছে, পদাঘাতে ছোট ছোট পাথর টুকরা ছিটকে পড়ছে রাস্তা থেকে। সবার আগে আহমদ মুসা, তারপর হাসান তারিক, তারপর অন্যান্যরা। কাফেলা এগিয়ে চলেছে পিয়ালং উপত্যকার দিকে।

পরবর্তী বই

# রক্ত সাগর পেরিয়ে

## কৃতজ্ঞতায়ঃ


1. Shaikh Noor-E-Alam
2. Ismail Jabihullah
3. Bondi Beduyin
4. Shohel Sharif
5. AMM Abdul Momen Nahid
6. M_R_
7. Syed Murtuza Baker
8. Nazrul Islam
9. Osman Gani
10. Sabuz Miah
11. Ashrafuj Jaman
12. Mustafijur Rahaman
13. Tuhin Azad
14. Rashel Ahmed
15. Abdullah Mohammad Choton
16. A.S.M Masudul Alam
17. Esha Siddique
18. Salahuddin Nasim
19. Mohammod Amir
20. S A Mahmud
21. Ataus Samad Masrur
22. Mostafizur Rahman
23. Anisur Rahman
24. Nabil Mahmud
25. Arif Rahman
26. Md. Jafar Ikbal Jewel
27. Umayir Chowdhury

সাইমুম-৬

# রক্ত সাগর পেরিয়ে

আবুল আসাদ

# ১

সেদিন প্রতিদিনের মতই পিয়ালং উপত্যকার জীবন শুরু হলো। উপত্যকার ও পাহাড়ের গা বেয়ে কয়েক'শ তাঁবু।

উপত্যকার বড় তাঁবু থেকে আজানের ধ্বনি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার সংগে সংগে তাঁবুগুলো জেগে উঠল। পুরুষরা ওজু করে মসজিদে গেল। মেয়েরা আবার তাবুর ভেতরেই ফিরে গেল।

বাচ্চারা তখনও ঘুমে। মেয়েরা নামাজ সেরে কেউ গড়িয়ে নিচ্ছিল, কেউ বা তাবুর বাইরে এসে পাথরে বসে গুনগুন করছিল। হয় কুরআন তেলাওয়াত। নয়তো কোন উজবেক কবিতা তাদের মুখে। আবার কেউ ঘরকন্নার কাজ শুরু করে দিয়েছিল।

আর ছেলেরা নামাজ শেষে নিত্যকার মত মসজিদেই বসেছিল। ইমাম তকিউদ্দিন আলোচনা করছিলেন সমসাময়িক প্রসংগ নিয়ে। আলোচনা তার খুবই উপভোগ্য হয়, যতক্ষণ আলোচনা হয় বিছানার সাথে আঠার মত লেগে থাকে মানুষ। আজও তাই হয়েছে। নীরবে গোগ্রাসে গিলছে লোকেরা তার বক্তৃতা।

এমন সময় আকাশ থেকে হেলিকপ্টারের শব্দ ভেসে এল।

পিয়ালং আশ্রয় শিবিরের পরিচালক আবু ওমায়েরভ উঠে দাঁড়িয়ে ইমাম তকিউদ্দিনের কানে কানে কিছু বলল।

ইমাম সাহেব তার বক্তৃতা বন্ধ করে বলল, হেলিকপ্টারের শব্দ শুনা যাচ্ছে আপনারা শান্ত হয়ে বসুন। এখনই এ ব্যাপারে খবর পাবেন। ইমাম সাহেবের কানে কানে কথা বলার পরই আবু ওমায়েরভ মসজিদ থেকে বেরিয়ে এসেছিল। তার হাতে দূরবীন।

আকাশে তিনটি হেলিকপ্টার উপত্যকার প্রান্ত দিয়ে চক্কর দিচ্ছিল। চোখে দুরবীন লাগিয়ে ওমায়েরভ দেখল হেলিকপ্টারগুলোর গায়ে 'ফ্র'- এর চিহ্ন আঁকা।

ওমায়েরভ দ্রুত ফিরে এল মসজিদে। সে আসার পর ইমাম তকিউদ্দিন তার কথা বন্ধ করল। কথা শুরু করল এবার ওমায়েরভ।

ওমায়েরভ পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের যুবক। তাসখন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের ছাত্র সে। চাকুরী করছিল কৃষি দপ্তরের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশনে। বিয়ে করেছে দু'বছর হলো। সাইমুমের কর্মী ছিল ওমায়ের ছাত্র জীবন থেকেই। তার উপরের অফিসার ছিল অ-তুর্কি, রুশীয় অঞ্চলের একজন গোড়া অফিসার। তার চোখে ধরা পড়ে যায় ওমায়েরভ। অবশেষে সে গ্রেফতার এড়িয়ে রাতের অন্ধকারে সবকিছু ফেলে স্ত্রী এবং একমাত্র মেয়েটির হাত ধরে পালিয়ে আসে। সে এক বছর আগের কথা। বিশ্বস্ততা কর্মদক্ষতা গুনে সে এখন সাইমুমের একটি গুরুত্বপূর্ণ আশ্রয়কেন্দ্রের পরিচালক। বুদ্ধিমান ওমায়েরভ 'ফ্র' এর হেলিকপ্টার দেখেই বুঝতে পেরেছে, এ আশ্রয় কেন্দ্রের জন্য একটা চুড়ান্ত সময় আসন্ন। সে শান্ত কন্ঠে বলল, প্রিয় ভাইয়েরা শত্রুপক্ষের তিনটি হেলিকপ্টার আমাদের মাথার উপর উড়ছে। জানিনা তারা কি চায়। কিন্তু, যতটুকু আঁচ করা যায় তাতে বলতে পারি বোমার ভয় ওগুলো থেকে নেই, আর ওগুলো প্যারাট্রুপারস নামালে কয়জনকেই বা নামাতে পারে। সে সাহস তারা করবে বলে আমি মনে করি না। একটাই হতে পারে ওরা আরও নিচে নেমে এসে মেশিনগান দাগাতে পারে। এ অবস্থায় সকলের প্রতি আমার পরামর্শ আপনারা যে যার তাবুতে ফিরে যান, নিজ নিজ অস্ত্র নিয়ে তৈরী থাকুন এবং আদেশের অপেক্ষা করুন।

হেলিকপ্টারগুলো থেকে যদি ফায়ার আসে তাহলে তা থেকে আত্মরক্ষা আপনাদেরই করতে হবে।

একটু থামল ওমায়েরভ। তারপর বলল, আপনারা আদেশ পাওয়ার সাথে সাথে স্থান ত্যাগের জন্যেও তৈরী থাকবেন। আমার মনে হয় এই হেলিকপ্টারগুলো একটা অনুসন্ধানী দল। এদের পাঠানো খবরের পরেই আমাদের উপর আসল বিপদ আসবে।

আবার থামল ওমায়েরভ। তারপর অত্যন্ত ধীর কন্ঠে বলল, প্রিয় ভাইয়েরা, আমরা আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারে সাধ্যমত চেষ্টা করব, কিন্তু যে কোন পরিণতির জন্যই আমরা প্রস্তুত। জীবন এবং মৃত্যু দুই-ই আমাদের কাছে প্রিয়। আমাদের বাঁচাটা আল্লাহর জন্য, মৃত্যুও আল্লাহর জন্য। সুতরাং, কোন কিছুতেই আমাদের দুঃখ নেই, ভয় নেই। আমাদের শুধু প্রার্থনা যুগ যুগ ধরে এই ভুখন্ডের মুসলমানরা পরাধীনতার অসহনীয় জ্বালা ভোগ করছে, আল্লাহ্ তাদের মুক্ত করুন, স্বাধীনভাবে মুক্ত বায়ুতে নিঃশ্বাস নেয়ার সুযোগ তাদের দান করুন।

কথা শেষ করল ওমায়েরভ। নীরবে এক এক করে সবাই চলে গেল যে যার তাবুতে। ইমাম তকিউদ্দিনও।

সবার শেষে বেরুল ওমায়েরভ। অনেকখানি ফর্সা হয়ে গেছে তখন। হেলিকপ্টার আরো কিছুটা নিচে নেমে এসেছে। এক সাথেই তিনটা চক্কর দিচ্ছে। হেলিকপ্টারগুলো আকারে কিছুটা বড়, গঠনটাও একটু ভিন্ন প্রকৃতির। নিছক পর্যবেক্ষনের ছোট হেলিকপ্টার এগুলো নয়।

ওমায়েরভ তার তাবুতে এসে পৌছল। তার স্ত্রী আরেফা দু'বছরের মেয়েটির হাত ধরে তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল। তার চোখে একরাশ শংকা। কিন্তু দু'বছরের ফাতিমা খুবই খুশী। ওমায়েরভ যেতেই মায়ের কাছ থেকে হাত ছাড়িয়ে দৌড়ে এসে ওমায়েরভের হাত ধরে বলল, ঐ দেখ আব্বা, কি নাম ওটার?

ওমায়েরভ ওকে কোলে নিয়ে চুমু খেয়ে বলল, ওটা হেলিকপ্টার।

এটুকু কথায় ফাতিমার মন তৃপ্ত হয়নি। হৈ চৈ করে আরও কিছু বলছিল সে। কিন্তু ওমায়েরভ সেদিকে কান দিতে পারলো না।

স্ত্রীর শংকাকুল চোখের দিকে চেয়ে ওমায়েরভ বলল, ওটা 'ফ্র' এর হেলিকপ্টার। আমাদের আশ্রয় কেন্দ্র ধরা পড়ে গেছে আরেফা। সম্ভবত আমাদের সরতে হবে। তৈরী হয়ে নাও।

বলে ওমায়েরভ তাবুর ভিতরে ঢুকে স্টেনগানটা কাধে তুলে নিল তার সাথে গুলির বাক্সও। তারপর বাইরে বেরুল সে তাবু থেকে। আবার দৃষ্টি ফেললো হেলিকপ্টারের দিকে। এবারের বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করল, হেলিকপ্টারগুলো গোটা উপত্যকা কভার করে তিনটি সমান্তরাল লাইনে এগিয়ে আসছে কাত হয়ে, ঠিক বোমারু বিমানগুলোর বোমা ফেলার ভংগির মত করে। তাহলে কি কিছু ফেলছে হেলিকপ্টারগুলো? কি ফেলছে? উৎকন্ঠিত হয়ে উঠল ওমায়েরভ।

হেলিকপ্টারগুলো আসছে উত্তরদিক থেকে বাতাসও উত্তরে হঠাৎ বাতাসে সুক্ষ্ম এক অপরিচিত গন্ধ পেল সে। বিজ্ঞানের ছাত্র ওমায়েরভ সংগে সংগে বুঝতে পারল, অন্য কিছু নয় গ্যাসের গন্ধ এটা। ওরা তাহলে গ্যাস বোমা ফেলছে?

আৎকে উঠল ওমায়েরভ। দৌড়ে সে তাবুর ভিতরে ঢুকে গেল এবং ব্যাটারী চালিত সাইরেন বের করে এনে চেপে ধরল তার সুইচ।

তীব্র কন্ঠে বেজে চলল সাইরেন।

হৈ চৈ পড়ে গেল আশে পাশের তাবুগুলোতে। এ সংকেতের অর্থ সকলেই বুঝে। এ সংকেতের নির্দেশ ছুটে সরে যেতে হবে অন্য কোথাও।

হেলিকপ্টারগুলো অর্ধেকটা উপত্যকা পেরিয়ে এসেছে। ছুটে আসছে ওগুলো। বাতাসে গন্ধ বেড়ে গেছে, কেমন যেন ভারী মনে হচ্ছে বাতাস। স্ত্রী আরেফা বলল, ফাতিমা কেমন যেন করছে।

চমকে ফিরে তাকাল ওমায়েরভ। দেখল, ফাতিমার ঘাড় কাত হয়ে ঢলে পড়েছে। তার হাতে পায়ে হাত দিয়ে বুঝল ওগুলো ঠান্ডা এবং শিথিল। হৃদয়ে যন্ত্রণার এক ছোবল লাগল ওমায়েরভের। ভাবল সে, তাদেরও তো এখান থেকে সরে পড়া দরকার। কিন্তু কেমন করে পালাবে সে সবাইকে রেখে।

স্ত্রীর দিকে চেয়ে ওমায়েরভ বলল, আরেফা, শত্রুরা গ্যাসবোমা ছেড়েছে। তুমি ফাতেমাকে নিয়ে পালাও। আমি আসছি।

আরেফা স্বামীর হাত চেপে ধরে বলল, তুমি চল, তোমাকে রেখে আমি যাব না।

ওমায়েরভ উত্তরের তাবুর সারির দিকে চেয়ে বলল, আরেফা ওদিকের কাউকে তো আমি বেরুতে দেখছি না! আমি কি করে সরে যাব তাদের রেখে!

হেলিকপ্টার আরও সামনে চলে এসেছে। আরেফা চিৎকার করে উঠল, আমার ফাতিমার কি হল, দেখ কি হল। আরেফার কোলে ঢলে পড়েছে দু'বছরের ফাতিমা। গোটা দেহ তার নীল। জ্ঞান হারিয়েছে সে। ফাতিমার মুখের দিকে একবার চেয়ে ফিরে তাকাল ওমায়েরভ উত্তর দিকে। দূরবীন তার চোখে। দেখল সে। দেখে শিউরে উঠল ওমায়েরভ। তাঁবুর পাশে, পাথরের উপর ঢলে পড়েছে মানুষ। এদিকে অনেকে দেখল পাহাড় ডিঙিয়ে পথে সরে যাবার চেষ্টা করেছিল, মৃত্যু-গ্যাসের তারাই শিকার হয়েছে প্রথম। মাথা ঝিমঝিম করছে ওমায়েরভের।

এসে স্ত্রীর কাঁধে হাত রাখল। টলছে আরেফা। বুকে জড়িয়ে রেখেছে ফাতিমাকে।

ওমায়েরভ ফাতিমাকে আরেফার কোল থেকে নিয়ে মাটিতে শুইয়ে দিল অত্যন্ত আদরে, তারপর একটা চুমু খেয়ে আরেফার একটা হাত ধরে বলল চল।

আরেফা চিৎকার করে উঠল, ফাতিমাকে রেখে আমি যাবনা।

ওমায়েরভ আর কথা না বলে ফাতিমাকে তুলে নিল বুকে, তারপর আরেফার হাত ধরে অনেকই যে পথে চলেছে, সে পথে যাত্রা করল ওমায়েরভ।

হেলিকপ্টার তখন মাথার উপরে। ওমায়েরভ দেখল, কয়েকশ' গজ সামনেই একটা সিলিণ্ডার এসে পড়ল। ফেটে গেল। হাত পায়ের শক্তি নিঃশেষ হয়ে পড়েছিল ওমায়েরভের। স্ত্রী আরেফার দেহের ভার এখন তার উপর। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তার।

ফাতিমাকে নামিয়ে রাখার জন্যে সে নীচু হল। আরেফা পড়ে গেল।

ফাতিমাকে রেখে ওমায়েরভ দেখল জ্ঞান হারিয়েছে আরেফা। ওমায়েরভ বসে পড়ল। চারদিকে তাকাল। কয়েকগজ দূরেই দেখল, একজন মা তার শিশুকে জড়িয়ে পড়ে আছে। দু'জনেই নিস্তব্ধ। ওমায়েরভ তায়াম্মুম করল। তখনও জ্ঞান আছে তার। দু'টি হাত উপরে তুলল। বলল, হে আল্লাহ আমাদের জীবনকে কবুল

কর। মুসলিম হিসাবে যে দায়িত্ব তুমি দিয়েছিলে, তা পালন করতে পারিনি। কিন্তু যখন থেকে বুঝেছি, চেষ্টা করেছি। এ চেষ্টা তুমি কবুল কর, কবুল করে তুমি আমাদের নাজাত দাও, আর আমার জাতিকে তুমি পরাধীনতার শৃংখল থেকে মুক্ত কর। আর.........

কথা জড়িয়ে গেল ওমায়েরভের। সে ঢলে পড়ে গেল পাশের পাথরের উপর। হেলিকপ্টার তখন আরও দক্ষিনে এগিয়ে গেছে।

সামনে পাহাড়, পাহাড়ের পরের উপত্যকা পেরুলেই পিয়ালং উপত্যকা। আহমদ মুসা খুশী হল, 'ফ্র' এর দলটা পিয়ালং-এ পৌঁছার আগেই তারা এখানে পৌঁছে গেছে। ওদেরকে অনেকটা ঘুরা পথে পিয়ালং-এ আসতে হবে। আহমদ মুসা ভেবে পেলনা এখানে আসার এই দুঃসাহস তারা কেমন করে দেখাতে পারছে? ওদের দলটা তাহলে কত বড়? যত বড়ই হোক শহরের বাইরে এলে ওরা অসহায় হয়ে যায়, একথা তারা তো ভালো করেই বুঝে।

সংকীর্ণ এক গিরি পথ দিয়ে সামনের পাহাড়টা অতিক্রম করল আহমদ মুসার দল। পরের উপত্যকা মাইল খানেকের মত প্রস্থের দিকে। উপত্যকা পার হয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই তারা পিয়ালং উপত্যকার উত্তর দিকের পাহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত হল। পাহাড়টা বেশ উঁচু এবং দুর্গমও। বাঁ দিকের কিছুটা পথ এগুলে একটা গিরিপথ পাওয়া যায়। ঘোড়ার লাগাম টেনে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল আহমদ মুসা। চলল সেই গিরিপথের দিকে।

উত্তরের গিরিপথ দিয়ে পিয়ালং উপত্যকায় প্রবেশ করছে আহমদ মুসা। বাতাস উত্তর দিক থেকে বইছে। সে গিরি পথে তখন প্রবল বাতাস। পাহাড়ের দেওয়ালে এই করিডোর খুঁজে পেয়ে বাতাস যেন মহাখুশি। পথ শ্রান্ত আহমদ মুসাদের শরীরেও বাতাস শান্তির পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে।

গিরিপথের মাঝামাঝি তখন তারা। খুব সূক্ষ একটা পরিচিত গন্ধ পেলো আহমদ মুসা। সংগে সংগে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। তার সাথে সাথে দাঁড়িয়ে পড়ল গোটা কাফেলা। হাসান তারিক পেছন থেকে আহমদ মুসার পাশে এসে দাঁড়াল।

একটা গন্ধ পাচ্ছ তারিক? বলল আহমদ মুসা।

ভ্রু কুঞ্চিত হলো হাসান তারিকের। অনুভব করার চেষ্টা করল সে। বলল, হ্যাঁ খুব সূক্ষ্ম একটা গন্ধ বাতাসে মিশে আছে।

মাথা নিচু করে ভাবছিল আহমদ মুসা। হঠাৎ তার নজর পড়ল ছোট দুই পাথরের মাঝখান দিয়ে বেড়ে ওঠা ঘাসের উপর। ঘাসটির চিকন লম্বা দুই পাতা এবং ডগা নেতিয়ে পড়েছে পাথরের উপর। ঘোড়া থেকে নেমে বসে পড়ল আহমদ মুসা। ভালো করে দেখলে ঘাসটাকে। না, সূর্যের তাপে পাহাড়ী ঘাস এমন কোন দিনই হয়না। আশে পাশে তাকিয়ে দেখল একই অবস্থা। অথচ একটু বড় গাছগুলির কিছুই হয়নি। এক জায়গায় আহমদ মুসা দেখল, একদল পাহাড়ী পিপড়া সার বাধা অবস্থাতেই মরে পড়ে আছে। যে শস্যকণা তারা বহন করছিল তা পাশেই পড়ে আছে। এ সংঘবদ্ধ মৃত্যুর কোন কারণই খুঁজে পেলনা আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। তার কপাল কুঞ্চিত। হিসেব মিলাতে পারছে না সে। ঘাসের মৃত্যুর সাথে পিপড়াদের মৃত্যুর কোন সম্পর্ক আছে?

আর এদের সকলের সাথে কি এই গন্ধের কোন সম্পর্ক আছে?

উত্তরে বাতাস তেমনি তীব্র ভাবেই বইছিল সেই গিরিপথ দিয়ে।

সবাই তাকিয়ে ছিল আহমদ মুসার চিন্তিত মুখের দিকে। সকলেই উৎকণ্ঠিত। তারা জানে আহমদ মুসা অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায় না।

আহমদ মুসা সবার দিকে তাকিয়ে বলল, আমার কাছে কোন যুক্তি নেই কিন্তু আমার মন বলছে, আমাদের আর সামনে এগুনো উচিৎ নয়। তারপর তারিকের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, তুমি কাফেলা নিয়ে গিরিপথের মুখে ফিরে যাও। আমি পাহাড়ে উঠব। চারদিকটা একটু দেখে আসি।

বলে ঘোড়ার লাগামটা হাসান তারিকের হাতে দিয়ে দূরবীনটা নিয়ে ঢাল বেয়ে পাহাড়ের উঁচু চূড়ার দিকে উঠতে শুরু করল আহমদ মুসা। পাহাড়ের চূড়ায় উঠে এলো সে। চূড়ায় বসে একটু জিরিয়ে নিল।

কেমন অপরিচিত এক আশংকা শরীরটাকে মনে হচ্ছে আরও ক্লান্ত করে তুলেছে তার।

আহমদ মুসা বসে আছে দক্ষিনমুখী হয়ে। সামনেই আরো দুটো চূড়া। তার ফাঁক দিয়ে গোটা পিয়ালং উপত্যকাই তার নজরে আসছে। তাঁবুগুলোর সারি স্পষ্ট নজরে পড়ছে। আহমদ মুসা দূরবীন তুলে নিল হাতে। চোখে দূরবীন লাগিয়ে তাকালো পিয়ালং উপত্যকার দিকে। দূরবীনের প্রথম দৃষ্টিটাই গিয়ে পড়ল একটা তাঁবুর পাশে। দূরবীন ধরা হাতটা যেন কেঁপে উঠল আহমদ মুসার। তাঁবু থেকে একটু দুরে তিনটা দেহ পড়ে আছে, একটা পুরুষের, একটা নারীর, আরেকটা শিশুর। পুরুষের একহাতে স্টেনগান অন্যহাতে শিশুকে ধরা, নারীরও একটা হাত আঁকড়ে ধরে আছে শিশুকে। নিশ্চল নিস্পন্দ ওদের দেহ, ওরা কেউ বেঁচে নেই। প্রবলভাবে কেঁপে উঠল আহমদ মুসার হৃদয়টা। মনের কোনে অপরিচিত আশংকা যাকে দমিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে, মুখ ব্যাদান করে উঠল হৃদয়ের সিংহ দরজায়।

আহমদ মুসার দূরবীনের চোখটা একবার ঘুরে এল গোটা উপত্যকা। একই দৃশ্য নীরব-নিথরভাবে পড়ে আছে মানবদেহগুলো। যেন কোন যাদু বলে অঘোরে ঘুমাচ্ছে পুরুষ নারী প্রত্যেকেই। আহমদ মুসার দূরবীনের অস্থির দুটি চোখ যেন পাগল হয়ে চষে ফিরছে গোটা উপত্যকায় একটা সচল দেহের সন্ধানে। না, নেই জীবনের স্পন্দন নেই কোথাও।

চোখ থেকে দূরবীন নামাল আহমদ মুসা। বেদনায় বিবর্ণ হয়ে গেছে তার মুখ। দুচোখ থেকে তার দুফোটা অশ্রু কিছুটা নেমে শুকিয়ে আছে। গোটা দেহে অপরিসীম একটা ক্লান্তি।

নেমে আসার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল আহমদ মুসা। নামতে গিয়ে আরেকবার দূরবীনটা চোখে লাগাল সে। দূরবীনের চোখটা পিয়ালং উপত্যকার চাররিদকটা আবার ঘুরতে শুরু করলো। এক জায়গায় এসে হঠাৎ আটকে গেল দূরবীনের চোখ। জায়গাটা পিয়ালং এর দুই উপত্যকার পশ্চিমের একটি পাহাড়। পাহাড়টির

গিরিপথ ধরে এগিয়ে আসছে একদল মানুষ। দূরবীনের চোখ ওখানে আটকেই থাকল। জনা পঁচিশেক লোক হবে ওরা। পিঠে ঝুলানো স্টেনগান, কোমরে পিস্তল। প্রত্যেকেই সাদামুখো রুশ।

আহমদ মুসা নিশ্চত হল 'ফ্র'-এর সেই দলটাই আসছে।

আহমদ মুসা পাহাড় থেকে নামতে শুরু করল। নামতে নামতে ভাবল কেন আসছে ওরা? সবাইকে হত্যা করার পর আবার প্রয়োজন কি? হঠাৎ তার মনে পড়ল, ওদের ডকুমেন্ট চাই, সাইমুম এর পরিচয় ও অবস্থান সংক্রান্ত ডকুমেন্ট। সবাই নিহত হবার পর এখানে তো ফ্রি পড়ে আছে ওগুলো। সে সব উদ্ধারের জন্যই ওরা আসছে। তা ছাড়া এখানে সাইমুমের অস্ত্র-শস্ত্র, অর্থ সম্পদও কম নেই। হাসল আহমদ মুসা, ওদের লোভ কম নয়। সেই সাথে দৃঢ় এক শপথে তার চোয়াল দুটি শক্ত হয়ে উঠল। নীচে নেমে এল আহমদ মুসা। সবাই উৎকণ্ঠিত ভাবে অপেক্ষা করছিল আহমদ মুসার। আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে তাদের উদ্বেগটা আরও বেড়ে গেল। কিন্তু কেউ কথা বলছে না। সবার চোখেই একরাশ প্রশ্ন। আহমদ মুসা ওদের দিকে তাকিয়ে ধীর কণ্ঠে বলল, প্রিয় ভায়েরা, যতদূর দেখেছি, পিয়ালং উপত্যকায় আমাদের কেউ বেঁচে নেই। খুনী 'ফ্র' বিষাক্ত গ্যাস বোমা ফেলে তাদের সবাইকে হত্যা করেছে।

কেউ কোন শব্দ করল না, কেউ কোন কথা বলল না। চোখ তাদের নীচের দিকে, নতমুখী তারা। নীরবে তাদের চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু। অসহায় মজলুম ঐ মানুষরা তাদের স্বাধীন মন ও বিশ্বাস নিয়ে বাঁচার আশাতেই আশ্রয় নিয়েছিল এখানে। কিন্তু পারলনা তারা বাঁচতে। শিকার হলো মর্মান্তিক এক মৃত্যুর। শত শত পুরুষ নারী শিশু এক সাথে।

আহমদ মুসা আবার ধীরে ধিরে বলল, প্রিয় ভায়েরা, তোমরা অশ্রু মুছে ফেল। এস আমরা প্রতিশোধ নিই। প্রতিরোধের আগুন জ্বালি এ চোখে।

একটু থেমে আহমদ মুসা বলল, একটা সুখবর তোমাদের জন্য। 'ফ্র' এর সেই দলটা পশ্চিমদিক থেকে পিয়ালং উপত্যকার দিকে আসছে। ওদের বড় আশা, সবাইকে হত্যা করার পর এখান থেকে সাইমুমের দলিল দস্তাবেজ ওরা হাত করবে। সেই আশাতেই ওরা ছুটে আসছে।

সবাই একসাথে চোখ তুলে আহমদ মুসার দিকে তাকাল। তাদের চোখে শপথের দীপ্তি চক চক করছে।

আহমদ মুসা হাসান তারিকের দিকে আর একটু এগিয়ে তার হাত থেকে নিজের ঘোড়ার লাগামটা নিতে নিতে কয়েকটা জরুরী নির্দেশ দিল।

হাসান তারিক নির্দেশ পেয়ে তার মুজাহিদ কাফেলাকে নিয়ে গিরিপথের মুখ থেকে একটু উত্তরে একটা দীর্ঘ টিলার আড়ালে চলে গেল। আহমদ মুসা ওয়্যারলেসে তাসখন্দে আনোয়ার ইব্রাহীম, গুলরুখ রাষ্ট্রীয় খামারে কুতাইবা, লেনিন স্মৃতি পার্কে আলদর আজিমভকে কয়েকটা নির্দেশ দিয়ে সেই টিলার আড়ালে হাসান তারিকদের সাথে একত্রিত হলো।

আহমদ মুসার নিশ্চিত বিশ্বাস 'ফ্র' এর ওই দলটাও পিয়ালং উপত্যকায় প্রবেশের জন্য এই গিরিপথই ব্যবহার করবে। এই একই উপত্যকা পিয়ালং এর পশ্চিম পাশের পাহাড়কেও বেষ্টন করে আছে। সুতরাং, উচু পাহাড় ডিঙানোর চাইতে উপত্যকার পথ ব্যবহারের জন্য এই গিরিপথের দিকেই তারা এগিয়ে আসবে।

যে টিলার আড়ালে আহমদ মুসারা আশ্রয় নিয়েছে তার অবস্থানটা খুবই সুন্দর। টিলাটির পশ্চিম প্রান্তে দাঁড়িয়ে প্রায় গোটা উপত্যকাটাই নজরে আসছে। সুতরাং, 'ফ্র' এর লোকেরা এ উপত্যকায় পা দেবার সাথে সাথেই তাদের সব গতিবিধি নজরে আসবে।

অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান ঘটল। উপত্যকার পশ্চিম পাশের এক গিরিপথ দিয়ে 'ফ্র' এর বাহিনীটি উপত্যকায় নেমে এল। উপত্যকায় ওরা সোজা পিয়ালং পাহাড়ের দিকে না গিয়ে উপত্যকা ধরে এদিকেই এগিয়ে আসছে। লক্ষ্য তাদের এ গিরিপথটাই। আহমদ মুসা খুশী হল।

আহমদ মুসা হাসান তারিককে বলল, তুমি তোমার লোকজনদের টিলার পশ্চিম প্রান্তে নিয়ে মোতায়েন কর যাতে ওরা এ টিলা অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে ওদের পেছনে গিয়ে দাঁড়ানো যায়। দেখ, ওদের মুখে গ্যাস মাস্ক আছে। ওদেরকে গিরিপথে ঢোকার সুযোগ দিলে আমরা বিপদে পড়বো। গ্যাস মাস্ক ছাড়া আমরা উপত্যকায় ঢুকতে পারব না।

হাসান তারিক তার সাইমুম ইউনিট নিয়ে টিলার পশ্চিম প্রান্তে চলে গেল। আর আহমদ মুসা টিলার পুর্বপ্রান্তের গিরিপথটার মুখ বরাবর ওঁত পেতে থাকল।

অনেকটা সমান্তরাল সার বেধে ওরা এগিয়ে আসছে। সকলের হাতে স্টেনগান। উপত্যকার মাঝামাঝি এসে ওরা গ্যাস মাস্ক পরে নিয়েছে। এখন ওদের পদক্ষেপ অনেক সতর্ক মনে হচ্ছে।

ওরা টিলাটির পশ্চিম প্রান্ত অতিক্রম করে এগিয়ে গেল গিরিপথটির দিকে। হাসান তারিকের নেতৃত্বে সাইমুম ইউনিট বেরিয়ে এল টিলার আড়াল থেকে। দ্রুত চন্দ্রাকার লাইনে আড়াআড়িভাবে টিলা থেকে পাহাড় পর্যন্ত গোটা জায়গায় তারা ছড়িয়ে পড়ল। তাদের হাতে উদ্যত স্টেনগান।

হঠাৎ, 'ফ্র' এর একজন সম্ভবত জুতা ঠিক করতে গিয়ে নিচু হয়েছিল। তার চোখে ধরা পড়ে গেল সাইমুমের লোকেরা। ভুত দেখার মত চমকে উঠে দাড়াল সে। পাথরের মুর্তির মত সে দাড়িয়ে থাকল। কিছু করতে, কিছু বলতেও যেন সে ভুলে গেল। বোধ হয় তার কি হোল তা দেখার জন্যই আরেকজন পিছন ফিরে তাকাল। সে পিছনে তাকিয়ে সবটা ব্যাপার বুঝতে পারল। তার চমকে উঠা ভাব দুর হবার আগেই স্টেনগানটা সোজা করতে করতে হাটু গেড়ে বসে পড়ল সে।

স্টেনগানের ট্রিগারে হাত রেখেই এগিয়ে আসছিল হাসান তারিক। তাকে বসতে দেখেই হাসান তারিক চেপে ধরল স্টেনগানের ট্রিগার। এক পশলা গুলি ছুটে গেল। ছেঁকে ধরল সেগুলো দাঁড়ানো এবং বসা সেই লোক দু'টিকে। বসা লোকটিও ট্রিগার চেপেছিল শেষ মুহুর্তে। কিন্তু গুলিবিদ্ধ তার দেহ স্টেনগান ধরে রাখতে পারল না। লক্ষ্যভ্রষ্ট হল গুলি। দু'জনেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাটিতে।

হাসান তারিকের সাথে সাথে অন্য ১৯ টি স্টেনগানও একই সাথে গর্জন করে উঠল। আগুনের এক দেয়াল এগিয়ে গেল 'ফ্র' এর বাহিনীর দিকে। ওরা ফিরে দাঁড়ানোরও সময় পেল না। সার বেধে চলছিল, সার বেধেই ওরা ঢলে পড়ল মাটিতে। ১৯ টি স্টেনগান অবিরাম গুলী বৃষ্টি করছিল, সুতরাং সামনে আরও যারা ছিল পাকা ফলের মতই খসে পড়তে লাগল মাটিতে। কয়েকজন মাথা নিচু করে সামনে দৌড় দিয়েছিল। উদ্দেশ্য গিরিপথে ঢুকে পড়া, পাহাড়ের আড়াল নেয়া। কিন্তু, কাছেই ওঁত পেতে থাকা আহমদ মুসার মুখে পড়ল ওরা। আহমদ মুসার

স্টেনগানের শিকার হয়ে ওরা গিরিপথের সামনেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। মাত্র এক মিনিট। এর মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল। 'ফ্র'-এর ২৫ সদস্যের সবাই মারা গেল।

আহমদ মুসা বেরিয়ে এল টিলার আড়াল থেকে। তাকাল ২৫ টি লাশের দিকে। রক্তে ভাসছে ওরা। হাসান তারিক গিয়ে আহমদ মুসার পাশে দাঁড়াল। আহমদ মুসা তাকিয়েছিল ঐ লাশগুলোর দিকে। অনেকটা স্বগত কন্ঠে সে বলল, কার পাপে এরা এমনভাবে মরছে, কারা দায়ী এর জন্যে?

হাসান তারিক বলল, আল্লাহর সৃষ্ট স্বাধীন মানুষকে দাস বানাবার কম্যুনিস্ট ক্ষুধাই এর জন্য দায়ী।

-এ ক্ষুধা কত বড় হাসান তারিক? শুরুতেই ৫০লাখ কৃষক ওদের পেটে গেছে। আরও ১কোটি অসহায় মানুষকে ওরা সাইবেরিয়ার সাদা বরফের নিচে ফ্রিজ করে রেখেছে। তারপরও লাখ লাখ মানুষকে ওরা গুম করেছে। কতবড় ক্ষুধা ওদের? মধ্য এশিয়ার ক'জন মানুষকে এভাবে গিলে না খেলে তাদের চলত না? কবে নিবৃত্ত হবে তাদের ক্ষুধা?

-এ ক্ষুধা তাদের এক উন্মত্ত ব্যাধি। মৃত্যু ছাড়া কম্যুনিজমের এ ব্যাধি যাবে না।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, কম্যুনিজম বেচে নেই হাসান তারিক। বাস্তবতার হাতুড়াঘাতে কার্ল মার্কসের কম্যুনিজমের স্বপ্ন-ফানুস বহু আগেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। বেচে আছে তাদের প্রেতাত্মা। নাম তার কম্যুনিজমই। এর মৃত্যু কত দূরে সেটাই এখন প্রশ্ন।

-ভাববেন না মুসা ভাই, পিয়ালং এর ঘটনা তাদের শেষ দশারই সংকেত দিচ্ছে।

পিয়ালং এর নাম উচ্চারিত হতেই মুখের ভাবটা বদলে গেল আহমদ মুসার। আর কোন কথা সে বলল না। একটুক্ষণ চুপ থাকল। তারপর বলল, তোমরা সবাই গ্যাস মাস্কগুলো খুলে নিয়ে পরে নাও। এখন আমরা পিয়ালং উপত্যকায় ঢুকব।

আহমদ মুসাসহ ২১ জন সকলে গ্যাস মাস্ক পরে নিল। গ্যাস মাস্ক সংগ্রহ করতে গিয়ে একটা ভিডিও ক্যামেরা পাওয়া গেল। পেয়ে খুশিই হল আহমদ মুসা।

বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগে এই গণহত্যার একটা দলিল রাখা যাবে। প্রস্তুতি শেষ করে তারা ওই গিরিপথ ধরে পিয়ালং উপত্যকায় প্রবেশ করল।

নিঝুম-নিস্তব্ধ এক উপত্যকা। কোন প্রাণের চিহ্ন সেখানে নেই। উপত্যকার আকাশে কোন পাখি পর্যন্ত উড়ছে না। পিয়ালং এখন এক মৃত উপত্যকা। এই মৃত পুরীতে আহমদ মুসা এবং তার সাইমুম সাথীরা প্রতিটি তাবু প্রতিটি লাশের কাছে গেল। প্রতিটি দৃশ্যকে ভিডিও ক্যামেরায় ধরে রাখল তারা। ঘটনার বীভৎসতা তাদের সকলের চোখের পানি শুকিয়ে দিয়েছিল। বেদনায় যেন শক্ত কাঠ হয়ে গিয়েছিল তারা।

উপত্যকার সাইমুম অফিস থেকে প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র, দলিল, দস্তাবেজ সংগ্রহ করল। তারপর সন্ধ্যা নামার আগেই বেরিয়ে এল মৃত উপত্যকা থেকে।

তাদেরকে আবার ফিরে আসতে হবে এ উপত্যকার শহীদদের দাফনের জন্য প্রস্তুত হয়ে। রাতটা তারা বাইরের উপত্যকাতেই কাটাবে।

সুর্য অস্ত গেল। অন্ধকার নেমে এল উপত্যকা জুড়ে।

সাইমুমের একজন কর্মী আযান দিল। পরিমাণ মত খাবার পানি রেখে অজু সেরে তারা সবাই নামাজে দাঁড়াল।

পিয়ালং এর ঘটনার পর আহমদ মুসা গম্ভীর হয়ে গেছে। যেন অথৈ এক ভাবনার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে সে। আজ সাইমুমের জরুরী পরামর্শ সভাতেও তার মুখে চোখে সেই গাম্ভীর্য। আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু পিয়ালং এর ঘটনা এবং ভবিষ্যতের চিন্তা। আহমদ মুসা গম্ভীরভাবে এই বিষয়ের উপর সকলের মত শুনছিল। আজকের জরুরী সভায় সবাই হাজির না থাকলেও পরামর্শসভায় নেতৃস্থানীয় সবাই হাজির আছে। সবাই একে একে তাদের মত প্রকাশ করল। মতামত তাদের প্রায় একই রকম। এমন ত্যাগ ও কোরবাণীর জন্য আমাদের

আরও প্রস্তুত থাকতে হবে। খুনী "ফ্র"-এর শক্তির এখন শেষ প্রদর্শনী চলছে। জনগণ আমাদের পাশে আছে। বিজয় আমাদের হবেই।

সবার বলা শেষ হলে আহমদ মুসা একটু নড়ে চড়ে বসল। ধীর কন্ঠে বলল, পিয়ালং-এর ঘটনা আমাদের জন্য আমি মনে করি একটা বড় শিক্ষা নিয়ে এসেছে। আরও ত্যাগ ও কুরবানীর জন্য আমাদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে। আপনাদের এ কথার সাথে আমি একমত। তবে, তা এমন বেঘোরে আর নয়। 'ফ্র' এর রাষ্ট্রশক্তি আছে, তার সাথে লড়াই-এ নামতে আমরা চাই না। কম্যুনিস্ট কবলিত আমাদের জনগনকে সচেতন করা, সুসংগঠিত করাই আমাদের কাজ। এই কাজে যেকোন আক্রমনের মুখে আমরা আত্মরক্ষা করব এবং তা করব জনগণের একজন হয়ে। 'জনতার' সারি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র সত্ত্বা সৃষ্টি করে আলাদা কোন টার্গেটের শিকার আমরা হব না যেমনটা পিয়ালং এ হলো। হিসার দুর্গের ঘটনা ঠিক আছে, গুলরোখ রাষ্ট্রীয় খামারের ঘটনা ঠিক আছে, আরিসের ঘটনা ঠিক আছে, কিন্তু পিয়ালং আর নয়।

থামল আহমদ মুসা। আহমদ মুসা থামতেই কুতাইবা বলে উঠল, আপনার কথা বুঝেছি, তবু আরেকটু খুলে বলুন।

'আমি বলতে চাচ্ছি', বলল আহমদ মুসা, পিয়ালং-এর মত কোন আশ্রয় কেন্দ্র আর আমরা গড়ব না, আমাদের লোকদের কোন বসতিও আমরা কোথাও সৃষ্টি করব না। আমরা জনগণের মধ্যে কাজ করব, তাদেরই মধ্যে থাকব।

-আমাদের ঘাটিগুলো? প্রশ্ন তুলল আলদর আজিমভ।

-আমাদের ঘাটিগুলো পিয়ালং নয়, আমাদের কোন বসতিও নয়, ওগুলো স্থানান্তর যোগ্য এবং ওগুলো পরিত্যাগ করেও চলে আসতে পারি।

অনেকটা হাসি মুখেই বলল আহমদ মুসা।

সকলের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, আপনার চিন্তা সঠিক। একমত আমরা আপনার সাথে।

-তাহলে আমাদের ৩ নং ঘাটি পিনান্দজে আরিসের যে ৫ শ' লোকের বসতি করলাম তা ভেঙে দিতে হয়। বলল আহমদ মুসা।

-ঠিক আছে, ভেঙে দেব আমরা। বলল হাসান তারিক।

-ওদের কি করা যায় তাহলে? প্রশ্ন আহমদ মুসার।

সবাই নীরব। কেউ কোন উত্তর দিল না। মনে হয় সবারই এ একই প্রশ্ন।

আহমদ মুসাই আবার কথা বলল। বলল সে, তাজিক সীমান্ত সংলগ্ন আফগান এলাকায় ওদের পাঠিয়ে দেওয়া হোক। সেখানে আমাদের আফগান ভাইদের তত্ত্বাবধানে ওরা ভাল থাকবে। যখনই প্রয়োজন হবে ওদের নিয়ে আসতে পারব।

সবাই প্রায় এক সাথে বলে উঠল, ভাল প্রস্তাব। আপনি এই ব্যবস্থাই করুন।

আহমদ মুসার চোখে-মুখে একটা স্বস্তির চিহ্ন ফুটে উঠল। দুশ্চিন্তার একটা কালো ছায়া যেন সরে গেল তার মুখ থেকে। তার ঠোঁটে ফুটে উঠল হাসির রেখা।

# ২

উজবেকিস্তানের সারাকায়া গ্রাম। পশ্চিম উজবেকিস্তানের সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে সমৃদ্ধ কলখজ বা যৌথ খামারের কেন্দ্র এটা।

গ্রামের প্রবেশ মুখে বড় রাস্তাটির পশ্চিম পাশ ঘেঁষে কম্যুনিস্ট যুব সংগঠন 'কমসমল' এর আঞ্চলিক অফিস। সময় তখন দুপুর পেরিয়ে গেছে। কমসমল অফিসের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। জানালাগুলো খোলা।

অফিসের ইজিচেয়ারে কমসমলের সাধারণ সম্পাদক ইউরি রশিদভ চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। তার পাশে ইজিচেয়ারের উপর পড়ে আছে 'তুর্কিস্তান' -এর চলতি সংস্করণ।

চোখ বন্ধ করে ভাবছে রশিদভ। ভাবছে সে, দেশ এক পরিবর্তনের দিকে গড়াচ্ছে, প্রত্যেক পরিবর্তনের পটভূমিতেই থাকে এক ঝড়, এক সংঘাত। এই সংঘাতে তার ভূমিকা কি হবে? কমসমল এবং কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে আমরা যাই বলি, আমাদের জনগণ এই পরিবর্তনের জন্য উন্মুখ। তাদের হৃদয়ে একটা দগদগে ক্ষত ঘুমিয়ে ছিল, সাইমুম তাকে জাগিয়ে দিয়েছে। এই জাগরণ রোধ করবে কে? নিজেরই উপর আর বিশ্বাস নেই রশিদভের। গতকাল যখন জানালা দিয়ে ফেলে যাওয়া 'তুর্কিস্তান' সে পেল, তখন রাগ হওয়ার বদলে ভাল লাগল তার। মনে হল, মন তার যেন এর জন্য অপেক্ষা করে ছিল। আমার তো উচিত ছিল 'তুর্কিস্তান' পাওয়ার পরেই এটা পার্টিকে জানানো, পার্টি অফিসে জমা দেওয়া। কিন্তু মন আমার তা দিতে দেয়নি। তাই শুধু নয়, হৃদয়ের এক দুর্বোধ্য তাড়নায় সে 'তুর্কিস্তান' কে সযতনে সবার চোখ থেকে গোপন রেখেছে। গোপন করার পরেও তার বড় বোন গোয়েন্দা বিভাগের অফিসার শাহীন সুরাইয়ার হাতে ওটা পড়ে যায়। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে উঠছিল সে। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার, তার আপা 'তুর্কিস্তান' তার হাতেই আবার ফেরত দিয়েছে। এই সাথে একটু চাপা স্বরে

মুরুব্বিয়ানার ঢংয়ে বলেছে, এসব জিনিস রাখার ব্যাপারে তোর আরও একটু সাবধান হওয়া উচিত।

তার কথা শুনে মনে হয়েছে ছোট ভাইয়ের কাজটাকে সে শুধু সমর্থনই নয়, আরও ভাল ভাবে করতে পারুক তাই যেন সে চায়।

বিস্মিত চোখে রশিদভ তার বোনের দিকে তাকিয়েছে। বলেছে আপা কিছুই যে বললেন না?

-কি বলব?

-বকবেন, কোথায় পেয়েছি তা জিজ্ঞেস করবেন।

-এসব বিষয় আমি কম জানতে চাই।

-কিন্তু আপনি তো গোয়েন্দা বিভাগের একজন অফিসার? রশিদভের চোখে অনুসন্ধান।

-তুইও তো কমসমলের সাধারণ সম্পাদক এ অঞ্চলের। সুরাইয়ার কথায় পাল্টা আক্রমণ।

-আপা আমি আসলে আপনার মতটা জানতে চাচ্ছি।

-মন না থাকলে মত থাকবে কি করে?

-মন নেই? রশিদভের চোখে অপার বিস্ময়।

-একটা জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য যদি মরে যায়, আত্মপরিচয়ের অধিকার যদি শেষ হয়ে যায়, তার মন আর বেঁচে থাকতে পারে না। মন আমাদের মরে গেছে রশিদ।

রশিদভ বিস্ময়ে কেঁপে উঠেছিল। একি বলছে তার আপা! কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের সে একজন দায়িত্বশীল অফিসার! সাপ্তাহিক ছুটি কাটাবার জন্য আজই সে বাড়িতে এসেছে তাসখন্দ থেকে। বিস্ময়বিমূঢ় ছোট ভাইয়ের দিকে তাকিয়েছিল সুরাইয়া। সে আরো কাছে সরে এসে বলল, মধ্য এশিয়ার মুসলমানরা যে অত্যাচার সহ্য করেছে, যুগ যুগ ধরে হাতুড়ির যে নিদারুণ আঘাত তারা পেয়েছে, কোন বিস্ময় দিয়েই তুই তার পরিমাপ করতে পারবি না রশিদ। সয়ে সয়ে আমাদের মত হুকুম বরদারদের মন ও মত দুইই মরে গেছে।

বোনের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল রশিদভ। ভাবনার মধ্যে আবার তার আগের প্রশ্নই ফিরে এল। বলল, সাইমুম সম্পর্কে তোমার কোনই মত নেই আপা?

-ওরা অনেক বড়, অনেক বড় কাজ করেছে ওরা। ওদের ব্যাপারে কোন মত প্রকাশের উপযুক্ত আমি নই। সুরাইয়ার কন্ঠ যেন তখন অনেকটা ভারি হয়ে এসেছে।

রশিদভের বোন কথা কয়টি বলেই তার কাছ থেকে সরে গিয়েছিল।

রশিদভ ইজিচেয়ারে একটা পাশ ফিরল। পাশ ফিরে তুলে নিল আবার সেই তুর্কিস্তান। হিসার দুর্গে গণহত্যার সচিত্র বিবরণ ওতে আছে। গুলরোখ কৃষি খামারের জীবনকে কিভাবে লন্ডভন্ড করে দেয়া হয়েছে তার সচিত্র বর্ণনাও ওতে রয়েছে। আরও রয়েছে পিয়ালং উপত্যকা মৃত্যুপুরীতে পরিণত হওয়ার হৃদয় বিদারক কাহিনী। সেই সাথে রয়েছে সাইমুমের মস্কো অপারেশন, আরিস অপারেশন, বখশ নগরী অপারেশন, পিয়ালং অপারেশন ইত্যাদি কাহিনী। হিসার দূর্গ, গুলরোখ খামার, পিয়ালং উপত্যকা ইত্যাদি হৃদয় বিদারক কাহিনী পড়ে রশিদভের মন যেমন বেদনায় টনটন করে উঠল তেমনি সাইমুমের অপারেশনগুলোর কাহিনী পড়ে তার হৃদয়টা গর্বে ফুলে উঠল।

নিজের মনের দিকে চেয়ে নিজের থেকেই চমকে উঠল রশিদভ। কমসমলের রিজিওনাল সাধারণ সম্পাদক সে, কেমন করে সে বিদ্রোহীদের সাথে এমন করে একাত্ম হচ্ছে? সংগে সংগে হৃদয়াবেগের এক বন্যা এসে এই চমককে একেবারেই ভাসিয়ে দিল। হৃদয় থেকে হৃদয়ের খোলা দরজায় মুখ এনে কে যেন বলল, কম্যুনিস্ট কমসমলের সাধারণ সম্পাদক তার আসল পরিচয় নয়, আসল পরিচয় সে রশিদভ, সে মুসলিম। অপরিচিত এক প্রশান্তির শিহরণ খেলে গেল তার দেহে।

এ সময় একজন যুবক কমসমল অফিসের জানালা দিয়ে ভিতরে উঁকি দিল। দরজা বন্ধ রেখে সে জানালায় এসে দাঁড়িয়েছে। তার চোখে মুখে দুষ্টামির ছাপ। তাই সরাসরি দরজায় টোকা না দিয়ে রশিদভ কি করছে দরজা বন্ধ করে তা দেখার জন্য জানালায় এসে দাঁড়িয়েছে। এই সময় দরজা বন্ধ করে রশিদভকে বসে পড়তে দেখে কৌতুকই বোধ করল যেন যুবকটি। কি পড়ছে রশিদভ? প্রেমের

নিষিদ্ধ উপন্যাস নাকি? বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলে, হাই তুলে, ভেতরে বড় ফু চালান দিয়ে দেখল রশিদভের ভাব ভাঙে না। অবশেষে সে ঠক ঠক করে টোকা দিল জানালার পাল্লায়।

রশিদভ চমকে উঠে তাকাল জানালার দিকে। দেখল, জামায়াতিন জালানায় দাঁড়িয়ে।

জামায়াতিন কমসমলের আঞ্চলিক সভাপতি। বিরাট লম্বা–চওড়া দেহ জামায়াতিনের। মাথার চেয়ে দেহই তার বেশী চলে। নাগরিক পরিবেশের চাইতে ঘোড়ার পিঠে চারণ ক্ষেত্রেই তাকে মানায় বেশী। যা বুঝে তা সোজাসুজি গড় গড় করে বলে ফেলা এবং করে ফেলাই তার স্বভাব।

রশিদভ জামায়াতিনকে দেখে 'তুর্কিস্তানটা' তাড়াতাড়ি লুকিয়ে রেখে, আসছি কমরেড জামায়াতিন, বলে উঠে দাঁড়াল।

দরজা খুলে দিল রশিদভ।

ঘরে ঢুকেই জামায়াতিন বলল, প্রেমপত্র পড়ার মত ওটা কি পড়ছিলে দেখি।

শংকিত হল রশিদভ। তবু মুখে স্বাভাবিক ভাব টেনে বলল, ও কিছু নয় একটা পার্টি বুলেটিন।

জামায়াতিন রশিদভের মুখের দিকে চেয়ে বলল, উঁহু কমরেড, পার্টি বুলেটিন কেউ ওভাবে পড়ে না। নিশ্চয় নিষিদ্ধ কোন লেখকের চমৎকার কোন গল্প-টল্প পড়ছিলে দেখাও না!

রশিদভ এবার তার সবটুকু শক্তি একত্র করে বলতে চেষ্টা করল, ও কিছু না কমরেড, চল বসি। পার্টি সেক্রেটারী ডেকেছেন। অল্পক্ষণ পরেই ওখানে যেতে হবে।

জামায়াতিন হাসল। বলল, তুমি বস। ঐ ওখানে তো রাখলে ওটা। বের করে আনি।

বলে জামায়াতিন নিজে ইজিচেয়ারের নীচে গুঁজে রাখা 'তুর্কিস্তান' বের করে আনল।

ফ্যাকাসে হয়ে গেল রশিদভের মুখ।

‘তুর্কিস্তান’ হাতে নিয়ে জামায়াতিন এসে রশিদভের পাশে বসল। রশিদভের মুখ নীচু। মুখ তোলার সাহস পাচ্ছে না সে।

জামায়াতিন গম্ভীরভাবে রশিদভের আসামী সুলভ অবস্থার দিকে তাকাল। তার ঠোঁটের কোণায় একটা সূক্ষ হাসি। কিন্তু নীরস কন্ঠে বলল সে, এটা কি কমরেড?

কর্কশের কাছাকাছি জামায়াতিনের শুকনো কণ্ঠস্বরে আরো ঘাবড়ে গেল রশিদভ।

জামায়াতিনের দিকে না তাকিয়েই রশিদভ বলল, দেখতেই তো পাচ্ছো।

-দেখতে পাচ্ছি এটা ‘তুর্কিস্তান’ কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করছি, এ জিনিসটা যে কি তা তুমি জান?

-জানি।

-কি জান?

-বিদ্রোহীদের মুখপত্র।

-তোমার কাছে কেন?

রশিদভ এ প্রশ্নের কোন জবাব দিল না। আরো একটু গম্ভীর কন্ঠে জামায়াতিন বলল, তোমার কাছে ‘তুর্কিস্তান’ আছে, তুমি পড়ছ, এ খবর কি পার্টি জানে?

রশিদভ এবার মুখ তুলে জবাব দিল, না জানে না।

রশিদভের কণ্ঠে এবার যেন রুখে দাঁড়াবার ভংগি।

জামায়াতিন আবার বলল, এর অর্থ কি কমরেড জান?

-জানি

-কি?

রশিদভ কোন জবাব দিল না।

জামায়াতিন আবার বলল, এর অর্থ কি এই নয় যে, তুমি বিদ্রোহীদের সাথে যোগাযোগ রাখ, কিংবা তুমি তাদেরই একজন?

কেঁপে উঠল রশিদভ। একবার ভাবল, কিভাবে সে তুর্কিস্তান পেয়েছে তা খুলে বলে। কিন্তু পরে আবার ভাবল, এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে না,

কারণ সে তা পাওয়ার পর পার্টিকে জানায়নি, উপরন্তু সে গোপনে তা পড়েছে এবং লুকোবারও চেষ্টা করেছে। সুতরাং ঘটনার অহেতুক কোন ব্যাখ্যায় না গিয়ে সে বলল, যা ইচ্ছে বলতে পার, আমার কিছু বলার নেই।

রশিদভ চুপ করল।

জামায়াতিনও সংগে সংগে কিছু বলল না। তার ঠোঁটের কোণে তখনও সেই সূক্ষ হাসিটা।

একটু চুপ থেকে নতমুখে রশিদভকে বলল, কমরেড, এভাবে তোমার জীবন কোন ভয়াবহ গহব্বরের দিকে ঠেলে দিচ্ছ তুমি জান?

-জানি

-জানার পরেও এই কথা তুমি বলছ?

-হ্যাঁ

-ভয় করছে না?

রশিদভ মুখ তুলে দরজা দিয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টি মেলে ধরল। অনেকটা স্বাগত কন্ঠেই যেন বলল, কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত ভয় করেছে, এখন আর করছে না।

-কারণ

-এখন এই মুহূর্তে আমি ভাবছি, হতভাগা এই জাতির জন্য তো কিছুই করতে পারিনি। আর জাতিকে কিছু দিতে পারব এমন কোন যোগ্যতাও আমার নেই। প্রাণটাই শুধু আমার আছে, জাতির জন্য এ প্রাণটা দেবার সুযোগ পেলে জীবনটা আমার সার্থক হবে বলে মনে করছি।

জামায়াতিন রশিদভকে অবাক করে দিয়ে তার দিকে হাত বাড়াল এবং সজোরে হ্যান্ডশেক করল তার সাথে। বলল, তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি রশিদ।

রশিদভ বিস্মিত কন্ঠে বলল, এ কি বলছ তুমি জামায়াতিন?

-ঠিকই বলছি, আমি তো তোমার মত অত মাথার চাষ করি না। আমি এমন করে বলতে পারতাম না। আমার মনের আকুলি-বিকুলিকে তুমি ভাষা দিয়েছ। তাই তোমাকে অভিনন্দন।

একটু থামল জামায়াতিন। তারপর পকেট থেকে ‘তুর্কিস্তান’ বের করে বলল। বিশ্বাস কর তুর্কিস্তান আমি নিয়ে এসেছি তোমাকে পড়াব বলে।

দুদিন থেকে আমি এটা পড়ছি, অনেক ভেবেছি করণীয় নিয়ে। আমার ভাবনাকে তুমি ভাষা দিয়েছ রশিদভ।

দু’জনেই আরেক প্রস্ত হ্যান্ডশেক করল, তারপর দু’জনেই চুপচাপ। রশিদভ প্রথমে কথা বলল। বলল সে, মনে হচ্ছে ‘তুর্কিস্তান’ ওরা তুর্কিস্তানের ঘরে ঘরে পৌঁছিয়েছে।

-নিশ্চয়ই অদ্ভুত নেটওয়ার্ক সাইমুমের।

-আল্লাহ তাদের শক্তি দান করুন।

-আমিন। দু’টি হাত তুলে বলল জামায়াতিন।

জামায়াতিন তার মুনাজাতের হাতটা নামিয়ে নেবার সাথে সাথেই একটা গাড়ি এসে অফিসের দরজায় দাঁড়াল। গাড়িটা তুঘরীল তুগানের। তুঘরীল তুগান পশ্চিম উজবেকিস্তানের কম্যুনিস্ট পার্টির প্রধান। বেশ প্রভাবশালী। সকলেই জানে রাষ্ট্রের সুপ্রীম সোভিয়েটের কংগ্রেসে পার্টির আসল মনোনয়ন তার প্রতিই। অর্থাৎ আসছে নির্বাচনে এ অঞ্চল থেকে প্রতিনিধি হিসেবে সেই সুপ্রিম সোভিয়েটে যাচ্ছে। এই সারাকায়াতে তার বিশাল বাড়ি। অবশ্য এই বাড়িতেই পার্টি অফিস, কলখজ অফিস, ইউনিয়ন অফিস।

তুঘরীল তুগান বিকেলে তার বাড়িতে কমসমলের সভাপতি ও সেক্রেটারীকে ডেকেছে কি এক জরুরী ব্যাপারে। কোন জরুরী ব্যাপার হলেই কমসমল নেতৃবৃন্দকে এভাবে ডেকে সে পরামর্শ করে।

অফিসিয়াল কোন আলোচনায় যাওয়ার আগে এভাবেই সে একটা ওপিনিয়নে পৌছার চেষ্টা করে। তার এ কৌশল তাকে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য করেছে এবং তার নেতৃত্বকে পাকা পোক্ত করে দিয়েছে।

গাড়ি এসে দাড়ালে জামায়াতিন রশিদভকে বলল, চল পাঁচটা বাজতে দেরী নেই।

জামায়াতিন এবং ইউরি রশিদভ দুজনেই গিয়ে গাড়িতে উঠল।

গাড়ি ছুটে চলল গ্রামের মধ্যে দিয়ে প্রশস্ত রাস্তা ধরে গ্রামের অপর প্রান্তে।

গাড়ি এসে পৌছল তুঘরীল তুগানের বাড়িতে। তার প্রাইভেট গাড়ি বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। ড্রাইভার নেমে জামায়াতিনদের দরজা খুলে ধরল।

জামায়াতিন বলল, এখানে কেন ড্রাইভার, সদর গেটে গাড়ি যাবেনা?

ড্রাইভার বলল, সাহেব এখানেই নামতে বলেছেন, তিনি আপনাদের জন্যে তার ব্যক্তিগত ড্রয়িংরুমে অপেক্ষা করবেন। জামায়াতিন ও রশিদভ দুজনেই নামল গাড়ি থেকে।

গাড়ি বারান্দা থেকে কয়েক ধাপ উপরে উঠলে অর্ধচন্দ্রাকৃতি বিরাট বারান্দা। স্টিলের ফ্রেমে দামী পুরু কাঁচে ঢাকা। মাঝখানে দরজা। দরজাটাও কাঁচের।

গাড়ি বারান্দা থেকে উঠে দরজার মুখোমুখি হতেই দারোয়ান দরজা খুলে ধরল। ভেতরে প্রবেশ করল দুজন। হৃদয় জুড়ানো প্রশান্তি ভেতরে। ফুল এয়ারকন্ডিসন বাড়িটা। কাঁচ ঢাকা অর্ধচন্দ্রাকার বারান্দায় সোফা ও কুশন চেয়ার সাজানো। মাঝে মাঝে নানা গাছ ও ফুলের টব। সব মিলিয়ে সেখানে শান্তি ও সবুজের একটা আমেজ। তুঘরীলের পরিবারের সদস্যরা মাঝে মাঝে এখানে এসে বাইরের বিচিত্র দৃশ্য উপভোগ করে।

বারান্দার উত্তর পাশে ও দক্ষিণ পাশে পারিবারিক গেস্টরুম। আর সামনের বড় রুমটা ডাইনিং হল। ডাইনিং হলের পাশ দিয়ে প্রশস্ত করিডোর এগিয়ে গেছে। করিডোরটিও কার্পেটে মোড়া। তুঘরীল তুগানের অন্দরে তারা এর আগেও এসেছে, খাস ড্রইং রুমটি তারা চেনে। জামায়াতিন রশিদভ সেদিকে এগুলো।

এক জায়গায় এসে ভেসে আসা এক গানের সুরে তারা থমকে দাঁড়াল। থমকে দাঁড়াল মানে পা-টা যেন তাদের আটকে গেল। গানের সুরে নয়, গানের কথায়। উজবেক কবি ইব্রাহিম আলাউদ্দিনের এ গান আজ মৃত, কম্যুনিস্ট শাসকরা একে বহুদিন আগেই নিষিদ্ধ করে দিয়েছে।

এক নারী কণ্ঠ থেকে ভেসে আসছিল সেই গানটি। নীচুগলা, অনেকটা স্বাগত কণ্ঠ তার। সেই গাইছিল;

'তুমি একখানা কিতাব পড় আর কিতাবের লেখকের খোঁজ কর।

বিরাট অট্টালিকা দেখে নির্মাতার নাম জানতে চাও। তবে জমিন ও আসমানের কোন মালিক নেই?

হে মানুষ চিন্তা কর, বুঝে দেখ আমাদের কাছে সব জিনিসই নিশানা দিচ্ছে।

মহান সর্বশক্তিমান এক আল্লাহর।'

হৃদয়ের গভীর তলদেশ থেকে উতসারিত হচ্ছিল গানের কথাগুলো।

নরম কণ্ঠের এক মমতা মাখানো আবেগ তাতে। হৃদয়স্পর্শী এক মরমীয়া সুরে ভর করে আসছিল গানের কথাগুলো।

ইব্রাহিম আলাউদ্দিনের এ নিষিদ্ধ গান জামায়াতিন এবং রশিদভ দেখেছে কিন্তু এই প্রথম শুনল তারা। নিষিদ্ধ এই অমৃত তারা যেন গোগ্রাসে গিলছে। তন্ময় হয়ে তারা যেন নিজেদের হারিয়ে ফেলেছে। গানের নরম মরমীয়া সুর নীরব পরিবেশকে করে তুলছে বেদনার্ত।

গান শেষ হলো। তন্ময়তা ভাঙল জামায়াতিন ও রশিদভের। নড়ে উঠল তারা। ফিরে তাকাতেই দেখল, তুঘরীল তুগান পেছনে দাড়িয়ে। তার চোখে-মুখে বিরাট এক অস্বস্তি।

জামায়াতিন ও রশিদভ তার দিকে তাকাতেই সে বলল, চল তো দেখি ব্যাপারটা কি? বলে সে যে ঘর থেকে গানটি ভেসে আসছিল সেদিকে চলল।

জামায়াতিন ও রশিদভ পরস্পর এক ধরনের অবুঝ দৃষ্টি বিনিময় করে তুঘরীল তুগানের পেছনে চলল।

দরজা খোলাই ছিল। ওরা ভেতরে প্রবেশ করল। প্রথমে তুঘরীল তুগান তারপর ওরা।

তুঘরীল তুগানের মেয়ে ফায়জাভা নাতাকায়ার পড়ার ঘর এটা। একটি বুকসেলফ, পড়ার জন্যে চেয়ার-টেবিল, একটা ইজিচেয়ার এবং ঘরের এক কোণে একটা ফ্রিজ।

ইজিচেয়ারে চোখ বুজে শুয়ে ছিল ফায়জাভা। উনিশ-বিশ বছরের মত হবে বয়স। তাসখন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিক ইনিঞ্জনিয়ারিং এর ছাত্রী সে।

লাল তুর্কী চেহারা, চোখ একটু বেশীই যেন নীল।

ওরা প্রবেশ করতেই ফায়জাভা উঠে দাড়াল। ওর চোখে কিছুটা বিস্ময়। বোধ হয় পিতার সাথে জামায়াতিন ও রশিদভকে এভাবে দেখেই। উঠে দাড়িয়ে ফায়জাভা পিতাকে স্বাগত জানাল। কিন্তু পিতার গম্ভীর মুখ দেখে চমকে উঠল সে।

এত লোকের বসার জায়গা ঐ পড়ার ঘরে ছিলনা। সুতরাং দাড়িয়েই থাকল সবাই।

বিস্মিত, অপ্রস্তুত ফায়জাভার দিকে চেয়ে তার পিতা তুঘরীল তুগান গম্ভীর কণ্ঠে বলল, ওটা কি গান করছিলে ফায়জাভা?

ফায়জাভার মুখ আরো লাল হয়ে উঠল। কোন উত্তর দিলনা। মাথা নীচু করে দাড়িয়ে থাকল সে।

আকস্মিকভাবে এই অবস্থায় পড়ে জামায়াতিন ও রশিদভ অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। তারা বুঝতে পারল, উত্তর উজবেকিস্তানের কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রধান তুঘরীল তুগান তার মেয়ের এই নিষিদ্ধ গান গাওয়াকে স্বাভাবিক ভাবেই সহ্য করতে পারছেনা। কিন্তু আবার চিন্তা করল, তারা যেহেতু গান শুনেছে, তাই সম্ভবত তাদের সামনেই মেয়ের এ শাস্তির ব্যবস্থা।

মেয়েকে নীরব দেখে তুঘরীল তুগান আবার জিজ্ঞাস করল, এ গান নিষিদ্ধ, এ গান বিদ্রোহী কবির তুমি জাননা?

তুঘরীলের স্বর এবার আরেকটু শক্ত শোনাল।

ফায়জাভা মুখ নিচু রেখেই বলল, জানি।

জান তাহলে এ গান কেন?

আমার ভাল লাগে। মুখ না তুলেই জবাব দিল ফায়জভা।

তুঘরীল তুগানের মুখ আরো লাল হয়ে উঠল। মুহূর্তের জন্যে সে জামায়াতিনদের দিকে তাকাল। মনে হয় জামায়াতিন ও রশিদভের সামনে তার মেয়ের কম্যুনিষ্ট-নীতি বিচ্যুতির এ ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়ায় সে বেশী অস্বস্তি ও অপমান বোধ করছে।

তুঘরীল তুগান মুখটা ঘুরিয়ে কঠোর কণ্ঠে বলল, এর পরিণতি কি জান?

এবার মুখ তুলল ফায়জাভা। তার রক্তাভ পাতলা ঠোঁট দুটি মনে হলো শক্ত হয়ে উঠছে। তার চোখের দৃষ্টি স্থির। পিতার জিজ্ঞাসার জবাবে সেই উত্তরটা দিল, জানি।

তুঘরীল তুগানের মুখটা আরো লাল হয়ে উঠল। ক্রোধ এবং বিরক্তির একটা ছায়া দেখা দিল তার চোখে-মুখে। মুখ খুলল সে। মনে হল কঠোর কোন কথা ছুটে যাবে ফায়জাভার দিকে।

কিন্তু তুঘরীল তুগান কিছু বলার আগেই রশিদভ বলল, সম্মানিত কমরেড, ফায়জাভা অন্যায় কিছু বলেনি, ও গান আমরও খুব ভালো লাগে। জামায়াতিন বলল, আমারও।

তুঘরীল তুগান এদের দিকে ফিরে বলল, তোমরা বল কি! কেন ভাল লাগে?

-জানিনা, তবে মনে হয় আমাদের মনের যে কথাগুলো বলতে পারিনা, গান তাই বলে দেয়। বলল রশিদভ।

-তোমার একথার অর্থ কি দাড়ায় রশিদভ?

-কিছু আড়াল না করে মনের কথাটাই বলেছি কমরেড।

-নাস্তিক্য প্রচার, ধর্মের বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডা কি তোমার কমসমলের একটা বড় দায়িত্ব নয়?

-তা জানি এবং তা করছিও কিন্তু যেটা বললাম, সেটা আমার মনের কথা।

-একজনের সত্তা দুটো হতে পারে কি করে?

-পারে সম্মানিত কমরেড। সত্তা যখন বাইরের কোন শক্তির পরাধীন হয় তখন তার একটা স্বাধীন অন্তর রূপ থাকে।

-তোমাকে পরাধীন বলছ! তুমি কোথায় যাচ্ছ রশিদভ?

-আমি জানিনা, তবে আমার মনে হচ্ছে আমার পথ যেন এটাই।

আবেগে উত্তেজনায় রশিদভের মুখ লাল, চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ভারি শোনালো তার শেষের কথাগুলো।

তুঘরীল তুগান তার দিকে স্তম্ভিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ফায়জাভার উজ্জ্বল চোখ দুটি রশিদভের দিকে নিবদ্ধ।

একটু পরে তুঘরীল তুগান মুখ খুলল। বলল, এখানে আর নয় চল বৈঠকখানায়। ওখানেই কথা বলা যাবে।

বলে সে রুম থেকে বেরিয়ে গেল। তার পিছনে জামায়াতিন ও রশিদভও যাচ্ছিল।

-এই যে।

-পিছনে থেকে ছোট্ট একটা ডাক। ফিরে দাড়াল রশিদভ।

-শুকরিয়া। উজ্জ্বল চোকে সলজ্জ ফায়জাভার ছোট্ট সম্ভাষণ।

-ধন্যবাদ। বলেই বেরিয়ে আসার জন্যে ফিরে দাড়িয়েছিল রশিদভ।

-শুনুন।

আবার ডাকল ফায়জাভা। রশিদভ ঘুরে দাড়াল। তার একটু কাছে সরে এল ফায়জাভা। বলল, আপনি বেশী বলে ফেলেছেন, এমন করে বিপদ ডেকে আনা উচিত হবে না।

মুহূর্তের জন্যে চোখ বুজল রশিদভ। তারপর চোখ খুলে ফায়জাভার দিকে তাকিয়ে বলল, বিপদ কয়দিন আটকে রাখা যাবে ফায়জাভা?

-তবু সাবধান হওয়া উচিত। বলল ফায়জাভা।

-মনে রাখব তোমার কথা।

ফায়জাভার চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে ঔজ্জ্বল্য যেন রশিদভের চোখকে স্পর্শ করল। নতুন করে সেদিকে একবার চোখ তুলে বেরিয়ে আসার জন্য দাড়াল রশিদভ।

তুঘরীল তুগান এবং জামায়াতিন গিয়ে বসেছিল ড্রইংরুমে। রশিদভ গিয়ে জামায়াতিনের পাশে বসল।

তুঘরীল তুগানের মুখটা গম্ভীর। শোফায় গা এলিয়ে দিয়েছিল সে। চোখ দুটি বোজা।

বয়স তার পঞ্চাশ হবে। মাথা ভর্তি চুল চুল দু'একটা পাকতে শুরু করেছে। স্ট্যালিনের মত মোচ উপরের ঠোঁটটাকে প্রায় ঢেকে দিয়েছে। চোখের দৃষ্টি গভীর এবং তীক্ষ্ণ। সব মিলিয়ে তার চেহারায় একটা তীক্ষ্ণ ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে। নীচের লোকেরা তাকে ভালবাসার চেয়ে ভয়ই বেশী করে। আর এই কারণে সে উপরের

লোকদেরও প্রিয়। কারণ কম্যুনিষ্ট শাসনে ভালবাসার মত হৃদয়বৃত্তির কোন ভূমিকা নেই, সেখানে ভয় ও কঠোরতাই বলা যায় শাসনের একমাত্র হাতিয়ার। তুঘরীল তুগানের গম্ভীর নীরবতার সামনে জামায়াতিন ও রশিদভ খুবই অস্বস্তি বোধ করছিল। রশিদভ এইমাত্র ফায়জাভার পড়ার ঘরে যে কথাগুলো বলল, তা স্বাভাবিক অবস্থায় বলার মত নয়।

কিন্তু আজ সকাল থেকে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে এবং অবশেষে ফায়জাভার গান ও তার উত্তর সবগুলো মিলেই তাকে কম্যুনিষ্ট পার্টির এক জাদরেল নেতার সামনে অমন করে বিদ্রোহাত্মক কথা বলিয়েছে। তুঘরীল তুগান কথাগুলোকে কিভাবে গ্রহণ করেছে, কি বলবে সে, ইত্যাদি কথা রশিদভ ও জামায়াতিনের মনে উঁকি দিচ্ছিল। তবে একটা জিনিস তারা লক্ষ্য করেছে, তুঘরীল তুগানের মত কম্যুনিষ্ট নেতার মধ্যে বিষয়টা যতটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা উচিত, তা করেনি। সেটা কি মেয়ের কারণেই?

এ সময় নাস্তা এল। নাস্তা পরিবশেন করল বেয়ারা। চোখ খুলে সোজা হয়ে বসল তুঘরীল তুগান। তারপর জামায়াতিন ও রশিদভের দিকে চেয়ে বলল, নাও শুরু কর।

নাস্তা শেষ হল। বেয়ারা বেরিয়ে গেলে তুঘরীল তুগান উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল। ফিরে এল তার জায়গায়। সোজা হয়ে বসল। তারপর একটু সামনে ঝুঁকে বলল, জামায়াতিন, রশিদভ গুরুত্বপূর্ণ একটা পরামর্শের জন্যে তোমাদেরকে ডেকেছি। কিন্তু তার আগে আমি যে কথাগুলো তোমরা বললে তার ব্যাখ্যা জানতে চাই।

বলে তুঘরীল তুগান জামায়াতিন ও রশিদভের দিকে তাকিয়ে রইল। রশিদভই প্রথম বলল, সম্মানিত কমরেড, বিষয়টি যেখানে আছে সেখানেই রেখে দিলে ভাল হয়।

-কেন?

-যা বলেছি তার বেশী আমি বলতে পারব না, বলাও ঠিক হবেনা।

মনে হয় আপনার শোনাও ঠিক হবেনা।

উত্তরে তুঘরীল তুগান আর কিছু বললনা। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ওদের দিকে।

একটু পরে বলল, ফায়জাভার জবাবও কি একই রকমের?

রশিদভ বলল, আমি জানিনা কমরেড, তবে মনে হয় এ রকমেরই।

তুঘরীল তুগান আবার চোখ বন্ধ করল। চোখ খুলল কিছুক্ষণ পর।

তারপর সোজা হয়ে বসে বলল, সাইমুমের সাথে তোমাদের কোন সম্পর্ক আছে?

জামায়াতিন ও রশিদভ দু'জনেই বলে উঠল, না কোন সম্পর্ক নেই।

-তাহলে এসব কথা আজ তোমাদের মুখে আসছে কেমন করে?

দু'জনেই নীরব। সহসা কোন উত্তর তারা দিল না, বা দিতে পারল না। দুজনেরই মাথা নীচু।

একটু পরে ধীরে ধীরে মুখ তুলল রশিদভ। বলল, আমার মনে হয় হৃদয়ের যে দুয়ার আমাদের বন্ধ ছিল, সাইমুম তা খুলে দিয়েছে। বন্ধ দুয়ারের আড়ালে এতদিন আমাদের যে জীবন-চেতনা, ঐতিহ্য চিন্তা এবং জীবন-বোধ মাথা খুঁড়ে মরছিল,তা আজ মুক্ত পাখায় ভর করে বেরিয়ে এসেছে। থামল রশিদভ।

তুঘরীল তুগান চোখ বন্ধ করে রশিদভের কথা শুনছিল। কথা শেষ হলেও তার চোখ বন্ধই থাকল। এক ভাবনার সমুদ্রে যেন সাঁতার কাটছে সে। এক সময় সে চোখ খুলে সোজা হয়ে বসল। যেন ঘুম থেকে জাগল সবে মাত্র। সজীব মনে হল তাকে।

আমি আজ তোমাদের যে জন্যে ডেকেছি শোন, বলে সে শুরু করল, স্থানীয় গোয়েন্দা সূত্র খবর দিয়েছে আজ রাতে আহমদ মুসা অথবা সাইমুমের অন্য কোন বড় নেতা আমাদের কলখজে আসছে। আমাদের কলখজের গোপন সাইমুম ইউনিট নাকি এ সফরের বন্দোবস্ত করেছে। তাদের আঞ্চলিক নেতাদের আজ বৈঠক বসছে সারাকায়াতে। বৈঠক কোথায় হবে তা জানা যায়নি।

একটু থামল তুঘরীল তুগান। তারপর আবার শুরু করল, মুশকিলে পড়েছি, এই খবরটা আজ সরকারকে জানালে আজই এই কলখজে বিরাট একটা ঘটনা ঘটে যাবে, যার পরিণতি আমি জানিনা। তারপর শুধু এই কলখজ নয় গোটা

অঞ্চলের জীবনটাই লন্ডভন্ড হয়ে যাবে সন্দেহ সংঘাতের মধ্যে পড়ে। আর এ ঘটনাটা যে আমি জানাব না তাও ঠিক মনে করছি না। এখন তোমাদের পরামর্শ বল। আমি খুব চিন্তিত এ অঞ্চলের ভবিষ্যত নিয়ে।

জামায়াতিন ও রশিদভের চোখে মুখে প্রথমে বিস্ময় ও আনন্দের চিহ্ন ফুটে উঠল তুঘরীল তুগানের কথায়। আহমদ মুসা তাদের কলখজে আসছে এই খবরে তারা প্রথমে আনন্দই বেশী পেয়েছিল। কিন্তু তাদের আনন্দটাই তুঘরীল তুগানের কথার শেষে এসে চিন্তায় রূপান্তরিত হলো।

তুঘরীল তুগান কথা শেষ করলেও তারা সংগে সংগে তার উত্তর দিতে পারলো না। চিন্তা করছে তারা।

কথা প্রথমে জামায়াতিনই বলল। বলল সে, খবরটা উপরে জানান ঠিক হবে না। আমার মতে খবরটা জানালে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশী। সাইমুমরা পিঠটান দিয়ে পালিয়ে যাবার মত নয়। ফলে এক রক্তক্ষয়ী ব্যাপার ঘটে যাবে, যার পরিণতি এ অঞ্চলের জন্য ভাল হবে না। তার চেয়ে কেউ জানল না সাইমুম প্রোগ্রাম করে চলে গেল। এটাই ভাল। আমি মনে করি সাইমুমের ব্যাপারগুলো প্রকাশ করার চাইতে গোপন রাখার মধ্যেই লাভ বেশী।

থামল জামায়াতিন। কথা বলল এবার রশিদভ। বলল, ব্যাপারটাকে আমি অন্যভাবে দেখতে চাই। আমরা না জানালেই উর্ধতন কর্তৃপক্ষ খবর জানাবেন না, এটা আমি মনে করি না। সম্মানিত কমরেড যে সূত্র থেকে জেনেছেন, সে সূত্র কিংবা অন্য কোন সূত্র খবর কর্তৃপক্ষকেও পৌঁছাতে পারে। যদি এর সামান্য সম্ভাবনাও থাকে, তাহলে আমাদের তরফ থেকে খবর উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে না জানানো অত্যন্ত মারাত্মক হয়ে দাঁড়াবে। সুতারাং খবর জানানই উচিত।

-তাহলে ধরে নিতে হবে এ অঞ্চলে আমরা এক রক্তক্ষয়ী সংঘাতের সূত্রপাত ঘটাচ্ছি। আর সাইমুমকে ঠেলে দিচ্ছি বিপদের মুখে। বলল জামায়াতিন।

-সংঘাত আমরা এড়াতে পারবনা কমরেড। আজ না হয় কাল সেটা বাধবেই। আর সাইমুমকে বিপদে ফেলার কথা? সাইমুম কারো উপর নির্ভর করে প্রোগ্রাম করতে আসছে না। তাদের শক্তির প্রতি আমার আস্থা আছে। জবাব দিল রশিদভ।

রশিদভের কথা শেষ করলে মুখ খুলল তুঘরীল তুগান। বলল, তোমাদের দুজনেরই কথাতেই যুক্তি আছে, তবে রশিদভের কথা আমার কাছে বেশী বাস্তব বলে মনে হয়। কিন্তু একটা কথা আমি ভাবছি। আমি আমার জনগণের মধ্যে কাজ করছি সেই ছোটবেলা থেকে। আমি তাদেরকে চিনি। আমার ভয় হচ্ছে এখানে সরকার পক্ষের সাথে সাইমুমের কোন সংঘাত বাধলে সরকার জনগণের কাছ থেকে কোন সহযোগিতা পাবেনা। এই অবস্থায় গোটা অঞ্চলের ওপর বিরাট বিপদ নেমে আসবে যেমন এসেছে গুলরুখ সহ অনেক খামার এবং অনেক জনপদের ওপর। এটা কি করে ঠেকাব?

রশিদভ বলল, যেহেতু পরিস্থিতির কোন নিয়ন্ত্রণই আমাদের হাতে নেই, তাই ঐ পরিণতি আমরা রোধ করতে পারবো না। তবে খবরটা জানালে অন্তত নেতৃত্বটা আমরা রক্ষা করতে পারি, যা আমরা নানা কারণেই প্রয়োজন মনে করি।

তুঘরীল তুগান এবং জামায়াতিন দুজনেই ভাবছিল। রশিদভ কথা শেষ করলে দুজনেরই মাথা রশিদভের কথায় সায় দিল।

রশিদভ কথা শেষ করলে তুঘরীল তুগান বলল, তাহলে এটাই ঠিক হলো, বিষয়টা আমি এখন তাসখন্দকে জানিয়ে দিচ্ছি। পার্টি লেভেলে আমি আলোচনা করেছি,তাদেরও সব শেষ মত এটাই।

একটু থামল তুঘরীল তুগান। তারপর বলল, তোমাদের ধন্যবাদ, কোন নির্দেশ এলে তোমাদের জানাব।

জামায়াতিন ও রশিদভ বুঝল কথা এখানেই শেষ। তারাও জবাবে বলল, ধন্যবাদ কমরেড।

বলে তারা উঠে দাঁড়াল। বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

ঘর থেকে বেরিয়ে তারা দেখল ফায়জাভা করিডোরে দাঁড়িয়ে আছে। তারা চলতে শুরু করল। চলতে চলতে বলল, শুধু একপক্ষকে জানাবার সিদ্ধান্ত কি ঠিক হল?

-কোন এক পক্ষ? জিজ্ঞেস করল রশিদভ।

-সরকার পক্ষ। বলল ফায়জাভা।

-আর কোন পক্ষকে জানাতে হবে।

-সাইমুম।

-সাইমুমকে কেন? বলে দাঁড়িয়ে পড়ল রশিদভ। তার সাথে জামায়াতিনও। রশিদভ আবার বলল, আমরা সরকারের লোক, সাইমুমকে জানাব কেন?

রশিদভের প্রশ্নের কোন জবাব না আসতেই জামায়াতিন বলল, তুমি কি সাইমুম পক্ষের লোক ফায়জাভা?

দুজনের এ আক্রমণে বিন্দুমাত্রও অপ্রতিভ হলোনা ফায়জাভা। হাসিমুখেই বলল, আমি জনগণের পক্ষে।

আবার চলতে শুরু করেছে তারা। চলতে চলতেই রশিদভ জিজ্ঞেস করল, সরকার এবং জনগণ কি আলাদা?

সেই কাঁচের দেয়াল ঘেরা গোল বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে তারা।

দেয়ালের ওপর দরজার পাশে বসা দারোয়ানকে দেখা যাচ্ছে।

ফায়জাভা রশিদভের প্রশ্নের জবাবে বলল, আপনার প্রশ্ন আমি আপনাকেই করছি রশিদভ ভাই।

রশিদভ একটু দাঁড়াল। গাম্ভীর্য নেমে এল তার চোখে মুখে। সে জামায়াতিনের দিকে তাকিয়ে বলল, কমরেড জামায়াতিন তুমিই এ প্রশ্নের উত্তর দাও।

জামায়াতিন বলল, দেখ এ প্রশ্নের জবাব তুমি জান, ফায়জাভা জানে, আমিও জানি। অযথা এই জিজ্ঞেস করাটা কেন? বলে জামায়াতিন দরজার দিকে হাঁটা শুরু করল।

রশিদভ ও ফায়জাভার মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হলো। হাসল তারা জামায়াতিনের নাটকীয়তায়।

চলে আসার জন্যে রশিদভ ঘুরে দাঁড়াল। তারপর ফায়জাভার দিকে ফিরে বলল, তোমার উদ্বেগটা বুঝেছি। আল্লাহ ভরসা। বলে রশিদভ দরজার দিকে পা বাড়াল।

একখন্ড হাসি ফুটে উঠল ফায়জাভার মুখে। কম্যুনিষ্ট যুবলীগ কমসমল এর নেতা রশিদভের মুখে ‘আল্লাহ ভরসা’ শব্দটা এই প্রথম শোনা গেলেও বেমানান মনে হলো না।

রশিদভরা বেরিয়ে গেলে সেখানেই সোফায় বসে পড়ল ফায়জাভা। দরজায় আড়ি পেতে ফায়জাভা তার পিতা এবং রশিদভদের মধ্যকার সব কথাই শুনেছে। সাইমুম নেতারা তাদের কলখজে আসছে জেনে যতখানি খুশি হয়েছে, ততখানিই উদ্বিগ্ন হয়েছে তাদের আসার খবর সরকারের কানে দেয়ার খবর শুনে। এ সব শোনার পর থেকেই তার মনটা খচ খচ করছে। সরকার তাদের এখানে আসার খবরটা জানতে পেরেছে একথা যদি সাইমুমকে জানানো যেত। কিন্তু কিভাবে? তাসখন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে সে 'তুর্কিস্তান'-এর নিয়মিত গ্রাহক। কিন্তু সাইমুম এর সাথে তার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। তাদের কলখজেও সাইমুমের ইউনিট আছে বুঝা যাচ্ছে, তাদের সাথেও ফায়জাভার জানা শোনা নেই। হঠাৎ তার মনে পড়ল সহপাঠিনী নাজিয়ার কথা। নাজিয়া সাইমুমের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রাখে। ফায়জাভা সাইমুমের মেম্বারশীপের উপযুক্ত হয়েছে এই কথা নাজিয়াই তাকে জানিয়েছে। তাকে ব্যাপারটা জানালেইতো সাইমুম জানতে পারে। খুশি হয়ে উঠল ফায়জাভা। ঘড়ির দিকে তাকাল, দেখল বিকেল ৬টা বাজে। যথেষ্ট সময় আছে, টেলিফোনেই সে খবরটা জানিয়ে দিতে পারে।

টেলিফোন করার জন্যে ফায়জাভা উঠে দাঁড়াল। গেল সে টেলিফোনের কাছে। টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিয়েও সে রেখে দিল। পার্টি লিডারের টেলিফোন এই দেশে আনরেকর্ডেড থাকে না।

ভাবল ফায়জাভা পাবলিক কল অফিসে যাওয়াই ভাল। চিন্তার সাথে সাথেই সে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু গাড়িতে উঠে সে ভাবল, পাবলিক কল অফিসে তার টেলিফোন করাটা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। ওখানে এখন গোয়েন্দারা তো অবশ্যই পাহারায় থাকবে। হঠাৎ তার মনে পড়ল নাইট স্কুলে বেড়াতে গিয়ে একটা টেলিফোন করার সুযোগ সে সহজেই নিতে পারে। অনেক দিন হল যায়নি সে ওখানে, গেলে সবারই সে খাতির পাবে।

ফায়জাভা তার গাড়ি নাইট স্কুলের দিকে ঘুরিয়ে নিল।

সারকায়া গ্রামে প্রবেশের তিনটা পথ। প্রধান সড়কটি এসেছে আরিস ও কিজিলওরদা হয়ে তাসখন্দ থেকে। এ সড়কটি গ্রামের উত্তর প্রান্ত দিয়ে প্রবেশ করে গ্রামকে ডান পাশে রেখে এগিয়ে গেছে কলখজের দিকে।

আরেকটা রাস্তা সমরখন্দ, বোখারা, খিভা হয়ে আমু দরিয়ার ধার ঘেঁসে চলে এসেছে। এ রাস্তা গ্রামে প্রবেশ করেছে দক্ষিণ থেকে। করখজে এসে তাসখন্দ থেকে আসা রাস্তা এ রাস্তার সাথে এক হয়ে গেছে। তৃতীয় রাস্তাটি তুর্কমেনিস্থান থেকে এসে কলখজে প্রবেশ করেছে পশ্চিম দিক দিয়ে। এ রাস্তাটা আসমান ও সাবেকী ধরনের।

আমুদরিয়া কলখজের মাঝখান দিয়ে বযে গেছে। আমুদরিয়ার উভয় তীরে প্রায় ১০০০ বর্গমাইল এলাকায় কলখজ এলাকা বিস্তৃত। আমুদরিয়ার উপর দিয়ে একটা ব্রিজ উভয় অংশকে যুক্ত করেছে।

সন্ধ্যার পর থেকেই রাস্তাগুলোর বিভিন্ন স্থানে পাহারা বসানো হয়েছে। বিশেষ করে খিভা হয়ে এবং তুর্কমেনিস্তান থেকে যে রাস্তা দুটি এসেছে সারাকায় কলখজে, সে দুটি রাস্তায় শক্ত পাহারা বসানো হযেছে। কারণ 'ফ্র' মনে করেছে সাইমুমের লোকেরা এলে খিভা হয়ে সহজ পথ অথবা তুর্কমেনিস্তান থেকে আসা নিরাপদ পথ হয়েই আসবে। কারণ তাদের কাছে খবর আছে, খিভা থেকে সাইমুম উজবেকিস্থানের এ অঞ্চলের উপর নজর রাখছে।

সারাকায়া গ্রামের রাত তখন ৯টা। সর্বাংগ কাপড়ে ঢাকা একটা মূর্তি গ্রাম থেকে বেরিয়ে কার্পাস বাগানের মধ্য দিয়ে তাসখন্দ রোডের দিকে এগুচ্ছে। তাসখন্দ রোড প্রায় ২০ ফিট চওড়া। পাথর সিমেন্ট মিশিয়ে তৈরী এখানে রাস্তার দু'পাশে চোখ জুড়ানো কার্পাস ক্ষেত। কার্পাস গাছগুলো বেশ বড়। এই গাছের মধ্য দিয়েই এগুচ্ছে ছায়ামূর্তিটি। গাছগুলো বড় বলে বাইরে থেকে বুঝার উপায় নেই। ছায়ামূর্তিটি রোডের কাছাকাছি গিয়ে পৌছল। রাস্তা এবং রাস্তার আশপাশটা তার পরিস্কার নজরে পড়ছে। রাস্তার বিদ্যুৎ বাতি ও চাঁদের আলো সব মিলিয়ে চারদিকে একটা স্বচ্ছতা। ছায়ামূর্তিটি আরেকটু এগিয়ে গেল। কার্পাস ক্ষেত থেকে বেরুতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। মাত্র শ'দুয়েক গজ দূরে একটা কার্পাস গাছের গোড়ায় গিয়ে কে একজনকে বসতে দেখা গেল। ছায়ামূর্তিটা আর একটুও না নড়ে ঐ খানেই বসে রইল। কোমরে জুলানো পিস্তলের অস্তিত্বটা একবার অনুভব করে তাকাল কার্পাস গাছের গোড়ায় বসা লোকটির দিকে। কার্পাস গাছের ছায়ায় ওকে একটা জমাট অন্ধকারের মত দেখাচ্ছে।

কার্পাস বাগানের পরে ৫০ গজের মত একটা ফাঁকা জায়গা, তার পরেই তাসখন্দ সড়ক। ফাঁকা জায়গা এবং পাশ দিয়ে এক শ্রেণীর কাঁটাগাছ কোথাও হাটু পরিমাণ, কোথাও কোমর পরিমাণ উঁচু। বিজলী বাতি এবং চাঁদের আলোতে তাসখন্দ সড়কটি মোটামুটি আলোকিত।

একটা গাড়ি উত্তর দিক থেকে তীরবেগে এসে দক্ষিণে মিলিয়ে গেল। পুলিশের গাড়ি। ছায়ামূর্তিটি ভাবল ওটা টহলের গাড়ি।

ছায়ামূর্তিটির ইচ্ছা ছিল সড়ক বরাবর গ্রামের প্রান্তে ব্রীজ পর্যন্ত এগিয়ে যাবে। কার্পাস তলার ঐ লোকটি তার পরিকল্পনা ভন্ডুল করে দিল। ভাবল, সামনে পেছনে এমন লোকের দেখা হয়তো আরও পাওয়া যাবে। সুতরাং কোনদিকে অগ্রসর হওয়া নিরাপদ মনে করল না।

উত্তরদিক থেকে একটা গাড়িকে তীব্র বেগে ছুটে আসতে দেখা গেল। তার পেছনে আরও দুটো হেডলাইট।

হঠাৎ পেছনে পায়ের শব্দে পিছনে ফিরে তাকাল ছায়ামূর্তিটি। দেখল, মুখোশ ঢাকা একজন লোক। তার উদ্যত রিভলভার তার দিকে স্থির। কিন্তু শীঘ্রই উদ্যত রিভলবারটা নীচে নেমে গেল। নীচু কণ্ঠে তার মুখ থেকে বেরুল, ফায়জাভা তুমি? এখানে।

ফায়জাভা ঠোটে আঙুল ঠেকিয়ে উত্তর দিকে ইংগিত করল। ফিস ফিসে কণ্ঠে বলল, ঐখানে একজন লোক। হয়তো আরও আশে পাশে আছে রশিদ ভাই।

ফায়জাভা রশিদভকে দেখিয়ে দিল জায়গাটা। রশিদভ কিছু বলতে যাচ্ছিল ফায়জাভাকে। কিন্তু বলা হলোনা। দেখল সেই ছুটে আসা গাড়িটি সামনের লাইট পোস্টটা পেরিয়ে এসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। বলতে গেলে একেবারে তাদের নাক বরাবর সমান্তরালে।

ছয় সিটের জীপ গাড়ি। গায়ে সেনাবাহিনীর প্রতীক আঁকা। অর্থাৎ সেনাবাহিনীর গাড়ি।

তারা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করল, এ গাড়িটি দাঁড়ানোর সাথে সাথে পিছনে ছুটে আসা গাড়িটিও কড়া একটা ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল প্রায় দুশ গজ পেছনে।

বিজলী বাতির আলোতে এ গাড়ির গায়েও সেনাবাহিনীর প্রতীক স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

এই সময় দক্ষিণ দিক থেকে আরেকটা গাড়িকে ছুটে আসতে দেখা গেল। সামনে ছয় সিটের যে গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছিল তা ব্যাক-ড্রাইভ করে পিছু হটতে লাগল। মনে হল গাড়িটি পিছনের গাড়ির কাছে যেতে চায়। গাড়িটির ব্যাক-ড্রাইভ দ্রুত হলো। পেছনের গাড়ি থেকে গুলীর শব্দ হলো, পর পর দু'টি। ভীষণ শব্দের টায়ার ফেটে গেল সামনের গাড়িটির। কিন্তু ততক্ষনে গাড়িটি পেছনের গাড়িটির অনেকখানি কাছে এসে গেছে।

টায়ার ফেটে যাবার পর গাড়িটি থেমে গেল। তার সাথে সাথেই সেই গাড়ি থেকে দু'টি গোলাকার বস্তু ছুটে গেল পেছনের গাড়ির উদ্দেশ্যে। বস্তু দু'টি অভ্যর্থভাবে আঘাত করল পেছনের গাড়িকে। একই সাথে দু'টি বিস্ফোরণের শব্দ হলো। সেই বিস্ফোরণে পেছনের গাড়টি খেলনার মত টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল চারদিকে।

দক্ষিণ দিক থেকে ছুটে আসা গাড়িটি ততক্ষণে এসে পড়েছে। ও গাড়িটিও সেনাবাহিনীর। ক্যারিয়ার জাতীয় ভ্যান। গুলী ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে এল গাড়িটি।

টায়ার ফেটে যাওয়া জীপ থেকে চারজন লোক লাপ দিয়ে রাস্তার পশ্চিম পাশে নেমে এল। নামল তারা সেই কার্পাস গাছের গোড়ায় বসে থাকা লোকটির প্রায় নাক বরাবরই।

রশিদভ ফিস ফিস করে বলল, বুঝতে পারছ কিছু ফায়জাভা?

ফায়জাভা বলল, না। এনিক কোন সেমসাইড ব্যাপার?

-না সেমসাইড নয়। আমার মনে হচ্ছে মাঝের অর্থাৎ টায়ার ফাটা গাড়িটা সাইমুমের। ওরা সেনাবাহিনীর জীপ ব্যবহার করছে। বলল রশিদভ।

-কি বললে সাইমুমের! এক রাশ বিস্ময় ঝরে পড়ল ফায়জাভার কণ্ঠে। একটা উষ্ণ শিহরণ খেলে গেল তার গোটা দেহে।

চারজন লোক জীপ থেকে রাস্তার পাশে লাফিয়ে পড়ে ধীরে ধীরে এগুচ্ছিল দক্ষিণ দিক থেকে এগিয়ে আসা গাড়ির দিকে।

এই সময় রশিদভ এবং ফায়জাভা লক্ষ্য করল, সেই চারজনের ঠিক পেছনেই একজন লোক যেন ঠিক মাটি ফুঁড়েই উদয় হলো তার হাতের মিনি সাবমেশিনগান মাথা তুলেছে সেই চারজনকে লক্ষ্য করে। কিন্তু হঠাৎ একটা গুলীর শব্দ হলো তার পিছন থেকে। স্টেনগান ওয়ালা লোকটি মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মাটিতে।

গুলীর শব্দের সেই চারজন মুখ ফিরিয়ে তাকাল। একজন মাথা নিচু করে ছুটে এল মুখ থুবড়ে পড়া লোকটির কাছে। এ সময় কার্পাস ক্ষেত থেকে একজন লোক বেরিয়ে "আল্লাহু আকবর" ধ্বনি দিয়ে তার দিকে এগুলো। তার হাতে রিভলবার। মনে হলো এই লোকটিই স্টেনগান ওয়ালা লোকটিকে মেরেছে। মুখ থুবড়ে পড়া লোকটির কাছে এসে পড়া সাইমুমের লোকটি তার অস্বাভাবিক লম্বা ধরনের ব্যারেল ওয়ালা বাঘা রিভলবারটি আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিয়ে এগিয়ে আসা লোকটির দিকে তাক করে আবার নামিয়ে নিল।

লোকটির 'আল্লাহ আকবর' ধ্বনি শুনে রশিদভ এবং ফায়জাভা চিনতে পারল ও জামায়াতিন।

জামায়াতিন কার্পাস ক্ষেত থেকে সড়কের অর্ধেকটা পথ এগিয়েছে। এমন সময় কার্পাস ক্ষেতের দিক থেকে একটা গুলির শব্দ হলো। গুলীবিদ্ধ জামায়াতিনের দেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

ফায়জাভা চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল। রশিদভ তার মুখ চেপে ধরে বলল, সামনে ও উত্তর দিকে চেয়ে দেখ। দেখা গেল দক্ষিণ দিকে চুটে আসা গাড়ি থেকে দশ বারজন সৈনিকের ইউনিফর্মধারী লোক লাফিয়ে পড়ল সড়কে। আর উত্তর দিকে সেই কার্পাস গাছের নীচের লোকটি উঠে দাঁড়িয়েছে। তার হাতে উদ্যত রিভলবার তাক করেছে সেই সাইমুমের লোকটিকে।

রশিদভ এবং ফায়জাভার রিভলবার এক সাথে অগ্নিবৃষ্টি করল কার্পাস তলার সেই লোকটির দিকে। লোকটি একটি 'আ-আ' চিৎকারে উপুড় হয়ে সামনে আছড়ে পড়ল।

এদিকে দক্ষিণের দিক থেকে আসা গাড়ি থেকে যারা নেমেছিল তারা দক্ষিণ দিকে অগ্রসররত সাইমুমের তিনজন লোকের গুলীর মুখে পড়ল। তাদেরও

অটোমেটিক এম-১০ রিভলবার গুলী বৃষ্টির এক দেয়াল সৃষ্টি করল। ঝড়ের তোড়ে গাছের পাকা আমের মতই ঝরে পড়ল লোকগুলো মাটিতে।

রশিদভ এবং ফায়জাভা গুলী করেই ছুটল উত্তর দিকে যেখানে জামায়াতিন গুলী খেয়ে পড়ে আছে সেদিকে। তারা সেই কার্পাস গাছ পার হতেই দেখল একটা উদ্যত রিভলবার তাদের দিকে ছুটে আসছে।

রাশিদভ বাম হাতে ফায়জাভাকে এক হ্যাচকা টান মেরে মাটিতে শুয়ে পড়ল। তার সাথে সাথে ফায়জাভাও পড়ে গেল। তাদের মাথার উপর দিয়ে চলে গেল একটা বুলেট। দ্বিতীয় গুলীর জন্য ঐ লোকটা তাক করেছিল। কিন্তু পারল না। সাইমুমের সেই লোকটির দীর্ঘ ব্যারেলওয়ালা রিভলবার উঁচু হলো। সংগে সংগে এম-১০ থেকে গুলীর ঝাঁক এসে ঝাঁঝরা করে দিল লোকটিকে।

রশিদভ এবং ফায়জাভা উঠল। ছুটে গেল জামায়াতিনের কাছে। পিঠে গুলী লেগেছে তার। রক্তে ভেসে যাচ্ছে। রশিদভ এবং ফায়জাভা ঝুকে পড়ে ব্যাকুলভাবে পরীক্ষা করল জামায়াতিনকে। না, জামায়াতিন আর নেই। রশিদভ এবং ফায়জাভা দুজনারই চোখ ফেটে নেমে এল অশ্রুর বান। রক্তের সম্পর্কে জামায়াতিন তাদের কেউ নয় কিন্তু জামায়াতিন তাদের বহুদিনের সাথী, তাদের সব চিন্তার শরীক। তার এমন মর্মান্তিক বিদায় তারা কল্পনা করেনি।

সাইমুমের সেই চতুর্থ লোকটি এবং অপর তিনজন তাদের চারপাশে এসে দাড়িয়েছে। দেখছে তারা এই দৃশ্যকে।

সাইমুমের একজন বলল, আপনারা কে জানতে পারি?

রশিদভ মুখ তুলল। বলল, আমি হতভাগা রশিদভ কমসমলের সাধারণ সম্পাদক, এই বোন তুঘরীল তুঘানের মেয়ে ফায়জাভা। আর এই ভাই কমসমলের পশ্চিম উজবেকিস্তান ইউনিটের সভাপতি। আমরা সাইমুমের কেউ নই কিন্তু ভালবাসি সাইমুমকে।

সাইমুমের সেই লোকটির চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং মুখে উচ্চারণ করল, আলহামদুলিল্লাহ।

একটু থেমে সে আহমদ মুসার দিকে ইংগিত করে বলল, ইনি সাইমুম নেতা আহমদ মুসা আর ইনি সাইমুম নেতা কর্ণেল কুতাইবা আর আমরা দু'জন নগণ্য কর্মী।

রশিদভ এবং ফায়জাভা বিস্ময়াবিষ্টের মত তাকিয়ে রইল আহমদ মুসার দিকে। যেন অবিশ্বাস্য কোন এক দৃশ্যের তারা মুখোমুখি। যেন স্বপ্নের কোন এক নায়ককে তারা দেখছে। হাজারো কথা-কিংবদন্তী যাকে ঘিরে- সেই মহানায়ক তাদের সামনে।

নিরবতা ভাঙল আহমদ মুসা নিজেই। তাদের বিস্ময়াবিষ্ট চোখে চোখ রেখে বলল, প্রিয় ভাই বোনেরা, তোমাদের কাছ থেকে যে সাহায্য পেয়েছি তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে খাট করবো না। যা তোমরা করেছ জাতির একজন হয়ে জাতির জন্য করেছ। অসীম দুর্ভাগ্যের শিকার জাতি তোমাদের কাছ থেকে এটাই আশা করে।

একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর ঝুকে পড়ে জামায়াতিনের কপালে একটা চুম্বন দিয়ে বলল, পশ্চিম উজবেকিস্তানের প্রথম শহীদ আমার এ ভাই। আমি প্রার্থনা করি তার প্রতি ফোঁটা রক্ত আমাদের মধ্যে সংগ্রামের একজন করে সৈনিক গড়ে তুলুক। এর কে কে আছে আমি জানি না। তাদের কাছে তোমরা আমার শ্রদ্ধা জানিও।

একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর আবার বলল, তোমাদের কাছ থেকে আমাদের আরও অনেক কথা শুনার আছে। আল্লাহ সে সুযোগ আমাদের দিন। এখন আমরা বিদায় নিতে চাই, এই মুহুর্তে অনেক কাজ।

ফায়জাভা বলল, এর মধ্যেই আপনারা মিটিং-এ যাবেন?

-হ্যাঁ বোন, আমরা আশা করি।

-কিন্তু কিভাবে?

-চিন্তা কর না। ঐ যে ক্যারিয়ারটা দাঁড়িয়ে আছে ওটা নিয়েই আমরা যাব। আগের গাড়ির নাম্বারটা সম্ভবত আমরা ওটা দখল করার সময়ই ওরা চার দিকে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিল। তাই কিছু অসুবিধা হয়েছে। আমরা ওদের সৈনিকদের

পোশাকেই আছি। ওরা যে পরিমাণ দিশাহারা হয়ে পড়েছে তাতে কিছুই ঠিক করতে পারবে না।

-কিন্তু আপনারা আসছেন এ খবর এরা জানে এবং সেভাবেই এরা প্রস্তুত।

-জানে? বিস্মিত কন্ঠ আহমদ মুসার।

-জানে। আমরাও জানি বলেই ঔৎসুক্য নিয়ে বেরিয়েছি। এ খবর তো আমি আজ সন্ধ্যায় তাসখন্দের আমার এক বান্ধবী সাইমুম কর্মীকে জানিয়েছি, যাতে এ বিষয়টা আপনারা জানতে পারেন।

সন্ধ্যার আগেই আমরা তাসখন্দ থেকে বেরিয়ে এসেছি।

এ সময় উত্তর দিগন্তে একটি গাড়ির হেডলাইট স্পষ্ট হয়ে উঠল। উত্তর দিক থেকে এ পথেই একটি গাড়ি আসছে। সেদিকে তাকিয়ে আহমদ মুসা বলল, আসি বোন, খোদা ভরসা।

বলে আহমদ মুসা সালাম দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। ফায়জাভা জিজ্ঞেস করল, আমাদের জন্য কোন পরামর্শ, কোন নির্দেশ?

আহমদ মুসা থমকে দাঁড়িয়ে আবার এদিকে ফিরল। বলল, তোমরা সাইমুমের সৈনিক হিসেবে মুসলিম জনগনের কাছে একটা কথাই বল, শোষকদের শোষণের দিন শেষ হয়েছে, মুসলমানদের ঈমান জেগে উঠেছে, ঈমানের শক্তির কাছে পশুর শক্তির পরাজয় যাত্রা শুরু হয়েছে। এ কথা বলে আহমদ মুসা ঘুরে চলতে শুরু করল দাঁড়িয়ে থাকা সৈনিক ভ্যানের দিকে।

রশিদভ এবং ফায়জাভা সে দিকে তাকিয়ে রইল অপলক চোখে। তাদের চোখে উজ্জ্বল আলো। তার চেয়েও বড় আলোর দেয়ালী চলছে তাদের হৃদয়লোকে। মনে হল তারা যেন নতুন মানুষ। আর আদিগন্ত এক নতুন পথ তাদের সামনে।

সৈনিক ভ্যানটি এগিয়ে চলছে আহমদ মুসাদের নিয়ে। আহমদ মুসা ড্রাইভিং সিটে। পাশে কুতাইবা। পেছনে দু'জন।

ড্রাইভিং সিটে একটা অয়্যারলেস সেট পড়েছিল। আহমদ মুসা সেটা কর্ণেল কুতাইবার হাতে তুলে দিয়ে বলল, দেখ কোন কাজে লাগে কিনা?

সামনেও একটা গাড়ির হেডলাইট দেখা গেল। অর্থাৎ উত্তর দিকের মত দক্ষিন দিক থেকেও আরেকটা গাড়ি আসছে। আহমদ মুসা বলল, আমরা আসছি যখন ওরা জানে তখন ফাঁদে ফেলার কোন আয়োজনই ওরা বাদ রাখেনি কুতাইবা।

একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর বলল, আমুদরিয়া ব্রিজের অপর মাথায় আমাদের লোকেরা অপেক্ষা করছে। ওখানে আমাদের পৌছতেই হবে।

এ সময় কুতাইবার হাতের ওয়্যারলেস কথা বলে উঠল। আর্মি কোডে কথা বলছে। উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর জানতে চাচ্ছে, কি হয়েছে, কি ঘটেছে?

কর্নেল কুতাইবার আর্মি কোড মুখস্থ। সে উত্তর দিল, ঘটনাটা পরিষ্কার অন্তর্ঘাতমুলক, অন্য কিছু নয়। আমরা ফিরে আসছি। একবার আমুদরিয়ার ওপারটা ঘুরে আসব।

কুতাইবার দিকে চেয়ে হাসল আহমদ মুসা। বলল, শুকরিয়া, কুতাইবা। ওয়েল ডান।

সামনে থেকে যে গাড়ি দু'টো আসছে ও দুটোও আর্মির গাড়ি। আলোক সংকেতে এটা জানিয়ে ওরা এ গাড়ির পরিচয় জানতে চাচ্ছে।

কর্নেল কুতাইবার দিকে একবার তাকিয়ে আহমদ মুসা আলোক সংকেত দিল, সব ঠিক আছে, আমরা ওদিকের পেট্রলে যাচ্ছি।

কুতাইবা আহমদ মুসার দিকে চেয়ে হাসল। বলল, ধন্যবাদ মুসা ভাই। আপনার আলোক-সংকেত নিখুঁত হয়েছে।

আহমদ মুসা কম্যুনিস্ট সেনাবাহিনীর শব্দ, আলো এক কথায় আর্মি কোড কর্নেল কুতাইবার কাছ থেকেই শিখেছে।

সামনে অর্থাৎ দক্ষিন দিক থেকে আসা গাড়িটি সাইড নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল উত্তর দিকে। আহমদ মুসার গাড়ি সাইড নিয়ে ও গাড়িটাকে পেরিয়ে এসে দ্রুত ছুটে চলল দক্ষিন দিকে। আহমদ মুসা তার গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে দিল। কুতাইবার দিকে তাকিয়ে বলল, ও গাড়িটা স্পটে গিয়েই সব বুঝতে পারবে এবং

বুঝতে পেরে শুধু পাগলের মত ফিরে আসা নয়, খবরটা সে রিলে করবে সব জাগায়। তার আগেই আমাদের ব্রীজ পেরুতে হবে।

তীর বেগে এগিয়ে চলেছে গাড়ি। দূরে আমুদরিয়া ব্রীজের উপর আলোর সারি দেখা যাচ্ছে। গাড়ি এগিয়ে চলেছে ঐ ব্রীজ লক্ষ্যে। ব্রীজের ওপারে সাইমুমের যে লোকেরা তাদের রিসিভ করার কথা তারা কি আসতে পারবে এদের মারমুখো-মরিয়া এই আয়োজনের মধ্যে?

আর এক মিনিটের মধ্যে গাড়ি পৌছে যাবে ব্রীজের মুখে। আরো কিছুটা পথ এগিয়েছে গাড়ি। এমন সময় ব্রীজের মুখে লালবাতি জ্বলে উঠল। ছ্যাঁৎ করে উঠল আহমদ মুসার মন। খবর কি এখানে ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে? না এটা কোন রুটিন ব্যাপার?

স্টিয়ারিং হাতে আহমদ মুসা কুতাইবার দিকে মুখ না ঘুরিয়েই বলল, তুমি সেনাবাহিনীর একজন কর্ণেল। এ হিসেবেই পরিস্থিতির মোকাবিলা করবে। এখানে যাদের পাবে তারা নিশ্চয়ই জুনিয়র অফিসার।

গাড়ির হেডলাইটে দেখা যাচ্ছে ব্রীজের মুখে একজন অফিসার দাঁড়িয়ে, তার পাশেই একটা গাড়ি দাঁড়ানো। আহমদ মুসা পকেট থেকে মিনি দূরবীনটা বের করে চোখে লাগাল। দেখল, দাঁড়ানো অফিসারের কাঁধে পুলিশ অফিসারের ইনসিগনিয়া, গাড়িটাও পুলিশের। খুশি হলো আহমদ মুসা। বিষয়টা কুতাইবাকে জানিয়ে বলল, ওদের ধমক দিলেই চলবে। আর ওরা যখন অস্ত্র বাগিয়ে নেই, তখন নিশ্চয় ওরা সব খবর জানে না।

আহমদ মুসা গাড়িটা একদম পুলিশ অফিসারটির পাশে দাঁড় করাল, যাতে কুতাইবা তার মুখোমুখি হতে পারে।

কুতাইবার বাম বাহুটি গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আছে। তাতে কর্ণেলের ইনসিগনিয়া জ্বল জ্বল করছে। পুলিশ অফিসারটি তা দেখেই লম্বা একটা স্যালুট দিল।

কুতাইবা মাথাটা ঈষৎ ঝুঁকিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, এই লাল সংকেত কেন?

পুলিশ অফিসারটি নরম কন্ঠে বলল, স্যার এই মাত্র নির্দেশ এল সব গাড়ি আটকে রাখার জন্য।

-ও অল রাইট। শত্রুরা ঢুকে পড়েছে কিনা, এর দরকার আছে। কোন গাড়ির নাম্বার কিছু জানিয়েছে?

না স্যার বলেছে চেষ্টা করছে। তবে গাড়িটা সেনাবাহিনীর ক্যারিয়ার ভ্যান।

ছ্যাৎ করে উঠল কুতাইবার মন। কিন্তু বাইরে তার কোন প্রকাশ ঘটল না। খুশী হলো যে নাম্বারটা তারা এখনও পায়নি।

এ সময় আহমদ মুসা স্টার্টারে একটু চাপে দেয়ায় ইঞ্জিন শব্দ করে নড়ে উঠল গাড়িটি। সংকেত বুঝতে পেরে কুতাইবা পুলিশ অফিসারকে লক্ষ্য করে বলল, ওকে, চারদিকে নজর রাখ আমরা আসছি।

পুলিশ অফিসারটিকে একটু বিহ্বল মনে হল। সে যেন কিছু বলতে চায় কিন্তু পারল না। তার সামনে দিয়ে গাড়িটি তীরের মত উঠে গেল ব্রীজে।

আহমদ মুসা বলল, আলহামদুলিল্লাহ, তোমার অভিনয় ভাল হয়েছে। ব্রীজের সামনের মুখেও এ ধরনের বাধা নিশ্চয় আছে কিন্তু ওখানে আর দাঁড়াতে চাই না।

ব্রীজের মাঝামাঝি এসে আহমদ মুসা সাইমুমের কোডে একবার হর্ণ বাজালো। মুহুর্তকাল পরে সামনে ব্রীজের ওপারে অনেক দুর থেকে আরেকটা হর্ণ বেজে উঠল সাইমুমের কোডে।

আহমদ মুসা এবং কুতাইবা দুজনের মুখই খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ব্রীজের সামনের প্রান্তটি এখন দেখা যাচ্ছে। ওখানে সেই লাল আলো। অর্থাৎ দাঁড়াতে হবে।

দেখা গেল ব্রীজের মুখের পাশেই একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তার সামনে দুজন পুলিশ অফিসার। হঠাৎ এ সময় আরেকটা গাড়ি এসে সেখানে দাঁড়াল। সেনাবাহিনীর একটি সুদৃশ্য জীপ। নিশ্চয় গাড়িটি কোন উচ্চপদস্থ অফিসারের।

জীপটি দাঁড়াল রাস্তার ডান ধার ঘেঁষে। বাম দিকে প্রচুর জায়গা। আহমদ মুসা ঠিক করল এদিক দিয়েই সে স্লিপ করবে।

এ সময় সেখানে থেকে আহমদ মুসার গাড়ির প্রতি সংকেত এল গাড়ি দাঁড় করাবার জন্য। আহমদ মুসা বলল, কুতাইবা আমরা না দাঁড়ালে অবশ্যই ওরা গুলি করবে।

একটু থামল আহমদ মুসা। একটু হাসল। তারপর নিজেই আবার বলল, আশা করি এ সুযোগ তারা পাবে না।

আর দু'শ গজ দুরেই ব্রীজের মুখ, ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে জীপটি। আহমদ মুসা গাড়ির গতি কমিয়ে দিল। বোঝা যাচ্ছে ব্রীজের মুখে গিয়েই গাড়িটি দাঁড়াবে। বিস্ময়ে একবার কুতাইবা কিছু বলতে সাহস পেল না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল কুতাইবা। ঐ জীপের উর্ধ্বতন সামরিক অফিসারের সন্মুখে পড়লে তার কিছুই বলার থাকবে না সেখানে।

আহমদ মুসার গাড়িটি ধীর গতিতে ব্রীজের মুখ পেরিয়ে জীপটির সমান্তরালে দাঁড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে।

ব্রীজের ডানপাশে দাঁড়িয়ে থাকা দুজন পুলিশ অফিসার আহমদ মুসার গাড়ির দিকে এগুবার জন্য নড়ে উঠল। জীপটির দরজাও নড়ে উঠল। মাঝ বয়সি একজন জেনারেল গাড়ি থেকে নামার জন্য তৈরী হলেন। জীপের পেছনে জেনারেলর ৪ সদস্যর স্কোয়াডটিও জীপের দরজায় হাত দিল তা খোলার জন্য।

গড়িয়ে গড়িয়ে আহমদ মুসার গাড়িটি জীপের সমান্তরালে এসেই যেন প্রচন্ড এক লাফ দিয়ে উঠল। প্রবল এক ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়িটি তীরের মত ছুটে চলল সামনে।

পুলিশ অফিসার দুজন জীপের ঐ পাশ দিয়ে জীপের মাথা বরাবর পৌঁছেলিল। হাতের স্টেনগান তাদের মাথার উপর উঠল কিন্তু সামনে জীপের আড়াল থাকায় আহমদ মুসার গাড়িকে তাক করতে পারল না।

জেনারেল এবং তার স্কোয়াড জীপ থেকে নামছিল। যখন নামা তাদের শেষ হলো, তখন আহমদ মুসার গাড়ি অনেক দুর এগিয়ে গেছে। স্টেনগানের গুলী তখন সেখানে অকেজো।

জেনারেল জীপটি ঘুরিয়ে পিছু নেবার নিদেশ দিল। কিন্তু সামনের দিকে তাকিয়ে দেখল, গাড়ির পেছনের যে আলো দেখা যাবার কথা তা দেখা যাচ্ছে না। অথাৎ সব আলো নিভিয়ে দেয়া হয়েছে। অন্ধকারে হাতড়ানো নিরর্থক।

জেনারেল অয়্যারলেস তুলে নিল হাতে।

ঝড়ের বেগে চলছিল আহমদ মুসার গাড়ি। সব লাইট নিভানো। অন্ধকারে এক দৈত্যর মতই মনে হচ্ছে গাড়িটাকে।

অনেক খানি এগিয়ে সাইমুম কোডে আবার হর্ণ বাজালো আহমদ মুসা। মুহুর্তেই উত্তর এল পাশের এলাকা থেকে। অল্পক্ষণের মধ্যেই দক্ষিণ থেকে একটা হেডলাইট এগিয়ে এল। আলোর সংকেত দেখে বুঝল ওটা সাইমুমের গাড়ি।

আহমদ মুসা ও কুতাইবা গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। পেছন থেকে ওরা দুজনও নামল।

ক্যারিয়ার ভ্যানটি ফেলে রেখে সাইমুমের জীপটিতে চড়ে আহমদ মুসা এবং অন্যরা একটা ছোট রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল পশ্চিম দিকে। আঁকা-বাঁকা পথে দশ মিনিট ড্রাইভের পর তারা কলখজের লিগ্যাল এইড অফিসে এসে পৌঁছল।

গাড়ির ড্রাইভিং সিট থেকে নেমে আবদুল্লাহ জমিরভ গাড়ির দরজা খুলে আহমদ মুসা ও কুতাইবাকে নামিয়ে নিয়ে বলল, এখন আপনাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে আমার সাথী রসুলভ। আমি গাড়ি নিয়ে এখানে আমার অফিসেই থাকব। জমিরভ সারাকায় কলখজের লিগ্যাল এইড অফিসের জাজ এডভোকেট।

আহমদ মুসা বলল, তুমি যাচ্ছ না তাহলে?

-না জনাব, আমার দায়িত্ব পথের এ দিকটা পাহারা দেয়া। যদি কেউ ফলো করে থাকে, কিংবা জানতে পেরে থাকে, তাহলে আমার অফিস পযর্ন্ত এসেই যেন সে ঠেকে যায়।

আহমদ মুসা সবাইকে নিয়ে রসুলভের পিছনে পিছনে লিগ্যাল অফিসের পাশের গলিপথ ধরে কলখজের বিশাল গোডাউন চত্বরের দিকে এগিয়ে চলল। সাইমুমের আজ বৈঠক বসেছে ঐখানেই।

# ৩

'ফ্র' এর নতুন সিকিউরিটি চীফ জেনারেল বোরিস বেবিয়ার এর গোটা মুখটাই লাল টকটকে। বুকভরা ক্রোধ ও ক্ষোভের আগুন যেন ঠিকরে পড়েছে মুখ দিয়ে।

চেয়ার থেকে উঠে সে পায়চারী করছিল।

প্রশাসন ও নিরাপত্তা বিভাগের কয়েকজন উধর্তন অফিসার টেবিল ঘিরে বসে আছে। সকলেরই মুখ গম্ভীর, অবস্থা বিব্রতকর।

জেনারেল বোরিসকে গত রাতের ঘটনা যেন কুরে কুরে খাচ্ছিল। তার চোখের সামনে দিয়ে আহমদ মুসা গাড়ি হাকিয়ে চলে গেল, কিছুই করতে পারল না সে! তাদের শক্তি-সামর্থ্যকে আহমদ মুসা যেন ছেলেখেলার মত তাচ্ছিল্য করল।

কোথায় হাওয়া হয়ে গেল তারা। ব্রীজের পশ্চিমে কিছু দুরে সেনাবাহিনীর ক্যারিয়ার ভ্যানটা পরিত্যক্ত পাওয়া গেছে। কোন দিকে গেল ওরা? প্রধান সড়ক ধরে যায়নি। যেখানে গাড়ি পাওয়া গেছে সেখান থেকে তিনটা গলি তিন দিকে বেরিয়ে গেছে। রাতেই সে গলিগুলো এবং গলির আশে পাশের জায়গা আতি-পাতি করে সার্চ করা হয়েছে, কিন্তু কোন কিছুই পাওয়া যায়নি। রাত তখন তো ১০টাও হয়নি। লোকজন সবাই রাস্তায় কিংবা বাড়ি বা বাড়ির আশে পাশেই ছিল। কিন্তু কেউ কিছুই বলেনি। সবারই এক জবাব, তারা তেমন কিছু দেখেনি। সব গাদ্দার। এরা দেখলেও কিছু বলবে না। ব্যাপারটা তাই ঘটেছে। তা না হলে নতুন চারজন লোক সবার সামনে দিয়ে চলে গেল আর কারোর নজরে পড়ল না, এটা একেবারেই মিথ্যা কথা। ঠিক আছে, মিথ্যার শাস্তি ওরা পাবে।

উত্তেজিত জেনারেল বোরিস তার অস্থির পায়চারীটা থামাল। থেমে দাঁড়িয়ে টেবিলের একেবারে ডান পাশে টেকো মাথা এক রাশ দুঃশ্চিন্তার ছাপ মুখে নিয়ে

বসে থাকা গোয়েন্দা অফিসার কর্নেল ভাদিনের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার তদন্ত শেষ হয়েছে? জামায়াতিন মরল কার গুলিতে?

কর্নেল বলল, আমাদের গোয়েন্দা কর্মীর গুলিতে।

-অর্থাৎ জামায়াতিন বিদ্রোহীদের পক্ষে যোগ দিয়েছিল?

-ব্যাপারটা তাই দাঁড়াচ্ছে। বলল ভাদিন।

-সবগুলো ডেড বডি পরীক্ষা শেষ হয়েছে?

-হ্যাঁ।

-উল্লেখযোগ্য কিছু আছে তাতে?

কর্নেল ভাদিন একটু নড়ে-চড়ে বসলো। তারপর বলল, গাড়িতে বিস্ফোরণে যারা মারা গেছে তাদের বাদ দিলে অবশিষ্ট দুজন ছাড়া সবাই মারা গেছে সাইমুমের বিশেষ ধরনের পিস্তুল এম-১০ এর গুলিতে। আর দুজন মারা গেছে সাধারণ পিস্তলের গুলিতে। একজনের দেহে ছিল একটা গুলি। আরেকজনের দেহে দুটি।

-এগুলীগুলো কোন পিস্তল থেকে তাহলে এসেছে?

-একটা পিস্তল জামায়াতিন। তার মৃত দেহের কাছেই তার পিস্তলটি পাওয়া গেছে। ওটা থেকে একটা গুলী ছোঁড়া হয়েছিল। অন্য দুটি গুলীর পিস্তলের সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি।

এ সময় কথা বলে উঠল পুলিশ প্রধান তুরিন। সে টেবিলের বাম প্রান্তে বসেছিল। বলল সে, আমরা সারাকায়ার সবগুলো পিস্তল সিজ করেছি এবং সেগুলোকে পাঠানো হয়েছে কেমিক্যাল পরীক্ষার জন্য। পরীক্ষার রিপোর্ট এখনি পাওয়া যাবে। তাতে হয়তো ঐ দুটো গুলীর উৎসের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

তুরিন থামতেই সহকারী পুলিশ প্রধান এসে ঘরে প্রবেশ করল।

তার দিকে চেয়ে তুরিন বলল, এনেছ রিপোর্ট?

'এনেছি' বলে সহকারী পুলিশ প্রধান পকেট থেকে দুটো পিস্তল এবং রিপোর্টের কাগজ পুলিশ প্রধান তুরিনের হাতে তুলে দিল।

কাগজের দিকে নজর বুলিয়ে জেনারেল বোরিসের দিকে তাকিয়ে তুরিন বলল, স্যার আমাদের এক জনের দেহ থেকে যে দুটি গুলী পাওয়া গেছে তা দুজনার দুই পিস্তল থেকে এসেছে।

-কার পিস্তল? বলল জেনারেল বোরিস।

তুরিন পিস্তল দু'টি জেনারেল বোরিসের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল, একটা হল তুঘরীল তুগানের এবং অন্যটা রশিদভের।

-এ কি বলছ! সত্যি বলছ তুরিন?

সত্যি স্যার, দেখুন পিস্তলের সাথের ট্যাগে মালিকের নাম রয়েছে।

জেনারেল বোরিস তুঘরীল তুগানের পিস্তলটি হাতে নিয়ে ট্যাগটির দিকে একবার নজর দিয়ে বলল, এর অর্থ কি তুরিন? কাল তো তুঘরীল তুগান সারাক্ষণ আমাদের সাথেই ছিল।

তুরিন বলল, রাসায়নিক রিপোর্ট বলছে রশিদভ ও তুঘরীল তুগানের এ পিস্তল থেকে এক সাথেই গুলী ছোঁড়া হয়েছে এবং গুলী দুটি আমাদের দ্বিতীয় লোককে হত্যা করেছে। তুঘরীল তুগান ও রশিদভের কাছ থেকেই ঘটনার সবটা জানা যাবে।

জেনারেল বোরিস মাথা নেড়ে বলল, ওদের কি গ্রেফতার করা হয়েছে?

উত্তর দিল সহকারী পুলিশ প্রধান। বলল, পুলিশ পাঠান হয়েছে। এখনি তারা গ্রেফতার করে নিয়ে আসবে।

এরপর একটুক্ষণ নীরবতা।

নীরবতা ভঙ্গ করল কর্নেল ভাদিন। বলল, স্যার, জামায়াতিন ও রশিদভের ব্যাপারটা এবং তুঘরীল তুগানের পিস্তল এর ঘটনার পর আমরা আর কাকে বিশ্বাস করব, কার উপর নির্ভর করব? আমি ওদের যতদিন থেকে জানি, জামায়াতিন এবং রশিদভ দুজন অত্যন্ত ভাল ছেলে ছিল, পার্টির কাজে জান কবুল করার মত নিবেদিত প্রাণ ছিল তারা।

পুলিশ প্রধান তুরিন মাথা নেড়ে সমর্থন করল ভাদিনের কথা। জেনারেল বোরিস বলল, তোমার কথা ঠিক ভাদিন। কিন্তু অতীতকে দিয়ে আর বর্তমান বিচার হবে না। ডেভিল সাইমুম সবার মাথা খারাপ করে দিয়েছে। এই খারাপ

মাথাগুলোকে গুড়িয়ে দিয়েই আমাদের কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রকে রক্ষা করতে হবে। এ সময় টেলিফোন বেজে উঠল। জেনারেল বোরিস রিসিভার তুলে নিল। ওপারের কথা শুনে নিয়ে বলল, শুধু তুঘরীল তুগানকে পাঠিয়ে দাও।

অল্পক্ষণ পরেই তুঘরীল তুগান ঘরে প্রবেশ করল। একজন পুলিশ অফিসার তাকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে চলে গেল।

তুঘরীল তুগান ধীর পদক্ষেপে এসে টেবিলের সামনে দাঁড়াল। ভাবলেশহীন তার মুখ। কিন্তু তার মধ্য দিয়েও চিন্তার একটা কালো ছায়া ফুটে উঠছে চোখে-মুখে। তবে তার চখে-মুখে দৃঢ়তার ছাপ।

জেনারেল বোরিস তার দিকে তাকিয়ে সামনের খালি চেয়ারটা দেখিয়ে বলল, বসুন মিঃ তুগান।

সবাই নীরব। জেনারেল বোরিস সোজা হয়ে বসে তুঘরীল তুগানের দিকে না চেয়ে অনেকটা স্বগত কণ্ঠেই বলল, আমরা দুঃখিত মিঃ তুগান আপনাকে আজ এভাবে এখানে আসতে হয়েছে। কিন্তু দায়িত্ব দায়িত্বই।

একটু থেমে বলল, আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।

-বলুন। ভাবলেশহীন কণ্ঠে বলল তুঘরীল তুগান। একটা পিস্তল তুঘরীল তুগানের দিকে এগিয়ে দিকে এগিয়ে দিয়ে জেনারেল বোরিস বলল, এ পিস্তলটা কার?

পিস্তলটা হাতে নিয়ে নেড়ে-চেড়ে বলল, আমার।

-গতকাল রাতে এ পিস্তলটা কার কাছে ছিল?

-আমার পিস্তল দু'টো। তার একটা গত রাতে আমার কাছে ছিল। আর এ পিস্তলটা ছিল আমার ড্রইং রুমের ড্রয়ারে। সকালে এটা সেখানেই পেয়েছি।

-রাতে কি এটা কেউ ব্যবহার করেছে?

-আমি জানি না।

-এ পিস্তলের গুলীতে আমাদের একজন গোয়েন্দা কর্মী মারা গেছে।

-এ পিস্তলের গুলীতে? ভীষণভাবে চমকে উঠল তুঘরীল তুগান।

-হ্যাঁ, এ পিস্তলের গুলীতে। বলল জেনারেল বোরিস।

এতক্ষণে একটা উদ্বেগ ও আশংকা তুঘরীল তুগানের মুখে-চোখে ফুটে উঠল। সে বলল, এটা কি করে সম্ভব?

-সেটাই তো আমাদের জিজ্ঞাসা তুগান।

বিমর্ষ তুঘরীল তুগানের কপালে চিন্তার গভীর বলিরেখা। ব্যাপারটা তার কাছে সত্যিই ভুতুড়ে মনে হচ্ছে। সকলেই জানে, গতকাল ঘটনার সময় সে সারাক্ষণ জেনারেল বোরিসের সাথে সাথেই ছিল। কে তার পিস্তল ব্যবহার করবে? তাছাড়া তার পিস্তল খোয়া যায়নি, ড্রয়ারেই ছিল।

নিশ্চিত তুঘরীল তুগানের দিকে চেয়ে জেনারেল বোরিস বলল, ঘটনা আরও আছে মিঃ তুগান। তারপর অপর পিস্তলটি হাতে তুলে নিয়ে বলল, এটা রশিদভের পিস্তল। এ পিস্তলের একটা গুলী এবং আপনার ঐ পিস্তলের একটা গুলী আমাদের নিহত একজন গোয়েন্দা কর্মীর দেহ থেকে পাওয়া গেছে। এর অর্থ আপনার পিস্তল এবং রশিদভের পিস্তল এক সাথেই ছিল।

তুঘরীল তুগানের অন্তরটা এবার সত্যিই কেঁপে উঠল। রশিদভের নাম শুনে হঠাৎ তার মানে ফায়জাভার মুখ ভেসে উঠল। জামায়াতিনের মত রশিদভ এবং ফায়জাভাও তো সাইমুমের প্রতি সহানুভূতিশীল। তাহলে ফায়জাভাই কি কোন পাগলামী করেছে? তার পক্ষেই তো সম্ভব পিস্তল ড্রয়ার থেকে নিয়ে গিয়ে আবার যথাসময়ে যথাস্থানে এনে রাখা! এই ভাবনার উদয় হবার সাথে সাথে তার পিতৃমন কেঁপে উঠল থর থর করে। তাহলে কি ফায়জাভার কথা জানতে পেরেছে? রশিদভকে তো ওরা গ্রেফতার করেছে। ওর কাছ থেকেই তো ফায়জাভার কথাও বেরিয়ে আসবে। আর সাইমুম নিয়ে তার সাথেও রশিদভের আলোচনা হয়েছে, এ কথাও তো রশিদভের কাছ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে।

এতক্ষণে তুঘরীল তুগান সত্যিই দুর্বল হয়ে পড়ল।

তুঘরীল তুগানকে নীরব দেখে জেনারেল বোরিসই আবার বলল, বলুন মিঃ তুগান, আপনি কি বুঝছেন, কতটুকু কি জানেন?

স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে তুঘরীল তুগান বলল, আমি কিছুই জানি না, কিছুই বুঝতে পারছি না। গত রাতে আমার গোটা ব্যাপারটাই আপনাদের সামনে আছে।

-তা জানি, বলল জেনারেল বোরিস। তার চোখে-মুখে বিরক্তি ও উত্তেজনার চিহ্ন। সে পুলিশ প্রধান তুরিনের দিকে তাকিয়ে বলল, রশিদভকে এখানে হাজির কর। সব কথা তার কাছ থেকেই পাওয়া যাবে।

জেনারেল বোরিস কথা শেষ করতেই সহকারী পুলিশ প্রধান মিঃ রেকফ উঠে দাঁড়াল। বেরিয়ে গেল সে। কয়েক মিনিট পর রশিদভকে নিয়ে সে প্রবেশ করল ঘরে।

রশিদেভের চেহারায় কোন অস্বাভাবিকতার কিছু নেই। চোখে মুখে শান্ত ভাব, কোন উদ্বেগের চিহ্ন তার চোখে পড়ছে না।

মিঃ বেকফ বসল। রশিদভ দাঁড়িয়েই থাকল। কেউ তাকে বসতে বললো না।

জেনারেল বোরিস তার তীক্ষ্ণ চোখটা রশিদভের দিকে একবার তুলে ধরে রশিদভের পিস্তলটা হাতে তুলে নিয়ে নাচাতে নাচাতে বলল, এ পিস্তলটা কার রশিদভ?

ধীরে অথচ স্পষ্ট কণ্ঠে রশিদভ বলল, পিস্তলের ট্যাগে আমার নাম ও দস্তখত থাকলে ওটা আমার।

-পিস্তল থেকে কয়টা গুলী ছুড়েছিলে?

-একটা। দ্বিধাহীন কণ্ঠ রশিদভের।

-আমাদের গোয়েন্দা কর্মীকে হত্যা করেছ, এটা স্বীকার করছ?

-হ্যাঁ আমি তাকে গুলী করেছি।

তুঘরীল তুগানের চোখ দু'টি বিস্ফারিত। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার ঝড় তার ভেতরে। রশিদভের কি মাথা খারাপ হল, এমনভাবে সব স্বীকার করছে সে? এমনিভাবে কি তাহলে তার কথা এবং ফায়জাভার কথা সব বলে দেবে? এক অজানা ভয় এসে তাকে ঘিরে ধরল।

-ঐ গোয়েন্দা কর্মীর দেহে দুটি গুলী ছিল, দ্বিতীয় পিস্তল পাওয়া গেছে, লোক পাওয়া যাচ্ছে না। সেই লোকটি কে যে তোমার সাথে ছিল?

রশিদভ এই প্রশ্ন শুনে ভাবল, তাহলে নিশ্চয় এরা ফায়জাভার সন্ধান পায়নি। তুঘরীল তুগানের নিশ্চয় কিছু বলার কথা নয়। তাছাড়া সে গত রাতের

ব্যাপারটা জানেও না। গ্রেফতার না করার কারণ তাহলে এটাই। রশিদভ খুশী হল। ফায়জাভার মুখটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। ভাল লাগে তার ফায়জাভাকে। কবে এর শুরু সে জানে না। ফায়জাভার দেশপ্রেম, জাতিপ্রেম, আদর্শ নিষ্ঠা সম্প্রতি তাকে রশিদভের হৃদয়ের একান্ত কাছে এনে দিয়েছে। গত রাতে বিদায়ের সময় রশিদভ ফায়জাভার হাত ধরতে গিয়েছিল, কিন্তু ফায়জাভা হাত টেনে নিয়ে সরে দাঁড়িয়ে বলেছে, আমি মুসলিম, তুমিও মুসলিম, আগের সেই কমরেড নই। সুতরাং আল্লাহ আমাদের মাঝে সীমারেখা টেনে দিয়েছেন তা আমারা মেন চলব। ফায়জাভার এই পবিত্রতা, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি তার আগ্রহ ফায়জাভাকে রশিদভের কাছে এক মহৎ আসনে সমাসীন করছে। তার যাই হোক, ফায়জাভার বাঁচা প্রয়োজন।

রশিদভ বলল, আমার সাথে আর কেউ ছিল না।

-তাহলে দ্বিতীয় গুলী কে করেছে?

-দ্বিতীয় গুলীটাও আমি করেছি।

-এই তো বললে, তুমি একটা গুলী করেছো?

-আমার পিস্তল দিয়ে একটা গুলী করেছি কিন্তু দ্বিতীয় পিস্তল দিয়ে দ্বিতীয় গুলী...।

-অর্থাৎ তোমার হাতে দুটো পিস্তল ছিল।

-দ্বিতীয় পিস্তলটি কোথায় পেলে?

-তুঘরীল তুগানের বাড়ি থেকে চুরি করেছিলাম। আবার কাজ সেরে রেখে আসি।

জেনারেল বোরিস কিছু না বলে উঠে দাঁড়াল। তার চোখ-মুখ লাল টকটকে। সে পায়চারী করতে লাগল। এ সময় সে রশিদভের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, তুমি মিথ্যা বলছ রশিদভ, তোমার সাথে কে ছিল বল?

তুঘরীল তুঘানের তুগানের মুখটা ভয়ে ফ্যাকাসে। গোটা শরীরটা তার কাঁপছে। এই বুঝি রশিদভ বলে দেয় ফায়জাভার নাম, রশিদভের পিস্তল চুরির কথা তারও বিশ্বাস হয়নি।

জেনারেল বোরিসের প্রশ্নের জবাবে রশিদভ বলল, আমি বলছি আমার সাথে কেউ ছিল না।

ক্রোধে কাঁপছিল জেনারেল বোরিস। রশিদভের জবাব শোনার সাথে সাথে তা চোখ দুটি জ্বলে উঠল আগুনের ভাটার মত। ডান হাত তুলে প্রচন্ড এক ঘুষি দিল সে রশিদভের গালে।

আকস্মিক এই আঘাতে রশিদভ পড়তে পড়তে আবার দাঁড়িয়ে গেল।

ঘুষি মনে হয় লেগেছিল দাঁতের মাড়িতে। রশিদভের মুখ দিয়ে রক্ত আসতে দেখা গেল।

জেনারেল বোরিসকে শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এমন একটা ক্ষিপ্ত বাঘের মত মনে হচ্ছে। গতকাল থেকেই তার মেজাজ খারাপ। আহমদ মুসারা তার নাকের ডগার উপর দিয়ে চলে গেল একান্তই তাচ্ছিল্ল্য ভরে, এই ব্যর্থতার বেদনা যেন কিছুতেই ভুলতে পারছে না। হাতের কাছেই একটা শিকার পেয়ে যেন সে কালকের শোধটাও নিতে চাচ্ছে।

রশিদভের মুখের রক্ত ঠোঁট বেয়ে বুকের উপর গড়িয়ে পড়ছিল। সেদিকে চেয়ে ক্রুর হাসিতে ফেটে পড়ে বলল, বল, কে ছিল তোর সাথে, আহমদ মুসারা মিটিং কোথায় করল, তা না হলে একেবারে ভর্তা করে ফেলবো।

রশিদভ কোনই জবাব দিল না। যেন কিছুই হয়নি তার, এমনি ভাবেই দড়িয়ে রইল। বেপরোয়া তার মুখ ভংগি।

রশিদভের এই ভাবে নীরব থাকা আগুন ধরিয়ে দিল যেন জেনারেল বোরিসের দেহে। ডান পা তুলে প্রচন্ড এক লাথই মারল রশিদভের কোমরে। রশিদভ হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে। শক্ত মেঝের উপড় পড়ে তার কপালের একাংশ কেটে গেল। পড়ে যাওয়া দেহের উপর আরেকটা লাথি ছুঁড়ে মেরে জেনারেল বোরিস চিৎকার করে বলল, তুরিন, তুরিন, হারামজাদাকে ছাদের সাথে টাঙ্গাও। দেখি ব্যাটা কতক্ষণ মুখ বন্ধ করে থাকে।

তুঘরীল তুগান মুখ নিচু করে বসেছিল। রশিদভের দিকে তাকাবার সাহস পাচ্ছে না। সমস্ত শরীরে কি এক বেদনা তাকে দহন করছে, হৃদয়টা এফোড় ওফোঁড় হয়ে যাচ্ছে তার বেদনায়।

রশিদভকে ছাদের সাথে টাঙ্গানো হলো। তারপর জেনারেল বোরিস নিজ হাতে চাবুক তুলে নিল। নরম স্টিলের মত চামড়ার চাবুক অসীম হিংস্রতা নিয়ে এলোপাথাড়ী পড়তে লাগল রশিদভের উন্মুক্ত শরীরে। রশিদভের গোটা দেহটাই ফেটে রক্তাক্ত হয়ে গেল। ফোঁটায় ফোঁটায় তা পড়ে নীচের মেঝকে লাল করে তুলল। কিন্তু যাকে কথা বলাবার জন্য এই অমানুষিক অত্যাচার করা হচ্ছে, সে রশিদভ একেবারেই নিঃশব্দ, একটা 'আ' শব্দ তার মুখ থেকে বের হলো না।

তুঘরীল তুঘানের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার বেদনা এবার বিস্ময়ে পরিণত হলো। তার যেন বিশ্বাস হতে চাইছে না, এ রশিদভ তাদের সেই রশিদভ। এমন নির্যাতন তো হাতিও চিৎকার করতো। এ ধৈর্য্যের শক্তি রশিদভ পেল কোথায়?

টেবিলের চারদিকে আরও যারা বসে আছে, তা তো তারা দেখেনি। ক্রোধে, ক্ষোভে, পরিশ্রমে ক্লান্ত জেনারেল বোরিস একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ঘরের এক কোনে বসল। ২ মিনিট টাইম দিলাম। তোর সাথে কে ছিল, কারা আছে বল। তা না হলে একদম গুড়ো করে ছাড়ব।

রশিদভের চোখ বন্ধ ছিল। মুখ চোখ তার প্লাবিত ছিল রক্তে। নীচের দিকে ঝুলে থাকা একটা হাত তুলে অতি কষ্টে সে চোখটা পরিস্কার করল। হাতটা কাঁপছিল।

রক্তের বেড়াজাল ভেংগে চোখ খুলে তাকাল রশিদভ। তারপর ধীরে কন্ঠে বলল, মিথ্যা আশা করবেন না জেনারেল বোরিস, কিছু পাবেন না আমার কাছ থেকে। আমি আপনাদের কমরেড নই, আমি মুসলিম। অত্যাচার দিয়ে নিপিড়ন দিয়ে দেহকে দুর্বল করা যায়, শেষও করা যায়, কিন্তু বিশ্বাসের শক্তিকে স্পর্শ করা যায় না। আপনাদের কাছে আমি কিছুই আশা করি না, আমার ভরসা আল্লাহ...।

চুপ কর হারামজাদার বাচ্চা, আবার বক্তৃতা করা হচ্ছে। বলে জলন্তে এক অগ্নিপিণ্ডের মত লাফিয়ে উঠল জেনারেল বোরিস। পকেট থেকে রিভলবারটা বের করে নিয়ে রশিদভের মুখ লক্ষ করে ট্রিগার টিপল, এক, দুই, তিন। পর পর তিনটা গুলি গিয়ে আঘাত করল রশিদভের মুখে। সমগ্র মুখটা একটা রক্তের পিন্ডে পরিনত হল। প্রবল ভাবে ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল রশিদভের দেহ কয়েকবার। তারপর একবারে স্থির।

তুঘরীল তুগান সেদিকেই স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। এখন আর তার মনে কোন ভয় নাই। রশিদভ তার মনের ভয়ের পর্দাটা যেন কোথায় সরিয়ে দিয়েছে। এখন নিজ হৃদয়ের অন্তঃপুর দিয়ে সুদূর অতিতকেও যেন সে দেখতে পাচ্ছে। সাহসী, সংগ্রামী, চির স্বাধীন, পুর্ব পুরুষের রক্ত যেন তার  শিরায় শির শির করে জেগে উঠল। রশিদভের দেহটা যখন কেঁপে স্থির হয়ে গেল, তখন তুঘরীল তুগান চোখ বন্ধ করে মুসলমানের মৃত্যু সংবাদের যা পাঠ করতে হয় সেই ভুলে যাওয়া দোয়াই স্মরন করার ব্যর্থ চেষ্টা করল। জেনারেল বোরিস পিস্তলটা পকেটে ফেলে বলল, তুরিন এই বিশ্বাসঘাতকের কি শাস্তি! আর সন্দেহজনক যাদের ধরেছ, কাউকে ছেড়ো না। হয় তারা মুখ খুলবে, নয়তো তাদের রশিদভের ভাগ্যই বরন করতে হবে।

তুঘরীল তুগানের দিকে চেয়ে জেনারেল বোরিস বলল, সাইমুমের খবর তুমি উপরে জানিয়েছ এবং গত রাতে তুমি আমাদের সাথে ছিলে এই কারনেই তুমি রক্ষা পাচ্ছ কিন্তু পিস্তল রহস্যের ব্যাপারটা তোমাকে সমাধান করতে হবে।

একটু থামল জেনারেল বোরিস। তারপর রুমাল বের করে মুখ মুছতে মুছতে তুঘরীল তুগানকে লক্ষ করেই বলল, তোমার পার্টির লোকজনদের নিয়ে এ্যাসেম্বলী হলে যাও। আমি আসছি।

কথা শেষ করে জেনারেল বোরিস গট গট করে বেরিয়ে গেল।

দু হাতে মুখ ডেকে কাঁদছিল ফায়জাভা। নিঃশব্দ কান্না।

রশিদভের কাহিনী বলছিল তুঘরীল তুগান। তার চোখের নীচে ঘুকিয়ে যাওয়া অশ্রুর দাগ। সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে কথা বলছিল সে। তার শুন্য দৃষ্টি জানালা দিয়ে বাহিরের দিকে নিবদ্ধ। বলছিল সে, নিজের কথা স্বীকার করল কিন্তু বলল না তার সাথে কেউ ছিল।

চুপ করল তুঘরীল তুগান। চোখ বন্ধ করে কিছু ভাবল। তার পর চোখ খুলে সোজা হয়ে বসল। একটু ঝুঁকে পড়ে ডাকল, মা ফায়জাভা!

ফায়জাভা মুখ তুলল। অশ্রু ধোয়া তার মুখ।

তুঘরীল তুগান বলল, তাদের গোয়েন্দা কর্মীর দেহ থেকে দ্বিতীয় যে গুলী পাওয়া গেছে, সেটা আমার পিস্তলের সে ব্যাপারে তারা নিশ্চিত। সে গুলী ছুড়ল তা তারা বের করবেই। আমাকে যে তারা ছেড়েছে এটা তাদের সাময়িক কৌশল।

একটু থামল তুঘরীল তুগান, একটু ঢোক গিলল। আর একটু নড়ে-চড়ে বসে বলল, মা ফায়জাভা, তোকে নিয়ে আজ রাতেই কোথাও চলে যেতে চাই।

ফায়জাভা চমকে উঠল। মুখ তুলে বলল, কেন আব্বা?

রশিদভের মতই তোকে তারা নিয়ে যাবে, আমি তা সইতে পারবোনা। বলে দুহাতে মুখ ঢাকল তুঘরীল তুগান। শক্ত ও কঠোর প্রকৃতির তুঘরীল তুগান শিশুদের মত কেঁদে উঠল।

ফায়জাভা উঠে এল। পাশে দাঁড়িয়ে পিতার মাথায় বুলিয়ে বল, তুমি কিছু ভেবনা আব্বা, আমি কোন কিছুকেই ভয় করি না। 'চুপ কর', বলল তুঘরীল তুগান, 'আমি জীবিত থাকতে তোর গায়ে কেউই হাত তুলতে পারে না, আমি তা হতে দেব না। আজ রাতেই আমরা চলে যাব এখান থেকে।'

পিতার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে ফায়জাভা বলল, কোথায় যাব আব্বা?

-জানি না। কেন এত বড় দেশে তোকে নিয়ে মাথা গুজবার এতটুকু জায়গা কোথাও পাবনা ?

এই কষ্টের মধ্যেও হাসি পেল ফায়জাভার। তার আব্বা অবুঝ হয়ে গেল নাকি? কম্যুনিস্ট দেশে সরকার সর্বনিয়ন্তা। তার সাথে বিরোধ করে কেউ এখানে বাঁচার অধিকার পায় না, নিরাপদ জায়গা তার আবার কোথায় মিলবে? আমরা কি দেশ ত্যাগ করতে পারব?

-প্রয়োজন হলে তাই করবো। আমাদের পুর্ব পরুষেরা এই কম্যুনিস্টদের অত্যাচারে, তাদের হাত থেকে নিজেদের ঈমান আকীদা রক্ষার জন্য লাখ লাখ সংখ্যায় দেশ ত্যাগ করেছে। আমরা তাদের পথ অনুসরন করব।

-কিন্তু সাইমুমেরা তো দেশের ভেতরে থেকেই দেশকে, জাতিকে মুক্ত করার জন্য কাজ করছে। বলল ফায়জাভা।

-আমার যেটুকু বোঝার বাকী ছিল রশিদভ তা বুঝিয়ে দিয়ে গেছে। ওদের পাশে দাঁড়াতে পারলে গৌরব বোধ করব।

ফায়জাভা কিছু বলতে যাচ্ছিল। এমন সময় দারোয়ান এসে দরজায় দাঁড়াল। তার সাথে তিনজন পুলশি অফিসার।

পুলিশ অফিসারদের উপর নজর পড়তেই তুঘরীল তুগান উঠে দাঁড়াল। গোটা দেহে তার রক্তের এক উষ্ণ স্রোত বয়ে গেল।

একজন পুলশি অফিসার দরজা পেরিয়ে এগিয়ে এল। বলল, ফায়জাভাকে জেনারেল বোরিসের অফিসে নিয়ে যেতে এসেছি।

চমকে উঠল না তুঘরীল তুগান। শুধু ডান হাতটা তার একবার মুষ্টিবদ্ধ হলো। এগিয়ে এল সে পুলিশ অফিসাররে দিকে। মুখ তার ভাবলশেহীন। কন্তি চোখের দৃষ্টিতে এক তীক্ষ্মতা।

শেষ মুহূর্তে এগিয়ে আসা পুলিশ অফিসার বোধ হয় কিছু সন্দেহ করেছিল। তার হাতটা কোমরের বেল্টে ঝুলানো রিভলবারের বাঁটে উঠে এসেছিল। কিন্তু যতটা সে ভাবেনি, তার চেয়েও দ্রুত ঘটনাটা ঘটে গেল। তুঘরীল তুগান প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে পুলিশ অফিসারটির খাপ থেকে রিভলবার ছিনিয়ে নিল এবং সংগে সংগেই গুলী বর্ষিত হলো তার হাতের রিভলবার থেকে। ঢলে পড়ল পুলিশ অফিসারটির রক্তাক্ত দেহ।

চোখের পলকে ঘটে গেল ঘটনাটা। মুহূর্তের জন্য একটা কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা ছড়িয়ে পড়ল বাকি দু'জন পুলিশ অফিসারের মধ্যে। কিন্তু পরক্ষণেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল তুঘরীল তুগানের উপর। তুঘরীল তুগান তার রিভলবার উঁচু করে তুলে ধরছিল। তারা ঝাঁপিয়ে পড়ার সাথে রিভলবারের একটা ফায়ার হলো। গুলীটা ব্যর্থ হলো না। একজন পুলিশ অফিসারের বুকের বাম পাশে ঢুকে গেল গুলীটা। এক পাশে ঢলে পড়ে গেল তার দেহ।

তুঘরীল তুগান পড়ে গিয়েছিল। হাতের রিভলবার ছিটকে পড়েছিল হাত থেকে। তৃতীয় পুলিশ অফিসারটি এসে চেপেছিল তার উপর। পুলিশ অফিসারটির

দু'হাত চেপে বসেছিল তুঘরীল তুগানের গলায়। তুঘরীল তুগান তার ডান হাত পাকিয়ে ঘুষি লাগাল তার কানের নীচে ঠিক নরম জায়গাটার লক্ষ্যে। কিন্তু মাথাটা চকিতে ঘুরিয়ে নেয়ায় ঘুষিটা গিয়ে লাগল ঘাড়ের নীচের জায়গাটায়। এই সময় পুলিশ অফিসারের হাতটা কিছুটা আলগা হয়ে গিয়েছিল। তুঘরীল তুগান এক ধাক্কায় তাকে ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়িয়েই আবার ঝাঁপ দিল পুলিশ অফিসারটির উপর। কিন্তু পুলিশ অফিসারটি ততক্ষণে তার রিভলবারটি তুলে নিয়েছিল। সে রিভলবারের গুলী তুঘরীল তুগানের বুকটি একদম এফোড় ওফোড় করে দিল।

ফায়জাভা পিতার ছিটকে পড়া রিভলবারটা কুড়িয়ে নিয়েছিল। পিতৃহন্তা পুলিশ অফিসারটির রিভলবার অন্য দিকে ঘুরবার আগেই ফায়জাভার রিভলবার অগ্নি বৃষ্টি করল পর পর দু'বার। পুলিশ অফিসারটির মাথা একেবারে গুড়ো হয়ে গেল।

গুলীর শব্দ শুনে বাইরে থেকে দু'জন পুলিশ অফিসার ছুটে আসছিল। উদ্যত রিভলবার হাতে তারা এসে দাঁড়াল সেই দরজায়।

ফায়জাভা গুলী করে রিভলবারটা ফেলে দিয়েই ঝুঁকে পড়েছিল পিতার মুখের উপর। পাগলের মত ডাকছিল সে তার আব্বাকে।

উদ্যত রিভলবার হাতে দাঁড়ানো দু'জন পুলিশ অফিসারের একজন বলল, এবার আসুন মিস ফায়জাভা, অনেক করেছেন।

চকিতে চোখ তুলে তাকিয়েই ফায়জাভা ছুটল রিভলবারের দিকে।

-রিভলবারে হাত দিবেন না ফায়জাভা, হাত একেবারে গুড়ো করে দেব- চিৎকার করে উঠল একজন পুলিশ অফিসার।

ফায়জাভা দাঁড়িয়ে গেল।

সেই পুলিশ অফিসার আবার চিৎকার করে উঠল, বেরিয়ে আসুন জেনারেল বোরিস অপেক্ষা করছেন।

ফায়জাভা দাঁড়িয়েই থাকল।

পুলিশ আবার গর্জে উঠল, শেষ বারের মত বলছি, আসুন আমাদের সাথে। তা না হলে বলপ্রয়োগ করতে হবে আমাদের।

এইবার ফায়জাভা বেরিয়ে এলো।

আগে আগে সে চলল, পিছনে দু'জন পুলিশ অফিসার।

বাইরে এসে গাড়ির দিকে তিনজন এগুচ্ছিল। আগে ফায়জাভা পেছনে উদ্যত রিভলবার হাতে দু'জন পুলিশ অফিসার।

হঠাৎ এ সময় দু'টো গুলীর শব্দ হলো। আর্তনাদ করে দু'জন পুলিশ অফিসার লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। দু'জনের মাথাই গুলীতে এফোড় ওফোড় হয়ে গেছে।

কয়েক মুহূর্ত বিস্ময়ের ঘোর নিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল ফায়জাভা। এই সময় দু'জন যুবক এসে দাঁড়াল তার পাশে। দু'জনেই ফায়জাভার পরিচিত। একজন কলখজের গণনিরাপত্তা অফিসার আহমদভ আরেকজন স্টোর সিকুরিটি অফিসার আলী খান।

তারা এসে সালাম দিল। তারপর নরম এবং দ্রুত কণ্ঠে বলল, মিস ফায়জাভা গাড়িতে উঠুন।

তাদের সালাম দেয়া শুনে ফায়জাভা যতটা আশান্বিত হয়েছিল, তাদের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে সে আশাটা তিরোহিত হতে চাইল। ফায়জাভা জিজ্ঞেস করল, আমাকে কোথায় যেতে হবে?

তারা মুখ না তুলে চোখ নীচু রেখেই জবাব দিল, আমরা সাইমুমের কর্মী, আমরা খোঁজ নিতে এসেছিলাম আপনাদের।

ফায়জাভা আর কোন কথা না বলে পুলিশের ঐ গাড়িতে এসে বসল। ড্রাইভিং সহ সামনের দুই সিটে গিয়ে বসল ঐ দুই যুবক।

গাড়ি চলতে শুরু করেছে।

দু'জন যুবকের একজন বলল, দেরী করেছি আমরা আসতে মিস ফায়জাভা। ওরা আসবে আমরা জানতাম কিন্তু এত তাড়াতাড়ি আসবে জানতাম না।

ফায়জাভা বলল, আপনাদের এই পরিচয় জেনে খুশী হয়েছি।

-আপনাদের পরিচয় জেনেও আমরা খুশী হয়েছি। দুঃখিত যে, আমরা ওদের জন্য কিছুই করতে পারলাম না।

তারপর সবাই চুপ। লাইট নিভিয়ে অন্ধকার পথে কলখজের বাইরের, এবড়ো থেবড়ো রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলছিল গাড়ি। প্রায় তিন ঘণ্টা পরে কলখজের উত্তর প্রান্তে পশ্চিমের এক উপত্যকায় এসে গাড়ি দাঁড়াল।

গাড়ি দাঁড়াতেই দু'দিক থেকে দু'টি ছায়ামুর্তি গাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নেমে আহমদভ সামনের জনকে উদ্দেশ্য করে বলল, কি খবর আসলাম সবাই এসেছে?

-এসেছেন।

-শহীদরা?

-আনা হয়েছে। এখন জনাব ইউসুফ শামিল এলেই দাফন হবে।

ইউসুফ শামিল কলখজ আদালতের তিন বিচারপতিদের একজন। অবশিষ্ট দু'জন বিচারপতি রুশ। একমাত্র তিনিই তুর্কি। ইউসুফ শামিল সাইমুমের সারাকায়া ইউনিটের প্রধান।

গাড়িতে আবার উঠে বসল আহমদভ। গাড়ি আবার চলতে শুরু করল। মিনিট পনের চলার পর গাড়ি উপত্যকার পশ্চিম প্রান্তে এসে দাঁড়াল। সেখানে অনেকগুলো লোক, কেউ বসে কেউ দাঁড়িয়ে। এক জায়গায় গোল হয়ে কিছু লোক দাঁড়িয়ে। পাশাপাশি দু'টো লাশ সেখানে রাখা। একটি জামায়াতিনের, অন্যটি রশিদভের। জামায়াতিনের লাশ ছিল মর্গে, আর রশিদভের লাশ বাজারে টাঙিয়ে রাখা হয়েছিল। কিন্তু টাঙানো বেশীক্ষণ থাকেনি, রাতের অন্ধকার নামতেই স্থানীয় জনসাধারণের সাথে মিলে সাইমুম কর্মীরা রশিদভের লাশ নিয়ে এসেছে। আর জামায়াতিনের লাশ মর্গ থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। শহীদের লাশ অবমাননার শিকার হবে, কবর পাবে না, সাইমুম এটা বরদাশত করতে পারেনি। তাই এই দাফনের ব্যবস্থা।

ইউসুফ শামিল এসে পৌছলেন অল্পক্ষনের মধ্যেই। এসেই তিনি কথা বললেন ফায়জাভার সাথে। ফায়জাভাকে সান্তনা দিয়ে স্বস্নেহে বললেন, তোমার আব্বা, তুমি, রশিদভ ও জামায়াতিনের জন্য আমরা গৌরব বোধ করছি। দুঃখ করো না, তোমার কোন চিন্তা নেই। সাইমুম তোমার নিজ পরিবার। এখানে পিতার স্নেহ, মায়ের ভালবাসা, ভাইয়ের আদর সবই পাবে।

কবর তৈরীই ছিল, ইউসুফ শামিল আসার সংগে সংগে জানাজা হয়ে গেল। তারপর দুই শহীদকে দাফন করা হলো। যাতে কবরের চিহ্ন সবার নজরে না পড়ে এ জন্য পাথর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা হলো সবটা জায়গা জুড়ে।

দাফন শেষে মুনাজাত শেষ করার পর ইউসুফ শামিল বলল, আমাদের পশ্চিম উজবেকিস্তানের এরাই প্রথম শহীদ। এদের দিয়েই উদ্বোধন হলো এখানকার শহীদী ঈদগাহের। এই শহীদী ঈদগাহ আমাদের জীবনের প্রতীক, জয়েরও প্রতীক। অনেক দুরে সুবহে সাদেকের যে আলোক রেখা ফুটে উঠেছে, তা মুক্তির সূর্যোদয়ে রূপান্তরিত হবে এ শহীদের রক্তভেজা পথ বেয়েই।

সবাই নীরব, কারো মুখে কোন কথা নেই। উপত্যকা পথে এগিয়ে আসা গাড়ির শব্দে নীরবতা ভংগ হলো। সবাই ওদিকে মুখ ফিরাল।

গাড়ি এসে থামল তাদের সামনে, গাড়িতে অনেকগুলো নতুন শহীদের লাশ। গাড়ি থেকে নামল আবদুল্লা জমিরভ, বলল সে, সন্দেহ করে আজ যাদের ওরা গ্রেফতার করেছিল, অকথ্য নির্যাতনের পর সন্ধ্যায় সবাইকে ওরা হত্যা করেছে। বাজারেই ফেলে রেখে গিয়েছিল ওদের সবাইকে, সকলের দেখার জন্য। আরো লাশ আসছে অন্য গাড়িতে।

কারো মুখে কোন কথা যোগাল না, নীরব সবাই, মাথা নীচু। রাতের অন্ধকার না থাকলে দেখা যেত কারো চোখই শুকনো নেই।

নীরবতা ভাঙল ইউসুফ শামিল, বলল, এমন একটা দিন আসবে জানতাম কিন্তু এত তাড়াতাড়ি আসবে তা ভাবিনি। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা দরকার আমাদের মনে হচ্ছে মুক্তির সোনালী দিগন্ত আর খুব বেশী দুরে নয়।

এক পাশে দাড়িয়েছিল ফায়জাভা। রশিদভের দেহ কবরস্থ হওয়ার পর তার চোখের পানি শুকিয়ে গেছে। সেখানে এসে দাড়িয়েছে কঠোর শপথের এক দীপ্তি।

ইউসুফ শামিল তার দিকে এগিয়ে এল। বলল, এখন তোমাকে আমার বাসায় পাঠিয়ে দেই। কাল তুমি যাবে আমাদের মহিলা হেডকোয়াটার লেনিন স্মৃতি পার্কে। অনেক সংগ্রামী বোন তুমি সেখানে পাবে।

নীরবে মাথা নেড়ে সায় দিল ফায়জাভা।

# ৪

তাসখন্দের ১১ তলা বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবন। ভবনের ১০ম তলার বিশাল শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ। উজবেক ফার্স্ট সেক্রেটারীর অফিস এটা, তার বিশাল চেয়ারটি শুন্য, তার শূন্য চেয়ারে বসে আছে জেনারেল বোরিস। সারাকায়ার ঘটনার পর ফিরে এসেই জেনারেল বোরিস উজবেকিস্থান সহ এ অঞ্চলের সবগুলো মুসলিম রিপাবলিকের সরকার এবং কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বরখাস্ত করেছে। কোন মুসলিম নেতৃত্বকেই সে আর বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস করে না।

জেনারেল বোরিসের মুখ সেই আগের মতই টকটকে লাল। সে কথা বলছিল সদ্য মস্কো থেকে আসা ঐ এলাকার জন্য 'ফ্র' নিযুক্ত গভর্নর আদ্রে শিপিলভের সাথে। বলছিল সে, প্রতিটি মুসলমান একটা করে শয়তানের বাচ্চা। সুযোগ পেলেই ওরা তোমাকে কাল সাপের মত ছোবল দেবে। সারাকায়ায় কম্যুনিষ্ট পার্টি, কমসমল কিছুই আমাদের হাতে ছিল না। কম্যুনিষ্ট পার্টি ও কমসমলের নেতারাই আমাদের নিরাপত্তা এজেন্টদের হত্যা করে সাইমুমের পথ নিরাপদ করে দিয়েছে। ছদ্মবেশী শয়তান তুঘরীল তুগানেরও মুখোশ শেষ পর্যন্ত খসে পড়েছে। অবাক ব্যাপার, সাধারণ মুসলমানরাও রাতারাতি যেন একদম পাল্টে গেছে। সাইমুমের কোন খবর ওদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না। রশিদভের লাশ তারা সরিয়ে নিয়ে মুসলিম কায়দায় দুরের এক উপত্যকায় দাফন করেছে। জেনারেশনের পর জেনারেশন কম্যুনিষ্ট শাসনে থাকলেও ওদের মুসলমানিত্ব আমরা খতম করতে পারিনি, মুসলমানিত্ব খতম না করে আমরা ওদের ঈমান খতম করতে পারবো না। বলশেভিকদের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা 'ফ্র'রা কাজ করব। ওদেরকে আমাদের মনে করে যে শাসনের সুযোগ দিয়েছিলাম তা আর নয়।

-কিন্তু মুসলিম অফিসার ও কর্মচারীদের গণ ট্রান্সফারের আমাদের সিদ্ধান্ত, বলল আদ্রে শিপিলভ, মুসলিম জনগণের মধ্যে কি বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে না?

-করবে, বলল জেনারেল বোরিস, করবে জেনেও এটা করা হয়েছে। কারণ এর কোন বিকল্প নেই। জামিলভের মত বিশ্বস্ত অফিসার, তুঘরীল তুগানের মত বহু বছরের নির্ভরযোগ্য সাথী, রশিদভ ও জামায়াতিনের মত তুখোড় এবং নিবেদিত প্রাণ কর্মী যখন বিগড়ে গেছে, বিগড়ে গিয়ে বিদ্রোহীদের দলে যোগ দিয়েছে এবং তাদের বন্দুক নির্মম হয়ে উঠেছে আমাদের বিরুদ্ধে, তখন মুসলমানদের আর কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না। কারও উপরেই সামান্যতম নির্ভরতাও রাখা যায় না। এ অবস্থায় মুসলিম অঞ্চল থেকে তাদের সরিয়ে দেয়াই তাদের জন্য সবচেয়ে লঘু দন্ড। এই পদক্ষেপই আপাতত 'ফ্র' নিয়েছে। প্রতিক্রিয়া প্রকাশের পথ না পেলেই তা অবশেষে থেমে যাবে। আর অফিসার কর্মচারীদের অসন্তোষ? ওর পরোয়া আমরা করি না। মস্কোসহ রুশ অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় এমনভাবে ওদের ছড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে যে ওরা সেই পরিবেশে মাথা তোলার কোন সুযোগই পাবে না।

এই সময় জেনারেল বোরিসের ইন্টারকম কথা বলে উঠল। পি.এ জানাল ব্রিগেডিয়ার পুশকিন সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করছেন।

জেনারেল বোরিস ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে জবাব দিল, ৫ মিনিট পর পাঠাও। পি.এ'র সাথে কথা শেষ করে সে ইন্টারকমে কথা বলল পার্সোনাল সেক্রেটারী ভিক্টর কমাকভের সাথে। বলল, ভিক্টর এখনি নির্বাচনের উপর ফাইলটা নিয়ে এস।

নির্বাচন সংক্রান্ত ফাইলে চোখ বুলাচ্ছিল জেনারেল বোরিস। স্প্রিং-এর পার্টিশন ডোর ঠেলে প্রবেশ করল ব্রিগেডিয়ার পুশকিন।

ব্রিগেডিয়ার পুশকিন কম্যুনিষ্ট সেনাবাহিনীর সাউদার্ণ কমান্ডের গণসংযোগ বিভাগের প্রধান ছিলেন। মুসলিম নিয়ন্ত্রিত প্রশাসন ভেংগে দেবার পর হোম এ্যাফেয়ার্সের দায়িত্ব তার উপর পড়েছে।

ব্রিগেডিয়ার পুশকিন বসলে ফাইলে মুখ রেখেই জেনারেল বোরিস জিজ্ঞেস করল, কতদুর এগুলো পুশকিন?

নির্বাচনী জোনের পুনর্গঠন শেষ হয়েছে। নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব বন্টনও শেষ করেছি। যে কোন সময় নির্বাচন....

কথা শেষ করতে না দিয়েই জেনারেল বোরিস অনেকটা বিরক্তির সাথেই বলে উঠল, আসল কথায় আসছ না কেন? মনোনয়নের কতদুর?

একটু ঢোক গিলেই ব্রিগেডিয়ার পুশকিন বলল, আমরা অনেকটা এগিয়েছি। উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, কাজাখস্তান, কিরঘিজিস্তান- এই পাঁচটি রাজ্যের জন্য ১০০টি সুপ্রিম সোভিয়েতের সিট রয়েছে। এ ১০০টি সিটের জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকায় বসবাসকারী ১০০ জন রুশীয়কে পাওয়া গেছে। কিন্তু রাজ্য কংগ্রেসের ৫০০টি সিটের জন্য দেড়শ'র বেশী রুশীয়কে অনেক চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি। তার উপর সমস্যা দাঁড়িয়েছে রুশরা কেউ ভয়ে প্রার্থী হতে রাজী হচ্ছে না।

প্রায় কথা কেড়ে নিয়ে জেনারেল বোরিস বলল, ভয় রাখ তোমার। ওরা সব নির্বাচিত হয়ে ঘাড়টা বাড়িয়ে দিয়ে তুর্কীদের মধ্যে ঘুরে বেড়াবে নাকি যে ভয়ে ওদের কাঁপতে হবে।

একটু থেমে জেনারেল বোরিস আবার বলল, রাজ্য কংগ্রেসের বাকী সিটগুলোর জন্য এমন সব মুসলমান খুঁজে বের কর যারা আধুনিক শিক্ষিত এবং কোন প্রকার ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলে না। আগামী ১৫ দিনের মধ্যেই তোমাকে নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে। মুসলিম রিপাবলিকগুলোর সরকার ও কম্যুনিষ্ট পার্টি ভেঙে দেয়ায় আন্তর্জাতিকভাবে নানা সন্দেহ করার কারণ সৃষ্টি হয়েছে। জাতিগত নিপীড়নের অভিযোগ ইতিমধ্যেই অনেকে তুলেছে। সুতরাং তাড়াতাড়ি একটা নির্বাচন করে সবাইকে বুঝাতে হবে নিছক একটা অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসনিক পদক্ষেপ হিসেবেই ঐ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

কথা শেষ করে চেয়ারে পা এলিয়ে চোখ বুজল জেনারেল বোরিস। এর অর্থ কথা তার শেষ।

কোন কথা না বলে ফাইলটা হাতে তুলে নিয়ে উঠে দাড়াল ব্রিগেডিয়ার পুশকিন।

তখন সন্ধ্যা।

৫ জন সৈনিক পরিবেষ্টিত নির্বাচনী অফিসার বেরিয়ে গেল আহমদ নুরভের বাড়ি থেকে। রুস নির্বাচনী অফিসার পেছন ফিরে তাকালে দেখতে পেত এক রাশ কালি যেন ঢেলে দেয়া হয়েছে আহমদ নুরভের মুখে।

নির্বাচনী অফিসার বেরিয়ে গেলে আহমদ নুরভ অন্ধকার মুখ নিয়ে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করল। বাড়ির হলরুমে তখন সন্ধ্যা নাচ চলছে। স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, বন্ধু-বান্ধব সবাই ওখানে জুটেছে। প্রতিদিনই বিনোদনের এ আসর বসে। হলের মাঝখানে গোল টেবিলে সুদৃশ্য পানাধার এবং পানপাত্র। রুশীয় মদ ভদকার কড়া আমেজে নাচের উচ্ছ্বলতা পাখির মত যেন পাখা মেলে।

আষাড়ের আকাশের মত অন্ধকার মুখ নিয়ে আহমদ নুরভ গিয়ে নাচ ঘরের একটা সোফায় ধপ করে বসে পড়ল। তার উপর প্রথমে চোখ পড়ল সাদেকার। সাদেকা আহমদ নুরভের বড় মেয়ে। বয়স বাইশ। তাসখন্দ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য পাশ করে বেরিয়েছে সে। সে এক বন্ধুর সাথে নাচছিল। নাচ ছেড়ে দিয়ে সে পিতার কাছে এসে বসল।

-কি হয়েছে আব্বা, অসুস্থ তুমি? বলল উৎকণ্ঠিত সাদেকা।

-না মা। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল আহমদ নুরভ।

-না আব্বা, আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি কেমন যেন মুষড়ে পড়েছ, কি হয়েছে বল। ডাক্তার ডাকব?

-না মা, আমি অসুস্থ নই।

-তাহলে?

-মন খারাপ লাগছে।

-কেন কি হয়েছে?

এই সময় আহমদ নুরভের স্ত্রী এসেও তাদের পাশে বসল। তার চোখেও প্রশ্ন।

সাদেকা বলল, আব্বা চল ড্রয়িংরুমে। বলে সাদেকা তার আব্বাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে ড্রয়িং রুমে চলল। পিছনে পিছনে আহমদ নুরভের স্ত্রীও চলল।

ড্রয়িং রুমে আহমদ নুরভের পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে সাদেকার হাতে তুলে দিল কিছু না বলে।

সাদেকা কাগজটিতে দ্রুত চোখ বুলাল। বলল, একি আব্বা, এ যে রাজ্য কংগ্রেজের জন্য তোমার মনোনয়ন পত্র। তুমি কি ভোটে দাঁড়াচ্ছ? শাদেকার শেষ বাক্যটি বিস্ময়সূচক এক চিৎকারের মত শোনাল।

আহমদ নুরভ বলল আমি দাঁড়াচ্ছি না, আমাকে দাঁড় করিয়ে দেয়া হচ্ছে।

-জোর করে?

-জোর করবে কেন আদেশ দিচ্ছে। এ আদেশ অমান্য করলে 'বিদ্রোহী' হিসেবে অভিযুক্ত হতে হবে।

-দাঁড়ানো, না দাঁড়ানোর মত নাগরিক স্বাধীনতাটুকুও কি নেই?

-হাসালে মা। সব বুঝেও স্বাধীনতার নাম করছ?

-তাহলে সাইমুম সব সত্য কথাই বলে।

-আমি পঁচে গেছি মা, ওদের মত সত্য বলার সৎ সাহসও আমার নেই। মনে হয় এ দিকটি বিবেচনা করেই 'ফ্র'-এর কম্যুনিস্ট সরকার আমার উপর তাদের আস্থা স্থাপন করেছে।

-কিন্তু আব্বু, 'বিদ্রোহী' হওয়ার অভিযোগ থেকে বাঁচতে গিয়ে তো তোমাকে জাতির বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করতে হবে। কম্যুনিস্ট সরকার মুসলিম প্রভাবিত প্রশাসন ও পার্টি ভেঙ্গে দিয়ে এই নির্বাচন নামের প্রহসনের মাধ্যমে এ অঞ্চলের রুশ অধিবাসী এবং মুসলিম নামের লোকদের নিয়ে একটা বশংবদ পার্টি ও প্রশাসন গড়তে চায়। এ কাজে যে মুসলমান তাদের সহযোগিতা করবে তারা জাতি-বিদ্রোহী এবং দালাল হিশেবেই চিহ্নিত হবে।

-আমার তো সেটাই উদ্বেগের বিষয় মা। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপতে চাপতে বলল আহমদ নুরভ।

আহমদ নুরভ একজন সরকারী সুবিধাভোগী পার্টি কর্মী এবং গোয়েন্দা ও ইনফরমার। পূর্ব উজবেকিস্তানে এক বিরাট চরণ ক্ষেত্রের মালিক সে।

সবাই নীরব। এবারও প্রথমে কথা বলল সাদেকাই। বলল সে, চল আব্বা, তোমাকে মসজিদের বাবাখান হুজুরের কাছে নিয়ে যাই। এই অবস্থায় আমি মনে করি তিনিই উপযুক্ত পরামর্শ দিতে পারেন।

আহমদ নুরভ বলল, কোন দিন ওপথে পা বাড়াইনি, কোন দিন তার কাছে যাইনি, আজ কোন মুখে তার কাছে যাব সাদেকা?

-না আব্বা, তার মত লোক হয় না। দুনিয়ার কোন মানুষ সম্পর্কে তার কোন কু ধারণা নেই।

এবার মুখ তুলল আহমদ নুরভের স্ত্রীও। বলল সে, সাদেকা ঠিক বলেছে, আমি অনেকবার গেছি তার দরবারে।

-গেছ তুমি, কেন? বিস্ময়ে প্রশ্ন তুলল আহমদ নুরভ।

-সাদেকার নাম সুলতানা সাদেকা এবং ছেলে পেটভের নাম 'আহমদ ওমর' তার কাছ থেকেই নেয়া। ছেলে মেয়ের কানে তিনিই এসে কালেমা পড়ে গেছেন এবং আকিকা তার মাধ্যমেই দিয়েছি।

-এত সব তো আমি জানি না, বলনি তো কোন দিন আমকে?

-বলিনি ভয়ে।

আহমদ নুরভ কোন কথা বলল না। তার শূন্য দৃষ্টি চেয়ে থাকল ড্রয়িং রুমের জানালা দিয়ে বাইরে মাঠের দিকে।

নীরবতা ভেঙ্গে সাদেকা বলল, চল আব্বা বাবাখান হুজুরের কাছে।

আহমদ নুরভ নীরভেই উঠে দাঁড়াল, বলল, চল।

বিবিখান গ্রামটি পাশ দিয়ে খরস্রোতা একটা ঝরনা। সে ঝরনার পাশে একটা উঁচু টিলা। টিলার উপর সবুজ বাগান বেষ্টিত একটা ভাঙ্গা মসজিদ। মসজিদের পাশেই ভাঙ্গা একটা মাজার। বলা হয় মাজারটি বিবিখানের। কাহিনী প্রচলিত আছে, বিবিখান আরব দেশীয় একজন পুণ্যবতী মহিলা। বাগদাদের পতনকালে হালুকার একজন সেনাপতি বন্দিনী বিবিখানকে বিয়ে করে মধ্য এশিয়ার এখানে নিয়ে আসেন। শীঘ্রই বিবিখানের চরিত্র-প্রভায় মধ্য এশিয়ার এ অঞ্চলে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ে। তিনি বিবিখানে একটি মাদ্রাসা গড়ে সারাজীবন এলাকার মহিলাদের তালিম তরবিয়াতে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। তিনি ছিলেন সবার মা। মানুষ অপরিসীম ভয় ও ভক্তি করত তাকে। তার মৃত্যুর পর মসজিদ-মাদ্রাসা গৃহের পাশেই তাকে কবরস্থ করা হয়। ভক্তদের দোয়া ও দর্শনের একটা কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় সেটা। গড়ে ওঠে প্রভাবশালী এক মাজার। মধ্য

এশিয়ার কোন শাসকই একবার বিবিখানে না এসে পারত না। কিন্তু কম্যুনিস্টরা দেশ দখলের পর পরিস্থিতি পাল্টে যায়। তাদের হাজার হাজার মসজিদ মাদ্রাসা ধ্বংস তালিকার মধ্যে বিবিখানও ছিল। কিন্তু তারা জনমত দেখে বিবিখানে হাত দিতে পারেনি। তাই বিবিখান এখনও টিকে আছে কিন্তু ভাল অবস্থায় নয়। চারদিকে প্রাচীর ভেঙ্গে গেছে, মাজার ও মসজিদের দেয়াল ফেটে গেছে। সেখান থেকে ইট খসে পড়ছে কিন্তু কম্যুনিস্ট সরকার থেকে মেরামতের কোন অনুমতি নেই। তারা চায় এ মসজিদ-মাজার আপনাতেই ধ্বংস হয়ে যাক। কিন্তু এ অবস্থার মধ্যেও ভক্তরা রাতের আঁধারে মসজিদ-মাজারের ভাঙ্গা স্থানে দু'একটি করে ইট সিমেন্ট লাগায়। এভাবেই ইবাদতের এই কেন্দ্রটি আজও বেঁচে আছে।

বৃদ্ধ সৈয়দ জিয়াউদ্দিন বাবাখান মসজিদ মাজারের ইমাম ও মুতাওয়াল্লি। কম্যুনিস্ট গোয়েন্দাদের কড়া নজরে ছিলেন তিনি। তিনি তার সবুজ টিলাটির বাইরে আর কোথাও যেতেন না। ইদানিং তিনি একটু করে বাইরে বের হন। সাইমুমের প্রভাব-প্রতিপত্তি এ অঞ্চলে বেড়ে যাওয়ায় মসজিদটাও এখন সরগরম হয়ে উঠেছে। যারা এতদিন নামাজের জন্য আসতে ভয় পেত তারা এখন মসজিদে আসতে শুরু করেছে। সৈয়দ জিয়াউদ্দিন বাবাখানের সাথে আহমদ মুসার আকস্মিক সাক্ষাৎ এ অঞ্চলে জাগরণের এক তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টি করেছে। সাক্ষাতের ঘটনাটা এই রকম।

সময়টা হবে মাস দুই আগের।

অনেক বছর পর অনেক অনুরুদ্ধ হয়ে কোকন্দের মীর-ই আরব মাদ্রাসায় বার্ষিক অনুষ্ঠানে তিনি গিয়েছিলেন। দু'দিন সেখানে অবস্থানের পর তিনি সেদিন বিবিখানে ফিরছিলেন। বেশ একটু রাত হয়েছে। মীর-ই আরব মাদ্রাসার ছাত্র তাঁর একমাত্র পুত্র সৈয়দ রফীউদ্দিনকে সাথে নিয়ে ফিরছিলেন তিনি। ঝরনার ধার বেয়ে সুন্দর রাস্তাটা ধরে আসছেন তারা। ঐ তো দূরে টিলার উপর সবুজ বাগান ঘেরা বিবিখানকে মনে হচ্ছে একটা জমাট অন্ধকার। হঠাৎ সেই অন্ধকারের বুক চিরে বেরিয়ে এল এক আজানের ধ্বনি। ইথারের কণায় ভর করে কেঁপে কেঁপে তা এসে প্রবেশ করল কানে।

চমকে উঠে জিয়াউদ্দিন বাবাখান হাত ঘড়ির দিকে তাকাল। দেখল, রাত ৮টা বাজে। বিবিখান মসজিদের এশার আযানের সময় এটা। ঠিক সময়েই আযান দেয়া হচ্ছে। কিন্তু এ আযান দিচ্ছে কে? আযান দেয়ার তো ওখানে, ঐ লোকালয়ে কেউ নেই! আর এত সুন্দর আযান। অপূর্ব ছন্দ, অপরূপ উচ্চারণ। প্রতিটি শব্দ যেন মর্মে পশে যাচ্ছে। এত মধুর হতে পারে আযান। এ কোন বেলাল এলো বিবিখানে।

দ্রুত পা চালান জিয়াউদ্দিন বাবাখান। ধীর লয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে আযানের ধ্বনি। এমন উচ্চকণ্ঠে আযান বিবিখানে আর কখনও হয়নি কম্যুনিস্ট শাসনামলে। উচ্চকণ্ঠে আযান নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেই কবে পণপ্রতিক্রিয়া আর পণ অশ্লীলতার অজুহাত তুলে। এ কোন দুঃসাহসী মানুষ লা-শরীকের উচ্চকণ্ঠের জয়গানে যুগ যুগান্তের সে নীরবতা ভাঙল? অজান্তেই জিয়াউদ্দিন বাবাখান এর চোখ দু'টি ভিজে উঠল আবেগের অশ্রুতে।

মসজিদ চত্বরে গিয়ে পৌঁছলেন জিয়াউদ্দিন বাবাখান। চত্বরে তখন আরো অনেক লোক জমেছে। বাবাখানকে দেখে তারা দু'পাশে সরে দাঁড়াল। সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন বাবাখান। আযান দিচ্ছে সৌম্য শান্ত এক যুবক। সফেদ মুখে সুন্দরভাবে বিন্যস্ত কালো দাড়ি। কোকড়া কালো চুল। নীল চোখ। বলিষ্ট দেহে সামরিক কায়দার পোশাক। কোমরে পিস্তল ঝুলছে। তাঁর দু'জন সাথী এক পাশে দাঁড়িয়ে। কি সুন্দর নুরানী চেহারা তাদের। উপস্থিত সবাই যেন গোগ্রাসে গিলছে। আযানের স্বর্গীয় সুমধুর সুর সবাইকে যেন সম্মোহিত করে তুলছে।

আযান শেষ হলো।

ঠোঁট নেড়ে আযান শেষের দোয়া পড়ল তারা।

আযান শেষে ঘুরে দাঁড়াল আযান দেয়া সেই স্বর্গীয় যুবক। সবার দিকে চোখ বুলিয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল সে জিয়াউদ্দিন বাবাখানের উপর।

ধীরে যুবকটি এসে বাবাখানের সামনে দাঁড়াল। সালাম দিয়ে মুসাফাহা করল। আপনিই কি সৈয়দ বাবাখান, আমাদের মুরুব্বি!

-জি হ্যাঁ। তুমি বাবা? জিজ্ঞেস করল বাবাখান।

-আমি আহমদ মুসা।

'আহমদ মুসা' -স্বগত স্বরে উচ্চারণ করল বাবাখান। তাঁর বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখ আহমদ মুসার উপর নিবদ্ধ। কী এক ভাব-বিহ্বলতা তার চোখে-মুখে!

সাইমুম ও আহমদ মুসা সম্পর্কে বাবাখান কিছু কিছু কথা জানতেন। কিন্তু এবার মীর-ই-আরব মাদ্রাসায় গিয়ে তার কাছে সব পরিস্কার হয়েছে। ফিলিস্তিনে এবং মিন্দানাওয়ে আহমদ মুসা যা করেছে, এখানে সে এবং সাইমুম যা করছে সব শুনেছে বাবাখান। সব শুনে বাবাখানের মনে হয়েছে, মহান ইমাম মেহেদী যেদিন আসবেন আসুন, কিন্তু আহমদ মুসা মধ্য এশিয়ায় কম্যুনিষ্ট কবলিত মুসলমানদের ইমাম মেহেদী।

স্বপ্নের সেই আহমদ মুসা তার সামনে! বাবাখানের বিস্ময় ধীরে ধীরে আনন্দে রূপান্তরিত হল। দু'ধাপ এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে। বলল, বাবা তুমি দীর্ঘজীবি হও। তুমি আমাদের চোখের মণি আশার আলো। যেমন করে তোমার আযানের ধ্বনি এই এলাকায় যুগ-যুগান্তের জমাট নীরবতার পাষাণ কারা ভেঙেছে, তেমনি করে তোমাদের হাতে কম্যুনিজমের জিন্দানখানা থেকে মধ্য এশিয়ার কোটি কোটি মুসলমানের মুক্তি হোক।

বৃদ্ধের দু'গন্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল অশ্রু। এলাকার সমবেত অনেক মানুষ দেখছিল এই দৃশ্য। তাদের চোখে বিস্ময়! এ কোন যুবক যার কাছে তাদের বাবাখান এমনভাবে গলে যেতে পারে!

আহমদ মুসা বৃদ্ধ বাবাখানকে শান্ত করে তার সাথে পাশে দাঁড়ানো হাসান তারিক ও কর্ণেল কুতাইবাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

নামাযের সময় হলো। বাবাখান আহমদ মুসাকে ইমামের আসনে ঠেলে দিলেন। আহমদ মুসা আপত্তি জানালে বাবাখান বলল, ইসলামে ইমামের যে বিধিগত ধারণা  তাতে ইমাম তুমিই।

নামায শেষে বাবাখান আহমদ মুসাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন উপস্থিত মুসল্লীদের সাথে। সেই সাথে তিনি বললেন সাইমুমের কথা এবং মুসলমানদের জীবনে আবার কিভাবে সুবহে সাদেকের উদয় হতে পারে সেই কথা। আনন্দে-বিস্ময়ে উপস্থিত সকলের সাথে আহমদ মুসা, হাসান তারিক এবং কর্ণেল কুতাইবা

মুসাফাহ করলেন। অপরিচয়ের গন্ডি কোথায় মিলিয়ে গেল। মনে হল, কত পরিচিত স্বজন তারা। সেই থেকে বাবাখান এলাকায় নতুন একটা প্রাণ চাঞ্চল্য এসেছে।

বাদ মাগরিব বাবাখান তার জায়নামাজে বসে তসবিহ পড়ছিলেন।

মসজিদে তখন কেউ নেই।

আহমদ নূরভ, তাঁর স্ত্রী রফিকা এবং মেয়ে সাদেকা এসে প্রবেশ করল মসজিদে। মসজিদে ঢোকার আগে আহমদ নূরভ অজু সেরে নিয়েছে এবং তার মাথায় একটা তুর্কি টুপি শোভা পাচ্ছে, যা এর আগে তার মাথায় কখনও দেখা যায়নি।

আহমদ নূরভের স্ত্রী রফিকা এবং সাদেকা মুখমন্ডল ছাড়া গোটা শরীরটা চাদরে ঢেকে নিয়েছে।

ওরা মসজিদ কক্ষের ডান পাশে গিয়ে বসল।

বেশ কিছুক্ষণ পর এদিকে মুখ ফিরাল বাবাখান। একবার এদিকে চেয়ে মুখটা নামিয়ে নিল। বলল, কি খবর তোমাদের, বলবে কিছু?

রফিকা কথা বলল। বলল, বাবাখান হুজুর, আমার স্বামী আহমদ নূরভের একটা ব্যাপারে পরামর্শের জন্য এসেছি।

-কি ব্যাপার? প্রশ্ন করল বাবাখান।

-হুজুর, আমি একটা বিপদে পড়েছি। বলল আহমদ নূরভ।

-বিপদটা কি?

আহমদ নূরভ পকেট থেকে কাগজ বের করে কাগজ বের করে উঠে গিয়ে সেটা বাবাখানের হাতে দিল। বাবাখান কাগজটির উপর নজর বুলিয়ে বলল, এতো দেখি তোমার মনোনয়ন, বিপদটা কোথায় দেখছ?

বাবাখানের মুখে এক টুকরো হাসি।

প্রায় আর্তনাদ করে উঠল আহমদ নূরভ। বলল, কি বলছেন, বিপদ নয় এটা আমার জন্যে?

-এ মনোনয়নে লাভ তো তোমার অনেক।

-কিন্তু বিপদ তো তার চেয়ে বড়।

-কি সেটা?

-জাতির লোকেরা আমাকে শত্রু জ্ঞান করবে, জাতি থেকে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব।

-বৈষয়িক স্বার্থের মোহে অনেকেই তো জাতির কোন পরোয়া করেননি।

আহমদ নূরভ হঠাৎ করে কোন জবাব দিল না। কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে চুপ থাকল। তারপর ধীরে ধীরে মাথা তুলে বলল, বাবাখান হুজুর, আমি পাপী, আমি নষ্ট চরিত্র। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্তও বৈষয়িক স্বার্থকেই আমি সবার উর্ধ্বে স্থান দিয়েছি। কিন্তু এ মনোনয়ন হাতে পাবার পর আমার মনে হচ্ছে, আমি আমার জাতিকে ভালবাসি, আমার জাতি থেকে আমি বিচ্ছিন্ন হতে পারব না। আমার স্ত্রীর কাছে আমি শুনলাম, আমার স্ত্রী হুজুরের কাছ থেকে আমার ছেলে-মেয়ের নাম নিয়েছে, ছেলে-মেয়েদের আকীকা করেছে এবং ছেলে-মেয়েদের কানে ইসলামের কালেমা পড়িয়ে দিয়েছে। এ কথা শুনে আমার রাগ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আজ দেখছি আমার মন গর্বে ফুলে উঠছে। আজ মনে হচ্ছে,আমি মনে-প্রাণে মুসলমান। মুসলমানিত্ব আমি ত্যাগ করতে পারবো না। কোন কিছুর বিনিময়েও না।

-তুমি মনোনয়ন প্রত্যাখ্যান করলে শুধু তোমার সহায় সম্পদ নয়, জীবন বাঁচানও তোমার দায় হয়ে উঠতে পারে।

-কিন্তু এসব কিছুর চেয়ে ভারী মনে হচ্ছে আমার কাছে মনোনয়নকে। চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল বাবাখান। তারপর চোখ খুলে বলল, তুমি সাইমুমকে জান?

-জানি, জাতির মুক্তির জন্য ওরা সংগ্রাম করছে।

-সাইমুম সম্পর্কে তোমার এখন মত কি?

-কম্যুনিষ্ট সরকারের দালালী করার চেয়ে ওদের সহযোগিতা করে মৃত্যুবরণ করাকেই আমি এখন শ্রেয় মনে করছি।

বাবাখান মূহুর্তকাল চুপ করে থাকল। তারপর আহমদ নূরভের দিকে চেয়ে বলল, আহমদ নূরভ আমি তোমার নবজন্মকে অভিনন্দিত করছি। মনোনয়ন প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে জাগতিক স্বার্থের চেয়ে নিজের স্বার্থের চেয়ে জাতির স্বার্থকে

তুমি বড় করে দেখলে। আল্লাহ তোমাকে তার জাযাহ দিন এবং আল্লাহ সকলকে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়ার তৌফিক দান করুন।

বাবাখানের কথা শেষ হলে আহমদ নূরভ ধীরে ধীরে উঠে বাবাখানের কাছে এল এবং তাঁর একটি হাত তুলে নিয়ে চুম্বন করে বলল, আপনার নির্দেশ শিরোধার্য করে নিলাম। আপনি দোয়া করুন অতীতের পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্ত হয়ে ইসলামের উপর যাতে অটল থাকতে পারি।

বাবাখান 'আমিন' বলে চোখ বুজল।

আহমদ নূরভ বুঝল, তাদের যাবার নির্দেশ হয়েছে। তারা বেরিয়ে এল মসজিদ থেকে। বাইরের উন্মুক্ত বাতাস যেন প্রশান্তির এক পরশ বুলিয়ে দিল আহমদ নূরভের শরীরে। বাগানের সবুজটা তার কাছে আগের চেয়ে অনেক বেশী সবুজ ও প্রাণদীপ্ত মনে হল। গাছের ডাল থেকে পাখির গান, গাছের ফাঁক দিয়ে দেখতে পাওয়া ঝরণার সফেদ পানি সবই তার কাছে নতুন মনে হল। হঠাৎ তার মনে হল হৃদয়টা যেন তার স্বচ্ছ স্ফটিকের মত। নতুন এক প্রশান্তি সেখানে। সামনের প্রতিটি পদক্ষেপ মনে হচ্ছে তার কাছে নতুন জীবনে পদার্পণ।

সারাকায়ার মহাসড়কটি খিভা, বোখারা, সমরকন্দ হয়ে তাসখন্দ গেছে, সেই পথ ধরে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল শাহীন সুরাইয়া। সেই-ই একমাত্র আরহী। গাড়ীর পেছনটা লাগেজে ভর্তি।

গাড়ি তখন বোখারা পার হয়ে সমরকন্দের পথে চলছিল। বেলা পড়ে এসেছে। রোদের সাদা রংটা এখন হলুদ।

মরুপথ ধরে এগিয়ে চলছিল গাড়ি। চারদিকেই দিগন্ত জোড়া মাঠ। জনমানবের চিহ্ন কোথাও নেই। অখন্ড এক নীরবতা চারদিক জুড়ে। এ নীরবতার একটা সৌন্দর্য আছে। কিন্তু এ সৌন্দর্যের অশরীরি স্পর্শের মাঝে ভীতির একটা শিহরণও রয়েছে। শাহীন সুরাইয়া গোয়েন্দা বিভাগে চাকুরী করে। বিপদ-

আপদের সাথেই তার খেলা। তবু জনমানবহীন পরিবেশের এ জমাট নীরবতা তার মনের উপর চাপ সৃষ্টি করছিল।

প্রায় ১২০ কিলোমিটার বেগে এগিয়ে চলছিল শাহীন সুরাইয়ার গাড়িটি। হঠাৎ বিশ্রি এক শব্দ করে থেমে গেল ইঞ্জিন, দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়ি।

উদ্বিগ্ন শাহীন সুরাইয়া গাড়ি থেকে নামল। ইঞ্জিনের উপরের ডালাটা খুলে সে বুঝতে চেষ্টা করল ইঞ্জিনের কি হয়েছে। ইঞ্জিন দেখে সে চমকে উঠল, ইঞ্জিনের ফুয়েল লাইনটা একেবারেই জ্বলে গেছে। ইঞ্জিনের ডালাটা বন্ধ করে হতাশভাবে এসে রাস্তার উপর সে ধপ করে বসে পড়ল।

আরো উদ্বিগ্ন হলো সে বেলার দিকে চেয়ে। অল্পক্ষণ পরেই রাত নামবে। যদি কোন গাড়ি না আসে! এসব ভেবে মনটা কেঁপে উঠল তার। একটা অজানা ভয় এসে তাকে ঘিরে ধরল। সে যে মেয়ে মানুষ, এ বোধটাও এ সময় তার কাছে বড় হয়ে উঠল।

শাহীন সুরাইয়া কিছুক্ষণ বালির উপর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে থাকল। তারপর উঠে ব্যাগ খুলে দূরবীন লাগিয়ে রাস্তার উপরেই নজর বুলাল। রাস্তার দক্ষিণ প্রান্তে তাকাতে গিয়ে তার চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। একদম দিগন্তের কোলে একটা সচল বিন্দু তার চোখে ধরা পড়ল, চোখ থেকে দূরবীন সে আর নামাতে পারল না।

ক্রমে সচল কালো বিন্দুটি বড় হয়ে উঠল। হ্যাঁ, একটি গাড়ি, একটি কার। গাড়িটি আরও এগিয়ে এলে নাম্বার দেখে বুঝল গাড়িটা বেসরকারী। যাই হোক , খুব খুশি হল শাহীন সুরাইয়া।

চোখ থেকে দূরবীনটি নামিয়ে পকেটে পুরে সে গাড়ির কাছে গেল। মনে করল, গাড়ি থেকে মালপত্র নামিয়ে রাখবে যাতে করে দেরী না করে গাড়িতে উঠা যায়। কিন্তু পরক্ষণেই মনে করল, কি হবে, না জেনে আগাম এসব করে লাভ কি!

গাড়ির কাছ থেকে সরে এসে আবার দূরবীনটি চোখে লাগাল সে। এবার গাড়ির সব কিছুই পরিস্কার। গাড়িতে তিনজন আরোহী। পিছনের সিটে দু'জন। সামনের ড্রাইভিং সিটে একজন, তিনজনই পুরুষ কিন্তু দূরবীনের লেন্সে তাদের মুখ এখনও ধরা পড়ছে না। আনন্দের মাঝেও একটা উৎকন্ঠা জাগছে,

লোকগুলো কি তাকে গাড়িতে নেবে? কেমন হবে লোকেরা? রাস্তা-ঘাটে পশু-বৃত্তির খবর আজকাল প্রায়ই পাওয়া যাচ্ছে, বুকটা কেঁপে উঠল শাহীন সুরাইয়ার।

গাড়িটা কাছে এসে গেছে। তীব্র বেগে ছুটে আসছে গাড়িটা। সুরাইয়া তার গাড়িতে বাম হাত রেখে ডান হাত উঁচু করে গাড়িটাকে দাঁড়াবার জন্য সংকেত দিল। সংকেত পাওয়ার পরই গাড়িটার গতি শ্লো হয়ে গেল। গাড়িটা ধীর গতিতে এসে সুরাইয়ার গাড়ি অতিক্রম করে প্রায় ৫০ গজ গিয়ে থেমে গেল। দেখা গেল গাড়ির আরোহীরা গাড়িতে বসেই সুরাইয়ার গাড়িটাকে তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করছে।

সুরাইয়াও গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। গাড়ির আরোহী তিনজনই গাড়ি থেকে নেমে এল। তিনজন আরোহীর দু'জন ক্লিন শেভ অন্যজনের সুন্দর মুখ ঘিরে সুন্দর দাড়ি। প্রথম দৃষ্টিতেই তিনজনকে সৌম্য-শান্ত ভদ্রলোক বলে মনে হয়। সুরাইয়ার মন সাহসী হয়ে উঠল। তার উপর সুরাইয়ার মনে হল দাড়িওয়ালা মুখটাকে কোথায় সে দেখেছে।

সুরাইয়া কিছু বলার আগেই ওদের মধ্য থেকে সেই দাড়িওয়ালা লোকটা বলল আপনাদের গাড়ির কি হয়ছে?

-গাড়ির ফুয়েল লাইনটা জ্বলে গেছে।

নিজের গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে ক্লিন শেভদের একজনের দিকে তাকিয়ে সেই দাড়িওয়ালা লোকটা বলল দেখে এস ইঞ্জিনটা।

ওরা সবাই গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। ইঞ্জিন দেখে ফিরে এসে বলল মেরামতের কোন সুযোগ নেই এখানে।

দাড়িওয়ালা লোকটা শাহীন সুরাইয়ার দিকে চেয়ে বলল আপনার নাম কি? যাবেন কোথায়?

-যাব তাসখান্দে। নাম আমার শাহীন সুরাইয়া।

-গাড়ি তো আপনাকে রেখেই যেতে হবে, সমরকন্দ পর্যন্ত আমরা আপনাকে পৌছাতে পারব।

-ধন্যবাদ ঐ পর্যন্ত হলেই আমার চলবে, বাকি পথের ব্যবস্থাটা আমি করতে পারব। শাহীন সুরাইয়ার জিনিসপত্র সেই ক্লিন শেভড দু'জনই ধরাধরি করে এনে

এ গাড়িতে তুলল, তারপর সামনের সীটে সুরাইয়াকে বসিয়ে দাড়িওয়ালা সহ একজন পেছনের সীটে বসল।

গাড়ি আবার চলতে শুরু করল।

শাহীন সুরাইয়া ভুলতে পারছিলনা দাড়িওয়ালা ঐ চেহারাকে। সে যেন কোথায় দেখেছে। এক সময় সে মাথা ঘুরিয়ে পিছনের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি।

উত্তরে সেই লোকটি বলল, কিছু মনে করবেন না, আপনার বাড়ি কোথায়?

-সারাকায়া।

-সারাকায়া?

আকস্মিক এক জিজ্ঞাসা ফুটে উঠল লোকটির কণ্ঠে।

-সারাকায়া আপনি চিনেন?

-জানি সারাকায়াকে

-কাউকে চিনেনে?

-চিনি।

-দু একজনের নাম করুন।

-রসিদভ জামায়াতিন তুঘরীল তুগান।

-রসিদভকে চিনতেন আপনি আমি রসিদভের বোন।

-রসিদভের বোন আপনি। একটা বিস্ময়বেগ সেই লোকটির কণ্ঠে।

-রসিদভের খবর জানেন? কিছুটা ভারী কণ্ঠস্বর সুরাইয়ার।

-জানি, কিন্তু বলুন কেন এমন হল?

সুরাইয়া কোন জবাব দিল না। সে স্মৃতির গোটাটা হাতড়িয়ে ফিরছিল এই দাড়িওয়ালাকে সে কোথায় দেখেছে। অবশেষে সে প্রশ্ন করল আপনাকে কোথায় দেখেছি তা তো বললেন না?

-আমার প্রশ্নের আগে জবাব দিন।

-রসিদভ বিদ্রোহের শাস্তি পেয়েছে।

মানুষ কি মনে করে, সত্যই সে কোন অপরাধ করেছিল?

সুরাইয়ার সমৃতির দরজা যেন হঠাৎ খুলে গেল। তার গোয়েন্দা দপ্তরে রক্ষিত রাজনৈতিক টার্গেটদের ফটোর প্যানেল তার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে ভেসে উঠল। ফটোর আহমদ মুসাকে জলজ্যান্ত সামনে দেখে মুহূর্তের জন্য বিহবল হলো সুরাইয়া। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে পেছন দিকে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, আমি এবার আপনাকে চিনেছি আপনি আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা একটু হেসে নির্দ্বিধায় বলল, হ্যাঁ বোন আমি আহমদ মুসা। তুমি রশিদভের বোন। আমাকে তুমি না চিনলেও আমার পরিচয় তুমি পেতে। রশিদভ উত্তর উজবেকিস্তানের প্রথম শহীদ। কিন্তু একটা প্রশ্ন করি তুমি তো আমাকে কোথাও দেখার কথা না। দেখার কথা বলছ কেমন করে, চিনলেই বা কি করে?

সুরাইয়া বলল আমি গোয়েন্দা বিভাগে চাকুরী করি। ফাইলে আপনার ছবি দেখেছি।

-গোয়েন্দা বিভাগে চাকুরী কর? তোমার ভাইয়ের কথা তুমি জানতে না?

-জানতাম, আমি এসব ব্যাপারে সতর্ক হয়ে চলতেও বলেছিলাম। কিন্তু আবেগকে সে দমিয়ে রাখতে পারেনি।

বলতে বলতে কণ্ঠ ভারী হয়ে উঠল সুরাইয়ার

-তোমার ভাইয়ের জন্য আমরা গর্বিত সুরাইয়া।

-জনাব আমি আমার একমাত্র ভাইকে হারিয়ে বেদনা বোধ করি কিন্তু সে আমারও গর্বের বস্তু।

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। তীব্র বেগে এগিয়ে চলছে গাড়ি। নীরবতা ভাঙল আহমদ মুসাই প্রথম। বলল বোন সুরাইয়া সম্ভবত তোমার কাছে অনেক খবর আছে।

-জি হ্যাঁ। বলল সুরাইয়া।

তারপর একটু থেমে আবার সেই কথা বলে উঠল, আমাকে মস্কোতে ট্রান্সফার করা হয়ছে। তাসখন্দ হয়ে আমি সেখানেই যাচ্ছি। আপনি খবর জানতে চেয়েছেন। ঠিকই খবর আছে। মুসলিম সংখ্যাধিক্য নিয়ে গঠিত সরকার ও পার্টি ভেঙ্গে দেবার পর সামরিক ও বেসামরিক সমস্ত মুসলিম আফিসারকে মধ্য এশিয়া অঞ্চল থেকে রুশ অঞ্চলে ট্রান্সফার করে হয়েছে সহায়-সম্পদ সব সহ। মনে হয়

তারা আর কোন দিন দেশে ফেরার সুযোগ পাবে না। আমরা মনে করেছিলাম সরকারী কর্মচারীদের ট্রান্সফার করারা মধ্যেই ব্যাপারটা সীমিত থাকবে। কিন্তু তা নয়। রাজনৈতিক ও সমাজনেতাদেরকেও রুশ অঞ্চলে চালান দেয়া হচ্ছে। যাতে করে ক্ষমতাচ্যুত এই নেতারা এখানে থেকে কোন প্রকার অসন্তোষ ছড়াতে না পারে।

আহমদ মুসা চুপ করে তার কথা শুনছিল। সুরাইয়ার কথা থামলেও চুপ করেই থাকল আহমদ মুসা। যেন কোন ভাবনার অতলে নিমজ্জিত সে। অনেকক্ষণ পর কথা বলল আহমদ মুসা। বলল সে, আচ্ছা সুরাইয়া সরকারের কোন শাখা এটা ডিল করছে? কে কোথায় যাচ্ছে এই একজ্যাক্ট রেকর্ডটা কোত্থেকে জানা যাবে?

-এটা কয়েকদিন হল জেনারেল বোরিসের নিজস্ব দপ্তরে চলে গেছে। একমাত্র সেখান থেকেই এটা জানা যেতে পারে।

-আচ্ছা তুমি তো মস্কো যাচ্ছ। সেখানকার গোয়েন্দা বিভাগে যোগ দেয়ার জন্যই?

-জি হ্যাঁ।

-তুমি কি কখনও ভেবছ সাইমুমের সাথে তোমার সম্পর্ক কি হবে?

-অতীতে ভাবতে সাহস পাইনি। আজ মনে হচ্ছে ভাবা দরকার। এখন আপনি যা আদেশ করবেন।

নতুন সমরখন্দ নগরীর প্রবেশ গেট আর বেশী দুরে নয়। গেটের উজ্জল আলোর নীচে চেকপোস্টের অবস্থান স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আহমদ মুসা বলল, আমরা শহর কে বাম পাশে রেখে এখন দক্ষিন দিকে এগিয়ে যাব। তোমাকে গেটে নামিয়ে দিলেই তো চলে।

-জি হ্যাঁ, চলবে।

গাড়ি গেটের কাছাকাছি এসে গেছে। সুরাইয়া পিছন দিকে মাথা ঘুরিয়ে বলল, আমি তো নির্দেশ পেলাম না?

আহমদ মুসা বলল সুরাইয়া তুমি সচেতন এবং বুদ্ধিমতী। মস্কো গিয়ে তোমার চলার পথ তোমাকেই খুজে নিতে হবে। আমি আশা করি তা তুমি পারবে। নির্দেশও তুমি সে পথ থেকেই পাবে।

সুরাইয়ার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বলল আমি তা পারব। দোয়া করবেন আমার চাকুরী যেন আমার জাতির কাজেই লাগে।

গেটের এপারেই বাস স্টপেজ এবং একটি যাত্রী ছাউনি। যাত্রীদের বিশ্রাম নেবার জায়গা। সুরাইয়া সেখানেই নেমে গেল।

সুরাইয়াকে নামিয়ে দিয়ে গাড়ি ছুটল দক্ষিণ দিকে। কর্নেল কুতাইবা গাড়ি ড্রাইভ করছিল। আহমদ মুসার পাশে ছিল হাসান তারিক।

তুর্কমেনিস্তানে ১০ দিনের সংগঠনিক সফর শেষে তারা ফিরছে হেড কোয়ার্টার শহীদ আনোয়ার পাশা ঘাটিতে।

পথ অনেক দুরের।

ঝড়ের বেগে এগিয়ে চলছে গাড়ি।

# ৫

শাহিন সুরাইয়ার সহপাঠিনী বান্ধবীর ছোট বোন রাইছা। সেই সুত্রে সুরাইয়া গত তিন উইক এন্ড অর্থাৎ শনিবার বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাসে রাইছার ওখানে গেছে। রাইছা খুশি হয়েছে, অনেক আলাপ হয়েছে তার সাথে। গত শনিবারে রাইছার রুমে দেখা হয়েছে খোদেজায়েভা এবং তাহেরোভার সাথে। আলোচনায় দেশের প্রসংগও এসেছে। বুঝা গেছে দেশের সব ব্যাপারেই তারা সচেতন। এমনকি সরকারী কর্মচারী ও জননেতৃবৃন্দের গনস্থানান্তর সম্পর্কিত সব খবর তারা জানে। কিন্তু তাদের প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারটা অতি সন্তর্পণে এড়িয়ে গেছে। সাইমুম সংক্রান্ত কোন প্রসংগ তো তোলারই সুযোগ হয়নি। তবে সুরাইয়ার সন্দেহ নেই এই সচেতন মেয়েরা কম্যুনিস্ট সরকারের ধামাধরা হতেই পারে না।

অফিসের টেবিলে বসে শাহিন সুরাইয়া গত তিন সপ্তাহের মস্কো জীবনের হিসাব নিকাশ করছিল। কাল আবার শনিবার রাইছার ওখানে যাবে সুরাইয়া।

দেয়াল ঘড়ি থেকে দশটা বাজার সংকেত এল। দশটা অফিসের কাজ শুরুর সময়। সুরাইয়া সব ঝেড়ে ফেলে সামনের ফাইলের দিকে মনোযোগ দিল।

সুরাইয়া মস্কো এসে কোন বাইরের এসাইনমেণ্ট পায়নি। তাকে অফিসে বসানো হয়েছে। সরকারের প্রশাসনিক নির্দেশের একটা কপি গোয়েন্দা বিভাগে আসে। সেই নির্দেশেগুলো রেকর্ড করা এবং তা গোয়েন্দা বিভাগের নির্বাহী ব্রাঞ্চে পাঠানোই তার দায়িত্ব। কাজটা একদমই একঘেয়ে এবং কষ্টকর। এই কয় দিনেই তার গোয়েন্দা অফিসারের চরিত্র কেরানী চরিত্রে রূপান্তরিত হবার যোগাড় হয়েছে।

সামনের ফাইল খুলে রেজিস্টারে নিতে শুরু করল সুরাইয়া। এ সময় মুভিং ক্যারিয়ারে একটা ফাইল এসে বাম দিকের ডেস্কে ছিটকে পড়ল। হোম মিনিস্ট্রির ফাইল। টপ সিক্রেট এবং ইমিডিয়েট ট্যাগ লাগানো। কেন জানি তৎক্ষণাৎ ফাইলটি দেখার কৌতুলহ সে রোধ করতে পারল না। হাতের কাজ বন্ধ করে

ফাইলটি সে টেনে নিল। খুলে দেখল সংক্ষিপ্ত একটা নির্দেশ, ভ্যাকেশনে এশিয়ার সকল মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীর বাড়ি যাওয়া নিষিদ্ধ। তাদের উপর চোখ রাখতে হবে, আটকাতে হবে তাদেরকে কোন বিনোদন ট্যুরের ব্যবস্থা করে হলেও।

পড়া শেষে ফাইল ক্লোজ করে সেটা আবার সেই ডেস্কের উপর রেখে দিয়ে আগের কাজে মনোযোগ দিল সুরাইয়া। এ সময় দরজা ঠেলে দ্রুত প্রবেশ করল সেকশন ইনচার্জ টেনিসভ। সে এসে ডেস্ক থেকে হোম মিনিস্ট্রির সেই ফাইল তুলে নিয়ে বলল, কখন এসেছে এ ফাইল?

-এই মাত্র।

-রেকর্ড করেছ?

-না।

-দেখেছ?

-না।

দেখার কথা অস্বীকার করল সুরাইয়া। অফিসারকে ফাইলটি তুলে নিতে দেখেই সে বুঝেছে ফাইলটা ভুল করে এখানে পাঠানো হয়েছে।

এখন দেখার কথা স্বীকার করলে ঐ ফাইলের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে গোয়েন্দা দফতরের আইন অনুযায়ী অন্তরীণ থাকতে হবে। অন্তরীণ থাকা তার কাছে বড় কথা নয় কিন্তু এই মুহূর্তে অফিসারটির হন্তদন্ত অবস্থা দেখে ঐ তথ্যটিকে তার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে, যা সাইমুমের কাজে আসতে পারে। সুতরাং মিথ্যা কথা বলা এখানে সে দূষণীয় মনে করেনি।

অফিসারটি ফাইল নিয়ে যেতে যেতে বলল, ফাইলটা আমার কাছেই থাকবে। রেকর্ডের সিরিয়াল আমার একথার নোট থাকলেই চলবে।

অর্থাৎ ফাইলটা রেকর্ড করার জন্যে সুরাইয়াকে দেওয়া হবে না। যেহেতু সে তুর্কী এবং বিশ্বাসে মুসলমান তাই তাকে তাদের বিশ্বাস নেই। ঠোঁটে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল সুরাইয়ার। মনে মনে বলল, বিশ্বাস করলে তাকে দেশের মাটির কোল থেকে ছিন্ন করে এই বিদেশ বিভূঁইয়ে এনে টেবিলে আটকে রাখত না।

অবরুদ্ধ একটা ক্ষোভ দীর্ঘ নিঃশ্বাসের আকারে বেরিয়ে এল সুরাইয়ার বুক থেকে।

সুরাইয়া আবার মনোযোগ দিতে চেষ্টা করল ফাইলে। কিন্তু ফাইলে মন বসছে না। মনে হল এ খবরটা তাড়াতাড়ি সাইমুমের কাছে পৌঁছানো দরকার। আর দিন পরেই ভ্যাকেশান। এখনই ওরা জানতে না পারলে সরকারের ফাদে ছাত্ররা সবাই আটকা পড়ে যাবে, কেউ দেশে যেতে পারবেনা।

সুরাইয়া ভাবল কাল শনিবার, না আজই একবার তাকে রাইছার কাছে যেতে হবে। পথ তাকে বের করতে হবে সাইমুমকে এ খবর জানানোর। আহমদ মুসার নির্দেশের কথা তার মনে পড়ল, পথ বের করার অর্থ আহমদ মুসা সাইমুমকে খুঁজে বের করার কথাই বলেছে। আহমদ মুসা তাকে সাইমুমের খোঁজ দিয়ে দিতে পারতো কিন্তু তা না দিয়ে খুঁজে নিতে বলেছে তাকে। এতে প্রথমে তার মন খারাপ হয়েছিল, পরে বুঝেছে সাইমুমের মত একটা আন্দোলনের জন্য এটাই স্বাভাবিক। এই বোধ আসার পর আহমদ মুসার নেতৃত্বের প্রতি তার দুরদর্শিতার প্রতি সুরাইয়ার ভক্তি শ্রদ্ধা আকাশস্পর্শী হয়ে উঠেছে। সে যে তিন সপ্তাহেও সাইমুমকে খুঁজে পায়নি এটা তার দুর্বলতা, এজন্যে নিজের কাছেই নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে সুরাইয়ার।

সুরাইয়া ঠিক করল আজ অফিস শেষে বাসায় না ফিরে সে সোজা রাইছার ওখানে চলে যাবে। রাইছা ১২ টার দিকেই ক্লাস থেকে হলে ফিরে আসে। দুপুরেই তার সাথে দেখা হবে।

সুরাইয়া একটু আগে সাড়ে ১২ টার দিকেই অফিস থেকে বেরুল, যেতে হবে বাস বদল করে, সময় লাগবে তাতে।

ঠিক দেড়টার সময় সুরাইয়া বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পৌঁছল। রাইছার হলে পৌঁছতে আরও ২০ মিনিট সময় লাগলো তার। সুরাইয়া যখন রাইছার দরজায় দাঁড়াল, তখন বেলা ১ টা বেজে ৫০ মিনিট।

রাইছা রুমের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। কিছুক্ষণ দাঁড়াল সুরাইয়া কিন্তু ভেতর থেকে সাড়া শব্দ নেই। অবশেষে দরজায় টোকা দিল এক দুই তিন। আবার কছু সময় কেটে গেল। টোকা দিল আবার সেই তিনটা। কোন সাড়া নেই। আবার

কিছু সময় অপেক্ষা করল সুরাইয়া। কি ব্যাপার, রাইছা কি ঘুমালো নাকি এই অসময়ে? অসুস্থ নয়তো সে?

আর টোকা নয় এবার নাম ধরে ডাক দিল সুরাইয়া।

এবার একটু পরেই দরজা খুলে গেল। দরজা খুলেই রাইছা বলল, মাফ করবেন একটু দেরি হয়ে গেল।

আমিতো ভাবছিলাম তুমি ঘুমিয়ে গেছ, বলে ঘরে ঢুকল সুরাইয়া। দেখল রাইছার সাথে আরেকটা মেয়ে।

সুরাইয়া রাইসার দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে চাইতেই রাইছা বলল, এ আমার বান্ধবী। নাম ফাতিমা ফারহানা। তাজিক মেয়ে।

ফাতিমা ফারহানার সাথে কুশল বিনিময়ের পর সুরাইয়া বলল, তোমরা বোধ হয় নামাজ পড়ছিলে?

আকস্মিক এই প্রশ্নে রাইছা এবং ফাতিমা ফারহানা দুজনেই চমকে উঠল এবং মুহূর্তের জন্যে অপরাধ ধরা পড়ার মত একটা বিমূঢ় ভাব দেখা গেল তাদের মধ্যে।

তাদের অবস্থা দেখে হেসে উঠল সুরাইয়া। তারপর রাইছার গালে একটা টোকা দিয়ে বলল, তোমরা তো কোন অপরাধ করনি, আমি আনন্দিত হয়েছি।

রাইছা বলল, আপনি জানলেন কি করে আমরা নামাজ পড়ছিলাম?

-জানতে পারিনি, বুঝতে পেরেছি।

-কেমন করে?

-তোমাদের মুখের পবিত্রতা দেখে এবং তোমাদের দুজনের মাথায় ওড়না দেখে।

রাইছা ও ফারহানা দুজনেই এ কথা শুনে মাথায় হাত দিল এবং হেসে ওড়না নামিয়ে নিল।

সুরাইয়া গিয়ে ওদের মাথায় ওড়নাটা আবার তুলে দিয়ে বলল, নামিওনা বেশ লাগছে। আমাদের ঐতিহ্য কত সুন্দর!

-সুন্দর ঐতিহ্য আমরা অনুসরণ করতে পারছি কই? এইতো মাথার এই ওড়না কারও নজরে পড়লে সন্দেহ শুরু হয়ে যাবে যে, আমরা ধর্মের আফিম বোধ হয় আবার গলঃধকরণ করছি।

ঠিক বলেছ ফারাহানা, বলে সুরাইয়া একটু পিছন ফিরে গিয়ে দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে এসে বলল, এস তোমরা, বস, আমার জরুরী কথা আছে।

সবাই বসলে সুরাইয়া বলল, আমি একটা খবর নিয়ে এসেছি।

সামনের ভ্যাকেশনে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের দেশে যেতে দেওয়া হবে না, এ সংক্রান্ত অর্ডার খুব শীঘ্রই বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে আসছে।

-সত্যি! প্রায় কপালে চোখ তুলে প্রশ্ন করল ফারহানা।

-সত্যি। উত্তর দিল সুরাইয়া।

তারপর সবাই চুপচাপ।

নিরবতা ভাঙ্গল সুরাইয়াই। প্রশ্ন করল, তোমরা তো ছাত্র, বলতে পার সরকার কেন এই পদক্ষেপ নিচ্ছে?

রাইছা এবং ফারহানা পরস্পর একবার চোখ চাওয়া চাওয়ি করে চুপ করে থাকল। মনে হল তারা এ প্রশ্নে অস্বস্তি বোধ করছে।

সুরাইয়া একটু হাসল। বুঝতে পারছি তোমরা বলতে একটু দ্বিধা করছ। আমার পরিচয় শুন। আমি গোয়েন্দা বিভাগের একজন অফিসার। সারাকায়ার ঘটনা তোমরা নিশ্চয়ই জান। সে ঘটনায় আমার ছোট ভাই রশিদভ সাইমুমের হয়ে শহীদ হয়েছে। শাস্তিমূলক ট্রান্সফারের শিকার হয়ে আমাকে মস্কো আসতে হয়েছে। আসার পথে ভাগ্যক্রমে সাইমুম নেতা আহমদ মুসার সাথে আমার দেখা হয়, এখানে সাইমুমের সন্ধান করা এবং তাকে সাহায্য সহযোগিতা করা তারই নির্দেশ।

রাইছা ও ফারহানার চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ফারহানা সুরাইয়ার একটা হাত তুলে নিয়ে চুমু দিয়ে বলল, মাফ করুন আপা।

আমরা কি যে খুশি হলাম আপনাকে পেয়ে। একটু থেমে ফারহানা গভীর আগ্রহ নিয়ে বলল, কোথায় ওর সাথে আপনার দেখা হয়েছে?

-উজবেকিস্তানের মরুভূমিতে। বলে সুরাইয়া তার কাহিনীটা খুলে বলল তাদের। ওরা প্রায় মুখ হা করে গোগ্রাসে গিলল সে কাহিনীটা।

আবার প্রশ্ন করল ফারহানাই, ও কেমন আছে, ভাল?

রাইছা অলক্ষ্যে একটা চিমটি কাটল ফারহানাকে। মুখে গাম্ভীর্য টেনে বলল, এসব ব্যক্তিগত প্রশ্ন কেন? ওর প্রশ্ন শুনে উত্তর এখনো দেয়া হয়নি।

ফারহানার মুখে লজ্জার একটা লাল আভা খেলে গেল।

এ দৃশ্যটা নজর এড়াল না গোয়েন্দা অফিসার সুরাইয়ার। কিন্তু তা এড়িয়ে গিয়ে বলল, হ্যাঁ ওটা কি ব্যাপার বলো। ফারহানার দিকে তাকিয়ে নিয়ে রাইছা বলল, সাইমুমের নির্দেশ এসেছে এবার ভ্যাকেশনে সবাইকে দেশে যেতে হবে। কর্মচারী ব্যবসায়ী যারা তাদেরও এ সময় দেশে ফিরতে হবে।

-কর্মচারীদেরকেও?

-হ্যাঁ।

-সবাই কি জানে? আমি তো জানতাম না।

-আপনার সাথে আমাদের পরিচয় না হবার কারনেই আপনি জানতে পারেন নি।

রাইছা কিছু বলার আগেই ফারহানা বলল, ভ্যাকেশনের আর মাত্র ১৫ দিন বাকী। ওরা আট-ঘাট বেধে ফেলার আগেই তো আমাদের কিছু করা দরকার।

-হ্যাঁ তোমরা চিন্তা কর। এ ব্যাপারে যতটুকু সহযোগিতা করতে পারি আমি করব। বলে দাঁড়াল, সুরাইয়া। রাইছা ও ফারহানাও উঠে দাঁড়াল। দুজনেই বলে উঠল, বসবেন না, একটু কিছু........

-না না, আজ নয়। অফিস থেকে সোজা এসেছি।

সুরাইয়া ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে মুখটা আবার ফারহানার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে তার থুতনিতে একটা টোকা দিয়ে বলল, ওকে ভাল সুস্থই দেখেছি। কবে দেখা হল ওর সাথে তোমার?

আকস্মিক এ প্রশ্নে ফারহানা যেন বিব্রত হয়ে পড়ল। একরাশ লজ্জা ছড়িয়ে পড়ল তার চোখে- মুখে।

ফারহানা কিছু বলার আগেই রাইছা বলল, সে এক বিরাট কাহিনী। আপা ঘুমন্ত রাজকুমার কি করে পাতালপুরীতে এল, কি করে রাজকুমারীর জীবন কাঠির স্পর্শে রাজকুমার জাগল সে এক অপরুপ....

ফারহানা রাইছাকে এক ধাক্কা দিয়ে বলল, রাইছা বড় বেয়াদব। আপা ওকে বিশ্বাস করবেন না।

ফারহানার মুখটা লাল হয়ে গেছে লজ্জায়।

রাইছা তার কথা সমাপ্ত করতে না পারার দুঃখে গলা বাড়িয়ে আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল।

সুরাইয়া হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে বলল, আজ আর নয়, আরেকদিন এসে তোমাদের কথা শুনব।

মস্কো এয়ারপোর্টের ডোমেস্টিক উইং এর রুমের এক কোণে অনেকটা নিজেদের লুকিয়ে যেন দাঁড়িয়েছিল ফাতিমা, খোদেজায়েভা, তাহেরভা, রাইছা এবং আরও ৫ ছাত্রী। ওদের প্রত্যেকের মুখেই একটা চাঞ্চল্যের চিহ্ন। ৩টায় ফ্লাইট। সবে দেড়টা বাজে। সময় যেন একেবারেই যাচ্ছে না। ঘড়ির কাঁটা আজ নড়ছেনা যেন।

দুটো বাজতেই ভেতরে ঢোকার ঘন্টা ধ্বনি হলো। ফারহানা খোদেজায়েভাকে কানে কানে বলল, তুমি সবাইকে নিয়ে ঢুকে যাও। আমি ওলগার জন্যে আর একটু অপেক্ষা করব।

-কিন্তু বেশী দেরী করোনা, কখন আমরা ওদের নজরে পড়ে যাই, ভয় করছে খুব। বলে খোদেজায়েভা সবাইকে নিয়ে বিমান বন্দরের ভেতর ঢুকে গেল। আরও পাঁচ মিনিট পার হয়ে গেল।

ফাতিমা ফারহানা অস্থির হয়ে উঠেছে। তাহলে ওলগা আসবে না?

কিন্তু আসবে না তা হতেই পারে না।

হঠাৎ পেছন থেকে মাথায় কে যেন তার টোকা দিল। চমকে উঠে পেছন ফিরে দেখল ওলগা হাসছে। হেসে উঠে ফারহানা জড়িয়ে ধরল তাকে। এসেছ উঃ কি উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছি। ভাবছি, বোধ হয় তোমার সাথে আর দেখা হলো না।

-উঃ না এসে বুঝি পারি? গাড়ির জন্যে একটু দেরী হয়ে গেল, বলল, ওলগা, জান একটা খবর আছে?

কি খবর? বলে উৎকণ্ঠিত চোখ দুটি ফারহানা তুলে ধরল ওলগার মুখের ওপর।

ওলগা ফারহানার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল, মাকে ওরা মস্কোভা বন্দী শিবিরে নিয়ে গেছে সপ্তাহ খানেক হলো।

-অর্থাৎ তাকে সাধারণ আসামীর মত কায়িক পরিশ্রমও করতে হবে, ফারহানার কন্ঠ যেন আর্তনাদ করে উঠল। তার মুখটা মুহূর্তের জন্য অন্ধকার হয়ে গেল।

হঠাৎ ভেতরের অবরুদ্ধ আবেগ অশ্রুর রুপ নিল চোখের দু কোণায় এসে।

ওলগা ফারহানাকে সান্তনা দিয়ে বলল, আম্মা আমাকে কাঁদতে নিষেধ করেছেন। আমি আর কাঁদি না। কাঁদলে তো এরা খুশী হয়, আরও শক্তিশালী হয়। অশ্রু নয়, এদের অত্যাচারের সিংহাসন পুড়িয়ে দেয়ার জন্যে চোখে আগুন দরকার।

ফারহানা চোখের কোণ দুটি মুছে নিয়ে ওলগার হাত হাতের মধ্যে নিয়ে বলল, ঠিক বলেছ ওলগা, অশ্রু এদের কাছে দুর্বলতার প্রতীক।

বলল ওলগা, আরও খবর আছে। মাকে ওরা সাইবেরিয়া পাঠাবার পর আমার স্টাইপেন্ডও বন্ধ করে দিয়েছে।

-স্টাইপেন্ড বন্ধ করে দিয়েছে? এরপর আবার ফ্ল্যাটটাও কেড়ে নেবে নাতো?

-নিপীড়নের দ্বিতীয় অধ্যায় সবে শুরু, কি হবে জানি না।

-এখন তোমার লেখাপড়া কিভাবে চলবে?

-লেখাপড়া বাদ দিব ভাবছি।

-লেখাপড়া বাদ দেবে? না তা হতে পারেনা।

একটু ভাবল ফারহানা। তারপর ব্যাগ খুলে পাঁচ হাজার রুবলের একটা বান্ডিল ওলগার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, বড় বোন ছোট বোনকে এটা দিল। এতে তোমার মাস তিনেক চলবে। পরের ব্যবস্থা যেখানেই থাকি আমি করব।

বিব্রত ওলগাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে চকিতে ঘড়িটা একবার দেখে নিয়ে ফারহানা বলল, ওলগা আমি তোমাকে নিয়ে যেতে চাইলে রাজী হবে?

এবার ওলগা ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল।

ফারহানা তাকে বুকে জড়িয়ে বলল, কেঁদো না বোন, আমরা আছি, আল্লাহ্ আছেন।

একটু থেমে ফারহানা আবার বলল, কই আমার জিজ্ঞাসার জবাব দিলেনা?

ওলগা বলল, একটাই খারাপ লাগবে, মার কাছ থেকে আরও দূরে সরে যাব।

ওলগার চোখের উপর চোখ রেখে ফারহানা বলল, শুধু তোমাকে সরিয়ে নেয়া নয়, তোমার মাকেও কাছে আনার চেষ্টা আমাদের থাকবে।

শেষ কথাটায় ওলগার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, তাকি সম্ভব হবে?

অসম্ভব কিছুই দুনিয়াতে নেই, তাছাড়া দিনও সব সময় একরকম যায় না, বলল ফারহানা।

সময় শেষ হয়ে গিয়েছিল। ফারহানা ওলগাকে একটা চুমু খেয়ে বলল, আমি চললাম, তুমি প্রতি সপ্তাহে কিন্তু চিঠি দিবে, নাহলে আমি ভীষণ রাগ করব।

বলে ফারহানা বিমান বন্দরে ঢোকার জন্যে ফিরে দাঁড়াল। ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে কয়েক কদম গেছে এমন সময় একজন লোক পাশ থেকে তার হাতে একটা চিঠি গুঁজে দিয়ে চলে গেল।

চমকে উঠেছিল মুহূর্তের জন্যে। তারপর স্বাভাবিক গতিতে সে ঢুকে গেল বিমান বন্দরে। চিঠিটা কি তা দেখার জন্যে তার মন বড় উসখুস করছিল। কিন্তু দেরী হয়ে যাওয়ায় বিমানে উঠার আগে চিঠি পড়ার আর সুযোগ পেল না সে। বিমানে পাশাপাশিই তাদের দশজনের সিট পড়েছিল। ফারহানার পাশেই বসেছিল খোদেজায়েভা।

চিঠিটা ছোট্ট। লেখা আছে, বাসে, বিমানে, ট্রেনে তোমরা ভ্যাকেশনের আগেই যে চলে যাছ এ খবর তাদের কাছে এই মাত্র পৌঁছল। তোমাদের ব্যাপারটাও এখনি তাদের জানা হয়ে যাবে। সুতরাং হুশিয়ার থেকো। তাসখন্দ বিমান বন্দরে তোমাদের অবতরণ নিরাপদ নাও হতে পারে।

চিঠিতে কোন স্বাক্ষর নেই। কিন্তু হাতের লেখা দেখেই ফারাহানা বুঝতে পারল এ চিঠি সুরাইয়ার।

চিঠিটা পড়ে ফারহানা সেটা খোদেজায়েভার হাতে দিল। খোদেজায়েভা ওটার ওপর চোখ বুলিয়ে বলল, আল্লাহ্ ভরসা, আমরা এ প্লেনে যাচ্ছি সেটা সাইমুমকেও জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

এ্যারোফ্লোতের বিমানটি সন্ধ্যা ৬ টায় ল্যান্ড করল তাসখন্দ বিমান বন্দরে।

অজানা এক আশংকা পীড়িত দুরু দুরু মন নিয়ে ফারহানারা বিমানের সিড়ি দিয়ে নিচে নামল। ফারহানা বলল, আমরা তো কোন অপরাধ করিনি, হল কর্তৃপক্ষর বৈধ অনুমতি পত্র নিয়েই আমরা এসেছি। তাছাড়া দেশে আসতে কোন সময় আমাদের নিষেধ ও করা হয়নি। সুতরাং আমাদের বিরুদ্ধে করার তাদের কি আছে? খুব বেশী করলে যেটা পারে সেটা হল আমাদের আবার মস্কো ফিরিয়ে নেয়া।

খোদেজায়েভা এবং রাইছা মাথা নেড়ে সায় দিল ফারহানার কথায়। বিমান বন্দরের লাউঞ্জে প্রবেশ করার পরই একজন পুলিশ অফিসার তাদের কাছে এল। বলল, আপানারা মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের তো? ফারহানা বলল, জি হ্যাঁ।

তারপর পুলিশ অফিসারটি একটা লিস্ট থেকে ১০ জনের নাম পড়ল এবং বলল, আপনাদের এই দশজনকে এখনই আমার সাথে মিনিস্ট্রি অব হোমে যেতে হবে।

যেন আকাশ থেকে পড়ল এমন ভাব নিয়ে ফারহানা বলল, কেন?

পুলিশ অফিসারটি হাল্কা ভাবে বলল, এই তেমন কিছুনা, হয়ত হবে কোন রুটিন চেকিং এর কাজ। আমি বেশি কিছু জানি না।

ফারহানা আগে থেকেই জানে, এ ধরনের ব্যাপারে আপত্তির কোন মূল্য নেই, বরং তাতে আরও ক্ষতির সম্ভবনা বেশী।

তাদের সবাইকে নিয়ে একটি মাইক্রোবাসে তোলা হলো। একজন পুলিশ ড্রাইভিং সিটে বসল। গাড়ি ছেড়ে দিল।

ফারহানারা দেখল, জনা চারেক পুলিশ নিয়ে আরেকটা জীপ পেছন পেছন আসছে। বুঝতে তাদের কারও বাকী রইল না যে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে, তারা আর স্বাধীন নয়। ফারহানার মনটা আনচান করে উঠল, দেশমুখী সব ছাত্র-ছাত্রীদের কি এই পরিণতি হচ্ছে!

এক চিন্তা থেকে আরেক চিন্তা তাদের মনে স্রোতের মত আসতে লাগল। ওরা যদি একবার সন্দেহ করে এবং ওদের হাতে পড়া যায় তাহলে কি পরিণতি যে হতে পারে তা তাদের কারোই অজানা নেই। আর সন্দেহ না করলে তো তাদের ধরাই হত না। সুতরাং সবারই মুখ শুকনো। কি ঘটতে যাচ্ছে তার ভয়ে আতংকিত। একবার মস্কোভা বন্দী শিবিরের কথাও ফারহানার মনে পড়ল। এটা মনে করতে গিয়ে আয়েশা আলিয়েভার কথা মনে পড়ল। সেই সাথে ফারহানা কিভাবে গাড়িতে পুলিশ প্রহরীদের পরাভূত করে নিজেকে মুক্ত করেছিল সেটা মনে পড়ল এবং মনে পড়ল ড্রাইভার কে কাবু করে গাড়ি দখলের তার নিজের চোখে দেখা ঘটনা। একটা আলোর সন্ধান যেন সে পেল। মুখটা তার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আশেপাশে সে তাকাল, না তেমন কিছু নেই। হঠাৎ তার মনে পড়ল, ব্যাগের মধ্যে স্টিলের একটা ব্যাটন আছে যা সে তার ভায়ের ফরমায়েশ হিসেবে কিনেছে। এটা ফোল্ড করলে হাতের মুঠোর মধ্যে এসে যায় এবং আন-ফোল্ড করলে দু'ফুট লম্বা ওজনদার এক মারাত্মক ব্যাটনে পরিণত হয়।

খুশী হয়ে ফারহানা খোদেজায়েভার কানে ব্যাপারটা বলল। খোদেজায়েভাও খুশী হল। কিন্তু পরক্ষনেই তার মুখটা অন্ধকার হয়ে গেল। বলল, ড্রাইভারকে না হয় কাবু করলাম, কিন্তু পিছনের পুলিশের গাড়ি কি হবে? ওর স্পীড তো এ মাইক্রোবাসের চেয়ে অনেক বেশী।

ফারহানা বলল, সে চিন্তা পরে করা যাবে কিন্তু এ পথ ছাড়া তো এদের হাত থেকে মুক্তির কোন পথ দেখি না।

ফারহানার কথা শেষ হতে না হতেই পেছন থেকে হর্নের শব্দ পাওয়া গেল এক সঙ্গে কয়েকবার। ফারহানা ও খোদেজাভার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, এতো সাইমুমের গাড়ির কোড হর্ন। তাহলে তারা এসে গেছে।

ফারহানা তাড়াতাড়ি তার ব্যাগ খুলে সেই ব্যাটনটি বের করল। তারপর ড্রাইভারের পেছনের সিটে একটা আসন খালি ছিল, ফারহানা গিয়ে সেখানে বসল।

এই সময় পিছন থেকে একটা গুলির শব্দ হলো। সংগে সংগে প্রচন্ড শব্দে একটা টায়ার বাস্ট হবার শব্দ পাওয়া গেল এর মুহূর্তকাল পরেই ব্রাস ফায়ারের শব্দ কানে এল।

মাইক্রোবাসের ড্রাইভার পাশের জানালা দিয়ে একবার পিছন দিকে তাকিয়েই গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিল।

ফারহানা জানালা দিয়ে পেছন দিকে তাকিয়ে দেখল টায়ার ফাটা পুলিশের জীপ রাস্তায় দাড়িয়ে পড়েছে। জীপের দুপাশে দুজন পুলিশের লাশ পড়ে আছে। সাইমুমের জীপটি পুলিশের গাড়ির পাশ কাটিয়ে সামনে এগিয়ে আসছে।

ফারহানা তার কর্তব্য ঠিক করে নিল। ব্যাটনের মাথার সুইচটায় চাপ দিতেই ব্যাটনটি নিঃশব্দে আন-ফোল্ড হয়ে গেল। প্রায় সের খানেক ওজন হবে ব্যাটনের।

মাইক্রোবাসের ড্রাইভার পেছনে নড়াচড়া বোধ হয় টের পেয়েছিল। চকিতে সে একবার পেছনে ফিওে চাইল। পেছনে ফারহানাকে উঠে দাড়াতে দেখে ড্রাইভিং হুইল থেকে দ্রুত একটা হাত নামিয়ে পাশে রাখা রিভলভারে সে হাত দিতে যাচ্ছিল।

কিন্তু রিভলভার হাতে নেয়ার সুযোগ ফারহানা আর তাকে দিল না, ফারহানার ব্যাটন বিদ্যুৎ গতিতে একবার উপরে উঠে আড়াআড়ি ভাবে গিয়ে আঘাত করল তার বাম কানের ঠিক উপরে। ডানদিকে কাত হয়ে পড়ে গেল ড্রাইভারের দেহটা। ফারহানা তার দেহটা কাত হয়ে পড়ার সাথে সাথে প্রায় ঝাপিয়ে পড়ল ড্রাইভিং হুইলের উপর, পায়ের সর্বশক্তি দিয়ে চেপে ধরল ব্রেক।

মাইক্রোবাসটা তার মাথা কয়েকবার এদিক ওদিক ঘুরিয়ে রাস্তার একপাশে গিয়ে থেমে গেল।

মাইক্রোবাসের ড্রাইভার আঘাতটা সামলে নিয়ে উঠে বসার চেষ্টা করছিল। ফারহানা পাশে পড়ে থাকা ব্যাটনটি তুলতে যাবে এমন সময় পাশে এসে একটি গাড়ি থামল। পরক্ষনেই দুজন এসে মাইক্রোবাসের জানালায় দাঁড়াল। তাদের একজনকে দেখে ফারহানা অপূর্ব এক ভাবাবেগে নিশ্চল হয়ে গেল। ব্যাটনটি তুলতে গিয়ে সে যেভাবে ছিল সেভাবেই ছিল।

আহমদ মুসা সেদিকে একবার তাকিয়ে দ্রুত ড্রাইভিং দরজা খুলে ফেলল। ড্রাইভার-পুলিশ ইত্যবসরে তার পিস্তলটি তুলে নিয়েছিল। ওদিকে নজর পড়তেই আহমদ মুসা প্রচন্ড বেগে গাড়ির দরজা বন্ধ করার জন্যে ধাক্কা দিল। ড্রাইভার পুলিশটির একটা পা এবং মাথা দরজার বাইরে এসেছিল, দরজার ধাক্কায় পা এবং মাথা একেবারে থেতলে গেল, রিভলভারটি ছিটকে গাড়ির মধ্যেই পড়ে গেল।

গাড়ির দরজা আবার খুলে ফেলল আহমদ মুসা। তারপর ড্রাইভার-পুলিশকে টেনে বের করে ছুড়ে দিল রাস্তার বাইরে।

তারপর দ্রুত উঠে বসল ড্রাইভিং সিটে। ফারাহানা ওড়না দিয়ে মাথা মুখ প্রায় ঢেকে ফেলে ড্রাইভারের পাশের সিটেই বসে পড়েছিল।

আহমদ মুসা দ্রুত বলল, ফারহানা তোমাকে ধন্যবাদ, গাড়ি দাঁড় না করাতে পারলে অসুবিধা হতো। একটু থেমে বলল, ফারহানা তুমি পেছনের সিটে যাও। তারপর বাইরে মুখ বাড়িয়ে বলল, হাসান তারিক তুমি উঠে বস।

ফারহানা পেছনে চলে গেল। হাসান তারিক এসে বসলে জীপকে লক্ষ্য করে বলল, কুতাইবা একেবারে সোজা লেনিন স্মৃতি পার্কে।

মাইক্রোবাস আবার ফুল স্পীডে চলতে শুরু করল। তার পেছনে কুতাইবার জীপ।

পুলিশের জীপের অবশিষ্ট দুজন পুলিশ গুলি করতে করতে ছুটে আসছিল কিন্তু তারা শীঘ্র পিছনে দৃষ্টির বাইরে হারিয়ে গেল।

শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার মধ্যে সময় কাটল খোদেজায়েভা এবং অন্যান্য মেয়েদের। এর মধ্যেও ফারহানার আকষ্মিক পরিবর্তন, তার লাজ নম্র নির্বাক

চেহারা এবং মাথায় ওড়না উঠে আসা তাদের নজর এড়ায়নি। যে ফারহানা ব্যাটন হাতে একজন পুলিশ অফিসারকে কাবু করে গাড়ি দখলের সাহসিকতা প্রদর্শন করতে পারে, সে ঐ লোকটিকে দেখে অমন সংকুচিত হয়ে গেল কেন? এ কৌতুহল তারা দমিয়ে রাখতে পারছিল না।

গম্ভীর খোদেজায়েভাই প্রথম প্রশ্ন করল, কি ব্যাপার ফারহানা, তোমার কি হল?

খোদেজায়েভার প্রশ্ন শেষ না হতেই রাইছা প্রশ্ন করে বসল, ইনিই বোধ হয় আহমদ মুসা? তার মুখে হাসি বিস্ময় দুটোই।

ফারহানা গম্ভীর কন্ঠে বলল, হ্যাঁ, উনিই।

রাইছা কিছু বলতে যাচ্ছিল, ফারহানা তার মুখ চেপে ধরে সেই গম্ভীর কন্ঠেই বলল, এটা আমাদের ড্রইং রুম নয়।

-আচ্ছা ঠিক আছে, আমি কিছু বলব না, কিন্তু বলতো আমি কি করে বুঝলাম উনি আহমদ মুসা? বলল রাইছা।

-নিছক অনুমান করেই।

-না।

-তাহলে কি?

-তোর কাপুনি আর তোর লাল মুখ দেখে। কত নায়ক-নায়িকার মুখোমুখি হবার দৃশ্য আমি উপন্যাসে দেখেছি।

ফারহানা খোদেজায়েভার দিকে ফিরে বলল, আপা, ওকে সামলাও। সীমা লংঘন করছে ও।

-ঠিক আছে, তওবা করছি, এই মুখ বন্ধ করলাম। বলে রাইছা সত্যিই সত্যিই দু আংগুলে ঠোট চেপে ধরে চোখ বন্ধ করে সিটের উপর শুয়ে পড়ল।

তাসখন্দ এয়ারপোর্ট থেকে লেনিন স্মৃতি পার্ক প্রায় হাজার মাইল। গোটাটাই জনমানবহীন পথ। যাতে শত্রুরা ঠিক করতে না পারে কোথায় তারা যাচ্ছে এজন্যে আহমদ মুসা বিভিন্ন রাস্তা ঘুরে কেউ অনুসরণ করছে না নিশ্চিত হয়ে তবেই লেনিন স্মৃতি পার্কের পথে গিয়ে পড়ল।

জেনারেল বোরিসের পি এস ভিক্টর কুমাকভ ঠিক সাড়ে আটটায় অফিসে গিয়ে পৌঁছল। জেনারেল বোরিস অফিসে আসেন নয়টায়। তাঁর জন্য সব ফাইল রেডি করা এবং দিনের কাজের একটা আউট লাইন দাঁড় করতে আধা ঘন্টা সময় ভিক্টর কুমাকভের দরকার হয়। সেই জন্য ভিক্টর কুমাকভের অফিস আওয়ার সাড়ে আটটা থেকেই।

অফিসে বসে ভিক্টর কুমাকভ সবে ফাইলে হাত লাগিয়েছে এমন সময় দরজা ঠেলে প্রবেশ করল অপারেশনাল উইং-এর ডিজি টিটভ। তার হাতে একটা ফাইল। ফাইলটা টেবিলে রেখে বলল, ফাইলটার কাজ ইমিডিয়েটলি হওয়া দরকার। আমি দশটায় ফাইল ফেরত নেয়ার জন্য আসব।

ভিক্টর কুমাকভ মাথা নেড়ে বলল, ঠিক আছে।

বেরিয়ে গেল টিটভ।

ভিক্টর কুমাকভ হাতের ফাইল্টা রেখে ‘টপ সিক্রেট’ ‘টপ প্রায়োরিটি’ লেবেল আঁটা টিটভের ফাইলে মনোযোগ দিল। দেখল ফাইলের ভিতরে একটা ইনভেলাপ আঠা দিয়ে মুখ আঁটা। বিশেষ গোপনীয় ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ছাড়া কোন ডকুমেন্টই মুখ আঁটা অবস্থায় পি,এস এর কাছে আসেনা।

ইনভেলাপটি হাতে নিয়ে কয়েকবার নাড়াচাড়া করল ভিক্টর কুমাকভ। অপারেশনাল উইং থেকে আসা এমন জরুরী মুখবন্ধ ডকুমেন্টের অর্থ হলো এর মধ্যে নিশ্চয় কোন অপারেশন সংক্রান্ত পরিকল্পনা আছে। এই চিন্তার সাথে সাথে ইনভেলাপের ডকুমেন্টের প্রতি আকর্ষণ বেড়ে গেল ভিক্টরের।

পাঠকদের মনে থাকার কথা এই ভিক্টর কুমাকভের আসল নাম যুবায়েরভ। সাইমুমের গোয়েন্দা ইউনিটের একজন কর্মকর্তা ইনি। আগে ইনি সিক্যুরিটি বিভাগের রেকর্ড সেকশনে ছিলেন। অরুশ তূর্কী, বিশেষ করে মুসলিম অফিসার কর্মচারীদের রুশ অঞ্চলে ট্রান্সফার করার পর এখানে আগে থেকে কর্মরত রুশ কর্মচারীরা তাদের অভিজ্ঞতার কারণে বড় বড় শিফট পেয়ে যান। সেই সুবাদে

দায়িত্বশীল ও কর্তব্যনিষ্ঠ বলে পরিচিত যুবায়েরভ জেনারেল বোরিসের পার্সোনাল সেক্রেটারী পদ লাভ করেছে। সাইমুম একে তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র এক বিশেষ রহমত হিসেবে মনে করছে।

ইনভেলাপ শেষ পর্যন্ত খোলারই সিদ্ধান্ত নিল যুবায়েরভ। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল তখন ৮ টা ৭ মিনিট। যুবায়েরভ তাড়াতাড়ি উঠে পাশের টেকনিক্যাল রুমে গেল। সর্বাধুনিক ইনভেলাপ ওপেনারও আছে সেখানে। সুইচ টিপে যন্ত্রের মধ্যে ইনভেলাপটি ঢুকিয়ে দিল ইনভেলাপের আঠা বিন্দুমাত্র নষ্ট না করেই ইনভেলাপ খুলে দেয়। কাজ সেরে ইনভেলাপের আঠাতেই সেটা আবার বন্ধ করা যায়। ধরবার কোন উপায় থাকেনা।

ভিক্টর ইনভেলাপ ওপেনার দিয়ে দ্রুত ইনভেলাপটি খুলে ফেলল।

ইনভেলাপের ভিতরে টাইপ করা দুটো কাগজ। একটা হল তথ্য-বিবরণী, আরেকটা অপারেশন প্ল্যান।

যুবায়েরভ দ্রুত কাগজ দু'টির ফটো করে নিল। তারপর মূল কাগজ দুটি ইনভেলাপে ঢুকিয়ে আবার ইনভেলাপের মুখ বন্ধ করে দিল।

ঠিক ন'টায় বোরিস অফিসে এল। যুবায়েরভ নিয়ম অনুসারে অপারেশনাল উইং-এর টপ প্রায়োরিটি তার কাছে পেশ করল।

যুবায়েরভের মনটা উসখুস করছিল। তথ্য-বিবরণী ও অপারেশন প্ল্যানের শিরোনাম ছাড়া আর কিছুই পড়া হয়নি তার। শিরোনাম দেখেই বুঝেছে লেনিন স্মৃতি পার্ক নিয়ে তারা কিছু করতে যাচ্ছে।

এসময় টেলিকম কথা বলে উঠায় তার চিন্তায় ছেদ পড়ে গেল। টেলিকমে কথা বলছিল জেনারেল বোরিস। বলল সে, ভিক্টর টিটভ কখন আসবে বলেছে?

-দশটায়। বল যুবায়েরভ।

-না দশটায় নয়, এখুনি আসতে বল।

-বলছি স্যার।

টেলিকম বন্ধ হয়ে গেল। যুবায়েরভ অয়্যারলেসে টিটভের সাথে যোগাযোগ করল। তাকে জানাল জেনারেলের নির্দেশের কথা।

অয়্যারলেস বন্ধ করে দিয়ে চেয়ারে গা এলিয়ে দিল যুবায়েরভ। ব্যাপারটা নিশ্চয় জরুরী। তা নাহলে জেনারেল বোরিস ১০ টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবেননা কেন! আর স্থির থাকতে পারলো না যুবায়েরভ। অবশেষে কাগজ দু'টো নিয়ে বাথরুমে প্রবেশ করল সে।

প্রথমে অপারেশন প্ল্যানটায় চোখ বুলাল যুবায়েরভ। চোখ বুলাতে গিয়ে চোখ দু'টো ছানাবড়া হয়ে উঠল তার। আজ রাত ১ টা থেকে লেনিন স্মৃতি পার্কে ওদের কম্বিং অপারেশন। সন্ধ্যা ৬ টা থেকে আফগান সীমান্তে সশস্ত্র গোয়েন্দাদের পাহারা বসান হবে যাতে একটা পিঁপড়াও সীমান্ত অতিক্রম না করতে পারে।

লেনিন স্মৃতি পার্কের সব বিষয়ে নজর রাখার জন্য নির্দিষ্ট কিছু পয়েন্টে গোয়েন্দা মোতায়েনের উল্লেখ আছে। বেলা ৩ টায় ষ্ট্যালিনবাদ থেকে আর্মি মুভ করাবে, রাত ৯ টায় লেনিন স্মৃতি পার্কে তারা পৌঁছবে।

তথ্য বিবরণীতে উল্লেখ আছে, লেনিন স্মৃতি পার্কে সাইমুম বিরাট এক অস্ত্রাগার গড়ে তুলেছে। লেনিন স্মৃতি পার্কের প্রধান প্রবেশ পথে যে গোপন ক্যামেরা আছে তার ছবিতে দেখা যাচ্ছে, মস্কোভা জেল থেকে পালানো আয়েশা আলিয়েভ ও রোকাইয়েভা, রোকাইয়েভার মা, হিসার দূর্গের মোল্লা আমীর সুলাইমানের মেয়ে শিরীন শবনম এই লেনিন স্মৃতি পার্কে প্রবেশ করেছে। তারা বের হবার প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। সর্বশেষ মস্কো থেকে পালানো ১০ জন ছাত্রীও সেদিন এখানেই এসে উঠেছে। সব মিলিয়ে ধরে নেয়া হয়েছে লেনিন স্মৃতি পার্ক সাইমুমের এক বিরাট ঘাটি। পড়া শেষ করে যুবায়েরভ বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। উদ্বেগে ছিঁড়ে যাচ্ছে যেন হৃদয়টা। এই মূহূর্তেই খবর পৌঁছানো দরকার হেড কোয়ার্টারে। কিন্তু বেলা ১টার আগে অফিস থেকে বেরুবার কোনই উপায় নেই।

নিদারুণ উদ্বেগে সময় কাটছিল যুবায়েরভের। চেয়ারে হেলান দিয়ে মনটাকে একবার স্থির করতে গিয়ে ঘুম এসে গিয়েছিল তার চোখে। এ সময় রুমে প্রবেশ করল জেনারেল বোরিস। যুবায়েরভের অবস্থা দেখে জেনারেল বোরিস একটু উদ্বিগ্ন হয়েই বলল, তোমার শরীর খারাপ নয়তো ভিক্টর?

দ্রুত সোজা হয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে যুবায়েরভ বলল, একটু খারাপ বোধ করছি স্যার।

-এতক্ষণ বলনি কেন? আমার আজ তেমন কাজ নেই। তুমি চলে যেতে পার।

আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া আদায় করে যুবায়েরভ বেলা ১১ টায় অফিস থেকে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে সোজা চলে এল বাড়ীতে।

নিজের রুমে ঢুকে দরজা-জানালা বন্ধ করে দিল। ষ্টীল আলমারীটা খুলে বের করল একটা এটাচি কেস। এটাচি খুলতেই বেরিয়ে পড়ল একটি শক্তিশালী রেডিওগ্রাহক যন্ত্র। বৈধ লাইসেন্সের অধীনে রাখা অত্যন্ত শক্তিশালী গ্রাহক যন্ত্র এটা। কিন্তু এই গ্রাহক যন্ত্রের নিচের অংশে বিশেষভাবে যুক্ত করা হয়েছে অত্যাধুনিক একটি রেডিও ট্রান্সমিটার।

হাজার বর্গমাইলের মধ্যে যে কোন জায়গায় এর মাধ্যমে খবর প্রেরণ ও গ্রহন করা যায়। এর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল, এর ট্রান্সমিশনের অবস্থান ডিটেক্ট করার কোন যন্ত্র এখনও উদ্ভব হয়নি।

যুবায়েরভ চিন্তা করল, প্রথমেই ব্যাপারটা লেনিন স্মৃতি পার্কে আলদর আজিমভকে জানিয়ে দেয়া দরকার। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবল, না প্রথমে হেড কোয়ার্টারকেই জানানো উচিত। এই খবর কোথায় কিভাবে কতখানি পাঠানো হবে সেটা হেডকোয়ার্টারই ভাল বুঝবে।

যুবায়েরভ সালাম জানিয়ে বলল, মুসা ভাই জরুরী মেসেজ।

-ভাল আছ তো?

-জি হ্যাঁ।

-বল তোমার মেসেজ।

যুবায়েরভ তার স্মৃতি থেকে তথ্য বিবরণী ও অপারেশন প্ল্যানের পুরো বিবরণ রিলে করল আহমদ মুসার কাছে।

মেসেজ শেষ হলে ওপার থেকে আহমদ মুসা বলল, বড় একটা জায়গাকে ওরা টার্গেট করেছে যুবায়েরভ। আল্লাহ নিশ্চয় আমাদের সাহায্য করবেন।

তোমাকে মোবারকবাদ, আল্লাহ্ তোমাকে দিয়ে জাতির একটা বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন।

এপার থেকে যুবায়েরভ বল, দোয়া করুন মুসা ভাই। দুনিয়ার স্বার্থ সম্পদ কিছুই আমাদের লক্ষ্য নয়। আমরা চাই আল্লাহর বান্দাহদের কল্যাণ এবং যা কিছু করতে পারছি তার বিনিময়ে আল্লাহ যেন দয়া করে আমাদের পরকালীন মুক্তির ব্যবস্থা করেন।

আহমদ মুসা ওপার থেকে 'আমিন' বলে অয়্যারলেসের লাইন কেটে দিল।

শহিদ আনোয়ার পাশা ঘাঁটিতে আহমদ মুসার রুমে পরামর্শে বসেছে আহমদ মুসা, হাসান তারিক এবং কর্ণেল কুতাইবা। যুবায়েরভের পাঠানো তথ্য নিয়ে অনেক আলোচনা হল। সবশেষে আহমদ মুসা বলল, আমরা লেনিন স্মৃতি পার্কে 'ফ্র'-এর সাথে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে চাইনা। ভেতর থেকেই আজ যখন এরা ভেংগে পড়ার মুখোমুখি, তখন একে আমি অনর্থক মনে করি। আমি লেনিন স্মৃতি পার্ক ঘাঁটি সরিয়ে আনতে চাই। শুধু আলদর ক্ষুদ্র দল নিয়ে ওখানে থাকবে। অস্ত্রগুলো সীমান্তের ওপারে আমাদের আফগান ঘাটিতে আপাতত রাখা হোক। মেয়েদের সরিয়ে আনতে হবে বখশ নদীর তীরে আলী ইব্রাহীমের ওখানে গুলমহল ঘাঁটিতে। আর ষ্ট্যালিনবাদ থেকে যে কম্যুনিষ্ট সেনাদল লেনিন স্মৃতি পার্কে যাত্রা করবে তাদের আমরা পথেই আটকাতে চাই। আমার মতে উদ্ভূত পরিস্থিতি আমরা এভাবেই মোকাবিলা করতে পারি।

হাসান তারিক এবং কুতাইবা মাথা নেড়ে সায় দিল আহমদ মুসার কথায়।

পরামর্শের পর আহমদ মুসা গিয়ে বসল অয়্যারলেস সেটের পাশে। যোগাযোগ করল লেনিন স্মৃতি পার্কে আলদর আজিমভের সাথে। মুসা তাকে বলল, আমি তো মনে করি ওখানকার গোয়েন্দাদের ট্যাকল করতে তোমার লোকরাই যথেষ্ট!

ওপার থেকে আলদর আজিমভ বলল, দোয়া করুন, মোতায়েন হবার পর ওদের গোয়েন্দারা আমাদের হাতে ধরা পড়ে যাবে।

আহমদ মুসা আবার বলল, লেনিন স্মৃতি পার্ক ঘাঁটি থেকে আপাতত জমা অস্ত্রগুলো এবং মেয়েদের সরিয়ে নিতে হবে। সব পরামর্শ দিয়ে ওখানে হাসান

তারিক এবং কুতাইবাকে পাঠাচ্ছি। সবাইকে আমার সালাম বলো। বলে আহমদ মুসা অয়্যারলেস বন্ধ করে দিল।

তারপর বখশ নদীর তীরের ঘাটিতে আলী ইব্রাহীমের সাথে যোগাযোগ করে বলল, তোমরা তৈরী থেকো আমি আসছি। একটু থেমে বলল, আমার মনে হয়, প্রস্তুত হয়ে তোমরা যদি পশ্চিমে এগিয়ে যাও এবং বখশ শহরের ৫০ মাইল পূর্বের ব্রীজ টার কাছে ৫টার মধ্যে পৌছে যাও তাহলে সেখানেই আমার সাথে তোমাদের দেখা হতে পারে এবং এটাই সবদিক থেকে ভাল হবে।

ওপার থেকে আলী ইব্রাহিম বলল, আমরা আপনার এ পরামর্শ অনুসারে কাজ করব।

আরেকটা জরুরী কথা, বলল, আহমদ মুসা, গুলমহলে আমাদের ঘাটির কাজ কি কমপ্লিট?

-জি হ্যাঁ। বলল, আলী ইব্রাহীম।

একটূ থেমে আবার সে বলল, এখন আমরা আমাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারি।

-না করে আর উপায়ও নেই আলী ইব্রাহীম। আমাদের লেনিন স্মৃতি পার্ক ছাড়তে হচ্ছে। সম্ভবত আজই আমাদের মেয়েরা গুলমহল ঘাটিতে পৌছে যাবে।

-ঠিক আছে, ওখানে সব ব্যবস্থাই কমপ্লিট। হাসান তারিক ভাই সব কিছু জানেন।

-আর কোন কথা আলী ইব্রাহিম?

-নেই জনাব।

-ইনশাআল্লাহ ৫টার মধ্যে ওখানে আমাদের দেখা হচ্ছে।

বলে আহমদ মুসা অয়্যারলেস রেখে দিল। তারপর উঠে ফিরে দাঁড়াল হাসান তারিক ও কুতাইবার দিকে। বলল তোমরা এখনি রওনা হও লেনিন স্মৃতি পার্কে। সীমান্তের ওপারে অস্ত্র পাঠানোর কাজ সহজেই হয়ে যাবে। আগামী ভোরের আগেই তোমরা আমাদের মেয়েদের গুলমহল ঘাটিতে পৌছাতে পারবে ইনশাআল্লাহ। আমরাও আলী ইব্রাহিমের ঘাটি হয়ে ওখানে সকালের দিকে যেতে পারি।

বলে আহমদ মুসা হাত বাড়িয়ে দিল ওদের দিকে হ্যান্ডশেকের জন্যে।

হ্যান্ডশেক করতে করতেই কুতাইবা বলল, আপনার সাথে কে যাচ্ছে মুসা ভাই?

-জীপ নিয়ে যাব। দেখি, দু'একজন কেউ সাথে গেলেই চলবে। আহমদ মুসা বিদায় হলো ওদের কাছ থেকে। জীপ রেডি ছিল। ঘাঁটি প্রধান আলী আমর লোক বাছাই করে আগেই তুলে দিয়েছিল জীপে। আহমদ মুসা এসে জীপের ড্রাইভিং সিটে বসল। স্টার্ট নিল জীপ। আহমদ মুসা বিসমিল্লাহ বলার সাথে চলতে শুরু করল। জীপ ছুটে চলল পামির সড়কের দিকে।

ব্যবসার কাফেলার আনাগোনা ছাড়া পামির সড়ক আজকাল প্রায় শূন্যই থাকে। 'ফ্র' এর কম্যুনিস্ট সরকারের বাহিনী এখন বড় বড় দল ছাড়া বিচ্ছিন্ন ভাবে বের হয় না। স্থানীয় লোকদের নিয়ে গঠিত সরকার ও কম্যুনিস্ট পার্টি ভেঙ্গে দেবার পর তারা নিজেরাও এখন নিজেদেরকে জনগন থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবছে। সুতরাং জনগনকে তারা ভয় করে। বিরাট কোন বাহিনী বহর ছাড়া এখন রাস্তায় বের হয় না বললেই চলে। সুতরাং সাইমুমের জন্য মধ্য এশিয়ার সব রাস্তা আজ প্রায় নিরাপদ হয়ে গেছে।

পামির সড়ক দিয়ে তীব্র গতিতে এগিয়ে সেই ব্রীজের দিকে যাচ্ছিল আহমদ মুসার জীপ। ৪টার দিকে বখশ শহর অতিক্রম করে সোয়া চারটার দিকে সে বখশ শহর থেকে ৫০ মাইল দুরের সেই ব্রীজের কাছে পৌছল।

জায়গাটার নাম সফেদকোহ। এই এলাকার সবচেয়ে উচু পর্বত এখানেই। এ পর্বতের মাথায় আইস ক্যাপ আছে। ওখানে বরফ জমে থাকে প্রায় সারা বছরই। এই থেকে এ জায়গাটার নাম হয়েছে সফেদকোহ। এখানে এসে পামির সড়ক অনেক উচু। সফেদকোহর মাঝখান দিয়ে একটা সংকীর্ণ ও গভীর উপত্যকা। সে উপত্যকা দিয়ে অত্যন্ত খরস্রোতা একটা পাহাড়ী নদী প্রবাহীত। উপত্যকার উপর একটা বড় ব্রীজ পামির সড়কের সংযোগ সাধন করেছে।

ব্রীজের কাছে এসে আহমদ মুসা সাইমুমের কোডে হর্ন বাজাল। মুহূর্ত কয়েকের মধ্য রাস্তায় স্বয়ং আলী ইব্রাহীম নেমে এসে আহমদ মুসাকে স্বাগত জানাল।

আহমদ মুসা প্রথমেই তাকে বলল, জীপটাকে কোথাও সামলানো দরকার। মুহূর্তে সামলানো হলো জীপটা। কিছু পথ ঘুরে পাহাড়ের একটা গলিপথ দিয়ে জীপটাকে একটা পাহাড়ের আড়ালে নিয়ে আসা হলো।

তারপর আহমদ মুসা আলী ইব্রাহীমকে নিয়ে পরামর্শে বসল। প্রথমে আলী ইব্রাহীমের কথা শুনে নিয়ে আহমদ মুসা উপসংহার টানল এইভাবে। আমাদের লোকেরা ব্রীজের এপারে রাস্তার দুধারে পাহাড়ে মোতায়েন থাকবে। রাস্তার একপার তুমি, অন্য পারে আমি তাদের সাথে থাকব। ব্রীজ আমরা ওদের পেরোতে দেবো না। আমার জীপে দেখ একটা স্ট্যান্ড সাইন বোর্ড আছে। ওটা আমরা ব্রীজ থেকে দু'শ গজ ওপারে রাস্তার উপর রেখে দেব। ওতে নির্দেশ দেখার পর তারা স্বাভাবিক ভাবেই মনে করবে ব্রীজের ওপারে তাদের জন্যে প্রতিরোধ অপেক্ষা করছে, এ অবস্থায় তারা তিনটা কাজ করতে পারে। এক, তারা এখানে সামনে অগ্রসর হবে। দুই, তারা পিছনে সরে যাবে। তিন, তারা এখানে নেমে পড়ে রাস্তার দুধারে আশ্রয় নিয়ে স্ট্যালিনবাদ কিম্বা বখশ শহর থেকে বিমান সাহায্যর জন্য অপেক্ষা করবে। তিন অবস্থার মধ্যে তারা যদি পিছিয়ে যায় তাহলে আমরা তাদের যেতে দেব। কিন্তু যদি তারা সামনে অগ্রসর হয় কিম্বা নামার চেষ্টা করে অথবা অন্য কোন তৃতীয় পন্থার আশ্রয় নেয়, তাহলে আমরা তৎক্ষণাৎ ওদের উপর এন্টি ট্যাংক ডিনামাইট দিয়ে আক্রমন চালাব রাস্তার দুপাশ থেকে।

এ্যান্টি ট্যাংক ডিনামাইট সাইমুমের অস্ত্রাগারে নতুন আমদানী। কম্যুনিস্ট সরকারেরই এক মুসলিম বিজ্ঞানীর ফর্মূলায় তৈরী এটা। তৈরীও হয়েছে কম্যুনিস্ট সরকারের ফ্যাক্টরীতে। এই ডিনামাইট ছোড়ার ঝুঁকি অতি সামান্য কিন্তু ৯০ ফুট আয়তনের মধ্য এর ধ্বংসকারী ক্ষমতা অতি ভয়াবহ।

বেলা ৫ টা বেজে ৪মিনিট। এ সময় আহমদ মুসার দূরবীনে ধরা পড়ল ৩০টি সামরিক ট্রাকের একটা কনভয় উঠে আসছে পামির সড়কের ঢাল বেয়ে।

আহমদ মুসা দ্রুত হিসাব করল সাইনবোর্ড স্ট্যান্ড থেকে শুরু করে ৩০টি ট্রাক পিছন দিকে কতটুকু জায়গা নেবে। হিসাব করে পকেট অয়্যারলেসে রাস্তার ওপারে আলী ইব্রাহীমকে জানিয়ে দিল তার লোকজনদের পিছনের দিকে কতটা ছড়িয়ে দিতে হবে।

ঠিক ৫টা ১০মিনিটে ৩০টা ট্রাকের কনভয় এসে হাজির হলো আহমদ মুসাদের বেষ্টনীর মধ্যে। ট্রাক বহরের সামনে ছিল একটা জীপ। জীপটা রাস্তার স্ট্যান্ড সাইনবোর্ডের ৫গজের মধ্যে এসে দাঁড়াল। এক এক করে সব গুলি ট্রাক একটার পেছনে আরেকটা দাঁড়িয়ে পড়ল।

জীপে ড্রাইভারের পাশের সিটে একজন ব্রিগেডিয়ার বসেছিল। সে সাইনবোর্ড পড়ল তারপর পিছনের অফিসারদের সাথে আলোচনা করল।

আহমদ মুসা সাইন বোর্ডের সমান্তরাল এক পাথর খন্ডের আড়াল থেকে সবকিছু প্রত্যক্ষ করছিল। আহমদ মুসার পাশেই ডিনামাইট হাতে প্রস্তুত একজন।

জেনারেল তার অধঃস্তনদের সাথে কি পরামর্শ করল জানা গেল না। কিন্তু দেখা গেল অয়্যারলেস মুখের কাছে তুলে নিয়ে কি যেন নির্দেশ দিল। পরক্ষণেই দেখা গেল ৩০টি ট্রাকের দুপাশের মোতায়েন রাখা কামানের লোকগুলো নড়ে চড়ে প্রস্তুত হয়ে উঠল। তারপর জেনারেলের জীপ নড়ে উঠে দ্রুত অগ্রসর হলো সামনে।

জীপটি তখন রাস্তার সেই সাইনবোর্ডের উপর গিয়ে পড়েছে, জীপের বলিষ্ঠ চাকার আঘাতে সাইনবোর্ডটি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যখন ছিটিয়ে পড়ছে, ঠিক সে সময় রাস্তার দুপাশ থেকে দুটো ডিনামাইট এসে জীপকে আঘাত করল। মাত্র কয়েক সেকেন্ড! প্রচন্ড বিস্ফোরণের মধ্যে জীপটি ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল। গোটা রাস্তা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল আগুন।

প্রথম ডিনামাইট দুটির শব্দ মিলিয়ে যাবার আগেই রাস্তার দুধার থেকে ৩০টি সামরিক ট্রাক লক্ষ্যে বৃষ্টির মত নিক্ষিপ্ত হল ডিনামাইট।

তারপরের দৃশ্যটা ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। কোন কোন কামানের নল একটু উচু হয়েছিল গোলাবষর্ণের জন্যে, কেউ কেউ কামানের বোতাম টিপতে যাচ্ছিল কিন্তু সব ডুবে গেল অনেক ডিনামাইটের সম্মিলীত বিস্ফোরণের আকাশ ভেদী শব্দে। মুহুর্তে গোটা রাস্তা অগ্নিগোলকে পরিণত হল। অনেক্ষন পর সেই আগুন কিছুটা থামল, তখন ট্রাকগুলো দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া চেসিস এবং ইতঃস্তত ছিটানো ইস্পাতের টুকরো ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না।

আহমদ মুসা দূরবীন চোখে ধরেই বসে ছিল, মৃত্যু ও ধ্বংসের দৃশ্য থেকে সে চোখ সরাতে পারছিল না। এইতো জ্বলজ্যান্ত মানুষগুলো ছিল, কোথায় হারিয়ে গেল নিমেষে! কি মর্মান্তিক এই হারিয়ে যাওয়ার দৃশ্য। এদের মা আছে, স্ত্রী আছে, ছেলে মেয়ে আছে। কত স্নেহ কত আকুলতা নিয়ে তারা পথ চেয়ে থাকবে। তারপর যখন খবর পৌছবে কি ভাববে তারা? কেমন হবে তখনকার দৃশ্য? তারা কি বুঝবে সেই রাজনীতির কথা যে রাজনীতি তাদের ঠেলে দিয়েছে মৃত্যুর মুখে, যে রাজনীতি মানবতার কন্ঠ রোধ করা আর মানুষের শান্তি স্বাধীনতা হরণ করার অস্ত্র হিসাবে তাদের প্রিয়জনদের ব্যবহার করছে। চোখ দুটি আহমদ মুসার সিক্ত হয়ে উঠেছিল।

আলী ইব্রাহীম এসে ধীরে ধীরে একটা হাত রাখল আহমদ মুসার কাঁধে।

আহমদ মুসা ধীরে মুখটা তার ঘুরিয়ে নিয়ে আলী ইব্রাহীমের দিকে চেয়ে বলল, আমরা তো এই হত্যাযজ্ঞ চাইনি আলী আব্রাহীম, কেন তা চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে আমাদের উপর।

কন্ঠ ভারী আহমদ মুসার।

আলী ইব্রাহীম বলল, জনসমর্থন হারিয়ে ওরা মরিয়া হয়ে উঠেছে। একমাত্র শক্তির জোরে রক্ত সাগর বইয়ে হলেও ওরা টিকে থাকতে চায়। তা না হলে ওরা লেনিন স্মৃতি পার্কের মত জায়গায় বাড়তি ৩০ ট্রাক সৈন্য পাঠাবে কেন?

ছাই এর স্তুপ, পোড়া দেহ এবং কুন্ডলি পাকান ইস্পাত রাশির দিকে আবার চোখ ফিরিয়ে আহমদ মুসা অনেক স্বগত কন্ঠেই বলল, কাজ আমাদের দ্রুত করতে হবে আলী ইব্রাহীম। আল্লাহর বান্দাদেরকে এদের ধ্বংশকারী অক্টোপাশ থেকে বাঁচাতে হবে।

বখশ নদী তীরের আলী ইব্রাহীমের ঘাটি এবং এই নদীর তীরে অবস্থিত আলী ইব্রাহীমের গ্রাম গুলমহলের মাঝামঝি জায়গায় পাহাড়ের দেয়াল আর নদী ঘেরা উপত্যকায় গড়ে তোলা হয়েছে গুল মহল ঘাটি। সবুজ বনানীর মধ্যে সবুজ রং করা পাথর দিয়ে গড়ে তোলা এই লোকালয় উপর থেকে চোখই পড়ে না। একটু দুর থেকেও এর অস্তিত্ব ভালভাবে বুঝা যয় না। আলী ইব্রাহীমের ঘাটি হয়ে

আসাই এখানে আসার সবচেয়ে সহজ পথ। খরস্রোতা বখশ নদীপথে স্পিডবোট দিয়েও এখানে আসা যাওয়া করা যায়।

সাইমুমের হাসপাতাল এবং মেয়েদের আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবেই একে গড়ে তোলা হয়েছে।

গতরাতে লেনিন স্মৃতি পার্ক থেকে মেয়েদের এখানে আনা হয়েছে।

সম্প্রতি মস্কো থকে পালিয়ে আসা ছাত্রীরাও এখানে আশ্রয় নিয়েছে, একমাত্র ফারহানা ছড়া।

লেনিন স্মৃতি পার্ক থেকে অস্ত্র সরান এবং মেয়েদের এখানে নিয়ে আসরা সব বিবরণ দিচ্ছিল তারিক আহমদ মুসার কাছে।

সে বলছিল, এ কাজে কোন অসুবিধাই হয়নি। আলদর আজিমভের পাতা ফাঁদে 'ফ্র' এর সব গোয়েন্দা ধরা পড়ে যায়। লেনিন স্মৃতি পার্ক প্রশাসনের কিছু বুঝার আগেই আমরা সেখান থেকে সরে এসেছি। বিনা রক্তপাতেই আমরা সবকটা কাজ সমাধান করতে পেরেছি। রাত ৯টায় আর্মি আসা এবং ১টায় অপারেশন এই রুটিন প্রোগামের দিকেই তাদের সবার নজর ছিল। এর বাইরে কোন কিছু তারা চিন্তা করতে পারেনি।

একটু থেমে হাসান তারিক বলল, আসার পথে পামির সড়কে হঠাৎ করে আব্দুল্লায়েভের সাথে আমাদের কাফেলার দেখা হয়ে যায়। পিতার ভীষণ অসুখের খবর শুনে ফারহানা ঐখানে নেমে পড়ে আব্দুল্লায়েভের সাথে চলে যায়।

উদ্বিগ্ন আহমদ মুসা প্রশ্ন করল, অসুখের কিছু বিবরণ শুনেছ?

-অল্প শুনেছি, পাহাড় থেকে নামার পথে পড়ে গিয়েছিল। সেই থেকে শরীরটা ক্রমশ তার খারাপ হয়েই চলছে। হাসপাতালে নিয়ে যেতে চেয়েছিল কিন্তু তাদের পিতা রাজী হয়নি।

আহমদ মুসা আর কিছু বলল না। বৃদ্ধ আব্দুল গফুরের চেহারা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। ওয়াদা দিয়েছিল সে মাঝে মাঝে ওখানে যাবার কিন্তু সময় করে উঠতে পারেনি আহমদ মুসা। আজ মনটা যেন বলে উঠতে চায়, অসুখের খবর পেয়ে ফারহানা ছুটে গেছে, তারও উচিত যাওয়া।

এ সময় খবর এল দাদী তাদের ডাকছে। রোকাইয়েভের দাদীই আজ সকলের দাদীতে পরিণত হয়েছে। সকলের কাছে দাদী অসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র। গোটা মেয়ে মহলের অভিভাবিকা এখন সে। তার ডাক পেয়ে আহমদ মুসা এবং হাসান তারিক দুজনেই সেদিকে চলল।

মেয়েদের জন্য যে হল বরাদ্দ হয়েছে তার, অতিথি রুমে গিয়ে আহমদ মুসা ও হাসান তারিক বসল।

সাদা চাদর গা মুড়ে দাদী এসে ভেতরের দরজার পাশেই একটা চেয়ারে বসল। বয়সের ভারে দেহটা একটু নুয়ে পড়েছে। কিন্তু হাঁটতে পারেন ভালভাবেই। চশমাও ব্যবহার করতে হয় না।

দাদী এসে প্রবেশ করতেই আহমদ মুসা এবং হাসান তারিক তাকে সালাম জানাল।

দাদী সালাম নিয়ে বসতে বসতে বলল, বেঁচে থাক ভাইয়া, আল্লাহ তোমাদের হায়াত দরাজ করুন।

-দাদী আমাকে মাফ করবেন, নানা কাজে ব্যস্থ থাকায় এতদিন আপনার সাথে দেখা করার সুযোগ করে উঠতে পারিনি। বলল আহমদ মুসা।

- না না, ঠিক আছে তাতে হয়েছে কি! আমি তো জানি তোমরা কত ব্যস্ত। তোমরা আমার গর্ব।

একটু থামল দাদী, তারপর বলল, হাসান তুমি একটু বাইরে যাও মুসার সাথে একা কয়েকটা কথা বলব।

হাসান তারিখ বাইরে বেরিয়ে গেল। হাসান তারিক বেরিয়ে গেলে আহমদ মুসা একটু নড়ে চড়ে বসে বরল, বলুন দাদী।

-আমি বলতে চাই, তুমি তোমার বোনদের কথা কিছু কি ভাব?

-কোন বোনরা দাদী?

-তোমার যে বোনরা এখানে আছে?

-হ্যাঁ ভাবিতো। কোন ভাবনার কথা বলছেন?

-আমি তোমার বোনদের বিয়ের কথা বলছি। ইসলামী শরিয়তের বিধান, মেয়ে বড় হলে তাড়াতাড়ি তার বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে আমি মাঝে মাঝে অস্বস্তিবোধ করি কিন্ত তোমরা কিছুই ভাব না।

-দাদী, আপনি অভিভাবক হিসেবে এ ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করলে আমরা খুশি হবে।

-বোকা ভাই তুমি তো সকলের সর্দার, তোমাকেই ভাবতে হবে, সব ব্যবস্থা তোমাকেই করতে হবে।

-দাদী জানেন তো, আমি খুব ব্যস্ত।

-আমি জানি সেটা কিন্ত ইসলাম তো ভারসাম্যের ধর্ম। যুদ্ধের ময়দানে তুমি যাবে, জেহাদের ময়দানে তুমি থাকবে কিন্তু তার অর্থ তোমার ঘর থাকবেনা তা নয়। ঘর এবং বাইর দুটো নিয়েই তোমার জীবন, কোন একটি বাদ দিয়ে নয়। এ ব্যাপারে ইসলামের স্পষ্ট বিধানও আছে তুমি জান।

-জানি দাদী, একটু থেমে আহমদ মুসা বরল, পরামর্শ দিন দাদী।

-তোমার কোন চিন্তা আছে কিনা জানালে আমার পরামর্শ বলতে পারি।

একটু থামল আহমদ মুসা। একটু চিন্তা করল। তারপর বলল, সকলের মত আমার জানা নেই, তবে আমার মনে হয়েছে আয়েশা আলিয়েভাকে হাসান তারিক, শিরীন শবনমকে কুতাইবা এবং রোকাইয়েভাকে যুবয়েরভের সাথে বিয়ে দেয়ার কথা আমরা চিন্তা করতে পরি। অন্যদের ব্যাপারেও এইভাবে ভেবে দেখা যেতে পারে।

দাদী একটু হাসল, বলল, আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন।

তুমি ঠিকই ভেবেছ, আমিও এরকম চিন্তা করেছি।

একটু থেকে দাদী আবার বলল, হাসান তারিক, কুতাইবা এখানে হাজির আছে, যুবায়েরকে খবর দিলে সেও আসবে, তোমাকেও পেয়েছি। আমি আজই এই বিয়ের কাজ সেরে ফেলতে চাই।

-আমি আপনার সাথে একমত দাদী কিন্ত ওদের মতটা না জেনে একেবারে ফাইনাল করা..।

-তিন ছেলের মত সম্পর্কে তোমার বক্তব্য?

-এ প্রস্তাবের সাথে তারা দ্বিমত করবে না।

-ঠিক আছে আমি মেয়েদের মতটা নিয়ে আসছি।

বলে দাদী ভেতর চলে গেল।

ভেতরে লাইব্রেরীতেই সবাইকে পেল। আয়েশা আলিয়েভা, শিরীন শবনম ও রোকাইয়েভাকে রেখে সবাইকে লাইব্রেরী থেকে বের করে দিল দাদী।

-কি ব্যাপার দাদী সবাইকে বের করে দিলেন কেন? প্রশ্ন রাখলো আলিয়েভা।

-তোমাদের তিনজনের সাথে জরুরী কথা আছে।

-কি ব্যাপার, আমরা কি কিছুর আসামী নাকি? বলল রোকাইয়েভা।

কিন্তু রোকাইয়েভার কথার দিকে কান না দিয়ে দাদী গম্ভীর কণ্ঠে বলল, দেখ তোমাদের বয়স হয়েছে। তোমাদের ব্যাপারে তোমরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা রাখ। তোমাদের বিয়ের ব্যাপারে আহমদ মুসার কাছ থেকে প্রস্তাব এসেছে, প্রস্তাব সম্পর্কে তিনি তোমাদের মত জানতে চান।

আহমদ মুসা যার জন্যে যে নাম প্রস্তাব করেছে, সে নাম লেখা চিরকুট তাদের সামনে দিয়ে দিল দাদী, তারপর বলল, সত্ত্বর মত দাও তোমরা।

দাদীর মুখে বিয়ের কথা শুনে তিনজনেরই হাসি উবে গিয়েছিল। লজ্জায় সংকুচিত হয়ে পড়েছিল তারা। এর মধ্যে আশা নিরাশার একটা কষ্টকর অনুভুতি তাদের পীড়িত করছিল।

তারপর দাদীর চিরকুটে চোখ বুলিয়ে লজ্জায় তিনজনের মুখ লাল হয়ে উঠল। দাদী যখন মত জানতে চাইল, রোকাইয়েভা তখন 'তুমি সব জান, আমি জানিনা,' বলে দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গের। আর দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকল আয়েশা আলিয়েভা এবং শিরীন শবনম।

ওদের কাছে কোন জবাব না পেয়ে দাদী উঠে গিয়ে ওদের দু'জনের মুখ তুলে ধরল। দেখল অশ্রুতে ধুয়ে যাচ্ছে ওদের মুখ। দাদী একটু হেসে ওদের দু'জনের গালে স্নেহের দুটো টোকা দিয়ে বলল, জবাব পেয়েছি বুড়িরা, আনন্দের অশ্রু জবাব দিয়ে দিয়েছে।

দু'জনে মুখ ঢাকল আবার।

দাদী বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বাইরে দরজার পাশেই দাড়িয়েছিল রোকাইয়েভা। দাদীকে দেখে রোকাইভেয়া পালাতে যাচ্ছিল। ওর হাতটা চেপে ধরল দাদী। বলল, এখনি সরছিস দাদীর কাছ থেকে? যুবায়ের আসলে কি দাদীর কথা আর মনে রাখবি?

এবার রোকাইয়েভা জড়িয়ে ধরল, দাদীকে। কেঁদে ফেলল সে।

বলল, আমি তোমাকে ছেড়ে যেতে পারবনা দাদী।

দাদী হেসে জবাব দিল, ঠিক আছে তুই একথা যুবায়েরকে বলিস।

দাদী অতিথি রুমে ফিরে এল। বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, সব ঠিক আছে, বিয়ের ব্যবস্থা কর।

-ঠিক আছে দাদী, তাহলে এখন উঠি।

-না বস, বলল দাদী।

দাদী একটু থামল। তারপর আবার বলল, তোমার কথা তুমি ভাবছ কিছু?

-কি কথা দাদী

-তোমার বিয়ের কথা।

-না দাদী আমি ভাবছি না, ভাবতে পারছি না।

-তুমি না পারলেও তোমার দাদীকে তো ভাবতে হচ্ছে।

আহমদ মুসা চুপ করে থাকল। দাদীই আবার কথা বলল, আমাদের এক বোন আমাদের সাথে ছিল, পিতার অসুস্থতার খবর পেয়ে চলে গেছে। তুমি অনুমতি দিলে তার নাম প্রস্তাব করতে পারি।

আহমদ মুসার মুখটা মুহুর্তের জন্যে রাঙা হয়ে উঠল কিন্তু সামলে নিয়ে আহমদ মুসা গম্ভীর হল। একটু ভেবে নিয়ে বলল, না থাক দাদী। আমি যাযাবর, আমি কিছু চিন্তা করতে পারছি না।

দাদী আহমদ মুসার দিকে একবার চোখ তুলে তাকাল। তারপর একটু কঠিন স্বরেই বলল, তুমি নিজের উপর জুলুম করবে, এ অধিকার ইসলাম তোমাকে দেয়নি।

আহমদ মুসার অন্তরটা সত্যিই কেঁপে উঠল। দাদীর যুক্তিকে খন্ডন করার যুক্তি সে পেলনা। তার খুব ভাল লাগল দাদীর এ ধমক। এক আপনাত্বের সুর

আছে এ ধমকে। দাদা দাদীকে সে দেখেনি। বাবা-মা'র স্নেহও বেশী দিন ভাগ্যে জোটেনি তার। আপনজনের এমন স্নেহ মাখানো ধমক সে কতদিন শোনেনি। চোখটা তার ছলছল করে উঠতে চাইল। অশ্রু গোপন করার চেষ্টা করে আহমদ মুসা বলল, দাদী! ওর অভিভাবক আছে, এ প্রসংগটা আজ থাক।

দাদি বলল, ঠিক আছে আজকের মত থাক। কিন্তু মনে রেখ, তুমি কচি হৃদয়ের উপর জুলম করছ।

দাদীর একথাটা বুকের কোথায় যেন খোঁচা দিল আহমদ মুসার। আহমদ মুসার চোখের সামনে ভেসে উঠল ফাতেমা ফারহানার বিনত সলজ্জ মুখ। মনে পড়ল পুলিশের হাত থেকে তাদেরকে উদ্ধারের সেদিনের ঘটনা। আহমদ মুসাকে দেখে সেদিন ফাতেমা ফারহানা বিদ্যুতে শক পাওয়া মানুষের মত নির্বাক হয়ে গিয়েছিল, নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল ফারহানা একেবারেই। আহমদ মুসা জোর করেই সেদিন কিছু বুঝতে চায়নি। কিন্তু সেই দৃশ্য তার অবচেতন সত্তায় একটা তৃপ্তির বান ডেকেছিল, একটা পাওয়ার আনন্দ হৃদয়কে ভরে দিয়ছিল, একে সে অস্বীকার করবে কেমন করে? দাদী যা বলেছেন, সত্যি কি সে তার উপর জুলুম করছে, জুলুম করছে সে নিজের উপরও? দাদীর কথার উত্তরে আর কোন কথা যোগালোনা আহমদ মুসার মুখে। অল্পক্ষণ মাথা নীচু করে চুপ থেকে সে বলল, এখন উঠি দাদী।

দাদীকে সালাম জানিয়ে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বেরুতে বেরুতে বলল, দাদী বিয়ের জন্যে ভেতরের যা ব্যবস্থা সব করুন। আমি বাইরেরটা দেখছি।

বিকেলের মধ্যেই যুবায়েরভ এস পড়ল। কেনা কাটার যা কাজ আলী ইব্রাহীম তা সেরে এল। মাগরিব নামাজ শেষে কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে বিয়ের অনুষ্ঠান শুরু হলো।

গুলমহল উপত্যকা তখন গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা, উপরে আকাশে নবমীর চাঁদ। এরই মধ্যে শান্ত-পবিত্র এক পরিবেশে দাদী লাজনম্র অশ্রু ধোয়া আয়েশা আলিয়েভাকে তুলে দিল হাসান তারিকের হাতে, শিরীন শবনমকে কুতাইবার হাতে এবং রোকাইয়েভাকে যুবায়েরভের হাতে। শেষ হাতটি তুলে দেয়ার সময়

কান্নায় ভেংগে পড়ল দাদী। বোধ হয় তার মনে পড়ছিল শহীদ ওমর জামিলভের কথা এবং অতীত দিনের অনেক কথাই।

# ৬

জেনারেল বোরিস নিজের চুল যেন নিজেই ছিঁড়ছিল। রাগে-দুঃখে ক্ষোভে তাকে বড়ই বিপর্যস্ত দেখাচ্ছে। হাত দুটি পিছনে বেঁধে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে সে আহত বাঘের মত। লেনিন স্মৃতিপার্কে তার লোকরা কিছুই করতে পারলনা। উল্টো যে গোয়েন্দাদের পাহারায় দেয়া হয়েছিল তারাই জীবন হারাল। সবচেয়ে অসহনীয় তিরিশ ট্রাক সৈন্যের জীবন হানি। এ ব্যর্থতার কোন কৈফিয়ত তার কাছে নেই। মস্কো থেকে টেলিফোন এসেছিল, কোন জবাব জেনারেল বোরিস দিতে পারেনি। তীব্র তিরস্কার এবং ভৎসনার শিকার হয়েছে সে। মস্কো থেকে 'ফ্র' প্রধান বলেছে, রাশিয়ার সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ দানা বাঁধছে। শুধু জনগন নয়, খোদ সেনাবাহিনীর মধ্যে থেকেও। মধ্য এশিয়ার পরিস্থিতি সরকারকে ডুবাতে পারে বলে আশংকা করা হয়েছে। সুতরাং কোন ব্যর্থতাই আর ক্ষমা করা হবে না। উদ্বেগ বোধ করেছে জেনারেল বোরিসও। পায়ের তলার মাটি যেন ক্রমেই সরে যাচ্ছে। বলতে গেলে গোটা মধ্য এশিয়ার জনগনই সাইমুমের দখলে চলে গেছে। কয়েকটা শহর ছাড়া সৈনিকরাও আজ আর কোথাও বেরুতে পারছে না। গ্রামাঞ্চলের যে লীডারশীপের উপর ভর করে কম্যুনিষ্ট শাসনব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা হয়েছিল তা আজ একেবারেই ধ্বসে পড়েছে। তুঘরীল তুগানের মত হারিয়ে গেছে সবাই। ক্ষমতার এই ভিত কি আর গড়ে তোলা যাবে?

নির্বাচন কি তাদের সুযোগ এনে দেবে?

ইন্টারকম কথা বলে উঠল এ সময়। ইন্টারকমে পি.এ বলল, স্যার টিটভ এসেছেন, সাক্ষাৎ করতে চান।

-'আসতে বল' বলে জেনারেল বোরিস চেয়ারে এসে বসল। নতুন একটা উদ্বেগ উৎকন্ঠার চিহ্ন ফুটে উঠল জেনারেল বোরিসের মুখে। আজ ছিল সুপ্রিম কংগ্রেস এবং রাজ্য কংগ্রেসের নমিনেশন পেপার সাবমিটের দিন। সম্ভবত টিটভ সেই খবরই নিয়ে আসছে। খবর নিশ্চয়ই ভাল হবে।

দরজা ঠেলে ঘরে প্রবেশ করল টিটভ। তার মুখটা বিষন্ন, বিধ্বস্ত। ধীরে ধীরে টেবিলে এসে বসল টিটভ।

জেনারেল বোরিস তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। তার দৃষ্টিতে একটা ফুঁসে ওঠা ভাব।

টিটভ বসলে জেনারেল বোরিস বলল, বল কি খবর?

-খবর ভাল নয় স্যার।

-জানতে চাই সেটা কি?

-কোন নমিনেশন জমা পড়েনি স্যার। কান্নার মত করুণ কন্ঠস্বর টিটভের।

-কোন নমিনেশন জমা পড়েনি? কেন রূশীয়দের?

-শহরাঞ্চলে রূশীয়দের নমিনেশন জমা পড়েছে। তাদের সংখ্যা সব মিলে দেড়শ'র বেশী নয়। এর মধ্যে কম্যুনিষ্ট সুপ্রিম কংগ্রেসের ৭০ টি এবং রাজ্য কংগ্রেসের ৮০ টি। রূশীয়দেরই রাজ্য কংগ্রেসে ৭০ টি এবং সুপ্রিম সোভিয়েতে ৩০ টি নমিনেশন জমা পড়েনি। এদেশীয় তুর্কীদের তিনশ' নমিনেশনের একটিও জমা পড়েনি।

কতকটা মুখ ভেংচিয়েই জেনারেল বোরিস বলে উঠল, জমা পড়েনি। যাদের মনোনয়ন দিলে তারা কোথায় গেল?

ক্রোধে মুখটা বিকৃত হয়ে উঠেছে জেনারেল বোরিসের।

-নমিনেশন পেপার জমা দিতে কেউ আসেনি। বাড়িতে ও পাওয়া যায়নি। সবাই পালিয়েছিল। অনুসন্ধান করে সন্ধ্যার দিকে মোট ১০০ জনকে ধরা হয়েছে। অন্যান্যের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি এখনও।

-এই একশ' জনের নমিনেশন তো জমা করতে পারতে, করনি কেন? জেনারেল বোরিসের চোখে আগুন।

টিটভ দু'হাত কচলে বলল, স্যার বিদেশী সাংবাদিকদের কাছে সব তথ্য চলে গেছে, এখন কিভাবে......

ধমকে উঠল জেনারেল বোরিস, বিদেশী সাংবাদিকদের কে এ্যালাও করল?

-স্যার কেন্দ্রের নির্দেশে এই অফিস থেকেই তো তাদের পাশ দেয়া হয়েছে।

-নির্দেশ থাকলেই সব কাজ করতে দেয়া যায় না। আন্তর্জাতিক মুখ রক্ষার জন্য কেন্দ্রকে অনেক কিছুই করতে হয় কিন্তু তোমাদের সে দায়- দায়িত্ব নেই। নির্দেশ দিয়েছে, যেতে দেব না, কি হবে?

-এ রকম কোন নির্দেশ আমাদের উপর থাকলে...।

-সবই নির্দেশ দিতে হবে, তোমরা কি করবে, ঘোড়ার ঘাস কাটবে? জেনারেল বোরিস থর থর করে কাঁপছিল রাগে।

কিছুক্ষন কথা বলতে পারল না জেনারেল বোরিস। একটু দম নিয়ে বলল, সেই ১০০ জন যাদের ধরেছ, কোথায় রেখেছ তাদের?

-জনাবিশেক আমাদের এখানে আছে। অবশিষ্টরা বিভিন্ন শহরে।

জেনারেল বোরিস উঠে দাঁড়াল। বলল, চল দেখব সেই হারাম-জাদাদের ধড়ে কয়টা প্রাণ আছে।

টিটভ জেনারেল বোরিসকে নিয়ে তার স্বরাস্ট্র বিভাগের প্রিজনারস রুমে প্রবেশ করল।

চোরের মত কোমরে দড়ি বাঁধা বন্দীরা বসেছিল। জেনারেল বোরিস ও টিটভ ঘরে প্রবেশ করতেই তারা উঠে দাঁড়াল।

জেনারেল বোরিস ঘরে ঢুকেই তাদের উদ্দেশ্য করে বলল, নিমক হারাম কুত্তার বাচ্চারা, তোদের নমিনেশন পেপার কোথায়? হারামজাদার বাচ্চা, এই বিশ্বাসঘাতকতা করতে একটুকু ও চক্ষুলজ্জা হলো না?

সামনেই ছিল উজবেকিস্তানের আহমদ নূরভ। সে বলল, আমরা কুত্তার বাচ্চা হারামজাদার বাচ্চা কিছুই নই। আমরা বিস্বাসঘাতকতা করিনি। আমরা যা করেছি সেটা হল আমরা জাতির বিরুদ্ধে যাইনি, জনগণের বিরুদ্ধে যাইনি।

ক্রোধে চিৎকার করে উঠল জেনারেল বোরিস। পাগলের মত পকেট থেকে পিস্তল বের করে আহমদ নূরভকে লক্ষ্য করে গুলী করতে লাগল সে। তিনটা গুলী শেষ হতেই গুঁড়ো হয়ে যাওয়া মাথা নিয়ে মাটিতে ঢলে পড়ল আহমদ নূরভ। তারপর পিস্তল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জেনারেল বোরিস পাশের প্রহরীর কাছ থেকে সাব মেশিনগান হাতে নিল। ট্রিগার চেপে ধরে একবার সেই সাব মেমিন গানটা

ঘুরিয়ে নিল বিস্ফোরিত চোখ সেই ঊনিশ জন বন্দীর উপর দিয়ে। চোখের নিমিষে ঊনিশটি লাশ পড়ে গেল মাটিতে।

রক্তের স্রোত বইল মেঝের উপর দিয়ে।

সাব মেশিন গানটা ফেলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল জেনারেল বোরিস। তার পিছনে পিছনে বেরিয়ে এল টিটভ। তারা প্রায় ধাক্কা খেল দু'জন বিদেশী সাংবাদিকের সাথে। সাংবাদিকদ্বয় তাদের স্টার্ট দেয়া মোটর সাইকেলে চড়ে দ্রুত সরে পড়ল সেখান থেকে। এটা দেখে জেনারেল বোরিস বিষদৃষ্টিতে তাকাল টিটভের দিকে। টিটভ পাশের দু'জন প্রহরীকে নির্দেশ দিল, দেখ হারামজাদাদের পাকড়াও কর। প্রহরী দু'জন গ্যারেজ থেকে গাড়ি নেয়ার জন্য ছুটল।

প্রিজনারস রুম থেকে বেরিয়ে জেনারেল বোরিস পকেট থেকে একটা অর্ডার শিট বের করে তাতে নির্দেশ লিখল নমিনিশন পেপার জমা না দেয়া বিশ্বাসঘাতকদের গুলী করে হত্যার জন্য এই মুহুর্তে। অর্ডার শিটটি টিটভের হাতে তুলে দিয়ে বলল, এখনই রিলে করে দাও সব জায়গায়।

-'ইয়েস স্যার' বলে টিটভ দ্রুত চলে গেল তার রুমের দিকে।

পরদিন গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ল এই খবর।

'সমগ্র মধ্য এশিয়া 'ফ্র' পরিচালিত কম্যুনিষ্ট সরকারের প্রতি সার্বিক অনাস্থা জ্ঞাপন করেছে। সেখানকার জনগন কম্যুনিষ্ট সরকার পরিকল্পিত নির্বাচনে অংশ নেয়নি। যাদের কে একান্ত অনুগত ও বংশবদ মনে করে কম্যুনিষ্ট কর্তৃপক্ষ মনোনয়ন দিয়েছিল, তারাও তাদের নমিনেশন পেপার জমা দেয়নি। মনোনয়ন দেয়া সাড়ে তিনশ' উজবেক, তাজিক, কাজাখ, কিরঘিজ ও তুর্কমেনের একটি নমিনেশন ও জমা পড়েনি। সুতরাং নির্বাচন করে শেষ রক্ষার উদ্যোগটি ও কম্যুনিষ্ট সরকারের ব্যর্থ হয়ে গেল। ইতিপূর্বে 'ফ্র' এর কম্যুনিষ্ট সরকার বিশ্বাসঘাতকতা ও আনুগত্যহীনতার অভিযোগ তুলে সেখানকার সরকার ও কম্যুনিষ্ট পার্টি ভেংগে দিয়েছিল।

প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিকের বিবরণে প্রকাশ, পরাজয়ের ক্রোধে অন্ধ হয়ে 'ফ্র' নমিনেশন জমা না দেয়া তিনশ' নেতৃস্থানীয় লোককে হত্যা করেছে।'

ফিলিস্তিনের সাইমুম সরকার এবং মিন্দানাও-এ পিসিডা সরকারের চেষ্টাতেই এ খবর গুলো  সংগৃহীত হয় এবং বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। তার সাথে সাথে ছড়িয়ে পড়ে মধ্য এশিয়ার অভ্যন্তরের রক্তলেখা হাজারো খবর। হৈ চৈ পড়ে যায় গোটা বিশ্বে। তীব্র চাপ সৃষ্টি হয় মস্কোর উপর।

সেনাবাহিনীর সুদৃশ্য একটি ইয়ট মস্কোভা নদীর ক্রেমলিন ঘাটে এসে ভিড়ল। ইয়ট থেকে প্রথমে নামল মার্শাল পিটার কারেনস্কী। তারপর নামল সেনাবাহিনীর ১০ জন জেনারেল।

মার্শাল পিটার কারেনস্কী বয়সের ভারে দুর্বল। সেনাবাহিনী থেকে অবসর নিয়েছেন অনেকদিন। অবসরকালে তিনি পিতা মনশেভিক নেতা কারেনস্কীর আদর্শ অনুসরণে গনতান্ত্রিক ও মানবতাবাদী আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। জারের বিরুদ্ধে রাশিয়ার গনতান্ত্রিক বিপ্লবের মহান নেতা কারেনস্কীর পুত্র মার্শাল পিটার কারেনস্কীকে সেনাবাহিনী ও জনগণ শ্রদ্ধার সাথে দেখে। সেনাবাহিনীর একটা সর্বোচ্চ প্রতিনিধি দল গিয়ে তাঁকে নিয়ে এসেছে ক্রেমলিনে দেশের হাল ধরার জন্য।

কারেনস্কী ইয়ট থেকে নেমে গাড়িতে উঠতে গিয়ে পাশে রাস্তায় একটা সবুজ লিফলেট পড়ে থাকতে দেখল। ঝুঁকে পড়ে সে তুলে নিল লিফলেটটা। ভিজে গেছে লিফলেটটা তুষার কণায়। তবু নিল সে। তার মনে পড়ছে, গতকাল বিকেলে যখন সে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরছিল, তখন রাস্তায় সকলের হাতে এই রঙের একটা কাগজ দেখেছে। তার মনে হল এ সেই লিফলেটটাই। গাড়িতে উথে লিফলেটের উপর চোখ বুলাল কারেনস্কী। লিফলেটে সে যা পড়ল সংক্ষেপে এই-

'স্বৈরাচারী 'ফ্র' প্রথমে আড়াল থেকে শাসন পরিচালনা করে, পরে স্বমূর্তিতে ক্ষমতায় এসে রুশ জাতিকে এবং জাতির মান-সম্মানকে ধূলায় লুটিয়ে দিয়েছে। ওদের কোন হৃদয় নেই, ওদের অবলম্বনই হল বন্দুক। এ বন্দুক দেশের চিন্তাশীল-বুদ্ধিজীবীদের উজাড় করেছে, দেশটাকেও। এদের বন্দুক আজ গোটা

মধ্য এশিয়ায় রক্তগঙ্গা প্রবাহিত করেছে। সেখানকার প্রতিটি লোক আজ বিদ্রোহী। সেখানে নির্বাচনের শেষ চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে। জনগণ নির্বাচন প্রত্যাহার করেছে। 'খুনি ফ্র'-এর প্রতিশোধ হিসেবে সেখানে হত্যা করেছে নির্বাচন প্রার্থি হতে না চাওয়া শত শত মানুষকে। মানবতা ও গনতন্ত্রের শত্রু 'ফ্র' এর কারণে দুনিয়ায় আজ রুশ জাতির মুখ দেখান ভার হয়েছে। এরা ক্ষমতায় থাকলে দেশ জাতি রসাতলে যাবে। সুতরাং মানবতা ও গনতন্ত্রের বিপ্লবকে সফল করার জন্য আপনারা এক যোগে রাস্তায় নেমে আসুন।'

কারেনস্কীর গাড়ি তখন চলছিল। লিফলেটটা পড়া শেষ হলে কারেনস্কী মুখ তুলে চারদিকে চোখ রাখতেই বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে গেল। এত মানুষ।! এ যে মানুষের সমদ্র। গাড়ি সামনে যতই এগুচ্ছে, মানুষের ভীর ততই বাড়ছে। রেডস্কয়ারে এসে দেখল কোথাও তিল ধারণের স্থান নেই। জনসমুদ্র জুড়ে একটাই শ্লোগান গণতন্ত্র জিন্দাবাদ, মানবতা জিন্দাবাদ, কারেনস্কী জিন্দাবাদ।

কারেনস্কী এবং অন্যান্য জেনারেলদের গাড়ি জনসমুদ্রের মধ্য দিয়ে পথ করে ক্রেমলিনের বেলকণীতে নিয়ে যাওয়া হল। সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল নিলফ একটা দূরবীন কারেনস্কীর হাতে দিয়ে বলল, স্যার চারদিকটা দেখুন।

দূরবীন চোখে লাগিয়ে কারেনস্কী অভিভূত হয়ে গেল। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু মানুষ আর মানুষ, সকল রাস্তা, লেন, বাইলেন মানুষে পরিপূর্ণ।

কারেনস্কী জেনারেল নিলফের সাথে ফিরে এলেন কনফারেন্স হলে। কনফারেন্স হল তখন পরিপূর্ণ। সামরিক বাহিনীর জেনারেলরা আছে এক পাশে দাড়িয়ে। বসে আছেন দেশের গণতন্ত্রবাদী ও মানবতাবাদী সকল নেতা ও ব্যাক্তিবর্গ।

কারেনস্কী এসে প্রেসিডেন্টের চেয়ারে বসল।......

তারপর জেনারেল নিলফ ধীরে ধীরে মাইকের সামনে দাঁড়াল। বলল, মিঃ প্রেসিডেন্ট এবং সমবেত নেতৃমণ্ডলী, দেশের সেবক হিসেবে জনগণের পক্ষ থেকে সেনাবাহিনীর যে টুকু করার সেনাবাহিনী তা করেছে। আমাদের দায়িত্ব শেষ।

আমরা ফিরে যাচ্ছি আমাদের কাজে। দেশকে নেতৃত্ব দেয়া, এগিয়ে নেয়ার দায়িত্ব আপনাদের।

কথা শেষ করে জেনারেল নিলফ সমবেত সকলের প্রতি একটা স্যালুট দিয়ে কনফারেন্স হল থেকে বেরিয়ে গেল। তার সাথে অন্যান্য জেনারেলরাও। কারেনস্কী এরপর পরামর্শের লক্ষ্যে এক ঘণ্টার জন্য কনফারেন্স মূলতবি ঘোষণা করল।

এক ঘণ্টা পরে আবার সবাই ফিরে এল কনফারেন্স হলে। কারেনস্কী গিয়ে প্রেসিডেন্টের আসনে বসল। কনফারেন্সের বেলকণীতে শত শত বিদেশী সাংবাদিক। কারেনস্কীর বক্তব্য সরাসরি দেস-বিদেশের সব জায়গায় ছড়িয়ে দেয়ার জন্য রেডিও টেলিভিশনের মাধ্যমে ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সবাই উন্মুখ হয়ে আছে। অতীত বর্তমান নিয়ে কত কিছু বলবে কারেনস্কী। নীতিনির্ধারণী কত কথা তার মুখ থেকে আসবে।

কারেনস্কী মুখ তুলল। রেডিও টেলিভিশনের ডজন খানেক স্পীকার তার মুখের সামনে। মুখ খুলল কারেনস্কী।

‘জনগণের পক্ষে একটা অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের দায়িত্বশীল হিসেবে আমি আমার জনগণের শুভকামনা করছি, তাদের জন্য একটা সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ নতুন দিনের প্রত্যাশা করছি, যেখানে তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক দুই অধিকার ই নিশ্চিত থাকবে। সেই সাথে বিশ্বের সব মানুষের জন্য আমার শুভেচ্ছা এবং কামনা করছি পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্যে এগিয়ে যাওয়ার সুন্দর বিশ্ব-পরিবেশ।

এক, অস্বস্তিকর অন্তর্বর্তীকালীন অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য অবিলম্বে জনগণের সরকার প্রয়োজন। আমি জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য আজ থেকে ১৫ দিন পর ৬ই নভেম্বর তারিখে সাধারন নির্বাচন ঘোষণা করছি। জনগণের সরকার গঠনের মাধ্যমে গনতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে।

দুই, দেশের সমস্ত বন্দী শিবির, শ্রম শিবির বিলোপ ঘোষণা করছি। একমাত্র ফৌজদারি দণ্ডবিধির অধীনে সাজাপ্রাপ্ত ছাড়া সকলকে মুক্তি দেয়ার কথা ঘোষণা করছি।

তিন, রাজনৈতিক লক্ষ্যে প্রণীত বিবর্তনমূলক বিধি বিধান ছাড়া দেশ পরিচালনায় সাধারণ আইন সমূহ সবই বলবৎ থাকবে।

চার, জনমনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মধ্য এশিয়াকে স্বাধীন সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করছি। আজই সাইমুমের হাতে ঐ সাধারণতন্ত্রের দায়িত্ব ভার তুলে দেবার জন্য আমাদের প্রতিনিধিকে নির্দেশ দিয়েছি।

পুনরায় আমরা জনগন ও বিশ্বের সকল মানুষের অশেষ শুভকামনা করে আমি মার্শাল পিটার কারেনস্কী আমার কাজ শেষ করছি।'

যারা মার্শাল কারেনস্কীর কাছ থেকে লম্বা কিছু শোনার আশা করেছিল, একে ওকে গালিগালাজ করার দৃশ্য উপভোগ করতে উন্মুখ হয়েছিল এবং নিজের প্রশস্তি সহ বড় বড় বুলি শ্রবণ করার জন্য নিজেকে তৈরি রেখেছিল, তারা চুপসে গেল। চুপসে গিয়ে ভাবল সত্যি তাহলে নতুন দিনই এদেশে আসছে।

ওলগা টেলিভিশনের সামনেই বসেছিল ওর ছোট্ট রুমটিতে। কারেনস্কীর ঘোষণা শুনে সে চিৎকার করে উঠলো। হৃদয়ের সব উচ্ছ্বাস যেন চিৎকার করে বেরিয়ে এল তার বুক থেকে। মাকে আবার দেখতে পাবে, এই আনন্দ এই আবেগে বুক কাঁপতে লাগল। সবই স্বপ্ন মনে হচ্ছে তার কাছে। হঠাৎ মনে হল ফারহানার কথা। ফারহানা বলেছিল, আল্লাহ সব কিছুই করেন, করতে পারেন। আরও মনে পড়ল তার ভলগার তীরে রেস্ট হাউজে ফারহানা বলেছিল অত্যাচারীদের আল্লাহ এ দুনিয়াতেও শাস্তি দেন, এর দৃষ্টান্তে অতীতের ইতিহাস ভরপুর। ফারহানার কথাই সত্যি হল। উফ ফারহানা যদি এখন থাকত তাহলে ওকে জড়িয়ে ধরে ওর ধর্ম গ্রহণ করে ওর সাথে এক হয়ে যেতাম। পরক্ষনেই ভাবল, কেন, ওকে কি দরকার, ওর আল্লাহকে, ওর ধর্মকে তো আমি একাই গ্রহণ করতে পারি। সেই কালেমা তো সে আমার নোট বইতে লিখে দিয়েছে।

ওলগা দৌড়ে গিয়ে সুটকেস থেকে তার নোট বই বের করল। পাতা উল্টাল ঝরের মত খস খস করে। হ্যাঁ, পাওয়া গেছে। এই তো লেখা আছে আরবী ভাষায়, আবার রুশ ভাষায় সেই কালেমা এবং তার অর্থ ফারহানা বলেছে, আল্লাহকে এক অদ্বিতীয় জেনে, তিনি ছাড়া আর সকলের সার্বভৌম ক্ষমতা অস্বীকার করে এবং

আল্লাহ্ ও তার নবীর আদেস-নিষেধ মানার স্বীকৃতি পাঠ করলেই সে মুসলমান হয়ে যায়।

ওলগা এই কালেমা পড়তে গিয়েও থেমে গেল। ফারহানা বলেছে, অজু করে পাক সাফ হয়ে এই কালেমা পড়ে মুসলমান হতে হয়। নোট বুকটা বুক সেলফে রেখে ওলগা বাথরুমে গিয়ে অজু করে এল। তারপর নোট বই হাতে নিয়ে ধীর কণ্ঠে ঐ কালেমা পাঠ করল এবং তার অর্থও পড়ল।

নোট বইটা সুটকেসে রেখে পড়ার টেবিলে এল ওলগা। আগের উত্তেজিত অবস্থা এখন আর তার নেই। ভাবছে সে, এখন আর আগের সেই ওলগা সে নয়, সে মুসলমান। একটা অপরিচিত ধরনের তৃপ্তি বোধ হচ্ছে তার। সেই সাথে মনে হচ্ছে কে যেন তার মাথার উপরে আছেন। তিনি দেখছেন তাকে। ভালমন্দ সব কাজই তিনি দেখছেন, দেখবেন। ভয় হল ওলগার অন্যায় কিছু করে বসবে নাতো? ফারহানাকে সে নামাজ পড়তে দেখেছে, নামাজ নাকি বাদ দেয়া যায় না। কিন্তু সে নামাজ পড়তে জানে না। করবে কি সে এখন? হৃদয়ে একটি যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ল তার। হঠাৎ তার মনে পড়ল ফারহানা একদিন বলেছিল, যে মানুষ যতটুকু জানবে, বুঝবে ততটুকু ন্যায়-অন্যায়ের জন্য দায়ী। মনে সান্ত্বনা পেল ওলগা।

এই সময় টেলিফোন বেজে উঠলো। টেলিফোন ধরতেই ওপার থেকে তার খালাম্মার গলা শোনা গেল। বলল, কেমন আছ ওলগা খবর শুনেছ?

-জি, শুনেছি বলল ওলগা।

-শোন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে টেলিফোন করে জেনে নাও তোমার মা কখন কিভাবে আসছেন।

-আচ্ছা ঠিক আছে।

-যদি জানতে পার আমাকে জানিও।

ওলগার খালাম্মা আগে এই মস্কোতেই ছিল। কিন্তু মস্কোভা বন্দী শিবির থেকে আয়েশা আলিয়েভা ও রোকাইয়েভা পালানোর পর সন্দেহ গিয়ে ওলগার মা ডঃ নাতালোভার উপর পড়ে। সেই সুত্রে তারা ওলগা এবং খালাম্মাকে সন্দেহ করে। অনুমান কোন প্রমান তারা পায়নি। এরপরও শাস্তি হিসেবে ওলগার স্টাইপেন্ড কাটা গেছে এবং খালাম্মাদের ট্রান্সফার করা হয়েছে দূর স্টালিনগ্রাদে।

খালাম্মার টেলিফোন পেয়ে ওলগা খুশি হল। খুশি হল তার মার অনুসন্ধানের একটা সুত্র পেয়ে।

ওলগা টেলিফোন করল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে। মন্ত্রণালয়ের জনৈক পদস্থ অফিসার ডঃ নাতালোভার মেয়ে ওলগার পরিচয় পেয়ে খুশি হয়ে তার মার মুক্তির জন্য তাকে অভিনন্দন জানাল। তারপর বলল, ওদের আসার ব্যাপারে প্ল্যান তৈরি হচ্ছে। কালকে তোমাকে জানাতে পারব।

পরদিন ওলগা জানতে পারল আগামী কাল ভোরে তার মা এসে মস্কো রেলওয়ে স্টেশনে নামছেন।

ওলগা খুশিতে যেন শিশু হয়ে গেল। কি করবে না করবে তার কুল কিনারা করতে পারছে না। ফারহানার নামাজের মত হাঁটু মুড়ে বসে সে হাত তুলে প্রার্থনা করল, হে আল্লাহ ! তোমারই সব দয়া, তোমারই অনুগ্রহ সব।

তুমি আমার মাকে নিরাপদে আমাদের মাঝে পৌছাও।

পরদিন সকালে বরফ ঠেলে ওলগা স্টেশনে পৌছাল। আত্মীয় স্বজনদের প্রচন্ড ভীড় স্টেশনে। তাদের লাইন করে দাঁড় করানো হয়েছে। মুক্তি প্রাপ্ত বন্দীদের স্বাগত জানানোর জন্যে সরকারী লোকজনও এসেছে। অনেককে সরকারী ব্যবস্থাপনায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কেউ আত্মীয়-স্বজনদের সাথে যাচ্ছে। বহু বছর পর মিলনের সে কি কান্না বিধুর দৃশ্য। যারা ট্রেন থেকে নামছে, যে আত্মীয়-স্বজনরা তাদেরকে রিসিভ করছে সবাই কাঁদছে।

ছোট্ট একটা হ্যান্ডব্যাগ হাতে ডঃ নাতালোভা নামল ট্রেন থেকে।

একজন সরকারী অফিসার তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, ডঃ নাতালোভা, সরকারের পক্ষ থেকে আমি আপনাকে নিতে এসেছি।

ডঃ নাতালোভা মুখ তুলে তাকে ধন্যবাদ জানাল। বলল, আমার ওলগা কোথায়?

সরকারী অফিসার বলল, কালকে আমি কথা বলেছি, সে আসবে, নিশ্চয় এসেছে।

এসময় ওলগা ছুটে এল লাইন থেকে। ডঃ নাতালোভা তাকে দু'হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরল। মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে ওলগা কাঁদছে। কান্নার আবেগে

তার দেহটা ফুলে ফুলে উঠছে। আর ডঃ নাতালোভার দু'চোখ বেয়ে নামছে নিঃশব্দে অশ্রু। অন্তরের বহু বছরের জমাট বেদনা যেন গলে গলে পড়েছে চোখ দিয়ে। মা ও মেয়ে কতক্ষণ যে এইভাবে থাকল।

সরকারী অফিসারটির চোখ দুটিও সিক্ত হয়ে উঠেছে। একটু এগিয়ে নাম সুরে বলল, ম্যাডাম আপনার জন্যে গাড়ি প্রস্তুত। সরকার আপনার জন্য বাড়িরও ব্যবস্থা করেছে।

মায়ের বুক থেকে মুখ তুলে ওলগা বলল, মা আপাতত আমার ওখানেই উঠবেন।

হ্যাঁ, আমি ওলগার ওখানেই উঠবো তারপর অন্যকিছু। বলল, ডঃ নাতালোভা।

ঠিক আছে, আমি আপনাদের পৌছে দেব ওলগার ওখানে।

ডঃ নাতালোভা এবং ওলগা হাত ধরাধরি করে সরকারী অফিসারটির পেছনে পেছনে স্টেশন থেকে বেরিয়ে এল। ওলগার ছোট ফ্লাটে ওদের পৌছে দিয়ে অফিসারটি নিজের কার্ড আর একগোছা চাবি ডঃ নাতালোভার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, ম্যাডাম আপনার বাড়ির চাবি এটা এবং এই আমার কার্ড। আপনি যখনই আমাকে বলবেন আমি আপনাকে সেখানে পৌছে দেব।

বলে অফিসারটি চলে গেল।

মায়ের কোলে মুখ গুজে ওলগা বলল, মা এই মুহূর্তে কার কথা সব চেয়ে বেশী মনে পড়ছে জান?

-কার কথা? বলল ডঃ নাতালোভা।

-আয়েশা আলিয়েভা এবং ফারহানা আপার কথা।

-আয়েশার কথা এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলিনি আমি। মেয়েটির কথা কোন দিনই ভুলব না। আর ওদের জন্যেই তো আমাদের এই মুক্তি, দেশের এই স্বাধীনতা, ওদের ঋণ অপরিশোধ্য ওলগা। একটু থেমে নাতালোভা আবার বলল কিন্তু তোমার ফারহানাকে তো চিনলাম না।

-ও আমার সহপাঠী সাইমুমের কর্মী। সেই তো অদ্ভুত সাহসিকতার সাথে খালাম্মার বাড়ি থেকে আয়েশা আলিয়েভা এবং রোকাইয়েভাকে সরিয়ে নিয়ে

আমাদের পরিবারকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছে। কোটি লোকের ভীড়ে সেই-আমার একান্ত আপন ছিল যার কাছে মন খুলে কিছু বলতে পারতাম। মা, আমার স্টাইপেন্ড কাটা গেলে সেই আমার সাহায্যে এগিয়ে আসে।

-কোথায় সে ওলগা?

-ওরা সবাই তুর্কিস্তানে চলে গেছে কদিন আগে।

দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকল। তারপর মায়ের একটা হাত হাতে নিয়ে নাড়তে নাড়তে ওলগা বলল, মা জান আমি ফারহানার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি।

ডঃ নাতালোভা বিস্মিত হলো না। এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল ওলগার দিকে। শেষে বলল, কেন বলত?

-আমার ভাল লেগেছে। মনে হয়েছে ওটাই একমাত্র জীবন ধর্ম। ওর মধ্যে গোটা জীবন আছে। মানুষের শান্তি ও সংশোধনের ধর্ম মনে হয়েছে ইসলামকে।

-তুই জীবনটাকে এত বুঝেছিস ওলগা, বলে মেয়েকে একটা চুমু খেল ডঃ নাতালোভা। তারপর বলল, ইসলাম সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পেরেছে এবং স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে সমর্থ হয়েছে। মধ্য এশিয়ার তুর্কী জাতির মত অনেকেই তো কম্যুনিষ্ট শৃংখলে বাধা পড়েছে, তারাও স্বাধীনতা চায় কিন্তু ইসলামের মত জীবন্ত ও অফুরন্ত শক্তির উৎস তাদের নেই বলে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না তারা।

মা তুমিও কি ইসলাম...কথা শেষ না করেই থেমে গেল ওলগা। ডঃ নাতালোভা হেসে বলল, নারে ইসলাম আমি এখনও গ্রহণ করিনি। তবে ইসলামকে আমি ভালবেসেছি। পড়াশুনা করছি এর উপর। রুশ ভাষায় অনুদিত ইসলাম পরিচিতি নামক বইটা আমাকে চমৎকৃত করেছে। ঐ লেখকের তাফহীমুল কোরআন নামক কোরআনের ইংরেজী কমেন্ট্রী আছে, ওটা এখন আমি জোগাড় করতে চেষ্টা করব। খুশি হয়েছি তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছ। আমাকে সাহায্য করতে পারবে।

এ সময় টেলিফোন বেজে উঠল।

টেলিফোন ধরে ওপারের কথা শুনেই ওলগা টেলিফোন মুখে রেখেই চিৎকার করে উঠল মা, আয়েশা আপা। তারপর বলল, কেমন আছ আয়েশা আপা? মাকে ফিরে পেয়েছি, এই তিনি আমার পাশে।

ডঃ নাতালোভা গিয়ে টেলিফোন ধরল। ওপার থেকে আয়েশা আলিয়েভা বলল, খালাম্মা আপনি মুক্ত? আপনি এসেছেন? উহ্ আল্লাহ তুমি রহমান।

ডঃ নাতালোভা বলল, আল্লাহ এনেছেরে। আর আল্লাহ তোমাদের দিয়েই তো এটা করালো। তোমাদের সকলের প্রতি আমার মোবারকবাদ। কেমন আছিস আয়েশা তুই?

-ভাল খালাম্মা, তোমাকে যদি এখন দেখতে পেতাম?

-দেখা তো হবেই, সব কিছু ঠিক হয়ে যাক।

একটু থেমে ডঃ নাতালোভা বলল, জানিস আয়েশা, আমার ওলগা কি করেছে?

-কি খালাম্মা?

-ওতো একা একাই ইসলাম গ্রহণ করে বসে আছে, অথচ মুসলমান হয়ে কি করতে হবে না হবে কিছুই জানে না। পাগলী মেয়ে। বসে বসে শুধু হাত তুলে দোয়া করে।

-ওতো আমার বোন, কি যে খুশি হলাম খালাম্মা। ওকে একটু দিন। ওলগা এসে টেলিফোন ধরল। আয়েশা আলিয়েভা বলল, খোশ আমদেদ বোন ওলগা। কাছে থাকলে তোমাকে চুমু খেতাম। কি যে খুশী হয়েছি। ফারহানা দেশের বাড়িতে। জানাবো ওকে আমি। কি যে খুশি হবে শুনলে।

একটু থেমে বলল, একটা ঠিকানা নাও। এ ঠিকানায় গিয়ে তুমি প্রয়োজনীয় উপদেশ পাবে, বই পুস্তক পাবে। তোমার কোন অসুবিধা হবে না। চুমু নিও, আজ আসি, খালাম্মাকে দাও।

ডঃ নাতালোভা টেলিফোন ধরলে আয়েশা আলিয়েভা বলল আজ আসি, আপনি বিশ্রাম নিন। পরে আবার যোগাযোগ করব।

-বেশ তোমাদের কল্যাণ হোক বলে টেলিফোন রেখে দিল ডঃ নাতালোভা।

# ৭

মার্শাল কারেনস্কী সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মিখাইল পেত্রভ সেদিন তাসখন্দে এসে পৌছল বেলা দশটায়। বিমান বন্দরে তাকে স্বাগত জানাল সাইমুম নেতা কুতাইবা। তাসখন্দের শাসন ও শান্তি রক্ষার দায়িত্ব সাইমুম নেতা কুতাইবার উপরই অর্পণ করে হয়েছে।

এর আগে মস্কোতে 'ফ্র' সরকারের পতনের সাথে সাথে তাসখন্দ থেকে জেনারেল বোরিস তার দলবল নিয়ে পালিয়ে যায়। সরকারী কোষাগার উজাড় করে কোটি কোটি টাকা এবং একটি ট্রাক বহর বোঝাই অস্ত্র নিয়ে তার দলবল সহ পালিয়ে গেছে জেনারেল বোরিস সেদিন রাত দুপুরে।

সকালেই সাইমুম প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছে এবং কুতাইবার হাতে তাসখন্দের দায়িত্ব অর্পণ করেছে।

বিমান বন্দর এবং গোটা শহরে সাদা ইউনিফর্ম পরে সাইমুম কর্মীরা শৃংখলা বিধানের দায়িত্ব পালন করছিল। জীবন যাত্রায় কোথাও কোন অস্বাভাবিকতা নেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী লেনদেন ছাড়া সব কিছুই আগের মত চলছে। আগের থেকে শুধু একটাই বড় পার্থক্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে সেটা হলো জীবন যাত্রায় কোন আড়ষ্টতা নেই, সবাই প্রাণ খুলে হাসছে। মসজিদ মিনারের যে মাইকগুলো বন্ধ ছিল, তা আবার মুখ খুলেছে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে সেখান থেকে আযানের উদাত্ত আহ্বান ধ্বনিত হচ্ছে। যে সব মসজিদকে ক্লাব ও কম্যুনিটি হলে পরিণত করা হয়েছিল, সেসবগুলোকে জনগণ আবার ফিরিয়ে নিয়ে মসজিদ বানিয়েছে। বহু বছর পর সেখান থেকে আযানের পবিত্র আহ্বান ধ্বনিত হচ্ছে। মানুষ দলে দলে আসছে সেখানে নামায পড়তে।

কুতাইবা মিখাইল পেত্রভকে প্রধান মন্ত্রীর বাসভবনে এনে তুলল। গিয়ে বসল তারা প্রধানমন্ত্রীর অফিসেই। প্রধানমন্ত্রীর আসন খালি থাকল দু'জনের কেউই সেখানে বসল না।

বসে সোফায় হেলান দিয়ে মিখাইল পেত্রভ বলল, সব ঠিক-ঠাক চলছে তো? অন্তর্বর্তীকাল বড় একটা দুঃসময়।

কুতাইবা বলল, অসুবিধা হচ্ছে না। রুশ কর্মচারীদের কেউ কেউ কোন কোন অফিস থেকে পালিয়েছে। আমরা চেষ্টা করছি এমনটা না ঘটে। স্বাভাবিক ভাবে কর্মচারী বিনিময়ের মাধ্যমেই এ সমস্যা দূর করা যাবে।

-আইন শংখলার কোন অসুবিধা নেই তো? জেনারেল বোরিস কোথায় পালালো?

-না কোন অসুবিধা নাই। জনগণের প্রত্যেকেই একজন পুলিশের দায়িত্ব পালন করছে। সার্বিক তদারকিতে আছে সাইমুম কর্মীরা।

একটু থেমে কুতাইবা আবার শুরু করল, জেনারেল বোরিস পামিরের পথে পূর্ব দিকে পালিয়েছে। আমরা ইচ্ছে করলে তাকে আটকাতে পারতাম কিন্তু আমরা তা করিনি। ও ছিল একটা সিস্টেমের অংশ, ব্যক্তি বোরিসের সাথে আমাদের কোন বিরোধ নেই।

-সত্যি কুতাইবা আহমদ মুসা এবং তোমরা জগতকে বিস্মিত করেছ। শক্তি এবং উদারতা দুটোতেই। রুশরাও তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ। তোমরা না এগুলে, 'ফ্র' এর উপর তোমরা সফল আঘাত না হানতে পারলে ঐখানে সেনাবাহিনীর চোখ খুলত না। এবং গণতন্ত্রী ও মানবতাবাদীরা এত তাড়াতাড়ি বর্তমান অবস্থানে আসতে পারতো না। মধ্য এশিয়ার সার্বিক বিদ্রোহ আমাদের বলে দিয়েছে, জনগনের প্রতিরোধ শক্তি এখনও মরে যায়নি, তারা যে কোন শক্তিমানের যে কোন পাষাণ কারা ভাঙতে পারে।

বলতে বলতে মিখাইল প্রেত্রভের চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

-এ কৃতিত্ব মোটেই আমাদের নয়। আল্লাহ আমাদের প্রতি রহম করেছেন এবং দূরদর্শী কুশলী সংগ্রামী নেতা আহমদ মুসাকে আমাদের মাঝে পাঠিয়ে তিনি আমাদের সাহায্য করেছেন। বলল কুতাইবা।

-আহমদ মুসা কোথায়? জিজ্ঞেস করল প্রেত্রভ।

-তিনি এখন বোখারায়।

মুহূর্ত কয়েক চুপ করে থাকল মিখাইল প্রেত্রভ। তারপর বলল, আমি আজই সন্ধ্যায় ফিরে যেতে চাই, ক্ষমতা গ্রহণের অনুষ্ঠানটি কোথাই কিভাবে হচ্ছে?

-আহমদ মুসা বোখারায় আছেন, সে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা তিনি সেখানেই করেছেন।

-রাজধানীতে নয় কেন?

-বোখারাও তো এক সময় রাজধানী ছিল।

মিখাইল প্রেত্রভ কুতাইবার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। মুখে তার হাসি ফুটে উঠলো। বলল বুঝেছি, সূর্য যেখানে ডুবেছিল, সেখান থেকেই সূর্যের উদয় ঘটাতে চাও তোমরা।

এই সময় ঘরে প্রবেশ করল আনোয়ার ইব্রাহিম। সাইমুমের পক্ষ থেকে সে তাসখন্দ জোনের সিকিউরিটি প্রধানের দায়িত্ব পালন করছে। ঘরে ঢুকে সে বলল, নাস্তা তৈরি আপনারা এলে বাধিত হবো।

নাস্তা শেষ হলো।

আনোয়ার ইব্রাহিম বলল, বোখারায় যাবার সবকিছু রেডি। ক'টায় বেরুনো যাবে?

কুতাইবা বলল, আমরা ১২ টায় বেরুবো। মুসা ভাই এর সাথে এ রকম কথা হয়েছে।

মিখাইল প্রেত্রভ এবং কুতাইবাদের নিয়ে বিমানটা যখন বোখারা বিমান বন্দরে পৌছাল তখন ১টা। বিমান বন্দরে তাদের স্বাগত জানাল আহমেদ মুসা, হাসান তারিক, আলী ইব্রাহিম, আলদর আজিমভ প্রমুখ সাইমুম নেতারা।

সবাই এসে উঠলো সরকারি অতিথি ভবনে। বিমান বন্দর থেকে আসার পথেই তারা ইমাম বোখারী মসজিদের আজান শুনল। সরকারী অতিথি ভবন

থেকে দূরে নয় ইমাম বোখারীর বিখ্যাত মাদ্রাসা ও মসজিদটা। সবাই ওখান থেকে নামায পড়ে এল। তারপর খাওয়া দাওয়া শেষ করল।

আহমদ মুসা অতীতের স্মৃতি বিজড়িত ইমাম বোখারীর বিখ্যাত মাদ্রাসা চত্বরকেই ক্ষমতা গ্রহণের মঞ্চ হিসেবে বেছে নিয়েছেন। সকাল থেকেই লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠেছে মাদ্রাসার গোটা এলাকা। কাজাকিস্তান ও উজবেক এলাকা থেকে দলে দলে লক এসে হাজির হয়েছে বোখারায়।

উঁচু প্রাচীর ঘেরা ইমাম বোখারী মসজিদে নেতৃবৃন্দ অবস্থান করছেন। মাদ্রাসার বিশাল গেটের বাইরে মঞ্চ সাজানো হয়েছে। সামনের জায়গাটা পরিষ্কার করে বিশাল ময়দানে পরিণত করা হয়েছে।

ঠিক আসরের নামাযের পরেই অনুষ্ঠান শুরু হল। আসর নামাযের পর মানুষ বসেছিল, সেই বসা থেকে তাদের আর উঠতে হল না। কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হল অনুষ্ঠান। কোরআন তেলাওয়াত করলেন ইমাম বোখারী মাদ্রাসার তরুণ মোহাদ্দেস সাইমুমের কর্মী হাফেজ মহিউদ্দিন বোখারী। তাঁর দরাজ কণ্ঠের প্রাণ স্পর্শী তেলাওয়াত লাখো জনতার মাঝে এক অভূতপূর্ব ভাবাবেগের সৃষ্টি করল। অনেকেরই মন চলে গিয়েছিল সুদূর অতীতে। এই বোখারায় এমন মুক্ত কণ্ঠের তেলাওয়াত একদিন হতো। তারপর কতদিন তা আর শোনা যায়নি। কে জানত আবার তা যাবে শোনা এমন করে। আল্লাহ্‌র অশেষ রহমত। তিনি ইমাম বোখারির বোখারাকে, ইমাম মুসলিমের বোখারাকে এবং লাখো মুসলিমের বোখারাকে আবার মুক্ত করেছেন। অনেকের চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল।

কোরআন তেলাওয়াত শেষ হলে আহমদ মুসা মাইকে দাঁড়ালেন। লাখো উদ্বেলিত জনতার উদ্দেশ্যে সালাম জানিয়ে তিনি বললেন, ‘আজ শুকরিয়া জ্ঞাপনের দিন। আপনারা রাব্বুল আলামিনের প্রশংসা-কীর্তন করুন। আর আজ আমাদের নেতা মুহাম্মাদ রসুল্লাহকে মুক্ত কণ্ঠে হৃদয় ভরে সালাম জানাবার দিন। আপনারা তার জন্য দুরুদ পাঠ করুন। মুক্ত মধ্য এশিয়ার মুক্ত এই বোখারা নগরীতে মুসলিম সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আমরা সমবেত হতে পেরেছি আল্লাহর অশেষ দয়ার ফলেই এবং তার নবী (স) এর পথ অনুসরণের মাধ্যমেই। এই

মহানগরীর পতনের মাধ্যমেই একদিন এই ভূখণ্ডে দু'শ বছরের মুসলিম শাসনের পতন ঘটেছিল, গলায় নেমে এসেছিল আমাদের পরাধীনতার শৃঙ্খল। আজও চোখে ভাসছে, এই  মহানগরীর পতনের শেষ মুহূর্তে  ধন-সম্পদ রক্ষায় আকুল, প্রাণ ভয়ে ভীত দুর্বল ঈমানের শাসকরা পালিয়েছেন কিন্তু এই মাদ্রাসা চত্বরে মুজাহিদরা এক হাতে কোরআন জড়িয়ে, অন্য হাতে তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন লাল ফৌজের সাথে। তাঁরা শেষ রক্ষা করতে পারেননি। তাদের পতাকা ভূলুণ্ঠিত হয়েছিল। সেই ভূলুণ্ঠিত পতাকা আজ আমরা তুলে ধরব আবার। এই পতাকা তুলে ধরবেন সাইমুম নেতা, কর্নেল কুতাইবা। নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত তিনই দেশকে নেতৃত্ব দেবেন আপনাদের অনুমতি নিয়ে। আপনারা সম্মত আছেন?

লক্ষ্য লক্ষ্য হাত উপরে উঠলো। ধ্বনি উঠলো লক্ষ্য কণ্ঠে, নারায়ে তাকবীর, আল্লাহ্ আকবর, আহমদ মুসা জিন্দাবাদ, কর্নেল কুতাইবা জিন্দাবাদ, সাইমুম জিন্দাবাদ।

জনতার কণ্ঠ নীরব হয়ে এলে আহমদ মুসা বলল, আমি ভাই কুতাইবাকে জনতার সামনে দাঁড়িয়ে তার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ করছি।

কুতাইবা কাঁদছিল। কয়েকজন ধরে তাকে মাইকের সামনে নিয়ে এল। সে আহমদ মুসাকে জড়িয়ে ডুকরে কেঁদে উঠলো। কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বলল, মুসা ভাই আপনি সরে দাঁড়াবেন না। এ দায়িত্ব আপনার। আমার উপর জুলুম করবেন না।

আহমদ মুসা তার কপালে একটা চুমু খেয়ে বলল, ভাই আন্দলনের তরফ থেকে যার উপর যে দায়িত্ব আসবে তা গ্রহণ করতে পিছপা না হওয়াই তো ইসলামের শিক্ষা। তুমি না ইসলামের সৈনিক! এমন দুর্বল হলে চলবে কেন?

বলে তাকে মাইকে দাঁড় করিয়ে দিল আহমদ মুসা। কুতাইবা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বিসমিল্লাহ বলে সংক্ষেপে শুধু এইটুকু বলতে পারল, 'আমাদের নেতা মুসা ভাইয়ের কণ্ঠে যে দায়িত্বের ঘোষণা হয়েছে, যে দায়িত্বের জন্য আপনারা আমাকে সমর্থন করেছেন, আল্লাহকে হাজির-নাজির জেনে তাঁর সাহায্যের উপর ভরসা করেই সে দায়িত্ব আমি গ্রহন করলাম। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।'

কুতাইবা সরে এল মাইক থেকে। প্রথমেই আহমদ মুসা তাকে জড়িয়ে ধরে স্বাগত জানাল। তারপর একে একে এল হাসান তারিক, আলদর আজিমভ, আনোয়ার ইব্রাহিম, আলী ইব্রাহিম প্রমুখ সাইমুম নেতারা। সবশেষে রুশ সাধারণ তন্ত্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মিখাইল প্রেত্রভ কুতাইবার একটা হাত তুলে নিয়ে চুমু খেয়ে তাকে স্বাগত জানাল।

এরপর রুশ সাধারণ তন্ত্রের পক্ষ থেকে মিখাইল প্রেত্রভের কথা বলার পালা।

মিখাইল প্রেত্রভ মাইকে এলেন। জনতাকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বললেন, আপনাদের আবেগ-অনুভুতি, আপনাদের উৎসাহ উদ্দীপনা এবং স্বাধীনতা-প্রীতি, আপনাদের নৈতিকতা, চরিত্র এবং ইতিহাস সৃষ্টি আমাকে অভিভূত করেছে। রুশ সাধারণতন্ত্রের পক্ষ থেকে আপনাদের মধ্য এশিয়া মুসলিম সাধারণতন্ত্রের সরকার এবং জনগণকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি এবং আপনাদের স্বাধীনতাকে আমি অভিনন্দিত করছি। এই সাথে দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে অব্যাহত সুসম্পর্ক ও সহযোগিতা রক্ষা করে চলার ব্যাপারে রুশ সাধারণতন্ত্রের পক্ষ থেকে আমি প্রতিশ্রুতি দান করছি।

কথা শেষ করলেন মিখাইল প্রেত্রভ।

তিনি মাইক থেকে সরে এলেন। আহমদ মুসা তাকে জড়িয়ে ধরে স্বাগত জানালেন। তারপর কুতাইবাও।

এরপর লক্ষ কণ্ঠের তকবীর ধ্বনির মধ্য দিয়ে এশিয়া মুসলিম সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট কর্নেল কুতাইবা কালেমা খচিত পতাকা উত্তোলন করলেন। আহমদ মুসার কান্না বিজড়িত এবং হৃদয় নিংড়ানো মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হল মধ্য এশিয়া মুসলিম সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানটি।

অনুষ্ঠানের ডায়াস থেকে নামছিলেন আহমদ মুসা। এমন সময় আহমদ মুসার সেক্রেটারি হিসেবে নিযুক্ত আবু আমর একটা চিঠি দিলেন তাঁর হাতে। ডায়াস থেকে নেমে খাম খুলে দেখল ফাতিমা ফারহানার চিঠি। চিঠি দেখেই চমকে উঠলো, কোন খারাপ খবর নয় তো।

পড়ল চিঠি। চিঠিতে ফারহানা লিখেছে তার পিতা খুবই অসুস্থ, দ্রুত অবস্থার অবনতি ঘটছে। তার পিতা দেখতে চায় একবার আহমদ মুসাকে। আহমদ মুসা চিঠিটা কুতাইবার হাতে দিল। কুতাইবা পড়ে তা হাসান তারিকের হাতে দিল।

কুতাইবা বলল, মুসা ভাই হেলিকাপ্টার নিয়ে আজই চলে যান আপনি। হাসান তারিক বলল, ব্যবস্থা তাহলে করে ফেলি মুসা ভাই?

আহমদ মুসা মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বলল, বেশ কর।

# ৮

আল্লাবখশ গ্রামের মাঝখানে কম্যুনিটি ময়দানে আহমদ মুসার হেলিকপ্টার গিয়ে নামল। গ্রামে এই প্রথম একটি হেলিকপ্টারের অবতরণ। গ্রামের বহু লোক সেখানে জমা হয়েছে। আবদুল্লায়েভ এবং ইকরামভও সেখানে এসছে। সকলের মনেই জিজ্ঞাসা কে আসছে?

ছোট্ট এটাচিকেস হাতে আহমদ মুসা নামল হেলিকপ্টার থেকে। এখানে কারও সে পরিচিত নয়। শুধু ইকরামভ তাকে চিনল। বড় ভাই আবদুল্লায়েভ কে বলল, ইনিই আহমদ মুসা।

শুনেই আবদুল্লায়েভ দ্রুত সেদিকে ছুটল। কাছে গিয়ে বলল, মুসা ভাই আমি আবদুল্লায়েভ, ফারহানার বড় ভাই।

আহমদ মুসা তাকে জড়িয়ে ধরল। বলল, দেখা এতদিন হয়নি কিন্তু আপনাকে জানি, বহু শুনেছি আপনার তৎপরতার কথা।

ইকরামভ কাছে আসতেই আহমদ মুসা তাকে জড়িয়ে ধরল। কপালে চুমু খেয়ে বলল, এতদিন পরে মুসা ভাই?

-জান তো, কেমন অবস্থায় কেটেছে দিন, বলে তিনজন চলতে শুরম্ন করল। ইকরামভ আহমদ মুসার হাত থেকে এটাচি কেস নিজের হাতে নিয়েছে।

চলতে চলতে আহমদ মুসা আবদুলস্নায়েভকে বলল, আব্বা কেমন আছেন?

-ভাল নয়, গতকাল থেকে কথাও ভাল করে বলছেন না।

-এই অবস্থায় হাসপাতালে নেয়াই ভাল হবে।

-কিন্তু উনি কিছুতেই রাজী হন না।

-আপনারা রাজী থাকলে আমি কালই হেলিকপ্টারে তাঁকে তাসখন্দ নিয়ে যেতে চাই।

-ফারহানাও যদি রাজী হয় আমরা খুশীই হব।

-কেন ফারহানা রাজী নয়?

-তার কথা হল, আব্বা যা চান না, তাঁর জীবনের শেষ কালে তা করা আমাদের উচিত নয়।

-ঠিক আছে দেখা যাবে।

আহমদ মুসাকে এনে তুলল তারা আগের সেই বৈঠকখানাতেই। তবে এবার বৈঠকখানা কিছু বদলেছে। ফরাশের বদলে চেয়ার-টেবিল, সাধারণ খাটিয়ার বদলে সুন্দর খাট।

আহমদ মুসা বলল, অনেক পরিবর্তন তো দেখছি আবদুল্লায়েভ?

-হ্যাঁ, এগুলো ফারহানার কাজ। আমরা আব্বাকে বুঝাতে পারিনি, সেই আব্বাকে মতে এনে এসব করেছে।

বৈঠকখানায় বসে আহমদ মুসার মনে পড়ল প্রথম দিনের কথাগুলো।

মাত্র একদিনই সে এদের মাঝে ছিল। কিন্তু এক দিনই এই পরিবারের সাথে যেন সে এক হয়ে গেছে। বৃদ্ধ আবদুল গফুর তাকে তার হারানো ছেলের মতই স্নেহ করে। যাবার দিন ইকরামভের অশ্রুর কথা তার আজও মনে আছে। আর ফারহানা? চিন্তা করতে আর সাহস হল না আহমদ মুসার।

আবদুল্লায়েভ এবং ইকরামভ ভেতরে গিয়েছিল। বৈঠকখানার ভেতরে দরজার ওপাশে পায়ের শব্দ হলো। পর মুহূর্তে সালাম দেয়র শব্দ ভেসে এল ওপাশ থেকে। ফারহানার গলা।

আহমদ মুসা সালাম নিয়ে বলল, কেমন আছ ফারহানা?

-আপনার দোয়ায় ভাল আছি।

-আয়েশা-রোকাইয়েভাদের খবর শুনেছ?

-জী।

ফারহানা একটু থেমেই বলল, আপনাকে যদি মোবারকবাদ দিতে চাই তাহলে কি দোষ হবে?

-কেন, কি মোবারকবাদ?

-মনে আছে নিশ্চয়, এই বৈঠকখানাতেই একদিন আমি এই বিপ্লবকে অসম্ভব বলেছিলাম। আল্লাহর কি ইচ্ছা সেই বিপ্লব সফল করেই আপনি এই বৈঠকখানায় আবার এলেন।

-এ বিপ্লব তো তোমরা সবাই মিলে করেছ। আমার মোবারকবাদ তোমরা নিলে তোমাদের মোবারকবাদ আমার নিতে আপত্তি নেই।

-এ বিনয় আপনার মহত্ব। ফারহানার কন্ঠে যেন অনেকটা ভারী।

আহমদ মুসা কথা পাল্টিয়ে বলল, তুমি নাকি তোমার আব্বাকে হাসপাতালে পাঠাতে রাজী হচ্ছো না?

-আমি হচ্ছি না নয়, আব্বা রাজী নন। আমি তার পক্ষেই কথা বলেছি।

-এখন আমি যদি ওঁকে তাসখন্দ নিয়ে যেতে চাই?

একটু চুপ থেকে ফারহানা বলল, আপনার মতের বাইরে আমার কোন মত নেই। মনে হলো ফারহানার কথাগুলো তার হৃদয়ের কোন অন্তস্থল থেকে বেরিয়ে এল।

আহমদ মুসার হৃদয়টা কেঁপে উঠল। একজন নারী কখন আরেকজনের উপর এমন করে তার সব মত, সব অধিকারকে সঁপে দেয়। আহমদ মুসা হঠাৎ করে কোন কথা বলে উঠতে পারল না। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তোমার আব্বার কাছে যেতে চাই, আবদুল্লায়েভকে বল। আবদুল্লায়েভের সাথে আহমদ মুসা আবদুল গফুরের ঘরে প্রবেশ করল।

আবদুল গফুর শুয়েছিল। খুব দুর্বল সে, আহমদ মুসা পাশে গিয়ে বসল। আবদুল্লায়েভ তার আব্বার মাথার কাছে গিয়ে বসল। আব্বা, আমাদের আহমদ মুসা ভাই এসেছেন।

কয়েকবার বলার পর বৃদ্ধ আবদুল গফুর চোখ খুলে বলল, কে কি বললি, আহমদ মুসা! কোথায় আমার বাবা?

আবদুল্লায়েভ বৃদ্ধের মাথা একটু উচু করে তুলে ধরল। আহমদ মুসার দিকে চোখ পড়তেই বলল, বাবা তুমি এসেছ? এস বাবা...........

বলে দু'টি হাত উঁচু করল বৃদ্ধ।

আহমদ মুসা তার আরও কাছে এগিয়ে গেল।

বৃদ্ধের দুর্বল একটি হাত উঠে এলো উপরে। হাত বুলাল সে আহমদ মুসার মাথা, মুখ এবং গায়ে। বুলাতে বুলাতে বলল, গত সন্ধ্যায় রেডিওতে তোমার বক্তৃতা শুনেছি বাবা। আঃ কি আনন্দ। আজ আমি যদি যুবক হতাম, চিৎকার করে

ঘুরে বেড়াতাম সারা অঞ্চলটা। বলতাম, মুসলমানরা মরে না। মরার জাতি নয় তারা।

প্রায় চিৎকার করে উঠেছিল বৃদ্ধের কন্ঠ। ক্লান্ত হয়ে পড়ল। সে ধুকল কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে বলল, আমার আল্লারাখা আজ জীবিত আছে কিনা জানি না। মরে গেলেও আজ তার আত্মা শান্তি পাবে। তোমরা সবাই তার জন্য দোয়া করো। বলতে বলতে বৃদ্ধের চোখ থেকে নেমে এল দু'ফোটা অশ্রু।

আবার থামল আবদুল গফুর। তারপর সে ধীরে ধীরে চোখ তুলল আহমদ মুসার দিকে। তাকিয়ে দেখল অনেক্ষণ। আহমদ মুসা বৃদ্ধের একটা হাত তুলে নিয়ে বলল, বলবেন কিছু?

-তুমি অনেক বড়, অনেক বড়, অনেক বড়, তা না হলে একটা কথা তোমাকে বলতাম।

-আমাকে লজ্জা দেবেন না, মানুষ হিসেবে কেউই বড় ছোট নয়। বলুন আপনার কথা।

-বলব? বলে বৃদ্ধ চোখ বুজল, কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে চোখ খুলল। চারদিকে তাকাল। দেখল সে আবদুল্লায়েভকে, ইকরামভকে। সবাইকে ছাপিয়ে তার চোখ গিয়ে পড়ল দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা ফারহানার উপর। বৃদ্ধ ডাকল, মা ফারহানা তুমি এসো তো মা।

দু'বার ডাকতেই চাদরে গা-মাথা ঢেকে মাথা নীচু করে সলজ্জ পদক্ষেপে পিতার মাথার কাছে এসে দাড়াল ফারহানা।

বৃদ্ধ ফারহানার একটা হাত হাতে নিয়ে বলল, এই আমার ফাতিমা ফারহানা। আমার আদরের ধন। মহানবী (স) এর মেয়ের নামের সাথে মিলিয়ে এর নাম রেখেছিলাম। সীমাহীন আদর দিয়ে গড়েছি আমার এই মাকে। এই মায়ের দায়িত্ব নেবার কথা কি আমি তোমাকে বলতে পারি বাবা?

আহমদ মুসা মাথা নীচু করে বসেছিল। বৃদ্ধের এই কথার জবাব কোন কথা হঠাৎ তার মুখে জোগাল না। নীরবতার মধ্যে দিয়ে তিল তিল করে বয়ে চলল সময়। সবাই মাথা নীচু ফারহানার দু'গন্ড বয়ে নেমেছে অশ্রুর ঢল।

ধীরে ধীরে মুখ খুলল আমহদ মুসা। মাথা নীচু করেই জবাব দিল, নেব আমি আপনার ফারহানাকে। কিন্তু আব্বা আমি যাযাবর, আমার কোন ঠিকানা নেই। আপনার আদরের ধন কি সুখী হবে আমার কাছে?

শেষের কথাগুলো আহমদ মুসার ভারী হয়ে ভেঙে পড়ল।

'আলহামদুলিল্লাহ' বলে বৃদ্ধ উঠে বসতে চেষ্টা করল, আবদুল্লায়েভ তাকে ধরে বসিয়ে দিল। বৃদ্ধ দু'টি হাত উপরে তুলে বলল, হে আল্লাহ! তুমি রহিম, তুমি রহমান। হযরত ফাতিমা (রা) এবং হযরত আলী (রা) এর মতই এদের জীবনকে তুমি সুখী কর, শান্তিময় কর, সুন্দর কর!

আহমদ মুসা, ফাতিমা ফারহানা, আবদুল্লায়েভ, ইকরামভ এবং আড়াল থেকে আবদুল্লায়েভের স্ত্রী এবং আবদুল্লায়েভের মা সবাই বৃদ্ধের সাথে হাত তুলেছিল। মুনাজাত শেষে উঠতে উঠতে আহমদ মুসা বলল, আব্বা আমি তাসখন্দকে জানিয়ে দিচ্ছি কালকেই কুতাইবারা আসবে। বিয়ের ব্যবস্থাটা ওরাই করবে।

বলে আহমদ মুসা বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তার সাথে চলে এল আবদুল্লায়েভ এবং ইকরামভও।

তারা বেরিয়ে গেলে আবদুল্লায়েভের স্ত্রী এসে অশ্রুরুদ্ধ ফারহানাকে ধরে নিয়ে গেল। যেতে যেতে বলল, পরম পাওয়ার কান্না বুঝি তাহলে এতই হয়।

জেনারেল বোরিস আশ্রয় নিয়েছিল আল্লাবখশ গ্রামের উত্তরে পামির সড়কের ধার দিয়ে যে পাহাড় সেই পাহাড়ে।

সেদিন সন্ধ্যায় আল্লাবখশ গ্রামে যখন আহমদ মুসার হেলিকপ্টারটি নামে, তখন জেনারেল বোরিসের একজন লোক নেমে এসেছিল এই গ্রামে। এখানে কারা থাকে তার খোঁজ নেবার জন্য। গ্রামের লোকদের মুখে সেই জানতে পারে আহমদ মুসা এসেছে আব্দুল গাফুরের বাড়িতে । সে ফিরে গিয়ে জেনারেল

বোরিসকে এ খবর জানায়। এ খবর শুনে সাত রাজার ধন মানিক পাওয়ার মতই তার চোখ দু'টি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কি করতে হবে সংগে সংগে সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে।

সন্ধ্যার পর পরই পাহাড়ী গ্রামগুলো ঘুমিয়ে পড়ে। রাত ৯টার মধ্যেই আল্লাবখশ গ্রামের সব বাতি নিবে গেল।

রাত ১১টার দিকে ডজন খানিক সাথী নিয়ে জেনারেল বোরিস নেমে এল আল্লাবখশ গ্রামে। বিড়ালের মত নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিয়ে ওরা পৌছল আব্দুল গফুরের বাড়ীতে। আব্দুল গফুরেরে বৈঠকখানার দরজায় গিয়ে যখন ওরা পৌছল তখন রাত ১১টা পনের। দরজা ভাল করে পরীক্ষা করল জেনারেল বোরিস। ইস্পাতের কবজা দিয়ে চৌকাঠের সাথে দরজা লাগানো। হাসল জেনারেল বোরিস।

তারপর ব্যাগ খুলে একটা লম্বা তার এবং একটা ছোট হাইপাওয়ার ক্লোরোফরম সিলিন্ডার বের করল। তারটা সে সংযোগ করল ক্লোরোফরম সিলিন্ডারের সাথে। এরপর ছিদ্রওয়ালা তারটা দরজার নীচে ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে দিল ঘরের ভিতর। ঘরের মাঝ বরাবর তারটা পৌছেছে এমনটা যখন মনে হল তখন সিলিন্ডারের সুইচটা অন করে দিল। গ্যাস তারের মধ্য দিয়ে ঘরে প্রবেশ করতে লাগল। পাঁচ মিনিটের খালি হয়ে গেল সিলিন্ডার। তারপর আরও পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করল জেনারেল বোরিস।

বাড়তি পাঁচ মিনিট পেরিয়ে গেলে জেনারেল বোরিস ব্যাগ থেকে লেসার বীম সিলিন্ডার বের করল। লেসার বীম দিয়ে দরজার সবগুলো কবজা কয়েক মিনিটে ধোঁয়া করে দিল। তারপর তিন-চার জনে ধরে দরজাটা সরিয়ে নিল।

জেনারেল বোরিসরা সবাই গ্যাস মাক্স পরা। তারা ঘরে ঢুকে পেন্সিল টর্চ জ্বালিয়ে দেখল ঘরের এক পাশে আহমদ মুসা, আরেক পাশে ইকরামভ । তাদের নেড়ে-চেড়ে দেখল, তাদের কারোরই জ্ঞান নেই।

জেনারেল বোরিসের নির্দেশে তিনজন এগিয়ে এসে অজ্ঞান আহমদ মুসাকে কাঁধে তুলে নিল। তারপর সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরের অন্ধকারে মিশে গেল।

খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠেছিল আব্দুল্লায়েভ। নদীর ঘাটের কাজ সেরে বাড়ির ভিতর ঢুকতে গিয়ে দক্ষিণে বৈঠকখানার দরজার দিকে তাকাতেই তার চোখ ছানাবড়া হয় উঠল। বৈঠকখানার দরজা গোটাটাই দরজার এক পাশে বারান্দায় কাত হয়ে পড়ে আছে। কি ভূতুড়ে কান্ড। আব্দুল্লায়েভ দৌড়ে গেল বৈঠকখানায়। খোলা দরজা দিয়ে ভোরের আলো ঘরে ঢুকেছে। সব কিছুই পরিষ্কার চোখে পড়ছে। আহমদ মুসার বিছানার দিকে চোখ পড়তেই বুকটা কেঁপে উঠল তার থর থর করে। আহমদ মুসার বিছানা খালি, নেই সে। অন্য বিছানায় শুয়ে আছে ইকরামভ। তাকে ধাক্কা দিল, কোনই সাড়া দিল না ইকরামভ। তার অংগ প্রত্যঙ্গ শিথিল। জ্ঞান হারিয়েছে ইকরামভ? আরেক দফা চমকে উঠার পালা আব্দুল্লায়েভের। হঠাৎ আব্দুল্লায়েভের মনে হল তার মাথা ঝিমঝিম করছে, এতক্ষণে অনুভব করল কি একটা অপরিচিত গন্ধ চারদিকে, গ্যাস কি? আঁৎকে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে এল আব্দুল্লায়েভ। বাড়ির ভেতরের আঙিনায় গিয়ে আব্দুল্লায়েভ চীৎকার করে উঠল, সর্বনাশ হয়ে গেছে!

সেই চীৎকার শুনে হন্ত-দন্ত হয়ে বেরিয়ে এল আব্দুল্লায়েভের মা, আব্দুল্লায়েভের স্ত্রী, এবং ফারহানা।

ফারহানাকে দেখেই আব্দুল্লায়েভ ডুকরে কেঁদে উঠল, সর্বনাশ হয়ে গেছে ফারহানা, বৈঠক খানার দরজা ভাঙা, আহমদ মুসা নেই। আব্দুল্লায়েভের কথা শেষ হবার সাথে সাথে 'আল্লাহ' বলে এক বুক ফাটা চীৎকার করে উঠল ফারহানা। জ্ঞানহীনা তার দেহটা ঢলে পড়ল মাটির উপর।

আব্দুল্লায়েভের স্ত্রী, আব্দুল্লায়েভের মা ছুটে গেল বৈঠকখানায়। ভাঙা দরজা, শূন্য ঘর, অজ্ঞান ইকরামভকে দেখে তারাও কেঁদে উঠল চীৎকার করে।

মধ্য এশিয়া মুসলিম সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট কুতাবার হেলিকপ্টার বহর যখন আল্লাবখশ গ্রামে পৌছল, তখন সুর্য সবে উঠেছে। হেলিকপ্টার থেকে নামল কর্নেল কুতাইবা, হাসান তারিক এবং তাদের সাথে বোরখা পরা দুই মহিলা শিরিন শবনম এবং আয়েশা আলিয়েভা।

হেলিকপ্টার থেকে নেমে বিস্মিত হলো কুতাইবা, আহমদ মুসা নেই এমনকি আব্দুল্লায়েভও নেই। এমনটা তো হবার কথা নয়।

হেলিকপ্টার থেকে নেমে তার একটু এগুতেই কুতাইবার পরিচিত ইমাম মোল্লা নুরুদ্দিন তাদের দিকে এগিয়ে এল। তার মুখ শুকনো, চেহারা বিধ্বস্ত।

বিস্তিত কুতাইবা প্রশ্ন করল, কি খবর নুরুদ্দীন?

নুরুদ্দীন কেঁদে ফেলল। একটু সামলে নিয়ে সে বলল, আব্দুল গফুরের বৈঠকখানার দরজা ভাঙা, আহমদ মুসা নেই।

-কি বলছ নুরুদ্দীন, বলে চীৎকার করে উঠল কুতাইবা।

তারপর তারা দৌড় দিল আব্দুল গফুরের বাড়ীর দিকে। তাদের পেছনে আয়েশা আলিয়েভা এবং শবনম।

বৈঠকখানার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে কাঁদছিল আব্দুল্লায়েভ। কুতাইবা এবং হাসান তারিক সেখানে পৌছতেই সে উঠে দাড়াল। তাদের নিয়ে প্রবেশ করল বৈঠকখানায়।

ঘরে ঢুকে পাগলের মত হয়ে গেল কুতাইবা এবং হাসান তারিক। হাসান তারিক সেই গ্যাস সিলিন্ডার, সেই তার এবং চৌকাঠের কব্জাগুলো পরীক্ষা করে গালে হাত দিয়ে বসে পড়ল মাটিতে। দু'চোখ দিয়ে ঝরঝর করে নেমে এলো অশ্রু। কুতাইবা আহমদ মুসার বিছানায় মুখ লুকিয়ে শিশুর মত কাঁদতে লাগল। দরজায় দাঁড়িয়ে আয়েশা আলিয়েভা এবং শবনম। দু'হাতে মুখ ঢেকে তারা কাঁদছে।

আব্দুল্লায়েভের মা এসে আয়েশা আলিয়েভাকে বলল, এস তোমরা ফারহানার কাছে। ওর জ্ঞান এখনও ফেরেনি।

-কোথায় ফারহানা, বলে ছুটল তারা বাড়ীর ভিতর।

ফারহানার জ্ঞান তখন ফিরে এসেছে, ইকরামভেরও জ্ঞান তখন ফেরানো হয়েছে। সবার অশ্রু শুকিয়ে গেছে।

বৈঠকখানার ভেতরের দরজায় ফাতিমাকে ঘিরে দাড়িয়েছিল শিরিন শবনম, আয়েশা আলিয়েভা, ফাতিমা ফারহানার মা ও ভাবী। বৈঠকখানার ভেতরে আব্দুল্লায়েভ, কুতাইবা হাসান তারিক এবং ইকরামভ। বৈঠকখানার বাইরের বারান্দা ও উঠানে সাইমুম কর্মীরা।

গভীর ভাবনায় নিমজ্জিত হাসান তারিক। কি অংক কষছে যেন সে। অবশেষে নীরবতা ভেংগে কথা বলল সে। বলল, আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয় তাহলে আমি বলতে পারি মুসা ভাইকে জেনারেল বোরিস অথবা তার লোকেরা কিডন্যাপ করেছে। আমরা জানি, বিপ্লবের পর সে পামির সড়ক ধরেই পালিয়ে এসেছে। সে পাহাড়ে কোথাও আশ্রয় নিয়েছিল, আল্লাবখশ গ্রামে আসার কথা কোন ভাবে জানতে পারে সে এর সুযোগ গ্রহণ করেছে।

এখন প্রশ্ন হলো, আহমদ মুসাকে কিডন্যাপ করে সে কোথায় নিয়ে যাবে? নিশ্চয় এ দেশে সে থাকবে না, রাশিয়াতেও যাবে না, আফগানিস্তানও যেতে পারবে না। বাকি থাকে চীন। আমার মতে চীনেই সে যেতে পারে। সেখানকার ফ্রদের সাহায্য নেবার জন্যে।

থামল হাসান তারিক।

তারপর উঠে দাঁড়াল।বলল, আমি এই মূহুর্তেই জেনারেল বোরিসের অনুসরণ করতে চাই। পামিরের পথে প্রান্তরে কিংবা তিয়েনশানের ওপারে শিংকিয়াং এ অথবা যেখানেই হোক তাকে খুঁজে বের করব, তার হাত থেকে ছিনিয়ে আনব আহমদ মুসাকে, ইনশাআল্লাহ।

আব্দুল্লায়েভ এসে তার পাশে দাঁড়িয়ে বলল আমি আপনার পাশে থাকব। আমি এ অঞ্চল এবং চীনের বহুকিছুই চিনি।

অশ্রু ঝরছিল কুতাইবার চোখ দিয়ে। সে বলল, আমিও আহমদ মুসার ভাই, আমিও কি এ অভিযানে শামিল হতে পারিনা?

হাসান তারিক বলল, না আহমদ মুসা যে পবিত্র ও গুরুদায়িত্ব তোমাকে দিয়েছেন সেটা পালন করা তোমার প্রথম কর্তব্য।

একটু থেমে হাসান তারিক বলল, কুতাইবা তোমার এখনই যে দায়িত্ব সেটা হল, আমাদের এ ভূখন্ডের অধীন সমস্ত বন-জংগল এবং পাহাড় চষে ফেলা যাতে নিশ্চিত হওয়া যায় জেনারেল বোরিস এদেশে নেই।

বেলা তখন ৮টা।

হাসান তারিক এবং আব্দুল্লায়েভ প্রস্তুত হল যাত্রার জন্য। ফাতিমা ফারহানা, আয়েশা আলিয়েভা ও শবনম দাঁড়িয়েছিল।

ওদের সামনে দাঁড়িয়ে হাসান তারিক বলল, আয়েশা  ফাতিমা ফারহানাকে নিয়ে তুমি তাসখন্দে দাদীর কাছে থাকবে। ফারহানার আব্বাকে আজই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে।  এদের পরিবারের সবাইকে আজই তাসখন্দে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

মেয়েরা সবাই কাঁদছিল।

হাসান তারিক বলল, সবাই তোমরা সাইমুমের কর্মী। কাঁদা তোমাদের শোভা পায় না। যে বিপদ এসেছে আল্লাহ তা থেকে আমাদের উদ্ধার করবেন। তোমরা দোয়া করো।

বলে হাসান তারিক ও আব্দুল্লায়েভ বেরিয়ে এল আব্দুল গফুরের বাড়ী থেকে। কিছুটা পথ তারা যাবে গাড়িতে। তারপর ইয়াকে চড়ে দুর্গম পামির পাড়ি দিয়ে তাদের পৌছতে হবে তিয়েনশানের ওপারে।

ফাতিমা ফারহানা, আয়েশা আলিয়েভা এবং শিরিন শবনম দরজায় দাঁড়িয়েছিল। হাসান তারিক এবং আব্দুল্লায়েভ চোখের আড়ালে হারিয়ে যেতেই তিনজনের হাতই উপরে উঠল। আরজ করল তারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে; 'হে আল্লাহ এ অভিযান সফরের অভিভাবক একমাত্র তুমিই। তুমি তাদের সফল কর। আহমদ মুসা সহ তাদের সবাইকে আবার ফিরিয়ে এনো আমাদের মাঝে।'

তিনটি হৃদয়ের কান্না বিজড়িত এই আকুল প্রার্থনার সবুজ শব্দমালা ইথারের পাখায় ভর করে উড়ে চলল আল্লাহর আরশের দিকে।

সাইমুম সিরিজের পরবর্তী বই

# তিয়েনশানের ওপারে

## কৃতজ্ঞতায়ঃ

1. Shaikh Noor-E-Alam
2. Ismail Jabihullah
3. Rabiul Islam
4. Syed Murtuza Baker
5. Nazrul Islam
6. Osman Gani
7. Ashrafuj Jaman
8. Mustafijur Rahaman
9. Tuhin Azad
10. Rashel Ahmed
11. Hassan Tariq
12. Md. Jafar Ikbal Jewel
13. Abdullah Mohammad Choton
14. A.S.M Masudul Alam
15. Esha Siddique
16. Salahuddin Nasim
17. Mohammod Amir
18. S A Mahmud
19. Ataus Samad Masrur
20. Mostafizur Rahman
21. Anisur Rahman
22. Nabil Mahmud
23. Muhammad Nawajish Islam
24. Sharmeen Sayema
25. Md Raihan
26. Monirul Islam Moni
27. Bondi Beduyin

সাইমুম-৭

# তিয়েন শানের ওপারে

আবুল আসাদ

# ১

আব্দুল গফুরের বাড়ি থেকে তারা মাত্র কয়েক'শ গজ এগিয়েছে। হেলিকপ্টারের কাছে পৌঁছতে এখনও অনেকটা পথ বাকী। হাসান তারিক আগে আগে চলছিল, পেছনে আব্দুল্লায়েভ। রাস্তার দু'ধারে আব্দুল্লায়েভদের গমের ক্ষেত। বলিষ্ঠ সবুজ গমের গাছগুলো দু'ফুটের মত লম্বা হয়ে উঠেছে। সামনে রাস্তার ডানপাশে একটা ঝোপ।

উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টিটা সামনে ছড়িয়ে পথ চলছিল হাসান তারিক। মনে মনে গুন গুন করে আল-কোরআনের একটা আয়াত পাঠ করছিলঃ 'রাব্বানাগ ফিরলানা যুনুবানা ওয়া ইসরাফানা ফি আমরিনা ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাউমিল কাফিরীন।'

হঠাৎ হাসান তারিকের চোখে পড়ল কারো একটা মাথা যেন ঝোপের বাইরে এসেই আবার ঝোপের আড়ালে মিলিয়ে গেল। হাসান তারিকের সতর্ক স্নায়ুতন্ত্রী জুড়ে একটা উষ্ণ স্রোত বয়ে গেল। হঠাৎই মনটা তার তোলপাড় করে উঠল। চিন্তা দ্রুত হলো। কে লুকাল ওমন করে ঝোপের মধ্যে কেন লুকালো?

পেছন দিকে না ফিরেই হাসান তারিক জিজ্ঞেস করল, 'আব্দুল্লায়েভ' পাড়ায় তোমাদের কি কোন শত্রু আছে?'

'না'-আবাদুল্লায়েভ জবাব দিল। তারপর উল্টো প্রশ্ন করল, 'কেন এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন?' আব্দুল্লায়েভের কন্ঠে বিস্ময়। হাসান তারিক কোন জবাব দিল না আব্দুল্লায়েভের প্রশ্নের। নানা চিন্তা তার মনে ঘুরপাক খাচ্ছিল। হঠাৎ তার মনে প্রশ্ন জাগল, জেনারেল বরিসরা কি চলে গেছে? বড় একটা শিকার তারা ধরেছে বটে, কিন্তু আর কি শিকার নেই? মধ্য এশিয়া মুসলিম সাধারণতন্ত্রের প্রধান কর্ণেল কুতায়বাও কি লোভনীয় শিকার নয়? এই কথা চিন্তা করার সাথে সাথে হাসান তারিকের মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। সেই সাথে পীড়া অনুভব করল মনে, এই সহজ সম্ভাবনার কথাটা কেন তাদের আগে মনে হয়নি।

তখনও ঝোপটা ১শ গজের মত দূরে। নিশ্চিত না হয়ে আর এগুনো ঠিক মনে করল না হাসান তারিক।

দাঁড়িয়ে পড়ল সে। বিস্মিত আব্দুল্লায়েভ পাশে এসে দাঁড়াল। হাসান তারিকের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'কিছু ঘটেছে তারিক ভাই?' তার কন্ঠে উদ্বেগ।

আব্দুল্লায়েভের প্রশ্নের প্রতি কোন মনোযোগ না দিয়ে হাসান তারিক জিজ্ঞেস করল, 'কেউ বা কারা যেন এ ঝোপে লুকিয়ে আছে। তারা এ পাড়ার কেউ হতে পারে বলে কি তুমি মনে কর?'

একটু চিন্তা করল আব্দুল্লায়েভ। তারপর বলল, আমাকে দেখার পর কোন উদ্দেশ্যে কেউ এই ঝোপে লুকাবে এমন কেউ এই পাড়ায় নেই।' একটু দম নিয়ে সে বলল, 'এমন কিছু কি ঘটেছে তারিক ভাই?'

'হ্যাঁ।' সংক্ষিপ্ত জবাব দিল হাসান তারিক।

'তাহলে আমি দেখি' বলে সামনের দিকে পা বাড়াতে চাইল আব্দুল্লায়েভ। হাত বাড়িয়ে তাকে বাধা দিল হাসান তারিক। বলল, 'কোন ব্যাপারকেই ছোট করে দেখা ঠিক নয় আব্দুল্লাহ, রিভলবারটা বের করে নাও। দেখ ওটা গুলি ভর্তি আছে কিনা।' বলে হাসান তারিক নিজেও জ্যাকেটের পকেট থেকে নিজের রিভলভারটা বের করে নিল।

এই সময় পেছনে আব্দুল্লায়েভের বাড়ির দিক থেকে সাব মেশিনগানের একটানা ব্রাশফায়ারের আওয়াজ ভেসে এল।

চমকে উঠে পেছন ফিরল দু'জনেই। মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত। ঝোপের দিক থেকে গর্জে উঠল কয়েকটা সাবমেশিনগান।

বিদ্যুত বেগে দু'জনেই বসে পড়ল। বসে পড়েই এক হাতে রিভলভার অন্য হাতে আব্দুল্লায়েভের হাত ধরে টেনে নিয়ে দৌড় দিল হাসান তারিক রাস্তার ডান পাশে একটা গাছের আড়ালে।

সেই ঝোপ থেকে ওরা জনা পাঁচেক লোক গুলি করতে করতে ছুটে আসছিল রাস্তা দিয়ে। প্রায় ৫০ গজ দূরে ওরা এসে পড়েছে। ওদের চোখে সন্ধানী দৃষ্টি, কিছুটা বিমূঢ় ভাবও। দু'জন মানুষ হঠাৎ কোথায় গেল এটাই বোধ হয় চিন্তা। কিন্তু তাদেরকে খুব সতর্ক মনে হলো না। লক্ষ্যহীনভাবে গুলির দেয়াল সৃষ্টি করে সৈনিকরা যেমন আত্মরক্ষামূলকভাবে সামনে এগোয়, তাদের আচরণটা সে রকমই। তাদের লক্ষ্য রাস্তা বরাবর সামনের দিকে, পাশের দিকে তাদের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই।

আরো কাছে চলে এসেছে তারা। গাছের গুড়ির সাথে মিশে রিভলভার বাগিয়ে অপেক্ষা করছিল হাসান তারিক। গাছের বাম পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল ওদের গুলি। কিছু গুলি এসে গাছে বিদ্ধ হচ্ছিল। কচিৎ দু'একটা গাছের ডান পাশ দিয়ে আসছিল। ওরা যখন আরও কাছে এসে পড়ল; তখন ডান পাশ দিয়ে গুলি আসা বন্ধই হয়ে গেল। হাসান তারিক এবার তার রিভলভারের ট্রিগারে আঙ্গুল চেপে মাথাটা একটু বাড়াল।

হঠাৎ ওদের একজনের দৃষ্টিতে পড়ে গেল হাসান তারিক। চোখাচোখি হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ওর ষ্টেনগানের মাথাটা এদিকে মোড় নিতে যাচ্ছিল। কিন্তু তারিক তাকে আর সুযোগ দিল না। দু'হাতে রিভলভার ধরে ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুলি দিয়ে প্রচন্ডভাবে চেপে ধরল ট্রিগার। সাইমুমের এম-১০ অটোমেটিক রিভলভার ঝাঁকি দিয়ে জেগে জেগে উঠল। ছুটে চলল গুলির বৃষ্টি। স্পট টার্গেট, লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার কোনই কারণ নেই। মাত্র কয়েক সেকেন্ড। পাঁচটি লাশ মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মাটিতে।

আরও কয়েক সেকেন্ড পার হলো। না; আর কেউ এল না। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল হাসান তারিক এবং আব্দুল্লায়েভ।

'ফ্র' -এর ইউনিফরম পরা লাশগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে ছুট দিল হাসান তারিক আব্দুল্লায়েভের বাড়ীর দিকে। পেছনে তার আব্দুল্লায়েভ । গুলি বৃষ্টির শব্দ তখনও আসছে সেদিক থেকে। হাসান তারিকরা যখন বৈঠকখানার চত্বরে পৌছঁল, তখন গুলি থেমে গেছে এবং বাড়ির গেট ও বৈঠকখানার দরজা দিয়ে সাইমুম কর্মীরা সাবমেশিনগান বাগিয়ে বেরিয়ে আসছিল।

হাসান তারিক ওদের বলল, 'এদিক থেকে আর কোন ভয় নেই, পাঁচ জনকে শুইয়ে রেখে এসেছি। এখানে খবর কি? কিছু হয়নি তো? হাসান তারিকের কন্ঠে উদ্বেগ।

একজন সাইমুম কর্মী বলল, 'জনাব কুতায়বা ভাল আছেন কিন্তু. ........'

'কিন্তু কি?' প্রশ্ন করল হাসান তারিক। প্রশ্ন করেই কোন জবাবের অপেক্ষা না করে হাসান তারিক এবং আব্দুল্লায়েভ ছুটে গেল বাড়ির ভেতর। দেখল তারা, বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে খামার বাড়ির সাথে যে প্যাসেজ সেই প্যাসেজে পড়ে আছে দু'টি দেহ। তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে কুতাইবা এবং ইকরামভ। আর ডান দিকে বড় ঘরের দরজার সামনে শিরীন শবনম ব্যান্ডেজ বাঁধছে আয়েশা আলিয়েভার বাম বাহুতে, কনুয়ের নিচে। আয়েশা আলিয়েভার ডান হাতে তখনও এম-১০ রিভলভার।

আয়েশা আলিয়েভা এবং শিরীন শবনমকে ওখানে দেখে ছ্যাঁৎ করে উঠল হাসান তারিকের বুকটা। তাহলে প্যাসেজে ঐ মেয়ে দু'টির লাশ কাদের?

ছুটে গেল হাসান তারিক সেখানে। দেখল বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া দু'টি দেহ। একটি ফাতিমা ফারহানার, আরেকটা তার ভাবী আব্দুল্লায়েভের স্ত্রী আতিয়ার।

হাসান তারিকের চোখ ফেটে অশ্রু নেমে এল। অশ্রু নামছিল কুতাইবা এবং ইকরামভের চোখ দিয়েও। কারও মুখে কোন কথা নেই। অনেক্ষণ পর মুখ খুলল কুতাইবা। বলল, 'ওরা দু'দিক থেকেই হামলা করেছিল। আপনারা সামনের দিকটা না ঠেকালে হয়তো আরও বিপদ হতো। কিন্তু সর্বনাশ তো হয়েই গেল, কি জবাব দেব আমরা মুসা ভাইকে ..........'

রুমালে চোখ মুছল কুতাইবা।

হাসান তারিক বলল, আমাদের ভূল হয়েছে। কেউ আমরা এ চিন্তা করিনি যে, 'ফ্র' শুধু একটা শিকার নিয়েই সন্তুষ্ট হবে না, তাদের জাল আরও থাকতে পারে।

-মুসা ভাইয়ের ব্যাপারটা আমাদের এতটাই অভিভূত করছিল যে আমরা কিছু ভাবতে পারিনি। তবু আল্লাহর শুকরিয়া যে, তারা তাদের লক্ষ্য হাসিল করতে পারেনি।

-কেন, ফারহানা ...........

-এ যাত্রা তাদের টার্গেট ছিল মধ্য এশিয়া মুসলিম সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট কর্ণেল কুতাইবা। আমার অনুমান যদি ভুল না হয়ে থাকে তাহলে বলতে পারি, হেলিকপ্টার থেকে আপনাকে নামতে দেখেই তারা এ অপারেশনের পরিকল্পনা করেছে। লক্ষ্যহীন লোক হত্যার অপারেশন হলে তারা ভোর রাতেই আরেক অপারেশনে আসত।

-আপনি কি মনে করেন, ওরা আশেপাশেই আছে? মুসা ভাইকে কি তাহলে আশেপাশেই পাওয়া যাবে?

-'না' আমি তা মনে করি না। মুসা ভাইকে মধ্য এশিয়ার কোথাও রাখার মত জায়গা তাদের নেই। মনে হয়, আশেপাশে তাদের কোন সংঘবদ্ধ লোকও আর নেই। থাকলে এত বড় অপারেশনে তারা মাত্র এ'কজন আসতো না।

হাসান তারিকের হাতে মারা পড়েছিল পাঁচজন 'ফ্র' কর্মী, আর এদিকে মারা পড়েছে ওরা সাতজন। ওদের লাশ খামার বাড়ির গোলা ঘরের পাশে এবং প্যাসেজের মুখে দু'পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ওরা এ পথেই বাড়িতে প্রবেশ করতে চেয়েছিল।

কুতাইবা চুপ করে কি যেন ভাবছিল। এসময় আব্দুল্লায়েভ বলল, 'তারিক ভাই, আয়েশা আপা আহত! ওদিকে। ..........

হাসান তারিক আব্দুল্লায়েভের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। তার কাঁধে হাত দিয়ে ধীর কন্ঠে উচ্চারণ করল, 'কিন্তু আব্দুল্লাহ তোমার স্ত্রী, তোমার বোন আহত নয়, নিহত।'

-না তারিক ভাই, ওরা নিহত নয়, ওরা শহীদ।

বলতে বলতে আব্দুল্লায়েভের চোখ দিয়ে অশ্রুর দু'টি ধারা নেমে এল। সে তাড়াতাড়ি চোখ দু'টি মুছে বলল, 'শহীদদের দাফনের ব্যবস্থা করতে হবে। তার আগে আব্বার কাছে একবার ..............'

-যাব চল, তার আগে আয়েশাকে একটু দেখে আসি।

আয়েশা ফারহানার ঘরে চলে গিয়েছিল। হাসান তারিক সে ঘরের দরজায় গিয়ে ছোট্ট একটা কাশি দিল। সঙ্গে সঙ্গে সে ঘর থেকে শিরীন শবনম বেরিয়ে গেল।

হাসান তারিক ঘরে ঢুকল। আয়েশা আলিয়েভা মাথা নিচু করে খাটের উপর বসে ছিল। হাসান তারিক সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, আঘাতটা কেমন, কেমন বোধ করছ এখন?'

আয়েশা কোন জবাব দিল না। 'ফারহানা আপা চলে গেলেন' বলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

হাসান তারিক পাশে বসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'আমাদের ধৈর্য্য ধরতে হবে আয়েশা, আল্লাহর পরিকল্পনা আমরা জানি না। খবর পেয়ে আমরা এলাম বিয়ে দিতে। কিন্তু দু জনই এখন আমাদের নাগালের বাইরে।

ওড়নার কোণা দিয়ে চোখ মুছে আয়েশা বলল, 'তোমাদের বিদায় দিয়ে আমরা এ ঘরেই এসে বসেছিলাম। ফারহানা কাঁদছিল। আমি সান্তনা দিলে ডুকরে কেঁদে উঠল। বলল 'আমি সহ্য করতে পারছি না আয়েশা। ও কেমন আছে কোথায় আছে –এ প্রশ্নের ছুরি যে আমার হৃদয়কে টুকরো টুকরো করে কাটছে অবিরাম।'

ফারহানার মনকে অন্যদিকে সরিয়ে নেবার জন্যই বোধহয় ওর ভাবী এই সময় বলল, 'চল খামার বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। আব্বার নাস্তার সময় হয়েছে ছাগলের দুধ দুইয়ে আনতে হবে।'

বলে ওর ভাবী ফারহানাকে টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেল। ওরা বেরিয়ে গেলে আমি একটু গা এলিয়ে দিলাম বিছানায়।

মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত। হঠাৎ ওদিকে থেকে 'আয়েশা' বলে একটা চিৎকার আমার কানে এল। ফারহানার গলা। আমি সংগে সংগে উঠে বসলাম।

ঠিক এ সময় একটা ব্রাশ ফায়ারের শব্দ কানে এল। আমি আমার রিভলবারটা নিয়ে ছুটলাম ওদিকে। প্যাসেজটির মুখে যেতেই দেখলাম কয়েকজন গুলি করতে করতে বাড়ির ভেতরে ছুটে আসছে, আমি এখানে দেয়ালের কোণায় শুয়ে পড়ে রিভলভার থেকে ওদের দিকে গুলি করতে লাগলাম। হঠাৎ গুলি বৃষ্টির মুখোমুখি হয়ে ওরা থমকে দাড়াল। কিন্তু বৃষ্টির মত গুলি আসতেই থাকল। একটা গুলি এসে আমার কনুই এর নীচে লাগল। গুলিটা বিদ্ধ হয়নি। বাহুর একটা অংশ ছিড়ে নিয়ে পিছলে গেছে। এ সময় বৈঠকখানার দিক থেকে ছুটে এল ভাই কুতাইবা এবং সাইমুম কর্মীরা।

হাসান তারিক বলল, কর্নেল কুতাইবা ওদের টার্গেট ছিল। আল্লাহ্ এক অপূরণীয় ক্ষতি থেকে মুসলিম মধ্য এশিয়াকে রক্ষা করেছেন। এ সময় আব্দুল্লায়েভ ঘরের সামনে এসে একটা কাশি দিল।

-'আসছি আবদুল্লাহ' বলে হাসান তারিক তাড়াতাড়ি উঠে দাড়াল এবং ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কুতাইবা, হাসান তারিক, আবদুল্লাহ সকলে অসুস্থ বৃদ্ধ আব্দুল গফুরের ঘরে প্রবেশ করল। ইকরামভ আগে থেকেই পিতার পাশে বসে ছিল। পাশে দাঁড়িয়েছিল আব্দুল্লায়েভের মা। এরা ঘরে ঢুকলে আব্দুল্লায়েভের মা ঘরের এক পাশে সরে গেল।

সবাই গিয়ে বৃদ্ধের কাছে তার বিছানার চার পাশে ঘিরে বসল। বৃদ্ধের চোখ দু'টি বোজা। সবারই মুখ নীচু কারো মুখে কোন কথা নেই। আবদুল্লাহ ডাকল আব্বা.....

ধীরে ধীরে বৃদ্ধ চোখ খুলল। চারদিকে একবার চাইল। তারপর চোখ দু'টি স্থির করল কুতাইবার দিকে। কুতাইবার চোখ ছলছল করছে। বিমুঢ় একটা ভাব কিভাবে কথা তুলবে যেন ভেবে পাচ্ছে না।

বৃদ্ধ তার দুর্বল হাত দিয়ে কুতাইবার একটা হাত তুলে নিয়ে বলল, 'আমি সব জানি তোমরা যা বলবে। আহমদ মুসাকে ওরা নিয়ে গেছে। আমার বৌমা, আমার ফাতিমা চিরতরে হারিয়ে গেছে।'

বৃদ্ধের দু'চোখ থেকে দু'ফোটা অশ্রু নেমে এল। কিন্তু গলা তার একটুও কাঁপল না। সে বলল, 'আমার আহমদ মুসা ফিরে আসবেই। আল্লাহ্ তার সহায়। আমার মা আর ফিরবে না, না ফিরুক। আয়েশা, শবনম এবং আরও অনেক মা আমি পেয়েছি।'

একটু থামল বৃদ্ধ তারপর আবার শুরু করল, 'তোমরা বুঝবে না আমার বুকে আজ কত গর্ব। যে দেশের মুক্তি কামনায় আমরা দেশ ছেড়েছি। সে মুক্ত দেশের অধিনায়ক তুমি আমার সামনে। এর চেয়ে বড় আনন্দের আমার আর কিছুই নেই। এখন আমার দুই সন্তান ইকরাম ও আবদুল্লাহ আছে, তাদেরকেও তোমার হাতে তুলে দিলাম।'

বৃদ্ধ আবার চোখ বুজল। হাঁপাচ্ছে সে। অনেক কষ্টে এক নাগাড়ে এতগুলো কথা সে বলেছে। হঠাৎ চোখ খুলল বৃদ্ধ, তার চোখ দু'টি চঞ্চল। কিছু যেন তার মনে পড়েছে। সে আব্দুল্লায়েভের দিকে চেয়ে বলল, 'বেটা, কাঠের বাক্সের তলায় দেখ রেশমের খাপে একটা তলোয়ার আছে। ওটা বের করে আন।'

আব্দল্লাহ পাশের ঘরে চলে গেল এবং কিছুক্ষণ পর রেশমের খাপে রাখা একটা দীর্ঘ তলোয়ার বের করে আনল।

বৃদ্ধ তলোয়ারটি হাতে নিয়ে খাপ খুলে ফেলল। কুতাইবার দিকে চেয়ে বলল, 'আজ বহু বছর ধরে এই তলোয়ার আমরা সযত্নে সংরক্ষণ করছি। এ তলোয়ার সাথে জড়িয়ে আছে এক কাহিনী।

যেদিন সন্ধ্যায় কম্যুনিস্ট লাল ফৌজের হাতে বোখারার পতন ঘটে, তার পরদিন সকালে আমাদের মহল্লার রাস্তার পাশে একজন আহত সংজ্ঞাহীন সৈনিককে কুড়িয়ে পাওয়া যায়। তার কোমরে রেশমের খাপে ছিল অসাধারন দীর্ঘ এক তলোয়ার। রাস্তায় দাড়িয়ে ছিল একটি ঘোড়া। আমরা বুঝেছিলাম ঐ ঘোড়াই সেই আহত ও সংজ্ঞাহীন সৈনিককে বহন করে আনে। সম্ভবত এখানে এসে সৈনিকটি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যায়। ঘোড়াও আর প্রভুকে ছেড়ে সামনে এগোয়নি।

শুশ্রুষা করার পর সৈনিকটির জ্ঞান ফিরে আসে। জানতে পারা যায় তার নাম আমীর আব্দুল্লাহ। তিনি বোখারার সেনাধ্যক্ষ আমীর আব্দল্লাহ এ পরিচয়

পেয়ে সবাই বিস্মিত হয়ে যায়। সকালে আরও বিস্মিত হয়ে যায় একশ মাইল দুরে এই উজবেক পল্লীতে তার পৌছার কাহিনী শুনে। সেনাধ্যক্ষ আমীর আব্দুল্লাহ বলেছিল, আধুনিক অস্ত্র সজ্জিত বিশাল লাল ফৌজের আক্রমন এবং বিশ্বাসঘাতকদের অন্তর্ঘাত তৎপরতায় নগরীর প্রতিরক্ষা দেয়াল যখন ধ্বসে পড়ে, যখন নগরীর অধিকাংশ এলাকা ওদের হাতে চলে যায়, যখন আমরা বোখারার প্রাণকেন্দ্র মীরই আরব মাদ্রাসা ঘিরে শেষ রক্ষার জন্য লড়াই করছি তখন একটা গুলি এসে আমার বুকের ডান অংশে বিদ্ধ হয়। তারপর কিছু মনে মনে নেই আমার।

আমরা তার জ্ঞান ফিরিয়ে এনেছিলাম, কিন্তু বহু চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারিনি। সেদিনই তিনি শাহাদাত বরণ করেন। মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর সেই দীর্ঘ তরবারী আমার দাদার হাতে তুলে দেন এবং বলেন, এই তরবারী ইসলামের স্বর্ণযুগের মধ্য এশিয়াকে জাহেলিয়াতের কবল থেকে মুক্তকারী মুসলিম বিজেতা দরবেশ সেনাপতি কুতাইবার। এই তরবারীটি সমরকন্দে মহানবী(সঃ)এর খুলুতাত কুসুম বিন আব্বাসের সৃতি সৌধ শাহ-ই-যিন্দ এ সংরক্ষিত ছিল। লাল ফৌজের হাতে সমরকন্দের পতন হলে এ তরবারী এক সৈনিক নিয়ে এসে আমাকে দেয়। আমার সময় এখন শেষ। এ তরবারী আমি আপনার হাতে দিয়ে গেলাম উপযুক্ত হাতে পৌছে দেবার জন্যে।'

বৃদ্ধ একটু দম নিল। এক নাগাড়ে এত কথা বলায় সে হাপাচ্ছে। তার কপালে দেখা দিয়েছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। আব্দুল্লায়েভ তার পিতার মাথায় ধীরে ধীরে পাখার বাতাস করছিল।

বৃদ্ধ আবার শুরু করল। বলল, 'আল্লাহু আকবর, আলৌকিকভাবে তরবারীটি আমাদের হাতে পৌছেছে। তা না হলে একজন সংজ্ঞাহীন সৈনিককে একটা ঘোড়া একশ মাইল পথ কিভাবে নিয়ে এল! আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি, হাজার হাজার বছর পর আর এক বিজেতা কুতাইবার হাতে তরবারীটি তুলে দিতে পারলাম। আমি মনে করছি বাবা, নতুন স্বর্ণযুগের যাত্রা শুরুর ইংগিত এটা। আবেগে বৃদ্ধের চোখ দু'টি ছলছল করে উঠল।

কুতাইবা তলোয়ার হাতে নিয়ে ধারের হীরার মত ঔজ্জল্য দেখে মুগ্ধ হোল। চুম্বন করল তরবারিটিকে। তারপর বলল, ‘চাচাজান এ তরবারী গ্রহন করার সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি মুসা ভাই। আমি তার পক্ষে এ তরবারী গ্রহন করলাম।’

বলে কুতাইবা তরবারী হাসান তারিকের হাতে তুলে দিল।

হাসান তারিকও তরবারীটাকে চুম্বন করল। তারপর বলল, ‘চাচাজান আমার মনে হয় সেনাপতি কুতাইবার পর এ তরবারী আর ব্যবহার হয়নি। তা গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল শাহ-ই- যিন্দের শো-কেসে। ঐক্য, সংহতি, শান্তি ও মুক্তির এ তরবারী কোষবদ্ধ হবার পরই মুসলমানদের পতন সুচিত হয় এবং কম্যুনিস্ট লাল ফৌজ সে পতন চুড়ান্ত করে। কম্যুনিস্ট লাল ফৌজের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ইসলামের তরবারী আজ আবার কোষমুক্ত হলো, ইনশাআল্লাহ কোষবদ্ধ হবে না এ তরবারী আর।’

-কিন্তু তারেক ভাই, সেনাপতি কুতাইবার পর কি মধ্য এশিয়ায় কোষমুক্ততরবারী ছিল না?’ জিজ্ঞেস করল আব্দল্লায়েভ।

-হ্যা কোষমূক্ত তরবারী ছিল কিন্তু সে তরবারী ছিল কোন শাসকের কিংবা কোন রাজা বাদশার স্বার্থে। বলল হাসান তারিক ।

-ইসলামের তরবারী এবং একজন মুসলিম শাসকের তরবারীর মধ্য কি কোন পার্থক্য আছে তারিক ভাই?

-পার্থক্য অনেক। একজন মুসলিম শাসকের তরবারী তার রাজ্যের স্বার্থে আরেকজন মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে ব্যবহার হতে পারে, যেমন অনেক হয়েছে। কিন্তু ইসলামের তরবারী শুধু আল্লাহর জন্যই ব্যবহৃত হয়। অন্যায়ের প্রতিরোধ, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা, ‘মানুষ খোদাদের’ কবল থেকে মানুষের মুক্তি এবং ‘মানুষ প্রভুদের’ রাজত্ব খতম করে আল্লাহর রাজ্যত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যই ইসলামের তরবারী ব্যবহার হয়। এজন্যই ইসলামের তরবারী শান্তির প্রতীক। অন্যদিকে কোন মুসলিম শাসকের তরবারী আল্লাহর বান্দাদের উপর জুলুমের প্রতীক হতে পারে। যার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে ইতিহাসে।

আব্দুলায়েভের মুখ উজ্জল হয়ে উঠল। আর বৃদ্ধা আব্দুল গফুর যেন কথাগুলো মন্ত্রমুগ্ধের মত গিলছে। ইকরামভ ইতিমধ্যে বাইরে গিয়েছিল। সে ঘরে ঢুকে বলল 'শহীদদের দাফন....'

ইকরামভকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বৃদ্ধা আব্দুল গফুর বলল, 'আমার শহীদ মা'দের দাফন আমার গোলাপ বাগানে হবে। ফাতিমা গোলাপ বড় ভালবাসত।'

এ নির্দেশ নিয়ে সকলেই বের হয়ে এল ঘর থেকে।

দাফন শেষ হয়েছে এমন সময় আকাশে হেলিকপ্টারের শব্দ পাওয়া গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই অনেকগুলো হেলিকপ্টার শব্দ আকাশে তোলপাড় করে তুলল। কয়েকটি হেলিকপ্টার মাথার উপর চক্কর দিতে লাগল। অধিকাংশই খুব নিচু দিয়ে উড়ে পূর্ব ও উত্তর দিকে চলে গেল। একটা হেলিকপ্টার নেমে এল।

কুতাইবা এবং হাসান তারিকরা আব্দুল গফুরের বৈঠকখানায় বসে অপেক্ষা করছিল। নতুন মধ্য এশিয়া প্রজাতন্ত্রের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারি অয়ারলেসে আগেই জানিয়েছিল, উদ্ধার অভিযানের নেতৃত্ব দিয়ে সাইমুমের ইষ্টার্ন ফ্রন্টিয়ারের অধিনায়ক আনোয়ার ইব্রাহিমকে পাঠানো হচ্ছে। আব্দুল গফুরের বাড়িতে 'ফ্র'-এর নতুন হামলার পর কুতাইবা অন্যদের সাথে পরামর্শ করে হাসান তারিকদের তিয়েনশান যাত্রা স্থগিত করে দিয়েছিল। জেনারেল বোরিস দেশের ভেতরে এই পূর্বাঞ্চলে ঘাপটি মেরে বসে থাকতে পারে। সুতরাং একটা সার্চ অভিযান না চালিয়ে কিছুটা নিশ্চিত না হয়ে তাদের পাঠানো ঠিক হবে না।

হেলিকপ্টার থেকে নেমে আনোয়ার ইব্রাহিম বৈঠকখানায় এল। সালাম বিনিময়ের পর অশ্রুরুদ্ধ আবেগকে চাপা দিতে গিয়ে আনোয়ার ইব্রাহিম শুরুতে কোন কথাই বলতে পারলনা। কুতাইবা তাকে সান্তনা দিল। হাসান তারিক তার কাঁধে এক ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'ইয়ংম্যান, আমাদের শোককে শক্তিতে পরিনত করতে হবে। এখন প্রতিটা মুহূর্ত আমাদের মূল্যবান।'

আনোয়ার ইব্রাহিম রুমাল দিয়ে চোখ মুছে বলল, ঠিক বলেছেন। তারপর সে কুতাইবার দিকে ফিরে বলল, জনাব, আপনার নির্দেশক্রমে গোটা মাউন্টেন

হেলিকপ্টার বহরকে পামির সীমান্তে পাঠানো হয়েছে। সকল রাস্তার সকল পয়েন্টে গাড়ি ও সকল প্রকার যানবাহন সার্চের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সকাল ৭টা থেকে এ আদেশ কার্যকরী হয়েছে। এ ব্যাপারে আমাদের সীমান্ত পর্যন্ত পামির সড়কে বিশেষ পাহারা ও সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। স্থল বাহিনীর কতকগুলো ইউনিট পামির সড়কে টহল দিচ্ছে। পাহাড় জংগলের সম্ভাব্য সকল স্থান চেক করার জন্য গোয়েন্দা বিভাগের বিমান ও স্থল ইউনিটকে কাজে লাগানো হয়েছে। সন্দেহজনক স্থানে প্যারাট্রুপারস নামানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই একটা প্রাথমিক রিপোর্ট পাব আশা করছি।

আনোয়ার ইব্রাহিমের কথা শেষ না হতেই তার ওয়ারলেস কথা বলে উঠল। সে কান লাগিয়ে কল রিসিভ করল। শুনতে শুনতে তার মুখটা কেমন যেন অন্ধকার হয়ে উঠল।

গোটা বৈঠকখানায় নিরবতা নেমে এসেছে। সবারই চোখেমুখে একটা উম্মুখ প্রশ্ন। সেই সাথে দুশ্চিন্তার একটা কাল ছায়াও।

আনোয়ার ইব্রাহিম কল রিসিভ শেষ করল। একটু থামল, দম নিল সে। তারপর বলল, আমাদের পামির বায়োলজিক্যাল ইনষ্টিটিউটস্থ ঘাঁটি আজ রাত থেকে বেলা দশটা পর্যন্ত ঘটনার যে সময়ওয়ারী তথ্য সংগ্রহ করেছে, তা থেকে জানাল, মধ্য এশিয়া মুসলিম সাধারণন্ত্রের পতাকাবাহী তিনটি মাউন্টেন ফুড ক্যারিয়ার আজ ভোর রাতে পামির অতিক্রম করেছে। অত্যন্ত দ্রুতগামী ক্যারিয়ারগুলো আজ ভোর ছয়টায় পামির বায়োলজিক্যাল ইনষ্টিটিউট পয়েন্ট পার হয়ে গেছে। কোন কোন পয়েন্ট থেকে কেউ কেউ এ তিনটি ক্যারিয়ারে রুশ সাধারণতন্ত্রের পতাকাও দেখেছে।

থামল আনোয়ার ইব্রাহিম। সবাই চুপচাপ। সবাই যেন ভাবনার এক অতল গভীরে হারিয়ে গেছে।

কথা বলল, প্রথমে হাসান তারিক। বলল, এ ক্যারিয়ার বহর যে জেনারেল বোরিসের আমার মনে হয় এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

-তাই মনে করো? বলল, কুতাইবা।

-হ্যাঁ, নিশ্চিতভাবে আমি এটা মনে করি। একবার মুসলিম, একবার রুশ পতাকা ব্যবহার থেকেই বুঝা যায়, প্রয়োজনমত সবার চোখকে ধুলা দেবার জন্যই এটা করা হয়েছে এবং বর্তমান অবস্থায় এটা জেনারেল বোরিস হওয়াই স্বাভাবিক।

একটু থেমে হাসান তারিক আবার বলল, 'এটা আমরা সকলেই জানি জেনারেল বোরিস ছাড়া 'ফ্র' পক্ষের আর কেউ এ পথে গাড়ি ঘোড়া নিয়ে সংঘবদ্ধভাবে পালায়নি।

একটু ভেবে কুতাইবা বলল, 'ঠিকই বলেছেন আপনি। জেনারেরল বোরিস প্রথমে হেলিকপ্টার নিয়ে পালায়। কিন্তু পরে সে বক্স শহরে হেলিকপ্টার ছেড়ে দিয়ে গোটা পাঁচেক মাউন্টেন ফুড ক্যারিয়ার নিয়ে নেয়। তারই তিনটি হয়তো সে নিয়ে গেছে। কিন্তু একটা জিনিস, সকালের আক্রমন পরিকল্পনায় সে ছিল কিনা?'

-আমার মনে হয়, না। আমি যেটা মনে করছি সেটা হলো, ধরিবাজ ক্রুর বোরিস ধরেই নিয়েছিল এখানে বড় ধরনের আরও শিকার পাওয়া যেতে পারে। এই শিকার পাওয়ার আশায় কিংবা একটা পশ্চাৎবাহিনী হিসেবেই এই গ্রুপকে সে পেছনে রেখে গিয়েছিল।

-তাহলে আমার মনে হয়, আশেপাশে কোথাও জেনারেল বোরিসের অবশিষ্ট দু'টো মাউন্টেন ক্যারিয়ার আমরা পাব। আনোয়ার ইব্রাহিম এ সময় তার ওয়ারলেসে একটা কল রিসিভ করছিল। কুতাইবার কথা শেষ হতেই সে বলল, অবশিষ্ট দু'টো মাউন্টেন ক্যারিয়ারের সন্ধান পাওয়া গেছে। আমাদের একটা সার্চ পার্টি এখানে পামির সড়কের পাশে ও দু'টো খুঁজে পেয়েছে।

-তাহলে আমরা কি এখন নিশ্চিত হতে পারি, জেনারেল বোরিস আমাদের সীমান্ত অতিক্রম করেছে? বলল কুতাইবা।

-ভোর ছ'টায় যদি তাদের পামির বায়োলজিক্যাল ইনষ্টিটিউট পয়েন্টে দেখা গিয়ে থাকে, তাহলে তারা এখন সীমান্ত অতিক্রম না করলেও নিরাপদ অবস্থানে পৌঁছে গেছে।

হাসান তারিক কথা শেষ করল। কেউ কোন কথা বলল না। সবাই চুপ চাপ। কিছুক্ষণ পর মুখ খুলল আব্দুল্লায়েভ। বলল, এবার আমাদের স্থগিত যাত্রা শুরু হতে পারে।

কুতাইবা প্রশ্নবোধকভাবে মুখ তুলল হাসান তারিকের দিকে। হাসান তারিক বলল, আমাদের সময় নষ্ট করা উচিত নয়।

-তাহলে হেলিকপ্টার আপনাদেরকে আমাদের সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দিক।

-এতে আমরা শত্রুর চোখে পড়া এবং শত্রুর সাবধান হয়ে যাবার সম্ভাবনা থেকে রক্ষা পাবনা। বলল হাসান তারিক।

-তাহলে?

-হেলিকপ্টার আমাদেরকে পামির বায়োলজিক্যাল ইনষ্টিটিউট পর্যন্ত পৌঁছে দেবে, তারপর আইস ক্যারিয়ারে করে যতটুকু যাওয়া যায় গিয়ে আমরা ঘোড়া নিয়ে সামনে এগুব।

-তাই হোক। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। বলল, কুতাইবা। তার শেষের কথাগুলো খুব ভারি শোনাল।

# ২

প্রবল ঝাকুনির মধ্য দিয়ে জ্ঞান ফিরে পেল আহমদ মুসা। জ্ঞান ফিরে পেয়েই সে তড়িঘড়ি উঠে বসল। চোখে তার একরাশ বিস্ময়। কোথায় সে? ফারহানাদের বৈঠকখানাতো এটা নয়। তাহলে কোথায় সে? স্পষ্টই বুঝতে পারছে, একটা উঁচু-নিচু পাথুরে পথের উপর দিয়ে একটা গাড়ীতে করে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

চারদিকে অন্ধকারটা একটু ফিকে হয়ে এলে সে বুঝল, খাদ্য দ্রব্য পরিবহনের ইয়ারকন্ডিশন ক্যারিয়ারে চড়ে সে চলছে। চারদিকে বন্ধ। কিছুই বোঝার উপায় নেই যে, কোন পথ দিয়ে কোথায় যাচ্ছে সে। চারদিকে হাতড়িয়ে সে দেখল, গাড়ীর মেঝেতে অনেকগুলো বড় বড় ট্রাংক স্যুটকেশ।

এটা এখন তার কাছে পরিষ্কার, শত্রুর হাতে সে বন্দী। কিন্তু কিভাবে? রাত দশটায় সে ফারহানাদের বৈঠকখানায় ঘুমিয়েছে। তারপর সেখানে কি ঘটেছে?

কি ঘটেছে চিন্তা করতে গিয়েই তার বুকটা কেঁপে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবল বড় কিছু ঘটলে তার ঘুম ভাঙবে না কেন? ঘুমানো অবস্থাতেই শত্রুরা তাকে বন্দী করেছে। অর্থাৎ শত্রুরা এ কাজ করেছে নিরবে, কোন শব্দ বা হৈ চৈ না করে।

এ শত্রু কে? কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে?

এ সময় ক্লিক করে একটা শব্দ হলো, সংগে সংগে কেবিনের সামনের দিকে খুলে গেল একটা জানালা। দিনের একরাশ আলো এসে প্রবেশ করল কেবিনে। জানালায় একটা মুখ দেখা গেল। মুখ দেখে চমকে উঠল আহমদ মুসা। একি! জেনারেল বরিস!

জেনারেল বোরিসের ঠোঁটে ক্রুর হাসি। বলল, আমাকে দেখে অবাক হয়েছ আহমদ মুসা? ভাবছ, যে শত্রুর সব শেষ করলে সে আবার তোমাকে এভাবে খাঁচায় পুরল কিভাবে। বলে সে হো হো করে এক অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল।

আহমদ মুসার মনে তখন অন্য চিন্তা। রক্তপায়ী, নিষ্ঠুর বোরিসরা আব্দুল গফুর, ফারহানাদের কোন ক্ষতি করেনি তো। এদের আকাশ-স্পর্শী প্রতিহিংসা থেকে তারা তো রক্ষা পাবার কথা নয়। চিন্তাটা তাকে মারাত্মকভাবে পীড়া দিতে লাগল।

জেনারেল বোরিসের মুখ থেকে বের করার জন্যেই বোধহয় আহমদ মুসা প্রশ্ন করল, কাউকে জানতে না দিয়ে কাপুরুষের মত একজন ঘুমন্ত মানুষকে চুরি করেছ, তাতে কৃতিত্বের কি আছে জেনারেল বোরিস?

-তোমাকে মুঠোয় পাওয়ার জন্য কাপুরুষ হতে দোষ নেই।

একটু থামল জেনারিল বোরিস। তারপর বলল, ভেব না, ফাঁদ পেতে রেখে এসেছি, আমি বড় শিকার আরও চাই, ছোট শিকার মেরে আমার এখনকার কোন মূল্যবান বুলেট আমি নষ্ট করতে চাই না।

থামল আবার জেনারেল বোরিস। তারপর হাতের পিস্তলটা তুলে আহমদ মুসাকে তাক করে অত্যন্ত কঠোর কন্ঠে বলল, তুমি আমাকে কাপুরুষ বলেছ, শুনে রাখ ‘ফ্র’ এর কেউ কাপুরুষ নয়। আবার যদি এমন বেয়াদবী কর জিহবা কেটে নেব।

-কাউকে গালি দেওয়া আমার অভ্যেস নয়। তুমি আমাকে কাপুরুষের মত বন্দী করেছ সেই কথা আমি বলেছি।

জেনারেল বোরিস আহমদ মুসার কথা শেষ না হতেই তার রিভালবারের ট্রিগারে চাপ দিল। একটা গুলি আহমদ মুসার কানের পাশ দিয়ে গিয়ে পেছনের দেওয়ালে বিদ্ধ হলো। বোরিসের চোখ দিয়ে যেন আগুন ঝরছিল। বলল, আহমদ মুসা, জেনারেল বরিস যা বলে তাই করে, মনে রেখ।

জানালা থেকে সরে গেল জেনারেল বোরিস। আহমদ মুসা কেবিনের চারদিকটা দেখে নিল। ঠিক যা অনুমান করছিল তাই, কেবিনটা ষ্টিলের বড় বড় ট্রাংকে ভর্তি। সামনে একপাশে দেখতে পেল কাঠের একটা বাস্কেট। তাতে কয়েক বোতল পানি এবং কতগুলো প্যাকেট। একটা প্যাকেট ছিড়ে দেখল রুটি। খুব ক্ষুধা পেয়েছিল আহমদ মুসার। রুটি খেতে শুরু করল।

আবার ক্লিক শব্দ করে জানালা বন্ধ হয়ে গেল। ঘুট ঘুটে অন্ধকার হয়ে গেল চারদিকটা। অন্ধকারের মধ্যেই রুটি খাওয়া শেষ করল আহমদ মুসা। অন্ধকারে হাতড়িয়ে বোতল থেকে পানিও খেয়ে নিল।

খাবার পরে একটু আরাম বোধ করল আহমদ মুসা। একটা বড় ট্রাংকে হেলান দিয়ে আরাম করে বসতে চেষ্টা করল সে। কিন্তু প্রবল ঝাকুনি এবং এবং ট্রাংকের ধারালো প্রান্ত তাকে কোন আরাম দিল না।

কোথায় যাচ্ছে সে, কোনদিকে যাচ্ছে? এ অন্ধকারে দিক নির্ণয় সম্ভব নয়। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল, জানালা খুললে সূর্যের আলো জানালার বাম প্রান্তকে বেশী আলোকিত করেছিল। অর্থাৎ সূর্য ডান দিকে রয়েছে। এর অর্থ ডান দিকটা পূর্ব। তাহলে গাড়ি এখন উত্তর দিকে যাচ্ছে।

কোন এলাকা, কোন পথের ওপর দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে এখন? আহমদ মুসা নিশ্চিত দেশের অভ্যন্তরের পথ দিয়ে জেনারেল বোরিস এভাবে চলতে পারে না, সে সুযোগ তার নেই। নিশ্চয় এতক্ষণে সব রাস্তা ব্লক করা হয়েছে, চেক করা হচ্ছে। তাহলে এ পাহাড়ী রাস্তা কোনটি? পামির সড়ক কি! হ্যাঁ পামির সড়কই হতে পারে, আহমদ মুসার মনে হল। রাতারাতি সে যদি পামির সড়কের নিম্নাঞ্চল পার হয়ে এসে থাকে, তাহলে পাহাড়ের উপরের পথটা তার জন্যে নিরাপদই হবে। গাড়ীর উত্তর গতি দেখে এটাই মনে হয় গাড়ি আপার পামিরে উঠে এসেছে।

ভাবতে ভাবতে আহমদ মুসা কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙল প্রচন্ড গোলাগুলির শব্দে। গাড়ীর সেই জার্কিং নেই। অর্থাৎ গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। মনটা আহমদ মুসার চঞ্চল হয়ে উঠল। গোলাগুলি হচ্ছে কার সাথে? সাইমুম কি জেনারেল বোরিসের সন্ধান পেয়েছে? তারাই কি এসেছে?

বেশ কিছুক্ষণ গোলাগুলি চলল। তারপর সব নিরব। গাড়িও স্থির দাঁড়িয়ে আছে, চলছে না। ব্যাপার কি? জেনারেল বোরিসরা কি পালাল? প্রতিটা মুহূর্ত এক এক ঘন্টার মত দীর্ঘ মনে হতে লাগল তাঁর।

আরো কিছুক্ষণ গত হলো। আহমদ মুসার অসহনীয় অপেক্ষার একটা মুহূর্তে হঠাৎ কেবিনের দরজা খুলে গেল। বিকেলের হলুদ রোদ চোখটা তাঁর

বাঁধিয়ে দিল, কিন্তু এক পশলা ঠান্ডা ও মুক্ত বাতাসের স্পর্শ খুবই ভাল লাগাল আহমদ মুসার।

কেবিনের দরজার সামনে উদ্যত ষ্টেনগান হাতে দু'জন দাঁড়িয়েছিল। একপাশে পিস্তল হাতে জেনারেল বোরিস দাঁড়িয়ে। গোলাগুলির শব্দ শুনে যে আশাটুকু আহমদ মুসার মনে জেগেছিল, তা দপ করে নিভে গেল।

রিভালবার নাচাতে নাচাতে জেনারেল বোরিস বলল, তাড়াতাড়ি নেমে এস আহমদ মুসা। আহমদ মুসা নামল।

নেমে চারদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে শিউরে উঠল আহমদ মুসা। গাড়ি থেকে আট-দশ গজ দুরে বুলেটে ঝাঝরা অনেকগুলো লাশ পড়ে আছে। একজন মুমূর্ষ মানুষ তখনও কাতরাচ্ছে আর আল্লাহ পানি, আল্লাহ পানি বলে চিৎকার করছে।

ঐ মুমূর্ষ মানুষের কাতরানি শুনে আহমদ মুসার গোটা দেহে অসহনীয় এক জ্বালা ছড়িয়ে পড়ল। দেহের মাংসপেশীগুলো যেন রোষে ফুলে উঠল।

আহমদ মুসা জ্বলন্ত দৃষ্টিতে একবার বোরিসের দিকে তাকাল। তারপর স্থির কন্ঠে বলল, জেনারেল বোরিস, ঐ মুমূর্ষ মানুষকে পানি দাও।

-কেন, ওর আল্লাহ ওকে পানি খাওয়াবে না? ক্রুর হাসিতে ফেটে পড়ল জেনারেল বোরিস।

-ঠিক আছে আমাকেই খাওয়াতে দাও।

জেনারেল বোরিস যেন একটু চিন্তা করল। তারপর বলল, স্বজাতির জন্যে খুব মায়া না?

-স্বজাতি নয়, মানুষের জন্যে।

জেনারেল বোরিস কিছু বলল না। একজনকে ইশারা করে বলল, আহমদ মুসাকে পানির বোতল এনে দাও, পানি খাইয়ে কিছু পূণ্য কামাবে।

আহমদ মুসা পানির বোতল নিয়ে এগিয়ে গেল সেই মুমূর্ষ লোকটির কাছে। পানির বোতলের দিকে চোখ পড়তেই রাজ্যের তৃষ্ণা নিয়ে লোকটি মাথা তুলল।

আহমদ মুসা এক হাতে লোকটির মাথা তুলে ধরে, অন্য হাতে পানির বোতল তার মুখে ধরল।

এমন সময় পাশে দাঁড়ানো জেনারেল বোরিস এক লাথি মারল পানির বোতলে। আহমদ মুসার হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল পানির বোতল।

আহমদ মুসা স্প্রিং এর মত বিদ্যুৎ গতিতে উঠে দাঁড়াল। জেনারেল বোরিস কিছু বুঝার আগেই এক ঝটকায় তার হাত থেকে রিভলভার কেড়ে নিল। কিন্তু পরক্ষণেই পেছন দিক থেকে স্টেনগানের বাটের প্রচন্ড এক আঘাত এসে পড়ল আহমদ মুসার রিভলভার ধরা হাতে। ছিটকে পড়ে গেল রিভলভার।

জেনারেল বোরিস তাড়াতাড়ি রিভলভারটি কুড়িয়ে আহমদ মুসার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। আগুন ঝরা কন্ঠে বলল, এর শাস্তি যে কি তুমি কল্পনা করতে পার না আহমদ মুসা। কিন্তু আমি তোমাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই। তুমি 'ফ্র' এর এক বিরাট পুঁজি। 'ফ্র' এক বড় ব্যবসায় করবে তোমাকে দিয়ে।

তবে বেয়াদবির শাস্তির তোমাকে পেতে হবে।

বলে সে পাশের লোককে বলল চাবুক লাগাও। মন থেকে মানুষের জন্যে ওর মায়া দূর হোক।

লোকটা দ্রুত পাশের গাড়ি থেকে চাবুক এনে তিনটি চাবুক লাগাল আহমদ মুসার পিঠে।

চামড়ার চাবুক পিঠে কিভাবে কতটুকু বসে গেল জামা গায়ে থাকায় তা বুঝা গেল না। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে জামা রক্তে ভিজে গেল। আহমদ মুসা পাথরের মত স্থির দাঁড়িয়ে চাবুকের তিনটি আঘাত গ্রহন করল। মুখে সামান্য পরিবর্তনও তার এল না।

জেনারেল বোরিস হেসে বলল, ধন্যবাদ তোমাকে আহমদ মুসা, এ আঘাতে হাতিও চিৎকার করত।

আহমদ মুসা বলল, জেনারেল বোরিস, এই যে নিরীহ মানুষকে তুমি পশুর মত হত্যা করলে, এর শাস্তি থেকে তুমি রেহাই পাবে না মনে রেখো।

-পারলে কেউ ছেড়ে কথা বলবে না আমি জানি, কিন্তু বিশ্বাস কর, ওদের না মেরে উপায় ছিল না। মুখে শয়তানের মতো ক্রুর হাসি টেনে বলল জেনারেল বোরিস।

একটু দম নিয়ে আগের কথার রেশ টেনে সে বলল, আমাদের গাড়ি তো আর চলবে না, তাই তাদের ঘোড়াগুলো আমাদের খুব দরকার। জীবিত থাকতে তো ওদের ঘোড়া নেয়া যাবে না, তাই ওদের মারা। তুমিই বল, হেঁটে গেলে কাশগড়ে যেতে আমাদের কতদিন লাগত।

কথা শেষ করে জেনারেল বোরিস একটু সরে গিয়ে তার লোকজনদের কি যেন র্নিদেশ দিল। এদিকে গাড়ি থেকে মাল সামান নামিয়ে ঘোড়ার পিঠে বোঝাই করা হচ্ছিল।

র্নিদেশ দিয়ে জেনারেল বোরিস গাড়িতে চলে যাবার পর চারজন লোক এসে আহমদ মুসাকে বাঁধল। তার দু'হাতকে শরীরের সাথে রেখে পা থেকে কাঁধ পর্যন্ত প্লাষ্টিক কর্ড দিয়ে শক্ত করে জড়িয়ে বাঁধা হলো। তারপর মাল-সামানের সাথে ঘোড়ার পিঠে বেঁধে রাখা হলো তাকে।

চারটি ঘোড়ার পিঠে মাল-সামান সাজিয়ে অন্য চারটি ঘোড়ায় দু'জন করে উঠল। অবশিষ্ট একটি ঘোড়ায় উঠল জেনারেল বোরিস। মাল-সামান বোঝাই ঘোড়া মাঝখানে রেখে ৯ ঘোড়ার কাফেলা ছোট তারিম নদী উপত্যকা ধরে কাশগড়গামী ঐতিহ্যবাহী পথে যাত্রা করল।

ছোট তারিম নদী আসলে একটা পাহাড়ী ঝর্ণা। ঝর্ণা হলেও বেশ প্রশস্ত এবং স্থানে স্থানে বেশ গভীর। এ পাহাড়ী নদীটি পামির থেকে উৎপন্ন হয়ে দীর্ঘ পাহাড়ী পথ অতিক্রম করে সিংকিয়াং-এর তাকলামাকান মরুভুমির পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে প্রবাহিত চীনের দীর্ঘতম নদী তারিমে গিয়ে মিশেছে। লোকে একে তারিমের নামেই ছোট তারিম বলে ডাকে।

হাসান তারিকরা ঘোড়ায় চড়ে এগুচ্ছিল। আগের পরিকল্পনায় যে পথটা আইস ক্যারিয়ারে চড়ে আসার কথা, সে পথটাও তারা ঘোড়ায় চড়েই আসছে। হেলিকপ্টারে পামির বায়োলজিক্যাল ইন্সটিটিউটে আসার পর তারা সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে। তারা চিন্তা করে মাঝখানের পথটুকুর জন্যে আর আইস ক্যারিয়ারের ঝামেলা করে লাভ নেই, ঘোড়াই উত্তম। পামিরের পথের শেষ পর্যন্ত হেলিকপ্টারে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু হাসান তারিক রাজী হয়নি তাতে। শত্রুর চোখে তারা কিছুতেই ধরা পড়তে চায় না। শত্রু তাতে সাবধান হয়ে যাবে, এমনকি কোন ক্ষতিও করে বসতে পারে আহমদ মুসার। ক্ষতির কথা তার মনে পড়তেই বুকটা কেঁপে ওঠে। কিন্তু পর মুহূর্তেই ভাবে। আহমদ মুসা ওদের জন্যে এখন বিরাট এ্যাসেট। একে তারা নানা রকম দর কশাকশিতে কাজে লাগাতে পারে। সুতরাং তাদের কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত আহমদ মুসাকে তারা হত্যা করবে না। এই চিন্তায় কিছুটা স্বস্তি বোধ করল হাসান তারিক।

হাসান তারিক আগে আগে চলছিল। পেছনে আবদুল্লায়েভ। দু'জনেই দু'টি উৎকৃষ্ট আরবী ঘোড়ায় সওয়ার। চলতে চলতে আবদুল্লায়েভ জিজ্ঞেস করল, ওরা কোথায় যেতে পারে আপনি মনে করছেন?

-আমি মনে করছি, ওরা আমাদের সীমান্ত অতিক্রম করে আপাতত চীনে প্রবেশ করবে। এটাই তাদের জন্য নিরাপদ।

-আমাদের সামনে চীনে প্রবেশের দু'টো পথ আছে। একটা হল তারিম হয়ে, আরেকটা কিরঘিজিয়ার রাজধানী ফ্রেঞ্জ থেকে যে পথটি কাশগড় গেছে সেই পথে। অন্য একটা পথ কাজাকিস্তানের রাজধানী আলমা আতা সড়ক থেকে বের হয়ে উরুমচি গেছে। কিন্তু সে পথটা অনেক দুরে এবং দুর্গম। অবশিষ্ট দু'টি পথের কোনটি জেনারেল বোরিস ব্যবহার করতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

-আমি মনে করি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে আমাদের এলাকা ত্যাগ করে চীনে প্রবেশ করতে চায়। কারণ সে পরিষ্কারই জানে, পামিরের পথে বেশী সময় নিলে ধরা পড়ে যাবে।

কথা বলতে বলতে একটা টিলার ওপাশে গিয়েই ঘোড়ার লাগাম টেনে থমকে দাঁড়াল হাসান তারিক। সে দেখতে পেল, কিছু দুরে পামির সড়কের উপর

তিনটি মাউন্টেন ফুড ক্যারিয়ার দাঁড়িয়ে আছে। সূর্য তখনও ডুবেনি। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তিনটি ক্যারিয়ারকে। তিনটিই চলার ভংগিতে উত্তর মুখো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মনে যাচ্ছে ওরা যেন কোন কাজে দাঁড়িয়ে আছে।

হাসান তারিক ঘোড়া পেছনে হাটিয়ে টিলার আড়ালে চলে এল। তারপর পকেট থেকে দুরবীন বের করে চোখে লাগাল। দুরবীনের চোখটা ওদিকে পড়তেই চমকে উঠল হাসান তারিক। ওকি! গাড়িগুলোর পাশে অত লাশ কার? তিনটি গাড়িরই দরজা খোলা, কোন জীবিত মানুষ চোখে পড়ল না। তারপাশে আতিপাতি করে খুঁজল। না, কোথাও জীবিত মানুষের কোন চিহ্ন নেই।

একটা আশংকা হাসান তারিকের মনে উঁকি দিল, তাহলে কি সব শেষ? অন্য কোন দল কি সম্পদের লোভে সবাইকে হত্যা করে গেছে? না আহমদ মুসা ওদের হত্যা করে নিজেকে মুক্ত করেছে? শেষ কথাটি হাসান তারিকের মনে আশার সঞ্চার করল। হাসান তারিক আবদুল্লায়েভের দিকে তাকিয়ে বলল, সামনে দেখেছ তো?

-হ্যাঁ, দেখেছি তিনটি মাউন্টেন ফুড ক্যারিয়ার, সম্ভবত জেনারেল বোরিস যেগুলো নিয়ে পালিয়েছিল সেগুলো।

-শুধু ঐ তিনটি গাড়ি নয়, গাড়ির পাশে অনেকগুলো লাশ দেখা যাচ্ছে।

-অনেকগুলো।

বিস্ময় উদ্বেগে আবদুল্লায়েভের চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল। হাসান তারিক আর কোন কথা না বলে আবদুল্লায়েভকে ইশারা করে গাড়ির দিকে চলল। দু'জনের হাতে উদ্যত স্টেনগান। সেখানে গিয়ে তারা লাশ আর শূণ্য গাড়ি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না।

লাশ দেখেই আবদুল্লায়েভ বলল, এতো দেখি চীনের উইঘুর কাজাখদের লাশ। হাসান তারিক হতাশ হল। সে দেখতে চেয়েছিল জেনারেল বোরিসদের লাশ। তার জায়গায় পাওয়া গেল স্বজনদেরই। একটা বুলেটের খোল তুলে নিয়ে একটু পরীক্ষা করে বুঝল 'ফ্র' দের ব্যবহৃত বিশেষ ধরনের স্টেনগানেরই বুলেট। হাসান তারিক বলল, আবদুল্লায়েভ, জেনারেল বোরিসরাই এদের মেরেছে।

একটু থামল, তারপর আবার শুরু করল হাসান তারিক, কিন্তু এদের মারল কেন? দু'পক্ষে সংঘর্ষ হয়নি বোঝাই যাচ্ছে। এদের কারও কাঁধ থেকেই রাইফেল নামেনি। মনে হচ্ছে গুলি খাবার আগে এরা বুঝতেই পারেনি কি হচ্ছে। নিশ্চয়ই জেনারেল বোরিসকে এরা বিশ্বাস করে, সম্ভবত সরকারী গাড়ি দেখে।

আবদুল্লায়েভ চারিদিক একবার পর্যবেক্ষণ করে বলল, দেখুন এদের ঘোড়া কোথাও দেখা যাচ্ছে না, উইঘুর কাজাখদের ঘোড়া তার মনিবদের ছেড়ে এভাবে দল বেধে সরে যায় না। নিশ্চয় জেনারেল বোরিসরা এদের ঘোড়া নিয়েই পালিয়েছে। আর এদের তারা হত্যাও করেছে ঐ ঘোড়া হাত করার জন্য।

হাসান তারিক আবদুল্লায়েভের পিঠে একটা থাপ্পড় দিয়ে বলল, ঠিক বলেছ, এটাই সবচেয়ে সংগত ব্যাখ্যা। গাড়ি যখন আর চলবে না, তখন ঘোড়ার চেয়ে বড় মূল্যবান তাদের কাছে আর কিছু ছিল না।

একটু থেমে হাসান তারিক আবার বলল, এর দ্বারা আরেকটা জিনিস প্রমাণ হয়, তারা এ ছোট তারিমের পথই অনুসরণ করেছে।

আবদুল্লায়েভ সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। সেই সাথে বলল, তবু সামনের পথটা আর একটু পরীক্ষা করে আসি। ঘোড়া যদি পামিরের পথে যেয়ে থাকে তাহলে চিহ্ন চোখে ধরা পড়বেই।

বলে আবদুল্লায়েভ সামনের দিকে এগুলো। পামিরে যদিও তখন গ্রীষ্মকাল। কিন্তু পামিরের মাথা বরফে ঢাকা। সাদা বরফের উপর শ্যেন দৃষ্টি আবদুল্লায়েভের।

হাসান তারিক শূন্য গাড়িগুলোতে একটু নজর বুলাতে গেল। তিনটি গাড়িই আনকোরা নতুন। তিনটি গাড়িই শূন্য, কোন চিহ্নই পেল না কোন গাড়িতে। হতাশ হলো হাসান তারিক। বোধহয় মন চাইছিল আহমদ মুসার কোন চিহ্ন খুঁজে পাক।

হাসান তারিক নেমে এল গাড়ি থেকে। আবদুল্লায়েভও এ সময় ফিরে এল।

-না তারিক ভাই, ওরা পামিরের পথে যায়নি। বলল আবদুল্লায়েভ।

-বলেছিই তো ওরা ছোট তারিমের পথ ধরবে।

-আমরা কি এখনই যাত্রা শুরু করব?

-আমরা সময় নষ্ট করতে পারি না। রাতেও আমাদের পথ চলতে হবে। ওদের আমরা পথেই ধরতে চাই।

-তারিক ভাই, রক্তের রং দেখে আমি বুঝতে পারছি, ঘটনা পাঁচ ঘন্টা আগে ঘটেছে। অর্থাৎ বলা যায়, প্রায় পাঁচ ঘন্টা আগে ওরা এই ছোট তারিমের পথে যাত্রা শুরু করেছে।

হাসান তারিক তাকিয়েছিল নিচে তিয়েনশানের পূর্ব্ ঢাল বেয়ে নেমে যাওয়া তারিম উপত্যকারই দিকে। তার চোখে ভেসে উঠছে, এ উপত্যকারই পথ ধরে আহমদ মুসাকে বন্দী করে জেনারেল বোরিসরা এগিয়ে যাচ্ছে। কি অবস্থায় আছে আহমদ মুসা! এ কথা ভাবতেই মনটা তার আনচান করে উঠল।

হাসান তারিক যেন অনেকটা স্বগত কন্ঠেই বলল, ওরা কমপক্ষে আট মাইল সামনে। সুতরাং ওদের নাগাল পাওয়া সহজ নয়। কিন্তু কাশগড়ে পৌছার আগে যদি ওদের সন্ধান করতে না পারি, তাহলে ওদের বের করা মুশকিল হবে আমাদের জন্য।

পামির থেকে তিয়েনশানের ঢাল বেয়ে তারিম উপত্যকার পথে যাত্রা শুরু করল হাসান তারিক ও আবদুল্লায়েভ। দু’জনেরই পরনে তাজিক ব্যবসায়ীর পোশাক।

আগে আগে চলছিল হাসান তারিক। আবদুল্লায়েভকে লক্ষ্য করে সে বলল, তুমি রাস্তার ডানদিকে সন্ধানী চোখ রাখবে, আমি বাম দিকটা দেখব।

আবদুল্লায়েভ মাথা নেড়ে সায় দিল।

নিরবে এগিয়ে চলল দু’জনের কাফেলা। সফেদ বরফের উপর দিয়ে ইতিহাসের এক অতি পুরানো পথ ধরে তারা চলছে। কত ঘটনার সাক্ষী এই পথ! কত আনন্দ, কত বেদনার পদচিহ্ন ঘুমিয়ে আছে এই পথে! বাগদাদে আব্বাসীয় খলিফাদের শাসন কাল। মুসলিম বিজয়ের তখন স্বর্ণযুগ। ইসলামের সেনাপতি কুতাইবা সমরখন্দ, বোখারা মুক্ত করার পর এ তারিমের পথ ধরেই কাশগড় পৌছে ছিলেন। বিজেতা কুতাইবা এ পথেই আবার ফিরেছিলেন বাগদাদ। সে বিজয়ী ঘোড়সওয়ারের পদচিহ্ন এ পথের বুকে এখন হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে

না, কিন্তু পথের স্মৃতিকথা এবং দু'পাশের পাহাড়ের মৌন শৃংগগুলোর নির্বাক জীবনকাব্যে তা অক্ষয় হয়ে আছে।

তিয়েনশানের পূর্ব ঢালটি তার পশ্চিম ঢালের মতই। পামির থেকে নেমে বরফ মোড়া পথে অনেকটা এগুতে হবে। এক সময় অথৈ এ বরফের রাজ্য শেষ হয়ে যাবে। পাওয়া যাবে সবুজ ঘাসে মোড়া উপত্যকা-পাহাড় শ্রেণীর এক জগত। সেটা পেরুলে সামনে আসবে সবুজ বনানী। তখন বুঝতে হবে আমরা তিয়েনশানের গোড়ায় পৌছে গেছি। তবু কিন্তু অনেক সময় লাগবে পাহাড় থেকে নামতে। পামির থেকে কাশগড় পর্যন্ত গোটা পথটা ছোট তারিম নদীকে অনুসরণ করে এগিয়ে এসেছে। এ পথের যাত্রীকে বারবারই তারিমের মুখোমুখি এসে দাঁড়াতে হবে এবং একে পার হয়েই সামনে এগিয়ে চলতে হবে। তারিমের পথ ধরে চলতে চলতেই এক সময় আঙুর ও নানা ফলের বাগান আচ্ছাদিত একটি নগরীর বহির্দেয়াল এসে পথিকের পথ আগলে দাঁড়াবে। এ নগরীই কাশগড়।

বিরামহীনভাবে চলছিল হাসান তারিকরা। খাওয়াও খাচ্ছে ঘোড়ার পিঠে। একমাত্র নামাজ পড়ার জন্যেই তারা ঘোড়া থেকে নামছে।

ছোট তারিমকে যেখানে প্রথম অতিক্রম করতে হয়, সেই জায়গাটা অতি সুন্দর। প্রায় পঞ্চাশ ফিট ওপর থেকে তারিম এখানে একটা সবুজ উপত্যকায় আছড়ে পড়ছে। সবুজ ঘাসে ঢাকা উপত্যকার মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া ছোট তারিমের রূপালী রূপ পথিকের মন কেড়ে নেবার মত।

এখানে ছোট তারিম পার হয়ে ওপারে উঠতেই একটা বড় পাথরের উপর কিছু ফলের খোসা পাথরের পাশে পড়ে থাকা সিগারেটের একটা কার্টুন দেখে হাসান তারিক খুশী হলো। ঘোড়া থেকে নামল হাসান তারিক। আবদুল্লায়েভও।

আবদুল্লায়েভ একটা কমলার খোসা ভালোভাবে পরীক্ষা করে বলল, তারিক ভাই, প্রায় পাঁচ ছয় ঘন্টা আগে এই কমলা ফাড়া হয়েছে।

-তোমার কথা ঠিক হলে বুঝা যাচ্ছে কোন বিশ্রাম না নিয়ে ওরা দ্রুত পথ চলছে।

-ঠিক তাই, রক্তের রং দেখে যে সময়ের কথা আমি বলেছিলাম, তার চেয়ে তারা পিছিয়ে পড়েনি। ওদের চলার গতিটা আমাদের চেয়ে কম নয়।

-তাহলে জেনারেল বোরিস তাকে অনুসরণের ভয় করছে কি?

-তাই মনে হয়।

হাসান তারিকেরা যে বড় পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল সে পাথরের পাশেই আরেকটা ছোট পাথর। সেদিকে চোখ পড়তেই হাসান তারিকের চোখ দুটি উজ্জল হয়ে উঠল। ওখানে কমলার ছোট ছোট খোসা এমনভাবে পাশাপাশি রাখা হয়েছে যা আরবী আলিফ-এর রূপ নিয়েছে। "আলিফ" আহমদ মুসার সাংকেতিক নাম। অর্থাৎ মুসা ভাই এ সংকেত এখানে রেখে গেছেন।

হাসান তারিক আনন্দে আবদুল্লায়েভকে জড়িয়ে ধরল। দু'জনে তাঁদের নেতা আহমদ মুসার বেঁচে থাকার সুস্পষ্ট ও নিশ্চিত সংকেত পেয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল।

তারপর আবার তাদের যাত্রা শুরু হলো। তারা চলার গতি আরও দ্রুততর করলো। তাদের মনে হল, শরীর এবং মনে যেন আগের চেয়ে বেশী শক্তি তারা পাচ্ছে।

তিয়েনশানের গোড়ায় তখন তারা পৌছে গেছে। শুরু হয়েছে জংগল পথ। তারিমকে বামে রেখে সংকীর্ণ উপত্যকা পথে তারা এগিয়ে চলেছে। তাদের দু'ধারে বিক্ষিপ্ত বনরাজী।

এই জংগল পথে প্রবেশের পর আবদুল্লায়েভ আগের চেয়ে অনেক সতর্ক। হাসান তারিককেও সে সতর্ক করে দিয়েছে। এক সময় দস্যুদের দৌরাত্মের কারণে তিয়েনশানের ঐ পথটি খুবই ঝুকিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। পরে সিংকিয়াং এ মুসলিম প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হবার পর এই বিপদ দূর হয়। কিন্তু চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পর আবার এই পথে কিছু উচ্ছৃংখলতা নেমে আসে, চীনা হানরা এখানে এসে আসন গাড়ার পর তাদের দৌরাত্ম কিছু কমে গেছে, কিন্তু শেষ হয়ে যায়নি। আবদুল্লায়েভ ও হাসান তারিক স্টেনগান হাতে নিয়ে সাবধানে সামনে এগুচ্ছিল।

তারিমের তীরে একটা প্রশস্ত উপত্যকায় এসে যোহরের সময় হলো। তারা সিদ্ধান্ত নিল, এখানেই তারা যোহরের নামাজটা সেরে নেবে। কিন্তু উপত্যকায় পা দেবার পর থেকেই তারা বারুদের গন্ধ পাচ্ছিল। দু'জনেই

উৎকন্ঠিত হয়ে উঠল। উপত্যকায় অল্প কিছুটা পথ এগিয়ে তারা দাড়িয়ে পড়ল। চোখে দূরবীন লাগিয়ে সতর্কতার সাথে চারদিকটা একবার পরীক্ষা করতে শুরু করল।

এক জায়গায় গিয়ে হাসান তারিকের দূরবীনের চোখ আটকে গেল। দৃশ্যটা দেখে চমকে উঠল হাসান তারিক। ৫ জন যুবকের রক্তাক্ত লাশ ইত:স্তত বিক্ষিপ্ত পড়ে আছে।

আবদুল্লায়েভের দূরবীনটাও এখানে এসে থেমে গিয়েছিল।

দু'জনেই তাদের চোখ থেকে দূরবীন নামাল। চাইল পরস্পরের দিকে। কথা বলল প্রথম আবদুল্লায়েভ। বলল, কোন স্বার্থ বা গোত্র দ্বন্দ্বের ফল এটা হতে পারে। অথবা হতে পারে জেনারেল বোরিসের কীর্তি।

-আমরা কি একটু এগিয়ে দেখব? বলল হাসান তারিক।

-কোন বিপদে জড়িয়ে তো কাজ নেই, আমাদের লক্ষ্য তো ভিন্ন। বলে আবদুল্লায়েভ আবার দূরবীন তুলে নিয়ে ঐ দৃশ্যটা নিরীক্ষণ করল। দূরবীনটা চোখে রেখেই বলল, তারিক ভাই, আমার দেখাটা মিথ্যা না হলে আমার মনে হচ্ছে এরা হুই জাতির মুসলমান। হুই যুবকরা যে ধরনের টুপী পরে, এদের মাথায় সেই টুপী দেখছি। চেহারাও তাদের......;

কথা শেষ হবার আগেই পেছন থেকে একটা শব্দ পেয়ে বিদ্যুত গতিতে হাসান তারিক পেছনে ফিরল। দেখল মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে তিনটি উদ্যত রাইফেল। তাদের দিকে হা করে আছে। হাসান তারিকের ডান হাতে ধরা স্টেনগান নিমিষে উঠে এল। ট্রিগারে চাপ পড়ল তার শাহাদত আঙুলের। বেরিয়ে গেল গুলি।

হাসান তারিকের সাথে সাথেই ঘুরে দাড়িয়েছিল আবদুল্লায়েভ। দেখল, রাইফেল বাগিয়ে দাড়িয়ে সেই হুই চেহারার তিন যুবক। আর সেই সাথে সে দেখল, হাসান তারিকের স্টেনগানের মাথা উপরে উঠছে। সংগে সংগে সে নিজের স্টেনগান দিয়ে আঘাত করল হাসান তারিকের স্টেনগানের নলে। মুখে চীৎকার করে উঠল, গুলি করবেন না তারিক ভাই।

কিন্তু তার আগেই কয়েকটা গুলি বেরিয়ে গেছে। ঢলে পড়েছে সামনের একজন যুবকের দেহ। দেহটা সবুজ ঘাসের উপর পড়ে কয়েক মুহূর্ত ছটফট করে নিশ্চল হয়ে গেছে। আবদুল্লায়েভের স্টেনগানের আঘাতে হাসান তারিকের স্টেনগানের নল নিচু হয়ে গিয়েছিল এবং শাহাদত আঙুলিও আলগা হয়ে গিয়েছিল ট্রিগার থেকে। গুলি আর হয় নি।

সামনে দাড়ানো অবশিষ্ট দুজন যুবকের মধ্যে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সুঠামদেহী যুবকটি উদ্যত রাইফেলের নল উপরে তুলে আকাশের দিকে একটা ফাকা আওয়াজ করল। গুলির শব্দে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে উপত্যকার চারদিক থেকে এক ঝাক মানুষ বেরিয়ে এল উপত্যকায়। তাদের প্রত্যেকের হাতে উদ্যত রাইফেল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কয়েক ডজন রাইফেল এসে তাদের ঘিরে ধরল। দীর্ঘ ও সুঠামদেহী সেই যুবকটি এগিয়ে এসে বলল, তোমাদের স্টেনগান দিয়ে দাও।

যুবকটি হুই ভাষায় এ নির্দেশ দিল। আবদুল্লায়েভ হুই ভাষা কিছু কিছু জানে। হাসান তারিক ও আবদুল্লায়েভ তাদের স্টেনগান যুবকটির হাতে দিয়ে দিল। যুবকটি হাত পেতে গ্রহন করল। তার এবং অন্যদের চোখে তখন রাজ্যের ক্রোধ ও ঘৃণা।

আবদুল্লায়েভ ভাংগা ভাংগা হুই ভাষায় সেই যুবকটিকে লক্ষ্য করে বলল, তোমার নাম কি, তুমি কি মুসলমান?

-আমি আহমদ ইয়াং। মুসলমান। অনেকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও ক্রোধের সাথে জবাব দিল যুবকটি।

-আমি আবদুল্লায়েভ এ হাসান তারিক। আমরা মুসলমান। বলল আবদুল্লায়েভ।

যুবকটির ক্রোধ ও ঘৃণাভরা চোখটি যেন হঠাৎ কেঁপে উঠল। তাক করে ধরে থাকা বন্দুকটির মাথাও যেন হঠাৎ নড়ে উঠল। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্যে। চোখ পাকিয়ে কঠোর স্বরে যুবকটি বলল, তোমাদের লোকেরা আমাদের ৬জন লোককে খুন করেছে।

আবদুল্লায়েভ প্রতিবাদ করে বলল, না একজন লোক মরেছে। তাও ভুল বুঝাবুঝির ফলে।

-অন্য পাঁচজন?

-আমরা জানি না। আমরা এই মাত্র উপত্যকায় পৌছলাম।

-কে তাহলে ওদের মারল? তোমাদের মত ওই স্টেনগানের গুলিতে ওরা মরেছে।

-আমরা জানি না, তবে আমরা অনুমান করতে পারি।

-কি?

-এখন থেকে প্রায় পাঁচ ঘন্টা আগে এখান দিয়ে আরেকটা দল চলে গেছে। এটা ওদের কাজ হতে পারে।

যুবকটি একটু চিন্তা করল। তারপর বলল, যাই হোক তোমাদের আমরা ছাড়তে পারি না। আমাদের শেখের কাছে তোমাদের যেতে হবে।

এরপর যুবকটি ছয়জনকে হাসান তারিকদের পাহারায় দাঁড় করিয়ে অবশিষ্টদের নিয়ে ছয়টি লাশ একত্রিত করল। তারপর সকলকে নিয়ে যাত্রা শুরু করল।

ছোট তারিমের সেই উপত্যকা থেকে সোজা দেড় মাইল উত্তরে পাহাড় ঘেরা একটা সবুজ উপত্যকা। এর একপাশ দিয়ে ছোট্ট একটা ঝরণা প্রবাহিত। উপত্যকার উত্তর পাশে পাহাড়ের একটা বড় গুহা ঘিরে বড় একটা পাথরের বাড়ি। পাহাড়ের পাদদেশে ছড়ানো আরো কয়েকটি তাবু। পাহাড়ের ঐ বড় গুহা বাড়িতে বাস করেন হুই নেতা শেখ ওয়াং চিং চাই।

শেখ ওয়াং চিং চাই চীনের বিখ্যাত হুই নেতা মা পেন চাই এর বংশধর। মা পেন চাই জাপান বিরোধী সংগ্রামের জন্যে চীনের ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন। জাপান বাহিনী যখন চীন আক্রমণ করে, যখন তাদের আগ্রাসী থাবা কানশু-শামসি পর্যন্ত বিস্তৃত হলো। হুই মুসলমানরা রুখে দাঁড়াল তাদের বিরুদ্ধে।

মা পেন চাই এর নেতৃত্বে হুই বাহিনী এতটাই সাহসী ও সফল ভুমিকা পালন করে যে এই বাহিনী কে ইস্পাত বাহিনী নামে আখ্যায়িত করা হয়েছিল।

আজকের চীনের কানশু প্রদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে চীং নদীর উপকুলবর্তী পিং লিয়াং ছিল হুই মুসলমানদের সবচেয়ে ঘন বসতি অঞ্চলের একটি। এখানে বাস ছিল মা পেন চাইদের। মা পেন চাই এর বড় ছেলে শেখ চি হো এন তখন হুই মুসলমানদের নেতা এবং তাদের ইমাম। এই সময় মাও এর নেতৃত্বে কম্যুনিষ্ট বাহিনীর কালো থাবা এ অঞ্চলের উপর এসে পড়ে। সংগ্রামী হুই মুসলমানরা তাদেরকে বুঝতে ভুল করে। প্রথমে তাদেরকে বন্ধু এবং নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের সহায়ক হিসেবে গ্রহণ করে। মাও এর প্রচারকরা প্রথমে এ কথাই বলেছিল, চীনের রাজতান্ত্রিক আধিপত্যবাদী আগ্রাসন থেকে তারা চিরতরে মুক্তি পাবে। কিন্তু চারিদিকে থাবা পাকাপোক্ত করার পর মাওবাদিরা স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করল। সংগ্রামী হুইরা তাদের আধিপত্য মেনে নিল না। ইমাম চি হো এন এর নেতৃত্বে তারা কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। কম্যুনিষ্টদের হাত তখন অনেক মজবুত। তবু সংগ্রাম চালাল অনেক দিন ধরে। হুইরা উৎখাত হলো ভিটেমাটি থেকে। পাহাড়ে আত্মগোপন করে তারা চি হো এন এর নেতৃত্বে সংগ্রাম চালিয়ে গেল। অবশেষে সোভিয়েতের মদদপুষ্ট মাও বাহিনীর দ্বারা কানশুর পাহাড় এলাকা থেকেও তারা বিতাড়িত হলো। অনেকে নিরুপায় হয়ে আত্মসমর্পন করল। কিন্তু চি হো এন এর নেতৃত্বে সংগ্রামরত হুই মুসলমানদের একটি দল সংগ্রামের পতাকা উড্ডীন রেখে কানশু থেকে পালিয়ে এল। প্রথমে তারা আশ্রয় নিল উরুমচিতে। সেখান থেকে কাশগড়ে। এখনও তারা কাশগড়ে আত্মগোপন করে আছে। ছোট তারিম নদীর উত্তরে এ ঘাটিটি তারা তৈরী করেছে ট্রেনিং কেন্দ্র হিসেবে। আজকের হুই নেতা শেখ ওয়াং চিং চাই ঐ শেখ চি হো এন এর বড় ছেলে।

পাহাড়ের সেই পাথুরে বাড়িটির সম্মুখ ভাগে একটি বড় কক্ষ। দরবার কক্ষ এটা। একই সাথে মসজিদও। মেহরাবের সামনে একটা জায়নামাজে বসে আছেন শেখ ওয়াং চিং চাই। তার সামনে বসে হাসান তারিক এবং আব্দুল্লায়েভ। শেখ ওয়াং চিং চাই এর ডানে-বামে এবং ঘরের চারদিক ঘিরে বসে আছে সেই

যুবক আহমদ ইয়াং সহ হুইদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। হাসান তারিক কথা বলছিল। ঘরের সবাই গোগ্রাসে তা যেন গিলছিল । যুবক আহমদ ইয়াং এর চোখ আনন্দোজ্জ্বল হয়ে উঠছিল, কখনও হয়ে পড়ছিল বেদনায় নিষ্প্রভ।

কথা শেষ করল হাসান তারিক।

সবাই নিরব। অশ্রু ঝরছিল বৃদ্ধ শেখ ওয়াং চিং চাই এর চোখ থেকে। অনেকক্ষণ পর সে মুখ তুলল। মাথা থেকে নেমে আসা রুমালের প্রান্ত দিয়ে দু'চোখ একটু মুছে প্রথমে হাসান তারিক তারপর আব্দুল্লায়েভ এর হাতে চুমো দিয়ে বৃদ্ধ বলল, বাবা আল্লাহর শোকর যে তোমাদের এমনভাবে কাছে পাবার সৌভাগ্য আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন ।

তারপর সে মুখ তুলে ঘরের সকলকে উদ্দেশ্য করে বলল, ভাইসব আমাদের যে ক'জন ভাই মারা গেছেন তাদের জন্যে আমরা বেদনা বোধ করছি, কিন্তু তার চেয়েও হাজার গুন বেশী বেদনাদায়ক হলো, ফিলিস্তিনের যে বিপ্লবের জন্যে আমরা গৌরব করি, মিন্দানওয়ে যে বিপ্লব আমাদের অহংকার, কয়েকদিন আগে সংঘঠিত মধ্য এশিয়ার যে বিপ্লব আমাদের কাছে প্রাণের চেয়ে প্রিয়, সেই বিপ্লবের নেতা আহমদ মুসাকে আমাদের পাশ দিয়ে ওরা ধরে নিয়ে গেছে। আমরা যদি জানতে পারতাম এবং আরও অনেক প্রাণের বিনিময়ে হলেও যদি ওঁকে উদ্ধার করতে পারতাম।

বৃদ্ধ একটু থামল। তারপর আহমদ ইয়াংকে উদ্দেশ্য করে বলল, তুমি কাশগড়ে এখনি ওয়ারলেস করে দাও। বলে দাও কাশগড় পৌছার আগেই যেন ওরা জেনারেল বোরিসকে পাকড়াও এবং আহমদ মুসাকে উদ্ধারের চেষ্টা করে।

আহমদ ইয়াং শেখ ওয়াং চিং চাই এর বড় ছেলে এবং এখানকার অপারেশন কমান্ডার।

নির্দেশ পাওয়ার পর আহমদ ইয়াং বেরিয়ে গেল।

বৃদ্ধ শেখ ওয়াং চিং চাই আবার আত্মস্থ হয়েছে। কোন ভাবনার গভীরে যেন ডুবে গেছে সে। কিছুক্ষণ পর মুখ তুলল। হাসান তারিকের দিকে চেয়ে বলল, তোমাদের কাছে পেয়ে বুক ভরা বেদনা যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

একটু থামল, একটু ঢোক গিলল শেখ ওয়াং চিং চাই। তারপর শুরু করল আবার, তোমরা ফিলিস্তিন, ফিলিপাইন এবং সোভিয়েত মধ্য এশিয়ায় মুসলমানদের যে দূর্দশা দেখেছ, যা জেনেছ, চীনের দুখী মুসললমানরা তার চেয়ে ভাল ব্যবহার পায়নি। আমার শৈশব কৈশোর কেটেছে কানশুর পিয়াংলিয়াংএ। আমি দেখেছি কম্যুনিস্টরা কেমন করে বন্ধু হিসেবে প্রবেশ করে আমাদের সর্বনাশ করেছে। একে একে ওরা আমাদের সব কিছু ছিনিয়ে নিয়েছিল, কিন্তু ওরা যেদিন আল্লাহর ঘর মসজিদে হাত দিল সেদিন আমরা বরদাশত করতে পারিনি। কিন্তু বাবা, আমরা জীবন দিয়েছি, সব হারিয়েছি, তারপরও আমরা মসজিদ বাঁচাতে পারিনি। শুনেছি, চিং নদীর তীরে আমাদের সুন্দর মসজিদটিকে ওরা নৃত্যশালা বানিয়েছে। এক ইঞ্চি পুরু ইমামের সুন্দর জায়নামাজটিকে নৃত্যশালার দরজায় রেখে ওতে ওরা পা মুছছে। এখন শুনছি আজকের চীনের নতুন সরকার ক্ষতিপূরণ হিসেবে এ মসজিদের বদলে আরেকটা মসজিদ করে দিতে চাইছে। কিন্তু গরু মেরে জুতা দান ক্ষতিপূরণ নয়।

এই সময় আহমদ ইয়াং ঘরে প্রবেশ করল। শেখ ওয়াং কে উদ্দেশ্য করে বলল, জনাব আমি কাশগড়ে কথা বলেছি ওরা এখনি বেরুচ্ছে।

-জনাব আমরাও এখনি কাশগড় যাত্রা করতে চাই, আপনি অনুমতি দিন। আহমদ ইয়াং কথা শেষ করার সাথে সাথেই বলে উঠল হাসান তারিক।

-নিশ্চয় যাবে, সময় এখন অত্যন্ত মুল্যবান। বলল বৃদ্ধ শেখ ওয়াং। একটু থামল, কি যেন চিন্তা করল। তারপর বলল, আমাদের ছেলে একটু ভুল করে ছিল, যার কারণে ঐ পাঁচজনকে জীবন দিতে হয়েছে প্রায়শ্চিত্য করার জন্যে। উইঘুরের মুসলিম চিত্রাভিনেত্রী 'মেইলিগুলি'কে ওরা কিডন্যাপ করে এখানে নিয়ে আসছিল। 'মেইলিগুলি' শুটিং এর জন্যে এসেছিল কাশগড়। ছেলেদের যুক্তি ছিল, একটি ভালো ঘরের ভা্লো মুসলিম মেয়ে নিয়ে সর্বব্যাপী নির্লজ্জ চর্চা অসহ্য, তাকে এবং মুসলিম সমাজকে এ থেকে রক্ষা করা দরকার।

একটা ঢোক গিলে বৃদ্ধ শেখ আবার বলল, এ বিষয়টা তোমাদের এ জন্যেই জানালাম যে, জিনিসটা শুরু থেকেই আমাকে পীড়া দিচ্ছে। মনে হচ্ছে ভাল কাজ হয়নি, এ জন্যেই আল্লাহ বোধ হয় শাস্তি দিলেন আমাদের।

থামল বৃদ্ধ শেখ ওয়াং। তারপর আহমদ ইয়াং এর দিকে চেয়ে বলল, মেহমানদের খাবার ব্যবস্থা কর।

আহমদ ইয়াং বেরিয়ে গেলে শেখ ওয়াং চিং চাই হাসান তারিককে বলল, খেয়ে আধা ঘন্টার মধ্যেই তোমরা যাত্রা করতে পারবে। তোমাদের সাথে যাবে আহমদ ইয়াং।

বলে বৃদ্ধ তার বিশ্রাম কক্ষের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, তোমরা খেয়ে নাও, আমি আসছি।

# ৩

জেনারেল বোরিস কোন শত্রু কিংবা সন্দেহজনক কিছু পেছনে রেখে যেতে চায় না। এই নীতির ভিত্তিতেই সে হত্যা করেছে ছোট তারিম নদীর তীরে ঐ পাঁচজন হুই যুবককে। সেই সাথে সে উদ্ধার করেছে সুন্দরী অভিনেত্রী মেইলিগুলিকে। মেইলিগুলিকে ঐ যুবকরা ধরে নিয়া যাচ্ছিল। তারা নিহত হলে মেইলিগুলি সাহায্যের আবেদন জানায় এবং তাকে কাশগড় পৌছে দিতে জেনারেল বোরিসকে অনুরোধ করে। জেনারেল বোরিস বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করার পর তাকে কাফেলায় শামিল করে নেয়।

মেইলিগুলির গোটা দেহটা কাল কাপড়ে আবৃত ছিল। হুই যুবকরা তাকে কিডন্যাপ করার পর তার দেহে এই বোরখা পরিয়ে দিয়েছিল। মেইলিগুলি এখন ওটা খুলে ফেলল। কালো বোরখার আবরন চলে গেলে বেরিয়ে এল লাল রং এর পশ্চিমা ষ্টাইলের স্কার্ট পরা তার দেহ। অপরূপ তার দেহ সুষমা।

আহমদ মুসা সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে নিল। তাকে বেঁধে ঘোড়ার পিঠে আগের মত করেই শুইয়ে রাখা হয়েছিল।

পাঁচজন হুই যুবক হত্যার ঐ ঘটনা ঘটার পর জেনারেল বোরিসের কাফেলা কোন প্রকার বিশ্রাম না নিয়ে দ্রুতবেগে এগিয়ে চলল কাশগড়ের দিকে। সে ভয় করেছিল হুইরা এই হত্যার প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করতে পারে।

মেইলিগুলি এবং জেনারেল বোরিসের ঘোড়া প্রায় পাশাপাশি চলছিল। তাদের সামনে কিছু আগে আহমদ মুসার ঘোড়া। ঘোড়ার জিনের সাথে বেঁধে রাখা তার দেহ দেখা যাচ্ছে, কিন্তু মুখ দেখা যাচ্ছেনা। পাহাড়ী পথে ঘোড়ার চলা ও উঠা নামায় দেহটা তার অবিরাম ঝাঁকুনি খাচ্ছে।

আহমদ মুসার নিষ্পাপ দীপ্তিমান মুখ প্রথমেই মেইলিগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আহমদ মুসার রক্তাক্ত পোষাকও তার দৃষ্টি এড়ায়নি। সে বুঝতে পেরেছে ঐ বন্দীর উপর অমানুষিক নির্যাতনও করা হয়েছে। কিন্তু সে বিস্মিত

হয়েছে আহমদ মুসার চিন্তা শূন্য উদ্বেগহীন উজ্জ্বল প্রশান্ত-পবিত্র মুখ দেখে। মনে হচ্ছে কোন কিছুর প্রতিই যেন তার ভ্রুক্ষেপ নেই। বন্দীর চেহারা তো এমন হয়না। সুতরাং শুরু থেকেই আহমদ মুসার ব্যাপারে মেইলিগুলির মনে একটা কৌতুহলের সৃষ্টি হয়। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করতে সে সাহস পায়নি। জেনারেল বোরিস তাকে আপনা থেকেই বলেছিল, বন্দী একজন ভয়ংকর লোক। মেইলিগুলি জেনারেল বোরিসের একথা বিশ্বাস করেনি। কারণ ভয়ংকর কোন লোকের চেহারা এমন হয় না। তবে সে মনে করেছে, সাধারন কোন মন ও অসাধারন কোন শক্তির অধিকারী না হলে এমন বিপদে কোন মানুষ এমন প্রশান্ত উজ্জ্বল থাকতে পারে না। এমন যে লোকটি সে কে? এই জিজ্ঞাসা মেইলিগুলির মনে তীব্রতর হয়ে উঠল।

আরেকটা জিনিস মেইলিগুলির নজর এড়ায়নি। সেটা হলো, একমাত্র বন্দী ছাড়া সবাই রুশ। বন্দীকে তার মতে তুর্কি বংশোদ্ভূত বলেই মনে হয়েছে। মুখের সুন্দর দাড়ি দেখে তার মনে বার বারই প্রশ্ন জেগেছে বন্দী কি মুসলমান?

জেনারেল বোরিসের কাফেলা অনেক্ষণ আগে অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমিতে নেমে এসেছে। অর্থাৎ তারা কাশগড়ের নিকটবর্তী হয়েছে। সমভূমিতে নেমে আসার পর জেনারেল বোরিসকে খুবই গম্ভীর দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে কি যেন হিসেব করছে সে।

এক জায়গায় এসে জেনারেল বোরিস থমকে দাঁড়াল। থামিয়ে দিল কাফেলা। পকেট থেকে একটা কাগজ টেনে বের করল। কাগজটা কাশগড় এলাকার মানচিত্র।

যেখানে এসে কাফেলা দাঁড়িয়েছে, সেখান থেকে একটা বড় রাস্তা সোজা পূর্ব দিকে এগিয়ে গেছে। আরেকটা ছোট রাস্তা উত্তর দিকে বাঁক নিয়ে ছোট তারিমের তীর ধরে এগিয়ে গেছে। বড় রাস্তাটা কাশগড় যাওয়ার সোজা এবং সংক্ষিপ্ত পথ। আর ছোট রাস্তাটা তারিমের সাথে আঁকা বাঁকা পথে এগিয়ে অনেক পথ ঘুরে কাশগড়ের পাশ দিয়ে আরও পূর্বে তাকলামাকান মরুভূমির দিকে চলে গেছে।

জেনারেল বোরিস মানচিত্রটি পকেটে রেখে তার একজন সহকারী কর্ণেল কুনাকভকে বলল, তুমি চারজনকে নিয়ে এই সোজা পথে কাশগড় চলে যাও। যা বলেছি সেইভাবে ব্যবস্থা করে আমাকে খবর দাও। তারপর আমরা আসব।

মেইলিগুলি বলল, আমি কি এদের সাথে কাশগড় চলে যেতে পারি জেনারেল?

জেনারেল বোরিস একটু হেসে বলল, না আপনি আমাদের সাথে যাবেন।

কুনাকভ সহ তার চারজন সাথী চলে যাবার মিনিট পাঁচেক পর জেনারেল বোরিস তার অবশিষ্ট কাফেলাকে উত্তরের রাস্তা ধরে এগিয়ে চলার নির্দেশ দিল। এই নির্দেশে মেইলিগুলি বিস্মিত হলো, কর্ণেল কুনাকভকে দেয়া কথা মোতাবেক তো তার তরফ থেকে খবর না আসা পর্যন্ত এখানেই অপেক্ষা করার কথা। মেইলিগুলি এই বিস্ময় তার মনে চেপে রাখল। দেখল, জেনারেল বোরিসের মুখ অত্যন্ত গম্ভীর।

কাফেলা প্রায় এক ঘন্টা চলার পর এক জায়গায় এসে জেনারেল বোরিস ওয়্যারলেস কানে লাগিয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়ল। সে ঘোড়া থেকে নামল এবং কাফেলাকে দাঁড়াতে বলে পাশের পাহাড়ের টিলায় উঠে গেল। চোখে দূরবীন লাগিয়ে চারদিকটা দেখল। প্রায় এক মাইল পূর্ব দিকে তারিম নদীর তীরে এই রাস্তার পাশে পুলিশ ষ্টেশনের একটা সাইনবোর্ড দেখে জেনারেল বোরিসের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

সে নেমে এল পাহাড় থেকে। তারপর কাফেলায় ফিরে এসে মেইলিগুলিকে একপাশে ডেকে নিয়ে চুপি চুপি বলল, আমি যে দলকে কাশগড় পাঠিয়েছিলাম, পথে তাদের উপর হুইরা আক্রমন করেছিল। কিন্তু আপনাকে না দেখে তাদের ছেড়ে দিয়ে ওরা এদিকে এগিয়ে আসছে এবং কাশগড় থেকে হুইদের আরেকটা দলও এই পথে এদিকে আসছে।

একটু দম নিল জেনারেল বোরিস, তারপর বলল, এখন আমাদের করণীয় হল, সামনেই একটা পুলিশ ষ্টেশন আছে। আমরা আপনাকে সেখানে নিয়ে যাচ্ছি। আপনি সেখানে গিয়ে বলবেন, হুইরা আপনাকে কিডন্যাপ করে পাহাড়ের ঘাটিতে নিয়ে যাচ্ছিল। আমরা ব্যবসায়ী, আসার পথে আমরা আপনাকে

উদ্ধার করেছি। উদ্ধার করতে গিয়ে এই লোক (আহমদ মুসা) আহত হয়েছে। এখন হুইরা আবার আপনাকে ধরতে আসছে। আপনি পুলিশের সাহায্য চান। এরপর যা বলার আমিই বলল।

মেইলিগুলি বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করল, কথাগুলো বলার সময় জেনারেল বোরিসকে খুবই উত্তেজিত ও উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। যে ধরনের ঘটনা এবং যে অবস্থা তাতে এতটা উদ্বেগ বোধ করার কিছু নেই। মেইলিগুলির মনে প্রশ্ন জাগল, তাহলে এর বাইরেও কি কিছু আছে? বন্দী লোকটা কে? এই প্রশ্ন আবার তার মনে জাগল।

জেনারেল বোরিসের কথার জবাবে মেইলিগুলি বলল, ঠিক আছে, আমি বলল। এরপর জেনারেল বোরিস আহমদ মুসার ঘোড়ার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তার বাঁধন খুলে দিল। বাঁধন খুলে গেলে আহমদ মুসা উঠে বসল। জেনারেল বোরিসের নির্দেশে একটা বড় সাদা চাদর আনা হলো। সে সাদা চাদরটি জেনারেল বোরিস আহমদ মুসার হাতে তুলে দিয়ে বলল, গায়ে জড়িয়ে নিন।

একটু দম নিল যেন জেনারেল বোরিস । তারপর বলল, শুনুন, এই মেয়েকে কিডন্যাপকারী হুইদের সাথে সংঘর্ষে আপনি আহত হয়েছেন, এখন অসুস্থ আপনি। কেউ জিজ্ঞেস করলে এই কথাই বলবেন।

একটু থেকে হাতের রিভলভারটি নাচিয়ে নাচিয়ে বলল, মনে রাখবেন, যে মুহূর্তে কথার সামান্য অন্যথা দেখব, ছাতু করে দেব মাথা।

আহমদ মুসার মুখে একটা প্রশান্ত হাসি ফুটে উঠল। কোন উত্তর দিল না।

মেইলিগুলি বোরিসের পাশেই দাঁড়িয়েছিল। তার মনে হল বোরিসের হুমকি যেন পাথরের বুকে আছাড় খেয়ে ফিরে এল।

জেনারেল বোরিসের কাফেলা থানায় গিয়ে হাজির হলো।

থানাটি রাস্তা থেকে গজ পঞ্চাশেক দূরে একেবারে নদীর তীরে দাঁড়ানো। প্রথমেই একটা বড় গেট। গেট পেরুলে একটা লন, তারপর থানার প্রধান অফিস ঘর।

গেটে একজন পুলিশ দাঁড়ানো ছিল। মেইলিগুলি তাকে গিয়ে তার প্রয়োজনের কথা বলল। পুলিশ একবার মেইলিগুলির আগুন ঝরা অপরূপ

সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে গেট ছেড়ে দিল। মেইলিগুলি এবং জেনারেল বোরিস ভেতরে ঢুকে গেল। আহমদ মুসাকে নিয়ে অন্যারা গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকল।

থানার অফিসার ইনচার্জ একজন হীন গোত্রীয় চীনা। ধর্ম পরিচয়ে ওরা বৌদ্ধ। দু'একজন সেপাই ছাড়া থানার অধিকাংশ পুলিশই হীন গোষ্ঠীর। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় অন্যান্য ক্ষেত্রের মত পুলিশ বিভাগ থেকে মুসলমানদের খেদানো হয়েছিল। বর্মমানে নতুন প্রশাসনের অধীনে তারা চাকুরী আবার কিছু কিছু ফিরে পেতে শুরু করেছে মাত্র।

মেইলিগুলি গিয়ে থানার অফিসার ইনচার্জকে তার কথা বলতে শুরু করল।

মেইলিগুলির নাম শুনেই পুলিশ অফিসার লাফিয়ে উঠল। পাশের ফাইল থেকে একটা ফটো বের করে এসে একবার ফটোর দিকে আর একবার মেইলিগুলির দিকে তাকিয়ে বলল, ঠিক মিলেছে, আপনার জন্যে হয়রান আমরা। কাশগড় রেষ্ট হাউজে আপনার মা ভীষণ উদ্বিগ্ন, তাকে আমরা জানিয়ে দিই আপনার কথা? খুশী হয়ে মেইলিগুলি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

অফিসার ভেতরে আরেকটা রুমে চলে গেল। অল্পক্ষণ পর ফিরে এসে বলল, হেড কোয়ার্টারে জানিয়ে দিয়েছি। এখনি ওরা জানিয়ে দেবে আপনার মাকে।

-এখন শুনুন আমার কথা। বলল মেইলিগুলি।

-হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন।

সব কথা শুনে অফিসার ইনচার্জ একগাল হেসে বলল, ও আপনি কোন চিন্তা করবেন না। ওরা থানার আশে-পাশে আসতে সাহস পাবে না।

তারপর জেনারেল বোরিসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, ব্রেভম্যান, আপনাদের ধন্যবাদ। আমাদের বিরাট ঝামেলা থেকে বাঁচিয়েছেন।

জেনারেল বোরিসের মাথায় তখন অন্য চিন্তার ঝড়। সে ভাবছে, কাশগড়ে তাদের সংবাদ গেল কি করে? নিশ্চয় ছোট তারিমের ঐ এলাকয় হুই মুসলমানদের যে ঘাটি আছে সেখান থেকেই তাদের ব্যাপারে সব কথা কাশগড়ে তাদের লোকদের জানানো হয়েছে। আর তা অবশ্যই ওয়্যারলেসে। ওয়্যারলেসে

তাদের জানানো সব কথার মধ্যে কি কি কথা আছে? সাইমুমের সাথে তাদের কি কোন সম্পর্ক আছে? যখন এসবের কিছুই জানা নেই, তখন সব কিছুই সন্দেহের ব্যাপার। সুতরাং কিছুতেই তার এদের নজরে পড়া চলবে না। আবার থানাতেও বেশীক্ষণ দেরী করা বিপজ্জনক। আহমদ মুসার ব্যাপারটাই শুধু নয়, আগ্নেয়াস্ত্রসহ যে সব লাগেজ আছে তা একবার চীনা পুলিশের নজরে পড়লে কোন দিনই এদের হাত থেকে ছাড়া পাওয়া যাবে না। এই সংকট থেকে উদ্ধার পাবার দুটোই পথ। প্রথমত মেইলিগুলিকে তার কাফেলা থেকে পৃথক করা, যাতে করে হুইদের নজরে পড়া থেকে এ কাফেলা বাঁচতে পারে। দ্বিতীয়ত কারো নজরে না পড়ে এইভাবে আহমদ মুসাকে কাশগড় পর্যন্ত পৌঁছানো। কাশগড়ে একবার পৌঁছাতে পারলে উরুমচি যাবার সব ব্যবস্থা এখানকার 'ফ্র' ইউনিট ঠিক করে রেখেছে।

জেনারেল বোরিস অফিসার ইনচার্জকে বলল, আমাদের প্রতি আপনার এ শুভেচ্ছার জন্যে ধন্যবাদ।

এক মুহূর্ত থেকে জেনারেল বোরিস বলল, মেইলিগুলির কাছে আপনি সবকিছু শুনেছেন। এখন আমার আবেদন হল, মেইলিগুলির দায়িত্ব আপনারা নিয়ে তাকে কাশগড়ে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। আর আমাদের জন্যে যেমন করে হোক একটা গাড়ির ব্যবস্থা করুন যাতে অসুস্থ লোকটিকে কাশগড় পর্যন্ত ভালোভাবে নিয়ে যেতে পারি। ঘোড়াগুলো আমাদের ক্লান্ত, এরা লাগেজও আর বইতে পারছে না।

থানা অফিসার একটু চিন্তা করে বলল, ঠিক আছে, অসুবিধা হবে না। একটা চার আসনের পিকআপ ভ্যান হলেই তো আপনার চলবে। আর মেইলিগুলিকে নিয়ে তো কাশগড় শুধু নয় উইঘুর ও গোটা সিংকিয়াং-এ মহা হৈ চৈ চলছে। ওঁকে এখনি একটা গাড়িতে কাশগড় পাঠিয়ে দিচ্ছি।

-আমরা এখনই যাত্রা করতে চাই।

-মেইলিগুলিকে এখনি পাঠাচ্ছি। পুলিশ সাথে থাকবে। এতে আপনাদেরও সুবিধা হবে।

-ধন্যবাদ। বলল জেনারেল বোরিস।

গাড়ির ব্যবস্থা হয়ে গেল। জেনারেল বোরিস ও তার লোকজন ঘোড়ার পিঠ থেকে লাগেজ খুলে পিকআপ ভ্যানে তোলার ব্যবস্থা করছে।

আহমদ মুসাকে প্রথমেই পিকআপ ভ্যান তোলা হয়েছে এবং দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। জানালা দিয়ে আহমদ মুসাকে দেখা যাচ্ছে। জেনারেল বোরিসের একজন লোক সে জানালার পাশে ঘুর ঘুর করছে। বোঝাই যাচ্ছে সে আহমদ মুসার দিকে চোখ রেখেছে। তার একটা হাত পকেটে। অর্থাৎ প্রয়োজন হলে রিভলভার বের করতে এক মূহূর্ত দেরী করবে না।

মেইলিগুলির জীপ রেডি। একসাথে যাবার জন্যে সে দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখ ঘুরে ঘুরে বারবার আহমদ মুসার দিকেই নিবন্ধ হচ্ছিল। কিন্তু একবারই শুধু তার সাথে চোখাচোখি হয়েছে। সেই যে চোখ নামিয়ে নিয়েছে আর সে মুখ তুলেনি তার দিকে। মেইলিগুলির মনে পড়ল, জেনারেল বোরিস যখন তার বাঁধন খুলে দিচ্ছিল এবং কথা বলছিল তখনও সে মেইলিগুলির দিকে একবারও ফিরে তাকায়নি। সে বিস্ময় মানল, কাছে পেয়েও মেইলিগুলির দিকে চোখ ফেলে না, তার দিকে গোগ্রাসে তাকিয়ে থাকে না, এমন মানুষ কি থাকতে পারে। সেই কৈশোর থেকে এমন একজন মানুষও তো সে পায়নি। হঠাৎ করে মনে পড়ল তাকে কিডন্যাপকারী যুবকদের কথা। তারা তাকে কিডন্যাপ করে দুই রাত লুকিয়ে রেখেছিল নির্জন স্থানে, তারপর একদিন মধ্য রাতে তাকে নিয়ে যাত্রা করেছিল তিয়েনশানে। কিন্তু তারা কেউ তার গা স্পর্শ করেনি, কোন প্রকার অশ্লীল আচরণও করেনি। ঐ যুবকদের আচরণও তার কাছে বিস্ময়কর। তবু তাদের চোরা চোখের দৃষ্টিতে মাঝে মাঝে সে তার প্রতি প্রশংসার পীড়ন অনুভব করেছে। কিন্তু এর চোখ তো তাকে কোন গণ্যের মধ্যেই আনছে না। কে এই অদ্ভুত বন্দী?

মেইলিগুলি ইতস্তত হাঁটতে হাঁটতে সেই পিকআপের জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। মেইলিগুলি সেখানে দাঁড়ালে জেনারেল বোরিসের লোকটি একপাশে সরে গিয়ে পায়চারি করতে লাগল।

মেইলিগুলি আহমদ মুসার প্রায় মুখোমুখি। দু'জনের মধ্যে ব্যবধান এক গজের চেয়ে বেশি হবে না। আহমদ মুসা একবার চোখ তুলেই আবার নামিয়ে নিয়েছে।

মেইলিগুলি জিজ্ঞেস করতে এসেছিল, কে এই বন্দী, কিন্তু হঠাৎ এ সময় তার মুখ দিয়ে বের হয়ে গেল, কিছু বলার আছে আপনার?

একেবারে ফিসফিসে স্বর ছিল মেইলিগুলির। প্রশ্নটা করেই সে ঘুরে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল লাগেজ টানাটানি কাজের দিকে। কিন্তু সে উৎকর্ণ ছিল আহমদ মুসার উত্তর শোনার জন্যে।

আহমদ মুসা তার এই প্রশ্নে কিছুটা বিস্মিত হলো এবং মেয়েটির এই সুন্দর অভিনয়ে মনে মনে হাসল। একটু ভেবে নিয়ে মেয়েটির ঐ প্রশ্নের জবাবে সে উইঘুর এলাকার আঞ্চলিক টানে বলল, শুকরিয়াহ বোন, আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন এবং জাতির কাজে লাগার শক্তি আপনাকে দিন।

কথা শেষ করে নিজের কথায় নিজেই চমকে উঠল আহমদ মুসা। বহুদিন-অনেক বছর পর সে নিজের মাতৃভাষায় কথা বলল। মাতৃভাষার এ ধ্বনি যেন মুহুর্তে তাকে অনেক পেছনের অতীতে টেনে নিয়ে গেল। মনে পড়ল শৈশব কৈশোর এবং যৌবনের প্রারম্ভ কালের অনেক ঘটনা, অনেক পুরানো চিত্র এবং তিয়েনশানের কোলে মুক্ত বাতাসের মত ছুটে বেড়ানোর মধুর অনেক স্মৃতি। যেভাবেই হোক, সেই তিয়েনশানের কোলে, সেই সিংকিয়াং-এ সে হাজির। একথা মনে হতেই কোত্থেকে যেন নতুন প্রাণের জোয়ার আসছে তার দেহে, প্রতি ধমনীতে।

আহমদ মুসার কথা শেষ হতে না হতেই জেনারেল বোরিস ছুটে এল এদিকে। এসে বলল, সব রেডি, উঠুন এবার গাড়িতে। এখন যাত্রা শুরু করলেও সন্ধ্যার আগে কিছুতেই আমরা কাশগড় পৌছাতে পারবো না।

মেইলিগুলি মনে মনে হাসল। বুঝল, বন্দীর সাথে কথা বলি এটা বোরিস চান না। এটা ঠেকানোর জন্যেই এখন গাড়িতে ওঠার তাড়াহুড়া। মেইলিগুলি মুখে বলল, ধন্যবাদ জেনারেল বোরিস, আমি প্রস্তুত।

মেইলিগুলি গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। গাড়িতে উঠে বসল সে। পেছনের সিটে বসল চারজন পুলিশ। হাতে তাদের স্টেনগান।

আগে চলল মেইলিগুলির জিপ। তার পেছনে জেনারেল বোরিসের পিকআপ। জেনারেল বোরিসদের ঘোড়াগুলো বাঁধা থাকল থানার গেটের বাইরে। ওগুলোর মালিকানা জেনারেল বোরিস থানা ইনচার্জকে দিয়ে গেল।

ছুটে চলেছে দু'টি গাড়ি কাশগড়ের পথে।

গাড়িতে বসে এখন এগিয়ে চলতে ভালো লাগছে মেইলিগুলির। মনে হচ্ছে, জীবনের এক দুঃস্বপ্নের ইতি ঘটিয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে সে।

সুখের এই স্মৃতিচারণের সময় আবার তার সামনে এল সেই অদ্ভুত বন্দীর কথা। কি অদ্ভুত মানুষ সে। নিজের কথা সে কিছুই বলল না, যা বলা ছিল ঐ রকম নির্যাতনপিষ্ট বন্দীর জন্যে স্বাভাবিক। উপরি সে আমারই মঙ্গল কামনা করল। নিজের সম্পর্কে এমন নির্বিকার কোন কাউকে তো তার এর আগে নজরে পড়েনি। তার উপদেশের কথাও মনে পড়ল। জাতির কাজে লাগার জন্যে যে শক্তি চাই তা তিনি মেইলিগুলির জন্যে প্রার্থনা করেছেন কিন্তু যা তিনি চেয়েছেন তা তো আমি কোনদিন চাইনি। নিজেকে নিয়ে ভেবেছি, জাতিকে নিয়ে তো কোন দিন ভাবিনি। তার কথা কি এই ভাববারই আহবান! কে এই আহ্বানকারী অদ্ভুত, অসাধারণ এবং অজানা এই বন্দী?

আশ-পাশের ঝোপঝাড় এবং পাহাড়ের ছোটখাট টিলার মিছিল পেছনে ফেলে তীব্র গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে দু'টো গাড়ি। মাঝপথে একদল ঘোড়সওয়ারকে অতিক্রম করল গাড়ি দু'টি। মুখ বাড়িয়ে তাদের দেখে মেইলিগুলি বুঝল, হুইরা বোধ হয় তাদের সন্ধানেই বেরিয়েছিল।

সন্ধ্যার পর গাড়ি দু'টি কাশগড় শহরে প্রবেশ করল। শহরে প্রবেশ করার পর মেইলিগুলির গাড়ি এগিয়ে চলল সরকারী রেষ্ট হাউজের দিকে। আর জেনারেল বোরিসের গাড়ি মোড় নিল শহরের হান রেসিডেন্সিয়াল এরিয়ার দিকে। মুখ ফিরিয়ে মেইলিগুলি একবার জেনারেল বোরিসের গাড়ির দিকে চাইল, একটা বেদনা বোধ করল সে মনে। জেনারেল বোরিসের হাতে ঐ অদ্ভুত বন্দীর কী যে হবে! বন্দীর মুখ থেকে শোনা তার উইঘুর টোনের কথা মনে পড়ল। সেকি তাহলে সিংকিয়াং-এর লোক? হঠাৎ মেইলিগুলির মনে হল, সে কি তার জন্যে কিছু করতে পারতো না!

কথাটা যখন মনে পড়ল, তখন সে চোখ ফিরিয়ে দেখল জেনারেল বোরিসের গাড়িটির রেয়ার লাইটের ক্ষীণ চিহ্নটিও পেছনের কালো আঁধারে মিশে গেছে।

কাশগড় থেকে অভ্যর্থনার জন্যে আসা দুই ঘোড়সওয়ারদের কাছ থেকে হাসান তারিক জেনারেল বোরিসকে অনুসন্ধানের তাদের চেষ্টার কথা শুনছিল। যেখান থেকে জেনারেল বোরিস উত্তর দিকে মোড় নিয়ে তারিম তীরের পথে কাশগড় যাত্রা করেছিল, সেখানে সে মোড়ে এসে হাসান তারিক দাঁড়াল।

হাসান তারিক কাশগড় থেকে আসা একজনের দিকে তাকিয়ে কাশগড়গামী সোজা পথটার দিকে ইংগিত করে বলল, তোমরা তো এ পথেই চারজন রুশ ঘোড়সওয়ারের দেখা পেয়েছিলে?

মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল সেই ঘোড়সওয়ার।

হাসান তারিক আব্দুল্লায়েভের দিকে তাকিয়ে বলল, ধূর্ত জেনারেল বোরিস চারজনকে সোজা পথটায় পাঠিয়ে উত্তরদিকের এ ঘোরা পথটা ধরেই কাশগড় গেছে।

সেই ঘোড়সওয়ারটি বলল, কিন্তু জনাব, আমরা সর্বক্ষন এ পথের ওপর চোখ রেখেছি, রাত তক এক বা একাধিক কোন ঘোড়সওয়ারই এ পথ দিয়ে যায়নি।

‘সেটা ভিন্ন কথা, কিন্তু জেনারেল বোরিস উত্তরের এ পথ ধরেই গেছে।’ বলে একটু থামল, একটু চিন্তা করল হাসান তারিক। তারপর উত্তরের পথ ধরে চলতে শুরু করল সে।

সেই থানার কাছাকাছি হাসান তারিকরা এসে পড়েছে। ওদিকে আলো দেখে হাসান তারিক জিজ্ঞেস করল, ওখানে কি? কোন বাড়ি?

-না ওটা থানা। আহমদ ইয়াং জবাব দিল।

থানার কথা শুনে হাসান তারিক থমকে দাঁড়াল। হঠাৎ তার মনে হল, জেনারেল বোরিসের হাতে মেইলিগুলি ছিল। প্রখ্যাত অভিনেত্রী সে, কিডন্যাপ হয়েছিল। পুলিশের সাহায্য সে পেতে পারে। জেনারেল বোরিস কি এরই সুযোগ গ্রহণ করেছে! কোন ঘোড়সওয়ার কাশগড় যায়নি। তার অর্থ ওরা কি এখনও থানায় থাকতে পারে? থানায় গিয়ে থানার প্যাঁচে আটকে পড়তেও তো পারে? একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা উঁকি দিল তার মনে।

হাসান তারিক একটু চিন্তা করল, তারপর আহমদ ইয়াং– এর দিকে চেয়ে বলল, থানায় একটু খোঁজ নেয়া যেতে পারে, আমার মনে হয় জেনারেল বোরিস এখানে আসতে পারে।

-তাহলে আপনারা দাঁড়ান, আমি খোঁজ নিয়ে আসি।

-ঠিক আছে, আমিও তোমার সাথে যাব। বলল হাসান তারিক

তারপর হাসান তারিক এবং আহমদ ইয়াং দু'জনে থানার পথ ধরে এগিয়ে চলল। আহমদ ইয়াং আগে চলছে, পেছনে হাসান তারিক।

থানা প্রাচীর ঘেরা। সামনে লোহার বড় গেট। লোহার গেট ঘেঁষে ভেতরে একটা পুলিশ বক্স। ওখানে বন্দুকধারী একজন পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। গেটের ডান পাশে জেনারেল বোরিসের রেখে যাওয়া সেই পাঁচটি ঘোড়া বাঁধা আছে তখনও।

আহমদ ইয়াং তখন গেটের কাছাকাছি পৌছেছে। হঠাৎ ঘোড়ারা হ্রেষা ধ্বনি করলে সে বাম দিকে চাইল। দেখল কয়েকটি ঘোড়া সেখানে বাঁধা। তাকে দেখে ঘোড়াগুলো পা ছুড়ছে এবং হ্রেষা ধ্বনি করছে।

আহমদ ইয়াং এর মনোযোগ ছিল গেটের দিকে, গেটের পুলিশের দিকে। সে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দ্রুত সেদিকে চলল।

গেটের পুলিশকে দেখে আহমদ ইয়াং মনে মনে বেজার হলো। পুলিশটি হান গোষ্ঠীর। ওরা সিংকিয়াং-এর মূল বাসিন্দা মুসলমানদের ভালো চোখে দেখে না। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়ে ওদের বিপুল সংখ্যায় এনে সিংকিয়াং-এ বসানো হয়েছে। এ অঞ্চলের মুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা পাল্টা শক্তি, এই মন্ত্র তাদের কানে দেয়া হয়েছিল। এটা তারা ভুলে যায়নি। তাদের বদ্ধমূল ধারণা, তারা শাসন করতেই এসেছে। এ ধারণা প্রকাশের কোন সুযোগই তারা ছাড়ে না।

আহমদ ইয়াং এসে দু’হাত গেটে রেখে গেট ঘেঁষে দাঁড়াল। সে জানে হানদের খুশী করতে হলে ওদের চীনা ভাষায় কথা বলতে হবে। আহমদ ইয়াং চীনা ভাষায় পুলিশটির প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে বলল, কোন মেহমান এসেছিল কি থানায়?

-কাদের কথা বলছ, মেইলিগুলি?

-রুশ কেউ?

-কয়েকজন রুশ মেইলিগুলির সাথেই এসেছিল। তাদের সাথে তোমার কি, কেন জিজ্ঞেস করছ?

-কিছু না খোঁজ করছি, ওরা আমাদের সাথী কিনা।

শেষ কথাটা শুনে পুলিশটি একটু খুশী হলো বলে মনে হলো। সাগ্রহে এবার বলল, মেইলিগুলিকে তোমরা কোথায় পেলে বলত? কি যে হয়রানী গেছে কয়দিন।

-পাহাড়ের পথে ওকে আমরা উদ্ধার করেছি।

-বড় ভাল মেয়ে তাই না, গোটা দেশে ও রকম একটি মেয়েও আমার চোখে পড়েনি। একেবারে সাক্ষাত পরী।

পুলিশের মুখে এবার কথার খই ফুটতে শুরু করেছে। আহমদ ইয়াং জানে মেইলিগুলির প্রসংগ নিয়ে কথা বললে ঘন্টাতেও শেষ হবে না। কিন্তু সময় নেই আহমদ ইয়াংদের। কথার মোড় ঘুরিয়ে সে বলল, ওরা এখন কোথায়?

-না ওরা সংগে সংগেই চলে গেছে। আমাদের সাহেব নিজে ওদের থানার গাড়িতে করে কাশগড় পাঠিয়ে দিয়েছে। ঐ দেখ ওদের ঘোড়া ওরা রেখে গেছে।

আহমদ ইয়াং ঘোড়াগুলোর দিকে ফিরে তাকালো। ঘোড়াগুলোর দিকে তাকাতে গিয়ে আহমদ ইয়াং আবার সেই দৃশ্যই দেখল, ঘোড়াগুলো তার দিকে তাকিয়ে মুখ তুলে হ্রেসা রব করছে। ঘোড়াগুলোর এই আচরণে এবার বিস্মিত হলো আহমদ ইয়াং।

পুলিশের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আহমদ ইয়াং ঘোড়াগুলোর কাছে এল। পেছনে পেছনে হাসান তারিক।

ঘোড়াগুলোর কাছে এসে চক্ষু স্থির হয়ে গেল আহমদ ইয়াং–এর একরাশ বিস্ময় এসে যেন তার কন্ঠ রুদ্ধ করে দিল। একি এ যে আমাদের ঘোড়া! সামনের দু'পায়ের সন্ধিস্থলে অস্পষ্টভাবে 'মুসলিম টার্কিক এম্পায়ার গ্রুপ' এর প্রতীক রেড ক্রিসেন্ট আঁকা! ঘোড়াগুলোকে এবার স্পষ্ট চিনতে পারল আহমদ ইয়াং। আর চিনতে পারার সাথে সাথে এক অজানা আশংকায় গোটা দেহ শিউরে উঠল তার।

অভিভূতের মত এগিয়ে আহমদ ইয়াং একটি ঘোড়ার গায়ে হাত বুলাল।

ইতিমধ্যে গেটের পুলিশ ছুটে এল সেখানে। বলল, শুন, ঘোড়াগুলো ওরা কিন্তু আমাদের বড় সাহেবকে দিয়ে গেছে।

আহমদ ইয়াং একবার পুলিশের দিকে ফিরে তাকাল। তারপর ফিরে আসার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল। কাফেলার উদ্দেশ্যে ধীরে ধীরে চলতে শুরু করল আহমদ ইয়াং। তার পেছনে পেছনে হাসান তারিক।

চলতে চলতে বিস্মিত হাসান তারিক বলল, কি ব্যাপার আহমদ ইয়াং, ঘোড়াগুলোর ব্যাপারটা কি?

-তারিক ভাই, মনে হচ্ছে আমাদের একটা বড় সর্বনাশ হয়ে গেছে।

-কি?

-'মুসলিম টার্কিক এম্পায়ার গ্রুপ' সোভিয়েত মধ্য এশিয়ায় আপনাদের বিপ্লবের খবর পেয়ে গ্রুপের ডেপুটি লিডার উরুমচির হাজি সেলিম চ্যাং এর নেতৃত্বে একটা দল তাসখন্দের উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিল, এ ঘোড়াগুলো তাদেরই।

'মুসলিম টার্কিক এম্পায়ার গ্রুপ' চীনের বিশেষ করে সিংকিয়াং অঞ্চলের মুসলমানদের মুক্তিকামী একটা বিপ্লবী সংগঠন সাধারন মুসলমানদের কাছে এ সংগঠন 'এম্পায়ার গ্রুপ' নামে পরিচিত। নয় শ' চৌত্রিশ খৃস্টাব্দে তিয়েনশানের এপারে পুর্ব তুর্কিস্তান অঞ্চলে ইসলাম প্রথম প্রবেশ করে। উইঘুর নেতা আবদুল করিম সাতুক বোগরা খান ইসলাম গ্রহণের পর পূর্ব তুর্কিস্থানে ইসলাম দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এই সাতুক বোগরা খানই চুরানব্বই খৃস্টাব্দে পূর্ব তুর্কিস্থানে ইসলামের প্রথম স্বাধীন মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সে রাষ্ট্র 'মুসলিম টার্কিক এম্পায়ার' নামে অভিহিত ছিল। চীনের মুসলিম ভূখন্ডে কম্যুনিষ্ট নিপীড়ন

শুরু হবার পর বিশেষ করে মাও এর নেতৃত্বে সাংস্কৃতিক বিপ্লব চলাকালে মুসলমানদের অস্তিত্ব বিলুপ্তি হবার মুখে চীনের মুসলমানদের মুক্তির জন্যে লড়াইরত মুসলমানরা মুক্তির সম্মিলিত প্লাটফরম হিসেবে চীনের প্রথম মুসলিম সাম্রাজ্যের নাম অনুসারে 'মুসলিম টার্কিক এম্পায়ার গ্রুপ' নামে এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করে। ' এম্পায়ার গ্রুপ' আরো সংক্ষেপে 'এম্পায়ার' এখন চীনা মুসলমানদের প্রাণের সংগঠন। কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে আপোষহীন বিপ্লবী নেতা শহীদ ওসিমান এর ছেলে উরুমুচির ইউসুফ চিয়াং এখন 'এম্পায়ার' এর নেতৃত্ব দিচ্ছেন্ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের 'কালো দিন' থেকে চীনা জনগণকে উদ্ধারকারী চীনের বর্তমান প্রশাসন 'এম্পায়ার গ্রুপ' এর অনেক দাবী ইতিমধ্যেই মেনে নিয়েছে। সংগঠনটি এখনও আন্ডারগ্রাউন্ডে থেকে কাজ করছে। 'এম্পায়ার গ্রুপ' এর প্রধান লড়াই কম্যুনিস্টদের আর্ন্তজাতিক সন্ত্রাসবাদী সংস্থা 'ফ্র' এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ধ্বংসাবিশিষ্ট 'রেড ড্রাগন' এর সাথে। চীনে 'ফ্র' এবং 'রেড ড্রাগন' কার্যত এক হয়ে এখন 'ফ্র' এর ব্যানারে কাজ করছে। সিংকিয়াং-এ তাদের এক নম্বর শত্রু মুসলমানরা এবং দু'নম্বর শত্রু হল নতুন চীন সরকার।

আহমদ ইয়াং এর কথা শেষ হলে একটু চিন্তা করে হাসান তারিক বলল, তারা যায়নি, এমনকি হতে পারে না?

-অসম্ভব। জেনারেল বোরিসের হাতে তাদের ঘোড়াগুলো পড়েছে এটাই প্রমাণ যে তারা গেছে।

হঠাৎ হাসান তারিকের মনে পড়ল পামিরে দেখা চীনা উইঘুর কাজাখদের দশটি লাশের কথা। সংগে সংগে হাসান তারিক দাঁড়িয়ে পড়ল। আহমদ ইয়াংও। হাসান তারিক বলল, ওরা কি দশজন ছিল?

-হ্যাঁ, দশজন, কেমন করে জানলেন আপনি?

-আমাদের চোখের দূর্ভাগ্য ইয়াং, আমরা তাহলে তাঁদের লাশই দেখে এসেছি পামিরে।

একটু ঢোক গিলে হাসান তারিক আবার বলতে শুরু করল, আমরা তখনই মনে করেছিলাম, ওদের ঘোড়া হাত করার জন্যেই ওদের হত্যা করা হয়েছে।

আহমদ ইয়াং দু'হাতে মুখ ঢেকেছিল। তার আঙুলের ফাঁক গলিয়ে গড়িয়ে পড়ছিল অশ্রু।

ধীরে ধীরে হাসান তারিক কাঁধে হাত রাখল। বলল, চল ভাই, ওরা আমাদের প্রেরণা। শহীদের রক্ত আন্দোলনকে দুর্বল করে না, শক্তিশালী করে।

কান্না চেপে কম্পিত গলায় আহমদ ইয়াং বলল, তারিক ভাই, হাজী সেলিম ভাই যেদিন গেছেন, তার পরদিন তার প্রথম পুত্র সন্তান জন্ম......

কথা শেষ করতে পারলো না আহমদ ইয়াং। কান্নায় জড়িয়ে গেল তার কথা।

হাসান তারিকের চোখটাও ভারী হয়ে উঠল। তবু আহমদ ইয়াংকে সান্তনা দিয়ে বলল, নিজের পুত্র, নিজের ভাই, নিজের স্ত্রী, নিজের আত্নীয় স্বজন সবার চেয়ে সেলিম ভাই যাকে বেশী ভালবাসতেন তার কাছেই তিনি গেছেন। ইয়াং, দু:খ করো না।

বলে হাসান তারিক আহমদ ইয়াং এর একটা হাত ধরে হাঁটতে শুরু করল।

কাফেলায় ফিরে এল তারা। কাফেলা ছুটে চলল এবার কাশগড়ের দিকে।

কাশগড়ের কাছাকাছি এসে হাসান তারিক আবদুল্লায়েভ ও আহমদ ইয়াং বাদে অন্যদের অন্যপথ ধরে কাশগড় প্রবেশের নির্দেশ দিল, দলবেঁধে প্রবেশ সে ভাল মনে করল না। সে ধূর্ত জেনারেলকে কিছুতেই জানতে দিতে চায় না যে কেউ তাকে অনুসন্ধান করছে।

কাশগড়ে বিখ্যাত ইদগান মসজিদের উত্তর পাশে তিনতলা একটা বিল্ডিং এ 'এম্পায়ার গ্রুপ' এর অফিস। কাশগড় এলাকার কাজ এখান থেকেই চলে।

অফিসের রেস্ট রুমে একটু গড়িয়ে নিল হাসান তারিক। অনেকদিন পর এই শয়ন। শোবার পর বুঝা গেল কি ধকল গেছে শরীরের ওপর দিয়ে। শরীরের জোড়াগুলো যেন খুলে যাচ্ছে, বেদনায় শরীরটা ঝাঁঝরা।

নরম বিছানায় একটু আরাম বোধ হতেই মনে পড়ল আহমদ মুসার কথা। সংগে সংগে ভুলে গেল নিজের দেহের কথা। জেনারেল বোরিসের মত অমানুষের

হাতে কেমন আছে সে? বিছানা থেকে উঠে বসল হাসান তারিক। ডাকল আবদুল্লায়েভ এবং আহমদ ইয়াংকে। আহমদ ইয়াং এর সাথে আলোচনা করল এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং 'ফ্র' এর কর্মতৎপরতা নিয়ে, জানা গেল পুর্ব তুর্কিস্থান অর্থাৎ সিংকিয়াং এ 'ফ্র' এর হেড় কোয়ার্টার উরুমচি এলাকায়। খোটান, ইয়ারকন্দ, আলতাই, তুরপান থেকে উরুমচি পর্যন্ত শরহগুলোর সাথে যোগাযোগের একমাত্র উপায় বাস। উরুমচির সাথে পনের দিনে একবার বিমান যোগাযোগ আছে।

সব শুনে হাসান তারিক বলল, আমার মনে হয় জেনারেল বোরিস আহমদ মুসাকে কাশগড়ে ইচ্ছা করে একদিনও রাখবেনা। যে শহর থেকে হুইরা মেইলিগুলিকে সরকারী তত্ত্বাবধান থেকে কিডন্যাপ করতে পারে, সে শহরে আহমদ মুসাকে রাখা নিরাপদ নয়।

একটু থেমে হাসান তারিক আহমদ ইয়াংকে বলল, আমি কয়েকটা জিনিস জানতে চাই। উরুমচিতে বিমান ফ্লাইট কবে, উরুমচিতে বাস যাবার সবচেয়ে কাছের তারিখ কবে, উরুমচি যাবার প্রাইভেট গাড়ি পাওয়া যায় কিনা।

আহমদ ইয়াং বলল, কাশগড়ে কোন প্রাইভেট গাড়ি মেলে না। আজ সকালে উরুমচিতে একটা ফ্লাইট গেছে। আগামী কাল উরুমচির উদ্দেশ্যে বাস ছাড়ার দিন।

একটু চিন্তা করল হাসান তারিক। তারপর বলল, তোমরা একটু বিশ্রাম নাও। আমরা যোহরের নামায পড়ে প্রথমে বিমান অফিস, তারপর বাস অফিসে যাব।

তারা যোহর নামায পড়ল ইদগান মসজিদে। কাশগড়ের সবেচেয়ে বড় মসজিদ। পনের হাজারেরও বেশি লোক এখানে একসাথে নামায আদায় করতে পারে। পাথরের দেয়াল। লক্ষণীয় মেহরাব এবং দেয়ালের বরাবর নিচের অংশটা খালি, সিমেন্ট বের হয়ে আছে।

হাসান তারিকের পাশে আহমদ ইয়াং নামায পড়ছিল। নামাযের ফাঁকে আহমদ ইয়াং কার্পেটের একটা অংশ উঠিয়ে দেখাল, মসজিদের মেঝেও এবড়ো থেবড়ো। আহমদ ইয়াং বলল, দেয়াল এবং মেঝে শ্বেত পাথরে আবৃত ছিল।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় কম্যুনিষ্টরা সব খুলে নিয়ে গেছে। মসজিদে ঝাড়বাতি ছিল, মূল্যবান কাঠের জানালা কপাট সবই ওরা নিয়ে যায়। বহুদিন মসজিদ জানালা কপাটহীন উন্মুক্ত ছিল। কুকুর বিড়ালের নিরাপদ আশ্রয়ে পরিণত হয়েছিল মসজিদ।

-কেন নামায হতো না মসজিদে? জিজ্ঞেস করল হাসান তারিক।

-প্রকাশ্যে মসজিদে আসার সাধ্য তখন কারো ছিলনা। মসজিদের ইমাম মুফতি হাজী ইউনুস এবং মুয়াজ্জিন হাজী ওয়াংকে যেদিন ওরা শ্রম-শিবিরে নিয়ে গেল, সেদিন থেকে কার্যত মসজিদে নামায বাদই হয়ে যায়।

-ওরা এখন কোথায়?

-হাজী ইউনুস এবং ওয়াং?

-হ্যাঁ।

-ওরা আর ফিরে আসেননি। শুনেছি অমানুষিক পরিশ্রম এবং রোগে ভূগে শ্রম শিবিরেই মারা গেছেন।

-এখনকার ইমাম ইনি কে?

-হুজুর হাজী ইউনুসের ভাতিজা।

তখন ইনি কাশগড়ের মাদ্রাসাতুল হাদিসের ছাত্র ছিলেন। তাঁকে পাঁচ বছর দাস শিবিরে কাটাতে হয়। বর্তমান সরকারের আমলে তিনি ছাড়া পেয়েছেন।

এ সময় ইকামত শুরু হলো। সবাই ফরজ নামাজ আদাযের জন্য উঠে দাঁড়াল।

নামায শেষে হাসান তারিক, আবদুল্লায়েভ এবং আহমদ ইয়াং বিমান অফিসে এল বিমান অফিস শহরের এক প্রান্তে। বিমান বন্দরের সাথে সংলগ্ন। দু'তলা বিল্ডিং।

বিমান অফিসের বুকিং কাউন্টারে ঢুকতে ঢুকতে হাসান তারিক আহমদ ইয়াংকে বলল, দু'টো খোঁজ নিতে হবে। এক, আজকের সকালের ফ্লাইটে কারা গেছে তাদের নাম। দুই, কি কি লাগেজ বুক হয়েছে তার তালিকা।

বুকিং অফিসে ঢুকে 'অনুসন্ধান' ট্যাগ আটা কাউন্টারে গিয়ে আহমদ ইয়াং বলল, আমি আমার একজন আত্নীয়ের সন্ধান করছি, আজকের ফ্লাইটে যারা উরুমচি গেছে তাদের একটা তালিকা এবং লাগেজের একটা বিবরণী চাই।

অফিসারটি হান গোষ্ঠীর। সে চোখ কপালে তুলে বলল, এ এক বিরাট ফিরিস্তির ব্যাপার। আমার এটা কাজও নয়।

কাউন্টার থেকে ফিরেই অফিসের একজন মেসেঞ্জারকে পেল। বয়স বিশ একুশ হবে। জাতিতে উইঘুর-মুসলমান। খুশী হল আহমদ ইযাং। সে তাকে জিজ্ঞেস করল, অফিসের বুকিং ইনচার্জ কে?

-কেন?

-আজকের ফ্লাইটের যাত্রী ও লাগেজের একটা তালিকা চাই।

-এ ধরনের তালিকা বাইরে দেয়ার নিয়ম নেই। একটু চিন্তা করে জবাব দিল যুবকটি।

-কিন্তু আমার যে জরুরী প্রয়োজন। জোর দিয়ে বলল আহমদ ইয়াং।

যুবকটি আহমদ ইয়াং-এর দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করল। তারপর তাদেরকে নিয়ে সে ওয়েটিং কর্ণারে এল। বসার পর যুবকটি চুপি চুপি বলল, একটাই পথ খোলা আছে। বুকিং ইনচার্জ হান জাতের একজন অফিসার। ঘুষখোর। আপনারা একজন তার রুমে যান। প্রথমে একটা মানিব্যাগ তার হাতে তুলে দিয়ে তার কাছে সাহায্য চাইবেন। আমার ধারণা কাজ হবে।

যুবকটির পরামর্শ কাজে লাগল। দশ মিনিট পর আহমদ ইয়াং যাত্রী ও লাগেজ তালিকার কপি নিয়ে বের হয়ে এল।

অফিস থেকে বেরুবার সময় আহমদ ইয়াং সেই মেসেঞ্জার যুবকটির হাতে পঞ্চাশ ইউয়ানের একটা নোট গুজে দিল।

যুবকটি বিনীতভাবে সেটা ফিরিযে দিয়ে বলল, আমি গরীব, কিন্তু এ টাকা নেয়ার আমার জন্য অন্যায় হবে। ঘুষ নেয়াকে আমার হুজুর বড় পাপ বলেছেন।

-তোমার হুজুর কে?

-আরতোশের হুজুরের কাছে আমি মাসে একবার কুরআন শেখার জন্য যাই।

আরতোশ কাশগড়ের কাছেই ছোট একটা শহর। কাশগড়ের চেয়েও প্রাচীন। এখানেই পূর্ব তুর্কিস্তানের প্রথম স্বাধীন মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আবদুল করিম সাতুক বোগরা খানের মাজার। মাজার সংলগ্ন প্রাচীন একটা মসজিদ আছে সেখানে। বৃদ্ধ শেখ জামীরুদ্দীন সেখানকার ইমাম। তিনি সেখানে একটি মাদ্রাসাও চালান। কোরআন-হাদীসে গভীর জ্ঞান ও পবিত্র চরিত্রের জন্যে তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। বহু দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ তাঁর কাছে কুরআনের তাফসীর শুনতে যায়। গভীর রাতে তাঁর এ কুরআনের দরস শুরু হয়।

যুবকটির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হাসান তারিকরা বেরিয়ে এল বিমান অফিস থেকে। আসার সময় আহমদ ইয়াং যুবকটির পরিচয় জেনে নিল।

তারা ভাড়া করা একটা বেবী ট্যাক্সী নিয়ে বেরিয়েছিল। গাড়িতে ওঠার সময় হঠাৎ পেছনে নজর যাওয়ায় হাসান তারিক দেখল, অনুসন্ধান কাউণ্টারের সেই হান যুবকটি অফিসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে মেসেঞ্জার যুবকটির সাথে আলাপ করছে। গাড়িতে ওঠা হলে গাড়ি ছেড়ে দিল।

বেবী ট্যাক্সীতে মুখোমুখি চারটি সিট। হাসান তারিক বসেছিল সামনের সিটে। অর্থাৎ তার নজর ছিল পেছনের দিকে।

গাড়ি একটা টার্ন নেবার সময় হাসান তারিকের নজর আবার পেছনে গেল। সে দেখল, অনুসন্ধান কাউন্টারের সেই যুবকটি একটা বেবী ট্যাক্সীতে উঠছে। বেবী ট্যাক্সীটি নতুন। সামনের নাম্বার প্লেটে লাল অক্ষরে বড় বড় করে ৯৯'লেখা। চীনে এ এলাকায় সামনে পিছনে দু'দিকেই নাম্বার থাকে।

হাসান তারিক আহমদ ইয়াং এর কাছ থেকে বিমানের যাত্রী ও লাগেজ তালিকা নিয়ে ওতে নজর বুলাতে লাগল।

যাত্রী তালিকায় জেনারেল বোরিসের নাম পাবে না এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত ছিল। একটা সোভিয়েত নাম সে খুঁজছিল তাও পেল না। হতাশ হয়ে হাসান তারিক লাগেজের তালিকাটা তুলে নিল। লাগেজ তালিকায় সর্বশেষ আইটেমটি ছিল একটা কফিন। আশার একটা আবেশ ফুটে উঠল হাসান তারিকের চোখে। সে দ্রুত যাত্রী তালিকা তুলে নিয়ে সর্বশেষ নামটির দিকে চোখ বসাল। নামটি ইংলিশ-আলেকজান্ডার। হঠাৎ হাসান তারিকের মনে হল আলেকজান্ডার নাম ইউরোপে

কমন। সোভিয়েতেও এ নাম আছে। খুশী হলো হাসান তারিক। আলেকজান্ডার যদি জেনারেল বোরিস হয় তাহলে তার ঐ কফিনে আহমদ মুসাকে পাচার করা যেতে পারে।

হাসান তারিকদের গাড়ি এসে দাঁড়াল বাস অফিসের সামনে। গাড়ি থেকে নেমে সবাই ঢুকে গেল অফিসের ভেতরে।

অফিসের ওয়েটিং রুমে পায়চারী করছিল হাসান তারিক। হঠাৎ জানালার বাইরে চোখ যেতেই তার নজরে পড়ল, সেই ৯৯নং বেবী ট্যাক্সীটি রাস্তার ওপারে একটা ব্যাংকের পার্ক ষ্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছে এবং 'অনুসন্ধান' কাউন্টারের সেই যুবকটি গাড়ির ভেতর বসে তাদের বেবী ট্যাক্সীর দিকে তাকিয়ে আছে।

মনটা ছ্যাঁত করে উঠল হাসান তারিকের। ও কি ফলো করছে আমাদের?

এই সময় আহমদ ইয়াংরা অফিস কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল। হাসান তারিক ইতিমধ্যেই একটা প্ল্যান দাঁড় করিয়েছে।

হাসান তারিক আবদুল্লায়েভ ও আহমদ ইয়াংকে এক পাশে ডেকে বলল, মনে হচ্ছে একটা ফেউ লেগেছে আমাদের পেছনে। আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাই।

হাসান তারিক একটু থামল। দ্রুত গাড়ির দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, আসার পথে রাস্তায় একটা সিনেমা হল দেখলাম। ওখানে ইভিনিং শো শুরু হচ্ছে বেলা তিনটায়। তোমরা এখান থেকে সোজা গিয়ে হলে ঢুকবে। ঘন্টাখানেক পরে বেরিয়ে বাসায় ফিরবে।

-আপনি? আহমদ ইয়াং জিজ্ঞেস করল।

-আমি ঐ ফেউকে পরখ করে দেখতে চাই।

নির্দেশ মোতাবেক আব্দুল্লায়েভ আহমদ ইয়াংকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

হাসান তারিক জানালা দিয়ে দেখল, আবদুল্লায়েভদের চলে যাবার পর সেই 'ফেউ' বেবী ট্যাক্সীটিও চলতে শুরু করল।

ওরা চলে গেলে হাসান তারিকও আরেকটি বেবী ট্যাক্সী নিয়ে সেই সিনেমা হলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

দিনটি সাপ্তাহিক ছুটির দিন। তাই হলের সামনে বেশ ভীড়। ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে হাসান তারিক দেখল আবদুল্লায়েভরা প্রথম শ্রেণীর টিকিট কাউন্টার থেকে বেরিয়ে হলে ঢুকে গেল! আর সেই 'ফেউ' যুবকটি মানিব্যাগ বের করে টাকা গুণল। তারপর কি ভাবল। যে দরজা দিয়ে আবদুল্লায়েভরা হলে ঢুকেছে সেদিকে একবার তাকাল। পরে হল থেকে বেরিয়ে হন হন করে গিয়ে গাড়িতে উঠল। গাড়ি ছেড়ে দিল তার।

হাসান তারিকও এসে গাড়িতে উঠল।

বেশী দূর যেতে হলো না। মাইল খানেক গিয়েই একটা আবাসিক এলাকায় প্রবেশ করল। দু'পাশে ফ্লাট বাড়ির সারি। অনেক খানি দূরত্ব রেখে হাসান তারিকের গাড়ি এগুচ্ছিল। একটা চারতলা ফ্লাট বাড়ির সামনে গিয়ে আগের বেবী ট্যাক্সীটি দাঁড়াল।

হাসান তারিক দেখল, বাড়িটির চার তলায় ষোলটি ফ্লাট আছে। সবগুলোই এক রুমের ব্যাচেলর কোয়ার্টার।

ফেউ'যুবকটি যখন ভাড়া মিটিয়ে সিঁড়িতে গিয়ে পা দিয়েছে সেই সময় হাসান তারিকের গাড়ি গিয়ে ফ্লাটের সামনে দাঁড়াল।

হাসান তারিক ড্রাইভারকে দাঁড়াতে বলে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। হাসান তারিক গাড়িতে উঠার পর তার সব সময়ের সাথী ব্যাগ থেকে গোঁফ বের করে মুখে লাগিয়ে নিয়েছিল। সুতরাং তাকে কেউ হঠাৎ করে দেখেই চিনতে পারবে না।

সে যুবকটি বেশ শব্দ করে সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। আর হাসান তারিক বিড়ালের মত নিঃশব্দে তার পিছু নিয়েছে।

চার তলায় গিয়ে ফেউ যুবকটির পায়ের শব্দ থেমে গেল। হাসান তারিক উঁকি দিয়ে দেখল, সিঁড়ির বাম পাশের ফ্ল্যাটের সামনে যুবকটি দাঁড়িয়ে। আরেকটু উঠে উঁকি দিল। দেখল, ঐ ফ্ল্যাটের দরজার কি হোলে চাবি দিয়ে ঘুরাচ্ছে সে। দরজা খুলে গেল। যুবকটি ভেতরে প্রবেশ করলে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ভেতর থেকে কি হোলে চাবি দেয়ার একটা ক্লিক শব্দও পাওয়া গেল।

হাসান তারিক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দরজা ও কি হোল ভাল করে দেখল। মনে মনে ভাবল, সে ভেতরে প্রবেশ করবে। ব্যাচেলর ফ্ল্যাট। যুবকটি একাই রয়েছে। ইচ্ছা করলে এখনই প্রবেশ করে প্রয়োজন সিদ্ধ করতে পারে। কিন্তু না, এখানকার 'ফ্র' এবং জেনারেল বোরিসকে সে এখনই জানতে দিতে চায় না যে কেউ তার পেছনে লেগেছে। নরপশু জেনারেল বোরিস তাহলে প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে আহমদ মুসার উপর কোন জঘন্য প্রতিশোধ নিয়ে বসতে পারে।

হাসান তারিক ধীরে ধীরে চারতলা থেকে নেমে এল।

সে গাড়িতে উঠে বসলে গাড়ি ছেড়ে দিল। গাড়িতে বসে হাসান তারিক হিসেব কশল, যুবকটি কাজ অর্ধ সমাপ্ত রেখে সম্ভবত টাকার ঘাটতি থাকায় বাড়িতে ফিরে এসেছে। শো ভাঙ্গার আগে অবশ্যই সে ফিরে আসবে যাতে করে ওদের অনুসরণ করে ঠিকানাটা জেনে নিতে পারে। যুবকটি যখন দ্বিতীয়বার এই কাজে বেরুবে, সেই সুযোগেই তার ঘরে প্রবেশ করতে হবে।

সেই সিনেমা হলে আবার ফিরে এল হাসান তারিক। ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আবদুল্লায়েভদের বের হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগল। সেই ফেউ যুবকটি আসে কখন সেদিকেও তার নজর থাকল।

ঘন্টা খানেক পর আবদুল্লায়েভরা বেরিয়ে এলে হাসান তারিক তাদেরকে বাথরুমের দিকে ডেকে নিয়ে শো শেষ হওয়া পর্যন্ত হলে থাকতে বলল। শো শেষ হলে তবেই তারা যেন বের হয়।

আবদুল্লায়েভরা গোঁফওয়ালা হাসান তারিককে দেখে প্রথমে চিনতে পারেনি। চিনতে পেরে নিজেদের বোকামীর জন্যে হেসেছে। আর হাসান তারিক খুশী হয়েছে এই ভেবে যে তার গোঁফ পরা সফল হয়েছে।

আবদুল্লায়েভরা আবার হলে ঢুকে গেল।

হাসান তারিককে আরও আধা ঘন্টা ভীড়ের মধ্যে অপেক্ষা করতে হল। তখন সাড়ে চারটা বাজে। সিনেমা হলের বিপরীত দিকে একটা দোকানের পাশে সে দাঁড়িয়েছিল। শব্দ করে একটা বেবী ট্যাক্সী সিনেমা হলের সামনে দাঁড়াতে দেখে ওদিকে তাকাল হাসান তারিক। দেখল, সেই যুবক বেবী ট্যাক্সী থেকে নেমে সিঁড়ি বেয়ে হলে উঠে গেল।

হাসান তারিক আরেকটা বেবী ট্যাক্সী নিয়ে এগিয়ে চলল সেই রেসিডেন্সিয়াল এরিয়ার দিকে।

খুবই সাধারণ ধরনের লক। সাধারণ মাষ্টার কি'তেই খুলে গেল।

মাষ্টার কি টা পকেটে রেখে এক হাতে ইলেক্ট্রিক ডেটোনেটর, অন্য হাতে দরজা খুলে ঘরে প্রবেশ করল হাসান তারিক।

হাতের ইলেক্ট্রিক ডেটোনেটরটা শান্ত। গোটা ঘরটা একবার ঘুরে এল। নিশ্চিত হল সে, না কোথাও ইলেক্ট্রিক ট্র্যাপ নেই।

ঘরটা একেবারেই সাদামাটা গোছের। একটা শোবার খাট। একটা টেবিল, একটা চেয়ার। একটা ওয়্যারড্রোপ। রান্না ঘরে একটা গ্যাস ষ্টোভ। ট্রাংক, সুটকেস, ব্রিফকেস কিছুই নেই। হতাশ হল হাসান তারিক। যুবকটি নিশ্চয় সাধারণ ইনফরমারের বেশী কিছু নয়!

টেবিলটা শুন্য। টেবিল ক্লথের নিচটাও শুন্য। টেবিলের ড্রয়ারে কয়েকটা ইউয়ান পড়ে আছে মাত্র। ড্রয়ারের ফ্লোরে একটা সাদা কাগজ বিছানো। চীনা এয়ারলাইন্সের প্যাডের একটা পাতা বেশ পুরানো। হাসান তারিক বুঝল, ড্রয়ারের কভার হিসেবে অনেক দিন ধরে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু দু'টো টেলিফোন নাম্বার লেখা দেখল। লেখা পুরানো, কালি বেশ ফেড হয়ে গেছে চার ডিজিটের নাম্বার। কাশগড়ের নাম্বার তিন ডিজিটের। তাহলে নাম্বারটা কাশগড়ের বাইরের। কাজে লাগতে পারে ভেবে নাম্বার দু'টো টুকে নিল হাসান তারিক।

ওয়্যারড্রোপ খুলল। তাতেও কিছু নেই। কয়েকটা জামা কাপড়। খুব ভালো করে পরীক্ষা করল, না কোন গোপন কেবিনও কোথাও নেই!

বালিশের নিচটা, তোষকের নিচটা সবই পরীক্ষা করল। না কিছুই কোথাও নেই।

হতাশ হলো হাসান তারিক। তাহলে সেকি একটা বাজে চুনোপুটির পিছনে ছুটে সময় নষ্ট করল!

কিচেনটা একবার দেখবে বলে ওদিকে পা বাড়াল, এমন সময় বাইরে থেকে দরজার তালা খোলার শব্দ হল। হাসান তারিক দ্রুত সরে গেল কিচেনে। পকেট থেকে রিভলবারটা হাতে তুলে নিয়েছে সে।

দরজা খুলে ঘরে ঢুকল একটি মেয়ে। বয়স বিশ বাইশ বছর হবে।

চৌকাঠের ফাঁক দিয়ে মেয়েটির দিকে নজর রেখেছিল হাসান তারিক। মেয়েটির ঘরে ঢুকার ভাব দেখে হাসান তারিক বুঝল, মেয়েটি এ ঘরের পরিচিত।

মেয়েটি ঘরে ঢুকে সোজা বিছানায় এসে বসল। জ্যাকেটের পকেট থেকে ছোট এক টুকরা কাগজ বের করল। তারপর বিছানা থেকে বালিশটি তুলে নিয়ে কভারটি খুলে ফেলল। বালিশের মাঝখানের সেলাইটি ফাঁক করে সেই কাগজের টুকরাটা বালিশের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। তারপর বালিশের কভার পরিয়ে যথাস্থানে রেখে যেমনভাবে এসেছিল ঠিক তেমনভাবে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

হাসান তারিক কিচেন থেকে বেরিয়ে দরজা লেগেছে কিনা দেখে এল। তারপর দরজা থেকে ফিরে এসে বালিশ থেকে সেই কাগজ বের করল সে। চীনা ভাষার একটা চিরকুট। চীনা ভাষা সে জানে না, মুশকিলে পড়ল সে। এখন এ চিরকুট না নিয়ে উপায় নেই। কিন্তু নিয়ে গেলে তার এখানে আগমন ধরা পড়ে যাবে। কিন্তু এছাড়া উপায় কি!

হাসান যখন রুম থেকে বেরিয়ে এল তখন বাজে সোয়া পাঁচটা। সিনেমা শো ভাঙ্গতে তখন পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাকী।

হাসান তারিক ফিরে এল সেই সিনেমা হলের সামনে আবার।

ঠিক ছয়টার সময় বেরিয়ে এল আবদুল্লায়েভরা হল থেকে। হাসান তারিক লক্ষ্য করল তাদের পেছনে পেছনে বেরিয়ে এল সেই 'ফেউ' যুবক!

হাঁটতে হাঁটতে হাসান তারিক আহমদ ইয়াংকে বলল, ফেউ আমাদের পেছনে লেগেছে ও আমাদের আস্তানা দেখে তবেই ছাড়বে। আমরা তার উদ্দেশ্য সফল হতে দিতে পারি না।

একটু থেমে হাসান তারিক জিজ্ঞেস করল, আরতোশ এখান থেকে কতদূর।

-পাঁচ মাইল।

-চল আরতোশ যাব, আবদুল করিম বোগরা খানের কবর জেয়ারত করে এশার দিকে ফিরে আসব। ইতিমধ্যে কেউ পিছু না ছাড়লে তার একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

একটা বেবী ট্যাক্সি নিয়ে আরতোশের দিকে ছুটল হাসান তারিকরা। গাড়িতে ওঠার সময় হাসান তারিক লক্ষ্য করল 'ফেউ' যুবকটি একটা বেবীতে উঠে বসছে।

আরতোশ শহরটি কাশগড় থেকে উত্তর পশ্চিমে পাহাড় ঘেরা একটা উপত্যকায় একটা বিখ্যাত ঝরণার পাশে।

সোয়া ছয়টার দিকে হাসান তারিকদের বেবী ট্যাক্সি শহর থেকে বেরিয়ে এল। 'ফেউ' এর বেবী ট্যাক্সি তখন পর্যন্ত সমান গতিতে তাদের পেছনে ছুটে আসছে। কিন্তু শহর থেকে বেরিয়ে কিছুদূর আসার পর বেবী ট্যাক্সিটি আর কেউ দেখতে পেল না। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন নেমে এসেছে। নিশ্চয় 'ফেউ' যুবকটি এই রাতের বেলা শহর থেকে বাইরে অনিশ্চয়তার পথে তাদেরকে অনুসরণ করতে সাহস পায়নি। হাসান তারিক হাফ ছেড়ে বাঁচল। অহেতুক একটা চুনোপুঁটিকে মেরে চারদিকে সাড়া জাগাতে চায় না, জেনারেল বোরিসদের সাবধান করে দিতে চায় না।

চলতে চলতে আব্দুল্লায়েভ জিজ্ঞেস করল, কিছু পেলেন তারিক ভাই?

-পেয়েছি। মুসা ভাইকে ওরা আজ সকালের ফ্লাইটেই উরুমচি নিয়ে গেছে।

-আর যে নতুন মিশনে গিয়েছিলেন সেখানে?

-'ফেউ' এর ওখানকার কথা বলছ?

-হ্যাঁ।

-শুরুতেই সন্দেহ হয়েছিল ও বোরিসের লোক, 'ফ্র' এর এজেন্ট, ঠিক তাই। ওর প্রত্যেক জামার কলারেই 'ফ্র' এর প্রতীক দেখেছি! তবে বিশেষ কিছু পাইনি। একটা চীনা ভাষার চিরকুট পেয়েছি। জানি না ওতে কি আছে।

সন্ধ্যা সাতটার দিকে হাসান তারিকরা আরতোশে পৌঁছাল। বেবী ট্যাক্সিকে অপেক্ষা করতে বলে তারা তিনজন ওজু খানায় ওজু করে বোগরা খান মসজিদে ঢুকে গেল। মসজিদের পাশেই কবর গাহ।

প্রথমে ওরা কবরগাহে গিয়ে দোয়া করল। অলঙ্কার বিহীন সাদা-সিদা কবর গাহ। বিল্ডিংটা জরাজীর্ণ। চারিদিকে লোহার রেলিং। মাঝে মাঝে ভেঙ্গে গেছে। ভেঙ্গে যাওয়া অংশ কাঠ লাগিয়ে পুরণ করা হয়েছে।

বোগরা খান মসজিদের অবস্থাও কবর গাহের মতই। দেয়ালের পাথরগুলো হা করে আছে। কোথাও কোথাও গর্ত হয়েছে। মসজিদের মেঝে এবড়ো-থেবড়ো। মসজিদের উঁচু মিনার দেখার মত, কিন্তু তার একাংশ ভেঙে গেছে। এখন মিনারে উঠে আর আযান দেওয়া হয় না। ওঠা বিপজ্জনক। ওখানে মাইকের হর্ণ লাগানো আছে। নিচে থেকে আযান হয়। মাইকের হর্ণটি নতুন, মাইকও নতুন। আহমেদ ইয়াং জানাল, মাইকটি অতি সম্প্রতি লেগেছে। এতদিন জোরে আযান নিষিদ্ধ ছিল। আর সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় তো আযান এবং নামাযও বন্ধ ছিল।

এশার নামায হাসান তারিকরা মসজিদেই পড়ল। বোগরা খান মসজিদের সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের জিনিস গোটা মসজিদ জুড়ে থাকা লাল কার্পেট। ঠিক এ ধরনের কার্পেট হাসান তারিক কাশগড়ের ঈদগান মসজিদেও দেখেছে। হাসান তারিক আহমেদ ইয়াংকে জিজ্ঞেস করল, মসজিদের অবস্থার সাথে কার্পেট তো মিলে না?

আহমেদ ইয়াং বলল, ঠিক বলেছেন, মসজিদ চীনের কিন্তু কার্পেটগুলো চীনের নয়। ওগুলো সম্প্রতি মক্কা থেকে এসেছে। মক্কার রাবেতায়ে আলম আল-ইসলামী সম্প্রতি এ কার্পেটগুলো দান করেছে। সিংকিয়াং এর সব মসজিদেই এ রকম কার্পেট দেখতে পাবেন। ওরা আমাদের ইসলামী সমিতির (সরকার নিয়ন্ত্রিত) কাছে মসজিদ সমূহ সংস্কারের জন্যে অর্থ সরবরাহেরও অফার দিয়েছে। আগে তো মসজিদ সংস্কারের অনুমতি ছিল না। এখন কিছু কিছু মিলছে। এখন যদি সরকার রাবেতার সাহায্য নেয়ার অনুমতি দেয়, তাহলে মসজিদগুলোর দুঃসময় হয়তো কাটতে পারে।

নামায শেষে আহমেদ ইয়াং মসজিদের শেখ জামিরুদ্দিনের সাথে হাসান তারিক এবং আব্দুল্লায়েভকে পরিচয় করিয়ে দিল।

বৃদ্ধ শেখ জামিরুদ্দিন তাদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

তারপর চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে কেউ নেই দেখে বলল, বাবা, সোভিয়েত মধ্য এশিয়ার মুক্তির খবর পেয়ে সেদিন কেঁদেছি আর প্রাণ ভরে দোয়া করেছি। এ ভাগ্য যেন আল্লাহ্ আমাদেরকেও দান করেন।

অনেক কথা হল শেখ জামিরুদ্দিনের সাথে। কিছু না খেয়ে আসতেই দিল না।

বিদায়ের সময় মসজিদের দিকে চেয়ে শেখ জামিরুদ্দিন বলল, মসজিদের এই বিধ্বস্ত দশা দেখে অনেক সময় দুঃখ হয়, কিন্তু যখন ভাবি মুসলিম সমাজের চেয়ে মসজিদ ভালো হবে কি করে, তখন অন্তরে বল পাই, কাজ করার শক্তি পাই। মুসলিম সমাজকে ধ্বংসস্তুপ থেকে উদ্ধার করতে পারলে তবেই মসজিদকে তার আপন জায়গায় বহাল করা যাবে।

হাসান তারিক বলল, ঠিক বলেছেন। মসজিদ হলো মুসলিম সমাজের স্বাধীনতার প্রতীক। মুসলিম সমাজের স্বাধীনতা না থাকলে মসজিদও অক্ষত থাকে না। আপন অবস্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। দোয়া করুন, মুসলিম সমাজ এবং মসজিদ যেন তাদের হারানো দিন ফিরে পায়, যেদিন আবদুল করিম সাতুক বোগরা খান একদিন এদেশের মুসলমানদের জন্য এনেছিলেন।

হাসান তারিকরা বিদায় নিল শেখ জামিরুদ্দিনের কাছ থেকে।

ছুটে চলল তাদের ট্যাক্সি কাশগড়ের উদ্দেশ্যে। হাসান তারিক নামাযের ফাঁকে সেই চীনা ভাষার চিরকুটটি পড়ে নিয়েছে আহমেদ ইয়াং এর কাছ থেকে। ওতে উরুমচির একটা ঠিকানায় টেলেক্স করতে বলা হয়েছে। টেলেক্সে বলতে বলা হয়েছে যে, তিয়েনশানের ওপার থেকে দু'জন সন্দেহ জনক ব্যক্তি হুইদের সাথে কাশগড়ে আজ বেলা দশটায় প্রবেশ করেছে।

হাসান তারিক খুশী হয়েছে। উরুমচির ঠিকানাটা নিশ্চয় জেনারেল বোরিস কিংবা 'ফ্র'-এর হবে।

বেবী ট্যাক্সি পাথুরে মরু পথের মধ্য দিয়ে ছুটছে কাশগড়ের দিকে পূর্ণ বেগে।

হাসান তারিক অনেকটা স্বগত কণ্ঠেই বলল, আপাতত কাশগড়ের কাজ শেষ। তারপর আহমেদ ইয়াং এর দিকে ফিরে বলল, যাবার পথেই আমরা বাস অফিস থেকে আগামীকাল সকালের জন্য উরুমচির তিনটা টিকিট করে নিয়ে যাব। প্রস্তুত আছ তো?

আহমেদ ইয়াং মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

# ৪

কয়দিন কাটল তার কোন হিসেব আহমেদ মুসার কাছে নেই। ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘর। পাথরের মেঝে, পাথরের দেওয়াল। অনেক উঁচুতে একটা ঘুলঘুলি। ওখানে মাঝে মাঝে একটা আবছা আলোর রেখা ফুটে ওঠে। আহমদ মুসা এখন বুঝেছে, ঐ আবছা আলোর রেখাটা দিনের লক্ষণ। যখন আবছা আলোটা থাকে না তখন রাত। এটা বুঝার পর আহমেদ মুসা আনন্দিত হয়েছে এই ভেবে যে, অন্তত রাত দিনের হিসেবটা সে রাখতে পারবে।

রাত দিনের পরিবর্তন বুঝার পর আহমদ মুসা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের একটা সময় ঠিক করে নিয়েছে। হাত মুখ ধোয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। গোসল কবে থেকে নেই তার মনে পড়ে না। অন্ধকার মেঝের এক কোণায় একটা মাটির ছোট কলস আছে। টিনের মগ দিয়ে ঢাকা। অন্ধকারে হাতড়ে ঐ মগ দিয়েই সে পানি খায়। মুখটা ধুয়ে নেয় মাঝে মাঝে। এই ঘরের সাথেই লাগানো একটা খুপরীতে পায়খানার জায়গা। সেখানেও পানির রেশন। প্রতিদিনের জন্যে এক মগ পানি বরাদ্দ।

ঘরের এক পাশে একটা খাটিয়া। কাঠের। কম্বল বিছানো। আরেকটা কম্বল আছে গায়ে দেবার। শীতটা যেন একটু বেড়েছে। সে বুঝতে পারে না, তার শরীর খারাপ না আবহাওয়ার পরিবর্তন। আবহাওয়ার পরিবর্তন কিভাবে এত তাড়াতাড়ি সম্ভব। তাহলে কি স্থান পরিবর্তন? সে কাশগড়ে এসেছে, এতটুকু সে জানে। কিন্তু কাশগড়ে তো এই শীত হবার কথা নয়! কোথায় সে তাহলে? মনে আছে সেদিন রাতে জেনারেল বোরিস তাকে একটা ইনজেকশন দেয়। ইনজেকশনের পর রাজ্যের ঘুম এসে তাকে জড়িয়ে ধরে। তারপর কি ঘটেছে কিছুই তার আর মনে নেই। সেই ঘুমানোর পর এই অন্ধকার ঘরেই সে চোখ মেলেছে।

পূর্ব, পশ্চিম কিংবা কেবলা কোন দিকে কিছুই তার জানা নেই। পাথরের দেয়ালে তায়াম্মুম করে মনে মনে একদিকে কেবলাকে ধরে নিয়ে সে নামায আদায় করে।

যেমন ঘুটঘুটে অন্ধকার, তেমনি নিঃসীম নিশব্দ চারদিক। এক অন্ধকার ছাড়া চোখ তার কিছু দেখে না। জীবনের একটা স্পন্দন হলো শব্দ, এ শব্দও তার কানে আসে না। ঘরটা কি তাহলে মাটির নীচে? জীবনের স্পন্দনহীন নিরব-নিথর অন্ধকারে মাঝে মাঝে নিজেকে অশরীর মনে হয়। মনে পড়ে যায় ছোটবেলার ভয় ও রোমাঞ্চের কথা। দাদির কোলে বসে ভূতের গল্প শুনত সে, ভালো লাগত। অন্ধকারকে দারুণ সে ভয় করত। এমনকি অন্ধকার ঘরে ঢুকতেও সে ভয় পেত। তার আম্মা দাদির কাছে এসে অনুযোগ করতেন, আম্মা আপনার নাতি কিন্তু দেখবেন ভীতু হবে।

-কেন, কেন? দাদি বলতেন।

-আপনার কাছে ভূতের গল্প শুনে শুনে এখন তো সব জায়গায় ভূত দেখে।

তার আম্মার কথা শুনে দাদি হাসতেন। তাকে কোলে তুলে নিয়ে মাথা নেড়ে দোয়া পড়ে বুকে ফু দিয়ে বলতেন, তুমি কিছু ভেব না বৌমা, আমার এ ভাইটি আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে ভয় করবে না। বড় হলে বাহাদুর হবে।

দাদির কথা শুনে তার আম্মার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠত। তার আম্মা তাকে কোলে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে বলতেন, আম্মা দোয়া করবেন আমার আহমদের জন্যে। যেন সে আমাদের নাম রাখে, জাতির মান রাখে।

কোথায় গেল সেই দিন। সেই দাদি, সেই আম্মা কোথায়, তাদের বুক ভরা সেই ভালবাসা কোথায়? চোখের কোণ দু'টি ভারি হয়ে ওঠে আহমেদ মুসার। তার দাদি, তার মায়ের কবরও সে আর কোনদিন কি দেখতে পাবে? পাবে না।

কমিউনিষ্ট বাহিনী ওখানে হয়তো প্রস্রাব পায়খানার জায়গা তৈরী করেছে। মুসলমানদের যা কিছু পবিত্র তাকে অপবিত্র করাই ছিল ওদের প্রথম কাজ। মুসলমানদের কবর গাহ ওদের হিংসার আগুন থেকে বাঁচবে কেমন করে?

অবসর ও একাকিত্বের সুযোগ গ্রহণ করে কত কথা, কত ঘটনা রূপ ধরে তার সামনে এসে দাড়ায়। বাইরের দু’চোখ বন্ধ করলে নাকি মনের চোখের গতি বেড়ে যায়। তাই হয়েছে আহমেদ মুসার ক্ষেত্রেও। যে স্মৃতিকে সে দু’হাতে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়, তাই যেন তার সামনে এসে ভীড় করে বেশী। ফাতিমা ফারহানার অশ্রু ধোয়া মুখটি আবার মূর্তিমান হয়ে যেন তার সামনে এসে দাঁড়াল। বৃদ্ধ আবদুল গফুর যখন ফারহানার হাত তার হাতে তুলে দিল, তখনকার তার হাতের উত্তপ্ত কম্পন তার হাতে যেন এখনও লেগে আছে। ও কেমন আছে? ফাতিমা ফারহানা যেন আরও নিবিড় হয়ে আসে তার কাছে। বৃদ্ধ আবদুল গফুরের বাড়িতে প্রথম দিন সেই ঔষুধ খাবার সময়, তারপর সেদিন ফারহানার হাত যখন হাতে এল সে সময় যে অপরিচিত এক সুবাস সে পেয়েছিল, তাও যেন এসে তাকে আচ্ছন্ন করছে। সচেতন হল আহমদ মুসা। দু'হাতে সে ঠেলে দিতে চাইল স্মৃতির ভাবকে। না, এমন নিবিড়তায় সে ওকে ভাবতে পারে না। আল্লাহ্ এ অধিকার এখনও তাকে দান করেননি। একজন মুমিনকে একজন মুমিনের চিন্তার কলুষতা থেকেও নিরাপদ রাখা দরকার।

এ সময় ঘরের ওপ্রান্তে দরজার ওপার থেকে পায়ের শব্দ ভেসে এল।

এ পায়ের শব্দের সাথে আহমদ মুসা পরিচিত। নির্দিষ্ট একটা সময় পর পর ওরা আসে। দরজার ওপারে আলো জ্বলে ওঠে। দরজা খুলে যায়। দরজায় দাঁড়ায় উদ্যত ষ্টেনগান হাতে চারজন রুশ প্রহরী। একজন চীনা মেয়ে খাবার নিয়ে ভেতরে ঢোকে। খাবার ট্রে বিছানার ওপর রেখে পাশের দেয়াল সেঁটে দাঁড়িয়ে থাকে।

মেয়েটির বয়স বিশ/বাইশের বেশী হবে না। সুন্দরী। চোখে মুখে বুদ্ধিমত্তার ছাপ।

যতক্ষণ আহমদ মুসা খায়, ততক্ষণ সে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। খাওয়া হলে ট্রে নিয়ে বেরিয়ে যায়। তারপর দরজা বন্ধ হয়ে যায়। আলো নিভে যায়। পায়ের শব্দ মিলিয়ে যায় দূরে।

এই অন্ধকার কুঠরীতে আসার পর জেনারেল বোরিস একবারই এসেছে। আনুমানিক সেটা গতকাল হবে। জেনারেল বোরিসের এত পরে আসায় আহমদ

মুসা প্রথমে বিস্মিত হয়েছিল। পরে বুঝেছে, আহমদ মুসাকে মানসিক ভাবে দূর্বল করার জন্যে সে সময় নিতে চায়।

গতকাল জেনারেল বোরিস একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল। প্রস্তাব ছিল, আহমদ মুসা কর্ণেল কুতাইবার কাছে চিঠি লিখবে 'ফ্র' কে দশ বিলিয়ন ডলার দেবার জন্যে। মধ্য এশিয়ার পাঁচটি সাবেক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের বিভিন্ন ব্যাংক ও ট্রেজারিতে এ টাকা রয়েছে। এ টাকা হেলিকপ্টারে করে নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে রেখে চলে যাবার পর 'ফ্র' আহমদ মুসাকে ছেড়ে দেবে। আর টাকা দিতে রাজী না হলে নির্দিষ্ট সময়ের পর 'ফ্র' আহমদ মুসাকে হত্যা করবে।

আহমদ মুসা কোন জবাব দেয়নি এ প্রস্তাবের। দেবার প্রবৃত্তি হয়নি তার। প্রস্তাব রাখার পর জেনারেল বোরিস দেরী করেনি। যাবার সময় বলে গেছে পরদিন আবার আসবে।

দরজার ওপাশের পায়ের শব্দ নিকটতর হলো। দরজার সামনে এসে তা থেমে গেল। ওপারে জ্বলে উঠল আলো। দরজার ফাঁক গলে ছুটে এলো জমাটবদ্ধ একগুচ্ছ আলোর কণা। চৌকাঠের প্রান্তকেই তা আলোকিত করল মাত্র।

দরজা খুলে গেল।

দরজায় এসে দাঁড়াল সেই চারজন প্রহরী।

তারপর দরজা দিয়ে প্রবেশ করল জেনারেল বোরিস। হাতে তার রিভলভার।

আহমদ মুসা মনে মনে হাসল। জেনারেল বোরিস লোকটা আসলে ভীতু। চারজন প্রহরী দাঁড় করিয়েও ভরসা নেই, নিজ হাতেও রিভলভার নাচাতে হচ্ছে।

জেনারেল বোরিস ঘরে প্রবেশ করে ঘরের এদিক-ওদিক একবার পায়চারী করল। তারপর আহমদ মুসার মুখোমুখি থমকে দাঁড়িয়ে বলল, কি চিন্তা করলেন?

-কোন ব্যাপারে?

-কালকে একটা চিঠি লেখার কথা বলেছিলাম!

-জেনারেল বোরিস, আপনারা একটা আদর্শের জন্যে লড়াই করেন জানতাম, কিন্তু আপনারা এমন নিরেট অর্থলোলুপ তাতো জানতাম না?

-আমার প্রশ্নের জবাব চাই আহমদ মুসা।

গর্জে উঠল জেনারেল বোরিসের কন্ঠ। গোটা মুখ লাল হয়ে উঠেছে তার।

-আমার একটা প্রশ্ন আছে জেনারেল বোরিস।

-কি প্রশ্ন?

-এই চিঠি আমাকে লিখতে বলছেন কেন?

-কে লিখবে তাহলে?

-জেনারেল বোরিস লিখবে, টাকা তো তারই দরকার।

-এ টাকা তোমারও দরকার। এ টাকার ওপর তোমার মুক্তি নির্ভর করছে। মনে করো না জেনারেল বাগাড়ম্বর করে। নির্দিষ্ট তারিখের নির্দিষ্ট দিন পার হয়ে গেলে তুমি আর এক মুহূর্ত পৃথিবীর আলো-বাতাস দেখবে না। তোমাকে গুলি করে মারবো না। গায়ের চামড়া খুলে পশুর মত তোমাকে মরাব।

-আমাকে ভয় দেখাচ্ছো জেনারেল বোরিস?

-হ্যাঁ, ভয় দেখাবার মত শক্তি আমার আছে?

-মৃত্যুকে যে ভয় করে না, তাকে আর কোন ভয় দেখাবে জেনারেল বোরিস?

জেনারেল বোরিস পাগলের মত হো হো করে হেসে উঠল। হাসি থামলে আবার সে তার আগের প্রশ্নেরই পুনরাবৃত্তি করল, আমার প্রশ্নের জবাব জানতে চাই আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা মৃদু হেসে বলল, জেনারেল বোরিস, তুমি কেমন করে ধারণা করলে যে আমি তোমার ব্ল্যাক মেইলিং এর সহায়ক হব?

-ইচ্ছায় না হলে অনিচ্ছায় তোমাকে সহায়ক হতেই হবে।

একটু থামল জেনারেল বোরিস। বাম্পের মত ফুঁসছে সে। মুখ তার টকটকে লাল। যেন আগুন বেরুচ্ছে মুখ দিয়ে। বার কয়েক পায়চারি করে সে বলল, হ্যাঁ দরকার হলে জেনারেল বোরিসই চিঠি লিখবে। কিন্তু মনে রেখ, তোমার যে হাত চিঠি লিখবে না, সে হাতও ঐ চিঠির সাথে যাবে। তোমাদের ইসলাম ধর্মের তো হাত কাটার অভ্যাস আছে। আমরা এবার ওটার প্রয়োগ করব। তোমার ডান

হাতটা যখন চিঠির সাথে ওদের কাছে যাবে, তখন তুমি চিঠি লেখার চেয়ে সেটা বেশী ফায়দা দেবে বলে আমি মনে করি।

বলে জেনারেল বোরিস আবার সেই হো হো করে হেসে উঠল।

যাবার জন্যে ফিরে দাঁড়াল সে। যেতে যেতে বলল, এখন আহমদ মুসা তুমিই সিদ্ধান্ত নাও তুমি চিঠি দেবে, না হাত দেবে।

জেনারেল বোরিস বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ওপারের আলো নিভে গেল। আবার সেই আঁধারে ডুবে গেল ঘর।

আহমদ মুসা তার দু'পা নিচে ঝুলিয়ে খাটিয়ায় বসে ছিল। ঐভাবেই বসে রইল। তার মনে ছুটে গেল হঠাৎ মধ্য এশিয়ায়। যুগ-যুগান্তের অপরিসীম ত্যাগ-তীতিক্ষার পর ওখানকার দুর্ভাগ্য মুসলমানরা স্বাধীন হয়েছে। ওদের হাজারো সমস্যা। এ সমস্যা মুকাবিলার জন্যে ওদের প্রচুর অর্থ চাই, যা ওদের নেই। এই অবস্থায় দশ বিলিয়ন কেন দশ ডলার ওদের অপচয় করা যাবে না। আহমদ মুসার জীবন মৃত্যুর মালিক আল্লাহ! দশ বিলিয়ন ডলার তাকে বাঁচাতে পারবে না। জেনারেল বোরিসের শেষ কথায় হাসি পেল আহমদ মুসার। আহমদ মুসার কাটা হাত ওখানকার সাথীদের দুঃখ দেবে, কিন্তু দশ বিলিয়ন ডলার দিলে আহমদ মুসা মুক্তি পাবে, এ বিশ্বাস তারা অবশ্যই করবে না করতে পারে না। মৃত আহমদ মুসার হাত কেটেও ওভাবে পাঠানো যায়!

এই চিন্তা আহমদ মুসার মনকে অনেক হালকা করে দিল। সে দু'টি পা বিছানায় তুলে গা এলিয়ে দিল বিছানায়।

শুয়েই নজর পড়ল সেই ঘুলঘুলির দিকে। ওখানে সাদা আলোর যে রেখাটা ছিল, তা এখন নেই। অন্ধকার সেখানে এসে স্থান করে নিয়েছে। আহমদ মুসা বুঝল, মাগরিবের সময় হয়েছে, বা যাচ্ছে।

সে উঠে বসল বিছানা থেকে। দেয়ালে তায়াম্মুম করে নামাযে দাঁড়াল।

হোটেল সিংকিয়াং এ বিরাট এক ভোজ সভা। উরুমচির সবচেয়ে অভিজাত হোটেল এটা। ভোজের আয়োজন করেছে আলেকজান্ডার বোরিসভ। জেনারেল বোরিস এখন এই নামে উরুমচিতে বাস করছে। তার পরিচয় বড় একজন ব্যবসায়ী সে। রুশ অঞ্চল থেকে বহুদিন আগে হিজরত করে আসা একজন চীনা নাগরিক বহুদিন সাংহাই এ বসবাস করছে, এখন এসেছে উরুমচিতে।

ভোজে আমন্ত্রিত হয়েছে উরুমচির নামি-দামি অনেক লোক। এ ধরনের ভোজ সরকারী ব্যবস্থাপনা ছাড়া বড় একটা হয় না। তাই দুর্লভ এমন আমন্ত্রণ পেয়ে কেউ তা ছাড়েনি।

আজকের আমন্ত্রিতদের মধ্যমণি দেখা যাচ্ছে মেইলিগুলিকে। সবারই চোখ তার দিকে। সিংকিয়াং এর অপরূপ সুন্দরী এই নায়িকা 'তিয়েনশান পাহাড়ের ফুল' নামে অভিহিত। অপরিচিত এক ব্যবসায়ীর দাওয়াতে তাকে এ ভোজ সভায় দেখে অনেকেই বিস্মিত হয়েছে।

এই বিস্ময়টা অমূলক নয়। মেইলিগুলি সাধারণের ধরা ছোঁয়ার বাইরে এক কল্পনার বস্তু। কিন্তু মেইলিগুলি জেনারেল বোরিসের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারেনি। প্রথম কারণ, এ লোকটি তাকে বড় এক বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে। দ্বিতীয়ত জেনারেল বোরিস তাকে টেলিফোন করার সংগে সংগে তার ঐ অদ্ভুত বন্দীর কথা মনে পড়েছিল। ঐ অদ্ভুত বন্দীটি কেমন আছে, কোথায় আছে, এটা জানার একটা অদম্য কৌতুহল তার জেগেছিল। তাই বিনা বাক্যব্যয়ে এই আমন্ত্রণ সে গ্রহন করেছিল।

ভোজ সভায় জেনারেল বোরিস সারাক্ষণ মেইলিগুলির কাছে ঘুরঘুর করেছে। খেতেও বসেছে পাশা-পাশি। খেতে খেতে জেনারেল বোরিস বলেছিলেন, কয়েকটা কথা আপনাকে বলতে চাই, যদি খাবার পর সময় দেন দয়া করে।

ঘড়ি দেখে মেইলিগুলি তাকে বলল, আমি এখান থেকে বাড়ি হয়ে তবে অফিসে যাব, পাঁচ/সাত মিনিট সময় আপনি নিতে পারেন।

খাবার পর মেইলিগুলি জেনারেল বোরিসের সাথে তার হোটেল স্যুটে এল।

সোফায় মেইলিগুলির পাশেই বসল জেনারেল বোরিস। মেইলিগুলির ভ্রুটা একটু কুঞ্চিত হলো। যেন ভালভাবে নিল না সে এই আচরণকে। কথা শুরু করল বোরিস। বলল আপনার মত এক অপরূপ নায়িকা আমি খুজছিলাম মিস মেইলিগুলি?

-কেন?

-আমি একটা বই করতে চাই।

-বই মানে চলচ্চিত্র? আপনি?

-হ্যাঁ সব ঠিক, আপনি রাজী ...।

মেইলিগুলির ঠোঁটে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল। বুঝতে পারল, জেনারেল বোরিসের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এদেশে যে বেসরকারী কোন চলচ্চিত্র হয় না তাও ভুলে গেছে। কিন্তু সে কথা আর না বাড়াবার জন্য বলল, সব ঠিক? তাহলে ঠিক আছে। পরে কথা বলব।

বলে মেইলিগুলি ঘড়ির দিকে চাইল। অর্থাৎ মেইলিগুলি এখন উঠতে চায়। হঠাৎ জেনারেল বোরিস মেইলগুলির আরেকটু কাছে সরে এল। তার বাম হাত চেপে ধরে বলল, প্লিজ মেইলিগুলি ...

মেইলিগুলি এক ঝটকায় তার হাত কেড়ে নিল। তারপর কাপড়ের ভেতর থেকে ছোট্ট একটা রিভলভার বের করে তার কপাল বরাবর ধরে বলল, ভদ্রবেশী শয়তান, আর এক পা এগুলে মাথাগুড়ো করে দেব। আমি চলচ্চিত্রে অভিনয় করি বটে, কিন্তু আমি উইঘুর মেয়ে।

জেনারেল বোরিসের যে চোখে এতক্ষণ ছিল কামনার আগুন সে চোখে এখন বিস্ময় ও ভয়ের চিহ্ন।

মেইলিগুলি বেরিয়ে এল জেনারেল বোরিসের হোটেল স্যুট থেকে। বেরিয়ে রিভলভারটা কাপড়ের তলায় আবার গোপন করে তর তর করে নেমে এল সিঁড়ি দিয়ে।

মেইলিগুলির এই আচরণ কোনো অস্বাভাবিক নয়। রিভলবার দিয়েই সে এর জবাব দিয়েছে। তাই এ রিভলবার তার অতি প্রিয়। বাইরে সে একপাও নড়ে না এ রিভলবার ছাড়া। তার স্টুডিও এবং শুটিং এর সময়ও সে অনেক অপ্রীতিকর অবস্থার মুকাবিলা করেছে। একবার একজন বেয়াদব চিনা পরিচালক তার রিভলবার এর গুলিতে আহত পর্যন্ত হয়। পড়ে সে পরিচালকের চাকুরী যায়। এখন সবাই তাকে সমীহ করে চলে। অনেকেই প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু তার জনপ্রিয়তা এতই যে, তার বিরুদ্ধে কোন কথাই কোথাও কাজে লাগেনি। বাইরের কোন শুটিং-এ সে তার পরিবারের সাথে ছাড়া যায় না।

হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে পার্কিং থেকে নিজের গাড়ি বের করে মেইলিগুলি ছুটল নিজের বাসার উদ্দেশে।

উরুমচির অভিজাত এলাকায় বিশাল বাড়ি মেইলিগুলির। বাড়িটা মেইলিগুলির পৈত্রিক। মেইলিগুলির পরিবার সিংকিয়াং এর সবচেয়ে পুরাতন সবচেয়ে সম্মানিত পরিবারের একটি। মেইলিগুলির পূর্ব পুরুষ ইবনে সাদ মক্কা থেকে সপরিবারে সিংকিয়াং এ আসেন। বলা হয় ইনি মহানবী (সঃ) এর একত্রিশতম বংশধরের পৌত্র। গোঁটা চীনে তিনি ইসলাম প্রচারের কাজে নিজেকে বিলিয়ে দেন। ইবনে সা'দ স্থানীয় জনগনের সাইয়েদে পরিনত হন এবং তাদের অতুল ভালবাসা লাভ করেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে শানসি, সিচুয়ান ও ইউনান প্রদেশের শাসন কর্তার পদ ও লাভ করেন। পড়ো জমি আবাদ করা, স্কুল প্রতিষ্ঠা, সেচ ব্যাবস্থার বিস্তার, ডাক চলাচল ও উন্নত কৃষি ব্যাবস্থা প্রবর্তন ইত্যাদি তার জনহিতকর কাজগুলির কথা প্রবাদের মত এখনও মানুষের মুখে মুখে। সিংকিয়াং এ মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা উইঘুরদের আব্দুল করিম সাতুক বোগড়া খানের পরিবারের সাথে সাইয়েদ ইবনে সাদের পরিবার ঘনিষ্ঠ হয়। এই উইঘুর পরিবারের এক রাজকুমারীকে বিয়ে করার মাধ্যমে সাইয়েদ পরিবার উইঘুরদের সাথে মিশে যায়। মেইলিগুলি এই সাইয়েদ উইঘুর পরিবারেরই সন্তান। শুধু উইঘুরই নয়, সিংকিয়াং এর হুই, কাজাখ, প্রভৃতি সব মুসলিম সম্প্রদায়ই এই সাইয়েদ পরিবারকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে দেখে। মাও এর সংস্কৃতিক বিপ্লব এর

সময় মেইলিগুলিদের বাড়িটাও বিপ্লবীরা দখল করেছিল। কিন্তু উইঘুরদের অসন্তোষ হ্রাসের জন্যে পরে তারা এই বাড়িটা মেইলিগুলিদের ফিরিয়ে দেয়।

মেইলিগুলি একুশ বছরে পা দিয়েছে। গত বছরে সে উরুমচির সমাজ বিজ্ঞান কলেজ থেকে ডিগ্রি নিয়েছে ইতিহাস বিষয়ে। তার শিক্ষার সাথে তার পেশা মেলে না। সিংকিয়াং এর সরকারি চলচ্চিত্র সংস্থা তিয়েনশান স্টুডিওতে যারা ঢোকে, তারা সকলেই কলেজ অফ আর্টস থেকে ডিগ্রি নেয়া। মেইলিগুলিই একমাত্র ব্যতিক্রম। প্রকৃত পক্ষে অনুকরন ও উপস্থাপনার অপূর্ব ক্ষমতা দেখেই যুব কম্যুনিস্ট পার্টি তাকে অভিনয়ে ঢুকিয়েছে। মেইলিগুলি উরুমচির যুব কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য। মেইলিগুলি আজ তিন বছর হল অভিনয়ে ঢুকেছে।

মেইলেগুলি বাড়িতে পৌঁছে তাড়াতাড়ি পোশাক পাল্টিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল অফিসে, তার কর্মস্থল তিয়েনশান স্টুডিওতে।

দাদির ঘরের সামনে দিয়ে নিচের তলায় নামার সিঁড়ি।

দাদির ঘরের সামনে দিয়ে মেইলিগুলি সিঁড়ির দিকে যাচ্ছিল।

দাদি ডাকল, আমিনা।

মেইলিগুলির দাদির ডাক শুনেই থমকে দাঁড়াল।

দাদির ঘরের দরজা খোলাই ছিল, মেইলিগুলি ছুটে ঘরে ঢুকে বলল, কি দাদি?

তার দাদির বয়স শত বর্ষ পূর্ণ হয়েছে গত বছর। একশ' এক বছর চলছে এবার। শুভ্র কেশ, গা-মুখের চামড়া কুচকে গেছে, নড়া-চড়ায় তার কষ্ট হয়, অবয়ব ঘিরে এক শুভ্র পবিত্রতা। মনে হয় তার চোখ মুখ দিয়ে কি এক উজ্জ্বল্য যেন ঠিকরে পড়ছে।

দাদি বালিশে ঠেশ দিয়ে বসেছিল। মেইলিগুলি ঘরে ঢুকলে সে সোজা হয়ে বসল। ঠোটে স্নেহের হাসি জড়িয়ে বলল, আয় আমার পাশে বস।

মেইলিগুলি এসে তার পাশে বসতে বসতে বলল, অফিস এর সময় হয়েছে তো তাই একটু তাড়া, তিনটায় একটা কাজ আছে।

-কথা বলার জন্য তোকে আজ কাল দু'দণ্ডও পাই না।

-সত্যি ব্যস্ত দাদি, মাঝখানে আবার কাশগড় গিয়েছিলাম।

-কাশগড়ে তোর কি ঘটেছিল, সেটা পুরাপরি কেউ আমাকে বলল না।

-ও কিছু না দাদি। একটা এক্সিডেন্ট।

-এক্সিডেন্ট কি ঘটনা নয়?

দাদি একটু থামল। কণ্ঠটা তার ভারি শোনাল। একটা ঢোক গিলল দাদি। তারপর আবার শুরু করল, জানি, তোদের এ সব কাজ আমি পছন্দ করিনা, তাই তোরা আমাকে এড়িয়ে চলতে চাস।

-না দাদি তুমি আমাকে ভুল বুঝ না। আমি সত্যিই ব্যস্ত, প্রায়ই উরুমচির বাইরে যেতে হয়।

-কেন ব্যস্ত, কিসের কাজে তুই ব্যস্ত।

বলে দাদি মেইলিগুলির মুখ এক হাতে উঁচু করে তুলে ধরল। তার চোখে চোখ রেখে বলল, তোকে ওরা মেইলিগুলি বলে- 'তুই তিয়েনশান পাহাড়ের ফুল' ওদের কাছে। কিন্তু আমরা তো তোর নাম রেখেছিলাম, 'আমিনাগুলি' আমরা চেয়েছিলাম তুই 'বিশ্বাসী ফুল' হবি। তুই আজ ঐ পথে কেন?

মেইলিগুলি ধীরে ধীরে চোখ নামিয়ে নিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, দোষ কি এতে দাদি?

-দোষ তুই দেখতে পাবি না। বলত তুই কে?

-উয়ঘুর মেয়ে।

-শুধু কি তাই? তোর কি অতীত নেই, কোন ঐতিহ্য নেই?

মেইলিগুলি নরম কণ্ঠে বলল, দাদি আমি যুব কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য। আমার তো কোন অতীত নেই।

-তুই এ কথা বলতে পারলি? তোর রক্ত তুই অস্বীকার করিস? সিংকিয়াং-এ ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা সকলের পরম শ্রদ্ধেয় ইবনে সাদ তোর পূর্ব পুরুষ। সিংকিয়াং-এ ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আবদুল করীম সাতুক বোগড়া খানের রক্ত তোর দেহে। তুই এসব অস্বীকার করিস?

বলতে বলতে দাদির কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। চোখ দুটি তার নিচে নেমে গেল।

মেইলিগুলি দাদির একটা হাত তুলে নিয়ে চুমু খেয়ে বলল, দাদি তুমি আমাকে ভুল বুঝ না, আমি তোমাকে আঘাত দিতে চাইনি। বাস্তবতাকেই শুধু আমি তুলে ধরতে চেয়েছি।

-গায়ের জোরে একটা জিনিস চালু হয়ে গেলেই তা বাস্তব হয়ে যায় নারে! বাস্তবতার সাথে মানুষের বিশ্বাসের যোগ থাকতে হয়। সেটা এখন কোথাও নেই। মানুষের বিশ্বাসের সাথে তোর ঐ বাস্তবতার সংঘর্ষে মানুষ আজ ক্ষত -বিক্ষত হচ্ছে। তুই বুকে হাত দিয়ে বলত, তোর বিশ্বাসের সাথে তোর বাস্তবতার কোনও সম্পর্ক আছে?

মেইলিগুলি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতে পারল না। একটু ভাবল, তারপর বলল, তোমার প্রশ্নের জবাব আজ দিতে পারলাম্ না। ভবিষ্যতের জন্য তোলা রইল।

বলে উঠে দাঁড়াল মেইলিগুলি। দাদির দু'টো হাত নিয়ে চুমু খেয়ে বলল, দাদি, তোমার 'আমিনাগুলি' আমিনাগুলিই আছে, তোমার 'বিশ্বাসী ফুল'- এতে কোনও অশুভ হাতের ছোঁয়া লাগেনি। অন্যান্য কম্যুনিস্টদের ব্যাপার যাই হোক, আত্ম সম্ভ্রম ও আত্ম মর্যাদা রক্ষার ঐতিহ্য আমার কাছে কোনও অতীত বিষয় নয়।

বলে মেইলিগুলি ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তর তর করে নামল সিঁড়ি দিয়ে। হাতের ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল, তিনটা বেজে পাঁচ মিনিট। আশ্বস্ত হল খুব একটা দেরী হবে না।

তখন বিকেল সাড়ে চারটা। তিয়েনশান স্টুডিওতে তার অফিস কক্ষে বসে মেইলিগুলি একটা স্ক্রিপ্ট এর ওপর চোখ বুলাচ্ছিল। এমন সময় এ্যাটেনডেন্ট মিস লি ওয়ান দরজায় এসে ভিতরে আসার অনুমতি চাইল।

মাথা নেড়ে অনুমতি দিল মেইলিগুলি।

লি ওয়ান ভিতরে ঢুকে একটা স্লিপ এগিয়ে দিল মেইলিগুলির সামনে। স্লিপটির উপর নজর বুলাল মেইলিগুলি। স্লিপে সাক্ষাতদানের একটা অনুরোধ। নিচে নাম স্বাক্ষর ‘হাসান তারিক’।

পড়ে ভ্রু কুঞ্চিত করল মেইলিগুলি। না এই নামের কাউকে সে চিনে না। এই নামের কোনও লোকের সাথে তার পরিবারের বা পেশাগত কোন সম্পর্কের কথাও সে স্মরণ করতে পারল না। নিশ্চয় কেউ বিরক্ত করতে এসেছে। এখন সাক্ষাত প্রার্থীর সংখ্যা প্রতিদিন প্রচুর। সবাইকেই ফিরে যেতে হয়। ফিল্ম সংক্রান্ত প্রয়োজন ছাড়া কারো সাথে সে দেখা করে না। তবু ওয়েটিং রুমে ভীড় লেগেই থাকে। বেরুবার সময় এক মুহূর্ত দেখার জন্যে।

মিস ওয়ান এর দিকে মুখ তুলে মেইলিগুলি বলল, তুমি বলনি ফিল্ম সংক্রান্ত প্রয়োজন ছাড়া কারো সাথে আমি দেখা করি না?

-বলেছি, কিন্তু সে নাছোড় বান্দা। বলছে, অভিনেত্রী বলে তার সাথে দেখা করতে আসিনি। তবু আমি রাজি না হলে সে বলেছে’ বিদেশ থেকে সে এসেছে, একটা উপকার আপনি, তার করতে পারেন’ এই অনুরধ আপনাকে জানাবার জন্যে।

ভ্রু কুঞ্চিত হল মেইলিগুলির। আবার চোখ বুলাল নামটার উপর। ঠিক নামটা এদেশে স্বাভাবিক নয়।

-জিজ্ঞেস করেছো কোন দেশী? বলল মেইলিগুলি।

-না জিজ্ঞেস করিনি। জিজ্ঞেস করে আসি।

বলে দরজার দিকে পা বাড়াল লি ওয়ান। মেইলিগুলি তকে থামিয়ে দিয়ে বলল, দরকার নেই জিজ্ঞাসার। তুমি তাকে নিয়ে এস।

লি ওয়ান বেরিয়ে গেল। অল্পক্ষণ পর হাসান তারিককে নিয়ে ফিরে এল।

হাসান তারিক ঘরে প্রবেশ করে মেইলিগুলির সাথে চোখাচোখি হতেই পরিষ্কার কণ্ঠে সালাম দিল।

মেইলিগুলি ছোট্ট করে সালামের জবাব দিয়ে বলল, বসুন।

মেইলিগুলিও উঠে দাঁড়িয়েছিল। হাসান তারিক বসার সাথে সাথে মেইলিগুলিও বসে পড়ল।

মেইলিগুলিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছিল হাসান তারিককে। পঁচিশ/ছাব্বিশ বছর বয়স। বলিষ্ঠ গড়ন। ছোট করে ছাঁটা চুল। মুখে সারল্য, দৃষ্টির মধ্যে একটা পরিছন্নতা। বিরক্তির ভাবটা কেটে গেল মেইলিগুলির। এমন চেহারার লোক চারশো বিশ গোছের হয় না।

মেইলিগুলি কিছু বলার জন্য মুখ খুলেছিল। কিন্তু তার আগেই কথা বলে উঠল হাসান তারিক। বলল, মিস মেইলিগুলি, আপনাকে বিরক্ত করার জন্য মাফ চাইছি। একটা ব্যাপারে আমি আপানার সাহায্য চাই।

-আপনি কে, কি পরিচয় আপনার আগে বলুন।

-পরিচয় দেবার মত কোন পরিচয় আমার নেই। একজন সাধারন মানুষ আমি। এসেছি তাসখন্দ থেকে।

-তাসখন্দ থেকে? আচ্ছা ওখানে যে বিপ্লব হয়েছে, সে সম্বন্ধে কিছু জানেন আপনি?

-হ্যাঁ, সেখানকার মুসলমানরা কম্যুনিস্টদের হটিয়ে দিয়ে দেশ স্বাধীন করেছে।

-ব্যাপারটা আমার কাছে এখনও অবিশ্বাস্য। মনে হয় যা শুনেছি সবই রুপকথা। যাক, আপনার প্রয়োজন বলুন।

-জেনারেল বোরিসকে আপনি চেনেন?

জেনারেল বোরিসের নাম শুনে চমকে উঠল মেইলিগুলি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকাল হাসান তারিকের দিকে। ধীর কন্ঠে বলল, তার সাথে পরিচয় হয়েছিল, কিন্তু কে তিনি তার বিস্তারিত কিছু জানি না।

-জেনারেল বোরিস কাশগড় থেকে উরুমচি এসেছেন, আপনি জানেন?

-জানি, এসেছেন।

একটু থামল হাসান তারিক। বোধহয় একটু ঢোক গিলল। মেইলিগুলির কথায় যেন তার চোখ দু'টি চকচক করে উঠেছে। ধীরে ধীরে সে বলল, মিস মেইলিগুলি, আপনি কি তার ঠিকানা দিয়ে আমাদের সাহায্য করতে পারেন?

-দুঃখিত, মিঃ হাসান তারিক, তার ঠিকানা আমার জানা নেই। উনি উরুমচিতে আসার পর হোটেল সিংকিয়াং-এ একটা ভোজ সভার আয়োজন

করেছিলেন। সেখানে আমাকেও দাওয়াত করেছিলেন। সেখানেই তার সাথে দেখা। আর কিছুই জানি না আমি তার সম্বন্ধে।

বিরাট আশা হোঁচট খেল হাসান তারিকের। একটা বিষণ্ন অন্ধকার নেমে এল তার চোখে মুখে। ব্যাপারটা মেইলিগুলির দৃষ্টি এড়ালনা। মনে মনে দুঃখই হলো তার। বেচারার কতইনা জরুরী কাজ ছিল।

'আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত মিস মেইলিগুলি' বলে উঠে দাঁড়াল হাসান তারিক। কিন্তু কয়েক পা এগিয়ে আবার ফিরে দাঁড়াল সে।

মেইলিগুলি হাসান তারিককে বিদায় দেবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছিল। তার ফিরে দাঁড়ানো দেখে বলল, কিছু বলবেন?

-আপনি তিয়েনশান ভ্যালি থেকে কাশগড় আসার পথে জেনারেল বোরিসের সাথে তো একজন বন্দী দেখেছিলেন।

-হ্যাঁ, কেন?

-কেমন দেখেছেন তাকে, কেমন ছিলেন তিনি? হাসান তারিকের স্বরটা ভারি।

মেইলিগুলিও কৌতুহল ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে। একটু পর বলল, মিঃ হাসান তারিক, আপনি কাকে খুজছেন, বন্দীকে না জেনারেল বোরিসকে?

-বন্দীকে। আর বন্দীকে পাবার জন্যেই খুঁজছি জেনারেল বোরিসকে।

মেইলিগুলি দাঁড়িয়েই কথা বলছিল। বসে পড়ল। হাসান তারিককেও বসতে বলল।

-বন্দীটি কে মিঃ হাসান তারিক?

-আহমদ মুসা। ফিলিস্তিন বিপ্লব, মিন্দানাও বিপ্লব এবং মধ্য এশিয়া বিপ্লবের অধিনায়ক।

বিস্ময়ের ঘোর নিয়ে কিছুক্ষণ সে তাকিয়ে রইল হাসান তারিকের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে। পরে সে চোখ দু'টি বন্ধ করে চেয়ারে গা এলিয়ে দিল।

কিছুক্ষন পর চোখ খুলে সে সোজা হয়ে বসল। অনেকটা স্বগত কন্ঠেই বলল, আমি দেখেই তখন তাকে অসাধারন কেউ ভেবেছিলাম। ঠিক হলো আমার ভাবনা। অসাধারন না হলে ঐ অবস্থায় অত নিশ্চিন্ত কোন মানুষ হতে পারে না।

তারপর হাসান তারিকের দিকে চেয়ে বলল, একটা কথাই আমি ওর সাথে বলার সুযোগ পেয়েছি। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তাঁর কিছু বলার আছে কিনা কাউকে? কি জবাব দিয়েছিলেন জানেন? চিরদিন মনে থাকবে আমার সেই জবাবটা। তিনি আমাকে বলেছিলেন, আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন, জাতির কাজে লাগার শক্তি আপনাকে আল্লাহ দিন।

-মিস মেইলিগুলি, ওঁর গোটা জীবন, ওঁর প্রতিটি পদক্ষেপ, ওঁর ধ্যান, জ্ঞান সব দুনিয়ার মুসলমানদের জন্যে নিবেদিত। স্বাধীন ইসলামী বিশ্ব ওর সর্বক্ষনের স্বপ্ন।

-সেদিন যা দেখেছি, এত বড় একজন বিপ্লবী এত শান্ত, এত সৌম্যও হতে পারে।

-অবসরকালীন আহমদ মুসার ঐ রুপ ওটা। কিন্তু এ্যাকশনের সময় সে সিংহের মত সাহসি, নেকড়ের মত ক্ষিপ্র। যাক, মিস মেইলিগুলি, আমি জানতে চেয়াছিলাম, কেমন ছিলেন তিনি?

একটু দ্বিধা করে মেইলিগুলি বলল, ওঁর গোটা পোশাক আমি রক্তে ভেজা দেখেছি। ওঁর মুখ দেখে আমি কিছু বুঝতে পারিনি, মাঝে মাঝে ওঁকে ওঁর মাথা চেপে ধরতে দেখেছি।

হাসান তারিক মুখ নিচু করেছিল। অশ্রু গোপন করতে চেষ্টা করল সে, কিন্তু পারলনা। দু'চোখ বেঁয়ে নেমে এলো অশ্রু।

মেইলিগুলি হাসান তারিকের দিকে তাকিয়ে ছিল। কিছু বিব্রত বোধ করল সে। জিজ্ঞেস করল, মিঃ হাসান তারিক, ওঁর সাথে আপনার কি সম্পর্ক?

হাসান তারিক চোখটা ভাল করে মুছে নিয়ে বলল, ওঁর সংগ্রামের একজন সাথী আমি।

-আচ্ছা জেনারেল বোরিস কে?

-জেনারেল বোরিস 'ফ্র' এর নেতা এবং মধ্য এশিয়ার কম্যুনিস্ট গভর্ণর জেনারেল ছিলেন।

-এবার সব বুঝেছি মিঃ হাসান তারিক।

হাসান তারিক একটু ভাবল। তারপর বলল, জেনারেল বোরিসকে ট্রেস করার আর কোন পথ আছে মিস মেইলিগুলি? আমরা একটা ঠিকানা উদ্ধার করেছিলাম কাশগড় থেকে। কিন্তু কাশগড় থেকে সে সম্ভবত ঐ খবর পেয়ে যায়। আমরা উরুমচিতে পৌছার আগেই সে তার ঐ ঠিকানা বদলে ফেলেছে।

চেয়ারে গা এলিয়ে বসে আছে মেইলিগুলি। সে চিন্তা করছিল। এক সময় খুশি হয়ে সে বলল, আপনি হোটেল সিংকিয়াং-এ খোঁজ নিন, একটা স্যুট ওর নামে ছিল, সেটা আছে কি না? আরেকটা জিনিস জেনারেল বোরিস আলেকজান্ডার বোরিসভ নামে এখানকার চেম্বার অব কমার্সের সদস্য হয়েছে। আপনি সেখানে গিয়ে খোঁজ নিতে পারেন। তার সাথে যোগাযোগের ঠিকানা সেখানে কি দেয়া আছে। তাছাড়া এই শহরে সে নতুন এসেছে। নিশ্চয় সিটিজেন রেজিষ্টারে তার নাম উঠেছে। সেখানেও ঠিকানা থাকার কথা। এ খোঁজগুলো আপনি নিন। আমিও এ ব্যাপারে দেখব।

‘শুকরিয়াহ’ বলে হাসান তারিক উঠে দাঁড়াল।

মেইলিগুলি তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বলল, প্রয়োজন হলেই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন, দ্বিধা করবেন না।

হাসান তারিক চলে গেলে মেইলিগুলি ফিরে এল তার চেয়ারে। কিন্তু আর কাজে মন বসাতে পারল না। বার বার তার ঐ অদ্ভুত বন্দীর কথাই মনে আসছে। আজকের মুসলিম জাতির মধ্যে এমন মানুষও আছে। মনে মনে হাসি পেল তার। থাকবে না কেন, না থাকলে ফিলিস্তিন, মিন্দানাও এবং মধ্য এশিয়ায় বিপ্লব হলো কেমন করে?

সামনের স্ক্রিপটা বন্ধ করে ফাইলে রেখে দিল ।

এ সময় একটা টেলিফন এল!

রিসিভার তুলে নিতেই ওপার থেকে কথা ভেসে এলো, গতকালের প্রস্তাব সম্পর্কে তুমি তো কিছু বললে না।

-সরি স্যার, একটু ব্যস্ত ছিলাম। ঐ বইয়ে আমি অংশ নিতে পারছি না।

-কেন, কেন?

-তিনটি এমন দৃশ্য আছে, যে দৃশ্যে আমি অভিনয় করি না, করব না।

-যেমন?

-আলিঙ্গন, পানির নিচে জলকেলি, গোসল করে উঠে ভিজা কাপড়ে নাচা।

-ঠিক আছে ও দৃশ্যগুলি বাদ যাবে।

-ধন্যবাদ স্যার।

ওপারে টেলিফোন রেখে দিল। মেইলিগুলিও টেলিফোন রেখে উঠে দাঁড়াল। বেরিয়ে এলো অফিস থেকে।

# ৫

ধীরে ধীরে উপরের ঘুলঘুলিটিতে সাদা আলোর একটা ক্ষীণ রেখা জেগে উঠল। আহমদ মুসা জেগেই ছিল। উঠে বসল সে। ফজরের নামাজ পড়তে হবে।

অন্ধকার হাতড়ে সে পানির কলসিটি খুঁজে বের করল। দেখল পানি বেশি নেই। পানিটুকু দিয়ে সে অজু করে ফেলল। খাবার পানি আর থাকল না। আর পানির তার দরকারও হবে না।

কয়েক দিন পর অজু করে বেশ ভাল লাগল আহমদ মুসার। ফজরের নামাজ শেষ করেও অনেকক্ষণ জায়নামাজে বসে থাকল আহমদ মুসা। পরম প্রভুর একান্ত মুখোমুখি নিজেকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করল। স্মরণ করল তাকে দেয়া আল্লাহর অতুল নেয়ামতগুলোর কথা। তারপর স্মরন করল নিজের দায়িত্বের কথা। বিবেকের কুটির থেকে তার দুয়ার খুলে কে যেন বলল, বন্দী হওয়ার পর থেকে তুমি স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছ। পরিস্থিতির কাছে আত্মসমর্পণ করেছ, নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছ তুমি।

চমকে উঠল আহমদ মুসা। তাই তো সে তো কিছুই করে নি। ঘটনার স্রোত তো তাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে প্রাণহীন খড় কুটার মত। কিন্তু মুসলমানের জীবন তো স্রোতে ভেসে চলার জন্য নয়। অশুভ শক্তির গতি পরিবর্তনই তো তার প্রকৃতি। একটা যুক্তি মনে এলো। বলতে চেষ্টা করল। মধ্য এশিয়ায় বিপ্লব হয়ে গেছে, তার দায়িত্ব শেষ, কোন কাজ তো আর নেই। কোন দায়িত্বে সে অবহেলা করছে না। কিন্তু বিবেকের কুটিরের সেই দরজা আবার নড়ে উঠল। কথা ভেসে এলো সেখান থেকে, একজন মুসলমানের দায়িত্ব তো মধ্য এশিয়ায় সীমিত নয়, তার দায়িত্বের অধীন গোটা বিশ্ব। তার দায়িত্ব তাই শেষ হতে পারে না।

এই কথা আহমদ মুসার গোটা দেহে একটা যন্ত্রনা ছড়িয়ে দিল। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল, সিংকিয়াং, ককেশাস, থাইল্যান্ডের পাত্তানি, বার্মার রোহিঙ্গা, বুলগেরিয়া, যুগোস্লাভিয়া, এবং আফ্রিকার কোটি কোটি মুসলমানের

মর্মান্তিক জীবনচিত্র। চলচ্চিত্রের দৃশ্যের মত তার সামনে ভেসে এল সর্বস্ব লুন্ঠিতা লাখো মা-বোনের বিবস্ত্র চেহারা, কানে তার এসে প্রবেশ করল লাখো মুসলিম এতিম শিশুর বুক ফাটা কান্না। অশ্রু গড়িয়ে পড়ল আহমদ মুসার দু'চোখ দিয়ে।

জামার আস্তিন দিয়ে আহমদ মুসা চোখের পানি মুছে ফেলল। না, এবার তার নিষ্ক্রিয়তার অবসান ঘটাবে। আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন, তা নিয়েই সে রুখে দাঁড়াবে। তার সামনে অনেক কাজ। এই চিন্তা করার সাথে সাথে অদম্য এক জীবন জোয়ারে জেগে উঠল গোটা দেহ, তার গোটা সত্তা।

আহমদ মুসা নামাযের আসন থেকে উঠে দাড়াল। পায়চারি করতে লাগল ঘরে।

আজ জেনারেল বোরিস আসবে। ভাত খাইয়ে যায় যে মেয়েটি, সে গত কাল এক চিরকুটে জানিয়েছে, আজ জেনারেল বোরিস আসবে। আজকেই সে ফাইনাল ডেট ঠিক করেছে। আর সে সময় দেবে না আহমদ মুসাকে। সব আয়োজন তার কমপ্লিট। মেয়েটি আড়ি পেতে জেনারেল বোরিসের শলাপরামর্শ শুনেছে।

মেয়েটি তার নিজের কথাও লিখেছে। নর পশুদের আড্ডা থেকে তার বাঁচার কোন উপায় নেই। সামান্য সন্দেহ হলেই মেরে ফেলবে। তার মত আরোও দুঃখিনি মেয়ে আছে। দাসিবৃত্তি ও দেহ দানের যন্ত্র তারা।

এদের পাষন্ডতায় গাঁ শিউরে ওঠে আহমদ মুসার। হাত দু'টো মুষ্টিবদ্ধ হয় তার।

পায়চারি বন্ধ করে আহমদ মুসা ফিরে আসে তার বিছানায়। গড়িয়ে নেবার জন্য বিছানায় গা এলিয়ে দিল আহমদ মুসা।

সারা দিন গেল, সন্ধ্যাও পার হলো, কিন্তু জেনারেল বোরিসরা এলো না। দুপুরে মেয়েটি ভাত খাইয়ে গেছে। কিন্তু কিছু জানায়নি। বোধ হয় কিছু সে জানতে পারেনি। তাহলে কি জেনারেল তার প্রোগ্রাম পাল্টাল?

প্রশ্নটা আহমদ মুসার মন থেকে মিলিয়ে যাবার আগেই দরজার ওপারে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। নিয়ম মাফিক ওপারে জ্বলে উঠল আলো।

আহমদ মুসা উঠল। দু'পা নিচে ঝুলিয়ে খাটিয়ায় বসল। দরজা খুলে গেল। দরজা দিয়ে প্রবেশ করল জেনারেল বোরিস। তার হাতে তার সেই কালো রং-এর বাঘা রিভলবারটি।

আহমদ মুসা দেখল, রুটিন মাফিক স্টেনগানধারী চারজন লোক দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।

অভ্যাস মত জেনারেল বোরিস ঘরে কয়েকবার পায়চারি করে আহমদ মুসার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। বলল, কি সিদ্ধান্ত নিলে আহমদ মুসা?

-কিসের সিদ্ধান্ত?

-বাগাড়ম্বর করো না। উত্তর দাও।

-জেনারেল বোরিস, আমার সিদ্ধান্ত গ্রহণের তো কিছু ছিল না।

-কাগজ কলম পাঠিয়েছিলাম, চিঠি লিখেছ কিনা?

-আমি চিঠি লিখব, একথা তো আমি কখনই বলিনি জেনারেল বোরিস।

-জীবনের মায়া তোমার নেই আহমদ মুসা?

-যে মায়া ভয় থেকে আসে এমন কোন বাড়তি মায়া আমার নেই।

-কথা বাড়িয়ো না আহমদ মুসা। আমি শেষ জবাব চাই তুমি চিঠি লিখবে কি না?

-জবাব তো আমি দিয়েছি।

-ঠিক আছে, দ্বিতীয় আয়োজন আমার কমপ্লিট। হাত কাটার জন্যে আমাদের জল্লাদকে এনে রেখেছি। সবার সামনে প্রদর্শনী করেই একাজটা আমরা করতে চাই। তোমাদের রাষ্ট্র তো নেই, তাই এমন দৃশ্য কেউ দেখেনি অনেক দিন।

বলে জেনারেল বোরিস হাসল। তারপর বোধ হয় দ্বাররক্ষীদের কোন নির্দেশ দেয়ার জন্যে সে মুখ ঘোরাল।

এমন একটা সুযোগের অপেক্ষা করছিল আহমদ মুসা। সে ঝাঁপিয়ে পড়ল জেনারেল বোরিসের ওপর। নিমেষে জেনারেল বোরিসের রিভলভারটি কেড়ে নিল তার হাত থেকে।

এক ঝটকায় বোরিস ফিরে দাঁড়াতে যাচ্ছিল। কিন্তু আহমদ মুসা সে সুযোগ দিল না। সে তার বাম হাতটি জেনারেল বোরিসের গলার সামনে দিয়ে

পেঁচিয়ে নিয়ে নিজের দেহের সাথে চেপে ধরল। আহমদ মুসার বাম বাহুটা সাঁড়াশির মত চেপে বসছিল জেনারেল বোরিসের গলায়। আর তার ডান হাতের রিভলবারটা তাক করে আছে জেনারেল বোরিসের মাথা।

দরজায় দাঁড়ানো চারজন প্রহরী প্রথমে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সামলে নিয়ে যখন স্টেনগানের মাথা উঁচু করল, তখন দেখল আহমদ মুসার দেহ জেনারেল বোরিসের দেহের আড়ালে। গুলী করলে তো জেনারেল বোরিসকেই বিদ্ধ করবে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তারা ছুটে এল ঘরের ভেতরে।

তারা ঘরের মাঝ বরাবর এসেছে। আহমদ মুসা কঠোর কন্ঠে বলল, আর তোমরা এক পা এগুলে জেনারেল বোরিসের মাথা গুড়ো করে দেব।

ওরা চারজন ঘরের মাঝখানেই দাঁড়িয়ে গেল।

আহমদ মুসা দ্বিতীয় নির্দেশ দিল, তোমরা জেনারেল বোরিসকে জীবিত চাইলে স্টেনগান মাটিতে রেখে সরে গিয়ে পেছন ফিরে দাঁড়াও।

ওরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করে স্টেনগান মাটিতে রেখে কয়েক ধাপ এগিয়ে পেছন ফিরে দাঁড়াল।

প্রথম দিকে জেনারেল বোরিস কিছু হাত পা ছুঁড়ে নিজেকে খসিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আহমদ মুসার বাহুর ইস্পাত বেষ্টনী তার শ্বাসরুদ্ধ করে ফেলায় অল্প কয়েক মুহূর্তেই তার দেহ নিস্তেজ হয়ে গেল। এবার তার দেহ নেতিয়ে পড়া দেখে আহমদ মুসা বুঝল সে জ্ঞান হারিয়েছে।

তাকে ছেড়ে দিয়ে এক দৌড়ে গিয়ে একটা স্টেনগান তুলে নিল সে।

আহমদ মুসা ছেড়ে দেয়ার পর সংজ্ঞাহীন জেনারেল বোরিস ধপ করে মাটিতে পড়ে গেল।

ওরা চারজনই পেছন ফিরে তাকাল। তখন আহমদ মুসা স্টেনগান হাতে তুলে নিয়েছে।

স্টেনগান বাগিয়ে ওদের নির্দেশ দিল আহমদ মুসা, তোমরা দেওয়ালের দিকে এগিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড় মেঝেতে।

ওরা নির্দেশ পালনে একটু দেরী করছিল। স্টেনগানের ট্রিগারে একটু চাপ দিল আহমদ মুসা। একরাশ গুলী বিদ্ধ করল মেঝেকে।

ওরা চারজন এরপর সুবোধ বালকের মত গিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল।

আহমদ মুসা অন্য তিনটি স্টেনগান কুড়িয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তারপর দরজা বন্ধ করে চাবি ঘুরিয়ে তালা বন্ধ করে দিল। চাবিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল অন্ধকার এক কোণায়।

আহমদ মুসা কড়িডোরের কোন দিকে যাবে যখন চিন্তা করছে, তখন মাথার উপর একটা ঘন্টা বেজে উঠল।

আহমদ মুসা বুঝল, ওটা বিপদ সংকেত। নিশ্চয় এ ঘরের ভেতর কোথাও বিপদ সংকেতের কোন গোপন সুইচ আছে। ওরা এই সুযোগই নিয়েছে।

আহমদ মুসা দেখল, লম্বা করিডোরের ডান দিকটা অন্ধকার। বাম প্রান্তে আর একটা আলো জ্বলছে। সে নিশ্চিন্ত হলো, বেরুবার প্যাসেজ ঐ দিকেই হবে।

আহমদ মুসা তিনটা স্টেনগান কাঁধে ঝুলিয়ে একটা হাতে নিয়ে ঐ আলোর দিকে ছুটল। ওখানে গিয়ে দেখল একটা সিঁড়ি ওপর দিকে উঠে গেছে। উঠতে যাবে এমন সময় ওপরে পায়ের শব্দ শুনতে পেল সে। সে আর না উঠে ছুটে গিয়ে সিঁড়ির পেছনে লুকাল।

সিঁড়ি দিয়ে তিনজন লোক ছুটে নেমে এল। কোন দিকে না তাকিয়ে ওরা করিডোর ধরে ছুটে গেল সেই বন্দী খানার দিকে।

ওরা আড়াল হতেই আহমদ মুসা সিঁড়ি ধরে উপরে ছুটল।

সে উপরে সিঁড়ির মুখে পৌঁছেছে, এমন সময় দেখল ডানদিক থেকে চারজন লোক ছুটে আসছে সিঁড়ির দিকে। ওদের হাতে স্টেনগান। ওরা আহমদ মুসাকে দেখে প্রথমটায় ভূত দেখার মত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। পরক্ষণেই ওদের স্টেনগানের নল আহমদ মুসাকে তাক করতে গেল।

কিন্তু আহমদ মুসার স্টেনগান তৈরী ছিল। এক ঝাঁক গুলী ছুটে গেল ওদের চারজনের দিকে। করিডোরে লুটিয়ে পড়ল ওদের চারজনের দেহ।

এখানেও সেই লম্বালম্বি করিডোর। দু'পাশে ঘর। কোন দিকে যাবে একটু চিন্তা করে নিয়ে যেদিক থেকে ওরা চারজন আসছিল সেদিকেই ছুটল। করিডোরের মাথায় গিয়ে বাঁক নিতেই আরো চারজনের সে মুখোমুখি পড়ে গেল।

ট্রিগারে হাত লাগানই ছিল আহমদ মুসার। ওরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওদের চারটা দেহ ঝাঁঝরা হয়ে গেল এক ঝাঁক বুলেটে।

ওরা চারজন যেদিক থেকে আসছিল, সেদিকেই ছুটতে যাচ্ছিল আহমদ মুসা।

এই সময় তাকে বন্দীখানায় খাবার দেয়া সেই মেয়েটি ছুটে এল তার সামনে। বলল, সামনে যাবেন না। ওদিকে আরও লোক আছে। ঐ দিকে চলুন, বেরুবার গেট ঐ দিকে।

আহমদ মুসা কড়িডোরের মোড় ঘুরে বাম দিকে যাচ্ছিল। এবার তারা ছুটল ডান দিকে।

করিডোরটি একটা ঘরে গিয়ে শেষ হয়েছে। এই ঘরটিই গেট রুম।

ঘরটির কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, এমন সময় পেছন থেকে অনেকগুলো পায়ের শব্দ ভেসে এল।

আহমদ মুসা পেছন দিকে একবার তাকিয়ে ছুটে সেই ঘরে ঢুকতে গেল। মেয়েটি আগে, আহমদ মুসা পেছনে। ঘরে ঢুকতে গিয়ে একঝাঁক গুলীর মুখোমুখি হল তারা। মেয়েটি আগেই ঘরে ঢুকে গিয়েছিল। গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে তার দেহটা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। একটা গুলি এসে আহমদ মুসার হাঁটুর নিচে বিদ্ধ হলো।

আহমদ মুসার আঙুল ট্রিগারেই ছিল। সে ঘরের চৌকাঠের পাশে মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে অগ্নি বৃষ্টি করল ঘরের ভেতর।

ঘরের ভেতর ছিল একজন প্রহরী। প্রহরীটি আহমদ মুসাকে তাক করার জন্য একটু ডান দিকে সরে গিয়েছিল। সেটা করতে গিয়ে আহমদ মুসার গুলির মুখে পড়ে গেল সে। মেয়েটির পাশেই তার দেহটি মাটিতে পড়ে গেল।

আহমদ মুসা দ্রুত ঘরে ঢুকে গেল। পেছন থেকে ওরা অনেকখানি কাছে এসে গেছে।

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল আহমদ মুসা। তারপর বাইরে বেরুবার দরজা খুলে ফেলল সে।

ওরা ভেতর থেকে এসে দরজা ধাক্কাতে শুরু করেছে। স্টেনগানের গুলি বৃষ্টি করছে ওরা দরজায়। কিন্তু ওদের শত ধাক্কা, শত গুলি বর্ষণেও কিছু হবে না ঐ স্টিলের দরজার।

আহমদ মুসা দরজা দিয়ে বাইরে পা রাখার আগে মেয়েটির দিকে একবার ফিরে তাকাল। রক্তে ভাসছে মেয়েটি। আহমদ মুসা স্বগত উচ্চারণ করল, বোন তুমি আমার অনেক উপকার করেছ, কিন্তু তোমার জন্যে আমি কিছুই করতে পারলাম না।

বাইরে পা বাড়াল আহমদ মুসা। এতক্ষণে অনুভব করল ডান পা তার যেন পাথরের মত ভারী। পা তুলতে পারছে না সে। রক্তে ভেসে গেছে হাঁটু থেকে নিচের অংশ।

তবু পা টেনে নিয়ে ছুটল সে। এক মুহূর্ত দেরী করা যায় না। ওরা অন্য পথ দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে। আহমদ মুসা স্টেনগানগুলো ফেলে দিয়েছিল। শুধু বোরিসের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া পিস্তলটাই তার পকেটে আছে।

ছোট একটা অন্ধকার উঠান পেরিয়ে সে একটা সরু রাস্তায় গিয়ে পড়ল। পাথর বিছানো কাঁচা রাস্তা। রাস্তাটা দক্ষিণ দিক থেকে এসে এ বাড়ির সামনে বাঁক নিয়ে পূর্ব দিকে চলে গেছে। আশেপাশে কোথাও বাড়ি নেই।

আহমদ মুসা ঠিক করল, রাস্তা দিয়ে সে যাবে না। ওরা বেরিয়ে প্রথমে রাস্তাটাই খোঁজ করবে। সে জোরে চলতে পারবে না, সহজেই ওদের চোখে পড়ার সম্ভাবনা।

রাস্তা ছেড়ে দিয়ে আহমদ মুসা বালু ও কংকরে ভরা গমের ক্ষেতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল। সামনে কিছুদূর গিয়ে গাড়ির হেডলাইট ছুটাছুটি করতে দেখে সে বুঝল, নিশ্চয় ওটা কোন হাইওয়ে। কোন গাড়ির সাহায্য তার চাই।

সে ঐ হাইওয়ের লক্ষ্যে হাঁটতে শুরু করল।

সে বুঝতে পারল না সিংকিয়াং-এর কোন নগরী এটা। ঘুটঘুটে অন্ধকার, কিছু দেখে বুঝারও উপায় নেই। গম তো সিংকিয়াং-এর বহু জায়গায় জন্মে।

মুক্ত বায়ুতে অনেক আরাম বোধ করল আহমদ মুসা। কিন্তু পা টেনে টেনে আর চলা সম্ভব হচ্ছে না তার।

হাইওয়েতে উঠে ধপ করে বসে পড়ল আহমদ মুসা। তখনও রক্ত ঝরছে ক্ষতস্থান দিয়ে। আহমদ মুসা জামার আস্তিন ছিঁড়ে ক্ষতটা বেঁধে ফেলল রক্ত পড়া রোধ করার জন্য।

পা টেনে নিয়ে অনেকখানি পথ সে এসেছে । শরীরটা খুব দুর্বল লাগছে। রক্ত কি খুব বেশি পড়েছে?

হাইওয়ের এই এলাকাটা অন্ধকার। সামনেই নগরীর আলো দেখা যাচ্ছে।

একটা গাড়ির হেড লাইট ছুটে আসছে দক্ষিণ দিক থেকে নগরীর দিকে। কাছাকাছি এসে পড়ল। আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। গাড়ির হেড লাইটে তার গোটা শরীর আলোর বন্যায় ভেসে গেল। গাড়ি দাঁড় করাবার জন্যে হাত তুলল আহমদ মুসা।

নিজের অসহায়ত্বের জন্য জীবনে কাউকে কোনদিন সে অনুরোধ করেনি। কি বলে আজ অনুরোধ করবে আহমদ মুসা। বেদনায় বুকটা যেন চিন চিন করে উঠল।

গাড়ি আহমদ মুসাকে সামনে রেখে দাঁড়াল। হেড লাইটের তীব্র আলো তার উপর।

গাড়ি থেকে কেউ নামল না, কেউ কথা বলছে না। ক্ষতস্থান চেপে ধরে আহমদ মুসা বসে পড়েছে। তীব্র আলোয় অস্বস্তি লাগছে তার।

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাবে এমন সময় গাড়িটি নড়ে উঠল। একটু সরে এসে গাড়িটি একেবারে আহমদ মুসার পাশ ঘেষে দাঁড়াল।

গাড়ির সামনের দরজা খুলে একটি মেয়ে বেরিয়ে এল। নেসে এসে গাড়ির পেছনের দরজা খুলে দিয়ে বলল, উঠতে পারবেন একা?

আহমদ মুসা তার পা-টি টেনে নিয়ে অতি কষ্টে গাড়িতে উঠল।

মেয়েটি লাল স্কার্ট পরা। লাল স্কার্ট, লাল হ্যাট মাথায়। হ্যাটের নেমে আসা প্রান্তটা তার নাক পর্যন্ত নেমে এসেছে। মুখ প্রায় দেখাই যায় না।

গাড়ির ভেতরে আলো জ্বেলে দিয়েছে মেয়েটি। আহত পায়ের দিকে তাকিয়ে মেয়েটি বলে উঠল, এখনো তো প্রচুর রক্ত বেরুচ্ছে, কাপড়টি রক্তে ভিজে গেছে।

মেয়েটি তাড়াতাড়ি ব্যাগ খুলে তার মাথার রুমালটি বের করল। তারপর আহমদ মুসার পা থেকে বাঁধা কাপড়টি খুলে ফেলে দিল। হাতের রুমাল দিয়ে রক্তটা একটু পরিষ্কার করে মাথার রুমালটা কয়েক ভাঁজ করে ক্ষতস্থানটা ভালো করে বেঁধে দিল।

মেয়েটি গাড়ির দরজাটা বন্ধ করে দিতে গেলে আহমদ মুসা বলল, দয়া করে রক্তমাখা কাপড়খন্ড এবং রুমাল গাড়ির ভেতরে নিন।

মেয়েটি একটু থমকে দাঁড়াল। একটু চিন্তা করল। তারপর ও দু'টো জিনিস রাস্তার উপর থেকে কুড়িয়ে গাড়ির ভেতর রেখে দিল।

'শুকরিয়াহ' জানাল আহমদ মুসা।

গাড়ি ছেড়ে দিলে আহমদ মুসা বলল, অনুগ্রহ করে আমাকে কোন ডাক্তারখানায় পৌঁছে দিন।

মেয়েটি কিছু বলল না।

তীব্র বেগে এগিয়ে চলল গাড়ি শহরের দিকে।

মিনিট দশেক পর গাড়িটি একটি বড় প্রাচীর ঘেরা বাড়ির গেট পেরিয়ে গাড়ি বারান্দায় প্রবেশ করল।

বার কয়েক হর্ণ বাজিয়ে গাড়ির দরজা খুলে মেয়েটি বেরিয়ে এল। আহমদ মুসার দরজাটিও খুলে ফেলল।

এ সময় সেখানে এসে দাঁড়াল মাঝ বয়েসী একজন মানুষ।

মেয়েটি তাকে বলল, চাচা, আমার এ মেহমান অসুস্থ। এঁকে আমাদের দু'তলার মেহমানখানায় পৌঁছে দাও। আমি ডাক্তার ডাকছি।

ডাক্তার ক্ষতস্থান ঠিক-ঠাক করে ভাল করে ব্যান্ডেজ করে দিয়ে গেছে। বলে গেছে, স্টেনগানের গুলি একদিক দিয়ে ঢুকে অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে যাবার কারনে ক্ষত বিরাট হয়েছে, কিন্তু অন্য কোন ভয়ের আশংকা নেই। গুলি হাড় স্পর্শ করেনি। প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে। সব মিলিয়ে সেরে উঠতে দেরী লাগবে।

নতুন এক সেট উইঘুর পোশাক পরে বালিশে হেলান দিয়ে আধ-শোয়া অবস্থায় আহমদ মুসা। তার আহত ডান পা-টা আরেক বালিশের ওপর। ডান হাতটা তার কপালের ওপর। তার শূন্য দৃষ্টি দরজা দিয়ে বাইরে ছড়িয়ে আছে।

চিন্তা করছে। সবটা ব্যাপার তার কাছে অলৌকিক বলে মনে হচ্ছে। কি পরিচয় এই মেয়েটির? গাড়িতে সে মেয়েটিকে চিনতে পারেনি, কিন্তু বাসায় এসে চিনেছে। তিয়েনশান ভ্যালি থেকে কাশগড় আসার পথে এই মেয়েটিই জেনারেল বোরিসের সাথে ছিল। মেয়েটিকে জেনারেল বোরিস উদ্ধার করে অপহরনকারীদের কাছ থেকে। জেনারেল বোরিসকে এড়িয়ে তার 'আপনার কিছু বলার আছে কিনা' প্রশ্নের কথা আহমদ মুসার এখনও মনে আছে। তার সেদিনের সেই আচরণ এবং আজকের আচরণের মধ্যে মিল আছে। মেয়েটির পরিচয় কি?

চোখ দু'টি আহমদ মুসার বাইরে থেকে ঘরের ভেতর ফিরে এল। ঘরের চারদিকে ঘুরে এল একবার চোখ। ঘরের দেয়ালে কার্ল মার্কস-এর একটা ছবি এবং প্রথম কম্যুনিষ্ট মেনিফেস্টোর বাঁধানো কপি ছাড়া বাড়তি কোন জিনিস নেই।

আহমদ মুসার চোখ দু'টি দেয়ালের সেই কম্যুনিষ্ট মেনিফেস্টোর দিকে আটকে থাকল। ভাবল সে, এরা অবশ্যই একটা সক্রিয় কম্যুনিষ্ট পরিবার। কার্ল মার্কসের ছবি অনেকেই রাখে। কিন্তু কোন কমিটেড কম্যুনিষ্ট ছাড়া প্রথম কম্যুনিষ্ট মেনিফেস্টোকে এভাবে মাথার মণি করে রাখে না।

এই চিন্তা এসে আবার মাথা গুলিয়ে যায় আহমদ মুসার। মেয়েটির পরিচয় যদি এই হয়, তাহলে জেনারেল বোরিসের সাথে তার পার্থক্য (cv_©K¨) কোথায়? তাহলে তার সাথে মেয়েটির আচরনের ব্যাখ্যা কি?

হঠাৎ তার মনে হল, জেনারেল বোরিসকে তার চেনার কথা নয়।

এ সময় পায়ের খস খস শব্দে আহমদ মুসা দরজার দিকে ফিরে তাকাল। দেখল, মেয়েটি ঘরে ঢুকছে। ধব ধবে সাদা স্কার্ট পরা, মাথায় সাদা রুমাল। আহমদ মুসা তার চোখ নামিয়ে নিল।

মেয়েটি ঘরে ঢুকে তার কাছে এসে বলল, কেমন লাগছে এখন?

আহমদ মুসা সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, বেশ ভাল।

মেয়েটি টেবিলে গিয়ে ওষুধের চার্টের দিকে নজর বুলাল। তারপর বলল, একটা ক্যাপসুল খেয়েছেন সন্ধ্যা সাতটায়, আরেকটা খেতে হবে রাত একটায়। আমি এ্যাটেনড্যান্টকে বলে যাচ্ছি। সে আপনাকে জাগিয়ে দেবে। এ সময় খাবারের ট্রলি ঠেলে ঘরে ঢুকল একজন পরিচারিকা।

পরিচারিকা ট্রলিটি এনে খাটের সাথে ভিড়িয়ে দিল।

মেয়েটি বলল, খেয়ে নিন। এখন রাত সাড়ে আটটা, ন'টার মধ্যে আপনার ঘুমানো উচিত।

বলে মেয়েটি বেরিয়ে গেল।

খাওয়া শেষে পরিচারিকা যখন ট্রলি ঠেলে বেরিয়ে গেল, তখন আবার ঘরে ঢুকল মেয়েটি। ঘরের চারদিকে একবার চেয়ে বলল, সব ঠিক আছে।

তারপর টেবিলের কাছে এগিয়ে আহমদ মুসাকে একটা সাদা সুইচ দেখিয়ে বলল, আপনার জরুরী কোন প্রয়োজন হলে এই সুইচ টিপবেন। আপনি ঘুমাবার আগে লক টিপে দরজা বন্ধ করতে বলবেন এ্যাটেনড্যান্টকে। সে এই পাশের খাটেই থাকবে। আমি তাকে বলে দিয়েছি, একমাত্র আমি ডাকা ছাড়া রাতে সে দরজা খুলবে না।

মেয়েটি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মেয়েটির শেষ কথায় আহমদ মুসা বিস্মিত হয়েছে। তার এই শেষ কথার অর্থ কি? সে কি কোন বিপদের আশংকা করে? আহমদ মুসার জন্যে তার এই সাবধানতা কেন?

তখন রাত একটা। ক্লান্ত-শ্রান্ত আহমদ মুসা গভীর ঘুমে অচেতন। এ্যাটেনড্যান্টও জেগে থাকার চেষ্টা করে আধা ঘন্টা আগে ঘুমিয়ে পড়েছে।

হঠাৎ দরজায় নক করার শব্দে আহমদ মুসা জেগে উঠল। আবার দরজায় নক করার আওয়াজ হলো, ঠক ঠক ঠক।

আহমদ মুসা সুইচ টিপে আলো জ্বালাল। দেখল, এ্যাটেনড্যান্ট টেবিলে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছে।

আবার নক হল দরজায়।

আহমদ মুসা বলল, কে?

বাইরে একটা নারী কন্ঠ ভেসে এল। বলল, আমি মেইলিগুলি। রাত একটা বাজে। এ্যাটেনড্যান্টকে ডেকে ওষুধ খেয়ে নিন।

কথা শেষ করেই সে চলে গেল। তার পায়ের আওয়াজ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

আহমদ মুসা অবাক হয়ে কিছুক্ষন বসে থাকল। এই রাত একটা পর্যন্ত মেয়েটি জেগে ছিল তাকে ওষুধ খাওয়ানোর জন্যে। গোটা ব্যাপারটা তার কাছে দুর্বোধ্য লাগছে।

তবে এইটুকু ভেবে খুশী হল যে, মেয়েটির নাম জানা গেল।

পরদিন বেলা আটটা।

আহমদ মুসা নাস্তা সেরে বসে মেইলিগুলির পাঠানো একটা আন্তর্জাতিক ম্যাগাজিনে নজর বুলাচ্ছে।

এই সময় মেইলিগুলি এসে ঘরে ঢুকল।

একটা হালকা নীল রংয়ের উইঘুর পোশাক পরেছে সে আজ। মাথায় নীল রুমাল।

আহমদ মুসা ম্যাগাজিনটা বন্ধ করল, কিন্তু মুখ তুলল না।

মেইলিগুলি বলল, কোন অসুবিধা নেই তো?

-না ভাল আছি। বলল আহমদ মুসা।

মেইলিগুলি কাপড়ের ভেতর থেকে একটা রিভলবার বের করে আহমদ মুসার সামনে রেখে বলল, রিভলবার সমেতই পরিচারিকা আপনার জামা নিয়ে গিয়েছিল। কাল রাতেই পেয়েছি, কিন্তু ফেরৎ দিতে ভুলে গেছি।

চুপ করল মেইলিগুলি।

আহমদ মুসা কৌতুহল আর চেপে রাখতে পারল না। বলল, মিস মেইলিগুলি, জেনারেল বোরিসের কাফেলায় আপনার সাথে আমার দেখা হয়েছিল। গাড়িতে আপনাকে চিনতে পারিনি, কিন্তু বাড়িতে এসে চিনতে পেরেছি।

-আমি আপনাকে গাড়িতে তুলে নেবার আগেই চিনেছি।

-কিন্তু মিস মেইলিগুলি, আপনি তো কাল থেকে একবারও জিজ্ঞেস করলেন না, আমি আহত হলাম কোথায়, আমার গুলি লাগল কিভাবে, কেন এমন হল? আপনার এই অস্বাভাবিক নিরবতা আমাকে বিস্মিত করেছে।

-আমি সব বুঝেছি।

-কি বুঝেছেন?

-আপনি জেনারেল বোরিসের কারাগার থেকে পালিয়েছেন।

-হ্যাঁ, এটা বুঝা স্বাভাবিক। আপনি আমাকে ওর হাতে বন্দী দেখেছিলেন।

একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর বলল, রাতে দরজা না খোলার জন্যে আপনার যে সাবধানতা, সেটা কি জেনারেল বোরিসের আশংকা থেকেই?

-আমি তেমন আশংকা করি না, ওটা আমার বাড়তি সাবধানতা।

আহমদ মুসা আর কোন কথা বলল না। তার মনের প্রশ্ন শেষ হয়নি, মন তার পরিষ্কার হয়নি, কিন্তু কি প্রশ্ন করবে তা খুঁজে পাচ্ছে না সে।

কিছুক্ষন পর মেইলিগুলিই মুখ খুলল। বলল, আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না?

মেইলিগুলির মুখে হাসি।

মেইলিগুলির দুষ্টুমিভরা কথার টোনে আহমদ মুসা মুখ তুলল। তার হাসিতে তার চোখে একটা দুষ্টুমি দেখতে পেল।

আহমদ মুসা নিরবে আবার চোখ নামিয়ে নিল। কোন উত্তর দিল না।

মেইলিগুলি বলল, জানেন, আমি আপনাকে জানি।

চমকে মুখ তুলল আহমদ মুসা। বলল, কি জানেন?

-আপনি এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী। আপনি আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা মুখ তুলল না। কিছুক্ষন কোন কথা বলতে পারল না।

মেইলিগুলি নিরব। এক দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে আহমদ মুসার দিকে।

কিছুক্ষণ পর আহমদ মুসা মুখ খুলল। ধীর কণ্ঠে বলল, এ কথা কি জেনারেল বোরিস আপনাকে বলেছে?

-না, তার কাছ থেকে আপনার নামও শুনিনি।

-তাহলে জানলেন কি করে?

বিস্ময়ে চোখ তুলে তাকাল মেইলিগুলির দিকে। দেখল, তার চোখে মুখে এখনও সেই দুষ্টুমি। ঠোঁটে সেই হালকা হাসি।

মেইলিগুলি বলল, আরেকটা শুভ খবর আছে আপনার জন্যে।

-কি খবর?

-হাসান তারিক এসেছে।

মেইলিগুলির এই খবর আহমদ মুসার মনে বিস্ময় ও আবেগের তরঙ্গ নিয়ে এল। সবচেয়ে ঘনিষ্ঠতম সাথী হাসান তারিক এসেছে তার খোঁজে? আবেগ অশ্রুরূপ নিয়ে তার চোখের কোণ ভারি করে তুলল।

আহমেদ মুসা মেইলিগুলির দিকে চেয়ে বলল, জানি সে না এসে পারে না। কিন্তু আপনি তাকে জানলেন কি করে? কোথায় দেখা হল?

মেইলিগুলি আহমেদ মুসাকে তার সাথে হাসান তারিকের দেখা হওয়ার ঘটনা বলল।

সব শুনে আহমেদ মুসা জিজ্ঞেস করল, তাকে কোথায় পাওয়া যাবে জানেন?

-না, সে আর যোগাযোগ করেনি। বলল মেইলিগুলি।

আহমদ মুসা ও মেইলিগুলি দু'জনেই নীরব।

একটা প্রশ্ন এখন আহমদ মুসার মনে কিলবিল করছে, সেটা হলো এই মেয়েটি কে? কি পরিচয় তার?

প্রশ্নটা সে করেই বসল। বলল, কিছু মনে করবেন না, আপনার পরিচয় জানতে পারি?

মেইলিগুলি হাসল। বলল, আমার পরিচয় শুনলে আপনি দুঃখ পাবেন। পেশায় আমি চিত্রাভিনেত্রী, রাজনৈতিক পরিচয় যুব কম্যুনিস্ট পার্টির একজন

কর্মী। আর পরিচয়ের যে টুকু বাকি থাকল, দাদি কিছুক্ষণ পরে আসবেন ওঁর কাছে তা জেনে নেবেন।

বলে মেইলিগুলি উঠে দাঁড়াল। বলল, চলি। অফিসে যেতে হবে। ভুলবেন না, আপনার ঔষধ খাওয়ার সময় কিন্তু বেলা একটা।

মেইলিগুলি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আহমেদ মুসার চোখ দু'টি তার চলার পথের দিকে একবার না তাকিয়ে পারল না। কি অদ্ভূত মেয়েটি। সে আবার অভিনেত্রী, যুব কম্যুনিস্ট কর্মী! কিন্তু এগুলোর কোন ছাপ তো তার চোখে-মুখে, আচার-আচরণে নেই?

কয়েকদিন পরের ঘটনা।

মেইলিগুলিকে মাঝখানে হঠাৎ দু'দিনের জন্য উরুমচি থেকে আশি মাইল দূরে তিয়েনশানের লেক হেভেনে যেতে হয়েছিল। আহমদ মুসা ঘুমিয়ে থাকায় তাকে বলে যাওয়া হয়নি।

লেক হেভেন থেকে ফিরে কাপড়-চোপড় ছেড়েই মেইলিগুলি আহমেদ মুসার রুমে আসল।

আহমেদ মুসা চোখ বুঝে শুয়েছিল। চোখ একটু ধরে আসছে তার। কিন্তু মেইলিগুলির পায়ের শব্দে তার ঘুমটা ছুটে গেল। কিন্তু চোখ খুলল না সে।

এ্যাটেনড্যান্ট মা-চু বাইরে দরজার সামনে বসে ছিল।

মেইলিগুলি ঘরে ঢুকে প্রথমে টেবিলের কাছে গেল। ঔষধের চার্টের সাথে ঔষধগুলো মিলিয়ে নিল। ক্যাপসুলগুলোও গুনে দেখল সে। হিসেবে একটা ক্যাপসুল বেশী হয়।

মেইলিগুলি ফিরে দাঁড়িয়ে মা-চুকে বলল, একটা ক্যাপসুল বেশী কেন?

নিশ্চয় একবার ঔষধ খাওয়ানো হয়নি?

মা-চু মুখ নিচু করেছিল।

অবস্থা দেখে আহমদ মুসাকেই মুখ খুলতে হল। বলল, ওর কোন দোষ নেই। গত রাত একটায় ঠিকই সে ডেকে দিয়েছিল। উঠেছিলামও। কিন্তু বাথরুম থেকে এসে ঔষধ না খেয়েই আবার ঘুমিয়ে পড়েছি।

মেইলিগুলি হাসল। বলল, যারা অন্যের ব্যাপারে বেশী চিন্তা করে, তারা নিজেদের ব্যাপারে বেশী বেখেয়াল হয়।

কথা শেষ করেই মেইলিগুলি মা-চুর দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি দেয়াল থেকে ওদু'টো ফটো নামিয়ে দাও।

মা-চু এসে দেয়াল থেকে কার্ল মার্কস এবং কম্যুনিস্ট পার্টির মেনিফেষ্টো নামাতে গেল।

আহমদ মুসা বলল, ওগুলো নামিয়ে ফেলছেন কেন?

মেইলিগুলি আহমদ মুসার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। আহমদ মুসার চোখে চোখ রাখল। বলল, আমি আপনাকে অনুরোধ করেছি, আমাকে 'আপনি' না বলার জন্যে।

আহমেদ মুসা তার চোখ নামিয়ে নিল। বলল, ভুলে গিয়েছিলাম, ঠিক আছে।

মেইলিগুলি বলল, ওগুলি নামাচ্ছি দাদির হুকুমে। দাদি বলে দিয়েছেন, ওগুলো যেন আমি আমার ঘরে টাঙিয়ে রাখি, এখানে নয়।

-দাদির ওপর রাগ হয়েছে বুঝি?

-না, আমি তাঁর আদেশ পালন করছি।

-না, ওগুলো নামাবার প্রয়োজন নেই। ওগুলো নামানোর কারণ যদি আমি হই, তাহলে বলছি, নিছক বাইরের পরিবর্তন আমার কাছে কোন বিষয়ই নয়।

-না আপনি কারণ নন। দাদি একটা সুযোগ গ্রহণ করেছেন মাত্র। দাদি এ দু'টো ফটো বাড়ির কোথাও টাঙাতে দেয়নি। শেষ পর্যন্ত তাঁর আওতার বাইরে এই মেহমান খানায় এনে টাঙিয়ে রেখেছিলাম।

-এখন যে এ দু'টো তোমার ঘরেই উনি টাঙাতে বলছেন?

মেইলিগুলির মুখে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল। বলল, আপনার তুলনায় বিন্দুমাত্র গুরুত্বও দাদির কাছে আমার এখন নেই। মনে হচ্ছে, দাদিকে আপনি জয় করে নিয়েছেন।

আহমদ মুসার মুখ নিচু। হাতের ম্যাগাজিনটা নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, না মেইলিগুলি, তোমার দাদিই আমাকে জয় করে নিয়েছেন। তোমার

দাদির মধ্যে আমি গোটা সিংকিয়াংকে দেখতে পেয়েছি। তিয়েনশানের মাথার বরফের মতই এই অঞ্চলের সব মুসলমানের বেদনা ও বঞ্চনার অশ্রু ওঁর হৃদয়ে জমাট বেধে আছে। একটা অক্ষম প্রতিবাদের ঝড় বইছে তাঁর হৃদয়ে নিরন্তর।

বলতে বলতে আহমদ মুসার কণ্ঠ ভারি হয়ে উঠেছিল অপ্রতিরোধ্য এক আবেগে।

মেইলিগুলি মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা কথা শেষ করে থামল।

মা-চু ফটো দু'টি নামিয়ে রেখে বাইরে গেছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলছিল মেইলিগুলি। সে টেবিলের পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ল। সে আহমদ মুসার মুখের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে মাথা নিচু করেছে। ভাবছে সে।

দু'জনেই নীরব।

নীরবতা ভাঙল মেইলিগুলিই। বলল, আমার দাদিকে আমি চিনি, এ ভাবে এতটা চেনার দৃষ্টি আমার নেই। কিন্তু আপনার তিনটি বাক্য সিংকিয়াং এর নতুন রূপ আমার সামনে তুলে ধরেছে। আমার প্রশ্ন, কম্যুনিজম ও মুসলিম স্বার্থ কি এক সাথে চলতেই পারে না?

আহমদ মুসা বলল, দেখ দু'টার দুই জীবন দৃষ্টি। এক সাথে চলতে পারে কি করে? কম্যুনিজমে জীবন এখানেই শেষ, তাই ভোগবাদ তাদের ধর্ম। এ ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের সাথে তার কোনই পার্থক্য নেই। কিন্তু ইসলামে এই জীবন এটা অসীম জীবনের প্রস্তুতি মাত্র, তাই ভোগের চেয়ে অন্যের জন্যে ত্যাগের শিক্ষা বড়। শান্তিময় ও সুশৃঙ্খল দুনিয়ার জন্য মানুষের ত্যাগের প্রবলতার চেয়ে মূল্যবান আর কিছু নেই। কম্যুনিজমের মাথার ওপর জওয়াবদিহী করার কোন অথরিটি বা আল্লাহ্ নেই, তাই কম্যুনিষ্টরা স্বেচ্ছাচারি হতে পারে। তারা তাদের ইচ্ছামত আইন করে, আবার ভাঙে। কিন্তু ইসলামের সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক মানুষ নয়। আল্লাহ্র কাছে প্রতিটি কাজের জন্য তাকে জওয়াবদিহী করতে হয়। তাই মানুষের স্বেচ্ছাচারি হবার অবকাশ এখানে নেই। ফলে 'মানুষ প্রভুদের' জুলুম অত্যাচার

থেকে মানুষ এখানে রক্ষা পায়। সর্বোপরি, কম্যুনিজমের আল্লাহ্ নেই বলে, পরকাল নেই বলে জীবনটাই সেখানে অর্থহীন, অসহনীয়।

কিন্তু ইসলামে আল্লাহ্ আছে ও পরকালে এক অসীম জীবন আছে বলে জীবন এখানে মূল্যবান, আনন্দময় ও তাৎপর্যপূর্ণ।

মেইলিগুলি গোগ্রাসে কথাগুলো যেন গিলছিল।

আহমদ মুসা থামলেও সে কিছুক্ষণ কথা বলল না। পরে ধীরে ধীরে বলল, আপনি ইসলামের যে রূপ তুলে ধরলেন, তা তো একটা নীতিকথা । বাস্তবে তো পুঁজিবাদের জয়জয়কার চলছে।

আহমদ মুসা হাসল একটু। বলল, নীতিই তো প্রয়োজন। যদি নীতি ঠিক থাকে তাহলে আজ না হলে কাল তার প্রয়োগ হবেই। তুমি পুঁজিবাদের যে জয়জয়কারের কথা বলছ, আসলে ওটার নাম স্বেচ্ছাচারিতা। এই স্বেচ্ছাচারিতার প্রকাশ ঘটে কোথাও পুঁজিবাদের নামে কোথাও কম্যুনিজমের নামে। অপরাধের নাম ঐ একটাই। মুসলিম বিশ্বেও তুমি এ অপরাধ দেখ কারণ সেখানে ইসলাম স্বাধীন নয়। মুসলিম দেশগুলি ঔপনিবেশিক শক্তির কবল থেকে মুক্ত হয়েছে কিন্তু ইসলাম সেখানে স্বাধীন হতে পারেনি। বিজাতীয় ঔপনিবেশিকদের গড়া ‘মুসলিম’ নামের লোকদের হাতে ইসলাম সেখানে বন্দী। ইসলামকে ওদের হাত থেকে মুক্ত করাই আমাদের সংগ্রাম। তুমি যাকে নীতি বলছ, মুক্ত ইসলামে সেটাই বাস্তবতা। আহমেদ মুসা থামল।

মেইলিগুলি বলল, বুঝলাম আপনার কথা। কিন্তু যে সংগ্রামের কথা বললেন তা পর্বতের চেয়েও তো ভারি।

আহমদ মুসার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল। বলল, ভারি বলেই আনন্দ এখানে বেশী, পুরুস্কারও অপরিসীম।

-সফল হলে তবেই তো?

-না পুরুস্কারের জন্যে সাফল্য শর্ত নয়। দেখ, গুলি আমার পায়ে লেগেছিল, বুকে লাগলেই মারা যেতাম। তাহলে আমার জীবন কি ব্যর্থ হতো? না। আমার আল্লাহ্ দেখবেন তার দেয়া জ্ঞান ও যোগ্যতাকে আমি তাঁর কাজে অর্থাৎ

তাঁর বান্দাহদের কল্যাণে ব্যবহার করেছি কিনা। যদি করে থাকি তাহলেই আমি সফল, অসীম এক পুরুস্কারের মালিক হব আমি।

আহমদ মুসা থামলেও মেইলিগুলি কিছু বলল না। মাথা নীচু করে ছিল সে। রুমালটা মাথা থেকে কিছুটা নেমে গেছে। কয়েকটা চুল উড়ে এসে পড়েছে কপালের ওপর। রুমালের একটা প্রান্ত নিয়ে খেলা করছিল তাঁর দু'টো আঙুল।

অবশেষে মুখ তুলল মেইলিগুলি। আহমেদ মুসার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে নিয়ে বলল, দাদি তো আমার প্রফেশনকে ঘৃণা করেন, আপনার মত কি?

-তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার মেইলিগুলি, আমার মন্তব্য করা ঠিক হবেনা।

-আপনি ঠিক বলছেন না।

-কেন?

-নীতির প্রশ্নে কোন নিউট্রালিটি থাকতে পারে না।

-ঠিক বলেছ।

-তাহলে উত্তর দিন।

-তোমার মতটা কি শুনি?

-আমার মত তো আছেই, আমি আপনার মত জানতে চাই।

-মেইলিগুলি, আমি আমার নিজের জন্য এ প্রফেশন পছন্দ করতাম না।

-কেন?

-নীতিগতসহ অনেক কারণ আছে। কিন্তু সেদিকে না গিয়ে একটা কথাই তোমাকে বলব। সেটা হল, এতে পার্সোনাল লাইফের ক্ষতি হয়।

-পার্সোনাল লাইফকে একদম পবিত্র রেখে কেউ যদি এটা করতে পারে?

-নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে পবিত্র রাখার প্রশ্ন শুধু তো নয় মেইলিগুলি, অন্যের মন ও মননকে পবিত্র রাখার প্রশ্নও আছে।

আহমেদ মুসার শেষ কথাটার পর মেইলিগুলি তার চোখ নামিয়ে নিয়েছে। তার নীল চোখ ও শুভ্র মুখের ওপর দিয়ে একটা সলজ্জ রক্তিম চাঞ্চল্য ভেসে উঠেই আবার মিলিয়ে গেল। এ সময় দাদি ধীরে ধীরে প্রবেশ করল ঘরে।

মেইলিগুলির দিকে চোখ পড়তেই বলল, তোকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না, তুই এখানে? ভাল। আল্লাহ্ তোকে সুমতি দিক। তোর অফিস-টফিসের চেয়ে এখানে বসে থাকা হাজারগুণ ভাল।

তারপর দেয়ালের দিকে চেয়ে বলল, ওদু'টো তাহলে নামিয়েছিস, বেশ করেছিস, আর টাঙাস না কোথাও।

মেইলিগুলি চেয়ার থেকে উঠে দাদির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, তুমি না ওদু'টো আমার ঘরে টাঙাতে বলেছ?

-ওটা বলা নয়। তুই আমার এ ভাই কে জিজ্ঞেস কর, অনুমতি দিলে টাঙাবি।

-উনি তো অনুমতি দিবেন। এখান থেকে নামাতে উনি নিষেধ করেছিলেন। তোমার মত সবাই নন।

-চুপ, কথা বলবিনা। তুই আমার এ ভাইটিকে জানিস? এ বাড়ি আজ ধন্য। মাঝে মাঝে ভাবি স্বপ্ন দেখছি কিনা, স্বপ্ন না আবার ভেঙ্গে যায়। তোর পূর্ব পুরুষ পূণ্যাত্মা ইবনে সাদ এবং আব্দুল করিম সাতুক বোগরা খানদের দোয়ার ফলেই একে আমরা পেয়েছি। তোরা তো সব গোল্লায় গেছিস।

-কিন্তু দাদি, আমিই তো ওঁকে এনেছি। না হলে পেতে?

-বেশ করেছিস, এবার ভাল হ।

-আমি কি খারাপ?

-খারাপ নয়, কিন্তু নামায তুই চিনিস? আর কাজটা করছিস কি?

বলেই দাদি আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, ভাই, তুমি আমার এ দুষ্টু বোনটিকে একটু নামায পড়তে বলে দাও। আমি বললে শুনে না। তুমি বললে শুনবে।

আহমদ মুসা মুখ নিচু করে একটা বই নাড়াচাড়া করছিল আর দাদি-নাতনির মধুর কথা কাটাকাটি শুনছিল। দাদির কথায় মুখ তুলল আহমদ মুসা। দাদি এবং মেইলিগুলি দু'জনেই তার দিকে তাকিয়ে।

দাদির দিকে চেয়ে আহমদ মুসা একটু হেসে বলল, আপনার নাতনি এখন থেকে নামায পড়বেন দাদি।

কথা শেষ করার আগেই আহমদ মুসা তার চোখ নামিয়ে নিয়েছিল।

মেইলিগুলির আরক্ত মুখের বিস্ময় দৃষ্টি আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা কথা শেষ করতেই দাদি তার হাত তুলে মেইলিগুলির মুখটা নিজের দিকে টেনে নিয়ে বলল, শুনলিতো, এবার তোর মুখে বলতো শুনি?

'বলব না' বলে মেইলিগুলি ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

# ৬

উরুমচির প্রাণকেন্দ্রে একটা তিনতলা ভবনের ভূ-গর্ভস্থ কক্ষ। সময় তখন সকাল। কক্ষের একপাশে চেয়ারে বসে আছে হাসান তারিক, আব্দুল্লায়েভ এবং আহমদ ইয়াং। কক্ষের মাঝখানে একটা লোহার চেয়ারে বসে আছে ফেংফ্যাস-'ফ্র' এর উরুমচি জোনের প্রধান। তার হাত দু'টি চেয়ারের সাথে বাঁধা। কক্ষে পায়চারি করছে ইউসুফ চিয়াং। ইউসুফ চিয়াং সিংকিয়াং 'এম্পায়ার গ্রুপ' এর প্রধান।

ফেংফ্যাস গতরাতে ধরা পড়েছে এম্পায়ার গ্রুপের হাতে। মেইলিগুলির অফিস থেকে হাসান তারিক ফিরে আসার পর এম্পায়ার গ্রুপ গত কয়েক দিনে হন্যে হয়ে ঘুরছে জেনারেল বোরিসের সন্ধানে।

হাসান তারিক মেইলিগুলির কাছ থেকে হোটেল সিংকিয়াং-এ জেনারেল বোরিস অর্থাৎ আলেকজান্ডার বোরিসভের একটা স্যুটের সন্ধান পেয়েছিল। এ ছাড়া মেইলিগুলি উরুমচির নাগরিক রেজিষ্ট্রেশন অফিসেও জেনারেল বোরিসের ঠিকানার খোঁজ করতে বলেছিল।

হাসান তারিক মেইলিগুলির অফিস থেকে ফিরে আসার পরদিনই ইউসুফ চিয়াং এবং আহমাদ ইয়াং ছুটে গিয়েছিল হোটেল সিংকিয়াং এর উদ্দেশ্যে। কিন্তু আলেকজান্ডার বোরিসভের নামে কোন রিজার্ভ স্যুট পায়নি। এরপর তারা রিজার্ভেশন ইনডেক্স ফাইল থেকে গত পনের দিনের গেষ্ট চার্ট বের করে নেয়। তালিকায় পেয়ে যায় আলেকজান্ডার বোরিসভের নাম। মাত্র দুই দিনের জন্য রুম রিজার্ভ করেছিল। ফাইল ইনডেক্স থেকে জেনারেল বোরিসের লোকাল এড্রেস নিয়ে হতাশ হল ইউসুফ চিয়াং। এটা পুরানো এড্রেস। এখান থেকে সে আগেই পালিয়েছে। হাসান তারিকরা উরুমচি পৌছার পরদিনই এই ঠিকানায় তারা জেনারেল বোরিসের সন্ধানে যায়। কিন্তু পায়নি। কাশগড় থেকে লাল সংকেত পেয়েই সম্ভবত সে এ ঠিকানা হতে পালিয়ে যায়।

হোটেল সিংকিয়াং থেকে হতাশ হয়ে ফিরে এসেছিল ইউসুফ চিয়াংরা।

এর পরদিন তারা যায় উরুমচির নাগরিক রেজিষ্ট্রেশন অফিসে।

বিরাট অফিস। ইউসুফ চিয়াং খোজ-খবর নিয়ে জানল, নাগরিক রেজিষ্ট্রারটি এবং সংশ্লিষ্ট ফাইল অফিসের বড় কর্তার সেফ কাষ্টোডিতে থাকে। ওখানে পৌছা দুরুহ ব্যাপার।

ইউসুফ এ ব্যাপারটা নিয়ে নাগরিক রেজিষ্ট্রেশন অফিসের 'এম্পায়ার গ্রুপ' ইউনিটের সাথে আলোচনা করে। তারা আশ্বাস দেয় যে, তারাই এটা হাত করতে পারবে। না পারলে পরে অন্য ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা যাবে।

ওরা গতকাল জেনারেল বোরিস অর্থাৎ আলেকজান্ডার বোরিসভের নাগরিক রেজিষ্ট্রেশন দরখাস্তের ফটোকপি ইউসুফ চিয়াংকে পৌছে দিয়ে গেছে।

নাগরিক রেজিষ্ট্রেশন দরখাস্তেও জেনারেল বোরিসের সেই পুরানো ঠিকানাটাই দেয়া। তবে এক্ষেত্রে তারা হতাশ হলেও দরখাস্তের সাক্ষী হিসেবে ফেংফ্যাস এর নাম এবং তার ঠিকানা তারা পেয়ে যায়। ঠিকানা পাওয়ার পর গত রাতেই তারা ঐ ঠিকানায় ছুটে যায়। ঠিকানাটা ছিল ফেং এর বাড়ির। বাড়িতে গিয়ে ফেংকে পেয়ে যায়। ধরে এনে এম্পায়ার গ্রুপের এই ঘাঁটিতে তাকে তোলা হয়েছে।

ইউসুফ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

গত আধা ঘন্টার জিজ্ঞাসাবাদে তার কাছ থেকে কিছুই আদায় করা যায়নি।

ইউসুফ চিয়াং বলল, তাহলে তুমি বলতে চাও কিছুই জান না তুমি? তোমাকে উরুমচির প্রধান বানিয়েছে ঘোড়ার ঘাস কাটার জন্যে?

-বিশ্বাস করুন, আসলেই আমাদের কোন কাজ নেই।

-মিথ্যা কথা।

-বিশ্বাস করুন, মিথ্যা নয়। আগে আমাদের অর্থ আসত মস্কো থেকে। এখন মস্কোতে 'ফ্র' বিরোধী গনতান্ত্রিক সরকারের প্রতিষ্ঠা হবার পর আমাদের অর্থের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে। এখানকার 'রেড ড্রাগন' গ্রুপের কাছ থেকে

ধার করে এখন আমরা চলছি। এরকম চললে দু'এক মাসের মধ্যে আমাদের অফিসও ছেড়ে দিতে হবে।

-কেন, জেনারেল বোরিসের কাছে তো অনেক টাকা। সে তো বিরাট কাফেলা নিয়ে এসেছে।

-বিশ্বাস করুন, জেনারেল বোরিস কোন টাকা নিয়ে আসেনি। কিছু সোনা নিয়ে এসেছে। কিন্তু চীনে ওগুলোর কোন বাজার নেই। ঐরকম তাল তাল সোনা বিক্রি করতে গেলেই সে ধরা পরবে। কালো বাজারই একমাত্র ভরসা। কিন্তু এজন্য সময় লাগবে।

-তুমি তো অনেক কিছু জান, জেনারেল বোরিসের সন্ধান জান না এটা মিথ্যা কথা।

-বিশ্বাস করুন, আমি মিথ্যা বলছি না। নাগরিক রেজিস্ট্রেশন অফিসে নিয়ে যাবার দিন ঐ একবারই তাকে দেখেছি। আর...

-থামলে কেন?

-ও কিছু নয়।

-শোন ফেংফ্যাস, আমাদের বোকা সাজিয়ো না। তুমি সব জান, আমাদের কাছে মিথ্যা বলছ।

কঠোর কন্ঠে বলল ইউসুফ চিয়াং।

আসলে ফেংফ্যাস লোকটা ভীতু। ইউসুফ চিয়াং- এর এ ধমকে সে ফ্যাল ফ্যাল করে তার দিকে চেয়ে রইল।

আহমদ ইয়াং বলল, ইউসুফ ভাই, ও ধাড়ি ইঁদুর। ও সহজে মুখ খুলবে না। শুধু শুধু আমাদের সময় নষ্ট করছে সে। ওকে ছাদে টাঙান। ইউসুফ চিয়াং বলল, শুনলে তো ফ্যাং। আমাকে তুমি বাধ্য করো না। জানি তোমার ছেলে আছে, স্ত্রী আছে......

ফেংফ্যাস এবার হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল। বলল, আমাকে আপনারা বিশ্বাস করুন, আমি বেশি কিছু জানি না। সম্প্রতি 'রেড ড্রাগন' গ্রুপের কাছ থেকে জেনারেল বোরিস নতুন একটা বাড়ি কিনেছে। ঐ বাড়িতে শুধু একবার আমি গেছি।

-বেশ তো একবার গেলেই চলবে। বল সে ঠিকানা।

বলে ইউসুফ চিয়াং এক টুকরো কাগজ এবং একটি কলম এগিয়ে দিল তার দিকে। ফেংফ্যাস সুবোধ বালকের মত ঠিকানা লিখে দিল।

ঠিকানার উপর চোখ বুলাতে বুলাতে ইউসুফ চিয়াং বলল, দেখ, ঠিকানায় যদি কিছু না পাই, তাহলে বুঝতেই পারছ।

বলে ইউসুফ চিয়াং কাগজের টুকরাটা পকেটে রেখে হাসান তারিকের দিকে চাইল।

হাসান তারিক বলল, দেরী নয়, এখনি আমারা যাব।

এই সময়ে ফেংফ্যাস তার মুখটা ঘুরিয়ে ইউসুফ চিয়াং এর দিকে চেয়ে বলল, ও বাড়ির পশ্চিম পাশে পাঁচিলের সাথে লাগানো একটা পায়খানা আছে। আসলে ওটা পায়খানা নয়। ঐ বাড়িতে আসা-যাওয়ার ভূগর্ভস্থ পথের ওটা গোপন দরজা।

ইউসুফ চিয়াং ফেংফ্যাস এর পিঠ চাপড়ে তাকে ধন্যবাদ জানাল।

ভূগর্ভস্থ কক্ষ থেকে সবাই বেরিয়ে এল। ইউসুফ চিয়াং কক্ষের দরজায় তালা লাগিয়ে সবার পিছে পিছে ওপরে উঠে এল।

হাসান তারিক, আব্দুল্লায়েভ, ইউসুফ চিয়াং এবং আহমদ ইয়াং যখন জেনারেল বোরিসের সন্ধানে ঐ ঠিকানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করল তখন সকাল সাতটা।

হাসান তারিক বলল, জেনারেল বোরিসের ঘাটিতে হানা দেবার এটাই উপযুক্ত সময়। ওরা সাধারণত সারারাত জেগে এই সময়টায় বিছানায় পড়ে থাকে।

-আল্লাহ ভরসা, দোয়া করুন আমাদের উদ্দেশ্য আল্লাহ যেন সফল করেন। বলল ইউসুফ চিয়াং।

-মুসা ভাইকে তো ওরা ওখানে নাও রাখতে পারে? বলল আব্দুল্লায়েভ।

-হ্যা তা হতে পারে। আমরা জেনারেল বোরিসকে পেলে মুসা ভাইকেও পেয়ে যাব।

পনের মিনিটের মধ্যেই ওরা এলাকায় পৌছে গেল। ইউসুফ চিয়াং ও আহমদ ইয়াং গাড়ি থেকে নেমে দেখতে গেল।

কিছুক্ষন পর ওরা ফিরে এসে বলল, বাড়িটা আমরা দেখে এসেছি। গাড়ি আর যাবে না, এখানেই রেখে যেতে হবে।

গাড়ি থেকে নেমে ওরা ইট বিছানো সরু গলি পথ ধরে প্রায় শ'তিনেক গজ এগিয়ে যাবার পর একটা ফাঁকা উঠানের মুখোমুখি হলো। ছোট উঠানটা পেরুলেই দু'তলা বিরাট বাড়ি। সামনেই বিরাট দরজাওয়ালা ঘর। বুঝাই যায় ওটা গেট রুম। সামনে প্রাচীর নেই, কিন্তু বাড়ির পেছনটা প্রাচীর ঘেরা। দু'দিক থেকে প্রাচীর এসে ঐ গেট রুমে মিশেছে।

গেট রুমের দরজাটা বন্ধ। হাসান তারিকরা অনেকক্ষণ দাঁড়াল। কিন্তু কোন সাড়া শব্দ নেই।

হাসান তারিক ইউসুফ চিয়াং এর দিকে চেয়ে বলল, আমরা সামনে দিয়েই ঢুকব, কিন্তু একজন পশ্চিম দিকে পাঁচিলের পেছনে যাওয়া দরকার।

ইউসুফ চিয়াং আহমদ ইয়াং এর দিকে চেয়ে বলল, তুমি যাও।

হাসান তারিক বলল, সামনে দিয়ে নয়, এই রাস্তা হয়ে দক্ষিন দিকটা ঘুরে পাচিলের পেছনে গিয়ে দাঁড়াবে যেখানে দরজা পাবে সেইখানে। আমরা না ডাকা পর্যন্ত সরবে না। তোমার দায়িত্ব হবে ঐ পথে কাউকে পালাতে না দেয়া।

আহমদ ইয়াং চলে যাবার পর ঘড়ি ধরে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করার পর হাসান তারিক বলল, আমরা যেতে পারি এবার।

বলে হাসান তারিক আগে আগে চলল। তার পেছনে আবদুল্লায়েভ এবং ইউসুফ চিয়াং। তাদের সকলের হাত জ্যাকেটের পকেটে রিভলবারের ওপর রাখা।

হাসান তারিক দরজার সামনে মুহুর্তকাল দাড়াল। তারপর বাম হাতে দরজায় পর পর তিনবার টোকা দিল। কোন সাড়া নেই। আবার টোকা দিল হাসান তারিক। না কোন সাড়া নেই।

পকেট থেকে ডান হাতে রিভলবার বের করে নিয়ে বাম হাতে দরজায় চাপ দিল। একটু চাপ দিতেই দরজা ফাঁক হয়ে গেল একটু।

দরজা খোলা! বিস্মিত হাসান তারিক এবার ঠেলা দিয়ে দরজা খুলে ফেলল। খুলেই তার চক্ষু স্থির হয়ে গেল। রক্তে ভাসছে ঘর। একজন মহিলা ও একজন পুরুষের রক্তাক্ত লাশ মেঝেয় পড়ে আছে।

রিভলবার বাগিয়ে তারা তিনজনই ঘরের ভেতর ঢুকে গেল। গেট লাগিয়ে দিয়ে গেট রুম পার হয়ে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করল। বাড়ির ভেতর আরও আটটি লাশ তারা পেল। সিড়ি দিয়ে ভূগর্ভস্থ করিডোরেও তারা ঢুকল। করিডোরের দু'পাশের রুমগুলো উকি মেরে দেখল। কেউ কোথাও নেই।

অবশেষে করিডোরের পশ্চিম প্রান্তে আরেকটি সিড়ি দিয়ে উঠে পেল দরজা। দরজা খুলে পাচিলের বাইরে গিয়ে হাজির। আহমদ ইয়াং ট্রিগারে চাপ দিয়ে ফেলেছিল আর কি। অন্ধকার থাকলে আর রক্ষা ছিল না।

হাসান তারিক আহমদ ইয়াংসহ সবাইকে আবার ভেতরে প্রবেশ করতে বলল।

ইউসুফ চিয়াং বলল, আর ভেতরে ঢুকে লাভ কি?

হাসান তারিক বলল, না বাড়িটি যেভাবে ছিল, সেভাবেই থাকতে হবে। যাতে কারো সন্দেহ করার অবকাশ না থাকে যে, বাড়িতে কেউ প্রবেশ করেছিল।

গেট রুমের দরজা সেভাবেই ভেজিয়ে দিয়ে হাসান তারিকরা এসে গাড়িতে বসল।

গাড়িতে বসেই ইউসুফ চিয়াং বলল, তারিক ভাই, কি বুঝলেন আপনি? রীতিমত তো যুদ্ধ হয়ে গেছে।

হাসান তারিক চিন্তা করছিল। বলল সে, হ্যাঁ তাই, কিন্তু যা দেখলাম তাতে লোক মরেছে এক পক্ষে। বুঝতে পারছি না দ্বিতীয় পক্ষটি কে? যারা মরেছে তারা জেনারেল বোরিসের পক্ষের, না অন্য কোন পক্ষের।

থামল একটু তারপরেই আবার মুখ খুলল হাসান তারিক। বলল, থাক এসব প্রশ্নের পালা। আমি এখন ভাবছি, এ বাড়িটা আমাদের পাহারা দেয়া দরকার। জেনারেল বোরিসের কেউ না কেউ এ বাড়িতে আসবেই।

ইউসুফ চিয়াং ও আহমদ ইয়াং দু'জনেই এক সাথে বলে উঠল ঠিক বলেছেন।

-সম্ভবত ওরা পুলিশের ঝামেলায় পড়ার ভয়েই পালিয়েছে। লাশ সৎকার করার জন্যে ওরা রাতেই আসবে।

-দিনেও তো আসতে পারে। বলল ইউসুফ চিয়াং।

-তা পারে, কিন্তু আজ আর আসবে বলে মনে করি না। সম্ভবত ওরা প্রতিপক্ষেরও ভয় করছে।

অবশেষে আলোচনায় ঠিক করল সন্ধ্যায় তারা ফিরে আসবে এবং রাতে পাহারা দেবে।

হাসান তারিকরা সন্ধ্যায় ফিরে এল সেই বাড়ির সামনে। সন্ধ্যার অন্ধকার তখনো ভালভাবে নামেনি। বাড়িটির গেট রুমের দিকে তাকিয়ে তাদের চক্ষু চড়কগাছ। ইয়া বড় তালা ঝুলছে গেটে। সবার মনেই এক প্রশ্ন, কখন লাগাল তালা? তাহলে কেউ এসেছিল?

হাসান তারিকের চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। যখন একবার ওরা এসেছে, তখন আবারও আসবে।

অন্ধকার একটু নামলে বাড়িটির উত্তর পাশ ঘেষে যে বড় গাছটি আছে সেখানে গিয়ে ওরা চারজন অবস্থান নিল। ওখান থেকে উঠান এবং গেটের সামনেটা পরিষ্কার দেখা যায়।

তিনরাত তারা ঐখানে বসে পাহারায় কাটিয়ে দিল। না, কেউ আসেনা। সবাই হতাশ হলো। কিন্তু হাসান তারিক নিশ্চিন্ত ওরা আসবেই।

তিন রাত পর হাসান দিনের বেলায়ও পাহারা বসালো। দু'জন দুপুরের পরে। আর রাতে পাহারায় থাকবে সবাই।

সপ্তম দিন বিকেল বেলা পাহারায় ছিল আহমদ ইয়াং এবং আবদুল্লায়েভ। বেলা তিনটার দিকে আহমদ ইয়াং হাঁফাতে হাঁফাতে এসে হাসান তারিককে বলল, বেলা তিনটায় দু'জন বাড়িতে ঢুকেছে। বাড়িতেই তারা আছে।

-তারা চীনা, না রুশ?

-চীনা।

হাসান তারিক এবং ইউসুফ চিয়াং শুয়ে ছিল। দুজনই উঠে বসল। তৈরী হয়ে তারা বেরিয়ে এল আহমদ ইয়াং এর সাথে।

রাত যখন প্রায় বারটা। ইউসুফ চিয়াং হাসান তারিককে বলল, ওরা তো বেরুল না, আমরা তো ঢুকতে পারি।

-না, ইউসুফ, বড় শিকার তো আসেনি। আমি জেনারেল বোরিসের অপেক্ষা করছি। বলল হাসান তারিক।

রাত তখন সাড়ে বারটা হবে। এমন সময় হাসান তারিকরা দেখল। গেট রুম দিয়ে একজন বাইরে বেরুল। তারপর আরেকজন। পরের জন প্রায় তিন ফিট লম্বা একটা বাক্স নিয়ে এল। তারপর ওরা দরজায় তালা লাগিয়ে বাক্সটি নিয়ে চলল উঠান পেরিয়ে।

হাসান তারিক উঠে দাঁড়াল। বলল, আমরা ওদের ফলো করব। নিশ্চয় নতুন ঘাটিতে ওরা যাচ্ছে।

ওরা দু'জন সরু গলি পেরিয়ে বড় রাস্তায় উঠে দাড়িয়ে থাকা বেবী ট্যাক্সিতে উঠে বসল। ওদের বেবী ট্যাক্সি ছেড়ে দিল।

ওদের বেবী ট্যাক্সির পেছনে ছুটে চলল হাসান তারিকদের গাড়ি।

প্রায় পনের মিনিট চলার পর দেংশিয়াং রোডে একটা দু'তলা বাড়ির গেটে গিয়ে গাড়িটা থামল। কাছে-কুলে বাড়ি নেই। আশপাশটা অন্ধকার। হাসান তারিকদের গাড়ি প্রায় দু'শ গজ দুরে হেড লাইট নিভিয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকল।

বেবী ট্যাক্সি দাঁড়ানোর পর লোক দু'টি গাড়ি থেকে বাক্সটি নিয়ে নেমে গেল।

প্রায় মিনিট পনের পর বাড়ির গেট দিয়ে লোক দু'টি বেরিয়ে এল। সবার হাতেই স্টেনগান। পাঁচজন লোক বেবীতে উঠল। আবার বেবীটি ছেড়ে দিল। হাসান তারিক ইউসুফ চিয়াং-এর দিকে চেয়ে বলল, আমার সন্দেহ ঠিক হলে ঐ পাঁচজনের লম্বাজন জেনারেল বোরিস। ওরা কোন অভিযানে যাচ্ছে। চল ওদের পেছনে।

প্রায় বিশ মিনিট সরু আঁকাবাঁকা গলিপথে চলার পর গাড়ি উরুমচির অভিজাত এলাকা গুলিস্তান পৌছল। ইবনে সা'দ রোডের একটা গাছের তলায়

গিয়ে বেবী ট্যাক্সিটি থামল। হাসান তারিকদের গাড়ি হেড লাইট নিভিয়ে আসছিল। বেবী ট্যাক্সিটি দাঁড়ালে তারাও দাঁড়াল।

যে গাছটির নিচে বেবী ট্যাক্সিটি দাঁড়াল, তার গজ পঞ্চাশেক সামনে একটা বিরাট বাড়ি। হাসান তারিক দেখল বেবী ট্যাক্সি থেকে পাঁচজন লোক নেমে ঐ বাড়ির দিকে চলল।

ওরা হাঁটা শুরু করলে হাসান তারিকদের গাড়ি ধীরে ধীরে নিঃশব্দে এসে বেবী ট্যাক্সিটার সামনে দাঁড়াল।

হাসান তারিকরাও গাড়ি থেকে নামল। গাছের অন্ধকারে দাড়িয়ে তারা। ওদের পাঁচজনের একজন তর তর করে টেলিফোনের পিলারে উঠে টেলিফোনের তার কেটে দিতে লাগল। তারপর ওরা পাঁচজনেই পাচিঁল টপকে ভেতরে ঢুকে গেল।

হাসান তারিক গাছের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে বাড়িটার এরিয়া এবং বিল্ডিং এর অবস্থানটা দেখে নিল। তারপর এসে ইউসুফ চিয়াংকে বলল, চল, আমরাও ভেতরে ঢুকব। সে কার কোন সর্বনাশ করতে গেল কে জানে?

ওরা পাঁচজন বাড়ির বড় গেটটির পূর্বদিক দিয়ে পাচিঁল টপকেছিল, আর হাসান তারিকরা গেটের পশ্চিম পাশের অন্ধকার মত জায়গা দিয়ে পাচিল টপকালো।

মেইলিগুলিদের বাসায় দু'তলার সিড়ির মুখেই তাদের ফ্যামিলি বৈঠকখানা। নিচের তলার বৈঠকখানা বাইরের অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে ব্যবহার হয়। আর দু'তলার এ বৈঠকখানা ফ্যামিলি গ্যাদারিং এর জায়গা। এর উত্তর পাশেই দাদির ঘর। তার পরেরটাতেই থাকে মেইলিগুলি। আরও উত্তরে ও পশ্চিমের ঘরগুলোতে থাকে মেইলিগুলির বাবা, মা ও অন্যরা। মেইলিগুলির আব্বা ও ভাইরা থাকে পিকিংএ। ওখানেই তাদের চাকুরী। মেইলিগুলি তার দাদী, মা, ফুফু এবং অন্যদের নিয়ে এ বাড়িতে থাকে। ফ্যামিলি বৈঠকখানার দক্ষিণ

দিকে পারিবারিক অতিথিদের থাকার স্থান। নিচের তলাতেও অতিথিখানা আছে, কিন্তু তা বাইরের লোকদের জন্যে। ফ্যামিলি বৈঠকখানার পশ্চিম দেয়ালে একটা দরজা। ওটা দিয়ে পাকঘর ও স্টোর রুমের দিকে যাওয়া যায়।

ফ্যামিলি বৈঠকখানা কার্পেট ও অত্যন্ত মূল্যবান কাঠের সোফা সেট দিয়ে সাজানো।

বাড়ির প্রধান গেটে একজন বিশ্বস্ত দারোয়ান থাকে। আহমদ মুসাকে নিয়ে আসার পর থেকে মেইলিগুলি নিচের সিড়ির মুখে ওমর ওয়াং চাচাকে পাহারায় রেখেছে।

সেদিন 'জেনারেল বোরিসের তরফ থেকে কোন আশংকা মেইলিগুলি করে কিনা' এ প্রশ্নের মেইলিগুলি 'না' সূচক জবাব দিলেও মেইলিগুলি কিন্তু একদিনের জন্যেও এই আশংকা থেকে মুক্ত হতে পারেনি। আহত আহমদ মুসা সেদিন গাড়িতে ওঠার সময় রক্তমাখা রুমাল ও জামার আস্তিন বাইরে ফেলতে না দেয়া থেকেও সে বুঝেছে জেনারেল বোরিস কতটা ভয়ের বস্তু। তাই মেইলিগুলি রাতে ঘুমাতে পারে না। রাত বারটার পর উঠে সিড়ির মুখে বৈঠকখানা এবং দু'তলার করিডোর দিয়ে পায়চারী করে বেড়ায়।

সেদিন দাদি এটা ধরে ফেলেছে। তুই এই রাত দু'টায় এভাবে পায়চারী করে বেড়াচ্ছিস কেন? এর আগেও একবার পায়ের শব্দ আমি শুনেছি। তুই কি?

মেইলিগুলি উত্তর দিয়েছে, হ্যাঁ দাদি।

তারপর মেইলিগুলি সব কথা দাদিকে খুলে বলেছে। শুনে আশংকায় ও ভয়ে দাদির মুখ শুকিয়ে গেছে, বলেছে, তোর আশংকার কথা মুসাকে বলিসনি কেন?

-না দাদি, উনি অসুস্থ তার নিশ্চিন্ত থাকা দরকার। কয়েক দিন তো গেল। উনি উঠে চলাফেরা করতে পারলে আর ভয় থাকবে না। উনি জেনারেল বোরিসের গোটা একটা বাহিনীকে বুদ্ধি ও শক্তির জোরে পরাজিত করে ওদের বন্দীখানা থেকে বেরিয়ে এসেছেন। সুস্থ হলে উনি একাই যথেষ্ট হন।

দাদি মেইলিগুলির মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছে, বোন, তোর অনেক পূণ্য হবে। তুই আমাকে মাফ করিস। কত খারাপ ভেবেছি তোকে। তুই আমার বংশের গৌরব।

মেইলিগুলি দাদিকে জড়িয়ে ধরে বলেছে, না দাদি, তুমি এমন করে বল না। তুমি দোয়া কর, যাতে উনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে নিরাপদ স্থানে চলে যেতে পারেন।

দাদি মেইলিগুলিকে বুক থেকে সরিয়ে তার মুখ নিজের মুখের কাছে তুলে ধরে বলেছে, তুই তাকে যেতে দিতে পারবি?

মেইলিগুলি চোখ বুজে আবার দাদির কোলে মুখ লুকিয়েছে। কোন উত্তর দেয়নি।

মেইলিগুলি নিত্যদিনের মত সে রাতেও পায়চারি করছিল। রাত তখন দেড়টা।

মেইলিগুলি সর্বদর্শী হলে দেখতে পেত, কি করে তিনটি ছায়ামূর্তি তার দারোয়ান ও ওমর চাচাকে ক্লোরোফরমে ঘুম পাড়িয়ে দোতলার সিঁড়ির দরজার তালা ল্যাসার বীম দিয়ে গলিয়ে ওপরে উঠে আসছে এবং কি করে আরও দু'টি ছায়ামূর্তি বাড়ির পেছনে পানির পাইপ বেয়ে ওপরে উঠে এল।

মেইলিগুলি তখন বৈঠকখানার মুখে দাঁড়িয়ে, সিঁড়ির মুখে পায়ের শব্দ শুনেই সে পেছন ফিরল। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে তিনজন লোক, হাতে স্টেনগান।

বিদ্যুৎ গতিতে মেইলিগুলির পিস্তল ওপরে উঠে এল। ট্রিগারে আঙুল চেপে বসতে যাচ্ছে। এমন সময় পেছন থেকে বিড়ালের মত ছুটে আসা এক ছায়ামূর্তি মেইলিগুলির ডান হাতের উপর রিভলভারের বাট দিয়ে আঘাত করল।

পিস্তল ছিটকে পড়ে গেল মেইলিগুলির হাত থেকে। কিন্তু ক্ষিপ্র বেপরোয়া মেইলিগুলি ছুটে গিয়ে পিস্তল তুলে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। পিছন থেকে আঘাতকারী জেনারেল বোরিসের দিকে নজর যেতেই মেইলিগুলির পিস্তল উঠে এল তাকে লক্ষ্য করে।

কিন্তু তার আগেই জেনারেল বোরিসের সাইলেন্সার লাগানো রিভলভার গুলি বর্ষণ করল। গুলিটি মেইলিগুলির পিস্তলে এসে আঘাত করল। গুলির

আঘাতে মেইলিগুলির শাহাদাত ও বুড়ো আঙুলের মাঝখানের কিছুটা অংশ ছিড়ে গেল। পিস্তলটি তার হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল। মেইলিগুলি দক্ষিণের দরজা দিয়ে আহমদ মুসার রুমের দিকে ছুটতে গিয়েছিল। কিন্তু সিঁড়ির তিনজন লোক তাকে ঘিরে ধরল।

জেনারেল বোরিস এসে মেইলিগুলির ওড়না দিয়ে তার মুখ শক্ত করে বেঁধে ফেলল। তারপর তিনজনের একজনকে লক্ষ্য করে বলল ওয়াংচু, একে সোফার সাথে বেঁধে রাখ।

মেইলিগুলিকে বেঁধে ফেলা হল সোফার সাথে!

জেনারেল বোরিস বলল, সুন্দরী, সেদিনের অপমানের কথা আমি ভুলিনি। আরেক দিন রাতে এসেছিলাম তোমাকে তুলে নিয়ে যেতে। তুমি লেক হেভেনে গিয়েছিলে, পাইনি তোমাকে। কিন্তু বড় শিকারের সন্ধান পেয়ে গিয়েছিলাম। দু'জন ছিলাম বলে সেদিন আহমদ মুসার গায়ে হাত দেইনি। আজ তোমাদের দু'জনকেই যেতে হবে আমার মেহমানখানায়।

বলে একজনকে সিঁড়ির মুখে ও এদিককার জন্যে পাহাড়ায় রেখে অন্য দু'জনকে নিয়ে আহমদ মুসার ঘরের দিকে চলল জেনারেল বোরিস। আরেকজনকে আগেই সে ওখানে পাঠিয়েছিল।

জেনারেল বোরিস চলে যাবার মিনিট খানেক পর হাসান তারিকরা উঠে এল দোতলার সিঁড়ি দিয়ে। আগে হাসান তারিক, পেছনে ওরা তিনজন।

বেড়ালের মত নিঃশব্দে উঠেছে হাসান তারিক। মেইলিগুলি চিৎকার করছিল। কিন্তু শক্ত করে বাঁধা মুখ থেকে অস্পষ্ট গোঙানি ছাড়া আর কিছু বেরুচ্ছিল না। সে প্রাণপণে হাত পা ছুড়ছিল বাঁধন খোলার জন্যে।

এখানে দাঁড়ানো জেনারেল বোরিসের প্রহরী লোকটা মেইলিগুলির ঐ দৃশ্য দেখে কৌতুক করে বলল, এটা শুটিং এর সেট.........

তার কথা শেষ হলো না। দুপ করে একটা শব্দ হলো। গুড়ো হয়ে যাওয়া মাথা নিয়ে লোকটা নিঃশব্দে ঢলে পড়ে গেল মাটিতে।

সিঁড়ির দিকে তাকাতেই মেইলিগুলির চোখ পড়ল হাসান তারিকের ওপর।

হাসান তারিক ছুটে এল মেইলিগুলির কাছে। তাড়াতাড়ি মুখের বাঁধন খুলে দিয়ে বলল, আপনি? আপনার বাড়ি এটা?

প্রশ্নের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে মেইলি কেঁদে উঠল। বলল, আহমদ মুসাকে রক্ষা করুন। যান তাড়াতাড়ি।

-আহমদ মুসা? কোথায় তিনি?

বিস্ময়-আবেগে বিস্ফারিত হয়ে ওঠে হাসান তারিকের চোখ।

মেইলিগুলি মুখ ঘুরিয়ে দক্ষিণ দিক দেখিয়ে বলল, জেনারেল বোরিসরা ওদিকে গেছে। যান তাড়াতাড়ি।

হাসান তারিক দ্রুত আহমদ ইয়াংকে বলল, তুমি একে খুলে দাও। আমরা ওখানে যাচ্ছি।

মেইলিগুলির দাদি, মা, ফুফু তখন প্রায় বাকরুদ্ধ অবস্থায় ওদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

মেইলিগুলি হাসান তারিককে বলল, না আমাকে খুলতে হবে না। যান আপনারা।

ওরা চারজন ছুটে চলে গেল দক্ষিণের দরজা দিয়ে।

মেইলিগুলির দাদি বাকরুদ্ধ হয়ে বসে পড়েছিল মেঝেতে। মা এসে মেইলিগুলিকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল।

মেইলিগুলি বলল, মা শব্দ করোনা। জেনারেল বোরিস সতর্ক হবে।

কিডন্যাপ করতে এসেছে ওরা আহমদ মুসাকে।

ফুফু মেইলিগুলির বাঁধন খুলে দিল। মেইলিগুলির আহত হাত থেকে অবিরাম ঝরে পড়া রক্তে মেঝের সাদা কার্পেট অনেকখানি লাল হয়ে উঠেছে। তখনও রক্ত ঝরছে প্রবলভাবে। ফুফু ওড়না দিয়ে ক্ষতস্থানটি চেপে ধরল।

এই সময় প্রায় একসাথেই স্টেনগানের ব্রাস ফায়ার এবং রিভলভারের শব্দ ভেসে এল।

মেইলিগুলি ডান হাত চেপে ধরে ছুটল ওদিকে। তার পেছনে মা, ফুফু এবং দাদিও।

আহমদ মুসার ঘরের সামনে তিনটি রক্তাক্ত লাশ পড়ে আছে।

আর পড়ে আছে ক্লোরোফরম গ্যাস ট্রান্সমিশনের যন্ত্রপাতি ও নল।

হাসান তারিক নক করল দরজায়।

মেইলিগুলিও তাদের পেছন গিয়ে দাঁড়াল।

দরজার কাছেই মেইলিগুলি এগিয়ে গিয়ে ডাক দিল, মা-চু দরজা খোল!

দরজা খুলে গেল! দরজা খুলে মা-চু এক পাশে সরে দাঁড়াল।

টেবিলে রিভলভার। তার পাশেই পা ঝুলিয়ে খাটে বসে ছিল আহমদ মুসা।

ভেতরে ছুটে গেল হাসান তারিক।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরল গভীর আবেগে। কাঁদছিল হাসান তারিক। আহমদ মুসার দু'চোখও ভিজে উঠেছিল।

হাসান তারিকের পরে এগিয়ে এল আব্দুল্লায়েভ। আহমদ মুসা অনেকক্ষণ বুকে জড়িয়ে ধরে থাকল তাকেও। আব্দুল্লায়েভও কাঁদছিল।

এই মিলন দৃশ্য দেখে কারোরই চোখ শুকনো ছিলনা। সজল চোখ দু'টি নিয়ে মেইলিগুলি অনিমেষ চোখে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে।

রুমালে চোখ মুছে নিয়ে হাসান তারিক, ইউসুফ চিয়াং ও আহমদ ইয়াংকে পরিচয় করিয়ে দিল আহমদ মুসার সাথে।

ওদেরকেও বুকে জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসা।

ওদের দিকে গিয়েই আহমদ মুসার চোখ পড়েছিল মেইলিগুলির উপর। ডান হাতে জড়ানো রক্তে লাল হয়ে যাওয়া ওড়নার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল আহমদ মুসা।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে একটু এগিয়ে এসে বলল, তুমি আহত মেইলিগুলি?

মেইলিগুলি মুখ নিচু করল।

হাসান তারিক বলল, উনিই প্রথম জেনারেল বোরিসকে বাধা দেন। ওকে আহত করে সোফায় কাঠের সাথে বেঁধে রেখে সে আপনার এ রুমে আসে।

আহমদ মুসা মা-চু'র দিকে চেয়ে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, তুমি তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডেকে আন।

আর দাদির দিকে চেয়ে বলল, দাদি ওঁকে শুইয়ে দিন।

হাসান তারিক এ সময় বলল, জেনারেল বোরিসকে ধরতে চেয়েছিলাম, তাই ওকে মারিনি। কিন্তু ওর ডান হাত গুঁড়ো হয়ে গেছে। ঝুলন্ত গুঁড়ো হাত নিয়েই সে দোতলা থেকে লাফ দিয়ে পালিয়েছে। আপনি অনুমতি দিন, আমরা এখনি ওর ঘাঁটিতে হামলা করতে চাই। ওকে সময় দেয়া ঠিক হবে না।

-আমি তো এখন তোমাদের নেতা নই হাসান তারিক।

হাসান তারিক এগিয়ে এসে আহমদ মুসার ডান হাত তুলে নিয়ে তাতে চুমু খেয়ে বলল, আপনি শুধু আমাদের নন, দুনিয়া জোড়া বিপ্লবী সংগঠনের নেতা।

আব্দুল্লায়েভ, ইউসুফ চিয়াং, আহমদ ইয়াং এসে ঐ একইভাবে চুম্বন করল আহমদ মুসার হাত।

-আমি অবসর চেয়েছিলাম হাসান তারিক?

-পরাধীন মুসলমানদের হাহাকার যখন চারদিকে, তখন আল্লাহ আপনাকে অবসর দেবেন কেন মুসা ভাই?

আহমদ মুসা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, যাও হাসান তারিক, সকালেই কিন্তু চলে এস। কিছু শুনতে পারলামনা তোমাদের কাছ থেকে।

হাসান তারিকরা বেরিয়ে গেল।

ওরা বেরিয়ে গেলে মেইলিগুলি বলল এখন রাত দু'টা। কোন প্রকার সাবধান থাকার কি প্রয়োজন আছে?

-না মেইলিগুলি, ওর সাথীরা সবাই নিহত। ওর ডান হাতটা শেষ। ও আপাতত আত্মরক্ষায় ব্যস্ত থাকবে। তাছাড়া হাসান তারিকরা ওর পিছু নিয়েছে।

মেইলিগুলি হাঁটতে শুরু করল তার ঘরের দিকে।

মা-চু আগেই ডাক্তার ডাকতে চলে গিয়েছিল।

আহমদ মুসা মেইলিগুলির চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে ভাবল, কি অদ্ভুত মেয়ে, যন্ত্রণাদগ্ধ গুলিবিদ্ধ হাতের দিকে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই, ভাবছে আহমদ মুসার নিরাপত্তার কথাই!

# ৭

হাসান তারিকরা গাড়ির কাছে এসে দেখল বেবী ট্যাক্সিটি নেই, আর তাদের গাড়ির সামনের চাকা জেনারেল বোরিস গুলি করে নষ্ট করে দিয়ে গেছে। তারা ভেবে পেল না, জেনারেল বোরিস এক হাতে বেবী ট্যাক্সি চালিয়ে নিয়ে গেল কি করে! হাসান তারিক পরিস্কার দেখেছে, রিভলভারের দু'টো গুলি গিয়ে বিদ্ধ হলো তার হাতে। সে যখন উঠে দাঁড়াল, কব্জি থেকে হাতের নিচের অংশটা তখন ঝুলছিল।

হাসান তারিক তাড়াতাড়ি এক্সট্রা চাকাটি গাড়িতে লাগিয়ে নিয়ে ছুটল। তাদের টার্গেট সেই বাড়ি যেখান থেকে ওরা পাঁচজন বেবীতে উঠেছিল।

বাড়িটির কাছাকাছি একটা অন্ধকার জায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে চারজন ওরা গেল সেই বাড়ির দিকে। বাড়ির সামনে গিয়ে দেখল প্রধান ফটকটি খোলা। ছ্যাঁৎ করে উঠল হাসান তারিকের মন। চিড়িয়া কি তাহলে উড়ে গেল! স্টেনগান বাগিয়ে ওরা প্রবেশ করল বাড়ির ভেতরে। এ চারটি স্টেনগান তারা যোগাড় করেছে জেনারেল বোরিসের ঐ চারজনের কাছ থেকে।

সব মিলিয়ে বাড়িতে দশটি ঘর। উপরে পাঁচটি, নিচে পাঁচটি। সবগুলি ঘর খোলা। কাপড়-চোপড় জিনিস পত্রের বিশৃংখল অবস্থা দেখে তারা বুঝল, বাড়ির লোকরা তাড়াহুড়া করে বেরিয়ে গেছে। এমন কি সিগারেটের বাক্স এবং লাইটার পর্যন্ত নেবার সুযোগ পায়নি।

বিছানার তোষকের তল এবং টেবিলের ড্রয়ারগুলো তারা দেখল। কিছু নেই। সব শূন্য। হাসান তারিক জানে জেনারেল বোরিস যেখানে থাকে আট ঘাট বেধেই থাকে। কোন বাহুল্য জিনিস সে রাখে না। হঠাৎ শোবার ঘরের একটা বালিশ উল্টাতে গিয়ে একটা ছোট নোট বই পেয়ে গেল। নোট বইটি বালিশের কভারের মধ্যে লুকানো ছিল। বালিশ তুলতেই সেটা বেরিয়ে পডল। মনে হয়

তাড়াহুড়ার জন্যে নোট বইয়ের মালিক এর কথা ভুলে গেছে। হাসান তারিক নোট বইটা পকেটে রাখল।

বাড়ি থেকে ওরা চারজন বেরিয়ে গাড়ির কাছে এল। ভাবছিল হাসান তারিক, জেনারেল বোরিস এখান থেকে কোথায় যেতে পারে। হঠাৎ হাসান তারিকের মনে হল সেই প্রথম বাড়িটার কথা। ওখান থেকেই ওরা স্টেনগান ভর্তি বাক্স এনে অভিযানে বেরিয়েছিল, এর অর্থ ওটাই তাদের মূল ঘাটি। একবার ওখানে গিয়ে দেখা যেতে পারে।

হসান তারিকের গাড়ি ছুটল ঐ বাড়ির উদ্দেশ্যে। গাড়িটি বড় রাস্তায় রেখে ওরা সে বাড়ির সামনে গিয়ে দাড়াল, দেখল এক বিরাট তালা ঝুলছে বাইরের গেটরুমের দরজায়।

হাসান তারিক একটু ভাবল। তারপর বলল, চল ঐ চোরা দরজা একবার দেখব।

দক্ষিণ রাস্তাটা ঘুরে প্রাচীরের পাশ দিয়ে তারা চারজন পশ্চিম দিকে আগ্রসর হলো। সামনে হাসান তারিক। পেছনে ওরা তিন জন। আকাশে জোৎস্না নেই, অন্ধকার । কিন্তু স্বচ্ছ আকাশের তারার আলো অন্ধকারের কাল রূপকে কিছুটা যেন ফিকে করে দিয়েছে। হাসান তারিক তার দু'চোখ সামনের কালো অন্ধকারের বুকে স্থির রেখে এগিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ সামনের অন্ধকারে একটা অংশ নড়ে উঠল। হাসান তারিক চাপা কণ্ঠে চিৎকার দিল, শুয়ে পড়, তোমরা।

হাসান তারিক শুয়ে পডেছিল, তার সাথে সাথে ওরা তিনজনও।

ওরা শুয়ে পড়ার সাথে সাথে এক ঝাক গুলি ওদের মাথার উপর দিয়ে চলে গেল।

হাসান তারিক শুয়ে পড়েছিল, কিন্তু তার রিভলভারটা নড়ে ওঠা অন্ধকারটিকে তাক করেই ছিল। হাসান তারিক শুয়ে পড়েই ট্রিগার টিপেছিল ঐ অন্ধকার লক্ষ্য করে।

অন্ধকারের ভেতর থেকে একটা আর্তনাদ উঠল এবং ওদিক থেকে গুলি বর্ষণও বন্ধ হয়ে গেল।

হাসান তারিক পেছনের দিকে লক্ষ্য করে বলল, তোমরা সব ঠিক তো?

-হ্যা। ইউসুফ জবাব দিল।

-ক্রলিং করে দ্রুত আমাদের এগুতে হবে। গুলির শব্দে অন্যেরা এখনি ছুটে আসবে। এ লোকটাকে নিশ্চয় ওরা পাহারায় বসিয়ে রেখেছিল।

হাসান তারিকরা দ্রুত এগিয়ে প্রাচীর যেখানে উত্তর দিকে বাঁক নিয়েছে তার কাছাকাছি গিয়ে পৌছল।

এমন সময় হাসান তারিক দেখল, একটা চলন্ত অন্ধকার এগিয়ে প্রাচীরের বাঁকের এপারে এসে চাপা কণ্ঠে ডাকল, ব্যাং কোথায় তুমি?

কোন সাড়া না পেয়ে আবার ডাকল ব্যাং।

চাপা ফিস ফিসে কণ্ঠ তার।

এরপর লোকটা এক পা দু'পা করে সামনে এগুলো। অন্ধকারেও তার উদ্যত স্টেনগানের অস্তিত্ব পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

লোকটা আরও কয়েক ফুট এগিয়ে এল।

হাসান তারিক হাত দিয়ে পরীক্ষা করল তার রিভলভারের সাইলেন্সার ঠিক আছে কি না। তারপর ধীরে সুস্থে শুয়ে থেকেই একটা গুলি করল সে।

নিরব অন্ধকারে 'দুপ' করে একটা শব্দ উঠল। আর লোকটার মুখ থেকে বেরুল একটা 'আ-আ' শব্দ। পেছন দিকে উল্টে পড়ে গেল লোকটা।

হাসান তারিকরা আরেকটু এগিয়ে প্রাচীরের কোণায় গিয়ে অবস্থান নিল। এই কোণা থেকে বিশ গজ উত্তরে এগুলেই সেই চোরা দরজাটা।

হাসান তারিক দেহটাকে দক্ষিণ দেয়ালের সাথে সেঁটে রেখে একটু মুখ বাড়িয়ে উঁকি দিয়ে উত্তর দিকে দেখল, চোরা দরজার সামনে মাইক্রোবাস সাইজের একটা গাড়ি কালো দৈত্যের মত অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। দরজা ও গাড়ির কাছ থেকে ঠুক-ঠাক, টুং-টাং শব্দ ভেসে আসছে। মনে হয় গাডিতে কিছু উঠছে।

প্রায় এক মিনিটের মত অপেক্ষা করল হাসান তারিক। কিন্তু আর কেউ এল না। পাশেই এসে বসেছিল ইউসুফ চিয়াং। হাসান তারিক তাকে বলল, ব্যাপারটা আমার কাছে ভালো লাগছে না। একজন লোককে তারা খোঁজ নিতে

পাঠাল, নিশ্চয় তার শেষ আর্তনাদটা তাদের কানে পৌছেছে। কিন্তু এর পরেও আসছে না কেন?

হঠাৎ হাসান তারিকের খেয়াল হল বইয়ে পড়া বাংলাদেশের সুন্দরবনের বাঘের চরিত্রের কথা। বাঘ চলার এক বৃত্ত রচনা করে শিকারীকে সেই বৃত্তে ফেলে পেছন থেকে তার ওপর ঝাপিয়ে পড়ে। তাহলে কি সামনে দিয়ে না এসে বাড়ি ঘুরে পেছন দিক দিয়ে ঘিরে ফেলার ষড়যন্ত্র এঁটেছে ওরা?

হাসান তারিক তাড়াতাড়ি ইউসুফ চিয়াংকে বলল, তুমি আব্দুল্লায়েভকে নিয়ে ক্রলিং করে নিঃশব্দে পূর্ব দিকে একটু এগোও। আমার মনে হয় ওরা পেছন থেকে আসছে।

ইউসুফ চিয়াং আব্দুলায়েভকে নিয়ে দ্রুত এগোতে লাগল পূর্ব দিকে।

হাসান তারিক প্রাচীরের কোণা থেকে মুখ একটু বের করে উত্তর দিকে তার শ্যেন দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখল। যাতে অন্ধকারে সামন্য নড়া চড়াও তার দৃষ্টি এড়িয়ে না যায়।

তখন পাঁচ মিনিট পার হয়েছে। এমন সময় প্রাচীরের পূর্ব কোণ থেকে এক সাথে একাধিক স্টেনগানের ব্রাশ ফায়ারের শব্দ ভেসে এল। পেছন ফিরে তাকাল হাসান তারিক। আহমদ ইয়াং ফিস ফিস করে বলল, ফায়ার এদিক থেকেই করা হয়েছে মনে হল।

‘আল্লাহ্ সহায়’ বলল হাসান তারিক।

কথা শেষ করেই হাসান তারিক তার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল আগের জায়গায়। দৃষ্টি ফিরিয়েই তার নজরে পড়ল, তিনটি ছায়ামূর্তি শরীর বাঁকিয়ে মাথা নিচু করে গুটি গুটি এগিয়ে আসছে।

আহমদ ইয়াংকে সাবধান করে হাসান তারিক স্টেনগান বাগিয়ে শুয়ে পড়ল। প্রাচীরের কোণায় তিন-চারটা ছোট ছোট গাছ ছিল। গাছগুলো ফুট খানেক করে লম্বা। এতে সুবিধা হলো হাসান তারিক এবং আহমদ ইয়াং এর।

ওরা তখন পঁচিশ গজ দূরে। হাসান তারিক মাথা তুলল। তাক করল স্টেনগান। তারপর ‘ফায়ার’ বলেই ট্রিগার চেপে ধরে ষ্টেনগানের মাথা ঘুরিয়ে নিল কয়েকবার। একই সাথে আহমদ ইয়াং-এর স্টেনগানও গর্জে উঠেছিল।

তিনটি ছায়ামূর্তি ঢলে পড়ল মাটিতে।

হাসান তারিক অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু ওপার থেকে কোন জবাব এলনা। এমন সময় ইউসুফ চিয়াংরা ফিরে এল। ওরা বলল, ওখানে জেনারেল বোরিসের চারজন লোক খতম হয়েছে।

অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেল ওদিক থেকে কোন সাড়াশব্দ নেই।

হাসান তারিক ইউসুফ চিয়াং কে বলল, তুমি আব্দুল্লায়েভকে নিয়ে ঐ গাড়ি ঘুরে দরজায় এস। আমরা এদিক থেকে যাচ্ছি। ওরা চলে গেলে হাসান তারিক এবং আহমদ ইয়াং সাপের মত গড়িয়ে চলল ঐ দরজার দিকে।

দরজায় পৌছে গেল হাসান তারিকরা। ওদিকে থেকে ইউসুফরাও এল। না কোন বাধা এল না। তাহলে ওরা সবাই শেষ হয়েছে?

দরজার গোড়ায় কয়েকটা টর্চ পেল। টর্চের আলো ফেলল প্রথমে ভেতরের করিডোরে। দেখল পাঁচটি ট্রাংক পড়ে আছে। তালাবদ্ধ। এরপর টর্চ নিয়ে গাড়িতে উঠল। ওখানেও অনুরূপ আটটি ট্রাংক।

গুলি করে একটি ট্রাংকের তালা ভেঙ্গে ফেলল হাসান তারিক।

ট্রাংকের তালা খুলে চোখ বিস্ফোরিত হয়ে গেল তাদের সকলের। সোনার তালে ভর্তি ট্রাংক।

বাড়িটি  সার্চ করে কয়েক বাক্স অস্ত্র-শস্ত্র ছাড়া তেমন আর কিছুই পেল না।

সোনা ও অস্ত্রের বাক্সগুলো তারা গাড়িতে তুলল। যারা মারা গেছে তাদের স্টেনগান গুলোও কুড়িয়ে আনা হলো। অস্ত্র কুড়াতে গিয়ে আরেকটা বিষয় তারা নিশ্চিত হল যে, জেনারেল বোরিস নিহতের মধ্যে নেই।

তারপর গাড়ি ছেড়ে দিল। যখন ঘাটিতে পৌছল, তখন রাত চারটা।

জিনিস পত্র সামলিয়ে যখন তারা হাত মুখ ধুয়ে বিশ্রামের জন্য বিছানায় এল, তখন উরুমচির ইবনে সাদ মসজিদে ফজরের আযান দিল।

চারজনই উঠে দাঁড়াল মসজিদে যাবার জন্যে। অন্যদেরও ডেকে দিল।

নামাজ পড়ে এসে বিছানায় গা এলিয়েই হাসান তারিকের খেয়াল হল সেই নোটবুকের কথা। তাড়াতাড়ি উঠে নোটবুক নিয়ে টেবিলে বসল। নোটবুক

খুলতেই তার ভেতর থেকে বাড়ি ভাড়ার দু'টি রশিদ বের হয়ে এল। আরবী মিশ্রিত টার্কিশ ভাষায় লেখা রশিদ। পড়ে বুঝল মাত্র ছয় দিন আগে এ দু'টি বাড়ি ভাড়া নেয়া হয়েছে। রশিদ দু'টি নিয়ে ছুটল ইউসুফ চিয়াং এর কাছে।

ইউসুফ চিয়াং রশিদ দু'টো পড়ে লাফিয়ে উঠল। ওদের আরেকটা ঘাটির সন্ধান পাওয়া গেল।

উদগ্রীব হাসান তারিককে ইউসুফ চিয়াং বুঝিয়ে বলল, এ দু'টো বাড়ির একটিকে আমরা দেখে এসেছি। আরেকটা বাড়ি তুবপাস রোডে। এখান থেকে দু'মাইল হবে।

হাসান তারিক বলল, ওদের জানা জানির কোন সময় না দিয়ে আমাদের তো তাহলে এখনই বের হওয়া দরকার।

-ঠিক বলেছেন তারিক ভাই।

বলে ইউসুফ চিয়াং উঠে দাঁড়াল। বলল তারিক ভাই আপনি তৈরী হন। আমি ওদের বলে আসি তৈরী হওয়ার জন্য।

হাসান তারিক, ইউসুফ চিয়াং, আব্দুল্লায়েভ ও আহমদ ইয়াং যখন সেই বাড়িটির সামনে গিয়ে পৌছল তখন চারদিক ফর্সা হয়ে গেছে।

বাডিটি দু'তলা। আশে পাশে লাগা কোন বাড়ি নেই। বাড়িটির নিচের তলা ও দু'তলার কোন জানালা তখনও খোলেনি। বাড়ির সামনে সামান্য একটু ফাকা জায়গা পেরুলেই বাড়িতে প্রবেশের একটি মাত্র দরজা।

রাস্তা দিয়ে পায়চারি করতে করতে বাড়ির দিকে লক্ষ্য করছিল হাসান তারিকরা।

এই সময় একটা বেবী ট্যাক্সি ঐ বাড়িটার সামনে এসে দাড়াল। ট্যাক্সি থেকে একজন লোক নেমে ভাড়া মিটিয়ে বাড়ির দরজার দিকে হাঁটা দিল।

হাসান তারিক ইউসুফ চিয়াং কে বলল, তুমি যাও ওর কাছে। জিজ্ঞেস করলে প্রথমে বলবে, আমরা আলেকজান্ডার বোরিসভের পরিচিত। ওর সাথে দেখা করতে এসেছি।

ইউসুফ চিয়াং ওদিকে ছুটল।

এদিকে বেবী ট্যাক্সিটি ঘুরে দাড়িয়েছিল ফিরে যাবার জন্য।

হাসান তারিক হাত তুলে বেবী ট্যাক্সিকে থামতে বলল। থামল বেবীটি। ড্রাইভারের চোখে নতুন ভাড়া পাওয়ার উৎসুক দৃষ্টি।

হাসান তারিক জিজ্ঞেস করল, কোত্থেকে এলে?

-এয়ারপোর্ট থেকে।

-কখন গিয়েছিলে এয়ারপোর্টে?

-চারটার পিকিং এর ফ্লাইট ধরার জন্য।

-কিছু মনে করো না, কাকে নিয়ে গিয়েছিলে?

-যে গাড়ি থেকে নামল তার সাথে হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা একজন আহত লোক ছিল। কেন সাব, কি হয়েছে?

-কিছু না। সেই লোক আমাদের পরিচিত ।তারই খোঁজে এসেছিলাম তো! ঠিক আছে তুমি যাও।

এদিকে ইউসুফ চিয়াং বাড়িটির লোহার রেলিং এর কাছে পৌঁছতেই লোকটি ভেতর ঢুকে গিয়েছিল। ইউসুফ চিয়াং ডান হাত পকেটে রিভালভারের ওপর রেখে বাম হাতে নক করল দরজায়। থেমে থেমে কয়েকবার নক করার পর দরজার ওপারে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। সেই সাথে সিঁড়ি দিয়ে কাউকে নেমে আসারও শব্দ সে পেল।

দরজাটি খুলে গেল। একটি মেয়ে দরজা খুলে দিয়ে পাশে সরে গেল।

দরজার মুখেই একটা খাড়া সিঁড়ি দু'তলায় উঠে গেছে। সিঁড়ির মাঝখানে বাইরে থেকে আসা সেই লোকটি দাঁড়িয়ে। তার একটা হাত পকেটে।

ইউসুফ চিয়াং এর দু'টো হাতই জ্যাকেটের পকেটে। দরজা থেকে দু'ধাপ ভেতরে প্রায় সিঁড়ির গোড়ায় এখন সে দাঁড়িয়ে। সিঁড়ির লোকটিকে লক্ষ্য করে সে বলল, আলেকজান্ডার বরিসভ আমার পরিচিত, তার খোঁজে এসেছি।

লোকটির ঠোঁটে চিকন হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। ইউসুফ চিয়াং এর কথা শেষ হবার সাথে সাথেই সে বাঘের মত সিঁড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ল তার ওপর।

ইউসুফ চিয়াং লোকটির চোখে চোখ রেখেছিল। সে সিঁড়ির ওপর লাফ দিতেই ইউসুফ চিয়াং বিদ্যুৎ গতিতে দরজার একপাশে সরে গেল। লোকটি মুখ

থুবরে পড়ে গেল দরজার ওপর। কপালের একপাশ তার থেতলে গেল। রক্ত বেরিয়ে এল সেখান থেকে।

অদ্ভুত ক্ষীপ্রগতি লোকটির। পড়ে গিয়ে ঐ অবস্থাতেই পকেট থেকে রিভলবার বের করে তাক করল ইউসুফ চিয়াং এর দিকে।

ইউসুফ চিয়াং সরে আসার সময়ই জ্যাকেটের পকেট থেকে রিভলবার সমেত হাতটা বের করে নিয়েছিল। সুতরাং লোকটির রিভলবার অগ্নিবৃষ্টির আগেই গর্জে উঠল ইউসুফ চিয়াং এর রিভলবার।

হাসান তারিকরা এসে দরজায় দাঁড়াল এ সময়।

আহমদ ইয়াং এবং আব্দুল্লায়েভ লোকটাকে টেনে ঘরের ভেতরে নিয়ে এল। তারপর দরজা বন্ধ করে দিল।

ইউসুফ চিয়াং এবং হাসান তারিক রিভলবার বাগিয়ে লক্ষ্য রেখেছিল সিঁড়ি ও নিচের তলার দরজার দিকে।

সেই মেয়েটি একটু ভেতরে দাড়িয়ে কাঁপছিল। সে যেন নড়া-চড়ার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। হান গোষ্ঠীর চীনা মেয়ে। বয়স চব্বিশ-পঁচিশ হবে।

ইউসুফ চিয়াং তার রিভলবার মেয়েটির দিকে তুলে ধরে বলল, আর কে আছে ভেতরে?

-আমরা দশজন আছি।

-আর কেউ?

-না কোন পুরুষ নেই।

ইউসুফ চিয়াং হাসান তারিকের দিকে তাকাল। হাসান তারিক বলল, মেয়েটিকে নিয়ে তুমি ও আব্দুল্লায়েভ নিচের তলাটা দেখে এস। আমরা সিঁড়ির দিকে লক্ষ্য রাখছি।

মিনিট পাঁচেক পর ইউসুফ চিয়াং ফেরত এল। সবটা দেখেছি, নিচে কেউ নেই।

এরপর হাসান তারিকরা ওপরে উঠে এল। ওপরে সিঁড়ির মুখে বসার ঘরটায় নয়টি মেয়ে জড়-সড় হয়ে বসেছিল। তাদের চোখে-মুখে ভয়-বিহবলতা। তারা সকলেই চীনা হান। বয়স একই রকমের-চব্বিশ পঁচিশ।

আহমদ ইয়াংকে ওদের কাছে দাঁড়িয়ে রেখে ওপর তলাটাও তন্ন তন্ন করে দেখল হাসান তারিকরা। নিচের তলার মত উপরেও ছয়টি ঘর। কেউ নেই।

হাসান তারিকরা ফিরে এল সেই বসার ঘরে মেয়েগুলির কাছে।

হাসান তারিক ওদের জিজ্ঞেস করল, আলেকজান্ডার বোরিসভকে তোমরা চিন?

সামনে বসা একটি মেয়ে বলল, চিনি?

-সেই কি আজকের ফ্লাইটে পিকিং গেছে?

-হ্যাঁ।

-কেন?

-এখানকার ডাক্তার বলেছে নাকি যে আজকের মধ্যেই ওর ডান হাতটা কেটে ফেলতে হবে। তাই পিকিং অঞ্চলের কোন হাসপাতালে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

-এ বাড়ির আর লোক কোথায়?

-দেংশিয়াং রোডের বাড়িতে থাকতে পারে।

-ওরা কতজন লোক ওখানে?

-দেংশিয়াং রোডের বাড়ি ও এ বাড়ি মিলে আলেকজান্ডার বোরিসভ সহ ওরা চৌদ্দজন থাকে।

হাসান তারিক বিস্মিত হলো, মেয়েটি মিথ্যে বলার চেষ্টাও করছে না। বলল, তোমরা কারা? এদের দলের?

মেয়েটি কেঁদে উঠল। বলল, আমরা সব হতভাগিনী। আমাদের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে ওরা আমাদের এনে আটিকে রেখেছে। দাসিবৃত্তি ও ভোগের সামগ্রী হিসেবে ওরা আমাদের ব্যবহার করে।

সব মেয়েদেরই চোখে পানি।

হাসান তারিক বলল, আমরা মুসলমান। আমরা সব রকম জুলুম নির্যাতনের বিরোধী। এ জন্যেই এদের সাথে আমাদের বিরোধ। তোমরা কি চাও বল?

সেই মেয়েটি চোখ মুছে বলল, আমরা বাইরে বেরুলেই ওরা মেরে ফেলবে। যেখানে যাব সেখান থেকেই ওরা ধরে আনবে। কত মেয়েকে কত কষ্ট দিয়ে যে ওরা মেরেছে।

হাসান তারিক হাসল, বলল, বোনরা তোমাদের ভয় নেই। ওদের সে শক্তি আর হবে না।

ওদের সকলের চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কয়েকটা মেয়ে ছুটে এসে পা জড়িয়ে ধরল হাসান তারিকের। বলল, আমরা বড় দুঃখী, আমাদের কেউ এমন করে বোন বলে ডাকেনি। আমাদের আপনি বাঁচান।

হাসান তারিক পা টেনে নিয়ে ওদের শান্তনা দিয়ে বলল, মানুষ মানুষের পায়ে পড়ে না বোন, আল্লাহ সকল মানুষকে সমান মর্যাদা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাদের মধ্যে বড় ছোট থাকতে পারে না।

হাসান তারিক একটু থেমে বলল, আমরা এখন চলে যাচ্ছি। তোমরা দরজা বন্ধ করে এ বাড়িতেই থাক। আমরা পরে ফিরে আসছি। কি ব্যবস্থা করা যায়, তখন দেখা যাবে।

হাসান তারিকরা ফিরে দাঁড়াল চলে আসার জন্য। চলতে গিয়ে আবার ফিরে দাড়াল হাসান তারিক। ওদের লক্ষ্য করে বলল, আমরা গিয়ে দ'জন লোক পাঠাচ্ছি। ওরা দরজার বাইরে পাহারায় থাকবে। ওদের টুপির সামনে দেখবে লাল অর্ধচন্দ্র। আমরা না ফেরা পর্যন্ত ওরা থাকবে, তোমাদের ভয় নেই।

হাসান তারিকরা বেরিয়ে এল দরজা দিয়ে। মেয়েরা খোলা দরজা দিয়ে তাকিয়ে থাকল ওদের দিকে। ওদের চোখে নতুন আনন্দ ও আস্থার আলো।

হাসান তারিকরা চলে গেলে ওরা দরজা বন্ধ করে ফিরে দাঁড়াল। ওরা কি মানুষ? মানুষ কি এত ভাল হয়?

আরেকজন বলল, নারে ওদের একটা বই পড়েছিলাম আমি, ওরা সত্যিই আলাদা।

রাত দু'টায় আহমদ মুসার কাছে থেকে চলে যাবার পর যা যা ঘটেছে তা খুঁটে খুঁটে সব আহমদ মুসাকে জানাল হাসান তারিক।

সব শুনে আহমদ মুসার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে সকলের পিঠ চাপড়ে দিল। বলল, তোমাদের সাফল্যের জন্যে মোবারকবাদ। আজকের রাতটা আন্দোলনের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আহমদ মুসা তার চোখ ইউসুফ ও আহমদ ইয়াং এর দিকে নিবদ্ধ করে বলল, আমার তরুণ দুই ভাই, তোমরা আমাকে মুগ্ধ করেছে, তোমরা তোমাদের ঐতিহ্যের সার্থক প্রতিনিধিত্বকারী।

ইউসুফ চিয়াং ও আহমদ ইয়াং এর চোখে মুখে একরাশ লজ্জা নেমে এল।

ইউসুফ চিয়াং বলল, না মুসা ভাই, আজ রাতে আমাদের কিছু করার ছিল না, ছিল শেখার এক দুর্লভ সুযোগ। আজ রাতের ঘটনা আমাদের শুধু অমূল্য অভিজ্ঞতা দান করেনি, আত্মবিশ্বাসও জাগিয়েছে। আজ মনে হচ্ছে, অনেক কিছু করার শক্তি আমাদের আছে।

আহমদ মুসা বলল, ইউসুফ, আমার মনে হচ্ছে এখানে সবকিছুই তোমাদের হাতের মুঠোয়। মধ্যে এশিয়ায় সাইমুম থেকে 'এম্পায়ার গ্রুপ' অনেক ভালো পরিবেশে রয়েছে। মুসলমানরা তাদের ভাষা তাদের শিক্ষা সংক্রান্ত তাদের বেশ কিছু অধিকার পিকিং এর নতুন সরকারের কাছ থেকে ফিরে পেয়েছে। আমার মনে হয়েছে, অবশিষ্ট অধিকার মুসলমানরা ফিরে পাবে।

ইউসুফ চিয়াং বলল, কিন্তু মুসা ভাই, বিরুদ্ধ শক্তির ঐ কিছুটা আপোশকামী ভূমিকা এখানকার কিছু মুসলমানের মধ্যে এমন একটা আত্মপ্রসাদ এনে দিচ্ছে যা এম্পায়ার গ্রুপের আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে।

আহমদ মুসা বলল, ঠিক বলেছ ইউসুফ, কিন্তু সমস্যা এত বেশী আছে। মুক্তির পথে এত বাধা ও জটিলতা আছে যে আত্মপ্রসাদ সৃষ্টির কোন অবকাশ নেই। এখানকার বিধ্বস্ত মুসলিম সমাজের পুনর্গঠন এবং মুসলমানদের সকলের মুখে মুক্তির হাসি ফুটানোর পথ অনেক দীর্ঘ।

কথা শেষ করে আহমদ মুসা হাসান তারিকের দিকে চাইল। বলল, জেনারেল বোরিসের কাছ থেকে যে আধ টন স্বর্ণ তোমরা উদ্ধার করেছ তা এম্পায়ার গ্রুপের জন্য ইউসুফ চিয়াং এর তত্ত্বাবধানে দিয়ে দাও। এ থেকে প্রাপ্ত অর্থের একটা অংশ এম্পায়ার গ্রুপ খরচ করবে ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদ, মাদ্রাসার পুনর্গঠন এবং মুসলিম, এতীম, বিধবাদের পুনর্বাসনের কাজে। অবশিষ্ট সব অর্থ ব্যয় হবে এম্পায়ার গ্রুপকে আরও সংহত ও শক্তিশালী করার জন্যে। আর এক লাখ ইউয়ান যে নগদ অর্থ পেয়েছ ওটা ঐ দশটি অসহায় মেয়েকে দিয়ে ওদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

হাসান তারিক উজ্জ্বল চোখে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।

কথা বলে উঠল ইউসুফ চিয়াং। বলল, মুসা ভাই, আপনি যেভাবে কথা বলেছেন তাতে মনে হচ্ছে আপনারা যেন ‘এম্পায়ার গ্রুপ’ এর কেউ নন।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, বিশ্বের যেখানে যে নামেই ইসলামী আন্দোলন হোক, আন্দোলন একটাই। এম্পায়ার গ্রুপ আমার, আমি এর সাথে আছি।

ইউসুফ চিয়াং এর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, মুসা ভাই, একটা সমস্যার কথা বলি। গতকাল একটা খবর এসেছে। শিহেজি উপত্যকায় দুই একর জমি মুসলমানদের কাছ থেকে সরকারী কাজের জন্যে একোয়ার করা হয়েছিল। কিন্তু এখন সেখানে সরকারী তত্ত্বাবধানে সিংকিয়াং এর বাইরে থেকে অমুসলিম হান গোষ্ঠীর লোক এনে বসানো হচ্ছে। মুসলমানরা এতে প্রতিবাদ করতে গেলে সংঘর্ষ হয় এবং বিশজন মুসলিম যুবককে গ্রেফতার করা হয়। এখন আমাদের কি করণীয়? আমরা সম্প্রতি এ ধরনের যে কোন নতুন বসতি ভেঙ্গে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এরকম বেশ কিছু পদক্ষেপ আমরা নিয়েছি। এতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নতুন বসতি আর পুনঃস্থাপনে তারা সাহস পায়নি। কিন্তু সমস্যা হল, আমাদের কাজের দায়দায়িত্ব স্থানীয় মুসলমানদের ওপর পড়ে এবং তারা পাইকারীভাবে নির্যাতনের শিকার হয়।

থামল ইউসুফ চিয়াং। আহমদ মুসা তার দিকে তাকিয়ে রইল। সে থামলে আহমদ মুসা বলল, বর্তমান ক্ষেত্রে তোমাদের ইচ্ছা কি?

-আমরা আমাদের সিদ্ধান্তের বিকল্প দেখি না। একটা বিকল্প হলো চুপ করে থাকা। কিন্তু চুপ করে থাকা সম্ভব নয়। এক দুই করে তারা পঞ্চাশ লাখ-অমুসলিম হান গোষ্ঠীর লোককে সিংকিয়াং-এ এনে ঢুকিয়েছে। তার ফলে নিজ দেশেই আমরা পরবাসী হবার উপক্রম। আমরা এ অবস্থা চলতে দিতে পারি না।

-বুঝেছি তোমরা কথা। তোমাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে ওদেরকে একটা সময় দেবে না?

-না মুসা ভাই, ওটা করতে গেলে পদক্ষেপ গ্রহণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। আর স্থানীয় মুসলমানদের উপর জুলুম-অত্যাচার হয়রানি এখনই শুরু হয়ে যাবে।

-বুঝলাম! ঠিক আছে, তাহলে সিদ্ধান্ত অনুসারেই কাজ করতে হবে।

একটু থেমে আহমদ মুসা বলল, বলত, তোমাদের সামনে আশু সমস্যা কি?

-সমস্যা আছে অনেক। তবে দু'টো বিষয়কে আমরা জরুরী ভিত্তিতে হাতে নিয়েছি। এর প্রথমটি হল মসজিদ-মাদরাসাকে কম্যুনিষ্ট খবরদারী থেকে মুক্ত করা। আর দ্বিতীয় হল, মুসলমানরা কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য না হলে পিওন-ক্লার্কের ওপরের পদে চাকুরী না পাওয়ার যে ব্যাপার চলছে তার প্রতিরোধ করা। বাইরের অন্যায় বসতি বিস্তারের প্রতিরোধের কথা তো আগেই বলেছি। অসহায় মুসলমানদের অভিভাবকত্ব দান এবং ইসলামী চিন্তা ও জ্ঞানের প্রসার প্রচেষ্টার বাইরে এই তিনটি কাজই আমাদের মুখ্য।

আহমদ মুসার চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিছু বলতে যাচ্ছিল সে। এমন সময় মা-চু এসে বলল, মেহমানদের নাস্তা দেয়া হয়েছে।

হাসান তারিক বলল, তোমরা সবাই খেতে থাক। আমি মুসা ভাইকে আরেকটা কথা বলে আসি।

মা-চু'র সাথে ওরা তিনজন চলে গেল।

ওরা চলে গেলে হাসান তারিক পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার আহমদ মুসার দিকে তাকাল। মুখটি আবার একটু নিচু করল সে।

-বলবে কিছু নিশ্চয়, বলে ফেল। আয়েশা কেমন আছে তাতো জানাওনি আমাকে? আহমদ মুসার মুখে এক টুকরো হাসি।

হঠাৎ হাসান তারিকের চোখ থেকে দু'ফোটা অশ্রু ঝরে পড়ল। দু'হাতে চোখ ঢাকল হাসান তারিক।

-তুমি কাঁদছ হাসান তারিক? তাহলে আয়েশা আলিয়েভার কিছু........ বিস্ময় ও উদ্বেগ ঝরে পড়ল আহমদ মুসার কন্ঠে।

-না আয়েশার কিছু হয়নি। আমাদের ফারহানা আপা নেই।

-কি বলছ তুমি হাসান তারিক? বিস্ময়ের এক বজ্রপাত হল আহমদ মুসার কন্ঠে।

হ্যাঁ মুসা ভাই, তিনি নেই। জেনারেল বোরিসের লোকরা তাঁকে হত্যা করেছে।

-হত্যা করেছে? ফারহানা নিহত হয়েছে?

বেদনায় শক্ত হয়ে উঠেছে আহমদ মুসার মুখ। কিছুক্ষণ তার যেন বাক স্ফুরণ হলো না। তার শক্ত এবং স্থির দৃষ্টি হাসান তারিকের দিকে।

হাসান তারিক মুখ নিচু করে আছে।

নিজেকে সামলে নিয়েছে আহমদ মুসা। ধীর গম্ভীর কন্ঠে বলল, কিভাবে এটা ঘটল হাসান তারিক?

হাসান তারিক সেদিনের সব ঘটনা খুলে বলল।

শুনে আহমদ মুসা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল। তার শুন্য দৃষ্টিটা জানালা দিয়ে বাইরে নিবদ্ধ ছিল। তার চোখের দু'কোণায় দু'ফোটা অশ্রু চিকচিক করছিল।

অনেকক্ষণ পর চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আহমদ মুসা বলল, যাও ভাই খেয়ে এস।

মনে হল আহমদ মুসা অনেক দূর থেকে কথা বলছে।

হাসান তারিক তার দিকে একবার তাকিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

ওরা খেয়ে ফিরে এল।

আব্দুল্লায়েভ আহমদ মুসার দিকে লক্ষ্য করেই বলে উঠল, মুসা ভাই কেমন লাগছে আপনার, খারাপ বোধ করছেন আপনি?

আব্দুল্লায়েভ তখন দাঁড়িয়েছিল। আহমদ মুসা উঠে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, আব্দুল্লাহ, তুমি আমাকে ফারহানার কথা জানাওনি, তোমার আতিয়ার কথাও জানাওনি।

-মুসা ভাই, অনেকবার মুখে এসেছে, কিন্তু বলতে পারিনি। কথা বের হয়নি।

তার চোখে অশ্রু টলটল করে উঠল। আহমদ মুসার চোখের কোণ দু'টিও আবার ভিজে উঠল।

এই সময় মা-চু ঘরে ঢুকল। বলল, ডাক্তার সাহেব এসেছেন।

আহমদ মুসা ফিরে দাঁড়িয়ে তার বিছানায় বসতে বসতে ধীর কন্ঠে বলল, তাহলে তোমরা রেস্ট নাও। বিকেলে এস, আমি তোমাদের সাথে একটু বেরুব।

আর মা-চু'র দিকে চেয়ে আহমদ মুসা বলল, নিয়ে এস ডাক্তারকে।

হাসান তারিক চলে গেল। ডাক্তার এসে প্রবেশ করল ঘরে। ডাক্তার ব্যান্ডেজ পরীক্ষা করে বলল, আর দু'দিন পরে এসে ব্যান্ডেজ পাল্টে দিয়ে যাব।

-আর কয়দিন বাণ্ডেজ রাখতে হবে?

-বাণ্ডেজ পাল্টাবার পর ধরুন আর সাত-আট দিন।

-আমি কি বাইরে টাইরে বেরুতে পারি?

-বাড়ির বাইরে?

-হ্যাঁ।

-গাড়ি করে বাইরে বেরুতে পারেন। তবে এক সাথে বেশী হাঁটা ঠিক হবে না।

হঠাৎ মেইলিগুলির কথা খেয়াল হল আহমদ মুসার। বলল, মেইলিগুলিকে কেমন দেখলেন ডাক্তার সাহেব?

-দু' আঙুলের মাঝখানে আঘাত। জায়গাটা সেনসেটিভ। একটু সময় নেবে। তাছাড়া কবজি থেকে একটু ওপরে যে আঘাত সেটাও বড়। হাড় কাটেনি বটে, কিন্তু বেশ আহত হয়েছে। এখন আবার আসতে দেখে এলাম জ্বর উঠেছে।

-জ্বর? জ্বরের কারণ কি?

-বুঝতে পারছিনা বিকেলে আবার দেখব।

ডাক্তার বেরিয়ে গেল।

একটু গড়িয়ে নেবার জন্যে শুয়ে পড়ল আহমদ মুসা। কিন্তু শুয়েই মনে পড়ল মেইলিগুলিকে দেখে আসা দরকার।

উঠে বসল আহমদ মুসা।

মা-চু'কে ডেকে বলল, তুমি মেইলিগুলিকে বল আমি আসতে চাই।

মা-চু চলে গেল। অল্পক্ষণ পরে ফিরে এসে বলল, চলুন।

মেইলিগুলির ঘর। খুব বড় নয়। একপাশে শোবার ডিভান। আর একপাশে পড়ার টেবিল। এপাশেই কোণায় একটি টেলিভিশন। পুরো ঘরটাই লাল কার্পেটে মোড়া।

আহমদ মুসা ঘরে ঢুকল।

মেইলিগুলি শুয়ে ছিল। আহমদ মুসা ঘরে ঢুকতেই সে উঠে বসল।

ডিভানের পাশেই একটা চেয়ার রাখা ছিল। ওখানে গিয়ে বসল আহমদ মুসা। চেয়ারে বসতেই মেইলিগুলির বালিশের পাশে ভাজ করে রাখা একটা জায়নামায আহমদ মুসার নজরে পড়ল।

মেইলিগুলির মুখ শুকনো। নীল চোখ দু'টির মধ্যে একটা ক্লান্তি। একটা বড় চাদরে মাথা ও গা ঢাকা। মেইলিগুলির জন্যে এটা নতুন একটা পরিবর্তন মনে হল আহমদ মুসার কাছে। মেইলিগুলির চুল উস্কো-খুস্কো। চাদরের প্রান্ত পেরিয়ে কিছু চুল এসে কপালে পড়েছে।

চেয়ারে বসতে বসতে আহমদ মুসা বলল, কেমন আছ?

-ভাল

-ডাক্তার বলল, গায়ে তোমার জ্বর উঠেছে। খুব জ্বর?

মেইলিগুলি চোখ তুলল। আহমদ মুসার চোখে চোখ পড়ল। চোখ নামিয়ে নিল আহমদ মুসা।

-খুব জ্বর নয় বোধ হয়।

-ডাক্তার বলল, তোমার কব্জির ওপরে আর এক স্থানেও নাকি একটা বড় আঘাত আছে?

-জ্বি আছে।

-ওটা কিসের আঘাত?

-পেছন থেকে জেনারেল বোরিস ওখানে প্রথম আঘাত করে।

-গুলি করে কখন?

-রিভলভারের বাট দিয়ে আঘাত করার পর আমার হাত থেকে রিভলভার পড়ে যায়। আমি রিভলভার কুড়িয়ে নিয়ে যখন তাকে গুলি করতে যাই, তখন সে গুলি করে।

-তুমি সেদিন জেনারেল বোরিসদের আসা কখন কিভাবে টের পেলে?

মেইলিগুলি উত্তর দিল না। মাথা নিচু করে থাকল সে।

-তুমি জেনারেল বোরিসদের আসার আশংকা করেছ, একা একা রাতে পাহাড়া দিয়েছ, আমাকে জানাওনি কেন?

-আপনি এসব কার কাছে শুনলেন? দাদী?

-হ্যাঁ।

-আমি এখন বুঝতে পারছি, না বলা আমার ভুল হয়েছে অপরাধ হয়েছে।

-না এমন করে ভাবা আবার তোমার ঠিক নয়।

-কিন্তু এ রাতে যদি কিছু ঘটে যেত তাহলে অপরাধ বোধের যন্ত্রণা থেকে কোন দিনই বাঁচতে পারতাম না।

বলার সময় গলা যেন মেইলিগুলির কিছুটা কেঁপে উঠল।

-এসব ভেবে মন খারাপ করো না, আমাদের সাধ্য কতটুকু। আল্লাহই আমাদের ভরসা।

কথা বলল না মেইলিগুলি।

আহমদ মুসাও কি কথা বলবে আর ভেবে পেল না।

মেইলিগুলিই মুখ খুলল। বলল, আজ তো ডাক্তার আপনার ব্যাণ্ডেজ দেখার কথা ছিল?

-হ্যাঁ দেখেছে।

-কি বলেছে?

আরও সাত-আট দিন ব্যাণ্ডেজ রাখতে হবে। আর ডাক্তার বলেছেন, আমি বাইরে একটু করে বেরুতে পারি।

-বলেছেন ডাক্তার এটা?

-হ্যাঁ।

মেইলিগুলি মাথা নেড়ে বলল, না, হাঁটাহাঁটি করলে সেলাই-এ টান পড়বে, ক্ষতি হবে তাতে।

-গাড়ি করে বেরুনো যাবে ডাক্তার বলেছেন। বেশী হাঁটাহাঁটি তিনিও নিষেধ করেছেন।

একটু থেমে আহমদ মুসা বলল, আজ বিকেলে একটু বেরুব।

-একা?

-না, হাসান তারিকরা থাকবে।

-মেইলিগুলি চুপ করল। কথা বলল না। মনে হল আহমদ মুসার এ সিদ্ধান্ত তার মনঃপুত হয়নি। আহমদ মুসাও এটা বুঝল। বলল সে, না হাঁটাহাঁটি করব না। গাড়ি করে একটু এদিক সেদিক ঘুরে আসব মাত্র।

আহমদ মুসা থামল।

মেইলিগুলি বলল, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?

-কি কথা?

-হাসান তারিকরা রাতে বেরিয়েছিল, কোন খারাপ খবর কি তারা এনেছে?

-না তো, তোমাকে বলা হয়নি। তাদের অভিযান আশাতীত সফল হয়েছে। জেনারেল বোরিসের শেষ দু'টো ঘাটিও আমাদের দখলে এসেছে, তার সঙ্গী-সাথী সব শেষ হয়েছে। সে পিকিং চলে গেছে তার আহত হাতটি কেটে ফেলার জন্য।

মেইলিগুলির চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তৎক্ষণাৎ কোন কথা বলল না সে। কি যেন ভাবছিল। অবশেষে বলল, কিছু মনে করবেন না, কোন দুঃসংবাদ কি আজ পেয়েছেন আপনি?

-কেন, এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছ কেন?

মেইলিগুলি বলল, প্রশ্ন করার অনুমতি আগেই চেয়ে নিয়েছি।

একটু থামল মেইলিগুলি। তারপর বলল, আপনার চেহারার মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখছি। আর মা-চু বলল, আপনার চোখে সে অশ্রু দেখেছে।

মেইলিগুলির কথার তখনই কোন উত্তর দিতে পারলো না আহমদ মুসা। চোখ বুজল সে। তার মুখ একটা বিষাদ বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

মেইলিগুলি আহমদ মুসার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। আহমদ মুসার এই বেদনার্ত পরিবর্তন মেইলিগুলির দৃষ্টি এড়াল না। আহমদ মুসার এভাবে চোখ বুজাটাও তার কাছে বিস্ময়কর লাগল। তাহলে কি বড় ধরনের দু:খজনক কিছু ঘটেছে। আহমদ মুসার মত পর্বত প্রমাণ ব্যক্তিত্ব কোন ধরনের ঘটনায় এমন হতে পারে? বুঝতে পারল না, প্রশ্ন করাই তার ভুল হয়েছে কিনা!

মেইলিগুলি মুখ তুলল। তার বিষণ্ন দৃষ্টি আহমদ মুসার দিকে তুলে ধরে বলল, আমি আপনাকে ব্যথা দিয়েছি?

-না মেইলিগুলি। তুমি ঠিকই ধরেছ, আমি একটা দু:সংবাদ পেয়েছি।

-জিজ্ঞেস করতে পারি কি? সেটা কি?

আহমদ মুসা তৎক্ষণাৎ জবাব দিল না। একটু ভাবল। তারপর বলল, ব্যাপারটা আমার একান্তই ব্যক্তিগত মেইলিগুলি। আমাকে অপহরণ করে নিয়ে আসার পর যার সাথে আমার বিয়ে স্থির হয়েছিল, সে মেয়েটিকেও জেনারেল বোরিসের লোকেরা হত্যা করেছে।

এমন খবর শোনার জন্যে মেইলিগুলিও প্রস্তুত ছিল না। সে সংকুচিত হয়ে পড়ল। বেদনায় বিবর্ণ হয়ে গেল তার মুখ। বুকের কোথায় যেন একটা অস্বস্তিকর খোঁচাও অনুভূত হতে লাগল তার।

দু'জনেই নিরব।

নিরবতা ভাঙল মেইলিগুলিই প্রথম। বলল, মাফ করুন আমাকে, আমি বুঝতে পারি নি।

মেইলিগুলি আর চোখ তুলতে পারলো না।

আহমদ মুসা একটু হাসতে চেষ্টা করল। বলল, ও কিছু না মেইলিগুলি। তুমি ঠিকই ধরেছ। ভাগ করে নিলে দু:খ কমে। দু:খের সাথী থাকলে সান্ত্বনা পাওয়া যায়।

মেইলিগুলি চোখ তুলে চাইল। ওর নীল চোখে যেন এক সাগর বেদনা, আকাশের মত নিসীম এক মমতা।

চমকে উঠল আহমদ মুসা। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল, ফারহানার অশ্রু ধোয়া এমনি চোখ, বহুদিন আগে ফেলে আসা হিমালয়ের বরফ রাজ্যের বরফ গুহার মুমূর্ষ ফারহানার প্রেম-মমতা-বেদনার সাগর গভীর কালো এমনি এক চোখ।

সম্বিত ফিরে পেয়ে চোখ নামিয়ে নিল আহমদ মুসা। উঠে দাঁড়াল সে।

'আসি মেইলিগুলি' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এল আহমদ মুসা।

দরজায় গিয়ে ডিভানের ওপর রাখা হাতের ম্যাগাজিনটা নেবার জন্যে ফিরে দাঁড়াল আহমদ মুসা। কিন্তু দেখল, মেইলিগুলি বালিশে মুখ গুঁজেছে। তার দেহটা ফুলে ফুলে উঠছে। কাঁদছে সে।

আহমদ মুসা আর ঘরে না ঢুকে চলে এল।

ঘরে এসে বিছানায় গা এলিয়ে দিল আহমদ মুসা। সব চিন্তা থেকে বিচ্ছিন্ন বিশ্রাম নেবার জন্যে চোখ বুজল সে। কিন্তু তবু মেইলিগুলির ঐ নিশব্দ কান্নার দৃশ্য ঘুরে ফিরে তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল।

# ৮

বিকেলে আহমদ মুসা হাসান তারিক, আবদুল্লায়েভ, ইউসুফ চিয়াং ও আহমদ ইয়াংকে নিয়ে বাইরে বেরুল।

ইউসুফ চিয়াং তার নিজের গাড়ি নিয়ে এসেছিল। কিন্তু তারা যখন বেরুতে যাবে এই সময় মা-চু মেইলিগুলির গাড়ির চাবি এনে হাসান তারিকের হাতে দিল।

হাসান তারিক আহমদ মুসার দিকে তাকাল। আহমদ মুসা তাকাল ইউসুফ চিয়াং এর দিকে।

ইউসুফ চিয়াং বলল, ঠিক আছে, ওঁর গাড়িই নেয়া যাক।

মেইলিগুলির দামী এয়ারকণ্ডিশন গাড়ি।

ইউসুফ চিয়াং ড্রাইভিং সিটে বসতে বসতে বলল, এই গাড়ি উরুমচিতে আর মাত্র দুটি আছে। সত্যিই মেইলিগুলির মত অর্থ, সম্মান ও নামের অধিকারী এর আগে কেউ হতে পারেনি।

-কেমন জানো তোমরা মেয়েটাকে? জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

-নিকট থেকে তাকে জানার সুযোগ হয়নি। তবে তার সম্বন্ধে আলোচনা হল, তাঁর মত ব্যক্তিত্ব ও আত্ম-মর্যাদাবোধ সম্পন্ন কেউ অভিনয়ের জগতে আর আসেনি।

-এই আলোচনার পক্ষে যুক্তি কি দেয়া হয়?

-তাঁর সম্বন্ধে কথা হলো, বইয়ের কাহিনী এবং দৃশ্য তিনি নিজে বাছাই করেন। কোন অশ্লীল দৃশ্যে কখনও তাকে দেখা যায়নি। আর বাইরের শুটিং এর সময় তিনি সব সময় তাঁর মা ও পরিবারের লোকদের সাথে থাকেন। সবচেয়ে বড় কথা হলো, গত তিন বছরে পত্র পত্রিকায় তাকে ঘিরে কোন কাহিনী তৈরী হয়নি। অথচ অন্যদের বেলায় এটা খুব সাধারণ ব্যাপার। খবরের কাগজের আরেকটা

আলোচনা পড়েছি, শুটিং এর সময় ছাড়া অন্য কোন সময় ক্যামেরার সামনে তিনি দাঁড়ান না।

থামল ইউসুফ চিয়াং। হাসান তারিক এর সাথে আরও যোগ করল। বলল, আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে কি যে বিপদে পড়েছিলাম! তার এ্যাটেনড্যান্টের এক কথা, উনি কারও সাথে তেমন দেখাই করেন না, অপরিচিত লোকের সাথে তো নয়ই। তার এ্যাটেনড্যান্ট তার যুক্তিকে পাকাপোক্ত করতে গিয়ে বলেছিল, অন্য নায়িকার অফিস যখন হাসি তামাশায় গোলজার থাকে, তখন তিনি নিরবে বই পড়েন, স্ক্রিপ্ট পড়েন। আর যখন তার দেখা পেলাম, বুঝলাম তার একটা ভিন্ন মনও আছে তাঁর সহযোগিতা আমরা পাব। জেনারেল বোরিসের হাতে বন্দী মুসা ভাই এর প্রতি গভীর সহানুভূতি এবং বিপুল শ্রদ্ধাবোধ সেদিনই আমি তাঁর মধ্যে দেখেছিলাম। থামল হাসান তারিক।

-তাহলে আহমদ ইয়াংরা তাঁকে কিডন্যাপ করেছিল কেন? বলল আহমদ মুসা।

-জনপ্রিয় ভাল একটি মুসলিম মেয়েকে গণ-আলোচনার অশ্লীল আসর থেকে সরিয়ে আনার জন্যে। এর পারিবারিক ঐতিহ্যের বিবেচনাও এখানে ছিল। আরো অনেক বখে যাওয়া মেয়ে আছে, তাদের ব্যাপারে এমন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। আহমদ ইয়াং বলল।

আহমদ মুসা কোন কথা বলল না। জানালা দিয়ে তার দৃষ্টিটা বাইরে নিবদ্ধ। তারও চোখে ভেসে উঠেছে, কাশগড়ে থানার সামনে মেইলিগুলির কথা বলার দৃশ্য। এরপর সেদিন আহত আহমদ মুসাকে তার গাড়িতে তুলে নেয়া এবং তার পরবর্তীকালের সব ঘটনা, সব কথা।

একটু নিরবতা। তারপর আহমদ মুসা ইউসুফের দিকে চেয়ে বলল, কোথায় যাচ্ছি আমরা ইউসুফ?

-আমরা ঠিক করেছি, প্রথমে আমরা আমাদের শহীদ পার্কে যাব।

-কতদূর এখান থেকে?

-বেশী দূর নয়। এসে গেছি। আর কয়েক মিনিট।

-শহরের এই এলাকা নতুন বোধ হয় না?

-হ্যাঁ কম্যুনিষ্টরা এই অভিজাত এলাকাটা গড়েছে তাদের ওপরতলার লোকদের জন্যে।

গাড়ি উরুমচির নতুন এলাকা পেরিয়ে পুরাতন এলাকায় প্রবেশ করল।

আহমদ মুসা চোখ ভরে যেন দেখছিল চারদিকটা। বলল, ইউসুফ পুরানো উরুমচির তো দেখছি কোন পরিবর্তন হয়নি?

-আপনি এসেছেন উরুমচিতে মুসা ভাই? বলল ইউসুফ।

-কেন আসব না? দু'বার এসেছি। আব্বা সরকারী কাজে উরুমচি এসেছিলেন। তার সাথে আমি এসেছিলাম।

-মনে পড়ে বাড়ির কথা মুসা ভাই? বলল আহমদ ইয়াং

-সে স্মৃতি কি ভুলবার মত ইয়াং! কিন্তু দু'চোখে সেই বাড়ি, সেই পরিবেশ তো আর দেখতে পাবে না। আমরা যখন সেখান থেকে হিজরত করি, তখন আমাদের জনপদ, ছোট্ট নগরী একটা ভাঙ্গা ইট পাথর আর ছাই- এর স্তুপে পরিণত হয়েছিল। জানি না সেখানকার অবস্থা কিরূপ আজ!

-যেতে ইচ্ছে করে না সেখানে?

-অবশ্যই। মাঝে মাঝে ভাবি ওখানে গেলে ওখানকার পাহাড়, উপত্যকা আর ফসলের মাঠে বোধ হয় আমার বাল্য ও কৈশোরকে দু'চোখ ভরে আমি দেখতে পাব।

আহমদ মুসার কন্ঠস্বরটা গম্ভীর শোনাল। তার চোখের দৃষ্টিটা শূন্যে। মনে হল স্মৃতির পাতা হাতড়াতে গিয়ে মনের কোন গহনে হারিয়ে গেছে সে।

শহীদ পার্কে এসে গাড়ি প্রবেশ করল।

নাম পার্ক কিন্তু যাকে পার্ক বলে তার কোন চিহ্ন নেই। উন্মুক্ত একটা মাঠ। মাঠের চারদিক দিয়ে কাঁটা গাছের বেষ্টনী। মাঠের মাঝখানে নানা রকমের পাথর সাজিয়ে একটা মিনারের মত দাঁড় করানো হয়েছে। মিনার থেকে কয়েকগজ পশ্চিমে একটা বিল্ডিং এর ধ্বংসাবশেষ। সে ধ্বংসাবশেষের উপর বেড়া ঘেরা টিনের একটা মসজিদ। এর সামনে মানুষ সমান উঁচু হয়ে একটা মিনারের ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে।

শহীদ পার্কে, পার্কের কিছুই নেই বটে, কিন্তু উরুমচি এবং এই এলাকায় মুসলমানদের জন্যে এই পার্ক সবচেয়ে আকর্ষণীয় জায়গা। দূর-দূরান্ত থেকে প্রতিদিন মানুষ এখানে আসে। ঐ ভাঙ্গা মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ে। তারপর পাথরের ওপর পাথর রেখে তৈরী মিনারের মত সেই পাথরের স্তুপটার কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ মৌনভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। কারো চোখে মুখে বিস্ময়, কারো চোখে জ্বলে ওঠে প্রতিশোধের আগুন এবং কারও চোখ থেকে গড়াতে থাকে অশ্রু। কুখ্যাত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ইতি ঘটার পর থেকে উরুমচির সবচেয়ে বড় ঈদের জামাত এই শহীদ পার্কেই অনুষ্ঠিত হয়।

আহমদ মুসাদের গাড়ি গিয়ে পাথর সাজিয়ে গড়া সেই মিনারটার কাছে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নামল সবাই। গাড়িটা বন্ধ করে ইউসুফ চিয়াং নামল সবার পরে।

ততক্ষনে আহমদ ইয়াং আহমদ মুসা ও আবদুল্লায়েভকে নিয়ে মিনারের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

আহমদ ইয়াং বলল, মুসা ভাই, পাথরের ওপর পাথর দিয়ে গড়া এই এবড়ো-থেবড়ো স্তুপটাকেই সকলে শহীদ মিনার বলে। এখানেই আমাদের ইউসুফ চিয়াং এর আব্বা কাজাখ নেতা ওসিমানকে কম্যুনিষ্টরা ফাঁসি দেয়। আপনি নিশ্চয় দেখেছেন, ঐ যে সামনে ওখানে উরুমচির সবচেয়ে বড় মসজিদ ছিল এবং এই উন্মুক্ত স্থান ও এর আশে পাশে ছিল কাজাখ ও উইঘুর মুসলমানদের এক বিরাট বসতি। কম্যুনিষ্টরা সেদিন এলাকার মুসলিম নারী, শিশু ও বৃদ্ধের কোমরে দড়ি বেঁধে সবাইকে এই মসজিদের সামনে হাজির করেছিল এবং তাদের চোখের সামনে তাদের মুক্তি আন্দোলনের নেতা ওসিমানকে এই জায়গায় ফাঁসি দেয়। যুবকরা সবাই তখন পাহাড়ে পালিয়ে মুক্তি আন্দোলনে শরিক হয়। এই মর্মান্তিক হত্যাকান্ড দেখে অসহায় বৃদ্ধ, নারী, শিশুরা ডুকরে কেঁদেছিল। ফাঁসি দিয়ে হত্যার পর ওসিমানের লাশ তারা একটা লম্বা কাঠের দন্ডে এখানেই টাঙ্গিয়ে রাখে। সেদিন সন্ধ্যা নামলে মুক্তি সংগ্রামীরা পাহাড় থেকে নেমে আসে এবং লাশ নিয়ে ঐ পাহাড়ে দাফন করে। থামল আহমদ ইয়াং।

সবাই নিরব। সবার বিষন্ন চোখে যেন একটা শুন্য দৃষ্টি। সবারই মন যেন হারিয়ে গেছে কোন দূর অতীতে।

ওসিমান চীনা মুসমানদের একটা প্রিয় নাম, সংগ্রামী চেতনার একটা প্রতীক। সিংকিয়াং যখন কম্যুনিষ্ট কবলে চলে গেল, উরুমচির ওপর যখন তাদের বিষাক্ত থাবা এসে চেপে বসল, তখন শেষ প্রতিরোধের জন্যে সংঘবদ্ধ হলো এলাকার কাজাখ ও উইঘুর মুসলমানরা। এদের নেতৃত্ব দিলেন ঈমান দীপ্ত, নির্ভীক কাজাখ নেতা ওসিমান। ওসিমানের ফাঁসি আন্দোলনের ক্ষতি করেছিল, কিন্তু আন্দোলনকে থামিয়ে দিতে পারেনি। বহু বছর কম্যুনিষ্টরা শান্তিতে ঘুমাতে পারেনি। কার্যকর কোন শাসন কাঠামো দাঁড় করাতে পারেনি। ওদের হিসেবেই কম্যুনিষ্টদের দুই শ' চারটি নির্বাচন প্রচেষ্টা মুক্তি সংগ্রামীরা নস্যাত করে দেয়।

আহমদ ইয়াং সবাইকে নিয়ে চলল ধ্বংসপ্রাপ্ত বিশাল মসজিদ বিল্ডিং এর কোণে দাঁড়ানো বেড়া দিয়ে তৈরী সেই মসজিদের কাছে।

আহমদ ইয়াং বলল, ওসিমানকে ফাঁসি দেয়ার দু'দিন পর বিদ্রোহীদের আড্ডা আখ্যা দিয়ে কম্যুনিষ্টরা মসজিদ বিল্ডিংটি ভেঙ্গে সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। মসজিদের গগণভেদী বিশাল মিনার আপনি দেখেছেন, দেখুন এখন ঐটুকু অতীতের সাক্ষী হিসেবে টিকে আছে।

মসজিদ ভাঙ্গা এবং এর সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের তীব্র প্রতিক্রিয়া হয় মুসলমানদের মধ্যে। বৃদ্ধ, নারী ও শিশুরাও পাগলের মত রাস্তায় নেমে আসে। সেই রাতেই কম্যুনিষ্টরা জ্বালিয়ে দেয় গোটা জনপদ। অনেকেই পুড়ে মারা যায়। গোটা উরুমচি যেন তারপর এক বিরাণ প্রান্তরে পরিণত হয়। সেই থেকে এই মাঠে কোন জনপদ গড়ে ওঠেনি। হান গোষ্ঠীর জনপদ গড়ে তোলার চেষ্টা কম্যুনিষ্টরা বারবার চালায়, কিন্তু মুসলমানদের অব্যাহত প্রতিবাদের মুখে কোন বসতিই এখানে তাদের স্থায়ী হয়নি। অবশেষে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পরে কিছু অধিকার ফিরে পাওয়ার পর মুসলমানরা এই শহীদী ঈদগাহকে একটি পার্কের রূপ দিয়েছে।

সেই ভাঙ্গা টিনের মসজিদে সকলে দু'রাকাত নফল নামায পড়ল। সবাই একসাথে হাত তুলল দোয়ার জন্য। দোয়া করল তারা শহীদ ওসিমান এবং জানা-

অজানা সব শহীদানদের জন্যে। দোয়া করল তারা মুসলমানদের মুক্তির জন্যে এবং তাদের মুক্তি সংগ্রাম 'এম্পায়ার গ্রুপ'কে মনজিলে মকসুদে পৌছার তৌফিক দেয়ার জন্যে।

মসজিদ থেকে বেরিয়ে তারা গোটা মাঠটা একবার ঘুরল। তারপর ফেরার সময় আবার সেই ভাঙ্গা মসজিদের কাছে এসে দাঁড়াল। আহমদ মুসা বলল, তোমরা মসজিদটিকে তার সাবেক ভিত্তির ওপর পুনর্ণির্মান কর। এ সমজিদের নাম হবে 'শহীদ ওসিমান মসজিদ'। শহীদের জন্য আলাদা কোন শহীদ মিনারের প্রয়োজন নেই। শহীদ মিনারের স্থানসহ মসজিদের সামনে একটা ফুলের বাগান করে দাও।

ইউসুফ চিয়াং বলল, অতীতে অনুমতি লাভ একটা সমস্যা ছিল বটে, কিন্তু টাকাও একটা সমস্য ছিল। ইনশাআল্লাহ মসজিদটি গড়তে এখন আর আমাদের কোন অসুবিধা হবে না।

আহমদ মুসারা তাদের গাড়িতে উঠে বেরিয়ে এল শহীদ পার্ক থেকে।

গাড়ি এগিয়ে চলছিল তখন মার্কস এভিনিউ দিয়ে। এ রাস্তাটির নাম আগে ছিল 'সাতুক বোগরা খান রোড'। কম্যুনিষ্টরা এ মুসলিম নাম পরিবর্তন করে এই নতুন রাম রাখে। এ রাস্তারই শেষ মাথায় সিংকিয়াং এ প্রথম মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল করিম সাতুক বোগরা খানের প্রাসাদ। প্রাসাদটি এখন উরুমচি কম্যুনিষ্ট পার্টির ফার্ষ্ট সেক্রেটারীর বাসভবন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বাড়িটি দেখার জন্যেই যাচ্ছিল আহমদ মুসারা। ড্রাইভ করছিল ইউসুফ চিয়াং।

শহরের এই এলাকাটা জনবিরল। তীব্র গতিতে এগিয়ে চলছিল আহমদ মুসাদের গাড়ি।

অনেকক্ষণ ধরেই ইউসুফ চিয়াং গাড়ির রিয়ার ভিউ এর দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিল। রিয়ার ভিউ-এ অনেকক্ষণ ধরে একটা গাড়িকে সে দেখছে। গাড়িটি সমান দুরত্ব বজায় রেখে আসছিল। গাড়ির গতি বাড়িয়ে, কমিয়ে সে দেখল ও গাড়িটারও গতি সমানতালে বাড়ছে, কমছে। তাহলে ওরা কি আমাদের অনুসরণ করছে?

আরও একটু পর্যবেক্ষণ করার পর ইউসুফ চিয়াং আহমদ মুসাকে বলল, মুসা ভাই, মনে হচ্ছে একটা গাড়ি আমাদের পিছু নিয়েছে।

- কি গাড়ি?

- ফোর্ড কার।

- সরকারী, না বেসরকারী?

- সরকারী নয়।

আহমদ মুসা চারদিকে একবার দৃষ্টি ফেরাল। দেখল মার্কস এ্যাভিনিউ থেকে একটা রাস্তা ডানদিকে বেরিয়ে উপত্যকার দিকে চলে গেছে। আহমদ মুসা জিজ্ঞেস করল, ডানদিকের রাস্তাটা কোথায় গেছে ইউসুফ?

- মাইল পাঁচেক ঘুরে একটা খামার ঘুরে রাস্তাটা আবার এই মার্কস এভিনিউ এর গোড়ায় গিয়ে মিশেছে।

- ঠিক আছে গাড়ি তুমি ডান দিকে ঘুরিয়ে নাও। গাড়ী ধীরে চালাও। লোকালয় থেকে সরিয়ে নিয়েই দেখতে হবে ওকে।

ইউসুফ গাড়ি ঘুরিয়ে ডাইনের রাস্তা দিয়ে চলল। রাস্তাটা খুব প্রশস্ত নয়। খুব বেশী হলে তিনটা গাড়ি পাশাপশি চলতে পারে।

গাড়ি ঘুরিয়ে নেবার পর অনুসরণকারী গাড়িটি রিয়ার ভিউ থেকে হারিয়ে গেল। কিন্তু মিনিট তিনেক পরই আবার রিয়ার ভিউ-এ ধরা পড়ল গাড়িটি।

ইউসুফ চিয়াং খবরটা জানাল আহমদ মুসাকে।

আহমদ মুসা একটু চিন্তা করল। তারপর বলল, সামনে রাস্তা মোড় ঘুরেছে দেখতে পাচ্ছি। ওখানে গিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে পিছনে ফিরে চল।

আর কিছুটা এগিয়ে মোড়ে গিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে নিল ইউসুফ। তারপর আবার মার্কস এ্যাভিনিউ এর দিকে ফিরে চলল।

ইউসুফের গাড়ি ঘুরিয়ে নিলে অনুসরণকারী গাড়িটি মহূর্তের জন্যে থেমে গিয়েছিল। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্যেই। তারপর আবার সমান গতিতে চলতে শরু করল।

আহমদ মুসা পেছনের গাড়িটির দিকে তাকিয়েছিল। বলল ইউসুফ, আর কোন সন্দেহ নেই ওটা ফেউ গাড়ি।

তারপর হাসান তারিকের দিকে চেয়ে বলল, তোমার এম-১০ রেডি?

-হ্যাঁ।

-ওরা দু'জন লোক। সামনেই বসেছে। অফেনসিভে নাও যেতে পারে। সেক্ষেত্রে ওদের গাড়ি অতিক্রম করার পর ওদের চাকা ফাটিয়ে দেবে, এবং সংগে সংগে আমাদের গাড়িও থেমে যাবে এবং আমরা নেমে পড়ব। ওদের মারা নয় ধরতে চাই। আর যদি ওরা আক্রমণ করতে চায় তোমার এম-১০ যেন ওদের সে সুযোগ না দেয়। ওদের গাড়ির যে পজিশন তাতে ওদের ডান দরজা দিয়ে গুলি আসবে না। আসলে তা বাম জানালা দিয়ে ড্রাইভারের হাত থেকেই আসবে। তোমার এম-১০ তৈরী রেখে খেয়াল রাখ ওদের বাঁ জানালার দিকে।

বলে আহমদ মুসা ছোট দূরবীন তুলে দিল হাসান তারিকের হাতে।

হাসান তারিক ওটা চোখে লাগাল।

আহমদ মুসাদের গাড়ির মাথা যখন অনুসরণকারী সামনের গাড়িটার পয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণে গিয়ে পৌঁছল, তখন হাসান তারিকের চোখে ধরা পড়ল ও গাড়ির ড্রাইভারের ডান হাতটা ষ্টিয়ারিং হুইল থেকে নিচে নেমে গেল, তারপর তা উঠে এল জানালায়। একটি রিভলভারের কালো নল তার চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

হাসান তারিক আর দেরী করা ঠিক মনে করল না। হাসান তারিকের ডান হাতে এম-১০ রেডি ছিল। গর্জে উঠল তার এম-১০। ওপক্ষের রিভলভারও গর্জে উঠেছিল। কিন্তু ততক্ষণে বৃষ্টির মত এক পশলা গুলি গিয়ে ঘিরে ধরেছিল ঐ গাড়িটিকে। গুড়ো হয়ে গিয়েছিল ওদের গোটা উইন্ড শিলড।

আর ওপক্ষের গুলিটি এসে বিদ্ধ হয়েছিল আহমদ মুসাদরে গাড়ির এক ইঞ্চি ওপরে। বোঝা গেল ড্রাইভিং সিটের ইউসুফ ছিল ওদের প্রথম টারগেট।

হাসান তারিকের গুলি বৃষ্টি যখন থামল, তখন আহমদ মুসাদের গাড়ি সামনের গাড়ির সমান্তরালে এসে গেছে। দেখা গেল, ওদের ড্রাইভার তার সিটেই ঢলে পড়ে গেছে। আর অন্যজনের দেহের অর্ধেকটা গড়িয়ে পড়ে গেছে বাইরে। বোধ হয় সে দরজা খুলে জাম্প দিতে চেয়েছিল, কিন্তু সময় হয়নি।

গাড়ি থামিয়ে ইউসুফ নেমে পড়ল। তাড়াতাড়ি ওগাড়ির দরজা খুলে ইউসুফ ড্রাইভার লোকটার কলার ব্যান্ড উল্টিয়ে এক নজর দেখেই আহমদ মুসার দিকে ফিরে তাকাল। আহমদ মুসারাও তখন গাড়ি থেকে নেমেছে। ইউসুফ বলল, এরা 'রেড ড্রাগন' এর সদস্য।

-এরা আমাদের পিছু নিল কেন? বলল আহমদ মুসা।

-এরা একই সাথে সরকার এবং 'এম্পায়ার গ্রুপ' তখা মুসলিম স্বার্থের বিরোধী। এ ছাড়া 'ফ্র' এবং 'রেড ড্রাগন' এরা এখন ঘনিষ্ঠ মিত্র।

তাড়াতাড়ি গাড়ি এবং তাদের পকেট সার্চ করে যে কাগজপত্র পেল, তা নিয়ে আহমদ মুসারা গাড়িতে উঠল।

গাড়িতে উঠে আহমদ মুসা বলল, পুলিশ এসে কিছু কি বুঝবে?

-বুঝবে। ওদরে জামার কলার ব্যান্ডে রেড ড্রাগন-এর প্রতীক রেড ড্রাগনের মুখ আঁকা আছে।

-আচ্ছা, ওদের মতলবটা কি ছিল আঁচ করতে পার?

ইউসুফ চিয়াং এর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

-আমার মনে হয় এটা ওদের কোন পরিকল্পিত ব্যাপার নয়। শহীদ পার্ক থেকেই ওরা আমাদের পিছু নিয়েছে। সম্ভবত আমাকে ওরা চিনতে পারে এবং ঠিকানা উদ্ধারের জন্যে পিছু নেই।

-আমারও তাই ধারণা। বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা আর কোন কথা না বলে ওদের কাছ থেকে পাওয়া কাগজের দিকে মনোযোগ দিল।

অধিকাংশ কাগজই অপ্রয়োজনীয়। এ সবের মধ্যে রয়েছে পরিবারিক হিসেব-নিকেশ, সিনেমার টিকেট, গোপন লটারীর কুপন, ইত্যাদি। কাগজপত্রের মধ্যে মুখবন্ধ নয়- পোষ্টাল একটি ইনভেলাপ এবং ছোট একটি চিরকুট পেল। চিরকুটটিতে একটি মাত্র লাইন শুধু। বলা হয়েছে, 'লেলিন স্কোয়ারের দশ নম্বরে বৈঠক রাত বারটায়।' আর ইনভেলাপটি ফেড়ে পাওয়া গেল একটি চিঠি। ঠিক চিঠি নয় রিপোর্টের মত। বক্তব্যের শেষে 'সু সাং' নামের একটি দস্তখত ছাড়া কোন সন্ধান নেই।

চিঠিতে বলা হয়েছে, "শিহেজী উপত্যকার অবস্থা ভাল নয়। সরকার 'এম্পায়ার গ্রুপ' এর সাথে রক্তপাত এড়িয়ে চলতে চায়। আমরা লোক পাঠিয়েছি, আমরা ছাড়ব না। এদিকে, 'ফ্র' এর সব ঘাঁটি 'এম্পায়ার গ্রুপ' ধ্বংস করে দিয়েছে। জেনারেল বোরিসের সব সোনা এখন তাদের দখলে। আহমদ মুসাও মুক্ত। মুশকিল হয়েছে আমাদের কোন লোক আহমদ মুসাকে দেখেনি, জেনারেল বোরিস দেখাননি। তাই আমাদের কোন করণীয় দেখছি না। কিন্তু 'এম্পায়ার গ্রুপে'র সাথে আহমদ মুসার সম্মেলন আমাদের বিপদ ঘটাবে। আমি চেষ্টা করছি এম্পায়ার গ্রুপ-এর ঠিকানায় পৌছার জন্যে। শহীদ পার্ক, ইবনে সাদ মসজিদ, ইমাম বোখারী মাদ্রাসা সহ তাদের আসা যাওয়ার সব জায়গায় সার্বক্ষণিক লোক বসিয়েছি। কিন্তু মুশকিল হয়েছে মুসলমানদের মধ্যে অমুসলমান চীনাদের অবস্থান খুব তাড়াতাড়ি ধরা পড়ে যায়।" আহমদ মুসা চিঠি ও চিরকুট ইউসুফ চিয়াং এর হাতে দিল। ইউসুফ চিয়াং গাড়ি চালানোর ফাঁকে চিরকুট ও চিঠিটা পড়ে নিল। পড়ে বলল, মুসা ভাই, চিরকুটটা আমরা পুলিশের কাছে পাঠিয়ে দেই। রেড ড্রাগনকে শায়েস্তা করার জন্য পুলিশই যথেষ্ট, ওরা হন্যে হয়ে ওদের খুঁজছে।

আহমদ মুসা বলল ঠিক আছে, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার পলিসি মন্দ নয়।

-মুসা ভাই, ইবনে সাদ মসজিদে আমাদের মাগরিবের নামায পড়ার ইচ্ছা বোধ হয় পরিত্যাগ করতে হয়। বলল ইউসুফ চিয়াং।

-জানতাম তুমি এ কথা বলবে। ঠিক আছে।

-আমরা ওদেরকে অন্ধকারেই রাখতে চাই। শহীদ পার্ক, ইবনে সাদ মসজিদ এবং ইমাম বোখারী মাদ্রাসা এলাকা থেকে ওদের ফেউদের পাকড়াও করার ব্যবস্থা আজকেই করছি।

-তাহলে চল এখন ফেরা যাক ইউসুফ।

একটু থেমে আহমদ মুসা বলল, শিহেজী উপত্যকার যে কথাটা লিখেছে তা পড়েছ তো?

-পড়েছি। গন্ডগোল ওখানে একটা হবেই। চিন্তান্বিত কন্ঠস্বর ইউসুফ চিয়াং এর।

গাড়ি ছুটে চলল ইবনে সাদ রোডের দিকে। গাড়ি যখন মেইলিগুলির বারান্দায় প্রবেশ করল, তখন দূরের মসজিদে মাগরিবের আযান হচ্ছে। নামায পড়া শেষে জায়নামায তুলতে তুলতে মা-চু বলল, মা মনি বলেছেন সবাই না পারলেও অন্তত দু'জন মেহমানকে এখানে থাকতে। পাশের ঘরে ওঁদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আহমদ মুসার খুব ভালো লাগল এই প্রস্তাবটা। মনটা যেন তার এর অপেক্ষা করছিল।

আহমদ মুসা তাকাল ইউসুফের দিকে।

ইউসুফ বলল, মুসা ভাই এ রকম কিছুর কথা আমিও চিন্তা করছিলাম। এভাবে একা একা থাকা আপনার ঠিক নয়।

-কে কিংবা কারা এখানে থাকবে বল।

-আমি মনে করি, হাসান তারিক ভাই এবং আহমদ ইয়াং এখানে থাকুক।

-ইউসুফ চিয়াং এর প্রস্তাব ভাল। বলল আবদুল্লায়েভ।

-ঠিক আছে, রাত্রে এসে থাকা যাবে, কিন্তু এখন তো আমাদের বাইরে বেরুতে হবে ইউসুফ, বলল হাসান তারিক।

-হ্যাঁ তারিক ভাই, যে তথ্যগুলো পাওয়া গেছে, ওগুলোর ব্যাপারে একটু মনোযোগ দেয়া দরকার। এ সময় নাস্তার খবর এল।

হাসান তারিকরা চারজন নাস্তা খেয়ে বেরিয়ে গেল।

আহমদ মুসা তার ঘরে ফিরে এল। দেখল তার বিছানার ওপর এক সেট কাপড়।

মা-চু'র দিকে চেয়ে আহমদ মুসা বলল, এগুলো এখানে কেন মা-চু?

-আপনার পোশাক পাল্টাবার জন্যে।

-কেন?

-বাইরে থেকে এসেছেন, ওগুলোর মধ্যে ইনফেকশনের কিছু থাকতে পারে।

-কে বলেছে?

-মা মনি বলেছেন।

আহমদ মুসা মনে মনে হাসল। বলতে চাইল, তোমার মা মনি কি আমাকে ননির পুতুল মনে করে? কিন্তু তার মনে একটি জিনিস বিধল, সব দিক পাহারা দেবার, সবদিকে নজর রাখার অদ্ভুত যোগ্যতা ওর আছে।

আহমদ মুসা ড্রেসিং রুম থেকে পোশাক পরে ফিরে এসে বলল, তোমার মা মনি কেমন আছে মা-চু?

-বিকেলে জ্বর ছেড়ে গেছে। আজ সারা বিকেল মা মনি খালাম্মার কাছে কোরআন শরীফ পড়েছে। জানেন, মা মনি নামাজও পড়ে?

-তোমার মা মনি বোধ হয় খুব ভাল তাই না?

-না খালাম্মার এ সব কথায় সে কোনই পাত্তা দিত না। আপনি আসার পর ভাল হয়ে গেছে।

-কেন?

-আপনাকে ভয় করে।

-ভয় করবে কেন?

-করে, এই দেখুন, বিকেলে মা মনি এসে এ ঘর ঠিকঠাক করে দিয়ে গেছে। কিন্তু আমকে নিষেধ করেছে আপনাকে বলতে।

-আমি যদি এখন বলে দিই তোমার মা মনিকে?

-বলবেন না আমি জানি।

-কেমন করে জান?

-আপনি খুব ভাল, মা মনি বলেছে।

-তোমার মা মনি বললেই হল?

-আমার মা মনি অনেক জানে। মা মনি মিথ্যা বলে না।

-ঠিক আছে। শোন, তোমার মা মনিকে বলো, ওর গাড়ির উইন্ড শিল্ডের ওপরে একটা গুলি লেগে কিছু ক্ষতি হয়েছে।

মা-চু দু'চোখ ওপরে তুলে কিছু বলতে যাচ্ছিল। এমন সময় বাইরে তার ডাক পড়ল। গলাটা মনে হল মেইলিগুলির।

মা-চু ছুটে বাইরে চলে গেল। অনেকক্ষণ পর ফিরে এল মা-চু।

আহমদ মুসা বিছানায় গা এলিয়ে দিল। ঘরে ঢুকে মা-চু বলল, স্যার খালাম্মা এখানে আসবেন।

আহমদ মুসা উঠে বসল। বলল, খালাম্মা মানে দাদি?

-হ্যাঁ।

-হাঁটতে কষ্ট হয় তাঁর। আমিই তাঁর কাছে যাব। উনি ঘরে আছেন এখন?

-হ্যাঁ।

আহমদ মুসা উঠল। মা-চুকে সাথে নিয়ে বেরুল ঘর থেকে।

দাদির ঘরে সুন্দর একটি শোবার ডিভান। ডিভানের সামনে দু'পাশে দু'টি করে চারটি সোফা।

একপাশে দু'টি করে চারটি সোফা।

একপাশে দু'টি সোফায় দাদি এবং মেইলিগুলি পাশাপাশি বসে গল্প করছিল। এমন সময় দরজায় এসে দাঁড়াল মা-চু। বলল, স্যার ঘরে আসবেন।

-দাদি তোমাকে বলেছেন না, দাদিই ওখানে যাবেন? বলল মেইলিগুলি।

-সেটা বলেছি আমি স্যারকে, বলল মা-চু।

ইতিমধ্যে দাদি উঠে দাঁড়িয়েছে। বলল, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন ভাই, এস ঘরে এস।

আহমদ মুসা ঘরে ঢুকে সালাম দিল। মেইলিগুলিও উঠে দাঁড়িয়েছিল। একরাশ লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে তার মুখ। সে তার গায়ের চাদর টেনে নিয়েছে মাথার উপর। কপালও ঢেকে গেছে সে চাদরে।

সে সরে গিয়ে ডিভানের কোণায় জড়সড় হয়ে বসে পড়ল।

আহমদ মুসা গিয়ে আরেক পাশের সোফায় দাদির মুখোমুখি হয়ে বসল। দাদীই প্রথম কথা বলল, কেমন আছ ভাই?

-ভাল আছি, দাদী।

-খারাপ থাকলে কি তোমরা বলবে, বল?

-আল্লাহ মানুষকে কোন সময় খারাপ রাখেন না, দাদী।

-কেন মানুষতো দুঃখ-কষ্ট ও রোগ শোকে পড়ে।

-তা পড়ে, কিন্তু ওটা তার জন্যে খারাপ অবস্থা নয়। দুঃখ-কষ্ট রোগ-শোকের মধ্যেও মানুষের মঙ্গল নিহিত থাকতে পারে সে কথা আমি যদি নাও বলি, তবু এ কথা বলা যায়, জীবন-নাট্যের এ গুলো বিভিন্ন দৃশ্য। জীবনের সাথে এর প্রয়োজন অবিচ্ছেদ্য। দুঃখ না থাকলে সুখ হতো না দাদী।

-তাই বলে দুঃখকে বরণ করে নেয়া যায়?

-মানুষ ভালোর জন্য চেষ্টা করবে এটাই আল্লাহর ইচ্ছা। দুঃখ যেহেতু 'ভাল নয়, তাই একে স্বাগত জানানোর প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু 'ভাল'র জন্য চেষ্টা সত্বেও দুঃখ যদি আসেই এবং তাকে সানন্দে বরণ করে নেবার মত ধৈর্য যদি থাকে তাহলে দুঃখকেও এক প্রকার সুখে পরিণত করা যায়।

দাদী মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল আহমদ মুসার দিকে। বলল, এ জ্ঞানের জন্য অনেক বড় হওয়া প্রয়োজন। এ সৌভাগ্য ক'জনের আছে।

আহমদ মুসা মাথা নেড়ে বলল, না দাদী তা ঠিক নয়। কুড়েঘড়ে মাটিতে শুয়ে একজন অজ্ঞ মানুষ ভাবনা-চিন্তাহীন নির্মল হাসি হাসতে পারে, অন্যদিকে একজন বালাখানার বাসিন্দার জীবনে নির্মল হাসির সুযোগ নাও ঘটতে পারে। আসলে প্রকৃত সুখ হৃদয় নির্ভর, বাইরের অবস্থার নির্ভর করে না। আর এ হৃদয়ের মালিক তো সকলেই।

আহমদ মুসা দৃষ্টি নিচু রেখে কথা বলছিল। দাদি তার দিকে অপলক চোখে তাকিয়েছিল। মেইলিগুলির উজ্জ্বল দৃষ্টিও ছিল ওর প্রতি নিবদ্ধ।

আহমদ মুসা থামলেও দাদী কিছু বলল না। ভাবছিল। একটু পরে বলল, ঠিক বলেছ ভাই।

দাদী আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। এমন সময় কাজের ছোট মেয়ে দরজায় আবির্ভূত হয়ে বলল, দাদী গরম পানি রেডি।

দাদী আহমদ মুসাকে বলল, একটু বস আমি এখনই আসছি

বলে উঠতে উঠতে দাদী মেইলিগুলি বলল, ওভাবে কোণায় ঢুকছিস কেন? একটু কথা বল আমি আসছি।

দাদী বেরিয়ে গেল।

দু'জনেই নিরব। আহমদ মুসার মুখ নিচু, মেইলিগুলিরও।

অস্বস্তিকর নিরবতা ভেঙ্গে আহমদ মুসাই প্রথম কথা বলল। বলল সে, তোমার গাড়ির ক্ষতি হয়েছে দেখেছ?

মেইলিগুলি মাথা নিচু করে দু'হাতে ওড়নার খুট ধরে নাড়া চাড়া করছিল। আহমদ মুসার কথা শেষ হবার একটু পর বলল, আপনার এভাবে বাইরে যাওয়া ঠিক নয়।

-বাইরেইতো আমার কাজ।

-আপনি আগে সুস্থ হোন।

একটু দম নিল মেইলিগুলি। তারপর বলল, আজ সেখানে যদ বেশি হাঁটা কিংবা ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার প্রয়োজন হতো, তাহলে কি...

কথা শেষ করতে পারলো না মেইলিগুলি। ভারী হয়ে ওঠা কন্ঠটি তার রুদ্ধ হয়ে গেল। মুখটা তার নিচু ছিল, আরও নিচু হয়ে গেল।

আহমদ মুসা তার মুখটা মেইলিগুলির দিকে তুলতে গিয়েও আবার নামিয়ে নিল।

তার হৃদয়ের অন্তঃপুরে এক নরম অনুভূতি হঠাৎ করে মাথা জাগাল। এমন সহৃদয় নিয়ন্ত্রণের মুখোমুখি সেতো কোন দিন হয়নি। তাকে নিয়ে এমন সজল উদ্বেগও তার কাছে অপরিচিত।

আহমদ মুসা মেইলিগুলির কথার কোন জবাব দিতে পারলো না।

মেইলিগুলি মুখ নিচু করে বসেছিল।

আবার নিরবতা।

মেইলিগুলিই আবার মুখ খুলল। স্বগতঃ উক্তির মত ধীর কন্ঠে বলল, আমি আর স্টুডিওতে ফিরে যাব না সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

আহমদ মুসা আবার মুখ তুলতে গিয়ে পারল না। মেইলিগুলির কথার শেষ ধ্বনিও অনেকক্ষণ মিলিয়ে গেছে বাতাসে। আরও পরে আহমদ মুসা ধীরে ধীরে বলল, কিন্তু অনেক কন্ট্রাক্ট তো তোমার রয়েছে।

-সব বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সবটার জন্যে ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেব আমি।

-সেত বিরাট অংক।

-যে কোন ক্ষতি আমি স্বীকার করে নেব।

আহমদ মুসার চোখ যেন তার অজ্ঞতেই ওপরে উঠে গেল। পারবে তুমি এত সহজে তোমার ঐ জীবন থেকে ফিরে আসতে, মেইলিগুলি।

-আমি আর মেইলিগুলি নই আমি....... আমি `আমিনাগুলি'।

শেষ কথাগুলো তার প্রায় ভেঙ্গে পড়েছিল। মেইলিগুলির দু'চোখের কোণায় চকচক করছে অশ্রু।

এ সময় দাদি এসে ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকল।

বসতে গিয়ে মেইলিগুলিকে চোখ মুছতে দেখে বলল, তোর আবার কি হল? চোখ মুছছিস যে?

আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি বলল, দাদি, আপনার নাতনি স্টুডিওর কাজ ছেড়ে দিল।

'ছেড়ে দিল, সত্যি?' বলে দাদি মেইলিগুলির কাছে গিয়ে ওর মুখটা তুলে ধরে বলল, সত্যি বোন ছেড়ে দিলি তুই?

-হ্যা দাদি। মুখটা নামিয়ে নিয়ে বলল মেইলিগুলি।

দাদি মেইলিগুলিকে বুকে টেনে নিয়ে কপালে অনেক চুমু খেয়ে বলল, বোন তোকে দোয়া করি, তুই আরও বড হ, তোকে আল্লাহ্ আরও সৌভাগ্য দান করুন।

দাদি এসে সোফায় বসতে বসতে বলল, জান ভাই, আমার এ বোনটির মন এত ভাল, এত বুদ্ধি ওর। আমার একটাই রাগ ছিল ওর ওপর। আজ থেকে তাও .....

দাদি তার কথা শুরু করলে মেইলিগুলি উঠে দাঁড়িয়েছিল। বেরিয়ে যাচ্ছিল সে।

দাদি তার কথা শেষ না করেই বলল, যাচ্ছিস কোথায় আমিনা শোন। ভাইটিকে তো ও কথা বলাই হয়নি।

মেইলিগুলি কান দিল না এদিকে। ছুটে বেরিয়ে গেল।

ওর বেরিয়ে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে দাদি বলল, লক্ষ্মী বোন আমার। যতখানি বেপরোয়া ছিল ততখানিই বদলে গেছে। এখন তোমার সামনেও বেরুতে চায় না।

তার পর মুখ ঘুরিয়ে আহমদ মুসার দিকে চেয়ে বলল, জান ও বোরখা তৈরী করতে দিয়েছে?

-খুশি হলাম। আহমদ মুসা বলল।

-খুশি হবেই এ কৃতিত্ব তোমার।

দাদির ঠোঁটে হাসি। আহমদ মুসা মুখ নামিয়ে নিল।

দাদিই আবার কথা বলল, শুন, আজ তুমি বাইরে গেলে পথে কি ঘটেছিল?আমিনা সেটা জানতে চেয়েছিল। এ জন্যই আমি তোমার ওখানে যেতে চেয়েছিলাম।

-না তেমন কিছু নয় দাদি। দু'জন শত্রু গাড়ি নিয়ে আমাদের গাড়ি ফলো করেছিল। ওদের সাথেই সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে ওরা দু'জনই মারা গেছে।

-এত বড় ঘটনা, তবু কিছু না বলছ? তুমি জীবনের ভয় কর না?

-না দাদি, মুসলমানরা জীবনের ভয় করেনা। মৃত্যুর ফায়সালা তো আল্লাহ্র হাতে।

-ঠিক বলেছ ভাই। আমাদের অতীত তো এটাই।

একটু থামল দাদি। তারপর বলল, তবু আমিনাগুলি আনুরোধ করেছিল তুমি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত এভাবে বাইরে না যেতে।

-ঠিক আছে, ওকে বলবেন দাদি ওর কথা আমার মনে থাকবে। বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তাহলে আনুমতি দিন দাদি, আমি যাই। 'বেশ এস' বলে দাদিও উঠে দাঁড়াল।

শিহেজী উপত্যকা। সবুজ এক খণ্ড চাদর যেন। তিয়েনশান থেকে নেমে আসা একটা ছোট্ট নদী বয়ে গেছে উপত্যকার মধ্য দিয়ে। নদীর দু'পাশে বিস্তীর্ণ

এলাকা জুড়ে সবুজ গমের ক্ষেত। উপত্যকার প্রান্ত দিয়ে উইঘুর ও কাজাখ মুসলমানদের বসতি। দু'হাজার পরিবার এই উপত্যকায় বাস করত।

উপত্যকার মুখে অনেকখানি উপরে সবুজ বনানী ঘেরা পাহাড়ের কোলে বিরাট একটা হ্রদ। সেই হ্রদ থেকে প্রস্রবণ আকারে পানির স্রোত আছড়ে পডছে নিচের উপত্যাকায়। বলা যায় মিনি জলপ্রপাত। ওপরে তিয়েনশানের বরফমোড়া সফেদ শিরপা, তার নিচে সবুজ বনানীর অপরূপ বেষ্টনির মধ্যে বিশাল হ্রদ, হ্রদ থেকে সবুজ উপত্যকায় ঝরে পড়া রূপালী প্রস্রবণ। সব মিলিয়ে শিহেজী উপত্যকা সিংকিয়াং এর আকর্ষণীয় স্থানগুলোর মধ্যে একটি। হ্রদ ঘিরে একটা পর্যটন কেন্দ্রও গড়ে উঠেছে। সবুজ বনানী ঘেরা কালো হ্রদে নৌবিহার এক আকর্ষণীয় বিষয়।

সবুজ শিহেজী প্রাচুর্যের দিক দিয়েও উল্লেখযোগ্য। পাহাড়ের কোলে হওয়া সত্তেও এর ভূ প্রাকৃতি এমন যে এখানে প্রচুর গম উৎপাদন হয়ে থাকে। এখানকার চাহিদা মিটিয়েও প্রচুর গম দেশের অন্যান্য অঞ্চলে পাঠানো হয়।

এই শিহেজী উপত্যকায় স্মরণাতীত কাল থেকে উইঘুর এবং কাজাখরা বাস করছে। এখানে শতকরা এক'শ ভাগই মুসলমান। কিন্তু পর্যটন কেন্দ্রের নামে এখানে কম্যুনিস্ট সরকার হান গোষ্ঠীর বহু অমুসলমান লোককে এনে বসিয়েছে। তাদের বসাবার জন্যে জমি এ্যাকুয়ারের মাধ্যমে যে উইঘুর ও কাজাখ মুসলমান পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়েছে তাদেরকে আর শিহেজি উপত্যকায় বসতি স্থাপনের অনুমতি দেয়া হয়নি। এইভাবে এখানে একদিকে মুসলমানদের সংখ্যা কমানো হয়েছে অন্যদিকে অমুসলমান চীনাদের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। পর্যটন এলাকাসহ শিহেজী উপত্যাকায় হানগোষ্ঠীর পাঁচ'শ পরিবার আসন গেড়ে বসেছে।

এরপর জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের নাম দিয়ে উপত্যকার ওপর এলাকায় প্রায় দু'হাজার একর ফসলি জমি এ্যাকুয়ার করা হয়েছিল। শত প্রতিবাদ সত্তেও জাতীয় স্বার্থের নাম দিয়ে এই এলাকা থেকে মুসলমানদের জোর করে উচ্ছেদ করা হয়েছে। অতীতের মত তারাও এই উপত্যকার অন্য কোথাও বসতি স্থাপনের অধিকার পায়নি, এমনকি তাদেরকে উপত্যকার আত্মীয় স্বজনদের আশ্রয়েও

থাকতে দেয়া হয়নি। বাস্তুহারা হয়ে শত শত মুসলিম পরিবার অতি কষ্টের যাযাবার জীবন যাপন করছে।

কিন্তু সেই দু'হাজার একর জমিতে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প হলো না। গড়ে উঠতে লাগল বসতবাটি। আধুনিক প্যাটার্নের সুন্দর বাংলোতে ভরে গেল ঐ এলাকা। জানা গেল পাঁচশ হান পরিবার আসছে ওখানে স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য। এই খবরে ধৈর্যের বাধ ভেঙ্গে গেল উপত্যকার মুসলিম অধিবাসিদের। এই হানরা এখানে এসে বসলে অমুসলমানদের সংখ্যা উপত্যকার মোট জনসংখ্যার অর্ধেক হয়ে যাবে। উপত্যকার মুসলমানদের কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল, উপত্যকার গোঁটা জনপদ থেকেই এলাকার কম্যুনিস্ট সরকার মুসলমানদের তাড়াতে চায়।

উপত্যকার মুসলমানরা সম্মিলিতভাবে সরকারের এই উদ্যোগের প্রতিবাদ করল এবং দাবী করল যে, যেহেতু এখানে জল বিদ্যুৎ প্রকল্প হলো না, তাই এই জমি যাদের ছিল সেই বাস্তুহারাদের এনে এখানে পুনর্বাসন করা হোক? সেই সাথে তারা ঘোষণা করল, কিছুতেই আমরা এখানে হানদের বসতি স্থাপন করতে দেব না।

কিন্তু তাদের প্রতিবাদ ও দাবীর কোনই জবাব দিল না সরকার। বরং তারা গ্রেপ্তার ও নির্যাতনের শিকার হলো আর সরকার পরিকল্পনা নিল সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করে হানদের এনে এখানে বসানোর।

ওদিকে যে হান গোষ্ঠীর লোকরা এখানে আসবে তাদের সর্দার ওয়াংহুয়া এ এলাকা দেখে গেছে। এখানে সবুজ ফসলের হাতছানিতে তাদের চোখে লোভের আগুন চিকচিক করে উঠেছে। সেই সাথে তারা উইঘুর ও কাজাখদের ক্ষোভের আগুনও প্রত্যক্ষ করেছে। সব দেখে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, শুধু সরকারের উপর নির্ভর করলে তাদের তাদের চলবে না। মুসলমানদের সম্মিলিত দাবীর মুখে বর্তমান সরকারের গণতন্ত্রমুখী কেন্দ্র দুর্বল হয়ে পড়তে পারে, সিদ্ধান্ত পাল্টিয়ে ফেলতেও পারে। সুতরাং ওয়াংহুয়া চরম মুসলিম বিদ্ধেসী কট্টর কম্যুনিস্ট 'রেড ড্রাগনের' সাহায্য প্রার্থনা করল। 'রেড ড্রাগনের' চোখ আগে থেকেই নিবদ্ধ ছিল। তারা এবার প্রস্তাব পেয়ে লাফিয়ে উঠল।

তারপর তারা উপত্যকার এক হাজার মুসলিম পরিবার কে কিভাবে মুঠোয় এনে হানদের নিরাপদে বসানো যাবে তার একটা পরিকল্পনা দাড় করাল।

পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়ে গেল তাদের।

সে দিন কয়েকটি ছায়ামূর্তি শিহেজী উপত্যকার মুসলিম জনপদে প্রবেশ করল। শিহেজী গ্রামের পাশ দিয়ে একটি পাকা রাস্তা শিহেজী লেকের দিকে চলে গেছে। সেই রাস্তার ধারেই শিহেজীর জামে মসজিদ। এ জামে মসজিদ ছাড়াও কয়েকটি ওয়াক্তিয়া মসজিদ আছে উপত্যকার চারদিকে ছড়ানো শিহেজী গ্রামে। জামে মসজিদের পেছনে একটা গম ক্ষেতে গাড়ি লুকিয়ে রেখে তারা প্রবেশ করল গ্রামে।

ছায়ামূর্তি ছয়টি গ্রামের বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ল। গ্রামের কয়েকটা নির্দিষ্ট বাড়ির সামনে গিয়ে ওঁৎ পাতল তারা। বাড়িগুলো কাজাখ ও উইঘুরদের উল্লেখযোগ্য কয়েক ব্যাক্তির, তারা শিহেজী উপত্যকায় হানদের পুনর্বাসনের বিরুদ্ধে মুসলিম জনসাধারণকে নেতৃত্ব দিচ্ছে।

তখন আযান হয়ে গেছে। ফজরের নামাজের জন্যে মানুষ উঠেছে। পুরুষরা নামাজের জন্য তৈরী হয়ে মসজিদের দিকে যাচ্ছে। গাছ-পালা ঘেরা জনপদে তখনও বেশ অন্ধকার।

ছয়টি ছায়ামূর্তি ওঁৎ পেতে আছে সেই ছয়টি গলির মুখে। তাদের হাতে রিভলভার। সাইলেন্সার লাগানো।

সব বাড়ি থেকেই মানুষ মসজিদে এল ঐ ছয়টি বাড়ি ছাড়া। নিঃশব্দ ছয়টি গুলির আঘাতে বাড়ির উঠানে ওদের লাশ লুটিয়ে পড়েছিল। মসজিদে মানুষ যখন নামাযে দাড়াচ্ছিল। রক্তাক্ত লাশ নিয়ে ছয়টি বাড়িতে তখন মাতম।

ছায়ামূর্তি ছয়টি পরে এসে জমা হল সেই মসজিদের সামনে। রিভলভার পকেটে রেখে ওরা কাঁধে ঝুলানো স্টেনগান তুলে নিল হাতে।

মসজিদে তখন জামায়াত শুরু হয়ে গেছে।

ছয়জনের চারজন মসজিদের উঠানে পাহারায় থাকল। আর দু'জন উঠে গেল মসজিদে। তখনও চারদিকটা স্বচ্ছ হয়ে উঠেনি। জনমানবহীন পথ।

একজন মুসল্লী জামায়াত ধরার জন্য দ্রত মসজিদের দিকে আসছিল। স্টেনগানধারী চারজন চীনাকে মসজিদের উঠানে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে আঁৎকে উঠল।

মসজিদের দিকে সে আর না গিয়ে পেছন ফিরে দৌড় দিল এবং চিৎকার করে সবাইকে ডাকতে লাগল।

ঠিক এ সময় চারদিকের নিরবতা ভেঙ্গে পড়ল ব্রাস ফায়ারের শব্দে।

লোকটির চিৎকার এবং ব্রাস ফায়ারের শব্দে চারদিকে একটা আতংক ছড়িয়ে পড়ে। জামে মসজিদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় নারী ও বালক শিশু ছাড়া বড়দের প্রায় সবাই গিয়েছিল মসজিদে। যারা ছিল তারা মসজিদের দিকে ছুটল।

কিন্তু তারা যখন মসজিদের উঠানে পৌছল তখন গম ক্ষেতের সেই গাড়িটা চলতে শুরু করেছে। কেউ কেউ ছুটে গেল গাড়ির দিকে। কিন্তু গাড়ি তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে তখন উত্তর দিকে, উরুমচির পথে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গোটা গ্রাম এসে যেন ভেঙ্গে পড়ল জামে মসজিদে।

মসজিদের মেঝে রক্তে ডুবে গেছে।

ত্রিশটি লাশ এনে সারি করে রাখা হয়েছে মসজিদের চত্বরে। আহতের সংখ্যাও প্রায় পঞ্চাশের মত।

সেই ছয়টি লাশও মসজিদের চত্বরে আনা হল।

শোকের মাতম চারদিকে।

মসজিদের বারান্দায় ফেলে যাওয়া একটা চিঠি পাওয়া গেল, তাতে লেখাঃ 'নতুন হান বসতির দিকে বাঁকা চোখে তাকালে এমনিভাবে দুনিয়া থেকেই উচ্ছেদ হয়ে যেতে হবে'। চিঠির শেষে স্বাক্ষর নেই, শুধু 'লাল ড্রাগন' আঁকা।

ইউসুফ চিয়াং শিহেজী উপত্যকার রক্তাক্ত ঘটনার বিবরণ শেষ করার পর চুপ করল।

সবাই চুপচাপ।

মসজিদের মেঝেতে জমে থাকা পুরু চাপ চাপ রক্তের জমাট স্রোতটা যেন তাদের সবার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। ভেসে উঠেছে স্বজনহারা শত মানুষের বিলাপ ধ্বনি।

হাসান তারিক, আব্দুল্লায়েভ, আহমদ ইয়াং সবারই মাথা নিচু। আহমদ মুসার শূন্য দৃষ্টি বাইরে নিবদ্ধ।

মেইলিগুলির দু'তলার পারিবারিক ড্রইংরুমে বসে তারা কথা বলছে।

তখন বেলা আড়াইটা। আহমদ মুসা খেয়ে এসে এই ড্রইংরুমে দাদির সাথে আলাপ করছিল। সাথে ছিল হাসান তারিক এবং আহমদ ইয়াং। এই সময়ই শিহেজী উপত্যকার দুঃসংবাদ নিয়ে ইউসুফ চিয়াং ও আব্দুল্লায়েভ প্রবেশ করে।

কথা শুরু হলে দাদি উঠে গেছে। ইউসুফ চিয়াং ও আব্দুল্লায়েভের চোখ-মুখ দেখেই বুঝেছে বড় ধরণের কিছু ঘটেছে।

দাদির কাছে খবর শুনে মেইলিগুলি এসে দাঁড়িয়েছে ড্রইংরুমের উত্তর পাশের পার্টিশন ডোরের ওপারে। ইউসুফ চিয়াং এর সব কথা তার কানে গেছে। আহমদ মুসার বেদনার্ত শূন্য দৃষ্টি সে পরিস্কার দেখতে পাচ্ছে। তার বুকটা কাঁপছে।

নির্বাক নিরবতার অবসান ঘটিয়ে আহমদ মুসাই প্রথম কথা বলল। সে বাইরে থেকে তার শূন্য দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে ইউসুফ চিয়াং এর উপর নিবদ্ধ করল। শুকনো মুখ, উস্কো-খুস্কো চেহারা ইউসুফ চিয়াং ও আব্দুল্লায়েভের।

আহমদ মুসা বলল, তোমরা এখন কোথেকে আসছ?

ইউসুফ চিয়াং বলল, মুসা ভাই, ইবনে সাদ মসজিদ এবং ইমাম বোখারী মাদ্রাসার সামনে থেকে 'রেড ড্রাগনে'র যে দু'জন ধরা পড়েছে, ওদের কাছ থেকে রেড ড্রাগনের দু'টো ঘাঁটির সন্ধান পেয়েছিলাম। মনে করেছিলাম ধীরে সুস্থে আজ রাতে সেখানে অভিযানে যাব। কিন্তু শিহেজীর খবর পাওয়ার পর আর থামতে পারিনি। আপনার অনুমতি নেবার সময় পাইনি। আব্দুল্লায়েভ ও লোকজনসহ সেখানেই গিয়েছিলাম।

-কি খবর?

-দুই ঘাটিতে মোট চৌদ্দজনকে পাওয়া গেছে! তার মধ্যে পাঁচজন মারা গেছে। অবশিষ্টদের ধরে ঘাটিতে পাঠিয়ে দিয়েছি। যারা ধরা পড়েছে তাদের মধ্যে শিহেজীর অপারেশনে অংশ নেয়া লোকও আছে।

আহমদ মুসার চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, মুবারকবাদ তোমাদের, ইউসুফ।

একটু থেমে আহমদ মুসা বলল, তোমরা তো দুপুরে খাও নি?

-মুসা ভাই, অনেক জরুরী কথা আছে।

-হবে। আগে খেয়ে নাও।

আহমদ মুসা মা-চু কে ডাকল।

মেইলিগুলি দরজা থেকে সরে গেল রান্না ঘরের দিকে।

অল্পক্ষণ পরে মা-চু এসে ইউসুফ চিয়াং ও আব্দুল্লায়েভকে নিয়ে গেল খাবার ঘরে।

ওরা খেয়ে এলে আহমদ মুসা প্রথমেই জিজ্ঞেস করল, আহতদের চিকিৎসার কি ব্যবস্থা হয়েছে?

-আহতদের মধ্য থেকে সকালতক আরো বিশজন মারা গেছে। সকালে সরকারী এম্বুলেন্স যায়। ওতে করে কিছু পাঠানো হয়েছে শিহেজী ট্যুরিস্ট হাসপাতালে, কিছু আনা হয়েছে উরুমুচিতে। বলল ইউসুফ চিয়াং।

কথা শেষ করে একটু থামল ইউসুফ চিয়াং। তারপর বলল, অবস্থা খুব ভয়াবহ, মুসা ভাই। আগামীকাল সকালে হানদের শিহেজীর ঐ পাঁচশ' বাড়িতে এনে পুনর্বাসন করা হচ্ছে। আমরা কি করব?

-তোমরা এখন কি চিন্তা করছ? আহমদ মুসা জিজ্ঞেস করল।

-হানদের কিছুতেই ওখানে বসতি স্থাপন করতে দেয়া যাবে না। যে হানদের ওখানে আনা হচ্ছে তারা রাজনৈতিক চরিত্রের। রেড ড্রাগনের যারা ধরা পড়েছে তাদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি, ঐ হান গোষ্ঠী ও রেড ড্রাগনের যৌথ পরামর্শক্রমেই শিহেজী উপত্যকার হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছে।

-মুকাবিলার কোন পথ চিন্তা করেছো?

-শিহেজীর যারা এসেছিল তাদের সাথে আলোচনা করেছি, আজ রাতে আমরা হানদের জন্যে গড়া ঐ নতুন জনপদ উড়িয়ে দিব। তাহলে ওদের আসাটা সাময়িকভাবে বন্ধ হবে। পরবর্তী পদক্ষেপ পরে চিন্তা করা যাবে।

আহমদ মুসা ইউসুফ চিয়াং এর কথা শুনল। কোন কথা বলল না। চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, শিহেজী উপত্যকা থেকে যারা এ পর্যন্ত উদ্বাস্তু হয়েছে তারা কোথায়?

-আশেপাশের উপত্যকায় তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

-আজ দিনের মধ্যে তাদের শিহেজী উপত্যকায় একত্রিত কর।

-রাতের মধ্যে তারা হানদের জন্যে তৈরী বাড়িতে উঠে যাবে।

ইউসুফের চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল সে আনন্দে লাফিয়ে উঠল আসন থেকে। সে ছুটে গিয়ে আহমদ মুসার একটা হাত তুলে নিয়ে চুমু খেয়ে বলল, এই কথা আমাদের কারো মাথায় আসেনি, মুসা ভাই।

ইউসুফ চিয়াং সিটে গিয়ে বসতে বসতে বলল, তারপর আমরা এক সাথে হয়ে মুকাবিলা করব সরকারী বাহিনীর এবং বসতির জন্যে আসা হানদের।

-ঠিক বলেছ, তবে হানদের ঐ শিহেজী উপত্যকা পর্যন্ত আসতে দেয়া যাবে না।

-তাহলে?

-পথেই ওদের আটকাতে হবে আজ রাতে। খোঁজ নাও কোন পথে তারা আসছে।

-ঠিক বলেছেন মুসা ভাই।

ইউসুফ চিয়াং এর চোখে আর এক দফা আনন্দের ঢেউ খেলে গেল।

-ভাবছিল আহমদ মুসা।

চোখ দু'টি তার বোজা।

একটু পর চোখ খুলে সে বলল, ইউসুফ, তুমি এবং আব্দুল্লায়েভ রাতে শিহেজীর ঘটনা সামলাবে। আমি হাসান তারিক ও আহমদ ইয়াংকে নিয়ে হানদের অগ্রযাত্রার সামনে দাঁড়াব।

ইউসুফ চিয়াং এবং আহমদ ইয়াং এক সাথে বলে উঠল, আপনি অসুস্থ মুসা ভাই।

-না আমি অসুস্থ নই, সম্পূর্ণ সুস্থ।

একটা আবেগ জড়িত ধমকের সুর আহমদ মুসার কন্ঠে।

আহমদ মুসা একটু থামল। তারপর বলল, যে জাতির মানুষ এক হাত কাটা গেলে আরেক হাতে পতাকা ধরে রাখে, সে জাতির কারো অসুস্থতার অজুহাত খাটে না ইউসুফ, আহমদ ইয়াং।

সবাই নিরব। সবার মুখে দৃঢ় এক শপথের ছাপ।

মেইলিগুলি দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে ছিল তখনও। তার চোখ দু'টি উজ্জ্বল। অজ্ঞাতেই কখন যেন দাঁতে দাঁত চেপে ধরেছে সে। 'আমি অসুস্থ নই, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ'-আহমদ মুসার এই উক্তি তার বুকে বেজেছে, কিন্তু বীরোচিত এই বক্তব্য আরো ভাল লেগেছে তার। আর আহমদ মুসার শেষ কথাগুলো তার চোখের সামনে জাতির এক নতুন রূপ তুলে ধরল।

নিরবতা ভেঙ্গে আহমদ মুসাই প্রথম কথা বলল। বলল যে, ইউসুফ হাসান তারিকদের নিয়ে তুমি যাও। সব ব্যবস্থা করে সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসবে।

আর কোন কথা না বলে সালাম জানিয়ে সবাই বেরিয়ে গেল। আহমদ মুসাও চলে গেল তার কক্ষের দিকে।

আহমদ মুসার কক্ষ। সময় সন্ধ্যা।

ইউসুফ চিয়াং সারাদিনের সব কাজ, গৃহীত সব ব্যবস্থার বিবরণ দিয়েছে আহমদ মুসার কাছে। আহমদ মুসা সব শুনে প্রয়োজনীয় পরামর্শও দিয়ে দিয়েছে ইউসুফ চিয়াং এবং আব্দুল্লায়েভকে।

তারপর শিহেজী উপত্যকায় যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল ইউসুফ চিয়াং এবং আব্দুল্লায়েভ।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়ে ওদের জড়িয়ে ধরে দোয়া করল, আল্লাহ্ তার সৈনিকদের সাহায্য করুন!

ওরা বেরিয়ে গেল। সন্ধ্যা তখন পেরিয়ে গেছে।

হাসান তারিক এবং আহমদ ইয়াং তাদের কক্ষে তৈরী হচ্ছে আহমদ মুসার সাথে আজকের অভিযানে বেরুবার জন্যে।

আহমদ মুসাও তৈরী হচ্ছে তার ঘরে। এমন সময় ঘরে ঢুকল দাদি।

আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি দাদিকে বসতে দিয়ে বলল, এই অসময়ে দাদি?

-আমিনা এসেছে, সে কথা বলতে চায়।

-কোথায় ও?

-দরজার বাইরে।

আহমদ মুসা দরজার দিকে চেয়ে বলল, বল আমিনাগুলি, কি বলতে চাও।

-আমি একটা অনুরোধ...

-কি?

-আপনি মা-চু'কে সাথে নিন। মা-চু' সেনাবাহিনীর বিস্ফোরক ইউনিটে চাকুরী করেছে। তাকে নিরীহ দেখালেও সে ভাল কারাতে ও কুংফুও জানে।

-তাকে কষ্ট দেয়ার প্রয়োজন আছে কি?

-সে আপনার সাথে থাকবে। আমার অনুরোধ...

আর বলতে পারলো না মেইলিগুলি। কন্ঠ তার রুদ্ধ হয়ে গেল।

বুকের কোথায় যেন মোচড় দিয়ে উঠল আহমদ মুসার। মেইলিগুলির উদ্বেগটা কি, কেন সে মা-চু'কে সাথে দিতে চায় আহমদ মুসা বুঝে। আহমদ মুসা পারল না একটি হৃদয়ের এই আকুল আকুতি প্রত্যাখ্যান করতে। শুধু বলল, ও রাজি তো?

দাদি বলল, তুমি সাথে থাকলে মা-চু আগুনে ঝাঁপ দিতেও রাজি।

-ঠিক আছে মা-চু'কে আমার কাছে আসতে বল আমিনা।

বাইরে পায়ের শব্দ হলো। মেইলিগুলি চলে গেল। তার সাথে দাদিও।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন নেমে এসেছে।

মেইলিগুলির বাড়ির গেট দিয়ে ওরা চারজন বেরিয়ে এল। সামনে আহমদ মুসা। তার পেছনে হাসান তারিক এবং আহমদ ইয়াং। সবার পেছনে মা-চু বড় বড় ধাপে সে এগিয়ে চলেছে।

তার কাঁধে বড় একটি ব্যাগ। দোতলার ব্যালকনিতে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মেইলিগুলি। ছোট্র বুকটি তার তোলপাড় করছে। ওদের যখন আর দেখা গেল না, তখন মেইলিগুলির মাথা নুইয়ে পড়ল ব্যালকনির রেলিং এর ওপর। মুখ থেকে অস্ফুটে বেরিয়ে এল ‘আল্লাহ হাফিজ’।

সাইমুম সিরিজের পরবর্তী বই

# সিংকিয়াং থেকে ককেশাস

## কৃতজ্ঞতায়ঃ

1. Shaikh Noor-E-Alam
2. A.S.M Masudul Alam
3. Mohammad Esha Siddique
4. Salahuddin Nasim
5. S A Mahmud
6. Ashrafuj Jaman
7. Anisur Rahman
8. Syed Murtuza Baker
9. Nazrul Islam
10. Sharmeen Sayema
11. Tuhin Azad
12. Monirul Islam Moni
13. Sohel Sharif
14. Gazi Salahuddin Mamun
15. Bondi Beduyin
16. Tariq Faisal
17. Md. Jafar Ikbal Jewel
18. Osman Gani
19. M_R_

সাইমুম-৮

# সিংকিয়াং থেকে ককেশাস

আবুল আসাদ

# ১

উরুমচির ইবনে সাদ রোড ধরে পুর্বদিকে তীব্র গতিতে এগিয়ে চলছে শক্ত সমর্থ একটা হাই ল্যান্ডার জীপ।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন রাস্তায় নেমে এসেছে। রাস্তার বিজলিবাতিগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সৃষ্টি হয়েছে শহর-জীবনের এক সনাতন আলো আঁধারী। অভিজাত আবাসিক এলাকা এটা। রাস্তায় লোকজন নেই বললেই চলে। ফুল স্পীডে এগিয়ে চলেছে আহমদ মুসার জীপ। জীপে মোট পাঁচটি সিট। সামনে দু'টা, পেছনে তিনটা। ড্রাইভিং সিটে বসেছে আহমদ ইয়াং তার পাশেই আহমদ মুসা। পিছনে হাসান তারিক এবং মা-চু বসেছে।

আহমদ মুসা ঘড়ির রেডিয়াম ডায়ালের দিকে একনজর দেখলেন, সন্ধ্যা ৭ টা। আহমদ মুসা চিন্তা করলেন, ওয়াংহুয়া তার নতুন বসতিকামী কাফেলা নিয়ে নিশ্চয়ই দিনে রওয়ানা দিয়েছে। মধ্য রাত্রির নীরব প্রহরে শিহেজি উপত্যকায় পৌছতে চাইবে এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং উরুমচিতে ওদের রাত দশটায় অবশ্যই পৌঁছা চাই। কিন্তু ওদের আটকাতে হবে উরুমচি থেকে অনেক দূরে বিজন পাহাড়ি অঞ্চলে।

কানশু প্রদেশ থেকে যে উরুমচি হাইওয়ে এগিয়ে এসেছে সেই পথেই ওয়াংরা আসছে।

আহমদ মুসার মানস দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে উরুমচি থেকে কানশু পর্যন্ত পথের দৃশ্য। কৈশোরে এই পথে সে একাধিকবার উরুমচি এসেছে। গোটা পথটাই তার চোখের সামনে এখনও জ্বল জ্বল করছে। পথটা তখনও পাকা হাইওয়ের রুপ নেয়নি। কাঁকর বিছানো সে পথে উট চলতো, ঘোড়ার গাড়িও চলতো অনেক। তখনকার চেয়ে এখনকার গতি অনেক বেড়েছে। ধীরে-সুস্থে গিয়েও একশ মাইল দূরের আল-খলিল উপত্যকায় রাত নটার মধ্যে তারা পৌছতে পারবে। তিয়েনশানের পাহাড়ের একটা ছোট দক্ষিণমুখী শাখায় এই আল-খলিল উপত্যকা। উরুমচি হাইওয়েটি পাহাড়ের একটি সংকীর্ণ গিরিপথ দিয়ে এই উপত্যকা অতিক্রম করে এসেছে। ঐ গিরিপথ হাইওয়ে দুপারে কয়েক মাইল বিস্তৃত উঁচু পাহাড়ের দেয়াল। ওয়াংদের আগ্রাসী কাফেলাকে আটকাবার উপযুক্ত জায়গা এটাই। আহমদ মুসা ভেবে-চিন্তে এই স্থানটা নির্বাচন করেছেন। পরিকল্পনা অনুসারে রাত নটার মধ্যেই আল-খলিল উপত্যকায় তাদের পৌছতে হবে। ওয়াংরা ওখানে পৌছার আগে তাদের অনেক কাজ আছে সেখানে।

আহমদ মুসার চিন্তা হোঁচট খেল। পেছন থেকে মা-চুর বেসুরো কন্ঠ ধ্বনিত হলো, সামনেই বাঁ দিকে বাঁক নেবেন। বাঁ দিকের লেনটা হয়ে পিয়াও লিন রোডে পড়া যাবে।

তোমার পিয়াও লিন রোড কি আমাদের উরুমচি হাইওয়েতে নিয়ে যাবে? বললেন আহমদ মুসা।

না স্যার। পিয়াও লিন রোড থেকে পূর্ব দিকে এগিয়ে লিও শাও চি স্কোয়ার হয়ে আমরা পিং রোডে পড়ব, সেখান থেকে উংফু, তারপর.......

আহমদ মুসা তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বললেন, তারপর থাক। মাথায় ওসব থাকবে না। তুমি আহমদ ইয়াংকে সাহায্য কর।

একটু দম নিয়ে আহমদ মুসা বললেন, মা-চু তুমি আল-খলিল চেন?

চিনব না কেন? আল-খলিল তো উরুমচির দরজা। কিন্তু ওর নাম এখানে আল-খলিল নয়।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব ওর নাম তো দিয়েছে ‘মাও ভ্যালি’ সেই কবে। আপনি আল-খলিলের নাম জানলেন কি করে?

জানব না কেন মা-চু? আমি কি সিংকিয়াং-এর মানুষ না?

মনে ছিল না স্যার। কিছুটা কাঁচু-মাচু হয়ে বলল মা-চু।

আচ্ছা মা-চু, আল-খলিল গিরিপথে আমরা ওয়াং হুয়ার মুখোমুখি দাঁড়ালে কেমন হবে?

খুশিতে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল মা-চুর। বলল ওখানে উপযুক্তভাবে দাঁড়াতে পারলে ওয়াং হুয়াদের কয়েকদিন তো ঠেকিয়ে রাখা যাবেই।

উপযুক্তভাবে বলতে তুমি কি বুঝাতে চাচ্ছ?

স্যার, উরুমচি হাইওয়ের আল-খলিল গিরিপথ থেকে দক্ষিণ দিকে পাহাড়ের দেয়াল গেছে মাইল চারেকের মত, আর উত্তর দিকে গেছে পাঁচ মাইল। গিরিপথে বাধা পেলে খাড়া পাহাড় ডিঙিয়ে ওদের পক্ষে মালসামান নিয়ে আল-খলিল উপত্যকায় নামা সম্ভব নয়। বিকল্প হিসেবে ওরা চার-পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম করে উত্তর বাঁ দক্ষিণ দিক দিয়ে পাহাড় ঘুরে এপারের আল-খলিল উপত্যকায় নামার চেষ্টা করবে। এ চেষ্টার পথ যদি বন্ধ করা যায় তাহলে ওয়া আটকা পড়ে যাবে। হতবুদ্ধি অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে নতুন পথের সন্ধান করতে ওদের অবশ্যই কয়েকদিন কেটে যাবে।

চমৎকৃত হলেন আহমদ মুসা অভিজ্ঞ সমরকুশলীর মত মা-চুর কথায়।

বিস্ময় মানলেন যে, মা-চু তার মনের কথাই গড় গড় বলে যাচ্ছে ঠিক মাইক্রোফোনের মত।

মা-চু একটু দম নিলে আহমদ মুসা বলে উঠলেন, আচ্ছা, মা-চু, ওয়াং হুয়াদের পাহাড়ে ঘুরে আসা কি করে ঠেকাবে, চিন্তা করেছ?

ও তো সোজা স্যার। পাহাড় ঘুরে আমাদের উত্তর ও দক্ষিণের সংকীর্ণ পথ দুটার কৌণিক পরিমাপে কয়েক সারি বিস্ফোরক পাততে হবে। তাহলে ওদের গতি রুদ্ধ হয়ে যাবে।

মা-চু থামল। খুশিতে ভরে উঠেছে আহমদ মুসার মুখ। তিনিও তৎক্ষণাৎ কিছু বললেন না।

পাশে বসে অনেকক্ষণ থেকেই উসখুস করছিল হাসান তারিক কিছু বলার জন্য। এবার সুযোগ পেয়ে বলল, মা-চু, আপনি তো সাংঘাতিক সমর প্রকৌশলী, আপনাকে সেনাবাহিনী থেকে ওরা ছাড়ল?

ছাড়েনি, পালিয়ে এসেছি। বে-দ্বীন শত্রুর সেনাদলে থেকে পরকাল খোয়াব নাকি?

বাসায় বসে বসে ভাল লাগে আপনার?

ভাল লাগে না, কিন্তু শান্তিতে ধর্ম-কর্ম করতে পারছি, এটাই আমার সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা। তারপর আল্লাহ নিজেদের কোন সৈন্যদল দিলে তাতে যোগ দেব। এসব ভাবি বলে আপনাদের আমার খুব ভাল লাগে।

কি ভাল লাগে আমাদের?

জাতির জন্য আপনারাই আসলে কিছু করেছেন, করছেন।

আপনি কি সব জানেন?

আপামনি আমাকে সব বলেছে।

মা-চু থামল। হাসান তারিকও আর কিছু বলল না। কথা বললেন আহমদ মুসা। বললেন, মা-চু, আমাদের সাথে তুমি নিজেই আসতে চেয়েছ, না তোমার আপা তোমাকে পাঠিয়েছে?

মাফ করবেন স্যার। আপনাদের সাথী হবার সাহস কি আমার আছে? আপাই আমাকে পাঠিয়েছেন। বলেছেন, তোমার স্যার সুস্থ হয়ে উঠেননি, তার পাশে পাশে তোমাকে থাকতে হবে।

মা-চুর সরল সোজা এ ধরনের প্রকাশে আহমদ মুসা কিছুটা বিব্রত বোধ করলেন। এক ঝলক রক্ত যেন তার মুখমণ্ডলকে মুহূর্তের জন্য লাল করে তুলে আবার মিলিয়ে গেল।

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। এই সময়ে মা-চু বাইরের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, এই তো আমরা লিও শাও চি স্কোয়ারে প্রবেশ করছি। স্কোয়ারের বাঁ পাশের রোডটাই পিং রোড।

লিও শাও চি স্কোয়ারে এসে বাঁ দিকে মোড় নিয়ে গাড়ি পিং রোডে প্রবেশ করল।

পিং রোড বাণিজ্যিক এলাকা। নিয়ন সাইনের সমারোহ। রাস্তায় প্রচুর লোকজন। গাড়িঘোড়াও প্রচুর। লিও শাও চি স্কোয়ারে এসেই গাড়ির স্পীড অনেকখানিই কমিয়ে দিতে হয়েছে। পিং রোড উরুমচির নতুন এলাকা। রাস্তাগুলো বেশ প্রশস্ত। মনে হয় পঞ্চাশ বছর সামনের প্রয়োজনকে লক্ষ রেখেই রাস্তাগুলো তৈরী হয়েছে। তাই খুব স্বচ্ছন্দ গতিতে গাড়ি এগুতে পারছে। পিং রোডে ঢুকে গাড়ির গতি আবার কিছুটা বাড়ানোও গেছে।

পিং রোড গিয়ে পড়েছে উংফু এভেনিউ-এ। উংফু উরুমচির সবচেয়ে অভিজাত বিপনী কেন্দ্র। দীর্ঘ এই এভেনিউরই শেষ প্রান্তে সরকারী রেসিডেন্সিয়াল ব্লক এবং সরকারী প্রশাসনিক ভবনসমূহ। প্রধান প্রশাসনিক ভবনের পরেই ছোট্ট একটি লেক এবং বিশাল একটি উদ্যান। এই সংরক্ষিত এলাকার মধ্যেই সিংকিয়াং- এর গভর্নর লি ইউয়ান এর বাস ভবন।

লি ইউয়ান জাতিতে হান। পৈত্রিক বাড়ি উরুমচিতে। তার শিক্ষা জীবন কাটে ব্যবসায়ী পিতার সাথে সাংহাইয়ে। কর্ম জীবন তার শুরু হয় পিকিং-এ। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় প্রতিক্রিয়াশীলতার অভিযোগে তার পিতা নিহত হয়। লি ইউয়ানও চাকুরী হারিয়ে উরুমচিতে তার পৈত্রিক বাড়িতে আশ্রয় নেয়। লি ইউয়ান পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিল। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় সে উরুমচিতে সবজি ফেরি করে জীবিকা নির্বাহ করত। দুরের উপত্যকা অঞ্চল থেকে শাক সবজি কিনে মাথায় করে বয়ে এনে উরুমচির বাজারে বিক্রি করত সে।

লি ইউয়ান সম্পর্কে জনশ্রুতি হল, তার পিতামহ একজন কাজাখ মুসলমান। তার পিতামহী ছিল হান বংশীয়। তার পিতার জন্মের অল্পকাল পরে পিতামহ মারা গেলে মাতামহী শিশুপুত্রকে নিয়ে হান পরিবারে ফিরে আসে। অতঃপর হানদের একজন হয়ে লি ইউয়ানের পিতা বড় হয়। লি ইউয়ান এখন পুরোপুরি হান বংশীয় বলে পরিচিত। কিন্তু, চেহারা মেলে না। টানা নীল চোখ, উন্নত নাসিকা, দীর্ঘ দেহ তার দেহে তুর্কী রক্তের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

আহমদ মুসার জীপ পিং রোড থেকে উংফু এভিনিউতে এসে পড়ল।

উংফু এভিনিউ-এ জনসমাগম আরও একটু কম। গতি বাড়িয়ে দিয়েছিল আহমদ মুসার জীপ।

বিপরীত দিক থেকে তীব্র গতিতে ছুটে আসছিল দুটো হেডলাইট। গতিটা একটু যেন বেপরোয়া। একদম কাছে এসে গেছে হেডলাইট দুটো।

এ সময় দুটো কার ওভারটেক করল আহমদ মুসার জীপকে। ওভারটেক করতে গিয়ে কার দুটো ছুটে আসা গাড়িটির পথটা অনেকখানি দখল করে ফেলেছিল। স্লো হয়ে গিয়েছিল ছুটে আসা গাড়িটির গতি।

কার দু'টো ওভারটেক করে তাদের লাইন পেরিয়ে গেল। ছুটে আসা গাড়িটি তখন আহমদ মুসার গাড়ির সমান্তরালে। গাড়ী দুটোর মধ্যে দুরত্ব চার গজের বেশী নয়।

'বাঁচাও' নারী কন্ঠের একটা চিৎকার ভেসে এল ঐ গাড়ী থেকে। সেই সাথে গোঙানিও। মনে হল অনেক বাধা ডিঙিয়ে গোঙানি মিশ্রিত চিৎকারটি ভেসে এল।

তা ছিল শব্দের এক ঝলক মাত্র। গাড়িটি ছুটে বেরিয়ে গেল পেছনে চোখের আড়ালে। চিৎকার শুনেই আহমদ মুসা চোখ ফিরিয়েছিলেন। চঞ্চল হয়ে উঠেছিল চোখের দৃষ্টি। একটা উদ্বেগ ঝরে পড়ছিল সে দৃষ্টি থেকে।

দ্রুত ভাবছিলেন তিনি। না, তিনি একজন অসহায় নারীর ওই আবেদনকে মাড়িয়ে সামনে এগুতে পারেন না। সিদ্ধান্তের এক দৃঢ়তা ফুটে উঠল তার চোখে মুখে।

আহমদ মুসা আহমদ ইয়াং- এর দিকে ফিরে বললেন, গাড়ি ঘুরাও আহমদ ইয়াং, ওই গাড়ীটাকে অনুসরণ কর।

আহমদ ইয়াং আহমদ মুসার দিকে একবার তাকিয়েই গাড়িটি ঘুরিয়ে নিল। পেছনের সিটে বসা হাসান তারিক একটু দ্বিধা করল। তারপর বলল: কিন্তু মুসা ভাই, আমাদের হাতে সময় তো কম।

জানি তারিক, কিন্তু কোন মজলুমের আবেদন কানে আসার পর তাকে তো আমরা উপেক্ষা করতে পারি না।

কিন্তু মুসা ভাই, যে দায়িত্ব আমাদের কাধে সেটা বড় নয়? সেটা বিবেচ্য নয়?

বড় অবশ্যই, কিন্তু একজন বিপদগ্রস্থা নারীর এই 'বাচাও' চিৎকার কানে আসার পর ওটা এখন আর প্রথম বিবেচ্য নেই।

হাসান তারিকের কাছ থেকে কোন উত্তর এল না। আহমদ মুসাই আবার কথা বললেন। বললেন, মনে কর তারিক, ওই মেয়েটি যদি আমার বোন হত, মেয়ে হত, তাহলে তার ঐ চিৎকার শোনার পর আমরা কি এক পা-ও সামনে এগুতে পারতাম? পারতাম  না। একজন মুসলমানের কাছে আল্লাহর প্রতিটি মজলুম  বান্দাই সমান।

ঠিক বলেছেন, মুসা ভাই, আমি ভুল করছিলাম।

ভুল নয় তারিক, তোমার যুক্তিও গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু, আল্লাহর ওপর ভরসা করে আমরা এই মুহুর্তে যা করণীয় তা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আল্লাহ আমাদের সব ব্যাপারে সাহায্য করুন।

আহমদ মুসাদের জীপ ছুটছিল সামনের গাড়িটির পেছনে। সামনের গাড়ীটি একটি ছোট্ট মাইক্রোবাস।

গাড়িটির কাছাকাছি হবার জন্য আহমদ মুসাদের জীপকেও গতি বাড়াতে হয়েছে। ফলে দুটো গাড়ীই ছুটছিল বেপরোয়া গতিতে।

উংফু এভিনিউ রিং রোডের মত। এভিনিউটি শহরের পুর্ব প্রান্তে উরুমচি হাইওয়ে থেকে বের হয়ে প্রথমে উত্তর দিকে এগিয়ে গভর্নর ভবনকে ক্রস করে পশ্চিম দিকে বাক নিয়েছে। নতুন উরুমচি নগরীর গোটা উত্তরপ্রান্ত বেষ্টন করে পুরোনো উরুমচি নগরীর প্রধান সড়ক বাজার রোডে গিয়ে লম্বাভাবে পড়েছে।

মাইক্রোবাসটিকে অনুসরণ করে আহমদ মুসার জীপ বাজার রোডে এসে পড়ল।

বাজার রোডটি উত্তর-দক্ষিণ লম্বা। উংফু থেকে অনেক খানি সরু। রাস্তার দু ধারে দোকান-পাট খোলা। কিন্তু, রাস্তায় লোকজন ও গাড়ী-ঘোড়ার সমাগম খুব বেশী নয়।

নতুন উরুমচির সাথে পুরাতন উরুমচির এটাই পার্থক্য যে, নতুন উরুমচির বিপনিগুলো সন্ধ্যার পর ঝলমলিয়ে ওঠে, কিন্তু পুরাতন উরুমচির বাজার-বিপনিগুলোতে লোকের সমাগম তখন কমতে থাকে। মাগরিবের আযানের আগে

থেকে এই ভীড় কমা শুরু হয়, এশার পর বাজারগুলো যেন ঘুমিয়ে পড়ে। মুসলিম শহর উরুমচির এ ঐতিহ্য অনেক আগের। তা এখনও চলছে। কম্যুনিস্ট শাসন এবং তারপরে সাংস্কৃতিক বিপ্লব মুসলমানদের অনেক কিছুই কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু, মুসলিম জনপদের অনেক অভ্যাসের মত এ অভ্যাসটিও দূর করতে পারেনি।

মাইক্রোবাসটি বাজার রোড ধরে সমান গতিতে এগিয়ে চলেছে।

আহমদ মুসা বললেন, ইয়াং ওরা আমাদের দেখতে পেয়েছে বলে মনে কর?

আমার মনে হয় না। ওদের গাড়ির স্পীডে কোন কমবেশি দেখছি না।

ঠিক বলেছ, বেশীক্ষণ আর গোপন থাকতে পারব না। উংফু এভিনিউতে প্রচুর গাড়ির ভীড়ে লুকানো গেছে। পুরানো উরুমচির ফাকা রাস্তায় আর তা সম্ভব নয়।

সত্তর কিলোমিটার গতিতে প্রায় দুশ গজের মত ব্যবধান রেখে এগিয়ে চলছিল গাড়ি দুটি। বাজার রোড ধরে কিছুক্ষণ চলার পর সামনের মাইক্রোবাসটির গতি হঠাৎ বেড়ে গেল।

আহমদ মুসা মুখ ফিরিয়ে আহমদ ইয়াং-এর দিকে তাকালেন।

আহমদ ইয়াং তার গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল। স্পীডোমিটারের কাটা একলাফে নব্বইতে উঠে এল।

গাড়িটার আরও কাছাকাছি যাও ইয়াং।

স্পিডোমিটারের কাটা আবার লাফিয়ে উঠল। একশ বিশ কিলোমিটারে উঠল গাড়ির গতি।

বাজার রোডের মাঝামাঝি জায়গায় এসে হঠাৎ মাইক্রোবাসটি বা দিকে মোড় নিয়ে পুর্বমুখী একটি রাস্তায় ঢুকে গেল।

ওরা পালাচ্ছে মুসা ভাই। পেছনে থেকে বলে উঠল হাসান তারিক।

ওরা যেখানে ঢুকল ওটা ওলুগবেগ রোড তারপর সুলেমানিয়া রোড হয়ে উংফুতে যাওয়া যায়।বলল মা-চু।

মিনিট খানেকের মধ্যেই আহমদ মুসাদের গাড়ি ওলুগবেগ রোডে প্রবেশ করল। মাইক্রোবাসটি তখন চারশ গজের মত দূরে।

ওলুগবেগ রোডটি আবাসিক। রাস্তার দুধারে কিছু কিছু দোকান-পাটও আছে। রাস্তায় দুচারজন লোক দেখা যাচ্ছে। গাড়ির পাগলাগতি দেখে মানুষ একবার এদিকে তাকিয়েই ছিটকে সরে যাচ্ছে পাশে।

কয়েক মাইল চলার পর মাইক্রোবাসটি ডানদিকের একটা রাস্তায় ঢুকে গেল।

পেছন থেকে মা-চু বলল, ওরা বিবিখান রোডে ঢুকল। বিবিখান রোড দক্ষিণ দিকে মাইল তিনেক এগিয়ে চ্যাংচিন রোডে পড়েছে।

বিবিখান রোড ধরে চ্যাংচিন রোডের কাছাকাছি আসার পর সামনের মাইক্রোবাস থেকে একটা হর্ণ শোনা গেল। তারপরই সামনে থেকে আর একটা হর্ণ বেজে উঠল। পরের হর্ণ যে গাড়ি থেকে আসল তা দেখা গেল না।

মা-চু পেছন থেকে প্রায় লাফিয়ে উঠল, স্যার ওদুটো হর্ণই রেড ড্রাগনের। আমি ওদের সংকেত জানি।

মুহুর্তের জন্যে কপালটা কুঞ্চিত হয়ে উঠল আহমদ মুসার। কিছু যেন ভাবলেন তিনি। তারপর সামনের দিকে দৃষ্টি রেখেই বললেন, হাসান তারিক তৈরি থাক। আমার মনে হয় সামনের মাইক্রোবাস আরেকজন সাহায্যকারীকে ডেকেছে অয়্যারলেসে।

একটু থামলেন আহমদ মুসা। তারপর আহমদ ইয়াং-এর দিকে আরেকটু এগিয়ে একটা হাত স্টিয়ারিং হুইলে রেখে বললেন, ইয়াং তুমি আমার সিটে চলে এস।

আহমদ ইয়াং পা দুটি সিটের উপর তুলে স্টিয়ারিং ছেড়ে দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে দ্রুত চলে এল আহমদ মুসার সিটে। আহমদ মুসা গিয়ে ড্রাইভিং সিটে বসলেন।

সামনেই মোড়। বিবিখান রোড গিয়ে পড়েছে চ্যাংচিন রোডে। চ্যাংচিন রোড পুর্ব পশ্চিম লম্বা।

সামনের মাইক্রোবাসটি মোড়ে গিয়ে পৌছেছে। মোড়ে গিয়ে বাক নিল বায়ে অর্থাৎ পুর্বদিকে।

এই সময় পশ্চিম দিক থেকে একটা ট্রাক এসে দাড়াল মোড়ে, একেবারে বিবিখান রোডের মুখে।

আহমদ মুসার মুখে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল। বুঝলেন, ওরা রাস্তা ব্লক করে মাইক্রোবাসটিকে সরে পড়ার সুযোগ করে দিতে চায়।

আহমদ মুসা মোড়ের দিকে তাকিয়ে মনে মনে পরিমাপ করে দেখলেন ট্রাকটা যেভাবে দাঁড়িয়ে আছে তাতে রাস্তা ধরে বা দিকে মোড় নেবার যো নেই। তবে, ফুটপাথ ধরে যাবার মত জায়গা আছে, কিন্তু ওখানে দাঁড়িয়ে আছে একটি বেবিট্যাক্সি। আহমদ মুসা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন।

ট্রাকটা তখন একশ গজও দূরে নয়। আমহদ মুসা বললেন, তারিক আমি ফুটপাথে নামছি। ট্রাক ও লাইটপোষ্টের মাঝখানের ফাঁকা স্পেস দিয়েই আমরা স্লিপ করব। বেবিট্যাক্সির মতলব খারাপ না হলে আমাদের রাস্তা দিয়ে দেবে আর খারাপ হলে ওকে ধাক্কা দিয়ে আমাদের রাস্তা পরিস্কার করে নিতে হবে। তারিক তুমি ট্রাকের চাকা ফুটো করে দাও। ট্রাকের জানালা দিয়ে দুটি মাথা দেখা যাচ্ছে। ওদের হাত বের না হলে তাদের কিছু বলো না।

হাসান তারিক এম-১০ হাতে নিয়ে তাক করল ট্রাকের সামনের চাকায়।

আহমদ মুসা গিয়ার চেঞ্জ করে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, জীপ লাফ দেবে সাবধান।

পরক্ষণেই প্রায় লাফিয়ে পড়ল জীপ ফুটপাথে। সেই সাথে গর্জে উঠল হাসান তারিকের হাতের এম-১০ মেশিন রিভলবার। প্রায় পাঁচ সেকেন্ড গুলি বৃষ্টি করল। এবড়ো থেবড়ো হয়ে গেল ট্রাকের সামনের চাকা। ট্রাকের বাঁ দিকটা কাত হয়ে বসে গেল।

অভ্যস্ত হাইল্যান্ডার জীপ অবিশ্বাস্য গতিতে লাফিয়ে লাফিয়ে সামনে এগুলো। একজন লোককে স্টেনগান নিয়ে বেবিট্যাক্সি থেকে লাফিয়ে পড়তে দেখে আহমদ মুসা চিৎকার করে উঠলেন, তোমার সিটে শুয়ে পড়।

কিন্তু দরকার হলো না। তৈরী ছিল আহমদ ইয়াং। নজর ছিল তার বেবিট্যাক্সির দিকেই। লোকটি লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ে স্টেনগান সোজা করার আগেই গর্জে উঠল আহমদ ইয়াং-এর হাতের স্টেনগান। লোকটা স্টেনগান নিয়ে

ঐখানেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। আর সেই সময়েই হাইল্যান্ডার জীপের এক ইঞ্চি পুরু ইস্পাতের এক্সিলেন্ট শিল্ডের বাঁ প্রান্ত প্রচন্ড বেগে আঘাত করল বেবিট্যাক্সিটাকে। বেবিট্যাক্সি পাঁচ-সাত হাত দূরে ছিটকে পড়ে ভেঙে-দুমড়ে উলটে গেল। জীপটা একটা বড় ঝাঁকুনি খেল। কিন্তু স্টিয়ারিং ধরা আহমদ মুসার হাত একটুও কাঁপলো না। স্থির থাকল জীপের মাথাও।

এ সময় স্টেনগানের শব্দ এল পিছন থেকে। কয়েকটা বুলেট এসে জীপের স্টীল বডিতে আঘাতও করল।

কিন্তু ঐ টুকুই। জীপ প্রচণ্ড গতিতে ভাঙা বেবিট্যাক্সিটাকে পাশ কাটিয়ে উঠে এল চ্যাংচিন রোডে। তারপর তীরের ফলার মত ছুটে চলল সামনে।

আহমদ মুসা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। বাধাটা পেরুতে তেমন একটা এক্সট্রা সময় ব্যয় করতে হয়নি। সামনে তাকিয়ে দেখলেন মাইক্রোবাসের হেডলাইট দুশ গজের মতই দূরে।

আহমদ মুসা মুখটা ঈষৎ ঘুরিয়ে বললের, তারিক, মা-চু সব ঠিক আছে তো?

জী, ঠিক আছে। হাসান তারিক প্রায় একসাথেই বলে উঠলেন।

ভাগ্যিস ওদের গুলিটা ওপর দিয়ে গেছে। টায়ারে লাগলে বিপদ হতো। বললেন আহমদ মুসা।

ঘটনা এইভাবে এত আকস্মিকভাবে ঘটবে তা তারা মনে করেনি। মনে হয় ওরা সম্মুখ যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়ে এসেছিল। মনে করেছিল গাড়িটা আমাদের থামবে তারপর শক্তি পরীক্ষা হবে। বলল আহমদ ইয়াং।

তোমার ধারনা ঠিকই ইয়াং। ওদের অপ্রস্তুত অবস্থা দেখে তাই মনে হয়।

আবার দৃষ্টি সামনে ফিরিয়ে নিয়েছেন আমহদ মুসা। তার দৃষ্টি সামনের মাইক্রোবাসের পেছনের লাল আলোর উপর।

এসময় হঠাৎ লাইটটি নিভে গেল।

দ্রুত কণ্ঠে আহমদ মুসা বললেন, মা-চু গাড়িটা মোড় নিল? মোড় নেবার এখানে কি জায়গা আছে?

না স্যার কোন রাস্তা নেই।

তাহলে কি ওরা আলো নিভিয়ে দিয়েছে? ওরা কি জানতে পেরেছে বাধা ডিঙিয়ে আমরা ওদের পিছু নিয়েছি?

হতে পারে। ট্রাক থেকে অয়্যারলেসে ওদের জানিয়ে দেওয়া হতে পারে। বলল হাসান তারিক।

আহমদ মুসা একটু চিন্তা করলেন, তারপর জীপের আলো নিভিয়ে দিলেন তিনি। বলল তারিক ইনফ্রারেড গগলসটা দাও।

ইনফ্রারেড গগলস চোখে লাগিয়ে জীপের গতি বাড়িয়ে দিলেন। বললেন ওদের কাছাকাছি পৌঁছতে হবে।

স্পীডোমিটারের কাঁটা মূহুর্তে একশ চল্লিশ কিলোমিটারে উঠল। গতির প্রচণ্ডতায় থর থর করে কাঁপছে জীপ। আহমদ মুসার শ্যেন দৃষ্টি সামনে পাতা। গাড়ি কোথায় হোঁচট খেলে রক্ষা নেই। ইনফ্রারেড গগলস অনেক দূর পর্যন্ত অন্ধকারকে ফিকে করে দিয়েছে। রাস্তা পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। কিন্তু উঁচু-নিচু আন্দাজ করা কঠিন। রক্ষা যে, চ্যাংচিন রাস্তাটা নতুন। কোন ভাঙা কাটা কোথাও নেই।

মিনিট খানেকের মধ্যেই একটা রোড সাইড লাইটের আলোতে মাইক্রোবাসটিকে এক ঝলক দেখা গেল। ঠিকই সামনে এগুচ্ছে। খুশি হল আহমদ মুসা। গাড়ির গতি আরও বাড়িয়ে দিল। একশ পঞ্চাশ কিলোমিটারে গাড়ির গতি। অল্পক্ষণ পরেই ইনফ্রারেড গগলসে কিছু দূরে একটা জমাট অন্ধকার দেখা গেল। বুঝলেন মাইক্রোবাসটি এখন নাগালের মধ্যে এসেছে। স্পীড কমিয়ে এনে দূরত্ব বজায় রেখে চলতে লাগলেন। মাইক্রোবাসের চোখে তাঁরা ধরা পড়তে চান না। তারা বুঝুক আমরা তাদের হারিয়ে ফেলেছি। এটা ভাবা তাদের জন্য অনেকটাই স্বাভাবিক। কারণ যারা ধরতে আসে তারা সাধারনত আলো নিভায় না।

এলাকাটা নির্জন। রাস্তার দুধারে নতুন নতুন রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং সবে গড়ে উঠেছে। এলাকাটা অন্ধকারও। অনেক দূরে দূরে লাইট পোষ্ট। বড় ক্ষীণ সে সবের আলো।

বেশ কিছুক্ষণ এই ভাবে চলার পর হঠাৎ আহমদ মুসার নজরে পড়ল, কালো জমাট অন্ধকারের মাইক্রোবাসটি ডানদিকে চ্যাংচিন রোড পার হয়ে দক্ষিন দিকে যেতে শুরু করল। রাস্তার লাইটে তার পরিস্কার চেহারা দেখা গেল।

মা-চু, এখানে চ্যাংচিন থেকে কোন রাস্তা কি দক্ষিন দিকে গেছে? সামনে চোখ রেখেই জিজ্ঞেস করলেন আহমদ মুসা।

বাইরে একটু নজর বুলিয়ে মা-চু বলল, হ্যাঁ এখান থেকে একটা রাস্তা উত্তর দিকে, আর একটা দক্ষিন দিকে চলে গেছে। আর দক্ষিণের রাস্তাটা নতুন হান এলাকায় গিয়ে প্রবেশ করেছে।

মাইক্রোবাসটি তাহলে হান এলাকার দিকেই যাচ্ছে।

লিও শাও চি স্কোয়ার দিয়ে না এসে এতদূর ঘুরে এল কেন ওরা? বললেন আহমদ মুসা।

নিশ্চয় চোখে ধূলো দেওয়ার জন্য। বলল হাসান তারিক।

আহমদ মুসা মোড়ে মোড়ে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে দক্ষিনমুখি সেই রাস্তায় প্রবেশ করলেন। আহমদ মুসার জীপের আগে আরো একটা জীপ প্রবেশ করল সেই রাস্তায়। বেশ দ্রুত যাচ্ছিল জীপটা। আর মাইক্রোবাসটা আলো নিভিয়ে চলার কারণে অপেক্ষাকৃত একটু ধিরেই চলতে হচ্ছিল। তার হেড লাইটের আলোতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল সামনের মাইক্রোবাস।

মাইক্রোবাস ও জীপটির দূরত্ব তখন দশ গজেরও বেশি নয়। এ সময় সেদিক থেকে একপশলা ব্রাশ ফায়ারের শব্দ ভেসে এল। সঙ্গে সঙ্গে টায়ার বার্ষ্ট হওয়ার শব্দ শোনা গেল। জীপটা এঁকে-বেঁকে কয়েক গজ এগিয়েই রাস্তার পাশের এক টিলার গোড়ায় মুখ থুবড়ে পড়ল।

মাইক্রোবাস মূহুর্তকালের জন্যে থেমেছিল। আবার দ্রুত চলতে শুরু করেছে। এবার আলো জ্বেলে দিয়েছে মাইক্রোবাস।

আহমদ মুসা বললেন, ভালই হল হাসান তারিক, মাইক্রোবাসটি ওই জীপটাকেই আমাদের জীপ মনে করেছিল। এখন ঐ জীপটাকে শেষ করে আলো জ্বেলে নিশ্চিন্তে এগুচ্ছে।

বিধ্বস্ত জীপটা অতিক্রম করার সময় আহমদ মুসা দেখলেন, জীপে একজন আরোহী ড্রাইভিং সিটে বসা। ওখানেই মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। আহমদ মুসাদের জীপ আলো নিভিয়েই এগিয়ে চলল মাইক্রোবাসটির আলো লক্ষ করে।

রাস্তার দুধারে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বাড়ি। কোনটা তৈরী হয়েছে, কোনটা তৈরী হচ্ছে। বুঝা গেল এ এলাকায় প্রচুর লোক বাস করে। হানদের নতুন কলোনী। কোত্থেকে এল এরা? নিশ্চয়ই টানা হান এলাকা থেকে এদেরকে সিংকিয়াং-এ আমদানি করা হয়েছে।

এখানে কি সবাই হান মা-চু? জিজ্ঞেস করলেন আহমদ মুসা।

জি স্যার। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় এ হান কলোনীর পরিকল্পনা হয়। সিদ্ধান্ত হয়েছিল, উরুমচিতে এভাবে হানদের আমদানী করে মুসলমানদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করা হবে। কিন্তু সাংস্কৃতিক বিপ্লবীরা পরাজিত হবার পর উরুমচিতে অন্যান্য কলোনী তৈরীর কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু এই কলোনীতেই বসতি স্থাপিত হয়েছে।

এ রাস্তা দক্ষিণে কতদূর গেছে মা-চু?

অল্প দূরে একটা পাহাড়ের টিলায় গিয়ে শেষ হয়েছে।

পাথরের টুকরোর সাথে পিচ মিশিয়ে রাস্তায় কার্পেট করা। বেশ মসৃন। সোজা রাস্তা। রাস্তায় দুএকজন লোক দেখা যাচ্ছিল। তাও এখন আর নেই বললেই চলে। অন্ধকার হলেও খুব নিশ্চিন্তেই গাড়ি চালাতে পারছে।

এক জায়গায় এসে মাইক্রোবাসটি বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে একটা সরু রাস্তা দিয়ে এগিয়ে একটা মাটির টিলার গোড়ায় গিয়ে থামল। টিলার ওপরে একটা বাড়ি। আমরা প্রায় রাস্তার প্রান্তে এসে গেছি। ঐ তো দক্ষিণ দিকে পাহাড়ের কালো টিলা দেখা যাচ্ছে। বলল মা-চু।

আহমদ মুসা কোন কথা বললেন না। চারদিকে একবার নজর বুলালেন। তারপর গাড়িটাকে রাস্তার ডানদিকে নামিয়ে দাঁড় করিয়ে বললেন, এস নেমে পড়ি।

সবাই নেমে পড়ল।

মাটির টিলা এবং বাড়িটি অন্ধকারে ঢাকা। মাইক্রোবাসের আলো নিভে গেছে। ওটাকে একটা জমাট অন্ধকারের মত দেখাচ্ছে।

আহমদ মুসারা গুটি গুটি পায়ে বিড়ালের মত ছুটলেন সেদিকে।

তিনদিকে খোলা গাড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে মাইক্রোবাসটি।

আহমদ মুসার চোখে তখন ইনফ্রারেড গগলস। তিনি মাইক্রোবাসের ভেতর উঁকি দিয়ে দেখলেন, গাড়ি খালি। হঠাৎ মাঝখানের সিটে ছোট ব্যাগের মত কি একটা তার নজরে পড়ল। গাড়ির দরজা খোলাই ছিল। ভেতরে উঠে গেলেন আহমদ মুসা।

ছোট লেডিস একটা হ্যান্ড ব্যাগ। গাড়ির ভেতরেই ব্যাগটা খুলে দেখলেন আহমদ মুসা। বেশ কিছু টাকা এবং একটি আইডেনটিটি কার্ড। কার্ডে একটা মেয়ের ছবি। নাম 'নেইজেন'। পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী লাল একটা সিল কার্ডে।

গাড়ি থেকে নেমে ব্যাগটি আহমদ ইয়াং-এর হাতে দিতে দিতে বললেন, মেয়েটারই হবে এই ব্যাগ, আইডেনটিটি কার্ডও।

আহমদ ইয়াং তার পেন্সিল টর্চ দিয়ে আইডেনটিটি কার্ডটার ওপর চোখ বুলিয়েই বলে উঠল, মুসা ভাই, মেয়েটা একজন স্টেট ভিআইপি। নিশ্চয় খুব উঁচু সরকারী কেউকেটার সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ হেব।

কিছু লেখা আছে ?

লাল সিল আছে। এ সিল খুব উঁচু সরকারী কাগজপত্রেই শুধু ব্যবহৃত হয়।

আহমদ মুসা গাড়ি থেকে অন্ধাকরে দাঁড়ানো বিশাল গেটটার দিকে এগুলেন।

গাড়ি বারান্দা পেরিয়ে সিড়িঁর তিনটা ধাপ উঠলেই গেট। মাত্র এ গেটটা ছাড়া আর কোন দরজা এদিকে দেখা গেল না। বাড়িটি একেবারেই অন্ধকার। কোন জানালার কোন ফাঁক ফোকর দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে না।

আহমদ মুসা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল হাসান তারিক এবং আহমদ ইয়াংও।

পেন্সিল টর্চের আলো ফেলে দেখলেন কাঠের দরজা। হাত দিয়েই বুঝলেন খুব ভারী এবং মজবুত দরজা।

টর্চের ছোট্ট আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আহমদ মুসা দরজার কি হোলের ওপর দাঁড় করালেন। অটোমেটিক লক সিস্টেম।

লকটা ভাল করে দেখার জন্য আহমদ মুসা তর্জনী দিয়ে লকটা স্পর্শ করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে হাতটা তার ছিটকে সরে এল প্রবল এক ধাক্কায়। ঝিম ঝিম করে উঠল হাতটা। চমকে উঠে আহমদ মুসা দুকদম পিছিয়ে গিয়েছিলেন।

পেছন থেক মা-চু প্রায় আর্তনাদ করেই বলে উঠল, স্যার লকে ডিসি চার্জ আছে, ভাগ্যিস এসি নয়।

বলে মা-চু এসে আহমদ মুসার পাশে দাঁড়াল। বলল, স্যার যা করতে হয় আমাকে হুকুম করবেন।

কিন্তু আহমদ মুসার এদিকে কোন খেয়াল নেই। তিনি উৎকর্ন হয়ে কি যেন শুনছেন। মুহুর্তকাল উৎকর্ন থাকার পর বললেন, হাসান তারিক, কিছু শুনতে পাচ্ছ ?

হ্যাঁ এই মাত্র কানে ঢুকেছে একটা চাপা মিনি সাইরেনের আওয়াজ। বলল হাসান তারিক।

ঠিক বলেছ ভেতর থেকে আসছে। সম্ভবত এটা ওদের বিপদ ঘন্টা। নিশ্চয় এই লক সিস্টেমের সাথে ঐ বিপদ ঘন্টার সংযোগ আছে।

একটু থেমেই আবার আহমদ মুসা বললেন, তোমরা তৈরি থাক। আমাদের অনুমান সত্যি হলে মুখোমুখি হবার সময় আসছে।

সবাই প্রস্তুত ছিল। হাসান তারিকের হাতে এম-১০ মেশিন পিস্তল, আহমদ ইয়াং একটা স্টেনগান বাগিয়ে ধরে আছে। আর মা-চুর হাত তার ব্যাগের ভেতরে। ওখানেই ওর সব অস্ত্র।

এই সময় ভেতর থেকে স্টেনগানের এক পশলা গুলির আওয়াজ ভেসে এল। ক্ষীণ আওয়াজ।

চঞ্চল হয়ে উঠলেন আহমদ মুসা। হাসান তারিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার ল্যাসার পিস্তলটা?

হাসান তারিক এগিয়ে গেল। পকেট থেকে ক্ষুদ্র সাদা রঙের ল্যাসার পিস্তল উঁচু করল কী-হোল লক্ষ্য করে। পিস্তলের রক্ত রাঙা লাল ট্রিগারটায় চাপ দিল হাসান তারিক। মাত্র মুহুর্তের ব্যবধান। ইস্পাতের গোটা কী বোর্ডটাই হাওয়া হয়ে গেল। সুক্ষ্ম একটা ধাতব গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল শুধু চার দিকে।

মেশিন পিস্তলটা বাগিয়ে দরজা ঠেলে আহমদ মুসা ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিলেন। মা-চু লাফ দিয়ে সামনে গিয়ে বলল, স্যার আমি আগে একটু দেখে নিই। যারা দরজায় বৈদ্যুতিক সাইরেন ফিট করতে পারে, তাদের প্রস্তুতি এ টুকুতেই শেষ হবার কথা নয়।

বলে মা-চু বাঁ হাতে দরজাটা একটু ফাঁক করে ডান হাতে তার ইলেকট্রো ম্যাগনেটো নিউট্রালাইজার মেলে ধরে চাপ দিল তার সাদা সুইচটায়। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রটির ক্ষুদ্র চোখ থেকে বিপদ সংকেত জ্ঞাপক লাল আলো বেরিয়ে এল, তার সাথে ব্লিতস ব্লিতস শব্দ। মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপরেই লাল আলো নিভে গিয়ে জ্বলে উঠল নীল আলো। থেমে গেল 'ব্লিতস' শব্দ। মা-চু'সহ সকলের চোখে-মুখেই স্বস্থি ফিরে এল।

ইলেকট্রো ম্যাগনেটো নিউট্রালাইজার চীনে উদ্ভাবিত সন্ত্রাস মুকাবিলার অত্যাধুনিক একটা যন্ত্র। পেতে রাখা বৈদ্যুতিক ও বিস্ফোরক জাল শুধু সে চিহ্নিতই করে না, এর অতি শক্তিশালী ম্যাগনেটিক পাওয়ার বিদ্যুৎ সঞ্চালনের গতি এবং বিস্ফোরকের সুইচ বিকল করে দিয়ে ওগুলোকে নিউট্রাল করে ফেলে। নীল আলো জ্বলে উঠতেই বুঝা গেল বিপদ কেটে গেছে।

আহমদ মুসা মা-চুকে চাপড়ে ফিসফিসিয়ে বললেন, শুকরিয়া মা-চু। মেইলিগুলি যা বলেছে তারচেয়েও অভিজ্ঞ তুমি।

আহমদ মুসার মুখে হাসি।

মা-চু বলল, লজ্জা দেবেন না স্যার, এ খুব ছোট ব্যাপার।

মা-চুর কথার দিকে আহমদ মুসার এখন কান নেই। তাঁর তখন অন্য ভাবনা। সাইরেন বেজেছে বেশ আগে। গেটের দিকে এখনও কেউ এল না কেন?

ভেতর থেকে ব্রাশ ফায়ার কেন? কাকে কে গুলি করল? ওরা কি তাহলে মেয়েটাকে মেরে ফেলে পালাল?

কথাটা ভাবতেই চঞ্চল হয়ে উঠল আহমদ মুসার মনটা, তাদের মিশন কি তাহলে ব্যর্থ হল?

ভেতরে প্রবেশ করলেন আহমদ মুসা।

ঢুকতেই একটা করিডোর। উত্তর-দক্ষিণ লম্বা। অন্ধকার। আরেকটা করিডোর নাক বরাবর পশ্চিমে এগিয়ে গেছে। করিডোরটার ঐ প্রান্তে এক টুকরো আলো এসে পড়েছে।

আহমদ মুসা তার এম-১০ পিস্তলটি বাগিয়ে বিড়ালের মত নি:শব্দে সেদিকে এগিয়ে চললেন। তার পেছনে হাসান তারিক, আহমদ ইয়াং ও মা-চু।

আলোর কাছাকাছি গিয়ে আহমদ মুসা দেখলেন, ডান দিকের একটা খোলা দরজা দিয়ে আলোর টুকরোটি এসে পড়েছে করিডোরে।

কয়েক ধাপ এগিয়ে ঘরের দিকে চোখ পড়তেই আঁৎকে উঠলেন আহমদ মুসা। রক্তে ভাসছে অনেকগুলো লাশ। রক্তের স্রোত বেরিয়ে এসেছে দরজা দিয়েও।

ছুটে গেলেন আহমদ মুসা দরজার দিকে। তার পেছনে সবাই। দরজায় দাঁড়িয়ে চক্ষু স্থির হয়ে গেল সবার। মেঝেয় পড়ে আছে দশটি মেয়ের বুলেট ঝাঁঝরা দেহ। রক্ত ঝরছে তাদের অনেকের দেহ থেকে এখনো।

সম্ভবত পায়ের শব্দে লাশের সারি থেকে একটা মেয়ে মাথা তুলল। অতি কষ্টে ডান হাতের উপর মাথার ভারটি রেখে হাসান তারিক ও আহমদ ও আহমদ ইয়াং-এর দিকে চেয়ে বলল, আপনারা এলেন? এত দেরিতে?

মেয়েটার দিকে তাকাতেই চমকে উঠল হাসান তারিক ও আহমদ ইয়াং দুজনেই। তুরপান রোডের 'ফ্র' ঘাঁটিতে যে দশজন অসহায় মেয়েকে তারা পেয়েছিল, তাদেরই সে একজন। এর সাথেই তারা কথা বলেছিল।

দুজনেই ছুটে গেল তার দিকে। বলল, তোমরা এখানে কিভাবে? একি হয়েছে তোমাদের।

মেয়েটি তাদের কথার দিকে কান না দিয়ে ঘরের কোণায় দাঁড়ানো একটা আলমারির দিকে কাঁপা হাত দুলে ইংগিত করে বলল, ওরা ওদিক দিয়ে পালিয়েছে। একটা মেয়েকেও ধরে নিয়ে গেছে।

শোনার সাথে সাথে আহমদ মুসা বললেন, হাসান তারিক, মা-চু তোমরা এদের দেখ। আহমদ ইয়াং এস আমার সাথে।

বলে আহমদ মুসা ছুটে গেলেন আলমারির দিকে। এক টানে খুলে ফেললেন আলমারি। দেখলেন একটা কাঠের সিঁড়ি নেমে গেছে। দ্রুত তার সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন।

সিঁড়িটা বাড়ির পেছনে একটা লনে এসে শেষ হয়েছে। লনে নেমেই তারা দেখলেন, একটা চীনা বেডফোর্ড কারকে তিনজন লোক পেছন থেকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। সম্ভবত গাড়িটা স্টার্ট নেয়নি। তাই স্টার্ট নেয়ানো এবং তাড়াতাড়ি কিছুটা দুরে সরে যাওয়ার প্রচেষ্টা। লোক তিনজনের কাঁধে ঝুলছে স্টেনগান।

দাঁড়াও। চীনা ভাষায় চিৎকার করে উঠলেন আহমদ মুসা। সেই সাথে তিনি ছুটছিলেন তাদের দিকে।

লোক তিনজন চমকে উঠে পেছন ফিরল। চোখের পলকে স্টেনগানগুলো নেমে এল তাদের হাতে। কিন্তু তাদের তর্জনি স্টেনগানের ট্রিগারে পৌছার আগেই আহমদ মুসার মেশিন রিভলবার এম-১০ এবং আহমদ ইয়াং-এর স্টেনগান গর্জে উঠল।

তিনজনের দেহ গাড়ির পাশেই লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

আহমদ মুসা ও আহমদ ইয়াং ততক্ষণে গাড়ির পেছনে এসে পৌছেছিলেন।

ড্রাইভিং সিট থেকে একজন লোক বেরিয়ে ছুটে পালাচ্ছিল। সেও মারা পড়ল আহমদ ইয়াং-এর স্টেনগানের গুলীতে। গাড়ির পেছন থেকে গাড়ির দরজার দিকে এগুতে গিয়ে দেখল, স্টেনগানের একটি কালো নল বেরিয়ে এসেছে। চমকে দু'পা পিছিয়ে এলেন আহমদ মুসা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে স্টেনগান থেকে এক ঝাঁক গুলী বেরিয়ে এল। আহমদ মুসা দু'পা পিছিয়ে বসে না পড়লে দেহটা তাঁর এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যেত।

আহমদ ইয়াং ততক্ষণে গাড়ির ওপাশের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মেয়েটা বসেছিল স্টেনগানধারী লোকটার এপাশে। তার মুখ কাগজের মত সাদা। আতংকে কাঁপছে সে।

আহমদ ইয়াং স্টেনগান ফেলে দিয়ে পিস্তল হাতে নিয়ে স্টেনগানদারী লোকটাকে বলল ফেলে দাও স্টেনগান।

অদ্ভুত ক্ষীপ্রগতিতে লোকটা আহমদ ইয়াং-এর কথা শেষ হবার আগেই স্টেগান সমেত এক ঝটকায় ঘুরে বসল। কিন্তু তার স্টেনগান থেকে গুলী বেরুবার আগেই আহমদ ইয়াং-এর প্রস্তুত রিভলবার থেকে একটি গুলী গিয়ে তার কপালটাকে তার গুড়ো করে দিল। গাড়ির সিটের উপর ঢলে পড়ল লোকটি। মেয়েটা ভীষণ কাঁপছিল।

আহমদ ইয়াং গাড়ির দরজা খুলে বলল, এস নেইজেন।

মেয়েটা কাঁপছিল। মনে হয় তার ওঠার শক্তি ছিল না। আহমদ ইয়াং-এর মুখে তার নাম শুনে একবার মুখ তুলে তাকাল।

আহমদ ইয়াং তাকে হাত ধরে টেনে বের করল। কিন্তু দেখল ঢলে পড়ে যাচ্ছে মেয়েটি।

মুসা ভাই। ডাকল আহমদ ইয়াং।

আহমদ মুসা গাড়ির ওপাশ ঘুরে ইয়াং-এর কাছে এলেন। বললেন, ওকে ভেতরে নিয়ে চল। অনেক ধকল গেছে, ও জ্ঞান হারাচ্ছে।

আহমদ ইয়াং ওকে পাঁজা-কোলে করে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল। কিছুদূর যাবার পর মেয়েটা ক্ষীণ কন্ঠে বলল, আমি হাঁটতে পারব।

আহমদ ইয়াং ওকে ছেড়ে দিল।

আহমদ মুসা বললেন, বোন আর ভয় নেই। এদের হাত থেকে তোমাকে উদ্ধার করার জন্যেই আমরা এখানে এসেছিলাম।

মেয়েটা একবার চোখ তুলে আহমদ মুসার দিকে তাকাল। তার নীল চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

কিন্তু শরীরের কম্পন এখনো তার শেষ হয়নি। ভাল করে হাঁটতে পারছিল না সে। আহমদ মুসা বললেন, আহমদ ইয়াং বোনকে একটু সাহায্য কর।

আহমদ ইয়াং তার একটা হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে চলল।

লালচে ফর্সা দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটার দেহে চীনা কোন বৈশিষ্ট্যই নেই। লাল স্কার্টটি হাঁটুর দু'ইঞ্চি নীচ পর্যন্ত নেমে এসেছে। লালচে গোলাপী শার্ট।

আরও কিছুদূর যাবার পর মেয়েটি নীরবে হাতটি ছাড়িয়ে নিল।

সেই সিঁড়ি দিয়েই উঠছিলেন আহমদ মুসারা। দু'ধাপ উঠেই মেয়েটি দাঁড়িয়ে গেল। সামনে চলছিল আহমদ মুসা, মাঝখানে মেয়েটি, সবশেষে আহমদ ইয়াং। মেয়েটাকে দাঁড়াতে দেখে আহমদ মুসা বললেন, কোন অসুবিধা হচ্ছে বোন?

আহমদ মুসার দিকে একবার চোখ তুলে তাকাল তারপর চোখ নামিয়ে নিয়ে একটু নীরব থেকে বলল, উঠতে পারছি না।

আহমদ মুসা আহমদ ইয়াংকে বললেন, তুমি একটু সাহায্য কর ওকে উঠতে।

আহমদ ইয়াং তার পাশে এসে তার বাঁ বাহুটা ধরল। ধরেই অনুভব করল মেয়েটা কাঁপছে। ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। সংকীর্ণ সিঁড়ি। কষ্ট হচ্ছিল পাশাপাশি উঠতে। মেয়েটির মাথা আহমদ ইয়াং-এর কাঁধে ঠেস দিয়ে আছে। বলতে গেলে তার দেহের গোটা ভারটাই আহমদ ইয়াং-এর ওপর।

সিঁড়ি দিয়ে আহমদ মুসারা সেই ঘরে এসে ঢুকলেন।

মেয়েটাসহ সবাইকে দেখে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করল হাসান তারিক। তারপর বলল, মুসা ভাই, মেয়েটাকে বাঁচানো গেল না। এই মাত্র মারা গেল। বড় হতভাগী এরা।

এরা কারা হাসান তারিক?

কেন আপনি তো জানেন, তুরপান রোডের 'ফ্র' ঘাঁটি থেকে সেই দশটি মেয়েকে উদ্ধার করে আমরা আমাদের পুনর্বাসন কেন্দ্রে রেখেছিলাম।

এরা তারা? তাহলে 'ফ্র' ওদের সন্ধান ইতিমধ্যেই পেয়ে গিয়েছিল?

তারপর কিছুক্ষণ কথা বললেন না আহমদ মুসা। কি যেন ভাবছেন তিনি। কয়েক মুহূর্ত পরে অনেকটা ঘুম থেকে জেগে ওঠার মতই বললেন, জেনারেল বোরিস ফিরে না এলে 'ফ্র' তো এভাবে সক্রিয় হবার কথা নয় তারিক।

কপালটা কুঞ্চিত দেখাল আহমদ মুসার। হঠাৎ আলোকিত ঘরে নেইজেন-এর দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠলেন আহমদ মুসা। তার শার্ট এবং স্কার্টের ডান দিকটা রক্তে ভেজা। তার দিকে দু'পা এগিয়ে বললেন তিনি, বোন তুমি আহত?

মেয়েটা মুখটা নিচু করে বলল, হ্যাঁ। গাড়িতে তোলার সময় আমি ধস্তাধস্তি করলে ওরা আমার ডান বাহুতে ছুরি মেরেছে।

আহমদ মুসা আহমদ ইয়াংকে বললেন, দেখ তো ক্ষতটা, মনে হয় এখনও রক্ত বেরুচ্ছে।

আহমদ ইয়াং আহত জায়গায় হাত দিতেই বেদনায় কঁকিয়ে উঠল মেয়েটা।

হ্যাঁ, এখনও একটু একটু করে রক্ত বেরুচ্ছে। বলল আহমদ ইয়াং।

এই সময় মা-চু তার ব্যাগ থেকে একটা ব্যান্ডেজ বের করে আহমদ ইয়াংকে দিয়ে বলল, বেঁধে দিন।

হ্যাঁ বেঁধে দাও। আপাতত রক্ত বন্ধ করা দরকার।

আহমদ ইয়াংকে এই নির্দেশ দিয়ে আহমদ মুসা হাসান তারিককে বললেন, চল আমরা বাড়িটি একটু ঘুরে দেখি। মেয়েটা আহত। এখনি ওকে পৌছে দিতে হবে। আমাদেরও অনেক দেরি হয়ে গেছে।

মিনিট তিনেকের মধ্যেই আহমদ মুসারা ফিরে এলো বাড়িটা ঘুরে দেখার পর। আহমদ মুসাকে চিন্তান্বিত দেখাল। ততক্ষণে আহমদ ইয়াং-এর ব্যান্ডেজ বাঁধা হয়ে গেছে। তারা সবাই বাড়িটি থেকে বেরিয়ে গাড়ির দিকে এগুলেন।

# ২

উংফু এভেনিউ-এর দিকে আবার ছুটে চলেছে আহমদ মুসার জীপ।

ড্রাইভিং সিটে এবার হাসান তারিক। তার পাশের সিটে আহমদ মুসা পেছনের সিটে প্রথমে মা-চু, তারপর আহমদ ইয়াং, সবশেষে মেয়েটা, নেইজেন।

'নেইজেন'- এর পরিচয় ওরা জেনে নিয়েছে। গভর্নর লিউয়ানের মেয়ে। বেইজিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-বিজ্ঞানের শেষ বর্ষের ছাত্রী নেইজেন। উংফু এভেনিউ-এর 'শেনচিং' শপিং সেন্টারে ঢোকার পথে তাকে কিডন্যাপ করেছে।

নেইজেন-এর পরিচয় পেয়ে আহমদ মুসা খুশি। নেইজেনের প্রপিতামহ যে কাজাখ ছিল সে কথাও আহমদ মুসারা জেনে নিয়েছেন নেইজেনের কাছ থেকে। জেনে আহমদ মুসা খুশি হয়েছেন। আবার ব্যাথা পেয়েছেন এই ভেবে যে এই ভাবে মুসলিম পরিবারের কত সন্তান যে মুসলমান হিসেবে জন্মগ্রহণ করেও অবস্থার কারণে মুসলিম সমাজ থেকে ছিটকে পড়ে গেছে।

আহমদ মুসার জীপ চ্যাংচিং রোড থেকে বেরিয়ে উত্তর দিকের আরেকটা রোড ধরে লিউ শাও চি স্কোয়ারের দিকে ছুটে চলেছে।

সবাই নীরব। এককক্ষণ নেইজেন একটানা প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেছে আহমদ মুসার।

সামনে চোখ মেলে সিটে হেলান দিয়ে বসে ছিল নেইজেন। তার মনেও নানা প্রশ্ন। এরা কারা? কেন তাকে উদ্ধান করতে ছুটে গিয়েছিল? লোকগুলো সবাই যে মুসলমান তা সে নাম থেকেই বুঝেছে। এ কারণেই তার প্রপিতামহও যে কাজাখ মুসলমান ছিল তা জানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ঐ প্রশ্ন তার মনে খচ খচ করে বিঁধছে। নেইজেন পাশের আহমদ ইয়াং- এর দিকে তাকাল। তার চোখ দুটি সোজা। বুঝাই যাচেছ গাড়ির ঝাঁকুনিতে একটু তন্দ্রার ভাব এসেছে তার চোখে। তন্দ্রাচ্ছাদিত আলো আঁধারে ঘেরা আহমদ ইয়াং- এর মুখের দিকে চেয়ে নেইজেনের মনে হল পবিত্র সুন্দর এক যুবক। কিছুক্ষণ আগের সবগুলো কথা তার এক এক করে মনে

পড়ল। কিন্তু এই যুবকটির আচরণ, কথা এবং চোখের দৃষ্টিতে বাড়তি কোন আগ্রহ তার নজরে পড়েনি। গাড়িতে বসে একটি কথাও সে বলেনি, তাকায়নি সে একবারও নেইজেনের দিকে। মুসলিম নৈতিকতার কথা নেইজেন ইতিহাসে পড়েছে, চোখে দেখেনি। আজ যেন সশরীরে তা দেখছে।

এই সময় জীপ একটি টার্ণ নিতে গিয়ে বড় একটা ঝাঁকুনি খেল।

চোখ খুলল আহমদ ইয়াং। একটু নড়ে চড়ে বসল, দৃষ্টি তার নিচের দিকে।

আপনার বোধ হয় ঘুম পাচ্ছে? বলল নেইজেন।

না ঠিক তা নয়। কিভাবে যেন চোখটা একটু ধরে এসেছিলো। চোখ নিচু রেখেই জবাব দিলো আহমদ ইয়াং। আবার নীরবতা। নীরবতা ভেঙে নেইজেনই আবার প্রশ্ন করলো, আমার নাম জানলেন কি করে?

আপনার আইডেনটিটি কার্ড থেকে।

বলে আহমদ ইয়াং পকেট থেকে নেইজেন - এর কার্ড এবং মা-চুর কাছ থেকে সেই ব্যাগটা নিয়ে নেইজেনকে দিয়ে দিল। বলল, ব্যাগটা ওদের গাড়ী থেকে আমরা পেয়েছিলাম।

কেন, কিভাবে আপনারা আমাকে উদ্ধার করতে গেলেন ?

আমরা একটা গাড়ী থেকে 'বাঁচাও' চিৎকার শুনতে পাই। সংগে সংগে আহমদ মুসা ভাই এর নির্দেশে আমাদের গাড়ি ঐ গাড়িটিকে ফলো করে।

একটা ছোট্ট 'বাঁচাও' চিৎকার শুনেই আপনারা এতটুকু করলেন ?

আহমদ মুসা ভাই তখন বলেছিলেন এই 'বাঁচাও' চিৎকার ছোট কিন্তু এর আবেদন ছোট নয়। আর আল্লাহর মজলুম বান্দাদের পাশে দাঁড়ানোই তো মুসলমানদের কাজ।

সে যদি অমুসলমান হয় ?

'মজলুম' -এর একটাই পরিচয় সে মজলুম। আর আল্লাহর মনোনীত শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে মুসলমানরা সকল জুলুমের বিরুদ্ধে, সকল মজলুমের পক্ষে।

'নেইজেন'-এর চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, আমিও অনেক মুসলমান দেখেছি, সবাইকে তো এমন দেখিনি?

অবস্থা, পরিবেশ, অজ্ঞতা মুসলমানদের তাদের স্থান থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

আপনারা কারা? কি পরিচয় আপনাদের?

এ প্রশ্ন আপনি মুসা ভাইকে করবেন। আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি, আমরা মুসলমানদেরকে তাদের বর্তমান অবস্থা ও অজ্ঞতা থেকে বের করে আনার চেষ্টা করছি।

গভর্নর লিইউয়ানের মেয়ে নেইজেন বুদ্বিমতি, সচেতন। আহমদ ইয়াং-এর কথায় তার দৃষ্টিটা মুহূর্তের জন্যে তীক্ষ্ম হয়ে উঠল। সে এটুকু বুঝল, এরা সাধারণের মধ্যে অসাধারণ।

একটুক্ষণ নীরব থেকে নেইজেন বলল, আমাকে আপনি প্রথম 'তুমি' বলেছেন, এখন 'আপনি' বলছেন কেন?

সেই অবস্থায় ভুল হতে পারে।

না ভুল নয় সেটাই ঠিক ছিল। আমাকে 'তুমিই' বলবেন। আহমদ মুসা সাহেব আমাকে বোন.............

'নেইজেন'- এর কথা শেষ হলো না একটা কড়া ব্রেক কষে জীপ দাঁড়িয়ে পড়ল পুলিশের সিগন্যাল পেয়ে।

লিও শাও চি স্কোয়ারে গাড়ি এসে পড়েছে। স্কোয়ারের প্রতিটি রোডের মুখে একেকটি করে পুলিশের গাড়ি। যাতায়াতকারী প্রতিটি গাড়ী তারা সার্চ করছে, জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

আহমদ মুসা বুঝলেন, নেইজেন-এর সন্ধানেই পুলিশের এই তৎপরতা। সম্ভবত গোটা শহরের প্রতিটি মোড় ও গলিমুখেই পুলিশ এই প্রহরা বসিয়েছে।

হাসান তারিক, ওরা বোধ হয় নেইজেনকেই খুঁজছে। বললেন আহমদ মুসা।

পুলিশকে পেয়ে আহমদ মুসা খুশিই হলেন। নেইজেনকে কোন দায়িত্বশীল পুলিশের হাওলায় দিয়ে তারা তাড়াতাড়ি চলে যেতে পারবেন। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন রাত আট টা বাজে। সময় যদিও অনেক নষ্ট হয়েছে। তবু ফুল স্পীডে গেলে পৌনে নটার মধ্যে তারা আল-খলিল উপত্যকায় পৌছতে পারবেন।

আহমদ মুসা চিন্তা করলেন। পুলিশ গাড়ি সার্চ করলে অসুবিধা সুতরাং ওদেরকে সার্চ করার সুযোগ দয়া যাবে না।

আহমদ মুসা জানালা দিয়ে হাত বের করে ইশারায় একজন পুলিশ অফিসারকে ডাকলেন। পুলিশ অফিসারটি এলে আহমদ মুসা বললেন, আপনারা কি গভর্নর লি ইউয়ানের মেয়ে 'নেইজেন'কে খোঁজ করছেন?

হ্যাঁ, কেন?

আহমদ মুসার হাসি মাখা মুখের দিকে চেয়ে উদগ্রীব কন্ঠে বলল পুলিশ অফিসারটি।

অপহরণকারীদের হাত থেকে আমরা তাকে উদ্ধার করেছি।

কোথায় সে, কোনখানে? বলে পুলিশ অফিসারটি উত্তরের অপেক্ষা না করে দুই হাত তুলে তার বস অফিসারকে ডাকল। এ অফিসারের ব্যস্ত ডাকার ঢং দেখে বস অফিসারটিও ছুটে এল। ডি এস পি ইনসিগনিয়া তার কলার ব্যান্ডে। সে থামতেই এ পুলিশ অফিসারটি আহমদ মুসাকে দেখিয়ে বললেন, ইনি বলছেন 'নেইজেন'কে এঁরা উদ্ধার করেছেন অপহরণকারীদের হাত থেকে।

ডি এস পি কিছু বলার আগে আহমদ মুসা বললেন, হ্যাঁ আমরা নেইজেনকে উদ্ধার করেছি। সে আমাদের গাড়িতে আছে।

ডি এস পি বিস্ফোরিত চোখে গাড়ির ভেতরে উঁকি দিল। নেইজেনকে দেখতে পেয়ে তাকে উদ্দেশ্য করে একটা স্যালুট ঠুকে সোজা হয়ে দাঁড়াল পুলিশ অফিসার। তাঁর কাঁধে ঝুলে থাকা বাঁশীতে একটা হুইসেল বাজালো।

সংগে সংগে সমস্ত পুলিশ, পুলিশের গাড়ি ছুটে এল এদিকে। তারা আহমদ মুসার জীপটিকে ঘিরে দাঁড়াল। তাদের চোখ-মুখ ও ব্যস্ততা দেখে মনে হচ্ছে, অপহরণকারীদের তারা ধরে ফেলেছে।

আপনারা নেইজেন এর দায়িত্ব নিয়ে নিন, আমাদের এক্ষুনি যেতে হবে। পুলিশ অফিসার ডি এস পি কে উদ্দেশ্য করে বললেন আহমদ মুসা। নেইজেনকে আমরা তুলে নিচ্ছি, কিন্তু হেড কোয়ার্টার্সের নির্দেশ না পেলে আমরা আপনাদের ছাড়তে পারি না।

বলে পুলিশ আফিসারটি অয়্যারলেসে যোগাযোগ করল হেডকোয়ার্টার্সের সাথে। বলল সব কথা। আলাপ শেষ করে অয়্যারলেসটা মুখের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে বলল, আপনাদের হেডকোয়ার্টার্সে যেতে হবে। যা করার উনারাই করবেন।

বলেই পুলিশ অফিসারটি আর কোন কথা শোনার অপেক্ষা না করে গাড়ির সামনের দিকটা ঘুরে নেইজেন- এর দিকে গেল।

পুলিশ অফিসারের কথা শুনে চোখটা মুহূর্তের জন্যে জ্বলে উঠেছিল আহমদ মুসার। চোয়ালটা শক্ত হয়ে উঠেছিল তাঁর। সেদিকে তাকিয়ে হাসান তারিক বলল, মুসা ভাই, নির্দেশ দিন। গাড়ি চালিয়ে দিই। ওরা আটকাতে পারবেনা আমাদের।

ততক্ষণে শান্ত হয়ে উঠেছিল আহমদ মুসা। বললেন, ওরা বোধ আমাদের সন্দেহ করছে কিছুটা বাজিয়ে দেখতে চায় সম্ভবত। কি আছে, দেখি আল্লাহ আমাদের কোথায়...........

আহমদ মুসাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই নেইজেন বলল, না জনাব এটা হতে দেবনা। আমি সব জানি আমি বলছি ওদের।

বলে নেইজেন তার পাশে এসে দাড়ানো ডিএসপিকে বলল, এরা আমাকে উদ্ধার করেছেন। এদের কি আপনারা সন্দেহ করছেন?

সন্দেহ নয়, হেড কোয়ার্টার্সের নির্দেশ যা তাই করছি।

তাহলে হেড কোয়ার্টার্সে নয়, গভর্নর ভবনে নিয়ে চলুন।

ম্যাডাম, তাহলে খবরটা আমি হেড কোয়ার্টার্সে জানিয়ে দেই।

ডি এস পি অয়্যারলেসে হেড কোয়ার্টার্সের সাথে কথা বলল। কথা শেষ করে বলল, ঠিক আছে ম্যাডাম, আমরা গভর্নর ভবনেই যাচ্ছি। আপনি আমাদের গাড়িতে উঠুন।

বলে সে গাড়ির দরজা খুলে নেমে আসার অনুরোধ করল নেইজেনকে।

না, আমি এ গাড়িতেই যাব। বলে সে টেনে গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিল। ডি এস পি মুখটা লাল করে গিয়ে তার গাড়িতে উঠল।

নেইজেন ও গাড়িতে গেলেই পারতে। বেচারার মুখের ওপর এভাবে দরজা বন্ধ করা ঠিক হয়নি। নরম কন্ঠে বললেন আহমদ মুসা।

সে আপনাকে অপমান করেছে।

না, জেন, তার দোষ নেই। ও তার দায়িত্ব পালন করেছে।

গাড়ি চলতে শুরু করেছে। মাঝখানে জীপ। তাকে ঘিরে পুলিশের গাড়ি সার বেঁধে এগিয়ে চলছে। আহমদ মুসা হাসলেন। বললেন , বেচারাদের ভীষণ সতর্কতা।

এ সতর্কতা কাজের বেলায় নেই, অকাজে। বলল নেইজেন। তার কথায় এখনও ক্ষোভ।

কিছুক্ষণ নীরবতা ভাঙল নেইজেন। আহমদ মুসাকে উদ্দেশ্য করে বলল, জনাব, আপনাদের কি পরিচয় আব্বাকে দেব?

পরিচয় দিয়ে আর কি করবে, পারলে তোমার আব্বার সাথে আমাদের দেখা করিয়ে দাও সত্ত্বর। রাত নটার মধ্যে আমাদের একশ মাইল দূরে এক জায়গায় পৌছতে হবে। বেশ দেরি করে ফেলেছি আমরা।

কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকল নেইজেন। তারপর বলল, নিশ্চয়ই আব্বার সাথে দেখা করিয়ে দেব।

একটু ঢোক গিলল নেইজেন। তাই বলে পরিচয় জানতে পারবনা? আপনারা আমাকে নতুন জীবন দিয়েছেন।

শেষের কথাগুলো নেইজেনের ভারী হয়ে উঠল।

দু:খ পেলে বোন? আসলে অনেক পরিচয় আছে যা দুএক কথায় বুঝানো যায় না।

কিন্তু আমি এক কথায় আপনাদের পরিচয় বলতে পারি।

বল তো?

আপনারা মুসলমানদের একটা আদর্শ বিপ্লবী দল। নাম জানি না।

কি করে বুঝলে?

একদিকে মুসলমানদেরকে বর্তমান অবস্থা ও অজ্ঞতা থেকে আপনারা মুক্ত করতে চান, অন্যদিকে স্রষ্টার সৃষ্টি হিসেবে সব মানুষকে আপনারা ভালবাসেন। যার জন্যে একজন অসহায় নারীকে বাঁচানোর জন্যে নিজেদের জীবন বিপন্ন করে ছুটে গিয়েছিলেন। সবশেষে মুখোমুখি লড়াইয়ে যে অপুর্ব দক্ষতা আপনাদের আমি দেখেছি। সব মিলিয়েই আমি ওটা বলেছি।

তুমি কেমন করে জানলে মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা ও অজ্ঞতা থেকে আমরা তাদের মুক্ত করতে চাচ্ছি?

আহমদ ইয়াং বলেছে আমাকে। একটু দ্বিধা করে বলল নেইজেন।

আমাদের পরিচয়টা তাকে জিজ্ঞেস করনি? হাসিমুখে বলল আহমদ মুসা।

জিজ্ঞেস করেছি। উনি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে বলেছেন।

আহমদ ইয়াং এর মুখটা লাল হয়ে উঠছিল। বিব্রত বোধ করছিল সে। মুহূর্ত কয়েক নিরব রইলেন আহমদ মুসা। তারপর বললেন, তুমি খুব চালাক নেইজেন। তুমি সাইমুমের নাম শুনেছ?

কোন সাইমুম? মুসলিম মধ্য এশিয়ার সাইমুম?

হ্যাঁ।

তারা সেখানে ও ফিলিস্তিনে যে ইতিহাস সৃষ্টি করল যার আলোচনা পত্রপত্রিকায় এখনো হচ্ছে তার নাম জানবনা?

আমরা সেই সাইমুমের লোক।

আপনারা সাইমুমের লোক? আপনি আহমদ মুসা কি সেই আহমদ মুসা? বিস্ময়ে বিস্ফোরিত হয়ে গেল নেইজেনের চোখ।

কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলনা নেইজেন। তারপর বলল, আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করি?

কর।

সিংকিয়াং-এর 'এম্পায়ার গ্রুপ' এর সাথে আপনাদের সম্পর্ক আছে?

তুমি কি মনে কর?

সাইমুম সিংকিয়াং-এ এসেছে আর 'এম্পায়ার গ্রুপ' এর সাথে তার সম্পর্ক থাকবেনা তা হয়না।

তাহলে আছে মনে কর। আহমদ মুসার মুখে হাসি। নেইজেন আবার কিছুক্ষণ কথা বললনা। তার বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি। সে বিশ্বাস করতে পারছেনা, পৃথিবীব্যাপী বহুল আলোচিত সাইমুম এর সাথে সে বসে আছে এবং কিংবদন্তির নায়ক আহমদ মুসা তার সামনে। তার মনের কোন গভীরে যেন কোন একটা অপরিচিত আনন্দ মাথা তুলছে। তার প্রপিতামহ যে কাযাখ ছিল, মুসলমান ছিল,

সেজন্য মনটা যেন গর্ব করতে চাইছে। আনন্দ অছে এই ভেবে যে, তার দেহেও মুসলিম রক্ত আছে। পাশে আহমদ ইয়াং মূর্তির মত বসে আছে। সে মা-চুর গায়ের সাথে সেঁটে আছে। নেইজেনের কোন স্পর্শ যেন না লাগে এ জন্যে সব সময় নিজেকে আড়ষ্ট করে রেখেছে। সে একবারও ফিরে তাকায়নি। কথা বলার সময়ও না। হাসি পাচ্ছিল নেইজেনের তার অবস্থায়। তার মনে পড়ল সাইমুম এর বিপ্লবী ও আদর্শ চরিত্রের এটাও একটা দিক।

আহমদ মুসা আরবী ভাষায় হাসান তারিকের সাথে কথা বলছিলেন। তিনি একবার থামলে সেই ফাঁকে নেইজেন বলল, আপনাদের পরিচয় সম্পর্কে যা শুনলাম আব্বাকে তার কিছুই জানাবনা।

জানি আমি।

কেমন করে জানেন?

অনেক সময় মনে এমন সব কথা উদয় হয়, কিন্তু কেমন করে হল তা জানা যায়না।

ঠিক বলেছেন।

গাড়ির গতি ধীর হয়ে গেল। নেইজেন সামনের দিকে তাকিয়ে বলল, এসে গেছি আমরা।

সামনে ঐ যে লন, তারপরে ঐ তো গভর্ণর ভবনের গেট।

গেটের কয়েক গজ সামনের জীপ দাঁড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে একদল পুলিশ অফিসার এসে জীপ ঘিরে দাঁড়াল। একজন অফিসার এসে জীপের দরজা খুলে ধরে একটা স্যালুট ঠুকে নেইজেনকে উদ্দেশ্য করে বলল, ম্যাডাম, নেমে আসুন।

নেইজেন তার ডান পাটা নিচে নামিয়ে দিল। মুখটা আহমদ মুসার দিকে ফিরিয়ে বলল, জনাব আমি আব্বার সাথে দেখা করে আসছি। আপনারা গাড়িতেই বসুন।

গাড়ি থেকে নেমে দরজা বন্ধ করে সামনেই পেল সিংকিয়াং-এর পুলিশ প্রধান চ্যাং ইউকে। নেইজেন নামতেই চ্যাং ইউ শশব্যস্তে বলল, কেমন আছ মা? ব্যান্ডেজের দিকে তাকিয়ে বলল আঘাতটা কিসের? বড় নয়তো?

না চাচাজান, আমি ভাল আছি। এঁরা ভাল করে ব্যান্ডেজ করে দিয়েছেন।

একটু থেমে আবার বলল, আব্বার সাথে দেখা করে না ফেরা পর্যন্ত এঁরা এ গাড়ীতেই থাকবেন। বলে গেটের দিকে এগুলো নেইজেন। তার পেছনে কয়েকজন পুলিশ অফিসার।

গেটের দুপাশে সৈনিকরা উদ্ধত স্টেনগান হাতে পাহারায়। গেটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে গভর্ণর লি ইউয়ান ও তার স্ত্রী ইউজিনা।

নেইজেনের মা খাস হান মেয়ে। উরুমচি আর্টস কলেজের সে ইতিহাসের অধ্যাপিকা।

নেইজেন গেটে পৌঁছুতেই বাপ-মা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল নেইজেনকে। ফুপিয়ে কেঁদে উঠল মা ইউজিনা।

নেইজেনের ব্যান্ডেজ বাঁধা হাতের দিকে আগেই নজর পড়েছিল লি ইউয়ানের। সে মেয়েকে মায়ের হাওলা করে পাশে দাঁড়ানো মিলিটারী সেক্রটারীকে বলল, ওয়াং, গাড়ী বের করতে বল। মাকে এখনই হাসপাতালে নিতে হবে।

মাকে ছেড়ে নেইজেন পিতার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল। ব্যস্ত হবেন না। ওটা সিরিয়াস কিছু নয়।

একটু থেমে একটা ঢোক গিলে সে আবার বলল, আব্বা যারা আমাকে অপহরণকারীদের হাত থেকে উদ্ধার করেছেন তারা আপনার সাথে দেখা করতে চান এখনি। আপনি অনুগ্রহ করে সময় দিন।

গভর্ণর লি ইউয়ান একটু থমকে দাঁড়াল। চিন্তা করল। পরে বলল, তা অবশ্যি উচিত কিন্তু এখনি?

হাঁ, আব্বা ওরা অনেক দূর যাবেন।

তুমি পরিচয় জেনেছ তাদের?

পরিচয়ের কি প্রয়োজন। আপনি তাদের ধন্যবাদ জানাবেন।

তা তো অবশ্যই, ঠিক আছে।

মিলিটারী সেক্রেটারীর দিকে ঘুরে লি ইউয়ান বলল, আমি অফিসে বসছি, তুমি ওদের নিয়ে এস।

স্যার এত রাত্রে এই অবস্থায় সবকিছু না জেনে কয়েকজন অপরিচিতের সাথে দেখা করাটা . . . . . আপত্তি জানাতে চেষ্টা করল ওয়াং।

ওরা আমার মেয়েকে বাঁচিয়েছে, তাদেরকে ধন্যবাদ জানানো আমার দায়িত্ব। তুমি যাও।

আব্বা আমিও যাচ্ছি। বলল নেইজেন।

না জেন ওরাই নিয়ে আসবে। তুমি চল আমার সাথে, তুমি ক্লান্ত, আহত তুমি।

বলে মেয়ের হাত ধরে হাঁটা শুরু করল লি ইউয়ান গভর্ণর ভবনে তার প্রাইভেট অফিসের দিকে।

গভর্ণর লি ইউয়ানের বাস ভবনে তার প্রাইভেট অফিস। বাইরে অফিসটা প্রায় ঘিরে রেখেছে সৈনিকরা। অফিসের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে মিলিটারী সেক্রেটারী। দরজা বন্ধ।

আহমদ মুসা কথা বলছিলেন লি ইউয়ানের সাথে। তার পাশের সোফায় আহমদ ইয়াং। আহমদ মুসা হাসান তারিকের আরব চেহারা এবং অন্যান্য দিক চিন্তা করে হাসান তারিক এবং মা-চু কে গাড়ীতে রেখে এসেছেন।

পিতার পাশেই সোফায় বসেছিল নেইজেন। সোডিয়াম লাইটের সুন্দর আলোতে নেইজেনকে অপরূপ এক কাজাখ মেয়ে মনে হচ্ছে। তার দেহে চীনা কোন চিহ্নই নেই।

চোখ নিচু করে বসেছিল আহমদ ইয়াং। দেখে মনে হচ্ছে অতি শান্ত, ভদ্র যুবক। শিশুর সারল্য তার চোখে মুখে। নেইজেন-এর বিস্ময়ভরা মুগ্ধ দৃষ্টি বার বারই ওর দিকে ছুটে যাচ্ছিল।

তখন কথা বলছিল গভর্ণর লি ইউয়ান। বলছিল, অশেষ ঋণে বেঁধে ফেলেছেন আপনারা আমাকে। আমি আপনাদের জন্য কি করতে পারি বলুন?

জেনের কাছ থেকে শুনলাম, নটার মধ্যেই নাকি একশ মাইল দূরে কোথাও আপনাদের পৌঁছতে হবে?

জি হ্যাঁ। খুবই জরুরী।

কিন্তু এখনতো সাড়ে আটটা। জীপ নিয়ে কি পৌঁছতে পারবেন?

আমরা চেষ্টা করব।

গভর্ণর লি ইউয়ান কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করল। একবার সে চোরা দৃষ্টিতে আহমদ মুসার দিকে চাইল। তার চোখ দুটো কেমন যেন উজ্জ্বল, সেখানে যেন অনেক কথা।

আমি আপনাদের জন্য একটা হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করতে পারি। কিন্তু জানতে পারি কি সেখানে কি ধরনের প্রয়োজন আপনাদের? লি ইউয়ানের ঠোঁটে যেন একটা হাসির রেখা। আহমদ মুসা পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে লি ইউয়ানের দিকে তাকালেন। তার চোখে চোখ রাখলেন কয়েক মুহূর্ত। তাঁরও চোখে যেন একটা নতুন চিন্তা।

যা বলতে চান বলুন। চোখে চোখ রেখেই বলল লি ইউয়ান।

জি বলতে চাই।

অনেকটা স্বগত ধরনের এই কথাটা। আহমদ মুসার হৃদয়ের কোন গভীর থেকে যেন বেরিয়ে এল। একটা আবেগ, একটা ভাবালুতা এসে তাঁর চেহারাটাকেই যেন পালটে দিয়েছে। তিনি যেন একটা অন্য মানুষ। নেইজেনের দৃষ্টি এড়ায়নি। বিষ্ময় দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে আহমদ মুসার দিকে। কিন্তু লি ইউয়ানের কোন ভাবান্তর নেই। তার ঠোঁটে তখনও সেই হাসি।

মুখ খুললেন আহমদ মুসা। বললেন, শানসি এলাকার হান সর্দার ওয়াং হুয়া শিহেজী উপত্যকার মুসলিম স্বার্থ গলাটিপে মারার জন্যে দশ হাজার নতুন বসতি নিয়ে ছুটে আসছে। ভোরের মধ্যেই ওরা গিয়ে শিহেজীর নতুন কলোনীতে জেঁকে বসতে চায়। আমরা ওদের বাধা দেব।

আপনার এই চার জন?

চেষ্টা করব।

কেন ওদের বাধা দিতে চান, সরকার তো ওদের অনুমতি দিয়েছে?

এ অন্যায় অনুমতি।

কেমন করে?

মুসলমানদের সেখান থেকে উচ্ছেদ করে হানদের সেখানে আনা হচ্ছে।

আপনাদের এটা কি অসম্ভব মিশন নয়?

আমরা সফল হব কিনা জানি না, কিন্তু দুনিয়াতে অসম্ভব কিছু নেই। যিনি সব কিছুর স্রষ্টা, সেই আল্লাহর কাছে সব কিছুই সম্ভব। আমরা তাঁরই সাহায্য প্রার্থী।

আপনারা ওয়াংকে কি আল-খলিলে গিয়ে বাধা দিতে চান?

জি।

বাধা দিতে চান, মানে তাকে ওখানে আটকে দেবেন এই তো! আর ওদিকে উদ্বাস্তু মুসলমানরা যারা এসে শিহেজীতে জমা হয়েছে তারা গিয়ে সেই কলোনী দখল করবে এই তো?

আহমদ মুসা বিস্ময় বোধ করলেন বললেন, আপনি তো সব কিছুই জানেন, জানার কথা।

কয়েক মুহূর্ত কথা বলল না লি ইউয়ান। তার ঠোঁটে সেই হাসি।

আপনাদের একটু সুখবর দিই?

বলুন। আগ্রহের সাথে বললেন আহমদ মুসা। তার চোখে কি যেন একটা আলো।

আমি আজ বিকেলেই ওয়াংকে শিহেজীর পথ থেকে ফিরিয়ে দিয়েছি। কেন্দ্রীয় সরকারকে ব্যাপারটা আমি জানিয়েছিলাম। পিকিঙ আজই নির্দেশ পাঠিয়েছে হানদের যেন শিহেজীতে আর না বসানো হয়। নতুন কলোনীয় মুসলমানরাই পাবে।

আহমদ মুসার চোখ দুটি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে তিনি বললেন, জনাব কি যে খুশি হয়েছি আমি বুঝাতে পারবো না। মনে হয় এত বড় উপকার আমি জীবনে পাইনি।

আরেকটা খুশির খবর আছে মহান যুবক। হাসি মুখে বলল লি ইউয়ান।

আহমদ মুসা শুধু মুখ তুলে চাইলেন। কিছু বললেন না। লি ইউয়ানই আবার মুখ খুলল। বলল, সেই সাথে পিকিং সরকার নির্দেশ দিয়েছে, সিংকিয়াং-এর কোন এলাকাতেই হানদের এনে বসানো হবে না আর আগের মত। এ অঞ্চলের মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা ও দাবী পূরণের জন্যেই এই ব্যবস্থা।

আমি জানি, পিকিং-এর নতুন সরকার অনেক উদার অনেক বাস্তববাদী হয়েছে। কিন্তু তারা এতটা এগুবে তা আমি ধারণা করিনি। বিস্ময়ের সাথে বললেন আহমদ মুসা।

সৌদি আরব সরকারের সাথে পিকিং-এর সম্পর্ক-উন্নয়ন এবং মক্কা ভিত্তিক রাবেতায়ে আলম আল-ইসলামীর চেষ্টা গভর্নমেন্টকে এই সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছে। সম্ভবত আরও অনেক পরিবর্তন আসছে।

কিন্তু এসব কি স্থায়ী হবে মনে করেন? সরকারের যদি পরিবর্তন আসে?

তা আসতে পারে। কিন্তু বাস্তবতাকে কে অস্বীকার করবে?

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার আগেই লি ইউয়ান পুনরায় কথা বলে উঠল, ইয়াংম্যান, এবার আপনার পরিচয়টা বলুন।

লি ইউয়ানের মুখে সেই হাসি।

আমার পরিচয় আমি মুসলিম সমাজের একজন কর্মী।

আমি বলি পরিচয়?

আহমদ মুসা একবার সন্ধানী চোখ তুলে তাকালেন লি ইউয়ানের দিকে, তারপর নেইজেনের দিকেও । বললেন, বলুন।

লি ইউয়ান সোফা থেকে উঠে তার টেবিলের পেছনের ছোট্ট ফাইল ক্যাবিনেটটার সামনে দাঁড়াল। ফাইল ক্যাবিনেট খুলে একটা ফাইল বের করে ফিরে এল। ফাইল খুলে এগিয়ে দিল আহমদ মুসার সামনে।

আহমদ মুসা বিস্ময়ের সাথে দেখলেন তার একটা ফটো, তার সাথে তার একটা পূর্ণ বায়োডাটা। সেই সাথে রয়েছে ফিলিস্তিন, মিন্দানাও ও মধ্য এশিয়ায় তার তৎপরতার পূর্ণ বিবরণ।

বিস্ময়ের বশে নেইজেনও আহমদ মুসার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সেও দেখছে।

ফাইল বন্ধ করে মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে রইলেন আহমদ মুসা।

ইয়াংম্যান, আপনাকে অভিনন্দন। আপনাকে দেখেই আমি চিনতে পেরেছি।

আহমদ মুসা তখনও নীরব। সম্ভবত ঘটনার আকস্মিকতা থেকে তখনো তিনি মুক্ত হননি।

লি ইউয়ানই আবার কথা বলল। বলল, আমি খুশি হয়েছি আহমদ মুসা। বলতে পারেন আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। আমি কোনদিনই ভাবিনি এভাবে আপনার মুখোমুখি হব।

একটু থেমেই সে আবার শুরু করল, সবচেয়ে আনন্দ লাগছে 'ফ্র' ও 'রেড ড্রাগন'দের হাত থেকে আমার মাকে উদ্ধার করার জন্যে আল্লাহ্ আপনাকেই পাঠিয়েছেন।

লি ইউয়ানের শেষের কথাগুলো যেন একটু ভারী শোনাল।

আল্লাহকে আপনি এখনও মনে রেখেছেন জনাব?

তৎক্ষণাৎ কোন উত্তর দিলনা লি ইউয়ান। শূন্য দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। পরে ধীরে ধীরে বলর, আমার সব কথাই আপনি জানবেন এটাই স্বাভাবিক।

আবার মুহূর্তের জন্যে থামল সে। শুরু করল আবার ধীরে ধীরে, আমার দাদার কুরআন শরীফ আর জায়নামায আমি সযত্নে রেখেছি। মনে করি ওগুলো আমার পরিচয়ের প্রতীক। মুসলমান সমাজের সাথেও আমার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয়েছে আমার অজ্ঞাতে রক্তের সাথেই যেন আল্লাহ নামটা মিশে আছে। আমি সরকারী কাজে একবার তুরস্ক গিয়েছিলাম। গিয়েছিলাম নীল গম্বুজ মসজিদ দেখতে। সেদিন ছিল শুক্রবার। জামায়াতে নামাজ হচ্ছিল। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার চোখ পানিতে ভরে গিয়েছিল। অতীতটা আমার সামনে এসে গিয়েছিল। মনে পড়ে গিয়েছিল দাদাকে। মনে হয়েছিল আমি যেন আমার পরিচয়ের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছি।

থামল লি ইউয়ান। এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল নেইজেন পিতার দিকে। পিতাকে যেন সে নতুন করে দেখছে। তার চোখে বিস্ময় এবং একটা নতুনকে

খুঁজে পাওয়ার আনন্দ। আহমদ মুসা ও আহমদ ইয়াংও গোগ্রাসে গিলছিল লি ইউয়ানের হৃদয় থেকে নিঃসারিত কথাগুলো।

আবার কথা বলে উঠল লি ইউয়ান। নরম কণ্ঠ তার, আপনি একটা শক্ত প্রশ্ন করেছেন। এ প্রশ্ন আমি কোনদিন আমার নিজকে করিনি। কিন্তু একটা জিনিস, ফিলিস্তিন বা মিন্দানাওয়ের মুসলমানরা মুক্তি পেল, বিজয়ী হল, তখন আমার খুব ভাল লেগেছে। বলে বুঝাতে  পারব না, মধ্য এশিয়ায় যেদিন আপনাদের বিপ্লব সফল হল সেদিন শুধু আনন্দিত হওয়া নয়, একটা তীব্র আবেগ যেন আমাকে অভিভূত করছিল। এখানকার 'এম্পায়ার গ্রুপ'কে আমি সমর্থন করতে পারি না, কিন্তু ওদের কোন ক্ষতির খবর যখনই পাই, বুকের কোথায় যেন বেদনা বোধ হয়। শিহেজী উপত্যকাসহ অন্যান্য এলাকায় হান বসতি নিয়ে যা ঘটেছে তাকে কোন সময় আমার ভাল মনে হয়নি। সরকারের নতুন সিদ্ধান্ত আমাকেই খুশি কেরেছে সবচেয়ে বেশি। তাই বাস্তবায়ন করতে আমি এক মুহূর্তও বিলম্ব করিনি। 'ফ্র' এবং 'রেড ড্রাগন'রা এটা জানে বলেই ওরা আমার মাকে কিডন্যাপ করেছিল। জেনকে আটকে রেখে ওরা শিহেজী উপত্যকার বসতি নিয়ে আমার সাথে দর কষাকষি করতে চেয়েছিল।

থামল লি ইউয়ান। একটা আবেগ ও বেদনায় আচ্ছন্ন লি ইউয়ানকে এখন একজন নতুন মানুষ বলে মনে হচ্ছে। তার পাশে নেইজেন পুতুলের মত নির্বাকভাবে বসে আছে। তার চোখে একটা কিছু খুঁজে পাওয়ার আলো।

আমি আমার উত্তর পেয়ে গেছি জনাব। শান্ত-গম্ভীর কণ্ঠে বললো আহমদ মুসা।

কি পেয়েছেন?

আপনার আল্লাহ বিশ্বাস, জাতি প্রেম এবং আপনার ঐতিহ্য আপনার সচেতন স্বত্তার গোটাটাই দখল করে আছে। প্রকাশের সুযোগ পায় না।

সামান্য সুযোগ পেলেই সচেতন স্বত্তার সাথে সংঘাত বাধে অবচেতন স্বত্তার।

কিন্তু প্রায় দুই পুরুষ ধরে অতীতের সাথে আমার বিচ্ছিন্নতা। বিচ্ছিন্নতা শুধু নয়, বিরোধিতা। বিশ্বাস বাঁচতে পারে কি করে?

বিশ্বাস মানুষের মনের নিজস্ব একটা প্রকৃতি। বাইরের ঘটনা- দুর্ঘটনার ঝড়ো হাওয়া এবং পরিবর্তন একে খুব কমই স্পর্শ করতে পারে। এ কারণেইতো সোভিয়েত ইউনিয়ন যুগ যুগ ধরে চেষ্টা সত্ত্বেও মানুষের ধর্ম বিশ্বাসকে মেরে ফেলতে পারেনি। আজ বিশ্বাসকে তারা স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হচ্ছে।

থামলেন আহমদ মুসা। লি ইউয়ানও কথা বলল না। নীরবতা কয়েক মুহূর্তের। ভাবনার গভীরে ডুবে আছে লি ইউয়ান। কয়েক মুহূর্ত পরে একটু নড়ে-চড়ে বসল সে। যেন জেগে উঠল এমন কণ্ঠে সে বলল, আপনার জন্যে আরেকটা সুখের খবর আছে আহমদ মুসা। কি? নতুন আগ্রহ ঝরে পড়ল আহমদ মুসার কণ্ঠে।

আজ সন্ধ্যার আগে মুসলিম মধ্য এশিয়া প্রজাতন্ত্র ও ফিলিস্তিন সরকারের দুজন প্রতিনিধি এসেছে। তাদের সরকারের চিঠি নিয়ে এসেছে তারা। ঐ চিঠিতে জানতে পারলাম, আপনি এখন সিংকিয়াং-এ।

তারা কোথায়? তারা আর কি বলেছে?

চিঠিতে দুসরকারই বলেছে, আপনার সন্ধানে সাহায্য করার জন্যে। দূতাবাসের মাধ্যমে পিকিংকেও তারা এ অনুরোধ করেছে। আমাকে তারা বাড়তি অনুরোধ জানিয়েছে আন-অফিসিয়ালি। তারা আমাদের অতিথি ভবনে আছে।

আপনি কিছু মনে না করলে আমি এখুনি তাদের সাথে দেখা করতে চাই।

নিশ্চয়ই দেখা করবেন। এই প্রাসাদেরই উত্তর ভবনে অতিথি ভবন। উংফু এভিনিউ ঘুরে এদিক দিয়ে গেছে।

আপনি ব্যবস্থা করলে আমরা এখনই উঠতে পারি।

ঠিক আছে, বলে লি ইউয়ান কলিংবেলে হাত দিতে যাচ্ছিল। নেইজেন পিতার কানের কাছে মুখ নিয়ে কিছু কথা বলল। লি ইউয়ানের মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, বেশ তো যাও, নিয়ে এস।

হাসি ভরা মুখ নিয়ে নেইজেন ভেতরে চলে গেল। লি ইউয়ান আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, আমার মা আপনাকে তার নিজস্ব রিভলবারটা উপহার দিতে চায়।

খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে জেন। কিছু না জেনেও শুধু ঘটনা বিশ্লেষণ করেই আমাদের পরিচয় প্রায় সে বলেই ফেলেছিল।

কি বলেছিল? আগ্রহের সাথে জানতে চাইল লি ইউয়ান।

জেন বলেছিল, আমরা একটা মুসলিম আদর্শবাদী বিপ্লবী দল।

লি ইউয়ান কিছু বলতে যাচ্ছিল, এই সময় নেইজেন ঘরে ঢুকল। তার হাতে সাদা চামড়ার কেসে ভরা রিভলবার।

নেইজেন কেস থেকে রিভলবার বের করল। রিভলবারটাও সাদা ধপধবে। দেখেই বুঝা যায় একটা দুর্লভ সংগ্রহ।

লি ইউয়ান বলল, আমি জেনকে এ রিভলবার জার্মানী থেকে অনেক খুঁজে এনে দিয়েছিলাম।

নেইজেন পিতার হাতে রিভলবার দিয়ে বলল, আব্বা, আমার পক্ষ থেকে তুমি ওনাকে দিয়ে দাও।

কেন তুমিই দাও মা, উপহার নিজ হাতেই দিতে হয়। হেসে বলল লি ইউয়ান।

নেইজনের মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। পিতার হাত থেকে রিভলবারটা নিয়ে নিল সে। এগুলো সে আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়ালেন। লি ইউয়ানও উঠে এল। নেইজেন কম্পিত হাতে রিভলবারটা আহমদ মুসার হাতে তুলে দিতে দিতে বলল, এ রিভলবারটা বহুদিন আমার কাছে লুকিয়ে আছে। জাতির সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তিকে আমি এটা উপহার দিলাম।

কথাগুলো তার কাঁপল অব্যক্ত এক আবেগে।

আহমদ মুসা রিভলবারটি নিয়ে একটু চুমু খেলেন তাতে। তারপর কেসে ভরতে ভরতে বললেন, আমার বোনের কাছ থেকে পাওয়া শক্তি ও সংগ্রামের এ প্রতীক উপহার আমার চিরদিন মনে থকবে।

মাথা নিচু করল নেইজেন। আনন্দ-আবেগে তার মুখটা লাল হয়ে গেছে। মুহূর্তকাল পরে মুখ তুলে নেইজেন পিতার দিকে চেয়ে বলল, আব্বা ওঁরা তো যাচ্ছেন, বোনের বাড়িতে ওঁদের দাওয়াত দাও না!

লি ইউয়ান হেসে উঠল। নিশ্চয়ই মা, ওঁদের ছাড়ছি না। নিশ্চয় আসবেন। একবার নয়, অনেক বার।

আহমদ ইয়াং আহমদ মুসার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল একটা শান্ত সুবোধ বালকের মত। তার মধ্যে কেমন একটা সংকোচ ও জড়তার ভাব। লি ইউয়ান তার দিকে চেয়ে বলল, মাই বয়, তুমি তো কিছু বলছ না?

জি মুসা ভাই বলছেন.....

তখন তোমার দরকার কি, বলার এই তো? হেসে বলল লি ইউয়ান।

আহমদ মুসা আহমদ ইয়াং-এর পিঠ চাপড়ে বললেন, আপনি একে চিনবেন হয়তো। কানশুর পিয়ং লিয়াং-এর হুই নেতা মা পেন চাই বংশের ছেলে।

কোন মা পেন চাই? ইস্পাত বাহিনীর?

জি। এ হুই নেতা ওয়াং চিং-এর ছেলে আহমদ ইয়াং।

লি ইউয়ান এগিয়ে এসে আহমদ ইয়াং-এর ঘাড়ে হাত রেখে বলল, তোমার আব্বা তিয়েনশান ভ্যালিতে না?

জি। বলল আহমদ ইয়াং।

লি ইউয়ান আহমদ মুসার দিকে চেয়ে বলল, এদের চিনব না! মা পেন চাই তো চীনের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন। আর ওয়াং চিং চাই এবং তাঁর পিতা স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের জন্য যে সংগ্রাম করেছে এবং পরাধীনতার সুখের চাইতে সর্বস্ব ত্যাগ করে স্বাধীনচিত্ততার যে নজীর স্থাপন করেছে তাও কোন দিন ভুলার নয়। ওরা আসলেই গর্বের বস্তু। আহমদ ইয়াং-এর দিকে ফিরে তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, ইয়াং, খুশি হলাম তোমার সাথে পরিচিত হয়ে। তোমার পিতার সাক্ষাৎ পেলে আমি খুশি হতাম।

কথা শেষ করে লি ইউয়ান দরজার দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলল, আসুন আমি বলে দিচ্ছি। ওরা অতিথি খানায় পৌঁছে দেবে আপনাদের।

চারজনেই লি ইউয়ানের প্রাইভেট অফিস থেকে বেরিয়ে এল। কড়া স্যালুট করল বাইরে দাঁড়ানো মিলিটারি সেক্রেটারী ও সৈনিকরা।

লি ইউয়ান মিলিটারী সেক্রেটারীকে বলল, এদের সবাইকে পৌঁছে দাও আজ মধ্য এশিয়া থেকে যে মেহমানরা এসেছে তাদের কাছে।

চারজনই অফিসের সিঁড়ি দিয়ে নামছিল। নেইজেন আহমদ ইয়াং-এর পাশাপাশি চলছিল। তার হাতে একটা লাল গোলাপ। গোলাপটি আহমদ ইয়াং-এর হাতে গুঁজে দিল। সিঁড়ির নিচে গাড়িতে উঠতে গিয়ে বিদায় নেবার সময় আহমদ ইয়াং জেনকে কিছু বলল না, জেনও কিছু বলতে পারল না। মাথা নিচু করে গাড়ির জানালা দিয়ে এক পলক দেখে সরে দাঁড়াল জেন।

গেটের বাইরে দাঁড়ানো জীপে এসে উঠলেন আহমদ মুসা ও আহমদ ইয়াং। সামনে একটা আর্মির জীপ। তাকে অনুসরণ করে আহমদ মুসার জীপ ছুটে চলল অতিথি ভবনের দিকে।

এবার জীপের পেছনের সিটে বসেছিলেন আহমদ মুসা ও আহমদ ইয়াং।

আহমদ ইয়াং-এর হাতে ধরা সেই গোলাপ। গোলাপটি নাকের কাছে তুলে নিতে গিয়ে চমকে উঠল আহমদ ইয়াং। এ গোলাপ যেন গোলাপ নয়। এ যেন নেইজেনের সেই চোখ এবং কথা বলতে না পারা নেইজেনের সেই লাজ নম্র মুখ।

অদ্ভুত সুন্দর সুগন্ধ গোলাপটির। উরুমচির গোলাপে সুগন্ধ একটু বেশি নাকি? হতে পারে, আহমদ ইয়াং ভাবল।

পাশেই বসেছিলেন আহমদ মুসা। এক সময় বললেন, গোলাপটার খুব সুন্দর সুগন্ধ তো আহমদ ইয়াং।

আহমদ ইয়াং হাত বাড়িয়ে গোলাপটি দিতে গেল আহমদ মুসাকে। আহমদ মুসা একটু হেসে বললেন, না ইয়াং, এ গোলাপ তোমার জন্যই। আহমদ ইয়াং কিছু বলতে পারল না। লাল হয়ে উঠল সে লজ্জায়!

# ৩

যুবায়েরভ এবং আবুল ওয়াফা আহমদ মুসা এবং হাসান তারিককে সামনে এসে দাঁড়াতে দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠল। তারপর সামনে এগিয়ে দুজন দুজনকে পাগলের মত জড়িয়ে ধরল।

যুবায়েরভ মুসলিম মধ্য এশিয়া প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান কর্নেল কুতাইবার এবং আবুল ওয়াফা ফিলিস্তিন প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান কর্নেল মাহমুদের প্রতিনিধি হিসেবে এখানে এসেছে। আবুল ওয়াফার সাথে আহমদ মুসা ও হাসান তারিকের কয়েক বছর পর দেখা। আর যুবায়েরভের সাথে এই সেদিন বিপ্লব পর্যন্ত এক সাথে করেছে তারা। আনন্দে ও আবেগে যুবায়েরভ ও আবুল ওয়াফার দুচোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল।

আলিঙ্গন শেষে দুজনের একসাথে প্রশ্ন আপনারা তো ভাল ছিলেন? ভাল আছেন?

হ্যাঁ আমরা ভাল আছি। বললেন আহমদ মুসা।

মুসা ভাইকে কোথায় পেয়েছিলেন, কীভাবে পেয়েছিলেন?

যুবায়েরভ হাসান তারিকের দিকে এক সাথে প্রশ্নগুলো ছুঁড়ে দিল।

সব শুনবেন, মুসা ভাই-ই সব বলবেন। তার আগে ওদিকে সবাই কেমন আছে?

কেমন থাকবে, সবার অবস্থা পাগলের মত। সবাই সব কাজ করে কিন্তু যেন প্রান নেই কারও। কুতাইবা ভাইকে দেখলে চিনতে পারবেন না। একদম অর্ধেক হয়ে গেছে। আহমদ মুসা আলাপ করছিলেন আবুল ওয়াফার সাথে। যুবায়েরভের এ কথা তার কানে যেতেই তিনি বলে উঠলেন, কেন কি হয়েছে তার, কোন অসুখ-বিসুখ?

না কোন অসুখ নয় মুসা ভাই। আপনাকে হারাবার পর থেকেই উনি যেন কেমন হয়ে গেছেন। একদম নিরব। সারাদিন নীরবে কাজ করে যান। আর রাতের সাথী জায়নামায। রাতে চোখের পানি তার বোধ হয় শুকায় না।

ওখানে কি সবাই পাগল হয়ে গেছে? কোন কিছুর অভাবে বা কোন ব্যাথায় মুষড়ে পড়া তো ইসলামী চরিত্র নয়।

অনেকেই তাকে বুঝিয়েছেন। কিন্তু তিনি বলেন, আমি তো মুষড়ে পড়িনি, আমি তো গাফলতি করছি না কোন কাজে? তার বার বার একটাই কথা, আমি আমার দায়িত্ব পালন করতে পারিনি মুসা ভাইয়ের প্রতি।

পাগল, পাগল। আল্লাহর যে কি পরিকল্পনা এতে ছিল তা তো সে ভেবে দেখেনি।

একটু থামলেন আহমদ মুসা। তারপর হাসান তারিকের দিকে ফিরে বললেন, তুমি আয়েশার খবর নিয়েছ? হাসান তারিকের মুখ লাল হয়ে উঠল। মাথা নিচু করল। বলল, ঠিক আছে, নেব পরে।

যুবায়েরভ এই কথা শুনেই উঠে দাড়াল। বলল, ওরা সবাই ভাল আছেন মুসা ভাই। আয়েশা ভাবী একটা চিঠি দিয়েছিল। এনে দিচ্ছি।

সুটকেস থেকে চিঠি এনে যুবায়েরভ হাসান তারিকের হাতে দিল। হাসান তারিক চিঠিটা নিয়ে পকেটে রেখে দিল। তা দেখে আহমদ মুসা বললেন, তারিক যাও পাশের ঘরে, চিঠিটা পড়ে এস। জরুরী খবর থাকতে পারে।

হাসান তারিক একটু দ্বিধা করল। তারপর নির্দেশ মেনে চলে গেল পাশের ঘরে।

আহমদ মুসা বললেন, দেখ কি ভুল। আমাদের এ ভাইয়ের সাথে তোমাদের পরিচয় করে দেয়া হয়নি।

আহমদ ইয়াং পাশে একটা চেয়ারে বসে বিচ্ছিন্ন একটা দ্বীপের মত অপলক কোছে এই মিলন দৃশ্য দেখছিল।

আহমদ মুসা তাকে দেখিয়ে বললেন, এ আহমদ ইয়াং। এখানকার ইসলামী আন্দোলন অর্থাৎ 'টার্কিক এম্পায়ার গ্রুপের' একজন সিপাহসালার ও আমার একজন অতি প্রিয় সাথী।

যুবায়েরভ ও আবুল ওয়াফা এসে জড়িয়ে ধরল আহমদ ইয়াংকে।

আলাপ পরিচয় শেষে সবাই স্হির হয়ে বসল। হাসান তারিক ফিরে এল পাশের রুম থেকে।

কোন ম্যাসেজ যুবায়েরভ? বললেন আহমদ মুসা।

আপনার জন্য একটা চিঠি আছে। একটা চিঠি গভর্নর লি ইউয়ানকে আমরা দিয়েছি। আমাদের প্রথম দায়িত্ব ছিল সিংকিয়াং প্রশাসনের সহযোগিতায় আপনাদের খুজে বের করা।

কুতাইবা - মাহমুদরা কিভাবে নিশ্চিত হল যে, লি ইউয়ানের সাহায্য তারা পাবে।

পিকিংস্হ দুতাবাসের মাধ্যমে তার সাথে এ ব্যাপারে প্রাথমিক আলাপ হয়েছিল। বিস্তারিত না জানিয়ে শুধু বলা হয়েছিল 'ফ্র' এর লোকেরা আমাদের একজন লোককে কিডন্যাপ করে এনেছে। গভর্নর এতে সহযোগিতা করতে রাজি হন। তারপরই বিস্তারিত প্রস্তাব নিয়ে আমরা তার কাছে এসেছি। মিন্দানাও প্রজাতন্ত্রের সরকারও পিকিং- এর উপর চাপ দিচ্ছে। তারাও দেখা করেছে গভর্নর লি ইউয়ানের সাথে সিংকিয়াং-এর মুসলমানদের ব্যাপারে।

থামল যুবায়েরভ। তারপর সুটকেসটা টেনে একটা সিল করা বড় ইনভেলপ তুলে দিল আহমদ মুসার হাতে।

আহমদ মুসা উল্টে-পাল্টে খামটার উপর নজর বুলালেন। মুসলিম মধ্য এশিয়া প্রজাতন্ত্রের নামাংকিত সরকারী ইনভেলপ।

খামটার উপর চোখ বুলাতে বুলাতে চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল আহমদ মুসার। অনেকটা স্বগতঃই উচ্চারণ করলেন, কত ত্যাগ, কত সাধনা, কত লড়াই এর ফসল এই স্বাধীনতা। তিনি প্রশ্ন করলেন যুবায়েরভকে, সংস্কার-কাজ, মানুষের দুঃখ-মোচনের কাজ কেমন চলছে যুবায়েরভ?

শিক্ষা, মটিভেশন এবং তার সাথে সংস্কারের কাজ পাশাপাশি চলছে। প্রতিটি মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার মত মৌলিক অধিকারকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

খুশি হলেন আহমদ মুসা। তার মুখে হাসি ফুটে উঠল। বললেন, ঠিক করছ তোমরা। শুধু নাম বদল, পতাকা, মানুষ বদল ইত্যাদিতে কোন লাভ নেই যদি না আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যা চান তার ব্যবস্থা না করা যায়।

আহমদ মুসা ইনভেলপের একটা প্রান্ত ছিড়ে ফেললেন। বের করলেন বড় ধরনের একটা চিঠি। সুন্দর কাগজে লেখা। কাগজটা রুশ আমলের। লেটার হেডে ছাপা সোভিয়েত কম্যুনিস্ট প্রজাতন্ত্রের নাম কেটে তার পাশে মুসলিম মধ্য এশিয়ার নাম উৎকীর্ণ করা হয়েছে।

কাগজগুলো নষ্ট না করে এই ভাবে ব্যবহারের ব্যবস্থা করে তোমরা ঠিক করেছ যুবায়েরভ। শিশু রাষ্ট্রের সৌখিনতার চেয়ে অস্তিত্ব বহুগুণ বড়। বললেন আহমদ মুসা।

চিঠিটা তার চোখের সামনে মেলে ধরলেন আহমদ মুসা। দীর্ঘ চিঠি পড়তে শুরু করলেন তিনি।

আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় ভাই,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আপনাকে এই সালাম পাঠাতে গিয়ে বেদনায় মনটা মুষড়ে পড়ছে। আপনি কোথায় আছেন, কেমন আছেন আমরা জানি না। আমাদের সালাম আপনার কাছে কবে পৌছবে, আদৌ পৌছবে কিনা তাও জানি না। এই না জানার বেদনা আমাদে ক্ষত বিক্ষত করে চলছে। জেনারেল বোরিসের পেছনেই গেছে হাসান তারিক এবং আব্দুল্লায়েভ। তাদেরও কোন খোঁজ আমরা পাইনি। পিকিং সরকার এবং সিং কিয়াং এর প্রাদেশিক সরকারের মাধ্যমে আমরা চেষ্টা শুরু করেছি। ফিলিস্তিন ও মিন্দানাও সরকারও চেষ্টা করছে। সৌদি সরকারকেও অনুরোধ করা হয়েছে। তারা চেষ্টা করছে। মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে আমাদের আকুল প্রার্থনা, আল্লাহ আপনাকে নিরাপদে রাখুন, সুস্থ রাখুন।

এই চিঠি আপনার কাছে পৌঁছবে কিনা নিশ্চিত নই, তবু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন এক বিষয়ে আপনাকে লিখছি যদি চিঠিটা আপনার কাছে পৌঁছে এই আশায়।

ককেশাস অঞ্চল নিয়ে ভয়ানক এবং জঘন্য এক ষড়যন্ত্র দানা বেঁধে উঠেছে। আপনি জানেন, পামির থেকে কাস্পিয়ানের উত্তর তীর এবং আফগান সীমান্ত থেকে কাজাখস্থানের শেষ প্রান্ত ইউরাল পর্বতমালা পর্যন্ত এলাকা নিয়ে মুসলিম মধ্য এশিয়া সাধারণতন্ত্র গঠিত হয়েছে। আর নতুন রাশিয়ার রিপাবলিকের একটা সীমানা মধ্য এশিয়া মুসলিম সাধারণতন্ত্র, ক্রিমিয়া এবং তাতারিয়া স্বায়ত্ত শাসিত অঞ্চলের উত্তর বরাবর এসে শেষ হবার কথা। এখান থেকে ইরান ও তুরস্কের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত ক্রিমিয়া, জর্জিয়া, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান এবং তাতারিয়া এক কালের এই চার অঞ্চল নিয়ে গঠিত মুসলিম অধ্যুষিত ককেশাস অঞ্চল আজ মারাত্মক ষড়যন্ত্র ও সংঘাতের শিকার। সেখানে চেষ্টা হচ্ছে একটা খালেস খৃষ্টান রাষ্ট্র কায়েমের। কৃষ্ণ সাগর ও কাস্পিয়ান সাগরের মধবর্তি এশিয়া ও ইউরোপকে সংযোগকারী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন এই অঞ্চলে তারা চাচ্ছে পশ্চিমী স্বার্থের আজ্ঞাবহ একটা খৃষ্টান রাষ্ট্র কায়েম করতে। এ রাষ্ট্রের দুপাশে থাকবে দুই সাগর, পশ্চিম পাশে তুরস্ক, দক্ষিনে ইরান এবং উত্তর সীমান্ত গঠিত হবে ককেশাস পর্বত মালা দিয়ে। রাষ্ট্রটা হবে অবস্থান ও সমৃদ্ধির দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। এখান থেকে শুধু দুই সাগর নিয়ন্ত্রন নয়, চারপাশের গুরুত্বপূর্ন মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর উপরও খবরদারীর একটা পথ হবে। ওরা চেয়েছিল লেবাননকে দিয়ে এশিয়ায় একটি খৃষ্টান রাষ্ট্রের অভাব পূরণ করতে। কিন্তু সে আশা পূরন হয়নি। এখন ককেশাসকে দিয়ে সে সাধ পূরণ করতে চাচ্ছে। উত্তরের রাশিয়ান রিপাবলিক, যা মূলত খৃষ্টান জনঅধ্যুষিত, এতে তাদের লাভই দেখছে। তারা মনে করছে ককেশাসের ঐ অংশ যদি খৃষ্টানদের হাতে চলে যায়, তাহলে তাতারিয়া ও ক্রিমিয়াকে স্বাধীনতা না দিয়ে সে বাঁচতে পারে। এতে করে রাশিয়ান রিপাবলিকের সীমানা একদিকে ককেশাস পর্বতমালা পর্যন্ত পৌঁছবে, অন্যদিকে কৃষ্ণ সাগর ও কাস্পিয়ান সাগরে নামার পথ পাবে যা তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। অতএব রাশিয়ান রিপাবলিক এবং পশ্চিমা কয়েকটি খৃষ্টান দেশ আজ এক জোট হয়ে ককেশাসের মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে নেমেছে। ১৯১৭ সালে লেনিনের পাঠানো কম্যুনিষ্ট রেড আর্মি আর্মেনিয় খৃষ্টান শামিউনের নেতৃত্বে ককেশাসের মুসলমানদের উপর গনহত্যা চালিয়ে অঞ্চলটিকে যেভাবে তাদের দখলে নিয়েছিল, সেভাবেই তারা এখন এগুচ্ছে।

মুসলিম এলাকায় খৃষ্টান ও কম্যুনিষ্টদের মদদপুষ্ট গেরিলা সন্ত্রাস শুরু হয়েছে এবং মুসলিম নেতৃবৃন্দের অপহরণ ও হত্যার কাজও শুরু হয়ে গেছে। সুযোগ পেয়ে সন্ত্রাসী 'ফ্র'রাও জুটেছে এখানে এসে। ইরান ও তুরস্ক নানা কারনেই এ ব্যাপারে মাথা ঘামাতে নারাজ। হয়তো সে সুযোগ ও সামর্থ্যও তাদের নেই। এ অবস্থায় আমরা চোখে অন্ধকার দেখছি। সেখানকার মুসলমানরা চরম আতংক ও অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। অবিলম্বে যদি তাদের ব্যাপারে কিছু না করা হয়, তাহলে ১৯১৭ সালের পুনরাবৃত্তি ঘটবে আবার।

এই বিপদ আমরা বুঝতে পারছি, কিন্তু আমরা কিভাবে কি করণীয় তা বুঝতে পারছি না। ফিলিস্তিনের মাহমুদ ভাইয়েরও এই কথা। আমরা আপনার পরামর্শ ও পরিচালনা চাই।

সবশেষে আল্লাহর কাছে আমাদের আকুল প্রার্থনা এই চিঠি যেন অতি সত্ত্বর আপনার হাতে পৌছে।

ওয়াসসালাম-

আপনার স্নেহ ধন্য কুতাইবা।

চিঠি পড়া শেষ করে আহমদ মুসা নীরবে তা তুলে দিলেন হাসান তারিকের হাতে।

একটি কথাও বললেন না তিনি। তার শূন্য দৃষ্টিটা সামনে দেয়ালে নিবদ্ধ। ওখানে একটা বড় ল্যান্ডস্কেপ। ল্যান্ডস্কেপের দিগন্ত পেরিয়ে হারিয়ে গেছে তার দৃষ্টি। কপাল তার কুঞ্চিত। মুখে বেদনার কালো ছায়া।

সবাই নীরব। পল পল করে বয়ে যাচ্ছে সময়।

এক সময় আহমদ মুসার চোখ ধীরে ধীরে নীচু হল। যেন জেগে উঠলেন তিনি। একটু নড়ে বসলেন চেয়ারে। যুবায়েরভের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন তোমাদের কেউ গিয়েছিল ওখানে?

গিয়েছিল। একটা তথ্যানুসন্ধান দল পাঠনো হয়েছিল। আর ককেশাস থেকে কয়েকটা প্রতিনিধি দল এসেছে। কোন উত্তর এলোনা আহমদ মুসার কাছ

থেকে। তাঁর দৃষ্টি আবার ফিরে গেছে সেই দেয়ালে। দৃষ্টিটা আবার কোথায় যেন হারিয়ে গেছে তাঁর।

হাসান তারিক চিঠি পড়া শেষ করে ভাঁজ করতে করতে বলল, আরেক ফিলিস্তিন, আরেক মিন্দানাও মুসা ভাই।

আহমদ মুসা মখটা ঘুরিয়ে হাসান তারিককে বললেন, মিন্দানাও ও ফিলিস্তিনে খৃষ্টান ও কম্যুনিষ্ট স্বার্থের এমন সম্মেলন ঘটেনি তারিক।

ঠিক বলেছেন মুসা ভাই।

আহমদ মুসা কোন কথা বললেন না। হাসান তারিকই আবার বলা শুরু করল। বলল, এটা ঠিক ইহুদী–ইসরাইলের মত খৃস্টানরাও এশিয়ায় একটি খৃষ্টান-ইসরাইল চায়। ককেশাস তাদের একটি সুচিন্তিত সিলেকশন।

এতে বিস্ময়ের কিছু আছে হাসান তারিক? উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা ও বিজ্ঞানের উন্নতি দিয়ে খৃষ্টানরা বহুদুর এগিয়েছে। শুধু ককেশাস কেন প্রতিটি দেশেই তাদের অবস্থান নিয়ে তারা ভাবছে। আর এটা শুধু ভাবা নয়। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতিটি দেশ, গোটা বিশ্বকেই তারা একটি প্রতিষ্ঠানিক আওতার মধ্যে নিয়ে আসছে। ধীর কন্ঠে বললেন আহমদ মুসা।

কিন্তু কম্যুনিষ্ট ও খৃষ্টান স্বার্থের এই সম্মেলনের তাৎপর্য কি? যোবায়েরভ প্রশ্ন তুলল।

ধর্মকে বাদ দিয়ে স্থায়ী কোন জাতি গঠন হয় না, সোভিয়েত জাতি গঠনের ব্যর্থতা কম্যুনিষ্টদের তা পরিষ্কার করে দিয়েছ। তাই এখন রাশিয়ান রিপাবলিক যদি কোন ধর্মের আশ্রয় নিতে আগ্রহী হয় তাহলে বিস্ময়ের কি আছে। আর রাশিয়ার জন্যে স্বাভাবিক ভাবেই সে ধর্ম হবে খৃষ্টান ধর্ম।

আবার নীরবতা।

আহমদ মুসা একবার ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন, অনেক রাত। বাইরে সরকারী লোকরা কষ্ট পাচ্ছে। যুবায়েরভের দিকে চেয়ে আহমদ মুসা বললেন, তোমরা থাক এখানে। এখনকার মত উঠি। কাল দেখা যাবে।

কোথায় যাবেন? যুবায়েরভের কন্ঠে যেন উদ্বেগ।

এক শুভাকাঙ্ক্ষীর বাসায়। চলবার শক্তিহীন আহত অবস্থায় আমি যখন একটা রাস্তায় পড়েছিলাম তখন ওরাই আমাকে নিয়ে আসে।

জানে আপনাকে?

জানে। ওখানে হাসান তারিক ও আহমদ ইয়াং ও আমার সাথে থাকবে। আবদুল্লায়েভ আমাদের 'এম্পায়ার গ্রুপ' এর হেড কোয়ার্টার্সে থাকে। কোন চিন্তা নেই।

কিন্তু আপনাকে ছাড়তে মন চাইছে না। হয় আপনি এখানে থাকুন না হয় আমাদের নিয়ে চলুন।

আহমদ মুসা হেসে ফেলে বললেন, পাগল। তোমাদের নিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু তোমরা যার মেহমান তার অনুমতি না হলে পারি না। বলে আহমদ মুসা উঠে দাড়ালেন। তার সাথে হাসান তারিক এবং আহমদ ইয়াংও।

মুখ ভার করে যুবায়েরভ বলল, আপনার কিছুই আমরা শুনতে পারলাম না।

যুবায়েরভের পিঠ চাপড়ে আহমদ মুসা বললেন, হবে, কালকে সব শুনবে। আসি। তোমরা ঘুমাও।

বলে আহমদ মুসা বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। তার পিছনে হাসান তারিক এবং আহমদ ইয়াং। মা-চু গাড়িতে বসেছিল। মা-চুকে আহমদ মুসাদের সাথে আসতে বলা হলে বলেছিল, বড় ধরনের কোন কথা আমি কিছু বুঝি না। তার চেয়ে আমি গাড়ি পাহারা দিই।

আহমদ মুসা বুঝেছিল, মা-চু তার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন। গাড়িতে থাকাই তার জন্য বেশি প্রয়োজন। তবু আহমদ মুসা হেসে বলেছিলেন, তোমার আপামনি না তোমাকে আমার পাশে পাশে থাকতে বলেছেন।

মা-চু তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়েছিল, তা বলেছেন। কিন্তু আপনি তো এখন লড়াই-এ যাচ্ছেন না।

মা-চুর জবাবে আহমদ মুসা হেসে উঠেছিলেন। মনে মনে বুঝেছিল মা-চুকে বোকা মনে হলেও খুব চালাক সে।

বাইরে করিডোরে একটা চেয়ারে বসেছিল সেনাবাহিনীর একজন অফিসার। আহমদ মুসারা বেরুতেই সে উঠে দাড়িয়ে স্যালুট দিল।

আহমদ মুসা বললেন, খুব কষ্ট দিয়েছি আপনাদের। এখন আসুন। আমরা চলে যাচ্ছি।

সেনা অফিসারটি বলল, স্যার আপনাকে বাসায় পৌছে দিতে চায়।

এই-ই কি হুকুম?

গভর্নর সাহেবের এটা নির্দেশ।

ঠিক আছে। বলে আহমদ মুসা অতিথি ভবন থেকে বেরিয়ে তাদের জীপে এসে উঠলেন।

তাদের জীপের পেছনে পেছনে বেরিয়ে এল সেনাবাহিনীর একটি জীপ।

আহমদ মুসার জীপটি মেইলিগুলিদের গেটের মুখোমুখি হতেই বিস্ময়ে আঁতকে উঠলেন আহমদ মুসা। দেখলেন গেটটা হা হয়ে আছে। আরো দেখলেন একটা মাইক্রোবাস দ্রুত বেরিয়ে আসছে।

ছ্যাৎ করে উঠল আহমদ মুসার মনটা। নেইজেনকে উদ্ধার করতে গিয়ে আজ কিছুক্ষণ আগে 'ফ্র'র ঘাঁটিতে দেখা আলামতের কথা তার মনে পড়ল। ঘাঁটির ঘরগুলো দেখতে গিয়ে একটা ঘরে হ্যাঙ্গারে একটা স্যুট সে দেখেছে। স্যুটটা জেনারেল বোরিসের। চীনে আসার সময় জেনারেল বোরিসের পরিধানে এই স্যুটটাই ছিল। কিন্তু বিশ্বাস হয়নি তার, জেনারেল বোরিস তার হাতটা সুস্থ না করেই ফিরে আসবে? কিন্তু এখন মেইলিগুলির বাড়ি থেকে এই মধ্যরাতে গাড়ি বেরুতে দেখে সেই আশংকা তার কাছে বাস্তবরূপ নিয়ে সামনে এল।

আহমদ মুসার জীপটি গেট থেকে রাস্তায় বেরুবার যে প্যাসেজে একদম গেটের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল। আর মাইক্রোবাসটি তখনো গেট থেকে পাঁচ-ছয় গজ ভিতরে।

মুহুর্তের জন্য বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন আহমদ মুসা। কিন্তু মাইক্রোবাস থেকে স্টেনগান হাতে একজনকে লাফিয়ে পড়তে দেখেই আহমদ মুসা বললেন,

‘সাবধান তোমরা’ কথাটা বলতে বলতেই গাড়ি থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছিলেন আহমদ মুসা।

ব্যাপারটা আহমদ ইয়াং ও হাসান তারিকের নজরে পড়েছিল। আর তার প্রায় সাথে সাথেই বৃষ্টির মত এক পশলা গুলী এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল জীপটার উপর। গুলী বন্ধ হলো না। পাগলের মত কে যেন স্টেনগান চালাচ্ছে।

সেনা অফিসারটির জীপ ও গেট বরাবর রাস্তার উপর এসে দাঁড়িয়েছিল। ফলে এ জীপও গুলীর মুখে পড়ল। অপ্রস্তুত ড্রাইভার সৈনিকটি গুলী বিদ্ধ হয়ে তার সিটেই ঢলে পড়ল। সেনা অফিসারটি তার আগেই লাফিয়ে পড়েছিল নিচে। পেছনের সিটে বসা দুজন লেফটেন্যান্ট পেছনের দরজা দিয়ে নিরাপদে বেরিয়ে আসতে পেরেছে।

আহমদ মুসার জীপের চেহারার একদম পাল্টে গেছে। উইন্ড স্ক্রিনের কোন চিহ্ন নেই। জীপের সামনের দিকটা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। দুটো হেড লাইটও গুড়ো হয়ে গেছে।

আহমদ ইয়াং এবং দুজন লেফটেন্যান্টের স্টেনগানও উঁচু হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আহমদ মুসা হাত তুলে তাদের নিষেধ করেছে। ওরা নিশ্চিন্তে বেরিয়ে আসুক।

কর্ণেল সেনা অফিসারও আহমদ মুসার সাথে একমত হয়েছে। বলেছে, আমরা এবার আক্রমণের পজিশনে, ওদের বিভ্রান্ত করা এবং একটু আশ্বস্ত করে বন্দুকের নলের সামনে বের করে আনাই আমাদের প্রধান কাজ।

কর্ণেল, আপনারা এই কাজটি করুন। আর আহমদ ইয়াং, এদের সাথে এখানে দাঁড়িয়ে গেট থেকে কেউ যাতে বেরিয়ে যেতে না পারে তা নিশ্চিত করা তোমার দায়িত্ব। বলে আহমদ মুসা হাসান তারিককে বললেন, চল আমরা পেছন দিক দিয়ে বাড়িতে ঢুকব। পালাবার ওদিকের পথও বন্ধ করতে হবে।

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই আহমদ ইয়াং উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, মা-চু কোথায় মুসা ভাই? সে তো গাড়ি থেকে নামেনি।

আহমদ মুসা একটু চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, চিন্তা করো না ইয়াং, আত্মরক্ষা ও আক্রমণ দুটি কৌশলই মা-চুর জানা আছে।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক প্রাচীর ঘুরে দ্রুত চলে এলেন বাড়ির পেছনে।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা। করিডোরের ও বাড়ির পেছনের যে আলোটা সব সময়ই থাকে তাও নেই। আহমদ মুসার মনে পড়লো গেটের শেডেও কোন আলো দেখা যায়নি। তাহলে কি বিদ্যুত লাইন ওরা কেটে দিয়েছে? টেলিফোন লাইনও? এত বড় আয়োজন! বিস্ময় বোধ করলেন আহমদ মুসা। হঠাৎ মনে পড়লো, জেনারেল বোরিস তো কোন ছোট্ট মিশনে আসেনি। আহমদ মুসাসহ সবাইকে ধরার মত আঁট-সাট বেঁধেই সে এসেছে। ভাবতে গিয়ে বুকটা কেঁপে উঠলো আহমদ মুসার। আল্লাহই জানেন, মেইলিগুলির কি হয়েছে! দেহের স্নায়ুতন্ত্র জুড়ে একটা জ্বালা ছড়িয়ে পড়ল তার। প্রাচীরের পেছনে অপেক্ষাকৃত একটি অন্ধকার জায়গায় এসে তারা দাঁড়ালেন।

পেছনের দিকে প্রাচীরটা আট ফিট উঁচু। আহমদ মুসা হাসান তারিককে বললেন, তুমি আমার কাঁধে পা টা রেখে প্রাচীরে উঠে যাও। হাসান তারিক একটু ইতস্তত করে বলল, আপনি কিভাবে উঠবেন?

এখন নষ্ট করার মত সময় নেই হাসান তারিক। যা বলছি কর। প্রায় ধমকে উঠলেন আহমদ মুসা। হাসান তারিক প্রাচীরে উঠে গেল। নেমে গেল ওপারে।

আর আহমদ মুসা প্রাচীরের প্রায় দশ গজ দূর থেকে তীব্র গতিতে ছুটে এসে অদ্ভূত দক্ষতার সাথে প্রাচীরের অর্ধেকটা দৌড়ে উঠে গেলেন এবং ওই অবস্থায় দুই হাত দিয়ে প্রাচীরের মাথাটা ধরে প্রাচীরে উঠে পার হয়ে গেলেন ওপারে।

প্রাচীর টপকে তারা বাড়ির পেছনের বাগানে এসে দাঁড়ালেন। এই বাগানটাই ঘুরে বাড়ির সামনে চলে গেছে।

আহমদ মুসা পকেট থেকে বের করে ইনফ্রারেড গগলসটি চোখে পরে নিলেন। তারপর বিল্ডিংয়ের পাশ ঘেঁষে সামনে এগুলেন। তাঁর পেছনে হাসান তারিক। হাতে তাদের এম-১০ মেশিন রিভলভার। তাদের লক্ষ্য বাগান ঘুরে সেই মাইক্রোবাসটির পেছনে গিয়ে পৌঁছা।

বিল্ডিং এর দক্ষিণপাশ ঘুরে উত্তরমূখী হয়ে চলতে শুরু করেছেন এমন সময় আবার গুলি শুরু হল। গুলি শুরু হয়েছে এ পাশ থেকে।

বিল্ডিংটা উত্তর দক্ষিণ লম্বা। মাঝখানে গাড়ি বারান্দা। গাড়ি বারান্দারও প্রায় দশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে মাইক্রোবাসটি।

বিড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে দ্রুত আহমদ মুসা ও হাসান তারিক গাড়ি বারান্দায় উঠে দুই থামের আড়ালে দুজন বসে পড়লেন। এখান থেকে মাইক্রোবাসের পূব পাশ দিয়ে গেটের পুরোটাই দেখা যাচ্ছে। দেখলেন, স্টেনগানধারী ছয়জন লোক গুলি করতে করতে সামনে এগুচ্ছে। গেটের গজ দুয়েক ভেতরে থাকতেই বিকট শব্দে একটা হাত বোমা এসে বিস্ফোরিত হল তাদের উপর। তার ইনফ্রারেড গগলসে তিনি বিস্ময়ের সাথে দেখলেন, বোমাটি ছুটে এল আহমদ মুসার সেই বিধ্বস্ত জীপ থেকে। তাহলে মা-চু এই সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিল।

চারজন লোক ঢলে পড়লো ওখানেই। অন্য দুজন দুপাশে ছিটকে পড়েছিল। হামাগুড়ি দিয়ে ওরা সরে আসতে চেষ্টা করল এ দিকে।

এই সুযোগে গুলি করতে করতে গেট দিয়ে ছুটে এল আহমদ ইয়াং এবং অন্যরা।

মাইক্রোবাসের ড্রাইভিং সিট থেকে লাফ দিয়ে একজন নেমে এল এ সময়। টেনে নামাল সে আরেকজনকে। তারপর সেই লোক চিৎকার করে উঠল, আহমদ মুসা তোমরা আর এক পা এগুলে এবং গুলি করা বন্ধ না করলে মেইলিগুলির মাথা গুড়ো হয়ে যাবে।

দেখা গেল সেই লোকটা গাড়ি থেকে যাকে টেনে নামাল তাকে সামনে রেখে তার গা ঘেঁষে পেছনে দাঁড়িয়ে। আহমদ মুসা বুঝলেন সামনের জনই তাহলে মেইলিগুলি। তাকে বোরিস এখন ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে।

জেনারেল বোরিসের কণ্ঠ ধ্বনিত হবার সাথে সাথে আহমদ ইয়াংরা থমকে দাঁড়াল, গুলিও বন্ধ হয়ে গেল তাদের।

জেনারেল বোরিস হো হো করে হেসে উঠল। বলল, আহমদ মুসা, জেনারেল বোরিসের হারাবার কিছূ নেই। আমি মৃত্যুকে ভয় করি না। কিন্তু আজ তোমার প্রিয়তমা আগে মরবে তারপর আমি মরব।

একটু দম নিল জেনারেল বোরিস, তারপর আবার চিৎকার করে উঠল, তোমরা স্টেনগান ফেলে দিয়ে গেটের পূবপাশে গিয়ে দাড়াও। এক মুহূর্ত দেরি করলে মেইলিগুলির মাথা গুড়ো করে দেব।

আহমদ ইয়াংরা মুহূর্ত দ্বিধা করল, তারপর স্টেনগান ফেলে দিয়ে গেটের বাঁ পাশে চলে গেল।

আহমদ মুসা ততক্ষণে বিড়ালের মত নিঃশব্দে জেনারেল বোরিসের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। শেষ মুহূর্তে টের পেল জেনারেল বোরিস। চমকে সে মাথা ঘুরিয়ে তাকিয়েছিল।

কিন্তু ব্যাপারটা বুঝে উঠার আগেই আহমদ মুসা রিভলবারের বাট দিয়ে তার কানের ঠিক উপরটায় প্রচন্ড একটা আঘাত করলেন। ঘুরে পড়ে গেল জেনারেল বোরিস একপাশে ।

হঠাৎ আহমদ মুসার নজর পড়ল মেইলিগুলির উপর। মেইলিগুলি টলছে। ঠিক পড়ে যাবার মুহূর্তে তাকে গিয়ে ধরলেন আহমদ মুসা। বললেন, কি হয়েছে মেইলিগুলি? অসুস্থ বোধ করছো? আহমদ মুসার কাঁধের উপর ঢলে পড়ল মেইলিগুলি। বলল, একটা গুলি লেগেছে।

গুলি লেগেছে? কোথায়?

পাঁজরে।

আহমদ মুসা তাকে পাঁজাকোলা করে হাতে তুলে নিলেন। ডাকলেন হাসান তারিককে।

আমি এখানে। পাশ থেকে বলে উঠল হাসান তারিক। এই সময় আহমদ ইয়াং, মা-চু, সেনা অফিসারসহ সৈনিকরা সেখানে এসে দাঁড়াল।

মেইলিগুলিকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। রাস্তা থেকে জীপটা সরিয়ে ফেল। এই মাইক্রোবাসটা নিয়েই যেতে হবে।

বলে আহমদ মুসা মেইলিগুলিকে নিয়ে মাইক্রোবাসের দিকে এগুলেন। মাইক্রোবাসে উঠে সিটের উপর তাকে শুইয়ে দিলেন।

মেইলিগুলি ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, আমার দাদী, আমার দাদীকেও ওরা গুলি ..... কান্না এসে কথা তার রুদ্ধ করে দিল।

দাদীকেও। বিস্ময়ে বিস্ফোরিত হলো  আহমদ মুসার চোখ। আহমদ ইয়াং ও অন্যরা চলে গিয়েছিল গেটের সামনে থেকে জীপটি সরিয়ে দিতে। হাসান তারিক ও মা-চু মাইক্রোবাসের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। মা-চু বাকরুদ্ধ প্রায়।

আহমদ মুসা ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন, হাসান তারিক তুমি ও মা-চু ওপরে যাও। দাদী কি অবস্থায় দেখ। ওঁকেও হাসপাতালে নিয়ে এস সৈনিকদের ওই জীপে করে। আহমদ ইয়াং ও মা-চু এখানেই থাকবে।

লেফটেন্যান্ট দুজনকে হাসান তারিকের সাথে জীপে আসার জন্য রেখে আহমদ মুসা মেইলিগুলিকে নিয়ে ছুটলেন হাসপাতালের দিকে। ড্রাইভিং সিটে বসে সেই সেনা কর্ণেল অফিসারটি।

আহমদ মুসা সিটের সামনে গাড়ির ফ্লোরে বসে মেইলিগুলির দেহকে ধরে রেখেছিলেন সিটের সাথে। আহমদ মুসার সামনের দিকটা রক্তে ভিজে গেছে।

শংকিত হয়ে উঠলেন আহমদ মুসা। কখন থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে মেইলিগুলির?

মেইলিগুলি নিঃসাড়ভাবে শুয়ে আছে। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেনি তো? আহমদ মুসা আস্তে ডাকলেন, আমিনা?

জ্বি। একটু সময় নিয়ে দুর্বল কণ্ঠে উত্তর দিল মেইলিগুলি।

কখন গুলি লেগেছে তোমার আমিনা?

আমি স্টেনগান দিয়ে ওদের ঠেকিয়ে রেখেছিলাম। একটা গুলি এসে লাগলে আমার হাত থেকে স্টেনগান পড়ে যায়।

ধীরে ধীরে বহু কষ্টে উচ্চারণ করল মেইলিগুলি। ক্রমেই সে দুর্বল হয়ে পড়ছে।

আহমদ মুসা মাথাটা খাড়া করে বললেন, হাসপাতাল আর কতদূর কর্ণেল?

আর দুমিনিট স্যার, বলল কর্ণেল। আবার নীরবতা।

মেইলিগুলি কি জ্ঞান হারিয়ে ফেলল? উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন আহমদ মুসা। আবার ডাকলেন, আমিনা?

জ্বি। অস্ফুট একটা জবাব এল বেশ দেরীতে।

কেমন বোধ করছ?

কোন জবাব দিল না মেইলিগুলি। মেইলিগুলিকে ধরে রাখা আহমদ মুসার একটা হাতের উপর অতি ধীরে উঠে এল মেইলিগুলির একটি হাত। চমকে উঠলেন আহমদ মুসা। অপরিচিত অস্বস্তির একটা ঢেউ যেন খেলে গেল তার গোটা দেহে। মেইলুিগলির দুর্বল হাত কাঁপছিল।

এই সময় হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে ঢুকে গেল মাইক্রোবাসটি।

কর্ণেলের ইঙ্গিতে দ্রুত ছুটে এল ইমার্জেন্সির লোকরা রোলিং স্ট্রেচার নিয়ে। কর্ণেলের হাঁক ডাকে পাশের রুম ইনচার্জ ডাক্তারও বেরিয়ে এসেছিল। কর্ণেল তাকে কানে কানে কি যেন বলল।

ডাক্তারও ছুটে এল মাইক্রোবাসের গেটের দিকে স্ট্রেচারের কাছে। আহমদ মুসাকে হাত তুলে একটা স্যালুট দিয়ে বলল, কোন অসুবিধা হবে না স্যার।

বলেই সে পেশেন্টকে সোজা অপারেশন কক্ষে নিয়ে যেতে নির্দেশ দিয়ে ছুটল ইমার্জেন্সি কক্ষের দিকে।

অপারেশন কক্ষের বাইরে উদ্বিগ্নভাবে অপেক্ষা করছিলেন আহমদ মুসা ও হাসান তারিক। কর্ণেল চলে গিয়েছিল।

আহমদ মুসা ঘড়ি দেখলেন। রাত আড়াইটা। হাসপাতালে আসার পর প্রায় দেড় ঘন্টা পেরিয়ে গেছে। আরও পনের মিনিট পরে অপারেশন কক্ষের দরজা খুলে গেল। বেরিয়ে এলো সিংকিয়াং এর শ্রেষ্ঠ অস্ত্রোপচারবিদ ডাক্তার চ্যাং। তার মুখ গম্ভীর। বলল, অপারেশন সফল, কিন্তু কিছু জটিলতা দেখা দিয়েছে। ইনটেনসিভ কেয়ারে আছে। আগামী বার ঘন্টা খুবই গুরুত্বপূর্ন।

আর দাদী, মানে বৃদ্ধা মহিলাটির খবর? বললেন আহমদ মুসা।

স্যরি। মাথা নিচু করে বলল ডাক্তার।

সঙ্গে সঙ্গেই একটা অন্ধকার নেমে এল আহমদ মুসার মুখে। বেদনায় নীল হয়ে এল তার মুখটা। কয়েক মুহুর্ত কথা বলতে পারলেন না তিনি।

অপারেশন কক্ষের দরজা আবার বন্ধ হয়েছে। ডাক্তার চলে গেছে।

আহমদ মুসা হাসান তারিককে কিছু বলার জন্য মুখ তুললেন, এমন সময় করিডোর দিয়ে একজন হন্ত-দন্ত হয়ে ছুটে এল। বলল, আহমদ মুসা কে?

আমি। বললেন আহমদ মুসা।

শীগ্রি আসুন, গভর্ণর সাহেবের টেলিফোন।

আহমদ মুসা টেলিফোন ধরতেই ওপার থেকে লি ইউয়ান বলল, আমি সব শুনেছি মি. আহমদ মুসা। ডাক্তারের কাছ থেকে মেইলিগুলির কথাও শুনলাম। চিন্তার কিছু নাই। আমি নির্দেশ দিয়েছি, এই কেস টপমোস্ট প্রাইওরিটি পাবে।

শুকরিয়া মি. গভর্নর।

আমি মেইলিগুলির বাড়িতে পাহারা বসাবার নির্দেশ দিয়েছি। আর মেইলিগুলির আব্বা-আম্মা সরকারী সফরে এখন জেনেভায়। সেখানেও খবর পৌছাচ্ছি।

আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব।

আমি কাল নেইজেনকে নিয়ে একবার মেইগুলিকে দেখতে যাব। একটু থেমে গভর্ণর আবার বলল, আপনি বাসায় চলে আসুন। বিশ্রাম প্রয়োজন আপনার। হাসপাতালের জন্য কোন চিন্তা নেই।

টেলিফোনে কথা শেষ করে আহমদ মুসা বললেন, এখানে আর কোন কাজ নেই হাসান তারিক। চল বাসায় ফিরি। 'ফ্র'র যে দু'জন লোক ধরা পড়েছে তাদের নিয়ে আহমদ ইয়াং কি করছে চল দেখি।

সেই মাইক্রোবাসে আহমদ মুসারা মেইলিগুলির বাসায় ফিরে এল।

গেট বন্ধ করে দিয়ে আহমদ ইয়াং ও মা-চু গাড়ি বারান্দাতেই বসেছিল। তাদের সামনে বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে বোমার স্প্লিন্টারে আহত 'ফ্র'র দুজন লোক।

প্রাথমিক অনুসন্ধানের কাজ আহমদ ইয়াং মোটামোটি সেরেই ফেলেছে। মা-চু কাটা বিদ্যুত সংযোগে জোড়া লাগিয়েছে। আলোয় ঝলমল করছে এখন বাড়ি।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক আসতেই উৎসুকভাবে মুখ তুলল আহমদ ইয়াং এবং মা-চু দুজনেই।

আহমদ মুসা গম্ভীর কন্ঠে বললেন, খবর ভাল নয় মা-চু। দাদী নেই, মেইলগুলি এখন ইনটেনসিভ কেয়ারে আছে।

শুনে মা-চু মাথা নিচু করল। দুহাত দিয়ে মুখ ঢাকল সে।

কিছুক্ষন কেউ কিছু বলতে পারল না। অবশেষে মুখ খুললেন আহমদ মুসা। বললেন, এ দিকের খবর কি ইয়াং?

কিছু খবর নিয়েছি। এখানে এবং নেইজেনকে অপহরণ করার অভিযান এক জায়গা থেকেই হয়েছে।

হ্যাঁ, সেটা আগেই বুঝতে পেরেছি।

এই অভিযান ছিল 'ফ্র' এবং 'রেড ড্রাগনের' সম্মিলিত। নেইজেনকে কিডন্যাপ করে গভর্ণরকে শিহেজী উপত্যকায় হান বসতির পক্ষে ওরা বাধ্য করতে চেয়েছিল।

হ্যাঁ, ওটা তো গভর্ণরও বলেছেন।

আর এখানে জেনারেল বোরিসের অভিযানের লক্ষ্য ছিল আপনাকে অপহরণ করা। আপনাকে না পেয়ে প্রতিশোধ স্পৃহায় অন্ধ বোরিস বাড়িতে যাকেই পেয়েছে তাকেই হত্যা করেছ। মেইলিগুলিকে নিয়ে যাচ্ছিল জিম্মি হিসাবে আপনাকে ধরার জন্য।

জেনারেল বোরিস পিকিং থেকে কবে ফিরেছে?

আজ সকালে। সব প্ল্যান ঠিক করে পিকিং থেকে প্রস্তুত হয়েই সে ফেরে।

একটু থেমে আহমদ ইয়াং বলল, জেনারেল বোরিসের ফেলে যাওয়া মানিব্যাগে একটা টেলেক্স পেয়েছি। টেলেক্সটি এসেছে আর্মেনিয়ার রাজধানী ইয়েরেভেন থেকে। পাঠিয়েছে জনৈক মাইকেল পিটার। বলেছে, চুড়ান্ত প্রস্তুতি এগুচ্ছে। জেনারেল বোরিসকেও সেখানে প্রয়োজন। স্ট্যালিনের জন্মভূমি জর্জিয়া এবং তার সাথে আর্মিনিয়া তাকে স্বাগত জানাবে।

থামল আহমদ ইয়াং।

কি যেন চিন্তা করছিলেন আহমদ মুসা। একটু পরে বললেন, মনে হয় চীনে জেনারেল বোরিসের এটাই শেষ অভিযান ছিল। আহমদ মুসার ওপর প্রতিশোধ নেয়া শেষ করে সে নতুন ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র ককেশাসে পাড়ি জমাতে চেয়েছিল।

কিন্তু আল্লাহর চেয়ে তো বড় পরিকল্পনাকারী আর কেউ নেই। জেনারেল বোরিসের যেখানে ককেশাসে যাবার কথা সেখানে যাচ্ছে আহমদ মুসা।

শেষের কথা ছিল ধীর স্বগত কন্ঠের.......

কি মুসা ভাই, আপনি কোথায় যাবেন? চমকে উঠেই যেন বলল আহমদ ইয়াং।

আহমদ মুসা হাসলেন। কোন জবাব দিলেন না। তার দৃষ্টি বাইরে অন্ধকারের বুকে নিবন্ধ কোন ভাবনায় যেন ডুব দিয়েছে আবার আহমদ মুসা।

# ৪

মেইলিগুলির চোখ ধরে এসেছিল। পায়ের শব্দে সে চোখ খুলল। দেখল মা-চু রুমে ঢুকছে। মেইলিগুলির গোটা দেহ, মুখ পর্যন্ত সাদা চাদরে ঢাকা। খুব দুর্বল মেইলিগুলি। নড়া-চড়া তো নিষিদ্ধই। উঠে বসারও অবস্থা নেই। ভিআইপি পেশেন্টদের জন্য নির্ধারিত সবচেয়ে মূল্যবান রুমটি দেয়া হয়েছে মেইলিগুলিকে। বিরাট ঘরের এক পাশে পেশেন্ট সিট অন্য পাশটা সোফা দিয়ে সাজানো। মাঝখানে সুন্দর একটা সাদা স্ক্রীন। প্রয়োজন হলে গুটিয়ে নেয়া যায়। বেলা তখন বিকেল তিনটা।

মা-চুকে ঘরে ঢুকতে দেখে খুশি হয় মেইলিগুলি।

কেমন আছ মা-চু তোমরা?

ভাল

খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধা হচ্ছে না তো? যেভাবে বলে দিয়েছি তা হচ্ছে তো?

জ্বি। মাথা দুলিয়ে বলল মা-চু।

তোমার স্যার কোথায়? কালকে আসেননি, আজকেও আসেননি।

আজ ভোরে শিহেজী উপত্যকায় গিয়েছেন। কিন্তু কাল এসেছিলেন।

এসেছিলেন?

এসেছিলেন, কিন্তু রুমে ঢুকেননি। দর্শনার্থীর নাকি ভীড় ছিল। খোঁজ নিয়ে চলে গিয়েছিলেন।

আসলে মেইলিগুলির রুমে স্রোতের মত লোক আসছে প্রথম দিন থেকেই। এমনকি পিকিং থেকেও লোক এসেছে।

মেইলিগুলি এতে অস্বস্তিই বোধ করেছে। অনেকদিন থেকে সে সবার সামনে বের হওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু এখন তো সে কাউকে নিষেধ করতে

পারে না। আহমদ মুসা কি এটা ভালো চোখে দেখেনি? না, উনি তো সব বুঝেন, সব জানেন।

আপা, স্যার যেন কেমন হয়ে গেছেন? মা-চুই অবশেষে নীরবতা ভাঙল।

কেমন হয়ে গেছেন মানে? মেইলিগুলির চোখটা চঞ্চল হয়ে উঠল।

আগের চেয়ে কথা কম বলেন, হাসি-খুশি তো দেখিই না।

কেন মা-চু? মেইলিগুলির কন্ঠে যেন উদ্বেগ।

জানিনা, সেদিন দেখলাম চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন। আমি ঘরে ঢুকলে ধীরে ধীরে উঠে বসলেন। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললাম, কিছু বলবেন স্যার? তিনি ধীরে ধীরে গম্ভীর কন্ঠে বললেন, ‘মা-চু এই পরিবারটা কত শান্তিতে ছিল তাই না? আমি এসে সব ভেঙে দিয়েছি।

দাদী নিহত হলেন, মেইলিগুলি মারাত্নক আহত। বলতে বলতে স্যারের চোখে পানি এসে গিয়েছিল। মা-চু থামল।

তুমি কিছু বললেন না? মেইলিগুলির মুখ ম্লান হয়ে উঠেছে।

না, আমি কিছু বলতে পারিনি। স্যারের এ অবস্থা কখনও দেখিনি।

তাঁকে কিছু বলার যোগ্যতা আমার আছে?

মেইলিগুলি কথা বলল না। চোখ বুজেছে সে। তার গোটা হৃদয়টা আলোড়িত হয়ে উঠেছে। বুঝতে পারছে মেইলিগুলি আহমদ মুসার মনের অবস্থা। কি যন্ত্রনা তাঁর মনে তা স্পষ্ট হয়ে উঠল মেইলিগুলির কাছে।

মা-চু উঠে গিয়েছিল। অনেকক্ষন পর চোখ খুলল মেইলিগুলি। তার চোখের কোণটাও মনে হল সজল হয়ে উঠেছে।

মা-চু তোমার স্যার শিহেজী উপত্যকা থেকে কখন আসবেন?

মা-চু দরজার ওদিক থেকে মেইলিগুলির দিকে সরে এসে বলল, আমি জানি না, আপা। মেইলিগুলি আবার নীরব হল।

এই সময় ঘরে ঢুকল নেইজেন। গভর্নর লি ইউয়ানের মেয়ে। রোজ বিকেলে সে মেইলিগুলির কাছে আসে। ঘন্টাখানেক থাকে। মেইলিগুলির সাথে আগে থেকেই পরিচয় ছিল তার।

মা-চু বেরিয়ে গেল।

নেইজেন একটা চেয়ার টেনে নিয়ে মেইলিগুলির সামনে বসল।

কি ব্যাপার আপা, তোমার মুখটা খুব বিষন্ন দেখাচ্ছে? খারাপ লাগছে না তো?

না জেন। তুমি কেমন আছ? হাসতে চেষ্টা করে বলল মেইলিগুলি।

ভাল। আচ্ছা আপা, আমি শুনলাম ফিল্ম লাইন নাকি তুমি একেবারেই ছেড়ে দিয়েছ?

ওটা তো পুরানো খবর।

আমি ভেবেছিলাম তোমার সিদ্ধান্তটা সাময়িক।

জেন, মুসলিম মেয়েদের জনে তো একাজ নয়।

হঠাৎ এ সিদ্ধান্তে তুমি কেমন করে পৌঁছলে? সবাই কিন্তু অবাক হয়েছে। অনেকে বিশ্বাসই করতে চায়না।

মুসলিম মেয়ে হয়েও আমি আগে আমি অন্ধ ছিলাম, আহমদ মুসা আমার চোখ খুলে দিয়েছেন।

ও বুঝেছি, বুঝেছি। আচ্ছা আপা, ওরা যাদু জানে নাকি?

কেন?

যে কথা তোমাকে বলেছিলাম, সেদিন রাতে আহমদ মুসার সাথে দেখা হওয়ার পর আব্বা যেন বদলে গেছেন। জান, আব্বা নামায পড়া শুরু করেছেন। কুরআন শিখছেন আহমদ মুসার কাছে গোপনে।

ওরা যাদু নয় নেইজেন, সত্যের শক্তি। সত্যের শক্তি অপরিসীম। দেখ না, মুসলমানরা যতদিন সত্যের উপর ছিল, ইসলাম কিভাবে বিস্তার লাভ করেছে। এরা সত্যের উপর, সঠিকভাবে ইসলামের উপর আছেন বলেই ওদের কথার শক্তি অপরিসীম।

তাই হবে হয়তো। তবু আমার বিস্ময়ই লাগে।

কিন্তু পরিবর্তনটা কি শুধু তোমার পিতারই, তোমার পরিবর্তন আসেনি?

হঠাৎ মুখটা লাল হয়ে উঠল নেইজেনের। তারপর সামলে নিয়ে বলল, কি পরিবর্তন?

কেন তোমার মাথায় গায়ে তো কোনদিন চাদর দেখিনি, কিন্তু কদিন থেকে তো......

ঠিক বলেছ আপা। আমার কিন্তু খুব আনন্দ লাগছে। আমি মুসলিম মেয়ে এই অনুভূতি ফিয়ে পেয়ে আমার গর্ববোধ হচ্ছে।

আসলে কি জান জেন, মুসলমানদের ঈমান, ধর্ম বিশ্বাস একটা স্বাভাবিক প্রবণতা। প্রতিকুল পরিবেশ বা অজ্ঞতার কারনে তা কোন সময় চাপা পড়ে গেলেও সুযোগ পেলেই জেগে উঠে।

সে রাতের ঘটনা এবং সবকিছু মিলিয়ে মনে হয়, ওরা আল্লাহর একটা রহমত হিসেবে এসেছেন।

ঠিক বলেছ জেন।

কিন্তু একটা খবর শুনেছ? মুসা ভাই নাকি চলে যাচ্ছেন?

ভীষনভাবে চমকে উঠল মেইলিগুলি। মূহুর্তেই তার মুখের উপর থেকে একটা অন্ধকার নেমে এল। কিছুক্ষন কথা ফুটল না তার মুখে।

ব্যাপারটা নেইজেনের নজর এড়াল না। একটা প্রশ্ন তার মুখ থেকে উচ্চারিত হতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই মেইলিগুলি নিজেকে সামলে নিয়ে শান্ত কন্ঠে বলল, তুমি কার কাছে এ খবর শুনলে জেন?

আব্বার কাছ থেকে শুনেছি। মধ্য এশিয়া এবং ফিলিস্তিন থেকে যে দুজন মেহমান এসেছেন তারা কি যেন চিঠি এনেছেন। ককেশাসের কি নাকি খারাপ অবস্থা। কি খবর যেন এসেছে সেখান থেকে?

হৃদয় কেঁপে উঠল মেইলিগুলির। সমগ্র দেহটা তার একটা অবশ স্রোতে আচ্ছন্ন হলো। নেইজেনের প্রত্যেকটা কথা বিশ্বাস হলো তার।

আর কথা বলতে পারল নয়া মেইলিগুলি। সামনের সাজানো দুনিয়াটা তার সামনে যেন ওলট-পালট হয়ে গেল। একটা আবেগ যেন তার বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইলো। গোপন করার জন্যে নেইজেনের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল মেইলিগুলি।

নেইজেন বিব্রত হয়ে পড়ল। আহমদ মুসার এই খবর যে মেইলিগুলিকে এই ভাবে আঘাত করবে, তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। পারলে সে অসুস্থ মেইলিগুলির কাছে কিছুতেই এ খবর জানাতো না।

নেইজেন একটু ঝুঁকে পড়ে মেইলিগুলির কপালে হাত রেখে বলল, আপা, আমি বুঝতে পারিনি, এভাবে বলা ঠিক হয়নি।

মেইলিগুলি মুখ ফেরাল। তার চোখে পানি। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে আছে সে। কিন্তু কথা বলতে পারলো নয়া মেইলিগুলি।

নেইজেন মেইলিগুলির মাথার কাছে বসে তার মাথায় হাত রেখে বলল, আপা আমি যা শুনেছি তা সত্য নাও হতে পারে।

মেইলিগুলি চাদরটা মুখের উপর টেনে নিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

নেইজেনের চোখেও পানি এসেছে। কি বলে মেইলিগুলিকে শান্তনা দেবে তা ভেবে পেলনা নেইজেন। নীরবে মেইলিগুলির মাথায় হাত বুলাতে লাগল।

এক সময় নেইজেন মেইলিগুলির কপালে কপাল রেখে ফিসফিসিয়ে বলল, আপা সব কিছু কি মুসা ভাই জানেন?

জানি না।

অনেকক্ষন পর জবাব দিল মেইলিগুলি।

এই সময় এটেনডেন্ট মেয়েটা ঘরে ঢুকল। একটা স্লিপ দিল নেইজেনের হাতে।

মেইলিগুলি চোখ মুছে নিজেকে সামলে নিয়েছিল।

নেইজেন স্লিপটা হাতে নিয়ে দেখল, স্লিপটা আহমদ মুসার।

নেইজেন স্লিপটা মেইলিগুলির হাতে দিল। স্লিপের উপর চোখ বুলিয়ে মুহুর্তের জন্য চোখ বুজল মেইলিগুলি। তারপর এটেনডেন্ট কে বলল স্ক্রিনটা টেনে নিয়ে ওকে বসতে দাও সোফায়।

আহমদ মুসা সোফায় এসে বসলেন। এটেনডেন্ট দরজা লাগিয়ে দিয়ে চলে গেল। স্ক্রিনের এপারে মেইলিগুলি ও নেইজেন। নেইজেন বলল, আমি একটু ঘুরে আসি আপা।

মেইলিগুলির মুখটা লাল হয়ে আসল লজ্জায়। সে নেইজেনের হাতটা শক্ত করে ধরে রাখল।

আজ কেমন আছি আমিনা, তুমি? স্ক্রিনের ওপার থেকে বললেন আহমদ মুসা।

ভাল।

নেইজেন মেইলিগুলির কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল, উনি বুঝি তোমাকে আমিনা বলে ডাকেন? আন্ডার গ্রাউন্ড নামটা, যা আমরাও জানিনা, তা ওকে জানিয়েছ?

দাদী ওকে বলেছিলেন। বলল মেইলিগুলি।

ডাক্তার বলেছেন, আর দিন চারেকের মধ্যেই তুমি একটু করে চলাফেরা করতে পারবে। বললেন আহমদ মুসা।

মেইলিগুলি নীরব। কি বলবে ভেবে পেল না। নেইজেন বলল, কিছু বলছ না যে, উনি কি মনে করবেন।

মেইলিগুলি কিছু বলার আগেই আহমদ মূসা বললেন, তোমার আব্বা-আম্মা আসছেন আজ সন্ধায়। মা-চু এয়ারপোর্ট থেকেই সোজা ওঁদের এখানে নিয়ে আসবে।

একটু থেমে আহমদ মূসা বললেন, আমি সম্ভবত দুতিন দিন থাকবো না।

কেন?

ত্বরিত প্রশ্ন করল মেইলিগুলি। তার মুখ বিষণ্ন হয়ে উঠল।

আমি আজ কানশুতে যাচ্ছি। কিছুই নেই সেখানে। তবু জন্মভূমিকে দেখতে চাই।

মেইলিগুলির মুখটা ভারি হয়ে উঠল। মাথা নিচু করল সে। তখনই কোন কথা সে বলল না। একটু পরে মেইলিগুলি মুখ তুলে বলল, আমার পরিবারে যা ঘটেছে তার জন্য কি আপনি নিজেকে দায়ী করছেন?

এ প্রশ্ন কেন আমিনা?

আমি জানতে চাই।

মা-চু তোমাকে কিছু বলেছে নিশ্চয়ই। তার ঠিক হয়নি বলা। এসব কথা নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না। তুমি সুস্থ হয়ে ওঠ।

না আমি জানতে চাই। মেইলিগুলির কথাটা কাঁপল।

আহমদ মুসা কথা বললেন না। মুখটা তার গম্ভীর হয়ে উঠল। সোফায় হেলান দিয়ে বসেছিলেন। সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, আমিনা, আমাকে দায়ী মনে করি না, কিন্তু আমাকে উপলক্ষ করেই সব কিছু ঘটল -এমন চিন্তা অবশ্যই সংগত।

কিন্তু চিন্তাই তো প্রমাণ করে আপনি নিজেকে দায়ী মনে করছেন। অর্থাৎ আমাদের পরিবারের জন্যে যেটা গৌরব তাকে আপনি কেড়ে নিতে চাইছেন নির্মমভাবে।

আমিনা তুমি কথাটাকে সিরিয়াসলি নিয়েছ, আমি এভাবে কথাটা বলিনি।

মেইলিগুলি উত্তরে কিছু না বলে চুপ করে থাকল। একটু ভাবলো। আমার অনুরোধ কানশুর প্রোগ্রাম আপনি বাতিল করুন।

কেন আমিনা?

আব্বা আম্মা আসছেন।

আহমদ মুসার মুখে এক টুকরা হাসি ফুটে উঠলো। বললেন ঠিক আছে করলাম।

নেইজেন মেইলিগুলির কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, প্রথম বিজয় মেইলিগুলি। দেখ আমি বলে রাখলাম যিনি সব মানুষকে ভালোবাসতে পারেন তিনি হৃদয় ভাংতে পারেন না।

মেইলিগুলি নেইজেনের দিকে মুখ তুলে চাইল শুধু। কোন কথা বলল না।

আমিনা, আমি এখনকার মত উঠি। নীরবতা ভেঙ্গে কথা বললেন আহমদ মুসাই।

এখানে নেইজেন আছে। মেইলিগুলি বলল।

নেইজেন এখানে? বিস্ময় প্রকাশ করলেন যেন আহমদ মুসা।

নেইজেন মাথায় চাদরটা ভালো করে টেনে নিয়ে স্ক্রীনের দিকে মুখটা বের করে সালাম দিল আহমদ মুসাকে। বলল ভাইয়া কেমন আছেন?

সালাম নিয়ে আহমদ মুসা বলল, বোনটি, এতক্ষন যে কথা বলনি?

কথা শুনছিলাম তাই।

ভালই হল, শোন তুমি আমিনাকে ভারি বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে নিষেধ কর। ওর স্নায়ুগুলো শান্ত থাকা দরকার।

ভাইয়া একটা কথা বলব?

বল।

মানবতা বড় না কর্তব্য বড়?

মানবতা এবং কর্তব্যকে যদি প্রতিদ্বন্দ্বী ধর, তাহলে প্রশ্ন কঠিন। আমি কিন্তু মনে করি দুটা দুই জিনিস নয়, এক জিনিস। মানবতা যেখানে কর্তব্যও সেখানে।

কিন্তু ধরুন দুটা যদি দুই প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ায়?

তাহলে কর্তব্যই আগ্রাধিকার পাবে। কারন মানবতা যদি কর্তব্যবোধ থেকে দূরে সরে যায়, তাহলে তার পিছনে কোন ‘রিজন’ বা যুক্তি থাকে না এবং তাকে তখন সুস্থও বলা যাবে না।

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা বললেন হঠাৎ এই দার্শনিক প্রশ্ন কেন নেইজেন?

প্রশ্নের দিকে কান না দিয়ে নেইজেন বলল, কর্তব্যের বাহিরে হৃদয়বৃত্তি বলে কিছু নেই?

আহমদ মুসা থামলেন। বললেন, কর্তব্য হলো যা করনীয়। হৃদয়বৃত্তি বিষয়টা তা থেকে বাহিরে হবে কেন? যদি তা কখনো হয়, তাহলে তা হবে অসংগত এবং তা-ই অবিবেচ্য।

আর একটা প্রশ্ন করব ভাইয়া ?

কর।

আপনাকে নিয়ে আপনি কখন ভাবেন না?

ভাবি। আনন্দিত হলে হাসি, দুঃখ পেলে কাঁদি, বিরক্ত হলে রেগে যাই। এই তো আমাকে নিয়েই তো আমি আছি।

তা নয় ভাইয়া আমি বলতে চাচ্ছি............।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়ালেন। তোমার আর কোন প্রশ্ন নয় যেতে হবে আমাকে।

নেইজেন একেবারে পর্দার বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। বলল না আরেকটা প্রশ্ন জবাব দিতেই হবে।

আহমদ মুসা পা বাড়াতে গিয়েও থেমে গেলেন। বলল ঠিক আছে বল কি তোমার প্রশ্ন।

নেইজেন বলল, আপনাকে নিয়ে আপনি আছেন, ঠিক আছে। কেউ আপনাকে নিয়ে থাকতে পারে তা আপনি দেখবেন না?

আহমদ মুসা বললেন, বোনটি আল্লাহ আমাকে দুচোখ দিয়েছেন দেখার জন্যই তো।

বলেই আহমদ মুসা বেরিয়ে এলেন রুম থকে।

নেইজেন স্ক্রীন ঠেলে চলে গেল ওপারে।

মেইলিগুলি গোগ্রাসে গিলছিল কথা গুলো। নেইজেন গিয়ে মেঝেতে হাটু গেড়ে বসে মেইলিগুলির মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলল, শুনেছ তো আপা ভাইয়া কি বললেন?

থাক ওসব কথা। তুমি ওঁর সাথে এইভাবে কথা বলতে পার? ভয় করে না? জান উনি কত বড়?

মেইলিগুলির কাছে অবশ্যই উনি অনেক বড়, কিন্তু আমার কাছে ভাইয়া।

নেইজেনের মুখে দুষ্টামির হাসি।

এই সময় ঘরে একজন ডাক্তার এবং একজন নার্স প্রবেশ করলো।

নেইজেন ঘড়ির দিকে তাকালো। বেলা চারটা।

আপা তাহলে আজকের মত আসি, বলে মেইলিগুলির কপালে একটা চুমু খেতে গিয়ে ফিসফিসিয়ে আবার বলল, তোমার কপালটা ভাগ্যবান আপা। তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে ছুটে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

গভর্নর লি ইউয়ানের পারিবারিক ড্রয়িং রুমের সামনে গাড়ি থেকে নেমে আহমদ মুসা ঢুকে গেলেন ভিতরে। আহমদ ইয়াং গাড়িটা পার্ক করে এসে সিড়ি দিয়ে উঠতে যাচ্ছিল ড্রয়িং রুমে। এমন সময় সেখানে নেইজেনের গাড়ি এসে থামল।

নেইজেন গাড়ি থেকে নেমে পেছন থেকে ডাকল, শুনুন।

আহমদ ইয়াং থমকে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরল।

আপনি একা?

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল নেইজেন।

নেইজেন সেলোয়ার কামিজ পরেছে। সাদা। আর বড় সাদা চাদর জড়িয়েছে গায়ে। চাদরটা কপাল পর্যন্ত নেমে এসেছে।

না মুখ নিচু করে জবাব দিল আহমদ ইয়াং।

কে এসেছেন, মুসা ভাই?

হ্যাঁ । নেইজেন হঠাৎ কিছু যেন বলতে পারলোনা। দুজনেই নীরব।

আহমদ ইয়াং ঘুরে দাঁড়াতে গেল চলে যাবার জন্যে। নেইজেন আবার বলল, শুনুন।

আহমদ ইয়াং ফিরে দাঁড়াল আবার। তার চোখ নিচু। চোখে-মুখে লজ্জা জড়ানো একটা বিব্রত ভাব।

আমার কি অপরাধ হয়েছে?

আহমদ ইয়াং চকিতে একবার চোখ তুলে বলল, কি অপরাধ, না তো।

আপনিতো সে থেকে আর আসেন নি।

প্রয়োজন তো হয় নি।

নেইজেন একটু থেমে বলল, আপনি ফুলটা ফেলে দিয়েছেন না?

না।

এখনও রেখেছেন?

হাঁ।

কেন?

আহমদ ইয়াং-এর মুখটা লাল হয়ে উঠল। কঠিন প্রশ্ন নেইজেন-এর। এ প্রশ্নের জবাব তো আহমদ ইয়াং চিন্তা করে নি। ওয়েল পেপারের ইনভেলাপে তুলে কেন সে ফুলটা সযতনে তুলে রেখে দিয়েছে।

নেইজেন দুষ্টামি ভরা হাসি নিয়ে আহমদ ইয়াং-এর এই বিব্রত অবস্থা উপভোগ করছিল।

আহমদ ইয়াং একটু নীরব থেকে বলল, আমি প্রশ্নটির জবাব ভেবে দেখিনি।

বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে ড্রয়িং রুমে উঠে গেল আহমদ ইয়াং।

ড্রয়িং রুমে আহমদ মুসা কথা বলছিলেন লি ইউয়ানের সাথে। নেইজেনের মা মিসেস লি ইউয়ানও তার পাশে বসেছিল।

কথা বলছিল লি ইউয়ান, তুমি যাবে, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি?

আজকে আরেকটা খবর পেলাম পিকিং থেকে। মধ্য এশিয়া মুসলিম প্রজাতন্ত্রের দুতাবাস থেকে পাঠানো কাগজ পত্রে দেখলাম, খুব খারাপ অবস্থা ককেশাসে।

মেইলিগুলিদের বলেছ?

সিদ্ধান্তটা এই মাত্র নিলাম। ওদের বলব।

একটু থেমে আহমদ মুসা বললেন, আমি আপনার কাছে দুটা জরুরী বিষয় নিয়ে এসেছি।

বল। বলল লি ইউয়ান।

এম্পায়ার গ্রুপ যে কাজ করছিল, তার দায়িত্ব এখন আপনাকে নিতে হবে। অর্থাৎ সিংকিয়াং-এর মুসলমানদের দায়িত্ব এখন আপনার।

আমি বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করেছি আহমদ মুসা। আমার মত হল এম্পায়ার গ্রপ তাদের কাজ করে যাক। তারা প্রেসার গ্রুপ হিসাবে কাজ করবে। সে প্রেসারে পিকিং সরকারের কাছ থেকে দাবি আদায় আমার পক্ষে সহজ হবে। এই ভাবে একটা পর্যায় শেষ হবার পর আমরা যখন মঝবুত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েছি ভাবব, তখন একটা চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে। আমি এম্পয়ার গ্রুপকে আমার সংগঠন হিসাবে সাধ্যমত সব রকম সাহায্য দিয়ে যাবো।

আপনার পরিকল্পনার সাথে আমি একমত। আজ রাতে এম্পায়ার গ্রুপের একটা মিটিং ডেকেছি। সেখানে আপনাকে আমরা চাই।

কোথায় হবে?

আপনি যেখানে চান।

আমার মিটিং রুমে?

হ্যাঁ।

ব্যাপারটা এই রকম হবে, দেশের মুসলিম সংগঠন গুলোর একটা প্রতিনিধিদল আমার সাথে দেখা করতে এসেছে বেসরকারীভাবে। সেখানে আমি ছাড়া সরকারী কেউ থাকবে না।

খুব ভাল আইডিয়া।

খুশি হলেন আহমদ মুসা।

বল, এবার তোমার দ্বিতীয় কথা কি?

আহমদ মুসা পাশে বসা আহমদ ইয়াং-এর দিকে চেয়ে বললেন, তুমি একটু বাইরে বস ইয়াং।

আহমদ ইয়াং উঠে বাইরে গেল।

আহমদ মূসা একটু চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, আমার বোন নেইজেনের একটা বিয়ের কথা চিন্তা করছি।

আহমদ মুসার মুখে এক টুকরো হাসি।

কোথায়?

মিঃ ও মিসেস ইউয়ান এক সাথেই বলে উঠল।

আহমদ ইয়াং-এর সাথে। তার সব কিছুই তো আপনারা জানেন।

মিঃ ও মিসেস লি ইউয়ান দুজনেরই চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

মিসেস লি ইউয়ান বলল, আমার অনুমান ঠিক হয়েছে, এই প্রস্তাবের কথাই আমি ভেবেছিলাম।

মিঃ লি ইউয়ান বলল, তোমার প্রস্তাবে আমরা খুশি হয়েছি আহমদ মুসা। কিন্তু ওদের মতটা? নেইজেনকে ডাকি?

ডাকুন। তবে আমার মনে হয় ডাকার দরকার হবে না। আমি ওদের দুজনকে বুঝার পরেই এ প্রস্তাব দিয়েছি।

ঠিক আছে, ডেকে আর লজ্জা দিয়ে লাভ নেই।

এ সময় ড্রইং রুমে প্রবেশ করল নেইজেন। বলল, মুসা ভাই,

আপনি বোধ হয় কাউকে না বলে খুব ভোর বেলায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছেন।

হ্যাঁ। কাউকে পাইনি। কিন্তু গেটম্যান তো দেখার কথা। কেন কি হয়েছে?

আপা টেলিফোন করেছিলেন? ওরা ভয়ে আতংকে একদম সারা। নাস্তাও হয়নি ওদের। চাচাজান তো কয়েকবার থানায় গেছেন, আইজিকে টেলিফোন করেছেন। চাচিমা তো কেঁদেই সারা।

আমার ভুল হয়েছে নেইজেন। এভাবে কখনও আমি বের হই না। আজ মা-চু ছিল না, তাই অসুবিধায় পড়েছিলাম।

একটু থেমেই আবার বললেন আহমদ মুসা, তাহলে এখন উঠি চাচাজান?

বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়ালেন।

লি ইউয়ান বলল, একটু দাঁড়াও আহমদ মুসা।

বলে নেইজেন-এর দিকে ফিরে লি ইউয়ান বলল, মা খবর জান, তোমার ভাইয়া তোমাকে বিয়ে দিচ্ছে ?

বাজে কথা।

বলে নেইজেন আহমদ মুসার দিকে তাকাল।

বাজে কথা নয়, আহমদ ইয়াংকে আজ এ জন্যেই সাথে করে এনেছিলাম। হেসে বললেন আহমদ মুসা।

লজ্জায় লাল হয়ে উঠল নেইজেন-এর মুখ। সে ছুটে পালাতে যাচ্ছিল। আহমদ মুসা বললেন, শোন নেইজেন, আমি কাল চলে যাচ্ছি, তাই তাড়াহুড়ো করে এই ব্যবস্থা।

নেইজেন থমকে দাঁড়াল। তার চোখটি বিস্ময়ে বিস্ফারিত। এক পা দুপা করে ফিরে এল। বলল, কাল যাচ্ছেন আপনি ভাইয়া?

হ্যাঁ।

কালই যাচ্ছেন।

প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করল নেইজেন। তার বিশ্বাস হচ্ছে না, বিশ্বাস করতে যেন চাইছে না সে।

হ্যাঁ বোন কাল যাচ্ছি।

আপা জানেন?

না।

'ভাইয়া' বলে চিৎকার করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল নেইজেন। তারপর বাইরের দরজা দিয়ে ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল। নেইজেনের আব্বা-আম্মাকে বিস্মিত-বিব্রত মনে হল। আহমদ মুসা আবার বসে পড়েছিলেন সোফায়। তার মুখটা নত। আহমদ ইয়াং এর আগেই ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছিল আহমদ মুসার আহ্বানে। লি ইউয়ান তাকে লক্ষ্য করে বলল, বাবা দেখতো, নেইজেন কোথায় গেল।

আহমদ ইয়াং বেরিয়ে গেল।

কয়েক মুহূর্ত পরে ফিরে এসে বলল, গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছে।

পাগল মেয়ে, কোথায় গেল! বলল ইউজিনা, নেইজেনের মা।

ও মেইলিগুলির কাছে গেছে। মুখে ঈষৎ হাসি টেনে বললেন আহমদ মুসা।

কেন?

বোধ হয় আমার যাওয়ার খবরটা দিতে।

দেখতো কি দরকার ছিল, তুমি তো যাচ্ছই!

আহমদ মুসা কোন কথা বললেন না এর উত্তরে। লি ইউয়ান কোন কথা বলেনি। সে যেন কি চিন্তা করছে।

এখন উঠি চাচিমা, চাচাজান, আবার দেখা হবে। বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়ালেন।

লি ইউয়ান উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এস।

আহমদ মুসা হ্যান্ডশেক করে বেরিয়ে গেলেন।

আহমদ মুসা বেরিয়ে গেলে লি ইউয়ান গম্ভীর কন্ঠে বলল, বলতো আমরা কি মেইলিগুলির বাড়িতে যাব, না মেইলিগুলির আব্বাকে ডাকব।

তোমার আবার কি হল, এ কথা বলছ কেন?

তুমি কিছুই বুঝনি তাহলে?

কি বুঝব?

তোমার মেয়ে আহমদ মুসা চলে যাওয়ার কথায় কেন অমন করে অস্বাভাবিক হয়ে গেল, কেনই বা খবরটা জানাতে মেইলিগুলির কাছে ছুটল, এসব থেকে কিছু বুঝনি?

আচ্ছা ব্যাপারটা তাহলে আহমদ মুসা ও মেইলিগুলি......

একটু চিন্তা করে বলতে শুরু করল ইউজিনা।

ঠিক বুঝেছ, এবার বল কি করব? আমার মনে হচ্ছে দুজনার মধ্যে ইনফরমেশন গ্যাপ আছে।

কিন্তু তুমি আহমদ মুসাকে না জেনে মেইলিগুলির আব্বা-আম্মার সাথে কি আলোচনা করবে? আহমদ মুসা তো আর সাধারণ লোক নয়, গোটা বিশ্বজোড়া তার ঘর। তাকে বাঁধা সহজ নয়।

শোন ইউজিনা, আমার চুল পেকেছে। অভিজ্ঞতা কম হয়নি।

নেইজেন যখন কথা বলছিল, তখন আহমদ মুসার চেহারায় অসহায়ত্ব দেখেছি। মনে হয় সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে ।

এখানেই তো সমস্যা। তার সিদ্ধান্ত বা কথা না জেনে এগুনো কি ঠিক হবে?

ইউজিনা, আহমদ মুসা বিশ্ববরেণ্য একজন বিপ্লবী নেতা। কিন্ত সে মানুষ। বিশেষ করে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রত্যেকেরই একটা দুর্বলতা থাকে। সুতরাং এই ব্যাপারটা তার ওপর ছেড়ে দিয়ে রাখা ঠিক নয়।

মনে হয় তুমি ঠিকই বলেছ। ইয়াং এবং নেইজেনকেও তো আমাদের কিছু জিজ্ঞেস করতে হয়নি।

তাহলে......

কিছু বলতে গিয়েছিল লি ইউয়ান। এমন সময় বাইরের দরজা ঠেলে ড্রইংরুমে প্রবেশ করল মেইলিগুলির আব্বা এবং আম্মা।

লি ইউয়ান ও ইউজিনা বিস্ময় ও আনন্দের সাথে স্বাগত জানাল ওদের।

এই মাত্র আহমদ মুসা গেলেন। আমরা তোমাদের কথাই বলছিলাম। তোমরা বাঁচবে বহুদিন। বলল লি ইউয়ান।

মেইলিগুলির পিতা ঝাও জিয়াং ইবনে সাদ বলল, বাঁচার জন্যে দোয়া করনা ভাই, মুনাফেকী থেকে উদ্ধার যত তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় ততই মঙ্গল।

মেইলিগুলির পিতা ইবনে সাদ পিকিং-এর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের ডিরেক্টর। লম্বা-চওড়া চেহারা। চেহারার মধ্য দিয়েই তার একটা ঐতিহ্যের ইংগিত পাওয়া যায়। বিখ্যাত সাদ পরিবারের সন্তান হিসেবে সবার বিশেষ একটা সম্মানের পাত্র সে।

আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া কর ইবনে সাদ, মুনাফেকী বেশি দিন করতে হবে না। আহমদ মুসা কিছুদিন মাত্র হলো এসেছে, কিন্তু মনে হচ্ছে আন্দোলন পঞ্চাশ বছর সামনে এগিয়ে গেছে।

আসলেই ওঁর একটা যাদুকরী শক্তি আছে, গোটা দুনিয়ায় ওঁকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। ও পরাধীন মুসলমানদের মুক্তির প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কথা শেষ করে একটু যেন ঢোক গিলল ইবনে সাদ। তারপর বলল, আমি একটা সমস্যায় পড়েছি বড় ভাই।

কি সমস্যা?

সমস্যা মেইলিগুলিকে নিয়ে।

লি ইউয়ান ও ইউজিনা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। তারপর লি ইউয়ান বলল, কেন কি হয়েছে?

কি ভাবে ব্যাপারটা বলব বুঝতে পারছি না। আমরা বুঝেছি মেইলিগুলি আহমদ মুসাকে ভালবেসে ফেলেছে।

কিন্তু সমস্যা কি?

সমস্যা নয়, এটা কি ছোট ব্যাপার? আহমদ মুসার কথা কি আমরা চিন্তা করতে পারি? কত বড় সে! কত কাজ তাঁর। কত বিরাট তাঁর মিশন!

তাহলে?

এ প্রশ্নের জবাব খোঁজার জন্যেই তো আমরা আপনার কাছে ছুটে এসেছি। জানতে পেরেছি, অল্প কিছু দিনের মধ্যেই চলে যাবে সে ককেশাসে। তাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি মেয়েটার কথা ভেবে। কিছু হলে বাঁচবে না মেয়েটা।

সাদ, আহমদ মুসা আগামীকাল চলে যাচ্ছে।

কাল?

ইবনে সাদ এবং ফাতিমা, মেইলিগুলির মা, আব্বা-মার সবার এক সাথে একরাশ বিস্ময় ঝড়ে পড়ল।

হ্যাঁ কালই। গুরুত্বপূর্ণ কি খবর এসেছে ককেশাস থেকে।

ইবনে সাদ এবং ফাতিমা কারো মুখেই কোন কথা জোগাল না। বিস্ময়, বেদনা, কিংকর্তব্যবিমুঢ়তা তাদেরকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

লি ইউয়ান কিছুক্ষণ আগে যা ঘটেছে সব কথা ইবনে সাদকে জানিয়ে বলল, বিষয়টা আমরাও চিন্তা করছি।

তোমরা না এলে আমরাই তোমাদের কাছে যেতাম। চল গিয়ে চা খাই, পরে কথা হবে। বলে উঠে দাঁড়াল লি ইউয়ান। তাঁর সাথে সকলে।

আহমদ মুসা সিড়ি দিয়ে উঠেই দেখতে পেলেন নেইজেন ও মেইলিগুলি দুজন জড়াজড়ি করে বসে।

আহমদ মুসাকে দেখে দুজনেই তাদের চাদর ঠিক করে নিল। নেইজনে উঠে দাঁড়াল। মনে হল সে কেঁদেছে। কিন্তু ঝগড়াটে দৃষ্টি নিয়ে সে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। আর মেইলিগুলি ভালো করে চাদরটা টেনে দিয়ে অন্য মুখো হয়ে মাথা এলিয়ে দিয়েছে সোফায়।

চাচাজান, চাচিমা কোথায় নেইজেন?

আমি এসে ওঁদের পাইনি, বাইরে গেছেন।

আহমদ মুসা একটু চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, ঠিক আছে, মেইলিগুলির সাথে কথাটা সেরে নিই। বলে আহমদ মুসা এ প্রান্তের একটা

সোফায় বসলেন। তাঁর মুখটা উত্তরমুখী। মেইলিগুলি বসে আছে পশ্চিম প্রান্তের একটা সোফায়। নেইজেন চলে যাচ্ছিল।

আহমদ মুসা বললেন, তুমিও বস নেইজেন।

আসছি ভাইয়া, কথা বলুন।

বলে নেইজেন কিচেনের দিকে চলে গেল।

'আমিনা' শুরু করলেন আহমদ মুসা। আজ ভোর চারটায় টেলিফোন পেয়েছিলাম হাসান তারিকের। জরুরী একটা পরামর্শ বৈঠক ছিল সাড়ে চারটায়। আমি চলে গিয়েছিলাম। জানিয়ে যেতে পারিনি। তোমরা কষ্ট পেয়েছ, এ জন্য আমি দুঃখিত।

মেইলিগুলি কিছু বলল না।

আবার শুরু করলেন আহমদ মুসা। বললেন, ককেশাস থেকে খারাপ খবর আগেই পেয়েছিলাম। কিন্তু মারাত্মক খবর এসেছে গত রাতে।

আহমদ মুসার সামনে এক কাপ চা রেখে নেইজেন গিয়ে বসেছে মেইলিগুলির পাশে। আহমদ মুসা চায়ে একটা চুমুক দিয়ে বললেন, গত কয়েক মাস ধরে ককেশাসে হত্যাকান্ড চলছে, মুসলমানদের অনেক গ্রাম উজাড় হয়েছে। অনেক মুসলমান এলাকা ছেড়া আশ্রয় নিয়েছে শহরে। এতদিন এসব ছিল অনেকটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। বিভিন্ন ঘটনা-দুর্ঘটনা উপলক্ষ্যে সংঘটিত এসব ঘটনার রাজনৈতিক ব্যাখ্যা দুর্বল ছিল। গত পনের দিন ধরে ঘটনা ভয়াবহ মোড় নিয়েছে। পনের দিনে বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনের পঁচিশজন প্রভাবশালী মুসলিম নেতা হারিয়ে গেছে। শত চেষ্টাতেও কোথাও কোন চিহ্ন তাদের পাওয়া যায়নি। মধ্য এশিয়া থেকে সাইমুমের একটি ইউনিট সেখানে গেছে কিন্তু তারা ঘটনার কোন কুল কিনারা করতে পারেনি। একটা অদৃশ্য আতংক ছড়িয়ে পড়েছে গোটা মুসলিম সমাজে। এই সন্ত্রাস পরিকল্পনায় সাহায্য করছে শক্তিশালী ক্লু-ক্লাক্স-ক্লান, ফ্র, এবং রাশিয়ান রিপাবলিক এবং পশ্চিমের কয়েকটি দেশ। গ্রোজনিতে ঘাঁটি করে বসে রাশিয়ান রিপাবলিক বাহিনীর সতর্ক প্রহরাধীন আজার বাইজানের দুর্বল আধা মুসলিম সরকার এই সন্ত্রাস এবং বাইরের চাপের কাছে অসহায় হয়ে পড়েছে। ভেতর থেকেও মীরজাফরদের মাধ্যমে এই সরকারকে ধ্বংস করার

চেষ্টা চলছে। সরকার ভেঙ্গে পড়লে সেখানকার মুসলমানরা আজ যে বিশৃঙ্খল অবস্থায় আছে তাতে সম্মিলিত চক্রান্তের মুখে মুসলমানদের অস্তিত্ব হয়তো তৃণের মত ভেসে যাবে। এই অবস্থায় সব দিক বিবেচনা করে আমরা সেই মজলুম ভাইদের কাছে ছুটে যাবার সিদ্ধান্ত না নিয়ে পারিনি।

থামলেন আহমদ মুসা।

কিন্তু ভাইয়া...............

কথা শেষ করতে পারলো না নেইজেন। একটা বাঁধ ভাঙ্গা আবেগ এসে তার কন্ঠ ভেঙে দিল। দুহাতে মুখ ঢাকল সে।

তুমি যা বলতে চাচ্ছ আমি তা জানি। হয়ত আমি অবিচারও করছি। কিন্তু........

অবিচারকে অবিচার বলে বুঝার পর কি সে অবিচার আর করা যায়?

আহমদ মুসাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই বলল নেইজেন।

যায় না কিন্তু অনেকগুলো অবিচার যদি এক সাথে সামনে এসে যায় তাহলে বড় অবিচারকেই প্রথম মোকাবেলা করতে হয়।

ভাইয়া, আপনাকে যুক্তি দিয়ে আটকাতে পারবো না কিন্তু আপনি আপার জায়গায় একটু দাঁড়িয়ে বলুন, আপনি আপা হলে কি করতেন?

নেইজেনের প্রশ্নের ঢংয়ে এই অবস্থাতেও আহমদ মুসার মুখে হাসি ফুটে উঠল। বললেন, তোমার আপা আমি হলে কোন যাযাবরের দিকে চোখ তুলেই চাইতাম না। বিশ্বে যার কোন ঘর নেই তাকে ঘরে বাধাঁর চেষ্টাই করতাম না কিন্তু থাক এসব কথা।

'না থাকবে না'। আহমদ মুসাকে বাধা দিয়ে বলল নেইজেন, 'এই চাওয়াটাকে কি সব সময় মানুষের ইচ্ছাধীন বলে মনে করেন ভাইয়া?

না করি না।

আরকটা প্রশ্ন ভাইয়া, যাযাবরের কি মন নেই? যার দুনিয়াতে কোন ঘর নেই তার কি ঘর বাঁধার কোন স্বপ্ন থাকতে পারে না?

নেইজেন, এসব কথা থাক। একটা সমস্যায় আমি পড়েছি। মেইলিগুলির কাছে আমি তা তুলে ধরেছি।

‘বেশ আপনারা কথা বলুন’ বলে নেইজেন কৃত্রিম রাগের সাথে বেরিয়ে গেল ড্রয়িং রুম থেকে।

নীরবতা। আহমদ মুসা ও মেইলিগুলি দুজনেই নীরব।

আমি কি অন্যায় করেছি। মেইলিগুলিই প্রথম নীরবতা ভাঙল।

না তা আমি বলিনি।

আপনি কি একে কোন অবাঞ্ছিত, অহেতুক শৃঙ্খল বলে মনে করেছেন?

না তা মনে করিনি।

আপনি যে সমস্যা তুলে ধরলেন, তার সমাধান কিভাবে চাইছেন?

ককেশাসে আমাকে যেতে হবে, কিন্তু আমার হৃদয় বলছে, তোমার সম্মতি নিয়ে আমার যাওয়া উচিত।

মেইলিগুলির মুখ মনে হলো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

কিছুক্ষণ কথা বলল না। তারপর বলল, যদি সম্মতি না পান?

আমিনার কাছ থেকে সম্মতি পাব না এটা কোন সময়ই আমার মনে আসেনি।

কেন?

আমাদের প্রয়োজন তুমি বুঝবে।

মেইলিগুলি কোন কথা বলল না। দুজনেই নীরব। অবশেষে কথা বলল মেইলিগুলি। বলল, জানি আমি, দায়িত্ব আপনাকে নিয়ে বেড়াচ্ছে বিশ্বময়, ফিলিস্তিন থেকে মিন্দানাও, মিন্দানাও থেকে মধ্যে এশিয়া, তারপর চীন। আর এ গতি আমি রোধ করতে পারব না।

একটু থামল, একটা ঢোক গিলল মেইলিগুলি। তারপর আবার বলতে শুরু করল, যাওয়ার আগে আমার প্রতি আপনার কি কোন নির্দেশ নেই?

কেঁপে উঠলেন আহমদ মুসা। বুঝতে পারলেন যে, মেইলিগুলি স্পষ্টভাবে কোন কথাটা জানতে চায়।

কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলেন না আহমদ মুসা। তারপর বললেন, আমিনা, আমি অনেকটা স্রোতে ভাসা পানার মত। তার পর আমি যাচ্ছি জীবন-মৃত্যুর এক

লড়াইয়ে। তোমাকে কোন নির্দেশ দিয়ে যাবার মত নিশ্চয়তা আমার কি আছে? না তা ঠিক হবে?

মেইলিগুলী কিছু বলল না। তার দুচোখ দিয়ে নেমে এল অশ্রুর দুটি ধারা। নীরব কান্নায় তার মাথাটা এলিয়ে পড়ল সোফার দেয়ালে। কাঁপতে থাকল তার দেহটা।

আহমদ মুসা কোন কথা বললেন না। কান্নায় বাধাও দিলেন না। অনেক্ষণ পর মেইলিগুলি থামল। চোখ মুছল। সোজা হয়ে বসে ধীর কন্ঠে বলল, একটা অনুমতি চাই।

কি?

যতদিন না ফেরেন ততদিন আপনার পথ চেয়ে বসে থাকব।

যদি না ফিরি?

যিনি সব দায়িত্ব পালন করেন তিনি আরেকটা দায়িত্ব অস্বীকার করবেন না আমি জানি।

কিন্তু এভাবে রাখা তোমার প্রতি আমার একটা জুলুম হবে।

তাই যদি বলেন, আমিও তো আপনার প্রতি জুলুম চাপিয়ে দিচ্ছি।

একটু থামল মেইলিগুলি। তারপর আবার বলল, আপনি যাকে আমার উপর জুলুম বলছেন সেটা আমার জন্য আনন্দ, আমার জীবনের সম্বল। কিন্তু জনাব, আমি আমার জুলুম থেকে আপনাকে মুক্তি দিচ্ছি। আমি আপনাকে বিয়ের অনুমতি দিলাম।

আমিনার কথাগুলো অত্যন্ত শান্ত। একটুও কাঁপলো না তার কন্ঠ। আহমদ মুসা মাথা নিচু করে বসেছিলো। মেইলিগুলির স্থির, শান্ত কথাগুলির এক অশরীরি শক্তি তার সমগ্র সত্তাকে আচ্ছন্ন করে দিল। তিনি ধীরে ধীরে বললেন, আমিনা দোয়া করো, যে আস্থা তুমি আমার ওপর রাখলে তার সামান্য অবমাননা যেন আমার দ্বারা না হয়।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়ালেন। বেরিয়ে গেলেন ড্রইং রুম থেকে।

নেইজেন পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়েছিল। সে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল মেইলিগুলিকে। অশ্রুরুদ্ধ কন্ঠে বলল, এ তুমি কি করলে আপা ? আমি এ হতে দেব না।

মেইলিগুলির দুচোখ দিয়ে নিঃশব্দে জলের দুটি ধারা নেমে এল। সে বলল, নেইজেন, একটি বড় মিশন নিয়ে উনি যাচ্ছেন। নিশ্চিন্ত মন নিয়ে ওঁর যাওয়ার দরকার। তাঁর কাজ আমাদের সবার কাজ। ওঁকে আর বিরক্ত করো না। দোয়া কর ওঁর জন্যে।

আপা আপনি ভাইয়ার মধ্যে হজম হয়ে গেছেন। তাই তাঁর মত করেই কথা বলছেন। কিন্তু আমি এ হতে দেব না।

কি করবে তুমি?

অস্ত্র আমার হাতেও আছে।

কি অস্ত্র?

টের পাবে, ভাইয়াকে কাবু করার মত অস্ত্র।

দুপুর বারটায় উরুমচি থেকে আহমদ মুসার বিমান উড়বে আকাশে।

বিমান যাবে পিকিং, সেখান থেকে তাসখন্দে। বিয়ের আয়োজনটা খুব সিম্পলভাবে হলেও সময় তাতে লাগলোই। লি ইউয়ান তার প্রথম মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে, ঘটনা খুব ছোট নয়। লি ইউয়ান তার গভর্নর ভবনে এ বিয়ের আয়োজন করেনি। যথা সম্ভব হৈ চৈ এড়ানোর জন্যে উরুমচিতে তার পৈত্রিক বাসভবনেই বিয়ের অনুষ্ঠানের ব্যবস্হা করেছে।

লি ইউয়ান আহমদ ইয়াং-এর পিতা ওয়াং চিং চাইকে বিমানে করে আনার চেষ্টা করেছিল কিন্তু তিনি অসুস্হতার জন্য আসতে পারেননি। তিনি সব ভার আহমদ মুসার উপর দিয়ে দিয়েছিলেন।

সব আয়োজন ঠিকঠাক করে বিয়ের সময়টা দশটার আগে নির্ধারণ করা কিছুতেই সম্ভব হয়নি। লি ইউয়ান এতে কিছুটা বিব্রত বোধ করেছে। কিন্তু আহমদ মুসা সান্ত্বনা দিয়ে বলেছে, না কোন অসুবিধা নেই। তারা শুধু যাবার আগে এই নতুন দম্পতিকে দোয়া করার সুযোগ চায়।

বিয়ের সব আয়োজন সম্পূর্ণ।

লি ইউয়ানের বাড়ির বাইরের ঘরটায় বর বসেছে। তার সাথে আছে আহমদ মুসা, হাসান তারিক, আবদুল্লায়েভ এবং এম্পায়ার গ্রুপের নেতৃবৃন্দ ও কর্মী। এ ছাড়াও আছে লি ইউয়ানের আত্মীয়-স্বজন।

আর মেয়েরা বসেছে বাড়ির ভেতরে পারিবারিক ড্রইংরুমে। সেখানে নেইজেনকে ঘিরে মেইলিগুলি এবং অন্যান্য আত্মীয়। নেইজেনের মা ইউজিনা এবং মেইলিগুলির মা ফাতিমা ব্যবস্হাপনা নিয়ে ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছে।

দশটা এক মিনিটে মেয়ের 'এজেন' নেবার সময় নির্দিষ্ট হয়েছে। তখন নটা পঞ্চাশ মিনিট। বিয়ে মজলিস থেকে মেয়ের 'এজেন' নেবার জন্যে যারা যাবে তারা তৈরি। লি ইউয়ান শেষ প্রস্তুতিটা দেখার জন্যে একটু আগে ভেতরে গেছে।

লি ইউয়ান দেরি করে ফিরে এল। তার মুখটা শুকনো। এসেই সে আহমদ মুসাকে ডাকল। আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি উঠে গেলেন তার কাছে।

লি ইউয়ান বলল, নেইজেন ভয়ানক মুশকিল বাঁধিয়েছে।

কি মুশকিল? উদ্বিগ্ন কন্ঠে বললেন আহমদ মুসা।

নেইজেন বলছে, আমি বিয়ে এখন করব না। ভাইয়া এলে তার সাথে একসাথে বিয়ে করব।

এই কথা এখন বলছে সে?

হ্যাঁ।

আপনি তাকে বুঝাননি যে, সব আয়োজন কমপ্লিট, বিয়ের আসরে সবাই বসে গেছে, এখন আর ফেরার কোন উপায় নেই।

এতক্ষণ ধরে বুঝালাম, কিন্তু তার ঐ এক কথা। সে আরো বলছে বাইরের লোক তো ডাকা হয়নি, সবাই আত্মীয়-স্বজন এবং নিজেদের লোক। কোন ক্ষতি হবে না বিয়ে স্হগিত রাখলে।

আহমদ মুসা মাথা নিচু করে চিন্তা করছিলেন। গত কয়েকদিন নেইজেনকে যতটুকু জেনেছে, তাতে বুঝেছে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও বিচক্ষণ সে। জেদ আছে বটে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে এমনটা করার মত অবিবেচক তো তাকে মনে হয়নি।

মুখ তুলে আহমদ মুসা বললেন মেইলিগুলি কোথায়?

ওখানেই আছে।

ওকে একটু ডেকে দিন।

আহমদ মুসা ও লি ইউয়ান দুজনেই ভেতরে গেলেন। একটা কক্ষে আহমদ মুসাকে রেখে মেয়েদের বিয়ের আসরে গেল মেইলিগুলিকে ডাকতে। মেইলিগুলি এসে দরজার আড়ালে দাঁড়াল। বলল, আমাকে ডেকেছেন জনাব?

হ্যাঁ আমিনা। নেইজেন কি পাগলামী শুরু করেছে বল তো?

সে কারো কথাই শুনছে না। চাচি আম্মা তো বসে বসে কাঁদছেন।

তুমি তাকে বুঝিয়েছ?

শুধু বোঝানো সহজ নয়। আমি তার হাত ধরে অনুরোধ করেছি সকলের মান-সম্মান রক্ষা করার জন্যে। কিন্তু তার কথা থেকে সে একটুও নড়েনি।

তাহলে?

একমাত্র আপনিই তাকে রাজি করাতে পারেন বলে মনে হয়। তাকে আপনি একটু বলুন।

পিতা-মাতা, মেইলিগুলি সবাই যদি ব্যর্থ হয়ে থাকে তার কথা কি আর থাকবে,আহমদ মুসা ভাবলেন। তিনি মেয়েটাকে বোন ডেকেছেন।

এমনি অনেককেই তো আহমদ মুসা বোন ডাকেন। কিন্তু ডাকের সাথে সাথেই নেইজেন যেন আহমদ মুসার বোন হয়ে গেছে। ওর 'ভাইয়া' ডাকে কোন কৃত্রিমতাই আহমদ মুসা দেখেন না। বোনের মত সে ভাইয়ার সাথে কথা বলে আবদার জানায়। আহমদ মুসার ছোট বোন নেই। ছিল লায়লা, মারা গেছে সে ছয় বছর বয়সে। তার ভাইয়া ডাক এখনও তার কানে বাজে।

নেইজেনর ভাইয়া ডাকের মধ্যে লায়লার কন্ঠই যেন শুনতে পায়। ইতিমধ্যেই অপরিসীম একটা স্নেহের সৃষ্টি হয়েছে নেইজেনের জন্যে তার মনে।

আহমদ মুসা পাশে দাঁড়ানো লি ইউয়ানকে বললেন, নেইজেনকে একটু ডাকুন, আমি কথা বলে দেখি।

নেইজেন এল। বিয়ের সাজ তার গায়ে। সে এসে দরজার বাইরে দেয়ালের আড়ালে দাঁড়াল।

বলুন ভাইয়া। কথা শুরু করল নেইজেন।

কি পাগলামী তুমি শুরু করেছ বলতো?

পাগলামী নয়, খুব সামান্য কথা বলেছি।

এটাকে তুমি সামান্য বলছো?

কেন বিয়ে স্থগিত হয় না?

হয়, কিন্তু স্থগিত হওয়ার মত কোন অসুবিধা-গণ্ডগোল কিছুই তো এখানে নেই।

কিন্তু আমি তো আমার অসুবিধার কথা বলেছি।

কি অসুবিধা?

আমার ভাইয়া একটা বড় মিশনে যাচ্ছেন, আমি এখন বিয়ে করব না। ভাইয়া ফিরে এলে বিয়ে করব।

কিন্তু তোমার ভাইয়াই তো চেয়েছেন এখনই বিয়ে হোক।

কিন্তু আমি চাচ্ছি না।

তোমার ভাইয়াকে অপমান করবে?

এত ক্ষুদ্র ঘটনায় অপমানিত হবার মত ছোট আমার ভাইয়া নন।

তোমার ভাইয়া তোমাকে যদি এখন নির্দেশ দেয়?

অন্য সকলের কাছে ভাইয়া নেতা, সুতারাং তার নির্দেশ সকলের শিরোধার্য। কিন্তু আমার কাছে ভাইয়া ভাইয়াই। বোনের ওপর ভাইয়ার অধিকার আছে, সেই অধিকারে ভাইয়া নির্দেশ দেবেন। বোনেরও তো ভাইয়ার ওপর অধিকার আছে, সেই অধিকারে বোন নির্দেশ অমান্য করবে। আমার পরিষ্কার কথা। ভাইয়া ফিরে এলে ভাই বোন এক সাথে বিয়ে করব।

নেইজেনের শেষ কথায় হঠাৎ তার মনোভাব আহমদ মুসার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। পরিষ্কার হওয়ার সাথে সাথে চমকে উঠলেন আহমদ মুসা। এটা কি সম্ভব এখন? আর দুঘণ্টা সময় আছে, এর মধ্যে মেইলিগুলির সাথে তার বিয়ের আয়োজন কি সম্ভব, না উচিত! কিন্তু পরিষ্কার হয়ে গেছে নেইজেন তার শর্ত থেকে সরে দাঁড়াবে না। সে ভেবে চিন্তেই এ অবস্থার সৃষ্টি করেছে। যাতে আর কোন বিকল্প না থাকে।

তবু আহমদ মুসা বললেন, বোন নেইজেন, তুমি কি বলতে চাও এতক্ষনে আমি বুঝেছি। এই জেদ কি তোমার ঠিক হচ্ছে? তুমি তো জান, আমি আমিনার সম্মতি নিয়েছি।

আমি এই সম্মতি মানি না, মানবো না।

নেইজেনের শেষের কথাগুলো ভেঙ্গে পড়ল কান্নায়। সে কান্না জড়িত কণ্ঠে বলতে লাগল, ভাইয়ার ভালমন্দ চিন্তা করার অধিকার বোনের আছে। আমার ভাইকে আর এক মুহূর্ত আমি যাযাবর থাকতে দেব না, ঘরহীন থাকতে দেব না, তার ঠিকানা অবশ্যই একটা থাকবে।

তোমার কোন কথাই আমি অস্বীকার করছি না নেইজেন। কিন্তু এর একটা সময় তো আছে। নরম কণ্ঠে বুঝাতে চেষ্টা করলেন আহমদ মুসা নেইজেনকে।

কোন সময় অসময় নয়। আমি জিজ্ঞেস করি ভাইয়া, বিয়ে করে যুদ্ধ যাত্রার ইতিহাস কি ইসলামে নেই?

আহমদ মুসা কথা বললেন না। মাথাটা একটু নিচু করলেন। একটু চিন্তা করলেন। তারপর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন দশটা বাজে। আহমদ মুসা বললেন, ঠিক আছে নেইজেন। বোনের কাছে ভাইয়া হার স্বীকার করল। তোমাদের 'এজেন'টা ঠিক সময়ে হয়ে যাক। তারপর তোমার ভাইয়েরটা।

'ভাইয়া' বলে একটা চিৎকার করে ছুটে গেল নেইজেন। গিয়ে জড়িয়ে ধরল মেইলিগুলিকে।

আহমদ মুসা তার পাশে দাঁড়ানো লি ইউয়ানকে বললেন, আপনি আমিনার মতটা নিন এবং তার পিতামাতাকে বলুন।

লি ইউয়ান নতমুখে দন্ডায়মান আহমদ মুসাকে জড়িয়ে ধরল। বলল, বাবা তোমাদের দুভাইবোনের কথা শুনলাম। আমার কোন ছেলে নেই এ দৃশ্য আমার কাছে অভূতপূর্ব। আমার আজ গর্বে বুক ফুলে উঠছে এক ছেলে পেয়ে। বাবা আমার বেঁচে থাক।

আহমদ মুসাকে আলিঙ্গন থেকে ছেড়ে দিয়ে বলল, বাবা তুমি আহমদ ইয়াং-এর কাছে যাও। আমি এদিকে সব ব্যবস্থা করছি। আর নেইজেনের 'এজেন' নেবার জন্যে ওদেরকেও পাঠাও।

আহমদ মুসার চোখের দুকোণায় দুফোঁটা পানি এসে জমা হয়েছিল। চোখ মুছে তিনি চলে গেলেন বিয়ের আসরে।

আহমদ ইয়াং ও নেইজেনের বিয়ের পর আহমদ মুসা ও মেইলিগুলির বিয়ে সম্পন্ন করতে এগারটা পনের মিনিট বেজে গেল। মেইলিগুলির সম্মতি আদায়ে বেশ সময় নিয়েছে। তার বক্তব্য ছিল আহমদ মুসাকে চাপের মুখে ফেলে এই সম্মতি আদায় ঠিক হয়নি, কিছুতেই এ বিয়ে এভাবে হতে পারে না এ নিয়ে বহু কাঁদাকাটি সে করেছে। অবশেষে আহমদ মুসাকে মেইলিগুলির সাথে কথা বলতে হয়েছে। আহমদ মুসা তাকে বলেছেন, নেইজেনের উপর রাগ করো না আমিনা। সে যেটা করেছে , আল্লাহর ইচ্ছা হয়তো সেটাই।

বিয়ে অনুষ্ঠান শেষে প্রীতিভোজের পাঠ চুকাতে আরো পঁচিশ মিনিট চলে গেল। এয়ারপোর্টে কমপক্ষে এগারটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে যাত্রা করতেই হবে।

খাওয়া শেষ করে আহমদ মুসা ভেতরে আসতেই নেইজেনের মা প্রায় কাঁদো কাঁদো  কন্ঠে বলল, বাবা মেইলিগুলির সাথে যে তোমাকে দেখা করাতেই পারলাম না। কালকে গেলে হয় না বাবা?

না আম্মা, দেরী করা যাবে না। একদিন দেরী করে গেলে গোটা পরিকল্পনা গরমিল করে দেবে। এয়ারপোর্টে যাবার পথে আমার গাড়িতে মেইলিগুলিকে তুলে নেব। গাড়িতেই ওর সাথে কথা বলব।

তা হয়না বাবা।

কিছু চিন্তা করবেন না আম্মা। চলুন, আমিনার আম্মা-আব্বা কোথায়।

মেইলিগুলির পিতামাতা, মেইলিগুলি ও নেইজেন সবাই এক ঘরে বসে ছিল। আহমদ মুসা তাদের সালাম দিলেন।

মেইলিগুলি আহমদ মুসাকে দেখে মাথার চাদরটা টেনে দিয়েছিল। মুখের অর্ধেকটাই ঢেকে গেছে চাদরে। নেইজেন উঠে চাদরটা টেনে মাথা পর্যন্ত সরিয়ে এনে বলল, এখন আর ভাইয়ার কাছে মুখ ঢাকার পর্দা তো দরকার নেই। মেইলিগুলির মা নেইজেনের মায়ের মতই চোখ মুছতে মুছতে বলে উঠল, বাবা অন্তত একটা দিন কি থাকা যায় না?

না আম্মা, একটা দিন দেরী করলে গোটা পরিকল্পনাই ঢেলে সাজাতে হবে।

ককেশাসে তুমি কবে যাচ্ছ?

তাসখন্দে পৌছার পরই আমি বিস্তারিত জানতে পারব আম্মা।

ককেশাসের সাথে আমাদের যোগাযোগ কিভাবে হবে?

সেখানে যাওয়ার আগে সবকিছুই আমার কাছে অন্ধকার।

ভাইয়া, আমার ভয় করছে, আপনার ভয় করছে না সেই ভয়ংকর অন্ধকারে পা বাড়াতে? বলল নেইজেন।

কিসের ভয় করব. জীবনের ভয়?

জীবনের মায়া করলে তো হাসি মুখে এবং দ্বিধাহীন চিত্তে মৃত্যুমুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারব না। আর তা না পারলে শত্রুর সাথে আমরা লড়ব কি করে?

মৃত্যুকে জ্বলজ্যান্ত দেখে ভয় করে না? আমি সেই কথাই বলছি। বলল নেইজেন।

ভয় করবে কেন? মৃত্যু তো একবারই আসবে এবং আসবে আল্লাহ যখন নির্ধারিত করেছেন তার এক মিনিট আগেও নয় পরেও নয়।

আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, আম্মা-আব্বা আপনারা আমাকে দোয়া করুন। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমাকে বেরুতে হবে। প্রস্তুতির কিছু বাকিও আছে আমার। এই সময় চোখ তুলে মেইলিগুলি আহমদ মুসার দিকে তাকাল। তার দুচোখ জলে ভরা। বিয়ের পর এটাই প্রথম দৃষ্টি বিনিময়। আহমদ মুসা এই প্রথম দেখল মেইলিগুলিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে। দুজনের কেউই চোখ সরাতে পারছিল না। অবশেষে আহমদ মুসাই তার চোখ টেনে নিয়ে বললেন, তুমি তৈরী হও আমিনা। আমার সাথে তুমি এয়ারপোর্টে যাবে।

গাড়ির এক মিছিল চলছে এয়ারপোর্টের দিকে। সামনে পেছনে এম্পায়ার গ্রুপের কর্মীদের গাড়ী। মাঝখানে পর পর চারটি করে। সামনেরটিতে হাসান তারিক, যুবায়েরভ, আবুল ওয়াফা, ও আব্দুল্লায়েভ। তারপর আহমদ মুসার গাড়ী। আহমদ মুসা নিজেই ড্রাইভ করছেন। তার পাশে মেইলিগুলি। আহমদ মুসার

পেছনে আহমদ ইয়াং এবং নেইজেনের গাড়ী। তার পরের গাড়িতে আছেন নেইজেনের মা ইউজিনা এবং মেইলিগুলির আব্বা-আম্মা।

ধীর গতিতে চলছে গাড়ী। স্টিয়ারিং হুইল ধরা আহমদ মুসার হাত। তার দৃষ্টি সামনে। মেইলিগুলি মুখ নিচু করে বসে আছে। তার চোখ দুটি ভারী।

আহমদ মুসা মেইলিগুলির দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, কথা বলছ না যে?

মেইলিগুলির মুখটা লাল হয়ে উঠল। একটু চুপ করে থেকে সে বলল, এমনটা হয়ে গেল কিছু মনে করনি তো?

আল্লাহ হয়তো আমার জন্য ভালটাই করেছেন। এখন কি মনে হচ্ছে জানো? মনে হচ্ছে, আমার একটা শিকড় আছে। আগে আমার সামনেটাই ছিল সব, পেছন বলতে কিছুই ছিল না। কিন্তু এখন পেছনে এক প্রবল আকর্ষন।

এ আকর্ষণ তোমার কাজের গতির ক্ষতি করবে না তো?

এ আকর্ষণ পেছনে টানার আকর্ষণ নয়। জীবনটাকে আরো ভালবাসার আকর্ষণ। সত্যি আমিনা শূণ্যতা যে একটা ছিল এখন পূর্ণতার পরই তা বুঝতে পারছি।

আহমদ মুসা কথাটা শেষ করেই একবার মেইলিগুলির দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, সবাই অন্তত একটা দিন থাকতে বলল, তুমি তো কিছু বললে না।

বললে তুমি যেতে পারবে না এ ভয়ে।

ভয় কেন?

ককেশাস সম্পর্কিত তোমার পরিকল্পনার ক্ষতির ভয়। আমি চাইনি আমাদের এই মিলন আন্দোলনের ক্ষতির কারণ হোক। তোমাকে তো সেখানে কত কষ্ট করতে হবে। তার সাথে আমার এ ভাগ্যটুকু জুড়ে দিতে পেরে খুবই গর্ব বোধ করছি।

আহমদ মুসা মুগ্ধ দৃষ্টিতে মেইলিগুলির দিকে তাকালেন। তারপর ডান হাত স্টিয়ারিং হুইলে রেখে বাঁ হাত বাড়িয়ে দিলেন মেইলিগুলির দিকে। মেইলিগুলি একটু সরে এল । আহমদ মুসা তার ডান হাতটা তুলে নিয়ে তাতে চুমু খেলেন। বললেন আমিনা, তুমি হবে আমার সামনে এগুবার শক্তি, আমার সংগ্রামের প্রেরণা।

মেইলিগুলি আহমদ মুসার হাতটি আর ছাড়ল না। হাতটি দুহাতে জড়িয়ে ধরে তাতে মুখ গুঁজল।

আহমদ মুসা হাত টেনে নিলেন না।

মেইলিগুলির চোখের পানিতে আহমদ মুসার হাত ভিজে গেল।

কাঁদছ তুমি আমিনা? নরম কন্ঠে বললেন আহমদ মুসা।

মেইলিগুলি আহমদ মুসার হাত ছেড়ে দিয়ে চোখ মুছে বলল, তুমি কিছু মনে করো না, এ আমার কান্না নয়, আনন্দ। বিদায়ের আগে এতটুকু স্পর্শ তোমার পাই, আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করেছিলাম। আল্লাহ তা পূরণ করেছেন।

গাড়ি বিমান বন্দরে এসে পৌঁছল। বিমান উড়ার আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি।

আহমদ ইয়াংসহ এম্পায়ার গ্রুপের কর্মীরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে। আহমদ ইয়াং কাঁদছে। সকলের চোখেই পানি।

গাড়ির পাশেই মায়েদের সাথে সারা গা চাদরে ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে মেইলিগুলি এবং নেইজেন। তাদেরও চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে। মেইলিগুলি কাঁদবে না ভেবেছিল। কিন্তু পারল না নিজেকে ধরে রাখতে। এম্পায়ার গ্রুপের নেতা ও কর্মীদের কাছে বিদায় নিয়ে আহমদ ইয়াং এর কাছে এসে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসা। আহমদ ইয়াং হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। কিন্তু আহমদ মুসার চোখ একেবারে শুকনো, মুখে হাসি। আহমদ ইয়াং এর পিঠ চাপড়ে আহমদ মুসা চলে এলেন নেইজেন ও মেইলিগুলির কাছে। নেইজেনকে বললেন, বোকা বোনটি, ভাইয়ের বিদায়ের সময় হাসি দিতে হয়, কান্না নয়। ক্রন্দনরতা মেইলিগুলির কাছে দাঁড়িয়ে আহমদ মুসা বললেন, আমিনা, তাকাও আমার দিকে, দেখ আমার চোখে কোন অশ্রু নেই, আছে আল্লাহ। একজন সৈনিক হিসেবে আল্লাহর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার আনন্দ।

মেইলিগুলি চোখ তুলে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। দেখল আহমদ মুসার চোখে নিশ্চিত প্রত্যয়ের এক প্রদীপ্ত শিখা। সে শিখা যেন সব শংকা, সব দুর্ভাবনা নিমেষে দূর করে দেয়।

মেইলিগুলি চোখ মুছল। বলল, তুমি আমাকে মাফ কর।

আহমদ মুসা বললেন, মেইলিগুলি মনে রেখ তুমি সেই মুসলিম মহিলাদের উত্তরসূরি, যারা স্বামী এবং সন্তানদের শাহাদতের খবর শুনে হাত তুলে প্রার্থনা করেছে- হে আল্লাহ; আমার আরও সন্তান থাকলে তাদেরকেও তোমার রাস্তায় শহীদ হবার জন্যে পাঠাতাম!

মেইলিগুলি বলল, আমার জন্যে তুমি দোয়া কর।

'ফি আমানিল্লাহ' বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে সবাইকে সালাম দিয়ে টারমাকের দিকে পা বাড়ালেন আহমদ মুসা। বিমানের সিঁড়িতে একজন তাকে রিসিভ করার জন্যে দাঁড়িয়ে।

# ৫

আর্মেনিয়ার রাজধানী ইয়েরেভেনের নতুন অংশে সেন্ট জন পল রোড যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে নীরব- মনোরম পরিবেশ এক সবুজ টিলার উপর দাঁড়িয়ে আছে ককেশাস অঞ্চলের সবচেয়ে মর্যাদাশালী শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'ইনস্টিটিউট অব এডভান্সড নিউক্লিয়ার ফিজিক্স'।

ইনস্টিটিউট বিল্ডিং -এর সামনে কৃত্রিম একটা লেক। তার চারপাশে বাগান। বাগানের ছায়ায় অনেক আসন পাতা। ক্লাস বিরতির সময়টুকু ছাত্ররা লাইব্রেরীতে অথবা এখানেই কাটায়।

বেলা দেড়টা। শেষ বর্ষের ক্লাস থেকে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এল সোফিয়া এঞ্জেলা। সাদা স্কার্ট, সাদা শার্ট পরা। গলায় একটা সোনার চেন। চেনের সাথে বুকের ওপর ঝুলে আছে মূল্যবান লাল পাথরের তৈরি ক্রুশের উপর ক্রুশবিদ্ধ খ্রিস্টের ছবি। খুব সাধারণ পোশাকেও মেয়েটিকে 'এঞ্জেলা' অর্থাৎ দেবী বলেই মনে হচ্ছে। সোফিয়া আর্মেনিয়ার কিরকেশিয়ান গোত্রের মেয়ে। সৌন্দর্যের জন্য এরা বিখ্যাত। তুর্কী খলিফাদের অনেকেই এখান থেকে তাদের বেগম বাছাই করেছেন।

সোফিয়া এঞ্জেলা আর্মেনিয়ার নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় নেতা সেন্ট জর্জ সাইমনের মেয়ে।

সোফিয়ার চোখ দুটি চঞ্চল। সে তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক। সে খুঁজছে সালমান শামিলকে। সালমান শামিল ক্লাসের সেরা ছাত্র। বরাবর সে ক্লাসে প্রথম হয়ে আসছে। খৃস্টান আর্মেনিয়দের পরিচালিত এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলমানদের উৎকট বৈষম্যের দৃষ্টিতে দেখা হয়। সে যদি আবার আজারবাইজানী হয় তাহলে তো কথাই নেই। কিন্তু সালমান শামিল আজারবাইজানী হবার পরেও তাকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা হয়নি। তার মত ছাত্র এ ইন্সটিটিউটে আর আসেনি। শিক্ষকরাও তাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করেন।

সালমান শামিল তো প্রথম সারিতেই বসেছিল, হুট করে বেরিয়ে গেল কোথায়? সোফিয়া তাকে খুঁজতে লাইব্রেরীতে এল। না লাইব্রেরীতে নেই। লাইব্রেরীতে যে চেয়ারে সে বসে সেটা খালি। এল এবার সে লেক গার্ডেনে। না, কোথাও নেই। হতাশ হয়ে ইনস্টিটিউট বিল্ডিং-এ ফেরার পথে পেল ডেভিডকে। তাদেরই সহপাঠী। সে সালমানকে দেখেছে কিনা সোফিয়া জিজ্ঞেস করল।

ডেভিড থমকে দাঁড়িয়ে সোফিয়ার দিকে মুহূর্তকাল এক দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, বয়ে গেছে আমার ঐ খুনেদের খোঁজ রাখতে।

সোভিয়েতরা ককেশাস দখলের পর এর নাম পরিচয় অনেক কিছুই পাল্টে দিয়েছিল জাতীয় ঐক্য যাতে আসতে না পারে এজন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জাতিসত্তাকে উজ্জীবিত করে ককেশাসকে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়েছে। সৃষ্টি করা হয়েছে জর্জিয়া, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান ইত্যাদি। সবচেয়ে অবিচার করা হয়েছে ইতিহাস নিয়ে। রাজনৈতিক লক্ষ্য চরিতার্থ করার জন্য ইতিহাস নতুন করে লেখা হয়েছে। এ ইতিহাসে মুসলমানদের খুনি জাতি হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। নতুন আর্মেনিয়রা মুসলমানদের প্রতি একটা জাতি বিদ্বেষ নিয়ে তাদের বুদ্ধির চোখ মেলে।

একজনকে এভাবে বলা ঠিক নয়। বলল সোফিয়া।

সে তো একজন ব্যক্তি মাত্র নয়, একটা জাতির অংশ।

তা হোক, ওর দোষটা কি?

দোষটা টের পাবে। দুধ-কলা দিয়ে সাপ পুষছে ইনস্টিটিউট। তার প্রতিভা দিয়ে আমাদের কি?

তাদের প্রতিভা কি আমাদের কাজে লাগছে না?

তুমি সেন্ট সাইমনের মেয়ে বটে। কিন্তু অন্ধ। বই ছাড়া কিছুই বুঝ না। সামনে দিনটা কি আসছে জান?

কি?

দুই প্রদীপ তো একসাথে থাকতে পারে না, এই ককেশাসে হয় তারা থাকবে, না হয় আমারা থাকব।

দেখ এসব রাজনীতির কথা। নতুন কথাও নয়। এসব আমি বুঝি না। বল দেখেছ কিনা সালমানকে, ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেল কোথায়?

কি দরকার তাকে, ঐ মুসলমানের বাচ্চাটাকে?

সামনে পরীক্ষা মনে নেই, ওর একটা নোট আজ আমাকে দেবার কথা।

তাহলে পালিয়েছে। ও হিংসুক, কোন উপকার করবে আমাদের?

এ সময় আরেক সহপাঠী রাফেলো সেখানে এসে দাঁড়ালো। বলল, কার কথা বলছিসরে ডেভিড?

খুনি কুকুরদের কথা, সালমানদের কথা।

কি উপকার করবে সে?

সোফিয়া একটা নোট চেয়েছে তার কাছে। দেবার কথা আজ। পালিয়েছে।

রাফেলো সোফিয়ার দিকে কটাক্ষ করে বলল, যতই সুন্দরী হও, স্বর্গের অপ্সরী হও, ও ব্যাটারা কিন্তু কাজে ঠিক আছে। কলা দেখাবে তোমাকে। তুমি চেন না ওদের।

বলে ডেভিডের পিঠে একটা থাপ্পড় দিয়ে বলল, চল লাঞ্চ সেরে আসি। ক্লাসের দেরি হবে আমাদের।

ডেভিড যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে পকেট থেকে একটা হ্যান্ডবিল বের করে সোফিয়ার হাতে দিয়ে বলল, রাজনীতি তো বুঝ না, পড়ে একবার বুঝতে চেষ্টা করো।

তারা চলে গেল।

সোফিয়া হ্যান্ডবিলটির দিকে নজর বুলাতে বুলাতে ইন্সটিটিউটের দিকে পা বাড়াল।

হ্যান্ডবিলটি প্রচার করেছে 'জাগ্রত আর্মেনিয় জনগণ' -এর পক্ষে 'হোয়াইট উলফ'। হ্যান্ডবিলে এ অঞ্চলের খৃস্টান জনগণের ওপর মুসলমানদের নির্যাতন ও গণহত্যার বিবরণ দেয়া হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে, তাদের হাত থেকে ককেশাস অঞ্চল মুক্ত করতে না পারলে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি আবার ঘটবে। সুতরাং 'হোয়াইট উলফ' -এর সাথে সকলে একাত্ম হওয়া এবং দেশকে খুনিদের হাত থেকে মুক্ত করার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

হ্যান্ডবিলটির শেষে ফুটনোটে লেখা হয়েছে, হ্যান্ডবিলটি বার বার পড়ুন, সংরক্ষণ করুন এবং অন্যকে পড়ান, খ্রিস্ট খুশি হবেন।

সোফিয়া পড়ে হ্যান্ডবিলটি ব্যাগে রেখে দিল। একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার বুক থেকে। কি হচ্ছে এসব দেশে? এমন অসহনশীল ছিল না মানুষ। এই ডেভিড, রাফেলোকে তো সে আজ থেকে থেকে চিনে না। তারা এমন মানুষ ছিল না। এই তো এক বছর আগে সালমান যখন অনার্সে ফার্স্ট হলো, ডেভিডই তো তাঁকে কাঁধে তুলে নিয়েছিল, যদিও মুসলমান বলে একটা ঘৃণা, একটা বিদ্বেষ তার প্রতি ছিল। কিন্তু এই এক বছরের মধ্যে কি ঘটে গেল, তারা এমন হয়ে গেল কেন? শুধু তারা কেন, সর্বত্রই তো ধূমায়িত বিক্ষোভ দেখছি।

সোফিয়া আবার ফিরে এল লাইব্রেরীতে। কিন্তু দেখল সালমানের সিটটা শূন্যই। সোফিয়া তার নিজের ব্যাগটা টেবিলে রেখে বাথরুমে গেল।

বাথরুমের সামনের করিডোরটি পশ্চিম দিকে এগিয়ে বাথরুম ঘুরে উত্তর দিকে গেছে। করিডোরটি পশ্চিম দিকে এগিয়ে বাথরুম ঘুরে উত্তর দিকে গেছে। করিডোরের উত্তর প্রান্তে বাথরুম। সুইপারদের স্টোর রুম।

সোফিয়া করিডোরের পশ্চিম প্রান্তে দুটো জুতার গোড়ালী দেখতে পেল। ওভাবে ওখানে জুতা পড়ে কেন?

বাথরুম থেকে বেরুবার পর সোফিয়ার সে কৌতূহলটা আবার জাগল, জুতা কেন, কার জুতা!

করিডোরের পশ্চিম প্রান্তের কাছাকাছি হতেই পুরো জুতাটা তার নজরে পড়ল। একি, এ যে সালমান শামিলের জুতা!

করিডোরের মাথায় গিয়ে উত্তর দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল সোফিয়া। দেখল, সালমান নামাযে দাঁড়িয়ে। তার হাত দুটি বুকে বাঁধা, চোখ দুটি মাটির দিকে। ধ্যানমগ্ন চেহারা। ঠোঁট দুটি শুধু তার নড়ছে।

সোফিয়া সেদিক থেকে চোখ সরাতে পারল না। সালমান শামিল শুধু ভাল ছাত্র নয়, তার ব্যায়াম পুষ্ট সুন্দর সুগঠিত দেহও সকলের ঈর্ষার বস্তু। সবচেয়ে আকর্ষণীয় তার চোখ ও মুখের পবিত্র লাবণ্য। সেদিকে চাইলে মনে হয় না সে

কারো শত্রু হতে পারে। তার নিষ্পাপ চেহারা শুধু কাছেই টানে কাউকে দূরে সরিয়ে দেয় না।

সোফিয়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সালমানের রুকু, সিজদা গোটা নামাযই দেখল। সে যে একজন সামনে দাঁড়িয়ে, কোন খেয়ালই তার নেই। যেন গোটা দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন সে, যেন মন তার অন্য কোন জগতে। নামায এই রকম, এত সুন্দর। কই গীর্জায় তো সে যায়, ফাদার কিংবা কারো মধ্যেই তো এই ধ্যানমগ্নতা, এই একাগ্রতা কোন দিন সে দেখেনি।

সালাম ফিরিয়েই সালমান শামিল সোফিয়াকে দেখতে পেল। হেসে উঠে দাঁড়ালো। কি ব্যাপার সোফিয়া, তুমি এখানে?

তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে হয়রান।

কি করে জানলে আমি এখানে?

তোমার জুতা বলে দিয়েছে। এসেছিলাম বাথরুমে। জুতার গোড়ালি দেখে সন্ধান নিতে এসে দেখি তুমি এখানে নামায পড়ছ। বলতো, সুইপারের করিডোরে এভাবে নামায পড়ছ কেন? সব জায়গায় কি নামায হয়?

আল্লাহর জমিনের সব জায়গাই পবিত্র, সব জায়গা থেকেই তাকে ডাকা যাবে।

তবু লাইব্রেরীতে তো অনেক নিরিবিলি জায়গা আছে, সেখানে তো নামায পড়তে পার।

আপত্তি উঠেছে।

আপত্তি উঠেছে? কে আপত্তি করেছে?

এসব কথা থাক সোফিয়া। তুমি অনেক কিছুই জান না, জেনে কি লাভ!

এসব নিকৃষ্ট সংকীর্ণতা।

সংকীর্ণতাকে দোষ দিচ্ছ? এ সংকীর্ণতাই তো যুগ যুগ ধরে ক্রুসেড চালিয়েছে।

কিন্তু ক্রুসেডের জন্য তো তোমরা দায়ী।

বল সোফিয়া, মুসলমানরা কি যুদ্ধ করার জন্য ইউরোপে গিয়েছিল, না ইউরোপীয়রা যুদ্ধ করতে মুসলিম ভূখন্ডে এসেছিল?

কিন্তু তোমরা তো আমাদের খ্রীষ্ট ভূমি জেরুজালেম দখল করে রেখেছিলে।

না, জেরুজালেম আমরা মুক্ত করেছিলাম, অনাচারের হাত থেকে মুক্ত করে খ্রীষ্ট এবং বহু নবীর জম্ম ও কর্মস্থানকে আমরা মর্যাদা দিয়েছিলাম। আমরা জেরুজালেম মুক্ত করেছিলাম তার প্রমাণ জেরুজালেম যখন আমাদের হাতে আসে তখন একফোটা রক্তপাত ও হয়নি, কোন মানুষের একটি টাকা ও লুন্ঠিত হয়নি। মুসলমানদের আগমনে জেরুজালেমবাসীরা হেসেছিল। কিন্তু তোমরা যখন জেরুজালেমে প্রবেশ করেছ তখন সত্তর হাজার লোক নিহত হয়েছে, কোন বাড়িই লুন্ঠনের হাত থেকে বাঁচেনি, কোন একটি বাড়িও আগুন ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়নি।

শোন তোমার সাথে আমি ঝগড়া করতে পারব না। ভাল লাগছে না। আজ সারাদিনই এসব শুনছি।

কি শুনছ?

এখন আমি আবার আরেকটা কাহিনী শুরু করি। আমি পারব না। এসব কথা উচ্চারণ করতে ও আমার ঘৃণা বোধ হয়।

কোন সব কথা?

নোংরা রাজনীতির কথা।

বলে সোফিয়া তার ব্যাগ থেকে সেই হ্যান্ডবিলটা বের করে সালমানের হাতে দিতে দিতে বলল, এই কিছুক্ষণ আগে একজন এটা আমার হাতে দিল এবং দুজনে একটা বক্তৃতাও দিয়েছে।

সালমান শামিল হ্যান্ডবিলে নজর বুলিয়ে সোফিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, এ হ্যান্ডবিলটা এ ইনস্টিটিউটেও বিলি হচ্ছে?

তা বোধ হয় নয়। একজন আমাকে ব্যক্তিগতভাবে দিয়েছে।

পড়ে কি মনে করছ?

বলেছিই তো, ভাল লাগছে না। আমি এসব আলোচনা করতে রাজী নই। আমি এসেছি তোমাকে একটা কথা বলতে।

বল। সোফিয়ার দিকে চকিতে একবার চোখ তুলে বলল সালমান শামিল।

হ্যাঁ, এই সুইপার করিডোরে দাঁড়িয়ে কথা বলি! চল লাইব্রেরীতে। লাইব্রেরীতে গিয়ে দুজন বসল পাশাপাশি চেয়ারে। চেয়ারটা একটু লাগালাগি হয়ে গিয়েছিল। সালমান শামিল চেয়ারটা টেনে সরিয়ে নিল। সোফিয়া ভ্রুকুটি করে বলল, দেখ আমি বাঘ নই যে তোমাকে নিরাপদ দূরত্বে সরে থাকতে হবে।

তা নয়.........

লজ্জিত সালমান শামিল তার কথা শেষ না করেই থেমে গেল।

তা নয় তো কি? পুরুষ মানুষের এত লজ্জা সাজে না। বলতো কোন মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তুমি কথা বলতে পার? বিয়ের অনুষ্ঠানে বরের মত চোখটা সব সময় নিচের দিকে। এটা কি?

সোফিয়ার কথা শুনে সালমান শামিল হাসল। বলল, সোফিয়া, পারি না বলে নয়, পারা উচিত নয় বলে তাকাই না।

উচিত নয় কেন?

ইসলামে নিষেধ আছে। নর ও নারীর বৃহত্তর স্বার্থেই এই নৈকট্য ও ঘনিষ্ঠতাকে নিষেধ করা হয়েছে।

সোফিয়া একটু ভাবল। বলল, সালমান বিষয়টাকে নিয়ে আমি এভাবে কখনও ভাবিনি। আমাকে ভাবতে হবে আরও।

তারপর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, ঠিক আছে তুমি একটু দুরেই থাক, এবার শোন আমার কথা।

থামল সোফিয়া। ধীরে ধীরে শুরু করল আবার, তোমার কি শত্রু আছে সালমান?

কেন এ কথা বলছ?

এমনি, বল না?

না, আমি আমার শত্রু দেখছি না।

আচ্ছা, তুমি কারো কোন স্বার্থের ক্ষতি করেছ?

না।

কিন্তু তোমার শত্রু আছে। তারা তোমার ক্ষতি করতে চেষ্টা করবে। তোমাকে সাবধান থাকতে হবে।

এসব কথা তুমি বলছ কোথেথকে?

আমাকে তুমি এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করো না। আমাকে তুমি বিশ্বাস কর, আমি ঠিক বলছি। অনুরোধ ঝরে পড়ল তার কন্ঠে।

সোফিয়ার কাছে থেকে এ ধরনের খবর শুনে কিছুটা চমকে উঠেছিল সালমান শামিল। কিন্তু চমকে ওঠাটা সে প্রকাশ হতে দেয়নি সোফিয়ার কাছে এবং সোফিয়ার কথা সে এক বিন্দুও অবিশ্বাস করেনি। কিন্তু বিষ্ময়ের ব্যাপার হলো সোফিয়ার কাছে এ খবর এল কি করে? এ বিষয়টা তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। তাই সে প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে বলল, বিপদের পরিচয় জানলে সাবধান হওয়া সহজ হতো সোফিয়া।

তোমার কাছে মিথ্যা বলব না সালমান। আমি কিছুই জানি না। শুধু এটুকু বুঝতে পেরেছি, তুমি কারো ভয়ানক শত্রুতার টার্গেট। এই বুঝতে পারা সূত্রটা কি তা জিজ্ঞেস করতে তোমাকে নিষেধ করছি।

শুকরিয়া সোফিয়া।

শুকরিয়া জানাতে হবে না, তুমি বল আমার কথা তুমি গুরুত্বের সাথে নিয়েছ? সাবধান থাকবে?

জীবনের ভয় কি আমার নেই সোফিয়া?

না, নেই। একদিন তুমি বলেছিলে না যে, জীবন-মৃত্যু আল্লাহর হাতে? এ নিয়ে মানুষের চিন্তার কিছু নেই।

এ কথা আমি এখনো বলি।

এখানেই আমার আপত্তি। সাবধান তুমি তাহলে কেমন করে হবে?

পাগল, যুদ্ধে জয়-পরাজয় তো আল্লাহর হাতে, তার মানে কি অস্ত্র না ধরলেও, যুদ্ধ না করলেও আল্লাহ জয় এনে দেবে?

'ঠিক আছে, বুঝেছি' বলে একটু হেসে উঠে দাঁড়ালো সোফিয়া। বলল, এখন আসি। বলে হাত বাড়িয়ে দিল। কিন্তু 'স্যরি' বলে হাত টেনে নিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল সালমান শামিলের। ঘড়ির রেড়িয়াম ডায়ালের দিকে চেয়ে দেখল রাত দুটা। এ সময়ে ঘুম ভাঙল কেন?

এই সাথে খেয়াল হল, সে তো বিছানায় শুয়ে নেই, সোফায়। মনে পড়ল, সোফায় হেলান দিয়ে চিন্তা করতে করতেই সে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছে।

সোফিয়ার দেয়া তথ্য নিয়েই চিন্তা করছিল সালমান শামিল। ককেশাসের মুসলিম কম্যুনিটির এ পর্যন্ত পঁচিশজন নেতা হারিয়েছে।

সালমান শামিল জানে। এই হারিয়ে যাওয়ার তালিকায় সেও থাকতে পারে। প্রতিভাবান ও সম্বাবনাময় ছাত্র বলে শুধু নয় । তার সবচেয় বড় অপরাধ হল সে ইমাম শামিল এর বংশধর।

ঈমাম শামিল ককেশীয় মুসলমাদের কিংবদন্তীর নায়ক অকুতভয় স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং ককেশীয় মুসালমানদের অবিসংবাদিত আধ্যাত্তিক নেতা। ইমাম শামিল উনিশ শতকের মধ্য ভাগের প্রায় চার দশক ধরে ককেশীয় মুসলমানদের নেতৃত্ব দিয়েছেন। জনগণকে সংঘবদ্ধ করে রাশিয়ার জারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। বহু বছর তিনি জারের সংগ্রাম ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। রুশ বিপ্লবের পর লিখিত সোভিয়েত এনসাইক্লোপেডিয়ার প্রথম সংস্করণেও তার জার বিরোধী সংগ্রামের প্রশংসা আছে । তাতে পরিস্কার বলা হয়ছিল ককেসীয় পাহাড়ী জনগণের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান নায়ক ছিলেন শামিল। জার শাসিত রাশিয়ার আগ্রাসনের বিরুদ্ধেই ছিল তার সংগ্রাম।

কিন্তু পরবর্তীকালে সোভিয়েত কম্যুনিস্টরা যখন দেখল শামিলকে স্বীকৃতি দিলে শামিলের ইসলামী আন্দোলনের প্রতিও স্বীকৃতি দেয়া হয়ে যা, তখন তারা ইতিহাস পাল্টায়। ককেশাসের মীরজাফর বাগীরভ ও দানিয়ালভদের দ্বারা ঘোষণা করা হলো শামিলকে জাতীয় নেতা বলে স্বীকার করা যেতে পারে না। বলা হলো শামিলের ইসলামী আন্দোলন প্রগতিশীল ও স্বাধীনতাকামী হতে পারে না।

সেই ইমাম শামিল এর বংশধর সালমান শামিলের ভর্তি নিয়েও অনেক টাল বাহানা হয়েছে। কিন্তু তার ব্যতিক্রমধমী রেজাল্টই ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের দরজা তার সামনে খুলে দিয়েছে।

সোফিয়ার ওটুকু ইংগিতই সালমান শামিলের জন্য যথেষ্ট হয়েছে। সালমান শামিল ইমাম শামিলের প্রতিষ্ঠিত ইসলামী আন্দোলন ককেশাস ক্রিসেন্ট এর যুব শাখার প্রধান। তার চিন্তার বিষয় ছিল, এখন তার কি করনীয়। অদৃশ শত্রুর বিরুদ্ধে কি করে সে লড়াই করবে? এ অদৃশ শত্রুদের তারা চেনে। কিন্তু কারা কোত্থেকে কিভাবে কাজ করে চলেছে এটাই জানা নেই তাদের। এরা অত্যন্ত কুশলী এবং দক্ষ। তারা কাজ করে কিন্তু পেছনে কোন চিহ্ন রেখে যায় না।

সালমান শামিল দুচোখ ভালো করে রগড়ে সোফা থেকে উঠতে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটা ধাতব গন্ধ তার নাকে প্রবেশ করল। বিজ্ঞানের ছাত্র সালমান শামিল সংগে সংগে বুজতে পারল এটা গলিত ইস্পাতের গন্ধ। বুঝার সাথে সাথেই আঁৎকে উঠল সালমান শামিল। তাহলে কি ঘরের ইস্পাতের লক গলিয়ে ফেলা হচ্ছে!

সালমান শামিল দ্রুত সন্তর্পণে ছুটে গেল প্রথমে বাইরের ব্যালকনির দিকের দরজার কাছে। দরজার লকের দিকে তাকাতেই কীহোল দিয়ে ক্ষুদ্র একবিন্দু চোখ ধাঁধানো নীল আলো দেখতে পেল। বুঝলো ল্যাসার বিম দিয়ে দরজার লক গলিয়ে ফেলা হচ্ছে।

সালমান শামিলের কাছে সব পরিস্কার হয় গেল। মনে পড়ল সোফিয়ার সাবধান বানীর কথা।

সালমান শামিল তাড়াতাড়ি দরজার পাশে রাখা ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করার বাড়তি ব্যবস্থা লোহার মোটা বার তুলে সন্তর্পণে চৌকাঠের দুই হুকে ঢুকিয়ে দিল। সালমান শামিল জানে ল্যাসার বিম দিয়ে গোটা দরজাই উড়িয়ে দেয়া যাবে। তবু এই ব্যবস্থা এ জন্যই যে, কিছুটা সময় হাতে পাওয়া যাবে।

সালমান শামিল দ্রত ভেতরের দরজা খুলে বাড়ির ছাদে উঠে এল। সিড়ি দিয়ে নিচে নামার চেষ্টা করল না। সেখানে পাহারা থাকবে নিশ্চিত।

সালমান শামিলের এ বাড়িটি সেন্ট জন পল রোডের পাশেই। এ রোডের মাঝামাঝি গোল্ডেন প্লাজা এলাকায় একটা ছোট রাস্তা সেন্ট জন পল রোড থেকে পূর্বদিকে বেরিয়ে গেছে। এই রাস্তা দিয়ে শ'দুয়েক গজ গেলেই এই বাড়ি। বাড়িটির উত্তর পাশ দিয়েই ঐ রাস্তাটির পূর্ব ও দক্ষিন পাশ খোলা। পশ্চিম পাশে

একটা বাড়ি। দুই বাড়ির মাঝখানে অন্ধকার। সুইপার প্যাসেজ। প্যাসেজটির মাথায় একটি ভাঙা দরজা।

আটটি ফ্ল্যাট বিশিষ্ট চারতলা বিল্ডিং এর টপ ফ্লোরে একটা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকছে সালমান শামিল। তার চার রুমের দুরুম সে থাকতে দিয়েছে একটি মুসলিম পরিবারকে অবশিষ্ট দুরুম নিয়ে সে থাকে।

সালমান শামিল ছাদে উঠে দ্রুত পানির পাইপ বেয়ে বাড়ির মধ্যকার সেই অন্ধকার প্যাসেজে নেমে গেল। তারপর গুটি গুটি করে এগুলো রাস্তার দিকে।

ভাঙ্গা দরজার কাছে এসে ফুটোয় চোখ লাগিয়ে দেখল দরজার মুখেই একটা জীপ দাড়িয়ে। রাস্তার বাতিটা বেশ খানিকটা তফাতে। তবুও জীপের ভেতরে বেশ ফর্শা। দেখল কেউ জীপে নেই। ওরা কি সবাই ভেতর ঢুকে গেছে? না ও হতে পারে, হয়তো দু একজনকে সালমান শামিলের বাসার সামনের লনটায় পাহারায় রেখে গেছে।

সালমান শামিল হামাগুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে জীপের দিকে এগোল। তার লক্ষ জীপে এমন কিছু পাওয়া যায় কিনা যা থেকে নাম পরিচয় ঠিকানার কিছু জানা যাবে।

জীপের দরজা তারা খোলাই রেখে গিয়েছিল। জীপে প্রবেশ করে চারদিক চোখ বুলাতে গিয়ে প্যানেল বোর্ডের উপর নজর পড়তেই তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দেখল, একটা নোট বুক। নোট বুকটা পকেটে ফেলে জীপ থেকে নামতে গিয়ে সে দেখল জীপের লকে চাবি ঝুলছে। একটা চিন্তা ঝিলিক দিয়ে উঠল তার মনে। এই জীপ নিয়েই তো সরে যেতে পারি।

যা ভাবা সেই কাজ। কী হোলে চাবি ঘুরিয়ে একসেলটারে চাপ দিল সে। গাড়ি গো গো করে উঠে চলতে শুরু করল সালমান শামিল গিয়ার চেঞ্জ করে স্পীড বাড়িয়ে দিল জীপের। লাফিয়ে উঠে ছুটে চলল গাড়ি। সালমান শামিল মুখ বাড়িয়ে পেছনে দিকে তাকিয়ে দেখল সালমান শামিলের গেট দিয়ে বেরিয়ে কে একজন ছুটে আসছে। মুখ ঘুরিয়ে নিল সালমান শামিল। পেছনে থেকে পর পর গুলীর আওয়াজ শুনতে পেল।

সালমান সেন্ট জন পল রোডে উঠে এসে সোজা দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চলল। তারপর অনেক রাস্তা ঘুরে সে ব্ল্যাক টেম্পল এর পাশে এসে থামল। গাড়ির নাম্বারটা দেখে নিয়ে সালমান শামিল সেখানে থেকে পায়ে হেঁটে অপেক্ষাকৃত ছোট কিংস রোড ধরে পূর্বদিকে এগিয়ে চলল। কয়েকটা অলি গলি পেরিয়ে সে একটা ফ্লাটের দরজায় এসে দাড়াল। রাস্থার লাইটটা নষ্ট থাকায় জায়গাটা অন্ধকার। এই অবস্থায় পুলিশ তাকে এখানে দাড়ানো দেখলে নির্ঘাত চোর ডাকাত ঠাওরাবে। সে খুশি হলো যে তার  জামার পকেটে আইডেন্টিটি কার্ডটা আছে। যে জামা পরে সে ইনস্টিটিউটে গিয়েছিল সে জামা আর খুলেনি। জামার পকেটে কিছু টাকাও আছে।

সালমান শামিল  প্রথমে দরজার টোকা দিল। প্রথমে এক ... দুই  ... তিন। তারপর এক ......দুই ...। সব শেষে এক ......। কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করল সে এই সিরিজের। এই সিরিজ ‘ককেসাস ক্রিসেন্ট’ এর একটা কোড।

মিনিট তিনেক পরে দরজা নিঃশব্দে খুলে গেল। সালাম দিয়ে সালমান শামিল ভেতর প্রবেশ করল।

দরজা বন্ধ করে বিস্মিত উসমান এফেন্দী লাইট জ্বেলে দিয়ে বলল কি ব্যাপার সালমান শামিল ভাই কিছু ঘটেছে?

সালমান শামিল সোফায় বসে গাটা এলিয়ে দিয়ে চোখ দুটো বন্ধ করে বলল ওরা আজ আমার ওখানে গিয়েছিল।

তারপর? মুখটা কালো করে বলল উসমান।

হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে যায়। টের পেয়ে যাই। ওরা যখন ল্যাসার বিম দিয়ে দরজার তালা গলাচ্ছিল তখন আমি সরে আসি আল্লাহর ইচ্ছায়।

উসমান এফেন্দী কিছুক্ষন কথা বলতে পারল না। হা করে তাকিয়ে থাকল সালমান শামিলের দিকে। আনেকক্ষণ পর বলল আল্লাহর অশেষ দয়া এবং আমাদের ভাগ্য, ওদের হাত থেকে এইভাবে তো আর কেউ বাঁচেনি।

জীবন মৃত্যু আল্লাহর হাতে উসমান।

বলে একটু থেমে আবার বলল এসব আলোচনা পরে হবে এখন তুমি আমাকে শোবার ব্যবস্তা করে দাও।

উসমান এফেন্দী ভেতর চলে গেল।

উসমান এফেন্দী ককেশাস ক্রিসেন্ট এর যুব শাখার একজন কর্মী। কিংস রোডে তার একটা ফলের দোকান আছে।

ড্রইং রুমের পাশেই ছিল মেহমান খানা। বিছানা করে উসমান সালমান শামিল কে ডাকল।

শুতে গিয়ে হঠাৎ মনে পড়ল পকেটের সেই নোট বুকের কথা। সোজা হয়ে বসল। বলল উসমান তুমি শুয়ে পড়। আমি একটু পরে শোব।

'আজ রাতে আমার ঘুম ধরেছে সালমান ভাই' বলতে বলতে ভেতর চলে গেল উসমান।

সালমান শামিল পকেট থেকে নোট বুকটি বের করল। নোট বুকটি একদম সাদা। মনে হল সদ্য কেনা। হতাশ হল সালমান শামিল।

হতাশভাবে নোট বুকটির পাতা উল্টাচ্ছিল। হঠাৎ নোট বইয়ের মধ্যে থেকে একখণ্ড কাগজ বেরিয়ে এল। কাগজটি সাদা নয় লেখা।

আগ্রহের সাথে সালমান শামিল কাগজটি চোখের সামনে তুলে ধরল। একটি নামের তালিকা। প্রথমেই কর্নেল আবদুল্লা এফেন্দীর নাম। চমকে উঠল সালমান শামিল। ইনি পঁচিশজন হারানো নেতার প্রথম জন। বাকুর 'ককেশাস ক্রিসেন্ট' ইউনিটের প্রধান ছিলেন ইনি।

নামের তালিকা রুদ্ধশ্বাসে পড়ে গেল সালমান শামিল। পঁচিশজন হারানো নেতার নামই সেখানে। ছাব্বিশ নম্বর নামটি সালমান শামিলের। সাতাশ নম্বরে 'ককেশাস ক্রিসেন্ট' –এর প্রধান আল্লামা ইব্রাহীম এদতিনার নাম। পঁচিশটি নামের বামে লালা কালি দিয়ে ক্রস দেয়া। খালি আছে মাত্র তিনটা নাম।

চমকে উঠল সালমান শামিল। অর্থাৎ 'আমি ছিলাম ছাব্বিশ নম্বর টার্গেট।' আর .....

পরবর্তী সাতাশ নম্বর নামের কথা মনে হতেই সমস্ত শরীরটা ঝিম ঝিম করে উঠল সালমান শামিলের। আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয়, 'ককেশাস ক্রিসেন্ট'-এর সংগ্রামী নেতা আল্লামা ইব্রাহীম এদতিনা তাদের সাতাশ নম্বর টার্গেট।

সালমান শামিল তার ঘড়ির দিকে তাকাল। দেখল রাত সাড়ে তিনটা বাজে। ইয়েরেভেন থেকে কুমুখী তিনশ মাইল পথ।

আজারবাইজানের কুরা উপত্যকায় 'কুরা' নদী ও 'আরাকস' নদীর সংগমস্থলে প্রাচীন নগরী 'কুমুখী'তে বাস করেন আল্লামা ইব্রাহীম এদতিনা। ইয়েরেভেন সড়ক পথে ওখানে যেতে লাগবে কমপক্ষে ছয়ঘন্টা। ককেশাস পর্বতের অলিগলি দিয়ে ঘন্টায় পঞ্চাশ মাইলের বেশি গাড়ি চালানো মুশকিল। আর ট্রেনে যেতে লাগবে আরো বেশি সময়।

সালমান শামিল উঠে গিয়ে আবার উসমান এফেন্দীর শোবার ঘরের দরজায় নক করল।

বেরিয়ে এল উসমান এফেন্দী। বলল কি ব্যাপার সালমান শামিল ভাই। তার কন্ঠে উদ্বেগ।

তোমার জীপ কোথায়?

সামনেই কার টার্মিনালে।

টার্মিনালের গেট কখন খুলবে?

সাড়ে চারটায়।

এখন তিনটা। আর দেড় ঘন্টা।

কেন কি হয়েছে সালমান শামিল ভাই?

কুমুখী যেতে হবে, এখনি। কিন্তু এখন তো যাবার উপায় নেই। দেড় ঘন্টা অপেক্ষা করতেই হবে।

কি ঘটেছে ব্যাপার কি জানতে পারি কিছু?

উসমান এফেন্দীর কণ্ঠে উদ্বেগ।

সালমান শামিল উসমান এফেন্দীকে নামের তালিকার সব কথা জানিয়ে বলল, নাও তৈরি হয়ে নাও। ঠিক সাড়ে চারটাতেই আমরা গাড়িতে উঠব।

বলে সালমান শামিল তার বিছানায় এসে গা এলিয়ে দিল। শুয়ে হঠাৎ মনে পড়ল সোফিয়া এঞ্জেলার কথা। ও এতটা সঠিক সংবাদ পেল কোত্থেকে? বলতে চায় না। হাজার হোক তার কম্যুনিটির ব্যাপার। কিন্তু এই সাবধান করে দেবার কাজটা সে করল কেন?

ভাবতে ভাবতে কখন যেন ঘুম এসে তাকে দখল করে নিয়েছিল, টেরই পায়নি। উসমান এফেন্দীর ডাকে ধড়মড় করে উঠে বসল, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, ভোর চারটা দশ মিনিট।

টেবিলের উপর কিছু সাজানো।

উসমান এফেন্দী বলল, সালমান শামিল ভাই, আসুন কিছু খেয়ে নেই। রাস্তায় কখন কোথায় কি পাওয়া যাবে।

সালমান শামিল বাথরুমে যেতে যেতে বলল, খাবারগুলো প্যাকেট করে গাড়িতে নিয়ে নাও। গাড়িতে বসে খাওয়া যাবে।

ঠিক চারটা পঁচিশ মিনিটে ওরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল।

সালমান শামিল বলল, এক্সট্রা রিভলবার নিয়েছ তো? আমি কিন্তু খালি হাতে এসেছি।

জি এনেছি বলে উসমান এফেন্দী পকেট থেকে একটা রিভলবার বের করে সালমান শামিলের দিকে এগিয়ে দিল।

সালমান শামিলদের গাড়ি ঠিক চারটা চল্লিশ মিনিটে টার্মিনাল ভবন থেকে রাস্তায় নামল।

ব্লাক টেম্পেলের পাশ দিয়ে যাবার সময় সালমান শামিল দেখল, হানাদারদের সেই জীপটি এখনও সেখানে দাঁড়িয়ে। ড্রাইভিং সিটে বসেছিল সালমান শামিল। তার পাশে ওসমান এফেন্দী। সালমান শামিলের দৃষ্টি সামনে। বলল, আমরা কি ঠিক সময়ে পৌছতে পারব? ওদের ছাব্বিশ-সাতাশের মধ্যে গ্যাপটা কতখানি?

উসমান এফেন্দী শুধু শুনল। কোন জবাব তার কাছেও নেই।

কাস্পিয়ান সাগর তীর থেকে পঞ্চাশ মাইল ভেতরে কুরা ও আরাকস নদীর সংগমস্থলে কুমুখী একটি সবুজ নগরী। ছোট ছোট পাহাড় উপত্যকাগুলো সবই সবুজ। প্রায় চারশ বছর আগের এই শহরটি তুর্কি সুলতানরা প্রতিষ্ঠিত করে।

শহরের পশ্চিম অংশটা পুরনো। এই অংশেই একেবারে পশ্চিম প্রান্তে একটা পাহাড়ের পাদদেশে আল্লামা ইব্রাহিম এদতিনার বাড়ি। বাড়িটি বিরাট এবং

পুরনো। বাড়ির সামনে মসজিদ এবং মাদ্রাসা। এসবের গায়ে কিছু কিছু নতুন প্রলেপ লাগলেও কাঠামোটা অতীতকে বুকে নিয়ে ঠিকই দাঁড়িয়ে আছে।

এই বাড়িটি ককেশীয় মুসলমানদের কাছে অনেকটা তীর্থের মত। গোটা ককেশাসে এই এদতিনা মাদ্রাসা বিখ্যাত। ককেশীয় মুসলমানদের আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক নেতা ইমাম শামিল এই মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করেন। আল্লামা ইব্রাহিম এদতিনার পূর্বপুরুষ আরচি জামাল এদতিনা এই বাড়ি, এই মাদ্রাসা, এই মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা। তিনিই ইমাম শামিলের উস্তাদ ছিলন।

একটি সুন্দর স্বচ্ছ-জল দিঘির উত্তর পাড়ে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত দক্ষিণমুখী বাড়ি আল্লামা ইব্রাহিম এদতিনার। দিঘিটির পশ্চিম পাড়ে মসজিদ এবং দক্ষিন পাড়ে মাদ্রাসা। বিশাল মাদ্রাসাটি দিঘির একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। ককেশাস, তাতারিয়া এবং ক্রিমিয়ার প্রায় পাঁচশত ছাত্র লেখাপড়া করে এই মাদ্রাসায়। ইমাম শামিল প্রতিষ্ঠিত 'ককেশাস ক্রিসেন্ট' - এর জন্যে লোক তৈরির একটা কেন্দ্র এই মাদ্রাসা। এখানে যুদ্ধ বিদ্যাকে দ্বীনি শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ বলে ধরা হয়। দিঘির পূর্ব পাড়ে চারদিকে বাগান ঘেরা এক বিশাল মাঠ। আল্লামা ইব্রাহিম এদতিনা মাগরিবের নামায থেকে এশার আযান পর্যন্ত ছাত্রদের একটা ক্লাশ নেন। তারপর এশার নামায শেষে মসজিদ সংলগ্ন দরবার কক্ষে আধা ঘন্টার জন্যে বসেন। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা লোকজনকে সাক্ষাৎ দেন। এটাই তাঁর দিনের শেষ রুটিন। তারপর তিনি ঘরে ফেরেন। খাওয়া-দাওয়ার পর রাত দশটার দিকে ঘুমাতে যান।

সেদিনও তিনি এশার নামায শেষে দরবার কক্ষে ঢুকলেন। আজ সাক্ষাতের জন্য বেশি লোক ছিল না। দুজন লোক এল। উস্কো-খুস্কো চুল। সফরের ক্লান্তি তখন তাদের চোখে-মুখে।

ওরা এখান থেকে ষাট মাইল দূরে 'কুরা' তীরের পার্বত্য গ্রাম 'মুগীর' এর বাসিন্দা। প্রায় পাঁচশ মুসলিম পরিবার নিয়ে সমৃদ্ধ গ্রামটি।

দরবার কক্ষে ঢুকেই ওরা কেঁদে উঠল। বলল, হুজুর, আমাদের সব শেষ হয়ে গেছে। গোটা গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছে। সবগুলো ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে পেট্রল ছিটিয়ে ওরা আগুন ধরিয়ে দেয়। দুচারজন ছাড়া আর কেউ বেরুতে

পারেনি, সবাই পুড়ে মারা গেছে। আমাদের বাগান, শস্য ক্ষেতও ওরা পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে গেছে।

ওরা থামল।

আল্লামা ইব্রাহিম এদতিনা ওদের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ওদের সব কথা মনোযোগের সাথে শুনলেন। ওরা থামলে তার দৃষ্টি জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকারে নিবদ্ধ হলো। তার দৃষ্টিটা শূন্য। সেখানে যেন বাইরের অন্ধকারের মতই একটা অনিশ্চয়তা। কোন কথা বললেন না তিনি।

অনেকক্ষণ পর তাঁর দৃষ্টি বাইরে থেকে ফিরিয়ে এনে আবার নিবদ্ধ করলেন লোক দুজনের মুখের উপর।

আল্লামা এদতিনার চুল-দাড়ি সফেদ। চোখের ভ্রুও সাদা হয়ে গেছে। কিন্তু স্বাস্থ্যটা অটুট আছে। প্রশস্ত ললাট। মুখে একটা পবিত্র দীপ্তি। কঠিন দুঃসংবাদেও ম্লান হয়নি। একটু গম্ভীর মনে হচ্ছে মুখ, আর তাঁর চোখে একটা বেদনার রেখা।

গম্ভীর মুখের ঠোঁট দুটি নড়ে উঠল আল্লামা এদতিনার, 'যারা বেঁচে আছে তারা কোথায়?'

পাহাড়ের ওপরে এক গুহায় আশ্রয় নিয়েছে।

খাওয়ার ব্যবস্থা?

জঙ্গলে ফল আছে।

কতজন?

তিরিশ জন। তার মধ্যে শিশু মাত্র এক, নারী দুই।

অর্থাৎ গ্রামের প্রায় তিন হাজার লোককে ওরা পুড়িয়ে মেরেছে। আল্লামা এদতিনা মুহূর্তের জন্যে তাঁর চোখটা একবার বুজেছিলেন। বোধ হয় ধাক্কাটা শামলে নিলেন তিনি।

চেখ খুলে শান্ত কন্ঠে বললেন, লোক এখনি পাঠাচ্ছি ওখানে। তোমরা খেয়ে বিশ্রাম নাও। আল্লামা এদতিনা তাঁর আসন থেকে উঠতে উঠতে বললেন, ওরা মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করতে চায় ককেশাসের মাটি থেকে। যে কোন ক্ষতির জন্যে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে, ধৈর্য ধরতে হবে। আল্লাহর সাহায্য আমরা পাবেই। বলে আল্লামা এদতিনা দরবার কক্ষ থেকে বেরিয়ে বাড়ির দিকে চললেন।

বাড়ির ভেতরে ঢুকতেই নাতি আবু জামাল এদতিনা এসে আল্লামা এদতিনাকে জড়িয়ে ধরল। বলল, দাদু- আম্মা বলেছে, বড় হলে আমাকে যুদ্ধ করতে হবে? নাতিকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, তা তো করবেই।

যুদ্ধ করলে কি করতে হয় দাদু?

গুলী করতে হয়।

তাহলে যে মানুষ মরে যাবে, গুলী করব কেন?

তোমাকে যখন কেউ গুলী করতে আসবে?

আমাকে গুলী করতে আসবে কেন?

আল্লাহর শত্রু অনেক দুষ্ট লোক আছে দুনিয়ায়।

রাসুল (স:) যুদ্ধ করেছেন দাদু?

হ্যাঁ।

গুলী করেছেন?

আল্লামা এদতিনা মুশকিলে পড়ে গেলেন। বললেন, দাদু তখন তো বন্দুক ছিল না। তলোয়ার ছিল।

কথা শেষ করেই আল্লামা এদতিনা নাতিকে মেয়ে সালমার কোলে তুলে দিয়ে বলল, নাও তোমার সর্ব-সন্ধানী ছেলেকে।

আল্লামা এদতিনা একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে খাবার ঘরের দিকে পা বাড়ালেন।

আল্লামা এদতিনার বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে। মাদ্রাসার ছাত্ররাও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

বাকু-নাগারনো কারাবাখ সড়কের একটা শাখা যেখানে দিঘির পূর্ব পাড়ের বাগানে এসে প্রবেশ করেছে, সেখানে দুজন প্রহরী স্টেনগান হাতে বসে । আরেক জন প্রহরী বাগানের উত্তর-পশ্চিম কোণ যেখানে শেষ হয়েছে তার কয়েক গজ সামনে দিঘির বাঁধানো পাড়ে বসে। তার হাতেও স্টেনগান। তার সন্ধানী দৃষ্টি

আল্লামা এদিতনার বাড়ির দিকে। অন্য একজন প্রহরী দক্ষিণ দিক থেকে পায়ে চলা যে রাস্তাটি মাদ্রাসার পূর্ব পাশ দিয়ে উঠে এসেছে, তার মুখে দাঁড়িয়ে। আল্লামা এদতিনার বাড়ির উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকটায় পাহাড়। পাহাড়গুলো আবার পানি ও জঙ্গলে পূর্ণ গভীর উপত্যকা দিয়ে ঘেরা।

রাত তখন দুটা।

আকাশে চাঁদ নেই। রাস্তার বিজলী বাতিগুলো অন্ধকারের সাথে লড়াই করে অবরুদ্ধ অবস্থায় আত্মরক্ষা করে চলেছে। রাস্তার বাতি ছাড়াও আল্লামা এদতিনার বাড়ির সামনে একটা, মসজিদের সামনে একটা, মাদ্রাসার সামনে একটা এবং পূর্ব পাড়ের দিঘির ঘাটে একটা আলো জ্বলছে। সব মিলে একটা আলো-আঁধারীর এই লুকোচুরি খেলায় আঁধারকেই বিজয়ী দেখা যাচ্ছে। কালো পোশাক পরা এক ঝাঁক লোককে অন্ধকার সাপের মত গড়িয়ে গড়িয়ে আল্লামা এদতিনার বাড়ির দিকে আসতে দেখা গেল। তারা আসছে সড়ক পথ-বাদ দিয়ে পাথর ও আগাছা ভরা নিম্নভূমি দিয়ে। পিঠে তাদের একটি করে কালো ব্যাগ আছে, একটি করে খাটো নলওয়ালা রাইফেল। কোমরে ঝুলানো পিস্তল। মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে।

নিঃশব্দে তারা উঠে এল বাগানে। বাগানে উঠে ওরা ব্যাগ থেকে গ্যাস মাস্ক বের করে নিল। তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে তারা তিন দলে বিভক্ত হয়ে গেল। একদল গেল উত্তর দিকে সড়কটি যেখানে এসে মিশেছে সেই দিকে। মনে হল তাদের লক্ষ্য সড়কের মুখে বসে থাকা স্টেনগানধারী দুজন প্রহরী। দ্বিতীয় দল এগলো বাগানের মধ্য দিয়ে পশ্চিম দিকে। আর তৃতীয় দলটি বাগানের পূর্ব ও দক্ষিণ দিক ঘুরে সেই পায়ে হাঁটা রাস্তার মুখের দিকে এগুলো। মনে হল, তারা পরিস্কার জানে প্রহরীরা কে কোথায়।

বাগানে নানা রকম ফুল ও ফলের গাছ সারিবদ্ধভাবে লাগানো। বাগানের গাছের তলায় ঘুটঘুটে অন্ধকার। এই অন্ধকারকে আশ্রয় করে দুই সারির মাঝখানের সরল প্যাসেজ দিয়ে ধীরে নিঃশব্দে ওরা এগিয়ে চলল। উত্তরের দলটি সড়ক মুখে বসে থাকা সেই দুজন প্রহরীর পাঁচ গজের মধ্যে গিয়ে পৌঁছল। কিন্তু গাছের আড়ালে দেখা যাচ্ছে না ওদের। দুজনকে থামতে বলে দলের একজন

আরো বাঁয়ে ঘুরে সামনে এগুলো। পেছনটা বাগানের মধ্যে বলে দলের একজন আরো বাঁয়ে ঘুরে সামনে এগুলো। পোছনটা বাগানের মধ্যে রেখে মাথা বাড়িয়ে পূর্বদিকে তাকিয়ে দেখল, প্রহরী দুজন পূর্বদিকে তাকিয়ে বসে আছে।

হাসি ফুটে উঠল লোকটির মুখে। খাটো নল রাইফেলটি পিঠ থেকে হাতে নিয়ে পাশাপাশি দুজনের একজনকে তাক করে ট্রিগারে চাপ দিল। ক্লিক করে সাড়া দিয়ে উঠল ট্রিগারটি। সাইলেন্সার লাগানো রাইফেল থেকে দুপ করে একটি ক্ষুদ্র নিউট্রন বুলেট বেরিয়ে গেল। নিউট্রন বুলেট নিউট্রন বোমার ক্ষুদ্রতম একটি সংস্করণ। বুলেটটি নির্দিষ্ট একটা দূরত্ব পার হওয়া কিংবা কারো গায়ে আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরিত হয়ে যায়। তারপর সেকেন্ডের মধ্যেই পাঁচ বর্গগজের মধ্যেকার সব প্রাণী নীরবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। বাতাসে নিউট্রন বুলেটের কার্যকারিতা ত্রিশ সেকেন্ডের বেশি স্থায়ী হয় না।

প্রহরী দুজন 'দুপ' শব্দ শুনে চমকে পেছনে তাকয়েছিল এবং ঐ ভাবেই তারা নিঃশব্দে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। তাদের শিথিল হাত থেকে খসে পড়ল স্টেনগান।

এ দলটি বাগানের পাশে অন্ধকারে বসে একটু জিরিয়ে নিল। তারপর একজন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আর্মেনিয় ভাষায় বলল, চল।

তারা তিনজন রাস্তা ধরে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলল দিঘির পাড়ের দিকে।

বাগানের কোণায় গিয়ে উঁকি মেরে দেখল, দিঘির পাড়ে বসা প্রহরীটি ঢলে পড়ে আছে মাটিতে এবং মাঝখানের দলটি এগিয়ে যাচ্ছে মাদ্রাসার হোস্টেল ভবনের দিকে। পরিকল্পনা অনুসারে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলটি প্রহরীদের সরিয়ে ফেলার পর সম্মিলিতভাবে মাদ্রাসা হোস্টেলে আপারেশন চালায়। হোস্টেলের পাঁচশ নিবেদিত ছাত্রই এখানকার শক্তির উৎস। ওদেরকে আগে সরাতে হবে।

দশ সদস্যের সম্মিলিত দল উঠে গেল পাঁচ তলা হোস্টেলে। প্রতি তলায় দুজন করে। তাদের এক হাতে নিউট্রন রাইফেল, অন্য হাতে নিউট্রন স্প্রেয়ার। তারা প্রতিটি রুমে দরজার নিচ দিয়ে নল ঢুকিয়ে নিউট্রন গ্যাস স্প্রে করতে শুরু করল।

মাদ্রাসা হোস্টেলে আপারেশন শেষ করে আধা ঘন্টা পরে সম্মিলিত দলটি ফিরেএল আল্লামা এদতিনার বাড়ির সামনে পুকুরের কোণায় বসা প্রথম দলটির কাছে। অপারেশনের দ্বিতীয় পর্যায় নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হওয়ার আনন্দে ওরা হেঁটেই এল দিঘির পাড় দিয়ে।

তিনটি গ্রুপ একত্রিত হয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল এদতিনার বাড়ির দিকে।

এদতিনার বাড়ির সামনে, যেখানে পাথর বিছানো পায়ে হাঁটার রাস্তাটা শেষ হয়েছে, সেখানে একটা ছাদওয়ালা খোলা উঁচু বারান্দা। মাঝে মাঝে আল্লামা এদতিনা অবসর সময়ে চেয়ার নিয়ে এখানে বসে কারো সাথে আলাপ করেন কিংবা তাকিয়ে থাকেন দিঘির স্বচ্ছ পানির দিকে, অথবা চোখ মেলে ধরেন তিনি নীল আকাশের দিকে।

পাথর বিছানো পায়ে হাঁটা রাস্তা থেকে তিন ধাপ উঠলেই বারান্দা। বারান্দা পেরিয়ে গেলে একটা বড় দরজা। ওটা একটা  হলঘর ... পারিবারিক বৈঠকখানা হিসেবে ব্যবহার হয়। বৈঠকখানা পেরুলে খাবার ঘর। খাবার ঘর থেকে বাম দিকের প্যাসেজ ধরে এগুলো আল্লামা এদতিনার শোবার ঘর।

আল্লামা এদতিনার বিরাট পরিবার।

কালো কাপড়ে সর্বাঙ্গ ঢাকা গ্যাস মাস্ক পরা ছায়ামূর্তিরা সেই বারান্দায় উঠে এল। সবাই নয়, বুকে কালা কাপড়ের ওপর সাদা নেকড়ে আঁকা দলপতিসহ চারজন। অন্যরা বারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে থাকল রাইফেল বাগিয়ে প্রস্তুত হয়ে।

দলপতি লোকটা সম্ভবত লক পরীক্ষার জন্যে দরজার দিকে এগুলো। এ সময় ঝট করে দরজা খুলে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই দরজা দিয়ে ছুটে এল এক ঝাঁক গুলী।

বারান্দায় দাঁড়ানো চারজন কিছু বুঝার আগেই ঢলে পড়ল ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া দেহ নিয়ে।

কিন্তু যারা বারান্দার নিচে দাঁড়িয়েছিল, তাদের মাথার উপর দিয়ে চলে গেল গুলী। ফলে তারা বসে পড়ার এবং পাল্টা আক্রমণের সুযোগ পেয়ে গেল। তাদের কয়েকজনের নিউট্রন রাইফেল থেকে সেই 'দুপ' আওয়াজ উত্থিত হলো। নিউটন বুলেটগুলো ছুটে গেল ভেতরে।

স্টেনগান হাতে আল্লামা এদতিনা এবং তার ছেলে আবদুল্লাহ এদতিনা গুলী করতে করতে তখন দরজা পর্যন্ত ছুটে এসেছিলেন। কিন্তু নিউট্রন বুলেট তাদের এগুতে দিলনা। পাকা ফলের মতো তাদের দেহ ঝরে পড়ল দরজার ওপরেই।

বারান্দার নিচের ছায়ামূর্তিগুলো উঠে এল বারান্দায়। কালো মুখোশের নিচে তাদের চোখগুলোতে হিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। তাদের কয়েকজন ছুটল বাড়ির ভেতরে। একজন চিৎকার করে নির্দেশ দিল, নিউট্রন বুলেট নষ্ট করবেনা। ওদের স্টেনগান দিয়েই ওদের সৎকার করে এস।

ভেতর থেকে ভেসে এল স্টেনগানের একটানা গুলীর শব্দ এবং শিশু ও নারীর বুকভাঙা আর্তনাদ।

কুমুখী শহরের পথে চলতে গিয়ে মনটা আনচান করে উঠল সালমান শামিলের। যে কয়টা মসিজদ সে এ পর্যন্ত পথের পাশে পেল, সবগুলো মসজিদে সবাই গোল হয়ে বসে কুরআন শরীফ পড়ছে। কোন দুঃসময়ে কিংবা বড় কেউ মারা গেলে এইভাবে সম্মিলিত ভাবে কুরআন শরীফ পড়া ককেশাসের একটা নিয়ম। শংকা বোধ করল সালমান শামিল, বড় কিছু কি ঘটেছে? আল্লামা এদতিনার কথা মনে হতেই বুকটা আবার ধড়ফড় করে উঠল সালমান শামিলের।

সালমান শামিল তার জীপের স্পীড বাড়িয়ে দিল। মুখ ফিরিয়ে উসমান এফেন্দীকে সালমান শামিল জিজ্ঞেস করল, কি বুঝছ তুমি উসমান?

নগরীর কোন লোকের মুখে হাসি দেখছি না। সবাই মাথা নত করে হাঁটছে।

কোন দোকান-পাটও খুলেনি লক্ষ্য করেছ?

ঠিক তাই তো।

এর অর্থ কি উসমান? সালমান শামিলর গলাটা কাঁপল।

উসমান কোন জবাব দিতে পারল না।

সালমান শামিলের গাড়ি যতই নাগারনো কারাবাখ - বাকু রোড হয়ে আল্লামা এদতিনার বাড়ির কাছাকাছি পৌছতে লাগল মানুষের ভীড় ততই বাড়তে লাগল।

নাগারনো কারাবাখ সড়ক থেকে যে সড়কটি বেরিয়ে আল্লামা এদতিনার বাড়ির দিকে গেছে সে সড়ক একদম লোকে ভর্তি।

ইমাম শামিলের ছেলে যুবনেতা সালমান শামিল সবার কাছে পরিচিত। তাকে দেখে সবাই পথ করে দিতে লাগল। কিছু যুবক ত্বরিৎ এগিয়ে এসে এ কাজে সহযোগিতা করতে লাগল।

কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করার সাহস হলো না সালমান শামিলের। সালমান শামিলকে দেখে অনেকেই কেঁদে ফেলেছে, বিশেষ করে যুবকরা। সালমান শামিলের কিছু বুঝার বাকি রইল না। তার বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল বেদনায়।

কিন্তু আল্লামা এদতিনার বাড়িতে পৌঁছার পর যে দৃশ্য দেখল, তাতে সালমান শামিল একদম যেন বোবা হয়ে গেল। এত নিষ্ঠুরতা, এত বর্বরতাও কোন মানুষ করতে পারে। মাদ্রাসার পাঁচশ' ছাত্রের কেউ বেঁচে নেই। প্রত্যেকে যে যার সিটে বিছানায় শুয়ে আছে। কিন্তু কারও প্রাণ নেই। ওদের চেহারা দেখেই বিজ্ঞানের ছাত্র সালমান শামিল বুঝল, ভয়াবহ নিউট্রন গ্যাসের ফল।

আল্লামা এদতিনার বৈঠকখানার দরজায় চৌকাঠের ওপর তখন আবদুল্লাহ এতদিনা পড়ে আছে। বাড়ির সব নারী-শিশু একটি ঘরে রক্তে ভাসছে। আল্লামা এদতিনার অতি আদরের নাতি আবু জামাল এদতিনা মায়ের কোলের ভেতরই বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। মা হয়তো কোলে লুকিয়ে নিজের জীবন দিয়ে তাকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মা এবং ছেলে কেউই বাঁচেনি।

কিন্তু আল্লামা এদতিনাকে কোথাও পাওয়া গেল না। হঠাৎ সালমান শামিলের খেয়াল হলো, আগের পচিঁশজনকে জীবিত কিংবা মৃত কোন ভাবেই খুঁজে পাওয়া যায়নি। সেই তালিকায় আল্লামা এদতিনাকে পাওয়া যাবে কেমন করে?

সবকিছু পর্যবেক্ষণ করে সালমান শামিল 'কুমুখী'র 'ককেশাস ক্রিসেন্ট'-এর প্রধান লতিফ কিরিমভকে বলল, আল্লামা হুজুর যে শেষ মুহূর্তে জানতে

পেরেছিলেন এবং প্রতিরোধ করেছিলেন বারান্দার রক্তগুলোই তার প্রামাণ। নিশ্চয় তাদের মধ্যে থেকে কয়েকজন আহত-নিহত হয়েছে। আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করল, আবদুল্লাহ এদতিনার দেহে কোন গুলীর দাগ বা আঘাতের চিহ্ন নেই। সেও নিউট্রন গ্যাসের শিকার। নিউট্রন বুলেটই তাদের প্রতিরোধকে সফল হতে দেয়নি।

সালমান শামিল বারান্দার মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ দেখতে পেল সিঁড়ির নিচে ভাঁজ করা একটা কাল কাগজ। কাগজটি তুলে নিয়ে ভাঁজ খুলে দেখল, আর্মেনিয়া, জর্জিয়া, আজারবাইজান, পারস্য ও তুরস্কের একটা অংশ নিয়ে বৃহত্তর আর্মেনিয়ার একটা মানচিত্র। তার ভেতরে সাদা একটা নেকড়ে আঁকা। কাগজটি লতিফ কিরিমভের হাতে তুলে দিতে দিতে সালমান শামিল বলল, 'হোয়াইট উলফ' তার চিহ্ন রেখে গেছে।

বারান্দার নিচে এবং দিঘির চারধার ঘিরে তখন হাজারো মানুষের ভীড়। লতিফ কিরিমভ বলল, সালমান শামিল ভাই, ভয়, আশংকা এবং শোকে মানুষ মুষড়ে পড়েছে। আপনিই এখন উপযুক্ত ব্যক্তি তাদের সান্ত্বনা দেবার জন্যে। আপনি কিছু বলুন। লোকজনকে এদিকে ডাকার জন্য আমি বলে দিয়েছি।

একজন ঘোষক ঘোষণা করে দিয়ে এল।

মানুষ এগিয়ে এল আল্লামা এদতিনার বাড়ির দিকে।

সালমান শামিল একটা টেবিলের ওপর দাঁড়ালেন। তারপর জনতার উদ্দেশ্যে বললেনঃ

ভাই সব, খৃষ্টানদের সংগঠন, 'হোয়াইট উলফ' অন্যান্য ঘটনার মত এ ঘটনার জন্যেও দায়ী। তারা চায় আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমি থেকে উৎখাত করে তাদের স্বপ্নের বৃহত্তর আর্মেনিয়া গঠন করতে। তাদের সাহায্য করছে কম্যুনিষ্ট দেশ রাশিয়া রিপাবলিক এবং পশ্চিমের কিছু খৃষ্টান দেশ। আমাদের সহায় আল্লাহ। ইতিহাস সাক্ষী, তাদের সব যড়যন্ত্রই অতীতে আমরা ব্যর্থ করে দিয়েছি। এ নতুন যড়যন্ত্রও আমরা ব্যর্থ করে দেব। আপনাদের সংগঠন 'ককেশাস ক্রিসেন্ট' তাদের জঘন্য ও কাপুরুষোচিত কাজের উপযুক্ত জবাব দেবে। আমি আনন্দের সাথে ঘোষণা করছি, বিশ্বের মজলুম মুসলমানদের নেতা অনেক

বিপ্লবের মহানায়ক আহমদ মুসা দুএকদিনের মধ্যেই আমাদের মধ্যে আসছেন। তিনি আমাদের নেতৃত্ব দেবেন। ইমাম শামিল যে কাজ শেষ করে যেতে পারেননি, তা ইনশাআল্লাহ তিনি শেষ করবেন।

উপস্থিত শোক-সন্তপ্ত জনতা সমবেত কণ্ঠে 'আল্লাহ আকবার' ধ্বনি দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করল।

সালমান শামিল নেমে এল টেবিলের মঞ্চ থেকে। লতিফ কিরিমভকে বলল, শহীদদের দাফনের কি ব্যবস্থা হয়েছে?

জেলা গভর্নর শহিদভ সকালেই এসেছিলেন। তিনি সব ব্যবস্থা করছেন। বলল লতিফ কিরিমভ।

এখানকার সব ব্যাপার গুছিয়ে নেয়ার দায়িত্ব কে পালন করবে? এ চিন্তার দায়িত্ব এখন আপনার।

ঠিক আছে, কুমুখীর 'ককেশাস ক্রিসেন্ট'- এর প্রধান হিসেবে এখানকার দায়িত্ব তোমাকেই পালন করতে হবে।

আহমদ মুসা কবে আসছেন?

দুএকদিনের মধ্যেই আশা করছি।

তাকে বাধা দেবার জন্য 'হোয়াইট উলফ' রাশিয়া ও পশ্চিমের সহযোগিতায় সব ব্যবস্থাই করেছে শোনা যাচ্ছে।

আমি ইয়েরেভেনে থাকার জন্য বিস্তারিত ব্যাপারটা জানি না। জানতো আল্লামা হুজুর। আর জানে বাকুতে যে সাইমুম ইউনিট এসেছে তারা। তবে আমি এটুকু জানি, আহমদ মুসাকে বাধা দেয়ার সাধ্য 'হোয়াইট উলফ' এবং তার মুরুব্বীদের নেই।

এ সময় একটি গাড়িতে করে আজারবাইজান সরকারের 'কুমুখী' জেলার গভর্নর আহমদ শহিদভ এবং আরও কয়েকজন আল্লামা এদতিনার বাড়ির সামনে এসে নামল।

গাড়ি থেকে নেমে ওরা এসে জড়িয়ে ধরল সালমান শামিলকে। শহিদভের চোখে অশ্রু।

লতিফ কিরিমভের কাছে শুনেছি দাফন সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আপনারা নিয়েছেন। এটা আপনাদের সরকারের অনুমতিক্রমে? জিজ্ঞাসা করল সালমান শামিল।

সরকার এ ব্যাপারে বিরোধিতা করবে না, অনুমতিও দিতে পারবে না। কিছু জানে না এই ভূমিকা পালন করবে।

সালমান শামিলের মুখে একটা বেদনার হাসি ফুটে উঠর। বলল, এই নতজানু ভূমিকা কি সরকারকে রক্ষা করতে পারবে?

সালমান শামিল ভাই, আমি গত পরশু দিন বাকুতে ছিলাম। ঐ দিন রুশ, বৃটিশ ও মার্কিন এমবাস্যাডর আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করেন। তারা বলে দিয়েছেন, 'ককেশাস ক্রিসেন্ট'-এর মত সাম্প্রদায়িক সংগঠনকে আজারবাইজন সরকার যদি সহযোগিতা করে, তাহলে তারা আজারবাইজানের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

আপনাদের প্রধানমন্ত্রী 'হোয়াইট উলফ'-এর হত্যা, সন্ত্রাস ও পোড়ামাটি নীতি সম্পর্কে কিছু বলেননি? বলেনি যে, আর্মেনিয়া, জর্জিয়া এবং তারাও কিভাবে 'হোয়াইট উলফ' কে সাহায্য করছে?

বলেছে। কিন্তু তাদের বক্তব্য হলো, এসব হত্যা, সন্ত্রাস মুসলমানদের আভ্যান্তরীন গ্রুপ দ্বন্দ্বের ফল এবং 'ককেশাস ক্রিসেন্টে'র কারণেই এসব ঘটেছে। 'হোয়াইট উলফ' নামে কোন সংগঠনকে তারা চেনে না।

সালমান শামিল হাসল। একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল, ঠিক আছে। আমরা জানি, মুসলমানদের আল্লাহ ছাড়া কোন বন্ধু নেই, আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। আমরা তাঁরই ওপর নির্ভর করছি।

বলে সালমান শামিল, লতিফ কিরিমভের দিকে ফিরে বলল, লতিফ তুমি এঁদের সাথে শহীদদের দাফনের আয়োজন কর। আমি আল্লামা হুজুরের অফিসটা একটু চেক করি।

মসজিদের পাশে দরবার কক্ষের সাথে সংলগ্ন 'ককেশাস ক্রিসেন্ট'-এর নাম সাইনবোর্ডহীন সদর দফতর। আল্লামা এদতিনা এখানেই বসতেন।

সালমান শামিল বারান্দা থেকে নেমে ঐ অফিসের দিকে চলে গেল।

# ৬

বাকুর 'ককেশাস সিক্রেট' প্রধান মুহাম্মদ বিন মুসার সাথে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ করে এবং বাকুতে অবস্থানরত সাইমুম প্রতিনিধি দলের নেতা আলী আজিমভের সাথে প্রয়োজনীয় আলোচনা সেরে সালমান শামিল সেদিন রাতেই ইয়েরেভেনে ফিরে এসেছে। 'কুমুখী' ও 'মুগী' গ্রামের ভয়াবহ হত্যাকান্ড এবং আল্লামা ইব্রাহীম এদতিনার হারিয়ে যাওয়া সালমান শামিলকে অস্থির করে তুলেছে। 'হোয়াইট উলফ' দেখা যাচ্ছে 'ককেশাস ক্রিসেন্ট'-এর সব কিছুই জানে এবং তাদের পরিকল্পনা মুতাবিক একের পর এক ঘটনা ঘটিয়েই চলেছে, কিন্তু 'ককেশাস ক্রিসেন্ট' তাদের কোন নাগালই পাচ্ছেনা। তাদের একজন লোকেরও পরিচয় জানা যায়নি। তাদের বিরুদ্ধে 'ককেশাস ক্রিসেন্ট' কার্যত এক ইঞ্চিও এগুতে পারেনি। এই ব্যর্থতার বেদনা সালমান শামিলের অন্তরকে স্থির থাকতে দিচ্ছেনা। আল্লামা ইব্রাহিম এদতিনার হারিয়ে যাওয়ার পর আন্দোলন পরিচালনার বিরাট দায়িত্ব তার ওপর অর্পণ করা হয়েছে। সাংগঠনিক অনেক কাজ তার পড়ে রয়েছে। এরপরও কিছুমাত্র দেরি না করে ছুটে এসেছে ইয়েরেভেনে। তার আশা এখান থেকেই সে সামনে এগুবার একটা 'ক্লু' পাবে।

সালমান শামিলের লক্ষ্য সোফিয়া এঞ্জেলা। তার ধারণা সোফিয়া এঞ্জেলার কাছ থেকে একটু সূত্র পাওয়া যাবে। সালমান শামিলকে সাবধান করার মত 'এ্যাকুরেট' খবর সোফিয়া যে সূত্র থেকে পেয়েছে, সে সূত্র ধরে এগুলেই, সালমান শামিলের বিশ্বাস, 'হোয়াইট উলফ' এর একটা ঠিকানায় পৌঁছা যাবে।

সালমান শামিল ও উসমান এফেন্দী ভোরে এসে পৌঁছেছে ইয়েরেভেনে। এসে ফজরের নামায পড়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ঘুম থেকে উঠল সকাল আটটায়। হাতমুখ ধুয়ে এসে দেখল টেবিলে সেদিনের কাগজ। সালমান শামিল কাগজটি হাতে নিয়ে আরেকবার বিছানায় গা এলিয়ে দিল। কাগজের এক জায়গায় গিয়ে চোখ আটকে গেল সালমান শামিলের।

আগের দিন রাতে সালমান শামিলের ঘরে যে অভিযান পরিচালিত হয়েছিল, তার ওপর রিপোর্ট করেছে পত্রিকাটি। শিরোনাম দিয়েছে, 'নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের দেশ বরেণ্য কৃতি ছাত্র এবং ইনস্টিটিউট অব এডভানস্ড নিউক্লিয়ার ফিজিক্স'- এর চূড়ান্ত বর্ষের ছাত্র সালমানকে বাসভবন থেকে কে বা কারা অপহরণ করেছে। অকুস্থল পরিদর্শন করতে গিয়ে এই রিপোর্ট দেখেছে, অত্যাধুনিক ল্যাসার বীম দিয়ে দরজার তালা গলিয়ে ফেলে তার ঘরে প্রবেশ করা হয়। ওয়াকিফহাল মহলের ধারণা একটি শক্তিশালী মহল সুপরিকল্পিতভাবে এই কাজ করেছে। এ ব্যাপারে তার প্রতিবেশী জনাব খলিলভ থানায় একটা মামলা দায়ের করেছে। পুলিশী তদন্ত চলছে। পুলিশ এ পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করেনি।'

খবর পড়ে মাথায় হাত দিল সালমান শামিল। কি ঝামেলা। এখন আবার থানায় যেতে হবে, বলতে হবে আমি অপহৃত হইনি। তা বললেই ঘটনার শেষ হয়ে যাবেনা। অপহরণকারীরা কারা এসেছিল, তাদের ব্যাপারে কতটুকু জানি, ইত্যাদি নানা রকম সাক্ষ্য দেয়ার ঝামেলায় তাকে পড়তে হবে। তাছাড়া তার ইনস্টিটিউটেতো এ নিয়ে হৈ চৈ পড়ে গেছে। এতো সব ঝামেলায় সে জড়িয়ে পড়তে চায়না।

অনেক চিন্তা ভাবনা করে সালমান শামিল থানার জন্যে জবানবন্দী তৈরী করে উসমান এফেন্দীর হাতে দিয়ে বলল, এটা তুমি খলিলভকে দিয়ে এস। সে থানায় পৌছেঁ দেবে এটা। থানায় খলিলভ যেন বলে, নিরাপত্তার কারণেই আমি কয়েকদিন বেরুতে পারবোনা।

উসমান এফেন্দীকে পাঠিয়ে দিয়ে সালমান শামিলও বেরিয়ে পড়ল ইনস্টিটিউটের উদ্দেশ্যে। তখন বেলা সড়ে আটটা। দশটায় ইনস্টিটিউটের ক্লাস শুরু হয়। ছেলেদের কাছে অন্তহীন জবাবদিহির ঝামেলা এড়াবার জন্যে সে

আগেই ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টরের সাথে দেখা করে সব কথা বলে সোফিয়ার সাথে কথা বলা যায় কিনা চেষ্টা করে আজকের মত সরে পড়তে চায়।

ইনস্টিটিউটের পাশেই ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর পল জনসনের বাড়ি। ভদ্রলোকের বয়স ষাটের কাছাকাছি হবে। দীর্ঘ দেহ। ব্যায়াম পুষ্ট সুগঠিত দেহ। মনেই হয়না যে, বয়স তার চল্লিশের বেশি হবে। মুখে হাসি সব সময় লেগেই থাকে যেন। অথচ সে হাসে অত্যন্ত কম। তাঁর মুখে হাসি হাসি ভাবটা আসলে তার শিশুসুলভ সারল্যের দীপ্তি। একজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী, জ্ঞানের একজন নিবেদিত সাধক সে। ভাল ছাত্ররা তার কাছে সন্তানের চেয়েও প্রিয়।

সালমান শামিল এসে ইনস্টিটিউটের প্রশাসনিক ভবনের কাছে গাড়ি থেকে নামল।

প্রশাসনিক ভবনের নিচের তলাতেই ড. পল জনসনের অফিস। ঢুকতেই বাম পাশের প্রথম ঘরটি।

সালমান শামিল অফিসের বারান্দায় উঠতেই একজন বেয়ারা মুখোমুখি হলো। সালমান শামিলকে দেখে ভুত দেখার মতই সে দাড়িয়ে গেছে। বলল, শুনলাম স্যার, আপনি না ...

সালমান শামিল তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বলল, হ্যাঁ আমি ফিরে এসেছি।

বলে সে দ্রুত ডিরেক্টরের অফিসের দিকে চলে গেল।

কিন্তু বেয়ারাটি চলে গেলনা, সালমান শামিল ড. পল জনসনের অফিসে ঢোকা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকল অফিসের সিড়িঁর ওপর।

সালমান শামিল দরজার লক ঘুরিয়ে একটু ফাঁক করে দেখল ড. পল জনসন এক মনে টেবিলে কাজ করছেন।

স্যারকে এই সময় বিরক্ত করার ব্যাপারে সালমান শামিল একটু দ্বিধা করল। কিন্তু পর মুহূর্তেই দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে বলল, আসতে পারি স্যার?

ড. পল জনসন চমকে উঠে মাথা তুলল। সালমান শামিলের উপর চোখ পড়তেই তাঁর শিশু সুলভ চোখে একটা আনন্দের দীপ্তি চিকচিক করে উঠল। ছোট্ট করে সে বলল, এস বৎস।

সালমান শামিল গিয়ে তাঁর টেবিলের কাছে দাঁড়াল। ড. জনসন তাঁর চোখ দুটি সালমান শামিলের ওপর থেকে সরায়নি। তাকে একটা চেয়ার দেখিয়ে বলল, বস।

ড. জনসনের হাসি মাখা মুখ। বলল, বোধ হয় বলতে এসেছ যে, তুমি অপহৃত হওনি?

জি স্যার।

জান, আমি ঘটনার কথা খুটিয়ে খুটিয়ে শুনেছি। যখন শুনলাম, তোমার ঘুমানোর পোশাকটা বিছানার উপর পড়ে আছে, তখনই আমি বুঝেছি তুমি অপহৃত হওনি, সরে পড়তে পেরেছ।

আমি সেদিন বিছানায় ঘুমোতেই যাইনি স্যার প্যান্ট-শার্ট পরা অবস্থায় সোফাতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

কিছুক্ষণ কথা বলল না ড. পল জনসন. তার চোখটা বুজে গেছে। কিছু একটা চিন্তা করছে সে। ঐ অবস্থাতেই সে প্রশ্ন করল, কিছু চিন্তা করেছ, কারা তোমার সে শত্রু?

কারা তা জানতে পারিনি স্যার।

সালমান শামিল ইচ্ছা করেই 'হোয়াইট উলফ'-এর নাম গোপন করল

আমি চিন্তা করেছি বৎস। প্রথমে ভেবেছিলাম, তোমার অসাধারণ প্রতিভার প্রতি হিংসা পরায়ন কেউ এটা করতে পারে। কিন্তু পরে মনে হয়েছে তা নয়। তোমার শত্রু আরও বড় কেউ।

বলতে বলতে ড. পল জনসনের হাসি মাখা মুখটা ম্লান হয়ে গেল।

কে হবে স্যার?

আমি জানি না, তবে আমার মনে হয়েছে গোটা ককেশাসে যে ভয়াবহ সন্ত্রাসটা চলছে তার সাথে তোমার ব্যাপারটা নিঃসম্পর্ক নয়।

মুহূর্ত কয়েক থেমেই আবার শুরু করল, তোমাকে নিয়ে সত্যিই আমি উদ্বিগ্ন বৎস।

কেন স্যার?

তোমার বিপদ কাটেনি। আমি তোমাকে ইনস্টিটিউটে আসা এ্যালাও করবোনা। এতে তোমার ক্ষতি হবে। কিন্তু তোমার প্রতিভার মূল্য তার চেয়ে অনেক বড়। আমি আগে জানতে পারলে তোমার এই আসাও আমি এ্যালাও করতামনা। তুমি এখান থেকে ফিরে যাও এখনি।

ড. পল জনসনের মুখটা গম্ভীর।

তাহলে ইনস্টিটিউটে যাব না?

না।

স্যার সোফিয়ার সাথে দেখা করতে চেয়েছিলাম।

হ্যাঁ তার সাথে তুমি দেখা করতে পার। বড় ভাল মেয়ে। তোমার খবর শুনে কেঁদে কেঁদে একাকার। আমাকে এসে বলেছে, আমি পুলিশকে বলে দেই পুলিশ যেন তোমার অনুসন্ধানের ব্যাপারে কোন গাফলতি না করে।

তাহলে উঠি স্যার।

কোথায় যাবে?

সোফিয়া তো এখন লাইব্রেরীতে এসেছে।

না তুমি যাবে না।

একটু উচ্চ কণ্ঠে বলল ড. পল জনসন। রাগ ফুটে উঠল তাঁর কণ্ঠে। একটু থেমেই আবার সে বলতে শুরু করল, আমি চাই তুমি কারো চোখে না পড়। শোন সালমান, পরাজয়ের প্রতিহিংসা আরও ভয়ংকর। যাদের সেদিন পরাজিত করেছ, তারা কি পরাজয় মেনে নিয়েছে ভেবেছ?

ড. পল জনসনের এই কথা সালমান শামিলের মনকেও কাঁপিয়ে দিল। সালমান শামিল সত্যিই ব্যাপারটাকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেনি। এই মুহূর্তে তার মনে হচ্ছে, চারিদিকেই শত্রুর চোখ। খোলামেলা চলতে সে পারে না।

সালমান শামিল মাথা নিচু করে বলল, এখন আমি বুঝতে পেরেছি স্যার।

ড. পল জনসন টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াতে বাড়াতে বলল, সালমান, পাশে আমার রেস্ট রুমে গিয়ে বস। আমি সোফিয়াকে ডেকে পাঠাচ্ছি।

সালমান শামিল ড. জনসনের অফিস থেকে বেরিয়ে এসে প্রবেশ করল রেস্ট রুমে।

দুমিনিট পরেই সোফিয়া এসে উঁকি দিল ড. জনসনের রুমে।

কালো স্কার্টের ওপর কালো শার্ট পরেছে সোফিয়া।

ড. জনসন মাথা নিচু করে টেবিলে কাজ করছিল। সোফিয়া বলল, আসব সার?

আমার রেস্ট রুমে যাও। মাথা না তুলেই বলল ড. জনসন।

সোফিয়া এঞ্জেলা দ্বিতীয় প্রশ্ন করার সাহস পেল না, কিন্তু বুঝলনা কেন সেখানে যাবে। ডেকেছিলেন তো তিনি। ঐ রুমে তো কাউকে তিনি প্রবেশ করতে দেন না।

আস্তে আস্তে গিয়ে লক ঘুরিয়ে দরজা খুলল রেস্ট রুমের। উকি দিল ভেতরে। সালমান শামিলের ওপর নজর পড়তেই চমকে উঠল সোফিয়া। মুহূর্ত কয়েক তার নড়ার শক্তি থাকলনা।

সোফায় গা এলিয়ে চোখ বুজে বসেছিল সালমান শামিল। সে টের পেলনা দরজার দাঁড়ানো সোফিয়াকে।

দরজায় কয়েক মুহূর্ত দাড়িয়েঁ সোফিয়া ছুটে গিয়ে ঝাপিয়ে পড়ল সোফার ওপর। সালমান শামিলের একটা হাত ছড়ানো ছিল সোফায়। সোফিয়া উপুড় হয়ে আঁকড়ে ধরেছে সে হাত। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সে বলছে, তুমি বেঁচে আছ সালমান, আমার বিশ্বাস হচ্ছেনা, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, তুমি পেরেছ ওদের হাত থেকে ছুটে আসতে।

সালমান শামিলও মুহূর্তের জন্যে বিমুঢ় হয়ে পড়ল সোফিয়ার এমন ভেঙ্গে পড়ায়। সালমান শামিল এতটা আশা করেনি।

সালমান শামিল হাত টেনে নিতে চেষ্টা করল। কিন্তু পারলনা, বলল, শান্ত হও সোফিয়া। বলেছি না যে জীবন-মৃত্যু আল্লাহর হাতে।

একটু থেমে সালমান শামিল আবার বলল, তুমি সেদিন সাবধান না করলে আমি হয়তো কিছু বুঝতে পারতাম না, পালাতেও পারতমাম না।

মুখ তুলল সোফিয়া। অশ্রু ধোয়া তার মুখ। বলল, ওরা তোমার ধরতে পারেনি?

না।

তাহলে তুমি কোথায় ছিলে? কাগজে নিউজ বেরুল। আমরা এদিকে অস্থির।

'আমরা' কে, শুধু তো তুমি?

না, তুমি ডিরেক্টর স্যারকে জান না। তিনি তোমাকে ছেলের চেয়েও বেশি ভালবাসেন।

সোফিয়া এঞ্জেলা শান্ত হয়ে সোফায় সালমান শামিলের পাশে বসল।

তুমি নাকি খুব কেঁদেছিলে? বলল সালমান শামিল।

কে বলল?

ডিরেক্টর স্যার।

তুমি কি চেয়েছিলে ? আমি হাসি?

হাসলে কি হতো?

কিছুই হতো না। কিন্তু তোমার মত কি সব মানুষ পুস্তকের পাতায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে বসে আছে। তাদের একটা মন আছে।

মন তো অনেকেরই আছে, কিন্তু কেউ তো কাঁদেনি?

যার ইচ্ছা কেঁদেছে। সে কথায় তোমার কাজ নেই। এখন বল, স্যারের এ নিষিদ্ধ রুমে কেন?

স্যারের সাথে দেখা করতে এসেছিলাম। স্যার লাইব্রেরীতে যেতে দেয়নি।

কেন?

স্যার আমার নতুন বিপদের ভয় করছেন। স্যার বলেছেন, তিনি আগে জানতে পারলে ইনস্টিটিউটে আসতেই তিনি আমাকে নিষেধ করতেন।

তিনি এতটা আশংকা করছেন? মুখ কালো করে বলল সোফিয়া।

তিনি বলেছেন পরাজিত শত্রুরা আরও ভয়ংকর হয়ে ওঠে।

উদ্বেগ ফুটে উঠল সোফিয়ার চোখে-মুখে। কি চিন্তায় যেন সে ডুবে গেল। ধীরে ধীরে তার চোখে-মুখে উদ্বেগের স্থলে ভয় ও আতংক ফুঠে উঠল। বলল, স্যার ঠিকই বলেছেন সালমান। তোমার ইনস্টিটিউটে আসার তাহলে কি হবে, পরীক্ষা সামনে, কেমন করে পরীক্ষা দেবে?

সালমান শামিল মুখে হাসি টেনে বলল, ইনস্টিটিউটে আসতে পারবনা, পরীক্ষা দিতে পরবনা। তুমি খুশি হবে।

খুশি হব? বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলেল বলল সোফিয়া।

হ্যাঁ। ইনস্টিটিউটে শেষ পরীক্ষাটায় তুমি প্রথম স্থান অধিকার করবে।

মুহূর্তে বেদনায় নীল হয়ে গেল সোফিয়ার মুখ। বোবা দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল সালমান শামিলের দিকে। তার চোখ থেকে কয়েক ফোটা অশ্রু খসে পড়ল তার গন্ডে। বলল, সালমান তুমি এত নিষ্ঠুর! তুমি এত কম মূল্যে মানুষকে বিচার কর! তুমি কি জান না, তোমার রেজাল্ট নিয়ে আমার চেয়ে বেশি গর্ব আর কেউ করেনা? বলে দুহাতে মুখ ঢাকল সোফিয়া।

সালমান শামিল গম্ভীর কণ্ঠে বলল, আমি ওটা কথার কথা বলেছি সোফিয়া। তুমি এতটা সিরিয়াসলি......

সালমান শামিলকে বাধা দিয়ে সোফিয়া বলল, না এ সময় তুমি এমনভাবে কথা বলতে পারনা।

স্বীকার করছি, এভাবে বলা আমার ভুল হয়েছে।

কোন বিষয়ই, বিশেষ করে নিজের ব্যাপার, তুমি সিরিয়াসলি নাও না। এটা তোমার দোষ।

স্বীকার করছি সোফিয়া। সোফিয়া কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, এখন কি করবে ভাবছ?

স্যার বলেছেন, সরে থাকতে হবে কিছু দিন।

কত দিন?

আমি জানি না।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল, সোফিয়া। সে নত মুখে শার্টের বোতাম খুটছিল। এক সময় সে মুখ তুলল। বলল, আমার সাথে দেখা হবে না?

যদি সম্ভব না হয়?

তোমার কোন খবর জানাবে না?

চেষ্টা করব।

দুজনেই নীরব। মাথা নিচু করে বসে আছে সোফিয়া। সালমান শামিল একবার সে নত মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব সোফিয়া?

সোফিয়া মুখ তুলে বলল, কর।

সালমান শামিল কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলল, আমার বিপদ আসছে, এ খবর তুমি কার কাছ থেকে পেয়েছিলে?

সোফিয়া এঞ্জেলা মাথা তুলে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে সালমান শামিলের দিকে তাকাল। বলল, এ তথ্যের কি তোমার খুব বেশি প্রয়োজন?

শত্রুকে না চিনলে আমি তার কাছ থেকে কিভাবে আত্মরক্ষা করব?

সোফিয়া আবার কিছুক্ষণ চুপ থাকল। তার মুখ নিচু, গম্ভীর। কালো বেদনার একটা ছায়া তার গোটা মুখে। একটা যন্ত্রণা যেন তার চোখ-মুখ থেকে ঠিকরে পড়েছে।

সালমান শামিলসেদিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। বলল, আমি চাপ দেব না সোফিয়া।

সোফিয়া চোখ তুলল। তার চোখ জলে ভরা। বলল, সালমান তোমাকে অদেয় আমার কিছু নেই।

তার চোখ থেকে কয়েক ফোটা পানি খসে পড়ল।

সোফিয়া চোখ মুছে বলল, আমার বাবা, আমার বাবার কাছ থেকে শুনেছি।

তোমার বাবা?

বিস্ময় ঝরে পড়ল সালমান শামিলের কণ্ঠে।

সোফিয়া মুখ তুলে স্পষ্ট কণ্ঠে বলল, আমি জানতে পেরেছি আমার বাবা ‘হোয়াইট উলফ’-এর একজন নেতা।

সালমান শামিল কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে বসে রইল। কোন কথা বলতে পারছিলনা; অনেকক্ষণ নীরবতার পর বলল, তোমাকে বললেন কেন?

না, আমাকে বলেনি। বলে একটু থামল সোফিয়া। তারপর ধীরে ধীরে বলতে শুরু করল:

একদিন রাত দশটা। আবার শোবার ঘরের পাশ দিয়ে আসছিলাম। হঠাত আবার একটা কথা আমার কানে গেল। আব্বা আম্মাকে বলছেন, ‘একটা বিরল প্রতিভার মৃত্যু হল এলিজা।‘ আব্বার এই কথা শুনে কৌতুহলবশত আমি থমকে দাঁড়ালাম।

কে, কোন প্রতিভা? মা, প্রশ্ন করলেন আব্বাকে।

সালমান শামিল। বললেন আব্বা।

সালমান মারা গেছে? কবে? সোফিয়া তো বলেনি কিছু? মা বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

মরেনি, মরার পরোয়ানা জারি হয়ে গেছে।

কি বলছ তুমি ?

হ্যাঁ এলিজা–'হোয়াইট উলফ' এর 'প্রতিরোধ নির্মূল'-এর পরিকল্পনায় সালমান শামিলের নামও এসেছে। অতএব তাকে মরতে হবে।

এর কোন নড়চড় হতে পারে না? উৎকণ্ঠার সাথে মা বললেন।

না । বরং তার নাম অনেক পরে ছিল, তাকে সামনে আনা হয়েছে।

যতই বল এটা অন্যায় অযৌক্তিক নিষ্ঠুরতা।

এলিজা, মুখ সংযত কর। দরকার হলে 'হোয়াইট উলফ' কিন্তু হাসতে হাসতে তোমার বুকেও ছুরি বসাতে পারে। এর কাছে কোন ব্যক্তি নয় , জাতি বড়।

আম্মাকে ধমক দিয়ে আব্বা এই কথাগুলো কঠোর ভাষায় বললেন।

তাদের মধ্যে আর কি কথা হয়েছিল জানি না আমি। আমার সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার মত অবস্থা ছিল না। আমি কাঁপতে কাঁপতে সেখান থেকে ফিরে এসেছিলাম। তার পরদিনই আমি তোমাকে সাবধান করেছি।

থামল সোফিয়া  এঞ্জেলা। দু'জনেই চুপচাপ। কারো মুখেই কোন কথা নেই। দেয়াল ঘড়িতে দশটা বাজার শব্দ হলো।

সালমান শামিল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তোমার ক্লাসের সময় হলো, তুমি যাও সোফিয়া। সোফিয়াও উঠে দাঁড়াল। বলল কিছু বললে না?

কি বলব? আল্লাহই আমার ভরসা। ম্লান হেসে বলল সালমান শামিল। দু'জনে চলতে শুরু করল। দরজার কাছাকাছি এসে সোফিয়া সালমান শামিলের হাত চেপে ধরে বলল,সালমান, ডিরেক্টর স্যার ঠিকই বলেছেন। তুমি খুব সাবধানে থেকো। তুমি তোমার ওপর অবহেলা করো না।

সালমান মুখটা ঘুরিয়ে সোফিয়ার দিকে ফিরে বলল, তুমি দেখেছ আমি অসাবধান নই সোফিয়া। বাকি আল্লাহর হাতে। বলে সালমান শামিল বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তার সাথে সোফিয়াও।

করিডোরে বেরিয়ে সালমান শামিল সালমান একবার ডক্টর পল জনসনের দরজার দিকে তাকাল। কিন্তু তাকে আর বিরক্ত করা ঠিক মনে করল না। সে বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে এল নিচের নলে।

ওখানেই তার গাড়ি দাঁড়িয়েছিল।  সালমান শামিল  গাড়িতে উঠে বসল। গাড়ি স্টার্ট দিতে দিতে সালমান শামিল  একবার ফিরে চাইল বারান্দার দিকে। দেখল সেখানে শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছে সোফিয়া এঞ্জেলা।

সালমান শামিল হাত তুলল। সোফিয়াও হাত তুলে বিদায় জানাল।

স্টার্ট দিয়ে  সালমান শামিলের গাড়ি তীরের মত বেরিয়ে গেল ইন্সটিটিউটের গেট দিয়ে রাস্তায়। সেই পথের দিকে তাকিয়ে অচল মূর্তির মত দাঁড়িয়ে ছিল সোফিয়া এঞ্জেলা। গাড়ি তার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে অনেক্ষন। কিন্তু পথের ওপর তার শূন্য দৃষ্টিটা আটকে আছে।

এই সময় প্রচণ্ড একটা ধাতব সংঘর্ষের তীক্ষ্ণ শব্দ ভেসে এল বাগানের ওপার থেকে। বাগানের ওপারেই জন পল রোড।

শব্দটি সোফিয়া এঞ্জেলার মনকেও কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। কিন্তু তার তন্ময়তা ভাঙতে পারল না।

শব্দটি বাতাসে মিলিয়ে যাবার অল্পক্ষণ পরেই গেটের দারোয়ান ছুটে এল। হন্ত-দন্ত হয়ে সে গিয়ে ঢুকল ডক্টর জনসনের ঘরে।

বিস্মিত সোফিয়া এঞ্জেলাও এক পা, দু’পা করে এগুচ্ছিল ডক্টর জনসনের ঘরের দিকে।

এই সময় ডক্টর জনসন দারোয়ানের সাথে দ্রুত বেরিয়ে এল তার ঘর থেকে। উদ্বিগ্ন তার চখ-মুখ। সোফিয়া এঞ্জেলাকে সামনে পেয়ে বলল, শুনেছ?

কি স্যার?

সোফিয়া এঞ্জেলার চখে-মুখে উদ্বেগ।

দারোয়ান বলছে, আমাদের গেটে একটা এ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। এ্যাকসিডেন্টে সালমান শামিলের জীপ উল্টে যায়।

একটু দম নিল ডক্টর জনসন। তারপর কথা শুরুর আগেই অধৈর্য সোফিয়া এঞ্জেলা বলল, সালমান শামিল কোথায়?

তার কথা আর্ত চিৎকারের মত শোনাল।

ও জীপ থেকে ছিটকে পড়ে। একটা মাইক্রোবাস তাকে তুলে নিয়ে গেছে। কথা শেষ করেই ডক্টর পল জনসন বারান্দার সিঁড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল। বলল, এস তোমরা।

সবাই এসে গেটে দাঁড়াল।

গেটের পর প্রায় সাত ফুটের মত ফুটপাত। তারপর শুরু হয়েছে রাস্তা। সালমান শামিলের জীপটি গেটের ডান দিকে প্রায় গজ দশেক দূরে রাস্তার ওপর উল্টে পড়ে আছে।

দারোয়ান জানাল, সালমান শামিলের জীপটি রাস্তায় উঠে যখন ডান দিকে মোড় নিতে যাচ্ছিল, তখন উত্তর দিক থেকে একটা ট্রাক আসে। তার সাথে ধাক্কা খেয়ে জীপটি উল্টে যায়। সালমান শামিল রাস্তার ওপর ছিটকে পড়েই উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। এই সময় একটা মাইক্রোবাস এসে তার পাশে দাঁড়ায়। মাইক্রোবাস থেকে দু'জন লোক নেমে তাকে মাইক্রোবাসে টেনে তোলে।

সেন্ট জন পল রোড বাম দিকে ইন্সটিটিউটের একাডেমী ভবনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে। ওদিক থেকে ট্রাক এল কেন? আর যেখানে ট্রাকটা এসে জীপের সাথে ধাক্কা খেয়েছে, এত বড় রাস্তা ফেলে সেখানে ট্রাকটা এল কেন? এক্সিডেন্টের পর যে উঠে দাঁড়াতে পারে, তাকে তুলে নিয়ে মাইক্রোবাসটি ঐভাবে চলে গেল কেন?

এ প্রশ্ন সামনে আসার পর ডক্টর জনসন অজান্তেই যেন দু'হাতে তার মাথা চেপে ধরল। একটা যন্ত্রনা যেন অনুভব করছে সে। অস্ফুটে তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'মাই ইলফেটেড বয়'।

পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল সোফিয়া এঞ্জেলা। উদ্বেগে সে যেন কাঁপছে। বলল, স্যার হাসপাতালে দয়া করে খোঁজ নিন। না হয় চলুন হাসপাতালে।

ডক্টর জনসন ধীরে ধীরে ফিরল সোফিয়া এঞ্জেলার দিকে। তাঁর মুখ বেদনার্ত, গম্ভীর। বলল, মাই ডটার, হাসপাতালে ওকে পাওয়া যাবে না।

কেন স্যার? আর্তস্বরে বলল সোফিয়া এঞ্জেলা।

যাকে এ্যাক্সিডেন্ট মনে করেছ, সেটা এ্যাক্সিডেন্ট নয়। তাকে আবার কিডন্যাপ করা হয়েছে।

'ও গড' বলে চিৎকার করে উঠে দু'হাতে মুখ ঢেকে রাস্তার ওপরেই বসে পড়ল সোফিয়া এঞ্জেলা।

অন্ধকার ঘরে চোখ খুলল সালমান শামিল। চিন্তা করতে চেষ্টা করল কোথায় সে? বুঝল কংক্রিটের একটা নগ্ন মেঝেতে সে শুয়ে আছে। তার মনে পড়ল, সে জীপ নিয়ে ইনস্টিটিউটের গেট দিয়ে বের হয়ে এসেছিল। সে বাম দিক মোড় নেবার জন্য স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে নিচ্ছিল। হঠাৎ তার চোখে পড়ে বাম দিক থেকে একটা ট্রাক তার জীপ লক্ষ্যে ছুটে আসছে। কিছু করার আগেই ট্রাকটির প্রচণ্ড একটা আঘাতে জীপ সমেত সে ছিটকে পড়ে। মনে পড়ছে মাথাটা প্রচণ্ড বাড়ি খেয়েছিল পিচ ঢাকা রাস্তার সাথে। চোখ তার অন্ধকার হয়ে আসে। এই সময়েই কারা যেন তাকে গাড়িতে টেনে তলে। একটা মিষ্টি গন্ধ তার নাকে প্রবেশ করে। আর কিছুই মনে নেই তার।

সালমান শামিল হাত-পা নেড়ে দেখল, হাত-পা বাঁধা নেই। কপালের বাম পাশে একটা জায়গা খুব ব্যথা করছে। মাথার ঐ জায়গাটাই রাস্তার সাথে বাড়ি খেয়েছিল।

উঠে বসল সালমান শামিল। চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। রাত না দিন কিছুই বোঝা যাচ্ছে ন।

কোথায় সে? সন্দেহ নেই, সে শত্রুর হাতে। এবং তার অনুমান মিথ্যা না হলে 'হোয়াইট উলফ'-এর হাতে সে বন্দী। ডক্টর স্যারের কথাই সত্য হল, 'হোয়াইট উলফ' তার পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে কোন সুযোগই নষ্ট করেনি।

সালমান শামিল উঠে দাড়াল। শরীরটাকে খুব হালকা ও দুর্বল মনে হল। ক্ষুধায় পেট চোঁ চোঁ করছে।

অন্ধকারে হাতড়িয়ে ঘরের দেয়াল স্পর্শ করল সালমান শামিল। দেয়াল ধরে সে দরজার সন্ধানে এগুল। কিছু খোঁজার পরই দরজা পেয়ে গেল। হাত দিয়েই বুঝল ইস্পাতের দরজা। আরেকটু খুঁজে হাতল পেয়ে গেল দরজার। হাতল ধরে টান দিল সে। সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বলে উঠল, কিন্তু দরজা খুলল না।

সালমান শামিল দেখল, বিরাট হল ঘর। হল ঘরের এক পাশে শোবার সুন্দর একটি ডিভান। আর অন্য পাশে সিংহাসনের মত বড় এবং সুন্দর একটা চেয়ার। ঘরের লম্বালম্বি দু'পাশ দিয়ে শোফা সেট সাজানো। শ্বেত পাথরের মেঝ। দেখলে মনে হয় এক দরবার কক্ষ এটা। একমাত্র ঐ দরজা ছাড়া কোন দরজা-জানালা ঘরে নেই। কিন্তু কোন অস্বস্তি বোধ হচ্ছে না। এতক্ষণ সালমান শামিল উপলব্ধি করল, ঘরটা এয়ারকন্ডিশন করা। সালমান শামিল দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। দেখল সে তার সামনেই দরজাটা নিঃশব্দে খুলে গেল। বুঝল স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা।

দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল সালমান শামিল।

বেরিয়ে সে দীর্ঘ বারান্দায় এসে দাঁড়াল। দু'পাশে তাকিয়ে দেখল, বারান্দাটি সামনে গোল হয়ে বেঁকে গেছে।

বারান্দার পরেই উন্মুক্ত উঠান। ওটাও বারান্দার মতই। গোল হয়ে বেঁকে যাওয়া। উঠান এক বিরাট মাঠের মত। মাঝখানটা উঁচু। চারদিকটা ঢালু হয়ে চারদিকের বিল্ডিং এর বারান্দায় গিয়ে ঠেকেছে।

উঠানের মাঝখানে উঁচু শীর্ষবিন্দুটিতে শ্বেত পাথরের একটা বেদী। বেদীর উপর শ্বেত মর্মরের একটা সুদৃশ্য মূর্তি।

সালমান শামীল উঠান পেরিয়ে সেই বেদীর উপর গিয়ে দাঁড়াল।

মূর্তিটির মুখোমুখি হতেই সালমান শামিল চিনল ওটা শামিউনের মূর্তি। শামিউন খৃষ্টান আর্মেনিয়ার জাতীয় বীর। বৃহত্তর খৃস্টান আর্মেনিয়া গড়ার স্বপ্ন নতুন করে সে চাঙ্গা করে এবং সর্বশেষ সংগ্রাম তার দ্বারাই পরিচালিত হয়। রাশিয়ান জারের পতন ঘটলে ১৯১৮ সালের আটাশে মে ককেশাসের মুসলমানরা

স্বাধীনতা ঘোষণা করে। কম্যুনিস্ট বিপ্লবের আগে লেনিন ককেশাসের মুসলমানদের এই স্বাধীনতারই আশ্বাস দিয়েছিল। কিন্তু প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে লেনিন মুসলমানদের স্বাধীনতার কণ্ঠ রোধ করার জন্য ১৯১৭ সালে বিপ্লবের পরই বিশাল কম্যুনিস্ট বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে শামিউনকে ককেশাসে পাঠায়। আর্মেনীয় শামিউন ছিল বৃহত্তর খৃষ্টান আর্মেনিয়া গড়ার স্বপ্নে বিভোর মুসলিম বিদ্বেষী একজন মানুষ। শামিউন কম্যুনিস্ট বাহিনী নিয়ে ককেশাসে প্রবেশ করে প্রথমে ট্রেড ইউনিয়ন ও আঞ্চলিক নির্বাচনের প্রহসন করে ককেশাসের নিয়ন্ত্রণ হাতে নেবার চেষ্টা করে। কিন্তু ককেশীয় সচেতন জনগণ তাদের সে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেয়। সবখানেই মুসলিম নেতৃবৃন্দ নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে। এরপরই শুরু হয় গণহত্যা। শামিউন বিশাল কম্যুনিস্ট বাহিনীর সহায়তায় ১৯১৮ সালের মার্চ থেকে পরবর্তী চার-পাঁচ মাসে উল্লেখযোগ্য মুসলিম নেতৃবৃন্দসহ পচাত্তর হাজার মুসলিম নর-নারীকে হত্যা করে। কিন্তু চির স্বাধীনতাকামী ককেশীয় মুসলমানরা এত সহজে দমবার পাত্র ছিল না। তারা নতুন করে সংঘবদ্ধ হয় এবং চার মাসের চেষ্টায় শামিউনসহ কম্যুনিস্ট বাহিনীকে তারা ককেশাস থেকে বিতাড়িত করে। কিন্তু ককেশীয় মুসলমানদের দূর্ভাগ্য, ক্রিমিয়া, তাতারিয়া ও মধ্য এশিয়ার মুসলমানদের অব্যাহত পরাজয়ে ককেশাসের উপর কম্যুনিস্ট চাপ বৃদ্ধি পায়। ১৯২০ সালের ২৭ এপ্রিল শামিউন রুশ সৈন্যের সাহায্যে ককেশাস দখল করে নেয়। তার অত্যাচার ও গণহত্যার ফলে মুসলিম জনপদগুলো শ্মশানে পরিণত হয়। পুড়িয়ে দেয়া মসজিদ, স্কুল, পাঠাগার ইত্যাদিতে বহু বছর কেউ পা দেয়নি। এই জালিম শামিউনই আর্মেনিয়ার এক মহান নায়ক। কম্যুনিস্টদের জন্য এত কিছু করেও শামিউন কিন্তু কম্যুনিস্টদের কাছ থেকে কিছুই পায়নি। ককেশাস কম্যুনিস্টদের করতলগত হবার পর বৃহত্তর আর্মেনিয়া গঠিত হয়নি, বরং ককেশাসকে জর্জিয়া, আজারবাইজান, তাতারিয়া ও আর্মেনিয়ার মাঝে ভাগ করে দেয়া হয়। আর্মেনিয়ার ভাগে সবচেয়ে কম অঞ্চলই পড়ে। আজ মুসলমানদের উদ্যোগে কম্যুনিস্ট সাম্রাজ্য যখন ধ্বসে পড়েছে, তখন আর্মেনিয়রা তাদের বৃহত্তর খৃস্টান আর্মেনিয়ার স্বপ্ন নিয়ে আবার মাথা তুলেছে ককেশাসের মুসলমানদের বিরুদ্ধে। আর তাদের

সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে মুসলমান বিদ্বেষী কম্যুনিস্ট ও খৃষ্টান রাষ্ট্রগুলো। সালমান শামিলের মনে হল, শ্বেত মর্মরে গড়া শামিউনের উই উদ্ধত মূর্তি তাদের সে সম্মিলিত চেষ্টারই প্রতীক। পুজোর বেদীতে শামিউনকে প্রতিষ্ঠা করে তারা শামিউনের সেই গণহত্যা ও সন্ত্রাসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চাচ্ছে ককেশাসে।

সালমান শামিল দেখল, শামিউনের বাম হাতে একটা মানচিত্র। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। বৃহত্তর আর্মেনিয়ার মানচিত্র ওটা। পারস্যের একটা অংশ এবং গোটা পূর্ব আনাতোলিয়াসহ কৃষ্ণ সাগর ও কাস্পিয়ান সাগরের সমগ্র অঞ্চলকে বৃহত্তর আর্মেনিয়ার অংশ দেখানো হয়েছে। ডান হাত তার মুষ্টিবদ্ধভাবে উপরে তোলা যা শক্তির প্রতীক। অর্থাৎ শক্তির জোরেই তারা বৃহত্তর আর্মেনিয়া গঠন করবে। সালমান শামিলের চোখ নেমে এল নিচে। তার চোখ শামিউনের পায়ের তলার বেদীতে নিবদ্ধ হতেই ভীষণভাবে চমকে উঠলো সালমান শামিল। দেখল, শামিউনের মূর্তি যে প্রস্তরখণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে আছে, তার চারদিক ঘিরে নরমুণ্ডু সারিবদ্ধভাবে সাজানো। নরমুণ্ডুগুলো পিতলের প্লেটে রাখা। যেন অর্ঘ দেয়া হয়েছে শামিউনের পায়ে।

নরমুণ্ডুগুলো শামিউনের পদ-তলের সোপান ঘিরে একটি বৃত্ত রচনা করেছে। শামিউনের বাম পাশ থেকে আরেকটি বৃত্তের কাজ শুরু হয়েছে। এ অসমাপ্ত বৃত্তের শেষ নরমুণ্ডুটি সালমান শামিলের একেবারে সামনেই।

সালমান শামিল বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করল এই শেষ নরমুণ্ডটির আগের পিতলের প্লেটটি খালি। একটা প্লেট খালি রেখেই পরের প্লেটে শেষ নরমুণ্ডটি রাখা হয়েছে। একটা কৌতুহলই হলো। সালমান শামিল কয়েক পা সামনে এগুলো। সামনের নরমুণ্ডটি তার কাছে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠলো। শামিউনের মূর্তি-মুখো করে দাঁড় করিয়ে রাখা নরমুণ্ডটির মাথার খুলিতে কাল কালিতে লেখা তিনটি শব্দ তার নজরে পড়ল। পড়ার জন্যে সামনে একটু ঝুঁকে পড়লো সালমান শামিল। কালো কালির "আল্লামা ইব্রাহিম এদতিনা" নামটি জ্বল জ্বল করে উঠল তার সামনে।

হৃদয়ের কোথায় যেন প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেল সালমান শামিল। মুহূর্তের জন্যে নিঃশ্বাস নিতেও সে ভুলে গেছে যেন। অব্যক্ত যন্ত্রণার একটা ঢেউ খেলে গেল তার গোটা দেহে -সমগ্র স্নায়ুতন্ত্রীতে।

আরেকটু ঝুঁকে পড়লো সালমান শামিল নরমুণ্ডটির ওপর। ঔষধ দিয়ে মাথাটি পরিষ্কার করা হয়েছে। সালমান শামিল দেখল হাড়গুলো একদম কাঁচা। মনে হচ্ছে, আজই বা এই মাত্র একে এখানে রাখা হয়েছে। লেখার কালিগুলো যেন এখনও ভাল করে শুকায়নি। অর্থাৎ তাকে কিডন্যাপ করে আজ কালের মধ্যেই খুন করা হয়েছে।

সালমান শামিল মাথা তুলে পাশের নরমুণ্ডটির দিকে এগিয়ে গেল। মাথার খুলিতে সেই কালো কালিতে লেখা নাম পড়ল, 'আবুল বরকত আহমদভ'।

আবুল বরকত আহমদভ ছিল ককেশাসের নাগারনো কারাবাখ অঞ্চলের 'ককেশাস ক্রিসেন্ট' এর প্রধান। দিন আটেক আগে সে হারিয়ে যায়।

সালমান শামিল মাথা তুলল। বেদনা বিস্ফোরিত তার চোখ। তার মনে জেগে উঠল জিজ্ঞাসা, তাহলে কি আমাদের হারানো সব নেতৃবৃন্দকে এনে শামিউনের পায়ে অর্ঘ দেয়া হয়েছে?

সালমান শামিল গুণে দেখল, প্রথম বৃত্তটিতে বিশটি মাথা এবং অসমাপ্ত দ্বিতীয় বৃত্তটিতে ছটি মাথা। হিসেব মিলে যায়, বিগত কয়েক সপ্তাহে ছাব্বিশজন মুসলিম নেতার অন্তর্ধান ঘটেছে, আর ছাব্বিশটি মাথাই এখানে আছে। তবুও একবার ঘুরে ঘুরে নামগুলো দেখল। নজর বুলাল তাদের কংকালে পরিণত হওয়া মুখের দিকে। চোখ ফেটে অশ্রু নেমে এল তার। সবশেষে সে এসে দাঁড়াল ছাব্বিশ নম্বরে রাখা পিতলের খালি প্লেটের কাছে, মনে পড়লো, হ্যাঁ-তালিকায় তার নাম ছাব্বিশ নম্বরে ছিল। অর্থাৎ এ প্লেটটি তার মাথার জন্যেই নির্ধারিত। যেহেতু তার মাথা পাওয়া যায়নি এ পর্যন্ত, তাই ওটা খালি রাখা হয়েছে।

এই সময় বেদীর বুক থেকে একটা কণ্ঠ ধ্বনিত হল। বলল, সালমান ঠিকই ভাবছ, এ প্লেটটি তোমার জন্যেই নির্ধারিত। শিঘ্রই তুমি ওর গৌরব বৃদ্ধি করবে।

সালমান শামিল, বুঝল, বেদীর সাথে মাইক্রোফোন সংযোগ রয়েছে।

সালমান শামিল চারদিকে একবার নজর বুলালো। চারদিকে ঘোরানো বিশাল বিল্ডিং এর সবগুলো দরজাই বন্ধ, একমাত্র তার ঘরের দরজাটা ছাড়া।

সালমান শামিল ধীরে ধীরে বেদী থেকে নেমে এল। সে গোটা বিল্ডিংটা একবার দেখতে চায়। কি আছে, কে আছে ঐ বন্ধ ঘরগুলোতে। কেন কেউ তার সামনে আসছে না।

সালমান শামিল যে ঘরে ছিল সেটা বেদীর পূর্ব দিকে। সালমান শামিল পশ্চিম প্রান্তের বিল্ডিং এর দিকে নেমে গেল। ঘোরানো বিল্ডিংটা গোটাটাই তিনতলা। দূর্গের মত দেখতে। ধরণ-ধারণ ও অবস্থা দেখলেই বোঝা যায়, শত বছরেরও বেশি পুরানো বিল্ডিং। কিন্তু খুবই মজবুত তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সালমান শামিল চিন্তা করে পেল না, এমন বিল্ডিং ইয়েরেভেনের কোথায় আছে। ইয়েরেভেনের প্রতি ইঞ্চি জায়গা সে চেনে। আড়াই হাজার বছর আগের ধ্বংসাবশেষ, এক হাজার, দেড় হাজার বছর আগের ভগ্ন প্রাসাদসহ সব কিছুই সে দেখেছে। কিন্তু এ ধরণের একটা জায়গা, এ ধরণের একটা ভবন তো কোথাও দেখেনি! তাহলে কি এটা ইয়েরেভেন নয়? আর্মেনিয়ার দূর্গম স্থানের কোন কি গোপন নগরী?

সালমান শামিল এসে বারান্দায় উঠে একটা কক্ষের দরজার দিকে চলল। এ সময় একটা কণ্ঠ বিকট শব্দে হেসে উঠল। বলল, সালমান শামিল ঘরগুলো তুমি সার্চ করতে চাও? পারবে না। দরজা তুমি কোনভাবেই ভাঙতে পারবে না। আর ভাঙলেও কোন লাভ হবে না। এই গোটা বিল্ডিং এ তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। তুমি বেঁচে থাকা পর্যন্ত ওখানে কারো যাবারও দরকার নেই।

কণ্ঠটি একটু থামল। একটু পরেই আবার বলে উঠল, 'হোয়াইট উলফ' একটা শিকারের ওপর দু'বার ঝাপিয়ে পড়ে না। কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে একটা অসম্ভব ব্যতিক্রম ঘটেছে। তাই তোমার ব্যাপারে তারা একটা মজার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তোমার গায়ে তারা হাত লাগাবে না। একজন মানুষ ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় কিভাবে তিল তিল করে মৃত্যুবরণ করে সে দৃশ্যটা তারা ধীরে সুস্থে দেখবে। কথা শেষ করে কণ্ঠটি আবার সেই বিকট শব্দে হেসে উঠল।

এক সময় তার হাসিটিও থেমে গেল।

সালমান শামিল কয়েক মূহুর্ত বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে থাকল। সে ঐ কন্ঠের কোন কথাকেই অবিশ্বাস করলো না। ‘হোয়াইট উলফ’-এর পেছনে খৃষ্টানদের যে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী সংস্থা ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান এবং যে কম্যুনিষ্ট সন্ত্রাসবাদী সংস্থা, ‘ফ্র’ রয়েছে, তাদের চেয়ে জঘন্য, বর্বর, পশু কোন কিছু আর দুনিয়াতে নেই। এদের উম্মত্ত ও বিকৃত মানসিকতা সব পারে।

সালমান শামিল ফিরে দাঁড়াল ।

সে হাঁটতে শুরু করল তার ঘরের দিকে। হাঁটতে হাঁটতে সে ভাবল, তার প্রতিটি পদক্ষেপ ওরা টেলিভিশন ক্যামেরায় দেখছে। বিল্ডিংসহ গোটা এলাকার সবকিছুই নিশ্চয়ই টেলিভিশন ক্যামেরার আওতায়।

সালমান শামিল তার ঘরের দরজায় এসেও আবার বারান্দায় ফিরে গেল।

বসে পড়ল সে বারান্দার পাথরের মেঝেতে।

অনেক হেঁটেছে। খুব ক্লান্তি লাগছে তার। আর খাদ্য ও পানি পাওয়া যাবে না শুনে ক্ষুধা-তৃষ্ঞাও যেন হঠাৎ বেড়ে গেল।

# ৭

কাস্পিয়ান সাগরের কালো পানি কেটে চারদিকের ঘুটঘুটে অন্ধকার ঠেলে পোর্ট আনোয়ার থেকে একটি পেট্রোল বোট এগিয়ে চলেছে পশ্চিম দিকে।

পোর্ট আনোয়ার কাস্পিয়ান সাগর তীরস্থ মুসলিম মধ্য এশিয়া প্রজাতন্ত্রের একটি বন্দর। রুশ শাসন আমলে এ বন্দরের নাম ছিল ক্রাজনোভস্ক। কাস্পিয়ান সাগরের পূর্ব তীরে মুসলিম মধ্য এশিয়ার এটাই একমাত্র বন্দর। মধ্য এশিয়া স্বাধীন হবার পর মুসলিম সরকার এই বন্দরের নাম রেখেছে পোর্ট আনোয়ার - শহীদ আনোয়ার পাশার নাম অনুসারে।

শহীদ আনোয়ার পাশা মধ্য এশিয়ার মুসলমানদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে কম্যুনিষ্ট লালফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শহীদ হয়। কম্যুনিস্ট চাপের মুখে মধ্য এশিয়ার মুসলমানদের যখন ঘোর দুর্দিন, তখন সেনাধ্যক্ষ আনোয়ার পাশা কাস্পিয়ান সাগরের পথে ছুটে আসে মধ্য এশিয়ায়। এই বন্দরেই সে বোট থেকে নামে। একজন মহান শহীদের সে স্মৃতি ধরে রাখার জন্যে মুসলিম মধ্য এশিয়ার স্বাধীন সরকার তার নামে বন্দরের এই নাম রেখেছে।

বোটে মাত্র ছয়জন আরোহী। ড্রাইভিং সীটে মুসলিম মধ্য এশিয়ার নৌবাহিনীর তরুণ অফিসার আলী নকীর। তার পেছনে সোফায় আহমদ মূসা। সারফেস টু এয়ার কামান রয়েছে। সারফেস টু সারফেস কামানের পাল্লা পঞ্চাশ মাইলেরও বেশী।

বোটের স্বল্প পাল্লার হেডলাইটের আলোটি ছাড়া সব আলো নিভানো। বোটটি একটা জমাট অন্ধকারের মত এগিয়ে চলেছে পশ্চিমে। লক্ষ্য তার ককেশাসের বাফু ও সীমান্ত নগরী আশতারার মধ্যবর্তী উপকূলের একটি স্থান।

ঘন্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে চলেছে বোটটি। পোর্ট আনোয়ার থেকে বাকু দু'শ মাইল। আহমদ মূসা তার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন রাত এগারটা। এই

গতিতে গেলে পথে কোন ঝামেলা না হলে তিনটার দিকে তিনি ককেশাস উপকূলে পৌঁছতে পারবেন।

বহু চিন্তা করে আহমদ মুসা ককেশাস যাবার এই কাস্পিয়ানের পথটাকে বেছে নিয়েছেন। মধ্য এশিয়া প্রজাতন্ত্রের কাজাখিস্তান হয়ে ককেশাস প্রবেশ করা যেত, কিন্তু পথটায় বিপদ বেশি। কাজাখ বর্ডার থেকে ককেশাস বর্ডারের মধ্যবর্তী গোটা তাতারিয়া অঞ্চলে রুশরা সর্বক্ষণ চোখ আর কান খাড়া করে আছে যাতে একটা পিঁপড়াও মধ্য এশিয়া প্রজাতন্ত্র থেকে সেদিকে প্রবেশ করতে না পারে। অন্যদিকে পারস্যের পথটা আহমদ মূসার জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। অবশেষে কাস্পিয়ানের সংক্ষিপ্ত পথটাকেই সবচেয়ে অনুকূল মনে করেছে। কিন্তু এখানে বিপদ নেই তা নয়। মধ্য এশিয়া প্রজাতন্ত্রের পানিসীমা পার হবার পর আজারবাইজানের প্রায় উপকূল পর্যন্ত দেড়শ' মাইল পথটি রুশদের কড়া পাহারায় রয়েছে। কাজাখ অঞ্চল থেকে তাতারিয়া অঞ্চলে সে যেমন একটা পিঁপড়া ঢুকতে দিতেও নারাজ, তেমনি কাস্পিয়ান সাগরের পথটাও সে পাহারা দিচ্ছে যাতে মধ্য এশিয়া থেকে ককেশাসে আসা যাওয়া কারও পক্ষে সম্ভব না হয়। এই পাহারা দেয়ার কাজে সাবমেরিন এবং একটি শক্তিশালী নৌ-গোয়েন্দা ইউনিটসহ অনেক যুদ্ধ জাহাজ ও পেট্রোল বোট রয়েছে। চব্বিশ ঘন্টা তাদের এই পাহারা কাজ চলছে। এতদসত্ত্বেও আহমদ মূসা মনে করেছেন, স্থল পথের চেয়ে পানি পথে শত্রুকে ফাঁকি দেয়া সহজ হবে।

এই বিপদ সংকুল পথে আহমদ মুসাকে এইভাবে একাকি ছেড়ে দিতে কেউ রাজী হয়নি। কিন্তু আহমদ মুসা কাউকেই সাথে নিতে চাননি। শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত হাসান তারিক জেদ করেছে। আহমদ মুসা বলেছেন, এ ধরনের অভিযানে যত কম লোক জড়িত হয়ে পারা যায় তাই করা উচিত। আর হাসান তারিককে তিনি পরামর্শ দিয়েছেন, তার কিছুদিন বিশ্রাম প্রয়োজন। তার দেশ ফিলিস্তিন থেকে সে বহুদিন বাইরে। এমন কি, স্বাধীন ফিলিস্তিনকে সে এখনও দেখেইনি। বাড়িতে মা-বোনের সাথে বহুদিন থেকে বিচ্ছিন্ন। সুতরাং আয়েশা আলিয়েভকে নিয়ে একবার তার দেশে যাওয়া দরকার। প্রয়োজন হলেই তাকে ডেকে নেবে

আহমদ মুসা। তাছাড়া আহমদ মুসা মনে করেন, নেতৃত্বের ক্ষেত্রে মাহমুদ ফিলিস্তিনে একাকিত্ব অনুভব করছে। হাসান তারিকের মত দক্ষ নেতৃত্ব তার পাশে থাকলে ইসলামী ফিলিস্তিন আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

একটু মাথা ঝুঁকিয়ে আহমদ মুসা 'ডিস্টেন্স রেকর্ড' প্যানেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, নকীর, পঞ্চাশ মাইল পেরিয়ে আসছো, এবার বোধ হয় তোমাকে হেডলাইটের আলোটুকুও নিভিয়ে ফেলতে হবে।

কাস্পিয়ান সাগরের ক্ষেত্রে উপকূল পঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত জাতীয় অর্থনৈতিক এলাকা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই অর্থনৈতিক এলাকা পর্যন্ত স্বাধীনভাবে বিচরণ করা যায়।

পেট্রোল বোটটি একান্নতম মাইলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হেড লাইটের আলো নিভিয়ে দিল।

চার দিক থেকে জমাট অন্ধকারের এক পাহাড় এসে বোটটিকে ঘিরে ধরল। বোটটিকে মনে হল চলন্ত এক খন্ড জমাট অন্ধকার।

চোখ বন্ধ করে এগিয়ে চলার অবস্থা। কম্পাস ও সামনে মেলে রাখা মানচিত্রই আলী নকীরের ভরসা। মাঝে মাঝে সে তাকাচ্ছে কঠিন বস্তু নিরীক্ষণ স্ক্রীনের দিকে। বোটের দশ মাইলের মধ্যে কোন কঠিন বস্তু এসে পড়লেই সাদা পর্দায় কাল স্পট জেগে উঠবে। স্ক্রীনটি অসংখ্য বর্গক্ষেত্রে ভাগ করা। বর্গক্ষেত্রে কাল অবস্থান থেকে বুঝা যাবে বস্তুটি কোনদিকে কতদূরে।

আরও চল্লিশ মাইল চলার পর প্রায় একই সময়ে উত্তর ও দক্ষিণ দিগন্তে দুটি আলোক রেখা ফুটে উঠল। বোঝা গেল বড় যুদ্ধ জাহাজই হবে। জাহাজ দুটির প্রত্যেকটিতেই কয়েকটি করে সার্চ লাইট।

আলোগুলোকে ঘুরতে দেখা গেল। এই সময় পশ্চিম দিগন্তেও আরেকটা আলো দেখা গেল। তিনটি আলোই দ্রুত এগিয়ে আসছে।

আহমদ মুসা সেদিকে কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করার পর বললেন, আলী নকীর, জাহাজগুলো খুব দ্রুতগামী এবং তাদের সার্চ লাইটগুলি খুব পাওয়ারফুল। তাছাড়া তিনটি জাহাজ একা নয়। ভালো করে দেখ, বিড়ালের চোখের মত আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলো দেখা যাচ্ছে। এর অর্থ পেট্রোল বোটের সারিও এগিয়ে আসছে।

এই সময় রিয়ারভিউ স্ক্রীণের দিকে চোখ পড়তেই আঁৎকে উঠল আলী নকীর। বলল, জনাব, পেছন থেকেও একটা জাহাজ ছুটে আসছে।

মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে বসে থাকলেন আহমদ মুসা। বললেন, আলী নকীর, চারদিক থেকে জাল ফেলে ওদের এই এগিয়ে আসা কোন রুটিন প্রেট্রোল নয়। একটা সচেতন পরিকল্পনা নিয়ে ওরা এগিয়ে আসছে। আমার মনে হয় আমাদের এই যাত্রা শত্রুদের কাছে গোপন নেই।

একটু থামলেন আহমদ মূসা। চারদিকটায় একবার নজর বুলালেন। তারপর বললেন, ভয় নেই আলী নকীর, আমরা ওদের চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে আছি। ওরা আমাদের অবস্থান দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু ওদের অবস্থান আমরা দেখতে পাচ্ছি।

আহমদ মূসা উঠে গিয়ে আলী নকীরের পাশে বসলেন। বললেন, আমরা আর সামনে এগুব না। তুমি বোটের মাথা বাম দিকে ঘুরিয়ে নাও। দক্ষিণ দিক থেকে ও পূবদিক থেকে ছুটে আসা জাহাজ আরও ক্লোজ হবার আগে আমরা এ দুয়ের ফাঁক গলিয়ে দক্ষিণ দিকে বেরিয়ে যাব। তারপর ওদের এই বেষ্টনির বাইরে গিয়ে প্রয়োজন হলে পারস্য জল সীমার কাছাকাছি দিয়ে ঘুরে গিয়ে আজার বাইজান জলসীমায় প্রবেশ করব। অনেকটা পথ আমাদের ঘুরতে হবে। তুমি স্পীড বাড়িয়ে দাও। আমি 'হার্ড অবজেক্ট ভিশন' প্যানেলের দিকে নজর রাখছি। কারও সাথে ধাক্কা লাগবে এ চিন্তা কর না। বলে আহমদ মূসা ম্যাপটাকে নিজের সামনে টেনে নিলেন।

আহমদ মূসার কথা শেষ হবার আগেই বোটের মাথা দক্ষিণ দিকে ঘুরে গেল।

আহমদ মূসা বললেন, বোটের মাথা আরও পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী ইস্টে সরিয়ে নাও।

বোটের মাথা আরও পূর্ব দিকে ঘুরে গেল। ছুটে আসা জাহাজগুলোর শক্তিশালী সার্চ লাইট সাগরের বিস্তৃত অঞ্চলকে আলোকিত করেছে। চারটি জাহাজ আরও কাছাকাছি এগিয়ে এলে মধ্যবর্তী সাগরের গোটাই আলোকিত হয়ে উঠবে। আহমদ মুসার বোটকে ওরা এই আলোর ফাঁকেই বন্দি করতে চাইছে।

জাহাজ ও পেট্রোল বোটের বেস্টনি গড়ে নিশ্চিন্ত মনেই ওরা এগিয়ে আসছে। ওরা জানে আহমদ মুসার বোট পশ্চিম দিকের কোন ফাঁক-ফোঁকড় দিয়েই কেটে পড়তে চাইবে। তাই সে ফাঁক-ফোকড় বন্ধের জন্য ওরা পেট্রোল বোটের পাহারা সাথে নিয়ে আসছে।

আহমদ মুসা হাসলেন। এত বড় সাগরের সব দরজা ওরা বন্ধ করবে, এটা ওদের দুরাশা।

আহমদ মুসা তাকিয়ে দেখলেন, দক্ষিণ ও পূর্বদিক থেকে যে জাহাজ দুটো এগিয়ে আসছে ওদের সার্চলাইট ক্রমেই নিকটতর হয়ে উঠছে। এক সময় ওরা মিশে যাবে, তার আগেই তাকে এ বেষ্টনি পার হতে হবে।

জাহাজ দুটোর কৌণিক অবস্থান বিবেচনা করে ছোট্ট একটা অংক কষে আহমদ মূসা বললেন, আলী নকীর, পনের মিনিটে আমরা যদি পঁচিশ মাইল পথ পার হতে পারি তাহলে ওদের সার্চলাইট আমাদের স্পর্শ করতে পারবে না।

আলী নকীর মাথা দুলিয়ে বলল, আমরা এখন ঘন্টায় নব্বই মাইল চলছি। গতিবেগটা আমি একশ' মাইলে তুলে দিচ্ছি। আমরা পনের মিনিটের আগেই পঁচিশ মাইল পেরিয়ে যাব।

পেট্রোল বোটের স্পিডোমিটারের কাঁটা লাফ দিয়ে নব্বই থেকে একশ মাইলে দিয়ে স্থির হলো। আহমদ মুসার বোট যখন পঁচিশ মাইলের পনের মাইল পার হয়েছে, তখন 'হার্ড অবজেক্ট ভিশন' অর্থাৎ 'শক্ত বস্তু নিরীক্ষণ' স্ক্রীনে একটা কাল বিন্দু জেগে উঠল।

ভ্রু কুঁচকালেন আহমদ মূসা। কাল বিন্দুটির অবস্থান ঠিক আহমদ মূসার বোটের নাক বরাবর।

আহমদ মুসা বললেন. আলী নকীর, তোমার ঠিক নাক বরাবর দশ মাইল দূরেএকটা পেট্রোল বোট এগিয়ে আসছে।

একটু থেমে আহমদ মুসা বললেন, দুটো জাহাজের সার্চলাইট এবং পেট্রোল বোটটির সার্চলাইট একসাথে  মিশে যেতে পারে, এমন জায়গায় যদি ওদের নজরে পড়ি তাহলে বিনা সংঘাতে আমরা বেরিয়ে যেতে পারবনা।  আর সংঘাত করে বেরিয়ে গেলেও ওরা পিছু ছাড়বেনা আমাদের বার মাইলের জলসীমা পর্যন্ত।

আমরা তাহলে ককেশাসে যেতে পারবনা। তুমি তোমার গতি একশ বিশ মাইলে তোল নকীর।

পেট্রোল বোটের সর্বোচ্চ গতিই হলো একশ তিরিশ মাইল। যে লোড বোটে আছে তাতে গতি একশ বিশে তোলা ঝুঁকিপূর্ণ।

কিন্তু দক্ষ নৌ-অফিসার আলী নকীর বলল, বুঝেছি জনাব, আমরা বার মিনিটেই নির্ধারিত দূরত্ব পার হয়ে যাব ইনশাআল্লাহ।

আহমদ মুসার পেট্রোল বোট প্রচণ্ড বেগে লাফিয়ে লাফিয়ে সামনে এগিয়ে চলল। স্পিডোমিটারের কাঁটা একশ' বিশে দাঁড়িয়ে থর থর কাঁপছে। কাঁপছে গোটা বোট প্রচণ্ডভাবে। মনে হচ্ছে বড় বড় পাথর ডিঙিয়ে কখনও আছড়ে পড়ে, কখনও লাফিয়ে উঠে দৌড়ে চলেছে একটা জীপ।

আহমদ মুসা 'হার্ড অবজেক্ট ভিশন' প্যানেলের দিকে তার চোখ স্থির রেখেছিলেন। এগিয়ে আসা পেট্রোল বোটটা তখন তিন মাইল দূরে।

আহমদ মুসা এ সময় তার সামনের স্পীকার সুইচ অন করে বললেন, আবদুল্লাহ আমাদের সামনেই একটা শত্রু পেট্রোল বোট। তার সার্চ লাইটটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। মনে রেখ কোন প্রকার সংঘর্ষে লিপ্ত না হয়ে আমরা এদের বেষ্টনি থেকে বেরিয়ে যেতে চাই। আক্রান্ত হলেও আমরা গুলি ছুড়বনা, আত্মরক্ষার শেষ মুহূর্ত ছাড়া। সে নির্দেশ আমিই দেব। এখন তোমরা কামানের সবগুলো ব্যারেল নামিয়ে নাও।

আবদুল্লাহ পেট্রোল বোটের চার সদস্য বিশিষ্ট গোলন্দাজ ইউনিটের প্রধান।

নির্দেশের সাথে সাথে কামানের সবগুলো ব্যারেল নিচে নেমে এল।

দক্ষিণ ও পূর্বের দুই জাহাজের সার্চ লাইটের মধ্যে ব্যবধান তখনও অনেক। প্রায় তিন মাইলের মত। শত্রুর পেট্রোল বোটের সার্চ লাইটের হিসেবটা বিয়োগ করলে এক মাইল বিস্তৃত দুটো অন্ধকার লেন সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে শত্রু বোটের দুপাশে।

শত্রু বোট থেকে আহমদ মুসার বোটের দূরত্ব তখন দেড় মাইল, তখন আহমদ মুসা আলী নকীরকে বোটের মাথা ত্রিশ ডিগ্রী ডান দিকে ঘুরিয়ে নিতে বললেন।

বোঝা গেল শত্রু বোটও তখন সামনে কিছুর অস্তিত্ব নিয়ে অস্থির হয়ে উঠেছে। সার্চ লাইট ছারাও হেড লাইটের আলো সে সামনে ফেলেছে।

শত্রু বোটের সাথে মুখোমুখী অবস্থা থেকে ত্রিশ ডিগ্রি টার্ন নিয়ে তীর বেগে ছুটে চলল আহমদ মুসার বোট।

আহমদ মুসার বোটের এই গতি পরিবর্তন শত্রু বোটও টের পেল। তার সার্চ লাইট আরও চঞ্চল হয়ে উঠল হেড লাইটের আলোও এদিকে বেঁকে এল।

আহমদ মুসা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করলেন দক্ষিণের জাহাজটির সার্চ লাইটও এদিকে এসে স্থির হল।

কিন্তু শত্রু বোট এ শত্রু জাহাজের সার্চ লাইটের মাঝের ব্যবধান প্রায় এক মাইল। এই অন্ধকার লেন দিয়েই আহমদ মুসার বোট বেরিয়ে যেতে চায়।

আহমদ মুসা বললেন, শত্রু জাহাজ ও শত্রু বোটের মধ্যে সংবাদ বিনিময় হয়েছে। ওদের মনে কিছুটা সন্দেহও হয়েছে। সার্চ লাইট ফেলে অনুসন্ধানের চেষ্টা তারই প্রমাণ। কিন্তু স্বস্তির সাথে লক্ষ্য করলেন শত্রু বোট বা শত্রু জাহাজের গতি পরিবর্তন হয়নি।

আহমদ মুসার বোট যখন শত্রু বোটের সমান্তরালে অর্থাৎ সবচেয়ে কম দূরত্বে এল, ঠিক তখনই শত্রু বোট থেকে কামানের গর্জন শোনা গেল। কয়েকটা গোলা আহমদ মুসার বোটের পাশে ও পেছনে এসে পড়ল।

কামানের গর্জনের সংগে সংগে আলী নকীর বোটটি আরেকটু ডান পাশে সরিয়ে নিয়েছিল। আহমদ মুসার বোট তখন চলছিল ঘন্টায় একশ বিশ মাইল বেগে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই দুই বোটের মধ্যে ব্যবধান বেড়ে গেল। ওদিকে কামানের গর্জনও থেমে গেল।

আহমদ মুসা হেসে বললেন, সম্ভবত কোন উত্তর না পেয়ে ওরা ভেবেছে, নিরীহ কোন মাছ ধরা বোট ভয়ে পালাচ্ছে। তারা ধারনা করেনি যে, আহমদ মুসার ককেশাসমুখী বোট এবাউট টার্ন করতে পারে। আহমদ মুসা সম্পর্কে শত্রুর এই উচ্চ ধারণা আহমদ মুসাকে বহুবারই সাহায্য করেছে। শত্রুর মনে এই অনুভূতি সৃষ্টি আল্লাহরই অসীম রহমত। আহমদ মুসা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন।

ওদের বেষ্টনী পেরিয়ে মাইল দশেক আসার পর আহমদ মুসা বোটের মুখ সোজা দক্ষিণ দিকে ঘুরিয়ে নিতে বললেন। দক্ষিণ দিকে পঞ্চাশ মাইল চলার পর আহমদ মুসা বললেন, ওদের কোন জাহাজের আলো আর দেখা যাচ্ছেনা। মনে হচ্ছে সবই উত্তর দিকে চলে গেছে। কিন্তু আবার ফিরে আসবে। তার আগেই মধ্য-কাস্পিয়ানে আমাদের পাড়ি দিতে হবে। তুমি বোট পয়তাল্লিশ ডিগ্রী পশ্চিমে ঘুরিয়ে নাও। তারপর ত্রিশ মাইল চলার পর বোট সোজা পশ্চিম দিকে চলবে। তাহলে আমরা পারস্যের পানি সীমা ঘেঁসে আজার বাইজানের সীমান্ত শহর আশতারা উপকূলে পৌঁছতে পারব। এ এলাকায় রুশদের পাহারা একটু কম থাকবে।

আহমদ মুসা উঠে পেছনে সোফায় গিয়ে বসলেন। সোফায় হেলান দিয়ে গা এলিয়ে দিলেন।

ঘন্টায় একশ মাইল বেগে চলছে বোট। গতির তীব্রতায় বোট থর থর করে কাঁপছে।

বোট ইঞ্জিনের গুম গুম আওয়াজ এবং পানি কেটে চলার তীক্ষ্ণজলজ শব্দ ছাড়া চারদিকটা নীরব-নিথর। মাটির গাঢ় অন্ধকারটা যেন আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। সেই আকাশ-অন্ধকারে জ্বলছে তারার প্রদীপ।

আহমদ মুসার চোখ ছিল সেই তারার জগতে নিবদ্ধ। বড় ভাল লাগে তাঁর এই তারার জগত। খোদায়ী প্রভূত্বের বিশালতা এবং মহিমাময়তা তাঁর কাছে মূর্ত হয়ে ওঠে এদিকে চাইলে। আমরা বলদর্পী মানুষ- বিশাল পৃথিবীর তুলনায় দৃষ্টি গোচরের অযোগ্য এক দূর্বল অস্তিত্ব আমাদের। বিশাল পৃথিবী ঐ মিট মিট তারার তুলনায় একটা বিন্দু বই আর কিছুই নয়। কিন্তু বিশাল বপু এই তারা আবারন আমাদের ছায়াপথ নামক গ্যালাক্সির গায়ে ক্ষুদ্র এক তিল মাত্র। তাই বলে ‘ছায়াপথ’ গ্যালাক্সির গর্বের কিছু নেই। অন্তহীন আকাশ জগতে লক্ষ-কোটি গ্যালাক্সির মাঝে আমাদের ছায়াপথ গ্যালাক্সি অনুজ্জ্বল এক আলোক বিন্দু ছাড়া আর কিছুই নয়। অসীম বিশালত্বের বিস্ময়ে বিমূঢ় আহমদ মুসার মন ভেবে পায় না, বৃহত্তরের পথে ঊর্ধ্বমুখী এই যাত্রার শেষটা কোথায় যেখানে গিয়ে শেষ সেটাই কি ‘সিদরাতুল মুন্তাহা’ অথবা প্রথম আকাশ! তারও তো অনেক ওপরে সবকিছু

সৃষ্টি জুড়ে সর্বশক্তিমান, সর্ব প্রশংসার অধিকারী আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আরশুল আজিম। মানুষের অসহায় ক্ষুদ্রত্বের কথা বিবেচনা করে এবং মানুষের প্রতি আল্লাহর অসীম দয়ার কথা স্মরণ করে সব সময়ের মত আহমদ মুসার দুচোখ কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে ভরে ওঠে।

তারার জগতে একবার পৌঁছুলে আহমদ মুসা নিজেকে হারিয়ে ফেলে। অসীমের উদার স্পর্শ তাকে আকুল করে তোলে। আজও তাই হয়েছিল। কতক্ষণ তিনি এই ভাবে ছিলেন জানেন না। গভীর প্রশান্তিতে তাঁর চোখ দুটোও এক সময় ধরে এসেছিল।

হঠাৎ বোটের গতি কমে যাবার চাপ আহমদ মুসার তন্দ্রা ভেঙে দিল।

চোখ খুলেই আহমদ মুসা ঘড়ির রেডিয়াম ডায়ালের দিকে নজর বুলালেন। রাত আড়াইটা।

আহমদ মুসা মুখ তুলে হঠাৎ বোটের গতিটা এভাবে কমে গেল কেন জিজ্ঞেস করতে যাবেন, এই আলী নকীর পেছন দিকে তাকিয়ে বলল, জনাব, মাইল চারেক সামনে একটা পেট্রোল বোট। অয়্যারলেসে আমাদের পরিচয় জানতে চাচ্ছে। আমি বোটটাকে পাশ কাটাবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আমাদের বোটটা লক্ষ্য করেই ঐ বোটটা এগিয়ে আসছে।

আলী নকীরের কথার জবাব না দিয়ে আহমদ মুসা বললেন, আমরা কোথায় আলী নকীর?

এই মাত্র আমরা আজারবাইজানের জলসীমায় প্রবেশ করেছি। আমরা এখন পারস্য ও আজারবাইজানের জলসীমার মাঝখান দিয়ে আসতারার দিকে চলছি।

বোটটা এখন কার পানি সীমায় আছে?

আজারবাইজানের।

কতদূর বললে?

চার মাইল।

আলো নিভানো?

হ্যাঁ সব আলো নিভানো।

তাহলে ওটা শত্রুদের পেট্রোল বোট। আন্তর্জাতিক পানি সীমায় আমাদের খুঁজে না পেয়ে আজারবাইজানের পানি সীমায় ওরা প্রবেশ করেছে।

আমিও তাই মনে করছি।

তোমার 'হার্ড অবজেক্ট ভিশন'-এ কারও সন্ধান পাচ্ছ?

না।

তাহলে বোঝা গেল দশ বর্গমাইলের মধ্যে আর কোন শত্রু বোট নেই ।

জি হ্যাঁ।

আমাদের পরিচয় জানতে চাচ্ছে?

জি।

আহমদ মুসা একটু চিন্তা করলেন। তারপর বললেন ঠিক আছে, আমি ওদের সাথে কথা বলছি।

বলে আহমদ মুসা উঠে এসে আলী নকিরের পাশে ওয়ারলেসের সামনে বসলেন।

সুইচ অন করার আগে আহমদ মুসা আলী নকির কে বললেন, তুমি বোটের মাথা ত্রিশ ডিগ্রি পরিমান পারস্যের দিকে ঘুরিয়ে ফুল স্পীডে চালিয়ে যাও।

ওয়ারলেসের সুইচ অন করে আহমদ মুসা আর্মেনীয় ভাষায় বললেন, আমাদের ভয় করছে, আপনাদের পরিচয় আগে বলুন।

কিসের ভয়। ওপার থেকে বলল।

এ উপকূলে দস্যুদের উপদ্রুব বেড়েছে। আপনাদের বোটে বাতি নেই।

আপনাদের নেই কেন?

বললাম তো আমাদের ভয় আছে। পুলিশ, জলদস্যু উভয়কেই আমাদের ভয়।

কি ব্যাপার, আপনারা ওদিকে পালাচ্ছেন কেন?

আপনাদের পরিচয় বললেন না, বাতি নেই কেন তা বললেন না।

হাঃ হাঃ হাঃ ভয় নেই তোমাদের। কি মাল আছে বোটে?

অনেক জিনিস।

তোমরা কি পূর্ব থেকে মানে ওপার থেকে কোন বড় পেট্রোল বোট আসতে দেখেছ?

না।

ততক্ষণে আহমদ মুসার বোট পারস্যের তাব্রিজ উপকূলে কয়েক মাইল ভিতরে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু দেখা গেল শত্রু বোটটি তার মাথা ঘুরায়নি। বরং ওদের শেষ প্রশ্নের উত্তরে 'না' বলার পর ওরা পূর্ব-উত্তর দিকে বোটের মুখ ঘুরিয়ে চলতে শুরু করেছে।

আহমদ মুসা হাসতে হাসতে বললেন, ওরা আমাদের চোরাচালানই মনে করে খুব মজা করল।

আহমদ মুসা চারদিকে একবার নজর বুলিয়ে বললেন, বোটের স্পীড এবার কমিয়ে দাও। আশতারাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চল।

সীমান্ত নগরী আশতারার চার মাইল দূর দিয়ে এগিয়ে চলল আহমদ মুসার বোট। রাত সাড়ে তিনটার সময় তারা কুরা নদীর মোহনায় এসে পৌঁছালেন। ককেশাসের আরাকাস ও কুরা নদী সম্মিলিতভাবে এখানে এসে কাস্পিয়ান সাগরে পড়েছে।

মোহনা পাড় হবার পর আহমদ মুসা আলী নকিরকে বোট উপকূলের আরও কাছে নিতে বললেন।

বোট উপকূলের আরও সিকি মাইলের কাছাকাছি এসে পৌছাল। আহমদ মুসা এবার আলী নকিরকে বোটের আলো জ্বেলে দিতে বললেন।

উপকূলের ধার দিয়ে বোট ধীরে ধীরে বাকুর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আহমদ মুসা মানচিত্র থেকে মুখ তুলে বললেন, এবার সিগন্যাল দিতে শুরু কর আলী নকির।

আহমদ মুসার বোটের হেড লাইট এবার সাইমুমের কোডে সিগন্যাল দিতে শুরু করল।

মাত্র মিনিট খানেক পরে পাশের উপকূলে নীল আলো জ্বলে উঠল। নীল আলোটিও সাইমুমের কোডে সংকেত দিয়ে চলল।

আহমদ মুসা সেদিকে একবার তাকিয়ে বললেন, আলী নকীর এবার বোট তীরে নাও। ওটা আলী আজিমভের সংকেত।

কাস্পিয়ানের তীরে কুরা নদীর স্বাগত জানাবার মোহনায় এই 'কুদতলি' ককেশাস ক্রিসেন্টের একটা প্রধান ঘাটি।

আজ বাকুর ককেশাস ক্রিসেন্টের নেতা মুহাম্মদ বিন মুসা এবং এখানকার সাইমুম ইউনিট এর প্রধান আলী আজিমভ এসেছে আহমদ মুসা কে স্বাগত জানাবার জন্য। পরিকল্পনা অনুসারে স্বাগত জানাবার জন্য আসার কথা ছিল আল্লামা ইব্রাহীম এদতিনার। তাঁর শাহাদাতের পর ঠিক হয় আজ এখানে আসবে সালমান শামিল। কিন্তু সালমান শামিলও গত পরশু কিডন্যাপ হবার পর স্থানীয়ভাবে আলি আজিমভের সাথে মুহাম্মদ বিন মুসা এসেছে।

আহমদ মুসার বোট ধীরে ধীরে নোঙর করল অস্থায়ীভাবে তৈরি একটি কাঠের জেটিতে। জেটিতে দাঁড়িয়েছিল আলী আজিমভ এবং মুহাম্মদ বিন মুসা। তাদের পিছনে সাইমুম এবং ককেশাস ক্রিসেন্টের একদল মুজাহিদ। তাদের চোখে –মুখে আশা আনন্দের এক দীপ্তি। যেন অমূল্য এক সম্পদ তাদের হাতে এসে পৌঁছেছে।

বোট থেকে নামান হল এলুমিনিয়ামের এক সিঁড়ি।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন আহমদ মুসা। বিসমিল্লাহ্ বলে তিনি পা রাখলেন ককেশাসের মাটিতে।

ককেশাস ক্রিসেন্টের বাকুর প্রধান মুহাম্মদ বিন মুসার কাছ থেকে ককেশাস পরিস্থিতির দীর্ঘ রিপোর্ট নিয়েছেন আহমদ মুসা।

অবস্থা খুবই হতাশাব্যঞ্জক। ককেশাস ক্রিসেন্টের এবং মুসলিম সমাজের যারা মাথা ছিল তারা সবাই হারিয়ে গেছে। একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে সবার মধ্যে। সবাই মনে করছে 'হোয়াইট উলফ' অপ্রতিরোধ্য। আজারবাইজান সরকারও আতংক বোধ করছে, কিন্তু কিছু করতে নারাজ। তার ভয় হল, রাশিয়া

ও পশ্চিমা খৃষ্টান দেশগুলোর মদদ-পুষ্ট ‘হোয়াইট উলফ’ কে ক্ষ্যাপালে তার অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে। আর ক্ষ্যাপাবার স্কোপ ও তার নেই। রাশিয়া এবং পশ্চিমা দেশগুলোর রাষ্ট্রদূতরা পরিস্কার বলেছে, ‘হোয়াইট উলফ’ এর ব্যাপারে যেন আজারবাইজান সরকার কোন প্রকার নাক না গলায়। ‘হোয়াইট উলফ’ মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তির উৎখাতের জন্য কাজ করছে, আজারবাইজান সরকারের সাথে তাদের কোন বিরোধ নেই। ‘হোয়াইট উলফ’ মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তির উৎখাতে সফল হলে তাতে আজারবাইজান সরকারের ও লাভ। তার এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর হাত থেকে বাঁচবে। আজারবাইজান সরকার বাধ্য হয়ে এই পরামর্শ গলধঃকরন করেছে, কিন্তু এই কথা গুলো তারা বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করেনা। রাশিয়া ও পশ্চিমা  দেশসমূহের মদদ-পুষ্ট ‘হোয়াইট উলফ’ কি তা আজারবাইজান সরকার ভাল করেই জানে। যাদেরকে তারা মৌলবাদী বা সাম্প্রদায়িক বলছে তারাই জাতির মৌল শক্তি। এ মৌল শক্তির বিনাশ করতে পারলে মূল্যহীন আজারবাইজান সরকারকে কুপোকাত করা কোন সময়ের ব্যাপার নয়। এই বিষয়টা পরিষ্কার বুঝার পরেও আজারবাইজান সরকারের আজ করার কিছুই নেই। ‘ককেশাস ক্রিসেন্ট' কে গোপনে সাহায্য করতেও সে ভয় পায়। সে মনে করে 'হোয়াইট উলফ’-এর সর্বদর্শী চোখ থেকে সে কিছুই লুকাতে পারবেনা। মোট কথা একদম মুষড়ে পরা অবস্থা ককেশাসের মুসলমানদের। আল্লামা  ইব্রাহীম এদতিনা হারিয়ে যাবার পর সকলের অনেকখানি ভরসা ছিল ইমাম শামিলের বংশধর প্রতিভাবান তরুন সালমান শামিলের বুদ্ধিমত্তার ওপর। কিন্তু সে কিডন্যাপ হবার পর সকলের চোখে অন্ধকার নেমেছে।

ককেশাসের এই পরিস্থিতি আহমদ মুসার কাছে স্বাভাবিক বলেই মনে হল। সত্যই হোয়াইট উলফ এই পর্যন্ত যা করেছে তাতে কোন খুঁত নেই। ছাব্বিশজন মুসলিম নেতার অপহরনের কেস তিনি বিশদভাবে পর্যালোচনা করেছেন। ‘হোয়াইট উলফ’ কে এবং কারা তার চেনার কোন চিহ্নই তারা পেছনে রেখে যায়নি। এমন কি ঘটনার কোন সাক্ষীও নয়।

যেখানেই ‘হোয়াইট উলফ’ অপারেশনে গেছে সেখানকার কাউকেই সে বাঁচিয়ে রাখেনি। তাই জানা যায় না, অপহরণের কাজ কাদের দ্বারা, কিভাবে

ঘটল। এমন কি এ সংক্রান্ত কোন খবরও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। ‘হোয়াইট উলফ’-এর হুমকিতে সব পত্রিকাই নীরব হয়ে গেছে।

শুধু ব্যতিক্রম সালমান শামিলের ব্যাপারটা। তাকে অপহরণের প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হবার খবরও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরে তার কিডন্যাপের খবর বিস্তারিতই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। খবর বলে, কিভাবে সালমান শামিল একটা জীপ নিয়ে ইনস্টিটিউটের গেট দিয়ে বেরিয়ে আসে, কিভাবে একটা ট্রাক এসে তার জীপকে ধাক্কা দেয়, কিভাবে ছিটকে পড়ার পর উঠে বসতে চেষ্টা করে এবং কিভাবে একটা মাইক্রোবাস এসে তাকে তুলে নিয়ে যায়। তার সাথে বলে-দেশে ইদানিং সন্ত্রাসী তৎপরতা বৃদ্ধির কথা।

আহমদ মুসা ভেবে পেলনা, এই খবর প্রকাশ কিভাবে সম্ভব হল? নিউক্লিয়ার ফিজিক্স ইনস্টিটিউটের সালমান শামিল। ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ কি তাহলে এই ঘটনা প্রকাশের ব্যাপারে চেষ্টা করেছে বা চাপ দিয়েছে?

আহমদ মুসার চিন্তা স্রোতে বাধা পড়ল। হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল মুহাম্মদ বিন মুসা। বলল, জনাব আমাদের একজন লোককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

কোত্থেকে হারিয়েছে?

কুদতলি থেকে।

সে কি আমাকে দেখেছে কিংবা আমি আসার খবর জানে?

জানে, সে তখন উপকূলে হাজির ছিল।

খবর আপনি কখন পেয়েছেন।

এই মাত্র।

কে আপনাকে খবর দিয়েছে?

কুদতলি ‘ককেশাস ক্রিসেন্ট’- এর একজন কর্মী এসেছে।

কুদতলি থেকে কখন বেরিয়েছে সে?

বিকেলে।

এত দেরি কেন? ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন আহমদ মুসা।

রাস্তায় গাড়ি খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া প্রথমে সে ‘কুমুখী’তে যায়, তারপর এখানে আসে।

আহমদ মুসা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। বললেন তারপর, আমার অনুমান মিথ্যা না হলে আমি বলব আমাদের কুদতলি ঘাঁটি এতক্ষণে আক্রান্ত হয়েছে।

মুহাম্মদ বিন মুসা কোন কথা না বলেই সোফায় বসে পড়ল। তার মুখ শুকনো। চোখে-মুখে উদ্বেগ।

রাত তখন দশটা। আহমদ মুসা ভাবছিলেন চোখ বুজে। এক সময় চোখ খুলে মুহাম্মদ বিন মুসার দিকে তাকিয়ে বললেন, বাকুতে কতদিন ধরে আপনারা এই ঘাটিতে আছেন?

এক বছর।

আমার আশংকা হচ্ছে আজ রাতে এখানেও আক্রমণ হতে পারে।

কেমন করে বুঝলেন?

যে কর্মীকে ধরে নিয়ে গেছে তার কাছ থেকে নিশ্চিতভাবে আমার আসার খবর পাবে এবং সে খবর পাবার পর কোন সময় না দিয়ে সম্ভাব্য সকল স্থানে ওরা আঘাত হানবে।

আহমদ মুসা কথা শেষ করতেই টেলিফোন বেজে উঠল। মুহাম্মদ বিন মুসা গিয়ে টেলিফোন ধরল।

টেলিফোন ধরে কথা শুনতে শুনতে মুহাম্মদ বিন মুসার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠল।

তারপর টেলিফোন রেখে আতর্নাদ করে উঠল, মুসা ভাই আমাদের কুদতলি ঘাঁটি শেষ করে দিয়েছে। কেউ বাঁচেনি।

কখন আক্রমণ হয়েছে?

সন্ধ্যার পর পরই।

কে টেলিফোন করেছে?

কুদতলির পাঁচ মাইল পশ্চিমের একটি ছোট শহর থেকে আমাদের এক কর্মী।

আহমদ মুসা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, মুহাম্মদ বিন মুসা, এখনই কয়েকজন কর্মীকে কুদতলিতে পাঠাও সব বিষয় সরেজমিনে জানার জন্যে।

একটু থেমে আবার বললেন, 'কুমুখী' তে খবর পাঠাও এখনি যাতে সকলে ঘাঁটি ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র সরে যায়। আর এ ঘাঁটি থেকেও সবকিছু এবং সবাইকে এখনই সরিয়ে দাও। এ ঘাঁটিতে আজ শুধু তুমি, আজিমভ এবং আমি থাকব। বলে আহমদ মুসা চোখ বুজে সোফাতে গা এলিয়ে দিলেন।

তার মানস চোখে কুদতলি ঘাঁটির দৃশ্য। সারিবদ্ধ লাশ সেখানে। এদের মা, বাবা, ভাই-বোন, স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে সবাই আছে। তাদের বুক ফাটা কান্নায় কোন সান্ত্বনা দেয়া যাবে? চোখের কোণ ভারী হয়ে উঠল আহমদ মুসার।

আহমদ মুসা চোখ খুলে দেখল , মুহাম্মদ বিন মুসা নেই। সম্ভবত তার নির্দেশ পালন করতে বেরিয়ে গেছে।

সেদিন গভীর রাত। বাকুর 'ককেশাস ক্রিসেন্ট'-এর ঘাঁটিটার দক্ষিণ পাশ দিয়ে একটা বড় এ্যাভিনিউ। আর পূর্ব পাশ দিয়ে ছোট একটা রাস্তা। ছোট রাস্তাটা ঐ এ্যাভিনিউ থেকে বেরিয়েছে। বাড়ির পূর্ব ও উত্তর দিকটা বাগান ঘেরা।

রাত এগারোটায় আহমদ মুসা, আলীআজিমভ ও মুহাম্মদ বিন মুসা গ্যাস মাস্ক হাতে নিয়ে বাড়ির পেছন দিকের সুইপার প্যাসেজ দিয়ে বেরিয়ে এলেন। আহমদ মুসা মুহাম্মদ বিন মুসার দিকে চেয়ে বললেন, তুমি পূব দিকে বাগানে লুকিয়ে দক্ষিণ ও পূর্বের প্রাচীরে দিকে লক্ষ্য রাখ। আর আলী আজিমভ উত্তর দিকের প্রাচীরে। আমি পশ্চিম দিকে থাকছি। আমার ধারণা ওরা এলে বারটার আগে আসবে না। ওরা এলে আমি যেভাবে বলেছি কাজ করবে।

এক এক করে বারটা বাজার শব্দ উঠল বাকু মিউজিয়ামের পেটা ঘড়িতে।

ধীরে ধীরে রাস্তায় গাড়ির শব্দ, হর্ণের আওয়াজ কমে এল। নিস্তব্ধতা নেমে এল রাতের বাকুতে।

আহমদ মুসা নিশ্চিত 'হোয়াইট ওলফ'-এর কেউ যদি ককেশাস ক্রিসেন্টের এ ঘাঁটিতে ঢুকতে চায় তাহলে ফল বাগানের দিকটাই ব্যবহার করবে।

আহমদ মুসার অনুমান সত্য হল। রাত সাড়ে বারটার দিকে নিঃশব্দে একটা ছায়ামুর্তি উঠে এল প্রাচীরে ওপর। তারপর আরও দুজন।

প্রাচীরের এই অংশটা গাছের ছায়ায় অন্ধকার। কিন্তু আহমদ মুসার ইনফ্রারেড গগলস-এ সবছিু স্পষ্টভাবে ধরা পড়ল।

ওরা তিনশন নিঃশব্দে প্রাচীর থেকে নামল। কিছুক্ষণ দাড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাল। তারপর বিড়ালের মত নিঃশব্দে এগিয়ে চলল। ককেশাস ক্রিসেন্টের বাড়ির দিকে।

আহমদ মুসা মুখে তার গ্যাস মাস্ক ঠিক আছে কিনা দেখে নিয়ে তাদের পিছু নিলেন। কিন্তু কয়েক পা এগিয়েই পেছনে একটা শব্দ পেয়ে পেছনে ফিরে তাকালেন। দুজন লোক লাফিয়ে পড়েছে প্রাচীর থেকে ।তাদের হাতে লম্বা ব্যারেলের রিভলবার।

ওদিকে এক নিমেষ তাকিয়েই আহমদ মুসা চকিতে পাশের মোটা গাছটার আড়ালে সরে গেলেন।

পর মুহূর্তেই একটা নিউট্রন বুলেট এসে বিস্ফোরিত হল গাছটির পাশে, আহমদ মুসার থেকে এক হাতের মধ্যে। ভয়াবহ নিউট্রন বুলেটটির এত সান্নিধ্যে শিউরে উঠল আহমদ মুসার দেহ।

আহমদ মুসা বুঝতে পেরেছিলেন তার সামনে পেছনে দুদিকেই শত্রু। তাদের সময় দেয়া যাবে না। যে মুহূর্তে নিউট্রন বুলেট বিস্ফোরিত হল, সে মুহূর্তেই গাছের আড়াল থেকে আহমদ মুসার এম-১০ মেশিন রিভলবার গুলী বৃষ্টি করল পেছনের ঐ ছায়ামুর্তি লক্ষ্য করে।

সাইলেন্সর লাগানো এম-১০ থেকে চাপা শিষের মত একটা আওয়াজ বেরুল শুধু।

নিউট্রন বুলেট ছোঁড়ার পর ওরা উঠে দাড়িয়েছিল এগিয়ে আসার জন্যে। কিন্তু এম-১০ এর এক ঝাঁক বুলেটে ঝাঝঁরা হয়ে যেখানে দাড়িয়েছিল সেখানেই পড়ে গেল।

আহমদ মুসা গুলী ছোড়ার পর ফিরে দাড়িয়ে দেখলেন, সামনের চলমান তিনটি ছায়ামুর্তি থমকে দাড়িয়েছে।

আহমদ মুসা বুঝলেন পেছনের সাথীদের কি হয়েছে, কি ঘটেছে তা না দেখে ওরা আর সামনে এগুবে না।

ওদের থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্যে আহমদ মুসা সন্তর্পণে গাছের পশ্চিম পাশে চলে এলেন।

তারপর গাছের আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখলেন, তিনটি ছায়ামুর্তি নিশ্চলভাবে দাড়িয়েই আছে। বোধ হয় ঘটনা বুঝতে চেষ্টা করছে।

আরও কিছুক্ষণ পর ঝি-ঝি পোকার মত এক ধরণের শব্দ করে উঠল তাদের একজন।

ওটা ওদের সংকেত । কোন উত্তর ওরা পেল না।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ওরা তিনটি ছায়ামুর্তি হামাগুড়ি দিয়ে সর্ন্তর্পণে এগিয়ে আসতে লাগল।

আহমদ মুসা একহাতে টর্চ, অন্য হাতে এম-১০ নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল । ইচ্ছা করলে আহমদ মুসা খুব সহজেই তাদের হত্যা করতে পারেন। কিন্তু আহমদ মুসা 'হোয়াইট উলফ'কে জীবন্ত ধরতে চান। জানতে চান ওদেরকে।

ওরা গাছের সমান্তরালে আসতেই আহমদ মুসা টর্চের আলো ওদের ওপর ফেলে কঠোর কণ্ঠে বললেন, উঠে হাত তুলে দাড়াও। না হলে এম-১০ এর গুলী ঝাঁক এখনই তোমাদের ঝাঁঝরা করে দেবে।

টর্চের আলোর দিকে স্থির দৃষ্টি রেখেই তারা উঠে দাড়াচ্ছিল। দুচোখে থেকে তাদের হিংস্রতা ঝরে পড়ছিল। উঠতে গিয়ে তাদের একজন অকস্মাৎ ঝাপিয়ে পড়ল আহমদ মুসার ওপর।

আহমদ মুসা তাদের উপর স্থির দৃষ্টি রেখেছিলেন। মতলব বুঝতে পেরেই আহমদ মুসা লোকটি ঝাঁপিয়ে পড়ার সাথে সাথেই নিজেকে ডানপাশে একটু সরিয়ে নেন।

এইভাবে সরতে গিয়ে বামহাতের টর্চ নিভে যায়, কিন্তু এম-১০ এর ট্রিগার তার তর্জনি চেপে বসল। বেরিয়ে যায় এক ঝাঁক গুলী। সামনের দুজন অস্ফুট আর্তনাদ করে মুখ থুবড়ে পড়ে যায় মাটিতে। যে লোকটি আহমদ মুসার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সে আহমদ মুসার পাশেই উপুড় হয়ে পড়ে যায়। আহমদ মুসা

তাকে আর ওঠার সুয়োগ দেননি। এম-১০ ও টর্চ ফেলে দিয়ে তার ওপর ঝাপিয়ে পড়েন।

কিন্তু লোকটির কাছ থেকে কোন প্রতিরোধ আসে না। বরং তার শরীরে এক অস্বাভাবিক কম্পন অনুভব করেন আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা উঠে দাড়ান। টর্চ কুড়িয়ে নিয়ে তার ওপর টর্চের আলো ফেলে দেখে, লোকটি তার ডান হাতের আংটিটি কামড়ে ধরে আছে।

আহমদ মুসার আর বুঝতে বাকি থাকে না, আংঠিতে লুকানো ভয়ানক বিষ খেয়ে লোকটি আত্মহত্যা করছে।ধরা পড়া অবধারিত জেনেই সে এটা করেছে 'হোয়াইট উলফ'-এর এটাই বোধ হয় নির্দেশ যে, কারো জীবন্ত ধরা পড়া চলবে না।

আহমদ মুসা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে একটা শিস দিলেন।

সংকেত পেয়ে অল্পক্ষনের মধ্যেই আলী আজিমভ এবং মুহাম্মদ বিন মুসা এসে হাজির হল সেখানে।

আহমদ মুসা ওদেরকে সংক্ষেপে সব কথা বলে লাশগুলো বাগান থেকে টেনে নিয়ে এলেন আলোতে। দেখলেন, সবাই আর্মেনিয়।

তাদের পকেট হাতড়ে কিছুই পাওয়া গেল না। অস্রশস্র আর কিছুই নেই তাদের সাথে।

পরদিন সকাল। ককেশাস ক্রিসেন্টের বাকু পার্টির ড্রইংরুম।

আহমদ মুসা মহাম্মাদ বিন মুসাকে বললেন, লাশগুলোর ব্যবস্থা করেছ?

জি হ্যাঁ।

আজ তোমাদের প্রধান কাজ হল ককেশাস ক্রিসেন্টকে তার সব ঘাঁটি খালি করতে বলা। তুমি তোমার পক্ষ থেকে সবাইকে জানিয়ে দাও সবাইকে, পুরাতন ঘাঁটি ছেড়ে আজই নতুন ঘাটি যেন খুঁজে নেয়।

আজ মুহাম্মদ বিন মুসাকে খুব খুশি দেখাচ্ছে। গতকাল পর্যন্ত তরি মধ্যে যে ভয় আর হতাশার চিহ্ন ছিল আজ তা নেই। এই প্রথমবারের মত তারা 'হোয়াইট উলফ'-এর পাঁচজনকে হত্যা করতে পেরেছে, তাদের একটা মিশন তারা ব্যর্থ করতে পেরেছে। সে খুব খুশি যে, সাফল্য দিয়েই আহমদ মুসার যাত্রা শুরু

হয়েছে। ঐসময় আহমদ মুসার ঐ নির্দেশকে তার ভাল লাগল না। বলল, কেন জনাব? আমাদের জন্যে  কি এটা এখন খুব জরুরি?

হ্যাঁ, আমরা ওদের আক্রমণের অসহায় শিকার হতে পারি না।

কিন্তু আক্রান্ত না হলে তো আজকের এই সাফল্য আসতো না।

এইধরনের সাফল্যের জন্যে যে প্রস্তুতি আমাদের প্রয়োজন তা আমাদের নেই।

কিন্তু এই সরে পড়া 'আমরা ভীত' প্রমাণ করবে না?

তা করুক। শত্রু একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করুক। কিন্তু আমাদের এটা কৌশল।

শত্রুকে আমাদের ব্যাপারে অন্ধকারে ফেলে দেয়া। আমরা যেমন ওদের ঠিকানা জানি না তেমনি আমাদের ঠিকানাও ওদের কাছ থেকে মুছে ফেললাম।

ঠিক বলেছেন জনাব। খুশি হয়ে বলল, মুহাম্মদ বিন মুসা।

আমার আরও একটা নির্দেশ সবাইকে জানিয়ে দাও। সেটা হল আমাদের পরিচিত ও নেতৃস্থানীয় সব লোককে আজ থেকে আত্মগোপন করতে হবে। পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত কাউকে জনসমক্ষে আসা চলবে না।

এটা কেন জনাব? সম্ভব হবে কি এটা?

সম্ভব হতে হবে।

আমাদের লোকক্ষয় এড়াবার জন্যে এটা প্রয়োজন। তাছাড়া আমাদের পরিচিত ও নেতৃস্থানীয় লোকজন যদি জনসমক্ষে থাকে, তাহলে আমাদের নতুন ঘাঁটির সন্ধান 'হোয়াইট উলফ' দু'এক দিনেই বের করে ফেলবে।

আমি এখন বুঝতে পেরেছি জনাব। হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করে বলল মুহাম্মদ বিন মুসা।

হাসিমুখেই মুহাম্মদ বিন মুসা আহমদ মুসার নির্দেশ পালনের জন্য বেরিয়ে গেল।

হোয়াইট উলফের পাঁচজনকে মারতে পেরে মুহাম্মদ বিন মুসার খুশি ধরছে না। বলল আলী আজিমভ।

কিন্তু ওদের মৃত্যু আমাদের ক্ষতি করেছে, ওদের এই মৃত্যু আমি চাইনি। এঘটনা শত্রুকে আরও সাবধান ও সতর্ক করে দিয়ে গেল। বেঁচে থাকলে ওদের কাছ থেকে শত্রুর একটা সন্ধান আমরা পেতামই।

আলী আজিমভ কোন কথা বলল না, আহমদ মুসাও না।

আহমদ মুসা সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করলেন। তাঁর কপাল কুঞ্চিত। ভাবছেন তিনি।

কোন পথে এগুনো যায়? পথ কোথায় সামনে এগুবার? অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে কিভাবে লড়াই করা যায়?

মনে পড়ল আহমদ মুসার সালমান শামিলের কথা। সালমান শামিলের কিডন্যাপের মধ্যেই শুধু একটা আলোর ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু যারা কিডন্যাপ দেখেছে, যারা ঝুঁকি নিয়ে নিউজটা সংবাদপত্রে দিয়েছে, তারা কি আহমদ মুসার সাথে কথা বলতে রাজি হবে? আর্মেনিয়ার রাজধানী ইয়েরেভেনের ঐ সম্মানিত ইনস্টিটিউটের কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই খৃস্টান হবে। তাদের কোন প্রকার সহযোগিতা মুল্যবান হতে পারে।

আহমদ মুসার বিশ্বাস, 'হোয়াইট উলফ'-এর মেরুদন্ড যেহেতু খৃস্টান আর্মেনিয়া, তাই হোয়াইট উলফের মূল ঠিকানা ঐ ইয়েরেভেনেই হবে। যাই হোক অবিলম্বে তাঁর ইয়েরেভেনেই যাওয়া দরকার।

এই সময় মুহাম্মদ বিন মুসা ড্রইং রুমে প্রবেশ করল উসমান এফেন্দীকে নিয়ে কথা বলতে বলতে।

চিন্তায় বাধা পড়ল আহমদ মুসার। চোখ মেলে তাকালেন তিনি।

মুহাম্মদ বিন মুসা বলল, জনাব ইনি উসমান এফেন্দী। ইয়েরেভেন থেকে এসেছেন। আমাদের ইয়েরেভেন যুব শাখার কর্মী।

সালাম বিনিময়ের পর আহমদ মুসা তাকে বসতে বলে বললেন, ভালই হল আমি ইয়েরেভেন যেতে চাচ্ছি।

সত্যি? আপনার যাওয়া প্রয়োজন। চোখ উজ্জ্বল করে বলল উসমান এফেন্দী।

কেন প্রয়োজন মনে কর? প্রশ্ন করলেন আহমদ মুসা।

সালমান শামিলের অনুসন্ধানের জন্যে।

সন্ধানের কোন সুত্র পাওয়া যাবে সেখানে?

বলতে পারব না, তবে এটুকু শুনেছি- সালমান শামিল ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর ডঃ জনসনের খুব প্রিয় ছাত্র ছিল। দারোয়ানের কাছ থেকে আমি শুনেছি সালমান সেদিন সোজা গিয়ে ডঃ পল জনসনের কাছেই উঠেছিল। দেড় ঘন্টা ছিল সেখানে। সেখান থেকে বেরিয়ে ফেরার পথেই সে কিডন্যাপ হয়।

ঠিক বলেছ উসমান, আমরা তার সাহায্য চাইতে পারি সালমান শামিলের অনুসন্ধানের জন্যে।

সালমান শামিল তার প্রথম কিডন্যাপ প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে পালিয়ে উসমান এফেন্দীর ওখানেই উঠেছিল। আবার যেদিন সে কিডন্যাপ হয় সেদিন উসমান এফেন্দীর ওখান থেকেই যায়। বলল মুহাম্মদ বিন মুসা।

ঠিক আছে উসমান তুমি একটু বিশ্রাম নাও। পরে তোমার কাছ থেকে সব শুনব। আজই আমরা ইয়েরেভেনে রওয়ানা হতে চাই। বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়ালেন। প্রবেশ করলেন তাঁর বিশ্রাম কক্ষে।

সেদিনই বাদ আসর।

একটা জীপ দাঁড়িয়েছিল বাকু ককেশাস ক্রিসেন্টের নতুন ঘাঁটির সামনে। জীপের ড্রাইভিং সিটে স্টিয়ারিং ধরে বসেছিল উসমান এফেন্দী। পাশের সিটে আলী আজিমভ।

পেছনের সিটে গিয়ে উঠলেন আহমদ মুসা। লাগেজ এর আগেই উঠেছে। সকলেরই পরনে আর্মেনিয় পোশাক।

মাথায় খৃস্টানদের মত শোলার ক্যাপ।

জীপে উঠে আহমদ মুসা বললেন, উসমান তুমি রেডি?

জি হ্যাঁ। উত্তর দিল উসমান এফেন্দী।

মুহাম্মদ বিন মুসা ও 'কুমুখী'র ককেশাস ক্রিসেন্টের প্রধান লতিফ করিমভ জীপের দরজায় আহমদ মুসার সামনে দাঁড়িয়ে।

আহমদ মুসা তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা সাবধানে থেকো। পরিকল্পনার বাইরে যেও না। মনে রেখ ইতিমধ্যেই যথেষ্ঠ ক্ষতি আমাদের হয়েছে। অহেতুক ক্ষতি অর্থাৎ তাদের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে আমরা যেন ক্ষতির শিকার না হই সে চেষ্টা আমাদের করতে হবে।

তারপর উসমানের দিকে ফিরে বললেন, বিসমিল্লাহ বলে স্টার্ট দাও উসমান।

উসমান এফেন্দী চাবি ঘুরাতেই গর্জে উঠল ইঞ্জিন।

জীপের দরজায় দাঁড়ানো মুহাম্মদ বিন মুসা ও লতিফ করিমভ বলল, আপনার সব নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হবে জনাব।

আল্লাহ সহায় হোন। বললেন আহমদ মুসা।

সচল হল গাড়ি। ছুটে চলল তারপর ইয়েরেভেনের দিকে।

আহমদ মুসার দৃষ্টি সামনের দিকে প্রসারিত। ভাবছেন তিনি, ইয়েরেভেন শুধু আর্মেনিয় রাজধানী নয়, 'হোয়াইট উলফ'-এরও রাজধানী। কম্যুনিষ্ট ও খৃস্টান শক্তির মানস সন্তান 'হোয়াইট উলফ' -রহস্যময় রাজধানী কি তাকে দরজা খুলে দেবে? আল্লাহ তাকে তাওফিক দেবেন রক্ষা করতে ককেশাসকে, ককেশাসের মজলুম মুসলমানদেরকে? ভেবে চলেছেন আহমদ মুসা।

জীপ তখন ছুটে চলেছে ফুল স্পীডে বাকু-নাগারনো কারাবাখ সড়ক হয়ে ইয়েরেভেনের দিকে।

পরবর্তী বই

# ককেশাসের পাহাড়ে

# কৃতজ্ঞতায়ঃ


1. Shaikh Noor-E-Alam
2. Ismail Jabihullah
3. Rabiul Islam
4. AMM Abdul Momen Nahid
5. Rubel Hasan Mon
6. Foysal Ahmad
7. Iftikhar Tariq
8. Abdullah Mohammad Choton
9. Mohammad Rayhan
10. Md. Samsuzzaman
11. Kamrul Alam
12. Gaziur Rahman
13. Abdullah Al Mamun
14. Rashel Ahmed
15. Khondakar Moniruzzaman
16. Salahuddin Nasim
17. Osman Gani
18. A.S.M Masudul Alam
19. Jahedul Islam
20. Munjur Morshed
21. Anisur Rahman
22. Mostaque Ahmad
23. Sabuz Miah
24. Muhammad Shahjahan
25. Umayir Chowdhury
26. Asma Jahan
27. Ridwan Mahmud
28. Bondi Beduyin
29. Nazrul Islam
30. Esha Siddique

সাইমুম-৯

# ককেশাসের পাহাড়ে

আবুল আসাদ

# ১

আরাকস হাইওয়ে ধরে ছুটে চলছিল আহমদ মুসার জীপ।

বাকু থেকে পনের মাইল পশ্চিমে এসে নগরন-কারাবাখ সড়ক উত্তর-পশ্চিমে এগিয়ে গেছে। এখান থেকে আরেকটা হাইওয়ে বেরিয়ে গেছে দক্ষিণ-পশ্চিমে একেবারে আরাকস নদীর তীর ঘেঁষে। এটাই আরাকস হাইওয়ে। আরাকস নদীর তীর ঘেঁষে এই হাইওয়ে এগিয়ে গেছে ইয়েরেভেনের পাশ দিয়ে আরও উত্তরে। ইয়েরেভেন পর্যন্ত দীর্ঘ পাঁচশ' মাইলের এই সফর।

আরাকস ও কুরা বিধৌত সবুজ উপত্যকার মধ্যে দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল আহমদ মুসার জীপ।

নগরন-কারাবাখ সড়ক হয়ে ইয়েরেভেন অনেক সংক্ষিপ্ত পথ। প্রায় ১শ' মাইলের মত কম। কিন্তু তবু আহমদ মুসারা আরাকস হাইওয়েই বেছে নিয়েছে। নগরন-কারাবাখ সড়কের উপর হোয়াইট ওলফ নাকি হঠাৎ করে খুব নজর রাখতে শুরু করেছে। ইয়েরেভেন থেকে আসার পথে ওসমান এফেন্দীর গাড়ি তিনবার চেক করা হয়েছে, তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। কি পরিচয়, কোথায় যাবে, কেন যাবে ইত্যাদি। যারা চেক করেছে তারা স্বেচ্ছাসেবকের ব্যাজ পরা। কিন্তু ওসমান এফেন্দীর বুঝতে কষ্ট হয়নি, কোন রুটিন চেক এসব নয়।

স্বেচ্ছাসেবকদের কাছে স্টেনগান থাকে না, তাদের আচরণও অমন রুক্ষ্ম ও অসৌজন্যমূলক হয় না। ওসমান এফেন্দী যুক্তি দেখিয়েছে, আরাকস হাইওয়ে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ হবে। পাহাড়ের দেয়ালের পাশ ঘেঁষে সুদৃশ্য উপত্যকা বেয়ে প্রবাহিত সুন্দর নদী আরাকস-এর তীর বরাবর আরাকস হাইওয়েতে সাধারণত বিদেশি পর্যটকদেরই ভিড় থাকে বেশি। এসব চিন্তা করেই ওসমান এফেন্দী আরাকস হাইওয়েই পছন্দ করেছে।

আহমদ মুসার গাড়ি প্রায় তীর বেগে দেড়শ' মাইল রাস্তা পেরিয়ে এল। রাস্তা প্রায় ফাঁকা, কোনই ঝামেলা হয়নি। আজারবাইজান সীমান্ত পেরুবার সময় একবার রুটিন চেক হয়েছে। কিন্তু সীমান্ত পেরুবার পর আর্মেনিয়া প্রবেশের সময় একটু বেশি জিজ্ঞাসাবাদ করেছে আর্মেনীয় পুলিশরা। এ ধরনের জিজ্ঞাসাবাদ নাকি আগে ছিল না। কিন্তু হোয়াইট ওলফের তৎপরতা শুরু হবার পর এটা হচ্ছে। নানা ঘটনা ও গুজবে আতংকিত হয়ে অনেক আর্মেনীয় মুসলিম পরিবার না কি ইরান ও তুরস্কে প্রবেশ করেছে। এতে আর্মেনিয়ার বদনাম হচ্ছে। এজন্যে আর্মেনীয় পুলিশরা ইরান ও তুরস্ক সীমান্ত বরাবর এখন একটু বেশি নজর রাখছে। স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে সাথে থাকলে না কি এ সীমান্ত পথে কাউকে চলতেই দিচ্ছে না। আহমদ মুসারা সে ক্যাটেগরিতে না পড়ায় একটু জিজ্ঞাসাবাদ বেশি করলেও বেশিক্ষণ তাদের আটকায়নি।

আরও ৫০ মাইল পেরুবার পর আগারাক শহর। আরাকস নদী-তীরের শিল্প নগরী। বলা যায় দক্ষিণ আর্মেনিয়ার প্রধান নগরী।

নগরীর পূর্ব প্রান্তে পাহাড়ের দেয়াল। দেয়ালটি নেমে গেছে একেবারে নদীর পানিতে। পাহাড়ে সুড়ঙ্গ করে আরাকস হাইওয়ে এগিয়ে নেয়া হয়েছে।

পাহাড়ের উপরিভাগ বরফে সাদা। নিচের অংশে সবুজের সমারোহ। একদম পাহাড়ের গোড়ায় গাছগুলো বেশ বড়।

সুড়ঙ্গের মুখ দু'শ গজের মত দূরে তখন। মাত্র ৭০ কিলোমিটার বেগে বলা যায় অত্যন্ত ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে আহমদ মুসার জীপ। সুড়ঙ্গের ভেতরটা অন্ধকার। দূর থেকে সুড়ঙ্গের ভেতরের বিদ্যুৎ বাতিগুলোকে মনে হচ্ছে বাঘের চোখের মত।

আহমদ মুসা তার সিটে গা এলিয়ে দিয়েছিল। চোখটা তখন ধরে এসেছিল তার।

হঠাৎ আলী আজিমভের ডাকে তন্দ্রার ভাবটা কেটে গেল আহমদ মুসার।

চোখ মেলে তাকাতেই তার চোখ গিয়ে পড়ল সোজা সুড়ঙ্গের মুখে। দেখল, স্টেনগান হাতে দু'জন দাঁড়িয়ে সুড়ঙ্গের মুখে একদম রাস্তার উপর। দীর্ঘকায় দু'জন লোক। কাল ওভারকোট ওদের হাঁটুর অনেকখানি নিচ পর্যন্ত নেমে গেছে। মাথার হ্যাট কপাল পর্যন্ত নামানো।

ওরা তো পুলিশ নয় দেখছি। বলল আহমদ মুসা।

জ্বি, ওরা পুলিশ নয়। বলল ওসমান এফেন্দী।

যেই হোক, ওরা আমাদেরকে বড় রকমের কিছু সন্দেহ করেনি। ওদের স্টেনগানের মাথা নিচের দিকে নামানো।

বলতে বলতে জীপটি সুড়ঙ্গের মুখে এসে পড়ল।

আহমদ মুসা তার মাথার হ্যাটটা কপালের উপর আরেকটু টেনে দিল।

সুড়ঙ্গের মুখেই রাস্তার মাঝখানে ওরা দাঁড়িয়েছিল। দু'জনেই তারা তাকিয়েছিল গাড়ির দিকে।

জীপ একদম ওদের প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়াল। গাড়ি দাঁড়াতেই দু'জনের একজন ধীরে হেঁটে গাড়ির পাশে চলে এল। ওদের স্টেনগানের মাথা তখনও নিচে নামানো।

লোকটি ওসমান এফেন্দীর জানালার পাশে এসে বাম হাতটা জানালার উপর রেখে মাথা নিচু করল। তার ডান হাতে ঝুলছে স্টেনগানটি।

ওসমান এফেন্দী জানালা দিয়ে মুখ বের করে বলল, কি ব্যাপার?

তার কথায় উত্তর আর্মেনিয়ার আঞ্চলিক ভাষার টান।

তোমরা আসছ কেত্থেকে? বলল লোকটি।

বাকু থেকে। বলল ওসমান এফেন্দী।

যাবে কোথায়?

ইয়েরেভেন।

থাক কোথায়?

ইয়েরেভেন।

কি কর?

ফলের ব্যবসা। ইয়েরেভেনে দু'টি ফলের দোকান আছে।

ওরা?

সবাই আমরা এক সাথে থাকি।

তোমার নাম?

ওসমান।

মুসলমান তুমি?

হ্যাঁ।

মনে হল লোকটির ভ্রু কুঞ্চিত হলো। বলল, দেখি তোমার কার্ড।

ওসমান এফেন্দী তার বুক পকেট থেকে আর্মেনিয়ার নাগরিক কার্ড বের করে দিল লোকটির হাতে।

আহমদ মুসা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছিল লোকটিকে। শক্ত-সমর্থ মাঝ বয়েসি লোক। দেখলেই বুঝা যায় পরিশ্রমী পেশীবহুল শরীর। তবে মুখটা বোকা বোকা।

লোকটা ওসমান এফেন্দীর আইডেনটিটি কার্ড হাতে নিয়ে চশমা বের করার জন্যে ওভারকোটের ভেতরের পকেটে হাত দিল।

হ্যাটের নিচ দিয়ে আহমদ মুসার দু'টি চোখ স্থির নিবদ্ধ ছিল লোকটির উপর। চশমা বের করার সময় লোকটির ওভারকোটের একটা অংশ উল্টে গেল। কোটের কাল ব্যান্ডের উপর একটা সাদা ব্যাজ ঝলমল করে উঠল। বাঘের একটা সাদা মুখ হা করে আছে স্পষ্টই বুঝা গেল। একটা উষ্ণস্রোত বয়ে গেল যেন আহমদ মুসার সমগ্র স্নায়ুতন্ত্রী জুড়ে। জীবন্ত এক 'হোয়াইট ওলফ' তার সামনে। ধীরে ধীরে হাতটি চলে গেল পিস্তলের বাঁটে। মন বলল, ওকে গাড়িতে তুলে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া যায়। অনেক জানার আছে ওর কাছ থেকে। কিন্তু মনকে সান্ত্বনা দিল আহমদ মুসা। ওরা আক্রমণ না করলে ওদের ফাঁদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ওদের গায়ে হাত দেয়া ঠিক হবে না। আপাতত লক্ষ্য আমাদের ইয়েরেভেন। ধৈর্য্য ধরতে হবে।

লোকটি ওসমান এফেন্দীর কার্ডের উপর নজর বুলিয়ে বলল, তুমি তো ইয়েরেভেনেরই লোক। ব্যবসায়ী। আবার মুসলমান কেন?

আমার পরিবার মুসলিম।

লোকটি মুখ ভেংচিয়ে কার্ডটি গাড়ির মধ্যে ছুড়ে দিয়ে বলল, যা, তবে মনে রাখিস, হয় মুসলমানি ছাড়বি, না হয় দেশ ছাড়বি।

বলে স্টেনগানের নল দিয়ে গাড়িতে এক গুঁতো দিয়ে একটু সরে দাঁড়াল।

গাড়ির সামনে দাঁড়ানো লোকটিও সামনে থেকে সরে এ লোকটির দিকে এগিয়ে এল।

এমন সময় সুড়ঙ্গের ডান পাশের গাছের আড়াল থেকে একজন লোক দ্রুত বেরিয়ে এল লোক দু'টির দিকে। কি যেন ইশারা করল লোক দু'টিকে।

গাড়ি তখন নড়ে উঠেছে, ঘুরতে শুরু করেছে জীপের চাকা। সেই সময় কার্ড চেক করা সেই লোকটি হাত তুলে চিৎকার করে উঠল, দাঁড়াও, দাঁড়াও।

গাড়ি তখন ছুটতে শুরু করেছে। ওসমান এফেন্দী একবার জানালা দিয়ে লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে শক্ত হাতে চেপে ধরল স্টিয়ারিং হুইল।

আহমদ মুসা পেছন ফিরে দেখল, ওরা কয়েক গজ ছুটে এসে তারপর দাঁড়িয়ে গেল। চেয়ে রইল গাড়ির দিকে।

তৃতীয় লোকটা কিছু মেসেজ নিয়ে এসেছিল মনে হয়। বলল আলী আজিমভ।

আহমদ মুসা পেছন থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, হবে হয়তো।

তার দৃষ্টি সামনে প্রসারিত।

ভাবছে সে। হোয়াইট ওলফ বড় আট-ঘাট বেঁধেই নেমেছে। দেখা যাচ্ছে, সর্বত্রই চোখ রেখেছে ওরা।

আগারাক শহর ডাইনে রেখে ছুটে চলল আহমদ মুসার জীপ আরাকস হাইওয়ে ধরে। আরও ২৫ মাইল চলার পর আর্মেনিয়ার সীমান্ত অতিক্রম করে গাড়ি আজারবাইজানের ছিটমহলে প্রবেশ করল। আজারবাইজানের এই এলাকাটা আজারবাইজান থেকে বিচ্ছিন্ন একেবারে আর্মেনিয়ার পেটের ভেতর। এর পশ্চিম সীমান্তে ইরান। উত্তরের কিছু অংশে তুরস্কের সাথে বর্ডার আছে।

আরাকস নদীই ইরান ও তুরস্ক থেকে আজারবাইজানের এই ছিটমহলকে বিচ্ছিন্ন করেছে।

আজারবাইজানের এ ছিটমহল অবস্থানগত দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফসলপূর্ণ উপত্যকা এবং মূল্যবান বন আচ্ছাদিত পাহাড় অধ্যুষিত এ ছিটমহলে ৬ লাখের মত মুসলমানের বাস। ইরান ও তুরস্কের মুসলমানদের সাথে এদের গভীর সম্পর্ক। আরাকস নদী পার হলেই এরা ইরান ও তুরস্কে প্রবেশ করতে পারে। হোয়াইট ওলফের অভিযোগ, আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ইরান ও তুরস্কের হস্তক্ষেপের একটা বড় চ্যানেল হলো এই ছিটমহল। হোয়াইট ওলফের এ অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই। পশ্চিমী প্রভাবের অধীন ধর্মনিরপেক্ষ তুরস্ক এখানে কোন তৎপরতা পরিচালনার উৎসাহই রাখে না, আর নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত শিয়া ইরান এদিকে তাকাবার কোন সময়ই পায় না। কিন্তু ভিত্তিহীন এ অভিযোগ তুলেই হোয়াইট ওলফরা আর্মেনিয়ার পেটের ভেতরের এ ছিটমহলে মুসলমানদের উপর নিপীড়ন চালাচ্ছে।

প্রায় জনবিরল আরাকস হাইওয়ে ধরে আহমদ মুসার জীপ এগিয়ে চলেছে। জীপের গতি এবার উত্তর-পশ্চিমে।

দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ আহমদ মুসারা লেক আরাকস অর্থাৎ আরাকস হ্রদের তীরে গিয়ে পৌঁছাল। এখানে এসে আরাকস নদী বিশাল আরাকস হ্রদে মিশে গেছে। আরাকস হ্রদের পশ্চিমে ইরান এবং পূর্ব পাড়ে আজারবাইজানের ছিট মহলটি। দুই দেশের সীমানা হ্রদের মাঝ বরাবর। হ্রদের পশ্চিমাংশ ইরানের এবং পূর্বাংশ আজারবাইজানের। হ্রদের ইরানী অংশের নাম লেক লিবার্টি এবং আজারবাইজানের অংশের নাম লেক আরাকস।

আরাকস হ্রদে এসে আরাকস হাইওয়ে একটু পূর্ব দিকে বেঁকে আরাকস হ্রদের পূর্ব তীর ধরে উত্তরে এগিয়ে গেছে।

আহমদ মুসার জীপ হ্রদের পূর্ব তীর ধরে এগিয়ে চলল। আরাকস হাইওয়ে এখানে এসে বেশ উচুঁ-নিচু। বেশ দুর্গম। বামে হ্রদ, ডাইনে পাহাড় এবং উপত্যকা। কোথাও কোথাও পাহাড় কেটে কিংবা সুড়ঙ্গ করে রাস্তা এগিয়ে নেয়া হয়েছে।

একটা সুন্দর উপত্যকা দিয়ে এগিয়ে চলছিল জীপ। উপত্যকাটা খুব প্রশস্ত নয়। কিন্তু খুব সুন্দর। ঢালু হয়ে নেমে গেছে হ্রদের পানিতে। ডাইনে পূর্বদিকে গাড়ির জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখল, দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে বহুদূর এগিয়ে গেছে উপত্যকাটি। উপত্যকার উত্তর প্রান্তের পাহাড়টি ধাপে ধাপে উঠে গেছে উপরে। পাহাড়ের গায়ে সবুজ গাছের সমারোহ। একদৃষ্টে আহমদ মুসা তাকিয়েছিল সে সবুজ রূপের দিকে। হঠাৎ আহমদ মুসার চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, ওসমান গাছের ফাঁকে ফাঁকে পাহাড়ের ধাপে ওগুলো দ্রাক্ষা কুঞ্জ নয়?

জ্বি, মুসা ভাই। এ এলাকায় প্রচুর দ্রাক্ষা জন্মে। উপত্যকায় ধান গমও প্রচুর হয়। বলল ওসমান এফেন্দী।

কিন্তু উপত্যকায় তো ফসল দেখছি না?

না মুসা ভাই, উপত্যকায় ধানের ক্ষেত ছিল। একটু খেয়াল করে দেখুন ধান গাছের পুড়ে যাওয়া গোড়া দেখতে পাবেন।

গাড়ি থামাও তো ওসমান।

গাড়ি থেমে গেল। নেমে পড়ল আহমদ মুসা, আলী আজিমভ এবং ওসমান এফেন্দী সকলেই।

আহমদ মুসা উপত্যকার বুকে ভালো করে চোখ বুলিয়ে দেখল, ধানগাছের গুচ্ছাকায় গোড়াগুলো পোড়া। উপত্যকা বিস্তারিত বুক জুড়ে একই দৃশ্য-বিস্তৃত বিরান ক্ষেত।

আহমদ মুসা মুখ তুলে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে ওসমান এফেন্দীর দিকে তাকাল।

ওসমান এফেন্দী বলল, ক্ষেত পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে মুসা ভাই। হোয়াইট ওলফ পুড়িয়েছে। এ এলাকার বাসিন্দাদের শতকরা একশ ভাগই ছিল মুসলমান। উপত্যকা, পাহাড়ের গায়ে ফসল ফলিয়ে তারা জীবিকা নির্বাহ করত। যুগ যুগ ধরে তারা সুখ শান্তিতে বসবাস করে এসেছে। কিন্তু গত এক বছর ধরে হোয়াইট ওলফের অত্যাচার এ অঞ্চলকে বিরান করে দিয়েছে। হত্যা, লুটতরাজ, ফসলের

ক্ষেত জ্বালিয়ে দেয়ার মাধ্যমে মুসলিম জনপদগুলোকে তারা উৎখাত করেছে। সীমান্ত এলাকায় এখন কোন লোক নেই। যারা মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচেছে, তারা পালিয়ে বেঁচেছে। এই আরাকস হ্রদ, আরাকস নদী পাড়ি দিয়ে তারা ইরান ও তুরস্কে চলে গেছে।

এখনও চলছে এই অত্যাচার?

জ্বি, হ্যাঁ। আজারবাইজানের মূল ভূখন্ড ও আর্মেনিয়া অঞ্চলের চাইতে বিচ্ছিন্ন এই অঞ্চলে অত্যাচার ও উৎখাত অভিযান বেশি তীব্র।

আহমদ মুসা চোখ তুলে চাইল উপত্যকার প্রসারিত বুকের দিকে। উদাস, লক্ষ্যহীন তার দৃষ্টি। সেখানে বেদনার অন্তহীন ছায়া। শত মানুষের তপ্ত দীর্ঘ নিঃশ্বাস যেন সে অনুভব করতে পারছে, তাদের কান্না, অসহায়দের চিৎকার তার কানকে যেন বিদীর্ণ করছে। আহমদ মুসা ধানগাছের একটা গোড়া তুলে নিয়ে তাতে চুমু খেল। ধানগাছের গোড়ায় ওদের মমতাময় অশরীরি স্পর্শ যেন অনুভব করল আহমদ মুসা।

ধানগাছের গোড়া হাতে নিয়ে আহমদ মুসা একটু সামনে এগুলো।

উপত্যকার মাঝখান দিয়ে একটা ঝর্ণার ক্ষীণ ধারা বয়ে চলেছে। ঝর্ণাটা পড়ছে গিয়ে হ্রদে।

আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, এস আমরা ঝর্ণায় অজু করে নেই। যোহরের সময় হয়ে গেছে। অজু সেরে আহমদ মুসা বলল, ওসমান তুমি গাড়ি একটু এগিয়ে পাহাড়ের গোড়ায় নিয়ে রাখ। রাস্তা থেকে নামিয়ে রাখবে, গাড়ি আসতে পারে। আমরা আর একটু এগিয়ে নামাজ পড়ব।

উপত্যকার উত্তর প্রান্তে পাহাড়ের প্রায় গোড়ায় একটা মসৃণ জায়গা দেখে ওরা নামাজে দাঁড়াল। আলী আজিমভ আজান দিতে চেয়েছিল। আহমদ মুসা বাঁধা দিয়ে বলল, আমরা রণাঙ্গনে, আজান না দিলেও চলবে।

ফরজ নামাজের সালাম ফেরানোর পর ফিরে বসতে গিয়ে পেছনের দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠল আহমদ মুসা। একজন যুবক দাঁড়িয়ে।

ফর্সা, দীর্ঘাঙ্গ যুবক। পরনে কাল প্যান্ট, গায়ে সাদা চাদর জড়ানো।

আহমদ মুসা তার দিকে চাইতেই সে এগিয়ে এল। একটু একটু খোঁড়াচ্ছে সে। আহমদ মুসা দেখল, তার বাম পায়ে ব্যান্ডেজ।

আহমদ মুসাকে বিস্মিত চোখে পেছনে তাকাতে দেখে আলী আজিমভ এবং ওসমান এফেন্দীও পেছনে তাকিয়েছে। সবার চোখেই প্রশ্নবোধক দৃষ্টি।

যুবকটি আরও কাছে এসে সালাম দিল। আহমদ মুসারা সালাম নিল। কিন্তু তারা কিছু বলার আগেই যুবকটি বলল, আমার নাম আবদুল্লাহ।

একটু দম নিয়েই যুবকটি বলল, আপনারা এখানে নিরাপদ নন। ওরা আবার ফিরে আসতে পারে।

ওরা কারা? বলল আহমদ মুসা।

পশুবাহিনী।

হোয়াইট ওলফকে আজারবাইজানিরা স্থানীয় ভাবে পশুবাহিনী বলে, ওদের পশুর মত আচরণের জন্যে।

তোমরা কে? আবার প্রশ্ন করল আহমদ মুসা।

প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে বলল, আমরা ওই উপরে জঙ্গলে লুকিয়ে আছি। এখানে আর দেরি করা যাবে না। চলুন উপরে, সব শুনবেন।

আহমদ মুসা আলী আজিমভ ও ওসমান এফেন্দীর দিকে চেয়ে বলল, চল যাওয়া যাক।

উঠে দাঁড়িয়ে গাড়ির দিকে চেয়ে আহমদ মুসা মনে মনে বলল, পাহাড়ের খাঁজে ঝোপের আড়ালে আছে, হঠাৎ করে গাড়ি কারও নজরে পড়বে না। তারপর ওসমান এফেন্দীর দিকে চেয়ে আহমদ মুসা বলল, গাড়িতে চাবি লাগিয়েছো তো?

জ্বি, হ্যাঁ। ওসমান বলল।

জঙ্গল ঠেলে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ওরা উপরে উঠতে লাগল। উঠতে উঠতেই আহমদ মুসা আবদুল্লাহর কাছ থেকে শুনলো, এই উপত্যকা থেকে পূর্বে প্রায় মাইল পনেরো ভেতরে সানাইন গ্রামে তাদের বাড়ি। আজই সকালে তারা কয়েকটি পরিবার পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে এই জঙ্গলে। তিনদিন আগে সেদিন গভীর রাতে হোয়াইট ওলফের লোকরা এসে গ্রামের বাড়িগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়। ঘুমন্ত গ্রামের নারী-শিশু-পুরুষ যারা বের হতে পারেনি, তারা পুড়ে

মরেছে। আবার যারা বের হয়েছে তারাও পশুদের ব্রাশফায়ারের মুখে পড়েছে। ফলে আগুন থেকে যারা বেঁচেছিল, তারা অধিকাংশই ব্রাশফায়ারে মারা গেছে। অঞ্চলের সবচেয়ে বড়, বর্ধিষ্ণু সানাইন গ্রামের ২ হাজার বাসিন্দার মধ্যে মাত্র ৫০ জন বেঁচে আছে। যারা বেঁচে আছে তাদের মধ্যে অনেকেই আহত। আবদুল্লাহর পায়েও গুলি লেগে ছিল। সানাইনের পাশের জঙ্গলে তারা দু'দিন পালিয়ে ছিল। মনে করেছিল, পশুরা চলে গেলে বিরানভূমিতেই তারা মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে। বিশেষ করে আব্দুল্লাহর আব্বা, সমাজের নেতা, কিছুতেই দেশ ছাড়তে রাজি ছিলেন না। তার কথা ছিল, অনেকেই গেছে ঠিক, কিন্তু সবাই চলে গেলে দেশের কি হবে? কিন্তু থাকা গেল না। দেখা গেল, তারা গ্রাম ছাড়ছে না। গ্রামে খৃস্টান বসতি গড়ার পরিকল্পনা তাদের।

আব্দুল্লাহ্ বলল, অবশেষে হিজরতেরই সিদ্ধান্ত নিতে হল আমাদের। লেক আরাকস পথে ইরানে প্রবেশ করা সবচেয়ে নিরাপদ। লেক আরাকসের মাঝ বরাবর উভয় দেশের সীমানা হওয়ায় লেক আরাকসে একবার ভাসতে পারলেই নিরাপদ হওয়া যায়। এই কারণে এই এলাকার বেশির ভাগ লোক এ পথেই হিজরত করেছে।

আমরাও সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে গত সন্ধ্যায় সানাইন থেকে বের হয়ে এলাম।

সম্ভবত পশুদের চর ছড়ানো ছিল চারদিকে। আমাদের এই হিজরত তারা টের পেয়ে যায়। আমাদের পিছু নেয় ওরা। আজ সকালে এই জঙ্গলে আমরা আশ্রয় নেয়ার এক ঘন্টা পরেই ওরা এই উপত্যকায় এসে পৌঁছে। এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজির পর ওরা সরে গেছে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, ওরা চলে যায়নি। কোথাও ওঁৎ পেতে আছে নিশ্চয়।

তোমরা চলে যাচ্ছ জেনেও ওরা তোমাদের ধরার জন্যে এমন মরিয়া হয়ে উঠেছে কেন? বলল আহমদ মুসা।

আগে চলে যেতে ওরা দিয়েছে, কিন্তু ইদানিং ওরা আর চলে যেতে দিচ্ছে না। একেবারে নির্মূল করার পরিকল্পনা নিয়েছে। সম্ভবত ইরান ও তুরস্কে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান থেকে অনেক উদ্বাস্তু যাওয়ার পর দুনিয়াতে যে হৈ চৈ শুরু হয়েছে, তার কারণেই তারা এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

কথা বলতে বলতে পাহাড়ের প্রশস্ত একটা ধাপে ওরা এসে উঠল। বলা যায় পাহাড়ের বুকে যেন একটা সবুজ উপত্যকা।

ধাপে উঠতেই জঙ্গল ফুঁড়ে যেন একটা যুবক বেরিয়ে এল। তার হাতে একটা বন্দুক। সে নরম গলায় সালাম দিল আব্দুল্লাহকে।

সালাম নিয়ে আব্দুল্লাহ আহমদ মুসাদের দেখিয়ে বলল, এরা আমাদের ভাই।

যুবকটি সলজ্জ হাসিতে সালাম দিল আহমদ মুসাদের।

সালামের জবাব দিয়ে আহমদ মুসা যুবকটিকে জিজ্ঞেস করল, তোমার নাম কি ভাই?

আলী। আমার চাচার ছেলে। আব্দুল্লাহ জবাব দিল।

কথা শেষ করে আলীর দিকে তাকিয়ে আব্দুল্লাহ জিজ্ঞেস করল, আব্বা কোথায়?

পূর্ব প্রান্তের একটা বড় গাছের দিকে ইংগিত করে আলী বলল, ওখানে শুয়ে আছেন।

আব্দুল্লাহ আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, চলুন যাই।

সামনে এগিয়ে চলল আহমদ মুসারা। চারদিকে ছোট ছোট গাছ আর দ্রাক্ষালতার দেয়াল। এরই ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে মানুষ। সবাই এদিক সেদিক বসে আছে, দু'একজন শুয়ে আছে। সবারই মুখ শুকনো, দৃষ্টি উদাস। একটা গাছের তলায় দশ বার জন মেয়েকে দেখা গেল। সবারই মুখ নিচু, চুপচাপ বসে আছে। বেদনার ভারে ওরা যেন ন্যুব্জ।

আব্দুল্লাহ বলল, যাদের দেখছেন, সবাই সব হারিয়ে নিঃস্ব। এক পরিবারের মধ্যে একজন বেঁচে আছে এমনদের সংখ্যাই আমাদের মধ্যে বেশি।

সামনে এগুচ্ছিল ওরা। সামনে আব্দুল্লাহ, তারপর আহমদ মুসা। এরপর আলী।

চারদিকের সবার উৎসুক দৃষ্টি আহমদ মুসাদের দিকে। সে ঔৎসুক্যের মধ্যে আশার আকুতি আছে। চলছিল ওরা। পাশ থেকে এক তরুণী ছুটে এল আব্দুল্লাহর সামনে। বলল, ভাইজান, আমার আব্বা -----

সে কথা শেষ করতে পারল না। কান্নায় বুজে গেল তার কণ্ঠ।

কি হয়েছে ফায়জা, অবস্থা আরও খারাপ? বলল আব্দুল্লাহ।

কোন জবাব না দিয়ে তরুণীটি বলল, শীঘ্রই চলুন আপনি। কেমন জানি করছেন।

আব্দুল্লাহ আহমদ মুসার দিকে তাকাল।

আহমদ মুসা বলল, চল আগে ফায়জার আব্বাকে দেখে আসি। উনি কি অসুস্থ?

একজন অপরিচিত লোকের মুখে ফায়জা তার নাম শুনে চোখ তুলে তাকাল। নেকাবটি নাকের উপর দিয়ে চলে গেছে। চোখ অশ্রু ধোয়া, বিষণ্ন বেদনায় পীড়িত। যেন বিধ্বস্ত একটি ফুল।

আব্দুল্লাহ চলতে শুরু করে বলল, উনি আহত। গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন।

অল্প দূরে একটা গাছের তলায় একটা চাদরে শুয়ে একজন শক্ত-সমর্থ মাঝ বয়েসি লোক চোখ বন্ধ করে মাথা ঠুকছিলেন। কষ্টে ফুলে ফুলে উঠছে তার বুক।

আব্দুল্লাহ ছুটে গিয়ে তার মাথা তুলে নিল দুই হাতে।

লোকটির পাঁজরের কাপড়ে রক্তের দাগ। পাঁজরে গুলি লাগে তার। দেখলেই বুঝা যায় অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণের শিকার সে। গোটা দেহ তার অসাড়। আহমদ মুসা বুঝল, আঘাতটা প্রাণহানিকর নয়, রক্ত বন্ধ হলেই তাকে হয়ত বাঁচানো যায়।

ধীরে ধীরে চোখ খুলল লোকটি। চোখ খুলে আব্দুল্লাহকে দেখে তার চোখ দু'টি যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সেই সাথে নেমে এল তার চোখ দিয়ে অশ্রুর দু'টি ধারা। ঠোঁট দু'টি তার নড়ে উঠল। অত্যন্ত দুর্বল কণ্ঠে থেমে থেমে বলল, বাবা আব্দুল্লাহ, আমার সময় হয়েছে। আমার মা ফায়জার আর কেউ থাকল না। তোমার হাতেই ওকে দিয়ে গেলাম। ওকে দেখো।

ফায়জা দাঁড়িয়েছিল। বসে পড়ল। দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠল, আব্বা!

লোকটি, ফায়জার আব্বা, একটু দম নিয়েছিল। আবার সে বলতে শুরু করল, বাবা আব্দুল্লাহ, হতাশ হয়ো না। আল্লাহর উপর ভরসা করো। তিনি সাহায্য করবেন। এ বিরান জনপদে দেখো আবার জীবনের জোয়ার জাগবেই।

শেষ কথা তার প্রায় ঠোঁটেই জড়িয়ে থাকল। ধীরে ধীরে বুজে গেল তার চোখ। শান্ত হয়ে গেল তার অশান্ত বুকটিও।

আব্দুল্লাহ ধীরে ধীরে হাত থেকে নামিয়ে রাখল তার মাথা।

ফায়জা পিতাকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল।

আব্দুল্লাহও দু'হাতে মুখ ঢাকল তার। আহমদ মুসার চোখ দু'টিও ভিজা। বড় দু'ফোঁটা অশ্রু তার দু'চোখের কোণায় এসে জমা হয়েছে। কিন্তু তার মুখ যেন ক্রমেই শক্ত হয়ে উঠল। ঠোঁট দু'টি তার দৃঢ় সংবদ্ধ।

অত্যন্ত দৃঢ় ও শক্ত গলায় আহমদ মুসা ডাকল, বোন ফায়জা, ভাই আব্দুল্লাহ!

নরম বেদনাবিধুর মৌন পরিবেশে তার এই শক্ত ও উচ্চকণ্ঠ বড় বেসুরো শুনাল।

ফায়জা ও আব্দুল্লাহ দু'জনেই প্রায় চমকে উঠে তার দিকে মুখ তুলল। ফায়জার মুখে সেই নেকাব তখন নেই।

আহমদ মুসা বলল, আব্দুল্লাহ, ফায়জা, আমি তোমাদের চোখে অশ্রু নয়, আগুন দেখতে চাই, শোকে মুষড়ে পড়া নয়, শক্তির প্রবল উচ্ছ্বাস দেখতে চাই। মুসলমানদের জন্ম কাঁদার জন্যে হয়নি, ইসলাম দুর্বলদের জন্যে নয়। রণাঙ্গনে লাশের পর লাশ পড়েছে, আমরা কি লাশের পাশে দাঁড়িয়ে জীবনের জন্যে যুদ্ধ করিনি?

ফায়জার আব্বার মৃত্যু সংবাদ শুনে নারী পুরুষ সবাই জমা হয়েছিল সেই গাছের তলায়। আব্দুল্লাহর আব্বাও। সবাই চারদিকে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ের সাথে আহমদ মুসার কথা শুনছিল আর ভাবছিল, এমন নতুন করে কথা বলছে এই লোকটি কে, এই লোকরা কারা!

আহমদ মুসার কথায় সবার মধ্যেই শক্তির একটা শিহরণ জেগে উঠেছিল, শোকের ঢেউটা যেন দূরে সরে যাচ্ছিল।

আব্দুল্লাহ্ ও ফায়জার মুখ থেকেও যেন শোকের ছায়া সরে গেল। চোখের অশ্রু শুকাতে লাগল। এমন কথাতো তারা কারো কাছ থেকে শুনেনি! এতো শুধু কথা নয়, এ যেন জীবন্ত এক শক্তি, যা ভয়-ভাবনাকে মুহূর্তে তাড়িয়ে দেয়।

আব্দুল্লাহর আব্বা বৃদ্ধ আলী আবরার খান এগিয়ে এল আহমদ মুসার দিকে।

কাছে এসে আহমদ মুসার একটা হাত তুলে নিয়ে নরম কণ্ঠে বলল, তুমি কে, তোমরা কারা বাবা?

এই সময় একজন চিৎকার করতে করতে ছুটে এল, সাবধান পশুরা আবার এসেছে।

লোকটি এসে আলী আবরার খানের কাছে দাঁড়াল। ভীষণ হাঁপাচ্ছে লোকটা।

আলী আবরার লোকটিকে বলল, কি খবর, কি দেখেছ তুমি শরীফ?

ওরা এসেছে, সাথে কুকুর দেখলাম। বলল শরীফ।

কুকুর? প্রশ্ন করল আহমদ মুসা।

--জি।

--কয়টি?

--দু'টি।

--ওরা কতজন?

--পনের-ষোলজন।

--কোথায় দেখেছেন ওদের?

--উপত্যকায়, এদিকে আসছে।

আহমদ মুসা মুহূর্তকাল চিন্তা করল। তারপর মুখ তুলল। তাকাল সবার দিকে। দেখল, একটা ভয়ের ছায়া নেমেছে সবার চোখে-মুখে।

আহমদ মুসা আলী আবরার খানের দিকে চেয়ে বলল, জনাব, আপনি মাইয়্যেতের দাফনের ব্যবস্থা করুন। কোন চিন্তা করবেন না, আমরা আসছি।

তারপর ওসমান এফেন্দীর দিকে চেয়ে আহমদ মুসা বলল, ওসমান তুমি এদের সাথে এখানে থাক। আমি ও আলী আজিমভ নিচে যাচ্ছি।

--কিন্তু মাত্র তোমরা দু'জন -------

প্রশ্ন তুলল আলী আবরার।

--অসুবিধা নেই। শরীফ আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

--অন্তত আব্দুল্লাহ, আলীসহ কয়েকজনকে নিয়ে যাও।

--দরকার হবে না, চাচাজান। আব্দুল্লাহ আহত। অবশ্য ইচ্ছা করলে আলী আমাদের সাথে যেতে পারে।

--আঘাত সামান্য, আমি পারব যেতে। বলল আব্দুল্লাহ।

আহমদ মুসা আব্দুল্লাহর কাঁধ চাপড়ে হেসে বলল, তোমার উপর আমার আস্থা আছে আব্দুল্লাহ। তবু বলছি, তুমি এখানেই থাক। পশ্চাৎদেশ অরক্ষিত রাখা যুদ্ধের স্ট্র্যাটেজী নয়।

এই সময় নিচের দিক থেকে চাপা একটা গোঙ্গানী ভেসে এল।

--কুকুরের গোঙ্গানী। বলল আলী আবরার।

--কুকুর ওদের পথ দেখাচ্ছে, ওরা তাহলে উঠছে। বলল আহমদ মুসা।

বলেই আহমদ মুসা ওসমান এফেন্দীকে বলল, তুমি আব্দুল্লাহ, আলী এবং আরও যুবক যারা আছে তাদের নিয়ে নজর রাখবে, কোন ফাঁক গলিয়ে কেউ যাতে উপরে আসতে না পারে। আমরা আলীকে সাথে নিচ্ছি না। শরীফ আমাদের পথ দেখাবে।

আহমদ মুসা এবং আলী আজিমভ সবাইকে সালাম জানিয়ে নিচে নামার পথ ধরল। পেছনে পেছনে চলল শরীফ।

প্রায় দু'শ গজ নামার পর একটা টিলার পাশে থমকে দাঁড়াল আহমদ মুসা। বলল, আজিমভ, অগ্রসর হবার আগে একটু ভালোভাবে চারিদিকটা দেখা দরকার, ওরা কোন পথে এগুচ্ছে।

টিলার গোড়াতেই অনেকগুলো গাছ। বেশ উঁচু। আহমদ মুসা তারই একটিতে তরতর করে উঠে গেল।

গাছের মাঝামাঝি উঠতেই পাহাড়ের গোটা ঢালটা নজরে এল, উপত্যকাও নজরে আসছে।

আহমদ মুসা দূরবীন লাগালো চোখে। আতিপাতি করে খুঁজতে লাগল গোটা পাহাড়ের ঢালটা। আহমদ মুসার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দেখল, আহমদ মুসারা যেখানে আছে সেখান থেকে প্রায় ৪'শ গজ নিচে ওরা উঠে আসছে। গাছের আড়াল হওয়ার কারণে ওদের দলের পুরোটা দেখা যাচ্ছে না। এই সময় ওরা উন্মুক্ত একটা ধাপে উঠে এল। এবার সবাই দূরবীনের লেন্সে ধরা পড়ল। কিন্তু ওদের উপর চোখ পড়তেই চমকে উঠল আহমদ মুসা। ওরা মাত্র ৮জন কেন? আর কুকুর কোথায়? চিন্তা করতে গিয়ে শিউরে উঠল আহমদ মুসা।

তরতর করে সে নেমে এল নিচে। ফিসফিস করে আজিমভকে বলল, সাবধান, যে কোন সময় আক্রমণের মুখোমুখি আমরা হতে পারি।

আহমদ মুসা এবং আলী আজিমভ দু'জনেই শোল্ডার হোলস্টার থেকে এম-১০ রিভলভার বের করে আনল।

শরীফের দিকে চেয়ে আহমদ মুসা বলল, তুমি আর কোথাও নড়ো না, এই টিলার গোড়ায় বসে থাক।

কথা শেষ করতে পারল না আহমদ মুসা। টিলার ওপাশ থেকে তীরের মত ছুটে এল দু'টি কুকুর। আহমদ মুসাদের দেখেই থমকে দাঁড়াল শিকারী কুকুর দু'টি। রক্তের মত লাল ওদের চোখ। আহমদ মুসা ও আলী আজিমভের হাতে উদ্যত রিভলভার। আলী আজিমভ ট্রিগার টিপতে যাচ্ছিল। আহমদ মুসা হাত তুলে নিষেধ করল। শিক্ষিত-শিকারী কুকুর দু'টি মুহূর্তকাল থমকে দাঁড়িয়েই ভীষণভাবে ঘেউ ঘেউ করতে করতে পেছনে সরে গেল।

আহমদ মুসা বলল, আজিমভ তুমি টিলার পশ্চিম পাশ আগলাও, আমি পূর্ব পাশে আছি। সামনেই একদল শত্রু, তার পেছনে আরেক দল আছে।

কুকুর পেছনে সরে যাওয়ার মুহূর্ত কয়েক পরেই চারজনকে উদ্যত স্টেনগান হাতে টিলার প্রান্তে এসে দাঁড়াতে দেখা গেল। আহমদ মুসা টিলার প্রায় গা সেঁটে একটা গাছের গুড়িকে আড়াল করে শুয়ে ছিল। আর ওদের চোখ ছিল সামনে, উপরদিকে। আহমদ মুসাকে ওরা দেখতে পেল না।

আহমদ মুসা উঠে বসল। তারপর এম-১০ এর বাঘা মুখটা ওদের দিকে তাক করে হুকুম দিল, হয়েছে, এবার স্টেনগান ফেলে দাও।

বিদ্যুৎ বেগে ওরা চারজনই এদিকে ঘুরে দাঁড়াল। সাথে ঘুরে গেল ওদের স্টেনগানও। কিন্তু আহমদ মুসা ওদের সুযোগ দিল না। তারা ট্রিগারে চাপ দেবার আগেই আহমদ মুসার তর্জনী চেপে বসল ট্রিগারে। এম-১০ থেকে গুলির একটা ঝাঁক বেরিয়ে গেল।

ওরা চারজন যে যেখানে ছিল সেখানেই ঝরে পড়ল মাটিতে। একটি শব্দও ওদের মুখ থেকে বের হয়নি।

এদিকে আলী আজিমভ আহমদ মুসার নির্দেশ পাবার পর হামাগুড়ি দিয়ে গেল টিলার পশ্চিম প্রান্তে। তারপর টিলার পশ্চিম মাথা ঘুরে টিলার দক্ষিণ পাশটায় উঁকি দিল আলী আজিমভ। তার হাতে উদ্যত এম-১০।

উঁকি দিয়েই চমকে একদম মুখোমুখি হলো তাদের সাথে। ওরাও চারজন গুটি গুটি এগুচ্ছিল টিলার পশ্চিম প্রান্তের দিকে। চমকে উঠেছিল ওরাও। ওদের হাতেও উদ্যত স্টেনগান।

এই সময়ই গর্জে উঠেছিল আহমদ মুসার এম-১০। ওদের চোখটা মুহূর্তের জন্যে ওদিকে ঘুরে গিয়েছিল। আলী আজিমভ এই সুযোগেরই সদ্ব্যবহার করল। অগ্নিবৃষ্টি করল তার এম-১০। মাত্র পাঁচ-ছয় হাতের ব্যবধান। ঝাঁঝরা দেহ ওদের মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

আহমদ মুসা, আলী আজিমভ ও শরীফ তিনজনই টিলার দক্ষিণ পাশে উন্মুক্ত ছোট্ট ধাপটার উপর এসে দাঁড়াল। তারা দেখল, কুকুর দু'টি চিৎকার করতে করতে নিচে নেমে যাচ্ছে। অল্পক্ষণ পরেই কুকুর দু'টির চিৎকার আর শোনা গেল না।

আহমদ মুসা দূরবীন হাতে নিয়ে আবার টিলার উপর উঠল। দূরবীন চোখে লাগাল। মাঝে মাঝে গাছের আড়াল থাকলেও সামনের এলাকাটার সবকিছুই মোটামুটি দেখতে পাচ্ছে আহমদ মুসা। দেখল, কুকুর দুটি সাথে নিয়ে ওরা আটজন দ্রুত উপরে উঠে আসছে। এবার স্টেনগান ওদের কাঁধে নয়, হাতে।

আহমদ মুসা আরও দেখল, প্রায় ১শ' সোয়াশ' গজ নিচে পাহাড়ের বড় একটা ধাপ। তার দু'পাশেই গভীর খাদ। এ এলাকায় উপরে উঠার এই ধাপই

একমাত্র পথ। ধাপের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে ছোট একটি টিলা। টিলার আড়ালে দাঁড়ালে গোটা ধাপটাই নজরে আসে।

আহমদ মুসা দ্রুত নেমে এল টিলা থেকে। বলল, আজিমভ চল, নিচের ঐ টিলাটা আমাদের দখল করতে হবে।

ক্রলিং করে দ্রুত ওরা নেমে এল ঐ টিলার পিছনে।

দশমিনিটও পার হয়নি। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে সেই ধাপের উপর প্রথম উঠে এল কুকুর দুটি। তারপর ওরা আটজন। ধাপে উঠেই কুকুর দুটি মহা ঘেউ ঘেউ শুরু করে দিল। ওরা একবার ছুটে এল টিলার দিকে।

আহমদ মুসা শুয়েছিল এক পাথরের আড়ালে। পাথরের সুড়ংগে তার এম-১০ রিভলভারের নল। সে ভাবল, আর ওদের সময় দেয়া যায় না।

আহমদ মুসা দৃঢ় ও উচ্চকণ্ঠে বলল, তোমরা আটজনই গুলির রেঞ্জে। স্টেনগান ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করো। পালাবার চিন্তা করলে মারা পড়বে।

আহমদ মুসার কথা শেষ হলো না। গর্জে উঠল ওদের আটটি স্টেনগান। আহমদ মুসার মুখের শেষ শব্দটি স্টেনগানের গর্জনে ঢাকা পড়ে গেল। গুলি করতে করতে ওরা ছুটে এল।

আহমদ মুসার তর্জনী ট্রিগারেই ছিল। শেষ শব্দ উচ্চারণ করেই চেপে ধরল ট্রিগার। পাথরের ফাঁক দিয়ে ঘুরিয়ে নিল রিভলভারের মাথা। গুলির স্রোত বেরিয়ে গেল মেশিন রিভলভার এম-১০ এর বুক থেকে। প্রশস্ত ধাপের অর্ধেকের বেশি ওরা আটজন এগোতে পারেনি। গুলি লেগে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ওরা আটজনই আছড়ে পড়ল মাটিতে। কুকুর দুটিও এবার বাঁচল না। ওদের সাথেই ছিল কুকুর দুটি। ওদের সাথে একই ভাগ্য বরণ করল তারা।

আহমদ মুসারা তিনজনই টিলার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। দাঁড়াল আটটি লাশের সামনে। রক্ত তখনও গড়াচ্ছে পাথরের কাল বুকের উপর দিয়ে। উন্মুক্ত গোটা ধাপটাই রক্তে লাল হয়ে উঠেছে।

আহমদ মুসা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল প্রবহমান লাল রক্তের দিকে।

এক সময় তার কণ্ঠ থেকে স্বগতঃ বেরিয়ে এল, আল্লাহর কাছে মানুষের রক্ত সবচেয়ে মূল্যবান। এজন্যই হন্তাকে তিনি হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে রক্তপাত থেকে মানবসমাজ মুক্ত হতে পারে। কিন্তু, তবু এই রক্তপাত কেন?

কে এর জন্য দায়ী?

একটু থামল আহমদ মুসা। শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল সে আলী আজিমভ ও শরীফের দিকে। বলল, মানুষকে, মানবসমাজকে মানুষ-প্রভুদের অক্টোপাস থেকে, তাদের লোলুপ-গ্রাস থেকে মুক্ত করতে না পারলে এ রক্তপাত থেকে আমাদের এ সুন্দর বিশ্বকে রক্ষা করা যাবে না।

শরীফ এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল আহমদ মুসার দিকে। ভেবে পেল না, কঠোর-কোমলে এমন অপরূপ মানুষ হয়! কে ইনি? কে এরা?

নিহত ষোল জনের দেহ সার্চ করে কিছু টাকা ছাড়া কিছুই পাওয়া গেল না, একটু কাগজও নয়। অর্থাৎ, হোয়াইট ওলফ এখানেও সামনে এগোবার কোন চিহ্ন রেখে গেল না।

ওদের ষোলটি স্টেনগান কুড়িয়ে নিয়ে আহমদ মুসারা উঠে এল উপরে।

উপর থেকে আহমদ মুসাদের দেখতে পাওয়ার সাথে সাথে আব্দুল্লাহ, আলীসহ যুবকরা দ্রুত নেমে এল। শরীফ আব্দুল্লাহকে দেখেই চিৎকার করে উঠল, আব্দুল্লাহ ভাই, ওরা ষোলজন কেউ বাঁচে নি।

আব্দুল্লাহ এসে জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে। বলল, খোশ আমদেদ মুসা ভাই।

--আমার নাম কি করে জানলে?

--ওসমান আমাদের সব বলেছে। তাইতো বলি, আহমদ মুসা ছাড়া খল, ক্ষিপ্র, ক্রুর ও হিংস্র হোয়াইট ওলফকে চ্যালেঞ্জ করতে এভাবে আর কে এগিয়ে যেতে পারে!

--এটা ঠিক নয় আব্দুল্লাহ, প্রতিটি মুসলিমই অকুতোভয় সৈনিক।

--ঠিক মুসা ভাই, কিন্তু আমরা তো সেই মুসলিম নই।

--একথাও তুমি ঠিক বললে না আব্দুল্লাহ, সবই ঠিক আছে। অব্যবহারের ফলে তলোয়ারে শুধু মরিচা ধরেছে মাত্র।

--ঠিক বলেছেন মুসা ভাই। আপনার সংস্পর্শ এই মরিচা তুলে দিচ্ছে। মুসা ভাই, এই কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত মৃত্যুভয় আমাকে ঘিরেছিল, কিন্তু এখন আর আমার মনে কোন ভয় নেই।

আহমদ মুসা আব্দুল্লাহর পিঠ চাপড়ে বলল, বাহাদুর ভাই এইতো চাই। মুসলমানরা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে গাজী হওয়ার জন্যেই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু তার কাছে জীবনের চেয়ে শাহাদাৎ বেশি লোভনীয়। এ ধরনের বাহিনী কখনও হারতে পারে না আব্দুল্লাহ।

আব্দুল্লাহ, আলী, শরীফ সকলেই মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখেছিল আহমদ মুসাকে।

আহমদ মুসা সবাইকে তাড়া দিল, চল এবার।

যুবকরা যুদ্ধলব্ধ ষোলটি স্টেনগান হাতে নিয়ে আনন্দ করতে করতে উপরে ছুটে চলল।

উপরের ধাপের প্রান্তে নারী-পুরুষ সবাই সার বেঁধে দাঁড়িয়েছিল। সকলের দৃষ্টি আহমদ মুসার দিকে নিবদ্ধ। সবার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন বৃদ্ধ আলী আবরার খান। তার পাশে ওসমান এফেন্দী।

যুবকরা স্টেনগানগুলো নিয়ে আলী আবরার খানের সামনে রাখল। কিন্তু সেদিকে বৃদ্ধের কোন মনোযোগ নেই। তার বিস্ময় বিজড়িত মুগ্ধ দৃষ্টি আহমদ মুসার দিকে নিবদ্ধ।

আহমদ মুসা এসে সালাম করতেই বৃদ্ধ একটু এগিয়ে এসে আহমদ মুসাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। বলতে লাগল, আল্লাহর কি করুণা, আমাদের কি সৌভাগ্য, তোমাকে আমরা পেয়েছি বাবা। রূপকথার মত আমরা তোমার গল্প শুনেছি, আর গৌরব বোধ করেছি।

তারপর আহমদ মুসাকে ছেড়ে দিয়ে বৃদ্ধ সকলকে লক্ষ্য করে বলল, হে আমার কবিলার ছেলেমেয়েরা, তোমাদের সবচেয়ে বড় দুর্দিনে তোমাদের সবচেয়ে বড় এবং মহান ভাইকে আল্লাহ তোমাদের সাহায্যে পাঠিয়েছেন। তোমরা সকলে আল্লাহর শোকর আদায় কর।

বলে বৃদ্ধ নিজেই কেবলামুখী হয়ে সিজদায় পড়ে গেল। তার সাথে সকলেই।

যখন তারা সিজদাহ থেকে মুখ তুলল, দেখা গেল, সকলের মুখই চোখের পানিতে ধোয়া।

আহমদ মুসা, আলী আজিমভ, ওসমান এফেন্দী এ অভূতপূর্ব দৃশ্যের সামনে অভিভূতের মত দাঁড়িয়েছিল। তাদের চোখেও অশ্রু।

সবাই মাথা তুলে উঠে বসলে আহমদ মুসা বলল, প্রিয় ভাই-বোনেরা, আল্লাহর অনুগ্রহ ভিখারী আমি তারই এক নগণ্য বান্দাহ। আমি মুসলিম। আমি আমার নিপীড়িত মুসলিম ভাই-বোনদের ভালবাসি। এ ভালবাসাই আমার শক্তি এবং এটা আল্লাহরই দেয়া নেয়ামত। আপনাদের এই সিজদাহ আল্লাহ কবুল করুন এবং এ দেশের মুসলমানদের উপর যে ভয়াবহ দুর্যোগ নেমে এসেছে তা থেকে সবাইকে আল্লাহ মুক্ত করুন।

একটু থেমে আহমদ মুসা বলল, আসুন এবার আমরা প্রথমে মাইয়্যেতের দাফন সম্পন্ন করি।

পাহাড়ের এক গুহায় পাথর দিয়ে কবরে দাফন সম্পন্ন করে সবাই এসে বসলো। আলী আবরার খানের পাশে আহমদ মুসা।

আলী আবরার খানের দিকে মুখ তুলে আহমদ মুসা বলল, জনাব আমি কয়েকটা কথা বলব।

--বল।

--আমার প্রথম কথা, আপনার সাথে বাপ-মা হারা, পরিবার হারা যে ইয়াতীম মেয়েরা আছে, তাদের অভিভাবকত্বের চিন্তা করুন। ইসলামের দৃষ্টিতে এটা খুব জরুরি।

--হ্যাঁ, আমিও এটা ভাবছি। তোমার কোন পরামর্শ আছে বাবা?

--মতামত নিয়ে ছেলে-মেয়েদের যাদের বিয়ের বয়স হয়েছে তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করাই আমি উত্তম মনে করছি। আমার একটা প্রস্তাবও আছে, আব্দুল্লাহর সাথে ফায়জার বিয়ে দিন। ফায়জার মরহুম পিতার এটাই ইচ্ছা ছিল, আমি তার সাক্ষী।

পাশেই বসে ছিল আব্দুল্লাহ। অল্প কিছু দূরে ফায়জা, নেকাবে মুখ ঢাকা তার। আহমদ মুসার কথাগুলো তাদেরও কানে গেল। তারা মুখ নিচু করল।

--বাবা, তোমার দু'টো পরামর্শই উত্তম। আমি ব্যবস্থা করছি।

--আমার দ্বিতীয় কথা, আপনাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি? শুনেছি, আপনারা সীমান্তের ওপারে ইরানে হিজরত করতে চান।

--হ্যাঁ, হিজরত করব বলেই আরাকস হ্রদের এখানে এসেছি। একটা নৌকাও যোগাড় হয়েছে। এখন তুমি যে পরামর্শ দেবে, তা-ই করব। তোমাকে পাওয়ার পর কিন্তু হিজরতের চিন্তা আমার মনে আর নেই।

--চাচাজান, বিষয়টা নিয়ে আমি চিন্তা করেছি। আজারবাইজানের এ ছিটমহলের এলাকা নিরাপদ নয়। আর এত দূর থেকে দেশের অভ্যন্তরে অনিশ্চিতভাবে ফিরে যাওয়া আর নিরাপদ নয়। সুতরাং সাময়িকভাবে আপনাদের হিজরত করতেই হচ্ছে।

--বাবা, তুমি আমাদের নেতা। তোমার পরামর্শ আমাদের কাছে নির্দেশ।

--নৌকা আপনাদের কোথায়, কোন অসুবিধা আছে কি না?

--উপকূলে একটা ঝোপের আড়ালে বাঁধা আছে। ইঞ্জিন, তেল সবই ঠিক আছে। অসুবিধা ছিল নিরাপত্তার প্রশ্নে। সে দিকটাও এখন আর নেই।

--কখন আপনারা যাত্রা করতে চান?

--তোমার নির্দেশ হলে আজ সন্ধ্যায়। রাতের অন্ধকার ছাড়া হ্রদে নৌকা ভাসানো নিরাপদ নয়।

--আমার তৃতীয় কথা চাচাজান, আমাদের এখন যেতে হয়।

সঙ্গে সঙ্গেই বৃদ্ধ কোন উত্তর দিল না। অনেকক্ষণ পর ধীরে ধীরে বলল, সব শুনেছি বাবা, তুমি অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজে ইয়েরেভেন যাচ্ছ। প্রতি মুহূর্ত তোমার জন্যে মূল্যবান। কিন্তু মন কি বলছে জান, তোমার সঙ্গ যতক্ষণ পাব, সাহসের সঞ্চয় যেন আমাদের তত বেশি হবে। তোমাকে ছাড়ার কথা ভাবতেই বুক খালি হয়ে যাচ্ছে।

আহমদ মুসা কিছুক্ষণ ভাবল। চিন্তা করল, বিধ্বস্ত এই লোকদের এভাবে রেখে যাওয়া ঠিক হবে কি না। অবশেষে সে বলল, ঠিক আছে চাচাজান, আপনারা নৌকায় উঠা পর্যন্ত আমরা আছি।

আলী আবরার খানের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সবচেয়ে খুশি হল আব্দুল্লাহ।

এই সময় খানা এল। শুকনো রুটি এবং ফল।

আলী আবরার খান ভারি কণ্ঠে বলল, মেহমানদারি করার আর কিছুই নেই বাবা আমাদের।

আহমদ মুসা হেসে বলল, যা ক্ষুধা, অমৃতের চেয়েও এ ভাল লাগবে।

নয়টি নতুন দম্পতিসহ সবাই নৌকায় উঠেছে। সবার চোখেই পানি। একবেলায় আহমদ মুসা সবার যে আপন হয়ে যাবে, কে ভেবেছে? বৃদ্ধ আলী আবরার খান চোখ মুছতে মুছতে নৌকায় উঠে গেল। তীরে দাঁড়িয়ে তখনও আব্দুল্লাহ এবং নববধূ ফায়জা।

আবদুল্লাহ ফুঁপিয়ে কাঁদছে আহমদ মুসাকে জড়িয়ে ধরে। বলছে, আমাকে আপনার সাথে থাকতে দিন, আমি দেশ থেকে পালাতে চাই না।

আহমদ মুসা তার পিঠ চাপড়ে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, তুমি পালাচ্ছ না। তুমি উদ্বাস্তু একটি জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাচ্ছ। চিন্তা করো না, আমি তোমাকে ডাকব। আর ওসমান এফেন্দীর ঠিকানা তোমার কাছে তো আছেই। দেরি করো না, যাও ভাই।

চোখ মুছতে মুছতে আব্দুল্লাহ ঘুরে দাঁড়াল এবং বলল, ঠিক আছে, আমি কিন্তু এসে যাব।

ফায়জা তখনও নতমুখে দাঁড়িয়ে। আব্দুল্লাহ চলতে শুরু করতেই ফায়জা একটু এগিয়ে এসে আহমদ মুসাকে সালাম দিয়ে বলল, বড় ভাই, পিতা-মাতা সব হারিয়ে আপনাকে ভাই পেয়েছিলাম, দোয়া কর------

কান্নায় কথা শেষ করতে পারলো না ফায়জা।

আহমদ মুসারও চোখ দিয়ে পানি গড়াচ্ছিল। বলল, যাও বোন, আল্লাহ হাফেজ।

ইঞ্জিনের মৃদু শব্দ তুলে নৌকা পানিতে ভাসল। ধীরে ধীরে তার গতি বাড়ল। নৌকার গলুইতে আব্দুল্লাহ ও ফায়জা দুই ছায়ামূর্তির মত দাঁড়িয়ে। ওরা বোধ হয় দেখতে চেষ্টা করছে উপকূলে দাঁড়ানো আহমদ মুসাদের।

ধীরে ধীরে তারা অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

এবং একসময় নৌকাও আর দেখা গেল না। হ্রদের কালো পানির দিকে তাকিয়ে আহমদ মুসা তখনও দাঁড়িয়ে। তার দৃষ্টি কিন্তু হ্রদের কালো পানিতে তখন নয়। ছুটে গেছে তা সুদূর সিংকিয়াং-এ। বিদায়কালীন আমিনার সজল চোখ তার সামনে ভেসে উঠেছে। ও কেমন আছে! কাঁদছে না তো ও! আর এক পশলা অশ্রু নেমে এল তার চোখ থেকে।

পেছনে গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দে সম্বিত ফিরে পেল আহমদ মুসা।

চোখ মুছে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, চল আজিমভ, ওসমান গাড়ি রেডি করেছে।

গাড়িতে গিয়ে ওরা উঠল।

ওরা উঠে বসতেই ইঞ্জিন গর্জন করে উঠল। নড়ে উঠল গাড়ি।

বামে কাল হ্রদ, ডাইনে কাল পাহাড় মৌন প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে। সামনে আরাকস হাইওয়েের শূন্য কাল বুক। চারদিকের অখন্ড নীরবতার মাঝে একটানা এক চাপা শব্দ-তরঙ্গ তুলে তীব্র বেগে ছুটে চলল আহমদ মুসার জীপ।

এক ঘন্টার মধ্যে তারা তাগাবান শহরের উপকণ্ঠে গিয়ে পৌঁছল। তাগাবান শহর আরাকস ও আরপা নদীর সঙ্গমস্থলে আরপা নদীর তীরে অবস্থিত। আরপা নদী লেক সেভেনের দক্ষিণে মধ্য আর্মেনিয়ার পর্বতমালা থেকে উৎপন্ন হয়ে তাগাবান শহরের পশ্চিম পাশে এসে আরাকস নদীতে পড়েছে।

তাগাবান শহর ছোট্ট, কিন্তু আজারবাইজানের এ ছিটমহলটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বন্দরনগরী। অবস্থানগত দিক দিয়েও তাগাবান গুরুত্বপূর্ণ। তাগাবান শহর থেকে আরাকস নদী ইরানের সীমানা দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। তাগাবান শহর থেকে ২৫ মাইল পর্যন্ত ইরানের সীমান্ত দিয়ে প্রবাহিত হবার পর, আরাকস তুরস্কের সীমানা দিয়ে প্রবাহিত হবার পর আবার আর্মেনিয়ার সীমানায় ফিরে

এসেছে। তাগাবান শহরের কাছে আরপা নদী যেখানে গিয়ে আরাকসে পড়ছে, সে স্থানটিও ইরান সীমান্তের অভ্যন্তরে।

এই অবস্থানগত গুরুত্বের কারণে আজারবাইজান ছিটমহলের এ এলাকার উপর খৃস্টান আর্মেনিয়া এবং হোয়াইট ওলফের বিশেষ নজর পড়েছে। তাদের অভিযোগ হল, এই পথে ইরান ও তুরস্ক থেকে মুসলমানদের ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটছে আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ায়। তারা বলছে, মুসলমানদের জন্যে অস্ত্র ও উস্কানি এপথ দিয়েই বেশি আসছে। কিন্তু আসল কথা হলো, হোয়াইট ওলফ এই এলাকায় মুসলমানদের উপর যে ব্যাপক নিপীড়ন চালাচ্ছে তাকে আড়াল করা এবং ইরান-তুরস্ক যাতে আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার হতভাগ্য মুসলমানদের কোন প্রকার সাহায্য-সহযোগিতার কথা চিন্তা করতে না পারে তার জন্যেই এই অপপ্রচার চালাচ্ছে।

তাগাবান শহরের উপকণ্ঠে এসে জীপের গতি অনেকখানি কমিয়ে আনল ওসমান এফেন্দী। রাস্তায় লোকজন, গাড়ি-ঘোড়া এখন দেখা যাচ্ছে।

তাগাবান শহরকে ডানে রেখে শহরের পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে আরাকস হাইওয়ে এগিয়ে গেছে আরপা নদীর ব্রীজের দিকে। ব্রীজ পার হবার পর আরাকস হাইওয়ের আবার সেই দীর্ঘ যাত্রা। এখানে আরাকস হাইওয়ে থেকে নদীর এপার তীরে অবস্থিত ইরানের ও তুরস্কের বর্ডার আউটপোস্টের আলো পাহাড়ের ফাঁক গলিয়ে মাঝে মাঝেই দেখা যায়।

শহর প্রায় পেরিয়ে ব্রীজের গোড়ার কাছাকাছি পৌঁছে গেল আহমদ মুসার জীপ।

--কোন চেক তো হল না ওসমান এফেন্দী? বলল আহমদ মুসা।

--কেন আজারবাইজান থেকে আর্মেনিয়া এলাকায় গাড়ি প্রবেশ করার সময় চেক হয়েছে, আবার আর্মেনিয়া থেকে আজারবাইজান ছিটমহলে প্রবেশের সময়ও তো চেক হয়েছে। এখনও তো আমরা আজারবাইজান এলাকায়। এই তো সামনে যখন আজারবাইজানের এ ছিটমহল ছেড়ে আর্মেনিয়ায় আবার প্রবেশ করব, তখন চেক হবে।

গাড়ি ব্রীজের উপর এসে উঠল। শহরের মতই ব্রীজও আলোকোজ্জ্বল।

তাগাবান শহরটা আরপা নদীর দক্ষিণ পাড়েই সীমাবদ্ধ। উত্তর তীর ঘেঁষে পাহাড়ের দেয়াল। তাই ওপারে শহর বিস্তারের কোন সুযোগ হয় নি। একটা সংকীর্ণ গিরিপথ বরাবর তৈরি হয়েছে আরপা ব্রীজটি।

ব্রীজটিই আলোকোজ্জ্বল, তারপরেই অন্ধকার।

আহমদ মুসার জীপ ব্রীজ পেরিয়ে অন্ধকার গিরিপথের সংকীর্ণ রাস্তায় গিয়ে পড়ল।

জীপ তখন স্বাভাবিক গতিতে ফিরে আসেনি। এমন সময় জীপের মাত্র কয়েকগজ সামনে ঠিক জীপের নাক বরাবর কাল ওভারকোটে দেহ ঢাকা এক ব্যক্তিকে হাত তুলে দাঁড়াতে দেখা গেল। লোকটির মাথায় হ্যাট, হাত তার খালি।

লোকটির মাত্র দু'গজ সামনে জীপটি প্রায় ধাক্কা খেয়েই থেমে গেল।

স্বভাববশতই আহমদ মুসা ও আলী আজিমভের হাত গিয়ে রিভলভার স্পর্শ করেছিল। এভাবে রাস্তার মাঝখানে গাড়ির নাক বরাবর দাঁড়িয়ে গাড়ি থামাবার দাবি জানানো স্বাভাবিক নয়।

কিন্তু রিভলভার বের করার সময় হলো না। গাড়ি ধাক্কা খেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াতেই গাড়ির চার জানালা দিয়েই স্টেনগানের নল এসে প্রবেশ করল।

একজন ড্রাইভার সিটের জানালায় মুখ এনে ওসমান এফেন্দীকে লক্ষ্য করে বলল, তুমি ওসমান এফেন্দী না?

হ্যাঁ! বলল ওসমান এফেন্দী।

আগারাক সুড়ঙ্গে আমাদের লোকদের খুব তো কলা দেখিয়ে চলে এসেছিলে, এখন?

তারা তো চেক করেই আমাদের ছেড়ে দিয়েছে।

না, ছেড়ে দেয়নি।

পাশ থেকে কে একজন এই সময় বলল, কথা থাক, ভদ্রলোকের মত নেমে আসতে বল সবাইকে।

হাত উপরে তুলে নেমে এস সবাই, চালাকি করলে মারা পড়বে।

আহমদ মুসা বুঝতে পারল না, এরা আহমদ মুসাদের চিনতে পেরেছে না আগারাক সুড়ঙ্গমুখে ওদের লোকদের নিষেধ অমান্য করে চলে আসাটাই অপরাধ

হয়েছে। সেখানে চলে আসার জন্য ছেড়ে দেবার পর তাদের দাঁড়াতে বলেছিল কেন? কোন নতুন খবর কি সেখানে পৌঁছেছিল? পৌঁছলে সেটা কি? আহমদ মুসা এসেছে, একথা হোয়াইট ওলফ জানে এবং সবাইকে ইতোমধ্যে জানিয়েও দিতে পারে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে তার ফটো সংগ্রহ এবং তা সব জায়গায় পৌঁছানো কিছুতেই সম্ভব নয়। তবে হোয়াইট ওলফরা যে তার আগের যে কোন শত্রুর চেয়ে সুসংগঠিত, ক্ষিপ্র এবং নিষ্ঠুর তা ইতোমধ্যেই প্রমাণ হয়েছে। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, এরা পিছু হটে না এবং মৃত্যু ছাড়া এরা থমকেও দাঁড়ায় না। হিটলারের নাজীদের মতই বোধহয় এদের ট্রেনিং-হয় করতে হবে, নয় মরতে হবে। পরাজিত হওয়া এবং বাঁচা দুটো একসঙ্গে চলবে না। এদের দায়িত্ববোধ এবং যোগাযোগও চমৎকার। আগারাক সুড়ঙ্গের লোকদের কাছ থেকে এরা নিশ্চয়ই ওয়্যারলেসেই খবর পেয়েছে।

এসব কথা চিন্তা করতে করতে আহমদ মুসা দু'হাত উপরে তুলে বেরিয়ে এল।

বেরিয়েই ইয়েরেভেন এলাকার আঞ্চলিক আর্মেনীয় ভাষায় বলল, তোমরা অযথা আমাদের কষ্ট দিচ্ছ, আমাদের পরিচয়ের কিছু কি বাকি আছে? সবই তো বলেছি ওখানে।

--পরিচয়-টরিচয় বুঝি না। সকল হাইওয়ে, রেল এবং বিমানে মুসলমানদের চলাচল নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে।

--কে নিষিদ্ধ করেছে?

--তোমার বাপ! হোয়াইট ওলফ-এর নাম শোননি?

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল। সেই ভারি গলার লোকটি ধমক দিয়ে বলল, কোন কথা নয়, এবার চলতে হবে।

চারজন স্টেনগানধারী তখনও তাদের চারদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। অন্য তিনজনের কাঁধেও স্টেনগান ঝুলানো।

লোকটির কথা থামতেই একজন এসে আহমদ মুসাদের তিনজনকে পিছমোড়া করে বাঁধল।

আহমদ মুসা বলল, তোমায় আমাদের বলতে হবে, কি দোষ আমাদের?

--সেটা পরে ঠিক হবে। হুকুম হয়েছে, সড়ক-হাইওয়ে এবং রেল-বিমানে মুসলমানদের যাকেই যেখানে পাওয়া যাক, আগামী কয়েকদিন তাদের আটকে রাখতে হবে। তারপর কি করা হবে সে হুকুম আসবে।

আহমদ মুসা আশ্বস্ত হলো, আহমদ মুসাদের পরিচয় ওরা জানে না। পাইকারি ধর-পাকড়ের হুকুম অনুসারেই তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। হোয়াইট ওলফ-এর এ পদক্ষেপ কেন, আহমদ মুসা তা পরিষ্কারই বুঝতে পারছে। আহমদ মুসার ফটো তাদের পাওয়া এবং তা সব জায়গায় পাঠানো পর্যন্ত তারা এই ধর-পাকড় অক্ষুণ্ন রাখতে চায়। আহমদ মুসা যাতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে কিংবা হাতের বাইরে যেতে না পারে, সেজন্যেই এই ব্যবস্থা। আহমদ মুসার ফটো পাওয়ার পর সব বন্দীর পরিচয় পরখ করার পরই হয়তো তারা বন্দীদের ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেবে।

আরাকস হাইওয়ে থেকে নামিয়ে পাহাড়ের এক গলিপথ দিয়ে তাদের নিয়ে চলল। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এগিয়ে যাওয়া গলিপথটি মনে হল নদীর দিকেই গেছে।

চলতে চলতে আহমদ মুসা বলল, নিরপরাধ মানুষকে এভাবে কষ্ট দিচ্ছ, এটা কি ঠিক?

--এটা কষ্ট হলো? চোখ বাঁধার হুকুম আছে সেটা তো করিইনি!

--তোমরা মুসলমানদের উপর এভাবে জুলুম করছ কেন?

--জুলুম কই, এতো লড়াই। এই লড়াই অতীতে হয়েছে, এখন হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে।

--গুপ্ত হত্যা, চোরা-গোপ্তা পাকড়াও করা ইত্যাদি তো যুদ্ধ নয়।

--লড়াইয়ের কৌশল বহু রকমের আছে।

কথা বলছিল ভারি গলার সেই লোকটি। লোকটির হ্যাট কপাল পর্যন্ত নামানো। চওড়া মুখের নাক থেকে নিচের অংশটা দেখা যাচ্ছে। কাঁধে তার স্টেনগান ঝুলানো। দু'হাত তার ওভারকোটের পকেটে। ডান হাত ওভারকোটের পকেটে উঁচু হয়ে আছে। মনে হল, এই লোকটিই টিম-লিডার। লোকটি কথা শেষ করে একটু থেমেই আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে আবার বলল, তুমি তো সাহসী

লোক দেখছি! হোয়াইট ওলফের হাতে পড়ে এইভাবে তো কেউ কথা বলেনি! তুমি ভয় কর না?

--মৃত্যুকে ভয় করি না, কাকে আর ভয় করব?

--মৃত্যুকে ভয় কর না?

--ভয় করব কেন, সে তো আসবেই একদিন।

--তাহলে তুমি তো ভয়ানক লোক!

একটু থেমেই লোকটি ঠোঁটের কোণে একটা বাঁকা হাসি টেনে বলল, তবে মৃত্যু সম্বন্ধে আমাদের সাথে তোমার খুব মিল আছে। আমরা পাখির মত লোক শিকার করি, বিচিত্রভাবে করি। অনেকে আমাদের নিষ্ঠুর বলে। এতে নিষ্ঠুরতার কি আছে? যে মৃত্যু অবশ্যই আসবে, তাকেই তো আমরা আনি!

--মৃত্যুকে ভয় না করা এবং হত্যা করা এক জিনিস নয়। ন্যায়, অন্যায় নেই?

--প্রয়োজন যা, তা-ই ন্যায়।

--আমরা মুসলমানরা তা মানি না।

--দরকার নেই। এটা শুধু হোয়াইট ওলফের মানার কথা।

তারা নদীর ঘাটে এসে পৌঁছল। ঘাটতো নয়, একটা বড় পাথর, তার সাথে একটা মোটর বোট নোঙর করা।

দু'জন স্টেনগানধারী আগে বোটে উঠে গেল। তারপর আহমদ মুসাদের তোলা হল নৌকায়। তারপর ওরা পাঁচজন উঠে এল।

বোটে উঠতে উঠতে আলী আজিমভ আহমদ মুসার দিকে তাকাল। দেখল, আহমদ মুসার চোখে-মুখে চিন্তার লেশমাত্র নেই।

গোটা বোটটাই বড় একটা হল ঘরের মত উন্মুক্ত। মজবুত ছাদ, কাঠের মজবুত সাইড-ওয়াল। বোটের একেবারে পেছনে একটা কেবিন। সম্ভবত বোটের ওটা স্টোররুম।

ঐ স্টোররুমে আহমদ মুসাদের ঢুকিয়ে একমাত্র দরজায় তালা লাগিয়ে দেয়া হল।

রুমটি খুব ছোট নয়। তবে অন্ধকার। আলোর ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তা তাদের জানার উপায় আপাতত নেই। জানালাও নিশ্চয় থাকতে পারে।

রুম তালাবদ্ধ করে ওরা সরে যেতেই আলী আজিমভ বলল, কি ব্যাপার, ওরা আমাদের সার্চ করল না?

--হতে পারে ওরা আমাদের সাধারণ কেউ মনে করেছে। আমরা ওদের বাঁধা দেইনি, এ কারণেও তাদের ঐ ধারণা আরো প্রবল হতে পারে। কিংবা তাদের মনে নাও থাকতে পারে। যাক, আল্লাহ এইভাবে আমাদের সাহায্য করেছেন। বলল আহমদ মুসা।

--মুসা ভাই, আপনি একদম চুপ থাকলেন, আমরা কি ওদের মোকাবিলা করতে পারতাম না?

--হয়তো পারতাম, কিন্তু হোয়াইট ওলফকে আমি এ পর্যন্ত যতটা জেনেছি, তাতে এ ঝুঁকি নেয়া ঠিক মনে করিনি। ক্ষিপ্রতা ও মৃত্যুভয়হীনতা—এ দুই দুর্লভ গুণ তাদের আছে। এ ধরনের শত্রু বড় বিপজ্জনক।

--এখন আমরা কি করব?

--চিন্তা করো না, এবার আমাদের কাজ শুরু হবে। ওরা আমাদের সার্চ করেনি, এটা আল্লাহ্‌র এক সাহায্য। আরেকটা সাহায্য হলো ওরা আমাদের আলাদা একঘরে রেখেছে।

তিনজনকেই পিছমোড়া করে বাঁধা। সরু প্লাস্টিক কর্ডের বাঁধন যেন কেটে বসে গেছে কব্জিতে।

আহমদ মুসা পিছমোড়া করে বাঁধা হাত দিয়েই আলী আজিমভ ও ওসমান এফেন্দীর বাঁধন পরীক্ষা করল।

বাঁধন খুব শক্ত। বাঁধা হাত দিয়ে সরু প্লাস্টিক কর্ডের শক্ত গিট খোলা অসম্ভব। হঠাৎ জুতার গোড়ালির গোপন কুঠিতে রাখা ইস্পাতের ছুরির কথা আহমদ মুসার মনে পড়ল। উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখ।

কিন্তু পিছমোড়া করে বাঁধা হাত দিয়ে জুতার গোড়ালি থেকে ছুরি বের করা সহজ হলো না। ডান জুতার গোড়ালির ডান কেবিনে আছে ছুরিটা। গোড়ালির ঐ প্রান্তটির ঠিক জায়গায় ঠিকমত চাপ পড়লে তবেই গোড়ালির একাংশ সরে

যাবে এবং ছুরিটি বেরিয়ে আসবে। কিন্তু হাত দু'টি পিছমোড়া করে এমনই বিদঘুটে করে বাঁধা যে, বামহাতের আঙ্গুল কিছুতেই ঐ জায়গায় ভাল করে চাপ দিতে পারছে না। অবশেষে সফল হল আহমদ মুসা। ছুরিটা হাত করল।

মোটর বোটটি অনেকক্ষণ হল চলতে শুরু করেছে। আরপা নদী দিয়ে পূর্ব দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বোটটি। গতি বেশ তীব্র।

আহমদ মুসা খুব সাবধানে তীক্ষ্ণধার ছুরি দিয়ে আলী আজিমভের বাঁধন কাটতে লাগল। বাঁধনের গিট খুঁজে নিয়ে গিটের গোড়ায় ছুরি চালাল আহমদ মুসা।

ব্লেডের মত তীক্ষ্ণধার ইস্পাতের ছুরি। পানির মত কেটে গেল প্লাস্টিকের কর্ড।

মুক্ত হলো আলী আজিমভ। মুক্ত হলো সবাই।

আহমদ মুসা ঘড়ির রেডিয়াম ডায়ালের দিকে তাকিয়ে দেখল, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। অর্থাৎ বোটটা পৌনে এক ঘন্টার পথ এগিয়ে এসেছে।

তারা পরীক্ষা করে দেখল কেবিনে কোন জানালা নেই। দরজার ফাঁক দিয়ে লম্বা এক চিলতে আলো দেখা যাচ্ছে।

বোটের ভেতরে ওদের কথা শোনা যাচ্ছে।

সবাই মিলে এই কিছুক্ষণ আগে খাওয়া-দাওয়া করল। এখন গল্প করছে। খোশগল্প।

এমন সময় বাইরে থেকে কেউ, বোধহয় বোটের চালক, চিৎকার করে উঠল, উস্তাদ, সামনে একটা বোট, আলো নেই।

বুঝা গেল, এই কথা শোনার পর সবাই একসাথেই বাইরে বেরিয়ে গেল।

সেই সাথে বোটের গতি অনেকটা স্থির হয়ে গেল।

--তোমরা কে? কোথায় যাবে? প্রশ্ন করল ভারি গলার সেই লোকটি।

একটু দূর থেকে একটা ভারি কণ্ঠ ভেসে উঠল, আমরা কাজরন থেকে আসছি। তাগাবান যাব আমরা।

--তোমাদের বোট আমাদের বোটে ভিড়াও।

কিছুক্ষণ নীরবতা। অল্পক্ষণ পরে মোটর বোটটা সামান্য দুলে উঠল, একটু শব্দ হল। মনে হল, সেই আলো নিভানো বোটটা বোধহয় এসে মোটর বোটের গায়ে ভিড়ল।

মোটর বোটের সামনে গিয়ে ভিড়ছে বোটটি। মনে হল, মোটর বোট থেকে কেউ কেউ নেমে গেল বোটটিতে। আস্তে আস্তে কি কথা বলল।

হঠাৎ ব্রাশফায়ারের শব্দ এবং সেই সাথে আর্তচিৎকার ভেসে উঠল। নারী ও শিশু কণ্ঠের 'আল্লাহ আল্লাহ' চিৎকার রাতের নীরবতাকে বিদীর্ণ করল।

চমকে উঠল আহমদ মুসা। গোটা স্নায়ুতন্ত্রীতে অসহ্য এক যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ল তার।

প্রচন্ড এক লাথিতে কেবিনের দরজা ভেঙে ফেলল সে। ভাঙা ছোট তালাটা ছিটকে গিয়ে পড়েছে উন্মুক্ত কেবিনের এক কোণায়। দরজার দুটো ছোট্ট পাল্লা দু'পাশে সরে গিয়ে ধাক্কা খেয়েছে কেবিনের কাঠের দেয়ালের সাথে। কিন্তু দরজা ভাঙ্গাতে বড় ধরনের কোন শব্দ হয়নি। গুলির শব্দ ও চিৎকারের মধ্যে এ শব্দ সম্ভবত কারো কানে পৌঁছেনি।

আহমদ মুসা কেবিন থেকে বেরিয়ে মুহূর্ত কয়েক দেরি করল। না, কেউ এদিকে এল না। তারপর ডান হাতে রিভলভার ধরে বিড়ালের মত নিঃশব্দে দ্রুত এগুলো বোটের সামনের দিকে। তার পেছনে আলী আজিমভ এবং ওসমান এফেন্দী।

বড় উন্মুক্ত কেবিনটির মুখে আরেকটি ছোট দরজা। তারপরেই উন্মুক্ত ডেক।

আহমদ মুসা সেই দরজা দিয়ে উঁকি দিল। দেখল, নৌকা থেকে দু'জন দু'টি মেয়েকে বোটে তুলে দিচ্ছে আর দু'জন বোটের ডেকে দাঁড়িয়ে তাদের তুলে নিচ্ছে। মহিলা দু'টি অবিরাম 'আল্লাহ বাঁচাও' 'আল্লাহ বাঁচাও' চিৎকার করছে। বোটের লোক দু'টি তাদেরকে পাঁজাকোলা করে বোটে তুলে নিয়ে ডেকে আছড়ে ফেলার পর তাদের মুখে লাথি মেরে অশ্লীল ভাষায় গালি দিল। লুণ্ঠিত দ্রব্য-সামগ্রীও কিছু জমা হয়েছে বোটের ডেকে। গুলি তখন থেমে গেছে, নৌকা থেকে তখন শুধু চিৎকার ও কান্না শোনা যাচ্ছে।

আহমদ মুসা এম-১০ মেশিন পিস্তলের ট্রিগারে তর্জনী চেপে বিদ্যুৎ বেগে বেরিয়ে এসে ডেকে দাঁড়াল। ডেকে দাঁড়ানো দু'জন তার দিকে চোখ তুলেই স্টেনগানে হাত দিয়েছিল। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। আহমদ মুসার এম-১০ এর গুলির ঝাঁক গিয়ে গ্রাস করল তাদের।

নৌকা থেকে যারা মেয়ে দু'টিকে তুলে দিয়েছিল, তারা আর দু'জনকে টেনে তোলার জন্যে ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল।

আহমদ মুসার এম-১০ এর নল তাদের দিকেও ঘুরে গেল। ঝরে পড়ল তারা নৌকার উপরেই।

নৌকার উপর হোয়াইট ওলফের আরও তিনজন ছিল। তাদের একজন লুণ্ঠনের কাজে ব্যস্ত ছিল। আর একজন এক বৃদ্ধকে পেটাচ্ছিল। অন্যজন স্টেনগান বাগিয়ে দাঁড়িয়েছিল। গুলির শব্দ শুনেই সে তড়িৎ গতিতে ফিরে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সে স্টেনগানের লক্ষ্য স্থির করার আগেই আলী আজিমভের বুলেট গিয়ে তার মাথা গুঁড়ো করে দিল। আলী আজিমভের দ্বিতীয় গুলি লুণ্ঠনরত লোকটির বুক এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল।

শেষ লোকটি, যে এক বৃদ্ধকে পেটাচ্ছিল, চট করে বৃদ্ধটির আড়ালে গিয়ে বসল। বৃদ্ধকে ঢাল হিসেবে সামনে ধরল। এখন বৃদ্ধকে না মেরে তাকে মারা যায় না। মুশকিলে পড়ে গেল আহমদ মুসারা।

লোকটি পিস্তল হাতে তুলে নিয়েছে। বেপরোয়া লোকটি এখন বৃদ্ধের আড়ালে দাঁড়িয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে চায়।

আহমদ মুসারা নতুন কিছু ভাবার আগে ওর পিস্তলের গুলি থেকে বাঁচার জন্যে ডেকের উপর শুয়ে পড়ল। কিন্তু এই সময় অভাবিত এক কান্ড ঘটে গেল।

বৃদ্ধটি জাপটে ধরেছে লোকটিকে। হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে রিভলভার। তারপর বুকে জাপটে ধরেই তার মাথায় রিভলভারের নল বসিয়ে গুলি করেছে পরপর তিনবার। গুঁড়ো হয়ে গেল তার মাথা। সব ঘটনা মুহূর্তের মধ্যেই ঘটে গেল।

আহমদ মুসারা উঠে দাঁড়িয়ে বিস্ময়কর এ দৃশ্য দেখল।

মোটর বোটে তোলা মেয়ে দু'টি তখন বসেছে। তারা কাঁপছিল তখনও। বোটের নারী, শিশুদেরও একই অবস্থা। বোটে অনেকগুলি লাশ পড়ে আছে। তার মধ্যে যুবকদের সংখ্যাই বেশি। কিছু লাশ হয়তো পানিতেও পড়ে গেছে। কিন্তু চারদিকে অন্ধকার, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। মোটর বোটের লাইট ও হেডলাইটের আলো অতি অল্প জায়গায়ই আলোকিত করেছে।

আহমদ মুসা একটু উচ্চস্বরে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল, ভাই-বোনেরা, আল্লাহ সাহায্য করেছেন, আর কোন ভয় নেই।

বলে আহমদ মুসা নৌকায় নেমে সেই বৃদ্ধের কাছে গেল।

সম্ভবত অবসাদ-উত্তেজনায় নেতিয়ে পড়েছে সে নৌকার ডেকে। তার কপালে ক্ষতচিহ্ন-ফেটে গেছে। গড়িয়ে পড়া রক্তে সফেদ দাড়ি ভিজে গেছে। বৃদ্ধ হলেও লোকটা শক্ত-সমর্থ। মুখে পবিত্রতা ও আভিজাত্যের ছাপ। কপালে সিজদার চিহ্ন ম্লান আলোতেও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

আহমদ মুসা কাছে যেতেই বৃদ্ধ ধড়-মড় করে উঠে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা তাকে সালাম দিল।

সালাম গ্রহণ করে কিছুক্ষণ সম্বিতহারার মত আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে থাকল বৃদ্ধ। তার দু'টি হাত উপরে তুলে উর্ধ্বমুখী হয়ে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল, হে আল্লাহ, তোমার পবিত্র কালামে পড়েছি, ফেরেশতা দিয়েও তুমি সাহায্য কর। কিন্তু কোনদিন তা দেখিনি। আজ দেখলাম। মজলুমের আবেদন তুমি শুনেছ। এ বান্দার শুকরিয়া তুমি গ্রহণ কর। তোমারই সমস্ত প্রশংসা।

বৃদ্ধের শেষ কথা কান্নায় প্রায় রুদ্ধ হয়ে গেল।

বৃদ্ধ চুপ করতেই আহমদ মুসা বলল, জনাব অনেকেই আহত। এদের শুশ্রুষা প্রয়োজন। আপনি সবাইকে মোটর বোটে উঠতে বলুন। শহীদদেরও দাফনের ব্যবস্থা করতে হবে।

কে বাবা তোমরা? আল্লাহর সাহায্য হয়ে কোত্থেকে তোমরা এলে?

সব বলব জনাব, আগে এ জরুরি কাজগুলো হয়ে যাক।

বৃদ্ধ সবাইকে মোটর বোটে উঠতে নির্দেশ দিল। নারী-শিশু মিলে ১৫ জন ছিল নৌকায়, দু'জন ছিল মোটর বোটের ডেকে। মোট ১৭ জন গিয়ে আশ্রয় নিল

মোটর বোটের বড় কেবিনে। নৌকায় তখনও ৫ জন যুবক, ৩ জন নারী এবং ৩টি শিশুর লাশ।

আহমদ মুসা বৃদ্ধকে লক্ষ্য করে বলল, আপনাদের আর লোক কোথায়?

গুলি শুরু করলে অনেকেই পানিতে লাফিয়ে পড়েছে। বিশেষ করে যুবকরা। নিশ্চয় আশে-পাশেই আছে।

কথা শেষ করেই বৃদ্ধ একটা তীক্ষ্ণ শীষ দিল। এ তীক্ষ্ণ শীষ চারদিকের নীরবতাকে যেন তীরের মত বিদ্ধ করল।

মুহূর্তকাল পরেই নদীর দু'তীর থেকে অনেকগুলো লোকের পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার শব্দ পাওয়া গেল। আহমদ মুসা, আলী আজিমভ এবং ওসমান এফেন্দী সাঁতরে যুবকদের টেনে তুলল মোটর বোটে। যুবকদের মাথা নিচু, মুখ ম্লান এবং চোখে একরাশ বিস্ময়।

আহমদ মুসা বলল, আল্লাহর হাজার শোকর যে, হোয়াইট ওলফের নিষ্ঠুর হাত থেকে তোমরা আত্মরক্ষা করতে পেরেছো।

আহমদ মুসা যুবকদের নিয়ে শহীদদের দাফন করার জন্যে তীরে উঠে গিয়েছিল। নদীর তীর থেকে একটু দূরে দু'টি পাহাড়ের গর্তে তাদের দাফনের ব্যবস্থা হয়েছিল।

আলী আজিমভ ও ওসমান এফেন্দী মোটর বোটের ডেকে স্টেনগান্ হাতে পাহারায় দাঁড়িয়েছিল। সেই বৃদ্ধ তাদের সামনেই বসেছিল। তার কপালে ব্যান্ডেজ।

বৃদ্ধের নাম মনসুর মোহাম্মদভ। সে বিখ্যাত কাজরন কবিলার নেতা। মধ্য আর্মেনিয়ায় আরপা নদীর দক্ষিণ পাশের বিশাল কাজরন উপত্যকায় এদের বাস। উৎকৃষ্ট ভেড়ার জন্যে গোটা ককেশাসে এই উপত্যকা বিখ্যাত। অর্থ-সম্পদেও এদের নাম ছিল। কিন্তু হোয়াইট ওলফের অব্যাহত হত্যা, সন্ত্রাস ও লুণ্ঠনের শিকার হয়ে এরা সব হারিয়েছে। অবশেষে অবশিষ্ট অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে এরা দেশত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল।

আহত ছেলেদের প্রাথমিক চিকিৎসা ও ব্যান্ডেজ বাঁধার কাজটা করেছিল আলী আজিমভ। নারী-শিশুদের দায়িত্ব নিয়েছিল সাবেরা সুরাইয়া। কারাবাখ

মেডিকেল কলেজের ছাত্রী সে। এ বছরেরও প্রথম দিকে সে ক্লাস করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে পালিয়ে আসতে হয়েছে দাংগা বা গুপ্ত হত্যার শিকার হবার ভয়ে। সুরাইয়া মনসুর মোহাম্মদভের মেয়ে।

সুরাইয়া শুধু প্রাথমিক চিকিৎসাই নয়, ছড়ানো জিনিসপত্রও একটু গোছ-গাছ করে নিয়েছে।

সব কাজকর্ম শেষে হাত পরিষ্কার করার জন্যে বাইরে এল সুরাইয়া।

পিতার মতই লম্বা, ফর্সা। মাথার রুমালটা কপাল পর্যন্ত নামানো। ম্লান মুখ, ঘামে ভেজা।

বালতি দিয়ে পানি তুলে মুখ-হাত ধুয়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, আব্বা, আপনি একটু বিশ্রাম নিলে হতো না?

না মা, প্রয়োজন নেই। ওদের অপেক্ষা করছি।

কি ভাবছেন আব্বা?

আমি কিছুই ভাবতে পারছি না। ও ছেলে ঘুরে আসুক। এ ছেলেদের পরামর্শ কি সেটা জানতে হবে।

এরা কারা আব্বা? হোয়াইট ওলফকে কেউ এভাবে চ্যালেঞ্জ করতে পারে, তা তো ভাবিনি।

আমিও জানতে পারিনি মা।

আলী আজিমভ স্টেনগান হাতে সামনে নদীর অন্ধকার বুকের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের শেষ কথাটার পর ঘুরে দাঁড়াল। বলল, চাচাজান, আমরা আরাকস হাইওয়ে দিয়ে ইয়েরেভেন যাচ্ছিলাম। এসেছি বাকু থেকে। আরপা ব্রীজ পার হবার পরেই হোয়াইট ওলফের এ লোকেরা আমাদের ঘিরে ফেলে। আত্মরক্ষার কোন সুযোগ হয়নি। তারপর এরা এই মোটর বোটের পেছনের কুঠরীতে বন্দী করে কোথাও নিয়ে যাচ্ছিল। তারপর আপনাদের চিৎকার শুনে দরজা ভেঙ্গে আমরা বেরিয়ে আসি।

কিন্তু আপনারা কে? জিজ্ঞেস করল সুরাইয়া।

আলী আজিমভ মুহূর্তকাল চুপ থাকল। তারপর বলল, বোন, তুমি ককেশাস ক্রিসেন্টকে চেন?

চিনি।

আমরা ককেশাস ক্রিসেন্টের লোক।

ককেশাস ক্রিসেন্টের লোক আপনারা?

বিস্ময় ঝরে পড়ল সুরাইয়ার কণ্ঠ থেকে। মুখ হয়ে উঠল উজ্জ্বল। মুখের উপরের ম্লান কাল ছায়া দূর হয়ে গেল যেন হঠাৎ।

ততক্ষণে বৃদ্ধ উঠে দাঁড়িয়েছে। সে আলী আজিমভের কাছে গিয়ে তার হাত চেপে ধরে বলল, কি বলছ বাবা তুমি? সত্য বলছ? ওদের তো কত খুঁজেছি, পাইনি। শেষ পর্যন্ত এসেছ!

বলতে বলতে বৃদ্ধের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল।

আহমদ মুসার নাম শুনেছেন চাচাজান?

তাকে চিনব না, কি বল তুমি? বলল বৃদ্ধ মনসুর মোহাম্মদভ।

ওর সব কাহিনীই আমি জানি। বলল সুরাইয়া সাবেরা।

আলী আজিমভের মুখে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল। বলল, তাকে দেখতে চাও বোন?

তিনি অনেক-অনেক বড়। অনেক ব্যস্ত। বিশ্বজোড়া কাজ তার। অসম্ভব আশা করি না।

না বোন, যেখানেই মুসলমানরা মজলুম, অসহায়, সেখানেই তিনি হাজির হন।

আমাদের যে সাথীটি শহীদদের দাফনে গেছে, তিনিই আমাদের মহান নেতা, মহান ভাই আহমদ মুসা।

'আল্লাহু আকবর' বলে এক চিৎকার করে বৃদ্ধ মনসুর মোহাম্মদভ বোটের ডেকে বসে পড়ল।

আর বিস্ময়ে বিমূঢ় সুরাইয়া যেন বাকরুদ্ধ। হঠাৎ চারদিকের পরিবেশটা যেন তার অবিশ্বাস্যরকম নতুন মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, নতুন কোন জগতে সে, যেখানে কল্পনার আহমদ মুসা সশরীরে এসে হাজির।

এই সময় শহীদদের দাফন শেষ করে আহমদ মুসা ও অন্যান্য যুবকরা চলে এল।

সুরাইয়া নড়তে পারল না। তার পা দু'টি যেন আটকে গেছে ডেকের সাথে। তার চোখ দুটি থেকে বিস্ময়–আনন্দ ঠিকরে পড়ছে।

আহমদ মুসাকে দেখেই বৃদ্ধ মোহাম্মদভ উঠে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা প্রথমে উঠে এল বোটে। উঠতে উঠতে বলল, এদিকে সব ঠিক তো আজিমভ?

'জ্বি জনাব'। বলল আজিমভ।

আহমদ মুসা বোটে উঠতেই বৃদ্ধ মোহাম্মদভ আহমদ মুসাকে জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি এতক্ষণ তোমার পরিচয় দাওনি বাবা। তোমাকে তোমার সম্মান আমরা দিতে পারিনি।

কথা শেষ করেই বৃদ্ধ চিৎকার করে উঠল, হে আমার কাজরন কবিলার ছেলে-মেয়েরা, আজ আমাদের সবচেয়ে বড় সৌভাগ্যের দিন। দুনিয়ার মুসলমানদের সিপাহসালার আহমদ মুসা আজ তোমাদের মধ্যে।

আহমদ মুসা প্রায় হাতজোড় করে বলল, চাচাজান, এইভাবে আমাকে বলবেন না, আমি খুব বেদনা অনুভব করি। যে যোগ্যতা আমার নেই, তা আমার উপর চাপাবেন না। আমি জাতির একজন সামান্য সেবক। আমি জানি, আমি তাদের জন্যে কিছু করতে পারছি না। আজ এশিয়া আফ্রিকার হাজার প্রান্ত থেকে মজলুম মুসলমানদের আহাজারি উঠছে, লক্ষ নারী-শিশুর বুক ভাঙ্গা আর্তনাদ পৃথিবীর বাতাসকে ভারি করে তুলছে, মুসলমানদের শত-সহস্র বিরান জনপদ আমাদের যোগ্যতাকে উপহাস করছে। আমরা তাদের জন্যে কিছুই করতে পারিনি, কিছুই করতে পারছি না চাচাজান! বলত বলতে আহমদ মুসার কণ্ঠ কান্নায় রুদ্ধ হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ কেউই কথা বলতে পারল না।

বৃদ্ধ মোহাম্মদভ ধীরে ধীরে বলল, তোমার কথা ঠিক বাবা। তবু তুমি অনেক অনেক করেছ। আর আমরা? আমরা সারা জীবনটা খেয়ে এবং খাওয়ার জন্যে কাজ করেই কাটিয়ে দিলাম।

বৃদ্ধের শেষ কথাগুলো আবেগে ভেঙ্গে পড়ল। আবার নীরবতা।

নীরবতা ভাঙ্গল আহমদ মুসাই। বলল, চাচাজান এখনি আমাদের একটা জরুরি সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

বলে একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর বলল, চাচাজান, ভাইদের কাছ থেকে আমি আপনাদের সব কথা শুনেছি। এখন আপনি বলুন, আপনার হিজরতের সিদ্ধান্ত ঠিক আছে কি না?

এ সিদ্ধান্তের দায়িত্ব এখন তোমার বাবা। বলল বৃদ্ধ।

আহমদ মুসা একটু চিন্তা করল। তারপর বলল, বর্তমান অবস্থায় আপনাদের হিজরতের সিদ্ধান্তই সঠিক। সাময়িকভাবে আপনাদের ইরান, না হয় তুরস্কে যেতে হবে।

-আমি যদি ভুল বুঝে না থাকি, তাহলে বলব, হোয়াইট ওলফের সাথে এবার আপনার লড়াই বাঁধবে। এ লড়াইয়ে শরীক হওয়ার জন্যে কি আমরা দেশে থেকে যেতে পারি না? বলল সুরাইয়া সাবেরা।

আহমদ মুসা মুহূর্তের জন্যে তার দিকে মুখ তুলে বলল, ঠিক বলেছ বোন, থাকা দরকার। কিন্তু ককেশাস ক্রিসেন্ট আজ এমন অবস্থায় যে, সাহায্য নেয়ার মত অবস্থাও সে সৃষ্টি করতে পারেনি। যতদিন তা না পারছে, তোমদের একটু সরে থাকতেই হবে, বিশেষ করে একবার যখন সরেই এসেছ।

আবার নীরবতা।

নীরবতা ভেঙ্গে আহমদ মুসাই বৃদ্ধ মোহাম্মদভকে উদ্দেশ্য করে বলল, চাচাজান, এই বোট নিয়ে কি আরপা হয়ে আরাকস লেক পাড়ি দিতে পারবেন?

--পারব। কিন্তু আরপা নদীর মুখে পুলিশ পাহারা আছে, আবার হোয়াইট ওলফও পাহারা দেয়।

--আজারবাইজানি পুলিশ কিছু বলবে না। আর হোয়াইট ওলফের পাহারাকে দেখা যাবে।

--তোমরা যাবে আমাদের সাথে?

--জ্বি, আমরা আরাকস লেক পর্যন্ত আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসব। বোট কি আপনারা চালিয়ে নিতে পারবেন?

--পারবো বাবা, আমাদের নিজেদেরই ৫টা মোটর বোট ছিল। ব্যবসায়ের বড় অংশ নদীপথেই আমরা করতাম। আমার মা সুরাইয়াতো ইঞ্জিনও মেরামত করতে পারে। সায়েন্স পড়েছে কিনা।

আহমদ মুসা সুরাইয়ার দিকে ইংগিত করে বলল, এ বুঝি আপনার মেয়ে?

--হ্যাঁ, মেডিকেল কলেজে পড়ত।

-- কোন ইয়ারে পড়তে? সুরাইয়াকে জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

--চতুর্থ বর্ষে। বলল সুরাইয়া।

--অল্পের জন্যে ডিগ্রি নেয়া হলো না। দুঃখ পেয়ো না বোন, আল্লাহ সুযোগ আবার করে দিতে পারেন।

--না জনাব, এখন আমার কোন দুঃখ নেই। আপনার দেখা পেয়ে মনে হচ্ছে, ডিগ্রি কেন, জাতির জন্যে সব ত্যাগই আমি করতে পারব।

--ধন্যবাদ বোন, এইতো চাই।

বলেই আহমদ মুসা আজিমভের দিকে ফিরে বলল, আজিমভ, বোট স্টার্ট দাও। আহমদ মুসার মোটর বোট যখন আরপা ব্রীজ পার হলো, তখন রাত ২টা। চারদিক নিঃশব্দ নিঝুম। ব্রীজের পশ্চিম পাশেই পুলিশ ফাঁড়ি। পুলিশরা আটকায়নি। বোট কোত্থেকে এসেছে, কারা আছে, কোথায় যাবে, এ তিনটি প্রশ্নের উত্তর জেনে নেয়ার পরই তারা ছেড়ে দিয়েছে। আজারবাইজানি ছিটমহলের পুলিশরা মজলুম উদ্বাস্তুদের দেশত্যাগে সাহায্যই করে থাকে। তারা যেহেতু নিরাপত্তা দিতে পারছে না, তাই নিরাপত্তার সন্ধানে এই চলে যাওয়াকে তারা বাঁধা দেয় না।

হোয়াইট ওলফের তরফ থেকেও কোন বাঁধা এল না। হতে পারে হোয়াইট ওলফের যে ইউনিটটি আহমদ মুসাদের হাতে ধ্বংস হলো, সে ইউনিটটিই এখানকার দায়িত্বে ছিল। সুতরাং বাঁধা দেয়ার আর কেউ ছিল না।

ইরানের সীমান্ত ফাঁড়ি থেকেও কোন বাঁধা এলো না। তাদের একটি মোটর বোট এসে এ মোটর বোটটি চেক করে শুধু ছেড়েই দিল না, অনেক খাবার এবং আহতদের জন্যে ঔষধপত্রও দিল।

ইরানের সীমান্ত এলাকার সৈনিক ও পুলিশরা সরকারি পলিসির বাইরেও অনেক সাহায্য-সহযোগিতা ককেশাস অঞ্চলের মুসলমানদের করে থাকে। কারণ, ইরানের তাব্রিজ এলাকার সুন্নী মুসলমানদের সাথে ককেশাসের এ অঞ্চলের সুন্নী মুসলমানদের ধর্মীয় বন্ধন ছাড়াও বংশগত যোগসূত্র আছে।

আহমদ মুসারা আরপা নদীর মুখ থেকে শ' খানেক গজ উত্তরে এগিয়ে আরাকস নদীর তীরে নেমে পড়ল।

আহমদ মুসাকে বিদায় দিতে গিয়ে বৃদ্ধ মনসুর মোহাম্মদভ কেঁদে ফেলল। বলল, তোমাকে সামনে দেখে যতখানি খুশি হয়েছিলাম, তারচেয়ে অনেক বেশি বুক ছিড়ে যাচ্ছে তোমাকে বিদায় দিতে।

বিদায়ের সময় সুরাইয়াও বোটের সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলল, আমি ডিগ্রি পাইনি, কিন্তু আমি একজন ডাক্তার। এই দুঃসময়ে জাতির কি কোনই কাজে লাগতে পারি না আমি?

-পার বোন। বলেছি তো, তোমরা যাচ্ছো সাময়িক প্রয়োজনে। তোমরা শীঘ্রই ফিরে আসবে, সে ব্যবস্থা আমরা করব।

একটু দ্বিধা করে সুরাইয়া বলল, আমার কৌতুহল, একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করব, অনুমতি দেবেন?

-হ্যাঁ, করতে পার।

-আপনার কে আছে, বাবা, মা, --------

কথা শেষ না করেই সুরাইয়া থেমে গেল।

আহমদ মুসা সংগে সংগে কোন উত্তর দিতে পারলো না। প্রশ্নটা হঠাৎ যেন তাকে আনমনা করে দিলো। বেদনার একটা কালো ছায়া নেমে এল তার চোখে-মুখে।

পল পল করে সময় বয়ে চলল।

আহমদ মুসার এই পরিবর্তন দেখে সুরাইয়ার মুখের হাসি নিভে গেল। সে সংকুচিত হয়ে পড়ল। কিন্তু কিছু বলতেও পারল না।

ধীরে ধীরে আহমদ মুসা মুখ তুলল, বোন, তোমরা যেমন আজ অনেক আপনজনকে মাটি চাপা দিয়ে দেশত্যাগ করছ, তেমনিভাবে আমিও একদিন

জন্মভূমি সিংকিয়াং ত্যাগ করেছিলাম। পেছনে পড়েছিল কম্যুনিস্ট বাহিনীর বুলেটে ঝাঁঝরা মা, বোমায় পুড়ে যাওয়া আব্বা, ভাই এবং অনেকের লাশ।

আহমদ মুসার নরম কণ্ঠ স্বগতঃই যেন উচ্চারণ করল কথাগুলো। জমাট বেদনার মতন শোনা গেল তা।

সুরাইয়া বিষণ্ন কণ্ঠে বলল, মাফ করবেন ভাইজান, আমি এ প্রশ্ন করে ঠিক করিনি।

সুরাইয়ার এ কথাগুলো আহমদ মুসার কানে গেল কি না কে জানে। সে তার আগের কথার রেশ ধরেই বলল, আর এই সেদিন তোমার ভাবী হয়েছে, তাকেও রেখে এসেছি সিংকিয়াং-এ।

পাশের সীমান্ত ফাঁড়ির কেউ যেন হুইসেল দিয়ে উঠল।

আহমদ মুসা চমকে উঠে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, যাও সুরাইয়া, বোটে স্টার্ট দাও।

তারপর বৃদ্ধ মোহাম্মদভের দিকে ঘুরে বলল, আসি চাচাজান।

# ২

সোফিয়া এ্যাঞ্জেলার পিতা সেন্ট জর্জ সাইমনের বাড়ি।

সময় তখন ৫টা।

এই মাত্র সে বাইরে থেকে ফিরল।

বাথরুমে গিয়েছিল।

হাত-মুখ ধুয়ে বাথরুমে থেকে বেরুতেই সোফিয়া এ্যাঞ্জেলার মা এলিজাবেথ বলল, তোমার মেয়ের যেন কি হয়েছে।

-কার, সোফিয়ার? কি হয়েছে?

-জানি না, সেই ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করেছে, আর খুলেনি।

সোফিয়া এ্যাঞ্জেলা জর্জ সাইমন ও এলিজাবেথের একমাত্র সন্তান।

স্ত্রীর কথা শুনে ভ্রু কুঁচকে গেল জর্জ সাইমনের। উদ্বেগ ফুটে উঠল তার চোখে-মুখে। বলল, তুমি ডাকনি এলিজা?

-অনেক ডেকেছি।

-অসুখ করেনি তো?

-অসুখ করলে দরজা বন্ধ করবে কেন?

'চল তো দেখি' বলে জর্জ সাইমন সোফিয়া এ্যাঞ্জেলার ঘরের দিকে চলল। পেছনে সোফিয়ার মা।

সোফিয়ার আব্বা সোফিয়ার দরজায় ধীরে ধীরে নক করল, ডাকল, সোফিয়া মা, দরজা খোল তো।

কয়েকবার ডাকাডাকির পর দরজা খুলে গেল। দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে সোফিয়া এ্যাঞ্জেলা। চুল উস্কো-খুস্কো। চোখ-মুখ ফোলা। অনেক কেঁদেছে সে।

-কি হয়েছে মা তোমার? উদ্বেগ ঝরে পড়ল সেন্ট জর্জ সাইমনের কণ্ঠে।

কোন উত্তর দিল না সোফিয়া।

জর্জ সাইমন সোফিয়ার কপালে হাত দিয়ে বলল, অসুখ করেনি তো মা?

সোফিয়া এ্যাঞ্জেলা দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

সোফিয়ার মা সোফিয়াকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, কাঁদিসনে মা, কি হয়েছে আমাদের বল।

সোফিয়া এ্যাঞ্জেলা কেঁদেই চলল। কোন জবাব দিল না।

সোফিয়া মাথায় হাত বুলিয়ে তার বাবা বলল, বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু ঘটেছে মা?

মায়ের বুক থেকে মুখ তুলে পিতার দিকে চাইল সোফিয়া এ্যাঞ্জেলা। চোখের পানিতে ধোয়া তার মুখ। চোখ দু'টি লাল। বলল, আব্বা, সালমান শামিল নেই, আজ------------

কথা শেষ করতে পারলো না। কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল তার।

এক সাগর মমতা ও উদ্বেগ নিয়ে সেন্ট জর্জ সাইমন তাকিয়ে ছিল মেয়ের দিকে। কিন্তু সোফিয়া এ্যাঞ্জেলার কথা শোনার সাথে সাথে একখণ্ড ঝড় যেন তার মুখের উপরে দিয়ে বয়ে গেল। একটা বিস্ময়-বিমূঢ় ভাব এসে তাকে গ্রাস করল। ধীরে ধীরে সেখানে ফুটে উঠল আতংকও।

কোন কথা বলতে পারল না। পাথরের মত নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইল সে।

সোফিয়ার মা এলিজাবেথও নির্বাক। তার অসহায় দৃষ্টি স্বামীর দিকে।

আর সোফিয়া এ্যাঞ্জেলাও একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পিতার দিকে। অন্তর্ভেদী তার দৃষ্টি। যেন সে পিতাকে পাঠ করতে চায়।

অনেকক্ষণ পর কিছুটা স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে সোফিয়ার আব্বা বলল, আবার ওকে কিডন্যাপ করেছে, এই তো?

একটু থেমে একটা ঢোক গিলে নিয়ে বলল, ঠিক আছে, খোঁজ করা যাবে। তুমি কেঁদো না মা।

সোফিয়া তার মাকে ছেড়ে দিয়ে পিতার দু'টি হাত জড়িয়ে ধরে বলল, খোঁজ করা যাবে আব্বা? তাকে পাওয়া যাবে?

আবার নিশ্চুপ হয়ে গেল সেন্ট জর্জ সাইমন। হৃদয়টা তার কেঁপেও উঠল। হোয়াইট ওলফের হাতে পড়লে তাকে কি খোঁজা যায়, না খুঁজে পাওয়া যায়! কিন্তু

মেয়েকে কি বুঝ দেবে সে? মেয়ে যে এই সর্বনাশ করে বসে আছে কে জানে। এখন মেয়েকে কি বলবে সে!

আবার অনেকক্ষণ পর মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, খুঁজতে তো হবেই মা।

একটু দম নিয়ে বলল, আর তুমি কেঁদো না মা। তুমি বড় হয়েছ, লেখা-পড়া শিখেছ। সবই জান তুমি। মোহামেডানদের সাথে তো আমাদের এখন যুদ্ধ চলছে। ওদের জন্যে তুমি আমি কি-ই বা করতে পারব।

-আব্বা ওরা তো যুদ্ধে নামে নি। আমরাই তো ওদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়াচ্ছি। বলল সোফিয়া।

-ইতিহাস তো আজ থেকে শুরু নয় মা, এই সংঘাতের শুরু অনেক আগে।

-কিন্তু আব্বা, কোন একসময়ের সংঘাতের জন্যে এখনকার নিরপরাধ লোকরা কি দায়ী?

জর্জ সাইমন মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, মা, ভুলে যেও না তুমি জাতির একজন। জাতির স্বার্থকে তোমার বড় করে দেখতে হবে।

-আব্বা, জাতির স্বার্থ, আর জাতির কোন এক গোষ্ঠীর স্বার্থ কি এক জিনিস?

কেঁপে উঠল সেন্ট জর্জ সাইমন। মেয়ের কথা যেন হৃদয়ের কোথায় গিয়ে তীরের মত বিদ্ধ হলো। সেই সাথে একটা ভয় ছড়িয়ে পড়ল তার চোখে-মুখে। তার তর্জনীটা সোফিয়া এ্যাঞ্জেলার ঠোঁটের কাছাকাছি তুলে বলল, পাগলি এইভাবে কথা বলতে নেই।

কথা শেষ করেই প্রসংগ পাল্টিয়ে বলল, তুমি দুপুরেও কিছু খাওনি মা, মুখ-হাত ধুয়ে খেয়ে নাও। পরে কথা বলব।

বলে সেন্ট সাইমন তার রুমের দিকে চলে এল।

সোফিয়ার মা সোফিয়াকে বলল, চল মা, হাত-মুখ ধুয়ে কিছু খাবি।

-একটুও ক্ষুধা নেই মা।

-অবুঝ হোস না মা। তোর আব্বা তো সবই বলল।

একটু শুকনো হাসি ফুটে উঠল সোফিয়া এ্যাঞ্জেলার মুখে। সে হাসি কান্নার চেয়েও করুণ।

বিছানায় গিয়ে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল সোফিয়া।

সোফিয়ার মা এ্লিজাবেথ এবার কেঁদে ফেলল।

বালিশ থেকে মুখ তুলে মায়ের দিকে চেয়ে একটু হাসতে চেষ্টা করে বলল, আমি একটু পরেই খেতে আসছি মা।

রাত তখন ১০টা।

রাত ১০টায় মিঃ সাইমন তার গাড়ি নিয়ে বেরুল। নিজেই ড্রাইভ করছিল।

মিঃ সাইমন গেট দিয়ে বেরুবার পর দারোয়ান গেট বন্ধ করতে যাচ্ছিল। এই সময় সোফিয়া এ্যাঞ্জেলার গাড়িও বেরিয়ে এল।

এইভাবে রাত দশটায় সোফিয়াকে একা বেরুতে দেখে দারোয়ানের চোখে মুহূর্তের জন্যে একটা বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠল। কিন্তু কিছুই বলল না।

মিঃ সেন্ট সাইমনের গাড়ি রাস্তায় পড়ার কয়েক মুহূর্ত পরে সোফিয়ার গাড়িও গিয়ে রাস্তায় পড়ল।

রাত দশটার রাস্তা। গাড়ির ভিড় অনেক কম। সেন্ট সাইমনের গাড়ি অনুসরণ করে এগিয়ে চলছে সোফিয়ার গাড়ি।

সোফিয়ার মুখ শক্ত। চোখে দৃঢ়তার ছাপ। তার স্থির দৃষ্টি সামনে প্রসারিত। সে অনেক চিন্তা-ভাবনা করেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সে বরাবরই দেখে আসছে, প্রতি বৃহস্পতিবার রাত দশটায় তার পিতা বেরিয়ে যান গাড়ি নিয়ে। ফেরেন শেষ রাতে অথবা সকালে। সে জানে না, কিন্তু তার ধারণা, হোয়াইট ওলফের কোন সাপ্তাহিক বৈঠক বসে এদিন। সে বৈঠকেই তার আব্বা যান। তার আব্বার জীবনে গোপনীয় কোন কিছুই নেই। যেখানে যে কাজেই তিনি যাবেন, বলে যাবেন। কিন্তু বৃহস্পতিবার রাতের তার এই সফরের কথা কাউকে তিনি বলেন না। সোফিয়ার ধারণা, তার পিতাকে অনুসরণ করলেই হোয়াইট ওলফের আস্তানার সন্ধান পাওয়া যাবে। আর আস্তানার খোঁজ পেলে সালমানের সন্ধান সে করতে পারবে। সালমানের তো কেউ নেই সাহায্য করার।

সোফিয়া কিভাবে বসে থাকতে পারে! জানে সে, হোয়াইট ওলফ কত ভয়ংকর। কিন্তু কোন ভয়ই আজ তার মনে নেই। সালমান থাকবে না, এমন দুনিয়া সে কল্পনাই করতে পারে না।

বিভিন্ন রাস্তা ঘুরে সেন্ট সাইমনের গাড়ি পার্ক রোডে এসে পড়ল। পার্ক রোড থেকে গাড়ি গিয়ে পড়ল ইয়েরেভেন হাইওয়েতে। ইয়েরেভেন হাইওয়ে দিয়ে সেন্ট সাইমনের গাড়ি ক্রমশ ইয়েরেভেন শহরের বাইরে এসে পড়ল।

'যাচ্ছে কোথায় তার আব্বা' চিন্তা ফুটে উঠল সোফিয়া এ্যাঞ্জেলার চোখে-মুখে। সোফিয়া মনে করেছিল, শহরেই হোয়াইট ওলফের কোন ঘাঁটিতে তার আব্বা যাচ্ছে। শহরের বাইরে আসতে দেখে তার মনে প্রশ্ন জাগল, আব্বা কি প্রতি বৃহস্পতিবারে এভাবে শহরের বাইরে কোথাও যান?

ইয়েরেভেন হাইওয়েতে গাড়ি আসা-যাওয়া তখন আরও কম। অনেকটা নির্জন রাস্তা। সোফিয়া তার পিতার গাড়ি থেকে তার গাড়ির দূরত্ব আরও বাড়িয়ে দিল। কোনভাবেই সে পিতার চোখে পড়তে চায় না।

ইয়েরেভেন হাইওয়েতে ১৫ মিনিট চলার পর সেন্ট সাইমনের গাড়ি হাইওয়ে থেকে নেমে গেল। আরাগাত রোড ধরে তার গাড়ি এবার দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চলল।

সোফিয়াও আরাগাত রোডে তার গাড়ি নামিয়ে নিল। আরাগাত রোডটি দক্ষিণে সাত-আট মাইল এগুবার পর আরাগাত পর্বতের পাদদেশে গিয়ে শেষ হয়েছে। যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে আরেকটি পাথুরে রাস্তা এঁকে-বেঁকে পাহাড়ের উপর উঠে গেছে। এই পাহাড়েই একটি ঢালে বিখ্যাত আমবার্ড দুর্গ। বিখ্যাত এই দুর্গের ভেতরই আর্মেনীয় খৃস্টানদের সবচেয়ে প্রাচীন সানাইন ধর্মমন্দির অবস্থিত।

সোফিয়া এবার অনেকটা ভয় পেয়ে গেল। তার আব্বা পাহাড়ে কোথায় যাচ্ছে? নিষিদ্ধ এলাকা আমবার্ড দুর্গে কি? আমবার্ড দুর্গের কথা মনে হতেই তার গা অনেকটা ছমছম করে উঠল। বাইরে থেকে সবাই একে রহস্যের আকর বলে মনে করে। আর্মেনিয়ার খৃস্টান ধর্মগুরু ফাদার পল এবং তিনি যাকে দয়া করে

বিশেষ অনুমতি দেন তিনি বা তারাই শুধু ঐ প্রাচীন দুর্গ ও ধর্মকেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারে।

ভয়বোধের সাথে সোফিয়া আনন্দিতও হল। সালমানকে হোয়াইট ওলফরা মেরে না ফেললে নিশ্চয় এমন জায়গাতেই রেখেছে। সালমানকে মেরে ফেলতে পারে, এমন কথা মনে হতেই সোফিয়ার মনটা মোচড় দিয়ে উঠল। না, না, সালমান মরতে পারে না। মন বলছে, সে মরতে পারে না।

সুউচ্চ মাউন্ট আরাগাত পর্বতের একদম কাছে চলে এসেছে। পর্বতের কালো দেয়াল গোটা দক্ষিণ দিগন্তটাকেই যেন গ্রাস করেছে।

গাড়ির গতি কমে এসেছিল। সোফিয়া তার আব্বার গাড়ির রেয়ার লাইট দেখে তাকে অনুসরণ করছিল। আরাগাত রোডে পড়ার পর সোফিয়া তার গাড়ির লাইট নিভিয়ে দিয়েছিল। নিভিয়েছিল পিতার এবং কারো নজরে পড়ার ভয়ে।

অনেকক্ষণ থেকেই গাড়ির চড়াই যাত্রা শুরু হয়েছিল। অর্থাৎ, গাড়ি মাউন্ট আরাগাতের গা বেয়ে উঠতে শুরু করেছে।

সামনে হঠাৎ একসময় সেন্ট সাইমনের গাড়ির রেয়ার লাইট নিভে গেল। হেডলাইটটিও।

সঙ্গে সঙ্গে সোফিয়াও তার গাড়ি থামিয়ে দিল। অল্প কিছুক্ষণ গাড়ির ভেতর অপেক্ষা করার পর গাড়ি থেকে নেমে পড়ল।

সামনে অন্ধকার। পাহাড়ের উপরটাও। আমবার্ড দুর্গ পাহাড়ের এক প্রশস্ত ঢালে—নিচে থেকে দেখা যায় না।

অন্ধকারে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল সোফিয়া। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দেখল, একটা টর্চ জ্বলতে জ্বলতে ক্রমে পাহাড়ের উপর উঠে গেল।

সোফিয়া এখন তার কি করা উচিত ভাবছিল। এমন সময় দু'দিক থেকে দু'জন এসে তাকে ঘিরে দাঁড়াল। তাদের হাতে স্টেনগান। কাঁধে ঝুলানো ওয়াকি টকি।

তাদের একজন ভারি গলায় বলল, কে আপনি?

সোফিয়া এমন অবস্থার কথা ভাবেনি। সে প্রথমটায় খুব ভীত হয়ে পড়ল। তারপর বুঝল, এরা নিশ্চয় হোয়াইট ওলফের লোক এবং আব্বা নিশ্চয় হোয়াইট

ওলফের এক ঘাঁটিতে এসেছেন। সাহস ফিরে এল সোফিয়ার। বলল, আমি সোফিয়া এ্যাঞ্জেলা। আমি আমার আব্বা সেন্ট সাইমনের সংগে এসেছি।

সোফিয়ার কথা শুনে দু'জন তাদের উদ্যত স্টেনগানের ব্যারেলটা নিচে নামাল এবং তাদের একজন দূরে গিয়ে ওয়াকি টকিতে কি যেন আলোচনা করল। তারপর ফিরে এসে বলল, ম্যাডাম, আপনাকে আমাদের সাথে যাওয়ার হুকুম হয়েছে।

--কোথায়?

--দুর্গে।

--কে বলেছে, আব্বা?

--না।

--কে?

--হুকুম তো একজনই দেন।

--কে?

--লর্ড মাইকেল পিটার।

মাইকেল পিটারের নাম শুনে শিউরে উঠল সোফিয়া। হোয়াইট ওলফের প্রধান এই মাইকেল পিটার। মা'র কাছ থেকে শোনা, দয়া, অনুকম্পা না কি এই লোকটির অভিধানে নেই। সাক্ষাত এক যম সে।

নির্দেশ অস্বীকার করার কোন উপায় ছিল না সোফিয়ার।

দু'জন লোকের একজন আগে এবং একজন পেছনে পেছনে চলল। তারা একটা পুরানো পাথুরে পথ ধরে পাহাড়ের উপরে উঠতে লাগল।

পথ বেশ প্রশস্ত, ধাপে ধাপে উপরে উঠে গেছে। আমবার্ড দুর্গটি যখন তৈরি হয়, তখনি এ রাস্তাটি তৈরি।

আমবার্ড দুর্গের প্রশাসনিক ওয়ার্ডের একটি কক্ষে বন্দী সোফিয়া এ্যাঞ্জেলা। কক্ষে একটা শোবার খাট, আর কিছুই নেই। বাথরুম ঘরের সাথেই। একটি মাত্র দরজা। কক্ষ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত।

কক্ষে খাটের উপর হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে আছে সোফিয়া। চুল উস্কো-খুস্কো। মুখ ম্লান। যেন তার উপর দিয়ে কত ঝড় বয়ে গেছে। চারদিন হল সে এই কক্ষে বন্দী হয়ে আছে। চারদিন ধরেই চলছে জিজ্ঞাসাবাদ।

মনে পড়ে সেদিন রাতে দু'জন প্রহরীর সাথে এ কক্ষে এসে পৌঁছার সংগে সংগেই স্বয়ং মাইকেল পিটার এ কক্ষে এসেছিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা শুরু হয়েছিল এইভাবেঃ

--মা এ্যাঞ্জেলা, তোমার আব্বা তোমাকে সাথে এনেছে?

--না।

--তোমার আব্বা জানতেন তুমি আসছ?

--না।

--তুমি জানতে বৃহস্পতিবার রাতে তোমার আব্বা কোথায় যান?

--কোথায় যান তা জানতাম না।

--কি জানতে তাহলে?

--এইটুকু অনুমান করতাম যে, তিনি হোয়াইট ওলফের কোন সিটিং-এ যান।

--কেমন করে জানলে তিনি হোয়াইট ওলফের লোক?

--হঠাৎ একদিন জেনে ফেলি।

--কিভাবে?

--হোয়াইট ওলফ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করতে মাকে তিনি নিষেধ করেছিলেন।

--তোমার মা কি সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন?

--নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে।

--তুমি সালমান শামিলের খোঁজে এসেছিলে।

--হ্যাঁ।

--সালমান শামিল হোয়াইট ওলফের টার্গেট, একথা তোমার আব্বা তাকে জানিয়েছিল, যার ফলে সে সাবধান হয় এবং প্রথম দফা বেঁচে যায়, ঠিক না?

--না।

--সালমান শামিল তাহলে তা কিভাবে জানতে পারল বলতে পার?

--হয়তো কোনভাবে জেনেছে।

--তুমি সালমানকে ভালবাস তোমার আব্বা জানেন?

--না।

--তোমার মা?

--না।

--সালমান শামিল কে জান?

--সে মুসলমান এবং একজন ছাত্র।

--ককেশোস ক্রিসেন্টকে চেন?

--না।

--নাম শুনেছ?

--না।

--তোমার আব্বা জানতেন?

--জানি না।

প্রথম দিনের জিজ্ঞাসাবাদ এখানেই শেষ হয়। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠার পরই সোফিয়া দেখতে পেয়েছিল কক্ষের দক্ষিণ পাশের কাঠের দেয়াল উঠে গেল। বেরিয়ে এল কাঁচের দেয়াল। কাঁচের দেয়ালের ভেতর দিয়ে ওপারের কক্ষে চোখ পড়তেই দেহটা যেন কাঠ হয়ে গেল তার। দেখল, তার আব্বা চেয়ারে বসা। তার সামনে আরেক চেয়ারে বসে মাইকেল পিটার। মাইকেল পিটারের মুখ নড়ছে, কথা বলছে সে। সোফিয়া বুঝলো, তার আব্বাকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। তার আব্বা একবার এদিকে চাইল। ভাবলেশহীন মুখ। বরং চোখে একটা প্রসন্ন দৃষ্টি।

কি জিজ্ঞাসাবাদ চলছিল সোফিয়া কিছুই শুনতে পাচ্ছিল না। তবে তার আব্বার মুখ খুব কমই নড়তে দেখছিল।

হঠাৎ একসময় মাইকেল পিটারকে জ্বলে উঠতে দেখা গেল। ক্রোধে উঠে দাঁড়ালো সে। তার চোখে যেন আগুন।

এর পরেই মাইকেল পিটার ঢুকলো সোফিয়ার কক্ষে। কক্ষে ঢুকে এদিক-ওদিক কয়েকবার পায়চারি করে শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, তোমার পিতা কে জান?

জানি, তিনি একজন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা।

জান, আমরা চাই তার সম্মান এবং মর্যাদা অটুট থাকুক?

জানি।

কিন্তু তোমরা আমাদের সাহায্য করছ না।

কি সাহায্য?

তুমি না জানলেও তোমার আব্বা জানেন, এ এলাকার মুসলমানদের 'ককেশাস ক্রিসেন্ট' আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। আমাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে প্রধান বাঁধা। সালমান শামিল 'ককেশাস ক্রিসেন্টের' একজন শীর্ষ নেতা। আমরা নিশ্চিত, তার মাধ্যমে আমাদের কৌশল ও পরিকল্পনার কথা ককেশাস ক্রিসেন্টের কাছে পৌঁছেছে। কি পৌঁছেছে, কতটুকু পৌঁছেছে এটুকুই শুধু আমরা তোমাদের কাছে জানতে চাই।

দুঃখিত, এ ব্যাপারে কিছুই জানি না।

কিছুই জান না, তাহলে হোয়াইট ওলফের কাছ থেকে সালমান শামিলকে উদ্ধার করতে এসেছ কেন? শত্রু তোমাদের কাছে বড় হলো কেন?

মাইকেল পিটারের চোখ দু'টি ক্রোধে জ্বলে উঠেছিল।

কথা শেষ করেই সে বেরিয়ে গিয়েছিল।

সোফিয়া তার পিতার কক্ষের দিকে চাইল। কাঠের দেয়ালে গিয়ে চোখ ধাক্কা খেল। কাঠের দেয়ালটা কখন যেন আবার নেমে এসেছে।

এভাবেই তিনদিন ধরে জিজ্ঞাসাবাদ চলছিল। সেদিন ডঃ পল জনসনের বিশ্রাম কক্ষে সালমান শামিলের সাথে সোফিয়ার আলোচনার বিষয়টা তারা খুঁটে খুঁটে জিজ্ঞাসা করেছিল। মধ্য এশিয়ার মুসলিম বিপ্লবের নায়ক আহমদ মুসা ককেশাস ক্রিসেন্টের সাহায্যে ককেশাসে এসেছে, এটা সোফিয়া জানে কি না বার বার জিজ্ঞাসা করেছে। সব ক্ষেত্রেই সোফিয়ার 'না' বলা ছাড়া উপায় ছিল না। আসলে তো কিছুই জানে না সে। কিন্তু মাইকেল পিটার তা বিশ্বাস করেনি। বরং মনে হয়েছে, সোফিয়ার প্রতি তার সন্দেহ যেন আরও ঘনীভূত হয়েছে। সোফিয়া

বুঝতে পেরেছে, তার পিতাকেও এইভাবে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। তৃতীয় দিন জিজ্ঞাসাবাদ শেষে যাবার সময় রক্তচক্ষু তুলে বলেছে, সেন্ট সাইমনের মেয়ে বলে তোমাকে যথেষ্ট সুযোগ দেয়া হয়েছে। হোয়াইট ওলফের বিচার কত কঠোর তুমি জান না।

হাঁটুতে মুখ গুঁজে এইভাবে গত তিনদিনের স্মৃতিচারণে ডুবে গিয়েছিল সোফিয়া।

তখন রাত অনেক হয়েছে। মন্দিরের পেটা ঘড়িতে ৯টা বাজার শব্দ অনেকক্ষণ আগে শোনা গেছে।

হঠাৎ দরজা খোলার শব্দে ভাবনার জাল ছিড়ে গেল সোফিয়ার। মুখ তুলল সোফিয়া। দেখল, হোয়াইট ওলফ প্রধান মাইকেল পিটার বাম হাতে দরজা খুলে ধরে আছে। খোলা দরজা দিয়ে প্রবেশ করছে সোফিয়ার আব্বা সেন্ট জর্জ সাইমন। মাইকেল পিটারের ডান হাতে রিভলভার।

সোফিয়া পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল। তার সৌম্যশান্ত মুখটি বেদনায় নীল। দু'চোখের কোণায় কালি পড়ে গেছে। চুল উস্কো-খুস্কো। চারদিন আগের পোশাকটাই এখনও তার পরনে। গোটা চেহারাটাই তার বিধ্বস্ত। মন হাহাকার করে উঠল সোফিয়ার।

'আব্বা' বলে চিৎকার করে উঠে সোফিয়া ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল তার আব্বাকে।

বলল, কেমন আছ তুমি আব্বা?

কোন কথা বলতে পারলো না সেন্ট সাইমন। শুধু মাথায় হাত বুলাতে লাগল সোফিয়ার। অশ্রু নেমে এল তার দু'চোখ থেকে।

মাইকেল পিটারের ঠোঁটে হাসি। সাপের মতো ঠান্ডা সে হাসি। হাতের পিস্তলটি নাচিয়ে নাচিয়ে সে বলল, সোফিয়া তোমার জন্যে একটি খবর।

সোফিয়া পিতাকে ছেড়ে দিয়ে একটু সরে দাঁড়াল।

মাইকেল পিটার বলল, হোয়াইট ওলফের বিচার-কমিটি তোমাদের বিষয় বিস্তারিত পর্যালোচনা করে আজ সন্ধ্যায় তাদের রায় ঘোষণা করেছে। রায়ে হোয়াইট ওলফের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা, ককেশাস ক্রিসেন্টের সাথে সম্পর্ক রাখা

এবং তাদের কাছে তথ্য পাচারের দায়ে তোমার পিতাকে অভিযুক্ত করেছে। বিচার-কমিটি মনে করে, সালমান শামিলের ক্ষেত্রে প্রথম অভিযান সফল না হওয়া, বাকুতে আমাদের একটি অপারেশনের বিপর্যয় ঘটা, লেক আরাকস এবং তাগাবান এর আমাদের শক্তিশালী ইউনিট সমূলে ধ্বংস হওয়া—এই পরপর ঘটনাগুলো ককেশাস ক্রিসেন্টের কাছে তথ্য পাচারেরই ফল। বুড়ো ডঃ পল জনসনেরও মাথা খারাপ হয়েছে। তার বিশ্বাসঘাতকতায় ইয়েরেভেনেও আমাদের বেশ লোকক্ষয় হয়েছে। তাকে মরতে হবে।

একটু দম নিল মাইকেল পিটার। তারপর শুরু করল আবার, তবে তোমার আব্বার দীর্ঘ জাতিসেবা এবং হোয়াইট ওলফের প্রতি তার অবদানের কথা স্মরণ করে দলের প্রতি বিশ্বস্ততা প্রমাণের একটা সুযোগ তাকে দেয়া হয়েছে। ককেশাস ক্রিসেন্টের একজন এজেন্টকে নিজ হাতে খুন করে তাকে এ বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিতে হবে। কেমন মনে কর তুমি এ বিচারকে?

সোফিয়া কোন জবাব দিল না। শুধু প্রশ্নবোধক একটা দৃষ্টি তুলে ধরল মাইকেল পিটারের দিকে।

উত্তরের অপেক্ষা না করে মাইকেল পিটার মুখে ক্রুর হাসি টেনে বলল, সেই এজেন্ট তুমি। তোমার পিতার উপর তোমাকে হত্যার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

মুহূর্তের জন্যে চোখ দু'টি বিস্ফারিত হয়ে উঠল সোফিয়ার। কিন্তু তাতে ভয় নয়, বিস্ময়। ওদের আজব, নিষ্ঠুর সিদ্ধান্তেই এ বিস্ময়।

সোফিয়া তার আব্বার দিকে চোখ তুলল। দেখল, স্নেহময় কোমল এক দৃষ্টি, কোন ভাবান্তর নেই তাতে। সোফিয়া বলল, আব্বা, তুমি কিছু ভেব না, আমি মৃত্যুকে ভয় করি না, সামান্য দুঃখও নেই আমার মরতে।

একটু থেমেই মাথাটা নিচু করে আবার বলতে শুরু করল, শুধু একটাই দুঃখ, সালমান শামিলের কোন সন্ধান করতে পারলাম না, জানি না কোথায়-------

মাইকেল পিটার সোফিয়াকে থামিয়ে দিয়ে বলল, তোমাকে দুঃখ করতে হবে না। তাকে শীঘ্রই আমরা তোমার কাছে পাঠাব। পৃথিবীর কোথাও আশ্রয় নিয়ে সে আমাদের হাত থেকে বাঁচবে না। তবে সবার আগে তোমাকেই মরতে হচ্ছে।

কথা শেষ করেই প্রচন্ড শব্দে হেসে উঠল মাইকেল পিটার। হাসতে হাসতেই হাতের রিভলভারটি তুলে দিল সেন্ট সাইমনের হাতে। বলল, নাও তাড়াতাড়ি কাজ শেষ কর, অনেক কাজ আছে।

সেন্ট সাইমন যন্ত্রের মত রিভলভারটি হাত দিয়ে ধরল। সংগে সংগেই রিভলভারশুদ্ধ হাতটি তার উপরে উঠে গেল। রিভলভারের নলটি ঠেকল তার মাথায়। কেউ কিছু বোঝার আগেই গুলির শব্দ হলো। মাথাটি একদিকে কাত হয়ে গেল সেন্ট সাইমনের। নিঃশব্দে দেহটি তার আছড়ে পড়ল মেঝের উপর।

'আব্বা' বলে সেন্ট সাইমনের বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সোফিয়া। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্যেই।

সেন্ট সাইমনের হাতে রিভলভারটি তখনও। সোফিয়া পিতার বুক থেকে মাথা তুলে রিভলভারটি হাতে তুলে নিয়েই ঘুরে দাঁড়াল।

মাইকেল পিটার হাসিমুখে মজা উপভোগ করছিল। সোফিয়াকে রিভলভার তুলে নিতে দেখেই হাসি মিলিয়ে গেল মাইকেল পিটারের মুখ থেকে। আর পরমুহূর্তেই বাঘের মতো সে লাফ দিল সোফিয়াকে লক্ষ্য করে। সোফিয়ার রিভলভারও গর্জে উঠল সেই মুহূর্তে। লাফ দেয়া অবস্থায় মাঝপথেই মাইকেল পিটারের গুলিবিদ্ধ দেহ আছড়ে পড়লো সেন্ট সাইমনের লাশের পাশে।

হেডকোয়ার্টারের সবগুলো কক্ষই ছিলো টেলিভিশন সার্কিটের আওতায়। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে সব কক্ষের সবকিছুই দেখা যায়।

মাইকেল পিটার পড়ে যাবার পরেই খবর হয়ে গেল সবখানে। চারিদিক থেকে সবাই ছুটে এল। দশ-বারোজন প্রবেশ করল ঘরে। সবার হাতে স্টেনগান। তাদের সাথে ঘরে এসে ঢুকেছে হোয়াইট ওলফের দু'নম্বর ব্যক্তি, ডেপুটি প্রধান জর্জ জ্যাকব এবং সিকিউরিটি প্রধান রবার্ট র‍্যাফেলো।

গুলি করার পরেই সোফিয়া রিভলভার ফেলে দিয়ে পিতার বুকের উপর পড়ে কাঁদছিল।

জর্জ জ্যাকব, রবার্ট র‍্যাফেলোসহ অন্যান্যরা ঘরে ঢুকে হোয়াইট ওলফ প্রধান মাইকেল পিটারের প্রাণহীন দেহের দিকে কিছুক্ষণ স্তম্ভিতের মত তাকিয়েছিল। বিস্ময়, বেদনা তাদেরকে যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দিয়েছে।

কিছুক্ষণ পর জর্জ জ্যাকব রবার্ট র‍্যাফেলোর দিকে তাকিয়ে বলল, র‍্যাফেলো ডাইনিকে তুলে নিয়ে যাও। ওর খাল খুলতে হবে।

জর্জ জ্যাকবের চিৎকার শুনে সোফিয়া মাথা তুলল।

রবার্ট র‍্যাফেলো সোফিয়ার দিকে এগিয়ে গেল।

পাশেই পড়ে ছিল রিভলভার। সোফিয়া রিভলভার তুলে নিতে যাচ্ছিল। র‍্যাফেলো লাফ দিল রিভলভারের লক্ষ্যে।

র‍্যাফেলোর বাম পা গিয়ে পড়ল রিভলভারের দিকে বাড়ানো সোফিয়ার হাতের উপর। বুটের তলায় পিষ্ট হয়ে গেল সোফিয়ার ডান হাত। কঁকিয়ে উঠল সোফিয়া।

ঠিক এই সময় বাইরে কিছুদূর থেকে ভেসে এল স্টেনগানের একটানা ব্রাশফায়ারের শব্দ।

চমকে উঠে সবাই বাইরের দিকে তাকাল।

রবার্ট র‍্যাফেলো মেঝে থেকে রিভলভার তুলে নিয়ে এগুলো দরজার দিকে। তার পেছনে অন্যরাও।

এসময় দরজার বাইরে থেকে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল।

# ৩

সালমান শামিল তার বন্দীখানার বারান্দায় একটা থামের সাথে হেলান দিয়ে বসে। তার হিসেব ঠিক হলো। তার বন্দী জীবনের তিনদিন কেটে গেছে।

গোটা দেহ তার ক্লান্তি এবং অবসাদে ভেঙ্গে পড়ছে। তার চেতনা যেন অনেকটা আচ্ছন্ন। তিনদিন আগে নাস্তা করেছিলো ওসমান এফেন্দীর বাসায়। তারপর কার্যত তার পেটে আর কিছুই পড়েনি। আগের দিন সকালের মত আজ সকালেও বরফ কণা কুড়িয়ে পানির প্রয়োজন মেটাবার সে চেষ্টা করেছে। লোহার মত শক্ত বরফ কণাগুলো মুখে রেখে গলিয়ে পাকস্থলির পানির দাবি অনেকখানি পূরণ করেছে। কিন্তু তা সেই সকালের কথা। বরফের সেই শিশিরগুলো রৌদ্রালোকিত দিনে আর পাওয়া যায়নি। পাথরের এই বন্দীখানায় সবুজের কোন চিহ্ন নেই। মানুষ কেন, কোন প্রাণীরও জীবনধারণের কিছু নেই এখানে।

গত রাতে তীব্র ঠান্ডায় সে ঘুমাতে পারেনি। বরফের মত ঠান্ডা বারান্দায় শোবার কোন প্রশ্নই উঠেনি। ঘর থেকে বেরুবার পর সেই সুন্দর এয়ারকন্ডিশন্ড ঘরে আর সে প্রবেশ করেনি। খাঁচায় সে আবদ্ধ হতে চায় না। মৃত্যু আল্লাহ বরাদ্দ করে রাখলে তা আসবেই, কিন্তু আল্লাহ যেটুকু স্বাধীনতা ও সুযোগ রেখেছিল তাকে সে হারাতে চায়নি।

সারারাত সে শীত-কাঁপা দেহ নিয়ে বারান্দায় হেঁটে হেঁটে কাটিয়েছে। এতে শীত তাকে একেবারে জমিয়ে ফেলতে পারেনি, কিন্তু সারারাতের এ পরিশ্রমে সে আরও ক্ষুধার্ত, আরও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। প্রায় সারাদিন আজ সে উঠানে শুয়ে শুয়ে গা গরম করেছে। তাতে গা গরম হয়েছে, খুব আরাম বোধ হয়েছে সত্য, কিন্তু রৌদ্র তাপে শরীরের শক্তি আরও ক্ষয়ে গেছে। ক্ষুধা-তৃষ্ণা আরও বেড়েছে। বেড়েছে ক্লান্তি এবং অবসাদ। উদ্বেগ এবং চিন্তা এই ক্লান্তি এবং অবসাদকে অনেক বাড়িয়ে দিচ্ছে। সালমান শামিল আল্লাহর উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর

করছে, কিন্তু সেই সাথে জালেমদের এই অক্টোপাস থেকে মুক্তির কথাও চিন্তা করছে। এই চিন্তাই তার মধ্যে এক ধরনের উদ্বেগও সৃষ্টি করছে।

বুকফাটা তৃষ্ণা যখন অসহ্য হয়ে উঠছে, তখন সালমান শামিল শুষ্ক জিহ্বাটার আগা জিহ্বার গোড়ায় আল-জিহ্বার উপর ন্যস্ত্ করছে। জিহ্বাটা সরস হয়ে উঠছে, মরুভূমি বুকও একটা ঠান্ডা হাওয়ার সজীব পরশ পাচ্ছে। বিজ্ঞানের ছাত্র সালমান জানে, এক সময় দেহ-রসের রি-সাইক্লিংও বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

সূর্য হয়তো তখনো ডোবেনি। কিন্তু বন্দীখানায় ইতোমধ্যেই অন্ধকার নেমে আসতে শুরু করেছে। এই সাথে ঠান্ডাও অশ্বারোহীর মত ছুটে আসছে। সালমান শামিল বারান্দার থামে হেলান দিয়ে ভাবছে। ভাবছে মুক্তির কথাই। সারাদিনই ভেবেছে। ভেবেছে, তাকে পরিস্থিতির কাছে আত্মসমর্পণ করলে চলবে না। সালমান শামিল চিন্তা করে দেখেছে, শত্রুরা তাকে কঠিন ফাঁদে আটকালেও তার হাতে অনেকগুলো সুযোগ রয়ে গেছে। যেমন, মুক্তি-প্রচেষ্টার জন্যে তার হাত-পা খোলা আছে, তার মুক্তির পথে দৃশ্যত একটা তিনতলা বিল্ডিং এর আবেষ্টনিই মাত্র বাঁধা। তার আরেকটা সুযোগ হলো, তাকে না খাইয়ে তিলে তিলে হত্যা করার যেহেতু সিদ্ধান্ত, তাই তাকে শারীরিকভাবে আক্রমণ করে হত্যা করা হবে না। তারপর সালমান শামিল চিন্তা করেছে, সে এই বিল্ডিং-এর আবেষ্টনি থেকে বেরুতে চাইলে কি কি বাঁধা পাবে। তার কাছে টেলিভিশন ক্যামেরাকেই প্রধান বাঁধা বলে মনে হয়েছে। এই টেলিভিশন ক্যামেরার মাধ্যমেই শত্রুপক্ষ সব জানতে পারবে, সাবধান হবে এবং বাঁধা দেবে। আরেকটা অদৃশ্য বাঁধা হতে পারে, সেটা হলো বিদ্যুতায়িত তারের বেড়াজাল। এছাড়া এ বিল্ডিং এর বেষ্টনির বাইরে পাহারার ব্যবস্থা নিশ্চয় থাকবে। সালমান প্রথম বাঁধা অর্থাৎ টেলিভিশন ক্যামেরার বাঁধা মোকাবিলার চেষ্টা প্রথম করেছে। টেলিভিশন ক্যামেরার চোখগুলো কোথায় আছে? এ জিজ্ঞাসার জবাব সন্ধানের জন্যে সালমান শামিল গোটা দিন ধরেই চারদিকের বিল্ডিং পর্যবেক্ষণ করেছে। প্রত্যেক রুমেই টেলিভিশন ক্যামেরার চোখ রয়েছে তা বোঝাই যাচ্ছে, বাইরেটা দেখার চোখগুলো কোথায়? অনুসন্ধানের সময় হঠাৎ সালমান শামিলের মনে পড়েছে, দু'বার শত্রুরা তাকে লক্ষ্য করে কথা বলেছে, দু'বারই তা এসেছে চত্ত্বরের মাঝখানে বেদীর

উপর দাঁড়ানো শামিউনের মূর্তির মুখ থেকে। তাহলে বক্তার মত কি সে দ্রষ্টারও দায়িত্ব পালন করছে? চত্ত্বরের মাঝখানে উঁচু বেদির উপর দাঁড়ানো তার পক্ষেই চারদিকের গোটা বিল্ডিং এবং চত্ত্বরের উপর নজর রাখা সহজ।

আশায় উদ্দীপ্ত সালমান শামিল ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেছে শামিউনের মূর্তির কাছে।

মুষ্টিবদ্ধ ডান হাত উপরে তুলে নির্দেশ দিচ্ছে এমন ভংগিতে দাঁড়ানো শামিউন। তার ঠোঁট দু'টি অনেকখানি ফাঁক। চোখ দু'টি বিস্ফারিত। সালমান শামিল আনন্দের সাথে লক্ষ্য করেছে, চোখ দু'টি তার পাথরের নয়। তা যে ক্যামেরার শক্তিশালী লেন্স, তা সালমান শামিল এক নজর দেখেই বুঝতে পারল। সে লক্ষ্য করল, চোখ দু'টির সমান্তরালে মাথার পাশে ও পেছনে সাদা পাথরের রঙের সাথে মেলানো গোলাকৃতি আরও তিনটি লেন্স ক্যামেরার চোখ। প্রথম এই সাফল্যে ভীষণ খুশি হয়েছিল সালমান শামিল। মনে হয়েছিল, চোখগুলি এখনি অন্ধ করে দেয় সে। কিন্তু মনকে সান্ত্বনা দিয়েছিল, যথা সময়েই তা করতে হবে।

রাত তখন অনেক। থামে হেলান দেয়া থেকে সোজা হয়ে বসল শামিল। টেলিভিশন ক্যামেরার চোখ অন্ধ করে দিয়ে বিল্ডিং টপকে বেরিয়ে পড়ার যে পরিকল্পনা সে দিনের বেলা তৈরি করেছিল তা একবার গোটা ভেবে নিল। তারপর উঠে দাঁড়াল।

সারাটা চত্ত্বর জুড়ে বিদ্যুতের ম্লান আলো। সালমান শামিল ধীরে ধীরে শামিউনের মূর্তির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর গা থেকে কোট খুলে তা চাপিয়ে দিল শামিউনের মাথায়। ঢেকে গেল গোটা মাথা। টেলিভিশন ক্যামেরার আই-লেন্সগুলো ঢাকা পড়ে গেল কোটের আড়ালে।

প্রথম এই কাজটা শেষ করে সালমান শামিল ছুটল বিল্ডিং-এর দক্ষিণ অংশের দিকে। দিনের বেলায় সে দেখে রেখেছিল, উপর থেকে একটা পানির পাইপ ওয়াল দিয়ে নেমে চত্ত্বরের মাঝ বরাবর একটা ট্যাপ পর্যন্ত এসেছে। বোধ হয় প্রয়োজন হলে চত্ত্বরে এ পাইপ দিয়েই পানি আনা হয়।

পানির পাইপের কাছে গিয়ে দাঁড়াল সালমান শামিল। কোটটা তো আগেই খুলেছে। এবার দ্রুত জুতাটাও খুলে উপরে তিনতলার ছাদে ছুঁড়ে ফেলে দিল। শুধু মোজাটাই পায়ে থাকল।

সালমান শামিল বিসমিল্লাহ বলে পানির পাইপে হাত রাখল। তারপর দ্রুত উঠতে শুরু করল। তার কাছে পরিষ্কার, নিরুপদ্রব সময় সে বেশি পাবে না। টেলিভিশন ক্যামেরার চোখ বন্ধ হয়েছে বা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, তা তাদের কাছে ধরা পড়ার সংগে সংগেই ওরা ছুটে আসবে। সুতরাং তার আগেই তাকে কোন আড়ালে যেতে হবে।

অভ্যস্ত সালমান শামিল। পানির পাইপ বেয়ে উঠতে তার অসুবিধা হলো না। কিন্তু প্রচন্ড ক্লান্তি এসে তাকে ঘিরে ধরল। মনে হলো, দেহের ওজন যেন তার বহুগুণ বেড়ে গেছে। হাত দু'টি তার দেহের ওজন ধরে রাখতে পারছে না। বুক তৃষ্ণায় ফেটে যাচ্ছে, মুখ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ক্লান্তিতে মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। চেতনা তার যেন ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে। এক সময় দেখল তার উপরে উঠার গতিটা থেমে গেছে। সালমান শামিল মাথাটা ঝাঁকিয়ে চেতনাকে সতেজ করে তুলল। জিহবার আগা উল্টিয়ে আল-জিহবার গোড়ায় নিয়ে বুকটাকে ঠান্ডা করতে চেষ্টা করল। উপরে তাকিয়ে দেখল, আরও একতলা পরিমাণ দূরত্ব তখনও বাকি। ইঞ্চি ইঞ্চি করে আবার সে শরীরটাকে টেনে তুলতে লাগল। তিনতলার ছাদের সাইড-ওয়ালে ক্লান্ত দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছাদকে পরীক্ষা করল সে। না, সেখানে কিছুই নেই সন্দেহজনক। সে দেহটাকে গড়িয়ে দিল ছাদের উপর। চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষন ধুঁকল সালমান শামিল। বুকের ধক-ধকানি কিছুটা কমে এলে, কিছুটা শক্তি সঞ্চয় হলে সালমান শামিল চোখ খুলল। পাশেই জুতা পড়ে থাকতে দেখল সে। জুতাটা পরে নিল। শরীরটা কাঁপছে। সে উঠে দাঁড়াতে পারল না।

চারদিকে ঘোরানো বিল্ডিংটা বেশ প্রশস্ত। সালমান শামিল বিল্ডিং এর দক্ষিণ অংশে উঠেছে।

হামাগুড়ি দিয়ে সালমান শামিল বিল্ডিং এর দক্ষিণ ধারে গিয়ে নিচে উঁকি দিল। নিচের দিকে তাকিয়ে তার মাথা ঘুরে গেল। নিচে অন্ধকার গভীর উপত্যকা।

একই দৃশ্য সে দেখল পূর্ব এবং পশ্চিম পাশেও। সালমান শামিলের সামনে যে আশার আলো জ্বলে উঠেছিল তা যেন দপ করে নিভে গেল। সে কি গিরিখাদ ঘেরা কোন বিচ্ছিন্ন পর্বত শিখরে বন্দী! এজন্যেই কি তারা তাকে মুক্ত রেখেও নিশ্চিত আছে!

উত্তর প্রান্তের অন্ধকারের বুকে আলোর ধূসর একটা ছটা দেখা যাচ্ছে। সালমান শামিল টলতে টলতে এবার ওদিকে ছুটল। উদ্বেগ ও ছোটাছুটিতে তার ক্লান্তি আরও বাড়ল। পা তার দেহের ভার আর যেন ধরে রাখতে পারছে না।

উত্তর প্রান্তে গিয়ে কিছু দূরে পাহাড়ের উঁচু একটা শৃংগ দেখতে পেল। বরফমোড়া সফেদ শৃংগটি অন্ধকারেও যেন হাসছে। তারার ম্লান আলো সেখানে আলো আঁধারীর এক মায়াময় দৃশ্য রচনা করেছে।

নিচের দিকে তাকিয়ে সে দেখতে পেল, বিশাল এলাকা জুড়ে বিরাট বিরাট বিল্ডিং। আলো দেখা যাচ্ছে এখানে-সেখানে। সে আরও দেখতে পেল, ঐ বিশাল স্থাপনার সাথে তার বন্দীখানা সরু এক ব্রীজ দ্বারা সংযুক্ত। সশব্দে বহমান একটা ছোট্ট নদী উভয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। নদীটির উপর দিয়েই ব্রীজ। সালমান শামিল বুঝল, এতক্ষণ সে যে একটানা একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছিল তা এই নদীর পানি দু'পাশের গভীর গিরিখাদে পড়ার শব্দ। নদী এল কোত্থেকে, সালমান শামিল ভাবল। নিশ্চয় ঐ বরফমোড়া পর্বত থেকে শক্তিশালী ঝর্ণা দুর্গের মত ঐ বিশাল স্থাপনার দু'পাশ দিয়ে এসে এই নদীর সৃষ্টি করেছে।

সালমান শামিল সরাসরি নিচের দিকে তাকিয়ে একটা একতলার ছাদ দেখতে পেল। একতলাটি ব্রীজের এপারের মুখে দাঁড়িয়ে। সে বুঝল, একতলাটি এ তিনতলারই একটা বর্ধিত অংশ।

এক তলার ছাদে নামতে হবে, সালমান শামিল সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু কিভাবে! এখান কোন পানির পাইপ নেই।

সালমান শামিল জুতা খুলে সহজে কারও চোখে না পড়ে এভাবে কার্নিশের গোড়ায় রেখে সে কার্নিশে নেমে পড়ল। উঁকি দিয়ে দেখল, কার্নিশের তিন-চার ফুট নিচেই তিনতলার জানালা। লোহার গরাদ দিয়ে বন্ধ। কার্নিশে ঝুলে ওখানে হয়তো পা রাখা যায়, কিন্তু হাত দিয়ে ধরার কিছু সেখানে নেই। সুতরাং

একটাই পথ, দোতলার কার্নিশে লাফিয়ে পড়া। কার্নিশটা খুব প্রশস্ত নয়, কিন্তু সেখানে পড়ে দাঁড়াতে না পারলে একদম একতলার ছাদে গিয়ে আছড়ে পড়তে হবে। কিন্তু এই ঝুঁকি নেয়া ছাড়া কোন পথ নেই। অন্য কোন চিন্তা করার সময়ও নেই। অনুসন্ধান শুরু হয়ে গেলে মুশকিল হবে।

সালমান শামিল বিসমিল্লাহ বলে কার্নিশে ঝুলে পড়ল। একটুক্ষণ ঝুলে থেকে দেহটাকে স্থির করে নিয়ে একসময় হাতটা ছেড়ে দিয়ে ফলের মত খসে পড়ল দোতলার কার্নিশ লক্ষ্যে।

পা দু'টি কার্নিশে ঠিকমতই পড়ল। কিন্তু দেহের ভারসাম্য সে রাখতে পারল না। কার্নিশে পড়েই গড়িয়ে পড়ে গেল সে একতলার ছাদে।

দোতলার কার্নিশ থেকে গড়িয়ে পড়ায় তিনতলা থেকে পড়লে আঘাত যে রকমটা হত তা হলো না। তবু বাম হাঁটু এবং মাথায় প্রচন্ড ব্যথা পেল সালমান শামিল। সেদিন বন্দী হবার দিন মাথার যে জায়গাটায় আঘাত পেয়েছিল, আজও সেই জায়গাটাই ছাদের সাথে ঠুকে গেল। মাথাটা ঘুরে উঠেছিল কিন্তু জ্ঞান হারায়নি সে। সে ভাবছিল, তাকে কিছুতেই জ্ঞান হারালে চলবে না। সে সমস্ত শক্তি একত্র করে আঘাতকে সামলে নেয়ার চেষ্টা করল।

সে অনেকক্ষণ মরার মত পড়ে রইল এবং শক্তি সঞ্চয় করার চেষ্টা করল।

বেশ কিছু সময় পর সে চোখ খুলল। চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল সে। দেখল, তার সামনে কিছু উপরেই দোতলায় একটা ছাদমুখী দরজা। দরজাটা বন্ধ।

সালমান শামিল বাম পাটা নাড়ল। না, নাড়তে পারছে। হাঁটুর আঘাত খুব বড় রকমের নয়। মাথার আঘাতের জায়গাটা খুব টাটাচ্ছে। হাত দিতেই হাত রক্তে ভিজে গেল। এতক্ষণে খেয়াল করল, তার সোয়েটারেরও কতক অংশ তাজা রক্তে ভেজা, মাথা থেকে রক্ত গড়িয়ে এসেছে।

খুবই দুর্বলতা অনুভব করল সালমান শামিল। জীবনীশক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এভাবে পড়ে থাকা চলবে না।

সালমান শামিল যন্ত্রণাকাতর মাথাটা ধীরে ধীরে তুলে ক্রলিং করে এগিয়ে গেল ছাদের উত্তর কিনারায়। ছাদের উত্তর প্রান্তটা একেবারে ব্রীজের মুখ বরাবর গিয়ে শেষ হয়েছে। সালমান শামিল ছাদের সাথে মিশে অতি সন্তর্পণে নিচে উঁকি

দিল। দেখেই বুঝল, একতলাটা একটা গেটরুম। সালমান শামিলের চোখ বরাবর নিচেই গেটটা। গেটের পাশে টুলে একজন প্রহরী বসে। তার হাতে স্টেনগান। গেটরুমের ভেতর রেকর্ডারে পপসংগীতের একটা রেকর্ড বাজছে।

সালমান শামিল মাথা সরিয়ে নিল। একটু বিশ্রাম নেয়ার জন্যে ছাদের উপর মাথাটা ন্যস্ত করল। এমন সময় ব্রীজের উপর অনেকগুলো পায়ের শব্দ শোনা গেল। শুয়ে থেকেই একটু চোখ ফিরাল সালমান শামিল। দেখল, চার-পাঁচজন লোক ব্রীজ দিয়ে ছুটে আসছে। তাদের হাতেও স্টেনগান।

ওরা যখন ব্রীজের এ প্রান্তে গেটরুমের দিকে এল, সালমান শামিল আস্তে তার একটা চোখ নিচের দিকে মেলে ধরলো। গেটের মাথায় ছাদের সাথে আটকানো বিদ্যুৎ বাতির স্ট্যান্ড। কিন্তু আলোতে শেড লাগানো থাকায় তার আলো উপরে উঠছে না। ফলে সালমান শামিল অনেকটা নিরাপদেই উঁকি দিতে পারছে।

ব্রীজ দিয়ে আসা লোকেরা গেটে যেতেই গেটম্যান উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কি ব্যাপার, কিছু হয়েছে মনে হচ্ছে?

-চত্বরের টেলিভিশন ক্যামেরা কাজ করছে না, নিশ্চয় কিছু একটা ঘটেছে।

-বন্দী তার কক্ষে নেই?

-কক্ষে সে ঢুকেই নি দু'দিন।

আর বাক্যব্যয় না করে ওরা ছুটল ভেতর দিকে। তাদের সাথে দারোয়ানও।

সালমান শামিল একবার ব্রীজের দিকে চাইল। ব্রীজটা পার হয়ে ওপারে বাড়িগুলোর মধ্য দিয়েই তাকে বেরুতে হবে। এখান থেকে মুক্ত হবার এ একটা পথই তার সামনে আছে। এবং এখনই তার সুযোগ। চিন্তা করার সাথে সাথেই সালমান শামিল সিদ্ধান্ত নিল।

গেটরুমের ছাদ থেকে সে লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার খেয়াল হলো, গেটে টেলিভিশন ক্যামেরার চোখ অবশ্যই থাকবে। চিন্তার সংগে সংগেই সে থেমে গেল।

থমকে গিয়ে একটু চিন্তা করে সমাধান পেয়ে গেল। গেটের ছাদের সাথে মাত্র ফুটখানেক নিচে বৈদ্যুতিক বাল্ব জ্বলছে।

সালমান শামিল হাত বাড়িয়ে বাল্ব খুলে নিল। গরমে প্রায় হাতটা পুড়ে গেল তার। কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করার সময় নেই।

বাল্ব খুলে নেয়ার সাথে সাথেই সালমান শামিল নিচে লাফিয়ে পড়ল। পড়ল শক্ত পাথরের উপর। পড়ার ঝাঁকুনিতে প্রচন্ড এক চাপ সৃষ্টি হল মাথায়। মাথাটা ঘুরে গেল। দুর্বল শরীরটা যেন মাথাটা আর দাঁড় করিয়ে রাখতে পারছে না।

দাঁতে দাঁত চাপল সালমান শামিল। তাকে অজ্ঞান হওয়া চলবে না, বসে থেকে সময়ও খরচ করতে পারবে না। গেটের টেলিভিশন ক্যামেরার চোখ বন্ধ হওয়ার খবর ইতোমধ্যেই তারা পেয়ে গেছে। কি ঘটেছে তা দেখার জন্যে কেউ ছুটে আসছে নিশ্চয়।

ব্রীজের একটা পিলার ধরে উঠে দাঁড়াল সালমান শামিল। চোখের অন্ধকার তখনও কাটেনি। ব্রীজের রেলিং ধরে টলতে টলতেই ছুটল সে।

ব্রীজের মুখ থেকে একটা প্রশস্ত পাথুরে রাস্তা এগিয়ে গেছে সোজা সামনে। ব্রীজ পার হয়ে সালমান শামিল ঐ পথ ধরেই ছুটে চলল।

কিন্তু কয়েকগজ যেতেই সামনে অনেকগুলো পায়ের শব্দ শুনতে পেল। বুটের খট খট শব্দ দ্রুত এদিকেই আসছে। সামনের বাঁকটা ঘুরলেই তারা তাকে দেখতে পাবে। ধরা পড়ার তার বাকি নেই।

সালমান শামিল এদিক–ওদিক তাকিয়ে দেখল, ডানদিকে একটা ছোট রাস্তা বেরিয়ে পূর্ব দিকে চলে গেছে। কোন চিন্তা না করেই ঐ রাস্তা ধরে সালমান শামিল ছুটতে শুরু করল। রাস্তাটি এঁকে-বেঁকে এগিয়ে গেছে। ছোট ছোট অনেক গলিও এ রাস্তা থেকে দু'পাশে বেরিয়ে গেছে। নিশ্চয় এ রাস্তা কোন বড় রাস্তায় পড়েছে এবং সে রাস্তা তাকে মুক্তি সিংহদ্বারে পৌঁছাবে।

রাস্তায় কোন মানুষ নেই। নীরব, অন্ধকার রাস্তা। মাঝে মাঝে আলো আছে, কিন্তু তাও বড় ম্লান।

সালমান আর শরীর টেনে নিয়ে চলতে পারছে না। টলতে টলতেই এগুচ্ছে সে।

হঠাৎ এক জায়গায় এসে সামনে মোটরসাইকেল এগিয়ে আসার শব্দ পেয়ে সালমান শামিল বাম দিকের এক গলিতে ঢুকে পড়ল।

বেশ কিছুদূর এগুবার পর সরু গলিটা একটা বিশাল তিনতলা বাড়ির লনে এসে শেষ হয়ে গেল।

সালমান শামিল লনে ঢুকে আর কিছু চিন্তা না করে বসে পড়ল। কোন চিন্তা করার শক্তিও তার ছিল না।

কিন্তু বসে পড়ার সাথে সাথেই সালমান শামিল অজ্ঞান হয়ে ঢলে পড়ল লনের পাথরের উপর। চলার ঝোঁক, এগুবার দৃঢ় সংকল্প তার যে চেতনাকে এতক্ষণ ধরে রেখেছিল, বসে পড়ার পর সে চেতনা আর থাকল না। ক্ষুধা-তৃষ্ণার দুঃসহ জ্বালা, দুর্বল আহত শরীরের প্রচন্ড ক্লান্তি এবং তীব্র উত্তেজনার মানসিক চাপ তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিল।

লেডি জোসেফাইন পায়চারি করছিল দোতলার ব্যালকনিতে। সে দেখল, একজন লোক ছুটতে ছুটতে তাদের সামনের লনে এসে বসল, তারপর মাটির উপর ঢলে পড়ে গেল। বিস্ময়ের সাথে অনেকক্ষণ লক্ষ্য করল, না, লোকটির কোন নড়া-চড়া নেই। কে লোকটি? কি হল তার? লোকটি মরে গেল না তো? না জ্ঞান হারাল? চঞ্চল হয়ে উঠল লেডি জোসেফাইন।

লেডি জোসেফাইন আর্মেনিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন এবং সবচেয়ে সম্মানিত সানাইন গীর্জার প্রধান পুরোহিত ফাদার পলের মা। ফাদার পল আর্মেনিয়ায় খৃস্টান ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহান সেন্ট গ্রেগরীর উত্তর পুরুষ। সানাইন গীর্জার ঐতিহাসিক 'ক্রস'টি সেন্ট গ্রেগরী কর্তৃক নির্মিত হয় খৃস্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে। এই ঐতিহাসিক ও পবিত্রতম সানাইন গীর্জাকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলা পর্বত শীর্ষের এই আমবার্ড দুর্গে হোয়াইট ওলফ প্রতিষ্ঠা করেছে তার হেডকোয়ার্টার। হোয়াইট ওলফ ফাদার পলকে ভয় এবং ভক্তি দুই-ই করে।

উদ্বিগ্ন লেডি জোসেফাইন নিজের ঘরে ফিরে এসে একটু পায়চারি করে চলে এল তার মেয়ের কক্ষে। মেয়ে সিস্টার মেরী ইতালীর ভ্যাটিকান সিটির খৃস্টান থিয়োলজী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। ছুটি কাটাবার জন্যে এসেছে বাড়িতে।

মেরী শুয়ে পড়েছিল। লেডি জোসেফাইন কক্ষের দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকল, মা মেরী, এস তো।

--কোথায় মা? মাথাটা একটু তুলে জিজ্ঞাসা করল সিস্টার মেরী।

'এস আমার সাথে' বলে চলতে শুরু করল লেডি জোসেফাইন।

সিস্টার মেরীও শোয়া থেকে উঠে মায়ের পিছু নিল। মায়ের মতই অপরূপ তার গায়ের রং। লেডি জোসেফাইন আমেরিকার বিখ্যাত কিরকেশিয়ান গোত্রের মেয়ে। তার উপর তারুণ্য যেন সিস্টার মেরীকে একগুচ্ছ গোলাপে পরিণত করেছে।

মা লেডি জোসেফাইন আবার সেই ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সিস্টার মেরীও তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। মা জোসেফাইন নিচে লনের দিকে ইংগিত করে সব কথা মেরীকে বলল।

শুনেই মেরী দ্রুত বলে উঠল, মা চল নিচে গিয়ে দেখি।

--না দুর্গের নিরাপত্তা বিভাগকে আগে জানাবে?

--না মা। আমরা আগে দেখি না!

'তাহলে চল' বলে লেডি জোসেফাইন ফিরে দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করল।

নিচে নেমে কাছে গিয়ে ওরা দেখল, সুন্দর স্বাস্থ্যবান এক যুবক। কপালের ডান পাশের একটা অংশ রক্তভেজা। ডান গাল বেয়ে রক্তের একটা ধারা নেমে এসেছে। গায়ে মাত্র সোয়েটার। পায়ে শুধু মোজা, জুতা নেই।

সিস্টার মেরী গায়ে হাত দিল। গা বরফের মত ঠান্ডা। তাড়াতাড়ি নাকে হাত দিয়ে নিঃশ্বাস পরীক্ষা করল। নিঃশ্বাস আছে। উজ্জ্বল চোখে সিস্টার মেরী মা লেডি জোসেফাইনের দিকে তাকিয়ে বলল, মা, লোকটি এখনও জীবিত।

--এখন কি করা? চিন্তিত কণ্ঠে বলল লেডি জোসেফাইন।

--এখন আমরা কি করতে পারি মা এত রাতে? মা'র কথাই পুনরাবৃত্তি করল উদ্বিগ্ন সিস্টার মেরী।

--যাই করা হোক, এখনি ভেতরে নিয়ে যেতে হবে। তা না হলে শীতেই মারা যাবে।

বলে লেডি জোসেফাইন ওভারকোটটা খুলে যুবকটিকে ঢেকে দিল।

ফাদার পলের এই বাড়িতে ফাদার পল, তার মা লেডি জোসেফাইন এবং বোন সিস্টার মেরী ছাড়া আর থাকে মাত্র কাজের একজন আয়া এবং ফাদার পলের একজন এ্যাটেনডেন্ট। আয়া মেয়েটি গতকাল ছুটিতে গেছে। আর ফাদার পল গেছে ভ্যাটিকানে ফাদারদের এক সম্মেলনে। তার সাথে এ্যাটেনডেন্টও। বাড়িতে এখন লেডি জোসেফাইন এবং সিস্টার মেরী ছাড়া আর কেউ নেই।

--মা, তুমি পেছনটা ধর, আমি মাথার দিকটা ধরছি। আমরা পারব নিয়ে যেতে। বলল সিস্টার মেরী।

মা ও মেয়ে ধরাধরি করে সংজ্ঞাহীন যুবকটিকে একতলার ড্রইংরুমে তুলল। টেবিল, টিপয় সরিয়ে কার্পেটের উপর যুবকটিকে শুইয়ে দিল তারা।

ক্লান্ত লেডি জোসেফাইন সোফায় বসে জিরোবার চেষ্টা করছে। আর সিস্টার মেরী যুবকটিকে কার্পেটে নামিয়ে ছুটে গেছে কম্বল আনার জন্যে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সিস্টার মেরী একটা কম্বল এবং গামলায় করে গরম পানি ও তোয়ালে নিয়ে এল।

ভ্যাটিকানের থিয়োলজি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সেবা' একটা বিষয় হিসেবে শেখানো হয়। সুতরাং সিস্টার মেরী শুশ্রুষা ও প্রাথমিক চিকিৎসায় দক্ষ।

সিস্টার মেরী যুবকটির গায়ে কম্বল চাপিয়ে দিচ্ছিল। মা লেডি জোসেফাইন বলল, মা, তোর হাত-কাপড়ে রক্তের দাগ লেগেছে দেখেছিস্?

--দেখেছি মা, এখন কাপড় পাল্টিয়ে লাভ নেই। আরও কাজ আছে।

বলে সিস্টার মেরী গরম পানির গামলায় তোয়ালে ডুবিয়ে তা চিপে নিয়ে যুবকটির মুখে এবং হাতে-পায়ে সেঁক দিতে লাগল।

সিস্টার মেরী যুবকটির মুখ ও গলায় গরম তোয়ালের সেঁক দিচ্ছিল। এই সময় যুবকটি চোখ মেলল।

চোখ মেলে বিস্ময় দৃষ্টি নিয়ে কয়েক মুহূর্ত সিস্টার মেরীর দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর চোখ বুজল আবার। পরমুহূর্তেই আবার চোখ খুলে চারদিকে

তাকাল। লেডি জোসেফাইন তখন সোফা থেকে উঠে যুবকটির সামনে এসে দাঁড়াল। লেডি জোসেফাইন এবং সিস্টার মেরী দু'জনার মুখই খুশিতে উজ্জ্বল।

যুবকটি চারদিক দেখে সিস্টার মেরীর আনন্দভরা মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি কোথায়? আপনারা কারা?

বড় দুর্বল, অস্ফুটপ্রায় কণ্ঠ যুবকটির।

সিস্টার মেরী কম্বলটা যুবকটির গলা পর্যন্ত টেনে দিতে দিতে বলল, আপনি নিরাপদে আছেন, কেমন বোধ করছেন এখন?

--আমি পানি খাব। বড় শুকনো ও চিঁ চিঁ কণ্ঠস্বর যুবকটির। চোখ আবার বন্ধ করেছে যুবকটি।

যুবকটির এত দুর্বল ও শুকনো কণ্ঠস্বরে বিস্মিত হল, ঘাবড়েও গেল সিস্টার মেরী।

তাড়াতাড়ি গিয়ে পাশের ঘর থেকে এক বোতল ব্রান্ডি নিয়ে এল। গ্লাসে ঢেলে যুবকটির মাথা বাম হাত দিয়ে একটু উঁচু করে ডান হাতে গ্লাসটি যুবকটির মুখের কাছে নিয়ে বলল, নিন।

যুবকটি চোখ খুলে গ্লাস দেখে তাড়াতাড়ি কম্বলের তলা থেকে হাত বের করে দু'হাতে ঠেস দিয়ে আধ-শোয়া হয়ে বসল। তারপর গ্লাসটি সিস্টার মেরী ঠোঁটের কাছে আনতেই দ্রুত মুখ সরিয়ে নিল যুবকটি। বলল, আমি মদ খাই না।

বিস্মিত সিস্টার মেরী গ্লাস সরিয়ে নিতে নিতে বলল, একটু অপেক্ষা করুন, আমি পানি নিয়ে আসছি।

লেডি জোসেফাইন ভীষণ বিস্মিত হয়েছে। যুবকটির একটু কাছে সরে এসে বলল, এই সময় একটু ব্রান্ডি খেলে খুবই উপকার হতো বাছা। সস্নেহ নরম কণ্ঠ লেডি জোসেফাইনের।

যুবকটি আবার শুয়ে পড়েছিল। লেডি জোসেফাইনের কথায় ধীরে ধীরে চোখ খুলে বলল, না মা, আমি মদ খাই না, খেতে পারব না।

যুবকটির 'মা' ডাক শুনে লেডি জোসেফাইনের মাতৃহৃদয় আলোড়িত হয়ে উঠল। যুবকটির পবিত্র, নিষ্পাপ, সুন্দর ও সারল্যভরা মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবল, বড় ভালো ছেলে, কার যে বুকের ধন!

এগিয়ে গিয়ে জোসেফাইন যুবকটির মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, ঠিক আছে, খেয়ো না বাছা!

পানি নিয়ে এসেছে সিস্টার মেরী।

সিস্টার মেরী হাঁটু গেড়ে বসল যুবকটির মুখের কাছে। লেডি জোসেফাইন দু'হাত দিয়ে মাথা উঁচু করে তুলে ধরল। সিস্টার মেরী যুবকটির ঠোঁটে গ্লাস তুলে ধরল।

যুবকটি গোগ্রাসে গিলে ফেলল গ্লাসের সবটুকু পানি।

মুখ থেকে গ্লাসটি সরিয়ে নিচ্ছিল সিস্টার মেরী। আর লেডি জোসেফাইন যুবকটির মাথা রাখতে যাচ্ছিল। এমন সময় যুবকটির বুকটা আন্দোলিত হয়ে উঠল এবং মুখ থেকে 'ওয়াক' শব্দ উঠল।

যুবকটি নিজেই দু'হাতে ঠেস দিয়ে মাথাটা উঁচু করে তুলল।

সিস্টার মেরী 'ওয়াক' শব্দ শুনেই বুঝতে পেরেছিল। গ্লাসটি তাড়াতাড়ি ফেলে দিয়ে তোয়ালেটা তুলে নিয়ে যুবকটির মুখের কাছে ধরল। কিন্তু তার আগেই যুবকটির মুখ থেকে হড় হড় করে বেরিয়ে এসেছে বমন। সিস্টার মেরীর তোয়ালে 'কিছু অংশ' ধরতে পারল, কিন্তু একটা অংশ তীব্র গতিতে গিয়ে সিস্টার মেরীর মুখ ও গায়ে ছড়িয়ে পড়ল।

পরপর কয়েকবার বমনের বেগ এল। সিস্টার মেরীর তোয়ালে এরপর সবটুকুই ধরে নিল। লেডি জোসেফাইন আরেকটা শুকনো তোয়ালে নিয়ে এসেছিল। সিস্টার মেরী সেটাকে যুক্ত করে বমন ভালোভাবে ধরে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। লেডি জোসেফাইন যুবককে ধীরে ধীরে শুইয়ে দিল।

সিস্টার মেরী মুখ-হাত ধুয়ে বাথরুম থেকে ফিরে এল।

বমনের পর অসাড় হয়ে পড়েছিল যুবকটি। চোখ দু'টি তার বোজা।

সিস্টার মেরী এসে আবার তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসল। তোয়ালে দিয়ে যুবকটির মুখের বমনের দাগ মুছে দিল।

যুবকটি চোখ খুলল। অশ্রু গড়িয়ে পড়ল তার দু'চোখ দিয়ে। বলল, আপনি, আপনারা কে জানি না। আমি দুঃখিত, আমাকে মাফ করবেন। যুবকটির ক্ষীণ কণ্ঠ কান্নায় রুদ্ধ হয়ে গেল।

সম্ভবত যুবকটি সিস্টার মেরীর মুখে গায়ে বমন করে দেয়ার জন্যেই এই দুঃখ প্রকাশ করল।

সিস্টার মেরীর রক্তাভ ঠোঁটে হাসির একটা রেখা ফুটে উঠল। কিন্তু যুবকটির কথার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ না করেই বলল, আপনার বমনে এক বিন্দু খাদ্য কণাও নেই। আপনি খেয়েছেন কখন?

যুবকটি চোখ বন্ধ রেখেই বলল, আজ তিন দিন এক কণা খাবার, এক ফোঁটা পানিও ওরা আমাকে দেয়নি।

--কারা? হঠাৎ প্রশ্ন করল সিস্টার মেরী।

--এসব প্রশ্ন এখন নয়, যাও এক গ্লাস গরম দুধ নিয়ে এস।

লেডি জোসেফাইন সোফা থেকে উঠে তাড়া দিল মেরীকে। তার কণ্ঠে উদ্বেগ।

'ঠিক বলেছ মা' বলে সিস্টার মেরী দ্রুত খাবার ঘরের দিকে চলে গেল।

অল্পক্ষণ পরেই গ্লাসভর্তি দুধ নিয়ে ফিরে এল সে।

লেডি জোসেফাইন যুবকটির মাথার কাছেই বসেছিল। সে দু'হাতে যুবকটির মাথা তুলে ধরল। সিস্টার মেরী যুবকটির মুখে দুধের গ্লাস তুলে ধরল।

অর্ধেক গ্লাস খাবার পর মেরী বলল, একবারে নয়, এই অর্ধেকটা পরে খাবেন। বলে মুখ থেকে দুধের গ্লাস সরিয়ে নিল।

লেডি জোসেফাইন যুবকটির মাথা নামিয়ে রাখল। সিস্টার মেরী দুধের গ্লাস তার মা'র হাতে তুলে দিয়ে বলল, মা, তুমি দুধটা খাইয়ে দিও। আমি ফাস্ট এইড বক্সটা নিয়ে আসি।

সিস্টার মেরী চলে গেল।

কিছুক্ষণ পর ফাস্ট এইডের জিনিসপত্র নিয়ে সিস্টার মেরী ফিরে এল। এসে দেখল, যুবকটি দু'হাতে ঠেস দিয়ে আধ-শোয়া হয়ে বসে আছে। আর মা লেডি জোসেফাইন গ্লাসের বাকি দুধটুকু খাইয়ে দিচ্ছে।

দুধ খাওয়া হলে যুবকটি শুয়ে পড়ল।

সিস্টার মেরী যুবকটির মাথার পেছনে গিয়ে মাথায় হাত দিল। চোখ খুলল যুবকটি। মেরী তার মাথা তুলে ধরতে চেষ্টা করে বলল, ক্ষতের জায়গাটা ড্রেসিং করতে হবে, মাথার তলে একটা ওয়েল-পেপার বিছিয়ে দেই।

যুবকটি মাথা তুলে উঁচু হলো। কার্পেটের উপর তার কাঁধ পর্যন্ত ওয়েল-পেপার বিছিয়ে দিল মেরী।

মাথাটা রাখলে সিস্টার মেরী কপাল থেকে চুল সরিয়ে দেখল, ডান চোখের ইঞ্চিখানেক উপরে অনেকখানি জায়গা থেতলে গিয়ে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। ক্ষত থেকে অল্প অল্প রক্ত ঝরছে এখনো।

সিস্টার মেরী ডেটল মেশানো পানিতে ন্যাকড়া ভিজিয়ে ক্ষত পরিষ্কার করা শুরু করল।

প্রথমে একবার মাত্র চমকে উঠল যুবকটি। তারপর গোটা সময় সে স্থির থাকল। তার শান্ত মুখেও কোন পরিবর্তন আসে নি। বিস্মিত হলো সিস্টার মেরী, আশ্চর্য শক্ত নার্ভ লোকটির। ক্ষত থেকে ছেঁড়া গোশত ও চামড়া তুলে ফেলতে হয়েছে। মুখে সে একটা উঃ শব্দও করে নি। ক্ষত পরিষ্কার করতে করতেই প্রশ্ন জাগল সিস্টার মেরীর মনে, লোকটি কে? উন্মুক্ত কপালের নিচে সুন্দর ঘন ভ্রু, নীল টানা চোখ, চোখের দৃষ্টি অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত ও পবিত্র, মুখে শিশুর সারল্য। লোকটি যে-ই হোক, সাধারণ নয়; কোন খারাপ লোক তো নয়ই।

মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা শেষ হলে সিস্টার মেরী গরম পানিতে ন্যাকড়া ভিজিয়ে মুখ ও গলার রক্ত পরিষ্কার করে দিল।

কাজ শেষ করে মাথার তল থেকে ওয়েল পেপার এবং সবকিছু নিয়ে বাথরুমে চলে গেল।

লেডি জোসেফাইন একটু আগেই উঠে গিয়েছিল।

হাত-মুখ ধুয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল সিস্টার মেরী। গায়ে তখনও তার গোলাপী নাইট গাউন। একটা ওভারকোট গায়ে চড়িয়ে বেরিয়েছিল। কিন্তু কাজের সময় তা খুলে রাখে। গাউনটি পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত নেমে যাওয়া। ঢিলা গাউনটি কোমরে বেল্ট দিয়ে আঁটা। কাজের সুবিধার জন্যে গাউনের হাতা কনুইর উপর গুটিয়ে রাখা। কিছু চুল কপালে নেমে এসেছে। গোলাপী শরীরে গোলাপী

নাইট গাউন অপরূপ কম্বিনেশন। সিস্টার মেরী বেরিয়ে এসে দেখল, যুবকটি উঠে বসেছে। চোখ নিচু।

--এখন কেমন বোধ করছেন? জিজ্ঞাসা করল সিস্টার মেরী।

--ভালো। চোখ না তুলেই উত্তর দিল।

এ সময় লেডি জোসেফাইনও ফলের জুস নিয়ে এল।

লেডি জোসেফাইন যুবকটির কাছে বসে প্লেটে করে কেক এগিয়ে দিয়ে বলল, বাছা কেকটুকু খেয়ে নাও। ভালো লাগবে।

লেডি জোসেফাইন যুবককে কেক ও ফলের জুস খাইয়ে দিল।

--মা, ওর কাপড় পাল্টানো তো দরকার। বলল সিস্টার মেরী।

--ওপরে নিয়ে চল। শুইয়ে দিতে হবে। ওখানে গিয়েই পাল্টাবে।

সিস্টার মেরী মায়ের মুখের দিকে চাইল। তার চোখে প্রশ্নবোধক দৃষ্টি। তার মনে হচ্ছিল, নিচের গেস্টরুমে রাখলেই তো চলতো। উপরে চারটি শোবার ঘর। একটি ফাদার পলের, একটি লেডি জোসেফাইনের, একটি সিস্টার মেরীর এবং অন্যটি পারিবারিক মেহমানের জন্যে। কিন্তু সিস্টার মেরী মায়ের শান্ত, নিশ্চিন্ত মুখের দিকে চেয়ে আর কিছু বলল না। তার মনে হলো, দেখাশোনার অসুবিধা হবে মনে করেই হয়তো মা এই ব্যবস্থা করলেন।

সিস্টার মেরী যুবককে জিজ্ঞাসা করল, হাঁটতে পারবেন?

--পারব। বলল যুবকটি, বলেই ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল সে।

লেডী জোসেফাইন আগে আগে চলল। তাকে অনুসরণ করল যুবকটি। তার পেছনে সিস্টার মেরী।

উপরে মোট ৮টি রুম। ৪টি শোবার ঘর ছাড়াও আছে ফাদার পলের লাইব্রেরী রুম, সিস্টার মেরীর স্টাডি রুম, পারিবারিক ড্রইংরুম এবং স্টোররুম।

দোতলায় সিঁড়ির মুখেই ফ্যামিলি ড্রইংরুম। ড্রইংরুমের উত্তর পাশে ফ্যামিলি গেস্টরুম।

যুবকটি লেডি জোসেফাইনের সাথে গিয়ে গেস্টরুমে প্রবেশ করল। রুমে ছোট একটি খাট। এক পাশে চেয়ার টেবিল। ঘরের এক কোণে ছোট একটি ফ্রিজ।

লেডি জোসেফাইন ঘরে ঢুকে যুবকটিকে লক্ষ্য করে বলল, এ রুমেই আপাতত তুমি থাকবে। লেডি জোসেফাইন গিয়ে চেয়ারে বসেছিল।

যুবকটি গিয়ে বসল খাটের এক কোণে।

উপরে উঠেই মেরী চলে গিয়েছিল তার পিতার ঘরে। তার পিতার স্লিপিং গাউন নিয়ে সে প্রবেশ করল যুবকটির রুমে। যুবককে লক্ষ্য করে বলল, এগুলো পরে নিন।

লেডি জোসেফাইন এবং সিস্টার মেরী দু'জনেই রুম থেকে বেরিয়ে এল।

ক'মিনিট পরে ঘরে ঢুকল। দেখল, যুবকটি গাউন পরে বিছানায় উঠে বসেছে।

সিস্টার মেরী মা লেডি জোসেফাইনকে বলল, মা তুমি একটু বস, আমি আসছি।

বলে সিস্টার মেরী যুবকটির পরিত্যক্ত কাপড়গুলো নিয়ে ওয়াশিং রুমের দিকে চলে গেল। ক'মিনিট পর ফিরে এল।

এই সময় যুবকটিও বাথরুম থেকে এসে তার খাটে বসল। তাকে অনেকখানি ফ্রেশ দেখাচ্ছে। যে ম্লান আভা মুখে ছিল তা দূর হয়ে স্বাভাবিক লাবণ্য ফিরে এসেছে। মুখ নিচু করে বসেছিল যুবকটি। যুবকটিকে খুব লাজুক মনে হল। এমনটা খুব কমই দেখা যায়। ভাবছিল লেডি জোসেফাইন।

সিস্টার মেরী ও লেডি জোসেফাইন দু'জনেই তার দিকে তাকিয়ে ছিল। দেখলেই বুঝা যায়, দু'জনের চোখেই প্রশ্ন কিলবিল করছে। অবশেষে প্রশ্ন করল লেডি জোসেফাইন, তোমার নাম কি বাছা?

--সালমান শামিল। মুখ না তুলেই বলল যুবকটি।

নাম শুনে মা-মেয়ে দু'জনের কপাল যেন ঈষৎ কুঞ্চিত হলো। অবচেতনভাবেই যেন তারা তাকাল পরস্পরের দিকে।

--মুসলমান? লেডি জোসেফাইনই আবার প্রশ্ন করল।

--জ্বি। মুখ না তুলেই জবাব দিল যুবকটি।

--কি কর? কোথায় থাক?

--ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের আমি ছাত্র। ইয়েরেভেনেই থাকি।

সিস্টার মেরীর কপালটা ঈষৎ কুঞ্চিত এবং দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। বলল, গত বছর অনার্স পরীক্ষায় ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট হলো, ইনিস্টিটিউটের ইতিপূর্বেকার সকল রেকর্ড ভংগ করে 'অর্ডার অব মেরিট' স্বর্ণপদক পেল, আপনি কি সেই সালমান শামিল?

সালমান মুহূর্তের জন্যে চোখ তুলে সিস্টার মেরীর দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল। বলল, হ্যাঁ।

সিস্টার মেরীর মুখে বিস্ময় ও আনন্দের একটা ঝিলিক দেখা গেল। কিন্তু পরমুহূর্তেই চোখে-মুখে উদ্বেগ টেনে বলল, কিন্তু আপনি এখানে কেন? এ অবস্থা কেন?

সালমান শামিল সংগে সংগেই কোন উত্তর দিতে পারল না। একটা চিন্তা, দ্বিধা যেন তার চোখে-মুখে ছায়া ফেলল। হোয়াইট ওলফের ঘাঁটিতে সবাইতো একরকমই হবে। আবার ভাবল, এরা কি তার প্রতি নিষ্ঠুর হতে পারে, বিশ্বাস হয় না।

সালমান শামিলকে চিন্তান্বিত দেখে লেডি জোসেফাইন বলল, তুমি কি ভয় করছ বাছা? তুমি তো ভাল ছেলে। তুমি অপরিচিত নও, তোমার কথা মেরীর বন্ধু সোফিয়া এ্যাঞ্জেলার কাছে আমিও শুনেছি।

সোফিয়ার নাম শুনে সালমান শামিলের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, সোফিয়াকে আপনারা চেনেন? ওতো আমার ক্লাসমেট।

--ও আমার ছোটবেলার বন্ধু। ইয়েরেভেনের প্রাথমিক ক্যাথলিক স্কুলে আমরা একসংগে পড়েছি। ইয়েরেভেনে গেলে আমরা ওর বাসায় যাই।

সিস্টার মেরী কথা শেষ করার পর সবাই চুপচাপ। ধীরে ধীরে মাথা তুলল সালমান শামিল। বলল, আপনারা বলা যায় আমাকে নতুন জীবন দিয়েছেন। কোন কথা গোপন করব না। তিনদিন আগে হোয়াইট ওলফ আমাকে ইনস্টিটিউট-গেট থেকে কিডন্যাপ করে আনে। এর আগেও আমাকে কিডন্যাপ করার একটা চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কিডন্যাপ করে খাদ্য-পানিহীন একটা নির্জন

বন্দীখানায় আমাকে বন্দী করে রেখেছিল। তারা আমাকে মৃত্যুদন্ড দিয়েছিল। খাদ্য-পানি থেকে বঞ্চিত করে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়াই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। তিনদিন পর দুঃসাধ্য এক চেষ্টা চালিয়ে বন্দীখানা থেকে বেরিয়ে এসেছি।

লেডি জোসেফাইন ও সিস্টার মেরী নীরবে সালমান শামিলের কথা শুনছিল। তাদের চোখে-মুখে ভয় এবং বিস্ময়। কথা শেষ করে সালমান শামিল থামলেও তারা কোন কথা বলল না। লেডি জোসেফাইন হোয়াইট ওলফের সব কথাই জানে এবং একে সমর্থনও করে। আর সিস্টার মেরী কথা না জানলেও হোয়াইট ওলফের দয়ামায়াহীন ভয়ানক চরিত্রের কথা জানে এবং জানে, হোয়াইট ওলফের স্বার্থের বিরুদ্ধে গেলে কেউই নিস্তার পায় না।

অনেকক্ষণ পর লেডি জোসেফাইন বলল, কেন তোমার উপর তাদের এই রাগ?

--আমি আমার জাতিকে ভালবাসি। আমি তাদের স্বার্থের পক্ষে। দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলল সালমান শামিল।

আবার নীরব হল লেডি জোসেফাইন। চিন্তা ও উদ্বেগের রেখা তার চোখে-মুখে। অনেকক্ষণ পর উঠে দাঁড়াল। বলল, অনেক ধকল গেছে তোমার উপর দিয়ে বাছা। বিশ্রাম নাও।

তারপর আরও কাছে এসে সালমান শামিলের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, বাছা, ঈশ্বরই তোমাকে আমাদের কাছে এনেছেন। ঈশ্বরই তোমাকে রক্ষা করেছেন। তুমি কোন চিন্তা করো না বাছা, ঈশ্বর আছেন।

বলে লেডি জোসেফাইন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সিস্টার মেরী চেয়ারে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে সালমান শামিলের দিকেই তাকিয়েছিল।

এই সময় মুখ তুলল সালমান শামিল। মেরীর সাথে চোখাচোখি হয়ে গেল। সালমান শামিল চোখ নামিয়ে নিল। গম্ভীর মুখ সালমান শামিলের। বলল, আমি বোধহয় আপনাদের বিপদে ফেললাম!

ঠোঁটে একটা সূক্ষ্ম হাসি ফুটে উঠল সিস্টার মেরীর, এখন তাহলে কি করতে হবে আমাদের?

উত্তরের ধরনে সালমান শামিল চোখ তুলে তাকাল মেরীর দিকে। আবার চোখাচোখি হয়ে গেল। মেরীর ঠোঁটের সেই সূক্ষ্ম হাসিটি সালমান শামিল দেখতে পেল। চোখ নামিয়ে নিল সালমান শামিল।

মেরীর প্রশ্নের কোন জবাব দিল না।

মেরীই হেসে বলল, উত্তরটা আজকের মত পেন্ডিং থাক সালমান সাহেব। আপনি ঘুমান।

বলে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, টেবিলে নরমাল পানির বোতল থাকল। প্রয়োজন হলে এ পানিই খাবেন, ঠান্ডা পানি নয়। আর দরজা খোলাই থাকবে। দু'রুম ওপারে আমি থাকছি। প্রয়োজন হলে বিনা দ্বিধায় ডাকবেন।

বেরিয়ে গেল সিস্টার মেরী।

পরদিন সকাল।

সালমান শামিল ঘরে বসেই নাস্তা করছিল। সামনে চেয়ারে বসেছিল লেডি জোসেফাইন। তাকিয়ে সালমান শামিলের দিকে। একসময় সে বলে উঠল, তুমি ভাল ছেলে, ভাল ছাত্র, তুমি কেন রাজনৈতিক আবর্তে জড়ালে?

--বিশ্বাস করুন আম্মা, আমি কারও এক কণা ক্ষতি করিনি। আমি শুধু মজলুম স্বজাতিকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম, তাদের আত্মরক্ষার, স্বার্থের পক্ষে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

--কিছু বুঝি না বাছা, হোয়াইট ওলফও তো জাতির স্বার্থে কাজ করছে।

--কিন্তু জালেম কে, মজলুম কে সেটা দেখুন। সিস্টার মেরী একটু আগে মায়ের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। তার হাতে সালমান শামিলের সদ্য ইস্ত্রি করা প্যান্ট, সোয়েটার ইত্যাদি। তার চেহারা কিছু উদ্বিগ্ন। সালমান শামিলের কথা শেষ হলে সে মাকে লক্ষ্য করে বলল, মা ওরা এদিকে খোঁজে এসেছে। প্রত্যেক বাড়ি দেখছে। এখানেও এসেছিল---

--তুমি তাদের কি বলেছ? মেরীকে কথা শেষ করতে না দিয়েই উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল লেডি জোসেফাইন।

--আমাদের বাড়ি দেখতে চায় নি, শুধু জিজ্ঞেস করেছে এরকম লোক এদিকে আসার খবর তারা জানে কিনা। আমি বলেছি, জানি না।

--বেশ করেছিস মা, স্পষ্ট জবাবই ভাল। ওরা এখন প্রতিহিংসায় উন্মত্ত।

বলে লেডি জোসেফাইন নাস্তার খালি প্লেটটা নিয়ে চলে গেল। তার মুখটা ম্লান, উদ্বিগ্ন সে।

সিস্টার মেরীর মুখটাও ম্লান।

তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে সালমান শামিল বলল, একটা ভুল হয়েছে মিস মেরী, আপনারা রাত্রে খাইয়ে দেবার পর চলে যাবার মত শক্তি আমার হয়েছিল। আরাগাত পর্বতের অঞ্চলটা আমি চিনি। রাত্রে আমবার্ড দুর্গ হতে আমি হয়তো পালাতে পারতাম। আপনাদের অসুবিধার কথা আমি বুঝতে পারছি।

ম্লান হাসল সিস্টার মেরী। বলল, হোয়াইট ওলফকে আপনি ভাল করে জানেন না। এই আমবার্ড দুর্গের কথাও জানেন না। এখান থেকে পালাবার একটাই পথ, কিন্তু ওখান দিয়ে একটা পিঁপড়াও পালানো অসম্ভব।

--ওরা যদি আপনাদের বাড়ি সার্চ করতো?

--আপনি কি ভয় করছেন?

--আমি কাপুরুষের মত যেমন মরতেও চাইনা, তেমনি মৃত্যু এলে বীরের মত তাকে আলিঙ্গনও করতে পারি। আমি ভাবছি আপনাদের সম্মানের কথা।

--মা বলেছেন না, ঈশ্বর আছেন!

একটা ঢোক গিলেই আবার সে প্রশ্ন করল, আচ্ছা বলুন তো, আমাদের ঈশ্বর, আর আপনাদের আল্লাহর মধ্যে কি কোন বিরোধ আছে?

--যিশু যাকে ঈশ্বর বলতেন, তিনিই আমাদের আল্লাহ।

--তাহলে এই বিরোধ কেন? কেন এই সংঘাত?

আমি ভ্যাটিকানে ধর্মতত্ত্ব নিয়েই পড়ছি। কিন্তু আমি দেখছি, ধর্মতত্ত্ব বিরোধ কমছে না, বাড়ছেই।

সিস্টার মেরী চেয়ারে বসে পড়েছিল। তার কোলের উপর সালমান শামিলের কাপড়।

--আপনি যে ধর্মতত্ত্ব পড়ছেন তা আপনাদের ঈশ্বর তৈরি করেননি, করেছেন মানুষ তার মনের মত করে।

--আপনাদের ধর্মতত্ত্বও কি তাই?

--না মিস মেরী, আমাদের কোরআন অবিকৃত আছে, রাসূল(সাঃ)-এর বাণীও অবিকৃতভাবে বাছাই করা হয়েছে। এই কোরআন ও হাদীসের বাইরে আমাদের ধর্মতত্ত্ব নেই।

--আপনার মত করে আমিও যদি এ মতকে চ্যালেঞ্জ করি এবং এমনকি বলি যে, আপনি যাকে ঈশ্বরের বাণী বলছেন তা ঈশ্বরের বাণী নয়।

সিস্টার মেরীর ঠোঁটে হাসি।

--আমি আপনার সাথে তর্কে যাবো না মিস মেরী। শুধু এতটুকুই বলব, নিরপেক্ষ ইতিহাস, নিরপেক্ষ বিবেক, নিরপেক্ষ অনুসন্ধান একবাক্যে আমার কথা সমর্থন করছে। তাছাড়া দেখুন, কোরআন যে আল্লাহর বাণী তার বড় প্রমাণ হল, একমাত্র কোরআনই কিন্তু মুসাসহ সব নবী-পয়গম্বরের প্রতি সুবিচার করেছে, একান্ত আপন করে দেখেছে। মানুষের রচিত গ্রন্থে এ সুবিচার ও নিরপেক্ষতা অসম্ভব ছিল।

--আপনার যিশুকে আপন করে নিলে, মেনে নিলে, আর বিরোধ থাকে কই?

--মেনে নেওয়ার অর্থ অনুসরণ করা নয়।

--তাহলে বিরোধ থেকেই যায়।

--সত্য একটাই, এক সত্যের উপর সবাই না এলে বিরোধ থাকবে।

--সত্য একটা ঠিক, সত্য হওয়ার দাবি তো একটা নয়।

--দাবি তো অনেক থাকবেই, কিন্তু বিচার-বিবেচনায় সত্য একটাই নির্দিষ্ট হয়।

--বিচার-বিবেচনার মানদন্ড যদি এক না হয়?

--যদি দমন-নিয়ন্ত্রণ না করা হয়, তাহলে মানুষের বিবেকের রায় কিন্তু দুই হয় না মিস মেরী।

--অর্থাৎ আপনি বলছেন, বিবেকের স্বাধীন রায় মানলে সে রায় যিশু নয়, আপনাদের নবী মুহাম্মদের দিকে যাবে?

--আচ্ছা আপনিই বলুন, ইব্রাহিম(আঃ)-এর মত মহান নবী হযরত মুসা(আঃ) আসার পর কার্যকর ছিলেন? ছিলেন না। আবার মুসা(আঃ) কি যিশু নবী হওয়ার পর কার্যকর ছিলেন? ছিলেন না। তাহলে হযরত মুহাম্মদ(সাঃ) আসার পর যিশুর দ্বীন কিভাবে কার্যকর থাকতে পারে?

সিস্টার মেরী সংগে সংগেই কোন উত্তর দিল না। তার চোখে বিস্ময়, আনন্দও। বেশ কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর বলল, আপনার মত অসাধারণের সাথে সাধারণ আমি বুদ্ধি-বিতর্কে পারব না। আপনি যে দৃষ্টিকোণ তুলে ধরেছেন, সেভাবে আমি বিষয়টাকে কখনও দেখিনি, জবাব দেবার আগে আমাকে অনেক ভাবতে হবে।

থামল সিস্টার মেরী। মুগ্ধ তার দৃষ্টি। একটু থেমে কোল থেকে সালমান শামিলের কাপড় তার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল, আপনার কোট কোথায়, জুতা নেই কেন?

-বন্দীখানার চত্তরে দাঁড়ানো তোমাদের জাতীয় বীর শামিউনের মূর্তির মাথায় আছে টেলিভিশন ক্যামেরার ৫টি চোখ। ওর মাথায় কোটটি চাপিয়ে দিয়ে পালিয়েছি। আর পাইপ বেয়ে তিনতলায় উঠার সময় জুতা খুলে ফেলেছি।

-আপনি অসাধারণ ভাল ছাত্র। সেই সাথে এসব দুঃসাহসিক কাজের ট্রেনিং নিলেন কোথায়?

-সময়ের প্রয়োজনই মানুষকে সব শেখায়।

-আমাদের জাতীয় বীর শামিউন সম্পর্কে আপনার মত কি?

-আমার মতের প্রয়োজন নেই, আপনারা শামিউনের যে রূপ এঁকেছেন তাতেই সব স্পষ্ট।

-কি রূপ সেটা?

সালমান শামিলের ঠোঁটে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল। বলল, বন্দীখানার চত্তরে শামিউনের মূর্তির চারদিক ঘিরে ২৭টি প্লেটে ২৬টি নরমুন্ডু সাজানো আছে। এই ২৬টি মুন্ডু আমাদের ২৬জন সম্মানিত নেতার। তাদের

কিডন্যাপ করে, হত্যা করে, তাদের মাথা শামিউনকে অর্ঘ্য দেয়া হয়েছে। একটি প্লেট আমার মাথার জন্য খালি আছে।

একটু থামল সালমান শামিল। ঢোক গিলল। তারপর বলল, বল----বলুন, শামিউনের কি রূপ এখানে তুলে ধরা হয়েছে? মুসলমানদের রক্তপানকারী হিসেবে নয় কি?

শেষ দিকে সালমান শামিলের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল।

সিস্টার মেরীর চেহারাটাতেও পরিবর্তন ঘটল। প্রথমে বিস্ময়, তারপর বেদনার একটা ছায়া তার মুখ ঢেকে দিল।

সালমান শামিল থামার পর একটু নীরবতা।

সিস্টার মেরী মুহূর্তের জন্যে নিজের দৃষ্টিটা একটু নিচের দিকে নামিয়ে নিল। তারপর বলল, 'বলুন' নয়, 'বল' ঠিক আছে। আমাকে 'তুমি' বলবেন, 'আপনি' নয়।

আবার মুখ নামিয়ে নিল সিস্টার মেরী। একটু পরে মুখ তুলে বলল, যা বললেন তা সব ঠিক?

-নরমুন্ডুগুলির যেটি আমাদের যে নেতার, তার নামও লেখা আছে মাথার কংকালে। আর যাকে যে তারিখে কিডন্যাপ করা হয়েছে, সে ক্রম অনুসারেই মাথাগুলি সাজানো।

আবার মাথা নিচু করল, নীরব হল সিস্টার মেরী। বেদনায় মুখটা তার ম্লান। ভাবছে সে। অনেকক্ষণ পর সে বলল, আচ্ছা ওরা যে বলে, আত্মরক্ষার জন্যেই আমাদের এই আক্রমণ। আমরা মুসলমানদের না তাড়ালে ওরাই আমাদের তাড়াবে, আমরা ওদের না মারলে ওরাই আমাদের মারবে যেমন অতীতে গণহত্যা চালিয়েছে, গণউচ্ছেদ চালিয়েছে ওরা বার বার। এ অভিযোগের কি জবাব?

হাসল সালমান শামিল। বলল, মেরী, ভ্যাটিকানের থিয়োলজি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসতো আবশ্যিক সাবজেক্ট। কি বলে তোমার সেই ইতিহাস?

সিস্টার মেরী ম্লান হেসে বলল, সে ইতিহাস কমবেশি হোয়াইট ওলফ যা বলছে, সে কথাই বলে। বিশেষ করে দু'টো গণহত্যার কথা নিয়ে ইতিহাস খুব

বেশি আলোচনা করেছে। একটি আর্মেনিয়া তুরস্কের অংশ থাকা কালে ১৮৯৫ সালে তুরস্কের সুলতান আব্দুল হামিদ কর্তৃক আর্মেনীয় খৃস্টান জনগণের উপর হত্যা অভিযান, অপরটি হল ১৯১৬ সালে আর্মেনীয় জনপদে তুর্কি সৈন্যদের গণহত্যা।

সালমান বলল, ইসলামের নীতি ও শিক্ষা এবং কোন স্বেচ্ছাচারী রাজা-বাদশাহ নিছক তার রাজ্যের স্বার্থে যে কর্ম করেন তা এক নয় মেরী। তবু আমি বলব, তুমি যে ঘটনা দু'টোর কথা বললে তা ঘটনা নয়, অনেক ঘটনার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি মাত্র। বিদেশি শক্তি তুরস্কের অংশ আর্মেনিয়া নিয়ে যে ষড়যন্ত্রে মেতেছিল তারই ফল এটা।

একটু থামল সালমান শামিল। তারপর আবার বলতে শুরু করল, তুর্কি শাসনে আর্মেনিয়াতে খৃস্টান ও মুসলমানরা শান্তিতেই বসবাস করছিল। তুরস্কের বৈরী ইউরোপের মিত্রশক্তি তুরস্কের সংখ্যালঘু খৃস্টানদের নিয়ে তুরস্ককে যে অব্যাহত যন্ত্রনা দিয়ে এসেছে, তারই একটা অংশ হিসাবে ১৮৭৮ সালে বার্লিন চুক্তির সুযোগে তারা আর্মেনিয়াতে নাক গলায়। তাদের কুমন্ত্রণা ও উস্কানির ফলে 'দাসনাক্ত সুতুন' নামে জেনেভাভিত্তিক একটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আর্মেনিয়ায় হত্যা-সন্ত্রাস চালাতে শুরু করে। হত্যা-সন্ত্রাস ব্যাপক হয়ে উঠলে ১৮৯৫ সালে সুলতান আব্দুল হামিদ 'দাসনাক্ত সুতুন' এর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনায় বাধ্য হন। খৃস্টান ঐতিহাসিকরা এরই নাম দিয়েছে গণহত্যা। দ্বিতীয় ঘটনার পটভূমি আরও মর্মান্তিক। ১৯১৩ সালের লন্ডন চুক্তির মাধ্যমে ইউরোপের মিত্রশক্তি নব্যতুর্কিদেরকে আর্মেনিয়ার খৃস্টানদের পৃথক বাহিনী গড়ার সুযোগ দিতে বাধ্য করে। রুশদের কাল হাত এই বাহিনী গঠনে সহায়তা করে। পরে ১৯১৬ সালে রাশিয়া আর্মেনিয়া দখল করে বসে এবং আর্মেনিয়ার খৃস্টানদের সাথে নিয়ে মুসলমানদের উপর গণহত্যা চালায়। এই পরিবেশে পরাজিত তুর্কি সৈন্যরা পালাবার সময় প্রতিরোধ হিসাবে খৃস্টান জনপদে হত্যাকান্ড চালায়। যুদ্ধ পরিবেশের এই হত্যাকান্ড আর শান্তিপূর্ণ পরিবেশে হোয়াইট ওলফের ঠান্ডা মাথায় হত্যাকান্ড এক জিনিস নয় মেরী।

সিস্টার মেরী মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সালমান শামিলের দিকে। সালমান কথা শেষ করলে বলল, ঘটনা দু'টির এই পটভূমি আমাদের ইতিহাসে নেই।

-আমি যে বিবরণ দিলাম, তা ইউরোপীয় খৃস্টান ঐতিহাসিকের বইতেই পড়েছি।

-আপনি বিজ্ঞানের সিরিয়াস বিষয়ের ছাত্র, এই ইতিহাস পড়ার সময় পান কখন?

-ইতিহাস যে জানে না, সে জাতির সচেতন সদস্য হতে পারে না, জাতিকে সে প্রকৃতপক্ষে কিছু দিতেও পারে না মেরী।

-জাতির জন্যে আপনি বুঝি খুব চিন্তা করেন?

-জাতির যখন এমন বিপদ তখন না ভেবে উপায় কি?

-জীবন-মৃত্যুর এ জটিল আবর্ত। এতে আপনি জড়িয়ে পড়েছেন। কিন্তু প্রতিভার কি একটা ভিন্ন দাবি নেই আপনার কাছে?

-আছে। সেটা আমার একটা লক্ষ্যের ব্যাপার। আর জাতির প্রতি যেটা, সেটা আমার দায়িত্ব। দু'টোই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। তবে আজ প্রথমটির সাথে আমার অস্তিত্বের প্রশ্ন জড়িত নেই, দ্বিতীয়টির সাথে আছে।

সিস্টার মেরীর মুগ্ধ দৃষ্টি সালমান শামিলের মুখে নিবদ্ধ। বলল, অর্থাৎ প্রতিভাবান সালমান শামিলের চেয়ে দায়িত্বশীল সালমান অনেক বড়।

একটু থামল মেরী। তারপর আবার শুরু করল, আমি এবং আমার বয়সের আরো যাদের দেখি, মনে করি সিরিয়াস ভাবনার সময় আমাদের এখনো আসেনি, কিন্তু আপনি দায়িত্বের এই শিক্ষা পেলেন কোত্থেকে?

--আমার ধর্মগ্রন্থ থেকে। সেখানে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পদ, বাড়ি-ঘর অর্থাৎ সকল প্রিয় জিনিস থেকে আল্লাহ, তার রাসূল(সাঃ) এবং আল্লাহর পথে সংগ্রামকে প্রিয়তর করে নিতে বলা হয়েছে।

সালমান শামিল থামল। মেরী কোন কথা না বলে মাথা নিচু করল। কিছুক্ষণ পর মাথা না তুলেই ধীরে ধীরে বলল, জানেন, আমাদের তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের বৃদ্ধ স্যারকে লাইব্রেরীতে একদিন আমি প্রশ্ন করেছিলাম, ধর্মীয়

অবক্ষয় এত ব্যাপক কেন? কেন চার্চগুলো বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে, এমনকি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে? তিনি অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন, বেটি আরও পড়, বুঝবে। আমাদের ধর্ম সবদিক থেকে 'লিভিং রিলিজিওন' এর দায়িত্ব পালন করতে পারছে না, যেমন পারছে মোহামেডান ধর্ম।

এই সময় দেওয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বাজার শব্দ হলো।

সিস্টার মেরী প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার ওষুধ খেতে হবে।

বলে উঠে দাঁড়াল।

টেবিল থেকে ক্যাপসুল নিয়ে সালমান শামিলের সামনে দাঁড়াল। তার ডান হাতে ক্যাপসুল, আর বাম হাতে গ্লাস। বলল, হা করুন।

সালমান শামিল বলল, না না মেরী, গ্লাস ক্যাপসুল আমাকে দাও। তুমি অনেক কষ্ট করেছ। এটুকু কাজ আমাকে করতে দাও।

--ইস, কি যে কষ্ট করেছি!

--কি করনি, মুখে বমন করে দিয়েছি, এ দুঃখ আমার চিরদিন মনে থাকবে।

সিস্টার মেরী গম্ভীর হলো। বলল, দুঃখ, আনন্দ সবার কাছে একরকম নয়, এটা রিলেটিভ জিনিস। একজনের কাছে যেটা দুঃখের স্মৃতি, আরেক জনের কাছে সেটা সুখকর স্মৃতিও হতে পারে মনে রাখবেন।

বলে সিস্টার মেরী ক্যাপসুল এবং গ্লাস বিছানার উপর রেখে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

সালমান শামিলের ঘর থেকে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল মেরী। বিছানায় গিয়ে বালিশ টেনে নিয়ে মুখ গুঁজল সে।

# ৪

আহমদ মুসা জীপে একা। নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করছিল। তার জীপ গিয়ে প্রবেশ করল ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভানসড নিউক্লিয়ার ফিজিকস-এর প্রশাসনিক ভবনের গাড়ি বারান্দায়। এ ভবনেরই নিচের তলায় ইনস্টিটিউট ডিরেক্টর পল জনসনের অফিস।

গাড়ি থামিয়ে গাড়ি থেকে নামল আহমদ মুসা।

গাড়ি বারান্দা থেকে উপরে বারান্দায় উঠার মুখে সিঁড়ির পাশে বসেছিল উর্দি পরা একজন এ্যাটেনডেন্ট।

সুন্দর শ্মশ্রুমন্ডিত অভিজাত চেহারার একজন যুবককে গাড়ি থেকে নামতে দেখে এ্যাটেনডেন্ট উঠে দাঁড়াল। সে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করল যুবকটিকে। অস্বাভাবিক কিছু খুঁজে পাওয়ার মত তার কপালটা হঠাৎ যেন কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

আহমদ মুসা এ্যাটেনডেন্টের দিকে তাকিয়েই সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠে আসছিল। এ্যাটেনডেন্টের চমকে উঠা দৃষ্টি এবং কপালের কুঞ্চন তার ভালো লাগল না।

বারান্দায় উঠে আহমদ মুসাই তাকে জিজ্ঞেস করল, ডঃ পল জনসনের অফিস কোনটা?

-স্যারের সাথে দেখা করবেন? এ্যাটেনডেন্ট পাল্টা প্রশ্ন করল।

-হ্যাঁ।

-তাহলে একটু অপেক্ষা করুন। স্যারকে বলে আসি। আপনার কি পরিচয় বলব?

-বলবেন, একজন সাধারণ মানুষ, আহমদ।

এ্যাটেনডেন্ট চলে গেল।

উত্তর-দক্ষিণ লম্বা বারান্দা। বারান্দায় উঠে লম্বালম্বি তাকালে যে দরজাটা চোখে পড়ে, সেটাই ডঃ পল জনসনের অফিস। এ্যাটেনডেন্ট নব ঘুরিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। মনে হল ভেতর থেকে কোন সংকেতের অপেক্ষা করল। তারপর ঢুকে গেল।

মুহূর্ত কয়েক পরে সে বেরিয়ে এল।

আহমদ মুসাকে ইশারা করল যাওয়ার জন্যে।

নব ঘুরিয়ে আহমদ মুসা প্রবেশ করল ঘরে।

গোটা মেঝে পুরু সাদা কার্পেটে মোড়া। দেওয়ালেও সাদা কার্পেটিং। ধূসর টেবিল সামনে নিয়ে বসে আছেন লম্বা-চওড়া, শক্ত-সমর্থ ডঃ পল জনসন। তার সাদা মুখের উপর মাথায় সাদা চুলের গুচ্ছ। সব মিলিয়ে পবিত্র পরিবেশ।

আহমদ মুসা যখন ঘরে ঢুকল, মুখ তুলল ডঃ পল জনসন। তার স্বচ্ছ সারল্যভরা মুখের অভ্যন্তরে তার যে হৃদয় তাকেও মনে হল সাদা। আহমাদ মুসা খুশি হলো, প্রকৃতই একজন জ্ঞান-সাধকের মুখোমুখি সে।

ডঃ পল জনসন উঠে দাঁড়িয়েছিল। আহমদ মুসা তার সাথে হ্যান্ডশেক করল। ডঃ জনসন ইংগিত করল আহমদ মুসাকে বসার জন্যে।

আহমদ মুসা বসল, তারপর বসল পল জনসন। ডঃ জনসনের মুখ স্বাভাবিক, তাতে কোনই ভাবান্তর নেই। অপরিচিত কে এল, কেন এল এ নিয়ে তার যেন কোন মাথা ব্যথা নেই। শুধু আহমদ মুসার মুখে তার দৃষ্টিটা কয়েক মুহূর্ত যেন আঠার মত আটকে ছিল।

আহমদ মুসাই প্রথমে কথা শুরু করল। বলল, বিনা নোটিশে এসে আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত।

সামনের একটা ফাইল বন্ধ করতে করতে ডঃ পল জনসন বলল, বিনা প্রয়োজনে এসেছ?

না!

-তাহলে একথা কেন? প্রয়োজনে মানুষ তো মানুষের কাছেই যাবে।

-এভাবে চিন্তা আমরা কয়জন করি?

-কেউ করে না বলে তুমি করবে না, আমি করবো না কেন?

-ঠিক বলেছেন। এক, দুই করে ব্যক্তিরা যদি ভালো কাজ শুরু করে, তাহলে একদিন সেটাই সামাজিক হয়ে যাবে।

ডঃ জনসন একবার চোখ তুলে আহমদ মুসার দিকে চেয়ে চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজল। এবং স্বগতঃই যেন উচ্চারণ করতে লাগলঃ জ্ঞান এবং মানুষ স্রষ্টার সম্পদ, আর দুনিয়ায় যা কিছু আছে সব মানুষের সম্পদ। মানুষকে দুনিয়ার খিলাফত দানের অর্থ তো এটাই। কিন্তু খলিফারা যখন নিজের মালিক নিজে বনে গেল, সব জ্ঞানের অধিপতি যখন নিজেই হয়ে দাঁড়াল এবং খিলাফতকে যখন মনে করল নিজের সার্বভৌম রাজত্ব, তখনই তো মানুষের সমাজ হয়ে গেল অমানুষের সমাজ। একথাগুলো তোমাদের ধর্মই সবচেয়ে বেশি, সবচেয়ে স্পষ্ট করে বলে। তাহলে কেমন করে তুমি মনে কর যে, এক, দুই করে এগুলে সমাজ আপনাতেই একদিন ভালো হয়ে যাবে? সাড়ে তেরশ' বছরে তো হয়নি!

আহমদ মুসার চোখে রাজ্যের বিস্ময়। কিন্তু সে বিস্ময় চেপে প্রশ্নের উত্তর দিতেই সে প্রথমে এগিয়ে এল। বলল, জনাব, এক, দুই করে সমাজ ভালো করা সহজ নয়, একথা ঠিক, সাড়ে তেরশ' বছরেও এমন এক নিরংকুশ মানব সমাজ গড়া যায় নি, একথাও ঠিক। কিন্তু এক, দুই করেই যে একদিন সুন্দর, সুস্থ মানুষের সমাজ গড়া হয়েছিল এটাও সত্য। আমাদের নবী(সাঃ) অন্ধকার সমাজে ছিলেন একটি মাত্র এক আলোর মানুষ। কিন্তু এক, দুই করে তেইশ বছরের চেষ্টায় তিনি এক আলোর সমাজ গড়েছিলেন। দীর্ঘ ৪০ বছর যে সমাজ তার পূর্ণ দীপ্তি নিয়ে টিকে ছিল এবং তখনকার অর্ধেক পৃথিবী সে করায়ত্ত করেছিল। তারপর প্রাচুর্যের পথ ধরে আপনি যে তিনটি রোগের কথা উল্লেখ করেছেন, সেই রোগ ধীরে ধীরে ক্ষমতাসীনদের গ্রাস করতে লাগল। শাসনদন্ড ইসলামের হাত ছাড়া হলো, এক শ্রেণীর মুসলমান শাসনদন্ডের মালিক হলেও যারা, আপনি যা বলেছেন, নিজে নিজের মালিক বনে সব জ্ঞানের উৎস নিজেই হয়ে দাঁড়াল এবং খিলাফতকে পরিণত করলো তার সার্বভৌম রাজত্বে। এইভাবে গোটা মানব সমাজ আজ পুনরায় অন্ধকারে নিমজ্জিত। এই অবস্থায় আমাদের আজ হয় হতাশার জগদ্দল পাথর বুকে নিয়ে অন্ধকারে ডুব দিতে হবে, অথবা জ্বালতে হবে এক, দুই করে

আলোর মশাল ঠিক মহানবীর পথ ধরে, নবীদের অনুকরণে। মহানবীর মতই যদি এ আলোকন প্রচেষ্টা চলে, তাহলে আলোর সমাজ আবার কায়েম হবে। এ পথ দীর্ঘ, কষ্টকর, কিন্তু এর কোন বিকল্প নেই।

ডঃ পল জনসন চেয়ারে গা এলিয়ে চোখ বন্ধ করে অনড় মনোযোগের সাথে কান পেতে ছিল আহমদ মুসার দিকে। আহমদ মুসার কথা শেষ হলে ডঃ পল জনসন ঐভাবে থেকেই প্রশ্ন করল, বৎস, যিশুর সেই হাওয়ারী, মুহাম্মদের সেই সাহাবীদের মত আলোক-সন্তানদের তুমি পাবে কোথায়?

আহমদ মুসা বলল, জনাব, গত সাড়ে তেরশ' বছরের ইতিহাসে যিশুর হাওয়ারী, মহানবী(সাঃ) এর সাহাবীদের মত আলোক সন্তানদের আমরা বার বার দেখেছি, যাদের ত্যাগ ও কোরবানীর অমর গাঁথায় ইতিহাস ভরপুর। এখনও তারা আছে। শুধু প্রয়োজন সংগঠন এবং সংগ্রামের যা অতীতে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে হয়নি।

ডঃ পল জনসন ধীরে ধীরে অনেকটা স্বগতঃ কণ্ঠে বলল, বৎস তুমি বড় বিপদে, অতীতে এমন জ্ঞান যারা লাভ করেছে তারা বিপদগ্রস্ত হয়েছে। তারপর সোজা হয়ে বসে মুখে হাসি টেনে বলল, বৎস, তাহলে এখন তোমার মনে নিশ্চয় কোন দুঃখ নেই--প্রয়োজনে মানুষ মানুষকে বিনা নোটিশেই বিরক্ত করতে পারে।

আহমদ মুসার মুখেও হাসি ফুটল। অন্তরও তার স্নিগ্ধ হল ডঃ জনসনের আন্তরিকতার স্পর্শে। আহমদ মুসা এবার তার আসল কথায় আসতে চাইল। বলল, জনাব, একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমি আপনার কাছে এসেছি।

--সালমান শামিলের খোঁজ চাও, এই তো?

আহমদ মুসার চোখ দু'টি বিস্ময়ে বিস্ফারিত হলো। বলল, জনাব, আপনি কি করে জানলেন যে আমি এই প্রয়োজনেই এসেছি?

--বিজ্ঞানে অনেক স্বতঃসিদ্ধ বিষয় আছে। ঠিক তেমনি স্বতঃসিদ্ধ যে, অপরিচিত একজন মুসলিম যুবক সালমান শামিলের খোঁজেই মাত্র আমার কাছে আসতে পারে।

--জনাব, আমরা আপনার সাহায্যপ্রার্থী।

ডঃ পল জনসন আবার চেয়ারে গা এলিয়ে চোখ বুজল। যেন আপনার মধ্যে সে হারিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ পর ধীরে ধীরে বলল, এমনি করে সাহায্য চেয়েছিল সোফিয়া এ্যাঞ্জেলাও। কান্নায় সে ভেংগে পড়েছে বার বার, সালমান শামিলকে খোঁজ করার জন্যে আমার সাহায্য চেয়েছে যেন অতুল ক্ষমতা আমার।

থামল ডঃ পল জনসন।

--সোফিয়া এ্যাঞ্জেলা কে জনাব?

--রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতা সেন্ট জর্জ সাইমনের মেয়ে।

--সেন্ট জর্জ সাইমনের মেয়ে? সালমানের সাথে কি সম্পর্ক তার?

--এ জবাব সোফিয়াই দিতে পারে বৎস।

একটু থেমে আবার বলতে শুরু করল ডঃ পল জনসন, তোমরা আমার সাহায্য চাও, আমি কার সাহায্য চাইব বল তো? আমার অতি প্রিয়, অতি আদরের এক ছাত্রকে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, আমি কার কাছে বলব, কার সাহায্য চাইব? আমি বৃদ্ধ হয়েছি, আমার দেবার মত কিছু নেই। ওরা যদি আমাকে বিনিময় হিসেবে চাইত, সালমানকে ছেড়ে দিত, আমি খুশি হতাম!

ডঃ পল জনসনের কন্ঠ ভারি। তার সাদা মুখটা ঈষৎ রক্তিম।

ডঃ জনসন নীরব হলো। আহমদ মুসাও কোন কথা বলতে পারলো না। ডঃ জনসনের আবেগ তাকেও অভিভূত করেছে।

অনেকক্ষণ পর আহমদ মুসা বলল, ওরা কত বড়, কত শক্তি ওদের সেটা আমাদের কাছে সমস্যা নয় জনাব, সমস্যা হলো ওদের সন্ধানের কোন সূত্র পাচ্ছি না আমরা।

ডঃ পল জনসন সোজা হয়ে বসল। তার দু'চোখে চাঞ্চল্য। বলল, পারবে ওদের  মোকাবিলা করতে?

--পারব!

--জান তুমি, ওরা কত ভয়ংকর, কত শক্তি ওদের?

--জানি জনাব।

--এখান থেকে বের হবার পরই তুমি যদি সালমানের মত আক্রান্ত হও?

--আমি তারই জন্যে প্রস্তুত জনাব।

--কখনও ওদের মুখোমুখি হয়েছ?

--হয়েছি। তিনবার।

--কি ফল হয়েছে?

--দলের কাছে খবর পৌঁছাবার মতও কেউ বাচেঁনি ওদের। তবে ওরা ভয়ংকর তা স্বীকার করি। ওরা মরে, কিন্তু পিছু হটে না।

ডঃ জনসন বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকল আহমদ মুসার দিকে। কিছুক্ষণ পর বলল, তোমার মধ্যে আগুন আছে তা প্রথমে দেখেই বুঝেছি, তোমার চেহারায়, দৃঢ়তায় অসাধারণত্ব আছে তাও বুঝতে পেরেছি। তোমার পরিচয় কি বৎস?

আহমদ মুসা মুখ নিচু করে ছিল। মুখ তুলল। একটু দ্বিধা করল, তারপর বলল, আপনার কাছে লুকাবার কিছু নেই, আমি মধ্য এশিয়া থেকে এখানে এসেছি আমাদের ভাইদের বিপদের খবর শুনে। আমার নাম আহমদ মুসা।

--আহমদ মুসা? কোন আহমদ মুসা? ফিলিস্তিন, মিন্দানাও, মধ্য এশিয়া বিপ্লবের নায়ক হিসেবে যার নাম খবরে পড়েছি, সেই?

--জ্বি, হ্যাঁ।

মাথা নিচু করল আহমদ মুসা।

ডঃ পল জনসনের চোখে পলক পড়ল না। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আহমদ মুসার দিকে। বলল এক সময়, কল্যাণের সব প্রতিভা, সব যোগ্যতা আমার কাছে আনন্দের বৎস। আমি তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি। তুমি বিশ্ব-নন্দিত বিপ্লবী, তোমাকে ছাত্রের মত 'তুমি' বলেছি, কিছু মনে করনি তো?

--লজ্জা দেবেন না 'স্যার'। আমি সালমান শামিলের ভাই। আমাকে 'তুমি'ই বলবেন।

--তুমি আর্মেনিয়ায়, আমার কাছে স্বপ্ন মনে হচ্ছে। আমি এখন আস্থাশীল, তুমি যা বলেছ তা তুমি পারবে।

একটু থেমে আবার বলতে শুরু করল ডঃ পল জনসন, তুমি ওদের সন্ধান পাবার সূত্রের কথা বলেছ। আমি এ নিয়ে কোন সময় মাথা ঘামাইনি। ওদের হাত

থেকে উদ্ধার করার কোন চিন্তা করা যেতে পারে বলেও আমি মনে করিনি। তবে এখন চেষ্টা করব, আমার সব সাধ্য দিয়ে তোমাকে সাহায্য করব, এ প্রতিশ্রুতি তোমাকে দিচ্ছি।

--তাহলে এখন উঠি জনাব। বলল আহমদ মুসা।

--উঠবে? ঠিক আছে।

উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে আহমদ মুসা বলল, আমি কি সোফিয়া এ্যাঞ্জেলার সাথে দেখা করতে পারি?

--পার। মেয়েটা খুশি হবে। খুব ভাল মেয়ে। সালমান শামিল অনার্সে ফার্স্ট হয়েছিল, সে সেকেন্ড হয়েছিল।

--জনাব, সোফিয়াদের বাড়ির লোকেশনটা?

--ভিক্টোরী স্কোয়ার থেকে যে রোডটা সোজা পশ্চিমে গেছে তার শেষ মাথায় ৭নং বাড়ি। কিন্তু তোমার সরাসরি যাওয়া কি ঠিক হবে? জর্জ সাইমন অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং কট্টরবাদী রাজনীতিক।

--চিন্তা করবেন না জনাব, সবদিক বিবেচনা করেই সেখানে যাব।

'এখন তাহলে আসি জনাব, আবার আসব' বলে ঘুরে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার দিকে স্নেহভরা চোখে তাকিয়ে ছিল ডঃ পল জনসন।

আহমদ মুসা দরজার নব ঘুরিয়ে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল।

দরজা থেকে গাড়ি বারান্দার সবটাই দেখা যায়। সামনে তাকাতে গিয়ে আহমদ মুসার দৃষ্টি এমনিতেই জীপের দিকে গেল। জীপের দিকে চাইতেই দেখতে পেল, সেই এ্যাটেনডেন্ট জীপ থেকে নামছে। আহমদ মুসা জীপের দরজা বন্ধ করে আসেনি।

দৃশ্যটা দেখে চমকে উঠল আহমদ মুসা। মনে পড়ল আসার সময় দেখা এ্যাটেনডেন্টের সেই কুঞ্চিত কপাল এবং চমকে ওঠা চোখের কথা। কৌতুহলবশতঃ খোলা জীপে ওঠা অস্বাভাবিক হয়তো নয়। কিন্তু কুঞ্চিত কপাল এবং চমকে ওঠা চোখের সাথে এটা যোগ করলে ঘটনা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

হঠাৎ আহমদ মুসার মনে পড়ল, এখান থেকে বেরিয়ে গেটে গিয়েই তো সালমান শামিল কিডন্যাপ হয়েছে। সালমান শামিলের এখানে আসার খবর কে হোয়াইট ওলফকে দিয়েছিল? যে দিয়েছিল সে কি এই এ্যাটেনডেন্ট হতে পারে না? এ্যাটেনডেন্ট হোয়াইট ওলফের কেউ, না চর? সে কি আহমদ মুসাকে চিনতে পেরেছে? চিনতে পারার জন্যেই কি চমকে ওঠা এবং কপাল কুঞ্চিত হওয়া? হোয়াইট ওলফ তার ফটো সব জায়গায় তো পৌঁছাতেই পারে।

মাথা নিচু করে চিন্তা করছিল আহমদ মুসা। সে মনে করল ডঃ পল জনসনকে সব কথা বলেই আসা দরকার।

আহমদ মুসা ফিরে দাঁড়াল। দরজার নব ঘুরিয়ে প্রবেশ করল ঘরে।

দরজা খোলার শব্দে মুখ তুলল ডঃ পল জনসন।

আহমদ মুসা বলল, আসব জনাব?

এস। ডঃ জনসনের চোখে কিছুটা চাঞ্চল্য। আহমদ মুসা এসে বসতেই জিজ্ঞাসা করল, জরুরি কিছু নিশ্চয়?

আপনার এ্যাটেনডেন্ট কেমন?

পুরানো এবং বিশ্বস্ত।

আমার সন্দেহ মিথ্যা না হলে সে হোয়াইট ওলফের লোক অথবা চর।

কি বলছ তুমি?

মনে হয় আমার সন্দেহে ভুল নেই।

সন্দেহের কিছু ঘটেছে?

কিছু ঘটেছে। আমার আরও ধারণা হচ্ছে, সালমান শামিল এখানে আসার খবর সেই হোয়াইট ওলফকে জানিয়েছিল।

তুমি এটা মনে কর?

বলে একটু থেমেই আবার সে শুরু করল, হতে পারে। ওরা সকলেরই মাথা খারাপ করেছে। সে আর বাদ থাকবে কেন।

ও কোথায় থাকে জনাব?

সরেজমিনে সন্ধান করে আরও নিশ্চিত হতে চাও বুঝি? মুখে একটুকরো হাসি।

জ্বি।

এ প্রশাসনিক ভবনের দক্ষিণ পাশে অধ্যাপকদের কোয়ার্টার। এর দক্ষিণ পাশের কোয়ার্টারগুলোতে কর্মচারীরা থাকে। ও থাকে একতলার ২১ নম্বর কোয়ার্টারে।

আপনার বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার একটা ম্যাপ দিয়ে আমাকে সাহায্য করতে পারেন?

'অবশ্যই' বলে ডঃ পল জনসন পাশের ড্রয়ার থেকে একটি ছাপানো পুস্তিকা এগিয়ে দিল। বলল, এর মধ্যে ম্যাপ এবং সব তথ্য পাবে।

আহমদ মুসা পুস্তিকাটির পাতা উল্টাল। মাঝখানে দু'পাতা ব্যাপী বিরাট স্কেচম্যাপ। একবার নজর বুলিয়ে নিয়ে বন্ধ করল। বলল, উঠি জনাব।

ডঃ জনসনের কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল আহমদ মুসা। এবার দেখল, এ্যাটেনডেন্ট বারান্দায় সিঁড়ির মুখে তার নির্দিষ্ট জায়গায় বসে আছে।

আহমদ মুসা কাছে যেতেই উঠে দাঁড়াল। তার চোখটা নিচু। আহমদ মুসা মনে মনে হাসল। গিয়ে গাড়িতে উঠল।

এক্সপ্লোসিভ ডিটেকটর বের করে গাড়িটা একবার পরীক্ষা করল। না, সেরকম কিছু নেই। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে দেখল ঠিক আছে, কম্পিউটার-আই গ্রীন সিগন্যাল দিচ্ছে। তাহলে সে গাড়িতে উঠেছিল কেন? কোন কাগজ-পত্রের সন্ধানে? সে কি সন্দেহ করেছে, না চিনতে পেরেছে? মনে হয় গেটে গেলেই এর উত্তর পাওয়া যাবে। সে চল্লিশ মিনিট কথা বলেছে ডঃ পল জনসনের সাথে। চিনতে পেরে থাকলে খবর দিয়ে এই সময়ের মধ্যে সব আয়োজন করে ফেলা সম্ভব।

আহমদ মুসা গাড়িতে স্টার্ট দিল।

ডঃ পল জনসনের অফিস থেকে সামনের রাস্তা সেন্ট জনপল রোডের দূরত্ব প্রায় ৪শ' গজের মত। মাঝখানে ছোট আঁকা-বাঁকা রাস্তা, বাগান আর গাছের সারি। এই দূরত্বের মাঝ বরাবর জায়গায় একটা চৌমাথা। এখান থেকে একটা

রাস্তা উত্তর দিকে ক্লাস বিল্ডিং এর দিকে, আরেকটা দক্ষিণ দিকে স্টাফ কোয়ার্টারের দিকে গেছে। একটা রাস্তা এডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এসে মিশেছে চৌরাস্তায়। চৌরাস্তা থেকে চতুর্থ রাস্তাটি সোজা পূর্বদিকে বেরিয়ে, পরে দক্ষিণ দিকে একটু টার্ন নিয়ে গেট পেরিয়ে সেন্ট জনপল রোডে গিয়ে পড়েছে।

রাত তখন ৮টা।

আহমদ মুসার জীপ চত্ত্বরের সেই চৌরাস্তার কাছাকাছি আসতেই আহমদ মুসা দেখতে পেল, চৌরাস্তার ডান পাশে দু'জন লোক মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলছে। একজন পূর্বমুখী, একজন পশ্চিমমুখী। পশ্চিমজনের চোখ জীপের হেডলাইটের দিকে। ওদের দু'জনের গায়েই ওভারকোট। মাথায় হ্যাট। ওদের পশ্চিমমুখী জনের ওভারকোটের নিচের পকেট থেকে বেরিয়ে আসা ধূসর নলটিকে ওয়াকি টকির নল বলেই আহমদ মুসার মনে হল।

আহমদ মুসার মন ছ্যাঁত করে উঠল। ওরা কি গেটের মূল বাহিনীর অগ্রবাহিনী? তাহলে ওরা জাল পেতেছে?

আহমদ মুসা তার জীপ একেবারে লোকটির গা ঘেঁষে দাঁড় করাল। ওরা প্রথমটায় আঁতকে উঠে এক ধাপ পিছিয়ে গেল। কিন্তু তারপরেই আবার স্থির হলো। ওদের হাত ওভারকোটের পকেটে।

আহমদ মুসা পাশ থেকে তার এম-১০ রিভালভারটি তুলে নিয়ে ওদের ডাকল। ওরা দু'জনেই কাছে এল।

আহমদ মুসার এম-১০ রিভলভারের নলটা গাড়ি দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে ওদের মুখোমুখি হলো।

আহমদ মুসা দ্রুত বলল, দেখ আমি অযথা খুনো-খুনি পছন্দ করি না। তোমাদের দু'জনের রিভলভার এবং ওয়াকি টকি দু'টো আমাকে----

আহমদ মুসার কথা শেষ হবার আগেই বিদ্যুৎ বেগে ওদের হাত কোটের পকেট থেকে বেরিয়ে এল। কাল চকচকে রিভলভার। কিন্তু তাদের রিভলভারের নল আহমদ মুসা পর্যন্ত উঠে আসার আগেই আহমদ মুসার সচেতন, ক্ষিপ্র তর্জনী এম-১০-এর ট্রিগারে চেপে বসল। নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল মেশিন পিস্তলের এক

ঝাঁক গুলি। সাইলেন্সার লাগানো ছিল, একটুও শব্দ হলো না। লাশ দু'টিও নিঃশব্দে রাস্তার পাশে ছোট সুন্দর ফুলগাছগুলোর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

এ সময় উত্তর দিক থেকে ছুটে আসা পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। আহমদ মুসা মুখ সরিয়ে দেখল, চৌমাথার ওপার থেকে দু'জন ছুটে আসছে। তাদেরও পকেটে হাত। আহমদ মুসা ওদের হাতে পিস্তল না দেখে বুঝল, গুলির শব্দ ওরা পায় নি, সাথীদের পরিণতিও জানতে পারে নি। জীপ দাঁড় করিয়ে সাথীদের সাথে কি করছে সেই খবর বোধহয় নিতে আসছে ওরা।

ওরা জীপের কাছাকাছি আসতেই আহমদ মুসা জীপের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, দেখ আমি তোমাদের কিছুই বলব না, তোমাদের পকেটের রিভলভার এবং ওয়াকি টকি ঐ পেছন দিকে বাগানে ছুঁড়ে ফেলে দাও। আমি চলে---------

এবারও আহমদ মুসার কথা শেষ করতে ওরা দিল না। বিদ্যুৎ গতিতে ওরা পা পেছনে ছুঁড়ে দিয়ে উপুড় হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গেই দু'টি গুলি ছুটে এল। ওরা অদ্ভুত কায়দায় শুয়ে পড়তে পড়তেই রিভলভার বের করে পজিশন করে নিয়েছিল। ওদের একটা গুলি দরজার ডান পাশের উপরের কোণটায় গিয়ে আঘাত করল। আরেকটা গুলি ৪৫ ডিগ্রি এ্যাংগেলে জানালা দিয়ে প্রবেশ করে গাড়ির ভেতরে ছাদে গিয়ে বিদ্ধ হলো। আহমদ মুসা সিটের সাথে সেঁটে না থাকলে গুলিটা আহমদ মুসার মাথার উপরের অংশ উড়িয়ে দিত।

আহমদ মুসার এম-১০ থেকেও সঙ্গে সঙ্গে গুলি বৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু তারা শুয়ে পড়ার ফলে প্রথম দিকের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। কিন্তু তার পরেই এম-১০ এর নল নিচে নেমে যায়। ঝাঁঝরা হয়ে যায় ওদের শুয়ে পড়া দেহ।

আহমদ মুসা দ্রুত জীপের মুখ ঘুরিয়ে নিল। স্টাফ কোয়ার্টারের দিকে। সোজা গেট দিয়ে বেরুতে গিয়ে নতুন হাঙ্গামায় সে পড়তে চায় না। তার সময়ের মূল্য অনেক। এখন তার লক্ষ্য সোফিয়া এ্যাঞ্জেলার বাড়ি। এদের সাথে শক্তি পরীক্ষার সময় সামনে আসছে।

আহমদ মুসা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাপে চোখ বুলাতে গিয়ে দেখেছিল, স্টাফ কোয়ার্টারমুখী রাস্তা দিয়ে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে সেন্ট জনপল রোডে পড়ার আগে আরও দু'টো গেট পাওয়া যাবে।

আহমদ মুসার জীপ তীর বেগে এগিয়ে চলল স্টাফ কোয়ার্টারের রাস্তা ধরে দক্ষিণ দিকে।

আহমদ মুসা গিয়ার চেঞ্জ করার সময় গিয়ারের পাশে রিভলভারের পোড়া বুলেট পড়ে থাকতে দেখল। উপরে তাকাল আহমদ মুসা। যে বুলেটটা গাড়ির ছাদে আঘাত করেছিল, সেটাই নিচে পড়েছে। লোক দু'টির অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার কথা আহমদ মুসার মনে পড়ল। আহমদ মুসা মনে মনে হোয়াইট ওলফের ট্রেনিং এবং তাদের নিষ্ঠার প্রশংসা করল। কোন পরিস্থিতিতেই ওরা আক্রমণ থেকে পিছপা হয় না, এমনকি মৃত্যুকে অবধারিত জেনেও। মৃত্যুর আগে যেটুকুই সময় পায়, ওরা কাজে লাগায়। সত্যিই ওরা ভয়ংকর।

একেবারে সর্ব দক্ষিণের কর্মচারী কোয়ার্টার বরাবর গেট দিয়ে সেন্ট জনপল রোডে পড়ে দক্ষিণ দিকে বাঁক নেয়ার সময় একবার চকিতে উত্তর দিকে প্রশাসনিক ভবনের সম্মুখস্থ গেটের দিকে আহমদ মুসা চাইল। দেখল, সেখানে সেই মুহূর্তে তিনটি গাড়ির ছয়টি হেডলাইট জ্বলে উঠল। ছুটে আসছে ওরা।

আহমদ মুসা গিয়ার চেঞ্জ করে, পা দিয়ে একসেলেটর চেপে ধরল। দৃঢ় হাতে খামচে ধরল স্টিয়ারিং হুইল। লাফিয়ে উঠল জীপ। দেখতে দেখতে স্পিডোমিটারের কাঁটা ১২০ এ গিয়ে উঠল।

তুলনামূলকভাবে জনবিরল সেন্ট জনপল রোড রাতে আরও জনবিরল হয়ে উঠেছে। ঝড়ের বেগে এগিয়ে চলেছে আহমদ মুসার জীপ।

সামনেই মোড়। গ্রীন সিগন্যাল দেখা যাচ্ছে। আহমদ মুসা প্রার্থনা করল, গ্রীন সিগন্যালটা যেন আর বিশ-পঁচিশ সেকেন্ড থাকে।

ভাগ্য ভাল। আহমদ মুসা যখন সিগন্যাল ক্রস করল ঠিক তখনি হলুদ সিগন্যাল জ্বলে উঠেছে। হাফ ছেড়ে বাঁচল আহমদ মুসা। রেড সিগন্যালের বাঁধার সম্মুখীন ওরা হবে।

আহমদ মুসার সামনে ইয়েরেভেনের রোডম্যাপ খোলা ছিল।

সে মোড় পার হয়েই সেন্ট জনপল রোড ছেড়ে দিয়ে একটা গলির মধ্যে ঢুকে গেল। গলিটি দিয়ে শামিউন এভেনিউতে পড়া যাবে। শামিউন এভেনিউ দিয়ে কিছু এগিয়ে আরেকটা লেন পাওয়া যাবে। সে লেন দিয়ে এগোলে সংক্ষেপেই ভিক্টোরী রোডে পৌঁছা যায়। এ রোডেরই দক্ষিণ মাথায় ভিক্টোরী স্কোয়ার।

আহমদ মুসা লেনে প্রবেশ করে কিছুটা এগিয়ে একটা অন্ধকার মত স্থানে জীপ দাঁড় করাল। তারপর দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির নাম্বার প্লেট পাল্টে দিল। আহমদ মুসা ভয় করছিল হোয়াইট ওলফরা ওয়্যারলেসে আহমদ মুসার জীপের নাম্বার সব জায়গায় পৌঁছে দিতে পারে। পুলিশও তাদের সহযোগী।

গাড়িতে উঠে আবার গাড়ি স্টার্ট দিল আহমদ মুসা। তাড়াহুড়া নেই। একটু ধীর গতিতেই এগিয়ে চলল আহমদ মুসার জীপ।

আহমদ মুসার জীপ যখন সোফিয়া এ্যাঞ্জেলাদের ফটকে গিয়ে পৌঁছল তখন রাত ৮টা ২৫মিনিট।

গেটের সামনে গাড়ি দাঁড়াতে দেখে দারোয়ান গেট না খুলে গাড়ির কাছে এল।

দারোয়ানের লম্বা-চওড়া, পরিশ্রমলব্ধ পেটা শরীর। মুখটি প্রসন্ন নয়। গাড়ির জানালার কাছে এসে আহমদ মুসাকে জিজ্ঞাসা করল, কাকে চাই?

সোফিয়া এ্যাঞ্জেলার সাথে দেখা করতে চাই।

দারোয়ান সঙ্গে সঙ্গে কোন উত্তর দিলনা। মুখটা যেন তার আরো মলিন হয়ে উঠল। বলল সে, সোফিয়া এ্যাঞ্জেলা নেই।

মাথা নিচু করে কথাটা বলল দারোয়ান।

দারোয়ানের এই ভাবান্তর আহমদ মুসার নজর এড়াল না। আহমদ মুসা আবার প্রশ্ন করল, কখন ফিরবে সোফিয়া এ্যাঞ্জেলা, কখন এলে দেখা পাব?

আমি জানি না।

কালকে আসি, তুমি সোফিয়াকে বলো।

কালকে দেখা পাবেন তা বলতে পারবো না।

কেন?

দারোয়ান কোন উত্তর দিল না। তার মুখ নিচু।

এ সময় দোতলার ব্যালকনি থেকে একটা নারী কণ্ঠ ধ্বনিত হলো, ডেভিড ওকে আসতে দাও। নিচের ড্রইংরুমে নিয়ে এস।

আহমদ মুসা মুখ তুলে উপরে তাকাল। দেখল, সাদা গাউন পরা একজন মহিলা ব্যালকনি থেকে ঘরে ঢুকে গেল।

দারোয়ান গেট খুলে দিল। আহমদ মুসা গাড়ি বারান্দায় নিয়ে গাড়ি দাঁড় করাল।

দারোয়ান গেট বন্ধ করে এসে আহমদ মুসাকে ড্রইংরুমে পৌঁছে দিল।

বিশাল ড্রইংরুম। সোফায় সাজানো। পশ্চিম দেয়ালের মাঝামাঝি জায়গায় শ্বেত পাথরের একটা মূর্তি। আহমদ মুসা চিনল, মূর্তিটা আর্মেনীয় খৃস্টানদের জাতীয় বীর শামিউনের।

মূর্তির পদতলেই সিংহাসন আকৃতির একটা চেয়ার। আহমদ মুসা বুঝল, চেয়ারটায় জর্জ সাইমন বসেন।

আহমদ মুসা চেয়ারটার বাম পাশের সোফায় গিয়ে বসল।

আহমদ মুসা ভাবল, সোফিয়া বাড়িতে নেই, কেন তাহলে তাকে ভিতরে আসতে বলল? কে তার সাথে কথা বলবে? জর্জ সাইমন কি? না ঐ মহিলা? মহিলাটি কে?

আবার ভাবল আহমদ মুসা, তাকে চিনতে পারেনি তো! চিনতে পেরেই কি আসতে বলেছে?

আহমদ মুসা তার ফুল লোড এম-১০ মেশিন রিভলভার একবার স্পর্শ করল।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না।

চেয়ারটির বাঁ পাশেই দরজা।

দরজা দিয়ে ধীর পদক্ষেপে প্রবেশ করল একজন মহিলা। একহারা, মাঝ বয়সী। সুন্দর, অভিজাত চেহারা। সবকিছু মিলিয়ে মাতৃসুলভ একটা ভঙ্গি। কিন্তু মুখ ম্লান, চেহারা জুড়ে বেদনার একটা কাল ছায়া। চোখের দৃষ্টি উদাস। আহমদ মুসার মনে পড়ল, দারোয়ানের মধ্যেও এই বিষণ্নতাই সে দেখেছে।

মহিলাটি বড় চেয়ারটিতে না বসে আহমদ মুসার পাশের সোফায় এসে বসল।

হাঁটা বসার মধ্যে তার নিঃসংকোচ কিন্তু শান্ত ও সংযত ভঙ্গি।

মহিলাটি বসেই বলল, আমি সোফিয়ার মা।

আপনি সোফিয়ার খোঁজ করছিলেন?

জ্বি হ্যাঁ, বলল আহমদ মুসা।

আপনার পরিচয়?

আহমদ মুসা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না। একটু ভাবল। বলল, আমি সালমান শামিলের ভাই।

মহিলাটি চোখ তুলে আহমদ মুসার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। বলল, আমি সোফিয়ার কাছে শুনেছি, সালমান শামিলের কোন ভাই-বোন নেই।

আমি সালমান শামিলের বিশ্বাসের ভাই। আহমদ মুসার মুখে হাসি।

সোফিয়াকে আপনার কেন প্রয়োজন?

আহমদ মুসা উত্তর দেবার আগে এবারও ভাবল। ভেবে নিয়ে ধীর কণ্ঠে বলল, আপনি জানেন সালমান শামিলকে অপহরণ করা হয়েছে। আমরা তার উদ্ধারের চেষ্টা করছি। কিন্তু সামনে এগোবার মত সূত্র আমরা পাচ্ছি না। আমি যতদূর জানি সোফিয়া সালমানের বন্ধু ছিল এবং অপহৃত হবার আগে সোফিয়ার সাথে সালমানের কথাও হয়েছে। আমরা চাইছিলাম, সোফিয়া আমাদের কোন সাহায্য করতে পারে কি না।

আহমদ মুসা থামলেও সোফিয়ার মা সংগে সংগে কথা বলতে পারল না। তার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়াচ্ছিল।

আহমদ মুসা এই অভাবিত অবস্থায় পড়ে বিব্রত বোধ করতে লাগল। সে বিস্মিত হলো। এমন দৃশ্য সে এখানে আশা করেনি।

সোফিয়ার মা রুমালে মুখ মুছে নিয়ে বলল, সালমান শামিলের অপহরণ আমারও সর্বনাশ করেছে।

বলতে বলতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল সোফিয়ার মা।

আহমদ মুসা কি বলবে, কি সান্ত্বনা দেবে তা ভেবে পেল না। তবে বুঝল, বড় ধরনের কিছু ঘটেছে। উদ্বিগ্ন হলো আহমদ মুসা।

দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছিল সোফিয়ার মা।

কিছু পর মুখ তুলল। চোখ মুছে আবার বলতে শুরু করল, যেদিন সালমান শামিল অপহৃত হয়, সেদিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরে মা আমার সারা দিন কেঁদেছে, কিছু খায়নি। রাত দশটায় ওর আব্বা বাইরে যায়। ওর আব্বা বাইরে যাওয়ার পর পরই সে কিছু না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। আজ তিন দিন কেউ ফিরে আসেনি।

কান্না রোধ করতে দু'হাতে মুখ ঢাকল সোফিয়ার মা।

কোথাও সন্ধান করেছেন, পুলিশ কিছু করতে পারেনি? দ্রুত কন্ঠে জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

সন্ধান করে কোন লাভ নেই, পুলিশ কিছুই করতে পারবে না। রুমালে চোখ মুছে শান্ত হবার চেষ্টা করে বলল সোফিয়ার মা।

কেন লাভ নেই? পুলিশ কোন কিছু করতে পারবে না? বিস্মিত কন্ঠে বলল আহমদ মুসা।

সোফিয়ার মা কোন উত্তর দিল না।

আহমদ মুসা বুঝল, সোফিয়ার মা প্রশ্নটির উত্তর দিতে চাচ্ছে না অথবা দ্বিধা করছে। তবু আহমদ মুসা আবার জিজ্ঞেস করল, আপনি কি জানেন তারা কোথায় গেছে কিংবা তাদের কি হয়েছে?

আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না।

এটা কি আপনি মনে করেন যে, সালমান শামিলকে যারা অপহরণ করেছে, তারাই ওদেরও আটকেছে?

তাই মনে করি।

ওরা কি এক সাথে গেছে?

না। সোফিয়ার আব্বা প্রতি বৃহস্পতিবারে রাত দশটায় এভাবে যান।

সোফিয়া কি ওর আব্বাকে অনুসরণ করেছে বলে মনে করেন?

সোফিয়ার মা আহমদ মুসার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে বলল, আমি তা মনে করিনি। এমন কি ঘটতে পারে?

সোফিয়া কখন বেরিয়েছে, ওর আব্বার পরেই কি?

প্রায় সংগে সংগেই। ওর আব্বার গাড়ি রাস্তায় পড়লে, সোফিয়ার গাড়ি গেট দিয়ে বেরিয়েছে।

আমার মন বলছে, সোফিয়া তার আব্বাকে অনুসরণ করেছে এবং সোফিয়া সালমানের সন্ধানেই বের হয়।

আহমদ মুসা একটু থামল। তারপর বলল, একথা সত্য হলে এটাও সত্য বলে ধরে নিতে হবে যে, তার পিতাকে অনুসরণ করলে সালমানকে সন্ধান করার সুরাহা হবে, এটা সোফিয়া মনে করেছিল।

আহমদ মুসার শেষ কথাগুলো বেশ শক্ত শোনাল।

একটু থেমে আহমদ মুসাই আবার শুরু করল, দয়া করে বলবেন, প্রতি বৃহস্পতিবার রাত দশটায় সোফিয়ার আব্বা কোথায় যেতেন?

কোন উত্তর দিল না সোফিয়ার মা। তার মুখে একটা ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল।

আহমদ মুসা বুঝল, সোফিয়ার মা কিছু বলতে ভয় করছে। তার ভয় দূর করার জন্যে আহমদ মুসা বলল, আপনি সোফিয়ার মা, আমারও মায়ের মত। কোন কথা বলতে দ্বিধা করবেন না, আপনার ভয় নেই। সবকিছু জানলে হয়ত আমি আপনাকেও সাহায্য করতে পারব, আমাদেরও উপকার হবে।

পারবে না বাবা। ওরা জানতে পারলে তুমিও বিপদে পড়বে, তুমিও হারিয়ে যাবে।

আহমদ মুসা এক মুহূর্ত চিন্তা করল। তারপর পকেট থেকে এম-১০ মেশিন রিভলভার বের করে সোফিয়ার মা'র কাছে ধরে বলল, দেখুন, রিভলভার এখনও গরম আছে, এখনও এতে বারুদের গন্ধ লেগে আছে। কিছুক্ষণ আগেই এ রিভলভার ওদের একটা ফাঁদ গুড়িয়ে দিয়েছে। আপনি বিশ্বাস করুন, আমরা পারব।

সোফিয়ার মা'র চোখে প্রবল ভয় ও আশংকার চিহ্ন ফুটে উঠল। সে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়েছিল আহমদ মুসার দিকে। বলল সে ধীরে ধীরে, তুমি ওদের চেন, জান ওদের কত শক্তি?

হোয়াইট ওলফকে চিনি, ওদের শক্তি সম্পর্কেও জানি।

ভয় করো না ওদের?

না।

পিস্তল গরম থাকার কথা বলছ, কোথায় লড়াই করে এলে ওদের সাথে?

সালমান সম্পর্কে জানার জন্যে ডঃ পল জনসনের কাছে গিয়েছিলাম। সালমানের মত করেই আমাকে ধরার জন্যে ওরা ফাঁদ পেতেছিল। ফাঁদ ছিড়ে গেছে। ওদের মধ্যে চারজন সেখানে লাশ হয়ে পড়ে আছে।

কি বলছ তুমি? প্রায় আর্তনাদ করে উঠল সোফিয়ার মার কণ্ঠ।

আমি বলছি ওরা অজেয় নয়, ওদের ভয়ের কিছু নেই।

তুমি একা পারবে?

আমি একা নই। অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার লোক তৈরি আছে।

সোফিয়ার মা মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ ভাবল। বলল, আমি বেশি কিছু জানি না, জানার চেষ্টা করাও অপরাধ ছিল। সোফিয়ার আব্বা প্রতি বৃহস্পতিবার রাত দশটায় কোথায় যেত আমি কোনদিন জিজ্ঞেস করিনি। তবে গাড়ির মিটার থেকে বুঝেছি জায়গাটা এখান থেকে তেত্রিশ-চৌত্রিশ মাইল দুরে। নাম জানতাম না জায়গাটার। কিন্তু আমার কৌতুহল ছিল। আমার স্বামীর চরিত্র সম্পর্কে আমার কোন সন্দেহ ছিল না, তবুও আশংকা মনে জাগতো যে, কেন তিনি রাতেই শুধু সেখানে যান! এক বৃহস্পতিবার অসুস্থ থাকায় তিনি যেতে পারলেন না। যেতে পারবেন না-একথা জানাবার জন্যে তিনি টেলিফোন করলেন। আমি পাশেই বসেছিলাম। নাম্বারটা মনে মনে আমি মুখস্ত করলাম। তারপর কৌতুহল চাপতে না পেরে একদিন সেখানে টেলিফোন করেই বসলাম। আমার লক্ষ্য ছিল জায়গাটার নাম জানা। টেলিফোন করার পর ওপার থেকে 'হ্যালো' বলতেই আমি বললাম, এটা কি 'জেগার্ড মনেস্টারী?' জেগার্ড মন্দির ইয়েরেভেন থেকে ৩৮ কিলোমিটার দুরে। ওপার থেকে সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর এল, না আমবার্ড দুর্গ।

জায়গাটার নাম আমি এভাবে জানতে পারি। কেন ঐ দিন নিয়মিত ওখানে তিনি যান, তা জানতে পারিনি। তবে সেখান থেকে ফিরে আসার বিভিন্ন সময় থেকে বুঝেছি সেখানে বিভিন্ন মেয়াদের মিটিং সিটিং হয়ে থাকে।

আহমদ মুসার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, আপনাকে ধন্যবাদ। এই তথ্যে আমাদের অনেক উপকার হবে।

একটু থেমে আহমদ মুসা আবার জিজ্ঞাসা করল, সোফিয়া তার পিতার এসব কি জানে? জানে কি সে, তার পিতা হোয়াইট ওলফের সাথে আছেন?

জানার কথা নয়। তবে বুদ্ধিমতী মেয়ে নিশ্চয় কিছু আঁচ করেছে।

আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, আমি আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

সোফিয়ার মাও উঠে দাঁড়াল। বলল, বাবা তোমার এ দুঃখিনী মা কি কিছু আশা করতে পারে?

আল্লাহ ভরসা। নিশ্চয় আশা করতে পারেন আম্মা।

ঈশ্বর তোমাদের সফল করুন।

আহমদ মুসা আসার জন্য ফিরে দাঁড়িয়েছিল।

সোফিয়ার মা বলে উঠল, আচ্ছা বল তো, তোমার নামটাই তো জানা হয়নি।

আহমদ মুসা ফিরে দাঁড়াল আবার। বলল, আমি আহমদ মুসা।

নাম শুনে কপাল কুঞ্চিত হলো সোফিয়ার মা'র। বলল, এক আহমদ মুসার কাহিনী পড়েছি পত্রিকায়। ফিলিস্তিন, মিন্দানাও এবং মধ্য এশিয়া বিপ্লবের নায়ক সে। সে নওতো তুমি?

জ্বি, আমি সেই। নরম, বিনীত কণ্ঠ আহমদ মুসার।

শুনেই সোফিয়ার মা ধপ করে বসে পড়ল সোফায়। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকল আহমদ মুসার দিকে।

'আচ্ছা চলি' বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল আহমদ মুসা।

সোফিয়ার মা বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে নেবার আগেই আহমদ মুসা বেরিয়ে গেল। কিছু বলার আর সুযোগ হলো না। তবে আহমদ মুসার গমন পথের দিকে

চেয়ে থাকা সোফিয়ার মা’র বিস্ময়-বিমূঢ় চোখে একটা আশার আলোও চিক চিক করে উঠতে দেখা গেল।

আহমদ মুসা বেরিয়ে এসে দেখল, দারোয়ান গেটের গার্ডরুমের দরজায় চুপচাপ বসে আছে। গেট বন্ধ। গাড়ির দরজা খুলে উঁকি মেরে দেখল, সব ঠিক-ঠাক আছে, এমনকি সিটের উপর রেখে যাওয়া ভুয়া টেলিফোন নাম্বারের স্লিপ পর্যন্ত যেভাবে রেখে গিয়েছিল সেভাবেই আছে।

আহমদ মুসা গাড়িতে উঠতেই দারোয়ান গেট খুলে দিল।

গেট দিয়ে বেরিয়ে রাস্তায় পড়ার আগে চারদিকে একবার তাকিয়ে নিল আহমদ মুসা, না, কোন মানুষ কিংবা কোন গাড়ি অপেক্ষা করে নেই। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল রাত ৯টা। আহমদ মুসা ভাবল, আমবার্ড দুর্গের যে ঠিকানা পাওয়া গেছে তাতেই চলে কি না? ডঃ জনসনের এ্যাটেনডেন্টের ওখানে ঢুঁ দেয়ার দরকার আছে কি না? কিন্তু চিন্তা করল, তারা যা খুঁজছে আমবার্ড দুর্গ তা নাও হতে পারে, সেটা নিছকই এক ঐতিহাসিক পবিত্র গীর্জা মাত্র। সুতরাং কোন সুযোগ হাতছাড়া না করে সবগুলো বাজিয়ে দেখা দরকার।

আহমদ মুসার জীপ তখন ছুটে চলছিল ওসমান এফেন্দীর বাড়ির দিকে। আলী আজিমভ ও ওসমান এফেন্দীকে নিয়ে যেতে হবে ডঃ পল জনসনের স্টাফ কোয়ার্টার অভিযানে।

রাত পৌনে বারটায় আহমদ মুসাদের জীপটি ডঃ পল জনসনের ইনস্টিটিউটের সীমানার কাছাকাছি পৌঁছল। আর গজ পঞ্চাশেক গেলেই স্টাফ কোয়ার্টারে প্রবেশের গেট পাওয়া যাবে।

আহমদ মুসা গাড়িটা সেখানেই থামাতে বলল। গাড়ি থামলে আহমদ মুসা আলী আজিমভকে নিয়ে নেমে গেল। ড্রাইভিং সিটে বসা ওসমান এফেন্দীকে লক্ষ্য করে বলল, তুমি ঠিক বারোটায় গাড়ি ২১নং স্টাফ কোয়ার্টারের সামনে নিয়ে আসবে।

আহমদ মুসা ও আলী আজিমভ দু’জনেই সেন্ট জন পল রোডের ফুটপাত ধরে হাঁটতে শুরু করল।

দু’জনেরই কাল ট্রাউজারের উপর কাল ওভারকোট। আহমদ মুসার মাথায় ফেল্ট হ্যাট কপাল পর্যন্ত নামানো। আলী আজিমভের মাথায় উলের টুপি। দু’জনেরই দু’হাত ওভারকোটের পকেটে। জনমানব শূন্য রাস্তা। মাঝে মাঝে দু’একটা গাড়ি তীরবেগে ছুটে যাচ্ছে।

আহমদ মুসা ও আলী আজিমভ স্টাফ কোয়ার্টারগামী রাস্তার মুখে গিয়ে মুহূর্তের জন্যে দাঁড়াল। দেখল, রাস্তা একদম ফাঁকা। সম্ভবতঃ আজ সন্ধ্যার এ ঘটনার পর কিছুটা অস্বাভাবিক ফাঁকা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এ এলাকায়।

স্টাফ কোয়ার্টারের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগল আহমদ মুসা এবং আলী আজিমভ।

স্টাফ কোয়ার্টারগুলো পূর্ব-পশ্চিমে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো। দক্ষিণের শেষ সারির পশ্চিমের শেষ বাড়িটা ডঃ পল জনসনের এ্যাটেনডেন্ট আলফ্রেডের।

অনেকখানি এগিয়েছে এমন সময় তারা পশ্চিম দিক থেকে একটা গাড়ি ছুটে আসতে দেখল। আলফ্রেডের বাড়ির দিক থেকেই আসছে গাড়িটা।

আহমদ মুসা ও আলী আজিমভ রাস্তার বামপাশ দিয়ে হাঁটছিল। গাড়িটা পঞ্চাশ গজের মধ্যে এসে পড়েছে। হেডলাইটের চোখ ধাঁধানো আলো তাদের প্লাবিত করেছে।

গাড়িটায় একটা ছোট হাফ ক্যারিয়ার।

গাড়িটা যখন পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল, তখন আহমদ মুসার দৃষ্টি হঠাৎ গিয়ে পড়ল খোলা ক্যারিয়ারের উপর। দেখল, ক্যারিয়ারের মেঝেতে হাত-পা বাঁধা একজন লোক। মুখও তার কাপড় দিয়ে বাঁধা। উঠে বসার চেষ্টা করছে।

আহমদ মুসা সংগে সংগেই ঘুরে দাঁড়াল এবং কোটের পকেট থেকে তার হাত এম-১০ সহ বেরিয়ে এল একই সাথে। উঁচু হল এম-১০ এর মাথা গাড়ির চাকা লক্ষ্য করে।

গাড়িটি তখন মাত্র কয়েকগজ সামনে এগিয়েছিল। এম-১০ এর এক ঝাঁক গুলি গিয়ে ছেঁকে ধরল পেছনের দক্ষিণ পাশের চাকাটিকে। সাইলেনসার লাগানো রিভলভার কোন শব্দ তুলল না, কিন্তু টায়ার ফাটার বিকট শব্দ চারদিকের নীরবতাকে উচ্চকিত করে তুলল।

গাড়িটা খোঁড়াতে খোঁড়াতে আরও কয়েকগজ সামনে এগিয়ে ডান দিকে বেঁকে গিয়ে দক্ষিণমুখো হয়ে থেমে গেল।

থামবার আগেই দু'জন লোক এদিকের গেট দিয়ে রাস্তায় লাফিয়ে পড়ল। তাদের হাতে রিভলভার।

আহমদ মুসার এম-১০ তার মাথা উঁচু করেই ছিল। এবং ট্রিগারেও তর্জনী নির্দেশ পালনের জন্যে প্রস্তুত হয়ে ছিল। আহমদ মুসা যখন দেখল লোক দু'টির রিভলভার উঁচু হচ্ছে, তখন তর্জনী চেপে বসল ট্রিগারে। আবার একটানা এক শীষ উঠল এম-১০ থেকে। বেরিয়ে গেল আর এক ঝাঁক গুলি।

লোক দু'টির রিভলভার আর উঁচু হলো না। ঝরে পড়ল তারা মাটিতে।

আহমদ মুসা এবং আলী আজিমভ দ্রুত এগিয়ে গেল গাড়িটির ক্যারিয়ারের দিকে। আলী আজিমভ লাফিয়ে উঠল ক্যারিয়ারে।

ক্যারিয়ারে বাঁধা অবস্থায় পড়ে থাকা লোকটি উঠে বসেছিল। তার চোখ দু'টি বিস্ফারিত। কাঁপছিল সে।

আলী আজিমভ তার মুখ ও হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিল।

আহমদ মুসা লোকটির উপর চোখ পড়তেই বিস্মিত হলো। একি! এ যে ডঃ পল জনসনের এ্যাটেনডেন্ট আলফ্রেড!

রাস্তার আলোতে চারদিকে সবকিছু মোটামুটি স্বচ্ছ দেখাচ্ছিল।

আহমদ মুসা মাথার হ্যাট খুলে বলল, আলফ্রেড তুমি এখানে, এভাবে?

আলফ্রেড আহমদ মুসার দিকে ভালো করে চেয়েই ভীষণভাবে চমকে উঠল, তার মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কাঁপতে লাগল সে।

পরমুহূর্তে ক্যারিয়ার থেকে লাফিয়ে পড়ে আহমদ মুসার পা জড়িয়ে ধরল এবং ডুকরে কেঁদে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমাকে মাফ করে দিন, আমার স্যারকে বাঁচান, আমার স্যারকে ওরা মেরে ফেলবে।

আহমদ মুসা তাকে হাত ধরে টেনে তুলল। বলল, তুমি কি বলছ বুঝতে পারছি না। কি হয়েছে বুঝিয়ে বল।

আলফ্রেড একটু থেমে কাঁপতে কাঁপতে বলল, স্যার, প্রাণের ভয়ে ওদের হুকুম তামিল করেছি, সালমান শামিল স্যারকে ধরিয়ে দিয়েছি। তা না করলে

বেটি-বাচ্চাসমেত আমাকে ওরা মেরে ফেলত। এখন ওরা আমার বড় স্যারের গায়েও হাত তুলেছে। আপনি তাকে বাঁচান, আপনি তাকে.......

বলে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

আহমদ মুসা ধমকে উঠে বলল, খবরদার কাঁদবে না, বলছি কি হয়েছে বল।

আলফ্রেড চুপ করল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, আপনাকে ধরতে না পারায় ওরা ভয়ানক ক্ষেপে গেছে। ওদের মিটিং-এ আজ রায় হয়েছে, আপনাদের সাথে ডঃ স্যারের যোগসাজশ আছে। এবং আজই তাকে কিডন্যাপ করা, শাস্তি দেয়া এবং হত্যা করার সিদ্ধান্ত ওরা নিয়েছে।

--ডঃ স্যার কে? ডঃ পল জনসন?

--হ্যাঁ। বলল আলফ্রেড।

--কিন্তু তোমাকে ওরা কিডন্যাপ করছিল কেন?

--স্যার সম্পর্কিত সিদ্ধান্তটা আমি জানতে পেরেছিলাম এবং তাকে বাঁচাবার পক্ষে কথা বলেছিলাম এই অপরাধে।

--কোথায় সিদ্ধান্ত হয়েছিল?

--ওদের উত্তর ইয়েরেভেন ঘাঁটিতে।

প্রশ্নের উত্তর দিয়েই আলফ্রেড বলল, স্যার ওদের যতটুকু জানি আমি সব বলব, কিন্তু ডঃ স্যারকে এখন বাঁচান।

--কোথায় তিনি?

--ওর বাসায়। কিন্তু ওরা এতক্ষণে গেছে ওর বাসায়। রাত ১২টায় ওর বাসায় আজ ওরা হামলা চালাবে।

আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল রাত ঠিক বারটা।

এই সময় ওসমান এফেন্দীর গাড়ি হাফ ক্যারিয়ারের ওপারে এসে থামল।

আহমদ মুসা ওসমান এফেন্দীকে লক্ষ্য করে বলল, ওসমান গাড়ি ওখানেই লক করে চলে এস।

তারপর আলফ্রেডকে সামনে রেখে ওরা ডঃ পল জনসনের বাড়ি লক্ষ্যে দ্রুত হাঁটতে শুরু করল।

আলফ্রেডের পাশেই হাঁটছিল আহমদ মুসা। হাঁটতে হাঁটতে বলল, হোয়াইট ওলফের হেডকোয়ার্টার কোথায় জান?

--জানি না, তবে শুনেছি ইয়েরেভেন থেকে পূর্বদিকে আরাগাত পাহাড়ের দিকে কোথায় যেন।

--সালমান শামিলের কোন খবর জান?

--এটুকু জানি তাকে মেরে ফেলেনি, তাকে খাদ্য-পানি না দিয়ে ধীরে ধীরে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

হৃদয়টা কেঁপে উঠল আহমদ মুসার। কত ক্রুর, কত নৃশংস এই হোয়াইট ওলফ! তবু এই ভেবে আহমদ মুসা আনন্দিত হল যে, সালমান বেঁচে আছে।

--তাকে কোথায় রেখেছে?

--শুনেছি, হেডকোয়ার্টারেই ওদের বন্দীখানা।

প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে আহমদ মুসা জিজ্ঞাসা করল, ডঃ পল জনসনের বাড়িতে কে কে থাকেন?

--তিনি, তার স্ত্রী এবং তার এক মেয়ে। তার ছেলে উচ্চশিক্ষার জন্যে আমেরিকায় আছে।

--দারোয়ান?

--জ্বি, গেটে একজন দারোয়ান আছে।

বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে থমকে দাঁড়াল আলফ্রেড। বাংলোর দিকে ইংগিত করে বলল, ডঃ পল জনসনের বাড়ি।

বাড়ির চারদিকে বাগান। বুক পরিমাণ উঁচু প্রাচীরে ঘেরা। বাড়ির সামনে প্রাচীরের সাথে একটা গেটরুম। গেটে ইস্পাতের একটা দরজা। দরজা পেরুলে পাথর বিছানো রাস্তা গাড়ি বারান্দা পর্যন্ত উঠে গেছে।

আহমদ মুসারা দেখতে পেল গেটটি খোলা। খোলা গেট দিয়ে ঢুকল ওরা। গেটরুমে উঁকি দিয়ে দেখল, দারোয়ান বেঘোরে ঘুমুচ্ছে। বুঝল, হোয়াইট ওলফের লোকেরা তাহলে প্রথমে প্রাচীর টপকে প্রবেশ করে দরজা খুলে দিয়েছে।

আহমদ মুসা ওসমান এফেন্দীর দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি আলফ্রেডকে নিয়ে এখানে অপেক্ষা কর।

বলে আহমদ মুসা এবং আলী আজিমভ সামনে এগোবার উদ্যোগ দিতেই আলফ্রেড বলল, ওরা কমপক্ষে পাঁচজন, আপনারা মাত্র দু'জন.....

ওসমান এফেন্দী ওকে থামিয়ে দিল।

আহমদ মুসা ওর দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, তুমি কেমন করে বুঝলে কমপক্ষে পাঁচজন ওরা এসেছে?

--স্যার, যে কোন অপারেশনে কমপক্ষে পাঁচজন ওরা যায়।

'ধন্যবাদ' বলে আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা এবং আলী আজিমভ বাগানের মধ্যে সেই পাথর বিছানো রাস্তা ধরে বাংলোর দিকে এগোতে থাকল। দুজনেরই হাত ওভারকোটের পকেটে।

আহমদ মুসা এবং আলী আজিমভ গাড়ি বারান্দায় পৌঁছে দেখল, সামনের বড় দরজাটি খোলা।

তারা সিঁড়ি ভেঙ্গে বারান্দায় উঠতেই নারী কণ্ঠের কান্না শুনতে পেল।

খোলা দরজা দিয়ে আহমদ মুসা ও আলী আজিমভ ভেতরে প্রবেশ করল। বিরাট হলরুম। কার্পেটে মোড়া। সোফাসেট দিয়ে সাজানো।

হলরুমটি পেরিয়ে তারা একটা করিডোরে প্রবেশ করল। করিডোরের মাথায় গিয়ে একটা দরজা পেল। দরজাটা খোলা। দরজার ওপার থেকে কান্নার শব্দ আসছে।

আহমদ মুসা বেড়ালের মত নিঃশব্দে এগিয়ে দরজা দিয়ে উঁকি দিল। বিরাট ঘর। মনে হল ডঃ পল জনসনের শোবার ঘর।

মেঝেয় পড়ে একজন মহিলা কাঁদছে। মাঝ বয়েসী। মনে হল ডঃ পল জনসনের স্ত্রী। ডঃ পল জনসন বাইরে বেরুবার মত পোশাকে প্রস্তুত। তার মুখ স্বাভাবিক। দুয়ারের একপাশে তিনজন স্টেনগান উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দু'জন ঘরের বিভিন্ন জায়গা সার্চ করছে। মনে হয় সার্চ শেষ হয়েছে। ওদের মধ্যেকার লিডার টাইপের লোকটি ডঃ পল জনসনকে লক্ষ্য করে বলল, চল ডক্টর।

ডঃ পল জনসন সঙ্গে সঙ্গেই যাবার জন্যে পা বাড়াল। মহিলাটি কাঁদতে কাঁদতে ছুটে দিয়ে এবার লিডার টাইপ লোকটির সামনে হাত জোড় করে দাঁড়ালো। বলল, তোমরা ওকে নিয়ে যেও না, ওর কোন দোষ নেই, উনি কোন দোষ করেননি।

ডঃ পল জনসন থমকে দাঁড়িয়ে মহিলাটিকে উদ্দেশ্য করে বলল, নিরর্থক অপমানজনক কোন আবেদন করে নিজেকে আর ছোট কর না ইভা, ধৈর্য্য ধর।

বলে ডঃ পল জনসন সামনে পা বাড়াতে চাইছিল। এমন সময় পাশের দরজা দিয়ে ছুটে এল একটি মেয়ে। 'আব্বা' বলে চিৎকার করে জড়িয়ে ধরল ডঃ পল জনসনকে। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সে বলতে লাগল, আব্বা তোমাকে যেতে দেব না। তোমাকে নিয়ে যেতে পারবে না।

মেয়েটির বয়স উনিশ-বিশ বছর। ডঃ পল জনসনের একমাত্র মেয়ে। নাম মারিয়া জনসন। ইয়েরেভেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ছাত্রী।

ডঃ পল জনসন মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, তোমরা ধৈর্য্য ধর, সবাইকেই তো একদিন যেতে হবে। দুনিয়ার--

ডঃ পল জনসনের কথা শেষ হবার আগেই সেই লিডার টাইপের লোকটা মারিয়ার একটা হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টানে মারিয়াকে সরিয়ে নিয়ে বলল, আমরা নাটক করতে আসিনি, সময় আমাদের মূল্যবান।

ক্রন্দনরত মারিয়া এবার লিডার লোকটার পায়ে গিয়ে পড়ল। বলল, তোমরা আমার আব্বাকে নিয়ে যেও না।

লিডার লোকটা সুন্দরী মারিয়ার দিকে একবার তাকাল। তার চোখটা যেন চক্ চক্ করে উঠল। সে ডঃ পল জনসনকে লক্ষ্য করে বলল, ডঃ, মেয়েটা তোমার খাসা, আমাদের দিয়ে দাও, তোমার অনেক পাপ মোচন হবে।

ডঃ পল জনসনের শান্ত চোখটি এবার আগুনের মত জ্বলে উঠল। গর্জে উঠল, অমানুষ কুকুর, মুখ সামলে কথা বল।

লিডার লোকটি হো হো করে হেসে উঠল। তারপর মুখ কঠিন করে ক্রুর হেসে বলল, কুকুর আমি, বেশ তাহলে কুকুরের ব্যবহার একবার দেখ ডক্টর।

বলে সে মারিয়াকে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ডঃ পল জনসন বিদ্যুৎ গতিতে কয়েক পা এগিয়ে গেল। তারপর প্রচন্ড এক লাথি মারল লোকটির মুখে।

ছিটকে পড়ল লোকটি। পড়েই আবার উঠে বসল। তার নাক থেকে গল গল করে রক্ত বেরুচ্ছে। ঠোঁট দু'টিও থেতলে গেছে। তার চোখ দু'টি ভাটার মত জ্বলছে।

উঠে বসেই সে পকেট থেকে রিভলভার বের করে তাক করল ডঃ পল জনসনের দিকে।

আহমদ মুসার ডান হাতে এম-১০ রিভলভার। লিডার লোকটিকে রিভলভার বের করতে দেখেই কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পারল আহমদ মুসা। দ্রুত সে বাম হাতে পকেট থেকে ছোট কোল্ট রিভলভার বের করে নিল। লোকটির রিভলভারের নল ডঃ পল জনসনের উপর স্থির হবার আগেই আহমদ মুসার ক্ষুদ্র কোল্টটি অগ্নি উদগিরণ করল।

গুলি ঠিক তার মাথায় গিয়ে আঘাত করল। লোকটি নিঃশব্দে ঢলে পড়ে গেল মাটিতে।

গুলি করেই আহমদ মুসা ঘরে ঢুকে স্টেনগানধারী তিনজনের দিকে এম-১০ এর বাঘা নল তাক করল।

গুলির শব্দ শুনে ওরা তিনজনও এদিকে ফিরে দাঁড়িয়েছিল।

আহমদ মুসা শান্ত কণ্ঠে ওদের বলল, দেখ রক্তপাত আমি পছন্দ করি না। তোমরা স্টেনগান ফেলে দাও, তোমাদের কিছু বলা হবে না।

বেপরোয়া লোক তিনটি যেন আহমদ মুসার কথা শুনতেই পায়নি। ভয়েরও কোন চিহ্ন তাদের চোখে নেই, বরং সেখানে হিংসার এক প্রচন্ড আগুন। দ্রুত ওদের স্টেনগান ওপরে উঠে এল। নল তিনটি আহমদ মুসার সমান্তরালে উঠে আসছে।

কিন্তু আহমদ মুসা সে সুযোগ তাদের দিল না। কয়েক সেকেন্ডের জন্যে সে চেপে ধরলো এম-১০ এর ট্রিগার। ছুটে গেল এক পশলা গুলি।

পাশাপাশি দাঁড়ানো গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া তিন জনের দেহ ঢলে পড়ল মেঝেতে।

এদিকে লিডার লোকটি গুলি খাওয়ার সংগে সংগেই তার ওপাশে অল্প কিছুদূরে দাঁড়ানো ৫ম লোকটি রিভলভার বের করেছিল। বিদ্যুৎ গতিতে তা উঠে আসছিল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে। আহমদ মুসার লক্ষ্য তখন সামনেই বাম পাশে দাঁড়ানো স্টেনগানধারী তিনজনের দিকে।

৫ম ঐ লোকটির দিকে নজর রাখছিল আলী আজিমভ। যখন সে দেখল লোকটি আহমদ মুসাকে টার্গেট করেছে, আলী আজিমভ তাকে আর সময় দিল না। পিস্তল তৈরি ছিল, শুধু ট্রিগারে চাপ দিতে হল। গুলি সরাসরি গিয়ে তার মাথায় আঘাত করল। দেহ তার ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে।

মারিয়া গিয়ে তার পিতাকে জড়িয়ে ধরেছিল। আতংকে সে পিতার বুকে মুখ লুকিয়েছিল। আর ডঃ পল জনসনের স্ত্রী ভয়ে-আতংকে যেন পাথর হয়ে গেছে। ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টি তার। নড়াচড়া, এমনকি কথা বলার শক্তিও যেন হারিয়ে ফেলেছে।

ডঃ পল জনসন অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল আহমদ মুসার দিকে। গলা শুনেই আহমদ মুসাকে চিনতে পেরেছিল। কৃতজ্ঞতায় অন্তর তার ভরে উঠেছিল। সে ভেবে পাচ্ছিল না কিভাবে এটা ঘটল।

আহমদ মুসা দুই রিভলভার দুই পকেটে রেখে মাথার হ্যাট খুলে বলল, আপনার সামনে, আপনার ঘরে রক্তারক্তির জন্যে আমি দুঃখিত জনাব। এড়ানোর উপায় ছিল না, ওদের না মেরে বাঁচা কঠিন।

--দুঃখ পরে করো। এখন বল, এ সময় তোমরা কেমন করে এসে পৌঁছলে? এখনও সবটা ব্যাপার আমার কাছে স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে।

--আমরা এসেছিলাম আলফ্রেডের কাছ থেকে তথ্য আদায়ের জন্যে, দরকার হলে তাকে কিডন্যাপ করতে। কিন্তু রাস্তায় দেখলাম, তাকেই হোয়াইট ওলফরা কিডন্যাপ করে নিয়ে যাচ্ছে। তাকে আমরা উদ্ধার করলাম। তার কাছ থেকেই জানলাম আপনার উপর এ বিপদ এসেছে। তারপর তাকে সঙ্গে নিয়েই আমরা এখানে এসেছি।

--আমার কি মনে হচ্ছে জান, ঈশ্বর যেন সাক্ষাৎ নেমে এসেছেন।

--আল্লাহ যাকে সাহায্য করেন এভাবেই করেন।

--কিন্তু দুঃখ, সবখানে সবাই এ সাহায্য পায় না।

--যেখানে পায় না, সেটাও আল্লাহর বিশ্ব-পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই ঘটে।

--তুমি কি বুঝাতে চাচ্ছ?

--আমি বলতে চাচ্ছি, আল্লাহ যেখানে সাহায্য করেন সেখানে যেমন তার একটা মঙ্গল ইচ্ছা থাকে, তেমনি যেখানে সাহায্য করেন না, সেখানেও তার মাধ্যমে তিনি মঙ্গলকরই কিছু করতে চান।

--কিন্তু সালমান শামিলকে ঐ নরপশুদের হাতে তুলে দেবার মধ্যে মঙ্গলকর কি আছে?

--হয়তো এর মাধ্যমে আল্লাহ হোয়াইট ওলফের ধ্বংসের ব্যবস্থা করেছেন।

--তুমি একজন বিপ্লবী, দার্শনিকের মত এমন ঠান্ডা চিন্তা তুমি করতে পারো কেমন করে?

--ইসলাম ধর্মে বিপ্লবী, দার্শনিক, ধর্মনেতা, রাষ্ট্রনেতা ইত্যাদির জন্যে আলাদা আলাদা কোন অবস্থান নেই। একজন মুসলমান একই সাথে বিপ্লবী, দার্শনিক, ধর্মনেতা, রাষ্ট্রনেতা-সবই হতে পারে। আমাদের নবী তা-ই ছিলেন। এটাই তাঁর শিক্ষা।

--সালমান শামিলের চরিত্র আমাকে দুর্বল করেছে, তুমি আমাকে আরও দুর্বল করে দিচ্ছ। আমার মনে এ বিশ্বাস যেন দৃঢ় হয়ে যাচ্ছে, ইসলামই একমাত্র পরিপূর্ণ ধর্ম এবং ইসলামই একমাত্র সময়ের সব দাবি পূরণ করতে পারে।

বলে ডঃ পল জনসন মেয়ে মারিয়া এবং স্ত্রী ইভার দিকে ফিরে বলল, তোমাদের পরিচয় করিয়ে দেইনি।

এরা সালমান শামিলের ভাই।

আহমদ মুসাকে দেখিয়ে তিনি বললেন, আর ইনি আহমদ মুসা, যার নাম তোমরা খবরের কাগজে পড়েছ। সেই বিপ্লবী পুরুষ ইনি।

মেয়ে মারিয়া এবং স্ত্রী ইভা অবাক বিস্ময়ের সাথে আহমদ মুসার কথা শুনছিল। তাদের চোখের পানি শুকিয়ে গিয়েছিল।

ডঃ পল জনসন থামলে তার স্ত্রী ইভা জনসন আহমদ মুসার কাছে এসে বলল, বাবা ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, তুমি আমাদের জীবন-মান বাঁচিয়েছ। বলে কেঁদে উঠলো ইভা জনসন। দু'হাতে মুখ ঢাকল সে।

--আল্লাহরই সব প্রশংসা আম্মা। শক্তি, সুযোগ তিনিই দিয়েছেন।

মারিয়া আহমদ মুসার দিকে চেয়ে বলল, আমি আপনার কথা পড়েছি।

--কোথায় পড়েছ? ঈষৎ হেসে জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

--'ফ্র' এবং 'ক্লু ক্ল্যাকস ক্ল্যান' দু'টো বই বের করেছে। দু'টোরই বিষয় 'ইসলামের ভয়ংকর পুনরুজ্জীবন প্রবণতা'। সেখানে আপনার কথা বিস্তারিত আছে। বই দু'টিকে ইতিহাসের রেফারেন্স তালিকায় শামিল করা হয়েছে।

--ইসলামের বিরুদ্ধে, আমার বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়াবার জন্যেই তো?

--কাউকে গালি দিতে হলে তাকে গালি দেয়ার মত বড় করে তুলতে হয় এবং তা করতে গিয়ে ঘৃণা ছড়াবার সাথে সাথে প্রশংসা ছড়াবার কাজও হয়ে যায়।

--বাঃ বোন! তোমার খুব বুদ্ধি! তোমার সাথে তো আরও কথা বলতে হবে।

কথাটা শেষ করেই আহমদ মুসা ডঃ পল জনসনের দিকে ফিরে বলল, জনাব, আপনি এখন কি করবেন মনে করছেন?

--আমি এখন আমার সহকর্মী সবাইকে ডাকব। তারপর পুলিশে খবর দেব। তাদের বলব, এরা আমাকে কিডন্যাপ করতে এসেছিল। এ সময় আরেকটা গ্রুপ এসে আমাদের বাঁচায় এবং তারপরেই তারা চলে যায়।

আহমদ মুসার মুখে স্বস্তির হাসি ফুটে উঠল। বলল, আপনার চিন্তা ঠিক জনাব। ঘটনার এই ব্যাখ্যাই আমার মনে হয় স্বাভাবিক।

একটু থেমে আবার বলল, আপনারা কি এখানেই থাকবেন?

--হ্যাঁ, কেন? বলল ডঃ পল জনসন।

--আমার মনে হয় এখানে থাকা আপনাদের উচিত হবে না। অন্তত আগামী কয়েকদিন।

ডঃ পল জনসন মাথা নিচু করেছিল। ভাবছিল সে। বলল, তুমি ভয় করছ, ওরা আবার আসবে?

--জ্বি।

--তোমার ধারণা ঠিক। ঠিক আছে, আমার এক নিকটাত্মীয় দু'দিন হলো ইয়েরেভেনে এসেছে। তাকে কেউ এখনো চেনে নি। আমরা সেখানেই ক'দিন গিয়ে থাকতে পারবো।

এই সময় আলফ্রেড এসে ঘরে প্রবেশ করল। ঘরে চোখ পড়তেই সে আঁতকে উঠল। ভয়ে তার মুখ পাংশু হয়ে উঠল। শুকনো গলায় ডঃ পল জনসনকে লক্ষ্য করে বলল, আপনারা সব ঠিক তো স্যার?

--ঠিক আছি। তোমাকে ধন্যবাদ আলফ্রেড। তুমি------

--না স্যার, প্রশংসা এদের। এরা আমাকে বাঁচিয়েছেন, আপনাদেরকেও।

আলফ্রেড ডঃ জনসনের কথায় বাঁধা দিয়েই কথা কয়টি দ্রুত বলল। তারপর একটু থেমে ঢোক গিলে নিয়ে বলল, হোয়াইট ওলফের পক্ষে গোয়েন্দাগিরী করে যে পাপ করেছি তার কি হবে! বলে কেঁদে ফেলল আলফ্রেড।

--কেঁদো না আলফ্রেড। তোমার পাপ মোচন তুমিই করেছ। বলল ডঃ পল জনসন।

চোখ মুছে আলফ্রেড ডঃ পল জনসনের দিকে তাকিয়ে বলল, বাইরে আশপাশ থেকে কয়েকজন স্যার এসেছেন।

--তাই? দেখছি।

বলে যাওয়ার উদ্যোগ নিল ডঃ জনসন।

আহমদ মুসা বলল, তাহলে আমরা আসি জনাব।

ডঃ পল জনসন একটু থমকে দাঁড়াল। তারপর বলল, যাবে তোমরা? হ্যাঁ যেতেই তো হবে।

বলে মেয়েকে বলল, মারিয়া তোমাদের ভাইদের পেছনের দরজা দিয়ে রাস্তায় তুলে দিয়ে এস।

তারপর আহমদ মুসার মুখোমুখি হয়ে তার একটি হাত ধরে বলল, দেখা সাক্ষাত কবে কোথায় কিভাবে হবে বৎস?

একটু চিন্তা করে আহমদ মুসা বলল, সোফিয়া এ্যাঞ্জেলার মাকে বললেই আমি জানতে পারব।

--ওখানে কিছু পেলে?

--না, সোফিয়া এং তার আব্বা দু'জনেই কয়েকদিন ধরে নিখোঁজ।

'কি বলছ, ওরাও নেই' বলেই ডঃ পল জনসন হঠাৎ নীরব এবং পাথরের মত স্থির হয়ে গেল।

'আসি জনাব' বলে বেরিয়ে আসতে আসতে আহমদ মুসা আলফ্রেডকে বলল, ওসমান এফেন্দীকে গাড়ির কাছে পাঠিয়ে দাও।

মারিয়া জনসন আগে আগে চলছিল। পেছনে আহমদ মুসা এবং আলী আজিমভ।

তিনজনই নীরব। এক সময় নীরবতা ভেঙ্গে মারিয়া বলল, আচ্ছা ভাইজান, একটা প্রশ্ন করব।

--কর। বলল আহমদ মুসা।

--এই যে আব্বা বললেন, ইসলামই একমাত্র পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এ দাবি তো সব ধর্মই করবে। তাহলে এ ঝগড়ার সমাধান কি? সেটা কি লড়াই?

--না, জ্ঞানার্জন। সৃষ্টি-প্রকৃতি ও বিশ্বব্যবস্থা সম্পকে জ্ঞানার্জন করতে হবে এবং সেই সাথে নিরপেক্ষভাবে সত্যের সন্ধান করতে হবে। তাহলে বুঝা যাবে, শেষ নবীর মাধ্যমে প্রেরিত ধর্ম ইসলামই মানবতার সর্বশেষ এবং পরিপূর্ণ জীবন-বিধান।

এক জায়গায় মারিয়া থমকে দাঁড়াল। বলল, এসে গেছি ভাইজান। এই তো রাস্তা।

আহমদ মুসা রাস্তায় উঠে বলল, তাহলে আসি বোন।

--আবার কবে দেখা হবে?

--জানি না, তবে হবে নিশ্চয়ই।

মারিয়া আহমদ মুসার দিকে দু'পা এগিয়ে এসে বলল, আমি সব কিছুই হারাতে বসেছিলাম। ভাইয়া আমাকে রক্ষা করেছেন। কিছুই করতে পারলাম না ভাইয়ার জন্যে।

--ভাইয়ার জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া কর বোন।

--ইসলামে কিভাবে দোয়া করে তা তো আমি জানি না।

--বেশ শিখবে। তবে এটুকু জান, ইসলামে বান্দাহ ও আল্লাহর মধ্যবর্তী কেউ নেই। তুমি যা চাইবে আল্লাহকেই সরাসরি বলবে।

--বেশ তাই করবো। আল্লাহকে বলবো, ভাইয়াকে যেন তাড়াতাড়ি আমাদের মাঝে ফিরিয়ে আনেন।

'বেশ, তাই করো' বলে আহমদ মুসা রাস্তায় পা বাড়াল। তার পেছনে আলী আজিমভ।

অনেকটা এগিয়ে আহমদ মুসা পেছনে তাকাল। দেখল, মারিয়া তখনও সেখানে একটা অন্ধকার ছায়ার মত স্থির দাঁড়িয়ে।

আহমদ মুসা ধীর কণ্ঠে বলল, দুনিয়াতে এত মায়া, এত মমতা থাকতে এত হানাহানি, রক্তপাত কেন আজিমভ!

'যে রহমান নামের প্রকাশ এই মায়া, এই মমতা, তার রাজত্ব দুনিয়াতে এখনও কায়েম হয়নি বলেই হয়তো'- ধীর স্বগতঃ কণ্ঠে বলল আলী আজিমভ।

# ৫

সোফিয়ার মা এবং আলফ্রেডের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য একত্রিত করে আহমদ মুসা সিদ্ধান্ত পৌঁছল, হোয়াইট ওলফের হেডকোয়ার্টার আরাগাত পর্বতের আমবার্ড দুর্গেই হবে।

তারপর পুরাতত্ত্ব বিষয়ক লাইব্রেরী ঘেঁটে আহমদ মুসা আমবার্ড দুর্গের ইতিহাসও পেল। আমবার্ড দুর্গ আরাগাত পর্বতের ক্রমশ সুন্দর ও সুপ্রশস্ত ধাপে অবস্থিত, যার চারদিক বেষ্টন করে ঝর্ণা-সৃষ্ট একটি পাহাড়ী নদী ধাপটির দক্ষিণ পাশের একটা অংশ দিয়ে জলপ্রপাতের আকারে গভীর উপত্যকায় নেমে যাচ্ছে।

আমবার্ড দুর্গের মুখে একটি কাঠের ব্রীজ। এই কাঠের ব্রীজ দিয়ে নদী পার হয়ে দুর্গে প্রবেশ করা যায়।

দুর্গে সাধারণের যথেচ্ছ প্রবেশাধিকার নেই। দুর্গাভ্যন্তরে পবিত্র সানাইন গীর্জা আর্মেনিয়ার ধর্মনেতাদের সাপ্তাহিক প্রার্থনা মন্দির হিসেবে ব্যবহৃত। আর্মেনিয়ার ক্যাথলিক গীর্জা-সমিতির হেডকোয়ার্টারও এই আমবার্ড দুর্গে।

এইভাবে সবদিক থেকেই আমবার্ড দুর্গ হোয়াইট ওলফের হেডকোয়ার্টার হবার সবচেয়ে অনুকূল স্থান। আর্মেনিয়ার খৃস্টান ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহান সেন্ট গ্রেগরীর প্রতিষ্ঠিত প্রথম গীর্জা ছিল এই আমবার্ড দুর্গে। সেই প্রথম গীর্জার স্থানেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সানাইন গীর্জা। সানাইন গীর্জার ফাদার সেন্ট পল সেন্ট গ্রেগরীর উত্তর পুরুষ।

সবদিক থেকে নিশ্চিত হবার পর আহমদ মুসা আমবার্ড দুর্গে অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

সেদিন সন্ধা ৬টা। সন্ধ্যার কাল অন্ধকারে চারদিক তখন ঢাকা পড়েছে। আহমদ মুসার জীপ এসে আমবার্ড দুর্গ থেকে পুরানো রাস্তাটা যেখানে এসে হাইওয়েতে মিশেছে সেখানে থামল।

গাড়ি থেকে প্রথমে নেমে এল আহমদ মুসা। তারপর আলী আজিমভ। সবশেষে ড্রাইভিং সিট থেকে ওসমান এফেন্দী।

তিন জনেরই দেহ কাল পোশাকে ঢাকা। কাল ট্রাউজার, কাল দীর্ঘ ওভারকোট এবং আর্মেনিয়ার ধর্মনেতারা যে ধরনের লম্বা কাল টুপি পরেন মাথায় সে ধরনের টুপি।

গাড়ি থেকে নামার পর গাড়িটা তারা রাস্তার পাশে একটা টিলার আড়ালে রেখে দিল।

তারপর তিন ছায়ামূর্তি আরাগাত পর্বতগামী পুরানো রাস্তাটা ধরে দ্রুত হাঁটতে শুরু করল। তিনজনের হাত ওভারকোটের পকেটে রিভলভারের বাঁটে।

আরাগাত রোড ধরে মাইল সাতেক এগুবার পর আহমদ মুসা থমকে দাঁড়াল, সেইসাথে সাথী দু'জনও। সমতল রাস্তার সমতল যাত্রা প্রায় শেষ। আর সিকি মাইল পর্যন্ত পথটা কোন রকমে গেছে, তারপরেই পর্বতারোহণ শুরু। আজ দিনের বেলা ওসমান এফেন্দী এ এলাকাটা ঘুরে গেছে, ট্যাক্সি ড্রাইভারের ছদ্মবেশে। খৃস্টান ফাদার, ধর্মনেতারা প্রায়ই আমবার্ড দুর্গে আসা-যাওয়া করেন। বিশেষ করে রোববার এবং সোমবার দিনের প্রথম ভাগে তাদের আসা-যাওয়া। সুতরাং এ সময় ট্যাক্সিওয়ালারা বেশ কাজ পায়। ওসমান এফেন্দী এমনি একজন ফাদারকে আজ দুপুরেই আরাগাত পর্বত থেকে ফিরতি দেবার সুযোগ পেয়েছিল। সেই সুবাদে ওসমান এফেন্দী এসেছিল আরাগাত রোডের দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত।

আরাগাত রোড যেখানে শেষ হয়েছে, সেখান থেকে একটা পথের চিহ্ন ধাপে ধাপে পাহাড়ের উপরে উঠে গেছে, সেখানে রাস্তার পূর্ব পারে একটা বড় টিলা। টিলার দক্ষিণপারে আরাগাত পাহাড়ের গায়ে একটা বড় গুহা। রাস্তা থেকে কিংবা দূর থেকে গুহাটা দেখা যায় না। টিলাটা যেন গুহা মুখের দরজা-সবার চোখ থেকে গুহাটাকে আড়াল করে রেখেছে। গুহার মুখে একটা ক্রস। দিনের বেলা গুহাতে দু'একজন খৃস্টান সাধুকে সব সময়ই দেখা যায়। মাঝে মাঝে গুহামুখ থেকে ধোঁয়াও ওঠে। সাধুরা ওখানে রান্না-বান্নাও করে। মানুষ মনে করে ওটা সাধুদের পবিত্র আস্তানা-দুনিয়াত্যাগী সাধুদের সাধনার একটা স্থান। মানুষ যারা এদিকে আসে, তারা সাধুদের কিছু নজর-নিয়াজ দিয়ে পুণ্য কামাবার চেষ্টা করে।

ওসমান এফেন্দীও সেই উসিলায় গুহামুখে গিয়েছিল। যখন দেখতে এসেছে, সবটাই দেখা দরকার।

গুহামুখ থেকে ভেতরে তখন একজন সাধু বসে ছিল। লম্বা দাড়ি, লম্বা চুল। গলায় বিরাট ক্রস ঝুলানো। যোগাসনে বসা, চোখ বন্ধ। ওসমান এফেন্দীর মনে হয়েছিল, তার উপর চোখ পড়ার পরেই যেন সাধু বাবাজী চোখ বন্ধ করলেন।

রীতি মোতাবেক সাধু বাবাজীর কাছে হাঁটু গেড়ে বসে সামান্য কিছু টাকা বিনীতভাবে তার সামনে রেখেছিল।

সাধু বাবাজীর শরীর দেখে ওসমান এফেন্দী বিস্মিত হয়েছিল। তার চোখে, মুখে-চেহারায় কৃচ্ছতার কোন ছাপ নেই। বরং মুষ্টিযোদ্ধার মত পেটা শরীর থেকে যেন শক্তির প্রাচুর্য ঠিকরে পড়ছে। উপঢৌকন দিয়ে উঠে দাঁড়াবার সময় ওসমান এফেন্দী সাধু বাবাজীর দিকে চেয়ে ভাবছিল, এ কেমন সাধুরে বাবা!

উঠে দাঁড়াবার পর নিচের দিকে চাইতেই সাধু বাবাজীর ডান উরুর পাশে পড়ে থাকা একটা জিনিসের দিকে নজর পড়তেই ওসমান এফেন্দী ভীষণ চমকে উঠল। সাধু বাবাজী দূরবীন দিয়ে কি করেন? ভালো করে তাকিয়ে দেখল, দূরবীনটা সাধারণ নয়। জার্মানীর সর্বাধুনিক মডেলের এ দূরবীনটির ইনফ্রা রেড আই রাত্রেও দেখতে পায়।

আহমদ মুসা আরাগাত রোডের উপর থমকে দাঁড়িয়ে ওসমান এফেন্দীর দেয়া এসব তথ্যের উপর আরেকবার চোখ বুলাচ্ছিল। আহমদ মুসা পরিষ্কার বুঝেছিল, আরাগাত পর্বতের ঐ গুহাটা আসলে হোয়াইট ওলফের অগ্রবর্তী ঘাঁটি। আর ঐ সাধুরা হোয়াইট ওলফের অগ্রবর্তী প্রহরী। আহমদ মুসা খুশিই হয়েছে, আমবার্ড দুর্গেই হোয়াইট ওলফের হেডকোয়ার্টার, এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই।

আহমদ মুসা আলী আজিমভ ও ওসমান এফেন্দীকে লক্ষ্য করে ফিসফিসিয়ে বলল, রাস্তা ধরে আর সামনে এগুনো যাবে না, ওদের দূরবীনের ইনফ্রা রেড লেন্সে ধরা পড়ে যাব।

একটু থেমে আহমদ মুসা বলল, আরাগাতের সেই গুহাটা রাস্তার বাম পাশে না?

জ্বি, হ্যাঁ। বলল ওসমান এফেন্দী।

রাস্তা থেকে বাম পাশে উঠে গেল আহমদ মুসা। আলী আজিমভ এবং ওসমান এফেন্দী তাকে অনুসরণ করল।

বাম পাশের মাটি ছোট-বড় পাথরে ঢাকা, উঁচু-নিচু, এবড়ো-থেবড়ো।

রাস্তা থেকে অনেকখানি পূর্বদিকে এগিয়ে তারা দক্ষিণ দিকে আরাগাত পর্বত অভিমুখে যাত্রা শুরু করল। হামাগুড়ি দিয়ে সামনে এগুচ্ছে। তাদের লক্ষ্য আরাগাতের সেই গুহা।

কিছুক্ষণ চলার পর আহমদ মুসা চোখে দূরবীন লাগিয়ে সামনেটা পর্যবেক্ষণ করল। ইনফ্রা রেড দূরবীন সামনের অন্ধকার স্বচ্ছ করে দিয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে কিছু দূরে সেই বড় টিলাটা দেখতে পেল। ওই টিলার দক্ষিণ পাশেই গুহা।

আরও কিছুক্ষণ চলল। গুহায় তারা সামনের দিক থেকে নয়, পূর্ব পাশ থেকে পৌঁছতে চায়। যাতে করে ওদের সন্ধানী চোখ ফাঁকি দেয়া যায়। আহমদ মুসারা এদের চোখ এড়িয়েও পাহাড়ে উঠতে পারতো, আমবার্ড দুর্গে যেতে পারতো। কিন্তু শত্রুকে পেছনে অক্ষত রেখে সামনে এগুনো আহমদ মুসা ঠিক মনে করেনি।

আরও কিছুটা এগিয়ে আহমদ মুসা চোখে আবার দূরবীন লাগাল। দেখল, টিলাটা এবার সোজা ডানপাশে এসে গেছে। অর্থাৎ তারা এখন গুহার সমান্তরালে পূর্ব দিকে অবস্থান করছে। এখন তারা গুহা লক্ষ্যে পশ্চিম দিকে এগুতে পারে।

এবার প্রায় ক্রলিং করে তারা সামনে এগুতে লাগল। নিঃশব্দে সাপের মত এগুচ্ছে। তিনজন পাশাপাশি।

গুহার কাছাকাছি পৌঁছে চোখে আবার দূরবীন লাগায় আহমদ মুসা। গুহামুখটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কেউ সেখানে নেই। গুহার ভেরতটা দেখতে হলে আরও অনেকখানি এগিয়ে গুহার লম্বা-লম্বি পৌঁছতে হবে।

আহমদ মুসা দূরবীনের চোখটা উত্তর দিকে টিলার দিকে সরিয়ে নিল। টিলার মাথায় দূরবীনের চোখটা স্থির হতে চমকে উঠল আহমদ মুসা। কাল

ওভারকোটে সর্বাঙ্গ ঢাকা একজন লোক বসে। তার দৃষ্টি উত্তরে রাস্তার দিকে। তার কাঁধে ঝুলছে খাট-মোটা ব্যারেলের রাইফেল। ওর নিউট্রন বুলেট আশে-পাশে কোথাও এসে পড়লেও রক্ষা নেই। সংগে সংগেই মৃত্যু, নিঃশ্বাস ফেলার মত সময়ও দেয় না।

এসময় রাস্তার দিক থেকে একটা কুকুরের ঘেউ ঘেউ আওয়াজ শুনা গেল। ঘেউ ঘেউ আওয়াজটা ছুটে আসছে এদিকে।

আহমদ মুসা প্রমাদ গুনল। লুকিয়ে এসে মানুষের চোখ এড়ানো যায়, গন্ধবিশারদ কুকুরকে তো ফাঁকি দেওয়া যায় না।

টিলায় বসা লোকটা কুকুরকে এদিকে ছুটে আসতে দেখে এদিকে ফিরে বসেছে।

আহমদ মুসা বাম হাতে দূরবীন আর ডান হাতে হাসান তারিকের দেয়া লেসার পিস্তল তুলে নিয়েছে।

কুকুরটি একদম কাছে চলে এসেছে। প্রচন্ড রকম ঘেউ ঘেউ করছে। চোখ দু'টো জ্বলছে ভাটার মত। যেন লাফিয়ে পড়বে।

আজিমভ পিস্তল তাক করেছিল তার দিকে।

আহমদ মুসা হাত নাড়ল গুলি না করার জন্যে।

কুকুরটা যতক্ষণ এখানে আছে, ততক্ষণ নিউট্রন বুলেট এদিকে আসবে না।

এসময় গুহামুখে একজন লোক দেখা গেল। একটা শীষ দিল সে। সংগে সংগে শিক্ষিত কুকুর পেছন দিকে ছুটতে লাগল। গুহা মুখের লোকটির মুখে মুখোশ, হাতে রিভলভার।

কুকুরটি যখন ছুটে সরে যাচ্ছে, সে সময় টিলার সেই লোকটি, আহমদ মুসা দেখল, নিউট্রন রাইফেলটি হাতে তুলে নিচ্ছে।

আহমদ মুসা বুঝল, সেই ভয়ংকর সময়টি দ্রুত ঘনিয়ে আসছে। আর তাকে সময় দেয়া ঠিক হবে না।

আহমদ মুসা বাম হাতে দূরবীনটি চোখে ধরে ডান হাতে লেসার পিস্তলটি তাক করল টিলার সেই লোকটির দিকে।

সাদা পিস্তলের লাল ট্রিগার বোতামটি আস্তে টিপে দিল আহমদ মুসা। সংগে সংগে চোখ ধাঁধানো আলোর এক সরল রেখা বেরিয়ে গেল পিস্তল থেকে।

পরমুহূর্তেই টিলার লোকটি গড়িয়ে পড়ে গেল টিলার মাথা থেকে।

গুহামুখের লোকটি হতচকিত হয়ে ছুটে গেল টিলা থেকে পড়া লোকটির কাছে।

পরমুহূর্তেই তাকে নিউট্রন রাইফেল হাতে উঠে দাঁড়াতে দেখা গেল। তার চোখে শংকা নয়, আগুন। নিউট্রন রাইফেলটি সে তাক করল কুকুরটি ছুটে এসে যেখানে থমকে দাঁড়িয়েছিল সেদিকে।

আহমদ মুসা লেসার পিস্তলটি তাক করেই ছিল, সেই লাল বোতামে চাপ দিল আহমদ মুসা। বোতাম থেকে আঙুল সরে যাবার আগেই লোকটি পাকা ফলের মত মাটিতে ঝরে পড়ল।

আহমদ মুসারা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। কেউ আর বেরিয়ে এল না। নিশ্চয় আর কেউ নেই।

তারপর আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল এবং গুহার দিকে এগিয়ে চলল।

গুহায় ঢোকার আগে প্রাণহীন পড়ে থাকা লোক দু'টির ওভারকোটের কলার ব্যান্ড উল্টিয়ে পরীক্ষা করল। দেখল, সাদা নেকড়ের হিংস্র মুখ জ্বলজ্বল করছে। আহমদ মুসার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তারা ঠিক জায়গাতেই এসেছে।

লোক দু'জনের পকেট সার্চ করে কিছু টাকা ছাড়া কিছুই পাওয়া গেল না। একজনের পকেটে একটা ছোট্ট চিরকুট পাওয়া গেল, তাতে একটা টেলিফোন নাম্বার লেখা। আহমদ মুসা চিরকুটটি পকেটে ফেলে গুহায় প্রবেশ করল।

গুহাতেও কিছু পাওয়া গেল না। আহমদ মুসার মনে পড়ল হোয়াইট ওলফের এ পর্যন্ত যতলোক মারা গেছে, তাদের কারো পকেটে তেমন কিছু পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ তারা সর্বাবস্থায় সাবধান থাকে।

দু'জনের কাছে দু'টি ওয়াকি টকি ছিল। সে দু'টি ওয়াকি টকি এবং পিস্তল ও নিউট্রন রাইফেল নিয়ে উপরে উঠার জন্যে তৈরি হল আহমদ মুসারা। দু'টো স্টেনগানও ছিল। সে দু'টি একটা পাথরের নিচে লুকিয়ে রাখল।

তারপর আহমদ মুসা, আলী আজিমভ এবং ওসমান এফেন্দী আরাগাত পর্বতের গা বেয়ে উঠা শুরু করল। পর্বতের গা কেটে আমবার্ড দুর্গ পর্যন্ত ধাপে ধাপে রাস্তা তৈরি হয়েছিল এক সময়। কিন্তু রাস্তাটি আজ আর তেমন নেই। চিহ্ন আছে মাত্র। তবু সেই আঁকা-বাঁকা পথ ধরে পুরানো ধাপে ধাপে পা রেখে উঠা বেশ আরামদায়ক।

আহমদ মুসারা অতি সন্তর্পণে অনেকটা হামাগুড়ি দিয়ে সেই পথ ধরে উঠতে লাগল। সামনে আহমদ মুসা, তার পেছনে আলী আজিমভ এবং সবশেষে ওসমান এফেন্দী।

আঁকা-বাঁকা রাস্তাটি পর্বতের গা বেয়ে দেড় হাজার ফিট চলার পর দু'টি শৃংগের মাঝখানে একটি সংকীর্ণ লেনে গিয়ে শেষ হয়েছে।

লেনটির কাছাকাছি তখন পৌঁছেছে আহমদ মুসারা। এই সময় আহমদ মুসার কাঁধে ঝুলানো ওয়াকি টকি কথা বলে উঠল। চমকে উঠল আহমদ মুসা। থমকে দাঁড়াল এবং কানের কাছে তুলে নিল ওয়াকি টকিটা।

'জন, জন........' কেউ যেন ওয়াকি টকিতে ডেকে চলেছে জন নামের একজন লোককে।

আহমদ মুসা বুঝল, টিলার উপর পাহারায় সেই লোকটিই ছিল এই জন। কান খাড়া করল, আরও সতর্ক হলো। নিশ্চয় আমবার্ড দুর্গের কল এটা।

'জন জন' বলে কিছু ডাক দেয়ার পর জনের সাড়া না পেয়ে কাউকে লক্ষ্য করে লোকটি বলল, শালা জন নিশ্চয় ঘুমিয়েছে, কি সর্বনাশ! তোমরা ক'জন যাও দেখ।

'টক' করে কানেকশান বন্ধ হয়ে গেল ওপার থেকে।

আহমদ মুসা পেছন দিকে মাথা ঘুরিয়ে বলল, তোমরা তাড়াতাড়ি কর, এখনি এপথে ওদের ক'জন আসবে।

লেনের মুখটি এখনও প্রায় ৫০ গজ উপরে। তাড়াহুড়া করে উঠার উপায় নেই। একেতো অন্ধকার, তার উপর সিঁড়িগুলো ভাঙা। তাড়াহুড়া করতে গেলে বিপদ ঘটতে পারে।

পাহাড়ের গা বেয়ে রাস্তাটি ধাপে ধাপে উঠে যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে, সেখানে দু'শৃংগের মাঝখানে অনেকখানি প্রশস্ত জায়গা। সে জায়গাটায় রয়েছে ছোট-বড় বেশ কিছু টিলা। এই প্রশস্ত জায়গাটি কয়েকগজ দক্ষিণে এগিয়ে সংকীর্ণ হয়ে লেন আকারে দুই শৃংগের মাঝখান দিয়ে দক্ষিণে এগিয়েছে। আহমদ মুসা ইনফ্রা রেড় দূরবীন দিয়ে উপরে যতদূর দেখা যায় দেখেই বুঝেছিল, ওখানে পৌঁছতে পারলে শত্রুর নজর এড়াবার মত আড়াল পাওয়া যাবে।

কিন্তু আহমদ মুসা শেষ ধাপটা পেরিয়ে দুই শৃংগের মাঝখানের সেই প্রশস্ত জায়গাটার প্রান্তে ডান পা রেখে উঠে দাঁড়াতেই তার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল সামনে তাকিয়ে। লেন থেকে বেরিয়ে এল তিনটি ছায়ামূর্তি। ওরাও থমকে দাঁড়িয়েছে আহমদ মুসাকে দেখে।

আহমদ মুসা দেখল, ওদের হাতে অস্ত্র উঠে আসেনি। বুঝল, ওরাও সম্ভবত পরিস্থিতির অভাবনীয় দৃশ্যে হতচকিত হয়েছে।

কিন্তু আহমদ মুসার হাতে অস্ত্র উঠে আসার সাথে সাথে ওদের হাতেও অস্ত্র উঠে এসেছে।

আহমদ মুসা এম-১০ হাতে নিয়েই বামপাশে ছুড়ে দিল নিজের দেহটাকে। স্টেনগানের একঝাঁক গুলি উড়ে গেল মাথার উপর দিয়ে। গুলি করার জন্যে আহমদ মুসা মুহূর্তকাল দেরি করলে গুলি করতে পারলেও সে ওদের গুলির মুখে পড়ত। আহমদ মুসা মনে মনে আবার ওদের প্রশংসা করল। অদ্ভুত ক্ষিপ্র ওরা, সময় এক মুহূর্তও নষ্ট করে না।

আহমদ মুসা দেহটাকে ছুঁড়ে দিয়েই ভূমি স্পর্শ করেই চেপে ধরল এম-১০-এর ট্রিগার।

ওরা বুঝে উঠে স্টেনগানের ব্যারেল নিচে নামানোর আগেই এম-১০ থেকে ছুটে যাওয়া গুলির ঝাঁক গিয়ে ওদের ওপর আপতিত হলো। ওরা পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল তিনজন। তিনজন এক সাথে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মাটিতে।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

আলী আজিমভ এবং ওসমান এফেন্দীও তখন উঠে এসেছে। ওরা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, মুসা ভাই আপনি ভাল আছেন তো?

'আলহামদুলিল্লাহ, তোমরা এস, দেখি ওদের' বলে আহমদ মুসা দ্রুত চলল ঐ তিনটি লাশের দিকে। তার পিছনে আলী আজিমভ এবং ওসমান এফেন্দীও।

তিনটি লাশেরই কলার-ব্যান্ডে সাদা নেকড়ের মুখ আঁকা পাওয়া গেল অর্থাৎ তারা হোয়াইট ওলফের লোক।

ওদের পরনে কাল ট্রাউজার, কাল ওভারকোট এবং মাথায় বিশেষ ধরনের কাল পশমী টুপি।

আহমদ মুসা বলল, এদের কাল টুপি পরে নিলেই তো এদের পোশাকের সাথে আমাদের আর কোন পার্থক্য থাকে না।

ওদের তিনটি টুপি আহমদ মুসারা তিনজনে পরে নিল।

পকেটে ওদের কিছুই পাওয়া গেল না।

লাশ তিনটি লেনের একপাশে একটু আড়ালে সরিয়ে রেখে ওরা লেন ধরে সামনে এগুলো।

লেনের দু'ধারে পাহাড়ের খাড়া দেয়াল হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেল।

থমকে দাঁড়াল আহমদ মুসা। কি যেন শব্দ কানে আসছে। কান পাতল আহমদ মুসা। হ্যাঁ, ঝর্ণার জমাটবদ্ধ শব্দ। বেশ কিছু ঝর্ণা উপর থেকে নিচে নেমে আসার সময় মিশ্র যে শব্দ তোলে ঠিক তেমনটা।

আহমদ মুসা ধীরে ধীরে লেনের মুখে গিয়ে বাইরে উঁকি দিল। তার চোখে ইনফ্রা রেড দূরবীন। দেখল সে, লেনটা কয়েকগজ নিচে গিয়ে উপত্যকায় মিশেছে। সামনে নজর পড়তেই ইতঃস্তত অনেক আলো দেখতে পেল। আমবার্ড দুর্গের বিখ্যাত উপত্যকা তাহলে এটাই, মনে মনে বলল আহমদ মুসা। তিনদিকে পাহাড় ঘেরা উপত্যকাটিকে বিশালই বলা যায়।

আহমদ মুসার চোখ সরে এল একেবারে কাছে সামনে।

সামনে যেখানে লেনটা গিয়ে উপত্যকায় মিশেছে সেখানে একটা পাথরের ঘর। ঘরের পাশ দিয়ে লম্বা কাল ফিতার মত ওটা কি? নদী না? হ্যাঁ, নদী। তাহলে আমবার্ড দুর্গের চারদিকে ঘিরে থাকা পাহাড়ী উচ্ছলা সে নদী এটাই।

আহমদ মুসার গোটা দেহে আনন্দের একটা শিহরণ খেলে গেল। নদী পেরুলেই আলো খচিত ঐ আমবার্ড দুর্গে তারা পৌঁছতে পারবে। কিন্তু নদীর এপারে এ ঘরটা কি?

হঠাৎ আহমদ মুসার মনে একটা চিন্তা ঝিলিক দিয়ে উঠল, আমবার্ড দুর্গে প্রবেশের পথে এটাই প্রথম চেকপোস্ট কি? এটাই কি আমবার্ড দুর্গে প্রবেশের পথ? ব্রীজটা কি এখানেই?

আহমদ মুসা পকেট থেকে আমবার্ড দুর্গের স্কেচটা বের করল। নজর বুলাল ভাল করে। আমবার্ড দুর্গের উত্তর পাশ দিয়ে প্রবাহিত নদীর উপর যেখানে ব্রীজের চিহ্ন আঁকা সেখান থেকে একটা ডট লাইন উত্তরে এগিয়ে গেছে, মিশেছে গিয়ে হাইওয়েতে। আহমদ মুসা খুশি হল, তারা ডট লাইনটির শেষপ্রান্তে ব্রীজের মুখে এখন দাঁড়িয়ে। সম্ভবত নদীর এপারের ঐ পাথুরে ঘরটিই ব্রীজের গেটরুম। এ ঘরের মধ্যে দিয়ে ব্রীজে উঠা যাবে। আহমদ মুসা হাসল, নদীর এপারে ঐ ঘরটিই তাহলে হোয়াইট ওলফের প্রতিরোধ ঘাঁটি। পাহারা কি ঘরটি ঘিরেই? বাইরেও কি ওঁৎ পেতে থাকা আরও পাহারা আছে?

আহমদ মুসা আলী আজিমভ ও ওসমান এফেন্দীর সাথে করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ করল। তারপর বিসমিল্লাহ বলে প্রথমে সামনে পা বাড়াল আহমদ মুসা।

হামাগুড়ি দিয়ে এগুচ্ছিল ওরা।

দু'পাশে ছোট-বড় অনেক পাথর। ছোট ছোট টিলাও বেশ আছে। এর মধ্যে দিয়েই পথের রেখা এগিয়ে সামনে গেছে। ঠিক পথ বলা যায় না। দু'পাশের তুলনায় কিছুটা সমতল ভূমি মাত্র।

গেটরুম থেকে তখনও তারা গজ পঞ্চাশেক দূরে। গেটরুমের দরজা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। দরজা বন্ধ। ঠিক দরজার উপরে একটি বাল্ব। আলো জ্বলছে। আলোটা দরজার সামনের অনেকখানি জায়গা আলোকিত করছে। কিন্তু সেই আলো চারদিকের অন্ধকার যেন আরও গাঢ় করে তুলেছে।

আহমদ মুসা যখন গেটরুমটি পর্যবেক্ষণ করছিল, সেই সময় ঘরের দু'পাশের অন্ধকার থেকে দু'জন লোক বেরিয়ে এসে দরজার সামনে দাঁড়াল। সংগে সংগেই দরজাটা খুলে গেল।

ঘরের ভেতরেও আলো। কিন্তু কোন লোক দেখা গেল না। লোক দু'জন ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল। সাথে সাথেই দরজা বন্ধ হয়ে গেল। দরজা খুলে যাওয়া ও বন্ধ হওয়া দেখে আহমদ মুসা পরিষ্কার বুঝল, দরজা খোলা ও বন্ধ করার স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা আছে। কিন্তু লোক এসেছে, দরজা এখন খুলতে হবে এটা ভেতর থেকে বুঝল কি করে? লোক দু'টি তো কোন সংকেত দেয়নি, দরজাও তারা স্পর্শ করেনি।

হঠাৎ আহমদ মুসার মনে পড়ল, লোক দু'টি আলোতে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়াবার পর দরজা খুলে গেছে। তাহলে কি দরজায় টেলিভিশন ক্যামেরা সেট করা আছে?

কথাটা মনে হবার সাথে সাথেই মন তার বলে উঠল, হোয়াইট ওলফের হোডকোয়ার্টারের জন্যে এ ধরনের ব্যবস্থাই স্বাভাবিক।

আহমদ মুসা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। আর একটু হলেই তারা আলোর নিচে গিয়ে পড়ত এবং তাদের আগমনের কথা শত্রুর জানা হয়ে যেত।

আহমদ মুসা পাশে আলী আজিমভকে তার সন্দেহের কথা জানাল এবং বলল যে, দরজা দিয়ে নয়, বিকল্প পথে আমাদের ব্রীজে পৌঁছতে হবে।

আলী আজিমভ তার কথায় সায় দিয়ে বলল, লোক দু'জন চলে গেল কেন?

আহমদ মুসা একটু চিন্তা করে বলল, প্রহরীদের ওটা ডিউটি পরিবর্তন হতে পারে। যদি তাই হয়, তাহলে নতুন দু'জনকে আমরা শীঘ্রই আসতে দেখব।

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা রাস্তা থেকে ডান দিকে নেমে পড়ল। পাথর ডিঙিয়ে টিলা পাশ কাটিয়ে গেটরুমের দিকে এগিয়ে চলল তারা।

আহমদ মুসারা গেটরুমের উত্তর দেয়ালের গোড়ায় গিয়ে পৌঁছল। পশ্চিমে অল্প নিচে দিয়ে পাহাড়ি নদী বয়ে যাচ্ছে। ফ্লাশ ওয়েভের মত প্রচন্ড বেগে বয়ে চলেছে নদী। নদীর ওপারের তীর বরাবর দুর্গের উঁচু দেয়াল। ২৫ফুট উঁচু পাথরের দেয়ালের উপর দিয়ে আবার কাঁটাতারের বেষ্টনি। দেখেই আহমদ মুসা বুঝল, কাঁটাতারের ঐ বেষ্টনি বিদ্যুতায়িত।

গেটরুমের দেয়াল ১০ফিটের মত উচু। এ দেয়ালের সাথে ব্রীজের ইস্পাতের দেয়াল একসাথে মিশে গেছে। ব্রীজটা চারদিক থেকে ঘেরা সুড়ঙ্গের মত। ব্রীজের উপরেও ইস্পাতের ছাদ দেখল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা মনে মনে প্রশংসাই করল, হোয়াইট ওলফ তাদের ঘাঁটিকে সত্যই দুর্ভেদ্য করে তুলেছে।

দুর্ভেদ্য বটে, কিন্তু কোন দুর্গই অজেয় নয়-মনকে বুঝ দিল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা পকেট থেকে সিল্কের কর্ড বের করে ছুঁড়ে দিল গেটরুমের ছাদে। তারপর টেনে দেখল, হুকটি ঠিকমতই আটকে গেছে ছাদের দেয়ালে।

আহমদ মুসা কর্ড বেয়ে প্রথমে ছাদে উঠল। পরে আলী আজিমভ ও ওসমান এফেন্দী উঠে এল।

আহমদ মুসা বলল, চল আমরা ব্রীজের ওপারে গিয়ে ছাদ কেটে ব্রীজে নামব।

ব্রীজের ছাদ দিয়ে ওরা চলে এল ব্রীজের পশ্চিম মাথায়।

ব্রীজের ছাদের পশ্চিম প্রান্ত দুর্গের দেয়ালের ভেতরে ঢুকে গেছে। ব্রীজের ইস্পাতের ছাদ এবং দুর্গের দেয়াল ভাল করে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে আহমদ মুসার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দেখল, ব্রীজের ছাদের ঠিক উপরে দুর্গের দেয়ালের দুই বর্গফুট পরিমাণ একটা অংশ ইস্পাতের পুরু পাত দিয়ে ঢাকা। আহমদ মুসা ভাবল, দুর্গ থেকে বেরুবার এটা একটা চোরা দরজা হতে পারে।

ইস্পাতের পাতটি টানাটানি করে, টোকা দিয়ে আহমদ মুসা বুঝল ভেতর থেকে হুক দিযে আটকানো।

ভালোভাবে পরীক্ষা করার পর আহমদ মুসা পকেট থেকে 'লেসার কাটার' বের করে লেসার রশ্মি দিয়ে ইস্পাতের গরাদটির ডানপাশের খাড়া-খাড়ি প্রান্তটি কেটে ফেলল। তারপর গরাদটির উপরের প্রান্ত ধরে টান দিতেই গরাদটি খুলে গেল।

গরাদ খুলে যেতেই এক গরম বাতাস বেরিয়ে এল। ওপারে ঘুটঘুটে অন্ধকার। বদ্ধ বাতাস বেরিয়ে যাবার অল্প কিছুক্ষণ সুযোগ দিয়ে আহমদ মুসা ভেতরে ঢুকে গেল। তারপর আলী আজিমভ এবং ওসমান এফেন্দীও।

ওপারে গিয়ে তারা যেখানে দাঁড়াল তা একটি সিঁড়ির মুখ। সিঁড়িটি এক অন্ধকার ঘরে নেমে গেছে। আহমদ মুসা ইনফ্রা রেড গগলস দিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখল একটা শূন্য ঘর। সিঁড়ি নেমে গিয়ে ঘরের যেখানে শেষ হয়েছে তার সামনেই দরজা।

আহমদ মুসা ঘরে নামার জন্যে সিঁড়িতে পা রাখতে যাবে, এমন সময় সিঁড়ির সামনে যে দরজা তার উপর একটি বাল্ব জ্বলে উঠল।

চমকে উঠল আহমদ মুসা, তাদের উপস্থিতি ওদের কাছে ধরা পড়ে গেছে। কিন্তু কিভাবে? তাহলে গরাদের সাথে কি কোন ইলেকট্রনিক সংকেত ব্যবস্থা ছিল? অস্বাভাবিক নয়। গোপন দরজার নিরাপত্তা বিধানের একটা ব্যবস্থা ওদের অবশ্যই থাকবে।

আলী আজিমভ ফিসফিস করে বলল, বাল্ব জ্বলে উঠল, আমরা কি ধরা পড়ে গেছি?

হ্যাঁ। দরজার সাথে কিংবা ঘরের কোথাও টেলিভিশন ক্যামেরার চোখ আছে। ওদের চোখ এড়িয়ে আমরা এক কদমও এগুতে পারবো না।

কথা শেষ করে আহমদ মুসা পকেট থেকে সাইলেন্সার লাগানো ছোট পিস্তলটা বের করে একটু ঝুঁকে পড়ে তাক করল আলো ছড়ানো বৈদ্যুতিক বাল্বটাকে। নিঃশব্দে একটা গুলি এগিয়ে গেল। ঠুস করে একটা শব্দ হল। সেই সাথে কাঁচের বাল্ব ভেঙে পড়ার শব্দ উঠল। ঘর আবার অন্ধকারে ডুবে গেল।

আহমদ মুসা দ্রুত সিঁড়ি ভেঙ্গে নামতে শুরু করল। মেঝেতে পা দিয়েই ছুটল দরজার দিকে। দরজা ধরে টানল। খুলতে পারলো না। বাইরে থেকে কি বন্ধ দরজা? হঠাৎ একটা চিন্তা আহমদ মুসার মনে ঝিলিক দিয়ে উঠল, দরজা কি গেটরুমের দরজার মতই স্বয়ংক্রিয়?

ঘেমে উঠল আহমদ মুসা উত্তেজনার চাপে। তাহলে কি তাদের মিশন ব্যর্থ হবে?

মনকে সান্ত্বনা দিল আহমদ মুসা। ওদের এই অতি সতর্কতাই প্রমাণ করে ওরা ভীত, ওদের দুর্বলতা আছে ওদের হেডকোয়ার্টারের রক্ষা ব্যবস্থায়।

আহমদ মুসা দ্রুত তার পকেট থেকে বের করল 'লেসার কাটার'। বাটের নিচের লাল সুইচটা টিপে দরজার একটা অংশের চারদিক দিয়ে ঘুরিয়ে নিল। ইস্পাতের দরজার বিচ্ছিন্ন অংশটি সরিয়ে রেখে বেরিয়ে এল ঘর থেকে আহমদ মুসা। তার সাথে সাথে আলী আজিমভরাও।

দরজা থেকে বেরিয়ে লম্বা করিডোরে পড়ল। করিডোরটি দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গেছে। করিডোর আলোকিত। আলোর উৎসের দিকে তাকিয়ে দেখল, করিডোরটি দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যেখানে পশ্চিম দিকে বাঁক নিয়েছে সেখানে উত্তরমুখী একটা সার্চ লাইট।

আহমদ মুসা এম-১০ হাতে তুলে নিল সার্চ লাইটের চোখ অন্ধ করে দেবার জন্যে। এমন সময় করিডোরের দক্ষিণ মাথায় চার-পাঁচজন লোককে উদ্যত স্টেনগান হাতে আবির্ভূত হতে দেখা গেল। তারা ছুটে আসছে করিডোর দিয়ে। ওদের চোখ পড়েছে আহমদ মুসাদের উপর। ওরা দৌঁড়াতে দৌঁড়াতেই স্টেনগানের ব্যারেল ঠিক করে নিচ্ছিল। হাত ওদের স্টেনগানের ট্রিগারে। আহমদ মুসার এম-১০ এর নল উপরে উঠেই ছিল। শুধুমাত্র কিঞ্চিত নামিয়ে ট্রিগারে চাপ দিল। করিডোর ধরে ছুটে গেল এক পশলা গুলি। মুহূর্তে ওরা পাঁচজন লোকই আছড়ে পড়ল করিডোরে।

আহমদ মুসা ট্রিগার থেকে হাত না সরিয়ে এম-১০ এর মাথা সার্চ লাইটের চোখ বরাবর তুলে নিল। মুহূর্তে অন্ধ হয়ে গেল সার্চ লাইটের চোখ। অন্ধকারে ডুবে গেল করিডোর।

আহমদ মুসা ছুটলো করিডোর ধরে দক্ষিণ দিকে।

করিডোরটি দক্ষিণ দিকে কিছুদূর এগোবার পর পশ্চিম দিকে বাঁক নিয়েছে।

আহমদ মুসা করিডোর ধরে পশ্চিমে এগিয়ে চলল। এ করিডোরটি অন্ধকার। দু'পাশ দিয়ে সারিবদ্ধ কক্ষ। দরজা বন্ধ। করিডোর পশ্চিমে অনেক দূর এগুবার পর প্রশস্ত আলোকোজ্জ্বল আরেকটা করিডোরে গিয়ে পড়েছে।

আহমদ মুসা করিডোরটিতে পা দিতে গিয়েও পা টেনে নিল। নিজেকে দেয়ালের আড়ালে লুকিয়ে রেখে করিডোরটিতে উঁকি দিল।

উত্তর-দক্ষিণে লম্বা করিডোর। করিডোরটি উত্তর দিকে এগিয়ে পশ্চিম দিকে বাঁক নিয়েছে। আর দক্ষিণ দিকে এগিয়ে নিকটেই একটা সুন্দর সাদা গোলাকার বিল্ডিং-এর বারান্দায় গিয়ে শেষ হয়েছে।

আহমদ মুসা চোখ সরাতে যাচ্ছিল এমন সময় দেখল বিল্ডিংটির সামনের কক্ষের খোলা দরজা দিয়ে চারজন লোক বাইরে এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কি কথা বলতে লাগল। তাদের চোখে উত্তেজনা, তারা করিডোরটির দিকে তাকাচ্ছে ঘন ঘন। তাদের তিনজনের হাতে স্টেনগান, একজনের হাতে নিউট্রন রাইফেল।

আহমদ মুসা চোখ সরিয়ে নিচ্ছিল, এমন সময় উত্তর দিক থেকে অনেকগুলি পায়ের শব্দ তার চোখ টেনে নিয়ে গেল উত্তর দিকে। দেখল, চারজন লোক ছুটে আসছে। তাদের হাতে উদ্যত স্টেনগান।

দু'দিক থেকেই সমান বিপদ। একপক্ষকে রুখতে গেলে অন্য পক্ষ ছুটে আসবে।

আহমদ মুসা নিজের কাঁধ থেকে নিউট্রন রাইফেল নামিয়ে হাতে নিতে নিতে বলল, আলী আজিমভ তুমি উত্তর দিক সামলাও, আমি দক্ষিণ দিকে দেখছি।

আলী আজিমভের হাতে এম-১০ রেডি ছিল। সংগে সংগেই সে করিডোরের উত্তর দিকের দেয়াল ঘেঁষে শুয়ে পড়লো। এক ঝলক দেখে নিয়ে এম-১০ এর মাথা বাড়িয়ে দিল। তারপর ট্রিগারে চাপ দিয়ে মাথাটা দেয়ালের বাইরে নিল সে।

আলী আজিমভের এম-১০ যখন গর্জে উঠল, তার আগেই মনে হয় আলী আজিমভ দক্ষিণ দিকে ঘরের দরজার সামনে বারান্দায় দাঁড়ানো লোকদের চোখে পড়ে গিয়েছিল। বিদ্যুৎবেগে ওরা সোজা হয়ে দাঁড়াল, চোখের পলকে ওদের স্টেনগান ওদের হাতে এসে গিয়েছিল। সেই নিউট্রন রাইফেলধারীই তার রাইফেল তাক করেছিল।

আহমদ মুসার নিউট্রন রাইফেল তার অনেক আগেই তার হাতে এসে গিয়েছিল। দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে লক্ষ্যও সে স্থির করে নিয়েছিল। আলী আজিমভের এম-১০ গর্জে উঠার সাথে সাথেই আহমদ মুসা তার নিউট্রন রাইফেলের ট্রিগারে চাপ দিল। পর পর দু'বার।

নিউট্রন রাইফেলের প্রথম বুলেটটি বিস্ফোরিত হলো বিল্ডিংটির বারান্দায়। আর দ্বিতীয়টি খোলা দরজা পথে চলে গেল ঘরের ভেতরে।

ভোজবাজির মতই ঘটল ঘটনা। নিউট্রন বুলেট বিস্ফোরিত হবার পরমুহূর্তেই চারজন যে যেভাবে ছিল ঝরে পড়ল মাটিতে। মাটিতে পড়ার পর একটু নড়লও না। একটা আঘাত সূঁচের মত বিদ্ধ হলো আহমদ মুসার মনে। কত ভয়াবহ মারণযন্ত্র তৈরি করেছে মানুষ। ট্রিগার টেপার সুযোগ সে আগে নিতে না পারলে নিউট্রন বুলেটের বিষ নিঃশ্বাসে তারাই ঐভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ত। জীবন-মৃত্যু এত কাছাকাছি!

আহমদ মুসা রাইফেল নামিয়ে উত্তর দিকে তাকাল। দেখল, আলী আজিমভ উত্তর দিক থেকে ছুটে আসা চারজনের সামাল ভালভাবেই দিয়েছে। স্তুপের মত চারটি লাশ পড়ে আছে জড়াজড়ি করে।

আর কোন দিক থেকে কেউ এলো না।

আহমদ মুসা বলল, চল আমরা আগে ঐ সাদা সুন্দর গোলাকার বিল্ডিংটা দেখবো।

--বিল্ডিংটার উপরে ওয়্যারলেস এ্যান্টেনা দেখা যাচ্ছে। নিশ্চয় ওটা কোন অফিস হবে। বলল আলী আজিমভ।

নিউট্রন বুলেটের ক্রিয়া শেষ হবার জন্যে আরও কয়েক মিনিট অপেক্ষা করার পর তারা বিল্ডিংটার দিকে এগিয়ে গেল।

উঁচু বেদীর উপর উঁচু একতলা বিল্ডিং। সিঁড়ির চারটি ধাপ পেরিয়ে ওরা বারান্দায় উঠল। দরজার সামনেই পড়ে থাকা লাশের পাশ কাটিয়ে ওরা ঘরে ঢুকলো। আহমদ মুসার নির্দেশে ওসমান এফেন্দী বারান্দায় পাহারায় থাকল স্টেনগান উঁচিয়ে। পোশাকে তাকে একজন হোয়াইট ওলফের প্রহরীর মতই দেখাচ্ছে।

ঘরটি গোলাকার। সাদা দেয়াল, সাদা কার্পেটে মোড়া। দরজা দিয়ে ঢুকতেই সামনের অর্থাৎ দক্ষিণ দেওয়ালে সাদা নেকড়ের মুখ ব্যাদানকারী হিংস্র মুখের এক বিশাল প্রতিকৃতি। প্রতিকৃতির নিচে ঘর লম্বালম্বি লম্বা সাদা টেবিল

দেয়ালের সাথে সেঁটে তৈরি। লম্বা টেবিলের এক পাশে পাশাপাশি চারটি টিভি স্ক্রীন। আর এক পাশে কয়েকটি বাঘা ধরনের ওয়্যারলেস সেট।

আহমদ মুসা ঘরে প্রবেশ করে আরেক দফা শিউরে উঠল। দেখল, লম্বা টেবিলের সামনে বসা চার চেয়ারে চারজন এবং ঘরের মাঝখানে বড় একটা চেয়ারে আরেকজন ঢলে পড়ে আছে। যেন ঘুমিয়ে। ঘুমের মত করেই তাদের অজান্তে তারা নীরব মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে।

আহমদ মুসা বুঝল, দ্বিতীয় নিউট্রন বুলেটটা দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করেছিল। তারই কাজ এটা।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল আহমদ মুসার বুক থেকে। ভাবল, মানুষ অন্যকে মারার জন্য খাদ খুঁড়ে, কিন্তু সে খাদে সেও যে পড়তে পারে-মানুষ তা মোটেই চিন্তা করে না।

ঘরটির চারদিকে একবার চোখ বুলিয়েই বুঝল, হোয়াইট ওলফের কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল রুম এটা। আনন্দে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আহমদ মুসার।

টেলিভিশন স্ক্রীনগুলো সজীব। স্ক্রীনগুলোয় ঘাঁটির বিভিন্ন কক্ষ ও স্থানের ছবি ভেসে উঠেছে। টেলিভিশন স্ক্রীনগুলোর পাশেই সুইচ প্যানেল। প্রতিটি সুইচের নিচে আর্মেনীয় ভাষায় স্থানের নাম লেখা আছে। যেমন, গেটরুম, গেটব্রীজ, এত নম্বর কক্ষ, এত নম্বর করিডোর, প্রিজন ব্রীজ, প্রিজন ইত্যাদি। প্রতিটি কক্ষ, প্রতিটি করিডোরের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন সুইচ আছে। সে সুইচ টিপলে আলোও জ্বলে, টেলিভিশন ক্যামেরাও সক্রিয় হয়।

আহমদ মুসার দৃষ্টি একটি টেলিভিশন স্ক্রীনের উপর গিয়ে আঠার মত আটকে গেল। দেখল, একটি কক্ষের মেঝেতে প্রৌঢ় একজন সৌম্যদর্শন মানুষ রক্তে ভাসছে। তার বুকের উপর পড়ে একটি তরুণী কাঁদছে। মুখ দেখা যাচ্ছে না। তাদের পাশেই রক্তে ভাসছে আরেকটি দেহ। তার মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল আহমদ মুসা। এ তো মাইকেল পিটার--হোয়াইট ওলফের প্রধান! মাইকেল পিটারের ছবি সে এরকমই দেখেছে। তার এই ভাবনায় ছেদ পড়ল। টিভি স্ক্রীনে সে দেখল, দরজা ঠেলে জনা সাতেক লোক প্রবেশ করলো ঘরে। তার মধ্যে দু'জনের হাতে পিস্তল। অন্যদের হাতে স্টেনগান। তাদের চোখে-মুখে বিস্ময় ও

আতঙ্ক। তাদের সামনের দু'জনের একজন মুখ ফাঁক করলো বিরাট রকমের। মনে হয় চিৎকার করে কিছু যেন বলল। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি সেই লাশের বুক থেকে মুখ তুলল এবং দ্রুত হাত বাড়িয়ে পাশে পড়ে থাকা রিভলভারটি নিতে গেল। কিন্তু চিৎকার করে ওঠা লোকটিও লাফ দিল পিস্তলের লক্ষ্যে।

আহমদ মুসা আর দেখতে পারলো না। তার হঠাৎ যেন মনে হল মেয়েটি সোফিয়া এ্যাঞ্জেলা এবং সেই প্রৌঢ় সৌম্যদর্শন লোকটি সোফিয়া এ্যাঞ্জেলার আব্বা সেন্ট জর্জ সাইমন।

আহমদ মুসা আর মুহূর্ত দেরি করলো না। প্যানেল বোর্ডের দিকে একবার তাকিয়ে ঘরের নাম্বারটি দেখে নিয়ে দ্রুত আলী আজিমভকে বলল, তোমার দায়িত্বে এখন কন্ট্রোলরুম, আমি আসছি। বলে মুসা দ্রুত বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

প্যানেল বোর্ডে সুইচের অবস্থান এবং এ পর্যন্ত দেখা কক্ষসমূহের নম্বর দেখে আহমদ মুসা বুঝে নিয়েছিল ঘটনা যেখানে ঘটছে সেই কক্ষটি পশ্চিম দিকে হবে এবং খুব দূরে হবে না।

আহমদ মুসা কন্ট্রোল রুম থেকে বেরিয়ে পশ্চিমমুখী একটা করিডোর ধরে ছুটতে লাগল। করিডোরটি অন্ধকার।

করিডোরটি কিছুটা এগিয়ে একটা উত্তর-দক্ষিণ লম্বা বারান্দায় গিয়ে শেষ হয়েছে। বারান্দার পশ্চিমে বড় একটা লন। তার পরেই আর একটা বিল্ডিং। বিল্ডিংটা একতলা এবং খুব বড় নয়। ঘরে আলো জ্বলছে। পর্দাবিহীন কাঁচের জানালা দিয়ে উজ্জ্বল আলো দেখা যাচ্ছে।

আহমদ মুসা বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল। বারান্দা থেকে একটা পাথর বিছানো রাস্তা বেরিয়ে সামনের ঐ বিল্ডিং এবং উত্তর পাশ দিয়ে পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেছে। আহমদ মুসা তাড়াহুড়ার জন্যে খেয়াল করেনি, বারান্দা থেকে কয়েক গজ পশ্চিমে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে আছে তিনজন স্টেনগান হাতে। লনে আলো জ্বলছে। সে আলোতে বারান্দাও আলোকিত।

আহমদ মুসার চোখ যখন ও তিনজনের উপর পড়েছে, তখন দেখল ওরা স্টেনগান হাতে তুলে নিয়েছে। আহমদ মুসার হাতেও এম-১০। কিন্তু তা তুলবার সময় নেই।

সামনেই ছিল বারান্দার প্রশস্ত পিলার। আহমদ মুসা নিজের দেহকে ছুড়ে দিল বারান্দার উপর সেই পিলারের আড়ালে। সংগে সংগেই এক ঝাঁক গুলি বেরিয়ে গেল পাশ দিয়ে। একটু দেরি হলে বুকটা তার ঝাঁঝরা হয়ে যেত।

আহমদ মুসা নিজেকে টেনে নিয়ে গেল পিলারের গোড়ায়। তারপর পিলারের সাথে গা মিশিয়ে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা। গুলি তখন বৃষ্টির মত এসে আঘাত করছে পিলারকে।

আহমদ মুসা এম-১০ এর নল একটু বের করে পিলারের গায়ের সাথে চেপে ধরল ট্রিগার। গুলি বর্ষণরত অবস্থায় নলটা একবার উপরে, আরেকবার নিচে নামিয়ে নিল। বেরিয়ে গেল গুলির বৃষ্টি।

মনে হল ওপক্ষের গুলিবৃষ্টিতে একটা ছন্দ পতন হলো। অর্থাৎ ফাঁকা জায়গায় দাঁড়ানো ওরা স্থান পরিবর্তন করছে। এটাই চেয়েছিল আহমদ মুসা।

বিদ্যুৎ ঝলকের মত তার ডান হাত বেরিয়ে গেল পিলারের বাইরে। ট্রিগার চেপে ধরে একবার ঘুরিয়ে নিল এম-১০ এর নল এবং তারপরেই মাথা বের করল পিলারের আড়াল থেকে। দেখল, দু'জন পড়ে গেছে মাটিতে, আর একজন ছুটে আসছে বারান্দার দিকে। সেও দেখে ফেলেছে আহমদ মুসাকে। কিন্তু তার স্টেনগানের নল আহমদ মুসার দিকে উঠে আসার আগেই আহমদ মুসার এম-১০ এর গুলি বর্ষণরত মুখ লোকটির দিকে ঘুরে গেল। স্টেনগানসমেত উপুড় হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল লোকটি।

আহমদ মুসা বেরিয়ে এল পিলারের আড়াল থেকে। ওদের দিকে ফিরে তাকাবার মত সময় নষ্ট না করে আহমদ মুসা ছুটল সামনের বিল্ডিংটার দিকে।

বিল্ডিংটা পশ্চিমমুখী এল টাইপ। 'এল' এর বাঁকা অংশটা উত্তরদিকে। বিল্ডিং এর এই উত্তর পাশ ঘেঁষেই এগিয়ে এসেছে রাস্তাটা।

আহমদ মুসা রাস্তা থেকে উঠে এল বিল্ডিং এর বাঁকা অংশের বারান্দায়। দেখল, বিল্ডিংটা যেখানে গিয়ে দক্ষিণ দিকে বাঁক নিয়েছে, তারপরের দরজাটা খোলা। ভেতরের একফালি আলো এসে বারান্দায় পড়েছে।

আহমদ মুসা লাফ দিয়ে এগিয়ে চলল দরজার দিকে। আহমদ মুসা যখন বিল্ডিং এর বাঁকে গিয়ে পৌঁছেছে, সে সময়েই ওরা ছয়জন বেরিয়ে এল দরজা দিয়ে। সামনেই রবার্ট র‍্যাফেলো। তার পেছনে আরও পাঁচজন। জর্জ জ্যাকব তখনও দরজার আড়ালে।

ওদের দৃষ্টি প্রথমত ছিল সামনের দিকে। কিন্তু ডান দিকে ফিরে তাকাতেই নজর পড়ল আহমদ মুসার উপর। আহমদ মুসার এম-১০ মেশিন রিভলভার তখন ওদের দিকে স্থির লক্ষ্যে উদ্যত।

--তোমরা পিস্তল স্টেনগান সব ফেলে দাও।

আহমদ মুসার শান্ত, কঠোর কণ্ঠের নির্দেশ চারদিকের নীরবতাকে ভেঙ্গে দিল খান খান করে।

কিন্তু পিস্তল স্টেনগান তাদের হাত থেকে পড়ল না। ভয়ের বদলে তাদের চোখ-মুখ আরও কঠোরই হয়ে উঠল। বিদ্যুৎ গতিতে রবার্ট র‍্যাফেলোর পিস্তল ঘুরে আসছিল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসার বাজের মত চোখকে ফাঁকি দেয়া সম্ভব হয়নি রবার্ট র‍্যাফেলোর। তার পিস্তল ঘুরে এসে স্থির হবার আগেই আহমদ মুসার তর্জনী চেপে বসেছিল এম-১০ এর ট্রিগারে। গুলির ঝাঁক বেরিয়ে গেল এম-১০ এর নল থেকে। ঝাঁঝরা হয়ে গেল গজ চারেক সামনে দাঁড়ানো দেহগুলো।

মুহূর্ত কয়েক অপেক্ষা করল আহমদ মুসা। টেলিভিশন স্ক্রীনে লম্বা-ভারিমত আরেকজনকে দেখা গিয়েছিল সে কই? নিশ্চয় সে দরজার আড়ালে। সুযোগের সন্ধান করছে।

আহমদ মুসা দেয়াল ঘেঁষে এক পা এক পা করে দরজার দিকে এগুলো। দরজার কাছে গিয়ে আরও মুহূর্ত কয়েক দেরি করল, না, কারো সাড়া নেই।

আহমদ মুসা মুখ বাড়িয়ে দরজায় উঁকি দিল। দেখল, মেয়েটি দরজার দিকে এগিয়ে আসছে। তার বিস্ফারিত দৃষ্টি লাশের স্তুপের দিকে। ভয়ে তার মুখ ফ্যাকাশে।

আহমদ মুসা তার এম-১০ এর নল নামিয়ে বলল, বোন, আর একজন লোক ছিল সে কই?

মেয়েটি ঘরের দক্ষিণ দিকে অংগুলি সংকেত করে বলল, ঐ দিক দিয়ে পালিয়েছে।

আহমদ মুসা লাফ দিয়ে ঘরে ঢুকল। কিন্তু দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে কিছু বুঝতে পারলো না। কাঠের পার্টিশন ওয়াল, কোন দরজার চিহ্ন কোথাও নেই।

মেয়েটি এগিয়ে গিয়ে দেয়ালে একটা সুইচ টিপে বলল, এই সুইচ টিপে সে পালিয়ে গেছে।

সুইচ টেপার সাথে সাথে কাঠের পার্টিশনটি অনেকখানি সরে গেল।

আহমদ মুসা সে দরজা পথে ঐ ঘরে ছুটে গেল। দেখল, ওপারের দরজা খোলা।

আহমদ মুসা ফিরে এসে বলল, ও পালিয়েছে। হোয়াইট ওলফের কাউকে এই প্রথম পালাতে দেখলাম। কে ছিল সে? কোন নেতা নিশ্চয়ই?

--জর্জ জ্যাকব, হোয়াইট ওলফের ডেপুটি প্রধান। বলল মেয়েটি।

--এ হোয়াইট ওলফের প্রধান মাইকেল পিটার না?

--জ্বি।

-- তুমি তো সোফিয়া এ্যাঞ্জেলা?

--জ্বি। বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে উত্তর দিল সোফিয়া এ্যাঞ্জেলা।

সোফিয়া এ্যাঞ্জেলা বিস্ময়ের সাথে দেখছে আহমদ মুসাকে। কে এই যুবক? শিশুর মত সরল, পবিত্র মুখ। চোখ দু'টি অদ্ভুত রকমের উজ্জ্বল। প্রত্যেকটি কথা ও চলাফেরার মধ্যে শালীনতা ও সৌন্দর্য্য। কিন্তু এই লোকটিকে শত্রুর মোকাবিলায় কি কঠোর দেখা গেল!

--ইনি তোমার আব্বা সেন্ট সাইমন না?

--জ্বি। আপনি আমাকে, আমার আব্বাকে চেনেন কি করে? বলল সোফিয়া এ্যাঞ্জেলা।

--বুঝতে পারছি, তুমি মাইকেল পিটারকে মেরেছ, কিন্তু তোমার আব্বা নিহত হলেন কি করে?

সোফিয়া সব ঘটনা আহমদ মুসাকে বলল। শেষ দিকে কান্নায় গলা তার রুদ্ধ হয়ে গেল।

আহমদ মুসা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, আর আধা ঘন্টা আগে যদি আসতে পারতাম!

সোফিয়া এ্যাঞ্জেলা চোখ মুছে বলল, আব্বা বাঁচেন নি, কিন্তু আমাকে বাঁচিয়েছেন।

একটু থেমে সোফিয়া এ্যাঞ্জেলা বলল, আপনি কে? আমাদের চেনেন কি করে আপনি?

--আমি আহমদ মুসা, সালমান শামিলের ভাই।

--মধ্য এশিয়ার আহমদ মুসা? কপালে চোখ তুলে প্রশ্ন করলো সোফিয়া এ্যাঞ্জেলা।

--হ্যাঁ।

--আপনিই সেই মহান বিপ্লবী?

আহমদ মুসা কোন জবাব দিল না।

সোফিয়া এ্যাঞ্জেলাই আবার বলল, এতক্ষণে মনের প্রশ্নটার জবাব পেলাম, আহমদ মুসা ছাড়া হোয়াইট ওলফের প্রধান ঘাঁটিকে এভাবে কে পদানত করতে পারে!

--আল্লাহ সাহায্য করেছেন, বলল আহমদ মুসা।

একটু থেমে আহমদ মুসা বলল, সালমান শামিল কোথায়?

আহমদ মুসার কণ্ঠে উদ্বেগের সুর।

সোফিয়া এ্যাঞ্জেলার চোখে মুখে অন্ধকার নেমে এল। বলল, আমি ওর কোন খোঁজ করতে পারি নি। সে এই ঘাঁটিতেই থাকবে।

একটু থেমে বলল, ওরা মরিয়া হয়ে তার কোন ক্ষতি করবে না তো? সোফিয়া এ্যাঞ্জেলার কথা কাঁপছে। তার মুখ ফ্যাকাশে।

--আল্লাহ্ সাহায্য করবেন বোন। চল আমরা কন্ট্রোল রুমে যাই। সেখান থেকে গোটা ঘাঁটিটা একবার পর্যবেক্ষণ করা যাবে। তারপর করণীয় ঠিক করব।

বলে আহমদ মুসা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল।

সোফিয়া যাবার আগে পিতার লাশের দিকে ফিরে একবার থমকে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা তা দেখতে পেল। বলল, ভেব না বোন, আমরা সব ব্যবস্থাই করব।

আহমদ মুসা আগে চলছে। সোফিয়া এ্যাঞ্জেলা তার পেছনে।

চলতে চলতে সোফিয়া বলল, আপনি কিন্তু আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেননি। আপনি আমাদের চিনলেন কি করে? সালমান ছাড়া আমাদের তো আর কেউ চেনে না।

--ডঃ পল জনসন আমাকে সব বলেছেন। তারপর তোমার সাথে দেখা করার জন্যে তোমার বাড়িতে যাই। সেখানে তোমার মা'র কাছ থেকে তোমার হারিয়ে যাবার কথা শুনি।

মায়ের কথায় সোফিয়ার মুখ বেদনার্ত হয়ে গেল। তার পিতার কথাও এ সময় মনে পড়ল। চোখে পানি এসে গেল তার। বলল, মা কেমন আছেন? খুব বুঝি কাঁদছেন মা?

--খুব স্বাভাবিক বোন। মায়েরা তো মা-ই।

নরম, মমতাপূর্ণ কথা আহমদ মুসার।

আহমদ মুসার মমতাভেজানো স্বর সোফিয়ার অন্তর স্পর্শ করল। অপরিচিত লোকটির প্রথম সম্বোধন থেকেই মনে হচ্ছে, বড় ভাইয়ের মত কত আপন! কত পবিত্র ব্যবহার! সোফিয়ার দিকে সে চোখ তুলছেই না। সালমান শামিলের মধ্যেই এ পবিত্রতা সে দেখেছে। সত্যিকার মুসলমানরা এত ভালো! এ চরিত্র তো জগৎ জয় করবেই!

পথে সামনে আশে-পাশে অনেক রক্ত, অনেক লাশ দেখে, পাশ কাটিয়ে সোফিয়া আহমদ মুসার সাথে কন্ট্রোল রুমে প্রবেশ করল। বিস্ময়ের সাথে সে ভাবছিল, এ নরম, পবিত্র মানুষগুলো যুদ্ধে আবার এত কঠোর! একেই কি বলে জীবনের ভারসাম্যতা!

লেডি জোসেফাইন দোতলার দক্ষিণ দিকের উন্মুক্ত ব্যালকনিতে বসে ছিল। রাত তখন আটটা বাজতে যাচ্ছে।

লেডি জোসেফাইনের মুখ দারুণ উদ্বেগে পীড়িত। আধা ঘন্টাখানেক আগে হোয়াইট ওলফের একজন লোক ফাদার পলের খোঁজে তাদের বাড়িতে এসেছিল। বৈঠকখানায় লেডি, সিস্টার মেরী তার সাথে কথা বলছিল। এমন সময় সালমান শামিল সেখানে ঢুকে পড়ে। কিন্তু ঢুকেই আবার ফিরে আসে। ঐ একঝলক দেখাতেই হোয়াইট ওলফের লোক তাকে মনে হয় চিনতে পারে। সে সালমান শামিলকে দেখে চমকে উঠেছিল। এরপর লোকটা আর দেরি করেনি।

লেডি জোসেফাইন উদ্বিগ্ন তার পরিবারের জন্যে, সালমান শামিলের জন্যেও। হোয়াইট ওলফের দয়ামায়াহীন নৃশংসতার কথা সে জানে। বারে বারে ভয়ে শিউরে উঠছে সে।

সিস্টার মেরী পেছন থেকে ধীরে ধীরে এসে মায়ের কাঁধে হাত রাখল। সিস্টার মেরীর মুখও শুকনো।

ফিরে তাকিয়েই লেডি জোসেফাইন মেয়েকে কোলে টেনে নিল।

--মা, তুমি বোধ হয় খুব ভাবছ? বলল সিস্টার মেরী।

--ভাবনার কথাই তো মা!

--ভাবনার কি আছে মা, একজন অসুস্থ মানুষকে চিনে তো আর আশ্রয় দাওনি।

--আমরা তাতে বাঁচব, কিন্তু তুই কি পারবি এভাবে ভাবতে?

সিস্টার মেরী জবাব দিল না। মায়ের কোলে মুখ গুঁজে চুপ করে রইল।

লেডি জোসেফাইন মেরীর মুখটা নিজের মুখের কাছে তুলে ধরল। চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে মেরীর মুখ।

লেডি জোসেফাইন মেয়েকে বুকে জড়িয়ে কেঁদে উঠল, একি করেছিস মা!

সিস্টার মেরীরও কান্নার বাঁধ ভেঙ্গে গেল। মাকে জড়িয়ে কান্নায় সে ভেঙ্গে পড়ল।

অনেকক্ষণ পর নিজের চোখ মুছে, মেরীর চোখ মুছে দিয়ে বলল, তুই বুদ্ধিমতি, কিছু বুঝলি না কেন তুই?

মায়ের বুকে মুখ গুঁজে মেরী বলল, আমি জানি না------।

কান্নায় তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

সালমানকে কিছু বলেছিস তুই?

কি বলব?

জানে সে?

জানি না আমি।

লেডি জোসেফাইন মেরীর মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, তুই এত অবুঝ!

লেডি জোসেফাইন মেরীকে পাশে বসিয়ে বলল, সালমানকে তো আজকের ঘটনা বলিসনি।

না।

ওকে জানাতে হবে, এখনই ওকে কোথাও সরাতে হবে।

কোথায়?

অন্ততঃ এ বাড়ি থেকে অন্য কোথাও যাতে ওরা ওকে খুঁজে না পায়।

ওকে একা কোথাও পাঠাতে পারব না। মেরীর কন্ঠ ভারি।

একটু দম নিল মেরী। চিন্তা করল। বলল, মা, ওকে গীর্জায় লুকিয়ে রেখে আসি।

গীর্জায়?

লেডি জোসেফাইন একটু চিন্তা করল, দ্বিধা করল, তারপর মুখটা উজ্জ্বল করে বলল, তোর প্রস্তাবটা ভালো। তাই কর।

ঠিক এই সময় স্টেনগানের ব্রাশফায়ারের শব্দ ভেসে এল। একটানা তা চলতেই থাকল।

সালমান শামিল্ও দ্রুত এসে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়েছে। সে উৎকর্ণ হয়ে শুনছে।

হঠাৎ ব্রাশফায়ারের শব্দ থেমে গেল।

লেডি জোসেফাইন, সিস্টার মেরী এবয়ং সালমান শামিল নির্বাকভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

দু'মিনিটও যায় নি।

একটানা গুলি বর্ষণের আরেকটা শব্দ ভেসে এল। তারপর চুপচাপ।

লেডি জোসেফাইন ও সিস্টার মেরীর মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেছে। কাঁপছে মেরী।

সালমান শামিলের মুখ গম্ভীর এবং শক্ত। সে মেরীদের দিকে তাকিয়ে বলল, দু'পক্ষের মধ্যে গুলি বিনিময় হচ্ছে।

বুঝলে কি করে? শুকনো কণ্ঠে বলল লেডি জোসেফাইন।

দু'ধরনের গান ব্যবহার হয়েছে।

কথা শেষ করে একটু থামল সালমান শামিল। তারপর লেডি জোসেফাইনের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি একটু বেরুতে চাই আম্মা।

কোথায়?

কি ঘটছে দেখা দরকার, জানা দরকার।

না বাবা, তুমি সুস্থ হওনি। গুলি গোলার মধ্যে তোমার যেয়ে কাজ নেই। তুমি একটু সরে থাক। মেরী তোমাকে গীর্জায় রেখে আসবে। অসুবিধা নেই, আমার ছেলের অফিস কক্ষে থাকবে।

কিন্তু----

কোন কিন্তু নয়, পরিস্থিতি দেখে যা করা যায় করা হবে।

সালমান শামিল নীরব রইল।

সিস্টার মেরী বলল, মা ঠিকই বলেছেন, চলুন।

সালমান শামিল চোখ তুলল মেরীর দিকে। দেখল মেরীর দু'নীল চোখ ভরা উদ্বেগ, আকুলতা। অসহায়া হরিণীর দু'চোখের মত অতলান্ত মমতা সেখানে।

সে চোখে চোখ রাখতে গিয়ে কেঁপে উঠল শামিল। সালমান শামিল নীরবে চোখ নামিয়ে নিল। বলল, চল।

সোজা সদর রাস্তা দিয়ে গেল না ওরা গীর্জায়। পেছন দরজা দিয়ে আঁকা-বাঁকা অন্ধকার গলিপথ দিয়ে ওরা চলল গীর্জার দিকে।

কারো মুখে কথা নেই।

সালমান শামিল ভাবছিল গোলাগুলির ব্যাপার নিয়ে। কি ঘটল সেখানে? কোন সেম সাইডের ব্যাপার? না ককেশাস ক্রিসেন্ট থেকে কেউ হানা দিয়েছে? কে হানা দেবে হোয়াইট ওলফের হেডকোয়ার্টারে? সে সাহস, সে শক্তি, সে বুদ্ধি কি ককেশাস ক্রিসেন্টের হয়েছে? যে অবস্থা ককেশাস ক্রিসেন্টের, তাতে উপরে আল্লাহ আর নিচে তিনিই আমাদের ভরসা। তিনি ক্রমে হাল ধরলে ককেশাস ক্রিসেন্টের ডুবন্ত তরী আবার জেগে উঠতে পারে।

নীরবতা ভাঙল মেরীই অবশেষে। বলল, আম্মা আপনাকে গীর্জায় সরিয়ে রাখছেন কেন জানেন?

--এসব গুলি-গোলা দেখে?

--না।

--তাহলে?

--তখন ড্রইংরুমে একজন লোক দেখেছিলেন, সে কে জানেন?

--না, তবে লোকটার দৃষ্টি আমার কাছে ভালো মনে হয়নি।

--লোকটা হোয়াইট ওলফের। আপনাকে চিনতে পেরেছে বলে আমার মনে হয়েছে।

--আমাকে তো বল নি? কেমন করে বুঝলে আমাকে চিনতে পেরেছে?

--আপনাকে দেখার পর আর দেরি করেনি। তার চোখ দেখেই বুঝেছি। সে চমকে উঠেছিল আপনাকে দেখে।

--আমাকে আগে বল নি কেন?

--বলতে পারিনি।

--কেন?

সিস্টার মেরী কোন জবাব দিল না প্রশ্নের। কি জবাব দেবে সে। হঠাৎ যদি কোথাও চলে যায়--এমন একটা ভয় তাকে পীড়িত করেছে। কিন্তু এই ছেলেমানুষির কথা বলবে কি করে।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল, পরে বুঝতে পেরেছি সঙ্গে সঙ্গেই আপনাকে সাবধান করা উচিত ছিল।

--অবশেষে মা-মেয়ে পরামর্শ করে আমার জন্যে গীর্জার ব্যবস্থা করেছ, এই তো! সালমান হাসল।

--আপনার ভয় করছে না?

--কেন ভয় করব? জীবনের?

--কেন, জীবনের কি ভয় নেই?

--আল্লাহ যখন মৃত্যু নির্দিষ্ট রেখেছেন, তার আগে মৃত্যু আসবে না। সুতরাং ভয় করব কেন?

--সাবধান থাকা কি ভয়?

--অবশ্যই না।

গীর্জায় এসে পড়ল ওরা। গীর্জার পেছনের দরজা খুলে ওরা গীর্জায় প্রবেশ করল।

গীর্জার পেছন অংশে প্রার্থনা-মঞ্চের সাথে লাগানো কয়েকটা কক্ষ নিয়ে ফাদার পলের অফিস। অফিসে একটা বিশ্রাম কক্ষ আছে। সেখানে শোবার খাট, ওয়ার্ড্রোব প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সব কিছুই আছে।

সিস্টার মেরী আলো জ্বেলে চাদর ও বালিশের কভার পাল্টিয়ে বিছানাটা ঠিক করে দিল।

সালমান শামিল মাথা নিচু করে দেখছিল মেরীর কাজ। তার চোখে বেদনার একটা ছায়া। মেরী বিছানা ঠিক করে উঠে দাঁড়াল। সালমান তার মুখ নিচু রেখেই বলল, মেরী তোমাদের এত ঋণ আমি শোধ দেব কি করে?

মেরীও চোখ নিচে নামিয়ে নিয়েছিল। মাথা নিচু হয়েছিল অনেকখানি।

অনেকক্ষণ কোন কথা বলল না মেরী। অবশেষে চোখ না তুলেই বলল, দাতা-ঘাতকের পরিচয়ই কি সব? মেরীর কণ্ঠ ভারি শোনাল।

--না মেরী, আমার কথার অর্থ তা নয়, আমি বলতে চাচ্ছিলাম, তোমরা আমার জন্যে যা করেছ.........

--ঠিকই বলেছেন, কাজই যেখানে বড়, হৃদয় নয় উপকার যেখানে বিবেচনার মানদন্ড, সেখানে তো এভাবেই কথা বলতে হয়। কেঁপে কেঁপে কথাগুলো বেরিয়ে এল সিস্টার মেরীর কণ্ঠ থেকে। যেন কান্না চাপার চেষ্টা করছে সে।

--আমার প্রতি অবিচার করো না মেরী। আমার কথা তোমাকে বুঝাতে পারি নি।

সিস্টার মেরী কোন উত্তর দিল না।

মাথা না তুলেই কয়েক পা এগিয়ে ফ্রিজ খুলে দেখল। তারপর পাশের স্টোররুম থেকে একটা নরমাল ওয়াটারের বোতল এনে টেবিলে রেখে বলল, নরমাল ওয়াটার থাকল, ঠান্ডা পানি খাবেন না।

তারপরে ঘুরে দাঁড়িয়ে সালমান শামিলের দিকে চোখ তুলে ম্লান হেসে বলল, আপনাকে ব্যথা দিয়েছি।

--না, তুমিই কষ্ট পেয়েছ।

সিস্টার মেরী কোন উত্তর না দিয়ে চোখ নামিয়ে বলল, এখন যাই, আসুন দরজাটা লাগিয়ে দেবেন।

গেটের দিকে কিছুটা এগিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, বাথরুমে গরম পানিও আছে। গরম পানি দিয়ে অজু করবেন।

দরজার কাছাকাছি পৌঁছেছে মেরী এমন সময় দরজায় কেউ নক করল এবং সঙ্গে সঙ্গে সালমানের নাম ধরে ডাকল। থমকে দাঁড়াল মেরী। তার মুখ মুহূর্তে কাগজের মত সাদা হয়ে গেল ভয়ে।

সালমান শামিল তার পাশে এসে দাঁড়াল। তার চোখেও বিস্ময়।

আবার ডাক এল সালমানের নামে।

সালমান শামিলের মন বলল, এটা শত্রুর কণ্ঠস্বর নয়। সালমান শামিল দরজা খোলার জন্যে এগিয়ে গেল।

মেরী তার সামনে গিয়ে দু'হাত বাড়িয়ে তাকে আগলে দাঁড়াল। বলল, খুলতে হয় আমি খুলব, আপনি নন।

ভয় ও উত্তেজনায় কাঁপছে মেরী।

সালমান শামিল মেরীর চোখে চোখ রেখে বলল, আমার চোখে দেখ মেরী, কোন ভয়, দুর্বলতা দেখতে পাও? মুসলমানরা মেয়েদের বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে পেছনে থাকে না।

একটু থেমেই একটু হেসে বলল আবার, তুমি একটু পাশে দাঁড়াও, আমি দেখি। ভয় করো না। রিভলভার আমারও আছে।

বলে সালমান শামিল বাইরের সুইচ টিপে দিয়ে ডান হাত পকেটে পিস্তলের উপর রেখে বাম হাতে দরজা খুলল।

দরজার একেবারে সামনেই ওরা দাঁড়ানো। কাল টুপি, কাল ওভারকোটে দেহ ঢাকা একজন পুরুষ। তার মুখটাই শুধু দেখা যাচ্ছে। শ্মশ্রুমণ্ডিত সুন্দর মুখ। তার স্থির দৃষ্টি সালমান শামিলের উপর নিবদ্ধ। তার দৃষ্টিতে প্রসন্নতা। তার পাশেই কাল ওভারকোট জড়ানো একটা নারী মূর্তি। তার ওভারকোটের কলার কান পর্যন্ত উঠে আসা। মাথা খোলা। তারও স্থির দৃষ্টি সালমান শামিলের উপর। সে দৃষ্টিতে তীব্র এক আবেগ এবং আকুলতা।

সালমান শামিলের দৃষ্টি মেয়েটির উপর পড়তেই ভূত দেখার মতই চমকে উঠল। মুখ থেকে অস্ফুটে বেরিয়ে এল, সোফিয়া তুমি......তুমি!

কথা শেষ করার আগেই সালমান শামিলের কণ্ঠ থেমে গেল।

সালমান শামিলের মাথায় তখনও ব্যান্ডেজ বাঁধা।

সোফিয়ার চোখ সালমান শামিলের উপর আটকে গেছে। এক অব্যক্ত আবেগে তার ঠোঁট থর থর করে কাঁপছে। দু'গন্ড বেয়ে গড়িয়ে এসেছে অশ্রু।

সোফিয়া দু'কদম এগিয়ে সালমানের আরও কাছে সরে এল। বলল, তুমি ভাল আছ তো?

সোফিয়ার আবেগরুদ্ধ কণ্ঠ থেকে কথাগুলো খুব কষ্ট করে বেরিয়ে এল। একটা উচ্ছ্বাস চাপতে সোফিয়া দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছে ঠোঁট।

--সোফিয়া তুমি আমবার্ড দুর্গে! আমি স্বপ্ন দেখছি না তো!

সোফিয়ার প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে বলল সালমান শামিল। তার চোখে তখনও বিস্ময়ের ঘোর। সোফিয়া চোখ মুছে পাশে দাঁড়ানো লোকটির দিকে ইঙ্গিত করে বলল, ওকে চেন?

সালমান শামিল লোকটির দিকে চোখ তুলে দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলল, না সোফিয়া।

লোকটি মাথার কাল টুপি খুলে ফেলল। টুপির তল থেকে তার বেরিয়ে এল উন্নত ললাট। মাথা ভর্তি কাল কোঁকড়ানো চুল। লোকটির ঠোঁট মিষ্টি হাসিতে ভরা। টুপি খুলেই বলল, আহমদ মুসা।

মুহূর্তেই সালমান শামিলের চেহারা পাল্টে গেল। চোখ-মুখ জুড়ে নেমে এল আনন্দ-আবেগের একটা বাঁধ-ভাঙ্গা তরঙ্গ। মুখ থেকে বেরিয়ে এল, আপনি...... আপনি...... আপনি আহমদ মুসা!

বলে দু'হাত বাড়িয়ে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে। আহমদ মুসা বুকে জড়িয়ে ধরল সালমান শামিলকে। বেশ কিছুক্ষণ থাকল ঐভাবে ওরা। যেন নীরবে হৃদয়ের ভাষায় কথা বলছে ওরা দু'জন।

পরে আহমদ মুসা তাকে বুক থেকে তুলে সালমান শামিলকে একটা চুমু দিয়ে বলল, আল্লাহর হাজার শুকরিয়া সালমান। মাঝে মাঝে আমরা হতাশ হয়েছি তোমাকে আবার আমাদের মাঝে ফিরে পাওয়া সম্পর্কে।

--আমরা জানি মুসা ভাই, আল্লাহ তাঁর সৈনিক আহমদ মুসার কপালে শুধু সাফল্যই লিখে রেখেছেন।

--এভাবে কথা বলো না সালমান। দোয়া করো, দুনিয়ার মজলুম মুসলমানরা যাতে স্বাধীনতা ও স্বস্তির মুক্ত বাতাসে প্রাণভরে শ্বাস নিতে পারে।

সালমান শামিল আহমদ মুসাকে ছেড়ে দিয়ে সোফিয়ার দিকে চেয়ে বলল, তুমি মেরীকে দেখেছো?

বলে সালমান শামিল পেছন দিকে তাকালো। দেখল, দরজার ওপারে আধো আলো-অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে মেরী।

সালমান ওদিকে এগিয়ে গেল। দেখল, মেরী কাঠের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ ফ্যাকাশে, বিধ্বস্ত। চমকে উঠল সালমান শামিল। হৃদয়ের

কোথায় যেন একটা খোঁচা লাগলো। যে আশংকা সে ক'দিন থেকে করে আসছে, তা আবার তার মধ্যে মাথা তুলল। মেরী ক্রমেই অবুঝ হয়ে পড়ছে।

যেন কিছু হয়নি এমন কণ্ঠে সালমান শামিল বলল, মেরী, আমাদের নেতা আহমদ মুসা এসেছেন।

তারপর পেছন ফিরে বলল, সোফিয়া এস, দেখ কে।

সোফিয়া ছুটে এল।

মেরীর সামনে এসে মেরীর দিকে চোখ পড়তেই মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল। তাকিয়ে রইল মেরীর দিকে। মেরীও চোখ তুলল। মেরীর ঠোঁটে হাসি, কিন্তু চোখের কোণায় অশ্রু। সোফিয়ার মুখে একটা কালো ছায়া ভেসে ওঠে আবার দ্রুত মিলিয়ে গেল। পরক্ষণেই সোফিয়া ঠোঁটে উজ্জ্বল হাসি টেনে জড়িয়ে ধরল মেরীকে।

--কেমন আছিস্ মেরী? বলল সোফিয়া।

--ভাল।

--সালমান শামিলকে কোথায় পেলি?

--দু'দিন আগে রাতে আমাদের বাড়ির সামনে আহত-অজ্ঞান অবস্থায় পেয়েছিলাম। দুই পুরনো বান্ধবী সোফিয়া ও মেরী কথা যেন শেষ করতে পারছিল না। একসময় আহমদ মুসা কথা বলে উঠল, দুঃখিত—সোফিয়া, এখন প্রতিটা মিনিট আমাদের জন্যে একটা দিনের সমান।

সোফিয়া মেরীকে ছেড়ে দিয়ে একটু সরে দাঁড়াল। তাকাল আহমদ মুসার দিকে।

সালমান শামিল আহমদ মুসাকে বলল, আমার উপর কি নির্দেশ মুসা ভাই?

--ককেশাসে নেতৃত্ব তোমার। ককেশাস ক্রিসেন্টের নেতৃত্ব এখন তোমাকেই দিতে হবে। আমার কোন নির্দেশ নেই, অনুরোধ আছে। মুখে মিষ্টি হাসি টেনে বলল আহমদ মুসা।

--ওসব কথা শুনিয়ে লাভ হবে না মুসা ভাই। এখন বলুন আপনার নির্দেশ।

--কন্ট্রোল রুমসহ ঘাঁটি আমাদের দখলে। কিন্তু হোয়াইট ওলফের ডেপুটি চীফ জর্জ জ্যাকব পালিয়েছে। কন্ট্রোল রুমে চল, অত্যন্ত জরুরি কাজ পড়ে আছে। কন্ট্রোল রুমের টেলিভিশন স্ক্রীনে তোমাকে এখানে দেখে সব ফেলে আমরা ছুটে এসেছিলাম। আল্লাহ আমাদের মিশন সফল করেছেন।

সালমান শামিল মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল।

কিছু বলবে সালমান?

আজ কিছুক্ষণ আগে হোয়াইট ওলফের লোক মেরীর বাড়িতে আমাকে হঠাৎ দেখে ফেলে এবং অকস্মাৎ এ গোলাগুলির আওয়াজ শোনার পর মেরীর মা গীর্জায় আমাকে লুকিয়ে রাখার জন্যে পাঠিয়েছিল। মেরীর মাকে কিছু না বলে----

সালমান শামিল কথা শেষ না করেই চুপ করে গেল।

আহমদ মুসা ভাবছিল।

এমন সময় মেরী এগিয়ে এসে সালমানকে বলল, আমি মাকে সব বুঝিয়ে বলব, উনি ঠিক বলেছেন। আপনি ভাববেন না, মা বুঝবেন।

সালমান শামিল চোখ তুলে তাকাল মেরীর দিকে। মেরী চোখ নামিয়ে নিল।

কথা বলল আহমদ মুসা। বলল, সালমান ঠিক বলেছে বোন। আমি ওদিকটা চিন্তা করিনি। তুমি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চল তোমার বাসায়।

আহমদ মুসার কণ্ঠে নরম স্নেহের সুর।

মেরী আহমদ মুসার দিকে চোখ তুলল। ভাই ফাদার পল এবং মা লেডি জোসেফাইন ছাড়া এমন স্নেহমাখা কণ্ঠ তো আর কোথাও শুনেনি সে! মেরী চোখ নামিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে বলল, শুধু মা'র সাথে দেখা করার জন্যে যদি এই পরিমাণ সময় নষ্ট করেন, তাহলে আমি দুঃখ পাব।

--'সুযোগ পেল আর বলার সৌজন্যটুকু না করেই চলে গেল' এটা কি মানবতায় বাঁধে না? বলল আহমদ মুসা।

--বাঁধে হয়তো। কিন্তু সেটা সাধারণ ক্ষেত্রে। যুদ্ধকালীন বা কোন জরুরি পরিস্থিতিতে এটা কেউ ধরে না। তাছাড়া মা'র কাছে সৌজন্য প্রকাশের কোন

প্রয়োজন নেই। তিনি সালমান সাহেবকে খুবই ভালবাসেন। সালমানের নিরাপত্তাকেই তিনি সবচেয়ে বড় করে দেখবেন।

--কিন্তু আমার খারাপ লাগছে মেরী। বলল সালমান শামিল।

--এমন খারাপ লাগার চেয়ে বাস্তবতার দাবি অনেক বড়।

সালমান শামিল মাথা নিচু করল। কোন কথা মুখে জোগাল না।

আহমদ মুসা এবং সোফিয়া এ্যাঞ্জেলাও নীরব। মেরী গীর্জার দরজা টেনে বন্ধ করে তাতে তালা লাগাল। তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, আপনারা যান, আমি বাড়ি যাচ্ছি।

মেরীর কথার শেষ কয়েকটা শব্দ রুদ্ধ হয়ে আসা তার কণ্ঠে যেন আটকে গেল। মাথা নিচু করে কথাগুলো বলেই দৌঁড় দিল মেরী। মনে হল সে টলছে। মাথা নিচু করে, ছুটে পালিয়ে সে যেন কিছু গোপন করতে চাচ্ছে।

সোফিয়া এ্যাঞ্জেলার মুখে কোন কথা নেই। তার চোখে-মুখে একটা কালো ছায়া। রক্তিম, পাতলা ঠোঁটে তার বেদনার একটা সূক্ষ্ম কম্পন।

সালমান শামিল যখন মুখ তুলল, তার চোখে শূন্য দৃষ্টি। মুখে একটা অপ্রস্তুত ভাব। আহমদ মুসার মুখ গম্ভীর। কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকার পর ওদের তাড়া দিয়ে বলল, এস যাই।

বলে আহমদ মুসা হাঁটা শুরু করল। সালমান ও সোফিয়াও পা তুলল তার পেছনে পেছনে। হাঁটতে হাঁটতে আহমদ মুসা বলল, ওদের কন্ট্রোল রুমের একটা গোপন ডেস্কে হোয়াইট ওলফের ঘাঁটিগুলোর ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বার ও ওয়্যারলেস কোডসহ তাদের নেটওয়ার্কের গোটা লগ পেয়ে গেছি। এখনই আঘাত হানার উপযুক্ত সময়। ওরা জানতে পারার আগে, সরে পড়ার আগে আমাদের আঘাত হানতে হবে।

--আমরা যদি ওয়্যারলেসে এখনি বাকু, কামি, সুমগেইট, ইয়েরেভেন, আলবার্দি, লেনিনাকান ঘাঁটিতে নির্দেশ পাঠাতে পারি, তাহলে রাতের মধ্যেই সবখানে খবর পৌঁছে যাবে এবং ভোর হবার আগেই আমরা সবখানে ওদের ওপর আঘাত হানতে পারি।

--তুমি এখনও জান না সালমান, ককেশাস ক্রিসেন্ট আগের সব ঘাঁটি ছেড়ে দিয়ে নতুন ঘাঁটিতে উঠেছে। আমরা ইচ্ছে করলেও আমাদের সব ঘাঁটিতে খবর পৌঁছাতে পারব না। তবে তুমি যা বলেছ বাকু, কামি, সুমগেইট, ইয়েরেভেন, আলবার্দি, লেলিনাকান, কিরোভাকান প্রভৃতি প্রধান ঘাঁটিগুলোর সাথে এখানে আমবার্ড দুর্গে আসার আগে আমাদের যোগাযোগ হয়েছে। আমরা ওদের কাছে নির্দেশ পৌঁছাতে পারি।

--আমরা ঘাঁটিগুলো পরিবর্তন করলাম কেন?

--শুধু তো ঘাঁটি নয়, ককেশাস ক্রিসেন্টের সব পরিচিত ব্যক্তিত্বকে আন্ডারগ্রাউন্ডে যেতে বলা হয়েছে। এসব করা হয়েছে ককেশাস ক্রিসেন্টের সব তৎপরতা ওদের চোখ থেকে আড়াল করার জন্যে। ওরা আমাদের জানত বলে ইচ্ছেমতো আঘাত করতো। কিন্তু আমরা ওদের জানতাম না, ফলে কিছু করতেও পারতাম না।

--একেই বলে নেতৃত্ব মুসা ভাই। আপনি দু'তিন দিনে যুদ্ধের মোড় একদম ঘুরিয়ে দিয়েছেন। এ সহজ বিষয়গুলোও আমরা আগে চিন্তা করতে পারিনি।

একটু থামল সালমান শামিল। তারপর বলল, আমার বিস্ময় এখনও কাটেনি মুসা ভাই, সোফিয়া এ্যাঞ্জেলাকে আপনি পেলেন কোথায়, আমবার্ড দুর্গের সন্ধান কি করে পেলেন, কেমন করে জানলেন এখানেই আমি বন্দী আছি, আর সিংহের এই অতি শক্তিশালী গুহায় কি করেই বা ঢুকলেন!

--তোমাদের স্যার ডঃ পল জনসন এবং সোফিয়া এ্যাঞ্জেলার মা আমাকে সাহায্য করেছেন। সোফিয়ার মা এবং ডঃ পল জনসনের এ্যাটেনডেন্ট আলফ্রেড যে তথ্য দিয়েছেন, তাতেই আমি স্থির নিশ্চিত হয়েছিলাম, আমবার্ড দুর্গই ওদের হেড কোয়ার্টার এবং এখানেই তোমাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে।

সোফিয়ার মা আপনাকে সাহায্য করেছে? কেন? আপনি এদের চিনলেনই বা কিভাবে?

সোফিয়ার মুখ বেদনায় মলিন। সেও আগ্রহের সাথে শুনছিল আহমেদ মুসার কথা।

আহমদ মুসা সালমান শামিলের কথার জবাব দিতে গিয়ে বলল, এখনও তুমি অনেক কিছুই জান না সালমান।

বলে একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর আবার শুরু করল, তুমি কিডন্যাপ হবার পর সোফিয়া এ্যাঞ্জেলা গোপনে তার পিতাকে অনুসরণ করে তোমার সন্ধানে আমবার্ড দুর্গে এসেছিল। ধরা পড়ে যায় সোফিয়া। সোফিয়ার অপরাধের সাথে তার পিতাকেও জড়ানো হয়। মৃত্যুদন্ড হয় সোফিয়ার। হোয়াইট ওলফের নেতা মাইকেল পিটার সোফিয়ার আব্বার হাতে রিভলভার দিয়ে সোফিয়াকে হত্যার নির্দেশ দেয়। কিন্তু সোফিয়ার আব্বা সোফিয়াকে হত্যা না করে নিজের মাথায় গুলি করে হত্যা করে নিজেকে। এর পরপরই আমরা সেখানে পৌঁছি।

আহমদ মুসার শেষ বাক্য শেষ হবার আগেই থমকে দাঁড়িয়েছিল সালমান শামিল সোফিয়ার পথ রোধ করে তার মুখোমুখি। বেদনায় নীল হয়ে গেছে সালমান শামিলের মুখ। সোফিয়া সালমান শামিলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। তার মুখ নিচু। জলে ভরে গেছে তার দুই চোখ। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে সে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছে।

সোফিয়া? ডাকল সালমান শামিল। তার কণ্ঠ ভারি।

সোফিয়া কোন উত্তর দিল না, মাথা তুলল না। দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সোফিয়া এ্যাঞ্জেলা।

সালমান শামিলও পাথরের মত দাঁড়িয়ে। অন্তরে তার বেদনার ঝড়। সোফিয়া তার জন্যে এত করেছে, এত হারিয়েছে!

জল গড়িয়ে পড়ছিল সালমান শামিলের দু'গন্ড বেয়ে।

আহমদ মুসা কয়েক পা পিছিয়ে এল। অত্যন্ত নরম, অত্যন্ত দৃঢ় কণ্ঠে বলল, সালমান, সোফিয়া এখন কাঁদার সময় নয়, সময় এখন এ্যাকশনের। অনেক কাজ বাকি আমাদের। এস।

বলে আহমদ মুসা আবার হাঁটা শুরু করল।

চোখ মুছে সালমান ও সোফিয়াও পা তুলল।

আহমদ মুসারা কন্ট্রোল রুমে পৌঁছলে প্রাথমিক সালাম, আলাপ-আলিঙ্গনের পর আলী আজিমভ বলল, জর্জ জ্যাকব সম্ভবত দুর্গের দক্ষিণ অঞ্চলে প্রিজন এলাকার কোথাও লুকিয়েছে। প্রিজন গেটের আলোটা কিছুক্ষণ হল হঠাৎ নিভে গেছে। জর্জ জ্যাকবই সম্ভবত বাল্ব ভেঙে দিয়েছে।

দুর্গ থেকে বের হওয়ার গেট তো ঠিক নজরে রেখেছ?

জ্বি, গেট আমরা সব সময় চোখের সামনে রেখেছি। এখন ওসমান এফেন্দীকে ওখানে কাজে লাগাতে পারি।

ঠিক আছে। জর্জ জ্যাকবকে আমরা পরে দেখছি। ওয়্যারলেসের কাজ আমরা সেরে নিই। পালাবে কোথায়? হোয়াইট ওলফের কোন সক্রিয় লোক আর আমবার্ড দুর্গে বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে না মেরে বা না মরে ওরা চুপ থাকতো না।

বলে আহমদ মুসা ওয়্যারলেস সেটের সামনে গিয়ে বসল। সালমান শামিলও গিয়ে বসল তার পাশেই এক চেয়ারে।

আহমদ মুসা হোয়াইট ওলফের নেটওয়ার্ক লগ বই বের করল। তারপর শুরু করল ককেশাস ক্রিসেন্টের ঘাঁটিগুলোতে নির্দেশ প্রেরণ। নির্দেশ তো নয় যেন হোয়াইট ওলফের মৃত্যু পরোয়ানা।

প্রত্যেক ঘাঁটিতে নির্দেশের শেষ কথা হলো, আগামীকাল ভোরের সূর্য যেন হোয়াইট ওলফের কোন ঘাঁটি আর না দেখে।

# ৬

আমবার্ড দুর্গের প্রিজন এলাকা এবং দুর্গের কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না জর্জ জ্যাকবকে। আমবার্ড দুর্গ থেকে বেরুবার একমাত্র পথ দিয়ে যে সে বেরুতে পারেনি, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। তাহলে গেল কোথায়? জর্জ জ্যাকবকে যে খুঁজে পেতেই হবে। নেতাদের মধ্যে সেই মাত্র জীবিত বলা যায়। প্রধান সব ঘাঁটি থেকেই খবর এসেছে, অভিযান সফল। হোয়াইট ওলফের কিছু লোক ধরা পড়েছে, অধিকাংশই সংঘর্ষে নিহত হয়েছে।

কন্ট্রোল রুমের দায়িত্বে আছে আলী আজিমভ। আর সেখানে সহযোগিতায় রয়েছে ওসমান এফেন্দী। জর্জ জ্যাকবের সন্ধানে বেরিয়েছে আহমদ মুসা, সালমান শামিল এবং সোফিয়া এ্যাঞ্জেলা। সোফিয়া এ্যাঞ্জেলাই চেনে জর্জ জ্যাকবকে।

সব খোঁজা শেষ করে ফেরার পথে ফাদার পল অর্থাৎ মেরীদের বাড়ির মুখোমুখি হলো আহমদ মুসারা। সালমান দেখাল ঐ বাড়িটা মেরীদের।

চল খবর নিয়ে যাই ওদের। বলল আহমদ মুসা।

হ্যাঁ, যাওয়া যেতে পারে আপনি মনে করলে। ওর মা'র সাথে দেখাটাও হয়ে যাবে।

সালমান শামিল মুখে একথা বলল, কিন্তু তার মনে প্রবল একটা অস্বস্তি। সালমান শামিলের মনে পড়ল গীর্জা থেকে মেরীর চলে আসার দৃশ্যটা। এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি তাকে আর হতে হোক সে তা চাইছিল না। কিন্তু এখানে এসে মেরীর মা'র সাথে দেখা না করে চলে যাওয়া কঠিন।

সোফিয়া এ্যাঞ্জেলা নীরব রইল। কোন কথা সে বলল না। কিন্তু তার মুখের উপর সেই কাল ছায়াটা এসে আবার মিলিয়ে গেল।

মেরীর বাড়ির দিকে চলছিল ওরা। বাড়ির সামনে লনটির কাছাকাছি পোঁছে সোফিয়া এ্যাঞ্জেলা জিজ্ঞেস করল, কোথায় তুমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে?

লনের মাঝ খানে একটা জায়গা দেখিয়ে দিল সালমান শামিল।

তিন দিন খাদ্য-পানি স্পর্শ না করে এমন সব বাঁধা ডিঙিয়ে ঐভাবে তুমি পালাতে পারলে কিভাবে?

আমারও বিস্ময় লাগে এখন সোফিয়া।

মনের শক্তি সব শক্তির চেয়ে বড়।

না সোফিয়া, আল্লাহর সাহায্যই সবচেয়ে বড়। দেখ, আমি যে মনের জোরে এ পর্যন্ত এসেছিলাম, সে আমি এখানে পৌঁছার পর শত চেষ্টা করেও নিজের জ্ঞানটা ধরে রাখতে পারিনি। এ থেকে বুঝা যায়, আল্লাহর ইচ্ছা ছিল এ পর্যন্ত পৌঁছি। এখানে পৌঁছার পর মনে হয় আল্লাহ আমার উদ্ধারের প্রয়োজনেই আমার জ্ঞান হারাবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

ঠিক বলেছ সালমান। পরিকল্পনা করেই যেন আল্লাহ তোমাকে এনেছিলেন। ভাবতে পারি না, মেরীরা না হয়ে, অন্য কারো হাতে পড়লে কি ঘটত? পালিয়েও আবার শত্রুর হাতে পড়ার নজির আছে।

তাহলে আমাদের আল্লাহর প্রতি তোমার বিশ্বাস বেড়েছে তো! মুখ টিপে হেসে বলল সালমান শামিল।

আল্লাহ কি তোমাদের একার?

একার নয়, কিন্তু তোমরা তো আবার ত্রি- ঈশ্বরে বিশ্বাসী।

বহুবচনে কথাটা বলছ কেন, ‘আমরা’ তো বলছি না।

‘তোমরা’ থেকে তুমি যে ভিন্ন, তোমার সে মনের কথা তো জানি না। ঠোঁটে হাসি টেনে বলল সালমান শামিল।

তোমার জানার তো দরকার নেই, আল্লাহ জানলেই হলো। এই সময় আহমদ মুসা ফিরে এল।

সালমান শামিল ও সোফিয়া লনের মুখে দাঁড়িয়েছিল। আহমদ মুসা সম্ভবত বাড়ির ওপাশটা দেখার জন্যে একটু লনের ওধারে গিয়েছিল।

সে ফিরে এলে তারা লনে প্রবেশ করে বাড়ির দিকে এগুলো।

আগে সালমান শামিল। তার পেছনে সোফিয়া এ্যাঞ্জেলা। সবশেষে আহমদ মুসা।

গাড়ি বারান্দায় পৌঁছে সামনের দিকে চাইতেই চমকে উঠল সালমান শামিল। দরজা খোলা কেন? এইভাবে রাত তিনটায় দরজা খোলা থাকবে কেন? এমন তো হবার কথা নয়।

সালমান শামিল থমকে দাঁড়াল। পাশে এসে দাঁড়াল আহমদ মুসাও। ব্যাপারটা তার চোখেও ধরা পড়ল।

কি ব্যাপার, দরজা খোলা যে! দু'চোখ কপালে তুলে প্রশ্ন করল আহমদ মুসা।

বুঝতে পারছি না মুসা ভাই, এমন তো হবার কথা নয়।

আহমদ মুসা ও সালমান শামিল দু'জনেই রিভলভার হাতে নিয়ে এক পা দু'পা করে সামনে দরজার দিকে এগুলো।

প্রথমেই ড্রইংরুম। খোলা দরজা দিয়ে তারা তিনজনই ড্রইংরুমে প্রবেশ করল। ড্রইংরুম খালি।

ড্রইংরুমে আলো নেই। করিডোরে আলো।

তারা ড্রইংরুম থেকে করিডোরে পা দিল। করিডোরে ছাড়া নিচে আর কোন রুমে আলো নেই।

সোফিয়াকে সিঁড়ির মুখে দাঁড় করিয়ে রেখে আহমদ মুসা ও সালমান দ্রুত নিচের ঘরগুলো দেখল। না, কেউ কোথাও নেই।

উপরে উঠার সিঁড়িতে আলো

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠল। সিঁড়ির মুখেই পারিবারিক ড্রইংরুম। তারও দরজা খোলা এবং ঘরে আলো জ্বলছে। কিন্তু শূন্য ঘর।

সালমান শামিলের চোখে তখন বিস্ময়ের বদলে উদ্বেগ এসে বাসা বেঁধেছে। আহমদ মুসারও কপাল কুঞ্চিত।

সালমান ড্রইংরুমে একবার চোখ বুলিয়েই ছুটল সিস্টার মেরীর রুমের দিকে। মেরীর রুমের দরজাও খোলা। ঘর শূন্য। শূন্য ঘরের দিকে একবার তাকিয়েই সালমান শামিল ছুটল লেডি জোসেফাইনের রুমের দিকে। সেখানেও একই দৃশ্য। দরজা খোলা, ঘর শূন্য।

শূন্য ঘরের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইল সালমান শামিল। কিছু আর ভাবতে পারছে না সে। তার চিন্তা শক্তি যেন ভোঁতা হয়ে গেছে।

তার পাশে এসে দাঁড়ালো আহমদ মুসা। তার চোখে বিস্ময়।

পাশে এসে দাঁড়াতেই সালমান শামিল বলল, কিছু বুঝতে পারছেন মুসা ভাই?

বুঝতে পারছি।

কি? ওরা কোথাও চলে গেছেন?

চলে গেছেন তো বটেই, কিন্তু তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

কেমন করে বুঝলেন?

সে তো স্পষ্ট, দরজাগুলো খোলা, আলোও নিভানো নয়।

কে তাদের নিয়ে গেল, হোয়াইট ওলফ?

তা বলতে পারবো না, তবে যে বা যারাই হোক, তারা মেরীদের একেবারে অপরিচিত নয়। তাকে বা তাদের ভেতরের ড্রইংরুমে বসানো হয়েছিল। সে ড্রইংরুমে আসেন লেডি জোসেফাইন এবং মেরী। সেখান থেকেই তাদের নিয়ে যাওয়া হয়।

এটা তো অনুমান।

অনুমান, কিন্তু এটাই ঘটেছে। দেখ না, ড্রইংরুম থেকে নেমে বেরিয়ে যাবার পথ, সিঁড়ি এবং করিডোরেই শুধু আলো।

এই সময় সোফিয়া এ্যাঞ্জেলা এসে ঘরে ঢুকল। সে ছোট্ট একটি চিরকুট তুলে দিল আহমদ মুসার হাতে।

আহমদ মুসা চিরকুটটিতে নজর বুলিয়েই তা তুলে দিল সালমান শামিলের হাতে।

সালমান শামিল চিরকুটটি হাতে নিয়ে লেখার দিকে তাকিয়েই চিনতে পারল। লেখাটা মেরীর হাতের। পড়ল সালমানঃ

"প্রিয় ভাই, ফাদার পল,

জর্জ জ্যাকব এসেছেন। কোথাও আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন। না গেলে বেঁধে নিয়ে যাবেন। রিভলভার হাতে করেই এসেছেন। সব কথা লেখার সময় নেই। ওদের কাছে অপরাধ আমাদের একটা আছে, কিন্তু সে অপরাধটা আমার জন্যে পরম সৌভাগ্য ভাইয়া।

মেরী।"

চিরকুটটা মুড়ে হাতের মধ্যে নিয়ে সালমান শামিল বলল, ব্যাপারটা পরিষ্কার মুসা ভাই। আমাকে আশ্রয় দেয়ার ব্যাপারটা হোয়াইট ওলফ নেতৃবৃন্দ জানতে পেরেছে। পরাজিত জর্জ জ্যাকব তাই সম্ভবত প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে ওদের উপর দিয়ে। তাই ওদের ধরে নিয়ে গেছে।

আহমদ মুসা চুপ করে ছিল। সে অন্যমনস্ক। সালমান শামিলের কোন কথাই বোধ হয় কানে গেল না। অনেকক্ষণ পর মুখ তুলে বলল, আমবার্ড দুর্গের এ দিকে প্রাচীরে নিশ্চয় কোন গোপন দরজা আছে।

বলে আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়াল। বলল, চল সব দরজা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে দিয়ে আমরা নিচে নেমে যাই।

গেটের দরজাটা লক করে আহমদ মুসা, সালমান শামিল ও সোফিয়া লনে বেরিয়ে এল। আহমদ মুসার মুখ গম্ভীর। আর একটি কথাও বলেনি আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার এ গাম্ভীর্যের সাথে সালমান শামিল ও সোফিয়া ইতোমধ্যেই পরিচিত হয়ে উঠেছে। আহমদ মুসা যখন কোন সিরিয়াস বিষয় হাতে নেয়, তখন সে এমন গম্ভীর ও অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

লনে বেরিয়ে এসেই আহমদ মুসা সালমান ও সোফিয়ার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, আমবার্ড দুর্গের এ দিকের বহির্দেয়াল আমি পরীক্ষা করতে চাই। তোমরা কন্ট্রোল রুমে ফিরে যাও। সোফিয়ার কষ্ট হচ্ছে।

সালমান শামিল ও সোফিয়া একসংগেই বলে উঠল, কন্ট্রোল রুমে আমাদের কোন কাজ নেই। আপনার সাথেই আমরা থাকব।

আহমদ মুসা চোখ বন্ধ করে একবার আরাগাত পর্বত ও আমবার্ড দুর্গের অবস্থানের দিকে দৃষ্টিপাত করল। তার মনে হল, আমবার্ড দুর্গের পূর্ব দিকের

আরাগাত পর্বত দুর্গম ও ক্রমশঃ উঁচু হয়ে উঠেছে। পশ্চিম দিকের অবস্থা সে রকম নয়। আহমদ মুসা স্থির করল, দুর্গের পশ্চিম দেয়াল থেকেই তারা অনুসন্ধান শুরু করবে।

আহমদ মুসা পা চালাল দুর্গের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের দিকে।

আহমদ মুসা আগে আগে হাঁটছিল। পেছনে সালমান শামিল ও সোফিয়া।

কি সাংঘাতিক ঘটনা ঘটল বলতো? বলল সোফিয়া।

আমি নিজেকে খুব অপরাধী বোধ করছি সোফিয়া।

হোয়াইট ওলফ তোমাকে ওখানে দেখেছে, এটা জানার পর ব্যাপারটাকে যে গুরুত্ব দেয়া দরকার ছিল, তা দেয়া হয়নি। মেরীকে রাতে ঐ ভাবে ছাড়া, তার বাড়িতে না যাওয়া বোধহয় আমাদের ঠিক হয়নি।

হয়তো তাই। ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিলে, তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করলে, এ মর্মান্তিক ঘটনা হয়তো এড়ানো যেত।

তুমি মেয়েটির মুখোমুখি হতে ভয় করেছ, তাই মেয়েটি যা বলল তা মেনে নিয়ে তার বাড়িতে গেলে না। তাদের নিরাপত্তার কথাও চিন্তা করতে পারনি এই কারণেই।

হবে হয়তো, কিন্তু আমি যা করেছি, আমার জন্যে সেটাই স্বাভাবিক ছিল সোফিয়া।

তুমি তো কোন দিকে চোখ তুলে চাও না, তুমি কি কোন সময় তার চোখের দিকে চেয়েছ?

চেয়েছি। কিন্তু যা দেখেছি, তাতো আমি দেখতে চাইনি।

তোমার চাওয়ার উপরই কি সব নির্ভর করবে? তাদের কথায় ছেদ পড়ল।

আহমদ মুসা প্রিজন ব্রীজের মুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। সালমান শামিল ও সোফিয়া কিছু পিছিয়ে পড়েছিল। আহমদ মুসা ডাকল, এখান থেকেই আমাদের কাজ শুরু হবে, এস তোমরা।

আহমদ মুসার হাতে বিরাট রকমের একটা হাতুড়ি।

সালমান শামিল ও সোফিয়া গিয়ে তার কাছে পৌঁছল।

পশ্চিম প্রাচীর ধরে তারা এগিয়ে চলল। যেখানেই সন্দেহ হচ্ছিল আহমদ মুসা হাতুড়ির ঘা দিয়ে প্রাচীর পরীক্ষা করছিল।

আহমদ মুসার বিশ্বাস, কোনও ভাবে প্রাচীর ডিঙিয়ে দুর্গের বাইরের পাহাড়ী নদী অতিক্রম করেই জর্জ জ্যাকব পালিয়েছে। কিন্তু প্রাচীরের কাঁটাতারের বেড়ায় যেহেতু বিদ্যুৎ স্বাভাবিক আছে এবং কোথাও কোন ছেদ পড়েনি, তাই তারা প্রাচীর ডিঙিয়ে যায়নি এটা পরিষ্কার। প্রাচীরের গায়ে নিশ্চয় কোনও গোপন পথ আছে, সেই পথেই জর্জ জ্যাকব পালিয়েছে। কিন্তু পালিয়েছে তা স্পষ্টভাবে না জানা পর্যন্ত এটা অনুমান এবং অনুমানের উপর ভিত্তি করে কোন পদক্ষেপই নেয়া যায় না।

প্রাচীরের গোড়া দিয়ে হেঁটে তারা প্রাচীর বরাবর চলছিল। এক জায়গায় এসে তাদের গতি রুদ্ধ হয়ে গেল। দুর্গের প্রাচীরের সাথে প্রাচীর ঘেরা আরেকটা বাড়িতে এসে তাদের গতি রুদ্ধ হয়ে গেল।

তারা প্রাচীর ঘুরে বাড়িটির সামনে এল। চারিদিকে টর্চ ফেলে এবং বাড়িটি দেখে বুঝল, এটা হোয়াইট ওলফ নেতা মাইকেল পিটারের বাড়ি। এ বাড়ি তারা কিছুক্ষণ আগেই সার্চ করে গেছে।

আহমদ মুসার মনে হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত একটা চিন্তা এল, দুর্গের প্রাচীরের সাথে দেয়াল ঘিরে এ বাড়ি তৈরি কেন? তাহলে কি দুর্গ থেকে নদী পথে বেরুবার মত প্রাচীরের সেই গোপন দরজা কি মাইকেল পিটারের বাড়ির ভেতর দিয়েই? আহমদ মুসার কেন জানি মনে হল, তার এ চিন্তার মধ্যে কোনও ভুল নেই।

আহমদ মুসা সালমান শামিলের দিকে চেয়ে বলল, সালমান, আমরা বোধ হয় প্রাচীরের সেই গোপন দরজা পেয়ে গেছি।

কোথায়?

--আমার মনে হচ্ছে, মাইকেল পিটারের বাড়ির সীমার মধ্যে প্রাচীরের যে অংশ পড়েছে, তার কোথাও সেটা আছে।

সালমান শামিলেরও মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বলল, ঠিক ধরেছেন মুসা ভাই। দুর্গের প্রাচীরে সেরকম দরজা যদি আর থাকেই, তাহলে সেটা এখানেই। আমারও এটা নিশ্চিত বিশ্বাস।

মাইকেল পিটারের বাড়ি সার্চ করার সময় তখন দেখে গেছে, বাড়িতে মাত্র পিটারের স্ত্রী এবং সাত-আট বছরের একটি মেয়ে রয়েছে। গুলিগোলার শব্দে তারা ভীত ছিল। আহমদ মুসাদের দেখে তারা আতংকিত হয়ে পড়েছিল। তারা মাইকেল পিটারের মৃত্যুর খবর তখনও জানতো না। আহমদ মুসা দরজায় নক করতেই দরজা খুলে দিয়েছিল।

মাইকেল পিটারের স্ত্রী পঁচিশ-ত্রিশ বছরের একজন মহিলা। ভদ্র-নির্দোষ চেহারা। দরজা খুলে দিয়ে আহমদ মুসাকে দেখেই আঁতকে উঠেছিল। ভযে চোখ তার বড় বড় হয়ে উঠেছিল। চিৎকার করার শক্তিও সে হারিয়ে ফেলেছিল।

আহমদ মুসা খুব শান্ত, নরম কণ্ঠে বলেছিল, বোন, আপনার কোন ভয় নেই। শত্রুতা আমাদের মাইকেল পিটারের সাথে। আপনি যদি শত্রুতা না করেন, আপনার বিন্দু পরিমাণ ক্ষতি হবে না।

আহমদ মুসার কথা শুনে মেয়েটি বোধ হয় সাহস ফিরে পেয়েছিল। বলেছিল, পিটার কোথায়, কেমন আছে?

আহমদ মুসা মাথা নিচু করে বলেছিল, বোন, আপনার জন্যে কোন সুসংবাদ আমাদের কাছে নেই।

মেয়েটি এ কথা শুনে একটা চিৎকার করেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল।

চিৎকার শুনে পিটারের মেয়েও বাড়ির ভেতর থেকে ছুটে এসেছিল। মা'কে ঐভাবে দেখে সেও চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিল।

সোফিয়া পিটারের স্ত্রীর জ্ঞান ফিরাবার চেষ্টা করছিল।

আহমদ মুসা ক্রন্দনরত বালিকাটিকে কাছে টেনে সান্ত্বনা দিয়েছিল, তোমার মা'র এখনি জ্ঞান ফিরে আসবে মা, কেঁদো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

সব ঠিক হয়ে যাবে কথা বলেই আহমদ মুসার মনে অসহনীয় এক খোঁচা লেগেছিল। কি করে সব ঠিক হয়ে যাবে? ওর আব্বা কি আর কোন দিন ফিরে

আসবে? যখন মেয়েটি তার পিতার কথা শুনবে তার কি অবস্থা হবে? তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল অসহনীয় দু:খ-কান্নায় ভেঙ্গে পড়া ছোট্ট এই বালিকার ছবি।

আহমদ মুসার চোখের কোণ ভিজে উঠেছিল।

ছোট মেয়েটি আহমদ মুসার দরদভরা সান্ত্বনা শুনে তার দিকে চেয়ে যেন একটু শান্ত হয়েছিল। প্রশ্ন করেছিল, তোমরা কে? তোমাদের তো দেখিনি!

আহমদ মুসা চোখের কোণ মুছে নিয়ে বলেছিল, তোমার আব্বার শত্রু আমরা মা! দেখবে কেমন করে?

--শত্রুদের তো রিভলভার থাকে। গুলি মারে। তোমাদের বন্দুক কই?

--শত্রু সবাইকে গুলি মারে না। শুধু শত্রুকেই মারে।

--তোমরা এসেছ কেন? আম্মার কি হয়েছে?

--আমরা তোমাদের বাড়িটা দেখব।

--কেন?

--এমনি, কেন দেখতে দেবে না?

--কেন দেব না, তুমি খুব ভাল।

এ সময় পিটারের স্ত্রীর জ্ঞান ফিরে এসেছিল।

আহমদ মুসা সালমানকে বলল, তুমি একে ভেতরে নিয়ে যাও।

তারপর বালিকাকে আদর করে বলল, তুমি তোমার এই চাচ্চুর সাথে ভেতরে যাও। আমরা আসছি তোমার মাকে নিয়ে।

বালিকাটি শান্তভাবে সালমান শামিলের সাথে ভেতরে চলে গিয়েছিল।

বালিকাকে ভেতরে পাঠিয়ে আহমদ মুসা পিটারের স্ত্রীর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

জ্ঞান ফেরার পর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল পিটারের স্ত্রী।

আহমদ মুসা নরম, শান্ত কণ্ঠে পিটারের স্ত্রীকে বলেছিল, আমরা ককেশাস ক্রিসেন্টের লোক। কেন আমরা পিটারের শত্রু, কেন পিটার আমাদের শত্রু আপনি জানেন। আপনার দুঃখের সাথে আমরাও দুঃখবোধ করছি বোন, কিন্তু আপনি জানেন কি জন্যে কি হয়েছে। আপনি আমাদের শত্রু নন, সামান্য ক্ষতিও আপনার

হবে না। আপনার সহযোগিতা চাই। আমরা শুধু পিটারের জিনিসপত্র সার্চ করতে চাই, যা আমাদের জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজন। আপনি অনুমতি দিন।

পিটারের স্ত্রী চোখ মুছে বলেছিল, পিটার নেই, আমি পিটারের স্ত্রী। তার দায়িত্ব এখন আমার কাঁধে। পিটার থাকলে যা হতে দিত না, আমি তা হতে দেব কেন?

আহমদ মুসা বলেছিল, আপনার এই মতকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আমরা তো সার্চ করতে চাই। তাহলে কি হবে এখন?

--কেন, পিটারকে যেভাবে হত্যা করেছেন, সেভাবে আমাদের মেরে ফেলে শুধু সার্চ করা কেন, সব কিছু নিয়ে যেতে পারেন।

--পিটারের মত আপনাদের কাছ থেকে আঘাত এলে কিংবা আপনারা শত্রু হয়ে দাঁড়ালে আমরা তাও করতে পারি। কিন্তু আপনাদের ঐ নির্দোষ, নির্মল বালিকা কখনোই শত্রু হতে পারে না। ওরা অবধ্য।

--আঘাত দেবার শক্তি আমাদের নেই, কিন্তু মুখ দিয়ে, ঘৃণা দিয়ে প্রতিরোধ আমরা করতে পারি।

--সেটা পারেন বোন। পিটারের স্ত্রী হিসেবে এ অধিকার আপনার আছে। কিন্তু এ অধিকারের জন্যে আমরা তো আপনাদের হত্যা করতে পারি না।

অত্যন্ত নরম কণ্ঠে বলেছিল আহমদ মুসা।

একটু থেমে আহমদ মুসা বলেছিল, আমি আপনার মেয়েকে শত্রু বলেই পরিচয় দিয়েছি। কিন্তু তবু সে বাড়ি দেখাতে সম্মত হয়েছে। সার্চ করার সময় আপনি আমাদের সাথে থাকুন আমরা চাই।

আমি এখানেই থাকব। বলে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল পিটারের স্ত্রী।

আহমদ মুসা মাথা নিচু করে বলেছিল, আমি দুঃখিত মিসেস পিটার। আমাকে আমার দায়িত্ব পালন করতেই হবে।

বলে চলে গিয়েছিল আহমদ মুসা বাড়ির ভেতরে।

সোফিয়া বসে পিটারের স্ত্রীকে পাহারা দিয়েছিল। তার একটা হাত কাপড়ের ভেতর পিস্তলের বাঁটে ছিল। পিটারের বাড়ির বাইরের গেট বন্ধ ছিল। ভেতরে ঢুকার পরেই দরজা লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল।

সার্চ করতে দশ মিনিটের বেশি লাগেনি।

সার্চ করে যখন বাইরে বেরিয়ে এসেছিল, তার সাথে এসেছিল পিটারের ছোট মেয়েটিও।

পিটারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সময় আহমদ মুসা পিটারের স্ত্রীকে বলেছিল, বোন, তোমরা সবদিক দিয়েই নিরাপদ থাকবে। তোমরা এখানেই থাকতে পারো। কিংবা অন্য কোথাও যেতে চাইলে আমরা পৌঁছে দেব। পিটারের যাবতীয় সম্পদ তোমারই থাকবে।

পিটারের স্ত্রী কিছু বলেনি। তার নত মুখটি একবার তুলেছিল। তাকাল আহমদ মুসার দিকে। চোখ দু'টি জলে ভরা।

পাশে দাঁড়ানো বালিকাই কথা বলেছিল, না চাচ্চু, আমরা কোথাও যাব না।

আহমদ মুসা বালিকাকে কাছে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বলেছিল, মা, আমরা যাই।

--তোমরা আবার কখন আসবে? আব্বা এলে আমি বলব।

বালিকার কথা শুনে আহমদ মুসা মুহূর্তের জন্যে আনমনা হয়ে গিয়েছিল। একসময় বালিকার দিকে চোখ ফিরিয়ে ধীর কণ্ঠে বলেছিল, তোমার আব্বা যদি না আসেন মা?

--না, এই তো আব্বা এখনি আসবেন।

--তোমার মত হাজারো বালক—বালিকার আব্বা ঘর থেকে বেরিয়ে আর ফিরে আসেনি। তোমার আব্বাও তো এমন হতে পারে?

--না না, তুমি জান না।

আহমদ মুসার চোখ দু'টি ভারি হয়ে উঠেছিল। বালিকাটির আস্থায় সে আর ঘা দিতে চাইল না।

আহমদ মুসা আসার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতে দাঁড়াতে অনেকটা স্বগতঃ কণ্ঠেই বলেছিল, দুনিয়ার সব মানুষ যদি এই শিশুদের মত সরল-সহজ, সুন্দর হতো!

আহমদ মুসার কণ্ঠ ভারি হয়ে উঠেছিল। কথাগুলো বলতে বলতেই গেট দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসারা এখন মাইকেল পিটারের বাড়ির সেই গেটের সামনেই আবার দাঁড়িয়ে।

আহমদ মুসা গেটে চাপ দিয়ে দেখল, গেট ভেতর থেকে বন্ধ।

দরজায় সেই প্রথমবারের মত করেই নক করল আহমদ মুসা।

পরপর তিনবার নক করল। না, কোন সাড়া নেই।

আহমদ মুসা পকেট থেকে লেসার কাটার বের করে তার বাঁটের লাল বোতামটা চেপে ধরে দরজার উপর থেকে নিচ পর্যন্ত একবার টেনে নিল। দরজার একটা পাল্লা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকল তিনজন।

নীরব-নিস্তব্ধ বাড়ী।

প্রাচীরের দিকে যাবার আগে সামনের রুমটির দরজা খোলা দেখে সেদিকে এগুলো। আগেই দেখেছিল, ঘরটা ড্রইংরুম। ড্রইংরুম খোলা। আলো নেই, কেউ নেই।

গোটা বাড়িটাতেই কাউকে পাওয়া গেল না। সবগুলো দরজাই খোলা।

সালমান শামিল বলল, দেখছি মেরীদের মতই ঘটনা।

--আকৃতি এক রকম, কিন্তু প্রকৃতি এক নয়। বলল আহমদ মুসা।

--অর্থাৎ? বলল সালমান শামিল।

--অর্থাৎ মেরীদের জোর করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, কিন্তু এরা গেছে স্বেচ্ছায়।

--ঠিক বলেছেন, তখন সুটকেস, ব্যাগ, কাপড়-চোপড় যা দেখেছিলাম, তার অনেক কিছুই নেই।

ঘর থেকে বেরিয়ে ওরা দুর্গের প্রাচীরের দিকে চলল।

বেশি খুঁজতে হল না।

প্রাচীরের কাছে যেতেই চোখে পড়ল, প্রাচীরের ভিত্তির দুই ফুট উপরে তিনফুট বর্গাকৃতির একটা দরজা। স্টিলের গরাদটা খোলা।

আহমদ মুসা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বাইরে অন্ধকার। চোখে ইনফ্রা রেড দূরবীন লাগিয়ে দরজা দিয়ে প্রাচীরের ওপারে গেল আহমদ মুসা। ওপারে দাঁড়াবার মত একটা সোপান আছে। বেশ প্রশস্ত।

আহমদ মুসা দেখল, সোপানের পাশে পোঁতা একটি স্টিলের পিলারে নাইলনের একটা মোটা দড়ি বাঁধা। দড়িটা পাহাড়ী নদী ক্রস করে ওপারের দিকে চলে গেছে। বুঝল, ওপারেও আছে এমনি একটি পিলার।

আহমদ মুসা খুঁজতে লাগল এবার একটি রাবারের নৌকা। রাবারের নৌকা করেই ওরা দড়ি টেনে ওপারে পার হয়ে পালিয়েছে।

আহমদ মুসা ওপারের তীরে চোখ ফেলল। খুঁজতে হলো না। পানির কিনারা থেকে একটু উপরেই পাথরের উপর একটা নৌকা।

আহমদ মুসা তাকাল ওপারের পাহাড়ের দিকে। পাহাড়ের ওখানে অপেক্ষাকৃত নিচু। নিশ্চয় এই পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে ওপারে এক উপত্যকায় নামার নিরাপদ কোন পথ আছে।

আহমদ মুসা পুনরায় প্রাচীরের সেই দরজা দিয়ে চলে এল দুর্গের ভেতরে। সালমান শামিল এবং সোফিয়া উন্মুখ হয়েছিল। আহমদ মুসা আসতেই জিজ্ঞাসা করল, কি দেখলেন মুসা ভাই?

--সবই দেখলাম। দড়ি টেনে রাবারের নৌকা করে ওরা নদী পার হয়েছে।

--এই ভীষণ স্রোত ঠেলে? বলল সালমান শামিল।

--ওপার—এপার মোটা দড়ি টানা দিয়ে বাঁধা আছে। ঐ দড়ি ধরে থাকলে স্রোতে ভেসে যাবার ভয় নেই।

--ওপারের পাহাড় থেকে সমভূমিতে নামবার তাহলে কোন পথ আছে।

--অবশ্যই।

--না ওপারের পাহাড়ে কোন ঘাঁটি আছে আবার?

--না নেই। থাকলে ওরা দরজা এইভাবে খোলা রেখে যেত না এবং পার হবার ঐ ব্যবস্থাও ঐ ভাবে তারা রেখে দিত না।

--ঠিক বলেছেন মুসা ভাই।

কন্ট্রোল রুমের দিকে ওরা পা চালাল। আহমদ মুসা এবং সালমান শামিল পাশাপাশি হাঁটছিল। তাদের পেছনেই সোফিয়া।

আহমদ মুসা ধীর কণ্ঠে বলল, আমবার্ড দুর্গের কাজ শেষ। এখনি বেরুতে হবে আরেক অভিযানে।

--কোথায়?

--মেরী এবং তার মা, লেডি জোসেফাইনের সন্ধানে। আমার মনে হচ্ছে, সোফিয়ার যে বিচার হোয়াইট ওলফ করেছিল, মেরীর ক্ষেত্রেও সে একই বিচার অপেক্ষা করছে। জর্জ জ্যাকব এখন ক্ষ্যাপা কুকুরের চেয়েও ভয়াল। সুতরাং তাকে কোন সুযোগ দেয়া যাবে না।

--কিন্তু খুঁজবেন কোথায় ওদের মুসা ভাই?

--এ সমস্যাটার সমাধান এখনো হয়নি। তবে আমি অনুমান করেছি, তাদেরকে আর্মেনিয়ার অন্যতম পুরনো ও শ্রেষ্ঠ ধর্মকেন্দ্র এজমেয়াদজিন নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি।

--আপনার এ অনুমানের যুক্তি কি মুসা ভাই?

--মাইকেল পিটারের নোটবুকে একটা স্কেচম্যাপ পেয়েছি। স্কেচম্যাপটি এজমেয়াদজিনের রিপ সাইম গীর্জার পার্শ্ববর্তী একটি স্থাপনার। ম্যাপের বিবরণ দেখে আমার মনে হয়েছে, এজমেয়াদজিনে হোয়াইট ওলফের দ্বিতীয় হেডকোয়ার্টার নির্মিত হয়েছে। কিন্তু একটা মজার ব্যাপার হলো, হোয়াইট ওলফের নেটওয়ার্কের যে লগ পাওয়া গেছে তাতে এজমেয়াদজিনের নাম নেই। এ থেকে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, সেখানে হোয়াইট ওলফের একটা বিশেষ ঘাঁটি আছে যাকে সবার চোখ থেকে সযতনে গোপন রাখা হয়েছে। আমার এ অনুমান ঠিক নাও হতে পারে। কিন্তু আমাদের প্রথম অভিযান হবে সেখানেই।

--আপনার অনুমান সত্য হোক মুসা ভাই। কিন্তু নতুন অবস্থা, ওদের সব ঘাঁটির উপর আমাদের আক্রমণ থেকে জর্জ জ্যাকব নতুন চিন্তা করবে না তো?

--যে চিন্তাই করুক, যেখানেই যাক তাকে ইনশাআল্লাহ খুঁজে বের করবই।

--এজমেয়াদজিনে আমরা কখন যাচ্ছি মুসা ভাই?

--এই তো যাত্রা শুরু করেছি। কন্ট্রোল রুমে যাব। ডিনামাইট দিয়ে কন্ট্রোল রুম উড়িয়ে দেব, তারপর তোমাদের নিয়ে যাত্রা করব। ইয়েরেভেনে গিয়ে তুমি সোফিয়াকে নিয়ে যাবে সোফিয়াদের বাড়ি, আর উত্তরমুখী এজমেয়াদজিন হাইওয়ে ধরে আমরা চলব এজমেয়াদজিনে।

--মুসা ভাই আমি যেতে পারি না?

--পারবে না কেন? কিন্তু দু'টো কারণে তোমাকে রেখে যেতে চাই। তুমি পুরোপুরি সুস্থ হওনি, তোমার একটু বিশ্রাম প্রয়োজন। তাছাড়া সারারাত ধরে আমাদের ঘাঁটিগুলো কি কি কাজ করল, আরও কি করণীয় এসব ব্যাপারে তোমাকে একটু খোঁজ-খবর নিতে হবে। এটা অত্যন্ত জরুরি।

সালমান শামিল আর কিছু বলল না। ভাবল, আহমদ মুসার পরিকল্পনার উপর হাত দেয়া তার ঠিক হবে না। কিন্তু মনটা তার খচ খচ করতে লাগল। মেরী, লেডী জোসেফাইন কি ভাববে! আমার জন্যেই তাদের দুঃখ-দুর্দশা, অথচ আমি তাদের কাছ থেকে দূরে থাকছি! আর, মেরী কি ভাববে! কান্না চেপে টলতে টলতে মেরীর ছুটে পালানোর দৃশ্য সালমান শামিলের চোখে ভেসে উঠল।

কন্ট্রোল রুমে এসে পড়ল ওরা, উদগ্রীবভাবে অপেক্ষমান আলী আজিমভ, ওসমান এফেন্দীর সাথে সালাম বিনিময় করে ওরা ঢুকে পড়ল কন্ট্রোল রুমে।

# ৭

বেলা তখন আটটা।

লেডি জোসেফাইন অনেকক্ষণ বিছানা থেকে উঠে বসেছে। রাত ৪টায় ওরা এজমেয়াদজিনে এসেছে। তাদের দু'জনের জন্যে দিয়েছে এই ছোট্ট ঘর। এক খানা খাটিয়া। কোন রকমে দু'জন শোয়া যায়। ঘরে কোন আসবাবপত্র নেই। বদলাবার মত কাপড়ও নেই। তাদেরকে কিছুই নিতে দেয়নি জর্জ জ্যাকব। খালি হাতে বের হয়ে আসতে হয়েছে ঘর থেকে। লেডি জোসেফাইন জেলখানা দেখেনি। কিন্তু এ ঘরটাকে তার জেলখানাই মনে হচ্ছে। ঘুমাবার জন্যে একটু শুয়েছিল, কিন্তু ঘুম একটুও আসেনি। তার নিজের জন্যে কোন চিন্তা নেই, চিন্তা তার মেরীকে নিয়ে।

মেরী পাশেই শুয়েছিল। আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে সে। একটুও নড়া চড়া নেই। ঘুমোচ্ছে। ছেলে-মানুষ তো, সংসারের ঘোরপ্যাঁচ এবং ভবিষ্যত চিন্তা কিছুই ওদের মাথায় আসেনি। ছোট বেলা থেকেই খুব সরল মেরী মেয়েটি। অন্তরটা কাগজের মত সাদা। কাউকেও রাগ করে দুটো কথা বলতে জানে না। কিন্তু অভিমান খুব। সে অভিমান কাউকে আঘাত করে না, নিজের কষ্টটা নিজের মনেই পুষে রাখে। আমার এই মেয়ের ভাগ্যেই এই ছিল! চোখ দু'টি ভারি হয়ে উঠল জোসেফাইনের।

লেডি জোসেফাইন ধীরে ধীরে মেরীর মুখ থেকে কম্বল সরিয়ে ফেলল। কম্বল সরিয়ে বিস্মিত হলো সে। দেখল, মেরীর দু'চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। বালিশ ভিজে গেছে। মেরী ঘুমোয়নি। চোখ বন্ধ করে আছে।

লেডি জোসেফাইনের বুক তোলপাড় করে উঠল বেদনায়। তারও চোখ থেকে অশ্রু নেমে এল।

মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, মা খুব কষ্ট হচ্ছে?

মেরী চোখ খুলে চোখ মুছে বলল, না মা।

--এমন করে কাঁদছিস যে?

--কিছু না মা, ভালো লাগছে না তাই। অনেকক্ষণ পর জবাব দিল মেরী।

--আমি তোর মা, আমার চেয়ে তোকে কে বুঝে।

একটু থেমে লেডি জোসেফাইনই আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় ঘরে প্রবেশ করল জর্জ জ্যাকব। তার হাতে রিভলভার, চোখ দু'টি লাল।

তাকে ঐভাবে দেখে অন্তরটা কেঁপে উঠল লেডি জোসেফাইনের। হোয়াইট ওলফের নৃশংসতার কথা সে জানে। ভয়ে তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

লেডি জোসেফাইনের দিকে তাকিয়ে ক্রুর হেসে বলল, ভয় পাবেন না, আমি গুলি করতে আসিনি। আমি কয়েকটা কথা জানতে এসেছি।

--কি কথা? বলল লেডি জোসেফাইন।

--আপনারা সালমান শামিলকে বন্দীখানা থেকে বের হতে সাহায্য করেছেন।

--না, এ কথা ঠিক নয়। সালমান শামিল বন্দী আছে-একথাই আমরা জানতাম না। আর সালমান শামিলকে সাহায্য করব কেন, তাকে তো আমরা চিনি না।

--মিথ্যা বলছেন আপনি। সালমান শামিল সোফিয়া এ্যাঞ্জেলারও বন্ধু, মেরীরও বন্ধু। মেরী সোফিয়াদের ওখানে যেত।

--সোফিয়া সেখানে গেছে দু'এক সময় কিন্তু সালমানের সাথে কোনদিনই দেখা হয়নি।

--আমি মেরীর মুখে এ প্রশ্নের উত্তর শুনতে চাই।

মেরী উঠে বসল। জর্জ জ্যাকবের দিকে না তাকিয়েই বলল, যেদিন সালমানকে অজ্ঞান অবস্থায় লেন থেকে আমরা তুলে নিয়ে যাই, তার আগে সালমানকে কোন দিন দেখিনি। আর শুনুন, আমরা মিথ্যা কথা বলি না।

--ষড়যন্ত্রকারীরা মিথ্যা কথা বলে না। বাঃ সুন্দর কথা।

বলে হো হো করে হেসে উঠল জর্জ জ্যাকব। বলল, সালমান শামিলকে বন্দীখানা থেকে উদ্ধার করে তাকে আমাদের মারার হাত থেকে বাঁচানোর পর

আপনারাই ভেতর থেকে আহমদ মুসাকে খবর দিয়েছেন এবং কিভাবে ঢুকতে হবে তারও গোপন তথ্য তাকে জানিয়েছেন।

--মিথ্যা কথা জর্জ। 'আহমদ মুসা' না কি নাম বললে সে নাম এই প্রথম তোমার কাছ থেকে শুনলাম।

--আমি জানি, সোজাভাবে সত্য কথা আপনারা বলবেন না। জিজ্ঞেস করি, আপনার বাসা থেকে সালমানকে সরিয়ে দেবার কি কারণ ছিল, হোয়াইট ওলফের হাত থেকে তাকে বাঁচানো নয় কি? এরপরও বলবেন কোন ষড়যন্ত্র আপনাদের নেই?

--সবার উপর মানবতা বলে একটা জিনিস কি নেই? আমরা অসুস্থ সালমানকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম, তার কি পরিচয় সে হিসেবে নয়। সে একজন মানুষ এই হিসেবে।

--আপনার কাহিনী কেউ বিশ্বাস করবে না, বিশ্বাসযোগ্য নয়। আপনারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই এ ব্যাপারে আমাদের।

একটু থামল জর্জ জ্যাকব। তারপর আবার বলতে শুরু করল, আপনাদের বিচার হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা অপেক্ষা করছি ফাদার পলের। তাকেই বিচারের রায় বাস্তবায়ন করতে হবে। যদি তিনি পারেন তার মঙ্গল। না হলে তাকেও মরতে হবে।

বলে রিভলভার পকেটে ফেলে হন হন করে বেরিয়ে গেল জর্জ জ্যাকব।

জর্জ জ্যাকব কি বলে গেল তা কারও কাছেই অস্পষ্ট নয়। জর্জ জ্যাকব বেরিয়ে যেতেই কেঁদে উঠল লেডি জোসেফাইন।

কিন্তু মেরীর চোখের পানি শুকিয়ে গেছে। তার চোখে-মুখে একটা দৃঢ়তা। মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি কেঁদ না মা, কাঁদলে ওরা খুশিই হবে। মৃত্যু তো একদিন আসবেই। ভয় পাব কেন মৃত্যুকে? আমার একটুও ভয় লাগছে না।

ঘরে এ সময় প্রবেশ করল সভেতলানা, পিটারের স্ত্রী। মেরীদের ঘর থেকে একটা ব্লক ওপারে বৃহৎ বিলাসবহুল এক ফ্ল্যাটে আশ্রয় পেয়েছে।

সে ঘরে প্রবেশ করেই চারদিকে তাকিয়ে বলল, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না খালাম্মা। আপনাদের উপর এমন অভিযোগ এল কেমন করে?

--অপরাধ একটাই, আমরা আহত, অজ্ঞান একজন মানুষকে আশ্রয় দিয়েছিলাম, চিকিৎসা ও শুশ্রুষা করে তাকে বাঁচিয়ে তুলেছিলাম।

--কাকে?

--সালমান শামিলকে। একদিন গভীর রাতে আমাদের লনে তাকে আহত ও অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখি। আমরা তাকে তুলে নিয়ে যাই। পরে তার মুখেই শুনেছিলাম তার নাম শামিল। কিন্তু সে ককেশাস ক্রিসেন্টের লোক তা জানতাম না। জর্জের কাছেই তা শুনলাম।

সভেতলানার মনে পড়ল গত রাতের কথা। যে তিনজন তাদের বাড়ি সার্চ করতে গিয়েছিল তাদের মধ্যে সালমানও ছিল। মনে পড়ল নেতা লোকটির (আহমদ মুসার) কথা। সেই থেকেই তার মনে এক অপার বিস্ময় সৃষ্টি হয়ে আছে। শত্রু আবার অত সুন্দর হয়! জানের দুশমন শত্রুর স্ত্রীকে কেউ বোন বলে ডাকে!

শত্রুকে হত্যা করার সাথে সাথে তার স্ত্রীকে হত্যা করা অথবা শত্রুর সম্পদের সাথে শত্রুর স্ত্রীকে দখল করাই তো নিয়ম। বিশেষ করে হোয়াইট ওলফ তো এটাই করছে, এর উত্তরে ককেশাস ক্রিসেন্ট এ কি আচরণ করল! শত্রুর কেউ ঐভাবে আদর করে কাছে টেনে নেয়!

সভেতলানা তার চিন্তায় ছেদ টেনে বলল, জর্জের এটা বাড়াবাড়ি খালাম্মা। পরাজয় তাকে পাগল করে দিয়েছে।

একটু থামল সভেতলানা, তারপর আবার শুরু করল, আমি সারারাত কেঁদেছি খালাম্মা। কিন্তু একটা বিস্ময়কর জিনিসের কথা আমি ভুলতে পারছি না, যে শত্রুরা আমার স্বামীকে হত্যা করেছে, তারাই আমার স্বামীর মৃত্যুর খবর আমাকে দিয়েছে। কিন্তু এই শত্রুদের দেখে আমি অবাক হয়েছি।

--কার কথা বলছ সভেতলানা?

--সালমান শামিলদের কথা বলছি। সালমান শামিল, সোফিয়া এবং আর একজন নেতামত গত রাতে আমার বাড়িতে গিয়েছিল। তারা পিটারের কাগজপত্র সার্চ করেছে।

--সালমান শামিল, সোফিয়া তোমার বাড়ি গিয়েছিল? তারা পিটারকে হত্যা করেছে?

--কে হত্যা করেছে বলতে পারবো না, তাদের সাথের নেতামত লোকটিই পিটারের মৃত্যুর খবর আমাকে দিয়েছে।

মেরী কথা বলে উঠল এ সময়। বলল, নেতামত ঐ লোকটির নাম আহমদ মুসা। মধ্য এশিয়া, ফিলিস্তিন বিপ্লবের নায়ক হিসেবে যার নাম শুনেছেন তিনিই এ আহমদ মুসা। ককেশাস ক্রিসেন্টকে নেতৃত্ব দেবার জন্যে আর্মেনিয়ায় এসেছেন। আসল ব্যাপার হলো, আহমদ মুসার নেতৃত্বে ককেশাস ক্রিসেন্টের লোকেরা গত রাতে আমবার্ড দুর্গে অভিযান চালিয়েছিল বন্দী সোফিয়া ও সালমান শামিলকে উদ্ধারের জন্যে। এ অভিযানেই মারা যান চাচা পিটারসহ হোয়াইট ওলফের আরো লোকেরা। অভিযান শেষে মুক্ত হবার পর সোফিয়া ও সালমান সার্চ করার কাজে সহায়তা করেছে।

--তুমি এ কথা জান কি করে মেরী? বিস্মিত চোখে প্রশ্ন করল সভেতলানা।

--আমি সালমানকে গীর্জায় লুকিয়ে রাখতে গিয়েছিলাম। আমরা যাওয়ার অল্পক্ষণ পরেই আহমদ মুসা ওখানে আসে সালমানকে উদ্ধার করার জন্যে।

--জানল কি করে?

--ওরা কন্ট্রোল রুম দখল করে নেয়। টেলিভিশন ক্যামেরার মাধ্যমেই ওরা জানতে পারে।

একটু থেমে মেরী বলল, আমি যা বলছিলাম। গীর্জায় এসে আহমদ মুসা যখন সালমানকে নিয়ে যায় তখনই তাদের কথোপকথনে আমি তাদের অভিযানের কথা জানতে পারি।

--তোকে ওরা তো কিছু বলেনি মেরী? বলল লেডী জোসেফাইন।

--কি বলবে মা, আহমদ মুসা আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে চেয়েছে, তোমাকে না বলে সালমানকে নিয়ে যেতে চায়নি। আমিই তো তাদের আসতে বাঁধা দিয়েছি কোন গন্ডগোল হয় এই ভয়ে।

--আমিও তো এই কথাই বলতে চাচ্ছিলাম খালাম্মা। এমন বিস্ময়কর শত্রু থাকতে পারে কোন দিন শুনিনি।

বলে একটু থামল সভেতলানা। তারপর কাঁদতে শুরু করলঃ জানেন খালাম্মা, পিটারের নিহত হওয়ার খবর পেয়ে আমি জ্ঞান হারালাম। তারাই আমার জ্ঞান ফিরিয়ে আনল।

নেতা লোকটি মানে আহমদ মুসা জ্ঞান ফিরলে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, আপনার দুঃখের সাথে আমরাও দুঃখবোধ করছি বোন, কিন্তু আপনি জানেন কি জন্যে কি হয়েছে। তারপর আমার বাড়ি সার্চ করার জন্যে আমার অনুমতি চেয়েছে। আমি যখন বলেছি, পিটার থাকলে এ হুকুম যেমন দিত না, আমিও তা দিতে পারিনা; উত্তরে বলেছে, আপনার মতকে আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু সার্চ আমাদের করতেই হবে। সার্চ করে ফিরে আসার সময় বলেছে, আমার কোন ভয় নেই, সবদিক থেকেই আমি স্বাধীন ও নিরাপদ। মেয়েটিকেও আদর করেছে। অদ্ভুতভাবে জানিয়েও দিয়েছে, তার পিতা ফিরে না আসতে পারে যেমন হাজারো শিশুর পিতা ফিরে আসেনি। আমার মেয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যেতে যেতে সুন্দর এই স্বগতোক্তি করেছেঃ দুনিয়ার সব মানুষ যদি শিশুদের মতো সুন্দর, সরল-সহজ হতো! আমি প্রথমে ওদের দেখে ভয় পেয়েছিলাম, পিটার নিহত হওয়ার খবর পাওয়ার পর আমার ও আমার মেয়ের পরিণতি ভেবে আঁতকে উঠেছিলাম। কিন্তু ব্যবহারে মনে হল, আমি আগের চেয়েও বেশি নিরুদ্বেগ। জর্জ চলে আসার জন্যে জেদ না ধরলে আমি আসতাম না। এমন সুন্দর শত্রুর কথা কোন দিন আমি শুনিনি।

--সত্যিকার মুসলমানদের আচরণ তো এমন। আপনি ক্রুসেডের কাহিনীতে গাজী সালাহউদ্দিনের অদ্ভুত সুন্দর ব্যবহারের কথা পড়েননি? বলল মেরী।

--ঠিক বলেছ মেরী, গাজী সালাহউদ্দিন শত্রু রিচার্ডকে নিরস্ত্র অবস্থায় আঘাত করেননি। নিজের ঘোড়া, তলোয়ার তাকে দিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর অসুস্থ রিচার্ড এর চিকিৎসা করেছিলেন নিজের হেকিম পাঠিয়ে। বলল সভেতলানা।

--খৃস্টান রাজ্য ছেড়ে খৃস্টান প্রজারা পার্শ্ববর্তী মুসলমান রাজ্যে আশ্রয় নেয়ার কথাও তো আমরা পড়েছি। তারপর দেখুন, খৃস্টান বাহিনী জেরুসালেম

দখল করার পর সেখানকার ৭০ হাজার বাসিন্দাকে হত্যা করে। অথচ মুসলিম বাহিনী যখন জেরুসালেম দখল করল তখন একজন মানুষেরও রক্তপাত হয়নি ক্রুসেডের ঘোর অরাজকতার সময়েও। বলল মেরী।

--তোমাদের আলোচনা কোথায় যাচ্ছে জান? বলল লেডি জাসেফাইন।

--জানি, ভালোকে আমরা ভালো বলছি। বলল মেরী।

--এ ভালো বলার অর্থ কি জান? ইসলাম ভালো হয়ে যাচ্ছে তোমাদের কাছে। বলল লেডি জোসেফাইন।

--হতে পারে। মেরী বলল।

--তাহলে তোর অবস্থানটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে?

--মানুষ ভালোকেই তো গ্রহণ করবে।

--চুপ কর মেরী, ছেলে মানুষ তুই।

--ঠিক আছে খালাম্মা, ওটা ওর আবেগের কথা বলেছে। আমিও ওর সাথে একমত। গত রাতে শক্রর যে চরিত্র দেখলাম, তার স্রষ্টা যদি ইসলাম হয় তাহলে সে ধর্ম অবশ্যই স্বাগত জানানোর যোগ্য। বলল সভেতলানা।

বলে সভেতলানা উঠে দাঁড়ালো। বলল, আসি খালাম্মা।

মেরীদের রুম থেকে একটা ব্লক পরেই সভেতলানার এপার্টমেন্ট। দু'টি শোবার ঘর, দু'টি বাথরুম, একটা রান্নাঘর ও একটা ড্রইংরুম নিয়ে এই এপার্টমেন্ট। সভেতলানার শোবার ঘরের পাশেই আরেকটি শোবার ঘর। সেখানে ঘুমোচ্ছে সভেতলানার মেয়ে। সভেতলানা এসে তার ঘরের ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরে প্রবেশ করেই চমকে উঠলো। তার বিছানায় শুয়ে জর্জ জ্যাকব।

সভেতলানা ঘরে ঢুকতেই জর্জ জ্যাকব উঠে বসল। তার ঠোঁটে হাসি, চোখে চকচকে দৃষ্টি।

সে চোখের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলো সভেতলানা। তবু সাহস করে বলল, আপনি এখানে কেন?

নির্লজ্জ হেসে জ্যাকব বলল, অনুমতি না নিয়ে তোমার বিছানায় শুয়েছি। অন্যায় হয়েছে। এবার অনুমতি দাও।

ঘৃণায় সর্বাঙ্গ রি রি করে উঠলো সভেতলানার। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল সভেতলানা।

সংগে সংগেই লাফ দিয়ে নামলো জর্জ জ্যাকব বিছানা থেকে। দরজার দিকে ছুটলো সভেতলানাকে ধরার জন্যে।

সভেতলানা ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটলো মেরীদের ঘরের দিকে। তার পেছনে ছুটলো জ্যাকব। সভেতলানা দৌঁড়ে জ্যাকবের সাথে পারবে কেন। উভয়ের দূরত্বটা তাড়াতাড়িই কমে এলো।

আহমদ মুসার জীপ এজমেয়াদজিন শহরের উপকণ্ঠে যখন পৌঁছল, তখন সকাল পৌনে আটটা।

মাইকেল পিটারের ডায়রী থেকে পাওয়া এজমেয়াদজিনে তৈরি হোয়াইট ওলফের ঘাঁটির স্কেচ চোখের সামনে মেলে ধরল। দেখল, ম্যাটেনাদারান রোডের উত্তর পার্শ্বে ঘাঁটিটি তৈরি হয়েছে। কিন্তু ঘাঁটির মুখ দক্ষিণমুখী অর্থাৎ রাস্তার দিকে নয়। ঘাঁটির সামনের দিকটা পশ্চিমে।

ম্যাটেনাদারান রোডের নাম বিশ্ববিখ্যাত ম্যাটেনাদারান লাইব্রেরীর নাম থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

ম্যাটেনাদারান লাইব্রেরী এবং রিপ সাইম গীর্জা ৭ম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত। এজমেয়াদজিন শহরের পত্তনও তখনি। পাহাড়ের উঁচু এক উপত্যকায় শহরটি অবস্থিত।

আহমদ মুসার জীপ আবার ছুটে চললো। নগরীর ভেতরে প্রবেশ করেছে জীপ। ড্রাইভিং সিটে ওসমান এফেন্দী। তার পাশে আলী আজিমভ। পেছনের সিটে আহমদ মুসা।

ম্যাটেনাদারান রাস্তা খুঁজে পেতে কষ্ট হলো না। প্রায় সব রাস্তার মোড়ে ম্যাটেনাদারান লাইব্রেরীর দিক নির্দেশিকা আছে। আর্মেনিয়ায় আসা কোন পর্যটকই ম্যাটেনাদারান লাইব্রেরী না দেখে ঘরে ফেরে না।

ম্যাটেনাদারান রোডে তারা পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবেশ করলো। অতএব হোয়াইট ওলফের ঘাঁটি পড়বে বাম পাশে। আহমদ মুসা ওসমান এফেন্দীকে গাড়ি ধীরে চালাতে বলল।

আহমদ মুসা মনে মনে হিসাব করছিল, এজমেয়াদজিন আসলে সদ্য নির্মিত ঘাঁটি। এখানে প্রতিরোধের ভালো ব্যবস্থা থাকা স্বাভাবিক নয়। সুযোগ পেলেই তারা এখন এ ঘাঁটিটিকে সংহত করবে, শক্তিশালী করবে সন্দেহ নেই। কিন্তু সুযোগ তারা পায় নি এবং তারা এত দ্রুত আক্রান্ত হবে এমন ধারণা করা তাদের জন্যে স্বাভাবিক নয়। আমরা সোফিয়া ও সালমান শামিলকে মুক্ত করেই দু'একদিন ব্যস্ত থাকবো এ চিন্তা তারা করতে পারে।

ম্যাটেনাদারান রোডের মাঝামাঝি আসতেই প্রাচীর ঘেরা একটা বিশাল বাড়ির উপর তার চোখ আটকে গেল। স্কেচম্যাপের সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে বাড়িটি। এটাই তাহলে হোয়াইট ওলফের গোপন নতুন ঘাঁটি।

বাড়ির সামনে বাউন্ডারী ওয়ালের সাথে বিশাল গেট। ভেতরে গেটের সামনে বড় গেটরুম। গেটরুমটাও গেটের মতো উঁচু।

আর্মেনিয়ায় সকাল ৮টা মানে খুবই সকাল। রাস্তা প্রায় জনশূন্য। কদাচিত দু'একজন লোক চোখে পড়ে যারা দ্রুত হাঁটছে তাদের জরুরি কাজের তাড়ায়। অতি জরুরি কাজ না থাকলে এই সাত-সকালে কেউই ঘরের বাহির হয় না।

ঘাঁটির সীমানা পেরিয়ে অনেক দূর যাওয়ার পর গাড়ি আবার ঘুরলো। ঘাঁটি থেকে একটু আগে আহমদ মুসা নেমে গেল। বলল, আমি বাড়ির পেছন দিয়ে ঢুকবো। তোমরা ঠিক এখন থেকে পনের মিনিট পরে গেটে গিয়ে হাজির হবে।

গাড়ি চলে গেল।

আহমদ মুসা হেঁটে গিয়ে বাড়ির উত্তর দেয়ালের গোড়ায় গিয়ে দাঁড়ালো।

বাড়ি থেকে উত্তর দিকে গজ পঞ্চাশেক দূরে একটি গীর্জা। এদিকটি গীর্জার পেছন দিক।

আহমদ মুসা উত্তর প্রাচীরের পূর্বাংশে একটা জায়গা বেছে নিয়ে দাঁড়াল। প্রাচীরটি প্রায় ১৫ফিটের মতো উঁচু। আহমদ মুসা পকেট থেকে নাইলন কর্ড বের করে হুক লাগানো মাথা ছুঁড়লো প্রাচীরের মাথা লক্ষ্যে। অব্যর্থ লক্ষ্য। প্রাচীরের মাথার সাথে গেঁথে গেল হুক।

আহমদ মুসা দড়ি বেয়ে তর তর করে উঠে গেল প্রাচীরের মাথায়। কিন্তু মাথায় উঠেই তার মাথা ঘুরে গেল নিচের দিকে তাকিয়ে। নিচে প্রাচীর বরাবর গভীর খাদ। ছোট-খাট খালের মতই। কিন্তু শুকনো! মনে হয়, সময়ে এটা পানিতে পূর্ণ করে রাখা হবে। খাদের ওপার বরাবর অনুরূপ আরেকটা প্রাচীরের প্রতিবন্ধক।

আহমদ মুসা নিচে নামার চাইতে সামনের প্রাচীরে আরেকটা হুক লাগিয়ে দড়ির ব্রীজ তৈরি করে পার হওয়াই সহজ ও দ্রুততর হবে মনে করলো।

সংগে সংগে পিঠের ব্যাগ থেকে অপেক্ষাকৃত মোটা নাইলন কর্ড বের করে তার হুক ছুঁড়ে দিল ওপারের প্রাচীরের মাথায়। গেঁথে গেল হুক। তারপর নাইলন দড়ির মাথাটি এ প্রাচীরের হুকের সাথে বেঁধে ঝুলে পড়লো দড়িতে। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ওপারের প্রাচীরের মাথায় উঠে বসলো আহমদ মুসা। তারপর নাইলন কর্ড গুছিয়ে নিয়ে ব্যাগে রেখে লাফিয়ে পড়ল নিচে মাটিতে।

লাফিয়ে পড়ে নিচে মাটির উপর চোখ পড়তেই চমকে উঠল আহমদ মুসা। বিদ্যুৎবাহী সূক্ষ্ম তামার তার নগ্নভাবে মুখ ব্যাদান করে আছে।

গায়ে একটা হিমশীতল স্রোত বয়ে গেল আহমদ মুসার। পায়ে রাবার জুতা এবং হাতে রাবারের গ্লোভস না থাকলে কিংবা লাফ দিয়ে পড়ে গেলেই তার সব শেষ হয়ে যেত এতক্ষণে।

আহমদ মুসা একটু সরে গিয়ে দাঁড়াতেই আবার তার খেয়াল হলো, এই বিদ্যুৎবাহী তারের সাথে কোনো এলার্মের সংযোজন নেই তো!

আহমদ মুসা চঞ্চলভাবে চারদিকে তাকালো। দেখল, দক্ষিণ এবং পশ্চিমে সারিবদ্ধ বিল্ডিং। তবে সামনেই প্রাচীরঘেরা ছোট একটি একতলা বাড়ি। সে প্রাচীরের পাশেই দ্রাক্ষা লতার ছোট্ট একটা ঝোপ।

আহমদ মুসা দৌঁড় দিয়ে গিয়ে সেই দ্রাক্ষার ঝোপের আড়ালে লুকাল।

আহমদ মুসার অনুমান মিথ্যা হলো না। মিনিটখানেকের মধ্যেই বিল্ডিং এর সারির পেছন দিক দিয়ে তিনজন লোক স্টেনগান বাগিয়ে বেড়ালের মতো নিঃশব্দ পায়ে ছুটে এলো এবং তারা আহমদ মুসা যেখানে লাফ দিয়ে পড়েছিল,

সেখানে ঝুঁকে পড়ে সম্ভবত মাটি পরীক্ষা করেই উঠে দাঁড়াল। চঞ্চল ও সন্ধানী চোখ তাদের চারদিকে ঘুরতে লাগল।

আহমদ মুসা বিস্মিত হলো, যেখানে সে লাফ দিয়ে পড়েছিল ঠিক সেখানে এসে তারা ঝুঁকে পড়ল কেন, জায়গাটা তারা চিহ্নিত করল কেমন করে? ওদের সিগন্যালিং সিস্টেম কি কম্পিউটারাইজড!

লোক তিনজন কয়েক মুহূর্ত এদিক-ওদিক দেখার পর ছুটে এল দ্রাক্ষার সেই ঝোপের দিকে।

আহমদ মুসা তৈরি ছিল। সাইলেন্সার লাগানো এম-১০ এর মুখ সে তুলে ধরল লোক তিনটির দিকে। তর্জনী দিয়ে চাপ দিল ট্রিগারে। হালকা একটা শিষ দিয়ে ছুটে গেল বুলেটের ঝাঁক। দ্রাক্ষার ঝোপ থেকে গজতিনেক দূরে তিনজনই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

আহমদ মুসা এম-১০ এর নল নামাতে যাচ্ছে, এমন সময় দক্ষিণ থেকে আরও তিনজন ছুটে এল। ওরা তিনটি লাশের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা ওদের আর সুযোগ দিল না।

তার এম-১০ এর মাথা পুনরায় উঁচু হল। বেরিয়ে গেল নিঃশব্দে একরাশ গুলি। ওরা তিনজন যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই পড়ে গেল।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়িয়ে একটু উৎকর্ণ হল। কোত্থেকে মাঝে মাঝে যেন পুরুষ কণ্ঠে একটা আল্লাহ শব্দ ভেসে আসছে। কিছুক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে থেকে বুঝল, শব্দটি আসছে প্রাচীর ঘেরা একতলা বাড়িটা থেকে।

বাড়িটা মনে হয় হোয়াইট ওলফের একটা বন্দীখানা হবে।

কিন্তু এদিকে এখন নজর দেয়ার সময় নেই। আগে ঘাঁটির প্রতিরোধকে নিষ্ক্রিয় করতে হবে।

আহমদ মুসা ছুটতে যাচ্ছিল প্রাচীর ও বিল্ডিং এর সারির মাঝখান দিয়ে পশ্চিম দিকে গেট লক্ষ্য করে। এমন সময় নারী কণ্ঠের একটা চিৎকার ভেসে এল, বাঁচাও, বাঁচাও----।

আহমদ মুসা থমকে দাঁড়াল। তারপর শব্দ লক্ষ্য করে ঘুরে সেদিকে ছুটল। কিছুদূর এগিয়ে দুই ফ্ল্যাটের মাঝখান দিয়ে ফ্ল্যাটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দেখল, একজন পুরুষ একটি মেয়েকে করিডোর দিয়ে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে আসছে। মেয়েটিকে চিনতে পারল আহমদ মুসা, পিটারের স্ত্রী।

আহমদ মুসা থেকে ওরা পাঁচ-ছয় গজ দূরে। পুরুষটিকে লক্ষ্য করে আহমদ মুসা ধীর, কিন্তু কঠোর কণ্ঠে নির্দেশ দিল, ছেড়ে দাও মেয়েটিকে।

লোকটি মেয়েটিকে ধরে রেখেই আহমদ মুসার দিকে মুখ ফিরাল। বিস্ময় তার চোখে-মুখে। পরক্ষণেই মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়ে চোখের পলকে লোকটি পকেট থেকে রিভলভার বের করল। মেয়েটি ছুটে সরে গেল।

আহমদ মুসার এম-১০ মুখ উঁচু করেই ছিল। যখন আহমদ মুসা দেখল, বেপরোয়া লোকটি গুলি করবেই, তখন আহমদ মুসা তার ট্রিগারে চাপ না দিয়ে পারল না।

লোকটি গুলিবিদ্ধ ঝাঁঝরা দেহ নিয়ে লুটিয়ে পড়ল করিডোরে।

লোকটি গুলিবিদ্ধ হবার আগেই সম্ভবত তার রিভলভারের ট্রিগার টিপেছিল। কিন্তু রিভলভারের নলটি তখনও আহমদ মুসা পর্যন্ত উঁচু হতে পারেনি। তার রিভলবারের গুলি গিয়ে বিদ্ধ করল করিডোরের মেঝেকে।

লোকটি যে ফ্ল্যাটের করিডোরে নিহত হলো, তার দক্ষিণ পাশের ছোট ফ্ল্যাটটিই মেরীদের। ভীত-সন্ত্রস্ত মেরীরা দরজায় দাঁড়িয়েছিল। ওখানেই গিয়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল মাইকেল পিটারের স্ত্রী সভেতলানা।

গুলি করেই আহমদ মুসা ওদিকে তাকাল। মেরীকে দেখে তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দ্রুত এগিয়ে গেল তাদের দিকে।

--মেরী, এই যে লোকটি মারা গেল, তাকে চেন? দ্রুত কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

--চিনি, জর্জ জ্যাকব। উজ্জ্বল চোখে বলল মেরী।

--জর্জ জ্যাকব?

বলেই আহমদ মুসা জর্জ জ্যাকবের লাশের দিকে একবার তাকাল।

তারপর মুখ ফিরিয়েই বলল, মেরী তোমরা ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে থাক, আমি না ফেরা পর্যন্ত।

বলে আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়াল। ঘুরে দাঁড়িয়েই দেখল, সামনের পূর্ব-পশ্চিম লম্বা বিল্ডিং-এর করিডোর দিয়ে চারজন লোক ছুটে আসছে স্টেনগান উঁচিয়ে।

আহমদ মুসা চিৎকার করে মেরীদের আবার সরে যেতে বলেই শুয়ে পড়ল মাটিতে। তারপর দ্রুত গড়িয়ে একটি পিলারের আড়ালে চলে গেল এবং সংগে সংগেই শুয়ে থেকেই এম-১০ এর ট্রিগার চেপে ধরল তাদের লক্ষ্য করে।

ছুটে আসা লোকদের স্টেনগানের প্রথম এক ঝাঁক গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। আহমদ মুসা শুয়ে পড়ায় গুলির ঝাঁক তার মাথার উপর দিয়ে চলে যায়। কিন্তু দ্বিতীয়বার আহমদ মুসাকে টার্গেট করার আগেই আহমদ মুসার এম-১০ এর বৃষ্টির মত গুলির ঝাঁক তাদেরকে ছেঁকে ধরল। কিন্তু তাদের অব্যাহত এলোপাথাড়ি গুলির একটি আহমদ মুসার বাম কাঁধের নিচে বাহুর এক খাবলা গোশত তুলে নিয়ে গেল।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। দেখল, স্টেনগানের গুলি মেরীরা যে ঘরে ঢুকেছে তার দরজা, দেয়াল ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে। আহমদ মুসা আরও কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়াল। না, কোন দিক থেকে কেউ আসছে না। আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকাল বেলা আটটা পনের মিনিট।

আহমদ মুসা পকেট থেকে মিনি ওয়াকি টকি বের করে বলল, আলী আজিমভ, তোমরা গেটে? আচ্ছা শোন। এদিকে ওদের এগার জন বিদায় হয়েছে, আমি গেটের দিকে আসছি।

মেরী ও সভেতলানা আস্তে আস্তে দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল। তারা দেখল, আহমদ মুসার বামবাহুর সোয়েটার রক্তে ভিজে গেছে। হাত দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

আহমদ মুসা ওয়াকি টকি পকেটে রেখে চলতে উদ্যত হল। এই সময় মেরী ও সভেতলানা সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, কি সর্বনাশ, আপনার গুলি লেগেছে তো!

আহমদ মুসা থমকে দাঁড়িয়ে একটু হেসে বাম বাহুর দিকে তাকিয়ে ডান হাত দিয়ে বাম বাহুটা চেপে ধরে বলল, এখন দাঁড়াবার সময় নেই মেরী, আসছি। তোমরা ঘরে দরজা বন্ধ করে থাক। বলে আহমদ মুসা দ্রুত পা বাড়াল সামনে।

পেছনে তার দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল মেরী ও সভেতলানা। সভেতলানা স্বগতঃ কণ্ঠে বলল, আশ্চর্য মানুষ, গত রাতে আমার দেখা আহমদ মুসা এবং আজকের রণাঙ্গনের আহমদ মুসার মধ্যে কত পার্থক্য! সময়ে মোমের মত নরম, আবার বজ্রের মত কঠোর।

গেট পর্যন্ত আহমদ মুসাকে আর কোন বাঁধার মুখোমুখি হতে হলো না। গেটে যাওয়ার আগে আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখল, গেটরুমের এদিকের দরজার দু'জন লোক স্টেনগানের ট্রিগারে হাত রেখে অস্থিরভাবে পায়চারি করছে। মাঝে মাঝে ওয়াকি টকিতে অস্থিরভাবে কাকে যেন ডাকছে। ভাল করে শুনে বুঝল, জর্জ জ্যাকবকে কল করছে। থামল আহমদ মুসা। বেচারারা জানে না, জর্জ জ্যাকব আর এ আহবানে সাড়া দেবার জন্যে দুনিয়াতে নেই।

আহমদ মুসা এম-১০ এর স্থির লক্ষ্য তাদের দিকে তুলে ধরে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল।

আহমদ মুসাকে দেখেই প্রহরী দু'জন বিদ্যুৎ বেগে তাদের স্টেনগান উপরে তুলল। তাদের চোখে চমকে উঠা বা ভয়ের লেশমাত্র নেই।

কিন্তু আহমদ মুসার লক্ষ্য আগে থেকেই স্থির ছিল। তারা তাদের স্টেনগান যখন উপরে তুলছিল, আহমদ মুসার এম-১০ থেকে তখন গুলির ঝাঁক বেরিয়ে গেল। তারা ট্রিগার চাপার আর সময় পেল না, লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

আহমদ মুসা লোক দু'টির দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। অন্যায়ের জন্যে এত আন্তরিকভাবে, এমন নির্ভীকভাবে জীবন দিতে আর কাউকেই সে দেখেনি। সার্থক হোয়াইট ওলফের ট্রেনিং এবং মোটিভেশন।

আহমদ মুসা গেটরুমের ভেতরে গিয়ে সুইচ টিপে গেট খুলে দিল। গেটে দাঁড়িয়ে ছিল আলী আজিমভ ও ওসমান এফেন্দী। তারা ভেতরে ঢুকল।

আবার গেট বন্ধ হয়ে গেল।

আলী আজিমভ ও ওসমান এফেন্দী আহমদ মুসার বাম বাহুর দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল।

মুসা ভাই আপনি আহত? দু'জনের স্বর একসংগেই কঁকিয়ে উঠল।

'ও তেমন কিছু নয়, এস তোমরা ভেতরে'–বলে আহমদ মুসা ভেতরে হাঁটা দিল।

তার পেছনে পেছনে আলী আজিমভ ও ওসমান এফেন্দী। হাঁটতে হাঁটতে আহমদ মুসার মনে পড়ল বন্দীখানার সেই বন্দীর কথা যে 'আল্লাহ আল্লাহ' বলে বিলাপ করে চলেছে।

তার কথা মনে হতেই আহমদ মুসা তার হাঁটা দ্রুততর করে দিল।

সাইমুম সিরিজের পরবর্তী বই

# বলকানের কান্না

# কৃতজ্ঞতায়ঃ


1. Shaikh Noor-E-Alam
2. Ismail Jabihullah
3. Meah Imtiaz Zulkarnain
4. Rabiul Islam
5. AMM Abdul Momen Nahid
6. Rubel Hasan Mon
7. Foysal Ahmad
8. Abdullah Mohammad Choton
9. Mohammad Rayhan
10. Md. Samsuzzaman
11. Kamrul Alam
12. Gaziur Rahman
13. Khondakar Moniruzzaman
14. Salahuddin Nasim
15. Osman Gani
16. A.S.M Masudul Alam
17. Munjur Morshed
18. Anisur Rahman
19. Sabuz Miah
20. Umayir Chowdhury
21. Ridwan Mahmud
22. Syed Murtuza Baker
23. Ataus Samad Masrur
24. Md Nazmul Islam
25. Shabbir Ahmad
26. Nazrul Islam

# সাইমুম-১০

# বলকানের কান্না

আবুল আসাদ

# ১

আহমদ মুসা, আলি আজিমভ ও ওসমান এফেন্দী মেরীদের ঘরের সামনে আসতেই মেরী, মেরীর মা এবং সভেৎলানা দরজা খুলে বেরিয়ে এল।

ওদের চোখে-মুখে আনন্দ।

আহমদ মুসা মেরীদের দিকে তাকিয়ে বলল, হোয়াইট ওলফের কেউ আর এ ঘাটিতে বেঁচে নেই। এখন নিরাপদ তোমরা। তোমরা আর একটু অপেক্ষা কর এখানে। আলি আজিমভ ও ওসমান এফেন্দী ঘাটিটা একবার সার্চ করে আসুক। আমার বন্দীখানায় একটু কাজ আছে।

বলে আহমদ মুসা পা তুলল যাবার জন্যে।

সভেৎলানা আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, একটু দাঁড়ান জনাব, ফাষ্ট এইডের ব্যাগ একটা পেয়েছি। আপনার আহত স্থানটা বেধে দেবে, এখনও রক্ত ঝরছে ওখান থেকে।

সভেৎলানা ফাষ্ট এইডের ব্যাগটি তুলে দিল আলি আজিমভের হাতে।

আলি আজিমভ সভেৎলানার হাত থেকে ব্যাগটি নিয়ে তাকে শুকরিয়া জানাল। তারপর আহমদ মুসাকে টেনে পাশের বিল্ডিং এর আড়ালে নিয়ে গেল।

খুলে ফেলল তার সোয়েটার, জামা। দেড় ইঞ্চি পরিমাণ গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে কাঁধের নিচে বাম বাহুর সামনের উপর।

ব্যান্ডেজ হয়ে গেলে আহমদ মুসা ছুটল সেই দেয়াল ঘেরা একতলা বন্দীখানার দিকে।

বন্দীখানার চারিদিক দিয়ে দেওয়াল। উঁচু দেয়ালের উপর কাটাতারের বেড়া। বন্দীখানায় ঢোকার উঁচু গেট। ইস্পাতের দরজা।

আহমদ মুসা দরজার সামনে দাড়িয়ে প্রথমে পরীক্ষা করল দরজা বিদ্যুতায়িত কিনা? বিদ্যুতায়িত নয় নিশ্চিত হবার পর দরজা খোলার চেষ্টা করল। বুঝল দরজা স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার অধীন। কন্ট্রোল রুম থেকেই দরজা খোলা-বন্ধ করা হয়। কিন্তু কন্ট্রোল রুমে যাবার এখন সময় নেই আহমদ মুসার। সে পকেট থেকে লেসার কাটার বের করল। কাটারের লাল সুইচটি চেপে তা দরজার চারদিকে একবার ঘুরিয়ে নিল। ইস্পাতের ভারি পাল্লাটি পড়ে গেল সশব্দে।

ভেতরে প্রবেশ করল আহমদ মুসা। তিন দিকে ঘুরানো একতলা বিল্ডিং।

উত্তরদিকের একটা কক্ষ থেকে 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' শব্দ শুনতে পেয়েছিল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা এগিয়ে গেল উত্তর দিকের ঘর গুলোর দিকে। সবগুলো ঘরের দরজা বন্ধ, মাত্র একটা ঘরের দরজা দেখতে পেল আধ-খোলা অবস্থায়। সে দরজার দিকে এগুলো আহমদ মুসা।

দরজা ঠেলে ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করল সে।

ছোট্ট ঘর। কোন আসবাব পত্র নেই। ঘরের এককোণে একটা প্লাষ্টিক বেদির উপর বড় ধরনের একটা পানির ফ্লাক্স। আর ঘরের এক পাশে ষ্টিলের খাটিয়া।

ঘরে ঢোকার পরেই খাটিয়ার উপর নজর পড়ল আহমদ মুসার। একজন যুবক কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে খাটিয়ার উপর।

আহমদ মুসা কাছে এগিয়ে গেল।

যুবকটির গলা পর্যন্ত কম্বলে ঢাকা। চোখ বন্ধ তার। ঘুমিয়ে পড়েছে। একেবারে তরুণ যুবক। সাদা ইউরোপীয় চেহারা। কিন্তু ঘন কালো কোকড়ানো

চুল দেখতে এশিয়ানদের মত। গভীর কালো ভ্রু। মুখে প্রচন্ড ক্লান্তির ছাপ। কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে উঠেছে তার মুখের আকর্ষণীয় আভিজাত্য।

দেখেই আহমদ মুসা বুঝল, দেহে কিছু তুর্কি বৈশিষ্ট থাকলেও লোকটা ইউরোপীয়। আগে 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' শব্দ শুনেছে, এখন তার কপালে সিজদার চিহ্ন দেকে বুঝল লোকটা মুসলমান।

আহমদ মুসা কিছুটা বিস্মিতই হলো। বিশ-বাইশ বছরের ইউরোপীয় মুসলিম যুবক আর্মেনীয় হোয়াইট ওলফের হাতে কেন?

আহমদ মুসা আরও কাছে এগিয়ে গেল।

যুবকটির সরল-নিষ্পাপ মুখচ্ছবি আহমদ মুসার মনে মায়ার সৃষ্টি করল।

আহমদ মুসা আস্তে আস্তে হাত রাখল তার মাথায়। কপালে হাত ঠেকতেই চমকে উঠল আহমদ মুসা'- কপাল ভীষণ গরম, যুবকটির গায়ে জ্বর। মাথায় হাত রাখতেই যুবকটি চমকে উঠে চোখ মেলল।

যুবকটির চোখ থেকে চমকে ওঠা ভাব কেটে যেতেই তাতে বিস্ময় ফুটে উঠল।

-আসসালামু আলাইকুম। আহমদ মুসা সালাম দিল যুবকটিকে।

-ওয়া আলায়কুম। অস্ফুটে ঠোট নেড়ে বলল যুবকটি।

যুবকটির চোখে তখনও বিস্ময়ের ঘোর।

-তোমাকে যারা আটকে রেখেছিল, তারা এখন কেউ নেই, তাদের পতন ঘটেছে। আমরা তোমার শুভাকাঙ্খী।

কথাটা শুনে যুবকটির চোখে একটা পলক পড়ল মাত্র। ঠোটে শুষ্ক হাসির একটা ক্ষীণ রেখা ফুটে উঠতেও দেখা গেল।

আহমদ মুসা বিস্মিত হলেন। যে সংবাদে যুবকটির আনন্দে উজ্জ্বল হবার কথা ছিল, তাকে এমন নির্লিপ্তভাবে যুবকটি গ্রহণ করল কেন? এমনটি তো সাধারণত হয় না!

কি কথা বলছ না যে, খুশী হওনি? বলল আহমদ মুসা।

যুবকটির ঠোটে এবার ম্লান হাসি ফুটে উঠল। বলল জি খুশী হয়েছি। শুকরিয়া। পরিষ্কার ইংরেজিতে বলল যুবকটি। বলে যুবকটি উঠে বসল।

গা থকে কম্বল পড়ে গেল। দেখা গেল দুই হাত শিকল দিয়ে বাধা। এক ফুট লম্বা শিকল।

আহমদ মুসা পকেট থেকে লেসার কাটার বের করে লেসার বীম দিয়ে শিকলের মাঝখানটা কেটে দিল।

দু''হাতে দু''প্রান্তের অবশিষ্ট অংশ ঝুলতে লাগল।

আহমদ মুসা সেদিকে তাকিয়ে বলল, ওগুলো পরে কেটে ফেলা যাবে।

''আরেকটি শিকল আছে'' বলে যুবকটি পা বের করল। দেখা গেল আগের মত করেই ১ ফুট লম্বা শিকল দিয়ে পা''দুটি বাধা। যা দিয়ে এক পা দু'পা করে হাটা যায় মাত্র।

আহমদ মুসা লেসার কাটারের লেসার বীম দিয়ে পায়ের শিকলটিও ঐভাবে কেটে দিল।

যুবকটি বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে দেখছিল লেসার বীমের অলৌকিক কাজ। বলল, লেসার পিস্তল, লেসার কাটারের কথা শুনেছিলাম। আজ দেখলাম।

যুবকটির চোখে এই প্রথমবারের মত একটা ঔজ্জল্য দেখা গেল। আহমদ মুসা খাটিয়ায় যুবকটির পাশে বসল। বলল, তুমি কে ভাই?

-লোকে আমাকে 'পল' বলে জানে।

-'পল' কেন?

-বাইরে সবার কাছে আমি খৃষ্টান নামে এবং খৃষ্টান বলেই পরিচিত।

-কিন্তু তোমার নাম?

-হাসান সেনজিক।

-কিন্তু তুমি কে? হোয়াইট ওলফের হাতে তুমি বন্দী কেন?

প্রশ্নটির তৎক্ষণাৎ কোন উত্তর দিলনা হাসান সেনজিক। উদাস চোখে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা খুটিয়ে খুটিয়ে দেখছিল যুবকটিকে। ইউরোপীয় চেহারা। দেখতে স্লাভদের মত। বুলগেরিয়া, যুগোশ্লোভিয়ার মত কোন বলকান দেশের সে মানুষ হবে।

এক সময় যুবকটি ধীরে ধীরে চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল, ''আমি এক হতভাগা''। কথার সাথে সাথে মুখটা তার আরও মলিন হয়ে উঠল।

একটু থেমে যুবকটি আবার বলতে শুরু করল, আমার বাড়ি আছে, দেশ আছে, কিন্তু আমি যাযাবর। বলা যায়, হোয়াইট ওলফের হাতে আমি পণবন্দী। এরা আমাকে বন্দী করে রেখেছে টাকার বিনিময়ে বলকানের ''মিলেশ বাহিনী'র' হাতে তুলে দেবার জন্যে।

-তোমার অপরাধ?

-অপরাধ আমি সার্ভিয়া-রাজ ষ্টিফেনের বংশধর, দ্বিতীয় অপরাধ আমি মুসলমান।

-সার্ভিয়ার রাজা লাজারাসের পুত্র রাজা ষ্টিফেন?

-মুসলমান হওয়া অপরাধ বুঝলাম,কিন্তু ষ্টিফেনের বংশধর হওয়া অপরাধ হলো কেন?

-ষ্টিফেন যেহেতু অপরাধী,তার বংশধরাও অপরাধী।

-ষ্টিফেনের কোনটাকে তারা এত বড় অপরাধ ধরে?

সবটাকেই -সার্ভিয়া-রাজষ্টিফেন তুরস্কের সুলতান বায়েজিদের সাথে মৈত্রী স্থাপন করেছিলেন,তার বোন লেডী ডেসপিনাকে সুলতানের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন,সমগ্র ইউরোপ যখন সুলতান বায়েজিদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড ঘোষনা করেছিলো, খৃষ্টান হওয়া সত্বেও ষ্টিফেন সে 'ক্রুসেডে যোগ দেননি',লেডী ডেসপিনার প্রভাব ও চেষ্টায় শুধু ষ্টিফেন পরিবার নয়,সার্ভিয়া,বসনিয়া, কসোভো,আলবেনিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে ইসলাম আসন গেড়ে বসে।

সুলতান বায়েজিদ তুরস্কের খলিফা সুলতান মুরাদের ছেলে। সুলতান মুরাদ ১৩৮৯ খৃষ্টাব্দে কসভোর যুদ্ধে মধ্য ও পুর্ব ইউরোপের মিলিত শক্তিকে পরাভূত ও পর্যুদস্ত করলে সার্ভিয়ার রাজা ষ্টিফেনের মত আনেকেই তুর্কি সুলতানের আনুগত্য স্বীকার করে এবং মিত্র হয়। ষ্টিফেন ছাড়া সকলেই বিশ্বাস ঘাতকতা করে। ষ্টিফেন যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন শত প্রতিকুলতাও সমগ্র খৃষ্টান ইউরোপের ক্রোধ বহ্নির শিকার হওয়া সত্বেও সুলতানকে দেয়া ওয়াদার প্রতি তিনি বিশ্বস্ত থেকেছেন। ১৩৯৪ খৃষ্টাব্দে পোপ নবম বেনিফেসের নির্দেশে

তুর্কি খিলাফাতের বিরুদ্ধে যে ক্রুসেড ঘোষিত হয়, ষ্টিফেন তাতে যোগদান না করায় ইউরোপের খৃষ্টান মিলিত শক্তি লুন্ঠন ও হত্যার মাধ্যমে ষ্টিফেনের রাজ্য উৎসন্ন করে ছাড়ে।

-শত শত বছর পার হলেও ষ্টিফেনের সেই ‘পাপ’ এখনো মোচন হয়নি? বলল আহমদ মুসা।

-না হয়নি। তবে হিংসাত্নক এ বিষয়টা ১৯৩০ সাল থেকে নতুন রূপ নিয়েছে। এ সময় সার্ভিয়াকে কেন্দ্র করে বলকান অঞ্চলে ‘মিলেশ বাহিনি'গঠিত হয়। তারা-‘ফাইনাল সলিউশন' অর্থাৎ ‘নির্মূল অভিযান'পরিকল্পনা গ্রহন করে। হত্যা উচ্ছেদের মাধ্যমে বলকান অঞ্চল থেকে মুসলমানদের উচ্ছেদ এর লক্ষ্য। আর এরই একটা অংশ ষ্টিফেন পরিবারকে ধ্বংস করার জন্য ষ্টিফেন- পরিবারের পুরুষ সদস্যদের তারা হত্যা করে আসছে। বংশের গুরুত্বপূর্ন পুরুষ শিশুরা তাদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। ‘মিলেশ বাহিনি'এ পর্যন্ত-ষ্টিফেন পরিবারের বিরাশি জন পুরুষ সদস্যকে হত্যা করেছে। বিশৃঙ্খল-বিপর্যস্ত ষ্টিফেন পরিবার আজ চোখের জলে ভাসছে,আতংক আর আহাজারিতে নিষ্পেষিত হচ্ছে।

থামল হাসান সেনজিক।

আহমদ মুসা গভীর মনোযোগের সাথে হাসান সেনজিকের কথা শুনছিল। তার চোখ দু'টি হাসান সেনজিকের মুখের উপর নিবন্ধ।

-ষ্টিফেন পরিবারে তোমার অবস্থান কোথায় হাসান? প্রশ্ন করল আহমদ মুসা।

-ষ্টিফেনের বড় ছেলের ছেলে মুহাম্মাদের সাথে লেডি ডেসপিনার নাতনির বিয়ে হয়। তাঁরা আমার উত্তম পুরুষ। এই বংশ ধারার পুরুষ,শিশু ও যুবকের মধ্যে আমিই একমাত্র জীবিত আছি। বংশের অন্যধারা গুলোরও অবস্থা এই রকম।

-তুমি এতদিন বাঁচলে কেমন করে?

ম্লান হাসল হাসান সেনজিক। বলল বাঁচার মত বাঁচা নয়। প্রান ভয়ে দেশ ছাড়া। যুগোশস্লাভিয়ার রাজধানী এবং আমার পুর্ব-পুরুষের রাজধানী শহর বেলগ্রেডে আমার জন্ম। জন্মের পরদিনই মা আমাকে বাঁচানোর জন্য আমাকে

নিয়ে বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়া চলে যান আমার এক খালার বাড়ীতে। খালার বাড়ীতে থেকেই আমি কৈশোরে পৌছলাম। কিন্তু মিলেশ বাহিনীর চোখ অবশেষে এড়ানো গেলোনা। তারা আঁচ করতে পেরেছিল, মরিয়া হয়ে খুঁজছিল তারা আমাকে। আমার দাদার আব্বা ডঃ মুহাম্মাদ ছিলেন বলকান মুসলমানদের বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা। মুসলমানদের আজাদী আন্দোলন 'যুগোশস্লাভেনস্কা মুসলিমানাস্কা অর্গানাইজেসিয়া'র তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা। এই কারনে মিলেশ বাহিনী আমাদের পরিবারের উপর আরো বেশি ক্ষ্যাপা। তারা আমার দাদাকে মেরেছে,আব্বাও সবশেষে তাদের হাত থেকে বাঁচতে পারেননি। আমাকেও তারা এখন হন্যে হয়ে খুঁজছে। তারা যখন সোফিয়াতে আমার সন্ধান পেল, সোফিয়া থেকেও পালালাম। বুলগেরিয়া থেকে গেলাম স্পেনে। সেখানে আমারএক দুরসম্পর্কীয় আত্নীয় থাকতেন। লেখাপড়া আমোরকায় করেছি,সেখান থেকে ফিরে স্পেনেই থাকতাম।

থামল হাসান সেনজিক।

-তারপর কেমন করে তুমি হোয়াইট ওলফের হাতে পড়লে? প্রশ্ন করল আহমদ মুসা।

সংগে সংগে কোন উত্তর দিল না হাসান সেনজিক। সে মুখ নামিয়ে নিল। মুখটা তার আরও মলিন হয়ে উঠল। চোখের কোণ দু'টি তার ভিজে উঠল।

এই সময় আলি আজিমভ,ওসমান এফেন্দী,সিষ্টার মেরী,মেরীর মা লেডী জোসেফাইন এবং সভেৎলানা এসে দরজার সামনে দাঁড়াল। হাসান সেনজিক পশ্চিম মূখী হয়ে বসে ছিলো,সে তাদের দেখতে পেল না।

আহমদ মুসা সেদিকে একবার তাকিয়ে মনোযোগ দিলো হাসান সেনজিকের দিকে।

হাসান সেনজিক মুখ তুলল। বলল,পনের বছর হলো মাকে দেখিনি। দিন সাতেক আগে চিঠি পেলাম,মা ভয়ানক অসুস্থ,মুমূর্ষ। মা লিখেছেন,আমি যেন যাই। সব সময় মা যেতে নিষেধ করছেন,এই প্রথম লিখলেন যেতে। চিঠি পেয়ে আমি অস্থির হয়ে গেলাম। পরদিনই ইস্তাম্বুলে আসার জন্যে স্পেনের মালাগা বন্দরে এলাম। বন্দরের এক হোটেলের রুম থেকে হোয়াইট ওলফ আমাকে কিডন্যাপ

করে। কিডন্যাপ করে হোটেলের অন্য একটি কক্ষে নিয়ে আমাকে একটি ইনজেকশন দেয়। তারপর আর কিছু মনে নেই আমার। চোখ মেলে এই ঘরেই আমি আমাকে দেখছি।

--হোয়াইট ওলফ কেন কিডন্যাপ করল? তার স্বার্থ কি?

--মিলেশ বাহিনী ও হোয়াইট ওলফ একই মিশন নিয়ে কাজ করছে। তাছাড়া টাকার লোভ। মিলেশ বাহিনী এ কাজের জন্য ৫০ হাজার ডলার দিতে চাচ্ছে। কিন্তু হোয়াইট ওলফ বলছে এক লাখ ডলার না পেলে আমাকে ওদের হাতে দেবে না।

--হোয়াইট ওলফ এখন আর নেই। বেচারারা ৫০ হাজার ডলারও হারাল।

একটু থামলো আহমদ মুসা। তারপর আবার বলল,তুমি এখন মুক্ত,তোমার মাকে দেখতে যাবে তুমি এখন?

মুখ তুলল হাসান সেনজিক। বলল,যাব। আর পালিয়ে থাকতে চাইনা। কি লাভ! যে ভাগ্য আমার দাদা,আমার আব্বা বরণ করছেন,যদি আসেই আমিও তা বরন করে নেব।

আহমদ মুসা হাসান সেনজিকের পিঠ চাপড়ে বলল,সাবাস হাসান,এমন ফাইটিং মনোভাবই তো চাই।

তারপর আহমদ মুসা দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে ডাকল, আলি আজিমভ, ওসমান তোমরা এদিকে এস।

ওরা দরজার ওপারে চুপ করে দাড়িয়ে ছিল। দেরি দেখে আহমদ মুসার খোঁজ নিতে ওরা এসেছিল। আহমদ মুসা ভেতরে একজন যুবকের সাথে গল্প করতে দেখে তারা বাইরেই দাড়িয়েছিলো।

ডাক শুনে আলি আজিমভ এবং ওসমান এফেন্দি ঘরে ঢুকে আহমদ মুসার পাশে এসে দাড়াল। আর সিষ্টার মেরী,মেরীর মা, সভেৎলানা এবং সভেৎলানার মেয়ে ঘরে ঢুকে দরজার সামনেই দাড়িয়ে থাকল।

হাসান সেনজিক আলি আজিমভদের উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে তাকাল মেরীদের দিকে। মেয়েদের উপর চোখ পড়তেই হাসান সেনজিক সলজ্জ চোখদু'টি সামিয়ে নিলো। মনে হলো হাসান সেনজিক খুবেই লাজুক প্রকৃতির।

আহমদ মুসা হাসান সেনজিকের দিকে ইংগিত করে বলল,এ হাসান সেনজিক,আমাদের একজন ভাই,জন্ম যুগোশস্লাভিয়ায়,আত্নগোপন করে মানুষ হয়েছে বুলগেরিয়ায় আর পালিয়ে ছিলো স্পেনে। অবশেষে হোয়াইট ওলফের হাতে পণবন্দি হয়ে এসেছে আর্মেনিয়ায়।

আলি আজিমভ ও মেরীদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে আহমদ মুসা বলল,চল এবার উঠা যাক।

তারা ঘাটি থেকে বেরিয়ে এলো। এসে প্রধান গেটে দাড়ালো। গেটে এখনো দু'টি লাশ রক্তে ভাসছে। হাসান সেনজিকের চোখ দু’টি ভয়-বিস্ফারিত। ঘাটির ভেতরে এমনি আরও অনেকগুলো লাশ সে দেখে এসেছে।

গেটে পৌছেই ঘুরে দাড়ালো আহমদ মুসা। পেছনেই দাড়িয়েছিল সিষ্টার মেরীরা। আহমদ মুসা সভেৎলানার দিকে তাকিয়ে বলল,আপনি এখন কি ভাবছেন?

প্রশ্ন শুনে একটু চিন্তা করল সভেৎলানা। তারপর বলল, আমি আপাততঃ লেলিনাকান যেতে চাই আমার বাবার কাছে!

-ইয়েরেভেনে ফিরে যাবেন, না এখান থেকেই?

-এখান থেকে লেলিনাকান নিকটে, আপনি যদি অন্য রকম মনে না রাখেন......

-নানা আপনি যা চাইবেন তাই হবে।

বলে আহমদ মুসা আলি আজিমভের দিকে চেয়ে বলল, তুমি এবং ওসমান এফেন্দী সভেৎলানাকে নিয়ে এখন লেলিনাকান যাবে।

সভেৎলানাকে মেরিদের কাছে বিদায় নিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠল। মিনিবাসের সামনের দু’’সিটে আলি আজিমভ ও ওসমান এফেন্দী আগেই উঠে বসেছিল।

আহমদ মুসা সভেৎলানার ছোট্ট মেয়ে এলিনার কপালে একটা চুমু খেয়ে গাড়িতে তুলে দিয়ে বলল, তোমার তো কোন কষ্ট হচ্ছে না মা, ক্ষুদা লেগছে?

এলিনা মাথা ঝাকিয়ে বলল, না, একটুও না।

আহমেদ মুসা সভেৎলানার দিকে এক পলক চেয়ে বলল, বোন আপনাকে বলার মত আমার কিছু নেই। শুধু প্রার্থনা করব, আল্লাহ্ আপনাদের ভাল রাখুন।

সভেৎলানা মুখ নিচু করে বসে ছিল। মুখ তুলে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, আমার গত রাতের ব্যবহারের জন্যে আমি মাফ চাচ্ছি। যে শত্রু বন্ধুর চেয়ে বড় আপনি এমনই এক শত্রু। আপনি আমাকে নতুন জীবনের সন্ধান দিয়েছেন। আমি সে নতুন পথ যেন গ্রহণ করতে পারি, প্রার্থনা করবেন। সভেৎলানার কণ্ঠ শেষের দিকে ভারি হয়ে উঠল।

গাড়ি স্টার্ট নিল সভেৎলানার। চলতে শুরু করল গাড়ি। এলিনা হাত তুলে বলল, চাচ্চু তুমি যাবে না?

আসব মা, তুমি কি তোমার চাচ্চুকে মনে রাখবে? বলল আহমদ মুসা

--বারে তুমি তো আসবেই, ভুলব কেন? বলল এলিনা।

গাড়ি ততক্ষণে সামনে এগিয়ে গেছে।

গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে হাত নাড়ছে এলিনা।

আহমদ মুসা সেদিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে। তার চোখ যেন সেদিক থেকে সরিয়ে নিতে-পারছেনা। জগতের সকল ভাল-মন্দ, লাভ-ক্ষতির কত উর্ধ্বে শিশুরা। এমন যদি হত মানুষের সমাজ।

আহমদ মুসা ঘুরে দাড়াতেই সিষ্টার মেরী এগিয়ে গেল। বলল, ভাইয়া আমরা কি করব?

--ভাইয়ার উপর ছেড়ে দিলে হয় না? ঈষৎ হেসে আহমদ মুসা বলল।

--হয়।' বলল সিষ্টার মেরী।

--তাহলে চল সোফিয়া এ্যাঞ্জেলার ওখানে যাই। সালমানও সেখানে আছে। সব চিন্তা সেখানে গিয়েই করব।

-বোনেরও যে কিছু কথা আছে।' মুখ নিচু করে বলল সিষ্টার মেরী। হঠাৎ বেদনার একটা ছায়া নামল সিষ্টার মেরীর মুখে।

-বল, মেরীর মুখের দিকে চেয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

-আমরা সোজা ইয়েরেভেন ইয়ারপোর্টে যেতে চাই।

-কোথায় যাবে?

-রোম। আমি কিছুক্ষণ আগে আমবার্ড দুর্গে ভাইয়ার সহকরী ফাদার জনসনের কাছে টেলিফোন করেছি। তিনি বাসা থেকে আমার লাগেজপত্র ও টিকিট ইয়ারপোর্টে পাঠিয়ে দিবেন। আমার টিকিট ইয়ারপোর্টে গেলে পাব জেনে নিয়েছি।

মুখ নিচু করে রেখেই কথাগুলো বলল সিষ্টার মেরী।

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলল না আহমদ মুসা। চিন্তা করল কিছুক্ষণ। তারপর মেরীর মা লেডি জোসেফাইনের দিকে চেয়ে বলল, আপনারও মত কি এটাই আম্মা?

-মেরী ওখানে পড়ে, আর আমার ছেলেও এখন রোমে। সুতরাং সেখানে যাওয়াটাই বোধ হয় ভাল। বলল মেরীর আম্মা।

ম্লান হাসল আহমদ মুসা। তারপর বলল, ঠিক আছে যাওয়া যাক। গাড়িতে উঠুন।

বেলা তখন ১১ টা। আহমদ মুসার গাড়ি ইয়েরেভেন ইয়ারপোর্টে বহিঃ লাউঞ্জের সিঁড়ির গোড়ায় গিয়ে দাঁড়াল।

গাড়ি দাঁড়াতেই মেরী নেমে পড়ল। নেমে হাত ধরে তার মাকে নামাল।

আহমদ মুসাও গাড়ি থেকে নেমেছিল। মেরী তার কাছে এসে বলল, আপনার আর এগুনো ঠিক হবে না ভাইয়া, আপনার জ্যাকেটের হাতটা রক্তে ভেজা।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ধন্যবাদ মেরী, তুমি ঠিকই বলেছ।

তারপর দু’’জনই নিরব।

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে মেরী। পাশেই তার মা।

এ অবস্থাই কি বলতে হবে, আহমদ মুসা তা যেন খুঁজে পেল না।

কথা বলল মেরীই প্রথমে । বলল, কিছু বলবেন না ভাইয়া?

আহমদ মুসা মুখ তুলে মেরীর গম্ভীর বিষণ্ন মুখের দিকে চেয়ে বলল, সালমানকে মাফ করে দিও মেরী। তোমরা তার অশেষ উপকার করেছ, বিনিময়ে অপুরণীয় ক্ষতি হয়েছে তোমাদের।

তৎক্ষণাৎ কোন কথা বলল না মেরী। তার শুকনো ও বেদনায় নীল হয়ে যাওয়া ঠোঁট কাঁপতে লাগল। তার দু''গণ্ড বেয়ে নেমে এল নিরষ অশ্রুর দু''টি ধারা।

নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করে মেরী বলল, ওঁর কোন অপরাধ নেই ভাইয়া, আমিই না বুঝে ওঁকে কষ্ট দিয়েছি। আমাকে যেন ও . . . .

কথা শেষ করতে পারল না মেরী। দু''হাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

মেরীর মা লেডি জোসেফাইন এগিয়ে এসে কাঁধে হাত রাখল মেরীর।

মেরী মায়ের কাঁধে মুখ গুজল।

আহমদ মুসা মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। বেদনার একটা নিল ছায়াতারও মুখ ঢেকে দিয়েছে। কি বলবে সে মেরীকে ভেবে পেল না।

লেডি জোসেফাইনেরও চোখ ভিজা। তারও মুখে কোন কথা নেই। নিরবে মেয়ের পিঠে সে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল।

অসহনীয় এক নিরবতা। নিরবতা ভাঙ্গল সিষ্টার মেরীই।

রুমাল দিয়ে দু''চোখ মুছে বলল, ভাইয়া আপনি যান, আপনি আহত।

-ভাইয়ার কিছু করার থাকলে বল মেরী।

-হোয়াইট ওলফের হাত থেকে বাঁচিয়ে ভাইয়া আমাদের নতুন জীবন দিয়েছেন। আমি জানি, আমরা যেখানেই থাকি ভাইয়া আমাদের খোজ নিবেন। মেরী থামল। একটা ঢোক গিলল মেরী। তারপর বলল, আমি পালাচ্ছি, কিন্তু সালমান আমাকে যে নতুন জীবন পথের সন্ধান দিয়েছে তা থেকে আমি পালাতে পারব না।

-খুশী হলাম মেরী। জীবনের ঐ পথ জীবনের সব ব্যথাই ভুলিয়ে দিতে পারে।

-না ভাইয়া, মানুষ সব ব্যথা ভুলতে চায়না। অনেক ব্যথা আছে যা জীবনের সঞ্চয়, জীবনের শক্তি। তা হারালে যে জীবনের সব হারিয়ে যায়।

কান্নায় রুদ্ধ হয়ে গেল মেরীর কণ্ঠ।

মেরী মুখ না তুলেই আহমদ মুসাকে ‘সালাম’ দিয়ে দ্রুত টলতে টলতে লাউঞ্জের সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতে লাগল। লেডি জোসেফাইন ও পেছনে পেছনে ছুটল।

আহমদ মুসা কিছুক্ষণ মেরীর পথের দিকে তাকিয়ে বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইল। এমন অসহায় নিজেকে যেন আর কোন দিনই মনে হয়নি।

আহমেদ মুসা ধীরে ধীরে এসে ড্রাইভিং সিটে বসল। পাশের সিটে মূর্তির মত বসেছিল হাসান সেনজিক।

চাবি ঘুরিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিল। চলতে শুরু করল গাড়ি।

হাসান সেনজিক বলল, সালমান কে মুসা ভাই?

-ককেশাস ক্রিসেন্টের প্রধান।

-কিন্তু মিস মেরীকে এভাবে যেতে হল কেন, উনিতো দেখছি ইসলামও গ্রহণ করেছেন।

-দুঃখটাতো এখানেই হাসান। সব বলব তোমাকে। তার আগে এইটুকু জেনে রাখ মহান আল্লাহ নর-নারীর মেলামেশায় যে সীমারেখা বেধে দিয়েছেন, যেভাবেই হোক তার ব্যতিক্রম হলে হৃদয় বিদারক এ্যাকসিডেন্ট ঘটতে পারে। মানুষ তো তার প্রকৃতিকে অস্বীকার করতে পারে না।

আহমেদ মুসার গাড়ি যখন সোফিয়া এঞ্জেলাদের গেটে গিয়ে পৌছালো, ঠিক তখনই সোফিয়াদের গেট দিয়ে সালমান শামিল বের হয়ে এল হন্তদন্ত হয়ে।

আহমদ মুসাকে দেখে সালমান শামিল দ্রুত ছুটে এল। সালমান শামিলের দিকে একবার তাকিয়ে এক রাশ উদ্বেগ নিয়ে আহমদ মুসা গাড়ি থেকে নামল।

-সর্বনাশ হয়ে গেছে মুসা ভাই।

-কি হয়েছে?

-সোফিয়া এ্যাঞ্জেলাকে ওরা কিডন্যাপ করেছে।

-কখন?

-আমি পাশেই ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। এসেই শুনলাম। বিশ মিনিট হবে।

আহমদ মুসার মনে হঠাৎ একটা দৃশ্য ঝিলিক দিয়ে উঠল। আহমদ মুসার গাড়ি যখন এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে মেইন রোডে পড়ছিল, তখন একটা গাড়ি তাকে রং সাইড থেকে দ্রুত ক্রস করে। আহমদ মুসা চকিতে একবার তাকিয়েছিল গাড়িটির দিকে। তার মনে হয়েছিল, গাড়িটির পিছনের সিটে মুখ বাধা একটা মেয়ে আর তার পাশে ভীমাকৃতি একজন লোক। মুহূর্ত কালের দেখা এ দৃশ্যটাকে আহমদ মুসা দৃষ্টি ভ্রম বলে আমল দেয়নি। কিন্তু এখন দৃষ্টি ভ্রম বলে মনে হচ্ছে না।

গাড়িটির কি রং ছিল? জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

সোফিয়ার মা এসে গেটে দাঁড়িয়েছিল। সেই উত্তর দিল। নীল রংয়ের কার।

আহমদ মুসার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে গাড়িটিও নীল ছিল।

আহমদ মুসা দ্রুত বলল, সালমান শিগগীর গাড়িতে উঠ।

তারপর সোফিয়ার মা'র দিকে তাকিয়ে বলল, চিন্তা করবেন না আম্মা, আল্লাহ সহায়। আমরা শিগগীরই ফিরে আসছি।

আহমদ মুসা দ্রুত গাড়ি ঘুরিয়ে রাস্তায় নামল। তারপর তীরের মত গাড়ি ছুটে চলল ইয়েরেভেন ইয়ারপোর্ট এর দিকে।

ইয়ারপোর্টের বহির্গমন কারপার্কিং এ প্রবেশ করেই আহমদ মুসা দেখল,হাঁ, সেই নীল গাড়িটি দাড়িয়ে আছে।

আহমদ মুসার জিপটি নীল গাড়িটির গা ঘেঁষে গিয়ে দাড়াল।

গাড়ি থেকে নামল আহমদ মুসারা তিনজন।

নীল গাড়িটা খালি। পেছনের সিটের উপর একটা কুঁচকানো রুমাল পাওয়া গেল। সম্ভবতঃ এই রুমাল দিয়ে সোফিয়া এ্যাঞ্জেলার মুখ বাধা ছিল।

লাউঞ্জে প্রবেশ করল আহমদ মুসারা তিনজন।

লাউঞ্জে তখন লোকজন নেই বললেই চলে। সতর্কভাবে একবার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে দেখল, না সোফিয়ারা লাউঞ্জে নেই। উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল আহমদ। কুঞ্চিত হয়ে উঠল তার কপাল।

আহমদ মুসা দ্রুত কম্পিউটার স্ক্রীনে ফ্লাইট সিডিউলের দিকে নজর করে দেখল, ৮টা ২৫ মিনিটে একটা বিমান আলবেনিয়াতে যাচ্ছে।

আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল ৮টা১০ বাজে। চঞ্চল হয়ে উঠল আহমদ মুসা।। তাহলে এই বিমানেই ওরা সোফিয়াকে নিয়ে পালাচ্ছে?

আর একবার চারিদিকে তাকাল আহমদ মুসা অসহায়ের মত। লাউঞ্জের একপ্রান্তে নজর পড়ল সিকুরিটি কাউন্টার।

আহমদ মুসা ছুটল সেদিকে।

সিকুরিটি কাউন্টারের কাছাকাছি যেতেই ভীতা চকিতা হরিণীর মত শিথিল পায়ে সামনে এসে দাঁড়াল সিস্টার মেরী।

সে সিকুরিটি বক্সের আড়ালেই দাঁড়িয়েছিল।

সিস্টার মেরীর মুখ ফেকাসে। চোখে তার একরাশ ভয়। ঠোট তার কাঁপছে।

কি ব্যাপার মেরী, তোমার কি হয়েছে, চোখে একরাশ বিস্ময় নিয়ে বলল আহমদ মুসা।

-ওরা সোফিয়া আপাকে ধরে নিয়ে গেছে।

-ওরা কি এই বিমানে উঠেছে?

-হাঁ, তাই মনে হল।

-সোফিয়া বাধা দেয়নি, কিছু বলেনি?

-কি বলবে, পিস্তল বাগিয়ে দু'জন তার সাথেই ছিল।

-সিকুরিটির লোকেরা সে সব দেখেনি? কিছু বলেনি তারা?

-ওরা লাউঞ্জে ঢুকেই একটি ফাঁকা ফায়ার করে বলেছে, আমরা হোয়াইট ওলফের লোক। আমরা বিমানে তিনটা সিট চাই।

থামল সিস্টার মেরী।

-তারপর কি ঘটল? কেউ কিছু বলল না?

-হোয়াইট ওলফকে কিছু বলার মত কেউ নেই। তাদেরকে বোর্ডিং কার্ড দিয়ে ভিতরে পাঠিয়ে দিল।

আহমদ মুসা আর কোন কথা না বলে ছুটল সিকুরিটি বক্সের দিকে।

সিস্টার মেরী মুখ নিচু করে দাড়িয়েছিল।

সালমান শামিল তার সামনে এসে দাঁড়াল।

সিস্টার মেরী দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, সালমান, কেমন করে এটা ঘটল?

-ওর দুর্ভাগ্য মেরী। শুকনো কন্ঠে বলল সালমান শামিল।

তারপর একটু থেমেই বলল, তুমি ইয়ারপোর্টে কেন? আম্মা কোথায়?

সিস্টার মেরী মুখ না তুলেই বলল, ওঁকে আড়ালে বসিয়ে রেখেছি।

তারপর সিস্টার মেরী তার ভেজা চোখটি সালমান শামিলের দিকে তুলে ধরে বলল, আমরা রোম যাচ্ছি।

-রোম যাচ্ছ? কেন? আমি তো জানি না।

সিস্টার মেরী চোখ নামিয়ে নিল। কিছু বলল না।

এই সময় সিকুরিটি কাউন্টারের দিক থেকে গরম কথা কাটাকাটির শব্দ এল।

সালমান শামিল সেদিকে ছুটল।

সালমান শামিল যখন পৌছল, তখন আহমদ মুসা বলছিল, একজন নাগরিককে দূর্বৃত্তরা ধরে নিয়ে যাচ্ছে আপনারা বাধা দিলেন না?

-ওরা দূর্বৃত্ত নয়। ওরা হোয়াইট ওলফের লোক।

-ওদের যা ইচ্ছা তাই করার অধিকার আপনারা দিয়েছেন?

-না তা আমরা দেইনি। তবে কোন কাজে ওদের সহযোগিতা আমরা যেমন করি না, তেমনি বাধা দেওয়ারও হুকুম নেই।

-ঠিক আছে তাহলে বিমান দেরি করানোর ব্যাবস্থা করুন। আমরাই ব্যাপারটা দেখছি।

বিমানবন্দরের সিকুরিটি প্রধান লোকটি মুহূর্তকাল চুপ করে থাকল। তারপর বলল, আমরা জানি, মেয়েটি জর্জ সাইমনের। তাঁর প্রতি আমার

সমবেদনা আছে, কিন্তু কোন সাহায্য আপনাকে করতে পারব না। তবে আপনাকে কোন কাজে বাধা দেবনা। ব্যস।

বলে লোকটি কাউন্টার থেকে সরে গেল ভেতরের দিকে। তারপর ওয়াকিটকিটা মুখের কাছে তুলে নিচু স্বরে কি যেন নির্দেশ দিল।

আহমদ মুসা দ্রুত ছুটল ভেতরের লাউঞ্জের দিকে। পথেই পেল সে ফ্লাইট ইনফরমেশন কাউন্টার।

আহমদ মুসা কাউন্টারের অফিসারকে দ্রুত বলল আলবেনিয়ার ফ্লাইট কিছু দেরী করাতে, অপারেশন ডাইরেক্টরকে কোথায় পাব?

-এক বিশেষ যাত্রী আসবেন, ফ্লাইট দেরী করানো হয়েছে ৯ টা পর্যন্ত। অফিসারটি হেসে জবাব দিল।

'ধন্যবাদ' বলে আহমদ মুসা এবার বিমানের গ্যাং ওয়েতে ঢোকার জন্য দ্রুত পায়ে যাত্রী প্রবেশের দরজার দিকে ছুটল।

দরজায় দু'জন অফিসার দাঁড়িয়েছিল বোর্ডিং কার্ড চেক করার জন্য। আহমদ মুসাদেরকে ওরা বাধা দিল না। ভেতরে ঢুকেই আহমদ মুসা বিমানবন্দরের সেই সিকুরিটি চীফকে দেখতে পেল।

আহমদ মুসা তাকে কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু বাধা দিয়ে সেই সিকুরিটি অফিসার নিচু গলায় বলল। ওরা গাংওয়ে লাউঞ্জে বসে আছে, ওদের আরেকজন কে আসবে, তারপর বিমানে উঠবে  ওরা।

বলেই সে দরজা দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল। আহমদ মুসা তাকে ধন্যবাদ জানানোরও সুযোগ পেল না।

আহমদ মুসা এবার প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে নিঃশব্দে বিড়ালের মত সামনে এগুতে লাগল। তাঁর পিছনে সালমান শামিল, হাসান সেনজিক এবং সিস্টার মেরী।

আহমদ মুসা গাংওয়ে লাউঞ্জে ঢোকার সিকুরিটি প্যাসেজের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দেখল নিরাপত্তা প্রহরী কেউ নেই। আহম্মদ মুসা বুঝল, সিকুরিটি চিফ সবাইকে সরিয়ে নিয়েছে।

আহমদ মুসা পেছন ফিরে সালমান শামিলকে বলল, তোমরা সবাই এখানে দাঁড়াও, প্রয়োজন না হলে লাউঞ্জে ঢুকবে না।

সালমান শামিল কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু আহমদ মুসার শক্ত হয়ে উঠা চোখের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে সাহস পেল না। শুধু মাথা নেড়ে তার সম্মতি জানাল।

আহমদ মুসা ধীর পায়ে লাউঞ্জের ভেতরে ঢুকে গেল। সালমান শামিল হাত দিয়ে পকেটের রিভলভারটা একবার স্পর্শ করে শুকনো মুখে লাউঞ্জের দরজার দিকে নজর রাখল।

আহমদ মুসা ডান হাতটি পকেটে ঢুকিয়ে স্বচ্ছন্দে হেটে প্রবেশ করল লাউঞ্জে।

লাউঞ্জে প্রবেশ করেই তার চোখে পড়ল, লাউঞ্জের এ দরজার দিকে মুখ করেই কিছু দুরে সোফায় বসে আছে সোফিয়া এ্যাঞ্জেলা। তার মুখ নিচু। তার পাশেই হোয়াইট ওলফের একজন লোক। হাতে তার পিস্তল। তার চোখটা ছিল ওপাশে গ্যাংওয়ের দিকে।

আহমদ মুসা অনেক পথ সামনে এগিয়েছে। হঠাৎ তার খেয়াল হলো, ও একা কেন? হোয়াইট ওলফের ওরা দু'জন তো। তার মাথায় ঝিলিক দিয়ে উঠল, ওকি আশে-পাশে কোথাও কিংবা টয়লেটে?

ঠিক এই সময়েই মুখ তুলেছে সোফিয়া এ্যাঞ্জেলা। আহমদ মুসাকে সামনে দেখেই আর্তস্বরে বলে উঠল, মুসা ভাই আপনি......

আহমদ মুসা মুখে আঙ্গুল তুলে তাকে চুপ করানোর আগেই তার কথা অর্ধেক বলা হয়ে গেছে।

হোয়াইট ওলফের লোকটি সোফিয়ার মুখে শব্দ উচ্চারিত হবার সাথে সাথেই বিদ্যুৎ বেগে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। সাথে সাথে উঁচু হয়েছে তার পিস্তল।

কিন্তু তার পিস্তলটি উঠে আসার আগেই আহমদ মুসার রিভলভারটি লোকটির কপাল বরাবর উঠে গেছে। আহমদ মুসা কঠোর কন্ঠে বলল, রিভলভার ফেলে দাও।

ঠিক এই সময়েই আহমদ মুসা তার পেছনে অস্পষ্ট পায়ের শব্দ পেল। কে তার পেছনে এমন চিন্তা যখন সে করছে সেই সময়ই রিভলভারের একটা শক্ত নল ক্রমে তার মাথায় ঠেকল। পেছন থেকে কে ভারি গলায় বলে উঠল, আহ! আহমদ মুসা তোমাকে এভাবে পেয়ে যাব তা ভাবিনি। ফেলে দাও রিভলভার।

আহমদ মুসা হোয়াইট ওলফকে চেনে। কোন কাজে বিলম্ব করা ওদের অভিধানে নেই।

আহমদ মুসা রিভলভার ফেলে দিল।

ওদিকে মুসার মাথায় পিস্তল ঠেকাতে দেখেই উদ্বিগ্ন, উত্তেজিত সালমান শামিল পিস্তল বাগিয়ে লাউঞ্জে প্রবেশ করল। তার পিস্তলটি উঠে এল আহমদ মুসার পেছনে দাড়ানো লোকটির মাথা লক্ষ্য করে। কিন্তু সে দেখতে পাইনি তাকে লক্ষ্য করে সোফায় বসা হোয়াইট উলফের প্রথম লোকটির পিস্তল উঁচু হয়েছে।

সালমান শামিলের পেছনে পেছনে সিষ্টার মেরীও লাউঞ্জে প্রবেশ করেছিল। সে সোফায় বসা লোকটির পিস্তল তাক করা দেখতে পেয়েছে। সে মুহূর্তে পাগলের মত ছুটে গিয়ে সে লোকটির পিস্তলের সামনে দাঁড়াল। সংগে সংগেই গুলির শব্দ।

একই সময় সালমান শামিলের পিস্তলও অগ্নি উদগীরণ করেছে।

একই সংগে দু'টি দেহ লাউঞ্জের মেঝেয় গড়িয়ে পড়ল।

সোফার লোকটির পিস্তলের গুলিতে সিষ্টার মেরীর বুক ভেদ করেছে, আর সালমান শামিলের গুলি আহমদ মুসার পেছনের লোকটির মাথা গুড়িয়ে দিয়েছে।

আহমদ মুসা গুলির শব্দ শোনার সংগে সংগেই বসে পড়েছিল। বসে পড়েই তুলে নিয়েছিল তার পিস্তল।

সোফায় বসা লোকটি তখন উঠে দাঁড়িয়েছিল, সে পিস্তল ঘুরিয়ে নিচ্ছিল আহমদ মুসার দিকে।

কিন্তু হোয়াইট ওলফের লোকটি দ্বিতীয় গুলি করার সুযোগ আর পেলনা। আহমদ মুসা শুয়ে থেকেই গুলি করল। মাথা গুড়ো হয়ে গেল লোকটির। সোফার উপরই গড়িয়ে পড়ল তার দেহ।

এদিকে সালমান শামিল সিষ্টার মেরীকে গুলি খেয়ে পড়ে যেতে দেখেই পিস্তল ফেলে দিয়ে ছুটে এসেছিল সিষ্টার মেরীর কাছে।

সিষ্টার মেরীর বুকে গুলি লেগেছিল। সর্বাঙ্গ কাঁপছিল সিষ্টার মেরীর।

সালমান শামিল পাশে বসে সিষ্টার মেরীর মাথা হাতে তুলে নিল।

চোখ মেলল সিষ্টার মেরী। সালমান শামিলের দিকে চোখ পড়তেই বলল, ভাল আছ তুমি? তোমার কিছু হয়নি তো?

সিষ্টার মেরীর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সালমান শামিল রুদ্ধ কন্ঠে বলল, তুমি এ কি করলে মেরী?

-আমার খুব আনন্দ সালমান, জীবনের চেয়ে শতগুন ভাল লাগছে আমার এ মৃত্যু।

সোফিয়া এ্যাঞ্জেলা এসে সালমান শামিলের পাশে বসেছিল।

সে সিষ্টার মেরীর মুখের উপর মুখ রেখে কেঁদে উঠল, এ কি হল মেরী?

এই সময় সিষ্টার মেরীর মা ছুটে এসে মেরীর বুকে লুটিয়ে পড়ল।

সিষ্টার মেরী তার দূর্বল হাত দিয়ে মায়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। দূর্বল হয়ে পড়েছে সিষ্টার মেরী। জীবনী শক্তি তার নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। দুর্বল কন্ঠে সে ডাকল, মা।

সিষ্টার মেরীর মা লেডি জোসেফাইন মাথা তুলে তাকাল মেয়ের দিকে।

সিষ্টার মেরী মুখ তুলে তাকাল সালমান শামিলের দিকে। বলল, মা এ তোমার ছেলে। তারপর সোফিয়া এ্যাঞ্জেলার দিকে চোখ তুলে বলল, এ তোমার মেয়ে মা। আমি এঁদের মাঝেই বেঁচে থাকব।

কথা শেষ করেই চোখ বন্ধ করে ঝিমিয়ে পড়ল। মুহূর্ত পরেই চোখ খুলে আহমদ মুসার দিকে তাকাল। আহমদ মুসা পাশেই পাথরের মত স্থির হয়ে বসেছিল। সিষ্টার মেরী তার দুর্বল দৃষ্টি জোর করে তার দিকে মেলে ধরে বলল, মুসা ভাই সাক্ষি থেকো আমি মুসলমান, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মা--দুর রাসূ--লু--ল্লা--হ।

চোখ দু'টি বন্ধ হয়ে গেল সিষ্টার মেরীর। যেন ঘুমিয়ে পড়ল সে।

সিষ্টার মেরীর মা মেরীর বুকের উপর আছড়ে পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠল।

আহমদ মুসা উঠে দাড়াল। তার দু'চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়েছে দু'ফোটা অশ্রু।

দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁফিয়ে কাঁদছে সোফিয়া এ্যাঞ্জেলা। অশ্রু সালমান শামিলের চোখে। যেন এ জগতে নেই সে।

পাশেই দাড়িয়েছিল হাসান সেনজিক। বিমুঢ়-বেদনায় বিধ্বস্ত তার চোখ-মুখ।

আহমদ মুসা হাসান সেনজিককে বলল, তুমি এখানে দাড়াও, আমি ওদের দেখি।

বলে আহমদ মুসা লাউঞ্জের দরজা দিয়ে ওদিকে চলে গেল।

দরজা পেরুতেই দেখল, চিফ সিকুরিটি অফিসার কয়েকজনকে সাথে নিয়ে আসছে।

সেই প্রথম কথা বলল, সব জেনেছি আমি। এখন এয়ারপোর্ট থানায় আপনি অথবা আপনাদের অন্য কেউ ডাইরী করে আসুন। সাক্ষি হিসেবে আমাকে রাখবেন।

-অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। বলে আহমদ মুসা আবার লাউঞ্জে ফিরে এল।

ধীরে ধীরে আহমদ মুসা সালমান শামিলের কাধে হাত রেখে বলল, সালমান তুমি এস জরুরী কাজ। তোমাকে থানায় যেতে হবে। তারপর তাকে সব কথা বুঝিয়ে বলল।

চলে গেল সালমান শামিল। তার সাথে গেল চিফ সিকুরিটি অফিসার।

ইয়েরেভেনে আহমদ মুসার দু'টো দিন খুব ব্যস্ত কাটল। হোয়াইট ওলফের প্রতিরোধের যে পকেটগুলো অবশিষ্ট ছিল, তাও ধ্বংস করা হলো।

আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের ককেশাস ক্রিসেন্টকে পুনর্গঠিত ও পুনর্বিন্যস্ত করা হলো। আবার প্রয়োজন না হলে অস্ত্র হাতে নেয়াকে পরিহার করা

হলো। ঠিক করা হলো, রাজনৈতিক পথেই সামনে এগুতে হবে। আর যে টুকু বাকি আজাদীর, তা রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমেই শেষ করা যাবে।

এক ঘন্টার ব্যবধানে 'তিরানা' ও 'রোম' এর বিমান দু'টি ছাড়বে। আলবেনিয়ার রাজধানী 'তিরানা'য় যাওয়ার বিমানটি ছাড়বে ৮টা ২৫ মিনিটে আর রোমের বিমানটি ছাড়বে সোয়া ন'টায়।

সিষ্টার মেরীর মা লেডী জোসিফাইন কে নিয়ে সোফিয়া এ্যাঞ্জেলার মা, সোফিয়া এ্যাঞ্জেলা এবং সালমান শামিল যাচ্ছে রোম। আহমদ মুসা এবং হাসান সেনজিক যাচ্ছে 'তিরানা'। বহু চিন্তা করে আহমদ মুসা তিরানা যাওয়াই যুক্তি যুক্ত মনে করেছে। সোজা বেলগ্রেডে গেলে সহজেই মিলেশ বাহিনী'র চোখে পড়ার সম্ভবনা আছে। হাসান সেনজিকের ফটো নিশ্চয় ওরা এতদিনে যেগাড় করেছে। আর তিরানা গিয়ে যদি সড়ক পথে বেলগ্রেড যাওয়া যায় তাহলে ওদের চোখকে ফাঁকি দেয়া অনেক খানিই সহজ হবে।

তিরানাগামী বিমান টারমাকে রেডি। যাত্রীরা উঠতে শুরু করেছে।

আহমদ মুসা ও হাসান সেনজিক উঠে দাঁড়াল।

সিষ্টার মেরীর মা, লেডি জোসেফাইন, সোফিয়া এ্যাঞ্জেলা, সালমান শামিল, ওসামন এফেন্দী, আলি আজিমভ এবং আরও যারা বিদায় জানাতে এসেছিল সবাই উঠে দাঁড়াল।

সিষ্টার মেরীর মা ও লেডি জোসেফাইন দুজনেই পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল।

আহমদ মুসা ওদের সামনে গিয়ে মাথা নিচু করে বলল, আসি আম্মা। আপনাদের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে, আল্লাহ তার জাযাহ আপনাদেরকে দিন।

-এসব কথা বলোনা বাবা, অনেক হারিয়েই তো তোমাদের মত অনেক ছেলেকে পেয়েছি।

দু'জনেই একবাক্যে কথাগুলো বলল।

একটু থেমে লেডি জোজেফাইন বলল, কি বলব বাবা, চাইলেই তো হবেনা, তোমাদের মত ছেলেদের কোন মা'ই তার কাছে ধরে রাখতে পারে না।

সোফিয়া এ্যাঞ্জেলার মা বলল, যাও বাবা, দোয়া করি, তাড়াতাড়ি আবার আমাদের মাঝে ফিরে এস।

সালমান শামিল, ওসমান এফেন্দীর চোখে পানি টল টল করছিল।

আহমদ মুসা সালমান শামিল ও ওসামান এফেন্দীর পিঠ চাপড়ে বলল, পাগল, আল্লাহর সৈনিকরা তো কাঁদেনা এভাবে, গোটা দুনিয়ায় তাদের ঘর।

গায়ে-মাথায় ওড়না জড়িয়ে এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিল সোফিয়া এ্যাঞ্জেলা। তার মাথার ওড়নার প্রান্ত কপালের নিচ পর্যন্ত নেমে এসেছে। সেদিকে তাকিয়ে খুশী হল আহমদ মুসা। সোফিয়া তাহলে আপনা থেকেই পর্দা করা শুরু করেছে। আসলে মানুষের মনই সব। মন থেকে মানুষ যখন কোন আদর্শ গ্রহন করে তখন তার বাহিরটাও সেই আদর্শের দাবী অনুসারে আপনাতেই পরিবর্তিত হয়ে যায়।

আহমদ মুসা তার কাছে গিয়ে বলল, আসি বোন।

-আমাদের জন্যে দোয়া করবেন। আর সাবধানে থাকবেন, নিজের যত্ন নিবেন। আপনার আঘাত এখনও সারেনি।

সোফিয় এ্যাঞ্জেলার শেষের কথা গুলো ভারী হয়ে উঠল। মুখ নিচু রেখেই কথা বলছিল সোফিয়া এ্যাঞ্জেলা।

'শুকরিয়া বোন, আল্লাহ তোমাদের ভাল রাখুন' বলে আহমদ মুসা অন্য সবাই এর কাছে বিদায় নিয়ে লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে এল।

আহমদ মুসা এবং হাসান সেনজিক হেটে হেটেই এগুচ্ছিল বিমানের দিকে।

'মুসা ভাই' হঠাৎ পেছন থেকে সালমান শামিলের ডাক শুনতে পেল আহমদ মুসা। থমকে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে তাকাল সে। তাকিয়েই দেখতে পেল, ডঃ পল জনসন এবং তার মেয়ে মারিয়া জনসন দ্রুত এগিয়ে আসছে। তাদের সাথে সালমান শামিল এবং সোফিয়া এ্যাঞ্জেলা।

আহমদ মুসাও পেছন ফিরে তাদের দিকে হাটা শুরু করল।

ডঃ পল জনসন কাছাকাছি হতেই আহমদ মুসা অত্যন্ত বিনীতভাবে বলল, আমাকে মাফ করবেন জনাব, আপনার সাথে দেখা না করে অন্যায় হয়েছে।

ডঃ পল জনসন এসে আহমদ মুসাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। বলল, তোমরা যুদ্ধের ময়দানে আছ, তোমার কিছুই অন্যায় হয়নি বৎস।

কয়েক মুহুর্তবাদ আহমদ মুসাকে আলিঙ্গন থেকে ছেড়ে দিয়ে বলল, যুদ্ধ বিজয়ী বীরকে আমি স্বাগত জানাতে এসেছি, আমি আজ উচ্চস্বরে বলতে পারি বৎস, তোমরা যে বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও গতি দিয়ে হোয়াইট ওলফকে জয় করেছ, তার কাছে গোটা বিশ্বই পদানত হবে। অন্যের কাছে অস্ত্র ও শক্তি আছে, কিন্তু তোমাদের বাড়তি আছে উদ্দেশ্যের মহত্ব ও চরিত্র, যা আর কারো কাছে নেই।

-আপনার কথাকে আল্লাহ সত্য করুন। মাথা নিচু করে বিনীত কন্ঠে বলল আহমদ মুসা। একটু থেমে আহমদ মুসা বলল, জনাব আমরা রাজ্য ও সম্পদের জন্যে লড়াই করছিনা। ইসলামের লড়াই আল্লাহর বান্দাদেরকে মানুষের দাসত্ব, শোষণ ও নীপিড়ন থেকে মুক্তি করার জন্যে এবং আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে মানুষের অধিকার মানুষকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে।

-এ লড়াই তোমাদের সফল হোক বৎস।

-এ লড়াই কি আপনারও হতে পারেনা? মাথা তুলে ডঃ পল জসসনের মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল আহমদ মুসা। মুহূর্তকাল নিরব থাকল ডঃ পল জনসন।

তারপর ডঃ পল জনসন তার ডান হাত বাড়িয়ে আহমদ মুসার হাত চেপে ধরে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই, মোহাম্মদ (স:) তাঁর প্রেরিত রসূল।

আহমদ মুসা বুকে জড়িয়ে ধরল ডঃ পল জনসনকে। বলল, জনাব আপনার এই ঘোষণা আর্মেনীয়া-আজারবাইজানের নতুন দিনের বার্তাবহ হোক।

ডঃ পল জনসন্ন আলিংগন মুক্ত হয়ে গম্ভীর কন্ঠে বলল, দোয়া কর বৎস।

পাশেই দাঁড়িয়েছিল মারিয়া জনসন। তার চোখে আনন্দোর ঝিলিক।

আহমদ মুসা তার দিকে চাইতেই সে বলল, আমি সোফিয়া আপার কাছে কালেমা আগেই পড়ে নিয়েছি ভাইজান।

-সোফিয়া এখন বুঝি গুরুর ভূমিকায়? হেসে বলল আহমদ মুসা।

-হবে না? জানেন না আপনি, সোফিয়া আপা অনেক জানেন।

এই সময় বিমানরে এক অফিসারের কাছ থেকে আহবান এল সময় আর নেই।

আহমদ মুসা দ্রুত সবার কাছ থেকে বিদায় নিল। বিদায় দিতে গিয়ে চপলা চঞ্চলা মারিয়া জনসন ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। বলল, ভাইজান আবার আপনাকে দেখতে পাব?

আহমদ মুসা কোন জবাব দিলনা, দিতে পারল না। কি জবাব দেবে। এর জবাব তো তারও জানা নেই।

আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়িয়ে পা চালান বিমানের সিড়ির দিকে।

সিড়ির গোড়ায় গিয়ে পেছন ফিরে তাকাল আহমদ মুসা। সোফিয়া এ্যাঞ্জেলা এবং মারিয়া জনসন দু'জনেই চোখ মুছছিল।

ঘুরে দাঁড়িয়ে বিমানের সিড়িতে পা রাখল আহমদ মুসা। মনে পড়ল সিংকিয়াং এর উরুমুচি বিমান বন্দরে আমিনার এমন সজল চোখই সে দেখে এসেছিল। গতকালও টেলিফোনে আমিনা কান্নায় কথা বলতে পারেনি। ওর সে কান্নার কাছে নিজেকে বড় হৃদয়হীন মনে হয়েছে আহমদ মুসার। ওরা এত কোমল বলেই পুরুষরা এতটা কঠোর।

আহমদ মুসা বিমানের শেষ সিড়ি পেরিয়ে প্রবেশ করল বিমানে।

দু'জনের পাশাপাশি সিট। বসে পড়ল আহমদ মুসা এবং হাসান সেনজিক দু'জনেই।

ওরা দু'জনেই আর্মেনিয়ার নাগরিক হিসেবে আলবেনিয়ার ভিসা নিয়ে প্রবেশ করেছে আলবেনিয়ায়।

সিট বেল্ট বাঁধছিল হাসান সেনজিক। বাঁধতে বাঁধতে বলল, মুসা ভাই, মনে হচ্ছে আমি স্বপ্ন দেখছি। স্বপ্নে যেমন ১০ বছরের ঘটনা ১০ মিনিটেও দেখা যায়, তেমনি বহু বছরের জানা যেন আমার দু'দিনেই জানা হয়ে গেল। আমার সমাজ, আমর ধর্ম, আমার আদর্শকে যেন আমি প্রথমবারের মত উপলব্ধি করছি, জানছি, বুঝছি, দু’দিনে আমার নতুন জন্ম হয়েছে মুসা ভাই।

থামল হাসান সেনজিক।

আহমদ মুসা হাসান সেনজিকের পিঠ চাপড়ে বলল, এই তো চাই। বলকানকে জাগাবার দায়িত্ব যে তোমাদেরই নিতে হবে।

-নেতার আনুগত্য, নেতার প্রতি ভালবাসা কেমন হতে হয় তাও শিখলাম মুসা ভাই। বলল, হাসান সেনজিক।

-ইসলামে নেতা-কর্মী কোন ভেদাভেদ নেই হাসান সেনজিক, সবাই এখানে ভাই ভাই।

মুসা ভাই, আমি আলী আজিমভ ভাই এর কাছে সব শুনেছি। আপনার যাত্রা শুরু ফিলিস্তিনে। সেখান থেকে মিন্দানাওয়ে তারপর মধ্য এশিয়ায়। সেখান থেকে চীনে, চীন থেকে আর্মেনিয়ায়। এখন বলকানের পথে। আপনি এক বিস্ময় মুসা ভাই।

-এমনভাবে বলনা হাসান সেনজিক। আমরা সাবই আল্লাহর বান্দাহ। কাজ তো তিনিই করান। সব প্রশংসা তো তাঁরই।

একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর আবার শুরু করল, মুসলমানরা সুখ-সম্পদ নিয়ে বসে থেকে জীবন কাটানোর মত কোন জাতি নয়। মুসলমানরা মিশনারী এক জাতি। এক মহা মিশন দিয়ে আল্লাহ তাদের দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাকে হতে হয় এক অস্থির বিপ্লবী। যেখানেই আল্লাহর বান্দারা শোষণ অত্যাচারে জর্জরিত, যেখানেই তাদের স্বাধীনতা বিপর্যস্ত, সেখানেই ঐ বিপ্লবীদের ছুটে যেতে হয় মানুষের মুক্তির বার্তা নিয়ে। কোন দেশের সীমার মাঝে তারা বাধ্য থাকবে কেমন করে?

থামল আহমদ মুসা।

শান্ত কন্ঠে ধীরে ধীরে শুরু করল হাসান সেনজিক, কিছু মনে করবেন না মুসা ভাই, আপনি আমার ম'র চোখের জল মুছাবার জন্যে আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন আমার মা'র কাছে। কিন্তু আপনি কি আরেকজনের কান্নাকে পদদলিত করছেন না?

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না আহমদ মুসা।

একটু ধীর কন্ঠে বলল, হয়তো করছি হাসান সেনজিক। কিন্তু সেটা একজনের ব্যক্তিগত কান্না। কিন্তু তোমার মা'র কান্না শুধু তোমার মা'র নয়। গোটা বলকানের অসংখ্য মুসলিম জনপদের লাখো হৃদয়ের কান্না আমি শুনতে পেয়েছি তোমার মায়ের কান্নায়।

থামল আহমদ মুসা।

হাসান সেনজিক পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আহমদ মুসার দিকে। বিহ্বল তার দৃষ্টি।

অনেকক্ষণ পর ধীর কন্ঠে বলল হাসান সেনজিক, মুসা ভাই, আমার বলকানকে তো এভাবে কখনও ভাবিনি, কখনও তো দেখিনি বলকানকে এভাবে। কি জাদু জানেন আপনি মুসা ভাই, কি শোনালেন আপনি। বলকানের যুগোশ্লাভিয়া,বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া এবং গ্রীসের লাখো মজলুম মুসলিমের কান্না যে আমি চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছি। এতদিন তো বুঝিনি আমার কান্না, আমার মা'র কান্না তাদের কান্নারই একটা অংশ।

থামল হাসান সেনজিক।

তার দু'চোখের পাতা ভিজে উঠেছে অব্যক্ত এক বেদনার দুঃসহ ভারে।

আহমদ মুসা কোন কথা বলল না। শুধু সস্নেহে তার পিঠে হাত বুলাল।

বিমান তখন টেক-অফ পর্যায়ে। ভীষণ চাপা শব্দতুলে অস্থির ভাবে কেঁপে চলেছে বিমানটি। এগুচ্ছে ধীরে ধীরে সামনে।

এক সময় মাটির স্পর্শ ছিন্ন করে বিমানটি পাখা মেলল আকাশে।

# ২

নতুন বেলগ্রেডের এক অভিজাত এলাকা। রাত তখন ৮ টা।

প্রশস্ত রাজপথ। তুষার পড়ছে। কনকনে শীত। রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া বেশ কম।

তবু ট্রাফিক সিগন্যালের সামনে বেশ ভিড় জমে উঠেছে। নীল সিগন্যালের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে পড়েছে গাড়ির এক লম্বা সারি।

মাথায় কালো হ্যাট এবং গায়ে কালো ওভার কোট জড়ানো একজন লোক এই সুযোগে দ্রুত গাড়ি গুলোর ড্রাইভিং সিটের খোলা জানালাগুলো দিয়ে কি কাগজ দিয়ে যাচ্ছে। গাড়ির লম্বা লাইনটির প্রায় পেছনের প্রান্তে মাঝারি সাইজের একটা মাইক্রোবাস। ঐ গাড়ির ড্রাইভারটিও তার জানালা দিয়ে ঐ কাগজটি পেল।

কাগজটির উপর এক পলক নজর বুলিয়েই পেছনে তাকিয়ে বলল,জর্জ তোমরা শয়তানটাকে পাকড়াও করো।

পেছনে সিটে ওরা তিনজন বসেছিল।

বলার সঙ্গে সঙ্গেই দরজার সামনে বসা লোকটি দরজা খুলে লাফিয়ে পড়ল নিচে, তার সাথে আরেকজন।

কাগজ বিলি করা কালো ওভার কোট জড়ানো সেই লোকটি তখন ফুটপাতে উঠে গেছে।

গাড়ি থেকে নেমে যাওয়া দু'জন লোক অদ্ভুত দ্রুততার সাথে সেই লোকটিকে প্রায় ছোঁ মেরে ধরে এনে গাড়িতে তুলল। লোকটি চিৎকার করারও সুযোগ পায়নি। বুঝে উঠার আগেই সে গাড়ির ভেতরে এসে আছড়ে পড়েছে।

হাইজাকের এই তৎপরতা দেখে মনে হয় এরা এই কাজে অত্যন্ত দক্ষ। যেমন গায়ের শক্তি, তেমনি কৌশলও রপ্ত।

মাইক্রোবাসটি দানিয়ুব এভেনিউ এর মাঝামাঝি জায়গায় একটা বড় লোহার গেটের সামনে এসে দাঁড়াল। গাড়ি দাঁড়াবার শব্দ পেয়ে গেট রুমের ক্ষুদ্র জানালা দিয়ে একটা মুখ বেরিয়ে এল। মাইক্রোবাসটির দিকে একবার নজর বুলিয়ে সরে গেল জানালা থেকে। পরক্ষণেই লোহার গেটটি আস্তে আস্তে খুলে গেল।

মাইক্রোবাসটি ভেতরে প্রবেশ করল।

ভেতরে একটি বিরাট বাগান। ফুলের বাগান। বাগানের মাঝখানে পানির একটা ফোয়ারা। ফোয়ারার ঠিক মাঝখানে শ্বেত পাথরের একটা মূর্তি। মূর্তিটি বলকান অঞ্চলের জাতীয় বীর বলে কথিত 'মিলেশ' এর। বিশেষ করে 'মিলেশ বাহিনী'র খৃষ্টান জাতীয়তাবাদিরা 'মিলেশ'কে গুরু হিসেবে বরণ করে নিয়েছে।

১৩৮৯ সালে কসভোর যুদ্ধে তুরস্কের সুলতান মুরাদ দক্ষিণ ইউরোপের খৃষ্টান বাহিনীর বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক বিজয় লাভ করে। কিন্তু যুদ্ধের পর পরই খৃষ্টান পক্ষের একজন সৈনিক 'মিলেশ' গোপনে মুরাদকে আক্রমন করে ও আহত করে এবং আহত সুলতান যুদ্ধক্ষেত্রেই মৃত্যুবরণ করেন। সেই থেকে 'মিলেশ' ইউরোপের খৃষ্টানদের কাছে শক্তি ও সাহসের প্রতীক হয়ে আছে।

মাইক্রোবাসটি বাগান পেরিয়ে একটি বড় বহুতল গাড়ির বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

গাড়ি থেকে সবাই নামল। মোট চারজন। সকলে নামার পর সেই ওভার কোট পরা লোকটিকে হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নামাল গাড়ি থেকে। ঐভাবে টেনে নামানোর ফলে লোকটি পড়ে গেল।

যে লোকটি ড্রাইভিং সিট থেকে নামল সে সঙ্গে সঙ্গে লোকটির পাঁজরে লাথি মেরে বলল, ব্যাটা, হিদেন, উঠ।

লোকটি উঠে দাঁড়াল।

উঠে দাঁড়াতেই একজন সামনের দিকে লোকটিকে ধাক্কা দিয়ে বলল চল মজা দেখবি, ইস হ্যান্ডবিল ছড়ানো হচ্ছে।

গ্রাউন্ড ফ্লোরের এক কোনে একটা অন্ধকার ঘরে লোকটিকে ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে ওরা চারজন উপরে উঠে গেল।

ঘণ্টা তিনেক পরে ওরা দশ বারোজন ফিরে এল। দরজা খুলে ওরা প্রবেশ করল রুমে।

আলো জ্বালাল।

লোকটি কার্পেটের উপর বসেছিল।

ঘরের মেঝেতে কার্পেট ছাড়া ঘরে আর বসার কিছু নেই।

ওরা ঘরে ঢোকার পর লোকটি উঠে দাঁড়াল। লোকটির মাথায় সেই হ্যাট।

ঘরে প্রবেশ করা লোকদের মধ্যে দীর্ঘ ও স্থূলদেহী একজন একটু এগিয়ে লোকটির মাথা থেকে হ্যাটটি টেনে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, ইয়েলেস্কু সেই হ্যান্ডবিলটি কোথায়, দাও তো দেখি।

ইয়েলেস্কু এগিয়ে এল। এই লোকটিই মাইক্রোবাস ড্রাইভ করছিল।

সে এগিয়ে এসে দীর্ঘ সেই লোকটির হাতে হ্যান্ডবিলটি তুলে দিতে দিতে বলল, স্যার সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়কে এরা এদের সুদিন মনে করে দারুণ বাড়বাড়ি শুরু করেছে।

এই 'স্যার' লোকটি বিল কনষ্টাইনটাইন, বলকানের 'মিলেশ বাহিনীর' নেতা। নিজেকে সে ইউরোপের ধর্মসম্রাজের অধিনায়ক সম্রাট সার্লেম্যানের বংশধর বলে প্রচার করে।

'পিপিলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে, কিছু ভেবনা ইয়েলেস্কু' বলে কনষ্টানটাইন হ্যান্ডবিলটি নিয়ে ধরে আনা সেই লোকটির দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

লোকটি বয়সে যুবক। মাথায় ঘন কালো চুল। কিন্তু গায়ের রং সাদা, স্লাভদের মতই অর্থাৎ তার দেহে তুর্কি ও স্লাভ দুই রক্তধারাই রয়েছে।

যুবকটির চেহারা বুদ্ধিদীপ্ত। ভাবলেশহীন তার দৃষ্টি। সেখানে ভয়ের কোন চিহ্ন নেই। যেন অনাকাঙ্খিত কিছু ঘটেনি তার।

বিল কনষ্টানটাইন যুবকটির দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার নাম কি? যুবকটি দেরী না করে বিনা দ্বিধায় বলল, সালেহ বাহমন।

নামের উচ্চারণ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে কনষ্টানটাইনের প্রচন্ড থাপ্পড় গিয়ে পড়ল যুবকটির গালে। বলল, কুত্তা ঐ নাম আমি শুনতে চাইনি, যুগোশ্লাভিয়ার নাগরিক হিসেবে তোর নাম কি তাই বল।

আকস্মিক থাপ্পড়ে যুবকটি মুহূর্তের জন্যে চমকে উঠেছিল মাত্র। কিন্তু শীঘ্রই নিজেকে সামলে নিল। বলল, আমার এখন এই একটাই না......।

এবার কথা শেষ হলো না। কনষ্টানটাইনের আরেকটি থাপ্পড় গিয়ে পড়ল যুবকটির অন্য গালটিতে। সেই সাথে সে চিৎকার করে উঠল, চুপ শয়তানের বাচ্চা। তোর নাম বল।

যুবকটি এবার আর চমকে উঠেনি। স্পষ্ট কণ্ঠে সে বলল, মুসলিম নাম গ্রহণ এখন আর বেআইনি নয়। এ অধিকার মুসলমানদের দেয়া হয়েছে।

--আইনের নিকুচি করি। গোলযোগ-অবস্থা ও সরকারের দূর্বলতার সুযোগে তোরা এটা আদায় করে নিয়েছিস। কেউ মানেনা এটা। যুগোশ্লাভ নাম তোকে বলতে হবে। বল বলছি।

--বলেছি, আমার নাম সালেহ বাহমন।

কনষ্টানটাইনের চোখ দু'টি জ্বলে উঠল।

সে ইয়েলেস্কুর দিকে চেয়ে বলল, চাবুক লাগাও ইয়েলেস্কু। হারামজাদা পাকা শয়তান।

'ইয়েলেস্কু চাবুক নিয়ে এসে সালেহ বাহমনের গা থেকে ওভার' কোট খুলে ফেলে দিল।

চামড়ার চাবুক।

ইয়েলেস্কু সালেহ বাহমনকে টেনে নিয়ে দেয়ালে বুক ঠেকিয়ে দাঁড় করাল।

ইয়েলেস্কুই চাবুক মারা শুরু করল সালেহ বাহমনের পিঠে।

এক-দুই-তিন......পাঁচটি চাবুক লাগাল এক নিঃশ্বাসে।

চাবুকের নির্দয় ছোবলে প্রথমে কেঁপে উঠেছিল বাহমন। পরে সে স্থির হয়ে গিয়েছিল। তাজা লাল রক্তে ভিজে উঠেছিল পিঠের সাদা সার্ট। দু'হাত ও মাথা দেয়ালে ঠেকিয়ে স্থির দাঁড়িয়েছিল সালেহ বাহমন।

পাঁচটি চাবুক শেষ করে ইয়েলেস্কু থামল।

কনষ্টানটাইন তার হাতের হ্যান্ডবিলটি ইয়েলেস্কুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, ওকে পড়তে দাও।

ইয়েলেস্কু সালেহ বাহমনকে ঘুরিয়ে নেবার জন্য হাত ধরে টান দিল। সালেহ বাহমন ঘুরে দাঁড়াল, কিন্তু কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল। ইয়েলেস্কু সালেহ বাহমনের পাঁজরে একটি লাথি দিয়ে বলল, এখনি এই অবস্থা।

বলে ইয়েলেস্কু হ্যান্ডবিলটি সালেহ বাহমনের দিকে ছুড়ে দিয়ে বলল, কি লিখেছিস পড়। তোর মুখেই আমরা শুনব।

সালেহ বাহমনের চোখে-মুখে প্রচণ্ড ক্লান্তি। হাতি পেটানো চাবুকের আঘাতে সে উঃ আঃ করেনি সত্য, কিন্তু বেদনা চাপতে গিয়ে বেদনায় জর্জরিত হয়েছে সে। চোখে-মুখে তার প্রকাশ স্পষ্ট।

প্রথমটায় সালেহ বাহমন হ্যান্ডবিলটি হাতে নিলনা। পড়ে গেল তা কার্পেটের উপরে।কিন্তু পরক্ষণেই হ্যান্ডবিলটি কুড়িয়ে নিয়ে সে বলল, আমাদের কথা আমি অবশ্যই পড়ব। বলে সে হ্যান্ডবিলটি চোখের সামনে তুলে ধরল। হ্যান্ডবিলটির শিরনামঃ 'যুগোশ্লাভ সর্ব সাধারণের কাছে মজলুম মুসলিমদের আবেদন'।

'মুসলমানরা যুগোশ্লাভিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম জাতি গোষ্ঠি। যুগোশ্লাভিয়ার অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের মত তারাও সমান অধিকার ভোগ করার কথা। কিন্তু বহু বছরের স্বৈরশাসন আমলে সুপরিকল্পিতভাবে এক এক করে তাদের অধিকার হরণ করা হয়েছে। এমনকি অবশেষে মুসলিম নাম রাখার অধিকারও হরণ করা হয়। স্বৈরাচারের ভিত্তি ধ্বসে পড়ার পর অনেক দাবীর পর মুসলিম নাম রাখার অধিকার টুকু ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে, কিন্তু আর সব অধিকার থেকে আমরা বঞ্চিত। ক্ষুদ্র একটি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর মনোরঞ্জনের জন্য লাখো মুসলমানের স্বার্থ নিয়ে ফুটবল খেলা.........

পড়ায় বাধা দিয়ে চিৎকার করে কনষ্টানটাইন, 'চুপ কর কুত্তার বাচ্চা।'

বলেই ইয়েলেস্কুর হাত থেকে চাবুকটি নিয়ে গায়ের সব শক্তি দিয়ে প্রচণ্ড এক আঘাত করল সালেহ বাহমনকে। চাবুকটি গিয়ে বাম কাঁধ ও পিঠে যেন কেটে বসে গেল। কেঁপে উঠল সালেহ বাহমনের দেহ।

চাবুকটি টেনে নিল কনষ্টানটাইন। সংগে সংগে কাঁধের জামা ভিজে উঠল রক্তে।

দ্বিতীয় আঘাতের জন্যে কনষ্টানটাইন চাবুকটি মাথার উপরে তুলেছিল, কিন্তু কি ভেবে চাবুকটি নামিয়ে নিয়ে সালেহ বাহমানকে লক্ষ্য করে বলল, তোর সাথে আর কারা আছে, কারা এ হ্যান্ডবিল ছেপেছে, কোত্থেকে ছেপেছে, আমাদের বলতে হবে তোকে। মিথ্যা বলবি না।

--মুসলমানরা মিথ্যা কথা বলে না। কনষ্টানটাইনের দিকে সোজা তাকিয়ে বলল সালেহ বাহমন।

--ঐ জাতের বড়াই করবি না আর, চাবুকে পিঠের ছাল তুলে দেব। একটু থেমেই কনষ্টানটাইন আবার শুরু করল, যে প্রশ্ন জিজ্ঞাস করেছি তার উত্তর দে।

--প্রশ্নগুলোর উত্তর আমি দেব না। দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিল সালেহ বাহমন।

--কি বললি উত্তর দিবি না? মূহূর্তকাল সালেহ বাহমনের দিকে তাকিয়ে থেকে কনষ্টানটাইন বলল, জানিস তোর এ কথার পরিণতি কি? তোর জীবনের ভয় নেই?

--জীবনকে যে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়, পরকাল যাদের জন্যে ভীতির, তারাই মৃত্যুকে ভয় করে।

চোখ দু'টি জ্বলে উঠল কনষ্টানটাইনের। বলল, আবার সেই বড়াই? অমন বড়াই অনেক দেখেছি।

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কনষ্টানটাইনের চাবুক উপরে উঠল, তারপর নির্মম গতিতে তা গিয়ে আঘাত করল সালেহ বাহমনের পিঠে।

একটার পর আরেকটা, চলতেই থাকল একের পর এক। কনষ্টানটাইন যেন পাগল হয়ে গেছে।

সালেহ বাহমনের রক্তাক্ত দেহ ঢলে পড়ে গেল কার্পেটের উপর। জ্ঞান হারিয়েছে সে।

থামল কনষ্টানটাইন। রক্তাভ চোখ দু'টি তার।

সে ইয়েলেস্কুর হাতে চাবুকটি দিল এবং বলল, একে দানিয়ুবে ফেলে দিয়ে এস ইয়েলেস্কু, পানিতে ডুবে মরুক।

বলে কনষ্টানটাইন ঘর থেকে বের হয়ে গেল। অন্যরা সবাই বের হয়ে গিয়েছিল আগেই। শুধু ইয়েলেস্কুর সাথে জর্জ নামের লোকটি দাঁড়িয়েছিল।

ইয়েলেস্কু মিলেশ বাহিনীর এই হেডকোয়ার্টারে যে, ‘নির্মূল স্কোয়াড’ গুলো রয়েছে তার প্রধান। জর্জ তার দক্ষিণ হস্ত।

কনষ্টানটাইন বেরিয়ে গেলে ইয়েলেস্কু এবং জর্জ দু’জনে ধরাধরি করে সংজ্ঞাহীন সালেহ বাহমনকে একটা খোলা জীপে তুলে নিল।

রাত তখন সাড়ে এগারটা। তীব্র শীতের রাত।

রাস্তায় গাড়ি ও যান চলাচল নেই বললেই চলে। দানিয়ুব এভিনিউ উত্তর পূর্বে দানিয়ুব নদী পর্যন্ত এগিয়ে গেছে।

সুন্দর, সুপ্রশস্ত দানিয়ুব এভিনিউ বেলগ্রড নগরীর উত্তর-পূর্ব প্রান্ত ছুয়ে পুর্ব-দক্ষিণে এগিয়ে গেছে।

জীপটি তীর গতিতে এগিয়ে চলছিল দানিয়ুব নদীর দিকে।

শহর পেরুলেই দানিয়ুব। সুন্দর, সুপ্রশস্তব্রীজ দানিয়ুবের উপর দিয়ে।

এলাকাটি নির্জন।

মাঝে মাঝে দু’একটি গাড়ি তীব্র গতিতে আসছে, যাচ্ছে।

ইয়েলেস্কু গাড়ি চালাচ্ছিল। পেছনে জর্জ এবং তার পাশে সালেহ বাহমনের সংজ্ঞাহীন দেহ।

জীপটি দানিয়ুব ব্রীজে উঠে মাঝ বরাবর এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ফুটপাতের একেবারে গা ঘেষে।

সংগে সংগে জর্জ সালেহ বাহমনকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। দ্রুত এগুলো সে রেলিং এর দিকে। সালেহ বাহমনকে রেলিং এর উপরে তুলে একটু দম নিয়ে দু’হাত বাড়িয়ে নিচে অন্ধকার নদী বক্ষের দিকে একবার তাকিয়ে সালেহ বাহমনের দেহ হাত থেকে ছেড়ে দিল।

তারপর দেরী না করেই ঘুরে দাঁড়িয়ে উঠে এল জীপে।

ইয়েলেস্কু জীপ ঘুরিয়ে নিয়েছিল। জর্জ উঠে বসতেই জীপ ছেড়ে দিল। ফিরে চলল তারা নগরীর দিকে।

দানিয়ুবের কাল বুক চিরে একটা ইঞ্জিন বোট এগিয়ে যাচ্ছিল। বেশ বড় বোট।

বোটের ডেকে অনেকগুলো প্লাস্টিক বস্তা। বস্তাগুলো শুকনো কাপড়ে ঠাসা।

বোটের পেছনে ইঞ্জিনের পাশে ছোট্ট একটা ইস্পাতের ষ্ট্যান্ডে একটা নেমপ্লেট। কালো প্লেট সাদা অক্ষরে লেখা 'মেসার্স দানিয়ুব লন্ড্রী হাউস' প্রোপ্রাইটর কালহান ফিহার নং ১৯।

নতুন সরকার বেসরকারী খাতে শিল্প-কারখানা স্থাপনের অনুমতি দিয়েছে। মেসার্স দানিয়ুব লন্ড্রী হাউস সে ধরনেরই একটা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান।

বোটে দু'জন মানুষ।

একজন ইঞ্জিনের কাছে বসে আছে। হ্যাটে তার কপাল পর্যন্ত ঢাকা। গায়ে ওভারকোট জড়ানো।

আরেকজন বসে আছে বোটের মাঝখানে। তার মাথায় সাদা উলের হেড কভার, গায়ে ওভার কোট।

ইঞ্জিনের কাছে ডেক চেয়ারে যে লোকটি বসে আছে তারই নাম কালহান ফিহার। দানিয়ুব লন্ড্রী হাউসের মালিক।

বোটের নেমপ্লেটে তার নাম কালহান ফিহার লেখা থাকলেও তার আসল নাম ওমর বিগোভিক।

ওমর বিগোভিক বেলগ্রেড বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের একজন কৃতি অধ্যাপক। প্রায় ২৫ বছর চাকুরী করার পর ক'য়েকমাস আগে সে চাকুরী হারিয়েছে। তার সুপারিশে ভর্তি হওয়া দুজন মুসলিম ছাত্র সাম্প্রদায়িক অর্থাৎ মুসলিম জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে জেলে যায়। তাদের অপরাধের সাথে ওমর বিগোভিককেও জড়ানো হয়। তবে তাকে এইটুকু দয়া করা হয়েছে যে, তাকে জেলে না পাঠিয়ে চাকরীচ্যুত করা হয়েছে। আর যেহেতু সে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানের যোগ্যতা হারিয়েছে অতএব কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই আর তার চাকুরী হবে না।

চাকুরী হারিয়ে ওমর বিগোভিক একেবারে পথে বসে।

অনেক চিন্তা করে ব্যবসায় ছাড়া আর কোনো বিকল্প দেখে না। অলঙ্কারাদি, কিছু আসবাবপত্র বিক্রি করে তার সাথে সঞ্চয়ের কিছু টাকা যোগ করেও মূলধন যথেষ্ট হয় না। অবশেষে দ্বারস্থ হতে হয় বন্ধু-বান্ধবদের। এভাবে সে মূলধন যোগাড় করে দানিয়ুব লন্ড্রী হাউস চালু করে। দানিয়ুবের তীরে একটা ছোট্ট বাড়ি ভাড়া নিয়ে এই ব্যবসায় তার শুরু হয়েছে। ব্যবসায় করতে গিয়ে তাকে তার মুসলিম নাম পাল্টিয়ে যুগোশ্লাভ খৃষ্টান নাম গ্রহণ করতে হয়। মুসলিম নাম নিয়ে ব্যবসায় করতে পদে পদে বাধা-বিপত্তি, অসহযোগিতা এবং সমস্যা-সংকটের ভয় আছে।

ওমর বিগোভিকের ইঞ্জিন বোট তখন দানিয়ুব ব্রীজের কাছাকাছি এসে পড়েছে। এমন সময় বিশ্রী এক শব্দ তুলে বোটের ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল।

ওমর বিগোভিক ইঞ্জিন স্টার্ট দিতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো।

বোটটি ধীরে ধীরে চলতে চলতে ব্রীজের তলায় এসে দাঁড়ালো।

ওমর বিগোভিক মুখ তুলে বোটের মাঝখানে বসে থাকা দ্বিতীয়জনকে লক্ষ্য করে বলল, মা নাদিয়া ব্রীজের থামের সাথে বোট বেঁধে দাও, স্রোতে বোট ভেসে যাবে। ইঞ্জিন খুলে দেখতে হবে কোথায় গন্ডগোল

নাদিয়া ওমর বিগোভিকের মেয়ে। নাম নাদিয়া নূর।

নাদিয়া নূর কাপড়ের বস্তা থেকে নেমে বোটের সামনের গলুইয়ে গিয়ে ছোট বৈঠা দিয়ে বোটকে ব্রীজের থামের কাছে টেনে নিলো। তারপর ব্রীজের হুকের সাথে নৌকা বেঁধে ফেলল।

দড়ি বাঁধা নৌকা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দুলতে লাগল।

ওমর বিগোভিক বোটের ইমারজেন্সি বক্স থেকে টর্চ বের করে ইঞ্জিনের দিকে এগুলো।

আর নাদিয়া নৌকার গলুই থেকে তার আগের জায়গায় ফিরে আসার জন্যে পা বাড়াল।

ঠিক এই সময়েই উপর থেকে ভারি কিছু নৌকার মাঝখানে বস্তার উপর এসে পড়লো।

নৌকা প্রচন্ডভাবে দুলে উঠলো।

নাদিয়া নৌকা থেকে পড়ে যেতে যেতে বেঁচে গেল। ওমর বিগোভিক ডেকের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল।

ওমর বিগোভিক তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে টর্চ জ্বালল দেখার জন্যে কি পড়ল বোটের উপর।

টর্চ জ্বেলেই চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল ওমর বিগোভিকের। নাদিয়া নূরও এগিয়ে এসেছিল। সে ভয়ে চিৎকার করে উঠলো।

বস্তার উপর একজন যুবকের সংজ্ঞাহীন দেহ। রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার শরীর।

ওমর বিগোভিক তাড়াতাড়ি যুবকটির পাশে বসে তার হাত তুলে নিয়ে নাড়ি পরীক্ষা করলো। তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, না- যুবকটি মরে যায়নি।

ওমর বিগোভিক তাড়াতাড়ি যুবকটিকে পাঁজাকোলা করে তুলে এনে বোটের সমতল ডেকে শুইয়ে দিলো। বলল, মা নাদিয়া একটু পানি দাওতো। নাদিয়া তাড়াতাড়ি ফ্লাক্স থেকে একটি পট নিয়ে নদী থেকে পানি তুলে আনলো।

ওমর বিগোভিক অল্পকিছু পানি তার মুখে ছিটিয়ে দিলো এবং বলল, মা ছেলেটি এখনও বেঁচে আছে।

--কিন্তু এখানে কোত্থেকে, কিভাবে এল? বলল নাদিয়া।

--মনে হয় ছেলেটির কোনো শক্র ছেলেটিকে মারার পর মরেছে মনে করে নদীতে ফেলে দিয়েছিল। ছেলেটির ভাগ্য নৌকার উপর এসে পড়েছে।

ক'য়েক মিনিট গেল, ছেলেটির জ্ঞান ফিরে এলো না।

ওমর বিগোভিক ভাবলো, আঘাত নিশ্চয় খুব মারাত্মক। কোথায় আঘাত দেখার জন্যে ওমর বিগোভিক বুক ও পিঠের জামা উঠিয়ে বীভৎস দৃশ্য দেখে কেঁপে উঠলো।

টর্চ ধরেছিল নাদিয়া। সে আরেক দফা আর্তনাদ করে উঠলো।

বুক, পিঠ গোটাটাই ফেটে ক্ষত-বিক্ষত। রক্ত ঝরছে এখনও সেগুলো থেকে।

ছেলেটিকে চীৎ করে শুইয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল বিগোভিক

নাদিয়ার টর্চ ছেলেটির মুখের উপর গিয়ে পড়েছে।

সুন্দর নিষ্পাপ চেহারা ছেলেটির। চোখ নীল, কিন্তু চুলগুলো কালো। অথচ স্লাভদের মতো সাদা চেহারা। তবে এই সাদার মধ্যে একটা সোনালী রং আছে।

--ছেলেটি কোনো ক্রিমিনাল নয়, ক্রিমিনালের চেহারা এ রকম হয় না। বলল ওমর বিগোভিক।

পিওর স্লাভ নয়। বলল নাদিয়া।

--ঠিক বলেছ। কিন্তু এখন কি করি বলত, দ্রুত চিকিৎসা দরকার ছেলেটির।

আমাদের ইঞ্জিন নষ্ট। কি করতে পারি। ঠিক এই সময় দক্ষিণ দিকে একটা হেডলাইট ছুটে আসছে দেখা গেল।

আশান্বিত হলো ওমর বিগোভিক। নিশ্চয় কোনো লঞ্চ অথবা মোটর বোট হবে।

হেডলাইটটি কাছে চলে এল। ছোট একটা মোটর লঞ্চ।

ওমর বিগোভিক টর্চ জ্বেলে বোটের পেছনে দাঁড়িয়েছিল। মোটর লঞ্চটি কাছাকাছি হতেই ওমর বিগোভিক বলল, আমার বোটের ইঞ্জিন বিকল হয়ে গেছে।

আহত মূমুর্ষ একজন আমার বোটে। সাহায্য করলে বাধিত হবো।

লঞ্চের গতি কমে গেল।

লঞ্চ থেকে হেড লাইটের আলো এসে বোটের উপর পড়ল। আলোর বন্যায় ভেসে গেল বোট।

নাদিয়া আহত যুবকটির পাশে উত্তরমুখী হয়ে বসে ছিল। তার মুখে আলো পড়লো না।

লঞ্চটি ধীরে ধীরে বোটের পাশে চলে এলো। লঞ্চটিকে দু'তলায় বলা যায়। তবে দু'তলায় উন্মুক্ত ডেকের মাঝখানে একটা কেবিন মাত্র।

লঞ্চ থেকে কে একজন বলল, কোথায় যাবেন?

--টিটো পোর্টে পৌঁছতে পারলেই হবে। বলল ওমর বিগোভিক।

--আপনার নাম কি?

--কালহান ফিহার।

লঞ্চের লোকটি কয়েক মুহূর্ত কথা বলল না। মনে হয় কারো সাথে পরামর্শ করছে।

একটু পরেই বলল, ঠিক আছে, আপনার বোট লঞ্চের পাশে বেঁধে নিন।

ওমর বিগোভিক দ্রুত সামনের গলুইয়ে গিয়ে দড়িটা পিলারের হুক থেকে খুলে নিয়ে লঞ্চের পাশের আংটার সাথে বেঁধে নিল।

লঞ্চ আবার চলতে শুরু করল। তার সাথে বোটটিও।

লঞ্চে দড়ি বাঁধার সময় এক তলার খুলে দেয়া জানালা দিয়ে ওমর বিগোভিকের নজর গিয়েছিল ভেতরে। ভেতরে নজর পড়তেই আঁৎকে উঠলো ওমর বিগোভিক।

জানালার পাশেই একটা শ্বেত পাথরের টেবিল। টেবিলে তখন কেউ নেই। টেবিলটির মাঝখানে ফনা তোলা একটা কালো সাপের মাথা। ফনার উপরটা ঘিরে অর্ধ চন্দ্রাকারে লেখা ‘মিলেশ’। অর্থাৎ মিলেশ বাহিনীর লঞ্চ।

ওমর বিগোভিক নাদিয়ার কাছে এসে নিচু গলায় বলল, এটা মিলেশ বাহিনীর লঞ্চ, সাবধান থাকতে হবে। পরিচয় প্রকাশ না হয়। তুমি ঐ পেছনটায় ইঞ্জিনের কাছে গিয়ে বসে থাক, কথা বলবে না।

নাদিয়া বুঝল। সে জানে মিলেশ বাহিনী বর্বর। সে পিতার হ্যাটটি মাথায় দিয়ে নৌকার পেছনে গিয়ে বসল।

লঞ্চের সেই আগের লোকটি  আবার দু’তলায় কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে ডেকের প্রান্তে দাঁড়িয়ে বলল, আপনার আহত লোকটা কেমন?

--এখনও জ্ঞান ফিরেনি, বলল ওমর বিগোভিক।

--আমাদের ডাক্তার আছে, পাঠাব নাকি?

--খুব ভাল হয়।

কিছুক্ষণ পর ডাক্তার নেমে এল নৌকায়। একটা ব্যাগ তার হাতে।

ডাক্তার যুবকটির শরীরে একবার নজর বুলিয়েই বলল, এগুলো চাবুকের ক্ষত।

বুক, নিশ্বাস, ইত্যাদি পরীক্ষা করে বলল, অমানুষিক মেরেছে, আর অল্প হলেই মারা যেত। জীবনী শক্তি শেষ প্রান্তে পৌঁছেছিল।

একটু থেমে বলল, এখনি জ্ঞান ফিরে আসবে। তবে এর যে ড্রেসিং দরকার তা আমার কাছে নেই। হাসপাতালেই নিতে হবে।

বলে ডাক্তার ব্যাগ খুলে তুলার কিছু এলকোহল ঢেলে যুবকটির নাকে ধরল।

লঞ্চের ডেক থেকে আসা আলো নৌকাকেও আলোকিত করছিল।

ডাক্তার বসেছিল যুবকটির মাথার কাছে। ওমর বিগোভিক বসেছিল যুবকটির উত্তর পাশে ডেকের উপর। নাদিয়া একটু দূরে নৌকার গলুইয়ে বসে সব কিছু দেখতে পাচ্ছিল।

--এর এ অবস্থা হলো কেন? কে তাকে অত্যাচার করল। জিজ্ঞাসা করল ডাক্তার।

মুস্কিলে পড়ে গেল ওমর বিগোভিক। নিজের লোক বলে পরিচয় দেওয়াও মুস্কিল। তাহলে বলতে হবে কি করে ঘটনা ঘটল এবং ঘটনার জড়িয়ে যেতে হবে। তাছড়া যুবকটির জ্ঞান ফিরলেই সব ফাঁস হয়ে যাবে যে, সে চেনা নয়। আবার নিজের লোক না বললে বলতে হবে কোথায় পেলাম, কি করে পেলাম। নৌকার উপর এসে পড়েছে, একথা কেউ বিশ্বাস করবে না।

ওমর বিগোভিক চিন্তা-ভাবনা করে দেখল, শেষের পন্থাটিই ঠিক এবং সত্য কথা বলারই সিদ্ধান্ত নিল।

--ইঞ্জিন নষ্ট হবার পর আমাদের নৌকা ব্রীজের তলায় বাধা ছিল। যুবকটি ব্রীজের উপর থেকে এসে আমার নৌকায় পড়েছে। সম্ভবতঃ কেউ মেরে ফেলে দিতে চেয়েছিল। বলল ওমর বিগোভিক।

অবাক দৃষ্টিতে ডাক্তার ওমর বিগোভিকের দিকে তাকাল। সে অবিশ্বাস করল মনে হল না।

--অলৌকিক ভাবে যুবকটি বেঁচে গেছে। পানিতে পড়লে সলিল সমাধি হতো। বলল ডাক্তার।

এই সময় যুবকটির হাত-পা নড়ে উঠল ঈষৎ। যুবকটি ধীরে ধীরে চোখ খুলল।

চোখে কোন চাঞ্চল্য নেই, কোন উদ্বেগ নেই। শান্ত চোখে একবার সে চারদিক চোখ বুলাল। বোধহয় বুঝে নিতে চেষ্টা করল সে কোথায়। তারপর চোখটি তার আবার অর্ধ নীপিলিত হয়ে গেল। কোন কথা সে বলল না।

অবাক হলো ওমর বিগোভিক। মনে হয় আবাক হয়েছে ডাক্তার এবং নাদিয়াও। এরকম একটা পরিস্থিতিতে আহত-মুমুর্ষ একজনের কাছ থেকে নানা জিজ্ঞাসা আসবে ও উদ্বেগ প্রকাশ পাবে, সেটাই স্বাভাবিক।

সবাই নিরব।

নিরবতা ভাঙল ডাক্তার।

বলল, আপনি কে, নাম কি?

--আমি সালেহ বাহমন, একজন ছাত্র। বলল আহত যুবকটি।

নাম শুনে চমকে উঠল ডাক্তার, চমকে উঠল ওমর বিগোভিক, নাদিয়াও।

কিন্তু ডাক্তারের চমকে উঠার মধ্যে ছিল দু'চোখ ভরা ঘৃণা। আর ওমর বিগোভিক ও নাদিয়ার মধ্যে ছিল উদ্বেগ।

ডাক্তার মুখ বাঁকা করে উঠে দাঁড়াল। বলল, পণ্ডশ্রম করলাম মিঃ কালহান। এ হিদেন ব্যাটা নিশ্চয় কোন ধাড়ি শয়তান হবে। এর মরাই উচিত। বলে ডাক্তার লঞ্চে উঠে গেল।

ওমর বিগোভিকের মুখে কোন কথা যোগাল না।

এরপর কি ঘটে সেই চিন্তায় তার মন দুরু দুরু করতে লাগল। মিলেশ বাহিনী হিটলারের নাজী বাহিনীর একটা প্রতিরূপ। মুসলমানদের অস্তিত্ব এদের কাছে অসহ্য। মুসলমানদের উপর আঘাত হানার কোন সুযোগই এরা হাত ছাড়া করে না। বলকানে এ বাহিনী গঠিত হয়েছে। মুসলমানদের এবং তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য নির্মূল করার জন্যই।

নিরবতা ভাঙল লঞ্চের ডেকের উপর থেকে আসা একটা আওয়াজে। ডেকের উপর দাঁড়িয়ে সেই আগের লোকটি বলল, লোকটির পরিচয় তো পেয়েছেন মিঃ কালহান। আমাদের জাত শত্রু, কাল সাপ। নদীতে ফেলে দিন। ডুবে মরুক। আমরা ওকে কোন সাহায্য করতে পারব না।

লোকটি ডেক থেকে চলে গেল।

পর মুহূর্তেই লঞ্চের সাথে বোট বেঁধে রাখা দড়িটি খুলে দিল।

ওমর বিগোভিক একটুও দুঃখিত হলো না। বরং আল্লাহ্‌র লাখো শুকরিয়া আদায় করল এই বলে যে, তারা নিজেরা যুবকটিকে নদীতে ফেলে দিয়ে যায়নি।

ওমর বিগোভিক উঠে দাঁড়াল। বলল, মা নাদিয়া তুমি এখানে ছেলেটির কাছে বস। আমি বৈঠা ধরি। নৌকা ভেসে যাবে।

বলেই ওমর বিগোভিক আবার যুবকটির মাথার কাছে ঝুকে পড়ে বলল, বাবা আল্লাহ্ তোমাকে বাঁচিয়েছে, তুমি এখন নিরাপদ।

একটু থেমে বলল, খুব কষ্ট হচ্ছে তোমার?

যুবকটি চোখ খুলল। দুর্বল কণ্ঠে বলল, এর চেয়েও বড় কষ্ট আছে। সেই সব বড় কষ্টের তুলনায় এসব কোন কষ্টই নয়।

নাদিয়া এসে পাশে দাঁড়িয়েছিল। যুবকটির কথা শুনে ওমর বিগোভিকের চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বিস্ময়ও জাগলো মনে, এ কোন সাধারণ যুবকের কথা নয়!

'আলহামদুলিল্লাহ্' বলে ওমর বিগোভিক নৌকার গলুই এর দিকে পা বাড়াল। কিন্তু দু'ধাপ গিয়েই আবার ফিরে দাঁড়াল।

হঠাৎ তার খেয়াল হল যুবকটি যে শুধু সার্ট গায়ে দিয়ে, শীতে জমে যাচ্ছে এটা তার চোখেই পড়েনি। ওমর বিগোভিক তাড়াতাড়ি বোটের ডেকের নিচ থেকে একটা কম্বল বের করল, আর নিজের সার্টটা খুলে ফেলল।

তখন বোটটি স্রোতের টানে ঘুরতে শুরু করেছে।

ওমর বিগোভিক তাড়াতাড়ি কম্বল ও সার্ট নাদিয়ার দিকে ছুড়ে দিয়ে বলল, ওর জামাটা পাল্টিয়ে গায়ে কম্বল দিয়ে দাও।

বলে ওমর বিগোভিক বোটের গলুইয়ে গিয়ে বৈঠা ধরল। প্রথমে সে বোটটা নদীর কিনারে টেনে নিল, তারপর বৈঠা চালিয়ে এগুতে শুরু করল। কিনারায় স্রোত কম। এগুতে খুব অসুবিধা হলো না।

নাদিয়া জামা নিয়ে সালেহ বাহমনের পাশে বসল। তারপর বাম হাতে তার মাথা মৃদু স্পর্শ করে বলল, শুনুন, আপনার জামা পাল্টাতে হবে, রক্তে ভিজে গেছে।

সালেহ বাহমন চোখ খুলল।

তারপর উঠে বসার জন্য সে মাথা তুলল। নাদিয়া তাড়াতাড়ি মাথা ধরে তাকে তুলে বসাল।

বসতে গিয়ে ককিয়ে উঠল সালেহ বাহমন।

এই প্রথম তার একটি আর্তনাদ।

নাদিয়া ব্যতিব্যস্ত হয়ে বলল, খুব কষ্ট হচ্ছে কি?

সালেহ বাহমন তখন নিজেকে সামলে নিয়েছে। বলল, না।

বলে সালেহ বাহমন গা থেকে জামা খুলতে গিয়ে বেদনায় ককিয়ে উঠল আবার।

কোন কোন জায়গায় রক্ত শুকিয়ে জামা আটকে গেছে।

দ্বিতীয়বার জামা খুলতে গিয়ে আবার সেই রকম আর্তনাদ করে উঠল সালেহ বাহমন। টলতে লাগল সে।

নাদিয়া তাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে উঠল, আব্বা তুমি এস।

বৈঠা ফেলে ছুটে এল ওমর বিগোভিক।

সে এসে সালেহকে ধরল। বলল, মা দেখ, ডেকের ড্রয়ারে কাঁচি আছে। ছুটে গিয়ে কাঁচি নিয়ে এল নাদিয়া।

ওমর বিগোভিক কাঁচি নিয়ে কেটে জামা খুলে ফেলল। কয়েকটা অংশ গায়ের সাথে থেকে গেল। তারপর জামা পড়িয়ে দিয়ে শুইয়ে দিল সালেহ বাহমনকে। কম্বল দিয়ে গোটা গা ঢেকে দিল।

নাদিয়া তাঁর নিজের উলের হেডকভার সালেহ বহমানের মাথায় লাগিয়ে দিল।

বোট ততক্ষণে অনেকটা ভাটিতে ভেসে এসেছে।

ওমর বিগোভিক গিয়ে আবার বৈঠা ধরল।

নাদিয়া সালেহ বাহমনের পাশে বসে রইল। তাঁর মনে খচ খচ করে বিধছিল একটা কথা বার বার, মিলেশরা এত অমানুষ কেন? একজন ডাক্তার এত জঘন্য চরিত্রের হতে পারে কেমন করে? কেমন করে তারা একজন আহত-অসুস্থ মানুষকে নদীতে ফেলে দিতে চায়, মুসলমানরা কি দোষ করেছে? মুসলমানরা শুধু

যুগোশ্লাভিয়ায় নয়, গোটা বলকানের শান্তিপ্রিয় নাগরিক। তারা কোন হাঙামায় নেই। একটাই তাদের অপরাধ। সেটা হল মুসলমান হিসেবে অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে যা করণীয় তা তারা করতে পারছে না, এটা তারা চায়। খৃষ্টান স্লাভ, বুলগার,গ্রীক সবাই চাচ্ছে মুসলমানরা তাদের মুসলমানিত্ব পরিত্যাগ করে তাদের সাথে মিশে যাক। মুসলমানরা রাজী হচ্ছেনা, এটাই তাদের অপরাধ। এ অপরাধ থেকে মুক্তির তাদের উপায় নেই। সালেহ বাহমন এ অপরাধেই অপরাধী। কারা তাকে নির্যাতন করল, কারা তাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল? নাদিয়ার আরও মনে হলো, সালেহ বাহমন সাধারণ শ্রেণীর কেউ নন, তা তাঁর কথা, নার্ভ-শক্তি থেকেই বুঝা যাচ্ছে।

নাদিয়া বেলগ্রেড বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞানের একজন ছাত্রী। শীতের রাত। নিরব চারদিক। নদীর বুকে ঘন অন্ধকার। এই অন্ধকারের মধ্যে গাঢ় একটা ছায়ার মত এগিয়ে যাচ্ছে বোটটি। ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোচ্ছে টিটো পোর্টের দিকে।

# ৩

বেলগ্রেড বিশ্ববিদ্যালয়। লাইব্রেরীর একটি নির্জন প্রান্তে একটি টেবিলে বসে আছে ডেসপিনা জুনিয়র।

তাঁর সামনে একটি বই খোলা।

তাঁর চোখ বইয়ের দিকে নিবদ্ধ। কিন্তু একটা বর্ণও সে পড়ছে না। ক্ষোভে, দুঃখে, বেদনায় বিপর্যস্ত তাঁর মুখ।

ডেসপিনা জুনিয়র ইতিহাসের একজন অত্যন্ত কৃতি ছাত্রী। অনার্সে সে প্রথম শ্রেনীতে প্রথম হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বর্ষে সে অধ্যয়ন করছে।

ইতিহাসের ক্লাসে আজ সে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছে। ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক ক্লাসে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। বক্তৃতার মাঝখানে ডেসপিনা বাধার সৃষ্টি করে কিছু বলার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু অধ্যাপক তাকে কিছু বলতে না দিয়ে ধমকে বসিয়ে দেয়। ক্রুদ্ধ ডেসপিনা অনুমতি না নিয়েই ক্লাস থেকে গট গট করে বেরিয়ে আসে।

অপমানিত অধ্যাপক ক্লাসে বসেই বিভাগীয় নির্দেশ জারি করেছেন, ডেসপিনা একমাসের জন্য সাসপেন্ড। একমাস তাকে ইতিহাসের ক্লাসে এলাও করা হবেনা।

এই অপমান এবং ক্ষোভে-দুঃখে জর্জরিত হচ্ছিল ডেসপিনা জুনিয়রের হৃদয়।

কারনিনা, জেমস এবং নাদিয়া লাইব্রেরীতে প্রবেশ করেই ডেসপিনাকে দেখতে পেল।

এরা সবাই ইতিহাস বিভাগের এবং ডেসপিনার সহপাঠী। ডেসপিনাকে ঘিরে বসল সবাই।

কারনিনা বলল, তোমার এভাবে অধৈর্য হওয়া এবং এভাবে বেরিয়ে আসা ঠিক হয়নি। সঙ্গে সঙ্গেই কিছু বলল না ডেসপিনা।

মুখ নিচু করে নিরব রইল। তাঁর দু'চোখ থেকে নেমে এল অশ্রু।

--আমি ঠিকই করেছি, ইতিহাস চুরি করবে কেন, ইতিহাস বিকৃত করবে কেন? বলল ডেসপিনা।

-- কি বলছ, স্যার ইতিহাস চুরি করেছেন? কারনিনাই আবার বলল।

--তোমার এসব বাড়াবাড়ি ডেসপিনা, স্যারের উপর এমন মন্তব্য ঠিক নয়। বলল জেমস।

--না আমার বাড়াবাড়ি নয়। স্যার ইতিহাস শিক্ষকের মত আচরণ করেননি, তাঁর বর্ণনা একচোখা হয়েছে।

--কেমন করে বলত। বলল নাদিয়া।

ডেসপিনা একটু চুপ করে থাকল। তারপর শুরু করল, স্যার বললেন হাঙ্গেরীর রাজা লেডিস লাস ও ওয়ালেচার রাজা ডাকুলের মিলিত বাহিনীর সাথে বুলগেরিয়ার ভার্সায় ১৪৪৪ সালের ১০ ই নভেম্বর তুর্কী সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের যে যুদ্ধ হয় তা সুলতানের নিষ্ঠুর দলননীতির ফল। সুলতান নাকি খৃষ্টানদের গ্রামের পর গ্রাম ও গীর্জা ধ্বংস করেন। এছাড়া স্যার যুদ্ধক্ষেত্রে হাংগেরীর রাজা লেডিস লাস-হত্যাকে বর্বর বলে অভিহিত করেছেন। হাংগেরীর রাজা লেডিস লাসকে হত্যা করে তাঁর মাথা তুর্কীরা তাদের পতাকার সাথে তুলে ধরেছিল।

একটু দম নিয়ে ডেসপিনা বলল, স্যারের এই কারণগুলো মিথ্যা ও আংশিক। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে হাংগেরীর রাজা লেডিস লাস হত্যাকে বর্বর বলেছেন, কিন্তু কে এই যুদ্ধ বাঁধাল, কেন এই যুদ্ধ বাঁধল তা তিনি বলেন নি। তিনি বলেননি লেডিস লাস কি ধরণের জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। ১৪৪৪ সালের ১০ই নভেম্বর ১০ বছরের জন্যে হাঙ্গেরী রাজ্যের সাথে সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের একটি সন্ধি হয়। হাঙ্গেরী, পোলান্ড, সার্ভিয়া, বসনিয়া, ওয়ালেচিয়া,আলবেনিয়া (বুলগেরিয়া, রুমানিয়াসহ সার্ভিয়া বসনিয়া ও গ্রীসের গোটা অঞ্চল ছিল তখন তুর্কী সুলতানের অধীনে) থেকে সংগৃহীত মিলিত খৃষ্টান বাহিনীর সাথে দীর্ঘ বিশ বছর যুদ্ধের পর উভয় পক্ষের উদ্যোগে এই সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। সন্ধির শর্ত অনুসারে সার্ভিয়া স্বাধীন হয়। এবং তুর্কীসৈন্যরা দুর্গগুলো খালি করে দিয়ে চলে যায়। কিন্তু দশ বছর শান্তি রক্ষার জন্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির বয়স একমাস না হতেই

পোপের পরামর্শে হাঙ্গেরী রাজ সন্ধি ভংগ করলেন। তাঁর মানে ইউরোপের আরও রাজারা যোগ দিলেন। সবাই বললেন, অবিশ্বাসীদের সাথে সন্ধি রক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন। সন্ধি ভঙ্গ করে তারা সার্ভিয়াসহ পুর্বদিকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত গোটা ভূভাগ দখল করে নিলেন। অবশেষে ১৪৪৪ সালের ১০ই নভেম্বর ভার্সায় তুর্কি সৈন্যদের সাথে তারা মুখোমুখি হল। সন্ধি ভংগের মত বিশ্বাসঘাতকতায় ক্রুদ্ধ তুর্কি সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ সন্ধির দলীলকে তাঁর যুদ্ধের পতাকা হিসেবে ব্যবহার করেন এবং যুদ্ধে নিহত হাঙ্গেরী রাজের কর্তিত মাথা ঐ পতাকার সাথে উত্তোলন করেন। ইতিহাসের রায় অনুসারে তুর্কি সুলতান এখানে কোন অন্যায় করেননি, জঘন্য একজন বিশ্বাসঘাতককে তিনি শাস্তি দিয়েছেন।

একটু থামল ডেসপিনা।

কিছু বলার জন্য জেমস মুখ খুলেছিল।

ডেসপিনা বাধা দিয়ে বলল, আমার কথা শেষ হলে তারপর বলবে।

বলে আবার শুরু করল, যুদ্ধের আগে তুর্কিরা খৃষ্টানদের অজস্র গ্রাম ও গীর্জা পুড়িয়ে ছারখার করেন, স্যারের এ বক্তব্য মিথ্যা শুধু নয়, উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর শামিল। ইতিহাসের সাক্ষী হল, পোপের মন্ত্রনায় হাঙ্গেরীর রাজ লেডিস লাসের নেতৃত্বে গঠিত বিশাল ক্যাথলিক বাহিনী স্বাধীন সার্ভিয়া পদানত করে যখন কৃষ্ণসাগরের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন তখন তাদের হাতেই গ্রীক-খৃষ্টানদের হাজার হাজার গ্রাম ও গীর্জা ধ্বংস হয়েছিল, পুড়ে ছারখার হয়েছিল অসংখ্য শস্যক্ষেত ও জনপদ। তাইতো দেখা যায় ভার্ণা যুদ্ধের পর সার্ভিয়া ও বসনিয়া আবার যখন তুর্কি অধিকারে আসল তখন সেখানকার গ্রীক-ধর্ম সমাজের খৃষ্টানরা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছিল, মুসলমানদের তারা স্বাগত জানিয়েছিল।

একটু দম নিয়েই ডেসপিনা বলল, ইতিহাসের আরেকটা সাক্ষের কথা তোমাদের বলি, সার্ভিয়ার এই দুর্যোগ প্রাক্কালে সার্ভিয়ার খৃষ্টান রাজা ব্রাংকোভিচ হাঙ্গেরী রাজকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তিনি জয়লাভ করলে ধর্ম সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করবেন? উত্তরে হাঙ্গেরী রাজ বলেছিলেন, সমগ্র দেশকে বলপূর্বক রোমান ক্যাথলিক করা হবে। ব্রাংকোভিচ এই প্রশ্ন তুর্কি সুলতান দ্বিতীয় মুরাদকেও

করেন। উত্তরে সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ জানিয়েছেন, তিনি প্রত্যেক মসজিদের নিকট একটি করে গীর্জা নির্মাণ করে দেবেন, লোকে স্বাধীনভাবে যেখানে ইচ্ছা গমন করবে। এরপর সার্ভিয়ার মানুষ তুর্কী শাসনকেই স্বাগত জানায়। স্যার এসব ঐতিহাসিক সত্য চেপে গিয়ে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়েছেন।

ডেসপিনা থামল।

জেমস এর চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছে। তাতে বিরক্তি ও ক্ষোভের চিহ্ন স্পষ্ট। সে বলল, ডেসপিনা তুমি এই যে কথাগুলো আমাদের কাছে বললে, তা বাইরে কখনো বলো না। যতই ইতিহাস হোক আমরা এগুলো মানিনা। স্যার ঠিকই আছেন।

--তুমি তা বলতে পার, ইতিহাস চুরি যদি পাপ না হয়।

--এ পাপ নয়। জাতিকে তুমি ভালোবাসনা ডেসপিনা?

--কোন জাতি কি মিথ্যা বলতে শেখায়, ইতিহাস চুরি করতে বলে?

জেমস-এর মুখ ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারন করেছে। সে চিৎকার করে কি বলতে যাচ্ছিল। কারনিনা তার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, জেমস আমি তোমাকে এখানে টেনে এনেছি ঝগড়া করার জন্যে নয়। তুমি যে দিকটা বলছ সেটা রাজনৈতিক, আর ডেসপিনা যে বিষয়ের উপর জোর দিচ্ছে সেটা ঐতিহাসিক। দু'জনেই ঠিক আছ।

জেমস অনেকখানি শান্ত হল।

কারনিন ও জেমস বিশ্ববিদ্যালয় চত্তরের এক সুপরিচিত জুটি-মঞ্চ-নেপথ্য সবখানেই। আবার এরা ডেসপিনাকে ভালোবাসে তার সারল্য, সুব্যবহার ও সুশিক্ষার জন্যে।

শান্ত হয়ে জেমস বলল, কারনিনা তোমার বান্ধবী ডেসপিনার ক্ষতি হবে যদি এরকম কথা সে বলে। তার ভবিষ্যৎ আছে, আমরা তার ভাল চাই।

ডেসপিনা তখন গম্ভীর হয়ে উঠেছে। বলল, ধন্যবাদ জেমস।

'ধন্যবাদ' বলে জেমস ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, কাজ আছে একটু।

জেমস-এর সাথে কারনিনাও চলে গেল।

নাদিয়া তার চেয়ার টেনে ডেসপিনার আরও কাছে সরে এল, ঘনিষ্ঠ হলো আরও।

ডেসপিনার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলল, ডেসপিনা অনেকদিন থেকে একটা সন্দেহ আমার মনে জাগছে, আজ সেটা ঘনিভূত হলো।

--কি সন্দেহ? নাদিয়ার দিকে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করল ডেসপিনা।

--বলব? বলল নাদিয়া।

--বল।

--আমার সন্দেহ তুমি মুসলিম।

ডেসপিনা মুখ নামিয়ে নিল। একটুক্ষণ চুপ থেকে বলল, তোমার সন্দেহ মিথ্যা নয় নাদিয়া।

--তাহলে প্রতিদিন আমার কাছেও পরিচয় গোপন করছ কেন, তুমি জান যে আমি মুসলমান।

--আমার উপর হুকুম, এ পরিচয় কাউকেই বলা যাবে না।

--কেন? আমি তো পরিচয় গোপন করিনি?

--তোমার আব্বা ছিলেন একজন মুসলিম অধ্যাপক, তোমার পরিচয় গোপন করার প্রশ্ন ওঠে না। তাছাড়া......

চুপ করল ডেসপিনা কথা শেষ না করেই।

--তাছাড়া কি?

ডেসপিনা পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে নাদিয়ার দিকে তাকাল। নাদিয়ার চোখে চোখ রেখে কি যেন ভাবছে ডেসপিনা।

--বলতে আপত্তি আছে ডেসপিনা?

--তোমাকে বলতে আপত্তি নেই, তোমার আব্বাও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। তিনি চাকুরী হারিয়েছেন দু'জন মুসলিম ছাত্রকে সাহায্য করে।

একটু থামল আবার ডেসপিনা। তারপর শুরু করল, আমি এক হতভাগ্য পরিবারের সন্তান নাদিয়া। আমাদের পরিবারের কোন পুরুষ ছেলেক বাঁচতে দেয়া হয়না, মেয়েরা বাঁচে, কিন্তু তাদেরকেও সংসার গড়তে দেয়া হয়না, দুর্বিসহ একাকিত্ব নিয়ে তাদের জীবন কাটাতে হয়।

নাদিয়ার চোখ দুটি বিস্ময়ে বিস্ফারিত।

সে চোখ দু'টি দিয়ে যেন ডেসপিনাকে গিলছে।

ডেসপিনা চুপ করেছে।

নাদিয়ার মুখেও কথা সরছে না।

অনেকক্ষণ পর নাদিয়া তার বিস্ময়ের ঘোর নিয়েই জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি স্টিফেন পরিবারের মেয়ে, যে সার্ভিয়া রাজ স্টিফেনের বোন লেডি ডেসপিনার বিয়ে হয়েছিল তুরস্কের সুলতান বায়েজিদের সাথে?

--হ্যাঁ নাদিয়া। বলল ডেসপিনা।

নাদিয়া জড়িয়ে ধরল ডেসপিনাকে পাগলের মত। কপালে চুমু খেল। বলল, ডেসপিনা, স্টিফেন পরিবারের জন্য আমরা গর্ব করি, কিন্তু এই পরিবারের কাউকে দেখার সৌভাগ্য আমার কোনদিন হয়নি।

--স্টিফেন পরিবারকে তোমরা জান?

--শুধু আমরা নই, বলকান অঞ্চলের সব মুসলিম পরিবারই জানে এবং তারা এ পরিবারের জন্যে গর্ব করে।

--তাদের সম্বন্ধে সবকিছুই কি জান?

--সবকিছু মানে, তুমি যে বিষয়টা বললে, সেটা আমি শুনেছি আব্বার কাছে।

--তিনি কি সব জানেন যে, আমাদের উপর কি নিপীড়ন চলছে যুগ যুগ ধরে?

--মনে হয় তিনি জানেন। তাঁর কাছে আরও আমি শুনেছি, এই পরিবারের মাত্র একজনই নাকি উপযুক্ত ছেলে জীবিত আছে, নাম হাসান সেনজিক। বিদেশে মানুষ হয়েছেন, বিদেশেই থাকেন।

--হ্যাঁ নাদিয়া, হাসান সেনজিক আমার খালা আম্মার ছেলে।

একটা কিছু বলতে গিয়েও ডেসপিনা বলতে পারলনা। তার গলা যেন বন্ধ হয়ে গেল। হঠাৎ থেমে গেল সে।

নাদিয়া তার দিকে তাকিয়েছিল। দেখল, ডেসপিনার চোখ দু'টি ছলছল করছে।

নাদিয়া কিছু বলতে পারল না।

ডেসপিনাই কথা বলল অল্পক্ষণ পরে। বলল, তারও কোন খবর নেই ১৫ দিন হল। আমার খালাম্মা মুমূর্ষ। তাঁকে দেখার জন্যে দেশে আসবে বলে স্পেন থেকে সে যাত্রা করেছিল ১৫ দিন আগে। তারপর আর কোন খোঁজ নেই তার।

ডেসপিনার শেষের কথাগুলো কান্নায় জড়িয়ে গেল।

নাদিয়াও অভিভূত হয়ে পড়েছে। বলল, কোন খোঁজ নেওয়া যায়নি?

--কে নেবে? শত্রুরা জালের মত ছেয়ে আছে, খোঁজ করতে গেলেও তার বিপদ হবে। হাসান সেনজিকের নাম নেওয়াও বিপদের কারণ।

--কিন্তু একটা পরিবারকে এভাবে ধ্বংস করা কেন? ইচ্ছা করলে সবাইকে তো একেবারে মেরে ফেলতে পারে? না, তারা তা করবে না। এই বংশকে তারা তিলতিল করে মারবে।

--ঠিক তাই। আব্বার কাছে শুনেছি, খৃষ্টানরা, খৃষ্টান যাজকরা, বিশেষ করে মিলেশ বাহিনী মনে করে স্টিফেন পরিবারই বলকান দেশগুলোতে ইসলাম প্রচারের নিমিত্ত হিসাবে কাজ করছে। তারা আরও মনে করে স্লাভ ও মুসলিম রক্তকে মিশিয়েছে এই পরিবারই।

--ঠিকই তিনি বলেছেন, এসবই আমাদের পরিবারের অপরাধ।

--কিন্তু ডেসপিনা, সব অত্যাচারেরই তো একটা শেষ আছে। এরও একটা শেষ অবশ্যই আছে।

--কিভাবে, ওদের শক্তির বিরুদ্ধে কে দাঁড়াবে? আগে কম্যুনিষ্ট সরকার ওদের পাপেট ছিল, আজকের গণতান্ত্রিক সরকারও ওদের মন রক্ষা করেই চলছে শুধু নয়, মনে মনে তারা মিলেশ বাহিনীর কাজে ভীষণ খুশি।

সরকার মনে করছে, তাদের কাজটাই মিলেশ বাহিনী করে দিচ্ছে।

নাদিয়ার মনে পড়ল সালেহ বাহমনের কথা। আপনাতেই মুখটা যেন তার আরক্ত হয়ে উঠল। সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, এসব প্রতিকূলতার মধ্যেও কাজ হচ্ছে ডেসপিনা।

বলে নাদিয়া সালেহ্ বাহমনের সব কাহিনী খুলে বলল এবং জানাল যে, মুসলিম যুবকরা হোয়াইট ক্রিসেন্ট নামে একটা সংগঠন গড়ে তুলেছে। মিলেশ বাহিনীকে প্রতিরোধের প্রস্তুতি তারা শুরু করেছে।

ডেসপিনা নাদিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে তার কথা শুনছিল। শুনতে শুনতে ডেসপিনার ঠোঁটে এক টুকরো হাসির রেখা ফুটে উঠেছিল।

নাদিয়া থামলে ডেসপিনা বলল, তোমার সালেহ্ বাহমন এখন কোথায়?

নাদিয়া চমকে উঠে তাকাল ডেসপিনার দিকে। তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

হাসল ডেসপিনা। বলল, কিছু মনে করোনা নাদিয়া, সালেহ্ বাহমন এখন কোথায়?

--এবাবে তোমার বলা ঠিক হয়নি ডেসপিনা। মুখ ভার করে বলল নাদিয়া।

একটু থেমেই আবার বলল নাদিয়া, আমিও তোমার চোখের অশ্রুতে একটা আলো দেখতে পেয়েছি।

--প্রতিশোধ নিচ্ছ ?

--প্রতিশোধ নয়, তোমার হৃদয় কি হাসান সেনজিকের জন্যে উম্মুখ হয়ে নেই ?

উত্তর দিল না ডেসপিনা।

মুহুর্তেই বদলে গেল তার মুখ। বিষাদের এক কালো ছায়া নামল সে মুখে। ধীরে ধীরে বলল, তোমার কথার প্রতিবাদ করব না নাদিয়া। কিন্তু কি জান, আমার দু'চোখ কোন দিন ওকে দেখেনি, দেখবেও কিনা জানিনা।

শেষের কথাগুলো যেন তার গলায় আটকে যাচ্ছিল।

নাদিয়া তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে বলল, তোমার প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়নি ডেসপিনা। সালেহ্ বাহমন এখনও আমাদের বাসায়, উঠে বসার মত অবস্থা তার এখনও হয়নি।

ডেসপিনা রুমাল দিয়ে চোখ ভাল করে মুছে নিয়ে বলল, তাঁদের যে সংগঠনের কথা বললে সেটা কি শুধু বেলগ্রেডে, না গোটা দেশে?

--গোটা দেশে শুধু নয়, গোটা বলকানে ওরা কাজ শুরু করেছে।

--আলহামদুল্লিাহ। আমাদের সামনে শুধুই অন্ধকার ছিল, আলোর কোন রেশই ছিলনা, কোন অবলম্বনের চিন্তা করতেও আমরা ভুলে গেছি। আমার খালাম্মার শেষ আশা হয়তো পূরণ হবে না। ছেলেকে হয়তো তিনি দেখতে পাবেন না। উনি নিখোঁজ হবার দুঃসংবাদ আমরা তাকে দেইনি। তিনি সহ্য করতে পারবেন না।

নাদিয়া বলল, চিন্তা করো না ডেসপিনা, আল্লাহই আমাদের সাহায্য করবেন।

একটু থেমেই নাদিয়া আবার বলল, কিন্তু ডেসপিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে তোমার পরিচয় গোপন রেখেছ কেমন করে?

--আমি স্টিফেন পরিবারের পরিচিত বাড়ীগুলোর কোনটাতেই থাকি না। আমি জন্মের পর থেকে বাবা মার সাথে বুলগেরিয়ায় মানুষ হয়েছি। বেলগ্রেডে এসেও স্টিফেন পরিবার থেকে ভিন্ন বাড়ীতে বাস করেছি। মায়ের নামও খৃষ্টান নাম। আব্বাও খৃষ্টান নাম নিয়ে আমাদের থেকে ভিন্নভাবে ভিন্ন বাড়ীতে বাস করেন। সবাই এখানে জানে আমার পিতা নেই। মায়ের পরিচয়েই আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি। রাতের অন্ধকারে আমরা আব্বার সাথে দেখা করি এবং পরিবারের অন্যান্যদের সাথে দেখা সাক্ষাত এভাবেই আমাদের হয়।

--কি দুঃসহ জীবন। বলল নাদিয়া।

একটু থেমে বলল আবার, ডেসপিনা আমাদের বাসায় যাবে, আব্বা আম্মা খুব খুশী হবেন স্টিফেন পরিবারের লোক পেলে।

--ঠিক আছে,একদিন যাব।

--আরেকটা কথা ডেসপিনা, তোমার নামটা ঠিক হয়নি। রাজা স্টিফেনের বোন সুলতান বায়েজিদের স্ত্রী লেডি ডেসপিনার নামে তোমার প্রকাশ্য নাম রাখা ঠিক হয়নি। ডেসপিনা জুনিয়র বলে আরও প্রকাশ করে দিচ্ছ সব।

--তুমি ঠিকই বলেছ নাদিয়া। কিন্তু আব্বা আম্মা এ নাম গোপন করতে রাজী নন। তারা এ নাম অত্যন্ত ভালবাসেন এবং এতে তারা সৌভাগ্যের প্রতীক বলে মনে করেন।

--এ নাম আমারও গর্ব ডেসপিনা। লেডি ডেসপিনা বলকানে যে পরিবর্তন একদিন এনেছিলেন, ডেসপিনা জুনিয়র সে পরিবর্তন আবার আনুন আমরা চাই।

আবেগে নাদিয়ার গলা কেঁপে গেল, তার চোখ দু'টি উজ্জল হয়ে উঠল।

--আমার নাম নিয়ে এভাবে বলো না নাদিয়া।

তোমার নাম নিয়ে বলছি না, তোমার নাম আমাদের এক স্বর্ণোজ্জল অতীতের প্রতীক। আমরা চাচ্ছি সেই অতীত আবার ফিরে আসুক।

এক সময় ঢং ঢং করে বারোটা বাজার শব্দ হলো দেয়াল ঘড়িতে। ১২ টা থেকে ৩ টা পর্যন্ত লাইব্রেরীর বিরতির সময়।

ডেসপিনা এবং নাদিয়া দু'জনেই ওঠে দাঁড়াল লাইব্রেরী থেকে বেরুবার জন্যে।

ডাক্তার ড্রেসিং চেঞ্জ করে হাত পরিষ্কার করে এসে তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে বলল, ইয়ংম্যান তোমার আর ড্রেসিং লাগবে না। তুমি ভাল হয়ে গেছ। যা সময় লাগার কথা, তার অনেক আগেই তোমার ঘাগুলো শুকিয়ে গেল। মানসিক শক্তি রোগ সারায়, কারণ এ শক্তি ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে।

সালেহ বাহমন শুয়ে ছিল। ডাক্তারের কথা সে মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। ডাক্তারটি খুব সরল, খবুই ভাল মানুষ। খুবই ভাবপ্রবণ। ডাক্তার না হয়ে দার্শনিক হলেই ভাল হতো।

ডাক্তার থামলে সালেহ বাহমন বলল, ডাক্তার তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করো?

ডাক্তার চোখ কপালে তুলে বলল, করব না মানে আমি তো কান্ডজ্ঞানহীন নই।

--কিন্তু বস্তুবাদী সমাজ ঈশ্বর বিশ্বাসীদেরই তো কান্ডজ্ঞানহীন বলে।

--বলে বলেই তো সমাজের আজ এই দূর্গতি। তুমি বেলগ্রেড থেকে প্যারিস পর্যন্ত হেঁটে যাও, দেখবে রাস্তার দু'ধারে শত শত গীর্জা আজ পরিত্যক্ত। উপাসকের অভাবে সেগুলো বিরান হয়ে গেছে। কিন্তু গীর্জাকে পরিত্যাগ করে

মানুষ কি পেয়েছে? কিছুই নয়, পরিবারে অশান্তি, সমাজে হানাহানি বহুগুণ বেড়েছে। ঈশ্বর প্রেম ছাড়া শান্তির,ভালোবাসার সমাজ গড়ে উঠতে পারে না।

--এ সমাজ আবার কি করে ভাল হবে ডাক্তার,হানাহানির পথ থেকে সরে আসার উপায় কি?

--আবার যিশুর রাজ্য ফিরিয়ে আনতে হবে।

--ডাক্তার সেটা কি যিশুর রাজ্য হবে,না যাজকদের রাজ্য হবে,যেমন একবার ছিল?

ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে কোন উত্তর দিল না। ডাক্তার তার দিকে বিস্ময়ভরা চোখে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। অনেকক্ষণ পর বলল,ইয়ংম্যান,তুমি সাংঘাতিক প্রশ্ন করেছ। এ প্রশ্ন আমাকেও পীড়া দেয়,যার উত্তর আমার কাছে নেই। উত্তর সন্ধানে যখনই সামনে আগাই,দেখি মনগড়া যাজকতন্ত্র সামনে এসে যাচ্ছে। তোমার কাছে কোন সলিউশন আছে ইয়ংম্যান?

--বাইবেলে কোন সলিউশন নেই।

--নেই? আমি বাইবেলের সব জানিনা। সত্যি নেই?

--নেই। পারিবারিক,সামাজিক,রাজনৈতিক,অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মানুষের কেমন হবে,যুদ্ধ-সন্ধি কিভাবে চলবে,বিচার-লেনদেন কিভাবে পরিচালনা করা হবে সে ব্যাপারে বাইবেল নিরব।

--তাহলে ধর্মরাজ্য কি হবে? ওরা কি করতে চায় তাহলে?

--কারা?

--জাননা,মহান ধর্মসম্রাট সার্লেম্যান-এর একমাত্র বংশধর কনস্টানটাইন সে ধর্মরাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে।

--কনস্টানটাইনের নাম শুনে চমকে উঠল সালেহ বাহমন। মিলেশ বাহিনীর নেতা কনস্টানটাইন।

--দুর্ভাগ্য ডাক্তার, আমি জানিনা তাকে।

--জানবে কি করে গীর্জায় তো যাওনা। রোববারে গীর্জায় গীর্জায় ইনি বক্তৃতা দেন।

--সালেহ্ বাহমনের কৌতুহল বাড়ল। সে এতদিন ভাবত কনস্টানটাইন একজন সেক্যুলার ও সন্ত্রাসবাদী জাতীয় নেতা। সে গীর্জাগুলোও সফর করে ফিরছে।

--কি বলেন তিনি ডাক্তার? বলল সালেহ্ বাহমন।

--ইউরোপে সার্লেম্যানের সেই ধর্মসম্রাজ্য ফিরিয়ে আনার কথা বলেন। তবে একটা কথা তিনি সাংঘাতিক বলেন।

--কি কথা?

--সাংঘাতিক কথাটা হলো, মুসলমানরা নাকি সাপের মত গোটা ইউরোপ গিলে ফেলার ষড়যন্ত্র করছে। খৃষ্টানদের উদাসিনতার সুযোগে ওরা অঢেল পেট্রোডলার দিয়ে শত শত গীর্জা ইতিমধ্যেই কিনে ফেলেছে। এভাবে চললে সবগুলো গীর্জাই মসজিদে পরিণত হবে।

একটু থামল ডাক্তার। তারপর বলল, এর পরের কথা আরও সাংঘাতিক।

--কি সেটা? বলল, সালেহ্ বাহমন।

--সেটা হলো,স্পেনে যিশুর সন্তানরা যেমন করে মুসলমানদের এক এক করে নির্মূল করেছে, এখানেও তাই করতে হবে।

--একথা তুমি ভাল মনে কর ডাক্তার? এতো হানাহানির কথা। তুমি কনষ্টানটাইনের কথা বিশ্বাস কর?

ডাক্তার জিভ কেটে বলল, ধর্মরাজ সার্লেম্যানের সন্তান কি মিথ্যা বলতে পারেন?

--তুমি এদেশে এবং ইউরোপে মুসলমানদের দেখেছ, তারা কি অশান্তিপ্রিয়?

--তারা তো সংখ্যালঘু, খুবই শান্তি প্রিয়। তবে গীর্জা মসজিদ হয়েছে তা বেশ কিছু আমি দেখেছি। বিক্রি হয়ে যাওয়া গীর্জা কি ক্লাব রেস্তোঁরা হয়নি?

--হ্যাঁ, হয়েছে হাজার হাজার।

--তাহলে বিক্রি হওয়া গীর্জা কি মসজিদ হতে পারেনা?

--ঠিক বলেছ, হতে পারে।

--তাহলে কনষ্টানটাইন কি মিথ্যা প্রচার করছেনা?

--তা আমি বলতে পারবো না, সে ধর্মপুত্র। আমার কিছু বলা ঠিক হবে না।

--কিন্তু এই ভাবেই কি একদিন যাজকতন্ত্র কায়েম হয়েছিল না,যা ধর্মের অপূরণীয় ক্ষতি করেছে?

ডাক্তার হাসল। বলল,তুমি অনেক জান ইয়ংম্যান। তুমি একদিন কনষ্টানটাইনের সাথে কথা বলনা!

বলে ডাক্তার তার মেডিকেল কিট নিয়ে উঠে দাঁড়াল। বেরিয়ে গেল ডাক্তার।

ডাক্তার বেরিয়ে যেতেই খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকল নাদিয়া নূর।

খাবার টেবিলে রেখে বলল,ডাক্তারের সাথে এভাবে কথা বলা আপনার ঠিক হয়নি। ডাক্তার একটু চালাক হলে আপনি ধরা পড়ে যেতেন।

নাদিয়ার পরনে সাদা ঢিলা জামা। একদম পা পর্যন্ত নেমে এসেছে। মাথায় জড়ানো সাদা বড় রুমাল। কপালও ঢাকা পড়েছে রুমালে।

চোখ নিচু করে কথা বলছিল নাদিয়া।

নাদিয়াকে ঢুকতে দেখেই চোখ নামিয়ে নিয়েছিল সালেহ বাহমন।

আহত অবস্থায় সেদিনের রাতের ঘটনার পর নাদিয়া সামনে আসলেই বাহমন খুবই অস্বস্তি বোধ করে। সেদিন সালেহ বাহমন যখন টলে পড়ে যাচ্ছিল, তখন নাদিয়া তাকে জড়িয়ে ধরে যে চিৎকার করেছিল তা এখনও তার চোখে ভাসে।

নাদিয়াও সাধারণতঃ তার সামনে আসেনা। কিন্তু বাড়ীতে লোক নেই। আব্বা ওমর বিগোভিক সারাদিন প্রায় বাইরে থাকে, তখন সালেহ বাহমনের দেখা-শুনা বাধ্য হয়ে নাদিয়াকেই করতে হয়।

নাদিয়া থামলে সালেহ বাহমন বলল, ঠিক বলেছেন, বেশীই একটু বলে ফেলেছি। কি করব মিথ্যার জবাব না দিয়ে তো পারা যায় না।

নাদিয়া আর কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না,চলে যাবে কিনা তাও বুঝতে পারছিল না। নাদিয়া অবাক হয় এমন জড়তা,সংকোচ তার তো কোন দিনই ছিল

না। এ ঘরে পা দিলেই এক অশরীরি আবেশ যেন তাকে ঘিরে ধরে। মনে পড়ল সেদিনের ডেসপিনার বলা কথা। অস্বস্তিটা তার আরও বাড়ল।

চলে যাবে কি যাবেনা যখন ভাবছিল নাদিয়া,তখন সালেহ বাহমন বললেন,আপনি সেদিন ষ্টিফেন পরিবারের যে ছেলেটির নিখোঁজ হওয়ার কথা বললেন, তার কি কোন ফটো আমাকে দিতে পারেন।

নাদিয়া সালেহ বাহমনের আপনি সম্বোধনে খুবই বিব্রত বোধ করে। আজ আর সে ধরে রাখতে পারলো না। বলল, 'আপনি'না বললে কি হয়না,অন্ততঃ বয়সে ছোট তো আমি।

সালেহ বাহমন মাথা নিচু করেই বসেছিল। মুহূর্তকাল কোন উত্তর দিলনা নাদিয়ার কথায়। পরে ধীরে ধীরে বলল,ঠিক আছে নাদিয়া।

ঐ ফটো আমাকে দেবে।

--যদি পারি।

--কিন্তু ফটো না পেলে খোঁজ করা মুস্কিল হবে।

--আমি চেষ্টা করবো।

এই সময় ঘরে প্রবেশ করল ওমর বিগোভিক।

এ সময় ওমর বিগোভিক কোন সময়েই বাড়ি ফেরেন না।

নাদিয়া বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তার পিতার দিকে তাকাল।

ওমর বিগোভিক সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে বলল, আজ মিলেশ বাহিনীর একজন আমার লন্ড্রী হাউসে এসেছিল।

নাদিয়া এবং সালেহ বাহমন দু'জনেই চমকে উঠে ওমর বিগোভিকের দিকে তাকাল।

একটু দম নিয়ে সে বলল, ভয় করোনা ওরা আমাকে চিনেনি। সম্ভবত: সেদিন রাতে শোনা আমার নাম, চেহারা কিছুই তারা মনে রাখেনি। এবং নৌকায় আমার লন্ড্রী হাউসের নেমপ্লেট নিশ্চয় তাদের চোখে পড়েনি।

--তাহলে কেন এসেছিল? বলল, নাদিয়া।

--এসেছিল একটা অর্ডার নিয়ে। এর আগেও অর্ডার নিয়ে এসেছে, কিন্তু তখন পরিচয় জানতে পারিনি। আজ গল্পে গল্পে অনেক কথা বলেছে, পরিচয়ও জানতে পেরেছি।

--কিছু জানতে পেরেছ তাহলে?

--হ্যাঁ, সেজন্যেই এলাম। এ কথা সালেহ বাহমনকে না বলে থাকতে পারলাম না। ওমর বিগোভিকের কথা শোনার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠল নাদিয়া এবং সালেহ বাহমন দু'জনেই।

ওমর বিগোভিক গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, লোকটি গল্পে গল্পে যে কথা বলল, তার সারাংশ হলো, ষ্টিফেন পরিবারের হাসান সেনজিক আর্মেনীয়ার হোয়াইট ওলফের হাতে বন্দী ছিল। ৫০ হাজার ডলারের বিনিময়ে হোয়াইট ওলফ তাকে মিলেশ বাহিনীর হাতে তুলে দেবে, এটা ঠিক হয়ে গিয়েছিল। এই সময়ই হোয়াইট ওলফের বিপর্যয় ঘটে। আহমদ মুসার নতুন নেতৃত্বে ককেশাস ক্রিসেন্ট হোয়াইট ওলফের সব ঘাটি একদিনেই বিধ্বস্ত করে দেয়। হোয়াইট ওলফের লোকরা হয় মারা পড়ে, নয় বন্দী হয়। হাসান সেনজিক যে ঘাটিতে বন্দী ছিল সে ঘাটিও বিধ্বস্ত হয়, কিন্তু হাসান সেনজিক মারা পড়েনি। মিলেশ বাহিনী মনে করছে ককেশাস ক্রিসেন্ট তাকে উদ্ধার করেছে। এই সম্ভবনাটিই মিলেশ বাহিনীর জন্যে উদ্বেগজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ককেশাস ক্রিসেন্ট হাসান সেনজিককে সাহায্য করলে তাকে হাতে পাওয়া অসুবিধা হবে।

গা থেকে কোট খুলে ফেলার জন্যে ওমর বিগোভিক কথা বন্ধ করেছিল।

ওমর বিগোভিক কোট খুলে নাদিয়ার হাতে দিয়ে এসে আবার বসল।

ওমর বিগোভিক কথা শুরু করার আগেই সালেহ বাহমন মুখ খুলল। বলল, মাফ করবেন, কথায় বাধা দিলাম। আমি জানতে চাচ্ছি, আপনি যে আহমদ মুসার কথা বললেন, সে কোন আহমদ মুসা?

--তুমি কোন আহমদ মুসাকে জান? বলল, ওমর বিগোভিক।

--জানি এক আহমদ মুসার কথা। তিনি ফিলিস্তিন, মিন্দানাও এবং মুসলিম মধ্য এশিয়ার ইসলামী বিপ্লবের নায়ক।

--হ্যাঁ বৎস, ইনিই তিনি।

--তিনি ককেশাসে এসেছিলেন?

--এসেছিলেন এবং আসার পর হোয়াইট ওলফের এ বিপর্যয় ঘটে।

--আলহামদুলিল্লাহ। খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল সালেহ বাহমনের মুখ।

--কে এই আহমদ মুসা আব্বা? আমি তো শুনিনি তার কথা? বলল,নাদিয়া।

--তিনি আল্লাহর এক রহমত। এক অকুতোভয়, অসীম সাহসী, এবং অসাধারণ ধী সম্পন্ন এক বিপ্লবী যুবক। মুসলিম জাতির যেখানেই বিপদ,সেখানেই ছুটে যান তিনি,থামল ওমর বিগোভিক।

সংগে সংগেই কথা বলে উঠল সালেহ বাহমন। বলল,নাদিয়া তোমার বান্ধবী ডেসপিনাকে বলতে পার, হাসান সেনজিককে আল্লাহ এমন এক স্থানে পৌছেছেন,যার চেয়ে নিরাপদ স্থান আমার মনে হয় এ দুনিয়াতে আর নাই।

বলে একটু থেমেই ওমর বিগোভিককে লক্ষ্য করে বলল, চাচাজান আমি আর শুয়ে থাকতে পারব না। আপনি যে খবর শুনিয়েছেন তাতে আমার মন ছুটে বেড়াতে চাচ্ছে। কেন জানি আমার মন বলছে, আহমদ মুসা বালকানে আসবেন।

--আব্বা,ওর আজ নতুন ড্রেসিং হয়েছে। এ ড্রেসিং খোলা পর্যন্ত ওর রেষ্ট নেওয়া দরকার। সালেহ বাহমনের কথা শেষ হতেই বলে উঠল নাদিয়া।

‘আমার কথা তো শেষ হয়নি, তোমরা অন্য কথায় গেছ' বলে ওমর বিগোভিক আবার তার কথা শুরু করল, ‘আনন্দের কথার মাঝে বিপদের কথাও আছে। আমি মিলেশ বাহিনীর লোককে প্রশ্ন করে ছিলাম, তোমরা কি তাহলে হাসান সেনজিকের আসা ছেড়ে দিলে?

উত্তরে সে তীব্রভাবে মাথা ঝাকিয়ে বলেছিল, না,না,না। আমরা জানি হাসান সেনজিক যেখানেই থাক,যার কাছেই থাক তার মুমূর্ষ মা’কে সে একবার দেখতে আসবেই। সীমান্ত এবং সর্বত্র তার ফটো আমরা ছড়িয়ে দিয়ে রেখেছি। আমাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সে বলকানে প্রবেশ করতে পারবে না। প্রবেশ করলেও তার মা’র সাথে দেখা করার চেষ্টা করলেই সে ধরা পড়ে যাবে। সিদ্ধান্ত হয়েছে,হাসান সেনজিকের মা’সহ ষ্টিফেন পরিবারের সবগুলো বাড়ী এবং লোকদের উপর  চব্বিশ ঘন্টা নজর রাখা হবে। থামল ওমর বিগোভিক।

ওমর বিগোভিকের শেষের কথাগুলো শুনে নাদিয়ার মুখ ছোট হয়ে গেল। সালেহ বাহমন বলল, হাসান সেনজিকের উপর মিলেশ বাহিনীর এত রাগ কেন?

--হাসান সেনজিক মিলেশ বাহিনীকে কাঁচকলা দেখিয়ে এতদিন বেঁচে আছে এটাই তার অপরাধ। তাদের মাথায় ভীষণ জেদ চেপেছে। আর তাছাড়া ষ্টিফেন পরিবারের প্রত্যক্ষ ও পিওর রক্ত যে একমাত্র যুবকের দেহে আছে,সে হলো হাসান সেনজিক। সুতারাং তাকে হত্যা করা তাদের চাই-ই।

--আব্বা ষ্টিফেন পরিবারকে সাবধান করা দরকার? এসব কথা কি আমি ডেসপিনাকে বলব? বলল নাদিয়া।

--অবশ্যই বলতে হবে মা। এই বিপদে ওদের যদি সাহায্য করা যেত! বলল ওমর বিগোভিক।

--চাচাজান আজই এখান থেকে বেরুতে চাই। মুসলিম যুবকদের নিয়ে গড়ে তোলা সংগঠন হোয়াইট ক্রিসেন্টের বেলগ্রেড ইউনিটের প্রধান হিসাবে আমার অনেক কাজ করার আছে।

--তা আমি বুঝেছি সালেহ বাহমন,কিন্তু.............

ওমর বিগোভিক সায় দিতে ইতঃস্তত করতে লাগলেন।

--না আব্বা,ঘাগুলো পুরো শুকাবার আগে বেরুলে ওর ক্ষতি হবে। ওর যাওয়া হবে না। শক্ত কণ্ঠে প্রতিবাদ করল নাদিয়া।

কথা শেষ করেই নাদিয়া দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ওমর বিগোভিক মেয়ের দিকে একবার চাইল। তার ঠোঁটে এক টুকরো স্নেহের হাসি।

তারপর সালেহ বাহমনের দিকে ফিরে ওমর বিগোভিক বলল,নাদিয়া ঠিকই বলেছে,ঘাগুলো না সারলে তোমার বেরুনো ঠিক হবে না। তোমার বাড়ীর লোকেরা তো আসছেই,কোন কথা,কোন কাজ থাকলে তাদের মাধ্যমে করতে পার,আমাকেও বলতে পার।

তাকে নিয়ে নাদিয়ার জেদে সালেহ বাহমন লজ্জায় মরে যাচ্ছিল। ওমর বিগোভিক কি কিছু বুঝেননি? অবশ্যই বুঝেছেন। নাদিয়ার উপর রাগ হলো

সালেহ বাহমনের কিন্তু এ রাগের মধ্যে অভূতপূর্ব এক তৃপ্তি আছে অনুভব করল সালেহ বাহমন। সে খুবই অস্বস্তি বোধ করতে লাগল ওমর বিগোভিকের সামনে।

সালেহ বাহমন ওমর বিগোভিকের কথার কোন জবাব দেয়নি।

ওমর বিগোভিক উঠে দাঁড়াল। বলল,তোমার অনেক সময় নিয়েছি। খাবার পড়ে আছে,খেয়ে নাও।

বলে ওমর বিগোভিক ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সালেহ বাহমন উঠে খাবারের টেবিলের দিকে চলল।

# ৪

তিরানা বন্দরে বিমানটা ল্যান্ড করল ঠিক বেলা সাড়ে এগারটায়।

তিরানা আলবেনিয়ার রাজধানী। বহু বছর আলবেনিয়া কম্যুনিষ্ট শাসনের লৌহ শাসনে বন্দী ছিল। সেই বাঁধন এখন নেই,কিন্তু তার রেশ এখনও যায়নি। পুরানো একটা অভ্যাস থেকে নতুন অভ্যাসে রূপান্তর রাতারাতি হয়না।

বিমান থেকে আহমদ মুসা চোখ ভরে দেখল তিরানা শহরকে। হাসান সেনজিকও দেখছিল। তার কাছেও সব নতুন।

--কেমন লাগছে হাসান সেনজিক? জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

--ভাল লাগছে, অনিশ্চয়তার একটা রোমাঞ্চ আছে। বলল হাসান সেনজিক।

--ভয় করছে না?

--না মুসা ভাই, আপনার সাথে দেখা হবার পর ভয় যেন কোথায় চলে গেছে।

আহমদ মুসা হাসান সেনজিকের পিঠ চাপড়ে বলল,সাবাস হাসান সেনজিক। সাহস না হারালে কোন অনিশ্চয়তাই অনিশ্চয়তা নয়,কোন বিপদই বিপদ নয়।

টারমাকে প্রবেশ করল বিমান।

বিমানের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আহমদ মুসা ভাবল,যতটা অনিশ্চয়তা নিয়ে সে তিরানায় নামছে,ততটা অনিশ্চয়তার মুখোমুখি কখনও সে আর হয়নি। যে দেশে তারা নামছে তার কিছুই চেনা নেই,কেউ চেনা নয়।

চেকিং এর ঝামেলা শেষ করে বেরিয়ে এসে যখন ওয়েটিং লাউঞ্জে বসল তখন বেলা সাড়ে এগারটা।

আহমদ মুসা ও হাসান সেনজিক কেউই লক্ষ্য করেনি তারা যখন চেকিং এরিয়া থেকে লাউঞ্জে বেরিয়ে আসছিল,তখন গেটের পাশে দাঁড়ানো দু'জন লোক হাসান সেনজিকের দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠেছিল।

লোক দু'টির শক্ত-সমর্থ চেহারা ও পেটানো স্বাস্থ্য,গায়ে টি শার্ট,চোখে সানগ্লাস। আলবেনীয়।

আহমদ মুসারা লাউঞ্জে এসে বসলে তারা দূরে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাদের উপর চোখ রাখল। এক সময় দু'জনকে পরামর্শ করতে দেখা গেল,তারপর একজন বেরিয়ে গেল। অন্যজন তাদের উপর নজর রাখল।

আহমদ মুসা ও হাসান সেনজিক আলোচনা করছিল তাদের এখনকার গন্তব্য নিয়ে। আহমদ মুসা বলল, প্রথমে একটা হোটেলে উঠা যাক। তারপর ঠিক করা যাবে আমরা কিভাবে এগুবো।

লাউঞ্জের এক পাশে একটা বুক ষ্টল দেখে আহমদ মুসা খুশী হয়ে উঠল। ওখানে তো ট্যুরিষ্ট গাইড ও ম্যাপও পাওয়া যেতে পারে।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, উঠ হাসান সেনজিক,আমরা ঐ বুক ষ্টলটা হয়ে বেরিয়ে যাব।

দূরে দাঁড়ানো লোকটিও নড়ে উঠল।

আহমদ মুসারা বই কিনে যখন লাউঞ্জ থেকে বাইরে বেরিয়ে এল, লোকটিও পিছে পিছে লেগে থাকল। সে এবার আগের চেয়ে অনেক ঘনিষ্ঠ হয়েছে।

লাউঞ্জ থেকে বেরুলেই একটা প্রশস্ত ফুটপাত। ফুটপাতের পরেই দীর্ঘ-প্রশস্ত গাড়ি বারান্দা। কিন্তু ভাড়া গাড়ি পেতে হলে গাড়ি বারান্দার পূর্ব-দিকে বিশাল পার্কিং এ নেমে যেতে হয়।

আহমদ মুসারা ফুটপাতে বেরুতেই গাড়ি বারান্দায় একজন লোক এগিয়ে এল এবং বলল,স্যার গাড়ি লাগবে?

লোকটা ড্রাইভার গোছেরই । আধা ইংরেজী আধা আলবেনীয় ভাষায় কথা বলল সে। তার মিশ্র ভাষা শুনে আহমদ মুসার হাসিই পেল।

তার দিকে চাইল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা ট্যুরিষ্ট গাইড থেকে তিরানার কয়েকটা হোটেলের নাম জেনে নিয়েছিল।

কঠোর কম্যুনিষ্ট শাসনের অধীন আলবেনিয়া দীর্ঘ দিন রুদ্ধদ্বার নীতি অনুসরণের ফলে বাইরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন সুযোগ-সুবিধাটা এখানে গড়ে উঠতে পারেনি। পাঁচতারা তিনতারা স্টাইলের কোন পশ্চিমা হোটেল তিরানায় নেই।

গাইডে প্রথম শ্রেণীর হোটেলগুলোর একটির নাম ‘এল-ফজর’, তিরানার কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল থেকে খুব দূরেও নয়, আবার কাছেও নয়। এ রকম একটা লোকেশনই আহমদ মুসার পছন্দ। তাছাড়া হোটেলটির নামটাও তাকে আকর্ষণ করেছে। সে বিস্মিত হলো,চার-পাঁচ দশকের কঠোর কম্যুনিষ্ট দলনেও আরবী শব্দ,আরবী নাম এখনও টিকে আছে আলবেনিয়ায়? আবার ভাবল, থাকবেনা কেন মুসলমানরা আলবেনিয়ায় বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ,শাসকরা কম্যুনিষ্ট হলেও তাদের পরিচয় মুসলমানই ছিল। ইসলামী কালচারকে তারা চাইলেও সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করতে পারেনি। হৃদয়ের গভীর থেকে যার উৎসরণ তাকে গলা টিপে মারা যায় না।

--এল-ফজর হোটেল এখান থেকে কতদূর? ড্রাইভার লোকটাকে জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

--এই চার-পাঁচ মাইলের বেশী নয় স্যার। দশ মিনিটেই পৌছে যাব স্যার।

কিছু না বলে আহমদ মুসা হাটতে শুরু করল কার পার্কের দিকে। ড্রাইভার লোকটিও সাথে সাথে চলল।

যে লোকটি আহমদ মুসাদের অনুসরণ করছিল। সে এই সময় তার পাশ কাটিয়ে দ্রুত কার পার্কের দিকে চলে গেল। তার ঠোঁটে এক টুকরো বাঁকা হাসি।

কার পার্কে তখন গোটা তিনেক ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। বিমান তো বেশ আগে ল্যান্ড করেছে, যাত্রীরা চলে গেছে।

কার পার্কের মাঝখানে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। অন্য দু’টো দু’পাশে বেশ খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে।

সাথের ড্রাইভার লোকটি মাঝের ট্যাক্সির এক পাশে গিয়ে দাঁড়াল। গাড়ির অন্য পাশে আহমদ মুসাদের উপর চোখ রাখা সেই দু'জন লোকও দাঁড়িয়ে আছে। তারা ড্রাইভারের সাথে আহমদ মুসার কথা শুনছে।

আহমদ মুসা মনে করল, ওরাও দু'টো গাড়ির ড্রাইভার। সম্ভবতঃ দর কষাকষি তারা শুনতে এসেছে। সুযোগ পেলে তারা নিজেদের গাড়ির দিকে টানবে। এয়ারপোর্টে এরকমটাই ঘটে অনেক জায়গায়।

গাড়ির কাছে পৌঁছে আহমদ মুসা জিজ্ঞেস করল, ৫ মাইল রাস্তা কত ভাড়া চাও, তোমাদের রেট কি?

--স্যার রেট তো দশ ডলার, এখন শেষ সময় আপনি দয়া করে যা দেন। বলে ড্রাইভার ট্যাক্সির চারটা দরজা খুলে তোয়ালে দিয়ে সিটগুলো ঝাড়া মোছা করে নিয়ে বলল, স্যারদের কি দেরী হবে, কিছু কাজ আছে আর?

--না, ড্রাইভার। বলে আহমদ মুসা হাসান সেনজিককে গাড়িতে উঠতে বলল।

হাসান সেনজিক খোলা দরজা দিয়ে পেছনের সিটে উঠে বসল।

ড্রাইভার তখন তার সিটে বসে ষ্টিয়ারিং হুইল মুছছিল তোয়ালে দিয়ে।

আহমদ মুসা স্যুটকেসটি হাতে নিয়ে বলছিল, ড্রাইভার স্যুটকেসটি...

আহমদ মুসা কথা শেষ করতে পারল না,বিদ্যুতবেগেই যেন ঘটনাটা ঘটল।

ট্যাক্সির ওপাশে দাঁড়ানো লোক দু'জন চোখের পলকে খোলা দরজা দিয়ে একজন সামনের সিটে অন্যজন পেছনের সিটে উঠে বসেছে। সংগে সংগেই গাড়ির দরজাগুলো বন্ধ হয়ে গেল, গাড়ি লাফিয়ে স্টার্ট দিয়ে তীর বেগে ছুটে চলল সামনে।

হাসান সেনজিকের পাশের দরজা খোলাই ছিল। কি ঘটেছে আহমদ মুসা যখন বুঝল, তখন সে দরজা ধরতে চেষ্টা করল কিন্তু পারলনা। হাত ফসকে বেরিয়ে গেল।

হাসান সেনজিকের চিৎকার শুনতে পেল আহমদ মুসা। কার পার্ক পার হবার আগেই হাসান সেনজিকের পাশের দরজাটাও বন্ধ হয়ে গেল।

গাড়িটার দিকে তাকিয়ে আহমদ মুসা কয়েক মুহূর্ত অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে রইল।

তার সমস্ত মুখটি বেদনা ও বিষাদে ভরে গেছে।

সম্বিত ফিরে পেয়ে আহমদ মুসা পাশের ট্যাক্সির দিকে তাকাল। দেখল, ট্যাক্সির ড্রাইভিং সিট  থেকে একজন তরুণী বেরিয়ে এল। তার পরনে ফুল প্যান্ট,গায়ে টি সার্ট।

আহমদ মুসা তার দিকে এগিয়ে বলল, আমাকে সাহায্য করুন, আমার সাথীকে ঐ গাড়িতে কিডন্যাপ করা হয়েছে। আমি ফলো করতে চাই। তরুণীও ঘটনাটা দেখছিল। সে আপত্তি করল না। বলল, আসুন।

বলে সে পেছনের দরজা খুলে ধরল।

আহমদ মুসা বলল, আপনি অনুমতি দিলে আমি ড্রাইভিং এ বসতে চাই। তরুণীটি মুহূর্তের জন্য চোখ তুলে আহমদ মুসার দিকে তাকাল।

আহমদ মুসার শান্ত দৃষ্টি এবং পবিত্র-সরল চেহারার দিকে একবার নজর ফেলেই একটু হেসে তরুণীটি ড্রাইভিং এর পাশের সিটে গিয়ে বসল।

আহমদ মুসা গাড়ি স্টার্ট দিতে দিতে বলল, কত পরিমাণ স্পিডে অসুবিধা হবে না?

--নতুন গাড়ি। ফুল স্পিডেও অসুবিধা নেই যদি.............. হেসে কথা শেষ না করেই থামল।

--ঠিক আছে, গাড়ির ও আমাদের নিরাপত্তা প্রথম শর্ত।

তীর বেগে আহমদ মুসার গাড়ি কারপার্ক থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে এল। গাড়ির নাম্বার

আহমদ মুসার চোখে তখনও জ্বল জ্বল করছেঃ ৮৩১১।

গাড়ি রাস্তায় বেরুতেই তরুণীটি বলল, সামনে দু'টো রাস্তা, একটা শহরে গেছে, অন্যটা উত্তরে দূরের ছোট্ট শহর ভেরার দিকে এগিয়েছে।

--ভেরা নয়, শহরের দিকে আমরা যাব। বলল আহমদ মুসা।

--তাহলে ডাইনে মোড় নিন।

মোড়ের উপর গাড়ি তখন এসে পড়েছে।

গাড়ি ডান দিকে টার্ন নিয়ে ছুটে চলল শহরের দিকে।

--শহর পর্যন্ত সাইড কোন রাস্তা নেই আর। বলল তরুণীটি।

তীরের ফলার মত এগিয়ে চলছে গাড়ি। গাড়ির বেগ ১২০ কিলোমিটারে,যা এই রাস্তায় জন্য অস্বাভাবিক। কিন্তু তরুণীটি সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল,অদ্ভুত দক্ষ হাত,অদ্ভুত পরিমিতি বোধ। একটার পর একটা গাড়ি ওভারটেক করছে,কিন্তু তা অপরূপ সুন্দরভাবে। গাড়ি চালনাও যে একটা শিল্প তরুণীটি আজ তা প্রথম অনুভব করল।

তাকাল তরুণীটি আহমদ মুসার দিকে। শান্ত মুখ। চোখ দু'টি পাথরের মত সামনে চেয়ে আছে।

হঠাৎ আহমদ মুসার চোখ দু'টি খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

তরুণীটি সামনের দিকে চেয়ে দেখল একটি ট্যাক্সি। বলল, ওটাই কি সেই ট্যাক্সি?

--জি হ্যাঁ।

গাড়ি দু'টির মাধ্যে ব্যবধান দ্রুত কমছে।

আর দু'মিনিট তাহলেই সে গাড়িটাকে ধরে ফেলবে।

হঠাৎ আহমদ মুসার মুখে অন্ধকার নেমে এল। সামনেই জ্বলজ্বল করছে লাল ট্র্যাফিক সিগন্যাল। শহরের মুখে রাস্তায় একটা ক্রসিং। লাল সিগন্যাল থামিয়ে-দিয়েছে এ রস্তার গাড়ি। কিন্তু ঐ গাড়িটি অল্পের জন্য বেরিয়ে যেতে পেরেছে।

আহমদ মুসার গাড়ি এসে থেমে গেল সিগন্যালের সামনে।

হাতাশভাবে আহমদ মুসা তার মাথা ছেড়ে দিল ষ্টেয়ারিং হুইলের উপর। হৃদয়ে কাঁটার মত বিধতে লাগল একটা কথা, নিরীহ, সরল তরুণ হাসান সেনজিক ওদের হাতেই পড়ে গেল।

তরুণীটিও ভীষণ দুঃখিত হয়েছিল।

আহমদ মুসার দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বলল, দুঃখিত আমি,লোকটি কে আপনার? কোত্থেকে আপনারা আসছেন?

আহমদ মুসা ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকিয়েই বলল,আমার এক হতভাগা বন্ধু।

আবার নীল সিগন্যাল জ্বলে উঠল।

আহমদ মুসার গাড়িটাকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে দাঁড় করিয়ে বলল, আর ফলো করে আমরা পারবো না। শহরের শত পথে আমরা ওদের খুঁজে পাব না।

একটু থেমে আহমদ মুসা বলল,আপনি তো এখন এয়ারপোর্টে ফিরে যাবেন।

হ্যাঁ, সেখানেই আমার ভাইয়া আছেন। একটা কাজে তিনি সেখানে গেছেন।

কেন জিজ্ঞেস করছেন?

--আমাকে তিরানা সিটি কারপোরেশন অফিসে যেতে হবে।

কেন?

ওই গাড়িটা কার তা সন্ধান নিতে হবে।

তরুণীটি আহমদ মুসার বুদ্ধি দেখে আবাক হলো। ওখান থেকে ঠিকানা সংগ্রহ করে যে একজন গাড়ি মালিককে খুঁজে বের করা যায় একথা কোন দিন সে ভাবেওনি।

--আপনি কখনও তিরানায় এসেছেন? কেউ পরিচিত আপনার এখানে?

--তিরানায় এই প্রথম আসা। কেউ আমার পরিচিত নেই এখানে।

--তাহলে সিটি কারপোরেশন অফিসে তাড়াতাড়ি কাজ উদ্ধার আপনার কঠিন হবে।

কেন?

কম্যুনিজম গেছে,কিন্তু কমিউনিষ্ট আমলাতন্ত্র এখনও যায়নি।

তরুণীটি একটু থেমেই আবার বলল, আপনি এখনি যেতে চান?

--জি, এখনকার প্রতিটি সেকেন্ড আমার কাছে একটা বছরের চেয়েও মূল্যবান।

--পুলিশকে বললে হয় না?

হাসল আহমদ মুসা। বলল,আপনাদের পুলিশের কথা জানিনা। তবে যে অভিজ্ঞতা আছে সেটা হলো, পুলিশের শরণাপন্ন হওয়ার অর্থ হলো বিষয়টাকে কোল্ড স্টোরেজে পাঠানো। আজ যে কাজ চাই,তা দশদিন বা দশমাস পরে পেতেও পারি।

তরুনীটিও হাসল। বলল,আমাদের পুলিশের অবস্থাও এই রকম,বিশেষ করে বেসরকারী অভিযোগের তদন্তে তারা গা করতেই চায় না।

--শহরের একটা মানচিত্র আমার কাছে আছে আমি খুঁজে নেব। আমি এখানেই নেমে যেতে চাই। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

তরুনীটি গম্ভীর হলো। বলল,আপনি এ শহরে নতুন,আপনি বিদেশী,আপনি বিপদগ্রস্থ। চলুন আপনাকে সিটি কর্পোরেশনের অফিসে নিয়ে যাব। আপনি এ সিটে আসুন।

--আপনার ভাই তো বিপদে পড়বেন। তিনি তো চিন্তা করবেন।

--বিপদে পড়বেন না, খুব চিন্তাও করবেন না। তাঁর বোন সম্পর্কে তার এ আস্থা আছে যে,আমি কোন জরুরী কাজ ছাড়া সেখান থেকে আসিনি। আর সিটি কর্পোরেশনে আমার এক আত্মীয় আছেন। আপনার কাজটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে।

'ধন্যবাদ' বলে আহমদ মুসা গাড়ি থেকে বেড়িয়ে এল। তরুনীটিও বেড়িয়ে এল। সিট বদল করল তারা।

--গাড়ি স্টার্ট দিতে দিতে তরুনীটি বলল, আপনার যে ড্রাইভ দেখলাম,সে ড্রাইভের কথা আমি কল্পনাও করিনি। আমি কোন রকমে কাজ চালাতে পারি।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, সিটি কর্পোরেশন এখান থেকে কতদূর?

'চার মাইলের বেশী হবে না।' বলল তরুনীটি।

আহমদ মুসা উত্তরে আর কিছু বলল না। চার দিকটায় সে চোখ বুলাতে লাগল। সেই সাথে তার মাথায় চিন্তার জট। একটা অনিশ্চতের পথে সে পা বাড়িয়েছে,পারবেন কি লক্ষ্যে পৌছতে? পারতেই যে হবে তাকে।

তরুনীটি ভাবছিল আহমদ মুসার কথা। এ ধরনের একটা ভয়ানক বিপদে সাধারণ যে কেউ মুশড়ে পড়ার কথা, প্রথমেই তার পুলিশের স্মরণাপন্ন হবার

কথা। কিন্তু তা না করে যে নিজেই পাল্টা আক্রমনের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়,সে তো সাধারণ নার্ভ,সাধারণ বুদ্ধি কিংবা সাধারণ শক্তির কেউ নয়।

তরুনীটি চাইল আহমদ মুসার দিকে। শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে আছে সে।

তরুনীটি ভাবল,এমন সরল পবিত্র মুখচ্ছবি যার সে যেই হোক আবাঞ্ছিত কেউ হতে পারে না।

সিটি কর্পোরেশন অফিসে ওরা পৌঁছল।

এডমিনিস্ট্রেটিভ সেকশনের গেট রুমে আহমদ মুসাকে বসিয়ে তরুনীটি সেক্রেটারীর কক্ষে চলে গেল। সিটি কর্পোরেশনের সেক্রেটারী তরুনীটির চাচা।

আধা ঘন্টা পর ফিরে এল তরুনীটি। তার মুখে হাসি।

সে এসে সোফায় আহমদ মুসার পাশে বসতে বসতে বলল,নাম পাওয়া গেছে। ট্যাক্সিটি পারসোনাল।

তারপর ঠিকানা লেখা চিরকুটটি আহমদ মুসার হাতে তুলে দিতে দিতে বলল, কিন্তু সমস্যা হলো চাচার কাছে শুনলাম ঠিকানার লোকটা সাংঘাতিক। সে ক্রিমিন্যাল অথচ তার গায়ে হাত দেয়া যায় না। খুন করে পাখি শিকারের মত,কিন্তু তাকে পাকড়াও করার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। দেশের সীমান্ত পেরিয়েও তার নাম।

--ধন্যবাদ,আমি তাই আশা করছিলাম। মুখে হাসি আহমদ মুসার।

বিস্মিত চোখে তরুনীটি বলল,আপনার মুখে হাসি,আমি মনে করেছিলাম চিন্তিত হয়ে পড়বেন আপনি।

--হাসছি কারণ, ঠিক ঠিকানাটা আমরা পেয়ে গেছি। এ ঠিকানাটা যদি কোন ভাল লোকের হতো, তাহলে চিন্তায় পড়তাম ঠিক ঠিকানা আমরা পাইনি।

বিস্ময়, বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তরুনীটি তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, আপনি অসাধারণ, এমন চিন্তা আমার আসেইনি।

দু'জনেই বেরিয়ে এল সিটি কর্পোরেশনের অফিস থেকে।

লনে এসে দাঁড়াল আহমদ মুসা। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল বেলা ১টা।

তিরানার ম্যাপের দিকে চোখ বুলিয়ে আহমদ মুসা বলল, ঠিকানার এই 'জগু রোডটি' কোথায়?

জগু রোড মানে আহমদ বেগ জগু রোড। বলল তরুণীটি।

তরুণীটি ম্যাপে রোডটি দেখিয়ে দিল। বলল, এটা তিরানা নগরীর পুরানো এলাকা। ১৯১২ সালে আলবেনিয়া স্বাধীন হলে ১৯২৮ সালে আহমদ বেগ জগু শাসন ব্যবস্থাকে রাজতন্ত্রে পরিণত করেন। তাঁরই নামানুসারে এই রাস্তার নামকরণ করা হয়। সে সময় নগরীর সিটি কর্পোরেশনের অফিস এই রাস্তার উপরেই ছিল।

জগু রোডে পৌছার পর পথগুলোর দিকে একবার নজর বুলিয়ে আহমদ মুসা বলল, অনেক কষ্ট দিয়েছি তোমাকে বোন।

'বোন' সম্বোধন শুনে তরুণীটি অনেক্ষণ তাকিয়ে থকল আহমদ মুসার দিকে। তারপর বলল, আপনি কোথাও যেতে চান?

--হ্যাঁ এই ঠিকানায় যাব।

--আপনি একা ঐ ঠিকানায়?

--আমাকে যেতে হবে বোন।

অত্যন্ত দৃঢ় কন্ঠস্বর আহমদ মুসার। তরুণীটি মুহুর্তের জন্যে আহমদ মুসার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, এখনি যেতে চান?

--হাঁ বোন,ঐ ক্রিমিনালদের আমি কোন সুযোগ দিতে চাই না।

--কিন্তু তার আগে আপনার খেয়ে নিতে হবে,বেলা ১টা বাজে। চিন্তা করবেন না। আমি আপনাকে ঐ ঠিকানায় পৌছে দেব।

--তুমি? না না,তোমার বাড়ি যাওয়ার দরকার। বাড়িতে সবাই.....

তরুণীটি বাধা দিয়ে হেসে বলল, আমি ভাইয়ের সাথে টেলিফোনে আলাপ করেছি। ভাইয়াও আসছেন, এখনি এসে পড়বেন।

সিটি কর্পোরেশনের পাশেই একটা হোটেল।

হোটেলের দিকে যেতে যেতে তরুণীটি বলল,আমার খুব আনন্দ লাগছে,রহস্য,এ্যডভেঞ্চার আমার খুব ভাল লাগে। আমার ভাইয়ারও। আমার

ভাইয়া তিরানা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক,কিন্তু খেলা-ধূলা-সমাজসেবা নিয়েই বেশী মেতে থাকেন।

খাওয়া শেষে হোটেল থেকে বেড়িয়ে আহমদ মুসা বলল,বোন আমি নামাজ পড়তে চাই,কোথায় পড়তে পারি?

কথাটা শুনে চমকে উঠে তরুণীটি আহমদ মুসার দিকে তাকাল। তার চোখে বিস্ময়। বলল আপনি মুসলমান?

--হাঁ বোন মুসলমানদের সাথে তোমার পরিচয় আছে?

তরুণীটি কোন জবাব দিল না। একটা বিষন্নতা,একটা বিব্রতকর ভাব তার মুখে ফুটে উঠল।

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল,নামাজ ঐ পার্কে পড়া যাবে?

সিটি কর্পোরেশন ও হোটেলের সামনেটা জুড়ে একটা সুন্দর পার্ক।

সেদিকে তাকিয়ে আহমদ মুসা বলল,হ্যাঁ অসুবিধা হবে না।

হোটেলে অজু করে নিয়েছিল।

নামাজ পড়ার জন্যে পার্কে চলে গেল আহমদ মুসা। পেছনে পেছনে চলল তরুণীটিও।

কেবলামুখী হয়ে ঘাসের উপর নামাজে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

পাশেই দাঁড়িয়েছিল তরুণীটি।

অপরূপ এক তন্ময়তার সাথে নামাজ পড়ছিল আহমদ মুসা। তার হাত বেঁধে নামাজে দাঁড়িয়ে থাকা, রুকু করা,সিজদা দেখে মনে হচ্ছিল এক মহা শক্তির সামনে ভয় ভক্তিতে আপ্লুত একজন মানুষ। যেন গোটা জগৎকেই সে ভুলে গেছে,মহাশক্তিমান প্রভু ছাড়া তার সামনে আর কাউকেই সে দেখছে না।

তরুণীটি চোখ ভরে পলকহীন দৃষ্টিতে দেখছিল এই অপরূপ দৃশ্য। তার মুখে বিস্ময়ের সাথে একটা আনন্দের স্ফুরণও আছে।

এই সময় একটি যুবক এসে তার পাশে দাঁড়ালো।

তরুণীটি মুখ ঘুরিয়ে ধীর কন্ঠে বলল,ভাইয়া তুমি এসেছ?

যুবকটির দৃষ্টি তখন নামাজরত আহমদ মুসার দিকে। বলল,এ কি সেই?

--হ্যাঁ ভাইয়া।

--উনি মুসলমান?

--তাই তো দেখছি।

যুবকটিও দেখতে লাগল নামাজ।

এক সময় আহমদ মুসার দিকে চোখ রেখেই বলল,আমাদের মুসলিম বোর্ড অফিসের মসজিদে নামাজ দেখেছি। কিন্তু এত সুন্দর নামাজ তো দেখিনি?

--ভাইয়া এর সব কিছুই আমি সুন্দর দেখছি,অসাধারণ দেখছি। বুদ্ধি,সাহস,দক্ষতার অপরূপ সমাবেশ তার মধ্যে। এখন দেখছি,ধর্মভীরুতাতেও সে সবাইকে ছাড়িয়ে।

--কে ইনি?

--আমি জানি না,জিজ্ঞেস করিনি। যিনিই হোন অসাধারণ কেউ।

নামাজ শেষে আহমদ মুসা মুনাজাত করল।

মুনাজাতের সময় তার চোখে-মুখে অপুর্ব এক আবেগ। এক সময় তার চোখ থেকে নেমে এল দু'ফোটা অশ্রু। তরুণীটি অভিভূতা। ঐ অশ্রু যেন তার চোখকেও ভারি করে তুলল। হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে একটা তোলপাড় উঠল তার।

যুবকটি দৃষ্টি বিস্ময়-বিমুগ্ধ।

আহমদ মুসা নামাজ শেষ করে উঠে দাঁড়াল।

ঘুরে দাঁড়াল সে আসার জন্য।

তরুণী এবং তার সাথে যুবকটিও আহমদ মুসার দিকে এগুলো।

কাছাকাছি পৌছে তরুণীটি তার ভাইয়ের দিকে ইংগিত করে বলল,আমার ভাইয়া,মোস্তফা মারলিকা ক্রিয়া।

--মোস্তফা ক্রিয়া? মানে তোমরা মুসলমান? বিস্ময়ে-আনন্দে চোখ কপালে তুলে বলল আহমদ মুসা।

কথা শেষ করেই যুবকটিকে জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসা।

মোস্তফা মারলিকা ক্রিয়াকে ছেড়ে আহমদ মুসা তরুণীটিকে বলল,বোন তুমি তো বলনি,তোমরা মুসলমান? তোমার নাম কি বোন?

--সালমা সারাকায়া।

--বলনি কেন যে তোমরা মুসলমান?

সালমা গম্ভীর হলো। বলল,যখন বলব ভেবেছি,তখন লজ্জাবোধ হয়েছে বলতে।

--কেন?

--এক নামের চিহ্ন ছাড়া,মুসলমানিত্বের আর কোন চিহ্নই অবশিষ্ট নেই আমাদের।

একটু থেমে ঢোক গিলে নিয়ে আবার শুরু করল,নামাজের নাম শুনেছি,আজ প্রথম দেখলাম নামাজ।

আহমদ মুসাও গম্ভীর হলো। বলল,এর জন্যে তোমরা দায়ী নও বোন। নামের যে চিহ্নটুকু সেটা কম কি! কি পরিমাণ খুশী হয়েছি তোমাকে বুঝাতে পারবো না।

--আপনার দেশ কোথায়? প্রশ্ন করল মোস্তফা ক্রিয়া।

--আমি আসছি আর্মেনিয়া থেকে। আমার দেশ কোনটি,এ প্রশ্ন আমার জন্যে খুব কঠিন মোস্তফা।

যে লোকটি কিডন্যাপ হয়েছে সে লোকটি কে? প্রশ্ন করল সালমা সারাকায়া।

--ওর নাম হাসান সেনজিক।

--ওকি যুগোশ্লাভ? কথাটা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল মোস্তফা ক্রিয়া।

--হা,যুগোশ্লাভ।

--ওকে কিডন্যাপ করল কে? কেন? প্রশ্ন করল সালমা সারাকায়া।

--সে এক বিরাট কাহিনী,এক কথায় বলা যাবে না। তাহলে এস একটু বসি এখানে।

বলে আহমদ মুসা বসে পড়ল।

গাছের ছায়ায় সবুজ ঘাসে ঢাকা জায়গাটা ছিল মনোরম। মোস্তফা এবং সালমা তার সামনে বসে পড়লো।

'হাসান সেনজিক এক হতভাগ্য পরিবারের এক হতভাগ্য সন্তান' বলে আহমদ মুসা হাসান সেনজিকের কাহিনী শুরু করল। আহমদ মুসা বলল,কি করে

হাসান সেনজিককে আর্মেনিয়ায় হোয়াইট ওলফের বন্দীখানায় খুঁজে পেল। তারপর বলল যুগোশ্লাভিয়ার স্টিফেন পরিবারের দুর্ভাগ্যের মর্মান্তিক কাহিনী এবং কি করে হাসান সেনজিক পালিয়ে মানুষ হয়েছে,কি করে মুমূর্ষ মা'কে দেখতে আসার পথে বন্দী হয়,কি করে মিলেশ বাহিনী তাকে ধরার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছে।

থামল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা থামলেও মোস্তফা এবং সালমা কেউ কোন কথ বলল না। তারা যেন নির্বাক হয়ে গেছে। সালমা সারাকায়া এবং মোস্তফা ক্রিয়া দু'জনের চোখে মুখে গভীর বেদনার ছাপ।

অনেক্ষণ পর ধীরে ধীরে মুখ তুলল মোস্তফা ক্রিয়া। বলল,আমাদের পাশে যুগোশ্লাভিয়ায় মুসলমানদের উপর এই ভয়াবহ জুলুম চলছে,অথচ আমরা তার কিছুই জানি না।

--ভাইয়া,এ জুলুম আমাদের দেশেও চলছে,আমরা কি তা জানি? না আমরা তার খোঁজ রাখি? বলল সালমা সারাকায়া।

আহমদ মুসা কিছু বলার জন্য মুখ খুলেছিল,কিন্তু তার আগেই আবার শুরু করল সালমা সারকায়া। বলল,আমি খবরে পড়েছি,আমার মনে আছে। কোরআন ছাপার জন্য এক ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত হয়েছিল, ছাপাখানা মালিকের হয়েছিল কারাদন্ড।

--আলবেনিয়া শাসনতান্ত্রিকভাবে নিরীশ্বরবাদী দেশ, এখানে ধর্ম অবলুপ্ত ঘোষিত। সুতরাং এখানে তো এসব ঘটবেই। কিন্তু মুসলমান নামের লোকদের এইভাবে হত্যার মাধ্যমে নির্মূল করার সুসংবদ্ধ কর্মসূচীর কথা আলবেনিয়ায় ছিল বা আছে বলে আমার জানা নেই। বলল মোস্তফা ক্রিয়া।

--ভাইয়া, আলবেনিয়ার প্রায় সবাই মুসলমান বলেই এমনটা ঘটতে পারেনি সম্ভবত। থামল সালমা সারাকায়া।

থেমেই সালমা সারাকায়া আহমদ মুসার দিকে চেয়ে বলল, হাসান সেনজিককে মিলেশ বাহিনীই কি কিডন্যাপ করেছে বলে আপনি বিশ্বাস করেন?

--আমার অনুমান সত্য হলে মিলেশ বাহিনী নয়, তার পক্ষে কেউ কিডন্যাপ করেছে।

একটু থেমে আহমদ মুসা বলল, এ কারণেই আমি তাড়াতাড়ি ওখানে পৌঁছতে চাই যাতে মিলেশ বাহিনীর হাতে পড়ার আগেই হাসান সেনজিককে উদ্ধার করা যায়।

--কিন্তু জেমস জেংগার ঐ আস্তানা বড় ভয়ংকর জায়গা। পুলিশের সাহায্য না নিয়ে ওখানে যাওয়া কি ঠিক হবে? বলল মোস্তফা ক্রিয়া।

--পুলিশকে বললে হয়ত বিপরীত হতে পারে।

ব্যাপারটা ছোট নয়, আন্তঃদেশ ষড়যন্ত্রের একটা অংশ। এ ব্যাপারে জেমস জেংগা পুলিশের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারে।

আহমদ মুসার কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল মোস্তফা ক্রিয়া এবং সালমা সারাকায়া দু'জনেই। মোস্তফা ক্রিয়া বলল, ঠিক বলেছেন, জেমস জেংগার এ ইতিহাস আছে। বহু ঘটনায় সে স্বার্থের ভাগাভাগি করেছে পুলিশের সাথে।

--কিন্তু এ অনুমানটা কি করে করলেন মুসা ভাই, আপনি তো এদেশের কিছুই জানেন না? বলল সালমা।

--এ কিছু নয় সালমা। জেমস জেংগা সম্পর্কে তোমার কাছে যে কয়টা কথা শুনেছি, তাতেই তার সম্পর্কে আমার একটা ধারণা হয়ে গেছে।

কথা শেষ করে আহমদ মুসা উঠতে উঠতে বলল, এবার যেতে হয়।

মোস্তফা ক্রিয়া এবং সালমা সারাকায়াও উঠে দাড়াল।

আহমদ মুসা মোস্তফা ক্রিয়ার দিকে চেয়ে বলল, আপনি আর কিছু জানেন জেমস জেংগা সম্পর্কে?

--প্রাচীর ঘেরা বিশাল এলাকা নিয়ে তার বাড়ি। ঘেরা এলাকার মাঝখানে তার তিনতলা প্রাসাদ। বাড়ির সামনে দক্ষিণ দিকে একটা বড় পুকুর। তার নিজস্ব বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা আছে। সে পেশাদার ক্রিমিনাল, কিন্তু উপরের পরিচয়ে সে রাজনীতিক, সরকারের সহযোগী।

--সে কখনও জেল খেটেছে, কিংবা আহত হয়েছে কোনদিন?

--না। সবাই জানে সে বড় বড় ক্রাইমের সাথে জড়িত, কিন্তু কোন ক্রাইম তার ধরা পড়েনি। গভীর পানির রাঘব বোয়াল সে।

--ধন্যবাদ মোস্তফা, আর দরকার নেই। হেসে বলল আহমদ মুসা।

--আপনি এখন যাবেন সেখানে?

--হ্যাঁ, এখনই।

--আমরাও যাব।

--না মোস্তফা, এরকম একটা জায়গায় আমি তোমাদের নিতে পারি না।

--একা আমরা আপনাকে ছাড়বো না।

আহমদ মুসা একটু চিন্তা করল। তারপর বলল, সঙ্গে নিতে পারি একটা শর্তে। সেটা হল আমি যা বলব তোমাদের তা মানতে হবে।

দু'জনে বলে উঠল, আমরা মানব।

তারা পার্ক থেকে বেরিয়ে এল।

গাড়িতে উঠে আহমদ মুসা সুটকেস খুলে কালো রংয়ের ছোট্ট ল্যাসার বীম পিস্তলটা তার ডানপায়ের মোজায় গুজে রাখল। তার সাদা পিস্তলটাও সে নিল। আরও কয়েকটা প্রয়োজনীয় জিনিস সে পকেটে পুরল।

সামনের সিট দু'টোতে বসেছিল ওরা দুই ভাই বোন। কিছু দেখতে পেলনা তারা।

ড্রাইভিং সিটে মোস্তফা ক্রিয়া।

জনাকীর্ণ রাজপথ দিয়ে মাঝারী গতিতে চলছিল গাড়ি।

গাড়ির সিটে হেলান দিয়ে চোখ বুজল আহমদ মুসা। হাতের সময়টুকু সে নিজেকে বিশ্রামের কোলে সঁপে দিতে চায়।

সালমা সারাকায়া একবার পেছন ফিরে দেখল চোখবন্ধ আহমদ মুসা গাড়ির সিটে নিজেকে এলিয়ে দিয়েছে। শান্ত মুখচ্ছবিতে দুঃশ্চিন্তা ও উদ্বেগের সামান্য চিহ্নও নেই। সালমা ভাবল, নার্ভ কত শক্ত হলে সংঘাতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানুষ এমন নিশ্চিন্ত থাকতে পারে। তার বুকতো এখনই তোলপাড় করতে শুরু করছে।

গাড়ি এসে পড়ল জগু রোডে।

জগু রোডের মাঝামাঝি জায়গায় জেমস জেংগার বাড়ী।

ঠিক মেইন রোডের উপর বাড়ী নয়। মেইন রোড থেকে পূর্ব দিকে একটু ভেতরে।

জেমস জেংগার যেখানে বাড়ী তার ঠিক বিপরীতে অর্থাৎ পশ্চিম পার্শে জগু রোডের উপর তিরানা সিটি কর্পোরেশনের পুরানো অফিস। এখন এটা পুরানা এলাকার শাখা কর্পোরেশন হিসাবে ব্যবহার হয়।

মোস্তফা ক্রিয়ার গাড়ি করপোরেশন অফিসের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে বলল, আমরা এসে গেছি মুসা ভাই।

তারপর মোস্তফা ক্রিয়া পূর্ব দিকে ইংগিত করে বলল, ঐ যে বড় লোহার গেট দেখা যায় ওটাই জেংগার বাড়ী।

আহমদ মুসা ওদিকে তাকাল।

মেইন রোড থেকে একটা প্রশস্ত রাস্তা বেরিয়ে গেটে গিয়ে ঠেকেছে। গেটের দু'পাশ দিয়ে উঁচু প্রাচীর উত্তর ও দক্ষিণে এগিয়ে গেছে। গেটের দু'পাশ ফাঁকা। আর প্রাচীরের পাশ দিয়ে বিলম্বিত খালি জায়গা। তবে মেইন রোড থেকে ঢুকতেই দু'পাশে বড় বড় দু'টো বিল্ডিং। সেগুলোতে বড় বড় তালা ঝুলছে। সম্ভবত ব্যাংক কিংবা কোন কোম্পানীর গোডাউন হবে।

এলাকাটা বলা যায় নির্জন।

আহমদ মুসা বেরুবার জন্য তৈরী হল।

তৈরী হয়ে বলল, মোস্তফা তুমি পারলে তোমার গাড়ির নাম্বার কিছু পরিবর্তন করে নাও। কিছু মনে করোনা আমি তোমাকে তুমি বলেছি।

মোস্তফা ক্রিয়া বলল, না মুসা ভাই, আমি খুশি হয়েছি, এতক্ষনে মনে হচ্ছে আমি আপনার ছোট ভাই হলাম।

আহমদ মুসা আবার বলল, তোমরা এখানে আধা ঘন্টার বেশী দেরী করবে না। আমি যদি আধা ঘন্টার মধ্যে না ফিরি তোমরা চলে যাবে।

সালমা সারাকায়া কোন কথা বলছে না। তার মুখ বিষন্ন, সেখানে উদ্বেগও। আহমদ মুসার শেষ কথায় তার চোখ দু'টি ছল ছল করে উঠল।

একটা আবেগ এসে মোস্তফাকেও ঘিরে ফেলেছে। আহমদ মুসার কথার পর সেও কথা বলতে পারল না।

সালমা সারাকায়া এবং মোস্তফা ক্রিয়া দু'জনে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে ছিল।

আহমদ মুসা হাসল। তাদের সান্তনা দিয়ে বলল, তোমরা ভেবনা, আমার সাথে দ্বিতীয় একজন আছেন, তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহ।

বলে আহমদ মুসা গাড়ি থেকে বেরিয়ে জগু রোড অতিক্রম করে গেটের দিকে এগিয়ে চলল। আহমদ মুসার শান্ত মুখ, ঠোঁটে সুখী মনের এক টুকরো অস্পষ্ট হাসি।

সালমা সারাকায়া এবং মোস্তফা ক্রিয়া সম্মোহিতের মত সেদিকে তাকিয়ে আছে। তাদের হৃদয়ে বেদনা ও বিস্ময়ের যুগপত আলোড়ন।

তারা দেখল, আহমদ মুসা গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

বড় গেটের পাশে ছোট আর একটি গেট। লোকদের আসা যাওয়ার জন্য। তার পাশেই গেট ম্যানের ঘর।

তারা দেখতে পেল, আহমদ মুসা গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই গেটম্যানের কক্ষের জানালা দিয়ে একটা মাথাকে উঁকি দিতে দেখা গেল।

তার কিছুক্ষন পরেই ছোট গেটটি খুলে গেল। গেট দিয়ে একজন লোক বেরিয়ে এল। তার হাতের পিস্তল আহমদ মুসার দিকে তাক করা। তার সাথে আহমদ মুসা ঢুকে গেল ভেতরে।

ছোট গেটটি বন্ধ হয়ে গেল।

ভয় ও আতংকে সালমা ও মোস্তফা ক্রিয়া যেন কাঠ হয়ে গেছে। সালমা সারাকায়ার চোখের কোণায় জমে ওঠা অশ্রু যেন উত্তাপে শুকিয়ে গেছে।

তাদের কারো মুখে কোন কথা নেই।

মোস্তফা ক্রিয়া তার হাত ঘড়ির দিকে তাকাল, বেলা ২টা ২৫ মিনিট।

আহমদ মুসার অনুমান মিথ্যা হয়নি। গেটে এমন একটা ব্যবস্থা থাকবে সেটাই সে আশা করেছিল।

যে লোকটি পিস্তল বাগিয়ে গেটের বাইরে এসেছিল, তাকে দেখেই আহমদ মুসা চিনতে পারল। বিমান বন্দরে গাড়ির ড্রাইভার বাদে আরও যে দু'জন গাড়ির ওপাশে দাঁড়িয়েছিল তাদেরই একজন সে।

আহমদ মুসা খুশী হলো এই ভেবে, তার মিশনকে আল্লাহ প্রথমেই সাফল্যের মুখ দেখালেন। ঠিক জায়গায় সে এসেছে। তার মনে একটা ক্ষীন সন্দেহ ছিল, গাড়িটি জেমস জেংগার হলেও হাসান সেনজিককে তারা জেংগার বাড়ীতেই তুলবে তার কোন কথা নেই। কিন্তু এখন সে নিশ্চিত হাসান সেনজিককে তারা জেংগার বাড়িতেই এনেছে।

আহমদ মুসা আগেই ঠিক করে নিয়েছিল, তাদের হাতে ধরা পড়ার মাধ্যমে সে দ্রুত এবং সহজে জেংগা কিংবা হাসান সেনজিকের কাছে পৌছতে পারবে যা তার জন্য খুবই জরুরী।

--আমি হাসান সেনজিকের বন্ধু। তার ব্যাপারে আমি তার সাথে কথা বলব।

জেংগার কাছে সে আছে তা তোমাকে কে বলেছে?

আহমদ মুসা চমকে উঠল। এমন প্রশ্নের মুখোমুখি হবার কথা তো চিন্তা করেনি। তাড়াতাড়ি কথা স্থির করে নিল। বলল, কেউ বলেনি, আমি জেনেছি। কেমন করে জেনেছি তা জেংগাকেই বলব।

তারা গেট রুমে এসে পড়েছে।

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই পিস্তলধারী লোকটি তার পিস্তলের বাট দিয়ে আহমদ মুসার ঘাড়ে একটা বাড়ি দিয়ে বলল, তুমি খুব সেয়ানা লোক দেখছি, চল জেংগার কাছেই। মজাটা ওখানেই হবে।

বলে লোকটি টেলিফোন হাতে নিল।

আরেকজন লোক, মনে হলো সেই আসল গেটম্যান, পিস্তল বাগিয়ে থাকল আহমদ মুসার দিকে।

সম্ভবত লোকটি টেলিফোনে জেংগার সাথে কথা বলল।

কথা শেষ করে বলল, চল জেংগা তোমাকে স্বাগত জানাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন।

বলে পিস্তলের নল আহমদ মুসার ঘাড়ে ঠেকিয়ে সামনের দিকে ধাক্কা দিল।

জেমস জেংগার তিনতলা বাড়ী। গেট থেকে একটা ফুটবল মাঠের মত ফাঁকা জায়গা। পুকুরের উত্তর ধারে দক্ষিণমুখী হয়ে দাঁড়ানো বাড়ীটি। গেট থেকে বেরিয়ে লাল ইটের একটা সুন্দর রাস্তা পুকুরের পাড় দিয়ে বিল্ডিং এর সিঁড়িতে গিয়ে ঠেকেছে।

পুরানো বাড়ী। একতলাটাই মাটি থেকে বেশ উঁচু। সিঁড়ির চারটা ধাপ ভেঙে এক তলার বারান্দায় উঠতে হয়। উঠার পরেই দোতলায় উঠার সিঁড়ি।

পিস্তল ধারী আহমদ মুসাকে দু'তালায় হল ঘরে নিয়ে এল।

আহমদ মুসা বুঝল জেমস জেংগার এটাই সাধারণ বৈঠকখানা। ঘরের তিন দিকে সোফা সাজানো। উত্তর দিকটায় জেমস জেংগার সিংহাসন আকারের এক আসন। তার আশে পাশে কোন চেয়ার নেই। অর্থাৎ জেমস জেংগার সহকারী কেউ নেই। সবাই তার হুকুম তামিলকারী। জেমস জেংগার মত আধা ক্রিমিনাল আধা পলিটিশিয়ানদের ক্ষেত্রে এটাই হয়। এরা হয় অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী। সবাইকে ব্যবহার করে, মর্যাদা দেয় না কাউকেই।

গোটা কক্ষ লাল কার্পেটে ঢাকা। সোফাগুলো কিন্তু সাদা, জেংগার সিংহাসনটাও। কনট্রাষ্টটা খুবই চোখে লাগছিল। কালার কম্বিনেশন থেকে আহমদ মুসা মনে করল, জেমস জেংগার বুদ্ধি স্থূল, কিন্তু নার্ভ খুবই শক্তিশালী।

জেমস জেংগার দিকে তাকিয়েও আহমদ মুসা এরই সমর্থন পেল । তার দেহের তুলনায় তার মাথাটা ছোট ।

আহমদ মুসাকে দেখেই জেমস জেংগা হেড়ে গলায় বলে উঠল, ফেউ তো দেখি খাসা, সে কি বলেরে টমাস?

--হাসান সেনজিকের ব্যাপারে সে আপনার সাথে কথা বলতে চায়।

--জানল কি করে যে হাসান সেনজিকের খবর আমার কাছে আছে?

--সেটাও সে নাকি আপনার কাছেই বলবে।

--বেশ জিজ্ঞাসা কর, আমার কথা তাকে কে বলেছে।

টমাস তাকে জিজ্ঞাসা করার আগেই আহমদ মুসা বলল, সিটি করপোরেশনের অফিসে গিয়ে গাড়ির নাম্বার থেকে নাম সংগ্রহ করেছি।

মিথ্যা কথা বলার চেয়ে সত্য কথা বলার মধ্যে ঝামেলা কম দেখছিল আহমদ মুসা। সত্য কথাই সে বলল।

টমাস নামের লোকটি পাশে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আহমদ মুসার দিকে পিস্তল তাক করে দাঁড়িয়েছিল।

আহমদ মুসার কথা শোনার পর জেমস জেংগার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। সে বলল, টমাস ফেউটাকে সার্চ করেছ?

--না। বলল টমাস।

পাশ থেকে পিস্তলটা হাতে তুলে নিয়ে জেমস জেংগা চিৎকার করে উঠল গর্দভ কোথাকার । তোমরা কি ঘাস খাও নাকি?

টমাস দ্রুত এসে আহমদ মুসার কোট ও প্যান্টের পকেট সার্চ করল। সাদা একটা পিস্তল ছাড়া আর কিছুই পেল না।

টমাস পিস্তলটি নিয়ে জেমস জেংগার পাশের টিপয়টিতে রেখে দিল। আহমদ মুসার পকেট থেকে পিস্তল বের হবার পর জেমস জেংগার গম্ভীর মুখের দু'পাশে তার চোখ ক্রোধে জ্বলে উঠেছিল।

টমাস সরে এসে তার জায়গায় দাঁড়ানোর পর জেমস জেংগা তার সিংহাসন থেকে উঠল । ধীরে ধীরে এগিয়ে এল আহমদ মুসার দিকে।

এসে দাঁড়াল আহমদ মুসার সামনে। জ্বলছিল তার চোখ দু'টি। বলল, সিটি করপোরেশন আমার নামটা নিয়ে তোমার জন্যে বোধ হয় বসেছিল? মিথ্যা বলার যায়গা পাওনি।

বলে জেমস জেংগা অকস্মাৎ এক ঘুষি চালাল আহমদ মুসার মুখ লক্ষ্য করে।

আহমদ মুসা এটা আশা করেন নি। শেষ মুহূর্তে মুখ সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু অদ্ভুত ক্ষিপ্র জেমস জেংগা। ঘুষিটা তার পূর্ণ ওজন নিয়ে আঘাত করল বাম চোখের উপরটায়।

আহমদ মুসা পড়ে যেতে যেতে আবার দাঁড়িয়ে গেল।

আহমদ মুসার মনে হল তার কপালের হাড়টা যেন ভেঙ্গে গেছে। জেমস জেংগার আঙ্গুলে বোধ হয় আংটি ছিল। মনে হল ওটা কপালে বুলেটের মত বসে গেছে। কপাল থেকে চোখের পাশ দিয়ে কিছু নেমে এল। আহমদ মুসা বুঝল কপাল কেটে গেছে।

আহমদ মুসা স্থির হয়ে দাঁড়াতেই জেমস জেংগা আবার চিৎকার করে উঠল, বল কুত্তা কে বলেছে আমার নাম, না বললে টুকরো টুকরো করে তোকে কুত্তাকে খাওয়াব।

--আমি সত্য কথাই বলেছি, বলল আহমদ মুসা। আবার সেই কথা, বলেই জেমস জেংগা আহমদ মুসার মুখ লক্ষ্য করে দ্বিতীয় ঘুষি চালাল। এবার বাম হাতে। প্রচন্ড ঘুষিটা এবার ডান চোখের ভ্রু'র উপর পড়ল। মনে হলো ডান হাতের চেয়ে বাম হাতের ঘুষিই বেশী মারাত্মক।

এবার পড়ে গিয়েছিল আহমদ মুসা। বোঁ করে মাথা ঘুরে গিয়েছিল। বুঝা গেল, জেংগা প্রচন্ড শক্তি রাখে।

ভ্রু কেটে গিয়ে আহমদ মুসার কপাল থেকে ঝরঝর করে নেমে এল রক্ত । মুখ বেয়ে তা ঝরে পড়ল বুকের ওপর।

আহমদ মুসা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, হাসান সেনজিকের দেখা পাওয়ার আগে সে আক্রমনে যাবে না।

আহমদ মুসার রক্তপ্লূত দেখে জেমস জেংগার রাগ যেন কিছুটা শীতল হল।

সে আহমদ মুসার কাছ থেকে কিছুটা সরে দাঁড়িয়ে বলল, জেংগার নাম যে-ই তোমাকে বলুক, জেংগার পরিচয় সে দেয়নি। এখন পাবে সে পরিচয়। ছারপোকার মত মারব তোমাকে। হাসান সেনজিকের খবর নিতে এসেছ তুমি জেংগার গুহায়। বলে হো হো করে হেসে উঠল জেংগা। হাসি থামলে টমাসকে

লক্ষ্য করে বলল, গেসিচকে বলো হাসান সেনজিককে এখানে আনতে। দেখুক সে তার উদ্ধারকারী বন্ধুর পরিণতি। টমাস বেরিয়ে গেল।জেমস জেংগা তার পিস্তল হাতে পায়চারী করতে লাগল।

অল্পক্ষণ পরেই টমাস ফিরে এল। টমাস ফিরে এলে বলল জেংগা, নিচে রাকিচরা নেই?

--ওদের তো 'মিলেশ' এর 'মিলেনকো'র কাছে পাঠিয়েছেন?

--ও ভুলে গেছিলাম।

আহমদ মুসা বুঝল, এদের একাধিক লোককে মিলেশ বাহিনীর কাছে পাঠানো হয়েছে। কেন? হাসান সেনজিককে হস্তান্তরের জন্যে? ওরা কি এসে পড়বে নাকি?

সচেতন হয়ে উঠল আহমদ মুসা।

বেশী দেরী করা যাবে না। এদের কথায় আরও বুঝা গেল, এদের কেউ কেউ ঘাটিতে এখন হাজির নেই। লোকজন যে এখন কম আছে, আসার সময় তা বুঝা গেছে।

হাসান সেনজিককে নিয়ে প্রবেশ করল গেসিচ নামের লোকটা। তার হাতেও রিভলভার।

হাসান সেনজিক ঘরে প্রবেশ করে আহমদ মুসাকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখে চিৎকার করে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে।

জেমস জেংগা কাছেই ছিল। ক্রুর হাসি ফুটে উঠেছে তার মুখে।

একটু এগিয়ে সে একটা হ্যাচকা টানে হাসান সেনজিককে ছুড়ে ফেলে দিল মেঝের উপর। হাসান সেনজিককে ছুড়ে ফেলে আহমদ মুসার দিকে ফিরে দাঁড়াতে পারেনি। এই সময় আহমদ মুসা চোখের পলকে ঝাঁপিয়ে পড়ে জেমস জেংগার পেছন থেকে বাম হাত দিয়ে সাঁড়াসির মত তার গলা পেঁচিয়ে ধরল এবং ডান হাত দিয়ে জেমস জেংগার হাত থেকে পিস্তল কেড়ে নিল। পিস্তলটি হাতে নিয়েই পাশে দাঁড়িয়ে থাকা টমাসের মাথা লক্ষ্য করে গুলি করল।

টমাস ব্যাপারটা বুঝে উঠে তার পিস্তল তুলে ধরার আগেই গুলি খেয়ে সে ঢলে পড়ল মেঝের কার্পেটের উপর।

জেমস জেংগা প্রচন্ড শক্তি রাখে। সে আহমদ মুসার হাতের বেড়ি থেকে খসে আসার প্রাণপণ চেষ্টা করছিল। কিন্তু যতই সে চেষ্টা করছিল, ততই আহমদ মুসার হাত সাঁড়াশির মত চেপে বসছিল তার গলায়।

আহমদ মুসা টমাসকে গুলি করেই তার পিস্তল তাক করেছিল নবাগত গেসিচকে।

গেসিচ আগেই পিস্তল তুলেছিল, কিন্তু জেমস জেংগার বিরাট বপুর পেছনে দাঁড়ানো মুসাকে গুলি করার কোন পথ পাচ্ছিল না।

আহমদ মুসা পিস্তল তুলে ধরে কঠোর কন্ঠে বলল, পিস্তল ফেলে দাও গেসিচ, না হলে এক্ষণি মাথা উড়ে যাবে।

গেসিচ একবার আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে পিস্তল হাত থেকে ফেলে দিল।

হাসান সেনজিক তখনও পড়ে ছিল মেঝের উপর। সে এবার তাড়াতাড়ি উঠে গেসিচের পিস্তলটি কুড়িয়ে নিল।

জেমস জেংগারে নড়াচড়া বন্ধ হয়ে ছিল। তার দেহটি শিথিল। এবার আহমদ মুসা তার হাত শিথিল করতেই জেমস জেংগার দেহ ঝরে পড়ল মাটিতে। তার দেহে প্রাণ নেই।

গেসিচ ভয়ে কাঁপছিল।

আহমদ মুসা বলল, ভয় নেই, বিনা কারণে আমরা কাউকে হত্যা করিনা।

আহমদ মুসা হাসান সেনজিককে নিয়ে ড্রইং রুম থেকে বেরিয়ে এল। দরজার লকের সাথে চাবি ঝুলতে দেখে খুশী হলো আহমদ মুসা। দরজা লক করে চাবিটি ছুড়ে ফেলে দিল মাঠের দিকে।

তারপর দ্রুত নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে নিচে। সিঁড়ির মুখে একটা জীপ দেখে গিয়েছিল, দেখল সেটা এখনও আছে।

হাসান সেনজিককে গাড়িতে উঠতে বলে সে ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল। ছুটে চলল গেটের দিকে। বাড়ীর আশে-পাশে কাউকে দেখলনা।

জেমস জেংগার পরিবার থাকে তিন তলায়, তারা কিছুই জানতে পারল না।

তিন তলার দিকে একবার চোখ তুলে তাকাল আহমদ মুসা। হৃদয়ে এক প্রচন্ড খোঁচা লাগল আহমদ মুসার। পৃথিবীতে এত মায়া, এত মমতা, তবু এত হানাহানি কেন?

জীপটি গেটের কাছাকাছি আসতেই গেটম্যান গেট রুম থেকে বেরিয়ে এল। কিন্তু জীপের দিকে চোখ পড়তেই আবার ফিরে গেল গেট রুমে।

রুম থেকে এবার সে গুলি করতে করেতেই বেরিয়ে এল। গুলির মুখে পড়ে গেল জীপ। গুলি বৃষ্টির আড়ালে দাঁড়ানো গেটম্যান।

গুলিতে জীপের উইন্ড শীল্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল।

আহমদ মুসা জীপ থেকে নেমে ঘুরে জীপের পিছনে চলে গেল। তারপর জীপের পূর্ব-উত্তর কোণায় গিয়ে দাঁড়াল। গুলির প্রধান টার্গেট সামনের সিট।

আহমদ মুসা পিস্তল বাগিয়ে ট্রিগারে আঙ্গুল চেপে মুখটা পলকের জন্য বাইরে নিয়ে গুলি করল। প্রথম গুলিটা ব্যর্থ হলো।

কিন্তু গুলির শব্দে গেটম্যান চমকে উঠেছিল এবং এদিক ওদিক তাকিয়েছিল। মুহূর্তে নিস্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল তার ষ্টেনগান। এই সুযোগেরই সদ্ব্যবহার করল আহমদ মুসা।

এবার গুলি অব্যর্থ। গুলি খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল লোকটি ষ্টেনগানের ওপর।

আহমদ মুসা দ্রুত হাসান সেনজিককে নিয়ে বেরিয়ে এল সেই ছোট গেট খুলে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলো ২ টা ৫০ মিনিট।

মোস্তফা ও সালমা সারাকায়া অসীম উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকিয়ে ছিল গেটের দিকে। গোলা গুলির শব্দ তারাও শুনতে পাচ্ছিল। মোস্তফার হাত ছিল ষ্টেয়ারিং হুইলেই।

আহমদ মুসাকে গেট দিয়ে বেরুতে দেখেই মোস্তফা তার গাড়ি তীর বেগে গেটে নিয়ে গেল। গাড়ি দাঁড়াতেই সালমা সারাকায়া দরজা খুলে দিল। গাড়িতে উঠে বসল ওরা দু'জন। গাড়ি ছেড়ে দিল।

আহমদ মুসার রক্তাক্ত চেহারার দিকে তাকিয়ে মোস্তফা ও সালমা দুজনেই উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগে এতটুকু হয়ে গিয়েছিল।

পেছনের সিটে বসেছিল আহমদ মুসা ও হাসান সেনজিক।

সামনের সিট থেকে তাকিয়ে ছিল সালমা আহমদ মুসার দিকে। কথা বলতে পারছিল না। তার দিকে চেয়ে আহমদ মুসাই বলল, ভয় নেই বোন। আমি ভাল আছি।

তারপর মোস্তফাকে লক্ষ্য করে বলল, গাড়ির নাম্বার পাল্টেছ?

--জি হ্যাঁ, বলল, মোস্তফা।

--তাহলে আরো সামনে গিয়ে গাড়িটা কোন নিরিবিলি জায়গায় দাঁড় করিয়ে আসল নাম্বারটা এবার লাগিয়ে দাও।

মোস্তফা ক্রিয়া এবার বুঝতে পারল আহমদ মুসা কেন তাকে গাড়ির নাম্বার পাল্টাতে বলেছিল। জেংগার ওখান থেকে যারা গাড়ি আসতে দেখবে, তারা যাতে গাড়ির আসল নাম্বার চিহ্নিত করতে না পারে সে জন্যেই এই ব্যবস্থা। আহমদ মুসার দূরদর্শিতায় বিস্মিত হলো মোস্তফা ক্রিয়া। পরক্ষণেই আবার ভাবলো, হবে না কেন এমন দূরদর্শী, জেংগার ঘাটিতে একা এভাবে ঢুকতে পারে কোন সাধারণ লোক! জেংগার ঘাটিতে ঢুকে তার সাথে লড়াই করে আহমদ মুসা হাসান সেনজিক কে উদ্ধার করে নিয়ে এল, এটা এখনও তাঁর কাছে স্বপ্নের মতো অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে।

সালমা সারাকায়ার বুকের কাঁপুনি ক্রমে থেমে আসছে। যে ঘটনাকে তারা ফেলে এল, তা তার কাছে দুঃস্বপ্নের মতই ভয়াবহ। আহমদ মুসাকে মনে হচ্ছে তার জীবন্ত রক রবিন-হুড। একা এক মানুষ শত্রু পুরীতে ঢুকে যুদ্ধজয় করে বেরিয়ে এল। সালমা সারাকায়ার বিস্ময় ক্রমশ বাড়ছেই, কে এই মানুষটি। বিদেশ বিভূঁইয়ে এসেও যে একা প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে এমন লড়াই করতে পারে! প্রথমেই জেংগার গেটে পিস্তলধারীর হাতে ধরা পড়ার পর আহমদ মুসা জেংগার আস্তানা থেকে ফিরে আসতে পারবে, এ আশা সে ছেড়েই দিয়েছিল। কেমন করে এ অসম্ভবকে সম্ভব করল। মনে পড়ল জেংগার ঘাটিতে যাবার সময়কার আহমদ মুসার শেষ কথা, তোমরা ভেব না, আমাদের সাথে দ্বিতীয় একজন আছেন, তিনি সর্ব শক্তিমান আল্লাহ। আল্লাহর কথা আসতেই এক খোঁচা লাগলো সালমা সারাকায়ার মনে। সে নামে মুসলিম বটে, কিন্তু এই আল্লাহকে তো সে চেনে না।

রাষ্ট্র নিরীশ্বরবাদী, সুতরাং শিক্ষা ও সমাজের কোথাও ধর্মের চিহ্ন রাখা হয়নি। মনে পড়ে তার দাদীমার কথা। কুরআন শরীফ সালমা দাদীর কাছে দেখেছিল। দাদী তা লুকিয়ে রাখতেন সকলের ধরা-ছোয়ার বাইরে বাক্সের মধ্যে। পবিত্র না হয়ে ওতে হাত দেয়া যায় না। ভোরে এবং রাতে তিনি কুরআন শরীফ পড়তেন আর কাঁদতেন। সালমা একদিন দাদীর গা ঘেঁষে বসে জিজ্ঞেস করেছিল, দাদী তুমি কাঁদ কেন?

দাদী চোখ মুছে বলেছিলেন, কুরআন না পড়লে বুঝবি না।

--তাহলে পড়ি, দাও। সালমা বলেছিল।

--তুইতো পড়তে শিখিসনি।

--তাহলে আমাকে শিখাও।

--তোর আব্বা শিখতে দেবে না।

সালমা তার আব্বাকে জিজ্ঞেস করেছিল, দাদী বলেছে, তুমি নাকি কুরআন শিখতে দেবে না?

আব্বা সালমাকে আদর করে বলেছিল, ওর কোন দরকার নেই মা, কেন সময় নষ্ট করবে?

মনে পড়ে সালমার, আব্বার কথা সেদিন তার ভাল লাগেনি। ভাল না লাগলেও আব্বার কথাই মানতে হয়েছে।

সালমা ছোট বেলা সেই যে দাদীর নামাজ পড়া দেখেছিল, তারপর প্রায় এক যুগ পর আজ আহমদ মুসার নামাজ দেখল।

একশ দশ বছর বয়সে দাদী মারা গেছেন। তার মৃত্যুর পর কুরআন এবং জায়নামাজ তার আম্মা দাদীর বাক্সে সেই যে তুলে রেখেছেন, তা আর বের করা হয়নি। তার আব্বা মাঝে মাঝে সব ফেলে দিয়ে বাক্স সাফ করতে চেয়েছেন, কিন্তু সালমার মা রাজী হননি। বলেছেন, আমি ঐ জিনিসগুলির মধ্যে শাশুড়ী আম্মাকে দেখতে পাই। আমি পারব না তাঁর কোন জিনিসের অবমাননা করতে। সালমার আম্মার এ কথায় তার আব্বাও নিরব হয়ে যেতেন।

সালমা সারাকায়ার খুবই গর্ব হচ্ছে, তার দাদীর সেই আল্লাহই আহমদ মুসার আল্লাহ। সালমা আল্লাহকে চিনে না,কিন্তু তার দাদীতো চিনতো।

গাড়িতে স্পিড কমে গিয়ে এক সময় দাঁড়িয়ে গেল। সালমা সারাকায়া চমকে উঠে তাকিয়ে দেখল, তারা তিরানার পুরানো এলাকার শিশু পার্কে এসে প্রবেশ করেছে।

তখন তিনটা পনের মিনিট। শিশু পার্ক ফাঁকা।

এ সময় শিশুরা থাকে না, আরও পরে আসবে।

একটা ঝোঁপের পাশে নির্জন জায়গায় এসে গাড়ি দাঁড়িয়েছে।

গাড়ি দাঁড়াতেই মোস্তফা গাড়ি থেকে নামল। নামতে নামতে বলল, সালমা ফাস্ট এইড বাক্সে দেখ গজ তুলা আয়োডিন আছে। নিয়ে এস এগুলো।

মোস্তফা ক্রিয়া প্রথমেই গিয়ে গাড়ির নাম্বার প্লেটের লাগানো ভূয়া নাম্বারের কাগজটি তুলে ফেলল।

আর সালমা গজ তুলা আয়োডিন নিয়ে আহমদ মুসার সামনে গিয়ে বসল।

আহমদ মুসার মুখে গড়িয়ে আসা রক্ত তখনও কাঁচা, শুকিয়ে যায়নি।

সালমা তুলে নিয়ে রক্ত মুছে দেয়ার জন্য আহমদ মুসার দিকে এগুতেই আহমদ মুসা হেসে বলল, তুলা আমাকে দাও বোন। বলে আহমদ মুসা তার দিকে হাত বাড়াল।

সালমা সারাকায়া একবার চোখ তুলে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে তুলার বান্ডিল আহমদ মুসার হাতে দিয়ে দিল।

সালমা সারাকায়া গম্ভীর হলো। তার চোখে মুখে একটা অভিমানের ছায়া নামল।

ব্যাপারটা আহমদ মুসার দৃষ্টি এড়াল না।

এ সময় মোস্তফা এসে পড়েছে।

সে আহমদ মুসার হাত থেকে তুলার বান্ডিল নিয়ে বলল, মুসা ভাই আমার ফাস্ট এইড ট্রেনিং আছে। অবশ্য সালমা আমার চেয়েও দক্ষ।

মোস্তাফা আহমদ মুসার মুখ ও গলা থেকে রক্ত পরিস্কার করে কপালের দু'পাশের কাটা ও থেতলে যাওয়া জায়গায় আয়োডিন দিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিল।

ব্যান্ডেজ শেষ করে মোস্তাফা বলল, কি করে আহত হলেন মুসা ভাই?

পাশেই বসে ছিল সালমা সারকায়া। তার চোখ-মুখ ভারি।

--তোমার জেমস জেংগার পুরস্কার মোস্তাফা। বলল আহমদ মুসা।

--মানে?

--কপালের কাটা দু'টো জেংগার হাতুড়ি মার্কা ঘুষির চিহ্ন।

--জেংগা কোথায়?

--জেংগার কেমন খবর পেলে তোমরা খুশী হও?

--সে বেঁচে থাকলে বিপদ হবে।

--বিপদ ঘটাবার জন্য তোমাদের জেংগা আর বেঁচে নেই।

--মরেছে সে? চোখ কপালে তুলে প্রশ্ন করল মোস্তাফা।

--হ্যাঁ তার সাথী সহ সে নিহত হয়েছে।

অপার বিস্ময় নিয়ে মোস্তাফা ও সালমা তাকিয়ে রইল আহমদ মুসার দিকে।

বেশ কিছুক্ষণ পর প্রশ্ন করল মোস্তাফা। বলল,আপনি খালি হাতে......

দেখলাম একজন পিস্তলধারী আপনাকে গেট থেকে ধরে নিয়ে গেল...........

প্রশ্ন শেষ না করেই থেমে গেল মোস্তাফা।

আহমদ মুসা হেসে বলল, এ কাহিনী পরে বলব। এখন বল, আমরা কোথায় যাব?

--কেন, আমাদের বাড়ীতে! আসুবিধা হবে আপনার?

--এ প্রশ্নটা তো আমিই তোমাকে করার কথা।

'প্রশ্ন আর করতে হবে না,তাহলে উঠুন' বলে মোস্তাফা উঠে দাঁড়াল। সবাই গাড়িতে উঠল।

সালমা আর একটা কথাও বলেনি। নিরবে সে গাড়িতে গিয়ে উঠল।

এ সময় হাসান সেনজিক ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল,মিলেশ বাহিনীর বেচারা লোকেরা

এতক্ষণে জেংগার শূন্য আস্তানা দেখে হতাশ হয়ে ফিরে গেছে।

--কয়টায় ওদের আসার কথা ছিল? জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

--তিনটায়? আহ্! আগে যদি বলতে।

--ঠিক হয়েছে না বলে, আপনার এখন বিশ্রাম প্রয়োজন। বলল মোস্তাফা।

গাড়ী তখন চলতে শুরু করেছে। মোস্তাফাদের নতুন তিরানা নগরীর অভিজাত এলাকায়।

প্রায় দশ মাইলের পথ।

সালমা সারকায়াদের বিশাল বাড়ী। সালমার আব্বা আলবেনিয়া সরকারের একজন বড় আমলা ছিলেন।

কম্যুনিষ্ট শাসনে আলবেনিয়ায় জনগণের কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না। কিন্তু আমলারা জনগণের কাতারে পড়ে না। আমলা এবং কম্যুনিষ্ট পার্টি জনগনের শাসক। তাই জনগণের আইন তাদের উপর প্রযোজ্য নয়। তাই আমলা ও কম্যুনিষ্ট পার্টির লোকদের বাড়ী-গাড়ি সবই থাকতে পারে। একথাগুলো স্পষ্টবাদী মোস্তাফা ক্রিয়াই আহমদ মুসাকে বলেছিল।

মোস্তাফা ক্রিয়ার বাড়ীতে তিন দিন কেটেছে আহমদ মুসার। এই তিনদিনে আমূল বদলে গেছে বাড়ীর দৃশ্য।

সালমা সারকায়ার অভিমানের মধ্যে আহমদ মুসা বিপদের যে মেঘ দেখেছিল,তা কেটে গেছে সেই দিনই। হাসান সেনজিক আহমদ মুসার সব কথা বলে দেয় তাদেরকে সেদিন বিকেলেই।

সেদিনই সন্ধ্যায় সালমাকে আহমদ মুসা সম্পূর্ণ ভিন্ন সাজে দেখে। গায়ে ঢিলা জামা,গাউন,মাথায় ওড়না।

--ধন্যবাদ সালমা,মুসলিম মেয়ের মত মনে হচ্ছে তোমাকে। বলেছিল আহমদ মুসা।

--আপনি আমাকে মাফ করুন,আপনি আমার ভাইয়া।

--কেন একথা বলছ।

--আপনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, আমি আহত বোধ করেছিলাম। আমি অন্যায় করেছিলাম।

আহমদ মুসার মনে পড়েছিল ফার্ষ্ট এইড নিয়ে যা ঘটেছিল সে কথা।

--তুমি কোন অন্যায় করনি সালমা। যে সংস্কৃতি তোমাকে গড়ে তুলেছে,সেদিক থেকে ওটাই স্বাভাবিক ছিল।

--নারী-পুরুষের এ সম্পর্ককে ইসলামী সংস্কৃতি কি দৃষ্টিতে দেখে ভাইয়া?

--ইসলামী সংস্কৃতি নারী-পুরুষের মেলামেশা ও মননের কতকগুলো সীমা নির্দেশ করেছে,নারী-পুরুষের এ সম্পর্ক যখন এ সীমার অধীনে অবস্থান করে তখন ইসলাম সেখানে হস্তক্ষেপ করতে যায় না।

--এ সীমানাটা কি ভাইয়া।

--এক কথায় এর উত্তর দেয়া যাবে না, একটা সোস্যাল সিস্টেমের এটা একটা অংশ। কোরআন-হাদিস পড়লে সব জানতে পারবে।

কোরআনের নাম শুনেই সালমা লাফিয়ে উঠেছিল। বলেছিল, আমার দাদীর একটা কোরআন ছিল ভাইয়া,১২ বছর হলো সেটা এখনও তাঁর বাক্সেই বন্ধ আছে। আপনি বের করে দিন ভাইয়া। আম্মাকে বলে আসি,বলে সালমা দৌড়ে ভেতরে চলে গিয়েছিল।

এই সময় মোস্তফা ক্রিয়া আহমদ মুসার ঘরে আসে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ফিরে এসেছিল সালমা। মোস্তাফা ক্রিয়াকেও আহমদ মুসার কাছে দেখে সে আরও উৎসাহিত হলো। প্রায় চিৎকার করে বলেছিল, আম্মা খুব খুশী হয়েছেন, দাদীর কোরআন বের করতে অনুমতি দিয়েছেন আম্মা। মুসা ভাইয়া এখনি চলুন, আম্মা বাক্স পরিষ্কার করছেন।

--কোরআন হাতে নিতে অজু করতে হয়। হেসে বলেছিল আহমদ মুসা।

--অজু করুন তাহলে, আমাদেরও শিখিয়ে দিন। দ্রুত বলেছিল সালমা।

তারা আহমদ মুসার সাথে বাথরুমে গিয়ে উৎসাহের সাথে অজু শিখেছিল। অজু করতে করতে সালমা বলেছিল,আমাদের নামাজও শিখাবেন মুসা ভাই। সেদিনই এশার সময় তারা নামাজ শিখেছিল। আহমদ মুসা ইমামের আসনে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর পেছনে দাঁড়িয়েছিল হাসান সেনজিক,মোস্তাফা ক্রিয়া

এবং তাদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল সালমা সারকায়া এবং তার আম্মা। নামাজ শেষে কি যে আনন্দ তাদের!

অজু শেষে আহমদ মুসা, সালমা এবং মোস্তাফা ক্রিয়ার পেছনে পেছনে গিয়ে হাজির হয়েছিল তাদের দাদীর ঘরে।

বাক্সের ভেতরে সাদা লিনেনের কাপড়ে বাঁধা ছিল কোরআন শরীফ।

আহমদ মুসা কোরআন শরীফটি হাতে তুলে নেয়।

সবাই নিরব। গম্ভীর সবার মুখ। যেন কোরআন শরীফের এক অশরীরি প্রভাব সকলকে অভিভূত করে তুলেছিল।

আহমদ মুসা ধীরে ধীরে কোরআনের কাপড় খুলতে শুরু করে।

'শাশুড়ি আম্মার বাঁধা,আজ বারো বছর হলো'—বলেছিল সালমার আম্মা। তাঁর কন্ঠ আবেগে কাঁপছিল।

সবাই তাঁর দিকে তাকিয়েছিল। আহমদ মুসাও। সালমার আম্মার চোখ অশ্রু সিক্ত হয়ে উঠেছিল।

কাপড়ের বাঁধন থেকে কোরআন শরীফ বের করে আহমদ মুসা পরম শ্রদ্ধায় তাতে চুমু খেল।

১২ বছর পর আবার মানুষের স্পর্শ পেয়েছিল কোরআন টি। সালমা সারকায়া বলেছিল,আমিও চুমু খাব ভাইয়া। সালমা চুমু খেয়েছিল,তার সাথে মোস্তাফা ক্রিয়া এবং সালমার মাও।

আবেগে আহমদ মুসার চোখও অশ্রু সিক্ত হয়ে উঠেছিল।

সকলেই পরম শ্রদ্ধা ও ভয়ের সাথে কোরআন শরীফকে দেখছিল।

কথা বলেছিল সালমা সারকায়া। বলেছিল, ভাইয়া আমাদের পড়ে শোনান কিছু।

--ঠিক আছে,চল বাইরে গিয়ে বসা যাক। বলেছিল আহমদ মুসা।

সবাই ভেতরের ফ্যামিলি ড্রইং রুমে গিয়ে বসেছিল। হাসান সেনজিকও এসেছিল।

আহমদ মুসা সোফায় বসে সামনে টেবিলে কোরআন শরীফ মেলে ধরেছিল।

কোরআন পাঠ শুরুর আগে আহমদ মুসা নবীর(সঃ) আগমন,তাঁর উপর ওহী নাজিলের ধরণ,কোরআন নাজিলের উদ্দেশ্য ইত্যাদি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করেছিল। তারপর কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেছিল,প্রথমে সুরা ফাতিহা,পরে সুরা বাকারার প্রথম রুকু।

অদ্ভুত সুন্দর তেলওয়াত আহমদ মুসার।

তার উচ্চ কন্ঠ মর্মস্পর্শী তেলাওয়াত অপূর্ব এক দৃশ্যের অবতারণা করেছিল। অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল আহমদ মুসার চোখ থেকে।

তেলাওয়াতের পর পঠিত আয়াতগুলোর অর্থ ও ব্যাখ্যাও করছিল আহমদ মুসা।

কোরআন পাঠ শেষ হওয়ার পরও অনেক্ষণ কেউ কথা বলেনি। সবারই মাথা নিচু।

অনেকক্ষণ পর কথা বলেছিল সালমাই প্রথম। বলেছিল, ভাইয়া আমরা কি মুসলমান আছি?

--মুসলিম চরিত্র কতকগুলো গুণের সমষ্টি, কিছু গুণ তোমাদের আছে, অবশিষ্ট গুণগুলো অর্জন করতে হবে। বলছিল আহমদ মুসা।

তারপর গত তিন দিন ধরেই সে কোরআনের দারস দিয়ে আসছে, কোরআন পাঠ শিখিয়ে আসছে।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজই আহমদ মুসার নেতৃত্বে জামায়াতে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

সালমাদের আত্মীয় ও বন্ধু পরিবারগুলোতেও একথা ছড়িয়ে পড়েছিল। সকলের উৎসাহ ও আবেগ দেখে অবাক হয়েছে আহমদ মুসা। কোরআন শরীফ পাঠ ও নামাজ শিখার জন্যে তারা পাগল। কিন্তু কোথায় শিক্ষক। আহমদ মুসা সালমা ও মোস্তফা ক্রিয়াকে বলেছিল, তাদেরকেই এ মহান দ্বায়িত্ব নিতে হবে।

তারা দু'ভাই বোন খুবই মেধাবী। তারা তিন দিনে তিন মাসের শিক্ষা সম্পূর্ণ করেছে। আরবী পড়ার কায়দা-কৌশল তারা ধরে ফেলেছে। সমস্যা দাঁড়িয়েছে কোরআন শরীফ নেই, একটা দিয়ে আর কতটা চলতে পারে।

বেলগ্রেড যাবার জন্যে আহমদ মুসা প্রস্তুত। কিন্তু যতবারই কথা তুলেছে তারা আমল দেয়নি। বলেছে, আমাদের হাতে আলো তুলে দিয়েছেন, পথে তুলে না দিলে আমরা পথ খুঁজে পাবো না।

তৃতীয় দিন রাতে শোবার আগে আহমদ মুসা সালমা, মোস্তফা ক্রিয়া, এবং তার মাকে জানাল কাল সকালেই আমাদের যাত্রা করতে হবে।

সকালে উঠেই আহমদ মুসা যাবার জন্যে তৈরী হলো।

যে পোশাকে আহমদ মুসা আলবেনিয়ায় এসেছিল, সেই পোশাক পরেছে। হাসান সেনজিকও রেডি।

মোস্তফা ক্রিয়া, সালমা সারাকায়া, এবং তাদের মা সবাই এসে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে।

--গাড়ি রেডি ভাইয়া। বলল মোস্তফা ক্রিয়া।

আহমদ মুসা বিস্মিত চোখে মোস্তফার দিকে তাকিয়ে বলল, গাড়ি কেন মোস্তফা?

--কেন, আপনি তো গাড়িতে যাবেন।

--তোমার গাড়ি নিয়ে?

--কেন অসুবিধা কি?

হাসল আহমদ মুসা। বলল, মোস্তফা আমরা প্রবেশ করছি অনিশ্চিত এক যুদ্ধ ক্ষেত্রে। কোথায় কখন যাব, কোথায় থাকব কিছুরই ঠিক নেই। গাড়ি রাখব কোথায়?

--কোন পথে যাবেন আপনি?

--এখান থেকে সকুদ্রা। সেখান থেকে পূর্ব দিকে কসভো হয়ে বেলগ্রেড।

--এ পথে কেন? সকুদ্রা থেকে টিটোগ্রাদ ও টিটোভা হয়ে বেলগ্রেড তো সহজ ও আরামদায়ক পথ।

--ঠিক আছে, এ পথে যেতে হলে আপনাকে গাড়ি নিতেই হবে। এ পথে যানবাহন অনিয়মিত এবং বিদেশীদের জন্য ভাল নয়।

একটু থেমেই মোস্তফা আবার শুরু করল, গাড়ি নিয়ে অসুবিধা নেই ভাইয়া, যুগোশ্লাভিয়ার সরকারী গ্যারেজগুলোতে ভাড়ায় গাড়ি রাখা যায়।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, তিন দিন তোমাদের আদরে থেকে শরীরটা বড় আরামপ্রিয় হয়ে উঠেছে, গাড়ি যদি দাও তাহলে আরামপ্রিয়তা আরও বাড়বে।

--শরীরটাকে কখনও বিশ্রাম দিয়েছেন ভাইয়া? বলল সালমা সারাকায়া।

--দেইনি, একথা বলার উপায় আছে? যদি হিসেব করি দেখব, জীবনের যে সময়টা অতীত হয়েছে তার তিনভাগের কমপক্ষে একভাগ ঘুমিয়ে কাটিয়েছি।

--ঘুম পেলেই কি শরীরের দাবী শেষ হয়ে যায়! তাহলে মানুষের কর্মঘন্টা সীমিত করা হয়েছে কেন?

--তোমার যুক্তি ঠিক আছে, কিন্তু তা শান্তিপূর্ণ সময়ের জন্য। অশান্তির সময়ে যখন মানুষ জুলুম- অত্যাচারে- জর্জরিত হতে থাকে, তখন শান্তির সময়ের যুক্তি আর চলেনা। আজ দুনিয়ার মুসলমানরা শোষণ ও জুলুম অত্যাচারে নিষ্পিষ্ট হচ্ছে, এ সময় কোন সচেতন মুসলমানই বিশ্রাম- বিনোদনের কথা ভাবতে পারে না।

কথা শেষ করে আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকাল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এবার উঠতে হয়।

মোস্তফা ইতিমধ্যেই স্যুটকেশ গাড়িতে তুলে দিয়ে এসেছে।

কথাবার্তা বলতে বলতে তারা গাড়ির দিকে এল।

সালমার আম্মা আহমদ মুসাদের দোয়া করে বলল, বাবা তোমাদের আয়ু শতবর্ষ হোক, জাতির খেদমতের জন্যে আরও শক্তি আল্লাহ তোমাদের দিন।

সালমা সারাকায়া ও মোস্তফার চোখ-মুখ ভারী হয়ে উঠেছে।

সালমা সারাকায়া তার ওড়নার এক প্রান্ত মুখে চেপে বলল, স্বপ্নের এ তিনটা দিন জীবনে আর কোন দিন ফিরে পাবো না। আনন্দের চেয়ে এ বেদনাই বেশী দেবে।

সালমার চোখে অশ্রু।

আহমদ মুসা একটু ঘুরে সালমা সারাকায়ার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, সালমা বিদায় সবচেয়ে বেদনাদায়ক, কিন্তু বিদায় এ দুনিয়ার সবচেয়ে বড় বাস্তবতা। আমি শিশুকালকে বিদায় দিয়েছি, বাল্য-কৈশোরকে বিদায় দিয়েছি, বিদায় দিয়েছি আমার বাবা-মা প্রিয়জনদের, বিদায় নিয়েছে পরিচিত শতমুখ।

সুতরাং বিষয়টা নতুন নয়। এই বাস্তবতাকে বড় করে দেখলে বেদনার ভারটা কমে যায়।

--এই বেদনাই বাস্তবতা ভাইয়া, আমাদের মহানবী (সঃ) তার জন্মভূমি মক্কা থেকে বিদায় নেবার সময় কেঁদেছিলেন।

--ঠিক বলেছ সালমা, কিন্তু মহানবী (সঃ) বিদায়ের যখন প্রয়োজন হল তখন এক মুহূর্তও বিলম্ব করেননি। মুখ টিপে হেসে বলল আহমদ মুসা।

হাসান সেনজিক গাড়ির দরজা খুলে ড্রাইভিং সিটের পাশের সিটে গিয়ে বসল।

সবাইকে সালাম জানিয়ে গাড়ির দরজার দিকে এগুলো আহমদ মুসা।

--আবার কবে দেখা হবে ভাইয়া? বলল সালমা সারাকায়া।

আহমদ মুসা গাড়ির দরজায় হাত দিয়েছিল। সালমার কথা শুনে ফিরে দাঁড়াল। ম্লান হেসে সে ধীরে ধীরে বলল, বহুবার বহু জায়গায় আমি এ প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছি বোন, কাউকেই এর জবাব দিতে পারিনি। তোমাকেও পারলামনা। প্রয়োজনের স্রোতে আমি ভাসছি। বলে আহমদ মুসা আবার ঘুরে দাঁড়াল।

গাড়ির দরজা খুলে ড্রাইভিং সিটে গিয়ে বসল আহমদ মুসা।

গাড়ি স্টার্ট নিল। চলতে শুরু করল গাড়ি।

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে একবার পেছনে তাকাল আহমদ মুসা। হাত নাড়ছে সবাই চোখ মুছছে মোস্তফা ও সালমা সারাকায়া।

আহমদ মুসা হাত নেড়ে চোখ ফিরিয়ে নিল সামনে। হৃদয়ের কোথায় যেন খচ করে উঠল। সালমা ঠিকই বলেছে, বিদায়ের মত বেদনাও বোধ হয় একটা চিরন্তন বাস্তবতা। যুক্তির বিচরণ হৃদয়ের যেখানে, মনে হয় প্রেম-প্রীতি, মায়া-মমতার অবস্থান তার চেয়েও আরও গভীরে।

# ৫

বেলা দশটা নাগাদ আহমদ মুসারা সকুদ্রা শহরে গিয়ে পৌছল।

পর্যটক তাদের পরিচয়। আর্মেনীয় পাসপোর্ট। আহমদ মুসার নাম জ্যাকব জেসিম এবং হাসান সেনজিকের নাম মিখাইল সেনভ। আলবেনিয়ায় যুগোশ্লাভ দূতাবাস থেকে তারা ভিসা নিয়েছে।

আহমদ মুসা নিশ্চিত, জেমস জেংগার ঘটনা এ তিন দিনে শুধু যুগোশ্লভিয়া নয়, গোটা বলকানে ছড়িয়ে পড়েছে। তারা অবশ্যই ধরে নিয়েছে, আমরা এবার যুগোশ্লাভিয়ায় প্রবেশ করব। সুতরাং সড়ক ও বিমান দুই পথের উপরই শ্যেন দৃষ্টি রাখবে। তবে আমরা ভিসা নিয়ে আইন সঙ্গতভাবে প্রবেশ করব তারা তা নিশ্চয় মনে করবে না। তাদের এ ভাবনাই স্বাভাবিক যে আমরা সীমান্ত প্রহরীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে চুরি করে যুগোশ্লাভিয়ায় প্রবেশ করব।

তিরানা বিমান বন্দরে হাসান সেনজিকের ধরা পড়া থেকে আরও একটা জিনিস পরিস্কার হয়ে গেছে যে, হাসান সেনজিকের ফটো সর্বত্রই ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

মোস্তাফার গাড়ির কাঁচ শেড দেয়া। তাতে সুবিধা হয়েছে বাইরে থেকে গাড়ির আরোহীদের দেখা যাচ্ছে না।

হাসান সেনজিক বসেছে পেছনের সিটে। পেছনের সিটের দুইটি জানালাই বন্ধ।

সুতরাং বাইরে থেকে হাসান সেনজিক কারো নজরে পড়ার সম্ভাবনা নেই।

সকুদ্রায় পৌছে আহমদ মুসারা কোন দেরী করল না। শুধু কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে পৌছে দু'জনে বোতল থেকে পানি পান করল। তারপর আহমদ মুসা গাড়ি থেকে নেমে একজনকে ডেকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিল পিউকা-কাকেজী রোডে কোন দিক দিয়ে যেতে হবে।

সকুদ্রা থেকে যে সড়কটি পূর্ব দিকে এগিয়ে আলবেনিয়ার সীমান্ত অতিক্রম করে যুগোশ্লাভিয়ার কসভো প্রদেশে প্রবেশ করেছে, তার দু'টি শহর হলো পিউকা ও কাকেজী।

তিরানা-সকুদ্রা সড়কের চেয়ে পিউকা-কাকেজী সড়ক অনেক খারাপ। কাকেজী পৌছতে আহমদ মুসাদের ঠিক দুপুর হয়ে গেল।

কাকেজী যুগোশ্লাভ সীমান্তের নিকটবর্তী একটি সুন্দর আলবেনীয় শহর শহরটির পাশ দিয়ে দ্রিনি নদী প্রবাহিত।

প্রচন্ড ক্ষুধা পেয়েছে আহমদ মুসাদের।

বাজার এলাকার মত দেখতে একটা সুন্দর মোড়ে এসে আহমদ মুসা তার গাড়ি দাঁড় করাল। মোড়ের মাঝখানে একটা সুন্দর আইল্যান্ডে আলেবনিয়ার প্রথম প্রেসিডেন্ট এনভার হোজার একটা মার্বেল মূর্তি। মূর্তিটির বেজে উৎকীর্ণ নাম 'কাকেজী সেন্ট্রাল স্কোয়ার'। আর রোডটির নাম কাকেজী এ্যাভেনিউ সেটা আগেই দেখেছে। এই এভেনিউটিই দ্রিনি সমান্তরালে অগ্রসর হয়ে আলবেনিয়া সীমান্ত অতিক্রম করেছে।

স্কোয়ারের এক পাশে আহমদ মুসা তার গাড়ি দাঁড় করাল।

আহমদ মুসা নামল গাড়ি থেকে। কাউকে জিজ্ঞাসা করে হোটেলের অবস্থান জেনে নেবে এই ছিল তার লক্ষ্য।

গাড়ি থেকে নেমেই আহমদ মুসা একজনকে সামনে পেয়ে গেল। দীর্ঘ শক্ত সমর্থ চেহারা, কিন্তু মানিচিত্রের মত এবড়ো – থেবড়ো মুখ। হন হন করে হাটছিল।

আহমদ মুসা তার মুখোমুখি হয়ে জিজ্ঞেস করল, মাফ করবেন, আশে পাশে কোন ভাল হোটেল .......

আহমদ মুসা কথা শেষ না করতেই সে তার পেছনে মুখ ফিরিয়ে সামনের দিকে ইংগিত করে বলল, আর একটু সামনে এগুলে রাস্তার এ পাশেই একদম রাস্তার উপরেই ‘কাকেজী ইন্টারন্যাশনাল’।

কথা শেষ করে একটা দম নিয়ে সে বলল, আপনারা নিশ্চয় এ শহরে নতুন, কোত্থেকে আসা হচ্ছে?

--তিরানা থেকে আসছি।

লোকটা আহমদ মুসার আপাদ মস্তকে একবার চোখ বুলিয়ে বলল, মহাশয়ের দেশ কোথায়?

আহমদ মুসা ভাঙা আলবেনীয় ভাষায় কথা বলছিল। সুতারাং তাকে বিদেশী বলে চেনা খুব সহজ।

প্রশ্নটি আহমদ মুসাকে বিব্রত করল। মুহূর্তকাল দ্বিধা করে আহমদ মুসা সত্য কথাটাই বলল। জানাল যে, তারা আর্মেনিয়া থেকে আসছে।

লোকটির পাথুরে মুখে আহমদ মুসা কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করল না।

আহমদ মুসা অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে তার গাড়িতে ফিরে এল।

গাড়ি এগিয়ে চলল সামনে। আহমদ মুসা মুহূর্তের জন্যে মুখ ফিরিয়ে পেছনে তাকাল। দেখল লোকটি যেমন যাচ্ছিল, তেমনি সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। তবে গতিটা খুবই মন্থর।

‘কাকেজী ইন্টারন্যাশনাল’ সত্যিই বড় হোটেল। কিন্তু খাওয়ার হল ঘর একেবারে পূর্ণ। দুপুরের খাবার সময়ের এটা পিক আওয়ার বলেই এই অবস্থা। অফিস ও কল-কারখানায় যারা চাকুরী করে, তাদেরকে টিফিন আওয়ারের এক ঘন্টার মধ্যেই তাদের খাবারের কাজ করতে হয়। এ কারণে এ নির্দিষ্ট সময়ে হোটেল- রেস্তোরাঁয় ভীড় খুব বেশী হয়। অবশ্য নিম্ন বেতনের চাকুরেদের হোটেল-রেস্তোরাঁয় আসার সৌভাগ্য হয় না, তবু যারা আসে তাতেই হোটেলগুলো উপচে পড়ে।

আহমদ মুসা ডাইনিং হলের চারদিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখল, এক কোনায় দু’টো সিট খালি আছে।

আহমদ মুসা টেবিলের কাছে গেল। টেবিলের অপর দু'টো সিটে একজন যুবক ও একজন যুবতী বসে। সম্ভবত এক দম্পতি ওরা।

আহমদ মুসা সে টেবিলে গিয়ে দু'টো শুন্য সিটে বসার অনুমতি চাইল, টারকিস শব্দ মিশ্রিত ভাঙ্গা আলবেনীয় ভাষায়।

যুবক-যুবতী দু'জনেই মুখ তুলে চাইল আহমদ মুসা ও হাসান সেনজিকের দিকে। ওরা মাথা নেড়ে অনুমতি দিল টেবিলে বসার জন্য।

ওয়েটার এলে আহমদ মুসা জিজ্ঞাস করল, হালাল জবাই করা গোশত পাওয়া যাবে?

ওয়েটার কথাটা বুঝতে পারলনা। হালালা জবাই অর্থ তার জানা নেই। মুহূর্ত কয়েক বিমূঢ় থাকার পর বলল, স্যার গরু, মেষ, শুকর সব ধরনের গোশতই আছে।

দম্পতির একজন যুবতী মেয়েটি ওয়েটারের কথা শুনে হেসে ফেলল। সে তার আঞ্চলিক ভাষায় ওয়েটারকে সম্ভবত হালাল জবাই কাকে বলে বুঝাল। তারপর সে আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, আলবেনিয়ার কোন হোটেল-রেষ্টুরেন্টেই হালালা জবাই করা গোশত পাওয়া যায় না।

একটু থেকে মেয়েটি বলল, আপনারা নিশ্চিয় মুসলমান, কোত্থেকে এসেছেন?

আহমদ মুসা ভেজিটেবলস, সালাদ ও রুটির অর্ডার দিয়ে মেয়েটির প্রশ্নের জবাব দিল। বলল, আমরা আর্মেনিয়া থেকে এখানে এসেছি।

--হালাল জবাই করা না হলে কি মুসলমানেরা সে গোশত খেতে পারে না?

--না।

--হালাল জবাই করা গোশত যদি না পাওয়া যায়।

--তাহলে আলবেনীয় মুসলমানরা তো গোশতই খেতে পাবে না। কিন্তু এটা কি সম্ভব?

--সম্ভব নয়, একথা ঠিক। কিন্তু মুসলমানদেরকে বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবে যখন এটা সম্ভব হচ্ছে না, তখন মুসলমানদের ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করতে হবে হালাল গোশত সংগ্রহের।

--কিন্তু এই চেষ্টা যদি অপরাধ হয়, যদি এ জন্য জুলুম নির্যাতন নেমে আসে?

--মুসলমানদেরকে তা মোকাবিলা করতে হবে। প্রকাশ্যে না পারলে গোপনে ঈমানের দাবী পূরণ করতে হবে। তা না হলে জাতীয় অস্তিত্ব বৈশিষ্টই একদিন বিলীন হয়ে যাবে।

দম্পতি দু'জন উত্তরে কিছু বলল না। তাকিয়ে রইল তারা আহমদ মুসার দিকে। খাওয়া তাদের বন্ধ হয়ে গেছে। গোশতের প্লেট তারা ঠেলে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। মুখে তাদের চিন্তা ও বিষাদের ছায়া।

আহমদ মুসা ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বলল, আপানাদের এসব প্রশ্ন থেকে মনে করছি আপনারা মুসলমান। আমার অনুমান কি মিথ্যা?

--মিথ্যা নয় এই অর্থে যে আমরা মুসলিম পিতা মাতার সন্তান, আবার মিথ্যা এই অর্থে যে, মুসলমান হিসেবে পরিচয় দেবার আমাদের কিছুই নেই।

--কিন্তু হালাল-হারামসহ অনেক বিষয়ই আপনারা জানেন বলে মনে হচ্ছে।

--আমরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চাকুরী করি। তাই বাইরে যাবার সুযোগ হয়েছে অনেক বার।

প্রশ্নের উত্তর দিয়েই যুবকটি বলল, আমাদের বাড়ী এই কাকেজীতেই। আপনারা কবে এসেছেন, ক'দিন থাকবেন কাকেজীতে?

--এইমাত্র এসে পৌছালাম, আবার খাবার পরেই চলে যাব।

--কোথায় যাবেন?

--যুগোশ্লাভিয়া।

এই সময় হাসান সেনজিক আহমদ মুসার কানে কানে কি যেন বলল।

কথা শুনেই আহমদ মুসা ডাইনিং হলের দরজার দিকে তাকাল। দেখল, মানচিত্রের মত এবড়ো-থেবড়ো মুখওয়ালা সেই লোকটি দরজায় দাঁড়িয়ে। তার সাথে আরও একজন। এদিকেই তাকিয়ে আছে।

মুহূর্তের জন্য আনমনা হলো আহমদ মুসা। তখনই লোকটাকে দেখে তার ভালো মনে হয়নি। জাত ক্রিমিনালের মত চেহারা। প্রশ্ন হলো, মিলেশ বাহিনীর কেউ, না তাদের কোন এজন্টে।

আহমদ মুসার দরজার দিকে তাকানো এবং ভাবান্তর দম্পতির দৃষ্টি এড়ালো না। যুবকটি বললো, কিছু ঘটেছে?

আহমদ মুসা যুবকটির দিকে মুহূর্তকাল চেয়ে বলল, মুসলমানরা মিথ্যা কথা বলে না, কিন্তু সত্য কথাও যে এই মুহূর্তে বলতে পারছি না।

যুবকটি খুশী হলো। বলল, ঠিক আছে বলতে হবে না। আপনার একটা দুঃশ্চিন্তার প্রকাশ দেখছিলাম তো তাই বলছিলাম। আপনাদের কোন অসুবিধা করতে চাই না।

--ধন্যবাদ। এই অসুবিধার ভয়ই আমরা করছি। আমরা প্রবল এক অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে পথ চলছি।

মেয়েটি অনেকক্ষণ কথা বলেনি। সে এবার মুখ খুলল বলল, আমি আপনাদের ট্যুরিষ্ট মনে করেছিলাম।

--ট্যুর তো বটেই, কিন্ত একটা বিপজ্জনক ট্যুর। হেসে বলল আহমদ মুসা।

--জানার লোভ কিন্তু বাড়ছে। বিপজ্জনক ট্যুর কথাটির মধ্যে একটা এ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ আছে। হেসে বলল মেয়েটি।

--এ্যাডভেঞ্চার কথাটির মধ্যে একটা সৌখিনতা আছে এবং সেখানকার বিপদগুলো ঘটনার প্রবাহের নগদ সৃষ্টি। আমাদের এ্যাডভেঞ্চার সৌখিনতা নয় একটা অপরিহার্য প্রয়োজন। আর এখানকার বিপদগুলো সুপরিকল্পিত।

--তাহলে আমরা বলতে পারি, আপনারা একটা বড় উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে বেরিয়েছেন, আর সে উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে আপনারা মোকাবিলা করছেন এক প্রবল শত্রুকে। এবার কথা বলল যুবকটি।

তখন ২টা বাজতে মিনিট দশেকের মত বাকি। ডাইনিং হল প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে। আহমদ মুসার টেবিলের দম্পতিটিও খাওয়া শেষ করেছিল। তারা গোশত থেকে সেই যে হাত তুলেছিল, আর খায়নি।

আহমদ মুসা যুবকটির কথার উত্তর দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় বাইরে একটা প্রচন্ড বিস্ফোরণের শব্দ হলো। সে শব্দে ডাইনিং হলে চেয়ার-টেবিল পর্যন্ত নড়ে উঠল।

বাইরে ছুটাছুটি শুরু হয়ে গেছে।

ডাইনিং হলে যে, দু'চারজন ছিল তারা হোটেল কাউন্টারে টাকা ফেলে দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছে।

আহমদ মুসাসহ তার টেবিলের তারা চারজনই উঠে দাঁড়িয়েছে।

দম্পতির যুবক-যুবতির মুখে উদ্বেগ। যুবকটি বলল উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে, খুব শক্তিশালী একটা বিষ্ফোরণের শব্দ এটা।

আহমদ মুসা ম্লান হেসে বলল, আমার অনুমান মিথ্যা না হলে আমদের গাড়িটিই বিষ্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

আহমদ মুসার কথার সাথে সাথে যুবক-যুবতীর চোখে-মুখে একটা আতংক নেমে এল।

আহমদ মুসা কথা শেষ করে ধীরে ধীরে হোটেল কাউন্টারের দিকে এগুলো। তার চোখে-মুখে উদ্বেগ-আশংকা কিছুই নেই।

দম্পতির যুবকটির নাম এভরেন রমিজ এবং যুবতীটির নাম লায়লা লিডিয়া। আশংকাকুল তারা। আহমদ মুসার স্বাভাবিক-স্বচ্ছন্দ মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হলো। যদি তাঁর কথা সত্য হয়, তাহলে এই পরিস্থিতিতে উনি এমন স্বাভাবিক থাকেন কি করে?

একটা হ্যান্ড ব্যাগ হাতে হাসান সেনজিক আহমদ মুসার পিছু পিছু চলছিল। রমিজ এবং লায়লাও তাদের পিছু পিছু চলল।

ধীরে সুস্থে আহমদ মুসা কাউন্টারে খাওয়ার পয়সা চুকিয়ে হোটেলের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। হোটেল কম্পাউন্ডে তখন দু'চারটি গাড়ি ছিল। আহমদ মুসার গাড়ি ফাঁকা একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছিল। বিস্ফোরণে গাড়িটি টুকরো

টুকরো হয়ে গেছে। তখনও দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন। আহমদ মুসা বেরিয়ে ঐ আগুনের দিকে চেয়ে রইল।

রমিজ ও লায়লা আহমদ মুসার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। রমিজ দগ্ধ গাড়ির দিকে চেয়ে বলল, আপনাদের সবকিছুই তো পুড়ে গেল।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, আলহামদুলিল্লাহ আমরা আছি।

--পুলিশকে জানানো দরকার নয় কি? বলল রমিজ।

--ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ নেই। কেউ না জানুক কার গাড়ি পুড়ল। আহমদ মুসা হেসে বলল।

--বিপদটা গাড়ির উপর দিয়েই গেল মনে করেন?

আহমদ মুসা চারদিকে দেখছিল। সেই এবড়ো থেবড়ো মুখওয়ালা লোক এবং তার সাথীকে কোথাও দেখলনা। গাড়ি ধ্বংস করে কোথায় গেল তারা? তারা তো চলে যাবে না, তাদের অপারেশনই তো বাকি। কোন ফাঁদ পেতেছে তারা? হতে পারে।

--না, গাড়ি ধ্বংস ভূমিকা মাত্র। আসল বিপদটা সামনে। বলল আহমদ মুসা।

রজিম এবং লায়লার চোখে আশংকা ও উদ্বেগের অন্ধকার আরও গভীর হলো।

--আপনারা এখন কি করবেন? বলল রমিজ।

--যুগোশ্লাভ সীমান্তে পৌঁছা যায়, এমন বাস বা গাড়ি কোথায় পাওয়া যাবে?

--কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে।

--কোথায়, কতদূর টার্মিনাল?

--আমাদের গাড়ি আছে, চলুন পৌঁছে দেব। বলল রমিজ।

রমিজের গাড়ি হোটেলের পাশেই একটা ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোরের লনে দাঁড়িয়েছিল তারা আসলে এসেছিল বাজার করতে। খাওয়ার সময় হয়ে যাওয়ায় তারা হোটেলে খেয়ে নিল।

রমিজ গাড়ির ড্রাইভিং সিটে গিয়ে বসল। তার পাশের সিটে লায়লা লিডিয়া। পেছনের সিটে আহমদ মুসা ও হাসান সেনজিক বসল।

গাড়িতে উঠে সেনজিক জিজ্ঞেস করল, বাস টার্মিনাল কতদূর?

--প্রায় ৪ মাইল হবে, দ্রিনি ব্রীজের ওপারে একদম শহরের পূর্ব প্রান্তে। গাড়ি চলতে শুরু করেছে। সবাই চুপচাপ।

আহমদ মুসার শান্ত দৃষ্টি সামনে প্রসারিত। কিন্তু সে শান্ত দৃষ্টির অন্তরালে চিন্তার এক ঝড় বইছে। ওরা গাড়ি ধ্বংস করে সরে পড়ল কেন? হোটেলের যে পরিবেশ ছিল সেখানে তো তারা অভিযান চালাতে পারতো হাসান সেনজিককে ধরার জন্যে। কিন্ত সেটা তারা করল না কেন? এর একটা ব্যাখ্যা এই হতে পারে, আহমদ মুসা ভাবল, যে তারা প্রকাশ্যে এ ধরণের অভিযান চালাতে ভয় পাচ্ছে। এর অর্থ এই যে, তারা পুলিশের কাছে প্রকাশ হতে চায় না। এসব চিন্তা থেকে আহমদ মুসা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে, এরা মিলেশ বাহিনীর লোক হোক কিংবা তাদের কোন এজেন্ট, পুলিশকে ভয় করার মত ক্রিমিনাল এরা। গোপনে এরা কাজ সারতে চায়। গাড়ি ধ্বংস করে আমাদের বিপদে ফেলার পর তারা নিশ্চয় ওঁৎ পেতে আছে নিরাপদ কোন জায়গায়। একটা বিষয় ভেবে আহমদ মুসা খুব খুশী হলো, ক্রিমিনালরা মনের দিক দিয়ে খুব দুর্বল হয়।

--আপনাদের নাম জিজ্ঞাসা করা হয়নি।

গাড়ি ড্রাইভরত এভরেন রমিজ সামনে দৃষ্টি রেখে অনেকটা স্বগত কণ্ঠেই বলল।

আহমদ মুসা একটু হাসল। বলল, আমিও ভুলে গেছি আমার নাম বলতে। আমার নাম আহমদ মুসা, আর এর নাম হাসান সেনজিক।

--আপনাদের সামনে দাঁড়ানো এই প্রবল শত্রুকে আমরা কি জানতে পরি? বলল লায়লা।

--আপনারা মিলেশ বাহিনীর নাম শুনেছেন?

--শুনেছি। ছেলেটি অর্থাৎ এভরেন রমিজ জবাব দিল।

--স্টিফেন পরিবারকে চিনেন, যুগোশ্লাভিয়ার স্টিফেন পরিবারের নাম শুনেছেন?

--শুনেছি। বিখ্যাত পরিবার। যুবকটিই বলল।

--এটুকু আমরা শুনেছি যে, এই পরিবারের পুরুষ সন্তানরা অব্যাহতভাবে গুপ্ত হত্যার শিকার হয়ে আসছে। আর কিছু জানি না। লায়লা লিডিয়া বলল।

--এই হত্যাকান্ড ঘটাচ্ছে খৃস্টান মিলেশ বাহিনী। বলল আহমদ মুসা।

--এই বাহিনী তো বলকান অঞ্চল থেকে মুসলমানদের নির্মুল করার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। বলল এভরেন রমিজ।

--ঠিক বলেছেন, এদের বিশেষ রাগ স্টিফেন পরিবারের উপর।

--জি, সেটাও জানি। সার্বিয়ার স্টিফেন রাজ সুলতান বায়েজিদের সাথে বোনকে বিয়ে দিয়েছিলেন এবং খৃস্টানদের মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে সুলতানকে সমর্থন দিয়ে গেছেন। বলকান অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে প্রভূত সাহায্য করেছে এই পরিবার। বলল এভরেন রমিজ।

--হাসান সেনজিক স্টিফেন পরিবারের প্রত্যক্ষ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ উত্তরসূরী।

লায়লা লিডিয়া এবং এভরেন রমিজ দু'জনেই একযোগে পেছনে তাকাল। তাদের দৃষ্টি হাসান সেনজিকের দিকে।

আহমদ মুসা হাসান সেনজিকের সব কাহিনী সংক্ষেপে বলে উপসংহার টানল, জানিনা হিংস্র, রক্তপায়ী মিলেশ বাহিনীর উদ্যত খড়গের মধ্যে দিয়ে আমরা হাসান সেনজিকের মা'র কাছে পৌছতে পারবো কিনা। আহমদ মুসা থামল।

আহমদ মুসা থামার কিছুক্ষণ পর লায়লা বলল, খুব খুশী হয়েছি। আপনাদের সাফল্য কামনা করি।

আহমদ মুসাদের গাড়ি মাঝারি গতিতে চলছিল। অনেক গাড়ি এ গাড়িকে ডিঙিয়ে গেল। অবশ্য গাড়ির ভীড় এখন খুব কম। এ সময়টা অফিস, মিল কারখানা, দোকান সব কিছুর ওয়ার্কিং আওয়ার।

গাড়ি দ্রিনি ব্রীজের সামনে এসে পড়লো। এদিকে গাড়ি চলাচল নেই বললেই চলে। কাকেজী শহরের পূর্ব প্রান্তে এ ব্রীজটি। গাড়িটি দ্রিনি ব্রীজের উপর উঠল। দ্রিনি ব্রীজ জনশুণ্য, গাড়ি-ঘোড়া কিছু নেই।

আহমদ মুসাদের গাড়ি ব্রীজের মাঝ বরাবর এসেছে। এমন সময় বিপরীত দিক থেকে একটা জীপ বিপজ্জনক গতিতে আহমদ মুসাদের গাড়ির ঠিক নাক বরাবর ছুটে আসছে দেখা গেল।

আহমদ মুসাদের গাড়ির চালক এভরেন রমিজ পাগলা জীপটিকে পাশ কাটানোর জন্য শেষ মুহূর্তে ডান দিকে মোড় নিয়েছিল। কিন্তু পাগলা জীপটিও মোড় নিয়ে আহমদ মুসাদের গাড়ির পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে গেল।

জীপটি দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে দু'জন লোক পিস্তল বাগিয়ে লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে পড়ল। তাদের টার্গেট আহমদ মুসা ও হাসান সেনজিক। ছুটে এল তারা তাদের দিকে।

হাসান সেনজিক পেছনের সিটে তাদের সামনেই বসে ছিল।

পিস্তল বাগিয়ে দু'জন গাড়ির পেছনের দরজার সামনে এসেই একজন গাড়ির দরজা খুলে হাসান সেনজিককে টেনে বের করে নিল।

আরেকজন আহমদ মুসার দিকে পিস্তল তাক করে দাঁড়িয়েছিল।

আহমদ মুসা লোকটির চোখে চোখ রেখে নিরীহ মানুষের মত আর্ত কণ্ঠে বলতে লাগল, আপনারা কে? কি দোষে তাকে আপনারা এভাবে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন?

বলতে বলতে আহমদ মুসা গাড়ির খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল।

লোকটি মাত্র দেড় গজ দূরে আহমদ মুসার কপাল বরাবর পিস্তল তাক করে দাঁড়িয়ে। আহমদ মুসা উঠে দাঁড়ালে লোকটি বলল, কোন চালাকি করার চেষ্টা করলে মাথা গুড়িয়ে দেব।

আহমদ মুসা সারেন্ডারের ভংগীতে দু'হাত উপরে তুলতে তুলতে সামনের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হেসে উঠল।

পিস্তলধারী লোকটি চমকে উঠে কি ঘটেছে তা দেখার জন্য চোখটা একটু পেছনের দিকে ঘুরিয়ে নিয়েছিল।

সংগে সংগে আহমদ মুসা বাজের মত ছোঁ দিয়ে পিস্তলটি কেড়ে নিয়ে ডান পা দিয়ে প্রচন্ড এক লাথি মারল লোকটির তলপেটে।

মুখে “কোৎ” করে শব্দ তুলে লোকটি বাকা হয়ে বসে পড়লো মাটিতে।

লোকটিকে দম নেবার সুযোগ না দিয়ে আহমদ মুসা ডান পায়ের আরেকটি লাথির নিম্নচাপ ছুড়ে দিল লোকটির হাটুর লক্ষ্যে। বোধহয় হাটুটি ভেঙে গেল।

এবার লোকটি একটা প্রচন্ড আর্তনাদ করে মাটিতে শুয়ে পড়লো।

যে লোকটি হাসান সেনজিককে টেনে গাড়িতে তুলছিল সে শব্দ শুনে পেছনে ফিরে তাকিয়ে ছিল। ফিরে তাকিয়েই সে হাসান সেনজিককে ছেড়ে দিয়ে হাতের পিস্তল ঘুরিয়ে নিচ্ছিল।

এই সুযোগে মুহূর্তেই হাসান সেনজিক পেছনদিক থেকে পিস্তলধারী লোকটিকে জাপটে ধরল। কিন্তু লোকটি সঙ্গে সঙ্গেই উন্মুক্ত ডান হাতের কনুই দিয়ে প্রচন্ড এক গুতো মারল হাসান সেনজিকের পাজরে।

হাসান সেনজিক মুখে যন্ত্রণাদায়ক এক চিৎকার তুলে পড়ে গেল। কিন্তু লোকটি হাসান সেনজিকের কাছ থেকে মুক্ত হয়ে আর পিস্তল তোলার সময় পেল না। আহমদ মুসা তার উপর তখন ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তার হাত থেকে পিস্তল কেড়ে নিয়ে তাকে জাপটে ধরে ড্রাইভিং সিটে বসা লোকটির দিকে ছুড়ে ফেলে দিল। লোকটি তার প্রাথমিক বিমুঢ়তা কাটিয়ে ছুরি বাগিয়ে এগিয়ে আসছিল আহমদ মুসার দিকে।

মাটিতে আছড়ে পড়েই আবার তারা উঠে দাঁড়াচ্ছিল। আহমদ মুসা এবার দু’হাতে দুই পিস্তল নিয়ে ওদেরকে বলল, বেয়াদবি করার চেষ্টা করলে আর জানে বাঁচিয়ে রাখব না।

ওরা দু’জনেই দু’হাত উপরে তুলে উঠে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা বলল, তোমরা মিলেশ বাহিনীর লোক?

--না। তাদের একজন বলল।

--তাহলে, তোমরা তাদের দালাল?

--হাঁ।

--কত টাকা বন্দোবস্ত?

--৫ হাজার মার্কিন ডলার।

--তোমরা কি শাস্তি চাও? তারা কথা বলল না।

--তোমরা সাঁতরাতে জান?

--জানি।

--তাহলে ঠিক আছে, তোমরা ব্রীজের রেলিং এ উঠে নদীতে ঝাপিয়ে পড়।

তারা দ্বিধা করছিল।

আহমদ মুসা পিস্তল নাচিয়ে বলল, এক মুহূর্ত দেরী করলে গুলি করবো।

তারা আহমদ মুসার হুকুম তামিল করল। এক সাথেই দু'জন নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ব্রীজ থেকে নদীর দূরত্ব খুব বেশী নয়। ভরা নদী। তবে প্রবল স্রোত আছে। বেশ ভাসতে হবে তাদের।

ওদের তৃতীয় জনও খোঁড়াতে খোঁড়াতে উঠে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আহমদ মুসা ওকে কিন্তু এ নির্দেশ দেয়নি। প্রাণের ভয়েই সে করেছে।

আহমদ মুসা এভরেন রমিজের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলল, তৃতীয় শ্রেণীর ক্রিমিনাল এরা।

এভরেন রমিজ এবং লায়লা লিডিয়া এতক্ষণ ভয়ে-আতংকে কাঠ হয়ে বসেছিল। আহমদ মুসার কথা শুনে তারা যেন জেগে উঠল।

গাড়ির দরজা খুলে এভরেন রমিজ বেরিয়ে এসে জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে। বলল, অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

আহমদ মুসা বলল, অভিনন্দন পরে হবে। চলুন এখান থেকে সরে যাই।

আহমদ মুসা ও হাসান সেনজিক জীপে উঠল। তারপর দুই গাড়ি মাইল খানেক সামনে এগিয়ে গিয়ে এক জায়গায় দাঁড়াল।

সবাই গাড়ি থেকে নামল। পাশেই বাস টার্মিনাল। আহমদ মুসা জিজ্ঞেস করল, বাস টার্মিনাল শহর থেকে এতটা বাইরে কেন?

--সাবেক কম্যুনিস্ট সরকারের এ আর এক খামখেয়ালি। কম্যুনিস্ট পার্টির কাউকে তো আর বাসে চড়তে হয় না। বলল রমিজ।

আহমদ মুসা বলল, আমরা তো সীমান্তে এই জীপ নিয়েই পৌঁছতে পারি?

--হ্যাঁ, অসুবিধা নেই। গাড়ির কাগজপত্র তো গাড়িতে আছেই। বলল রমিজ।

--ড্রাইভিং লাইসেন্স?

--বিদেশী ট্যুরিস্টদের জন্যে এটা প্রয়োজন হয়না নতুন আইনে।

--ধন্যবাদ।

--আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই। আহমদ মুসাকে বলল লায়লা লিডিয়া।

--করুন। বলল আহমদ মুসা।

--আমি এক আহমদ মুসার কথা জানি। তার সাথে আপনার কোন সম্পর্ক আছে?

--এ প্রশ্ন কেন?

--আমি ব্রীজের ঘটনায় আপনার যে অবিশ্বাস্য ভূমিকা দেখলাম তা সাধারণ নয়, এর সাথে আহমদ মুসার সাদৃশ্য আছে।

--কোথায় জেনেছেন আপনি আহমদ মুসার সম্পর্কে?

--কূটনীতিকরা তো অনেক কিছুই জানে। সেভাবেই জেনেছি।

আহমদ মুসা কিছু বলার জন্য মুখ খুলেছিল। কিন্তু তার আগেই হাসান সেনজিক বলল, আপনার অনুমান ঠিক। ইনিই সেই আমদ মুসা।

এভরেন রমিজ এবং লায়লা লিডিয়া কেউই সংগে সংগে কোন কথা বলতে পারলনা। তারা অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আহমদ মুসার দিকে।

শেষে কথা বলল এভরেন রমিজ। বলল, আমরা কূটনৈতিক ও পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ে চাকুরী করতে গিয়ে ফিলিস্তিন, মিন্দানাও, মধ্য এশিয়া ও চীনে আহমদ মুসার ভূমিকা সম্পর্কে অনেক পেপার পড়েছি। কিন্তু কোন দিন ভাবিনি, এ বিস্ময়কর মানুষটির মুখোমুখি কোন দিন হব!

--আমি বিস্ময়কর নয়, মজলুম মুসলমানদের একজন সামান্য খাদেম।

--শুধু মুসলমানদের কেন? কেন সব মুসলমানের নন? একটু হেসে বলল লায়লা।

--মজলুমের জাতভেদ করে ভাবা ঠিক নয়, কিন্তু যখন জাতভেদে মানুষ জুলুমের শিকার হয়, তখন জাত ভেদ করে ভাবা ছাড়া আর উপায় থাকেনা। যেমন আপনাদের বলকান অঞ্চল। এখানে মুসলমানরা জাতিগত নির্যাতন ও নির্মুল ষড়যন্ত্রের শিকার। এখানে মুসলমানদের কথাই আমাকে ভাবতে হবে।

--আর কোন কারণ নেই? লায়লাই বলল আবার।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, আছে সুপথ ও বিপথের প্রশ্ন। বিপথের মোকাবিলায় সুপথের পথিক যারা তাদের প্রতি একটা পক্ষ-পাতিত্ব থাকবেই। আসলে এটা পক্ষপাতিত্ব নয়, ন্যায়ের প্রতি সমর্থন। বিপথকে যদি সুপথে পরিণত করতে হয়, সুপথকে তাহলে শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করতেই হবে। ইসলাম মানবতার মুক্তির একমাত্র পথ।

সুতরাং এর পক্ষে সমর্থনের অর্থ হলো, মানবতার কল্যাণ করা। সুতরাং ইসলামের পক্ষে কাজ আমি করব, সেটাই স্বাভাবিক।

আহমদ মুসা থামলে লায়লা লিডিয়া বলল, প্রশ্নগুলো আমার নয়, আমি এক কমেন্ট্রিতে পড়েছি যে, আহমদ মুসা একজন গোঁড়া কম্যুনাল লিডার।

--সত্যকে ভালবাসা, নিষ্ঠার সাথে সত্যের পক্ষে দাঁড়ানো যদি কম্যুনালিজম হয়, তাহলে আমি একশ' বার কম্যুনাল। আর বাইরের সব দিক থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়া যদি কম্যুনালিজম হয়, আমি কম্যুনাল নই, কোন মুসলমান কম্যুনাল হতে পারেনা।

--দরজা বন্ধ করে দেয়ার অর্থ কি?

--যেমন ইহুদিদের চিন্তা বনি ইসরাইল কেন্দ্রিক। বাইরের গোটা দুনিয়া তাদের কাছে অনাত্মীয়। বাইরের দুনিয়ার লোকেরা তাদের অধীনতা ও আনুগত্য স্বীকারই করতে পারে মাত্র, তাদের জাতির একজন সম্মানিত সদস্যের আসন পেতে পারেনা। হিন্দু ধর্মের ব্যাপারটাও তাই। জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় না হলে অন্য কেউ এ আসন লাভ করতে পারেনা। একেই বলে দরজা বন্ধ করা। প্রকৃতপক্ষে একেই বলে কম্যুউনালিটি। ইসলাম এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলাম চায় গোটা বিশ্বকে জড়িয়ে ধরতে। কাফ্রী ক্রীতদাসও এখানে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারে।

--উৎকট জাতীয়তাবোধ কি এক ধরনের কম্যুনালিটি বা সাম্প্রদায়িকতা নয়?

--কেউ যদি বলে আমার জাতি ন্যায় করুক অন্যায় করুক আমার জাতিই ঠিক কিংবা নিজ জাতির সমৃদ্ধির জন্যে অন্য জাতির মাথায় অন্যায়ভাবে বাড়ি দেয়া যদি বৈধ করে নেয়, তাহলে তা এক ধরনের সাম্প্রদায়িকতা হবে বৈকি। কিন্তু এ ধরনের কাজকে ইসলাম অবৈধ ঘোষনা করেছে। ইসলামের আইন ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের উপর সমানভাবে প্রযোজ্য। সাধারণ একজন অমুসলিম নাগরিকের অভিযোগে স্বয়ং খলিফা হযরত আলী (রাঃ) আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় এসেছেন এবং তার বিরুদ্ধে আদালতের রায়কে তিনি মেনে নিয়েছেন। ইসলামের সোনালী যুগে যুদ্ধ অনেক হয়েছে, কিন্তু যুদ্ধের বৈধ রীতি-নীতির বাইরে পররাজ্য বা পরসম্পদ লুণ্ঠন আত্মসাতের কোন অভিযোগ ইসলামের বিরুদ্ধে নেই।

কথা শেষ করে আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, জোহরের সময় হয়েছে, নামাজ পড়ে নিতে হয়।

পাশেই ছোট একটা জলাশয়।

এভরেন রমিজ ও লায়লা লিডিয়া একটা বড় পাথরের উপর বসে রইল।

আহমদ মুসা এ হাসান সেনজিক গেল অজু করতে।

--অজু করাও একটা নিয়ম আছে নাকি? বলল লায়লা লিডিয়া।

--শুনেছি আছে।

--কেমন মনে হচ্ছে তোমার আহমদ মুসাকে?

--যেমন ভাবতাম, তার চেয়ে অনেক ভালো।

--কেমন?

--আমি ভাবতাম, চে-গুয়েভারা, হো-চি-মিন, অতবা ক্যাস্ট্রোর মত অস্বাভাবিক চেহারা হবে তাঁর। চুল বড় বড় হবে, চোখ হবে লাল, গায়ে মোষমার্কা মোটা কাপরের জামা কাপড়। তার সাথে থাকবে স্বৈরাচারী অহমিকা। তার বদলে তাঁকে দেখলাম অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন একজন ভদ্রলোক হিসেবে। স্বৈর-চরিত্রের কাঠিন্য বর্জিত সরল এবং পবিত্র চেহারা। সাধারণ, কিন্তু অসাধারণ।

--একই ধরনের বিপ্লবী তাঁরা, কিন্তু কেন এই পার্থক্য বলতে পার?

--একই ধরনের বিপ্লবী তারা তো নন।

--বিপ্লবের মত একই কাজ তো তারা করছেন।

--না একই কাজ তারা করেননি।

ভিয়েতনামে হো-চি-মিন, কিউবায় ক্যাস্ট্রো ও চে-গুয়েভারা, রাশিয়ায় লেনিন এবং চীনে মাও সেতুং কম্যুনিষ্ট বিপ্লব—করেছেন যেখানে স্বৈরচরিত্র ছিল অত্যাবশ্যক, যেখানে মিথ্যাচার, হিংসা, সন্ত্রাস, শঠতা, হত্যা ইত্যাদি ছিল সাফল্যের সোপান। আলবেনিয়ায় এসব আমরা নিজ চোখেই দেখেছি। কিন্তু আহমদ মুসা কাজ করছেন ইসলামী বিপ্লবের জন্যে। যেখানে বিপ্লবের স্বার্থেও কোন অন্যায়, অত্যাচার ও অসততাকে বৈধ করা হয়নি।

--ঠিক বলেছ, এ পার্থক্যের কথা আমি চিন্তা করিনি। বিপ্লবকেই আমি কাজ মনে করেছিলাম।

আহমদ মুসা এবং হাসান সেনজিক নামাজ পড়ছিল।

সবুজ গাছের ছায়ায় সবুজ ঘাসে ঢাকা চত্তর। সবুজ ঘাসের চাদরে দাঁড়িয়ে কাবামূখী হয়ে নামাজ পড়ছিল আহমদ মুসা এবং হাসান সেনজিক। পাশেই এক পাথরে বসে এভরেন রমিজ ও লায়লা লিডিয়া দু'চোখ মেলে তাদের নামাজ পড়া দেখছিল। নামাজীদের মত পবিত্র একটা ভাব তাদের মৌন মুখেও সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

নামাজ শেষে গাড়ির দিকে আসতে লাগল আহমদ মুসা।

এভরেন রমিজ তাকে পাথরে এসে বসতে অনুরোধ করল।

বড় পাথর। আহমদ মুসা ও হাসান সেনজিকের বসতে অসুবিধা হলো না।

আহমদ মুসারা বসার পর লায়লা লিডিয়াই সর্বপ্রথম কথা বললঃ নামাজ না পড়লে কি ক্ষতি হয়?

আহমদ মুসা হাসল; বলল, নামাজ এবং মুসলমান অবিচ্ছেদ্য। নামাজ বাদ দিলে মুসলমান আর মুসলমান থাকেনা।

এভরেন রমিজ ও লায়লা লিডিয়া দু'জনের মুখটা মলিন হয়ে গেল এইকথা শুনে।

--তাহলে আমাদের কি হবে? বলল এভরেন রমিজ।

--আপনারা একটা পরিস্থিতির শিকার যা আপনাদের মুসলমান হিসেবে গড়ে উঠার সুযোগ দেয়নি। আপনাদের নতুন যাত্রা শুরু করতে হবে।

--আমি একটা কথা বলব?

--কি? বলল আহমদ মুসা।

--কা'বা শরিফ আপনি দেখেছেন?

--দেখেছি। কয়েকবার হজ্জ করেছি।

--আমার খুব ইচ্ছা কা'বা শরিফ দেখার। কা'বা ও হজ্জের ইতিহাস আমি পড়েছি। আল্লাহর এ ঘর দেখার খুব ইচ্ছা আমার।

--শুধু দেখা কেন হজ্জ করার নিয়ত করুন, আল্লাহ অবশ্যই তা পূরণ করবেন।

--করবেন, আমি যে মুসলমানদের কিছুই করি না?

--এখন থেকে করুন।

--আরেকটা কথা বলব? লায়লা লিডিয়াই বলল।

--বলুন।

--কা'বা বা মক্কার কোন চিহ্ন আপনার কাছে আছে?

লায়লা লিডিয়ার মুখে সংকোচের একটা ভাব এবং কথার শেষ দিকে কণ্ঠটা ভারি হযে উঠেছিল।

আহমেদ মুসা চোখ তুলে লায়লা লিডিয়ার দিকে তাকাল। একটু ভাবল। তারপর বলল, একটা তসবিহ আছে। মক্কার পাহাড়ে এক সুগন্ধ কাঠ হয় নাম জানি না। সে সুগন্ধ কাঠের তৈরী তসবিহটি। দেড় বছর আগে ফিলিস্তিন থেকে আসার পথে উমরাহ করি। সে সময় কা'বার সম্মানিত ইমাম তসবিহটি আমাকে দিয়েছিলেন। আমি তোমাকে এটা দিতে পারি।

বলে আহমদ মুসা পকেট থেকে বের করে তসবিহটি লায়লা লিডিয়র দিকে বাড়িয়ে ধরল।

লায়লা লিডিয়া কম্পিত হাতে তসবিহটি নিল। তারপর অপলক চোখে চেয়ে রইল তসবিহটির দিকে। একসময় দু'হাতে তুলে ধরে তসবিহটি চুমু খেল। তার চোখ থেকে তখন গড়িয়ে আসছিলো অশ্রু। তার চোখে মুখে এক অপরূপ ভাবাবেগ।

আহমদ মুসা, এভরেন রমিজ এবং হাসান সেনজিক তিন জনের কারো মুখেই কোন কথা ছিলনা। লায়লার এই আবেগ, এই পরিবর্তন তাদের বিস্মিত করেছে।

লায়লা তার চোখের পানি মুছল না। সে-ই কথা বলল। বলল, মক্কায় কোন দিনে যেতে পারবো কিনা , কা'বা কোনদিন স্পর্শ করতে পারবো কিনা, জানি না। মক্কার মাটির স্পর্শ পেয়েছে এমন জিনিস তো পেলাম। আপনারা বুঝবেন না এ কত অমূল্য আমার কাছে।

আহমদ মুসা আনমনা হয়ে গিয়েছিল, ভাবছিলো অন্য কথা। অনেক দশক থেকে আলবেনিয়া নিরীশ্বরবাদী রাষ্ট্র। ধর্মকে উৎখাতের কোন উপায়ই এখানে বাদ রাখা হয়নি, বিশেষ করে লায়লাদের মত নতুন প্রজন্ম ইসলামরে সাথে পরিচয় লাভেরও কোন সুযোগ পায়নি। তারপরও লিডিয়ার মধ্যে ঈমানের বীজ কি করে প্রবেশ করল! লিডিয়ার চোখে অশ্রু তার হৃদয়ের গোপন কুঠরীতে লালন করা তার ঈমানেরই এক গলিতরুপ। কম্যুনিজম তার দীর্ঘ শাসনকালে শক্তির জোরে মুসলমানদের ঈমানের প্রকাশকে বাধাগ্রস্ত করেছে, তাদের ঈমানকে ধ্বংস করতে পারেনি।

--কি ভাবছেন? বলল এভরেন রমিজ আহমদ মুসাকে।

আহমদ মুসা মুখ তুলল। বলল, ভাবছি কম্যুনিজমের নিদারুন ব্যর্থতার কথা। ওরা মুসলমানদের জীবন থেকে অনেকটা বছর কেড়ে নিয়েছে, কিন্তু তাদের ঈমান কেড়ে নিতে পারেনি।

লায়লার অশ্রু তার ঈমানেরই প্রকাশ। কা'বার প্রতি তার ভালবাসা কা'বার মালিকের প্রতি ভালবাসা থেকেই এসেছে। আমি স্বাগত জানাচ্ছি রমিজ তোমাকে, লায়লাকে।

বলেই আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে চোখ বুলিয়ে বলল, আমাদের এখন যাত্রা করতে হয়, রমিজ।

--না আজকে যাবেন না ভাইয়া। বলল লায়লা লিডিয়া।

--না লায়লা, তা হয় না, অযথা সময় নষ্ট করা কেন? বলল আহমদ মুসা ।

--অযথা নয় ভাইয়া। আমাদের অন্তত নামাজ শেখাতে হবে আপনার। আপনি তো বলেছেন, নামাজ না পড়লে কোন মুসলমান মুসলমান থাকেনা।

--লায়লা ঠিকই বলেছে ভাইয়া। না হলে নামাজ আমরা কোথায় শিখব? বলল এভরেন রমিজ।

--নামাজ ছাড়াও ইসলাম সম্পর্কে আরও কিছু জানার আছে। যা জানলে আমরাও আমাদের সমাজে দায়িত্ব পালন করতে পারব। বলল লায়লা লিডিয়া।

আহমদ মুসা হাসান সেনজিকের দিকে চেয়ে বলল, এ দাবী আমি উপেক্ষা করতে পারি না হাসান। হোক একটা দিন দেরী।

আনন্দে উল্লাস করে উঠল এভরেন রমিজ ও লায়লা লিডিয়া দু'জনেই।

--জীপটি কি আমরা সাথে নিব? বলল আহমদ মুসা।

--সাথে নিয়ে ঝামেলার আশংকা বাড়িয়ে লাভ নেই। বলল এভরেন রমিজ।

জীপ আমরা বাস টার্মিনালের গেষ্ট গ্যারেজে রেখে যেতে পারি। কাল ওখান থেকে নিয়ে নিব।

--না, ও জীপের আর দরকার নেই। বেচারা টাকা হারাল, জীপটা অন্তত থাকুক। ওরা জীপটা গ্যারেজ থেকে খুঁজে নিতে পারবে।

--মুসা ভাই আপনি দুর্বৃত্তদের সুবিধা দেখছেন, তাদের চেয়ে আপনার সুবিধার মূল্য কি বেশী নয়?

--কিন্তু জীপটা তো ওদের। আর ভেবে দেখলাম ওরা প্রকৃতই আমাদের শত্রু নয়।

--মুসা ভাই, আপনি বিপ্লবী না হয়ে মিশনারী হওয়া উচিত ছিল। এমন দয়ার শরীর হলে চলবে কি করে? বলল লায়লা লিডিয়া।

--লায়লা, ইসলামে বিপ্লবী ও মিশনারী চরিত্র আলাদা নয়। এখানে বিপ্লবীকে মিশনারী হতে হয়, আবার মিশনারীকে বিপ্লবী হতে হয়। একজন মুসলমান একই সাথে গৃহী, ধর্মপ্রচারক, সৈনিক এবং পুলিশ।

--কিন্তু এ চরিত্র তাদের কোথায়? বলল লায়লা লিডিয়া।

--নেই বলেই তো মুসলমানদের পতন, মুসলমানরা পরাধীন হয়েছে। যখন মুসলমানরা ভোগবাদী গৃহীতে পরিণত হলো, অন্য সব বৈশিষ্ট্য পরিত্যাগ করলো তখনই এল পতন। তোমাদের আলবেনিয়ার শতকরা ৭৫ জন মুসলমান। মুসলমান হিসেবে তাদের সব বৈশিষ্ট থাকলে তারা তাদের স্বাধীনতা হারাতো না, বরং অবশিষ্টদের মুসলমান বানাতে পারতো।

এভরেন রমিজ জীপে গিয়ে উঠেছিল। সে বলল, মুসা ভাই আমি জীপটি বাস টার্মিনালে রেখে আসছি। বলে সে জীপটি নিয়ে চলে গেল।

আহমদ মুসা ও হাসান সেনজিক গিয়ে এভরেন রমীজের গাড়ির পেছনের সিটে বসল। লায়লা লিডিয়া ড্রাইভিং সিটের পাশের সিটে বসতে বসতে বলল, মুসা ভাই, আমাদের বাসা কিন্তু ভালো লাগবে না, একেবারে পায়রার খোপ। আমরা তো কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য ছিলাম না, তাই দু'জন চাকুরে হওয়ার পরও ভালো বাসা মেলেনি।

--আমরা বাসা ভাল নয়, মানুষ ভাল চাই। বলল আহমদ মুসা।

এই সময় এভরেন রমিজ এসে পৌছল। এসে বসল ড্রাইভং সিটে। একবার পেছন ফিরে আহমদ মুসার দিকে চেয়ে এভরেন রমিজ গাড়ি ছেড়ে দিল।

যুগোশ্লাভ সীমান্ত ফাঁড়ি থেকে বাস দ্রুতবেগে এগিয়ে চলছিল পূবে প্রিজরীন শহরের দিকে। প্রিজরীন যুগোশ্লাভিয়ার কসভো প্রদেশের পশ্চিম সীমান্তের ছোট সীমান্ত শহর। কসভো হাইওয়ে ধরে এগিয়ে চলছিল বাসটি।

আহমদ মুসা ও হাসান সেনজিক পেয়েছিল দরজার ঠিক পেছনের দু'টো সিট।

সীমান্ত ক্রস করতে তাদের কোন অসুবিধা হয়নি। এভরেন রমিজ ও লায়লা লিডিয়া সীমান্ত পর্যন্ত সাথে এসেছিল। যুগোশ্লাভ সীমান্ত ফাঁড়িতেও তারা এসেছিল। সুতরাং তাদের কোন ঝামেলাই পোহাতে হয়নি। বরং আলবেনীয় ও যুগোশ্লাভ সীমান্ত ফাঁড়িতে তারা যথেষ্ঠ খাতির-যত্ন লাভ করে। সকাল ৮টার বাসে কোন সিট খালি ছিলনা। সিটও তারা লাভ করে যুগোশ্লাভ ফাঁড়ি অফিসারদের সৌজন্যেই।

শুভযাত্রা দেখে আহমদ মুসার মনটা খুব প্রফুল্ল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু যাত্রার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে আহমদ মুসা দু'জন লোককে সীমান্ত ফাঁড়ির অফিসারদের সাথে আলাপ করতে দেখে। ওরা বার বার আহমদ মুসার দিকে তাকাচ্ছিল। এই দৃষ্টিপাতকে আহমদ মুসার ভালো মনে হয়নি। একটি অস্বস্তি নিয়েই আহমদ মুসা বাসে উঠেছিল। আহমদ মুসার এই অস্বস্তি উদ্বেগে রূপান্তরিত হোল যখন সে দেখল সেই দু'জন লোক ড্রাইভারের পিছনের সিট দুটো থেকে দু'জন লোক নামিয়ে দিয়ে সেখানে এসে বসল।

ওরা সিটে বসে মাথা ঘুরিয়ে চকিতে একবার আহমদ মুসাদের দেখে নিয়েছিল।

লোক দু'জনের পরনে কালো স্যুট। মাথায় বাদামী হ্যাট। নাকের নিচে হিটলারি ধাঁচের গোঁফ।

কসভো হাইওয়ে বেশ প্রশস্ত। প্রায় জনশূন্য রাজপথ। গাড়িরও কোন দেখা নেই। তীব্র বেগে এগিয়ে চলছিল বাসটি। নতুন বাস। সম্ভবত নতুন অকম্যুনিস্ট সরকারের নতুন ব্যবস্থার ফল।

আহমদ মুসা ভাবছিল লোক দু'টি কে? মিলেশ বাহিনীর লোক? না আগের মত তাদের লেলিয়ে দেয়া কোন ক্রিমিনাল? যেই হোক তারা, আহমদ মুসা মনে মনে প্রশংসা করল মিলেশ বাহিনীর। ওদের নেটওয়ার্ক ভালো। সব দিকেই ওরা চোখ রেখেছে। ওদের চোখ ফাঁকি দেয়া যাচ্ছেনা। বুঝা যাচ্ছে, হাসান সেনজিকের ফটো ওরা ব্যাপক ভাবে ছড়িয়েছে। সেই সাথে হাত করেছে স্থানীয় ক্রিমিনালদের। যদি তাই হয় তাহলে সামনেও তাদের যাত্রা নিরাপদ নয়, প্রতি পদেই বাধা পেতে হবে।

সকাল দশটায় প্রীজরীন শহরের বাস স্ট্যান্ডে গাড়ি গিয়ে থামল।

গাড়ি গিয়ে থামতেই আহমদ মুসা হাসান সেনজিককে ইশারা করে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। নেমে কন্ডাক্টর ছোকরাকে বলল, শহরে কাজ আছে আমরা আর যাচ্ছি না।

কথা শুনে ছোকরাটার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। নতুন যাত্রী নিয়ে বাড়তি আয় করতে পারবে এই আশায়।

প্রীজরীন বাস স্ট্যান্ডটি একেবারেই ছোট নয়। গোটা তিনেক বাস দাঁড়িয়ে আছে। আরো কয়েকটা ভাঙা বাস বাসস্ট্যান্ডের এক পাশে হুমড়ি খেয়ে পড়ে ছিল। বাসস্ট্যান্ডের এক প্রান্তে অফিস ভবন। আরেক প্রান্তে মোটামুটি বড় একটা ওয়ার্কশপ।

আহমদ মুসা খুশীতে উজ্জ্বল হওয়া কন্ডাক্টর ছোকরাকে জিজ্ঞেষ করল, বাস ছাড়া প্রিষ্টিনা যাওয়ার আর কি ব্যাবস্থা আছে?

প্রিষ্টিনা বেলগ্রেডগামী কসভো হাইওয়ের পরবর্তী বড় শহর এবং কসভোর রাজধানী।

কন্ডাক্টর ছোকরাটি বলল, আছে। প্রাইভেট ট্যাক্সি সার্ভিস। আগে ছিল না। অকম্যুনিষ্ট সরকার ক্ষমতায় আশার পর কম্যুনিষ্ট পার্টি সদস্যদের দখলে রাখা সরকারী গাড়িগুলো কেড়ে নিয়ে এই প্রাইভেট সার্ভিস চালু করেছে।

আহমদ মুসা চারদিকে চেয়ে দেখল, বাসস্ট্যান্ডের পাশের রোডটির ওপারেই একটা মার্কেট। আহমদ মুসা দ্রুত মার্কেটের দিকেই চলল। চলতে চলতে বলল, বাসটি স্টার্ট নেয়ার আগে পর্যন্ত কেউ দু'জন সন্দেহ করবে না যে, আমরা কেটে পড়েছি। কিন্তু গাড়ি স্টার্ট নিলেই সে বুঝতে পারবে। তখনি বুঝা যাবে তার আসল পরিচয়।

মার্কেটের সামনে কার-পার্কিং লন।

তারা দ্রুত কার-পার্কিং লন পার হয়ে মার্কেটের ভেতর ঢুকে গেল। তারপর আড়ালে দাঁড়িয়ে তারা বাসটির দিকে নজর রাখল।

দুই মিনিটও গেল না। আহমদ মুসা দেখল সেই ফেউ দু'জন বাস থেকে নেমে এসেছে। আহমদ মুসার ধারণা মিথ্যা হলোনা। বাস ছাড়ার আগেই ওরা সন্দেহ করেছে, তাই খোঁজ নেবার জন্যে তারা বাস থেকে নেমে এসেছে।

বাস থেকে নেমে লোক দু'জন বাসের পেছন দিকে দাঁড়িয়ে নতুন যাত্রীর সন্ধানরত কন্ডাক্টর ছোকরাকে কি যেন জিজ্ঞেস করল। ছোকরাটার সাথে কথা বলার পরই লোক দু'জন চঞ্চল হয়ে উঠল। তারা প্রথমেই ছুটে গেল বাস টার্মিনালের অফিসের দিকে। কয়েক মুহূর্ত পরে সেখান থেকে ফিরে এসে দাঁড়িয়ে থাকা বাসগুলো দেখল। তারপর গেল ওয়ার্কশপের দিকে।

আহমদ মুসা বুঝল, ওয়ার্কশপ দেখা শেষ হলেই সে আসবে নিশ্চয়ই এই মার্কেটের দিকে।

আহমদ মুসা ভাবল, মার্কেট থেকে তাদের সরে যাওয়ারই চেষ্টা করতে হবে। ওদের মুখোমুখি হয়ে কোন ঘটনা সে সৃষ্টি করতে চায় না। ঘটনা যত এড়িয়ে চলা যায় ততই ভাল।

আহমদ মুসা দ্রুত মার্কেটের ভেতর দিয়ে মার্কেটের পূর্ব-প্রান্তের দিকে চলল।

মার্কেটের পূর্ব-প্রান্তে পৌঁছে আহমদ মুসা দেখল, কার পার্কটি ঘুরে পূর্ব দিকে এসেছে। সে আরও খুশী হলো সেখানে একটি ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। কিন্তু হতাশ হলো গাড়িতে ড্রাইভার না দেখে।

আহমদ মুসা লোক দুটি কোন দিকে যায় তা দেখার জন্যে উত্তর দিকে আরও সরে এল। সে মার্কেটের প্রান্তে এসে উকি দিয়ে দেখল, লোক দুটি দ্রুত রাস্তা পার হয়ে মার্কেটের দিকে আসছে। আরও দেখল সেই বাসটি চলে গেছে। অর্থাৎ লোক দু'টি গেল না। আর সন্দেহের কোন অবকাশ নেই, আহমদ মুসারাই তাদের টার্গেট।

এই সময় হাসান সেনজিক আহমদ মুসার পিঠে টোকা দিয়ে বলল, ট্যাক্সিটির ড্রাইভার এসেছে।

সঙ্গে সঙ্গে আহমদ মুসা ঘুরে দাড়িয়ে দ্রুত ট্যাক্সিটির কাছে গেল।

ট্যাক্সি ড্রাইভারটির সাদা-সিদা চেহারা ও সরল মুখ দেখে খুব খুশী হল। এ ধরনের লোকরা ক্রিমিনাল হয় না। আহমদ মুসা তাকে জিজ্ঞেস করল যে, সে প্রিষ্টিনা যাবে কিনা।

ড্রাইভারটি খুশী হয়ে বলল, যাব।

--তুমি প্রস্তুত? আহমদ মুসা বলল।

--জি, আমি প্রস্তুত। বিনয়ের সাথে বলল ড্রাইভারটি। তারপর ভাড়া চুকিয়ে আহমদ মুসা ও হাসান সেনজিক গাড়িতে উঠে বসল।

সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ি স্টার্ট নিল।

গাড়ি চলতে শুরু করলে ড্রাইভারটি বলল, স্যাররা কি বিদেশী? কোত্থেকে আসছেন?

আহমদ মুসা জবাবে তারা আর্মেনিয়া থেকে আসছে জানাল।

গাড়ি তখন চলতে শুরু করেছে।

গাড়ি এসে রাস্তায় পড়ে যখন পূবমুখী হয়ে প্রিষ্টিনার দিকে চলতে শুরু করেছে, তখন আহমদ মুসা ডানদিকে চোখ ফিরিয়ে দেখল লোক দু'টি পূবের কার পার্কটি হতে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তাদের চোখ গাড়ির দিকে নয়।

আহমদ মুসা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। প্রিষ্টিনার দিকে ছুটে চলেছে তখন গাড়ি।

# ৬

লাল কার্পেটে মোড়া বিশাল কক্ষ। কক্ষের এক কোণে একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল। টেবিলের উপর বলকান অঞ্চলের একটা ম্যাপ মেলে রাখা। টেবিলের ওপাশে বিরাট একটা রিভলভিং চেয়ার। চেয়ারের পিছনে দেয়ালে বেশ উঁচুতে সম্রাট সার্লেম্যানের পূর্ণ দৈর্ঘ্য একটা ছবি। ছবিতে সার্লেম্যানের সঙ্গে আরেকজন রয়েছেন। তিনি পোপ তৃতীয় লিও। পোপ 'সার্লেম্যানের মাথায় রোমান সম্রাটের মুকুট পরিয়ে তাকে খৃষ্টান জগতের সম্রাট হিসেবে বরণ করে নিচ্ছেন। ঘটনাটি ঘটে ৮০০ খৃষ্টাব্দে রোমে। সার্লেম্যান ইউরোপ ও খৃষ্টান জগতের ঐক্য ও উত্থানের প্রতীক।

ঘরে মিলেশ বাহিনীর নেতা কনষ্টানটাইন অস্থিরভাবে পায়চারি করছিল। তার মুষ্ঠিবদ্ধ হাত দু'টি পেছনে। মাথা তার নিচু। কি এক অস্থিরতা, উদ্বেগে সে যেন বিপর্যস্ত।

শিথিল পায়ে পায়চারি করতে করতে একবার সে আসছিল টেবিলের কাছে, আবার যাচ্ছিল দরজার দিকে। তার মনে দুঃসহ চিন্তার জট।

হাসান সেনজিক একজন ব্যাক্তিমাত্র। অথচ সেই একজন ব্যাক্তিকে তারা বাগে আনতে পারছে না সকলে মিলে। তাদের সকলের ব্যর্থতার স্বাক্ষর হিসাবে এখনও বেঁচে আছে। হোয়াইট ওলফকে তারাই অনুরোধ করেছিল হাসান সেনজিককে ধরে দেয়ার জন্যে। বিনিময়ে বিরাট পুরস্কার। পোস্ট অফিস থেকে হাসান সেনজিকের মা'র চিঠির সেনসর রিপোর্ট পড়ে তারা জেনেছিল স্পেনে হাসান সেনজিকের ঠিকানা। এই ঠিকানা হোয়াইট ওলফকে দিয়ে তারা ঐ অনুরোধ করেছিল। তারা নিজেরাও এটা পারত, কিন্তু যেহেতু ইটালি ও স্পেন এলাকায় হোয়াইট ওলফের বন্ধু-বান্ধব বেশী তাই এ দায়িত্বটা তাদেরকে দিয়েছিল। কিন্তু এমন হবে কে জানত! তারাও শেষ হলো, আমাদেরও সর্বনাশ করে গেল। হাসান সেনজিক আবার হাতের মুঠোর বাইরে। উপরন্তু এখন সে

ককেশাস ক্রিসেন্টের সাহায্য পাচ্ছে। আলবেনিয়া থেকে যে খবর এসেছে তা উদ্বেগজনক। জেমস জেংগার মত ভয়ংকর, ক্ষমতাধর ও প্রভাবশালী ব্যক্তিকে পরাজিত করে, হত্যা করে যারা হাসান সেনজিককে উদ্ধার করে এনেছে, তারা ছোট কেউ নয়। একজন মাত্র লোক নাকি জেমস জেংগার ঘাঁটিতে ঢুকে এই কান্ড ঘটিয়েছে। এই সাংঘাতিক লোকটি কে? এদের ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্যে আর্মেনিয়া ও আলবেনিয়ায় ম্যাসেজ পাঠানো হয়েছে। বড্ড দেরী হচ্ছে ওদের উত্তর আসতে। আজও কি আসবে না নাকি।

এই সময় ঘরে প্রবেশ করল একটি মেয়ে। মিস লিন্ডা। ইনফরমেশন ডেস্কের সহকারী। তার হাতে একটা কাগজের শিট।

মিস লিন্ডাকে দেখে কনস্টানটাইন থমকে দাঁড়াল। তার মুখটা উজ্জল হয়ে উঠল। সে তার ডান হাত বাড়িয়ে মেয়েটার গালে একটা টোকা দিয়ে বলল পেয়েছ তাহলে উত্তর, কোথেকে?

মিস লিন্ডা কাগজের শিটটি কনস্টানটাইনের হাতে তুলে দিতে দিতে বলল, আর্মেনিয়ায় হোয়াইট উলফের আমাদের জানা সব ঠিকানায় আমরা ম্যাসেজ পাঠিয়েছিলাম কিন্তু জর্জিয়া সীমান্তের আলাভার্দি কেন্দ্র থেকে মাত্র এই জবাবটা এসেছে। বলে মিস লিন্ডা চলে গেল।

কনস্টানটাইন দাঁড়িয়ে ম্যাসেজটি পড়তে লাগল। লিখেছেঃ

“হাসান সেনজিককে উদ্ধার করেছে ককেশাস ক্রিসেন্ট কিন্তু ককেশাস ক্রিসেন্ট আসলে কিছু নয়। আসল ব্যক্তি আহমদ মুসা নামের একজন সাংঘাতিক লোক। সেই এসে আমাদের সর্বনাশ করেছে। আমরা শেষ হয়ে গেছি। আজকের দিনের পর এই আলাভার্দি ঘাটিতেও আমাদের পাবেন না। আমরা এখান থেকে সরে যাচ্ছি জর্জিয়ায়। আমরা আর্মেনিয়ায় নিরাপদ নই্ আমাদের ফটো, ঠিকানা সব কিছু ওরা টের পেয়ে গেছে। হাসান সেনজিকের সাথে কে গেছে, কে তাকে সাহায্য করছে জানতে চেয়েছেন। আমাদের পক্ষে তা জানা আপনাদের মতই সম্ভব নয়।”

ম্যাসেজটি পড়ে ‘কনস্টানটাইন কাগজটি হাতের মুঠোতে দলা পাকিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল মেঝেতে। বিরক্তি তার মুখে।

এই সময় মিস লিন্ডা আবার ঘরে প্রবেশ করল। তার হাতে আগের মতই একটা ম্যাসেজ ফ্যাক্সে আসা। কনস্টানটাইন গম্ভীরভাবে তার হাত বাড়িয়ে ম্যাসেজটি নিয়ে নিল।

মিস লিন্ডা কনস্টানটাইনের গম্ভীর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ম্যাসেজটি খুলল কনস্টানটাইন।

ম্যাসেজটি এসেছে আলবেনিয়া থেকে। জেমস জেংগার সহকারী টনি টমাস পাঠিয়েছে। এতে আগের ম্যাসেজের পুনরাবৃত্তি, হাসান সেনজিকের পেছনে কারা আছে, কে তাকে সাহায্য করছে তা তাদের জানা নেই। তারা আরও লিখেছে, যারাই তার পেছনে থাক, তারা বড় ঘড়েল লোক। জেমস জেংগার ঘাটিতে ঢোকার সাধ্য এবং সাহস আলবেনিয়ার কারো নেই। কিন্তু এ কাজটা তারা ছেলে-খেলার মতই করেছে।

ম্যাসেজটি পড়ে ক্রোধে, বিরক্তিতে কনস্টানটাইনের মুখটা বিকৃত হয়ে উঠল।

'বেটারা নিজেরো কিছু পারেনি, আবার ওকালতি করছে ওদের' বলে কনস্টানটাইন টুকরো টুকরো করে ম্যাসেজটি ছিড়ে ফেলে মেঝেই তা ছুড়ে মারল।

এদের গাল দিল ঠিকই, কিন্তু হৃদয়টা তার দুরু দুরু করছিল। হাসান সেনজিকের সাথে ঐ সাংঘাতিক 'লোকটি কে'? আহমদ মুসা কি হাসান সেনজিকের মত একজন ব্যক্তির পিছু পিছু বলকানে আসতে পারে!

কনস্টানটাইন ধীর পায়ে এগিয়ে এল টেবিলের দিকে। এসে দাঁড়াল একেবারে সার্লেম্যানের বিশাল ফটোটার নিচে। তারপর হাত জোড় করার মত দু'হাত তুলে বলতে লাগল, হে মহামহিম সম্রাট, হে গুরু, এক ইউরোপ, এক ধর্ম, এক রাজ্য গঠিত হবার আর কত দেরী। তোমার স্বপ্ন সার্থক হবে কবে! দুই জার্মানী এক হয়েছে, একক এক ইউরোপীয় পার্লামেন্ট হয়েছে যতই তা প্রতিকী হোক, ইউরোপের জন্য একক এক মুদ্রাও হচ্ছে, তবুও মনে হচ্ছে তোমার স্বপ্ন অনেক দূর। খৃস্টান ধর্মের অবসর এবং বেঈমান হিদেন মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অস্তিত্ব তোমার স্বপ্ন সফল করার পথে বড় বাধা। ওদের আহবান, ওদের কথা

ইউরোপীয়দের সম্মোহিত করে ওদের দিকে ঠেলে যাচ্ছে। ওদের নির্মূল করা ছাড়া তোমার স্বপ্ন....

এই সময়ে কনস্টানটাইন তার পেছনে পায়ের শব্দ শুনে কথা শেষ না করেই পেছনে তাকাল। দেখল, সহকারী ইয়েলেস্কু ঘরে প্রবেশ করছে। তার হাতে কাগজ।

ইয়েলেস্কুর গলা শুকনো, মুখ বিষন্ন।

--কোন খারাপ খবর? জিজ্ঞাসা করল কনস্টানটাইন।

--হ্যাঁ, খারাপ। বলল ইয়েলেস্কু।

সংগে সংগে কাগজ দু'টি ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলল, বল কি ঘটেছে?

ইয়েলেস্কু বলল, কাকেজীতে ব্ল্যাকক্যাটের হাতে ওরা ধরা পড়েও আবার ফসকে গেছে। ব্ল্যাকক্যাটের তিনজন হাসান সেনজিকের সাথের সেই লোকটির হাতে খেলনার মত পরাজিত হয়েছে। প্রিজরীন থেকেও এ ধরণেরই খবর। সীমান্ত থেকে ওদের প্রিজরীনগামী বাসে উঠতে দেখে আমাদের টম ও টিটো ওদের চিনতে পারে তারাও বাসে ওঠে। কিন্তু প্রিজরীনে এসে ওরা হঠাৎ বাস থেকে কোথায় হারিয়ে যায়।

--আর তখন ঐ গর্দভ দু'টো ঘুমাচ্ছিল, না" চিৎকার করে উঠল কনস্টানটাইন।

--না, ওরা....

--চুপ, সাফাই গেয়োনা ইয়েলেস্কু। ওদের কাছে পেলে এখন গুলি করে মারতাম। ব্যাটারা পুতুল খেলা পেয়েছে। ওদের ঘুমিয়ে রেখে ব্যাটারা নিশ্চয় আরেক বাসে চড়ে চলে এসেছে।

একটু দম নিল কনস্টানটাইন। তারপর বলল, যাও ইয়েলেস্কু গাড়ি রেডি করতে বল। হাসান সেনজিকের মা'র ওখানে যাব। ওটাই এখন ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র, সব খবর ওখানেই পাওয়া যাবে।

বলে কনস্টানটাইন ফিরে দাঁড়িয়ে চেয়ারে গিয়ে বসল। চেয়ারে গা এলিয়ে চোখ বুজল সে। বিষন্ন মুখে বেরিয়ে গেল ইয়েলেস্কু।

বেলগ্রেডের পুরতান এলাকায় হাসান সেনজিকদের বাড়ি। নগরীর একদম উত্তর প্রান্তে বিশাল এলাকা নিয়ে বাড়িটি। বাড়ির উত্তর পাশে বিরাট বাগান। বাগানের গা ছুঁইয়ে প্রবাহিত হচ্ছে দানিয়ুব।

বাড়ির বিশাল এলাকাটা প্রাচীর ঘেরা হাসান সেনজিকের গৌরবান্বিত পুর্বপুরুষ সার্বিয়া রাজ স্টিফেনের রাজবাড়ি এখানেই ছিল। কিন্তু তার কোন চিহ্ন এখন নেই। বিরান মাঠ পড়ে আছে, উঁচু-নিচু টিবিতে পূর্ণ।

যুগোশ্লাভিয়ার কম্যুনিষ্ট সরকার বাগান সমেত গোটা এলাকাকেই কম্যুনিষ্ট পার্টির সম্পত্তি হিসাবে ঘোষণা করেছিল। টিটোর পরিকল্পনা ছিল এখানে তিনি বলকান এলাকার কম্যুনিষ্ট পার্টির হেডকোয়ার্টার গড়ে তুলবেন। কিন্তু এ পরিকল্পনা তার সফল হয়নি। আলবেনিয়া, বুলগেরিয়াকে তিনি তাঁর সাথে একমত করতে পারেননি। নতুন অকম্যুনিষ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর কম্যুনিষ্ট পার্টির এ ধরনের দখলকে ছেড়ে দেয়। সুতরাং স্টিফেন পরিবার অর্থাৎ হাসান সেনজিকরা তাদের এই সম্পত্তি আবার ফিরে পেয়েছে।

প্রাচীর ঘেরা এলাকার একদম দক্ষিণ প্রান্তে হাসান সেনজিকদের বর্তমান বাড়ি। বাড়ির পেছনের অংশ প্রাচীরের ভেতরে পড়েছে এবং সামনের অংশ প্রাচীরের বাইরে। বাড়ীটি নতুন হলেও প্রায় দুই পুরুষ আগে তৈরী। হাসান সেনজিকের দাদা তৈরী করেছিলেন এ বাড়ী।

বাড়ীর সামনে গিয়ে শহীদ মসজিদ রোড। এ নামের পেছনে একটা ইতিহাস আছে। হাসান সেনজিকদের বাড়ীর পূর্ব দিকে এ রোডটির মাঝ বরাবর রোডটির পাশে একটা মসজিদ আছে। ১৯৪৬ সালের কথা। বেলগ্রেডসহ গোটা যুগোশ্লাভিয়া তখন বিজয়ী সোভিয়েত সৈন্যের পায়ের তলে। সোভিয়েত সৈন্যের ছত্রছায়ায় কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠিত হয়েছে তখন। নতুন উৎসাহে তখন তারা বেপরোয়া। একদিন স্থানীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির কর্মকর্তারা সেখানে এসে মসজিদের একটা অংশ তাদের অফিসের জন্য দাবী করে বসল। বলল, সেখানে তাদের একটা আলমারী থাকবে। কাগজ-পত্র থাকবে। সকাল-বিকেল তারা সেখানে বসবে। বসার জন্যে কয়েকটা চেয়ার, একটা, দু'টো টেবিল থাকবে এই যা।

মসজিদের লোকজন মসজিদের জায়গা ছেড়ে দিতে অপারগতা জানাল। মসজিদের লোকরা কম্যুনিষ্ট পার্টির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগকরে যুক্তি প্রদর্শন করলো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। একদিন ভোর বেলা ফজরের নামাজ শেষে মুসল্লিরা তখন সবে বাসায় ফিরেছে। এই সময় রাস্তার দু'পাশের মহল্লায় অনেক মুসলমানের বাস ছিল। সেই দিন ভোর বেলা কম্যুনিষ্ট পার্টির কর্মীরা একটা ট্রাকে করে চেয়ার-টেবিল নিয়ে তাদের অফিসের জন্যে মসজিদ দখল করতে আসে। খবরটা চারপাশের মহল্লায় সংগে সংগে আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ে। চারদিক থেকে এল মানুষ। তারা কম্যুনিষ্ট পার্টির কর্মীদের অনুরোধ করল চেয়ার, টেবিল, আলমারী মসজিদে না প্রবেশ করাবার জন্যে। কিন্তু তারা শুনল না। তারা পিস্তল বের করে মুসলমানদের হুমকি দিল এবং বাঁধা দিতে নিষেধ করল। তারা মসজিদের দরজা ভেঙে চেয়ার-টেবিল মসজিদে তুলতে উদ্যোগ নিল।

নিরুপায় মুসলমানরা মসজিদের ভাঙা দরজার সামনে সার বেঁধে কম্যুনিষ্টদের গতিরোধ করে দাঁড়াল। তারা বলল, লড়াই করে বাধা দেয়ার সাধ্য আমাদের নেই, কিন্তু মসজিদে ঢুকতে হলে আমাদের বুক পদলিত করেই ঢুকতে হবে।

কম্যুনিষ্ট কর্মীদের কাছে এটা চরম ঔদ্ধত্য মনে হয়েছিল। তারা প্রতিশোধ নিতে বিলম্ব করেনি। তাদের হাতের পিস্তলগুলো গর্জে উঠেছিল। মরে লাশ হয়ে পড়ে ছিল নিরস্ত্র মুসলমানরা মসজিদের দরজায়। ৫০টি লাশের স্তূপ মসজিদের দরজায় বাধার দেয়াল রচনা করেছিল। প্রবাহিত রক্তে মসজিদের মেঝে ও পাশের রাস্তা ভেসে গিয়েছিল।

কম্যুনিষ্ট কর্মীরা ফার্নিচার ভর্তি ট্রাক নিয়ে ফিরে গিয়েছিল। আর কোন দিনই আসেনি। জীবন্ত মানুষের দেয়াল কম্যুনিষ্টদের ফিরিয়ে দিতে পারেনি। কিন্তু মৃত মানুষের লাশের দেয়াল তাদের ফিরিয়ে দিয়েছিল। জীবন্ত মানুষরা তাদের পরাজিত করতে পারেনি, কিন্তু তারা পরাজিত হয়েছিল মৃত মানুষের কাছে। শহীদের রক্ত বিজয় লাভ করেছিল অসীম শক্তিধর কম্যুনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে।

সেই থেকে মসজিদটির নাম হয়েছে শহীদ মসজিদ এবং রোডটির নাম মুসলমানরা দিয়েছে শহীদ মসজিদ রোড। মুসলমানরা এখনও রোডটিকে এ নামেই ডাকে। কিন্তু কম্যুনিষ্ট সরকার এর নাম দিয়েছিল 'টিটো স্মরণী –এক'।

শহীদ মসজিদ রোড ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে হাসান সেনজিকদের বিরাট বাড়ী। বাড়ীর সামনেটাও প্রাচীর ঘেরা। এ নতুন প্রাচীরটা দু'পাশ দিয়ে গিয়ে পুরাতন প্রাচীরের সাথে যুক্ত হয়েছে।

বাড়ীর সম্মুখভাগে প্রাচীরের সাথে বিরাট গেট। গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকলে একটা বড় চত্তর, তারপর বাড়ী। বাড়ীর সামনে গাড়ি বারান্দা। গাড়ি বারান্দা থেকে লম্বা করিডোরে উঠলেই একটা বড় দরজা। দরজা দিয়ে ঢুকলে বড় হলরুম। এটাই বাইরের বৈঠকখানা। কার্পেট মোড়া এবং সোফায় সাজানো। কিন্তু এক নজর দেখলেই মনে হয়,কার্পেট, সোফা ও ঘরের অন্যান্য আসবাবপত্রের উপর দিয়ে অনেক সময়ের অনেক ঝড় বয়ে গেছে। সবগুলোকেই মনে হয় যেন তারা অতীতের কংকাল।

নিরব বাড়ীটি।

বাইরের গেটের সাথে লাগা গেটরুমে এক বৃদ্ধ। সেও যেন অতীতেরই এক কংকাল।

বিরাট বাড়ীর হেরেম অংশ বাইরের অংশথেকে আলাদাই বলা যায়। একটা দরজার সংযোগ পথ ছাড়া দুই অংশ বিচ্ছিন্নই বলা যায়। হেরেম এলাকা শুধু মেয়েদেরই জন্যে। এখানে পুরুষ চাকরদেরও প্রবেশ নিষিদ্ধ। এখন সে রাজাও নেই,রাজ্যও নেই। কিন্তু সে নিয়মটি এখনও আছে।

এতবড় বাড়ী যা একদিন আনন্দ কোলাহলে মুখরিত থাকত, তা আজ মৃতপুরীর মত নিরব। বাড়ীতে আছেন হাসান সেনজিকের মা বেগম আয়েশা খানম,হাসান সেনজিকের ফুফু বেগম নফিসা এবং বেগম নফিসার দশ বছরের মেয়ে নাজিয়া। এছাড়া রয়েছে দু'জন বয়স্কা আয়া। বাহির বাড়ীতে বাজার-ঘাট ও বাইরের কাজ দেখা-শুনা করার জন্যে কয়েকজন চাকর-বাকর।

সংসারের আয়ের উৎস কয়েকটা দোকান। বাড়ীর পূব পাশেই শহীদ মসজিদ রোডে কয়েকটা দোকান রয়েছে। চাকর-বাকররাই চালায়। এ সবের

খোঁজ-খবর রাখেন বেগম নফিসা। চাকর-বাকররা ষ্টিফেন পরিবারের অংশ হয়ে গেছে। বংশ পরস্পরায় এরা এ পরিবারের খেদমত করে আসছে।

হাসান সেনজিকের মা বেগম আয়েশা খানমের বয়স হবে পঞ্চাশ। কিন্তু তাকে দেখলে মনে হবে বয়স তার ষাট পেরিয়ে গেছে। একের পর এক আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়েছে তার হৃদয়। তারই প্রকাশ ঘটেছে দেহে। ভেঙে পড়েছে দেহ। অসুস্থ বেগম আজ দু'মাস থেকে শয্যাশায়ী। বেগম নফিসার বয়স তিরিশ। হাসান সেনজিকের পিতার সবচেয়ে ছোট বোন। বিয়ে হয়েছিল ষ্টিফেন পরিবারেরই এক ছেলের সাথে। পেশায় ছিল ডাক্তার। থাকত ওরা বসনিয়া প্রদেশের রাজধানী সারাজেভোতে। পাঁচ বছর আগের কথা। একদিন তাকে বুলেট বিদ্ধ অবস্থায় মৃত পাওয়া যায় তার ডাক্তার খানায়। সবার কাছেই পরিষ্কার ছিল মিলেশ বাহিনীরই সে এক শিকার। এই ঘটনার পর পাঁচ বছরের সন্তান নাজিয়াকে নিয়ে এসে বাস করছে ভাবী হাসান সেনজিকের মার কাছে।

বাড়ির হেরেম অংশের পূব পাশের বড় একটি কক্ষ। কক্ষের গোটাটাই লাল কার্পেটে মোড়া। ঘরের উত্তর অংশে একটা বড় পালংক। পূব দেয়ালের সাথে কাঠের বড় একটা আলমারী। আর পশ্চিম দেয়ালের সাথেও একটা আলমারী। এক এক সারিতে জরির কুশনওয়ালা গোটা তিনেক চেয়ার। আর খাটের ওপাশে মাথার কাছে একটা টেবিল। টেবিলে পানির একটা বোতল। ঔষধের কয়েকটা শিশি।

পালংকে শুয়ে আছে একজন মহিলা। পা থেকে গলা পর্যন্ত চাদরে ঢাকা। মুখটাই শুধু দেখা যাচ্ছে। বনেদী সার্বিয়ানরা যেমন হয় সে রকম। কাগজের মত সাদা গায়ের রং। সাদা মুখে নীল চোখ। মহিলাটি দু'চোখমেলে উদ্দেশ্যহীনভাবে তাকিয়েছিল ছাদের দিকে। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। মুখে বয়সের ভাঁজ খুবই সুস্পষ্ট। কিন্তু সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে মহিলাটির চেহারায় এক রাজকীয় আভিজাত্য। এই-ই হাসান সেনজিকের মা বেগম আয়েশা খানম।

বেগম খানম নিরবে উপরের দিকে তাকিয়ে ছিল। এই সময় ঘরে ঢুকল বেগম নাফিসা। সে টেবিল থেকে শূন্য পানির বোতলটা নিয়ে চলে যাচ্ছিল।

মুখ ঘুরিয়ে সেদিকে তাকিয়ে বেগম খানম ডাকল, নফিসা।

বেগম নফিসা ডাক শুনে ঘুরে দাঁড়িয়ে বেগম খানমের পালংকের পাশে এসে দাঁড়াল। বলল, কিছু বলবে ভাবী।

বেগম খানম বলল, একটু বস নফিসা।

বেগম নাফিসা পানির বোতলটা টেবিলে রেখে পালংকের উপর বেগম খানমের মাথার কাছে বসল।

বেগম খানম চোখ দু'টি তখন বন্ধ করেছে। ঐ অবস্থায় বলল, ডেসপিনা কবে এসেছিল নফিসা?

--সে তো সাতদিন আগে।

--আমার হাসান ছাড়া পেয়েছে, কার আশ্রয়ে আছে যেন বলেছিল?

--ককেশাস ক্রিসেন্টের হাতে।

--আরও কি যেন সে বলেছিল?

--বলেছিল, আর ভয় নেই। যাদের হাতে হাসান সেনজিক আছে, তারা একটা ব্যবস্থা করবেই।

--কিন্তু সাতদিন হয়ে গেল, আর কোন খবর দিচ্ছেনা কেন ডেসপিনা?

--নতুন কিছু জানতে পারলে অবশ্যই সে জানাত ভাবী। মাত্র সাতদিন তো হলো, এটা কতটুকুই বা আর সময়।

বেগম খানম হাসল। বলল, সাতদিন কম সময় নয় নফিসা। গোটা দুনিয়ায় একটা ওলট-পালট হয়ে যেতে পারে এ সময়ে।

--কিন্তু সে শক্তি তো আমাদের নেই ভাবী।

--শক্তি আছে, শক্তির প্রকাশ নেই, প্রকাশের জন্যে যে জ্ঞান দরকার তা নেই।

--আপনি কি মনে করেন এ অন্ধকারে আলো জ্বলবে?

--একবার জ্বলেছিল, আবার জ্বলবেনা কেমন করে বলব?

--কিন্তু আমি তো কোন চিহ্ন দেখছি না ভাবী।

--কেন সেদিন ডেসপিনা 'হোয়াইট ক্রিসেন্ট' এর কথা বলল শুননি তুমি?

--শুনেছি, কিন্তু হতাশার অন্ধকার এত ঘনিভূত যে কোন কিছুতে আস্থা রাখতে ইচ্ছা হয়না ভাবী।

--তোমার কথা ঠিক। কিন্তু আশা নিয়েই তোমাকে বাঁচতে হবে নফিসা। আশার নামই জীবন। হাসানকে আমি দেখতে পাব, এ আশা যদি আমি হারিয়ে ফেলি তাহলে বাঁচার সব শক্তি আমার উবে যাবে।

বেগম নফিসা বেগম খানমের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল, তোমার আশা অবশ্যই সার্থক হবে ভাবী।

--জান নফিসা, সেদিন ডেসপিনার কথা শোনার পর আশায় আমার বুক ভরে গেছে।

এই সময় একজন আয়া দৌড়ে ঘরে ঢুকল। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল,গেট দিয়ে কারা যেন ঢুকেছে, হাতে বন্ধুক,পিস্তল আছে।

শুনেই বেগম খানম বালিশ থেকে মাথা তুলল। দ্রুত বলল,নিশ্চয় ওরা মিলেশ বাহিনীর লোক। নাফিসা তুমি সরে যাও।

--ভাবী তোমাকে একা রেখে......

--আর কথা বলো না, কুকুরদের সামনে তোমাকে ফেলতে চাই না।

বেগম নফিসা আর কোন কথা বলল না। মিলেশ বাহিনীর লোকদের সম্বন্ধে সে জানে।

বেগম নফিসা দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের বড় আলমারির দিকে এগুলো।

আলমারী খুলল। ভেতরে হাংগারের সারিসারি কাপড় টাঙানো। বেগম নফিসা দু’হাত দিয়ে কাপড়ের মধ্যে দিয়ে পথকরে নিয়ে আলমারিতে ঢুকে গেল। ভিতরে ঢুকে আলমারির তলার পাটাতনের বিশেষ এক জায়গায় চাপ দিতেই একপাশে তা সরে গেল। তার পরেই একটা সুড়ঙ্গ পথ। বেগম নফিসা নেমে গেল সে সুড়ঙ্গ পথে। সঙ্গে সঙ্গে পাটাতন আবার তার জায়গায় ফিরে এল। দরজাও আপনাতেই বন্ধ হয়ে গেল আলমারীর।

ঘরের এ সুড়ঙ্গ পথটি পাশেই বাড়ীর বাউন্ডারী দেওয়ালের ওপারে তাদেরই একটা দোকানের পিছনের কক্ষে গিয়ে উঠেছে। সেখানেও অনুরূপ একটা আলমারী আছে।

খবর দিয়েই আয়া ছুটে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিল।

বেগম নফিসা চলে যাবার পর বেগম খানম মাথার ওড়নাটা ঠিক করে নিয়ে ভালো করে শুয়ে পড়ল। চাদরটা মুখ পর্যন্ত টেনে নিল।

স্বয়ং কনষ্টানটাইন এবং মিলেশ বাহিনীর আরও সাত-আট জন লোক বাড়ীতে প্রবেশ করেছে। চাকর-বাকররা মুর্তির মত দাঁড়িয়েছিল। কেউ কোন বাধা দিলনা। বাধা না দেওয়ার নির্দেশ ছিল বেগম খানমের।

বাইরের বৈঠকখানার বারান্দায় দু'জনকে রেখে সবাই এসে দাঁড়াল হেরেমের দরজায়। হেরেমের দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল দু'জন আয়া।

তাদের দিকে অগ্নিঝরা দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, তোদের বেগম সাব কোথায়?

--উনি খুব অসুস্থ। শুয়ে আছেন। বলল একজন আয়া।

--নিয়ে চল, কোথায় সে রাজরাণী।

কোন কথা না বলে আয়া দু'জনে চলতে লাগল বেগম খানমের ঘরের দিকে।

ঘরে ঢুকে আয়া দু'জনের একজন বেগম খানমের মাথার কাছে, আরেকজন পায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। একজনের হাত বেগম খানমের মাথায়,আরেক জনের হাত বেগম খানমের পা ছুঁয়ে আছে। যেন তারাও অভয় পেতে চায়,আবার অভয় দিতেও চায়।

কনষ্টানটাইন এবং তার সহকারী ইয়েলেস্কু ঘরে প্রবেশ করল। অন্যেরা দাঁড়িয়ে থাকল দরজার বাইরে।

ঘরে ঢুকেই কনষ্টানটাইন ঘরের মেঝেতে এক খাবলা থুথু নিক্ষেপ করে বলল, গাদ্দার ষ্টিফেন তুমি আজ কোথায়। দেখে যাও,তোমার গৌরবের প্রাসাদ আজ আমাদের পায়ের তলে।

তারপর ঘরের চারদিকটা একবার দেখে নিয়ে চোখ রাখল বেগম খানমের দিকে।

বেগম খানম চোখ বন্ধ করে শুয়েছিল।

--শয়তানের বাচ্চা শয়তান,শয়তানের স্ত্রী শয়তানী,শয়তানের মা শয়তানী দেখেছ আমরা এসে গেছি? চিৎকার করে বলল কনষ্টানটাইন।

--দেখেছি। ধীর কন্ঠে বলল বেগম খানম।

--কি জন্যে এসেছি জান?

--জানিনা।

--তোমার সন্তান হাসান সেনজিককে কোথায় লুকিয়ে রেখছ?

হাসান সেনজিকের নাম শুনে চোখ খুলল বেগম খানম। তারপর মাথাটা কাত করে কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে কনষ্টানটাইনের দিকে চেয়ে বলল, কোথায় আমার ছেলে হাসান সেনজিক?

--সেটা তো আমিই জিজ্ঞেস করছি তোমাকে। কোথায় লুকিয়ে রেখেছ বল?

আবার চোখ বুজল বেগম খানম। বলল, আজ দেড় যুগ আমার ছেলেকে দেখিনি। কান্নায় ভেংগে পড়ল খানমের কথা।

--কান্না দিয়ে ভোলাতে পারবেনা। বল তোমার ছেলে কোথায়?

--আমি জানিনা। আমার কান্না তোমাদের প্রতারণা করার জন্যে নয়। মুসলমানরা প্রতারণা করেনা।

--চুপ বুড়ি। ঐনামটা আর মুখে আনবেনা। জিব কেটে দেব তাহলে।

বলে একটু দম নিল কনষ্টানটাইন। তারপর আবার বলল,তুমি তোমার সন্তানকে দেখনি, কিন্তু কোথায় আছে জান তুমি।

--আমি জানিনা।

কনষ্টানটাইন পাশে দাঁড়ানো ইয়েলুস্কুর দিকে চেয়ে বলল, তোমরা বসে আছ কেন, সবটা একবার খুঁজে দেখ।

বলে কনষ্টানটাইন নিজেই এগুলো বড় আলমারীটার দিকে। প্রচন্ড একটা লাথি মারল দরজায়।

লাথিটা লেগেছিল দুই পাল্লার সংযোগ স্থলে। দরজার মুখ বরাবর লম্বভাবে কাঠের যে বাড়তি কাঠামোটা ছিল, সেটা সমেত দরজাটা মচকে ভিতরের দিকে ভাঁজ হয়ে গেল। লাথি মেরেই একটানে আলমারীটা খুলে ফেলল। তারপর টাঙানো কাপড়গুলো টেনে ছড়িয়ে দিল মেঝেয়। তারপর পশ্চিম দেয়ালের দিকে এক সারিতে রাখা চেয়ারের দিকে এগুল। একটা চেয়ার তুলে আরেকটা চেয়ারের উপর আছড়ে ফেলল। ভেঙে গেল দু’টি চেয়ারই।

কনষ্টানটাইন যেন পাগল হয়ে গেছে। তার রক্তবর্ণ চোখ দিয়ে যেন আগুন ছুটছে।

বেগম খানম শুয়েছিল নির্বিকার। তার চোখ দু'টি ওপর দিকে নিবদ্ধ। মুখে কোন ভাবান্তর নেই।

সেদিকে চেয়ে কনষ্টানটাইন আরও যেন আহত হলো। সে পাগলের মত পালংকের রেলিং এ একটা লাথি দিয়ে বলল,বুড়ি শয়তান,কথা কিভাবে বলাতে হয় আমরা জানি,আজ যাচ্ছি,ক'দিন পরে আবার আসব। ৭দিন সময় দিয়ে গেলাম। এর মধ্যে তোর সন্তানকে আমাদের হাতে দিতে হবে,নয়তো বলতে হবে কোথায় সে। না হলে তোকেই নিয়ে যাব। মনে রাখিস ৭দিন। বলে কনষ্টানটাইন হন হন করে বেরিয়ে গেল।

কনষ্টানটাইনের লাথিতে পালংকের রেলিং এর একটা অংশ ভেঙ্গে পড়েছিল।

ভয়ে কাঁপছিল আয়া দু'জন।

কনষ্টানটাইন বেরিয়ে গেলে তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

গোটা বাড়ীতে তখন চলছিল ভাঙার মহোৎসব। চেয়ার,টেবিল,বাক্স, আলমারী যা যেখানে পেল ভেঙ্গে তছনছ করল তারা। রান্না ঘর ভাঁড়ার ঘরও বাদ গেল না। বড্ড আরামের সাথে তারা ভাঙল। কেউ বাধা দিলনা। চাকর-বাকরা দাঁড়িয়ে ছিল পাথরের মত। তারাও লাথি ও কিল-থাপ্পড় অনেক খেল। হাসান সেনজিক এসেছে কিনা,কিংবা আর কে এখানে আসে,ইত্যাদি। কিন্তু তারা সকলে একই জবাব দিয়েছে, বেগম সাহেব ছাড়া কাউকে তারা দেখেনি, কেউ এখানে আসে না।

ভাঙার মহোৎসব শেষে গাড়ি বারান্দা দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে কনষ্টানটাইন হো হো করে হাসতে হাসতে তার আগের সেই কথা উচ্চারণ করল,কোথায় সেই গাদ্দার ষ্টিফেন,কোথায় তার রাজত্ব।

গাড়ি বারান্দা থেকে বেরিয়ে কনষ্টানটাইনরা যখন গেটের দিকে এগুচ্ছিল, ঠিক তখনই ডেসপিনার ট্যাক্সিটি গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

বৃদ্ধ গেটম্যান আলিস্কু ওসমান মাথা নিচু করে বন্ধ গেটের বাইরে একপাশে বসেছিল।

ডেসপিনা গাড়ি থেকে দৃশ্যটা দেখে অবাক হলো। অবাক হলো গেটে আরও দু'টো গাড়ি দেখে। তারপর ডাকল, চাচা ওভাবে বসে কেন,গেট খুলুন।

বৃদ্ধ ওসমান চমকে উঠে গাড়ির দিকে তাকাল। তার মুখে উদ্বেগ-আতঙ্ক এবং চোখে পানি।

বৃদ্ধ ডেসপিনাকে দেখেই তার শাহাদাৎ আঙুলি ঠোঁটে ঠেকিয়ে দ্রুত নেড়ে ইশারা করল চলে যাবার।

ডেসপিনা বৃদ্ধ ওসমানের মুখ দেখেই বুঝল বড় কিছু ঘটেছে। মন তার মোচড় দিয়ে উঠল। কিন্তু পা চাপ দিল গিয়ে একসেলেটারে। ডেসপিনা দ্রুত গাড়ি সরিয়ে আরও পূর্ব দিকে নিয়ে বাড়ীর পূর্ব পাশের দোকানগুলোর সামনে দাঁড় করাল। তারপর মাথাটা পেছনে ঘুরাতেই দেখল হাসান সেনজিকদের বাড়ীর গেট দিয়ে সাত আট জন বেরিয়ে দু'টি গাড়িতে গিয়ে উঠল। তাদের কাউকেই ডেসপিনা চিনলনা। কিন্তু মনের সন্দেহটা দানা বেঁধে উঠল।

এই সময় পাশেই যে দোকান তার সেলস গার্ল মধ্যবয়সী রাবেয়া এসে ডাকল,আপা,দোকানে আসুন।

মুখ ফিরিয়ে রাবেয়াকে দেখে প্রশ্ন করল, ব্যাপার কি রাবেয়া আপা? জবাব না দিয়ে রাবেয়া বলল, আপনি আসুন। ডেসপিনা গাড়ি থেকে নেমে গাড়ি বন্ধকরে দোকানে গিয়ে ঢুকল।

রাবেয়ার ইশারায় ডেসপিনা দোকানের ভেতরের কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করল। ডেসপিনা সেখানে বেগম নাফিসাকে বসে থাকতে দেখে ভীষণ চমকে উঠল।

কিন্তু ডেসপিনা কিছু কথা বলার আগেই বেগম নাফিসা ডেসপিনাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল। বলল, মা ডেসপিনা, মিলেশ বাহিনী বাড়িতে ঢুকেছে, ভাবিকে একা রেখে এসেছি।

বেগম নাফিসার কথা শুনে কেঁপে উঠল ডেসপিনা। কয়েক মুহূর্ত আগে হাসান সেনজিকদের গেট দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া লোকদের চিত্র তার চোখের

সামনে ভেসে উঠল। ঠিকই তাহলে ওরা মিলেশ বাহিনীর লোক। ওরা ফুফু আম্মার কোন ক্ষতি করেনি তো? ওরা ক্ষ্যাপা কুকুরের মত পাগল হয়ে গেছে এখন। ডেসপিনা তাড়াতাড়ি বলল, ফুফু আম্মা ওরা চলে গেছে। তাড়াতাড়ি চলুন, ফুফু আম্মার যদি কিছু হয়। কান্নায় জড়িয়ে গেল ডেসপিনার কথা।

বেগম নাফিসা ও ডেসপিনা সেই আলমারীর ভিতর ঢুকে সুড়ঙ্গ পথে বেগম খানমের ঘরে গিয়ে উঠল। উঠবার সিঁড়ির মুখে আলমারী খোলা ও ভাঙ্গা দেখে বেগম নাফিসা ও ডেসপিনা দু'জনেরই হৃদয়টা কেঁপে উঠল।

প্রথমে ঘরে ঢুকল বেগম নাফিসা।

ঢুকেই ছুটে বেগম খানমের কাছে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, আপনি ভাল আছেন ভাবী?

বেগম খানম কিছু বলার আগেই ঘরে ঢুকল ডেসপিনা। বেগম খানম নাফিসার মাথায় হাত বুলিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ডেসপিনাকে দেখে তার কথা বন্ধ হয়ে গেল। প্রবল আনন্দ উচ্ছাসে মুখটি হেসে উঠল বেগম খানমের। রোদ ঝলসানো গাছ যেমন বৃষ্টির পানিতে জেগে ওঠে, বেগম খানম যেন তেমনি ডেসপিনাকে দেখেই সজিব হয়ে উঠল। মাথাটা একটু তুলে দু'হাত বাড়াল বেগম খানম। ডেসপিনা ঝাঁপিয়ে পড়ল তার দু'বাহুতে। বেগম খানম জড়িয়ে ধরল তাকে বুকে।

ডেসপিনা বেগম খানমের বুকে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

বেগম খানম বুক থেকে ডেসপিনার মুখ তুলে নিয়ে চুমু খেল। বলল, কেঁদনা মা। হাসান সেনজিক নেই। তোমার মধ্যে আমি হাসান সেনজিককে কল্পনা করি। তুমি কাঁদলে আমি বাঁচার সাহস হারিয়ে ফেলব।

ডেসপিনা চোখ মুছে বলল, আমি কাঁদব না ফুফু আম্মা, আমাদের বাঁচতে হবে.... বাঁচার মত করেই।

দৃঢ়কণ্ঠ ডেসপিনার।

বেগম খানম ডেসপিনার চিবুকে আরেকটা চুমু খেয়ে বলল, এই না উপযুক্ত কথা ষ্টিফেন পরিবারের মেয়ের।

--আমি তো শুধু ষ্টিফেন পরিবারের মেয়ে নই ফুফু আম্মা, আমি মুসলিম পরিবারের মুসলিম মেয়ে।

খুশীতে মুখটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল বেগম খানমের। সে পাশেই বসা নাফিসাকে উদ্দেশ্য করে বলল, শুনেছ নাফিসা, আমার ডেসপিনার কথা।

--দোয়া করো ভাবি, আমরা কিন্তু এভাবে ভাবার সুযোগ পাইনি। আমরা বংশের ঐতিহ্যের কথা ভেবেছি, কিন্তু ঐতিহ্যের যেটা ভিত্তি, যেটা শক্তি তা নিয়ে কখনও মাথা ঘামাইনি।

এ সময় ঘরে ঢুকল আয়া। বলল, বেগম আম্মা আন্ডার গ্রাউণ্ড ঘরের খোঁজ ওরা পায়নি। ও ঘরটা অক্ষত আছে। আয়ার কথা শুনে মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল বেগম খানমের। ঐ আন্ডার গ্রাউণ্ড ঘরে ষ্টিফেন ও লেডি ডেসপিনা থেকে শুরুকরে সব পারিবারিক স্মৃতি-চিহ্নগুলো সংরক্ষিত আছে। বলা যায় ওটা একটা পারিবারিক মিউজিয়াম। আর ঐ ঘরেরই মেঝের এক কোণে মাটির তলায় লুকানো আছে একটা সিন্দুক। ওখানে গচ্ছিত আছে ষ্টিফেন রাজত্বের স্মৃতি, কয়েক কেজি সোনার মোহর। ষ্টিফেনের উত্তরাধিকার সূত্রে হাসান সেনজিকের আব্বা এর মালিক হয়েছিল। এখন বেগম খানম এ আমানত আগলে রেখেছেন হাসান সেনজিকের জন্যে।

কথা বলেই আয়া বেরিয়ে গিয়েছিল।

ভাঙ্গা দু'টো চেয়ারের দিকে চোখ বুলিয়ে ডেসপিনা বলল, ওরা গোটা বাড়ীই এভাবে তছনছ করেছে বুঝি?

--হ্যাঁ মা, বাড়ীতে ভাঙ্গার মত কিছুই আর বাদ রেখে যায় নি। বলল বেগম খানম।

--কি জঘন্য হিংস্রতা। বলল, বেগম নাফিসা।

--ওদের মনে হচ্ছিল জ্বলন্ত আগুন, বাড়ী ওরা পুড়িয়ে দিয়ে যায় নি এটাই বড়, নাফিসা। কিন্তু ৭ দিন পর ওরা আবার আসবে।

বেগম নাফিসা ও ডেসপিনা দু'জনেই চমকে উঠে তাকাল বেগম খানমের দিকে। তাদের চোখে নতুন আতংক।

--কেন ওরা আসবে? কথা বলল ডেসপিনা।

--ওরা বলে গেছে, সেদিন তাদের হাতে হাসান সেনজিককে তুলে দিতে হবে, না হলে খোঁজ দিতে হবে সে কোথায়। অন্যথায় সেদিন তারা আমাকে নিয়ে যাবে। আজ ওরা হাসান সেনজিকের খোঁজেই এসেছিল। ওদের ধারণা আমি জানি হাসান সেনজিক কোথায়।

উদ্বেগ-আতংকে বেগম নাফিসা প্রায় বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর বুক কাঁপছিল ডেসপিনার। সে ওদের কথার অর্থ বুঝতে পারছে, ওদের ধারণা হাসান সেনজিক বেলগ্রেড পৌঁছেছে। অথবা মনে করতে পারে, না পৌঁছালেও হাসান সেনজিক এখন যুগোশ্লাভিয়ার কোথায় এ খবর তার মা অবশ্যই জানে। অতএব মিলেশ বাহিনী যে আবার আসবে এবং হাসান সেনজিককে তখন পর্যন্ত না পেলে যে বেগম খানমকে পণবন্দি হিসেবে নিয়ে যাবে এতে কোন সন্দেহ নেই। কথাটা ভাবতেই বুক কেঁপে উঠছে ডেসপিনার।

ডেসপিনা অস্বস্তিকর নিরবতার মাঝে ধীরে ধীরে মুখ খুলল। বলল, ফুফু আম্মা হাসান ভাইয়ার আরও কিছু নতুন খবর আছে। মিলেশ বাহিনীর লোকদের এমন উম্মাদ হয়ে ওঠার কারণ বোধ হয় এ নতুন খবরগুলোই।

বেগম খানম বালিশ থেকে মাথা তুলল। অস্থিরভাবে বলল, এতক্ষণ বলছ না কেন, তুমি এত নিষ্ঠুর মা।

বেগম নাফিসার মুখেও একরাশ উম্মুখ জিজ্ঞাসা।

ডেসপিনা বলতে লাগল, আমি খবরগুলো শুনেছি আমার বান্ধবী নাদিয়া নূরের কাছ থেকে। নাদিয়া নূর জেনেছে ওর আব্বার কাছ থেকে।

একটু থামল ডেসপিনা।

‘ক’দিন আগে হাসান ভাইয়া’ শুরু করল ডেসপিনা আবার, ‘তিরানায় পৌঁছেছেন। মিলেশ বাহিনীর লোকরা তাকে চিনতে পারে। ভাইয়া ওদের হাতে আটক হন। কিন্তু ভাইয়ার সাথী যিনি এসেছেন, তিনি মিলেশ-এর লোকদের পরাভূত করে তাকে উদ্ধার করেন। তারপর যুগোশ্লাভ সীমান্তের ওপারে আলবেনিয়ার কাকেজী শহরে হাসান ভাইয়া আবার মিলেশ বাহিনীর হাতে পড়েন, কিন্তু ভাইয়ার সেই সাথীই আবার তাঁকে বাঁচান। যুগোশ্লাভিয়ার সীমান্ত ফাঁড়ি দারিনীতে আবার হাসান ভাইয়া মিলেশ বাহিনীর লোকদের চোখে ধরা পড়েন।

ভাইয়া এবং ভাইয়ার সাথী প্রিষ্টিনার বাসে চড়েন। তাঁদের অনুসরণ করে মিলেশ বাহিনীর লোকরাও বাসে ওঠে। কিন্তু ভাইয়ারা নাকি তা টের পেয়ে যান। তারা প্রিজরীন শহরে বাস থামলে দু'জনেই হঠাৎ নেমে যান। তারা নেমে গেছে বুঝতে পেরে মিলেশ বাহিনীর লোকরাও বাস থেকে নেমে যায়। কিন্তু ভাইয়াদের তারা খুঁজে পায়নি।

বেগম খানম গোগ্রাসে ডেসপিনার কথা শুনছিল। তার চোখ দু'টি আনন্দের আলোতে উজ্জ্বল, কিন্তু চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ছিল অশ্রু।

ডেসপিনার কথা শেষ হতেই বেগম খানম 'আমার হাসান যুগোশ্লাভিয়ার মাটিতে পা দিয়েছে' বলে অতি কষ্টে বসে সেজদায় পড়ে গেল।

অনেকক্ষণ পর সেজদা থেকে উঠে দু'টি হাত উপরে তুলে বলল, 'হে সর্বশক্তিমান প্রভু, তুমি আমাদের দয়া কর, আমার সন্তানকে আমার কাছে পৌঁছে দাও মা'বুদ।

মোনাজাত শেষ করে বেগম খানম ধীরে ধীরে শুয়ে পড়ল। শুয়ে চোখ দু'টি বন্ধ করে ক্লান্তিতে ধুঁকতে লাগল বেগম খানম।

মাথায় তখন হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল ডেসপিনা। বেগম খানম তার দুর্বল একটি হাত ডেসপিনার হাতের উপর রেখে ধীর কণ্ঠে বলল, ডেসপিনা সাথের লোকটি কে?

--আমরা জানিনা ফুফু আম্মা। তবে সন্দেহ হয় তিনি আহমেদ মুসা হতে পারেন। তিনি ছাড়া এমন দুঃসাহসী এবং দূর্ধর্ষ আর কে হতে পারেন।

--পরের জন্যে একজন এত করতে পারে?

--তিনি যদি আহমেদ মুসা হন, তাহলে বলতে হয় তিনি পরের জন্যেই বেঁচে আছেন ফুফু আম্মা। যেখানেই মুসলমানরা মজলুম, সেখানেই তিনি হাজির হন।

--আল্লাহ বাছার হায়াত দারাজ করুন, জাতির খেদমতে এমন লোকও আজ আছেন।

--জাতির জন্যে জীবন দেওয়ার জন্যে এমন হাজার হাজার তরুণ তৈরী হচ্ছে ফুফু আম্মা।

--নতুন কথা শুনছি ডেসপিনা, আল্লাহ আমাদের বাঁচিয়ে রাখুন।

--হাসানকে ওরা এভাবে চিনতে পারছে কেমন করে? বলল বেগম নাফিসা।

--মিলেশ বাহিনী হাসান ভাইয়ার ছবি সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছে।

--তাহলে ওরা কি বেলগ্রেড পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে, পৌঁছাতে পারলেও কি নিরাপদ থাকবে? মুখ শুকনা করে বলল বেগম নাফিসা।

--দোয়া করুন ফুফু আম্মা।

--হাসান বেলগ্রেড এলেই তো তুমি জানতে পারবে?

--বলতে পারছিনা ফুফু আম্মা, আমি চেষ্টা করব।

--হাসানকে চিনতে পারবে তুমি? বলল বেগম নাফিসা।

ডেসপিনা মুখ নিচু করে বলল, কি জানি। একটু থামল ডেসপিনা। তারপর মুখ নিচু রেখেই বলল, আমাকে তো উনি জানেনই না।

বেগম নাফিসা একটু হাসল। বলল, সব জানে। ভাবী তোমার কথাই বেশী লেখেন। ছবিও অনেক পাঠিয়েছেন।

ডেসপিনার মুখ লাল হয়ে উঠল লজ্জাই।

বেগম

এক দৃষ্টিতে ডেসপিনার রাঙ্গা মুখের দিকে তাকিয়ে দু'জনের কথা শুনছিল। তার ঠোঁটে মিষ্টি হাসি। নাফিসা থামলে বেগম খানম হেসে বলল, আমি বুঝি খালি লিখি। ডেসপিনার নাম ছাড়া হাসানের কোন চিঠি আছে?

ডেসপিনার মাথা আরও নুয়ে গেল লজ্জায়। সে তাড়াতাড়ি উঠে বলল,আপনারা কথা বলুন, আমি আসছি। বলে ডেসপিনা ছুটে বেরিয়ে গেল ঘরের বাইরে।

সেদিকে তাকিয়ে বেগম খানম মিষ্টি হেসে বলল, লক্ষী মা আমার। দু'জনকে এক সাথে দাঁড় করিয়ে কবে যে দেখতে পাব।

নাদিয়া নূর তাদের গেস্ট রুমটা গোছগাছ করছিল। গতকাল চলে গেছে সালেহ বাহমন। সে সুস্থ হয়ে উঠেছে। এরপরও সে চলে যাক, নাদিয়া নূরের মন সায় দেয়নি। কেন জানি তার মনে হয়েছে সালেহ বাহমন এখানে নিরাপদ,বাইরে বেরুলে আবার বিপদে পড়বে। কিন্তু নাদিয়া নূর এবার বাধা দিতে পারেনি লজ্জায়। এমনকি সালেহ বাহমনের বিদায়ের সময় নাদিয়া নূর সেখানে হাজির ছিল না। 'মা' পরে বলেছিল, এ কেমনরে নূর,ছেলেটা চলে গেল,বাড়ীতে থেকেও তুই সেখানে গেলি না। কি ভাববে বলত?

জবাবে নাদিয়া বলেছিল,উনি কিছুই ভাববেন না আম্মা, মুসলিম মেয়েদের এভাবে যাওয়া উচিত নয়, উনিই এটা সবচেয়ে ভাল জানেন।

মা একটু মিষ্টি হেসে নাদিয়ার মুখটি উপরে তুলে ধরে বলেছিল,ছেলেটাকে কেমন মনে হয় নূর?

এক ঝলক রক্ত এসে নাদিয়া নূরের মুখ ঢেকে দিয়েছিল। লজ্জায় মুখ রাঙ্গা হয়ে উঠেছিল নাদিয়ার। মায়ের এ কথার অর্থ সে বোঝে।

সে 'আম্মা' বলে মায়ের বুকে মুখ গুজেছিল।

মা আর কিছু বলেনি। হাসি ভরা মুখে মেয়ের পিঠে আদর করে হাত বুলিয়ে দিয়েছিল।

গেস্টরুমের টেবিল গোছাচ্ছিল নাদিয়া। রাইটিং প্যাড তুলে ড্রয়ারে রাখতে গিয়ে প্যাডের তলায় প্যাডের একটা আলগা পাতা পেল। পাতাটিতে সুন্দর করে নাদিয়া নূরের নাম লেখা। চার দিকের নানা আঁচড়-অক্ষর দেখে মনে হয় লেখক যেন আনমনে আঁকা-আঁকি করতে গিয়েই অনেকক্ষণ ধরে নামটি লিখেছে।

নাদিয়ার চিনতে অসুবিধা হলোনা সালেহ বাহমনের হস্তাক্ষর। প্রসন্ন একটুকরো হাসি ফুটে উঠল নাদিয়ার ঠোঁটে, তাতে লজ্জাও মেশানো ছিল।

নাদিয়া পাতাটি যত্নের সাথে ভাজ করে বুকে জামার নিচে গুঁজে রাখল।

বাইরে গেটে নক করার শব্দ হল এ সময়।

নাদিয়ার আব্বা ঘরে ঢুকছিল। নাদিয়াকে গেটের দিকে যেতে উদ্যত দেখে বলল, তুমি দাঁড়াও নাদিয়া, আমি দেখি।

নাদিয়ার আব্বা ওমর বিগোভিক গিয়ে দরজা খুলল। দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে একটা ফুটফুটে তরুণী। গায়ে ঢিলা জামা। মাথায় ওড়না জড়ানো। চোখে—মুখে আভিজ্যাত্যের ছাপ।

ওমর বিগোভিক কিছু বলার আগেই মেয়েটি সালাম দিল। বলল, আপনিকি নাদিয়ার আব্বা?

--হ্যাঁ মা।

--নাদিয়া আছে?

--আছে এস, মা।

বলে ওমর বিগোভিক দরজার এক পাশে সরে তরুণীটিকে অভ্যার্থনা জানাল এবং পাশের গেস্টরুম দেখিয়ে বলল, নাদিয়া ওখানেই আছে।

তরুণীটি ঘরের দিকে গেল। আর ওমর বিগোভিক দরজা বন্ধ করার জন্যে সামনে এগুলেন। দরজা বন্ধ করতে করতেই ওমর বিগোভিক নাদিয়ার হৈ চৈ শুনতে পেল।

গেস্টরুমের দরজা দিয়ে ঢোকার সময়ই তরুণীটি নজরে পড়ল নাদিয়ার। তার উপর নজর পড়তেই ভূত দেখার মত চমকে উঠে নাদিয়া বলল,'আরে ডেসপিনা' তুমি? বিস্ময়ের ঘোর নাদিয়াকে মুহূর্ত কয়েকের জন্যে বোবা করেদিয়েছিল। হা করে তাকিয়ে ছিল ডেসপিনার দিকে। তারপরেই ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল ডেসপিনাকে। বলতে লাগল 'কি সৌভাগ্য আমাদের', 'কি সৌভাগ্য আমাদের'।

চিৎকার করে ডাকল,আব্বা-আম্মা এস, দেখ কে এসেছে,আমাদের কি সৌভাগ্য!

নাদিয়ার আব্বা-আম্মা দু'জনেই এসে ঢুকল।

নাদিয়া ডেসপিনাকে জড়িয়ে ধরেই তার আব্বা-আম্মার সামনে টেনে নিয়ে বলল,তোমাদের ডেসপিনার কথা বলেছিলাম না। এ সেই 'ডেসপিনা জুনিয়র'-স্টিফেন পরিবারের মেয়ে।

ডেসপিনা সালাম দিল নাদিয়ার আব্বা-আম্মাকে।

তারা সালামের উত্তর দিল। নাদিয়ার আব্বা হাত তুলে বলল, বেঁচে থাক মা।

নাদিয়ার মা এগিয়ে এল ডেসপিনার দিকে। ডেসপিনার চিবুকে আলতো একটা চুমু দিয়ে বলল, আল্লাহ তোমাকে বাঁচিয়ে রাখুন মা।

--কিছুতেই বিশ্বাস হতে চাইছে না,ডেসপিনা আমাদের বাড়ীতে,সত্যিই আমাদের সৌভাগ্য। বলল নাদিয়া।

--কিছু মনে করবেন না খালাম্মা, খালুজান, নাদিয়া ছেলে মানুষী করছে। লজ্জায় মুখ লাল করে বলল ডেসপিনা।

--ঠিক আছে মা। তোমাকে আমাদের মাঝে পেয়ে আমরা গর্ব বোধ করছি। তুমি জাননা,স্টিফেন পরিবার বলকানের মুসলমানদের জন্যে কি। সবাই পরম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে এ পরিবারকে দেখে, এ পরিবারের কথা স্মরণ করে। নাদিয়ার উচ্ছাস সবার অন্তরকেই প্রতিধ্বনিত করছে। কথাটা বলে নাদিয়ার মা ডেসপিনার হাত ধরে তাকে নিয়ে সোফায় বসাল। পাশের সোফায় গিয়ে বসল নাদিয়ার আব্বা-আম্মা। নাদিয়া বসল ডেসপিনার পাশে।

নাদিয়ার মা'র কথায় ডেসপিনা মাথা নিচু করে গম্ভীর হয়েছিল। সোফায় বসে মুখটা একটু তুলে ডেসপিনা নাদিয়ার মা'র দিকে চেয়ে বলল, আজকের স্টিফেন পরিবার সেই স্টিফেন পরিবারের এক কংকাল, তাদের তো কিছু নেই খালাম্মা।

--জানি বাছা। কিন্তু স্টিফেন পরিবার সেই স্টিফেন পরিবারই আছে। না হলে তাদের উপর আজ দুঃখ-মুসিবত কেন? বলল নাদিয়ার মা।

--কিন্তু খালাম্মা এই পরিবার তো তার দায়িত্ব পালন করতে পারছে না,বরং তারই কারণে জাতির মুসিবত আরও বাড়ছে।

--দিন কারো সমান যায় না মা, আজ পারছে না, কাল পারবে।

--আপনি বলছেন পারবে খালাম্মা? চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল ডেসপিনার।

--পারা তো শুরু হয়ে গেছে মা। হাসান সেনজিক ইতিমধ্যেই মিলেশ বাহিনীর রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। এত বছর গেল, ওদেরকে এইভাবে চ্যালেঞ্জ আর কেউ করতে পারেনি। বলল ওমর বিগোভিক।

--আপনার কথা ঠিক খালুজান। কিন্তু এ ব্যাপারটা এখানে বিরাট বিপদের সৃষ্টি করেছে। আমি সেই বিপদের কথা নিয়েই আপনাদের এখানে ছুটে এসেছি।

--কি বিপদ মা?

উদ্বেগ ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ওমর বিগোভিক।

--গতকাল মিলেশ বাহিনির লোকেরা আমার খালাম্মার বাড়ীতে মানে হাসান সেনজিকের বাড়িতে এসেছিল হাসান সেনজিকের খোঁজে। গোটা বাড়ীতে তারা ভাংচুর করেছে, তছনছ করে দিয়েছে বাড়ীর সব কিছু। তারা দাবি করেছিলো হাসান সেনজিককে বের করে দিতে অথবা সন্ধান দিতে কোথায় আছে। অবশেষে যাবার সময় অসুস্থ খালাম্মা কে বলে গেছে, ঠিক সাত দিন পরে তারা আসবে, এসে হাসান সেনজিককে না পেলে বা তার কোন সন্ধান না দিলে খালা আম্মাকেই ওরা পণবন্দী করে নিয়ে ......।

কথা শেষ করেতে পারলনা ডেসপিনা। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

নাদিয়া ডেসপিনাকে কাছে টেনে নিল। নাদিয়ার মা এসে ডেসপিনাকে কাছে টেনে সান্তনা দিতে লাগল। ডেসপিনা রুমাল দিয়ে দু'চোখ মুছে বলল, ফুফু আম্মা খুবেই অসুস্থ। বিছানা থেকে উঠবার শক্তি তার নেই। অবস্থার এই চাপ তিনি সহ্য করেতে পারবেন না, কিছু যদি ঘটে যায়......।

কথা শেষ করল না, কথা বন্ধ করে কান্না চাপতে লাগল ডেসপিনা।

এই সময় বাহিরের দরজায় আবার নক করার শব্দ হল।

ওমর বিগোভিক উঠে দাঁড়াল। দেখি কে এল বলে ওমর বিগোভিক বের হয়ে গেল।

দরজায় নক করেছিল সালেহ বাহমন। ওমর বিগোভিক সালেহ বাহমনকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলো।

কথা শুনেই নাদিয়া বুঝতে পেরেছিল।

গেস্ট রুমের পাশেই ফ্যামেলি ড্রয়িং রুম। মাঝখানে একটা সংযোগ দরজা। নাদিয়া, নাদিয়ার মা এবং ডেসপিনা গিয়ে ভিতরের ড্রয়িং রুমে বসলো।

ওমর বিগোভিক সালেহ বাহমনকে নিয়ে গেস্ট রুমে এল।

সালেহ বাহমন বসেই বলল চাচাজান আপনার লন্ড্রি হাউসে মিলেশ বাহিনীর যে লোকটি আসে তাকে চিনে নিতে চাই। মিলেশ বাহিনির হেডকোয়ার্টার যেখানে ছিল সেখানে এখন আর নেই। বদলেছে। কোথায় আমরা তার সন্ধান পাচ্ছিনা। আপনার ঐ লোকটাকে ফলো করে কোন ঠিকানায় পৌঁছা যায় কিনা দেখতে হবে।

--তোমরা ওদের ফলো করছো কেন?

--ওদের গতিবিধি সম্পর্কে অবহিত হবার জন্য।

--কিন্তু ওরা টের পেলে তো সংঘাত বেধে যাবে।

--সংঘাত তো বাধবেই, কিন্তু আমরা যদি ওদের সম্পর্কে না জানি, ওদের গতি বিধি আমাদের কাছে পরিস্কার না থাকে, তাহলে সে সংঘাতে আমারা জয়ী হতে পারবো না।

--জয়ী হবার আশা কর বাহমন?

--করতেই হবে চাচাজান, দেশ শুদ্ধ সব মুসলমান দেশ ছেড়ে চলে যেতে পারে না। সুতরারং টিকে থাকার জন্য আত্মরক্ষার সংগ্রামে আমাদের জয়ী হতেই হবে।

দরজার ওপাশে নাদিয়াদের গল্প বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। তারা কান দিয়েছিল সালেহ বাহমন এবং নাদিয়ার আব্বার আলোচনার দিকে। নাদিয়ার আম্মা কি কাজে উঠে গিয়েছিলো।

নাদিয়া নূর ডেসপিনার পাশেই বসেছিলো। ডেসপিনা তাকে কনুই-এর এক গুতা দিয়ে বলল, এই বুঝি তোমার সেই সালেহ বাহমন?

আমার কেন বলছ? আমি যদি বলি হাসান সেন......

ডেসপিনা নাদিয়ার মুখ চেপে ধরে বলল। মাফ চাচ্ছি, প্রত্যাহার করে নিচ্ছি কথা। বল এই কি সেই সালেহ বাহমন?

--উত্তর দিবনা। অভিমান করে বলল নাদিয়া।

--ঠিক আছে উত্তর দিওনা এসব প্রশ্নের উত্তর না দেওয়াই বড় উত্তর।

নাদিয়া হেসে ডেসপিনাকে জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি যাই ভাব, আসল ব্যাপার হল ও আমাকে জানে না, ওকে আমি জানি না।

--কিন্তু আমি তো তোমাকে জানি। নাদিয়াকে একটা চিমটি কেটে বলল ডেসপিনা।

ঠিক এই সময়েই  সালেহ বাহমন ও নাদিয়ার আব্বার মধ্যে কথা শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং ওদিকে কান দিতে গিয়েই তাদের কথা বন্ধ হয়ে যায়।

সালেহ বাহমনের কথায় ওমর বিগোভিকের মুখ উজ্জল হয়ে উঠেছিল। বলল সে, ধন্যবাদ বাহমন আশার কথা শুনালে। আমাদের ছেলেরা সবাই এভাবে ভাবছে?

--সবাইকে তো জানিনা চাচাজান, যাদের জানি তারা এর চাইতেও বেশি ভাবছে।

--কিন্তু সংখ্যা শক্তি ও সুযোগ সব দিকেই ওরা ভালো অবস্থায়, ওদের মোকাবিলা কি সহজ হবে ?

--হবে না। কিন্তু মোকাবিলার তো বিকল্প নাই। আমরা তো নিরবে আত্নসমর্পণ করে জাতির অস্তিত্ব বিলীন করে দেবার পথ বেছে নিতে পারি না।

--তুমি তো ডেসপিনার নাম শুনেছ। সে এসেছে। একটা...............

--ডেসপিনা মানে স্টিফেন পরিবারের ডেসপিনা এসেছে?

--হাঁ

--আল-হামদুলিল্লাহ। আজকেই আমরা স্টিফেন পরিবারের সাথে যোগাযোগের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছি। চেষ্টা করেও ওদের পরিবারে কারো সাথে আলোচনা করার সুযোগ হয়নি। একদিকে পরিচিত বাড়িগুলি মিলেশ বাহিনীর চররা চোখে চোখে রেখেছে, অন্যদিকে বড়ীগুলোর চাকর-বাকর কিংবা কেউ মুখ খুলতে নারাজ। আলোচনা করতে গিয়ে মনে হয়েছে, ওরা সবাইকে মিলেশ বাহিনীর লোক বলে সন্দেহ করছে। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি, ডেসপিনা যোগাযোগের একটা পথ বাতলে দিবে।

ডেসপিনা মারাত্মক একটা দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছে। বলল ওমর বিগোভিক। কি দুঃসংবাদ? উদ্বিগ্ন কন্ঠে বলল সালেহ্ বাহমন।

ওমর বিগোভিক সেদিন হাসান সেনজিকের বাড়ীতে যা ঘটেছিল তার পুরো বিবরণ দিল। শেষে বলল হাসান সেনজিককে ওদের না দিলে বেগম খানমকে ওরা পণবন্দী করবেই।

শোনার পর সালেহ বাহমন অনেকক্ষন কথা বললেন না। তার উদাস দৃষ্টি দেয়ালে নিবদ্ধ ছিল।

অনেকক্ষণ পর তার দৃষ্টি ফিরে এল। সে সোফায় হেলান দিয়ে বসল। তার ঠোঁটে ফুটে উঠলো এক টুকরো হাসি। বলল, ওরা পাগল হয়ে উঠেছে।

--কিন্তু এই পাগলামিকে  যদি রোধ করা না যায়?

সাত দিন তো দেরি আছে চাচাজান, হাসান সেনজিকরা ততোদিন বেলগ্রেড এসে পৌঁছাবে।

--তুমি নিশ্চিত হচ্ছ কেমন করে ?

--আমার নিশ্চিত হবার কারণ, হাসান সেনজিকরা এ পর্যন্ত তাদের প্রতিরোধ খেলনার মত ভেঙ্গেছে। আমার আর একটি ধারনা, যে শক্তি ও যে বুদ্ধি দিয়ে ওরা মিলেশদের প্রতিরোধ ভাঙছে, সেই শক্তি ও বুদ্ধি যদি মিলেশদের রুখে দাঁড়ায় তাহলে ওদের পাগলামি বন্ধ করা যাবে।

--এসবই তোমার একটা অনুমান।

--শুধু অনুমান নয় চাচাজান, আমরা খবর পেয়েছি আলবেনিয়ার রাজধানীর দুধর্ষ সন্ত্রাসী জেমস জেংগা এবং কাকেজীর ত্রাস ব্ল্যাক ক্যাটকে ওরা যে ভাবে নিমিষে শেষ করেছেন তাতে আমাদের বুক ফুলে উঠেছে।

--কিন্তু ভুলে যেওনা মিলেশ বাহিনী জেমস জেংগা এবং ব্লাক ক্যাট নয়, বলকান অঞ্চলের সবচেয়ে সুগঠিত ও শক্তিশালী বাহিনী।

--জানি চাচাজান কিন্তু ওদের মধ্যে কম্পন শুরু হয়েছে, হেডকোয়ার্টার গোপন স্থানে সরিয়ে নেয়া এরই প্রমাণ।

ওমর বিগোভিক মুহুর্ত কয়েক চুপ থাকল। তারপর বলল আচ্ছা বাহমন, হাসান সেনজিকের সাথের ঐ লোকটা কে যে আমাদের কল্পনাকেও হার মানাচ্ছে।

--আমি জানি না তিনি কে? কিন্তু আমি অনুমান করি, তিনি আহমদ মুসা ছাড়া আর কেউ নন। হাসান সেনজিককে নিয়ে যুগোস্লাভিয়ার চরম প্রতিকুল মাটিতে পা রাখার দুঃসাহস একমাত্র তিনিই রাখেন।

--কিন্তু একজন মানুষ কি করে এত বড় চ্যালেঞ্জ ... ওমর বিগোভিক কথা শেষ না করেই থেমে গেল।

সালেহ বাহমন একটু হাসলো। বলল, তার ইতিহাস তো এটাই চাচাজান। ফিলিস্তিনে তিনি একা গিয়েছিলেন, মিন্দানাও, সোভিয়েত মধ্যে এশিয়া, সিংকিয়াং এবং ককেশাশেও তিনি একা গিয়েছিলেন এবং আল্লাহ তাকেই জয়ী করেছেন। চাচাজান, তিনি রূপ কথার রাজপুত্র,তার সামনে কোন প্রতিরোধই টিকে না।

ওমর বিগোভিক কোন কথা বলল না। তার মুখ দু'টি আনন্দে উজ্জল হয়ে উঠল। তার শূন্য দৃষ্টি দেয়ালে নিবদ্ধ। বোধ হয় সে মনে মনে সালেহ বাহমনের সুন্দর কথাগুলো নাড়াচাড়া করছে।

ডেসপিনা এবং নাদিয়া নূরের মুখেও কোন কথা নেই। তাদের সামনেও তখন সালেহ বাহমনের কথাগুলোই প্রতিধ্বনি হচ্ছে।

অনেকক্ষণ পর নাদিয়া নূর বলল, ওর কথা সত্য হলে আহমদ মুসা আমাদের জন্যে সৌভাগ্য বহন করে আনছেন।

‘কিন্তু আমি ভাবছি নাদিয়া'বলতে লাগল ডেসপিনা, 'মানুষের ভার নিয়ে দেশ থেকে দেশান্তরে এইভাবে ঘুরে বেড়ায় এমন মানুষও আজ দুনিয়াতে তাহলে আছে।'

নাদিয়া কিছু বলতে যাচ্ছিল।

এই সময় ডাইনিং রুম থেকে নাদিয়াকে ডাকল তার মা।

‘আসি' বলে নাদিয়া ছুটে গেল ডাইনিং রুমের দিকে।

# ৭

কসভো হাইওয়ে ধরে ছুটে চলছিল ট্যাক্সিটি। উঁচু-নিচু পথ। কখনো পাহার উঁচু-নিচু ভুমি, কখনও নিচু-উপত্যকা, কখনও বা আবার প্রান্তরের সমভুমি ধরে এগিয়ে চলছিল ট্যাক্সিটি।

কসভো নামটা বড় প্রিয় আহমদ মুসার কাছে। এই কসভোরই কোন এক স্থানে যুদ্ধ হয়েছিল তুরস্কের সুলতান মুরাদের সাথে ইউরোপীয় খৃষ্টানদের মিলিত বাহিনীর। এই যুদ্ধে মুরাদের বিজয় ইউরোপের দরজা খুলে দিয়েছিল ইসলামের জন্য।

নিরব প্রান্তরের ভিতর দিয়ে গাড়ি ছুটে চলার শোঁ শোঁ শব্দ ছাড়া আর শব্দ নেই কোথাও। প্রথম নিরবতা ভাঙল আহমদ মুসা। ড্রাইভারকে উদ্দেশ্য করে বলল, ধন্যবাদ ড্রাইভার, খুব সুন্দর গাড়ি চালাও তুমি।

ড্রাইভারের মুখ উজ্জ্বল হলো। সে ঘাড়টা পেছনের দিকে একটু ফিরিয়ে বলল, ধন্যবাদ।

আবার নিরবতা। নিরবতার এক প্রান্তে এসে আহমদ মুসা বলল, ড্রাইভার তোমার নাম কি?

--দিমিত্রি।

--বাড়ী কোথায় তোমার?

--প্রিজরীন।

--আমি মনে করেছিলাম প্রিষ্টিনায় হবে।

--কতদিন ধরে গাড়ি চালাও?

--এক বছর।

একটু চুপ করে থেকে আহমদ মুসা আবার জিজ্ঞেস করল, তুমি খৃষ্টান নিশ্চয়।

জবাব দিল না দিমিত্রি। মুখটা তার বিষন্ন হল যেন।

আবার প্রশ্ন আহমদ মুসার, ও তুমি তাহলে ধর্ম-টর্ম মাননা-কম্যুনিষ্ট।

--আমি এসব কোন কিছু নিয়েই ভাবি না। গম্ভীর কন্ঠে বলল দিমিত্রি।

--ভাবনা কেন? হেসে প্রশ্ন করল আহমদ মুসা।

--শুধু গন্ডগোল আর হানাহানি দেখে।

--তাই বলে তোমার কোন মত থাকবে না?

আবার নিরব হলো ড্রাইভার। উত্তর দিলনা। নিরবতা আবার।

অনেকক্ষণ পর ড্রাইভারই মুখ খুলল। বলল, স্যাররা তো খৃষ্টান?

--তোমার কি মনে হয়? হেসে বলল আহমদ মুসা।

--আমি বুঝতে পারিনি।

--আমরা মুসলমান।

ড্রাইভার চমকে উঠে পেছন ফিরে তাকিয়েছিল। স্টিয়ারিং হুইলের উপর তার নিয়ন্ত্রণ মুহূর্তের জন্যে শিথিল হয়ে পড়েছিল। বেঁকে গিয়েছিল গাড়ির গতি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সামলে নিয়েছিল দিমিত্রি। শক্ত হাতে ধরেছিল স্টিয়ারিং হুইল। ঝাঁকি খেয়ে গাড়ি আবার তার জায়গায় ফিরে এসেছিল।

দিমিত্রির এই পরিবর্তন আহমদ মুসার নজর এড়ায়নি। দিমিত্রি এভাবে চমকে উঠলো কেন? মুসলমান পরিচয়টাকে সে এভাবে গ্রহণ করল কেন? সন্দেহের একটা কালো মেঘ আহমদ মুসার মনে উঁকি দিতে চাইল। সেটাকে খুব একটা আমল না নিয়ে সে ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করল, ভয় পেলে দিমিত্রি?

--না স্যার।

--তবে যে চমকে উঠলে?

--চমকে উঠিনি স্যার, বিস্মিত হয়েছি।

--কেন?

--মুসলিম পরিচয় এভাবে এখানে কেউ দেয় না তাই।

--কেন দেয় না? ঠোঁটে হাসি টেনে জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

--ভয়ে। জীবনের ভয় এবং অনেক রকমের ভয়ে, যেমন পদে পদে লাঞ্ছনা ও অসহযোগিতার ভয়।

আহমদ মুসা কিছু বলার জন্য মুখ খুলেছিল। এই সময় সামনে থেকে প্রচন্ড, কর্কশ এক ধাতব শব্দ ভেসে এল। একটা এ্যাকসিডেন্ট। একটা দ্রুতগামী ট্রাকের ধাক্কায় একটা ট্যাক্সি খেলনার মত ছিটকে পড়েছে রাস্তার পাশে।

একটা বিশাল প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে তখন চলছিল গাড়ি।

ঘাতক ট্রাকটি পাগলা দৈত্যের মত পাশ দিয়ে ছুটে চলে গেল।

আহমদ মুসাদের গাড়ি কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এ্যাকসিডেন্টের জায়গায় আসল। কিন্তু ড্রাইভার গাড়ি না থামিয়ে চলে যাচ্ছিল।

আহমদ মুসা ড্রাইভারের কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, গাড়ি থামাও ড্রাইভার। শক্ত কন্ঠ আহমদ মুসার।

সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে দিল। তার ঘাড় ফিরিয়ে বলল,স্যার এদেশে এ ধরনের ঝামেলায় কেউ সাধারণত পড়তে চায় না।

আহমদ মুসা দ্রুত গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলল, এটা ঝামেলা নয়,দিমিত্রি, এটা মানুষের পবিত্র দায়িত্ব।

বলে আহমদ মুসা দ্রুত ছুটল দূর্ঘটনার শিকার রাস্তার পাশে ছিটকে পড়া গাড়ির দিকে। তার পেছনে পেছনে ছুটল হাসান সেনজিক। ড্রাইভার দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ তার গাড়ির কাছে। তারপর সেও ধীরে ধীরে এগুলো।

ভাগ্য ভালোই বলতে হবে, এ্যাকসিডেন্টের পর গাড়িটি ছিটকে পড়ে গড়াগড়ি খেলেও শেষ পর্যন্ত গাড়িটি সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কাছে গিয়ে আহমদ মুসারা দেখল, গাড়িটি মুখোমুখি ধাক্কা খায়নি। ট্রাকের ধাক্কাটি ট্যাক্সির ডান হেডলাইটের কোণায় লেগে পিছলে বেরিয়ে গেছে। ডান হেডলাইট সমেত ডান পাশটা দুমড়ে গেছে। ডান দরজাটাও বেঁকে গেছে। ছিটকে পড়ে গড়াগড়ির ফলে গাড়ির ছাদ এবং বাম পাশটাও দুমড়ে গেছে। গাড়ির ইঞ্জিনের দিক থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছিল। কিন্তু আহমদ মুসারা গাড়ির কাছে পৌঁছতে পৌঁছতেই দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল।

গাড়ির ড্রাইভিং সিটে একজন যুবক। সে সিটের উপর পড়ে আছে। অজ্ঞান মনে হয়। রক্তে ভিজে যাচ্ছে গাড়ির সিট। ড্রাইভিং সিটের পাশে একজন তরুণী। তার মুখও রক্তে ভেজা। সে সিট থেকে উঠে বসতে চেষ্টা করছে।

আহমদ মুসা দ্রুত গিয়ে প্রথমে ড্রাইভিং সিটের দরজা খুলতে চেষ্টা করল। দরজা খোলা গেলনা। দরজাটি ভেঙে চ্যাপ্টা হয়ে বডির সাথে কোথায় যেন আটকে গেছে।

আহমদ মুসা ছুটে ওপাশের দরজায় গেল। দরজা ভেতর থেকে লক করা। লাথি দিয়ে দরজার কাঁচ ভেঙে ফেলে দরজাটি আনলক করে দিল কিন্তু দরজাটি তবু খুলল না। দরজাটি বেঁকে কোথায় আটকে আছে।

কিন্তু এক মুহূর্তও বিলম্বের উপায় নেই। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠেছে। এখনই কেবিনে আগুন এসে পড়বে। ভেতরে মেয়েটি পাগলের মত চিৎকার শুরু করেছে।

পেছনে হাসান সেনজিকের দিকে তাকিয়ে আহমদ মুসা দ্রুত বলল,এস ধর।

তারপর দু'জনে মিলে বিসমিল্লাহ বলে হ্যাচকা একটা টান দিল।

দরজা খুলে গেল।

হাত ধরে প্রথমে মেয়েটিকে বের করে আনল আহমদ মুসা। তারপর ভেতরে ঢুকে গিয়ে সংজ্ঞাহীন যুবকটিকে দু'হাতে টেনে আনল গাড়ির দরজায়।

গাড়ির কেবিন তখন ধোঁয়ায় ভরে গেছে। আহমদ মুসা সংজ্ঞাহীন যুবকটিকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে দ্রুত গাড়ির কাছ থেকে সরে গেল।

আহমদ মুসা যখন যুবকটিকে রাস্তায় ঘাসের উপরে শুইয়ে দিল, তখন গোটা গাড়ি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। সবাই একবার সেদিকে চাইল। মেয়েটির চোখে আতংক।

আহমদ মুসা ঝুকে পড়ে যুবকটির নিঃশ্বাস পরীক্ষা করল। নাড়ী দেখল। নাড়ী সবল আছে।

মেয়েটিও এগিয়ে এসেছিল যুবকটির কাছে। তার চোখে একরাশ উদ্বিগ্ন জিজ্ঞাসা।

আহমদ মুসা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, ভয় নেই বোন, নাড়ী ভাল আছে। কিন্তু এখনই এর রক্ত বন্ধ করা দরকার।

বলেই আহমদ মুসা পাশে দাঁড়ানো ড্রাইভারের দিকে চেয়ে বলল, এখান থেকে নিকটবর্তী হাসপাতাল বা ডিসপেনসারী কতদূর।

--প্রিস্টিনা ছাড়া এ সুযোগ পথে আর কোথাও নেই। প্রিস্টিনা এখান থেকে দু'শ মাইল। বলল ড্রাইভার।

হতাশার একটা ছায়া নামল আহমদ মুসার চোখে-মুখে।

আহমদ মুসা ঝুকে পড়ে যুবকটির ক্ষত আবার পরীক্ষা করল। দু'টো বড় ক্ষত, একটা সামনের কপালে, আরেকটা কান ও কপালের সন্ধিস্থলে। সিট বেল্ট বাঁধা থাকায় আরও বড় ক্ষতি থেকে বেঁচে গেছে।

পাশে দাঁড়ানো হাসান সেনজিকের দিকে চেয়ে আহমদ মুসা বলল, ফাস্ট এইড ব্যাগটা নিয়ে এস।

হাসান সেনজিক চলে গেল গাড়ির দিকে।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়ে মেয়েটির আহত স্থান পরীক্ষা করল। মুখের কয়েক স্থানে ছোট কাটা, ভাঙ্গা কাঁচের টুকরোর আঘাতে ওগুলো হয়েছে। চোখের উপর একটাই বড় কাটা। ওটা দিয়ে রক্ত ঝরছে এখনও।

আহমদ মুসা মেয়েটিকে জিজ্ঞাস করল, যুবকটি তোমার কে বোন?

--আমার স্বামী। স্পষ্ট কণ্ঠে বলল মেয়েটি।

মেয়েটির পরনে লাল স্কার্ট, গায়ে সাদা জামা। তার উপর ব্লু কোট। মেয়েটির বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা।

আর ছেলেটির পরনে ব্লু স্যুট। স্বাস্থ্যবান ব্যায়াম পুষ্ট শরীর। কিন্তু মুখের চেহারায় একটা কর্কশ ভাব।

--তোমার আর কোথাও কোন আসুবিধা নেই তো? জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

--আর কোথাও লাগেনি আমার।

একটু থেমে একটা ঢোক গিলে মেয়েটি আবার শুরু করল, আপনি ওকে দেখুন, খুব ব্লিডিং হচ্ছে ওর। মেয়েটির কণ্ঠে কান্না ঝরে পড়ল।

হাসান সেনজিক 'ফাস্ট এইড কিট' নিয়ে পৌঁছল।

আহমদ মুসার 'ফাস্ট এইড কিটে তুলা, ব্যান্ডেজ, আয়োডিন, পেইন কিলার ট্যাবলেট, ছোট কাঁচি-সবই আছে।

আহমদ মুসা গা থেকে কোর্ট খুলে ফেলল। তারপর জামার হাতা গুটিয়ে তুলা ও আয়োডিনের শিশি নিয়ে যুবকটির মাথার কাছে বসে গেল।

ক্ষতস্থানে তুলা চাপা দিয়ে ব্লিডিং কমিয়ে আনা ছাড়া বিকল্প কিছু নেই।

আহমদ মুসা তুলা আয়োডিনে ভিজিয়ে যুবকটির কপালে ও কানের কাছের ক্ষতস্থানটি প্রথমে পরিষ্কার করল। তারপর পরিষ্কার তুলা দিয়ে ক্ষতস্থান দু'টো চাপা দিল এবং হাসান সেনজিককে ক্ষতস্থান দু'টি দুহাতে চেপে রাখতে বলল।

এরপর আহমদ মুসা যুবকটির মুখ-মণ্ডল থেকে তুলা দিয়ে রক্ত পরিষ্কার করল। পরে আয়োডিনের তুলা ক'য়েকবার পাল্টাতে হলো। ধীরে ধীরে কমে এল ব্লিডিং।

ইতিমধ্যে আহমদ মুসা যুবকটির জ্ঞান ফিরানোর চেষ্টা শুরু করেছে। আঘাতের ধরন দেখে আহমদ মুসার নিশ্চিত বিশ্বাস হয়েছে, তার মস্তিস্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। অতএব জ্ঞান তাড়াতাড়িই ফিরে আসবে। ছোট একটা ড্রাম ফাইলে কিছু স্পিরিট ছিল। সেটাই যুবকটির জিহ্ববায় কয়েক ফোটা ফেলে এবং নাকে ধরে রেখে তার মাথার স্নায়ুতন্ত্রীকে সজীব ও সচেতন করে তোলার চেষ্টা করছিল। কিছুক্ষন চেষ্টার পর যুবকটির চোখ মেলল। চোখ মেলেই আতংকে উঠে বসতে চেষ্টা করল।

আহমদ মুসা তাকে জোর করে শুইয়ে দিয়ে বলল, মাথা একটুও নড়াবেন না, ব্লিডিং শুরু হয়ে যেতে পারে। আপনি নিরাপদ আছেন, আপনার স্ত্রী ভাল আছেন। চিন্তা করবেন না। বলে আহমেদ মুসা যুবকটির মাথার পেছন দিকে দাঁড়ানো সেই মেয়েটির দিকে চেয়ে বলল, তুমি এর সামনে এসো বোন, যাতে তোমাকে দেখতে পান। মেয়েটি সরে এসে যুবকটির মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে বলল, চিন্তা করোনা, আমি ভাল আছি, তোমারও আর কোন ভয় নেই। এরা গাড়ি থেকে আমাদের উদ্ধার করেছেন। যুবকটি মেয়েটির একটি হাত ধরল। তারপর

শান্তভাবে চোখ বুজল। আহমেদ মুসা যুবকটির মাথার পেছনে বসে ব্যান্ডেজ বাঁধছিল। বলল, তোমরা কোথায় যাচ্ছিলে বোন, প্রিস্টিনা?

--হ্যাঁ। বলল মেয়েটি।

-- প্রিস্টিনায় তোমাদের বাড়ী কি?

--হ্যাঁ।

ব্যান্ডেজ বাঁধা হয়ে গেলে আহমেদ মুসা যুবকটিকে জিজ্ঞাস করল, এখন কেমন বোধ করছেন? যুবকটি চোখ খুলল। বলল, ভাল।

--মাথায় কোন যন্ত্রণা আছে?

--নাই

--খুব ভারী বোধ হচ্ছে কি মাথা?

--না। শুধু ব্যাথা বোধ হচ্ছে। আহমেদ মুসা খুশি হয়ে বলল, আর কোন বিপদ নেই।

একটু থেমে আহমেদ মুসাই বলল। এখন তা হলে আমরা যাত্রা করতে পারি।

বলে আহমেদ মুসা উঠে দাঁড়িয়ে যুবকটিকে পাঁজাকোলা করে তুলতে গেল গাড়িতে নেয়ার জন্য।

যুবকটি হেসে বলল, ধন্যবাদ ভাই, আমি হাটতে পারব।

বলে যুবকটি ধীরে ধীরে উঠে বসল।

আহমেদ মুসা তাকে ধরে দাঁড় করাল।

যুবকটি দাঁড়িয়ে একবার পেছন ফিরে গাড়ির দিকে চাইল। গাড়িটি তখনও জ্বলছিল আগুনে।

মেয়েটিও তাকিয়েছিল সেদিকে। ধীরে ধীরে বলল মেয়েটি, মাজুভ, ওরা আমাদের গাড়ির দরজা ভেঙে বের না করলে আমাদের দেহ এতক্ষণ ছাই হয়ে যেত।

যুবকটি আহমদ মুসার দিকে চেয়ে বলল, শুধু ধন্যবাদ দিয়ে এ ঋণ আমি শোধ করতে চাই না। নতুন জীবন দিয়েছেন আপনারা আমাদের।

--কোন মানুষ কোন মানুষকে জীবন দিতে পারে না ভাই। বলল আহমদ মুসা।

মেয়েটি বলল, আমাদের তো পরিচয় এখনও হয়নি।

পরিচয়ের কথা উঠতেই যুবকটির চোখ গিয়ে পড়ল আহমদ মুসা ও হাসান সেনজিক উভয়ের দিকেই। হাসান সেনজিকের দিকে তাকিয়ে যুবকটির চোখ দু'টি কেমন যেন চঞ্চল হলো।

মেয়েটি কথা বলছিল। সে যুবকটিকে দেখিয়ে বলল, এ হলো লাজার মাজুভ, আর আমি নাতাশা। আমি কলেজে পড়াই, আর ও সেনাবাহিনী থেকে আগাম অবসর নিয়ে ব্যবসা করছে।

আহমদ মুসা কি পরিচয় দেবে তা নিয়ে ভাবল। পাসপোর্টের ছদ্মনাম বলতে তার মন কিছুতেই সায় দিলনা। মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে সে বলল, আমি আহমদ মুসা, আর ও হাসান সেনজিক। আমরা আসছি আর্মেনিয়া থেকে।

মেয়েটা সংগে সংগেই বলল, আপনারা মুসলমান?

--হ্যাঁ বোন। বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা খেয়াল করলে দেখতে পেত তাদের নাম বলার সাথে সাথে যুবকটি অর্থাৎ লাজার মাজুভের মুখে একটা গভীর বিষন্নতা নেমে এসেছিল, আর ড্রাইভারের মুখে ফুটে উঠেছিল একটা বিস্ময় মেশানো আনন্দ।

আহমদ মুসা মাজুভকে হাত ধরে এনে গাড়ির পেছনের সিটে শুইয়ে দিল। নাতাশাকে সে বলল মাজুভের মাথার কাছে বসতে।

মাজুভ শোয়া থেকে উঠে বলল, আপনারা দু'জন কোথায় বসবেন?

--সামনের সিটে আমরা দু'জন বসব। বলল আহমদ মুসা।

--অসুবিধা হবে, বসতে পারবেন না। তার চেয়ে আমার পাশে আসুন। আমি বসেই যেতে পারব।

--আপনার কিছুতেই বসে যাওয়া হবে না, গাড়ির ঝাকুনিতে এখনই আবার ব্লিডিং শুর হবে।

--কিন্তু আপনাদের কষ্ট হবে ঐ ছোট্ট এক সিটে দু'জন বসে যেতে।

--কষ্টটা অনেকটা মনের ব্যাপার, কষ্ট মনে না করলে আর কষ্ট থাকেনা।

আবার এমনও কষ্ট আছে যা আনন্দদায়ক।

--আনন্দদায়ক কষ্টটা কি?

--মানুষ মানুষের জন্য যে কষ্ট করে সেটা আনন্দদায়ক।

--কিন্তু তার জন্যে তো শর্ত মানুষ মানুষকে ভালবাসবে।

--এই ভালোবাসাই তো স্বাভাবিক, এর উল্টোটা ব্যতিক্রম।

--এই ব্যতিক্রমটাকেই তো আমরা সাধারণ হিসেবে দেখছি।

--তা ঠিক। এটা মানুষের ক্রটি, মানবতা কিন্তু এর দ্বারা কলুষিত হয়নি।

--আপনি দর্শন চর্চা করেন বুঝি? বলল নাতাশা।

--এটা দর্শনের কথা নয় নাতাশা, খুব পরিচিত মানব-প্রকৃতির কথা। বলে আহমদ মুসা গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিয়ে এসে সামনের সিটে হাসান সেনজিকের পাশে বসল।

আহমদ মুসা গাড়িতে উঠে বসতেই গাড়ি ছেড়ে দিল। গাড়ি ছুটতে শুরু করল।

আহমদ মুসা একটু মাথা ঘুরিয়ে বলল,নাতাশা মিঃ মাজুভের মাথাটা একটু উঁচুতে থাকা দরকার যাতে মাথায় রক্তের চাপ কম হয়।

নাতাশা কোন উত্তর দিল না। ঠোঁটে একটুকরো হাসি ফুটে উঠল। নিরবে সে মাজুভের মাথা তার উরুর উপর তুলে নিল।

মাজুভ আগের চেয়ে অনেক আরাম বোধ করল। সে নড়ে-চড়ে শুয়ে স্বগত কণ্ঠে বলল, আশ্চর্য সাবধানি উনি,ওর চোখ থেকে কোন ছোট জিনিসও দেখছি এড়ায়না।

নাতাশা মাজুভের মাথার চুলে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, ঠিক বলেছ, সব মিলিয়ে উনি সাধারণের মধ্যে পড়েন না।

মিঃ মাজুভ কোন কথা আর বলল না। আবার সেই গভীর বিষন্নতা তার মুখে দেখা দিল। গম্ভীর হলো মিঃ মাজুভ। গাম্ভীর্যের সাথে একটা যন্ত্রণার ভাবও তার মুখে ফুটে উঠল।

ছুটে চলছিল গাড়ি।

প্রায় পৌনে একশ' কিলোমিটার চলার পর গাড়ি 'স্টিমলে' নামক স্থানে এসে পৌছল। স্টিমলে একটা ছোট্ট বাজার। রাস্তার দু'পাশের কিছু দোকান নিয়ে এই বাজার। পাশ দিয়ে একটা ছোট্ট নদী প্রবাহিত। বাজার সংলগ্ন নদীর ঘাটে বেশ কিছু নৌকাও রয়েছে।

রাস্তার ধার ঘেঁষেই দোকানগুলো।

আহমদ মুসা ড্রাইভারকে একটা কনফেকশনারী দেখে গাড়ি দাঁড় করাতে বলল। পেছন ফিরে মিঃ মাজুভকে লক্ষ্য করে বলল, মিঃ মাজুভ, আপনার পানি ধরণের তরল কিছু খাওয়া দরকার।

একটা কনফেকশনারীর পাশে গাড়ি গিয়ে দাঁড়াল। আহমদ মুসা হাসান সেনজিকের হাতে কিছু টাকা তুলে দিয়ে বলল, তুমি আপেল বা কোন ফলের কয়েকটা জুস নিয়ে এস।

হাসান সেনজিক নেমে গেল গাড়ি থেকে। আহমদ মুসা গা এলিয়ে আরাম করে সিটে বসল। তার উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টি গাড়ির জানালা দিয়ে এদিক-সেদিক ঘুরে ফিরছে।

মিঃ মাজুভও উঠে বসেছে।

হাসান সেনজিক পাশের দোকানেই গিয়েছিল জুস কিনতে। আহমদ মুসার দৃষ্টি এদিক-সেদিক ঘুরে সেই দোকানের উপর নিবদ্ধ হলো।

একজন মাত্র দোকানি। একমাত্র খদ্দের হাসান সেনজিক তার সাথে কথা বলছিল আর একজন লোক দোকানের অন্য পাশে দাঁড়িয়েছিল। তার দৃষ্টিটা হাসান সেনজিকের উপর নিবদ্ধ। সে ধীরে ধীরে এসে হাসান সেনজিকের পাশে দাঁড়াল।

হাসান সেনজিক একটা প্লাস্টিক ব্যাগে জুসের টিনগুলো নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল। আহমদ মুসা দেখল লোকটিও হাসান সেনজিকের পেছনে পেছনে আসছে। লোকটির হাবভাব ও হাটা আহমদ মুসার কাছে স্বাভাবিক মনে হলো না হাসান সেনজিক গাড়ির কাছে এসে পড়েছে।

আহমদ মুসা দরজা খুলে গাড়ি থেকে বেরুল।

হাসান সেনজিক গাড়িতে ঢুকতে যাচ্ছিল। হঠাৎ সেই পেছন পেছন আসা লোকটি তার হাত চেপে ধরে বলল,আপনাকে আমার সাথে একটু যেতে হবে।

হাসান সেনজিক পেছনে ফিরে বলল, কেন? কোথায়?

'এই এইখানে কাছেই' বলল লোকটি।

'কেন' আবার জিজ্ঞেস করল হাসান সেনজিক।

লোকটি অসহিষ্ণুভাবে হাসান সেনজিকের হাত ধরে একটা হ্যাচকা টান দিয়ে বলল, সব কিছু বলব, চলুন।

আহমদ মুসা নিরবে দাঁড়িয়ে দেখছিল।

এবার সে দু'পা এগিয়ে লোকটির মুখোমুখি হয়ে শান্ত-কঠোর কণ্ঠে বলল, হাত ছেড়ে দাও।

লোকটি আহমদ মুসার দিকে একবার তাকিয়ে হাত ছেড়ে দিয়েই পকেট থেকে পিস্তল বের করল। আহমদ মুসার দিকে পিস্তল তাক করে বলল, সরে যাও, বাঁচতে চাইলে।

বলে লোকটি আবার হাসান সেনজিকের হাত ধরে ফেলল।

হাসান সেনজিকের হাত ধরার জন্যে যখন লোকটি মনোযোগ দিয়েছে সেই ক্ষণের সুযোগ গ্রহণ করল আহমদ মুসা। লোকটির কব্জিতে আঘাত করতেই তার হাত থেকে পিস্তল পড়ে গেল।

হাত থেকে পিস্তল পড়ে যেতেই লোকটি হাসান সেনজিকের হাত ছেড়ে দিয়ে ডান হাতের এক প্রচন্ড ঘুষি ছুটল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে।

পিস্তল হারাবার পর এ ধরণের ঘুষিই যে তার কাছ থেকে আসবে, সে ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল আহমদ মুসা। চকিতে মাথা একদিকে সরিয়ে নিয়ে ঘুষি এড়িয়ে গেল সে।

লোকটি ভারসাম্য হারিয়ে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়েছিল। সে সোজা হয়ে উঠার সংগে সংগেই আহমদ মুসা ডান হাতের একটা কারাত চালাল লোকটির ঘাড়ে, ডান পাশে একেবারে কানের নিচেই।

টলতে টলতে লোকটি গোড়া কাটা গাছের মত আছড়ে পড়ল মাটিতে।

আহমদ মুসা পিস্তলটি কুড়িয়ে নিয়ে লোকটির পকেটে গুজে দিয়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে এল।

হাসান সেনজিক গাড়িতে ঢুকে গিয়েছিল। আহমদ মুসা উঠে বসেই গাড়ি ছাড়তে বলল।

গাড়ি স্টার্ট নিল। চলতে শুরু করল গাড়ি।

সিনেমার একটা দৃশ্যের মতই ঘটে গেল ঘটনাটা।

ড্রাইভার ও নাতাশার চোখে আতংক। কিন্তু মিঃ মাজুভ বসেছিল পাথরের মত। তার মুখে ভয় উদ্বেগের কোন চিহ্ন নেই, আছে এক প্রকারের কাঠিন্য এবং সেই বিষন্নতা।

গাড়ি তখন ফুল স্পীডে চলতে শুরু করেছে।

আহমদ মুসা আপেল জুসের দু'টো টিন পেছনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, মিঃ মাজুভ আপনি এবং নাতাশা খেয়ে নিন।

মিঃ মাজুভ হাত বাড়ালো না, হাত বাড়াল নাতাশা।

নাতাশা জুস নিতে নিতে বলল আমার গা এখনও কাঁপছে। কি সাংঘাতিক। দিনে-দুপুরে এইভাবে হাইজ্যাক। ঠিক শাস্তি দিয়েছেন। কিন্তু যদি গুলি করত?

আহমদ মুসা ভাবছিল মিলেশ বাহিনীর কথা। আশ্চর্য, ওদের জাল দেখছি সর্বত্র। মনে হয় ওদের প্রতিটি ইউনিট, প্রতিটি লোকের কাছেই হাসান সেনজিকের ফটো পৌঁছেছে, নির্দেশও পৌঁছেছে তাকে ধরার। হাসান সেনজিককে লোক চক্ষুর আড়ালে রাখাই এখন দেখছি সবেচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

নাতাশার কথা হাসান সেনজিকের চিন্তাকে আর আগাতে দিল না। আহমদ মুসা বলল, জীবন-মৃত্যু একদম পাশাপাশি বিরাজ করছে নাতাশা, এ নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই।

'আপনার খুব সাহস', বলল নাতাশা।

--এ সাহস সবার আছে নাতাশা। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে এ সাহস আপনাতেই এসে হাজির হয়।

--কিন্তু আপনি পিস্তলটা ওর পকেটে দিয়ে এলেন কেন?

--বাইরে পড়ে থাকলে কেউ নিয়ে নিতে পারত, তাই।

--সেটা ভালই তো হতো।

--হতো হয়তো, কিন্তু ভাবলাম যার জিনিস তারই থাক।

--আশ্চর্য মানুষ আপনি, শত্রুর জন্যে এমন করে কেউ ভাবে?

--জানি না। তবে সে যতটুকু শত্রুতা করেছে,ততটুকু উত্তর আমি দিয়েছি। এর বেশি কোন ক্ষতি তার আমি চাইনি।

--কি জানি, আমি এসব বুঝি না। শত্রু শত্রুই। কথায় আছে শত্রুর শেষ রাখতে নাই।

--আমিতো এই শত্রুকে চিনি না। কি কারণে,কোন অবস্থায় সে একাজ করতে এসেছে তা আমি জানি না। সুতারাং তাকে ঐভাবে শত্রু ভাবা ঠিক নয়।

--আপনার এ কথাটা একজন প্রতিপক্ষের নয়,বরং একজন বিচারকের। একটি পক্ষ এবং একজন বিচারকের ভূমিকা এক হতে পারে না।

--পারে। পারা উচিত। পক্ষগুলো যদি বিচারকের বিচার বুদ্ধি দ্বারা সজ্জিত হয়,তাহলে পক্ষগুলোর পার্থক্য ও বিরোধ দূর হবে এবং তাতে হানাহানি দূর হয়ে সমাজ, পৃথিবীতে শান্তি আসবে।

--আপনি দার্শনিক ও সংস্কারকের সুরে কথা বলছেন,আমি পারবো না আপনার সাথে কথায়।

মাজুভ একটা কথাও বলেনি। সে এক বিষন্ন গভীরতা নিয়ে এইকথাগুলো শুনছিলো। শুনতে শুনতে সেই বিষন্নতার মধ্যে তার চোখে-মুখে একটা বিস্ময় ফুটে উঠেছিলো।

নাতাশা আর কথা বলেনি। জুসের একটা টিন খুলে সে মাজুভের দিকে তুলে ধরল। মাজুভ নাতাশার হাত থেকে জুস নিয়ে নিরবে খেতে শুরু করল।

মাজুভের নিরবতা ও গাম্ভীর্য নাতাশার চোখ এড়ায়নি। এতবড় ঘটনা ঘটে গেল,সে একটা কথাও বলল না। এতে তার খারাপই লাগছিল। ব্যাপারটা তার কাছে দৃষ্টি কটুও মনে হয়েছে। আবার সে উদ্বিগ্নও হয়ে উঠেছে। তার শরীর খারাপ করছে নাতো। নাতাশা বলল,তোমার কি খুব খারাপ লাগছে মাজুভ? কষ্ট হচ্ছে?

মাজুভ হাসতে চেষ্টা করে বলল, না নাতাশা আমি ভাল আছি।

আহমদ মুসা সিটের উপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল,মিঃ মাজুভ,আপনার ব্রেনের নার্ভগুলোর রেষ্ট দরকার খুব বেশী। আপনার বসে থাকা চলবে না।

মাজুভ আগের মতই হাসতে চেষ্টা করে বলল, ধন্যবাদ। বলে মাজুভ শুয়ে পড়ল আগের মতই নাতাশার উরুতে মাথা রেখে।

নাতাশা মাজুভের চুলে হাত বুলাতে লাগল। এক সময় মাথা নিচু করে মুখটা মাজুভের কানের কাছে এনে নাতাশা ফিসফিসিয়ে বলল,গাড়ি কিংবা লাগেজের জন্য কি খারাপ লাগছে তোমার?

মাজুভ নাতাশার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলল,আমরা বেঁচেছি,তোমাকে এতটা সুস্থ পেয়েছি,এটাই এখন আমার কাছে দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় পাওয়া নাতাশা।

নাতাশা আর কিছু বলল না।

আরেকটু জোরে নাতাশা আকড়ে ধরল মাজুভের হাত।

তীব্র বেগে ছুটে চলছে তখন গাড়ি প্রিষ্টিনার দিকে।

প্রিষ্টিনা প্রাদেশিক রাজধানী শহর। বেশ বড়। প্রিষ্টিনার মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত সিটনিক নদী। সিটনিকের স্বচ্ছ পানি,দু’তীর বরাবর সুদৃশ্য এভেনিউ, সিটনিকের বুকে ভাসমান নানা বর্ণের বোটের সারি প্রিষ্টিনাকে দিয়েছে অপরুপ এক সাজ।

সিটনিকের দু'পাশের এভেনিউ বরাবর গড়ে উঠেছে প্রিষ্টিনার অভিজাত এলাকা।

সিটনিকের পশ্চিম তীর বরাবর যে এভেনিউ তার নাম,'লাজারাস এভেনিউ'। ‘লাজারাস’ ষ্টিফেন পরিবারের সেই রাজা ষ্টিফেনের পিতা রাজা লাজারাস। কসভো প্রান্তরে ১৩৮৯ সালে এই লাজারাসের সাথেই যুদ্ধ হয়েছিল তুরস্কের সুলতান মুরাদের।

এই লাজারাস এভেনিউকে সামনে রেখেই লাজার মাজুভের সুন্দর বাড়ীটি। লাজার মাজুভের পিতা ছিলেন প্রেসিডেন্ট টিটোর প্রিয়পাত্র যুগোশ্লাভ সেনাবাহিনীর একজন জেনারেল। উত্তরাধিকার সূত্রেই সে এই বাড়ীর মালিক হয়েছে। অবশ্য লাজার মাজুভও সেনাবাহিনীর একজন কৃতি সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। কর্নেল র‍্যাঙ্কে থাকাকালে তিনি অবসর নিয়েছেন।

আহমদ মুসা ও হাসান সেনজিক মাজুভের বাড়ীতে এসে উঠেছে। নাতাশার অনুরোধ তারা এড়াতে পারেনি।

প্রিষ্টিনায় ঢুকে গাড়ি নিয়ে তারা সোজা মাজুভের বাড়ীতেই এসেছিল। মাজুভদের নামিয়ে দেয়ার পর সংগে সংগেই তারা চলে যেতে চেয়েছিল।

মাজুভকে নিয়ে নাতাশা যখন ভেতরে চলে গিয়েছিল,আহমদ মুসা তখন ড্রাইভারকে তার ভাড়া চুকিয়ে দেবার জন্যে দু'শো যুগোশ্লাভ দিনার তার হাতে গুঁজে দিয়েছিলো। প্রিজরীন থেকে প্রিষ্টিনা পর্যন্ত ভাড়া ঠিক হয়েছিলো দেড়শ' দিনার।

ড্রাইভার টাকার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে বলেছিল,ভাড়া তো দেড়শ'দিনার, পঞ্চাশ দিনার বেশী এসেছে।

'প্রয়োজনের চেয়ে বেশী সময় তুমি দিয়েছ,তাছাড়া আমাদের আরেকটু এগিয়ে দেবে বাস ষ্ট্যান্ড পর্যন্ত', বলেছিল আহমদ মুসা।

ড্রাইভার ছেলেটি কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে ছিল। সে যখন মাথা তুলেছিল,তখন তার চোখের কোণটি ভিজা। সে তার হাতের দু'শ দিনার সবটাই আহমদ মুসার হাতে গুঁজে দিয়ে বলেছিল,আমি আপনার কাছ থেকে টাকা নিতে পারবো না।

কথা বলার সাথে সাথে তার চোখ থেকে দু'ফোটা পানি গড়িয়ে পড়েছিল।

আহমদ মুসা তার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বলেছিল,কাঁদছ তুমি?

ড্রাইভার ছেলেটি দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠে বলেছিল আমি মিথ্যা বলেছি, আমি মুসলমান।

--তুমি মুসলমান?

--হ্যাঁ। আমার নাম দরবেশ জুরজেভিক।

--মিথ্যা কথা বলেছিলে কেন?

--সব সময় ঐ মিথ্যা পরিচয়ই দেই। মুসলিম পরিচয়ে কাজ পাওয়া যায় না,তাছাড়া জীবনেরও ভয় আছে। আপনারা মুসলিম জানলে আমি মিথ্যা পরিচয় দিতাম না।

চোখ মুছে কথাগুলো বলেছিল দিমিত্রি।

আহমদ মুসা দু'পা এগিয়ে এসে দিমিত্রিকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল,তুমি আমার ভাই খুব খুশি হয়েছি তোমার এই পরিচয় পেয়ে।

দিমিত্রির চোখে পানি। কিন্তু মুখ তার আনন্দে উজ্জ্বল।

আহমদ মুসা তাকে আলিংগন থেকে ছেড়ে দিয়ে বলেছিল,ভাইয়ের একটা কথা কিন্তু মানতে হবে।

'কি কথা' বলেছিল দিমিত্রি।

আহমদ মুসা পকেট থেকে এক হাজার দিনারের একটা নোট বের করে দিমিত্রির হাতে গুঁজে দিয়ে বলেছিল,ভাইয়ের কাছ থেকে ভাইকে উপহার।

দিমিত্রি নোটের দিকে একবার তাকিয়ে বলেছিল,কিন্তু এ টাকা আপনার কাছ থেকে নিলে আমি চিরদিন কষ্ট পাব।

আহমদ মুসা দিমিত্রির পিঠ চাপড়ে বলেছিল,আমি তোমাকে কাজের বিনিময় দিচ্ছি না ভাইকে ভাইয়ের উপহার ওটা।

কয়েক মুহুর্ত মাথা নিচু করে থেকে দিমিত্রি টাকা পকেটে রেখে বলেছিল,আপনারা ওদের কাছে সত্য পরিচয় দিয়ে ঠিক করেননি। ওদের কাউকে বিশ্বাস নেই।

--তাই কি? বলেছিল আহমদ মুসা।

--আমার পরিচয় পেলে আমাকে এভাবে ওরা গাড়ি চালাতে দেবে না। গাড়িটাও কেড়ে নেবে। একটু থেমেই আবার বলেছিল,চলুন স্যার।

আহমদ মুসা গাড়ির দিকে এগুতে এগুতে বলেছিল,স্যার নয় ভাই।

এই সময় ছুটে বেরিয়ে এসেছিল নাতাশা বাড়ী থেকে। ছুটে এসে আহমদ মুসার সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিল,আমার ভুল হয়েছিল,আমি ওকে নিয়ে চলে গেছি।

আপনাদের কিছু বলে যেতে পারিনি। আপনাদের যাওয়া হবে না,আমি যেতে দেব না। শিশুর মত জেদ নাতাশার কন্ঠে ঝরে পড়ল।

আহমদ মুসা হেসে বলেছিল,কোন ভুল হয়নি বোন। তোমার এই আমন্ত্রনের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ,কিন্তু আমরা প্রিষ্টিনায় দেরি করতে পারবো না,বেলগ্রেড যাব আমরা। এখন বাস ষ্ট্যান্ডে যাচ্ছি।

নাতাশা দু'হাত মেলে আরও শক্ত করে দাঁড়িয়ে বলেছিল,আমি কোন কথা শুনব না। আপনাদের যাওয়া হবে না। মাজুভ আপনাদের কিছু বলতে পারেনি আমি ওর হয়ে মাফ চাচ্ছি।

--এভাবে কথা বললে দুঃখ পাব বোন। বলেছি তো তোমাদের কোন ভুল হয়নি। তোমারা দু'জনেই অসুস্থ। মাজুভের জন্য এখনই তোমাকে ডাক্তার ডাকতে হবে। অযথা ঝামেলা বাড়িয়ো না। আর আমাদের জরুরি কাজ, তাড়াতাড়ি যেতে হবে। বলেছিল আহমদ মুসা।

--দেখুন কথা বাড়িয়ে লাভ হবে না, আমি যেতে দেব না, আমি বলেছি। একটা নিখাঁদ আন্তরিকতার সুর নাতাশার কথায়।

নাতাশার এই অনুরোধ উপেক্ষা করে চলে যাওয়া আহমদ মুসা ও হাসান সেনজিকের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

পুরো দুই দিন হলো তারা নাতাশার বাড়িতে। এর মধ্যে যাবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু নাতাশা যেতে দেয়নি। গত দুই দিনে আত্মীয়-স্বজনের স্রোত এসেছে নাতাশার। আহমদ মুসারাই যে তাদের জীবন রক্ষা করেছে, না হলে গাড়ির সাথে পড়ে যে ছাই হয়ে যেতে হতো, এ কথাটা সবার কাছে বার বার বলেছে। পরিচয় করিয়ে দিয়েছে নতুন জীবনদাতা হিসেবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কারো কাছেই নাতাশা, আহমদ মুসাদের মুসলিম পরিচয় প্রকাশ করেনি। এর কারণ হিসেবে আহমদ মুসাকে নাতাশা বলেছে, অহেতুক প্রশ্ন সৃষ্টি করে, আর পরিবেশ খারাপ করে লাভ কি। মুসলিম পরিচয় যে এখানে কত অগ্রহণযোগ্য, কত বিপদের কারণ আহমদ মুসা তা এ থেকে আরও বেশি বুঝেছে। এ জন্যেই দিমিত্রি মুসলিম পরিচয় প্রকাশ করার ব্যাপারে আপত্তি তুলেছিল।

নাতাশা এবং বাড়ির অন্যান্যদের আন্তরিক ব্যবহার আহমদ মুসাদের মুগ্ধ করেছে, বরং যত্নের আতিশয্যে তারা বিব্রতই বোধ করেছে। কিন্তু একটা বিষয় আহমদ মুসা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করেছে, মিঃ মাজুভ যেন তাদের কাছে সহজ হতে পারছে না। সে কথা বলে, কিন্তু তার সাথে যেন অন্তরের কোন যোগ নেই। একটা জমাট গাম্ভীর্য, একটা বিষন্নতা যেন সব সময় তাকে ঘিরে থাকে। আহমদ মুসা লক্ষ্য করেছে, নাতাশাও অনেক সময় এতে বিব্রত বোধ করেছে। মাজুভের এই আচরণের কোন ব্যাখ্যা আহমদ মুসা খুজেঁ পায়নি।

এই ব্যাখ্যা নাতাশাও খুজেঁ পায়নি। সেই গাড়ি থেকেই মাজুভের এই গাম্ভীর্য, এ বিষন্নতা নাতাশা লক্ষ্য করছে। অথচ মাজুভ এমন নয়। সে অত্যন্ত হাসি-খুশি এবং অতিথিপরায়ণ। কেন সে হঠাৎ এমন হয়ে গেল। এটা তার মাথায় আঘাত লাগার কোন প্রতিক্রিয়া কি! এই চিন্তা মনে আসলেই নাতাশা ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে।

সেদিন রাত ১১টা। নাতাশা এসে শুয়ে পড়েছে। কিন্তু মাজুভ শুতে আসেনি। নাতাশা বিছানা থেকে উঠল।

এগুলো স্টাডি রুমের দিকে। দেখল, মাজুভ চেয়ারে গা এলিয়ে ছাদের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার চোখ-মুখ গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন। সেই বিষন্নতার একটা প্রলেপ সারা মুখে।

নাতাশা ধীরে ধীরে গিয়ে মাজুভের ঘাড়ে হাত রাখল। মাজুভের তাতে কোন ভাবান্তর হলো না। সে ঐভাবেই উপর দিকে চেয়ে রইল।

উদ্বেগে আকূল হয়ে উঠল নাতাশার বুক।

নাতাশা তার মাথাটি ধীরে ধীরে মাজুভের কাঁধে রেখে বলল, ওগো তোমার কি হয়েছে, তোমাকে এত গম্ভীর, এত বিষন্ন, এত চিন্তান্বিত তো আর কোন সময় দেখিনি।

বলতে বলতে নাতাশা কেঁদে ফেলল।

মাজুভ ঐভাবে থেকেই নাতাশার একটা হাত টেনে নিল নিজের হাতের মধ্যে। বলল, বুঝতে পারছি নাতাশা তুমি কষ্ট পাচ্ছ, কিন্তু আমিও যে খুব কষ্টে আছি। দ্বন্দ্ব-সংঘাতে আমার হৃদয় যে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে।

--আমাকে বলতে পার না সেটা কি? কোন দিন তো তুমি কিছু গোপন করনি।

--শুনলে তুমিও কষ্ট পাবে, নাতাশা।

--এ কথা কেন ভাবছ তুমি, তোমার কষ্টের শেয়ার আমার তো প্রাপ্য।

--বিষয়টা আহমদ মুসা ও হাসান সেনজিককে নিয়ে। আমি ভয়ানক উভয় সংকটে পড়েছি।

চমকে উঠল নাতাশা স্বামীর কথায়। ওদের নিয়ে আবার সংকট কি! বলল, বল ওদের নিয়ে কি সে সংকট। ওরা তো অত্যন্ত ভাল লোক।

--ভাল বলেই তো সংকট বেড়েছে, নাতাশা।

--তোমার কথা আমি কিছুই বুঝছি না।

--যে লোকটাকে আমরা হন্যে হয়ে খুঁজছি, যে লোকটিকে ধরার জন্যে হাজার হাজার ডলার খরচ হচ্ছে, যে লোকটি আজ বলকানের খৃস্টান সমাজের লক্ষ্যবস্তু, হাসান সেনজিক সেই লোক।

--এই হাসান সেনজিক সেই হাসান সেনজিক?

--হ্যাঁ

--আর যে ভয়ংকর লোকটি হাসান সেনজিককে হোয়াইট ওলফের হাত থেকে উদ্ধার করেছে, যে ভয়ংকর লোকটি তিরানার জেমস জেংগার মত দুর্ধর্ষ লোককে পরাভূত ও নিহত করে হাসান সেনজিককে মুক্ত করেছে, যে ভয়ংকর লোকটি কাকেজীর ব্ল্যাক ক্যাটের দখল থেকে পুনরায় হাসান সেনজিককে তুলে এনেছে, যে ভয়ংকর লোকটি ফিলিস্তিন, মিন্দানাও, মধ্য এশিয়া এবং ককেশাস বিপ্লবের নায়ক, সেই ভয়ংকর লোকটিই হলো আহমদ মুসা।

নাতাশা কোন কথা বলতে পারলো না। প্রায় কাঁপতে কাঁপতে সে গিয়ে মাজুভের পাশের চেয়ারে বসল। বহুক্ষণ সে দু'হাতে মাথা ধরে টেবিলে কনুই ভর দিয়ে মাথা নিচু করে বসে থাকল। বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে যেন সে।

মাজুভ ধীরে ধীরে নাতাশার পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, বলেছি না নাতাশা, যে তুমি কষ্ট পাবে শুনলে, আমার চেয়ে বেশি কষ্ট।

অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলল নাতাশা। উদ্বেগ ও আতংকে বিধ্বস্ত তার মুখ। বলল, মাজুভ সত্যই চিনেছ তাঁদের তুমি?

'আমার জ্ঞান ফিরে আসার পর হাসান সেনজিককে একনজর দেখেই আমি চিনতে পেরেছি, তার ফটো আমার বহুল পরিচিত। তারপর তাঁদের নাম শুনে কোন সন্দেহই আমার আর রইলনা। আর স্টিমলে'তে যে ঘটনা ঘটল তাতে তো প্রমাণই হয়ে গেল এরাই তাঁরা। স্টিমলে'তে যে লোকটি হাসান সেনজিককে ধরে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, সে লোকটিকে আমি চিনি আমাদের মিলেশ বাহিনীর লোক।' বলল মাজুভ।

আবার অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল নাতাশা। তারপর বলল, কিন্তু পরিচয় ওদের যাই হোক, তুমি ওদের কেমন দেখলে বলত?

'সেখানেই তো হয়েছে মুস্কিল, নাতাশা' বলতে শুরু করল মাজুভ, 'আমি যে পরিচয় ওদের জানি, তার সাথে যেমন ওদের দেখছি তা মিলছে না। বিপদে-আপদে সাহায্য চোর-ডাকাতরাও করতে পারে, কিন্তু যে আন্তরিকতা তাঁদের কাছ থেকে পেয়েছি, তা দুষ্ট প্রকৃতির কারও কাছ থেকে পাওয়া যেতে পারে না। আর স্টিমলে'তে একজন শত্রুর সাথে যে আচরণ আহমদ মুসা করল, তা অতি উদার ও মহৎ হৃদয়ের কাজ। এছাড়া যে ধরণের কথা তাদের কাছ থেকে শুনে আসছি, যে আচরণ আমরা পেয়ে আসছি, তা উন্নত মানব প্রকৃতির দ্বারাই শুধু সম্ভব।'

মাজুভ থামলে নাতাশা বলল, 'আর দেখ না, ওদের নামটা ওরা যেভাবে প্রকাশ করে দিল, আমরা হলেও তা করতাম না।'

--ঠিক বলেছ, নাতাশা, আমি ওদের মুখ থেকে ওদের নাম শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছি। অথচ ওরা ভাল করেই জানে ওদের চারপাশের বিপদের কথা। ওদের এই আচরণের ব্যাখ্যা দু'টো হতে পারেঃ এক, ওরা নিজেদের শক্তির উপর এতটাই আস্থাশীল যে, এসবকে তারা পরোয়া করে না, দুইওরা ওদের . আল্লাহর উপর এতটাই নির্ভর যে, দুনিয়ার আর কাউকেই তাঁরা ভয় করে না। ব্যাখ্যা যেটাই হোক, উভয় ক্ষেত্রেই তাঁদের উন্নত চরিত্রবলের প্রমাণ হয়। বলল মাজুভ।

--আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করেছ, ওদের ব্যবহার কত শালীন ও সংযত। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ওরা কোন সময় কথা বলেনি। মাটির পৃথিবীতে এমন মানুষও আছে, তা আমি কোনদিন ভাবিনি। আর দেখ, দু'দিন ওদেরকে আমরা প্রায় জোর করেই রেখেছি। কি যে দ্বিধা'সংকোচের মধ্যে দিয়ে ওরা এই দু-টো দিন আছে। অতি উন্নত ও রুচির মানুষ না হলে এমন হতে পারে না।

--নাতাশা, মুশকিল তো এখানেই। তারা আমাদের মত সাধারণ মানুষ হলেও কখন ওদের মিলেশ বাহিনীর হাতে তুলে দিতাম। বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ওদের মহত্ব, অপরূপ চরিত্র। অন্যদিকে জাতির একজন হিসেবে, মিলেশ বাহিনীর একজন হিসেবে আমার কর্তব্য ওদেরকে ধরিয়ে দেওয়া। কর্তব্য ও মানবিক নীতিবোধের দ্বিমুখী এই সংঘাতে আমি ক্ষতবিক্ষত হচ্ছি নাতাশা।-

নাতাশা কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে চুপ করে থাকল। তারপর মাথা তুলে বললওদেরকে ধরিয়ে দেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না ., ওরা আমাদের কাছে কোন অন্যায় করেনি। আর ওরা অন্যায় করার মত লোক বলে আমরা বিশ্বাসও করি না।

মাজুভ হাসল। বললওরা অপরাধ করেছে ., একথা কেউ বলছে না, নাতাশা, অপরাধ উত্তরাধিকার সূত্রে এসে ওদের ঘাড়ে বর্তেছে।

--ব্যাপারটা কি হাস্যকর নয়? দুনিয়ার কোন আইনে এটা বৈধ?

--এসব কথা আর কারো বিবেচ্য নয়, স্টিফেন বিশ্বাসঘাতক, জাতিদ্রোহী, তার উত্তরাধিকারীদেরকে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ব করতে হবে।

একটু থামল মাজুভ তারপর বলল, জাতির একজন সদস্য আমি নাতাশা। জাতির সাথে আমি বিশ্বাস- ঘাতকতা করব কি করে? আমি উভয় সংকটে।

নাতাশা কিছুক্ষণ ভেবে বলল, সংকট কিছু নয় মাজুভ, ওরা চলে যাবে। তুমিও ব্যাপারটা কাউকে জানাবে না, তা'হলেই হলো।

'কিন্তু নাতাশা' বলল মাজুভ, 'আমার শপথ আছে, আমি শপথ ভাঙব কি করে?'

নাতাশা একটু চিন্তা করে হাসি মুখে বলল, ঠিক আছে সব আমার উপড় ছেড়ে দাও। তোমাকে শপথ ভাঙতে হবেনা। চল এখন শুব, চল।

ওরা শোবার ঘরে চলে এল। শুয়ে পড়ল দু'জনে।

সকালে যখন মাজুভের ঘুম ভাঙল, দেখল নাতাশা মুখ ভার করে পাশে বসে আছে। চিন্তায় কপালটা কুঞ্চিত তার। বিস্মিত হলো মাজুভ। নাতাশা তো এত তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠেনা মাজুভ উঠে অনেক ডাকা ডাকি করে নাতাশাকে জাগায়।

মাজুভ তাড়াতাড়ি উঠে বসে বলল, কি ব্যাপার এত তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠেছ, আবার বসে আছ মুখ ভার করে!

নাতাশা মুখ নিচু করে বলল, আমি ব্যর্থ হয়েছি মাজুভ।

--কি ব্যর্থ হয়েছ, বুঝলামনা।

--কাল রাতে তোমাকে বলালম না, তোমার শপথ ভাঙতে হবেনা, আমার উপর ছেড়ে দাও সব।

--হাঁ বলেছিলে, তার কি হয়েছে?

--আমি সেটা পারিনি মাজুভ।

--কি পারনি?

--আমি পরিকল্পনা করেছিলাম, তোমার অজান্তে সব বলে ওদের পালিয়ে যেতে দিব। আমি তা পারিনি।

চমকে উঠল মাজুভ। এতক্ষণে ব্যাপারটা তার কাছে পরিষ্কার হলো। নাতাশার এ ধরনের একক উদ্যোগে সে বিস্মত হলো, আবার মজাও পেল। বলল, পারনি কেন? কে বাধা দিল তোমার ষড়যন্ত্রে?

--হ্যাঁ, ষড়যন্ত্রই বলতে পার। ষড়যন্ত্র করে দুই কুল রক্ষা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পারলাম না।

নাতাশার মুখ গম্ভীর, কন্ঠটা তার ভারি হয়ে উঠল।

--পারনি? কেন বলনি তাদের?

--বলেছি।

--তাহলে?

--ওরা এভাবে যেতে রাজী হননি। এভাবে পালাতে চান না তারা।

--কি বলছ তুমি! তুমি জানিয়েছ যে, আমি মিলেশ বাহিনীর লোক। ওদের সব পরিচয় আমি জানি।

--বলেছি। এও বলেছি যে, তোমার অজান্তে তাদের পালাবার সুযোগ করে দিচ্ছি।

--কেন পালাল না তারা। কি বলেছে?

--তারা বলেছে, এভাবে পালিয়ে তারা আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি কিংবা বিরোধ সৃষ্টি করতে চায়না।

--এ কথা বলেছে তারা!

মাজুভের চোখে-মুখে অপার এক বিস্ময় ফুটে উঠল। মাজুভের মন নাতাশার এই কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইছে না। স্বামী-স্ত্রীর একটা বিরোধের দিক বিবেচনা করে মানুষ কেমন করে এত বড় বিপদ মাথায় তুলে নিতে পারে।

মাজুভ উঠে দাঁড়াল। বলল, চল নাতাশা আমি ওদের সাথে কথা বলব।

--কি বলবে তুমি?

--ভয় করো না নাতাশা, তোমার স্বামী মানুষ!

মাজুভ এবং নাতাশা এল আহমদ মূসা এবং হাসান সেনজিক যে ঘরে রয়েছে সেই ঘরে।

হাসান সেনজিক তার খাটে শুয়েছিল। আর আহমদ মুসা দাঁড়িয়ে ছিল জানালায় বাইরের দিকে মুখ করে।

দরজায় নক করে মাজুভ ঘরে ঢুকল।

আহমদ মুসা দূরে দাঁড়িয়েছিল।

মাজুভকে দেখে আহমদ মুসা হেসে দু'পা এগিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল মাজুভের দিকে। বলল, মিঃ মাজুভ আমি আপনার কথাই ভাবছিলাম।

--কি ভাবছিলেন আমার কথা? ম্লান হেসে বলল মাজুভ।

হাসান সেনজিক শোয়া থেকে উঠে বসেছিল।

আহমদ মুসা মাজুভ এবং নাতাশেকে বসার অনুরোধ করে আরেকটা সোফায় নিজে বসতে বসতে বলল, বিদায় নিতে চাই আপনার কাছ থেকে। থাকলাম তো দু'দিন রাজার হালে।

--বিদায় যদি না দিতে চাই?

--তবু বিদায় দিতে হয়ই। হেসে বলল আহমদ মুসা!

--আমি কে জানেন তো?

--জানতাম না, নাতাশা বলেছে।

--এখন যদি মিলেশ বাহিনীর হাতে তুলে দেই?

--আমরা নিষেধ করবনা।

--কেন?

--এটা না করাই আপনার জন্য অস্বাভাবিক!

--নাতাশা বলার পর কেন আপনারা নিরাপদে যাবার সুযোগ ছেড়ে দিলেন?

--আমাদের জন্য কেউ অসুবিধায় বা বিপদে পড়ুক তা আমরা চাইনা।

--এভাবে আপনারা ধরা দিতে চাচ্ছেন কেন?

--না, আমরা ধরা দিতে চাইনা।

--তাহলে আপনি কি মনে করেন, আমি চাইলেও মিলেশ বাহিনীর হাতে আপনাদের ধরিয়ে দিতে পারব না?

--আমি তা বলিনি, আমি বলেছি আমরা ধরা দিতে চাইনা। হেসে বলল আহমদ মুসা।

--ধরা দিতে চান না,কিন্তু ধরা তো দিয়েছেন। আপনারা এখন আমার হাতে। মিলেশ বাহিনীর হাতে তুলে দিতে পারি আপনাদের।

--আপনি চেষ্টা করবেন ওদের হাতে তুলে দিতে, আমরা চেষ্টা করব ধরা না পড়তে। ফল কি হবে আমরা জানিনা।

মাজুভ কোন জবাব দিলনা। মূহুর্ত কয়েক চুপ করে থেকে বলল, বুঝতে পারছি নিজের শক্তির উপর অসীম আস্থা আপনাদের।

--না, আমরা নির্ভর করি আল্লাহর সাহায্যের উপর, কারণ আমরা ন্যায়ের উপর রয়েছি।

--এ দাবী তো আমাদেরও, ন্যায়ের উপর আছি।

--ন্যায় তো দু'টি হতে পারেনা?

--ঠিক।

--এখন বলুন হাসান সেনজিক কি অন্যায় করেছে, কোন ক্ষতি করেছে আপনাদের কারো?

--না।

--তাহলে বিনা অপরাধে সে যখন জুলুম –নির্যাতনের শিকার, তখন আমরাই ন্যায়ের পক্ষে।

--হাসান সেনজিক প্রত্যক্ষ কোন অপরাধ করেনি, কিন্তু তার পূর্ব-পুরুষ রাজা স্টিফেনের পাপের ভার তার উপরও এসে বর্তেছে, তাকে পাপের প্রায়শ্চিত্য করতে হবে।

--আপনার বিচার-বুদ্ধি কি এতে সায় দেয়?

--সেটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। এটা তো ঠিক, রাজা স্টিফেন বিশ্বাসঘাতক, জাতির দুশমন।

--রাজা স্টিফেন আর যাই হোন বিশ্বাসঘাতক ছিলেন না। বলল হাসান সেনজিক।

এতক্ষন সে চুপ করে বসে আলোচনা শুনছিল। এবার সে আলোচনায় যোগ দিল।

--বিশ্বাসঘাতক ছিলেন না বলছেন? বলল মাজুভ।

--হ্যাঁ, বরং তিনি বিশ্বাস ও প্রতিশ্রুতির মর্যদা রক্ষা করতে গিয়েই সুলতান বায়েজিদের পক্ষে খৃস্টান-মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছিলেন।

--ইতিহাসকে ইচ্ছে মত সাজালে হবেনা বন্ধু।

--না মিঃ মাজুভ আমি ইতিহাসের কথাই বলছি।

দৃঢ়তার সাথে বলল হাসান সেনজিক।

একটু দম নিয়েই সে আবার শুরু করল, ১৩৮৯ সালের ২৭শে আগষ্ট কসভোর ভয়াবহ যুদ্ধে স্টিফেনের পিতা লাজারাস তুরস্কের সুলতান মুরাদের বিরুদ্ধে একাই লড়াই করেছিলেন। লাজারাস পরাজিত ও নিহত হলেন। এই সময় বুলগেরিয়ার রাজা সিসভেনও পরাজিত হন এবং তার রাজ্য তুর্কি-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। এই বলকান অঞ্চলের রাজা ও জনগণ গ্রীক চার্চের অন্তর্ভক্ত খৃস্টান বলে তাদের এই দুর্দিনে হাংগেরী, জার্মানী, ইতালি অর্থাৎ ক্যাথলিক খৃস্টান ধর্মমতের অনুসারী পশ্চিম ইউরোপ তাদের সাহায্যে আসেনি। বুলগেরিয়া তুর্কি-সাম্রাজ্যের অধীনে চলে যাবার পর লাজারাসের পুত্র স্টিফেন তার রাজ্য সার্ভিয়াকে রক্ষার জন্য সুলতান বায়েজিদের সাথে সন্ধি করেন। এ সন্ধির মাধ্যমে তিনি তার রাজ্য রক্ষা করেন। স্টিফেনের অপরাধ এই সন্ধির প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। তিনি সন্ধি ভংগ করতে রাজী হননি। যে ক্যাথলিক পশ্চিম ইউরোপ এবং ক্যাথলিক পশ্চিম ইউরোপের যে ধর্মগুরু পোপ নবম বেনিফেস সার্ভিয়ার দুর্দিনে টু শব্দটিও করেননি, সেই তারা তাদের স্বার্থে ১৩৯৪ সালে এসে স্টিফেনকে বলল সন্ধি ভংগ করার জন্যে। কিন্তু রাজা স্টিফেন এই সুবিধাবাদী লোকদের পরামর্শে সন্ধি ভংগ করে দেশকে, জাতিকে বিপদগ্রস্ত করতে রাজী হননি। আপনি রাজা স্টিফেনকে বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী বলছেন, কিন্তু সার্ভিয়া, বোসনিয়া অর্থাৎ আজকের যুগোশ্লাভিয়ার কোন লোক তাঁকে বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী বলতেই পারেন না। বরং তাদের উচিত ক্যাথলিক পশ্চিম ইউরোপের কু-পরামর্শের শিকার হয়ে তিনি দেশ ও জাতিকে ধ্বংস ও পরাধীনতার দিকে ঠেলে দেন নি এ জন্য তার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া।

থামল হাসান সেনজিক।

কথাগুলো খুব আগ্রহের সাথে শুনছিল মাজুভ। নাতাশার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

হাসান সেনজিক থামলেও মাজুভ বেশ কিছুক্ষণ কথা বলল না। ভাবছিল সে। বলল বেশ কিছু পর, মিঃ হাসান সেনজিক আপনি একটা নতুন দৃষ্টিকোণ তুলে ধরেছেন। ক্যাথলিক পশ্চিম ইউরোপের সাথে গ্রীক অর্থোডক্স বালকান অঞ্চলের এই পার্থক্যের কথা আমি কোন সময় ভাবিনি। আর পোপ নবম

বেনফেস ঘোষিত যে ক্যাথলিক ক্রুসেডে শামিল হবার জন্যে রাজা স্টিফেনকে সন্ধি ভংগ করতে বলেছিল সেটা সার্ভিয়ার মানুষের স্বার্থের অনুকূলে ছিল কি না তাও কোনো দিন ভেবে দেখিনি। এদিকটা থাক। একটা কথা বলুন, রাজা স্টিফেন সন্ধি শর্ত ভংগ করলেন না ঠিক আছে, কিন্তু নিকোপলিসের ভয়ানক যুদ্ধে রাজা স্টিফেন কেন ইউরোপীয় খৃষ্টান শক্তির বিরুদ্ধে সুলতান বায়েজিদের পক্ষে যোগ দিলেন? সবাই আমরা জানি, রাজা স্টিফেন সুলতান বায়েজিদের পক্ষে যোগ না দিলে সম্ভবত খৃষ্টান শক্তিরই জয় হত।

হাসান সেনজিক হাসলো। বলল, এখানেও রাজা স্টিফেন বিন্দুমাত্র অন্যায় করেন নি। দু'টো কারণে রাজা স্টিফেন নিকোপলিসের যুদ্ধে সুলতান বায়েজিদের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। প্রথম কারণ, সার্ভিয়ার জনগণের উপর ক্যাথলিক ক্রুসেডারদের অত্যাচার। রাজা স্টিফেন সন্ধি ভংগ করতে রাজী না হলে ক্যাথলিকদের মিলিত বাহিনী  সার্ভিয়ার জনপদে নিষ্ঠুর লুন্ঠন চালায় এবং এর শস্য-জনপদ বিরান ভূমিতে পরিণত হয়। এ ছাড়া এই ক্যাথলিক খৃষ্টান বাহিনী সার্ভিয়ার দানিয়ুব সীমান্তের ভাদিন এলাকা এবং আর্সোভা দুর্গ দখল করে নেয়। এরপর সার্ভিয়ার রাকো দুর্গে যে হত্যাকান্ড তারা চালায় তার নজির ইউরোপে খুব কমই আছে। দুর্গের সৈন্যেরা অস্ত্রত্যাগ ও আত্মসমর্পণ করে তাদের আশ্রয় প্রর্থণা করলেও রাকো দুর্গের সব সৈন্যকে তারা নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। এরপরই রাজা স্টিফেন নিকোপলিসের যুদ্ধে সুলতান বায়েজিদের পক্ষে যোগদান করেন। দেশ ও জনগণের অস্তিত্বের প্রয়োজনেই এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল রাজা স্টিফেনকে। এছাড়া সন্ধির শর্ত অনুসারে সুলতান বায়েজিদ আইনত রাজা স্টিফেনকে সাহায্যের জন্য ডাকতেও পারতেন। সুতরাং নিকোপলিসের যুদ্ধে সুলতান বায়েজিদের পক্ষে যোগদান করে রাজা স্টিফেন কোন দিক দিয়েই অন্যায় করেন নি।

থামলো হাসান সেনজিক।

গভীর মনোযোগের সাথে হাসান সেনজিকের কথা শুনছিল মাজুভ। তার মুখের মলিন গাম্ভীর্য দূর হয়ে সেখানে আনন্দের উজ্জ্বলতা এসেছিল।

হাসান সেনজিক থামলে মাজুভ বলল, ধন্যবাদ মিঃ হাসান সেনজিক, আপনি আমার চোখ খুলে দিয়েছেন। কিন্তু একটা প্রশ্ন, রাজা স্টিফেনের উপর মিলেশ বাহিনী বিশেষ ক্ষুব্ধ এই কারণে যে, তিনি তার বোন ডেসপিনাকে সুলতান বায়েজিদের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন, এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি?

হাসান সেনজিক বলল, এটাও কোন কারণ আসলে নয়। এটাই যদি কারণ হয়, তাহলে গ্রীক সম্রাট ক্যান্টাকুজেনী, যিনি তার কন্যা থিয়োডরাকে তুর্কি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ওসমানের পুত্র অর্থানের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন, এবং বুলগেরিয়ার রাজা ক্রাল সিসভেন, যিনি সুলতান মুরাদকে তার কন্যাদান করেছিলেন, প্রমুখের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ ওঠেনা কেন?

মাজুভ হাসল। বলল, স্টিফেন পরিবারের বিরুদ্ধে আরেকটা অভিযোগ হলো, সুলতান বায়েজিদের বেগম লেডি ডেসপিনার মাধ্যমে স্টিফেন পরিবার শুধু ইসলাম গ্রহণ-ই করেনি, গোটা বলকানে ইসলামের বাণী ছড়াবারও সব ব্যবস্থা করে।

মাজুভ থামার সংগে সংগেই হাসান সেনজিক উৎসাহের সাথে জবাব দিলো, এ অভিযোগ আমি মাথা পেতে নিচ্ছি। বলকানে ইসলাম প্রচারের ব্যবস্থা করে স্টিফেন পরিবার অন্যায় করেনি। সকলেরই নিজ নিজ ধর্ম প্রচারের অধিকার রয়েছে। ধর্ম প্রচার করা যদি স্টিফেন পরিবারের দোষ হয়, তাহলে এ দোষে ক্যাথলিকরাও মহাদোষী। কারণ গ্রীক-অর্থোডক্স খৃষ্টান অধ্যুষিত বলকানে তারা জুলুম অত্যাচারের মাধ্যমে ক্যাথলিক ধর্মমত প্রচার করেছে, স্টিফেন পরিবার এ জুলুম অত্যাচার অন্তত কারো উপর করেনি।

হাসান সেনজিকের কথা শেষ হবার সাথে সাথে মাজুভ উঠে দাঁড়িয়ে কয়েক পা এগিয়ে হাসান সেনজিককে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, ঠিক বলেছেন মিঃ হাসান সেনজিক, ক্যাথলিকরা তাদের ধর্মমত বলকানের উপর চাপিয়ে দেবার জন্য যে জুলুম-অত্যাচার ও নৃশংশতা করেছে, তার এক আনাও ইসলাম করেনি।

তারপর সোফায় ফিরে গিয়ে মাজুভ বলল, আমি খুবই আনন্দ বোধ করছি। আমার প্রিয় মাতৃভূমি সার্ভিয়ার ইতিহাসকে এমন স্বচ্ছভাবে কোন সময় আর দেখিনি।

মাজুভ থামলে হাসান সেনজিক শুরু করল। বলল, আমার মনে হয় কি জানেন মিঃ মাজুভ, মিলেশ বাহিনীর নেতা ক্যাথলিক কনস্টানটাইন স্টিফেন পরিবারের উপর প্রতিশোধ নিচ্ছে এই কারণে যে, রাজা স্টিফেন ক্যাথলিকদের বিরোধিতা করেছিল। একই সাথে কনস্টানটাইন এদেশে ক্যাথলিক ধর্মমত প্রতিষ্ঠা এবং স্টিফেন পরিবারকে নির্মুল করার আড়ালে বলকান থেকে ইসলামকে নির্মূল করতে চায়। এতে গ্রীক-অর্থোডক্স ধর্মমত এবং ইসলাম দু'ই শেষ হয়ে যাবে। অতএব স্টিফেন পরিবারের কোনো অপরাধ নয়, বরং ক্যাথলিক স্বার্থ চরিতার্থই.....

'থামুন মিঃ হাসান সেনজিক' হাসান সেনজিককে বাধা দিয়ে বলতে শুরু করলো মাজুভ,'কি বললেন মিলেশ বাহিনী বলকানে ক্যাথলিক খৃষ্টানদের স্বার্থ রক্ষা করছে? তাই কি?

বলে মাজুভ নিরব হলো মুহূর্তের জন্যে। তারপর সোফায় গা এলিয়ে অনেকটা স্বগত কণ্ঠেই বলল,'মিলেশ বাহিনী ক্যাথলিক স্বার্থের প্রতিভূ বলেই কি মিলেশ বাহিনীর নেতা কনস্টানটাইনের অফিসে তার মাথার উপর সম্রাট সার্লেম্যানের পূর্ণ দৈর্ঘ্য ছবি টাঙানো? এই সম্রাট সার্লেম্যানকেই তো ক্যাথলিক পোপ রোম সম্রাটের মুকুট পরিয়েছিলেন।'

অনেকটা আনমনাভাবেই বসা থেকে ওঠে দাঁড়াল মাজুভ। ঘর থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে পা বাড়াল সে।

নাতাশাও উঠে দাঁড়াল। তার মুখে মিস্টি হাসি। আহমদ মুসাদের লক্ষ্য করে বলল, আপনারা নাস্তা করতে আসুন।

পরদিন সকাল ৮ টা। লাজার মাজুভ পায়চারি করছিল বাগান সংলগ্ন খোলা বারান্দায়।

তার মুখ প্রসন্ন। মুখ থেকে তার সেই বিষন্নতার মেঘ, মনের সেই উভয় সংকটের সংঘাত কেটে গেছে। আহমদ মুসাদের প্রতি তার মনটা আগেই ঝুঁকে

পড়েছিল। বাকি ছিল কিছু জিজ্ঞাসার দেয়াল এবং জাতির প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্যের প্রশ্ন। কিন্তু হাসান সেনজিকের সেদিনের কথাগুলো এবং তাদের সাথে আলোচনার পর সে জিজ্ঞাসার সবই উবে গেছে। এবং যাকে সে জাতির প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য বলে মনে করেছিল, তাকে এখন তার কান্ডহীনতাই শুধু নয়, জাতির জন্যে ক্ষতিকর বলেই মনে হচ্ছে। তার এ বিশ্বাস এখন দৃঢ় যে, রাজা স্টিফেন কোনো অন্যায় করেনি, বরং নীতি ও ওয়াদার প্রতি বিশ্বস্ততা এবং জাতির প্রতি দায়িত্ববোধেরই পরিচয় দিয়েছে। সুতরাং মাজুভ মিলেশ বাহিনীর সাথে তার সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। সে আরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে গ্রীক-অর্থোডক্স চার্চের হাজার হাজার সদস্যকে ক্যাথলিক মিলেশ বাহিনীর খপ্পর থেকে ছাড়িয়ে আনবে। মিলেশ বাহিনীর আন্দোলন বলকানের স্বার্থে নয়, পশ্চিম ইউরোপের ক্যাথলিক চার্চের স্বার্থে। এ ষড়যন্ত্র রুখতে হবে।

মাজুভের পরনে বাইরে বেরুবার পোশাক।

আহমদ মুসা এবং হাসান সেনজিকও বাইরে বেরুবার পোশাক পরে বারান্দায় বেরিয়ে এলো।

পেছনে পায়ের শব্দ শুনে পায়চারি বন্ধ করে থমকে দাঁড়াল মাজুভ।

মাজুভ আহমদ মুসাদের দিকে ফিরে দাঁড়াতেই আহমদ মুসা বলল, কোথায় আমরা যাচ্ছি বললেন না তো?

--খুব ভালো জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি। বলল মাজুভ। তার মুখে হাসি।

এই সময়ে নাতাশাও প্রস্তুত হয়ে বারান্দায় তাদের পাশে এসে দাঁড়াল। আজ নাতাশার পরনে গোলাপী ঢিলা একটা স্কার্টের উপরে গোলাপী ঢিলা একটা জামা। আর প্রথম বারের মতো মাথায় একটা রুমাল বেধেছে, গোলাপী রং এর।

বলকানের অনেক মুসলিম পরিবারের মেয়েরা মুসলিম ঐতিহ্য হিসেবে বাইরে বেরুবার সময় এখনও মাথায় রুমাল বাধে।

নাতাশার মাথায় রুমাল বাধা দেখে বিস্মিতই আহমদ মুসা। বলল, ধন্যবাদ বোন।

নাতাশা হেসে বলল, মাথায় রুমাল বেধে আমার কি যে ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে, আমি যেন উচ্চতর কোনো অভিজাত পর্যায়ে উন্নীত হলাম।

‘স্বাভাবিক বোন' বলল আহমদ মুসা, ‘মানব প্রকৃতির সাথে এর মিল আছে। মানুষের স্রষ্টা মেয়েদেরকে মাথায় ও গায়ে চাদর রাখতে বলেছেন। এটা তাদেরকে শোভন, সুন্দর এবং উন্নততর আচরণে অভ্যস্ত করে।'

বলে আহমদ মুসা মাজুভের কথার দিকে মনোযোগ দিলো। বলল, আমি যে কথা বলছিলাম, আমরা যাচ্ছি সেই ভালো জায়গাটা কি?

‘ভয় করছে নাকি?’ বলল মাজুভ। হাসল। তারপর আহমদ মুসাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বলল, আমি আপনাদেরকে কসভোর সেই ঐতিহাসিক যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যাব যেখানে রাজা লাজারাস ও সুলতান মুরাদের ঐতিহাসিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। যে যুদ্ধে সুলতান মুরাদের বিজয় দানিয়ুবের দেশে ইসলামের বিস্তারকে নিশ্চিত করে তুলেছিল।

কসভো প্রান্তরের নাম শুনে আহমদ মুসার হৃদয় রোমাঞ্চিত হলো। বলল, কোথায় সেই কসভো প্রান্তর?

--এখান থেকে ৫০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পুর্বে মনাস্তিরের দক্ষিণে। এই সিটনিক নদী সে কসভো প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে গেছে। বলল মাজুভ।

বারান্দার নিচেই চার সিটের একটা জীপ দাঁড়িয়েছিল। বারান্দার গা থেকে শুরু হয়ে একটা লাল সুরকীর রাস্তা বাগান পেরিয়ে লাজারাস এভেনিউতে গিয়ে পড়েছে।

--ধন্যবাদ মাজুভ, খুব খুশী হয়েছি আপনার এই ‘সাইট’ সিলেকশনে। বলল আহমদ মুসা।

--ধন্যবাদ। আমি মনে করি সেখানে গিয়ে আপনারা আরও খুশী হবেন।

সবাই বারান্দা থেকে নেমে এল।

ড্রাইভিং সিটে বসল মাজুভ। তার পাশে নাতাশা। আর পেছনের দু’সিটে আহমদ মুসা এবং হাসান সেনজিক।

গাড়ি স্টার্ট নিল।

গাড়ি বাগান পেরিয়ে এসে পড়ল লাজারাস এভেনিউতে। ছুটতে শুরু করল লাজারাস এভেনিউ ধরে।

মাজুভের দু'টি হাত স্টিয়ারিং হুইলের উপর। দৃষ্টি তার সামনে প্রসারিত। বলল, মিঃ আহমদ মুসা, আমার নতুন জীবন শুরু হলো। এর আগে কসভো'র যুদ্ধক্ষেত্রে গেছি সুলতান মুরাদকে হত্যাকারী বলকানের জাতীয় বীর 'মিলেশ কবি লোভিশ' এর বেদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে মিলেশ বাহিনীর জন্যে নতুন শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে। আর আজ যাচ্ছি 'মিলেশ কবি লোভিশ' এর বেদেহী আত্মাকে এ কথা বলতে যে, মিলেশ বাহিনী বলকানের মানুষের স্বার্থে নয়, সম্রাট সার্লেম্যানের ক্যাথলিক সাম্রাজ্য কায়েমের জন্যে চেস্টা করছে। আমার প্রতিটি পদক্ষেপ হবে এখন তাদের বিরুদ্ধে। থামল মাজুভ।

আহমদ মুসা বলল, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের সংগ্রামের এ নতুন পথে আমরা আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি মিঃ মাজুভ।

'ধন্যবাদ মিঃ আহমদ মুসা' বলতে শুরু করল মাজুভ, 'হাসান সেনজিকের কাছে আমি শুনেছি ফিলিস্তিন, মিন্দানাও, মধ্যএশিয়ে, সিংকিয়াং এবং ককেশাশের ন্যায়ের সংগ্রামে আপনার সুমহান কৃতির কথা। আমি প্রার্থনা করি, আপনার শুভ পদার্পণ 'দানিয়ুবের দেশে' নিয়ে আসুক অশান্তির বদলে শান্তি, হানাহানির বদলে প্রীতি-মৈত্রী, বিভক্তির বদলে ঐক্য এবং চুর্ণ করে দিক দানিয়ুবের দেশে জেঁকে বসা ষড়যন্ত্রের সৌধ। থামল মাজুভ।

আর কথা বলল না কেউ।

সবার দৃষ্টি সামনে- সামনের অনাগত পথের দিকে।

মাজুভের প্রার্থনার অবিনশ্বর শব্দগুলো বাতাসের ইথারে মিশে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে -- ধাবমান হলো উপরে-- উর্ধ্বাকাশে –আরশুল আজিমের দিকে।

আর তার নিচে মাটির বুক কামড়ে ছুটে চলছে মাজুভের গাড়ি লাজারাস এভেনিউ ধরে কসভোর পথে।

পরবর্তী বই

# দানিয়ুবের দেশে

## কৃতজ্ঞতায়ঃ

1. Shaikh Noor-E-Alam
2. Ismail Jabihullah
3. Osman Gani
4. Sabuz Miah
5. Ashrafuj Jaman
6. Mustafijr Rahaman
7. Tuhin Azad
8. Arif Rahman
9. Md. Jafar Ikbal Jewel
10. Abdullah Mohammad Choton
11. Rabiul Islam
12. AMM Abdul Momen Nahid
13. Rubel Hasan Mon
14. Mohammad Rayhan
15. Gaziur Rahman
16. Rashel Ahmed
17. Salahuddin Nasim
18. A.S.M Masudul Alam
19. Munjur Morshed
20. Anisur Rahman
21. Umayir Chowdhury
22. Ridwan Mahmud
23. Syed Murtuza Baker
24. Omar Faruk
25. Sk.Tariquel Islam
26. Nazrul Islam
27. Boshir Ahmed Sohel
28. Mostafizur Rahman
29. Saif Mahdee
30. Mohammod Amir

# সাইমুম-১১

# দানিয়ুবের দেশে

আবুল আসাদ

# ১

সিটনিক নদীর পশ্চিম তীরের হাইওয়ে ধরে ছুটে চলছিল মাজুভের জীপ।

মনাস্তিরের কাছাকাছি আসার পর হাইওয়েটি বেঁকে পশ্চিম দিকে চলে গেছে। এখানে মাজুভদের সিটনিক পার হয়ে সিটনিকের পূর্ব তীরের হাইওয়ে ধরে মনাস্তির পৌঁছতে হবে।

হাইওয়ের সেই বাঁকে এসে মাজুভের জীপ থামল।

নদী পার হবার জন্যে রয়েছে ব্রীজ।

ব্রীজটির বয়স বেশি নয়, কিন্তু ভূমিকম্পের ফলে ব্রীজে মারাত্মক ফাটল দেখা দেয়ার পর ব্রীজের উপর দিয়ে চলাচল নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। পণ্যবাহী ওয়াগন, ট্রাক পারাপার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ওগুলো এখন ফেরিতে পারাপার করে। যাত্রীবাহী বাস ও গাড়িগুলো ব্রীজ পার হওয়ার আগে গাড়িগুলো খালি করে দেয়। লোকদের হেটে ব্রীজ পার হতে হয়।

গাড়ি থামাল আহমাদ মুসা, হাসান সেনজিক এবং নাতাশা গাড়ি থেকে নেমে পড়ল।

মাজুভ ধীরে ধীরে গাড়ি চালিয়ে ব্রীজে উঠল।

মাজুভের গাড়ির আগে আরও একটা গাড়ি।

ধীরে ধীরে গাড়ি চলছে। লোকেরা গাড়ির দু'পাশ দিয়ে গাড়ির প্রায় সাথেই চলতে পারছে।

মাজুভ গাড়ি চালাচ্ছিল। তার দৃষ্টি ছিল সামনে।

হঠাৎ গাড়ির সামনে একজনের দিকে দৃষ্টি পড়তেই চমকে উঠল মাজুভ।

লোকটি গাড়ির সামনে রাস্তার একপাশ দিয়ে পথ চলছিল। দীর্ঘদেহী পেশি বহুল। চলার মধ্যে একটা ঔদ্ধত্য ভাব। দেখলেই বুঝা যায়, দাঙ্গা-হাঙ্গামায় বড় ওস্তাদ লোক।

মাজুভ লোকটিকে দেখে যখন চমকে উঠেছে, ঠিক তখন লোকটিও পেছনে ফিরে তাকিয়েছে। লোকটির দৃষ্টিও এসে পড়ল সরাসরি মাজুভের উপরেই। সঙ্গে সঙ্গে লোকটি থমকে দাড়াল। তার চোখে বিস্ময়। মাজুভের চমকে উঠার সাথে ছিল অস্থির ভাব, আর লোকটির বিস্ময়ের সাথে রয়েছে আনন্দ।

লোকটি দাঁড়িয়েই ছিল। তার মুখে হাসি।

মাজুভের গাড়ি পাশে আসতেই বলল, কি মিঃ মাজুভ আপনি ও বুঝি কসভো যাচ্ছেন?

লোকটি ইয়েলেস্কু। কনস্টানটাইনের দুর্ধর্ষ সহকারী, তার সব অভিযানের সাক্ষী।

মাজুভের মুখটা স্বাভাবিক। কিন্তু মনে তার কাঁপুনি ধরে গেছে ভয়ে। ভয়টা তার নিজের জন্য নয়। এখনি হাসান সেনজিক ইয়েলেস্কুর নজরে পড়ে যাবে, তখন কি ঘটবে এই ভয়ে।

হাসান সেনজিক এখনও ইয়েলেস্কুর নজরে পড়েনি। কারন হাসান সেনজিকরা যাচ্ছে গাড়ির ওপাশ অর্থাৎ উত্তর পাশ দিয়ে আর ইয়েলেস্কু যাচ্ছে দক্ষিণ পাশ দিয়ে।

মাজুভ মুখে হাসি টানার চেষ্টা করে বলল, হ্যাঁ মিঃ ইয়েলেস্কু, আমিও কসভোর পথে।

-ভালই হলো। আমার সাথে জর্জ এসেছে। আমরা 'মিলেশ' এর জন্মদিন এবার কসভোতে আনন্দের সাথেই সেলিব্রেট করতে পারব। হাসিতে মুখটি উজ্জ্বল করে বলল ইয়েলেস্কু।

ইয়েলেস্কুর কথা শোনার পরই শুধু মাজুভের খেয়াল হল, আজ মিলেশ-এর জন্মদিন। এই বিপদটা না ঘটলে মাজুভ মনে মনে হাসত এই বলে যে, মিলেশ-এর জন্মদিনে মাজুভের শুভ সংবাদটা মিলেশের বিদেহী আত্মাকে শোনানো খুবই ভাল হবে। কিন্তু এখন সে সব ভাবার অবস্থা মাজুভের নেই। তার সব চিন্তা এখন হাসান সেনজিককে নিয়ে। কি করে তাকে রক্ষা করবে।

-ঠিক বলেছেন মিঃ ইয়েলেস্কু। জর্জ কি গাড়িতে? মুখ স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে বলল মাজুভ।

জর্জ মিশেল বাহিনীর খুনে গ্রুপের একজন সদস্য। আদেশ পালন ছাড়া আর সে কিছু বুঝে না। সর্বক্ষণ সে ইয়েলেস্কু অথবা কনস্টানটাইনের কাছেই ঘুর ঘুর করে। লোক হত্যা তার কাছে পিঁপড়ে হত্যার চেয়ে বেশি কিছু নয়।

-হ্যাঁ, সে গাড়ি চালাচ্ছে। ড্রাইভার নেইনি। জানেন, মিঃ মাজুভ, লিডারও আসবেন সব ঠিক হয়েছিল। শেষ মুহূর্তে একটা ঝামেলায় তার প্রোগ্রাম বাতিল হলো। শেষে আমাকেই আসতে হলো তার প্রতিনিধিত্ব করতে ‘মিলেশ’-এর জন্মদিনের অনুষ্ঠানে।

ঝামেলার কথা শুনে মাজুভের বুকটা কেঁপে উঠল। এখনই সে হয়ত হাসান সেনজিক এর প্রশ্ন তুলবে। ‘মিলেশ’-এর ঝামেলা, বলতে এখন হাসান সেনজিককেই বুঝায়।

গাড়ি দুটো ব্রীজ পার হয়ে এসেছে। আগের গাড়িটা থেমে গেছে। আগের গাড়িটাই ইয়েলেস্কুর গাড়ি, জর্জ চালাচ্ছে।

আগের গাড়ি থামার সাথে সাথে মাজুভও গাড়ি থামিয়ে দিল।

মাজুভ সর্বান্তকরণে কামনা করছে ইয়েলেস্কু তাড়াতাড়ি উঠে যাক তার গাড়িতে এবং হাসান সেনজিক তার নজরে পড়া থেকে রক্ষা পাক।

গাড়ি থামলে ইয়েলেস্কু মাজুভকে বলল, মিঃ মাজুভ, তাহলে আসুন আমি গাড়িতে উঠি। আপানার সাথে আর কে আছে?

মাজুভের মুখ কালো হয়ে উঠল। কেঁপে উঠল তার বুক, গলা তার যেন শুকিয়ে যাচ্ছে। শুকনো কণ্ঠে বলল, আমার স্ত্রী।

কথা শেষ করতে পারল না মাজুভ। আর কথা শেষ করতে দিলও না ইয়েলেস্কু। হৈ হৈ করে উঠল সে। বলল, ভাবি সাথে আছে এতক্ষণ বলেননি! দেখা করেই গাড়িতে উঠি, কি বলবেন তাছাড়া উনি।

বলেই ইয়েলেস্কু গাড়ির সামনে দিয়ে কয়েক ধাপ এগিয়ে পেছনে তাকাল।

মাজুভের মাথা তখন ঘুরছে।

পেছনে তাকিয়েই চোখ দু'টি ছানাবড়া হয়ে গেল ইয়েলেস্কুর। সে দেখল, মাজুভের স্ত্রী নাতাশার আগে আগে হেটে আসছে হাসান সেনজিক। তার পাশে আরেকজন লোক। বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই ইয়েলেস্কু ছুটল হাসান সেনজিকের দিকে।

হাসান সেনজিক ও আহমদ মুসা তখন থমকে দাঁড়িয়েছিল। নাতাশাও তাদের পাশে এসে দাঁড়াল।

নাতাশা চিনতে পারল ইয়েলেস্কুকে।

মুহূর্তে ফ্যাকাসে হয়ে গেল নাতাশার মুখ। ইয়েলেস্কু এসে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, একে চিনেন মিসেস মাজুভ? ইয়েলেস্কুর ডান হাত তার কোটের পকেটে।

নাতাশা কোনও কথা বলতে পারল না। কোন কথা বেরুল না তার কণ্ঠ থেকে। কাঁপছিল সে।

ইয়েলেস্কু হাসান সেনজিকের দিকে আরও দু'ধাপ এগিয়ে হঠাৎ বাম হাত দিয়ে হাসান সেনজিকের টাই পেঁচিয়ে ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে বলল, পেয়েছি শয়তানের বাচ্চাকে, আমরা খুজে হয়রান।

বলে সে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলল হাসান সেনজিককে। ইয়েলেস্কু তার ডান হাত কোটের পকেট থেকে বের করে এনেছে। সে হাতে তার চক চকে একটা রিভলভার।

আহমদ মুসার মুখ ভাবলেশহীন। সে হাসান সেনজিকের পেছনে পেছনে চলল।

নাতাশা দৌঁড়ে গিয়ে মাজুভের পাশে দাঁড়াল। মাজুভ তখন গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির পাশেই দাঁড়িয়েছিল। সে কিংকর্তব্য বিমুঢ়। তার চোখে বোবা দৃষ্টি।

ইয়েলেস্কুর গাড়ি মাজুভের গাড়ি থেকে ১০ গজের বেশি দূরে নয়।

ইয়েলেস্কু মাজুভের গাড়ি অতিক্রম করে যেতে যেতে বলল, মিঃ মাজুভ আপনি কালসাপকে চিনতে পারেননি। বাঘের ঘরে এসে ঘোগ আশ্রয় নিয়েছে। বলে ইয়েলেস্কু মজা করার জন্য হাসান সেনজিকের টাই ধরে হঠাৎ প্রচণ্ড একটা হ্যাঁচকা টান দিল। এই হ্যাঁচকা টানে উপুড় হয়ে পড়ে গেল হাসান সেনজিক।

আহমদ মুসা এতক্ষণ নিরব ছিল। সে বুঝতে চাচ্ছিল মাজুভের ভুমিকা কি। মাজুভের গাড়ি বরাবর এসে মাজুভকে এক নজর দেখেই বুঝতে পারল মাজুভের কোন ষড়যন্ত্র এটা নয়।

হাসান সেনজিক তখন মাটি থেকে উঠছে। মাটি থেকে তার পিঠ একটু উচু হতেই একটা লাথি তুলল ইয়েলেস্কু।

-থাম, পা নামাও। খুব শান্ত, অথচ কঠোর কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

বিদ্যুৎ গতিতে ইয়েলেস্কু ঘুরে দাঁড়াল আহমদ মুসা দিকে। তার আগুনের মত দৃষ্টিটা নিক্ষেপ করল আহমদ মুসার দিকে।

কিছুক্ষন স্থির দৃষ্টিতে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, তোমার কথা ভুলেই গিয়াছিলাম। তুমিই জেমস জেঙ্গার সেই হত্যাকারী।

কথা শেষ করেই ইয়েলেস্কু তার ডান হাত উপরে তুলল। তার পিস্তল এর নল তখন আহমদ মুসার বুক বরাবর উঠেছে।

গজ দেড়েক দূরে দাঁড়িয়েছিল আহমদ মুসা। হঠাৎ আহমদ মুসার মাথা মাটির দিকে ছুটল, আর তার দুটি পা বিদ্যুৎ বেগে উঠে এল উপরে ইয়েলেস্কু ডান হাত লক্ষে। জোড়া পায়ের অব্যর্থ আঘাত।

ইয়েলেস্কুর হাত থেকে রিভলভার ছিটকে পড়ে গেল।

কিন্তু আহমদ মুসা মাটি থেকে উঠে দাঁড়ানোর আগেই ক্ষিপ্র গতিতে ইয়েলেস্কু ঝাপিয়ে পড়ল তাকে লক্ষ্য করে।

আহমদ মুসা চোখের পলকে একপাশে গড়িয়ে গেল। ইয়েলেস্কু লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে উপুড় হয়ে আছড়ে পড়ল মাটিতে।

বুকে ও মাথায় আঘাত পেয়েছিল ইয়েলেস্কু। কিন্তু বাঘের মত গোঁ গোঁ করে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে সে।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়েছিল। সে দেখল, ইয়েলেস্কুর জীপ থেকে একজন লোক নামল। লোকটি রিভলভার তুলছে তাকে লক্ষ্য করে।

পাশেই ইয়েলেস্কু টলতে টলতে উঠে দাঁড়াচ্ছে। আহমদ মুসা নিজের দেহকে ছুঁড়ে দিল ইয়েলেস্কুর পেছনে। জড়িয়ে ধরল তাকে পেছন থেকে।

লোকটি রিভলভার তুলেই চলন্ত আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে গুলি করল। লোকটি ভুল করেনি। আহমদ মুসা ইয়েলেস্কুর পেছনে না দাঁড়ালে গুলি তার বুক ভেদ করে যেত। কিন্তু যে গুলি আহমদ মুসার বুক ভেদ করত সে গুলি ইয়েলেস্কুর বুকে এসে বিঁধল।

লোকটি সম্ভবত তার ভুল বুঝতে পেরেছিল। দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল মুহুর্ত কয়েকের জন্য। তারপরই ছুটে আসতে লাগল রিভলভার বাগিয়ে।

আহমদ মুসার ডান পাশে হাত তিনেক দুরেই পড়েছিল ইয়েলেস্কুর সেই রিভলভার।

আহমদ মুসা ইয়েলেস্কুকে ছেড়ে দিয়ে ঝাপিয়ে পড়ল ঐ রিভলভারের উপর।

সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে শুরু করা লোকটি একটা গুলি করল। কিন্তু আহমদ মুসা তখন মাটিতে। গুলি মাথার উপর দিয়ে চলে গেল।

আহমদ মুসা ঝাপিয়ে পড়ে রিভলভার হাতে তুলে নিয়ে শুয়ে থেকেই গুলি করল ছুটে আসা লোকটি লক্ষ্য করে। লোকটি তৃতীয় গুলিটি করার আর সুযোগ পেল না। গুলি খেয়ে সে ছুটে আসা অবস্থাতেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মাটিতে।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। পকেট থেকে রুমাল বের করে ধুলা ঝাড়তে লাগল গায়ের।

মাজুভ এবং নাতাশা কাঠের মত দাঁড়িয়েছিল গাড়ির পাশে। উদ্বেগ-উৎকন্ঠায় তারা যেন বোবা হয়ে গিয়েছিল। হাসান সেনজিকও আহমদ মুসার একটু দূরে অভিভুতের মত দাঁড়িয়েছিল।

আহমদ মুসা মাজুভের দিকে তাকিয়ে ঈষৎ থেমে বলল, মিঃ মাজুভ কেচ্ছা শেষ। গাড়িতে উঠে বসুন। কেউ এসে পড়ার আগে আমাদের সরতে হবে।

বলে আহমদ মুসা রুমাল দিয়ে রিভলভারটি পরিষ্কার করে, রুমাল দিয়ে ধরেই ইয়েলেস্কুর ডান হাতে গুজে দিল।

তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাসান সেনজিককে বলল, এস।

বলে গাড়ির দিকে হাটতে শুরু করল আহমদ মুসা।

গাড়ির কাছে আসতেই মাজুভ ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে।

বলল, অভিনন্দন জানাচ্ছি মিঃ আহমদ মুসা। যা দেখলাম আমার কাছে অবিশ্বাস্য। ইয়েলেস্কু আর জর্জের মৃত্যু এত সহজে হল।

নাতাশার চোখে তখনও বিস্ময়ের ঘোর। তার উজ্জ্বল চোখ দু'টি আহমদ মুসার দিকে নিবদ্ধ।

আহমদ মুসা কথা না বাড়িয়ে বলল, চল গাড়িতে উঠি কেউ এখানে এসে পড়ার আগেই।

মাজুভ ড্রাইভিং সিটে উঠল। নাতাশা তার পাশের সিটে।

হাসান সেনজিকও গাড়িতে উঠেছে। আহমদ মুসা গাড়িতে উঠতে উঠতে বলল, আমি ওদের মারতে চাইনি মাজুভ। কিন্তু না মেরে উপায় ছিল না।

-হ্যাঁ, ইয়েলেস্কুকে তো জর্জই মারল। বলল মাজুভ।

-জর্জ কে? ইয়েলেস্কু কে? জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

-ইয়েলেস্কু 'মিলেশ বাহিনীর' নেতা কনস্টানটাইনের সহকারী এবং দক্ষিণ হাত আর জর্জ 'মিলেশ বাহিনীর' সবচেয়ে নিষ্ঠুর খুনি। সে কনস্টানটাইন ও ইয়েলেস্কুর সাথে ছায়ার মত থাকে।

আহমদ মুসা খুশি হলো। বলল, মিঃ মাজুভ আপনার নতুন জীবনের যাত্রা শুভ তাহলে আমরা বলব।

-কিন্তু ইয়েলেস্কুর হাতে যখন হাসান সেনজিক ধরা পড়ে গেল, তখন আমি ভাবছিলাম নতুন জীবনের যাত্রা আমার শুরুতেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। সমাপ্তির এই আশঙ্কাকে আপনিই শুভ'তে পরিণত করেছেন।

একটু ঢোক গিলেই মাজুভ আবার শুরু করল, কিন্তু লাশগুলো কি আমরা নদীতে ফেলে দিয়ে আসতে পারতাম না?

-না, যেভাবে আছে সেটাই ভাল। যে কেউ তাদের দেখে বুঝবে দু'জন দু'জনকে গুলি করে মেরেছে।

এ সময় মুখ খুলল নাতাশা। বলল, আপনি রিভলভারটা ঐভাবে রুমালে মুছে ইয়েলেস্কুর হাতে গুঁজে দিয়ে এলেন কেন?

হাসল আহমদ মুসা। বলল, রুমাল দিয়ে মুছে রিভলভার থেকে আমার হাতের দাগ মুছে ফেলেছি। তারপর গুঁজে দিয়েছি ইয়েলেস্কুর হাতে। এখন রিভলভারে শুধু ইয়েলেস্কুর হাতের দাগই পাওয়া যাবে। পুলিশ লাশগুলো পোষ্টমর্টেম করে দেখবে, ইয়েলেস্কুর গুলিতে জর্জ মরেছে, আর জর্জের রিভলভারের গুলিতে ইয়েলেস্কু মরেছে। অতএব দু'জন দু'জনার খুনী প্রমাণ হবে।

নাতাশা এবং মাজুভ দু'জনেই হেসে উঠল। নাতাশাই কথা বলল। বলল, এর মধ্যে এ বুদ্ধি আপনার মাথায় এল কি করে?

-বুদ্ধি আল্লাহর তরফ থেকে আসে নাতাশা। দেখবে সংকট সময়ে এমন বুদ্ধি তোমার মাথায় এসেছে যে বুদ্ধি তোমার বলে মনে হবেনা।

-এ আল্লাহর প্রতি আপনার কৃতজ্ঞতা। কিন্তু সত্যিই কি এভাবে বুদ্ধি আসে? বলল নাতাশা।

-আসে। ইসলামের পরিভাষায় একে বলা হয় 'ইলহাম'। আল্লাহ তার বান্দাদের এভাবেই সাহায্য করেন। গাড়ী তখন ছুটে চলছিল পূর্ণ গতিতে মনাস্তিরের দিকে।

আহমদ মুসা কথা শেষ করার পর, কেউ আর কথা শুরু করল না। সবাই চুপচাপ।

অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল আবার নাতাশাই। বলল, ইয়েলেস্কুর পেছেনে দাঁড়াতে আপনার একটু দেরি হলে এবং শুয়ে পড়ে জর্জকে গুলি করতে আরেকটু বিলম্ব করলে আপনাকে আমরা ফিরে পেতাম না। আপনার ভয় করেনা এসব ভেবে?

-কোন বুলেটে কারো মৃত্যু হয়না নাতাশা, যদি না সে বুলেটে স্রষ্টা কর্তৃক তার মৃত্যু নির্দিষ্ট থাকে। সুতরাং ভয় কাকে?

-আপনি তো অদৃষ্টবাদের কথা বলছেন।

-কেন অদৃষ্টকে বিশ্বাস কর না?

-আসলেই অদৃষ্ট নামে কিছু আছে? বিজ্ঞান কি একে সমর্থন করে?

-কেন, বিজ্ঞান সবচেয়ে শক্তভাবে যে জিনিসটা প্রমাণ করেছে সেটা হলো অদৃষ্টবাদ।

-কেমন? বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে বলল নাতাশা।

-অদৃষ্ট মানে আইন- স্রষ্টার আইন। বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে পরমাণু থেকেও ক্ষুদ্রতর মৌলিক কণা থেকে শুরু করে কোটি কোটি আলোকবর্ষ ব্যাপি বিস্তৃত মহাবিশ্ব পর্যন্ত সবকিছু স্রষ্টা কর্তৃক বিধিবদ্ধ আইনের অধীন- তাদের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিলয় সব ক্ষেত্রেই। সবকিছুর মত মানুষও যেহেতু একটি সৃষ্টি তাই তার সৃষ্টি, স্থিতি ও বিলয় সুনির্দিষ্ট আইনের অধীন। সব ক্ষেত্রে অদৃষ্ট মানলে, শুধু মানুষের ক্ষেত্রে মানব না কেন?

-তাহলে স্বর্গ নরকটাও কি অদৃষ্ট? হেসে বলল নাতাশা।

-আমি আলোচনা করছি মানুষের জীবনকালের মৌলিক প্রসঙ্গ নিয়ে। আর স্বর্গ-নরকের ব্যাপারটা পরকালের ঘটনা। মানুষের জীবনের দু'টো দিক। একটা হলো মানুষের জীবনাচরনগত জীবন পদ্ধতি, অন্যটি তার দেহ ব্যবস্থাপনা সহ কিছু মৌলিক দিক। প্রথমটিকে আল্লাহ মানুষের ইচ্ছার অধীন করে দিয়েছেন এবং দ্বিতীয়টি আল্লাহর বিধিবদ্ধ আইনের অধীন বা তারই সার্বভৌম ইচ্ছার নিয়ন্ত্রনে। স্বর্গ-নরক প্রথমটির ফলশ্রুতি। তাই এটা অদৃষ্ট নয়।

-কিছু মনে করবেন না। আমার কৌতূহল। জীবনাচরন বা জীবনপদ্ধতি- নির্বাচনকে মানুষের ইচ্ছার অধীন করে দেবার পর স্বর্গ, নরক অর্থাৎ পুরস্কার ও তিরস্কার কেন?

-স্বর্গ, নরক হলো ফলশ্রুতি- সফলতার পুরষ্কার এবং ব্যর্থতার তিরষ্কার। ব্যাপারটা এই রকম, তোমাকে বেলগ্রেড যেতে বলা হলো। তোমাকে বেলগ্রেডের রাস্তায় তুলে দিয়ে তোমার হাতে ম্যাপ দেওয়া হলো আর বলা হলো, ম্যাপ

অনুসারে চললে তুমি সফল হবে, পুরষ্কার পাবে। আর যদি ম্যাপ অনুসরণ না কর তাহলে বেলগ্রেড না গিয়ে অন্য কোথাও পৌঁছাবে এবং তুমি ব্যর্থ হবে, তোমার ভাগ্যে জুটবে তিরষ্কার। এই পুরষ্কার, তিরষ্কারই স্বর্গ, নরক।

-ধন্যবাদ। হাসল নাতাশা। আর কথা বাড়ালো না সে।

দু'পাশে ছোট টিলা। তার মাঝখান দিয়ে উঁচু-নিচু পথে দোল খেয়ে এগিয়ে চলছিল গাড়ি। রাস্তায় লোকজন নেই বললেই চলে। কদাচিৎ দু'একটা গাড়ি চোখে পড়ছে। কিছুদূর পর পরই ছোট ছোট সাঁকো পার হচ্ছে গাড়ি। ছোট ছোট খালের উপর এ সাঁকোগুলো। এ খালগুলো দিয়ে সিটনিকের পানি নিয়ে যাওয়া হয়েছে ফসলের ক্ষেতে। বহুকষ্ট করে খাল কেটে পানি নেয়া হয়েছে। এই সার্ভিয়া অঞ্চলের প্রায় অর্ধেকই মুসলমান। কিন্তু সরকারী হিসাবে এর কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায়না। প্রথম দিকে কম্যুনিষ্ট সরকার তাদের আদম শুমারিতে মুসলমানদের পরিচয় গোপন করেছে। এখন অবস্থার কারণে মুসলিম পরিচয় গোপন করতে বাধ্য হচ্ছে মুনলমানরা।

সবাই নিরব। সবার চোখ সামনে।

নিরবতার মাঝে শব্দ তুলছে গাড়ির শোঁ শোঁ শব্দ এবং নাম না জানা পাখির কিচির-মিচির রব।

নিরবতা ভাঙল মাজুভ। হাত দু'টি তার স্টিয়ারিং হুইলে, চোখের দৃষ্টি সামনে। বলল, মিঃ আহমদ মুসা, মিলেশ বাহিনীর ঘরে আগুন লাগবে। ইয়েলেস্কু ও জর্জের মৃত্যু কনস্টানটাইনকে পাগল করে দেবে। ওরা ছিল তার ডান হাত।

-ঠিক বলেছেন মিঃ মাজুভ। পুলিশ কি এদের পরিচয় জানতে পারবে? ও না, গাড়ির কাগজ পত্রে তো পরিচয় আছেই।

-তাছাড়া আজ 'মিলেশ' এর জন্মদিন। 'মিলেশ' এর স্মৃতি সৌধ দর্শনে আজ মিলেশ বাহিনীর অনেকেই কসভোতে আসবে। সুতরাং ঘটনাটা তাদের কারো চোখে এখনই পড়ে যাবে।

-আপনার যাওয়াও কি জন্মদিন উপলক্ষে?

-না মিঃ আহমদ মুসা, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। আজ মিলেশ এর জন্মদিন। ইয়েলেস্কুর কাছে শোনার পর আমার মনে পড়েছে।

-আজ কসভোতে ‘মিলেশ’ বাহিনীর লোকরা যদি অনেকে আসে, তাহলে হাসান সেনজিক ওদের চোখে পড়ার সম্ভাবনা আছে।

-ঠিক বলেছেন। মিলেশ বাহিনীর প্রত্যেকের কাছেই হাসান সেনজিকের ফটো আছে।

-তাহলে?

-আমাদের সতর্ক হতে হবে, আর আমরা মিলেশ এর স্মৃতি সৌধে তো অবশ্যই যাবো না।

মনাস্তির সিটনিকের তীরে একটা ছোট্ট শহর। কসভো উপত্যকার মুখেই অবস্থিত। বলা হয়, ঐতিহাসিক কসভো যুদ্ধ জয়ের পর সুলতান মুরাদের ইচ্ছা পূরনের জন্যই সুলতান বায়েজিদ মনাস্তিরে একটা ছোট্ট দুর্গ নির্মাণ করেন। এই দুর্গ কেন্দ্র করেই পরবর্তীকালে গড়ে ওঠে শহরটি। এই শহরে মুসলমানরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ট। আজ দুর্গের কোন অস্তিত্ব নেই। দুর্গের মসজিদটা বহুকাল অক্ষতভাবে টিকে ছিল। মুসলমানরা টিকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু মুসলমানদের জীবনে বিপর্যয় আসার পর মসজিদটির রক্ষণাবেক্ষণ আর হয়নি।

মাজুভের গাড়ি মনাস্তির অতিক্রম করছিল। সুলতান বায়েজিদের দুর্গটি ছিল নদীর তীরেই। দুর্গের ধ্বংসাবশেষের পাশ দিয়েই ছুটে চলছিল মাজুভের গাড়ি। দুর্গের মসজিদটির ভাঙ্গা মিনার সুস্পষ্টভাবেই দেখা যাচ্ছিল।

সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে হাসান সেনজিক মাজুভকে বলল, মিঃ মাজুভ এটাই কি সুলতান বায়েজিদের মনাস্তির দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এবং ঐটাই কি তার সেই মসজিদ?

-হ্যাঁ, মিঃ হাসান সেনজিক। মসজিদের নামকরণ করা হয়েছে সুলতান মুরাদের নামে, বলে মাজুভ গাড়ি থামিয়ে দিয়ে বলল, যেতে চান কি ওখানে আপনারা?

-কেউ কি থাকে ওখানে? প্রশ্ন করল আহমদ মুসা।

-না। বলল মাজুভ।

-মসজিদে কি নামায হয়?

-না। এই দূর্গ এলাকা সহ মনাস্তিরে বিপুল মুসলিম বসতি ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত এখানে জনসংখ্যার অর্ধেকই ছিল মুসলমান। সবাই মনাস্তিরকে মুসলিম শহর বলে মনে করত। তারপরেই এল মুসলমানদের জীবনে বিপর্যয়। কম্যুনিজম ও 'মিশেল' বাহিনীর যৌথ ষড়যন্ত্রে ধীরে ধীরে মুসলমানরা হারিয়ে গেল মনাস্তির থেকে। থামল মাজুভ।

সঙ্গে সঙ্গেই আহমদ মুসা প্রশ্ন করল, কোথায় গেল তারা?

-কেউ তা বলতে পারবে না। ব্যাপারটা একদিনে ঘটেনি। লবন যেমন কোন কিছুকে ক্ষয় করে ধীরে ধীরে তেমনি। কাউকে হত্যা করা হয়েছে। কাউকে চালান করা হয়েছে দূরে কোথাও। একদিন সকালে উঠে দেখা গেল, চারটি বাড়ি শূন্য- খাঁ খাঁ করছে, মানুষ নেই। কোথায় গেল, কে নিয়ে গেল, কেউ বলতে পারেনা। কারও জিজ্ঞাসা করারও ক্ষমতা ছিলনা। এই ভাবেই মুসলিম জনপদ উজাড় হয়ে গেছে। আমরা যতদূর জানি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পরই কোন এক সময় থেকে এই দুর্গ মসজিদে আর আযান হয়না। মেরমাতও হয়নি।

মাজুভ গাড়িটি হাইওয়ে থেকে নামিয়ে দুর্গমুখী এক ভাঙ্গা রাস্তা দিয়ে চালিয়ে দুর্গের নিশ্চিহ্ন প্রায় গেটের কাছে দাঁড় করাল।

গাড়ি থেকে সবাই নামল।

চারজনই ভাঙ্গা দুর্গে প্রবেশ করল। দুর্গের কোন ঘরই অক্ষত নেই। কোন কোনটির ছাদ ভাঙতে ভাঙতে টিকে থাকলেও দরজা-জানালার অস্তিত্ব নেই কোথাও। দেয়াল কোথাও টিকে আছে, কোথাও নেই।

দুর্গের মধ্যে আলো-আঁধারী, সেই সাথে অপরিচিত এক নিরবতা। এই নিরবতার সাথে জমাট বেঁধে আছে ইতিহাস, যে ইতিহাসের খুব অল্পই এখন মানুষের জানা। যেখানে অজানা, সেখানেই বাসা বেধে থাকে রহস্য। আর রহস্যের দ্বারে উঁকি দিতে গেলেই মুখ তুলে দাঁড়ায় এক প্রকারের আশংকা ও আতঙ্ক। এই জন্যই বুঝি প্রাচীর সৌধমালার কংকালে প্রবেশ করলে এক নতুন ভাব এবং আবেশ এসে ঘিরে ধরে।

এই দুর্গে প্রবেশ করেও বোধ হয় তাই হলো। চারজনের কারও মুখে কোন কথা নেই। সবার মধ্যেই একটা অপরিচিত গাম্ভীর্য। সবাই যেন অতীতমুখী হয়েছে-ইতিহাসের কোন অলি-গলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সবারই লক্ষ্য মসজিদ। অলি-গলি ছাড়িয়ে, ভাঙ্গা মেঝের উপর দিয়ে সোজা তারা এগুচ্ছে মসজিদের দিকে।

বিশাল এলাকা নিয়ে দুর্গ। দুর্গের মাঝামাঝি জায়গায় মসজিদ।

মসজিদের সামনে পৌঁছতে প্রায় দশ মিনিট সময় লাগল।

মুল মসজিদের সামনে বিরাট একটা চত্তর। চত্তর ঘিরে প্রাচীর। প্রাচীর এখনও অক্ষত। চত্তরের তিন দিকে তিনটি গেট। চত্তরটি পাথরের। তা সত্বেও মাঝে মাঝে ভেঙে ছোট ছোট গর্তের সৃষ্টি হয়েছে।

আহমদ মুসারা চত্তরের পূর্ব দিকের প্রধান গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রধান গেটে চারটি মিনার। চারটি মিনারের ভেতর দিয়ে উঠে গেছে সিঁড়ি। বেশ উঁচুতে মোয়াজ্জিনের আযান দেয়ার জায়গা। চারটি মিনারের একটিও অক্ষত নেই। মিনার চারটির ভাঙ্গা মাথা এক সমান উঁচু। যেন চারটিকেই একসাথে সমানভাবে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে।

আহমদ মুসা মিনারের দিকে ইংগিত করে বলল, ঐভাবে মেপে-জুকে কি মিনার ভাঙ্গে?

-ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে, এটাই ঠিক। ঠিক যে তার কারনও আছে। বলল মাজুভ।

-কি কারন?

-সাধারণভাবে খৃষ্টানরা মিনারকে মসজিদের প্রতীক মনে করে। তাই মিনারের সাথেই তাদের শত্রুতা বেশি। সুতরাং মুসলমানদের উচ্ছেদ করার সময় মিনার যে তারা ভাঙবে, এটাই স্বাভাবিক।

আহমদ মুসারা চত্তরে প্রবেশ করল। ভাঙ্গা চত্তরটি ময়লা ও আগাছায় ভরে গেছে।

চত্তরের উপর দিয়ে তারা মসজিদের মুল ভবনের দিকে এগুলো। চত্তর পেরিয়ে তারা পৌঁছল মুল ভবনের বারান্দায়। বিরাট প্রশস্ত বারান্দা। অন্ততঃ পাঁচ সারি মুসল্লি দাঁড়াতে পারে।

বারান্দাটি পাথরের তা আঁচ করা যায়, কিন্তু তা চোখে দেখা যাচ্ছে না। ময়লার পুরু আস্তরণ পড়ে গেছে মেঝের উপর। কতযুগ থেকে কারও পা যে এখানে পড়েনি! মুসল্লিদের সজীব আনাগোনা যে কবে শেষ হয়ে গেছে কে জানে!

বারান্দা পেরিয়ে মুল ঘরের দেয়াল। মুল মসজিদ ঘরে ঢোকার তিনটি দরজা। আহমদ মুসা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করল তিনটি দরজাই বন্ধ।

দরজার পাল্লা কালো রঙ এর। বোঝা গেল লোহার। মাঝে মাঝে মরিচা স্পষ্ট। দরজার পাল্লা কব্জা দিয়ে দেয়ালের সাথে আটকানো।

আহমদ মুসা দরজার দিকে তাকিয়ে ভাবল, শেষ মুসল্লিটি যেদিন শেষবারের মত মসজিদ থেকে বেরিয়ে যায়, সেদিন বোধ হয় দরজাটি ঐভাবে বন্ধ করে গেছে। তারপর আর খোলা হয়নি।

আহমদ মুসা জুতা পায়ে বারান্দায় উঠতে গিয়ে দ্বিধা করল। জুতা পায়ে উঠবে? আবার ভাবল, এখানে নামাজ হয় না-ময়লা ভর্তি, বলা যায় পরিত্যক্ত। এখানে জুতা পায়ে উঠা যায়।

আহমদ মুসা উঠল বারান্দায়। তার সাথে হাসান সেনজিক।

মাজুভ উঠতে যাচ্ছিল। নাতাশা তার একটি হাত ধরে ফিস ফিস করে বলল, আমার ভয় করছে মাজুভ।

-কেন? সেই রকম নিচু কন্ঠে বলল, মাজুভ।

-মুসলমানদের মসজিদে নাকি ফেরেশতা থাকে, জিন থাকে।

-এস তুমি তো একা নও। বলে মাজুভ বারান্দায় উঠল। তার হাত ধরে নাতাশাও উঠল।

মাঝের দরজার দিকে এগোচ্ছিল আহমদ মুসা। তার পেছনে ওরা তিনজন। আহমদ মুসা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দরজার বাইরে থেকে শিকল লাগানো। মরিচা শিকলকে প্রায় গিলে খেয়েছে।

শিকল খুলতে কষ্ট হলো আহমদ মুসার। কতযুগ থেকে যে শিকলে হাত পড়েনি।

শিকল খুলে গিয়ে পড়ে গেল দরজার উপর। ঠন করে শব্দ হলো। ভারি শব্দ।

আহমদ মুসা বুঝলো দরজাটি পুরু ইস্পাতের পাতে তৈরি। শিকলে যেভাবে মরিচা ধরেছে, দরজায় সেই পরিমাণ মরিচা নেই।

শিকল খুলে যাবার পর দরজা খোলার জন্যে দরজা ঠেলল আহমদ মুসা। সেই সাথে অন্য হাতে রুমাল নিল ঘরের বদ্ধ-বিষাক্ত গ্যাস থেকে নাককে বাঁচাবার জন্যে।

শিকলের মতই দরজার কব্জাগুলো মরিচার কবলে পড়ে চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল।

দু'হাত লাগিয়ে জোরে ঠেলা দেয়ার পর কব্জাগুলো ক্যাচ ক্যাচ, কট কট করে আর্তনাদ তুলল। কিন্তু, দরজা খুলে গেল।

আহমদ মুসা তার হাতের রুমালটা নাক পর্যন্ত তুলেছিল, কিন্তু আর তোলা হল না। হাত আর উপরে উঠলো না। তার বদলে তার চোখ দু'টি হয়ে উঠল ছানাবড়া।

মুল মসজিদের মেঝেটি পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন। বদ্ধ ঘরের কোন গুমোট হাওয়াও ধেয়ে এল না। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, মসজিদের মেহরাবের সামনে একটা জায়নামাজ পাতা। আহমদ মুসার চোখে যে বিস্ময়ের ঘোর সে বিস্ময় সকলের চোখেই। যুগ যুগ ধরে যে মসজিদ পরিত্যক্ত সে মসজিদের মেঝে অমন পরিচ্ছন্ন কেন, অমন ঝকঝকে জায়নামাজই বা কে পাতল।

তারা আরও বিস্ময়ের সাথে দেখল, মেহরাবের ডানপাশে মিম্বরের উপর একটা আধপোড়া মোমবাতি দাঁড়িয়ে আছে।

পাংশু হয়ে গিয়েছিল নাতাশার মুখ। সে ভাবছিল এ নিশ্চয় মুসলমানদের ফেরেশতা অথবা জিনের কাজ। মাজুভের মনেও নাতাশার সেই কথা জাগছিল। তাহলে নাতাশার কথাই কি ঠিক হল?

আহমদ মুসা জুতা খুলে মসজিদে প্রবেশ করল। হাসান সেনজিকও তাকে অনুসরণ করল।

ইতস্তত করছিল মাজুভ এবং নাতাশা। মাজুভ বলল, অমুসলিমরা কি মসজিদে.....

মাজুভ শেষ করার আগেই আহমদ মুসা বলল, কোন বাধা নেই। মসজিদ আল্লাহর ঘর। সবার জন্য এর দ্বার উন্মুক্ত, শুধু শর্ত হচ্ছে পবিত্রতা।

মাজুভ জুতা খুলতে খুলতে বলল, নাতাশার খুব ভয় করছে।

-কেন? বলল আহমদ মুসা

মাজুভ কিছু বলার জন্য মুখ খুলেছিল। নাতাশা হাত দিয়ে মাজুভের মুখ চেপে ধরে হেসে বলল, পড়ো এলাকা, পুরানো ও বদ্ধ ঘরতো তাই।

সকলেই মসজিদে প্রবেশ করল।

আহমদ মুসা সারা ঘরটা একবার নিরীক্ষণ করল। জায়নামাজ শুকে দেখল। মোমবাতির পোড়া সুতা পরীক্ষা করল। এরপর বলল, আজই এ মোমবাতি জালানো হয়েছে। কেউ এই জায়নামাজে আজই নামাজ পড়েছে। আজ ঘরটাও একবার ঝাট দেয়া হয়েছে।

নাতাশার মুখের পাংশু অবস্থা আরও বাড়ল। মাজুভের মনেও গা ছম ছম করা একটা ভয় উকি দিচ্ছে। আর হাসান সেনজিক প্রায় হতবাক। তাদের সবার মনে এক প্রশ্ন, মানুষ কোত্থেকে আসবে এখানে? তাহলে কি.....

আহমদ মুসার মনে কিন্তু অন্য চিন্তা। তার মনের এক কোণে আনন্দের আলো, সেই সাথে আবেগেরও এক উত্থান। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কোন বান্দা এখানে আসেন, মসজিদকে তিনি আবাদ রেখেছেন।

আহমদ মুসা মাজুভের দিকে তাকিয়ে বলল, মিঃ মাজুভ খুব ইচ্ছা করছে, এখানে দুই রাকাত নামাজ পড়ি। আপনারা একটু দাঁড়ান।

মাজুভ আনন্দের সাথে সায় দিল।

আহমদ মুসা হাসান সেনজিককে বলল, তোমার কি অজু আছে হাসান সেনজিক?

হাসান সেনজিক 'না' জবাব দিল।

আহমদ মুসা তাকে তায়াম্মুম করতে বলল।

দু'জনে নামাজে দাঁড়াল, সেই জায়নামাজে।

প্রভুর সামনে হৃদয় উজাড় করে দেয়া দু'রাকাত নামাজ পড়ল আহমদ মুসা। জনপদ থেকে বিচ্ছিন্ন, পরিত্যক্ত, নামাজ ও তেলাওয়াত মুখরিত মুসল্লিদের পূণ্য পদভার বঞ্চিত, বিষন্ন নিরবতায় নিমজ্জিত মসজিদে নামাজ পড়তে গিয়ে আবেগ হয়তো আহমদ মুসা সামলাতে পারেনি। দু'চোখ থেকে তার নেমে এসেছিল অশ্রুর দু'টি ধারা- প্রভুর প্রতি ভক্তি, ভয়, আবেগের তরল প্রস্রবন।

মাজুভ এবং নাতাশা আহমদ মুসাদের ডাইনে অল্প দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল আহমদ মুসাদের নামাজ।

আহমদ মুসা ও হাসান সেনজিকের নামাজ তারা আগেও দেখেছে। কিন্তু, আজকের নামাজ তাদের অভিভূত করল। প্রার্থনা এত সুন্দর, এত স্নিগ্ধ, এত প্রাণস্পর্শী হতে পারে। আহমদ মুসার অশ্রু মাজুভ এবং নাতাশার হৃদয়কেও যেন সিক্ত করে দিল। তাদের হৃদয়ও যেন অমন প্রার্থনায় বিনত হতে চাইল।

আহমদ মুসা সালাম ফেরাল। প্রথমে ডানদিকে। ডানদিকে সালাম ফেরাতে গিয়ে নামাজের মধ্যেই চমকে উঠল আহমদ মুসা। তারপর বামদিকে সালাম ফিরিয়েই আহমদ মুসা উত্তরদিকে ঘুরে বসল। তার চোখ ছুটে গেল মসজিদের উত্তর দিকের একমাত্র দরজার দিকে।

উত্তরদিকের এই দরজাটি মসজিদের অপর অংশের সঙ্গে সংযোগ পথ। মসজিদের উত্তর দিকের অংশটি মহিলাদের। মহিলারা মসজিদের ঐ অংশে জুমার নামাজ আদায় করত। মসজিদের ঐ অংশের প্রবেশ পথ পশ্চিম দিকে অর্থাৎ, দুর্গের হেরেমের দিকে। হেরেমের মহিলারা এবং অন্যান্য মহিলা ঐ পথেই মসজিদে আসত।

উত্তর দরজায় দাঁড়ানো এক বৃদ্ধের উপর গিয়ে আহমদ মুসার অবাক দৃষ্টি স্থির হলো।

আহমদ মুসার সাথে সবাই ওদিকে তাকাল। সবার দৃষ্টি গিয়ে আছড়ে পড়ল সেই বৃদ্ধের উপর।

মাথা ভর্তি সফেদ চুল, সুন্দরভাবে বিন্যস্ত সফেদ দাড়ি, চুল ও দাড়ির মাঝখানে সফেদ মুখ। পা পর্যন্ত নেমে যাওয়া শুভ্র ঢিলা জামা। হাতে তার কাধ পর্যন্ত উচু একটা লাঠি।

বৃদ্ধও তাকিয়ে ছিল আহমদ মুসার দিকে। আহমদ মুসার দু'গন্ড তখনও অশ্রুসিক্ত।

বৃদ্ধের চোখের দৃষ্টি অত্যন্ত স্নিগ্ধ। সকলের জন্য অফুরন্ত মায়া-মমতা যেন জমাট বেধে আছে সে চোখে।

কিছুক্ষণ মৃত্যুর মত শীতল এক জমাট নিরবতা। এই নিরবতার মাঝে নরম পদক্ষেপে বৃদ্ধ এগিয়ে এল আহমদ মুসার দিকে।

এসে দাঁড়াল আহমদ মুসা থেকে গজ দু'য়েক দূরে।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। তার সাথে হাসান সেনজিকও।

বৃদ্ধ একবার সবার মুখের উপর চোখ বুলিয়ে চোখ স্থির করল আহমদ মুসার উপর। বলল, তুমি কে, তোমরা কে বৎস? আল্লাহর এই ঘরের অবশেষে খোঁজ নিতে এলে?

'আমি আহমদ মুসা।' 'আর এ হাসান সেনজিক এবং এরা লাজার মাজুভ এবং নাতাশা।' বলে থামল আহমদ মুসা।

বৃদ্ধ বলল, আমি নাম জিজ্ঞেস করিনি। বহুনামের বহুলোক তো দেশ ভরে আছে, কিন্তু কেউতো কখনও আসেনি।

হাসান সেনজিক দু'ধাপ এগিয়ে এল। বলল, ইয়া শেখ, ইনি ফিলিস্তিন, মিন্দানাও, মধ্য এশিয়া ও ককেশাসের ইসলামী বিপ্লবের নেতা আহমদ মুসা।

'আচ্ছালামু আলাইকুম' বলে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বৃদ্ধ বলল, এ রকমই আমি ভেবেছি। আমার নব্বই বছরের জীবনে এই অশ্রু আর আমি কারো চোখে দেখিনি। বিরাণ জনপদের ভাঙ্গা, পরিত্যক্ত মসজিদে এসে যিনি এইভাবে অশ্রু বিসর্জন করেন, তিনি সাধারণের মধ্যে পড়েন না।

'আর যিনি বিরাণ জনপদের ভাঙ্গা, পরিত্যক্ত মসজিদকে আবাদ রেখেছেন তিনি?' বলল আহমদ মুসা বৃদ্ধের সাথে হ্যান্ডশেক করতে করতে।

‘না আমি কিছু নই,’ বলল বৃদ্ধ, ‘আমি একটা অতীতকে আকড়ে ধরে পলাতক জিন্দেগী যাপন করছি, আমার কোন বর্তমান নেই।’ থামল বৃদ্ধ। তার দু’চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল।

এক মুহূর্ত থেমেই আবার বৃদ্ধ শুরু করল, আমার অশ্রু অতীতের একটা বিলাপ, ব্যর্থতার গ্লানি থেকে উদ্ভুত। এ অশ্রুতে বর্তমানের কোন উত্তাপ নেই, ভবিষ্যতের জন্যে কোন প্রতিশ্রুতি নেই। হাদিস শরীফে আছে, অন্যায়কে হাত দিয়ে বাধা দিতে হবে, না পারলে মুখ দিয়ে, তাও সম্ভব না হলে মন দিয়ে ঘৃণা করতে হবে। শেষোক্তটা সর্ব নিম্নস্তরের ঈমান। এই সর্ব নিম্নস্তরের ঈমান নিয়েই আমি বেঁচে আছি। জাতির ঘোর সংকটে আজ ঈমান দরকার প্রথম শ্রেণীর।

‘কিন্তু জনাব,’ বলল আহমদ মুসা, ‘জাতির ইতিহাস ঐতিহ্যকে এইভাবে আঁকড়ে থাকার প্রয়াস, জাতির ধ্বংসোন্মুখ অস্তিত্বকে এইভাবে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ প্রচেষ্টা ছোট ঘটনা নয়। মনাস্তির দুর্গের এই সুলতান মুরাদ মসজিদের মুল কক্ষকে এইভাবে পরিস্কার রাখা, এখানে নামাজ জারি রাখা মুসলিম জাতির শক্তির প্রতীক হিসেবে আমার কাছে প্রতিভাত হয়েছে। ইসলাম যে কোন পরিবেশেই যে বেঁচে থাকার শক্তি রাখে এ তারই প্রমাণ। এই ঘটনা আমার মনে যে গৌরবের অনুভুতি দিয়েছে, বিস্ময়কর যে আবেগে আমাকে অভিভুত করেছে, তার একক কোন দৃষ্টান্ত আমার জীবনে নেই। আমার অশ্রু ছিল বেদনা, আনন্দ-উভয়েরই প্রকাশ।’

‘বর্তমানে কাজ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তোমার আছে বলেই এই অনুভুতি, এই আবেগ তোমার মধ্যে এসেছে বৎস যা আমার মধ্যে নেই।’ বলল বৃদ্ধ।

‘ইয়া শেখ, বলল আহমদ মুসা, আপনার এটা বিনয়, কিন্তু এর দ্বারা আপনি আপনার উপর জুলুম করেছেন।’

‘না বৎস,’ বলতে শুরু করল বৃদ্ধ, ‘এটা আমার জুলুম নয়, আত্ম-সমালোচনা। আমার নব্বই বছরের জীবনে আমি মনাস্তিরের সমৃদ্ধ মুসলিম জনপদকে ধ্বংস হতে দেখলাম। দেখলাম একটি, দু’টি নয় হাজারো রক্তাক্ত লাশ, যাদের একমাত্র মুসলমান হওয়া ছাড়া আর কোন অপরাধ ছিল না। দেখলাম

লোকদের হারিয়ে যেতে একের পর এক, যাদের সন্ধান কোনদিনই আর মিলল না। বাপ-মা হারা শিশু এবং স্বামী হারা স্ত্রীদের অশ্রুর সাগর আমি দেখলাম। আমার সামনে দিয়েই বিরাণ হয়ে গেল সমগ্র জনপদ, কিন্তু আমি বেঁচে রইলাম। বেঁচে রইলাম পলাতক এক জিন্দেগী নিয়ে।'

বৃদ্ধের চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ছিল নিরব অশ্রু।

'বলবেন কি আপনার পরিচয়, কে আপনি, কিভাবে পাড়ি দিয়ে এলেন এই দীর্ঘ পথ?' অত্যন্ত নরম কন্ঠে বলল আহমদ মুসা।

'এস বৎস তোমরা, দাঁড়িয়ে আর নয়।' বলে বৃদ্ধ ফিরে দাঁড়িয়ে উত্তরের সেই গেট দিয়ে বেরিয়ে চলতে শুরু করল।

তার সাথে হাটতে শুরু করল আহমদ মুসা, হাসান সেনজিক, মাজুভ এবং নাতাশাও।

মেয়েদের নামাজ-কক্ষের দরজা দিয়ে বেরিয়ে হেরেমের ভেতর দিয়ে তারা দুর্গের দক্ষিণ দিকে চললো। দুর্গ থেকে বেরিয়ে তারা নদী-তীরের অস্পষ্ট রাস্তা ধরে দক্ষিণ দিকে এগুলো। দশ মিনিট চলার পর তারা জঙ্গলে ঢাকা একটা এক তলা দালানে এসে উঠল।

পুরানো দালান। সবগুলো ইট বেরিয়ে আছে। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে মনাস্তির দুর্গের মতই একটা মৃত বাড়ি এটা। কিন্তু ভেতরটা আবাসযোগ্য নয়।

ভেতরে সব কয়টা ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। একটা ঘরে একটা খাটে থাকেন বৃদ্ধ। অন্য ঘরগুলো শূন্য। সবাই গিয়ে বসল বৃদ্ধের ঘরে।

'কেউ আর থাকে না বাড়িতে, কেউ নেই আপনার?' বলল আহমদ মুসা।

বৃদ্ধের খাটের পাশেই জানালা। বৃদ্ধের চোখটা ঘুরে সেই জানালার দিকে গেল।

জানালার ওপারে চারটা কবর পাশা-পাশি। দু'টো ছোট, দু'টো বড়। চারটা কবরেরই শিয়রে ফুলগাছ।

বৃদ্ধ এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ওদিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, সবাই ছিল, সবাই ওখানে ঘুমিয়ে। প্রবল সেই ঝড় ওদের ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। তারপর এই ঘর শূন্য। সবাই চোখভরা প্রশ্ন নিয়ে তাকাল বৃদ্ধের দিকে।

বৃদ্ধ চোখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, আজ থেকে ৪৫ বছর আগের কথা। তখন আমার বয়স পয়ত্রিশ। আমার আব্বা শেখ বুরহানুদ্দিন ছিলো এই সুলতান মুরাদ মসজিদের ইমাম। তিনি মনাস্তিরের রাজপথে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হলেন। আমাকে দেয়া হল ইমামের দায়িত্ব।

প্রথা অনুসারে ইমামতের দায়িত্ব পাবার পরেই আমি হজ্জ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। তখন চরম অশান্ত অবস্থা। মুসলমানরা হত্যা, গুম, উচ্ছেদের শিকার হচ্ছে অব্যাহত ভাবে। আম্মা প্রশ্ন তুললেন, এই অবস্থায় বাড়ি ছাড়া কি ঠিক হবে? কিন্তু হজ্জের যেহেতু সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তিনি অবশেষে অনুমতি দিলেন।

আমার আম্মা, আমার স্ত্রী, আমার দশ বছরের ছেলে এবং পাঁচ বছরের মেয়ে সবাই হজ্জের সফরে আমাকে বিদায় জানাল। বিদায়ের সময় মুখে হাসি টানতে গিয়ে সবাই কেঁদে ফেলেছিল।

দু'মাস পর হজ্জ থেকে ফিরেছিলাম। ফিরে পেয়েছিলাম এই শুন্য ঘর। আর পেয়েছিলাম চারটি কংকাল। সবাইকে জবাই করা হয়েছিল। কাউকে ডাকব এমন লোক কোথাও পাইনি। যারা বেঁচেছিল, তারা পালিয়েছিল বা আত্মগোপন করে থাকতো। একাই চারটি কবর খুড়েছিলাম, একাই ওদের চারজনকে দাফন করেছিলাম ওখানে। তারপর থেকে এই শূন্যতা।

'এই শুন্যতার মধ্যে, এ শুন্য ঘরে আপনি পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে বাস করছেন?' বলল নাতাশা। বেদনায় তার চোখ মুখ ভারি।

'না আমার কষ্ট মনে হয় না, কারন এই শুন্যতা আমার একার ঘরে তো নয়। বলকানের হাজারো মুসলিম জনপদ যেমন বিরাণ, তেমনি লাখো পরিবারের ঘরও এমন শূন্য হয়ে গেছে। তবু কখনও যদি হাপিয়ে উঠি নিরব শুন্যতার মধ্যে, তখন দক্ষিনের জানালা খুলে ঐ চারটি কবরের দিকে তাকাই। ওদের তখন আমি দেখতে পাই, যেমনটি হজ্জে যাবার সময় দেখেছিলাম ঠিক তেমনি।'

'কথা না বলে আপনি দিনের পর দিন থাকতে পারেন?' আবার বলল নাতাশা।

'সপ্তাহ, দেড় সপ্তাহ পর বাজারে যাই, মানুষের সাথে কথা বলি। আর কথা বলার মানুষ না থাকলেও আমার অসুবিধা হয় না। নামাজ তো আল্লাহর সাথে

কথা বলা। আল্লাহ তো সাথেই আছেন। নানা কথা আমি তাঁর সাথে বলতে পারি।' বলল বৃদ্ধ।

'আর কতদিন এভাবে পালিয়ে থাকবেন?' এবার কথা বলল আহমদ মুসা।

'আমি পালিয়ে থাকতে চাইনা। আমি চাই সুলতান মুরাদ মসজিদ আবার মুখরিত হয়ে উঠুক, তাঁর মিনারে ধ্বনিত হোক আবার আজান। তা না পারলে আমি বের হয়ে কি করব। যা একটু আঁকড়ে ধরে আছি, তাও হারিয়ে ফেলতে আমি চাই না।' বলল বৃদ্ধ।

'কিন্তু ইয়া শেখ, দেশের মুসলিম জনপদগুলো মুখরিত না হয়ে উঠলে, মসজিদ মুখরিত হবে না, সেখানে আজানের ধ্বনিও জাগবে না।' বলল আহমদ মুসা।

'আমি সেদিনেরই অপেক্ষায় মসজিদের মুল কক্ষ বাঁচিয়ে রেখেছি বৎস।'

'সেদিনটি আর কতদুরে ইয়া শেখ' বলল আহমদ মুসা।

আনন্দে মুখ উজ্জ্বল করে বলল, 'অন্ধকার ঘরে বদ্ধ দরজায় সুবেহ সাদেকের রূপালী আলো এসে করাঘাত করছে আমি এখন দেখতে পাচ্ছি।'

বৃদ্ধ কয়েক মুহূর্ত থামল, তারপর আবার শুরু করল, 'আমি হাসান সেনজিকের নাম শুনেই ওকে চিনতে পেরেছি। স্টিফেন পরিবারের বহুল আলোচিত সন্তান সে, যাকে মিলেশ বাহিনী হন্যে হয়ে খুঁজছে। তাঁর দেশে প্রবেশ এবং সেই সাথে যখন তোমার পরিচয় পেলাম, তখনই আমি সুবেহ সাদেকের ঐ আলো দেখতে পেলাম। যুগোশ্লাভিয়ায় তোমাদের প্রবেশের মত সুলতান মুরাদ মসজিদে তোমাদের আগমন আল্লাহর একটা পরিকল্পনার অধীনেই ঘটেছে। আমি দেখতে পাচ্ছি মুসলমানরা এবার ঘুরে দাঁড়াবে।'

'আপনি আমাদের দোয়া করুন।' বলল আহমদ মুসা।

বৃদ্ধ বলল, 'শুধু দোয়া নয়, আমি তোমাদের একজন।'

'আমরা কসভো যাচ্ছি, যাবেন কি আমাদের সাথে?' বলল মাজুভ।

বৃদ্ধ বলল, 'খুশি হতাম যেতে পারলে। কিন্তু ফিরে এসে যোহরের নামাজ ধরতে পারবো না মসজিদে। ৪৫ বছরের মধ্যে এক ওয়াক্ত নামাজও বাদ যায়নি, মসজিদ থেকে।'

আহমদ মুসা উঠে বৃদ্ধের সামনে এসে তাঁর একটি হাত তুলে নিয়ে চুমু দিয়ে বলল, আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন ইয়া শেখ। আপনার এই সংগ্রাম আমাদের জন্যে অফুরন্ত প্রেরণার উৎস হবে। বলকানের বিশৃঙ্খল, বিধ্বস্ত মুসলিম জনপদে সংগ্রামী জীবন মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে আছে, আপনি তারই প্রতীক।

একটু থেমে আহমদ মুসা বলল, আজকের মত আমাদের বিদায় দিন। ফেরার পথে আবার দেখা হবে।

'শুধু ফেরার পথে কেন, সব সময়ই দেখা হবে, এই কথা বল।' বলে বৃদ্ধ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ৪৫ বছর হলো কাউকে কিছু খাওয়াবার সৌভাগ্য হয়নি। তোমরা কিছু মুখে না দিয়ে যেতে পারবে না।

উঠে দাঁড়াল বৃদ্ধ। ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল পাশেই রান্না ঘরের দিকে।

বাধা দিতে চেয়েও আহমদ মুসা বৃদ্ধের মুখের দিয়ে তাকিয়ে পারল না। ওর এই দুর্লভ আনন্দে বাধা দেয়া ঠিক নয়।

মনাস্তির পার হলেই কসভো উপত্যকা শুরু। উপত্যকার প্রায় মাঝখান দিয়ে সিটনিক নদী প্রবাহিত। বিশাল কসভো উপত্যকার উত্তর-পশ্চিম কোণে মনাস্তির শহর।

এই কসভো উপত্যকায় ১৩৮৯ সালে ঐতিহাসিক যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়। এক পক্ষে ছিলেন তুরস্কের সুলতান মুরাদ, অন্যপক্ষে ছিলেন সার্ভিয়ার রাজা লাজারাসের নেতৃত্বে পূর্ব ইউরোপীয় খৃষ্টানদের মিলিত বাহিনী।

সুলতান মুরাদ বুলগেরিয়া থেকে দানিয়ুব পার হয়ে পূর্ব প্রান্ত দিয়ে কসভো উপত্যকায় প্রবেশ করেছিলেন। তারপর সিটনিক নদী পার হয়ে নদীকে পেছনে রেখে ঠিক নদীর পাড়েই মুসলিম বাহিনীর প্রধান তাবু স্থাপন করেছিলেন

তিনি। আর লাজারাসের নেতৃত্বে খৃষ্টানদের চোখ ধাঁধানো বিশাল বাহিনী কসভো উপত্যকায় প্রবেশ করেছিল উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত মনাস্তিরের সংকীর্ণ উপত্যকা পথ দিয়ে।

সিটনিক নদীর পশ্চিম তীরে যেখানে সুলতান মুরাদ তার প্রধান তাঁবু গেড়েছিলেন, সেখানেই সুলতান বায়েজিদ তার পিতার ঐতিহাসিক বিজয়ের স্মারক হিসেবে একটি বিজয় সৌধ নির্মাণ করেন।

সুলতান বায়েজিদের এই বিজয় সৌধ থেকে মাত্র তিনশ গজ দূরে যেখানে লাজারাসের একজন সৈনিক 'মিলেশ' সুলতান মুরাদকে প্রতারণামুলকভাবে আহত করার পর নিহত হয়েছিলেন, সেখানেই 'মিলেশ' বাহিনী ১৯৩০ সালের দিকে 'স্মৃতি স্তম্ভ' তৈরি করেছে মিলেশ এর নামে।

মনাস্তির পার হয়ে হাইওয়েটির একটি শাখা বেঁকে বেরিয়ে গেছে সোজা দক্ষিণ দিকে সিটনিক পার হয়ে। এই পথ দিয়ে মিলেশ স্মৃতি স্তম্ভে যাওয়া যায়। আর হাইওয়েটি নদীর পশ্চিম তীর বরাবর এগিয়ে গেছে কসভোর ভেতর দিয়ে দক্ষিণ সার্ভিয়া অঞ্চলের দিকে।

মাজুভের গাড়ি হাইওয়ের শাখা রাস্তাটি ধরে এগিয়ে চলল কসভো উপত্যকার দিকে।

এ রাস্তায় মানুষকে বেশ চলতে দেখা যাচ্ছে। গাড়িও বেশ চলছে রাস্তা দিয়ে। এসব লোকের প্রায় সবাই মিলেশ বাহিনীর। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এসেছে। মিলেশ স্মৃতি সৌধে তারা যাচ্ছে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের জন্যে।

মাজুভ একটু চিন্তিত হলো, হাসান সেনজিক কারও নজরে পড়ে যেতে পারে। জীপের উন্মুক্ত দরজা দিয়ে সবকিছুই পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। আর রাস্তায় লোকজনের কারনে গাড়ির স্পীডও অনেক কমাতে হয়েছে।

মিলেশ স্মৃতি স্তম্ভ কাছাকাছি এসে পড়েছে। রাস্তার ভীড়ও আরেকটু বেড়েছে।

সামনে দেখা গেল ব্যাজ বিতরণ হচ্ছে। কয়েকজন যুবক লোকজনদের দাঁড় করিয়ে বুকে ব্যাজ লাগিয়ে দিচ্ছে এবং বিনিময়ে যে যা দিচ্ছে তা একটি থলেতে রেখে দিচ্ছে।

মাজুভের মনে পড়ল, এভাবে ফান্ড সংগ্রহ প্রতি বছরই হয়। এই টাকা দিয়ে অনুষ্ঠানের ব্যয়ের একটি অংশ মেটানো যায়।

মাজুভ শংকিত হলো। কিছু টাকা যাবে এজন্যে নয়, রাস্তায় থামতে হোক, হাসান সেনজিক কারও নজরে পড়ুক, এটা কাম্য ছিল না।

কিন্তু থামতে হলো। যুবকরা গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে গাড়ি থামিয়ে দিল।

গাড়ি থামতেই কয়েকজন যুবক এসে গাড়ির পাশে ভীড় করে দাঁড়াল।

মাজুভ টাকা নিয়ে তৈরি ছিল। বলল, আমাকে চারটা ব্যাজ দাও আমরা পরে নেব। টাকা নাও। বলে মাজুভ একজন যুবকের হাতে টাকা গুজে দিল।

কিন্তু যুবকরা ততক্ষণে দু'পাশ থেকে পরিয়ে দেবার জন্যে এগিয়ে এসেছে এবং তারা চারজনকেই ব্যাজ পরিয়ে দিল। কিছু টাকা দিয়েছিল মাজুভ, আরও কিছু দিল নাতাশা। উদ্দেশ্য তাড়াতাড়ি ছাড়া পাওয়া।

এতটা ভীড়ের মধ্যে পড়বে মাজুভ এটা কল্পনা করেনি। প্রতি বছরের চেয়ে ভীড়টা এবার অনেক বেশি।

মিলেশ স্মৃতি স্তম্ভকে সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। সামনে একটা সুদৃশ্য গেট তৈরি করা হয়েছে। গেটে একটি ব্যানার। ব্যানারে লেখাঃ 'বলকানের জাতীয় বীর মিলেশ এর স্মৃতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অনুষ্ঠানে স্বাগত।'

রাস্তার পাশেই মিলেশ স্মৃতি স্তম্ভ। মাজুভ ধীর গতিতে গাড়ি চালিয়ে স্মৃতি স্তম্ভ ডাইনে রেখে এগিয়ে চলল সামনে। মনে হবে গাড়ি পার্ক করার জন্যে আশে পাশে কোথাও যাচ্ছে।

মিলেশ স্মৃতি স্তম্ভ পেরিয়ে রাস্তাটি এগিয়ে গেছে সিটনিক নদীর দিকে। সুলতান মুরাদের বিজয় সৌধের পাশ দিয়ে রাস্তাটি নদী পার হয়ে ওপারে হাইওয়ের সাথে মিশেছে। নদীর একটা ব্রীজ দু'পাশের পথের সংযোগ রক্ষা করছে।

মাজুভের গাড়ি সিটনিক নদীর তীরে ব্রীজের মুখে এসে দাঁড়াল। হাতের বাঁয়েই সুলতান মুরাদের বিজয় সৌধ।

৫শ বছরের পুরানো এই বিজয় সৌধ। সৌধের কেন্দ্র বিন্দুতে ছিল একটা সুউচ্ছ মিনার। মিনারের সেই সুউচ্ছ মাথা আর নেই। মিলেশ স্মৃতি স্তম্ভ যখন তৈরি

হয়, তখন এই মিনার ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। গোটা সৌধই গুড়িয়ে দেবার প্রস্তাব হয়েছিল। কিন্তু অবশেষে তা করা হয়নি দু'টো কারণে। এক, জাঁক-জমকপুর্ণ মিলেশ স্মৃতি-স্তম্ভের পাশে সুলতান মুরাদের বিজয় সৌধের দৈন্যদশা দেখিয়ে একথা বলা যে, সেই বিজয় এখন পরাজয়ে পরিণত হয়েছে। দুই, শত্রুর এই বিজয় সৌধ দেখিয়ে তরুণদের ক্রোধকে উদ্দীপ্ত করা।

মিনারের নিচেই বৃহৎ নামাজের ঘর। নামাজের ঘরের চারপাশে চারটি ঘরের একটি ছিল লাইব্রেরী, অবশিষ্ট তিনটি ঘর মুসাফিরদের বিশ্রামখানা। নদী ও স্থল পথের যাত্রীদের কাছে বিজয়-সৌধের এই বিশ্রাম কেন্দ্র ছিল বিরাট আকর্ষণ।

এখন আর সেই আকর্ষণের কিছুই অবশিষ্ট নেই। বিশ্রামখানার দেয়াল আর মেঝে ছাড়া কোন কিছুর চিহ্ন নেই। লাইব্রেরী পুড়িয়ে ফেলা হেয়ছে। দেয়াল ও ছাদের পোড়া চিহ্ন এখনও দৃষ্টি আকর্ষন করে। নামাজঘর সহ দরজা-জানালাহীন সবগুলো ঘর এখন পোকা-মাকড়, জীব-জন্তুর আস্তানা এবং ময়লার ভাগাড়। জাঁক-জমকপূর্ণ মিলেশ স্মৃতি সৌধের পাশে বিজয় সৌধটি সত্যিই পতন ও পরাজয়ের প্রতীক হযে দাঁড়িয়েছে।

আহমদ মুসা বিজয়-সৌধের সামনে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল ভাঙ্গা মিনারের দিকে, ময়লা আবর্জনার স্তুপে নিমজ্জিত ঘরগুলোর দিকে।

আহমদ মুসার চোখে ভেসে উঠেছিল কসভোর সেই অতীত দিনের স্মৃতি। বুলগেরিয়া জয়ের পর দুর্গম পার্বত্য পথ পাড়ি দিয়ে দানিয়ুব অতিক্রম করে সুলতান মুরাদ এই কসভো প্রান্তরে এসে পূর্ব ইউরোপের মিলিত খৃস্টান বাহিনীর মুখোমুখি হয়েছিল। সার্ভিয়ার রাজা লাজারাসের নেতৃত্বাধীন খৃষ্টান বাহিনীকে মনে হয়েছিল সাগরের তরঙ্গ মালার মত বিশাল-অন্তহীন। তার উপর সুলতান মুরাদের মুসলিম বাহিনী ছিল অব্যাহত যুদ্ধ এবং দীর্ঘ পথশ্রমে ক্লান্ত। শংকিত হয়ে পড়েছিলেন সুলতান মুরাদ। এই বিজয়-সৌধের এই খানেই তাঁবু গেড়ে ছিলেন তিনি। পরদিন সকালেই বেজে উঠবে যুদ্ধের দামামা। সারারাত সুলতান মুরাদ ঘুমাননি। সারারাত ধরে নামাজ পড়েছেন, আর কেঁদেছেন আল্লাহর কাছে। কেঁদে কেঁদে আল্লাহর সাহায্য চেয়েছেন তিনি।

আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছিলেন। ১৩৮৯ সালের ২৭ আগষ্টের সকালে শুরু হলো ভয়াবহ যুদ্ধ। ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনী সাগর তরঙ্গ মালার মত বিশাল খৃষ্টান বাহিনীর চাপে প্রথমে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল, মনে হয়েছিল সুলতান মুরাদ হেরে যাচ্ছেন। কিন্তু তার পরেই ঘুরে গেল যুদ্ধের মোড়। বিজয় লাভ করলো সুলতান মুরাদের মুসলিম বাহিনী।

আহমদ মুসার চোখে ভেসে উঠল আরো, বিজয়ের এই মুহূর্তে খৃষ্টান বাহিনীর একজন সৈনিক, মিলেশ কবি লোভিক, সুলতানের সাথে একান্তে আলাপ করতে চাইল। সরল ও উদার হৃদয় সুলতান শত্রু পক্ষের হলেও একজন সৈনিকের এ প্রার্থনা না মঞ্জুর করলেন না। কিন্তু সেই সৈনিক কথা বলার ছলে কাছে এসে আকস্মিকভাবে আক্রমণ করে বসল সুলতানকে। অপ্রস্তুত সুলতান মারাত্মকভাবে আহত হলেন। মিলেশ কবি লোভিক পরে সৈনিকদের হাতে নিহত হলো সত্য, কিন্তু সুলতান বাঁচলেননা। সুলতান মুরাদ বাঁচলেননা বটে, কিন্তু সমগ্র বলকানে বিজয়ের পাতাকা উড্ডীন হলো ইসলামের। সুলতান মুরাদের পুত্র বায়েজিদ পিতার তাঁবুর স্থানে তৈরি করলেন বিজয় সৌধ।

সেই বিজয় সৌধ পরাজয়ের কালিমা সর্বাঙ্গে ধারণ করে আজ মৃত। আর তারই পাশে বিশ্বাসঘাতক মিলেশ কবি লোভিকের বর্ণাঢ্য স্মৃতি স্তম্ভে একজন বিশ্বাসঘাতক জাতীয় বীরের পূজো পাচ্ছেন আজ।

আহমদ মুসা বিজয়-সৌধের দিকে তাকিয়ে অতীতের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলেন। তার পলকহীন দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল বিজয়-সৌধের দিকে। কিন্তু সে দৃষ্টিতে ছিল না তার উপস্থিতি। পাথরের মতই ছিল সে দাঁড়িয়ে।

মাজুভ ও নাতাশা তার দিকে এগিয়ে গেল।

মাজুভ ধীরে ধীরে হাত রাখল আহমদ মুসার কাঁধে। বলল, কি ভাবছেন মুসা ভাই?

আহমদ মুসা চমকে উঠে চোখ ফিরিয়ে নিল মাজুভের দিকে। আহমদ মুসার গোটা মুখ জুড়ে বেদনার একটা ছায়া। ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা, কিছু বলছিলে তুমি?

-বলছিলাম, কি ভাবছেন আপনি এমন করে?

-ভাবছিলাম, বিজয় কিভাবে পরাজয়ে পরিণত হল। ম্লান হেসে বলল আহমদ মুসা।

-কোন বিজয়?

-এই কসভোতে সুলতান মুরাদের বিজয়ের মাধ্যমে সূচিত হওযা ইসলামের বিজয়।

-কি জবাব পেলেন মুসা ভাই?

-জবাব?

বলে হাসল আহমদ মুসা। ম্লান হাসি। তারপর বলল, কসভোর যুদ্ধে আল্লাহর প্রতি ভয় ও ভালবাসার যে অশ্রু সুলতান মুরাদের চোখে ছিল তা পরাজয়কে জয়ে পরিণত করেছিল, সেই অশ্রু পরবর্তীদের চোখে ছিলনা। ফলে ধীরে ধীরে জয় পরাজয়ে পরিণত হয়েছে।

-তাহলে পরবর্তীরা কি পথভ্রষ্ট হয়েছিলেন?

-আমি তা বলব না মাজুভ। তারা মুসলিম ছিলেন, তাদের আবেগ অনুভূতি সবই ঠিক ছিল। কিন্তু জাতীয় স্বার্থের চেয়ে তারা রাজ্যের স্বার্থকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এই গুরুত্ব দিতে গিয়ে তারা ধর্ম নিরপেক্ষ সেজেছেন এবং নিজ জাতি ও নিজ আদর্শের প্রতি অবিচার করেছেন। এতে জাতির ক্ষতি হয়েছে, আদর্শের বিস্তার ও বিকাশ ব্যাহত হয়েছে। যার পরিণাম হিসেবে তাদের রাজ্যও অবশেষে বাঁচেনি।

-সত্যিই কি, পরবর্তিরা নিজ জাতির প্রতিও অবিচার করেছে?

-ইতিহাস সাক্ষী, রাজ্যকে সবেচেয়ে বড় মনে করতে গিয়ে পরবর্তিরা অনেক অন্যায়ের সাথে আপোষ করেছেন, ইউরোপীয় শক্তি ও অমুসলিম প্রজাদের অন্যায় মনোরঞ্জন করতে গিয়ে নিজ আদর্শ ও অবস্থান থেকে তারা সরে এসেছেন এবং নিজ জাতির প্রতিই জুলুম করেছেন।

এই সময় বিজয় সৌধের পাশ থেকে হাসান সেনজিক ছুটে এসে বলল, মুসা ভাই, আমি দেখলাম, যে দু'জন যুবক আমাদের পেছন পেছন এসেছিল। তারা এখন সৌধের ওপারে আড়ালে দাঁড়িয়ে মিলেশ স্মৃতি সৌধের দিকে তাকিয়ে কি যেন সিগন্যাল দিচ্ছে।

আহমদ মুসা, মাজুভ ও হাসান সেনজিকদের দিকে চেয়ে বলল তোমরা গাড়িতে যাও, আমি এদিকটা দেখছি।

মাজুভরা দ্রুত গাড়ির দিকে চলল।

আহমদ মুসা বিজয় সৌধের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। সে যুবক দু'জনের প্রতিক্রিয়া দেখতে চায়। ওরা মিলেশ বাহিনীর লোক হলে নিশ্চয় মাজুভদের গাড়িতে উঠতে দেখলে সক্রিয় হয়ে উঠবে।

গাড়িটা দাঁড়িয়ে ছিল ব্রীজের মুখে। বিজয় সৌধের পশ্চিম পাশ থেকেও ঐ জায়গা দেখা যায়।

আহমদ মুসার অনুমান সত্য হলো, মাজুভদের গাড়িতে উঠতে দেখে যুবক দু'টি চঞ্চল হয়ে উঠল। তাদেরকে মুহূর্তের জন্যে কিংকর্তব্যবিমুঢ় মনে হলো। তারা বার বার তাকাচ্ছিল মিলেশ স্মৃতি সৌধের দিকে। কিন্তু যখন দেখল মাজুভরা গাড়িতে উঠে বসেছে, তখন তারা দু'জন পকেট থেকে পিস্তল বের করে ছুটল গাড়ির দিকে।

আহমদ মুসাকে অতিক্রম করে তারা যখন সামনে এগুলো তখন আহমদ মুসাও তাদের পিছু নিল।

গাড়ি যুবক দু'টির পিস্তলের রেঞ্জে না আসতেই তারা গুলি বর্ষন শুরু করেছে। যেন ওদের তর সইছেনা। আহমদ মুসা বুঝল গাড়ির টায়ার ওদের টার্গেট। গাড়িকে অকেজো করে পালাবার পথ তারা বন্ধ করে দিতে চায়।

আহমদ মুসা যুবক দু'টির গতি রুদ্ধ করার জন্যে পকেট থেকে রিভলবার বের করে শুন্যে ফায়ার করল।

পেছনে গুলির শব্দ শুনে যুবক দু'টি থমকে দাঁড়াল। বিদ্যুত বেগে পেছনেও ঘুরল। কিন্তু আহমদ মুসার রিভলবারের নল তখন ওদের দিকে সাজানো। যুবক দু'টি ঘুরে দাঁড়াতেই আহমদ মুসা বলল, হাত থেকে পিস্তল ফেলে দাও।

যুবক দু'টি আহমদ মুসার চোখের দিকে একবার তাকিয়ে পিস্তল হাত থেকে ছেড়ে দিল।

‘ঘুরে দাড়াও।’ আহমদ মুসা হুকুম দিল ওদের। ওরা সঙ্গে সঙ্গে হুকুম পালন করল।

আহমদ মুসার ঠোটের কোনে হাসি ফুটে উঠল। মনে মনে বলল, বেচারারা পাকা হয়ে সারেনি এখনও।

‘সামনে আগাও একপা একপা করে।’ পরবর্তী নির্দেশ দিল আহমদ মুসা ওদের।

ওরা এগুলো। আহমদ মুসা ওদের পেছনে পেছনে এগুলো। ওদের পিস্তল দু’টি হাতে তুলে নিল আহমদ মুসা। যুবক দু’টি গাড়ি পার হয়ে ব্রীজের উপর উঠল। আহমদ মুসাও ওদের পেছনে পেছনে।

গাড়ি পার হয়ে আহমদ মুসা মাজুভকে বলল, তোমরা এস ধীরে ধীরে গাড়ি চালিয়ে।

মাজুভ গাড়ি চালিয়ে আহমদ মুসার পিছু আসতে লাগল।

ব্রীজের মাঝ বরাবর গিয়ে আহমদ মুসা নিজে দাঁড়াল এবং যুবক দু’জনকে দাড়াবার নির্দেশ দিল।

মাজুভের গাড়িও আহমদ মুসার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো।

আহমদ মুসা যুবক দু’জনকে ঘুরে দাঁড়াতে বলল। ওরা ঘুরে দাঁড়ালে আহমদ মুসা বলল, তোমরা কে?

-মিলেশ বাহিনীর লোক। কাঁপা গলায় বলল একজন যুবক। দু’জন যুবকই কাঁপছিল আহমদ মুসার পিস্তলের সামনে দাঁড়িয়ে।

-তোমরা কতদিন এ দলে?

-ছয় মাস।

-তোমাদের কে আছে?

দুজনেই জানাল তাদের বাপ-মা আছে, ভাইবোন আছে।

-তোমরা কেন এখানে এসেছিলে? দুজনেই কেঁদে উঠে বলল, আমরা ইচ্ছে করে আসিনি। আমাদেরকে একটা ফটো দিয়ে বলেছে এই লোক আপনাদের মধ্যে থাকলে সিগন্যাল দিয়ে যেন জানাই। কে একজন নাকি ফটোর লোকটিকে আপনাদের গাড়িতে দেখেছে।

-এখন তোমরা কি শাস্তি চাও?

-স্যার আমরা খারাপ লোক নই, আমরা কখনও খারাপ কাজ করিনি। আমরা কখনও এ ধরনের কাজ আর করবনা? কাঁদতে কাঁদতে বলল দু'জন যুবক।

ওরা আরও বলল, আমরা দু'জন চাচাত ভাই। আমরা চাইনি এসব কাজ। কিন্তু মিলেশ বাহিনীতে না আসলে আমাদের পরিবারের ক্ষতি হবে, এই ভয়ে আমরা এখানে এসেছি।

-তোমরা সাঁতার জান? আহমদ মুসা জিজ্ঞেস করল।

-জানি। দু'জনেই জবাব দিল।

-তাহলে যাও নদীতে ঝাপ দাও, এটাই তোমাদের শাস্তি।

সঙ্গে সঙ্গেই যুবক দু'জন নির্দেশ পালন করল। ওরা ব্রীজের রেলিং এ উঠে ঝাপিয়ে পড়ল নদীতে।

গাড়ি এসে আহমদ মুসার পাশে দাঁড়াল। আহমদ মুসা যুবক দুটির পিস্তল মাজুভের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল, রাখ মাজুভ, যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। সামনে দরকার হবে।

আহমদ মুসা জীপে উঠতে গিয়ে পেছনে তাকিয়ে দেখল, মিলেশ স্মৃতি স্তম্ভের দিক থেকে দু'টি গাড়ি এদিকে ছুটে আসছে।

আহমদ মুসা গাড়িতে উঠে বলল, দুটো গাড়ি এদিকে আসছে। নিশ্চয় মিলেশদেরই হবে। সিগন্যাল পেয়ে আসছে।

মাজুভ গাড়ি ষ্টার্ট দিল। লাফিয়ে উঠে ছুটতে শুরু করল গাড়ি। গাড়ি চলতে শুরু করলে নাতাশা পেছনে তাকিয়ে বলল, শত্রুকে আপনি এভাবে ছেড়ে দেন, ভাইজান?

-ওরা খুব কাঁচা। ওরা শত্রুর পর্যায়ে পড়ে না। শুনলেই তো ওদের কথা।

-কিন্তু ওরা সুযোগ পেলে কি আপনাকে ছাড়তো?

-তা ছাড়তো না, কারণ আমি তো ওদের কাঁচা শত্রু নই।

-কিন্তু ভাইজান, কথায় আছে শত্রুর শেষ রাখতে নেই।

-তোমার কথা ঠিক নাতাশা। কিন্তু সব জায়গায় তা হয় না। ওদেরকে আমার অপরাধী মনে হয়নি। নিরপরাধ লোককে গুলি করা যায় না।

-আপনি বিপ্লবী নন ভাইজান, আপনার আসল পরিচয় আপনি মিশনারী।

-ঠিক বলেছ বোন। মুসলমানদের আসল পরিচয় তারা মিশনারী। তাদের বিপ্লবী চরিত্র তাদের এই মিশনারী কাজের একটা অস্ত্র মাত্র যা তারা আত্মরক্ষার জন্য এবং অন্যায়ের মুলোৎপাটনের কাজে লাগায়।

ব্রীজ থেকে গাড়ি নেমে এসেছে হাইওয়েতে। নদীর তীর বরাবর হাইওয়ে ধরে ছুটে চলল গাড়ি উত্তর দিকে মনাস্তিরের পথে।

আহমদ মুসারা নজর রেখেছিল ব্রীজের উপর। ব্রীজটি আড়াল না হওবা পর্যন্ত তারা পেছনের গাড়ি দু'টিকে ব্রীজে উঠতে দেখল না।

আহমদ মুসা বলল, তারা সম্ভবত সৌধে তাদের ঐ দু'জন লোককে এখনও খোঁজ করছে।

'নদী থেকে এতক্ষণ তাদের উঠে যাবার কথা।' বলল মাজুভ।

'উঠলেও তাদের কাছে সব শোনার পরই না তারা করণীয় ঠিক করবে।' বলল আহমদ মুসা।

'ভালই হল, আরেকটা ঝামেলা থেকে বাঁচা গেল।' বলল মাজুভ।

আহমদ মুসা আর কোন কথা বলল না। তার দৃষ্টি সামনে।

আহমদ মুসা মাজুভের ঝামেলা কাটার কথা শুনে মনে মনে হাসল। মনে মনেই বলল, ঝামেলা কাটেনি, ঝামেলা আসছে। তবে তার মনে হচ্ছে, মিলেশ বাহিনী হোয়াইট ওলফের চেয়ে কম দক্ষ। তবে সংখ্যায় এরা বেশি হবে এবং মনে হয় বেশি বুদ্ধিমানও। সবাই নিরব, কেউ আর কোন কথা বলল না।

হাইওয়ে ধরে ছুটে চলেছে গাড়ি।

লক্ষ্য তাদের প্রিষ্টিনা, বাড়িতে ফিরে আসা।

# ২

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল আহমদ মুসার। ঘুম ভাঙলেই সে বুঝতে পারল অসময়ে তার ঘুম ভেঙেছে। কেন? উৎকর্ণ হয়ে উঠলো সে।

অস্পষ্ট একটা ধাতব শব্দ। শুনেই বুঝতে পারল দরজার তালা খোলার চেষ্টা হচ্ছে।

আহমদ মুসার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল ব্যাপারটা। ঘরে শত্রুর হানা। সমগ্র স্নায়ুতন্ত্রীতে আগুন ধরে গেল আহমদ মুসার। তড়াক করে উঠে বসল সে।

পাশের খাটেই হাসান সেনজিক।

আহমদ মুসা বালিশের তলা থেকে রিভলভার দু'টি নিয়ে লাফ দিয়ে হাসান সেনজিকের খাটে গিয়ে পড়ল।

হাসান সেনজিকের গায়ে হাত দিতেই হাসান সেনজিক উঠে বসল ভীষণভাবে চমকে উঠে।

আহমদ মুসা দ্রুত কানে কানে বলল, তাড়াতাড়ি আলমারির আড়ালে দাঁড়াও।

বলেই আহমদ মুসা বিড়ালের মত নিঃশব্দে ছুটে গিয়ে দাঁড়াল দরজায়।

ঘরে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

আহমদ মুসা দরজার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

দরজার তালা খোলার ধাতব শব্দ তখন বন্ধ হয়ে গেছে।

দরজা খুলে গেছে বলে আহমদ মুসা মনে করল।

আহমদ মুসা একটা হাত আলতোভাবে দরজার গায়ে রেখেছিল। সে অনুভব করল দরজা তার হাতের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। অর্থাৎ দরজা খুলে যাচ্ছে। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সাথে সাথে আহমদ মুসাও সরে এল। দরজা ঠেলে দু'টি ছায়ামুর্তি ঘরে প্রবেশ করল।

ওদেরকে মনে হল চলন্ত জমাট অন্ধকার। দু'টি দেহের মাঝখানে ব্যবধান একহাতও নয়। আহমদ মুসা দাঁড়িয়ে আছে দরজার আড়ালে দরজার মুখেই। আহমদ মুসা থেকে ওদের ব্যবধানও একহাতের বেশী নয়।

আহমদ মুসা ডান হাতের রিভলভারটি বাম হাতে নিয়ে এবং বাম হাতের রড ডান হাতে তুলে নিল।

রডটি এক ফুট লম্বা। ষ্টিলের রড, রূপোর নিকেল করা। বেশ ভারী। রডের মুখে একটা ক্যাপ আছে। ক্যাপ খুলে গোড়ায় চাপ দিলে ক্লিক করে দুধারী ছুরির ফলা বেরিয়ে আসে। তেমনি আরেকটা চাপ দিলে ভেতরে ঢুকে যায়। সুন্দর রড-ষ্টিকটি গতকাল মাজুভ আহমদ মুসাকে উপহার দিয়েছে। রডটি আলমারীর উপর রাখা ছিল।

আহমদ মুসা রড-ষ্টিকটি ডান হাতে নিয়ে অন্ধকারে খুব হিসেব করে পেছনের লোকটির ঘাড় লক্ষ্যে আঘাত করল।

'কোঁৎ' করে একটা শব্দ উঠল লোকটির মুখ দিয়ে। তারপর ঢলে পড়ে গেল মেঝের উপর। সামনের লোকটি থমকে দাঁড়িয়ে পেছনে ফিরছিল।

আহমদ মুসা প্রথম আঘাত করেই এক পা এগিয়ে দ্বিতীয় আঘাত করল সামনের লোকটিকে। এই আঘাত সে করেছিল ঘুরে দাঁড়ানো লোকটির কাঁধ ও কানের মাঝখানে। প্রায় কেজি ওজনের রড থেকে প্রচন্ড গতির আঘাত। এ লোকটি মুখ দিয়ে কোঁৎ করে একটা শব্দ তুলে ঢলে পড়ে গেল মেঝেতে।

আঘাত করেই আহমদ মুসা পেছনে সরে এসেছিল দরজার আড়ালে। আহমদ মুসার বিশ্বাস, দু'জন ঘরে ঢুকেছে নিশ্চয় পেছনে আরও কেউ আছে।

আহমদ মুসার অনুমান সত্য হলো। আহমদ মুসা দরজার আড়ালে সরে আসতে না আসতেই আধ খোলা দরজা থেকে ঘরের মধ্যে টর্চের আলো ছুটে এল এবং সেই সাথে ষ্টেনগানের এক পশলা গুলি।

গুলি করতে করতে ওরা ঘরে ঢুকছিল। আহমদ মুসা তৈরি হয়েছিল। ওরা ঘরে পা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে দরজা প্রচন্ড বেগে ঠেলে দিল চৌকাঠের দিকে।

মুহূর্তে টর্চের আলো নিভে গেল। গুলিও বন্ধ হয়ে গেল। মানুষের মুখ থেকে বের হওয়া কয়েকটা শব্দও শোনা গেল।

আহমদ মুসার হাতের কাছেই সুইচ ছিল। আলো জ্বালিয়ে দিয়ে রিভালভার বাগিয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল সে। দু'জন ঘরে ঢুকছিল। দরজার প্রচন্ড বাড়ি খেয়ে দু'জনই তখন মেঝে লুটোপুটি খাচ্ছিল। একজনের কপাল এবং আরেকজনের মাথার পেছন দিকটা ফেটে গেছে। পায়েও ওদের সম্ভবত আঘাত লেগেছিল। ওরা উঠে দাঁড়াতে পারছিল না।

আহমদ মুসা ওদের সামনে দাঁড়াতেই ওরা তড়িঘড়ি উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছিল। একজনের মুখ রক্তে ভেজা। কপালের ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে। আরেকজনের পিঠ রক্তে ভেসে যাচ্ছে, ফেটে যাওয়া মাথার রক্তে। ওরা বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিল। উঠে দাঁড়াতে ব্যর্থ হয়ে ওরা দু'জনেই পকেট থেকে রিভালভার বের করল।

আহমদ মুসা ওদেরকে আর গুলি করার সুযোগ দিল না। পর পর দু'টি গুলি বেরুল আহমদ মুসার রিভলভার থেকে। বসা লোক দু'টি লুটিয়ে পড়ল মেঝের উপর। আহমদ মুসা গুলি করে জুতো পরে নিল। তার মনে তখন একটা উৎকট আশংকা উঁকি দিল, আজকের টার্গেট তো শুধু হাসান সেনজিক নয়, মাজুভও। গতকাল কসভোতে অনেকেই মাজুভকে হাসান সেনজিকের সাথে দেখেছে।

জুতা পরতে পরতে আহমদ মুসা হাসান সেনজিককে বলল, তুমি এস, মাজুভের কি হল দেখি।

বলে আহমদ মুসা ঘর থেকে বের হতেই বাড়ির লনে কান্না শুনতে পেল। আহমদ মুসার বুঝতে কষ্ট হলো না ওটা নাতাশার কান্না।

আহমদ মুসা মাজুভের ঘরের দিকে না ছুটে, ছুটল লনের দিকে। কিন্তু কয়েক ধাপ এগুবার পরেই সামনে পায়ের শব্দ শুনতে পেল আহমদ মুসা। একাধিক লোক ছুটে আসছে এদিকে। আহমদ মুসা দেয়ালের আড়ালে দাঁড়াল।

ওরা দু'জন। টর্চ জ্বেলে ছুটে আসছে। ছুটে আসছে আর চিৎকার করছে, টিটো তোদের এত দেরি কেন, কোথায় তোরা।

আহমদ মুসা সময় নষ্ট করতে চাইল না। মাজুভের চিন্তা তাকে চঞ্চল করে তুলেছে।

আবার আহমদ মুসার রিভলভার থেকে পর পর দু'টি গুলি বেরিয়ে এল। ওরা দু'জন হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল করিডোরে।

এই সময় হাসান সেনজিক এসে আহমদ মুসার পাশে দাঁড়ালো।

আহমদ মুসা করিডোরে ছিটকে পড়া ওদের দু'টি রিভলভার কুড়িয়ে নিয়ে ছুটল লনের দিকে।

লনে দু'টি জীপ দাঁড়িয়েছিল।

সামনের জীপটির পাশে নাতাশা মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছিল।

আহমদ মুসা ছুটে নেমে এসেছিল লনে। কিন্তু লনে নেমেই তার খেয়াল হল সে ধরা পড়ে গেছে। লনটি আলোকজ্জ্বল।

খেয়াল হওয়ার সাথে সাথেই আহমদ মুসা মাটিতে শুয়ে পড়ল। আর সে সময়ই একটা রিভবারের গুলি ছুটে গেল তার মাথার উপর দিয়ে।

হাসান সেনজিক তখনও লনে নামেনি।

আহমদ মুসা দ্রুত গড়িয়েই দ্বিতীয় জীপটির আড়ালে গিয়ে উঠে দাঁড়াল।

উঠে দাঁড়িয়েই সামনের জীপ ষ্টার্ট নেয়ার শব্দ শুনতে পেল। আহমদ মুসা বুঝতে পারল, মাজুভকে নিয়ে ওরা পালাচ্ছে।

চিৎকার করে কেঁদে উঠল নাতাশা।

আহমদ মুসা দ্রুত দ্বিতীয় জীপের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। সামনের জীপটি তখন গেটের কাছাকাছি চলে গেছে।

হাসান সেনজিকও তখন আহমদ মুসার পাশে এসে দাঁড়াল।

আহমদ মুসার কাছে ছুটে এল নাতাশাও।

আহমদ মুসা দ্রুত হাসান সেনজিককে গাড়ীতে উঠতে নির্দেশ দিয়ে নাতাশাকে বলল, কেঁদোনা বোন, আমরা ইনশা-আল্লাহ মাজুভকে নিয়ে ফিরে আসব।

বলে আহমদ মুসা ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল। হাসান সেনজিক তার পাশের সিটে উঠে বসেছে।

নাতাশা কেঁদে উঠে বলল, আমিও যাব, আমিও রিভলভার চালাতে জানি।

আহমদ মুসা নাতাশার দিকে একবার চেয়ে বলল, ঠিক আছে বোন, উঠ। নাতাশা উঠে বসল পেছনের সিটে। ষ্টার্ট নিল জীপ।

সামনের জীপটি তখন গেট পেরিয়ে রাস্তায় পড়েছে।

আহমদ মুসার জীপ লাফিয়ে উঠে ছুটতে শুরু করল।

আহমদ মুসার জীপ যখন রাস্তায় এসে পড়ল সামনের জীপটি তখন দু'শ গজ সামনে।

রাত তিনটার জনমানবহীন রাস্তা।

আহমদ মুসার স্পিডোমিটারের কাঁটা লাফিয়ে লাফিয়ে উপরে উঠতে লাগল।

তীরের মত ছুটে চলেছে আহমদ মুসার জীপ।

সামনের জীপটিও সমান স্পিডে চলছে। এরাস্তা ওরাস্তা ঘুরে শেষ পর্যন্ত সামনের জীপটি বেলগ্রেড হাইওয়েতে এসে উঠল। তারপর ছুটল বেলগ্রেডের দিকে।

আহমদ মুসা ভাবল, সামনের জীপটির লক্ষ্য কি বেলগ্রেড, না কোন উপায় না দেখে এই পথই বেছে নিয়েছে?

বেলগ্রেড হাইওয়ে সুপ্রশস্ত ও সরল রাস্তা। এ হাইওয়েতে উঠে আহমদ মুসা ফুলস্পীড দিল জীপে।

নতুন জীপ। খুশি হলো আহমদ মুসা। গতির প্রেসারে থর থর করে কাঁপছে গোটা জীপ।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আহমদ মুসা লক্ষ্য করল, দুই জীপের মাঝে ব্যবধান একটু একটু করে কমছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্যবধান একশ' গজের মধ্যে চলে এল।

প্রায় আধ ঘন্টা চলার পর ব্যবধান ৫০ গজে নেমে এল। আহমদ মুসা বলল, নাতাশা হাসান সেনজিক তোমরা সিটের উপর শুয়ে পড়। ওরা কাছাকাছি এসে গেছে, সামনে থেকে গুলি করতে পারে।

আরও কিছুক্ষণ চলার পর ব্যবধান আরও কমে প্রায় ২০ গজের মধ্যে চলে এল।

আহমদ মুসা রিভলভার তুলে নিল হাতে।

আহমদ মুসা আশ্চর্য হলো, এত কাছে আসার পরেও ওপক্ষ থেকে কোন গুলি আসছে না কেন? ষ্টেনগান, সাব-মেশিন গানের আওতায় তারা তো এসেই গেছে। হতে পারে আহমদ মুসার গাড়ির হেডলাইট নেভানো থাকার কারনে তাদের সঠিক অবস্থান তারা জানতে পারছে না। কিন্তু পেছনে তাকিয়ে একটু খেয়াল করলেই এ অবস্থান ঠিক করা সম্ভব। আহমদ মুসা আরও কিছুক্ষণ সময় নিয়ে ব্যবধান আরও কমিয়ে গাড়ির হেডলাইট অন করে দিয়েই টার্গেটকে ভালো করে দেখে নিয়ে পরপর তিনটি গুলি করল।

একটি গুলি গিয়ে পেছনের ডান টায়ারে বিদ্ধ হলো। গাড়িটি প্রবল ঝাকুনি খেয়ে কিছুদুর এঁকে বেঁকে এগিয়ে থেমে গেল। থামার সঙ্গে সঙ্গে একজন লোক ড্রাইভিং সিট থেকে লাফ দিয়ে নেমে দৌড় দিল।

আহমদ মুসার জীপ ততক্ষণে সামনের জীপের সমান্তরালে এসে গিয়েছিল।

আহমদ মুসার রিভলভার তৈরিই ছিল। লোকটির আর পলানো হলোনা। গুলি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল রাস্তায়।

আহমদ মুসা গাড়ি থামাল।

আহমদ মুসার গাড়ি থামতেই ওই জীপ থেকে একটা কন্ঠ চিৎকার করে উঠল 'মুসা ভাই, একজনকে এখানে ধরে রেখেছি, আসুন।'

সবাই চিনতে পারল মাজুভের গলা।

আহমদ মুসা, হাসান সেনজিক গাড়ি থেকে ছুটল সেদিকে।

নাতাশাও নামল গাড়ি থেকে।

আহমদ মুসা ছুটে গিয়ে জীপের পাশে দাঁড়াল।

মাজুভ একজনকে গাড়ির মেঝেতে ফেলে হাত দু'টিকে পিছমোড়া করে ধরে রেখেছিল।

-এভাবে একে ধরে রেখেছ কেন? এর 'সদগতি' করে ড্রাইভিং সিটের ওকেতো কাবু করতে পারতে।

-একে আপনার জন্যে রেখেছি। আপনি একে ছেড়ে দিয়েছিলেন তো, তাই আমি একে মারলাম না।

-অর্থাত ব্রীজের সেই দু'জনের একজন?

-হ্যাঁ মুসা ভাই।

-তুমি নেমে এস মাজুভ, আমি ওকে দেখি।

মাজুভ নেমে এল জীপ থেকে।

যুবকটি গাড়ির মেঝেতেই উঠে বসল।

আহমদ মুসা ওকে নেমে আসতে বলল।

মুহূর্ত দেরি না করে সুবোধ বালকের মত নেমে এল যুবকটি। তার মুখ ফ্যাকাশে, কাঁপছিল।

-তুমি যে আবার? আহমদ মুসা পিস্তল নাচিয়ে জিজ্ঞাসা করল।

-আমি আসতে চাইনি, ওরা আমাকে জোর করে এনেছে। বলল যুবকটি।

-বানানো কথা।

-দোহাই স্যার, বানানো নয়, না আসতে চাইলে আমার ভাইকে ওরা আমার সামনে হত্যা করেছে, পরে আমি আর আপত্তি করতে সাহস পাইনি।

-যেভাবেই হোক, তুমি অভিযানে যোগ দিয়েছ, মাজুভকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিলে।

-স্যার, বিশ্বাস করুন। আমি সাথে ছিলাম, কিন্তু কিছুই করিনি। ঐ স্যারকে জিজ্ঞাসা করুন, ওকে ধরে রেখেছিলাম, কিন্তু পকেট থেকে আমি পিস্তলটাও বের করিনি। বলে যুবকটি পকেট থেকে পিস্তল বের করে দেখাল।

আহমদ মুসা হেসে উঠল।

-ও ঠিকই বলেছে, ওকে কাবু করতে গিয়ে দেখলাম ও আমাকে তেমন বাধা দিলনা। পিস্তল ও বের করেনি। বলল মাজুভ।

-ড্রাইভারকে কাবু করতে এগুলে না কেন? বলল আহমদ মুসা।

-গেলাম না কারণ ও ব্যাটা দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে, যে জোরে গাড়ী চলছিল। আর দেখলাম, আপনি যখন আসছেন তখন আর ঝুকি নেবার প্রয়োজন নেই।

আহমদ মুসা এবার যুবকটির দিকে মনোযোগ দিলে যুবকটি বলল, আমাকে মেরে ফেলুন স্যার, না হলে ওরা আমাকে খুব কষ্ট দিয়ে মারবে।

-কেন? বলল আহমদ মুসা।

-সেদিনও আমাকে ছেড়ে দিয়েছেন, আজ ওরা সবাই মরেছে, আমি যদি না মরি তাহলে বলবে, আমার কোন যোগ-সাজস আছে। বলে যুবকটি আহমদ মুসার হাতে পিস্তল তুলে দিল।

আহমদ মুসা পিস্তল হাতে নিয়ে বলল, তুমি বাড়িতে পালিয়ে যাও।

-না স্যার, যেখানেই যাই, সেখান থেকে ওরা ধরে আনবে, ওদের হাত থেকে নিস্তার নেই। ওদের বাধা দেবার কেউ নেই। শুধু আপনাদেরই ভয় করে ওরা।

-ভয় করলে ওভাবে আমাদের বাড়িতে হানা দিতে সাহস করতো?

-ওরা মরিয়া হয়ে উঠেছে। ইয়েলেস্কু ও জর্জের মৃত্যু ওদের পাগল করে তুলেছে। বহু হিসেব-নিকেশ করে সার্ভিয়া প্রদেশের মিলেশ বাহিনীর কমান্ডার, যিনি দলের দু'নম্বর ব্যক্তি, জারজেস জিবেঙ্কুর নেতৃত্বে আজকের হামলা চালানো হয়েছিল। মুখোশ পরা সেই লোকটিই জারজেস জিবেঙ্কু।

জারজেস জিবেঙ্কুর নাম শুনে চমকে উঠল মাজুভ।

এ এক সাক্ষাত রক্তপায়ী শয়তান। ইয়েলেস্কু ও জর্জরা হুকুম পেলে হত্যা করত, কিন্তু জেবেঙ্কুর কোন নির্দেশের প্রয়োজন হয়না। কত হাজার লোক যে তার হাতে নিহত হয়েছে, সে হিসেব কেউ দিতে পারবে না। মিলেশ বাহিনীর সবাই তাকে 'কিলার মেশিন' বলে ডাকে। বলা হয়, সে দলে প্রভাবশালী হবার পর থেকেই মুসলিম বিরোধী হত্যাকান্ড গণরূপ নিয়েছে। মাজুভ জারজেস জিবেঙ্কুর নাম শুনে যতটা চমকে উঠেছিল, ততটাই মনে মনে হালকা অনুভব করল। বলল সে, ওকে আমি চিনতে পারিনি, গোটা অভিযানে একটা কথাও সে বলেনি।

-সে আপনার উপর সাংঘাতিক ক্ষিপ্ত। এ কারনে আপনাকে ধরার জন্যে সে নিজেই গেছে। বলল যুবকটি।

-জানি, দলত্যাগীদের সে গায়ের চামড়া খুলে মারে। ও এক জীবন্ত নরক। নাতাশা এত কেঁদেছে একটা কথাও সে বলেনি।

-আপনি জানেন না, ওদের পরিকল্পনা ছিল নাতাশাকেও নিয়ে আসা। সে আগেই বলে দিয়েছিল, নাতাশার যেন কেউ ক্ষতি না করে, নাতাশাকে সে তার জন্যে অক্ষত নিয়ে আসবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হলোনা, তড়িঘড়ি করে তাকে পালাতে হলো।

মাজুভ ও নাতাশা দু'জনেই শিউরে উঠল। বিশ্বাস করল তারা, জিবেঙ্কু এই চরিত্রেরই লোক।

মাজুভ আহমদ মুসার দিকে ফিরে বলল, ধন্যবাদ মুসা ভাই, শয়তানদের ষড়যন্ত্র আপনি ব্যর্থ করে দিয়েছেন। ওরা ক'জন ছিল, ক'জন মরেছে।

-ওরা ছিল আটজন। দু'জন আমাদের ঘরে সটান হয়ে আছে। দু'জন আমাদের দরজায় এবং আরও দু'জন করিডোরে মরে পড়ে আছে। একজন এখানে মরল।

-তাহলে এখন এই যুবকটির কি হবে? বলল মাজুভ।

আহমদ মুসা যুবকটিকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার নাম কি?

-জাকুব। বলল যুবকটি।

-তুমি কি ইহুদি?

-না।

-কিন্তু কোন খৃষ্টানের নাম তো জাকুব অর্থাৎ ইয়াকুব হয় না? ইহুদি অথবা মুসলমানরা এ ধরনের নাম রাখে।

যুবক কোন উত্তর দিলনা। মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ নিরব থাকল। তারপর একবার মুখ তুলে আহমদ মুসার দিকে চাইল।

-তুমি কিছু গোপন করতে চাইছ।

-ঠিক আছে গোপন করব আর কোন ভয়ে? আমি তো বাঁচতেই চাই না।

বলে যুবকটি একটু নিরব হলো, তারপর বলল, আমার দাদা পর্যন্ত সবাই মুসলমান ছিলেন। আমার আব্বা একজন খৃষ্টান মেয়েকে বিয়ে করেন এবং আমি যখন কোলে সেই সময় আমার আব্বা, চাচারা সবাই খৃষ্টান হয়ে যান। আমাদের বাড়ি বিখ্যাত সমুদ্র বন্দর রিকায়। খৃষ্টান না হলে আমার আব্বা-চাচাদের রিকা ছাড়তে হতো। রিকা তখন প্রায় মুসলিম মুক্ত শহর। তাই খৃষ্টান হয়ে তারা রিকায়

থাকা পছন্দ করেন। আমার জাকুব নাম আমার দাদা রেখেছিলেন। আমার জন্মের পরেই তিনি মারা যান।

-তোমার এ পরিচয় তুমি গোপন করেছিলে কেন?

-ছোট বেলা থেকেই আব্বার নিষেধ, কোন মুসলমানের কাছে এ কথা প্রকাশ যেন আমরা না করি। মুসলমানদের কাছে ধর্মত্যাগ নাকি ভয়ানক অপরাধ। মৃত্যুদন্ড নাকি এর শাস্তি।

-ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র সত্যপথ, শান্তির পথ। মানুষ সত্য ও শান্তির পথ থেকে মুখ-ফিরাক, স্রষ্টা তা চান না বলেই এই কঠোরতা। এই কঠোরতা মানুষের মঙ্গলের জন্যেই।

একটু থেমেই আহমদ মুসা আবার বলল, তা ইসলাম ত্যাগ করে তোমাদের পরিবার কেমন আছে?

-স্যার, আমরা এখন না খৃষ্টান, না মুসলমান, আমরা গীর্জাতেও যাই না, মসজিদেও যাই না। কিন্তু সত্য বলছি, মসজিদের দিকেই আমার আব্বার টান বেশি। মনে পড়ে একবার আমি এবং আব্বা মাগরেব শহরের একটা মসজিদের ধার দিয়ে যাচ্ছিলাম। মসজিদের দরজা খোলা ছিল। একটা কুকুর ঢুকছিল দরজা দিয়ে। আব্বা ছুটে গিয়ে কুকুরটিকে তাড়িয়ে দিয়ে মসজিদের দরজা বন্ধ করে দিলেন। আমি এর কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, কুকুর মসজিদে ঢুকতে নেই, কুকুর নাপাক। আবার একটা ঘটনা মনে পড়ে। ঘটনাটা ঘটেছিল জার্মানিতে। সূর্য ডোবার সময় আমরা হাটছিলাম এক মসজিদের পাশ দিয়ে। এই সময় আজান শুরু হলো। আব্বা সংঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়ালেন। মাথা নিচু করে গোটা আজান শুনলেন। আজান শেষ হলে তিনি যখন মুখ তুললেন, তখন মনে হলো তার চোখের কোণ ভিজা। মিলেশ বাহিনীতে যোগ দিয়েছি বাধা দেয়ার সাধ্য তার ছিলনা। কিন্তু খুব ব্যাথা পেলেন তিনি, যেদিন খবরটি প্রথম শুনলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন তোমার দাদা এবং পূর্বপুরুষ মুসলমান ছিল মনে রেখো বাছা। আব্বার কথা আমি মনে রেখেছি, মুসলমান কাউকে বাঁচাতে হয়তো পারিনি, কিন্তু কোন মুসলমানের কোন ক্ষতি আমার দ্বারা হয়নি।

-ধন্যবাদ জাকুব। তুমি জান আমরা কে?

-জানি। আপনি আহমদ মুসা এবং সাথে ষ্টিফেন পরিবারের হাসান সেনজিক।

-আমি আহমদ মুসা একথা কে বলল?

-কেউ বলেনি। মিলেশ বাহিনী আগে বুঝতে পারেনি আপনি কে। কিন্তু এখন তারা নিশ্চিত আপনি আহমদ মুসা ছাড়া আর কেউ নন।

-তুমি আমাদের সাথে থাকতে চাও?

-ওখানে গিয়ে মরার চেয়ে এখানে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা ভাল মনে করি কিন্তু আমি যে খৃষ্টান?

-তোমাকে মুসলমান হতে হবে এ শর্ত তো আমরা আরোপ করিনি জাকুব?

-আমি মুসলমান হতে পারবো?

-এ দরজা সকলের জন্য সব সময় খোলা। আর তোমরা তো অবস্থার শিকার ছিলে।

জাকুবের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

আহমদ মুসা মাজুভকে বলল, চল এখন আমরা প্রিষ্টিনায় ফিরে যাই। ওদিকটা একবার দেখে সকালেই আমরা বেলগ্রেড যাত্রা করব।

মাজুভ মাথা নেড়ে সাঁয় দিল।

সামনের জীপে উঠল আহমদ মুসা। এ জীপের পিছনের দু'টি সিটে বসল হাসান সেনজিক এবং জাকুব, আর পিছনের জীপে উঠল মাজুভ এবং নাতাশা। তারা দু'জন পাশাপাশি সিটে।

জীপ দু'টি প্রিষ্টিনার দিকে ছুটতে শুরু করল। প্রিষ্টিনার কাছাকাছি চলে এসেছে তাদের গাড়ি। আর পাঁচ কিলোমিটারের মত গেলেই শহরের উপকন্ঠে পৌঁছা যাবে। এই সময় আহমদ মুসাদের জীপের সামনে দ্রুত ছুটে আসা দু'টো গাড়ির চারটি হেডলাইটের আলো স্পষ্ট হয়ে উঠল। অল্পক্ষণের মধ্যেই আহমদ মুসাদের জীপ এবং এগিয়ে আসা গাড়ি দু'টি কাছাকাছি এসে পড়ল। আহমদ মুসা ওদের সাইড দেবার জন্যে রাস্তার বাম পাশ বরাবর চলতে শুরু করল। আহমদ মুসার জীপ ওদের হেডলাইটের আওতায় এসে গেছে।

ওদের সামনের গাড়িটার হেডলাইটের আলো একবার আহমদ মুসার জীপে এসে পড়ল। তার পর মূহুর্তের জন্যে সরে গেল। তারপর পুনরায় তা ফিরে এসে আহমদ মুসার উপর স্থির হয়ে গেল।

আহমদ মুসা বিরক্ত হলো এভাবে আলো ফেলা আইন সিদ্ধ নয়।

হেডলাইটের সেই আলোটি আহমদ মুসার জীপের উপর থেকে আর সরল না, বরং আলোটা কয়েক বার নিভিয়ে জ্বালিয়ে এবং কয়েকবার হর্ণ বাজিয়ে সামনের গাড়িটি রাস্তার বাম পাশে সরে এসে বলা যায় আহমদ মুসার গাড়ির পথ রোধ করে দাঁড়াল।

এই সময় পেছন থেকে জাকুব প্রায় আর্তস্বরে বলল, সামনের গাড়ি দু'টি মিলেশ বাহিনীর।

কেমন করে বুঝলে? বলল আহমদ মুসা।

হর্ণ আর আলোর সংকেতে বুঝেছি। মিলেশ বাহিনীর কোডে ওরা সংকেত দিয়েছে।

এতক্ষণে আহমদ মুসার কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। ওরা হেডলাইটের আলোতে জীপের নাম্বার দেখেই চিনতে পেরেছে এ জীপ দু'টি মিলেশ বাহিনীর। তারপর জীপে মিলেশ বাহিনীর লোক আছে কিনা তা নিশ্চিত হবার জন্যেই ওরা আলো ও শব্দের সংকেত দিয়েছে। উত্তর না পেয়েই তারা ধরে নিয়েছে এ জীপগুলো শত্রুর দখলে।

আহমদ মুসার কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হওয়ার সাথে সাথে সে যখন রিভলবার তুলেছে সামনের গাড়ির হেডলাইটে গুলি করার জন্যে, সেই সময় সামনের গাড়ি থেকে ছুটে এলো বৃষ্টির মত মেশিন গানের গুলি।

'জীপের মেঝেতে শুয়ে পড় হাসান সেনজিক তোমরা,' বলে আহমদ মুসা শুয়ে পড়ল সিটের নিচে।

গুলির শুরুতেই গাড়ির উইন্ডশিল্ড উড়ে গেল। টুকরো টুকরো কাঁচ এসে পড়ল আহমদ মুসার গায়ের উপর। দুই সিটের ফাঁকে গিয়ারের কাছে সে একটা তোয়ালে পেল। তোয়ালেটা মাথার উপর চাপাল সে। সামনের গাড়ির হেডলাইটের আলোতে জীপ এবং এর দু'পাশ আলোকিত। আহমদ মুসা মাথা

তুলে দেখল ওদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে গাড়ি থেকে নামা সম্ভব নয়। একমাত্র বিকল্প হিসেবে গাড়ি কোনভাবে সামনে এগিয়ে নেবার জন্যে ড্রাইভিং প্যানেলের দিকে চোখ ফেরাতে যাবে এমন সময় তার চোখের সামনে মাত্র ফুট দেড়েক দূরে একটি গোলাকার পিন্ড এসে পড়ল। পিন্ডটি আহমদ মুসার চোখে পড়তেই ভূত দেখার মত চমকে উঠে সে তোয়ালেই মুখগুজে তোয়ালে দিয়ে নাক চেপে ধরল প্রচন্ড ভাবে।

পড়েই পিন্ডটি শব্দ করে ফেটে গেলে। ফেটে যাবার সংগে সংগে তুলোর মত সাদা গ্যাস বাতাসের চেয়ে অনেক দ্রুত গতিতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

পিন্ডটি আহমদ মুসার চোখে পড়তেই বুঝতে পেরেছিল ওটা ক্লোরোফরম বোমা। মানুষকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে সেন্সলেস করার অত্যন্ত কার্যকরী অস্ত্র। বিস্ফোরিত হবার পর কার্যকরী মাত্র ৩০ সেকেন্ড। কিন্তু এই ত্রিশ সেকেন্ডের ক্রিয়া মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে দীর্ঘ ৮ ঘণ্টা। যদি জ্ঞান ফেরানোর কোন ব্যবস্থা না করা হয়।

প্রথম বোমা বিস্ফোরিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আরও চারটি ক্লোরোফরম বোমা বিস্ফোরিত হয়েছিল পেছনের জীপ সহ দু'টি জীপে।

আহমদ মুসা প্রায় দেড়মিনিট নাক বন্ধ করেছিল। এর পরেও তার সন্দেহ হচ্ছিল তার জ্ঞান আছে কিনা। সে পা নেড়ে দেখছিল, না তার জ্ঞান ঠিক আছে।

দেড়মিনিট পর আহমদ মুসা নিশ্বাস নিল। পরিষ্কার বাতাস, শুধু বারুদের গন্ধ, গ্যাস বোমার সম্মোহনকারী মিষ্টি গন্ধ আর নেই।

গুলি তখন বন্ধ হয়ে গেছে।

আহমদ মুসা বুঝল, ওরা নিশ্চিত হয়ে গেছে জ্ঞান আর কারো অবশিষ্ট নেই। সেই সাথে সে বুঝল, এখন ওরা আসবে। এই সময় পায়ের শব্দ পেল জীপের সামনে। কে যেন কথা বলে উঠল, ওদেরকে মাইক্রোবাসে তুলে নাও। আর তোমরা জীপে উঠ।

যে কন্ঠটি কথা বলছিল, সে কথা বলতে বলতেই জীপের দিকে আসছিল। পদশব্দে মনে হল লোকটি তার জীপের দরজায় দাঁড়ল। দরজা খোলার

শব্দ হলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা টর্চ জ্বলে উঠল। কে যেন তার মাথার চুল ধরে টেনে মুখ উপরে তুলল। আহমদ মুসা মরার মতই পড়ে ছিল।

এ সময় পিছনের জীপের দিক থেকে কে যেন ছুটে এসে বলল, স্যার ও জীপে মাজুভ এবং নাতাশা।

আহমদ মুসার মাথার চুল ধরে যে তুলেছিল, সে বলল, এখানে তিনজন। জাকুব বেঁচে আছে, জাকুব কে দেখছি হাসান সেনজিকের সাথে এখানে। আহমদ মুসার চুল ছেড়ে দিতে দিতে বলল, তাহলে এই লোকটিই তাহলে হবে সেই আহমদ মুসা। গাড়ি থেকে লোকটি নেমে গেল।

গাড়ি থেকে লোকটি নেমে যাবার পর কয়েকটি পায়ের শব্দ এগিয়ে এল। তিনজন লোক। তারা আহমদ মুসাদের ধরা ধরি করে নামিয়ে নিয়ে চলল ওদের মাইক্রোবাসের দিকে।

আহমদ মুসাদের চার জনকে মাইক্রোবাসে তুলে দরজা বন্ধ করে দেয়া হলো। বাইরে দরজায় চাবি লাগানোর শব্দও আহমদ মুসা শুনল।

আহমদ মুসা মনে মনে খুশী হলো এই ভেবে যে, জাকুবকে তাহলে ওরা অবিশ্বাস করেনি।

অল্পক্ষণ পরেই গাড়ী নড়ে উঠল। চলতে শুরু করল গাড়ী।

আহমদ মুসা খেয়াল করল গাড়ী তার দিক পরিবর্তন করল না। অর্থাৎ তারা বেলগ্রেডের  দিকে যাচ্ছে।

আহমদ মুসা ঘড়ির রেডিয়াম ডায়ালে দেখল, রাত সাড়ে চারটা। খুশি হলো ঘড়ি তারা নেয়নি। পকেট থেকে দু'টো রিভলভার ও ছুরিটাই শুধু নিয়ে গেছে। কিন্তু তার প্রিয় লেসার পিস্তলটা রয়ে গেছে উরুর সাথে টেপ দিয়ে সেঁটে রাখা।

মাইক্রোবাসের ড্রাইভিং কেবিনে দু'জন আরোহী। একজন ড্রাইভার এবং তার পাশে একজন। পাশের জনের হাতে ষ্টেনগান। সে বলা যায় পেছন ফিরে অর্থাৎ আহমদ মুসাদের দিকে তাকিয়েই বসে আছে।

ভোর ৬টার দিকে আহমদ মুসাদের নিয়ে চারটি গাড়ির বহর কোকা শহরে পৌঁছল। কোকা প্রিষ্টিনার চেয়ে বড় শহর নয়। কোকার পরের শহরটিই বেলগ্রেড।

কোকা শহরের বেলগ্রেড হাইওয়ের উপরেই একটা বিরাট ত্রিতল বাড়ীর গেট দিয়ে প্রবেশ করল গাড়ির বহরটি। দাঁড়াল বিরাট বাড়ির প্রশস্ত গাড়ি বারান্দায়। থামল গাড়ি।

আহমদ মুসা আবার আগের মতই মরার মত গা এলিয়ে দিল চোখ বন্ধ করে।

রাত এখনও দেড় ঘন্টা বাকি।

সব গাড়ি দাঁড়ালে আবার সেই কন্ঠ শোনা গেল, যে কন্ঠকে আগে একবার নির্দেশ দিতে শুনেছিল আহমদ মুসা।

ভারি গলায় লোকটি এবার নির্দেশ দিল, এদেরকে নিয়ে নিচের মাল খানায় রাখ। সকালে সবাই আমরা বসব, তখন ওদের ওখানে নিয়ে জ্ঞান ফিরালেই হবে, সবাই মজাটা দেখবে। আর জাকুবকে নিয়ে ওর জ্ঞান ফেরাও, ওর কাছ থেকে কথা শুনতে হবে।

পদ শব্দে মনে হলো লোকটি কথা বলেই গট গট করে চলে গেল।

আহমদ মুসাদেরকে মালের বস্তার মত টেনে টেনেই গাড়ি থেকে নামানো হল। তারপর ওদেরকে টেনে হেচড়ে নিয়ে চলল করিডোর দিয়ে। নাতাশাকে যে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল সে এক শিষ দিয়ে বলে উঠল, খাসা মালরে।

আরেক জন বলে উঠল, চুপ বড় সাহেবদের এ সব মালে চোখ দিতে নেই।

অন্য একজন বলল, মাজুভ এবং এই নাতাশা দলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আজ সকালে যা ঘটবে তা দেখার মত হবে। ঐ সুন্দর অঙ্গ দেখবি শকুনের মত সবাই খাবে।

এই ভবনটি কোকা শহরে মিলেশ বাহিনীর হেড কোয়ার্টার। তিন তলা ভবনের মাটির তলায় একটি ঘর, এটাই মালখানা বা বন্দীখানা। খুব গুরুত্বপূর্ন কয়েদিদের এখানে রাখা হয়। এক তলার শেষ ঘরটির উত্তর দেয়ালে সুইচ বোর্ডে

'O' মার্কিং করা একটা সুইচ আছে, সেটা টিপলেই সুইচ বোর্ডের নিচেই মেঝের একটা অংশ সরে যায়। মেঝটা সরে গেলেই সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে নামলেই মালখানা। ভেতর থেকে বের হবার জন্যেও অনুরূপ একটা সুইচ আছে। কিন্তু সে সুইচ টিপলে মেঝেটা সরে যায়না। সে সুইচ আসলে একটা কলিং বেল। সে কলিং বেল শুনে যে ঘরের মধ্যে আন্ডারগ্রাউন্ড ঘরের সিঁড়ি সে ঘরের প্রহরী গিয়ে সুইচ টিপে সিঁড়ির মুখ খুলে দেয়।

আহমদ মুসাদেরকে বন্দীখানার মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে যখন ওরা উঠে যাচ্ছিল, তখন আহমদ মুসা চোখ খুলল, ওরা কি করে বেরুচ্ছে তা দেখার জন্যে। আহমদ মুসা শব্দ শুনেই বুঝেছে তারা সকলে সিঁড়িতে নামার সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ির মুখ আবার বন্ধ হয়ে গেছে।

আহমদ মুসা দেখল, ওরা সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে একজন হাত বাড়িয়ে সবচেয়ে উপরের সিঁড়ির ডান প্রান্তে কিছু একটাতে চাপ দিল। তার কিছুক্ষণ পরেই খুলে গেল সিঁড়ির মুখ। ওরা বেরিয়ে গেল।

বন্ধ হয়ে গেল সিঁড়ির মুখ।

সিঁড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেলে আহমদ মুসার চোখ ফিরে এল হাসান সেনজিক ও মাজুভদের দিকে। ওরা পড়ে আছে ঘরের মেঝেতে।

স্বাভাবিকভাবে জ্ঞান ফিরতে ওদের আরও পাঁচ ছয় ঘন্টা দেরী। কিন্তু শয়তানরা ফিরে আসার আগে এদের জ্ঞান ফিরাতে না পারলে তাদের উদ্ধার কিঠন হয়ে পড়বে।

অজ্ঞান করার জন্যে যে ক্লোরোফরম বোমা ব্যবহার করা হয়েছে তা সাধারণ শ্রেণীর। খুব মারাত্মক নয়। শরীরের স্নায়ুগুলোকে উত্তেজিত ও অবস্থাগত একটা পরিবর্তন আনতে পারলেই স্নায়ুর অবসাদ কেটে গিয়ে জ্ঞান ফিরে আসবে। আহমদ মুসা ঘরের চারপাশে একবার চোখ বুলাল। ঘরের এক কোনে পানির বেসিন দেখে খুশি হলো। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দেখল, পানির কলে পানি আছে।

পানির বেসিনের পাশেই আহমদ মুসা ফুটখানেক লম্বা ইলেকট্রিকের তার পড়ে থাকতে দেখল। খুশি হলো আহমদ মুসা।

মেঝে থেকে, তার তুলে নিয়ে এর দুই প্রান্ত থেকে রবারের কভারিং খুলে মাথা দু'টিকে তীখন করল।

পাশেই পড়েছিল নাতাশা। আহমদ মুসা হাতে করে গরম পানি নিয়ে নাতাশার মুখে ছিটিয়ে দিল। তারপর তার পায়ের কাছে বসে ইলেট্রিক তারের দুই মাথা একত্রিত করে নাতাশার পায়ের তালুতে আঁচড় কাটতে শুরু করল। মিনিট খানেক আঁচড় কাটার পর নাতাশার পা নড়ে উঠল।

আহমদ মুসার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

আহমদ মুসা নাতাশার মুখে আরো একটু পানি ছিটিয়ে দিল। তারপর আরো এক মিনিট নাতাশার দু'পায়ে আঁচড় কাটার পর নাতাশা চোখ খুলল।

চোখ খুলেই নাতাশা উঠে বসল এবং মাজুভদের ঐ ভাবে পড়ে থাকতে দেখে কেঁদে উঠল বলল, আমরা কোথায়, এদের কি হয়েছে?

আহমদ মুসা উঠে পানির কলের দিকে যেতে যেতে বলল, আমরা মিলেশ বাহিনীর হাতে বন্দী। তোমার জ্ঞান ফিরল, ওদের জ্ঞান এখনও ফেরেনি।

বলে আহমদ মুসা হাত ভরে পানি নিয়ে এসে মাজুভের মুখে ছিটিয়ে দিল।

নাতাশা নিজের মুখে হাত দিয়ে দেখল তার মুখেও পানি এবং চুল ও কাপড় কিছু ভিজা।

আহমদ মুসা মাজুভের পায়ের কাছে বসে তার পায়ের তালুতে তারের দুই তীখন মাথা দিয়ে আঁচড় কাটতে শুরু করল।

নাতাশাও তার পায়ের তালু দেখল। দেখল তার পায়ের তালু লাল হয়ে আছে এবং তার মধ্যে গভীর লাল অনেক আঁচড়। সব বুঝল নাতাশা। গভীর কৃতজ্ঞতায় তার দু'চোখের কোন ভিজে উঠল।

মিনিট দু'য়েকের মধ্যেই মাজুভ জ্ঞান ফিরে পেল।

এরপরে হাসান সেনজিকের জ্ঞান ফিরে পাবার পর চারদিকে চেয়ে তাদের মুখে অন্ধকার নামল। তারা বুঝতে পারল, তারা সম্ভবত মিলেশ বাহিনীর হাতে বন্দী। কিন্তু কি করে বন্দী হলো তারা বুঝতে পারলো না।

নাতাশাই প্রথম কথা বলল, আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে সে জিঞ্জেস করল, আমরা কি করে বন্দী হলাম, কিভাবে জ্ঞান হারালাম? কি করে আপনার জ্ঞান ফিরল?

আহমদ মুসা বলল, আমি জ্ঞান হারাইনি। ওদের গুলি বর্ষনের সময় প্রথম ক্লোরোফরম বোমা এসে আমার সামনে পড়ে। আমি তোয়ালেই মুখ গুজে দেড় মিনিট নিশ্বাস বন্ধ করে রাখি। আমি জ্ঞান না হারালেও জ্ঞান হারানোর মত পড়ে থাকি আমাদের সবাইকে ওরা বন্দী করে আনে। আহমদ মুসা থামল।

সবাই নিরব।

আহমদ মুসাই আবার কথা বলল। বলল, সকাল হলেই ওরা আমাদের নিয়ে যাবে। তারপর কি হবে আমি জানি না। আবার ওদের হাতে পড়ার আগে আমাদের সরতে হবে।

-যে লোক এই অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছে সে স্বয়ং কনষ্টানটাইন। আমি ওর গলা শুনেই চিনেছি। বলল মাজুভ।

-ও যার গলা শুনেছি, সেই তাহলে কনষ্টানটাইন। এখানে আসার পর সর্বশেষ হুকুমটাও সেই দিয়েছে। বলেছে সকালে ওদের দরবারে আমাদের নিয়ে যেতে। ওখানেই মজা করে আমাদের জ্ঞান ফেরানো হবে। বলল আহমদ মুসা।

-জাকুব কোথায়?

-জাকুবকে সম্ভবত ওরা বিশ্বাস করেছে। ওরা হয়তো মনে করেছে আমরা ওকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিলাম।

-আমরা কোথায় বেলগ্রেডে?

-না, দেড় ঘন্টায় কি বেলগ্রেড আসা যাবে?

-না, গাড়ি কি দেড় ঘন্টা চলেছে?

-হ্যাঁ, সাড়ে ৪টা থেকে ৬টা।

-তাহলে নিশ্চয় এটা 'কোকা' শহর হবে। এর পরের শহরই বেলগ্রেড। এখানে মিলেশ বাহিনীর ভাল অফিস আছে, এটাই সেই অফিস। আমি এ অফিসে এসেছি।

আহমদ মুসা কোন কথা বলল না। মাথা নিচু করে ভাবছিল সে।

সবাই নিরব।

অনেক্ষণ পর আহমদ মুসা বলল, এখান থেকে ওরা বের হয়েছে কিভাবে আমি দেখেছি। এই সিঁড়িটার উপর একটা গোপন সুইচ আছে। ওটা টিপলে মেঝের একটা অংশ সরে যাবে। কিন্তু একটা সমস্যা সেটা হলো, উপরের ঘরের সুইচ টিপলে সঙ্গে সঙ্গেই মেঝেটা সরে গিয়ে সিঁড়ি পথ বের হয়েছিল। কিন্তু দেখলাম, সিঁড়ির সুইচ টেপার সঙ্গে সঙ্গে মেঝেটা সরে যায়নি। বেশ কিছুক্ষণ সময় লেগেছে মেঝের অংশটা সরে গিয়ে দরজা বের হতে। আমার মনে হচ্ছে, সিঁড়ির সুইচটা টিপলে অন্য কোথাও খবর হয়, সেখান থেকে নির্দেশ দিলেই সম্ভবত সিঁড়ির মুখটা খুলে যায়। তাই যদি হয়, তাহলে এ সুইচ টেপার অর্থ হবে আমাদের সবার জ্ঞান ফিরেছে। সেক্ষেত্রে ওদের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের মোকাবেলা করতে হবে।

-তাহলে কি চিন্তা করছেন? বলল মাজুভ।

আহমদ মুসা সঙ্গে সঙ্গে কোন উত্তর দিল না। অনেক্ষণ পর বলল, আমি ভাবছি ওদের জন্যে অপেক্ষা করাটাই স্বাভাবিক হবে। কি বল তোমরা?

মাজুভ বলল, আমাদের মত চেয়ে লজ্জা দেবেন না। আমি আগে ভাবতাম, আমি এ লাইনে যথেষ্ট বুদ্ধি ও দক্ষতা অর্জন করেছি। কিন্তু এখন আপনাকে দেখার পর আমার মনে হচ্ছে, শিশুত্বই আমার এখনও কাটেনি।

সাড়ে ছয়টার দিকে আহমদ মুসা তায়াম্মুম করে ফজরের নামায পড়ল। তার সাথে নামাজ পড়ল হাসান সেনজিক।

দীর্ঘ কেরায়াতের সাথে অত্যন্ত ধীরে সুস্থে নামাজ পড়ল আহমদ মুসা। তার তেলাওয়াত অত্যন্ত মিষ্টি ও হৃদয়গ্রাহী। মনে হয় প্রত্যেকটা শব্দ, প্রত্যেকটা অক্ষর যেন হৃদয়ের কোমল ছোঁয়া নিয়ে বের হয়ে আসছে। কেরায়াতের সময় চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিল আহমদ মুসার।

দীর্ঘ মুনাজাত করল আহমদ মুসা। মুনাজাতে সে বিশ্বের মজলুম মুসলমান, মজলুম মানুষের জন্যে দোয়া করল। তাদের মুক্তি প্রার্থনা করল আল্লাহর কাছে। সেই সাথে নিজেদের বিপদের কথা জানিয়ে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করল।

মাজুভ এবং নাতাশা মন্ত্রমুগ্ধের মত আহমদ মুসার নামাজ দেখছিল। প্রার্থনা এত সুন্দর, এত প্রভাবশালী হতে পারে। আহমদ মুসার নামাজ, তার তেলাওয়াত, তার প্রার্থনা সেই ছোট্ট ঘরে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যাতে আহমদ মুসা যে স্রষ্টার উদ্দেশ্যে-বিনত হচ্ছে তার উপস্থিতি যেন মাজুভ, নাতাশাও অণুভব করতে পারছে।

নামাজ শেষ করে আহমদ মুসা ফিরে বসলে মাজুভ তাকে বলল, মুসা ভাই একটা কথা ক'দিন থেকে বলব বলব ভাবছি বলা হয়নি। আমি মুসলমান হতে চাই।

মাজুভের কথা শেষ না হতেই নাতাশা বলল, এ সিদ্ধান্ত আমি আগেই নিয়ে রেখেছি।

নাতাশার কথা শেষ হলে আহমদ গম্ভীর কন্ঠে বলল, তোমরা ইসলামকে বুঝে এ সিদ্ধান্ত নিচ্ছ তো?

-কতটুকু বুঝতে হবে জানি না, তবে আমি এতটুকু বুঝেছি, ইসলাম বাস্তববাদী ধর্ম। সেই সাথে আধ্যাত্মবাদীও। বলল মাজুভ।

-আপনারা কেউ জানেন না, এ ক'দিনে মোহাম্মাদ (স) এর জীবনী পড়ে আমি শেষ করেছি। আরকাইভস লাইব্রেরীতে বইটা পেয়েছিলাম। বলল নাতাশা।

-তুমি জাননা, তোমার আনা বইটা তোমার আগে আমিই শেষ করেছি, এক রাত আমার লেগেছে।

-তাহলে তো তোমরা জানো, আমাদের মহানবী (স) এর উপর চারিদিক থেকে কেমন বিপদের পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছিল। আজ বলকানের মুসলমানদের উপরও এ ধরনের বিপদের পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছে। এসব বিবেচনা করে কি তোমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছ?

উত্তরে দু'জন প্রায় একই রকম কথা বলল। তারা জানাল, ধর্মত্যাগী হিসাবে আমরা আরও বেশি হিংসার শিকার হতে পারি, এটা ধরেই নিয়েছি। কিন্তু সত্য ধর্ম গ্রহণের আনন্দ ও তৃপ্তির চেয়ে এই দুঃখ আমাদের কাছে বড় হবে না।

আহমদ মুসা মাজুভের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, তুমি আমার হাতে হাত রাখ, আর নাতাশা তোমার হাতে হাত রাখবে।

আহমদ মুসা ওদের কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করাল।

সাড়ে সাতটায় সুর্য ওঠে। সাড়ে সাতটার পরেই আহমদ মুসা মাজুভদের বলল, তোমরা যে যেখানে পড়েছিলে, সেখানে মরার মত শুয়ে থাক। আমি বলার আগে উঠবে না।

আহমদ মুসাকে সিঁড়ির নিচেই ফেলে রেখে গিয়েছিল। আহমদ মুসা গিয়ে সেখানেই শুয়ে পড়ল। ৮টা বাজতে পাঁচমিনিট বাকি থাকতে সিঁড়ির মাথায় কট করে একটা শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ির মাথায় পায়ের শব্দ হলো। পায়ের শব্দ গুলো দ্রুত নিচে নামতে লাগল।

আহমদ মুসা এক নিমেষ তাকিয়ে দেখে নিয়েছিল, সামনে আট জন খালি হাতে, পেছনে একজনের হাতে ষ্টেনগান।

সিঁড়ি থেকে পায়ের শব্দগুলো মেঝেয় নেমে এলো।

আহমদ মুসা প্রস্তুত হলো। এখন প্রয়োজন শুধু ষ্টেনগানধারীর অবস্থান জানা।

উঠে দাঁড়াবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আহমদ মুসা পরিপূর্ণভাবে চোখ খুলল। দেখল, তার পা থেকে ফুট তিনেক দুরে সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে ষ্টেনগানধারী। আর খালি হাতে একজন লোক তার পায়ের কাছে, আরেকজন আসছে মাথার দিকে সম্ভবত তাকে তুলে নেবার জন্যে।

আহমদ মুসা চোখ খুলেই স্প্রিং এর মত উঠে দাঁড়িয়ে ঝাপিয়ে পড়ল ষ্টেনগানধারীর উপর।

ষ্টেনগানধারী লোকটি সিঁড়ির উপর পড়ে গেল। আহমদ মুসা তার ষ্টেনগান হাতে করেই উঠে দাঁড়াল। উঠে মেঝের উপর দাঁড়িয়েই ষ্টেনগানের ট্রিগার চাপল আহমদ মুসা। শুরু করল ষ্টেনগানধারী থেকেই। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে ষ্টেনগানের ব্যারেল ঘুরিয়ে নিল গোটা ঘরের উপর দিয়ে।

আহমদ মুসাকে আকস্মিকভাবে উঠতে দেখে ঘরের মেঝেয় দাঁড়ানো আটজনই চমকে উঠল। তারা ঘটনার আকস্মিকতার ধাক্কা কেটে উঠার আগেই দেখল আহমদ মুসার হাতে ষ্টেনগান। আটজনই কিংকর্তব্যবিমুঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এই অবস্থায় তারা ষ্টেনগানের গুলি বৃষ্টির মুখে পড়ল।

তিরিশ সেকেণ্ড লাগল না। ৯টি লাশ ঝরে পড়ল ঘরের মেঝেতে।

‘তোমরা উঠে দাঁড়াও।’ বলেই আহমদ মুসা সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত উপরে উঠল।

সিঁড়ির মুখ বন্ধ হয়নি। সম্ভবত এখনি তারা বন্দীদের নিয়ে উপরে উঠবে এই জন্যেই সিঁড়ির মুখ বন্ধ করা হয়নি।

আহমদ মুসা ধীরে ধীরে সিঁড়ির খোলা মুখ দিয়ে মেঝের উপরে মাথা তুলে দেখল ঘরের দরজায় একজন প্রহরী। সে সিঁড়ি মুখের দিকেই তাকিয়ে আছে। ষ্টেনগানটা তার কাঁধে ঝুলানো।

আহমদ মুসা তড়াক করে সিঁড়ি থেকে মেঝতে উঠেই ষ্টেনগান উঁচু করল প্রহরীকে লক্ষ্য করে।

প্রহরী ষ্টেনগান কাঁধ থেকে হাতে নেয়ার সুযোগ আর পেল না।

আহমদ মুসা প্রহরীকে নির্দেশ দিল ঘরের ভেতর সরে আসার জন্যে।

প্রহরী এসে আহমদ মুসার সামনে দাঁড়ালো। কাঁপছিল সে।

এই সময় মাজুভ, হাসান সেনজিক ও নাতাশা সিঁড়ি দিয়ে মেঝেতে উঠে এল।

আহমদ মুসা বলল, মাজুভ, ওর ষ্টেনগানটা নিয়ে নাও।

আহমদ মুসা প্রহরীটিকে সিঁড়ি দিয়ে আন্ডার গ্রাউণ্ড ঘরে নামার নির্দেশ দিয়ে বলল, সিঁড়ির মুখ বন্ধ করতে হবে কিভাবে?

প্রহরী কাঁপতে কাঁপতে দেয়ালের সেই সুইচ দেখিয়ে বলল, প্রথমবার চাপলে সিঁড়ির মুখ খুলে যায়। দ্বিতীয় বার চাপ দিলে সিঁড়ির মুখ সাথে সাথেই বন্ধ হয়ে যায়।

‘আর নিচের সিঁড়িতে যে সুইচ আছে সে সুইচ টিপলে কিভাবে দরজা খুলে?’ প্রশ্ন করল আহমদ মুসা।

প্রহরীটি ঘরের দরজার পাশে ছোট কলিং বেল দেখিয়ে বলল, ঐ সুইচ টিপলে এ কলিং বেলে শব্দ হয়, তখন প্রহরী গিয়ে সুইচ টিপে সিঁড়ির মুখ খুলে দেয়।

‘ঠিক আছে এবার ভিতরে যাও।’ প্রহরীটিকে নির্দেশ দিল আহমদ মুসা।

সে সিঁড়িতে নেমে গিয়ে দেয়ালের সেই সুইচ চাপ দিল আহমদ মুসা। সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালের ভেতর থেকে মেঝের একটা অংশ এসে সিঁড়ির মুখ বন্ধ করে দিল।

আহমদ মুসা এবার ষ্টেনগান বাগিয়ে বাইরে বেরুবার জন্যে দরজার দিকে ছুটল।

দরজার পরেই লম্বা করিডোর। আহমদ মুসার মনে পড়ল করিডোরের মাঝখানে গাড়ি বারান্দায় নামার সিঁড়ি। গাড়ি বারান্দার পরেই ছোট একটি লন। তার পরেই গেট।

আহমদ মুসা করিডোরে পা দিল। বাইরে ঘন কুয়াশা। আট-দশ হাত দূরেও কোন কিছু দেখা যাচ্ছে না। খুশি হলো আহমদ মুসা।

ষ্টেনগান বাগিয়ে দ্রুত এবং সাবধানে করিডোরের সিঁড়ির দিকে এগুলো। তার পিছনে হাসান সেনজিক, তারও পিছনে মাজুভ এবং নাতাশা।

আহমদ মুসা করিডোরের সিঁড়ির প্রায় কাছাকাছি এসে গেছে। আর মাত্র হাত চার-পাঁচ দূরে।

এই সময় আহমদ মুসা পায়ের শব্দ পেল। দোতলার সিঁড়ি দিয়ে কে যেন করিডোরে নামছে। করিডোরের সিঁড়ি সোজা করিডোর থেকে উঠে গেছে দোতালার সিঁড়িতে। দোতালার সিঁড়ির মুখ স্টিলের একটি কোলাপসিবল গেট। সেটা খোলা।

আহমদ মুসা ষ্টেনগান বাগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সিঁড়ি থেকে লোকটির করিডোরে নামার অপেক্ষা করতে লাগল।

লোকটি করিডোরে পা রাখল। তাকে দেখে চমকে উঠল আহমদ মুসা। লোকটি জাকুব। জাকুবের দৃষ্টি পড়েছিল আহমদ মুসার উপর। সে চমকে উঠেই তার তর্জ্জনিটা ঠোটে ঠেকিয়ে পরক্ষণেই ইশারা করল পেছনে সরে যাবার জন্যে। জাকুবের ভয়ার্ত দৃষ্টি গাড়ি বারান্দার দিকে।

গাড়ি বারান্দায় একটা গাড়ি এসে দাঁড়ানোরও শব্দ পেল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা বুঝল ব্যাপারটা। দ্রুত সে কয়েক হাত পিছনে সরে থামের আড়ালে দাঁড়াল। তার সাথে মাজুভরাও।

থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে সামনের আবছা কুয়াশার মধ্য দিয়ে দেখল, করিডোরের সিঁড়ি দিয়ে উঠে একজন দীর্ঘদেহী এবং আর একজন বেঁটে মত লোক দোতলার সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল।

আহমদ মুসারা থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। জাকুব ছুটে এসে বলল, সবাই ওরা উপরে দরবারে বসেছে। গাড়ি বারান্দায় গাড়ি আছে। যান আপনারা। বেলগ্রেডে কোথায় যোগাযোগ করব?

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে চুপ করল জাকুব।

আহমদ মুসা কিছু বলার আগেই হাসান সেনজিক বলল, টিটো স্মরণী-এক, ষ্টিফেন পরিবারের বাড়ি।

কথাটা শুনেই জাকুব পেছন ফিরে ছুটল। সিঁড়ি দিয়ে সে দ্রুত উপরে উঠে গেল।

আহমদ মুসারা গাড়ি বারান্দায় নেমে এল।

গাড়ি বারান্দায় তখন দু'টা গাড়ি। একটা মাইক্রোবাস। আহমদ মুসা দেখেই চিনতে পারল রাতের সেই মাইক্রোবাস। আরেকটি জীপ। জীপটি তখনও গরম। তাহলে এই জীপেই লোকটি এসেছে।

আহমদ মুসা জীপের ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল। তার পাশে বসল হাসান সেনজিক। পেছনের সিটে মাজুভ এবং নাতাশা বসল।

আহমদ মুসা বিসমিল্লাহ বলে জীপ ষ্টার্ট দিল। আহমদ মুসা নিশ্চিন্ত। উপরে দোতলা, তিনতলা থেকে ওরা কুয়াশার মধ্যে লনের জীপ দেখতে পাবে না। সমস্যা শুধু, আহমদ মুসা ভাবল, গেটে কোন ঝামেলা পোহাতে হয় কিনা।

লন পেরুলেই বিশাল লোহার গেট। গেটের পাশেই গেটরুম। সেখানে সার্বক্ষণিক প্রহরী। সুইচ টিপে দরজা খোলা হয়। তারপর দরজা আপনিই বন্ধ হয়ে যায়।

আহমদ মুসা লাইট না জ্বালিয়ে এবং কোন প্রকার হর্ণ না দিয়ে দ্রুত গাড়ি চালিয়ে গেটের মুখোমুখি হলো। আলো এবং হর্ণের এদের নিজস্ব কোড আছে, সুতরাং ও দু'টা ব্যবহার করলে বিপদ আছে।

আহমদ মুসার জীপ যখন গেটের হাত পাঁচেক দূরে। গেটটি তখন খুলে গেল। আহমদ মুসা দ্রুত গাড়ি চালিয়ে গেট পেরিয়ে রাস্তায় এসে পড়ল।

আহমদ মুসা বলল, বেলগ্রেড কোনদিকে, ডাইনে?

‘হ্যাঁ’ উত্তর দিল মাজুভ।

আহমদ মুসা গাড়ি ডানদিকে ঘুরিয়ে নিল।

গাড়ির ‘ফগ লাইট’ জ্বালিয়ে দিয়েছে আহমদ মুসা।

বেলগ্রেড হাইওয়ে ধরে ছুটতে শুরু করল গাড়ি।

পেছন থেকে মাজুভ বলে উঠল, আমাদের ভাগ্য ভাল মুসা ভাই। এ জীপটা কনষ্টানটাইনের। তাই গেটম্যান জীপের নাম্বার দেখেই গেট খুলে দিয়েছে।

‘কেমন করে তুমি বুঝলে জীপটা কনষ্টানটাইনের’ বলল আহমদ মুসা।

‘যে দু’জন লোক সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে গেল, তার মধ্যে দীর্ঘদেহী লোকটিই কনষ্টানটাইন।’ বলল মাজুভ।

‘সত্যিই ভাগ্য ভাল আমাদের, কনষ্টানটাইনকেও চেনা আমার হয়ে গেল।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আমি ভাবছি, আমাদের সাথে আপনিও যদি জ্ঞান হারাতেন, তাহলে কি হতো।’ বলল নাতাশা।

আহমদ মুসা বলল, তাহলে আল্লাহ অন্যভাবে সাহায্য করতেন।

‘আপনি খুবই সংবেদনশীল, আপনি সব মানুষকে ভালবাসেন, কিন্তু এই যে ন’জন মানুষ আপনার গুলিতে মরল, মায়া লাগল না আপনার?’ বলল নাতাশা।

‘হৃদয় ভরা এই মায়া নিয়েই তো যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষ মারতে হয় নাতাশা। হত্যা না করলে যেখানে হত্যা হতে হবে সেখানে হত্যা করা জীবনের মতই জরুরী। প্রহরী আত্মসমর্পণ করেছে, ওকে আমি মারিনি।’ বলল আহমদ মুসা।

‘এই রক্তপাত, এই হানাহানি কি বন্ধ করা সম্ভব?’ বলল নাতাশা

‘বোধ হয় সম্ভব নয়।’

‘কেন সম্ভব নয়?’

‘কারণ, সত্য ও মিথ্যা এবং ন্যায় ও অন্যায়ের সহাবস্থান হতে পারে না। যতদিন দুনিয়াতে অন্যায় ও অমঙ্গলের পথ থাকবে, যতদিন মানুষ এই অন্যায় ও অমঙ্গলের পথে চলবে, ততদিন এই রক্তপাত ও হানাহানি বন্ধ হবেনা।’ বলল আহমদ মুসা।

‘অন্যায় ও অমঙ্গলের পথ বন্ধ করা কি সম্ভব নয়?’ বলল নাতাশা।

‘ইসলামতো এই জন্যই এসেছে, ইসলামী আন্দোলন তো এ লক্ষ্য সামনে রেখেই।’ বলল আহমদ মুসা।

‘দুনিয়া এ আন্দোলনের সাফল্য ও শান্তির মুখ কবে দেখবে?’

‘জানিনা নাতাশা, আমাদের দায়িত্ব হলো এই সাফল্য ও শান্তির জন্যে কাজ করা। যদি আমরা তা করি তাহলে আমরা মুক্তি লাভ করব, পুরষ্কার হিসেবে আখেরাতে আমরা লাভ করব অনন্ত শান্তি।’ বলল আহমদ মুসা।

‘কিন্তু আল্লাহ তো চাইলেই, এ দুনিয়াতেও শান্তির সমাজ কায়েম হতে পারে। তাঁর ইচ্ছাই তো যথেষ্ট।’

‘আল্লাহ্ তা কেন চাইবেন নাতাশা। পরীক্ষকরা যদি পরীক্ষার হলে সব উত্তর পরীক্ষার্থীদের বলে দেয়, তাহলে তো সবাই পাশ করবে। ভালো-মন্দের পরীক্ষা তাহলে হবে কেমন করে? আল্লাহ তো পরীক্ষা করতে চান ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্য থেকে কে কোনটা বেছে নেয়। আল্লাহ তো সে অনুসারেই আখেরাতে পুরষ্কার ও শান্তি দেবেন।’ বলল আহমদ মুসা।

‘তাহলে ইসলামী আন্দোলন কেন?’ বলল নাতাশা।

‘ইসলামী আন্দোলন দয়াময় আল্লাহর তরফ থেকে আসা এক অসীম নেয়ামত। এ নেয়ামত মানুষকে জানায় ন্যায় কোনটা, অন্যায় কোনটা, মুক্তির পথ কোনটা, আর সর্বনাশের পথ কোনটা, যাতে করে মানুষ এ দুনিয়াতেও শান্তি লাভ করতে পারে এবং পরকালেও লাভ করতে পারে অনন্ত শান্তি।’ বলল আহমদ মুসা।

নাতাশা কোন কথা আর বলল না। তাঁর মুখ গম্ভীর, চোখে উজ্জ্বল এক আলোর দীপ্তি।

আহমদ মুসা কিছুক্ষণ নিরব থাকার পর মুখ একটু ফিরিয়ে মাজুভকে লক্ষ্য করে বলল, গাড়ির নাম্বার পাল্টাতে হবে মাজুভ। ওরা এতক্ষণে নিশ্চয় সব পথের সব পয়েন্টেই এ গাড়ির নাম্বার জানিয়ে দিয়েছে।

'ঠিক আছে মুসা ভাই আমি দেখছি।' বলল মাজুভ।

প্রায় মিনিট পাচেঁক গাড়ি চলার পর এক জায়গায় এসে মাজুভ আহমদ মুসাকে গাড়ি থামাতে বলল।

গাড়ি থামল গাড়ির বড় একটা ওয়ার্কশপের সামনে। ওয়ার্কশপের সামনে বেশ কয়েকটা ভাঙ্গা গাড়ি দাঁড়িয়ে। একটা জীপও আছে। দেখলেই বোঝা যায় অনেকদিন ধরে পড়ে আছে। জীপের উপরের কভার নেই। টায়ারগুলোও জীর্ণ। নাম্বার প্লেটের একটা মাথা খসে গিয়ে ঝুলছে। মাজুভ দেখে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল।

চারদিক কুয়াশায় ঢাকা। কোন লোকজন নেই। ওয়ার্কশপ খুলতে দেরি আছে।

মাজুভ জীপের নাম্বার প্লেট দু'টি খুলে নিয়ে এ জীপে লাগিয়ে নিল। আর এ জীপের নাম্বার প্লেট দু'টি দুমড়ে দলা পাকিয়ে আবর্জনার স্তূপে ফেলে দিল।

আবার ছুটতে শুরু করল জীপ।

বেলা ১০টার দিকে আহমদ মুসারা লাজারাভেক এসে পৌঁছাল। মাঝখানে রাস্তার পাশের একটা রেস্টুরেন্ট থেকে ওরা সকালের ব্রেকফাস্ট সেরে নিয়েছে।

লাজারাভেক বেলগ্রেড ও কোকার মাঝখানে একটা ছোট্ট বাজার। আহমদ মুসা মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে দেখল, লাজারাভেক থেকে একটা রাস্তা প্রথমে সোজা পূর্বদিকে, তারপর পূর্ব-উত্তর কোণে এগিয়ে দানিয়ুব তীরের গ্রোকা শহর পর্যন্ত চলে গেছে। ওখানে দানিয়ুব পেরোলেই দানিয়ুবের পূর্ব তীর ধরে বেলগ্রেড পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়া দানিয়ুব হাইওয়েতে পৌঁছা যাবে।

মানচিত্র থেকে মুখ তুলে আহমদ মুসা বলল, মাজুভ, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক দিয়ে যতগুলো রাস্তা বেলগ্রেডে প্রবেশ করেছে সবগুলো রাস্তায় মিলেশ বাহিনী নিশ্চয় কড়া পাহারা বসাবে। যদিও আমরা গাড়ির নাম্বার প্লেট বদলেছি,

তবুও মানুষ কিন্তু আমরা ঠিকই আছি। ওরা শুধু গাড়ির নাম্বার নয়, গাড়ি ও মানুষের বিবরণও জানিয়ে দিয়েছে। সুতরাং ঝামেলা এড়াবার জন্যে আমরা সামনে লাজারাভেক থেকে লাজারাভেক গ্রোকা রাস্তা ধরে এগিয়ে দানিয়ুব পার হয়ে পূর্ব দিক দিয়ে বেলগ্রেডে প্রবেশ করতে পারি।

মাজুভের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, সবচেয়ে সুন্দর ও নিরাপদ পথ আপনি বের করেছেন মুসা ভাই। বেলগ্রেডে প্রবেশের এর চেয়ে নিরাপদ বিকল্প পথ আর নেই। আমার মাথায় এপথের কথা আসতোই না। মুসা ভাই আপনাকে মুবারকবাদ।

আহমদ মুসা কোন উত্তর দিলনা। লাজারাভেক বাজারে গাড়ি তখন প্রবেশ করেছে। বাজারে গাড়ি থামাল না আহমদ মুসা। একবার সে ফুয়েল ট্যাংকের দিকে তাকিয়ে গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে দিল। গাড়ি দুটি চলল দানিয়ুব তীরের গ্রোকার উদ্দেশ্যে।

# ৩

জাকুব মিলেশ বাহিনীর অন্যান্যদের সাথে ‘টিটো স্মরনী-এক’ এর মুখে এসে গাড়ি থেকে নামল। এই ‘টিটো স্মরনী-এক’ এর মাঝ বরাবর স্থানেই ষ্টিফেন পরিবার অর্থাৎ হাসান সেনজিকের বাড়ি।

এই রাস্তার দুই মুখে মিলেশ বাহিনী সার্বক্ষণিক পাহারা বসিয়েছে। রাস্তার দুই মুখেই পাঁচ ছয় জন করে সর্বক্ষণ ঘোরা ফেরা করছে। ছদ্মবেশে তারা আশে-পাশের রেস্টুরেন্ট ও দোকানের লোকদের সাথে মিশে থেকে রাস্তার প্রতিটি লোক প্রতিটি গাড়ির দিকে নজর রাখছে। তাদের প্রত্যেকের পকেটে পিস্তল এবং কোটের তলায় কাঁধে ঝুলানো স্টেনগান। সন্দেহ হলেই তারা লোকদের নামিয়ে, গাড়ি থামিয়ে পরীক্ষা করছে, জিজ্ঞাসাবাদ করছে। এছাড়া মিলেশ বাহিনীর লোকেরা হাসান সেনজিকের বাড়ির সামনে পাহারা বসিয়েছে। সেটাও ছদ্মবেশে। হাসান সেনজিকের বাড়ির বিপরীত দিকের রাস্তার দক্ষিন পাশে একটা আধা সরকারি ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর। কর্মচারীরা সবাই খৃষ্টান। এখানে মিলেশ বাহিনী তাদের তাদের চারজন লোক বসিয়েছে হাসান সেনজিকের বাড়ির গেটে নজর রাখার জন্য। বাড়িতে কে ঢোকে কে বেরোয় তা তারা মনিটর করছে। বাড়ির পেছনটাও নিশ্চিদ্র করেছে মিলেশ বাহিনী। হাসান সেনজিকের বাড়ির পেছনে প্রাচীর ঘেরা বিরাট মাঠ। সেখানেও সার্বক্ষণিক পাহারার ব্যবস্থা করেছে।

এসব ব্যবস্থা ছাড়াও হাসান সেনজিকের বাড়ির সামনের রাস্তা অর্থাৎ ‘টিটো স্মরণী-এক’ এ মিলেশ বাহিনীর দুটি গাড়ি প্রায়ই চক্কর দিয়ে ফিরছে।

হাসান সেনজিকের বাড়ি ঘিরে মিলেশ বাহিনীর এভাবে আট-ঘাট বেঁধে বসার লক্ষ্য দুটি। এক, হাসান সেনজিকের মায়ের পালিয়ে যাওয়া অথবা তার স্থানান্তর রোধ করা, দুই, এইভাবে হাসান সেনজিককে মায়ের কাছে আসতে বাধ্য করে তাকে ফাঁদে ফেলা।

জাকুব গাড়ি থেকে বলল, আমি এখানে নতুন রাস্তাটা, এলাকাটা একবার ঘুরে-ফিরে দেখতে পারি তো? হাসান সেনজিকের বাড়ি চিনিনা, ওটাও দেখা হবে।

টিমের অপারেশন কমান্ডার ব্রাংকো বলল, কোন অসুবিধা নেই, সব জায়গায় যেতে পারেন।

‘ওদের কোন লোকজন নেই?’ বলল জাকুব।

ব্রাংকো হাসল। বলল, পাগল হয়েছেন ওরা আসবে এখানে মরতে! ওরা এখানে সেখানে চোরা-গোপ্তা মিছিল করে, হ্যাণ্ডবিল ছড়ায়। সামনে আসবার শক্তি ওদের নেই। ওরা নাকি হোয়াইট ক্রিসেন্ট নামে একটা গুপ্তদল গড়েছে, কিন্তু ওদের কোন সাক্ষাৎ এ পর্যন্ত আমরা পাইনি।

‘হাসান সেনজিকের বাড়ীতে কেউ নেই?’ বলল জাকুব।

তাচ্ছিল্যের সাথে ব্রাংকো আবার হাসল। বলল, শুন্য নীড়। পরিবারের মধ্যে আছে শুধু দুই মহিলা হাসান সেনজিকের মা আর তার ফুফু আর আছে ঝি, আয়া এবং কয়েকজন চাকর-বাকর ও একজন দারোয়ান।

‘চলে কি ভাবে ওদের?’ বলল জাকুব।

‘পারিবারিক সম্পত্তি থেকে কিছু আয় পায়। বাড়ির সংলগ্ন কয়েকটা দোকান আছে, তার ভাড়া থেকেও কিছু আয় আসে।’ বলল ব্রাংকো।

জাকুব পায়ে হেটে ধীরে ধীরে সামনে এগুল।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ঘনিয়ে আসছে।

দুপুরেই জাকুব কনস্টানটাইনের সাথে বেলগ্রেড পৌঁছেছে। পৌঁছেই সে পরিকল্পনা করেছে ‘টিটো স্মরণী-এক’ এ আসার। তারপর যখন জানতে পেরেছে একটি স্কোয়াড় ‘টিটো স্মরনী-এক’ এ আসছে, তখন তার সাথেই সে শামিল হয়েছে।

হাটতে হাটতে ভাবছিল জাকুব, আহমদ মুসারা নিশ্চয় দুপুরের আগেই বেলগ্রেড পৌঁছেছে ওরা কি এসেছে হাসান সেনজিকের বাড়ীতে। মিলেশ বাহিনী যেভাবে বাড়ীটাকে বেরিকেড দিয়ে রেখেছে তাতে এ বাড়িতে পা দেবার কথা চিন্তা করা সহজ নয়। কিন্তু আহমদ মুসার অসাধ্য কিছুই নয়, এই বাধা আহমদ মুসাকে আটকাতে পারেনা। ও একটা বিস্ময়কর মানুষ। মাজুভের বাড়িতে সেদিন সে শুধু

আত্মরক্ষাই করেনি, দু'জনকে পরাভূত ও ৫ জনকে হত্যা করে সে মাজুভকে উদ্ধারও করেছে। আর সবচেয়ে অবাক ব্যাপার হলো গ্যাস বোমায় অজ্ঞান আহমদ মুসারা কোকার ভূ-গর্ভস্থ বন্দীখানা থেকে বেরিয়ে আসতে পারল কেমন করে? জাকুব তো জানে, তাকে ইনেজকশন দিয়ে মিলেশ বাহিনীর লোকেরা তার জ্ঞান ফিরিয়েছে। তাদের জ্ঞানই বা ফিরল কেমন করে, আর ৯ জনকে হত্যা করে ওরা বেরিয়ে আসতে পারল কেমন করে? মিলেশ বাহিনী এখন একমাত্র আহমদ মুসাকেই ভয় করছে।'

রাস্তার উত্তর পাশের ফুটপাত ধরে হাটছিল জাকুব। হাসান সেনজিকদের গেটে এসে থমকে দাঁড়াল সে। গেটও বাড়ির যে বর্ণনা শুনেছিল তাতে গেট ও বাড়ির দিকে নজর পড়তেই জাকুব চিনতে পারল হাসান সেনজিকদের বাড়ি।

গেট ভেতর থেকে বন্ধ। জাকুব কয়েক মূহুর্ত গেটের সামনে দাঁড়াল। কিন্তু নক করতে সাহস পেলনা।

আরও সামনে এগুল জাকুব। হাসান সেনজিকের বাড়ি সংলগ্ন পূব পাশের কিছু দোকান হাসান সেনজিক পরিবারের। দোকানগুলো ভাড়া দেয়া আছে। জাকুবের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ভাবল, নিশ্চয় দোকানের লোকদের সাথে হাসান সেনজিকের পরিবাবের লোকদের একটা সম্পর্ক আছে।

জাকুব একটা দোকানের সেলস কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়াল।

তখন সূর্য ডুবে গেছে।

দোকানে তখন খদ্দের নেই। দু'জন ছিল, তারা জিনিস কিনে বেরিয়ে গেল।

জাকুব সেলস কাউন্টারে দাঁড়াতেই সেলসম্যান দ্রুত তার কাছে এল খদ্দের ভেবে।

'মাফ করবেন, আমি খদ্দের নই, আমি একটা বিষয় জানতে চাই।' বলল জাকুব।

অল্প বয়সের সেলসম্যান ছেলেটি জাকুবের মুখের দিকে একবার তাকাল, তারপর বলল, বলুন কি জানতে চান।

হাসান সেনজিকের বাড়ির দিকে ইঙ্গিত করে বলল, ওটা তো হাসান সেনজিকের বাড়ি, তাই না?

সেলসম্যান ছেলেটির মুখটা মলিন হয়ে উঠল কথাটা শুনেই। বলল, হ্যাঁ।

'ও বাড়ির কাউকে তুমি অবশ্যই চেন, তাই না?' বলল জাকুব।

ছেলেটি আবার জাকুবের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, চিনি। ছেলেটির মুখে উদ্বেগ ও ভয়ের চিহ্ন।

এ সময় দোকানের ভেতরের কক্ষ থেকে একজন যুবক বেরিয়ে এল।

যুবকটি সালেহ বাহমন।

সালেহ বাহমন এবং তার হোয়াইট ক্রিসেন্টের লোকেরা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে হাসান সেনজিকের বাড়ীর আশে-পাশে অবস্থান নিয়েছে। হাসান সেনজিকের পরিবারের ভাড়া দেওয়া এই দোকান গুলোর লোকজন প্রায় সকলেই এখন হোয়াইট ক্রিসেন্টের লোক। তাদের একটাই লক্ষ্য, বিপদের সময় হাসান সেনজিকের মাকে সাহায্য করা। ছদ্মবেশে সালেহ বাহমনও এখন এসে দোকানে বসছে।

সালেহ বাহমন তার ছদ্মবেশ হিসেবে লম্বা গোঁফ ব্যবহার করে। কিন্তু যখন দোকানের ভেতরের কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল তখন মুখে সেই গোঁফ ছিলনা। তার আসল চেহারায় সে বেরিয়ে এসেছে। সালেহ বাহমন কাউন্টারে এসে প্রথমে এক নজর জাকুবকে দেখে নিল। তারপর বলল, হাসান সেনজিক পরিবারের কাউকে চেনার কথা আপনি জিজ্ঞাসা করেছেন কেন? আপনি কে?

জাকুব কিছু বলতে যাবে এমন সময় ফুটপাতে একটা হুইসেল বাজার শব্দ হলো এবং তার মূহুর্তকাল পরেই একজন লোক দ্রুত এসে সেলস কাউন্টারে সালেহ বাহমনের মুখোমুখি দাঁড়াল। এবং দাঁড়িয়েই চ্যালেঞ্জের সুরে বলল, তুমি সেই সালেহ বাহমন না?

সালেহ বাহমন চমকে উঠল। মূহুর্তে তার মুখটি উদ্বেগে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। অনেকটা কষ্ট করেই যেন বলল, আপনি কে?

‘আমি মিলেশ বাহিনীর লোক তোমার যম।’ বলে লোকটি পিস্তল বের করে সালেহ বাহমনের বুক বরাবর ধরল, ভোজবাজির মত দ্রুত ঘটে গেল ঘটনাটা।

জাকুব প্রথমটায় হকচকিয়ে গিয়েছিল। তারপরেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল তার কাছে আর পরিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে তার পকেট থেকে রিভলভার বের করে মিলেশ বাহিনীর সেই লোকটির বুক বরাবর ধরে বাম হাত দিয়ে তার হাত থেকে পিস্তল কেড়ে নিয়ে সালেহ বাহমনের হাতে দিয়ে দিল। তারপর দ্রুত তাকে টেনে দোকানের ভিতরের কক্ষে নিয়ে গেল। সালেহ বাহমনও পেছনে পেছনে ভেতরে ঢুকে গেল।

ভেতরে ঢুকা পর্যন্ত জাকুব দেরি করল না। পেছন পেছন ঢুকতে ঢুকতেই জাকুব রিভলভারের বাঁট দিয়ে মিলেশ বাহিনীর সেই লোকটির কানের নিচে ঘাড়ের পাশটিতে প্রচন্ড আঘাত করল।

সঙ্গে সঙ্গেই লোকটি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল।

জাকুব দ্রুত বলল, সালেহ বাহমন একে গায়েব করবার কোন জায়গা আছে এখানে?

‘আছে’ সালেহ বাহমন বলল, ‘দোকানের পেছনেই আন্ডার গ্রাউন্ড ড্রেনের মুখ আছে।’

‘বেশ একে সরিয়ে ফেলুন, আর আশে-পাশে আপনি লুকিয়ে থাকুন। আমার মনে হচ্ছে, এখনি এক বা একাধিক কেউ এর খোঁজে আসবে, এ হুইসেল বাজানোর পর দোকানে এসেছে।’ বলল জাকুব।

বলে জাকুব দ্রুত দোকানের সেলস কাউন্টারে বেরিয়ে এল।

সেলসম্যান ছেলেটি ভয় পাওয়া হরিণের মত সন্ত্রস্তভাবে বসে আছে।

জাকুব এসেই সেলসম্যান ছেলেটিকে বলল, ‘যা ঘটেছে সব ভুলে যাও, মুখে হাসি নিয়ে এস।’

কথা শেষ করেই জাকুব আবার কয়েকটা জিনিসের অর্ডার দিল।

সেলসম্যান ছেলেটি জাকুবের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে জিনিসগুলো আনতে গেল।

ঠিক এই সময় দু'জন লোক হন্ত-দন্ত হয়ে ছুটে এল। বলল, এখানে কেউ এসেছে, কিছু ঘটেছে?

জাকুব চোখ কপালে তুলে বলল, কে আসবে? কি ঘটবে?

লোক দু'টি অনেকটা দ্বিধাগ্রস্তের মত বলল, মানে এখানে এই এখনি একজন লোক এসেছে, সে গেল কোথায়?

'আমিই তো এসেছি পাঁচ-ছ' মিনিট হলো, আর কে আসবে কার আসার কথা বুঝিয়ে বলুন তো?' বলল জাকুব।

'অল্প কিছুক্ষণ আগে একজন লোক এখানে এসেছে। আমরা তার হুইসেল শুনেছি এবং তাকে এদিকেই আসতে দেখেছি।' বলল আগন্তুকদের একজন।

'কিসের হুইসেল শুনেছেন? আপনাদের পরিচয় কি বলুন তো?' বলল জাকুব।

লোক দু'টি কয়েক মুহূর্ত কিছু বলল না। তারপর একটু রুক্ষকন্ঠে বলল, আপনার এত প্রশ্ন কেন, আমি যা বলছি তার জবাব দিন।

'আপনাদের সাহায্য করতে চাই বলেই তো প্রশ্ন করছি, কিন্তু আপনারা তো দেখি উল্টো রাগ করছেন। আমি আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে কি বাধ্য?' বলল জাকুব।

'অবশ্যই বাধ্য।' বলে আগন্তুকের একজন পকেট থেকে পিস্তল বের করে নাচাতে নাচাতে বলল, 'জবাব না দিলে জবাব দিতে বাধ্য করব।'

জাকুবও তার পকেট থেকে রিভলভার বের করে হেসে উঠে বলল, ও জিনিসটা আমারও আছে। পিস্তলের ভয় দেখাচ্ছেন আমাকে, স্পর্ধা আপনাদের কম নয়?

সেলসম্যান ছেলেটি জাকুব যে সব জিনিস চেয়েছিল তা নিয়ে দোকানের মাঝখানে মুর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। কাঁপছে সে।

লোক দু'টির চোখ এবার জ্বলে উঠল। বলল, জানেন আপনার এ ধৃষ্টতার কি শাস্তি হতে পারে, জানেন আমরা এখন ডাকলেই ডজন ডজন পিস্তল ছুটে আসবে?

‘আমি ডাকলেও আসবে।’ হেসে বলল জাকুব।

‘জানেন আমরা কে?’ বলল আগন্তুকের একজন।

‘এ প্রশ্ন তো আমি অনেক আগেই জিজ্ঞাসা করেছি।’ বলল জাকুব।

আগন্তুক দু’জনের একজন কাউন্টারে একটা ঘুষি মেরে বলল, আমরা তোমার যম, মিলেশ বাহিনীর লোক আমরা।

জাকুব হেসে তার কোটের কলারের প্রান্ত উল্টিয়ে ওদের দেখাল। সেখানে জ্বল জ্বল করছে মিলেশ বাহিনীর প্রতীক।

আগন্তুক দু’জনের রাগ একদম পানি হয়ে গেল। তাদের পিস্তল চলে গেল তাদের পকেটে। একাবারে ভিজা গলায় বলল তাদের একজন, কিন্তু আপনাকে তো আমরা চিনি না।

‘চিনবেন না, আজই আমি প্রিষ্টিনা থেকে কনষ্টানটাইনের সাথে বেলগ্রেড এসেছি। এখানকার কোন ডিউটিতে এখনও আমি যোগ দেইনি। ব্রাংকোর সাথে এ রাস্তায় আমি এসেছি পরিস্থিতি দেখতে।’ বলল জাকুব।

‘কিছু মনে করবেন না, নিজেদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি হয়ে গেছে।’ বলল তাদের একজন।

কথা শেষ করেই আবার সে বলল, কিন্তু যে হুইসেল বাজিয়ে আমাদের আসার সংকেত দিল সে গেল কোথায়?

‘আপনারা কোনদিক থেকে এসেছেন?’ বলল জাকুব।

‘পশ্চিম দিকে রাস্তার ওপাশের ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর থেকে।’ ওদের একজন বলল।

‘হতে পারে কাউকে সে ধাওয়া করেছে, পুব পাশের দোকান গুলোতে আর একটু খোঁজ করুন। আমিও আপনাদের সাথে আসব, পয়সা চুকিয়ে আসছি।’ বলল জাকুব।

‘ঠিক বলেছেন ধাওয়া করে কোন দিকে যেতে পারে, সন্ধ্যার অন্ধকারে তো সঠিকভাবে কিছু ঠাহর করা যায়নি।’ বলে ওরা পুব পাশের দোকানের দিকে চলে গেল।

এ দোকানটিই সেনজিক পরিবারের দোকানগুলোর শেষ দোকান। এর পুব পাশ থেকে অন্যদের দোকান শুরু হয়েছে এবং মাঝখানে অল্প একটু ফাঁকা জায়গা। ফাঁকা জায়গাটিতে সেনজিক পরিবারের আরেকটা দোকানের কাঠামো তৈরী আছে, কিন্তু কাজ শেষ হয়নি এখনও।

ওরা চলে গেলে জাকুব সেলসম্যানকে জিনিসগুলো প্যাকেট করতে বলে দোকানের ভেতরের কক্ষে চলে গেলে।

সালেহ বাহমনও তখন সেখানে এসে প্রবেশ করেছে।

জাকুব তাড়াতাড়ি বলল, এখন কথা বলার সময় নেই। আপনি একটা ঠিকানা দিন যেখানে গিয়ে আজই আমি কথা বলতে পারি।

সালেহ বাহমন তাড়াতাড়ি কাগজের একটা টুকরো নিয়ে একটা ঠিকানা লিখে জাকুবের হাতে দিতে দিতে বলল, কখন আপনি যাবেন?

'ওরা পাশের দোকানের দিকে গেছে, ওদের সাথে আমাকে কিছুক্ষণ থাকতে হবে। তারপর ঘন্টা দু'য়েকের মধ্যে আমি আপনার সাথে দেখা করতে পারি।' বলল জাকুব।

'ঠিক আছে।' বলে হাত বাড়িয়ে দিল সালেহ বাহমন।

জাকুব হ্যান্ডশেক করে বেরিয়ে এল দোকান থেকে। তার হাতে দোকান থেকে কেনা কয়েকটা জিনিসের একটা প্যাকেট।

ওমর বিগোভিকের ড্রইংরুম।

ওমর বিগোভিক এবং সালেহ বাহমন সোফায় পাশাপাশি বসে। দু'জনের চোখেই উদ্বেগ মুখ শুকনো।

ড্রইং রুমের পাশের ঘরে সংযোগ দরজার ওপারেই বসে আছে নাদিয়া নুর এবং তার মা। তাদেরও চোখে মুখে উদ্বেগ।

কথা বলছিল সালেহ বাহমন, 'ভীষণ তাড়াহুড়া করে একটা জায়গার ঠিকানা চেয়েছে, হঠাৎ করেই আমি এখানকার ঠিকানা দিয়ে দিয়েছি লোকটিকে।

পরক্ষণ থেকেই আমি ভাবছি, এ আমার ঠিক হয়নি। কোন হোটেল রেষ্টুরেন্টের কথা বললেই ভাল হতো।

‘লোকটির নাম কি?’ বলল ওমর বিগোতভিক।

‘নাম জানি না।’ বলল সালেহ বাহমন।

‘পরিচয়ও তো জিজ্ঞাসা করার সময় হয়নি।’

‘আমি মাত্র তাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছি, সে তার উত্তর দেবার আগেই ওরা এসে পড়েছে।’ বলল সালেহ বাহমন।

ওমর বিগোভিক কথা বলল না। চোখ বন্ধ করে সে ভাবছিল। অল্পক্ষণ পর সে চোখ খুলল। বলল, মৃত্যু অথবা কিডন্যাপের হাত থেকে লোকটি তোমাকে বাঁচিয়েছে, সে দিক থেকে তাকে বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু তার যে পরিচয়, প্রকাশ পেয়েছে সন্দেহজনক। থামল ওমর বিগোভিক।

সালেহ বাহমন বলল, শুধু তো আমাকে বাঁচানো নয়, মিলেশ বাহিনীর লোকটিকে সেই হত্যা করেছে বলা যায়, কারণ গুম করার পরামর্শ সেই দিয়েছে।

‘ঠিক বলেছ, একথাটা আমার মনেই ছিল না। এদিক দিয়ে তো দেখা যাচ্ছে সে মিলেশ বাহিনীর বিরুদ্ধে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, গরম তর্ক-বিতর্ক, এমনকি পিস্তল বের করার পর মিলেশ বাহিনীর লোকেরা তাকে ছেড়ে দিল কেন? এবং পরে সেই বা কেন মিলেশ বাহিনীর লোকদের সাথে গেল? আর তুমি যা শুনেছ সে অনুসারে সে আজ কনষ্টানটাইনের সাথে প্রিষ্টিনা থেকে এসেছে, তাহলে তো সে মিলেশ বাহিনীর প্রধান কনষ্টানটাইনের বিশ্বস্ত লোক।’ বলল ওমর বিগোভিক।

চিন্তার নতুন একটা কালো ছায়া নামল সালেহ বাহমনের মুখে। বলল, সেদিক দিয়ে তো তাই।

থামল সালেহ বাহমন। তারপরেই আবার শুরু করল, কিন্তু হাসান সেনজিক পরিবারের কারো সাথে সে কথা বলতে চায় কেন? আমি তো হাসান সেনজিক পরিবারের লোক নই, আমার সাথে কথা বলতে চাইছে কেন?

‘ঠিক আছে সালেহ বাহমন, আমরা চিন্তা করে কোন কুল পাবনা। আল্লাহ ভরসা। আসতে দাও তাকে।’

ঠিক এই সময়েই ওমর বিগোভিকের গেটের কলিং বেল বেজে উঠল।

সালেহ্ বাহমনের বুকটা ধক করে উঠল।

সালেহ্ বাহমন ও ওমর বিগোভিক পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাল।

সালেহ্ বাহমন উঠে দাঁড়াল। বলল, চাচাজান আপনি বসুন, আমি দেখছি। বলে সালেহ্ বাহমন গেটের দিকে চলল। বিসমিল্লাহ্ বলে গেট খুলল।

ঠিক, গেটে দাঁড়িয়ে দোকানে দেখা সেই লোকটি।

সালেহ বাহমন উদ্বেগটা ভেতরে চেপে রেখে মুখে হাসি টেনে তাকে স্বাগত জানাল। বলল, আসুন, খুব খুশি হয়েছি, ভেতরে আসুন।

উভয়ে হ্যান্ডশেক করল। তারপর লোকটিকে নিয়ে সালেহ্ বাহমন চলে এল ড্রইং রুমে।

ওদেরকে ঢুকতে দেখে ওমর বিগোভিক উঠে দাঁড়াল।

সালেহ্ বাহমন লোকটিকে তার সাথে পরিচয় করে দেয়ার জন্যে বলল, ইনি ওমর বিগোভিক। আমার মুরব্বী।

হ্যান্ডশেক করে ওমর বিগোভিক লোকটিকে বসিয়ে তার পাশে বসে পড়ল। সালেহ্ বাহমন আরেকটি সোফায় বসল।

বসেই সালেহ বাহমন বলল, ওর সামনে তো আমরা আলাপ করতে পারি।

লোকটি অর্থাৎ জাকুব হেসে বলল, কোন অসুবিধা নেই, বরং ভালই হবে।

একটু চুপ করেই জাকুব আবার মুখ খুলল। বলল, প্রথমেই আমার পরিচয় সুস্পষ্ট করতে চাই। আমি মিলেশ বাহিনীর লোক, আমার নাম জাকুব।

দম নিবার জন্যে কথায় একটু বিরতি দিয়েছিল জাকুব।

নাম ও মিলেশ বাহিনীর কথা শুনেই ওমর বিগোতিক ও সালেহ্ বাহমনের মুখ অন্ধকার হয়ে গেল।

তাদের এই পরিবর্তন জাকুবের নজর এড়াল না।

জাকুব হাসল। বলল, জানি আমার এ পরিচয়কে আপনারা ভাল ভাবে নেবেন না। কিন্তু এটাই আমার সব পরিচয় নয়। থামল জাকুব।

সালেহ বাহমন ও ওমর বিগোতিক কোন কথা বলল না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইল জাকুবের দিকে।

জাকুব আবার শুরু করল, আমি মিলেশ বাহিনীর লোক। কিন্তু আহমদ মুসা আমাকে জয় করে নিয়েছেন। আমি এখন মিলেশ বাহিনীর হয়েও মিলেশ বাহিনীর লোক নই।

-তোমার মানে আপনার আহমদ মুসার সাথে দেখা হয়েছে? চোখে আলো জ্বালিয়ে বলল ওমর বিগোতিক।

-শুধু আহমদ মুসা নয়, হাসান সেনজিকের সাথেও দেখা হয়েছে।

-কোথায়? কেমন করে? বলল সালেহ বাহমন।

'সে এক বিরাট কাহিনী' শুরু করল জাকুব, 'সেদিন মিলেশ-এর জন্মদিনে আমি ছিলাম কসভোর মিলেশ স্মৃতি স্তম্ভে। শোনা গেল হাসান সেনজিকের মত একজনকে গাড়িতে মিলেশ স্মৃতি স্তম্ভের পাশ দিয়ে সিটানিক নদীর দিকে যেতে দেখা গেছে। দুরবীণ দিয়ে দেখা গেল তাদের গাড়ি মুরাদের বিজয় সৌধের কাছে থেমেছে। আমাকে ও আমার চাচাত ভাইকে পাঠানো হলো নিশ্চিত হবার জন্যে। আমরা ছুটলাম। গিয়ে আমরা হাসান সেনজিককেই সামনে পেলাম। নিশ্চিত হয়ে আমরা বিজয় সৌধের একটু আড়ালে গিয়ে পরিকল্পনা অনুসারে সংকেত দিলাম। এর কিছুক্ষণ পরেই আমরা দেখলাম, হাসান সেনজিক এবং আরো দু'জন তড়িঘড়ি গিয়ে গাড়িতে উঠেছে। বুঝলাম ওরা পালাচ্ছে আমাদের টের পেয়ে। আমরা দু'জন পিস্তল বাগিয়ে ছুটলাম। কয়েক মুহূর্ত পরেই পেছনে রিভলভারের গুলির আওয়াজ শুনে চমকে উঠে আমরা ফিরে দাঁড়ালাম। দেখলাম উদ্যত রিভলবার হাতে এক যুবক। আমাদেরকে পিস্তল ফেলে দিয়ে ব্রীজের দিকে হাটবার নির্দেশ দিল। বুঝলাম, আমাদের গুলি করে নদীতে ফেলে দেবার জন্যেই নিয়ে যাচ্ছে। আমরা মৃত্যুভয়ে তখন অস্থির। কাঁপছিলাম আমরা। ব্রীজের উপর নিয়ে আমাদের দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করল, আমরা কতদিন ধরে মিলেশ বাহিনীতে আছি, বাড়ীতে কে কে আছে। আমরা সত্য জবাব দিলাম। তারপর তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা সাঁতার জানি কিনা। জানি শুনে বললেন, যাও তোমরা সিটনিকে লাফিয়ে পড়ে চলে যাও, এটাই তোমাদের শাস্তি।

আমরা কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। জীবন নিতে আসা শত্রুকে যে কেউ মাফ করে, কেউ ছেড়ে দেয় এই প্রথম দেখলাম।

আমরা নদীতে ঝাপিয়ে পড়ে চলে এলাম। আমরা দুই ভাই ঠিক করেছিলাম তাদের বিরুদ্ধে আর যাব না। কিন্তু সেই রাত্রেই যেতে হল।

হাসান সেনজিকের সাথে সেদিন ঐ গাড়িতে ছিল আরও দু'জন, মাজুভ ও নাতাশা স্বামী-স্ত্রী। মাজুভ প্রিষ্টিনা শহরের মিলেশ বাহিনীর একজন নেতৃস্থানীয় লোক। প্রমাণ পাওয়া গেল এবং দেখা গেল সে আহমদ মুসার পক্ষে যোগ দিয়েছে। আরও অনুমান করা হলো এবং খোঁজ নিয়ে নিশ্চিত হওয়া গেল তার বাড়িতে আহমদ মুসা ও হাসান সেনজিক আছে। সংঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধান্ত হলো সেই রাতেই মাজুভ, নাতাশা, হাসান সেনজিক ও আহমদ মুসাকে কিডন্যাপ, না পারলে হত্যা করা হবে। ঠিক হলো সার্ভিয়া প্রদেশের মিলেশ বাহিনীর প্রধান দূর্ধর্ষ জারজেস জিবেঙ্কু সহ নয়জন এই অভিযানে অংশ নেবে। আমার ভাই যেতে রাজি হলো না, তাকে গুলি করে মারা হলো। ভয়ে আপত্তি না করে আমি অভিযানে শরিক হলাম।

আটজন দু'ভাগে ভাগ হয়ে আমরা চারজন গেলাম মাজুভ ও নাতাশাকে ধরে আনতে দোতালায়, অন্য চারজন গেল হাসান সেনজিক ও আহমদ মুসাকে কিডন্যাপ অথবা হত্যা করতে।

আমরা চারজন সফল হলাম। মাজুভকে ধরে নিয়ে এসে গাড়িতে তুললাম। নাতাশা কাঁদতে কাঁদতে এমনিতেই সাথে এসেছিল। জোর করে আনতে হয়নি।

কিন্তু অন্য চারজন তখনও ফেরেনি। এই সময় আমরা গাড়িতে এসে উঠতেই ভেতর থেকে ষ্টেনগানের গুলির শব্দ পাওয়া গেল।

আমাদের দু'জন ছুটল কি হল খোঁজ নেবার জন্যে। ওরা যাবার কয়েকমুহূর্ত পরেই আবার রিভলভারের দু'টি গুলির শব্দ হলো। রিভলভারের গুলির পর পরই আহমদ মুসাকে রিভলভার হাতে ছুটে নেমে আসতে দেখলাম আমরা। বুঝা গেল আমাদের লোকেরা পরাজিত হয়েছে। জারজেস একটা গুলি করল আহমদ মুসাকে। কিন্তু তার আগেই সে লনে শুয়ে পড়েছিল।

এই অবস্থায় ভয়ে আমরা মাজুভকে নিয়ে গাড়ি করে পালালাম। কিন্তু নাছোড়বান্দা আহমদ মুসা মাজুভকে উদ্ধারের জন্যে আমাদেরই অন্য গাড়িটা নিয়ে আমাদের পিছু নিল। বেলগ্রেড হাইওয়ে দিয়ে দেড়শ মিটার আসার পরেই আহমদ মুসা আমাদের ধরে ফেলল। জারজেস জিবেঙ্কু পালাতে গিয়ে নিহত হলো। পেছনের সিটে আমি ও মাজুভ ছিলাম। আমি আগেই মাজুভের কাছে আত্মসমর্পন করেছিলাম। এবারও আহমদ মুসা আমাকে মাফ করে দিলেন। অভিযানের ৮ জনের মধ্যে আমিই শুধু বেঁচে গেলাম।

দু'টি গাড়িতে করে আমরা প্রিষ্টিনায় ফিরে যাচ্ছিলাম। প্রিষ্টিনার কাছাকাছি পৌঁছতেই মিলেশ বাহিনীর নেতা স্বয়ং কন্সটান্টাইনের নেতৃত্বে দু'টি গাড়ি আমাদের গতিরোধ করে দাঁড়ায়। গতিরোধ করেই ওরা আমাদের উপর মেশিনগানের অবিরাম গুলি বর্ষণ শুরু করে। তারপর আমার কিছু মনে নেই। আমার জ্ঞান ফিরল কোকা শহরে মিলেশ বাহিনীর ঘাটিতে। জ্ঞান ফিরেই সামনে দেখলাম মিলেশ বাহিনীর নেতা কনষ্টান্টাইনকে। আঁতকে উঠলাম, তাহলে কি আহমদ মুসাদের সবাইকে বন্দী করেছে অথবা মেরে ফেলেছে। পরে ওদের কাছেই শুনলাম, গ্যাস বোমা ফেলে সবাইকে অজ্ঞান করে বন্দী করে কোকার ভূগর্ভস্থ বন্দীখানায় বন্দী করে রাখা হয়েছে। আট ঘন্টার আগে কারও জ্ঞান ফিরবে না। আমাকে ওদের কাছ থেকে উদ্ধার করে ইনজেকশন দিয়ে জ্ঞান ফেরানো হয়েছে। আরও শুনলাম সকাল ৮ টায় মিলেশ বাহিনীর দরবার বসবে, সেখানে আহমদ মুসা, হাসান সেনজিক, মাজুভ ও নাতাশাকে এনে তাদের জ্ঞান ফিরিয়ে মহা উৎসবের মাধ্যমে তাদের হত্যা করা হবে।

মনটা আমার খুব খারাপ হয়ে গেল। আসলে মানুষকে আপন করে নেবার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে আহমদ মুসার। তাছাড়া আহমদ মুসার মত বিষ্ময়কর সাহসী, অকল্পনীয় ক্ষিপ্র এবং অপরূপ কুশলী মানুষ মিলেশ বাহিনীর হাতে মারা যাবে আমার মন কিছুতেই মেনে নিতে চাইছিল না।

পৌনে ৮টায় দরবার বসল। ৮টায় কনষ্টান্টাইন দরবারে আসবেন। পৌনে ৮টায় ৯ জনকে পাঠানো হলো ভূগর্ভস্থ বন্দীখানা থেকে আহমদ মুসা, হাসান সেনজিক, মাজুভ ও নাতাশাকে আনার জন্যে।

আমার সামনে দিয়েই ওরা চলে গেল। আমার মনে হল আমার বুকের উপর দিয়ে ওরা যাচ্ছে। এত কষ্ট লাগল আমার। আমি উঠে দাঁড়ালাম। ওদের বীভৎস উৎসব নিজ চোখে দেখতে পারবো না।

আমি কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক পায়চারি করে বাগানের দিকে যাবার জন্যে সিঁড়ি দিয়ে এক তলায় নামছিলাম। শেষ সিঁড়ি থেকে করিডোরে পা দিয়ে সামনে তাকিয়ে ভূত দেখার মত চমকে উঠলাম। সামনেই আহমদ মুসা, মাজুভ, হাসান সেনজিক ও নাতাশাকে দেখলাম। আহমদ মুসার হাতে ষ্টেনগান।

চমকে উঠার পরক্ষণেই খুশিতে আমার মন ভরে গেল। ওরা মুক্ত হতে পেরেছে দেখে আনন্দিত হলাম। ওরা চলে আসার সময় আমি আহমদ মুসাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বেলগ্রেডে কোথায় আমি তাদের সাক্ষাৎ পাব। আমাকে হাসান সেনজিকের বাড়ির ঠিকানা দিয়ে ওখানেই তাদের খোঁজ নিতে বলা হয়েছিল। সেজন্যেই আমি আজ হাসান সেনজিকের ওখানে গিয়েছিলাম।

একটু থামল জাকুব। থেমেই আবার বলল, এত কথা বললাম এই কারণে যে মিলেশ বাহিনীর একজন লোককে বিশ্বাস করা আপনাদের জন্যে সহজ নয়।

ওমর বিগোভিক ও সালেহ বাহমনের মুখ তখনও হা হয়ে আছে। তারা যেন বিস্ময়কর এক রূপকথা শুনছিল।

জাকুব থামার পর ওমর বিগোভিক বলল, আপনাকে ইনজেকশন দিয়ে জ্ঞান ফেরানো হলো। কিন্তু আহমদ মুসারা চারজন কি করে জ্ঞান ফিরে পেল? কেমন করেই বা তারা মুক্ত হলো? অবিশ্বাস্য ঘটনা।

জাকুব বলল, সেদিন মিলেশ বাহিনীর সকলের মনেই এ প্রশ্ন জেগেছিল, আমার মনেও জেগেছিল। কিন্তু উত্তর আমরা পাইনি। ওরা চলে যাবার পর বন্দীখানায় গিয়ে ষ্টেনগানের গুলিতে ঝাঝরা হয়ে যাওয়া মিলেশ বাহিনীর লোকদের ৯ টি লাশ পাওয়া গেছে। মিলেশ বাহিনীর সবার কাছেই ঘটনাটা অবিশ্বাস্য হয়ে আছে। কিন্তু আমি মনে করি আহমদ মুসাকে যতটুকু আমি দেখেছি তাতে মনে হচ্ছে, আহমদ মুসা সব অসম্ভবকেই সম্ভব করতে পারেন। অথচ লোকটির নিষ্পাপ হাসি, সরল মুখ, অত্যন্ত ভদ্র ও দয়ালু ব্যবহার দেখে মনেই হয় না যে অমন এক দুর্ধর্ষ লোক তিনি।

জাকুব থামতেই সালেহ বাহমন প্রশ্ন করল, ওরা কি বেলগ্রেড এসেছেন?

জাকুব বলল, আমি নিশ্চিত ওরা বেলগ্রেড এসেছেন। কিন্তু মিলেশ বাহিনী প্রমান পাচ্ছে না যে, তারা বেলগ্রেড এসেছেন। দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক থেকে যত রাস্তা বেলগ্রেডে প্রবেশ করেছে, সব রাস্তার মুখে সকাল থেকেই মিলেশ বাহিনী পাহারা বসিয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেকটি গাড়ি পরীক্ষা করা হয়েছে। তাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কারোর শহরে ঢুকা অসম্ভব।

-তাহলে আপনি নিশ্চিত হচ্ছেন কি করে যে তারা বেলগ্রেড এসেছেন? বলল সালেহ বাহমন।

-আমি আগেই বলেছি, আহমদ মুসা এমন এক লোক যিনি অসম্ভবকে সম্ভব করেন। বুঝছেন না, মাজুভের মত মিলেশ বাহিনীর একজন নেতৃস্থানীয় লোক কি করে আহমদ মুসার ভক্তে পরিণত হলো, আর আমিই বা কি করে এত তাড়াতাড়ি মিলেশ বাহিনীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস পেলাম।

-আপনার কথাটাই বলুন তো, কেন কিসে আপনার এই পরিবর্তন? বলল সালেহ বাহমন।

-প্রথমেই আহমদ মুসার দয়া, উদারতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমি ভেবেছি, শক্রুর কাছে যে লোক অত সুন্দর হয় সে অনেক বড় মানুষ। দ্বিতীয়তঃ তাকে দেখে আমার অতীতের কথা মনে হয়েছে। আমার দাদা এবং পূর্বপূরুষ মুসলমান ছিলেন। আহমদ মুসাকে দেখে আমার মনে হয়েছে, মুসলমান হওয়া একটা গৌরবের বিষয়। এ দু'টি বিষয়ই মিলেশ বাহিনীর সাথে আমার সম্পর্ক নষ্ট করেছে।

-আহমদ মুসারা বেলগ্রেডে এলে কোথায় উঠতে পারে বলে আপনি মনে করেন? বলল ওমর বিগোভিক।

-এটা বলা মুশকিল। আহমদ মুসার সাথে মাজুভ রয়েছে। মাজুভ বেলগ্রেডের সব কিছুই জানে। সুতরাং তাদের কোন অসুবিধা হবে না। বলল জাকুব।

একটু থেমেই আবার সে বলল, এতক্ষন আমি আমার কথাই বলেছি, আমি যা জানতে চাই তা জানা হয়নি। আপনাদের পরিচয়ও জানা হয়নি।

ওমর বিগোভিক বলল, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরীচ্যুত একজন শিক্ষক, এখন ব্যবসা করি।

ওমর বিগোভিক থামলে সালেহ বাহমন বলল, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র। আরেকটা ছোট পরিচয় আছে। সেটা হলো, আমি হোয়াইট ক্রিসেন্টের একজন কর্মী।

হোয়াইট ক্রিসেন্টের নাম শুনে জাকুব আগ্রহী হয়ে উঠল। বলল, এ সংগঠনের কথা মিলেশ বাহিনীতে এখন খুব আলোচনা হচ্ছে। সংগঠনের বিস্তার কেমন হয়েছে, শক্তি সামর্থ কেমন অর্জন করেছে?

-নতুন সংগঠন। সংগঠিত হওয়ার পর্যায় চলছে। এখনও উল্লেখ করার মত কিছু সংগঠন করতে পারেনি।

-নতুন বটে, মিলেশ বাহিনীতে কিন্তু আতংকের সৃষ্টি হয়েছে। তারা ভয় করছে মুসলমানরা সংগঠিত হলে তাদের গায়ে আর হাত দেয়া যাবেনা, প্রতিটি আঘাতের প্রত্যাঘাত আসবে।

-তারা আঘাত না দিলেই তো পারে, শান্তিতে সহাবস্থান করা যায়। বলল ওমর বিগোভিক।

-এই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকেই মিলেশ বাহিনী এবং বিদ্বেষবাদী খ্রিষ্টানরা যমের মত ভয় করে।

-কেন? বলল সালেহ বাহমন।

-শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অর্থ হলো, তারা মনে করে, খ্রিষ্টানদের বিপর্যয় এবং মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও বিকাশ। বলল জাকুব।

-কেমন করে? বলল সালেহ বাহমন।

-আসলে খৃষ্টধর্ম তো কোন জীবন-ধর্ম নয়, নিষ্ক্রিয় কিছু বিশ্বাসের সমষ্টি মাত্র, যার আবার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। সুতরাং এ ধর্ম আজকের দিনের চাহিদা পুরণ করতে পারছে না। অন্যপক্ষে, তারা মনে করে, ইসলাম একটি জীবন-ধর্ম। ইসলাম শুধু বিশ্বাস নির্ভর নয়, কাজ নির্ভর ধর্ম, যা বিজ্ঞান ও বাস্তবতা সম্মত। সুতরাং মুসলমানরা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সুযোগ পেলে তাদের প্রভাব

খৃষ্টানদের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়বে। শান্তি ও সত্য সন্ধানী সব খৃষ্টান ইসলামের ছায়ায় গিয়ে আশ্রয় নেবে।

-খৃষ্টানরা মুসলমানদের এত ভয় করে? বলল ওমর বিগোভিক।

-ভয় করবে না? সোভিয়েত ইউনিয়নে কম্যুনিষ্ট সরকার সেখানকার মুসলমানদের জাতিসত্তা ধ্বংসের জন্যে হেন ব্যবস্থা নেই যা গ্রহণ করেনি। আরবী ভাষা বিলুপ্ত করেছে, কোরআন পড়া ও ধর্মীয় শিক্ষা বন্ধ করেছে, সচেতন মুসলমানদের হত্যা করেছে, চালান নীতির মাধ্যমে মুসলিম জনশক্তিকে বিভক্ত, বিশৃঙ্খল করে দিয়েছে। ইতিহাস বিকৃত করে অতীত থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করেছে, অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে বিয়ে বাধ্যতামুলক করে তাদের জাতীয় বিশুদ্ধতা বিনষ্ট করেছে এবং ধর্ম-কর্ম অপ্রোয়জনীয় ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। যুগের পর যুগ ধরে এই শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা চলার পরেও দেখা যাচ্ছে মুসলমান জাতির মৃত্যু হয়নি। বরং অবস্থা এতটাই উদ্বেগজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, মুসলমানরাই অদুর ভবিষ্যতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সংখ্যাগুরু জাতিতে পরিণত হবে। অর্থাৎ মুসলমানদের বিশ্বাসের কোন মৃত্যু নেই, বরং প্রতিকুল পরিবেশে এ বিশ্বাস আরও তাজা হয়ে ওঠে। এ কারণেই মিলেশ বাহিনী মুসলিম-নিধন নীতি গ্রহণ করেছে। তাদের কথা, মুসলমানদের বাঁচিয়ে রাখলে আর ওদের সাথে পারা যাবে না। থামল জাকুব।

-মেরে কি একটা জাতিকে শেষ করা যায়? বলল ওমর বিগোভিক।

-সেটা তারা ভাবছে না। তারা ভাবছে, যা তারা করছে, তার কোন বিকল্প নেই।

কথা শেষ করেই জাকুব বলল, আমার মূল প্রশ্নটায় আমি ফিরে আসতে চাচ্ছি। হাসান সেনজিক পরিবারের কারো সাথে যোগাযোগের পথ কি?

সালেহ বাহমন হাসল। বলল, ওর বাড়ীতে কোন ব্যাটা ছেলে নেই।

হাসান সেনজিকের মা ও ফুফু ছাড়া কোন মেয়ে ছেলেও আর নেই।

বাড়ীর আয়া, চাকর-বাকর তো কিছুই জানে না। অতএব তাদের ওখানে যোগাযোগের কোন পথ নেই। তাদের সাথে অন্যভাবে যোগাযোগ করতে হয়। আমরা এ ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করব।

জাকুব বলল, আমার বেশি প্রয়োজন নেই। আমি আহমদ মুসার সাথে যোগাযোগ করতে চাই। এই যোগাযোগের পয়েন্ট হিসাবে তিনি হাসান সেনজিকের বাড়ির কথাই উল্লেখ করেছেন।

'ঠিক আছে, উনি যোগাযোগ করলেই আমরা আপনাকে জানাব।' বলল সালেহ বাহমন।

কথা শেষ করেই সালেহ বাহমন আবার বলল, কিন্তু আপনাকে আমরা পাব কোথায়? জাকুব একটা চিরকুট সালেহ বাহমনের হাতে তুলে দিতে দিতে বলল, এটা মিলেশ বাহিনীর নতুন হেড কোয়ার্টারের ঠিকানা। ঠিকানাটা আপনাদের অবগতির জন্য দিলাম। ওখানে আমার খোঁজ করার দরকার নেই। আমি নিজেই হাসান সেনজিকের বাড়ির পাশের দোকানগুলোতে বিশেষ করে ঐ দোকানের ঐ সেলসম্যানের কাছে খোঁজ করব।

'ঠিক আছে, এটাই সবচেয়ে সহজ হবে।' বলল সালেহ বাহমন।

এই সময় ভেতরের দরজায় নক করার শব্দ হলো।

ওমর বিগোভিক ভেতরে চলে গেল।

গিয়েই ফিরে এসে হাসতে হাসতে বলল, আমার ভুল হয়ে গেছে, মেহমানকে শুধু কথাই শোনাচ্ছি, কোন মেহমানদারী এখনও হয়নি। ভেতর থেকে এই অভিযোগ উঠেছে। সুতরাং আপনারা একটু বসুন, আমি আসছি। বলে ওমর বিগোভিক ভেতরে চলে গেল।

সালেহ বাহমন বলল, বিকালে আমার নাস্তা হয়নি, সত্যিই ক্ষুধা পেয়েছে। বলে আবার আলোচনায় ফিরে এল তারা।

'মা নাদিয়া, আনেক ঘটনা ঘটেছে, আহমদ মুসা ও হাসান সেনজিকরা বেলগ্রেড এসে পৌঁছেছে, এ খবর তো ডেসপিনার কাছে তোমাকে পৌঁছাতে হয়।' বলল ওমর বিগোভিক।

'আমার যেন বিশ্বাস হতে চাইছে না। ওরা সত্যিই কি এত প্রতিরোধের মধ্যে বেলগ্রেড ঢুকতে পেরেছেন?' বলল নাদিয়া নূর।

'জাকুবের কথা তোমরাও তো শুনেছ। আহমদ মুসা কি করে মিলেশ বাহিনীর পাতা জাল একের পর এক ছিন্ন করেছে, সে সব ঘটনা অকল্পনীয়,

অবিশ্বাস্য মনে হয়নি? যদি ঐ অবিশ্বাস্য ব্যাপারগুলো সত্য হয়ে থাকে, তাহলে তোমার কাছে যা এখন অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে তা সত্য হবে না কেন?' বলল ওমর বিগোভিক।

'এই খবর ডেসপিনা এবং হাসান সেনজিকের মা শুনলে ভয়ানক খুশী হবে, আমি এখনই যাই আব্বা ডেসপিনার ওখানে।' বলল নাদিয়া নূর।

'আমি তো সে কথাই বলছি, ওদের তাড়াতাড়ি জানান দরকার খবরটা। আর আমরাও জানতে পারব কোন খবর তারা জানে কিনা।' বলল ওমর বিগোভিক।

'ঠিক বলেছেন,' বলে উঠে দাঁড়াল নাদিয়া। হাতের ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে চলে গেল নিজের ঘরের দিকে তৈরী হবার জন্যে।

# ৪

শোয়া থেকে উঠে আড়মোড়া ভেঙে টান হয়ে বসে আহমদ মুসা বলল, এভাবে শুয়ে থাকলে শুয়ে থাকার মজা পেয়ে বসবে। আর নয়।

বলে আহমদ মুসা বাথরুমে গেল।

পাশেই আরেকটা সিটে হাসান সেনজিক শুয়েছিল।

গতকাল বিকেলে আহমদ মুসারা বেলগ্রেড এসে পৌঁছেছে। উঠেছে মাজুভের বোনের বাসায়। মাজুভের বোন ৭ বছরের এক মেয়ে নিয়ে বিরাট এক বাড়িতে বাস করে। মাজুভের ভগ্নিপতি নৌবাহিনীর একজন উচ্চ পদস্থ অফিসার। সে আছে এখন অদ্রিয়াতিক সাগরে।

মাজুভদের বিশেষ করে নাতাশাকে পেয়ে তার বোন মহাখুশি। নাতাশাও হাফ ছেড়ে বেঁচেছে প্রাণ খুলে কথা বলার লোক পেয়ে।

মাজুভের বোনের বাসা বেলগ্রেডের অভিজাত এলাকার সেনাবাহিনীর অফিসার কলোনীতে।

গতকাল থেকে গোটা সময়টাই মাজুভ, নাতাশা, হাসান সেনজিক ও আহমদ মুসা ঘুমিয়ে কাটিয়েছে। ক'দিনের উদ্বেগ-অস্থিরতার পর নিরাপদ ঘুমটা সবার জন্যেই মধুর হয়েছে। খাওয়া আর নামাজ ছাড়া আর কিছুই করেনি আহমদ মুসারা।

এই সময় তাদের নিস্তরঙ্গ জীবনে তরঙ্গ তুলেছে মাজুভের ৭ বছরের ভাগ্নী রিটা রাইন। মাজুভের বোন মারিয়া মাজুভ ও নাতাশার নামাজ পড়া দেখে ভীত হয়েছে, কিন্তু নামাজ পড়া দেখে খুব মজা পেয়েছে রিটা। তার প্রশ্নের জবাব দিতে সবাই অস্থির।

নাতাশাকে প্রথম নামাজ পড়তে দেখে রিটা অবাক হয়ে তার সামনে হা করে দাঁড়িয়ে থেকেছে। বার বার প্রশ্ন করেছে, কি করছ, কি করছ তুমি বল? কথা

বলছ না কেন? সিজদায় গেলে নাতাশার চুল ধরে টানাটানি করেছে আর বলছে, কি হল তোমার মামী? এ রকম করছ কেন? কথা বলছ না কেন?

নাতাশা নামাজ পড়ছে, জবাব দেবে কেমন করে!

অবশেষে মারিয়া এসে রিটাকে ধরে সরিয়ে নিয়ে নাতাশাকে রক্ষা করেছে।

নামাজ শেষে নাতাশা রিটাকে কাছে টেনে বলেছে, নামাজের সময় কথা বলে না, কথা বলব কি করে?

-কেন বলে না? প্রশ্ন করেছে রিটা।

-আমার তোমার সকলের স্রষ্টা যে আল্লাহ্ সেই আল্লাহ্র হুকুম নামাজের সময় কথা বলা যাবে না, আর নামাজ যে পড়ছে তাকে কিছু জিজ্ঞাসাও করা যাবে না।

-নামাজ কি?

-নামাজ আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা।

-আম্মা নামাজ পড়ে না কেন?

বিপদে পড়ে গেল নাতাশা। এখন কি জবাব দেবে? কাছেই মারিয়া দাঁড়িয়েছিল। মুখ টিপে হেসে বলেছে, এখন জবাব দাও। তোমাদের নতুন ধর্ম গ্রহণে কি সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে দেখ।

নাতাশা রিটাকে কাছে টেনে আদর করে বলেছে, তোমার আম্মাও তো প্রার্থনা করে।

-কোথায় করে, একদিনও তো আমি নামাজ পড়তে দেখিনি।

-কেন গির্জায় যায় তো রোববারে। সেখানে প্রার্থনা করে তো।

-তোমার মত বাড়িতে নামাজ পড়ে না কেন?

মহা বিপদে পড়ে গেল নাতাশা। এখন কেমন করে বলে যে, তার মা খৃষ্টান, আর নাতাশারা মুসলমান। আর বললে বিপদ কমবে না, আরও বাড়বে। অবশেষে নাতাশা কোন রকমে পাশ কাটাবার জন্যে বলেছে, সবাই নামাজ পড়ে না, দেখ না আমি আগে পড়তাম না, এখন পড়ি। তোমার মাও একদিন পড়বে।

রিটা বোধ হয় কথাটার যুক্তি বুঝেছিল। সে একটু দম নিল। এই সময় মাজুভ রিটাকে ডাকলে সে ছুটে সেদিকে চলে গেল।

সে চলে যায় বটে, কিন্তু তার মা মারিয়া ধরে বসে নাতাশাকে। বলে, শিশুর কাছে মিথ্যা কথা বলা হলো না? আমি নামাজ পড়ব একথা কি ঠিক?

নাতাশা হেসে মারিয়ার হাত ধরে বলেছে, আপা, আমি ভবিষ্যতের কথা বলেছি। ভবিষ্যতের কথা নিশ্চিত করে আমিও বলতে পারিনা, আপনিও বলতে পারেন না। আমি ইসলাম গ্রহণ করব কোনদিন ভাবিনি।

-অর্থাৎ তুমি বলতে চাচ্ছ, তুমি যা ভাবনি তা যখন ঘটেছে, আমার ক্ষেত্রেও তা ঘটতে পারে।

-ঠিক তা আমি বলিনি। আমি নিছক একটা নীতি কথা বলেছি।

মারিয়া হেসে বলেছিল, তোমরা এই অভাবনীয় কান্ড কিভাবে ঘটালে? ভাবনা-চিন্তার জন্যেও তো সময় দরকার, সে সময়ও তো তোমরা নাওনি। যাদুতে আমি বিশ্বাস করলে বলতাম তোমরা যাদুর কবলে পড়েছ।

নাতাশা বলেছে, কোন ধর্ম যদি পড়া-শুনা করে বুঝে-সমঝে গ্রহণ করতে হয়, তাহলে তার জন্যে সময় দরকার হয়। কিন্তু আমরা পড়ে-বুঝে তো ইসলাম গ্রহণ করিনি। আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি ইসলামকে স্বচক্ষে দেখে।

-সেটা কি রকম? বিমূর্ত কোন আদর্শকে কি দেখা যায়, ইসলামের কি কোন রূপ আছে?

-আদর্শ বিমূর্ত, আদর্শ দেখা যায় না। কিন্তু আদর্শবান মানুষের মধ্যে আদর্শকে জীবন্ত রূপে দেখা যায়। আমরা আহমদ মুসার মধ্যে ইসলাম দেখেছি। তাঁর প্রার্থনায়, তাঁর স্বভাবে, তাঁর আচরণে যে ইসলামকে এক মুহূর্তে আমরা চিনেছি, তা পড়ে বুঝতে বছরের পর বছর লাগত। এ কারণেই ইসলাম গ্রহণে আমাদের দেরি হয়নি।

একটু থেমে দম নিয়েছিল নাতাশা। তারপর আবার শুরু করে, ইসলাম সম্পর্কে অনেক কুৎসা শুনেছি, ইসলামের একটা ভয়ংকর রূপ আমাদের সামনে ছিল। সম্ভবত এ কারণেই ইসলামের প্রকৃত রূপ যখন আমরা দেখলাম, তখন আমরা অভিভূত হয়েছি বেশি। শত্রুর প্রতি যে মানবীয় আচরণ, মানুষের প্রতি যে

ভালবাসা এবং সুন্দর ও সুদৃঢ় চরিত্র আমরা আহমদ মুসার মধ্যে দেখেছি, তা আমাদের জয় করে নিয়েছে। সুলতান সালাহউদ্দিনের কাহিনীকে রূপকথা মনে করতাম, কিন্তু আহমদ মুসার মধ্যে তাকে আমরা জীবন্ত দেখেছি।

মারিয়া নাতাশার কথাগুলো গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছিল।

নাতাশার কথা শেষ হলেও কিছুক্ষণ মারিয়া কথা বলেনি। সে কিছুটা আনমনা হয়ে পড়েছিল। বলেছিল, সত্যি নাতাশা, গতকাল থেকে আহমদ মুসা ও হাসান সেনজিকের সাথে আমার পাঁচবার দেখা হয়েছে, আলাপও করেছি তাদের সাথে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার একবারও ওরা চোখ তুলে কথা বলেনি।

মারিয়া থামলে নাতাশা বলেছিল, ওরা যখন প্রার্থনায় দাঁড়ায় তখন মনে হয় ওরা যেন এ পৃথিবীর মানুষ নয়-দেবদূত। আবার যখন ওরা সংঘাত-সংঘর্ষের ময়দানে, তখন ওরা কঠোর বাস্তববাদী এবং বিবেচক মানুষ। ভাববাদ ও বাস্তববাদিতার এমন অনুপম সমন্বয় শুধু মুসলিম চরিত্রেই দেখলাম।

এ সময় রিটা আবার ছুটে আসে এবং নাতাশাকে জড়িয়ে ধরে বলে, মামী নতুন মামারা নামাজে ওগুলো কি পড়ছে?

নাতাশা তাড়াতাড়ি রিটাকে আহমদ মুসার ঘরের দরজা পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে বলেছিল, ওদের পাশে গিয়ে চুপ করে বস। নামাজ শেষ হলে তোমার নতুন মামাকে জিজ্ঞেস করে নিও ওরা কি পড়ছিল।

রিটা ওঘরে চলে যায়।

'আর এক ধাক্কা রিটার হাত থেকে বাঁচা গেল আপা।' বলল নাতাশা।

মারিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিল রিটার হাত থেকে এভাবে বাঁচবে সমাজের হাত থেকে কি বাঁচতে পারবে। তোমার সব যুক্তিই মানলাম সবই ঠিক আছে, কিন্তু এই দিকটা কেন একবারও ভাবনি তোমার? দেখছ না গোঁটা বলকানে আজ মুসলমানদের অস্তিত্ব বিনাশের চেষ্টা চলছে?

নাতাশাও গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিল। আপা আমরা সবদিকই ভেবে দেখেছি। সব ভেবে পরকালের চিরন্তন শান্তিকেই আমরা অগ্রাধিকার দিয়েছি এর সাথে এ পৃথিবীতে শান্তির একটা বাড়তি লাভের ব্যাপার তো আছেই।

তোমাদের আশা পূর্ণ হোক। তোমাদের মত করে ভাবতে এখনও আমি পারছিনা নাতাশা। বলে মারিয়া নাতাশার চিবুকে একটা চুমু দিয়েছিল। মাজুভ মারিয়ার ছোট। নাতাশা মারিয়ার ছোট ভাইয়ের স্ত্রী। খুব ভালবাসে মারিয়া নাতাশাকে।

আহমদ মুসা বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে দেখল, হাসান সেনজিক উঠে বসেছে।

তুমি আবার উঠেছ কেন শুয়ে থাক। আমি বাইরে বেরুবো তাই উঠলাম। বলল আহমদ মুসা।

'আমিও তো যাব।' বলল হাসান সেনজিক।

'না তুমি যাবে না।' বলল আহমদ মুসা।

এই সময় ঘরে প্রবেশ করল মাজুভ। আহমদ মুসার শেষ কথাটা শুনেছিল মাজুভ।

বলল কে যাবে না, আপনি কোথাও বেরুচ্ছেন মুসা ভাই?

'হ্যাঁ বেরুচ্ছি। কিন্তু তুমি আর হাসান সেনজিক বাড়িতে থাকবে। আমি একাই একটু বেরুব।' বলল আহমদ মুসা।

'আপনি একা কেন, আমরা থাকব না কেন?' বলল মাজুভ।

আহমদ মুসা বলল, 'তুমি ও হাসান সেনজিক সকলের চেনা। তোমাদের সাথে নিলে কারো চোখের আড়ালে থাকা যাবে না। আমি একবার নিরুপদ্রবে বেড়িয়ে আসতে চাই হাসান সেনজিকদের শহীদ মসজিদ রোডটা।

মাজুভ ও হাসান সেনজিক আর বাধা দেবার সাহস পেল না। মাজুভ শুধু বলল, আপনি মিলেশদের জীপটা না নিয়ে আমার দুলাভাইয়ের কারটা নিয়ে যান। এটাই ভালো হবে।

সঙ্গে সঙ্গেই না সুচক জবাব দিয়ে আহমদ মুসা বলল, তোমার ভগ্নিপতি আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন এই-ই যথেষ্ট, তাঁকে আমাদের সাথে জড়াতে চাই না। তার গাড়ি নিলে চিহ্নিত হয়ে যেতে পারেন তিনি।

এবারও মাজুভ নিরব হয়ে গেল। মনে মনে আহমদ মুসার দুরদৃষ্টির প্রশংসা করল। আরও ভাবল, নিজেকে ঝুকির মধ্য ফেলেও অন্যের মঙ্গল চিন্তা এভাবে কয়জন করতে পারে।

আহমদ মুসা প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে গেল। জীপে উঠল আহমদ মুসা মিলেশ বাহিনীর কাছ থেকে নিয়ে আসা সেই জীপ। গাড়ির নাম্বার আবার পাল্টানো হয়েছে। একটা পরিচিত সরকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অকেজো হয়ে পড়ে থাকা নাম্বার এবার ব্যবহার করা হয়ছে।

জীপের ড্রাইভিং সিটে বসে ষ্টার্ট দিল।

পাশেই সিটের উপর শহরের একটা মানচিত্র। মানচিত্রে শহীদ মসজিদ রোডের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

শহরের নানা রাস্তা ঘুরে আহমদ মুসা প্রবেশ করল শহীদ মসজিদ রোডে। শহীদ মসজিদ রোডের মুখেই তার জীপ দাঁড় করানো হলো। দু'পাশে থেকে দু'জন এসে গাড়ী এবং তার দিকে শ্যেন দৃষ্টিতে তাকাল আহমদ মুসা কোন ছদ্মবেশ নেয়নি। তাকে চিনে এমন খুব একটা কেউ নেই। সেদিন রাতের বেলা ওদের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিল। কিন্তু তাকে ভালো করে দেখার সুযোগ কারোও হয়নি। এটা সে নিজেই দেখেছে।

দু'পাশ থেকে আসা দু'জন লোক একবার শ্যেন সন্ধানী দৃষ্টি ফেলেই চলে গেল।

আহমদ মুসা দু'পাশের পরিবেশ দেখে বুঝল ওদের আরও লোক এখানে আছে।

গাড়ি নিয়ে সামনে এগিয়ে চলল আহমদ মুসার।

শহীদ মসজিদ রোডের প্রায় মাঝামাঝি এসে পড়েছে আহমদ মুসার গাড়ি, সামনেই হবে হাসান সেনজিকের বাড়ি। আহমদ মুসা মানচিত্র থেকে মুখ তুলে সামনে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গেই তার কানে এল চিৎকার। দেখতে পেল ফুটপাত থেকে দু'টি তরুণীকে রাস্তার পাশে দাঁড়ানো একটা মাইক্রোবাসে জোর করে টেনে তোলা হচ্ছে। প্রাণপণ চিৎকার করছে দু'টি তরুণী।

তরুণী দু'টিকে গাড়িতে তুলে চলতে শুরু করল মাইক্রোবাসটি। আহমদ মুসার পাশ দিয়েই চলে যাচ্ছে। গাড়ির ভেতর থেকে চিৎকার ও গোঙানীর শব্দ শোনা যাচ্ছে।

চিৎকার ও গোঙানীর শব্দে আহমদ মুসার হৃদয়ে যেন হাতুড়ীর মত আঘাত করছে। আহমদ মুসার রক্তে যেন আগুন ধরে গেল মুহূর্তেই আহমদ মুসা তার গাড়ি ঘুরিয়ে নিল। দ্রুত ধাবমান মাইক্রোবাসটি অনেক দুর এগিয়ে গেছে।

আহমদ মুসা তার পিছু নিল।

শহীদ মসজিদ রোড় থেকে বেরুবার সময় গাড়ির জ্যামে পড়ে আরেকটু দেরি হলো আহমদ মুসার। কিন্তু মাইক্রোবাসটি তবু নজরের বাইরে যেতে পারেনি।

নিউ বেলগ্রেড এভেনিউ ধরে মাইক্রোবাসটি দক্ষিণ দিকে ছুটে চলেছে।

মাইক্রোবাসটি নতুন। বাতাসের বেগে এগিয়ে চলেছে। চালাচ্ছেও বেপরোয়া গতিতে। মনে হচ্ছে সাহসী কোন পক্ষ। কোন বিপদকে এরা থোড়াই পরোয়া করে।

ব্যস্ত রাস্তায় আহমদ মুসা নিজের ইচ্ছামত গাড়ি চালাতে পারছে না তাই দুই গাড়ির মধ্যকার ব্যবধান কমলেও মাইক্রোবাসটি এখনও বেশ দুরে। নিউ বেলগ্রেড এভেনিউটি বেলগ্রেডের নতুন এলাকা দক্ষিণ বেলগ্রেড ঘুরে দানিয়ুব পর্যন্ত পৌঁছেছে। সরল এবং প্রশস্ত এই দীর্ঘ রাস্তাটি।

নতুন বেলগ্রেডের শুরুতেই বিশাল এক বোটানিক্যাল গার্ডেন এবং পার্ক। এর প্রান্ত ঘেষেই নিউ বেলগ্রেড এভেনিউ। বোটানিক্যাল গার্ডেন ও পার্কে ঢোকার এক বিশাল গেট। টিকেট করে ঢুকতে হয়। মাইক্রোবাসটি বোটানিক্যাল গার্ডেনের গেটে গিয়ে দাঁড়াল। দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই গেটটি খুলে গেল। খোলা গেট দিয়ে মাইক্রোবাসটি বোটানিক্যাল গার্ডেনে ঢুকে গেল।

'ওরা বোটানিক্যাল গার্ডেনে প্রবেশ করছে কেন?' ভাবল আহমদ মুসা। ভাবতে গিয়ে আঁৎকে উঠল আহমদ মুসা। তাহলে কি ওরা নিছক লালসা বশত তরুণীদ্বয়কে কিডন্যাপ করেছে।

মাইক্রোবাসটি গেট দিয়ে ঢুকে যাওয়ার অল্পক্ষণ পরেই আহমদ মুসার জীপ গিয়ে গেটে পৌঁছল।

গেটে তখনও একজন লোক দাঁড়িয়েছিল। আহমদ মুসা তাকে গেট খুলে দিতে বলল।

লোকটি বলল টিকেট করে আসুন। আর গাড়ি নিয়ে ভেতর যাওয়া যাবে না।

‘ওরা ঢুকল কি করে গাড়ি নিয়ে। আর ওরা তো টিকেটও করেনি?’ বলল আহমদ মুসা।

লোকটি বলল, ওদের সাতখুন মাফ। ওদের টিকেট করতে হয় না।

‘কারা ওরা?’ বলল আহমদ মুসা।

‘ওরা মিলেশ বাহিনীর লোক।’ লোকটি বলল।

চমকে উঠল আহমদ মুসা মিলেশ বাহিনীর নাম শুনে। এত তাড়াতাড়ি ওদের মুখোমুখি হচ্ছে সে এইভাবে।

‘কত টিকেটের দাম?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘দশ দিনার।’ বলল লোকটি।

আহমদ মুসা ওর হাতে ৫০ দিনার তুলে দিয়ে বলল, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। তুমি টিকিট করে নিও। আর আমি ওদেরই কাছে যাব, গেট খুলে দাও।

লোকটি একবার ৫০ দিনারের নোট এবং একবার আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে গেট খুলে দিল।

আহমদ মুসার জীপটি দ্রুত ঢুকে গেল বোটানিক্যাল গার্ডেনের ভেতরে।

বিশাল বোটানিক্যাল গার্ডেন। এদিক সেদিক ঘুরাঘুরি করে অবশেষে মাইক্রোবাসটির সন্ধান পেল আহমদ মুসা। ছুটে গেল গাড়ি নিয়ে সেখানে।

কাছাকাছি পৌঁছেই দেখল, মেয়ে দু’টিকে তারা মাইক্রোবাস থেকে টেনে নামিয়েছে।

মেয়ে দু’টির পরনে ঢিলা লম্বা জামা পা পর্যন্ত নেমে গেছে। দু’জনার গলায় পেছানো চাদর। অভিজাত চেহারা। দেখলেই বুঝা যায় শিক্ষিত এবং অভিজাত পরিবারের মেয়ে দু’টি।

মেয়ে দু'টি আর কাঁদছে না। কিন্তু ভয়ে আতংকে ওদের চোখ যেন বেরিয়ে আসছে।

কিডন্যাপকারী ওরা চার জন।

দু'জন এগিয়ে গিয়ে মেয়ে দু'টির ওডনা টেনে খুলে ফেলল। তারপর দু'জন লোভাতুর বাঘের মত মেয়ে দু'টির দিকে দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেল। মেয়ে দু'টি ভয়ে চিৎকার করে পিছিয়ে গেল।

ঠিক সেই সময় আহমদ মুসা জীপের হর্ন বাজাল। হর্নের শব্দে ওরা চারজনই চমকে উঠে ফিরে তাকিয়েছে।

আহমদ মুসা লাফ দিয়ে জীপ থেকে নেমে ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা কিছু বলার আগেই ওদের একজন বলল, তুমি এখানে কেন, যেখানে যাচ্ছিলে যাও। নাক গলাতে এলে ভাল হবে না।

-তোমরা মেয়ে দু'টিকে জোর করে ধরে এনেছ, ছেড়ে দাও। শান্ত কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

-একশ' বার ধরে আনব। তোমার কি, তোমার কাজে তুমি যাও।

-মেয়ে দু'টিকে ছেড়ে না দিলে আমি যাব না।

-তোমার কপাল মন্দ হবে যদি বাড়াবাড়ি করো। এরা হিদেন, মুসলমান। শয়তানী এরা। এদের যা ইচ্ছা তাই করার অধিকার আমাদের আছে।

আহমদ মুসার বুকটা কেঁপে উঠল ওদের কাছ থেকে মেয়ে দু'টির পাওয়া পরিচয়ে। ওরা মুসলমান। দেহের প্রতিটি স্নায়ুতন্ত্রীতে একটা প্রচণ্ড জ্বালা ছড়িয়ে পড়ল আহমদ মুসার। গোটা দেহ তার শক্ত হয়ে উঠল। বলল সে, ওরা যেই হোক, ওদের ছেড়ে দাও।

-আমাদের হুকুম দিচ্ছ, স্পর্ধা তো কম নয়। জান আমরা কে? ওদের একজন বলল।

-না, পরিচয় আমার প্রয়োজন নেই। আমি তোমাদের সাথে আত্মীয়তা করতে যাচ্ছি না।

ক্রোধে ওরা জ্বলে উঠল। ওদের লাল চোখ আরও লাল হয়ে উঠল। একজন দু'ধাপ এগিয়ে আহমদ মুসার একেবারে সামনে এসে বলল। ভাল চাওতো এখনি এখান থেকে সরে যাও।

তার কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে আহমদ মুসা বলল, আমার প্রশ্নের জবাব দাও মেয়ে দু'টিকে ছাড়বে কিনা?

আহমদ মুসার কোথা শেষ হবার আগেই লোকটি একটা প্রচণ্ড ঘুষি ছুড়ে মারল আহমদ মুসার নাক লক্ষ্য করে।

আহমদ মুসা মুখটা সরিয়ে নিয়েছিল। ঘুষিটা আহমদ মুসার মুখে না লেগে গিয়ে লাগল কপালের বাম পাশে। লোকটির হাতে সম্ভবত তীক্ষ্ণ আংটি ছিল। আহমদ মুসার কপাল কেটে গিয়ে ঝর ঝর করে রক্ত বেরিয়ে এল।

আহমদ মুসা তার মাথাটা সোজা করেই বিদ্যুৎ গতিতে ডান হাতের একটা কারাত চালাল লোকটির ঘাড়ের বাম পাশে কানের নিচে।

সঙ্গে সঙ্গেই লোকটি জ্ঞান হারিয়ে টলতে টলতে পড়ে গেল মাটিতে।

ঘুষি বাগিয়ে আরেকজন তেড়ে এল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা একধাপ এগিয়ে লোকটির তলপেট লক্ষ্যে একটা লাথি মারল এবং তারপরেই ডান হাতের প্রচণ্ড কারাত চালাল লোকটির ঘাড়ে।

লোকটি টলারও সুযোগ পেল না। বোঁটা থেকে খসে পড়া আমের মতই ঝরে পড়ে গেল মাটিতে।

লোকটি যখন পড়ে যাচ্ছিল তখন আহমদ মুসা দেখল সামনের দু'জনেই পকেটে হাত দিচ্ছে।

আহমদ মুসা এক লাফে সামনে দাঁড়ানো লোকটির ঘাড়ে পড়ে বাম হাতে তার গলা পেঁচিয়ে তাকে বুকের সাথে চেপে ধরল।

লোকটি সবে পিস্তল হাতে নিয়েছিল।

আহমদ মুসা তার হাত থেকে পিস্তল কেড়ে নিল।

লোকটি ছাড়া পাবার জন্যে যতই জোর করছিল, ততই আহমদ মুসার বাম হাতের লৌহ বেষ্টনি তার গলায় চেপে বসতে লাগল।

দ্বিতীয় লোকটি পিস্তল তুলে ধরেছে। কিন্তু মহাবিপদে পড়েছে সে। গুলি করলে গিয়ে লাগে নিজের সাথীর বুকে। আহমদ মুসা তাকে বুকে জাপটে ধরে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে।

আহমদ মুসা লোকটির হাত থেকে কেড়ে নেয়া পিস্তল এবার দ্বিতীয় লোকটির দিকে তুলে ধরে বলল, পিস্তল ফেলে দাও না হলে মাথা গুড়িয়ে দেব।

কিন্তু বেপরোয়া লোকটি পিস্তল হাতে ছুটে এল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা তার কৌশলটা বুঝল। সে এসে জড়িয়ে ধরে আহমদ মুসার পিঠ দখল করতে চায়। আহমদ মুসা আর সময় নষ্ট করতে চাইল না। সে উদ্যত রিভলভারের ট্রিগার টিপে ধরল।

মাথাটি গুড়িয়ে গেল লোকটির।

মুখ থুবড়ে পড়ে গেল লোকটি আহমদ মুসার একদম কাছেই।

আহমদ মুসা যাকে ধরে রেখেছিল, তাকেও এবার ছেড়ে দিল।

ছেড়ে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটি গোড়া কাটা লতার মত লুটিয়ে পড়ল।

মেয়ে দু'টি কাঠের মত দাঁড়িয়েছিল। রক্তহীন ফ্যাকাশে তাদের মুখ। বাক শক্তি তারা হারিয়ে ফেলেছিল।

আহমদ মুসা পিস্তলটি পকেটে ফেলে ধীরে ধীরে মেয়ে দুটির দিকে এগুলো। নতমুখে নরম কন্ঠে বলল, আর কোন ভয় নেই, তোমরা এস গাড়িতে।

বলে আহমদ মুসা ফিরে দাঁড়িয়ে গাড়ির দিকে হাটতে লাগল।

মেয়ে দু'টিও যন্ত্রের মত ধীরে ধীরে গাড়ির দিকে হেটে এল।

আহমদ মুসা জীপের ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল। মেয়ে দু'টি গাড়ির কাছে এসে দাঁড়ালে বলল, তোমরা পিছনের সিটে উঠে বসে বোন।

সিটে বসেই আবার নেমে গেল আহমদ মুসা। নেমে গিয়ে গাড়ির নাম্বার প্লেট খুলে এনে ড্রাইভিং প্যানেলের উপর রেখে দিল। তারপর গাড়ি ষ্টার্ট দিল আহমদ মুসা।

জীপটি গেটে আসতেই সেই লোকটি তাড়াতাড়ি গেট খুলে দিতে এল।

আহমদ মুসার মুখ রক্তাক্ত দেখে লোকটি চমকে উঠল। তার চোখে সন্দেহের চিহ্ন ফুটে উঠল। কিন্তু কিছু বলার সাহস পেল না।

গাড়ি গেট থেকে যখন বের হতে যাচ্ছে, তখন লোকটি বোধ হয় মরিয়া হয়েই জিজ্ঞেস করল, স্যার ওরা কোথায়? এরা তো আপনার গাড়িতে যাবার সময় ছিল না?

আহমদ মুসা গেট থেকে বের হয়ে একটু হেসে বলল, এসব প্রশ্নের জবাবে তোমার কোন প্রয়োজন নেই, থাকলে দিতাম।

গাড়ি যখন চলে যাচ্ছে, তখন গেটম্যান ভয় ও সন্দেহের দৃষ্টি নিয়ে গাড়ির নাম্বার প্লেটের দিকে চাইল। তার চোখ ছানা-বড়া হয়ে উঠল যখন সে দেখল যে গাড়ির কোন নাম্বার প্লেট নেই।

আহমদ মুসা দ্রুত গাড়ি চালিয়ে বোটানিক্যাল গার্ডেন পেরিয়ে প্রায় মাইল দুয়েক উত্তরে এসে রাস্তার পাশে একটা নির্জন স্থানে নেমে এল। তারপর গাড়ির নাম্বার প্লেট দু'টি নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে গেল এবং নাম্বার প্লেট যথাস্থানে লাগিয়ে দিল।

মেয়ে দু'টি মুর্তির মত আহমদ মুসার সব কাজ দেখছিল। তাদের চোখ থেকে আতংকের ঘোর তখনও সম্পূর্ণ কাটেনি। তবে তারা নিশ্চিত হয়েছে, এই মানুষের কাছে তারা সম্পূর্ণ নিরাপদ। তাদের কাছে মনে হচ্ছে, এ মানুষটি যেন মানুষ নয়, আল্লাহর ফেরেশতা। যে মানুষটি একাই চারজন মানুষকে পরাভূত করল মহাশক্তিধর বীরের মত, তার কন্ঠস্বর, সম্বোধন এতো নরম হয়! কঠোরতা ও নমনীয়তার অপূর্ব সমাহার। ফেরেশতা ছাড়া আর কি! ফেরেশতার মতই তো হঠাৎ করে উদয় হয়েছেন।

আহমদ মুসা গাড়ির নাম্বার প্লেট লাগিয়ে এসে ড্রাইভিং সিটে আবার ফিরে এল। এরপর সে গাড়ির ফার্স্ট এইড বক্স থেকে তুলা বের করে মুখের রক্ত মুছতে লাগল।

মেয়ে দু'টি আহমদ মুসার সারা মুখে রক্ত দেখে আঁৎকে উঠল। তারা এতক্ষণ খেয়াল করেনি। অবাক হলো তারা। তাহলে কি আতংকের ঘোর কেটে তাদের চোখ এখনও স্বাভাবিকভাবে সব কিছু দেখতে পারছে না, বুঝতে পারছে না!

আহমদ মুসা মুখ থেকে রক্ত পরিষ্কার করে কপালের ক্ষতটায় তুলা লাগাল। কিন্তু তুলার নরম আঘাতেও সেখান থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত নেমে এল। আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি বেশি পরিমাণ তুলা ক্ষতস্থানে চাপা দিয়ে ধরে রাখল। আশ-পাশে তাকিয়ে বেঁধে রাখার মত কিছু দেখল না। মেয়েদের একজন আহমদ মুসার দিকে ওড়না এগিয়ে দিয়ে বলল, এটা দিয়ে আপনি ব্যান্ডেজ বাঁধুন। আহমদ মুসা বলল, না লাগবে না বোন অল্পক্ষণের মধ্যেই রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে।

সেই মেয়েটি বলল, কিন্তু এভাবে তুলা ধরে রেখে তো গাড়ি চালাতে পারবেন না।

সত্যি, কথাটায় বাস্তবতা আছে।

আহমদ মুসা ওড়না নিয়ে কপালে ভালো করে ব্যান্ডেজ বাঁধল।

তারপর আহমদ মুসা গাড়ি ষ্টার্ট দিতে গিয়ে থেমে গেল। পেছন দিকে না তাকিয়েই আহমদ মুসা বলল, তোমাদেরকে কোথায় পৌঁছে দেব বোন?

মেয়ে দু'টি পরামর্শ করল, তারপর তাদের একজন পূর্ব বেলগ্রেডের একটা রাস্তার কথা বলল।

আহমদ মুসা মানচিত্রে চোখ বুলাল। না মানচিত্রে সে রাস্তার নাম নেই।

আহমদ মুসা বলল, মানচিত্রে ও রাস্তার নাম নেই। আমি বেলগ্রেডে নতুন তো রাস্তা ঘাট আমি চিনি না। তোমরা বলে দিতে পারবে না?

'পারব।' বলল ওদের একজন।

আহমদ মুসা গাড়ি ষ্টার্ট দিলে ওই মেয়েটিই বলল, আরেকটু উত্তর দিকে এগিয়ে প্রথম যে পূর্বমুখী রাস্তা পাবেন, সেটা দিয়ে এগুবেন।

আহমদ মুসা মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে বলল, সেন্ট্রাল রোড দিয়ে তো?

মেয়েট বলল, জি হ্যাঁ।

সেন্ট্রাল রোড ধরে ছুটে চলল গাড়ি।

মেয়ে দু'টি সামনে তাকিয়ে আছে। তাদের চোখ বারবার ছুটে যাচ্ছে আহমদ মুসার দিকে। তাদের জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হচ্ছে, লোকটি কে? এমন উপকারী লোক আবার এদেশে আছে? বেলগ্রেডে নতুন, তাহলে বেলগ্রেডের বাইরে থেকে এসেছে। কিন্তু ওকে তো যুগোশ্লাভ মনে হয়না। হতে পারে, কত

দেশের লোকই তো যুগোশ্লাভিয়ায় বাস করে। জিজ্ঞাসা করবে নাকি লোকটি কে? কিন্তু কেন করবে, প্রয়োজন কি? লোকটিই বা কি মনে করবে। তাদের তরফ থেকে এমন উদ্যোগ নেয়া ঠিক হবে না। যাই হোক উনি তো পুরুষ মানুষ, অপরিচিত।

আহমদ মুসার মনেও চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। মেয়ে দুটি কে? মুসলমান তো শুনলাম। ওদের নাম কি জিজ্ঞেস করব? কেন করব? কি প্রয়োজন তার? তারা বিপদে পড়েছিল, সাহায্য করেছি। এখন ওদেরকে বাসায় পৌঁছে দেয়ার মধ্যেই তো আমার দ্বায়িত্ব শেষ। প্রয়োজন নেই এমন আলোচনায় যাওয়া তো ঠিক নয়। হ্যাঁ ওদের বাড়ির পুরুষদের পাওয়া গেলে কথা বলা যেতে পারে।

সেন্ট্রাল রোড তীরের মত সোজা একটা রাস্তা। রাস্তাটি সোজা এগিয়ে পূর্ব বেলগ্রেডের প্রান্তে নিউবেলগ্রেড এভেনিউতেই আবার পড়েছে। সেন্ট্রাল রোড নামকরণ যথার্থ হয়েছে। রোডটি বেলগ্রডকে মাঝ বরাবর দু'ভাগে ভাগ করেছে।

পূর্ব বেলগ্রেডে এসে পড়েছে আহমদ মুসার জীপ। সামনেই একটা চৌমাথা। সেন্ট্রাল রোড থেকে উত্তর ও দক্ষিণে দু'টি রাস্তা বেরিয়ে গেছে।

চৌমাথার কাছে পৌঁছতেই যে মেয়েটি পথ-নির্দেশ করছিল সে বলল, এবার আমাদের উত্তরের পথ ধরে যেতে হবে।

আরও কয়েকটি রাস্তা বদলে আহমদ মুসার জীপ একটা সুন্দর দোতলা বাড়ির সামনে দাঁড়াল। যে মেয়েটি গাইড করছিল সে বলল, আমরা পৌঁছে গেছি।

বাড়িটি ওমর বিগোভিগকের।

আহমদ মুসা বাড়ি ও বাড়ির নাম্বারের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে বলল, তোমাদের আব্বার নাম কি? কি করেন?

মেয়ে দু'টির একজন যে গাইড করছিল, বলল, আমার আব্বার নাম ওমর বিগোভিক। এটা আমাদের বাড়ি। আমার আব্বা অধ্যাপনা করতেন, এখন ব্যবসা করেন।

একটু থেমে সাথের মেয়েটিকে দেখিয়ে বলল, এর বাড়ি উত্তর বেলগ্রেড এলাকায়। আমার আব্বা ওকে পৌঁছে দেবেন।

তোমার আব্বা কি এখন বাড়িতে আছেন? জানতে চাইল আহমদ মুসা।

মেয়েটি বলল, এক মিনিট, আমি দেখে আসছি।

বলে মেয়েটি বাড়ির ভেতর চলে গেল। মেয়েটি নাদিয়া নুর।

কয়েক মুহূর্ত পরে নাদিয়া নুর ফিরে এসে বলল, আব্বা বাড়িতে নেই, আম্মা আছেন। আপনি ভেতরে আসুন, বসবেন একটু।

আহমদ মুসা একটু হেসে মাথা নেড়ে বলল, ধন্যবাদ বোন। আজ নয়, পারলে আরেকদিন আসব।

নাদিয়া নুরের সাথের মেয়েটি ডেসপিনা জুনিয়র। ডেসপিনা জুনিয়র এবং নাদিয়া নুর হাসান সেনজিকের খবর জানাতে গিয়েছিল হাসান সেনজিকের মাকে। ওরা ফেরার সময় যখন গাড়ির সন্ধানে ফুটপাত দিয়ে হাঁটছিল তখনই তারা মিলেশ বাহিনীর হাতে কিডন্যাপ হয়। ওদেরকে হাসান সেনজিকের বাড়ি থেকে বেরুতে দেখে ইচ্ছা করেই ওদের কিডন্যাপ করা হয়।

নাদিয়া নুর তার পিতার সন্ধানে বাড়ির ভেতর গেলে ডেসপিনা গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল।

নাদিয়া নুর ফিরে এসে তার কাছেই দাঁড়াল।

আহমদ মুসা কথা শেষ করে একটু মাথা নিচু করল। তারপর আবার মাথাটা তুলে বলল, একটা কথা বলব বোন, সমগ্র বলকান অঞ্চলে মুসলমানদের কঠিন দুর্দিন চলছে। এ সময় মুসলিম মেয়েদের অনেক সাবধানে থাকতে হবে, সাবধানে বেরুতে হবে।

-আপনি কি মুসলিম? জিজ্ঞেস করল ডেসপিনা।

-'হ্যাঁ।' বলল আহমদ মুসা।

-আমাদের ও সন্দেহ হয়েছিল। আমরা কি যে খুশি হয়েছি তা বুঝাতে পারবোনা। বোনদেরকে একটু মেহমানদারীরও সুযোগ দেবেন না?

-না আজ নয়। বলেছি তো, আরেকদিন সম্ভব হলে আসব। বাড়ি চিনে গেলাম।

বলেই গাড়ি ষ্টার্ট দিয়েই কি মনে করে গাড়ির কী বোর্ডের সেলফ থেকে একটা ইংরেজী বই বের করে বলল, তোমরা ইংরেজী জান?

নাদিয়া ও ডেসপিনা দু'জনেই বলল, ইংরেজী আমাদের সাবসিডিয়ারী ভাষা। জানি মোটামুটি।

আহমদ মুসা বইটি তাদের দিকে তুলে ধরে বলল, বইটি তোমাদের দিলাম, ভাল বই।

বইটি সাইয়েদ কুতুব শহীদের। নামঃ 'দ্য প্রসেস অব ইসালিমক রেভ্যুলেশন।'

ডেসপিনা বইটি হাতে নিয়েই বলল, লিখে দিন।

আহমদ মুসা বইটি হাতে নিয়ে লিখে দিলঃ 'বোনদেরকে আহমদ মুসা।'

বইটি ওদের হাতে আবার তুলে দিয়েই গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল আহমদ মুসা।

ডেসপিনা বইটি হাতে নিল।

দু'জনেই আহমদ মুসাকে সালাম জানিয়ে হাত নাড়তে লাগল।

আহমদ মুসাও একবার পিছনে তাকিয়ে হাত নাড়ল।

যতক্ষণ আহমদ মুসার গাড়ি দেখা গেল ওরা দাঁড়িয়ে থাকল।

আহমদ মুসার গাড়ি চোখের আড়াল হবার আগেই আরেকটি গাড়ি আসতে দেখল তারা। গাড়ি দেখে নাদিয়ার আব্বার গাড়ি মনে হচ্ছে। ওরা আর সরল না।

ঠিক, গাড়িটি নাদিয়ার আব্বারই।

গেটে এসে গাড়ি থেকে নামল নাদিয়ার আব্বা।

আব্বাকে দেখে নাদিয়া প্রায় চিৎকার করে বলে উঠল, আব্বা তুমি যদি দু'মিনিট আগে আসতে।

কিন্তু ওমর বিগোভিকের খেয়াল নাদিয়ার কথার দিকে নেই। সে নাদিয়া এবং ডেসপিনার চেহারা, চুল ও পোষাকের অবস্থা দেখে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের একি অবস্থা? মনে হচ্ছে তোমরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরলে! ডেসপিনাকে তো কোন দিন চাদর ছাড়া দেখিনি। কি হয়েছে তোমাদের?

আব্বার এ প্রশ্নে নাদিয়ার মুখভাব মুহূর্তে পাল্টে গেল। কিছুক্ষণ আগের দুঃস্বপ্নময় অতীত যেন তার উপর এসে ভর করল। আব্বাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁফিয়ে কেঁদে উঠল নাদিয়া।

ওমর বিগোভিক নাদিয়া ও ডেসপিনাকে নিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল।

গিয়ে বসল ভেতরের ড্রইং রুমে।

নাদিয়ার মাও এসে বসল। বলল, এই মাত্র ওরা এল। একজন জীপে করে রেখে গেল। লোকটির মুখে রক্তের দাগ। মাথায় ব্যান্ডেজ।

ওমর বিগোভিক উদ্বিগ্ন কন্ঠে বলল, বল কি। লোকটি চলে গেছে কখন?

'এই তো দু'মিনিটের মত হল, তোমার সাথে কথা বলতে চেয়েছিল।' বলল নাদিয়ার মা।

নাদিয়ার কান্না তখন থেমেছে। সে পিতার কাঁধে মুখ গুঁজে রয়েছে।

ডেসপিনা মুখ ভার করে বসে আছে।

ওমর বিগোভিক নাদিয়ার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, কি হয়েছে মা বল।

নাদিয়া মুখ তুলে বলল, ডেসপিনা তুমিই বল।

ওমর বিগোভিক ডেসপিনার দিকে চেয়ে বলল, ঠিক আছে মা তুমিই বল।

ডেসপিনা মুখ তুলল। মুখ তার ফ্যাকাশে। বলল, নাদিয়া হাসান সেনজিকের খবর নিয়ে আমার কাছে গিয়েছিল। আমি ওকে সাথে করে খবরটা দেয়ার জন্যে হাসান সেনজিকের মা'র কাছে গিয়েছিলাম আজ দশটায়। কথাবার্তা বলে ১১টার দিকে বেরিয়ে আসি। হাসান সেনজিকদের গেট থেকে বেরিয়ে ফুটপাত ধরে হাটছিলাম। হঠাৎ একটা মাইক্রোবাস আমাদের পাশে দাঁড়ায়। দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে দু'জন লোক বেরিয়ে এসে আমাদের ধরে টেনে হেঁচড়ে গাড়িতে তোলে। আমরা প্রাণপণে চিৎকার করি, কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে আসে না।

বলতে বলতে ডেসপিনার চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে অশ্রু নেমে এল।

অশ্রু বিজড়িত কন্ঠে ডেসপিনা তাদের কিডন্যাপ হওয়া এবং আলৌকিক ভাবে উদ্ধার কাহিনী বিস্তারিত বর্ণনা করল।

মুখ ভরা উদ্বেগ-আতংক নিয়ে বাক-রুদ্ধভাবে ওমর বিগোতিক ও নাদিয়ার মা ডেসপিনার কাহিনী শুনছিল।

ডেসপিনার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওমর বিগোভিক সোফা থেকে নেমে মেঝেতে কাবামুখী হয়ে সিজদায় পড়ে গেল।

সিজদা থেকে উঠে দু'টি হাত উপরে তুলে বলল, হে আল্লাহ তুমি আলৌকিক সাহায্য পাঠিয়ে আমাদের মেয়ে দু'টিকে রক্ষা করেছ। তোমার

শুকরিয়া আদায়ের ক্ষমতা আমার নেই। আমরা যতদূর কল্পনা করতে পারি না তার চেয়েও তুমি শক্তিশালী, তোমাকে যত বড় দয়ালু বলে জানি, তার চেয়েও বড় দয়ালু তুমি।

ওমর বিগোভিক সোফায় ফিরে এসে বলল, আল্লাহ মানুষকে ফেরেশতা পাঠিয়েও সাহায্য করেন। ও লোকটি আল্লাহরই সাহায্য ছিল। তা নাহলে একজন লোক খালি হাতে এসে চারজন সশস্ত্র লোককে ওভাবে শেষ করে তোমাদের উদ্ধার করতে পারে! কিন্তু আশ্চর্য মা! এত বড় লোক কে, যে নিজে আহত হয়েছে উদ্ধার করতে গিয়ে, তোমরা ঘরে এনে একটু বসাতেও পারলে না, এক গ্লাস পানিও খাওয়াতে পারলে না।

'না, আব্বা, অনেক বলেছি, উনি কিছুতেই গাড়ি থেকে নামেননি। আপনি আছেন কিনা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। থাকলে হয়ত নামতেন।' বলল নাদিয়া নুর।

'অদ্ভুত মানুষ উনি, আমাদের নামটা পর্যন্ত উনি জিজ্ঞেস করেননি। আমরা কি করি, কেমন করে কিডন্যাপের ঘটনা ঘটল ইত্যাদি যে সব কথা জিজ্ঞাসা করা স্বাভাবিক, সে সব কথাও জিজ্ঞেস করেননি। মনে হয় এসব কোন ব্যাপারে সামান্য আগ্রহও নেই। কিন্তু যাবার সময় যখন তিনি বলে গেলেন বলকান অঞ্চলে মুসলমানদের কঠিন দুর্দিন চলছে, মুসলিম মেয়েদের সাবধানে বের হওয়া উচিত, তখন মনে হল তিনি অত্যন্ত সচেতন ব্যক্তি।' বলল ডেসপিনা।

'উনি কি মুসলিম?' ওমর বিগোভিক বলল।

'জি' বলল ডেসপিনা।

'এমন একজন মুসলিম ছেলে, তার ঠিকানা জানলাম না, তার নামও পর্যন্ত তোমরা জিজ্ঞাসা করনি, কি দুর্ভাগ্য!' খেদের সাথে বলল ওমর বিগোভিক।

'আমাদের নাম যিনি জিজ্ঞাসা করেননি, তার নাম আমরা কেমন করে জিজ্ঞাসা করতে পারি?' বলল নাদিয়া।

'নাম পাওয়া গেছে নাদিয়া।' বলে ডেসপিনা তার পাশে সোফার উপর পড়ে থাকা আহমদ মুসার দেয়া বইটি হাতে নিয়ে কভার উল্টিয়ে লেখার উপর নজর বুলাল।

নজর বুলানোর সঙ্গে সঙ্গে ডেসপিনার চেহারাটা একদম পাল্টে গেল। চোখ দু'টি তার বিস্ফারিত হলো। বাকরুদ্ধ হয়ে গেল সে। দেহটা তার যেন শিথিল, অবসন্ন হয়ে পড়েছে। তার হাত থেকে বইটা খসে পড়ে গেল।

ডেসপিনা অসুস্থ হয়ে পড়েছে মনে করে ওমর বিগোভিক ও নাদিয়ার মা ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠল। ছুটে এল দু'জন তার কাছে।

কিন্তু নাদিয়া বুঝল লোকটির লেখার দিকে নজর বুলানোর পরই ডেসপিনা অস্বাভাবিক হয়ে পড়েছে।

নাদিয়া বইটি তুলে নিয়ে কভার উল্টিয়ে সেই লেখাটির প্রতি নজর দিয়ে চিৎকার করে উঠল, আব্বা লোকটি ছিল আহমদ মুসা।

'কি বললে?' বলে ওমর বিগোভিক নাদিয়ার হাত থেকে বইটি নিয়ে সেই লেখাটির প্রতি নজর বুলাল। দেখল পরিষ্কারভাবে লিখাঃ 'বোনদেরকে- আহমদ মুসা।'

সোফার উপর ধপ করে বসে পড়ল ওমর বিগোভিক।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলতে পারল না।

নাদিয়ার মা-ই প্রথম মুখ খুলল। বলল, তাই বলি এমন বিস্ময়কর ছেলে এদেশে কোত্থেকে আসবে যে মিলেশ বাহিনীর পিছু নিতে সাহস করে, যে খালি হাতে মিলেশ বাহিনীর চারজনের উপর ঝাপিয়ে পড়তে পারে এবং জয়ীও হতে পারে।

ওমর বিগোভিক সামনের দিকে একটু ঝুকে বসে দু'কনুই হাঁটুর উপর রেখে দু'হাতে মাথা চেপে ধরে বলল, দুর্ভাগ্য আজকের মুসলিম দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সন্তানকে হাতে পেয়েও আবার হারিয়ে ফেললাম। তাও আবার সে আহত। আঘাতটা কি খুব বেশী মা?

ডেসপিনা এবং নাদিয়া দু'জনেই সোফায় হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসেছিল। তারা অতীতে ফিরে গেছে। বহুবিশ্রুত, বিষ্ময়কর আহমদ মুসাকে নতুন করে দেখার জন্য। কি করে সে জীপ থেকে নামল, কেমন শান্ত, অথচ অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তাদের মুক্তি দাবী করল, কেমন করে আক্রান্ত হল, কেমন করে সে আত্মরক্ষা করে পাল্টা আক্রমণ করল, কেমন করে দু'টি পিস্তলের মুখে পড়েও

অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সাথে তাদেরই একজনকে ঢাল বানিয়ে শেষে ওদেরই অস্ত্রে ওদেরকে পরাভূত করল, কেমন ভাবে চোখ নীচু রেখে নরম কন্ঠে তাদের গাড়িতে উঠতে বলল, তার রক্তাক্ত মুখের সেই দৃশ্য, এতবড় ঘটনার পরেও কেমন নিরুদ্বিগ্ন, ভাবলেশহীন ছিল সে, ইত্যাদি দৃশ্য তাদের চোখে এক এক করে ভেসে উঠছে। সেই সাথে ভেবে আঁৎকে উঠছে তারা, উনি যেতে যদি আর পাঁচ মিনিটও দেরি করতেন, তাহলে কি ঘটত তাদের ভাগ্যে। ঐ মানুষটির প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাদের চোখে অশ্রু নেমে এল।

পিতার প্রশ্ন শুনে চোখ খুলল নাদিয়া। তারপর ওড়নায় চোখ মুছে বলল, রক্তে ঢাকা থাকার কারণে দেখা যায়নি আব্বা ক্ষতটা কেমন। তবে প্রচুর রক্ত পড়েছে। শেষ পর্যন্ত রক্ত বন্ধ হয়নি। ক্ষতের উপর তুলা দিয়ে ডেসপিনার ওড়না দিয়ে কোন রকমে একটা ব্যান্ডেজ বেঁধে উনি আমাদের পৌঁছে দিয়েছেন।

'আল্লাহ ওকে ভাল রাখুন মা। দেখা ইনশাআল্লাহ আমাদের সাথে হবেই।' বলল ওমর বিগোভিক।

ওমর বিগোভিক উঠে দাঁড়াল। বলল, ডেসপিনা মা, খেয়ে দেয়ে রেষ্ট নাও। আমি বিকেলে তোমাকে বাড়িতে পৌঁছে দেব। একা তোমাদের বেরুনো চলবে না।

ওমর বিগোভিক চলে গেল তার ঘরের দিকে। বাইরে থেকে এসে সে এখনও কাপড় ছাড়েনি।

# ৫

ঐ দিনই সন্ধ্যায় আহমদ মুসা আবার বেরুল শহীদ মসজিদ রোডে যাবার জন্যে। এবার সাথে মাজুভ। আহমদ মুসা একাই যেতে চেয়েছিল। কিন্তু মাজুভ নাছোড়বান্দা, একা ছাড়তে রাজী হয়নি আহমদ মুসাকে। তবে আহমদ মুসার সাথী হওয়ার জন্যে মাজুভকে ছদ্মবেশ নিতে রাজী হতে হয়েছে। মুখে গোঁফ লাগাতে হয়েছে, সেই সাথে লাগাতে হয়েছে কানের নিচ পর্যন্ত জুলফি।

আহমদ মুসা জীপে উঠে বলল, শহীদ মসজিদ রোডে ঢুকেছিলাম পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে। আর কোন রাস্তা নেই শহীদ মসজিদ রোডে ঢোকার?

মাজুভ বলল, আছে। পূব প্রান্ত এবং অন্য আরেকটি লেন দিয়েও আমরা ঢুকতে পারি। তবে সেটা কিছু গলিপথের মত হবে।

'সেটাই তো ভালো।' বলে আহমদ মুসা গাড়ী ষ্টার্ট দিল।

বিভিন্ন গলিপথ ঘুরে আহমদ মুসার জীপ যখন শহীদ মসজিদ রোডে প্রবেশ করল তখন সন্ধ্যার লালিমা কেটে পুরোপুরি রাত নেমে এসেছে।

পুরানো বেলগ্রেডের মূল এলাকা এটা। বাড়িগুলো পুরানো, রাস্তাগুলোও সংকীর্ণ। সেই তুলনায় শহীদ মসজিদ রোড বলা যায় বেশ প্রশস্ত।

আহমদ মুসা ধীর গতিতে গাড়ি ড্রাইভ করে এগুচ্ছিল। হাসান সেনজিকের বাড়ি বরাবর পৌঁছে গাড়ি দাঁড় করানো তার লক্ষ্য।

হাসান সেনজিকের বাড়ি রাস্তার উত্তর পাশে, আর সে গাড়ি চালাচ্ছিল রাস্তার দক্ষিণ পাশ দিয়ে।

রাস্তা, ফুটপাত বেশ আলোকোজ্জ্বল।

সামনেই রাস্তার উত্তর পাশে বিশাল পুরানো গেট দেখেই আহমদ মুসা হাসান সেনজিকের বাড়ি চিনতে পারল। যে বর্ণনা সে শুনেছিল, তার সাথে মিলে গেল।

আহমদ মুসা গাড়ি দাঁড় করাল।

গাড়ি থেকে নামল। বলল, মাজুভ গাড়ি নিয়ে তুমি এখানে একটু দাঁড়াও। আমি বাড়ির সামনেটা একটু ঘুরে আসি।

আহমদ মুসার গায়ে লম্বা ওভার কোট। মাথায় ফেল্ট হ্যাট। কপাল পর্যন্ত নামানো।

আহমদ মুসা রাস্তা পার হয়ে ওপারের ফুটপাতে গিয়ে উঠল।

ফুটপাতের যেখানে গিয়ে উঠল, সেখানে কতকগুলো দোকান, রাস্তা বরাবর সারিবদ্ধ। দোকানগুলোর পরেই হাসান সেনজিকের বাড়ি।

আহমদ মুসা যখন ফুটপাতে উঠছে, ঠিক সে সময় তার পাশেই একটা মাইক্রোবাস এসে দাঁড়াল।

গাড়ি থেকে নামল কয়েকজন লোক। আহমদ মুসার সামনে দিয়েই ওরা নামল।

আহমদ মুসা থমকে দাঁড়াতে বাধ্য হলো।

গাড়ির দু'দরজা দিয়ে দু'জন প্রথমে নেমে এসে ফুটপাতে দাঁড়াল। তারপর আরেকজন গাড়ি থেকে নেমে একজনকে হাত ধরে টেনে নামাল।

যাকে হাত ধরে টেনে নামাল, সে ফুটপাতে এসে দাঁড়াতেই তাকে একটা ধাক্কা দিয়ে সামনের দিকে ঠেলে দিল। তারপর তাকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে দোকানের দিকে নিয়ে চলল।

আহমদ মুসা সেই লোকটির দিকে চেয়ে চমকে উঠল। এ যে জাকুব!

আহমদ মুসা এক অমোঘ টানে সেই লোকদের পেছনে পেছনে চলল।

জাকুবকে নিয়ে লোকগুলো সামনের দোকানগুলোর পুব প্রান্তের দোকানে ঢুকল।

দু'জন দোকানের কাউন্টারে দাঁড়াল। আরেক জন জাকুবকে টেনে নিয়ে কাউন্টারের ভেতরে চলে গেল।

সেলসম্যান ছেলেটির চোখ দু'টি ছানাবড়া হয়ে উঠেছে। জাকুবকে সে চিনতে পেরেছে। তাতেই তার আতংক আরও বেড়েছে। জাকুবকে কেন এখানে ধরে আনা হতে পারে, তা কিছু কিছু সে বুঝতে পারে।

যে লোকটি জাকুবকে নিয়ে কাউন্টারের ভিতরে প্রবেশ করেছে, সে জাকুবকে দেখিয়ে সেলসম্যান ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করল, চেন তুমি এ-কে?

সেলসম্যান ছেলেটি কোন উত্তর দিল না।

একই প্রশ্ন আবার জিজ্ঞাসা করল লোকটি সেলসম্যান ছেলেটিকে।

ছেলেটি কোন জবাব দিল না। বোবা দৃষ্টি মেলে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল।

লোকটি রিভলভার বের করল। রিভলভারটি ছেলেটির কপাল বরাবর তুলে ধরে বলল, তুমি সব জান, তোমাকে বলতে হবে সব। সেদিন একজন লোক এখানে খুন হয়েছে। এই লোকটি তার সাথে জড়িত ছিল।

সেলসম্যান ছেলেটি মুখ খুলল না।

লোকটির মুখ শক্ত হয়ে উঠল। চোখ জ্বলে উঠল তার। তার তর্জ্জনিটি হঠাৎ চেপে বসল রিভলভারের ট্রিগারের উপর। বেরিয়ে এল রিভলভার থেকে একটা গুলি। কপাল ফুটো করে তা ঢুকে গেল সেলসম্যান ছেলেটির মাথায়। লুটিয়ে পড়ল ছেলেটি মেঝের উপর।

আহমদ মুসা দাঁড়িয়ে ছিল দোকানের বাইরে। ধীরে ধীরে সে এগুলো দোকানের দিকে। ঢুকল দোকানে। যেন সে রিভলভারের গুলির আওয়াজ শুনে প্রবেশ করেছে এমন ভাব নিয়ে।

আহমদ মুসা যখন কাউন্টারের পাশে দাড়াল, ঠিক তখনই লোকটির রিভলভার ঘুরে গেছে জাকুবের দিকে। জাকুবের কপাল বরাবর রিভলভার তুলে লোকটি বলল, সেলসম্যান ছেলেটির মৌনতাই প্রমাণ করে তুমি অপরাধী, হত্যাকারী।

বলে সে ট্রিগার চাপতে যাচ্ছিল।

আহমদ মুসা দ্রুত বলল, থাম, কি হচ্ছে এখানে। এক সেলসম্যানকে হত্যা করলে, আবার আর একজনকে হত্যা করছ ব্যাপার কি?

লোকটি আহমদ মুসার দিকে মুখ ফিরাল। মুহুর্ত কাল চেয়ে থেকে বলল, বুঝেছি তুমিও তাহলে এর সাথী। সেদিন এর সাথে ছিলে। এখন এসেছ বাঁচাতে। তোমাকেই তাহলে আগে দেখতে হয়।

বলে লোকটি রিভলভারের মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছিল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা বুঝল, বেপরোয়া লোকটি নির্ঘাত গুলি করবে। আহমদ মুসার দু'টি হাত ছিল কাউন্টারের উপর। ডান হাতের কাছেই ছিল সেলসম্যানের পেপার ওয়েটটা। আহমদ মুসা সেটা তুলে নিয়ে চোখের নিমেষে ছুড়ে মারল লোকটির মাথা লক্ষ্যে।

এতদ্রুত ব্যাপারটা ঘটল যে লোকটি কিছু বুঝে উঠার আগেই ভারি পেপার ওয়েটটি বুলেটের মত ছুটে গিয়ে আঘাত করল লোকটির বাম কানের ঠিক ওপরের জায়গাটায়।

লোকটি একবার টলে উঠেই আছাড় খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

আহমদ মুসা পেপার ওয়েট ছুড়েই পকেট থেকে রিভলভার বের করে নিয়েছিল।

আহমদ মুসার সামনে সেলস কাউন্টারের পাশে যে দু'জন লোক দাড়িয়েছিল তারাও হাতে রিভলভার তুলে নিয়েছে।

আহমদ মুসা রিভলভার বের করেই সামনের লোকটিকে গুলি করেছিল, সে তখনও আহমদ মুসার দিকে রিভলভার তাক করে সারেনি। এ লোকটি গুলি খেয়ে পড়ে গেল, কিন্তু আহমদ মুসা দ্বিতীয় লোকটির গুলির মুখে পড়ে গেল। তার রিভলভারের নল তখন উঠে এসেছে আহমদ মুসার কপাল লক্ষ্যে।

রক্ষা করল জাকুব। পেপার ওয়েটের আঘাত খেয়ে যে লোকটি পড়ে গিয়েছিল, তার রিভলভারটি জাকুব সঙ্গে সঙ্গেই তুলে নিয়েছিল। দ্বিতীয় লোকটি ট্রিগার টেপার আগেই জাকুব গুলি করে তার মাথা গুড়িয়ে দিল।

আহমদ মুসা লক্ষ্য করেনি, দোকানে যখন এসব গুলি-গোলা চলছিল, তখন মাইক্রোবাস থেকে আরও চার পাঁচজন লোক নেমে বিড়ালের মত নিঃশব্দে ছুটে এসেছে। তাদের কারো হাতে ষ্টেনগান, কারো হাতে পিস্তল, একজনের হাতে রড। ড্রাইভার লোকটিই আগে নেমেছিল রড নিয়ে।

জাকুব যখন দ্বিতীয় লোকটিকে গুলি করছিল সে সময়ই তারা আহমদ মুসার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

আহমদ মুসা পেছনে পায়ের শব্দে মাথা ঘুরাতেই ওদের চার পাঁচ জনকে দেখতে পেল। কিন্তু রিভলভার তোলার আগেই রডের একটা আঘাত এসে পড়ল মাথায়।

আঘাত খেয়ে আহমদ মুসা পড়ে গিয়ে মনে হয় জ্ঞান হারাল।

আহমদ মুসা পড়ে যাবার পর জাকুবও আর গুলি করতে পারে নি। ঐ পাঁচজন লোক অজ্ঞান হয়ে যাওয়া আহমদ মুসা এবং জাকুবকে হিড়হিড় করে টেনে মাইক্রোবাসের দিকে নিয়ে চলল। সকলের আগে যাচ্ছে স্টেনগান ধারী লোকটি। সে আতংক সৃষ্টির জন্যে গুলি বৃষ্টি করতে করতে সামনে এগুচ্ছে।

মাজুভ দেখতে পেয়েছিল আহমদ মুসা কয়েকজন লোকের পেছনে দোকানের দিকে যাচ্ছে। দোকানে ঢুকে গেল তাও সে দেখল।

দোকানে গুলির শব্দ পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল মাজুভ। সে বেরিয়ে এল জীপ থেকে। রাস্তা পেরুতে পেরুতেই আরও দুটি গুলির শব্দ পেল। সে যখন ওপারের ফুটপাতে উঠল, তখন দেখল আর চার-পাঁচজন লোক দৌড়ে গিয়ে দোকানে উঠল।

মাজুভ দাড়িয়ে পড়ল। সে রিভলভার বের করল। এক পা দু'পা করে এগুতে লাগল। কিন্তু এই সময়েই ওরা গুলি বৃষ্টি করতে করতে ফিরে আসছে। মাজুভ ওদের গুলি বৃষ্টির মুখে পড়ে গেল।

মাজুভ দ্রুত শুয়ে পড়ে ফুটপাতের নিচে রাস্তায় গিয়ে গড়িয়ে পড়ল। জায়গা ছিল আলো থেকে দূরে, প্রায় অন্ধকার। ওরা এদিকে খেয়াল করল না। ওরা গাড়িতে উঠে গাড়ি চালিয়ে চলে গেল।

ওরা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে উদ্বেগ-উত্তেজনায় কম্পিত হৃদয়ে মাজুভ ছুটল দোকানের দিকে।

দোকানে ঢুকে চারদিকে নজর বুলিয়ে চারটি লাশ পড়ে থাকতে দেখল। উদ্বেগে কাঁপতে লাগল মাজুভ। তাহলে কি আহমদ মুসা....। সে এক এক করে চারটি লাশেরই মুখ দেখল। না, এর মধ্যে আহমদ মুসা নেই। মনে একটু বল পেল মাজুভ। আহমদ মুসা অন্তত মরেনি। তাহলে কোথায়? সে কি সরে পড়েছে

কোথাও? না, আহমদ মুসা তো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালান না। তাহলে সে কি বন্দী? আহমদ মুসাকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে?

এই সময় মাজুভের নজর পড়ল সেলস কাউন্টারের গোড়ায় পড়ে থাকা একটা ফেল্ট হ্যাটের দিকে। দেখেই চমকে উঠল মাজুভ, ওটা আহমদ মুসার ফেল্ট হ্যাট। মাজুভ নীচু হয়ে ফেল্ট হ্যাটটি তুলে নিল। সে খেয়াল করল না ফেল্ট হ্যাটের অল্প দূরে একটা লোহার টুপিও পড়ে আছে।

ফেল্ট হ্যাট তুলে নিয়ে এর দিকে চোখ বুলাতে গিয়ে চোখ থেকে ঝর ঝর করে পানি নেমে এল মাজুভের।

একজন লোক গুটি গুটি পায়ে এসে দোকানের বাইরে দাঁড়িয়েছিল। সে মাজুভকে লক্ষ্য করছিল।

মাজুভ যখন ফেল্ট হ্যাট তুলে কেঁদে উঠেছিল তখন বাইরে দাড়ানো লোকটি দোকানে প্রবেশ করল।

পায়ের শব্দে চমকে উঠে মাজুভ মুখ ফিরাল। চোখ পড়ল আগন্তুক লোকটির উপর।

আগন্তুক লোকটি সালেহ বাহমন। গুলির শব্দে সেও ছুটে এসেছিল পাশের দোকান থেকে পেছন দিক দিয়ে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সেও দেখেছিল দু'জন লোককে টেনে কয়েকজন গাড়িতে তুলল। সে বুঝতে পারল মিলেশ বাহিনীর হামলা হয়েছে। সে বিস্মিত হলো, তিনটি গুলি কার বিরুদ্ধে হলো? আর যাদেরকে টেনে ছেচড়ে গাড়িতে তোলা হলো, সে দু'জনের মধ্যে সেলসম্যান নেই, তাহলে ও দু'জন কে? সালেহ বাহমন ধাঁধায় পড়ে গেল, মিলেশরা কার বিরুদ্ধে লড়াই করল।

আগন্তুক সালেহ বাহমন মাজুভকে বলল, আমি আপনার শত্রু নই, আপনি মিলেশ বাহিনীর নন আমি জানি।

-কেমন করে জানেন? প্রশ্ন করল মাজুভ।

-আমি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দেখলাম, আপনি মিলেশ বাহিনীর গুলি থেকে বাঁচার জন্যে ফুটপাতের নিচে গড়িয়ে পড়েছিলেন আর ওরা চলে যাবার পর আপনি দোকানে ঢুকেছেন।

-আপনি মিলেশ বাহিনীকে চিনলেন কেমন করে? আপনি কে?

-মিলেশ বাহিনীকে চিনব না কেন? ওরা তো আমাদের উৎখাতের চেষ্টা করছে। আমি সালেহ বাহমন।

-আপনি মুসলমান?

-হ্যাঁ। আপনি?

-আমি খৃষ্টান ছিলাম। আমি মিলেশ বাহিনীতে ছিলাম। আহমদ মুসা আমাকে নতুন জীবনের সন্ধান দিয়েছেন। আমি মিলেশ বাহিনী ত্যাগ করেছি, ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেছি।

সালেহ বাহমনের চোখ দু'টি ছানা বড়া হয়ে উঠল। বলল, আহমদ মুসার সাথে কোথায় দেখা হলো আপনার? আপনার নাম কি মাজুভ?

-হ্যাঁ মাজুভ। কি করে জানলেন আমার নাম?

-জেনেছি জাকুবের কাছ থেকে। এই দোকানেই তার সাথে আমার পরিচয় হয়। সে যাক, আহমদ মুসা ভাই কোথায়?

আহমদ মুসার নাম শুনতেই মাজুভের মুখ আবার বিবর্ণ হয়ে গেল। আবার উদ্বেগ-আশংকা ফুটে উঠল তার মুখে। বলল, আহমদ মুসার খোজেই আমি এ দোকানে এসেছি। তিনজন লোককে অনুসরণ করে তিনি এ দোকানে ঢুকেছেন। তারপরেই গুলি-গোলা। পরে আরও চার পাঁচজন এ দোকানে এসে ঢোকে। থামল মাজুভ।

-তাহলে আহমদ মুসা ভাই......। উদ্বেগ-উৎকন্ঠায় কথা শেষ করতে পারলো না সালেহ বাহমন।

-এখানে যাদের লাশ আছে তারা সবাই মিলেশ বাহিনীর। মনে হয়, আহমদ মুসাকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে, তিনি আহতও হতে পারেন। তারপর সালেহ বাহমনকে ফেল্ট হ্যাট দেখিয়ে বলল, এটা আহমদ মুসার। আমি মনে করি তিনি আহত হয়ে পড়ে না গেলে তার মাথার হ্যাট পড়ে যেত না।

মাজুভের শেষের কথাগুলো কান্নায় বুজে গেল।

সালেহ বাহমন কিছুক্ষণ বাকরুদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বলল, ওরা তো চলে গেছে, ওদের পিছু নেয়া আর যাবে না। তাহলে এখন করনীয়?

-মিলেশ বাহিনীর হেড কোয়ার্টার সম্প্রতি বদলেছে। আমি চিনি না। বলল মাজুভ।

-আমি জানি। জাকুব আমাকে ঠিকানা দিয়েছিল। কিন্তু সেখানে যেতে প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে। আর এ খবরটা সবাইকে জানানোও দরকার।

-ঠিক বলেছেন।

-চলুন আমরা যাই। তার আগে এদিকের ব্যবস্থাটা করে ফেলতে হবে। বলে সালেহ বাহমন পাশের দোকান থেকে তার লোকদের ডেকে বলল, এ দোকান বন্ধ করে দাও। মিলেশ বাহিনীর তিনটি লাশ ড্রেনে ফেলে দাও। আমাদের সেলসম্যানের লাশটি দাফনের ব্যবস্থা কর।

নির্দেশ দিয়ে সালেহ বাহমন মাজুভকে সাথে নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে আসতে আসতে বলল, ভুলে গেছি জিজ্ঞাসা করতে, হাসান সেনজিক কোথায়?

-নিরাপদে আছে। আমার বোনের বাড়িতে আহমদ মুসাসহ আমরা ওখানেই আছি।

-চলুন তাহলে আমরা ওখানে যাই, তাপর আপনাকে নিয়ে আমি বেরুব।

-সেটাই ভাল, ওদের খবরটা জানানো দরকার।

রাস্তা পার হয়ে জীপের কাছে গিয়ে পৌঁছল দু'জন। মাজুভ জীপের ড্রাইভিং সিটে বসল। সালেহ বাহমান বসল পাশের সিটে।

জীপ চলতে শুরু করল।

মাজুভ বলল, আহমদ মুসা ভাই আহত ছিলেন। আজকেই তিনি আহত হয়েছেন।

-আজকেই? কোথায়, কিভাবে?

-বেলা দশটার দিকে এসেছিলেন উনি এই শহীদ মসজিদ রোডে একা। হাসান সেনজিকের বাড়ির পশ্চিম পাশে ফুটপাত থেকে একটি মাইক্রোবাস দু'টি মেয়েকে কিডন্যাপ করে এবং তারা ছিল মিলেশ বাহিনীর লোক। ওদের সাথে সংঘর্ষে কপালে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। মিলেশ বাহিনীর দু'জন মারা যায়, দু'জন জ্ঞান হারায়।

-হাসান সেনজিকের বাড়ির পশ্চিম পাশ থেকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। ওরা কি মুসলমান?

-হ্যাঁ মুসলমান।

-নাম কি?

-আহমদ মুসা নাম জিজ্ঞেস করেননি।

সালেহ বাহমান কিছু বলল না। কিন্তু তার মনের কোথায় যেন খচ খচ করতে লাগল।

জীপ ছুটে চলল মাজুভের বোনের বাড়ির দিকে।

আহমদ মুসা মাইক্রোবাসের মেঝেতে মরার মত পড়ে ছিল। তার পায়ের কাছে, মেঝের উপর বসে ছিল জাকুব। মাইক্রোবাসে তুলে তাকে পিছমোড়া করে বেঁধে রাখা হয়েছে।

তাদের পাশেই সিটে বসেছিল তিনজন। তাদের একজনের হাতে ষ্টেনগান। আর দু'জনের হাতে রিভলভার। ড্রাইভিং সিটে একজন বসেছে। তার পাশের সিটে একজন। তার হাতেও একটি রিভলভার।

গাড়ির ভেতরে অন্ধকার।

আহমদ মুসা চিৎ হয়ে পড়েছিল। তার মাথা গাড়ির দরজার দিকে। খুব সর্তকভাবে আহমদ মুসা একবার চোখ খুলল। তার পাশেই একজন বসে। তার হাতে ষ্টেনগান।

আহমদ মুসা রড়ের আঘাতে জ্ঞান হারায়নি। সে ফেল্ট হ্যাটের নিচে কপাল পর্যন্ত নামানো লোহার টুপি পরেছিল। রডের আঘাত লোহার টুপিতে পড়ে। কিন্তু আহমদ মুসা অজ্ঞান হওয়ার ভান করে পড়ে গিয়েছিল আত্মরক্ষার কৌশল হিসেবে। কারণ পেছন থেকে ছুটে আসা পাঁচজনকে মোকাবিলা করা ঐ অবস্থায় আত্মাহুতির সমান ছিল। আহমদ মুসা অজ্ঞান হওয়ার ভান করে সময় নিতে এবং শত্রুকে বিশৃঙ্খল ও অসতর্ক করতে চেয়েছিল।

আহমদ মুসা যখন চোখ খুলেছিল সে সময়ই ড্রাইভিং সিটের পাশের সিটে বসা লোকটি রিভলভার নাচাতে নাচাতে বলল, জাকুবকে দু'ঘা লাগিয়ে জিজ্ঞেস করতো হে, আমাদের তিন তিন জন লোককে মেরে ফেলল এই লোকটা কে?

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে জাকুবের কাছে বসা লোকটি জাকুবের দুই গালে দুই থাপ্পড় লাগিয়ে বলল, শুনলি তো বল তোর এই সঙ্গীটি কে?

জাকুব কোন জবাব দিল না।

ঐ লোকটি আবার বলল, চল কতক্ষণ মুখ বন্ধ করে রাখিস দেখা যাবে। সেদিন মেরেছিলি একজন, আজ তিনজন। এখন মনে হচ্ছে, প্রিষ্টিনাতে আমাদের যে ব্যর্থতা এবং তাতে আমাদের যে সাতজন লোক জীবন দিল, তাও তোরই জন্যে। গায়ের চামড়া খুলে মারলেও তোর অপরাধের শাস্তি যথেষ্ট হবেনা।

পাশের সিট থেকে একজন বলে উঠল, ব্যাটা টাকা খেয়েছে, হেভি টাকা। টাকা এখন বেরুবে।

সামনের সিটের একজন বলল, না টাকা নয়, আসলে ও ব্যাটা জাত সাপ। রক্তে ও মুসলমান। ওর দাদা ও পূর্বপুরুষ ছিল মুসলমান। মাঝখানে ওর বাপ খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল মানুষকে ধোকা দেয়ার জন্যে। ভেতরে ভেতরে ওরা সবাই মুসলমানই রয়ে গেছে। মিলেশ বাহিনীর সাথে কোন খৃষ্টান বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেনা।

পেছন থেকে একজন বলে উঠল, কিন্তু উস্তাদ মাজুভতো জাত খৃষ্টান। সেও তো বিশ্বাস ঘাতকতা করল।

-মুসলমানরা জাদু জানে, ওরা মানুষকে হিপনোটাইজ করে। তাই ওদের সংস্পর্শে যাওয়া, ওদের কথা শোনা নিষেধ। বলল সামানের সেই লোকটা।

-ওদের শেষ না করে তো এসব সম্ভব নয়। ওদের অস্তিত্ব থাকলে মাজুভরা ওদের ফাঁদে পড়বেই। বলল ড্রাইভার।

-এ জন্যেই তো ওদের নির্মুল করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। বলল সামনের লোকটি।

-জাকুবদের মত ছদ্মবেশীদেরও এবার বাদ দেয়া হবেনা। বলল পেছনের ষ্টেনগানধারী লোকটি।

-সেটা আর বলতে হবে না। জাকুবের বাপ-মা সহ ওদের বিশ্বাসঘাতক পরিবারকে কালকেই বেলগ্রেডে দেখতে পাবে। ওদের চোখের সামনেই ওদেরকে দিয়েই জাকুবকে মারা হবে। বিশ্বাসঘাতক পরিবারের কেউই বাঁচবে না। বলল সামনের সিটের পিস্তলধারী।

কেঁপে উঠল জাকুবের হৃদয়। সে মৃত্যুকে ভয় করে না, কিন্তু তার জন্যে তার পিতা-মাতা, পরিবার নির্যাতিত হবে, এটা সে সহ্য করতে পারবেনা।

এই সময় সামনের লোকটি মাথা ঘুরিয়ে বলল, ঐ লোকটিকে বেঁধেছিস তো?

পেছন থেকে এজন বলল, সংজ্ঞাহীন একটা লোককে বাঁধার দরকার কি?

ধমক দিয়ে বলল সেই লোকটি, বেঁধে ফেল, স্যার দেখলে আস্ত রাখবেনা। ক্লোরোফরম বোমায় অজ্ঞান হয়ে যাওয়া লোকদের বেঁধে না রেখে কি ফল হয়েছে, ভুলে গেছ?

জাকুবের পাশেই সিটে যে লোকটি বসেছিল, সে লোকটি উঠে দাঁড়াল। বোধহয় বাঁধার নির্দেশ পালনের জন্যে।

আহমদ মুসা ভাবল, আর সময় নষ্ট করা ঠিক হবেনা। সে প্রস্তুত হলো। ধীরে ধীরে সে চোখ মেলল। দেখল তার পাশের লোকটি ষ্টেনগানের বাট গাড়ির মেঝেতে রেখে খাড়া করে ধরে আছে। ষ্টেনগানের বাটটি তার ডান হাত প্রায় স্পর্শ করছে। আহমদ মুসা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল। সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে তার ডান হাত ষ্টেনগানের বাট ধরে ফেলল। আর সেই সাথে বাম হাত ছুটে এসে আঁকড়ে ধরল স্টেনগানের ব্যারেল। দু'হাতে একটা হ্যাচকা টানে ষ্টেনগান কেড়ে নেয়ার সাথে সাথেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল ষ্টেনগান উদ্যত করে।

পর মুহূর্তেই আহমদ মুসা ষ্টেনগানের ট্রিগার চেপে ব্যারেলটা একবার ঘুরিয়ে নিল তিনজনের উপর দিয়ে। তারপরের ব্যারেলটি ঘুরিয়ে নিল সামনের পিস্তলধারী লোকটির দিকে। লোকটি ব্যাপারটা বুঝে রিভলভার নিয়ে ঘুরে বসার

আগেই ষ্টেনগানের গুলি বৃষ্টির সম্মুখীন হলো এ তিন জনের মত সেও ঝাঝরা দেহ নিয়ে লুটিয়ে পড়ল সিটের উপর।

আহমদ মুসা ড্রাইবারের দিকে ষ্টেনগান তাক করে জাকুবকে বলল, তুমি ঠিক আছো তো জাকুব?

জাকুব চিৎকার করে বলল, আমার সন্দেহ তাহলে ঠিক। ঠিকই আপনি মুসা ভাই। জিন্দাবাদ আহমদ মুসা। আমি ভাল আছি।

আহমদ মুসা ড্রাইভারকে বলল, রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করাও। তুমি শত্রুতা না করলে তোমাকে কিছু আমরা বলবনা যদিও তুমিই আমার মাথায় রড় দিয়ে বাড়ি দিয়েছিলে।

ড্রাইভার রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করাল। আহমদ মুসা ষ্টেনগান ও তিনটা পিস্তল কুড়িয়ে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। জাকুবও নামল।

জায়গাটা বেলগ্রেড সার্কুলার রোডের একটা জনবিরল অংশ। রাস্তার পশ্চিম পাশে একটা ঝিল। আহমদ মুসা ষ্টেনগানটি ঝিলে নিক্ষেপ করল। এবং পিস্তলের দু'টো গুলিতে মাইক্রোবাসটির দুটো টায়ার ফুটো করে দিল যাতে করে গাড়ি নিয়ে গিয়ে কোন ষড়যন্ত্রের সুযোগ ড্রাইভার না পায়। কারণ গাড়ি না পাওয়া পর্যন্ত তাদের হাটতে হবে।

পিস্তলটি পকেটে রাখতে রাখতে আহমদ মুসা ড্রাইভারকে বলল, কষ্ট করে হেটে যাও। আমাদের হাতে গাড়ি থাকলে তোমার গাড়ির টায়ার আমরা ফুটো করতাম না।

বলে আহমদ মুসা ফুটপাত ধরে উত্তর দিকে হাটতে থাকল। তার পেছনে জাকুব। হাটতে হাটতে আহমদ মুসা জাকুবকে জিজ্ঞেস কল, তোমাকে সন্দেহ করল কিভাবে?

-সেদিন বেলগ্রেডে পৌঁছার পরই আমি আপনাদের কথা মত টিটো রোড অর্থাৎ শহীদ মসজিদ রোডে গিয়েছিলাম হাসান সেনজিকের বাসার খোঁজে। বাসাতো চিনলাম। ভয়ে ভেতরে ঢুকলাম না বাড়ির পূব পাশের একটা দোকানে উঠে জিজ্ঞাসা করছিলাম হাসান সেনজিকের বাসার কোন একজনকে পাওয়া যায় কিনা। আমার কথা শুনে ভেতর থেকে একজন লোক বেরিয়ে আসে। পরে জেনেছি

উনি হোয়াইট ক্রিসেন্টের লোক সালেহ বাহমান। এই সময় মিলেশ বাহিনীর একজন লোক সেখানে পৌঁছে। সে চিনতে পারে সালেহ বামনকে। সালেহ বাহমনকে বাঁচাতে আমি হত্যা করি মিলেশ বাহিনীর লোককে। লাশ সরিয়ে ফেলার পর মিলেশ বাহিনীর আরও কয়েকজন সেখানে যায়। আমি হত্যা করেছি বা লোকটি ঐখানেই নিহত হয়েছে এমন কোন প্রমাণ তারা পায়নি। কিন্তু তারা আমাকে সন্দেহ করেছে। আজ আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল আরও নিশ্চিত হতে।

-প্রিষ্টিনা অভিযানের পর জারজেস জিবেঙ্কু বেঁচে থাকলে তুমি আরও আগে সন্দেহের শিকার হতে, সেটা একটু পরেই হয়েছ।

-আহমদ মুসা ভাই আপনিতো সব শুনেছেন, এখন আমার আব্বা-আম্মা এবং পরিবারের কি হবে। আমাকে হারিয়ে তো ওরা ক্ষ্যাপা কুকুরের মত হয়ে যাবে। কান্না ভেজা কণ্ঠে বলল জাকুব।

-চিন্তা করোনা, কালকে তোমার আব্বা-আম্মা বেলগ্রেডে কোন দিক দিয়ে পৌছবেন?

-বিমানে আনা হচ্ছে শুনেছি।

-কয়টার বিমান?

-কাল দশটায়।

-ঠিক আছে, সকাল দশটায় প্যাসেঞ্জার লিস্ট দেখলেই বোঝা যাবে ঐ বিমানে তারা আসছেন কিনা। চিন্তা করো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

-আরেকটা খবর মুসা ভাই।

-কি?

-ওরা নাকি হাসান সেনজিকের মাকে সাত দিন সময় দিয়েছিল। কাল সেই সপ্তম দিন। তারা হাসান সেনজিককে না পেলে তার মাকেই তার বাড়ী থেকে নিয়ে যাবে-এ পরিকল্পনা তারা চূড়ান্ত করেছে।

আহমদ মুসা থমকে দাঁড়িয়ে বলল, তাই নাকি?

-হ্যাঁ। বলল জাকুব।

আহমদ মুসা আবার চলতে শুরু করল। চলতে চলতে বলল, ওদের শক্তি সম্পর্কে তোমার কি ধারণা জাকুব?

জাকুব বলল, ওদের সংগঠনের ষ্ট্রাকচারটা, আমি যেটা দেখেছি, ভূমির উপর একটা লম্ব এর মত। ভূমিটা হলো জনশক্তি। এই জনশক্তি বিশাল। কিন্তু নেতৃত্বটা 'লম্ব'-এর মত। অর্থাৎ নেতৃত্বে লোক খুব কম। প্রতিটি শহরের নেতৃস্থানীয় লোক দু'একজনের বেশি নেই। কেন্দ্রেও নেতৃত্বের টিম খুব ছোট। সে ছোট টিমটিও এখন ভেঙ্গে পড়েছে। আজকেই তিনজন নেতা তাদের নিহত হয়েছে। একজন বোটানিক্যাল গার্ডেনে, একজন শহীদ মসজিদ রোডের ঐ ঘটনায়, আর এখানে একজন এর আগে মারা গেছে ইয়েলেস্কু। বলা যায় কনস্টানটাইনের হাত পা প্রায় কেটে গেছে। কনস্টানটাইনকে সরাতে পারলে সংগঠনের গোটা ষ্ট্রাকচার ধ্বসে পড়বে। রাজা মারা গেলে যোগ্য উত্তরাধিকারী না থাকলে রাজ্য যেমন বিপন্ন হয় সেই রকম। কনস্টানটাইন একাই সব ক্ষমতা ভোগ করতে চান, তাই তার চারপাশে কিছু হুকুম বরদার ছাড়া উপযুক্ত লোক তৈরি করেননি।

আহমদ মুসা খুশি হয়ে বলল তোমাকে ধন্যবাদ জাকুব। তুমি অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য দিয়েছ।

এই সময়ে একটা খালি ট্যাক্সি যাচ্ছিল। জাকুব ডাকল ট্যাক্সিকে।

ভাড়া ঠিক করে তারা উঠে বসল। আহমদ মুসা মাজুভদের গেটে নেমে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল। গেটে দাঁড়িয়ে কলিং বেলে চাপ দিল আহমদ মুসা।

দরজা খুলে হাসান সেনজিক আহমদ মুসাকে দেখেই ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল। বলল আল্লাহর হাজার শুকরিয়া। আমার গোটা জগৎ অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল মুসা ভাই। আমি আল্লাহর কাছে বলেছিলাম, আমার অন্য সব চাওয়ার বিনিময়ে আল্লাহ আপনাকে ফিরিয়ে দিন।

আহমদ মুসা তার পিঠ চাপড়ে সান্তনা দিল। বাড়ির ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, না হাসান সেনজিক এভাবে বলে না। আল্লাহ কাকে রাখবেন, কাকে কখন টান দিয়ে নিয়ে নেবেন সেটা আল্লাহরই পরিকল্পনা। আর আল্লাহ কোন স্থানই

শূন্য রাখেন না। সুতরাং কোন অবস্থাতেই ভেঙে না পড়ে আল্লাহর ইচ্ছাকেই সবার উপরে রাখতে হবে।

ড্রয়িং রুমে প্রবেশ করল হাসান সেনজিকের সাথে আহমদ মুসা এবং জাকুব।

ড্রয়িং রুমের ভেতরের দরজার পর্দার ওপাশে দাঁড়িয়ে মুখ বের করল নাতাশা। বলল, আপনি সুস্থ আছেন তো?

-হ্যাঁ। বলল আহমদ মুসা মাথা নিচু করে।

-মাজুভকে এ খবর কি করে জানানো যায়! তার মাথা ঠিক নেই, কোথায় কি করে বসে!

আহমদ মুসা হাসান সেনজিকের দিকে চেয়ে দ্রুত বলল, মাজুভ কোথায়?

-প্রথমে গেছে ওমর বিগোভিকের বাড়িতে। সেখান থেকে...... বাঁধা দিয়ে আহমদ মুসা বলল, ওমর বিগোভিক কে? তাকে মাজুভ চিনল কেমন করে?

হাসান সেনজিক বলল, শহীদ মসজিদ রোড থেকে মাজুভের সাথে এসেছিল সালেহ বাহমন। সে হোয়াইট ক্রিসেন্টের লোক। আমার পরিবারের সাথেও যোগাযোগ আছে। তার সাথেই গেছে ওমর বিগোভিকের বাড়িতে। ওমর বিগোভিকের মেয়ে নাদিয়া নুরের মাধ্যমেই আমার পরিবারের সাথে যোগাযোগ করেছিল সালেহ বাহমন। সেখানেই খবরটা জানাতে গেছে আমার এবং আপনার দুই খবরই। এখন পর্যন্ত ওরা এবং আমার পরিবার জানেনা আমরা কোথায় আছি।

সালেহ বাহমনকে আহমদ মুসা চিনতে পারল। জাকুবের কাছে তার কথা আহমদ মুসা শুনেছে। কিন্তু ওমর বিগোভিক? মেয়ে দু'টিকে আহমদ মুসা সেদিন যে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিল, সে বাড়ির মালিকের নামও তো ওমর বিগোভিক। মেয়ে দু'টির নাম তো সে জিজ্ঞাসা করেনি। হতে পারে ওমর বিগোভিকের মেয়ে নাদিয়া ঐ দু'টি মেয়ের একজন হবে।

'কিন্তু তুমি কি যেন বলছিলে? সেখান থেকে তারা.....' বলল আহমদ মুসা।

'হ্যাঁ ওমর বিগোভিকের ওখান থেকে তারা তৈরি হয়ে মিলেশ বাহিনীর হেড কোয়ার্টারে যাবে আপনার সন্ধানে।' বলল হাসান সেনজিক।

‘সর্বনাশ মিলেশ বাহিনীর লোকেরা তো ক্ষ্যাপা কুকুরের মত হয়ে আছে। ওদের হাতে গিয়ে পড়লে আর রক্ষা নেই।’ বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, চল জাকুব আমরা প্রথমে ওমর বিগোভিকের বাড়িতে খোঁজ করি, না পেলে আমাদেরকেও মিলেশ বাহিনীর হেডকোয়ার্টারে যেতে হবে।

জাকুব উঠে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা বলল এদিকে কোথায় গাড়ি তাড়াতাড়ি পাওয়া যাবে?

নাতাশা পর্দার ওপারেই দাঁড়িয়েছিল। সে রিটার মা’র সাথে আলোচনা করে পর্দার এপারে মুখ বাড়িয়ে বলল, ভাইজান, কার আছে ওটাই নিয়ে যান।আপা তাই বললেন।

‘শুকরিয়া’ বলে বেরিয়ে এল আহমদ মুসা ড্রয়িং রুম থেকে।

গ্যারেজে গাড়ির কাছে পৌঁছতেই রিটা চাবি নিয়ে এল।

আহমদ মুসা রিটাকে দু’হাতে তুলে ধরে কপালে একটা চুমু খেয়ে বলল, মা মনি তুমি অনেক বড় হও।

‘না অনেক বড় নয়, তোমার মত বড় হব।’ বলল রিটা।

‘কেন আমার মত কেন?’ বলল আহমদ মুসা।

‘তুমি ভাল’ বলল রিটা।

সবাই হেসে উঠল।

‘না মানুষ সবাই ভাল।’ বলল আহমদ মুসা।

‘না সবাই ভাল না, কাল জেমস আমার পেনসিল চুরি করেছিল।’ বলল রিটা।

‘জেমসও আগে ভাল ছিল, পরে খারাপ হয়েছে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘মানুষ কেন খারাপ হয়?’ বলল রিটা।

‘অন্যায় লোভ মানুষকে খারাপ করে।’ বলল আহমদ মুসা।

এই সময় রিটার মা দরজায় এসে রিটাকে ডাকল। রিটা ছুটল তার মায়ের দিকে। এভাবে রিটার মা এসে আহমদ মুসাকে রিটার হাত থেকে উদ্ধার না করলে আরও কতক্ষণ তার জিজ্ঞাসা চলত কে জানে?

আহমদ মুসারা গাড়িতে উঠল।

গাড়ি ছুটে চলল ওমর বিগোভিকের বাড়ির দিকে। জাকুব ওমর বিগোভিকের বাড়ি চেনে। সালেহ বাহমনের সাথে একদিন সে ঐ বাসায় গিয়েছিল।

ওমর বিগোভিকের বাসা চিনতে অসুবিধা হলো না।

বাড়ির গেটে গাড়ি দাঁড় করাল।

গাড়ির দরজা খুলে প্রথমেই নামল আহমদ মুসা। সে গেটে গিয়ে দরজায় নক করল।

মাত্র ১ মিনিট। দরজা খুলে গেল।

দরজা খুলেছে নাদিয়া নূর। সে আহমদ মুসাকে দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠল। পরক্ষনেই আনন্দে ভরে গেল নাদিয়া নুরের মুখ। বলল, আপনি ভাল আছেন? আপনাকে না মিলেশরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল?

আহমদ মুসা বলল, ভাল আছি। হ্যাঁ ওরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল।

'আমি নাদিয়া নুর। ওবেলা আপনি আপনার পরিচয় দেননি, আপনার দেয়া বই থেকে আপনার নাম জানতে পারি।' বলল নাদিয়া নুর।

একটু থেমেই সে আবার শুরু করল, আপনার নাম, পরিচয় জিজ্ঞাসা না করায় আব্বা আমাদের খুব বকেছেন। হেসে বলল নাদিয়া নুর।

'কি আমি বকলাম, কার সাথে কথা বলছিস নাদিয়া?' বলতে বলতে ভেতর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো ওমর বিগোভিক।

'আব্বা আসুন দেখুন কে এসেছেন।' বলে নাদিয়া তার আব্বার দিকে মুখ ফিরাল।

ওমর বিগোভিক নাদিয়ার পাশে এসে দাড়াল। জাকুব দেখেই চিনতে পারলো ওমর বিগোভিককে। জাকুবের পাশেই দাঁড়িয়ে সুন্দর, সুঠাম এক যুবক। যুবকটির শান্ত ও গভীর বুদ্ধিদীপ্ত চোখে মনোরম এক আকর্ষণ।

ওমর বিগোভিক নাদিয়ার কাছে দাঁড়াতেই আহমদ মুসা সালাম দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল। বলল, আমি আহমদ মুসা।

নাম শুনেই ওমর বিগোভিক ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে।

বুকে জড়িয়ে আর ছাড়লো না। অনেকক্ষণ তাকে বুকে জড়িয়ে থাকল। বুকে জড়িয়ে রেখেই বলল, কি বলে তোমাকে স্বাগত জানাব বাবা। এই মুহূর্তে আমার চেয়ে সৌভাগ্যশালী দুনিয়াতে আর কেউ নেই। তোমার পদধুলি পড়েছে আমার বাড়িতে, আমার সৌভাগ্য।

ওমর বিগোভিকের আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়ে আহমদ মুসা বলল, আমাকে এভাবে ভাবলে খুব খারাপ লাগে আমার। মনে হয়, আমি যেন আপনাদের একজন নই।

'তুমি অব্যশই আমাদের একজন, কিন্তু অসাধারণ একজন, অসামান্য একজন, অদ্বিতীয় একজন।' বলল ওমর বিগোভিক।

'এটাও ঠিক নয় জনাব, বিভিন্ন দেশে আমি যাদের নিয়ে কাজ করেছি, সবাই আমরা সমান।' বলল আহমদ মুসা।

'কিন্তু তবু আহমদ মুসা তো একজনই।' বলল ওমর বিগোভিক।

কথা শেষ করেই ওমর বিগোভিক ব্যস্ত হয়ে বলল, দেখো কি ব্যাপার! আমরা দরজায় দাঁড়িয়ে কথা বলছি। চল, ভেতরে চল।

দু'পা এগিয়েই আহমদ মুসা জিজ্ঞাসা করল, সালেহ বাহমন ও মাজুভ কোথায় চাচাজান?

'ওরা তো বেরিয়ে গেছে প্রায় আধাঘন্টা আগে।' বলল ওমর বিগোভিক।

আহমদ মুসা বলল, আমরা বসতে পারছি না।

'কেন?' বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে বলল ওমর বিগোভিক।

'সালেহ বাহমন ও মাজুভ জানে মিলেশ বাহিনী আমাকে তাদের হেডকোয়ার্টারে আটকে রেখেছে। আমাকে উদ্ধারের জন্যেই ওরা মিলেশ বাহিনীর ঘাটিতে গেছে। ওরা উত্তেজিত, উত্তেজিত হলে ভুল হয় বেশি। ওরা যদি মিলেশ বাহিনীর হাতে পড়ে যায়, তাহলে বিপদ হবে। সুতরাং সময় নষ্ট না করে এখনই আমাদের মিলেশ বাহিনীর হেড কোয়ার্টারে যেতে হবে।' শান্ত, অথচ দ্রুত কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার কথা শুনে উদ্বেগ ফুটে উঠল ওমর বিগোভিক ও নাদিয়া নুর দু'জনের মুখেই।

আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়াল। বলল, তাহলে চাচাজান আসি।

বলে আহমদ মুসা সামনের দিকে পা বাড়াল। সত্যি আহমদ মুসার চোখে-মুখে উদ্বেগ ফুটে উঠেছে যা সচরাচর হয় না। সালেহ বাহমন ও মাজুভের জন্যে সত্যিই সে চিন্তিত। তার জন্যে ওরা না বিপদে পড়ে।

'তোমাকে এক মুহূর্তও দেরি করতে বলতে পারিনা বাবা। কিন্তু ওয়াদা দাও, তুমি আবার আসবে।' বলল ওমর বিগোভিক।

আহমদ মুসা থমকে ঘুরে দাঁড়াল। অত্যন্ত শান্ত ও কোমল কণ্ঠে বলল, চাচাজান আমরা এক কঠিন জীবন-মৃত্যুর খেলায় রত। আমি কি এ ওয়াদা করতে পারি? যদি আমার সামনের এ পদক্ষেপটা শেষ পদক্ষেপ হয়, যদি আর না ফিরি! বলে আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়িয়ে পা চালাল সামনে।

আহমদ মুসার এই শান্ত ও কোমল কথা এত মর্মস্পর্শী ছিল যে, ওমর বিগোভিক ও নাদিয়া নুর দু'জনের চোখ দিয়েই ঝর ঝর করে নেমে এল অশ্রু।

ওরা অশ্রু সজল চোখে আহমদ মুসার গমন পথের দিকে চেয়ে রইল। ওরা গেট দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠল। গাড়ি ষ্টার্ট নিয়ে চলে গেল।

গাড়ি দৃষ্টির বাইরে চলে গেল তবু ওরা সেদিক থেকে দৃষ্টি ফেরাতে পারলো না।

নাদিয়া নুর ধীরে ধীরে এসে তার পিতার কাঁধে হাত রাখল।

ওমর বিগোভিক চমকে উঠে ফিরে তাকাল। বলল, কি মা!

'জানি উনি কত শক্ত মানুষ, কত বিপ্লবের উনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। কিন্তু ওর মন এত সংবেদনশীল, এত নরম!' বলল নাদিয়া নুর।

'পুর্ণ মানুষ বলেই হয়তো। একজন পূর্ণ মানুষ যেমন শক্ত হন, তেমনি হন নরমও।' বলল ওমর বিগোভিক।

'মৃত্যুকে ওরা এত সহজভাবে, এত সাধারণভাবে দেখেন আব্বা!' বলল নাদিয়া নুর।

'এটা তারাই পারে মা, যারা নিজের জন্য ভাবেন কম। ওরা ওদের জীবন আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিয়েছেন।' বলল ওমর বিগোভিক।

নাদিয়ার মা নাদিয়ার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। বলল, আল্লাহ তাঁর এ সৈনিকদের সাহায্যের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিজয় এদের জন্যেই।

ওমর বিগোভিক এবং নাদিয়া দু'জনেই তাকাল তার দিকে। বলল, আমিন।

# ৬

দক্ষিণ বেলগ্রেডের অভিজাত এলাকায় মিলেশ বাহিনীর হেড কোয়ার্টার। হেড কোয়ার্টারের সামনে দিয়ে নিউ বেলগ্রেড সার্কুলার রোড। চারপাশ দিয়ে উচু প্রাচীর।

হেড কোয়ার্টারটি তিনতলা বিল্ডিং। তৃতীয় তলায় কনষ্টানটাইনের বাসভবন। দ্বিতীয় ও প্রথম তলায় অফিস।

আহমদ মুসা মিলেশ বাহিনীর হেড কোয়ার্টারের কাছে যখন পৌঁছল, তখন রাত ৮টা। গাড়িটা রাস্তার পাশে পার্ক করে দু'জনে এগোল মিলেশ বাহিনীর হেড কোয়ার্টারের দিকে।

হাটতে হাটতে জাকুব মিলেশ বাহিনীর হেড কোয়ার্টারের একটা নকশা তুলে ধরল।

আহমদ মুসা বলল, আমরা ঘাটিতে ঢুকব পেছন দিক থেকে তার আগে চল আমরা সামনেটা একবার দেখে ওদিক দিয়ে পেছনে যাব।

সামনে রাস্তা ধরে বাড়ির সীমায় পা দিতেই দেখল, হেড লাইটের আলোতে রাস্তা আলোকিত করে দু'টি গাড়ি ছুটে আসছে। আহমদ মুসা ও জাকুব চট করে রাস্তার বাম পাশে নেমে প্রাচীরের আড়ালে চলে গেল। আরেকটু দেরি হলেই তারা হেড লাইটের আলোর মুখে পড়ে যেত।

যে প্রাচীরের আড়ালে তারা দাঁড়িয়েছিল সেটাই মিলেশ বাহিনীর হেড কোয়ার্টারের বহির্দেয়াল।

'চল সামনে গিয়ে কাজ নেই, পেছন দিক দিয়ে আমরা ঘাঁটিতে ঢুকব বেড়িয়ে সময় নষ্ট আমরা করতে চাই না।' বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসারা আর রাস্তায় ফিরে না এসে প্রাচীরের পাশ ঘেঁষে পূর্ব দিকে এগিয়ে চলল।

পূর্বদিকের প্রাচীরের গোড়ায় দিয়ে দাঁড়াল তারা। তারা পূর্বদিকে যেখানে দাঁড়াল, সেখানে প্রাচীর পেরুলেই গ্যারেজ। গ্যারেজের পশ্চিম পাশে ড্রাইভার, মালি, রাধুনেদের মত নিম্নকর্মচারীদের কোয়ার্টার। গ্যারেজ ও সার্ভেন্টস কোয়ার্টারের সামনে দক্ষিণ দিকে টেনিস লন।

জাকুব বলল, এদিকে কোন পাহারা থাকে না। ওদের এ প্রত্যয় খুব দৃঢ যে, ওদের ঘাটিতে হামলা চালাবার সাহস কারো নেই। ওদের ধারণা, আহমদ মুসা এসেছে হাসান সেনজিককে সাহায্য করতে, তার বেশি কিছু নয়।

'শত্রুর বেশী আত্মপ্রত্যয়টা আল্লাহর তরফ থেকে আমাদের জন্যে একটা সাহায্য।' বলে আহমদ মুসা কাঁধের ব্যাগ থেকে একটা নাইকর্ড বের করল। তার মাথায় একটা ভারি হুক। আহমদ মুসা হুকটা ছুড়ে মারল প্রাচীরের মাথায়। আটকে গেল হুক। প্রায় দশফিটের মত উঁচু দেয়াল।

প্রাচীর টপকালো আহমদ মুসা প্রথম, তার পরে জাকুব। প্রাচীরের ওপারে গ্যারেজের পাশেই গিয়ে ওরা নামল।

লম্বা গ্যারেজ। আট দশটি গাড়ি রাখা যায়। গ্যারেজে একটি মাইক্রোবাস এবং দু'টি জীপ দেখা যাচ্ছে।

গ্যারেজের পরেই কর্মচারীদের কোয়ার্টার।

গ্যারেজের সামনে উজ্জ্বল আলো। সে আলোতে গ্যারেজের সামনেটা আলোকিত। কিন্তু কর্মচারীদের কোয়ার্টারের সামনে কোন আলো নেই।

জানালা দিয়ে আলো এসে বাইরে কিছু আলো আঁধারীর সৃষ্টি করেছে।

আহমদ মুসা আলোর হাত থেকে বাঁচার জন্যে গ্যারেজের ভেতর দিয়ে পশ্চিম দিকে এগুলো। গ্যারেজের পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছতেই একটা চিৎকার ও কান্নার শব্দ পেল। আহমদ মুসা দ্রুত গ্যারেজ পেরিয়ে কর্মচারীদের কোয়ার্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

পাশেই একটা কর্মচারীর কোয়ার্টার। পশ্চিম দিকে পর পর এ ধরনের আট দশটি কোয়ার্টার।

পাশের কোয়ার্টার থেকেই চিৎকার ও কান্নার শব্দ আসছে। সামনের জায়গাটা অন্ধকার।

আহমদ মুসা কোয়ার্টারের দিকে এগুতেই দেখল, অন্ধকারের মধ্যে একজন লোক মুখ ঢেকে বসে আছে। আহমদ মুসাকে দেখেই সে উঠে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা বলল, ভেতর কি হচ্ছে, কাঁদছে কে?

লোকটি কেঁদে ফেলল। বলল, আমি গরীব ছোট কর্মচারী, আমার স্ত্রীকে বলপূর্বক...... লোকটি কথা শেষ করতে পারলোনা গলায় যেন আটক গেল কথা।

কিন্তু আহমদ মুসার বুঝতে কষ্ট হলো না। তার গোটা গা জ্বলে উঠল ক্রোধে।

'তুমি সরো আমি দেখছি।' বলে লোকটিকে একপাশে ঠেলা দিয়ে আহমদ মুসা সামনে এগুলো।

লোকটি দু'হাত বাড়িয়ে আবার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, ওরা তোমাকেও খুন করবে, আমাকেও করবে। যেও না।

আহমদ মুসা ওকে পাশে ঠেলে দিয়ে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

দরজা বন্ধ। আহমদ মুসা দরজায় ধাক্কা দিল।

দু'তিনবার ধাক্কা দেয়ার পর ভেতর থেকে একটা পুরুষ কণ্ঠ বলল, বিরক্ত করিস না ডিউক। খুন করে ফেলব আর একবার ধাক্কা দিলে।

আহমদ মুসার আর সহ্য হলো না। প্রচন্ড এক লাথি মারল দরজায়। ছিটকিনি ভেঙে খুলে গেল দরজা।

আহমদ মুসা দেখল, একটা নগ্নপ্রায় তরুনীকে একজন বিশাল বপু লোক টেনে এনে বিছানায় তুলছে। দরজা ভাঙার শব্দে বিশাল বপু লোকটি তরুনীটিকে ছেড়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলও হাতে তুলে নিয়েছে। লোকটি রাগে-উত্তেজনায় কাঁপছে তার চোখ দু'টি লাল টকটকে।

আহমদ মুসা ভাবল, এ অর্ধমাতাল গুলি করতে এক মুহূর্তও দেরি করবে না।

সুতরাং তার পিস্তলের নলটি উঠে আসার আগেই আহমদ মুসা তার উপর ঝাপিয়ে পড়ে পিস্তল সমেত তার হাতটি ধরে ফেলল। তার পিস্তলের নলটি বেঁকে গেল। লোকটি ট্রিগার চেপেছিল। পিস্তল থেকে গুলি বেরুল, কিন্তু সে গুলি গিয়ে বিদ্ধ করল লোকটিকেই। তার তলপেটে গুলি লাগল। পিস্তলের নলটি লোকটির

তলপেট স্পর্শ করেছিল। শব্দ বেশি হলনা। বিধ্বস্ত তলপেট চেপে ধরে লোকটি ঢলে পড়ে গেল। যে লোকটি বাইরে বসে মুখ ঢেকে কাঁদছিল, সে এবার ভেতরে ঢুকে ডুকরে কেঁদে উঠল। তরুণীটিও উঠে দাঁড়িয়ে কাপড় ঠিক করে নিয়েছিল। সেও কাঁপছিল।

লোকটি ডুকরে কেঁদে উঠে বলছিল, আমি এখন কি করব! আমাদের দু'জনকেই এরা জীবন্ত পুতে ফেলবে।

'কিন্তু তোমার তো কোন দোষ নেই।' বলল আহমদ মুসা।

'তবু দোষ আমারই, আমার স্ত্রীর ঘরে এসেছিলে এবং এখানেই সে মারা গেছে।' বলল লোকটি।

'আরেকজনের স্ত্রীর উপর চড়াও হয়ে সেই তো অপরাধ করেছে এবং তার মৃত্যুর জন্যে তো সেই দায়ী।' বলল আহমদ মুসা।

লোকটি চোখ মুছতে মুছতে বলল, আমাদের মত গরীবদের স্ত্রীর উপর চড়াও হওয়া তাদের অপরাধ নয় তারা এটা বরাবরই করে আসছে। আমি নতুন দু'দিন হলো চাকুরতে ঢুকেছি তাই আমি এবং আমার স্ত্রী কেউই এটা মেনে নিতে পারিনি। সবার মত আমরাও হয়তো ধীরে ধীরে মেনে নিতাম।

আহমদ মুসা লোকটির মুখের দিখে তাকিয়ে স্তম্ভিতভাবে কিছুক্ষণ বসে রইল। তারপর বলল, সবাই এ অবস্থা মেনে নিয়েছে কেন?

'আমরা গরিব, চাকুরী আমাদের দরকার, আমরা টাকা চাই।' বলল লোকটি।

এই সময় জাকুব বলল, এরা যুগোশ্লাভিয়া, অষ্ট্রিয়া ও ইটালীর সীমান্ত সন্নিহিত পাহাড়ী অঞ্চলের লোক। দরিদ্র, চাকুরীর সন্ধানে এরা এদিকে আসে।

আহমদ মুসা একটু ভাবল, তাপর পকেট থেকে ডলারের একটা বড় বান্ডিল বের করে তার হাতে তুলে দিয়ে বলল, কাল এখান থেকে সকালেই চলে যাবে।

ডলারের বান্ডিল দেখে লোকটি চোখ খুশীতে চক চক করে উঠল। কিন্তু তার পরেই তার মুখে নেমে এল বিষন্নতা। বলল, কাল সকাল পর্যন্ত আমরা বেঁচে থাকব না। আর যেখানেই আমরা পালাই ওরা ধরে আনবে।

'তুমি নিশ্চিন্ত থাক, সে সুযোগ আর ওরা পাবে না। ওদের দিন শেষ হয়ে আসছে।' বলে একটু থেমে আহমদ মুসা আবার বলল, 'তোমরা এখনি এখান থেকে চলে যেতে পার। আমরা পেছনের দেয়াল টপকে এসেছি, তোমরাও যেতে পার।'

'আপনারা কে?' বলল লোকটি।

'আমরা মুসলমান, আমরা ওদের শত্রু।' বলল আহমদ মুসা।

লোকটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, মুসলমানরা খুব ভালো। মিথ্যা বলে না, ঠকায় না। মানুষের প্রতি খুব দয়া ওদের।

'কেমন করে তুমি জানলে।' বলল আহমদ মুসা।

'এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমি যাগারেবে ছিলাম। আমি সেখানে একটি উল-ফ্যাক্টরীতে কাজ করতাম। ফ্যাক্টরীর মালিক ছিল মুসলমান। তাঁর মত ভাল মানুষ আমি জীবনে দেখিনি। একবার একজন সেলসম্যান ভুল করে একজন খদ্দেরের কাছ থেকে রেটের বেশি দাম নিয়েছিল। তা জানার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাড়তি টাকা ফেরত পাঠিয়েছিলেন। অনেক মুসলিক কর্মচারী ছিল ফ্যাক্টরীতে। দেখেছি, তারা মিথ্যা কথা বলতোনা এজন্যে তারা ক্ষতিগ্রস্থও হতো। যেমন, টাকা থাকলে মিথ্যা কথা বলতোনা বলে ধার গ্রহণকারীদের তারা ছিল সাধারণ শিকার। কিন্তু.....' কথা শেষ না করেই থেমে গেল লোকটি। বেদনার একটা ছায়া নামল তার মুখে।

'কিন্তু বলে থেকে গেলে কেন?' বলল আহমদ মুসা।

লোকটি বলল, সে এক দুঃখের কথা। একদিন সন্ধ্যায় এই মিলেশ বাহিনীর লোকেরা কারখানায় গিয়ে চড়াও হয়। তারা মালিক এবং কর্মচারীদের হত্যা করে এবং ফ্যাক্টরী লুট করে। খৃষ্টান কর্মচারীরা রক্ষা পায়, কিন্তু আমরা চাকুরী হারাই।

'তাদের হত্যা করে কেন?' জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

'শুধু তো ওদের নয়, আরও মুসলমানদের ওরা হত্যা করেছে। মিলেশ বাহিনী মুসলিম বিদ্বেষী।' বলল লোকটি।

একটু থেমেই লোকটি আবার বলল, ‘আজ ওরা দু’জন মুসলমানকে ধরে এনেছে।’

‘ধরে এসেন আমরা জানি। আমরা তাদের লোক। কোথায় তাদের রেখেছে?’ বলল আহমদ মুসা।

‘নিচের তলার একটি ঘরে। ঘরটি আসলে ছিল ষ্টোর রুম। জানালা নেই। ডবল দরজা। দরজার পরে গ্রীল করা আরেকটা দরজা। ওখানেই ওদরে দু’জনকে রেখেছে।’ বলল লোকটি।

আহমদ মুসা মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ওদের যে কোন ক্ষতি হয়নি এজন্যে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল। বলল, ঘাঁটিতে কতজন লোক আছে?

‘এখন লোক তেমন নেই। ওদেরকে ধরে এনে রেখেই দু’টো গাড়ি নিয়ে প্রায় সবাই ওরা বেরিয়ে গেছে। এখন গেটে একজন আছে, আর দু’জন আছে অফিসে। আরেকজন তো মারা গেল এখানে।’ বলল লোকটি।

‘সে ঘরটি কোনদিকে যেখানে ওদের রেখেছে?’ জিজ্ঞাসা কলল আহমদ মুসা।

লোকটি বলল, নিচ তলার উত্তর দিকের শেষ ঘর।

আহমদ মুসা লোকটিকে শুকরিয়া জানিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।  বেরিয়ে এল দরজা দিয়ে। তার পেছনে জাকুব।

আহমদ মুসা বের হয়েই একদম মুখোমুখি হয়ে পড়ল একজন লোকের। লোকটি লম্বা, পেশী বহুল এবং কুতকুতে খুনী চেহারা।

আহমদ মুসা তাকে দেখেই বুঝল, সে ঐ দুজনেরই একজন হবে। গুলির শব্দ শুনে খোঁজ নিতে এসেছে।

লোকটি পিস্তল হাতে গুটি গুটি এগিয়ে আসছিল। হঠাৎ আহমদ মুসার সামনে পড়ে লোকটিও হকচকিয়ে উঠল। সামলে উঠেই লোকটি পিস্তল তুলতে গেল।

আহমদ মুসা শুয়ে পড়ে জোড়া পায়ে তার হাত লক্ষ্যে একটা লাথি মারল। কিন্তু লাথিটা হাতে না লেগে আঘাত করল তলপেটে। আঘাতটা যুতসই

হলো না। ভারসাম্য বজায় রাখতে না পেরে লোকটি পড়ে গেল। কিন্তু পড়ে গিয়েই পিস্তল তুলল সে।

আহমদ মুসা তাকে গুলি করার সুযোগ দিল না। সে একটু সময় চেয়েছিল, পেয়ে গেল। মাটিতে শুয়ে পড়েই আহমদ মুসা রিভলভার বের করে নিয়েছিল পকেট থেকে। শুয়ে থেকেই সে গুলি করেছিল।

সুতরাং লোকটি পিস্তল তুলে ট্রিগার টেপার আগেই আহমদ মুসার রিভলভারের গুলি এসে তার বুক এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল।

জাকুব ও হাতে পিস্তল তুলে নিয়েছিল।কিন্তু গুলি করার আর প্রয়োজন হলো না।

আহমদ মুসা রিভলভার আর পকেটে না পুরে হাতে নিয়েই সামনে এগুলো। তার পেছনে জাকুব।

কর্মচারীদের কোয়ার্টার গুলোর সামনে জমে ওঠা অন্ধকারের পথ ধরে আহমদ মুসা সোজা ওদের অফিস বিল্ডিং এর গোড়ায় গিয়ে দাঁড়াল। তারপর বিল্ডিং এর দেয়াল ঘেসে এগুলো দক্ষিণ দিকে। দক্ষিণ পাশ ঘুরে করিডোরে ওঠার জন্যে।

বিল্ডিং এর দক্ষিণ প্রান্তে গিয়ে পশ্চিম দিকে ঘুরার জন্যে ধীরে ধীরে মুখ বাড়াতেই দেখল ষ্টেনগান বাগিয়ে একজন গুটি গুটি এগিয়ে আসছে।

আহমদ মুসা বিদ্যুৎ বেগে মুখটা সরিয়ে নিল দেয়ালের আড়ালে। আর সঙ্গে সঙ্গেই এক পশলা গুলি ছুটে এল। মুখ সরিয়ে নিতে এক মুহুর্ত বিলম্ব হলেই গুড়িয়ে যেত মাথা।

আহমদ মুসা বিল্ডিং এর গা ঘেষে শুয়ে পড়ল।

অবিরাম গুলি আসছিল ষ্টেনগান থেকে। বুঝা যাচ্ছে, গুলি করতে করতেই লোকটি ইঞ্চি ইঞ্চি করে সামনে এগুচ্ছে।

আহমদ মুসা ষ্টেনগানের গুলির গতি বিচার করে দেখল, গুলি মাটি থেকে দুই ফুট উপর দিয়ে আসছে। অর্থাৎ লোকটি দাঁড়িয়ে একটু সামনে ঝুকে গুলি করতে করতে সামনে এগুচ্ছে।

আহমদ মুসা গুলির লেভেল ও মাটির মধ্যেকার দুই ফুট খালি গলি পথের সুযোগ নিতে চাইল।

আহমদ মুসা বাম হাতে রিভলভার ধরে তার নলটা ষ্টেনগানের শব্দ লক্ষ্যে স্থির করে মুখটা বিদ্যুৎ বেগে দেয়ালের বাইরে বের করেই নিশ্চিন্ত হয়ে তর্জনিটা চাপল ট্রিগারের উপর।

লোকটি দেখতে পেয়েছিল আহমদ মুসাকে। কিন্তু ষ্টেনগানের ব্যারেল নিচে নামার আগেই বুকে গুলিবিদ্ধ হলো সে। প্রবল ঝাকুনি দিয়ে উঠল তার শরীর। শিথিল হাত থেকে ষ্টেনগান ঝরে পড়ল। তার পাশেই মুখ থুবড়ে পড়ল লোকটি।

আহমদ মুসা জাকুবকে ষ্টেনগান কুড়িয়ে নিতে বলে ছুটল করিডোরের দিকে।

করিডোরে কেউ নেই।

গেটের লোকটি ষ্টেনগান হাতে উদ্বিগ্ন চোখে এদিকে তাকাচ্ছে।

জাকুব এসে আহমদ মুসার পাশে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা বলল, জাকুব তুমি ষ্টেনগান নিয়ে গেটের রক্ষীকে পাহারা দাও। সে যেন পালাতে না পারে, আবার এদিকেও আসতে না পারে।

বলে আহমদ মুসা করিডোর ধরে ছুটল বন্দীখানার দিকে।

ঠিক সর্ব উত্তরের ঘরটাই বন্দীখানা। ডবল দরজা। আহমদ মুসা পকেট থেকে ল্যাসার পিস্তল বের করল। মিনিট খানেকের মধ্যেই ল্যাসার বিম দিয়ে দুই দরজারই তালা উড়িয়ে দিল। ভেতরে ঢুকল বন্দীখানার।

মাজুভ ও সালেহ বাহমন দু'জনারই হাত-পা বাঁধা। ওরা উঠে বসেছে। ওদের চোখে আনন্দের ঝিলিক।

আহমদ মুসা ওদেরকে সালাম দিল।

পকেট থেকে চাকু বের করে দ্রুত হাত-পা'র বাঁধন খুলে দিল ওদের।

আহমদ মুসা যখন সালেহ বাহমনের বাঁধন খুলছিল, সে বলল, আমরা যাকে উদ্ধার করতে এলাম তিনিই দেখি আমাদের উদ্ধার করছেন!

'আল্লাহ এটা পারেন না মনে কর?' হেসে বলল আহমদ মুসা।

‘তা মনে করব কেন, বন্দীখানায় এসে যখন দেখলাম আপনি নেই, তখন থেকে এই মুহূর্তেরই অপেক্ষা করছি।’ বলল সালেহ্ বাহমন।

আহমদ মুসা সালেহ্ বাহমনের পিঠ চাপড়ে বলল, এমন ক্ষেত্রে কারো অপেক্ষা করে বসে থাকা ঠিক নয়, যতটুকুই পারা যায় নিজে এগুনোর চেষ্টা করা দরকার।

আহমদ মুসা ওদেরকে নিয়ে বন্দীখানা থেকে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে আসতে আসতে মাজুভ বলল, মুসা ভাই কনষ্টানটাইনরা শহীদ মসজিদ রোড়ে গেছে হাসান সেনজিকের মাকে ধরে আনার জন্যে।

শুনেই আহমদ মুসা থমকে দাঁড়াল। ভ্রুকুচকে বলল, কি বলছ, ওরা শহীদ মসজিদ রোড়ে গেছে? হাসান সেনজিকের মাকে ধরে আনার জন্যে? বলেই আহমদ মুসা আবার হাটতে শুরু করল।

করিডোরে পৌঁছে আহমদ মুসা মাজুভ ও সালেহ্ বাহমনকে বলল, গাড়ি বারান্দায় জাকুব আছে, ওখানে তোমরা যাও। আমি এদিক দিয়ে গেটম্যানের পেছনে পৌঁছব।

বলে আহমদ মুসা করিডোর থেকে লনে নেমে পড়ল। লনটি উজ্জ্বল আলোতে ভাসছে। কিন্তু সারিবদ্ধ ফুলের গাছ লনে কিছুটা আড়াল ও আলো-ছায়ার সৃষ্টি করেছে।

আহমদ মুসা প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে উত্তর প্রাচীরের পাশ ঘেষে পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলল। কিছু পর প্রাচীরের সাথে দক্ষিণ দিকে মোড় নিল আহমদ মুসা।

গেটরক্ষী গেট থেকে কয়েকগজ সামনে দাঁড়িয়ে তার ষ্টেনগানকে গাড়ি বারান্দায় দাঁড়ানো জাকুবের দিকে তাক করে আছে। জাকুবের পাশে তখন মাজুভ ও সালেহ্ বাহমনও এসে দাঁড়িয়েছে।

আর কয়েকগজ গেলেই আহমদ মুসা গেটরুমের আড়ালে যেতে পারে। এমন সময় তিন তলার বারান্দা থেকে একটা মেয়ে চিৎকার করে উঠল, জেরিনস্কি! ঠিক তোমার পেছনে।

ঐ চিৎকারের সাথে সাথে তিনতলা থেকে গুলির আওয়াজ হলো।

জেরিনস্কি গেটরক্ষীর নাম।

আহমদ মুসা চিৎকার শুনেই বুঝতে পারল, কি ঘটতে যাচ্ছে। গেটরক্ষী পেছন ফিরলেই তাকে দেখতে পাবে।

মেয়েটি চিৎকার করে উঠার সঙ্গে সঙ্গেই আহমদ মুসা দৌড় দিল গেটরুমের আড়ালে যাবার জন্যে।

মেয়েটির চিৎকারে গেটরক্ষী চমকে উঠে যখন পেছনে ফিরল তখন আহমদ মুসার ছায়াটাই শুধু তার নজরে এল। সুতরাং তার ষ্টেনগানের গুলির ঝাঁক বৃথাই গেল।

গেটরক্ষী যখন পেছন ফিরে গুলি করছিল, তখন সেই সুযোগে জাকুব ষ্টেনগানের গুলি করতে করতে গেটের দিকে ছুটে এল।

গেটরক্ষী পুনরায় ফিরে দাঁড়িয়ে তার ষ্টেনগান তুলে ধরার আগেই সে জাকুবের গুলির মুখে পড়ে গেল। ঝাঁঝরা হয়ে গেল গেটরক্ষীর দেহ।

জাকুব লনের মাঝখানে দাড়িয়ে তিনতলার যেখান থেকে মেয়েটি চিৎকার করেছিল, গুলি এসেছিল সেদিকে তাকাল। তারপর ষ্টেনগান তুলে এক পশলা গুলি বৃষ্টি করল সেদিকে।

আড়াল থেকে আহমদ মুসা বেরিয়ে এসে বলল, থাক জাকুব, মেয়েদের উপর প্রতিশোধ নেবার দরকার নেই। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর আল্লাহ আমাদের যে সফলতা দিলেন তার জন্যে।

সবাই এসে গেটের সামনে আহমদ মুসার কাছে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা বলল, চল আর এক মুহুর্ত সময় নষ্ট করা যাবে না।

ঘড়ির দিকে নজর বুলিয়ে আহমদ মুসা আবার কথা শুরু করল। পনের মিনিট হলো ওরা এখান থেকে ষ্টার্ট করেছে। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওরা হাসান সেনজিকের বাড়িতে পৌঁছবে। ওদেরকে আমরা ওখানেই ধরব।

সবাই বেরিয়ে এল গেট দিয়ে। হাটতে শুরু করল তারা রাস্তার পাশে রেখে আসা গাড়ির লক্ষ্যে।

হাটতে হাটতে সালেহ বাহমন বলল, মুসা ভাই মিলেশ বাহিনী যদি হাসান সেনজিকের মাকে ধরে আনতে যায়, তাহলে তাকে সরিয়ে আনার একটা জরুরী ব্যবস্থা করে রেখেছি। সেটা হলো, হাসান সেনজিকের মা'র ঘর এবং পুব

পাশের একটি দোকানের সাথে সুড়ঙ্গ সংযোগ আছে। ঐ সুড়ঙ্গ পথে প্রথমে তাকে দোকানে আনা হবে তারপর তাকে ডেসপিনার বাড়ীতে সরিয়ে নেয়া হবে। প্রথম কাজটা সহজ, দ্বিতীয় কাজটা সহজ নয়। তবু একটা ব্যবস্থা আমরা করে রেখেছি।

আহমদ মুসা থমকে দাঁড়াল। তারপর সালেহ বাহমনের পিঠ চাপড়ে বলল, আমাকে অনেকটা নিশ্চিন্ত করলে সালেহ বাহমন।

একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর আবার বলল, তাহলে আমরা শহীদ মসজিদ রোড়ের পূর্ব প্রান্ত দিয়ে প্রবেশ করব।

চারজন গিয়ে গাড়িতে উঠল। ড্রাইভিং সিটে বসল আহমদ মুসা। ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে গাড়িতে ষ্টার্ট দিল আহমদ মুসা।

সালেহ বাহমন এই সময় প্রশ্ন করে বসল, মুসা ভাই আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি?

'অবশ্যই পার।' বলল আহমদ মুসা।

'মুসা ভাই, কয়েকটি বিপ্লবে আপনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। অনেক অভিযান আপনি পরিচালনা করেছেন। আজ এক অভিযানের এই মুহুর্তে আপনি অতীতের কোন ঘটনাকে সবচেয়ে বেশি স্মরণ করছেন?'

আহমদ মুসার হাত ছিল ষ্টিয়ারিং হুইলে। তার দৃষ্টি ছিল সামনে প্রসারিত। সালেহ বাহমনের প্রশ্ন শোনার পর তার মুখে নেমে এল গাম্ভীর্য। গাম্ভীর্য রুপান্তরিত হলো ধীরে ধীরে গভীর বেদনায়। বেদনার এক কালো আস্তরণে যেন ঢেকে গেল তার মুখ।

আহমদ মুসা বলল, আমি অতীতের দিকে ফিরে তাকাই না। সেখানে আনন্দের চেয়ে বেদনাই আমাকে পীড়িত করে বেশি বাহমন।

-কিন্তু আমরা তো দেখি ভিন্ন চিত্র। আপনি কোটি কোটি মানুষকে জুলুম থেকে মুক্তি দিয়েছেন, তাদের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন। বলল সালেহ বাহমন।

-দেহের বেদনা-পীড়িত জায়গার কথাই মনে থাকে বেশী, সেখানেই বার বার হাত যায়। বলল আহমদ মুসা।

-দেহের জন্যে একথা সত্য, জাতির জন্যে একথা কি সত্য? এখানে বিজয়কে, বিজয়ের প্রাপ্তিকেই তো বড় করে দেখা হয়। বলল সালেহ বাহমন।

তোমার একথাটা জাতির জন্যে সত্য, ব্যক্তির জন্যে নয়। বিজয়ের প্রাপ্তি এক ব্যক্তিকে গৌরবান্বিত করে, কিন্তু সে যখন বিজয়-পথের দিকে দৃষ্টি ফেরায় তখন পথের অনেক কষ্ট, হারানোর অনেক বেদনা তাকে আকুল করে। বিজয়ের প্রাপ্তির চেয়ে এই বেদনা একজন ব্যক্তির মনে বেশি দাগ কাটে, কারণ বিজয়ের প্রাপ্তিটা প্রকাশ্য, অন্য সকলের সাথে এর যোগ আছে। কিন্তু ঐ বেদনা হয় নিজস্ব, হৃদয়ের গভীরে থাকে লুকানো, যা অলক্ষে মানুষকে পোড়ায় বেশী। বলল আহমদ মুসা।

-ঠিক বলেছেন মুসা ভাই। এমন বেদনার দু'একটি ঘটনা আপনার মুখে শুনতে চাই যা আপনি ভুলতে পারেন না।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, এ ধরণের গল্প বলে মানুষ কর্মহীন সন্ধ্যায় সোফায় গা এলিয়ে, অথবা নিরব রাতের নিঝুম প্রহরে কম্বলের ভেতর ঢুকে।

এবার মাজুভ কথা বলল। বলল সে, ঠিক আছে সালেহ বাহমন তোমার প্রস্তাব তোলা রইল। অমন সন্ধ্যারই আমরা অপেক্ষা করব।

আহমদ মুসা মিষ্টি হাসল।

তারপর সবাই নিরব।

তীর বেগে তখন এগিয়ে চলছিল গাড়ি শহীদ মসজিদ রোড়ের দিকে।

আহমদ মুসা যখন শহীদ মসজিদ রোডে পৌছল, তখন রাত আটটা পার হয়ে গেছে। রাস্তায় লোক চলাচল কমে গেছে।

আহমদ মুসার গাড়ি শহীদ মসজিদ রোডে ঢুকে বাম পাশের ফুটপাত ঘেষে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে পশ্চিম দিকে। হাসান সেনজিকের বাড়ির পুব পাশে তাদের দোকানের যে সারি, তা দেখা গেল। সব দোকানেই আলো জ্বলছে একমাত্র সর্ব পশ্চিমের একটি দোকান ছাড়া। সালেহ বাহমন ফিস ফিস করে বলে উঠল, মুসা ভাই হাসান সেনজিক ভাইয়ের মাকে বাড়ি থেকে সরিয়ে আনা হয়েছে। সর্ব পশ্চিমের দোকান বন্ধ হয়ে যাওয়াই তার প্রমাণ। কথা আছে, চূড়ান্ত বিপদ মুহূর্ত যখন আসবে, যখন হাসান সেনজিকের মাকে সরিয়ে আনার প্রয়োজন হবে, তখন তার আগেই দোকানটি বন্ধ করে দিতে হবে। আমার মনে হয় কথা মোতাবেক কাজ হয়েছে।

‘ধন্যবাদ সালেহ বাহমন, তোমাদের পরিকল্পনা সত্যিই প্রশংসনীয়। তুমি কি মনে কর, হাসান সেনজিকের মাকে বাড়ি থেকে দোকানে সরিয়ে আনার পর এখান থেকে স্থানান্তর করার যে কথা তা হয়েছে?’ বলল আহমদ মুসা।

‘না মুসা ভাই, সুড়ঙ্গ দিয়ে দোকানে সরিয়ে আনা হয়েছে, কিন্তু সেখান থেকে স্থানান্তর সম্ভব হয়নি, তার প্রমাণ দোকানের বাইরের আলো। কথা ছিল, দোকান থেকে তাকে যখন স্থানান্তর করা হবে, তখন ঐ আলোও নিভে যাবে। সম্ভবত স্থানান্তর নিরাপদ মনে করা হয়নি।’ বলল সালেহ বাহমন।

‘সুড়ঙ্গের মুখটা বাড়ির কোথায়?’ জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

‘হাসান সেনজিকের মা’র ঘরের একটা বড় কাঠের আলমারী থেকে সুড়ঙ্গের শুরু।’ বলল সালেহ বাহমন।

‘তাহলে তো সুড়ঙ্গের মুখ খুঁজে পাওয়া ওদের পক্ষে কঠিন হবে না। হাসান সেনজিকের মাকে না পেলে ওরা পাগল হয়ে উঠবে, আলমারীটা তারা না দেখে ছাড়বে না।’ বলল আহমদ মুসা।

‘হ্যাঁ ঠিক তাই, মুসা ভাই। বেশীক্ষণ ওকে ওখানে রাখা যাবে না।’ বলল সালেহ বাহমন।

গাড়ি তখন প্রায় দোকানগুলোর বরাবর পৌছে গেছে। আহমদ মুসা গাড়ি দাঁড় করাল।

গাড়ি দাঁড়ানোর পর সালেহ বাহমন বলল, দেখুন মুসা ভাই, ফুটপাতে তিনজন লোক বসে আছে। ওরা নিশ্চয় মিলেশ বাহিনীর লোক। ওরা এদিকটা পাহারা দিচ্ছে, যাতে এদিক দিয়ে বাড়ি থেকে কেউ বেরিয়ে আসতে না পারে।

আহমদ মুসা তাকিয়ে দেখল, ঠিক ফুটপাতের আধো আলো-অন্ধকারে বেশ দূরে দূরে তিনজন ফুটপাতের উপর বসে আছে। ওদের চোখ দোকান এবং বাড়ির দিকে।

আহমদ মুসা বলল, সালেহ বাহমন তুমি গাড়ি পূর্ব প্রান্তের দোকানটির কোণায় নিয়ে দাঁড় করাও। আমরা তিনজন এখানে নেমে যাচ্ছি ওদের তিনজনকে দেখার জন্যে।

আহমদ মুসা, মাজুভ ও জাকুভ গাড়ী থেকে নেমে এল। মজুভ ও জাকুভকে সে বলল, গুলি-গোলা এই মুহূর্তে আমরা করতে চাই না। সুতরাং ওদের কোন সময় না দিয়ে রিভলভার দেখিয়ে ওদের আত্মসমর্পনে বাধ্য করাতে হবে।

বলে আহমদ মুসা হাটতে লাগল তিন জনের মধ্যে সর্ব পশ্চিমের লোকটির উদ্দেশ্যে। মাজুভ ও জাকুভও তাদের লক্ষ্যে হাটতে শুরু করল।

রাস্তা পারাপার সব সময়ই হয়ে থাকে। সাধারণ পথচারীর মতই আহমদ মুসা, মাজুভ ও জাকুভ রাস্তা পার হয়ে ওপারে চলল।

আহমদ মুসা যখন পশ্চিম প্রান্তের সেই লোকটির চারগজের মধ্যে গিয়ে পৌঁছেছে তখনও লোকটি ওদিক থেকে চোখ ফিরায়নি। অবশেষে আহমদ মুসার পায়ের শব্দে সে যখন চমকে উঠে চোখ ফিরাল, তখন আহমদ মুসার রিভলভার একগজের মধ্যে তারবুক লক্ষ্যে স্থির।

আহমদ মুসা তাকে বলল, একটা কথা বললে শেষ করে দিব। উঠে দাঁড়িয়ে ফুটপাত দিয়ে পুবদিকে চল।

লোকটি একবার ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ফুটপাত দিয়ে হাটতে শুরু করল।

আহমদ মুসা তাকিয়ে দেখল, মাজুভ এবং জাকুবও তাদের শিকারকে পোষ মানিয়ে নিয়ে চলেছে।

আহমদ মুসা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল।

ওদের তিন জনকেই দোকানের আড়ালে নিয়ে গেল।

সালেহ বাহমনও গাড়িটি নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড় করিয়ে সেখানে গিয়ে হাজির হলো। সে গিয়ে দোকান থেকে দড়ি নিয়ে এল।

সালেহ বাহমনের সাথে আরও দু'জন এল। সালেহ বাহমন তাদেরকে আহমদ মুসার সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। ওদের একজন বলল, কনষ্টানটাইন ওদের দলবল নিয়ে পাঁচ মিনিট আগে বাড়িতে প্রবেশ করেছে।

আহমদ মুসা দ্রুত ওদেরকে বলল, তোমরা এদের হাত, পা ও মুখ বেধে ফেল। আর সালেহ বাহমন তুমি আমার সাথে এস।

বলে আহমদ মুসা দ্রুত চলল সেই দোকানের দিকে যেখানে হাসান সেনজিকের মাকে এনে রাখা হয়েছে।

দোকানের পেছনের ঘরে একটা খাটে বিছানা পাতা। হাসান সেনজিকের মা সেখানে শুয়ে আছে। তার পাশে বসে আছে হাসান সেনজিকের ফুফু। ঘরের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন পরিচারিকা। হাসান সেনজিকের মা চোখ বন্ধ করে শুয়ে ছিল।

একটা কাঁসি দিয়ে ঘরে প্রথমে প্রবেশ করল সালেহ বাহমন। তার পেছনে পেছনে আহমদ মুসা।

তাদের পায়ের শব্দে চোখ খুলল হাসান সেনজিকের মা।

সালেহ বাহমন আহমদ মুসার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, খালাম্মা ইনি আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা হাসান সেনজিকের মাকে সালাম দিল।

আহমদ মুসার নাম শোনার সাথে সাথে হাসান সেনজিকের মা'র চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। একটু হাত তুলে বলল, দীর্ঘজীবী হও বাবা। তুমি এসেছ, আমার হাসান সেনজিক কোথায়?

'হাসান সেনজিক নিরাপদে আছে খালাম্মা। আপনি এখান থেকে গেলেই দেখতে পাবেন।' বলল আহমদ মুসা।

এই সময় হাসান সেনজিকের বাড়ির দিক থেকে শব্দ ভেসে আসতে লাগল। মনে হচ্ছে, কেউ যেন ভারী কিছু দিয়ে বন্ধ দরজার উপর আঘাত করে চলেছে।

আহমদ মুসা উৎকর্ণ হলো।

এই সময় হাসান সেনজিকের ফুফু বলল, আমরা ভাবীর ঘরের দরজা বন্ধ করে এসেছি। সেটাই ভাঙ্গার ওরা চেষ্টা করছে।

আহমদ মুসা সালেহ বাহমনের দিকে চেয়ে বলল, আর দেরি করা যাবে না।

বলে হাসান সেনজিকের মার দিকে চেয়ে বলল, খালাম্মা আপনাকে এবার উঠতে হবে।

হাসান সেনজিকের ফুফু উঠে দাঁড়াল। সে দুই পরিচারিকার দিকে চেয়ে বলল, এস তোমরা। বলে সে তার ভাবীর দিকে এগুলো।

আহমদ মুসা ও সালেহ বাহমন বাইরে বেরিয়ে এল।

দুই পরিচারিকা এবং হাসান সেনজিকের ফুফু হাসান সেনজিকের অসুস্থ মাকে ধরাধরি করে গাড়ির দিকে নিয়ে চলল।

আহমদ মুসার নির্দেশে সালেহ বাহমন গাড়ির ড্রাইভিং সিটে গিয়ে বসেছে। মাজুভ তার পাশের সিটে। জাকুব ও অন্যান্যরা দোকানগুলোর আশে-পাশে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে কেউ যাতে এদিকে আসতে না পারে। কিন্তু কারো নজর এদিকে আছে বলে মনে হলো না। সবারই নজর সম্ভবত বাড়ির দিকে নিবদ্ধ যেখানে কনষ্টানটাইন প্রবেশ করেছে।

আহমদ মুসা হাসান সেনজিকের মা'র সাথে সাথে গিয়ে তাদেরকে গাড়ীতে তুলে দিল। তারপর গাড়ির দরজা বন্ধ করে মাজুভ ও সালেহ বাহমনকে উদ্দেশ্য করে বলল, দোয়া করি, আল্লাহ নিরাপদে পৌঁছান। আর যদি কোন বাধা আসে তাহলে নির্মমভাবে তা দমন করে সামনে এগুবে।

সালেহ বাহমন বলল, কিন্তু মুসা ভাই আপনি?

আহমদ মুসা বলল, আমি কনষ্টানটাইনকে দেখে তবে আসব। আল্লাহ ভরসা। বলে গাড়ি ছাড়ার নির্দেশ দিল আহমদ মুসা। সালেহ বাহমন গাড়ি ষ্টার্ট দিল। গাড়ী চলতে শুরু করল।

গাড়ি চোখের আড়ালে না যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকল আহমদ মুসা ফুটপাতের উপর। তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে দোকানের কাছে চলে এল যেখানে জাকুব দাঁড়িয়ে ছিল।

দোকানগুলোকে কেন্দ্র করে হোয়াইট ক্রিসেন্টের চারজন পাহারায় ছিল। তাদেরকে আহমদ মুসা নির্দেশ দিল মিলেশ বাহিনীর কেউ যাতে দোকানের পেছন দিকে যেতে না পারে। বলে আহমদ মুসা দ্রুত জাকুবকে নিয়ে সেই সুড়ঙ্গ ঘরে এল যেখানে হাসান সেনজিকের মা ছিল।

আহমদ মুসা নিশ্চিত, কনষ্টানটাইন এই সুড়ঙ্গপথে আসবেই হাসান সেনজিকের মা'র খোঁজে।

ঘরের আলো জ্বালাই ছিল। আহমদ মুসা পার্টিসনের আড়ালে সেলস-রুমে গিয়ে দাঁড়াল। সে এমন জায়গায় বসল যেখান থেকে পার্টিসন ডোর দিয়ে সুড়ঙ্গ মুখের আলমারীটা দেখা যায়। আর জাকুব দাঁড়াল কক্ষের বাইরে দোকানের পেছন দিকটায়।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না আহমদ মুসাকে। মিনিট কয়েক পরেই সুড়ঙ্গ মুখের আলমারীর ভেতর ঠক করে শব্দ হলো। মনে হল কাঠের সাথে ধাতব কোন জিনিস বাড়ি খেল। ষ্টেনগানের নল কি? ভাবল আহমদ মুসা।

আরও কয়েক মুহূর্ত পরে, আহমদ মুসা দেখল, ধীরে ধীরে নিশব্দে আলমারীটির দরজা খুলে গেল। সেই খোলা পথে বেরিয়ে এল ষ্টেনগানের কাল কুচকুচে নল। পরে ষ্টেনগান ধরা হাত। তারপর পূর্ণ একটা মানুষ বেরিয়ে এল। আহমদ মুসা তাকে দেখেই চিনল, ‘কনষ্টানটাইন’ মিলেশ বাহিনীর প্রধান।

কনষ্টানটাইনকে দেখে আহমদ মুসার প্রতিটি স্নায়ুতন্ত্রীতে তীব্র একটা জ্বালা ছড়িয়ে পড়ল। এই সেই কনষ্টানটাইন যার হাত হাজারো মুসলমানের রক্তে রঞ্জিত, যার রাত-দিনের স্বপ্ন হলো বলকান এবং ইউরোপের মুসলমানদের নির্মূল করে সম্রাট শার্লেম্যানের খৃষ্টরাজ্য আবার প্রতিষ্ঠা করা।

কনষ্টানটাইন তার ষ্টেনগান বাগিয়ে বিড়ালের মত নিশব্দে নেমে এল আলমারী থেকে।

তার পেছনে পেছনে নেমে এল আরেকজন। তারও হাতে ষ্টেনগান।

কনষ্টানটাইন আলমারী থেকে নেমে মেঝের উপর মুহূর্ত কাল দাঁড়াল। তারপর কয়েক ধাপ এগিয়ে এল সেলস রুমের দিকে। কিন্তু সম্ভবত পেছনের খোলা দরজার দিকে চোখ পড়তেই সে ঘুরে সেদিকে চলল। আর সাথের লোকটি এর আগেই খোলা দরজা দেখে সেদিকে পা বাড়িয়েছিল।

আহমদ মুসা আর দেরি করল না। পার্টিসনের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে কনষ্টানটাইনের মাথা বরাবর রিভলবারের নল তুলে বলল, কনষ্টানটাইন ফিরে যাচ্ছ কেন? আমি এখানে।

কথার শব্দ পাওয়ার সাথে সাথে কথা শেষ হতেই কনষ্টানটাইন চরকীর মত ঘুরে দাঁড়াল। মুহূর্তে সে ষ্টেনগান তুলতে যাচ্ছিল।

আহমদ মুসা কঠোর কন্ঠে বলল, ষ্টেনগানের নল আর এক ইঞ্চিও উঠলে তোমার মাথা গুড়ো হয়ে যাবে। মনে রেখ,আহমদ মুসা এক কথা দুই বার বলে না।

কনষ্টানটাইনের ষ্টেনগানের নল আর উপরে উঠল না।

আবার বলল আহমদ মুসা, ষ্টেনগান ফেলে দাও।

ঠিক এই সময় কনষ্টানটাইনের সাথী ঘুরে দাঁড়িয়ে ষ্টেনগান তাক করছিল আহমদ মুসার দিকে। জাকুব দরজার পাশেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিল। সে কনষ্টানটাইনের সাথীকে ষ্টেনগানের ট্রিগার চাপার সুযোগ দিল না। তার রিভলভারের গুলি বুক ভেদ করল কনষ্টানটাইনের সাথীর।

সাথীর মৃত্যু কনষ্টানটাইনকে বোধ হয় অধৈর্য্য অথবা বেপরোয়া করে তুলছিল। সাথীর মুখের অন্তিম চিৎকার শোনার সাথে সাথেই তার ষ্টেনগানের নল নড়ে উঠল। উঠতে শুরু করল উপরে বিদ্যুৎ গতিতে।

কিন্তু আহমদ মুসার তর্জ্জনিটা রিভলভারের ট্রিগার স্পর্শ করে হুকুমের অপেক্ষা করছিল।

আহমদ মুসার সিদ্ধান্ত নিতে একটু বিলম্ব হলো না। তর্জ্জনিটা চেপে বসল ট্রিগারে। বেরিয়ে গেল এক ঝলক আগুন। কনষ্টানটাইনের মাথা গুড়ো করে দিল রিভলভারের নির্দয় বুলেট। আলমারীর গোড়ায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল কনষ্টানটাইনের বিশাল দেহ।

আহমদ মুসা এবং জাকুব সুড়ঙ্গের মুখে সেই ঘরে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। কেউ এলো না।

অবশেষে আহমদ মুসা এবং জাকুব দু'জন সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ল। সাথে নিল দু'জনার দুই ষ্টেনগান এবং কনষ্টানটাইনের মাথার রক্তাক্ত হ্যাট।

সুড়ঙ্গ পথ বেশ প্রশস্ত। পাথর ও সিমেন্ট দিয়ে একদম পাকা করা।

দু'মিনিট লাগল ঘরের সুড়ঙ্গের মুখে পৌঁছতে।

সুড়ঙ্গ পথটি খোলা। সুড়ঙ্গ-মুখের আলমারী কাত হয়ে পড়ে আছে।

আহমদ মুসা হাটছিল। ধীরে ধীরে উঁকি দিল সুড়ঙ্গ-মুখে। দেখল, একজন ষ্টেনগান হাতে দাঁড়িয়ে আছে দরজায় আর দু'জন দরজার ডান পাশে দেয়াল ঘেষে দাঁড়ান ষ্টিলের আলমারী খুলে তার দেরাজগুলো হাতড়াচ্ছে।

আহমদ মুসা রিভলভার বাগিয়ে সুড়ঙ্গ দিয়ে উঠতে যাবে এমন সময় ওদিক থেকে একজন হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে এসে দরজায় ষ্টেনগান হাতে নিয়ে দাঁড়ানো লোকটিকে বলল, উস্তাদ মালখানা পাওয়া গেছে। পুরানো আমলের অনেক সোনা-দানা, টাকাপয়সা এবং জিনিসপত্র সেখানে। ষ্টেনগানধারী লোকটি তাকে ধমক দিয়ে বলল, একটাও যেন এদিক-সেদিক না হয়, সব তুলে নিয়ে এস তোমরা।

চলে গেল খবর নিয়ে আসা লোকটি। যারা ষ্টিল আলমারী হাতড়াচ্ছিল তারা তখনও সেখানে ব্যস্ত।

ষ্টেনগানধারী লোকটি কয়েক পা তাদের দিকে এগিয়ে বলল, কি তোমাদের হয়নি এখনও?

ঠিক এই সুযোগেই আহমদ মুসা এবং তার পেছনে জাকুব সুড়ঙ্গ দিয়ে উঠে এল। আহমদ মুসার হাতে রিভলভার এবং জাকুবের হাতে ষ্টেনগান।

ষ্টেনগানধারী লোক বিপদ আঁচ করতে পেরেছিল। হঠাৎ তাকে শক্ত হয়ে উঠা দেখেই আহমদ মুসা এটা বুঝতে পেরেছিল।

ষ্টেনগানধারী লোকটি ষ্টেনগানের নলটি উঁচু করে ষ্টিল আলমারীর দিকে এগুবার জন্যে সামনে এক পা এগিয়ে বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়াতে গেল ষ্টেনগানের ট্রীগার চেপে ধরে।

ষ্টেনগানের গুলি বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ষ্টেনগানের নলটি ঘুরে আহমদ মুসাদের বরাবর আসার আগেই আহমদ মুসার রিভলভারের গুলি ষ্টেনগানধারীকে থামিয়ে দিল। লোকটি গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে মেঝের উপর তার ষ্টেনগান হাতে নিয়েই। লোকটি পড়ে যাবার সাথে সাথে যে দু'জন লোক আলমারীর কাছে দাঁড়িয়েছিল তাদের একজন ঝাপিয়ে পড়ল ষ্টেনগানধারী লোকটির লাশের উপর। মনে হয়েছিল তার লক্ষ্য লোকটির অবস্থা দেখা। কিন্তু না

সে তার উপর পড়েই তার হাত থেকে ষ্টেনগান নিয়ে শোয়া অবস্থায় ষ্টেনগান তুলে ধরতে গেল আহমদ মুসাদের লক্ষ্যে।

এবার গর্জে উঠল জাকুবের ষ্টেনগান। সামনে এগিয়ে এল গুলি বৃষ্টির এক দেয়াল। তার সামনে পড়ে গেল লাশের উপরে এবং আলমারীর কাছে দাঁড়ানো দুই লোকই।

'ধন্যবাদ জাকুব, তোমার ষ্টেনগান ঠিক সময়েই কথা বলেছে।' বলল আহমদ মুসা।

'খুশীর খবর মুসা ভাই, ওদের অবশিষ্ট তিন নেতাও শেষ।' বলল জাকুব।

'কেমন? বুঝলাম না।' বলল আহমদ মুসা।

'কনষ্টানটাইন তো গেছেই। তার সাথে ওখানে যে লোকটি মরেছে এবং এখানে যে ষ্টেনগানধারী আপনার গুলিতে মরল দুইজন কনষ্টানটাইনের পরের অবশিষ্ট দুই নেতা। এখন মুসা ভাই প্রকৃত পক্ষে মিলেশ বাহিনীকে কমান্ড করারও কেউ থাকল না।' বলল জাকুব।

আহমদ মুসা কাঠের আলমারী টেনে সুড়ঙ্গের মুখে চাপা দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। জাকুবও বেরিয়ে এল তার পেছনে।

ষ্টিফেন পরিবারের ভূগর্ভস্থ মিউজিয়াম ও ষ্টোর রুমে প্রবেশ করেছিল তিনজন। মিলেশ বাহিনীর সে তিনজন লোককে আহমদ মুসা ও জাকুব ধরে নিয়ে এল। তারা বাধা দিতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তারা যখন দেখল বাধা দেওয়া ও মৃত্যুর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, তখন তারা আত্মসমর্পন করলো। ওদেরকে পিছমোড়া করে বেঁধে ওপরে নিয়ে আসা হলো।

বাইরের করিডোরে পাহারা দিচ্ছিল দু'জন ষ্টেনগান হাতে। ওরা গাড়ি বারান্দা থেকে করিডোরে উঠে আসা সিঁড়ির দু'পাশের দু'টি পিলারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ওদের ষ্টেনগান ওদের হাতে ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল।

আহমদ মুসা ও জাকুব যখন ষ্টেনগান হাতে হলরুম থেকে করিডোরে এসে দাঁড়াল, তখন ওরা দু'জন চমকে উঠে ষ্টেনগান তুলে ধরতে চেষ্টা করছিল।

আহমদ মুসা খুব ঠান্ডা ভাষায় ওদের বলল, তোমরা মরতে চাইলে কোন কথা নেই। কিন্তু মরতে যদি না চাও তাহলে ষ্টেনগান ফেলে দাও।

ওরা মুহূর্ত কয়েক চিন্তা করল। পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাল। খোলা দরজা পথে তাকিয়ে হাত বাধা সহযোগীদেরও বোধহয় দেখতে পেল। তারপর ওরা দু'জনই ওদের ষ্টেনগান করিডোরের উপর ফেলে দিল।

জাকুব এগিয়ে গিয়ে ষ্টেনগান দু'টি কুড়িয়ে নিল। তারপর ওদের দু'জনকে পিছমোড়া করে বেঁধে হলরুমে ঢুকিয়ে দিল।

রাত তখন সাড়ে ৮টা।

আহমদ মুসা জাকুবকে বলল, আমি এ দিকটা দেখছি, তুমি গিয়ে হোয়াইট ক্রিসেন্টের ঐ চার ভাইকে ডেকে আন দোকানের সামনে থেকে।

পাঁচ মিনিট পর জাকুব ওদের চারজনকে নিয়ে এল। আহমদ মুসা ওদেরকে সব জানাল। তারপর বলল, বাড়ির অন্যান্য লোকজন কোথায়? গেট রক্ষী কোথায়?

চারজনের একজন বলল, জীবনহানি এড়াবার জন্যে সবাইকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে ওদের আসার খবর পাবার পরেই। ওদের ডাকব এখন?

আহমদ মুসা সম্মতি সূচক মাথা নাড়ল। সঙ্গে সঙ্গে চারজনের মধ্যে যে কথা বলছিল সে ছুটে বেরিয়ে গেল গেটের দিকে। সেখানে গিয়ে বোধহয় একটা সুইচ টিপল। সঙ্গে সঙ্গে গেটের মাথার লাইট জ্বলে উঠল। লোকটি ফিরে এল।

'কি করলে, আলোই তো শুধু জ্বাললে!' বলল আহমদ মুসা।

'ঐ আলোটাই সংকেত। এ সংকেতের অর্থ বাড়ি এখন বিপদমুক্ত, ফিরে আসতে হবে এখন ওদের।' বলল লোকটি।

আহমদ মুসা হেসে বলল, তোমাদের হোয়াইট ক্রিসেন্টকে ধন্যবাদ, আত্মরক্ষার তোমরা চমৎকার ব্যবস্থা করেছিলে। এ ব্যবস্থা না থাকলে রক্তপাত হতো অনেক।

হোয়াইট ক্রিসেন্ট আপনারও। আপনাকে পেয়ে আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মত আমরা গর্ব বোধ করছি।' বলল সেই লোকটিই।

আহমদ মুসা হেসে বলল, হোয়াইট ক্রিসেন্ট অবশ্যই আমারও। আমি হোয়াইট ক্রিসেন্টের একজন। তোমার নাম কি ভাই?

এই সময় চারজন মধ্যবয়সী লোক, একজন বৃদ্ধ এবং দু'জন কিশোর প্রবেশ করল গেট দিয়ে। ওরা ভয় ও বিস্ময় নিয়ে করিডোরে উঠে এল।

সেই লোকটি সবার সাথে আহমদ মুসার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, এরাই এ বাড়ির তত্ত্বাবধায়ক, সব কিছু দেখা-শোনার দায়িত্ব এদের।

আহমদ মুসা ওদের উদ্দেশ্য করে বলল, তোমরা তোমাদের বাড়ির দায়িত্ব বুঝে নাও। বলে আহমদ মুসা হল রুমে প্রবেশ করল যেখানে মিলেশ বাহিনীর পাঁচজন বাঁধা অবস্থায় ছিল।

আহমদ মুসা চারজনের দলের সেই লোকটিকে লক্ষ্য করে বলল, এদের ঘর থেকে এবং দোকান থেকে লাশগুলো সরাও। রক্তও পরিষ্কার করে নাও। একজনকে শুধু আমি সাথে নিচ্ছি।

বলে আহমদ মুসা ঐ পাঁচজনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, কনষ্টানটাইন সহ তোমাদের নেতারা কেউ বেঁচে নেই। তোমরা বাঁচতে চাও, না মরতে চাও?

'বাঁচতে চাই।' ওরা সমস্বরে বলল।

'তাহলে আমাকে সাহায্য করতে হবে।' বলল আহমদ মুসা।

ওরা সকলেই প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে আহমদ মুসার দিকে তাকাল।

আহমদ মুসা বলল, এই রাস্তার দু'পাশের দোকানে মিলেশ বাহিনীর লোকদের বসিয়ে রাখা হয়েছে তোমরা সকলেই জান। তাদের চিনিয়ে দিতে হবে।

ওদের একজন বলল, সব দোকানে নেই, কোন কোন দোকানে ছিল। কিন্তু আজ সকাল থেকেই ওদের কাজ শেষ। হাসান সেনজিকের বাড়ীতে ফাইনাল অপারেশন পর্যন্ত অর্থাৎ ৭ দিনের জন্যে ওদের রাখা হয়েছিল।

'রাস্তার মুখেও তো পাহারা বসানো ছিল। ওরা নেই?' বলল আহমদ মুসা।

'ওরাও নেই। ওদের মধ্যে থেকে চারজন এ অপারেশনে শামিল হয়েছিল। অবশিষ্টদের ছুটি দেয়া হয়েছে।' বলল সেই লোকটি।

‘দোকান ও রাস্তার পাহারা মিলে মোট কতজন ছিল ওরা?’ বলল আহমদ মুসা।

‘তিরিশ জনের মত হবে।’ বলল লোকটি।

‘এরা এখন কোথায়?’ জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

জবাবে লোকটি বলল, এরা সবাই এখন নিজ নিজ কাজে ফিরে গেছে। এদের কেউ চাকুরে, কেউ ব্যবসায়ী, কেউ বা ছাত্র।

‘এরা মিলেশ বাহিনীর নিয়মিত লোক নয়?’ জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

লোকটি বলল, মিলেশ বাহিনীর নিয়মিত লোক কম। যখন কাজ পড়ে লোক ডেকে আনা হয়। মিলেশ বাহিনীর সদস্য প্রচুর। চাকুরে, পেশাজীবি, ছাত্র সকলেই এর সদস্য হতে পারে। সদস্য হবার পর মিলেশ বাহিনী ওদের প্রশিক্ষণ দেয়। ওদের অঙ্গিকার করতে হয় যে, মিলেশ বাহিনী যখন যাকে ডাকবে, আসতে হবে জাতীয় দায়িত্ব মনে করে জাতির সবার জন্যে।

আহমদ মুসা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। বলল, যদি মিলেশ বাহিনী এদের না ডাকে?

‘না ডাকলে এরা কোন কাজে আসে না, নিজ নিজ কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকে।’ বলল সেই লোকটি।

‘কেন এরা স্বতঃস্ফুর্তভাবে জাতীয় দায়িত্ব মনে করে মিলেশ বাহিনীর কোন কাজ করতে এগিয়ে আসে না?’ বলল আহমদ মুসা।

লোকটি কতকটা বিস্ময়ের সাথে বলল, দায়িত্ব বিচার করবে, ঠিক করবে তো মিলেশ বাহিনী, তারা না ডাকলে, দায়িত্ব না বলে দিলে তারা নিজের থেকে কি করবে। এরকমটা কেউ করে না।

জাকুবের বলা কথা এ সময় আহমদ মুসার মনে পড়ল। বিশাল সমর্থক শ্রেণী নামক ভুমির উপর সরল ও সংকীর্ণ লম্ব রেখার মত দাঁড়ানো ক্ষুদ্র পরিসরের লিডারশীপ ভেঙে পড়লে গোটা সংগঠনই শেষ হয়ে যাবে। জাকুবের এই কথাটা এতক্ষণে আহমদ মুসার কাছে আরো স্পষ্ট হলো। আহমদ মুসা নিশ্চিত হলো,

নতুন আর এক কনষ্টানটাইন জন্ম না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন আর হাটতে পারবে না।

আহমদ মুসা হোয়াইট ক্রিসেন্টের ঐ চারজনকে উদ্দেশ্য করে বলল, শুনলে তো তোমরা সব। এই মুহূর্তে কোন বিপদ আর আমরা দেখি না। এখানকার কাজ আপাতত শেষ। আমরা এখন সালেহ বাহমনের ওখানে ফিরে যেতে পারি। এখানে আরো যা কিছু করার, সালেহ বাহমন ও হাসান সেনজিকরা এসে করবে।

বলে আহমদ মুসা করিডোরে বেরিয়ে এল। তার সাথে বেরিয়ে এল হোয়াইট ক্রিসেন্টের চারজনও।

করিডোরে এসে আহমদ মুসা একটু দাঁড়াল। হোয়াইট ক্রিসেন্টের চারজনকে লক্ষ্য করে বলল, মিলেশ বাহিনীর এই পাঁচজন এবং দোকানের ওখানে আরো বাঁধা আছে তিনজন- এই আটজনকে আপাতত তোমরা হাত-পা বেধে নিরাপদ কোথাও আটকে রাখ। আর সালেহ বাহমন এখানে না আসা পর্যন্ত তোমরা বাড়িটার পাহারায় থাকবে।

কথা শেষ করে আহমদ মুসা করিডোর থেকে নেমে এল গাড়ি বারান্দায়। গাড়ি বারান্দায় দু'টি গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। একটি জীপ, একটি মাইক্রোবাস। এই দু'টি গাড়ি করেই এসেছিল কনষ্টানটাইন এবং তার লোকেরা।

আহমদ মুসা জীপের ফুয়েল মিটারের দিকে একবার নজর বুলিয়ে বলল, জাকুব চল আমরা জীপটা নিয়ে যাই।

আহমদ মুসা জীপের ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল। জাকুব উঠে বসল পাশের সিটে।

হোয়াইট ক্রিসেন্টের চারজনের দিকে তাকিয়ে একবার হাত নাড়ল আহমদ মুসা। তারপর ষ্টার্ট দিল জীপে।

জীপ শব্দ তুলে চলতে শুরু করল। হোয়াইট ক্রিসেন্টের চারজন দাঁড়িয়ে অগ্রসরমান জীপের দিকে তাকিয়ে রইল।

তাদের পাশে এসে দাঁড়াল হাসান সেনজিকের বাড়ির পরিচারকদের প্রধান মোস্তফা ইস্পাহিক। ষাটের কোঠায় বয়স কিন্তু শক্ত সমর্থ। সে জিজ্ঞাসা করল, কথা বলল, হুকুম দিয়ে গেল এই লোকটি কে?

-'আহমদ মুসা' তুমি চিনবে না। বলল হোয়াইট ক্রিসেন্টের একজন।

-কনষ্টানটাইনকে এই-ই মেরেছে?

-হ্যাঁ। শুধু কনষ্টানটাইনকে কেন, কয়দিনে মিলেশ বাহিনীর সব নেতাকেই তো সে মেরেছে।

-সাংঘাতিক তো! কোত্থেকে এসেছে? আমাদের দেশী তো মনে হচ্ছে না।

-কিছুই দেখি তোমরা জাননা। তোমাদের হাসান সেনজিককে বন্দীদশা থেকে কে উদ্ধার করেছে, কে হাসান সেনজিককে দেশে এনেছে মিলেশ বাহিনীর সব বাধা সব প্রতিরোধ চূর্ণ করে? এই তো সেই লোক।

মোস্তফা মাথা ঝাঁকিয়ে আফসোস করে বলে উঠল, আগে কেন বললে না ভাই, আমি ওকে একটা সালাম করতাম? ওর হাতটা চুম্বন করতাম। এমন লোক আমার সামনে দিয়ে গেল, আর আমি কিছুই করতে পারলাম না।

হোয়াইট ক্রিসেন্টের লোকটি বলল, আর দুঃখ করো না। উনি চলে যাননি আবার আসবেন। ভালো করে রান্না করে খাইয়ে দিও।

বলে ফিরে দাঁড়াল সে। সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল, চল নির্দেশ তো সবাই শুনেছ। এখন কাজগুলো আমাদের শেষ করতে হবে।

সবাই ঘুরে দাঁড়াল। একজনকে করিডোরে ষ্টেনগানসহ পাহারায় রেখে সবাই বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল।

# ৭

ওমর বিগোভিক হাঁফাতে হাঁফাতে ড্রইং রুম থেকে বাড়ির ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, কি বিপদ, এখন কি করি বলত মা নাদিয়া নুর।

নাদিয়া নুর উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, কি হয়েছে আব্বা?

'এখনি শহীদ মসজিদ রোড থেকে একজন খবর দিয়ে গেল, স্বয়ং কনষ্টানটাইন তার বিপুল সংখ্যক লোকজন নিয়ে হাসান সেনজিকের বাড়ি ঘিরে ফেলেছে। সে কনষ্টানটাইনকে হাসান সেনজিকের বাড়িতে প্রবেশ করতে দেখে এসেছে।' একটু থামল ওমর বিগোভিক। তারপর আবার বলতে শুরু করল, 'হোয়াইট ক্রিসেন্টের একজন ছেলে সালেহ বাহমনের খোঁজে এসেছিল। সালেহ বাহমনকে না পেয়ে খবর দিয়েই সে চলে গেছে। সন্দেহ নেই, কনষ্টানটাইন এবার হাসান সেনজিকের মাকে ধরে নিয়ে যাবার জন্যেই ওখানে গিয়েছে।'

থামল ওমর বিগোভিক। ঢোক গিলল। তারপর ভেঙে পড়া কণ্ঠে বলল, সালেহ বাহমন, মাজুভ গেছে মিলেশ বাহিনীর হেড কোয়ার্টারে। তাদের খোঁজে আবার আহমদ মুসা এবং জাকুবও সেখানে গেছে। এখন আমি কি করি? সর্বনাশ হতে তো আর দেরি নেই।

নাদিয়া নুর ভাবছিল। বলল, 'একটা কাজ আমরা করতে পারি বসে না থেকে। সেটা হলো, হাসান সেনজিক এবং ডেসপিনাকে এ খবর আমাদের জানানো উচিত। তারা দু'জনেই হয়তো পরে বলতে পারে, কেন আমরা খবরটা তাদের দেইনি। কোন চেষ্টা হয়তো তারা করতে পারতো।'

'ঠিক বলেছ মা। হাসান সেনজিক মাজুভের বোনের বাড়িতে আছে। সে ঠিকানা মাজুভ দিয়ে গেছে। আর ডেসপিনার বাড়ি তো তুমি চেনই।'

বলে ওমর বিগোভিক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তুমি তৈরি হয়ে এস নাদিয়া, আমি গাড়ি বের করছি।

ওমর বিগোভিক গাড়ি বের করল। নাদিয়া এসে তার আব্বার ড্রাইভিং সিটের পাশে বসল। গাড়ি ছুটল মাজুভের বোনের বাসার দিকে।

ডিফেন্স কলোনীতে মাজুভের বোনের বাসা খুঁজে পেতে মোটেই কষ্ট হলো না। গাড়ি বারান্দায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে ওমর বিগোভিক এবং নাদিয়া নুর নেমে এল গাড়ি থেকে। কলিং বেলের সুইচ টেপার কয়েক মুহূর্ত পরেই দরজা খুলে গেল।

দরজা খুলে দিয়েছে একজন যুবক। সুন্দর, সুঠাম দেহ যুবকটির। মুখে মিষ্টি সরল হাসি। চেহারায় উচু আভিজাত্য।

ওমর বিগোভিক সালাম দিয়ে বলল, আমি ওমর বিগোভিক, এ আমার মেয়ে নাদিয়া নুর। তুমি হাসান সেনজিক না?

যুবকটি ঠোটে আরও একটু স্পষ্ট হাসি টেনে বলল, জি আমি হাসান সেনজিক। আপনাদের কথা আমি শুনেছি। আসুন ভেতরে।

বলে হাসান সেনজিক এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে তাদের ভেতরে প্রবেশের জায়গা করে দিল।

ওমর বিগোভিক ভেতরে ঢুকে দরজার সামনেই থমকে দাঁড়াল। তার সাথে নাদিয়াও। ওমর বিগোভিক বলল, বাবা, আমাদের বসার সময় নেই। তোমাকে শুধু একটা খবর জানাতে এসেছি। গম্ভীর কণ্ঠস্বর ওমর বিগোভিকের।

হাসান সেনজিকের মুখটা ম্লান হয়ে গেল। নেমে এল তার মুখে চিন্তার ছায়া। শুকনো কণ্ঠে বলল, কি খবর?

ওমর বিগোভিক একটা ঢোক গিলে শুরু করল, সালেহ বাহমন ও মাজুভ গেছে মিলেশ বাহিনীর হেড কোয়ার্টারে, তাদের খোঁজে সেখানে গেছে আহমদ মুসা এবং জাকুব। তাদের কোন খোঁজ আমরা জানি না। এদিকে খবর এল এই কিছুক্ষণ আগে, কনষ্টানটাইন তার বিরাট দল নিয়ে তোমাদের বাড়ি ঘিরে ফেলেছে এবং কনষ্টানটাইন তোমাদের বাড়িতে ঢুকেছে। আশংকা করা হচ্ছে, তোমার মাকে তারা কিডন্যাপ করবে। থামল ওমর বিগোভিক।

হাসান সেনজিক তৎক্ষণাৎ কোন কথা বলল না। সে মাথা নিচু করল। প্রচন্ড এক আবেগ এসে তাকে জড়িয়ে ধরেছে।

সে নিজেকে সামলে নিয়ে কিছুক্ষণ পর মুখ তুলল। বিধ্বস্ত তার চেহারা। ধীর কণ্ঠে সে বলল, এখন আপনি কি ভাবছেন?

চেষ্টা করেও হাসান সেনজিক তার কাঁপা কণ্ঠ ঢাকতে পারেনি।

ওমর বিগোভিক বলল, আমরা এখন ডেসপিনাকে এ খবর দিতে চাই। ডেসপিনাই তোমার বাড়ির সব খবর রাখে। তার কাছে কোন সমাধান আছে কিনা জানা দরকার।

'আপনারা কি এখনি যাবেন সেখানে?' বলল হাসান সেনজিক।

'হ্যাঁ বাবা, এ কারণেই আমরা বসে সময় নষ্ট করতে পারছি না।' বলল ওমর বিগোভিক।

'একটু দাঁড়ান, বলে আসি। আমিও যাব।' বলেই হাসান সেনজিক ভেতরে ছুটে গেল। ফিরে এল এক মিনিট পরেই।

সে ফিরে এলে ওমর বিগোভিক বলল, 'বাবা আহমদ মুসা হাজির নেই। তাকে না জানিয়ে এত বড় সিদ্ধান্ত নেয়া কি ঠিক হবে?'

'তিনি থাকলে অনুমতি আমি অবশ্যই নিতাম, কিন্তু যেহেতু তিনি নেই তাই সিদ্ধান্ত আমাকেই নিতে হবে। এই অবস্থায় আমি ঘরে বসে থাকতে পারি না।' বলল হাসান সেনজিক।

মাজুভের স্ত্রী নাতাশা এ সময় ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। সে নিজের পরিচয় দিয়ে ওমর বিগোভিককে উদ্দেশ্য করে বলল, সব ঘটনার কেন্দ্র বিন্দু হাসান সেনজিক। কনষ্টানটাইন আজ হাসান সেনজিকের মাকে ধরে আনতে গেছে তারও মূলে হাসান সেনজিক। সুতরাং আমার মনে হয় এ ধরনের জটিল সময়ে হাসান সেনজিকের বাইরে পা বাড়ানোই উচিত নয়।

হাতজোড় করে হাসান সেনজিক বলল, আপনি বাধা দেবেননা, আমি এ সময় ঘরে বসে থাকলে মরে যাব ভাবী। শেষের কথা তার কণ্ঠে জড়িয়ে গেল কান্নায়।

নাতাশা আর কোন কথা বলতে পারল না।

ওমর বিগোভিকও না।

নাদিয়া নুর নির্বাক হয়ে গেছে হাসান সেনজিকের বুক ভরা আবেগের উত্তাল তরঙ্গ দেখে। তার ভয়ও হলো, এ অবস্থায় মানুষ সব রকম ঝুকিই নিতে পারে। যদি না তাকে বাস্তবতায় ফিরিয়ে আনা যায়।

গাড়িতে এসে ওমর বিগোভিক ড্রাইভিং সিটে বসল। নাদিয়া নুরকে ওমর বিগোভিক তার পাশের সিটে এসে বসতে বলল। আর হাসান সেনজিককে বলল পিছনের সিটে বসতে। মানুষের চোখ থেকে তাকে একটু আড়াল করার জন্যেই এই ব্যবস্থা।

গাড়ি ষ্টার্ট নিল। চলতে শুরু করল গাড়ি। চুপ চাপ। কারো মুখে কোন কথা নেই।

অনেকক্ষণ উসখুস করার পর নাদিয়া নুর হাসান সেনজিককে প্রশ্ন করল, হাসান সেনজিক ভাই ডেসপিনাকে মনে আছে, জানেন আপনি তাকে?

জবাব দিতে একটু দেরি হলো হাসান সেনজিকের। তার বেদনাচ্ছন্ন বুকে বড্ড বেসুরো লাগল এ প্রশ্ন। কিন্তু এই বেসুরো প্রশ্নটাই ধীরে ধীরে তার হৃদয়ে নিয়ে এল উত্তপ্ত শিহরণ। অনেকক্ষণ পর হাসান সেনজিক বলল, ওকে মনে পড়ে না নাদিয়া। কিন্তু ওকে জানি।

আর প্রশ্ন করতে সাহস পেল না নাদিয়া নুর।

নাদিয়া নুর পথ দেকিয়ে গাড়ি নিয়ে এল ডেসপিনাদের গাড়ি বারান্দায়। গাড়ি থামল।

গাড়ি থেকে প্রথম নামল নাদিয়া নুর। নেমেই সে ছুটে গেল।

দরজা খুলে দিয়েছে ডেসপিনা। দরজার উপরই ডেসপিনাকে জড়িয়ে ধরল নাদিয়া। বলল, হাসান সেনজিককে এনেছি। চল, খালাম্মাকে বলি।

বলেই ডেসপিনাকে ছেড়ে দিয়ে ছুটল খালাম্মার কাছে খবরটা দিতে।

খবরটা শোনার পর ডেসপিনার গোটা শরীর যেন চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলল। সে নড়তে পারল না দরজা থেকে। পা দু'টি যেন তার আটকে গেছে মেঝের কার্পেটের সাথে।

হাসান সেনজিক এবং ওমর বিগোভিক দরজার দিকে এগিয়ে আসছিল। হাসান সেনজিক আগেই চলে এসেছিল। ওমর বিগোভিক গাড়িটা পার্ক করে আসতে গিয়ে পেছনে পড়ে গিয়েছিল।

হাসান সেনজিক এসে ডেসপিনার সামনে দাঁড়াল। ডেসপিনা মুখ তুলে তাকাল হাসান সেনজিকের দিকে। চার চোখের প্রথম মিলন হলো। এর আগে কেউ কাউকে দেখেনি। কিন্তু একটুও কষ্ট হলো না একে অপরকে চিনতে।

'কেমন আছ ডেসপিনা?' প্রথম জিজ্ঞাসা ফুটে উঠল হাসান সেনজিকের কণ্ঠে।

কথা বলতে পারলো না ডেসপিনা। তার জিহ্বা যেন তালুর সাথে আটকে গেছে।

উত্তরহীনা ডেসপিনা তার অপলক চোখের উপর দু'টি হাত চেপে ছুটে পালাল হাসান সেনজিকের সামনে থেকে।

হাসান সেনজিক তার প্রশ্নের উত্তর পেল না। কিন্তু তার মনে হল, উত্তর না দিয়েই ডেসপিনা তাকে তার সব বলে গেল।

আনমনা হয়ে গিয়েছিল হাসান সেনজিক। দাঁড়িয়েছিল হাসান সেনজিক ডেসপিনার মত করেই।

ওমর বিগোভিক এসে বলল, কি ব্যাপার হাসান সেনজিক দাঁড়িয়ে কেন? নাদিয়া কোথায় গেল!

নাদিয়া ছুটে এল এ সময়।

নাদিয়া ওদেরকে নিয়ে ড্রয়িং রুমে বসাল। হাসান সেনজিক বসতে যাচ্ছিল। নাদিয়া বলল, আপনি মেহমান নন। ভেতরে চলুন, খালাম্মা দাঁড়িয়ে আছেন।

ডেসপিনার মা, হাসান সেনজিকের খালাম্মা, ড্রয়িং রুমের ওপারেই দাঁড়িয়ে ছিল।

হাসান সেনজিক ভেতরে ঢুকতেই তার খালাম্মা কেঁদে উঠে জড়িয়ে ধরল হাসান সেনজিককে। হাসান সেনজিকও না কেঁদে পারল না।

শান্ত হয়ে বসার পর হাসান সেনজিক বলল, খালাম্মা, ডেসপিনাকে ডাকুন, জরুরী খবর আছে। ওর জানা দরকার।

পাশের ঘরেই ডেসপিনা বালিশে মুখ গুজে শুয়ে ছিল। হাসান সেনজিকের কথা সে শুনতে পেল। শুনতে পেয়েই সে চমকে উঠল। কি খবর! সে উঠে বসল।

নাদিয়া এ সময় ঘরে ঢুকে ডেসপিনার গালে একটা টোকা দিয়ে বলল, 'তুমি ভেতরে ভেতরে এতদূর.....।' তারপর একটু থেমে বলল, এস ডেসপিনা, খারাপ খবর আছে। গম্ভীর কন্ঠস্বর নাদিয়ার।

ডেসপিনা উদ্বিগ্ন কন্ঠে বলল, তুমি বলছ খারাপ খবর, উনি বললেন জরুরী খবর। কি ব্যাপার নাদিয়া!

উত্তর না দিয়ে ডেসপিনাকে টেনে নিয়ে গেল নাদিয়া। ওরা গিয়ে বসল সোফায়।

মুখ নিচু ডেসপিনার।

হাসান সেনজিক বলল, নাদিয়ার আব্বা, চাচাজান আমাকে একটা দুঃসংবাদ দিতে গিয়েছিলেন। সে সংবাদ তিনি দিতে এসেছেন ডেসপিনাকেও। ডেসপিনা আম্মার খবরাখবর বেশি রাখে তাই। থামল হাসান সেনজিক।

একটু থেমে আবার শুরু করল, কিছুক্ষণ আগে খবর এসেছে, মিলেশ বাহিনী গিয়ে আমাদের বাড়ি ঘিরে রেখেছে আম্মাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। মুসা ভাই, মাজুভ, সালেহ বাহমন সবাই গেছে মিলেশ বাহিনীর হেড কোয়ার্টারে। ওদের কোন খোঁজ নেই।

ডেসপিনা সোজা হয়ে বসল। ভয়ে, উদ্বেগে তার মুখ পাংশু হয়ে গেছে। বলল, তাহলে..... কথা শেষ করতে পারলো না ডেসপিনা। উদ্বেগে, উতকন্ঠায় কন্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল তার।

'তাহলে যা করতে হবে, আমি তা জানি ডেসপিনা।' বলল হাসান সেনজিক।

ডেসপিনা মাথা সোজা করে তাকাল হাসান সেনজিকের দিকে। বলল, সেটা কি?

হাসান সেনজিক উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আমি সেখানে যাচ্ছি। আম্মাকে যদি তাদের হাত থেকে উদ্ধার করা না যায়, তাহলে আমাকে পেলেই তারা আমার অসুস্থ আম্মাকে ছেড়ে দেবে। আমার জন্যে আম্মা কষ্ট ভোগ করবেন তা হয় না।' বলে হাসান সেনজিক পা বাড়াল বাইরে যাবার জন্যে।

ডেসপিনা উঠে দাঁড়াল। দৌড়ে গিয়ে হাসান সেনজিকের সামনে দু'হাত প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে বলল, এটা সমস্যার সমাধান নয়।

হাসান সেনজিক থমকে দাঁড়াল। শান্ত গম্ভীর কন্ঠে বলল, আমার সামনে আর কোন বিকল্প নেই ডেসপিনা। সময় পার হয়ে যাচ্ছে। পথ ছেড়ে দাও।

'আপনি যদি যেতেই চান, তাহলে আমাকেও সাথে নিতে হবে।' কান্নাজড়িত ভাষায় দৃঢ় কন্ঠে বলল ডেসপিনা।

এই সময় বাইরে গাড়ির হর্ণ বেজে উঠল। নাদিয়া ছুটে বাইরে গেল। কয়েক মুহুর্ত পরেই ছুটে এল ভেতরে। আনন্দে চিৎকার করে বলে উঠল, হাসান সেনজিক ভাইয়ের মাকে নিয়ে এসেছে সালেহ বাহমন ও মাজুভ।

ঘটনার আকস্মিকতা, আনন্দের আতিশয্য ঘরের মানুষগুলোকে যেন বোবা করে দিল। হাসান সেনজিক ও ডেসপিনা যেভাবে দাঁড়িয়েছিল সেইভাবেই দাঁড়িয়ে রইল।

দুই পরিচারিকার কাঁধে ভর করে হাসান সেনজিকের মা ঘরে প্রবেশ করল। তার পেছনে পেছনে হাসান সেনজিকের ফুফু।

মাকে সামনে দেখে হৃদয় উপচানো আবেগে কাঁপছিল হাসান সেনজিক।

ডেসপিনার মা উঠে এসেছিল। সে গিয়ে হাসান সেনজিকের মাকে ধরে হাসান সেনজিকের কাছে এনে বলল, আপা এই তোমার হাসান সেনজিক।

হাসান সেনজিকের মা চিৎকার করে জড়িয়ে ধরল হাসান সেনজিককে। হাসান সেনজিক 'মা আমার' বলে চিৎকার করে জড়িয়ে ধরল তার মাকে।

হাসান সেনজিককে জড়িয়ে ধরেই তার মা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। প্রায় পনের বছরের অবরুদ্ধ আবেগ এবং পাওয়ার অপরিমিত আনন্দের চাপ হাসান সেনজিকের অসুস্থ মা সহ্য করতে পারেনি।

ভয় ও উৎকণ্ঠায় ফুপিয়ে কেঁদে উঠল হাসান সেনজিক জ্ঞান হারা মাকে কোলে নিয়ে। তার সাথে ডেসপিনাও।

হাসান সেনজিক ও ডেসপিনা ধরাধরি করে হাসান সেনজিকের মাকে নিয়ে শুইয়ে দিল। শুইয়ে দিয়েই ডাক্তারকে টেলিফোন করল ডেসপিনা।

ডাক্তার এল।

ডাক্তার বলল, ভয়ের কিছু নেই। দুর্বলতা ও অতিরিক্ত মানসিক চাপে জ্ঞান হারিয়েছেন। এখনি জ্ঞান ফিরে আসবে।

একটি ইনজেকশন ও কিছু ঔষধ দিয়ে ডাক্তার চলে গেল।

ফুফু ও খালাম্মাকে মায়ের কাছে থাকতে বলে হাসান সেনজিক উঠে দাঁড়াল। বলল, ওদের কাছ থেকে আসি। কি ঘটেছে আমরা এখনও কিছু জানতে পারিনি। বলে হাসান সেনজিক বেরিয়ে গেল।

তার সাথে বেরিয়ে গেল ডেসপিনা ও নাদিয়াও। ওরা গিয়ে ড্রয়িং রুমের দরজার আড়ালে দাঁড়াল। হাসান সেনজিক ড্রয়িংরুমে গিয়ে বসেছে ওদের পাশে।

ওমর বিগোভিক সালেহ বাহমন ও মাজুভের সাথে গল্প করছিল।

হাসান সেনজিক বলল, আমার তর সইছে না মাজুভ ভাই। মুসা ভাই ও জাকুব তো আপনাদের সন্ধানে মিলেশ বাহিনীর হেড কোয়ার্টারে গেছেন। কোথায় তারা? আপনারা কখন শহীদ মসজিদ রোডে গেলেন?

সালেহ বাহমন বলল চাচাজানকে সব বলেছি; আবার বলছি। বলে সালেহ বাহমন ঘটনাগুলো আবার বলে গেল।

বলা শেষ করে সালেহ বাহমন থামতেই হাসান সেনজিক বলল, কনষ্টানটাইন ও তার দুর্ধর্ষ দলকে মোকাবিলার জন্যে শুধু মুসা ভাই থেকে গেলেন জাকুবকে নিয়ে! আমরা এখন যেতে পারি না ওখানে?

মাজুভ বলল, আহমেদ মুসা ভাই এ নির্দেশ দেননি। আপনার মার নিরাপত্তা বিধানই শুধু আমাদের দায়িত্ব। আপনিই ভালো জানেন, মুসা ভাই সামনের অনেক দূর দেখে সিদ্ধান্ত নেন। সুতরাং তার নির্দেশ ছাড়া কোন পদক্ষেপ নেয়া, বিশেষ করে এখান থেকে আমরা চলে যাওয়া সঠিক মনে করি না।

'মাজুভ ভাই আপনার যুক্তি ঠিক। কিন্তু সেই ককেশাস থেকে মুসা ভাইকে আমি দেখে আসছি। আমি জানি, তিনি তার সাথীদের পারতপক্ষে কোন ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দেন না, তিনি সব বিপদ সব ঝুঁকি নিজের কাঁধে তুলে নেন। সুতরাং তিনি নির্দেশ না দিলেও তার বিপদ কমানোর জন্যে আমরা কিছু করতে পারি, তিনি কিছু কখনই বলবেন না।' বলল হাসান সেনজিক।

'এমন বড় হৃদয়ের মানুষ, এমন দায়িত্ব পাগল নেতা আজকের দুনিয়াতে আছে তাঁর কথা না শুনলে আমার বিশ্বাস হতো না।' বলল ওমর বিগোভিক।

হাসান সেনজিক বলল, কেমন দায়িত্ব পাগল তিনি, কেমন বিচিত্র তার জীবন, একটা কাহিনী শুনুন। বলে একটা দম নিয়ে আবার শুরু করল সে, সিংকিয়াং থেকে ককেশাসে আসার দিন যাত্রার এক ঘন্টা আগে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের আসর থেকেই তিনি এসে বিমানে ওঠেন। বিমান বন্দরে আসার পথে গাড়িতে কনের সাথে দু'চারটা কথা বলেন। ককেশাসে যেহেতু জরুরী প্রয়োজন, তাই কনের বাপ-মা এবং সকলের অশ্রুসজল অনুনয় সত্তেও তিনি একটা দিনও দেরি করতে রাজী হননি।

ঘটনা শুনে ওমর বিগোভিক, সালেহ বাহমন, মাজুভ সকলেই চোখ কপালে তুলল।

আড়ালে দাঁড়ানো নাদিয়া ও ডেসপিনার মুখ হা হয়ে গেছে বিস্ময়ে।

ওমর বিগোভিক বলল, এমন ঘটনা নাটক উপন্যাসে কখনো কখনো আমরা দেখি, বাস্তবেও তাহলে ঘটে! কিন্তু এমনভাবে বিয়ে হলো কেন?

হাসান সেনজিক বলল, সিংকিয়াং এর গভর্ণরের মেয়ে আহমদ মুসাকে ভাই ডাকত। মুসা ভাই তার সেই বোনের বিয়ে ঠিক করল সিংকিয়াং এর তার এক সাথীর সাথে। আহমদ মুসা হঠাৎ করে ককেশাসে আসার সিদ্ধান্ত নিল, তাই তিনি আসার আগেই তাড়াহুড়া করে বিয়ের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু বিয়ের আসরে বসে তার বোন শর্ত আরোপ করল ভাইয়া বিয়ে না করলে সে এখন বিয়ে করবেনা। এই রকম প্যাচে পড়ে শেষ পর্যন্ত আহমদ মুসাকেও বিয়ে করতে হয়।

'মুসা ভাই-এর বিয়ে কি ঠিক হয়ে ছিল?' জিজ্ঞাসা করল মাজুভ।

হাসান সেনজিক বলল, সে আর এক কাহিনী। সিংকিয়াং এর বিখ্যাত মুসলিম পরিবারের মেয়ে মেইলিগুলি। একদিন একাকী গাড়ি নিয়ে যাবার সময় গুলিবিদ্ধ মুমুর্ষ অপরিচিত আহমদ মুসাকে পথের পাশে পায়। মেইলিগুলি তাকে তুলে নিয়ে যায়। প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে তখন আহমদ মুসার লড়াই চলছিল। আহমদ মুসাকে আশ্রয় দেয়ায় মেইলিগুলি এবং মেইলিগুলির পরিবার নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায় মেইলিগুলির দাদি এবং মেইলিগুলি নিজেও গুলিতে আহত হয়। সবাই চাইতো এই মেয়েটির সাথে আহমদ মুসার বিয়ে হোক। সবচেয়ে বেশি চাইত আহমদ মুসার সেই বোন। সে-ই অবশেষে বেকায়দায় ফেলে আহমদ মুসাকে।

'অদ্ভুত উপন্যাসের চেয়েও সুন্দর কাহিনী। এসব মুসা ভাইয়ের কাছে শুনেছেন হাসান সেনজিক ভাই?' বলল সালেহ্ বাহমন।

'না মুসা ভাই তাঁর ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কোন সময় কোন আলোচনা করেন না। এসব কথা আমি শুনেছি ককেশাসে মুসা ভাই এর এক সাথীর কাছ থেকে যিনি মধ্য এশিয়া থেকে এসেছিলেন তাঁর সাথে।' বলল হাসান সেনজিক।

'নিজের জীবনের দিকে না তাকিয়ে কেমন করে একজন মানুষ পরার্থে নিজের জীবন বিলিয়ে দিতে পারে!' বিস্ময়ের সাথে বলল ওমর বিগোভিক।

'মুসলমানরা পারে চাচাজান। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে শুরু করে আফ্রিকার গহীন অরণ্য পর্যন্ত ইসলামের যে বিস্তার তা সম্ভব হয়েছে এমনভাবে জীবন বিলিয়ে দেয়া মুসলিম মিশনারীদের দ্বারাই যারা নিজেদের দেশ-সংসার ফেলে, স্বজনদের মায়া-মমতার বন্ধন ছিন্ন করে বিদেশ বিভূয়ে অবিরাম ঘুরে বেড়িয়েছেন অন্ধকারে ইসলামের দ্বীপ প্রজ্বলনের জন্যে। আহমদ মুসা আর কেউ নয়, তাদেরই উত্তরাধিকার, তাদের মূর্তিমান আধুনিক দৃষ্টান্ত।' বলতে বলতে আবেগ রুদ্ধ হয়ে গেল হাসান সেনজিকের কন্ঠ।

হাসান সেনজিকের এই আবেগ সকলকেই স্পর্শ করল। কারো মুখেই কোন কথা জোগাল না।

আড়ালে দাঁড়ানো ডেসপিনা ও নাদিয়ার সজল চোখে তখন ফুটে উঠেছে বোটানিকাল গার্ডেনের সেদিনকার সেই দৃশ্য। সম্পূর্ণ অপরিচিত দু'জন তরুণীর

জীবন ও সম্মান রক্ষার্থে আহমদ মুসা ছুটে গিয়েছিল। নিজের নিরাপত্তার কথা, নিজের জীবনের জন্য এক মুহূর্তও সে ভাবেনি। এটাই আহমদ মুসার জীবন-রূপ, একজন মুসলমানের জীবন-রূপ।

এই সময়ে সেখানে ছুটে এল একজন পরিচারিকা। বলল, বড় বেগমের জ্ঞান ফিরেছে। উনি হাসান সেনজিককে চাইছেন।

নাদিয়া তাড়াতাড়ি দরজায় মুখ বাড়িয়ে বলল, ভাইজান, খালাম্মার জ্ঞান ফিরেছে। উনি আপনাকে চাইছেন।

শুনেই হাসান সেনজিক ছুটে এল ভেতরে।

আনন্দ ও এ্যাকশনের মধ্যে দিয়ে অনেকগুলো দিন যেন চোখের পলকেই কেটে গেল আহমদ মুসার।

আনন্দটা হলো হাসান সেনজিকের সাথে ডেসপিনার এবং সালেহ বাহমনের সাথে নাদিয়া নুরের বিয়ে। হাসান সেনজিকের বিয়েতে খুব বেশি ধুমধাম হয়েছে। কয়েক যুগের মধ্যে ষ্টিফেন পরিবারের কোন বিয়ে প্রকাশ্যে হয়নি, ধুমধামতো দূরে থাক। বিয়ের ভোজ চলেছে তিনদিন ব্যাপী। বোসনিয়া, হারজেগোভিনা, কসভো প্রভৃতি রাজ্যসহ গোটা দেশের উল্লেখযোগ্য মুসলিম পরিবারগুলো দাওয়াত পেয়েছে বিয়েতে। ডেসপিনা ও নাদিয়া নুরের বিয়ে একই দিনে অনুষ্ঠিত হয়েছে হাসান সেনজিকের বাড়িতেই।

আরও একটা বড় আনন্দের ঘটনা ঘটেছে। সেটা হলো বোসনিয়া ও হারজেগোভিনা রাজ্যে অর্ধশতাব্দির কম্যুনিষ্ট শাসন অবসানের পর প্রথম যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো, তাতে একজন মুসলমান প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন এবং তিনি হাসান সেনজিকের দাওয়াতে এসেছিলেন। আহমদ মুসার সাথে তার

অনেক কথা হয়েছে। তিনি তো আহমদ মুসাকে না নিয়ে কিছুতেই যাবেন না তাঁর রাজধানীতে। পরে অবশ্যই যাবে এই ওয়াদা দিয়ে আহমদ মুসা রক্ষা পেয়েছে।

বোসনিয়া ও হারজেগোভিনাতে এই বিজয় কি করে সাধিত হলো তার জবাব আহমদ মুসা প্রেসিডেন্টের কাছ থেকেই জানতে পেরেছিলেন, জনসংখ্যার ৪০ ভাগ মুসলমান ঐক্যবদ্ধ ছিল এবং তাদের প্রধান শত্রু মিলেশ বাহিনী হঠাৎ করে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। বোসনিয়া ও হারজেগোভিনার প্রেসিডেন্ট আলিজ্য ইজ্বেত হাসান সেনজিককেও উৎসাহ দিয়ে গেছেন, নির্বাচনের জন্যে তৈরী হবার। সার্ভিয়ার মুসলিম জনসংখ্যাও বোসনিয়ার মতই। আর হাসান সেনজিক তাদের সবারই প্রিয়। সুতরাং সাহসের সাথে তাকে জাতির নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসতে হবে।

আনন্দের সাথে সাথে দিনগুলো এ্যাকশনের মধ্যে দিয়েও কেটেছে।

সেদিন হাসান সেনজিকের বাড়ীতে কনষ্টানটাইন নিহত হবার পর আহমদ মুসা জাকুবকে নিয়ে ডেসপিনার ওখানে আসে এবং ঐ রাতেই মাজুভ ও জাকুবকে সাথে নিয়ে মিলেশ বাহিনীর হেড কোয়র্টারে আবার হানা দেয়। কোন বাধাই তারা পায়নি। তাদের আগমন টের পেয়েই কয়েকজন যারা ছিল পালিয়ে যায়।

আহমদ মুসা মিলেশ বাহিনীর অফিস অনুসন্ধান করে তাদের কাগজপত্র ও দলিল দস্তাবেজ হস্তগত করে। কনষ্টানটাইনের পার্সোনাল ফাইল ক্যাবিনেটের গোপন কুঠুরীতে কিছু যুগোশ্লাভ দিনার সহ প্রায় ১লাখ মার্কিন ডলার পায়। আহমদ মুসা টাকায় হাত দেয়নি। আহমদ মুসা তিন তলা থেকে কনষ্টানটাইনের স্ত্রীকে ডেকে এনেছিল। তার সামনেই সে এ অনুসন্ধানের কাজ করেছে। কনষ্টানটাইনের স্ত্রী প্রথমে আসতে ভয় করেছে। আহমদ মুসা স্বয়ং গিয়ে তাকে অভয় দিয়ে নিয়ে এসেছে। আহমদ মুসা প্রাপ্ত টাকা তার হাতে তুলে দিয়ে বলেছে, আমরা মিলেশ বাহিনী সংক্রান্ত কাগজপত্র অনুসন্ধানের জন্যে এসেছি, টাকার জন্যে নয়।

গোটা সময় কনষ্টানটাইনের স্ত্রী একটা কথাও বলেনি। ভয় ও শোকে যেন সে পাথর হয়ে গিয়েছিল।

অনুসন্ধান শেষে বিদায়ের সময় আহমদ মুসা কনষ্টানটাইনের স্ত্রীর সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিল, আপনাকে বিরক্ত করতে হলো, এজন্যে দুঃখিত।

বলে আহমদ মুসা আসার জন্যে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু কয়েক পা এগিয়েই আবার সে ফিরে দাঁড়িয়ে বলেছিল, যা কিছু ঘটে গেল, তার জন্যে আমরা দায়ী নই। আমরা আত্মরক্ষা করেছি মাত্র।

'এই যে রাতে এখানে হানা দিলেন, এটাও কি আত্মরক্ষার জন্য?' এটাই প্রথম কথা ছিল কনষ্টানটাইনের স্ত্রীর।

উত্তরে আহমদ মুসা বলেছিল, 'হ্যাঁ আত্মরক্ষার জন্যেই এই হানা। মিলেশ বাহিনীর রেকর্ড থেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মিলেশ বাহিনীর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আরও সম্যক ধারণা আমরা পেতে চাই।'

বলে আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়িয়েছিল যাবার জন্যে। 'শুনুন' পেছন থেকে ডেকে উঠেছিল কনষ্টানটাইনের স্ত্রী।

আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়ালে কনষ্টানটাইনের স্ত্রী বলেছিল, শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিলেন না?

'কোথায় শত্রু?' বলেছিল আহমদ মুসা।

'কেন আমি এবং আমার সন্তানেরা?'

'না আপনাদের সাথে আমাদের কোন বিরোধ নেই।'

'আমার স্বামী থেকে আমি এবং আমার সন্তান বিচ্ছিন্ন নই।'

'তা ঠিক, কিন্তু কনষ্টানটাইন আপনারা নন। আপনার কাছে পিস্তল আছে, কিন্তু সুযোগ পেয়েও আপনি সে পিস্তল ব্যবহার করেননি। কনষ্টানটাইন হলে সামান্য সুযোগও হাতছাড়া করতো না।' একটু হেসে বলেছিল আহমদ মুসা।

'কেমন করে জানলেন আমার কাছে পিস্তল আছে?' চোখে বিস্ময় টেনে বলেছিল কনষ্টানটাইনের স্ত্রী।

'আপনি পিস্তল হাতে না নিয়ে শত্রুর ডাকে আসতে পারেন না। সন্ধ্যা রাতে আপনিই তিনতলা থেকে গুলি করেছিলেন।'

বিস্ময় ফুটে উঠেছিল কনষ্টানটাইনের স্ত্রীর চোখে। সে বলেছিল, তাহলে তো প্রমাণ হলো আমি আপনার শত্রু। কিন্তু বললেন যে আপনার শত্রু নই।

আহমদ মুসার মুখে হাসি ফুটে উঠেছিল। বলেছিল, বলেছিতো আপনি পিস্তল ব্যবহার করেননি, যা করতো কনষ্টানটাইন।

কনষ্টানটাইনের স্ত্রী তৎক্ষণাৎ কোন উত্তর দেয়নি। সে গম্ভীর হয়ে উঠেছিল। একটুক্ষণ নিরব থেকে সে আহমদ মুসার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বলেছিল, 'আপনাকে ধন্যবাদ, আমার একটি নতুন অভিজ্ঞতা হলো। আমার স্বামী কি করতেন আমি জানি। তিনি এ অবস্থায় আপনার পরিবারকে ছাড়তেন না।'

'একজনের অপরাধে অন্যের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ মুসলমানরা করে না, এ অনুমতি ইসলামে নেই। ধন্যবাদ।' বলে আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে এসেছিল।

আহমদ মুসা মিলেশ বাহিনীর হেড কোয়র্টারে মূল্যবান অনেক তথ্য পেয়েছিল। তার মধ্যে মিলেশ বাহিনীর বিভিন্ন শাখা অফিসের ঠিকানা এবং লোকদের পরিচয়। এই তথ্য গুলোই আশু প্রয়োজন ছিল আহমদ মুসার।

মিলেশ বাহিনীর শাখা অফিসগুলো ভেঙ্গে দেয়া এবং পরিচয় প্রাপ্ত লোকদের পাকড়াও করার পরিকল্পনা আহমদ মুসা সেই রাতেই গ্রহণ করে। এ পরিকল্পনা মোতাবেক আহমদ মুসা, মাজুভ, জাকুব এবং সালেহ বাহমন হোয়াইট ক্রিসেন্টের কর্মীদের সাথে নিয়ে গোটা যুগোশ্লাভিয়ার এ শহর থেকে সে শহরে, এ শাখা ঘাটি থেকে সে শাখা ঘাটিতে দিনের পর দিন পাগলের মত ছুটে বেড়ান। পরিশ্রমের ফলও তারা লাভ করে। মিলেশ বাহিনীর গোটা অবকাঠামোই ভেঙ্গে পড়ে, মাত্র দেড় সপ্তাহে মিলেশ বাহিনীকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেওয়া সম্ভব হয়। সেই সাথে হোয়াইট ক্রিসেন্টের শক্তিশালী একটা কাঠামো গড়ে তোলা হয়।

এই বিজয়ের পর পরই খবর আসে বোসনিয়া ও হারজেগোভিনা রাজ্যে মুসলমানদের নির্বাচন বিজয়ের। এই বিজয়-সংবাদের উত্তপ্ত অবস্থার মধ্যেই ডেসপিনা এবং নাদিয়ার বিয়ে আনুষ্ঠিত হয়।

এ সবের মধ্য দিয়ে সপ্তাহ তিনেক সময় কোন দিক দিয়ে কেটে গেল তা বুঝতেই পারলো না আহমদ মুসা।

মাজুভের সাথে মাজুভের বোনের বাড়িতে উঠেছিল আহমদ মুসা। সেখানেই সে অবস্থান করছে। হাসান সেনজিক তার বাড়িতে যাবার জন্যে আহমদ মুসাকে অনুরোধ করেছে, জেদ করেছে, কিন্তু আহমদ মুসা যায়নি। হেসে বলেছে, স্থান পরিবর্তন না করে যেখানে এসে উঠেছি সেখানেই থাকি। যাচ্ছি তো তোমাদের বাড়িতে প্রতিদিনই। ডেসপিনা অভিমান করেছে। তার জবাবে আহমদ মুসা গম্ভীর কণ্ঠে বলেছে, বোনদের কাছ থেকে দূরে যেতেই হবে, তাই আর কাছে যেতে চাই না।

সেদিন মাজুভের বোনের বাড়িতে হাসান সেনজিক এবং সালেহ বাহমন ও ওমর বিগোভিক পরিবারের দাওয়াত ছিল।

আহমদ মুসা খুব সকালে বাইরে গিয়েছিল। ফিরল ১১টার দিকে।

ভেতরে ফ্যামিলি ড্রইংরুমে বসেছিল নাতাশা, ডেসপিনা, নাদিয়া এবং মাজুভের বোন।

আহমদ মুসা বাইরের ড্রইংরুমে এসে বসার সাথে সাথেই ডেসপিনা দরজায় পর্দার আড়ালে এসে দাঁড়াল। বলল, ভাইয়া, আপনি বেরিয়ে যাবার পরপরই ভাবী টেলিফোন করেছিলেন। ঠিক সময়ে এসেছেন, ১১টার পরেই ভাবী টেলিফোন করতে চেয়েছেন।

‘জরুরী কিছু বলেছে?’ উদ্বেগ ঝরে পড়ল আহমদ মুসার কণ্ঠে।

‘না তেমন কিছু নয় আপনি টেলিফোন করে তাঁকে পাননি, তাই তিনি টেলিফোন করেছিলেন।’ বলল ডেসপিনা। এই সময় এসে ড্রইংরুমে ঢুকল মাজুভ, সালেহ বাহমন, জাকুব এবং হাসান সেনজিক।

ওরা সবে বসেছে, এই সময়ই ভেতর থেকে নাতাশা বলে উঠল, এসেছে টেলিফোন।

মাজুভ কিছু জানত না। সে বলে উঠল, কার টেলিফোন, কিসের টেলিফোন?

‘ভাইয়ার টেলিফোন, সিংকিয়াং থেকে ভাবী করেছেন।’ বলল নাতাশা।

মাজুভ তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে নাতাশার কাছ থেকে টেলিফোনের কর্ডলেস রিসিভার নিয়ে এসে আহমদ মুসার হাতে দিল।

আহমদ মুসা টেলিফোন ধরে সালাম দিল। আমিনা সালাম নিয়ে বলল, কেমন আছ?

-ভালো।

-তুমি কাল যখন টেলিফোন করেছিলে আমি আম্মাকে নিয়ে তখন মার্কেটে গিয়েছিলাম। তুমি কবে পৌঁচেছ যুগোশ্লাভিয়ায়?

-আর্মেনিয়া থেকে এসেছি একমাস হলো। আর যুগোশ্লাভিয়ায় এসেছি ২৭দিন।

-সকালে ডেসপিনা, নাতাশা ও নাদিয়ার সাথে কথা বলেছি। তোমার প্রশংসা করতে করতেই সময় শেষ করেছে। আমি খুব খুশি হয়েছি।

-কেন? কিসে?

-কেন তোমার গৌরবে।

-গৌরব আমার নয়, তোমার। তোমার ত্যাগটাই বড়।

-কি ত্যাগ করলাম?

-কেন তোমার অধিকার ত্যাগ করেছ।

-ইস, চাইলেই তো অধিকারকে ধরে রাখতে পারতাম না।

-পারতে কিনা আমি জানি এবং তুমিও জান।

-তাই?

-কেন, এয়ারপোর্টে আসার পথে কি বলেছিলে মনে পড়েনা? তুমি আমাকে থাকতে বলোনি, সে কথা ভুলে যাচ্ছ কেন?

-তোমার এত কথা মনে থাকে! আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।

-দেখ, সব আবার ভুলে না যাও।

-আমি এক বন্দিনী, আমার গবাক্ষে আকাশ একটাই। আমি সারাক্ষন ওর দিকেই চেয়ে থাকি। আর মুক্ত বিহঙ্গ তুমি। প্রতি মুহূর্তেই তোমার কাছে নতুন আকাশ। ভোলার ব্যাপারটা তোমার ক্ষেত্রেই খাটে।

-তোমার বুঝি আশংকা হয়?

-কই তুমি তো জিজ্ঞাসা করলেনা আমি কেমন আছি?

-আমি তোমাকে বিপদে ফেলতে চাইনা।

-কেমন?

-অসত্য বলার বিপদে তোমাকে ফেলতে চাইনি। তুমি ভাল না থাকলেও বলবে ভাল আছি।

-তুমিও কি তাই বলেছ নাকি?

-আমি মিথ্যা বলিনি। ভাল থাকার অনেক দিক আছে। শরীর ভাল থাকা, মন ভাল থাকা, পরিবেশ ভাল থাকা ইত্যাদি। আমি ভাল পরিবেশে আছি।

-তার মানে তোমার শরীর ভাল নেই? উদ্বেগ ঝরে পড়ল আমিনার কন্ঠে।

-চিন্তা করোনা। আমবার্ড দুর্গে মাথায় যে আঘাত পেয়েছিলাম। সেটা এখন ভাল। আর্মেনিয়া থেকে আসার সময় বাম বাহুতে বুলেটের যে আঘাত নিয়ে এসেছিলাম সেটা সেরে গেছে। এখানে কপালের দু'পাশে আঘাত পেয়েছিলাম সেটাও এখন আর নেই। সুতরাং শারীরিক ভাবেও আমি ভাল আছি।

-আল্লাহ তোমাকে সুস্থ রাখুন। কবে আসছ তুমি?

-বলকানের কাজ শেষ। তবে তোমার কাছে ফিরতে পারছি না। আমাকে স্পেনে যেতে হচ্ছে এবং আজকেই যাচ্ছি। গতকাল তোমাকে টেলিফোন করেছিলাম একথা বলার জন্যেই। তোমার সম্মতি চাই।

-আবার চাইতে হয় বুঝি, সম্মতি কি তোমাকে দেইনি?

-দিয়েছ। তবু বার বার আমি নিশ্চিত হতে চাই আমি জুলুম করছি না। ঘরে এবং বাইরে উভয় জুলুমই সমান অপরাধের।

-তোমার কাছ থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করো না, তুমি যে কাজ করছ তা আমারও কাজ।

-ধন্যবাদ আমিনা। আল্লাহ তোমাকে জাযাহ দিন।

-স্পেনে কেন যাচ্ছ?

-মিলেশ বাহিনীর হেড কোয়ার্টারে একটা ডকুমেন্ট পেয়েছি। একটা ষড়যন্ত্র। সেটাকে কেন্দ্র করেই আমাকে যেতে হচ্ছে।

একটু থেমেই প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে আহমদ মুসা বলল, দেশের খবর বল।

-তোমাকে পেয়ে দেশের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। দেশের ভেতরের দৃশ্যটা ভালো নয়।

-কি সেটা?

-একদিকে যেমন চীনকে আরও গণতান্ত্রিক করে গড়ে তোলার চেষ্টা ছাত্র-তরুণদের মধ্যে প্রবল, অপরদিকে তেমন মাওবাদী স্বৈরতন্ত্র জিইয়ে রাখার একটা ষড়যন্ত্র কাজ করছে এবং এই ষড়যন্ত্র ক্রমেই সরকার ও প্রশাসনে প্রভাব বিস্তার করছে।

-খুব খারাপ খবর শোনালে আমিনা। যদি এই ষড়যন্ত্র উঠে দাঁড়াবার সুযোগ পায়, তাহলে সিংকিয়াংসহ মুসলিম অঞ্চলের অধিবাসীরা যে সুযোগ পেয়েছে তা হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে।

-হ্যাঁ এটাই চিন্তার বিষয়।

-আমিনা, তুমি আহমদ ইয়াংসহ সবাইকে আমার পক্ষ থেকে জানাবে তারা যেন সব রকমের পরিস্থিতির জন্যে প্রস্তুতি নেয়, প্রস্তুত থাকে।

-জানাব। আর কিছু বলবে তুমি আমাকে?

-তোমাকে একটা সুখবর জানাতে চাই। তোমাকে নিয়ে এক সাথে এ বছর হজ্জ্ব করার ইচ্ছা আছে আমার।

-আল-হামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করুন, আর সে সৌভাগ্য আল্লাহ আমাকে দান করুন।

-রাখি আজকের মত।

-আচ্ছা খোদা হাফেজ।

-আসসালামু আলাইকুম।

আহমদ মুসা সালামের জবাব দিয়ে টেলিফোন রেখে দিল।

মাজুভ, হাসান সেনজিক, সালেহ বাহমন সকলেই আহমদ মুসার পাশেই বসেছিল। আর ভেতরের ড্রইংরুমে ছিল নাতাশা, নাদিয়া, ডেসপিনা এবং মাজুতের বোন। আহমদ মুসা অনুচ্চ কন্ঠে কথা বলছিল, তবু তার প্রত্যেকটি কথাই সকলে শুনেছে। প্রথমে সবাই মজা পেয়েছে, কিন্তু যখন শুনেছে আহমদ

মুসা স্পেনে যাচ্ছে এবং আজই যাচ্ছে, তখন সকলেরই হাসিখুশী উবে গেছে, সকলেই হয়ে পড়েছে বিস্মিত এবং বিষাদে আচ্ছন্ন।

আহমদ মুসা টেলিফোন রাখার সাথে সাথে সবাই তাকে ঘিরে ধরল।

হাসান সেনজিক বলল, আপনি ভাবীকে ওটা কি কথা বললেন?

-কি কথা? বলল আহমদ মুসা।

-আপনি স্পেনে যাচ্ছেন এবং আজই যাচ্ছেন। বলল মাজুভ।

-হ্যাঁ যাচ্ছি। ম্লান হেসে বলল আহমদ মুসা।

-না আপনার যাওয়া হবে না, আজ তো কিছুতেই নয়। দৃঢ় কন্ঠে বলল হাসান সেনজিক।

আহমদ মুসা হাসল। পকেট থেকে বিমানের টিকেট বের করে টেবিলের উপর রাখতে রাখতে বলল বিকেল ৩টায় প্লেন। তোমরা জেদ করো না ভাই।

কেউ কোন কথা বলল না। সবাই একবার প্লেনের টিকেটের দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করল।

বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে সবার কন্ঠ।

অনেকক্ষণ পর হাসান সেনজিক অভিমান-রুদ্ধ কন্ঠে বলল, আমরা কি আপনার কেউ নই যে, আপনি এভাবে পালাচ্ছেন?

আহমদ মুসা হাসান সেনজিকের পিঠে একটা হাত রেখে ম্লান হেসে বলল, তুমি উল্টো কথা বলছ হাসান সেনজিক। বিদায় যেখানে কষ্টের, সেখানেই তো মানুষ পালায়। আর বিদায় কষ্টের হয় আপনজনদের কাছেই।

-না মুসাভাই আমরা আপনাকে এভাবে কিছুতেই যেতে দেব না। কান্না জড়ানো কন্ঠ হাসান সেনজিকের।

আহমদ মুসা তৎক্ষণাৎ কোন কথা বলল না। সোফায় হেলান দিল। তারপর বলল, হাসান সেনজিক তোমার মনে আছে আলবেনিয়ার সমুদ্র সৈকতে এক নিরব সন্ধ্যায় আড্রিয়াটিকের কাল বুকের উপর চোখ রেখে তুমি স্পেনের একটা গল্প বলেছিলে। এক বৃদ্ধ প্রতিদিন সন্ধ্যায় গোয়াদেল কুইভার নদীর কার্ডোভা ব্রীজের রেলিং এ এসে বসত। নিরবে তাকিয়ে থাকত কর্ডোভার ভগ্ন প্রাসাদে ‘আল কাজারের’ দিকে। অশ্রু গড়িয়ে পড়ত তার চোখ থেকে অবিরল

ধারায়। মিশে যেত তা গোয়াদেল কুইভার নদীর স্রোতের সাথে। জিজ্ঞাসা করলে সে মুখ ঘুরিয়ে চলে যেত। একদিন সে উঠে দাড়িয়ে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়নি। বলেছিল তোমাকেঃ 'আমি অতীতের এক বিধ্বস্ত অবশিষ্ট, তাকিয়ে আছি অতীতের এক ধ্বংস-স্তুপের দিকে 'আমার কান্নার আর কোন ব্যাখ্যা নেই।' আমি তোমার বলা এই বৃদ্ধের কান্নার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম হাসান সেনজিক। কিন্তু সেদিন মিলেশ বাহিনীর হেড কোয়ার্টারে যে কাগজ পত্র পেয়েছিলাম, তার মধ্যে স্প্যানিশ কু-ক্ল্যাকস-ক্ল্যানের যে কয়েকটা ডকুমেন্ট পেয়েছি তা বৃদ্ধের সেই কান্নাকে আমার সামনে আবার বড় করে তুলে ধরেছে। একটি ডকুমেন্টে স্পেনের মুসলমানদের বিরুদ্ধে ভয়াবহ এক ষড়যন্ত্রের বিবরণ আছে। স্পেনের কু-ক্ল্যাকস-ক্ল্যান মিলেশ বাহিনীর মাধ্যমে কেজিবি'কে অর্থ দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে এক বিশেষ ধরণের তেজস্ক্রিয় আমদানি করেছে। এই তেজস্ক্রিয়ের ধীর ক্রিয়া পুরো কংক্রিটের নতুন একটি বিল্ডিংকেও মাত্র ৫ বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলতে পারে। শুধু তাই নয়, এই তেজস্ক্রিয় বিল্ডিং ব্যবহারকারীদের প্রজনন ক্ষমতা ধ্বংস সহ তাদেরকে ধীর মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয় যদি যথাসময়ে তারা প্রতিকারমুলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করে। স্পেনের কু-ক্ল্যাকস-ক্ল্যান এই তেজস্ক্রিয় মাদ্রিদে কোটি কোটি ডলারের সৌদি অর্থ সাহায্যে নির্মিত মসজিদ কমপ্লেক্সের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। এছাড়া কর্ডোভা, গ্রানাডা, টলেডো, মালাগা প্রভৃতি এককালের মুসলিম সিটি গুলোতে যে মসজিদ ও ঐতিহাসিক স্থাপত্য সমূহ এখনও বর্তমান আছে সেগুলো ধ্বংসের কাজেও এই তেজস্ক্রিয় ব্যবহার করা হচ্ছে। বহু বছরের বহু চেষ্টা সাধনার পর মাদ্রিদে নতুন মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে স্পেনে মুসলমানদের যে নতুন যাত্রা শুরু হয়েছে তাকে এই ভাবে তারা ধ্বংস করতে চায়। ডকুমেন্টে কোন তারিখ নেই। এই ষড়যন্ত্রের বাস্তবায়ন কবে থেকে শুরু হয়েছে জানি না। সুতরাং ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরী। এই ষড়যন্ত্রকে যদি যথাসময়ে রোধ করা না যায়, তাহলে শুধু মসজিদগুলো ধ্বংস হবে তা নয়, মসজিদগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট গোটা মুসলিম কম্যুনিটি ধ্বংস হয়ে যাবে। হাসান সেনজিক তুমি গোয়াদেল কুউভার নদীর সেতুর উপর বসা বৃদ্ধের চোখে যে অশ্রু দেখেছ সেই অশ্রু ঐ বৃদ্ধের নয়, সেটা কর্ডোভার অশ্রু, গ্রানাডা, মালাগা,

টলেডোর অশ্রু। যদি ঐ ষড়যন্ত্র বানচাল করা না যায় তাহলে স্পেনে অশ্রুর আরেক অধ্যায় রচিত হবে। আহমদ মুসা থামল।

হাসান সেনজিক, মাজুভ, সালেহ বাহমন, জাকুব এবং ভেতরে ডেসপিনা, নাদিয়া, নাতাশা সকলেই সমোহিতের মত আহমদ মুসার কথা শুনছিল।

আহমদ মুসা থামলেও কেউ কোন কথা বলতে পারলো না। সবার মাথা নিচু, সবাই নিরব।

ভেতর থেকে ডেসপিনা কথা বলে উঠল। বলল, স্পেনে আমাদের ভাইদেরকে এ ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে দিলেই তো হয়ে যায় ভাইয়া।

'কু-ক্ল্যাকস-ক্ল্যান অত্যন্ত ভয়ংকর সংগঠন। তারা ঠান্ডা মাথায় নিরবে কাজ সারতে চাচ্ছে। কিন্তু যখনি দেখবে তাদের ষড়যন্ত্র প্রকাশ হয়ে পড়েছে, তখনি তারা হয়ে উঠবে ভয়ংকর। সাপের মত নিঃশব্দে জীবন-বিনাশী ছোবল মেরে চলবে একের পর এক।' বলল আহমদ মুসা।

সবাই শিউরে উঠল। কু-ক্ল্যাকস-ক্ল্যানের কথা কমবেশি সকলেই জানে।

ডেসপিনাই আবার কথা বলল, 'কিন্তু আপনি একা ওদের বিরুদ্ধে.......' কথা শেষ না করেই থেমে গেল ডেসপিনা।

'আমি একা কোথায়। আল্লাহ আছেন সাথে। আর ওদের আমি কিছুটা চিনি। ফিলিস্তিনে এবং মিন্দানাও-এ ওদের আমি মোকাবিলা করেছি।' বলল আহমদ মুসা।

'আচ্ছা, মুসা ভাই একটা কথা বলব। আপনার দায়িত্ব চিন্তার বাইরে এসে আপনি আপনার মনের কথা কি কখনও ভাবেন, কখনও কি ফিরে তাকান আপনার মনের দিকে?' ভারী কন্ঠে বলল হাসান সেনজিক।

'কেন, মন কি আমার মাথা থেকে ভিন্ন সংসারে বাস করে মনে কর?' হাসতে হাসতে বলল আহমদ মুসা।

'না, মুসা ভাই, ককেশাস থেকে বিদায়ের সময় সালমান শামিল, সোফিয়া এ্যাঞ্জেলাদের কান্না আমি দেখেছি, আলবেনিয়ার মোস্তফা ক্রিয়া ও সালমা সারাকায়াদের কান্নাও আমি দেখেছি, আমি শুনেছি আরো পেছনের অনেক

কান্নার কথাও। এত কান্নার স্মৃতি যার বুকে তার মন কেমন করে সুস্থ থাকতে পারে।' গম্ভীর কন্ঠে বলল হাসান সেনজিক।

আহমদ মুসা আবারো হাসল। বলল, হাসান সেনজিক, জীবনটা পায়ে চলার পথ। এ চলার পথে হাসি এবং কান্না উভয়ের সঞ্চয়ই তোমার থাকবে। সে সঞ্চয় নিয়ে তুমি হাসবে, কাঁদবে, পেছনেও ফিরে তাকাতে পার বার বার, কিন্তু থমকে দাঁড়াতে পারো না। কাল এবং জীবন উভয়ই বহমান, স্থবির নয়।

আহমদ মুসা থামলে কথা বলে উঠল নাতাশা। বলল, ভাইজান, কোন স্থান বা কারো মায়ার বাধনে বাঁধা পড়া বহমান জীবনের প্রতিকুল তো নয়।

'ঠিক। কিন্তু সামনে থেকে আরও অশ্রুর হাতছানি, আরো দায়িত্বের আহ্বান যদি টেনে নিয়ে যায় কাউকে সামনে, তাহলে সেটাও জীবনের একটা বাস্তবতা। এ বাস্তবতাকেও স্বীকার করতে হবে।' বলল আহমদ মুসা।

'মুসা ভাই, আপনি বলেছেন চলার পথে না থেমেও পেছন ফিরে তাকাতে পারি। আপনি পেছন ফিরে তাকান না? কত হাসি, কত কান্না, কত ঘটনার মিছিল আপনার পেছনে। আপনার কষ্ট হয় না?' বলল মাজুভ।

'অতীত শুধু কষ্টের নয়, অনুপ্রেরণারও। আমি অনুপ্রেরণা গ্রহণ করি অতীত থেকে।' বলল আহমদ মুসা।

'কিছুই কষ্ট লাগেনা? এই আমরা যারা আপনার এত নিকট, আমরা সবাই কি আপনার জীবন থেকে হারিয়ে যাব?' ভারি কন্ঠে বলল হাসান সেনজিক।

আহমদ মুসা তৎক্ষণাৎ জবাব দিল না। চোখ বন্ধ করে সোফায় গা এলিয়ে দিল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, হাসান সেনজিক এটাই সবচেয়ে কষ্টের যে মানুষ ইচ্ছা করলেই তার স্মৃতিকে মুছে ফেলতে পারে না। তাই মানুষের কর্মহীন দিনের অবসর মুহুর্ত এবং ঘুমহীন রাতের নিরব প্রহরগুলো অনেক সময়ই তার জন্যে পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে।'

'আচ্ছা মুসা ভাই, আপনার ঘটনাবহুল জীবনের কোন ঘটনাটি আপনার সবচেয়ে বেশী মনে পড়ে? আপনি কিন্তু এ প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্যে ওয়াদাবদ্ধ আছেন।' হেসে বলল হাসান সেনজিক।

অনেকক্ষণ পর কথা বলল আহমদ মুসা। বলল, দুঃখিত হাসান সেনজিক তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি পারছি না। কাকে ছেড়ে আমি কার কথা বলব, অতীতকে আমি এভাবে বাছাই করতে পারবো না।

'অতীত থাক, সবচেয়ে সাম্প্রতিক একটা বলুন।' জেদ ফুটে উঠল হাসান সেনজিকের কন্ঠে।

আহমদ মুসা ধীর কন্ঠে বলল, 'আমি সেদিন কনষ্টানটাইনের স্ত্রীর মুখোমুখি হতে গিয়ে খুব কষ্ট অনুভব করেছি। সে যখন বলেছে আমার উপর, আমার সন্তানদের উপর প্রতিশোধ নিলেননা কেন তখন আমার মন বেদনায় চিৎকার করে উঠতে চেয়েছে। ঠিক এ রকমই হয়েছিল আমি যখন ককেশাসের হোয়াইট ওলফের নেতা মাইকেল পিটারকে হত্যার পর তার স্ত্রী সভেতলানা এবং শিশু কন্যার মুখোমুখি হয়েছিলাম। খবর শুনেই সভেৎলানা জ্ঞান হারিয়েছিল, আর তার মা'র জ্ঞান হারানো দেখে শিশু কন্যা কেঁদে উঠে জিজ্ঞাসা করেছিল তার মা'র কি হয়েছে? অবুঝ শিশুর ঐ প্রশ্নের মুখে আমার সমগ্র সত্তা অব্যক্ত এক যন্ত্রণায় কেঁদে উঠেছি।'

বলতে বলতে আহমদ মুসার কন্ঠ ভারি হয়ে উঠল, তার দু'চোখের কোণায় দেখা দিল দু'ফোটা অশ্রু। থামল আহমদ মুসা।

সবাই নিরব। আহমদ মুসার অনুভূতি সবাইকেই যেন স্পর্শ করেছে।

পরে সালেহ বাহমন বলল, মুসা ভাই এত নরম মন নিয়ে এত কঠিন কাজ আপনি করেন কি করে? শত্রুকে, শত্রুর পরিবারকে, শত্রুর সম্পদকে ধ্বংস করাইতো সাধারণ ব্যাপার।

'না বাহমন, ইসলামে নারী, শিশুর গায়ে হাত দিতে নিষেধ করা হয়েছে। ঘোষিত যুদ্ধের সময়ও নারী, শিশু এবং শত্রুর শস্য ক্ষেতের ক্ষতি না করতে মুসলিম সৈন্যবাহিনীকে নির্দেশ দেয়া হতো।'

ভেতর থেকে এ সময় নাতাশা বলে উঠল, মুসা ভাই এর টেলিফোন।

মাজুভ কর্ডলেস রিসিভার এনে আহমদ মুসার হাতে দিল।

আহমদ মুসা টেলিফোনের মেসেজটি শুনে নিয়ে টেলিফোন রেখে হেসে বলল, বিমানের দু'ঘন্টা লেট হবার কথা ছিল তা হচ্ছেনা। এখন ঠিক সময়েই প্লেন ছাড়ছে। অর্থাৎ ১টায় বোর্ডিং।

খবর শুনে সকলের মুখেই বিষাদ নেমে এল। ভেতর থেকে ডেসপিনা ও নাদিয়া প্রায় এক সঙ্গেই ভারি কন্ঠে বলে উঠল ভাইজান, নিষ্ঠুরের মতো আপনি আমাদের কাছ থেকে পালাচ্ছেন।

আহমদ মুসা কোন উত্তর দিলনা। ম্লান হেসে সোফায় গা এলিয়ে দিল।

মাজুভ উঠে দাঁড়াল। বলল, মুসা ভাই আপনার গোছ-গাছ তো কিছুই হয়নি।

আহমদ মুসা হাসান সেনজিকের দিকে তাকিয়ে বলল, আমার কাপড়-চোপড়গুলো ব্যাগে ভরে দাও হাসান সেনজিক। আর মাজুভ ফার্ষ্ট এইডের কয়েকটা জিনিস শেষ হয়েছে। তুমি গিয়ে দেখ, কিনে আনতে হবে।

মাজুভ এবং হাসান সেনজিক ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে গেল।

সালেহ বাহমন ও জাকুব উঠতে যাচ্ছিল। আহমদ মুসা বলল, তোমরা বস তোমাদের হোয়াইট ক্রিসেন্ট সম্পর্কে আরও কয়েকটা কথা বাকি আছে।

ওরা আবার বসল।

ভেতর থেকে নাতাশা বলল, খাবার রেডি ভাইজান।

একটু থেমে নাতাশা বলল, ডেসপিনা ও নাদিয়া কাঁদছে।

'ডেসপিনা, নাদিয়া বোন, তোমাদের এ কান্না আমার জন্যে বেদনাদায়ক হবে। সব তোমরা শুনেছ। অনেক ভাই, অনেক বোনের বিপদ ও দুঃখ-বেদনার কথা স্মরণ করে তাদের সাহায্যে ভাইকে তো হাসি-মুখে তোমাদের বিদায় দেয়া উচিত।'

'মাফ করবেন আমাদের, এমনভাবে আপনি যাবেন তা আমরা কেউ ভাবিনি। আমার বাড়ি, নাদিয়ার বাড়ি কারো বাড়িতেই আপনি একদিনও থাকলেন না।' বলল ডেসপিনা কান্না জড়িত কন্ঠেই।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ঠিক আছে এবার এলে তোমাদের ওখানেই উঠবো।

বলে আহমদ মুসা সালেহ বাহমন ও জাকুবের দিকে মনোযোগ দিল।

ঠিক বেলা ১টায় বেলগ্রেড বিমান বন্দর থেকে যুগোশ্লাভ এয়ার ওয়েজের একটা বিমান আকাশে উড়ল।

নিচে গ্যাংগুয়েতে দাঁড়িয়ে আছে হাসান সেনজিক, সালেহ বাহমন, মাজুভ, জাকুব, নাতাশা, ডেসপিনা এবং নাদিয়া।

তাদের সকলের চোখ পাখা মেলে উড়ে উঠা প্লেনের দিকে। তাদের কারোরই চোখ শুকনো নেই। অশ্রু গড়াচ্ছে সবার চোখ থেকেই। প্লেনটা যতই দুরে সরে যাচ্ছে, হৃদয়ের কোথায় যেন টানটা তাদের তীব্রতর হচ্ছে।

ওদিকে প্লেনের সিটে বসা আহমদ মুসার সামনে স্পেনের মানচিত্র। আর চোখে ভাসছে কর্ডোভা, গ্রানাডা, টলেডো প্রভৃতি বিধ্বস্ত নগরীর দৃশ্য আর গোয়াদেল কুইভার নদীর সেতুতে দাঁড়ানো সেই বৃদ্ধের অশ্রু ধোয়া মুখ।

সাইমুম সিরিজের পরবর্তী বই

# কর্ডোভার অশ্রু

## কৃতজ্ঞতায়ঃ

1. Maruf Matin
2. Sohel Sharif
3. Rabiul Islam
4. AMM Abdul Momen Nahid
5. Syed Murtuza Baker
6. Nazrul Islam
7. Osman Gani
8. Sabuz Miah
9. Ashrafuj Jaman
10. Mustafijr Rahaman
11. Tuhin Azad
12. Md. Jafar Ikbal Jewel
13. A.S.M Masudul Alam
14. Esha Siddique
15. Salahuddin Nasim
16. Mohammod Amir
17. S A Mahmud
18. Anisur Rahman
19. Nabil Mahmud
20. Sharmeen Sayema
21. Hassan Tariq
22. Gazi Salahuddin Mamun
23. Muhammad Nawajish Islam
24. Ismail Jabihullah
25. Shaikh Noor E Alam

সাইমুম-১২

# কর্ডোভার অশ্রু

আবুল আসাদ

# ১

মাদ্রিদ বিমান বন্দরের মাটিতে পা রাখতেই গোটা শরীরে একটা শিহরণ খেলে গেল আহমদ মুসার। সে শিহরণের মধ্যে একটা গৌরবও আছে, কিন্তু বেদনার ভাবটাই মুখ্য। সাতশ' এগারো খৃষ্টাব্দে তারিক বিন যিয়াদ এমনি করেই স্পেনের এক প্রান্ত জাবলুত তারিকে পা রেখেছিলেন। তার সেদিনের অনুভূতি ছিল বিজেতার, এই আইবেরীয়া উপদ্বীপের মানুষকে মুক্ত করার এবং তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসার আনন্দও ছিল তার অন্তরে। কিন্তু আজ স্পেনের মাটির স্পর্শ থেকে সৃষ্ট শিহরণ আহমদ মুসার হৃদয়টাকে যেন বেদনায় মুষড়ে দিল! দূরে সরে যাওয়া, পর হয়ে যাওয়া আত্মীয়ের মুখোমুখি হওয়ার মতোই যেন ব্যাপারটা। আহমদ মুসার মনে হলো স্পেনের মাটিই যেন তাকে বিস্ময়ের সাথে চোখ তুলে দেখছে! তার চোখেও যেন অতীতের বেদনার এক অনুরণন। অনাকাঙ্ক্ষিত দখলের অধীন কেউ যেমন হঠাৎ দেখা পাওয়া মুক্ত আপনজনের প্রতি বিস্ময় আর বেদনার আকুতি নিয়ে তাকায় এ যেন ঠিক তেমনি! আহমদ মুসার মনে হলো, স্পেনের বোবা এই দৃষ্টিতে এক সাগর কথা যেন উপচে পড়ছে। যেন বলছে, অযোগ্য, অপদার্থ তোমরা পালিয়ে গেছ আমাকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করে, আজ অমন বেদনা নিয়ে তাকচ্ছ কেন?

স্পেনের মাটিতে পা রেখে আবেগে, আবেশে আহমদ মুসা হঠাৎ করে চলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। তার চোখের দৃষ্টিটা ঝাপসা হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পেছনে তখন যাত্রীর স্রোত। কে একজন পেছন থেকে তার পায়ে হোঁচট খেয়ে ‘স্যরি’ বলে উঠল। সম্বিত ফিরে পেল আহমদ মুসা। হাঁটতে শুরু করল। কিন্তু পায়ে যেন জোর পাচ্ছে না সে। হঠাৎ কেমন এক অবসাদ এসে তাকে ঘিরে ধরেছে! স্পেনের বেদনাময় অতীত যেন সবটাই এসে তার মাথায় চেপে বসেছে। দেহের প্রতিটি রক্ত কণিকায় তা ছড়িয়ে দিয়েছে অবসাদজনক এক যন্ত্রণা।

আহমদ মুসা লাগেজের অপেক্ষায় বসে ছিল। বসে বসে সে মাদ্রিদের ট্যুরিষ্ট গাইডের ওপর নজর বুলাচ্ছিল।

পাশের চেয়ারে একজন তরুনী এসে বসল। স্প্যানিশ। পরনে প্যান্ট, গায়ে শার্ট। চেহারায় নরম লাবণ্য। কিন্তু চোখে মুখে ভাব-ভংগিতে বুদ্ধি ও শক্তি যেন ঠিকরে পড়ছে!

তরুণীটি বলল, ‘মাফ করবেন, আপনি কি অধূমপায়ী?’

তরুণীটি হাতে সিগারেটের একটি প্যাকেট ও একটি লাইটার।

‘হ্যাঁ, অধূমপায়ী।’ ট্যুরিষ্ট গাইড থেকে মুখ তুলে বলল আহমদ মুসা। ‘তবে আপনি ধুমপান করতে পারেন।’

‘থ্যাংক ইউ।’ সিগারেটের প্যাকেট ও লাইটার পকেটে রাখতে রাখতে বলল মেয়েটি।

‘বললাম তো আমার অসুবিধা নেই।’

মেয়েটির দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে মুখে সামান্য হাসি টেনে বলল আহমদ মুসা।

‘থ্যাংক ইউ।‘ সংক্ষিপ্ত উত্তর মেয়েটির।

আহমদ মুসা আবার মনোযোগ দিল ট্যুরিষ্ট গাইডের দিকে। কিছুক্ষণ পর গাইডটি উল্টে পাল্টে বন্ধ করল। তারপর তরুণীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে একটু দ্বিধা করে বলল, ‘মাফ করবেন, মাদ্রিদে কি মুসলিম হোটেল আছে?’

মেয়েটি চোখ তুলে মুহুর্তকাল আহমদ মুসার দিকে চেয়ে রইল। তার চোখে কৌতুহল। বলল সে, ‘আপনি নিশ্চয় মুসলমান?’

‘হ্যাঁ।’ বলল আহমদ মুসা।

‘নিশ্চয় স্পেনেও নতুন?’

‘হ্যাঁ।’

‘কিন্তু তবু স্পেনের কথা তো আপনার জানার কথা?’

‘তা ঠিক, কিছু জানি কিন্তু সব জানি না।’

‘স্পেনে মুসলিম পরিচয় নিয়ে কোন হোটেলে ওঠা সম্ভব নয়, এটা তো সবার জানা কথা।’

‘দুঃখিত, আমি এতটা জানি না।’

‘আপনার দেশ কোথায়?’

দ্বিধায় পড়ল আহমদ মুসা। কোনটাকে তার দেশ বলবে? সে তো যাযাবর। বিভিন্ন দেশ থেকে পাসপোর্ট নিয়েছে। অবশেষে বলল, ‘আমি যুগোশস্নাভিয়া থেকে আসছি।’

মেয়েটির মুখে ছোট্ট একটা হাসি ফুটে উঠল। বলল, ‘যুগোশস্নাভিয়া থেকে স্পেন তো বেশি দূরে নয়?’

‘আমার মাতৃভুমি আরো দূরে, মধ্যএশিয়া।’

’বুঝলাম।’

লাগেজ আসতে শুরু করেছে।

‘মাফ করবেন।’ বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

মেয়েটির প্রশ্নের হাত থেকে বাঁচল। মেয়েটির প্রশ্নের হাত থেকে বাঁচতে পেরে খুশিই হলো আহমদ মুসা। কি করি, সংঘাতকালীন যুগোশস্নাভিয়া কেন গিয়েছিলাম, স্পেনে কেন এসেছি? এমন সব প্রশ্নেও সে করতে পারত।

আহমদ মুসা লাউঞ্জ থেকে কারপার্কে বেরিয়ে এসেছে। সে এক ড্রাইভারের সাথে কথা বলছে। আহমদ মুসা আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কসমৃদ্ধ শেরাটন হোটেলে ওঠাই ঠিক করেছে। এসব হোটেলে হালাল খাদ্যের ব্যাস্থা থাকে।

এই সময় তার বাম পাশেই  ধস্তাধস্তির শব্দ পেয়ে চমকে উঠে সেদিকে ফিরে তাকাল আহমদ মুসা। সে দেখল, সেই তরুনীকে দু’পাশ থেকে দু’জন জাপটে ধরেছে। মেয়েটি ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করছে। নিজেকে ছাড়াতে

পারলও সে। দু’পাশের দু’জন লোক মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। ভালো কংফু জানে মেয়েটি। কিন্তু মেয়েটি সোজা হয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই সামনে থেকে একজন ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। মেয়েটি অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সাথে ডান হাঁটুটি একটু মুড়ে, একটু নিচু হয়ে, তীব্র বেগে ডান হাতটি লোকটির তলপেটে ছুঁড়ে দিল। লোকটি কোন শব্দ না করেই জ্ঞান হারিয়ে সটান মাটিতে পড়ে গেল।

পাশে ভুমিতে গড়াগড়ি যাওয়া লোক দু’টি তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। তারা পিস্তল বের করেছে। দু’দিক থেকে দু’জন মেয়েটির পাঁজরে পিস্তল চেপে ধরে ঠেলে নিয়ে পাশের একটি মাইক্রোবাসে তুলল। গাড়ি থেকে একজন নেমে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে থাকা লোকটিকে দ্রুত তুলে নিয়ে গেল।

ভোজবাজির মতোই দ্রুত ঘটে গেল ঘটনা!

মেয়েটিকে হাইজ্যাক করে মাইক্রোবাসটি কারপার্ক থেকে বেরোবার জন্যে ছুটল সামনের দিকে।

আশেপাশের সবার মতো আহমদ মুসাও কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

মাইক্রোবাসটি চলতে শুরু করলে মেয়েটি ‘বাঁচাও’ বাঁচাও’ বলে চিৎকার করে উঠল। সম্বিত ফিরে পেল আহমদ মুসা।

ভাবল সে, স্পেনে নতুন, কিন্তু তাই বলে এমন একটা হাইজ্যাকের প্রতিবাদ সে করবে না! একটা অসহায় মেয়ের সাহায্যের আবেদনে সে সাড়া দেবে না!

‘না, তা হয় না।’ স্বগত উক্তি করল আহমদ মুসা। ‘অন্যায়ের প্রতিরোধ, ন্যায়ের আদেশ দেবার জন্যেই তো মুসলমান জাতির উত্থান।’

আহমদ মুসা  চাইল সামনেই দাঁড়িয়ে থাকা ট্যাক্সি ড্রাইভারের দিকে। দ্রুত বলল, ‘মাইক্রোবাসটিকে ফলো করবে, যাবে?’

ট্যাক্সি ড্রাইভারটি ছেলে বয়সের। সেও ঘটনাটা দেখেছে। তার চোখে মুখেও উত্তেজনা। মুহূর্তকাল ভেবে নিয়ে বলল, ‘ঝুঁকির ব্যাপার স্যার। ঠিক আছে যাব।’

‘আমি গাড়ি চালাতে চাইলে তোমার আপত্তি আছে?’ গাড়ির কাছে যেতে যেতে বলল আহমদ মুসা

‘না, নেই।’ একটু ভেবে নিয়ে বলল ড্রাইভার।

আহমদ মুসা গিয়ে ড্রাইভিং সিটে বসল। ড্রাইভার বসর পাশের সিটাতে। ট্যাক্সি ষ্টার্ট নিতে যাচ্ছে, এম সময় গাড়ির খোলা জানালা দিয়ে একটা পিস্তলের নল এসে আহমদ মুসার মাথা বরাবর স্থির হয়ে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা মাথা ঘুরিয়ে পিস্তলধারীর দিকে তাকাল। একজন ষন্ডামার্কা লোক। ডান হাতে পিস্তল বাগিয়ে ঠান্ডা চোখে তাকিয়ে আছে। আহমদ মুসা ওর দিকে তাকাতেই লোকটি বাম হাতে গাড়ির দরজা খুলে হুকুম দিল, ‘বেরিয়ে এসো।’

আহমদ মুসা দ্রুত নির্দেশ পালন করল। তার চিন্তা ফাঁকা জায়গা পেলে কিছু একটা সুযোগ হয়তো আসতে পারে।

বাইরে এসে দাঁড়াতেই পিস্তল নাচিয়ে লোকটি বলল, ‘মনে হচ্ছে তুমি বিদেশি, মরার জন্য পাখা উঠল কেন?’

বলেই কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে একটু উচ্ছ স্বরে বলে উঠল, ‘ব্লেদা এদিকে আয়, মালটাকে বেঁধে গাড়িতে তোল। যাবার সময় একটা গার্বেজে ফেলে দিয়ে যাব।’

আহমদ মুসা দেখল ওপাশের একটা প্রাইভেট কার থেকে একজন লোক বেরিয়ে এলো সরু প্লাষ্টিকের কর্ড হাতে নিয়ে।

ব্লেদা নামের লোকটি কাছে এগিয়ে আসতেই পিস্তরওয়ালা পিস্তলের নলটি নামিয়ে একটু সরে দাঁড়াচ্ছিল।

আহমদ মুসা সুযোগ নষ্ট করল না। বিদ্যুৎ গতিতে সে দ’পা এগিয়ে বাম হাত দিয়ে পিস্তলওয়ালার হাত মুচড়ে ধওে ডান হাত দিয়ে পিস্তল কেড়ে নিয়েই লোকটির কানের নিচটায় ঘাড়ে পিস্তল দিয়ে প্রচন্ড এক আঘাত করল।

লোকটি কিছু বুঝে ওঠার আগেই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। আহমদ মুসা ঘুরতে গিয়েই দেখল, গাড়ি থেকে নেমে আসা হাতে কর্ডওয়ালা লোকটি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। সরে দাঁড়ানোর সময় ছিল না। আবার গুলীও

করতে মন চাইল না তার। শুরুতেই খুনোখুনিতে জড়িয়ে পড়ে বিপদ বাড়াতে চায় না সে।

আহমদ মুসা বসে পড়ায় লোকটি ভারসাম্য হারিয়ে আহমদ মুসার মাথার ওপর দিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল।

দ্রুত উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

উপুড় হয়ে পড়ে যাওয়া লোকটির মুখ ভীষণভাবে ঠোকা খেয়েছে লনের নগ্ন একটা পাথরের সাথে। ঠোঁট কেটে গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছে।

নেকড়ের মতো হিংস্র দৃষ্টি নিয়ে লোকটি উঠে দাঁড়াচ্ছিল।

আহমদ মুসা তার দিকে পিস্তল তাক করে কঠোর কন্ঠে বলল, 'মাথা গুঁড়ো করে দেব, যেমন পড়ে আছ ঠিক তেমনি পড়ে থাক।'

বলে আহমদ মুসা দ্রুত পেছন হতে বাম হাতে ব্যাটি তুলে নিয়ে কর্ড হাতে লোকটি যে প্রাইভেট কার থেকে বেরিয়ে এসেছিল সেই গাড়িতে গিয়ে উঠল। তারপর দ্রুত গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে এলো কারপার্ক থেকে। একবার পেছন ফিরে দেখল, মাটিতে পড়ে থাকা লোকটি উঠে ছুটে যাচ্ছে সংজ্ঞাহীন লোকটার দিকে। আহমদ মুসা বুঝল, লোকটি তার সাথী জ্ঞান না ফিরিয়ে তার পিছু নিতে আসবে না।

বিমান বন্দর থেকে বেরিয়ে আসা তীরের মতো সোজা রোড ধরে ঝড়ো বেগে এগিয়ে চলছিল আহমদ মুসার গাড়ি।

পকেট থেকে মাদ্রিদের ট্যুরিষ্ট গাইড বের করে বাম হাতে রেখেছে, ডান হাতে তার ষ্টিয়ারিং হুইল।

আহমদ মুসা দেখল, বিমান বন্দর থেকে বেরিয়ে আসা রোডটি বড় একটা হাইওয়েতে পড়েছে। হাইওয়েটি পশ্চিমে মাদ্রিদ শহরে প্রবেশ করেছে। আর হাইওয়ে ধরে পূর্বদিকে এগোলে প্রথম যে ছোট্ট শহরটি পাওয়া যায় তার নাম টারজন ডে আরগোজ। আহমদ মুসা নিশ্চিত হলো মেয়েটিকে নিয়ে হাইজ্যাকররা মাদ্রিদেই যাচ্ছে। এর আর একটি বড় কারণ হলো, এরা চুনোপুঁটি হাইজ্যাকার নয়। যারা একটা মাইক্রোবাস, একটা প্রাইভেট কার নিয়ে হাইজ্যাক করতে যায়, যারা বিমান বন্দরের কারপার্কে গিয়ে হাইজ্যাক করতে সাহস করে, পেছন থেকে

একটা পাহারায় রেখে আসার মতো আঁটঘাট বেঁধে যারা কাজ করার বুদ্ধি রাখে, তারা ছোটখাট হাইজ্যাকার নয়। রাজধানীতেই তাদের মানায়। সুতরাং মাদ্রিদের রাস্তা ধরে এগোবারই সিদ্ধান্ত গ্রহন করল আহমদ মুসা।

মাদ্রিদগামী বিমান বন্দর রোডটি বেশ প্রশস্ত। গাড়ি-ঘোড়াও বেশ কম। আহমদ মুসা গাড়ির বেগ বাড়িয়ে দিল। গাড়ির গতি যখন ১৪০ কিলোমিটার উঠল তখনও মনে হলো গাড়ির গতি আরও বাড়ানো যায়। খুশি হলো আহমদ মুসা। গাড়িটি নতুন আমেরিকান গাড়ি। বেশ মজবুত।

হাইজ্যাককারীর মাইকোবাসটি সাদা। তার নাম্বার এখনও জ্বলজ্বল করছে আহমদ মুসা সামনে। আহমদ মুসার দৃষ্টি সামনে প্রসারিত। একের পর এক গাড়িকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলছে আহমদ মুসার গাড়ি।

দশ মিনিট চলার পর আহমদ মুসা সাদা মাইক্রোবাসটিকে দেখতে পেল। উজ্জ্বল হয়ে উঠল আহমদ মুসার মুখ। তাহলে হাইজ্যাকররা খুব বেশি এগোতে পারেনি! পেছনে পাহারা দেবার লোক আছে যেহেতু এবং সম্ভবত তাদের পিছু নেবে কেউ এমন আশংকা করে না বলেই তারা নিশ্চিত মনে মাঝারি চালে গাড়ি চালাচ্ছে।

আরও মিনিট খানেকের মধ্যে আহমদ মুসার গাড়ি মাইক্রোবাসটির একশ' গজের মধ্যে পৌছালো।

মাইক্রোবাসটির গতি হঠাৎ স্লো হয়ে গেল। সংগে সংগে আহমদ মুসাও তার গাড়ির গতি স্লো করে দিল। এই সময় মাইক্রোবাসটিতে কয়েকবার হর্ন বেজে উঠল। তারপরই আবার দ্রুত চলতে শুরু করল মাইক্রোবাসটি।

চককে উঠল আহমদ মুসা! মাইক্রোবাসটি কি তাকে সন্দেহ করল? মাইক্রোবাসটির শক্তিশালী রিয়ারভিউ মিররে ১০০ গজ পেছনের তার এই গাড়ি অবশ্যই ধরা পড়ার কথা। পেছনে নিজেদের গাড়ি দেখেই কি তাহলে গতি ওভাবে স্লো করে দিয়েছিল? মাইক্রোবাসটির সামনে তো কোন গাড়ি ছিল না, তাহলে হঠাৎ হর্ন বাজিয়েছিল কেন? ওটা কি ওদরে কোন সংকেত ছিল? সংকেতের জবাব না পেয়ে কি তারা ধরে নিয়েছে তাদের গাড়ি শত্রু পক্ষের হাতে পড়েছে?

আহমদ মুসা নিশ্চিত হলো, সে ওদের অনুসরণ করছে এটা ওদের কাছে ধরা পড়ে গেছে। ওরা এখন পালাচ্ছে।

আহমদ মুসাও তার গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল। প্রায় ১০০ গজের মতো পেছনে থেকেই আহমদ মুসার গাড়ি মাইক্রোবাসটিকে অনুসরণ করে চলল।

মিনিট পাঁচেক চলার পর মাইক্রোবাসটি হাইওয়ে থেকে নেমে অপেক্ষাকৃত একটা ছোট রাস্তা ধরে ধরে দক্ষিণ দিকে ছুটতে লাগল।

রাস্তাটি আরও নির্জন। গাড়ির চলাচল খুব কম। যতই সামনে এগোতে লাগল গাড়ির চলাচলের সংখ্যা মনে হলো আরও কমে যাচ্ছে। এলাকাটি মাদ্রিদের উপকন্ঠ, কিন্তু রেসিডেন্সিয়াল কিংবা শিল্প এলাকা নয়। মাঝে মাঝে টিলা, আর মধ্যে বড় বড় কৃষি ক্ষেত। দু'পাশে ক্ষেত রেখে মাঝের রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছে গাড়ি।

জলপাই গাছে ঢাকা একটা ছোট্ট টিলার মুখে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল মাইক্রোবাসটি।

আহমদ মুসা দাঁড়াবে কি না ভাবল। ভাবতে ভাবতেই প্রায় মাইক্রোবাসটির কাছাকাছি পৌছে গেল সে।

মাইক্রোবাসটি থেমেছে, কিন্তু কেউ গাড়ি থেকে বের হয়নি।

মাইক্রোবাসটির গড় দশের পেছনে থাকতেই আহমদ মুসা গাড়ির ব্রেক কষল।

ব্রেক কষতে গিয়ে রিয়ার ভিউতে চোখ পড়তেই ভুত দেখার মতো চমকে উঠল আহমদ মুসা! পেছনে থেকে একটা জীপ গাড়ি তার প্রায় ঘাড়ের ওপর এস পড়েছে। মাইক্রোবাসটির ওপর নজর থাকায় এতক্ষণ সে পেছনে খেয়ালই করেনি। নিজের বোকামিটাও এখন তার কাছে ধরা পড়ে গেল। শত্রু পিছু নিয়েছে একথা জানার পর সামনের মাইক্রোবাস যে অয়্যারলেসে তার বিপদের কথা নিজের লোকদের জানাতে পারে, তারা পেছন থেকে আহমদ মুসার ওপর যে চড়াও হতে পারে, আহমদ মুসাকে এ ধরনের ট্র্যাপে ফেলার জন্যেই যে এমন নির্জন, ফাঁকা জায়গায় নিয়ে আসছে, এসব কথা আহমদ মুসার আগেই আঁচ করা উচিত ছিল।

পেছনের জীপটি থামতেই চারজন চারটি পিস্তল হাতে জীপ থেকে লাফিয়ে পড়ল। ওদিকে সামনের জীপ থেকেও দু'জন নেমে এসেছে। ওদেও হাতেও পিস্তল।

আহমদ মুসার খালি হাত। জুতার খোলে ছোট একটি ছুরি আছে, একটা ল্যাসার কাটার আছে। ওগুলো দিয়ে এখানে লড়াই করা যাবে না। আর লোকগুলোকে নিছক হাইজ্যাকার মনে হচ্ছে না। ওদের ঠান্ডা মাথা, ঠান্ডা চোখ দেখে মনে হচ্ছে ওরা দক্ষ প্রফেশনাল। অয়্যারলেস ব্যবহারের যোগ্যতা যাদের আছে, তাদেরকে ছোট করে দেখার কোন অবকাশ নেই।

আহমদ মুসা শান্ত, নিরীহ মানুষের মতো গাড়ি থেকে নেমে মাইকোবাসের দিকে চলল। তার পেছনে চারজন পিস্তরধারী।

আহমদ মুসা মাইক্রোবাসের দরজার কাছে দাঁড়ানো দীর্ঘকায় লোকটির মুখোমুখি হয়ে মুখে একটু হাসি টেনে শান্ত কন্ঠে বলল, 'একজন নিরস্ত্র লোকের জন্যে এত আয়োজন?'

মাইক্রোবাসের খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, মেয়েটি হাত, পা, মুখ বাঁধা অবস্থায় সিটে বসে আছে। সে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয়েছে। হয়তো সে ভাবতে পারেনি, বিমান বন্দরে দেখা হওয়া সেই বিদেশি তার উদ্ধারের জন্যে ছুটে আসতে পারে!

আহমদ মুসা দাঁড়ালে পিস্তলধারীরা এসে তাকে ঘিরে ফেলল।

'তুমি কে, তুমি কি চাও?' আহমদ মুসার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে দীর্ঘকায় লোকটি পাল্টা প্রশ্ন করল।

'আমি একজন বিদেশি। আমার চোখের সামনে থেকে একটি মেয়েকে হাইজ্যাক করা হলো, আমি তাকে উদ্ধার করতে এসেছি।' বলল আহমদ মুসা

'আমাদের গাড়ি কোথায় পেলে? আমাদের দু'জন লোককে কি করেছ?'

'ওদের ওখানে রেখে গাড়ি নিয়ে চলে এসেছি।'

'কী সুন্দর কথা! যেন তারা গাড়ি ওর হাতে তুলে দিয়েছে। ওস্তাদ, লোকটা মনে হচ্ছে ধাড়ি শয়তান!' পেছন থেকে বলল একজন পিস্তলওয়ালা।

‘ঠিক আছে, সব শয়তানকেই আমরা ঠিক করতে জানি। একে বেঁধে গাড়িতে তোল। আর দু’জন বিমান বন্দরে চলে যাও। খোঁজ নাও ওদের।’ বলে দীর্ঘকায় লোকটি মাইক্রোবাসের সামনের সিটে গিয়ে উঠল। আহমদ মুসাকে বাঁধতে বাঁধতে একজন বলল, ‘ব্যাটা! আরেকজনকে উদ্ধার করতে এসেছিলি, একন তোকে উদ্ধার করে কে?’

ওর কথার ঢংয়ে আহমদ মুসার মুখ ফুটে হাসি বেরুল। সে আরও ভাবল, এই মুহুর্তে এর হাতের পিস্তলটি কেড়ে নিয়ে কয়েকজনকে শেষ করতে পারে, নিজে পালিয়েও যেতে পারে, কিন্তু মেয়েটির তো উদ্ধার হবে না।

আহমদ মুসার হাসি দেখে সম্ভবত লোকটির আত্মসম্মানে ঘা লেগেছিল। সে আহমদ মুসার হাত বাঁধা শেষ করে  তার নাকের ওপর প্রবল ঘুষি চালিয়ে বলল, ‘আমাদের বুঝি পছন্দ হচ্ছে না, চল দেখিয়ে দেব।’

আহমদ মুসার নাক ফেটে গল গল করে রক্ত বেরিয়ে এলো। কিন্তু আহমদ মুসা মুখে হাসি টেনেই বলল, ‘আমার ভুল হয়েছে, যারা দুর্বল নারীদের হাইজ্যাক করে তাদের বীর ভাবা উচিত।’

পিস্তল উঁচিয়ে আর একজন পিস্তলধারী এগিয়ে এলো। বলল, ‘ব্যাটা ব্ল্যাক ডগ, তোর কাছে আমাদের নীতি শিখতে হবে না।’

বলে ধাক্কা দিয়ে আহমদ মুসাকে মাইক্রোবাসে উঠিয়ে দিল।

মেয়েটির পাশেই জায়গা হলো আহমদ মুসার।

মেয়েটির মুখ বিস্ময় ও বেদনায় ছেয়ে আছে। সবচেয়ে তাকে বিস্মিত করেছে, আহমদ মুসার ভয়হীন, নিরুদ্বিগ্ন মুখ ও সহজ হাসি। এ সময় তো ভয় ও উৎকন্ঠায় মুষড়ে পড়ার কথা! ঘুষি খেয়ে তার নাক ফেটে গেল, রক্তে ভেসে গেছে, এরপরও কত সহজ ও নির্ভয়ে কথা বলছে সে! সাধারন নার্ভ নিয়ে এটা সম্ভব নয়।

মাইক্রোবাসটি চলতে শুরু করেছে।

আহমদ মুসার পাশে দরজার কাছে একজন পিস্তলধারী বসেছে। আর দু’জন পিস্তলধারী পেছনের সিটে।

প্রান্তরের রাস্তা ধরে মাইক্রোবাস পশ্চিম দিকে এগোচ্ছে। আহমদ মুসা বুঝল, তারা মাদ্রিদে যাচ্ছে।

সামনের সিট থেকে দীর্ঘকায় লোকটি মাথা ঘুরিয়ে আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, ‘বিদেশি, মরবার জন্যে তোমর পাখা উঠেছিল বুঝি?’

‘মানুষ পিপীলিকা নয়।’ বলল আহমদ মুসা।

‘তাহলে তোমার পাখা বাঁচার জন্যে উঠেছে, না?’

‘একজনের বিপদে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছি।’

‘আমরা একজন মানুষ হাইজ্যাক করেছি, তুমিও তো একটা গাড়ি হাইজ্যাক করেছ।’

নাক থেকে আসা রক্ত বার বার মুখে এসে পড়ছিল। বাঁধা হাত দিয়েই বার বার মুছতে হচ্ছে। বাঁধা হাত দু’টি তুলে ঠোঁটের ওপর নেমে আসা রক্ত আরেকবার মুছে আহমদ মুসা বলল, ‘আমি করেছি সেটা অপরাধ নয়, আপনাদের কৃত অপরাধেরই একটা ফল।’

‘বাহ্, চমৎকার যুক্তি।’

থামল লোকটি। একটু থেমেই আবার মুখ খুলল, ‘হাইজ্যাক করব না কেন? এমন অপরূপা তুমি কয়জন দেখেছ, তুমিই বলো।’

লোকটির মুখে চটুল হাসি।

‘এ জঘন্য কথার আমি কোন জবাব দেব না।’

‘জঘন্য বলছ, তুমি ফেরেস্তা নাকি? দেখব, ঠিক আছে।’

’আমি মানুষ, তবে প্রত্যেক মানুষের অধিকারকে আমি শ্রদ্ধা করি।’

‘আমার অধিকারকেও?’

’অবশ্যই।’

‘মেয়েটিকে আমার ভালো লেগেছে, ওকে হাইজ্যাক করা আমার অধিকার।’ তার মুখে আবার চটুল হাসি।

‘আমার ভালো লাগছে বলেই কাউকে আমি খুন করতে পারি না।’

লোকটি উত্তর দিল না। অল্পক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, ওরা ঠিকই বলেছে, তুমি সাংঘাতিক ঘড়েল লোক। এমন বিপদে এমন ঠান্ডা মাথা কাউকে তো আমি দেখিনি। কিন্তু জেনে রেখো, তোমার চেয়েও লাখো গুণ বড় ঘড়েলের হাতে পড়েছ। জান আমরা কে?’ লোকটির কথায় ক্রোধ ফুটে উঠেছে।

‘আগে জানতাম না। এখন মনে হয় বুঝতে পারছি।’

‘কি বুঝতে পেরেছ?’ লোকটি চমকে উঠে মুখ ফেরাল।

আহমদ মুসা নিজেকে সামলে নিল। ওরা যে ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্লানের লোক সে পরিস্কার বুঝতে পেরেছে। পাশের লোকটির পিস্তলের বাঁটে সাদা রংয়ের ছোবল-উদ্যত সাপের মাথা আঁকা। এটা ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের মনোগ্রাম। কিন্তু তাদের পরিচয় যে আহমদ মুসা জানতে পেরেছে, এ কথা এত তাড়াতাড়ি প্রকাশ করা ঠিক মনে করল না। সে চুপ করে রইল, লোকটির প্রশ্নের কোন জবাব দিল না।

‘কি বুঝতে পেরেছ, বল?’ লোকটি পিস্তল নাচিয়ে ধমকে উঠল।

তবু আহমদ মুসা দ্বিধা করল, কোন মিথ্যা কথা বলতে তার বিবেকে বাঁধল।

লোকটি এবার আহমদ মুসার মাথা বরাবর পিস্তল তাক করে বলল, ‘দেখ, প্রশ্নের জবাব না দিলে এখনি মাথা উড়িয়ে দেব।’

পাশের মেয়েটির মুখ পাংশু হয়ে উঠল। সে আর্ত কন্ঠে বলল, ‘বলুন, ওরা সব করতে পারে।’

আহমদ মুসা মেয়েটির দিকে একবার তাকিয়ে হেসে উঠে বলল, ‘ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান’ এর লোকেরা তাদের পরিচয়ের ব্যাপারে এত স্পর্শকাতর তাতো জানতাম না।’

‘আমরা ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান,’ কে তোকে বলল।

‘বলার তো দরকার নেই, এই যে পিস্তলের বাঁটে সাপের মাথায় মনোগ্রাম দেখেই বুঝতে পেরেছি।’

লোকটির মুখ কিছুক্ষণ বিস্ময়ে হাঁ হয়ে থাকল। তারপর বলল, ‘এটা যে ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান এর মনোগ্রাম তা তুমি জানলে কেমন করে?’

আহমদ মুসা কথা সাজিয়েই রেখেছিল। বলল, ‘দেখুন, আমি লেখাপড়া জানি। দুনিয়ার ইতিহাস আমি ঘাঁটাঘাঁটি করি বলে বিভিন্ন খোঁজ-খবর রাখা আমার নেশা। ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান বিয়ষটা খুব গোপন কিছু নয়।’

লোকটি তৎক্ষনাৎ কোন কথা বলল না।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'বিদেশি, তুমি অনেক বিষয় জান। কিন্তু এটা জান না, পরিচয় জানার পর ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের হাত থেকে ছাড়া পাওয়া তোমার জন্যে এখন কঠিন হয়ে গেল?'

'কেন?'

'কেন? আমরা তোমাকে ভালো মানুষ ঠাওরে ছেড়ে দিই আর তুমি বাইরে গিয়ে এখন বলে দাও, বাসক গেরিলা প্রধানের বোন আমাদের হাতে বন্দী, তা হয় না।'

মেয়েটি বাসক গেরিলাপ্রধানের বোন শুনে আহমদ মুসা সবিস্ময়ে মেয়েটির দিকে চোখ ফেরাল। মেয়েটিও তখন তাকিয়েছে। চোখাচেখি হলো। এই পরিচয় শুনে মেয়েটির প্রতি মমতা ও সহানুভুতি যেন আরও বেড়ে গেল আহমদ মুসার!

'হ্যাঁ, আমি বাসক গেরিলাপ্রধান ফিলিপের বোন।' ওরা আহমদ মুসা ও মেয়েটিকে জানালাহীন এ কক্ষটিতে ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে চলে যেতেই বলল মেয়েটি।

'আপনি কিন্তু আপনার পরিচয় বলেননি। এরপরও আমাকে উদ্ধারের ইচ্ছা আপনার থাকবে?' মেয়েটি শেষ করল তার কথা।

'বাস্ক গেরিলাদের সম্পর্কে আমি বেশি কিছু জানি না, কিন্তু এঁকু জানি উত্তর স্পেনের পিরেনিজ পাদদেশের কাটালোনিয়া ও ভাসেলিয়া প্রদেশে স্বাধিকারের যে আন্দোলন ছিল, সেটাই বাস্করা আজ করছে এবং তা করতে গিয়ে তারা অমানুষিক ত্যাগ স্বীকার করছে।' বলল আহমদ মুসা।

থামল আহমদ মুসা। একটু থেমেই আবার শুরু করল, 'কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান- এর সাথে আপনাদের বিরোধ কেন?'

'কারন হলো,' শুরু করল মেয়েটি, 'স্পেনের ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান-এর লোকজন ও সরকার একই লবীর, একই স্বার্থের ভাগীদার। তাই বাস্কদের

আন্দোলন ধ্বংস করতে ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় সাহায্যই সরকারকে দিয়ে যাচ্ছে। জঘন্য এরা। বেনামীতে আমাদের লোকদের পণবন্দী করে এরা বহু টাকাও কামাই করেছে বাস্কদের কাছ থেকে।'

'আপনাকে কিডন্যাপ করার কি টার্গেট ওদের? বলল আহমদ মুসা।

'গাড়িতে ওদের আলাপে যতটুকু বুঝেছি, 'ব্ল্যাক সেভেন' নামে একটা গ্রুপের ছন্মনামে আমার ভাইয়ার কাছ থেকে এক কোটি টাকা দাবী করবে। ভাইয়াকে এসে নির্দিষ্ট লোকের কাছে এই টাকা হস্তান্তর করতে হবে। তাদের মূল টার্গেট হলো ভাইয়াকে হাতের মুঠোয় আনা। ভাইয়া হাতে এলে আমাদের দু'জনকে ওরা তুলে দেবে সরকারের হাতে তিন কোটি টাকার বিনিময়ে।'

'আপনার ভাইয়া যদি টাকা দিতে না আসেন?'

'তারা জানে, ভাইয়া আসবেন। আমি তার একমাত্র বোন। আমাকে মুক্ত করার জন্যে তিনি জীবনও দিতে পারেন।'

'ধাপনি একা এতটা অসাবধানে এলেন কেন?'

'আমি আসছি জার্মানি থেকে, সেখানে পড়ি। গতকাল এসে পৌঁছানোর কথা ছিল, তার জন্যে এখানে ব্যবস্থাও ছিল। কিন্তু ট্রানজিটে অসুবিধা হয়েছে। ১২ ঘন্টা দেরিতে ফ্লাইট পেয়েছি। একথা আর জানাবার সুযোগ হয়নি।'

'তাহলে আপনার মূল্য এখন তিন কোটি টাকা!' গম্ভীর কন্ঠে বলল আহমদ মুসা।

'আমি আমার কথা ভাবছি না, ভাবছি ভাইয়াকে নিয়ে।' মেয়েটির কন্ঠে যেন কান্না ঝরে পড়ল!

আহমদ মুসা মাথা নিচু করে চুপ করে ছিল। উস্কোখুস্কো তার চুল, চেহারাটা বিধ্বস্ত।

দু'জনের হাত-পা তখনও বাঁধা। হাত পিছমোড়া করে বেঁধে রেখে যাওয়ায় হাত কোন কাজেই লাগছিল না।

ঘরটা বেশ বড়। জানালা না থাকলেও অনেক উঁচুতে ছাদের কাছাকাছি জায়গায় দু'পাশের দেয়ালে দু'টা ঘুলঘুলি আছে। ঘরের এক কোণে ছোট একটা লোহার খাটিয়া। দু'টো কম্বল সেখানে।

আহমদ মুসা মেয়েটিকে বলল, বোন, তুমি অনেক পরিশ্রান্ত! ঐ খাটিয়ায় গিয়ে একটু বিশ্রাম নাও। অবস্থাকে আমাদের মেনে নিতে হবে।’

‘আপনি? আপনি তো আহত এবং আমার জন্যেই আপনার এই দুর্দশা।’ নরম কন্ঠে বলল মেয়েটি।

‘আমি এই মেঝেতেই দিব্যি ঘুমাতে পারব। আমার আহত হওয়ার কথা বলছ? একে আমি কিছুই মনে করি না।’

মেয়েটি বিস্ময়-বিমুদ্ধ চোখে তাকিয়েছিল আহমদ মুসার দিকে। অত্যন্ত শরিফ, শান্ত, সরল চেহারা লোটির। কিন্তু যে সাহস ও নির্ভীকতা সে এর মধ্য এ পর্যন্ত দেখেছে তা তার কাছে অকল্পনীয়। চূড়ান্ত বিপদ, জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে মানুষ অত ঠান্ডা, অত স্বাভাবিক থাকতে পারে, না দেখলে তার কোনদিনই বিশ্বাস হতো না। আর সাহসের সাথে তার শক্তি ও বুদ্ধি না থাকলে দু’জনকে কুপোকাত করে তদের গাড়ি ছিনিয়ে সে এসে পড়তে পারল কেমন করে!

মেয়েটি চোখ আহমদ মুসার ওপর থেকে না নামিয়েই জিজ্ঞেস করল, ‘আপনি কে তা কিন্তু জানা হয়নি। আমার কথাই শুধু আমি বলেছি।’

আহমদ মুসা ঘরের লোহার দরজাটাকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করছিল। মেয়েটির কথা কানে গেলে মুখটা ঘুরিযে মুহুর্তকাল মেয়েটির দিকে চেয়ে ইশারায় জিজ্ঞাস করতে নিষেধ করল।

মেয়েটি বিস্মিত হলো। কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু আহমদ মুসা তাকে কথা বলতে না দিয়ে বলল, ‘চিন্তার কিছু নেই, আমাদের সব কথা ওরা শুনতে পাচ্ছে, কিছু চাইলে ওরা সংগে সংগেই জানতে পারবে।’

মেয়েটি ব্যাপারটা এবার বুঝতে পেরেছে। হাসল। আহমদ মুসা তার পরিচয় ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানকে জানাতে চায় না বলেই তা না জিজ্ঞেস করার জন্যে ঐভাবে ইংগিত করল। কিন্তু এটা বুঝতে পেরে মেয়েটির ঔৎসুক্য আরও বেড়ে গেল। লোকটির এমন কি পরিচয় আছে যা ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানকে জানানো যাবে না? মেয়েটির মনে পড়ল লোকটির নামটিও তো জানা হয়নি এবং তার নামও তো লোকটি এখনও জানে না।

মেয়েটি বলল, ‘আমরা কেউ কারো নামও তো জানি না।’

‘আপনি ঐ খাটিয়ায় গিয়ে বিশ্রাম নিন!’ মেয়েটির কথার দিকে কান না দিয়ে বলল আহমদ মুসা।

মেয়েটির মুখটি এবার মলিন হয়ে উঠল।

মেয়েটি ক্ষুণ্ন হয়েছে বুঝতে পেরে আহমদ মুসা নরম সান্তবনার সুরে বলল, ‘যাও বোন! বিশ্রাম নাও, সামনে অনেক কথা বলার সময় হবে।’ আহমদ মুসার কথায় মেয়েটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বসে বসে অনেক কষ্টে খাটিয়ার দিকে এগোলো।

আহমদ মুসা সবে কাত হয়েছে মেঝের ওপর। এই সময় কক্ষের দরজা খোলার শব্দ হলো। আহমদ মুসা শুয়েই থাকল, উঠল না।

খুলে গেল দরজা।

সেই দীর্ঘকার লোকটি ঘরে প্রবেশ করতে করতে বলল, ‘সুন্দর, সজ্জিত ঘরে তোমার হানিমুনটা কেমন লাগল? তোমার জন্যে দুঃসংবাদ, বিদেশি! সামনে কথা বলার অনেক সময় তোমরা পাবে না। কালকে সকালেই বাস্ক-নন্দিনী মারিয়া ফিলিপ যাচ্ছে আরও বড় জায়গায়, আর তোমাকেও যেতে হবে রাজধানী থেকে দূরে আরও একটু নিরিবিলি জায়গায়।’

লোকটির পেছন পেছন দু’জন প্রহরী এবং আরও একজন লোক ট্রলি করে খাবার নিয়ে প্রবেশ করল!

লোকটি কথা শেষ করেই পেছন ফিরে প্রহরীদের লক্ষ্য করে বলল, ‘ওদের হাত দুলে দে, খেয়ে নিক।’

আহমদ মুসা ও মারিয়া ফিলিপের হাত খুলে দিল প্রহরী এসে। পা তাদের বাঁধাই থাকল।

মারিয়া খাটিয়ায় বসে এবং আহমদ মুসা মেঝেতে বসে খেয়ে নিল।

আহমদ মুসারা যখন খাচ্ছিল, তখন দীর্ঘকার লোকটি বলল, ‘দেখো বিদেশি! ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের অনেক বদনাম আছে, কিন্তু পেটে খেলে পিঠে সয়-’ এ নিয়ম ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান মেনে চলে।’

‘কেন পিঠে আমাদের কিছু সইতে হবে নাকি?’ বলল আহমদ মুসা।

‘তোমার পরিচয় তুমি বলনি, এমন কি মারিয়াকেও বললে না, তোমার কপালে দুঃখ আছে। কাল টের পাবে বসের কাছে গেলে। আর উনি তো আমাদের বড় মেহমান।’

‘তিন কোটি টাকা দামের মেহমান, তাই না?’

‘তুমি সব জেনেছ মারিয়ার কাছ থেকে, কিন্তু জানাটা তোমার জন্যে কাল হলো। কেউ এভাবে ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের ভেতরে ঢোকার পর আর প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারে না।’

‘ফিরে, যেতে পারা না পারা সবটাই কি তোমাদের হাতে?’

‘কেন, তোমার সন্দেহ আছে এতে? বের হবার একবার চেষ্টাই করো না, হয় কুকুরের মতো গুলী খেয়ে মরবে, না হয় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েও প্রাণ দিতে পার। আর বন্দীখানা থেকে এ পর্যন্ত কেউ বেরুতেই পারেনি। তোমার মতো একশ’জনও এ দরজা ভাঙ্গতে পারবে না। আর খুলতে পারলেও কোন লাভ হবে না। চৌকাঠের কব্জার ওপর কোন প্রকার চাপ পড়ালেই চারদিকে এলার্ম বেজে উঠবে।’ গর্বের সাথে কথাগুলো বলল লোকটি। আহমদ মুসা গ্রোগ্রাসে কথাগুলো গিলল।

খাওয়া শেষ হলে পরিবশেনকারী লোকটি বাসনপত্র গুছিয়ে নিয়ে ট্রলি ঠেলে বেরিয়ে গেল।

আহমদ মুসা ও মারিয়ার হাত আবার শক্ত করে বাঁধা হলো।

দীর্ঘকায় লোকটি বলল, ‘আমরা দুঃখিত! বাথরুম ব্যবহার করতে তোমাদের একটু অসুবিধা হবে, এ শেষ মধুযামিনীটাও তোমাদের জন্য আরামদায়ক হবে না। কিন্তু কি করব? আমরা ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের বন্দীখানার এটাই যে নিয়ম।’

‘হাত পা খোলা রাখলে ক্ষতি কি ছিল, ঘরের সব কিছু তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ!’ বলল আহমদ মুসা।

’না, বন্দীখানায় আমরা টিভি ক্যামেরা ফিট করিনি। কি দরকার ঝামেলা বাড়িয়ে, বেঁধে ফেলে রাখব সবদিক দিয়ে সেই ভালো।’

আহমদ মুসা ও মারিয়ার হাত বেঁধে ফেলার পর প্রহরীরা গিয়ে দরজায় দাঁড়িয়েছিল।

লোকটি কথা শেষ করে দরজার দিকে এগোতে এগোতে বলল, 'শুভরাত্রি।'

'শুভরাত্রি!' আহমদ মুসা বলল। তার ঠোঁটের কোণ হাসি।

দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ওদের পায়ের শব্দও মিলিয়ে গেল।

মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ ভাবল আহমদ মুসা।

তারপর দেয়াল ঘড়িটার দিকে তাকাল। দেখল রাত দশটা।

আহমদ মুসা মারিয়ার দিকে চেয়ে বলল, 'আপনি শুয়ে পড়ুন। এখন একটু বিশ্রাম খুব জরুরী।'

মেয়েটি বাঁধা গা দু'টি তুলে খাটিয়ার ওপর বসেছিল। তাকিয়েছিল আহমদ মুসার দিকেই। বলল,' আমাকে আপনি না বললে খুব খুশি হবো।'

তারপর একটু থেকে আবার বলল, 'একটা কম্বল আপনি নিন। কিন্তু কিভাবে দেব?'

'দরকার নেই, আমি ঘুমুচ্ছিনা।'

'ঘুমাবেন না, কেন?'

'এমন অবস্থায় আমার ঘুম আসে না।' বলে আহমদ মুসা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে চোখ ও মুখ নেড়ে ইশারা করল কথা না বলার জন্যে।

মারিয়া ইশারা বুঝল। আর কোন কথা সে বলল না।

আহমদ মুসা আগেই ঠিক করে ফেলেছে, যেমন করে হোক, আজকেই পালাতে হবে। মেয়েটিকে অন্যত্র সরালে তাকে উদ্ধার করা কঠিন হবে।

আহমদ মুসা নিজের বাঁধন খোলার দিকেই প্রথম মনোযোগ দিল।

হাত পা এমন শক্ত করে বাঁধা যে, জুতার মোজা থেকে ছুরিটা বের করে নেওয়াও অসম্ভব। হাত পিছমোড়া করে বাঁধা থাকায় তা কোনই কাজে আসছে না। বাম জুতার গোড়ালির একটা অংশে চাপ দিলেই তা খাঁজ থেকে উঠে আসবে। বেরিয়ে পড়বে একটা ছোট্ট কুঠুরি। ওখানেই লুকানো আছে বহু কাজের উপযোগী সুইডিশ একটা ছুরি।

আহমদ মুসা বহু চেষ্টা করেও জুতার গোড়ালিকে হাত কিংবা মুখের কাছে আনতে পারল না। কপালে কিছু ঘাম জমেছে তার।

হঠাৎ তার মনে পড়ল, সে তো চেষ্টা করলে জুতা খুলে ফেলতে পারে। এরপর আহমদ মুসা জুতা ঢিলা করার কসরত শুরু করল। কিছুক্ষন চেষ্টার পর বেশ ঢিলা হলো।

আহমদ মুসা গড়িয়ে গড়িয়ে খাটিয়ার কাছে গেল।

মারিয়া ফিলিপ বসে বসে অবাক চোখে আহমদ মুসার কাজ দেখছিল। আহমদ মুসাকে খাটিয়ার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে বুঝল, সে খাটিয়ার ধারাল প্রান্তে বাঁধিয়ে জুতা খুলতে চায়। মারিয়া আহমদ মুসাকে ইশারা করল পা তার দিকে এগিয়ে আনার জন্য।

আহমদ মুসা পা দু'টি তার দিকে এগিয়ে দিল। মারিয়া খাটিয়া থেকে আহমদ মুসার পায়ের কাছে পেছন দিকে ফিরে বসল। কিন্তু পরক্ষনেই আবার ঘুরে বসে ইশারায় জানতে চাইল কোন জুতা। আহমদ মুসা বাম জুতার দিকে ইংগিত করল।

মারিয়া আবার পেছন ফিরে ঘুরে বসে বাঁধা দু'হাত দিয়ে বাম জুতাটি খুঁজে নিয়ে ফিতা খুলে জুতাটি খুলে ফেলল।

মারিয়া জুতা খুলে খাটিয়ায় উঠে বসতে যাচ্ছিল। আহমদ মুসা তাকে নিষেধ করল। তারপর গড়িয়ে জুতার কাছে গিয়ে পিছমোড়া করে বাঁধা দু'টি হাত দিয়ে জুতা টেনে নিল এবং নিমিষেই জুতার গোড়ালি থেকে ছুরি বের করে আনল।

মারিয়া এবার ব্যাপারটা বুঝতে পারল। তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

এরপর আহমদ মুসা ছুরি হাতে নিয়ে পিছু ফিরে মারিয়ার বাঁধা হাতের কাছে পৌছল এবং মারিয়ার হাতের বাঁধন পরীক্ষা করে সাবধানে তা কেটে দিল।

হাত মুক্ত হতেই মারিয়া ঘুরে বসে আহমদ মুসার হাত থেকে ছুরি নিয়ে তার হাতের বাঁধন কেটে দিল।

হাত পায়ের বাঁধন কেটে দু'জনেই মুক্ত হয়ে গেল।

মুক্ত হবার পর মারিয়া ফিলিপ নিরবে মাথা ঝাঁকিয়ে আহমদ মুসার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাল। তারপর সটান শুয়ে পড়ল খাটিয়ায়। তার চোখ মুখে ভীষণ ক্লান্তি।

আহমদ মুসা বিড়ালের মতো ধীর পায়ে বাথরুমে ঢুকল, অজু করার জন্যে। আসর ও মাগরিব নামায তার কাজা হয়ে আছে। এশার সময়ও যাচ্ছে। বের হবার চিন্তা করার আগে নামাযগুলো পড়ে নিতে হবে।

আহমদ মুসা অজু করে এসে নামাজে দাঁড়াল, ঘরের যে প্রান্তে খাটিয়া আছে সে দিকটাই পশ্চিম।

উত্তর- দক্ষিণে পেতে রাখা খাটিয়ার দক্ষিণ পাশে মেঝের অনেকখানি জায়গা খালি আছে। আহমদ মুসা সেখানেই নামাজ দাঁড়াল।

মারিয়া ফিলিপ উত্তর দিকে মাথা কাত করে শুয়ে থেকেই আহমদ মুসার ওঠা-বসা সব দেখতে পাচ্ছে। মারিয়া মুসলমানদের নামাজের কথা শুনেছে, কিন্তু কোনদিন দেখেনে। সে আগ্রহ ও কৌতুহলের সাথে একদৃষ্টে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে আছে।

নামাজ দেখে চমৎকৃত হলো মারিয়া। প্রার্থনা এত সুন্দর হতে পারে! প্রার্থনায় এমন মগ্নতা, চেহারায় তার অমন অপরূপ অভিব্যক্তি তার কাছে বিস্ময়কর! প্রায় নিয়মিতই সে গীর্জায় যায়। কিন্তু প্রার্থনা যে এমন হতে পারে তা সে কল্পনাও করেনি কখনও। স্বর্গীয় অভিব্যক্তির কথা সে পুস্তকে পড়েছে, কিন্তু মনে হচ্ছে তার একটা বাস্তব ঝিলিক সে দেখল। নামাজ শেষ করে আহমদ মুসা গোটা ঘরটা ঘুরে একবার দেখল। তারপর সামনে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে ছুরি বের করল, ছুরির অগ্রভাগটা দরজায় ঠেকিয়ে পরীক্ষা করল দরজায় বিদ্যুৎ প্রবাহ আছে কিনা। কিন্তু ছুরির বাঁটের গোড়ায় ছোট স্বচ্ছ কেবিনটিতে কোন আলো জ্বলল না। আহমদ মুসা নিশ্চিত হলো, অন্তত এ দরজাকে তারা বিদ্যুতায়িত করেনি। আহমদ মুসা ভাবল, এ দরজার পরেই করিডোর এবং এ দরজার পড় আর দু'দরজা পরেই ভূ-গর্ভ থেকে ওপরে ওঠার সিঁড়ি। এখানে সিঁড়ি মুখে আসার সময় দু'জন প্রহরীকে দেখে এসছে। এরপর বাইরের গেট পর্যন্ত আর কোন প্রহরীকে দেখেনি।

আহমদ মুসা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। দরজা থেকে ঘুরে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

মারিয়া ফিলিপ শুয়ে থেকে বিস্মিত দৃষ্টিতে আহমদ মুসার কাজ দেখছিল। সে বুঝতে পারল এসব বের হবার চিন্তা খুশি হলো মারিয়া। কিন্তু পরক্ষনেই খুশি উবে গেল। হাজার চেষ্টা করলেও এ ভু-গর্ভস্থ কক্ষ থেকে বের হবার পথ সে দেখছে না। লোহার দরজা খুলবে কি করে? আর খুললেও কি হবে। দরজার কব্জার সাথেই তো এলার্ম আছে।

মারিয়ার চিন্তায় ছেদ পড়ল আহমদ মুসাকে তার দিকে আসতে দেখে। আহমদ মুসার দৃষ্টিটা নিম্নমুখী। মারিয়া বিস্মিত হলো, আহমদ মুসা কোন সময়ই তার দিকে চাইছে না।

কয়েকবার ইশারায় কথা বলার সময় মুহুর্তের জন্যে তার চোখের ওপর চোখ ফেলেছে, কিন্তু তা মুহুর্তের জন্যেই। আর ওর দৃষ্টিটা কত পবিত্র! সে মেয়ে মানুষ, ছেলেদের দৃষ্টি সে বহু দেখেছে, সব সে বোঝে। আর এমন একটা পরিবেশে কি হতে পারে তা সে জানে। এ কেমন অদ্ভুত মানুষ! এমন মানুষও এই দুনিয়ায় আছে! মুসলমাদের উন্নত নৈতিকতার কথা সে শুনেছে কিন্তু আবার সেই সাথে মুসলিম দেশে মুসলমানদের মধ্যে হাজারো জঘন্য অপরাধ সংঘটনের কথাও পড়েছে।

আহমদ মুসা নত মুখে মারিয়ার কাছে এগিয়ে আসছে। একদম কাছে এসে মুহুর্তের জন্যে চোখ তুলে ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে একটু ঝুঁকে পড়ে ফিসফিসিয়ে বলল, ‘এখন বারটা, আমরা রাত দু’টায় বের হবার চেষ্টা করব। তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও।’

বলে কোন কথা শোনার অপেক্ষা না করে সরে গেল আহমদ মুসা। ঘরের এক কোণায় গিয়ে বসে পড়ল। মাথাটা দেয়ালের সাথে হেলান দেয়া। চোখ বন্ধ।

মারিয়া ইচ্ছা করেও এই বিস্ময়কর লোকটির থেকে তার চোখ ফেরাতে পারল না, মারিয়ার হৃদয়ে তোলপাড়, তার বিশ বছরের জীবনে সুন্দর পোশাক, শিক্ষার অহংকার আর ভদ্র আচরণের যাদের দেখেছে তারা এর তুলায় পশুর চেয়ে বড় কিছু নয়।

ঠিক রাত দু'টায় আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

উঠে বসেই চিৎকার শুরু করল, 'কে কোথায় আছ, তৃষ্ণা, তৃষ্ণ পানি চাই, পানি।'

একবার, দু'বার নয়। চিৎকার করেই চলল আহমদ মুসা। প্রথমটায় ঘাবড়ে গিয়েছিল মারিয়া। উদ্বেগে চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছিল তার। সাংঘাতিক কিছু হলো নাকি লোকটির! কিন্তু কয়েক মুহুর্তের মধ্যেই আহমদ মুসার চেহারা দেখে সব ব্যাপারটা বুঝতে পারল।

কিছুক্ষণ চিৎকার চলার পর একটা কন্ঠ ভেসে এলো, 'জানান্নামে যাও, রাত দুপুরে জ্বালাতন। থাম, যাচ্ছে পানি।' ছাদের মাঝখান থেকে কথাগুলো ভেসে এলো। গোপন মাইক্রোফোনটি ওখানেই আছে বুঝা গেল।

আহমদ মুসা থামল। থেমেই বিড়ালের মতো নিঃশব্দে ছুটল দরজার দিকে। মারিয়াকেও দরজার দিকে আসতে ইংগিত করল। মারিয়াও ছুটে এলো।

দরজার পাল্লা ভেতর দিকে খোলার সিস্টেম। খোলার পর দরজার পাল্লা দেয়ালের যেখানে এসে দাঁড়ায়, আহমদ মুসা মারিয়াকে ঠিক সে স্থানে দেয়াল সেঁটে দাঁড় করিয়ে দিল। নিজে দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল কোন পায়ের শব্দ আসছে কি না।

মারিয়া এতক্ষণে কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পারছে। ওর খালি হাত। খালি হাতে একা বন্দুকধারীদের সাথে কি করে পারবে? ভয়ে তার মুখ পাংশু হয়ে উঠল। হার্টের স্পন্দন দ্রুত হলো।

বাইরে বুটের শব্দ পাওয়া গেল। আহমদ মুসা খেয়াল করে শুনে বুঝল, দু'জন লোক আসছে। দরজার তালায় চাবি লাগানোর শব্দ হলো।

মারিয়া মুখ বাড়িয়ে দেখল, আহমদ মুসা দরজার ভেতর থেকে তালা লাগানোর যে দু'টো রিং দু'পাশের পাল্লায় আছে তা শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

আঁৎকে উঠল মারিয়া। দরজা খুললেই তো সে গুলীর মুখে পড়ে যাবে! ওর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? মারিয়া হাত বাড়াল তাকে টেনে আনতে। ঠিক তখনই সশব্দে দরজার হুক খোলার শব্দ হলো, আর সেই সংগে ... ...। মারিয়া হাত টেনে চোখ বন্ধ করল।

আহমদ মুসা দু'পাশে দু'টি রিং ধরে তার সমস্ত মনোযোগ বাইরের হুক খোলার দিকে নিবদ্ধ করে দঁড়িয়েছিল। তার শরীরের প্রতিটি পেশী শক্ত হয়ে উঠেছে, প্রতিটি স্নায়ুতন্ত্রীতে অদম্য শক্তির এক শিহরণ।

আহমদ মুসা যখন বুঝল হুক খোলা এখন কমপ্লিট, তখনই দু'হাতে হ্যাঁচকা টানে দরজার পাল্লা খুলে ফেলল এবং ঝাঁপিয়ে পড়ে সামনের লোকটির হাত থেকে পিস্তল কেড়ে নিল। লোটির বাম হাতে রিভলবার ছিল, ডান হাত দিয়ে দরজার হুক খুলছিল।

আহমদ মুসা রিভলবার কেড়ে নিয়ে সংগে সংগেই রিভলবারের নলটি লোকটির বুকে চেপে ধরে ট্রিগাঁর টিপল। সাইলেন্সার চাপা বিস্ফোরণের মতো একটা শব্দের কম্পন উঠল শুধু। লোকটি কাটা কলাগাছের মতো উল্টে পড়ে গেল। লোকটির সাথের লোকটি একেবারে পেছনেই দাঁড়িয়েছিল। তার এক হাতে ছিল পানির জগ, অন্য হাতে রিভলবার। লোকটির চোখের ছানাবড়া ভাব কেটে যাওয়ার আগেই আহমদ মুসার রিভলবারের নল লোকটির বুক স্পর্শ করল।

ভয়ে লোকটির চোখ বেরিয়ে আসার দশা হলো। মুখ তার হাঁ হয়ে গেছে। কন্ঠ থেকে কোন শব্দ বেরুল না। হাত থেকে তার রিভলবার ও পানির জগ পড়ে গেল।

তার বুকে রিভলবার ধরে রেখেই ফিসফিসিয়ে বলল, 'জামা খুলে ফেল।'

লোকটি সংগে সংগে যন্ত্রের মতো আদেশ পালন করল।

আহমদ মুসা তাকে শুয়ে পড়তে বলল। সে শুয়ে পড়লে তার জামা দলা পাকিয়ে তার মুখে ঢুকিয়ে দিল। তারপর পেছন ফিরে দেখল, মারিয়া দরজায় ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আহমদ মুসা ইশারা করে তাকে কাছে ডেকে ফিসফিসিয়ে বলল, 'বাঁধার দড়িগুলো নিয়ে এসো।'

মারিয়া ঘরের ভেতর থেকে দড়িগুলো এনে দিলে লোকটিকে পিছমোড়া করে বাঁধল। তারপর তাকে ঘরের মধ্যে ঠেলে দিয়ে ঘরে তালা লাগিয়ে দিল।'

দ্বিতীয় লোকটির রিভলবার করিডোর থেকে তুলে নিয়ে মারিয়ার হাতে তুলে দিতে দিতে বলল, ‘তুমি তো সাহসী মেয়ে, সেদিন একাই তো এদের তিনজনকে প্রায় কুপোকাত করে ফেলেছিলে!’

মারিয়ার কারাত ও কুংফু’র ট্রেনিং আছে। সে সাহসীও বটে, কিন্তু সে সাহস এই অবস্থার জন্যে নয়। সে আহমদ মুসার হাত থেকে রিভলবারটি হাতে নিতে নিতে বলল, ‘আমি আপনার কাছ থেকে অন্তত পালাব না।’

‘ধন্যবাদ বোন’ বলে আহমদ মুসা ছুটল ভূগর্ভ থেকে উঠবার সিঁড়ির দিকে। ছায়ার মতো তার পেছনে পেছনে মারিয়া।

সিঁড়ির মুখে প্রহরীর বসার জায়গা দু’টি খালি। আহমদ মুসা ভাবল এরাই তার ঘরে পানি নিয়ে গিয়েছিল। অনেকটা নিঃশঙ্ক চিত্তে তর তর করে উঠল সিঁড়ি দিয়ে। শেষ ধাপে উঠে দাঁড়িয়ে ডান দিকে ঘুরেই মুখোমুখি হয়ে গেল দু’জনের। আকস্মিকতায় আহমদ মুসা যেমন অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে, তেমনি ওরা দু’জনও। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্যে। আহমদ মুসা প্রস্তুত হয়ে পিস্তল তুরে ধরার আগেই ওরা দু’জন এক সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ল আহমদ মুসার ওপর।

আহমদ মুসা ত্বরিত একটু পিছু হটে পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পেল। কিন্তু হাত থেকে পিস্তলটা ছিটকে পড়ে গেল এবং শক্ত একটা ঘুষি খেল সেই আহত নাকটার ওপর আবার।

ওদের একজন ভারসাম্য রাখতে না পেরে সিঁড়ির ঠিক মুখের ওপরই পড়ে গিয়েছিল। তার দ্বিতীয় প্রবল আর একটা ঘুষি ছুটে আসছিল তার সেই নাক লক্ষ্যে।

আহমদ মুসার নাক ফেটে আবার রক্ত নামছিল। নাক লক্ষ্য করে  আসা দ্বিতীয় ঘুষিটাকে সত্যিই ভয় পেল আহমদ মুসা। সে বিদ্যুৎ গতিতে একটু নিচু হয়ে দু’হাত দিয়ে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সাথে লোকটার ঘুষি বাগানো হাতের কব্জিটা ধরে প্রবল বেগে চরকির মতো একটা ঘুরপাক খেল। মট করে একটা হাড় ভাঙ্গার অথবা কনুইয়ের জয়েন্ট খুলে যাওয়ার শব্দ হলো। লোকটা ঘোড়ার মতো চিৎকার করে সটান মাটিতে পড়ে গেল। আর ওঠার নামটি করল না।

অন্যদিকে প্রথম লোকটি যে ভারসাম্য হারিয় সিঁড়ির মাথায় পড়ে গিয়েছিল, তার কপাটা শক্ত মেঝের সাথে ঠোকা খাওয়ায় মুহূর্তের জন্যে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল। নিজেকে সামলে নেবার পর সে উঠে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয়বার আহমদ মুসার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল। তখন আহমদ মুসা দ্বিতীয় লোকটিকে কুপোকাত করে পুরোপুরি উঠে দাঁড়াতে পারেনি। মারিয়া সিঁড়ির মুখেই দাঁড়িয়েছিল, লোকটি এদিকে লক্ষ্যই করেনি। লোকটি আহমদ মুসার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে বাম পায়ের ওপর দেহের চাপটা ছুঁড়ে দিয়ে ডান পা'টা একটু শূন্যে তুলে দিল। মারিয়া ঝাঁপিয়ে পড়ে তার সে আগলা পা'টা ধরে হ্যাঁচকা একটা টান দিল। লোকটি মুখ থুবড়ে পড়ে গেল কিন্তু আবার মাথা তোলার চেষ্টা করছিল সে। মারিয়া একটু ঝুকে পড়ে দু'হাতের একটা জোড় কারাত চালাল লোকটির ঘাড়ে। লোকটির মাথা স্থির হয়ে খসে পড়ল মাটিতে।

আহমদ মুসা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে বিভলবারটা কুড়িয়ে নিয়েছে। মারিয়ার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। তারপর 'ধন্যবাদ এসো' বলে ছুটল করিডোর ধরে পূর্বদিকে। আহমদ মুসার, মনে পড়ছে এ পথ দিয়েই তাদেরকে ভূ-গর্ভস্থ কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

করিডোরটি পূর্বদিকে শেষ প্রান্তে পৌছে দক্ষিণ দিকে ঘুরে গেছে। তার পরেই বেরুবার গেট। যেখানে করিডোরটি দক্ষিণ দিকে বেঁকে গেছে সেখান দিয়ে দোতালায় ওঠার সিঁড়ি। আহমদ মুসারা যখন সিঁড়ির মুখের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে সে সময় তারা সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেল। ডান পাশেই একটা দরজা বন্ধ। আহমদ মুসা থমকে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে চাপ দিলে নব ঘুরে গেল, খুলে গেল দরজা।

আহমদ মুসা মারিয়ার হাত ধরে টেনে দ্রুত ঘরের ভেতরে  ঢুকে গেল। দরড়া পুরোপুরি বন্ধ কলল না, ঈষৎ ফাঁক রেখে সেখানে চোখ লাগিয়ে রাখল।

সিঁড়ি থেকে নেমে দু'জন লোক করিডোর দিয়ে দ্রুত পশ্চিম দিকে এগোচ্ছিল। একজন উদ্বিগ্ন কন্ঠে বলছিল, 'বন্দীখানায় নিশ্চয় কিছু ঘটেছে, কারো কোন কথা নেই!'

ওরা দরজা পার হয়ে যেতেই আহমদ মুসা দরজা খুলে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেটের দিকে ছুটল।

দক্ষিণ দিকে বাঁকে ঘুরে আহমদ মুসা থমকে দাঁড়াল। মারিয়ার দিকে ফিরে বলল, 'তুমি রিভলবার নিয়ে করিডোর ও সিঁড়ি পাহারা দাও। ওরা দু'জন শীঘ্রই ফিরবে। ওরা ফিরলে আমাকে ইংগিত দিও।'

বলে আহমদ মুসা দ্রুত লোহার মজবুত গেটের দিকে এগোলো। দরজায় তালা লাগানো আছে, আবার হুড়কোও। আহমদ মুসা দরজায় হাত দিতে গিয়েও আঁৎকে উঠে দু'পা পিছিয়ে এলো। মনে পড়ল সে দীর্ঘকায় লোকটির হুশিয়ারী 'পালাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মরবে!' গেটটা তো বিদ্যুতায়িত হতে পারে। আহমদ মুসা দ্রুত পকেট থেকে ছুরি বের করে তার অগ্রভাগ দিয়ে দরজা স্পর্শ করল। জ্বলে উঠল ছুরির বাঁটের বিশেষ কক্ষটি। হতাশ হয়ে আহমদ মুসা তাকাল দরজার চারপাশে কোথাও কোন গোপন সুইচ আছে কি না। না, নেই।

গেট প্যাসেজের পশ্চিম পাশের দেয়ালে আহমদ মুসা দেখল বিরাট একটা সুইছ বোর্ড। বোর্ডের মিটার বক্স ও মেইন সুইচের সারি। আহমদ মুসার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দ্রুত সে মারিয়াকে কাছে ডাকল। মারিয়া এলে বলল, 'আমি গেটে গিয়ে দাঁড়ালে তুমি সব মেইন সুইচ অফ করে দেবে।' দ্রুত আহমদ মুসা গেটে চলে গেল।

খটাখট সব মেইন সুইচ অফ করে দিল মারিয়া। আহমদ মুসা তার ছুরির অগ্রভাগ লোহার দরজায় স্পর্শ করল। মারিয়ার শেষ সুইচ অফ করার সাথে সাথে ছুরির বাঁট সংলগ্ন বিশেষ কেবিনটির আলো নিভে গেল অর্থাৎ গেট এখন আর বিদ্যুতায়িত নেই।

চারদিক তখন অন্ধকারে ডুবে গেছে। সম্ভবত বাড়িটির সব আলোই নিভে গেছে।

আহমদ মুসা মারিয়াকে গেটে আসার জন্যে নির্দেশ দিয়ে গেটের লোহার হুড়কোটি খুলে ফেলল। তারপর গেটের তালা ভালো করে দেখে নিয়ে রিভলবারের নল তাতে সেট করে গুলী করল। ভেঙে পড়ে গেল তালা। দ্রুত হুক খুলে ফেলল আহমদ মুসা। টান দিয়ে খুলে ফেলল দরজা।

করিডোরে এই সময় গুলীর শব্দ পাওয়া গেল। কে যেন করিডোর দিয়ে গুলী করতে করতে ছুটে আসছে।

আহমদ মুসা মারিয়াকে বাইরে ঠেলে দিয়ে নিজে বাইরে ছিটকে বেরিয়ে এলো এবং সংগে সংগে বাইরে থেকে গেটের দরজা ধড়াস করে বন্ধ করে দিয়ে বাইরে থেকে হুক লাগিয়ে দিল। এই সময় গেট রুমে গুলীর শব্দ পাওয়া গেল। কয়েকটি গুলী দরজার গায়েও শব্দ তুলল।

গেটের পরে বেশ বড় লন। তারপর বাইরের গেট। গেটে পাহারার কোন ব্যবস্থা আহমদ মুসা ঢোকার সময় দেখেনি। তবে গেটে তালা দেয়া থাকতে পারে। লনও অন্ধকারে ডুবে গেছে। তবে অন্ধকারটা ভেতরের মতো অত গাঢ় নয়।

বাইরে থেকে গেটের হুক বন্ধ করেই আহমদ মুসা মারিয়াকে বলল, 'যতটা পার মাথা নিচু করে গেটের দিকে ছুটতে থাক। এবার ওপর থেকে লনে গুলী আসতে পারে।'

এলোও ঠিক। দোতলার জানালা দিয়ে স্টেনগান থেকে বৃষ্টির মতো গুলী নেমে এলো লনে। কিন্তু ততক্ষনে আহমদ মুসারা গেটে পৌছে গেছে। গেট টপকে তারা ছুটে বেশ খানিকটা জায়গা পাড়ি দিয়ে রাস্তায় গিয়ে উঠল।

কিন্তু রাস্তায় উঠেই মারিয়া আহমদ মুসাকে টেনে একটা অন্ধকার গলিতে নিয়ে এলো।

পকেট থেকে রুমাল বের করল মারিয়া।

আহমদ মুসা অবাক হয়েছিল। এখন বুঝতে পারল, আহত নাকের রক্তে মুখটা তার ঢেকে আছে, যা মানুষের মনে কৌতুহল বা সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে।

রুমালশুদ্ধ মারিয়ার হাত আহমদ মুসার মুখের দিকে এগিয়ে আসছিল।

'ধন্যবাদ, মারিয়া' বলে আহমদ মুসা তার হাত থেকে রুমাল নিয়ে নিজের মুখ পরিষ্কার করতে লাগল।

মারিয়া একটা হোঁচট খেল। সে বুঝল, মারিয় মুখের রক্ত মুছে দিক, এট আহমদ মুসা চায় না। যে স্বাভাবিক সেবাটুকু এই অবস্থায় সকলেরই স্বাগত জানানোর কথা, তাও সে করল না।

মুখ থেকে রক্ত মুছে ফেলার পর আহমদ মুসা ও মারিয়া আবার ফিরে এলো রাস্তায় এবং সংগে সংগে একটা ট্যাক্সি ডেকে ওরা উঠে বসল।

# ২

সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অব মাদ্রিদ আজ উৎসবমুখর। পদার্থ বিজ্ঞান অনার্সের আজ রেজাল্ট হয়েছে। সায়েন্স ফ্যাকাল্টিতে আনন্দটা আজ যেন বেশিই! আনন্দের কেন্দ্রবিন্দু আজ জেন ক্যাথরিনা। প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হবার দুর্লভ সৌভাগ্য এবার সেই লাভ করেছে। জেন ক্যাথরিনাকে ঘিরে আনন্দটা আরও এই কারনে বেশি যে, সে অভবিতভাবে এই সম্মান লাভ করেছে। সবাই জানত প্রথম হওয়ার সম্মানটা জোয়ান ফার্ডিনান্ডের জন্যেই বরাদ্দ। সে কোন পরীক্ষাতেই কখনও দ্বিতীয় হয়নি। আর সে প্রথম হয় অনেক ব্যবধান নিয়ে, ক্লাস-পরীক্ষাতেও এটাই দেখা গেছে সব সময়। জেন ক্যাথরিনা, জোয়ান ফার্ডিনান্ডের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু দ্বিতীয় আসন নিয়েই তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে সব সময়।

সেমিনার কক্ষে বন্ধু-বান্ধবীদের ভিড়ের মধ্যে বসেছিল জেন। বিয়ের কনের মতো তাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে সবাই।

সেমিনার কক্ষে প্রবেশ করল জোয়ান ফার্ডিনান্ড। তার আজ পরাজয়ের দিন। এ পরাজয়টা তার জন্যে নির্মেঘ আকাশের বজ্রপাতের মতোই আকস্মিক! কিন্তু অন্যেরা একে যেভাবেই দেখুক, জোয়ান একে সহজভাবেই গ্রহন করেছে। জোয়ান স্বভাবগতভাবেই শান্ত ছেলে। অত্যন্ত মেধাবী ও বুদ্ধিমান সে, কিন্তু তার প্রকাশ পাহাড়ী নদীর মতো উচ্ছল নয়, উচ্ছৃংখল তো নয়ই, সমভূমির নদীর মতো তা শান্ত-স্নিগ্ধ। ছাত্র বয়সেই সে এক বছর আগে মৌলিক গবেষণার জন্যে ইউরোপের সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার 'ইউরোপ বিজ্ঞান একাডেমী পুরস্কার' লাভ করেছে। সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অব মাদ্রিদ ও স্পেনের জন্যেও ছিল এটা দুর্লভ সম্মান। এটা ইউরোপের জন্যেও অদ্বিতীয়। মৌলিক আবিষ্কারের জন্যে একজন ছাত্রের এই পুরস্কার পাওয়া এই প্রথম। যেদিন এ খবর মাদ্রিদে এলো, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত লাফিয়ে উঠেছিল। কিন্তু মুখে নির্মল এক খন্ড হাসি ফুটে ওঠা ছাড়া জোয়ানের মধ্যে আর কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি। জোয়ান

ফার্ডিনান্ডের এই চরিত্র তার প্রতিভার মতোই সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যে আনন্দে আত্মহারা হয় না, সে কোন আঘাতেও মুষড়ে পড়ে না। জোয়ানের ক্ষেত্রে আজও তাই হয়েছে। জোয়ান ফার্ডিনান্ড যখন জেনকে স্বাগত জানানোর জন্য সেমিনার কক্ষে প্রবেশ করল, তার চোখে তখন খুঁজলে হয়তো ম্লানিমার একটা কালো ছায়া কেউ পাবে, কিন্তু ঠোঁটে ছিল তার স্বভাবজাত নির্মল এক টুকরো হাসি। আর হাতে ছিল ফুটন্ত এক গোলাপ-কুঁড়ি।

জেনকে মধ্যমণি করে টেবিল ঘিরে সবাই বসে ছিল। সেমিনার কক্ষে প্রবেশ করে যখন জোয়ান টেবিলটির দিকে এগোলো, তখন সবাই কক্ষে হৈ হৈ করে উঠল। কেউ মজা পেল, কারও মধ্যে বিদ্রূপের প্রকাশ ঘটল এবং কারও মধ্যে বিজয়ের উল্লাস। কিন্তু লাল স্কার্ট আর লাল শার্ট পরিহিতা উপচে পড়া আনন্দে উচ্ছ্বালা, চঞ্চলা জেন যেন জোয়ানকে দেখেই দপ করে নিভে গেল! সে জোয়ানের দিকে চাইতে পারছিল না। সে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল, চোখটা নিচু।

জোয়ান তার দিকে এগিয়ে গিয়ে সহাস্যে বলল, 'জেন, তোমাকে স্বাগত!'

বলে জোয়ান তার দিকে গোলাক-কুঁড়ি এগিয়ে দিতে দিতে বলল, 'তোমার আনন্দে আমার এই উপহার। আমরা সকলে প্রকৃতির সন্তান, আর প্রকৃতির সুন্দরতম প্রকাশ হলো ফুল।'

জেন চোখ তুলে হাত বাড়িয়ে ফুলটি গ্রহন করে বলল, 'ধন্যবাদ জো।' মনে হলো চেষ্টা করল সে হাসার জন্যে, কিন্তু পারল না। কেমন অপ্রতিভ ভাব জেনের মধ্যে!

জেনের পাশের চেয়ার থেকে সহপাঠী বার্কা ফোঁস করে উঠল, 'কিন্তু গোলাপ কেন জো?'

জোয়ান কিছু বলার আগেই জেনের অন্য পাশে বসা হ্যামিলকার ফোঁড়ন কাটল, 'বার্কা, তুই বোকার মতো প্রশ্ন করেছিস। শুনলি না যে ও 'মরিসকো'! এতদিন ও গোপন রেখেছিল, আজ হাটে হাঁড়ি ভেঙে গেছে। গোলাপ তো 'মরিসকো' দেরই ফুল।'

স্পেনে বাধ্য হয়ে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহনকারী মুসলমানদেরকে ‘মরিসকো’ নামে ডাকা হয়। মরিসকোরা স্পেনে তৃতীয় শ্রেনীর নাগরিক। মনে করা হয় এদের পূর্বপুরুষরা জীবন বাঁচানোর জন্যে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহন করেছিল, মনেপ্রানে খৃষ্টান হয়নি। সব ক্ষেত্রেই মরিসকোদেরকে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের চোখে দেখা হয়। ঘৃণার পাত্র তারা। তাই মরিসকোরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের পরিচয় গোপন রাখতে চেষ্টা করে।

হ্যামিলকার কথা শেষ করতেই হাসির একটা হুল্লোড় পড়ে গেল টেবিলে। সে হাসিতে যোগ দিল না শুধু জেন। একবার সে শুধু চোখ তুলে তাকিয়েছিল জোয়ানের দিকে। তার চোখে বেদনা ও বিব্রত অবস্থার পাশাপাশি প্রবল জিজ্ঞাসার চিহ্ন।

জোয়ানের ঠোঁটের হাসি তখন মিলিয়ে গেছে, চোখে-মুখে অন্ধকার নেমে এসেছে অপমানের জ্বালা সেখানে স্পষ্ট। সে মুখ খুলল, তীব্র কন্ঠে প্রতিবাদ করল, ‘হ্যামিল, এভাবে যা ইচ্ছা তাই বলা যায় না। আমি যদি তোমাদের কোন ক্ষতি করে থাকি, শাস্তি দাও। কিন্তু মিথ্যা আরোপ কেন?’

‘আমি মিথ্যা বলিনি জো।’ চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তীব্র কন্ঠে বলল হ্যামিলকার।

এই সময় চিৎকার করে কথা বলতে বলতে সেমিনার কক্ষে প্রবেশ করল দুংগা ডে ডেলা। সে বলছিল, ‘আমাদের ইউনিভার্সিটির ইজ্জত শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়েছে ‘মরিসকো’ ব্যাটা প্রথম হতে পারেনি। জেন, তোমাকে হাজার বার ধন্যবাদ।’

‘কি এসব তোমরা শুরু করেছ?’ অধৈর্য কন্ঠে চিৎকার করে উঠল জেন।

জোয়ান আর ফুঁসে উঠল না, প্রতিবাদও করল না। অপমান ও বেদনায় ভেঙে পড়েছে তার চেহারা। দ্রুত সে বেরিয়ে এলো সেমিনার কক্ষ থেকে। সে সায়েন্স ফ্যাকাল্টি থেকে বেরিয়ে লনে নেমে এলো। তার দৃষ্টিটা ঝাপসা হয়ে উঠেছে। সামনের রাস্তা তার কাছে অস্পষ্ট লাগছে। মগজে ও গোটা সত্তায় একটাই শুধু চিৎকার উঠছে, তাকে ‘মরিসকো’ বলল কেন?’ সে কি ‘মরিসকো’? না, না, এটা হবে কেন?’ এটা হতে পারে না, পারে না এটা হতে! রাগে, উত্তেজনায় মাথা,

কপাল, চোখ তার টনটন করছে। চোঁখ ফেটে যেন রক্ত বেরিয়ে আসবে তার! কে যেন সামনে এসে দাঁড়াল তার। জোয়ান চোখ তুলে দেখল, নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর স্যার জনসন। জোয়ান তার দিকে চোখ তুললে স্যার জনসন জোয়ানের দিকে একবার তাকিয়ে তার মাথায় হাত রেখে বলল, 'দুঃখ করো না বৎস, ধৈর্য ধর। তুমি মেধায় হারনি, হার হয়েছে পরিচয়ে। খৃষ্টান স্পেনের প্রতিষ্ঠাতা রানী ইসাবেলার ধর্মগুরু কার্ডিনাল ফ্রান্সিসকো জেমেনিজ ও সিসনারোজ -এর প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন 'মরিসকো' কে প্রথম স্থান দেয়া ঠিক মনে করা হয়নি। অতীতে যা হয়েছে না জেনে হয়েছে। তুমি ... ...

স্যার আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু শোনার মতো ধৈর্য, শক্তি কোনটাই জোয়ানের ছিল না। স্যার তার হৃদয়ের জ্বালা আরও শত গুণ বাড়িয়ে দিল। কোন কথা না বলে স্যারকে পাশ কাটিয়ে জোয়ান আবার চলতে শুরু করল।

জোয়ান সেমিনার কঁক্ষ থেকে বেরিয়ে এলে জেনও বেরিয়ে এসেছে পেছনে পেছনে। তার মনে প্রবল অস্বস্তি। প্রথম স্থান অধিকার করার খবর তার কাছে পৌছার পর থেকেই এই অবস্থার সৃষ্টি। জোয়ান তার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। সে সব সময় জোয়ানকে হারাবারই চেষ্টা করেছে, কিন্তু জোয়ান আজ হারার পর তার আর কিছু ভালো লাগছে না। মনে হচ্ছে, জোয়ান প্রথম হলেই যেন তার মনটা বেশি খুশি হতো। তার ওপর জোয়ানের বিরুদ্ধে 'মরিসকো' হবার অভিযোগ তাকে অস্থির করে তুলল। সে কিছুতেই এটা মেনে নিতে পারছে না। কেউ কি এভাবে এতদিন পরিচয় গোপন করতে পারে!

জেন ফ্যাকাল্টি থেকে নিচে লনে নেমে এসে দেখল, জোয়ান কারপার্কের দিকে যাচ্ছে। জেন ছুটে গিয়ে তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে তার দু'হাত ধরে পাগলের মতো ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, 'বলো তুমি 'মরিসকো' নও, তুমি অস্বীকার কর।'

জোয়ান মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়াল। তার রক্তের মতো লাল চোখটি জেনের দিকে তুলে ধরল। জেন আঁৎকে উঠল জোয়ানের চোখ দেখে, তার বিধ্বস্ত চেহারা দেখে।

‘আমি কিছু জানি না, আমাকে কিছু বলতে বলো না, যারা ষড়যন্ত্র করেছে তাদের কাছে যাও।’ তীব্র কন্ঠে কথাগুলো ছুঁড়ে দিয়ে জোয়ান জেনকে পাশ কাটিয়ে হন হন করে ছুটল গাড়ির দিকে।

জোয়ানের লক্ষ্য বাড়ি। দ্রুত সে বাড়ি পৌঁছতে চায়। মায়ের কাছে। মায়ের কাছেই জানতে পারবে সে ‘মরিসকো’ কি না।’ গাড়ি চলতে শুরু করল জোয়ানের। আব্বার কথা তার মনে পড়ল। তার আব্বা এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই একজন অধ্যাপক ছিলেন। জোয়ানের বয়স যখন পনের, তখন তার আব্বা মারা যান। তার আব্বার সব কথা তার স্পষ্ট মনে আছে। তিনি ছিলেন, স্নেহপরায়ণ পিতা, সুবিবেচক পরিবার-কর্তা, সচেতন ও নীতিনিষ্ঠ একজন নাগরিক। অনেক সমাজ-সংগঠনের সাথে তিনি যুক্ত ছিলেন। বিশ্বস্ততার সাথে তিনি দেশ ও জনগণের সেবা করেছেন। তিনি ‘মরিসকো’ ছিলেন। তার আব্বা কখনও গীর্জায় গেছেন বলে মনে পড়ে না, এমন তো অনেকেই যায় না। কিন্তু কখনও তিনি গীর্জার অবমাননা করেছেন কেউ বলতে পারবে না। ‘মরিসকো’ হওয়ার অভিযোগ তাহলে আসছে কি করে! হৃদয়টা জ্বলে উঠল আবার জোয়ানের।

বাড়িতে পৌঁছে, গাড়ি বারান্দায় রেখেই ছুটল ভেতরে। সোজা মা’র ঘরে। জোয়ানের মা ঘর থেকে বেরুচ্ছিল। দরজায় তার সাথে জোয়ানের দেখা হলো।

জোয়ানের মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল জোয়ানের মা। উদ্বিগ্ন কন্ঠে বলে উঠল, ‘তোর কি হয়েছে জো, কিছু ঘটেছে? অসুখ করেনি তো?’

‘না মা!’ বলে জোয়ান মাকে ঘরের ভেতর টেনে নিয়ে চেয়ারে বসাল। তারপর এসে দরজা বন্ধ করে দিয়ে মায়ের মুখোমুখি বসল।

জায়ানের মার চোখমুখে কৌতূহল, সেই সাথে উৎকন্ঠা।

জোয়ান মা’র দু’টি হাত হাতে নিয়ে অস্থির কন্ঠে বলল, ‘মা, আমি, আমরা মরিসকো?’

জোয়ানের মা এলিনা চমকে উঠল, জোয়ানের কথায়। মুহূর্তে তার মুখের আলো যেন দপ করে নিভে গেল!

‘এ প্রশ্ন কেন জো?’ কষ্ট করে যেন কথা কয়টি উচ্চারণ করল জোয়ানের মা।

মা’র চেহারা পরিবর্তন জোয়ানের চোখ এড়াল না। মায়ের মুখের আলো নিভে যাওয়া দেখে জোয়ানের আশার শেষ আলোটুকু যেন নিভে গেল। হৃদয় তার কেঁপে উঠল।

আবেগ রুদ্ধ কন্ঠে সে মায়ের দু’টি হাত জড়িয়ে ধরে বলল, ‘বলো মা, দেরি কর না, বলো আমাদের বিরুদ্ধে মরিসকো হওয়ার অভিযোগ সত্য নয়।’

জোয়ানের মা এলিনা তৎক্ষণাৎ কোন জবাব দিল না। গম্ভীর হয়ে উঠেছে তার মুখ। একটু সময় পর সে বলল, ‘অভিযোগ কে করেছে জো?’

‘বিশ্ববিদ্যালয়ের সবাই জানে, সবাই বলছে, এমনকি স্যারও বলেছেন আমি ‘মরিসকো’ বলেই আমাকে অনার্সে প্রথম স্থান দেয়া হয়নি।’

বলতে বলতে আবেগে-উত্তেজনায় জোয়ানের কন্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

জোয়ানের মা এলিনা পাথরের মতো স্থির হয়ে গেছে। তার মাথা নিচু।

‘কিছু বলছ না কেন মা, কথা বলো।’ প্রায় কান্না ঝরা কন্ঠে বলল জোয়ান।

মা এলিনা চোখ তুলল। গম্ভীর কন্ঠে বলল, ‘তোর প্রশ্নের সবটুকুর উত্তর আমি দিতে পারব না জো। আমি ‘মরিসকো’ ঘরের মেয়ে সেহেতু আমি মরিসকো।’

‘আব্বা?’ সংগে সংগেই বিস্ফরিত চোখে প্রশ্ন করল জোয়ান।

‘তোর আব্বা ‘মরিসকো’ কি না আমি জানি না। আমি ‘মরিসকো’ একথা আমি কোনদিন তোর বাবাকে বলিনি।’

‘আব্বা জানতেন না?’

‘তা বলতে পারব না।’ এ নিয়ে কোন কথা কোনদিন তার সাথে হয়নি। তবে একটা জিনিস জানি, অনেক দেখে-শুনে, অনেক খোঁজ-খুঁজি করে তোর আব্বা বিয়ে করেছে।’

‘কেন তা করেছেন?’

‘জানি না।’

‘দাদী কিছু বলতে পারবেন আম্মা?’

তিনি কিছু জানতেও পারেন, তবে তার কাছে কিছু শুনিনি কোনদিন।’

জোয়ান উঠে দাঁড়াল। দরজা খুলে ছুটে গেল দাদীর কামরায়।

জোয়ানের দাদীর বয়স নব্বই পার হয়েছে। চলা-ফেরা করতে পারেন তবু।

জোয়ান ঘরে ঢুকে দেখল বিছানায় ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে আছে। তার দাদীর এ দৃশ্যই সাধারন। জোয়ান গিয়ে পাশে বসতেই তার দাদী চোখ খুলল। বলল, ‘কিরে জো, বলবি কিছু?’

‘না, বলতে আসিনি শুনতে এসেছি দাদী।’ গম্ভীর কন্ঠ জোয়ানের।

‘কেচ্ছা শুনবি?’

‘শুনব, ‘মরিসকো’দের কেচ্ছা বলো।’

দাদী চোখ তুলে তাকাল। যেন একটু ভাবল। তারপর বলল, ‘ওটা নিষিদ্ধ গল্প, আমি বলতে পারব না।’

একটু থেমে বলল, ‘কিন্তু তুই আজ একথা জানতে চাচ্ছিস কেন?’

‘জানতে চাচ্ছি দাদী, আমরা মরিসকো কি না?’

গম্ভীর কন্ঠে সরাসরি প্রশ্ন করল জোয়ান।

দাদী চোখ তুলে তাকাল। দৃষ্টিটা কিছুক্ষণ জোয়ানের ওপর স্থির রেখে বলল, ‘ আমরা ‘মরিসকো’ কি না বলতে পারব না, তবে আমি ‘মরিসকো’।

‘দাদা?’

‘আমি জানি না, কোনদিন কিছু বলেননি’

‘তুমি ‘মরিসকো’ জানতেন তিনি’

‘আমি কোনদিন বলিনি, জানতেন কি না জানি না।’

‘তোমাকেও দাদা কি খুঁজে খুঁজে বিয়ে করেন?’

‘তোর বাবা তোর মাকে যেমন?‘

’হ্যাঁ।’

‘মনে হয়। তা না হলে ভ্যালেনসিয়া থেকে গ্রানাডায় তিনি গেলেন কি করে!’

জোয়ান আর প্রশ্ন করল না। আর সে কথা বলতে পারছে না। ভেতরটা তার কাঁপছে। তোলপাড় উঠেছে গোটা সত্তায়। তার আব্বার ও তার দাদার খুঁজে খুঁজে মরিসকো বিয়ে করার রহস্য কি এই যে, তারা 'মরিসকো' ছিলেন বলেই খুঁজে খুঁজে 'মরিসকো' কনে বের করেছেন। তার এ জিজ্ঞাসার জবাব কে দেবে?

আর চিন্তা করতে পারছে না জোয়ান। অনেকটা টলতে টলতেই উঠে দাঁড়াল।

কোনমতে ছুটে গিয়ে সে শুয়ে পড়ল তার বিছানায়। বিছানার ওপর পড়েছিল 'ফিউচার' নামক বিশ্ববিখ্যাত সায়েন্স জার্নালের সর্বশেষ সংখ্যা। আজ সকালেই পেয়েছে। পড়তে পড়তে রেখে গিয়েছিল। জোয়ান ওটা ছুঁড়ে ফেলে দিল মেঝেয়। ২টা বাজার শব্দ হলো ঘড়িতে। জোয়ানের চোখটা ঘুরে গেল টেবিল বুক সেলফের দিকে। বইগুলো মনে হচ্ছে তার কাছে অর্থহীন। টেবিলে একটা বাঁধানো ছবি রাখা ছিল। অনার্সে ভর্তির সময় তোলা ডিপার্টমেন্টের ছাত্র-শিক্ষকদের সাথে সুন্দর একটা গ্রুপ ছবি। ছবির মানুষগুলোকে, ছবির জোয়ানকে তার অপরিচিত মনে হচ্ছে। কান্নায় ভেঙে পড়ল জোয়ান।

অনেক কাঁদল জোয়ান। দুপুরে খেল না। ঘর থেকেও বেরুল না। তার সামনে সুন্দর দুনিয়া আজ তার কাছে বিস্বাদ হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে, সব কিছুর মধ্যে সে যেন এক অনাহূত অতিথি। পরিচিত দুনিয়ায় তার অস্তিত্বই এখন বেঢপ বেমানান ঠেকছে। সন্দেহ আর অবিশ্বাসের যেন এক জ্যান্ত প্রতিমূর্তি সে এখন! ভাবতেই বুকটা ফেটে চেমচির হয়ে যাচ্ছে, হু হু করে বেরিয়ে আসছে কান্না।

চোখ বন্ধ করে শুয়েছিল জোয়ান। দুই গন্ডে অশ্রুর শুকিয়ে যাওয়া ধারা স্পষ্ট। চোখের কোণ ভেজা।

মা এলিনা এসে ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকল।

তার চোখ ভারি, মুখ ভারি। বোঝা গেল সেও কেঁদেছে।

মা এলিনা এসে বসল জোয়ানের বিছানায় তার মাথার কাছে। ধীরে ধীরে হাত রাখল জোয়ানের মাথায়। জোয়ান চোখ খুলল।

জোয়ানের ঠোঁট কাঁপছিল। সে ডান হাতটা তুলে এনে মায়ের হাতে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ল। বলল, 'মা, একি হলো আমাদের। সবাই যা

জানে, আমি তা জানতে পারিনি কেন আগে! কেন আমি জীবনকে এত সুন্দর ভেবেছিলাম?'

'বাবা, আমি কিছুই যে জানতাম না। আমি 'মরিককো' এ কথা আমি প্রকাশ করিনি, এটা আমার অপরাধ হতে পারে। কিন্তু কোন 'মরিসকো'ই তো তার পরিচয় প্রকাশ করতে চায় না। করলে যে তাদের বিয়ে হয় না, চাকরি মেলে না, সমাজের কোন সহযোগিতা মেলে না।' একটু থামল মা এলিনা। তারপর বলল আবার, 'আমার কাছে তোর বাবার একটা আমানত আছে তোর জন্যে। কথা ছিল তোর বয়স বাইশ পূর্ণ হলে তোর হাতে তুলে দিতে হবে। আগামী কাল তোর জন্মদিন। আজ তোর বাইশ বছর পূর্ণ হলো।'

তড়াক করে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠল জোয়ান। বলল, 'কী আমানত মা?'

'তোর বাবার হাতে সিলমোহর করা তালা বদ্ধ একটা কঠের বাক্স।'

বলে মা এলিনা কাপড়ের আড়াল থেকে কাঠের একটা ছোট বাক্স বের করে তুলে দিল জোয়ানের হাতে।

জোয়ান কম্পিত হাতে তা গ্রহন করল। তার চোষে নতুন উৎকন্ঠা, উত্তেজনা! বাক্সটি জোয়ানের হাতে তুলে দিয়ে মা এলিনা নীরবে ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

জোয়ান ভালো করে বাক্সটির ওপর চোখ বুলাল। মূল্যবান মেহগনি কাঠ দিয়ে অত্যন্ত যত্ন করে তৈরি করা বাক্সটি। বন্ধ তালার ওপর গালা করে সিল লাগানো। সিলের কাগজে বাবার হস্তক্ষর স্পষ্ট।

জোয়ান পাগলের মতোই দ্রুত সিল ও তালা ভেঙে ফেলল।

ধীরে ধীরে কম্পিত হাতে খুলল বাক্সটি।

বাক্সের মুখ ফাঁক হতেই ভেতর ছুটে গেল তার দু'চোখ। চোখে পড়ল একটি খাতা, তার ওপর একটি খাম।

খামটি দ্রুত হাতে তুলে নিল জোয়ান।

সুন্দর নীল খাম। খামের ওপর গাঢ় নীল কালিতে লেখা একটা নামঃ 'মুসা আবদুল্লাহ' ওলফে 'জোয়ান ফার্ডিনান্ড'। কোন সন্দেহ নেই জোয়ানের বাবার হস্তাক্ষর।

নামটি পড়ার সংগে সংগে জোয়ানের হার্টের স্পন্দন যেন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল মুহূর্তের জন্যে। মনে হলো তার, তার হৃৎপিন্ডটাকে কেউ খামচে ধরে যেন থামিয়ে দিয়েছে।

বহু কষ্টে একটা ঢোক গিলল জোয়ান।

গলাটা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে! শরীরের ভেতরটা অসহ্য শুষ্কতায় কাঁপছে।

তার শরীরের যেন কোন ওজন নেই। যেন শূন্যে ভাসছে সে।

তার হাতে ধরা নীল খামের কভারে লেখা অক্ষরগুলো যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এগুলো যেন তার কানে চিৎকার করে বলছে, 'তুমি জোয়ান ফার্ডিনান্ড নও, তুমি মুসা আবদুল্লাহ।' সে চিৎকার তার দেহের প্রতিটি স্নায়ুতন্ত্রী ও অণু-পরমাণুতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

জোয়ানের কাঁপা হাতে ধরা ছিল ইনভেলাপ। সে খুলে ফেলল ইনভেলাপের মুখ। বেরিয়ে এলো দুই ভাঁজ করা একটা কাগজ। সেই নীল কাগজে গাঢ় নীল কালিতে লেখা কয়েকটা লাইন- জোয়ানের উদ্দেশে লেখা চিঠি। পিতার চিঠি।

চিঠির ওপর আছড়ে পড়ল জোয়ানের চোখ। পড়তে লাগল সে-

প্রিয় মুসা আবদুল্লাহ,

মুসা আমার প্রিয় নাম। ইনি ছিলেন মুসলিম স্পেনের শেষ আশ্রয় গ্রানাডার শেষ সিংহ হৃদয় বীর। তার নামেই তোমার নাম রেখেছি। আর আবদুল্লাহ? আবদুল্লাহ তোমার এক দুর্ভাগা পূর্বপুরুষ।

এই চিঠির সাথে চামড়া বাঁধানো যে খাতা তুমি পাবে, তা আমি পেয়েছিলাম এমনি বাক্সে করে আমার আব্বার কাছ থেকে। আমার বাবা পেয়েছিলেন তার বাবার কাছ থেকে। ছয় পুরুষ ধরে এই বাক্স এমনিভাবে

আসছে। সপ্তম পুরুষ হিসেবে তোমার জন্যে বংশের এই পবিত্র আমানত আমি রেখে গেলাম।

আমাদের স্বরূপ সন্ধানের জন্যে আমাদের আত্মপরিচয়ের এই বার্তা তোমার কাছে পৌঁছে দেয়া ছাড়া তোমার প্রতি আমার কোন নির্দেশ নেই।

তোমার পিতা

আহমদ আবদুল্লাহ ওরফে জন জিমেনিজ

চিঠির শেষ শব্দ কয়টি পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল জোয়ান। 'বাবা, তোমার এই নির্দেশ না দেয়াই যে আমার ওপর বড় নির্দেশ। বাবা, তুমি উদার, তুমি আমার ওপর কোন চাপ সৃষ্টি করতে চাওনি, কিন্তু এই চাপ না দেয়াই যে আমার ওপর সবচেয়ে শক্ত চাপ! বাবা, তুমি আমাকে স্বাধীনতা দিয়েছ, এই স্বাধীনতা দিয়েই তুমি আমাকে বুঝিয়েছ পরম স্বাধীনতাটা কি! আমার পরম প্রিয় আব্বা, আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।'

জোয়ানের দু'চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় গড়িয়ে পড়ছিল পানি। এই পানি তার হৃদয়ের অসহ্য যন্ত্রণার গলিত রূপ। অশ্রুর এই স্রোত বেগবান পাহাড়ী নদীর মতো জোয়ানের বাইশ বছরের সুন্দর, উজ্জ্বল, বর্ণাঢ্য জীবনের অতি প্রিয় পরিচয়গুলোর ওপর যেন হাতুড়ির আঘাত হানছে, তাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। প্রতি ফোঁটা অশ্রু যেন এক খন্ড করে যন্ত্রণার আগুন। এই যন্ত্রণার মধ্যে জোয়ানের নবজন্ম হচ্ছে।

অশ্রুর ধারায় ভাসছে জোয়ানের চোখ। দৃষ্টি তার ঝাপসা। তার সেই ঝাপসা দৃষ্টির সামনে ফুটে উঠল তার পিতার ছবি। আব্বা তার সুন্দর, সহজ, সরল জীবনের অন্তরালে পাহাড়ের মতো বিরাট এত কথা, এই বেদনা লুকিয়ে রেখেছিলেন! তার হাসি-আনন্দের আড়ালে লুকানো ছিল এত বড় বুকফাটা বেদনা! কী দুর্বহ এই জীবন! জোয়ানের বুক ঠেলে বেরিয়ে এলো এক কান্নার ঝড়।

অনেক পরে জোয়ান মুখ তুলে বাক্সটার দিকে তাকাল। খোলা ছিল বাক্স। চামড়া বাঁধানো সুন্দর খাতাটি তার নজরে পড়ল। কি আছে ওতে! তার আত্মপরিচয়! তাদের 'মরিসকো' জীবনের কাহিনী! বুক কেঁপে উঠল জোয়ানের।

ধীরে ধীরে কম্পিত হাত বাড়িয়ে জোয়ান বাক্স থেকে তুলে নিল খাতাটি।

খাতার পৃষ্ঠার সংখ্যা পঞ্চাশের বেশি নয়। চামড়ার তৈরি অত্যন্ত দামী কাগজ খাতার। পাতা উল্টিয়ে প্রথম পৃষ্ঠা জোয়ান তার সামনে মেলে ধরল।

পাতার শীর্ষে আরবী ভাষায় বিসমিল্লাহ লেখা। জোয়ান পড়তে পারল না, কিন্তু ভাষাটি যে আরবী তা বুঝল। তারপর স্প্যানিশ ভাষায় লেখা শুরু। বড় বড় অক্ষরে পরিচ্ছন্ন লেখা। পড়তে লাগল জোয়ান-

'আমাকে সবাই 'টম' বলে ডাকে। বাসার কুকুরটির নাম 'টমি'। আমার মতো গৃহভৃত্যের নাম আমার 'প্রভু' কাউন্ট জুলিয়াস এর চেয়ে ভালো কিছু আর পাননি। কিন্তু আমার নাম আছে। আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান আমি। আমি আম্মার কাছে শুনেছি, আমার জন্মের সপ্তম দিনে দশটি খাসি আকিকা করে মহাসড়ম্বরে আমার এই নাম রাখা হয়েছিল। ভ্যালেনসিয়া শহরের আমির ওমরাহ গণ্যমান্য সকলেরই আমি দোয়া পেয়েছিলাম, আমার আকিকা-উৎসবে সবাই এসে আমাকে দোয়া করেছিলেন। আমার আব্বা ভ্যালেনসিয়ার 'দারুল হিকমহ' অর্থাৎ বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। রসায়নবিদ্যার ওপর তার লেখা বই স্পেনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ানো হতো। পরে শুনেছি।

আমার এখনকার মনিবের নাম কাউন্ট জুলিয়াস ডে ডেল্লা। সে এখন ভ্যালেনসিয়ার নগর কোতোয়াল। সে খোঁজ নিয়ে আমার পরিচয় জেনেই আমাকে গৃহভৃত বানিয়েছেল। খুব ভালো হতো যদি আমার পরিচয় না জানা কারও গৃহভৃত্য আমি হতাম। তাতে অন্তত বাড়িতে মানসিক যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেতাম। সুযোগ পেলেই মালিক ও মালিকপত্নী আমাকে আমার আব্বার নাম ধরে গালি দিত। আমার গৃহভৃত্য জীবনের দ্বিতীয় দিনে বাগানের ফুল গাছগুলোর জন্যে কূপ থেকে পানি তুলছিলাম। অনভ্যস্ত হাতে অল্প সময়ের মধ্যেই ফোস্কা পড়ে গিয়েছিল। বালতির দড়িতে আর হাত দিতে পারছিলাম না। নিরুপায়ভাবে দাঁড়িয়েছিলাম। মনিব আর মনিবপত্নী বাগানে চেয়ারে বসেছিলেন। তারা বুঝতে পারলেন আমার অবস্থা। মুনিব হাঁক দিয়ে বলল, হে আমীর আবদুর রহমানের পুত্র! এটা তোমার বাবার বিশ্ববিদ্যালয় নয়, এখানে গতর খাটিয়ে কাজ করে খেতে হবে। কলম পেশার চাকুরি নেই। এখানে গতর না খাটালে ভাতও হবে না।

মুনিবপত্নী উঠে এসে এক খন্ড কাপড় দিয়ে বলল, হাতে জড়িয়ে পানি তোল। অর্ধেক কাজও তো এখনও হয়নি।

আব্বার নাম শুনে আমার চোখ ফেটে পানি এলো। সেই সাথে মনে পড়ল মায়ের কথা। মাত্র একদিন আগের বুকফাটা দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। আমি আমার আব্বা-আম্মার সাথে ভ্যালেনসিয়া বন্দরে জাহাজে উঠেছিলাম স্পেন ছেড়ে চলে যাবার জন্যে। রাজা ফিলিপের নির্দেশ জারী হয়েছে, মুসলমানরা আর কেউ স্পেনে থাকতে পারবে না। না হলে বাড়ি-ঘর, বিষয়-সম্পত্তি তো যাবেই, জীবনও যাবে। শুনেছিলাম, স্পেনের সব জায়গা থেকেই মুসলমানরা উৎখাত হয়েছে, শুধু বাকী ছিল পূর্ব স্পেনের এই ভ্যালেনসিয়া। সেই ভ্যালেনসিয়াতে এসেও ওদের হাত পড়ল। ক'দিন ধরেই মুসলমারা পালাচ্ছিল ভ্যালেনসিয়া ছেড়ে, কেউ ফ্রান্সের দিকে, কেউ নৌকা বা জাহাজে চড়ে অনিশ্চিতের পথে যাত্রা করছিল। আমরা ছিলাম শেষোক্ত দলে। অনেক ভাড়া করা জাহাজ আমাদের তুলে নিচ্ছিল। আমি আব্বা-আম্মার সাথে জাহাজের ডেকে রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিলাম। আমরা তাকিয়েছিলাম ভ্যালেনসিয়া নগরীর দিকে। আম্মা কাঁদছিলেন। আব্বাকে কোনদিন আমি কাঁদতে দেখিনি। সেই আব্বাকেও আমি চোখ মুছতে দেখলাম। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, আব্বা, আমরা স্পেনের অন্য কোথাও গিয়ে থাকতে পারি না? আব্বা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, 'তেমন এক ইঞ্চি জায়গাও আজ স্পেনে নেই বাছা।' বলে আব্বা শিশুর মতো কেঁদে উঠেছিলেন। তখন আম্মা কান্না থামিয়ে আব্বার কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন, তুমি কাঁদলে, তুমি ভেঙে পড়লে আমরা বাঁচব কি করে! আব্বা বলেছিলেন, আমি কাঁদিনি, কিন্তু আর কত পারি! আমার এই প্রিয় মাতৃভূমি, চার পুরুষের এই জায়গা, আমার বিশ্ববিদ্যালয়, আমার লাইব্রেরি ছেড়ে যেতে যে হৃদয় ছিঁড়ে যাচ্ছে! জাহাজে লোক ওঠা তখন শেষ। জাহাজ শেষ ভেঁপু বাজচ্ছে। এমন সময় রাজা ফিলিপের পতাকাধারী কে একজন তীর থেকে জাহাজের দিকে চোখ তুলে উচ্চ স্বরে ঘোষণা করল, 'তোমরা মুসলমানরা চলে যাও, কিন্তু বালক-বালিকারা, শিশুরা মা মেরীর সন্তান। তারা মহান রাজা ফিলিপের সম্পদ। তাদের রেখে তোমরা গোল্লায় যাও।' ঘোষণার সংগে সংগে রাজার সৈনিকরা এবং সারি

সারি লোক জাহাজে উঠে এলো। ওরা মায়ের বুক থেকে, পিতার বাহুবন্ধন থেকে সন্তানদের কেড়ে নিতে লাগল। যারা সামান্যও বাধা দিল, তাদের অমানুষিক মারধর করল। যারা প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করল, তারা জীবন দিল। জাহাজের ভেতরটা মানুষের রক্তে লাল হয়ে উঠল। আমি কাঁপছিলাম। মা আমাকে বুকে জড়িয়ে রেখেছিলেন। আর আব্বা আমাদের দু'জনকে আড়াল করে রেখেছিলেন যাতে কেউ দেখতে না পায়। তবু ওরা দেখতে পেল। বন্দুকধারী একজন এসে আব্বাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। আর আম্মাকে বন্দুকের বাঁটের এক বাড়ি দিয়ে এক হ্যাঁচকা টানে আমাকে মায়ের বুক থেকে কেড়ে নিল। মা এক বুকফাটা আর্তনাদ করে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গিয়েছিলেন ডেকের ওপর। তারপর মায়ের কন্ঠ আমার কাছে চিরদিনের মতোই নিরব হয়ে গেল। আমি নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্যে হাত-পা ছুঁড়ছিলাম, আর চিৎকার করে কাঁদছিলাম। শেষবারের মতো পেছনে তাকিয়ে দেখছিলাম, আব্বা ডেক থেকে উঠছেন। তার কপাল ফেটে গিয়েছিল, তার গোটা মুখ রক্তাক্ত। এখনও চোখ বুজলে আব্বার এ রক্তাক্ত মুখই আমি দেখি, মায়ের বুকফাটা ঐ আর্তনাদই আমি শুনতে পাই। আমি তখন আমার সব শক্তি হারিয়ে ফেলি, চারদিকের এ দুনিয়াটা আমার অপরিচিত ও অর্থহীন হয়ে যায়।

সেদিনও তাই হলো। আমার হাত থেকে বালতির দড়ি খসে গেল, বালতি পড়ে গেল কূপে। মুনিব ও মুনিবপত্নীর নজরে পড়লে সংগে তারা ছুটে এলো। মুনিব একবার আমার দিকে চেয়েই বলল, 'বাদশাহ নন্দন! আবার কাঁদছেন, কাজ ফাঁকি দেয়ার কৌশল। এই মুর বেটারা শেয়ালের মতো চালাক!' বলে তার হাতের ছড়ি দিয়ে আমাকে প্রহার করতে লাগল। মুনিব পত্নী বলল, তুমি বেছে বেছে কুড়ের সর্দার এক বিজ্ঞানীর পুত্রকে নিয়ে এসেছ। আর লোক পাওনি। আমার মনিব কোতোয়াল বলল, আমি বেছে বেছেই এনেছি গিন্নী। বিজ্ঞানী আবদুর রহমানের পুত্রকে আমি গৃহভৃত্য বাহিয়েছি- এর মধ্যে একটা গৌরব এবং 'মুর'দের উঁচু মাথা পদদলিত করার একটা সুখ আছে না?

সেদিনই আমার জ্বর এসেছিল। অচেতন-আধা চেতন অবস্থায় আমার কয়দিন কেটেছিল জানি না। কিন্তু যেদিন প্রথম বাইরে বের হলাম দেখলাম, ফুলের

কুঁড়িগুলো পূর্ণ প্রস্ফুটিত ফুলে পরিণত হয়েছে। জ্বরের সময় আমি সিঁড়ি ঘরের পাশের একটা ছোট্ট ঘরে পড়েছিলাম। গোট সময়ে পলের মা, মাঝ বয়সী এক ঝাড়ুদারণী, ছাড়া আর কাউকে দেখিনি। আমি জ্বর, মাথা ব্যথায় অস্থির হয়ে পড়লে তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন, দেখাশোনা করতেন।

যে দিন আমার জ্বর সম্পূর্ণ ছাড়ল, সেদিন সন্ধ্যায় মনে হলো, আমি তো একয়দিন নামাজ পড়িনি। আব্বা-আম্মা থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কয়েকটা দিন আমার দুঃস্বপ্নের মতো একটা ঘোরের মধ্যে দিয়ে কেটে গেছে। নামাজ পড়ার কথা মনেই হয়নি। আমার বয়স সে সময় দশ। আব্বা যখন বাসায় থাকতেন, তখন আমাকে সাথে নিয়েই মসজিদে নামাজ পড়তে যেতেন। এভাবে সে বয়সেই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে আমি অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। কুরআন পড়া আরো আগে শিখেছিলাম। প্রয়োজনীয় সব দোয়া-দরুদও। সেদিন সন্ধ্যায় আমি আমার হাতের কাজ সেরে অজু করে নিয়ে সিঁড়ির পাশে মাগরিবের নামাজে দাঁড়ালাম। শেষ রাকাতের রুকুতে গেছি, এমন সময় আমি মুনিবের গলার আওয়াজ শুনলাম। তিনি আমাকে ডাকছেন, ড্রইংরুমের এ্যাসট্রে বদলাতে হবে।

তার পায়ের শব্দ পেলাম। আমি তখন সিজদায়। মনে হলো পায়ের শব্দ দরজায় এসে মুহূর্তের জন্যে থামল। তারপর আবার তা ছুটে এলো। আমি সিজদা থেকে মাথা তুলছি, এমন সময় মনিবের হাতের রাবারের ছড়ি সাপের ছোবলের মতো পিঠে, মাথায় আঘাত করতে লাগল। আমি সিজদা থেকে মাথা তুলে বসতে পারলাম না। যন্ত্রণায় লুটিয়ে পড়লাম বিছানায়। এক পশলা চাবুক চালাবার পর মনে হয় তার রাগের কিছু উপশম হলো। তিনি কথা বলল। ঠিক কথা বলল না, চিৎকার করল- তোকে এসব অপকর্ম করার জন্যে স্পেনে রাখা হয়নি। স্পেনে থাকতে হলে খৃষ্টান হয়েই থাকতে হবে। প্রথম দিনেই ব্যাপটাইজ (খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষেতকরণ) করার কথা ছিল, তা না করে ভুল করেছি। একটু থামল, তারপর বলর, প্রস্তুত থাকিস কাল সকালে গীর্জায় যেতে হবে।

মনে কোথা থেকে সাহস এসেছিল জানি না। মুনিব তার কথা শেষ করতেই আমি মাটি থেকে মাথা তুলে বললাম, না, আমি খৃষ্টান হবো না, আমি মুসলমান। বারুদে আগুন লাগার মতোই জ্বলে উঠল মুনিব। জ্বরে ওঠার প্রকাশ

ঘটল কাথায় নয়, চাবুকে। আগের মতোই রাবারের চাবুক নেমে এলো পিঠে। ভাবতে বিস্ময় লাগে সেদিন সে মার আমি কেমন করে সহ্য করেছিলাম! মুনিব বলল, খৃষ্টান হওয়ার কথা স্বীকার না করা পর্যন্ত চাবুক থামবে না। আমাকে মুখ খুলতে হয়নি। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম।

আমার জ্ঞান ফিরেছিল হাসপাতালে। পরে শুনেছিলাম, আমি মরে যাচ্ছি মনে করে সেই পলের মা'ই আমাকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছিল। হাসপাতালে থাকতেই পলের মায়ের কাছে শুনলাম, আমি কোতোয়ালের বাড়ি থেকে ছাড়া পেয়েছি। মাত্র ১ হাজার টাকার বিনিময় নিয়ে সে আমাকে হস্তান্তর করেছে এক ব্যবসায়ীর কাছে। পলের মা জানাল সেই আমাকে সেখানে পৌছে দেবে।

যেদিন আমি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলাম। পলের মা এলো আমাকে সেই বাড়িতে পৌছে দেবার জন্যে। নতুন মনিবের বাড়িতে যাত্রা করার আগে সেই দয়ালু মহিলা একটা গাছের ছায়ায় বসে আমাকে অনেক উপদেশ দিল। বলল, 'বাছা, আমিও তোমার মতো মুসলমান। একটা গরীব পরিবারের গৃহবধু ছিলাম। স্বামী-পুত্রকে ওরা খুন করেছে। জোর করে ওরা আমাকে খৃষ্টান বানিয়েছে। প্রাণ বাঁচানোর জন্যে খৃষ্টান হয়েছি, কিন্তু মন তো খৃষ্টান হয়নি। তোমাকেও তাই করতে হবে বাছা। তা না হলে তোমাকে ওরা খুন করবে। এদের হাত থেকে বাঁচার এমন একটাই পথ খৃষ্টান হওয়া। আমি দৃঢ়তার সাথে বললাম, আমি খৃষ্টান হতে পারব না কিংবা ভেতরে-বাইরে দুই রকম করার মতো মিথ্যাও বলতে পারব না। পলের মা বলল, তোমাকে মিথ্যা বলতে হবে না। তুমি শুধু চুপ করে থাকবে। ওদেরকে আমি জানাব, তুমি ব্যাপটাইজ হয়ে গেছ। তাহলে খৃষ্টান হওয়ার ঝামেলা থেকে তুমি বেঁচে যাবে, কিন্তু তোমার বহ্যিক পরিচয় হবে খৃষ্টান।

এভাবে আমার নতুন ব্যবসায়ী মুনিবের বাড়িতে আমার খৃষ্টান পরিচয় হলো। সকলের চোখে আমি হয়ে গেলাম মরিসকো। কিন্তু ইসলাম ত্যাগ করিনি। দিনে নামাজ আমি পড়তে পারিনি। কিন্তু রাতে আমি আল্লার কাছে হাজির হয়ে কেঁদে কেঁদে মাফ চেয়েছি। ত্রিশ বছর বয়সে আমি স্বাধীন হতে সমর্থ হই। ব্যবসায়ী মনিবের কাছে ব্যবসা শিখেছিলাম। ব্যবসা করে টাকা উপার্জন করি। মরিসকোদের কাছে জমি বিক্রি হয় না। তাই ভ্যালেনসিয়া থেকে উঠে যাই

মাদ্রিদে। সেখানে গিয়ে মরিসকো পরিচয় গোপন করে আমি জমি কিনি এবং বাড়ি করি। সম্মানজনক জীবনের জন্য সকলের সন্দেহ অবিশ্বাস ও শ্যেন দৃষ্টি থেকে বাঁচর জন্য মরিসকো পরিচয় গোপন করলেও খুঁজে পেড়ে একজন মরিসকো মেয়েকে বিয়ে করি। আমি আমার বংশের রক্ত বিশুদ্ধ রাখতে চাই, আমার আশা এই রক্ত একদিন জাগবে একদিন শক্তি সাহস নিয়ে কথা বলবে, যা আমি পারিনি।

যথাসময়ে সন্তান হলো। সামর্থ্যের আমার বাড়ল। আবাল্য গোপন, অতৃপ্ত ইচ্ছা তখন আমার মনে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। আমার বাবা মা'র সন্ধান করতে আমি বেরুব। আমি বেরুলাম। আগের অনুসন্ধান থেকে আমি জানতে পেরেছিলাম। আমার বাবাদের সে জাহাজ ভূমধ্যসাগরে মেজর্কা দ্বীপের কাছে লুন্ঠিত হয়। অনেক নিহত হয়। অবশিষ্টরা মেজর্কার পালমা বন্দরে গিয়ে নামে। আমি মেজর্কার পালমা শহরে গেলাম। সেখানে আতিপাতি করে খুঁজলাম। এই রকম একজন বিজ্ঞানী দম্পতির খোঁজ কেউ জানে কি না। একদিন রেষ্টুরেন্টে একজন বৃদ্ধ নাবিকের সাথে আলোচনায় জানতে পারলাম, স্পেন থেকে একদল উদ্বাস্তুকে মেজর্কা তেকে ফ্রান্সের পোর্ট ভেনড্রেসে তাদের জাহাজ পৌছে দিয়েছিল। তাদের মধ্যে এ রকম স্বা-স্ত্রী ছিলেন। নানা কথার মধ্যে একথাও শুনেছিল স্বামী ভদ্রলোকটি একজন বড় বিজ্ঞানী। এই খবর পাওয়ার পর আমি দক্ষিণ ফ্রান্সের পোর্ট ভেনড্রেসে যাই। সেখানে গিয়ে এই খোঁজ পাই যে, স্পেন থেকে একদল উদ্বাস্তু এখানে নেমেছিল। কিন্তু নগর কর্তৃপক্ষ এ শহরে তাদের বসতি স্থাপন করতে না দিয়ে ওদের পশ্চিম দিকে ঠেলে দেয়। শোনা যায় ওরা পিরেনিজ পবর্তমালার পাদদেশে বাস্ক এলাকার দিকে চলে যায়। আর আমি এগোতে পারিনি। পিরেনিজের এক শৃঙ্গে দাঁড়িয়ে তার অন্তহীন পাদদেশের দিকে নজর ফেললাম, তখন সেখানে সবটা জুড়ে আমার পিতার সেই রক্তাক্ত মুখই শুধু দেখলাম এবং শুনতে পেলাম পিরেনিজের মৌন বুক ভেঙে চৌচির করে জেগে উঠছে আমার মায়ের বুকফাটা সেই চিৎকার। চোখের পানিতে ভেসে সেখান থেকে ফিরে এলাম। ফিরে এলাম কিন্তু মনের শান্তি আর ফিরে এলো না। সব সময় মনে হতো পিরেনিজের ওপারে পার্বত্য বনাঞ্চলে আমার বৃদ্ধ আব্বা-আম্মা কেঁদে

কেঁদে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হয়তো চেষ্টা করছেন পিরেনিজ ডিঙিয়ে আবার স্পেনে ফিরে আসার।

একদিকে মনে এই অশান্তি, অন্য দিকে ধীরে ধীরে জীবনটা হয়ে উঠছিল অসহনীয়। ভেবেছিলাম, খৃষ্টান হওয়া কিংবা খৃষ্টান পরিচয় গ্রহনের পর মুসলমাদের ওপর নির্যাতন, নিপীড়ন কমবে। কিন্তু তা হলো না। তারা জোর করে মুসলমানদের খৃষ্টান বানাল কিন্তু খৃষ্টান হওয়া এই মুসলমাদের তারা বিশ্বাস করল না। তারা মনে করল, মুসলমানরা কেউ আসলে মুসলমানিত্ব ছাড়েনি। গোপনেও যাতে কেউ নামাজ পড়তে না পারে, রোজা রাখতে না পারে, আরবী শিখতে না পারি, সেদিকে কড়া নজর রাখা হতো। 'মরিসকো'দের কেউ মারা গেলে গ্রাম্য গীর্জা সংগে সংগে তার লাশ দখল করতো এবং খৃষ্টান মতে তারা দাফন করতো। যতই দিন যাচ্ছে, তাদের আচারণ 'মরিসকো'দের ওপর ততই কঠিন হচ্ছে। কুরআন শরীফ কোথাও পাওয়া যায় না, আরবী বইও কোথাও মেলে না। আমি আমার সন্তানদের কুরআন মুখস্থ শিখিয়েছি, কিন্তু এভাবে কতদিন চলবে? মাঝে মাঝে ভাবি, এর চেয়ে ভালো, বিদ্রোহ করে জীবন দিয়ে শেষ হয়ে যাওয়া, কিন্তু পারি না। বুঝতে পারি, এই না পারাটাই আমার জাতির সবচেয়ে বড় দুর্বলতা, আমাদের পতনও বোধ হয় এই কারনেই। অনেক সময় আবার ভাবি, দিন সমান যায় না। মরিসকোরা কি কোনদিনই জাগবে না? তাদের মরা প্রাণে কি বাঁচার আগুন জ্বলবে না? নিহত লাখো শিশুর চিৎকার, নির্যাতিতা লাখো মা-বোনের আর্তনাদ কি বৃথাই যাবে? নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের অশ্রুর যে নদী বইছে, সে অশ্রু কি কোনদিনই কথা বলবে না? গ্রানাডার শেষ বীর মুসার জন্ম কি আর হবে না 'মরিসকো' দের মধ্যে? আমি আশাবাদী। আশাবাদী বলেই অসহনীয় জীবন নিয়ে আমি বেঁচে আছি, 'মরিসকো'রা বেঁচে থাকুক তাও আমি চাই।'

জোয়ান যখন তার পড়া শেষ করল, তখন তার চোখের পানি শুকিয়ে গেছে। বিষন্ন চোখ তার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মনে যেন নতুন শক্তির স্পন্দন জাগছে! তার পূর্বপুরুষ হতভাগ্য আবদুল্লাহর শেষ কথাগুলো তার অস্তিত্বের প্রতি পরতে পরতে যন্ত্রণার এক কিলিবিলি সৃষ্টি করছে। তার সত্তার অন্তঃপুর থেকে তার পূর্বপুরুষের সেই প্রশ্নই যেন মাথা তুলছেঃ লাখো শিশুর কান্না, লাখো মা-বোদের

আর্তনাদ, লাখো নিযাতির্তের অশ্রুর নদী কি বৃথাই যাবে? গ্রানাডার শেষ বীর সেই মুসার জন্ম কি আর হবে না? জোয়ানের রক্তে একটা উত্তপ্ত শিহরন জাগল। তার আব্বা গ্রানাডার শেষ বীর সেই মুসার নামেই তার নাম রেখেছেন। সেই মুসার কাহিনী জোয়ান জানে না, তবু এই প্রথমবারের মতো গর্বে তার বুকটি যেন ফুলে উঠল! সেই সাথে 'মরিসকো'রা তার কাছে নতুন রূপ নিয়ে আবির্ভূত হলো। এই নির্যাতিত জাতির জন্যে তার অন্তরে কোথা থেকে যেন হু হু করে ছুটে এলো মমতার বন্যা। মনে পড়ল, তার পূর্বপুরুষ হতভাগ্য বালক আবদুল্লাহর দুঃসহ জীবনের কথা তার আব্বা-মা'র বুক থেকে তাকে ছিনিয়ে নেয়ার দৃশ্য এবং দশ বছরের এক অসহায় বালকের নিছক মুসলমান হওয়ার কারণে তার পিঠে চাবুক বর্ষনের কাহিনী। চোখের কোণ ভিজে উঠল জোয়ানের। হঠাৎ করে চোখের সামনে ভেসে উঠল গোটা স্পেনের মানচিত্র জুড়ে ঐ রকম লাখো বালক যেন অশ্রু বর্ষণ করছে! হৃদয়টা কেঁপে উঠল জোয়ানের। মনে হলো তার, সে ঐ লাখো বালকেরই একজন।

মনটা অনেক হালকা হলো জোয়ানের। মরিসকো হওয়ার জন্যে তার বেদনাবোধ, ভয়, অস্বস্তি, হীনমন্যতা ধীরে ধীরে তার অন্তর থেকে উবে গেল।

জোয়ান ধীরে ধীরে খাতাটি বন্ধ করল। সযত্নে তা রেখে দিল বাক্সে। হঠাৎ তার মনে হলো, তার সন্তানের জন্যে এই আমানত তাকে রক্ষা করতে হবে। কিন্তু পর মুহূর্তে একটা জিজ্ঞাসা তার অন্তরে ঝড়ের বেগে প্রবেশ করল, ইতিহাসের এই গোপন হস্তান্তর আর কতদিন চলবে? আমাদের পরিচয় কেন আমরা গোপন করে চলব? কেন চিৎকার করে বলব না আমাদের পরিচয়ের কথা? কেন শতাব্দীর পর শতাব্দী থেকে চলে আসা বর্বরতার প্রতিবাদ আমরা করব না, প্রতিকার আমরা চাইব না?

জোয়ানের চোখ-মুখ প্রবল এক আবেগ ও দৃঢ়তায় শক্ত হয়ে উঠল।

জোয়ানের আবেগ-উজ্জ্বল চোখটি জানালা দিয়ে বাইরে ছুটে গেল। নিবদ্ধ হলো দূরের উদার-নীল নীলিমার বুকে। তার মনে হলো নীল আকাশ যেন বিরাট এক রূপালি পর্দা! হাজারো ছবি তাতে ভেসে উঠছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। সে জীবন-চলচ্চিত্রে ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে দেখল তার পুরাতন জীবন, সেখানে

এসে দাঁড়াল নতুন এক জোয়ান ফার্ডিনান্ড- মুসা আবদুল্লাহ। এ জীবনের সামনে অনিশ্চয়তা ও অন্ধকার এক ভবিষ্যৎ। কিন্তু তবু এই অনিশ্চত ও অন্ধকার ভবিষ্যতের সামনে দাঁড়িয়ে জোয়ানের হৃদয়টা গভীর এক প্রশান্তিতে ভরে উঠছে, কোথা থেকে শক্তির এক প্রসরণ জাগছে তার হৃদয়-কন্দরে।

জোয়ান তাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেলে জেন কিছুক্ষন স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকল। তার মনে হলো, জোয়ান যেন তার কাছ থেকে পালিয়ে গেল। অভিযোগ মোকাবিলার সাধ্য তার নেই! তাহলে সে সত্যিই 'মরিসকো''! জেনের মনটা অস্থির হয়ে উঠল।

জেন বাড়ির পথে পা বাড়াল। বাবার চেহারা ভেসে উঠল জেনের চোখে। তার বাবা জিমোনেজ ডে মিজনারোসা কট্টর মুসলিমবিদ্বেষী, মরিসকো'দের সে দু'চোখে দেখতে পারে না। মনে পড়ে তাদের এক ড্রাইভার ছিল। নাম স্টিফেনো। বয়স ছিল পঞ্চাশের ওপর। দীর্ঘ দিনের পুরানো ড্রাইভার, খুব বিশ্বস্ত ছিল। পরিবারের একজন সদস্যে পরিনত হয়েছিল সে। তারপর একদিন প্রকাশ পেল সে মরিসকো। বাবা শুনে বারুদের মতো জ্বলে উঠেছিলেন। সেদিন নিত্যনিনের মতো ষ্টিফেনো কাজে এসেছিল। বাবা টের পেয়েই ছুটে গিয়েছিলেন। সেদিনের সে দৃশ্যটা এখনও জেনের চোখে ভাসে। তারা দোতালার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে গোটা ব্যাপারটাই দেখেছিল। বাবা ছুটে গিয়ে ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তুই মরিসকো?'

প্রশ্ন শুনেই স্টিফেনোর চোখ ছানাবড়া হয়ে গিয়েছিল! বাবা আর তাকে কোন প্রশ্ন করেননি। 'ব্যাটা প্রতারক, কালসাপ!' বলেই হাতের রাবারের চাবুক দিয়ে তাকে পাগলের মতো প্রহার শুরু করেছিলেন। স্টিফেনো কোন কথা বলেনি। তার বড় বড় বোবা দৃষ্টিতে ছিল রাজ্যের ভয় এবং এক আকুল মিনতি।

প্রহারের তোড়ে স্টিফেনোর রক্তাক্ত দেহ মাটিতে পড়ে যায়। বাবা তাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে বেরিয়ে যান। জেন মনে করেছিল তাকে হাসপাতারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু কোনদিন স্টিফেনো আর ফিরে আসেনি। আব্বা-আম্মাকে জিজ্ঞেস করলে তারা ব্যাপারটা এড়িয়ে যান। পরে জেন ধীরে ধীরে জানতে পারে, স্টিফেনো বেঁচে নেই। যেহেতু সে মরিসকো অবিশ্বস্ত, তাই তাদের কোন কথা

যাতে প্রকাশ করার সুযোগ না পায় এজন্যে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। জেনের ছোটবেলায় সে অনেক কোলে-পিঠে চড়েছে স্টিফেনোর। জেন মনে খুব কষ্ট পায়। কিন্তু সেও ভাবে, মরিসকো'রা সাংঘাতিক কিছু। এখন জোয়ান সেই সাংঘাতিক কিছুতে পরিনত হয়েছে। তার মানস চোখে ভেসে উঠল তার বাবা যখন জানবেন জোয়ান মরিসকো তখন ঘৃণায় তার মুখটা কেমন বাঁকা হয়ে যাবে! স্টিফেনোর মতো জোয়ানের ওপর তিনি চড়াও হতে পারবেন না বটে তবে জোয়ান তার কাছে আর কোন মানুষরূপেই গণ্য হবে না।

কেঁপে উঠল জেন। জোয়ান তার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। সেই স্কুল জীবন থেকে জোয়ান তার সহপাঠি ও প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেন সব সময় পরাজিত হয়েছে। বরাবরই প্রথম হয়েছে জোয়ান। জেনকে এটা আহত করেছে সব সময়। জেনরা স্পেনের শ্রেষ্ঠ পরিবার। রানী ইসাবেলার গুরু ও এই ইউনিভার্সিটি অব মাদ্রিদ, যার নাম ছিল ইউনিভার্সিটি অব আলফালা, এর প্রতিষ্ঠাতা কার্ডিনাল ফ্রান্সিসকো তাদের উত্তর পুরুষ। জেনের হৃদয় জুড়ে ছোটবেলা থেকে বিরাট এক অহংবোধ গড়ে উঠেছে। সে অহংবোধকে জোয়ান আহত করেছে বার বার। অনার্স ফাইনালে এসে এই প্রথম বারের মতো জিতল সে হারল জোয়ান। জেতার পর জেন আনন্দের চেয়ে বিস্মিত হয়েছে বেশি। জোয়ানের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ শুনে তার বিস্ময়টা বেদনায় রূপন্তরিত হয়েছে। জেন জিততে চেয়েছে, কিন্তু জোয়ানকে তো সে এভাবে হারাতে চায়নি। তার মনে একটা প্রবল অস্বস্তি তাকে ভীষণ পীড়া দিচ্ছে, জোয়ান মরিসকো প্রকাশ হওয়ার পরই কি এভাবে হারল সে! হৃদয়টা বেদনায় মোচড় দিয়ে উঠল। মরিসকো'রা কি মানুষ নয়! মরিসকো বলেই একজনের সব ভালো শেষ হয়ে যাবে?

বাড়ি ফিরতে প্রবৃত্তি হলো না জেনের। সে নিরিবিলি থাকতে চায়। বাড়িতে গেলে তাকে নিয়ে হৈ চৈ চলবে। তার প্রথম হওয়ায় পরিবার ও তার বন্ধু-বান্ধবরা আনন্দে নাচছে।

জেন পার্কের পথ ধরল। কৃত্রিম হ্রদ ঘেরা বিশাল মাদ্রিদ পার্ক।

একটা নিরিবিলি স্থান দেখে বসল জেন। নিরব পার্ক। লোকজন নেই বললেই চলে। পাখির কিচির-মিচির ও বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ ছাড়া কোথাও কোন শব্দ নেই।

কিন্তু প্রকৃতির প্রশান্তি জেনের হৃদয়ের ঝড় থামাতে পারল না। স্বস্তি পাচ্ছে না সে, তার অন্তরটা খচ খচ করছে। ও হারল, সেই সাথে ওর বিরুদ্ধে মরিসকো হবার অভিযোগ উঠল। জোয়ানের সুন্দর, সরল, নিষ্পাপ মুখ ভেসে উঠছে জেনের সামনে। বড় অসহায় মনে হচ্ছে ওকে। ওকে এই আঘাত তো জেন দিতে চায়নি। জেনকে নিজের কাছে বড় অপরাধী মনে হচ্ছে। বড় অসুস্থ মনে হচ্ছে নিজেকে। কপালটা দপ দপ করছে বেদনায়।

পার্কের বেঞ্চিতে নিজের অবসন্ন দেহটাকে এলিয়ে দিল জেন। চোখ দু'টো বুজে গিয়েছিল তার।

কারও স্পর্শে চমকে উঠে চোখ খুলল জেন। চোখ খুলে দেখল, বান্ধবী হান্না। রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে! বলল, 'কিরে জেন, তুই এখানে! কি হয়েছে তোর?'

জেন চোখ বুজে বলল, 'কিছু হয়নি।'

'বললেই হলো। চোখ-মুখ শুকনো কেন? চোখ অমন লাল কেন?'

'ও কিছু না, মাথা ধরেছে।'

'এসময় এখানে তুই?'

'ভালো লাগছে না।'

'ভালো লাগছে না? তোর না আজ আনন্দের দিন?'

কোন উত্তর দিল না জেন।

হান্না চোখে-মুখে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। সে জেনের আরও কাছে এগিয়ে এলো। জেনের মুখোমুখি হয়ে বলল, 'কি হয়েছে তোর বলত? বাড়িতে কিছু ঘটেছে?'

'না।'

'তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু হয়েছে?'

'না।'

'কিছুই হয়নি, কিছুই ঘটেটি, তাহলে তোর কি হলো?'

একটু থামল হান্না। মুহূর্তের জন্যে চোখ বন্ধ করল। চিন্তা করল যেন! তারপর বলল, 'জোয়ানের খবর শুনেছিস?'

'কি খবর?' চমকে উঠে বলল জেন।

হাসল হান্না। বলল, 'জোয়ান মরিসকো, তুই শুনেছিস?'

সেই অসহ্য কথাটা আবার শুনল জেন। তার বুকে কেউ যেন চাবুক হানল! ক্ষেপে উঠল তার মন। সে সোজা হয়ে বসে বলল, 'খুব খুশি হয়েছিস না?' জেনের লাল চোখ আরও লাল হয়ে উঠল।

'বুঝলাম, তোর অসুখ কি!' মুখে হাসি টেনে বলল হান্না। 'কিন্তু তুই মন খারাপ করছিস কেন? ও তোর প্রতিদ্বন্দ্বী। মনে নেই তোর, প্রতিটি পরীক্ষায় ওর কাছে হারার পর তুই কাঁদতিস।'

'এভাবে ওকে হারাতে চাইনি। বুঝতে পারছি, মরিসকো বলোই ওকে পরীক্ষায় হারানো হয়েছে।' ভারি গলায় বলল জেন।

'তাতে তোর কি? ও মরিসকো, ওর হারাই ... ... '

'থাম!' বলে চিৎকার করে উঠে জেন দু'হাতে নিজের মাথা চেপে ধরে বেঞ্চিতে এলিয়ে পড়ল।

হান্না এগিয়ে এসে জেনকে ধরে দ্রুত বলল, 'তুই সত্যিই অসুস্থ, তোর বিশ্রাম দরকার। এখানে আর নয়, চল তোকে বাড়িতে পৌছে দেব।'

'আমার গাড়ি আছে।'

'না, তুই গাড়ি ড্রাইভ করতে পারবি না।'

বান্ধবীর এই সহানুভূতিতে জেনের চোখের কোণায় পানি এসেছিল। জেন তাড়াতাড়ি মুছে বলল, 'তোর গাড়ির কি হবে?'

জেনের চোখের পানি হান্নার দৃষ্টি এড়াল না। জেনকে ধরে নিয়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'তোকে বলিনি, বার্কা ওদিকে আছে।' তারপর প্রসংগে ফিরে এসে বলল, 'জেন, তুই বড় সেন্টিমেন্টাল। ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে তোকে এমন সেন্টিমেন্ট হওয়া তো সাজে না।'

জেন কোন জবাব দিল না। মুহূতের জন্যে তার চোখ দু'টি বুজে এলো। হান্নাকে জড়িয়ে ধরে গাড়ির দিকে পা বাড়াতে বাড়াতে জেন বলল, 'জোয়ানের বিরুদ্ধে মরিসকো হওয়ার অভিযোগ, এক তুই ছোট ব্যাপার বলছিস?'

'আমি নই, সবাই বলছে, খুশী হয়েছে সবাই।'

'কেন খুশি হয়েছে?'

'একজন মরিসকো ধরা পড়েছে বলে।'

জেনের বুকে হান্নার কথা চাবুকের মতো কেটে বসল যেন! বুকটা কেঁপে উঠল তার। মুখের ওপর বেদনার এক পাংশু ছায়া নেমে এলো। তার শুকনো ঠোঁক কাঁপতে লাগল। জেন ঠোঁট কামড়ে ধরল। কোন কথা সে আর বলল না।

জেনকে বাড়িতে ঢুকতে দেখে জেনের মা ছুটে এসে জেনকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেছিস মা!' জেনের কপালে চুমু খেতে গিয়ে জেনের চোখে চোখ পড়তেই চমকে উঠল জেনের মা। বলল, 'জেন, তোর অসুখ করেছে?'

জেনের বাবাও তখন এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে। সে জেনের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, 'রোদে নিশ্চয় খুব হৈ-হুল্লোড় করেছ। যাও একটু বিশ্রাম নাও।'

জেন চলে গেল তার ঘরে। জেন তার বিছানায় মুখ গুঁজে শুয়েছিল।

সে শুধু এপাশ ওপাশ করে  সময় কাটিয়েছে।

এপাশ ওপাশ করতে গিয়ে বুক পকেটে রাখা জোয়ানের দেয়া গোলাপ পড়ে গেল বিছানায়। জেন আস্তে তুলে নিল গোলাপটি। গোলাপটি হাতে তুলে নিতেই জোয়ানের মুখ ভেসে উঠল জেনের চোখে। জেন ধীরে ধীরে গোলাপটি তুলে ধরে আলতোভাবে ঠোঁটে স্পর্শ করে আবার সে বুক পকেটে রেখে দিল। তারপর নিজেকে বিছানার ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বালিশে মুখ গুঁজল সে।

ঘরে পায়ের শব্দ শুনে মুখ তুলল জেন। দেখল আব্বা-আম্মা ঘরে ঢুকেছেন।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে জেনের আব্বা বলল, 'জেন, মা শুনেছ, জোয়ান মরিসকো। কী হৈ চৈ আজ এ নিয়ে! কী সাংঘাতিক ওরা! আত্মগোপন করে থাকার কী দক্ষতা ওদের ।'

'কিন্তু জোয়ান তো দেখতে খুব ভদ্র, সৎ ও শান্ত স্বভাবের ছিল।' বলল জেনের মা।

'মরিসকোরা মনেপ্রাণে মুসলমানই রয়ে গেছে। ওরা ইবলিশের চেয়েও বড় শয়তান। বাইরে দেখে ওদের বুঝতে পারবে না।'

'কিন্তু যাই হোক, জোয়ান ছেলেটার মাথার তুলনা হয় না।'

'মরিসকোদের মাথা দিয়ে কি হবে? পরিচয় নিয়ে প্রতারণার জন্যে ওর ডিগ্রিও কেড়ে নেয়া উচিত।'

পিতার কথাগুলো জেনের হৃদয়ে নিষ্ঠুরভাবে কষাঘাত করল। জোয়ান প্রতারক! ভন্ড! না, না, তা হতে পারে না। সেই ছোটবেলা থেকে ওকে দেখছে। ওর মতো শান্ত ছেলে, সুন্দর চরিত্র তো আর সে দেখেনি! ওর মতো প্রতিভা তো আর নেই। মরিসকো হবার কারণে তার সব কিছু মিথ্যা হয়ে যাবে। হোক তারা ছদ্মবেশী মুসলমান! কিন্তু কার কি ক্ষতি করেছে তারা? ওরা তো শান্ত, অনুগত নাগরিক। মুসলমান হওয়া কি অপরাধ? ইতিহাস কি এটাই নয় যে, মুসলমানরা স্পেনকে শুধু নয়, ইউরোপকে শুধু দিয়েছেই, নেয়নি কিছু। মন কাঁপছে, দেহের সব স্নায়ু কাঁপছে জেনের। দেখতে পাচ্ছে, চারদিকে পুঞ্জীভূত ঘৃণা, সন্দেহ ছাড়া মরিসকোদের আর কিছু পাবার নেই। সেই পুঞ্জীভূত ঘৃণা ও সন্দেহের স্তূপে হারিয়ে যাচ্ছে জোয়ান, ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সে। আর সে দেখতে পাচ্ছে, বিপর্যস্ত বিধ্বস্ত জোয়ান যেন তার দিকে তাকিয়ে বলছে, 'তোমার আশা পূর্ণ হয়েছে, এখন আমার ধ্বংস দেখে খুশি হও।' অনেকটা অবচেতনভাবেই জেনের মুখ থেকে 'না,না ... চিৎকার বেরিয়া এলো।

জেনের আব্বা-আম্মা ছুটে এলো জেনের পাশে। জেনের আম্মা জেনের মাথায় হাত দিতে গিয়ে চমকে উঠল, 'একি জ্বর তোর গায়ে।' তারপর মেয়ের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে তাকাল, বলল, 'খুব খারাপ লাগছে মা?'

জেন তখন সম্বিভ ফিরে ফেয়েছে। সম্বিত ফিরে বালিশে মুখ গুঁজল সে।

জেনের আম্মা জেনের আব্বার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘তুমি বসে থেকো না, তাড়াতাড়ি ডাক্তারকে টেলিফোন করে দাও।’

জেনের আব্বা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

জেনের আম্মা জেনের মাথায় হাত বুলাতে লাগল।

# ৩

রাতের মাদ্রিদ, ফাঁকা রাস্তা। ট্যাক্সি চলছিল ঝড়ের বেগে।

ট্যাক্সির প্যানেল বোর্ডের দিকে তাকিয়ে আহমদ মুসা দেখল রাত তখন আড়াইটা।

কোথায় যেতে হবে জিজ্ঞেস না করেই ট্যাক্সি ড্রাইভার তার গাড়ি ছেড়ে দিয়ে ছিল। সোজা রাস্তাটি একটা মোড়ের মুখোমুখি হলে ট্যাক্সি ড্রাইভার পেছন দিকে না ফিরেই জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাবো স্যার?'

আহমদ মুসা ও মারিয়া পেছনের সিটে বসেছিল। ড্রাইভারের প্রশ্ন শুনে আহমদ মুসা মারিয়ার দিকে তাকাল।

মারিয়া বুঝল, কোথায় যেতে হবে সেটা মারিয়াকেই বলতে হবে। বিদেশি সে, বলবে কি করে।

মারিয়া একটু ভাবল। মাদ্রিদ বিমান বন্দর থেকে সোজা লা গ্রিনজাতে যেতে বলা হয়েছে। মাদ্রিদের বাড়িতে নিশ্চয়ই কেউ নেই। সুতরাং সেখানে গিয়ে লাভ নেই। লা-গ্রিনজাতে এই ট্যাক্সি যাবে না।

'সেন্ট্রাল ট্যাক্সি পুলে চল।' বলল মারিয়া। সেন্ট্রাল ট্যাক্সি পুল উত্তর মাদ্রিদে। অনেক দূর-প্রায় দশ মাইলের মতো এগোতে হবে।

ট্যাক্সি ড্রাইভার মোড়ে পৌঁছে উত্তরমুখী মাদ্রিদ সেন্ট্রাল হাইওয়ে ধরে এগিয়ে চলল।

কিছুক্ষণ চলার পর ড্রাইভার বলল, 'শুরু থেকেই একটা গাড়ি আমাদের পেছনে। আমি যতই স্পিড বাড়াচ্ছি, ওরাও বাড়াচ্ছে। আমার সন্দেহ নেই ওরা আমাদের পিছু নিয়েছে।'

আহমদ মুসা সংগে সংগেই তার চোখ পেছনে ফেরাল। দেখল, দু'টো হেড লাইটচ ছুটে আসছে।

মারিয়াও চোখ ফেরাল পেছনে। সেও দেখতে পেল ছুটে আসা দু'টো হেডলাইট। তার চোখে ফুটে উঠল উদ্বেগ। সে পেছন থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে আহমদ মুসার মুখ সে দেখতে পেল না। অন্ধকারের মতোই রাজ্যের উদ্বেগ এসে ঘিরে ধরল মারিয়াকে। সে অবশ্য ভাবল, পাশের সুন্দর, শান্ত, সরল লোকটির সঙ্গ সে যতটুকু পেয়েছে, যতটুকু তার কাজ দেখেছে তাতে এ বিস্ময়কর মানুষটির ওপর চোখ বুজে নির্ভর করা যায়। কিন্তু সেতো আহত, আর একজন মানুষের শক্তি কতটুকুই বা!

ওরা নিশ্চয় দল বেঁধে ছুটে আসছে!

আহমদ মুসা পেছন থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে বসল। একবার হাত দিয়ে পকেটের রিভলবারটা স্পর্শ করল। তারপর বলল, 'তুমি ঠিকই বলছ ড্রাইভার, ওরা আমাদের ফলো করছে। তুমি গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে দাও। সামনের টার্নিং পয়েন্টে গাড়ি ঘুরিয়ে নেবে, দক্ষিণ দিকে চলবে। যা করার আমি করব। তোমার ভয় নেই।'

গাড়ির স্পিড বাড়াতে গিয়ে আঁৎকে উঠল ড্রাইভার, 'স্যার, রং লেন ধরে সামনে থেকে একদম আমাদের নাক বরাবর একটা গাড়ি ছুটে আসছে!'

সংগে সংগে আহমদ মুসার চোখ চলে গেল সামনে। দেখল দু'টো হেডলাইট পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটে আসছে। আহমদ মুসার বুঝতে বাকি রইল না, ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান সামনে-পেছনে দু'দিকে থেকেই তাদের ঘিরে ফেলেছে। আহমদ মুসা বলল, 'ড্রাইভার, আমাদের ওরা ফাঁদে আটকিয়েছে। সামনে-পেছনে দু'দিক থেকেই ওরা আসছে।'

'স্যার, আমি গরীব মানুষ, আমার গাড়ির কিছু হলে...' কথা শেষ না করেই থেমে গেল ড্রাইভার।

আহমদ মুসা একটু ভাবল। সামনের গাড়িটা বেশ দূরে আছে, পেছনের গাড়িটা কাছে এসে পড়েছে।

'তোমার কোন ভয় নেই ড্রাইভার। তুমি গাড়ি থামিয়ে দাও। হ্যাজার্ড লাইট অন করো।' নির্দেশ দিল আহমদ মুসা।

ড্রইভার অবাক হয়ে একবার পেছনে তাকিয়েই গাড়ি থামিয়ে দিল।

‘তারপর, এখন কি হবে?’ বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলল মারিয়া।

‘আত্মসমর্পন নিশ্চয় করব না।’ বলে আহমদ মুসা গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলল, ‘তুমি রেডি থাক ড্রাইভার, বলার সাথে সাথে যাতে গাড়ি স্টার্ট দিতে পার।’

আহমদ মুসা গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির তলায় শুয়ে পড়ল। রিভলবারের ট্রিগারে তার আঙ্গুল।

পেছনের গাড়ি একদম কাছে এসে গেছে। হঠাৎ এ গাড়ি দাঁড়াতে দেখে এবং হ্যাজার্ড লাইট জ্বালাতে দেখে তারাও হ্যাজার্ড লাইট অন করেছে, কিন্তু গাড়ির স্পিড কমায়নি। সম্ভবত ওরা মনে করল মারিয়া, আহমদ মুসারা পালাবার চেষ্টা করছে। তাই তারা তাড়াতাড়ি এখানে পৌঁছতে চাচ্ছে।

রিভলবারের রেঞ্জের ভেতর আসতেই আহমদ মুসা ধীরে-সুস্থে গাড়িটির বাম পাশের সামনের চাকায় গুলী করল। তারপর রেজাল্ট দেখার অপেক্ষা না করেই লাফ দিয়ে গাড়িতে উঠে এলো। দরজা বন্ধ করতে করতে বলল, ‘স্টার্ট’।

সংগে সংগেই লাফিয়ে উঠে ছুটতে লাগল ট্যাক্সিটি।

মারিয়া জানালা দিয়ে পেছনে তাকিয়েছিল। মুখ ঘুরিয়ে এনে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘কনগ্রাচুলেশন! গাড়িটা হুমড়ি খেয়ে রাস্তার পাশে উল্টে গেছে।’

‘উল্টানোর কথা ছিল না সম্ভবত লোড বেশি ছিল গাড়িতে।’ বলল আহমদ মুসা।

সামনে রাস্তার বাম পাশে মাদ্রিদ পার্ক। আর রাস্তার ডান পাশে প্রশাসনিক ভবনসমূহ।

‘রাস্তার বাম পাশ ঘেঁষে গাড়ি চালাও ড্রাইভার।’ বলল আহমদ মুসা, ‘আমি যেখানে তোমাকে থামতে বলব সেখানেই থেমে যাবে।’

তারপর আহমদ মুসা মারিয়াকে বলল,’তুমি এপাশে এসো, আমাকে বাম পাশটা দাও।’

মারিয়া সরে এলো। আহমদ মুসা বাম পাশে দরজা ঘেঁষে বসল।

সামনের গাড়ি তখন দু'শ গজের মতো দূরে। সামনেই রাস্তার ধার ঘেঁষে কয়েকটা জলপাই গাছ। এরপর কয়েক গজ ফাঁকা জায়গা, তারপর পার্ক শুরু।

'ড্রাইভার, আমি নেমে যাবার পর দ্রুত তুমি গাড়ি ব্যাক করবে, যাতে সামনের গাড়ি বুঝতে পারে আমরা ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাচ্ছি। সামনের গাড়িটি না থেমে যাওয়া পর্যন্ত তুমি পেছতেই থাকবে।' কথা শেষ করেই আহমদ মুসা বলল, 'দাঁড়াও!' গাড়ি তখন জলপাই গাছ সোজাসুজি এসে গেছে।

দরজা আন-লক করেই বসেছিল আহমদ মুসা। গাড়ির গতি স্লো হতেই এবং গাড়ি থেমে যাবার জার্কিংটা আসার ঠিক আগেই আহমদ মুসা ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে ফেলল। অদ্ভুত দক্ষতার সাথে ডাইভ দিয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়ল এবং কয়েকবার ডিগবাজি খেয়ে জলপাই গাছের ছায়া পর্যন্ত এগিয়ে গেল। তারপর শুয়ে থেকে একটু দম নিয়ে তাকাল ট্যাক্সির দিকে। হ্যাঁ, ট্যাক্সিটি দ্রুত পিছিয়ে যাচ্ছে। দৃষ্টি ফেরাল আহমদ মুসা, সামনের গাড়িটা দ্রুত ছুটে আসছে। আর কয়েক মুহূর্ত, তারপরেই গাড়িটি আহমদ মুসার সমান্তরালে চলে আসবে।

আহমদ মুসা ঘাসের ওপর দিয়ে সাপের মতো গড়িয়ে রাস্তার কিছুটা কাছে এগিয়ে গেল। এসে পড়ল গাড়িটা। জীপ গাড়ি।

সমান্তরালে আসার আগেই ৪৫ ডিগ্রি অবস্থানে সামনের ডান চাকা লক্ষ্য করে ধীরে সুস্থে গুলী করল আহমদ মুসা। মাত্র দশ গজ দূরত্ব থেকে। সশব্দে বিস্ফোরিত হলো টায়ার।

এ গাড়িটা উল্টে গেল না, কিন্তু টাল সামলাতে গিয়ে এঁকেবেঁকে রাস্তার অনেকখানি বাইরে চলে এসে থেমে গেল।

যেখানে এসে গাড়ি দাঁড়াল সেটা আহমদ মুসার সাথে সমান্তরাল অবস্থান। দূরত্ব আহমদ মুসা থেকে ৫ গজের বেশি নয়। আহমদ মুসা একটু পিছিয়ে জলপাই গাছের ছায়ায় সরে গেল।

জীপটি থামতেই ব্রাশ ফায়ার করতে করতে একজন নেমে এলো।

চাকার দিকে একবার তাকিয়েই সে চোখ ফেরাল জলপাই গাছের অন্ধকার ছায়ার দিকে।

রিভলবারে মাত্র আর দু'টি গুলী রয়েছে।

আহমদ মুসা তার রিভলবার তুলল স্টেনগানধারী লোকটিকে লক্ষ করে। ট্রিগারে চাপ দিল আহমদ মুসা।

ঠিক এই সময়েই গাড়ির ওপাশ থেকে আরেকজন স্টেনগানধারী এসে দাঁড়াল প্রথমজনের পাশে।

গুলীটা কপাল ভেদ করে ঢুকে গিয়েছিল। প্রথম স্টেনগানধারী দ্বিতীয় স্টেনগানধারীর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল।

চমকে উঠে দ্বিতীয় স্টেনগানধারী তার স্টেনগান ঘুরাল জলপাই গাছের অন্ধকারের দিকে।

আহমদ মুসা তার হাত আর নামায়নি। রিভলবারের নলটা সামান্য ঘুরিয়ে আরেকবার ট্রিগার টিপল সে। দ্বিতীয় স্টেনগানধারী তার স্টেনগানের ট্রিগার টেপার আগেই প্রথম জনের লাশের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

ঠিক এই সময়েই দু'দিক থেকে দু'টি পুলিশের গাড়ি আসতে দেখা গেল।

পুলিশের একটা গাড়ি এসে থামল জীপের কাছে, আরেকটা ট্যাক্সির কাছে।

আহমদ মুসা জলপাই গাছের অন্ধকার থেকে বের হয়ে অগ্রসরমান দু'জন পুলিশের হাতে তার শূন্য রিভলবারটি তুলে দিয়ে জীপের কাছে সেই দুই লাশের পাশে এসে দাঁড়াল।

একজন পুলিশ অফিসার এগিয়ে এসে পুলিশের কাছ থেকে আহমদ মুসার রিভলবারটি হাতে নিয়ে বলল, 'এই রিভলবার দু'টি গুলী দিয়ে এ দু'জনকে আপনি খুন করেছেন?'

'হ্যাঁ, আমিই গুলী করেছি।'

'আর চারটি গুলী কোথায়?'

'একটি দিয়ে দক্ষিণে অল্প দূরে উল্টে থাকা গাড়ির চাকা ফুটো করেছিলাম?'

'আর তিনটি?'

'একটি দিয়ে এই জীপের চাকা ফাটিয়েছি।'

'অবশিষ্ট দু'টি?'

'অবশিষ্ট দু'টি এদের বন্দীখানা থেকে বের হবার জন্যে আমরা খরচ করেছি।'

এই সময় মারিয়া ও ড্রাইভারকে নিয়ে পুলিশের অন্য দলটি সেখানে এসে পৌঁছল।

আহমদ মুসা মারিয়াকে দেখিয়ে বলল, 'ও আর আমি।'

মারিয়াদের নিয়ে আসা পুলিশ অফিসারটি বলল, 'এই মেয়ে আর ওকে এই গ্রুপ কিডন্যাপ করে ওদের ঘাঁটিতে আটক করে। সেখান থেকে ওরা পালায়। ওরা ধরার জন্যে এদের পিছু নেয়। অবশেষে এখানে লড়াইটি বাঁধে।'

আগের পুলিশ অফিসারটি আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি তো দেখছি একা দশজনের লড়াই করেছেন!'

'বলেন কি, দশজনও এদের গায়ে হাত দিতে পারতো না।' বলল অন্য পুলিশ অফিসারটি।

'উল্টে পড়া গাড়িটা কোথায়?' বলল প্রথম পুলিশ অফিসার।

'গাড়িটা উল্টে গিয়ে আগুন ধরে গিয়েছিল। আহত হয়েছে কয়েকজন ওদের পাঠিয়ে দিয়েছি। ওখানে পাঁচটা স্টেনগান ও তিনটা রিভলবার পাওয়া গেছে।'

প্রথম পুলিশ অফিসারটি আহমদ মুসা, মারিয়া ড্রাইভারকে লক্ষ করে বলল, 'উঠুন আপনারা গাড়িতে।'

দ্বিতীয় পুলিশ অফিসার বলল, 'দু'জন পুলিশ দিয়ে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিই। তাহলে ট্যাক্সিটাও নিয়ে যাওয়া হলো।'

'ঠিকই বলেছেন।' বলল প্রথম পুলিশ অফিসার।

'আমাদের যেতে হবে কেন? আমাদের তো দোষ নেই। আমরা যা করেছি, নিজেদের বাঁচার জন্যেই করেছি।' বলল মারিয়া।

'সে বিচার তো আমরা করব না, করবে কোর্ট।' বলল প্রথম পুলিশ অফিসার।

'আর এটা আপনাদের নিরাপত্তার জন্যেও প্রয়োজন।' বলল দ্বিতীয় পুলিশ অফিসার।

‘কিভাবে?’ বলল মারিয়া।

‘জানেন কারা আপনাদের কিডন্যাপ করেছে, কাদের সাথে আপনারা লেগেছেন? ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান! ওদের গায় আমাদের সরকারও হাত দেয় না।’

‘তাহলে আমরা হাত দিয়ে নিশ্চয় অপরাধ করেছি?’ বলল আহমদ মুসা।

‘আমরাও ওদের এড়িয়ে চলি। ওদের গায়ে হাত দিয়ে কেউ রেহাই পায় না।’ বলল দ্বিতীয় পুলিশ অফিসার।

আহমদ মুসা ও মারিয়া গাড়িতে উঠল। গাড়িটা একটা প্রিজনারস্ ভ্যান।

আহমদ মুসা উঠলে বাইলে থেকে ভ্যানে তালা লাগিয়ে দেয়া হলো। ভ্যানে একটাই দরজা। ঘুলঘুলির মতো ছোট অনেক জানালা রয়েছে।

ভ্যানের ভেতর ডিম লাইট। বসার জন্যে লাইন করে বসানো লোহার চেয়ার। চেয়ারে বসে আহমদ মুসা চোখ বন্ধ করে গা এলিয়ে দিল বিশ্রামের জন্যে।

মারিয়ার মুখ পাংশু। মামলায় কি হবে কে জানে? একটা আতংক এসে তাকে ঘিরে ধরেছে। সবচেয়ে বড় বিপদ হলো তার পরিচয় প্রকাশ হওয়ার ভয়।

মারিয়া তাকাল আহমদ মুসার দিকে। আহমদ মুসার মুখ দেখে সে বিস্মিত হলো! সে মুখে কোন ভয়, উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তার লেশমাত্র নেই। মনে হচ্ছে যেন নিজের বাড়ির ইজিচেয়ারে বিশ্রাম নিচ্ছে! লোকটাকে যতই সে দেখছে, তার বিস্ময়ের পরিধি বাড়ছে। এর কাছে কোন বিপদ যেন বিপদ নয়, কোন কাজই যেন অসাধ্য নয়! কে এই লোক? এ শুধু অসাধারণ নয়, অসাধারণদের মধ্যে অসাধারণ। এমন সরর, সুন্দর মুখচ্ছবির মধ্যে অসাধারণ মানুষ কেমন করে বাসা বেঁধে আছে!

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর আহমদ মুসা চোখ খুলল। একবার চোখ তুলে তাকাল মারিয়ার দিকে। ঠোঁটে হাসি টেনে বলল, ‘কিছু ভেব না মারিয়া। আমরা ন্যায়ের ওপর আছি। আল্লাহ্ আমাদের সহায়।’

বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। একে একে সব জানালায় চোখ রাখল বুঝল হাইওয়ে থেকে বেরিয়ে অপেক্ষকৃত ছোট রাস্তা দিয়ে তারা এগোচ্ছে।

আহমদ মুসা সবশেষে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। পরীক্ষা করল দরজা। আন্ডার লক সিস্টেম। খুশি হলো সে।

এই সময় গাড়ির গতি কমে গেল। অবশেষে থেমে গেল। আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি দরজার সামনে থেকে এসে একটা জানালায় চোখ রাখল। দেখল গাড়ি রাস্তা থেকে একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছে। হেড কোয়ার্টারে গেলে ঝামেলায় পড়বে। নাম-ধাম প্রকাশ পাবে, ছবিও নেবে ওরা। কিন্তু বাড়িটার দিকে ভালো করে তাকাতেই চোখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ওটা একটা বার। ক্লান্ত পুলিশ অফিসাররা নিশ্চয় বারে যাওয়ার মতলব করছে।

ঠিক তাই। গাড়ি থেকে বেরিয়ে এক অফিসারসহ দু'জন পুলিশ বারে প্রবেশ করল।

সংগে সংগে মেঝেতে বসে পড়ে জুতার গোড়ালি থেকে ল্যাসার নাইফ বের করে নিয়ে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

ভীত ও বিস্ময়-বিস্ফরিত চোখ মেলে মারিয়া আহমদ মুসার কাজ দেখছে। পালাবার প্রস্তুতি চলছে তার বুঝতে কষ্ট হলো না। বুক কেঁপে উঠল মারিয়ার। ধরা পড়লে দশা কি হবে!

কয়েক সেকেন্ডেই ল্যাসার নাইফ আন্ডার লক গলিয়ে হাওয়া করে দিল।

মারিয়াকে ইংগিত করে আহমদ মুসা দ্রুত দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো।

ছুটল গাড়ির ড্রাইভিং কেবিনের দিকে। পেছনে মারিয়া।

আহমদ মুসা যা ভেবেছিল তাই। দরজা ওরা লক করে যায়নি। অবশ্য লক করে গেলেও ক্ষতি ছিল না।

আহমদ মুসা মারিয়াকে গাড়িতে ওঠার ইংগিত করে নিজে লাফ দিয়ে গিয়ে ড্রাইভিং সিটে বসল। একবার চকিতে বারের দরজার দিকে তাকিয়ে দেখল ফাঁকা, নিশ্চয় এতক্ষনে ওরা মদ গিলতে বসেছে।

দ্রুত গাড়ি ঘুরিয়ে রাস্তায় তুলে মারিয়ার দিকে চেয়ে বলল, 'আমি তো কিছু চিনি ন।। কোন দিকে যাবো বল?'

মারিয়ার চোখ ভয়ে-বিস্ময়ে তখনও ছানাবড়া! একটা ঢোক গিলে বলল, 'পুব দিকে চলুন। অল্প কিছু গেলেই সেন্ট্রাল হাইওয়ে। সেন্ট্রাল ট্যাক্সি পুল আর বেশি দূরে নয়।'

ঝড়ের বেগে চলতে লাগল গাড়ি।

আহমদ মুসা বলল, 'হাইওয়ের মুখে গিয়েই আমরা গাড়ি ছেড়ে দেব। টের পেলেই ওরা গাড়ির নাম্বার ওয়ারলেসে সব জায়গায় জানিয়ে দেবে। ধরা পড়তে বিলম্ব হবে না।'

সেন্ট্রাল হাইওয়ের প্রায় মুখেই বলতে গেলে একটা ছোট পার্ক। চারদিক দিয়ে গাছে ঘেরা। বেশ অন্ধকার।

বেশি অন্ধকার দেখে একটা জায়গায় আহমদ মুসা গাড়ি দাঁড় করাল। তারপর লাফ দিয়ে নামতে নামতে বলল, 'এস মারিয়া, দেখা যাচ্ছে ওটা নিশ্চয় তোমাদের সেন্ট্রাল হাইওয়ে।'

আহমদ মুসা ও মারিয়া এক দৌড়ে রাস্তার মুখে হাইওয়ের ফুটপাতে এসে দাঁড়াল। যেখানে দাঁড়াল তার বাম পাশেই একটা পেট্রল স্টেশন এবং তাদের পাশ দিয়েই সে স্টেশনে প্রবেশের পথ। তারা ওখানে দাঁড়াবার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই একটা ট্যাক্সি এলো। ট্যাক্সিটা খালি। পেট্রল স্টেশনে প্রবেশ করছিল। মারিয়া হাত তুললে দাঁড়াল ট্যাক্সি।

'যাবে?' বলল মারিয়া।

'কোথায়?'

'ট্যাক্সি পুলে।'

'ভাড়া দু'শো পিসেটা।'

'বেশি চাইলে, ঠিক আছে।'

আহদম মুসা ও মারিয়া ট্যাক্সিতে উঠে বসল।

তেল নিয়ে ট্যাক্সি হাইওয়েতে উঠে এলো। ছুটতে শুরু করল ট্যাক্সি।

'ট্যাক্সি পুল থেকে আপনারা কোথায় যাবেন?' বলল ড্রাইভার।

'লা-গ্রীনজা।' বলল মারিয়া।

'আমার গাড়িটাও ট্রাক্সি পুলের।'

‘তুমি লা-গ্রীনজা যাবে?’

‘অবশ্যই যাব।’

মারিয়া আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘ঠিক আছে?’

‘লা-গ্রীনজা সেতো অনেক দূর!’

‘হ্যাঁ, আমার ভাইয়া ওখানেই এখন আছেন।’

ওঁর সাথে তো আপনার দেখা করতেই হবে।’

কথা শেষ করেই মারিয়া ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বলল, ‘ঠিক আছে, চল লা-গ্রীনজা।’

‘ধন্যবাদ।’ বলল ড্রাইভার।

নড়ে-চড়ে বসল ড্রাইভার।

লা-গ্রীনজা মাদ্রিদ থেকে সোজা উত্তরে। প্রায় ১০০ মাইলের পথ ড্রাইভার তার ট্যাক্সির স্পীড বাড়াল।

লা-গ্রীনজা উত্তর স্পেনের একটা পার্বত্য নগরী। মনোরম জেরামা হ্রদের তীর থেকে অল্প দূরে সালডেল ফেনসো পর্বতমালার কোলে গড়ে উঠেছে নগরীটি। জেরামা হ্রদের দক্ষিণ তীরের বিখ্যাত শহর ‘বুত্রাগো ডেল লুজিয়াকে’ যদি বলা হয় মুখরা, হাস্যোজ্জ্বল তরুণী, তাহলে লা-গ্রীনজাকে বলা যাবে ধ্যানরতা শান্ত সুন্দর এক বালিকা। লা-গ্রীনজা সা ডেলফেনসো’র বুকের এক লুকানো মাণিক। নীল আকাশে মাথা তোলা সুউচ্চ পর্বতশৃংগের নিচে শান্ত, সুন্দর নগরী প্রথম দৃষ্টিতেই আহমদ মুসার মন কেড়ে নিয়েছিল। আজ দু’দিন হলো আহমদ মুসা লা-গ্রীনজায় মারিয়ার ভাই ফিডেল ফিলিপের বাড়িতে এসেছে।

ফিডেল ফিলিপের বাড়ি লা-গ্রীনজার একটা নির্জন টিলার ওপরে। বাড়িটিতে মনে হয় সবুজের সমুদ্রে সাদা একটা তিলক। ফিডেল ফিলিপ তার ছদ্ম নাম। বাস্ক গেরিলা নেতার আসল নাম স্যামুয়েল শার্লেম্যান। কোড নাম ‘ডাবল এস’। আসল নামেই তার এ বাড়ি এবং তিনি এখানে আসল নামেই পরিচিত। ফিডেল ফিলিপকে মানুষ জানে ভয়ংকর গেরিলা নেতা, কিন্তু স্যামুয়েল শার্লেম্যান একজন শান্ত, নিরীহ নাগরিক। বছরের কোন কোন সময় ফিলিপ লা-গ্রীনজায় আসেন, অধিকাংশ সময়ই থাকেন পিরেনিজের গেরিলা ঘাঁটিতে। সরকার

বাস্কদের অনেক দাবী মেনে নিয়ে পিরেনজ সন্নিহিত দু'টি প্রদেশে তাদেরকে স্বায়ত্ত শাসন দান করেছে। সেখানে বাস্কদের রাজনৈতৈক সরকারও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু বাস্করা এখনও তাদের অস্ত্র ছাড়েনি। কারণ অস্ত্র ছাড়লে এ স্বায়ত্ত শাসনও তাদের হারিয়ে যাবে।

বাড়িটির ভেতরে ফ্যামিলি ড্রইংরুম। ফিডেল ফিলিপের স্ত্রী জোনার সাথে কথা বলছিল মারিয়া। মারিয়া শোনাচ্ছিল তাকে তার কিডন্যাপের কাহিনী, উদ্ধারের কাহিনী। মারিয়ার বলার ঢং, আহমদ মুসার প্রশস্তির বহর দেখে মুখ টিপে হাসছিল জোনা। চোখ এড়ায় না তা মারিয়ার।

'তুমি হাসছ ভাবি?' বলল মারিয়া।

'খুশি হবো না! আমার বাঘিনী ননদিনী তো কারো কখনো এত প্রশংসা করেনি!'

'প্রশংসা কোথায় পেলে, আমি তো যা ঘটেছে তাই বলছি।'

'প্রশংসা বেশি করনি, তবে সুন্দরের দেবতা, শক্তির দেবতা, বুদ্ধির দেবতা- সকলের আসন গিয়ে তার ভাগ্যেই জুটেছে।'

'একটাও অতিরঞ্জিত কথা বলিনি ভাবি।' মুখ লাল করে বলল মারিয়া।

'ঠিকই বলছ। আমার ননদিনীকে জয় করা সাধারনের কাজ নয়।'

'ভাবি, তুমি ইয়ার্কি করছ, তুমি বুঝছ না! তিনি, আমার মনে হয়, এমন এক শান্ত সাগর যার বুকে কখনও ঢেউ জাগে না।' বলল মারিয়া।

গম্ভীর, ভারি কন্ঠ মারিয়ার।

জোনা মারিয়ার একটা হাত তুলে নিয়ে বলল, 'তা আমার বুঝতে বাকি নেই ননদিনী। বন্ধ, নির্জন ঘরে আমার আগুন ননদিনী যাকে গলাতে পারেনি, আমার আগুন ননদিনীর নিবিড় সংগ যার মধ্যে চাঞ্চল্য আনতে পারেনি, সে রক্ত-মাংসের মানুষ বলে ভাবতে আমার কষ্ট হয়।'

'কিন্তু তিনি মানুষ ভাবি। এখানেই আমার বিস্ময়! আমার প্রশংসা এখানেই। তিনি মুসলমান, কিন্তু আরও মুসলমান আমি দেখেছি, জার্মানিতে তাদের সাথে আমি মিশেছি। কিন্তু তাদের সাথে এর কোনই মিল নেই।'

বলল মারিয়ার ভাবি জোনা, 'কী আশ্চর্য! এত সময় এক সাথে থাকলি, এত পথ এলি, তবু তোর সম্পর্কে কিছু জানল না, তারও কিছু জানাল না।'

'তার কথা ও দৃষ্টিতে কোন বাড়তি আগ্রহ আমার চোখে ধরা পড়েনি। আমি তাকে না দেখলে মনে করতাম, তিনি ক্ষমতাদর্পী একজন অহংকারী, কিন্তু না, তিনি তা নন। তার চোখ দেখলে অন্তর দেখা হয়ে যায়। সেখানে লুকানো কিছু নেই। এত সরল, এত ঋজু মানুষ আমার কাছে অকল্পনীয়। ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের হাতে তিনি আহত হয়েছিলেন। গোটা মুখ ছিল রক্তে ভেজা। আমি ওর মুখ মুছে দিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। মনে হয়েছিল এটা তার অহংকার। পরে বুঝেছিলাম, আমার ভূল হয়েছে। ওটা তার নিজস্ব রীতি।'

'কোথায় বাড়ি, কি করেন জানা যায়নি, না?'

'আসার পথে জিজ্ঞেস করেছিলাম। উত্তর দিয়েছিলেন তার কোন দেশ নেই। আর আল্লাহর বান্দাদের কাজে ঘুরে বেড়ানোই তার কাজ।'

'আসলে তোক পাত্তা দেয়নি মারিয়া।' মুখ টিপে হাসল জোনা।

'হতে পারে!' মুখ কালো করে বলর মারিয়া, 'তবে একজন অজ্ঞাত-পরিচয় মেয়েকে বাঁচানোর জন্যে যিনি নিজেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন, তিনি কাউকে ছোট মনে করেন বলে মনে করি না।'

'দেশ নেই এমন লোক কি আছে, আর ঘুরে বেড়ানো লোক কি অমন হয় ননদিনী?'

'এ জিজ্ঞাসা প্রশ্নকারী ভাবির চেয়ে আমার মাঝে আরও তীব্র। এ জিজ্ঞাসা আমাকে কষ্ট দিচ্ছে ভাবি।'

'কষ্ঠ কেন রে? ও তোকে উদ্ধার করেছে বলেই কি?' হেসে বলল জোনা।

'যা জানতে চাই, তা জানতে না পারার মধ্যে কষ্ট আছে।'

'জানার আগ্রহ স্বাভাবিক কি না, তাই জানার কষ্ট এখানে স্বাভাবিক নয়।'

'হয়তো অস্বাভাবিক, কষ্ট লাগছে এটা বাস্তবতা। তুমি হয়তো এর মধ্যে ভিন্ন অর্থ খোঁজার চেষ্টা করবে। সে রকম কোন আর্ট আছে কিনা এখনও ভেবে দেখিনি। তবে তিনি যত বড় ব্যক্তিত্ব, তাতে তাকে না জানার এ কষ্ট স্বাভাবিক। ভাবি, তিনি শুধু শক্তি ও বুদ্ধিতে নন, তার হৃদয়বৃত্তিও দেখার মতো। বন্দীখানা

থেকে বের হবার সময় একজন প্রহরীকে তিনি হত্যা করেছিলেন। কিন্তু অন্যজনকে তিনি হাত, পা, মুখ বেঁধে রেখে আসেন। এতে বেশ সময় খরচ হয়, যা ঐ সময়ের জন্যে জীবনের মতো মূল্যবান ছিল। পরে আমি তাকে জিজ্ঞাস করিছিলাম, একটা গুলী খরচ করলেই তো ঝামেলা চুকে যেত। তিনি কি উত্তর দিয়েছিরেন জান? বলেছিলেন, মানুষের জীবন খুব মূল্যবান। আমরা গোটা দুনিয়া মিলেও একজন মানুষ সৃষ্টি করতে পারব না! অথচ কিছু মানুষের স্বার্থের যূপকাষ্ঠে মানুষ নিমর্মভাবে বলি হচ্ছে। যতটা পারা যায় নিজের হাতকে এ থেকে মুক্ত রাখা উচিত।'

'তাহলে দেখছি উনি নীতিবাগিশ, ভাববাদী!' এই অবস্থায় তিনি হাতে পিস্তল ধরেন কেমন করে?' বলল জোনা।

বলল মারিয়া, 'ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি সত্যিই অবাক করে দেয়ার মতো। আমরা প্রথম যে ট্যাক্সিটি ভাড়া করেছিলাম, তাকে আমরা ভাড়া দিতে পারিনে। ওকেও পুলিশ নিয়ে যায়, আমাদেরকেও। ট্যাক্সিটার নাম্বার ওর জানা ছিল। দ্বিতীয় যে ট্যাক্সিটা করে আমরা এখানে এলাম, সে ট্যাক্সি ড্রাইভারের মাধ্যমে উনি প্রথম ট্যাক্সির ভাড়া পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমি বলেছিলাম, আমরা তো ইচ্ছে করে ভাড়া না দেয়ার চেষ্টা করিনি। আমাদের যেখানে দোষ নেই, সেখানে আমাদের দায়িত্ব কি? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, ট্যাক্সি আমাদের প্রয়োজনে আমরা ভাড়া করেছিলাম, ভাড়া পরিশোধের দায়িত্বও আমাদের। তাছাড়া সে যে পুলিশের ঝামেলায় পড়ল, তার জন্যেও দায়ী আমরা। সুতরাং গরীব ট্যাক্সি ড্রাইভারের ক্ষতিপূরণ করতে আমরা না পারি, তার ন্যায্য প্রাপ্য থেকে তাকে বঞ্চিত রাখতে পারি না।' থামল মারিয়া।

মারিয়ার ভাবি জোনা তাকিয়েছিল মারিয়ার মুখের দিকে। মারিয়া থামলেও কিছুক্ষণ পর্যন্ত কথা বলতে পারল না তার ভাবি।

কিছুক্ষণ পর মুখ খুলল জোনা। বলল, 'তুই আমাকে কি শোনালি মারিয়া! মুরদের, মুসলমানদের সততা, মানবতার কথা শুনেছি, কিন্তু সেতো বহু শতাব্দী আগের কথা, সে সব তো এখন কাহিনী! কাহিনী কেমন করে রূপ ধরে এলো। একজন ব্যক্তির মধ্যে কি করে বিপরীতমুখী এত গুণ থাকতে পারে!'

কিছু বলতে যাচ্ছিল মারিয়া। এমন সময় পেছন থেকে কথা বলে উঠল ফিডেল ফিলিপ। সে অনেকক্ষন ধরে পেছনে দাঁড়িয়ে ওদের কথাগুলো শুনছিল। ফিলিপ এসে সোফার সিটে হেলান দিয়ে বসতে বসতে বলল, 'জোনা, মারিয়া ওকে যত বড় বলে কল্পনা করছে, উনি তার চেয়েও বড়।'

'তুমি জেনেছ, ভইয়া?' বলে সোফা থেকে লাফিয়ে উঠল মারিয়া।

'হ্যাঁ, জেনেছি।' বলতে শুরু করল ফিলিপ, 'তিনি আমার কাছে ছিলেন এক স্বপ্ন, যার সাক্ষাৎ আমি কোনদিনই পাব ভাবিনি, তিনি হলেন সেই।'

মারিয়া, জোন দু'জনেই ভ্রু কুচকালো। শোনার জন্যে উন্মুখ হলো। তাদের দু'চোখ ভরা কৌতূহল।

'ফিলিস্তন বিপ্লব, মিন্দানাও বিপ্লব, মধ্যএশিয়া বিপ্লবের নায়ক তিনি। আর্মেনিয়া, আজারবাইজান ও বলকানের সাম্প্রতিক পরিবর্তনের তিনিই কেন্দ্রবিন্দু।'

'আহমদ মুসা তিনি?' বিস্ময়ে হাঁ হয়ে ওঠা মারিয়ার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো।

'হ্যাঁ বোন, আহমদ মুসা তিনি। আমরা একটা বিপ্লব করতে পারি না, আর তিনি অর্ধ ডজন সফল বিপ্লবের নায়ক।'

একটু থামল ফিলিপ। তারপর আবার শুরু করল, 'মারিয়ার কাহিনী শোনার পরেই আমার মনে হয়েছিল, ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের বন্দীখানা এভাবে ভাঙতে পারে, তাদের প্রতিরোধ এমনভাবে চূর্ণ করতে পারে একাকি, এমন তো কেউ আমার জানার মধ্যে নেই!'

মারিয়া, জোনা কারও মুখেই কোন কথা নেই। তারাও আহমদ মুসা সম্পর্কে অনেক পড়েছে। পক্ষে বিপক্ষে সবরকম। সমসাময়িক বিশ্বের সবচেয়ে সফল, সবচেয়ে দূর্ধর্ষ বিপ্লবী পুরুষ তাদের সামনে উপস্থিত। তাদের অনুভূতি যেন ভোঁতা হয়ে গেছে, বিশেষ করে বুক তোলপাড় করছে মারিয়ার! সেই জগৎ বিখ্যাত বিপ্লবী পুরুষের তিনি সংগ পেয়েছেন! এত কাছে থেকে তার কাজ দেখার সুযোগ হয়েছে!

‘আমাকে সবচেয়ে বিস্মিত করেছে তার সহজ সারল্য এবং নম্র-ভদ্র আচারন। মনেই হয় না তিনি এত বড় একজন বিপ্লবী!’ বলল ফিডেল ফিলিপ।

‘আমাকে তো তাকে সদ্য বিয়ে হওয়া বরের মতো লাজুক মনে হয়েছে। কোন মতে একবার চোখ তুলে চেয়েছে। আর চোখ তোলেনি একবারও। এজন্যেই মারিয়ার গল্পে আমার কাছে তেমন বিশ্বাস্য হয়নি। একজন বিপ্লবী অমন নরম-নধর কান্তি হয়?’ বলল জোনা।

‘চোখ তুলে চায় না, ভিন্ন মেয়েদের সামনে লজ্জা-সংকোচ, ওটা ওদের পর্দা। ভালো মুসলমান সত্যিকার মুসলমান ছেলেমেয়েরা পর্দা করে। ওটা ওদের অবশ্য পালনীয় রীতি, দুর্বলতা নয়।’ বলল ফিডেল ফিলিপ।

‘ভাইয়া, ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের বন্দীখানায় আমি ওর নামাজ দেখেছি। অকল্পনীয় এক ধ্যানমগ্নতা, মনে হয় যেন তিনি এ দুনিয়ায় নেই!’ বলল মারিয়া।

‘অমন সন্ন্যাসী প্রকৃতির লোক বিপ্লবী হলেন কেন? অস্ত্র হাতে তুলে নেন কেন? ঈশ্বরপ্রেমী সন্ন্যাসী চরিত্রের সাথে তো এটা মিলে না।’ বলল জোনা।

‘তুমি তাহলে মুসলমানদের কিছু জান না। যুদ্ধের ময়দানে ওরা বীর যোদ্ধা, আবার প্রার্থনার আসনে ওরা ঈশ্বর প্রেমে বিলীন হওয়া সন্ন্যাসী। মুরদের কাহিনী তুমি পড়নি।’ বলল ফিডেল ফিলিপ।

‘পড়িনি, কিন্তু মরিসকোদের তো আমি দেখেছি। সেবার বিলেতে গিয়ে একটা মুসলিম পরিবারকেও দেখেছিলাম।’ বলল জোনা।

‘মরিসকোরা তো খৃষ্টান মুসলমান! ওদের বুকে ঈমান লুকানো থাকলেও প্রকাশ্যে ওরা খৃষ্টান। আর বিলেতে যে মুসলিম পরিবার দেখেছ, ওরা মুসলমানদের ধ্বংসাবশেষ। এসব মুসলমানদের কারনেই মুসলিম শাসন ও সংস্কৃতির পতন হয়েছে। স্পেনে যতদিন মুসলমানরা প্রকৃত মুসলমান ছিল, মুসলিম রাজত্বের ওপর খৃষ্টানরা কোন আঁচড় কাটতেও সাহস করেনি। আহমদ মুসার তুলনা মরিসকোরা নয় কিংবা নয় বৃটেনের ঐ মুসলিম পরিবার। আহমদ মুসার তুলনা স্পেন বিজেতা তারিক বিন যিয়াদ, মুসা বিন নুসায়ের প্রমুখের সাথে।’ ফিডেল ফিলিপ বলল।

'বাঃ আহমদ মুসা তো দেখি দু'ভাইবোনকে একদম শিষ্য বানিয়ে ছেড়েছে!' বলল জোনা।

'অমন বিপ্লবীর শিষ্য হওয়া ভাগ্যের কথা। আমি খুব খুশি হয়েছি, ওর কাছ থেকে কিছু শিখতে পারব।'

'ও কেন স্পেনে এসেছেন জান?'

'না জিজ্ঞেস করিনি।'

'তোমাদের উনি জানেন?'

'জানেন নিশ্চয়, আমাকে উনি বললেন, মুসলমানরা বাস্কদের কাছ থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছে। এ কথা তিনি যখন জানেন, তখন অনেক কথাই তিনি জানবেন।'

'কেমন আশ্চর্য না, মারিয়াকে এই সাহায্য উনি করতে না গেলে তো এই পরিচয় হতো না। একজন অজ্ঞাত-পরিচয় তরুণীকে সাহায্য করতে গিয়ে অত বড় একজন বিপ্লবী নিজেকে অমন বিপদগ্রস্ত করলেন কেন?

'প্রথম আলাপেই আমি তাকে এজন্যে ধন্যবাদ দিয়েছিলাম। তিনি কি বললেন জান? বললেন, মানুষকে সাহায্য করা মানুষের দায়িত্ব। কোন মানুষ যদি আপনার সামনে জুলুমের শিকার হয়, আপনি যদি সাহায্য না করেন, তাহলে যে আল্লাহ আপনাকে শক্তি সাহস দিয়েছেন, তার কাছে কঠোর জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে। সুতরাং যে আল্লাহ আমাদের এ শিক্ষা দিয়েছেন এবং শক্তি-সাহস দিয়েছেন, সব ধন্যবাদ, সব প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য।'

জোনা ট্যাক্সি ভাড়া দেয়া ও একজন প্রহরীকে না মারা সম্পর্কে মারিয়ার কাছে যে কাহিনী শুনেছিল তা ফিডেল ফিলিপকে বলল। শুনে ফিডেল ফিলিপ বলল, 'মুরদের কাহিনী যদি পড়, তাহলে এ ধরনের অনেক কাহিনী জানতে পারবে। চরিত্র শক্তিই মুসলমানদের প্রধান শক্তি ছিল।'

মারিয়া বসে বসে ভাই-ভাবির আলাপ গোগ্রাসে গিলছিল। সে নড়ে-চড়ে বসে বলল, 'ভাইয়া, ওর কে কে আছে, কোথায় বাড়ি?'

আমি জিজ্ঞেস করিনি, আমাকে কিছু বলেওনি। কিন্তু তুই এ প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞেস করছিস কেন? আমরাই না তোকে জিজ্ঞেস করার কথা!'

‘পাথরের মতো শক্ত, বরফের মতো ঠান্ডা উনি ভাইয়া..........’

‘মারিয়ার আগুনের উত্তাপ তাকে গলাতে পারেনি।‘ মারিয়াকে কথা সম্পূর্ণ করতে না দিয়ে ফোঁড়ন কেটে বলে উঠল জোনা।

‘ভাবি যেভাবে কথাকে ভিন্ন দিকে ঠেলে দিচ্ছে, তাতে আর কথা চলে না ভাইয়া!’ বলে মারিয়া লাফ দিয়ে উঠে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

‘শোন মারিয়া, শোন’- বলে জোনাও ছুটল মারিয়াকে ধরতে।

সেদিনেরই গোধূলি লগ্ন।

আহমদ মুসা বারান্দার রেলিং- এ দু’কনুই ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল নিচের সবুজ উপত্যকার দিকে। সবুজ উপত্যকার বুক চিরে একটা রাস্তা এগিয়ে গেছে উত্তরে। অল্প কিছু উত্তরে দাঁড়িয়ে আছে সান ডেলফেনসো পর্বতমালার বিখ্যাত শৃংগ ডে মাজুরা। এই শৃংগের বুক চিরেই উত্তর স্পেনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ডে মাজুরা গিরিপথ। উপত্যকার এই পথ ধরে ঐ গিরিপথ দিয়েই মুসা বিন নুসায়ের ও তারিক বিন যিয়াদের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী উত্তর স্পেনে প্রবেশ করেছিল এবং পিরেনিজের উত্তর প্রান্তে ফ্রান্সের মাটিতে শান্তি ও মানবতার প্রতীক ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করেছিল। আহমদ মুসা নিজেকে হারিয়ে ফেললেন এই পথ ও ঐ গিরিপথের দিকে চেয়ে। মনে হলো তিনি দেখতে পাচ্ছেন মুসা বিন নুসায়ের ও তারিক বিন যিয়াদের মুসরিম বাহিনীকে। ওদের ঘোড়ার খুরের শব্দ, পতাকার পত পত আওয়াজও যেন তার কানে এসে প্রবেশ করছে! তারপর তার চোখে ভেসে উঠসে মুসা বিন নুসায়েরের মুসলিম বাহিনী বিজয়ের বেশে ফিরে আসার দৃশ্যও। বিজয়ী সে বাহিনী ফিরে আসার মধ্যে বাঁধনহারা কোন উল্লাস নেই, অহংকারের কোন চিৎকার নেই।

তার কানে আসছে বিজয়ী বাহিনীর পতাকাধারী কন্ঠনিৎসৃত কুরআনের সুমিষ্ট নরম সুর ‘আর যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি.....।’ আহমদ মুসার চোখের সামনে থেকে ধীরে ধীরে সে দৃশ্য সরে যায়। সে দৃশ্য বিজয়ের নয়, পরাজয়ের, আনন্দের নয়, কান্নার। পথে-প্রান্তরে মুসলমাদের লাশের সারি, রক্তের স্রোত, বিলাপে মুহ্যমান মুসলমান নারী-শিশুর মিছিল। স্পেনে পা রাখার মতো এক ইঞ্চি মাটিও দুর্লভ

হয়ে উঠল মুসলমানদের জন্যে। বেদনায় ছেয়ে গেল আহমদ মুসার মুখ। ভারি হয়ে উঠল চোখ। আহমদ মুসা নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল অতীতের বুকে।

মারিয়া উঠে আসছিল উপত্যকা থেকে। উপত্যকা থেকে রাস্তা বারান্দার সেই রেলিং- এর নিচ দিয়েই ঘুরে এসে বাড়িতে উঠেছে। মারিয়া আপনহারা আহমদ মুসাকে দেখল। মারিয়া কিছু বলতে গিয়েছিল রাস্তা থেকেই, কিন্তু আহমদ মুসার চোখে অশ্রু দেখে সে চমকে উঠল!

মারিয়া ধীরে ধীরে রেলিং ঘুরে এসে আহমদ মুসার পেছনে দাঁড়াল। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। কিন্তু আহমদ মুসা কিছুই টের পেল না।

মারিয়া গিয়ে আহমদ মুসার পাশে দাঁড়াল। মুখ ঘুরিয়ে আহমদ মুসার মুখের ওপর চোখ রেখে বলল, 'আপনি কাঁদছেন?'

চমকে উঠে আহমদ মুসা সোজা হয়ে দাঁড়াল। তাড়াতাড়ি চোখ মুছে নিয়ে বলল, 'না, মারিয়া, ও কিছু নয়।'

'কিন্তু আপনার চোখে যে অশ্রু!'

আহমদ মুখা চোখ আবার ভালো করে মুছে নিল। কোন উত্তর দিল না।

'আপনি কি ভাবছিলেন?' মারিয়াই প্রশ্ন করল।

'ভাবছিলাম না, দেখছিলাম।'

'কি দেখছিলেন?'

তৎক্ষণাৎ কোন উত্তর দিল না আহমদ মুসা। চকিতে একবার চোখ তুলে তাকাল মারিয়ার দিকে। তারপর চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল, 'ঠিক দেখছিলাম নয়, মনে হচ্ছিল যেন দেখছি!'

'কি সেটা?'

'দেখছিলাম, ডে মাজুরা গিরিপথের ওপর থেকে উপত্যকার গোটা পথে লাশের সারি, রক্তের স্রোত ও নারী-শিশুর চোখে অশ্রুর বন্যা।'

'বুঝলাম না!' বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে বলল মারিয়া।

'ছবিগুলো অনেক আগের মারিয়া। তখন সবে ষোড়শ শতকের শুরু। কার্ডিনাল ফ্রান্সিসকো'র উচ্ছেদ ও নির্মূল অভিযান শুরু হলে উত্তর স্পেনের ভাল্লাদলিদ এলাকার হাজার হাজার মুসলমান এই গিরিপথ, এই উপত্যকার

পথেই পালিয়ে বাঁচাতে চেয়েছিল। কিন্তু বাঁচেনি। তাদেরই লাশে ভরে ওঠে ডে মাজুরা থেকে এই গোটা উপত্যকা পথ। আমি সেই দৃশ্যই দেখছিলাম মারিয়া।' আহমদ মুসার ভারি কন্ঠ যেন কাঁপছিল!

'সেতো অনেক অতীতের কথা।' নরম কন্ঠে বলল মারিয়া।

'সেই অতীতই হঠাৎ যেন আমার সামনে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল!'

'আপনার অশ্রু কি এজন্যই?' বলল মারিয়া।

'তাই হবে। আহত হৃদয়ের রক্তই তো হলো অশ্রু।'

'এত পরে অত দূরের অতীত নিয়ে আপনার হৃদয় কাঁদে?'

'নিজের প্রতি ভালোবাসা তো চিরনতুন। সময়ের ব্যবধান তাকে মলিন করেনি!'

'আপনার জাতিকে আপনি এত ভালোবাসেন?'

'নিজেকে আমি ভালোবাসি মারিয়া।'

'জানতে আগ্রহ হচ্ছে, নিজের প্রতি এই ভালোবাসার পাশে অপরের প্রতি, অপর জাতির প্রতি বিদ্বেষ থাকে শুনেছি?'

'দৃষ্টান্ত হিসেবে যদি হিটলার, ফ্রাংকো, মসোলিনী, বেগিন, খৃষ্টান ক্রুসেডারদের আন, তাহলে ঠিক আছে। কিন্তু দৃষ্টান্ত হিসেবে খালেদ, তারিক, মুসা ও সালাহ উদ্দিনদের যদি আন, তাহলে তোমার শোনা ঠিক নয়। মুসলমানরা নিজ জাতিকে ভালোবেসেই অপর জাতিকে ভালোবাসে।'

'এই যার নাম বললেন যে স্পেনে মুসলিম নির্মূল অভিযানের প্রথম নেতা সেই কার্ডিনাল ফ্রান্সিসকো ও তার জাতির প্রতি আপনার বিদ্বেষ নেই?'

'মানুষ ফ্রান্সিসকোর সাথে আমার বিরোধ নেই। তার হাতে জুলুমের তলোয়ার না থাকলে আমি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরব তার জন্যে আমি জীবন দিতে রাজী, কিন্তু উদ্যত সংগীন হাতে দাঁড়ানো জালেম কার্ডিনাল ফ্রান্সিসকো'র বিরুদ্ধে আমি আজীবন লড়াই করতে প্রস্তুত।'

'এ লড়াইয়ের জন্যেই কি আপনার স্পেনে আসা?'

'আমি একা খালি হাতে স্পেনে এসেছি মারিয়া।'

'মনে কিছু করলেন? আমি কিন্তু তা মিন করিনি।'

‘তাতে কি, তোমার জায়গায় হলে আমিও এ কথাই বলতাম।’

‘না, বলতেন না, আপনি ‘আমি’ নন।’

‘তুমি নিশ্চয় বিশ্বাস করবে মারিয়া, আমি একেবারে বেড়াবার জন্যে স্পেনে আসিনি।’

‘কেমন করে বিশ্বাস করব, কিছুই তো বলেননি, নামটিও না। বিশ্বাস করলে তো!’

তৎক্ষণাৎ আহমদ মুসার উত্তর এলো না। একটু চুপ করে থাকল। তারপর ধীর কন্ঠে বলল, ‘তোমার ভাইয়ার কাছে নিশ্চয় সব শুনেছ। ব্যাপারটাকে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাত্রায় নিলে আমার ওপর অন্যায় করা হবে। পরিচয় নিয়ে আলাপ করার কোন সুযোগ কি আসলেই আমাদের হয়েছিল? আমার অসুবিধা নিশ্চয় তোমার  বুঝার কথা।’

‘মাফ করবেন, বিষয়টাকে আমি এভাবে দেখিনি। আসলে কি জানেন, আপনার মতো বিস্ময়কর একজন মানুষের পরিচয় ভাইয়াকে দিয়ে চমকে দেয়ার সুযোগ আমার হয়নি, এটাই আমার দুঃখ।’

‘লোকটি আসলেই বিস্ময়কর নয়, ভাবলেই দুঃখটা কমে যাবে।’

‘মনের মতো করে ভেবে নিলেই সব দুঃখ যায় না।’

মারিয়া একটু থেমেই আবার শুরু করল, ‘জানেন, আমি ভাইয়াকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনার কে কে আছে, কোথায় বাড়ি? উত্তরে ভাইয়া বললেন, বিষয়টা নাকি আমার কাছেই তাদের জিজ্ঞেস করার কথা। তাদের ধারণা আমি সব জানি আপনার সম্পর্কে। অথচ .......।’ কথা শেষ না করেই থেমে গেল মারিয়া।

‘ওরা ঠিক ধারনা করেছেন মারিয়া। দেখা হলে, এক সাথে কিছু পথ চললে তাদের মধ্যে পরিচয় হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু পরিচয় দেবার জন্যে তো পরিচয় থাকা দরকার।’

‘বিশ্ববিখ্যাত বিপ্লবী আহমদ মুসার কোন পরিচয় নেই?’

‘জন্মভূমি আমার একটা ছিল, কিন্তু সতের-আঠার বছরের যখন আমি তখন সেখান থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছি, হারিয়ে এসেছি আব্বা-আম্মা, ভাইবোন

সবাইকেই। সেদিন যে নিঃস্ব ছিলাম, আজও নিঃস্বই আছি। কোন দেশের নাগরিক আমি জানি না, কোথাও আমার জন্যে একটি ঘরও তৈরি হয়নি। এমন যে তার কি পরিচয় দেবার আছে মারিয়া?'

'আপনার কাহিনী আমি পড়েছি। ফিলিস্তিন, মিন্দানাও, মধ্য এশিয়া, সিংকিয়াং, ককেশাস, বলকান দেশগুলো- সবই তো আপনার, সবার আপনি মাথার মণি।'

'সব আমার বলেই তো কোথাও আমি নেই।'

'আমি একটা কথা বলব, কিছু মনে করবেন না তো?'

'অবশ্যই না।'

'ছেলেরা ঘর অনেক সময় বাঁধে না, তাদের ঘরে বাঁধতে হয়, আপনার এ রকম.....'

'বুঝেছি মারিয়া', মারিয়ার কথা শেষ হওয়ার আগেই বলতে শুরু করল আহমদ মুসা, 'তুমি যা বলতে চাও, আমিই সেটা বলছি। সিংকিয়াং থেকে আর্মেনিয়ায় আসার আধা ঘন্টা আগে আমি বিয়ে করেছি। ওদের মূল লক্ষ্য আমাকে একটা ঠিকানা বাঁধা। কিন্তু যিনি আমাকে বাঁধবেন তিনি কি বলেন জান, তার সাথে বিয়ে যেন আমার কাজের স্বাধীন গতিকে সামান্যও ব্যহত না করে।'

'অবিশ্বাস্য! যাত্রার আধা ঘন্টা আগে বিয়ে হয়েছে? তারপর?'

'বিমান বন্দরে আসার পথে গাড়িতে ওর সাথে কথা বলেছি।'

'কাঁদেননি উনি?'

'কেঁদেছেন, কিন্তু বলেছেন দায়িত্বকেই বড় করে দেখতে হবে?'

'কোন দায়িত্ব?'

'আমি তখন একটা মিশন নিয়ে আসছিলাম আর্মেনিয়ায়। আর্মেনিয়ার মজলুম মুসলমানরা ছিল তখন এক ভয়ানক সংকটে।'

'বুঝলাম, উনি অনেক বড়, অনেক বড় ওর হৃদয়। তবু আমি বলব, আপনি ওর ওপর জুলুম করেছেন, অবিচার করেছেন।'

'তোমার কথা হয়তো ঠিক মারিয়া। কিন্তু তার ও আমার হাজার হাজার ভাইবোন যখন বেঘোরে প্রাণ দিচ্ছে, লাখো ভাইবোন যখন নির্যাতিত-নিষ্পিষ্ট

হচ্ছে, হাজার এতিম শিশু ও স্বামীহারা নারীর আর্তবিলাপ যখন আকাশ-বাতাসকে ভারি করে তুলছে, তখন কি আমরা ব্যক্তিস্বার্থের কথা ভাবতে পারি?'

মারিয়া তৎক্ষণাৎ কোন উত্তর দিল না। আবেগ উচ্ছল হয়ে আহমদ মুসার মুখের ওপর চোখ রাখল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'কিন্তু সব মজলুমের অশ্রু মোছাবার দায়িত্ব কি আপনার একার?'

'তা নয়। কিন্তু সবাই যদি বলে তার একার দায়িত্ব নয়, কেউ যদি না এগোয়, তাহলে অশ্রু মোছাবার কাজ কোনদিনই হবে না।'

'আবার জিজ্ঞেস করছি, আপনি আপনার জাতিকে খুব ভালোবাসেন, তাই না?'

'কারণ তারা সবচেয়ে বেশি মজলুম।'

'কেন মুসলমানরা ছাড়া দুনিয়াতে আর কেউ কি নির্যাতিত হচ্ছে না?'

'হচ্ছে হয়তো, কিন্তু মুসলমানরা জাতিগতভাবে সর্বব্যাপী এক নির্যাতনের শিকার। বলতে পার মারিয়া, স্পেনে মুসলমানরা যে নির্যাতনের শিকার হয়েছে, তার কোন দৃষ্টান্ত দুনিয়াতে আছে? যে মুসলমানরা সহায়-সম্পদে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে ও সভ্যতা-সংস্কৃতিতে স্পেনকে ইউরোপের মুকুট হিসেবে গড়ে তুলেছিল, সেই কোটি কোটি মুসলমান আজ কোথায়? পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে মর্মান্তিক গণহত্যা, উচ্ছেদ ও বলপূর্বক ধর্মান্তরণের মাধ্যমে তাদের শেষ করা হয়েছে।'

'আমি আপনার সাথে একমত। আমিও যখন পেছন ফিরে তাকাই তখন বেদনা বোধ করি। কিন্তু বিস্মিত হই, স্পেনের মুসলমানরা কারও কাছ থেকেই কোন সাহায্য পেল না!'

'পাবে কোথেকে? উত্তর আফ্রিকার মুসলিম রাজ্যগুলো তখন ক্ষয়িষ্ণু, নিজেরাই লড়াইয়ে লিপ্ত। আর তূর্কি খিলাফত নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। সবচেয়ে বড় কথা, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী আদর্শবাদের বড় অভাব দেখা দিয়েছিল তখন।'

'বেদনার শত স্মৃতিবিজড়িত স্পেনে আপনার সফর আপনাকে শুধু বেদনাই দেবে। লা-গ্রীনজার উপত্যকা আপনার চোখে অশ্রুর ফোঁটা এনেছে, কিন্তু ভগ্ন, বিরান কর্ডোভা ও গ্রানাডার মৌন মুখ আল হামরার দিকে চাইলে আপনি

ডুকরে কেঁদে উঠবেন।' মারিয়ার নরম কন্ঠ শেষ দিকে কেমন যেন ভারি হয়ে উঠল!

'না, মারিয়া, মৌন মুখ আল হামরা ও কার্ডোভার ভগ্ন প্রাসাদগুলোর চেয়ে সেখানকার বাতাসে শত হৃদয়ের যে বিলাপ, ভাঙ্গা মসজিদের বোবা মিনারের যে হাহাকার জমাট বেঁধে আছে তার ভার দড় দুর্বহ।' আহমদ মুসার ভারি কন্ঠ শেষের দিকে ভেঙে পড়ল। তার চোখের দুই কোণের শুকিয়ে যাওয়া ধারা আবার সজীব হয়ে উঠল।

মারিয়া আহমদ মুসার মুখ থেকে চোখ সরিয় নিয়ে বলল, 'আপনার হৃদয়টা তো কবি-সাহিত্যিকের মতো স্পর্শকাতর, কোমর, বিপ্লবীর হৃদয় তো এমন হয় না!'

'আমি বিপ্লবী নই মারিয়া, আমি মুসলিম। বিপ্লব আমার লক্ষ্য নয়, আমি চাই মজলুম মানুষের মুক্তি।'

'পার্থক্য কোথায়? মুক্তির জন্যেই তো বিপ্লব চাই।'

'পার্থক্য আছে। বিপ্লব লক্ষ্য হলে সেখানে অন্যায়, অবিচার ও হত্যা সব কিছুই বৈধ হয়ে যায়। কিন্তু মানুষের মুক্তি লক্ষ্য হলে অন্যায়, অবিচার ও অহেতুক হত্যা অবশ্যই এড়িয়ে চলতে হয়।'

মারিয়া পলকহীন চোখে তাকিয়েছিল আহমদ মুসার দিকে। বিমান বন্দরে আহমদ মুসার সাথে দেখা পাওয়ার পর থেকে লা-গ্রীনজায় পৌঁছা পর্যন্ত সব ঘটনা এক এক করে তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। আহমদ মুসা শত্রুর সাথে আচরণ করেছেন বিদ্বেষ নিয়ে নয়, ভালোবাসা নিয়ে। শ্রদ্ধায় নুয়ে এলো মারিয়ার হৃদয়। মনে হলো, আহমদ মুসা সম্পর্কে যা সে শুনেছে, বুঝেছে ও ভেবেছে তার চেয়েও তিনি অনেক বড়। মনে হচ্ছে, বিনয়, কোমলতায় নুয়ে থাকা আহমদ মুসার ঐ মাথা যেন আকাশ স্পর্শী! মারিয়া নুয়ে পড়ে আহমদ মুসাকে অভিবাদন করে বলল, 'আমার হৃদয়ের সবটুকু শ্রদ্ধা আপনার জন্যে। আমি গৌরবান্বিত। আপনার সাক্ষাত আমার জীবনের পবিত্রতম সম্পদ।' আবেগে ভেঙে পড়ল মারিয়ার কন্ঠ। চোখের কোণটা ভেজা।

‘মারিয়া বোন, মানুষের কাছে মানুষের মাথা নত করতে নেই। এ মাথা শুধু স্রষ্টার কাছে অবনত হবার জন্যে।’

মারিয়া চোখের কোণ দু’টি মুছে নিয়ে বলল, ‘আমার খুব বেশি কি ইচ্ছে জানেন, এত বড় মানুষকে যিনি জয় করতে পেরেছেন, সেই ভাবিকে দেখার!’

বলেই মারিয়া ঘুরে দাঁড়াল। বলল, ‘আসুন মাগরিবের নামাজের সময় হয়েছে।’

মারিয়া বারান্দা থেকে ঘরে ঢুকে গেল। আহমদ মুসাও তাকে অনুসরণ করল।

বলল ফিলিপ, ‘যে কথা বলছিলাম, ইউরোপের সবচেয়ে পুরাতন, সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী জাতি-গোষ্ঠী হলো বাস্করা। ইউরোপের অন্য জাতি-গোষ্ঠীরা বার বার ভোল পাল্টেচ্ছে, একে অপরের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে, কিন্তু বাস্করা হাজার হাজার বছর ধরে তাদের রক্ত বিশুদ্ধ রেখেছে, তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রেখে চলেছে, তাদের কৃষ্টিতে সামান্যও বিকৃত হতে দেয়নি। ভাষার স্বাতন্ত্র্যও তাদের অমলিন আছে।’

‘এমন একটি জাতি-গোষ্ঠীর সাথে মুসলমাদের সম্পর্ক সৃষ্টি হলো কি করে?’ কাপড় গুছিয়ে ব্যাগে ভরতে ভরতে বলল আহমদ মুসা।

আজ আহমদ মুসার চলে যাবার দিন। যাবার জন্যে সে তৈরি হচ্ছে। ফিলিপরা আহমদ মুসাকে এত তাড়াতাড়ি যেতে দিতে চায়নি। আরও ক’টা দিন থেকে যেতে বলেছে। লোভ দেখিয়েছে আহমদ মুসাকে তারা বাস্ক এলাকায় নিয়ে যাবে, যেখানে দেখতে পাবে সে প্রচুর মুসলমানকে। পিরেনিজ পর্বতমালার উভয় পারে বাস্ক এলাকায় মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ এখন মুসলমান। বাস্ক গেরিলা বাহিনীতে মুসলমানরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছে। এমনি বাস্কের কেন্দ্রীয় একজন অপারেশনাল কমান্ডার মুসলমান। নাম সপ্তম আবদুর রহমান, ডাক নাম ‘দি সেভেনথ’। আরও লোভ দেখিয়েছে বাস্ক এলাকায় গেলে আহমদ মুসা মসজিদ দেখতে পাবে, আজান শুনতে পাবে, যা স্পেনে কোথাও যে পাবে না। কিন্তু আহমদ মুসা বিনয়ের সাথে বলেছে, বাস্ক এলাকায় সে অবশ্যই যাবে কিন্তু যে গুরুত্বপূর্ণ মিশন নিয়ে স্পেনে এসেছে সেটা আগে তাকে সমাধান করতে

হবে। আহমদ মুসা তার মিশনের কথা ফিলিপকে বলেছে। সব শুনে ফিলিপ উদ্বিগ্ন কন্ঠে বলেছে, ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান যখন কোন কাজে হাত দেয়, আটঘাট বেঁধে হাত দেয়। ওদের কাজে কোন বাধা পড়লে ওরা সীমাহীন হিংস্র হয়ে ওঠে। আপনার মিশন খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। মাদ্রিদের আল ফয়সাল মসজিদ কমপ্লেক্স ও স্পেনের মুসলিম স্থাপত্যগুলো রেডিয়েশনের মাধ্যমে ধ্বংস করার উদ্যোগ যদি তারা নিয়ে থাকে, তাহলে এর প্রতিরোধের জন্য মসজিদ ও স্থাপত্যগুলোকে কেন্দ্র করেই কাজ করতে হবে এবং এই কাজে ওদের চোখে পড়ে যাবার আশংকাই বেশি। তারপরই বাঁধবে সংঘাত যা সবদিক থেকে ওদেরকেই আনুকূল্য দেবে। এসব যুক্তি তুলে ধরে ফিলিপ বলেছে, সুতরাং আহমদ মুসা, হঠাৎ করে ওকাজে হাত দেয়া ঠিক হবে না, ধীরে সুস্থে কোন পথ নিরাপদ তা প্রথম ঠিক করতে হবে।

উত্তরে আহমদ মুসা বলেছে, ‘তোমার সব কথাই ঠিক ফিলিপ। ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানকে আমিও চিনি। কিন্তু ভয়ানক ষড়যন্ত্রটা কোন পর্যায়ে আছে, ভয়ংকর ক্ষতি কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে, আমি তার কিছু জানি না। সুতরাং এক মুহূর্ত সময়ও এখন নষ্ট করা ঠিক হবে না।’

আহমদ মুসার এ কথা বলার পর ফিলিপ তৎক্ষনাৎ কোন কথা বলতে পারেনি। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে মারিয়া আহমদ মুসা ও ফিলিপের আলাপ শুনছিল। আহমদ মুসা থামলেই মারিয়া বেরিয়ে আসে। এসে সে দাঁড়ায় ফিলিপের একেবারে পেছনে। ফিলিপের কাঁধে একটা কনুইয়ের ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়। তারপর বলে, ‘ভাইয়া, আমি তোমাদের কথা শুনলাম। শুনে আরও নিশ্চিত হলাম, ওঁকে একা ছেড়ে দেয়া আমাদের ঠিক হবে না। আমার ব্যাপারটা নিয়ে ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান ওর ওপর ভীষণ ক্ষেপে আছে, ওর মুক্ত চলাফেরই সম্ভব নয়। তার ওপর ঐ মিশন।’

ফিলিপ আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলে, ‘শুনলেন তো মারিয়ার কথা! আমি তার সাথে একমত।’

আহমদ মুসা বলে, ‘আমিও মারিয়ার সাথে একমত। কিন্তু একজন যাওয়ার মধ্যে বাড়তি কোন ঝুঁকি আমি দেখি না।’

সংগে সংগেই মারিয়া বলে ওঠে, 'না, এটা ঠিক নয়, একজন এবং একটা টিম এক হতে পারে না।'

আহমদ মুসা বলে, 'এটাও ঠিক, কিন্তু ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের যে সংখ্যা এবং যে শক্তি তাতে একজন না গিয়ে ৫ জন গেলে অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটবে না, বরং একা যাওয়াই আমার কাছে নিরাপদ।'

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই মারিয়া বলে ওঠে, 'জানতাম আমি, আপনি সিদ্ধান্ত নিলে পাল্টাবেন না, বড় হওয়ার এটা একটা অহমিকা।' বলে মারিয়া ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। তার শেষের কথাগুলো ভারি হয়ে ওঠে সম্ভবত বুক থেকে উঠে আসা জমাট এক অভিমান।

মারিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর আহমদ মুসা ও ফিলিপ কথা বলছিল।

ফিলিপ আহমদ মুসার প্রশ্নের উত্তরে বলল, 'বাস্কদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক কিভাবে সৃষ্টি হলো, এই আপনাকে বলা হয়নি!' একটু থামল ফিলিপ। তারপর আবার শুরু করল, 'আপনি জানেন 'গথ' দের রাজা রডারিকে পরাজিত করে তারিক বিন যিয়াদ স্পেনে ইসলামী শাসনের প্রতিষ্ঠা করে। এক সময় জার্মানি থেকে এসে স্পেনে জেঁকে বসা গথরা ছিল বাস্কদের শত্রু। সুতরাং গথদের পতনে বাস্করা খুশি হয় এবং মুসলমাদের স্বাগত জানায়। মুসলিম শাসনামলে বাস্করা স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে। বাস্ক এলাকা এই সময় ফরাসীদের দ্বারা আক্রান্ত হলে বাস্ক ও মুসলমানরা কাঁকে কাঁধ মিলিয়ে ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে স্পেনে মুসলিম শাসনের শেষ অবস্থান গ্রানাডার পতনের পর স্পেনে মুসলমানদের জীবনে কাল অমানিশা নেমে আসে, সেই সাথে বাস্কদের ঘোর দুর্দিন শুরু হয়। মুসলমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া সাম্রাজ্যের মালিক হওয়ার আনন্দে আত্মহারা ক্ষমতা-অন্ধ নতুন স্পেন সম্রাট ১৫১২ সালে বাস্ক এলাকার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং বাস্কদের স্বাধীনতা ও শান্তি নষ্ট হয়ে যায়। বাস্করা এই সময় স্বাভাবিকভাবেই মনে করল, মুসলিম শাসনের পতন না ঘটরে 'বাস্কদের এই দুর্দিন আসতো না। এভাবেই মুসলমানদের সাথে বাস্কদের একটা গভীর সুসম্পর্কের সৃষ্টি হয়। এই সুসম্পর্কের কারণেই স্পেন থেকে মুসলমারা

উচ্ছেদ হলে বাস্করো তাদেরকে ব্যাপকভাবে আশ্রয় দেয়। প্রচুর মুসলমান মধ্য ও উত্তর স্পেন থেকে পিরেনিজ পর্বত অঞ্চলের বাস্ক এলাকায় পালিয়ে আসে। তবে বাস্ক এলাকায় সবচেয়ে বেশি উদ্বাস্ত্ত আসে ভূমধ্যসাগরের পথে। দক্ষিণ ও পূর্ব স্পেন থেকে অবশিষ্ট উদ্বাস্ত্ত বোঝাই জাহাজ কোনটি উত্তর আফ্রিকার দিকে চলে যেত, কোনটি পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ মেজর্কা-মেনর্কা হয়ে পিরেনিজ-এর পাদদেশে অবস্থিত ফ্রান্সের সর্বদক্ষিণ পোর্ট ভেনসেড্রস দিয়ে এখানে পৌঁছাত। সেখান থেকে মুসরিম উদ্বাস্ত্তরা পিরেনিজের বাস্ক অঞ্চলে গিয়ে আশ্রয় নিত।'

আহমদ মুসা ফিলিপের কথা গোগ্রাসে গিলছিল। ফিলিপ থামলে বলল, 'আমার হৃদয়ের বুকভরা কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন মি. ফিলিপ। আমি কিছু কিছু জানতাম, কিন্তু এত কিছু জানতাম না। বাস্ক এলাকায় সফর আমার জন্যে 'ফরজ' হয়ে গেল।'

'ধন্যবাদ মি. আহমদ মুসা, আমি খুশি হলাম।' বলল ফিলিপ।

আহমদ মুসার ব্যাগ বাঁধা হয়ে গিয়েছিল। সে ঘড়ির দিকে চেয়ে বলল, '৫টা বাজছে। আমি তাড়াতাড়ি মাদ্রিদে পৌঁচতে চাই।'

ম্লান মুখে উঠে দাঁড়াল ফিলিপ। এগোলো দরজার দিকে নিরবে। তার পেছনে পেছনে আহমদ মুসা।

বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল গাড়ি। ড্রাইভার প্রস্তুত হয়ে তার সিটে বসেছিল।

গাড়ি বারান্দায় নামার মুখে দাঁড়িয়েছিল মারিয়া ও জোনা। মারিয়ার মুখ মলিন। আহমদ মুসা ও ফিলিপ তাদের কাছাকাছি পৌঁতেই মারিয়া আহমদ মুসার দিকে এক ধাপ এগিয়ে গেল। তার মাথা নিচু। মাথা নিচু রেখেই বলল, 'আমাকে মাফ করবেন, আমি তখন 'অহমিকা' শব্দ 'অহংকার' অর্থে বলতে চাইনি।' কাঁপল মারিয়ার গলা।

আহমদ মুসা থমকে দাঁড়াল। তারপর হেসে বলর, 'আমি তোমার কথা বুঝেছি। আমি দুঃখিত যে, শব্দটা তুমি মনে রেখেছো।'

একটু থেমে আবার বলতে শুরু করল, 'আমি সকলের সাহয্য-সহযোগিতা চাই মারিয়া, কিন্তু সামনে এগোবার পথে একে শর্ত হিসেবে দেখার আমি বিরোধী।'

কথা শেষ করে পা তুলতে যাচ্ছির আহমদ মুসা।

মারিয়া বলে উঠল, 'সামনে এগোবার পর সাহায্যের যদি প্রয়োজন হয়?'

'যেখান থেকে যতটুকু সাহায্য পাওয়া যায় চাইব।'

'কিন্তু চাওয়ার যদি সুযোগ না পান?' বলল মারিয়া।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'আমি এর উত্তর জানি না মারিয়া। আল্লাহ আমার ভরসা।'

বলে আহমদ মুসা মারিয়া ও জোনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে পা বাড়াল সামনে।

মারিয়া আর কিছু বলতে পারল না। কিন্তু তার ভারি হয়ে ওঠা নীল চোখে অনেক কথার আকুলি-বিকুলি।

গাড়ির দরজা ড্রাইভার খুলে ধরেছিল।

আহমদ মুসা ফিলিপকে জড়িয়ে ধরে আরবীয় কায়দায় তাকে একটা চুমু খেয়ে বলল, 'ভেবো না ফিলিপ, আল্লাহ আমার সাথে আছেন।' বলে গাড়িতে উঠে বসল আহমদ মুসা। গাড়ির দরজা লাগিযে দিল ফিলিপ। স্টার্ট নিল গাড়ি। চলতে শুরু করল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল আহমদ মুসা, বেলা ৫টা ১০ মিনিট। মাদ্রিদ পৌঁছতে দেড় ঘন্টার বেশি লাগার কথা নয়।

# ৪

'মা, টেলিফোনটা একটু দেবে?'

দুর্বল কন্ঠে তার আম্মাকে উদ্দেশ্য করে বলল জেন। তার মা তখন কি কাজে জেনের ঘরে এসেছিল!

জেনের মা টেবিল থেকে কর্ডলেস টেলিফোনটা জেনের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলর, 'কথা বলতে তো তোর কষ্ট হচ্ছে। কোথায় টেলিফোন করবি?'

প্রবল জ্বরে বেহুশ অবস্থায় কয়েকটা দিন কেটেছে জেনের। জ্বর এখন নেই, কিন্তু ভীষণ দুর্বল। ক'দিনেই শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে জেন!

মায়ের প্রশ্নের উত্তরে জেন অস্ফুট কন্ঠে বলর, 'ভালো লাগছে না, হান্নাকে একটা টেলিফোন করে দেখি।'

'হান্না কয়েকবার টেলিফোন করেছিল তোর জ্বরের সময়।'

'তাই?' বলে জেন টেলিফোনের দিকে মনোযোগ দিল।

তার মা বের হয়ে গেল।

তার মা বেরিয়ে যেতেই ঘরে এসে ঢুকর হান্না।

আনন্দে চিৎকার করে উঠল জেন। বলল, 'আমি তোকেই টেলিফোন করছিলাম। কী যে খুশি হলাম! সমগ্র অন্তর তোকেই চাচ্ছিল।'

'আমাকেই চাচ্ছিল একথা কি ঠিক?'

'আপাতত!' মুখ লাল করে বলল জেন, 'বল কেমন আছিস? ভালো?'

'হ্যাঁ, জেন। তুই কেমন আছিস? জ্বর আছে?'

'না, জ্বর নেই, কিন্তু উঠতে পারছি না।'

'তা হবে। দারুণ ধকল গেছে তোর ওপর দিয়ে।'

'ওদিকের খবর কি?'

'আজও বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিল? ডিপার্টমেন্টে এক বিরাট মিটিং হলো আজ।'

‘কি মিটিং?’

‘কি আবার, জোয়ানকে নিয়ে?’

‘জোয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিল?’ জেনের কন্ঠে সজীব আনন্দের রেশ।

‘পাগল হয়েছিস! জোয়ানের বিরুদ্ধেই তো মিটিং।’

’কেমন?’

‘জোয়ানের সকল ডিগ্রি কেড়ে নেয়ার দাবি করে প্রস্তাব করা হয়েছে মিটিং-এ।’

‘কেন?’

‘জোয়ান তার পরিচয় গোপন করে বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রতারণা করেছে বলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে।’

‘কেন? মরিসকো হওয়া কি বেআইনি? রাষ্ট্রবিরোধী?’ জেনের কন্ঠে একরাশ ক্রোধ ঝরে পড়ল।

’শক্তি এখন আইনে জায়গায় জেন।’

‘হান্না, আমি তোকে ওর কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম।’

‘জোয়ানের কথা?’ বলে হান্না একটা ঢোক গিলল, তারপর ধীর কন্ঠে বলল, ‘তোর সাথে সেদিন কথা বলার পর দু’বার ওর বাড়িতে গেছি। তুই অসুস্থ ছিলি, বলতে পারিনি সে সব কথা।’

‘ওর দেখা পেয়েছিলি, কথা হয়েছিল?’

‘বলছি,’ বলে শুরু কলল হান্না, ‘প্রথম দিন ওর দেখা পাইনি। দেখলাম জোয়ানের মা কাঁদছেন। আমাকে দেখেই জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন । বললেন, তোমরা জোয়ানকে বাঁচাও। ও যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে। বলে আমাকে টানতে টানতে তিনি জোয়ানের ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরে গিয়ে জানালা দিয়ে স্তুপীকৃত পোড়া কাগজের ছাই দেখালেন। ছাই থেকে তখনও ধোঁয়া উঠছিল। আমি কিছু বুঝতে না পেরে জোয়ানের মার দিকে তাকালাম। তিনি আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। বললেন, জোয়ান তার শিক্ষা জীবনের সমস্ত সার্টিফিকেট, রেকর্ডপত্র ওখানে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছে, শিক্ষা জীবনের কোন চিহ্নই সে..।’

'আর বলিস না হান্না, আর বলিস না।' বলে জেন কান্নায় ভেঙে পড়ল। বালিশে মুখ গুঁজল সে। কাঁদতে লাগল জেন।

হান্না কিছু না বলে জেনের মাথায় হাত বুলাতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর মুখ তুলল জেন। অশ্রুধোয়া মুখ। বলল, 'ওকে কি করে বাঁচাবে, ও বাঁচবে না, পাগল হয়ে যাবে।'

'ও সবাইকে ভুল বুঝেছে জেন, তোকেও।'

'কি হয়েছে হান্না, কিছু ঘটেছে?'

'বলছি!' বলে শুরু করল হান্না, 'দ্বিতীয় বার জোয়ানের বাড়ি গিয়ে তার দেখা পেলাম। দেখলাম, জোয়ান তার টেবিরে বসে একমনে কি যেন করছে! ধীর পায়ে তার কাছে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম, তার অত্যন্ত প্রিয় পারসোনাল নোট বুকটির পাতা একটি একটি করে ছিঁড়ে টুকুরো টুকরো করছে। আমি তার নোট বুকটি কেড়ে নিলাম। সে চমকে উঠে আমার দিকে তাকাল। অন্য সময় হলে হাসিতে তার মুখ ভরে যেত, কিন্তু তার মুখে এক কণা হাসিও ফুটে উঠতে দেখা গেল না। যেন অন্য এক জোয়ান। কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে শান্ত গম্ভীর কন্ঠে বলল, নোট বুকটা আমাকে দাও হান্না। আমি বললাম, না, মূল্যবান এ নোট বই আপনি ছিঁড়তে পারেন না। জোয়ানের মুখে একটা শুকনো হাসি ফুটে উঠল। বলল, আমি অতীত মুছে ফেলেছি। মরিসকো জোয়ানের সাথে এই অতীতের কোন সম্পর্ক নেই। আমি বললাম, মরিসকো কি এদেশে নেই? তুমি পাগলের মতো কাজ করছ কেন? জোয়ানের মুখে একখন্ড বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল। বলল, তোমরা আমাকে পাগল করতে চেয়েছিলে, কিন্তু আমি পাগল হবো না। আমি বললাম, 'তোমরা' বলতে কাদের বুঝাচ্ছ, আমরা কি তোমার শত্রু? সে বলল, আমি কাউকে শত্রু ভাবি না, কিন্তু তোমরা আমাকে, আমার মতো মরিসকোকে ধ্বংস করতে চাও। আমি বললাম, এই 'তোমরা'- এর মধ্যে আমাকে, জেনকেও কি ধরছ? জোয়ান কোন উত্তর দিল না। আমিই আবার বললাম, জান, জেন ভীষণ অসুস্থ? কোন উত্তর দিল না। শুধু চকিতে মুখ তুলে একবার চাইল। আমি বললাম আবার, জিজ্ঞেস কররে না, কি অসুখ, হঠাৎ করে কেন অসুখ? কোন উত্তর এলো না তার কাছ থেকে। আমিই কথা বললাম, উত্তর

দিতে ভয় পাচ্ছ? তুমিই তার অসুখের কারন। কথা বলল সে। মুখ না তুলেই। বলল, একজন মরিসকো সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করেতো, এই যন্ত্রণা তাকে পীড়া দিতেই পারে। সব ঠিক হয়ে যাবে হান্না। ওকে বলে দিও, যে জোয়ানের সাথে তার পরিচয় ছিল যে জোয়ান মাদ্রিদের সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিতে পড়ত, সে জোয়ান আজ বেঁচে নেই। আজকের জোয়ান স্পেনের পদদলিত শ্রেণী মরিসকোদের সারিতে নেমে গেছে। আমি বললাম, জোয়ান, তুমি......!'

জেন তার ঠোঁট কামড়ে হান্নার কথা শুনছিল। বুঝাই যাচ্ছে, প্রাণপণে সে নিজেকে ধরে রাখতে চাচ্ছে। কিন্তু আর পারল না। সে দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

হান্না কথা থামিয়ে জেনের কাঁধে একটা হাত রেখে বলল. 'তোকে এভাবে ভেঙে পড়লে চলবে না, শক্ত হতে হবে।'

'না, আমি পারছি না। ও এভাবে শেষ হয়ে যাবে কেন?' বলর জেন।

জেন থামতেই হান্না বলল, 'আমার কিন্তু মনে হয়েছে, নতুন বাস্তবতা জোয়ান মেনে নিয়েছে। আমি তাকে বললাম, তুমি তোমার ওপর জুলুম করছ, এভাবে তুমি তোমাকে শেষ করে দিচ্ছ! সে তখন আমার দিকে অত্যন্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'আমি আমার পরিচয় নিয়ে লজ্জিত নই হান্না, আমি গর্বিত। মনে হচ্ছে, আমার এই গর্ব এত বড় যে, আমি গোটা পৃথিবীর বিরুদ্ধে একা দাঁড়াতে পারি। এই সময় তার চোখে যে আলো আমি দেখেছি, তা কোনদিন আর দেখিনে।'

জেন ঠোঁট কামড়ে কান্না চেপে ধীরে ধীরে বলর, 'হান্না, তুমি ভুল করছ, এই কথাগুলো তার সুস্থ মনের নয়। এর মধ্যে প্রবল ক্ষোভ, প্রচন্ড অভিমান তাড়িত বিদ্রোহের একটি সুর আছে যা তার আরো ক্ষতি করবে, সে ধ্বংস হয়ে যাবে হান্না।'

একটু থামল জেন। তারপর আবার বলল, 'হান্না, তুই আমাকে তার কাছে নিয়ে চল। ও বড় একা। নিজের ওপরই সে প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছে। ঠেলে দিচ্ছে নিজেকে বিপদের মধ্যে। ওকে বাঁচাতে হবে।'

হান্না চোখ তুলে জেনের ওপর একটা স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল, 'সেটা হবে জেন, কিন্তু তোকে আমার একটা প্রশ্ন।'

'কি?'

'আমি কেন, আমরা সকলেই জানি জোয়ানের সাথে তোর তো এরকম সম্পর্ক ছিল না? তুই তো ওকে সব সময় প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতিস। ওর প্রতি একটা ঈর্ষাই আমরা তোর মধ্যে দেখেছি।'

হান্নার প্রশ্ন শুনে জেন দু'হাতে মুখ ঢাকল। বলল, 'তোর প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারব না। আমি কিছু জানি না।'

'ঘটনা তোর, জানে বুঝি অন্যে? লুকোবার অর্থ কি বলত?'

'না, আমি লুকোচ্ছি না। আমি বুঝতে পারছি না, কি থেকে কি হয়ে গেল! ও আমার প্রতিদ্বন্দ্বী, ওকে আমি ঈর্ষা করতাম। ঈর্ষার সাথে আমি কার্ডিনাল ফ্রান্সিসকো'র বংশীয় এ বড়াইও ছিল।'

একটু থামল জেন। তারপর আবার শুরু করল, 'কিন্তু হান্না, সেদিন ডিপার্টমেন্টে গিয়ে যখন ফল জানলাম, আমি প্রথম হয়েছি এবং জোয়ান দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে, তখন বুকটা আমার মোচড় দিয়ে উঠল। প্রথম বারের মতো মনে হলো এ ফল আমি চাইনি। ওর পরাজিত মুখের ছবি আমার কাছে বড় অসহ্য হয়ে উঠল। বুক কেঁদে উঠল আমার। তোমরা যখন আমাকে ঘিরে আনন্দ করছিলে, তখন মনে হচ্ছিল জোয়ানকে আমার কাছ থেকে তোমরা দূরে ঠেলে দিচ্ছ। তার ওপর জোয়ানের বিরুদ্ধে যখন মরিসকো হওয়ার অভিযোগ উঠল, তখন বুকটা আমার ছিঁড়ে যেতে চাইল। প্রথমবার অনুভব করলাম, জোয়ান আমার বুকের গভীরতম প্রদেশে সবটা স্থান জুড়ে আছে। জানি না এমনটা কখন ঘটল, কিভাবে ঘটল হান্না?'

কান্নায় কন্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল জেনের।

'আমি মনে করি একজন ভালো ছাত্রের জন্য এটা একটা সাময়িক আবেগ তোর।' জেনকে সান্তবনা দিয়ে বলল হান্না।

'এসব কথা ভেবেও আমি মনকে সান্তবনা দিতে চেষ্টা করেছি হান্না। মনে হয়েছে, ওকে আমি কোনদিনই প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিনি, আসলে ওটা ছি আমার

একটা গর্ব। আর ওর প্রতি ঈর্ষা ছিল আমার অনুরাগ, আনন্দ। কৃত্রিম প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ঈর্ষার প্রাচীর যখন ভেঙে গেল, আমি তখন ধরা পড়ে গেলাম হাতেনাতে।'

'কিন্তু জেন, এখনকার বাস্তবতার বিষয়টা তো তোকে ভাবতে হবে। ভুলিস না, তুই কার্ডিনাল ফ্রান্সিসকো পরিবারের মেয়ে!'

'ওসব আমি কিছুই ভাবছি না হান্না। একটাই আমার চিন্তা ওকে বাঁচাতে হবে। জীবন সম্পর্কে, ভবিষ্যত সম্পর্কে ওকে আশাবাদী করে তুলতে হবে।'

হান্না কিছু বলতে যাচ্ছিল। এই সময় এক গ্লাস দুধ হাতে ঘরে ঢুকল জেনের মা। জেনের মা'র পরপরই ঢুকল জেনের আব্বা।

জেনের আব্বা হান্নাকে দেখে বলল, 'কেমন আছ মা? তোমার আব্বার সাথে দেখা হলো।'

'ভালো আছি। আব্বার সাথে কোথায় দেখা হলো আংকেল?' বলল হান্না।

'বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের মিটিং ছিল আজ। এখানেই দেখা হলো।'

একটু থামল জেনের আব্বা। তারপর বলল, 'বড় একটা খবর আছে হান্না। আজ একাডেমিক কাউন্সিলের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হলো, বিশ্ববিদ্যায়য়ের ভর্তি ফরমে মরিসকোদের জন্যে আলাদা কলাম থাকবে, যেখানে তাদের পরিচয় লিপিবদ্ধ করা হবে। আরেকটা সিদ্ধান্ত হলো, মরিসকোরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চাইলে ওদের জন্য আলাদা পরীক্ষা নেওয়া হবে।'

'আলাদা পরীক্ষা নেওয়া হবে।'

'আলাদ পরীক্ষা কেন আংকেল?'

'মরিসকোদের সব ক্ষেত্রেই আলাদা করে দেখতে হবে।'

'কেন?'

'তোমরা ছোট, কিছুই জান না। মরিসকোরা ছদ্মবেশী মুসলমান। ওরা আমাদের বন্ধু কোন সময়ই নয়। সুতরাং ওদেরকে ওপরে উঠে আসার সুযোগ দিলে সমস্যা আমাদের জন্যে বাড়ে।'

'কেন ওরা আমাদের বন্ধু হতে পারে না।?'

'পাগল মেয়ে, ওদের কাছ থেকে এ রাজ্য আমরা কেড়ে নিয়েছি না! ওরা এটা ভোলেনি। মুসলমানরা কিছুতেই তাদের অবসস্থান থেকে সরে না।'

'কিন্তু মরিসকোরা তো আসলেই এখন মুসলমান নেই। ওরা তো খৃষ্ট ধর্ম গ্রহন করেনি, জোর করে এটা করতে ওদের বাধ্য করা হয়েছে?'

'কিন্তু সেটা তো কয়েক জেনারেশন আগের কথা। মরিসকোদের বর্তমান জেনারেশন তো খৃষ্টান হয়েই জন্মেছে।'

'তোমার কথা ঠিক, কিন্তু ইতিহাস তো তারা পড়ে। এখানেই হয়েছে বিপদ।'

'কি বিপদ?'

'ওরা পড়ে ওদের পূর্বপুরুষদের কিভাবে হত্যা করা হয়েছে, স্পেন থেকে নির্মূল করা হয়েছে এবং কিভাবে হত্যাবশিষ্টদের জোর করে খৃষ্টান বানানো হয়েছিল। এই ইতিহাস তাদের মন-মানসকে আমাদের জন্যে বিপজ্জনক করে তোলে। ওরা ছোবল দেয়ার কোন সুযোগই ছাড়বে না।'

'কিন্তু আংকেল, ধর্মান্তর নতুন ব্যাপার নয়, যারা মুসলমান তারা খৃষ্ট ধর্ম কিংবা অন্য ধর্ম থেকেই মুসলমান হয়েছে, কিন্তু সেখানে তো ইতিহাস এভাবে বিপজ্জনক হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না?'

জেনের আব্বা হাসল। বলল, 'তুমি প্রশ্ন তুলেছ হান্না। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা সবার বুঝতে হবে। একটা বিষয় লক্ষ্য করবে, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু প্রভৃতি ধর্মাবলম্বীরা সহজেই ধর্মান্তরিত হয় এবং স্বাভাবিকভাবেই অন্য ধর্ম পালন করে চলে। কিন্তু মুসলমানদের ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরিত হবার কোন নজীর নেই। যেখানে এটা ঘটেছে, কোন চাপ ও লোভ বা অন্য কোন অস্বাভাবিক কারনেই ঘটেছে এবং প্রকৃত অর্থে তাদের ধর্মান্তর হয় না। মনে মনে তারা মুসলমানই থেকে যায়। এই কারনেই মরিসকোরা বিশ্বস্ত নয়।'

'আংকেল, আমার একটা কৌতূহল। আমরা মুসলমানদের কাছ থেকে স্পেন কেড়ে নেয়ার পর মুসলমানদের আমরা ব্যাপকভাবে হত্যা করেছি, স্পেন থেকে নির্মূল করেছি, অবশিষ্টদের আমরা জোর করে খৃষ্টান বানিয়েছি, অথচ

মুসলমানরা যখন খৃষ্টানদের কাছ থেকে স্পেন কেড়ে নিয়েছিল, তখন তারা এসব কিছুই করেনি। আমাদের ভূমিকার ব্যাখ্যা কি?’

‘আমার আগের কথার মধ্যেই এর কিছুটা উত্তর আছে। মুসলমানরা খৃষ্টানদের খৃষ্টান রেখে রাজ্য চালাতে পেরেছে কিন্তু মুনলমানদের মুসলমান রেখে আমরা দেশ চালাতে পারতাম না। মুসলমানরা চরিত্রগতভাবে স্বাধীনচেতা।’

‘কিন্তু নিরস্ত্র পরাজিত মুসলমানরা আমাদের কি ক্ষতি করতে পারত, আরা ওদের ভয় করেছি কেন?’

‘ভয় করেছি আমরা মুসলমানদের নয়, আমরা ভয় করেছি মুসলমানদের আদর্শকে। ওদের আদর্শ ভয়ানক প্রভাবশলী। আমরা যদি মুসলমানদের মুসলমান থাকতে দিতাম, তাহলে দেখা যেত আমাদের সংখ্যা কমছে আর ওদের সংখ্যা বাড়ছে। একদিন দেখা যেত স্পেনে শাসকরা খৃষ্টান, প্রজাদের মধ্যে কেউ খৃষ্টান নেই, সবাই মুসলমান হয়ে গেছে। তারপর শাসকরাও আর খৃষ্টান থাকতে পারতো না।

‘আংকেল, ইউরোপীয় দেশ আর স্পেন এক নয়। স্পেনের সভ্যতা মুসলমানদের গড়া, তারা শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, সামাজিকত, সভ্যতা সবক্ষেত্রেই শ্রেষ্ঠতর অবস্থানে ছিল। যাকে অতিক্রম করতে অন্যান্য স্পেনীয় কোন সময়েই পারতো না্ এই স্পেনীয়দের ওপর মুসলমাদের যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব ছিল, তা অব্যাহত থাকতে দিলে স্পেনীয়রা ধীরে ধীরে ইসলাম গ্রহন করে মুসলমান হয়ে যেত। হান্না, তুমি জান, শত শত বছর গত হলেও স্পেনের মানুষ মুসলিম শাসনের কথা এখনও স্মরণ করে।’

জেন বালিশে মুখ গুঁজে পড়েছিল। মুখ তুলে প্রথম কথা বলল সে। বলল, ‘তাহলে আব্বা, যোগ্যতর একটা জাতিকে আমরা ধ্বংস করেছি যুক্তিসংগত কোন কারণে নয়।’

‘অবশ্যই যুক্তিসংগত কারণে মা। জাতির বাঁচার ব্যাপারটা কি যুক্তিসংগত কারণের মধ্যে পড়ে না।’

‘ওটা ছিল তো নিছক একটা ভবিষ্যত আশংকার ব্যাপার।’

‘আশংকা নয় মা, বাস্তবতা। ওদেরকে রেখে আমরা দেশ চালাতে পারতাম না।’

‘কিন্তু তাই বলে একটা নিরপরাধ জনগোষ্ঠীকে ঐভাবে ধ্বংস করা ....।’

জেনকে কথা শেষ করতে না দিয়ে জেনের কথার মাঝখানেই তার আব্বা কথা বলে উঠল, ‘তোমরা ছোট, আরও বড় হও বুঝবে, অনেক বাস্তবতা আছে যা নিষ্ঠুর হলেও প্রয়োজন। গাছের নিরপত্তার জন্যে আগাছা কেটে ফেলা তো একটা প্রাকৃতিক নিয়ম।’

‘গাছ ও মানুষকে কি এক কাতারে ফেলা যায়?’

‘এই সময় ‘গাছ ও মানুষ’কে এক কাতারে ফেলার কি হলো?’ বলতে বলতে ঘরে প্রবেশ করল জেনের আব্বার বন্ধু শিল্পপতি মি. সানচেজ।

জেনের আব্বা উঠে দাঁড়িয়ে তাকে স্বাগত জানিয়ে পাশে বসাল। তারপর হাসতে হাসতে ‘গাছ ও মানুষে’র ব্যাপারটা তাঁকে বুঝিয়ে বলল।

শুনে হো হো করে উচ্চ স্বরে হেসে উঠল মি. সানচেজ। বলল, ‘যাই বলো, ফ্রাঁসো-ফ্রান্সিসকো আমি আমার পূর্বপুরুষের কাজ সমর্থন করতে পারি না।’

একটু থামল সানচেজ। জেনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল সমর্থন পাবার আশায়।

আবার শুরু করল সানচেজ, ‘আমাদের পূর্বপুরুষরা ছিল বোকা, যথেষ্ট দূরদর্শী নয়। তারা গাছ কেটে গোড়া রেখেই গেছে। তারা কর্ডোভা-গ্রানাডার মতো মুসলিম নিদর্শনগুলোকে উপড়ে ফেলেনি কেন, কেন তারা ব্যাটা মুসলমাদেরকে আবার খৃষ্টান বানাতে গেল। আমাদের জন্যে একটা মুসিবত রেখে গেছে।’

থামল। একটু ঢোক গিলল মি. সানচেজ। তারপর গা থেকে কোট খুলে বলল, ‘দেখো কি মুসিবত, আমাদের এ্যারোনটিক ইঞ্জিনিয়ারকে তো তুমি চেন ফ্রাঁসো।’

‘চিনব না মানে? মি. মিশেল তো খুব ভালো ছেলে। সোনার ছেলে বলতে পারো।’

‘আঃ থামো। ভালো হওয়াই তো হয়েছে বিপদ। ব্যাটা যে মরিসকো তা তো জানতাম না।’

জেনের আব্বা লাফ দিয়ে উঠল, ‘কি বলছ তুমি মি.মিশেল মরিসকো?’

‘মরিসকো মানে একদম বিশুদ্ধ মরিসকো। বিয়েও করেছে মরিসকোদের ঘরে। ব্যাপারটা গোপন করে রেখেছিল। জানতে পেরেছি হিস্টোরিক্যাল ফাউন্ডেশনের গোপন চিঠির মাধ্যমে। একেবারে বংশ তালিকা দিয়েছে ওরা।’

‘তারপর?’

‘তারপর আর কি? আমি সোজা মিশেলকে ডাকলাম আমার চেম্বারে। তার সামনে মেলে ধরলাম তার বংশ তালিকা। প্রথমটা সে চমকে উঠেছিল। কিন্তু মুহূর্তেই মুখে হাসি টেনে বলল, ‘জি স্যার, আমি মরিসকো।’

‘কিন্তু এতদিন বলনি কেন?’ আমি জিজ্ঞেস করলাম।

সে বলল, ‘স্যার, চাকুরির জন্যে এরকম শর্ত থাকলে অবশ্যই সত্য বলতাম।’

‘সত্যবাদী হওয়ার ভড়ং করো না। সত্য গোপন করেছ বলেই তো একজন মরিসকোকে এতদিন ধরে ‘দুধ কলা’ দিয়ে পুষছি।’ বললাম আমি।

সে বলল, ‘স্যার, বিনিময়ে আমি অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে আপনার প্রতিষ্ঠানের সেবা করেছি।’

এতগুলো কথা বলার পর থামল মি. সানচেজ। জেনের আব্বা আগ্রহের সাথে শুনছিল সানচেজের কথা। আসলেই জেনের আব্বা ছেলেটাকে অত্যন্ত ভালো জানত। জেন ও হান্নাও পলকহীন চোখে মি. সানচেজের দিকে চেয়ে তার কথা শুনছিল।

মি. সানচেজ থামলে জেনের আব্বা বলল, ‘মিশেলকে বুঝি চাকুরি থেকে তাড়িয়েছ?’

‘না, চাকুরি থেকে তাড়াইনি, দুনিয়া থেকেই তাড়িয়ে দিয়েছি?’

‘কেমন?’ বলল জেনের আব্বা।

‘কেমন আবার জিজ্ঞেস করছ! মিশেল আমার রুম থেকে ওর রুমে ফিরে যাবার পর আমার বডিগার্ড গিয়ে তার পিস্তলের একটা গুলী খরচ করেছে। ব্যাটা

চেয়ার থেকে ওঠারও সুযোগ পায়নি। চূর্ণ হয়ে যাওয়া মাথা নিয়ে চেয়ারের ওপরই মুখ থুবড়ে পড়ে যায়।'

'ওর পরিবার জানতে পারেনি?'

'দেখ, কোন কাজে দেরি করি না আমি। মিশেলের রক্ত-মাথা কোটটা নিয়ে তার স্ত্রীকে বলা হয়েছে, আত্মগোপনকারী মরিসকোর এই শাস্তি তারপর তাকে এক কাপড়ে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে বাড়িতে তালা লাগানো হয়েছে। পরদিনই আরেকজন অফিসার সে বাড়িতে গিয়ে উঠেছে।' থামল মি. সানচেজ।

মি. সানচেজের কথা শুনে জেন ও হান্না দু'জনেরই মুখ পাংশু হয়ে গিয়েছিল। জেন আতংকে চোখ বুজেছিল। কাঁপছিল তার বুক। জোয়ানের অসহায় মুখ তার সামনে ভেসে উঠল। মিশেলও এই রকম এক জোয়ান ছিল। প্রবল ভয় এসে ঘিরে ধরল জেনকে।

মি. সানচেজ থামলে জেনের আব্বা বলল, 'সান, তুমি কাজের কাজে একটুও দেরি কর না, এটাই তোমার ভাগ্যলক্ষী।' বলতে বলতে জেনের আব্বা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'চল সান, ড্রইংরুমে বসি, কথা আছে।'

জেনের আব্বা ও মি. সানচেজ উভয়ে বেরিয়ে গেল, জেনকে দুধ খাইয়ে জেনের মা আগেই বেরিয়ে গিয়েছিল।

জেনের আব্বা ও মি. সানচেজ বেরিয়ে যাবার পরও জেন কিংবা হান্না কেউই কথা বলল না। জেন তখনও চোখ বুজে পড়ে আছে এবং হান্নার মুখ বিস্ময় ও বেদনায় আচ্ছন্ন।

কিছুক্ষণ পর হান্না জেনের কাঁধে হাত রেখে বলল, 'সংসারটা বড় কঠিন জেন। তোকে বাস্তববাদী হতে হবে। আর জোয়ানকে বাঁচানোর কথা বলছিস, তুই ও আমি চেষ্টা করলেই কী তা পারব? ওর হৃদয়ে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে, তার নিরাময় আমাদের হাতে নেই। অন্যদিকে গোটা দেশের রোষ থেকে বাঁচাবার ক্ষমতাও আমাদের নেই।'

জেন কিছুই বলল না। তার চোখ থেকে অশ্রুর দু'টি ধারা নেমে এলো।

হান্নাই কথা বলল আবার। বলল, 'নীতির দিক দিয়ে যদি বলি বলব, জাতি অন্যায় করছে, কিন্তু আমরা কি করতে পারি! আমরা জাতির একটা অতি ক্ষুদ্র অংশ ছাড়া আর কিছু নই।'

অনেকক্ষণ পর জেন বলল, 'তুই আমাকে ওর কাছে নিয়ে যাবি?'

'যেয়ে কি লাভ? তার চেয়ে তোকে ও ভুল বুঝেছে, এ অবস্থায়ই থাকা ভালো।'

জেন চোখ মুছে বলল, 'না হান্না, আমাকে ওর কাছে যেতে হবে।'

'কিন্তু জেন একটা কথা চিন্তা কর। মিশেল মাত্র তার পরিচয় গোপন করার কি শাস্তি পেল। তোর আর জোয়ানের ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে পড়লে কী ভয়ংকর অবস্থা সৃষ্টি হবে তা কি ভেবে দেখেছিস!'

'যে অবস্থারই সৃষ্টি হোক হান্না ও আমাকে ভুল বোঝার কষ্ট আমার বুকে যতখানি, তার চেয়ে বেশি অবশ্যই নয়।'

'বিস্মিত হচ্ছি জেন, তোদের মধ্যে এ রকম সম্পর্ক তো ছিল না!'

'মানুষ তার নিজের সবটুকু কি জানে? আমিও জানতে পারিনি।'

একটু থেমেই বলল জেন আবার, 'কবে আমাকে ওর কাছে নিয়ে যাবি?'

'তোর এই অবস্থা নিয়ে?'

'যতটা দুর্বল মনে হচ্ছে ততটা দুর্বল আমি নই।'

'তবু তোর অন্তত কয়েকটা দিন রেষ্ট নেয়া উচিত বাইরে বেরুবার আগে।'

জেন কী যেন ভাবল! কোন জবাব দিল না হান্নার কথায়।

হান্নাও কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বলল, 'ঠিক আছে আমি তাহলে উঠি। দু'দিন পর আমি আসছি।'

বলে হান্না বেরিয়ে গেল।

জেন ভাবছিল। হান্নার চলে যাওয়ার দিকে একবার শূন্য দৃষ্টিতে চাইল। কিছু বলল না।

হান্না বেরিয় যেতেই জেনের মা ঘরে ঢুকল। বলল, 'ওষুধ খাওয়ার সময় পার হয়ে যাচ্ছে। খেয়েছিস ওষুধ?'

‘খাচ্ছি মা!‘ বলে জেন নিজে উঠে টেবিল থেকে ওষুধ নিল। জেনের মা দ্রুত এগিয়ে এসে বলল, ‘বলবি তো, তুই আবার উঠছিস কেন?’

‘আমার আজ খুব ভালো লাগছে?’ বলে হাসল জেন। বলল, ‘আমার একটু বাইরে বেড়িয়ে আসতে ইচ্ছা করছে মা।’

জেনের মা জেনের গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে পরীক্ষা করে বলল, ‘হাটতে পরবি?’

‘পারব।’

‘ঠিক আছে। আশেপাশে কোথাও বেড়িয়ে আসিস। শরীরটা আরো ভালো লাগতে পারে।’

বলে জেনের মা চলে গেল।

জেনের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

বিকেল বেলা।

জোয়ান তার বাড়ির পাশের বাগানে খন্তা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আগাছা পরিষ্কার করছিল। বিরাট ফল ও ফুলের বাগান। সকালেও কিছু সময় কাজ করেছে। বিকেলে ঘন্টা খানেক কাজ করলে শেষ হয়ে যাবে বলে রেখে দিয়েছিল।

কয়েক দিন থেকে বাগানের মালি আসছে না। সুযোগ পেয়ে আগাছা দল বেঁধে মাথা তুলেছে। অপরিচর্যায় ফলও নষ্ট হচ্ছে। আজ সকালে খবর এসেছে মালি আর আসবে না। মালি ক্ষমা প্রার্থনা করে একটা চিঠি লিখেছে। তাতে বলেছে, জোয়ান পরিবারের কাছে সে আকন্ঠ ঋণী। সারা জীবন বিনা পয়সায় কাজ করলেও এ ঋণ শেষ হবে না। কিন্তু কাজ করতে সে অপারগ। তার কাছে হুমকি এসেছে, সে যদি মরিসকো’র বাসায় কাজ ছেড়ে না দেয়, তাহলে তাকে দেখে নেয়া হবে। অন্যদিকে বাইবেল-সোসাইটি থেকে বলা হয়েছে, মরিসকোর বাড়ির নওকরী সে যদি পরিত্যাগ না করে তাহলে সামাজিকভাবে তাকে বয়কট করা হবে। এই অবস্থায় কাজে যোগদান থেকে বিরত থাকা ছাড়া তার উপায় নেই। সে তার অপারগতার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে।

জোয়ান বাগানের আগাছা পরিষ্কার শেষ করে উঠে দাঁড়াল। তারপর খন্তাটা বাগানের পাশে স্টোর রুমে দিয়ে বাগানে পানি ছিটানোর কাজ শুরু করল।

জোয়ান পানি ছিটাচ্ছিল আর ভাবছিল, তাদের বিশ বছরের পুরানো মালিকের কাজ ছেড়ে দিতে হলো! কারণ মরিসকো পরিবারে কাজ করা অপরাধ। জোয়ানের মুখে একটা তিক্ত হাসি ফুটে উঠল।

জোয়ানের মা ধীরে ধীরে এসে বাগানে দাঁড়াল। তার চোখ কাজে ব্যস্ত জোয়ানের দিকে। চোখে তার একরাশ বেদন। জীবনে জোয়ানকে এসব কাজে হাত দিতে হয়নি। ভাগ্যের কী বিপর্যয়! যার হাতে ছিল এতদিন কলম, তাকে আজ হাতে তুলে নিতে হয়েছে খন্তা।

জোয়ানের মা ধীরে ধীরে ডাকল, 'জোয়ান, এসো বেটা, এখন চা খাবার সময়।'

জোয়ান মায়ের দিকে ফিরে তাকাল। বলল, 'আম্মা, তুমি আবার এতদূর এসেছ। ডাকলেই তো হতো।'

বলে জোয়ান পানির পাইপ বন্ধ করে মায়ের সাথে চলে এলো।

নাস্তা শেষ করার পর জোয়ান তার মায়ের কাপে চা ঢেলে তার মাকে এগিয়ে দিচ্ছিল।

জোয়ানের মা জোয়ানের হাতের দিকে চেয়ে চমকে উঠল। বলল, 'জোয়ান, তোর হাতে ফোস্কা!'

জোয়ান তাড়াতাড়ি হাত টেনে নিয়ে বলল, 'ও কিছু না আম্মা। অভ্যেস নেই তো!'

জোয়ানের মা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল জোয়ানের দিকে। বেদনায় মুষড়ে যাওয়া তার মুখ। সে জোয়ানের দিকে তাকিয়ে আছে বটে, কিন্তু তার দৃষ্টিটা শূন্যে। যেন কোথায় হারিয়ে গেছে তার মন কিংবা গভীরভাবে কিছু সে ভাবছে!

জোয়ান চায়ে চুমুক দিয়ে মায়ের দিকে চেয়ে বলল, 'আম্মা, এসব নিয়ে ভেবে মন খারাপ করবে না। নিজেদের সব কাজ নিজে করার জন্যে তৈরি থাকতে হবে। সুযোগ পেয়ে আমি খুশি আম্মা!'

মুখে হাসি টানার চেষ্টা করে বলল জোয়ান। জোয়ানের মা নিরব তবু।

'কি ভাবছ আম্মা?' বলল জোয়ান।

জোয়ানের মা ধীর, কিন্তু অত্যন্ত দৃঢ় কন্ঠে বলল, 'আমি ভাবছি। ভাবছি, আমরা মাদ্রিদ থেকে চলে যাব।'

বিস্মিত হলো জোয়ান। বলল, 'মাদ্রিদ থেকে আমরা চলে যাব? কেন আম্মা?'

'কেন বুঝতে পারছ না! এখানে ওরা আমাদের জীবনকে দুঃসহ করে তুলবে। মালি কাজ ছেড়ে দিয়েছে, কাজের ছেলেটাও আজ আসেনি। শীঘ্রই শুনতে পাব, মরিসকোদের বাসায় সে কাজ করবে না। এভাবে সব দিক থেকে ওরা আমাদের বয়কট করবে।'

'মাদ্রিদ থেকে চলে গেলেই কি এ সমস্যার সমাধান হবে মা?'

'হবে, দূরের কোন শহরে চলে যাব। সেখানে কেউ আমাদেরকে চিনবে না।'

'অর্থাৎ আমরা আবার আমাদের আত্মপরিচয় গোপন করব, এই তো?'

'তাছাড়া উপায় কি বেটা? আমরা তো বাঁচতে চাই, ভালোভাবে বেঁচে থাকতে চাই।'

'না, আম্মা! আমরা মাদ্রিদ থেকে যাবো না। আমার পূর্বপুরুষ একবার ভ্যালেনসিয়া থেকে মাদ্রিদ এসেছিল আত্মপরিচয় গোপন করার জন্যে। কিন্তু অবশেষে তা গোপন থাকল না।'

'থাকল না সেটা এখনকার কথা। কিন্তু কয়েক পুরুষ তো গোপন ছিল। পরিবারের জীবনে শান্তি ও সমৃদ্ধিও এসেছিল।'

'পলাকত জীবনের এ শান্তি-সমৃদ্ধি দিয়ে কি লাভ আম্মা?'

'কি বলতে চাও তুমি?'

'বলতে চাই, আর আত্মগোপন নয়, আর পলাতক জীবন নয়। আত্মপরিচয় নিয়ে পূর্ণভাবে প্রকাশিত হতে চাই।'

'তারপর?'

'তারপর কি আম্মা?'

'ওরা কি শান্তিতে বাস করতে দেবে? বাঁচতে দেবে?'

‘বাঁচতে চেষ্টা করব, না পারি আত্মপরিচয় নিয়েই শেষ হয়ে যেতে চাই আম্মা।’

জোয়ানের আম্মা উঠে দাঁড়াল। জোয়ানের পাশে এসে জোয়ানের কাঁধে হাত রেখে ধীর কন্ঠে বলল, ‘যা কেউ করতে পারেনি, তুমি তা করবে? করতে পারবে?’

‘চেষ্টা করব মা।’

‘কিন্তু কি লাভ বেটা, এমন চরম অসম লড়াইয়ে কি লাভ হবে?’

‘লাভ এই হবে আমার পরিচয় সমুন্নত হবে। আমি হয়তো থাকব না, কিন্তু আমি যে মুসা আবদুল্লাহ, আত্মপরিচয় গোপনকারী জোয়ান নই, এই কথা এদেশবাসীর কাছে, বিশেষ করে মরিসকোদের কাছে বেঁচে থাকবে।’

জোয়ানের মার মুখ পাংশু হয়ে গেল। চোখ ফেটে ঝর ঝর করে নেমে এলো অশ্রু। বলল, ‘বেটা, দু’হাত বাড়িয়ে সেই পথকে স্বাগত জানানো কি ঠিক, যে পথ নিশ্চিতভাবে ধ্বংসের? তোমার পূর্বপুরুষরা ও মরিসকোরা কেউই এটা করেনি।’

‘তারা ভুল করেছেন। আম্মা, আমি ভুল করতে চাই না। আমি কাপুরুষের মতো বাঁচতে চাই না। পদদলিত জীবন নিয়ে আমি এক মুহূর্তে বাঁচতে চাই না।’

‘তোমার এসব ক্ষোভের কথা, আবেগের কথা। তোমাকে ভুললে চলবে না, স্পেনে মরিসকোরা আজ পর্যন্ত কৌশল করেই বেঁচে আছে।’

‘এ বাঁচায় কি লাভ আম্মা! আমরা আমাদের নিজের নাম বলতে পারি না, নিজের বিশ্বাসের কথা বলতে পারি না। এমন জীবনের ঘানি আমরা কেন বয়ে চলব শতাব্দীর পর শতাব্দীকাল ধরে?’

বলে জোয়ান উঠে দাঁড়াল। মায়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার চোখে চোখ রেখে বলল, ‘আম্মা, আমার দিকে চেয়ে দেখ। আমি ক্ষোভ থেকে কিংবা আবেগ নিয়ে কোন কথা বলছি না। আমি আমার শান্ত মনের স্থির সিদ্ধান্ত থেকে এ কথা বলছি। আর আমাকে এ সিদ্ধান্ত নেয়ার নির্দেশ দিয়েছে আমার পূর্বপুরুষ আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমানের জীবন কাহিনী, যার মধ্যে দিয়ে আমি আমাকে খুঁজে পেয়েছি, যা এতদিন অজানা ছিল।’

জোয়ানের মা জোয়ানকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'বেটা, তোমার এতটুকুন বয়স, কেউ তো কোথাও সাহাযয্যের নেই। আমার ভয় করছে।'

এ সময় জোয়ানের দাদী ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। তার মুখ উজ্জ্বল।

বেরিয়ে এসে একটা চেয়ার টেনে বসে বলল, 'জোয়ান, তোর সব কথা আমি শুনতে পেয়েছি। আল্লাহ তোকে বাঁচিয়ে রাখুন!'

একটু থামল জোয়ানের দাদী। তারপর আবার শুরু করল, 'অ-নে-ক দিন আগের কথা! আমি সবে স্কুল পাস করেছি। আমি আব্বার সাথে গ্রানাডার আল হামরা দেখতে গিয়েছিলাম। আমরা আল হামরা প্রাসাদ ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে প্রাসাদের পেছন দিকে চলে গিয়েছিলাম। তুষারময় সিয়েরানিবেদা পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে আল হামরার লাল প্রাসাদকে দেখতে অপরূপ লাগছিল। একটা জলপাই গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আমরা আল হামরা দেখছিলাম। আব্বা আমারকে আল হামরার ইতিহাস বলছিলেন, 'মুসলিম শাসনের আলোক প্রভায় সমগ্র স্পেন তখন আলোকিত। সভ্যতা ও সমৃদ্ধিতে স্পেন তখন সমগ্র ইউরোপের অন্ধকার জীবনে সূর্যসদৃশ। সেই সময় ১২৪৮ খৃষ্টাব্দে গ্রানাডার শাসক মোহাম্মদ আল হামর আল হামরা প্রাসাদের নির্মাণ শুরু করেন। বিশ্বে এমন প্রাসাদ দ্বিতীয়টি নেই। কিন্তু আজ যে এর দুর্ভাগ্য, এমন দুর্ভাগ্যও কোন প্রাসাদের ভাগ্যে আর জোটেনি। মুসলিম শাসনের প্রতীক হিসেবে আজ এ এক বিদ্রূপের বস্তু, এর গায়ে আদর করে হাত বুলাবার একজন লোকও নেই। এর শূন্য বুকে কান পাতলে মা, একটা আকুল হাহাকার শুনতে পাবে। এর প্রতিটা পাথর আজ একটি করে অশ্রু ফোঁটা।' বলতে বলতে আব্বার চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়েছিল। আমি তাকে কোনদিন কাঁদতে দেখিনি। আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। এই সময় পাশের ঝোপের আড়াল থেকে একজন যুবক বেরিয়ে এলো। বেরিয়ে এসে একেবারে আব্বার মুখোমুখি দাঁড়াল। পরিষ্কার কন্ঠে সালাম দিল। তারপর বলল, 'মূর্তিমান দুর্ভাগ্য দেখে কাঁদছেন। এই দুর্বলতাই মুসলমানদের পতন ঘটিয়েছে। পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য চারটা শক্তি প্রয়োজন-জ্ঞান চর্চা, সুবিচার, প্রার্থনা ও সাহসিতা। গ্রানাডার ভেতরে যান। দেখবেন প্রতিটি ভাঙা কলেজের তোরণে এই

কথাগুলো লেখা আছে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এ চারটি শক্তি যেদিন আমরা হারিয়ে ফেললাম, দুর্ভাগ্য মূর্তিমান হয়ে আমাদের দ্বারে এসে দাঁড়াল। সর্বশেষে হারিয়েছিলাম সাহসীদের শৌর্য। এর পরেই এলো কান্না। এখনও কাঁদছি আমরা। তাই কান্নাকে আমি দেখতে পারি না। কান্না নয়, চোখে চাই আগুন।' বলেই যুবকটি যেভাবে এসেছিল সেভাবেই দৌড়ে ঝোপের আড়ালে পালিয়ে গেল। তারপর অনেকদিন, অনেক বছর চলে গেছে, আমি যুবকটিকে ভুলতে পারিনি, ভুলতে পারিনি তার ঐ কয়টি কথা।'

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে জোয়ানের দাদী থামল। মুহূর্তের জন্যে চোখ বুজল। তারপর চোখ খুলে বলল, 'জোয়ান, বহুদিন পর সেই যুবকের কন্ঠ তোর কন্ঠে প্রতিধ্বনিত হতে শুনলাম। আল্লাহ তোর মঙ্গল করুন, আল্লাহ তোকে বাঁচিয়ে রাখুন।'

জোয়ান ছুটে এসে দাদীর কাছে হাঁটু গেড়ে বসে বলল, 'দাদী, তোমাকে ধন্যবাদ। তোমাকে নতুন দাদী মনে হচ্ছে। তোমার এ কথাগুলো আমার কাছে অসীম প্রেরণা। গল্পটা তোমার কাছে আরও বিস্তারিত শুনতে চাই দাদী।'

জোয়ানের দাদী জোয়ানের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'বলব, অবশ্যই বলব।'

জোয়ান উঠে দাঁড়াল। বলল, 'দাদী বাগানে আর একটু কাজ বাকী আছে। সেরে আসি। তোমার গল্প বলতে হবে।'

বলে জোয়ান বেরিয়ে এলো বাড়ি থেকে। ঢুকল গিয়ে বাগানে।

ঠিক বিকেল পাঁচটায় একটা গাড়ি এসে প্রবেশ করল জোয়ানদের গাড়ি বারান্দায়।

গাড়ি থেকে নামল জেন। সে নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করছিল।

বাড়িতে গাড়ি ঢুকতে দেখে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল জোয়ানের মা।

জেনকে দেখে এগিয়ে এলো জোয়ানের মা। বলল, 'একি! তুমি যে একেবারে অর্ধেক হয়ে গেছ! মা, তোমার অসুখ করেছিল বুঝি?'

'জি, খালা আম্মা!' ম্লান হেসে বলল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'জোয়ান আছে খালা আম্মা?'

'আছে। বাগানে। তুমি বস। আমি ডেকে দিচ্ছি।'

বলে জোয়ানের মা বারান্দা থেকে এসে বাগানের দিকে চলল।

জেন কিন্তু ড্রইংরুমের দিকে না গিয়ে বাগানের দিকে চলল জোয়ানের মার পিছু পিছু।

জোয়ানের মা বাগানের ভেতর ঢুকে গেছে।

জেন বাগানের প্রান্তে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। দেখতে পেল জোয়ান খন্তা দিয়ে একটা গাছের গোড়া খোঁচাচ্ছে। অন্য হাতে তার পানির পাইপ।

জোয়ানের মা জোয়ানকে কি বলল।

জোয়ান সংগে সংগে ফিরে তাকাল। দেখতে পেল জেনকে। মুহূর্তের জন্যে মাথাটা নিচে নামাল। পরক্ষনেই মাথা তুলে জেনকে লক্ষ্য করে জোয়ান উচ্চ স্বরে বলল, 'জেন, তুমি গিয়ে আমার ঘরে বস, আসছি আমি।'

জোয়ানের মাও ঘুরে দাঁড়াল।

জোয়ানের মা জেনকে জোয়ানের ঘরে বসিয়ে বলল, 'ওষুধ খাচ্ছ বুঝি? চা তো বারণ নেই?'

জেন জোয়ানের টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। জোয়ানের মার কথায় ঘুরে দাঁড়াল। বলল, 'বারণ নেই খালাম্মা, কিন্তু আপনাকে কষ্ট করতে হবে না।'

'পাগল-মেয়ে!' বলল জোয়ানের মা। 'চা করা আবার কষ্টের!'

বলে জোয়ানের মা বেরিয়ে গেল।

জেন ঘুরে ঘুরে ঘরের চারদিকে নজর বুলাচ্ছিল। ঘরের মেঝেতে লাল কার্পেট, সাদা বিছানা, সাদা সোফা, সাদা টেবিল ও সাদা কুশনের একটি চেয়ার- ঘরের সবই ঠিক আছে। কিন্তু নেই শুধু টেবিলের স্তুপাকার বই এবং টেবিলের এক প্রান্তে রাখা ডিপার্টমেন্টাল গ্রুপ ফটো। আর ফ্লাওয়ার ভাসের ফুলগুচ্ছও শুকিয়ে আছে। ক'দিন থেকে পাল্টানো হয়নি।

পেছনে পায়ের শব্দ শুনে জেন ঘুরে দাঁড়াল। পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে জোয়ান।

জেন ও জোয়ান একেবারে মুখোমুখি। দু'জনের চোখ দু'জনের চোখে নিবদ্ধ। কিছুক্ষণ দু'জনের কেউই কথা বলতে পারল না।

দু'জনেই বাকরুদ্ধ।

দু'জনের চোখ যেন দু'জনের চোখের সীমানা পেরিয়ে হৃদয়ের গভীরে অবগাহন করছে।

দুর্বল জেনের ঠোঁট দু'টি কাঁপছিল।

'তুমি এত অসুস্থ জেন!' উদ্বিগ্ন কন্ঠে বলল জোয়ান। 'হান্না আমাকে বলেছিল, কিন্তু আমি এতটা ভাবিনি।'

জেন কথা বলার জন্যে ঠোঁট দু'টি ফাঁক করল। কিন্তু কথা বলতে পারল না। তার শরীর কাঁপতে লাগল।

জোয়ান তাড়াতাড়ি জেনকে ধরে সোফায় এনে বসাল। বলল, 'বসে থাকতে পারবে, না বিছানায় শুইয়ে দেব?'

জেন কোন কথা বলল না। জোয়ানের একটা হাত সে শক্ত করে ধরে থাকল।

'তুমি এ শরীর নিয়ে কেন এলে? কেন বাড়ি থেকে বেরুলে?' নরম কন্ঠে বলল জোয়ান।

জেনের ঠোঁট কেঁপে উঠল আবার। একরাশ কান্না যেন তার চোখ-মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ল!

'তুমি তোমার সার্টিফিকেটগুলো কেন পুড়িয়েছ? কেন? কেন? তোমার টেবিলে কেন কোন বই নেই?' কান্নার একটা বাঁধ ভাঙা উচ্ছাসের সাথে জেনের মুখ থেকে বেরিয়ে এলো কথাগুলো।

তার সাথে সাথে জেনের দুর্বল দেহ লুটিয়ে পড়ল সোফার ওপর।

জোয়ান তাড়াতাড়ি ধরে ফেলল তাকে।

জেন জ্ঞান হারিয়েছে।

জোয়ান ধীরে ধীরে জেনেরে মাথা একটু তুলে ধরে চিৎকার করে উঠল, 'আম্মা, এদিকে এসো, জেন জ্ঞান হারিয়েছে।'

ছুটে এলো জোয়ানের মা।

‘কি হলো, জেনের কি হয়েছে?’ জোয়ানের মা’র কন্ঠে উদ্বেগ।

‘অসুস্থ, দুর্বল মাথা ঘুরে পড়ে গেছে আম্মা।’

‘ডাক্তার ডাকব?’

‘দেখা যাক আম্মা। আমার ইনস্ট্রুমেন্ট বক্সে দেখ একটা সাদা শিশিতে স্পিরিট আছে। স্পিরিটে একটু তুলা ভিজিয়ে নিয়ে আস আম্মা।’

স্পিরিটে ভেজানো তুলা জোয়ানের হাতে তুলে দিয়ে জোয়ানের আম্মা বলল, ‘তুমি এটা ওর নাকে ধর। আমি একটু গরম দুধ করে আনি।’

বেরিয়ে গেল জোয়ানের মা।

মিনিট দু’য়েকের মধ্যেই চোখ খুলল জেন। চারদিকে একবার চেয়ে উঠে বসতে চেষ্টা করল জেন। জোয়ান তাকে নিষেধ করে বলল, ‘এখনই উঠে বসা ঠিক হবে না। একটু গরম দুধ খেয়ে নাও। আম্মা এখুনি নিয়ে আসছেন।’

‘হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গেছে।’ বলল জেন।

‘অসুস্থ শরীর, অতটা উত্তেজিত হওয়া ঠিক হয়নি।’

জোয়ানের উরুতে তখনও জেনের মাথা। জেন চোখ ওপরে তুলে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল জোয়ানের দিকে। তার ঠোঁট দু’টি আবার কাঁপতে লাগল অবরুদ্ধ এক আবেগে।

জোয়ান তাড়াতাড়ি জেনকে সান্তনা দিয়ে বলল, ‘শান্ত হও জেন, আমি তোমাকে সব বলব।’

‘আমি তোমার কোন কথা শুনব না।’ বলে দু’হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল জেন।

দুধের গ্লাস হাতে ঘরে ঢুকল জোয়ানের আম্মা।

জেনের মাথা জোয়ান ধীরে ধীরে সোফায় রাখতে রাখতে বলল, ‘জেন, আম্মা দুধ নিয়ে এসেছে।’

জোয়ান উঠে দাঁড়ালে জোয়ানের আম্মা জেনের মাথা কোলে তুলে নিল। জেন জোয়ানের মা’র কোলে মুখ গুঁজে কান্নায় ভেঙে পড়ল। বলল, ‘খালাম্মা, জোয়ান তার সার্টিফিকেটগুলো পুড়িয়ে ফেলেছে কেন, টেবিল থেকে বই সরিয় ফেলেছে কেন?’

জেনের কথাগুলো জোয়ানের মার বুকের ক্ষতকে যেন উস্কে দিল! তার চোখ থেকেও ঝর ঝর করে অশ্রু নেমে এলো। কান্নাজড়িত ভাঙা গলায় জোয়ানের মা বলল, 'মা, দুধটুকু খেয়ে নাও, ওসব কথা পরে হবে। সব ওলট-পালট হয়ে গেছে মা।'

বলে জোয়ানের মা জেনকে তুলে বসাল। তারপর চোখ মুছে দিয়ে দুধ খাইয়ে দিল। জোয়ান মেঝের ওপর কাঠের মতো স্থির দাঁড়িয়েছিল। তার চোখে বেদনা ও অসহায়ত্বের একটা কালো ছায়া।

জেনের দুধ খাওয়া হলে জোয়ান বলল, 'আম্মা, ওকে একটু বিছানায় শুইয়ে দাও। একটু বিশ্রাম নিক। আমি ওকে পৌছে দেব।'

জেন কোন কথা বলল না। একবার চোখ তুলে জোয়ানের বিছানার দিকে চাইল। জোয়ানের মা জেনকে ধরে বিছানায় শুইয়ে দিল। শান্ত বালিকার মতো জেন হুকুম তামিল করে শুয়ে পড়ল।

'এখন কেমন লাগছে মা?' জিজ্ঞেস করল জোয়ানের মা।

'ভালো খালাম্মা। মনে হচ্ছে আমি হেঁটে বাসায় ফিরতে পারব।'

'পাগল মেয়ে! একটু বিশ্রাম নাও, আমি আসছি।' বলে জোয়ানের মা বেরিয়ে গেল।

জোয়ান ঠিক সেভাবেই মেঝের মাঝখানটায় দাঁড়িয়েছিল।

জেন চোখ তুলে জোয়ানের দিকে তাকাল। বলল, 'বস।'

জোয়ান টেবিলের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বিছানার পাশে বসল।

জোয়ান মাথা নিচু করে চেয়ারে বসে রইল। কোন কথা বলল না। জেন তাকিয়েছিল জোয়ানের দিকে।

সেই কথা বলল প্রথম। বলল, 'সব বলতে চেয়েছিলে, বলো।'

'আজ বলব না। তুমি অসুস্থ, সেরে ওঠ।'

'ও তুমি পাশ কাটাতে চাচ্ছ।'

জোয়ান জেনের চোখে চোখ রেখে নরম কন্ঠে বলল, 'না জেন। তোমার শরীর ভীষণ খারাপ, তোমার বিছানা থেকে ওঠা উচিত নয়। আমি ভেবে পাচ্ছি না, তুমি এলে কেমন করে!'

‘বলত কোন শক্তি আমাকে নিয়ে এসেছে?’

‘জেন, বাস্তবতাকে তুমি অস্বীকার করছ কেমন করে?’

‘কিসের বাস্তবতা?’

‘আমি মরিসকো। তুমি বিশ্বাস কর না?’

‘তুমি এ শব্দ উচ্চারণ করো না। আমি এ শব্দ শুনতে চাই না।’ দু’হাতে মুখ ঢেকে চিৎকার করে বলে উঠল জেন।

‘আমি উচ্চারণ না করলেও আমি মরিসকো।’ নরম কন্ঠে বলল জোয়ান।

‘আর দশজন ‘স্পেনীয়’র মতোই তুমি স্পেনীয়। তোমার গায়ে কি লেখা আছে তুমি মরিসকো, তোমার কপালে কি লেখা আছে তুমি মরিসকো?’ উত্তেজিত কন্ঠে বলল জেন।

‘আমার রক্তে লেখা আছে যা আমি জানতাম না জেন।’

‘না, জোয়ান, আমি তোমাকে ধ্বংস হতে দেব না, দিতে পারি না, আমি বাঁচবো না।’

কান্নায় ভেঙে পড়ল জেন।

‘জেন, আমি ধ্বংস হতে চাই না।’

‘তাহলে এ অভিযোগ মাথা পেতে নিচ্ছ কেন, অস্বীকার করছ না কেন?’

‘মরিসকো পরিচয়ে আমি গৌরব বোধ করছি জেন। মরিসকো হিসেবেই আমি মাথা তুলে দাঁড়াতে চাই।’

‘পারবে না জোয়ান, পারবে না। এটা ধ্বংসের পথ। না, এ পথে তোমাকে যেতে দেব না।’

‘জেন, ধ্বংসের হলেও এটাই আমার চলার পথ। তুমি আমাকে মাফ কর।’

‘জোয়ান তুমি অবুঝ হয়ো না, তুমি জান না তুমি একা, আর কত বড় ভয়ংকরের বিরুদ্ধে তোমার উত্থান! আজকেই গল্প শুনলাম, এ্যারোপ্লেন নির্মাণ কোম্পানী ‘এ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স’- এর চীফ ইঞ্জিনিয়ার মি. মিশেল ধরা পড়েন। তিনি মরিসকো। মানুষ হিসেবে তিনি মহত্তম এবং ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে

দেশে অদ্বিতীয় হওয়া সত্ত্বেও তাকে গুলী করে মারা হয়েছে এবং তার স্ত্রীকে রাস্তায় বের করে দেয়া হয়েছে। জোয়ান, তুমি জান না ওরা কত অমানুষ!’ থামল জেন।

জোয়ান তৎক্ষণাৎ কথা বলতে পারল না। জেনের দেয়া খবর বিদ্যুৎশকের মতো জোয়ানের দেহ-মনকে আহত করেছে। মি. মিশেলকে জোয়ান চিনত। ফিজিক্সের ইঞ্জিনিয়ারিং পরিমাপ সম্পর্কিত একটা জটিল অংকের সমাধান নেবার জন্যে জোয়ান তার কাছে একবার গিয়েছিল। তার অসাধারণ প্রতিভা ও সারল্যে মুগ্ধ হয়েছিল জোয়ান। এই মি. মিশেল মরিসকো ছিল? মরিসকো হওয়ার অপরাধে তাকে জীবন দিতে হলো? বুক থেকে উঠে আসা একটা আবেগ রুখতে গিয়ে জোয়ান চোখ বুজল। তবু চোখের পাতা ঠেলে দু’চোখ থেকে বেরিয়ে এলো দু’ফোঁটা অশ্রু।

জেন তাকিয়েছিল জোয়ানের দিকে। জোয়ানের চোখের দু’ফোঁটা অশ্রু তার নজর এড়ালো না। সে কিছু বলতে যাচ্ছিল এই সময় জোয়ান কথা বলে উঠল। বলল, ‘জেন, আমি মাথা উঁচু করে ঘোষণা কতে চাই, আমি মরিসকো। মরিসকোদের উত্থান আমার থেকেই শুরু হবে।

জোয়ান চোখের কোণের দু’ফোঁটা অশ্রু মছে ফেলল।

‘তুমি আগুনে ঝাঁপ দিতে চাইছ। মিশেলের ঘটনা জানার পর একটুও তোমার ভয় করে না!’ অবরুদ্ধ স্বরে কাঁপা গলায় বলল জেন।

‘জেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে তোমার সামনে প্রথম যখন আমি শুনলাম আমি মরিসকো, হৃদয় তখন আমার ভেঙে গিয়েছিল। আমি মুষড়ে পড়েছিলাম। পাগলের মতো আমি বাড়িতে ছুটে এসেছিলাম। চাইছিলাম অভিযোগটাকে আমার মা, দাদী মিথ্যা বলুন। তারা মিথ্যা বলতে পারলেন না। বললেন, তারা মরিসকো, কিন্তু আব্বা, দাদা মরিসকো ছিলেন কি না বলতে পারলেন না। আমি বুঝে ফেললাম, আব্বা, দাদা মরিসকো না হলে মরিসকো মেয়ে বিয়ে করলেন কেন? আমার তখন মনে হচ্ছিল আমি শেষ হয়ে গেছি, নিজেকে মনে হচ্ছিল জগতের সবচেয়ে বড় অপরাধী। ধ্বংস হয়ে যাওয়াই আমার ভাগ্য লেখা। মুহূর্তে গোটা দুনিয়া আমার কাছে অপরিচিত হয়ে রূপ নিল। এই অবস্থা থাকলে মি.

মিশেলের খবর শুনে আমি ভয় পেতাম, হয়তো মাদ্রিদ ছেড়ে পালাতাম। কিন্তু সে অবস্থা এখন নেই জেন।'

'তারপর এমন কি ঘটেছে যার জন্যে তুমি ভয় করছ না?'

জোয়ান তার আম্মার কাছে আব্বার রেখে যাওয়া বাক্স পাওয়া এবং বাক্সের ভেতর থেকে পারিবারিক ইতিহাস পাওয়া ও পড়ার কথা উল্লেখ করে বলল. 'মরিসকো হওয়ার জন্যে জেন, আমার মনে আজ কোন দুঃখ নেই, কোন ক্ষোভ নেই, বরং গর্বে আমার বুক ভরে গেছে! আজ আমার মনে যে শান্তি, যে শক্তি তা অতীতে কোন সময়ই ছিল না। এক মিশেল হত্যার খবর কেন, এক হাজার মিশেল হত্যার খবরও আমার হৃদয়ে কোন কম্পন সৃষ্টি করতে পারবে না। আজ আমার হৃদয় সব জুলুম, সব অন্যায়ের প্রতিকার প্রত্যাশী।' থামল জোয়ান।

জেন বোবা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে ছিল জোয়ানের দিকে। জোয়ানকে তার নতুন জোয়ান মনে হচ্ছিল। আগের জোয়ানের মধ্যে ছিল প্রতিভার এক শান্ত জ্যোতি, আর এ জোয়ানের মধ্যে দেখতে পাচ্ছে একজন প্রতিবাদী-বিপ্লবীর অদম্য তেজ। জোয়ানের এ রূপ তার কাছে আরও মোহনীয়, আরও পৌরুষদীপ্ত মনে হলো।

কিছুক্ষণ এভাবে তাকিয়ে থাকার পর জেন বলল, 'ঐ ইতিহাসে কী জেনেছ বলবে?'

'নিশ্চয় তোমাকে বলব জেন!' বলে জোয়ান কিভাবে তার পূর্বপুরুষ ভ্যালেনসিয়া থেকে উচ্ছেদ হয়েছিল, কিভাবে পিতা-মাতার কাছে থেকে সন্তানদের কেড়ে নেয়া হয়েছিল, পিতা-মাতা থেকে তার বালক পূর্বপুরুষের মর্মান্তিক জীবনটা কেমন ছিল ইত্যাদি যত কাহিনী জোয়ান জেনকে শোনাল। বলা শেষ করে থামল জোয়ান।

চোখ বুজল জেন। কোন কথা সে বলল না। তার দৃষ্টিতে তখন ৫শ' বছর আগের দৃশ্য। শিক্ষা, সভ্যতা, শক্তিতে বিশ্বের সেরা একটি জাতি, মুসলমানরা স্পেনে রাজত্ব করতো। তারা স্পেনকে, স্পেনীদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে এলো। সুআচরণ ও সুব্যবহার দিয়ে তারা স্পেনীয়দের আপন করে নিল, স্পেনীয়রাও তাদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরল। জেন ভাবল, জোয়ান সেই মহান

জাতিরই একজন। তাদের গৌরব, তাদের শক্তিই জোয়ানের বুকে এসে মাথা তুলেছে। কিন্তু অতীত তো বর্তমান হতে পারে না!

জেন চোখ খুলল। দেখল, জোয়ান তার দিকেই তাকিয়ে আছে। জেন বলল, ‘একটা কথা বলব?’

‘বল।’

‘তোমাকে বর্তমান নিয়ে ভাতে হবে জোয়ান। এখন তোমার কি আছে, কি নেই তার ভিত্তিতেই তোমাকে কথা বলতে হবে।’

‘তোমার কথা বুঝেছি। আমি তো লড়াইয়ে নামতে চাচ্ছি না। আমি শুধু আমার পরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই।’

‘এজন্য তুমি মরিসকো- একথা ঘোষণা করার দরকার আছে?’

‘আছে জেন, মরিসকোদেরকে তাদের হীন অবস্থা থেকে নিজের পরিচয় নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে। নিজেদেরকে তাদের প্রকাশ করতে হবে।’

কোন উত্তর দিল না জেন।

আবার সে চোখ বুজেছে।

এবার জোয়ানই কথা বলল। বলল, ‘জেন, একটা কথা বলব তোমাকে।

‘বল, কি কথা?‘ তড়িঘড়ি চোখ খুলে জোয়ানের দিকে চোখ তুলে বলল জেন।

জোয়ান একটু দ্বিধা করল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, ‘এই যে দীর্ঘ দিনের জানাজানি আমাদের, আজ তুমি যে এলে, এত কথা হলো, সব আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত।’

‘কেন?’ দৃঢ় কন্ঠ জেনের।

‘কেন একথা বলছি তুমি জান।’

‘আমার কাছে ওটা যদি কোন কারণ না হয় তাহলে?’

‘অবুঝ হলে চলবে না জেন। এটা বাস্তবতা। আমি চাই না তোমার সুন্দর জীবন কোন ঝড়ের কবলে পড়ুক!’

‘তুমি না চাইলে আমি কেমন করে চাইতে পারি তোমার মতো অতুলনীয় একটা প্রতিভা ধ্বংসের কবলে পড়ুক?’

‘আমি যে অবস্থায় পড়েছি সেটা একটা বাস্তবতা। আমরা চাইলেও এটা এড়াতে পারতাম না।’

‘আর ঝড়ে উপড়ে পড়ার ভয়ে আমি বুঝি আমার নিজের বাস্তবতা পরিত্যাগ করতে পারি?’

‘আমাকে ভূল বুঝ না জেন, সময় আমাদের এ আবেগ, এ অনুভূতিকে মুছে ফেলতে পারে।’

লাফ দিয়ে উঠে বসল জেন। হামগুড়ি দিয়ে ছুটে এলো জোয়ানের কাছে। মুখোমুখি হয়ে বলল, ‘কি বললে তুমি, কি বললে তুমি জোয়ান।’

বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল জেন। অশ্রুরুদ্ধ কন্ঠে বলল, ‘জোয়ান, তুমি নিজেকে দিয়ে সবাইকে বিচার করতে পার না।’

বলে জেন ছুটে বেরিয়ে গেল।

জোয়ান বোবার মতো বসে রইল। সে যেন এই জগতে নেই।

কয়েক মুহূর্ত পরেই ছুটে এসে ঘরে ঢুকল জোয়ানের মা। বলল, ‘জেনের কি হলো? ও কি গাড়ি চালাতে পারবে?’

জোয়ানের সম্বিত ফিরে পেল। আতংকে তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল জোয়ান।

জোয়ান যখন গাড়ি বারান্দায় পৌঁছল, জেনের গাড়ি গেট পেরিয়ে তখন রাস্তায় গিয়ে পড়েছে। জোয়ান গাড়ি দেখতে পেল না।

দু’হাতে মাথা চেপে ধরে গাড়ি বারান্দায় বসে পড়ল জোয়ান। জেন শুধু দুর্বল নয়, তার মাথাও এখন ঠিক নেই। এ অবস্থায় গাড়ি চালানোর অর্থ .....।

বিভীষিকাময় একটা দৃশ্য ফুটে উঠল জোয়ানের চোখে।

জোয়ানের মা এসে জোয়ানের মাথায় হাত রাখল।

জোয়ান শিশুর মতো কেঁদে উঠল, ‘আম্মা, আমি জেনকে খুন করেছি।’

মাদ্রিদ জেনারেল হাসপাতাল।

ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট থেকে ছাড়া পেয়ে জেন কেবিনে এসে উঠল।

জেনের গাড়ি একটা লাইট পোষ্টের সাথে ধাক্কা খায়। আঘাত গাড়ির বাম অংশের ওপর দিয়ে যায় বলে জেন প্রাণে বেঁচে গেছে। তবু সে মাথার বাম পাশে ও বাম চোখে ভয়ানক আঘাত পেয়েছে। ১২ ঘন্টা পর তার জ্ঞান ফেরে। গাড়ির ব্লু-বুক থেকে ঠিকানা নিয়ে পুলিশ জেনের আব্বাকে টেলিফোনে খবর দেয়। জেনের বাবা মা ছুটে আসে হাসপাতালে। সর্বাত্মক চিকিৎসা-যত্ন জেন পায়, কিন্তু তারপরও তার বাম চোখটার ক্ষত রোধ করা যায়নি। জেনকে বাঁচানেই যেহেতু মুখ্য ছিল, তাই চোখের ক্ষতিটা স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। জেন জোয়ানের ওখানে গিয়েছিল একথা বাবা-মা'র কাছে গোপন রেখেছে। আর বাবা-মা জানতেও চেষ্টা করেনি, জেন কোথায় গিয়েছিল। জেনকে কেন তারা একা গাড়ি নিয়ে বেরুতে দিল, এজন্যে তারা নিজেরাই নিজেদের অপরাধী মনে করেছে। জেন বাবা-মা'র একমাত্র সন্তান। গত কয়েকদিন জেনের বাবা-মা হাসপাতালেই পড়ে আছে। জেন বিপদমুক্ত হওয়ার এবং ইনটেনসিভ কেয়ার থেকে ছাড়া পাবার পর জেনের বাবা-মা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

জেন ইনটেনসিভ কেয়ারে থাকার সময় জেনের বাবা-মা ছাড়া কোন ভিজিটরকেই এ্যালাউ করা হয়নি।

জেনকে কেবিনে স্থানান্তরিত করার কয়েক মিনিট পরেই হান্না গিয়ে হাজির হলো কেবিনের দরজায়। কেবিন থেকে বেরুচ্ছিল জেনের আব্বা-আম্মা। হান্নাকে দেখে তারা খুশি হলো। বলল, 'মা, এখন আর কোন অসুবিধা নেই জেনের সাথে দেখা করার। যাও, জেন একাই আছে।'

বলে একটু থামল জেনের আব্বা। তারপর বলল, 'তুমি কতক্ষণ থাকছ হান্না?'

'কেন আংকেল?'

'তাহলে আমরা দু'জন বাড়ি থেকে ঘুরে আসতে পারি। ধরো ঘন্টা দু'সময়।'

'আমি দু'ঘন্টার বেশি থাকতে পারি। অসুবিধা নেই। আপনারা আসুন।'

জেনের আব্বা-আম্মা চলে গেল।

কেবিনে প্রবেশ করল হান্না।

চোখ বুজে শুয়ে আছে জেন। তার বাম চোখে ব্যান্ডেজ। মাথায় ব্যান্ডেজ।

জেন আরও শুকিয়ে গেছে।

হান্না ধীরে ধীরে জেনের পাশে বসে তার হাতে হাত রাখল।

চমকে উঠে চোখ খুলল জেন। হান্নাকে দেখে হেসে উঠল। বলল, ‘এতদিনে এলি, কতদিন তোকে দেখিনি।’

‘বারে প্রতিদিন এসেছি, কিন্তু ইনটেনসিভ ইউনিটে ঢুকতে দিলে তো!’

‘হ্যাঁ, শুনলাম বাবা-মা ছাড়া কাউকেই ঢুকতে দেয়নি।’

জেন মুহূর্তের জন্যে থামল। তারপরেই প্রশ্ন করল আবার, ‘তুই জানতে পেরেছিলি কবে?’

‘এ্যাকসিডেন্টের এক ঘন্টার মধ্যে।’

‘এক ঘন্টার মধ্যে! কি করে?’

‘সে এক কাহিনী!’ মুখ টিপে হেসে বলল হান্না।

‘কাহিনী? কি সেটা?’

হান্না গম্ভীর হলো। বলতে শুরু করল, ‘সেদিন সন্ধ্যা সাতটা। আমি বাইরে থেকে ফিরছি। গেটে জোয়ানের সাথে দেখা। আমাকে না পেয়ে সে ফিরে যাচ্ছিল। তার উস্কো-খুস্কো, বিধ্বস্ত চেহারা। আমাকে সামনে পেয়ে সে শিশুর মতো কেঁদে ফেলল। বলল, ‘হান্না, আমি জেনকে খুন করেছি। আমি আঁৎকে উঠলাম। ধমক দিয়ে বললাম, এসব কি বলছ জোয়ান? জোয়ান বলল, ঠিকই বলছি, ও অসুস্থ, ওকে রাগানো আমার ঠিক হয়নি। আমার ওপর রাগ করে অসুস্থ শরীর নিয়ে গাড়ি চালাতে গিয়ে ও এ্যাকসিডেন্ট করেছে। ও এখন জেনারেল হাসপাতালে। তুমি যাও হান্না, আমাকে খবর এনে দাও। বলে কান্নায় ভেঙে পড়ল জোয়ান। আমি সংগে সংগেই গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে চলে আসি।’ হান্না থামল।

অশ্রুতে ভরে উঠেছিল জেনের চোখ।

‘ও কোথায় হান্না?’ বলল জেন।

‘ও প্রতিদিন হাসপাতারে আসে, আজও ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করছে। আমি খবর নিয়ে গেলে তবে যাবে।’

‘ওকে ডেকে দিতে পারবি হান্না?’

‘ডাকব। তার আগে একটা কথা বলি, তোর এতটা পাগলামী কি ঠিক হয়েছে? তুই সেদিনই যদি যাবি আমাকে খুলে বললি না কেন?’

‘মাফ কর হান্না, আমি কিছুতেই স্থির থাকতে পারিনি, দেরি করতে পারিনি।’

‘আর ওর ওপর এভাবে রাগ করলি কেন? অভিমান বুঝি এভাবে করে!’

‘কয়দিন ইনটেনসিভ কেয়ারে শুয়ে শুয়ে আমি ভেবেছি হান্না, ঐভাবে রাগ করা আমার ঠিক হয়নি। ওর দিকটা ভাবলে আমি ওর ওপর রাগ করতে পারতাম না।’ হান্না উঠে দাঁড়াল।

‘ওকে পাঠাচ্ছি জেন!’ বলে হান্না কেবিন থেকে বেরুবার জন্যে পা বাড়াল।

‘তুমি আবার চলে যেয়ো না যেন।’ বলল জেন হান্নাকে লক্ষ্য করে।

জোয়ান কেবিনে প্রবেশ করল, জেন তখন দরজার দিকেই তাকিয়ে ছিল। জোয়ান এসে জেনের পাশে দাঁড়াল। জেন তখন তার চোখ নামিয়ে নিয়েছে। চোখ বুজেছে সে। বোজা চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে জেনের।

জোয়ানের বুকে তখন তোলপাড়। জেনের বাম চোখের ব্যান্ডেজটা তার বুকে সূচবিদ্ধ করছে। কোনদিন কি আর ঐ চোখ দিয়ে দেখতে পাবে জেন! এত বড় সর্বনাশ হলো তারই ভুলে, তারই দোষে। অসুস্থ জেন কোন কথা বলতে না চেয়েও কেন সে ঐসব কথা সেদিন বলেছিল! কি কথা আজ সে বলবে জেনকে। জোয়ানেরও চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। কেউই কথা বলতে পারছিল না।

সময় বয়ে চলছিল পল পল করে।

মুখ খুলল জোয়ানই প্রথম। বলল, ‘আমাকে মাফ কর জেন, আমি সেদিন ভুল বলেছিলাম। ভুলের খেসারত যে এত বড় হবে আমি বুঝিনি। তোমার চোখ....’

কথা শেষ করতে পারল না জোয়ান। কান্নায় কন্ঠ বন্ধ হয়ে গেল। চোখ খুলল জেন। চোখ থেকে উপছে পড়া অশ্রু স্রোতের মতো নেমে এলো গন্ড বেয়ে। বলল, 'জোয়ান, আমি আজ সুখী। আমার জন্যে তোমার ঐ চোখের পানি গোটা দুনিয়ার চেয়ে আমার কাছে মূল্যবান। হান্না আমাকে সব বলেছে। একটা চোখ হারিয়েও যদি আমি এটা পেয়ে থাকি আমি ভাগ্যবতী।'

এসময় কেবিনে প্রবেশ করল হান্না। বলল, 'দু'জনে গন্ডগোল পাকিয়ে অঘটন ঘটিয়ে দু'জনেরই আবার কাঁদা হচ্ছে! কান্না থামাও, চাচাজান আসছেন।'

জোয়ান ও জেন দু'জনেই চোখ মুছল। চোখ মুছে জেন জোয়ানকে নরম কন্ঠে বলল, 'মরিসকোদের নিয়ে আমাদের কাছে যেমনটা তুমি বলেছিলে, আব্বার কাছে বলো না যেন। তোমাকে অনেক ধৈর্য ধরতে হবে জোয়ান।'

জোয়ান নিরবে গিয়ে বসল সোফায়।

জেনের আব্বা ফ্রান্সিসকো জেমেনিজ কেবিনে ঢুকেই দেখতে পেল জোয়ানকে। মুখে একটা বিস্ময়ের রেখা ফুটে উঠেই আবার মিলিয়ে গেল। তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, 'জোয়ান তুমি!'

জোয়ান উঠে দাঁড়িয়েছিল। বলল, 'জি।'

'তোমার খবরে আমরা সবাই দুঃখিত, কিন্তু সত্য যা তা হতেই হবে, কি বল?' বলল জেনের আব্বা।

'জি।' বলল জোয়ান।

জেনের আব্বা সোফায় না বসে জেনের খাটে গিয়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। তার মুখ জোয়ানের দিকে। বলল, 'বুঝলে জোয়ান, তুমি এতটুকুন বয়সে যে দুর্লভ কৃতিত্ব দেখিয়েছ এবং আরও যা তুমি পার, জাতির কোন কাজে আসবে না, এটাই দুঃখ। জাতির কেউ মরিসকোদের বিশ্বাস করে না।'

জোয়ান দাঁড়িয়েই ছিল। কোন উত্তর দিল না। মুহূর্ত কয়েক বিরতি দিয়ে জেনের আব্বা আবার শুরু করল, 'জোয়ান, একটা কথা আমি বুঝি না, মরিসকোরা পরিচয় গোপন রেখে অন্যদের প্রতারণা করে কেন? এতে গন্ডগোল আরও বাড়ে। ধরো তোমার কথা, তুমি মরিসকো পরিচয় দিয়ে লেখাপড়া যদি করতে, তাহলে কি হতো? সুযোগ-সুবিধা, সহযোগিতা কম পেতে। এটা ঠিক। কিন্তু এটা তো

বাস্তবতা! এ বাস্তবতা অস্বীকার না করলে তোমাকে তো এমন বিপর্যয়ে পড়তে হতো না।' থামলো জেনের আব্বা।

জেন চোখ বুজে আছে। তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে। জোয়ান মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখও লাল। কিন্তু কোন কথা বলল না সে।

হান্না জেনের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সংকুচিত সে। ভয় করছে কিছু বলতে। ভাবছে কিছু বললে হয়তো আঙ্কেলের কথা খারাপের দিকে মোড় দিতে পারে।

জেনের আব্বা গা থেকে কোট খুলে কেবিনের হ্যাংগারে রাখতে রাখতে বলল, 'জোয়ান, তুমি জেনকে দেখতে এসেছ খুব খুশি হয়েছি। হাজার হলেও ছোটবেলা থেকে এক সাথে পড়েছ। তবে জান কি, জেন 'দি গ্রেট কার্ডিনাল' পরিবারের মেয়ে। এভাবে তোমার আসাটা অনেকেই পছন্দ করবে না।'

জেনের মুখটা পাংশু হয়ে গেল যেন মুখের আলোটা দপ করে নিভে গেল! জিহবা, গলা তার শুকিয়ে এলো। কোন কথা বলতে পারল না। চোখ খুলে জোয়ানের দিকে তাকাতেও তার ভয় হতে লাগল। হান্না উৎকন্ঠিত চোখে তাকিয়ে ছিল জোয়ানের দিকে।

কিন্তু জোয়ান পাথরের মতো স্থির। মুখ নিচু তখন তার। দাঁত দিয়ে ঠোঁট সে কামড়ে ধরেছে।

জেনের আব্বা থামলে জোয়ান মুহূর্তের জন্যে চোখ বন্ধ করে, একটা ঢোক গিলে নিজেকে সামলে বলল, 'আমি আসি, চাচাজান।'

বলে জোয়ান পা বাড়াল দরজার দিকে। পেছন থেকে জেনের আব্বা বলে উঠল, শোন জোয়ান, 'একটু সাবধানে থেকো। তুমি 'এ্যারোমেটিক ইঞ্জিনিয়ার্স'-এর চীফ ইঞ্জিনিয়ার মি. মিশেলের নাম শুনে থাকবে। সে মরিসকো বলে জানাজানি হবার পর কে বা কারা তাকে হত্যা করেছে।'

জোয়ান ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। মুখ তুলে জেনের আব্বার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ধন্যবাদ চাচাজান!'

বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে শান্ত পায়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল জোয়ান।'

# ৫

মাদ্রিদে ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের হেডকোয়ার্টার। অপারেশন ডিরেক্টরের কক্ষ। অপারেশন ডিরেক্টর সিনাত্রা মেন্ডো তার রিভলভিং চেয়ারে বসে। তার সামনে বিশাল টেবিল।

সিনাত্রা মেন্ডো একটা ফাইল ওপর চোখ বুলাচ্ছে। ফাইলটি এসেছে ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান প্রধান বুটাগুয়েনা ভাসকুয়েজের কাছ থেকে। বাস্ক গেরিলা কন্যা মারিয়া পণবন্দী হিসেবে আটক হওয়ার পর হাত থেকে ফসকে যাওয়া, মাত্র একজন লোক ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের ৫ জন লোককে হত্যা করে ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের ঘেরাও বিধ্বস্ত করে দিয়ে মারিয়াকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার মর্মান্তিক ঘটনার ওপর মন্তব্য করেছে বুটাগুয়েনা ভাসকুয়েজ। এমন বিপর্যয় স্পেনের ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের জীবনে আর আসেনি। এমন লজ্জাকরভাবে পরাজিত, অপমানিত তাকে আর হতে হয়নি কখনও। এই ব্যর্থতার জন্যে ভাসকুয়েজ অপারেশন ডিরেক্টর সিনাত্রা মেন্ডোকেই দায়ী করেছে। ভাসকুয়েজ হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছে, ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান কোন ব্যর্থতাকেই ক্ষমা করে না, তবে মেন্ডোকে সুযোগ দেয়া হয়েছে।

রিপোর্ট পড়ে ঘামছিল সিনাত্রা মোন্ডো। এই সুযোগ যে তার শেষ সুযোগ তা মেন্ডো মর্মে মর্মে অনুভব করেছিল। এরপর যে কোন ব্যর্থতা তার জন্যে নিয়ে আসবে কাল মৃত্যু। ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের অভিধানে ব্যর্থতার অন্য নাম মৃত্যু একথা সবাই জানে।

সিনাত্রা মেন্ডো সমস্ত ক্রোধ গিয়ে পড়ছিল সেই লোকটির ওপর, যে মারিয়াকে তাদের হাত থেকে উদ্ধার করে নিয়ে গেল এবং যে তাদের এত বড় বিপর্যয়ের মূল হোতা। এই সময় পকেটের অয়্যারলেস সেট 'ক্লিক দেয়া শুরু করল।

তাড়াতাড়ি অয়্যারলেসটি বের করে নিয়ে এন্টেনাটা টেনে দিয়ে কানের কাছে ধরল। শুনেতে শুনতে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। শুনে নিয়ে সে বলল,

‘ওকে, তোমরা ফল করো। আমরা আসছি, পরে যোগাযোগ করব।’ বলে এন্টেনা ক্লোজ করে অয়্যারলেসটি রেখে দিল পকেটে। তারপর টেবিরে একটা মুষ্ঠাঘাত করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

ছুটল সে বুটাগুয়েনা ভাসকুয়েজের কক্ষে প্রবশে করে আসামীর মতো গুড়ি মেরে দাঁড়াল ভাসকুয়েজের টেবিলে সামনে।

ফাইল থেকে ধীরে ধীরে মুখ তুলে ভাসকুয়েজ বলল, ‘কোন খবর ?

‘জি, স্যার, সেই লোকটির দেখা পাওয়া গেছে।

‘কোন লোকটির?’

‘বাস্ক গেরিলা কন্যা মারিয়াকে যে উদ্ধর করে নিয়ে গেছে।’

‘কোথায়?’

‘তাকে দেখা গেছে বাট্রাগো ডে লুজিয়ার মাদ্রিদ হাইওয়েতে। সে মাদ্রিদের দিকে আসছে।’

‘তারপর?’

‘আমি তাকে ফলো করার নির্দেশ দিয়ে আপনার কাছে এসেছি।’

‘সে একা?’

‘তার সাথে মাত্র একজন ড্রাইভার।’

‘তোমার কি পরিকল্পনা?’

‘খবরটা পেয়েই আমি আপনার কাছে এসেছি।’

ভাজকুয়েজ দেয়ালে সেট করা বিশাল মানচিত্রের দিকে চোখ নিবদ্ধ করে বলল, ‘সে যেই হোক, তাকে যে আন্ডারএস্টিমেট করা যায় না তা বোধ হয় বুঝেছ তুমি।’

কথা শেষ করে একটু থেমেই আবার সে বলল, ‘মাদ্রিদের ৩০ মাইল উত্তরে ঐ যে আল কামেন্দা শহর, তার উপকন্ঠে একটা উন্মুক্ত উপত্যকায় দেখ পূর্ব-পশ্চিম একটা রোড মাদ্রিদ হাইওয়েকে ক্রস করেছে। এখানেই ওকে চারদিক থেকে আটকাও।’ বলে মাথা নিচু করল ভাসকুয়েজ।

সেন্ডো বুঝল, কথা শেষ, মাথা নিচু করার অর্থ তার চলে যাবার নির্দেশ।

সেন্ডো বেরিয়ে এলো ভাসকুয়েজের রুম থেকে।

অফিসে এসে সেন্ডো আল কামেন্দার ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান অফিসসহ টেলিফোনে কয়েকটি প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে বেরিয়ে এলো সেন্ডো। সুসজ্জিত দু'টি গাড়ি একটি মাইক্রোবাস, আরেকটি জীপ রেডি হয়ে গাড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। লোকজন যা নেয়ার তারাও গাড়িতে উঠে বসেছে। সেন্ডো জীপের সামনের সিটে গিয়ে উঠল।

গাড়ি দু'টি স্টার্ট নিল।

গাড়ি ছুটতে শুরু করল আল কামেন্দার শহরের উদ্দেশে।

মি. সেন্ডো বাত্রাগো ডে লুজিয়া থেকে ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের যে গাড়িটি ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের নতুন টার্গেট আহমদ মুসাকে অনুসরণ করছিল তার সাথে অয়্যারলেসে যোগাযোগ করে তাদের অবস্থান ও গাড়ির স্পিড জেনে নিল। সেন্ডো হিসেব করল, যে গতিতে তারা আসছে তাতে আল কামেন্দার সেই উপকন্ঠে পৌঁছতে ওদের সাড়ে ৬টা বেজে যাবে। আবার ওয়্যারলেস তুলে নিয়ে মি. সেন্ডো আল কামেন্দার অফিসের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিল।

একদিকে ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের যখন এই আয়োজন, তখন আহমদ মুসা নিশ্চিন্ত মনে চারদিকের প্রাকৃতিক পরিবেশ উপভোগ করতে করতে ছুটে আসছিল মাদ্রিদের লক্ষ্যে।

গাড়িটা ছিল নতুন। গাড়িটা চলতে শুরু করলেই আহমদ মুসা বুঝেছিল ড্রাইভারও যথেস্ট দক্ষ। গাড়ির সিটে গা এলিয়ে আহমদ মুসা সমগ্র হৃদয় দিয়ে সফরটাকে উপভোগ করছিল।

আহমদ মুসার এ উপভোগে বাধ সাধল একমাত্র সাথীটি- ড্রাইভার। বলল, 'স্যারের বাড়ি কোথায়?'

'কেন স্পেন যদি হয় আপত্তি করবে?'

'কেন করব, কিন্তু শুনেছি স্যার বাইরে থেকে এসেছেন।'

'ঠিক। আসলে কি জানো, গোটা দুনিয়াকেই আমার ঘর মনে করি।'

'আমার স্যার বলেছিলেন, আপনি খুব বড় বিপ্লবী, আজকের দুনিয়ায় আপনার তুলনা নেই। কিন্তু শুনলাম আপনি মুসলমান।'

‘কেন মুসলমানরা কি বড় হতে পারে না, দুনিয়ার সেরা বিপ্লবী হতে পারে না?’

‘স্পেনে তো মুসলমানদের খুব খারাপ অবস্থা হয়েছিল, তাই বলছিলাম।’

‘তোমার কথা ঠিক। ৮’শ’ বছর পর্যন্ত স্পেনকে শিক্ষা, সভ্যতা ও সমৃদ্ধিতে সাজিয়েও মুসলমানরা স্পেন থেকে উৎখাত হয়ে যায়। যারা অবশিষ্ট ছিল তাদেরকে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হয়েছে। এই অবস্থায় মুসলমানদের সম্পর্কে বড় কিছু চিন্তা করা স্বাভাবিক নয়।’ বলল আহমদ মুসা।

‘খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেও ওদের কোন লাভ হয়নি স্যার। চাকরি-বাকরির দরজা ওদের জন্যে বন্ধ, কায়িক শ্রমই ওদের সম্বল। জমি রাখতে ও জমি কিনতে পারে না বলে ওদের নিজের কোন বাড়ি নেই। আমাদের গ্রামে দক্ষিণ স্পেন থেকে একটা পরিবার এসে জমি কিনে বাড়ি করেছিল। পরে প্রকাশ হয়ে পড়ল ওরা খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণকারী ছদ্মবেশী মুসলমান-মরিসকো। আশেপাশের বাইবেল সোসাইটির লোকেরা এসে প্রতারণার অভিযোগে বাড়ির মালিক লোকটাকে মারতে মারতে মেরে ফেলে এবং বাড়ি ও সহায়-সম্পদ সব কেড়ে নিয়ে বাড়ির নারী ও শিশুদের রাস্তায় নামিয়ে দেয়। পরে শুনেছি মাদ্রিদ যাবার পথে ডে মাজুরা গিরিপথে ঠান্ডায় বরফে জমে পরিবারটির সবাই মারা যায়।’

‘মরিসকোদের কেউ সাহায্য করে না?’

‘অনেকেই করতে চায়। কিন্তু সাহস পায় না, সমাজে একঘরে হবার ভয় আছে। তা’ছাড়া ঐ বাইবেল সোসাইটির মতো দেশে অনেক সংগঠন আছে, যারা মুসলমানদের ঘোরতর শত্রু।’

‘সরকারের ভূমিকা কি?’

‘সরকারী আইন তো মুসলমানদের বিরুদ্ধে। তবে সরকার প্রকাশ্যে মরিসকোদের ওপর জুলুম-অত্যাচার করতে আসে না। চার্চ, ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান প্রভৃতি শক্তিশালী সংস্থাগুলো মুসলমানদের বিরুদ্ধে সব রকম ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত।’

‘তুমি অনেক বিষয় জানো দেখছি।’

‘স্যার, এসব তো চোখে দেখি, না জেনে উপায় কি?’

একটু থেমেই ড্রাইভার আবার বলল, 'স্যার, মুসলমানদের জন্যে কিছু কি করবেন?'

'একথা জিজ্ঞেস করছ কেন?'

'মুসলমানদের একজন নেতা আপনি, আপনারা না ভাবলে মুসলমানদের কথা ভাববে কে?'

'কি করা যায় বলত?'

'এখানকার মরিসকো ও মুসলমানদের আত্মবিশ্বাস বলতে কিছু নেই। তারা সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ নয়। তাদেরকে সচেতন করতে হবে, ঐক্যবদ্ধ করতে হবে এবং তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে হবে।'

'তুমি তো মুসলমাদের প্রতি খুব সহানুভূতিশীল, ভালোবাস তো মুসলমানদের?'

'স্যার, আমরা বাস্করা তো মুসলমানদের মিত্র! আমরা যতটুকু পারি ওদের জন্যে করি। আমাদের এলাকায় ওদের সমস্যা নেই স্যার।'

'আমি জানি, তোমরা খুব ভালো।'

এই সময় ড্রাইভার উদ্বিগ্ন কন্ঠে বলল, 'স্যার, বহুক্ষণ ধরে একটা গাড়ি একই গতিতে আমাদের পেছনে আসছে। আমি গাড়ির স্পিড কমিয়ে দেখেছি ও গাড়িরও স্পিড কমিয়েছে।'

সন্ধা তখন পার হয়ে গেছে। আহমদ মুসা মুখ ফিরিয়ে পেছনে তাকাল। দেখল, পেছনে একটা হেড লাইট ছুটে আসছে।

পেছন থেকে চোখ ফিরিয়ে সোজা হয়ে বসল আহমদ মুসা। বলল, 'আমরা এখন কোথায় ড্রাইভার?'

'আল কামেন্দা শহরের প্রায় উপকন্ঠে পৌঁছে গেছি আমরা।'

আহমদ মুসা মুহূর্ত কয়েক ভাবল। তারপর বলল, 'গাড়িটা নিশ্চয় আমাদেরকে বাট্টাগো ডে লুজিয়া থেকে ফলো করছে। মাঝখানে আমরা কোথাও থামিনি, সুতরাং মাঝপথে আমরা কারো নজরে পড়ার কোন আশংকা নেই।'

'আমারও তাই মনে হয়।' বলল ড্রাইভার।

'যদি তাই হয় তাহলে বড় বিপদটা আসবে আমাদের সামনে থেকে।'

'কিভাবে?'

'গাড়িটা ঐভাবে নিশ্চিন্তে আমাদের ফলো করার কারণ হলো, তার দায়িত্ব শুধু ফলো করা, পেছন থেকে আমাদের পাহারা দেয়া যে, ঠিক যাচ্ছি আমরা।'

'তাহলে আমাদের খবরটা মাদ্রিদ কিংবা অন্য কোথাও অনেক আগে পৌঁছে গেছে!'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'কিভাবে?'

'অয়ারলেস অথবা টেলিফোনে।'

একটু থেমেই আহমদ মুসা আবার বলল, 'সামনে এই হাইওয়ে ছেড়ে ডাইনে বা বাঁয়ে যাবার কোন পথ কি কাছাকাছি আছে?'

'আছে। আল কামেন্দা শহরে ঢোকার মুখে পুব - পশ্চিম একটা সড়ক এই মাদ্রিদ হাইওয়েকে ক্রস করেছে।'

'পুব ও পশ্চিম এর মধ্যে কোন দিক দিয়ে মাদ্রিদ পৌঁছা সহজতর হবে?'

'বাঁ দিক দিয়ে।'

'তাহলে ঐ ক্রসিং পর্যন্ত পৌঁছে আমরা বাঁ দিকে মোড় নেব।'

ক্রসিং কাছে এসে গেছে। আহমদ মুসা দেখল, পুব-পশ্চিম সড়কটি ফ্লইওভার দিয়ে মাদ্রিদ হাইওয়েকে ক্রস করেছে। সোজা হাইওয়েটি চলে গেছে ফ্লাইওভারের নিচ দিয়ে। আর হাইওয়ের থেকে একটা রাস্তা ধনুকের মত বেঁকে গিয়ে পুবের রাস্তার সাথে মিশেছে। অনুরূপ অন্য একটি শাখা পশ্চিমের রাস্তার সাথে মিশেছে। একইভাবে ফ্লাইওভারের অপর পার্শ্ব থেকেও হাইওয়ে থেকে দু'টি শাখা ঐভাবে পুব ও পশ্চিমের রাস্তার সাথে গিয়ে মিশেছে।

আহমদ মুসার গাড়ির ড্রাইভার ক্রসিং এর মুখে এসে বাম দিকে টার্ন নিয়ে বামের রাস্তাটি ধরে পুবের রাস্তাটির ওপর ওঠার জন্যে এগিয়ে চলল। ফ্লাইওভারের পুব দিকের শেষ প্রান্ত যেখানে, সেখানে গিয়ে মিশেছে হাইওয়ে থেকে আসা রাস্তা।

আহমদ মুসার গাড়ি তখন পুবের রাস্তাটিতে উঠে ৫০ গজের মতো এগিয়ে গেছে, এমন সময় সামনে একসংগে চারটে হেডলাইট জ্বলে উঠল মাত্র কয়েক গজ সামনে, একেবারে নাকের ডগা বরাবর। চারটি হেডলাইট পাশাপাশি। দু'টো গাড়ি, একটা ট্রাক, একটা মাইক্রোবাস।

এ্যাকসিডেন্ট এড়াবার জন্যে আহমদ মুসার গাড়ি বিশ্রী এক শব্দ তুলে দাঁড়িয়ে গেল।

সামনের গাড়ি দু'টোর দিকে একবার তাকিয়ে আহমদ মুসা পেছন ফিরে চারদিকে একবার নজর বুলাল। ঠিক যা সে সন্দেহ করেছে তাই, দু'পাশ থেকে দু'টো করে চারটে এবং পেছন থেকে চারটে হেডলাইট প্রায় এসে পড়েছে তাদের ওপর।

নতুন কিছু ভাবার আগেই দু'পাশ থেকে চারটে এবং পেছন থেকে দুটো গাড়ির ব্যারিকেডের মধ্যে পড়ে গেল আহমদ মুসার গাড়ি।

সামনের গাড়ি দু'টোও এগিয়ে আসছে।

ড্রাইভার পকেট থেকে পিস্তল বের করে বলল, 'স্যার, পিস্তলটা কি আপনার কাজে আসবে।?'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'অনেক দেরি হয়ে গেছে। যে ফাঁদ এড়াতে চেয়েছিলাম, সে ফাঁদে পড়ে গেছি। শোন, তুমি পিস্তলটা লুকিয়ে ফেল। ভাড়াটে ড্রাইভর বলে নিজের পরিচয় দেবে। তোমার অসুবিধা হবে না, ট্যাক্সিটা লা-গ্রীনজা ট্রান্সপোর্ট করপোরেশনের নামে রেজিস্ট্রি।'

কিন্তু স্যার, আপনার কি হবে....।' কথা শেষ করতে পারল না ড্রাইভার। উদ্বেগে তার স্বর বন্ধ হয়ে গেল।

'শত্রুর মোকাবিলায় সাধ্যমত সব কিছুই করতে হয়। কিন্তু যখন করার কিছু থাকে না, তখন যা ঘটে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করার মধ্যে কোন লাভ নেই।' হেসে বলল আহমদ মুসা।

এই সময় আহমদ মুসার গাড়ির দরড়া দু'দিক থেকেই খুলে গেল। দু'পাশেই জনা চারেক করে লোক। দু'পাশ থেকেই উদ্যত স্টেনগান। দক্ষিণ পাশের গেটে পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছে সিনাত্রা সেন্ডো। সে পিস্তল নাচিয়ে

হুংকার দিয়ে আহমদ মুসাকে বলল, ‘নেমে এসো বাছাধন, কত ধানে কত চাল এবারে দেখিয়ে ছাড়ব!’

বেরিয়ে আসার সংগে সংগে সেন্ডা তার সুঁচালো বুটের একটা লাথি হাঁকালো আহমদ মুসার তলপেটে এবং সেই সাথেই বাম হতের একটা কারাত চালাল কানে নিচে ঘাড়ের নরম জায়গায়।

আহমদ মুসা এই ধরনের আক্রমণ আশা করেনি। তাই প্রস্তুত হতে পারেনি।

আহমদ মুসা ঘুরে পড়ে গেল।

দু’জন তাকে টেনে তুলল গাড়িতে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে সব সাঙ্গ হয়ে গেল।

ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের ৭টি গাড়ির মিছিলের মতো সার বেঁধে মাদ্রিদের পথে যাত্রা করল।

গাড়ির মিছিলটি যখন ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের হেডকোয়ার্টারে পৌঁছল, তখন সেখানে মহোৎসব। যেন সেন্ডো বিশ্বজয় করে এসেছে! আহমদ মুসা প্রদর্শনীর বস্ত্ত হয়ে দাঁড়াল। ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের হেডকোয়ার্টারে আহমদ মুসার বিরাট ইমেজ সৃষ্টি হয়েছে। সে ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানকে শুধু পরাস্ত করা নয়, ৫জন গুরুত্বপূর্ণ লোককে হত্যাও করেছে। সুতরাং আহমদ মুসাকে এক নজর সবাই দেখতে চায়। তাকে দেখে কিন্তু কেউ তেমন খুশি হয় না। সবারই আশা বিরাট ধরনের ষন্ডামার্কা লোককে তারা দেখবে, কিন্তু তার বদলে তারা দেখে শান্ত সরল চেহারার এক ভদ্রলোককে। তারা বুঝতে পারে না, এমন ধরনের লোক কি করে ক্রিমিনাল হয়!

গাড়িতেই আহমদ মুসার জ্ঞান ফিরে এসেছিল। তাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে ধাক্কিয়ে হেডকোয়ার্টারের ভেতরে এনে তিনতলায় বিশেষভাবে তৈরি বন্দীখানায় রাখল।

বন্দীখানাটা একটা সেলের মতো। ঘুলঘুলির মতো ছোট একটা জানালা উত্তর দেওয়ালে। দক্ষিণ দিকে পুরু স্টিলের দরজা। সেলের মধ্যে আছে একটা খাটিয়া আর কিছু নায়।

আহমদ মুসা কম্বল বিছানো খাটিয়াতে গিয়ে বসেছিল। সেন্ডো ঘরে ঢুকে বলল, 'আরাম করে নাও, এরপর আরামের সময় কম পাবে। আসছি আমরা।'

বলে বাইরে পা বাড়াচ্ছিল, এমন সময় একজন এসে বলল, 'বস আসছেন।'

অর্থাৎ বাটা গুয়েনা ভাসকুয়েজ আসছেন। সেন্ডো সংগে সংগেই এ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা সেন্ডোর এ পর্যন্তকার বীরত্ব ও এখনকার বসভীতি দেখে মনে মনে হাসল। বলল, 'মি.সেন্ডো, আপনি কি সেনাবাহিনীতে ছিলেন কখনও?'

'কেন?' সেন্ডো কটমট করে তাকিয়ে প্রশ্ন করল।

'বসকে দেখে এধরনের এ্যাটেনশন হওয়ার অভ্যাস সেনাবাহিনীর লোকদের।'

'ও, তখন দু'টো ঘা খেয়েও দেখি শিক্ষা হয়নি।'

'নিরস্ত্র শত্রু যখন নিজের ইচ্ছাতে ধরা দেয়, তখন তার ওপর দুটো ঘা লাগানোর মধ্যে কো বীরত্ব নেই মি. সেন্ডো।'

সেন্ডো মুখ লাল করে কী যেন বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় করিডোরে জুতার শব্দ পাওয়া গেল।

মি. সেন্ডো আহমদ মুসার দিকে একবার বিষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আবার এ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল। বাটা গুয়েনা ভাসকুয়েজ এলো।

সেলের দরজায় দাঁড়ানো মি. সেন্ডোকে লক্ষ্য করে বলল, 'তুমি দেখছি নিজে এবার সেলের দরজায় পাহারায়, সাবধান হওয়া ভালো।'

মি. সেন্ডো মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, 'লোকটি সাংঘাতিক ঘাড়েল স্যার! সাতটি গাড়ি দিয়ে ঘেরাও করে অনেক কষ্টে তবে........'

'গ্রেপ্তার করেছ তাই না? কিন্তু শুনলাম একটি গুলীও নাকি খরচ হয়নি?'

'স্যার, নিখুঁত পরিকল্পনা.......।'

মি. ভাসকুয়েজ সেন্ডোর পিঠ চাপড়ে সেলে প্রবেশ করল।

আহমদ মুসা শুনছিল ভাসকুয়েজ ও মি. সেন্ডোর কথোপকথন। কৌতুক বোধ করছিল তাদের কথার ঢংয়ে।

মি. ভাসকুয়েজ সেলে ঢুকে নিশ্চিন্ত মনের শান্ত চেহারার একজন মানুষকে দেখল। ভাসকুয়েজ বিস্মিতই হলো। বন্দী তো এমন হয় না!

বন্দীর দিকে ভালো করে তাকাতে গিয়ে চমকে উঠল ভাসকুয়েজ। মুখটি তার যেন চেনা! হঠাৎ একটি নাম তার মনে ঝলসে উঠল। একি সেই আহমদ মুসা! মনটা কেঁপে উঠল ভাসকুয়েজের।

উত্তেজিতভাবে ভাসকুয়েজ ঘুরে দাঁড়াল। সেন্ডোকে লক্ষ্য করে বলল, ‘বন্দীকে আমার কক্ষে নিয়ে এসো।’

বলে ভাসকুয়েজ হন হন করে ছুটল তার কক্ষের দিকে।

আহমদ মুসা ভাসকুয়েজের আচরণে খুব বিস্মিত হলো না। ভাবল, ভাসকুয়েজ সম্ভবত তাকে চিনতে পেরেছে অথবা সন্দেহ করেছে।

কিন্তু বসের আচরণ দেখে মি. সেন্ডো শুধু বিস্মিত নয়, উৎকন্ঠিত হয়ে উঠল। বস কি দেখলেন, কি ভাবলেন, কি হলো ইত্যাদি চিন্তা তার মনে উঁকি দিতে লাগল।

বস্ চলে গেলে মি. সেন্ডো আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, ‘তাড়াতাড়ি ওঠ, এসো। বস কোন প্রকার এদিক-সেদিক পছন্দ করেন না।’

‘বসকে তুমি বুঝি খুব ভয় কর?’

‘বক বক করো না। চল, বসকে দেখতে পাবে। ডেকেছেন যখন, একটা কিছু দেখাবেন নিশ্চয়।’

মি. সেন্ডো আহমদ মুসাকে নিয়ে ভাসকুয়েজের কক্ষে হাজির হলো।

ভাসকুয়েজেরে বন্ধ কক্ষের দরজায় দু’জন স্টেনগানধারী প্রহরী।

ঘরটি বিরাট। লাল কার্পেটে আগাগোড়া মোড়া। দেয়ালও কার্পেটিং করা। ঘরের মাঝেখানে বিশাল টেবিল।

বিশাল এক রিভলভিং চেয়ারে বসেন মি. ভাসকুয়েজ। তার বাম পাশের একটা টেবিলে কম্পিউটার। মি. ভাসকুয়েজ কম্পিউপটারের সামনে বসে। মি. সেন্ডো আহমদ মুসাকে নিয়ে সেই বিশাল টেবিলটির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

মি. ভাসকুয়েজের সামনের কম্পিউটার স্ক্রিনে একের পর এক ফটো ভেসে উঠছিল, তারপর মিলিয়ে যাচ্ছিল। আহমদ মুসা পরিষ্কার বুঝতে পাল, ভাসকুয়েজ কি খুঁজছে।

একটি ফটো অবশেষে মি. ভাসকুয়েজের কম্পিউটার স্ক্রিনে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

মি. ভাসকুয়েজ উঠে দাঁড়াল। ফিরল। তার মুখে বিস্ময়, সেই সাথে আনন্দও। সে মি. সেন্ডোর দিকে চেয়ে বলল, 'কম্পিউটার স্ক্রিনের ফটোগ্রাফ ও ইনি কি এক ব্যক্তি মনে হচ্ছে?'

'জি, স্যার।' আরেকটু ভালোভাবে দেখে নিয়ে বলল সেন্ডো।

'কে, চেন?'

'না, স্যার।' আহমদ মুসার দিকে একবার তাকিয়ে বলল সেন্ডো।

'যখন ধরলে নাম জিজ্ঞেস করনি?'

'না, স্যার।'

'সব অপদার্থ!'

বলে একটু থেমে ঢোক গিলে বলল, 'জানো দুনিয়ায় সমচেয়ে মূল্যবান ব্যক্তি এখন ইনি এবং সবচেয়ে দামি পণবন্দী ইনি হতে পারেন?'

মি. সেন্ডো একটু বিমূঢ় হলো। যেন বুঝতে পারল না ভাসকুয়েজের কথা! নিরব রইল সেন্ডো।

এবার ভাসকুয়েজ আহমদ মুসার মুখোমুখি হয়ে বলল, 'চেনেন ঐ ফটোগ্রাফকে?'

'ফটো খোঁজার দরকার ছিল না। নাম জিজ্ঞেস করলেই বলতাম।' বলল আহমদ মুসা।

'হয়তো ছিল না, কিন্তু ঘটনাটা এত বড় যে, আমি আগে নিশ্চিত হতে চেয়েছিলাম।'

বলে ভাসকুয়েজ বিমূঢ় সেন্ডোকে জিজ্ঞেস করল, 'আহমদ মুসার নাম শুনেছ?'

'জি, স্যার।'

'আহমদ মুসার ফটোগ্রাফ দেখনি?'

'দেখেছি, একবার।'

'একে চিনতে পার?' আহমদ মুসার দিকে ইংগিত করে বলল ভাসকুয়েজ।

'ইনিই আহমদ মুসা!' বলে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে দু'পা পিছিয়ে গেল সেন্ডো। তার চোখে-মুখে অপার বিস্ময়। যার কাহিনী রূপকথার মতো এসেছে তাদের কাছে, যার ভয়ংকর একটা ইমেজ তাদের কাছে সর্বদা জীবন্ত, এই সেই আহমদ মুসা! এমন একজন সরল, শান্ত, ভদ্র চেহারার যুবক দেশে দেশে এত কাহিনীর সৃষ্টি করেছে! আহমদ মুসার ওপর থেকে চোখ যেন সরতে চাইছেল না মি. সেন্ডোর!

'কি সেন্ডো, ভয় পেলে, না প্রেমে পড়লে? বিরোধীকে বোকা বানাবার কিংবা বশ করবার মতো ভয়ংকর যাদু জানে কিন্তু এ।'

'না, স্যার।' এ্যাটেনশন হয়ে বলল মি. সেন্ডো।

ভাসকুয়েজ আহমদ মুসার আপাদমস্তক এবার চোখ বুলিয়ে বলল, 'আপনি ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের হাতের মুঠোয়, কেমন লাগছে আপনার?'

'বিনা শ্রমে আপনাদের এত বড় সৌভাগ্য লাভ দেখে খারাপ লাগছে।'

'ঠিক বলেছেন, আকাশের চাঁদ যেন নিজে এসে আমাদের হাতে ধরা দিয়েছে, অথচ তাকে ধরার জন্যে ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান অতীতে কী করেনি?'

একটু থামল ভাসকুয়েজ। তারপর আবার শুরু করল, 'মি. আহমদ মুসা, যে ভাগ্য আপনাকে সব সময় বাঁচিয়েছে সেই ভাগ্য এখন আপনার বিরুদ্ধে। সব কিছুরই একটা শেষ আছে। আপনার খেলাও এবার সাঙ্গ হবে। ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের বিশ্ব-হেডকোয়ার্টার প্রতিশোধের জন্যে পাগল হয়ে আছে। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের 'ওয়ার্ল্ড রেড ফোর্সেস' আপনাকে চিবিয়ে খাবার জন্যে তৈরি হয়ে আছে। আমরা যদি আপনাকে তাদের হাতেও তুলে দিতে চাই, তাহলেও শত শত বিলিয়ন ডলার ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান পাবে।'

'আপনাদের এই বড় ব্যবসায়ের সংবাদে আমি আনন্দই বোধ করছি।' বলল আহমদ মুসা।

‘এসব কথা বলে মনকে সান্তনা দিন ক্ষতি নেই, কিন্তু জেনে রাখুন, সব খেলা আপনার সাঙ্গ হয়ে গেছে। যে স্পেন মুসলমানদের সমাধি রচনা করছে, সেই স্পেনেই আপনার সব জারিজুরি শেষ হয়ে গেল।’

আহমদ মুসার মনে একটা কথা ঝিলিক দিয়ে উঠল। বলল, ‘স্পেনে মুসলমানদের কোথায় সমাধি হলো, তারা তো আবার মাথা তুলছে। এই মাদ্রিদেই তো তাদের মসজিদের মিনার আবার মাথা তুলেছে।’

হেসে উঠল ভাসকুয়েজ হো হো করে। বলল, ‘আপনার দেখার সময় হবে না, তা না হলে দেখতেন ঐ মিনার গুঁড়ো হয়ে মাটির সাথে মিশে গেছে।’

‘পারবেন না, মি. ভাসকুয়েজ, যে কারণে আপনাদের সরকার মসজিদ তৈরির অনুপতি দিতে বাধ্য হয়েছেন, সেই কারনেই আপনারা পারবেন না মসজিদ গুঁড়ো করতে।’

হাসল ভাসকুয়েজ। এবার আরও জোরে। বলল, ‘আপনি বুদ্ধিমান হয়েও অবুঝের মতো কথা বলছেন। সরকার ভাঙবে কেন? আপনাতেই মসজিদ ভেঙে পড়বে। শুধু ঐ মসজিদ নয়, স্পেনের মাটিতে দাঁড়ানো সব মুসলিম স্মৃতি চিহ্নই ধ্বসে পড়বে আপনা আপনি। সে সাথে ক্রিপলড হয়ে যাবে মসজিদকে কেন্দ্র করে গড়িয়ে ওটা মুসলিম সমাজ।’

‘অবাস্তব আপনার আশাবাদ মি. ভাসকুয়েজ।’

‘অবাস্তব নয়, ধ্বংসের কাজ শুরু হয়ে গেছে লোকচক্ষুর অন্তরালে যা অণুবীক্ষণ যন্ত্র লাগিয়েও কোন চোখ দেখতে পাবে না। কিন্তু দেখবে একের পর এক সব ধ্বসে পড়ছে ইশ্বরের বিষদৃষ্টিতে। কিন্তু তা দেখার জন্যে আপনি বেঁচে থাকবেন না।’

কেঁপে উঠল আহমদ মুসার হৃদয়। গোপন তেজস্ক্রিয় দিয়ে মাদ্রিদের শাহ ফয়সাল মসজিদ কমপ্লেক্স ও স্পেনের জগৎবিখ্যাত মুসলিম স্মৃতিচিহ্নগুলো ধ্বংসের কাজ তা’হলে শুরু হয়ে গেছে!

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু কথা বলে উঠল ভাসকুয়েজ সেন্ডোকে লক্ষ্য করে। বলল, ‘শোন সেন্ডো, বুঝতে তো পেরেছ, ইনি দুনিয়ার সমচেয়ে মূল্যবান মানুষ, আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান বন্দী। একে এই

খোলামেলা হেডকোয়ার্টারের জনবহুল পরিবেশে রাখা যাবে না। কোথায় রাখতে হবে বুঝতে পেরেছ?'

'জি স্যার।'

'কোথায়?'

'কার্ডিনাল হাউজের আন্ডার গ্রাউন্ড সেলে।'

'কিভাবে নিয়ে যাবে, যথেষ্ট ফোর্স তোমার আছে?'

'পুলিশের হাত থেকে ফসকেছিল শুনেছ তো।'

'জি।'

'বেশ যাও।'

বলে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'যান এর সাথে। আপনার সাথে অহেতুক খারাপ ব্যবহার আমরা করতে চাই না। কিন্তু এবার পালাবার সামান্য মতলব আমাদের কাছে ধরা পড়লে সংগে সংগে আমরা কুকুরের মতো গুলী করে মারব। আর যেখানে আমরা রাখছি, পালাবার চেষ্টা করেও কোন লাভ হবে না।'

ভাসকুয়েজ কথা শেষ করে তার চেয়ারে ফিরে গেল। আহমদ মুসা বেরিয়ে এলো মি. সেন্ডোর সঙ্গে।

করিডোর ধরে আহমদ মুসা ও মি. সেন্ডো পাশাপাশি চলছিল। পেছনে দুই স্টেনগানধারী।

হাঁটতে হাঁটতে সেন্ডো বলল, 'ভালো জায়গা নির্ধারিত হয়েছে আপনার থাকার।'

'কেন?'

'আমার জানামতে ওখান থেকে কেউ জীবন্ত বের হয়নি। যারা পালাতে চেষ্টা করেছে, সবাই দানবের হাতে গুলী খেয়ে মরেছে।'

'দানব কি গুলী চালায় নাকি, এমনিতেই তো ঘাড় মটকাতে পারে।' দানবটা কি জানার লক্ষ্যেই প্রশ্নটি করল আহমদ মুসা।

'দানব মানে সে দানব নায়, যন্ত্র দানব! ওর ম্যাগনেটিক চোখকে কেউ ফাঁকি দিতে পারে না এবং ওর ম্যাগনেটিক গানও অব্যর্থ।'

লিফটের দরজায় এসে দাঁড়াল মি. সেন্ডো এবং পেছন ফিরে তাকাল দু'জন প্রহরীর দিকে। সঙ্গে সঙ্গে ওদের একজন আহমদ মুসার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল।

'কিছু মনে করবেন না, এটাই ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের নিয়ম। বন্দীকে রাস্তায় বের করলে তার হাতে হাতকড়া থাকবে।' মুখে বাঁকা হাসি টেনে বলল সেন্ডো।

'লিফটের যেখানে শেষ-গ্রাউন্ড ফ্লোর-ওটাই গাড়ি বারান্দা। তিনটি গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। মাঝখানের মাইক্রোবাসে আহমদ মুসাকে তুলল। তার সাথে স্টেনগানধারী দুই প্রহরী। সামনের সিটে উঠল সেন্ডো নিজে।

তিন গাড়ির মিছিল বেরিয়ে এলো ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের হেড কোয়ার্টার থেকে। চলতে শুরু করল গাড়ি।

'মি. সেন্ডো, আপনার কার্ডিনাল না কি ভবন, ওটা কোথায় মাটির ওপরে, না মাটির নিচে?'

সেন্ডো তার হাতের পিস্তলটা নাচাতে নাচাতে বলল, 'রাস্তায় নামার পর ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের বন্দীদের কথা বলা নিষেধ। দ্বিতীয় আর একটি কথাও বলবেন না।'

অহেতুক ক্ষ্যাপানো ঠিক মনে করল না আহমদ মুসা। অনেক কথা বের হয়েছে সেন্ডোর মুখ থেকে। আরও বের হতে পারে ধৈর্য ধরলে।

সবাই চুপচাপ। ছুটে চলেছে গাড়ি।

দক্ষিণ মাদ্রিদের বুক চিরে বয়ে গেছে ছোট নদী তাগুনা।

নদীর প্রায় তীরেই 'কার্ডিনাল হাউজ'। ৫শ' বছরের পুরোনো বাড়ি। মাঝে মধ্যে সংস্কার হলেও বাড়ির কাঠামোতে হুবহু একই রাখা হয়েছে। বাড়িটি স্পেনের খৃষ্ট ধর্মীয় মহলের কাছে একটা সম্মানিত তীর্থক্ষেত্র।

বাড়িটি কার্ডিনাল ফ্রান্সিসকো জিমেনিজ সিসনা রোজ তার দরবার গৃহ হিসেবে তৈরি করে ১৪৯৯ সালে। কার্ডিনাল ফ্রান্সিসকো ছিলেন মুসলিম

শাষনোত্তর খৃষ্টান স্পেনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রাণী ইসাবেলার ধর্মগুরু। ইনি মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয়েরও প্রতিষ্ঠাতা। সে সময় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ছিল ইউনিভার্সিটি অব আলফালা। কিন্তু কার্ডিনাল ফ্রান্সিসকো যে কারনে খৃষ্টান মহলে প্রাতঃস্মরনীয়, সেটা হলো তারই উদ্যোগ ও তত্ত্বাবধানে স্পেন থেকে মুসলিম উচ্ছেদ শুরু হয়। তার এই দরবার গৃহ, কার্ডিনাল হাউজ ছিল তার এই উচ্ছেদ অফিযানের একটা কেন্দ্রবিন্দু।

কার্ডিনাল পরিবারই এখনও বাড়িটির মালিক। সেই সূত্রে কার্ডিনাল পরিবারের বর্তমান উত্তর পুরুষ ফ্রান্সিসকো জিমেনিজ, জেনের আব্বা, এই কার্ডিনাল হাউজের মালিক। বাড়িটি ৩ তলা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলা নিয়ে গড়ে উঠেছে একটা লাইব্রেরি। এখানে দুর্লভ বইয়ের সংগ্রহ আছে, যার একটা অংশ মুসলিম লাইব্রেরি থেকে লুট করে আনা। এই লাইব্রেরি সর্বসাধারণের জন্যে উন্মুক্ত নয়। শিক্ষক, ছাত্র ও গবেষকরা অনুমতি নিয়ে লাইব্রেরি ব্যবহার করতে পারে। ৪টি তলার প্রথম তলাটির মাটির নিচে আরেকটা ফ্লোর আছে। আন্ডারগ্রাউন্ড ও প্রথম তলা স্পেনের কেন্দ্রীয় চার্চকে ব্যবহারের জন্যে দেয়া হয়েছে। কার্যত ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান এই ফ্লোরে। কারও সেখানে প্রবেশ অধিকার নেই। প্রধান গেটে চবিবশ ঘন্টা প্রহরী থাকে।

কার্ডিনাল হাউজের সামনেথেকে শুরু করে নদীর তীর পর্যন্ত একটা সুন্দর বোটানিক্যাল গার্ডেন ও পার্ক তৈরি করা হয়েছে। এই পার্ককে দক্ষিণ মাদ্রিদের নার্ভ বলেও অভিহিত করা যায়। দর্শক ও ভ্রমণকারীদের পদভারে সব সময় গমগম করে গার্ডেনটি।

বোটানিক্যাল গার্ডেনকে সামনে রেখে দাঁড়িয়ে আছে কার্ডিনাল হাউজ। বাড়িটির পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দেয়াল ঘেরা বাগান। এখানে জনসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

কার্ডিনাল হাউজের উত্তর পাশে সবুজ ঘাসে ঢাকা সুন্দর একটি চত্বর। সে চত্বর পেরোলেই বোটানিক্যাল গার্ডেন। মাঝখান দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে লাল ইটের একটা রাস্তা।

বোটানিক্যাল গার্ডেনের দিক থেকে কার্ডিনাল হাউজের দ্বিতলে ওঠার সিঁড়ি সবুজ চত্বরের মাঝখান থেকে সোজা উঠে গেছে দু'তলার বারান্দায়।

আর বেশ উঁচুতে দাঁড়ানো একতলায় ওঠার সিঁড়ি পুব দিকে থেকে। পুব দিকের বাগানের উত্তর দেয়ালে একটা দরজা। সে দরজা পেরুলে পাওয়া যাবে লাল ইটের একটা রাস্তা। রাস্তাটি সিঁড়িমুখে গিয়ে শেষ হয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠলে সিঁড়ির মাথায় একটা দরজা। দরজাটা স্টীলের। এ দরজা ছাড়া একতলায় ওঠার কোন দ্বিতীয় পথ নেই।

বাড়ির পুব পাশের বাগানের উত্তর দেয়ালের গেটে সর্বক্ষণ পাহারা থাকে। বাগানের ভেতরে দরজা সংলগ্ন একটা গেট রুম। গেট রুমের ঘুলঘুলি দিয়ে দেখা যায় বাইরে দরজায কে এসেছে।

কার্ডিনাল হাউজের আন্ডারগ্রাউন্ড ফ্লোরের প্রশস্ত একটি কক্ষ। সম্পূর্ণ এয়ারকন্ডিশন করা। মেঝেয় ব্রাউন রংয়ের কার্পেট। ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা স্টিলের খাট পাতা। মেঝের সাথে ফিক্সড করা। ঘরে একটি দরজা, কোন জানালা নেই। ঘরে একটা বাথরুম। বাথরুমের কোন জানালা নেই।

বাথরুমের দরজার দক্ষিণ পাশে ঘরের পশ্চিম দেয়ালের সাথে বেসিন। বেসিন একটা ট্যাপ। ওটা থেকে খাবার পানি পাওয়া যায়। বেসিন থেকে ঠিক ওপরে মাথা বরাবর উঁচুতে দেয়ালের সাথে লাগানো একটা তাক। তাকের সাথে ফিক্সড করা স্টিলের একটা বাক্স মতো কনটেইনার। ছাদ থেকে বেশ মোটা পাইপ ক্রমে সেই কনটেইনারের পেটে ঢুকে গেছে। এই পাইপ দিয়ে বাক্সের মধ্যে আসে খাবার। ঠিক সময়ে খাবার আসে। কনটেইনারের পাশের ছোট দরজাটা খুলে খাবার খেতে হয়। খাবার কিছু উচ্ছিষ্ট থাকলে কনটেইনারের নির্দিষ্ট পটে রাখলে সেটা তুলে নেয়া হয়।

প্রথম দিনেই এসব কিছু শিখিয়ে দিয়ে গেছে আহমদ মুসাকে।

অদ্ভুত এ বন্দীখানা! বিছানায় শুয়ে সাদা ছাদটার দিকে চোখ নিবদ্ধ করে ভাবছিল আহমদ মুসা। একটা শব্দও কোথাও থেকে কানে আসছে না। মৃতপুরীর মতোই অখন্ড নিরবতা। মৌনতা যে কত ভয়ংকর এ ক'দিনে আহমদ মুসা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছে। মানুষের কন্ঠ, পাখির কিচির-মিচির, গাড়ির ভেঁপু মনে

হচ্ছে কতদিন শোনেনি। এখানে প্রবেশের পর মাঝখানে একদিন ভাসকুয়েজ এসেছিল বৃটিশ ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান-এর প্রধান মি. টমাসকে সাথে নিয়ে। টমাস দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফেরার পথে মাদ্রিদে যাত্রা বিরতি করেছিল। ভাসকুয়েজের কাছ থেকে খবরটা শুনে সে ছুটে এসেছিল আহমদ মুসাকে দেখতে।

তার প্রথম প্রশ্নট ছিল, 'যুগোশস্লাভিয়ায় আপনার কাজ শেষ?'

আমি তো যুগোশস্লাভিয়ায় কোন কাজ নিয়ে যাইনি! গিয়েছিলাম একজন বিপদগ্রস্ত লোককে তার মায়ের কাছে পৌঁছে দিতে।' বলল আহমদ মুসা।

'কিন্তু সেখানে তো বড় কাজ করেছেন!'

'কি কাজ করেছেন?' বলল ভাসকুয়েজ।

'মিলেশ বাহিনীকে শেষ করেছেন। মিলেশ বাহিনীর নেতা কনস্টেনটাইন নিহত, দলের মাথা বলতে কেউ বেঁচে নেই।'

'কি বলছ টমাস? মিলেশ তো আমাদের বন্ধু-সংগঠন ছিল!' বলে ভাসকুয়েজ বিষদৃষ্টিতে তাকায় আহমদ মুসার দিকে। তারপর বলে আবার, 'মি. আহমদ মুসা, আপনার অপরাধ ক্রমশই বাড়ছে। বন্ধু সংগঠনের পক্ষে প্রতিশোধ নেয়ার দায়িত্ব আমাদের।'

'ভাসকুয়েজ ছোট প্রতিশোধের পণ্য বানিয়ে এ সম্পদকে শেষ করো না।' বলল মি. টমাস।

'না, তা করছি না। আমেরিকার বেঞ্জামিন এ সপ্তাহের শেষে আসছেন।'

'বেঞ্জামিন কিবলে?'

'বিনিময়ে যা চাই তাই দেবে বলেছে।'

'এ পণ্য হাতে পেলে শুধু মূল্যবান তথ্য উদ্ধার নয়, কিছু মুসলিম দেশের যে সুবিধা আদায় করতে পাবে তার মূল্য টাকার অংকে হিসেব করা যাবে না। আমেরিকান ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান-এর অনেক স্বার্থ আছে আরব ও ইসলামিক দেশে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, ফিলিস্তিনে আমেরিকান ইহুদি মাইগ্রেশনের অধিকার লাভ। আমেরিকান ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান আমেরিকান ইহুদিদের আমেরিকা থেকে তাড়াতে চাচ্ছে, কিন্তু জায়গা পাচ্ছে না।' বলল টমাস।

মি. টমাস কথা শেষ করে আহমদ মুসার দিকে তাকায় ও জিজ্ঞেস করে, ‘স্পেনে আপনি কি মিশনে আহমদ মুসা?’

‘কেন বেড়াতে আসতে বারণ আছে?’

‘আমি যতদূর জানি, আহমদ মুসা কোথাও বেড়াতে যায় না।’

‘ঠিক বলেছেন মি. টমাস। প্রশ্নটা তো আমাদের মাথায় আসেনি। বলল মি. ভাসকুয়েজ। তারপর মি. ভাসকুয়েজ আহমদ মুসার দিকে চেয়ে বলল, ‘ওঁর সাথে আমিও একমত, আহমদ মুসা শুধুই সফরে আসে না।’

‘আমি সময় কাটাবার মতো কোন সফরে আসিনি। এখানকার মুসলমানদের অবস্থা জানা এবং মুসলিম স্মৃতিচিহ্নগুলো দেখা আমার জন্যে ছোট ব্যাপার নয়।’ বলল আহমদ মুসা।

‘এখানে মুসলমান কোথায়, কি অবস্থা দেখবেন?’

‘সংখ্যা যাই হোক, আছে তো কিছু।’

‘তাদের সাথে যোগাযোগ আছে বুঝি?’

‘যোগাযোগ দূরের কথা, তাদের ঠিকানাও আমার জানা নেই।’

আহমদ মুসা কথাগুলো বলার পরেও ভাসকুয়েজের মুখ থেকে সন্দেহের চিহ্ন যায়নি। বলে ওঠে, ‘ষড়যন্ত্র হতে পারে, এমন আশঙ্কা আমরা আগেই করেছিলাম। সরকারকে আমরা বলেছিলাম, একজন মুসলমানকেও মুসলমান পরিচয় নিয়ে জায়গা দেয়া যাবে না। সরকার আমাদের কথা শোনেনি। সউদি আরবের পেট্রোডলারকেই বেশি মূল্য দিয়েছে। তাদের চাপে শুধু মুসলমানদেরকে একটা মাইনরিটি কম্যুনিটি হিসেবে সরকারী স্বীকৃতি দেয়াই নয়, তাদেরকে মাদ্রিদের বুকের ওপর বিশাল একটা মসজিদ কমপ্লেক্স গড়ারও অনুমতি দিয়েছে। আমাদের কথাই সত্য হয়েছে। ওরা এখন দেশের দুষ্টক্ষত হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে গেছে।’

‘দেখুন মি. ভাসকুয়েজ, দেশজোড়া সংখ্যাগরিষ্ঠের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জন্যে যে শক্তি, সামর্থ্যের দরকার হয়, স্পেনের অতি ক্ষুদ্র মুসলিম কম্যুনিটির তার কিছুই নেই। এমন একটি মাইনরিটি গ্রুপের বিরুদ্ধে অহেতুক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ

আনলে বুঝতে হবে সে মাইনরিটিরাই তা'হলে ষড়যন্ত্রের শিকার।' বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার কথা শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল ভাসকুয়েজ। বলল, 'দেখুন আহমদ মুসা, মুখ সামলে কথা বলবেন। আপনার বিচারের জন্যে আপনাকে সঠিক ব্যবহারের জন্যে আপনার সবচেয়ে বড় শত্রুর হাতে আপনাকে তুলে দিতে চাই বলেই আপনি এখনও বেঁচে আছেন। আপনাকে টুকরো টুকরো করে কুকুর দিয়ে খাওয়ালেও আপনার অপরাধ শেষ হবে না।'

সেদিন ভাসকুয়েজ ও টমাস আরও অনেক কথা বলে। শেষে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় ভাসকুয়েজ বলেছিল, 'বেশি নয়, আর মাত্র ক'টা দিন মি. আহমদ মুসা। শনিবারেই হয় আপনি উড়বেন আমেরিকার পথে, হয়তো ......।'

কথা শেষ না করেই ভাসকুয়েজ বেরিয়ে গেল। কথা শেষ না করলেও ভাসকুয়েজের না বলা কথাটা আহমদ মুসা বুঝেছে। আমেরিকান ক্লু-ক্ল্যক্স-ক্ল্যানের কাছ থেকে বিলিয়ন ডলার পেলে আহমদ মুসাকে তাদের হাতে তুলে দেবে, তা না হলে এরা আহমদ মুসাকে হত্যা করবে। এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছে।

আহমদ মুসা পাশ ফিরে শু'ল। তার চোখটা গিয়ে দরজার ওপর পড়ল। অন্যদিকে ধাবিত হলো আহমদ মুসার চিন্তা। বিস্ময়কর সিকুরিটি সিস্টেম এই বন্দীখানার! সম্ভবত রাতে অন্ধকারে ঘুমিয়ে থাকার সময়টা ছাড়া সর্বক্ষণ টেলিভিশন ক্যামেরা তাকে পাহারা দিচ্ছে, তার সব গতিবিধি রেকর্ড করছে। ঘর থেকে বেরুবার একমাত্র দরজাটি কনট্রোল রুম থেকে নিয়ন্ত্রিত। দরজার সামনে দাঁড়ালে টেলিভিশন ক্যামেরায় তা তারা দেখে, তারপর দরজা খুলে দেয়। বাইরের গেট ছাড়া আর কোথাও যে পাহারাদার দেখেনি। সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলার মুখে যে দরজা তাও দূর নিয়ন্ত্রিত। কনট্রোল রুম থেকে টেলিভিশন ক্যামেরা দেখে দরজা বন্ধ কিংবা খুলে দেয়া হয়। দোতলা থেকে আন্ডারগ্রাউন্ড ফ্লোরে নামার পথে সিঁড়ির মুখে আরেকটা দরজা আছে সেটাও ঐভাবে দূর নিয়ন্ত্রিত।

সেদিন দোতলা থেকে আন্ডারগ্রাউন্ড ফ্লোরে নামবার সময় আহমদ মুসা সিনাত্রা সেন্ডোকে বলেছিল, 'আপনাদের সেই দানবকে তো দেখছি না?'

‘দেখতে চান?’

‘অমন আশ্চর্য জিনিস কে না দেখতে চায়?’

‘এখন ও ঘুমিয়ে আছে। পাহারায় নিয়োগ করা হয়নি ওকে। ও যখন পাহারায় থাকবে, সেই হবে গোটা আন্ডারগ্রাউন্ড ফ্লোরের মালিক। চলন্ত সব জিনিসই তার শত্রু।’

‘আপনাদের লোকদের ওপর আপনাদের আস্থা বোধ হয় খুব কম। তাই না?’

‘কেন?’

‘রোবটকে রেখেছেন পাহারায়।’

হেসেছিল মি. সেন্ডো। বলেছিল, ‘রোবটটা আমাদের অগ্রবাহিনী। সে সক্রিয় হবার সাথে সাথে মানুষ প্রহরীরাও ছুটে আসবে। ওরা ষ্ট্যান্ডবাই থাকে ওদের ডিউটি রুমে।’

‘একজন বা দু’জন বন্দীর জন্যে আপনাদের এত আয়োজন!’

‘যুদ্ধের আশংকা না থাকলেও সৈন্য রাখা কেউ বাদ দেয় না।’

‘তাছাড়া বন্দী পালাতেও তো পারে না?’

‘পারে। কিন্তু আমাদের এখান থেকে সম্ভব নয়। অতীতে কয়েকজন পালাবার চেষ্টা করেছিল, যারা খাবার নিয়ে যেত তাদের পরাভূত করে। কিন্তু এখন সে সুযোগও নেই।’

একটু থেমেই মি. সেন্ডো আবার বলল, ‘তবে যারা পালাবার চেষ্টা করেছিল সবাই মারা পড়েছিল আমাদের যন্ত্র দানবের হাতে।’

যন্ত্র দানব তো নয়, আপনারা মেরেছেন। আপনারা তার গুলী করা বন্ধ করতে পারতেন।’

‘কেমন করে জানলেন?’

‘কেন, ওর কমান্ড কম্পিউটার আপনাদের হাতে ছিল, এতো সবারই জানা!’

‘ঠিক বলেছেন, আমরা পলাতককে বাঁচাই না, তার প্রাপ্যই হলো মৃত্যুদন্ড।’

কথা বলতে বলতে তারা এই ঘরে পৌঁছে গিয়েছিল। কথা আর হয়নি তারপর। কিন্তু আহমদ মুসার বুঝার আর বাকি ছিল না, তারা অতীতের ভুল-ভ্রান্তি থেকে শিক্ষা নিয়ে অত্যন্ত কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে।

আহমদ মুসা জানে, রোবটের চোখ রোবট দেখে না, দেখে কমান্ডো কম্পিউটারের পরিচালক। তাছাড়া বন্দীখানার সব কক্ষ ও করিডোরে দাঁড়িয়ে আছে টেলিভিশন ক্যামেরার চোখ। কমান্ডো কম্পিউটারের পরিচালক তার চারদিকে টিভি স্ক্রীনে সবটাই দেখতে পায় এবং সব দেখেই রোবটকে নির্দেশ দেয়। ওদের টিভি স্ক্রিনে এ ঘরের প্রতিটি কাজ ধরা পড়ছে। রাতেও ইচ্ছামত আলো জ্বালিয়ে তাকে ওরা দেখে। ঘুমের ভান করে সে দেখেছে, ঘুমাচ্ছে জেনেও ওরা মাঝে মাঝে আলো জ্বালিয়ে দেখেছে। অতএব, ঘর থেকে বেরুবার যে কোন চেষ্টা ওদের চোখে ধরা পড়ার আশংকা আছে। আর ঘর থেকে কোনমতে বেরুলেও করিডোরে পা রাখার সাথে সাথে রোবটের বন্দুকের মুখে পড়তে হবে। সুতরাং সব বিচারেই বড় কঠিন জায়গা এটা, স্বীকার করল আহমদ মুসা।

আবার পাশ ফিরল আহমদ মুসা। আবার সেই ভাবনা, বড় কঠিন জায়গা হলেও কিছ একটা করতে হবে তাকে। কাল শনিবার, এ বন্দীখানার শেষ দিন তার, সে কথা ভাসকুয়েজ বলেই গেছে। হয় কাল সকালে বিক্রি হয়ে তাকে আমেরিকার ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের নতুন বন্দী হিসেবে উড়তে হবে, নয়তো তাকে এরাই হত্যা করবে। এ বিকেল ও আজকের রাতটাই তার হাতে মাত্র কিছু চিন্তা করার। কিন্তু কী চিন্তা করবে সে?

পুনরায় পাশ ফিরল আহমদ মুসা। চোখ বুঝল সে। কপাল তার কুঞ্চিত হয়ে উঠিল।

বুঝা গেল কোন গুরুতর চিন্তা তাকে আচ্ছন্ন করেছে।

কার্ডিনাল হাউজের সামনের পার্ক। সন্ধ্যা তখন পেরিয়ে গেছে।

কার্ডিনাল হাউজের তিনতলায় অবস্থিত লাইব্রেরি থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো জেনের আব্বা ফ্রান্সিসকো জেমেনিজ, জেনের মা ও জেন।

কার্ডিনাল পরিবারের সদস্যরা প্রায় বেড়াতে আসে কার্ডিনাল হাউজে। আজও তেমনি ধরনের বেড়াতে আসা। তবে আজকের বেড়ানোর প্রধান উদ্দেশ্য জেনকে নিয়ে মুক্ত হওয়ায বেড়ানো। সে হাসপাতাল থেকে ক'দিন হলো বের হয়েছে। তার মুখ ম্লান, শরীরটা অনেকখানি কৃশ।

চোখে তার সবুজ গগলাস। তার বাম চোখের দৃষ্টি শক্তি প্রায় নেই। ডাক্তারের পরামর্শ, জটিল একটা অপারেশন আছে যা তার চোখ পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনতে পারে। কিন্তু সে অপারেশনের জন্যে জেনকে সুস্থ হওয়া প্রয়োজন।

ফ্রান্সিসকো জেমেনিজরা সিঁড়ির গোড়ায় নামতেই তাদের দেখা হলো ভাসকুয়েজের সাথে।

ফ্রান্সিসকো জেমেনিজ স্প্যানিশ ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের উপদেষ্টা পরিষদের একজন প্রভাবশালী সদস্য।

ভাসকুয়েজের সাথে দেখা হতেই ফ্রান্সিসকো ভাসকুয়েজকে স্বাগত জানিয়ে বলে উঠল, কি মি. ভাসকো শেষ খবরটা কি?'

'আজ রাত ২টার ফ্লাইটে আমেরিকা থেকে ওরা আসছেন। ১ বিলিয়ন ডলারে রফা হয়েছে। আমরা আজ রাতেই আহমদ মুসাকে ওদের হাতে তুলে দেব।' বলল ভাসকুয়েজ।

'একটা ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে মি. ভাসকো। আহমদ মুসা যে আমাদের হাতে এবং তার যে এই ধরনের পরিণতি ঘটতে যাচ্ছে- এই গোটা ব্যাপারটাই আমার কাছে এখনও স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে।'

'ঠিক বলেছেন। আজকের দুনিয়ার বলা যায় সবচেয়ে মূল্যবান ব্যক্তি আহমদ মুসা যে এভাবে আমাদের হাতে আসবে, তা আমরা কোনদিন কল্পনায়ও ভাবতে পারিনি।'

'আপনাকে ধন্যবাদ মি. ভাসকো। আপনার কৃতিত্ব এটা।'

'ধন্যবাদ, মি. ফ্রান্সিসকো।'

বলে একটু থেমে মি. ভাসকো আবার বলল, 'আপনি তো আরও কিছু সময় আছেন, আমি আসছি একটু ভেতর থেকে।'

বলে মি. ভাসকো কার্ডিনাল হাউজের দ্বিতলের দিকে চলে গেল।

মি. ভাসকো চলে যেতেই জেন তার আব্বার কাছে সরে এলো। বলল, 'এ কোন আহমদ মুসা আব্বা?'

'কেন তুমি জান না তাকে? সেই যে ফিলিস্তিন বিপ্লব, মিন্দানাও বিপ্লব, মধ্যএশিয়া বিপ্লব, ককেশিয়া বিপ্লব,....'

তার আব্বার কথা শেষ না হতেই জেন বলল, 'তাকে চিনব না! কাগজে কত পড়েছি। সাবই তো তাকে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নেতা বলে।'

'হ্যাঁ, সেই শ্রেষ্ঠ নেতাই এখন আমাদের হাতের মুঠোয়।'

'কিভাবে?'

'সে এক মজার কাহিনী' বলে মি. ফ্রান্সিসকো আহমদ মুসা কিভাবে বাস্ক গেরিলাপ্রধানের বোন মারিয়াকে বাঁচাতে গিয়ে ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের হাতে বন্দী হয়, কিভাবে ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের সতর্কতা ও প্রতিরোধকে পরাভূত করে মেয়েটিকে উদ্ধার করে পালিয়ে যায় এবং কিভাবে আবার সেধরা পড়ে। সব কাহিনী জেনকে শুনিয়ে বলল, 'আহমদ মুসার বিপ্লবী জীবনের সব লীলাখেলা এবার শেষ হচ্ছে।'

জেনের কাছে তার আব্বার কথা ভালো লাগল না, বরং মনটার কোথায় যেন খচখচ করতে লাগল! জোয়ানের মুখটাও তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। ভাবল, জোয়ান যেহেতু মুসলমান, তাই এ খবরটায় নিশ্চয় সে বড় রকমের আঘাত পাবে। জেন বলল, 'আব্বা এ ধরনের একজন বিপ্লবী নেতাকে বিক্রি করা কি সম্মানজনক? এমন ব্যবসায় মনোবৃত্তি কি ভালো দেখায়?'

'তুমি জান না জেন, এটা বিক্রির ব্যাপার নয়, একধরনের বিনিময় বলতে পার। আমাদের যে ক্ষতি হয়েছে আহমদ মুসা দ্বারা তার একটা অংশ পুরণ করলাম আমরা এর মাধ্যমে।'

'শুনেছি লোকটি নাকি খুবই ভালো। যা কিছু করছেন জাতির জন্যে, নিজের জন্যে কিছুই নয়। আহমদ মুসার চরম বৈরী কাগজ 'ওয়ার্ল্ড টাইমস' তার ওপর একটা কভার স্টোরি করছিল। তাতে বলা হয়েছিল আহমদ মুসা ফিলিস্তিন

বিপ্লব সমাপ্ত করে যখন ফিলিস্তিন থেকে চলে যান, তখন এক শুভাকাঙক্ষীর কাছ তেকে ১ হাজার ডলার ধার নেন। সব ক্ষেত্রেই অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। তিনি কোথাও থেকে ব্যক্তিগতভাবে কোন ফায়দা নেননি। এমন নিঃস্বার্থ বিপ্লবী দুনিয়াতে দুর্লভ আব্বা। দুনিয়াতে যারা কষ্ট করে বিপ্লব করেছে, তারা সবাই রাষ্ট্রক্ষমতা ভোগ করেছে, বিপ্লবের সকল সহায় সম্পদের মালিক হয়েছে।'

'তোমার কথা অস্বীকার করছি না জেন। কিন্তু তার বিপ্লব যাদের ক্ষতি করেছে, আমরাও তাদের মধ্যে। সুতরাং আমরা তাকে ঐভাবে বিচার করব না। তিনি আমাদের শত্রু।'

'শত্রু হলেও মহৎ শত্রু আব্বা।' আমি এ কভার স্টোরিতে পড়েছি, বিপ্লবের সময় ও বিপ্লব কর্মকান্ডের বাইরে তিনি কারও কোন ক্ষতি করেননি, ক্ষতি করেন না।'

'কিন্তু তার পরেও তিনি আমাদের স্বার্থের শত্রু।'

জেন কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আব্বা বলল, 'চল, পার্কে গিয়ে বসি। আরও কিছুটা সময় আমরা কাটাতে পারি ওখানে গিয়েই আমরা কথা বলব।'

ওরা সকলেই পা বাড়াল পার্কের দিকে।

আহমদ মুসা বুঝল বাইরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে।

ধীরে ধীরে সে গিয়ে বাথরুমে প্রবেশ করল।

বাথরুমের মেঝেয় দাঁড়িয়ে আহদম মুসা বাথরুমের ছাদের দিকে তাকাল। যা ভেবেছিল তাই, পয়ঃপাইপ যেখান দিয়ে নেমে এসছে তার পাশের জায়গাটা ছাদের অন্য জায়গা থেকে আলাদা। ছাদের এ এলাকাটা ভেঙে পয়ঃপাইপ বসানো হয়েছে। পরে ছাদের ঐ অংশ আলাদাভাবে তৈরি করা হয়েছে।

আহমদ মুসা পকেট থেকে ল্যাসার কাটার বের করে হাতে নিল। তারপর পয়ঃপাইপ বেয়ে ওপরে উঠে গেল। ডান হাতে পাইপ ধরে রেখে বাম হাতে

কাটারের সূক্ষ আগা দিয়ে নতুন তৈরি ছাদটা পরীক্ষ করল। দেখল, লোহার দুই বীমের ওপরা স্টিলের শীট চাপিয়ে তার ওপর ছাদ ঢালাই করা হয়েছে। নিচে থেকে তা অবশ্য বুঝা যায় না রংয়ের কারণে। আহমদ মুসা লেসার কাটার চালু করে স্টিল শীটের যে পাশটা লোহার বিমের ওপর আটকানো, সে পাশটা লেসার বিম দিয়ে কেটে ফেলল। তারপর ষ্টিল শিটের সে অংশটা দেয়ালের মধ্যে ঢুকানো দেয়াল বরাবর সে পাশটাও কেটে ফেলল। কিন্তু ষ্টিল শিটটা পড়ে গেল না। টানাটানি করল, তবু পড়ল না। আহমদ মুসা নেমে এলো নিচে। টয়লেটের ফ্লাশের স্টিলের হাতলটা কেটে নিল। হাতলটার এক প্রান্ত বেশ চোখা।

আবার উঠল আহমদ মুসা। অনেকক্ষনের প্রচেষ্টায় হাতলের সুঁচালো প্রান্ত স্টিল শিটের ওপর দিয়ে ছাদের ভেতর ঢুকানো গেল। তারপর হাতল ধরে অনেক টানাটানির পর স্টিল শিটের একটা প্রান্ত আগলা করা গেল। দেরি সইছিল না। আহমদ মুসা আলগা অংশটা দু'হাতে ধরে ঝুলে পড়ল। কাজ হলো। আহমদ মুসা আছড়ে পড়ল মেঝের ওপর, তার সাথে সশব্দে এসে পড়ল স্টিল শিটটি।

পাইপ বেয়ে আবার উঠে গেল আহমদ মুসা। স্টিল শিটের ওপর ছিল সিমেন্ট দিয়ে পাথর জমানো আস্তরণ। আহমদ মুসা আগের মতোই এক হাতে পাইপ ধরে অন্য হাতে লেসার বিম দিয়ে সিমেন্ট গলিয়ে এক এক করে পাথর খুলতে লাগল। বড় কষ্টকর এই কাজ। ঘেমে উঠল আহমদ মুসা। মেঝেতে আছড়ে পড়ায় পায়ের গোড়ালিতে লেগেছিল, সে জায়গায় চিন চিন করছে। তা'ছাড়া স্টিল শিটটি মাথায় আঘাত করেছিল। সে জায়গাটাও টন টন করছে। কিন্তু বিশ্রাম নেবার সুযোগ নেই। বেশি দেরি হলে ধরা পড়ার আশংকা। বাথরুমে ওদের টিভি ক্যামেরার কোন চোখ নেই বলে রক্ষা। কিন্তু বেশিক্ষণ ঘর থেকে অনুপস্থিত থাকলে ওরা সন্দেহ করতে পারে।

আস্তরণটির ওপরের অংশটা ছিল গুঁড়ো পাথর ও সিমেন্টে জমানো। আহমদ মুসা যতটা পারল লোহার বিম ও দেয়ালের পাশ বরাবর জায়গায় সিমেন্ট গলিয়ে ফেলল। তারপর লেসার কাটার পকেট পুরে দু'হাতে পাইপ আঁকড়ে ধরে দু'পা জোড়া করে ওপরে তুলে সর্বশক্তি দিয়ে লাথি দিতে লাগল। তিন-চারটি

লাথির পরই পাতলা আস্তরণটি তার পায়ের ওপর নেমে এলো, তারপর সশব্দে গড়িয়ে পড়ল নিচে মেঝেতে।

ওপরে ছাদে বেশ বড় একটি গহবরের সৃষ্টি হলো। আহমদ মুসা লোহার বিম ও ভাঙা ছাদের প্রান্ত ধরে দ্রুত ওপরের মেঝেতে উঠে গেল। একবার চোখ তুলে তাকাল বাথরুমের দরজার দিকে। দরজা বন্ধ। আহমদ মুসা গভীর ক্লান্তিতে এলিয়ে পড়ল মেঝেতে। বড় বড় দম নিয়ে সে ক্লান্তি দূর করার চেষ্টা করল। এই মুহূর্তে দুনিয়ার মধ্যে তার কাছে সবচেয়ে লোভনীয় মনে হচ্ছে বিশ্রামকে।

কিন্তু মিনিট দুয়েকের বেশি সময় সে নষ্ট করতে পারল না। উঠে দাঁড়াল। গোটা গা ধুলো-বালিতে ভরে গিয়েছিল। একটু ঝেড়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে গেল দরজার দিকে। চারদিকে তাকিয়ে বাথরুমটাকে তার কাছে নোংরাই মনে হলো অর্থাৎ বাথরুমটা সাধারণের ব্যবহারের জন্যে! আহমদ মুসার মনে পড়ল এঘরটি তার ওপরের ঘর। এখান থেকেই তার ঘরে খাদ্য সরবরাহ হতো। সুতরাং এঘরটা কিচেন, স্টোর রুম ইত্যাদি জাতীয়ই কিছু হবে।

আহমদ মুসা বাথরুমের দরজার নব ঘুরাতে যাচ্ছিল, এমন সময় দরজার নব ঘরে গেল। সংগে সংগে খুলে গেল দরজা।

একেবারে মুখোমুখি। মাঝারি লম্বা, মোটা সোটা একজন লোক। শক্ত-সমর্থ শরীর। আহমদ মুসাকে সামনে দেখে তার চোখ ছানাবড়া!

বিস্ময়ের ঘোর কাটার আগেই আহমদ মুসা তার ডান হাতের একটা কারাত চালাল লোকটির কানের নিচে নরম জায়গাটায়। লোকটা নিঃশব্দে গোড়া কাটা গাছের মতো দরজার ওপর পড়ে গেল।

আহমদ মুসা নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ। কেউ এলো না। আহমদ মুসা বুঝল, এঘরে কেউ নেই।

লোকটিকে টেনে বাথরুমে ঢুকিয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে দিল সে।

ঘরটি আসলেই একটা স্টোর রুম।

ঘরের চাদিকে একবার নজর বুলাল আহমদ মুসা। পাশেই একটা বাক্সে সে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম দেখতে পেল। তারপর সে এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

দরজার সামনে একটু দাঁড়িয়ে নব ঘুরিয়ে ধীরে ধীরে দরজাটা একটু ফাঁকা করে বাইরে উঁকি দিল। দেখল লম্বালম্বি একটা করিডোর।

আহমদ মুসার মনে পড়ল এ ধরনের একটা করিডোরের মুখেই নিচে নামার সিঁড়িটি করিডোরে গিয়ে উঠেছে। আহমদ মুসার আরও মনে পড়ল সিঁড়ির পাশেই ইলেকট্রিক সুইচ বোর্ড। বিশাল মাষ্টার সুইচটাকে সে ওখানেই দেখেছে।

আহমদ মুসা দরজা খুলে বেরিয়ে আসবে এমন সময় পেছনে পায়ের শব্দ পেয়ে বিদ্যুৎ গতিতে পেছনে ফিরল। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে তখন। একটা লোহার রড নেমে আসছে তার মাথা লক্ষ্যে। শেষ মুহূর্তে তার মাথাটা কাত করে একদিকে সরিয়ে নিতে পারল। মাথাটা বাঁচল, কিন্তু আঘাতটা এসে লাগল গলা ও ঘাড়ের সন্ধিস্থলে।

মাটিতে পড়ে গেল আহমদ মুসা।

ঘাড়ের পেশিটা থেঁতলে গেল বলে মনে হলো। মাথাটাও চিন চিন করে উঠল ব্যথায়। ঘুরে উঠেছিল মাথাটা।

মাটিতে পড়েই আহমদ মুসা দেখল, লোকটি রডটা তুলে নিচ্ছে, আরেকটা আঘাত নেমে আসছে তার ওপর।

আহমদ মুসা এক পাশে নিজেকে ছুঁড়ে দিল। রডের আঘাতটি গিয়ে কংক্রিটের মেঝের ওপর পড়ল।

আহমদ মুসা এক পাশে সরে গিয়েই উঠে দাঁড়িয়েছিল।

লোকটি তৃতীয়বার রডটি তোলার আগেই আহমদ মুসার ডান হাতের কারাত লোকটির বা কানের নিচে ঠিক আগে জায়গাটায়। লোকটি রড আর তুলতে পারল না। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল রডের ওপরেই।

আহমদ মুসা ফিরে দাঁড়িয়ে আবার দরজা দিয়ে উঁকি দিল বাইরের করিডোরে। না, কোন লোক নেই। আহমদ মুসা মুখটা নিচু করে করিডোর ধরে উত্তর দিকে দৌড় দিল। লক্ষ্য, সিঁড়ির ঘর।

আহমদ মুসার স্মৃতি ঠিকই বলেছিল। যেখানে করিডোরটি পুব দিকে মোড় নিয়েছে, সেখানেই পেয়ে গেল সে সিঁড়ি ঘর। সিঁড়ি মুখের পুব পাশে দেয়ালেই সুইচ বোর্ড।

আহমদ মুসা এক লাফে গিয়ে সুইচ বোর্ডের কাছে দাঁড়াল। মাষ্টার সুইচের ওপর নজর বুলাল। পাশাপাশিই অন ও অফ এর বোতাম। আহমদ মুসা চকিতে একবার পুব দিকে তাকিয়ে দোতলায় ওঠার সিঁড়িটা দেখে নিল।

তারপর মুখ ঘুরিয়ে যখন অফ-এর বোতামের দিকে হাত বাড়াল, তখনই বেজে উঠল সাইরেন।

আহমদ মুসা দ্রুত অফ- এর বোতামটি চেপে দৌড় দিল করিডোরে ওঠার সিঁড়ির দিকে।

অন্ধকারে সিঁড়ির রেলিং এর সাথে সে ধাক্কা খেল। তবু খুশি হলো সিঁড়ি পেয়ে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল বারান্দায়।

দোতলার বারান্দায় যখন সে উঠল, বিভিন্ন দিকে পায়ের শব্দ ও হৈ চৈ শুনতে পেল। হঠাৎ বিদ্যুত চলে যাওয়ায় বুঝা গেল তারা উত্তেজিত ও আতংকিত হয়ে পড়েছে।

আহমদ মুসা ভাবল, তারা অবিলম্বে আলোর ব্যবস্থা করবে। নিজস্ব জেনারেটরও থাকতে পারে। মাঝেখানে যেটুকু সুযোগ পাবে, তাকেই কাজে লাগাতে হবে।

ভাবল আহমদ মুসা, বারান্দা দিয়ে আরেকটু সামনে এগোলেই নিচের বাগানে নামার সিঁড়িমুখের দরজা। কিন্তু আহমদ মুসার মন বলল, ও পথটা নিরাপদ নয়। সাইরেন যখন বেজেছে, তখন বেরুবার ঐ পথটাই তারা আটকেছে প্রথম। বেরোলেই ওদের ফাঁদে পড়তে হবে।

হঠাৎ আহমদ মুসার মনে পড়ল, ভাসকুয়েজ বলেছিল কার্ডিনাল হাউজের দু'তালা, তিনতালায় লাইব্রেরি আছে। কথাটা মনে পড়ায় আহমদ মুসার মন খুশি হয়ে উঠল। সেন্ডোর সাতে একতলার করিডোরে ওঠার পর সে লক্ষ্য করেছে, যে সিঁড়ি দিয়ে আন্ডারগ্রাউন্ডে নামা যায় সে সিঁড়িটিই ঘুরে দু'তলায় উঠে গেছে। হয়তো সিঁড়ির মাথায় দরজা কিংবা কিছু দিয়ে তিনতলায় উঠে গেছে। হয়তো সিঁড়ির মাথায় দরজা কিংবা কিছু দিয়ে তিনতলায় ওঠার পথ বন্ধ করা হয়েছে। তা হোক, ঐ প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা অনেক নিরাপদ হবে।

চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে আহমদ মুসা দেয়ালের গা ঘেঁষে দু'তলার সিঁড়ি মুখের দিকে এগোলো। এ সময় করিডোর দিয়ে বেশ কয়েকজন লোকের ছুটে আসার শব্দ পাওয়া গেল। আহমদ মুসা দেয়ালের সাথে সেঁটে নিঃশ্বস বন্ধ করে দাঁড়াল।

ছুটে আসা লোকরে কয়েকজন তা সামনে দিয়ে ছুটে বারান্দার দিকে বেরিয়ে গেল। আহমদ মুসা বুঝল, ওরা নিচে নামার সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল।

আহমদ মুসা এবার হাতড়িয়ে দু'তলায় ওঠার সিঁড়িমুখ খুঁজে নিল। তারপর দু'হাত ও দু'পা ব্যবহার করে হামাগুড়ি দেয়ার মতো করে দ্রুত সিঁড়ির মাথায় উঠে গেল। হাতড়িয়ে দরজাটা বের করল। টোকা দিয়ে পরীক্ষা করে বুঝল স্টিলের দরজা।

এই সময় সিঁড়ির অন্ধকারটা অনেকখানি ফিকে হয়ে গেল। আহমদ মুসা বুঝল, মাষ্টার সুইচ তারা অন করেছে। আহমদ মুসা উদ্বিগ্ন হলো, এ সিঁড়িতেও তারা উঠতে পারে। কিন্তু পরক্ষনেই আশ্চর্য হলো এই বলে যে, নিচের তিনটি ফ্লোর খোঁজা কমপ্লিট না করে তারা এ সিঁড়িতে আসবে না। এ সময়ের মধ্যে তাকে সরে পড়তে হবে।

আহমদ মুসা দরজা পরীক্ষা করে বুঝল, স্টিলের দরজাটা ওয়েল্ডিং করে স্থায়ীভাবে আটকে দেয়া হয়েছে।

সে আর সময় নষ্ট করল না। লেসার কাটার বের করে দরজার মাঝখানটা কেটে একটা ফোকর সৃষ্টি করল।

আহমদ মুসা সেই ফোকর দিয়ে বেরিয়ে এলো দু'তলার বারান্দায়।

কেউ কোথাও নেই।

আহমদ মুসা চিন্তা করল কার্ডিনাল হাউজের সম্মুখ ভাগ উত্তর দিকটা। সুতরাং নিচে নামার সিঁড়ি উত্তর দিকেই থাকবে। তখন সন্ধ্যা। লাইব্রেরিতে লোকজন থাকতে পারে। বারান্দাতেও কেউ থাকা বিচিত্র নয়। আহমদ মুসা মাথার চুলটা একটু ঠিক করে ধীর পায়ে এগোলো বারান্দা দিয়ে উত্তর দিকে।

ঘুরানো বারান্দা। উত্তর দিকে কিছুটা ঘুরে আবার পশ্চিম দিকে গেছে।

আহমদ মুসা পশ্চিম দিকে ঘুরেই নিচে নামার সিঁড়ি দেখতে পেল।

সিঁড়িমুখে একজন চেয়ারে বসে আছে। আহমদ মুসা বুঝল, সে প্রহরী। লাইব্রেরীতে প্রবেশ তাহলে নিশ্চয় নিয়ন্ত্রিত।

সে ধীর পায়ে সিঁড়ি মুখের দিকে এগোলো।

সিঁড়ির মুখের লোকটি আগেই দেখতে পেয়েছিল আহমদ মুসাকে। তার চোখে কিছুটা বিস্ময়। আহমদ মুসা কাছে আসতেই সে উঠে দাঁড়াল বলল, 'স্যার, ওদিকে কেন? কোথায় গিয়েছিলেন?'

'এই দেখলাম আর কি!' মুখে হাসি টেনে অনেকটা তাচ্ছিল্যের সাথে বলল আহমদ মুসা।

কিছু বলতে যাচ্ছিল প্রহরী। আহমদ মুসা তার আগেই বলল, 'তোমার কোন ভয় নেই, ওদিকে কোন সোনাদানা থাকে না। আর আমি খালি হাতে দেখতেই তো পাচ্ছ।'

বলে আহমদ মুসা সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল।

প্রহরী কিছু বলতে গিয়েও আবার চুপ করে গেল। সংকোচের একটা ভাব তার চোখে-মুখে প্রকাশ পেল। সম্ভবত আহমদ মুসার মতো একজন সুন্দর ভদ্রলোককে আর কিছু বলতে তার মন সায় দেয়নি।

এই প্রহরী লোকটি ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান থেকে নিয়োগ করা। তার দায়িত্বের মধ্যে একটি হলো লাইব্রেরি ছাড়া বাড়ির অন্য অংশে কেউ না যায় তা নিশ্চিত করা। তার আরেকটি দায়িত্ব হলো, সাদা চামড়ার লোক ছাড়া আর কেউ যেন লাইব্রেরিতে ঢুকতে না পারে, তা দেখা।

আহমদ মুসা দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে বাড়ির সামনের লনটা পেরিয়ে লাল ইটের সেই রাস্তায় গিয়ে পড়ল।

এই সময় আহমদ মুসা পেছনে বাড়ির দু'তলার বারান্দায় হৈ চৈ ও দৌড়াদৌড়ির শব্দ শুনতে পেল। আহমদ মুসা পেছনে না তাকিয়েই বুঝল, সে যে দু'তলার সিঁড়িপথ দিযে পালিয়েছে তা ওরা টের পেয়েছে।

আহমদ মুসা দেখল সেই লাল ইটের রাস্তায় একটা নতুন কার দাঁড়িয়ে আছে। পার্কের গেট পেরিয়ে একজন বয়স্ক লোক, একজন তরুনী ও একজন মহিলা রাস্তার দিকে এগিয়ে আসছে।

এই সময় দু'তলা থেকে গুলীর শব্দ হলো। পিস্তলের গুলী। না তাকিয়েও আহমদ মুসা বুঝল, তাকে লক্ষ্য করেই গুলী করা হয়েছে। কিন্তু পিস্তলেল গুলী এত দূর আসবে না। পূর্বদিকের ঘেরা প্রাচীরের গেটেও কয়েকজনের জটলা দেখতে পেল সে। গুলীর শব্দ শুনে ওরা এদিকেই আসছে।

আহমদ মুসা অন্য কিছু আর ভাবতে পারল না। পাশে দাঁড়ানো গাড়ির ড্রইভিং সিটে চোখের পলকে সে উঠে বসল। চাবি স্টার্টারের সাথেই ছিল।

এক হাতে আহমদ মুসা দরজা টেনে বন্ধ করল, অন্য হাতে চাবি ঘুরিয়ে গাড়ি ষ্টার্ট দিল।

ঘুমন্ত গাড়িটা জেগে উঠেই লাফ দিয়ে চলতে শুরু করল। কেউ কিছু বুঝার আগেই গাড়ি কার্ডিনাল হাউজের সীমানা পেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়ল।

রাস্তায় পড়ে ভাবল আহমদ মুসা, কোথায় যাবে সে। হোটেলে যাওয়া রিস্কি। শহরে নিজের তো কেউ নেই। চিন্তা করে সময় নষ্ট করার তার সময়ও নেই। ওরা নিশ্চয় পিছু নেবে, অন্যদিকে গাড়ির নাম্বার পুলিশকে জানালে তারাও পাহারা বসাবে। পুলিশ এলার্ট হবার আগেই তাকে নিরাপদ কোথাও পৌঁছতে হবে।

দক্ষিণগামী একটা হাইওয়ে খুব কাছেই। দক্ষিণ দিকে শহর বেশি নেই। শহর পেরুই উঁচু-নিচু পাহাড়ী এলাকা। সেখানে বিশাল এলাকা জুড়ে জলপাই বাগান। জংগলে ভরা। শহরের ম্যাপ যেটুকু সে দেখেছে তাতে এতটুকু মনে পড়ছে।

আহমদ মুসা দক্ষিণ হাইওয়ের দিকেই ছুটে চলল। রিয়ার ভিউতে তার পেছনে কোন গাড়ি সে আসতে দেখছে না। ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের গাড়ি আছে প্রাচীর ঘেরা বাগানে। সিদ্ধান্ত নিয়ে সেখান থেকে গাড়ি বের করতে অবশ্যই সময় লাগবে।

আহমদ মুসা শহর থেকে বেরিয়ে সেই জলপাই বাগানে এসে পৌঁছল। সে হাইওয়ে থেকে গাড়িটি বাগানে ঢুকিয়ে একটা বড় ঝোপের আড়ালে এনে দাঁড় করাল। গাড়ি থেকে নেমে চারপাশটা একবার দেখে নিল। জায়গাটাকে তার খুবই নিরাপদ মনে হলো। শহর থেকে বেরুবার পর সে গাড়ির আলো নিভিয়ে

দিয়েছিল। সুতরাং তার বাগানে প্রবেশ কারও নজরে পড়ার কথা নয়। কেউ তাকে ফলো করেনি। অন্তত তার এটা নজরে পড়েনি।

নতুন গাড়ি। খুব দামি গাড়ি। গাড়ির কাচ রঙীন। বাইরে থেকে ভেতরের কিছুই দেখা যায় না, কিন্তু ভেতর থেকে বাইরের সব কিছুই দেখা যায়।

আহমদ মুসা গাড়ির আলো জ্বালিয়ে ভেতরটা একবার ভালো করে দেখল। একটি ভ্যানিটি ব্যাগ দেখল পেছনের সিটে। তাছাড়া আরও পেল কয়েক কৌটা ফলের রস ও কেকের প্যাকেট। শেষ দু'টো পেয়ে আহমদ মুসা খুব খুশি হলো। গাড়িতে যারা এসেছিল তারা এগোলো এনেছিলন পার্কে বসে খাবার জন্যে। কিন্তু বোধ হয় তাদের প্রয়োজন হয়নি। এখন যেহেতু ক্ষুধার্ত সে, তাই সে এগোলো খেতে পারে। গাড়ি ফেরত দেবার সময় ওদের অনুমতি নিলেই চলবে।

সত্যিই খুব ক্ষুধা পেয়েছিল আহমদ মুসা। অনেক পরিশ্রম ও ধকল গেছে তার।

গোটা কেকটাই খেয়ে নিল আহমদ মুসা। তার সাথে তিন কৌটা ফলের জুস। খেয়ে খুব আরাম লাগল তার। মনে হলো, যথাসময়ে পরিশ্রমের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ হলো।

খাবার পর গাড়ির সিটে গা এলিয়ে একটু বিশ্রাম নিল সে।

শুয়ে শুয়েই ভাবল গাড়িটা কার কি করে মালিককে খুঁজে পাবে সে! হঠাৎ তা সেই ভ্যানিটি ব্যাগটার কথা মনে পড়ল।

ভ্যানিটি ব্যাগটি তুলে নিয়ে খুললো সে। ভেতরে টাকা, ছোট্ট একটা বিউটি বক্স ও ছোট্ট একটা চিরকুট পেল। তাতে লেখা, 'জেন, তোর দেখা না পেয়ে এই চিঠিটা তোর ব্যাগে রেখে গেলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার মতো তোর শরীর হয়েছে, কিন্তু যাচ্ছিস না। এটা ঠিক নয়। লেখাপড়ায় তোর মনোযোগী হওয়া দরকার। মনটাও তাতে ভালো হবে। - হান্না।'

আহমদ মুসা ভাবল, গাড়ির মালিক মেয়েটির নাম তাহলে 'জেন'! নাম পাওয়া গেল, কিন্তু ঠিকানা?

হঠাৎ আনন্দে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আহমদ মুসার। গাড়ির ব্লু-বুকেই তো সব পাওয়া যাবে!

চিন্তার সাথে সাথেই আহমদ মুসা ব্লু-বুক বের করে আনল। খুলে নাম-ঠিকানার ওপর চোখ বুলাল। নাম-ঠিকানা পড়ে আহমদ মুসা স্বগত উচ্চারণ করল জেনের পিতার নাম ফ্রান্সিসকো জেমিনেস ডে সেজনারোসা। ঠিকানা কার্ডিনাল হাউজ দেখে ভাবল, এরা কি তাহলে কার্ডিনাল ফ্রান্সিসকো ডেমেনিজ ডে সাজনারোসার পরিবার। তা'হলে এর কি ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানেরও কেউ?

রাত দশটার দিকে আহমদ মুসা গাড়ি নিয়ে বাগান থেকে বেরুল। গাড়ির নাম্বার সে পাল্টে ফেলেছে। গাড়ির এমারজেন্সী কেবিনে পেস্টি টেপ ও ছোট কাঁচি পেয়েছিল। ছোট একটা সাদা প্যাড পেয়েছিল' ব্লু-বুকের সাথে। আহমদ মুসা নিখুঁতভাবে কাগজ কেটে গাড়ির নাম্বারের দ্বিতীয় অংক ও শেষ অংক পরিবর্তন করেছিল। পরিবর্তিত নাম্বারটা ফিডেল ফিলিপের গাড়ির নাম্বার হয়ে গেল। আহমদ মুসার গন্তব্য কার্ডিনাল হাউজ। লক্ষ্য, গাড়িটা ফেরত দেয়া। গাড়িটা ফেরত না দেয়া পর্যন্ত সে নিজেকে মুক্ত করতে পারছে না। গাড়ি চুরি করার জন্যে ওরা কি পরিমাণ গাল-মন্দ করছে কে জানে!

মাদ্রিদ শহরের রোড় ম্যাপের একটা কপি তার পকেটে সব সময়ই আছে। গাড়ি ছাড়ার আগে সে একবার ওটাতে চোখ বুলিয়ে নিয়েছে।

রাস্তা চিনে নিতে কোন অসুবিধা হলো না আহমদ মুসার। ঠিক রাত সাড়ে দশটায় কার্ডিনাল কটেজের গেটে থামাল আহদম মুসা।

কার্ডিনাল কটেজটি প্রায় একটি রাজপ্রাসাদ।

গাড়ি থামতেই গেট রুম থেকে গেটম্যান উঁকি দিল। আহমদ মুসা বলল, 'মি. ফ্রান্সিসকো আছেন?'

'না, নেই।' বলল গেটম্যান।

'জেন আছে?'

'আছে।'

'তাকে হলেও চলবে।'

'আমি ওর হারানো গাড়ির খোঁজ নিয়ে এসেছি।'

গেটম্যান সঙ্গে সঙ্গে সরে গেল জানালা থেকে।

অল্প কিছুক্ষণ পরেই গেট খুলে গেল। আহমদ মুসা গাড়ি নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

গাড়ি দিযে দাঁড়াল গাড়ি বারান্দায়।

গাড়ি বারান্দা থেকে দু'ধাপ উঠলেই লম্বা করিডোর।

গাড়ি বারান্দায় পৌঁছে আহমদ মুসা গাড়ি থেকে নামতে নামতে দেখতে পেল একটি তরুণী এসে করিডোরে দাঁড়াল। তার চোখে মুখে বিস্ময়!

আহমদ মুসা গাড়ি থেকে নেমেই দু'ধাপ পেরিয়ে করিডোরে উঠে গাড়ির চাবিটি জেনকে দিতে দিতে বলল, 'বাধ্য হয়ে আপনার গাড়ি বিনা অনুমতিতে নিতে হয়েছিল, এজন্যে আমি দুঃখিত। আপনার ব্যাগ গাড়িতে আছে।'

আহমদ মুসা একটু থেমেছিল ঢোক গেলার জন্যে।

সেই ফাঁকেই মেয়েটি বলল, 'আপনার নাম আহমদ মুসা?' মেয়েটির গলা কাঁপছিল।

'হ্যাঁ, আমি আহমদ মুসা। আপনি কেমন করে জানেন আমার নাম?'

'আপনার নাম আগে থেকেই জানতাম। মি. ভাসকুয়েজের কাছ থেকে জেনেছিলাম আপনিই আমার গাড়ি নিয়ে গেছেন।'

'আমাকে মাফ করবেন। আপনাদের কেক ও ফলের জুসও আমি খেয়েছি, আমি খুব ক্ষুধার্ত ছিলাম। এর জন্যেও আমি ক্ষমা চাই।'

'আপনি এই ভাষায় কথা বলায় আমি বিব্রত বোধ করছি। আপনি আমাকে গাড়ি ফেরত না দিলেও কিছু মনে করতাম না। ভাবতাম, আমার গাড়ি একজন মহান বিপ্লবীর কাজে লাগছে। আপনি ভেতরে আসুন, বসবেন।'

'ধন্যবাদ। আপনার পরিচয় কি জানি না। কিন্তু আপনাকে আমার কাছে বিস্ময়ের মনে হচ্ছে।'

'ভেতরে আসুন, বলব সব।'

'ধন্যবাদ বোন, আমার সময় কম আর সম্ভবত আমার সব বিষয় তুমি জানো।'

বলে আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'গাড়ির নাম্বারটি বদলে নিও বোন।'

আহমদ মুসা দ্রুত পা চালাল সামনে।

জেন আরও কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারল না। নির্বাক বিস্ময়ে সে তাকিয়ে রইল আহমদ মুসার দিকে। মনে তার প্রবল আলোড়ন, যার সাথে দেখা হলো, কথা হলো, এই সুন্দর সারল্যে ভরা মুখের এই যুবকটিই কি বিশ্ববরেণ্য বিপ্লবী নেতা?

আহমদ মুসা চলে গেছে জেনদের গেট পেরিয়ে। কিন্তু দাঁড়িয়েই আছে জেন। স্মৃতিচারণ করছে জেন বিস্ময়ভরা মুহূর্তগুলোর। আহমদ মুসা তাকে বো বলেছে। একজন এত বড় বিপ্লবী এত নরম ভাষায় কথা বলে! সত্যিই মানুষকে আপন করে নেবার অদ্ভুত ক্ষমতা তারা ঐ ধরনের বিপ্লবীরা কখনও কি এভাবে গাড়ি ফেরত দিতে আসে। গাড়ি ব্যবহারের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করে! না বলে জুস ও কেক খাওয়ার জন্যে মাফ চায়! সত্যি আহমদ মুসা সম্পর্কে সে যা শুনেছিল তার চেয়েও অনেক বড় সে।

ধীরে ধীরে গাড়ির দিকে এগোলো জেন।

দেখল তার ভ্যানিটি ব্যাগ সিটের ওপর পড়ে আছে। জুসের খালি টিন ও কেন বাঁধা কাগজ গাড়ির মেঝেয় পড়ে আছে। গাড়ি খুলে ভ্যানিটি ব্যাগের সাথে জুসের টিন তিনটিও নিয়ে নিল জেন। আহমদ মুসার স্মৃতিগুলো। জোয়ান দেখলে নিশ্চয় খুব খুশি হবে।

ওদিকে আহমদ মুসা এক ভাড়াটে ট্যাক্সি নিয়েছে। ভাবছে কোথায় যাবে। হঠাৎ তার মনে পড়ল হোটেল পিরেনিজ- এর কথা। ভুলেই গিয়েছিল সে এই হোটেলের ব্যাপারটা। মারিয়ার ভাই ফিডেল ফিলিপ এই হোটেলের কথাই বলেছিল। হোটেলের মালিক বাস্ক গোষ্ঠীর একজন এবং বাস্ক গেরিলার একজন সক্রিয় সদস্য। ফিলিপ টেলিফোন করে হোটেল মালিককে আহমদ মুসার কথা বলে রেখেছে। তা'ছাড়া ফিলিপের একটা কোড চিহ্নও তাকে দিয়েছে ফিলিপ। ওটা এখনও তার জুতার সুখতলার নিচে রয়েছে।

রোডের নাম এখনও মনে আছে তার। আহমদ মুসা ড্রাইভারকে হোটেল পিরেনিজ-এর নাম বলল।

'খুব চালু হোটেল স্যার, সিট বুক করা আছে?' বলল ড্রাইভার।

‘না, নেই।’

‘তাহলে কি সিট মিলবে?’

‘দেখি চেষ্টা করে। হোটেলটি খুব চালু, তাই না?’

’হ্যাঁ, ব্যবহার ভালো। খুব ভালো সার্ভিস।’

‘মালিক কোন ধর্মের?’

স্পেনে তো প্রায় একটাই ধর্ম। খৃষ্ট ধর্ম।

‘কেন, ইহুদি, মুসলমান নেই?’

‘ইহুদি কিছু আছে, কিন্তু মুসলমান কোত্থেকে আসবে?’

‘কেন, মুসলমান তো আছে!’

‘চোরের মতো থাকাকে থাকা বলে না।’

‘চোরের মতো কেন?’

‘চোরের মতো ওরা নাম ভাঁড়িয়ে চলে।’

‘কেন?’

‘মুসলমান জানলে চাকরি-বাকরি, ব্যবসায়-বাণিজ্য, এমনকি লেখা-পড়ায় পর্যন্ত সুযোগ-সুবিধা পায় না।’

‘এর জন্যে দায়ী কে?’

‘কি বলব স্যার, দায়ী ওদের অতীত।’

‘অতীতে ওরা স্প্যানিশদের ওপর অত্যাচার করেছে?’

‘না, তা নয়, ওদের অতীত শৌর্য, শক্তি, জ্ঞান ও গৌরবই ওদের কাল।’

‘তুমি এত জান কি করে?’

জবাব দিল না ড্রাইভার।

আহমদ মুসা আবার তার প্রশ্নের পুনারাবৃত্তি করল।

‘আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস পড়েছি।’

‘তুমি বিশ্ববিদ্যালয় পাস করেছ?’

‘হ্যাঁ।’

‘তাহলে ড্রাইভিং এ এসেছ কেন, রেজাল্ট বুঝি ভালো হয়নি?’

‘না স্যার, আমি প্রথম শ্রেনী পেয়েছিলাম।’

‘তারপরও তুমি এ পেশায় কেন?’

‘চাকরি আমার কোথাও মেলেনি।’

‘প্রতিযোগিতায় টিকতে পারোনি?‘

‘প্রতিযোতিায় টিকেছি, ভাগ্য দোষে চাকরি হয়নি।’

‘কেমন?’

উত্তর দিল না ড্রাইভার।

একটু পরেই আবার মুখ খুলল। বলল, ‘আপনি বিদেশি বলা যায়।’

বলে একটু থামল। তারপর বললক, ‘আমার দুর্ভাগ্য হলো আমি মরিসকো। চাকরিতে যখন ঢুকতে গেছি এ কথা প্রকাশ হয়ে গেছে। তাই চাকরি কোথাও জোটেনি।’

‘সব মরিসকোর বেলায় কি এটাই ঘটছে?’

‘হ্যাঁ, প্রকাশ হয়ে পড়লে আর রক্ষা নেই।’

‘কি হয়েছে তাহলে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহন করে?’

‘এ পাপ আমাদের পূর্বপুরুষদের, কিন্তু বাধ্য হয়েই তারা এটা করেছে, এছাড়া বাঁচার তাদের আর কোন উপায় ছিল না।’

‘পূর্বপুরুষদের ঐ পাপ কি মুছে ফেলা যায় না?’

‘এমন চিন্তা আমাদের অনেকের মাথায় এসেছে, কিন্তু স্পেনে থেকে তা সম্ভব নয়।’

‘এ চিন্তা কিছু সংখ্যক মরিসকোর মধ্যে আছে?‘

‘শিক্ষিত সব মরিসকোই এমন চিন্তা করে।’

একটু থেমেই ড্রাইভার প্রশ্ন করল, ‘স্যারের কি ধর্ম?’

‘তুমি কি মনে কর?’

‘মুসলমান।’

‘কেমন করে বুঝলে?’

‘মুসলমানদের প্রতি, বিশেষ করে মরিসকোদের প্রতি এমন সহানুভূতি কোন অমুসলমান দেখাতে পারে বলে আমি জানি না।’

‘ঠিকই বলেছ ভাই, আমি মুসলমান।’

ড্রাইভার তৎক্ষণাৎ কোন কথা বলল না। অনেকক্ষণ পর বলল, ‘আমার কি যে আনন্দ লাগছে, একজন মুসলমানের সাথে এই প্রথম আমি কথা বললাম।’

‘মুসলমানদের ভালোবাস, ইসলামকে ভালবাসে তুমি?’

‘ভালোবাসি কিনা জানি না, কিন্তু গৌরব বোধ করি এজন্যে যে, আমার পূর্বপুরুষরা মুসলমান ছিল। যতবার কর্ডোভায় গেছি, গ্রানাডায় গেছি, না কেঁদে থাকতে পারিনি।’

‘তুমি যাকে গৌরব বলছ, সেটাই তো ভালোবাসা। যাকে মানুষ ভালোবাসে না তার জন্যে গৌরবও বোধ করে না।’

‘স্যার, আমার খুব সাধ হয় মক্কা দেখতে, মদিনা দেখতে। কিন্তু আমি মরিসকো হই, যাই হই, পরিচয় যে আমার খৃষ্টান! আমি কা’বার একটা ফটো যোগাড় করেছি ইতিহাস বই থেকে। সুযোগ পেলেই ওটা দেখি। ওদিকে তাকালে আর চোখ সরাতে পারি না।’ শেষের দিকে গলাটা ভারি হয়ে উঠল ড্রাইভারের। সে চোখ মুছল।

আহমদ মুসার বুকটাও যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল। মরিসকো পরিচয়ে এ যুবকটির বুকে তার স্বজাতি ও স্বধর্মের প্রতি যে অসহায় ভালোবাসা বিরাজ করছে এবং যে মানসিক দ্বন্দ্বে সে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্ত তা আহমদ মুসাকে অভিূত করে তুলল। তার মনে হলো, গোটা স্পেনে হাজার হাজার মরিসকো যুবক, বৃদ্ধ ও নারনারীর হৃদয় এভাবে কাঁদছে। কেঁদে কেঁদেই তারা শেষ হয়ে যাচ্ছে, শেষ হয়ে যাবে। দুনিয়ার কেউ দেখতে পাচ্ছে না তাদের হৃদয়ের এই কান্না। দেখতে তো একজন পাচ্ছেন যিনি সর্বশক্তিমান। কবে তাঁর দয়া এদের ওপর বর্ষিত হবে, কবে আসবে এদের মুক্তির সোনালি দিন, কান্নার শেষ!

আহমদ মুসার চোখ দিয়েও অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। চোখ মুছে সে বলল, ‘ভাই, আশা ছেড়ো না, আল্লাহ তাঁর বান্দার কোন একান্ত ইচ্ছা সাধারনত অপূর্ণ রাখেন না।’

গাড়ি এই সময় এসে হোটেল পিরেনিজ এর গাড়ি বারান্দায় প্রবেশ করল।

‘ড্রাইভার গাড়ি দাঁড় করিয় পেছন ফিরে বলল, ‘আপনাকে ধন্যবাদ স্যার, আপনার কথা সত্য হোক!’

আহমদ মুসা মিষ্ট হেসে বলর, ‘আমাকে স্যার নয়, ভাই বলবে। এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই।’

‘কিন্তু আমি কি মুসলমান?’

‘তোমার মন মুসলমান।’

কী এক ঔজ্জ্বল্যে ড্রাইভারের মুখ ভরে গেল! কিন্তু রাজ্যের কান্না এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল যেন তার গলায়! সে কথা বলল না। দু’হাতে মুখ ঢেকে মনে হলো নিজেকে সে সংযত করছে।

আহমদ মুসা বাইরে বেরিয়ে এসেছে। সে ঘুরে এসে ড্রাইভারের দরজার কাছে দাঁড়াল। ড্রাইভার বেরিয়ে এলো চোখ মুছতে মুছতে।

আহমদ মুসা পকেট থেকে মানি ব্যাগ বের করল।

তা দেখে ড্রাইভার দুই হাত জোড় করে বলল, ‘আপনি ভাই ডেকেছেন। অনুরোধ করব, টাকা দিয়ে ভাইয়ের গৌরব ম্লান হতে দেবেন না।’

আহমদ মুসা মানি ব্যাগ পকেটে রাখতে রাখতে বলল, ‘টাকা দিচ্ছি না একটা শর্তেই যে, কাল তুমি এই হোটেলে আসবে। আর বলো তোমার না কি?’

ড্রাইভার খুশি হয়ে বলল, ‘অবশ্যই আসব, কি বলে খোঁজ করব? আমার নাম রবার্তো।

আহমদ মুসা একটু ভাবল। তারপর বলল, ‘কাল টিক ন’টায় এসো, আমি রিসিপশনে দাঁড়িয়ে থাকব।’

ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল হোটেল থেকে।

আহমদ মুসাও পা বাড়াল হোটেলের রিসেপশন লাউঞ্জের দিকে।

সূর্য তখনও ওঠেনি। একটা দামি শেভ্রলেট গাড়ি এসে থামল হোটেল পিরেনিজ এর গাড়ি বারান্দায়।

গাড়ি থেকে নামল ফিডেল ফিলিপ ও মারিয়া।

ফিলিপকে চেনার উপায় নেই। মুখে বিরাট গোঁফ এবং মাথায় বড় বড় চুল। ছদ্মবেশ নিয়েছে ফিলিপ। ছদ্মবেশ না নিয়ে সে রাস্তায় বেরোয় না। যদিও

সরকারে সাথে বাস্ক গেরিলাদের একটা সমঝোতা হয়েছে, তবু সরকার সুযোগ পেলে তাকে সরিয়ে দিতে ছাড়বে না, এটা সবাই জানে।

স্বয়ং হোটেল মালিক মি. আলেকজান্ডার সেসনারোসা গাড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন। ফিলিপরা গাড়ি থেকে নামরে তাদের তিনি স্বাগত জানালেন এবং ভেতরে নিয়ে চললেন।

'কোথায় উনি?' হাঁটতে হাঁটতেই জিজ্ঞাসা করল ফিলিপ আলেকজান্ডারকে।

'উনি এসেছেন রাত এগারটায়। সরকারের রিজার্ভড পাঁচটি স্যুট ছাড়া আর কোন স্যুট, কেবিন কিছুই খালি ছিল না। আমাদের ফ্যামিলি স্যুটটাই তাঁকে দিয়েছি।'

ফিলিপ থমকে দাঁড়িয়ে আলেকজান্ডারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তাঁকে তার উপযুক্ত মর্যাদা দিয়েছেন।'

আবার হাঁটতে লাগল তারা।

'তাঁর পরিচয়টা কিন্তু দেননি।' বলল আলেকজান্ডার।

'বলব, চলুন। এইটুকু জেনে রাখুন তিনি বিশ্বের একজন মহান বিপ্লবী। তার সংগ্রাম ও সাফল্যের কাছে আমরা শিশু।'

ফিলিপরা সবাই তৃতীয় তলায় আলেকজান্ডারের স্যুটে এসে বসল।

আহমদ মুসা রয়েছে ৩১ তম তলায়।

'মারিয়া, ওকে টেলিফোন কর। বলো আমরা আসছি।' বলল ফিলিপ।

মারিয়া উঠে টেলিফোন ডেস্কে গেল।

'ক'দিন খুব উদ্বেগে কেটেছে আলেকজান্ডারের। ওর কিছু হলে সারা জীবন দুঃসহ এক বেদনায় জর্জরিত হতে হতো।'

মারিয়া ফিরে এলো ডেক্স থেকে। বলল, 'নো রিপ্লাই হচ্ছে।'

বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলল ফিলিপ! 'উনি তো এ সময় ঘুমান না!' বলল ফিলিপ।

'অসম্ভব ভাইজান, উনি এ সময় ঘুমাতে পারেন না।'

ফিলিপ উঠে গিয়ে আবার টেলিফোন করল। নো রিপ্লাই আগের মতোই।

ফিলিপ উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘চল, ব্যাপারটা আমার কাছে ভালো লাগছে না।’

লিফটে গিয়ে উঠল তারা তিনজন। আলেকজান্ডার বলল, ‘ঘুমিয়েও থাকতে পারেন। কাল যখন তাঁকে দেখেছি, খুব টায়ার্ড মনে হয়েছে। গোটা গা ছিল ধূলিধূসরিত।’

‘কিছু বলেছিলেন আপনাকে?’

‘আমি যখন স্যুট, কেবিন খুঁজতে ব্যস্ত, তিনি বললেন, আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমার একটু বিশ্রাম প্রয়োজন, সেটা করিডোর হলেও আমার আপত্তি নেই। তার এ কথার পর আমি আর দেরি করিনি, আমার ফ্যামিলি স্যুটটাই দিয়ে দিয়েছি।’

চোখ দু’টি ভারি হয়ে উঠল মারিয়ার। মুখ নিচু করল সে। ভাবল, আহমদ মুসার মতো শক্ত মানুষ কেমন অবস্থায় পড়লে করিডোরে হলেও বিশ্রাম নেবার প্রস্তাব করতে পারেন।

আহমদ মুসার স্যুটের দরজায় এসে দাঁড়াল তারা তিনজন।

দরজায় নক করল ফিলিপ। একবার নয় তিনবার। কোন সাড়া সেই ভেতর থেকে।

ফিলিপ শুকনো মুখে তাকাল আলেকজান্ডারের দিকে।

‘ঘুমিয়ে থাকতে পারেন, আমার কাছে মাষ্টার কি আছে, খুলব দরজা?’

মাথা নেড়ে সম্মতি দিল ফিলিপ।

আলেকজান্ডার দরজা খুলল। প্রথমে ঘরে ঢুকল ফিলিপ, তার পেছনে আলেকজান্ডার। সবার পরে মারিয়া। মারিয়ার বুক দুরুদুরু করছে।

বিছানায় শোয়া আহমদ মুসার দিকে চোখ পড়তেই অনেকখানি আশ্বস্ত হলো মারিয়া।

চিৎ হয়ে চোখ বুজে শুয়ে আছে আহমদ মুসা। মনে হয় গভীর ঘুমে, কিন্তু তার মুখটা লাল।

ফিলিপ এগিয়ে গিয়ে গায়ে হাত দিয়েই চমকে উঠল। বলল, ‘উঃ গা পুড়ে যাচ্ছে!’

গায়ে হাত রাখল আলেকজান্ডারও। বলল, ‘ভয়ানক জ্বর ফিলিপ। ডাক্তার ডাকতে হবে।’

বলে আলেকডান্ডার দ্রুত সরে এলো টেলিফোনের কাছে।

ফিলিপ হাত বুলাতে লাগল আহমদ মুসার আগুনের মতো কপালটায়।

‘ওঁর তো জ্ঞান আছে ভাইয়া?’ বলল মারিয়া।

এই সময় আহমদ মুসা চোখ খুলল। চোখ খুলেই দেখল ফিলিপকে, তারপর দাঁড়ানো মারিয়াকে। ঠোঁটে তার হাসি ফুটে উঠল। উঠে বসতে চেষ্টা করল আহমদ মুসা। মাথাটা তুলেই ‘আঃ’ বলে চিৎকার করে উঠল সে, মাথাটা আবার তার বালিশে পড়ে গেল। যন্ত্রণায় তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল।

আবার চোখ বুজে গেল আহমদ মুসার।

‘কি হয়েছে মুসা ভাই আপনার, কোথাও আঘাত?’ মাথায় হাত বুলিয়ে বলল ফিলিপ।

ডাক্তার এসে ঘরে প্রবেশ করল। ফিলিপ একটু সরে বসল।

ডাক্তার জ্বর পরীক্ষা করে গা থেকে কম্বল সরিয়ে গোটা শরীর পরীক্ষা করতে লাগল। ‘গোটা গা নয়, ডাক্তার। আঘাতের কারণে যদি জ্বরটা হয়ে থাকে তাহলে সেটা মাথায় ও বাম কাঁধে।’ নরম কন্ঠে বলল আহমদ মুসা।

মাথা ও ঘাড় পরীক্ষা করল ডাক্তার।

‘মাথা ও ঘাড়ে কি যন্ত্রনা আছে?’ বলল ডাক্তার।

‘যন্ত্রণা নেই, তীব্র ব্যধা।’

‘ঈশ্বর রক্ষা করেছেন, ফ্যাকচার হয়নি। জায়গা দু’টো ভয়ানক থেঁতলে গেছে।’

ডাক্তার একটু থামল। একটু থেমেই আবার শুরু করল, ‘আঘাতটা কোন ভোঁতা অস্ত্রে হয়েছে, কিসের আঘাত?’

‘মাথার আঘাতটা স্টিল শিটের, ছাদ থেকে বড় একটা স্টিল শিট মাথায় পড়েছিল। কাঁধে পেয়েছিলাম লোহার রডের আঘাত। গত সন্ধ্যায়।’

‘রাতে ওষুধ খেলে কিন্তু অনেক সুস্থ থাকতেন।’

‘রাত ১১টা পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছি, কিছুই বঝিনি। শুতে গিয়ে বুঝলাম বড় ধরনের আঘাত খেয়েছি।’

‘ঠিক আছে, সব ঠিক হয়ে যাবে।’ বলে উঠে দাঁড়াল ডাক্তার। যেতে যেতে বলল, ‘আমি ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি। জ্বর, ব্যথা কমে যাবে।’

‘প্লিজ ডাক্তার, আগামী কাল আমি বাইরে বেরুতে চাই। আপনি দয়া করে ব্যবস্থা করুন।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আমরা ওষুধ দিই, রোগ ভালো করেন ঈশ্বর। তাকে বলুন।’ বলে হেসে বেরিয়া গেল ডাক্তার।

ডাক্তার চলে যেতেই আহমদ মুসার কাছে সরে এলো ফিলিপ ও মারিয়া।

‘আপনার অন্তত ৭দিন বিশ্রাম নিতে হবে। কোথাও বেরুবার পরিকল্পনা বাদ দিন।’ গম্ভীর কন্ঠে বলল মারিয়া।

‘আমি সময় দিতে রাজী, কিন্তু ষড়যন্তকারীরা কি সময় দেবে মারিয়া?’

মারিয়ার মুখ ভর করে কিছু বলতে যাচ্ছিল, ফিলিপ বাধা দিয়ে বলে উঠল, ‘এসব কথা থাক। আগামীকাল আসুক দেখা যাবে। আমার জানতে কৌতূহল হচ্ছে মুসা ভাই, ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের মৃত্যুপুরী থেকে কি করে বেরুলেন? ওখানে যে গেছে, কেউ আর ফিরে আসতে পারেনি। গত ৫শ’ বছরের ইতিহাস এটা ঐ মৃত্যুপুরীর।’

‘সেখানে ছিলাম আমি কি করে জানলে?’

‘আমরা ঐদিনই ড্রাইভারের কাছ থেকে খবর পেয়েছিলাম, আপনি ওদের হাতে ধরা পড়েছেন। পরদিনই আমি ও মারিয়া চলে আসি মাদ্রিদে। সেদিন থেকেই আমরা জানতে পারি কার্ডিনাল হাউজের ভূগর্ভের জিন্দানখানায় আপনাকে রেখেছে। এ খবর আমাদের হতাশ করে। সবাই আমরা জানি, অত্যন্ত কঠিন জায়গা ওটা। সর্বশেষ স্থান ওটা। অবশেষে গতকালই আমরা ভাসকুয়েজকে পণবন্দী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।’

‘ঠিক বলেছ ফিলিপ, কঠিন জায়গা ওটা। আমার গোটা জীবনে এমন সুচিন্তিত বেষ্টনীর মধ্যে পড়িনি।’

'ঐ মৃত্যুপুরীর ভয়ংকর অনেক কথা আমরা শুনেছি, ওর প্রকৃতি আমরা জানি না। বলুন কি দেখেছেন, কিভাবে বেরুলেন!'

আহমদ মুসা ধীরে ধীরে গোটা কাহিনী ওদের শোনাল। তারপর বলল, 'তোমরা ভাসকুয়েজকে পণবন্দী করেও আমাকে পেতে না। আমাকে এতক্ষণ আকাশে উড়তে হতো আমেরিকার পথে। স্প্যানিশ ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান আমাকে এক বিলিয়ন ডলারে বিক্রি করেছিল আমেরিকান ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের হাতে।'

মুখ হাঁ হয়ে গিয়েছিল ফিলিপের।

কেঁপে উঠেছিল মারিয়া।

'আমেরিকার ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান এক বিলিয়ন ডলারে আপনাকে কিনবে কেন?' বলল ফিলিপ।

'তারা মনে করে আমার কাছ থেকে ইসলামী বিশ্বের অনেক মুল্যবান তথ্য পাবে। তাছাড়া আমাকে পণবন্দী সাজিযে ইসলামী সরকারগুলোর কাছ থেকে বহু বিলিয়ন ডলার কামাই করতে পারবে। সবশেষে আমাকে হত্যা করে তারা অনেক পরাজয়ের প্রতিশোধ নিত।'

ফিলিপ ও মারিয়া উভয়েরই মুখ বিস্ময় ও বেদনায় বিবর্ণ!

'আপনার এত বিপদ, আপনার এত শত্রু!' কাঁপছিল মারিয়ার গলা।

'এরা আমার শত্রু নয় মারিয়া, এরা মুসলমানদের শত্রু। মুসলমাসদের জন্যে আমি কিছু করি বলে তারা আমার অস্তিত্ব বরদাশত করতে পারে না।' হেসে বলল আহমদ মুসা।

'আপনার একা বেরুনো আর ঠিক নয়। সেদিন আপনাকে একা ছেড়ে দেয়া আমাদের ঠিক হয়নি।'

'সেদিন আমার সাথে আর একজন থাকলে কি হতো, দু'জনেই ওদের হাতে পড়তাম। আসলে মারিয়া, আমি তো কখনই একা থাকি না। আল্লাহ তো সাথে থাকেন! তাঁর সাহয্য না হলে গতকাল ঐ মৃত্যুপুরী থেকে বের হতে পারতাম না।'

ওষুধ এলো এ সময়। মারিয়া বেয়ারার হাত থেকে ওষুধ নিয়ে প্রেসক্রিপশনের ওপর নজর বুলাল। তারপর ওষুদের মধ্যে থেকে একটা ট্যাবলেট

ও একটা ক্যাপসুল বেছে নিয়ে অন্য ওষুধগুলো টেবিলে রেখে দিল। এক গ্লাস পানি নিয়ে এগোলো আহমদ মুসার দিকে। ফিলিপকে বলল, 'ভাইয়া, ওনার মাথা একটু তুলে ধর।'

ওষুধ খাইয়ে দিল মারিয়া।

'মারিয়া, তুমি একটু লাউঞ্জে গিয়ে দেখ রবার্তো এসেছিল কিনা। তাকে ওপরে পাঠিয়ে দাও। সে দরজায় পাহারায় থাকবে। তারপর তুমি বাসা থেকে ঘুরে এসো একটু, কিছু খবর আসার কথা আছে। হেডকোয়ার্টার থেকে।' বলল ফিলিপ।

'মারিয়া, রিসেপশনকে বলো, রবার্তো নামের এই রকম চেহারার একজন লোক ঠিক ৯টায় সেখানে আসবে। তাকে এখানে পাঠিয়ে দিতে বলবে।' বলল আহমদ মুসা।

মারিয়া দরজার দিকে পা বাড়াতে বাড়াতে বলল, 'ভাইয়া, ওকে বাসায় নেয়া সবদিক থেকে নিরাপদ।'

'আমারও এই মত।' বলল ফিলিপ।

'ধন্যবাদ ভাইয়া।' বলে দরজার দিকে হাঁটতে শুরু করল মারিয়া।

# ৬

জোয়ানের গেটের সামনে এসে হর্ন দিল জেন। কিন্তু গেট রুম থেকে দারোয়ান বেরুল না কিংবা গেট খুলতে কেউই এলো না।

অবশেষে নিজেই গেট খোলার জন্যে গাড়ি থেকে নামল জেন।

কিন্তু গেটের দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেটের ওপর চোখ পড়তেই চমকে উঠল জেন্। গেটে এক বিশাল তালা ঝুলছে।

ভীষণ বিস্মিত হলো জেন! জোয়ানের গেটে তো কোনদিন তালা থাকে না! তবে গেটের দারোয়ান কি চলে গেছে? চলে গেছে বলেই কি এই তালা?

গাড়িতে ফিরে এসে জোরে জোরে হর্ন বাজাল।

অবশেষে মোটা মতো একজন লোক বেরিয়ে এলো বাড়ি থেকে। জেন তাকে চেনে না, কোনদিন দেখেনি এ বাড়িতে। বিরক্তি ভরা তার মুখ।

এসে গেটের ওপারে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞেস করল, 'কাকে চাই?'

'গেট খুলুন।' বলল জেন ক্ষোভের সাথে।

'কাকে চাই?' আবার প্রশ্ন লোকটির।

'জোয়ান বাসায় নেই?' বিরক্তি ভরা কন্ঠে বলল জেন।

'জোয়ানরা এ বাসায় থাকে না।'

'কি বলছেন আপনি, এটা জোয়ানদের বাড়ি! জেনের কন্ঠে উদ্বেগ।

'ঠিক এটা জোয়ানদের বাড়ি, কিন্তু এখন নেই।'

কেঁপে উঠল জেন। তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল! তার মুখ থেকে কোন শব্দ বেরুতে পারল না। শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল লোকটির দিকে। লোকটি বুঝল ব্যাপারটা।

সে তার আগের কর্কশ কন্ঠটা নরম করে এনে বলল, 'আপনি এখনও জানেন না দেখছি! জোয়ানরা মরিসকো তো, তারা কোন জমি কিনতে পারে না।

কিন্তু পরিচয় ভাঁড়িয়ে কিনেছিল। পরিচয় প্রকাশ হবার পর তাদের বাড়ি ও সম্পত্তি কেড়ে নেয়া হয়েছে।'

জেনের মাথা ঘুরছিল। টলছিল তার দেহ। কোন রকমে স্খলিত পায়ে গাড়ির কাছে এসে গাড়িতে গিয়ে বসল সে।

জেনের কাছে দুনিয়াটা ছোট হয়ে যাচ্ছে। অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে পরিচিত সব কিছু।

চোখ বুজল জেন। গাড়ির সিটে গা এলিয়ে দিল সে। দেহের সব শক্তি তার যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে!

গেট খোলার শব্দে চোখ খুলল জেন। দেখল জোয়ানদের কাজে মেয়েটা বেরিয়ে আসছে। কিন্তু খুশি হলো না সে। জানে সে, জোয়ানরা মরিসকো বলে এ মেয়েটা কাজ করতে আসা বন্ধ করেছিল! জোয়ানরা চলে যাবার পর তাহলে এসেছে।

মেয়েটা এসে গাড়ির জানালায় দাঁড়াল। বলল, 'জোয়ানদের খুঁজছেন?'

'ওরা কোথায়?' কষ্টে উচ্চারণ করল জেন।

'জোয়ানের মামার বাসা তো আপনি চেনেন। সে বাসার পুব পাশের ফ্ল্যাট বাড়ির নিচের ফ্ল্যাটটাতে গিয়ে ওরা উঠেছেন।'

জেন কিছু বলল না।

সেই আবার বলল, 'ওরা মরিসকো বলে সমাজের লোকদের ভয়ে শেষে ওদের কাজ করতে পারিনি, কিন্তু ওদের মতো লোক হয় না। আহা সেকি কান্না জোয়ানের মা'র! যাওয়ার সময় আমি ছিলাম ওদের সাথে।

চোখ মুছতে লাগল মেয়েটি।

কোন কথা বলতে পারল না জেন। বুক থেকে উঠে আসা একটা ঝড়কে দাঁতে দাঁত চেপে রোধ করার চেষ্টা করে জেন গাড়ি ঘুরিয়ে নিল।

জোয়ানের সাথে তার মামার বাড়ি অনেকবার এসেছে জেন। জেন গাড়ি চালিয়ে জোয়ানের মামার বাসার সামনে পৌঁছল। গাড়ি নিয়ে দাঁড় করাল তার পুব পাশের ফ্ল্যাট বাড়িটির সামনে।

জেন গাড়ি থেকেই দেখল, নিচের দুই দুইটি ফ্ল্যাট। পশ্চিম দিকের ফ্ল্যাটে 'টু-লেট' নোটিশ তাহলে পূর্ব দিকেরটাই হবে।

গাড়ি থেকে নামল জেন। এগোলো ফ্ল্যাটের দিকে।

দরজা বন্ধ। দরজায় নক করল জেন।

দরজা খুলে গেল।

দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে জোয়ানের মা। জেনকে দেখে সে বিস্মিত হয়েছিল। বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই তার চোখ দু'টি ছল ছল করে উঠল। মুখ তার শুকনো।

বুক থেকে উঠে আসা যে ঝড়কে জেন এতক্ষণ দাঁতে দাঁত চেপে আটকে রেখেছিল, তা এবার বাঁধ ভাঙ্গল।

জেন 'মা' বলে চিৎকার করে পাগলের মতো জোয়ানের মাকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল।

জেনকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল জোয়ানের মা'ও।

কান্নার শব্দ শুনে জোয়ান পাশের ঘর থেকে ছুটে এলো।

জেন জোয়ানের মা'র বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদছিল। কান্না থামছিল না জেনের।

জেন জোয়ানের মা'র বুক থেকে মুখ তুলল জোয়ানকে দেখল। তারপর জোয়ানের পায়ের কাছে বসে পড়ল। কান্নায় ভেঙে পড়ে বলল, 'এমন কেন হলো? কেন?'

জোয়ান জেনের হাত ধরে টেনে ওঠাতে ওঠাতে বলল, 'চল, বলি।'

শূন্য ঘর জোয়ানদের। কাপড়-চোপড়, সুটকেশ ইত্যাদির মতো কিছু জিনিস ছাড়া বাড়ির কিছুই তাদের নিতে দেয়া হয়নি। সিটি কর্পোরেশনের স্থানীয় কর্মকর্তারা তাদের বলেছে, মরিসকো পরিচয় গোপন করে জমি কেনা, বাড়ি তৈরি ও মানুষকে প্রতারণা করার জন্যে তাদের যে শাস্তি দেয়া হচ্ছে না, তাই-ই তো বড়, সম্পদ-জিনিসপত্রের আর লোভ করা তাদের ঠিক নয়।

ড্রইং রুমে সাধারন কয়েকটা চেয়ার।

সেখানেই গিয়ে বসল জেন ও জোয়ান।

জোয়ানের মা চোখ মুছে বলল, 'তোরা বস জোয়ান। আমি রান্না চড়িয়েছি। জেন, মা আজ কিন্তু খেয়ে যাবে।'

'আজ আমি চেয়েই খেয়ে যেতাম আম্মা।' বলল জেন। তার গলা তখনও স্বাভাবিক হয়নি।

জোয়ানের মা এগিয়ে এসে ঝুঁকে পড়ে জেনের কপালে চুমু খেয়ে বলল, 'তোমার মতো ভালো 'মা' আর নেই।'

রান্না ঘরের দিকে চলে গেল জোয়ানের মা।

জেনের মুখ নিচু।

জোয়ানেরও দৃষ্টি নিচের দিকে।

দু'জনেই নিরব। অস্বাভাবিক এক নিরবতা।

অবশেষে মুখ খুলল জেন। মুখ ভারি করে অভিমান ভরা কন্ঠে বলল, 'এত কিছু হলো, আমাকে কিছুই জানাওনি।'

'তুমি অসুস্থ ছিলে, আর তোমার ওখানে যেতে সাহসও পাইনি।' শান্ত কন্ঠে বলল জোয়ান।

'সেদিন আব্বার কথায় মন খারাপ করেছ না?' কাঁপছে জেনের কন্ঠ।

'না, জেন।'

'সেদিন আব্বার কথার জবাব তুমি দিতে পারতে, কিন্তু দাওনি। আমার কথা তুমি শুনেছ। কষ্ট হয়েছে তাতে তোমার। তুমি আমাকে মাফ কর।'

'তুমি এসব ভেবে অযথা কষ্ট পাচ্ছ জেন, ঐসব কথায় আমি আর কষ্ট পাই না। তোমাকে বলেছি, মরিসকো পরিচয় এখন আমার কাছে পরম গৌরবের।'

'তোমাকে একটা বড় খবর দেব জোয়ান।'

'কি খবর?'

'তুমি খুব খুশি হবে সে খবরে।'

'আমি খুব খুশি হবো এমন কি খবর? বিশ্ববিদ্যালয়ের?'

'না, তোমার চিন্তা ওদিকে যাবেই না, এমন খবর। সাংঘাতিক খবর!' হাসতে হাসতে বলল জেন।

‘দেখ, এ ধরনের খবর নিয়ে এত দেরি করা চলে না।’

‘আহমদ মুসাকে চেন?’

‘কোন আহমদ মুসা?’

‘সেই বিপ্লবী নেতা আহমদ মুসা!’

’চিনব না কেন তাকে? কত পড়েছি তার কথা! তিনি আমাদের মতো মজলুম মুসলিমদের আশা-ভরসার স্থল।’

‘তাঁকে আমি দেখেছি।’

‘দেখেছ!‘ বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল জোয়ানের মুখ।

‘আমি তার সাথে কথা বলেছি।’ জেনের মুখে জগৎ জয়ের হাসি!

‘তুমি তার সাথে কথা বলেছ। তুমি জেগে কথা বলছ তো?’ জোয়ানের কন্ঠে বিদ্রুপের সুর।

‘হ্যাঁ গো, হ্যাঁ, জেগে কথা বলছি। গতরাত সাড়ে দশটায় আমার বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমি কথা বলেছি।’

‘জেন, আমাকে অন্ধকারে রেখ না, ব্যাপার কি বলো? আমি কিছু বুঝতে পারছি না।’ জোয়ানের কন্ঠে এবার অনুনয়ের সুর।

জেন গম্ভীর হলো। ধীরে ধীরে সে আহমদ মুসা কিভাবে কার্ডিনাল হাউজ থেকে তার গাড়ি নিয়ে যায়, কিভাবে রাত সাড়ে দশটায় তা আবার ফেরত দিয়ে যায়, আহমদ মুসার কি কি কথা, জেন তাকে কি কথা বলেছিল। সব বলল। কথা শেষ করল জেন।

পলকহীন জোয়ান তাকিয়ে আছে জেনের দিকে। বিস্ময় উত্তেজনায় তার বাকরোধ হয়ে গেছে!

কিছুক্ষণ পর জেনই জোয়ানের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, ‘বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?’

‘অবিশ্বাস নয় জেন, আমি ভাবছি, আহমদ মুসা স্পেনে এসেছেন, কেন? ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান জানল কি করে, আটকই বা করল কেন?’

‘ওসব বড় বড় কথা আমি জানি না জোয়ান। তবে গতরাতে আব্বার কাছে থেকে গল্পে শুনেছি, ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান বাস্ক গেরিলাদের একটা মেয়েকে

বিমান বন্দর থেকে কিডন্যাপ করে। আহমদ মুসা সেখানে হাজির ছিলেন এবং মেয়েটিকে উদ্ধার করে পালিয়ে যেতে সমর্থ হন আহমদ মুসা। পরে ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান আহমদ মুসাকে বন্দী করতে সমর্থ হয়? তাকে সবচেয়ে নিরাপদ কার্ডিনাল হাউজের মাটির তলায় বন্দীখানায় এনে বন্দী করে রাখে।'

একটু থামল জেন। একটা ঢোক গিলে আবার শুরু করল, 'আহমদ মুসা পালাবার কিছুক্ষণ আগেও ভাসকুয়েজ আমাদের বলেছেন, আজ ভোরেই তারা এক বিলিয়ন ডলার পাচ্ছেন আহমদ মুসাকে আমেরিকান ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের হাতে তুলে দেবার বিনিময়ে। ভাল ঘোল খেয়েছে ভাসকুয়েজ।' বলে হাসতে লাগল জেন।

জোয়ানের মুখে কিন্তু হাসি নেই। বলল, 'ভাসকুয়েজের আশা ঠিকই জেন। ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের একজনের কাছ থেকে গল্প শুনেছিলাম, কার্ডিনাল হাউজরে বন্দীখানা থেকে কোন মানুষের পালানো সম্ভব নয়। ইতিপূর্বে যারাই পালাতে চেষ্টা করেছে তারাই মারা পড়েছে যন্ত্রদানবের হাতে, বন্দীখানার দরজা থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই।'

'ঠিক বলেছ জোয়ান। তাই হবে। আহমদ মুসার পালাবার পর ভাসকুয়েজ আব্বার সাথে কথা বলছিলেন। আহমদ মুসার পালাবার কাহিনী বর্ণনা করে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, 'কোন মানুষ এভাবে পালাতে পারে তা অকল্পনীয় ছিল।'

'সে কাহিনীটা কি জেন?' উন্মুখ কন্ঠে জিজ্ঞেস করল জোয়ান।

জেন ভাসকুয়েজের কাছে শোনা কাহিনীটা বলল জোয়ানকে।

জোয়ান কাহিনীটা শুনে নিজেকে হারিয়ে ফেলার মতো শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, 'ভাসকুয়েজ ঠিকই বলেছে এমন পালানো ব্যাপারটা সত্যিই অকল্পনীয়!'

একটু থেকেই জোয়ান আবার বলল, 'আজকের দুনিয়ায় তার সাহস, শক্তি ও বুদ্ধির সত্যিই তুলনা নেই জেন।'

'কিন্তু জোয়ান, তোমরা যাই বলো, ওর হৃদয়টাই সবচেয়ে বড়, নীতিবোধের দিক থেকেও তিনি মহত্তম। একজন বিপ্লবী, বন্দুক যার হাতের খেলনা, রক্ত নেয়া ও রক্ত দেয়াই যাঁর নিত্যদিনের কাজ এবং যিনি আবার এমন

বিপদগ্রস্তও, তিনি কিভাবে বিপদের ভয় উপেক্ষা করে শুধু নীতিবোধের কারণে গাড়ি ফেরত দিতে আসতে পারেন এবং না বলে কিছু কেক ও জুস খাওয়ার জন্যে মাফ চাইতে পারেন! এমন বিপ্লবী যিনি, তার কাছে জীবনের চেয়ে নীতিবোধই বড়। আহমদ মুসা, আমি বুঝেছি, সে ধরনেরই একজন বিপ্লবী।'

জোয়ান অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল জেনের দিকে। বলল, 'ধন্যবাদ জেন, আমি কিন্তু ব্যাপারটাকে ঐভাবে উপলদ্ধি করতে পারিনি। তুমি ঠিকই বলেছ, বিপ্লবী আহমদ মুসার চেয়ে নীতিবান আহমদ মুসা অনেক বড়। এদিক দিয়ে আমার মনে হয় আহমদ মুসার কোন জুড়ি নেই। লেনিন বলো, মাওসেতুং বলো, হোচিমিন বলো কিংবা গুয়েভারাই বলো সবাই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নীতিকে বলি দিয়েছেন, নীতিকে জীবনের চেয়ে বড় করে দেখা তো দূরের কথা!' থামল জেন।

একটু পর জেন উঠে দাঁড়িয়ে ওপাশের ঘরের দিকে উঁকি দিল। তারপর বলল, 'জোয়ান, তুমি একটু বস, দেখে আসি আম্মা কী করছেন।'

বলে দৌড়ে সে চলে গেল রান্না ঘরের দিকে।

জোয়ানও উঠে দাঁড়াল।

ঘড়ির দিকে একবার চোখ বুলিয়ে একটু এগিয়ে রান্না ঘরের দিকে মুখ বাড়িয়ে বলল, 'জেন তাহলে তুমি বস, আমি একটু বাইরে থেকে আসছি।'

জোয়ানের মা রান্না ঘর থেকে বলল, 'এসে দেখ জোয়ান, জেনের কান্ড। আমাকে কিছু করতে দিচ্ছে না।'

'ঠিক আছে আম্মা, ওকে একটু কষ্ট করতে দাও।' বলে হাসতে হাসতে বেরিয় এলো জোয়ান বাসা থেকে।

টেবিলে খাবার সাজিয়ে জেন জোয়ানের খোঁজে এসে দেখল জোয়ান শুয়ে আছে কপালে হাত দিয়ে।

'ভাবছ কিছু?' পাশে বসে বলল জেন।

'ভাবছি তোমার কথা। তোমার আব্বার সে দিনের কথা শুনেছ। তুমি এখানে এসেছ শুনলে তিনি কি যে করবেন!'

‘সে ভাবনা আমার, তোমাকে ভাবতে হবে না।‘ একটু থামল জেন। তারপর আবার বলল, ‘তুমি তো আমাকে বলনি, তুমি কার্ডোভা যাচ্ছ?’

‘বলার সময় তো পাইনি জেন।’ বলল জোয়ান।

‘কেন যাচ্ছ কার্ডোভা?’

‘শুধু কার্ডোভা নয়, প্রথমে কার্ডোভা, তারপর গ্রানাডা, এই স্মৃতি-বিজড়িত সব জায়গা ঘুরে আসব।’

‘ভালই হলো।’

‘কি ভালো হলো?’

‘আমরাও কার্ডোভা যাচ্ছি।’

‘আমরা মানে তুমি আর কে?’

‘আমি, আম্মা ও আব্বা।’

‘কেন?’

‘আব্বার কি কাজ আছে যেন! কিন্তু আমরা যাচ্ছি আমার খালাত বোনের বিয়েতে।’

‘তোমরা কবে যাচ্ছ?’

‘তুমি কবে যাচ্ছ?’

‘আমি বৃহস্পতিবারে যাচ্ছি।’

‘বারে কি কান্ড, আমরাও তো বৃহস্পতিবারেই যাবো ঠিক করেছি।’

‘এভাবে সব মিলে গেল কি করে?’

‘আমার ভাগ্য জোরে।’

‘না, আমার ভাগ্য জোরে?’

‘ঠিক আছে, দু’জনের ভাগ্য জোরে। এবার খাবে, চল।’ হেসে বলল জেন।

‘না, আকেটি কথা।’

‘কি কথা?’

‘তোমরা তো তোমাদের গাড়িতে যাচ্ছ।’

‘হ্যাঁ, তুমিও তো।’

‘আমার গাড়ি কোথায়?’ ম্লান হেসে বলল জোয়ান।

‘কেন, ওরা তোমার গাড়িও তোমাকে দেয়নি?’ ভারি কন্ঠে বলল জেন।

আমার কোন দুঃখ নেই জেন। আগের জোয়ানের সব চিহ্ন এভাবে আমার জীবন থেকে মুছে যাক।’

তৎক্ষণাৎ কোন কথা বলল না জেন। তার মুখটা ম্লান। জোয়ানের মুখের দিকে চাইতে পারছিল না যেন! মুখ নিচু রেখেই বলল, ‘কিসে যাচ্ছ?’

‘সেটা কোন ব্যাপার নয়, আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছিলাম, সেটা হলো ওখানে আমাদের কোথায় দেখা হবে।’

‘কোথায় তুমি বলো।’

কার্ডোভার গোয়াদেল কুইভার ব্রীজে আমি প্রতিদিন বিকেলে থাকব।’

আমারও জায়গাটা খুব পছন্দ।’

খাবার ঘর থেকে জোয়ানের মা’র কন্ঠ শোনা গেল, ‘আমি বসে আছি তোদের জন্যে জোয়ান।’

জেন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ‘আহা ওঁকে আমরা বসিয়ে রেখেছি। ওঠ।’

জোয়ান উঠে দাঁড়াল। দু’জেনই পা বাড়াল খাবার ঘরের দিকে।

সূর্য অস্ত যাবার তখনও বাকি।

এক খন্ড কালো মেঘ ঢেকে দিয়েছে সূর্যকে।

চারদিকে সন্ধ্যার আগেই নেমেছে সন্ধ্যার বিষণ্নতা।

সেই বিষণ্নতার ছাপ পড়েছে গোয়াদেল কুইভারের বুকে। গোয়াদেল কুইভারের নিরব স্রোত যেন বেদনার অশ্রু। আর তার দু’তীরে দাঁড়ানো কার্ডোভা নগরী যেন বিধ্বস্ত এক মুখচ্ছবি।

গোয়াদেল কুইভারে বয়ে চলেছে সেই বিধ্বস্ত মুখচ্ছবিরই অশ্রুর প্রস্রবণ।

গোয়াদেল কুইভারের তীরে দাঁড়ানো স্পেনে ৮শ’ বছর রাজত্বকারী খলিফাদের প্রাসাদ আল কাজার থেকে যন্ত্রণার বিলাপ উঠছে। সে প্রাসাদ মৃদু বিধ্বস্ত-উলংগ নয়, অপমানের আগুনে দগ্ধ করার জন্যে তাকে বানানো হয়েছে জেলখানা।

আল-কাজারের অল্প দূরে এক ফোঁটা তপ্ত অশ্রুর মতো দাঁড়িয়ে আছে কর্ডোভার বড় মসজিদ। ১২৯৩টি স্তম্ভ, যাকে ষ্ট্যানলি লেনপুলও স্তম্ভ অরণ্য বলে অভিহিত করেছেন, এর ওপর দাঁড়ানো যে মসজিদটির বুক আবৃত থাকতো ৪৭ হাজার ৩শ কার্পেটে, যার বুক আলোকিত করতে ১০ সহস্র আলোক শিখা, তার সুউচ্চ মিনার আজ ভগ্ন, দরজা-জানালা লুন্ঠিত, দেয়াল-গাত্রের সৃদৃশ্য পাথর অপসৃত, মেঝে ক্ষত-বিক্ষত, তার সমগ্র বুকটি জমাট অন্ধকারে আবৃত, মুয়াজ্জিন নেই, আজানের অনুমতিও নেই, নামাজী নেই, নামাজীদের পদক্ষেপও সেখানে নিষিদ্ধ। আসন্ন সন্ধ্যার বিষণ্ন অন্ধকারে মুখ গুঁজে ক্ষত-বিক্ষত দেহ আর হৃদয়ের অসীম যন্ত্রণা নিয়ে মসজিদটি যেন গুমরে কাঁদছে! এই কান্নার রোল উঠছে দশ মাইল দীর্ঘ কর্ডোভার ২ লাখ ৬০ হাজার বিশ্বস্ত ভবনের অন্তরদেশ থেকেও।

গোয়াদেল কুইভারের সেতুতে দাঁড়ানো আহমদ মুসার দু’কান দিয়ে মর্মে প্রবেশ করছে সেই কান্নার রোল। এক তীব্র যন্ত্রণা দলিত মথিত করছে তার হৃদয়কে, সমগ্র সত্তাকে। যে কান্না সে শুনতে পাচ্ছে কর্ডোভার কন্ঠ থেকে তা তো শুধু কার্ডোভার নয়, গোটা স্পেন থেকেই উঠছে কান্নার করুণ আর্তনাদ। ৫শ’ বছর ধরে অসহায় মুসলমান যারা কেঁদে কেঁদে শেষ হয়ে গেছে তাদের সবার অশ্রু-বিলাপ ধ্বনি আর দীর্ঘশ্বস মিশে আছে স্পেনের বাসাসে এবং তার অসংখ্য বালুকণায়। তারা সবাই আজ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কর্ডোভার বড় মসজিদের ভাঙা মিনারের অশ্রুধারার মধ্য দিয়ে তাদের সবাইকেই আহমদ মুসা দেখতে পাচ্ছে।

অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল আহমদ মুসার চোখ দিয়ে। গোয়াদেল কুইভার সেতুর রেলিংয়ে কনুই দু’টি ঠেস দিয়ে আহমদ মুসা এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল গোদেল কুইভার নদীর তীরে দাঁড়ানো কর্ডোভার দিকে। তার স্বপ্নের কর্ডোভাকে আজ সে প্রথম দেখল। কর্ডোভার সামনে দাঁড়িয়ে আহমদ মুসা হারিয়ে ফেলেছে নিজেকে।

সে দেখতে পাচ্ছে কর্ডোভার অতীতকে, কর্ডোভার মধ্য দিয়ে স্পেনের মুসলিম অতীতকে। সমগ্র ইউরোপ অজ্ঞতার অন্ধকারে যখন নিমজ্জিত, তখন মুসলমানদের হাতে প্রজ্বলিত জ্ঞানের শিখায় স্পেন ছিল সূর্যকরোজ্জ্বল মধ্যদিনের মতো দেদীপ্যমান। স্ট্যানলি লেনপুল (Moors in Spain)-এর ভাষায় 'খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর কথা। তখন আমাদের স্যাকসন পূর্বপুরুষগণ কদর্য কুটিরে বসবাস করতেন, তখন আমাদের ভাষা গঠিত হয়নি; লেখা-পড়া প্রভৃতি অর্জিত গুণাবলীও অত্যল্প সংখ্যক মঠাধ্যক্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, ইউরোপ তখন বর্বরোচিত অজ্ঞতা ও অসভ্যোচিত আচার-ব্যবহারে নিমগ্ন ছিল, আন্দালুসিয়ার রাসধানী (কর্ডোভা) সে সময় বিস্ময়কর বৈসাদৃশ্যের পরিচয় দেয়।' এ কর্ডোভা নগরীতেই তখন ৩৫০টি হাসপাতাল ও ৮০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। অসভ্য ইউরোপীয়রা যখন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বুঝত না এবং পানি স্পর্শ না করাকেই কৃতিত্বের মনে করতো, তখন এক কর্ডোভাতেই ছিল ৯০০টি পাবলিক হাম্মামখানা জনগনের গোসলের জন্যে। কর্ডোভাতে যখন মানুষ সরকারী বাতির আলোকে উজ্জ্বল রাস্তায় আনন্দে চলাফেরা করত, তার সাতশ' বছর পরেও লন্ডনের রাস্তায় সরকারী বাতি জ্বলেনি। ইউরোপ যখন বিদ্যালয় কাকে বলে জানতো না, তখন স্পেনের মুসলিমরা জ্ঞান চর্চার জন্যে যে অগণিত বই ব্যবহার করতো তার নামের তালিকাটাই ছিল ৪৪ খন্ডে বিভক্ত। তাতে হেনরী স্মীথ ইউলিয়ামস বলেছেন, 'মুসলমানরাই স্পেনকে সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল করেছে, তারা স্প্যানিশদের শিল্পকলা, দর্শন, চিকিৎসা বিজ্ঞান, অংক ও জ্যোতির্বিদ্যা।'

এই মুসলমানদেরকে সীমাহীন বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। এই বর্বরতার চিহ্ন পাওয়া যায় সমগ্র স্পেনে, পাওয়া যায় মালাগা, গ্রানাডা, শেভিল প্রভৃতি অসংখ্য শহরে, সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় কার্ডোভায় এলে। আহমদ মুসা সেই কর্ডোভাকেই দেখছে অশ্রুসজল চোখে।

হঠাৎ আহমদ মুসার কনুই -এর চাপে ব্রীজের রেলিং এর এক টুকরো আস্তরণ খসে পড়ল। আহমদ মুসা মনোযোগ আকৃষ্ট ব্রীজের দিকে। ব্রীজে ওঠার সময় সে দেখেছে, ১৭টি খিলানে ওপর দাঁড়িয়ে আছে ব্রীজটি। ভূমিকম্প ও শত সহস্র প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে টিকে আছে হাজার বছরেরও বেশি

কাল ধরে। সে সময়ের মুসলিম ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশলের অতুলনীয় এক সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ব্রীজটি। আহমদ মুসার পলক পড়ছে না, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ব্রীজের দিকে। মনে হচ্ছে তার, সে এক ইতিহাসের অংশ। এক প্রান্তে সে দাঁড়িয়ে, অন্য প্রান্ত চলে গেছে অতীতের বুকে প্রায় তেরশ' বছরের লম্বা পথ ধরে। স্পেনে প্রথম মুসলিম খলিফা আবদুর রহমান, মহামতি তৃতীয় আবদুর রহমান, হাকাম প্রমুখ একদিন এভাবেই হয়তো দাঁড়িয়েছিলেন এই ব্রীজের রেলিং-এ। তারিক বিন যিয়াদ, মু'সা বিন নুসায়েরের মতো সহস্র বীর সেনাধ্যক্ষ ও সৈনিকের স্পর্শ এ ব্রীজের গায়ে ঘুমিয়ে আছে। সহস্র বছর হলো, সোনালি অতীতের সবচেয়ে অক্ষত, সবচেয়ে সক্রিয় এই ব্রীজটি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে মুসলিম কৃতিত্বের জয় ঘোষণা করছে। আহমদ মুসা মুখ নিচু করে তার দু'টি ঠোঁট স্পর্শ করল ব্রীজের গায়ে এবং মনে মনে বলল, স্পেনে মুসলিম সভ্যতা ভেঙে পড়েছে, পড়েছে ভেঙে আল-কাজার ও প্রিয় বড় মসজিদটির সুউচ্চ মিনারও, কিন্তু তুমি ভেঙে পড়নি। আহমদ মুসার দু'ফোঁটা অশ্রুও খসে পড়ল ব্রীজের গায়ে।

আহমদ মুসার মনে হলো ব্রীজটি যেন হঠাৎ কোন কথা বলে উঠল। কথা কান্নায় জড়ানো। বলল, 'তোমার দুই ঠোঁটের আদরের স্পর্শ আমাকে কশাঘাত করেছ, তোমার কথা আমার বুকে শেল বিদ্ধ করেছে। আমি ভেঙে পড়িনি এটা আমার জন্যে অভিশাপ। এই অভিশাপ আমি বয়ে বেড়াচ্ছি আজ ৫০০ বছর ধরে। আল-কাজার বড় মসজিদ- ওদের বুকে শত্রুর পদচারণা নেই, শত্রুরা ওদের ব্যবহার করতে পারেনি, কিন্তু আমি ব্যবহৃত হচ্ছি আমি শত্রুদের পিঠে করে বয়ে বেড়াচ্ছি। আল-কাজার, বড় মসজিদ- ওরা শহীদ, কিন্তু আমি দুর্ভাগা ওদের স্বাথের ঘানি টানছি। তুমি কি পার না বিপ্লবী অতিথি, আমাকে ধ্বসিয়ে দিতে গোয়াদেল কুইভারের বুকে। দু'পাশের শত সাথীর লাশের মিছিলে আমার এই বেঁচে থাকাটা বড় দুঃসহ, বড় দুঃসহ।'

আহমদ মুসার দু'চোখ থেকে ঝর ঝর করে নেমে এলো অশ্রু। ব্রীজের গায়ে মাথা ঠেকিয়ে বলল, 'তোমার বেদনা আমি বুঝেছি, তোমার যন্ত্রণা আমি উপলব্ধি করেছি, কিন্তু তোমার ভেঙে পড়া চলবে না, আরেক তারিক বিন যিয়াদ,

আরেক মুসা বিন নুসায়ের ও আরেক আবদুর রহমানের জন্যে তোমকে অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু কতদিন, সেটা আমি জানি না।'

বলে আহমদ মুসা কান্নায় ভেঙে পড়ল।

ব্রীজের অপর প্রান্ত থেকে তখন দু'টি ছোট্ট পকেট দূরবীনের চারটি চোখ আহমদ মুসার ওপর নিবদ্ধ। এ চারটি চোখ আহমদ মুসার ওপর নিবদ্ধ। এ চারটি চোখ বহুক্ষণ ধরে দেখছে আহমদ মুসাকে।

দু'টি দূরবীনের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল আহমদ মুসা। জেন ব্রীজে উঠে ব্রীজের মাঝখানে দাঁড়ানো আহমদ মুসার দিকে চোখ পড়তেই তাকে চিনতে পেরেছে। চিনতে পেরে ভূত দেখার মতো দাঁড়িয়ে পড়েছে জেন!

জোয়ান বলে ওঠে, 'কি হলো?'

'ঐ দেখ।' আহমদ মুসার দিকে ইংগিত করে বলল।

'কে?'

'জগতের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী, তোমার স্বপ্ন আহমদ মুসা।' আহমদ মুসা দিক থেকে চোখ না সরিয়েই গম্ভীর কন্ঠে বলল জেন।

জোয়ান কোন কথা আর বলতে পারেনি। তার দু'টি চোখ আটকে গেছে আহমদ মুসার মুখে। জোয়ানের দৃষ্টির সমস্ত শক্তি, হৃদয়ের সমস্ত আগ্রহ ঝাঁপিয়ে পড়েছে আহমদ মুসার মুখের ওপর।

'জোয়ান, দেখছ ওর চোখে অশ্রু?'

'হ্যাঁ, উনি তাকিয়ে আছেন বিধ্বস্ত আল-কাজারের দিকে।'

তারপর দু'জন বসে পড়ছে ব্রীজের ঐ প্রান্তে এবং চোখ রেখেছে আহমদ মুসার ওপর।

আহমদ মুসার ঠোঁট দু'টি যখন ব্রীজের গা স্পর্শ করল তা তারা দেখেছে এবং যখন ব্রীজে তার মাথা রেখে সে কান্নায় ভেঙে পড়ল তা তারা দেখল।

বিশ্ব-বিশ্রুত আহমদ মুসার এই একান্ত রূপ, যার রিপোর্ট কখনও খবরের কাগজে আসেনি, অভিভূত করল জেন ও জোয়ানকে।

'চল, ওর কাছে যাই।'

‘না, জোয়ান, ওর এই আত্মস্থ অবস্থা থাক, ওঁকে ডিস্টার্ব করা ঠিক হবে না।’

আহমদ মুসা ব্রীজ থেকে মাথা তুলে আবার তাকাল আল-কাজারের দিকে। তাকাতে গিয়ে হঠাৎ আহমদ মুসার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল শতবর্ষের এক বৃদ্ধের ওপর। সফেদ চুলের ও ঝুলে-পড়া চামড়ার ঐ বৃদ্ধেরও দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল বিধ্বস্ত আল-কাজারের দিকে।

হঠাৎ আহমদ মুসার মনে পড়ল, বৃদ্ধটি হাসান সেনজিকের সেই বৃদ্ধ নয় তো?

আহমদ মুসা এগোলো বৃদ্ধের দিকে। বৃদ্ধের কাছে পৌঁছে দেখল, সত্যিই বৃদ্ধের চোখে অশ্রু! হাসান সেনজিকের বলা সেই ভাবলেশহীন মুখ। যেন এ পৃথিবীতে সে নেই!

আহদম মুসা তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

বৃদ্ধ চোখ ফেরাল আহমদ মুসার দিকে। গভীরভাবে যেন পাঠ করছে আহমদ মুসাকে!

‘বহুদিন থেকে আপনি কাঁদেন, কেন আপনার এই কান্না?’ বলল আহমদ মুসা।

‘তোমার চোখে এই অশ্রু কেন?’ পাল্টা প্রশ্ন করল বৃদ্ধ।

‘আমি তারিক বিন যিয়াদ ও মুসা বিন নুসায়েরের জন্যে কাঁদছি। তারা কবে আসবে আবার, কবে তাদের বন্দুক আবার গর্জন করে উঠবে গোয়াদেল কুইভারের তীরে, তারই অপেক্ষায় কাঁদছি।’

‘তুমি বোধ হয় স্পেনে নতুন?’

‘কেন?’

‘তোমার এই আবেগ দেখে মনে হচ্ছে।’

‘কেন? এই আবেদ এখানে নেই?’

‘এমন আবেগের জন্যে, যে আশা দরকার তা কোথাও কারো মধ্যে বর্তমান নেই। সবটা জুড়ে আছে হতাশা।’

‘আপনি কাঁদছেন কেন?’

‘কাঁদছি কারো আশায় পথ চেয়ে নয়। আমি এক বিধ্বস্ত অতীত, কাঁদছি আশার কবরের ওপর দাঁড়িয়ে।’

‘বুঝলাম না।’

‘বুঝে কাজ নেই।’

‘না, আমাকে বুঝতে হবে, আশার কবর রচিত হয়েছে আমি মানি না।’ রুখে দাঁড়ানোর মতো অত্যন্ত দৃঢ় কন্ঠে বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার কথার মধ্যে এক অপরিচিত শক্তির প্রকাশ যেন দেখতে পেল বৃদ্ধ! তাকিয়ে রইল এক দৃষ্টিতে আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসাই কথা বলল আবার। বলল, ‘যে জাতি নিজেকে সাহায্য করে না, আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করেন না। জনাব, আমি মনে করি, রাণী ইসাবেলা কিংবা ফার্ডিনান্ডের হাতে আমাদের পরাজয় ঘটেনি। আমাদের ভাগ্যের দরজা আমরাই বন্ধ করেছিলাম।’

‘তোমার কথা ঠিক, কিন্তু সবটুকু ঠিক নয়।’

‘আমিও স্বীকার করি, কিন্তু ১৪৯২ সালে গ্রানাডার পতন মুহূর্তে জীবন উৎসার্গীকৃত ‘মুসা’ ছিল একজন, আর আত্মসমর্পনকারী ‘আবু আবদুল্লাহ’ ছিল লাখ লাখ।

জেন ও জোয়ান অনেক্ষণ আগে এসে বৃদ্ধ ও আহমদ মুসার পেছনে দাঁড়িয়েছিল। তারাও গোগ্রাসে গিলছিল এই কথোপকথন। ‘রাণী ইসাবেলা বা কিং ফার্ডিনান্ডের হাতে আমাদের পরাজয় ঘটেনি, আমাদের ভাগ্যের দরজা আমরাই বন্ধ করেছিলাম, ১৪৯২ সালে গ্রানাডার পতন মুহূর্তে জীবন উৎসর্গকারী ‘মুসা’ ছিল একজন আর আত্মসমর্পণকারী ‘আবু আবদুল্লাহ’ ছিল লাখ লাখ! আশার কবর রচিত হয়েছে আমি মানি না! প্রভৃতি আহমদ মুসার অপরূপ নতুন ও প্রত্যয়দীপ্ত কথাগুলো ইতিহাস সচেতন জেন ও জোয়ানকে এক নতুন জগতের মুখোমুখি করছিল।

আহমদ মুসা থামলেও বৃদ্ধ তখনও  মুখ খোলেনি। বিস্ময়ে বৃদ্ধের চোখ দু’টি বড় বড় হয়ে উঠেছিল। তার বিস্ময় বিস্ফরিত চোখ অনেক প্রশ্ন! বৃদ্ধ তার

লাঠিতে শরীরের ভারটা আরেকটু ন্যাস্ত করে বাঁকা কোমরটটা সোজা করার চেষ্টা করে বলল, 'তুমি কে নওজোয়ান? স্পেনে তো এমন কন্ঠ, এমন কথা শুনিনি?'

'বলব, কিন্তু এই ব্রীজে দাঁড়িয়ে প্রতিদিনের আপনার এই কান্না কেন তা বলেননি।'

বৃদ্ধ গম্ভীর হলো। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো বৃদ্ধের বুক থেকে। বলল, 'আমি প্রতিদিন এই ব্রীজে এসে বিরান আল কাজার, আর ভাঙা শূন্য হৃদয় কর্ডোভা মসজিদের দিকে তাকিয়ে থাকি। কারণ বিধ্বস্ত আমার সাথে ওদের বড্ড মিল আছে। আমি ওদের সব হারানো মর্মস্পর্শী আর্তনাদ, যেভাবে বুঝতে পারি, আর কেউ তা পারে না। উঁচু ব্রীজের এখানে যখন এসে দাঁড়াই, তখন ওরা ও আমি এক হয়ে যাই। আমার দীর্ঘশ্বাস, ওদের দীর্ঘশ্বাস এক হয়ে যায়। এক সাথে আমরা কাঁদি। মনে অনেক শান্তনা পাই।' থামল বৃদ্ধ।

'আল-কাজার ও বড় মসজিদের সব হারানোর কথা জানি, কিন্তু আপনাকে তো জানি না!' বলল আহমদ মুসা।

'বলছি', শুরু করল বৃদ্ধ, 'আমার বলতে ছিল আমার ৪টি তাজা প্রাণ ছেলে, আর ফুলের মতো দু'টি মেয়ে। আজ থেকে ৩০ বছর আগে একদিন বিকেল বেলা। আমি তখন ভীষণ অসুস্থ, শুয়েছিলাম। আমার চার ছেলে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। বলল, আব্বা, আর সহ্য করতে পারছি না। আজ ওরা বড় মসজিদে নাচ গানের আসর বসিয়েছে, সারা রাত ধরে চলবে। আপনি জানেন, সেখানে কি হবে। আমি বললাম, তোমরা কি করবে? তারা বলল, আমরা বাধা দেব। আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তারা বলল, আব্বা আমাদের আর ধরে রাখবেন না। বলে ছুটে বেরিয়ে গেল চারজন। সন্ধ্যা গড়িয়ে গেল, ফিরে এলো না ওরা। ক্রন্দনরত দু'বোন এসে আমাকে বলর, আব্বা, একটু খোঁজ নিয়ে আসি।' আমি ওদেরও বাধা দিতে পারিনি। ওরাও বেরিয়ে গেল। ফিরে এলো না ওরাও। সারা রাত গড়িয়ে গেল, ছটফট করলাম সারা রাত বিছানায়। সকালে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ঘর থেকে বেরুলাম। খোঁজ করলাম।

ব্রীজের এই স্থানেই উঁচু মঞ্চে হত্যা করে টানিয়ে রাখা হয়েছিল আমার চার ছেলেকে। আর আমার ফুলের মতো মেয়ে দু'টির কথা, বলতে পারব না বুক

ফেটে যায়। ওদেরও রক্তাক্ত দেহ লাশ হয়ে এখানেই পড়েছিল।’ থামল বৃদ্ধ। ক্লান্তিতে ধুঁকতে লাগল।

আহমদ মুসার ঠোঁট দু’টি দৃঢ়সংবদ্ধ, মুখ শক্ত। তার শূন্য দৃষ্টি গোয়াদেল কুইভারের বহমান স্রোতের দিকে।

অল্প দূরে ব্রীজের রেলিং-এ ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো জেন ও জোয়ানের মুখ ভারি। চোখ তাদের ভিজে উঠেছে। জোয়ানের মনে স্মৃতির ভিড়। তার পূর্বপুরুষের ইতিহাস এবং তার সাথে মিলিয়ে নিচ্ছে বৃদ্ধের কাহিনীকে।

বৃদ্ধ চোখ মুছে বলল, ‘আমি রোজ এখানে আসি। কারণ আমার ছয়টি সন্তানের সঙ্গ এখানে এলে পাই। তারা আমাকে ঘিরে থাকে এখানে এলে। শূন্য মনটা যেন অনেক ভরে ওঠে!’ থামল বৃদ্ধ।

থেমেই আবার বলল, ‘এবার বলো তুমি কে? এত কথা আমাকে বলালে যা কাউকে বলিনি গত ৩০ বছর।’

‘আমার নাম আহমদ মুসা, জাতির একজন সেবক।’

‘না হলো না, কিছু বুঝলাম না। বলল বৃদ্ধ।

এই সময় এগিযে এলো জেন, তার পেছনে জোয়ান।

তারা আহমদ মুসা ও বৃদ্ধের সামনে দাঁড়াল।

‘মাফ করবেন আমাকে আপনাদের মাঝে এসে পড়ার জন্যে।’ তারপর একটু থেমে জেন বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘জনাব, ইনি আহমদ মুসা, ফিলিস্তিন, মিন্দানাও, মধ্যএশিয়া, ককেশাস ও বলকান বিপ্লবের নায়ক-সেখানকার মুসলমানদের মুক্তিদাতা, তাদের স্বাধীনতার জনক।’

বৃদ্ধের মুখে একটা আলো জ্বলে উঠল নেচে উঠল তার চোখটা। তার পর তা পলকহীনভাবে স্থির হলো আহমদ মুসার মুখে। তার চোখ দু’টো যেন আটকে গেছে আহমদ মুসার চোখে!

চোখ ঐভাবে স্থির রেখেই বৃদ্ধ ধীরে ধীরে বলল, ‘এমটাই ভাবছিলাম আমি, তাছাড়া কে আর এমনভাবে কাঁদবে এসে মৃত কর্ডোভাকে দেখে, কে আর পারে স্পেনের মুসলিম ইতিহাসের গভীর থেকে চরম সত্য কথাটাকে এভাবে বের

করে আনতে, কার পক্ষে আর পারা সম্ভব এমন প্রত্যয়দীপ্ত আশার বাণী উচ্চারণ করা!'

বৃদ্ধ তার ডান হাত বাড়িয়ে আহমদ মুসার হাত ধরল। বলল, 'বিধ্বস্ত মুসলিম স্পেনের পক্ষ থেকে ইসলামের উত্থানের প্রতীক বিপ্লবী তোমাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। তাবে হতাশার নিঃসীম অন্ধকারেও কখনও আশার প্রদীপ জ্বলতে পারে। স্পেনে এমনি একটি প্রদীপ যিয়াদ বিন তারিক। তার সাথে তোমার দেখা হয়েছে?'

'না, সে কে?' বলল আহমদ মুসা।

'এক প্রাণ-উচ্ছল তরুণ। 'ফ্যালকন বল স্পেন' বদর বিন মুগীরাকে কি তুমি জান, যে সব ছেড়ে বনে আশ্রয় নিয়েও আমৃত্যু লড়াই করে গেছেন ইসাবেলা ও ফার্ডিনান্ডের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে?'

'জানি'

'সেই বদর বিন মুগীরার ভূলূন্ঠিত পতাকা তুলে ধরতে চাচ্ছে শপথদীপ্ত প্রানোচ্ছল তরুণ যিয়াদ বিন তারিক।'

'কোথায় পাব তার দেখা?' বলল আহমদ মুসা।

বৃদ্ধ চোখ বুজল। কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বলল, 'গ্রানাডার স্বল্প দূরে 'ফেজ আল্লাহু আকবার' পাহাড় যাকে স্পেনীয়রা 'মুরের শেষ দীর্ঘশ্বাস' বলে। সেখানে যাবে। পাহাড়ের যে স্থানে দাঁড়িয়ে গ্রানাডার শেষ সুলতান আবু আবদুল্লাহ শেষবারের মতো গ্রানাডোকে দেখেছিলেন, সেখানে দাঁড়িয়ে বাদ আসর তিনবার আল্লাহু আকবর ধ্বনি দেবে। দ্বিতীয় তকবিরটি হবে দীর্ঘ, শেষটি হবে সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত ও অনুচ্ছ।'

কথা শেষ করেই বৃদ্ধটি 'আচ্ছালামু আলায়কুম' বলে ঘুরে দাঁড়াল। চলতে শুরু করল।

জেন তাকে কিছু বলতে গিয়েছিল।

আহমদ মুসা তাকে নিষেধ করল।

লাঠিতে দেহের ভার ন্যস্ত করে ধীরে ধীরে চলছে বৃদ্ধ ব্রীজের ওপর দিয়ে।

আহমদ মুসা, জেন জোয়ান তিনজনই এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

আহমদ মুসা তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে ধীরে ধীরে বলর, 'উনি শুধুই একজন সর্বহারা বৃদ্ধ নন, বিধ্বস্ত মুসলিম স্পেনের প্রতীক তিনি। সমগ্র মুসলিম স্পেন ওর কন্ঠে কথা বলে উঠেছে।' ব্রীজ পার হয়ে চলে গেল বৃদ্ধ। হারিয়ে গেল দৃষ্টির আড়ালে। তার শূন্য ঐ জীবনের ঠিকানা কোথায় কে জানে!

আহমদ মুসা বৃদ্ধে চলার পথ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তাকাল জেন-এর দিকে। বলল, 'হঠাৎ তোমাকে কার্ডোভায় দেখে বিস্মিত হয়েছি!'

'অনুসরণ করছি মনে করেননি তো?' বলল জেন।

'ঐ প্রশ্ন সব সময় আমার সামনে আছে, কিন্তু সেই অনুসরণের কাজ তুমি করবে না জানি।'

'আব্বা-আম্মা এসেছেন। তাঁদের সাথে এসেছি।'

'তোমরা তো কার্ডিনাল পরিবার! কার্ডিনাল কটেজের মতো কার্ডিনাল হাউজও তো তোমাদের?'

'হ্যাঁ, তবে কার্ডিনাল হাউজের বন্দীখানা নয়। এটা ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের ।'

হাসল আহমদ মুসা, কিছু বলল না।

'আমি মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি। আর এ জোয়ান। এও মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের। আমরা এবার অনার্স পাস করেছি।'

'অনার্স পাস করা কোন এক জোয়ানকে নিয়ে কি যেন ঘটেছে! সব সময় প্রথম হলেও সে মরিসকো একথা প্রকাশ পাওয়ায় সে নাকি প্রথম হতে পারেনি এবং তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ও ছাড়তে হয়েছে। তোমরা জান ব্যাপারটা?'

বিস্ময় ফুটে উঠল জেন ও জোয়ানের মুখে।

'আপনি কি করে জানলেন এ ঘটনা?' বিস্ময় ভরা কন্ঠে বলল জেন!

'আমি মারিয়ার কাছে, শুনেছি।'

'মারিয়া কে?'

'বাস্ক গেরিলাপ্রধান ফিডেল ফিলিপের বোন মারিয়া। ওকে কিডন্যাপ করেছিল, ওকে বাঁচাতে গিয়েই ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের হাতে পড়েছিলাম আমি।'

জেন এবার জোয়ানকে দেখিয়ে বলল, 'এই সেই জোয়ান, আর আমি হতভাগ্য জেন, যাকে অনার্সে প্রথম করা হয়েছে ওকে বাদ দিয়ে।'

'কিন্তু দুই প্রতিদ্বন্দ্বী যে এক সাথে!' হেসে বলল আহমদ মুসা।

'আমি ফার্স্ট হতে চাইনি।'

'ওটা বলার দরকার পড়ে না। তোমরা পাশাপাশি সেটাই বড় প্রমাণ।'

বলে আহমদ মুসা জোয়ানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'ভাইটি, মরিসকো বলে তুমি কষ্ট পেয়েছ?'

'শুধু কষ্ট নয়, প্রথমে পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলাম! কিন্তু পরে আব্বার রেখে যাওয়া পরিবারের গোপন দলিল আমাদের মরিসকো জেনারেশনের প্রথম পুরুষ আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমানের লেখা কাহিনী পড়লাম তখন দুঃখটা আনন্দে পরিণত হলো, লজ্জাটা পরিনত হলো গৌরবে।'

'কিন্তু তোমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ও ছাড়তে হলো, অথচ হতে পারতে তুমি একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী।'

শুধু আমার কাছ থেকে আমার ছাত্র জীবন নয়, সপ্তাহ খানেক আগে ওরা আমার বিশাল বাড়ি ও বিরাট সম্পতি কেড়ে নিয়েছে। আম্মা অনেক কেঁদেছেন, কিন্তু আমার একটুও কষ্ট লাগেনি। আমার পূর্বপুরুষরা মরিসকো পরচিয় গোপন করে এই সম্পত্তি করেছিল, তা চলে যাওয়ায় আমি খুশি হয়েছি। আমি এখন নিজের পরিচয়ে নিজের অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছি। এ জীবন আমার গৌরবের। আমি এখন জোয়ান নই, আব্বার দেয়া গোপন নাম আমার 'মুসা আবদুল্লাহ! আমি এখন মুসা আবদুল্লাহ।'

আহমদ মুসা জোয়ানকে বুকে জড়িয়ে ধরল, বলল, 'এই না যথার্থ মুসলিমের মতো কথা বলেছ!'

জোয়ানের মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'কিন্তু আমি মুসলমানের তো কিছু জানি না। নামাজ জানি না, কোরআন জানি না।'

'ঠিক আছে এখন সব শিখবে!' এ অবস্থার জন্যে তো তুমি দায়ী নও!'

'একটা প্রশ্ন করতে পারি?' আহমদ মুসাকে প্রশ্ন করল জেন।

'বল।'

‘ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান আপনার পেছনে হন্যে হয়ে ঘুরছে, ওরা হারিয়েছে ১ বিলিয়ন ডলার। আপনার ভয় করে না?’

‘জীবন-মৃত্যুর খেলা এটা। ভয় করলে তো খেলা হাবে না।’

‘এটা খেলা কি, খেলা তো বিনোদন!’ বলল জোয়ান।

‘এক ধরনের খেলাই বটে, জীবনের মতো গুরুত্বপূর্ণ এই খেলা। তাই‌এই খেলায় হার মানা যায় না। সুতরাং ভয়ের অবকাশ নেই।’

এই সময ওপারে সিঁড়ির গোড়ায় হর্ন বেজে উঠল।

আহমদ মুসা উৎকর্ণ হলো। এ হর্ন তো রবার্তোর। কিন্তু এ অসময়ে!

মুহূর্ত কয়েক পরেই একটি ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল তাদের পাশে। ঠিক, রবার্তোর গাড়ি।

আহমদ মুসা ভ্রুকুঞ্চিত করে বলল, ‘রবার্তো, কিছু ঘটেছে নিশ্চয়?’

গাড়ি থেকে নামল রবার্তো। বলল, ‘এই কিছুক্ষণ আগে একজন লোক আমাকে গিয়ে বলল, তোমার গাড়িতে যে ভাড়া এসেছে তার নাম আহমদ মুসা কি না? এখানে কোথায় উঠেছে? আমি উত্তরে বলেছি, ভাড়া নিয়ে আমার কথা। নাম জিজ্ঞেস করা আমার কাজ না। জবাব না পেয়ে সে সরে গেল। এই এখনি আমি নদীতে নামছিলাম, মুখ ধোয়ার জন্যে। ঝোপের আড়ালে মানুষের কন্ঠ শুনতে পেয়ে থমকে দাঁড়ালাম। শুনতে পেলাম, কে যেন আমার গাড়ির নাম্বার বলছে, সেই সাথে বলল, ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক আছে, দেরি না হয় যেন! উঁকি দিয়ে দেখলাম ওয়াকিটকিতে কথা বলছে সেই লোকটি। তারপর নদীতে আর না নেমে আমি চলে এলাম।’

‘রবার্তো, তোমার গাড়ির নাম্বার পাল্টে ফেল।’ নির্দেশ দিল আহদম মুসা।

‘রবার্তো দ্রুত গাড়ির ভেতর থেকে নতুন নাম্বার প্লেট বের করে পাল্টে ফেলল গাড়ির নাম্বার।

আহমদ মুসা জেন ও জোয়ানকে বলল, ‘তোমরা ব্রীজ থেকে সরে পাশে কোথাও দাঁড়াও, রবার্তো তুমিও।’

বলে আহমদ মুসা গাড়ির ব্যাগের মধ্যে থেকে এক জোড়া গোঁফ ও হ্যাট বের করে আনল।

জেনরা ও রবার্তো সরে গেল ব্রীজ থেকে।

আহমদ মুসা গোঁফ পরে মাথায় হ্যাট চাপিয়ে ব্রীজের রেলিং এ ঠেস দিয়ে দাঁড়াল গিয়ে।

বেশি সময় গেল না।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ব্রীজের দু'দি গাড়ি এসে ব্রীজে প্রবেশ করল। ব্রীজে প্রবেশ করেই গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল। দুই গাড়ি থেকে ২জন করে চার জন লোক নামল। ওরা ধীরে ধীরে পাইচারী করতে করতে আহমদ মুসার গাড়ির দিকে এগোলো।

আহমদ মুসা ব্রীজের পুব রেলিং -এ পশ্চিমমুখী হয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার দৃষ্টি ডুবন্ত সূর্যের দিকে। তবে দেখতে পাচ্ছ ওদের গতিবিধি।

ওরা মনে হয় গাড়ির নাম্বার ও আহমদ মুসাকে দেখে কিছুটা হতাশ হয়ে পাইচারী করতে লাগল। ওরা নিজেদের মধ্যে কিছু আলোচনাও করল।

একজন আহমদ মুসার দিকে এগিয়ে এলো। বলল, 'এই ক'মিনিট আগে একটা গাড়ি ও দু'জন লোক এখানে ছিল, কোন দিকে গেল ওরা?'

'আমি বলতে পারব না।' বলল আহমদ মুসা।

'আপনি কতক্ষণ আছেন?'

'অনেকক্ষণ।'

'আপনি বিদেশি?'

'দেখতেই তো পাচ্ছেন।'

'যারা ছিল তারা কোন দিকে কতক্ষণ আগে গেছে?'

'আমি তো জবাব দিয়েছি।'

'না, জবাব দেননি।'

'আমাকে তো দেখি জেরা করতে শুরু করেছেন!'

'আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দিন। তাড়াতাড়ি।'

'দেখুন, আপনার আচরন শোভন হচ্ছে না।'

'শোভন আচরন ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান করে না। ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান কে চেনেন?' বলে লোকটি পিস্তল বের করল। কিন্তু লোকটি পিস্তল ওপরে তোলার আগেই আহমদ মুসা ঐভাবে দাঁড়িয়ে থেকেই তার বাম পা'টা দ্রুত চালাল লোকটির তলপেট লক্ষ্যে। লোকটি কোঁৎ করে উঠে ভাঁজ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল, পিস্তলটিও ছুটে গেল তার হাত থেকে।

আহমদ মুসা তুলে নিল তার পিস্তল।

অন্য তিনজন এক সাথে দাঁড়িয়ে তর্ক শুনছিল এদিকে তাকিয়েই। হঠাৎ ঐভাবে ঘটনা ঘটে যাওয়ায় মুহূর্তের জন্যে তার বিমূঢ় হয়ে পড়ে। তারপর তারা যখন পিস্তলের জন্যে পকেটে হাত দিচ্ছিল, তখন আহমদ মুসা পিস্তলের নল ওদের দিকে স্থির লক্ষ্যে উদ্যত। হাত ওদের আর নড়ল না।

আহমদ মুসা এগোলো ঐ তিনজনের দিকে। মুখে হাসি টেনে বলল, 'তোমরা বুঝি হাইজাক পার্টি না? কতদিন এ পেশায়?'

'না, আমরা হাইজাক পার্টি না? আমরা ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের সদস্য।'

'হ্যাঁ, ওরকম বড় দলের নামে পরিচয় দেয় সবাই বিপদে পড়লে। তোমরা আমার ওপর পিস্তল তুলেছিলে, হয়তো মেরেও ফেলতে গাড়িটা লুট করার জন্যে। বল, তোমরা কি শাস্তি চাও।'

ওরা কিছু বলতে যাচ্ছিল। আহমদ মুসা বাধা দিয়ে বলল, 'আর এক মুহূর্ত নয়, পিস্তল ফেলে দিয়ে রেলিং-এ উঠে নদীতে তিনজন এক সাথে ঝাঁপিয়ে পড়। ওকেও সাথে করে নিয়ে যাও। ও অজ্ঞানের ভান করে আছে। ঐটুকু লাথিতে ক্রিমিনালরা অজ্ঞান হয় না।'

ঠিক তাই। ওরা তিনজন রেলিং এ উঠলে সেও উঠে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা বলল, 'এক মাইল যাওয়ার পর তোমরা তীরে উঠবে, আমি দাঁড়িয়ে দেখছি।'

ওরা চারজন এক সাথেই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

হাসল আহমদ মুসা। বেচারা ওরা ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের নতুন রিক্রুট।

জেন, জোয়ান ও রবার্তো সামনে এসে দাঁড়াল আহমদ মুসার।

আহমদ মুসার হাতে তখনও একটা পিস্তল, আরও তিনটা পিস্তল মাটিতে পড়ে আছে। সেদিকে ইংগিত করে বলল, 'জেন, জোয়ান, রবার্তো তোমরা তিনজন ও তিনটা পিস্তল নিতে পার, ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের অনেক টাকা আছে। কিনে নিতে পারবে।'

আহমদ মুসা তখন গোঁফ ও হ্যাট খুলে ফেলছে।

'পিস্তলে আমার ভয় করে! জোয়ান, তুমি নাও।' বলল জেন।

জোয়ান ও রবার্তো পিস্তল তুলে নিল এবং তৃতীয় পিস্তলটা জোয়ান আহমদ মুসার হাতে দিল।

'আমরা ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে সব দেখেছি, আপনি যাদু জানেন কানি মুসা ভাই যে, ওরা চার চারজন সশস্ত্র মানুষ এই শীতে সন্ধ্যায় একান্ত অনুগতের মতো নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল।'

বলে জেন নদীর দিকে আঙ্গুলি সংকেত করে বলল, 'দেখুন, ওরা এখনও নির্দেশ মোতাবেক সাঁতারাচ্ছে, তীরে ওঠেনি।'

'যাদু নয় জেন, যারা অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকে, তারা মনের দিকে থেকে খুব দুর্বল হয়, আর জীবনের ভয় ওরা খুব বেশি করে।'

'কিন্তু ঐ যে লোকটা পিস্তল বের করেছিল, আপনি যদি ঐভাবে তাকে কাবু করতে না পারতেন তাহলে কি হতো?'

'বলেছি তো জেন, এটা জীবন-মৃত্যুর খেলা। এখানে জীবন আছে অথবা মৃত্যু-মাঝখানে কিছু নেই।'

'কিন্তু ওদের আপনি ছেড়ে দিলেন যে, ওরা আপনাকে ছাড়তো না।'

'তা ঠিক, কিন্তু ওরা বেতনভোগী হুকুম পালকারী ছাড়া কিছুই নয়, কি দরকার ওদের সংসারে হাহাকার এনে!'

'শত্রুর সংসারের কথা আপনি চিন্তু করেন?'

'আমরা মানুষ এক পরিবারেরই তো সন্তান!'

'ইসলাম কি এভাবেই চিন্তা করতে শেখায়?'

'অবশ্যই। রাজা-বাদশাদের ইতিহাস নয়, ইসলামের ইতিহাস ও ইসলামের যারা অনুসরণ করেছে সেই সব রাজা-বাদশার ইতিহাসের দিকে

তাকিয়ে দেখ, ইসলাম মানুষকে মুক্ত করেছে, জুলুম করেনি, জুলুমকে প্রশ্রয়ও দেয়নি। তোমাদের স্পেনের দিকেই তাকিয়ে দেখ। মুসলমানেরা খৃষ্টানদের ভালোবাসা দিয়েছে, সমৃদ্ধি দিয়েছে, আর খৃষ্টানরা যখন সুযোগ পেল মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করল।'

'এর প্রতিকার কি হবে?'

'জালেমরা সব সময় বিজয়ী থেকেছে, একম নজির ইতিহাসে নেই।'

'স্পেনে কি কোন পরিবর্তন আসবে?' বলল জেন।

'ওটা অনেক বড় কাজ, আল্লাহই জানেন।'

'প্রশ্নটা এজন্যেই করলাম, আপনি যেখানেই পা দেন পরিবর্তন আসে।'

'ওটাও আল্লাহরই হচ্ছা, মানুষ চেষ্টা করে, ফল তার হাতে নয়।'

'বলতে পারি, চেষ্টা আপনি করবেন।'

হেসে উঠল আহমদ মুসা। বলল, 'জেন, তুমি কার্ডিনাল পরিবারের মেয়ে, কিন্তু বাস্তবে তা তো মনে হচ্ছে না।'

'কার্ডিনাল পরিবারের মেয়েরা কি অন্যায়কে অন্যায়, ন্যায়কে ন্যায় বলতে পারবে না?'

'তোমাকে ধন্যবাদ, জেন। চল, আজকের মতো উঠি। নামাজের সময় হয়ে যাচ্ছে।'

'আরেকটা প্রশ্ন, আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে, আপনার কে কে আছে, কোথায় আপনার বাড়ি?'

'সব প্রশ্নের উত্তর একদিনে নয়।' বলে হেসে উঠে হেলান দেয়া অবস্থা থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াল আহমদ মুসা। বলল, 'আজ বড় মসজিদেই আমি নামাজ পড়তে চাই।'

আহদম মুসা পা বাড়াল সামনে।

তার পেছনে জেন, জোয়ান ও রবার্তো।

কার্ডাভার অখ্যাত একটি হোটেল।

আহমদ মুসা প্রস্তুত হয়ে ব্যাগ হাতে তার একটি কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো।

গ্রনাডা যাত্রার জন্যে তৈরি।

রবার্তো ড্রাইভিং সিটে গিয়ে বসেছে। তার পাশের সিটে বসেছে জোয়ান। জোয়ানও আহমদ মুসার সাথে গ্রানাডা যাচ্ছে। আহমদ মুসা প্রথমে নিতে চায়নি, বিপদের ঝুঁকি আছে বলে। আহমদ মুসা বলেছিল, জোয়ান তার মা, দাদীকে এক ঐভাবে ফেলে কোন কিছুর মধ্যে জড়িয়ে পড়া ঠিক হবে না। কিন্তু জোয়ান জেদ ছাড়েনি! জেনও অনুরোধ করেছে আহমদ মুসাকে। আহমদ মুসার সঙ্গ জোয়ানের জন্য এক দুর্লভ পাওয়া হবে বলে জেন মনে করেছে। অবশেষে আহমদ মুসা রাজী হয়েছে।

আহমদ মুসা কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসতেই হোটেল মালিক জিমেনিজের সাথে তার দেখা হলো। জিমেনিজ তার কাছেই আসছিল।

হোটেল মালিক জিমেনিজ সামনে এসে আহমদ মুসার হাত চেপে ধরে বলল, 'আপনি হোটেল ভাড়া ও খাবার বিল দিয়েছেন, এটা নিলে এ টাকা আমাকে আগুনের মতো পোড়াবে, মনের জ্বালায় আমি মরে যাব।' প্রায় কান্নাজড়িত কন্ঠ জিমেনিজের।

হোটেল মালিক জিমেনিজ রবার্তোর পূর্ব পরিচিত। চাকুরির সন্ধানে এসে কয়েকদিন সে এখানে ছিল। তখনই পরিচয় জিমেনিজ মরিসকো। কিন্তু বাইরের কেউই তার পরিচয় জানে না। ছদ্ম পরিচয়ে সে হোটেল চালাচ্ছে।

হোটেল মালিকের সাথে পরস্পরের মরিসকো হওয়া সম্পর্কে জানাজানি হয়ে যায় ঘটনাক্রমেই। একদিন রবার্তো তার হোটেল কক্ষে শুয়ে শুয়ে 'ম্যানসেবো ডে আরেভ্যালো'(Young man from Manccbo) পড়ছিল। 'ম্যানসেবো ডে আরেভ্যালো' মরিসকোদের একটা বিখ্যাত কাহিনী। গ্রন্থটি 'আল জামিয়াতো' (হরফ আরী, ভাষা স্প্যানিশ) ভাষায় লেখা। ম্যানসেবে নামক একজন খচ্চর চালক মরিসকো- এর আবেগজড়িত কাহিনী নিয়ে এই বইটি। এই খচ্চর চালক মরিসকো বাইরের পরিচয় খৃষ্টান, কিন্তু অন্তরে তার ঈমানের আগুন। কাবা শরীফ দর্শন ও মহানবী (স) এর মাজার যেয়ারতের জন্যে হৃদয় তার ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। গরীব খচ্চর চালক অত্যন্ত সংগোপনে কঠোর পরিশ্রম করে তিল তিল করে টাকা জমিয়েছে। স্পেন থেকে সমুদ্র পথে মক্কা সে যেতে পারবে না,

ধরা পড়ে যাবে। আবার জিব্রালটার পার হয়ে উত্তর আফ্রিকায় পার হতে চাইলে ধরা পড়ার ভয় আরও বেশি। এজন্যে ম্যানসেবে সবার চোখ এড়িয়ে উত্তর স্পেনের আবাগন এলাকায় যায়। সেখান থেকে গোপনে সে ঢুকে পড়ে দক্ষিণ ফ্রান্সে। তারপর সে গোপনে ইটালি পাড়ি দেয়। সেখান থেকে সে জেনোয়া যায়। জেনোয়া থেকে শ্রমিকের বেশে সে পাড়ি দেয় আরবে। পৌঁছে যায় সে তার স্বপ্নের, তার বড় সাধনার ধন কাবা শরীফে।

রবার্তো পড়ছিল এই মর্ম স্পশী কাহিনী। তার চোখ দিযে পড়ছিল অশ্রু।

ঘরের দরজা খোলা ছিল। খোলা দরজা দেখে ঘরে উঁকি দেয় হোটেল মালিক জিমেনিজ। সে দেখেতে পায় রবার্তোর অশ্রু, পুস্তকটির নামও তার চোখে পড়ে। জিমেনিজের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সে ঘরে প্রবেশ করে দরজা লাগিয়ে দেয়।

রবার্তো পুস্তক থেকে মুখ তোলে। তখনও তার চোখে অশ্রু।

'তুমি মরিসকো রবার্তো?' উজ্জ্বল চোখে প্রশ্ন করে জিমেনিজ।

রবার্তো উঠে বসে। সুস্পষ্ট কন্ঠে জবাব দেয়, 'হ্যাঁ, আমি মরিসকো।'

জিমেনিজ পাগলের মতো বুকে জড়িয়ে ধরে রবার্তোকে, হু হু করে তার বুক থেকে উঠে আসে কান্না।

আহমদ মুসা বাঁ হাত থেকে ব্যাগটি নিচে রেখে বলল, 'জনাব, হোটেল আপনার ব্যবসায়, আর এ ব্যবসায় আপনার জীবিকা।'

জিমেনিজের বয়স সত্তরের কাছাকাছি। সে নরম ও কাতর কন্ঠে বলল, 'ব্যবসায় বলে কি আমি আমার আত্মীয়, আমার ভাইদের কাছ থেকে টাকা নিতে পারি? আপনি কী আত্মীয়ের চেয়ে বড় নন? তার চেয়ে বড় কথা হলো, আপনি যে কাজ করছেন সেটা আমারও কাজ।'

বৃদ্ধের কাতর কন্ঠ আহমদ মুসার হৃদয়টা ভিজিযে দিল। স্পেনে হতাশার জমাট অন্ধকারে এমন কত মন লুকিয়ে আছে কে জানে! আবেগের এক বন্যা এসে জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে। সে দু'হাতে বৃদ্ধের হাত জড়িয়ে ধরে বলল, 'যারা হারিয়ে গেছে বলে দূর থেকে আমরা ধরে নিয়েছিলাম সেই মরিসকোদের মনে এত আবেগ, এত বেদনা ও এত কথা লুকিয়ে আছে কল্পনা করিনি। যার সাথেই

দেখা হয়েছে, আমাকে অভিভূত করেছে তারা। এই বিশ্বাস এখন আমার দৃঢ়, পাঁচশ' বছরের শ্বাসরুদ্ধকর প্রতিকূলতা যে চেতনাকে মেরে ফেলতে পারেনি, সে চেতনা বিজয় লাভ করবেই।'

জিমেনিজ আহমদ মুসাকে তার টাকা ফেরত দিযে টাকার আরেকটি প্যাকেট তার হাতে তুলে দিতে দিতে বলল, 'আমি বড় কেউ নই, জাতির জন্যে কিছু করার ক্ষমতাও আমার নেই। জাতির জন্যে আমার এটুকু দান গ্রহন করলে আমার বেদনা-জর্জরিত হৃদয়ে শান্তির একটু স্বাদ পাব।'

'কিন্তু জনাব, এই আমানতের দায়িত্ব পালন আমার জন্যে অত্যন্ত কঠিন।'

'কোন আমানতের দায়িত্ব এর মধ্যে নেই, এ আপনার সম্পদ।'

আহদম মুসা নামিয়ে রাখা ব্যাগ তুলে নিতে যাচ্ছিল। বৃদ্ধ জিমেনিজ তাড়াতাড়ি ব্যাগটা তুলে নিয়ে বলল, 'চলুন'।

আহমদ মুসা বৃদ্ধ জিমেনিজের দিকে চাইল, কিন্তু বাধা দিতে পারল না।

পাশাপাশি দু'জন  হেঁটে চলল গাড়ির দিকে।

গাড়িতে উঠল আহমদ মুসা।

জিমেনিজ ব্যাগটা গাড়িতে রেখে নিজের হাতে গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিল।

আহমদ মুসা বিদায়ের সময় বলল, 'আসসালামু আলাইকুম।'

বৃদ্ধের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। উত্তর দিল, 'ওয়া আলায়কুম.....।'

গাড়ি চলতে শুরু করল।

আহমদ মুসার গাড়ি গেট পেরিয়ে রাস্তায় পড়তেই সামনে থেকে এলো জেনের গাড়ি।

আহমদ মুসা গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল। তার পাশে এসে দাঁড়াল জেনের গাড়ি।

জেন লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে এলো। ছুটে গেল আহমদ মুসার জানালায়। বলল, 'দেরি করব না। আপনার জন্যে আমার শুভেচ্ছা। ঈশ্বর আপনাকে সুস্থ রাখুন, নিরাপদ রাখুন, দীর্ঘজীবী করুন।'

‘ধন্যবাদ, জেন। হেসে বলল আহমদ মুসা।

তারপর জেন গিয়ে জোয়ানের পাশের জানালায় দাঁড়াল। জোয়ানের হাতে একটা লাল  গোলাপ ও একটা মানি ব্যাগ গুজে দিয়ে জোয়ানের ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে কিছু বলতে নিষেধ করে বলল, ‘পারলে টেলিফোন করো, বাড়ির জন্যে ভেব না, আসি।’

বলে জেন ছুটে তার গাড়ির কাছে চলে গেল। স্টার্ট নিল তার গাড়ি।

আহমদ মুসার গাড়িও ষ্টার্ট নিয়ে চলতে শুরু করল।

জোয়ানের এক হাতে ফুল, আরেক হাতে মানিব্যাগ। লাল গোলাপ উপহার পেয়ে লাল গোলাপের মতোই লাল হয়ে উঠেছে জোয়ানের মুখ। আহমদ মুসার সামনে এভাবে তাকে এমন লাল গোলাপ দেয়া কি ঠিক হয়েছে! কী বুছেছেন তিনি ও রবার্তো! ওদের দিকে মুখ তুলে তাকাতে লজ্জা করেছ জোয়ানের।

আহমদ মুসা সামনে তাকিয়ে আছে স্থির দৃষ্টিতে। তার -চোখে ভাসছে গ্রানাডার চিত্র, বৃদ্ধের সেই নিউ ফ্যালকন যিয়াদ বিন তারিকের না দেখা বিমূর্ত এক অবয়াব এবং মাদ্রিদের শাহ ফয়সাল মসজিদ কমপ্লেক্স, কর্ডোভা, গ্রানাডা, মালাগার, সেভিলের শত মুসলিম স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে ভয়ানক ষড়যন্ত্রের কালো বিভীষিকার দৃশ্য। মুখ ক্রমেই গম্ভীর হয়ে উঠল আহমদ মুসার্ কোন পথে এগোবে সে এই ভয়ানক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে? নিউ ফ্যালকন যিয়াদ বিন তারিকের কাছ থেকে কি কোন আশার আলো সে পাবে? তার মনে পড়ল সামনে বসা তরুণ পদার্থ বিজ্ঞানী জোয়ানের কথাও। ষড়যন্ত্রটাও বৈজ্ঞানিক পথে। উজ্জ্বল হয়ে উঠল আহমদ মুসার মুখ।

ছুটে চলছে গাড়ি আন্দালুসিয়া হাইওয়ে ধরে দক্ষিণ-পূর্ব গ্রানাডার পথে। ভাবছে আহমদ মুসা।

ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান মাদ্রিদে মুসলমানদের নতুন অস্তিত্ব ও স্পেনের সব মুসলিম স্মৃতিচিহ্নগুলো একেবারে মুছে ফেলার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে মজলুম মরিসকোরাও জেগে ওঠার জন্যে চোখ খুলছে, তার ওপর গোয়াদেল কুইভার ব্রীজের সেই বৃদ্ধ খবর দিল নিউ ফ্যালকন অব স্পেনের

আশাদীপ্ত উত্থানের! মুসলিম আন্দালুসিয়ার বিরান প্রান্তরে গোয়াদেল কুইভারের তীরে কি তাহলে ঘটতে যাচ্ছে আরেকটা ঘটনা, আরেকটা পরিবর্তন! গোয়াদেল কুইভারের সেই লড়াইয়ে খৃষ্টান রডারিকের বিরুদ্ধে জিতেছিল জাবালুত্তারিক হয়ে আসা জাহাজ পুড়িয়ে ফেরার পথ করে দেয়া ইসলামের সেনাপতি তারিক বিন যিয়াদ। এবার গোয়াদের কুইভারের নতুন লড়াইয়ে কে জিতবে?

গভীর ভাবনায় নিমজ্জিত আহমদ মুসা।

বিরামহীন এক শোঁ-শোঁ শব্দ ছুটে চলেছে গাড়ি আন্দালুসিয়া প্রান্তরের বুক চিরে।

সাইমুম সিরিজের পরবর্তী বই

# আন্দালুসিয়ার প্রান্তরে

**কৃতজ্ঞতায়ঃ Monirul Islam Moni**

# সাইমুম-১৩

# আন্দালুসিয়ার প্রান্তরে

আবুল আসাদ

# ১

গ্রানাডা থেকে দু'মাইল দূরে 'মুরের শেষ দীর্ঘশ্বাস' পাহাড়, স্প্যানিশ ভাষায় 'Eultimo suspiro del Moro'। স্প্যানিশরা একে এই নামেই ডেকে থাকে স্পেনের শেষ মুসলিম সুলতান আবু আব্দুল্লাহর শেষ বিলাপকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য। পরাজিত ও আত্ম – সমর্পিত সুলতান আবু আব্দুল্লাহ গ্রানাডা নগরীর চাবি বিজয়ী ফার্ডিন্যান্ডের হাতে তুলে দেয়ার পর নিঃস্ব হয়ে নগরী ত্যাগ করে চলে আসেন। এই পাহাড়ে এসে ফিরে দাঁড়ান তিনি অতি সাধের গ্রানাডা কে শেষ বারের মত এক নজর দেখার জন্য। যে কান্না, যে অশ্রুকে সুলতান এই পর্যন্ত রোধ করে রেখেছিলেন, গ্রানাডার উপর শেষ নজরটি পড়ার পর তা আর কোন বাধ মানল না। শিশুর মত অঝোর ধারায় অশ্রু বর্ষণ করতে লাগলেন তিনি। আর তিনি বলতে লাগলেন, 'আল্লাহু আকবর, আমার মত দুর্ভাগ্য কার!' এই ঘটনা থেকে মুসলিমরা এই পাহাড়ের নাম দেয়, 'ফেজ আল্লাহু আকবর।' আর স্পেনীয় খ্রিষ্টানরা বলেন, 'মুরের শেষ দীর্ঘশ্বাস।'

মুরের দীর্ঘশ্বাস পাহাড়ের আহমদ মুসা যখন পৌঁছেছিল, তখন সাড়ে তিনটা। আসরের নামাযের তখনও অনেক দেরি। শোয়া চারটায় আসরের নামায এখানে।

আহমদ মুসা নামেনি গ্রানাডায়, সোজা চলে এসেছে মুরের দীর্ঘশ্বাস পাহাড়ে।

কর্ডোভা থেকে যে আন্দালুসিয়ান হাইওয়ে বেরিয়ে এসেছে, সেটা গ্রানাডার বুকের উপর দিয়ে মুরের দীর্ঘশ্বাস পাহাড়ের গিরিপথটি অতিক্রম করে চলে গেছে দক্ষিণে জিব্রালটার প্রণালীর দিকে। গ্রানাডা প্রবেশের অনেক আগেই আহমদ মুসা সিয়েরা নিবেদা পাহাড়ের পাদদেশে, দাঁড়ানো ‘আল হামরার দৃষ্টি মনোহর লাল প্রাসাদের একটা অংশ এবং তার ১২টি অভ্রভেদী চুড়ার একটির একটা ভাঙ্গা অংশ দেখতে পেয়েছিল। বুকে একটা প্রচন্ড খোঁচা লেগেছিল আহমদ মুসার। চোখের সামনে ভীড় করে উঠেছিল অতীতের হাজারো দৃশ্য এবং বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছিল হাজারো কথা।

ভারী হয়ে উঠেছিল আহমদ মুসার চোখ। হঠাৎ নিরব হয়ে গিয়েছিল আহমদ মুসা। গ্রানাডায় পৌঁছে রবার্তো একবার বলেছিল আহমদ মুসা ভাই, গ্রানাডায় আমরা কি দাঁড়াব?

কোন উত্তর আসেনি আহমদ মুসার কাছ থেকে। রবার্টও পেছনে ফিরে আহমদ মুসার মুখের দিকে তাকিয়ে আর কোন প্রশ্ন করেনি।

মুরের দীর্ঘশ্বাস পাহাড়ের শীর্ষদেশের নিচেই প্রশস্ত একটা চত্বর আছে এখানে দাঁড়িয়েই স্পেনের শেষ মুসলিম সুলতান আবু আবদুল্লাহ, তার পরিবার এবং তার সাথীরা গ্রানাডাকে শেষবারের মত দেখেছিল। এই জায়গাটা স্প্যানিশ খ্রিস্টানদের জন্যে গৌরবের জায়গা। প্রতিবছর ২রা জানুয়ারী যখন খ্রিস্টানরা গ্রানাডা বিজয়ের উৎসব করে, তখন এখানে তারা আবু আবদুল্লাহর দু’শ পুত্তলিকা দাঁড় করিয়ে তার চোখে একটা পানির নল লাগিয়ে দেয় যেখান থেকে অঝোর ধারায় ঝরতে থাকে পানি। আর এই জায়গাটা মুসলিমদের জন্য কাঁদার জায়গা।

আহমদ মুসা মুরের দীর্ঘশ্বাস পাহাড়ে উঠে এই চত্বরটিতে এসে দাঁড়াল।

মুরের দীর্ঘশ্বাস পাহাড়টি গ্রানাডার সোজা দক্ষিণে। তার চত্বরটি থেকে ভেগা প্রান্তরে দাঁড়ানো গ্রানাডা নগরীকে অত্যন্ত সুন্দর লাগে। দেখা যায়, গ্রানাডার

গা ছুয়ে সেনিল নদী সবুজ ভেগা প্রান্তরের বুক চিরে রুপালী ফিতার মত এগিয়ে গেছে।

চত্বরটিতে উঠে উত্তর দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠল গ্রানাডা। কিন্তু লাল পাথরের নিরাভরণ আলহামরা (যাকে সারাজিনী নাইডু বলেছেন তাজমহলের চেয়ে অধিকতর অনিন্দসুন্দর এবং ঐতিহাসিক স্যার আমীর আলী যার সম্পর্কে বলেছেন আলহামরার দৃশ্য বর্ণনা অত্যন্ত শক্তিশালী কলমের দ্বারাই শুধু সম্ভব) যেন বৈধব্যের পোষাক পরে মুখভার করে দাড়িয়ে আছে।

আহমদ মুসা চোখ সরাতে পারলো না গ্রানাডার উপর থেকে। ধীরে ধীরে আজকের গ্রানাডার দৃশ্য সরে গিয়ে তার চোখে ভেসে উঠছে আরেক গ্রানাডার দৃশ্য। যে দৃশ্যে আহমদ মুসা দেখল হৃদয় বিদারক এক নাটকঃ

১৪৯১ সালের ২রা জানুয়ারী। সূর্য উঠতে তখন ও অনেক দেরী। আত্মসমর্পিত গ্রানাডার মুসলিম অধিবাসীরা তখনও ঘুম থেকে জাগেনি। আত্মসমর্পণ এর শর্ত অনুসারে গ্রানাডা ত্যাগের জন্য সুলতান আবু আবদুল্লাহ তার পরিজন ও সাথী সহ আল-হামরা প্রাসাদের পশ্চাতের এক দুয়ার দিয়ে বের হলেন এবং নগরীর সবচেয়ে জনহীন অংশ দিয়ে গ্রানাডা ত্যাগ করলেন। সুলতানের চোখে অশ্রু নেই, কিন্তু সুলতানের হেরেমের মহিলারা আত্ম-সংযম করতে পারলো না, তারা সকলেই রোদন করছিল। সুলতান চাইছিলেন, বিদ্রুপ- কঠোর তাদের এ দৃশ্য যেন না হাসে, আর শত্রু তাদের দেখে যেন জয়োল্লাস না করে, এই জন্যই এই গোপন বাবস্থা। সুলতানের এই ছোট কাফেলাটি গ্রানাডা থেকে বেরিয়ে ভেগা প্রান্তরে সেনিল নদী অতিক্রম করে আল-পুজারিশ পাহাড় পাড়ি দিয়ে এক গ্রামে এসে দাঁড়ালেন।

.........ওদিকে বিজয়ী খ্রিস্টান সম্রাট ফার্ডিন্যান্ড এবং রানী ইসাবেলার বাহিনী সেনিল নদীর তীরে শহীদ পাহাড়ের কাছে এক ক্ষুদ্র মসজিদের কাছে এসে উপস্থিত হল। সুলতান আবু আবদুল্লাহ তার কয়েকজন সাথী সমেত খ্রিস্টান রাজ-দম্পতির সামনে এলেন। রাজ-দম্পতির সামনে বশ্যতা স্বীকার এর চিহ্ন ঘোড়া থেকে নামতে উদ্যত হলেন। কিন্তু ফার্ডিন্যান্ড তাকে নিষেধ করলেন। অধীনতা

জ্ঞাপনের জন্য সুলতান তখন সম্রাট এর হাতে চুম্বন করতে অগ্রসর হলেন। ফার্ডিন্যান্ড তাও করতে দিলেন না। অবশেষে আবু আবদুল্লাহ নত ফার্ডিন্যান্ড এর ডান হাতকে সালাম করলেন। অতঃপর সুলতান আবু আবদুল্লাহ প্রাসাদের চাবি সম্রাট ফার্ডিন্যান্ডের হাতে তুলে দিলেন এবং বললেন, 'এই চাবি স্পেনের মুসলিম শাসনের শেষ নিদর্শন। রাজন, আমাদের রাজ্য, আমাদের ধন-সম্পদ, আমাদের প্রাণ পর্যন্ত আপনার করায়ত্ব। আপনি অঙ্গিকার করেছেন, আমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন। আমরা আপনার সেই দয়া-ই প্রত্যাশা করি।' .....ঠিক এই সময় আল-হামরার দূর্গ শীর্ষ থেকে মুসলিম শাসনের অর্ধচন্দ্র পতাকা ভূ-লুণ্ঠিত হল, আর তার স্থানে সকালের সোনালি সূর্য কিরণে রৌপ্য নির্মিত প্রকাণ্ড ক্রস ঝলমল করে উঠল। ক্রসটি এখানে স্থাপন করলেন একজন বিশপ। পরে সেখানে উত্তোলিত হল রাজকীয় পতাকা, উত্তোলন করলেন ফৌজের প্রধান পতাকাবাহী।

আহমদ মুসার পলকহীন চোখ থেকে দু'টি অশ্রু ধারা নামছিল তার দু'গন্ড বেয়ে। একসময় গ্রানাডার উপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে তাকাল জোয়ানের দিকে, রবার্তোর দিকে।

গ্রানাডার দিকে নিবন্ধ– দৃষ্টি আহমদ মুসার চোখ থেকে অশ্রু গড়াতে দেখে জোয়ান এবং রবার্তো অভিভূত হয়ে পড়েছিল।

আহমদ মুসা ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, জোয়ান, রবার্তো, শত শত বছর আগের গ্রানাডার ছবি দেখলাম।

'কি ছবি?' বলল জোয়ান।

'ছবিটা মুসলিম গ্রানাডার অন্তিম দৃশ্য।

দেখলাম সেই দৃশ্য, কিভাবে শেষ সুলতান আবু আবদুল্লাহ আল-হামরা থেকে, গ্রানাডা থেকে বেরিয়ে এলেন, কিভাবে কি কথা বলে নগরীর চাবি তুলে দিলেন ফার্ডিন্যান্ডের হাতে, কিভাবে গ্রানাডার দূর্গশীর্ষ থেকে মুসলমানদের অর্ধচন্দ্র পতাকা ভূ-লুণ্ঠিত হল এবং তার জায়গায় উঠে এল ক্রস।'

'আপনার চোখের অশ্রু কি এই দৃশ্য দেখে?' বলল রবার্তো।

‘ঠিক শুধু এই দৃশ্য দেখেই নয়, সুলতান আবু আবদুল্লাহকে ফার্ডিন্যান্ডের হাতে নগরীর চাবি তুলে দিয়ে তার সামনে মাথা নত করে নিরাপত্তা ও ক্ষমা–ভিক্ষা করতে আমি যখন দেখছিলাম, তখন গ্রানাডার আরেক সিংহ–দিল তরুনের কথা আমার মনে পড়েছিল। তিনি তরুণ সেনাধ্যক্ষ মুসা। সুলতান আবু আব্দুল্লাহর আত্ম-সমর্পণের বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল, যখন দরবারে আমির-উমরাহ ও উপস্থিত বিশিষ্ট নাগরিক আত্মসমর্পণের পক্ষে মত দিচ্ছিল, তখন প্রতিবাদের জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে এই তরুন সেনাধ্যক্ষ বলল, ‘শেষ পর্যন্ত শত্রুর সঙ্গে লড়াই করা হোক। দরকার হয়, তাদের বর্ষার মুখে গিয়ে আমরা আত্মহত্যা করব। যেখানে শত্রু সবচেয়ে প্রবল, সৈনিকদের সেখানে নিয়ে যেতে আমি প্রস্তুত। যারা বেঁচে থেকে গ্রানাডা নগরীকে শত্রু হস্তে অর্পণ করবে, তাদের মধ্যে গণ্য হওয়ার চেয়ে যারা শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করে জীবন-পাত করবে, তাদের মধ্যে গন্য হওয়াকে আমি গৌরবের মনে করি।’ কিন্তু এই তরুণের প্রতিবাদ কোন কাজে আসেনি। সুলতান এবং দরবার আত্মসমর্পণেরই সিদ্ধান্ত নেয়। সিদ্ধান্ত নেয়ার পর গোটা দরবার শিশুর মত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। শুধু কান্না ছিল না ওই তরুণ সেনাধ্যক্ষের চোখে। সে কান্নার রোলের মধ্যে উঠে দাঁড়াল সেই তরুণ আবার। উচ্চ কন্ঠে বলল, ‘জাতির প্রবীণ সর্দারবৃন্দ, অর্থহীন রোদন আর বিলাপ ছেলেদের ও অবলা নারীদের জন্যে রেখে দিন। আমরা পুরুষ। আমাদের অন্তর অশ্রু বর্ষণের জন্যে সৃষ্টি হয়নি, রক্ত বর্ষণের জন্যে সৃষ্টি হয়েছে। আসুন আমরা স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করতে করতে বীরের মত আত্মবিসর্জন করি। গ্রানাডার উপর যে অন্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার প্রতিকারার্থে মৃত্যুকে বরণ করি। আমাদের মৃত দেহকে আচ্ছাদিত করার জন্যে যদি এক মুঠো মাটিও না জোটে, উদার অন্তহীন আকাশের কখনও অভাব হবে না।’ তরুণ সেনাধ্যক্ষ কথা শেষ করে থামল। সমগ্র দরবার নিরব, নিস্পন্দ। সুলতান আবু আবদুল্লাহ আগ্রহ ভরে দরবারের মুখগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। সাহস, শৌর্য ও আগ্রহের একটি কথাও বিশাল দরবারে একটি কন্ঠ থেকেও উচ্চারিত হল না। দূর্বল চিত্ত সুলতান আবু আবদুল্লাহ কাতর কন্ঠে চিৎকার করে উঠলেন, ‘আল্লাহু আকবর, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে, তকদীরের বিধানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে লাভ

নেই। তকদীরের ফলকে অতিস্পষ্টভাবেই লেখা আছে, আমার জীবন হতভাগ্যের জীবনেই পর্যবসিত হবে। সাম্রাজ্য আমার শাসনকালেই বিলুপ্ত হবে।' অবশেষে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত যখন দরবারে চুড়ান্ত হয়ে গেল, আত্মসমর্পণ পত্রে স্বাক্ষরের জন্যে সুলতানের কলম উত্তোলিত হলো, তখন তরুণ সেনাধ্যক্ষ মুসা ক্রোধ-কম্পিত কন্ঠে শেষবারের মত চিৎকার করে উঠল, 'আপনারা নিজেদের প্রতারিত করবেন না। মনে ভাববেন না যে, খৃষ্টানেরা তাদের অঙ্গীকার পালন করবে। যে লাঞ্ছনা এবং বিপদ আমি দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি, তার তুলনায় মৃত্যু তুচ্ছ ব্যাপার। আমাদেরই চোখের সামনে আমাদের এই প্রিয় নগরী লুন্ঠিত হবে, আমাদের মসজিদ, এবাদতগৃহ নিগৃহীত, অপমানিত হবে, আমাদের গৃহ-সংসার বিধ্বস্ত হবে, আমাদের স্ত্রী-কন্যারা উৎপীড়িত-ধর্ষিতা হবে। নিষ্ঠুর অত্যাচার, হৃদয়হীন অসহিষ্ণুতা, চাবুক এবং শৃঙ্খল, অন্ধকার কারাগৃহ, মৃত্যুর অগ্নিকুন্ড, ফাঁসির কাষ্ঠ, এ সবই আমাদের ভাগ্যে জুটবে, মৃত্যুর অগ্নিকুন্ড, ফাঁসির কাষ্ঠ, এ সবই আমাদের ভাগ্যে জুটবে, এ সবই আমাদের দেখতে হবে, এ সবই আমাদের সহ্য করতে হবে। অন্ততঃ এই সব হতভাগ্য কাপুরুষেরা এসব দেখবে- এখন যারা সম্মানজনক মৃত্যুকে বরণ করতে কুন্ঠিত। আমি নিজের কথা বলতে পারি, ইনশাআল্লাহ, আমার চোখ দিয়ে এসব কখনও দেখবে না।' তরুণ সেনাধ্যক্ষ মুসা কথা শেষ করে বেরিয় এল দরবার থেকে। সে নেমে এল রাজপথে। কারও সাথে কথা বলল না, কারও দিকে তাকালোও না সে। ঘরে গিয়ে অস্ত্রে-শস্ত্রে নিজেকে সজ্জিত করল, আরোহন করল নিজের প্রিয় অশ্বে। তারপর গ্রানাডা নগরীর 'এলভিরা' নামক সিংহদ্বার অতিক্রম করে দৃঢ় পদক্ষেপে যুদ্ধ ক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে চলল।'

থামল আহমদ মুসা। শেষ দিকে তার কন্ঠ ভারি হয়ে উঠেছিল কান্নায়।

জোয়ান ও রবার্তো রুদ্ধশ্বাসে শুনছিল অভূতপূর্ব কথাগুলো। তাদের চোখ, বিস্ফারিত, উজ্জ্বল।

'তারপর।' আহমদ মুসা থামার সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল জোয়ান।

'তারপরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। ঘোড় সওয়ার মুসা ফার্ডিন্যান্ডের একটি সেনাদলের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। আমৃত্যু লড়েছিল সে। আঘাতে আঘাতে

জর্জরিত হয়েছিল তার দেহ। ভারি বর্ম আচ্ছাদিত মুমূর্ষ দেহ তার ডুবে গিয়েছিল সেনিলের পানিতে।'

আহমদ মুসা থামল। থেমেই আবার শুরু করল, গ্রানাডার দিকে তাকিয়ে সুলতান আবু আবদুল্লাহর আত্ম-সমর্পণ দৃশ্যের পাশাপাশি এই তরুণ সেনাধ্যক্ষের আত্ম-বিসর্জনের দৃশ্যই আমাকে বেশী অভিভূত করে।

আহমদ মুসা মুরের দীর্ঘশ্বাস পাহাড়ের যে চত্তরে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল, সে চত্তরের এক পাশে পাহাড়ের শীর্ষ চূড়া, অন্য পাশে ছোট বড় চূড়ার দীর্ঘ সারি এগিয়ে গেছে পূর্ব দিকে। চত্তরের পাশেই দু'টি ছোট চূড়া পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। চূড়া দু'টির মাঝখানে দিয়ে সংকীর্ণ একটা পথ। সে পথটির মাথায় পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে দু'জন যুবক। ওরা চত্তরেই দাঁড়িয়েছিল, তিনজন অপরিচিত যুবক অর্থাৎ আহমদ মুসাদের চূড়ায় উঠতে দেখে তারা পাথরের আড়ালে সরে গেছে।

দু'জন যুবকের কারও বয়সই বাইশের বেশী নয়। চেহারা ও দেহের গড়ন আরবীয় কিন্তু দেহের রং ইউরোপীয়দের মত সাদা, চুল ও চোখ এশীয়দের মত কাল। যুবকদের একজনের চেহারা খুবই বুদ্ধিদীপ্ত, শরীরটাও অত্যন্ত সুগঠিত। নিষ্পাপ হাসিমাখা মুখ, কিন্তু দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা বাজপাখীর মত। এই তরুণের নাম যিয়াদ বিন তারিক। কার্ডোভার বৃদ্ধ একেই স্পেনের নতুন ফ্যাল্কন নামে অভিহিত করেছে। তার সাথের যুবক আবদুল্লাহ তার সর্বক্ষণের সাথী।

যিয়াদ বিন তারিক গ্রানাডার এক পার্বত্য গ্রামের সর্দারের ছেলে। গ্রানাডার দক্ষিণ-পূর্বে সিয়েরা নিবেদা পর্বত শ্রেণীর দক্ষিণ ঢালে পশ্চিমে গোয়াদেল ফো এবং পূর্বে গোয়াদেলজ নদীর মাঝখানে বিশাল এক বনাঞ্চল। এই বিশাল এবং গভীর বনাঞ্চলেরই একটা গ্রামে বাস করে যিয়াদ বিন তারিকের পরিবার। দুর্গম বনাঞ্চলে এই জনবসতি গড়ে উঠার একটা ইতিহাস আছে। গ্রানাডার পতনের পর মুসলমানদের উপর চরম নির্যাতন নেমে আসে। জোর করে তাদের খৃষ্টান করা হয়, অথবা দেশ ত্যাগে বাধ্য করা হয়। বেশীর ভাগ বাঁচার জন্যে খৃষ্টান হওয়ার মহড়া দিল, অনেকে স্পেন থেকে পালিয়ে গেল। কিন্তু অনেকে খৃষ্টানও হলো না এবং স্পেন থেকে পালিয়েও গেল না। গ্রানাডা অঞ্চলের

এরাই এসে আশ্রয় নিয়েছিল সিয়েরা নিবেদা দক্ষিণ ঢালের এই দুর্গম বনাঞ্চলে। যিয়াদ বিন তারিকের পরিবার তাদের উত্তরসুরীদেরই একটা অংশ। যিয়াদ বিন তারিক খৃষ্টান ছদ্মনাম নিয়ে গ্রানাডা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাস বিষয়ে সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়েছে। সবে সে বেরিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া কালেই যিয়াদ বিন তারিক 'ব্রাদার্স ফর ক্রিসেন্ট' নামে তরুণদের একটা গ্রুপ গঠন করে। প্রথম দিকে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছদ্মবেশী মুসলিম তরুণরাই এর সদস্য ছিল। এর সদস্যপদ এখন ছাত্র-তরুণদের বাইরেও বিস্তৃত করা হয়েছে। 'ব্রাদার্স ফর ক্রিসেন্ট' এর সদস্যদের নিবেদা পার্বত্যঞ্চলে নিয়ে ট্রেনিং দেয়া হয়।

পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে যিয়াদ বিন তারিক এবং আবদুল্লাহ চত্তরে উঠে আসা নতুন আগন্তুক আহমদ মুসাদের উপর চোখ রেখেছিল। যিয়াদরা প্রথমে মনে করেছিল, আগন্তুকরা কোন খৃষ্টান ভ্রমনকারী হবে, তারা মুরের দীর্ঘশ্বাস পাহাড় এবং 'দীর্ঘশ্বাস' এর ঐতিহাসিক চত্তরটা দেখে আনন্দ করতে এসছে। কিন্তু আহমদ মুসার এশীয় চেহারা এবং মুখভাব দেখে তাদের চিন্তা প্রথম হোঁচট খায়। তারা দেখে আগন্তুকদের মুখে হাসি নেই, বরং গম্ভীর বেদনার্ত তাদের মুখ। তাদের মুখে কথাও নেই। কিন্তু তাদের হোঁচট খাওয়া চিন্তা বিস্ময়ে রূপান্তরিত হয় যখন গ্রানাডার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকা আহমদ মুসার চোখ থেকে অশ্রু গড়াতে তারা দেখে। তারপর যখন জোয়ানের সাথে আহমদ মুসার কথা শুরু হলো, যখন আহমদ মুসার কন্ঠ থেকে ফার্ডিন্যান্ডের কাছে আবু আবদুল্লাহর আত্মসমর্পণের বিষাদ -ছবি বেরিয়ে এল, যখন আহমদ মুসা তরুণ সেনাধ্যক্ষ মুসার বিরত্ব ও আত্মবিসর্জনের অভূতপূর্ব মর্মস্পর্শী কাহিনী বর্ণনা করল, তখন অভিভূত যিয়াদ বিন তারিক এবং আবদুল্লাহ আর অশ্রু রোধ করতে পারেনি। তাদের চোখ থেকে নেমে আসে অশ্রু অঝোর ধারায়। পবিত্র, জ্যোতির্ময় মুখের আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে যিয়াদ বিন তারিক কাঁদতে কাঁদতেই আব্দুল্লাহকে বলে, আবদুল্লাহ স্পেনের মুসলমানদের জন্যে এত দরদ তো কারও কন্ঠে শুনিনি, এত অশ্রু তো কারও চোখে দেখেনি, হতভাগ্য সেনাধ্যক্ষের এই কাহিনী তো কেউ কোনদিন এমনভাবে বলেনি। কে এই বিস্ময়কর বিদেশী যুবক আবদুল্লাহ। উঠ, চল যাই। এরপর লুকিয়ে থাকা পাপ হবে।'

বলে যিয়াদ বিন তারিক উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়াল আব্দুল্লাহ। তারা গিরীপথের দূরত্বটুকু অতিক্রম করে চত্তরের উপর দিয়ে এগোয়। তাদের দু'জনেরই চোখে অশ্রু, অশ্রুতে গন্ড ভেজা।

আহমদ মুসা ওদের দেখতে পেল। দেখতে পেল তাদের চোখের অশ্রুও। বিস্মিত আহমদ মুসা কিছু বলার আগেই যিয়াদ বিন তারিক সোজা এসে আহমদ মুসাকে বলল, 'কে আপনি বিদেশী ভাই?'

আহমদ মুসা তাকে নরম কন্ঠে পাল্টা প্রশ্ন করল, 'তুমি কে ভাই।'

'আমি যিয়াদ বিন তারিক।' বলল আগন্তুক যুবকটি।

'তুমি যিয়াদ বিন তারিক।' বলে আহমদ মুসা জড়িয়ে ধরল যিয়াদকে। বলল, 'আমি তোমার খোঁজেই এখানে এসেছি।'

'আপনি কে তা কিন্তু বলেননি? আপনার পরিচয়ের জন্যেই আমরা আড়াল থেকে ছুটে এসেছি।' বলল যিয়াদ।

এগিয়ে এল রবার্তো। আহমদ মুসা ও যিয়াদ বিন তারিকের সামনে এসে যিয়াদকে বলল, 'যার পরিচয় লাভের জন্যে ছুটে এসেছেন, তিনি আহমদ মুসা।

'আহমদ মুসা!' বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে বলল যিয়াদ।

'হ্যাঁ, সেই বহু বিপ্লবের নেতা আহমদ মুসা।'

মুখ দিয়ে কোন কথা সরলো না যিয়াদ বিন বিন তারিকের। সে এবং আবদুল্লাহ বিস্ময়-বিস্ফারিত অপলক চোখে তাকিয়ে রইল আহমদ মুসার দিকে। তারা মুর্তির মত স্থির হয়ে গেছে। কিন্তু অন্তরে তাদের ঝড় বইছে। যাকে নিয়ে তাদের আকাশ স্পর্শী গর্ব, যাকে ঘিরে তাদের হাজারো স্বপ্ন, যিনি কিংবদন্তীর মত মুখে মুখে উচ্চারিত, সেই আহমদ মুসা তাদের সামনে!

আহমদ মুসা যিয়াদ বিন তারিকের কাঁধে হাত রেখে বলল, 'বিস্মিত হচ্ছ? কেন আমি আসতে পারি না? এক দেশ থেকে আরেক দেশে মানুষ যায় না?'

যিয়াদ আহমদ মুসাকে গভীর ভাবে জড়িয়ে ধরে বলল, 'চোখকে যে বিশ্বাস হচ্ছে না! আল্লাহ আপনাকে স্পেনে আনবেন, এইভাবে আপনাকে পাওয়ার সৌভাগ্য আমাদের হবে, এ যে আকাশ-কুসুম কল্পনা আমাদের জন্যে। বিশ্বের

মুসলমানরা যে আমাদের কথা ভুলেই গেছে, আমাদের তারা বাদ দিয়ে রেখেছে তাদের তালিকা থেকে।'

আহমদ মুসা যিয়াদের পিঠ চাপড়ে বলল, 'না বিশ্বের মুসলমানরা তোমাদের ভোলেনি। মাদ্রিদের শাহ ফয়সাল মসজিদ কমপ্লেক্স- এর কথা ভুলে যাচ্ছ কেন?'

এই দান এসেছে শত শত বছর পরে। বলল যিয়াদ।

তোমার কথা ঠিক যিয়াদ কিন্তু তোমাকে একটা বিষয় স্বীকার করতে হবে। ইসলামী বিশ্বের দূর্ভাগ্য শুরু হবার পর স্পেনের দূর্ভাগ্যের সূত্রপাত। সমগ্র উত্তর আফ্রিকা তখন খন্ড-বিখন্ড এবং পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত। সুতরাং সাহায্য যেখান থেকে সবচেয়ে সহজে আসতে পারতো, সেখান থেকে আসতে পারেনি। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলে তখন তুর্কি সাম্রাজ্য শক্তিশালী, কিন্তু সাগর পাড়ি দিয়ে স্পেনে পৌছা তার সামর্থ্যের বাইরে ছিল।

জানি জনাব, আমি স্পেনের দূর্ভাগা মুসলমানদের একটা আবেগের কথা বলেছি। তাদের কেউ সাহায্য করতে না পারুক, তাদের উপর শতাব্দীর পর শতাব্দী থেকে যা ঘটে আসছে, তার কোন প্রতিবাদও মুসলিম বিশ্বের কোথাও থেকে উত্থিত হয়নি। কারও চোখ থেকে অশ্রুও ঝরেনি। বলল, যিয়াদ।

এই আবেগকে আমি শ্রদ্ধা করি যিয়াদ এবং মুসলিম শক্তিগুলোর ব্যর্থতাকেও আমি স্বীকার করি। তুর্কি সাম্রাজ্যে খৃষ্টান প্রাজারা মুসলমান প্রজাদের চেয়ে বেশী সুবিধা ভোগ করছে, কিন্তু তারপরও তুর্কি সাম্রাজ্যের খৃষ্টান প্রজাদের কাল্পনিক দুঃখ-দুর্দশার শ্লোগান তুলে ইউরোপীয় খৃস্টান শক্তিগুলো চিৎকার করেছে, কিন্তু মুসলিম শক্তিগুলো মুসলমানদের উপর জলজ্যান্ত খৃস্টান নির্যাতনের বিরুদ্ধে টু-শব্দটিও করেনি। এর জন্যে আফসোস করে কোন লাভ নেই। সে সময় প্রকৃত অর্থে অনেক জায়গায় মুসলমানরা ক্ষমতায় থাকলেও ইসলাম ক্ষমতায় ছিল না। আহমদ মুসা থামল।

ধন্যবাদ জনাব। অতীতের জন্য কোন ক্ষোভ নেই, কোন দুঃখ নেই এখন আর। আজ আপনাকে পেয়ে সব যেন শেষ হয়ে গেছে, সব ক্ষতির পূরণ হয়েছে।

একটু থামল যিয়াদ। রুমাল দিয়ে চোখটা ভালো করে মুছে নিয়ে বলল, এখনও আমার কাছে স্বপ্নই মনে হচ্ছে যে, আমি আহমদ মুসার সামনে দাঁড়িয়ে। ভয় হচ্ছে স্বপ্ন না ভেঙ্গে যায়। কিভাবে আপনি হঠাৎ এখানে হাজির হলেন? যিয়াদের কথাগুলো শেষের দিকে আবেগে ভারি হয়ে উঠেছিল।

হঠাৎ নয় অনেক ঘটনা পাড়ি দিয়ে আমি তোমার এখানে পৌঁছেছি। ইতোমধ্যে দু'বার আমি ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান এর হাতে পড়েছি, অনেক ঘটনা ঘটেছে।

ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান এর হাতে দু'বার বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলল যিয়াদ।

তোমাদের মাদ্রিদ বিমান বন্দরে পা দিয়েই প্রথমবার।

তারপর?

বলব সব কাহিনী।

আমরা খুব খুশী হবো। আচ্ছা বলুন, আমার নাম জানলেন কি করে, আর আমাদের খোঁজে এই স্থানেই বা এলেন কি করে?

আহমদ মুসা কর্ডোভার গোয়াদেল কুইভার ব্রীজের সেই বৃদ্ধের সব কাহিনী শোনাল।

সব শুনে যিয়াদ বলল, হ্যাঁ, বৃদ্ধ আমার সব কথা জানে। ছাত্র জীবন থেকেই এই বৃদ্ধকে আমি দেখছি, তখন থেকেই তার সাথে আমার পরিচয়। জীবন সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ আজ হতাশ বটে, কিন্তু তার ভেতরে আগুন আছে, সে আগুন আমার পথকেও অনেক খানি আলোকিত করেছে।

বৃদ্ধ আমার কাছে মুসলিম স্পেনের প্রতিকৃতি।

একটু ভেবে যিয়াদ বলল, ঠিক বলেছেন। স্পেনের মুসলমানরা সর্বস্ব হারিয়েছে, সেও। স্পেনের মুসলমানরা যেমন হতাশ, বৃদ্ধও তেমনি। লাঞ্ছনা-গঞ্জনা যেমন স্পেনের মুসলমানদের প্রতিদিনের সাথী, তেমনি তারও।

আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছি, নামাজ সেরে নিয়ে আমরা ফিরতে পারি। বলল, যিয়াদের সাথী আব্দুল্লাহ।

যিয়াদ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, ঠিক বলেছ। নামাজের সময়ও হয়ে গেছে।

নামাজের জন্য সবাই প্রস্তুত হলো।

আহমদ মুসা ইমামের জায়গায় যিয়াদকে ঠেলে দিল। যিয়াদ দ্রুত পেছনে সরে এসে বলল, অসম্ভব, আমি ঐ জায়গায় দাঁড়াতে পারিনা। আপনি আমাদের ইমাম সব ক্ষেত্রের জন্যেই।

নামাজ শেষে আহমদ মুসা ফিরে বসল। যিয়াদ বলল, এখান থেকে দুই মাইল পূর্বে পাহাড়ের এক গুহায় আমাদের একটা আস্তানা। ওটা আমাদের একটা বিশ্রাম কেন্দ্র। কিন্তু আমরা আপনাকে নিয়ে যেতে চাই সিয়েরা নিবেদার বনাঞ্চলে আমাদের আসল ঘাঁটিতে। এই ঐতিহাসিক বনাঞ্চলই ছিল ফ্যালকন অব স্পেন বশীর বিন মুগীরার কর্মক্ষেত্র।

আহমদ মুসার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, খুব আনন্দের হবে এই সফর, তোমাদের ব্যবস্থাদিও দেখতে পাব। কিন্তু যিয়াদ, খুব বেশী সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। আমি যে বড় কাজটি নিয়ে এখানে এসেছি তাতে এখনও হাত দেয়াই হয়নি।

কি সেটা? সাগ্রহে প্রশ্ন করল যিয়াদ।

বলব তোমাকে? ভয়াবহ ষড়যন্ত্র এঁটেছে ক্লু-ক্লাক্স-ক্লান।

চোখে-মুখে উদ্বেগ ফুটে উঠল যিয়াদের এবং সকলের। যে ষড়যন্ত্রকে স্বয়ং আহমদ মুসা ভয়াবহ বলে এবং যার জন্যে সে নিজে স্পেনে এসেছে সেটা নিশ্চয় খুব বড় ব্যাপার তা সকলেই হৃদয় নিয়ে অনুভব করল। সকলেই গম্ভীর হয়ে গেল।

'বন্দর নগরী মিত্রালীতেও আমাদের একটা ঘাঁটি আছে। ওখানেই আমরা আপাততঃ যেতে পারতাম, তারপর কোন সুযোগে না হয় নিবেদায় যেতাম। কিন্তু আমাদের এক কর্মীর সামান্য এক ভুলের কারণে ঘাঁটিটি সরকারের চোখে পড়ে গেছে। আজ সকালে খবর পেয়েছি ব্যাপারটা ক্লু-ক্লাক্স-ক্লানও জেনে ফেলেছে। গত সন্ধ্যা থেকেই মাথা মুন্ডিত কে একজন বাড়িটার উপর চোখ রেখেছে। আমার আম্মা অসুস্থ। আমার আম্মা ও স্ত্রী ওখানেই আছেন। আমি সকালেই জানিয়ে দিয়েছি তাদেরকে সকালের মধ্যেই নিবেদায় নিয়ে যেতে। সুতরাং সেখানে আমাদের যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। বলল, যিয়াদ।

আমি তোমাদের নিবেদায় যাব, তুমি নিষেধ করলেও আমাকে যেতেই হবে বদর বিন মুগীরা আর যিয়াদ বিন তারিকের স্বাধীন সাম্রাজ্যে। কিন্তু যিয়াদ আমি ভাবছি ক্লু-ক্লাক্স-ক্লানের নজরে যদি পড়েই থাকে তোমাদের ঘাঁটি, তাহলে কি তোমার পরিবার নিরাপদে সরতে পারবে?

দিনের বেলা, লোকজনও আমাদের আছে। অসুবিধা হবে না জনাব। বলল যিয়াদ।

আহমদ মুসার মন থেকে অস্বস্থি গেল না। উঠে দাঁড়াল সে। বলল, আমরা তাহলে এখন যাত্রা শুরু করতে পারি।

উঠে দাঁড়াল সকলে।

আহমদ মুসা যাবার আগে আরেকবার গ্রানাডার দিকে তাকাল। তার পাশে যিয়াদ।

আহমদ মুসা আনমনা হয়ে গিয়েছিল গ্রানাডার দিকে তাকিয়ে।

যিয়াদও তাকিয়েছিল গ্রানাডার দিকে। গ্রানাডা যিয়াদের আবাল্য পরিচিত। কিন্তু আহমদ মুসার পাশে দাঁড়িয়ে গ্রানাডাকে তার আজ সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম লাগছে। মনে হচ্ছে এ তার পরিচিত গ্রানাডা নয়, ইসলামের, মুসলমানদের, তাহলে কি তিনি এই সাম্রাজ্যের চাবী ঐভাবে ফার্ডিন্যান্ডের হাতে তুলে দিতে পারতেন? পারতেন না। পেরেছেন কারণ, সাম্রাজ্যটা তার ব্যক্তিগত ছিল, ইসলামের নয়, মুসলমানদের নয়। অন্যদিকে ফার্ডিন্যান্ড ও ইসাবেলা এই সাম্রাজ্য দখল করেছিল তাদের ধর্মের নামে, সৈন্যেরা যুদ্ধও করেছিল তাদের ধর্মের জন্য। গ্রানাডার দূর্গশীর্ষে প্রথম উঠেছিল ক্রস। এই ক্রস উত্তোলিত করেছিলেন তাদের দেশের ধর্মগুরু। ক্রসের পর উত্তোলিত হয়েছিল রাজার পতাকা। যুদ্ধ চলাকালিন সময়ে গ্রানাডার নিকটে ভেগা প্রান্তরে রানী ইসাবেলার নির্দেশে একটি সুন্দর নগরী নির্মিত হয়। সকলে বলেছিল এ নগরীর নাম ইসাবেলা রাখা হোক। কিন্তু রানী তা করেননি। ঐতিহাসিক আন্টিনিও আগানিতা বলেছেন, ধর্মপ্রাণ দেশবাসী যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই নগরীর সৃষ্টি সেই উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রাখবার জন্যে নগরীর নাম সান্টা ফে অর্থাৎ পবিত্র ধর্মের নগরী রাখলেন। এই ধরনের গভীর ধর্মনিষ্ট মানসিকতা সুলতান আবু

আব্দুল্লাহর ছিল না, তার বাহিনীর ছিল না এবং তখনকার গ্রানাডাবাসীরও ছিল না। অর্থাৎ তুমি বলতে পার যিয়াদ, ৭১১ খৃস্টাব্দে তারিক বিন যিয়াদ এবং মুসা বিন নুসায়েরের ইসলামের যে পতাকা নিয়ে স্পেন জয় করেছিলেন, সেই পতাকা পরে ভূ-লন্ঠিত হয় এবং তার জায়গায় ওঠে ব্যক্তির পতাকা, গোষ্ঠীর পতাকা। তুমি হয়তো জান যিয়াদ, স্পেনে তৃতীয় আব্দুর রহমানের মত হুসিয়ারী লোকও তাঁর পাশে মহিষী জোহরার নাম অক্ষয় করে রাখার জন্য কর্ডোভার পাশে আজ-জোহরা নামক এক উপনগরী নির্মাণে এমনই মশগুল হয়ে পড়েছিলেন যে, পরপর তিন শুক্রবার তিনি জুম্মার জামায়াতে হাজির হতে পারেননি, যার জন্য প্রচন্ড ধমক খেতে হয়েছিল তাকে ইমামের কাছে।'

শত শত বছর আগের আবু আব্দুল্লাহর গ্রানাডা যেন জীবন্ত হয়ে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। যিয়াদের মুখ ফেটেই যেন একটা প্রশ্ন বেরিয়ে এল, 'গ্রানাডার কেন পতন হয়েছিল, আপনার উল্লেখিত সেই সেনাধ্যক্ষ মুসার আবেদন কেন কন কাজে আসেনি, কেন পরাজিত হয়েছিলো মুসলমানরা মুসা ভাই?'

আহমদ মুসা তৎক্ষণাৎ কোন উত্তর দিল না। পরে একটু ম্লান হাসল। তারপর ধীর কন্ঠে শুরু করল, 'এই চত্ত্বরে দাঁড়িয়ে গ্রানাডার দিকে তাকিয়ে সুলতান আবু আবদুল্লাহ যখন শিশুর মত কাঁদছিল, তখন সুলতানের মা বীর নারী আয়েশাতুল হুররা কি বলেছিলেন জান? বলেছিলেন, 'যে রাজ্য পুরুষের মত তুমি রক্ষা করতে পারনি, তার জন্যে নারীর মত অশ্রু বিসর্জন তোমারই শোভা পায়।' অন্য দিকে আল হামরা প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসে আবু আবদুল্লাহ খৃষ্টান সেনাপতিকে যখন প্রাসাদে ঢুকার পথ করে দিয়েছিলেন, দূর্গশীর্ষে পতাকা উত্তোলনের জন্যে, তখন তিনি অর্থাৎ আবু আবদুল্লাহ বলেছিলেন, 'সেনাপতি যান, দূর্গ আপনি হস্তগত করুন। এ বৈভব আল্লাহ আপনার শক্তিশালী প্রভূকে অর্পণ করেছেন মুরদের পাপের শাস্তির জন্যে।' এই দুই উক্তির মধ্যে তিনটি কারণ আমরা দেখি, এক, রাজ্য রক্ষাই তখন শাসকদের কাছে ছিল মুখ্য, মুসলিম কিংবা মুসলমানদের ধর্ম রক্ষা নয়। দুই, রাজ্য রক্ষার মত পৌরুষ শাসকদের ছিল না। তিন, পরাজয় ছিল শাসকদের পাপের শাস্তি। প্রথম কারণটিই মূল কারণ। মূল

কারণ থেকে শেষের দু'টি কারণ সৃষ্টি হয়েছে। মুসলমানদের রক্ষা ইসলাম রক্ষা যদি শাসকদের লক্ষ্য হতো, তাহলে তাদের মধ্যে বিভেদ ষড়যন্ত্রের জায়গায় ঐক্য এবং দূর্বলতার বদলে পৌরুষ সৃষ্টি হতো, ভোগ সর্বস্বতা ও পাপাচার দূরে সরে যেত এবং তাদের পরাজয় ঘটত না। ভেবে দেখ যিয়াদ, সুলতান আবু আবদুল্লাহ যদি মনে করতেন এই গ্রানাডা, এই কর্ডোভা, এই সাম্রাজ্য তার নয়।'

থামল আহমদ মুসা।

তারপর আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, আমরা তো চলতে পারি।

'আহমদ মুসা ভাই, সুলতান আবু আবদুল্লাহ তাহলে ঠিকই বলেছিল, খৃষ্টান ফার্ডিন্যান্ড ও রানী ইসাবেলার কাছে মুসলিম স্পেনের আত্মসমর্পণ মুরদের পাপেরই কথা।' বলল যিয়াদ।

বলতে বলতে সামনে পা বাড়াল যিয়াদ বিন তারিক। আহমদ মুসাও হাঁটতে শুরু করেছিল। বলল, 'অবশ্যই। তবে এই পাপ স্পেনের জনতার ছিল না, মুসা, বদর বিন মুগীরা, প্রমুখ ছিলেন এঁদেরই প্রতিনিধি। কিন্তু দায়ী তারা না হলেও পাপের মাশুল তাদেরকেই দিতে হয়েছে ষোল আনা।'

'কেন মুসা ভাই, এমনটি হলো কেন, শাসকদের পাপের জন্যে নিরপরাধ মুসলমানরা মার খেল কেন?' বলল জোয়ান।

'এটাই নিয়ম জোয়ান। পাইলটের দোষে প্লেন ক্রাশ হলে নিরপরাধ যাত্রীরাও বাঁচে না। স্পেনের মুসলিম প্রজাদের দায়িত্ব শুধু খাজনা দেয়া ছিল না, রাজাকে সংশোধন করা, ঠিক পথে চালনা করা, রাজার সমালোচনা করা, ইত্যাদি তাদেরই দায়িত্ব ছিল। তারা সে দায়িত্ব পালন করেনি।'

'দুনিয়ার অনেক দেশের মুসলমানরা এমন দোষে দোষী, কিন্তু স্পেনের মুসলমানদের ভুলের মাশুল হয়েছে অত্যন্ত ভয়াবহ।' ভারী কন্ঠে বলল রবার্তো।

'ঠিক বলেছ ভাই।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল আহমদ মুসা।

চত্ত্বর থেকে তারা নেমে এল পাহাড়ের গায়ে। তারা পাঁচজন পাহাড়ের গা বেয়ে নামতে লাগল ধীরে ধীরে।

পাঁচজনের এ মিছিলের সারিতে প্রথমে আহমদ মুসা, তারপর যিয়াদ বিন তারিক। পরে ওরা তিনজন- আবদুল্লাহ, জোয়ান ও রবার্তো।

আহমদ মুসার গাড়ী ছুটছে গ্রানাডা হাইওয়ে ধরে দক্ষিণে মিত্রালীর দিকে। ড্রাইভিং সিটে যিয়াদ বিন তারিক।

কিন্তু গন্তব্যস্থল তাদের মিত্রালী নয়।

গ্রানাডা হাইওয়ে যেখানে গোয়াদেলফো নদী অতিক্রম করে মিত্রালীর দিকে এগিয়ে গেছে, সেখানে গোয়াদেলা নামে ছোট শহর গড়ে উঠেছে। এখান থেকে যিয়াদ বিন তারিকদেরকে নদী পথে যেতে হবে তাদের প্রধান ঘাঁটিতে নিবেদার জংগলে যেতে হলে। এই শহরকে লক্ষ্য করেই ছুটছে মুসার গাড়ি।

ড্রাইভিং সিটে যিয়াদ বিন তারিক। আহমদ মুসা তার পাশের সিটে। আর ওরা তিনজন বসেছে পেছনের সিটে।

দু'পাশে পাহাড়, উঁচু-নিচু টিলা। এর মধ্যে দিয়েই এঁকে-বেঁকে এগিয়ে গেছে গ্রানাডা হাইওয়ে।

মাঝারি গতিতে এগিয়ে চলছিল যিয়াদের গাড়ি।

কথা বলে উঠল যিয়াদ। বলল, 'মোটামুটি আপনার সব খবরই পত্রিকায় আসে। আপনি আর্মেনিয়ায় এসেছেন, আর্মেনিয়া থেকে বলকানে গেছেন তাও আমরা জানতে পেরেছি। কিন্তু আপনার স্পেনে আসার খবর এখনও প্রকাশ হয়নি।'

'সরকার ও সাংবাদিকরা এখনও জানার কথা নয়। প্রথমবার যখন ক্লু-ক্লাক্স-ক্ল্যানের হাতে পড়ি, ওরা আমাকে চিনতে পারেনি। কিন্তু দ্বিতীয়বার বন্দী হবার পর ভাসকুয়েজ আমাকে চিনতে পারে। মনে হয় তারা সাংবাদিকদের জানায়নি।' বলল আহমদ মুসা।

'আপনাকে চেনার পর ওরা তো সাংঘাতিক ক্ষেপে যাবার কথা।' বলল যিয়াদ।

'আমি যে রাতে বেরিয়ে আসি, তারপর দিন সকালেই আমাকে হত্যা করা কিংবা বিক্রি করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ছিল।'

‘বিক্রি করা, কোথায়?’

‘ওরা এক মিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে আমাকে আমেরিকান ক্লু-ক্লাক্স-ক্ল্যানের কাছে বিক্রি করেছিল। সেদিন সকালেই আমাকে আমেরিকার পথে আকাশে উড়তে হতো।’

‘আল্লাহর হাজার শোকরিয়ে যে তা হয়নি। আপনাকে কোথায় রেখেছিল? কিভাবে বেরুলেন? এটা প্রচলিত আছে যে, ক্লু-ক্লাক্স-ক্ল্যানের হাতে পড়া মানে শেষ হয়ে যাওয়া।’

‘সে অনেক কাহিনী, পরে বলব।’

একটু থেমে আহমদ মুসা আবার বলল, ‘মিন্দানাও, মধ্য এশিয়া সরকার অনেক দূরে, ফিলিস্তিন সরকারের সাথে কোন সময় তোমরা যোগাযোগ করনি? তারা তো আনন্দের সাথেই তোমাদের সাহায্য করতো।’

‘দূতাবাসের সাথে আমরা যোগাযোগ করেছি। তারা আমাদের একটা ডেলিগেশনকে আমন্ত্রণ করেছে। কিন্তু কিভাবে যাওয়া হবে এটা ঠিক হয়নি এখনও। তবে সৌদি দূতাবাস এই ব্যবস্থা করার দায়িত্ব নিয়েছে।’

‘মুসলমানদের বিভিন্ন ব্যাপারে সৌদি আরব তো সাহায্য করে থাকে।’

‘আমরা যোগাযোগটা খুব সম্প্রতি করেছি। মানবিক সাহায্য আমরা পেয়েছি। মসজিদ ও মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কার, নির্মাণ, ব্যবহার এখনও এখানে নিষিদ্ধ। সৌদি সরকার চেষ্টা করছে এ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়ে নেবার জন্যে। সেটা সম্ভব হলে একটা বড় কাজ হবে।’

কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ আহমদ মুসা থেমে গেল, উৎকর্ণ হয়ে উঠল।

সামনে দূরে একটা গাড়ির হেডলাইট দেখা গেল। ঐ গাড়ি থেকেই হর্ন শোনা গেছে।

আহমদ মুসাকে উৎকর্ণ হতে দেখে যিয়াদও সতর্ক হয়ে উঠেছিল।

‘সামনের গাড়িটা ক্লু-ক্লাক্স-ক্ল্যানের যিয়াদ।’ বলল আহমদ মুসা।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার তখন চারদিকে। সূর্য বেশ আগে ডুবেছে। কিন্তু উন্মুক্ত প্রান্তর বলেই

অন্ধকারটা গাঢ় হয়নি।

বলতে বলতেই গাড়িটা সামনে এসে গেল। গাড়িটা মাইক্রোবাস।

আহমদ মুসা গাড়িটার দিকে তাকিয়ে ছিল। লক্ষ্য নাম্বারটা দেখে নেয়া।

ক্লু-ক্লাক্স-ক্ল্যানের গাড়িটা চলে গেল।

'আপনি কি করে জানলেন ওটা ক্লু-ক্লাক্স-ক্ল্যানের গাড়ি?' বলল যিয়াদ।

'ক্লু-ক্লাক্স-ক্ল্যান কয়েকটা নির্দিষ্ট কোডে হর্ন বাজায়।'

সামনে আরেকটা হেড লাইট তীব্র বেগে এগিয়ে আসছে। যিয়াদ সেদিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন

কন্ঠে বলল, 'মুসা ভাই, ওটা 'ব্রাদার্স ফর ক্রিসেন্ট'-এর গাড়ি। কিন্তু এ সময় এ দিকে কেন?'

ভ্রু কুঁচকে গেল আহমদ মুসার। তার মনের সুপ্ত সন্দেহটা এবার শতকণ্ঠে কথা বলে উঠল। আহমদ মুসা দ্রুত কন্ঠে বলল, গাড়ি ঘুরিয়ে নাও যিয়াদ।

যিয়াদ একবার অবাক ও উদ্বিগ্ন চোখে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার নির্দেশ পালন করল। এ সময় সামনের গাড়িটাও এসে পড়ল। আগেই সংকেত দিয়েছিল যিয়াদ। গাড়িটা এসে দাঁড়াল যিয়াদের পাশে।

গাড়ি থেকে নামল যিয়াদের ছোট ভাই জায়েদ। কেঁদে উঠল। বলল, আম্মা ও ভাবীকে কিডন্যাপ করেছে।

যিয়াদ কিছু বলতে যাচ্ছিল। আহমদ মুসা বাধা দিয়ে বলল, 'যিয়াদ আমি সব বুঝেছি, তুমি এ সিটে এস, আমাকে ড্রাইভিং সিট দাও।'

বিনা বাক্যব্যয়ে যিয়াদ সরে এল, আহমদ মুসা গিয়ে বসল ড্রাইভিং সিটে। সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিন গর্জন করে উঠল। আহমদ মুসা জানালা দিয়ে জায়েদকে লক্ষ্য করে বলল, আমাদেরকে যদি হারিয়ে ফেল, তাহলে গ্রানাডার দক্ষিন গেটে দাঁড়াবে।

বলে আহমদ মুসা স্টার্ট দিল গাড়িতে। দেখতে দেখতে গাড়ির গতি ১৩৯ কি.মি. তে গিয়ে উঠল। ঝড়ের বেগে চলছে গাড়ি। গতির চাপে গাড়ি থর থর করে কাঁপছে।

যিয়াদের উদ্বিগ্ন চোখ আহমদ মুসার দিকে। আঁকা-বাঁকা রাস্তায়, তার উপর রাতের বেলায় এই গতি বেগ। কিন্তু যিয়াদ দেখল, আহমদ মুসা খেলনার

মত ঘুরিয়ে নিচ্ছে গাড়ি প্রতিটি বাঁকে। গাড়ি যেন নিজেই প্রান পেয়েছে, নিজেই পথ দেখে নিখুঁত ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল যিয়াদের মন, চোখটাও তার ভারি হয়ে উঠল। আজ এই মুহূর্তে এমন গতিবেগই তো দরকার। আহমদ মুসা সন্দেহ করেছে ঐ মাইক্রোবাসকে। ওটা তো অনেক দূর এগিয়ে গেছে। যিয়াদের চোখের সামনে ভেসে উঠল অসুস্থ মা আর সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী'র ছবি। হৃদয় তার বেদনায় মোচড় দিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে পাঠ করল সে, 'আল্লাহই যথেষ্ঠ, তিনিই অভিভাবক এবং তিনিই সাহায্যদাতা।' তারপর সে চোখ তুলল আহমদ মুসার দিকে। দেখল, তার মুখ প্রশান্ত, সেখানে কোন উদ্বেগের চিহ্ন নেই। মনে অনেক সান্ত্বনা পেল যিয়াদ। আজ তার ভীষণ বিপদের দিনে আল্লাহর বান্দাহদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিটি তার পাশে রয়েছে।

গাড়ি স্টার্ট দেয়ার পর আহমদ মুসা একটি কথাও বলেনি। মাঝখানে সে একবার ঘড়ি দেখেছে। আরেকবার ঘড়ির দিকে চেয়ে আহমদ মুসা বলল, এই গ্রনাডা হাইওয়ে ছাড়া গ্রানাডায় পৌঁছার বিকল্প কোন পথ আছে যিয়াদ?

'জি না, নেই।'

'হিসেব অনুযায়ী আমরা গাড়ি স্টার্ট দেয়ার সময় মাইক্রোবাস থেকে ১৬ মিনিট পেছনে ছিলাম। ১২ মিনিট এসেছি। মাইক্রোবাস যদি রাস্তা না বদলায়, কিংবা স্পিড যদি না বাড়িয়ে থাকে, তাহলে আর চার মিনিট পড় মাইক্রোবাসের পেছনের আলো আমরা দেখতে পাব।'

যিয়াদ, আবদুল্লাহ, জোয়ান, রবার্তো সকলেই আহমদ মুসার হিসেব শুনে বিস্মিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল।

'আমরা কোথায় এসেছি যিয়াদ?'

'ফেজ আল্লাহু আকবর পাহাড় আমরা পার হয়ে এসেছি মুসা ভাই।'

'তাহলে গ্রানাডা আর পাঁচ মাইল?'

'জি।'

'তাহলে মনে হচ্ছে গ্রানাডার গেটের মাইল খানেকের মধ্যে ওদের সাক্ষাৎ আমরা পাব।'

‘যায়েদদের গাড়ি দেখতে পাও আবদুল্লাহ?’ পেছন ফিরে জিজ্ঞাসা করল যিয়াদ।

‘না, পাঁচ মিনিট পর থেকে ওদের আর দেখা যাচ্ছেনা। মনে হচ্ছে অনেক পেছনে পড়েছে।’ বলল আবদুল্লাহ।

গ্রানাডার দক্ষিন গেট তখন আহমদ মুসার গাড়ি থেকে সিকি মাইলেরও কম। এই সময় একটি গাড়ির পেছনের পেছনের দু’টি লাল আলো আহমদ মুসাদের চোখের সামনে জ্বল জ্বল করে উঠল। আহমদ মুসা আরও কিছুটা এগুনোর পর বলল, এটাই সেই মাইক্রোবাস। যখন গ্রানাডার গেটে মাইক্রোবাসটি, তখন তার নাম্বার স্পষ্ট হয়ে উঠল। আহমদ মুসা বলল, এবার নিশ্চিত কন্ঠে, ‘নাম্বারও মিলে গেছে যিয়াদ। আমরা ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের গাড়িটা পেয়ে গেছি।’

মাইক্রোবাসটি নগরীর ভেতরে ঢুকে গেল।

আহমদ মুসার গাড়ি তাকে অনুসরণ করল।

সন্ধ্যা তখন ৭টা।

দু’পাশে ব্যস্ত বিপনী। মাঝখানে প্রশস্ত রাস্তা। গ্রানাডার নতুন অংশ এটা।

গাড়ির স্পিড অনেক কমে গেছে। গজ দশেক দূর থেকে মাইক্রোবাসটিকে অনুসরণ করছে আহমদ মুসা। রাস্তায় ভীড় কম।

নগরীতে ঢোকার পর একই রাস্তা ধরে এগিয়ে চলছিল তারা। যিয়াদ জানাল, এ রাস্তার নামের অর্থ ডি-টেন্ডেলা সার্কুলার রোড। ফার্ডিন্যান্ডের সেনাপতি অধিকৃত গ্রানাডার প্রথম গভর্নরের নাম অনুসারেই এ রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে। এ রাস্তাটি নগরীর সবচেয়ে বড় রাস্তা, গোটা গ্রানাডাকে চক্রাকারে বেষ্টন করে আছে।

রাস্তা নগরীর একদম পশ্চিম প্রান্তে। মাইক্রোবাসটি ডি-টেন্ডেলা সার্কুলার রোড থেকে নেমে প্রাচীর ঘেরা দু’তলা একটা বাড়ির গেটে গিয়ে তাঁগাল। দাঁড়িয়ে হর্ন দেয়ার কয়েক মুহূর্ত পরে গেটটি খুলে গেল। মাইক্রোবাসটি ভেতরে ঢুকে গেল। রাস্তার একপাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে আহমদ মুসারা দেখল এটা।

মাইক্রোবাসটি যখন ভেতরে ঢুকে গেল এবং গেটটি আবার বন্ধ হয়ে গেল বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল যিয়াদের। এক অশুভ আশংকায় গোটা গা কাঁটা দিয়ে উঠল তার।

আহমদ মুসা বোধ হয় টের পেল ব্যাপারটা। যিয়াদের কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনার স্বরে বলল, 'ভেব না যিয়াদ, আল্লাহ আছেন।'

যিয়াদ মুখ ফিরিয়ে আহমদ মুসার দিকে তাকাল। কিন্তু কিছু বলতে পারল না। ভেতর থেকে একটা উচ্ছ্বাস উঠে মুহূর্তের জন্যে তার কন্ঠকে রুদ্ধ করে দিল। তার ঠোঁট কাঁপল।

আহমদ মুসা যিয়াদের চিন্তার মোড় অন্য দিকে ঘুরিয়ে নেবার জন্যে বলল, 'শহরের এই এলাকা তুমি চেন যিয়াদ?'

'জি হ্যাঁ।' গলা পরিষ্কার করে বলল যিয়াদ।

'কমার্শিয়াল এলাকা মনে হচ্ছে, তাই কি?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু লোকজন কম কেন?'

'মাগরিবের পর থেকেই এখানে মার্কেটে লোক কমতে থাকে, এটাই গ্রানাডার নিয়ম।'

আহমদ মুসা মাইক্রোবাসটি যে বাড়িতে ঢুকল, সেদিকে চেয়ে বলল, বাড়িটিতে কোন সাইনবোর্ড

নেই, একে ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের অফিস মনে কর?'

'অফিস এবং বাসা দুই-ই হতে পারে।'

আহমদ মুসা পেছন দিকে ফিরে জোয়ানকে বলল, 'তোমর পিস্তলটা আমাকে ধার দাও জোয়ান।'

বলে আহমদ মুসা নিজের পিস্তলটা বের করল। পরীক্ষা করল ছয়টি গুলিই আছে।

জোয়ান তার পিস্তলটি বের করে আহমদ মুসার হাতে দিল। আহমদ মুসা সে পিস্তলটি পরীক্ষা করে

হাঁটুর নীচে প্লাস্টিক টেপ দিয়ে বেঁধে রাখল।

তারপর যিয়াদের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘তোমার কাছে পিস্তল আছে নিশ্চয়?’

‘জি হ্যাঁ।’

‘আমরা, মানে আমি আর তুমি, এখন এ বাড়িতে প্রবেশ করব। তুমি রেডি?’

‘জি হ্যাঁ।’ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল যিয়াদের। যিয়াদের দুর্বলতা কেটে গেছে দেখে খুশী হলো আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা পেছন দিকে আবদুল্লাহর দিকে চেয়ে বলল, ‘তুমি এসে ড্রাইভিং সিটে বস। আমরা না ফেরা পর্যন্ত এ ক্ষুদ্র দলটির নেতা তুমি।’

আহমদ মুসা ‘বিসমিল্লাহ’ বলে নামল গাড়ি থেকে। ওদিকে যিয়াদও নেমে পড়ল।

শুকনো মুখে ড্রাইভিং সিটে এসে বসল আবদুল্লাহ। জোয়ান ও রবার্তোর মুখ উদ্বেগ-উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে।

মেইন রোড এবং ঐ বাড়িটির মাঝখানের এই জায়গায় কোন আলো নেই। বাড়িটির গেটের আলোও শেডে ঢাকা। সুতরাং মধ্যবর্তী স্থানটি বেশ অন্ধকার।

বাড়িটিও অন্ধকারের মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছে। গেটের শেডে ঢাকা আলোটি ছাড়া প্রাচীরের আর কোথাও আলো নেই।

বাড়ির চারদিক ঘুরে দেখলো আহমদ মুসা ও যিয়াদ। ছোট্ট একটা টিলার উপর বাড়িটা। পাচীরের ভেতর গাছ-গাছড়া আছে। প্রাচীরটাও ৭ ফুটের বেশী উঁচু হবে না। আহমদ মুসা লাফ দিয়ে উঠে প্রাচীরের মাথাটাও পরীক্ষা করলো, না বিদ্যুতায়িত করার মত কোন তারের ব্যবস্থাও নেই। অনেকটা বিস্ময়ের সাথেই আহমদ মুসা বলল, ‘অফিসের নিরাপত্তার ব্যাপারে খুব তো চিন্তা করেনি ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান?’

‘ওদের গায়ে কেউ হাত দিতে পারে এটা ওরা মনে করে না মুসা ভাই, অন্ততঃ কর্ডোভা, গ্রানাডা, সেভিল সহ আন্দালুসিয়া অঞ্চলের ক্ষেত্রে ওদের এটা বদ্ধমুল ধারণা।’

‘শত্রুর অতিরিক্ত আত্ন-বিশ্বাস থাকাটা ভাল।’

বাড়ির পেছন দিকে প্রাচীরের অন্ধকার মত এক জায়গায় এসে দাঁড়াল আহমদ মুসা। বাড়ির পেছনে প্রাচীরের ভেতর এলাকায় মাত্র দু’টি আলো।

দাঁড়ানোর পর আহমদ মুসা যিয়াদকে বলল, ‘তুমি আমার কাঁধে উঠে ভেতরটা দেখ।’

বলে আহমদ মুসা বসে পড়ল।

যিয়াদ দ্বিধা করতে লাগল আহমদ মুসার কাঁধে পা রেখে উঠতে।

‘আমার নির্দেশ যিয়াদ, দেরী করো না।’ দৃঢ় কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

সঙ্গে সঙ্গে যিয়াদ নির্দেশ পালন করল।

ভেতরটা দেখে আহমদ মুসার কাঁধে বসে ফিসফিস করে বলল, ঠিক আমাদের সোজা প্রাচীরের নিচে দু’জন প্রহরী একটা পাথরে বসে গল্প করছে। স্টেনগান তাদের পাশে রাখা।

‘তুমি প্রাচীরের মাথা ধরে ঝুলে থাক। আমি প্রাচীরে উঠার পর তুমি উঠবে।’ বলল আহমদ মুসা।

যিয়াদ আহমদ মুসার কাঁধ থেকে প্রাচীরে ঝুলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আহমদ মুসা একটু দৌড় দিয়ে এসে প্রাচীরের গায়ে লাফ দিয়ে উঠে প্রাচীরের মাথা ধরে তাতে উঠে বসল এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচীর থেকে গজ দু’য়েক দূরে পাথরের উপর বসে গল্পরত দু’জন প্রহরীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

শেষে মুহুর্তে প্রহরী দু’জন টের পেয়েছিল কি ঘটতে যাচ্ছে, কিন্তু তাদের সাবধান হবার সুযোগ দিল না।

আহমদ মুসা পাখির মত দু’হাত মেলে ঝাপটে ধরার মত করে ওদের ঘাড়ের উপর পড়ল। বসা অবস্থায়ই দু’জন প্রহরী মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

পড়েই আহমদ মুসা পিস্তল বের করে নিয়েছে হাতে। প্রহরী দু’জন ভূমি শয্যা থেকে উঠার চেষ্টা করছিল। আহমদ মুসা উঠে বসে ওদের দিকে পিস্তল তুলে বলল, যেমন আছ তেমন থাক, উঠার চেষ্টা করলে মাথা গুড়িয়ে দেব।

প্রহরী দু’জন মিট মিট করে আহমদ মুসার দিকে চাইল, উঠার আর চেষ্টা করল না।

যিয়াদও লাফিয়ে পড়ল আহমদ মুসার পাশেই। আহমদ মুসা যিয়াদকে বলল, ওদের জামা ছিঁড়ে ওদের মুখে পুরে দাও, পিছমোড়া করে ওদের হাত-পা বেঁধে ফেল।'

বলে সে পকেট থেকে সরু প্লাস্টিক কর্ড বের করে দিল।

বাঁধা হয়ে গেলে আহমদ মুসা ও যিয়াদ দু'জনে ওদেরকে টেনে নিয়ে পাশেই গাছের নিচে অন্ধকারে রেখে দিল।

বাড়িটির পেছনের এ অংশটায় অনেকগুলো গাছ।

আহমদ মুসা ও যিয়াদ গাছের ছায়া ধরে গুটি গুটি বাড়ির দিকে এগুলো।

বাড়িটার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে তারা। শেষ গাছটার যে অন্ধকার তারা অতিক্রম করেছে, তা পার হলেই তারা বিল্ডিং এর গোড়ায় পৌঁছে যাবে। এ সময় পেছনে পায়ের শব্দ শুনে বিদ্যুৎ বেগে ফিরল আহমদ মুসা। তার চোখে পড়ল তাদের উপর দু'টি দেহ ঝাঁপিয়ে পড়ছে গাছ থেকে ফল পড়ার মত করে আহমদ মুসা টুপ করে বসে পড়ল।

ঝাঁপিয়ে পড়া লোকটি আহমদ মুসার মাথার উপর দিয়ে মাটির উপর আছড়ে পড়ল। লোকটির দুই উরু এসে আঘাত করেছিল আহমদ মুসার মাথায়। আহমদ মুসাও পড়ে গিয়েছিল। লোকটির দুই পা আহমদ মুসা তার দুই কাঁধের উপর পেল।

আহমদ মুসা পা দু'টি শক্ত হাতে ধরে মোচড় দিয়ে উঠে দাঁড়াল। মোচড়ের ফলে লোকটি উপুড় হওয়া থেকে চিৎ হতে পারল। লোকটি তার হাত থেকে পড়ে যাওয়া পিস্তল তুলে নেবার জন্যে মাটি হাতড়াচ্ছিল। আহমদ মুসা তাকে সে সুযোগ না দিয়ে দুই পা ধরে জোরে ঘুরাতে শুরু করল। কয়েকটা ঘুরান দিয়ে পাশের গাছের গুড়ির উপর আঁছড়ে ফেলে দিল। একটুও নড়লনা। জ্ঞান হারিয়েছে লোকটি। তারপর আহমদ মুসা পিস্তল কুড়িয়ে নিয়ে মনোযোগ দিল যিয়াদের দিকে। দেখল, যিয়াদ ও অন্য লোকটি তখনও একে অপরকে কাবু করার চেষ্টা করছে। যিয়াদ শেষ পর্যন্ত লোকটি বুকে উঠে বসে তাঁর গলা টিপে ধরল , কিন্তু লোকটি পাশে পড়ে থাকা পিস্তলটি হাতে পেয়ে গেল।

আহমদ মুসা ছুটে গিয়ে তার হাতের উপর পা চাপা দিয়ে পিস্তলটি কেড়ে নিল। তারপর বলল , যিয়াদ তুমি ওকে ছেড়ে দাও।

ছেড়ে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকটি স্প্রিং এর মত উঠে দাঁড়িয়ে কোমর থেকে একটা ছুরি বের করল।

আহমদ মুসা বিদ্যুৎ বেগে বাঁ হাত দিয়ে ছুরি সমেত তাঁর হাতটা ধরে ফেলে ডান হাতে বাঁট দিয়ে আঘাত করল তাঁর কানের পাশে নরম জায়গাটায়। লোকটি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল।

লোকটির হাত থেকে কেড়ে নেয়া পিস্তলটি যিয়াদের হাতে তুলে দিয়ে আহমদ মুসা বলল , আল্লাহর হাজার শোকর যে গোলাগুলি এখনও হয়নি , ভেতরে শত্রুরা তাহলে সতর্ক হয়ে যেত।

বিল্ডিংটির গোড়ায় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আহমদ মুসা দেখল, নিচের সবগুলো জানালা বন্ধ। শুধু একটা জানালার ফোকর দিয়ে আলোর রেশ পাওয়া যাচ্ছে। আর উপরে দু'তলায় দু'টি জানালা খোলা। আলো জ্বলছে ঘরে। একাধিক মানুষের কন্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে ঘর থেকে।

নিচের যে জানালা থেকে আলোর রেশ পাওয়া যাচ্ছে , ধীরে ধীরে এসে জানালার কাছে দাঁড়াল দু'জন। কাঠের জানালা ভেতর থেকে বন্ধ। দু'জনে কান পাতল জানালায়। ভেতর থেকে নারী কণ্ঠের কান্না শুনতে পেল তারা, সেই সাথে ভারী কন্ঠস্বরঃ 'চল সুন্দরী, উপরে সবাই অপেক্ষা করছে , সেখানে তোমাকে নিয়ে মহোৎসব। চল ম্যাডাম সাহেবা, তুমি দেখবে চল'।

কথা বন্ধ হলো। ভেতর থেকে চিৎকার শুনা গেল।

আহমদ মুসা যিয়াদের কাঁধে হাত রেখে বলল, এ সময় তোমাকে মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে যিয়াদ। ওদেরকে উপরে নিয়ে যাচ্ছে। চল, আর দেরী করা যায়না।

বাড়ির সামনেটা পশ্চিম দিকে। আহমদ মুসারা বাড়ির দক্ষিণ পাশ ঘুরে বাড়ির সামনের দক্ষিণ-উত্তর প্রসারিত বারান্দার দক্ষিণ প্রান্তে এসে দাঁড়াল।

বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ফুলের বাগান। দক্ষিণ দিক থেকেও গ্রাউন্ড ফ্লোরের বারান্দায় উঠার সিঁড়ি আছে।

বারান্দার এ প্রান্ত থেকে দোতালায় উঠার সিঁড়ির দূরত্ব দশ গজের বেশী হবেনা। সিঁড়িতে উঠার মুখে স্টেনগানধারী প্রহরী।

আহমদ মুসা ও যিয়াদকে বারান্দায় দেখে ভ্রু কুঁচকালো প্রহরী।

আহমদ মুসা যেন বেড়াতে এসেছে। এমন ভঙ্গিতে তর তর করে বারান্দার সিড়ি দিয়ে উঠে বারান্দা দিয়ে চলতে লাগল। তার ডান হাতটি প্যান্টের পকেটে। আহমদ মুসার পেছনে যিয়াদ।

আহমদ মুসাদের অগ্রসর হতে দেখে স্টেনগান তুলল প্রহরী। বলল, তোমরা যেই হও আর এক পা' এগুলে......

প্রহরীর কথা শেষ হতে পারলো না। আহমদ মুসার পকেট থেকে বেরিয়ে এল রিভিলবার চোখের পলকে। গুলী করল আহমদ মুসা। প্রহরীর কপাল গুড়ো করে দিল গুলিটা।

গুলী করেই ছুটল আহমদ মুসা। তুলে নিল প্রহরীর স্টেনগান। তারপর এক দৌড়ে লাফিয়ে উপরে উঠল সিঁড়ি দিয়ে। তিন লাফে সে দোতালার বারান্দায় উঠে গেল। যিয়াদও তার পেছনে পেছনে উঠে এসেছে।

দোতালার মাঝখানের ঘরে দু'টি জানালা দিয়ে আলো দেখেছে আহমদ মুসা। কথাও শোনা গেছে সেখান থেকে। আহমদ মুসা সিঁড়ি দিয়ে উঠে দেখল- সিঁড়ির বাঁ পাশে একটা বদ্ধ দরজার পরেই একটা দরজা খোলা দেখা যাচ্ছে।

আহমদ মুসা স্টেনগান বাগিয়ে ছুটল দরজার দিকে। অর্ধেক পথটা গেছে এমন সময় দু'জন লোক দরজায় বেরিয়ে এল। তাদের হাতেও স্টেনগান, কিন্তু ব্যারেল নামানো। আহমদ মুসাকে দেখেই ওরা ত্বড়িৎ গতিতে ভেতরে ঢুকে গেল।

দরজায় গিয়ে আহমদ মুসা একটু উঁকি দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। তার সাথে যিয়াদও।

তারা ঘরে ঢুকতেই হো হো করে হেসে উঠল ছ'ফুট লম্বা একজন লোক। সে যিয়েদের মায়ের পেছনে দাঁড়িয়ে। তার রিভলবারের নলটা যিয়াদের মায়ের মাথায় ঠেসে আছে।

ঘরে আরও চারজন লোক, তারা ঐ লোকটির পেছনে দাঁড়িয়ে। যিয়াদের স্ত্রী জোহরা যিয়াদের মা'র হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। কাঁপছে সে। যিয়াদের মা'র মুখ ফ্যাকাশে।

লোকটি হাসি থামিয়ে বলল, জানতাম যিয়াদ তুমি আসবে। শুন তোমরা , আমি তিন পর্যন্ত গুনব। এর মধ্যে যদি তোমরা হাত থেকে স্টেনগান ফেলে হাত তুলে না দাঁড়াও, তাহলে প্রথমে মরবে তোমার মা, পরে তোমার স্ত্রী। আর শুন যিয়াদ, গ্রানাডার ক্লু-ক্ল্যাক্স -ক্ল্যান চীফ আলফনসো এক কথা দুই বার বলে না।

গুনতে শুরু করল লোকটি। দুই পর্যন্ত যেতেই আহমদ মুসা স্টেনগান ফেলে দিয়ে হাত তুলে দাঁড়াল। তারপর যিয়াদের দিকে মুখ ফিরিয়ে আহমদ মুসা একটু বড় করেই বলল, 'ফেলে দাও যিয়াদ আমরা হেরে গেছি।'

যিয়াদের মুখ রক্তহীন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তাকাল সে আহমদ মুসার দিকে। কিন্তু আহমদ মুসার মুখে কোনই ভাবান্তর নেই, তার মুখ দেখে মনে হলো কিছুই ঘটেনি।

যিয়াদ স্টেনগান ফেলে দিয়ে দু'হাত উপরে তুলল।

এবার আলফনসো রিভলবার বাগিয়ে যিয়াদের মা'র আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। তার রিভলবারের নল যিয়াদ ও আহমদ মুসার দিকে। হো হো করে উৎকট শব্দে হেসে উঠল আলফনসো। বলল, এই গর্দভরা, এই কুকুর দু'টোর পকেটে কি আছে দেখে বের করে নে। দরজার সামনেই দাঁড়িয়েছিল আহমদ মুসারা। স্টেনগান বাগিয়ে দু'জন ছুটে এল। তারা পকেট সার্চ করে আহমদ মুসার পকেট থেকে দু'টো রিভলবার এবং যিয়াদের পকেট থেকে একটি পিস্তল বের করল।

'ওদের নিয়ে আয় ঘরের মাঝখানে। নাটক এখনি শুরু করব।' বলল আলফনসো।

আহমদ মুসাদের নিয়ে যেতে হল না। আহমদ মুসাই যিয়াদকে হাত ধরে নিয়ে ঘরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। ঘরের চারদিক ঘিরেই সোফা সাজানো।

ঘরের পশ্চিম পাশে সোফা ও দেয়ালের মাঝখান দিয়ে যাতায়াত প্যাসেজ। চারজন স্টেনগানধারী সেই প্যাসেজে গিয়ে দাঁড়াল। চারজনেরই স্টেনগান আহমদ মুসার দিকে উদ্যত।

আবার আলফনসোর সেই হাসি। হাসির হো হো রবে গম গম করে উঠল ঘর। চিৎকার করেই সে বলল, যিয়াদ তুমি শুধু নও, তোমার মা শুধু নয়, তোমার স্ত্রীও আমার হাতের মুঠোয়। আজ আমাদের মহোৎসব। আর নিবেদায় তোমরা যে খেলা শুরু করেছ তার আজ ইতি। তুমি প্রথমে দু'চোখ মেলে দেখবে তোমার স্ত্রীর ভাগ্য। নব বধু, ভালই জমবে মহোৎসবটা। তারপর তোমাদের টুকরো টুকরো করে নিবেদার জংগলে ছড়িয়ে আসা হবে।

থামল আলফনসো। সে দাঁড়িয়ে আছে উত্তর পাশের বিশাল সোফাটার সামনে।

আহমদ মুসা ও যিয়াদ এসে দাঁড়িয়েছে উত্তর মুখী হয়ে মেঝের ঠিক মাঝখানে। তাদের পুব পাশে মেঝের উপর বসেছিল যিয়াদের মা ও তার স্ত্রী।

যিয়াদরা ঘরের মাঝখানে আসার পর যিয়াদের মা ও যিয়াদের স্ত্রী এসে জড়িয়ে ধরেছে যিয়াদকে। এটা দেখেই আকাশ ফাটা হাসি হেসে আলফনসো ঐ কথাগুলো বলল।

আলফনসো থামার পর আহমদ মুসা বলল, দেখ আলফনসো তুমি নিরস্ত্র নারীর আড়ালে দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষা করেছ, বীরত্ব তোমার মুখে শোভা পায় না।

'কথা বলছ তুমি কে? আলফনসোকে বীরত্ব শেখাতে এসেছ ?'

'নারীকে যারা কিডন্যাপ করে, বীরত্ব তাদেরকে শেখাতেই হবে আলফনসো।' আহমদ মুসার মুখে বিদ্রুপের হাসি।

যিয়াদ, যিয়াদের মা এবং জোহরার দৃষ্টি আহমদ মুসার দিকে। তার ভাবনাহীন মুখ, ঐ ধরনের কঠোর উক্তি এবং মুখে এক ধরনের হাসি দেখে তাদের মুখে ভয়, বিস্ময় দুই-ই ফুটে উঠল।

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই গর্জে উঠল আলফনসো। ছুটে এল সে আহমদ মুসার সামনে। রিভলবারের বাঁট দিয়ে সে আঘাত করল আহমদ মুসার মাথায়।

আহমদ মুসা প্রস্তুত ছিল এর জন্যে। সে মাথা দ্রুত সরিয়ে নিল একদিকে হেলে। তবু কপালের এক পাশে আঘাতের একটা অংশ এসে পড়লই। কেটে গেল কপালের বাঁ পাশটা। ঝরঝর করে রক্ত বেরিয়ে এল। মুখের বাঁ পাশটা রক্তে ধুয়ে গেল।

রক্ত দেখে সম্ভবত খুশী হল আলফনসো। পশ্চিম দিকে দেয়াল বরাবর প্যাসেজে দাঁড়ানো স্টেনগানধারীদের কিছু নির্দেশ দেয়ার জন্যে ওদিকে ফিরল আলফনসো। সঙ্গে সঙ্গে আহমদ মুসা পশ্চিম দিকে এক ধাপ এগিয়ে বাঁ হাত দিয়ে গলা পেঁচিয়ে বুকের সাথে প্রচন্ড শক্তিতে চেপে ধরল আলফনসোকে , আর একই সময়ে ডান হাত দিয়ে আলফনসোর হাত থেকে রিভলবার কেড়ে নিল আহমদ মুসা। রিভলবার কেড়ে নিয়েই আহমদ মুসা পরপর চারটা গুলী করল। স্টেনগান ধারী চারজন পাকা ফলের মত পরপর টপ টপ করে ফ্লোরে পড়ে গেল।

গোটা ঘটনা ঘটতে পাঁচ সেকেন্ডের বেশী লাগল না। আলফনসো ও স্টেনগানধারীরা ব্যাপারটা বুঝে উঠার আগেই সব শেষ হয়ে গেল।

চারটি গুলী শেষ করার পর আহমদ মুসা ধাক্কা দিয়ে আলফনসোকে ফেলে দিল। পড়ে গিয়েই আলফনসো টলতে টলতে উঠে দাঁড়াচ্ছিল। তার হাতে রিভলবার। এর মধ্যেই সে পকেট থেকে একটি রিভলবার বের করে নিয়েছে। উপরে উঠছিল তার রিভলবার সমেত হাত।

আহমদ মুসা তাকে আর সুযোগ দিল না। রিভলবার তুলে গুলী করল তার উঠে দাঁড়ানো মাথা লক্ষ্য করে।

আলফনসো গোড়া কাটা গাছের মত হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল মেঝেতে। লাল কার্পেট তার লাল রক্তে ডুবে গেল।

যিয়াদ, যিয়াদের মা ও তার স্ত্রী ঘটনা দেখে যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল। চিন্তার চেয়ে দ্রুত ঘটে গেল ঘটনা। ঘটনা ঘটনার চেয়ে তা বুঝতেই তাদের দেরী হচ্ছে যেন।

আহমদ মুসা আলফনসো গুলী করার পর যিয়াদের দিকে ফিরল।

যিয়াদ বোবা বিস্ময় নিয়ে আহমদ মুসার দিকে একবার চেয়ে জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে। আনন্দে কেঁদে ফেলল যিয়াদ। আনন্দের অশ্রু যিয়াদের মা এবং জোহরার চোখেও।

'সব প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের যিয়াদ। চল আমাদের দ্রুত বেরুতে হবে।' যিয়াদের পিঠ চাপড়ে বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসারা বেরিয়ে এল ঘর থেকে। সিঁড়ি দিয়ে নামল বারান্দায়। সিঁড়ির গোড়ায় প্রহরীটি পড়ে আছে, বারান্দা তার রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

আহমদ মুসারা বারান্দা থেকে নেমে এল গাড়ি বারান্দায়।

গাড়ি বারান্দায় সেই মাইক্রোবাসটি তখনও দাঁড়িয়ে।

গাড়ির দরজা খোলা গাড়ির চাবীটি তার কি হোলে লাগানো।

আহমদ মুসা যিয়াদকে বলল, তুমি ওঁদের নিয়ে পেছনে উঠো , আমি ড্রাইভিং সিটে বসছি।

আহমদ মুসা গেট নিয়ে ভাবছিল। সেখান থেকে কোন প্রতিরোধ আসবে নাকি। স্টেনগানটা পাশে রেখেছে আহমদ মুসা। গাড়ি পৌঁছল গেটে, কিন্তু কেউ বেরুল না। গাড়ি দাঁড় করিয়ে আহমদ মুসা নামল স্টেনগান নিয়ে। গেট রুমে গিয়ে দেখল, গেট রুম শুন্য। পালিয়েছে তাহলে গেটম্যান।

গেটরুমের দেয়ালে সুইচ বোর্ড দেখল আহমদ মুসা। 'OPEN' চিহ্নিত সুইচ টিপে দিয়ে গাড়িতে ফিরে এল আহমদ মুসা।

খোলা দরজা পথে গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে এল আহমদ মুসা। এসে দাঁড়াল অপেক্ষমান তাদের গাড়িটির কাছে। সঙ্গে সঙ্গে ও গাড়ি থেকে নেমে এল আবদুল্লাহ, জোয়ান এবং রবার্তো। নামল আহমদ মুসা এবং যিয়াদ।

আহমদ মুসার গোটা মুখমন্ডল, রক্তাক্ত দেখে আৎকে উঠল জোয়ান, রবার্তো এবং আবদুল্লাহ। জোয়ান উদ্বিগ্ন কন্ঠে বলল, আপনি ভালো আছেন তো মুসা ভাই? ওরা ভাল আছেন ?

আহমদ মুসা হেসে বলল, 'চিন্তা করো না, আল্লাহর অপার সাহায্য আমরা পেয়েছি। সবাই আমরা ভালো আছি।'

একটা দম নিয়েই আহমদ মুসা বলল, ‘রবার্তো তুমি ড্রাইভ করবে যিয়াদের গাড়িটা, উঠো। আর আবদুল্লাহ তুমি মাইক্রোবাস ড্রাইভ করবে। আমি ও জোয়ান তোমার সাথে মাইক্রোবাসে উঠছি।’

সবাই গাড়িতে উঠার পর দুই গাড়ি একসাথে যাত্রা করল। আগে যিয়াদের গাড়ি , পেছনে মাইক্রোবাসটি।

গাড়ি চলছে, আহমদ মুসা সিটে গা এলিয়ে দিয়েছে। পাশে জোয়ান , সে উশখুশ করছিল। শেষে সে জিজ্ঞেস করেই বসল, ‘কি ঘটল মুসা ভাই ?’

‘বুঝেছি, তোমার তর সইছে না, কিন্তু এখন নয়, চল ধীরে সুস্থে বলব। ছয় ছয়টা মানুষকে মারতে হয়েছে, বড় খারাপ লাগছে। কি করব, উপায় ছিল না।’

‘ছয়জন!’ বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে বলল জোয়ান।

‘যিয়াদ ভাইয়ের মনটাও বড় নরম, প্রানহানী তিনিও সইতে পারে না।’ বলল আবদুল্লাহ।

‘তবু সইতে হয় ভাইয়া, অশান্তি, অন্যায়ের রাজত্ব-পিড়িত পৃথিবীতে এটাই এখন নিয়ম।’

ওদিকে যিয়াদের গাড়িতে যিয়াদের মা জোহরার উরুতে মাথা রেখে গাড়ির সিটে শুয়ে পড়েছে। আর জোহরা গাড়ির সিটে হেলান দিয়ে মাথাটা যিয়াদের কাঁধে রেখে নিরবে অশ্রুপাত করছে, আনন্দের অশ্রু, ভয়ানক এক দুঃস্বপ্ন থেকে বাঁচার অশ্রু, নতুন জীবন লাভের অশ্রু।

ধীরে ধীরে মাথাটা একটু তুলে যিয়াদের মা বলল, ‘যিয়াদ, ও ছেলেটা কে? আল্লাহর ফেরেস্তার মত কোত্থেকে এল ও? এমন নির্ভয়, এমন দু:সাহসী, বাজের মত এমন ক্ষীপ্র, কুশলী আমাদের কেউ আছে যিয়াদ?’

‘আছে আম্মা, উনি গোটা দুনিয়ার মুসলমানদের গর্ব, যেখানেই মুসলমানদের বিপদ সেখানেই তিনি। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহই তাঁকে পাঠিয়েছেন। চলুন আম্মা, বলব সব।’‘

রাত মাত্র ৮টার মত তখন। কিন্তু গ্রানাডার পথ প্রায় জনশূন্য। বিপনী কেন্দ্রগুলোর দরজা বন্ধ।

ফাঁকা পথ দিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলেছে আহমদ মুসাদের দু'টি গাড়ি পাশাপাশি।

# ২

মাদ্রিদের শাহ ফয়সল মসজিদ কমপ্লেক্স এবং স্পেনের মুসলমানদের ঐতিহাসিক স্মৃতি চিহ্নগুলো ধীর তেজস্ক্রিয়তার মাধ্যমে ধ্বংস করার যে জঘন্য ষড়যন্ত্র ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান এঁটেছে, তার বিবরণ শেষ করে আহমদ মুসা থামল।

আহমদ মুসা কথা শেষ করলেও কেউ কোন কথা বলল না। যিয়াদ বিন তারিক, যিয়াদেও সহকারী আহমদ আব্দুল্লাহ, জোয়ান ও রবার্তো কারও মুখেই কোন কথা নেই। বিস্ময় ও উদ্বেগ তাদের সকলকেই আচ্ছন্ন করেছে।

'ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান সরকারের যোগ সাজসে এটা করছে বলে কি আপনি মনে করেন মুসা ভাই?' যিয়াদই প্রথম মুখ খুলল।

'এ প্রশ্ন নিয়ে আমি চিন্তা করেছি, কিন্তু সরকারের যোগসাজস থাকতে পারে বলে আমার মনে হয়নি দু'টো কারণে। এক, নতুন শাসনতন্ত্রের অধীনে সরকার কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিশেষ বৈরীতা এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করছে, দুই, স্পেনের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের একটা প্রধান অবলম্বন হলো পর্যটন। আর পর্যটন খাতের আয়ের সিংহ ভাগ আসে মুসলিম ঐতিহাসিক স্থানগুলো থেকে। এগুলো নষ্ট হলে স্পেন প্রতিবছর কোটি কোটি ডলারের আয় থেকে বঞ্চিত হবে। সুতরাং উভয় কারণেই আমার বিশ্বাস স্পেন সরকার এ ষড়যন্ত্রের সাথে থাকতে পারে না।' বলল আহমদ মুসা।

'তবে এ রকম একটা কিছু হলে ক্ষতি নেই, এ ধরনের লোকের সংখ্যাই প্রশাসনে বেশী। আর এই ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের সাথে সহযোগীতা করতে পারে, এমন লোকও প্রশাসনে কম নেই।' বলল রবার্তো।

'সুতরাং এ ব্যাপারে সরকারের কাছ থেকে সহযোগিতা লাভের কোন আশা নেই। উপরন্তু যারা সরকারকে এ ব্যাপারে বলবে, তাদের কন্ঠরুদ্ধ হবার সম্ভাবনা ষোল আনা।' বলল জোয়ান।

‘ঠিক বলেছ জোয়ান, সরকারকে বললে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। আমরা নিজেরাই এগুতে চাই। তার আগে জোয়ান তোমার কি মত, ষড়যন্ত্রের প্রকৃতি সম্পর্কে, তুমি তো বিজ্ঞানী।’ বলল আহমদ মুসা।

‘বিল্ডিং ধ্বংসের বিস্ফোরক তো বানানোই হয়েছে। তাত্বিকভাবে তেজস্ক্রিয় বানানোও সম্ভব যা নিরবে ধীরে ধীরে কোন বিল্ডিংকে ভেতর থেকে শেষ করে দেবে। নিশ্চয় রুশরা এমন অস্ত্র গোপনে তৈরী করেছে শ্যাবোটাজ কাজের জন্যে।’ বলল জোয়ান।

‘এই অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে আমরা লড়াই কিভাবে করব? রিমেডী তোমার মতে কি আছে এর?’

‘প্রথমে তেজস্ক্রিয়কে চিহ্নিত করতে হবে, তারপর প্রয়োজন এর বিশ্লেষণ। বিশ্লেষণের পর এর এ্যান্টিডোট পাওয়া যাবে মুসা ভাই। যদি তেজস্ক্রিয় আণবিক হয়, যদি এর কোন আণবিক এ্যান্টিডোটের পাওয়া না যায়, সেক্ষেত্রে এ্যান্টিম্যাটার এ্যান্টিডোটের প্রয়োজন হবে।’

‘শুনেছি, তোমার মৌলিক গবেষণা আছে এ্যান্টিম্যাটার বিজ্ঞানের উপর। তোমার ইউরোপীয় বিজ্ঞান একাডেমির পুরস্কারও এই গবেষণার উপর। বলত, এ্যান্টিম্যাটার গবেষণা কতটা এগিয়েছে?’ বলল আহমদ মুসা।

‘থিয়োরিটিক্যাল গবেষণার উল্লেখযোগ্য কিছু বাকি নেই। এখন গবেষণা চলছে এর বহুবিধ ব্যবহার নিয়ে। ছোট ছোট বিষয়ে এর নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার ছিল আমার গবেষণার বিষয়।’

‘কি রেজাল্ট পেয়েছ জোয়ান আমি জানি না।।’

‘নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে পরমানুর মত সবক্ষেত্রেই একে ব্যবহার করা যাবে, কিন্তু ফল পাওয়া যাবে পরমানুর চেয়ে কমপক্ষে দশগুণ বেশী।’

‘ষড়যন্ত্র যদি সত্যি হয়, তাহলে জোয়ান তোমার কাজ অনেক বেড়ে যাবে। তোমার মত বিজ্ঞানীকে পেয়ে আমরা খুশী জোয়ান।’

‘মুসা ভাই, আগের জোয়ানের সবকিছু আমি ত্যাগ করেছিলাম। বই-পুস্তক, সার্টিফিকেট নোট, সব আমি পুড়িয়ে ফেলেছি। আমি ভেবেছিলাম, স্পেনে একজন মরিস্কোর জীবনে এ সবের কোনই মূল্য নেই, কোনই কাজে আসবে না।

এখন যেন আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, জোয়ান তার অতীতকে কাজে লাগাতে পারে, তার অতীতের কিছু মূল্য আছে। আমার সব শক্তি সব মেধা আমি আমার জাতির জন্যে বিলিয়ে দেব মুসা ভাই।' জোয়ানের শেষের কথাগুলো আবেগে রুদ্ধ হয়ে এল।

আহমদ মুসা জোয়ানের কাছে এগিয়ে তার পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, আমরা তোমার প্রতিভাকে নষ্ট হতে দেব না জোয়ান। এই স্পেন মুসলিম বিজ্ঞানীদের চারণ ক্ষেত্র ছিল। তারা অন্ধকার ইউরোপকে পথ দেখিয়েছে, শিক্ষিত করেছে, তাদের জীবনে রেনেসাঁ এনেছে। তারপর আমাদের হাতের সে আলো নিভে গিয়েছিল। আমরা চাই, তোমার হাতে সে আলো আবার জ্বলে উঠুক।

জোয়ান আহমদ মুসাকে জড়িয়ে ধরে আবেগাপ্লুত কন্ঠে বলে উঠল, 'স্পেনে আমাদের সেদিন কি আসবে মুসা ভাই?'

আহমদ মুসা ঘরের জানালা দিয়ে আসা উদীয়মান সূর্যের সোনালী বর্ণচ্ছটার দিকে চেয়ে বলল, ইতিহাসের মোড় ঘুরছে জোয়ান। বহু শতাব্দী আমরা, ঔপনিবেশিক শাসনে নিস্পিষ্ট হয়েছি, মার খেয়েছি চূড়ান্ত। মার খেতে খেতে মৃত্যুভয় আমাদের চলে গেছে। সেই সাথে আমরা ইতিহাস থেকে এই শিক্ষা নিচ্ছি যে, আমাদের শক্তির উৎস আমাদের আদর্শ- ইসলাম। সেখান থেকে আমাদের বিচ্যুতিই রাজনৈতিকভাবে আমাদের দুর্বল করেছিল, সাংস্কৃতিকভাবে অন্তঃসারশূণ্য করে তুলেছিল, যার ফলে স্বাধীনতা আমাদের হাত থেকে খসে পড়েছিল। এই দুর্ভাগ্যজনক ইতিহাসের মোড় ঘুরছে আজ। তুমি জোয়ান, রবার্তো, যিয়াদ ও তার সাথীরা এবং তোমাদের মত বিশ্বের আরো লাখো তরুণ ইতিহাসের মোড় ঘুরানোর কাজে রত আজ। সকালের এই সূর্যের মতই আমি নিশ্চিত, ইতিহাস মানবতার জন্যে সুদিন নিয়ে আসছে।

এই সময় বাইরে একাধিক লোকের কন্ঠ শোনা গেল। যিয়াদ চট করে বাইরে চলে গেল।

মিনিটখানেক পরে ফিরে এসে বলল, আমাদের জংগল সীমান্তের দু'টি চৌকিতে দু'জন লোক ধরা পড়েছে। তাদের কাছে পিস্তল পাওয়া গেছে।

'এমন ঘটনা আগে ঘটেছে?' জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

'ঘটেনি।'

আহমদ মুসা ভ্রু কুঞ্চিত করল। বলল, 'নিয়ে এস তো দু'জনকে।'

চোখ বাঁধা দু'জন লোককে ঘরে নিয়ে আসা হলো।

'চোখ খুলে দেবে না?' যিয়াদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

'চোখ না খুলাই এখানকার নিয়ম মুসা ভাই, বন্দীখানায় ঢুকানোর পরই শুধু ওদের চোখ খুলে দেয়া হবে।'

'ভাল ব্যবস্থা যিয়াদ।'

একটু থেমে আবার জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় ধরা পড়েছে এরা?'

'জংগল সীমান্তের দু'চৌকিতে দু'জন ধরা পড়েছে।' বলল যিয়াদ।

'দু'চৌকিতে দু'জন? এক চৌকিতে নয়?'

'জি না।'

আহমদ মুসা পাশ থেকে ছড়ি তুলে নিয়ে চোখ বাধা লোক দু'টির গায়ে খোঁচা দিয়ে বলল, তোমাদের আর সাথীরা কোথায়?

'আর কেউ নেই।' তাদের দু'জনের একজন বলল।

আহমদ মুসা যিয়াদের কানে কানে কথা বলল। যিয়াদ উঠে গেল। কয়েক মুহূর্ত পর একটা ম্যাপ নিয়ে ঘরে ঢুকল। তারপর জংগল সীমান্তে চৌকি দু'টির অবস্থান দেখিয়ে দিল।

আহমদ মুসা ম্যাপটার দিকে একবার ভাল করে নজর করে মুখ ফেরাল লোক দু'টির দিকে। তাদের শরীরে সেই আগের মত ছড়ির খোঁচা দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, মিথ্যা কথা বলছ তোমরা, তোমাদের আরও ছয়জন সাথী আছে। কোথায় তারা?

'না কেউ আর নেই।' আগের মত উত্তর দিল ওদের একজন।

'দেখ মিথ্যা কথা আমরা পছন্দ করি না, ওদের পেলে কিন্তু তোমাদের প্রাণদন্ড হবে।' কঠোর কণ্ঠে উচ্চারণ করলল আহমদ মুসা।

ওরা কোন জবাব দিল না।

‘শুধু মুখের কথায় ওদের কথা বের হবে না। ওদরে নিয়ে যেতে বল যিয়াদ। আপাদমস্তক ওদের সার্চ করতে বল, জুতা পর্যন্ত।’

চোখ বাধা দু’জনকে নিয়ে গেল যিয়াদের দু’জন লোক।

ওরা বেরিয়ে যেতেই আহমদ মুসা বলল, ‘যিয়াদ আমারদ অনুমান মিথ্যা না হলে আরও ছয়জন লোক জংগলে প্রবেশ করেছে, খুঁজে বের করার নির্দেশ দাও।’

‘মুসা ভাই, জংগলে এমনভাবে পাহারা বসানো যে, কেউ জংগলে ঢুকলে ধরা পড়বেই। তবু একবার তাগিদ দিয়ে আসছি ভাল ভাবে খোঁজ করার জন্য।’ বলে যিয়াদ বেরিয়ে গেল।

যিয়াদ যখন ফিরে এল, তখন তার সাথে ঘরে ঢুকল যারা চোখ বাঁধা দু’জনকে নিয়ে গিয়েছিল তাদের একজন। সে সার্চ করে পাওয়া জিনিসগুলো আহমদ মুসার সামনে রাখল। ওদের কাছ থেকে পাওয়া মানিব্যাগ, কলম, চাবীর রিং, লাইটার ইত্যাদির মধ্যে লাইটার আহমদ মুসার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

লাইটারটি হাতে তুলে নিতেই লাইটারের এক পাশে মাছের চোখের মত ছোট স্বচ্ছ, উজ্জ্বল একটা জ্বলজ্বলে চোখ আহমদ মুসার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ভাল করে দেখার জন্যে কাছে নিয়ে আসতেই অস্পষ্ট ব্লিৎস ব্লিৎস শব্দ তার কানে গেল। আহমদ মুসা চমকে উঠল লাইটারটা কি তাহলে অটোমেটিক মুভি ক্যামেরা ও ট্রান্সমিটার দুই ভুমিকাতেই কাজ করছে।’ অন্য লাইটারটাও দেখল আহমদ মুসা। একই লাইটার একই ব্যবস্থা। আরও ভালভাবে উল্টে-পাল্টে দেখল আহমদ মুসা। অত্যন্ত পাওয়ারফুল ট্রান্সমিটার আহমদ মুসা তা দেখেই বুঝতে পেরেছে।

আহমদ মুসা ট্রান্সমিটার দু’টি জোয়ানের হাতে তুলে দিয়ে বলল, জোয়ান ক্যামেরা এবং ট্রান্সমিটার দেখ। এখনও মেসেজ রিলে করছে।

ঘরের সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল। বিস্মিত চোখে জোয়ান হাতে তুলে নিল লাইটারটি।

আহমদ মুসা হেলান দিয়ে চোখ বুজল। চিন্তা করছে সে। ট্রান্সমিটারটা অন কেন, স্বয়ংক্রিয়ভাবে কি মেসেজ সে রিলে করছে? দুই ট্রান্সমিটারের একই অবস্থা। তাহলে এই ট্রান্সমিটারের এটাই সিস্টেম। বাহকের কাছে এটা সব সময়

খোলা থাকবে কিন্তু কেন? কি মেসেজ এরা ট্রান্সমিট করে? হঠাৎ আহমদ মুসার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

এ সময় জোয়ান বলল, এর ব্লিৎস, এর সাইজ ও গ্লাভেটি থেকে বুঝা যাচ্ছে কমপক্ষে ১০০ বর্গমাইল সীমার পথে এ সংকেত পাঠাতে পারে।

এ সময় দ্রুত ঘরে ঢুকল আব্দুল্লাহ। বলল, অয়ারলেসে খবর এসেছে, আরও ছয়জন ধরা পড়েছে। ওদের নিয়ে আসছে।

সবাই স্তম্ভিত চোখে তাকাল- আব্দুল্লাহর দিকে নয়, আহমদ মুসার দিকে। মনে তাদের একটা প্রশ্নই বড় হয়ে উঠেছে, ছয়জনের কথা আহমদ মুসা কি করে বলল।

'আহমদ মুসা ভাই, ওদের সাথী আরও থাকতে পারে অনুমান করলেন ঠিক আছে, কিন্তু সংখ্যাটা কি করে বললেন?' বলল যিয়াদ।

'মুসা তখন অন্য চিন্তায় ব্যস্ত। তার কপাল কুঞ্চিত। মুখটা শক্ত। যিয়াদের প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে আহমদ মুসা বলল, 'গোয়াদেল ফো তীরের তোমাদের এ ঘাটিটা সরবরাহ ঘাটি তাই না? মূল ঘাটিটা এখান থেকে আরও কতদূরে?

'হ্যাঁ মুসা ভাই, এটা আমাদরে সরবরাহ ঘাটি। মূল ঘাটিটা আরও পুবে, বনের আরও গভীরে, ৪০ মাইল দূরে তো হবেই। কিন্তু কেন জিজ্ঞাসা করছেন মুসা ভাই?' যিয়াদের কণ্ঠে কিছুটা উদ্বেগ।

'আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয়, বলল আহমদ মুসা, 'তাহলে আটজন অনুপ্রবেশকারী চর এখানে একত্রিত হবার কয়েক ঘন্টার মধ্যে অথবা রাতের অন্ধকারে এই ঘাটি আক্রান্ত হবে। আকাশ পথে আসতে পারে, নদী পথে আসতে পারে, বোমা ফেলতে পারে, ছত্রীও নামতে পারে। এখানে ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের বিমান আছে যিয়াদ?'

'ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের নেই, চার্চের আছে বিমান এবং হেলিকপ্টার দুই-ই।'

'ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান এবং চার্চের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, তাই না?'

'জি।' বলল যিয়াদ।

'তাহলে শুন, অনুপ্রবেশকারী ছয়জনকে এখানে নিয়ে এস। আর তোমাদের লোক-জন, মাল-সামান সব মূল ঘাটিতে স্থানান্তরিত কর এখনি।'

একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর আবার শুরু কলল, ঐ ছয়জন এলে, ওদের কাছেও ছয়টি ট্রান্সমিটার পাওয়া যাবে, মোট ৮টি ট্রান্সমিটার হবে। এই ৮টি ট্রান্সমিটার ঘাটিতে রেখ, ৮ জন অনুপ্রবেশকারীকেও অন্য কোথায় নিয়ে আটকে রাখতে পার।'

'৮টি ট্রান্সমিটার এখানে থাকবে কেন মুসা ভাই?' বলল যিয়াদ।

'ওরাই তো সংকেত দাতা, ওরাই পথ বাতলাচ্ছে। ওদের যদি সাথে নাও, তাহলে যেখানে, নিয়ে যাবে, সেখানেই যাবে ওদের আক্রমণ।'

'৮টি ট্রান্সমিটার একত্র হওয়া আক্রমণের শর্ত কেন?' বলল জোয়অন।

'ওদের পরিকল্পনা হলো, ৮জন অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়ে তোমাদের ঘাটিতে আসবে, অথবা ধরা না পড়লে ওরাই তোমার ঘাটি খুঁজে নেবে। উভয় ক্ষেত্রেই তারা একত্রিত হচ্ছে। এক অবস্থান থেকে ৮টি ট্রান্সমিটারের সংকেত যখন ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্যানের কাছে যাবে, তখন ওরা বুঝবে এটাই যিয়াদের ঘাটি। যেখানে যিয়াদ ও তার লোকজন আছে এবং আছে আহমদ মুসা। এরপরেই তাদের আক্রমণ।'

যিয়াদ, জোয়ান, রবার্তো, আহমদ আব্দুল্লাহ সবার বিস্মিত দৃষ্টি আহমদ মুসার দিকে। তাদের সবার মুখ হা হয়ে গেছে। এতক্ষণে ব্যাপারটা তাদের কাছে পরিস্কার হয়ে গেছে। তাদের কারও মুখে কোন কথা নেই।'

কথা বলল প্রথম জোয়ান। বলল, বুঝেছি মুসা ভাই, ট্রান্সমিটারগুলো আসলে 'পথ ইন্ডিকটের' বা 'পথ নির্দেশক'। ওরা যে পথ দিয়ে যাবে, সে পথটা অংকিত হয়ে যাবে রিসিভিং স্ক্রীনে। সব পথ অবস্থানে এসে একত্রি হবে, সেটাকেই ওরা ধরে নেবে ঘাটি। এ জন্যেই বিভিন্ন পথ দিয়ে ওরা পাঠিয়েছে ওদের এজেন্টদের। কিন্তু মুসা ভাই আপনি দয়া করে বলুন, দু'জন অনুচরকে দেখে আপনি কেমন করে বুঝলেন আরও আছে এবং তারা ছয়জন?'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'খুবই সোজা ব্যাপারটা। স্বাভাবিক নিয়মে অনুপ্রবেশকারীরা যে ক'জনই আসুক, এক সাথে আসার কথা। কিন্তু দু'জনকে পাওয়া গেল একটা ব্যবধানে। তখনই আমার মনে হলো, অনুরূপ ব্যবধানে আরও অনুপ্রবেশকারী ঢুকেছে। ম্যাপে ঐ অঞ্চলের বন-প্রান্তের অবশিষ্ট অংশটা পরিমাপ

করে দেখলাম আরও ছয়জনের জায়গা আছে। এ থেকেই আমি ছয়জনের ব্যাপারটা অনুমান করেছি।'

'ধন্যবাদ মুসা ভাই, এই জন্যেই আপনি আহমদ মুসা। আল্লাহ তার অশেষ নেয়ামতকে আপনার উপর ঢেলে দিয়েছেন। আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া।' বলে যিয়াদ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বেশি কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল। বলল, এক ঘন্টার মধ্যেই এ ঘাটি ভ্যাকেন্ট করা হবে মুসা ভাই, আর আপনারাও আধা ঘন্টার মধ্যেই রওনা হচ্ছেন। তবে মুসা ভাই, এই ঘাটিকে আমরা ওদের জন্যে, মরণ ফাঁদ বানাতে চাই, আপনার মত কি?'

আহমদ মুসা একটু ভেবে বলল, তোমার পরিকল্পনা কি?

'আমরা ঘাটি খালি করে ওদের আসার সুযোগ করে দিতে চাই, তারপর ওদের চারদিক থেকে আক্রমণ করব। কাউকে পালাতে দেব না।' বলল যিয়াদ।

আহমদ মুসা তৎক্ষণাৎ কথা বলল না। তার কপাল কঞ্চিত। ভাবছে সে। বলল, 'যিয়াদ শত্রুর উপর আঘাত হানার এটা একটা লোভনীয় সুযোগ সন্দেহ নেই। কিন্তু যুদ্ধটা নিজের মাটিতে যতটা এড়ানো যায়, তত ভাল। এতবড় ঘটনা যদি এখানে ঘটে, তাহলে শুধু ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান নয় সরকারও গোটা জংগল এলাকাকে টার্গেট করবে। গোটা জংগল এলাকাকে বিধ্বস্ত করতে এগিয়ে আসবে। আর এখানকার হত্যাকান্ডকে গোটা দুনিয়ার কছে সে অজুহাত হিসেবে পেশ করবে। আমাদের এ আশ্রয়টা এ ধরণের বিপর্যয়ের স্বীকার হোক আমরা তা চাই না।

যিয়াদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, আপনাকে ধন্যবাদ মুসা ভাই, আপনি ঠিক বলেছেন। আমরা এভাবে চিন্তা করিনি। এখন আমরা কি করব? অনুপ্রবেশকারীদের এখানে না আনলেই ভাল হতো না?

'দু'জন তো আগে এসেই গেছে। জায়গাটা ওদের কাছে ডিটেক্টেড হয়ে গেছে। এখন যদি ওদের মেরে ও ফেল, তাহলেও ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান এখানে আসবে ওদের সন্ধানে। সুতরাং দু'জন যখন এসে গেছে, তখন সবাইকে এখানে আনাই ভাল। এতে ওরা বুঝবে গোটা জংগলে এটাই তোমাদের একমাত্র ঘাটি। আরেকটা

কথা, ওরা যখন ঐ ভাবে জংগলে সার্বিক অনুসন্ধান শুরু করেছে, তখন তোমাদের ঘাটির সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত ওরা সন্ধান চালাবেই। সুতরাং একটা ঘাটির পতন ঘটিয়ে যদি ওদের অনুসন্ধান বন্ধ করা যায় এবং অন্যসব ঘাটি রক্ষা করা যায় সেটাই ভাল।'

'তাহলে এখন আমাদের কি করণীয় মুসা ভাই?' বলল যিয়াদ।

'বন্দীরা কি জানতে পেরেছে, আমরা ঘাটি খালি করছি?'

'যেখানে ওদের রাখা হয়েছে, কিছুই জানা ওদের পক্ষে সম্ভব নয়।'

'ঠিক আছে। তাহলে ওদের এটা বুঝতে দাও যে তোমাদের পরিবার-পরিজন তোমরা বন্দর-নগর মিত্রালীতে ট্রান্সফার করছ। আচ্ছা শত্রুরা কোন পথ দিয়ে কখন আসছে তা জানার কি ব্যবস্থা রেখেছ?'

'ওরা আকাশ, জল, স্থল, যেদিক দিয়েই আসুক, আমাদের এলাকার সীমান্ত অতিক্রম করলেই আমরা জানতে পারব।'

'তাহলে চিন্তা নেই, আমরা যখন দেখব ওরা ঘাটির দিকে এগুচ্ছে, তখন আমরা অবশিষ্টরা ঘাটি ছেড়ে চলে যাব। বন্দীদের আমরা বুঝতে দেব যে, ঘাটিতে আক্রমণ আসছে এ জন্যে আমরা সরে পড়ছি।'

'কেন বন্দীদের আমরা শেষ করে যাব না?' বলল আহমদ আব্দুল্লাহ, যিয়াদের সহকারী।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'আত্মসমর্পণকারীদের মুসলমানরা হত্যা করে না এবং তাদের উপর নির্যাতনও করে না। ওদের সরিয়ে নিয়ে আমরা বন্দী করে রাখতে পারি। কিন্তু তার চেয়ে ওদের ঐভাবে চলে যাবার সুযোগ দেয়ার মধ্যেই কল্যাণ আছে। ওরা বুঝবে, বন্দীদের রাখার উপযুক্ত জায়গা আমাদের নেই।'

'শত্রুরা আমাদের কি দুর্বল ভাববে না?' বলল রবার্তো।

'আমরা যে পর্যায়ে আছে, সে সময় শত্রু আমাদের সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝিতে থাকা ভাল। আমি চাই, এই জংগলে 'ব্রাদার্স ফর ক্রিসেন্ট' (বি এফ সি) এর শক্তি সম্পর্কে ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান নিরুদ্বেগ বোধ করুক। তাতে তোমাদের আসল যে কাজ তাতে সুবিধা হবে। 'থামল আহমদ মুসা।

যিয়াদ, আহমদ আব্দুল্লাহ, জোয়ান, রবার্তো সকলের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

যিয়াদ জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে। বলল, মুসা ভাই, মুসলমানদের জন্যে আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবি করুন। আজ আপনি আমাদের মাঝে না থাকলে শত শত বছর ধরে যে জংগল এলাকাকে আমরা নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে গড়ে তুলেছি, তা এবং তার সাথে আমরাও বিপর্যয়ের মুখে পড়তাম।’

আহমদ মুসা যিয়াদের পিঠ চাপড়ে বলল, যখন যেখানে যা করার আল্লাহই করেন, শুধু প্রয়োজন তার বান্দারা যার যখন যেটা দায়িত্ব তা আন্তরিকতার সাথে পালন করা।

আহমদ মুসা, যিয়াদসহ সবাই উঠে দাঁড়াল। বেরিয়ে এল তারা ঘর থেকে। হাঁটতে হাঁটতে আহমদ মুসা বলল, ’আর কতক্ষণে ঐ ছয়জন এসে পৌছবে?’

‘আরও কয়েক ঘন্টা লাগবে।’ বলল যিয়াদ।

‘সবদিক বিচারে রাত ছাড়া বোধ হয় ওরা আসছে না।’ বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার কথাই ঠিক।

রাতে আসল ওরা। রাত বারটায়।

ঠিক রাত বারটায় কয়েকটা ক্ষুদ্রাকার শব্দহীন পরিবহন বিমানে করে ছত্রীসেনা নামানো হলো। ওরা তিন দিক থেকে ঘাটিটাকে ঘিরে ফেলল। সামনে থাকল নদী।

আরো আধা ঘন্টা পর ঠিক রাত সাড়ে বারটার দিকে তিনটা গানবোট নিঃশব্দে ভিড়ল ঘাটির ঘাটে এসে। গানবোটের কামানের নলগুলো ঘাটির দিকে তাক করা।

এমন শব্দহীন পরিবহন বিমান এবং গানবোট স্পেনীয় ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের নেই। আমেরিকার ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান এসব ব্যবস্থা করে দিয়েছে। তাদের স্বার্থ আহমদ মুসা কে হাতে পাওয়া, আর স্পেনীয় ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের স্বার্থ তাদের সহযোগীতার এই সুযোগ নিয়ে ‘ব্রাদারস ফর ক্রিসেন্ট’ এর ঘাটি ধ্বংস করা। এই

অপারেশন পরিচালনার জন্যে মাদ্রিদ থেকে স্বয়ং ভাসকুয়েজ এসেছে এবং তিনি পরিচালনা করছেন এই অভিযান।

গান বোটের অপারেশন কক্ষে বসে ভাস্কুয়েজ। তার হাতে ওয়াকিটকি। ঘাটির তিন দিক ঘিরে পূর্বেই মোতায়েন হওয়া ছত্রীসেনাদের সাথে কথা বলছে ভাসকুয়েজ। কথা শেষ করে ওয়াকিটকির এন্টেনা গুটিয়ে নিয়ে পাশে বসা সিনাত্রা সেন্ডোকে বলল, বুঝলে সেন্ডো, একটা কাকপক্ষিও পালাতে পারেনি। পালাবে কি করে! পরিকল্পনা দেখতে হবে তো! ওরা আমাদের আটজন লোককে ধরে নিশ্চয় আনন্দে বগল বাজাচ্ছে, কিন্তু ব্যাটারা জানেনা, ওরা তো টোপ, ধরা পড়ার জন্যেই পাঠানো হয়েছে। আমাদের পরিকল্পনা হান্ড্রেড পারসেন্ট সফল।'

'কিন্তু ওরা কেউ সাড়া দিচ্ছে না।পাহারা নিশ্চয় থাকার কথা। তারা কিছু বলছে না কেন? শিকার...।' কথা শেষ করতে পারলো না সেন্ডো। তার কথার মাঝখানেই ভাসকুয়েজ বলে উঠল, 'রাখ তোমার কথা। খবর দিয়েছে, এক নম্বর, দুই নম্বরসহ সবাই ঘাটিতে আছে।'

মিঃ ভাসকুয়েজ থামল। একটা সিগারেট ধরাল। তারপর আবার শুরু করল, আমার সৈন্যেরা তিন দিক দিয়ে ক্লোজ হয়ে ঘাটির দিকে আসছে। আর অল্পক্ষণের মধ্যেই ওরা ঘাটিতে ঢুকে পড়বে। সব ব্যাটাকে মরতে হবে, নয় তো ধরা দিতে হবে। এবার আহমদ মুসাকে হাতে পাওয়ার পর আর দেরী নয়, সঙ্গে সঙ্গে ভোঁ আমেরিকায়।'

'আহমদ মুসা ভীষণ ধড়িবাজ স্যার, কার্ডিনাল হাউজের মরণপুরী থেকে কি করে পালাল দেখেছেন তো স্যার?' বলল সেন্ডো।

কার্ডিনাল হাউজ থেকে আহমদ মুসার পালাতে পারার ঘটনা ভাসকুয়েজের কাছে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেয়ার মত বেদনাদায়ক। এই অপমান ও পরাজয় সহ্য করতে পারে না সে। সেন্ডোর কথায় ভাসকুয়েজ তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। বলল, 'তোমার মত গর্দভের চিন্তা সব সময় নিচের দিকে, কোন বড় চিন্তা তো তোমার নেই।'

'ইয়েস স্যার, ঘাটিটা এত চুপচাপ কিনা তাই বলছিলাম ওরা ভীষণ ধড়িবাজ...।' কথা শেষ না করেই থামল সেন্ডো।

‘তুমি কোন খবরই রাখ না সেন্ডো, ওরা সকলে শেষ রাতে উঠে নামায পড়ে, তাই ওরা একটু আগেই ঘুমায়।’

ভাসকুয়েজের ওয়াকিটকি কথা বলে উঠল, স্যার, ঘাটি খালি, কাউকেই দেখছি না। একটা ঘরে বন্দী অবস্থায় আমাদের আটজনকে পাওয়া গেছে।’

ভাসকুয়েজের মুখ অন্ধকার হয়ে গেল।

‘স্যার আমি একটু দেখি, বলে উঠে দাঁড়াল সেন্ডো। সে গান বোট থেকে ঘাটিতে নেমে গেল। তার দু’পাশে দু’জন প্রহরী উদ্যত স্টেনগান হাতে।

আধা ঘন্টা পরে সেন্ডো তাদের বন্দী আটজন লোক সহ ফিরে এল। ভাসকুয়েয এক দৃষ্টিতে তাকাল তাদের সেই আটজনের দিকে। হুংকার দিয়ে বলল, তোমরা কি খবর পাওনি যে, আহমদ মুসা, যিয়াদ সহ সবাই আছে?’

আটজনের একজন বলল, ’জি স্যার আমি খবর দিয়েছিলাম সন্ধ্যায়। তখন ওরা ছিল। সন্ধ্যার পর ওরা বেরিয়ে গেছে। সে খবর আমরা জানিয়েছি গ্রানাডা অফিসে।’

‘কোথায় গেছে ওরা?’ বলল ভাসকুয়েজ।

‘ওদের কথাবার্তায় শুনেছিলাম, সকালের দিকে ওরা পরিবার পরিজন মিত্রালীতে পাঠিয়ে দিয়েছে। সন্ধ্যার পর ওরাও মিত্রালীর দিকে গেছে বলেই আমাদের মনে হয়েছে।’ বলল সেই লোকটি।

এদের কথা ঠিক। এদেরকে এই ইম্প্রেশন দেবার জন্যেই আহমদ মুসারা মটর বোট চালিয়ে প্রথমে পশ্চিম দিকে চলে যায়।পরে ইঞ্জিন বন্ধ করে বৈঠা টেনে তারা ফিরে আসে এবং পুব দিকে ৪০ মেইল দুরের গভীর জংলের ঘাটির দিকে চলে যায়।

‘তোমাদের নিয়ে গেল না?’ বলল সেন্ডো।

‘চলে যাবার সময় আমাদের এসে বলেছে, আরও কয়েক ঘন্টা তোমরা থাক, তোমাদের বন্ধুরা আসছে, তোমাদের নিয়ে যাবে।’ আটজনের অন্য একজন জানাল।

‘ওরা জানলো কি করে যে আমরা আসছি ?’ হুংকার দিয়ে উঠল ভাসকুয়েজর গলা।

‘আমরা কেউই জানতামনা যে আপনারা আসছেন।’ বলল আটজনের একজন।

ভাসকুয়েজ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালো সেন্ডোর দিকে। সেন্ডো বলল, ‘স্যার আমারও একই প্রশ্ন ওরা এই তথ্য জানলো কি করে ?’

‘আমাদের গ্রানাডা অফিসটা অপদার্থ। ওখানেই কোন মরিসকো লুকিয়ে আছে মনে হয়। চল ফিরে চলো গ্রানাডা। জাহান্নামে পাঠাবো সবাইকে।’

ভাসকুয়েজ অন্য কক্ষে চলে যাবার জন্য পা বড়াতে বাড়াতে বলল, গোটা ঘাটি ভাল করে সার্চ করো সেন্ডো। কিছু পাও কিনা দেখ তারপর জ্বালিয়ে দাও শয়তানের আড্ডাটা।

ভাসকুয়েজ ঢুকে গেল তার বিশ্রাম কক্ষে। বন্ধ হয়ে গেল তার কক্ষের দরজা।

সেন্ডো উঠে দাঁড়াল। সবাইকে নিয়ে এগুলো গানবোট থেকে ঘাটিতে নামার জন্যে।

পরদিন সকাল।

বিধ্বস্ত ঘাটি থেকে ৪০ মাইল পূবে সিয়েরা নিবেদার পাদদেশে একটি পুরানো গ্রাম, পুরানো জনপদ। পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে সিয়েরা নিবেদার একটি ঝরনা। ঝরনাটা মাইল খানেক গিয়েই পড়েছে গোয়াদালেজ নদীতে।

এই পুরানো গ্রামের মাঝখানে একটা টিলার উপর কাঠের দোতলা বাড়ি। এই বাড়িটা যিয়াদ বিন তারিকের। এটাই ‘ব্রাদারস ফর ক্রিসেন্টে’ এর প্রধান দফতর। বাড়িটা ঘিরেই গড়ে উঠেছে সুন্দর জনবহুল একটা গ্রাম।

যিয়াদের বাড়িটা সবুজ জলপাই কুঞ্জে ঢাকা। টিলার গা বেয়ে দ্রাক্ষার বাগান।

বাড়িটার সামনে টিলায় এক প্রান্তে মসজিদ। মসজিদে কোন মিনার নেই। উড়োজাহাজের নজর থেকে গোপন রাখার জন্যই এই ব্যাবস্থা। মিনারের বদলে ছাদে উঠে আজান দেয়া হয়।

ভোরের নামাজ শেষে আহমদ মুসা মসজিদের ছাদে উঠেছিল। তার সাথে যিয়াদও।

চারদিকের নৈস্বর্গিক দৃশ্যে অভিভূত হয়েছিল আহমদ মুসা। তার পাশে দাঁড়িয়ে যিয়াদ। তাদের সামনে ঝরনা। ঝরনার ওপারে পাহাড়, পাহাড়ের ওপারে একটা দুর্গম উপত্যকা।

যিয়াদ ওদিকে তাকিয়ে বলেছিল, ওই পাহাড়ের পারে ঐ যে উপত্যকা ওটাই ফ্যালকন অব স্পেন বশির বিন মুগীরার শেষ রণক্ষেত্র। গ্রানাডা পতনের পর বিদ্রহী মুসলমানরা এই পাহাড়, এই বনাঞ্চলেই সংঘবদ্ধ হয়েছিল বশির বিন মুগীরার নেতৃত্বে। বেশ কয়েকটা যুদ্ধে ফার্ডিল্যান্ডের বাহিনী পরাজিত হয়েছিল বশির বিন মুগীরার কাছে। বশীর বিন মুগীরার শেষ রণাঙ্গন ছিল এই উপত্যকা। এই যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হন বশির বিন মুগীরা। তাকে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে আনা হয়েছিল ঐ পাহাড়ের পাদদেশের একটা গ্রামে। মুসলিম স্পেনের শেষ মুজাহিদকে ওই গ্রামেই সমাহিত করা হয়। তাঁর আকাঙ্খা ছিলো, তাঁর শেষ শয্যা যেন রণক্ষেত্রেই হয়। আজও স্পেনের সব মুসলমানের গৌরবের তীর্থ ক্ষেত্র তাঁর কবর গাহ। যাবেন না মুসা ভাই আপনি সেখানে?

আহমদ মুসার দু'চোখ দিয়ে অশ্রু গড়াচ্ছিল। বলল সে, ওখানে আহমদ মুসা যাবে না তো কে যাবে যিয়াদ। তিনি শুধু আমার প্রেরণা নন, তিনি আমার কাছে গৌরবজনক দৃষ্টান্ত।

যিয়াদ তারপর দক্ষিণ মুখি হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। দূরবীনটা আহমদ মুসার হাতে দিয়ে বলেছিল, দেখুন গোয়াদেলেজ নদী যেখানে সাগরে পড়েছে, সেখানে দেখুন ছোট্ট একটা নগরী, আদ্রা। সে সময় এখানে কোন নগরী ছিলো না। ছিল জংগল ঘেরা একটা ঘাটি। বশির বিন মুগীরার পরিবারের অসহায় কয়েকজন নারী অশ্রু জলে ভেসে নৌকায় উঠে স্পেন ত্যাগ করেছিল। জাবালুত তারিক আমাদের গৌরবের, কিন্তু এই সাগরতীর আমাদের কাছে কান্নার। ওখানে

দাঁড়ালে উপকূলে আছড়ে পড়া স্বচ্ছজলকে মনে হয় সেই অসহায়া নারীদের উপছে পড়া চোখের জল। বিষাদের ঐ তীরটায় আমরা কেউই যায় না মুসা ভাই। ঐ তীর আমাদের লাঞ্ছনার প্রতীক, অযোগ্যতার প্রতীক, সব হারানোর প্রতীক।

কাঁদছিল যিয়াদ।

চোখ দিয়ে অশ্রু গড়াচ্ছিল আহমদ মুসারও। মসজিদের ছাদ থেকে নেমে আহমদ মুসা এবং যিয়াদ, পেছনে পেছনে জোয়ান এবং রবার্তো, সেই ঝরনা পাড়ি দিয়ে সেই পাহাড় ডিঙিয়ে গিয়েছিল সেই উপত্যকায় এবং সেই গ্রামে।

বশির বিন মুগীরার কবরের সামনে দাঁড়িয়ে প্রান্তরের দিকে চোখ তুলে আহমদ মুসার মনে হয়েছিল, সে যেন দেখতে পাচ্ছে বশির বিন মুগীরাকে। পরাজয় যখন আসন্ন, নিশ্চিত, সাথীরা যখন বিধ্বস্ত- বিশৃঙ্খল, যখন ঘোড়ার লাগাম টেনে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে পেছনের দিকে ছোটার কথা, তখন বশির বিন মুগীরার ঘোড়া শত্রু ব্যুহ ভেঙে ঢুকে যাচ্ছে শত্রুর ভেতরে। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত বশীর জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ছে ঘোড়ার পিঠ থেকে।

বশীর বিন মুগীরার কবরটি সাধারণ। সবুজ মাটির উপর কবর। চারদিকে পাথর পুতে একটা সীমারেখা দাঁড় করানো হয়েছে মাত্র। কবরের শিয়রে একটা মিনার তুলেছিল মুসলমানেরা। স্পেনের খৃষ্টান বাদশাহ দ্বিতীয় ফিলিপ সেটা ভেঙে দেয়। এখনও সে মিনার ভাঙা ভিতটি দাঁড়িয়ে। ভিতের পাথরটির গায়ে একটা খোদাই করে লেখা এখনও জ্বল জ্বল করছে, ‘মুসলিম স্পেনের আশার শেষ প্রদীপটি এখানে ঘুমিয়ে।’

আহমদ মুসার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়াচ্ছিল। সত্যিই শেষ প্রদীপটি এখানে শান্তিতে ঘুমিয়ে। বশীর বিন মুগীরার কবরটি ঘন ঝোপে ঢাকা। প্রকৃতির নিবিড় স্নিগ্ধ পরশে ঘুমিয়ে আছে শহীদ।

হাত তুলেছিল আহমদ মসা। কবরের সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করেছিল আল্লাহর কাছে, ’একদিন এই প্রান্তরে যে পতাকা ভূ-লুন্ঠিত হয়েছিল, তা কি আবার বীরদর্পে উড়বে না স্পেনের আকাশে? আল্লাহ সে সুদিন দাও স্পেনের জন্যে।’

যিয়াদ, জোয়ান ও রবার্তো পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিল, আমিন।

ঘন্টা তিনেকের মধ্যেই ওরা ফিরে এসেছিল যিয়াদের বাড়িতে।

আজ ওরা মাদ্রিদ যাচ্ছে।

এবার জোয়ান ও রবার্তোর মত যিয়াদও আহমদ মুসার সাথী হচ্ছে।

যেহেতু যিয়াদরা বিপদে তাই আহমদ মুসা তাকে সাথে নিতে চায়নি। কিন্তু যিয়াদ তা মানতে রাজী হয়নি, এমনকি যিয়াদের মা চেয়েছে যিয়াদ আহমদ মুসার সাথী হোক।

আহমদ মুসা এবং জোয়ান ও রবার্তো প্রস্তুত হয়ে বসে আছে যিয়াদের পারিবারিক ড্রয়িং রুমে, বাড়ির ভেতরের অংশে।

যিয়াদ ড্রয়িং রুমে ঢুকে বলল, আম্মা এসেছেন মুসা ভাই।

ড্রয়িং রুম ও ভেতরের ঘরের মধ্যে তখন ভারী পর্দা। পর্দার ওপারে চেয়ারে এসে বসেছে যিয়াদের মা ফাতিমা এবং যিয়াদের স্ত্রী জোহরা। যিয়াদের মা'র দীর্ঘাঙ্গী আরবীয় লাল চেহারা, জোহরাও তাই।

'আম্মা, আমরা বিদায় চাচ্ছি, আমরা এখনি মাদ্রিদ যাত্রা করছি।'

পর্দার দিকে তাকিয়ে বলল আহমদ মুসা।

যিয়াদের মা বলল, 'যিয়াদের কাছে সব শুনেছি বাবা। আমি তোমাকে নিষেধ করতে পারবো না। কিন্তু খুব খুশি হতাম যদি তুমি আরও কটা দিন আমাদের মাঝে থাকতে।'

'আমিও খুশি হতাম আম্মা, মহান স্মৃতি বিজড়িত এখানকার বন ও পাহাড়ের এলাকা আমাকে যেমনটা আকর্ষণ করেছে, তেমনটা স্পেনের আর কিছুই আমাকে করেনি।' বলল আহমদ মুসা।

'বাবা, ফিরে আসবে না তুমি আবার ?' বলল যিয়াদের মা।

'বলতে পারবো না আম্মা, ঘটনা আমাকে কোথায় নিয়ে যায় বলতে পারি না।'

'কোরআন শরীফে আছে, ঈমানের উপর মানুষ যখন অটলভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন আল্লাহ মুমিনদের সাহায্যের জন্যে ফেরেশতা পাঠান। তুমি ফেরেশতার মতই আমাদের মাঝে এসেছ। তুমি আমার ছেলের মত। কিন্তু অভিজ্ঞতা ও দায়িত্বে তুমি আমাদের নেতা। তোমাকে কি জিজ্ঞাসা করতে পারি

না, আমাদের অন্ধকার রাতের অবসান কবে হবে ? আমাদের পলাতক জিন্দেগীর ইতি কবে ঘটবে ?' বলল যিয়াদের মা আবেগ জড়িত কন্ঠে।

'এই প্রশ্নের জবাব আমার কাছে নেই। তবে এটুকু বলতে পারি, স্পেনের মুসলমানদের জীবনে একটা পরিবর্তন আসছে। আগের জায়গা পৌঁছাতে হলে আমাদের আবার শূন্য থেকে কাজ শুরু করতে হবে।'

'এই কাজে তুমি থাকবে না বাবা?

'এ প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারবো না আম্মা। কোন ডাকে আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে বলতে পারি না।'

'আমি যিয়াদের কাছে সব শুনেছি। এমন অনিশ্চিত জীবন তো হতে পারে না বাছা, কোন ঠিকানায় তো তোমাকে দাঁড়াতে হবে।'

'গোটা দুনিয়ার মুসলমানরা এখন যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবস্থান করছে। চারিদিকে তাদের হাহাকার, আর্তনাদ, আর মুক্তির আকুলতা। এই যুদ্ধ ক্ষেত্রে দাঁড়াবার অবকাশ কোথায় আম্মা?'

যিয়াদের আম্মা কেঁদে উঠল। বলল, 'আচ্ছা ! দুনিয়ার সব মুসলমান যদি এভাবে ভাবতো ! আল্লাহ তোমাকে, শতায়ু করুন বাবা।'

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, সব মুসলিম মা যদি আপনার মত হত , তাহলে ঘরে ঘরে জন্ম হতো তারিক বিন যিয়াদদের, ঘুচে যেত আমাদের দুঃখের অমানিশা।'

থামল আহমদ মুসা। একটু থেমেই আবার বলল, 'আমাদের এবার যেতে দিন আম্মা।'

'সম্মানিত ভাইজান , আপনার কাছে আমাদের ঋণ শোধ হবার মত নয়। দোয়া ছাড়া আমাদের দেবার কিছু নেই।' ' কথা বলল জোহরা , যিয়াদ এর স্ত্রী।

'বোন , মুসলমানরা কাজ করে আল্লাহর জন্য, ঋণ যদি দেয় সেটা তাকেই দেয়। মুসলমানদের মধ্যে কোন ঋণের বাঁধন নেই। আসি বোন, আসি আম্মা।' ' বলে আহমদ মুসা সামনে বা বাড়াল।

তার সাথে জোয়ান ও রবার্টও।

পরে বের হয়ে এল যিয়াদ। চারজন বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। বাড়ির সামনে চত্বরে দাঁড়িয়ে চারটি ঘোড়া। ওরা এগুলো ঘোড়ার দিকে। জোয়ান হাঁটছিল আহমদ মুসার পাশাপাশি।

'মুসা ভাই , আপনি যে বললেন স্পেনে শূন্য থেকে কাজ শুরু করতে ববে, সত্যিই কি ?' বলল জোয়ান।

'কেন হতাশ হচ্ছ ?'

'হতাশ নয় , ভাবছি দীর্ঘ পথের কথা।' '

'ইসলামে বিজয়ের কোন সংক্ষিপ্ত পথ নেই জোয়ান। ইসলাম প্রথমে বিপ্লব আনে মানুষের মনে। ব্যক্তির মানসিক বিপ্লব , মনের পরিবর্তন ছাড়িয়ে পড়ে তার কাজ -কর্মে , পাল্টে দেয় তার জীবন পদ্ধতি। ব্যক্তির এই পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ইসলাম সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিপ্লব সংঘটিত করে। এই বিপ্লবের পথটা অবশ্যই দীর্ঘ হতে বাধ্য। '

'স্পেনের জন্য এই পথটা হবে কষ্টের।' ' বলল যিয়াদ।

'মহানবী (সঃ) - এর পথ -পরিক্রমার চেয়ে কষ্টের নয় নিশ্চয় যিয়াদ।' '

'ঠিক বলেছেন মুসা ভাই, আমার ভুল বুঝতে পারছি।' '

ঘোড়ার কাছে পৌঁছে গেল সবাই।

চলতে শুরু করল চারটি ঘোড়া।

তাদের গন্তব্য পশ্চিমে গ্রানাডা -মিত্রালি হাইওয়ের পাশে অলিভা শহর। ওখানে আছে রবার্তোর গাড়ি।

পশ্চিমে ঢলে পড়েছে সূর্য।

সন্ধ্যার মধ্যে ৬০ মাইল দূরে অলিভায় তাদের পৌছতে হবে। দুর্গম পাহাড়ি পথ।

চার ঘোড়া সওয়ার তাদের চলার গতি বাড়িয়ে দিল।

আহমদ মুসা গাড়ি শাহ ফয়সল মসজিদ কমপ্লেক্স-এর বন্ধ গেটের সামনে দাঁড়াতেই গেট রুম থেকে একজন লোক বেরিয়ে এসে গেট খুলে দিল।

বিরাট লোহার গেট , এ গেটের পাশ দিয়ে ছোট একটি দরজা। পায়ে চলা লোকেরা ও পথে যাতায়াত করে। গেট এর মাথাটা মিনারাকৃতি, পাথরের তৈরি। মিনারাকৃতির মাঝখানে পাথরের প্লেটে খোদায় করে আরবি ভাষায় , লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ লেখা। গেটের ষ্টীলের নীল পাল্লায় অর্ধ চন্দ্র আঁকা।

উত্তর মাদ্রিদে ছোট একটা সবুজ টিলার উপর তৈরি শাহ ফয়সল মসজিদ কমপ্লেক্স। কমপ্লেক্সটি উঁচু প্রাচীর ঘেরা। একটাই গেট। গেট দিয়ে আহমদ মুসাদের গাড়ি প্রবেশ করল মসজিদ কমপ্লেক্সে।

লাল ইটের সুন্দর রাস্তা এগিয়ে গেছে কমপ্লেক্সর গাড়ি বারান্দার দিকে। রাস্তার দু'পাশে ফুলের বাগান। মসজিদ কমপ্লেক্স -বিল্ডিং এর চারিদিকে ঘিরে টিলা জুড়েই ফুলের বাগান। চারিদিকে বাগানের মধ্যে অনেকগুলো ছোট ছোট বাংলো সাইজের বাড়ি। ও গুলোতে প্রধান ইমাম, সহকারী ইমামগণ , মুয়াজ্জিনগণ এবং কমপ্লেক্সের কর্মচারীরা থাকেন।

টিলার শীর্ষ দেশে মূল্যবান সফেদ পাথরে তৈরি বাগান ঘেরা মসজিদ কমপ্লেক্সটির দৃশ্য অপরুপ। সৌদি সরকার স্পেন সরকারের অনুমতি নিয়ে টিলাটি কিনে মসজিদ কমপ্লেক্সটি নির্মাণ করেছেন। খরচ হয়েছে ৫০ মিলিয়ন ডলার। সর্ব প্রথম বাদশাহ ফয়সল আকাঙ্খা ব্যক্ত করেন স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে এ ধরনের একটি মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণের। কিন্তু তিনি তার জীবদ্দশায় এ অনুমতি পাননি। পরবর্তীকালে তার স্বপ্ন সফল হয় এবং সৌদি সরকার বাদশাহ ফয়সলের নামেই এ মসজিদ কমপ্লেক্স এর নামকরণ করেন।

লাল ইটের রাস্তা ধরে আহমদ মুসাদের গাড়ি দিয়ে দাঁড়াল গাড়ি বারান্দায়। মসজিদের বিশাল প্রশস্ত সিঁড়ির নিচে গাড়ি বারান্দা। সিঁড়ি উঠে গেছে দু'তলার লাইব্রারিতে এবং তিনতলায় অবস্থিত মসজিদে। গ্রাউন্ড ফ্লোর জুড়ে বিশাল হল ঘর। দু'হাজার আসন বিশিষ্ট এই হল ঘর শুধু মাদ্রিদ নয়, স্পেনের মধ্যে সর্ববৃহৎ। হলের সামনে এবং দু'পাশে কমপ্লেক্সের অফিস কক্ষ সমূহ। এখানেই প্রধান ইমাম, সহকারী ইমামগণ, মুয়াজ্জিনদেরও অফিস। দু'তলার

একপাশে লাইব্রারি এবং অন্য পাশে ইসলামিক স্কুল। এই স্কুলে শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার যেমন ব্যবস্থা আছে, তেমনি কোরান , হাদিস, এবং ফেকাহ-এর উপর উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। এখানকার শিক্ষকদের মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওভারসীজ এডুকেশন ফান্ড থেকে বেতন দেয়া হয়। লক্ষাধিক গ্রন্থ সম্বলিত লাইব্রেরীটিও স্পেনের একটি শ্রেষ্ঠ লাইব্রেরীতে রূপান্তরিত। অঢেল পয়সা খরচ করে স্পেনসহ গোটা দুনিয়া থেকে দুর্লভ ও মূল্যবান বই জোগাড় করে এই লাইব্রেরী গড়ে তোলা হয়েছে। তৃতীয় তলা জুড়ে বিশাল মসজিদ , ৫ হাজার লোক এক সাথে এখানে নামায পড়তে পারে। তবে দুর্ভাগ্য , কয়েক শ'র বেশি লোক জুম্মার দিনেও এখানে হয় না। একে তো মুসলমান নেই বললেই চলে, অপরদিকে যাও আছে তারাও চিহ্নিত হবার ভয়ে মসজিদে আসে না। মসজিদকে কেন্দ্র করে যে ছোট মুসলিম কম্যুনিটি গড়ে উঠেছে তারাই এখানে নামায পড়ে। মসজিদের মুসল্লিদের মধ্যে বিদেশিদের সংখ্যাই বেশি। শুক্রবারের জামায়াতে মুসলিম দেশের কূটনীতিকরা আসেন। আর সব দিনই বিদেশী মুসলিম পর্যটকরা কিছু কিছু থাকেন। মসজিদ কমপ্লেক্সের প্রাচীরের বাইরে দিয়ে মার্কেট গড়ে তোলা হয়েছে। এই মার্কেট মসজিদের স্থায়ী আয়ের উৎসই শুধু নয়, শ'খানেক মুসলিম পরিবারের জীবিকার ব্যবস্থাও হয়েছে এর মাধ্যমে।

গাড়ি দাঁড়ালে প্রথমে নামল আহমদ মুসা। তারপর একে একে নামল যিয়াদ, জোয়ান এবং রবার্টও।

গাড়ি বারান্দার পরেই একটি করিডোর। করিডোরের বাঁ পাশে কাঁচের দেয়াল ঘেরা রিসেপশন কক্ষ। কক্ষে অনেকগুলো সোফা পাতা। একপাশে একজন লোক একটা ছোট টেবিলের পাশে বসে।

আহমদ মুসারা ঘরে প্রবেশ করতেই টেবিলে বসা লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে সালাম দিল।

আহমদ মুসা সালাম গ্রহন করে তার দিকে এগুলো। রিসেপশনিস্ট দাঁড়িয়ে ছিল। বলল, কি খেদমত করতে পারি আপনাদের?

'শাইখুল ইসলামের সাথে আমাদের একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে ৫ টায়।' বলল আহমদ মুসা।

‘অ্যাপয়েন্টমেন্টটা কে নিয়েছিলেন ?’

‘যিয়াদ।’ বলল আহমদ মুসা।

‘স্যার একটু বসুন , আমি দেখছি।’ ‘ ঘড়ির দিকে চেয়ে টেলিফোন হাতে তুলে নিতে নিতে বলল রিসেপশনিস্ট। ঘড়িতে পাঁচটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি।

টেলিফোনে কথা শেষ করে রিসেপশনিস্ট বলল, ‘স্যার শাইখুল ইসলাম স্যার তার অফিসে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। তার পি, এস ছুটিতে আছেন, চলুন আমি পৌঁছে দেব।’

বলে রিসেপশনিস্ট ছেলেটি উঠে দাঁড়াল।

রিসেপশনিস্ট ছেলেটি আগে আগে চলল, পেছনে আহমদ মুসা, যিয়াদ , জোয়ান এবং রাবার্তো।

আঁকা-বাঁকা করিডোর ধরে আহমদ মুসারা এগিয়ে চলছিল। দু’পাশেই অফিস ঘর। গোটা কমপ্লেক্সে অফিস এই এক স্থানে। কিন্তু কোন অফিসে কোন লোক নেই। রিসেপশনিস্ট জানাল, অফিস সময় সকাল ৭টা থেকে ১ টা পর্যন্ত। ‘

আহমদ মুসা দেখল, সামনে একটা খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে একজন লোক তাদের দিকে তাকিয়ে আছে, মনে হচ্ছে সে দাঁড়িয়ে যেন তাদেরই অপেক্ষা করছে।

রিসেপশনিস্ট বলল, ‘একজন মুয়াজ্জিন।’ ‘

‘কয়জন মুয়াজ্জিন?’ জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

‘তিনজন।’

রিসেপশনিস্ট ছেলেটা সামনে ছিল।

সেই সালাম দিল মুয়াজ্জিন সাহেবকে।

আহমদ মুসা লক্ষ্য করল, সালামের জবাব সুস্পষ্ট ভাবে শোনা যায় এমনভাবে উচ্চারিত হল না, মুয়াজ্জিন সাহেবের সব মনোযোগ যেন মেহমানদের দেখার কাজেই ব্যস্ত ছিল। আহমদ মুসা মনে মনে ভাবল, বেচারা এরা, বাইরের লোকের দেখা খুব কম পায় কিনা!

শাইখুল ইসলামের অফিসে তারা পৌঁছল।

আহমদ মুসারা বাইরে দাঁড়াল।

রিসেপশনিষ্ট দরজার নব ঘুরিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। কয়েক মুহূর্ত পরে খোদ শাইখুল ইসলাম উঠে এসে দরজায় আহমদ মুসাদের স্বাগত জানিয়ে ভেতরে নিয়ে গেল।

শাইখুল ইসলাম দীর্ঘদেহী মানুষ। মাথায় সাদা পাগড়ী। গায়ে সাদা জামার উপর সোনালী রঙয়ের আরবীয় আলখেল্লা জড়ানো। লাল গায়ের রং। বয়স ৪০ থেকে ৫০ এর মাঝখানে হবে। সুন্দর বিন্যস্ত কালো দাঁড়ি। অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। চোখে-মুখে তারুণ্যের একটা তেজ।

নাম শাইখুল ইসলাম ডঃ আবদুর রহমান আন্দালুসী। সেভিলের এক অখ্যাত শহরতলীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাদের পরিবারটি বাস করত উত্তরে পিরেনিজের পার্বত্য এলাকায়। উত্তর আফ্রিকায় হিজরতের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তাদের পরিবার ক্রমে দক্ষিণে এগুতে থাকে। পরিবারটি সেভিলে এসে যখন বাস করছিল সেই সময় আবদুর রহমানের জন্ম হয়। ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুযোগ হওয়ায় এবং জীবন-যাত্রা অনেকটা নিরাপদ দেখায় অবশেষে পরিবারটি সেভিলেই থেকে যায়। কিন্তু ছেলের মেধা দেখে আবদুর রহমানের পিতা আবদুর রহমানকে ১২ বছর বয়সে গোপনে মরক্কো পাঠিয়ে দেয়। প্রাথমিক শিক্ষা আবদুর রহমান মরক্কোয় লাভ করে। অত্যন্ত মেধাবী প্রমাণিত হওয়ায় মিসরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি নিয়ে সেখানে পড়ার তার সুযোগ সৃষ্টি হয়। আল-আজহার থেকে তিনি তাফসীর ও ফেকাহ শাস্ত্রে এবং কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী ভাষায় উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করেন। তারপর মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি হাদীস শাস্ত্র ও দাওয়া বিষয়ে অধ্যায়ন করেন। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থানুকূল্যে তিনি অক্সফোর্ড থেকে 'কনটেমপোরারী মিশনারী এ্যাকটিভিটিজ' এর উপর ডক্টরেট লাভ করেন। মাদ্রিদে শাহ ফয়সল মসজিদ কমপ্লেক্স তৈরী হবার পর মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় কমপ্লেক্সটি পরিচালনার সর্বময় দায়িত্ব দিয়ে তাকে মাদ্রিদে পাঠায়।

শাইখুল ইসলাম ডঃ আবদুর রহমান আন্দালুসী মেহমানদের বসিয়ে নিজে আসন গ্রহণ করে বললেন, 'আগে পরিচয়টা হয়ে যাওয়া দরকার। যিয়াদ কে?'

'আমি যিয়াদ বিন তারিক।' বলল যিয়াদ।

‘সান অব দি গ্রেট তারিক বিন যিয়াদ।’ হেসে বলল শাইখুল ইসলাম।

সলজ্জ হাসি ফুটে উঠল যিয়াদের মুখে।

‘এক অর্থে সবাই তো আমরা পূর্বসুরীদের সন্তান।’ বলল আহমদ মুসা।

শাইখুল ইসলাম তাকাল আহমদ মুসার দিকে। পবিত্রতা ও অসাধারণ প্রত্যয়ের দীপ্তিতে উজ্জ্বল তার মুখে শাইখুল ইসলামের চোখ দু’টি যেন আটকে গেল মুহূর্তের জন্যে। বলল শাইখুল ইসলাম আহমদ মুসার মুখে চোখ রেখেই, ‘সন্তান বটে, যোগ্য সন্তান নই।’

‘যোগ্য সন্তানের জন্যে যোগ্য পিতাও চাই।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ঠিক ইয়ংম্যান, কিন্তু সন্তানের কি কোন দোষ নেই?’

‘আছে, সেটা কর্তব্য না করার। কিন্তু সর্বব্যাপি যে দুর্ভাগ্য তাদের ঘিরে ধরেছে এর জন্যে তারা দায়ী নয়।’

শাইখুল ইসলামের চোখ দু’টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, ‘ধন্যবাদ ইয়ংম্যান, আসুন আমরা পরিচিত হই, তারপর আপনাদের কথা শুনব।’

যিয়াদ টেবিলের এক প্রান্তে বসেছিল। সেই-ই প্রথম পরিচয় দিতে এল। বলল, ‘আমি যিয়াদ বিন তারিক, আগেই জেনেছেন। আমি থাকি সিয়েরা নিবেদার পাহাড়ে। আমরা.........’

যিয়াদকে থামিয়ে দিয়ে শাইখুল ইসলাম বললেন, ‘আপনি সেই যিয়াদ? ‘ব্রাদার্স ফর ক্রিসেন্ট’ এর যিয়াদ?’

‘জি, হ্যাঁ।’ বলল যিয়াদ।

শাইখুল ইসলামের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। উঠে দাঁড়াল। হাত বাড়াল যিয়াদের দিকে। আবার উষ্ণ হ্যান্ডশেক করে বলল, ‘আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া, তিনি আমার এক আশা আজ পূর্ণ করলেন। আমি আপনাকে কত যে খুঁজেছি। দুইবার লোক পাঠিয়েছি গ্রানাডায়, কিন্তু কোন সন্ধান তারা পায়নি।’

থামল শাইখুল ইসলাম। থেমেই আবার বলল, ‘জানেন, আপনাকে ‘ফ্যালকন’ বলে ডাকা হয়?’

‘জানি, তারা আমার উপর অনেক আশা করে, কিন্তু উপযুক্ত আমি নই।’

'বশীর বিন মুগীরার পর আপনিই মানুষের মনে আশার আলো জ্বেলেছেন। কিছু করা যায়, এ চিন্তাও মানুষ হারিয়ে ফেলেছিল। আপনি হতাশার এই অন্ধকারে সাহসের একটা আলো প্রজ্বলিত করেছেন, যত ক্ষুদ্রই তা হোক।'

'ধন্যবাদ শাইখ' বলে যিয়াদের পাশে উপবিষ্ট জোয়ানের দিকে ইংগিত করে বলল, 'ইনি জোয়ান ফার্ডিন্যান্ড। মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ বিজ্ঞানী। মুসলিম নাম 'মুসা আবদুল্লাহ'।'

'না, পরিচয় সম্পূর্ণ হলো না, ইউরোপীয় বিজ্ঞান পদক লাভ করেছে, এবার অনার্সে প্রথম না হয়ে দ্বিতীয় হয়েছে, মরিস্ক বলে' বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়তে হয়েছে, বসত বাটিও হারাতে হয়েছে, সেই জোয়ান তো?' গম্ভীর কন্ঠে বলল শাইখুল ইসলাম।

'শাইখ দেখছি সবই জানেন।' বলল যিয়াদ।

'কোন সাহায্য কাউকে না করতে পারি, এটুকু খোঁজ না রাখলে আল্লাহর কাছে জি জবাব দেব?' বলে উঠে দাঁড়িয়ে শাইখুল ইসলাম হাত বাড়িয়ে দিল জোয়ানের দিকে। জোয়ানের সাথে হ্যান্ডশেক করতে করতে বলল, 'তোমার আমি সন্ধান করেছি বৎস, কিন্তু নতুন ঠিকানা জানতে পারিনি। সন্ধান এখনও চলছে। খুব খুশী হলাম তোমার দেখা পেয়ে।'

'ধন্যবাদ স্যার, আমাদের মত হতভাগ্যের কেউ এভাবে খোঁজ করতে পারে ভাবিনি। খুশী হলাম স্যার।' বলল জোয়ান।

জোয়ানের পরেই বসে ছিল আহমদ মুসা।

যিয়াদ বলল, 'শাইখুল ইসলাম স্যার, এবার আপনার সাথে এমন ব্যক্তির পরিচয় করিয়ে দেব যে, আপনি খুশী হবেন, খুব খুশী হবেন।'

'কেন আপনাদের সাথে পরিচয়ে খুশী হইনি বুঝি!' হেসে বলল শাইখুল ইসলাম।

'জি না, শাইখ, এ খুশী ভিন্ন স্বাদের। এমন খুশীর মুহূর্ত কচিত কারো ভাগ্যে জোটে।'

'আলহামদুলিল্লাহ, বলুন মিঃ যিয়াদ।' আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল শাইখুল ইসলাম।

‘ইনি আমাদের সম্মানিত ভাই, বিশ্বের মজলুম মুসলমানদের মহান বন্ধু, মহান নেতা আহমদ মুসা।’

শাইখুল ইসলামের চোখে-মুখে বিদ্যুৎ খেলে গেল। বিস্ময়ের একটা প্রচন্ড জোয়ার গিয়ে তার চোখে-মুখে আছড়ে পড়ল। কয়েক মুহূর্ত সে কথা বলতে পারলো না। রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে সে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। তারপরেই সে লাফিয়ে উঠল আসন থেকে। বলল, ‘আহমদ মুসা! আহমদ মুসা!!

মিলে যাচ্ছে, আমি ফটোতে দেখেছি, থিক মিলে যাচ্ছে।’ বলে আসন থেকে ছুটে এল শাইখুল ইসলাম।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়েছিল।

শাইখুল ইসলাম এসে জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে। বলল, ‘আমার কি সৌভাগ্য! যাঁকে মদীনায় কাছে পেয়েও দেখার সৌভাগ্য হয়নি, তাঁকে এভাবে এখানে দেখতে পাব, তা অসম্ভব একটা আশা। আল্লাহর অশেষ করুণা।’

আনন্দে আবেগে শাইখুল ইসলামের চোখ থেকে অশ্রু গড়াতে লাগল।

শাইখুল ইসলাম আহমদ মুসাকে অনেক্ষণ বুকে জড়িয়ে রাখলেন। তার এই আবেগের কাছে আহমদ মুসা বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, কি বলবে বুঝতে পারছিল না।

তারপর আহমদ মুসাকে বসিয়ে আসনে ফিরে গেল শাইখুল ইসলাম। বসে রুমালে চোখ মুছে আহমদ মুসার দিকে চেয়ে বলল, ‘জনাব, আপনি ফিলিস্তিন থেকে মিন্দানাওয়ের দিকে যাবার পথে মদিনা শরিফ গিয়েছিলেন। আমরা আপনার সাথে দেখা করতে চেয়েছিলাম, একটা সম্বর্ধনার আয়োজন করেছিলাম, কিন্তু সময় কম হওয়ায় সেটা বাতিল হয়ে যায়। আপনার দর্শন লাভের সৌভাগ্য আর হয়নি।’

‘আপনি বয়সে বড়, শিক্ষক তুল্য। এভাবে কথা বললে আমি বিব্রত বোধ করি জনাব।’ নরম কন্ঠে বলল আহমদ মুসা।

‘বয়স এবং পেটভরা নিস্ক্রিয় বিদ্যার কোন মূল্য আল্লাহর কাছে নেই জনাব আহমদ মুসা। মুজাহিদ হওয়া মুমিনের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। এই মুমিনরা আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী।’

‘কলম দিয়েও জিহাদ হয়, জ্ঞান বিতরণের মাধ্যমেও জিহাদ হয়। আপনি সে জিহাদ করছেন।’

‘যখন চারদিক থেকে মজলুমের কান্না ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়, তখন সেটা কলমের জিহাদ আর জ্ঞান বিতরণের জিহাদের সময় নয় জনাব।’

‘ঠিক, তবে সুযোগ একটা বড় শর্ত। সুযোগ এলে আমি মনে করি কলমের যুদ্ধ যারা করছেন, তারা কলম নিয়ে বসে থাকবেন না অবশ্যই।’

‘এটাই আমাদের সান্ত্বনা জনাব, কিন্তু ভয় হয় এই সান্ত্বনায় থেকে আমরা পরকালীন মুক্তি পাব কিনা। থাক, আপনি বলুন, আপনি স্পেনে কিভাবে, কবে এসেছেন? গোটা বিষয়টা আমার কাছে এখনও স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে।’

প্রশ্নের উত্তর দিল জোয়ান।

সে সংক্ষেপে আহমদ মুসার মাদ্রিদ বিমান বন্দরে নামার পর মারিয়ার ঘটনা থেকে শুরু করে যিঅদের মা ও স্ত্রীকে উদ্ধার পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করল।

শাইখুল ইসলাম ডঃ আবদুর রহমান আন্দালুসী মুর্তির মত বসে গোগ্রাসে গিলছিল কথাগুলো।

জোয়ানের কথঅ শেষ হওয়ার পরও কিছুক্ষন কথা বলল না শাইখুল ইসলাম। যেন কথাগুলো হজম করা এখনও তার শেষ হয়নি।

অবশেষে ধীরে ধীরে মুখ খুলল। বলল, ‘ইতিমধ্যেই এত কিছূ ঘটে গেছে! ইতিমধ্যেই দু’দুবার ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের বন্দীখানায় গেছেন তিনি?’

একটু থামল। গলাটা একটু পরিষ্কার করল শাইখুল ইসলাম। তারপর আবার শুরু করল, ‘জনাব আহমদ মুসা, দেখুন আপনি ক’দিন হলো এসেছেন, এর মধ্যেই পুরো সংঘাত শুরু হয়েছে শত্রুদের সাথে আপনার। কিন্তু আমি আজ দশ বছর এখানে, কেউ আমার গায়ে হাত দেয়নি। এর অর্থ কি? সত্যিই কি আমি পুরোপুরি ইসলামের উপর আছি?’

‘আপনার এই আবেগকে’, বলল আহমদ মুসা, ‘আমি শ্রদ্ধা করি জনাব। কিন্তু একটা জিনিস আপনাকে দেখতে হবে, আপনি যা করছেন সেই দায়িত্ব নিয়েই আপনি মাদ্রিদে এসেছেন আর আমি যে ধরনের কাজ নিয়ে এসেছি, সেই ধরনের কাজেই আমি জড়িয়ে পড়েছি।’

‘আমাকে এ দায়িত্ব দিয়েছে একজন মানুষ বা একটি সংস্থা। কিন্তু মুমিন হিসেবে আল্লাহর দেয়া কোন দায়িত্ব কি আমার উপর নেই?’

‘আছে।’ বলল আহমদ মুসা।, ‘কিন্তু সে দায়িত্ব বলে না খালি হাতে একা শত্রুর ব্যুহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে, বরং বলে শত্রুর উপর বিজয়ী হবার উপযুক্ত সুযোগ সৃষ্টি করতে।’

শাইখুল ইসলাম হাসল। বলল, ‘আপনার সাথে পারবো না আমি, আপনি আমার চেয়ে অনেক বেশী জানেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আপনাকে রহম করুন, আল্লাহ আপনাকে আরও বরকত দিন। এখন বলুন, আপনি কি কাজ নিয়ে স্পেনে এসছেন, যে কাজের কথা আপনি বললেন।’

‘জনাব সেটা বলার জন্যেই এসেছি।’ বলে আহমদ মুসা একটু থামল। তারপর যুগোশ্লাভিয়ায় পাওয়া ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের দলিলে তেজষ্ক্রিয়ের মাধ্যমে শাহ ফয়সল মসজিদ কমপ্লেক্সসহ স্পেনের সকল মুসলিম পূরাকৃর্তী ধ্বংস করার যে পরিকল্পনা রয়েছে তার বিবরণ দিয়ে আহমদ মুসা বলল, ‘আমি এখানে ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের হাতে বন্দী থাকা অবস্থায় তাদের সাথে কথায় নিশ্চিত হয়েছি, এ ষড়যন্ত্রের বাস্তবায়ন শুরু হয়ে গেছে।’

শুনতে শুনতে শাইখুল ইসলামের মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। কপাল কুঞ্চিত হলো, তার সজীব ঠোঁট শুকিয়ে উঠল।

‘অর্থাৎ তারা স্পেন থেকে মুসলমানদের সকল স্মৃতিচিহ্ন মুছে ফেলতে চায়।’ শুকনো কন্ঠে বলল শাইখুল ইসলাম।

‘জি হ্যাঁ, তাই। স্পেন থেকে সকল মুসলিম স্মৃতিচিহ্ন তারা মুছে ফেলতে চায়, সেই সাথে মুসলমানরো যেন স্পেনে আর কিছু না করতে এগিয়ে আসে, সে কথাও বলে দিতে চায়।’ বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা থামল। আর কেউ কিছু বলল না। সবাই নিরব।

‘ষড়যন্ত্রের বাস্তবায়ন’, উদ্বিগ্ন কন্ঠে বলতে শুরু করল শাইখুল ইসলাম, ‘যদি শুরু হয়ে থাকে, তাহলে এই শাহ ফয়সল মসজিদ কমপ্লেক্সসহ সবগুলো মুসলিম স্মৃতি সৌধে তেজষ্ক্রিয় বিকিরণের কাজ শুরু হেয় গেছে। আইম তো মনে করি মানুষও এখানে নিরাপদ নয়।’

'জি হ্যাঁ, আমি যে কথা বলিনি। এই তেজষ্ক্রিয়ের প্রভাবে সংশ্লিষ্ট এবং আশে-পাশের লোকদের বংশ-বৃদ্ধি লেআপ পেয়ে যাবে এবং কালক্রমে নিঃশ্চিহ্ন হয়ে যাবে মুসলিম কম্যুনিটি।'

বিস্ফোরিত হয়ে উঠল শাইখুল ইসলামের চোখ। বলল, 'এত গভীর, এত জঘন্য ষড়যন্ত্র?'

একটু থামল। ঢোক গিলল। তারপর আবার বলল, 'এখন এই অদৃশ্য শত্রুর মোকাবিলা কিভাবে সম্ভব?'

'এই পরামর্শের জন্যেই এসেছি জনাব। আমাদের জোয়ান পদার্থ বিজ্ঞানী। নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের উপরই তার গবেষণা। সে বলছে, এই বিশেষ ধরনের তেজষ্ক্রিয় ডিটেক্টরে ধরা পড়ে না। এই ডিটেকশনের জন্যে দরকার 'ম্যাটেরিয়াল এ্যানালঅইসিস'। কিন্তু স্পেনে এটা পারা যাবে না। মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ব্যবস্থা কিছু আছে, কিন্তু ওখান থেকে কোন সহযোগিতা নেয়া নিরাপদ নয়। তাই ঠিক করেছি জোয়ানকে ইটালীয় ট্রিয়েষ্টে ডঃ আবদুস সালামের প্রতিষ্ঠিত গবেষনাগারে পাঠাব। আমি ফিলিস্তিনের মাহমুদ কে বলে দিলে সে ট্রিয়েষ্টে যোগাযোগ করে সহযোগিতা পাওয়ার ব্যবস্থা করবে। আমরা গ্রানাডা, কর্ডোভা, মালাগা থেকে স্যাম্পল পেলেই জোয়ানকে ট্রিয়েষ্টে পাঠাতে পারি।'

থামল আহমদ মুসা।

'ডিটেকশন হওয়ার পর কি হবে?' জিজ্ঞাসা করল শাইখুল ইসলাম।

'তেজষ্ক্রিয়ের প্রকার-প্রকৃতি চিহ্নিত হবার পর এর প্রতিষেধক যোগাড় করতে হবে। এ ব্যাপারেও আমরা ট্রিয়েষ্টের সাহায্য পাব আশা করছি।'

'আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন। কোত্থেকে স্যাম্পল আপনারা নেবেন, নেবার ব্যবস্থা করুন।'

'ভিত্তি অংশ থেকে একটুকরো এবং বিল্ডিং এর উপরের অংশ থেকে এক টুকরো কংক্রিট হলেই চলবে। বলল আহমদ মুসা।

সংগে সংগে শাইখুল ইসলাম ইন্টারকমে একজনকে নির্দেশ দিল আশফাক আমিনকে পাঠাও, সেই সাথে বলল, নাস্তা রেডী কিনা। 'শুকরান' বলে

টেলিফোন রেখে দিল। 'আশফাক আমিন কমপ্লেক্সের সিকিউরিটি অফিসার। তাকে বলে দিচ্ছি, এখনি দুই খন্ড কংক্রিট যোগাড় করে দেবে।'

'ষড়যন্ত্রের বিষয়টা এবং আমাদের পরিচয় অন্য কাউকে এই মুহূর্তে আমরা জানতে দিতে চাই না জনাব।' বলল আহমদ মুসা

'এটাই ঠিক।'

ঘরে প্রবেশ করল সুঠাম দেহী এক যুবক।

'আশফাক এস, কেমন আছ তুমি?' স্নেহের স্বরে বলল শাইখুল ইসলাম।

'ভাল আছি স্যার।' বিনীত কন্ঠ আশফাকের।

'তোমাকে একটু কষ্ট করতে হবে আশফাক। আমাদের বিল্ডিং এর ভিতের অংশ এবং বিল্ডিং এর উপরের কোন জায়গা থেকে এক খন্ড করে কংক্রিটের টুকরো যোগাড় করে দিতে হবে। পারবে না?'

'পারব স্যার।'

'ঠিক আছে আমরা নাস্তায় যাচ্ছি, তুমি ইতিমধ্যে চেষ্টা কর।

'ঠিক আছে স্যার।' বলে আশফাক পা বাড়াল যাবার জন্যে।

'জনাব, আমি আশফাকের সাথে যেতে চাই।' বলে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

'কিন্তু নাস্তা..।'

'ওঁদের নিয়ে আপনি যান, আমি এসে নাস্তা করব।'

শাইখুল ইসলাম ভাবল, আহমদ মুসার মত লোক বিনা প্রয়োজনে, বিনা কারনে কিছু করে না। বলল আশফাককে উদ্দেশ্য করে, 'ইনি আমাদের অত্যন্ত সম্মানিত মেহমান, তুমি নিয়ে যাও সাথে। তোমাকে সাহায্য করবেন।'

আহমদ মুসা ও আশফাক শাইখুল ইসলামের ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

আগে চলছিল আশফাক, পেছনে আহমদ মুসা। আহমদ মুসা দেখল, যে পথ দিয়ে এ কক্ষে তারা এসেছিল সে কক্ষ দিয়েই তারা এগুচ্ছে।

সেই মুয়াজ্জিন সাহেবের দরজার সামনে দিয়ে এগুচ্ছিল আহমদ মুসারা। আহমদ মুসা দেখল, এবারও মুয়াজ্জিন সাহেব দরজায় দাঁড়িয়ে। দরজা বরাবর আসতেই মুয়াজ্জিন সাহেবই এবার সালাম দিল মনে হল, তাদেরই জন্যে সে

দরজায় অপেক্ষা করছিল। বিস্মিত হলো আহমদ মুসা, আহমদ মুসারা আসছে তা সে জানল কি করে!

দুই টুকরো কংক্রিট যোগাড় করে ফিরছিল আহমদ মুসা এবং আশফাক আমিন রিসেপশন রুমের সামনে দিয়ে।

রিসেপশনিস্ট কান থেকে টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে ছুটে এল আহমদ মুসার কাছে। বলল, একটা ফোন স্যার, আপনাদের, খুব জরুরী।

'টেলিফোন' আমাদের নামে এখানে! মনে মনে চমকে উঠল আহমদ মুসা তবু ছুটল টেলিফোন ধরার জন্যে।

'হ্যালো' রিসিভার তুলে নিয়ে বলল আহমদ মুসা।

'আমি জোয়ানের বন্ধু'।' ওপার থেকে ইংরেজী ভাষায় উত্তর এল। কন্ঠ শুনেই চিনতে পারলো জেনের গলা। বুঝতে পারল নাম গোপন রাখতে চাচ্ছে। আহমদ মুসাও বলল, আমিও জোয়ানের বন্ধু, তোমাকে চিনতে পেরেছি। জরুরী কিছু?

'খুবই জরুরী', ওখান থেকে আপনাদের কথা ওদেরকে কেউ জানিয়েছে, ওরা যাচ্ছে।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ বোন, চিন্তা করোনা। রাখি।' বলে টেলিফোন রেখে দিয়ে বেরিয়ে এল আহমদ মুসা। তার মুখ গম্ভীর, চিন্তা করছে। এখান থেকে আমাদের কথা কে ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানকে জানাল! এই কথা শোনার সময় থেকেই বার বার তার সামনে ভেসে উঠছে ঐ মুয়াজ্জিনের মুখ।

'কোন খারাপ খবর স্যার?' বলল আশফাক আমিন।

আহমদ মুসা হেসে আশফাকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি যদি তোমাকে একটা হুকুম দেই পালন করবে?'

'জি স্যার।'

'চল, বলে আগে চলল আহমদ মুসা। পেছনে আশফাক।

সেই মুয়াজ্জিনের ঘরের সামনে দাঁড়াল আহমদ মুসা। আশফাকও তার পাশে এসে দাঁড়াল। 'মুয়াজ্জিন সাহেব কি এখনো ঘরে?' আশফাকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'দেখতে হবে।' বলে আশফাক দরজায় নক করতে গেল।

আহমদ মুসা হাত তুলে তাকে নিষেধ করে বলল, 'কি করতে হবে আগে শুন।'

'কি করতে হবে, বলুন।'

'মুয়াজ্জিন সাহেবের ঘর সার্চ করতে হবে।'

'সার্চ করতে হবে, কেন?' চোখ কপালে তুলে প্রশ্ন করল আশফাক।

এই সময় নাস্তা সেরে ফিরছিল শাইখুল ইসলাম এবং যিয়াদরা।

আশফাক ছুটে গেল শায়খুল ইসলামের কাছে। তাকে জানাল আহমদ মুসার কথা। শুনে শায়খুল ইসলামের চোখও বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে উঠল। ইশারায় ডাকল আহমদ মুসাকে। আহমদ মুসা গেল।

'কিছু ঘটেছে?' জিজ্ঞাসা করল শাইখুল ইসলাম আহমদ মুসাকে।

'ঘটেছে। বলব। মুয়াজ্জিন সাহেবের ঘরে কোন টেলিফোন আছে?'

'না, নেই।' বলল শাইখুল ইসলাম।

'রিসেপশান ছাড়া নিচের তলায় আর কোথায় টেলিফোন আছে?'

'আমার পি, এস, এর রুমে আছে এবং আমার রুমে আছে।'

'আমার মনে হয়, মুয়াজ্জিন সাহেবের রুমে ওয়্যারলেস সেট আছে।' এখনই সার্চ হওয়া দরকার।'

মুহুর্ত কয়েক আহমদ মুসার দিকে বিস্ময়ের সাথে চেয়ে থেকে আশফাককে বলল, 'যাও উনি যা বলেছেন তা কর।'

আশফাক মুয়াজ্জিনের ঘরের দিকে চলে গেল।

সবাই ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকল। ওখান থেকে মুয়াজ্জিন সাহেবের ঘরের দরজা দেখা যায়।

আশফাক মুয়াজ্জিনের ঘরে ঢুকার কয়েক মুহূর্ত পরেই কথা কাটাকাটির শব্দ পাওয়া গেল। তার পরেই দেখা গেল আশফাককে হাত উপরে তুলে পিছু হটে বাইরে আসতে। মুয়াজ্জিনের হাতে পিস্তল, উদ্যত আশফাকের বুক বরাবর।

মুয়াজ্জিন সাহেব বাইরে বেরিয়েই দেখতে পেল শায়খুল ইসলাম এবং আহমদ মুসাদের। দেখতে পেয়েই ডান হাতের পিস্তলটা আশফাকের দিকে উদ্যত রেখেই বাম হাতটা সে চোখের পলকে পকেটে ঢুকাল।

আহমদ মুসা বুঝতে পারল, মুয়াজ্জিন নিশ্চয় দ্বিতীয় রিভলবার বের করতে যাচ্ছে, অথবা গ্রেনেড, নয়তো আরও বড় কিছু।

আহমদ মুসা আগেই রিভলবার বের করে নিয়েছিল। রিভলবার মুয়াজ্জিনের দিকে তুলে ধরে বলল, পকেট থেকে হাত বের করবেন না। মাথাগুড়ো হয়ে ...

আহমদ মুসার কথা শেষ হবার আগেই মুয়াজ্জিনের পিস্তল আশফাকের দিক থেকে বিদ্যুৎ গতিতে ঘুরে এল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসাও তার কথা মুখে রেখেই রিভলবারের ট্রিগারে রাখা আঙুলে চাপ দিল। ছুটে যাওয়া গুলি গিয়ে মুয়াজ্জিনের ডান হাতটা বিদ্ধ করল, তার বিধ্বস্ত হাত থেকে পিস্তল খসে পড়ল। কিন্তু তার বাম হাত তবু পকেট থেকে বেরোলই। আশফাক তার উপর ঝাপিয়ে পড়েছিল। কিন্তু মুয়াজ্জিন অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সাথে পাশে দু'ধাপ সরে দাঁড়াতে দাঁড়াতেই বাম হাতটি উপরে তুলল। তার হাতে গ্রেনেড। কিন্তু হাত নিচে নেমে আসার আগেই আহমদ মুসার দ্বিতীয় গুলি তার বাম বাহু ভেদ করল। গ্রেনেডটি তার হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল। কিন্তু বিস্ফোরিত হল না। সম্ভবতঃ পিন তখনও খোলা হয়নি।

মুয়াজ্জিন বসে পড়েছে।

বসে পড়েই সে তার বাম বাজুতে কাপড়ে ঢাকা কি একটা কামড়ে ধরেছে।

আঁতকে উঠল আহমদ মুসা। ছুটে গেল তার কাছে, কিন্তু ততক্ষনে ঢলে পড়েছে মুয়াজ্জিনের দেহ।'

আহমদ মুসা দেখল, প্রান নেই মুয়াজ্জিন সাহেবের দেহে। বাম বাহুর যে জিনিসটি সে কামড়ে ধরেছিল, সেটা পরীক্ষা করে দেখল, সায়নাইড ক্যাপসুল।

শায়খুল ইসলাম এবং অন্যান্যরাও এসে দাঁড়িয়েছিল আহমদ মুসার পেছনে।

‘ধরা পড়তে না হয় এ জন্যে পটাসিয়াম সাইনাইডের ব্যবস্থাও রেখেছিল? তাহলে সে ‘সুইসাইড স্কোয়াডের’ লোক!’ বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে বলল শায়খুল ইসলাম। একটা আতংক এসে তার মুখ ছেয়ে ফেলেছে।

‘জি জনাব, এ নিশ্চিতভাবেই ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্লানের সুইসাড স্কোয়াডের এজেন্ট।’ উঠে দাঁড়িয়ে বলল আহমদ মুসা।

শায়খুল ইসলাম কিছুই বলল না। তাকিয়ে রইল আহমদ মুসার দিকে চোখে রাজ্যের আতংক ও উদ্বেগ নিয়ে।

‘আসুন জনাব মুয়াজ্জিন সাহেবের ঘরে আরও কিছু পাওয়া যাবে, বলে আহমদ মুসা পা বাড়াল মুয়াজ্জিন সাহেবের ঘরের দিকে।

পেছনে পেছনে শায়খুল ইসলাম সহ সবাই।

ঘরে বালিশের তলায় পাওয়া গেল ক্ষুদ্র অয়্যারলেস সেট। দেখেই বুঝল আহমদ মুসা, অয়্যারলেস সেট ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু পাওয়ারফুল। হাতে নিয়ে সেটটির এ্যান্টেনা টেনে লম্বা করে বলল , শাইখুল ইসলাম এই ওয়্যারলেসটির মাধ্যমেই সে আমাদের আগমনের খবর বাইরে পাঠিয়েছে।’

মুয়াজ্জিন সাহেবের খাটিয়ার নিচে পাওয়া গেল একটি রেডিও রেকর্ডার। রেকর্ডার টি বিশেষ ধরনের। ২৪ ঘন্টা রেকর্ডার চললেও ভেতরের একটা ক্যাসেটই তা কভার করতে পারে।

আহমদ মুসা রেকর্ডার হাতে নিয়ে বিস্মিত হলো, রেকর্ডারটি তখনও চলছে।

‘কি রেকর্ড করছে রেকর্ডার?’ নিজের মনকে নিজেই প্রশ্ন করল আহমদ মুসা।

‘রেকর্ডার চলছে, কিছু রেকর্ড করছে জনাব।’ শাইখুল ইসলামের দিকে কথা কয়টি বলে আহমদ মুসা রেকর্ডারটির ‘রিভার্স’ বোতামটি টিপে দিল। কিছুদূর ব্যাকে নিয়ে প্লেয়ার স্টার্ট দিল আহমদ মুসা।

কিছুটা ফাঁকা, তারপরই শুরু হলো কথা। প্রথমেই কন্ঠস্বর শাইখুল ইসলামের। তিনি বলছেন, ‘আগে পরিচয়টা হয়ে যাওয়া দরকার, যিয়াদকে?’ তারপর সবাইকে অবাক করে দিয়ে বলতে লাগল শাইখুল ইসলাম ও আহমদ

মুসাদের মধ্যেকার কথোপকথনের রেকর্ড। মাঝখানে প্লেয়ার বন্ধ করে দিয়ে আহমদ মুসা বলল, ‘চলুন আপনার টেবিলে কোথাও রেডিও ট্রান্সমিটার পাতা আছে।’

শাইখুল ইসলামের টেবিলে পরীক্ষা করে দেখা গেল টেবিলের পেন স্ট্যান্ডের পেন হোল্ডারের মেটালিক বোর্ডটাই একটি রেডিও ট্রান্সমিটার। আহমদ মুসা কলম স্ট্যান্ডটি ভেঙে ট্রান্সমিটারটি বের করে আনল। বলল, এই ট্রান্সমিটারের সাহায্যে শাইখুল ইসলামের অফিসের যাবতীয় কথা মুয়াজ্জিন রুপী ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের এজেন্টটি রেকর্ড করতো এবং প্রয়োজনীয় সব তথ্য সে পাঠিয়ে দিত ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের কাছে। আজকে আমাদের পরিচয়টা সে ওদের কাছে পাঠিয়েছে, জানিনা আমাদের সব কথা সে পাঠিয়েছে কিনা।

হতবুদ্ধি ও বিহ্বল হয়ে পড়েছিল শাইখুল ইসলাম। তার ভাবনা, এত বড় শত্রুকে পাশে নিয়ে সে চলেছে। তার সব কথা শত্রুরা জেনে ফেলেছে। এই মুয়াজ্জিন স্পেনের মিসরীয় দুতাবাসে আরবী অনুবাদকের কাজ করত তার আরবী জ্ঞান, কেরায়াত দেখে এবং মিসরীয় দুতাবাসের সুপারিশে তাকে মুয়াজ্জিন পদে নিয়োগ দেয়া হয়। শাইখুল ইসলামের মন বেদনায় ভরে গেল, কমপ্লেক্সের এতগুলো লোক এত দিনেও তার ষড়যন্ত্রের কিছুই ধরতে পারেনি, সামান্য সন্দেহও কারও মনে জাগেনি। সেই সাথে শ্রদ্ধায় নুয়ে গেল তার মন, আহমদ মুসা কমপ্লেক্সে পা দেবার সংগে সংগেই সে ধরা পড়ে গেল। মুখ একটু উপরে তুলে বলল শাইখুল ইসলাম আহমদ মুসার দিকে চেয়ে, আল্লাহর হাজার শুকরিয়া, আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবি করুন। আল্লাহ আপনাকে বিস্ময়কর চোখ আর বিস্ময়কর বুদ্ধি দিয়েছেন। যাকে আমরা এক দশকেও ধরতে পারিনি, তাকে আপনি একবার দেখেই ধরে ফেললেন!’ বলবেন কি দয়া করে, কি দেখে আপনার সন্দেহ হয়েছিল?’

‘এখানে আসার পর ওর সাথে দু’বার ওর সাথে দেখা হয়েছে। দরজায় দাঁড়িয়ে আমাদের জন্য ওর অপেক্ষা করা এবং তার দৃষ্টিকে আমার কাছে স্বাভাবিক মনে হয়নি। তার সম্পর্কে মনে একটা সন্দেহর সৃষ্টি হয়েছিল। তার উপর আশফাকের সাথে ফেরার পথে রিসিপশনে জোয়ানের সহপাঠি জেনের কাছ

থেকে টেলিফোন পেলাম যে, ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান আমাদের এখানে আসার খবর জানতে পেরেছে এবং এখানে ওরা আসছে, তখন আমি নিশ্চিত হলাম, ঐ মুয়াজ্জিনই খবর দিয়েছে ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানকে।

'ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান কি কমপ্লেক্সে আসছে ?' মুখ কালো করে জিজ্ঞাসা করল শাইখুল ইসলাম।

'আমি নিশ্চিত ওরা আসছে।'

'পুলিশকে কি খবর দেব ?' উদ্বিগ্ন কন্ঠে বলল শাইখুল ইসলাম।

'জানিনা, পুলিশ কি আপনাকে সাহায্য করবে, না ওদের সাহায্য করবে ? তাছাড়া মুয়াজ্জিন আহত হওয়া, মারা যাওয়ার কি ব্যাখ্যা দেবেন পুলিশকে। ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান এই ঘটনা থেকে ফায়দা উঠানোর সুযোগ গ্রহন করবে।' বলল আহমদ মুসা।

'তাহলে ?' অসহায় কন্ঠ শাইখুল ইসলামের।

'কমপ্লেক্সের ভিতরে কিছু ঘটুক আমরা চাইনা জনাব, আমরা চলে যাচ্ছি।'

একটু ম্লান হাসল শাইখুল ইসলাম। বলল, জনাব, আমি কমপ্লেক্স নিয়ে ভাবছি না, আপনাদের নিরাপত্তাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় এখন।'

একটু থামল শাইখুল ইসলাম। আবার বলল, 'আপনারা চলে যাবেন কেমন করে, ওরা নিশ্চয় এতক্ষণে বে্রুবার পথ বন্ধ করে দিয়েছে।'

'পথে পা দিলেই একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে, আল্লাহর সাহায্য আসবে।'

'একটা পথ আছে, মুখ উজ্জল করে বলল শাইখুল ইসলাম, 'আমাদের পশ্চিম প্রচীরের মার্কেট ম্যানেজমেন্ট বিভাগের যে ষ্টোর আছে, তার সাথের প্রাচীরের ওপারের মার্কেট অফিসের যোগাযোগের জন্যে প্রচীরে একটা দরজা আছে। বাইরের থেকে সে দরজা দেখা যায় না। ঐ পথ দিয়ে গেলে কাকপক্ষিও টের পাবে না।'

আহমদ মুসার মুখ উজ্জল হয়ে উঠল। বলল, 'ঠিক আছে, যিয়াদ, জোয়ন এবং রবার্তো তোমরা ঐ পথে চলে যাও।'

'আপনি ?' বলল জোয়ান।

‘আমাকে সদর দরজা দিয়েই বের হতে হবে ?’

‘কেন ?’ বলল শাইখুল ইসলাম।

‘আমি ওদের টার্গেট, আমাকে বের হতে না দেখলে ওরা ভেতরে ঢুকে আমাকে খোঁজার জন্যে গোটা কমপ্লেক্স তছনছ করবে এবং আমার সাথে কমপ্লেক্স কর্তৃপক্ষের যোগসাজস আছে বলে ধরে নেবে। এতে কমপ্লেক্সের ক্ষতি হবে।’

‘তাহলে আমরা সবাই একসাথে সদর গেট দিয়ে বেরোব।, বলল যিয়াদ।

‘যখন পথ আছে, তখন সবাই এক সাথে বিপদগ্রস্থ হয়ে লাভ নেই। তাছড়া এখানে কারা আমার সাথী, এটা আমি তাদের জানতে দিতে চাই না। কাজের এতে সুবিধা হবে।’

‘আপনার যুক্তি ঠিক, ’ বলল শাইখুল ইসলাম, ‘কিন্তু শত্রুর শক্তি সম্পর্কে না জেনে একা তাদের মুখোমুখি হওয়া কি ঠিক হবে ?’

‘বেশী পরিমাণ লোক দেখলে ওরা বেশী পরিমাণ সতর্ক ও আক্রমনাত্নক হবে। আর একা একজনকে দেখলে ওদের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই একটা ‘অতি আত্নবিশ্বাসের’ ভাব সৃষ্টি হবে যা আমাকে সাহায্য করবে।’

বলে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা। শাইখুল ইসলামকে লক্ষ করে বলল, ‘জনাব ওদের যাবার ব্যবস্থা করুন। আমি এখুনি এখান থেকে বেরুতে চাই।’

শাইখুল ইসলাম সহ যিয়াদ, জোয়ান, রবার্তো সবাই উঠে দাঁড়াল। যিয়াদ, জোয়ান, রবার্তোর মুখ ভার। বুঝাই যাচ্ছে, আহমদ মুসার সিদ্ধান্তে ওরা সন্তুষ্ট হয়নি।

আহমদ মুসা তার দু’হাত যিয়াদ ও জোয়ানের কাঁধে রেখে বলল ‘তোমরা মন খারাপ করো না। আমার কথা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝেছ। আর চিন্তার কিছু নেই। ওরা জানে যে, ওদের ওঁৎ পেতে থাকার ব্যাপারটা আমরা জানি না, সুতরাং অপ্রস্তুত অবস্থায় ফাঁদে পা দেব কিন্তু আমি অপ্রস্তুত অবস্থায় যাচ্ছি না। অতএব ঘটনার নিয়ন্ত্রণটা আমার হাতে থাকবে।

শাইখুল ইসলাম আনন্দ বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে ছিল আহমদ মুসার দিকে। তার মনে বিস্ময়, প্রতিটি বিষয়ের দিকে আহমদ মুসার এত সূক্ষ্ণ দৃষ্টি। সাথীদের

প্রতি তার এত দরদ এবং তাদের নিরাপত্তা্র প্রতি তাঁর এত সতর্কতা। পরিস্থিতির এমন চুলচেরা বিশ্লেষণ সে করে।

আহমদ মুসার কথা শেষ হলে শাইখুল ইসলাম বলল, 'আল্লাহ আপনার সহায় হোন। এঁদের আমি নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আপনি বলুন, 'আপনার সাথে আবার কবে দেখা হবে কিংবা কিভাবে যোগাযোগ হবে। আমাদেরকে চরম উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাতে হবে।'

'সমানভাবে আমরাও উদ্বিগ্ন জনাব, আমরাই যোগাযোগ করব।'

বলে আহমদ মুসা সালাম দিয়ে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াল। কিন্তু ঘুরে দাঁড়িয়েই আবার ফিরল সে। শাইখুল ইসলামের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের লোকেরা অবশ্যই আসবে, আপনাদের বিরক্ত করতে চাইবে। তাদের বলে দেবেন, আমরা এসেছিলাম, চলে গেছি, আমাদের কোন খোঁজ আপনারা জানেন না। বহু পর্যটক এমন আসে। তাদের খোঁজ রাখা আপনাদের দায়িত্ব নয়। আর ওরা ঐ মুয়াজ্জিনের খোঁজ অবশ্যই করবে। আপনি ওদের বলে দেবেন, আমি মুয়াজ্জিন সাহেবের সাথে একান্তে কি বলেছি, তারপর থেকে মুয়াজ্জিন সাহেব আর নেই। বলবেন, আমার সাথের লোকেরা দেয়াল টপকে পালিয়েছে, তারাই সম্ভবতঃ মুয়াজ্জিন সাহেবকে সাথে নিয়ে গেছে। ওরা বেশী ঝামেলা করলে, পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ে বিষয়টা জানাবেন। আপনাদের নিরাপত্তা দেবার দায়িত্ব সরকারের।'

শাইখুল ইসলামের মুখ উজ্জল হয়ে উঠল। মনে হয় নিরাপত্তার এদিকটার কথা এতক্ষণে মাথায় আসেনি।

আহমদ মুসা আবার সালাম দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

শাইখুল ইসলাম আশফাক আমিনকে বলল, 'তুমি ওঁর সাথে অন্ততঃ গেট পর্যন্ত যাও। কিছুর প্রয়োজন হলে তুমি দেখ।'

আহমদ মুসা বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তার সাথে আশফাক আমিনও।

সাথে চলতে চলতে আশফাক আমিন বলল, 'জনাব জীবনে কখনও কোন বড় কাজ করিনি, আমি কি আপনার সাথী হতে পারি না?

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'তোমার কাঁধে যে দায়িত্ব সেটা তো ছোট কোন কাজের দায়িত্ব নয়।' তারপর একটু থেমে গম্ভীর কন্ঠে বলল, 'ওদের সাথে যত কম লোককে জড়িয়ে পারা যায়, যত কম লোককে ওদের সামনে হাজির করা যায়, ততই মংগল। এ ছাড়া তোমাকে সাথে নেয়ার ক্ষেত্রে আর কোন আপত্তি নেই।'

আশফাক আমিনের মুখ ম্লান হলো। তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় সে ক্ষুণ্ন হয়েছে বুঝা গেল।

আহমদ মুসা আশফাক আমিনের পিঠ চাপড়ে বলল, 'দেখ আমার মত তোমরা বিদেশী নও। তোমাদেরকে স্পেনে থাকতে হবে সুতরাং অপরিহার্য কোন প্রয়োজন ছাড়া ওদের কাছে চিহ্নিত হওয়া বোকামী বুঝলে। এই বোকামী আমি এড়াতে চাই।'

আশফাক আমিনের মুখ এবার উজ্জল হয়ে উঠল। বলল, 'বুঝেছি জনাব। কিন্তু আপনি এতটা সামনে দেখে সিদ্ধান্ত নেন।'

গাড়িতে ওঠার আগে আশফাক আমিনের সাথে হ্যান্ডশেক করল আহমদ মুসা। আশফাক আমিনের মুখ শুকনো। সে আহমদ মুসার হাত না ছেড়ে বলল 'জনাব এভাবে ভয়ংকর এবং শক্তিশালী শত্রুর মুখোমুখি হতে আপনার ভয় করে না?'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'মৃত্যুর সেই সময় না এলে কেউ কাউকে বাঁচাতে পারে না, আর মৃত্যুর সময় না এলে কেউ কাউকে মারতে পারে বলে কি তুমি মনে কর?'

'না, জনাব।'

'তাহলে আর ভয় কিসের?'

বলে, আহমদ মুসা গাড়িতে উঠে গাড়ি স্টার্ট দিল।

আহমদ মুসার গাড়ি গেটের কাছে পৌঁছতেই গেট খুলে গেল।

খোলা গেট পেরিয়ে আহমদ মুসার গাড়ি একবার লাফিয়ে উঠে তীব্র বেগে চলতে শুরু করল।

আহমদ মুসা হিসাব আগেই কষেছিল। গেট থেকে সেক্রেটারিয়েট এভ্যুনুর দূরত্ব প্রায় দু'শ গজ। সবটা বিচার-বিবেচনা করে আহমদ মুসা নিশ্চিত হয়েছে, ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান এই দু'শ গজকেই তাদের অভিযানের জায়গা হিসাবে বেছে নিবে। তাদের ফাঁদটা কেমন হবে, সে কথাও ভেবেছে আহমদ মুসা। সে লা-গ্রীনজা থেকে মাদ্রিদে ফেরার পথে তাকে যেভাবে বন্দী করা হয়েছিল, আহমদ মুসার তা মনে পড়েছিল। সেই কৌশল ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান এবারও গ্রহন করতে পারে বলে আহমদ মুসার মনে হয়েছে। গেট পেরিয়ে আহমদ মুসার গাড়ি যখন নিশ্চিন্তে সেক্রেটারিয়েট এভ্যুনুর দিকে এগুবে, তখন হঠাৎ তারা চারদিক থেকে আহমদ মুসাকে ঘিরে ফেলবে।

আহমদ মুসার গাড়ি এগুচ্ছিল ঝড়ের বেগে।

সেক্রেটারিয়েট এভ্যুনুতে পৌঁছার দুই-তৃতীয়াংশ পথ যখন এগিয়েছে, তখন আহমদ মুসা দেখতে পেল তার ডান, বাম ও সামনের দিক থেকে তিনটে গাড়ি তার দিকে ছুটে আসছে। ডান ও বাম দিকের গাড়ি দু'টো একটু পিছিয়ে পড়ার কারণে ওগুলো পেছন থেকে কোনাকুনি তার দিকে এগিয়ে আসছে। সম্ভবতঃ আহমদ মুসা এমন দ্রুত এগিয়ে আসার কারণেই তারা পিছিয়ে পড়েছে। আহমদ মুসার গাড়ি এমন পাগলা গতিতে তীব্র বেগে ছুটবে গেট থেকে বের হয়েই তা তারা ভাবতে পারেনি।

আহমদ মুসা বাম হাতে স্টিয়ারিং হুইল ধরে ডান হাত দিয়ে পকেট থেকে পিং পং বলের মত দু'টা বস্তু বের করে ছুড়ে মারল তার গাড়ির পাশেই।

তারপর টেনিস বলের মত আরেকটা গোলাকার বস্তু পকেট থেকে বের করে একবার পেছনে তাকাল। দেখল. পেছনে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ঘন কালো ধোয়ার দেয়াল পেছনে অমাবস্যার রাত ডেকে এনেছে।

আহমদ মুসা সামনে তাকিয়ে দেখল গজ বিশেক দূরে সামনের গাড়িটি দাঁড়িয়ে পড়েছে। আহমদ মুসা গাড়ির গতি বিন্দুমাত্র না কমিয়ে, আরও কয়েক গজ এগিয়ে ডান হাতের টেনিস সাইজের বলটা সামনের মাইক্রোবাসটার লক্ষ্যে ছুঁড়ে মেরেই বাম হাতে স্টিয়ারিং ঘুড়িয়ে গাড়ি রাস্তা থেকে ডান' দিকে নামিয়ে নিল এবং উঁচু-নিচু মাটির উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে তীব্র বেগে সামনে এগিয়ে

চলল। পাশ দিয়ে মাইক্রোবাসটি যখন অতিক্রম করছিল, দেখল বিশেষ ধরনের পাওয়ারফুল গ্রেনেডের বিস্ফোরণ মাইক্রোবাসটিকে টুকরো টুকরো করে চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিয়েছে। শিউরে উঠল আহমদ মুসা। এই গ্রেনেডটাই মুয়াজ্জিন সাহেব ছুড়তে যাচ্ছিল শাইখুল ইসলাম ও আহমদ মুসাদের লক্ষ্য করে। তার ইচ্ছা পূরণ হলে শুধু তারাই নয়, আশে-পাশের ঘরগুলোও উড়ে যেত।

আহমদ মুসার গাড়ি এসে সেক্রেটারিয়েট এভ্যুনুতে উঠল। আহমদ মুসা চোখ ফিরিয়ে দেখল, স্মোক বোম্বের কাল ধোয়া গাড়ি বিস্ফোরণের জায়গা পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। গোটা এলাকাটাই কাল অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। মসজিদ কমপ্লেক্সের গেট পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না।

আহমদ মুসার গাড়ি সেক্রেটারিয়েট এভ্যুনু ধরে চলতে লাগল উত্তরে। তার লক্ষ্য সারিয়ার ভাই ফিডেল ফিলিপের বাড়ি।

আহমদ মুসারা মাদ্রিদে এসে এবার উঠেছিল রাবার্তোর ছোট বাড়িটাতে। কিন্তু জায়গাটা নিরাপদ মনে না করায় তারা গিয়ে ওঠে জোয়ানের বাড়িতে। ইচ্ছা করেই তারা গিয়ে ওঠে জোয়ানের বাড়িতে। ইচ্ছা করেই তারা এবার হোটেলে ওঠেনি। প্রত্যেক আবাসিক হোটেলেই ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান এবং সরকারের লোকরা ঘুর ঘুর করে। পরে ফিডেল ফিলিপ জানতে পেরে আহমদ মুসাকে তার বাড়িতে নিয়ে এসেছে। বাড়িটা বড় নিরাপদ। তার উপর টেলিফোন থাকায় আহমদ মুসা খুব আপত্তি না করেই চলে এসেছে। কিন্তু জোয়ান যিয়াদকে আসতে দেয়নি। কিন্তু তারা চারজন তিন জায়গায় থাকলেও প্রতিদিন সকালে ফিডেল ফিলিপের বাসায় এসে তারা সকলে নাস্তা করে। তারপর শলা-পরামর্শ্ করে দিনের কাজ ঠিক করে।

কিছুদূর এগোনোর পর আহমদ মুসা পেছন ফিরে দেখল কেউ অনুসরণ করছে কিনা। না, পেছনে কোন গাড়ি নেই নিশ্চিত হলো আহমদ মুসা। ভাবল, গাড়ি দু’টা নিশ্চয় বিস্ফোরিত গাড়িটা নিয়ে ব্যস্ত। কয়জন লোক ছিল গাড়িটাতে? নিশ্চয় কেউ বেঁচে নেই। ভাবতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল আহমদ মুসার। ষড়যন্ত্রকারীদের জিঘাংসা আগুনে পুড়ে কত লোক এইভাবে শেষ হয়ে যাচ্ছে। সামনে প্রসারিত চোখ দু’টি আহমদ মুসার বেদনায় ভারি হয়ে উঠল।

গাড়িটি তখন সেক্রেটারিয়েট এভ্যুনু পেছনে ফেলে ফিলিপ স্কোয়ার ধরে ছুটে চলছিল।

# ৩

ইটালীর ক্ষুদ্র নগরী ট্রিয়েষ্টে পৌঁছে নোবেল পুরষ্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী ডঃ আবদুস সালামের পৃথিবী খ্যাত বিজ্ঞান গবেষণাগার 'ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স' খুঁজে পেতে কষ্ট হলো না জোয়ানের। গবেষণাগারটি দাঁড়িয়ে আছে আড্রিয়াটিক সাগরের শান্ত কূলে। দক্ষিণ মুখী গবেষণাগারটির সর্ব্ দক্ষিনে বহিঃপ্রাচীর ঘেষে দাঁড়ানো ছোট্ট মসজিদটির জায়গায় দাঁড়ালে চোখে পড়ে দিগন্ত বিস্তৃত আড্রিয়াটিকের অবারিত বুক।

ট্রিয়েষ্ট শহরটাই অদ্ভুত সুন্দর লেগেছে জোয়ানের। যুগোশ্লাভ সীমান্তের গা ঘেষে দাঁড়ানো ট্রিয়েষ্টের তিন পাশই সাগরে ঘেরা। আড্রিয়াটিকের নীল জ্বলে ভাসমান ট্রিয়েস্টের তিন পাশই সাগরে ঘেরা। আড্রিয়াটিকের নীল জ্বলে ভাসমান ট্রিয়েষ্ট যেন একটা সফেদ রাজ হংস। জোয়ান ভাবল, বিজ্ঞানী আবদুস সালাম শুধু জটিল পদার্থ্ বিজ্ঞান নিয়েই চর্চা করতেন না, তিনি মনে মনে কবিও ছিলেন। না হলে ইটালির সব বাদ দিয়ে প্রায় যুগোশ্লাভ সীমান্তে এসে সাগর-বাসী ট্রিয়েষ্টকে তিনি বাছাই করলেন কেন।

জোয়ান 'ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স' এর মসজিদের ছায়ায় দাঁড়িয়েছিল। দুনিয়ার একটি শ্রেষ্ঠ পদার্থ্ বিজ্ঞান গবেষণাগারের সাথে মসজিদ দেখে জোয়ান বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিল। জোয়ান এর আগে ট্রিয়েষ্টে আসেনি, ইউরোপের অন্যান্য জগৎবিখ্যাত বিজ্ঞান-গবেষনাগারে ঘুরে বেড়িয়েছে, কিন্তু কোথাও গীর্জা দেখেনি, মসজিদ দেখেনি। কিন্তু ধীরে ধীরে তার বিস্ময় কেটে গেছে। তাঁর মনে হয়েছে, নোবেল পুরষ্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী ডঃ আবদুস সালাম শুধু তো দুনিয়ার একজন শীর্ষ্ বিজ্ঞানী নন, তিনি মুসলমানও। এবং নামে মাত্র মুসলমান তিনি নন। তিনি ইসলামের বিধান সমূহ নিষ্ঠার সাথে পালন করেন এবং ভালোবাসেন তিনি ইসলামকে, মুসলমানদের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে। তিনি চান ইসলাম ও মুসলামদের গৌরবময়

যুগ আবার ফিরে আসুক। পশ্চিমের বিজ্ঞানের যে দান, সে দান মুসলামনরা ভিক্ষুকের মত হাত পেতে গ্রহণ করায় বিজ্ঞানী আবদুস সালাম দারুণভাবে বেদনা বোধ করেন, অপমান বোধ করেন। জোয়ানের মনে পড়ল ডঃ আবদুস সালামের একটা বিখ্যাত বক্তৃতার কথা সে বক্তৃতার উপসংহারে বিজ্ঞানী আবদুস সালাম বলেছেন-

'জ্ঞান সৃষ্টির এই অভিযানে আমাদের অংশ গ্রহণ করা সম্বন্ধে আমি যে এই আবেগ পূর্ণভাবে সুপারিশ করছি তার কারণ কি? এটা কেবল এ জন্য নয় যে, জানবার আগ্রহ দিয়ে আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন, এটা এ জন্যও নয় যে আজকের অবস্থায় জ্ঞানই শক্তি এবং প্রয়োগিক বিজ্ঞানে তা বস্তুগত উন্নতির প্রধান অস্ত্র; বরং এটা এজন্যে যে, আন্তর্জাতিক সমাজের সদস্য হিসাবে যারা জ্ঞান সৃষ্টি করেন তারা আমাদের জন্যে- অব্যক্ত কিন্তু তবু অস্তিত্বশীল- যে ঘৃণার চাবুক রেখে দেন তা আমি অনুভব করি।

আমার এখনো মনে আছে কয়েক বছর আগে কোনো ইউরোপীয় দেশের পদার্থ্ বিজ্ঞানে নোবেল পুরষ্কার বিজয়ী একজন বিজ্ঞানী আমাকে বলেছিলেন, 'সালাম, আপনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে, ঐ সব জাতিকে রক্ষা করা, সাহায্য করা এবং বাঁচিয়ে রাখা আমাদের কর্তব্য, সে দেশ যারা মানুষের জ্ঞান ভান্ডারে বিন্দুমাত্র কিছু সৃষ্টি করেনি বা দেয়নি?' এবং যদিও সে বিজ্ঞানী এ কথা বলেননি তবু যখনই আমি কোন হাসপাতালে প্রবেশ করি তখনই আমার আত্মমর্যাদা বিরাটভাবে আঘাত প্রাপ্ত হয়। এটা দেখে যে, আজকের প্রায় প্রতিটি শক্তিশালী জীবনরক্ষাকারী ওষুধ সৃষ্টি হয়েছে তৃতীয় বিশ্বের অথবা আরব দেশের অথবা ইসলামী দেশের আমাদের কারো কোন অবদান ছাড়াই।.................. আমরা সংখ্যায় কম, পৃথকভাবে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। কিন্তু, আমরা সকলে উম্মত উল ইলমে একত্রিত হলে তা আর হবে না। চুড়ান্ত বিচারে এ ধরণের একটি সত্যিকারের ইসলামী কমনওয়েলথ তৈরি করা এবং সেখানে বিজ্ঞানের পূনর্জাগরণ সম্ভব করা আমাদের উপরেই নির্ভর করে। আমি আপনাদের কাছে জামাল আব্দুন নাসের যা বলেছিলেন তার পূনরাবৃত্তি করছি, 'অহংকারের সঙ্গে এবং আত্ম-মর্যাদার সঙ্গে উঠে দাঁড়ান। ১৯৪৬ সালে কেম্ব্রিজে আমি যখন এক

ছাত্র হিসেবে যোগ দিয়েছিলাম, তখন আমার সমসাময়িক বৃটিশ ছাত্রদের চেয়ে আমার বয়স বেশী ছিল, তাদের চেয়ে আমি বেশী বিজ্ঞান জানতাম। কিন্তু, নিউটন, ম্যাক্সওয়েল, ডারউইন, ডিরাকের জাতির অংশ হওয়ায় তাদের এক ধরণের অহংকার ছিল। আপনারা মনে করুন যে আপনাদের অতীতে ইবনে হাইথাম, ইবনে সীনার মত কতো মানুষ ছিল। .................. আপনারা যৌথ ইসলামী বিজ্ঞান কমনওয়েলথের জন্য আপনাদের প্রতিষ্ঠান, প্রকল্প ও কর্মসুচীর সাহসিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করুন......।

ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি এমন দরদ যে বিজ্ঞানীর, তার বিজ্ঞান-গবেষণাগারে মসজিদ থাকবেই, উপসংহার টানল জোয়ান।

মসজিদের ছায়ায় বসে জোয়ান অপেক্ষা করছিল আব্দুল্লাহ জুবায়েরের। ডঃ আব্দুল্লাহ জুবায়ের ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের বিজ্ঞান ও কারিগরি মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারী। তিনি ইন্টার ন্যাশনাল সেন্টার ফর থিওরিক্যাল ফিজিক্স (আই সি টি পি)- এর উপদেষ্টা পরিষদের একজন প্রভাবশালী সদস্য। ফিলিস্তিন রাষ্ট্র তার বিজ্ঞান বাজেটের প্রায় এক চতুর্থাংশ চাদা হিসেবে দেয় ডঃ সালামের এই বিজ্ঞান কেন্দ্র আই সিটিপি'কে। আই সিটিপি'র এখন সবচেয়ে বড় ডোনার দেশ ফিলিস্তিন রাষ্ট্র। জোয়ান যাতে আই সিটিপি থেকে তার কাজ ভালভাবে করে নিতে পারে এ জন্য ফিলিস্তিন সরকার খোদ আব্দুল্লাহ জুবায়েরকে পাঠিয়েছে ট্রিয়েস্টে।

আহমদ মুসা ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট মাহমুদকে বলে আগেই এসব ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে রেখেছেন।

সেদিন শাহ ফয়সল মসজিদ কমপ্লেক্স থেকে ফিরেই আহমদ মুসা যিয়াদ ও জোয়ানকে নিয়ে মাদ্রিদস্থ ফিলিস্তিন দূতাবাসে গিয়েছিল।

স্পেনের মাদ্রিদে যে ফিলিস্তিন দূতাবাস আছে, আহমদ মুসার সে কথাটা মনে হয়নি। শাহ ফয়সাল কমপ্লেক্স থেকে ফিডেল ফিলিপের বাসায় ফিরে ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্টের সাথে জরুরী যোগাযোগের কথা ভাবছিল। কিন্তু পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। টেলিফোনে কথা বলতে গেলে সব কথা স্পেন সরকার শুধু নয়, ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের কানেও কথাটা পৌঁছে যাবে। সমস্যার সমাধান হিসেবে ফিডেল

ফিলিপই কথাটা প্রথম স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, আপনার এ্যামবেসী মানে ফিলিস্তিন এ্যামবেসী মাদ্রিদে থাকতে আপনি এত চিন্তা করছেন।

সংগে সংগেই আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল আহমদ মুসার মুখ। গাইড থেকে টেলিফোন নাম্বার খুঁজে নিয়েছিল ফিলিপ।

টেলিফোনে রাষ্ট্রদূতকে পেয়ে তার কাছে আহমদ মুসা নিজের পরিচয় দিতেই সে আনন্দে চিৎকার করে উঠেছিল। তারপর সে কিছুক্ষণ আবেগের আতিশয্যে কথা বলতে পারেনি। অনেকক্ষণ পর নিজেকে সামলে নিয়ে বলেছিল, জনাব, আমি আবু সাবের, আপনার একজন নগন্য কর্মী।

আহমদ মুসা আবু সাবেরকে চিনতে পেরেছিল। সংগ্রামকালে প্রচার বিভাগের কর্মী ছিল সে।

কোন কথা শুনেনি, সংগে সংগেই গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছিল আবু সাবের। সে গাড়িতে চড়েই আহমদ মুসা, যিয়াদ ও জোয়ান ফিলিস্তিন এ্যামবেসিতে গিয়েছিল।

এ্যামবেসীর অয়্যারলেসে আহমদ মুসা কথা বলেছিল ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট তার প্রিয় সহকর্মী মাহমুদের সাথে। মাহমুদও আবু সাবেরের সঙ্গী আনন্দে চিৎকার করে উঠেছিল এবং সেই সাথে তুলেছিল একরাশ অভিযোগ। বলেছিল, আপনি কোনই যোগাযোগ রাখছেন না। আমরা শুধুই আপনার পিছনে ছুটছি, ধরতে পারছি না। আমরা খোজ পাওয়ার পর ককেশাসে খুঁজতে গিয়ে দেখলাম আপনি বলকানে। বলকানে আপনার খোঁজ যখন পেলাম, তখন আপনি পাড়ি জমিয়েছেন স্পেনে, স্পেনের দূতাবাসকে নির্দেশ দিলাম আপনাকে খুঁজে বের করার জন্য। অবশেষে আজ পেলাম আপনাকে। আপনার কাছে কোন অপরাধ করেছি মুসা ভাই যে, আপনার সাথে সম্পর্ক রাখার অধিকার আমাদের থাকবে না?

মাহমুদের শেষ কথাগুলো অভিমানে ভারী হয়ে উঠেছিল।

আহমদ মুসার ঠোঁটে স্নেহের হাসি ফুটে উঠেছিল। উত্তরে বলেছিল, ভাইটি, আজ কিন্তু আমি নিজে খোজ করে তোমার দূতাবাসে এসেছি। প্রয়োজন হলে এক মুহুর্তও যে দেরী করব না তোমাদের কাছে আসতে সে পরিচয় তো তুমি

পেলে। আর শোন ঘটনার শ্রোত আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, ইচ্ছা করলেও পারি না তোমাদের খোজ নিতে। তোমার এমিলিয়া কেমন আছে?

'তাঁকেই জিজ্ঞাসা করুন, মুসা ভাই'। বলে মাহমুদ টেলিফোন দিয়েছিল এমিলিয়াকে।

এমিলিয়া কেঁদে ফেলেছিল। কথা বলতে পারেনি অনেকক্ষণ। শেষে বলেছিল, আপনি নিরুদ্দেশ হয়ে থাকতে পারেন, এমন করে বোনদের ভুলে থাকতে পারেন ভাবিনি। তাই কষ্ট লাগে। আয়েশা আলিয়েভার কাছে সব শুনেছি। বড় কষ্ট লাগে ভাবীর জন্য। আপনি শুধু মানুষকে কষ্ট দিতে পারেন। দায়িত্বের কাছে হৃদয় বৃত্তির কি কোনই মুল্য নেই?

আহমদ মুসা এমিলিয়াকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছিল, 'এমিলিয়া, আমি অব্যাহত এক যুদ্ধে জড়িয়ে আছি। যুদ্ধক্ষেত্রের ধর্ম অনুসারে অনেক স্বাভাবিক দাবী এখানে অস্বাভাবিকভাবে পদদলিত হয়।'

এমিলিয়াকে সান্তনা দিয়ে আহমদ মুসা কথা বলেছিল মাহমুদের সাথে। বলেছিল স্পেনে মুসলমানদের নতুন বিপদের কথা, বলেছিল ডঃ সালামের বিজ্ঞান গবেষণাগারের সাহায্যের প্রয়োজনের কথা। মাহমুদ বলেছিল, স্পেনের ভাইদের এই প্রয়োজন পূরণকে আমি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেব। আব্দুল্লাহ জুবায়েরকে আপনি জানেন। ওকেই আমি পাঠাচ্ছি ট্রিয়েস্টে যাতে কোন সমস্যা না হয়। তারপর খুঁটি-নাটি ব্যাপার নিয়ে মাহমুদের সাথে আহমদ মুসার আরো অনেক আলাপ হয়েছিল। একঘন্টা আলোচনার পর কথা শেষ করতে গিয়ে মাহমুদ কেঁদে ফেলেছিল। দু'টি কথা শেষে বলেছিল, ' এক; আপনার একটু বিশ্রামের জন্য আমি আপনার কাছে দরখাস্ত করছি, দুই; ফিলিস্তিন রাষ্ট্র আপনার, আপনার কোন কাজে যদি এ রাষ্ট্র না লাগে তাহলে কষ্ট পাই।'

মাহমুদের কথার জবাব দিতে গিয়ে আহমদ মুসা গম্ভীর কন্ঠে বলেছিল, বিশ্রামের কথা বলছ মাহমুদ! তুমি জান মুসলমানরা একটা মিশনারী জাতি এবং তারা একটা বিপ্লবী কর্মী দল। গোটা দুনিয়ার মানুষকে পথ দেখানো দূরে থাক, আমরা নিজেরাই আজ নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। এই যখন অবস্থা,

তখন বিশ্রামের চিন্তা তুমি আমি করতে পারি কি করে মাহমুদ। কথা সেদিন শেষ হয়েছিল এভাবেই।

জোয়ান ট্রিয়েস্টে গিয়ে কিভাবে আব্দুল্লাহ জাবেরের দেখা পাবে তার দিন, ক্ষণ, স্থান সব ঠিক করে দিয়েছিল ফিলিস্তিন এ্যামবেসীই।

সেই পরিকল্পনা অনুযায়ীই জোয়ান মসজিদের ছায়ায় দাঁড়িয়েছিল।

জোয়ান তার রিস্টওয়াচের দিকে তাকাল। দেখল, বেলা ১১টা বাজতে যাচ্ছে।

চঞ্চল হয়ে উঠল জোয়ান। ঠিক ১১ টায় তার আসার কথা।

হাত ঘড়ির দিকে তাকাল জোয়ান।

ঠিক এগারটা বাজে।

উৎসুক চোখ জোয়ান মেলে ধরল সামনে। চোখ তুলতেই তার চোখ গিয়ে পড়ল এগিয়ে আসা দীর্ঘকায়, সুঠামদেহী লোকের উপর। ধোপদুরস্ত ইউরোপীয় পোশাক, কিন্তু লাল আরবী চেহারা। সেই যে আব্দুল্লাহ জাবের কিছু মাত্র সন্দেহ রইল না জোয়ানের।

বেশ দূরে থাকতেই হাসিমুখে সালাম দিল লোকটি।

জোয়ান সালাম গ্রহণ করেই বলল, নিশ্চয় জনাব আব্দুল্লাহ জাবের।

‘হ্যাঁ, আপনি নিশ্চয় ভাই জোয়ান ওরফে মুসা আব্দুল্লাহ।’

হ্যান্ডশেক করে দু’জন দু’জনকে জড়িয়ে ধরল।

‘মুসা ভাই কেমন আছেন?’ বলল জোয়ান।

‘কতদিন তাঁর কথা শুনিনি। আপনার কাছ থেকে অনেক গল্প শুনব।’

‘আহমদ মুসা ভাইকে আপনারা এত ভালবাসেন?’ সেদিন দেখলাম, দূতাবাসের সবাই তাঁর জন্যে পাগল। কেন এত ভালবাসা?’

‘আপনার সাথে তার পরিচয় কতদিন?’

‘মাস হয়নি।’

‘আপনি তাকে ভালবাসেন না?’

‘অবশ্যই।’

‘কেন তাকে ভালবাসেন?’

জোয়ান একটু চিন্তা করল। তারপর বলল, 'মানুষের প্রতি তার অপূর্ব ভালবাসা, সাথীদের প্রতি তাঁর অবিশ্বাস্য মমতা দেখে।'

'তাঁর সাথে যারা মিশেছেন, সবাই এই একই জবাব দেবেন। তিনি এমন এক নেতা, যাঁর সাথে কেউ দু'দিন কাটালে সারাজীবন তাঁর সাথে থাকতে চাইবে। সাথীদের সুখ-সুবিধা, নিরাপত্তার দিকে তাঁর যত নজর, তার একাংশও নিজের জন্যে তিনি করেন না। সাথীদের তিনি নিরাপদ পক্ষপুটে রেখে সব বিপদ, সব ঝুঁকি তিনি নিজের কাঁধে তুলে নেন। এমন নেতার জন্যেই তো জীবন দেয়া যায়। তাই তো পাগল সবাই তাঁর জন্যে।'

'এমন বিস্ময়কর চরিত্র কি করে সৃষ্টি হলো?'

'ইসলামে নেতার চরিত্র এটাই। ইসলামের স্বর্ণযুগে এটাই ছিল নেতার চরিত্র। শুধু স্বর্ণযুগে কেন, চরিত্র, মানুষের প্রতি ভালবাসা দিয়েই তো ইসলাম জগত জয় করেছে।'

'মাফ করবেন হিংস্রতার ইতিহাসও তো আছে।'

'আপনি পরবর্তীকালের কিছু নাম মাত্র খলীফা, রাজা-বাদশাহদের কথা বলছেন। কিন্তু তাঁদের ইতিহাস ইসলামের ইতিহাস নয়। এ কথা ঠিক মুসলিম সাম্রাজ্য তারা সংহত করেছেন, সংরক্ষণ করেছেন, শাসন করেছেন, কিন্তু তাঁদের দেখে মানুষ ইসলাম গ্রহন করেনি। মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি, শাহ মখদুম, শাহ জালালের মত মুজাহিদ মিশনারীদের দেখে। যাঁরা ছিলেন মানুষের কাছে মোমের মত কোমল, আর অত্যাচারের মূলোতপাটনে ছিলেন সিংহের মত সংগ্রামী।' থামল আব্দুল্লাহ জাবের। থেমেই বলল, 'চলুন ওঁরা অপেক্ষা করছেন।' তারা পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করল।

চলল তারা গবেষণা প্রতিষ্ঠান আই, সি, টি, পি'র গেটের দিকে।

আই সি টি পি'র (ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স)-এর পরিচালক ডঃ নূর আব্দুল্লাহর অফিস।

রাত তখন নয়টা। ডঃ নূর আবদুল্লাহ তার টেবিলে তার রিভলভিং চেয়ারে বসে। তার চোখ-মুখ লাল, উত্তেজিত দেখাচ্ছে তাকে।

ডঃ নূর আবদুল্লাহ আফগান বংশোদ্ভুত। দুই পুরুষ ধরে ইতালীর নাগরিক। একজন কৃতি পদার্থ বিজ্ঞানী সে। যত নিষ্ঠা ও মমতা দিয়ে ডঃ আবদুস সালাম এই পদার্থ বিজ্ঞান গবেষনাগার গড়ে তুলেছিলেন তৃতীয় বিশ্বের অবহেলিত বিজ্ঞানীদের জন্যে, ডঃ নূর আবদুল্লাহ আজ ততটা মমতা ও নিষ্ঠা দিয়েই কেন্দ্রটি পরিচালনা করছেন। তার পরিচালনায় কেন্দ্রটি আজ তৃতীয় বিশ্বের বিজ্ঞানী বিশেষ করে মুসলিম বিজ্ঞানীদের জন্যে এক 'স্বর্গভূমি' হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ডঃ আবদুল্লাহ জাবের ধীর পায়ে ডঃ নূর আবদুল্লাহর অফিসে প্রবেশ করল।

ডঃ আবদুল্লাহ জাবেরকে দেখেই ডঃ নূর আবদুল্লাহ চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল এবং উত্তেজিত কন্ঠে বলল, ডঃ জাবের সর্বনাশ হয়ে গেছে, স্যাম্পুলগুলোর তেজস্ক্রিয় বিশ্লেষণের রিপোর্ট এবং স্যাম্পুল ল্যাবরেটরী থেকে হারিয়ে গেছে।

'হারিয়ে গেছে?' বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে বলল ডঃ আবদুল্লাহ জাবের।

'হারিয়ে গেছে মানে টেবিল থেকে উধাও হয়েছে। মাগরিব নামাযের ব্রেকে বিজ্ঞানী তৌফিক আল বিশারা বাইরে এসেছে। ফিরে গিয়ে রিপোর্ট এবং স্যাম্পুল কিছুই পায়নি।'

'অবিশ্বাস্য ঘটনা।'

'তুমি অবিশ্বাস্য বলছ, আমি তো আতংক বোধ করছি।' মুখ কালো করে বলল ডঃ নূর আবদুল্লাহ।

'রিপোর্ট ও স্যাম্পুল উধাও হয়েছে, কিন্তু কম্পিউটারে তো সবই আছে। অন্ততঃ এই ক্ষতিটা থেকে বাঁচা যাবে।'

শুকনো হাসি ফুটে উঠল ডঃ নূর আবদুল্লাহর ঠোঁটে। বলল, 'বিজ্ঞ চোর সে দরজাও বন্ধ করে গেছে। কম্পিউটারের সে ডিস্ক একদম সাদা, সব মুছে দিয়ে গেছে। অথবা ডিক্স বদলে আসলটা নিয়ে গেছে।'

ডঃ আবদুল্লাহ জাবের ধপ করে বসে পড়ল চেয়ারে। তার চোখে নেমে এলো অন্ধকার। তার চোখে ভেসে উঠল আহমদ মুসার মুখ। আহমদ মুসা তাকে

একটা দায়িত্ব দিয়েছিল, সে দায়িত্ব সে পালন করতে পারলো না। মানসিক দিক দিয়ে মুষড়ে পড়ল ডঃ আবদুল্লাহ জাবের।

ডঃ নূর আবদুল্লাহও তার চেয়ারে বসে পড়ল। মলিন এবং বিস্ময় তার চেহারা। বলল সে, দুঃখিত ডঃ জাবের, এ ধরনের ঘটনা আমাদের গবেষণা কেন্দ্রে এই প্রথম। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

'কাউকে সন্দেহ করেন, যে এই কাজ করতে পারে?'

'কাকে সন্দেহ করব, সবাই তো আমরা এখানে এক।'

'ঘটনা যখন ঘটেছে, কেউ অবশ্যই তা ঘটিয়েছে। অনুসন্ধানে তা বেরোবেই। দরকার হলে গোয়েন্দা ফার্মের সাহায্য নিতে হবে। সেটা পরে হবে। কিন্তু রিপোর্ট যে জরুরী, এর জন্যে তো অপেক্ষা করা যাবে না।'

'মিঃ জোয়ানের কাছে কি বাড়তি কোন স্যাম্পুল আছে?'

'জানি না। ওর কাছে তাহলে যেতে হয়, তাছাড়া ঘটনাও তার জানা দরকার।'

দু'জনেই উঠল।

বেরুল অফিস থেকে।

চলল দু'জন জোয়ান যেখানে থাকে সেদিকে। জোয়ান থাকছে আই সি টি পি'র রেস্ট হাউজে, গবেষণা কমপ্লেক্সের বাইরে সাগরের তীরে।

রেস্ট হাউজ এক তলা সাগর থেকে উঠে আসা উঁচু এক টিলার উপর নির্মিত। চারদিকে ফুলের বাগান। মাঝখানে সুন্দর ছবির মত রেস্ট হাউজটি।

রাত তখন ৮টা ৩০ মিনিট।

জোয়ানের সাথে কথা বলছিল ডঃ আবদুল্লাহ জাবের এবং ডঃ নূর আবদুল্লাহ।

রিপোর্ট এবং স্যাম্পুল হারানোর কথা শুনে জোয়ানের মুখ কাগজের মত সাদা হয়ে গেল। বলল, বাড়তি কোন স্যাম্পুল আমার কাছে নেই।

ডঃ আবদুল্লাহ জাবের এবং ডঃ নুর আবদুল্লাহর তখন বিব্রতকর অবস্থা। তাদের কারও মুখে কোন কথা নেই।

কথা বলল জোয়ানই আবার। বলল, মাদ্রিদের সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি থেকে একদল ছাত্র-শিক্ষক এসেছে স্টাডি ট্যুরে। ওরাই এটা ঘটিয়েছে।

ডঃ নুর আবদুল্লাহ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তার চোখে-মুখে বিস্ময়। বলল, ওরা? কেন করবে? জানবে কি করে ওরা?

'ওরা এসেই জানতে পেরেছে আমি এসেছি। ওদের কেউ একজন এখানে আছে। সেই সব জানিয়েছে।' বলল জোয়ান।

'এসব কথা আপনি কি করে জানলেন মিঃ জোয়ান?' বলল ডঃ আবদুল্লাহ জাবের।

'সন্ধ্যায় এসে আমার ঘরে একটা চিঠি পেয়েছি। ঐ স্টাডি টিমে আমার এক বান্ধবী আছেন, তিনিই আমাকে জানিয়েছেন।'

বলে জোয়ানের বালিশের তলা থেকে চিঠি বের করল। পড়ল চিঠিটিঃ

জোয়ান,

'মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্টাডি ট্যুরে এসেছে একদল ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক। সব ওরা জানতে পেরেছে। তোমাদের পরিকল্পনা ওরা ব্যর্থ করে দেয়ার ষড়যন্ত্র এঁটেছে। তুমিও ওদের টার্গেট। আমি চিন্তিত। সাবধানে থেকো, রাতে কোথাও সরে থাকতে চেষ্টা কর। তোমার সাথে দেখা করা নিরাপদ নয়। কিছু জানলে এইভাবে চিঠি দিয়ে জানাব। গবেষনা কেন্দ্রে এবং বাইরেও ওদের লোক আছে। খুব শক্তিশালী এরা। আবার বলছি, সাবধানে থেকো।

তোমার – 'জেন'

চিঠি শুনতে শুনতে ডঃ নুর আবদুল্লাহর চোখে-মুখে উদ্বেগ-আতংক ফুটে উঠল। চিঠি পড়া শেষ হলে সে বলল, 'গবেষণা কেন্দ্রের কেউ তাদের সাথে থাকবে কেন? কি সম্পর্ক তাদের সাথে? বিদেশী ওরা, দু'একদিনের স্ট্যাডি ট্যুরে এসেছে মাত্র।'

'স্ট্যাডি ট্যুরে কোন শিক্ষক এসেছে, তা জেন লিখেনি। লিখলে বুঝতে পারতাম। তবে যারা এসেছেন তাদের মধ্যে ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের কেউ অবশ্যই আছে এবং তিনি সব কলকাঠি নাড়ছেন। ইটালিতে ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান আছে।

ট্রিয়েষ্টেও অবশ্যই থাকবে এবং তাদের কাউকে তারা আই সি টি পি’তে রাখবে সেটাও স্বাভাবিক।’ বলল জোয়ান।

চোখ বুজে আছে ডঃ নুর আব্দুল্লাহ। ভাবছে সে।

জোয়ান থামলেও কিছুক্ষন কথা বলল না ডঃ নুর আবদুল্লাহ। পরে ধীরে ধীরে চোখ খুলে বলল, ‘ভেবে পাচ্ছি না, আমার গবেষণা কেন্দ্রে এমন কে আছে যে গবেষণা কেন্দ্রের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে?’

ডঃ আবদুল্লাহ জাবের কিছু বলার জন্যে মুখ খুলছিল। এই সময় দরজার ওপর শব্দ হলো।

ডঃ আবদুল্লাহ জাবেরের আর কথা বলা হলো না প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল জোয়ানের দিকে। জোয়ানের পড়া চিঠির কথা তাঁর মনে পড়ে গিয়েছিল।

জোয়ানের মুখ শুকনো। সে কোন কথা বলতে পারছে না।

আবার নক হলো দরজায়।

ডঃ নুর আবদুল্লাহ উঠল। বলল, জোয়ান তুমি একটু আড়ালে দাঁড়াও। আমি দেখছি কে ওখানে।

ডঃ নুর আবদুল্লাহকে আর এগুতে হলো না। দরজায় এসে দাঁড়ালো কালো ফেল্ট হ্যাট ও কালো ওভার কোটে আবৃত একজন আগন্তুক।

‘কে আপনি?’ জিজ্ঞাসা করল ডঃ নুর আবদুল্লাহ।

দরজা দিয়ে এক ঝলক আলো গিয়ে পড়েছিল আগন্তুকের উপর।

আগন্তুক ডঃ নুর আবদুল্লাহর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে তাঁর মাথার ফেল্ট হ্যাটটি খুলে ফেলল।

এবার আগন্তুকের পুরো মুখটার উপর নজর পড়ার সাথে সাথে ডঃ আবদুল্লাহ জাবের ‘মুসা ভাই’ বলে চিৎকার করে উঠে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল আগন্তুককে।

ডঃ আবদুল্লাহ জাবের আহমদ মুসাকে জড়িয়ে ধরেই ঘরে নিয়ে এল এবং ডঃ নুর আবদুল্লাহকে দেখিয়ে বলল, ইনি ডঃ নুর আবদুল্লাহ আই সি টি পি’র পরিচালক।

আহমদ মুসা হ্যান্ডশেক করল ডঃ নুর আবদুল্লাহর সাথে।

আড়াল থেকে বেরিয়ে জোয়ান আহমদ মুসার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। আহমদ মুসাকে এইভাবে আবির্ভুত হতে দেখে বিস্ময়ে তার নির্বাক অবস্থা।

জোয়ানের দিকে চোখ পড়তেই আহমদ মুসা তাকে জড়িয়ে ধরল। বলল, খুব অবাক হয়েছ না?

'শুধু অবাক নয়, আমার চোখকে এখনও বিশ্বাস করতে মন চাইছে না।' বলল জোয়ান।

সবাই বসল।

আহমদ মুসা ও জোয়ান পাশাপাশি।

তাদের মুখ দরজার দিকে

তাদের পাশের সোফায় বসল ডঃ আবদুল্লাহ জাবের এবং ডঃ নুর আবদুল্লাহ।

'তোমার এখানে যাত্রা করার একদিন পর', বলতে শুরু করল আহমদ মুসা, 'জেনের কাছ থেকে একটা চিরকুট পেলাম। চিরকুটটিতে লেখা ছিল, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্ট্যাডি-ট্যুর ট্রিয়েস্টে যাচ্ছে। বাধ্য হয়েই আমাকে যেতে হচ্ছে। হঠাৎ করেই সিদ্ধান্ত বলে আগে কাউকে জানাতে পারিনি। বাসায় জোয়ানকেও পাইনি, খালাম্মাকেও পাইনি। শুনলাম জোয়ান মাদ্রিদের বাইরে। তাকে কিছুই বলা হলো না। আপনি দয়া করে তাকে জানাবেন।' জেনের চিরকুটটি পড়েই আমার মনে হলো ট্রিয়েস্টে কিছু ঘটতে যাচ্ছে। ভাবলাম, সব ক্রোধের শিকার হবে তুমি। সংগে সংগেই আমি ফিলিপকে বললাম আমি ট্রিয়েস্টে যাব। কিন্তু সোজা পথে তো আমার আসার উপায় ছিল না। ফিডেল ফিলিপের সাথে পিরেনিজ পার হলাম তারপর বাসক এলাকার মধ্যে দিয়ে দক্ষিণ ফ্রান্সের পোর্ট ভেন্ড্রেস হয়ে ট্রিয়েস্ট এলাম।'

একটু থামল আহমদ মুসা।

সোফায় একটু নড়ে-চড়ে বসে আবার মুখ খুলতে যাচ্ছিল আহমদ মুসা।

এই সময় দু'টি ছায়া মুর্তি বিড়ালের মত নিঃশব্দে এসে খোলা দরজায় দাঁড়াল। তাদের হাতে উদ্যত স্টেনগান। একটি স্টেনগানের নল জোয়ানের বুক বরাবর উদ্যত। অন্যটি ঘুরছে অন্যান্যদের উপর দিয়ে।

আহমদ মুসা বিস্মিত হলো না। শুধু ভাবল, ঘটনা তার চিন্তার চেয়েও দ্রুত ঘটল।

আগন্তুক দু'জনের টার্গেটের ধরন দেখে আহমদ মুসা নিশ্চিত হলো, সে তাদের টার্গেট নয়। জোয়ানের উদ্দেশ্যেই এসেছে।

আপনারা কে? কি চান এখানে? ওদের উদ্দেশ্যে বলল আহমদ মুসা।

কোন উত্তর দিল না ওরা। ওদের পাথরের মত মুখে কোন পরিবর্তন হলো না। জোয়ানকে লক্ষ্য করে উদ্যত স্টেনগানের ট্রিগারে আঙুলের চাপটা আরও বাড়তে লাগল।

শংকিত আহমদ মুসা নিশ্চিত হলো, এরা পেশাদার খুনি, খুন করার জন্যেই এরা এসেছে।

ওদের মনোযোগটা কিভাবে অন্যদিকে আকৃষ্ট করা যায়, কিভাবে কিছুটা সময় নেয়া যায় এ চিন্তায় আহমদ মুসা যখন ব্যস্ত, তখন পর পর দু'টি গুলীর শব্দ হলো। আর তার সংগে সংগেই দরজায় দাঁড়ানো স্টেনগানধারী দু'জন দরজার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

আহমদ মুসা ছুটে গেল দরজায়। বাইরে আলো-অন্ধকারে ঘেরা বাগান কিছুই দেখা গেল না। আহমদ মুসা দৃষ্টি ফেরাল লোক দু'টির দিকে। ওদের দু'জনেরই মাথায় গুলী লেগেছে।

আহমদ মুসা ঘরের মধ্যে ফিরে এল।

জোয়ান এবং ডঃ আবদুল্লাহ জাবের বিমুঢ়। ডঃ নুর আবদুল্লাহর মুখ কাগজের মত সাদা। ভয় ও আতংকে সে আড়ষ্ট।

আহমদ মুসা ডঃ আবদুল্লাহ জাবেরকে বলল, এদিকে ঘটনা এতদুর গড়িয়েছে?

তারপর জোয়ানের দিকে ফিরে বলল, সব কি প্রকাশ হয়ে গেছে? অবস্থা সম্পর্কে কতটা জান?

জোয়ান কোন জবাব দিল না। জেনের চিঠিটা আহমদ মুসার হাতে তুলে দিল।

আহমদ মুসা চিঠি পড়ে মুখ তুলতেই ডঃ আবদুল্লাহ জাবের বলল, আজ সন্ধায় ল্যাবরেটরী থেকে তেজস্ক্রিয় বিশ্লেষণের রিপোর্ট এবং স্যাম্পুল দুইই হারিয়ে গেছে। এমনকি কম্পিউটার ডিস্কের রেকর্ডও মুছে ফেলা হয়েছে অথবা সেটাও চুরি হয়ে গেছে।'

'ওরা জানতে পারার পর এমনটা ঘটাই স্বাভাবিক। ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান আট-ঘাট বেঁধেই কাজ করে।'

বলে আহমদ মুসা বসল। তারপর ডঃ নুর আবদুল্লাহর দিকে চেয়ে বলল, জনাব রেস্ট হাউজে কি আপনাদের গার্ড আছে।

'আছে, গেটে একজন। কিন্তু তার কাছে কোন আগ্নেয়াস্ত্র থাকে না।'

আহমদ মুসা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল চোখ বন্ধ করে। তারপর বলল, জোয়ান, জেন গুলী ছুড়তে জানে?'

'জানে। সে খুব ভাল পিস্তল শুটার। এ্যামেচার রিভলবার শুটিং–এ গত তিন বার ধরে সে চ্যাম্পিয়ন হয়ে আসছে।'

'তাহলে জেনই আজ আমাদের বাঁচাল। তার গুলীতেই এ দু'জন মরেছে।'

'জেনের গুলীতে?' লাফিয়ে উঠল যেন জোয়ান। বলল, 'কেমন করে বুঝলেন? জেন হলে তো এখানে আসতো।'

'উত্তর খুবই সহজ। ডঃ নুর আবদুল্লাহ এবং আবদুল্লাহ জাবের দু'জনই এখানে। বাইরে জেন ছাড়া তো আমাদের আর কোন সাহায্যকারী নেই। আর জেন এখানে এল না কেন? জেন সময় নষ্ট না করে ফিরে গেছে তার আবাসস্থলে। যাতে সে সন্দেহের শিকার না হয় এ জন্যে এটাই তার করণীয় ছিল।'

জোয়ানের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

আহমদ মুসা ডঃ নুর আবদুল্লাহর দিকে চেয়ে বলল, ডক্টর আপনাকে কি কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারি?'

'যে কোন সাহায্য, যে কোন সহযোগীতার জন্যে আমি প্রস্তুত আছি। আমাদের এই দুর্দিনে আল্লাহ আপনাকে সাহায্যকারী হিসেবে পাঠিয়েছেন। আমার আজ মনে হচ্ছে, যারা আজকের ডকুমেন্টটি চুরির মত বিশ্বাস ঘাতকতা

করল, সে আরও সর্বনাশ করেছে আরও মূল্যবান তথ্য পাচার করেছে নিশ্চয়।' বলল ডঃ নুর আবদুল্লাহ।

ধন্যবাদ, বলল আহমদ মুসা,' এখন বলুন আপনার বিজ্ঞানীদের দেশ ও ধর্মীয় পরিচয় কি?'

'থিয়োরিক্যাল রিসার্চে আমাদের বিজ্ঞানীদের সংখ্যা একচল্লিশ, আর ল্যাবরেটরীতে আমাদের পরীক্ষণ বিজ্ঞানীর সংখ্যা দশ'। থিয়োরিক্যাল রিসার্চের বিজ্ঞানীদের জন্যে ল্যাবরেটরীতে ঢোকা নিষিদ্ধ। তাদের জন্যে অবশ্য আলাদা ল্যাবরেটরী আছে। পরীক্ষণ বিজ্ঞানীদের একজন ভারতীয়, ৭ জন বিভিন্ন মুসলিম দেশ থেকে এসেছে, আর অবশিষ্ট দু'জনের একজন ইতালীয়, একজন নরওয়ের।'

'আমাদের পরীক্ষণটি কার টেবিলে ছিল'?

'গবেষণা কেন্দ্রের সিডিউল অনুসারে এই দায়িত্বটা লেবানিজ ও ভারতীয় বিজ্ঞানীর গ্রুপে পড়েছিল। তারা এটা গ্রহনও করেছিল। কিন্তু একদিন পরে তারা জানায়, লেবানিজ বিজ্ঞানী ছুটিতে যাচ্ছেন তাই সময়ের মধ্যে এ পরীক্ষণ তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। এরপর এ দায়িত্ব গিয়ে পড়ে একজন পাকিস্থান ও একজন সৌদি বিজ্ঞানী গ্রুপের উপর। এদের টেবিল থেকেই খোয়া গেছে রিপোর্ট, স্যাম্পুল এবং কম্পিউটার রেকর্ড।'

'দয়া করে কি বলবেন কারও প্রতি কোন প্রকার সন্দেহ আপনার হয়?'

'সবাই আমার কাছে সমান।'

'ঠিক 'কোন সময় ডকুমেন্টগুলো হারায়?'

'যখন পাকিস্থানী ও সৌদি বিজ্ঞানী দু'জন মাগরিবের নামাজ পড়তে যায়'।

'অন্য সবাই কি নামাজ পড়তে গিয়েছিল?'

'নামাজের বিরতি হলে, মুসলিমরা প্রায় সকলেই নামাজে যায়, দু'একজন ব্যাতিক্রম আছে'।

'আপনি কি খোঁজ নিয়েছেন, নামাজের সময় কোন গ্রুপ কাজ করছিল কিনা?'

‘লেবানিজ ও ভারতীয় বিজ্ঞানী দু’জন কাজ করছিল’।

‘কেন ভারতীয় বিজ্ঞানী ছুটিতে যায়নি?’ বিস্ময়ের সাথে বলল আহমদ মুসা।

‘ছুটি নিয়েছিল কিন্তু একদিন পরেই বাতিল করে’।

আহমদ মুসার মুখ উজ্জল হয়ে উঠল। বলল ‘বিরতির সময় ল্যাবরেটরী কি বন্ধ হয়?’

‘না’।

‘কাজ শেষে ফেরার সময় বিজ্ঞানীদের কাগজপত্র তল্লাশি হয়? তারা হাতে করে কোন কাগজ-পত্র নিয়ে যেতে পারে?’

‘বিধি-নিষেধ আছে। ল্যাবরেটরী থেকে খালি হাত ও খালি পকেটে বেরুতে হবে। চোখ রাখা হয় চেক করা হয় না।’

‘লেবানিজ বিজ্ঞানীর নাম কি?’

‘দাউদ ইমরান।’

‘সে মুসলমান?’

‘মুসলমান।’

‘সে মুসলমান এটা তার বায়োডাটা থেকে জানেন, না তার ফ্যামিলি ব্যাক-গ্রাউন্ড আপনাদের জানা আছে?’

‘বায়োডাটা থেকে জানি।’

‘সে কি নিয়মিত নামাজ পড়ে?’

‘জামায়াতে সে নিয়মিত নয়, তবে একা পড়ে নেয় বলে জানি।’

‘মাফ করবেন, আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি, আজ বিজ্ঞানীদের যাবার সময় তাদের উপর চোখ রাখার দায়িত্ব কার ছিল?’

‘সিকুরিটি অফিসার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় থাকতে পারেননি। আর হারানোর বিষয়টা নিয়ে আমরা ব্যস্ত ছিলাম।’

‘এমন অসুস্থ হয়ে হঠাৎ না আসার রেকর্ড তার আছে?’

‘মনে পড়ে না।’

‘দাউদ ইমরান কোথায় থাকেন?’

‘খুব কাছেই একটা রেসিডেন্সিয়াল কলোনি আছে, সেখানে তিনি থাকেন।’

‘তিনি বাইরে থাকেন কেন?’

‘তিনি লেবানিজ নাগরিক, কিন্তু অনেক দিন বাস করছেন ইটালিতে। ঐ কলোনিতে তিনি একটি বাড়িও কিনেছেন।’

‘আপনাদের আর কোন বিজ্ঞানী বাইরে থাকেন?’

‘না।’

‘জনাব আমি দাউদ ইমরানের বাড়িতে যেতে চায়।’

‘কেন?’ ডঃ নুর আবদুল্লাহর কন্ঠে বিস্ময়।

‘এসব ঘটনার মূলে কে বা কারা আছে সেটা জোয়ানের বান্ধবি জেন জানে। কিন্তু তার কাছে যাওয়া তার জন্যে নিরাপদ নয়। আমার মনে হচ্ছে দাউদ ইমরান দ্বিতীয় ব্যক্তি যার কাছে কিছু জানা যেতে পারে।’

‘আপনি নিশ্চিত?’

সন্দেহটাকে কখনও নিশ্চিত বলা যায় না।’

আমি গবেষণা কেন্দ্রের শৃঙ্খলা, শান্তি ও সুনাম নিয়ে চিন্তিত।’ উদ্বিগ্ন কন্ঠে বলল ডঃ নুর আবদুল্লাহ।

‘আমিও এটা নিয়ে চিন্তিত জনাব। আমি এমন কিছু করব না যা আপনাকে এবং আমাদের এই প্রিয় গবেষণা কেন্দ্রকে বিপদে ফেলবে।’

ডঃ নুর আবদুল্লাহ কিছু বলল না। তার দৃষ্টি আহমদ মুসার দিকে। সে দৃষ্টিতে আস্থার আলো আছে। আহমদ মুসাই আবার কথা বলল। বলল সে, লাশ দুটোকে আমি মনে করি সাগরে ডুবিয়ে দেয়া দরকার। পুলিশের ঝামেলায় যাওয়া ঠিক হবেনা।’

ডঃ নুর আবদুল্লাহ এবং ডঃ আবদুল্লাহ জাবের দু’জনেই আহমদ মুসার কথায় সায় দিল। এবং ‘ডঃ নুর আবদুল্লাহ বলল, সব ব্যবস্থা আমি করছি।

‘ধন্যবাদ’, ‘দয়া করে দাউদ ইমরানের বাড়ির লোকেশানটার বিবরন দিন যাতে আমি চিনতে পারি।’ ডঃ নুর আবদুল্লাহকে বলল আহমদ মুসা।

‘কাউকে সাথে দেব?’

আমরা চারজন ছাড়া এ খবর কেউ জানবে না।'

'তাহলে আমি সাথে যেতে পারি। কিন্তু আপনি ওখানে গিয়ে কি করতে চান?'

'ওখানে কি ঘটবে আমি বলতে পারি না। তবে আমি একজন আগন্তুক হিসাবে যাব। বলব, সে লেবানিজ। আমি ফিলিস্তিনি। বেকার। তার খোজ পেয়ে আসলাম তার সাথে দেখা করতে।'

একটু থামলো আহমদ মুসা। থেমেই আবার শুরু করলো, 'আমি আপনাকে সাথে নেব না। আপনি মানে আই সি টি পি। আই সি টি পি'কে যতটা সম্ভব অপ্রীতিকর ঘটনা থেকে দুরে রাখা দরকার।'

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই ডঃ আবদুল্লাহ জাবের বলল, আমি আপনার পুরানো কর্মী। আমি সাথে যাব।'

'তুমি আমার পুরানো সাথী বটে, কিন্তু এখন তুমি ফিলিস্তিন রাষ্টের একজন দায়িত্বশীল। তুমি ধরা পড়লে কেলেংকারী হবে। আরেকটা কথা আমি ইচ্ছা করলে তো জোয়ানকেও সাথে নিতে পারি। তা নিতে পারছি না। আমার পরিকল্পনায় দ্বিতীয় জনের স্থান নেয়।'

ডঃ নুর আবদুল্লাহ দাউদ ইমরানের বাড়ির লোকেশানের একটা স্কেচ একে ফেলেছিল। ওটা তুলে দিল আহমদ মুসার হাতে।

আহমদ মুসা স্কেচটাতে ভালভাবে নজর বুলিয়ে পকেটে রেখে দিয়ে বলল, 'আমি তাহলে চলি, খোদা হাফেজ।'

আহমদ মুসা খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে।

দাউদ ইমরানের কলোনিটি সহজেই খুজে পেল আহমদ মুসা। বাড়িটি খুজে পেতে খুব কষ্ট হলো না। বাড়ির গেটে বাড়ির নম্বর প্লেট জ্বলজ্বল করছে লিওন সাইনে। তবে গেটে মালিকের নাম লেখা নেয়।

গেটে তালা দেওয়া নেয় আহমদ মুসা দেখলো। একটা হুক দিয়ে গেট এটে দেয়া আছে।

বাড়ির দিকে তাকালো আহমদ মুসা। নিচের তলা অন্ধকার। উপর তলায় একটা ঘরের জানালা দিয়ে আলোর রেশ পাওয়া যাচ্ছে।

আহমদ মুসা হুক খুলে গেট দিয়ে প্রবেশ করলো। গেট থেকে কংক্রিটের একটা রাস্তা আহমদ মুসাকে একটা খোলা দরজায় নিয়ে গেল। দরজার পরেই একটা হলঘর।

আহমদ মুসা প্রবেশ করল ঘরে। অন্ধকার ঘর। অন্ধকারে যতটুকু বুঝল তাতে ঘরটাকে ড্রইং রুম বলেই মনে হলো। ড্রইং রুম থেকে দোতলায় উঠার সিড়ি।

আহমদ মুসা সিঁড়ির দিকে এগুলো। দোতলায় আলো দেখা গেছে, দোতলায় উঠবে সে।

সিঁড়িতে এক পা তুলতেই ঠান্ডা শক্ত কিছু এসে মাথার পেছনটা স্পর্শ করল। আহমদ মুসা মাথা ঘুরাতে যাচ্ছিল। সংগে সংগেই পেছন থেকে একটা ভারী কন্ঠ বলে উঠল মাথা গুড়ো হয়ে যাবে, চল উপরে। আহমদ মুসা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এল। পেছনে লোকটিও। তার রিভলবারের নলটি মাথা থেকে একটুও নড়ল না।

সিঁড়ি দিয়ে তারা উঠে এল দোতালার ড্রইং রুমে। সেখানে আরও দু'জন বসেছিল।

তাদেরকে ঐভাবে ঢুকতে দেখে বসা দু জনের একজন বলে উঠল, কি সাঙাত? এ চিড়িয়া কে, কোথায় পেলে একে?

বাড়ীতে প্রবেশ করেছিল, যেন ওর বাড়ি। এখন চিড়িয়াকে দেখতে হবে।

বলে রিভলবারধারী লোকটি ডানহাতে রিভলবার ধরে বামহাতে আহমদ মুসাকে সার্চ করতে লাগল। বসা দুজনও উঠে এল। তারাও সাহায্য করল সার্চ করতে।

কিন্তু, খুচরো কিছু কয়েন ও টাকা ছাড়া আহমদ মুসার পকেটে তারা তেমন কিছু পেল না।

বসা থেকে উঠে আসা একজন বলল, এ শূন্য চিড়িয়ারে, শুধু পণ্ডশ্রম হল।

রিভলবারধারী লোকটি রিভলবার পকেটে ফেলে আহমদ মুসার সামনে এসে বলল, কে তুমি বাড়ীতে ঢুকেছিলে কেন?

আহমদ মুসা বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় বলল, আমি দাউদ ইমরানের কাছে এসেছি।

'দাউদ ইমরানকে চেন?' রিভলবারধারী লোকটিই বলল।

'চিনি না, তার নাম শুনেছি। আই সি টি পি'তে চাকুরী করেন।

'কেন তার কাছে এসেছ?

তিনি লেবাননী......

আহমদ মুসার কথার মাঝখানেই ড্রইং রুমের টেলিফোনটি বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সোফা থেকে উঠে আসা দীর্ঘবপু তীরের মত ঋজু নেড়ে লোকটি বলল, ওকে একটা ঘরে আটকে রাখ। কথা আদায় করতে হবে, তার আগে কিছু করা যাবে না।

রিভলবারধারী লোকটিই দাউদ ইমরান। সে আবার রিভলবারটি হাতে তুলে নিয়ে আহমদ মুসাকে সামনের দিকে ইংগিত করে বলল, চল।

আহমদ মুসা চলতে শুরু করল। চলতে চলতে ভাবল, টেলিফোন আসাটা তার জন্য আশীর্বাদ হয়েছে। তা না হলে আরও কত প্রশ্ন আসত, উত্তরে মিথ্যার মালা গাথা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। আহমদ মুসা সিদ্ধান্ত নিয়েই এসেছে, শুরুতেই এদের সাথে সংঘাত বাধানো যাবে না। আসল টার্গেট তেজস্ক্রিয় রিপোর্ট ও স্যাম্পুল উদ্ধার। ওগুলো উদ্ধার না হলে তাদের এ মিশন ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং ক্ষতির পরিধি আরও বাড়বে। সংঘাতে যাওয়ার আগে জানতে হবে ওগুলো কোথায়। আহমদ মুসা খুশী হল, সে ঠিক জায়গায় এসেছে। বিজ্ঞানী দাউদ ইমরানের হাতে রিভলবার অর্থ তাকে সন্দেহ তাদের যথার্থ হয়েছে। সে একজন মীরজাফর, আত্মবিক্রয় করেছে শত্রুর কাছে।

আহমদ মুসাকে একটা ছোট্ট ঘরে ঢুকিয়ে দরজা লক করে দিয়ে দাউদ ইমরান চলে গেল।

ঘরটি ছোট। পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল। দেয়ালের সাথে তৈরী দামী কাঠের বুক সেল্ফ। তিনদিকে ঘুরানো। সেল্ফে ছড়ানো-ছিটানো কিছু বই আছে। কিন্তু সেল্ফের বেশীরভাগই খালি। টেবিলের

উপরও দু'টি বই পড়ে আছে। টেবিলের সাথে একটা চেয়ার ছাড়াও পাশে একটা ইজি চেয়ার পাতা।

আহমদ মুসা টেবিলের বই হাতে নিয়ে দেখল বিজ্ঞানের বই। সেল্ফ থেকেও কয়েকটা বই টেনে দেখল বিজ্ঞানের বই।

আহমদ মুসা বুঝল দাউদ ইমরানের স্টাডি রুম এটা। আহমদ মুসা চেয়ারে বসল।

টেবিলের তিনটি ড্রয়ার।

ড্রয়ার খুলল আহমদ মুসা। প্রথম ড্রয়ারে কয়েকটা সাদা প্যাড, পেন্সিল ও কলম পড়ে আছে।

দ্বিতীয় ড্রয়ারে কয়েকটা জার্নাল পাওয়া গেল। বিজ্ঞান সাময়িকীর সাম্প্রতিক কয়েকটা সংখ্যা। এগুলো ঘাটতে গিয়ে একটা হিব্রু ম্যাগাজিনের দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠল আহমদ মুসা।

হাতে তুলে নিল ম্যাগাজিনটা। ফিলিস্তিনে থাকাকালে হিব্রু শিখেছিল আহমদ মুসা।

ম্যাগাজিনটির নাম 'দি ট্রুথ'। ইহুদিবাদী আন্দোলনের বিশ্ব-বিখ্যাত পত্রিকা।

আহমদ মুসা চমকে উঠল, দাউদ ইমরান হিব্রু জানে? কেন জানে? বিজ্ঞানী বলে কি?

'দি ট্রুথ'এর সাম্প্রতিক সংখ্যা ওটা। তাহলে দাউদ ইমরান কি ম্যাগাজিনটা নিয়মিত পড়ে? ভাবল আহমদ মুসা।

ম্যাগাজিনটার পাতা উল্টাতে লাগল আহমদ মুসা। লক্ষ্য সংখ্যাটিতে কি আছে দেখা।

পাতা উল্টাতে গিয়ে ম্যাগাজিনের মধ্যে চারভাজ করা একটা কাগজ পেল আহমদ মুসা।

ম্যাগাজিনটা টেবিলে রেখে চার ভাজ করা কাগজটি খুলল সে। একটা চিঠি হিব্রু ভাষায় লেখা।

‘প্রিয় ডেভিড’ সম্বোধন দিয়ে চিঠির শুরু। সম্বোধন পড়েই শিউরে উঠলো আহমদ মুসা। ‘দাউদ’ আসলে ‘ডেভিড’। ইহুদী সে। তবে হিব্রু জানা এজন্যই কি?

চিঠিটা পড়তে শুরু করল আহমদ মুসা।

“প্রিয় ডেভিড,

তোমার রিপোর্ট প্রতিমাসেই আমরা ঠিকঠাক পেয়েছি। সবকিছুই আমরা জানতে পেরেছি। আমরা এখানে মনে করছি, আইসিটিপি আমাদের জন্য হুমকী হয়ে উঠেছে। মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্র ওর যেভাবে বাড়ছে এবং মুসলিম বিজ্ঞানীদের ওটা আশ্রয় ও ট্রেনিং দিচ্ছে, তাতে, আমাদের সিদ্ধান্ত, আইসিটিপি আর চলতে দেয়া যায় না। তুমি এ মাসেই তিনটি স্টিল কন্টেইনার পাবে। এগুলো তুমি আইসিটিপি’র সুনির্দিষ্ট তিনটি স্থানে মাটির তলায় গেড়ে দেবে। মাটি চাপা দেয়ার আগে কনটেইনারের লাল বোতামে চাপ দিয়ে ছিদ্রপথগুলো খুলে দেবে এরপর তোমার মিশন ওখানে শেষ।

আগামী দু’মাসের মধ্যেই তোমাকে আইসিটিপি এবং ট্রিয়েস্ট ছাড়তে হবে।

তোমার একান্ত

‘আইজাক’

রুদ্ধশ্বাসে চিঠি পড়ে শেষ করল আহমদ মুসা। বুক কেপে উঠল তার। সর্বনাশা যে রাহুগ্রাস ঘিরে ধরেছে স্পেনের শাহ ফয়সল মসজিদ কমপ্লেক্স এবং মুসলিম ঐতিহাসিক স্মৃতি চিহ্নগুলো, সেই রাহুগ্রাস গ্রাস করতে আসছে সমগ্র তৃতীয় বিশ্ব ও মুসলিম জাহানের গর্বের ধন ও আশা-ভরসার কেন্দ্র আইসিটিপি’কে। ইহুদীরা আইসিটিপি ধ্বংস এবং এখানে কার্যরত মুসলিম ও তৃতীয় বিশ্বের বিজ্ঞানীদের বিনাশ করতে চায়।

আহমদ মুসা দ্রুত চিঠির তারিখের দিকে চোখ বুলাল। দেখল, এখন থেকে দেড় মাস আগের তারিখ। অর্থাৎ, ডেভিড ওরফে দাউদ তেজস্ক্রিয় পূর্ণ কন্টেইনার তিনটি অনেক আগেই পেয়ে গেছে এবং তা সে স্থাপনও করেছে

আইসিটিপির মাটির তলায়। আবার বুকটা কেপে উঠল আহমদ মুসার। আহমদ মুসা উঠে দাড়ালো।

‘দাউদ ইমরান তাহলে.........’ভাবল আহমদ মুসা, ইহুদী এবং ইহুদী এজেন্ট। দিনের পর দিন এই বিজ্ঞান কেন্দ্রের সকল তথ্য পাচার করেছে সে ইহুদীদের কাছে। অবশেষে বিজ্ঞান কেন্দ্র এবং বিজ্ঞানীদের বিনাশ করে সে চলে যাচ্ছে। যাবার আগে আমাদের অপূরণীয় ক্ষতি করল তেজস্ক্রিয় রিপোর্ট এবং স্যাম্পল চুরি করে।

‘দাউদ ইমরান যত পাপ করেছে, ওকে পালাতে দেয়া যাবে না।’ ভেবে চলল আহমদ মুসা, আমাদের তেজস্ক্রিয় রিপোর্ট উদ্ধার করতে হবে, সেই সাথে গবেষণা কেন্দ্রের কি কি ক্ষতি করেছে তাও জানতে হবে।

হাত দু’টো মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উঠল আহমদ মুসার। দরজার দিকে এগুলো সে। দরজা লক করা।

আহমদ মুসা তার সব সময়ের সাথী লেসার কাটার বের করে নিল জুতার সোল থেকে।

লকের কী হোলে লেসার বীম প্রয়োগ করে লক গলিয়ে হাওয়া করে দিল।

খুলে ফেলল দরজা।

এ স্টাডি রুম থেকে করিডর দিয়ে অল্প কিছু এগুলেই ড্রয়িং রুম যেখানে ওদেরকে বসে থাকতে দেখে এসেছে আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা পা টিপে টিপে এগুলো ড্রয়িং রুমের দিকে।

ড্রইং রুম থেকে একজনের কন্ঠ শোনা যাচ্ছিল। আহমদ মুসা উকি দিয়ে দেখল, সেই দীর্ঘ দেহ তীরের মত ঋজু টাক মাথা লোকটি টেলিফোনে কথা বলছে। আহমদ মুসা কান পাতল।

‘না, ওদের দু’জনকে কোথাও পাওয়া যায়নি। টেলিফোনে বলছিল

টাক মাথা লোকটি, ‘লোক পাঠানো হয়েছিল রেস্ট হাউজে। কেউ সেখানে নেই, সেই রুমটিও বন্ধ। আমরা সন্দেহ করছি, ওরা নেই।’ সেই কক্ষের দরজা এবং বাহিরটা পানি দিয়ে ধোয়া দেখা গেছে, আর সেখানে তাজা রক্তের গন্ধ পাওয়া গেছে।’ একটু থামল লোকটি। সম্ভবত: কথা শুনে নিয়ে আবার সে

বলল, ' কি জানি আমরা বুঝতে পারছি না। জোয়ান ঐ ঘরে একা ছিল। এমন কিছু ঘটার কথা নয়, কিন্তু ঘটেছে।' থেমে ওপারের কথা শোনার পর আবার সে বলল, 'না, গবেষণা কেন্দ্রের কারো পক্ষে এ ধরনের কিছু করা সম্ভব নয়। নিশ্চয় তৃতীয় কোন পক্ষ জড়িত হয়েছে।

'হ্যাঁ ডেলিগেশন আজ রাতেই মাদ্রিদে ফিরে যাচ্ছে। আজ রাতেই আমরা চলে আসছি। দাউদ গোছ-গাছ করছে।'

'ও, কে, বায়।'

টেলিফোন রেখে লোকটি পাশের করিডোর দিয়ে দক্ষিণ দিকে চলে গেল। আহমদ মুসা অনুমান করল দাউদের বেডরুম এ দিকেই হবে।

আহমদ মুসা সবে দেয়ালের আড়াল থেকে বেরিয়ে ড্রইং রুমের দিকে পা তুলতে যাবে, এমন সময় পেছনে পায়ের শব্দ শুনল, একদম পেছনেই।

সংগে সংগে আহমদ মুসার মাথা গাছ থেকে পড়া পাকা ফলের মত ঝুপ করে নিচের দিকে পড়ে গেল, আর দু'টি পা তার উপরে উঠে ধনুকের মত বেঁকে তীব্র বেগে ছুটে গেল পেছনের দিকে।

পেছনের লোকটির হাতের রিভলবারটা সবে উপরে উঠতে যাচ্ছিল। এই সময় সামনে ভোজবাজির মত দৃশ্য দেখে মুহূর্তের জন্যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। এরই মধ্যে আহমদ মুসার জোড় পায়ের লাথি এসে লোকটির হাত সমেত বুকে তীব্র বেগে আঘাত হানল। হাত থেকে রিভলবার ছিটকে পড়ে গেল, সেও করিডোরের মেঝেতে সটান চিৎ হয়ে আছড়ে পড়ল্

আহমদ মুসার পা দু'টি মাটি স্পর্শ করতেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

দেখল, লোকটি সেই দীর্ঘদেহী লোকটির সাথী। এরও মাথা নেড়ে। লোকটির ডান হাতের পাশেই রিভলবারটি।

আহমদ মুসা ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটির উপর।

লোকটি রিভলবার হাতে তুলে নিতে পারল না। হাতের ধাক্কা খেয়ে রিভলবারটি আরেকটু সরে গেল।

আহমদ মুসা লোকটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়েই তার ডান হাতের একটা ঘুষি চালাল লোকটির বাম চোখের উপরে কানের পাশের নরম জায়গাটায়। সেই

সাথে লোকটির উঁচু করা মাথাটাও ভীষণভাবে আঘাত খেল মেঝের সাথে। লোকটি জ্ঞান হারল।

আহমদ মুসা লোকটির রিভলবার কুড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াতে যাবে এমন সময় পেছন থেকে ভারি গলায় বলে উঠল, রিভলবার ফেলে দাও। এক মুহূর্ত দেরী করলে মাথা গুড়ো হয়ে যাবে।

আহমদ মুসা সঙ্গে সঙ্গেই হাত থেকে রিভলবার ছেড়ে দিল এবং ঘুরে দাঁড়াল। দেখল, সেই দীর্ঘদেহী লোকটি আহমদ মুসার মাথা লক্ষ্যে রিভলবার তুলে স্থির দাঁড়িয়ে গজ দুয়েক দুরে।

আহমদ মুসা ঘুরতেই লোকটি বলে উঠল, তুমি যে বড় ঘুঘু হবে, তা আমাদের আগেই বোঝা উচিত ছিল। কোন সাধু লোক এত রাতে এভাবে কারও বাড়িতে প্রবেশ করে না।

একটু থামল লোকটি, তারপর রিভলবার নাচিয়ে নাচিয়ে বলল, বুঝেছি তুমিই আমাদের দু'জনকে হত্যা করেছ রেস্ট হাউজে। তোমাকে এখনি কুকুরের মত গুলি করে মারতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু তা করব না। জানতে হবে তুমি কে?

বলে সে মেঝেয় পড়ে থাকা অজ্ঞান লোকটির দিকে ইংগিত করে বলল, নাও ওকে, বেডে পৌছে দাও।'

আহমদ মুসা সুবোধ বালকের মত তার হুকুম তালিম করল। আহমদ মুসা গিয়ে দাঁড়াল লোকটির মাথার কাছে। তারপর নিচু হয়ে দু'হাত লোকটির বগলের নিচ দিয়ে ঢুকিয়ে লোকটিকে তুলতে লাগল।

চোখের পলকে ঘটে গেল ঘটনাটা।

আহমদ মুসা অজ্ঞান লোকটিকে বুক বরাবর তুলেই বিদ্যুৎ গতিতে ছুড়ে দিল সামনের দীর্ঘবপু লোকটিকে লক্ষ্য করে।

শেষ মুহূর্তে লোকটি বুঝতে পেরেছিল। গুলিও করেছিল আহমদ মুসার মাথা লক্ষ্যে। কিন্তু আহমদ মুসা অজ্ঞান লোকটিকে ছুড়ে দেয়ার জন্য পেছন দিকে ঝুকতে গিয়ে অনেক খানি নিচু হয়েছিল। আর ছোড়ার বেগে অজ্ঞান লোকটিই বেশ উচুতে উঠেছিল। গুলী এসে আঘাত করল অজ্ঞান লোকটিকেই।

গুলী খাওয়া অজ্ঞান লোকটি গিয়ে আছড়ে পড়ল দীর্ঘবপু লোকটির উপর। দু'জনেই ছিটকে পড়ল মেঝের উপর।

আহমদ মুসা দ্রুত ছুটে গিয়ে লোকটির হাত থেকে ছিটকে পড়া রিভলবারটি তুলে নিল।

তারপর ঘুরে দাঁড়াতেই দেখল, দীর্ঘবপু লোকটি পকেট থেকে আরেকটি রিভলবার হাতে তুলে নিয়েছে। রিভলবারের নলটি দ্রুত ছুটে আসছে আহমদ মুসার দিকে। ভিজে গেছে লোকটির বুক গুলীবৃদ্ধ অজ্ঞান লোকটির লাল রক্তে। তার চোখ দু'টিই রক্তের মত লাল। খুনি হয়ে উঠেছে সে।

আহমদ মুসার রিভলবার তাকে সুযোগ দিল না। উদ্‌গিরণ করল। লোকটি মাথা তুলেছিল গুলী করার জন্যে। গুড়ে হয়ে গেল তার সে মাথা।

গুলী করার পর আহমদ মুসা মুহূর্তকাল চিন্তা করল। দাউদ কোথায়। গুলীর শব্দ শোনার পর তার তো বের হবার কথা। বেড় রুমে কি সে নেই।

কোন দিকে যাবে যখন চিন্তা করছে সে সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনতে পেল আহমদ মুসা। কেউ যেন দ্রুত উপরে উঠে আসছে।

আহমদ মুসা একটু সরে গিয়ে দেয়ালের আড়ালে দাঁড়ালো। পায়ের শব্দে বুঝল লোকটি সিঁড়ি থেকে উপরে উঠে এসেছে। করিডোরের মুখে ড্রয়ইরুমের প্রান্তেই পড়ে ছিল ওদের দু'জনের লাশ। সিঁড়ি থেকে উঠে ড্রইংয়ে পা দিলেই যে কেউ তা দেখতে পাবে।

আহমদ মুসা আড়াল থেকে উঁকি দিল। দেখল, রিভলবার হাতে দাউদ আতংক-বিহবল দৃষ্টিতে লাশ দু'টির দিকে তাকিয়ে। তার রিভলবারটি উদ্যত, কিন্তু কোন টার্গেটে নয়। আহমদ মুসা এক ঝটকায় বেরিয়ে এল দেয়ালের আড়াল থেকে। দাউদ ইমরানের দিকে রিভলবার উদ্যত করে বলল, রিভলবার ফেলে দাও ডেভিড। ইহুদী স্পাই সেজেছ বিজ্ঞানী। তোমার খেলা এবার সাঙ্গ।

দাউদের চোখ দু'টি জ্বলে উঠল। সে রিভলবার ফেলে দিল না। বিদ্যুৎ গতিতে তা ঘুরে এল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসার রিভলবার রেডি ছিল দাউদের রিভলবার ধরা হাত লক্ষ্যে গুলী করল সে।

দাউদের রিভলবার ধরা হাত ঘুরে এসে আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে আর উঠতে পারল না। তার গুলীবিদ্ধ হাত থেকে রিভলবার খসে পড়ল। বা হাত দিয়ে ডান হাত চেপে ধরে সে বসে পড়ল।

আহমদ মুসা এসে দাউদের সামনে দাঁড়াল। বলল, মি: ডেভিড তোমার কৃর্তির সবই আমি জানি। এখন বল, সেই স্যাম্পুল এবং তেজস্ক্রিয় রিপোর্টটি কোথায় রেখেছ?

'কে আপনি, সে রিপোর্টের সাথে আপনার কি সম্পর্ক?' হাতের যন্ত্রণায় মুখ বাঁকা করে বলল দাউদ।

'আমি কে তা জেনে তোমার কোন প্রয়োজন নেই, আমি যা জিজ্ঞেস করেছি, তার জবাব দাও।

'ওসবের সাথে আমার কি সম্পর্ক? আমি কিছু জানি না।'

'দেখ মনে করো না ঐ তথ্যটা আমার খুবই দরকার এবং ঐ তথ্যের জন্যে তোমার মাথায় এখনও গুলী করিনি। আমি জানি ওগুলো কোথায়।'

'কেন তাহলে বাঁচিয়ে রেখেছেন?'

'তুমি যা পাপ করেছ তার বিচার হতে হবে, শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞান কেন্দ্র ধ্বংসের জন্যে তেজস্ক্রিয় সেট পেতেছ বিজ্ঞান কেন্দ্রের মাটির তলায়।'

দাউদের চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠল। বলল, 'আপনি কে?'

'বলেছি, আমার পরিচয় দিয়ে তোমার কাজ নেই।'

'তেজস্ক্রিয় রিপোর্ট কোথায় আপনি জানেন?'

'হ্যা জানি, ওটা স্পেন থেকে শিক্ষা সফরে আসা দলের দলনেতার হাতে।'

আবার দাউদের চোখে একরাশ বিস্ময় ফুটে উঠল।

বসতে যাচ্ছিল। আহমদ মুসা তাকে বাধা দিয়ে বলল, উঠে দাঁড়াও, তোমার ফার্স্ট এইড বক্স কোথায় বের কর।'

দাউদ উঠে দাঁড়াল।

চলতে শুরু করল তার বেড রুমের দিকে। আহমদ মুসা তার পিছে পিছে।

বেড় রুমের থাক থেকে ফার্স্ট এইড বক্স বের করে আনল দাউদ। তারপর আহমদ মুসার নির্দেশে সে বাক্সটি খুলল এবং আহমদ মুসার নির্দেশেই সে ওষুধে তুলা ভিজিয়ে হাতের ক্ষতের উপর তা চাপিয়ে দিল।

দাউদের ডান হাতের গোড়ার দিকটা সহ হাতের ঐ অংশটা একদম বিধ্বস্ত হয়েছে।

আহমদ মুসা হাতের রিভলবার পাশে সরিয়ে রেখে দাউদের ক্ষতস্থানে আরও কিছু তুলা লাগিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিল।

আহমদ মুসা যখন ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছিল, তখন দাউদের একবার মনে হয়েছিল, বাম হাতের এক ঘুসি দিয়ে তার শত্রুকে কুপোকাত করতে পারে। কিন্তু পরক্ষনেই সে ভেবেছিল, লোকটি সোজা নয়। ইহুদি এজেন্সি ইরগুন জাই লিউমি'র বিশ্বখ্যাত দুই দুর্ধষ্য যোদ্ধাকে সে এইমাত্র হত্যা করেছে। আর নার্ভটা তার ভয়ানক রকম শক্ত না হলে হাত খালি করে এভাবে শত্রুর কাছাকাছি সে আসতো না।

যত্নের সাথে ব্যান্ডেজ বাঁধা দেখে দাউদের মনে আবার প্রশ্ন জাগল, শত্রুর ভাল-মন্দের দিকে মনোযোগী এই লোকটি কে? এমন শত্রুকে সে তো কোনদিন দেখেনি।

কিছু বলতে যাচ্ছিল দাউদ, তার আগে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়ে ফার্স্ট এইড বক্স থেকে দু'টুকরো সিল্কের কর্ড তুলে নিল। এক টুকরো দিয়ে দাউদের দু'টি হাত পিছ মোড়া করে বেঁধে ফেলল।

'আহত লোককেও ভয় করেন?' বলল দাউদ।

'না ভয় নয়। ঝামেলা এড়াতে চাই।'

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা বলল চলুন।

'কোথায়?'

'নিচে আপনার গাড়িতে।'

দাউদকে নিয়ে আহমদ মুসা নিচে নেমে এল। গাড়ি বারান্দাতেই দাঁড় করানো ছিল দাউদের গাড়ি। চাবিও ছিল গাড়ির সাথেই।

আহমদ মুসা গাড়ির পেছনের লাগেজ কেবিনটা খুলে সেখানে ঢুকিয়ে দিল দাউদকে। তারপর মুখে রুমাল পুরে দিয়ে লাগেজ কেবিন লক করে ফেলল।

গাড়ির ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল আহমদ মুসা।

গাড়ি চলতে শুরু করল।

জেনরা অর্থাৎ স্পেন থেকে আগত শিক্ষা সফরের লোকরা কোথায় উঠেছে আহমদ মুসা জানে। জোয়ান কোথায় উঠেছে, কোথায় তাকে পাওয়া যাবে, সেটা খোঁজ করতে গিয়েই সে জানতে পারে গবেষণা কেন্দ্রের গেটম্যানের কাছ থেকে যে, স্পেন থেকে শিক্ষা সফরে আসা একটি টিম উঠেছে গবেষণা কেন্দ্র থেকে একটু পুবে সাগর-তীরের 'সি-কুইন' নামক মোটেলে।

আহমদ মুসা অনুমানেই ধরে নিল মোটেলটি কোথায় হবে।

আড্রিয়াটিকের বেলাভূমি। বেলা ভূমির প্রান্ত ঘেঁষে এগিয়ে গেছে প্রশস্ত একটি পাকা রাস্তা। সেই পাকা রাস্তার উত্তর পাশ ঘেষে মোটেলের সারি। প্রত্যেক মোটেলের প্রবেশ গেটে মোটেলের নাম। রাতে লিওন সাইনের আলোতে তা জ্বলজ্বল করছে। রাস্তা থেকে তা পরিস্কার পড়া যায়।

আহমদ মুসা তিনটি মোটেল পেরিয়েই সামনের মোটেলটার লিওন সাইনে 'সি কুইন' নাম দেখতে পেল।

প্রধান রাস্তা থেকে একটা অপেক্ষাকৃত সরু রাস্তা বেরিয়ে মোটেলের গাড়ি বারান্দায় গিয়ে ঠেকেছে।

'সি কুইনের' গাড়ি বারান্দায় আগে থেকেই একটা গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। আহমদ মুসার গাড়ি গিয়ে সেই গাড়ির পাশে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা নামল গাড়ি থেকে। গাড়ি থেকে নেমে দেখল, একজন লোক দু'টো ব্যাগ ও একটি সুটকেশ ভেতরের দিক থেকে এনে দাঁড়িয়ে থাকা মাইক্রবাসে উঠাতে যাচ্ছে।

আহমদ মুসা বুঝল, শিক্ষা সফরের দলটি তাহলে যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছে।

আহমদ মুসা দ্রুত ঢুকে গেল ভেতরে।

ঢুকেই পেল রিসেপশন কাউন্টার। সেখানে একজন লোক বসে।

‘স্পেনের শিক্ষা সফরে আসা দলটির দলনেতা কত নম্বরে।’ স্পেনীয় ভাষায় জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘ঐ তো উনি আসছেন, চলে যাবেন উনি এখনি।’

আহমদ মুস ফিরে তাকাল রিসেপশনিস্ট–এর ইংগিত লক্ষ্য করে। দেখল, একজন মধ্য বয়সী লোক এগিয়ে আসছে। তার হাতে একটা ব্রিফকেস। লোকটির দু’পাশে এবং পেছনে কয়েকজন। তাদের মধ্যে জেনও।

জেন আহমদ মুসাকে দেখে ফেলেছে। আহমদ মুসাকে থেকে জেনের মুখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে। তার চোখ দু’টি বড় বড় হয়ে উঠেছে।

কিন্তু আহমদ মুসার চোখে সামান্য কোন পরিবর্তনও এল না। যেন কোনদিনই সে জেনকে দেখেনি।

জেনও নিজেকে সামলে নিয়েছে। কিন্তু তার মনটা থর থর করে কাঁপছে। সে জানে, আহমদ মুসা বিনা কারণে আসেনি, কি ঘটে কে জানে। সে মনে মনে প্রার্থনা করল, হে ঈশ্বর, তুমি ন্যায়ের পথে সংগ্রামী আহমদ মুসাকে, মজলুম জোয়ানকে সব বিপদ থেকে নিরাপদ কর।

ওরা এগিয়ে এলে আহমদ মুসা দু’ধাপ সামনে এগিয়ে দলনেতা লোকটির মুখোমুখি হয়ে বলল, গুড নাইট, আপনি কি শিক্ষা সফর টিমের দলনেতা?’

‘হ্যাঁ, আপনি কে?’

‘আমাকে চিনবেন না, আপনাদের কথা শুনে এলাম। আপনাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই।’

‘আমাকে? আমি তো যাবার জন্যে বেরিয়েছি। চলুন গাড়িতে বসে শুনব আপনার কথা।’

‘সবাই কি চলে যাচ্ছেন?’

‘হ্যাঁ যাচ্ছে, রাত দু’টার প্লেনে। আমার একটু কাজ আছে। তাই আগে বের হচ্ছি। যাচ্ছি এক বন্ধুর বাসায়।’

‘আপনি মি...।’

‘আমি অধ্যাপক ভিলারোয়া।’

হাঁটতে হাঁটতে কথা হচ্ছিল তাদের মধ্যে।

তারা হাঁটছিল গাড়ি বারান্দার দিকে।

মিঃ ভিলারোয়ার পাশাপাশি হাঁটছিল স্কিন হেডেড একজন লোক। বয়স হবে পঁয়ত্রিশের মত। লোকটি শুরু থেকেই আহমদ মুসাকে দেখে ভ্রুকুচকে ছিল।

আহমদ মুসাও তাকে লক্ষ্য করছিল।

গাড়ি বারান্দায় পৌঁছে স্কিন হেডেড লোকটি আহমদ মুসা যে গাড়ি নিয়ে এসেছিল, সে গাড়ির দিকে তাকিয়েই ফিরে দাঁড়াল আহমদ মুসার দিকে। লোকটির চোখে তখন ক্রুর দৃষ্টি। বলল সে, এই গাড়িতেই আপনি এসেছেন?

লোকটি পকেটে হাত দিয়েছে।

আহমদ মুসার হাত আগে থেকেই পকেটে। বলল, হ্যাঁ, গাড়ি আমিই এনেছি।'

আহমদ মুসার কথা শেষ হবার সাথে সাথেই লোকটির হাত বেরিয়ে এসেছে পিস্তল সমেত। আহমদ মুসারও।

আহমদ মুসা হিসেবটা আগেই সম্পূর্ণ করেছিল। দু'জনের হাতে রিভলবার বেরিয়ে আসলে, বর্তমান পরিস্থিতিতে যে কোন একজনকে মরতেই হবে। আহমদ মুসা রিভলবার বের করেছিল সিদ্ধান্ত নিয়েই। সুতরাং স্কিন হেডেড লোকটি রিভলবার বের করে যে সময়টা সিদ্ধান্ত নিতে ব্যয় করেছে, সে সময়ে আহমদ মুসার বুলেট গিয়ে তার বুকটা এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল।

ঢলে পড়ল তার দেহ মিঃ ভিলারোয়ার পায়ের কাছে।

কি ঘটে গেল বুঝে নিয়ে সবাই যখন আহমদ মুসার দিকে চোখ তুলল, তখন দেখল আহমদ মুসার রিভলবারটি মিঃ ভিলারোয়ার দিকে স্থিরভাবে উদ্যত। নিহত লোকটির পিস্তলটিও তখন আহমদ মুসার বাম হাতে।

'মিঃ ভিলারোয়া আপনার স্যুটকেশ এবং দু'টি ব্যাগ মাইক্রোবাসে উঠেছে, ওগুলো এই মুহূর্তে আমার গাড়িতে তুলে দিতে বলুন। এক মুহূর্ত দেরী করলে আপানা মাথা এবার গুড়ো হবে।

কাঁপছিল মিঃ ভিলারোয়া। সংগে সংগেই কিছু দূরে দাঁড়ানো বেয়ারাকে নির্দেশ দিল স্যুটকেশ ও ব্যাগ দু'টো আহমদ মুসার গাড়িতে তুলে দিতে।

বেয়ারা মুহূর্তকাল দেরী না করে নির্দেশ পালন করল।

আবার মুখ খুলল আহমদ মুসা। বলল, 'মিঃ ভিলারোয়া আমার গাড়িতে উঠুন।'

মিঃ ভিলারোয়ার কম্পন বেড়ে গেল। কথা বলতে চেষ্টা করেও পারল না।

জেন মিঃ ভিলারোয়ার পাশেই দাঁড়িয়েছিল। সকলের মধ্যে সেই মাত্র স্বচ্ছন্দভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। লক্ষ্য করলে দেখা যেত, তার চোখে-মুখে ভয়ের যে ভাবটা ছিল তা এখন নেই। সেই মুখ খুলল, তাকে কোথায় নিয়ে যাবেন?

'ভয় নেই ম্যাডাম, ওঁর কোন ক্ষতি হবে না। আমাদের চুরি করা জিনিস উদ্ধার হলেই ওঁকে ছেড়ে দেব।'

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা আবার তাঁর রিভলবার নাচিয়ে বলল, মিঃ ভিলারোয়া আমি এক আদেশ দু'বার করি না।'

মি:ভিলারোয়া কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে গাড়িতে চড়ল। আহমদ মুসা গিয়ে গাড়িতে উঠে গাড়িতে স্টার্ট দিল। ড্রাইভিং সিটের পাশেই বসেছিল অধ্যাপক ভিলারোয়া।

আহমদ মুসার গাড়ি যখন প্রধান রাস্তায় উঠে চলতে শুরু করেছে, তখন দূরে বিপরীত দিক থেকে একটি পুলিশের গাড়িকে দ্রুত 'সি-কুইনের' দিকে আসতে দেখা গেল।

কিছু দুর চলার পর আহমদ মুসার গাড়ির আলো নিভিয়ে দিল তারপর রাস্তা থেকে গাড়িকে সাগরের বেলাভূমিতে নামিয়ে নিল এবং একটি ঝোপের আড়ালে গিযে দাঁড়াল।

'মি: ভিলারোয়া, গবেষণা কেন্দ্র থেকে আপনারা যে স্যাম্পুল ও তেজস্ক্রিয় রিপোর্ট চুরি রেছেন, সেটা বের করে দিন। এখনই আপনি ছাড়া পাবেন। আর যদি মিথ্যা বলে হয়রান করেন, তাহলে আপনার কি পরিণতি হবে তা দেখেছেন।' ধীর, কিন্তু শক্ত কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

'আমি ওগুলো চুরি করিনি, ওরাই ওগুলো আমাকে গছিয়েছে স্পেনে বয়ে নেবার জন্যে। আমার ব্রীফকেসে ওগুলো আছে। দিয়ে দিচ্ছি।' কাঁপা গলায় বলর মি: ভিলারোয়া।

মি: ভিলারোয়া মুখে কথা বলার সাথে সাথে ব্রিফকেস খুলে ভেতর থেকে একটা ইনভেলাপ ও একটি প্লাস্টিক থলে আহমদ মুসার দিকে এগিয়ে দিল।

আহমদ মুসা গাড়ির ভেতরের লাইট অন করে ওগুলো পরীক্ষা করে পকেটে রেখে দিল।

'ধন্যবাদ মি: ভিলারোয়া, আপনার কোথায় যেন যাবার কথা ছিল? যাবেন সেখানে?'

'আমি জানি না, সাথের ঐ লোকটিই নিয়ে যাচ্ছিল।'

'তাহলে এখন মটেলে যাবেন?'

'জি।'

আহমদ মুসা গাড়ি স্টার্ট দিল।

চলতে শুরু করল গাড়ি।

'তেজস্ক্রিয় রিপোর্ট এবং স্যাম্পুল দিয়ে আপনি কি করতেন?

জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

'আমার দায়িত্ব ছিল শুধু বহন করা। মাদ্রিদে পৌছলেই ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের মি: ভাসকুয়েজের লোক এসে এসব নিয়ে যাবার কথা।'

রাস্তায় উঠে আহমদ মুসা গাড়ির আলো নিভিয়ে দিয়েছিল। 'সি-কুইন' মটেলের সামনে রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করাল আহমদ মুসা।

'দু:খিত মি: ভিলারোয়া আপনাকে একেবারে মটেলে পৌছে দিতে পারলাম না। পুলিশ ঝামেলা করবে।' বলল আহমদ মুসা।

গাড়ি থামতেই মি: ভিলারোয়া বুঝে নিয়েছিল, তাকে এখানেই নামতে হবে।

'ধন্যবাদ' বলে গাড়ি থেকে স্যুটকেশ, দু'টি ব্যাগ ও ব্রিফকেস নিয়ে নেমে পড়ল মি: ভিলারোয়া।

গাড়ি স্টার্ট নিল আহমদ মুসার। তার গাড়ি গবেষণা কেন্দ্রের দিকে।

তার গাড়ি দাঁড়াল গিয়ে গবেষণা কেন্দ্রের রেস্ট হাউজের গেটে। গাড়ি দাঁড়াতেই গেট রুমের জানালা দিয়ে মুখ বাড়াল গেঁটম্যান।

'ড: নুর আব্দুল্লাহ ভেতরে আছেন?'

‘চলে গেছেন।’

‘একা?’

‘না, মেহমানদের সমেত।’

‘কোথায়, ওর বাসায়?’

‘জি হ্যাঁ।’

‘বাসা কোথায়?’

‘কমপ্লেক্সের ভেতরে, গবেষণা কেন্দ্রের পাশেই।’

‘ধন্যবাদ।

বলে আহমদ মুসা তার গাড়ি ঘুরিয়ে নিল। কমপ্লেক্সের গেট সে চেনে।

গেটের সামনে গাড়ি পৌছতেই আহমদ মুসা দেখতে পেল গেট খোলা। ঘড়ির দিকে তাকাল। দেখল রাত ১২টা। এ সময় তো গেট খোলা থাকার কথা নয়।

গেটের মুখে গাড়ি দাঁড় করিয়ে নেমে পড়ল আহমদ মুসা।

গেটের একটা পাল্লা পুরো খোলা, আরেকটা পাল্লা অর্ধ খোলা। গেটরুম শূণ্য।

আহমদ মুসা অবাক হলো গুরুত্বপূর্ণ এই গেটের অবস্থা দেখে। হঠাৎ আহমদ মুসার মনে হলো, অস্বাভাবিক কিছু তো ঘটে যেতে পারে! একবার হামলা ব্যর্থ হয়েছে, আরেকটা হামলা তো আসতে পারে! দাউদের বাড়ির ঘটনা ইতিমধ্যে তারা জানতেও পারে। সতর্ক হয়ে উঠল আহমদ মুসা।

সে পা বাড়াবে ড: নুর আবদুল্লাহর বাড়ির দিকে যাবার জন্যে এমন সময় সে দেখতে পেল কমপ্লেক্সের দিক থেকে দুটো হেডলাইট এগিয়ে আসছে।

আহমদ মুসা দ্রুত গেট রুমের একটা থামের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল।

এগিয়ে আসা গাড়িটি গেটের কাছাকাছি এসে স্পিড কমিয়ে দিয়ে দু’বার হর্ন বাজাল। হর্ন শুনেই আহমদ মুসা বুঝল ওটা ইহুদী গোয়েন্দা সংস্থা ইরগুন জাই লিউমি’র সংকেত। নিশ্চিত হলো ওটা দাউদের দলের গাড়ি।

হর্ন বাজানোর কয়েক মুহূর্ত সব চুপচাপ। তার পরেই গাড়ি থেকে একটা হাত বেরিয়ে এল। আর সংগে সংগেই ক্রিকেট বলের মত গোলাকার একটা বস্তু

ছুটে গেল আহমদ মুসার গাড়ির লক্ষ্যে। গোলাকার বস্তুটি সরাসরি গিয়ে আঘাত করল আহমদ মুসার গাড়িতে। সংগে সংগেই প্রচন্ড বিস্ফোরণ। টুকরো টুকরো হয়ে গেল আহমদ মুসার গাড়ি।

এগিয়ে আসা গাড়িটি মুহূর্তের জন্যে থেমে গিয়েছিল। আবার নড়ে উঠল।

আহমদ মুসার কাছ থেকে গাড়ির দূরত্ব পাঁচ'ছ গজের মত। আহমদ মুসা সিদ্ধান্ত নিল গাড়ি থামাতে হবে। নিশ্চয় কোন অঘটন ঘটিয়ে ফিরে যাচ্ছে শত্রুর গাড়িটি।

গোলাকার সেই বস্তু অর্থাৎ গ্রেনেডটি ছোঁড়া হয়েছিল ড্রাইভারের সিট থেকে। সে জানালা খোলা।

আহমদ মুসা রিভলবার তুলে গুলী করল ড্রাইভারের আবছা অবয়বটা লক্ষ্য করে।

একটা চাপা আর্তনাদ ভেসে এল। একবারই মাত্র। তারপর গাড়িটা একটু বেঁকে গিয়ে থেমে গেল।

গাড়ির মাথাটা বেঁকে এল গেট রুমের দিকেই। নিকটতর হলো গাড়িটা এবং গাড়ির দু'পাশটা এখন আহমদ মুসার চোখের সামনে। আহমদ মুসা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল এই অযাচিত সাহায্যে।

গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে একজন হাত উঁচু করে গেট রুম লক্ষ্যে গুলী করতে করতে গাড়ির ওপাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল।

আহমদ মুসা এরই অপেক্ষা করছিল রিভলবার বাগিয়ে। লোকটির মাথা উঁচু হবার সাথে সাথেই ট্রিগার টিপল আহমদ মুসা ওর মাথা লক্ষ্যে।

মাথাটা আর ওর উঠল না দেহটা তার খসে পড়ল গাড়ির দরজাতেই।

আর কেউ বেরুল না গাড়ি থেকে। গুলীও এল না।

আহমদ মুসা ভাবল, গাড়িতে শত্রু পক্ষের কেউ থাকতে পারে। আহমদ মুসা আড়াল থেকে বের হওয়ার অপেক্ষা করতে পারে।

এই সময় আহমদ মুসা কমপ্লেক্সের দিক থেকে কয়েকজনকে আসতে দেখল। সেই সাথে ভেতর থেকে গাড়ির দরজায় ধাক্কা দেয়ার শব্দ শুনতে পেল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা বুঝল শত্রু পক্ষের কেউ নেই। নিশ্চয় কাউকে ওরা বন্দী করে এনেছিল তারাই বের হবার চেষ্টা করছে।

আহমদ মুসা ছুটে গেল গাড়ির দিকে।

গাড়ির কাঁচে ডার্ক শেড দেয়া। বাইরে থেকে কিছুই দেখা গেল না।

আহমদ মুসা সামনের গেট দিয়ে লাশ ডিঙিয়ে ভেতরে উঁকি দিল। তার হাতে তখন উদ্যত রিভলবার।

'মুসা ভাই দরজা খুলে দিন, আমরা বাঁধা।' জোয়ানের কণ্ঠ। আহমদ মুসা দ্রুত দরজা অন-লক করে দিয়ে বাইরে এসে দরজা খুলে দিল্

প্রথম বেরিয়ে এল জোয়ান, তারপর একে একে ড: নুর আবদুল্লাহ এবং ড: আবদুল্লাহ জাবের। তাদের সকলকেই পিছমোড়া করে বাঁধা।

এই সময় গবেষণা কেন্দ্রের নিরাপত্তা কর্মীসহ অন্যান্য লোকজন এসে পড়ল। তারা বাঁধন খুলে দিল সকলের।

বাঁধন খুললেই ড: নুর আবদুল্লাহ এসে আহমদ মুসাকে জড়িয়ে ধরল। বলল, ঠিক সময়ে আপনি এসে না পড়লে কি যে হতো! আপনি আমাদের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।

আহমদ মুসার মাথায় তখন অন্য চিন্তা গবেষণা কেন্দ্রের ভেতরে এসব হত্যাকান্ড ও ঘটনার একটা ব্যাখ্যা গবেষণা কেন্দ্রকে দিতে হবে।

চিন্তা করে নিয়ে আহমদ মুসা ডঃ নূর আব্দুল্লাহকে বলল, জনাব পুলিশ ষ্টেশনে খবর দিতে হবে। বলতে হবে আজ গবেষণাগার থেকে একটা গবেষণা রিপোর্ট চুরি হওয়ার পর এসব ঘটনা ঘটেছে। আপনারা কিডন্যাপ হবার পর যা ঘটেছে তার বাইরে আপনারা কিছুই জানেন না। সামনের গাড়ী ধ্বংস হবার পর ওদের গুলীতেই এ' দু'জন মরেছে। পরে কমপ্লেক্সের লোকজন আপনাদের উদ্ধার করেছে।

গবেষণা কেন্দ্রের সিকুরিটি চীফও আহমদ মুসার কথাগুলো শুনছিল। বলল, অর্থাৎ আমাদের শুধু একটা বিষয়ই গোপন করতে হবে, সেটা হলো, এ দু'জন আপনার হাতে নিহত হওয়া।

'কারণ আমি সাক্ষ্য দেবার জন্য ইটালীতে থাকতে পারবো না, এ কারণেই।

'ঠিক আছে জনাব, বলল সিকুরিটি চীফ।

সিকুরিটি চীফ ইসমত আবেদিন তুর্কি বংশোদ্ভূত একজন ইটালীয় মুসলিম। ইটালীয় আর্মির একজন অবসর প্রাপ্ত কর্ণেল। ট্রিয়েস্টেই তার বাড়ি। পুলিশ ও প্রশাসন মহলে তার পরিচিতি ব্যাপক।

'মিঃ ইসমত আপনিই আমার পক্ষ থেকে পুলিশ স্টেশনে ডাইরি করুন। সব আপনি শুনলেন, অন্য সব বিষয় আপনি জানেন। যে ভাবে লিখতে হয়, লিখবেন।

কথা শেষ করে ডঃ নুর আব্দুল্লাহ বলল, দারোয়ান কোথায়? পালালেও সে তো এতক্ষণ আসার কথা।

'আমি দেখছি স্যার। বলে ইসমত আবেদিন গেট রুমের দিকে গেল।

গেট রুমের ভিতরে গিয়ে সে চিৎকার করে উঠল, এখানে পড়ে আছে, কে যেন তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করেছে।

'ও যেভাবে আছে সে ভাবেই থাক'। বলল আহমদ মুসা।

ইসমত আবেদিন ফিরে এলো।

তার গ্যারেজ থেকে গাড়ী নিয়ে চলল পুলিশ স্টেশনে।

'জনাব আপনার সাথে আমার অত্যন্ত জরুরি আলাপ আছে, এখনি সে আলাপ করতে হবে। ডঃ নূর আব্দুল্লাহকে বলল আহমদ মুসা।

'চলুন আমার বাসায় ফেরা যাক'।

বলে ডঃ নূর আব্দুল্লাহ যাবার জন্যে পা তুলতে তুলতে বলল, অন্যান্য লোকদের লক্ষ্য করে। গেটটা এভাবেই থাকবে, তোমরা এখানেই থাক, সব যেমন আছে, তেমনই থাকবে।

ডঃ নূর আব্দুল্লাহ, ডঃ আব্দুল্লাহ জাবের, জোয়ান এবং আহমদ মুসা পাশাপাশি হেঁটে চলল, ডঃ নূর আব্দুল্লাহর বাড়ীর দিকে।

ডঃ নূর আব্দুল্লাহর বৈঠকখানায় বসে আহমদ মুসা রেষ্ট হাউজ থেকে যাবার পর দাউদের বাড়িতে পৌছা, দাউদের হাতে তার বন্দী হওয়া, ইহুদী

গোয়েন্দা সংস্থার চিঠিটি থেকে দাউদের প্রকৃত পরিচয় ও তার কুকর্তির সব ঘটনা জানা, বন্দী দশা থেকে মুক্ত হওয়া, দু'জন ইহুদী গোয়েন্দাকর্মীকে হত্যা, দাউদকে আহত করা, দাউদকে গাড়ীর লাগেজ কেবিনে পুরে মটেল 'সি কুইন' যাওয়া সেখানকার ঘটনায় আরেক ইহুদী গোয়েন্দা কর্মীকে হত্যা এবং অধ্যাপক ভিলারোয়াকে ধরে নিয়ে যাওয়া এবং তার কাছ থেকে 'তেজস্ক্রিয় রিপোর্ট ও স্যাম্পুল উদ্ধার করা, প্রভৃতি সব ঘটনা বলা শেষ করে বলল, কমপ্লেক্সের গেটে যা ঘটল তা তো আপনারা দেখছেন।

ঘটনা শুনার পর কেউ কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলনা। ডঃ নূর আব্দুল্লাহর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। সম্ভবতঃ গবেষণা কেন্দ্র ভয়াবহ তেজস্ক্রিয়ের শিকার হওয়ার কথা শুনে। কিছুক্ষণ পর ভাঙা গলায় বলল, আমাদের গবেষণা কেন্দ্রেও ওরা সেই ভয়াবহ তেজস্ক্রিয় পেতেছে। আমাদের সব তথ্য দাউদ পাচার করেছে ইহুদী সংস্থার কাছে। দাউদ তাহলে ইরগুন জাই লিউমি'র গোয়েন্দা কর্মী ডেভিড ইমরান।

বলে অনেক্ষণ মুখ নিচু করে থাকল ডঃ নূর আব্দুল্লাহ। যখন মুখ তুলল, দেখা গেল তার দু'চোখ দিয়ে অশ্রু গড়াচ্ছে। কাঁপা গলায় বলল, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আহমদ মুসা, আপনি সবার বহু সাধের এ গবেষণা সংস্থাকে অবশেষে বাঁচাবার একটা ব্যবস্থা করেছেন। আমি বিজ্ঞানী ডঃ সালামের এ পবিত্র আমানতের হেফাজত করতে পারিনি। আমি যথেষ্ট সতর্ক ছিলাম না। আমার বুঝা উচিত ছিল মুসলিম জগৎ ও তৃতীয় বিশ্বের উন্নতির একটা গুরুত্বপূর্ণ সোপান এ গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করার চেষ্টা অনেকেই করবে।

ডঃ নূর আব্দুল্লাহর শেষের কথা আবেগে ভেঙে পড়ল। আহমদ মুসা দাউদের কাছে লিখা ইরগুন জাই লিউমি'র চিঠিটি ডঃ নূর আব্দুল্লাহর হাতে দিতে দিতে বলল, অতীত এখন অতীত ডঃ নূর আব্দুল্লাহ। আমাদের এখন বর্তমান নিয়ে ভাবতে হবে। আল্লাহর অশেষ প্রশংসা যে তিনি ওদের ষড়যন্ত্র অবশেষে হাতে-নাতে ধরিয়ে দিয়েছেন।

দাউদ তাহলে ও গাড়ীটার লাগেজ কেবিনে ছিল, বিস্ফোরণে তাহলে সেও শেষ হয়ে গেছে। চিঠিতে নজর বুলাতে বুলাতে বলল ডঃ নূর আব্দুল্লাহ।

'জি হ্যাঁ, এটাই ঘটেছে। যদিও তার এ পরিণতি আমি চাইনি। আমি বন্দী করে নিয়ে এসেছিলাম এজন্যেই যে, তার কাছ থেকে আরও কথা পাওয়া যাবে। কিন্তু সে সুযোগ হলো না।

আহমদ মুসা কথা শেষ করে পকেট থেকে তেজস্ক্রিয় রিপোর্ট বের করে ডঃ নূর আব্দুল্লাহর হাতে দিয়ে বলল, রিপোর্ট কি বলছে দয়া করে বলুন।

রিপোর্টের উপর চোখ বুলাতে বুলাতে ডঃ নূর আব্দুল্লাহর কপাল কুঞ্চিত হয়ে উঠল, বিষণ্ন হয়ে উঠল তার মুখ। সে রিপোর্টটি ডঃ আব্দুল্লাহ জাবেরের হাতে তুলে দিতে দিতে বলল, দুঃসংবাদ জনাব আহমদ মুসা। বিশেষ তেজস্ক্রিয় বিষের কোন এ্যান্টিডোজ এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। যেখানে তেজস্ক্রিয় পোতা আছে তা খুজে বের করে তাকে তুলে ফেলা অথবা সে কমপ্লেক্স বা বিল্ডিং ছেড়ে সরে যাওয়া ছাড়া কোন বিকল্প নেই।

শুনে আহমদ মুসার মুখেও চিন্তা ও শংকার ভাব ফুটে উঠল, বলল, মাদ্রিদের মসজিদ কমপ্লেক্স না হয় ছেড়ে দিয়ে বাঁচা গেল, কিন্তু স্পেনের কর্ডোভা, গ্রানাডা, মালাগা, সেভিল প্রভৃতির শত শত অমূল্য মুসলিম স্মৃতি চিহ্নগুলোকে আমরা বাঁচাব কেমন করে। এতগুলো স্থান থেকে তেজস্ক্রিয়ের স্থান খুঁজে বের করা এবং তা তুলে ফেলা কি সম্ভব! আহমদ মুসার কন্ঠে অসহায় ও ভেঙে পড়া সুর।

আহমদ মুসার মত জোয়ানের মুখও অন্ধকার হয়ে উঠেছে। ভেঙে পড়েছে উভয়েই। কোন ঘটনায় জীবনে আহমদ মুসা এভাবে ভেঙে পড়েনি।

'মুসা ভাই আপনার কন্ঠে সাহসের সুর, আশার আশ্বাস বানী শুনতে আমরা অভ্যস্ত। আপনি ভেঙে পড়লে আর কেউ দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না।

একটু থামল ডঃ আব্দুল্লাহ জাবের। থেমেই আবার শুরু করল, সব ব্যাপারেই আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করেছেন। এ ব্যাপারেও নিশ্চয় করবেন। যেমন তিনি সাহায্য করলেন আমাদের গৌরবের এ গবেষণাগারকে। আল্লাহ আপনাকে ট্রিয়েস্টে এই কাজের জন্যেই এনেছিলেন। আল্লাহ আপনাকে স্পেনে নিয়ে এসেছেন সাফল্য দিবেনই আল্লাহ আপনাকে।

আবেগে ভারী হয়ে উঠেছে ডঃ আব্দুল্লাহ জাবেরের কন্ঠ।

‘ডঃ নূর আব্দুল্লাহ, ডঃ জাবের আমি এবং জোয়ান এই রাতে এখনই আমরা স্পেন যাত্রা করতে চাই। বলল, আহমদ মুসা।

একটু থেমেই আহমদ মুসা বলল, ‘দোয়া করুন আপনারা, স্পেনের অবস্থা গুরুতর। জোয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও মরিসকো হওয়ার কারনে শিক্ষার পথ তার রুদ্ধ হয়ে গেছে। এই পরিচয় প্রকাশ হওয়ায় অনেককে জীবন দিতে হচ্ছে। এ সবের মোকাবেলায় আল্লাহ যেন আমাদের সাফল্য দান করেন।

‘আবার বলছি মুসা ভাই, আল্লাহ আপনাকে সফল করবেন। এই সাফল্য আপনার হাতে আসবে বলেই আল্লাহ আপনাকে স্পেনে নিয়ে গেছেন। বলল, ডঃ আব্দুল্লাহ জাবের।

আল্লাহ সাফল্য দান করেন কতকগুলো শর্তে। ঈমানের দৃঢ়তা এবং যোগ্যতা তার মধ্যে অন্যতম। এগুলো না থাকলে তো আল্লাহর সাহায্য আসবেনা, এখানেই ভয় জাবের।

‘আল্লাহ সব সাহায্যেরই মালিক’। বলল, ডঃ জাবের।

আমার একটা কথা। বলল ডঃ নূর আব্দুল্লাহ।

‘বলুন’, বলল, আহমদ মুসা।

‘মিঃ জোয়ান একটি বিরাট বিজ্ঞান প্রতিভা, তার মেধাকে আমরা আমদের গবেষণা কেন্দ্রের কাজে লাগাতে চাই।

আমি খুশি হব এটা হলে। তুমি কি বল জোয়ান?

‘আপনি যা নির্দেশ করবেন, তাই করব।’

‘ঠিক আছে জোয়ান আসবে, তবে ওকে আমাদের আর একটু দরকার আছে। বেশী সময় নয়। দু’একমাস পরেই সে আসতে পারবে।’

‘জোয়ান তুমি একটা ফরম নিয়ে যাও। পুরণ করে দু’চার দিনের মধ্যেই পাঠিয়ে দিও।’ বলল ডঃ নুর আব্দুল্লাহ।

‘ধন্যবাদ।’ বলল জোয়ান।

ডঃ নুর আবদুল্লাহ উঠে গিয়ে দু’টি ফরম এনে জোয়ানের হাতে দিল।

‘দু’টি কেন?’ জোয়ান বলল।

‘রাখ, দরকার হতেও পারে।’

আহমেদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘আমরা এখনি যেতে চাই।’

জোয়ানও উঠে দাঁড়াল।

‘এখনি যাবেন?’ বলল ডঃ নুর আবদুল্লাহ।

‘এখনি মানে এই মুহূর্তে।’

বলে আহমদ মুসা হ্যান্ডশেকের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল ডঃ নুর আবদুল্লাহর দিকে।

ডঃ নুর আবদুল্লাহ ও ডঃ জাবেরের সাথে হ্যান্ডশেক করে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল আহমদ মুসা।

পরে তার পেছনে বেরিয়ে এল জোয়ানও।

ড্রইং রুমের দরজায় এসে দাঁড়াল ডঃ নুর আবদুল্লাহ এবং ডঃ আবদুল্লাহ জাবের।

বাগানের ভেতর দিয়ে লাল সুড়কির রাস্তা দিয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে আহমদ মুসা ও জোয়ান।

‘কোন পথে ওঁরা যাবেন, গাড়ি লাগবে কিনা, কিছুই জিজ্ঞাসা করা হলো না। ডাকি ওঁদের...।’

বলে সামনে পা চালাতে গেল ডঃ নুর আবদুল্লাহ।

ডঃ আবদুল্লাহ জাবের তাকে হাত দিয়ে বারণ করে বলল, ‘ডেকে লাভ হবে না। একটা পরিকল্পনা উনি নিশ্চয় করেছেন কোন প্রয়োজন হলে নিজেই বলতেন।’

‘তবু...।’

‘লাভ হবে না। নিজের পায়ে ভর করে স্বাধীনভাবে উনি চলবেন, এটাই ওঁর নিয়ম। কাউকে কষ্ট না দিয়ে যতটা সম্ভব নিজেই কষ্ট করবেন, এটাই ওঁর রীতি।’

‘তাই তো উনি সবার এত প্রিয়, তাই তো উনি এতবড় বিপ্লবী।’

‘হ্যাঁ, তাই।’

এগিয়ে চলছিল দু'জন রাত সাড়ে বারটায় শীতল নিরবতার মাঝে মৃদু স্পন্দন তুলে।

আহমদ মুসা ও জোয়ান যখন গবেষণা কেন্দ্রের এলাকা পেরিয়ে রাস্তায় উঠল, তখন পুলিশের দু'টি গাড়ি দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল আই সি টি পি' কমপ্লেক্সের দিকে।

আহমেদ মুসা একবার সেদিকে তাকিয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে সামনে নিক্ষেপ করল।

'কেন তাড়াতাড়ি চলে এলাম জান জোয়ান, ডঃ নুর আবদুল্লাহ যাতে সহজেই বলতে পারেন, গবেষণা কেন্দ্র থেকে চুরি করা একটা দলিলকে কেন্দ্র করে দু'দলের সংঘাতের ফল এসব ঘটনা, হত্যা কাণ্ড।' বলল আহমদ মুসা।

'দু'দল প্রমাণ হবে কি করে?'

'দু'টো গাড়ির মুখো-মুখি সংঘাত। তাছাড়া মিঃ ভিলারোয়া এর জীবন্ত সাক্ষ্য হবেন। এক পক্ষ তাকে তেজস্ক্রিয় ও স্যাম্পুল দিয়েছিল, অন্য পক্ষ তার কাছ থেকে সেগুলো কেড়ে নিয়েছে। আমি মনে করি, মিঃ ভিলারোয়াকে পুলিশ আপাততঃ ছাড়ছে না।'

'তাহলে জেনদের কি হবে?'

'ওদের চলে যেতে অসুবিধা হবে না, কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে মাত্র।'

'ওকে আমরা টেলিফোন করতে পারি না, শেষ খবরটা নিতে পারি না?

আহমদ মুসার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল। বলল, তোমার উদ্বেগ বুঝতে পারছি জোয়ান। কিন্তু এ সময় বাইরের কোন টেলিফোন জেনকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দিতে পারে। এমনিতেই সে ভয়ানক কাজ করে বসে আছে।'

রেস্ট হউজের দু'জন লোক নিহত হওয়ার ঘটনা মনে পড়ল জোয়ানের। আহমদ মুসা বলেছিল, সে দু'জন জেনের গুলীতেই মরেছে। জেনের শান্ত, সুন্দর, সরল মুখটা ভেসে উঠল জোয়ানের চোখে। জেন জোয়ানের জন্যে এতবড় ঝুঁকি নিল। জেনের কাছে সে এতবড়। কোন ভাবে জানাজানি হলে ওর যে কি হবে। বোকার মত পিস্তলটা আবার সাথে রাখেনি তো। মনটা অস্বস্তিতে ভরে গেল

জোয়ানের। একটা বোবা আতংক এসে তাকে ঘিরে ধরল। তার মনে হলো, তার জেনের নিরাপত্তার চেয়ে বড় যেন তার কাছে এখন আর কিছু নেই।

বলল জোয়ান, 'জেনের যদি কোন বিপদ ঘটে যায়?'

'আমি সেটা চিন্তা করেছি জোয়ান। কিন্তু আমরা তার সাথে যোগাযোগ করি কিংবা তাকে সেখানে থেকে সরিয়ে আনি- যাই করি আমরা তাকে ঘিরে, তাতে সে বেশী সন্দেহের শিকার হবে।'

থামল। 'একটু ভাবল আহমেদ মুসা, তারপর একটু হেসে বলল, তোমার জেনের জন্যে এটুকু করতে পারি, সে ট্রিয়েস্ট ছাড়ার আগে আমরা ট্রিয়েস্ট থেকে যাব না।'

'সেটা কিভাবে? আমরা তো ট্রিয়েস্ট ছাড়ছি।'

'আমরা যাচ্ছি বোটে। বোটে বসে আমরা যত খুশী অপেক্ষা করতে পারি।'

'কার বোট?'

'ও তুমি জান না। আমি ভেনিস থেকে বোট নিয়ে এসেছি ঝামেলায় যাতে না পড়তে হয় এ জন্যে। বোট ফিডেল ফিলিপের এক ভেনিসীয় বন্ধুর। তার বন্ধুটি আবার মুসলমান। সুতরাং বলতে পার বোটটি আমাদেরই।'

'আমরা কি আবার ভেনিসে যাব?'

'হ্যাঁ, বোটে ভেনিস। ভেনিস থেকে ফ্রান্সের 'মার্শেল' হয়ে দক্ষিণ ফ্রান্সের 'তুলুজ'। তুলুজ থেকে সড়ক পথে ফ্রান্স পেরিয়ে বাসক এলাকা দিয়ে পিরেনিজ পর্বত পার হয়ে স্পেনে।'

'আপনি এ পথেই বুঝি এসেছেন? আপনি ইউরপের এই অঞ্চলে নতুন। নাগরিকত্বের ঝামেলা আছে। আপনি কি করে একা এলেন?'

'ফিলিপ আমাকে স্পেনের অত্যন্ত বৈধ একটা পাসপোর্ট করে দিয়েছে। আর একা তো নই। আমার সাথে আবদুর রাহমান সপ্তম এসেছে, সে বাসক গেরিলার একজননেতা, মুসলমান। ফ্রান্স, ইটালী, ইত্যাদি তার কাছে বৈঠকখানার মত।'

'কোথায় সে?'

‘বোটে।’

কোন কথা এল না জোয়ানের তরফ থেকে।

একটা ট্যাক্সি দেখে ডেকে নিল আহমেদ মুসা।

উঠে বসল দু’জন গাড়িতে।

ছুটে চলল গাড়ি ট্রিয়েস্টের ‘বিনোদন বন্দরের’ দিকে। ওটা ট্রিয়েস্টের শুধু নয়, গোটা দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের অত্যন্ত লোভনীয় পর্যটন কেন্দ্র। ওখানেই রাখা আছে আহমেদ মুসার বোট।

# ৪

ট্রিয়েস্ট থেকে বের হওয়ার চতুর্থ দিন মধ্যরাতে আহমদ মুসারা তুলুজ বিমান বন্দরে পৌঁছাল। অথচ সিডিউল অনুসারে দ্বিতীয় দিন মধ্যরাতে তাদের তুলুজে পৌঁছার কথা ছিল। ট্রিয়েস্টে তাদেরকে দেখা করতে হয়নি। সকালেই তারা মটেল 'সি-কুইন'- এর রিসেপশনে টেলিফোন করে জানতে পেরেছিল, শুধু অধ্যাপক ভিলারোয়া ছাড়া সবাই রাতের প্লেনেই মাদ্রিদ রওনা হয়ে গেছে। আহমেদ মুসাদেরকে দু'দিন কাটাতে হয়েছে ভেনিসে।

আহমদ মুসারা ভেনিসে পৌঁছেছিল বুধবার বিকেলে। শুক্রবার পর্যন্ত তাদেরকে ভেনিসে থাকতে হয়েছে। ফিলিপ ও আবদুর রহমান সপ্তম এর বন্ধু ইব্রাহিম আলফনেসা কিছুতেই আহমেদ মুসাকে ছাড়তে রাজী হয়নি। তার যুক্তি ছিল, শুক্রবার বাদ জুমা গুরুত্বপূর্ণ দু'জন খৃস্টানের ইসলাম গ্রহণের অনুষ্ঠান আছে, এ অনুষ্ঠানে আহমদ মুসাকে হাজির থাকতেই হবে।

আপত্তি কিছু করলেও লোভ জেগেছিল আহমদ মুসার মনে। ভেনিসের মসজিদে জুমা পড়া যাবে, এখানকার মুসলমানদের সাথে সাক্ষাৎ হবে, সবচেয়ে বড় লাভ হবে দু'জন ভাইয়ের ইসলাম- গ্রহণ অনুষ্ঠানে হাজির থাকতে পারা।

সুতরাং ইব্রাহিম আলফনেসার যুক্তিতে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। আহমদ মুসা সেদিন আলাপ করছিল আলফনসোর ড্রইংরুমে বসে।

আহমদ মুসা কি সিদ্ধান্ত নেবে না নেবে ভাবছিল সেই সময় ঘরে প্রবেশ করেছিল একটি মেয়ে। পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত নামানো তার স্কার্ট জুতার প্রান্ত কোন ছুঁই ছুঁই করছে। গায়ে কোট। মাথায় রুমাল, চোখের প্রান্ত পর্যন্ত নামানো।

ঘরে ঢুকে সালাম দিয়ে মেয়েটি ইব্রাহিম আলফনসোকে বলেছিল, 'একটা সুখবর আব্বা'।

'আমার মেয়ে আয়েশা। ভেনিস বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে'। মেয়েটিকে দেখিয়ে বলেছিল আলফনসো।

কথা শেষ করেই মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করেছিল আলফনসো, ‘তুমি বুঝি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলে?’

‘জি, হ্যাঁ’।

‘তুমি তো এঁদের চিন না’।

‘চিনি না, আম্মার কাছে শুনলাম’।

‘কি শুনলে?’

‘ইনি সেই আহমদ মুসা’। আহমদ মুসার দিকে ইংগিত করে বলল মেয়েটি।

‘কোন আহমদ মুসা?’ একটু হেসে জিজ্ঞাসা করল আলফনসো।

‘যিনি মুসলমানদের জর্জওয়াশিংটন, যিনি মুক্ত করেছেন ফিলিস্তিন, মিন্দানাও, মধ্য এশিয়া, ককেশাস ও বলকানের মুসলমানদের?’

‘জর্জওয়াশিংটনের সাথে তুলনা কি মিলল, মা?’

‘ঠিক মেলে না, জর্জওয়াশিংটন একটা সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়েছেন মাত্র। কিন্তু ইনি একটা সার্বিক মুক্তি আন্দোলনের নির্মাতা ও সাফল্যদানকারি। ইনি সর্বোচ্চ সেনানায়ক, আবার সর্বনিম্ন সৈনিকও। ইনি যা আদেশ করেন, প্রথমে তিনি তা পালন করতে সামনে অগ্রসর হন। জর্জওয়াশিংটন শুধু ছিলেন মাথার ব্যক্তি, এমন মাথা ও মাটির ব্যক্তি ছিলেন না?’

আলফনসোর মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়েছিল। তার জায়গায় এসেছিল বিস্ময়। মেয়ের দিকে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে আলফনসো বলেছিল, ‘এত কথা এমন কথা তুমি জানলে কি করে, শিখলে কোত্থেকে মা?’

তখনই উত্তর দেয় নি আয়েশা। একটুক্ষণ চুপ করে ছিল। তারপর বলেছিল, ‘আপনাকে বলিনি আব্বা, আমরা ‘ইয়ুথ সোসাইটি ফর ইউরোপিয়ান রেনেসা’ নামে একটি সংগঠন করেছি। ছেলে ও মেয়েদের জন্যে এর দু’টি ভিন্ন ভিন্ন উইং আছে। দু’টো উইং স্বাধীনভাবে কাজ করে। প্রতি সপ্তাহে আমরা স্ট্যাডি সার্কেলে বসি। আমরা দু’টো কাজ করি, এক, ইসলামের আকিদা-বিশ্বাস ও ইতিহাস শিক্ষা করি আমরা, দুই, দেশ-বিদেশের সমস্যা নিয়ে আমরা আলোচনা করি, কোন দেশে মুসলমানদের কি সমস্যা সে তথ্য আমরা যোগাড় করি এবং

বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম সংস্থা সংগঠনকে আমরা সাধ্যমত বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, কাটিং, স্লিপিং পাঠিয়ে সাহায্য করি। এই সূত্রেই আমরা জনাব আহমদ মুসা সম্পর্কে জেনেছি'।

'এ সোসাইটি কি তোমার ভেনিস কেন্দ্রিক?'

'না আব্বা। এ সোসাইটি প্রথম গঠিত হয় জার্মানির মিউনিখ শহরে। ইসলাম গ্রহণকারী একজন জার্মান তরুণ ইঞ্জিনিয়ার এই সোসাইটি গঠনের উদ্যোক্তা। এই ইঞ্জিনিয়ার সৌদি আরবে পাঁচ বছর ছিলো একটি পারমাণবিক প্রকল্পে এবং সেখানেই ইসলাম গ্রহণ করেন। এখন এই সোসাইটি গোটা মধ্য ইউরোপ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের ইটালিতেই আছে ২০টি কেন্দ্র'।

আয়েশা থামতেই আহমদ মুসা বলে উঠেছিল, 'বোন, তোমাদের কাজের মতই তোমাদের সোসাইটির নামটা সুন্দর। কিন্তু বলত, 'আজকের সমৃদ্ধ ও সুন্দর ইউরোপ তার রেনেসাঁরই ফল, আবার ইউরোপে রেঁনেসা কেন?'

আয়েশার মুখে এক টুকরো সলজ্জ হাসি ফুটে উঠেছিল। বলেছিল সে, জনাব এর উত্তর আপনি জানেন, তবু বলছি, ইউরোপের সে রেনেসাঁ ইউরোপকে সমৃদ্ধি দিয়েছে এবং সমৃদ্ধিজাত সৌন্দর্য্য দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু এই সমৃদ্ধি এবং সমৃদ্ধিজাত সৌন্দর্য্য নিয়ে তারা কোন পথে চলবে, কোন পথে চললে তাদের আত্মার পরিতৃপ্তি আসবে, কোন পথে চললে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে আনবে তাদের সার্বিক মংগল, সেই ব্যাপারে ইউরোপ আজ ভীষণ অন্ধকারে। এই অন্ধকারে তাদের হতাশা ক্রমেই বাড়ছে, জীবন হয়ে উঠেছে ক্লান্তিকর। মহত্তর ও মংগলতর অতি-জীবনিক একটি লক্ষ্যের অভাবে তাদের জীবন ও সমৃদ্ধি সবই অর্থহীন হয়ে পড়ছে। আমাদের রেনেসাঁ ইউরোপকে এই জীবন-বিনাশী অবস্থার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যেই। আজ একমাত্র ইসলামেই আছে এই রেঁনেসার শক্তি'।

'ধন্যবাদ বোন। তুমি যে মহত্তর ও মংগলতর অতি-জীবনিক একটা লক্ষ্যের কথা বললে সেটা কি?'

সেই সলজ্জ হাসি আবার ফুটে উঠেছিল আয়েশার মুখে। বলেছিল, 'মাফ করবেন, আমার কথা আমি পরিষ্কার করতে পারিনি। অতি-জীবনিক বলতে

বুঝাতে চেয়েছি জীবন-পরপারের অর্থাৎ পরকালীন জীবনের মহত্তর, উচ্চতর লক্ষ্যের কথা'।

'অর্থাৎ আমাদের এই জীবনের স্বস্তি ও সুখকে এবং অর্থ-প্রাচুর্যের অর্থময়তাকে তুমি পরকালীন জীবন-মুখী মহত্তর ও উচ্চতর লক্ষ্যের সাথে সম্পৃক্ত করেছ। এর ব্যাখ্যা তুমি কিভাবে করবে'। বলেছিল আহমদ মুসা।

আয়েশার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল। বলেছিল সে, 'সব বিষয় আমি ভালভাবে বুঝিনি। আমি যেটুকু বলতে পারব তাহলো, এই জীবনটাই যদি শেষ হয়, এই জীবনের পর যদি আর কিছু না থাকে, তাহলে অর্থ-প্রাচুর্য-সমৃদ্ধি সবকিছু সত্ত্বেও জীবনে এক সময় হতাশা এসে দাঁড়ায়, সবকিছু অর্থহীন হয়ে পড়ে। যেমন, যে কোন সময় মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে, আর মৃত্যুর সাথে সাথেই যদি সব শেষ হয়ে যায়, তাহলে জীবনের এত আয়োজন কেন, এর প্রয়োজন কি! এ থেকেই আসে জীবনে বিশৃঙ্খলা, জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা। যার একটা প্রকাশ হলো, অস্বাভাবিক ধরণের ভাব-প্রবণতা, নেশাগ্রস্ততা। এটা হলো একদিক। আরেকটা দিক হলো, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ করতে ভোগও প্রয়োজন, ত্যাগও প্রয়োজন। প্রয়োজন ভোগ ও ত্যাগের ভারসাম্য। কিন্তু পরকালীন জীবন যদি না থাকে, সেখানে যদি পুরস্কারের নিশ্চয়তা এবং শান্তির যদি বিষয় না থাকে তাহলে মানুষ অব্যাহতভাবে ত্যাগ করে যাবে কেন, স্বেচ্ছাচারিতা অন্যায় ও অবিচার থেকে স্বেচ্ছায় বিরত থাকবে কেন? সুতরাং আমাদের এই জীবনের সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি পরকালীন জীবনের উচ্চতর ও মহত্তর প্রতিশ্রুতি ও পুরস্কারের সাথে সম্পৃক্ত'।

আহমদ মুসার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। ভেনিসে বসে ইউরোপীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন ইউরোপীয় তরুণীর কন্ঠে এই কথাগুলো শুধু অপরূপ নয়, অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল আহমদ মুসার কাছে। বলেছিল আহমদ মুসা, 'ধন্যবাদ বোন, এত শিখলে কোথায়, স্ট্যাডি সার্কেলে?'

'স্ট্যাডি সার্কেলে এবং বই পড়ে'।

'কি বই?'

‘সাইয়েদ কুতুব ও আবুল আ’লার তাফসীর, তাদের জীবনী এবং আরও অনেকের বই’।

‘কোথায় পাও?’

‘আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক বই আছে’।

‘কিনেছে ওরা?’

সোসাইটির মাধ্যমে আমরা পরিকল্পনা করেছি, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চেষ্টার মাধ্যমে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়েই এই সব বই কিনিয়ে নেব। আমরা তাই করেছি। এখন অন্ততঃ মধ্য ইউরোপের সব বিশ্ববিদ্যালয়েই প্রয়োজনীয় সব বই পাওয়া যায়’।

‘তোমাদের সোসাইটির কথা আমাকে বিস্মিত করেছে বোন। তোমরা অনেক-অনেক এগিয়েছ। আমার মনে হচ্ছে কি জান, ইউরোপের তোমরাই হবে আজকের বিশ্বে ইসলামের সবচেয়ে সুদক্ষ বাহিনী’।

‘ধন্যবাদ। কালকে আমাদের জোনাল সম্মেলন। ভেনিসেই। আপনাকে পেলে সেটা হবে আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার চেয়েও বড় বিস্ময়। আপনাকে দাওয়াত দিচ্ছি আমি’।

আয়েশার আব্বা আলফনসো চট করে বলে উঠেছিল, ‘ওদের প্লেন আজ রাতেই, চলে যেতে চাচ্ছেন ওরা’।

আয়েশা ছোট চঞ্চলা মেয়ের মত উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, ‘না আব্বা, ওঁদের যাওয়া হবে না কিছুতেই, যেতে দেব না। আহমদ মুসার উপর আমাদেরও অধিকার আছে। ইউরোপের প্রতিও ওঁর দায়িত্ব আছে’।

‘বল তুমি ওঁকে’। বলেছিল আলফনসো।

আহমদ মুসা সোফায় গা এলিয়ে দিয়েছিল। গম্ভীর কন্ঠে বলেছিল, ‘স্পেনে ফেরার কেন আমার এত তাড়া তা আপনারা জানলে দেরী করতে আমাকে বলতেন না। ওখানে মুসলমানদের অবশিষ্ট চিহ্নটুকুর উপর ভয়াবহ আঘাত আসছে, যে দীপ শিখাটুকু মাদ্রিদে জ্বলে উঠেছে, তাও নিভে যাওয়ার মুখে। আমরা একটা সাহায্যের জন্যে গিয়েছিলাম ট্রিয়েষ্টে ডঃ সালামের গবেষণা কেন্দ্রে। কিন্তু

সে সাহায্য সম্ভব নয়। এখন কঠিণতর পথে আমাদের এগুতে হবে। প্রতিটি মুহূর্ত এখন আমার কাছে অসহ্য রকম দীর্ঘ মনে হচ্ছে।'

থামল আহমদ মুসা।

গোটা ড্রইং রুমে নেমে এসেছে গাম্ভীর্য। আয়েশার মুখেও একটা বেদনা ও শংকার ভাব ফুটে উঠেছে। কারও মুখে কোন কথা নেই।

আহমদ মুসাই আবার কথা বলেছিল, 'তবু আমি থাকব দু'দিন ভেনিসে। জনাব আলফনসোর কথায় আমি দূর্বল হয়েছিলাম। আর আয়েশার কথায় আমি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছি।'

আয়েশার মুখে হাসি ফুটে উঠেছিল। ছুটে চলে যাচ্ছিল ভেতরে, সম্ভবতঃ তার মাকে সুখবরটি জানাবার জন্যেই। দু'পা গিয়েই ফিরে দাঁড়িয়েছিল আয়েশা। বলেছিল তার আব্বাকে লক্ষ করে, 'আপনাকে যে সুখবর জানাতে এসেছিলাম সেটা হলো, শুক্রবারে দু'জন ছাড়াও আরো কয়েকজন ইসলাম কবুল করতে পারে।'

কথা শেষ করেই আয়েশা ছুটছিল ভেতরে।

আলফনসো বলে উঠেছিল, 'শুন আয়েশা, এ খবর কার কাছ থেকে শুনলে, তুমি?

কিন্তু কে কার কথা শুনে। আলফনসো'র কথা শুরু হতে হতেই আয়েশা ভেতরে।

আহমদ মুসা মেয়েদের ইয়ুথ সোসাইটি ফর ইউরোপিয়ান রেনেসাঁর জোনাল সম্মেলনে গিয়েছিল। ঈদের আনন্দ এসেছিল সেদিন ঐ সম্মেলনে। প্রথমে ছিল বক্তৃতা। পনের মিনিটেই তার কথা শেষ করেছিল আহমদ মুসা। তারপর শুরু হয়েছিল প্রশ্নোত্তর। আড়াই ঘন্টা চলেছিল প্রশ্নোত্তরের আসর। এই আড়াই ঘন্টায় ইসলামের গত চৌদ্দশ' বছরের ইতিহাস, মুসলমানদের আজকের সমস্যা-সম্ভাবনার কোন প্রধানদিকই বাদ যায়নি। আহমদ মুসা ধৈর্যের সাথে সকল প্রশ্নের জবাব দিয়েছে। খুব খুশী হয়েছিল সে ইউরোপীয় বোনদের আগ্রহে। অনুষ্ঠান শেষে আহমদ মুসাকে ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে সোসাইটির পক্ষ থেকে

ভেনিস শাখার সভানেত্রী আয়েশা বলেছিল, 'সোসাইটির জীবনে আজ ঐতিহাসিক দিন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বিশেষ অনুগ্রহ আছে আহমদ মুসার উপর। তিনি যেখানে পা দেন, সেখানেই সোনার ফসল ফলে, মুসলমানদের জীবনের অন্ধকার কেটে গিয়ে আসে সোনালী দিন তার এই আগমন আমাদের মাঝে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এক পরিকল্পনার ফল আমরা মনে করি। তাঁর কথা, তাঁর শিক্ষা এবং তাঁর উৎসাহ দান আমাদের সোসাইটিকে নতুন জীবন দান করবে, আমাদের বহুদূর এগিয়ে নিবে। তাঁর কাছে আমাদের দাবী, ইউরোপ বঞ্চিত, ইউরোপের মানুষ বঞ্চিত, মুসলিম বিশ্ব ইউরোপের প্রতি নজর দিক। ইউরোপের মান অনুসারে উপ্যুক্ত ও যথেষ্ট ইসলামী সাহিত্য এখনও সৃষ্টি হয়নি। ইংরেজীতে, ফরাসী ভাষায় কিছু আছে, ইউরোপের অনেক জাতীয় ভাষায় ইসলামী সাহিত্য শূণ্যের কোঠায়। যোগ্য মুসলিম মিশনারীর সংখ্যাও বলা যায় শূণ্যের অংকে এই বিষয়গুলোর দিকে আমরা আমাদের মহান ভাই-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। জোর দিয়েই আমরা তাকে বলতে চাচ্ছি, ইসলামী আন্দোলনগুলো যে পরিশ্রম, যে কষ্ট, যে ত্যাগ ও কোরবানী মুসলিম দেশগুলোতে করছে, তা যদি তারা ইউরোপের জন্যে করে, তাহলে হাজারগুণ বেশী ফল তারা লাভ করবে। আমরা আশা করছি, ইউরোপের এই আকুল কণ্ঠ তাঁর মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বে যাদের কাছে পৌঁছা দরকার তাদের কাছে নিশ্চয় পৌঁছবে। আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের মহান ভাই-এর দীর্ঘ জীবন ও সব ক্ষেত্রে কামিয়াবী প্রার্থনা করছি। আর প্রার্থনা করছি, ইউরোপও যেন তাঁকে পায়।'

আহমদ মুসাকে ভেনিসের আবু আলী সুলাইমান মসজিদে নামায পড়াতে হয়েছিল।

ভেনিসের এই আবু আলী সুলাইমান মসজিদটি এ্ই নামের পুরানো মসজিদের ধ্বংসাবশেষের উপর নতুনভাবে নির্মিত হয়েছে। এই অপরূপ সুন্দর মসজিদ কমপ্লেক্সটিতে রয়েছে একটা বাজার, একটা শিক্ষালয়, একটা বড় সম্মেলন কেন্দ্র, একটা লাইব্রেরী।

এই আবু আলী সুলাইমান মসজিদের একটা ইতিহাস আছে।

তখন পঞ্চদশ শতকের শেষ দশক। তুরস্কে খলিফার আসনে তখন দিগ্বীজয়ী সুলাইমান। সমগ্র ভূমধ্যসাগর তার নৌবহরের দখলে। ইটালীর উপকূল ও বহু নগরী তাঁর কব্জায়। রোমের মত ভেনিস তখন খৃষ্টান প্রতিরোধের দুর্ভ্যেদ্য দূর্গ। এই দুর্ভেদ্য দূর্গে সুলাইমানের মুসলিম নৌবহর প্রবেশ করতে পারেনি। কিন্তু প্রবেশ করেছিল ইসলাম প্রচারক আবু আলী সুলাইমান। তাঁর হাতে ছিল কোরআন, আর তাঁর পিঠের ছোট্ট পুটুলিতে ছিল শুকনো রুটি। সৌম্যদর্শন, মৃদুভাষি ও দয়ালু হৃদয় আবু আলী সুলাইমান ছিল ভেনিসবাসীদের কাছে এক বিস্ময়। যে ভেনিসবাসীরা জানত মুসলমানরা যুদ্ধ, হত্যা ও নিষ্ঠুরতার প্রতীক, সেই ভেনিসবাসীরা একটা ভিন্ন চিত্র দেখল আবু আলী সুলাইমানের মধ্যে। তাঁর নম্রতা, ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের কাছে দাঁড়ালে হিংসা-বিদ্বেষ কোথায় যেন হাওয়া হয়ে যায়। ভীষণ স্বভাবের অপরাধীরা তাঁর সংস্পর্শে এলে গলে খাঁটি সোনা হয়ে যায়। তখন চারদিকের রণ-উন্মাদনা ও রণ-ডংকার মধ্যে তিনি যেন শান্তির এক ছায়াদার বৃক্ষ।

আবু আলী সুলাইমান তার বাসের স্থান নির্দিষ্ট করেছিলেন ভেনিসের এক প্রান্তে এক ছোট্ট-শান্ত স্রোতস্বীনির তীরে। খুব শীঘ্রই স্থানটি ধনী-নির্ধন সকলের দর্শন গাহ হয়ে উঠল। তিনি সকলকে বলতেন, স্রষ্টা যেভাবে চান সেভাবে না চলার কারণেই মানুষের মনে, সমাজে, দেশে-সবটা জুড়ে আসে অশান্তি। সব আচরণের জন্যে স্রষ্টামূখী না হয়ে স্বেচ্ছাচারী হওয়াই মানবতার জন্যে সবচেয়ে বড় অপরাধ। তিনি মানুষকে জানালেন, ইসলাম শুধু মানুষের নয়, কুকুর, ঘোড়ার মত পশুদেরও নিরাপত্তা বিধান করে, তাদের সুখ-দুঃখের কথা ভাবে।

আবু আলী সুলাইমানের ক্ষুদ্র কুটিরের সামনে গড়ে উঠে মসজিদ। সেখান থেকে উচ্চারিত হতে থাকে মুয়াজ্জিনের আযান দিনে পাঁচবার। এক থেকে দুই, দুই থেকে তিন, তিন থেকে চার-এইভাবে ধীরে ধীরে নামাজিতে ভরে উঠে মসজিদ। গড়ে উঠে ভেনিসে একটি মুসলিম সমাজ। আবু আলী সুলাইমান শীঘ্রই শাসকদের কোপ দৃষ্টিতে পড়েন। বলা হলো আবু আলী সুলাইমান তুরস্কের সুলতান দিগ্বীজয়ী সুলাইমানের চর। একদিন ফজরের সময় নামাযীরা গিয়ে দেখল, আবু আলী সুলাইমানের রক্তাক্ত ও নিষ্প্রাণ দেহ পড়ে আছে মসজিদে

জায়নামাযের উপর। তীক্ষ্ণধার ছুরির আঘাতের পর আঘাতে তার দেহ বিকৃত হয়েছে, কিন্তু মুখ ভরা ছিল পবিত্র হাসি, যেমন তিনি হাসতেন ঠিক তেমনি। সে দৃশ্যের দিকে চেয়ে মানুষ ডুকরে কেঁদে উঠেছিল।

তারপর ভেনিসের মুসলমানরা মসজিদের নামকরণ করে আবু আলী সুলাইমান মসজিদ। আবু আলী সুলাইমান মরলেও মানুষ তার নামকে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করে এইভাবে।

কিন্তু ভেনিসের দূর্বল সংখ্যালঘু মুসলমানরা শেষ পর্যন্ত তা পারেনি। আবু আলী সুলাইমানকে যেমন হত্যা করা হয়, তেমনি মসজিদটিকেও, প্রায় একশ' বছর পরে, ধ্বংস করা হয় এবং সেখানে গড়ে তোলা হয় গীর্জা।

কিন্তু ঊনিশ শতকের শেষ দিক থেকেই গীর্জাটি পরিত্যক্ত হয়, কোন উপাসক সেখানে আর যেত না রোববারের নির্দিষ্ট প্রার্থনা সভায়। সেখানে গড়ে উঠে ক্লাব, পরে রেস্তোঁরা। স্থানটি কিন্তু পরিচিত ছিল সব সময় 'হোলি আবু আলী সুলাইমান' বলেই।

অনেক পরে ভেনিসের মুসলমানরা স্থানটি কেনার উদ্যোগ নেয়। সিদ্ধান্ত নেয় পুরানো বুনিয়াদের উপর আবু আলী সুলাইমান মসজিদটি পূনঃনির্মাণের। কিন্তু অনেক টাকা প্রয়োজন। কোথায় সে টাকা। অবশেষে মক্কার রাবেতায়ে আলম আল-ইসলামী সাহায্যে এগিয়ে আসে। স্থানটি কেনার জন্যে অর্থ সাহায্য দেয়। তারপর সৌদি সরকারের অর্থ সাহায্যে গড়ে উঠে সুন্দর, সুদৃশ্য আবু আলী সুলাইমান মসজিদ কমপ্লেক্স।

এই কাহিনী আহমদ মুসা শুনেছিল আগেই। যখন সে আবু আলী সুলাইমান মসজিদে প্রবেশ করেছিল, তার স্মৃতির পর্দায় ভেসে উঠেছিল আবু আলী সুলাইমানের সব কাহিনী। একা এক মানুষ আবু আলী এসেছিলেন এই ভেনিসে- দেশ ছেড়ে, আত্মীয় স্বজন, পরিবার-পরিজন সব ছেড়ে! কিসের টানে তিনি এসেছিলেন এই বিদেশ- বিভূই-এ! মানুষের প্রতি ভালবাসার টানে, তাদেরকে মুক্তির পথ দেখাবার উদগ্র বাসনায়। নিজেদের সমস্ত সুখ-শান্তি বিসর্জন দানকারী এই মহান ত্যাগি ব্যক্তিদের চেষ্টার কারণেই ইসলামের আলো

বিশ্বের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই মহান অগ্রজদের কথা স্মরণ করতে গিয়ে আহমদ মুসার চোখ দু'টি ঝাপসা হয়ে উঠেছিল অশ্রুতে।

ইমাম সাহেবের অনুরোধে আহমদ মুসাকেই জুম্মার খোতবা দিতে হয়েছিল।

বিরাট মসজিদ। এক পাশে ছেলেরা, আরেক পাশে মেয়েরা। ভরে গিয়েছিল মসজিদ। শুধু ভেনিস নয়, আশ-পাশ থেকে যারা টেলিফোনে খবর পেয়েছিল তারাও ছুটে এসেছিল। প্রায় তিন হাজারের মত মুসল্লি হাজির হয়েছিল। অধিকাংশই যুবক ও তরুণ।

খোতবায় আহমদ মুসা বলেছিল, ইসলাম প্রচলিত অর্থের কোন ধর্ম নয়। জাগতিক জীবনে মানুষ যাতে ক্ষতি ও অন্যায়-অবিচার থেকে বাঁচতে পারে, সুখে-শান্তিতে থাকতে পারে এবং পরকালে যাতে চিরন্তন শান্তির জীবন লাভ করতে পারে ইসলাম তারই একক একটি প্রাকৃতিক বিধান। আহমদ মুসা বলেছিল ইসলাম কিভাবে এসেছিল কিভাবে বিজয় লাভ করেছিল এবং কিভাবে দাঁড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বব্যাপী। এই কথা বলতে গিয়ে সে স্মরণ করেছিল খাজা মঈনুদ্দিন চিশতীর কথা, শাহজালালের কথা, এক আবু আলী সুলাইমানসহ হাজারো শহীদি আত্মার কথা। বলতে গিয়ে আবেগে তার কন্ঠ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কেঁদে উঠেছিল মসজিদের প্রতিটি মুসল্লি। অশ্রু গড়িয়েছিল তাদের চোখ থেকে অঝর ধারায়। তারপর আহমদ মুসা বলেছিল মুসলমানদের আদর্শ-বিচ্যুতি কি করে সেই সোনালী দিনের ইতি ঘটাল, স্বার্থপরতাজাত অনৈক্য কি করে তাদের পতন ঘটাল সেই কাহিনী। আত্মবিনাশের সেই মর্মন্তুদ কাহিনী আবার মুসল্লিদের চোখ সজল করে তুলেছিল। এরপর আহমদ মুসা বলেছিল, পতনের শেষতল থেকে মুসলমানরা আবার উঠে আসছে, পৃথিবীকে পথ দেখাবার দায়িত্ব নিয়ে যে জাতির উত্থান, সেই মুসলিম জাতি সেই দায়িত্ব গ্রহণের জন্যে আবার আজ এগিয়ে আসছে। স্বার্থপরতাজাত অনৈক্য যে মুসলিম জাতির একদিন পতন ঘটিয়েছিল, জীবন দেয়ার মত চুড়ান্ত ত্যাগ স্বীকার করে তারা আজ ঐক্যকে আবার সংহত করছে। মানবতার কল্যাণে এবং মহৎ উদ্দেশ্যে জীবন দেবার সংখ্যা যে জাতির মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান হারে বাড়ে, সে জাতির উত্থান কেউ রোধ করতে পারে না, সে

জাতির বিশ্ব-নেতৃত্ব ঠেকিয়ে রাখতে পারে না কেউ। মুসলমানদের আবার বিশ্ব-নেতৃত্ব লাভ অবধারিত। আমি দুর দিগন্তে সে সোনালী দিনের স্বর্ণরেখা দেখতে পাচ্ছি। আহমদ মুসার এ শেষ কথাগুলো আনন্দে উজ্জ্বল করে তুলেছিল মুসল্লিদের মুখগুলোকে। আহমদ মুসা উপসংহারে বলেছিল, সে সোনালী দিনে পৌছার জন্যে সংগ্রামের এক কঠিন পথ এখনও আমাদের পাড়ি দিতে হবে।

জুম্মার নামাযের পর শুরু হয়েছিল ইসলাম গ্রহণ করতে আসা লোকদের ইসলামে দীক্ষা দানের অনুষ্ঠান।

কথা ছিল দু'ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণের। একজন ভেনিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, আরেকজন তরুণ ব্যবসায়ী। কিন্তু ইসলাম গ্রহণকারীর সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছিল সাতে। এদের পরের পাঁচজনের মধ্যে তিনজন সরকারী চাকুরে, দু'জন ব্যবসায়ী। সবাই বয়সে যুবক। সকলের মধ্যে প্রবীণ একমাত্র ভেনিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তাঁর বয়স পঞ্চাশ। পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক তিনি। উল্লেখ্য, তাঁকে নিয়ে এ পর্যন্ত ভেনিস বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন অধ্যাপক ইসলাম গ্রহণ করলেন।

সকলের অনুরোধে আহমদ মুসাই ওঁদের সকলের ইসলাম গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছিল।

অনুষ্ঠান ও দোয়া শেষে আহমদ মুসা অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে আলোচনা করেছিল কয়েকজনের সাথে।

প্রবীণ অধ্যাপক জোস ওরতেগা, মুসলিম নাম আহমদ হাসান'কে আহমদ মুসা জিজ্ঞাসা করেছিল, ইসলামের কোন জিনিসটি আপনাকে আকৃষ্ট করেছিল সবচেয়ে বেশী'।

'কোন একটা দিককে আমি চিহ্নিত করতে পারবো না। জীবন সম্পর্কে ইসলামের টোটাল দর্শনটাই আমাকে আকৃষ্ট করে'। বলেছিল অধ্যাপক ওরতেগা।

'আকৃষ্ট হওয়ার বিষয়টা কি ছিল?'

'তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত' এর বিশ্বাস সম্মিলিতভাবে যে অপূর্ব ও ভারসাম্যপূর্ণ বিধানের জন্ম দিয়েছে সেটা'।

কথার মাঝখানে একটু হেসেছিল অধ্যাপক ওরতেগা। তারপর আবার শুরু করেছিল, তাওহিদের বিশ্বাস মানুষকে সমস্ত অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার এবং সকল প্রকার দাসত্ব থেকে মুক্ত করে এক স্বাধীন মানুষে পরিণত করে, যেখানে উপরে এক আল্লাহ ছাড়া তার উপরে আর কেউ থাকে না। আর রেসালত সেই আল্লাহর খলিফা অর্থাৎ প্রতিনিধির মর্যাদায় অভিসিক্ত করে, আর তাকে দেয় স্রষ্টার দেয়া জীবন পরিচালনার সংবিধান। আখেরাতের বিশ্বাস 'মানুষকে দেয় সকল কৃতকর্মের জওয়াবদিহীর সদাজাগরুক ভয় এবং পরকালের চিরন্তনী জীবনে সৎ জীবনের জন্যে পুরস্কারের নিশ্চয়তা এবং অসৎ জীবনের জন্যে শাস্তির প্রবল ভীতি। জাগতিক জীবনকে সুখ ও শান্তিপূর্ণ করার জন্যে মানুষের এমন এক ভারসাম্যপূর্ণ জীবন অপরিহার্য'।

আহমদ মুসা অধ্যাপক ওরতেগার কথা শুনে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেছিল। বলেছিল, অধ্যাপক ওরতেগার এই উপলব্ধি যদি ইউরোপের জাগ্রত বিবেকের কাছে আমরা পৌঁছাতে পারি, তাহলে আমি মনে করি ইউরোপে পরিবর্তনের এক বিপ্লব ঘটে যাবে। মুসা বিন নুসায়েরের যে বিজয় অভিযান অষ্টম শতাব্দীতে ফ্রান্সের দক্ষিণ সীমান্ত পিরেনিজ পর্বতমালায় এসে থেমে গিয়েছিল, সে বিজয় আমরা ইউরোপে সম্পূর্ণ করতে পারবো। সমর শক্তি যা সেদিন পারেনি, ইসলামের আদর্শের শক্তি তা পারবে।

তরুণ-তরুণীর দল যারা হাজির ছিল সে সমাবেশে, তারা আনন্দে তকবীর দিয়ে উঠেছিল। তাদের চোখে-মুখে ফুটে উঠেছিল উজ্জ্বল ভবিষ্যতের এক স্বপ্ন।

আহমদ মুসা তরুণ যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল সেদিন তাদের সাথেও আলোচনা করেছিল, তাদের উপলব্ধির সাথে পরিচিত হবার জন্যে।

একজন তরুণ বলেছিল, আমি কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলাম। কিন্তু কম্যুনিষ্ট অর্থনীতি ও তার সাম্যবাদ অবাস্তব ও ব্যর্থ প্রমানিত হবার পর আমি হতাশায় ভুগছিলাম। সে সময় আমি 'ইয়ুথ সোসাইটি ফর ইউরোপিয়ান রেনেসা' আয়োজিত একটি সেমিনারে উপস্থিত হয়েছিলাম। সে সেমিনারে একজন বক্তা বলেছিলেন, 'শাসন দন্ড উচিয়ে বন্টনের সাম্যতা বিধানের মধ্যে শুধু অবাস্তবতা

নয়, এক ধরণের নিপীড়নও বিদ্যমান রয়েছে। ইসলাম এই ধরণের সাম্যতা নয়, আইনের সাম্যতা বিধানে অত্যন্ত কঠোর এবং আপোষহীন। এখানে একজন দুর্বলতম সাধারণ লোকের অভিযোগে রাষ্ট্র প্রধানকেও আসামীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াতে হয়। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় একজন সাধারণ লোক রাষ্ট্র প্রধানকেও রাস্তায় দাঁড় করিয়ে কৈফিয়ত তলব করতে পারে। ইসলাম মানুষের স্বাধীন আয়-ব্যয়ের উপর এমন নৈতিক ও আইনগত বিধিনিষেধ আরোপ করে এবং আয় ও ব্যয়কারীকে এমন দায়িত্ববোধে উজ্জীবিত করে যার ফলে সম্পদ অব্যাহতভাবে বিতরণশীল হয়ে ওঠে এবং এই সমাজে ধনী হওয়া যেমন কঠিন, তেমনি গরীব থাকাও অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এই কল্যাণ-সমাজে রাষ্ট্র প্রধানের ভাতা বা বেতন সাধারণ মানুষের অংশের চেয়ে বেশী হতে পারে না। আর এই কল্যাণ সমাজে শুধু মানুষ নয়, কুকুরও যদি না খেয়ে থাকে তার জন্যে আল্লাহর কাছে জওয়াবদিহীর ভয়ে রাষ্ট্র প্রধান ভীত থাকে'। এই কথাগুলো আমার সামনে অজানা এক জগতের দ্বার খুলে দেয় এবং আমাকে এমনভাবে প্রভাবিত করে যে, আমি ইসলাম সম্পর্কে পড়াশুনা করতে বাধ্য হই। ধীরে ধীরে আমার কাছে প্রতিভাত হয়ে ওঠে যে, মানবতার জন্যে স্বাভাবিক ও শান্তিময় জীবনের একমাত্র পথ ইসলাম। তার পরেই আমি ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি'।

'আপনার পরিবার থেকে কোন বাধা আসেনি?' আগ্রহের সাথে জিজ্ঞাসা করেছিল আহমদ মুসা।

'আসেনি। বরং আব্বা খুশী। তার বয়স একশ' তিন বছর, একজন গোঁড়া ক্যাথলিক তিনি। তিনি খুশী হয়েছেন কারণ আমি ধর্মদ্রোহী কম্যুনিজম থেকে ধর্মের দিকে আসছি। তিনি আমাকে বলেছেন, 'ইসলামই তোমাদের জন্যে উপযুক্ত। ধর্মগুলোর মধ্যে মাত্র ইসলামই তোমাদের দাবী পূরণ করতে পারে'।

আহমদ মুসার প্রশ্নের জবাবে আরেকজন যুবক বলেছিল, 'ইসলামের নামায আমাকে প্রথম আকৃষ্ট করে। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালে একটা মসজিদের কাছাকাছি আমি থাকতাম। আসা-যাওয়া কালে প্রায়ই এক সাথে মুসলমানদের নামায পড়তে দেখতাম। অনেক সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও দেখেছি। মুসলমানদের নামাযের মধ্যে গণতন্ত্র, সাম্যতা ও স্রষ্টার প্রতি আনুগত্যের চুড়ান্ত

প্রকাশ আমি দেখি। আরেকটা জিনিস আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। সেটা হলো, দিনে পাঁচবার নামায। এই ভাবে দিনে পাঁচবার কেউ যদি তার প্রভুর সামনে দাঁড়ায়, তাহলে নিঃসন্দেহে সে সৎ ও সুন্দর জীবনের অধিকারী হবে। এই অনুভূতি থেকেই ইসলামকে জানার ব্যাপারে আমি আগ্রহী হই। ইয়ুথ সোসাইটি ফর ইউরোপিয়ান রেনেসাঁ' এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করে'।

আহমদ মুসা ঐ দিনই বিকেলে 'ইয়ুথ সোসাইটি ফর ইউরোপিয়ান রেনেসাঁ'র ছেলেদের শাখার এক আঞ্চলিক সম্মেলনে যোগদান করেছিল।

এই দিনই সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় আহমদ মুসারা ভেনিস ছেড়েছিল। তাদেরকে বিমানে তুলে দিতে এসেছিল একদল যুবক। আর এসেছিল ইব্রাহিম আলফনসো এবং আয়েশা।

বিমানের গ্যাংওয়েতে প্রবেশের আগে আহমদ মুসা শেষ বিদায় সম্ভাষণ জানাবার জন্যে ফিরে দাঁড়িয়েছিল। ফিরেই দেখতে পেয়েছিল আয়েশা একদম পেছনেই। তার নীলচোখ ভরা জল।

'কাঁদছ আয়েশা তুমি?' বলেছিল আহমদ মুসা।

'আর দেখা হবে না কোন দিন?' বলেছিল আয়েশা।

'জীবন পায়ে চলা পথের মত, কেউ তো নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারে না আয়েশা?'

'পথিক কি ফেরেনা তার ফেলে আসা পথে আর?'

'ফেরে বোন, আবার ফেরেও না।'

'তাহলে বোনরা কি হারিয়ে যাবে, ভাইদের জীবন থেকে?' অসহ্য এ অনুভূতি।'

আয়েশার চোখটা ভিজে উঠেছিল।

'না মা, এমন ভাবছ কেন? তুমিই না বলেছ, ইউরোপের দাবী আছে ওর প্রতি? ওকে আসতেই হবে।

'পরিচিত ভাই-বোনদের কাছে ফিরে আসতে আমারও ইচ্ছে করে, কিন্তু এ ওয়াদা কোথাও করতে পারিনি।'

'ক্ষণিকের এমন স্মৃতি বেদনাদায়ক।' চোখ মুছে বলল আয়েশা।

‘তবু এমন হাজারো ঘটনা জীবনের চলার পথে ঘটবেই।’

‘মনকে আল্লাহর জন্যে প্রস্তুত করেননি কেন?’

‘মানুষ তাহলে বোন মানুষ হতো না।’

‘তাহলে কি আল্লাহ চান বোনরা ভায়ের জন্য এভাবে কাঁদবে?’

‘অর্ধেক বললে ভাইরাও কাঁদবে বোনের জন্যে, মা কাঁদবে সন্তানের জন্যে, সন্তান কাঁদবে মায়ের জন্যে। এই মমতার বাঁধনেই তো মানব সমাজ বাঁধা।’

দরজায় যাত্রীর ভীড় বেড়ে গিয়েছিল। আহমদ মুসা ইব্রাহিম আলফনসোর দিকে চেয়ে বলেছিল, ‘আসি জনাব, সবাইকে আমার সালাম বলবেন।’

তারপর আয়েশার দিকে চেয়ে বলেছিল, ‘আসি বোন।’

আয়েশার ঠোট কাঁপছিল। কিন্তু কোন শব্দ বেরোয়নি। তার ভেজা চোখে করুন এক দৃষ্টি। আহমদ মুসার অন্তরের কোথায় যেন মোচড় দিয়ে উঠেছিল। এমনভাবে বিদায় জানাবার মত তার কোন বোন নেই। বোনরা এমন মমতাময় হয় ভাইদের প্রতি! তাদের অশ্রু-জলে এমন ভাবেই কি সিক্ত হয়ে উঠে ভায়ের চলার পথ!

আহমদ মুসার মমতা-বুভুক্ষ হৃদয় বেদনায় চিনচিন করে উঠেছিল।

একটা আবেগ যেন বুক থেকে ঠেলে উপরে উঠতে চাইছিল।

আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়িয়েছিল!

লম্বা পা ফেলে চলতে শুরু করেছিল সে গ্যাংওয়ে ধরে।

গ্যাংওয়েতে ঢোকার পথে দরজায় দাঁড়ানো একজন লোক বিস্ফারিত চোখে দেখছিল আহমদ মুসাকে।

আহমদ মুসা চলে যেতেই সে জিজ্ঞাসা করেছিল ইব্রাহিম আলফনসোকে, ‘কে ইনি?’

‘আহমদ মুসা।’ বলেছিল আলফনসো।

‘ঠিক বলেছেন।’

‘আপনি চেনেন তাকে?’

‘না মানে ছবি দেখেছি। উনি কোথায় যাচ্ছেন?’

‘ফ্রান্সের তুলুজ।’

শুনেই লোকটি ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। প্রবেশ করেছিল পাশের একটি কক্ষে। হাতে তুলে নিয়েছিল টেলিফোন।

‘আব্বা, ওর নাম বলে তুমি ঠিক করনি। লোকটিকে আমার ভাল মনে হলো না।’ বলেছিল আয়েশা।

‘ঠিক বলেছ মা, হঠাৎ বলে ফেলেছি।’

আয়েশার চোখে উদ্বেগ।

চোখ তখনও তার ভেজা অশ্রুতে।

তারা বাপ-বেটি দু’জন ঘুরে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করেছিল বিমান বন্দর থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে। বাইরে লবীতে অন্যেরা অপেক্ষায় ছিল।

ফ্রান্সের তুলুজ বিমান বন্দরে পা দেবার পর আহমদ মুসার মনটা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল নতুন চিন্তায়। চিন্তাটা স্পেনের মুসলিম স্মৃতি চিহ্নগুলো এবং মাদ্রিদের শাহ ফয়সাল মসজিদ কমপ্লেক্সকে তেজষ্ক্রিয়তার হাত থেকে উদ্ধার করার প্রশ্ন নিয়ে। একটা উদ্বেগ তার মনকে এসে ঘিরে ধরেছিল। মনে হচ্ছিল তার, একটি করে দিন যাচ্ছে আর তেজষ্ক্রিয় দানবের ভয়ংকর রূপ ভয়ংকরতর হয়ে উঠছে। যার গ্রাসে শেষ হয়ে যাচ্ছে স্পেন থেকে মুসলিম ইতিহাসের শেষ উপস্থিতিটুকু।

আহমদ মুসা বিমান বন্দর থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠল এই চিন্তা মাথায় নিয়ে।

ভাড়া করা ট্যাক্সি। মুরেট পর্যন্ত ভাড়া করেছে। মুরেট তুলুজের ৫০ মাইল দক্ষিণে একটা ছোট্ট শহর। মুরেটে আব্দুর রহমান সপ্তমের বন্ধুর বাড়ি। রাতে তারা ওখানেই উঠবে।

গাড়ি ভাড়া করেছে আব্দুর রহমান সপ্তম। সে বসেছে ড্রাইভারের পাশে। পেছনের সিটে আহমদ মুসা এবং জোয়ান।

মধ্যরাতের তুলুজ। রাস্তায় লোকজন গাড়ি-ঘোড়া খুব কম। আধা ঘুমন্ত নগরী। আলো-আধারীর লুকোচুরি খেলা ছাড়া দু'পাশে দেখার কিছু নেই। আহমদ মুসা গাড়িতে উঠে চোখ বন্ধ করে সিটে গা এলিয়ে দিয়েছে। তাকে আবার সেই চিন্তাই পেয়ে বসেছে। বিজ্ঞান যে তেজষ্ক্রিয়ের লোকেশনকে ডিটেক্ট করতে পারছেনা, সেই অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে সে অগ্রসর হবে কোন পথে! তেজষ্ক্রিয় বিকিরণ হওয়ার আগে কিংবা শুরুর পর্যায়ে তেজষ্ক্রিয় কেন্দ্রকে চিহ্নিত করা যেত, কিন্তু তেজষ্ক্রিয় একবার চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে ওই তেজষ্ক্রিয়ের কেন্দ্র আর চিহ্নিত করা যায় না। কারণ তেজষ্ক্রিয় রাখা আছে ডিটেকশন প্রুফ কন্টেইনারে। কয়েকটি সুক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে তেজষ্ক্রিয়ের বিকিরণ হয়। বিকিরণের মাত্রা এত সুক্ষ্ম যে, ছড়িয়ে পড়া তেজষ্ক্রিয়ের সাথে তা প্রায় একাকার থাকে। এই অবস্থায় কেন্দ্রকে ডিটেক্টর আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে পারে না। এই অবস্থায় তেজষ্ক্রিয় বিকিরণের উৎস চিহ্নিত করে তা অপসারণের কোন উপায় নেই, সেই সাথে এর কোন এন্টিডোটও নেই। এখন এগুবার পথ কি! এই চিন্তাটাই আহমদ মুসাকে পেয়ে বসেছে।

রাতের জনবিরল রাস্তায় তীব্র গতিতে এগিয়ে চলছিল আহমদ মুসাদের ভাড়া করা গাড়ি।

ড্রাইভার ছেলেটি যুবক বয়সের। পরনে ট্রাওজার, গায়ে জ্যাকেট। মাথার হ্যাটটা কপাল পর্যন্ত নামানো।

'কি ড্রাইভার, আমরা এতক্ষণও তো গেরোনে হাইওয়ে পেলাম না?' বলল আব্দুর রহমান সপ্তম।

ড্রাইভার তৎক্ষণাৎ জবাব দিল না।

আব্দুর রহমান সপ্তমের কথা বলার শব্দে আহমদ মুসার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল।

'একটু অন্য পথ দিয়ে যাচ্ছি তো।' একটু সময় নিয়ে জবাব দিল ড্রাইভার।

আব্দুর রহমান সপ্তমের প্রশ্ন, ড্রাইভারের দেরী করে জবাব দেয়া এবং ড্রাইভারের জবাবের ধরণ শুনে ভ্রু-কুঞ্চিত হয়ে উঠল আহমদ মুসার। একটু ভাবল আহমদ মুসা। তারপর বলল, অন্য পথটা কি বাঁকা পথ ড্রাইভার?

ড্রাইভার আবার একটু সময় নিয়ে বলল, জ্বি, একটু বাঁকা।

'এয়ারপোর্ট থেকে গেরোনে হাইওয়ে কোন দিকে?'

'পশ্চিম দিকে।' ড্রাইভার মুখ খোলার আগেই জবাব দিল আব্দুর রহমান সপ্তম।

আহমদ মুসা বসেছিল ড্রাইভারের পেছনের সিটেই।

আব্দুর রহমান সপ্তম কথা শেষ করার সংগে সংগে আহমদ মুসার বাম হাতটি দ্রুত গিয়ে ড্রাইভারের গলা সাপের মত পেঁচিয়ে ধরল।

আহমদ মুসা দেখছিল স্পিডোমিটারের পাশে দিক নির্দেশক বোর্ডে গাড়ি যাচ্ছে উত্তর দিকে। কিন্তু আহমদ মুসা জানে তাদের গন্তব্যস্থল মুরেট দক্ষিণ দিকে। মুরেটগামী গেরোনে হাইওয়েতে পড়ার জন্য দক্ষিণ দিক দিয়ে ঘোরা স্বাভাবিক, কিন্তু উত্তরে যাওয়া স্বাভাবিক নয়।

আহমদ মুসার হাত সাঁড়াশির মত চেপে ধরেছিল ড্রাইভারের গলা।

ড্রাইভারের গলা থেকে একটা শব্দও বের হলো না। রুদ্ধশ্বাস ড্রাইভারের চোখ দু'টি বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু হাত দু'টি তার সক্রিয় ছিল। এক হাত ছিল স্টিয়ারিং হুইলে, অন্য হাতে চেপে ধরেছিল হর্ন। একটানা বেজে চলছিল হর্ন।

আহমদ মুসা তার ডান হাত দিয়ে ড্রাইভারে হাত সরিয়ে দিল হর্ন থেকে। আহমদ মুসার বুঝতে অসুবিধা হয়নি হর্নের মাধ্যমে সংকেত পাঠাচ্ছে সে।

ওদিকে আব্দুর রহমান সপ্তম আহমদ মুসা ড্রাইভারের গলা পেঁচিয়ে ধরার সাথে সাথে এগিয়ে গিয়ে স্টিয়ারিংটা ধরে ফেলেছিল। গাড়িটা অল্পকিছু এঁকে-বেঁকে এগিয়ে আবার সোজা চলতে শুরু করল।

ড্রাইভারের দেহটা শিথিল হয়ে এলে আহমদ মুসা টেনে তুলে তার দেহটা পেছনে নিয়ে এল এবং তাকে উপুড় করে ফেলে তাকে বেঁধে ফেলার জন্যে বলল জোয়ানকে। তারপর উঠে এল ড্রাইভারের সিটে। স্টিয়ারিং হুইল আব্দুর রহমান সপ্তমের হাত থেকে নিয়ে তাকে বলল, তুমি পেছনে গিয়ে ওকে সামলাও।

ড্রাইভিং সিটে বসে রিয়ার ভিউ মিররের দিকে তাকিয়ে আহমদ মুসা দেখল, পেছন থেকে তীব্র বেগে চার'টি হেডলাইট ছুটে আসছে।

মাত্র কয়েক মুহূর্ত। তারপরেই পেছন থেকে আহমদ মুসার গাড়ির দু'পাশে দু'টি গাড়ি উঠে এল। ঘন ঘন হর্ন দিচ্ছিল গাড়ি দু'টি।

আহমদ মুসা বুঝল, গাড়ি দু'টি ড্রাইভারের দলের। ওরা নিশ্চয় পেছন থেকে অনুসরণ করছিল। নিয়ে যাচ্ছিল আহমদ মুসাদেরকে নিশ্চয় কোন একটা ফাঁদে। ড্রাইভারের হর্নে বিপদ সংকেত পেয়েই সম্ভবত ওরা এসেছে খোঁজ নিতে। হর্ন দিয়ে ওরা জানতে চাচ্ছে, ড্রাইভার ঠিক আছে কিনা।

আহমদ মুসা আরও বুঝল, তারা কোন এক অজ্ঞাত শত্রুর কবলে পড়েছে। কিন্তু কারা এরা? বিমান বন্দরে কেউ কি তাদের চিনে ফেলল? তা হলেও এটা কি করে সম্ভব! বিমান বন্দরে চিনে ফেললেও শত্রুদের পক্ষে এই আয়োজন এত তাড়াতাড়ি করে তো সম্ভব নয়! মনে হচ্ছে ফাঁদ যেন পেতে রাখা হয়েছিল। তাহলে কি তাদের আগমনের খবর আগেই এসে পৌঁছেছিল? হতে পারে ভেনিস অথবা মার্শেই বিমান বন্দরে কেউ তাদের চিনে ফেলে টেলিফোন করে দিয়েছে এখানে। ফ্রান্সের মার্শেই বিমান বন্দরেও তাদের ১ ঘন্টা যাত্রা বিরতি করতে হয়েছিল। কারা এই শত্রু? ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান কি? ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের হর্ন কোডের সাথে এদের হর্ন-সংকেতের মিল আছে। কিন্তু আনাড়ী মনে হচ্ছে অনেকটা। হতে পারে ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানেরই কোন একটা গ্রুপ।

দু'পাশ থেকে দু'টি গাড়ি সমান্তরালে চলে আসার সাথে সাথে আহমদ মুসা গাড়ির গতি বেগ আকস্মিকভাবে বাড়িয়ে দিল। তীব্র বেগে সামনে এগোলো আহমদ মুসার গাড়ি।

ওরা মনে করল শত্রু পালাচ্ছে। ওরাও বাড়িয়ে দিল গাড়ির বেগ। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওদের গাড়ি আবার আহমদ মুসার গাড়ির পেছনে চলে এল। এবার পেছন থেকে ওরা গুলী করল আহমদ মুসার গাড়ি লক্ষ্যে। পর পর দু'টো গুলী। আহমদ মুসার গাড়ির দু'টি টায়ার প্রায় একই সাথে ভীষণ শব্দে ফেটে গেল।

কয়েক গজ মাটি কামড়ে, এগিয়ে গাড়িটি স্থির দাঁড়িয়ে গেল।

'আব্দুর রহমান দেখো, ওর পকেটে নিশ্চয় পিস্তল আছে।'

আব্দুর রহমান সপ্তম পিস্তল আগেই বের করে নিয়েছিল। দ্রুত সে পিস্তলটি আহমদ মুসার হাতে তুলে দিল।

পিস্তলটি হাতে নিয়েই আহমদ মুসা ডানদিকে তাকাল। দেখ গাড়ি থেকে বেরিয়ে দু'জন ছুটে আসছে। হাতে ওদের পিস্তল। আহমদ মুসা মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে পর পর দু'টি গুলী ছুড়ল। অব্যর্থ নিশানা। গাড়ি থেকে মাত্র দু'হাত দূরে এসে লোক দুটি মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

আহমদ মুসা গুলী করার পর ওদিকে আর না তাকিয়েই লাফ দিয়ে চলে এল গাড়ির বাম পাশে।

'মুসা ভাই গাড়ির এ পাশটা লক করে দিয়েছি। দু'জন ওপাশে গেছে।' বলল আব্দুর রহমান সপ্তম।

'ধন্যবাদ আব্দুর রহমান, ডান পাশটাও লক করে দাও।' বলে আহমদ মুসা বাম পাশের দরজা খুলে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। তারপর সাপের মত দ্রুত বুকে হেঁটে গাড়ির সামনের দিকটা ঘুরে এসে ডান প্রান্তে উঁকি দিল। দেখল ওরা দুজন পিস্তল বাগিয়ে গাড়ির গা ঘেঁষে বুকে হেঁটে এগিয়ে আসছে গাড়ির সামনের দরজার দিকে।

আহমদ মুসা সময় নষ্ট করল না। আরও দুটি গুলী বেরিয়ে এল তার পিস্তল থেকে পর পর। গুরিয়ে গেল ওদের দুজনের মাথা।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় সামনে ডান পাশের গাড়ি থেকে নারী কন্ঠের একটা গোঙানী ভেসে এল। আহমদ মুসা পিস্তল বাগিয়ে ছুটল ঐ গাড়ির দিকে। গাড়ির দরজা খোলাই ছিল। আহমদ মুসা দেখল হাত, পা, মুখ বাঁধা একটা মেয়ে গাড়ির সিটে বসে। মুখের বাঁধন খোলার চেষ্টা করছে।

আহমদ মুসা পিস্তলটি পাশে ফেলে দিয়ে মেয়েটির মুখের বাঁধন খুলে দিল।

মুখের বাঁধন খুলে গেলেই মেয়েটি কেঁদে উঠল হাউ মাউ করে।

আহমদ মুসা মেয়েটির হাত খুলে দিতে দিতে বলল, 'কেঁদো না বোন, তোমার আর কোনও ভয় নেই।'

এ সময় পাশে এসে দাঁড়াল আব্দুর রহমান সপ্তম। তার সাথে জোয়ানও।

‘তোমরা গাড়িটা লক করে দিয়ে এসেছো?’ বলল আহমদ মুসা।

‘জি হ্যাঁ।’ বলল আব্দুর রহমান সপ্তম।

‘ভাল করেছ, পুলিশ অন্তত একজনকে তো পাবে। কিছু জানতে পারবে।’

মেয়েটির পায়ের বাধনও খোলা হয়ে গিয়েছিল। মেয়েটি মুখে রুমাল চেপে কাঁদছে তখনও।

‘বোন তুমি উঠে এসে সামনের সিটে বস।’ বলল আহমদ মুসা।

মেয়েটি সংগে সংগেই যন্ত্রের মত নির্দেশ পালন করল। সামনে ড্রাইভিং সিটের পাশে গিয়ে বসল।

আহমদ মুসা উঠে বসল ড্রাইভিং সিটে।

জোয়ান ও আব্দুর রহমান বসল পিছনের সিটে।

দূরে পেছনে পুলিশের গাড়ির সাইরেন শোনা গেল।

আহমদ মুসা স্টার্ট দিল গাড়িতে। ব্রান্ড নিউ গাড়ি। মাইল মিটারে দেখল মাত্র পাঁচশ মাইল চলেছে।

‘পেছনে চারটি হেডলাইট দেখা যাচ্ছে, পুলিশের গাড়ি এদিকে আসছে।’ পেছন থেকে বলল আব্দুর রহমান সপ্তম।

আহমদ মুসার গাড়ি তখন চলতে শুরু করেছে।

সব ঘটনা মাত্র দু’মিনিটে শেষ হয়ে গেল।

সামনেই রাস্তায় বড় একটা টার্ন। সে টার্নটি পার হবার পর পুলিশের গাড়ি আর দেখা গেল না। আহমদ মুসা আলো নিভিয়ে গাড়ি চালাচ্ছিল। সুতরাং অত পেছন থেকে আহমদ মুসার গাড়ি তাদের নজরে পড়ার কথা নয়।

আহমদ মুসার গাড়ি চলছিল একশ’ চল্লিশ কিলোমিটার বেগে।

টার্ন নেবের পর আহমদ মুসা গাড়ির গতিবেগ কমিয়ে আশিতে নিয়ে এল।

মেয়েটি তখনও রুমালে মুখ বুজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

মেয়েটির পরনে ব্রাউন স্কার্ট, ব্রাউন কোট। মাথায় সাদা পশমের টুপি। বয়স বিশ বছরের বেশী হবে না। নিরেট ফরাসী চেহারা।

‘বোন, তুমি কে? কি করে ওদের হাতে পড়লে?’ বলল আহমদ মুসা মেয়েটির দিকে না তাকিয়েই।

মেয়েটির কান্না বেড়ে গেল। একটু পরে চোখ মুছে সে বলল, আমার দাদি মুমূর্ষ। টেলিফোন পেয়ে আমি যাচ্ছিলাম ওঁর কাছে। রাত ১১টায় ওরা আমাকে আমার এই গাড়ি সমেত কিডন্যাপ করে গেরোন হাইওয়ে থেকে।

‘কেন কিডন্যাপ করে?’

‘প্রথমে আমার গাড়ি ব্যবহার ওদের টার্গেট ছিল। পরে আমাকেও ওদের ঘাটিতে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ওদের মতলব খুব খারাপ ছিল।’

‘তোমার দাদির বাড়ি কোথায়?’

‘মন্ট্রেজু’তে।’

‘মন্ট্রেজু’তে? এত দূরের রাস্তা একা বেরিয়েছিলে এত রাতে?’

‘কি করব আমার আব্বা আম্মা থাকেন স্পেনে, ফ্রান্সের কূটনীতিক মিশনে। আমি তুলুজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি, একা থাকি।’

‘এখন তুমি কি করবে? কোথায় যেতে চাও?’

তৎক্ষণাৎ মেয়েটি কোন উত্তর দিল না। মনে হয় স্থির করতে পারছিল না।

আহমদ মুসাই কথা বলল আবার। বলল, দ্বিধা করো না বোন। এটা তোমার গাড়ি। যদি মনে কর আমরা এখানেই নেমে যাচ্ছি, তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যাও। আর আমি মনে করি মন্টেজু-তে আজ তোমার যাওয়া ঠিক হবে না।

মেয়েটি মুখ তুলে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। তার চোখে-মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন। মনে তার প্রশ্ন, কে এরা? সে নিজ চোখেই দেখেছে এই লোকটিই ঐ চারজন গুন্ডাকে পাখি শিকারের মত করে খুন করেছে। এর তো হওয়া উচিত ছিল ওদের চেয়েও কঠিন হৃদয় ও লোভী। এই রাত সাড়ে বারটায় যখন গাড়ি পাওয়া দুস্কর, তখন এভাবে গাড়ি ছেড়ে নেমে যাওয়ার প্রস্তাব করছে কেমন করে? এমন অস্বাভাবিক ব্যবহার তো সে দেখেনি!

“আজ আমাকে মন্টেজু” তে যেতে নিষেধ করছেন আপনি? বলল মেয়েটি।

ঠিক নিষেধ করছি না, আমি মনে করি একা যাওয়া নিরাপদ নয়।

মেয়েটির আরেক দফা বিস্মিত হবার পালা। একজন অচেনা, অজানা লোক তার নিরাপত্তার কথা এই ভাবে ভাবছে। মেয়েটির মনে পড়ল তার ছোটবেলার কথা। তখন পিতা মাতার সাথে থাকতো কায়রোতে। ওখানকার এক বৃদ্ধকে সে দেখত। তার কাজ ছিল অসুস্থ লোকের সেবা করা, পথহারা লোকদের পথ দেখানো এবং হারানো শিশুদের বাড়িতে পৌছে দেয়া। কিন্তু সে কারও গায়ে আচড় দিত না, আর এতো জলজ্যান্ত ৪টি লোক এখনি মারল। এখনও পিস্তল ওর পকেটে। এরপরও লোকটি এমন দায়িত্বশীল ও সৌজন্য বোধ সম্পন্ন হলো কি করে!

এ সময় নেমে গেলে আপনারা গাড়ি পাবেন কোথায়? এত রাতে তুলুজে কচ্চিত গাড়ি মেলে। বলল মেয়েটি।

কোন চিন্তা করো না। মানুষের চেষ্টা যেখানে শেষ হয়, বিধাতার চেষ্টা সেখান থেকে শুরু হয়।

মেয়েটি চোখ বড় বড় করে আহমদ মুসার দিকে তাকাল। বলল, আপনি বুঝি ঈশ্বরে খুব বিশ্বাস করেন?

অবশ্যই। তিনি আমার স্রষ্টা, তিনি আমার প্রতিপালক এবং তিনিই আমার সব কাজের বিচারক হবেন।

মেয়েটির মুখ হা হয়ে উঠল। লোকটি যে একদম গীর্জার ফাদারের মত কথা বলছে। কিন্তু গীর্জার ফাদাররা তো রক্তপাত করে না। কে এই বিচিত্র চরিত্রের চরিত্রের লোকটি।

একটু সময় নিয়ে মেয়েটি মুখ খুলল। ফিরে এল তার প্রসংগে। বলল, জনাব মন্ট্রেজু আমার যেতে হবে, জানি না আমার দাদির.......

মেয়েটির কন্ঠ ভারি হয়ে উঠেছিল। কথা শেষ না করেই সে থেমে গেল।

মিঃ সেভেন, আমাদের গন্তব্য তো মুরেট, মন্ট্রেজু এই একই রাস্তায় না? আহমদ মুসা একটু ঘাড় কাত করে পেছনে লক্ষ্য করে বলল।

আবদুর রহমান সপ্তমকে আহমদ মুসা বাইরের লোকদের সামনে তার নামে না ডেকে মিঃ সেভেন বলে।

জি হ্যাঁ। বলল আবদুর রহমান।

মুরেটে হল্ট করা কি আমাদের জন্য অপরিহার্য?

মোটেই না। আমরা শুধু ওখানে রাত কাটাতে চেয়েছিলাম।

আমরা তাহলে এখন সোজা মন্ট্রেজু যেতে পারি। ওকেও পৌছে দেয়া গেল, আমরা ওর গাড়িতে অনেকখানি এগিয়ে যেতে পারলাম।

এটাই বেটার হবে। বলল আবদুর রহমান সপ্তম।

আমি এখানকার রাস্তা ঘাট কিছুই চিনি না। তুমি আমাকে গাইড কর, এখন আমরা গেরোনে হাইওয়েতে উঠব। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল আহমদ মুসা।

মেয়েটির চোখ মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। জীবনের আশাই যেখানে সে ছেড়ে দিয়েছিল, সেখানে শুধু মুক্তি পাওয়াই নয়, রাতেই মন্ট্রেজুতেও সে যেতে পারছে। কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল তার মন পাশে বসা লোকটির প্রতি। সে তাকে সাক্ষাত জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করেছে। জীবনের ভয় সে করে না। কিন্তু গুন্ডাদের হাতে পড়লে জীবনের চেয়েও মুল্যবান জিনিস তাকে হারাতে হতো।

অনেক ধন্যবাদ আপনাদের।

মেয়েটি রাস্তা বাতলে দিল। মিনিট পাচেকের মধ্যেই আহমদ মুসার গাড়ি উঠে এল গেরোনে হাইওয়েতে।

এবার ছুটল গাড়ি দক্ষিণ দিকে গেরোনে হাইওয়ে ধরে। একদম রাস্তার ধার বরাবর প্রবাহিত দক্ষিণ ফ্রান্সের একটা বড় নদী গেরোনে। এই নদীর নাম অনুসারেই হয়েছে রাস্তার নাম। গেরোনে নদী নেমে এসেছে পিরোনিজ পর্বতমালা থেকে। পিরেনিজ-অভ্যন্তরের ছোট্ট দুর্গম নগরী ভেল্লা পর্যন্ত হাইওয়ে ও নদী এক সাথেই গেছে। ভেল্লা স্পেনের উত্তর সীমান্তের উপর দাড়ানো ছোট্ট পার্বত্য শহর। এই শহরের অদূরে দুর্গমতর এক উপত্যকায় আবদুর রহমান সপ্তমের বসতি।

রাতের গেরোনে হাইওয়ে।

একদম ফাকা।

তীরের মত ছুটছে আহমদ মুসার গাড়ি।

ঐ গুন্ডারা আপনাদের কিডন্যাপ করেছিল কেন? মৌনতা ভেঙ্গে প্রশ্ন করল মেয়েটি।

আমরা ওদের চিনি না, মতলব কি তাও জানি না। আগে থেকেই ফাদ পেতে বসেছিল ওরা। বলল আহমদ মুসা।

ওদের গল্প থেকে বুঝেছি, ভেনিস বিমান বন্দর থেকে কেউ ওদের টেলিফোন করেছিল। ওদের গল্পে এও বুঝেছি, সাংঘাতিক একজনকে ওরা ধরতে যাচ্ছে। সেই সাংঘাতিক লোক কে? আপনি?

তোমার তাই মনে হয় আমাকে?

মেয়েটির মুখে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠলো। বললো, হ্যাঁ।

কেন?

সাংঘাতিক না হলে ওভাবে চারজন ভীষণ গুন্ডা কি মরত?

সাংঘাতিক শব্দ কিন্তু কদর্যে ব্যবহৃত হয়। আমি কিন্তু ওদের হত্যা করিনি, ওদের হাত থেকে আমরা আত্মরক্ষা করেছি।

সরি। আমি সাংঘাতিক বলতে শক্তি বুঝিয়েছি।

আহমদ মুসা উত্তরে কিছু বলল না।

চলছিল গাড়ি ঝড়ের বেগে।

মাফ করবেন, আপনি কে? আপনারা কে? মেয়েটি মুখ ঘুরিয়ে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল।

পরিচয় জিজ্ঞাসা না করলেই খুশী হতাম মি....। তোমার নাম যেন কি?

আমি ডোনা জোসেফাইন। আপনার নাম?

বললাম তো জিজ্ঞাসা না করলেই খুশী হতাম। সংক্ষেপে, এ, এম, বলতে পার আমাকে। তোমার আব্বা কি রাষ্ট্রদূত স্পেনে?

জি হ্যাঁ।

তুমি তোমার আব্বার সাথে থাক না?

ছিলাম প্রাইমারী লেভেল পড়া পর্যন্ত।

কোন কোন দেশ তুমি দেখেছ?

কায়রো, রিয়াদ ও আংকারার কথা মনে আছে।

তোমার আব্বা মুসলিম দেশেই তো বেশী ছিলেন দেখছি?

হ্যাঁ, আমার আব্বা সারাসিনিক স্ট্যাডিজ-এ ডক্টরেট নিয়েছেন।

তোমরা কি খৃষ্টান?

বলছি, কিন্তু আপনার এ, এম, এর অর্থ কি?

ঠিক এই সময় সামনে অল্প দূরে রেড সিগন্যাল স্টিক জ্বলে উঠতে দেখা গেল।

প্রত্যেক গাড়িতেই এ ধরনের সিগন্যাল থাকে। বিপদে পড়লে এটা দিয়ে সংকেত দেয়া হয়।

হেড লাইটের আলোতে পরিস্কার দেখা যাচ্ছে, দুজন লোক পাশাপাশি দাড়িয়ে আছে। একজনের হাতে রেড সিগন্যাল। তাদের পাশেই রাস্তার এক ধারে একটা গাড়ি পার্ক করা।

রেড সিগন্যাল দেখার সাথে সাথেই ডোনার মুখ শুকিয়ে উঠেছিল। বলল, আজকেই কাগজে পড়েছি হাইওয়েতে রাতের বেলা ডাকাতি হচ্ছে, কিডন্যাপ হচ্ছে। কিডন্যাপ করে রেখে বড় অংকের টাকা দাবী করছে।

ভয় নেই ডোনা, ওরা তো সংখ্যায় খুব বেশী দেখছিনা।

বলে আহমদ মুসা বাম হাতে স্টিয়ারিং ধরে ডান হাত দিয়ে পকেট থেকে পিস্তল বের করে নিল এবং বলল, ডোনা, জোয়ান, আবদুর রহমান তোমরা মাথা নিচু রাখ। মতলব ওদের খারাপ হলে নিশ্চয় ওরা গুলী করবে।

আহমদ মুসা গাড়ির গতি একটুও স্লো করলো না। সে পরীক্ষা করতে চাইল, ওরা সত্যিই বিপদগ্রস্থ কেউ কিনা। বিপদগ্রস্থ হলে সিগন্যাল দেখানো এবং চিৎকার করে কিছু বলার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই করবে না। আর যদি ডাকাত-হাইজাকার হয় ওরা, তাহলে গাড়ি না দাড়াতে দেখলে নিশ্চয় গাড়ির টায়ার ফাটাবার চেষ্টা করবে।

তাই হলো। আহমদ মুসার গাড়ি যখন দাঁড়ানোর ভাব দেখালো না এবং দাঁড়ানো লোক দু'টি যখন পয়ঁতাল্লিশ ডিগ্রি এ্যাংগেলে এল, তখন দু'জনই দ্রুত রিভলবার বের করল।

আহমদ মুসা একটু অপেক্ষা করছিল। ডান হাতে পিস্তল তার রেডি ছিল। ওরা পিস্তল হাতে তুলে নেয়ার সাথে সাথে আহমদ মুসা গুলী করল পরপর দু'টি।

ওদের পিস্তল উঠে আসছিল আহমদ মুসার গাড়ি লক্ষ্যে। কিন্তু লক্ষ্যে উঠে আসার আগেই গুলী খেয়ে দু'জন পড়ে গেল রাস্তায়।

একই গতিতে গাড়ি ছুটছিল। গুলী করার সময় মনোযোগটা টার্গেটের দিকে শিফট হবার পরও গাড়ির মাথাটা একটুও কাঁপেনি। বাম হাতটা নিখুঁতভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে গাড়িটাকে।

গাড়িটা ওদের ছাড়িয়ে এগিয়ে চলে এল।

পেছন থেকে জোয়ান বলল, মুসা ভাই, গাড়ি থেকে আরও তিনজন বেরিয়ে এসেছে। ছুটছে এ দিকে।

পর মুহূর্তেই গুলীর তিনটি শব্দ পাওয়া গেল। প্রায় এক সাথেই। সম্ভবতঃ হাত ছাড়া হয়ে যাওয়া শিকারের লক্ষ্যে তিনটি গুলী ছুড়ে ব্যর্থতার জ্বালা জুড়াবার চেষ্টা করেছিল ওরা।

'গুলী খাওয়া দু'টির খবর কি জোয়ান?' জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

'দু'জন মাটি থেকে আর ওঠেনি।

ডোনা বিস্মিত চোখে তাকিয়ে ছিল আহমদ মুসার দিকে। সবিস্ময়ে সে ভাবছিল, কি অদ্ভুত লোক! কত কঠিন কাজ সে কত সাধারণভাবে করে ফেলে! এত বড় বিপদের সে মোকাবিলা করল, তার মুখে চিন্তার কোন ছায়াও পড়েনি। গোটা ব্যাপারটাই তার কাছে যেন ছিল একটা খেলার মত। এমন নার্ভ, গুলীর এমন নিশানা তার কাছে রূপ কথার মত লাগছে। রূপ কথার মত এই যে লোক, সে নিশ্চয় অসাধারণ কেউ হবে।

আহমদ মুসার দিকে অপলক চেয়ে ডোনা বলল, দয়া করে কি বলবেন আপনি কে? ওঁ আপনাকে 'মুসা ভাই' বলেছে, আপনার নাম এ, এম, এর অর্থ কি? এম এর অর্থ 'মুসা' ধরে নিলাম, কিন্তু 'এ'-এর অর্থ?

'ধন্যবাদ ডোনা, খুব বুদ্ধিমতি তো তুমি। আবিস্কার করেই ফেলেছ নামটা। 'এ'-এর অর্থ 'আহমদ'।

'অর্থাৎ আপনি, 'আহমদ মুসা'। মুসলমান?'

‘কায়রো, রিয়াদ ও আংকারায় তো তুমি মুসলমান দেখেছ, তাই না?’

‘দেখেছি। কিন্তু মুসলমানদের খুব ভয় করি ওরা নাকি খুব ঝগড়াটে জাতি। তিন’শ বছর ধরে আমাদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড করেছে।’

‘ডোনা, ক্রুসেড হয়েছিল কোথায় বলত?’

‘ফিলিস্তিন অঞ্চলে।’

‘ঐ অঞ্চলে কাদের বাস?’

‘মুসলমানদের।’

‘তাহলে ক্রুসেড করতে মুসলমানরা এসেছিল, না খৃষ্টানরা গিয়েছিল?’

একটু ভাবল। হাসল ডোনা। বলল, বুঝেছি, বলতে চাচ্ছেন, খৃষ্টানরাই ক্রুসেড করতে গিয়েছিল মুসলিম ভূ-খন্ডে। এবং দায়ী খৃষ্টানরাই।’

‘আমি বলতে চাচ্ছি না ডোনা, ইতিহাস বলে এটা। খৃষ্টানরা অমূলক এক উম্মাদনা আর কুৎসিত এক রক্ত পিপাসা নিয়ে অন্যায় এক যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল মুসলমানদের উপর। সে সময় খৃষ্টানরা ধর্মের নামে যা করেছে, তার চেয়ে অধর্মের কাজ আর নেই ইতিহাসই এটা বলছে।’

’আমি ইতিহাস জানি না। আব্বা এ বিষয়টা ভাল বলতে পারবেন। তিনি বলেন, কায়রো, আংকারার মত জায়গায় সাধারণভাবে যে সব মুসলমান দেখ, ওরা ইসলামের ধ্বংসাবশেষ।’

‘অর্থাৎ?’

‘আব্বা বলেন, কোন নগরীর বিক্ষিপ্ত সামান্য ধ্বংসাবশেষ দেখে যেমন সেই নগরীর পূর্ণাংগ ছবি আঁকা যায় না, তেমনি ঐসব মুসলামানের সমাজ ও জীবন দেখে ইসলামের পূর্ণ রূপ কল্পনা করা যায না।’

‘তোমার আব্বা ঠিকই বলেছেন, ইসলামকে নিশ্চয় তিনি জানেন। তবে কি জান, ইসলাম কিন্তু আল-কোরআন, হাদীসে রসূল (সঃ)-এর মাধ্যমে অবিকৃত অবস্থায় বর্তমান আছে, বিকৃত হয়েছে ঐ মুসলমানরা। এই বিকৃতিকে সংশোধনের কাজও কিন্তু চলছে।’

‘আপনাকে দেখে এটাই মনে হচ্ছে। একমাত্র বাপ-মার’র কাছ ছাড়া আজকের এই সময়ের মত এমন নিরাপত্তা বোধ আর কখনও করিনি। আমার জীবনে ‘বোন’-এর সম্মানজনক সম্বোধন দিয়ে কেউ আমাকে ডাকেনি।’

ডোনার কণ্ঠ গম্ভীর শোনাল।

‘ইসলাম সকল মানুষকে ভাই ও বোনের মধুর সম্পর্কে এক সাথে বেঁধে দিয়েছে।’

ডোনা একটা ভাবল। একটু পর বলল, ‘আমার ভাবতে ভাল লাগছে, এমন পবিত্র সম্পর্ক যেখানে, সে সমাজে শান্তি ও সকলের নিরাপত্তা আসা আমার মনে হয় খুব সহজ।’

ডোনার কথাটা স্বগতোক্তির মত শোনাল। তার দৃষ্টি প্রসারিত ছিল সামনে।

আহমদ মুসাও আর তৎক্ষণাৎ কোন কথা বলল না। তারও দৃষ্টি সামনে প্রসারিত।

বাইরে রাতের নিঃশব্দ প্রহর।

দু’পাশে অন্ধকারে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়ের অন্তহীন শ্রেণী।

এরই মাঝে মসৃণ পাথুরে পথ বেয়ে শোঁ শোঁ এক শব্দ তুলে তীর বেগে এগিয়ে চলেছে আহমদ মুসার গাড়ি।

মন্ট্রেজু থেকে গোরানে হাইওয়ে ধরে পিরেনিজ পর্বতমালার কোলে দাঁড়ানো দক্ষিণ ফ্রান্সের সর্বশেষ শহর। ম্যানোনার দিকে এগিয়ে চলছিল আহমদ মুসার গাড়ি। গাড়িটি ডোনার। মন্ট্রেজু থেকে আসার সময় গাড়িটি ডোনা উপহার দিয়েছে আহমদ মুসাকে। আহমদ মুসা নিতে অস্বীকার করেছিল। বলেছিল স্পেনে যাবার ট্যাক্সি সার্ভিস আছে, অসুবিধা হবে না। উত্তরে ডোনা কিছু বলেনি। তার দু’চোখ ভরে উঠেছিল অশ্রুতে, নেমে এসেছিল দু’গন্ড বেয়ে। ডোনার আব্বা পাশেই দাঁড়িয়েছিল। পক্ককেশ কুটনীতিক চার্লস প্লাতিনি আহমদ মুসার পিট

চাপড়ে বলেছিল, আমার একটি মাত্রই মা। বড় একা। তাই বোধহয় বড় জেদি। একটা ভাই পেয়ে ওর কি গর্ব। ওকে প্রত্যাখান করো না।

'না, আব্বা, থাক। কারো ভাল লাগা, না লাগা, পছন্দ-অপছন্দের উপর জোর খাটানো যায় না আব্বা।' বলে ডোনা দু'হাতে মুখ ঢেকে ছুটে পালাচ্ছিল।

'ডোনা, দাঁড়াও। আহমদ মুসা শক্ত কণ্ঠে নির্দেশের সুরে বলেছিল। ডোনা এ নির্দেশ উপেক্ষা করতে পারেনি। নির্দেশের সাথে সাথে সে দাঁডিয়ে গিয়েছিল। দাঁড়িয়ে থেকেই ধীরে ধীরে সে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। অশ্রুতে তার চোখ ভিজা।

আহমদ মুসা দু'ধাপ সামনে এগিয়ে তার সামনা-সামনি হয়ে বলেছিল, আমার উপর অবিচার করছ ডোনা। উপহার মানুষ যত্নে রাখে। আমার সে জায়গা কোথায়, সময় কোথায়? চীনে তোমারই মত এক বোন তার প্রিয় সাদা রিভলবার আমাকে উপহার দিয়েছিল। আমি তা রাখতে পারিনি। বলকানে এসে তা খুইয়েছি। তোমার গাড়ি আজ নেব, কালকেই হয়তো দেখবো এক ঝাঁক গুলীতে এর দেহ ঝাঝরা হয়েছে, অথবা বোমা মেরে কেউ উড়িয়ে দিয়েছে। অথবা আমার হাত ছাড়াও হতে পারে। তখন আমার কষ্ট লাগবে।'

'তাহলেও ঐ পিস্তলের মত আমার গাড়ি হবে সৌভাগ্যবান।'

'ঠিক আছে, তোমারই জয় হলো ডোনা। তোমার এই সহমর্মীতা ও সহযোগীতার জন্যে ধন্যবাদ তোমাকে।'

'কোথায় আমি কি করলাম? '

'তোমার গাড়ি আমাদের যাত্রাকে অনেক সহজ ও স্বাধীন করবে।'

'ধন্যবাদ। আমার ভাগ্য, আমার গাড়ি বিশ্ববিখ্যাত আহমদ মুসার সঙ্গ পাবে।'

বলে ছুটে চলে গিয়েছিল ডোনা তার গাড়ির কাছে।

আহমদ মুসার পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়েছিল ওদের কাছে আহমদ মুসা ডোনার বাড়িতে আসার পরেই।

ডোনার আব্বা চার্লস প্লাতিনি তার মা' অসুস্থতার খবর স্পেন থেকেই পেয়েছিল। পেয়েই স্থল পথে ছুটে এসেছিল মন্ট্রেজু'তে। ডোনা পৌঁছার আগেই তার আব্বা পৌঁছে গিয়েছিল।

ডোনা বাড়িতে পৌঁছে আহমদ মুসাদের ড্রইং রুমে বসিয়ে ছুটে গিয়েছিল ভেতরে। ভেতরে ঢুকে পেয়েছিল তার আব্বাকে। তার আব্বা তখন টেলিফোন করছিল তুলুজে। ডোনাকে দেখে টেলিফোনে রেখে সে লাফিয়ে উঠেছিল। জড়িয়ে ধরেছিল ডোনাকে। বলেছিল, সেই সন্ধ্যায় বেরিয়েছিস তুলুজ থেকে। তোর কোথায় কি হলো ভেবে আমাদের দম বন্ধ হবার যোগাড়। রাস্তায় কিছু হয়েছিল? এত দেরী হলো কেন? কেন রাতে একা বেরিয়েছিলি?'

ডোনা সংক্ষেপে বলেছিল তার কিডন্যাপ হওয়া এবং উদ্ধার পাওয়ার ঘটনা।

শুনতে গিয়ে বার বার কেঁপে উঠেছিল ডোনার আব্বা চার্লস প্লাতিনি। শেষে আহমদ মুসার নাম শুনে চমকে উঠেছিল। বিস্ময়ের সাথে বলেছিল, ঠিক বলছিস ওঁর নাম, উনি আহমদ মুসা বলেছিলেন? ঠিক শুনেছিস তুই?'

'ঠিক আব্বা। নাম বলতে চাননি, বলেছিলেন, এ.এম। তারপর তার সাথীর ডাক থেকে তা প্রকাশ হয়ে পড়ে। পরে স্বীকার করেন।

থেমেছিল ডোনা একটু, 'তারপরেই আবার চোখে-মুখে বিস্ময় নিয়ে বলেছিল, ওভাবে যে বলছ, চেন নাকি আব্বা তাঁকে?

'বিশ্ববিখ্যাত মুসলিম বিপ্লবী আহমদ মুসাকে জানি, তার ফটো দেখেছি। তোমার মুখে যে দুঃসাহসিক কাজ ও যে দুর্লভ চরিত্র বৈশিষ্টের কথা শুনলাম, তাতে ইনিই সেই আহমদ মুসা হবে। আমরা জেনেছি তিনি স্পেন অঞ্চলে এসেছেন।'

আব্বার কথা শুনে ডোনার মুখ থেকে ও বিস্ময় আনন্দ ঠিকরে পড়েছিল। আহমদ মুসার কথা পড়েছে পত্রিকায়। বার বার তাকে নিয়ে আলোচনাও হয়েছ। কেউ তাকে 'নিউ সালাহ উদ্দিন বলতো, কেউ বলতো সে মুসলমানদের 'মাওসেতুং', কারও কাছে সে ছিল স্পেন বিজয়ী 'তারিক বিন জিয়াদ' ও 'মুসা বিন নুসায়ের'-এর নতুন রূপ, কেউ আবার তাকে ডাকতো 'মুসলিম রবিনহুড'

বলে। আসার পথে ডোনার একবারও কিন্তু এসব কথা খেয়াল হয়নি, একবারও মনে আসেনি এ আহমদ মুসা সে আহমদ মুসাই হতে পারে!

আনন্দে চিৎকার করে উঠেছিল ডোনা। বলেছিল, 'ঠিক বলেছ আব্বা, ইনি তিনিই হবেন। এ আহমদ মুসা সে আহমদ মুসা হলেই শুধু সব দিক থেকে মানায়।'

তারপর বাপ-বেটি দুজনেই ছুটে গিয়েছিল তাদের ড্রইং রুমে।

ডোনা ছোট্ট চঞ্চলা বালিকার মত ছুটে গিয়ে আহমদ মুসার সামনে গিয়ে বলেছিল, 'বুঝেছি, আপনার নাম বলতে চাননি কেন? চিনেছি আপনাকে। আপনি সেই আহমদ মুসা।'

একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোককে সাথে নিয়ে ডোনাকে এসে দাঁড়াতে দেখে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়েছিল। আহমদ মুসা কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল। কিন্তু আহমদ মুসা মুখ খোলার আগেই ডোনার আব্বা আহমদ মুসার দিকে হাত বাড়িয়ে বলেছিল, ওয়েলকাম গ্রেটম্যান, আমি ডোনার আব্বা চার্লস প্লাতিনি।

আহমদ মুসা হ্যান্ডশেক করার জন্যে হাত বাড়িয়ে বলেছিল, 'খুশী হলাম আপনার সাথে দেখা হওয়ায়।

চার্লস প্লাতিনি আহমদ মুসার সাথে হ্যান্ডশেক করে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল। বলেছিল, ডোনা আমার একমাত্র সন্তান, তাঁকে আপনি নতুন জীবন দিয়েছেন। আমার কৃতজ্ঞতা গ্রহন করুন।

'জনাব, আমার বা আমাদের কারও কৃতিত্ব নেই আমরাও হাইজ্যাক হয়েছিলাম। নিজেরা বাঁচতে গিয়ে ওকে বাঁচানোর সুযোগ পেয়ে যাই আমরা। প্রশংসা আল্লাহর। তিনিই আমাদের সাহায্য করেছেন।'

'ধন্যবাদ আপনাকে, গ্রেটম্যানের কথা এরকমই হয়ে থাকে।'

'লজ্জা দেবেন না, আমি আপনার ছেলের মত। আমাকে 'তুমি' বললে খুশি হবো।'

পরদিন সকাল ১০টা পর্যন্ত আহমদ মুসা ডোনাদের বাড়িতে ছিল। অনেক কথা হয়েছিল ডোনার সাথে, ডোনার আব্বার সাথে।

ডোনার আব্বার সাথে পরিচয় হয়ে উপকৃত হয়েছে আহমদ মুসা। ডোনার আব্বা চার্লস প্লাতিনি প্রবীণ কুটনীতিক। কুটনৈতিক ও গোয়েন্দা সূত্রের অনেক খবর তিনি রাখেন। তিনি আহমদ মুসা কে জানিয়েছিলেন, ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান স্পেনে মুসলিম স্থাপনা ও ঐতিহাসিক স্মৃতি চিহ্ন গুলোতে যে তেজস্ক্রিয় পেতেছে, তা ফরাসি গোয়েন্দা সংস্থা অতি সম্প্রতি জানতে পেরেছে এবং স্পেন সরকারকে জানানো হয়েছে। কিন্তু স্পেন সরকার এটাকে ভিত্তিহীন প্রপাগান্ডা বলে অভিহিত করেছে। তাদেরকে বিশ্বাস করাবার মতো কোন ডকুমেন্টও নেই। ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানকে কেউ-ই ঘাটাতে চায় না বলে ফরাসি গোয়েন্দা বিভাগও এ নিয়ে আর মাথা ঘামাচ্ছে না। ডোনার আব্বা আরও একটা মূল্যবান তথ্য আহমদ মুসাকে জানিয়েছিল। সেটা হলো, প্রথমে মুসলিম স্থাপনাগুলোর বিস্তারিত নক্সা তৈরী হয়। সেই নক্সায় বৈজ্ঞানিক পরিমাপ অনুযায়ী তেজস্ক্রিয় সেট করার স্থান নির্দিষ্ট হয়। সেই নক্সা অনুসারে নিখুঁতভাবে তেজস্ক্রিয়গুলো পাতা হয়। এই নক্সা ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান এর কারও কাছে আছে। সেই নক্সা না পাওয়া গেলে সেই তেজস্ক্রিয় ইউনিটগুলো খুঁজে বের করা অসম্ভব।

আহমদ মুসা বলেছিল, স্থাপনাগুলোর ইট, পাথর, সিমেন্ট, মাটি ইত্যাদি পরীক্ষা করলেই তো তেজস্ক্রিয় ধরা পড়বে, স্পেন সরকারের কাছে এটা কি ডকুমেন্ট হতে পারে না?

ডোনার আব্বা উত্তরে বলেছিল, 'এক খন্ড কংক্রিট পরীক্ষা করলে ঐ টুকুর মধ্যে যে মাত্রার তেজস্ক্রিয় পাওয়া যায় তা এতই স্বল্প যে, এ থেকে প্রমাণ হয় না অস্বাভাবিক কোন তেজস্ক্রিয় সংক্রমণের ফল এটা এবং এ থেকে আরও প্রমাণ হয় না যে, অব্যাহত তেজস্ক্রিয় সংক্রমন চলছে।'

কথার উপসংহার টানতে গিয়ে ডোনার আব্বা আরও বলেছিলেন, এ নতুন ধরণের এক ভয়ানক যন্ত্র। ইউরোপের দু'একটা ল্যাবরেটরীই হয়তো পারে এর সঠিক প্রকৃতি প্রতিক্রিয়া নিরুপণ করতে। এখানেই হয়েছে মুস্কিল, কেউ ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না।'

আহমদ মুসা এই মূল্যবান তথ্য পেয়ে খুশী হয়েছিল, সেই সাথে ভীষণ হতাশও হয়ে পড়েছিল। চার্লস প্লাতিনি স্বান্তনা দিয়ে বলেছিল, মাদ্রিদে ফরাসি

দূতাবাসের দ্বার আহমদ মুসার জন্যে খোলা, যতটা পারে, যতদিক দিয়ে পারে সে তাদেরকে সাহায্য করবে।'

পরদিন সকাল ১০টায় আহমদ মুসা তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিল।

বিদায়ের সময় চার্লস প্লাতিনি এবং ডোনা দুজনেই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিল। ডোনার আব্বা আহমদ মুসার সাথে বিদায়ী হ্যান্ডশেক করতে গিয়ে বলেছিল, 'যুগের সবদিক থেকে সর্বোৎকৃষ্ট মানুষের সাথে একটা রাতের একটা অংশ আর একটা সকাল কাটাবার সৌভাগ্য আমার হলো। এমন সময় আরও পেলে খুশী হবো। আর ডোনা বলেছিল, 'আমি আপনাকে বিদায় দিচ্ছি না, বোন ভাইকে বিদায় দেয় না।' বলেই মাথা নিচু করেছিল ডোনা। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরেছিল। একটা ভেঙ্গে পড়া উচ্ছ্বাসে তবু কাঁপছিল তার ঠোঁট।

ডোনার একথাগুলো এবং ডোনার আব্বার অনেক কথা বাজছিল আহমদ মুসার কানে, তার চোখে ভাসছিল ডোনাদের শেষ বিদায়কালীন ছবি। আহমদ মুসা ভাবল, মানুষের মনের মায়া-মমতা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সুন্দরতম নেয়ামত। এই নেয়ামতই মানুষের সমাজকে মানুষের সমাজ রেখেছে।

ড্রাইভিং সিটে ছিল আব্দুর রহমান সপ্তম।

ছুটে চলছিল গাড়ি ডোনাদের মন্ট্রেজুকে পেছনে ফেলে ফ্রান্সের সীমান্ত শহর ম্যানোনার দিকে গেরোনে হাইওয়ে ধরে।

ম্যানোনা যতই কাছে এগিয়ে আসছে, পথ ততই দুর্গম হয়ে উঠছে। গাড়ির গতি কমে আসছে ততই। বেলা একটার দিকে ম্যানোনা অতিক্রম করলো আহমদ মুসার গাড়ি। ম্যানোনা শহর পার হয়ে একটা উপত্যকায় গাড়ি থামিয়ে আহমদ মুসারা নামায পড়ে নিল।

ম্যানোনা থেকে ১০মাইল দূরে ফ্রান্স স্পেন সীমান্ত। সীমান্ত রেখাটি পিরেনিজের উত্তর ঢাল বরাবর। ফরাসী সীমান্ত পুলিশের ফাঁড়িতে নাম লিখিয়ে পাসপোর্ট দেখিয়ে স্পেনে প্রবেশ করতে হয়। স্পেন পুলিশের সীমান্ত ফাঁড়িতেও এ ধরণের একটা ব্যবস্থা। এসব আনুষ্ঠানিকতা শেষ করতে কোনই অসুবিধা হয়নি

আহমদ মুসাদের। যাবার সময়ই আহমদ মুসার পাকা কাগজ-পত্র তৈরী হয়েছিল। স্পেনের নাগরিক হিসেবে পাসপোর্ট করা হয়েছিল আহমদ মুসার।

সীমান্ত ফাঁড়ির ঝামেলা চুকানোর পর আবার যাত্রা শুরু হলো আহমদ মুসাদের। এবার পথ আরও দুর্গম। পিরেনিজের একদম বুকের উপর দিয়ে চলছে এখন তারা। ভেল্লা পর্যন্ত পথ এ রকমই। ভেল্লা এখনও পনের মেইল দূরে।

ভেল্লা ছোট্ট একটি পার্বত্য শহর। উত্তরে স্পেনের সর্বশেষ শহর এটি। বাসক এলাকার মধ্যে পড়েছে এ অঞ্চলটি।

বেলা ৪টার দিকে। আহমদ মুসারা ভেল্লা শহরে প্রবেশ করল। আহমদ মুসারা ঠিক করেছে শহরে নাস্তা সেরে নামায পড়ে তারা আবার যাত্রা শুরু করবে মাদ্রিদের পথে। ভেল্লা থেকে মেইল দশেক পশ্চিমে পাহাড় ঘেরা একটা উপত্যকায় আব্দুর রহমান সপ্তমের বাড়ি। যাওয়ার পথে আহমদ মুসা আব্দুর রহমান সপ্তমের বাড়িতে গিয়েছিল। এক রাত সেখানে থেকেছিল। এবার আর সে রকম কোন প্রোগ্রাম নেই। আহমদ মুসা যতটা সম্ভব দ্রুত মাদ্রিদ পৌঁছুতে চায়।

নাস্তা ও নামায সেরে আবার যাত্রা শুরু করেছিল আহমদ মুসারা। আগের মতই ড্রাইভিং সিটে আবদুর রহমান সপ্তম।

একটা হাসপাতলের পাশ দিয়ে এগুচ্ছিল গাড়ি। হঠাৎ আবদুর রহমান সপ্তম ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দরজা খুলে হাঁক দিলঃ আবুল হাসান।

কয়েক মুহূর্ত পরেই এক যুবক এসে দাঁড়াল আবদুর রহমান সপ্তমের সামনে।

‘আম্মা অসুস্থ, আমি ওষুধ নিতে এসেছি।’ এসে দাড়িয়েই যুবকটি বলল।

আহমদ মুসা যুবকটিকে চিনতে পারল। আবদুর রহমান সপ্তমের ছোট ভাই সে।

কি অসুখ? উদ্বিগ্ন কন্ঠে বলল আবদুর রহমান সপ্তম।

‘বুঝা যাচ্ছে না। ডাক্তার দেখেছেন। ওষুধ নিতে এসেছিলাম।’

আবদুর রহমান সপ্তম তাকাল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা বুঝতে পারল আবদুর রহমান সপ্তমের মনের কথা। বলল আবদুর রহমান গাড়ি ঘুরাও। ওঁকে না দেখে যাওয়া যায় না।

'ধন্যবাদ মুসা ভাই। বলে আবদুর রহমান আবুল হাসানের দিকে তাকিয়ে বলল,' গাড়ি এনেছ?'

'হ্যাঁ'। বলল আবুল হাসান।

'যাও, গাড়ি নাও, চল যাই।'

আবুল হাসান এগিয়ে গেল কার পার্কিং এর দিকে।

এবার গাড়ি চলতে শুরু করল। আবদুর রহমান সপ্তমের বাড়ির দিকে। আগে আহমদ মুসাদের গাড়ি। পেছনে আবুল হাসানের গাড়ি।

'আবদুর রহমান সপ্তমের বাড়ি কোথায় কতদূর?' বলল জোয়ান।

'নিউ ভ্যালেনসিয়া, মাইল দশেক পশ্চিমে।'

নিউ ভ্যালেনসিয়া একটা সমৃদ্ধ উপত্যকা। চারদিকে পাহাড়ের দেয়াল।

উপত্যকায় প্রবেশের একটাই পথ, উত্তর দিকের একটি মাত্র গিরি পথ। বেশ প্রসস্ত। এটাই উপত্যকায় প্রবেশের দরওয়াজা।

উপত্যকায় উর্বর মাটিতে প্রচুর ফল ও ফসল উৎপাদিত হয়। বাসিন্দারা নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে প্রচুর পরিমানে বাইরে বিক্রি করতে পারে।

উপত্যকায় প্রায় ৫'শ বাসক ও মুসলিম পরিবার বাস করে। জনসংখ্যা প্রায় তিন হাজারের মত। এর প্রায় সবাই মুসলমান। এদের অনেকে দক্ষিণ ও স্পেন থেকে পালিয়ে আসা তবে বেশির ভাগই ধর্মান্তরিত। বাসক সম্প্রদায়ের প্রচুর পরিবার খৃষ্ট ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। জনশ্রুতি আছে ষোড়শ শতকের শুরুতেই এক দরবেশ নানা স্থান ঘুরে তার স্ত্রী সহ এসে এই উপত্যকায় আস্তানা গেড়েছিলেন। স্থায়ী জনপদ তখন এ উপত্যকায় গড়ে উঠেনি। সে পবিত্র দরবেশকে ঘিরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠল স্থায়ী জনপদ। সে দরবেশ জ্ঞানে ছিলেন সবজান্তা সুপন্ডিত, চরিত্রে ছিলেন ফেরেশতা তুল্য। মানুষ তাকে ভক্তি, শ্রদ্ধা দিয়ে মাথায় রাখতো, কিন্তু তিনি নিজেকে মনে করতেন মানুষের এক নগন্য সেবক। যেখানে মানুষের বিপদ সেখানেই তিনি। প্রতিটি দুঃখী ও অসুস্থ মানুষ নিশ্চিন্ত থাকতো, তাদের পাশে সাহায্যের হাত নিয়ে, চিকিৎসকের সেবা নিয়ে পবিত্র দরবেশ আবদুর রহমান আসবেনই। তার চরিত্রে ইসলামের রুপ-মাধুর্য দেখে শুধু এই উপত্যকার নয়, আশে পাশের শত শত পরিবার ইসলাম গ্রহণ

করে। আবদুর রহমান সপ্তমরা সেই দরবেশ আবদুর রহমানেরই বংশধর। উপত্যকার একটি সুন্দর সবুজ টিলায় তাদের বাড়ি। উপত্যকায় প্রবেশ করলেই দেখা যায় সুন্দর টিলাটি, তার আগে দেখা যায় টিলায় অবস্থিত মসজিদের সুউচ্চ মিনার।

আহমদ মুসাদের গাড়ি উপত্যকায় প্রবেশ করল, আযান ধ্বনিত হচ্ছিল সে মিনার থেকে। আযানের ধ্বনি সেই কেঁপে কেঁপে ছড়িয়ে পড়ছিল সমগ্র উপত্যকায়, প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল পাহাড়ের বুকে।

সবে সূর্য ডুবেছে। কিন্তু পাহাড় ঘেরা উপত্যকায় তখন অন্ধকার। উপত্যকার সবুজ আর সন্ধ্যার কালো একসাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

অন্ধকার জড়িত নিঃশব্দ এই পরিবেশে মধুর আযানের ধ্বনি প্রতিধ্বনি অপরুপ লাগছিল আহমদ মুসার কাছে। সমগ্র সত্তা দিয়ে উপভোগ করছিল আহমদ মুসা সেই আযান।

‘এই আযান বাসক এলাকা ছাড়া স্পেনের আর কোথাও পাবেন না মুসা ভাই।’ বলল আবদুর রহমান সপ্তম।

‘এমন পরিবেশ হৃদয় আকুল করা এমন আযান জীবনে আর একবার শুনেছিলাম মধ্য এশিয়ায় উজবেকিস্তানের একটা গ্রামে। এ মসজিদটি কোথায়, কতদূরে আবদুর রহমান?’

‘আমাদের বাড়ির সামনে মুসা ভাই। চলুন নামায আমরা ধরতে পারবো।’

আবদুর রহমান সপ্তমদের সুন্দর বিশাল বাড়িটির সামনে ছোট একটা চত্তর, তারপরেই মসজিদ। বিশাল মসজিদ। প্রথমে মসজিদটি ছিল বেড়ার। দরবেশ আবদুর রহমানের সময়েই জনগণ পাহাড় থেকে পাথর বয়ে এনে মসজিদ তৈরী করেছে। পরে আরও সম্প্রসারণ হয়েছে মসজিদটির।

মসজিদটি দেখে চমৎকৃত হলো আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা ইতিহাসে পড়েছিল, মুসলিম সেনাপতি মুসা বিন নুসায়ের পিরেনিজ পর্বতে উঠেছিলেন, কিন্তু ফিরে যেতে হয়েছিল তাঁকে। সেই সাথে ইসলামও এখানে থেকে পশ্চাতপসরণ করেছিল, ইতিহাস এটাই বলে। কিন্তু

ইতিহাস জানে না, পিরেনিজ এর বুকে এ রকম সুন্দর মসজিদ আছে, এ রকম সুন্দর সমৃদ্ধ মুসলিম জনপদ লুকিয়ে আছে। ইতিহাস শুধু রাজা-বাদশাহদের কথাই লিখে, লিখে না দরবেশ আবদুর রহমানদের কথা। লিখে না বলেই জানে না ইতিহাসের পরেও ইতিহাস আছে।

মাগরিবের জামায়াতের নেতৃত্ব দিতে হয়েছিল আহমদ মুসাকেই।

নামায শেষে আবদুর রহমান সপ্তম শুধু নামটা গোপন রেখে সকলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল আহমদ মুসাকে। সকলের অনুরোধে ছোট-খাট বক্তৃতাও দিতে হয়েছিল আহমদ মুসাকে বিশ্বে মুসলমানদের বর্তমান অবস্থার উপর। উপসংহারে আহমদ মুসা একজন মহান ব্যক্তির কথা উদ্বৃত করে বলেছিল, 'ইসলাম জিন্দা হয় প্রত্যেক কারবালার পর। কয়েক শতাব্দীর এক ভয়াবহ কারবালা মুসলমানদের উপর দিয়ে বয়ে গেছে। এবার তাদের উত্থানের পালা। এই জাগরণের গান শোনা যাচ্ছে চারদিকে। সামনের অন্ধকারের ওপারে সোবহে সাদেকের সফেদ আলোকছটা দেখা যাচ্ছে। মুক্তি আমাদের সুনিশ্চিত।'

নামায শেষে সকলের সাথে সালাম-মোহসাফা শেষ করে আহমদ মুসা আবুল হাসানের সাথে এল আবদুর রহমান সপ্তমের বাড়িতে। আবদুর রহমান সপ্তম আগেই চলে এসেছিল তার মায়ের কাছে।

বাড়িতে ঢোকার পথে দরজার উপরে কাঠের ফলকে স্প্যানিশ ভাষায় লেখা 'দারুল হিকমাহ'। তার নিচে আরবী অক্ষরে একই কথা লেখা আছে। আহমদ মুসা, জোয়ান সবাই এ লেখাটা পড়ল। বুঝল এটা বাড়ির নাম।

প্রবেশ করল বৈঠক খানায়।

বিরাট বৈঠকখানা।

ঘরের চারদিকে সাজানো সোফা। একসাথে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশজন লোক বসতে পারে।

আবদুর রহমান সপ্তমের বাড়ি শুধু এই উপত্যকায় নয় গোটা এই অঞ্চলের মিলন ক্ষেত্র। যত শালিস-দরবার সব এখানেই হয়। উত্তরাধীকার সূত্রে আবদুর রহমান সপ্তম এই এলাকার সর্দার। তবে আবদুর রহমান বাসক গেরিলা

বাহিনীর দায়িত্বশীল পদে উন্নীত হবার পর তার ভাই আবুল হাসান তার পক্ষ থেকে সরদারীর দায়িত্ব পালন করে।

আহমদ মুসা ঘরে প্রবেশ করেই দেখল টেবিলে শরবত রাখা হচ্ছে। আঙুরের শরবত।

আবুল হাসান আহমদ মুসাদের শরবত পান করিয়ে ভেতরে চলে গেল।

আহমদ মুসা ও জোয়ান যেখানে বসেছিল সেখান থেকে সোজা ওপাশের দেয়ালে হাতে আঁকা পাশা-পাশি দু'টি ছবি। একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোকের আর অন্যটি একটি বালকের।

ছবি দু'টি চোখে পড়ল জোয়ানের। ভাবল সে, নিশ্চয় বৃদ্ধের ছবিটি দরবেশ আবদুর রহমানের, আর বালকটি নিশ্চয় আবদুর রহমান সপ্তম হবে।

কৌতুহল হলো জোয়ানের। লোকটির চেহারার সাথে আবদুর রহমানের চেহারা মিলছেনা। আরও ভাল করে দেখার জন্যে জোয়ান উঠে গিয়ে ছবি দু'টির সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

কাছে গিয়ে দাঁড়ানোর পর ছবির নিচের লেখাগুলো জোয়ানের কাছে স্পষ্ট হলো।

প্রথমে চোখ পড়ল বৃদ্ধের ছবির নিচে লেখাগুলোর দিকে।

পড়ল জোয়ান -"নাম আব্দুর রাহমান। জন্ম পূর্ব স্পেনের ভালেন্সিয়ার ১৪৫৫সালে। ভালেন্সিয়ার দারুন হিকমার তিনি অধ্যক্ষ ছিলেন। বিজ্ঞানের উপর অনেক গ্রন্থের তিনি প্রণেতা। সব মুসলিমদের সাথে তাকেও উচ্ছেদ করা হয় ভালেন্সিয়া থেকে ১৫০৩ সালে। তিনি ইন্তেকাল করেন ১৫৩০ সালে। তিনি হক্কুল্লাহ ও হক্কুল এবাদ প্রতিষ্ঠায় জীবন উৎসর্গ করেন। আল্লাহ তার বেহেস্ত নসিব করুন"।

পড়তে পড়তে হৃদয়টা কেঁপে উঠল জোয়ানের। মনে পড়ল তার পূর্ব পুরুষ আবদুল্লাহ বিন আব্দুর রাহমান খাতার কথা, খাতায় লেখা স্মৃতি কথার বিষয় গুলো। তার পূর্ব পুরুষ আবদুল্লাহর পিতার নামও তো ছিল আব্দুর রাহমান। তিনি দারুল হিকমার অধ্যক্ষ ছিলেন। ভালেন্সিয়া থেকে তিনিও উচ্ছেদ হয়েছিলেন। ঐ সময়েই।

কম্পিত হৃদয় নিয়ে জোয়ান গিয়ে দাঁড়াল বালকটির ছবির নিচে। বালকটির ছবির নিচে একটা কবিতা। চার লাইনের কবিতার সার কথা হলঃ “বালকটি দশ বছরের আবুদুল্লাহ বিন আব্দুর রাহমান। সেদিন ভালেন্সিয়ায় রাজা ফিলিপ্সের নিষ্ঠুর সৈন্যরা ক্রন্দনরত বালকটিকে কেড়ে নিয়েছিল ক্রন্দনরত মায়ের বুক থেকে, পিতার কাছ থেকে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া বালকটির নেগাহবান আর কেও ছিল না।“

পড়া শেষ করার আগেই জোয়ানের গোটা সত্তা জুড়ে নেমে এল দুর্বোধ্য এক অবসন্নতা। এই উপত্যকার নাম “নিউ ভালেন্সিয়া, এই বাড়ির নাম ‘দারুল হিকমা’ কেন তা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। মনে হল এ নামগুলো, এই ছবিগুলো তারই জন্য অপেক্ষা করছিল। আব্দুর রাহমান সপ্তম-এর অর্থ তার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেল। সেই মহান আব্দুর রাহমানের সপ্তমের অধস্তন পুরুষ এই আব্দুর রাহমান।

মনে হল। এই “সপ্তম” শব্দটাও যেন তারই জন্য এক সংকেত। তার পূর্ব পুরুষ হতভাগ্য আবদুল্লাহ বছরের পর বছর দেশ-দেশান্তর ঘুরে যার দেখা পাননি, আমি আজ তার ঠিকানায়। আর চিন্তা করতে পারল না জোয়ান। সেই আচ্ছন্নতা গাড় অন্ধকার হয়ে ঘিরে ধরল তাকে। জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল সে মেঝের উপর।

ছুটে গেল আহমদ মুসা।

কোলে তুলে নিল জোয়ানকে।

অজ্ঞান জোয়ানকে যখন সোফায় শুইয়ে দিচ্ছে আহমদ মুসা, আব্দুর রাহমান সপ্তম এবং আবুল হাসান তখন ঘরে ঢুকল। জোয়ানকে ঐভাবে দেখে তাদের চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

দ্রুত এগিয়ে এল তারা আহমদ মুসার কাছে।

“কি ব্যাপার, জোয়ানের কি হয়েছে মুসা ভাই?” জিজ্ঞাসা করল আব্দুর রাহমান সপ্তম।

জোয়ানকে সোফায় শুইয়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাড়িয়ে আহমদ মুসা বলল, দেয়ালের ঐ ছবি দুটো দেখতে গেয়েছিল জোয়ান। ছবি দেখতে দেখতেই জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেছে জোয়ান। বলে আহমদ মুসা জোয়ানের একটি হাত তুলে নিল।

“ডাক্তার ডাকব মুসা ভাই”?

“না, দরকার নেই। এখনি ওর জ্ঞান ফিরে আসবে।“

বলে আহমদ মুসা জোয়ানের জুতা খুলে ওর পায়ের তালুর বিশেষ কিছু জায়গায় বিশেষ নিয়মে খোঁচা দিতে লাগল।

“আব্দুর রাহমান, ঐ ছবি দুটো কার”? জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

ছবি দুটির পরিচয় দিল আব্দুর রাহমান। তারপর বলল, “ছবি দুটো দেখেই কি জোয়ান....।

“তা বলতে পারব না আব্দুর রাহমান। তবে ছবি দেখার সময় তাকে স্বাভাবিক মনে হয় নি।

মিনিট তিনেক পার হল।

আহমদ মুসা জোয়ান এর পায়ে সেই খোঁচা দিয়েই চলেছিল।

নড়ে উঠল জোয়ান। ধীরে ধীরে চোখ মেলল সে। চোখ মেলেই তড়িঘড়ি উঠে বসল।

সামনেই দাড়িয়ে আব্দুর রাহমান সপ্তম। জোয়ান উঠে দাড়িয়ে “আমার ভাই” বলে জড়িয়ে ধরল আব্দুর রাহমানকে। বলল, “পিরেনিজের বুকে এইভাবে আমাদের দেখা হবে কে জানত”। আবেগে ভারি হয়ে উঠল জোয়ানের কণ্ঠ।

আব্দুর রাহমান সপ্তম কিছু বুঝতে না পেরে বিব্রত বোধ করছিল। আব্দুর রাহমানের ন’বছরের মেয়ে বৈঠক খানায় ঢুকেছিল সেও হ্যাঁ করে দেখছে ব্যাপারটা।

জোয়ান আব্দুর রাহমান সপ্তমকে ছেড়ে দিয়ে জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে। বলল, “মুসা ভাই আমার পূর্ব পুরুষ যা খুঁজে পায়নি, আমি তা পেয়েছি, এ বড় আনন্দের। কিন্তু এ আনন্দে হাসা যায় না, কান্না পায়।“

জোয়ান ভারি কণ্ঠে যখন এ কথা গুলো বলছিল, অশ্রু ঝরছিল তখন জোয়ানের চোখ দিয়ে।

আব্দুর রাহমান এগিয়ে এসে জোয়ানের পিঠ হাতে রেখে বলল, আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা ভাই, খুলে বলুন।

জোয়ান ঘুরে দাঁড়াল। অশ্রুতে ভেজা জোয়ানের চোখ।

কোন কথা না বলে জোয়ান আব্দুর রাহমান সপ্তমের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল বৃদ্ধের ছবির কাছে। বলল, ‘‘ভালেন্সিয়ার দারুল হিকমার অধ্যক্ষ এই আব্দুর রাহমান কে আপনার?’’

‘‘আমার পূর্ব পুরুষ, নিউ ভালেন্সিয়ার এই উপত্যকায় তিনি এসে বসতি স্থাপন করেন,’’। বলল আব্দুর রাহমান।

জোয়ান গিয়ে দাঁড়াল বালকের ছবির নিচে। বলল, আর এ হতভাগ্য বালক হল আমার পূর্ব পুরুষ যাকে ফিলিপের সৈন্যরা ছিনিয়ে এনেছিল পিতা-মাতার বুক থেকে, যাকে মর্মন্তুদ এক দাস জীবনযাপন করতে হয়েছে খ্রিষ্টান পরিবারে।

‘‘জোয়ান’’ বলে চিৎকার করে আব্দুর রাহমান সপ্তম জড়িয়ে ধরল জোয়ানকে। এবার আব্দুর রাহমান সপ্তমের চোখ ফেটে বেরিয়ে এসেছে অশ্রু।

পাশে মূর্তির মত দাড়িয়ে আছে আবুল হাসান।

আব্দুর রাহমান জোয়ানকে ছেড়ে দিয়ে ছুটে চলে গেল ভিতরে। আবুল হাসানও। সেই ন’বছরের মেয়েটিও।

জোয়ান ফিরে এল সোফায়।

বসল আহমদ মুসার পাশে।

আহমদ মুসাও এই মিলন দৃশ্যে অনেকটা নির্বাক হয়ে গিয়েছিল।

প্রথমবারের মত মুখ খুলে বলল, এই মিলন আমার কাছে রূপ কথার চেয়েও অপরূপ লাগছে জোয়ান। স্পেনে মুসলমানদের বিপর্যয় বিচ্ছিন্ন একটি বংশের দুটি ধারার শত শত বছর পর এই মিলন অকল্পনীয়। আল্লাহর হাজার শুকরিয়া।‘‘

কিছুক্ষণ পরে বৈঠকে খানায় ফিরে এল আব্দুর রাহমান সপ্তম। বলল, না বলেই চলে গিয়েছিলাম, মাফ করবেন মুসা ভাই। নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম হারানো মানিকের সন্ধান পেয়ে। আমরা কল্পনাও করতে পারি না মুসা ভাই,

আমার পূর্ব পুরুষ দরবেশ আব্দুর রাহমান খ্রিস্টান এর ছদ্মবেশ নিয়ে ভালেন্সিয়ায় কত দিন কত রাত যে খুঁজে বেড়িয়েছে তার হৃদয়ের ধন ঐ বালককে! সন্ধান তিনি পাননি, সেই পাওয়া আজ আমরা পেলাম।

আব্দুর রাহমান সপ্তম চোখ মুছল। বলল, চলুন মুসা ভাই, চল জোয়ান, খাবার রেডি। আম্মা এবং পরিবারের সবাই অস্থির হয়ে উঠেছে জোয়ানের কথা শোনার জন্য, কিন্তু তার আগে খাওয়া।

খাবার ব্যবস্থা হয়েছিল পারিবারিক ডাইনিং রুমে। খাওয়া শেষে আহমদ মুসা ও জোয়ানকে এনে বসানো হল পারিবারিক ড্রইং রুমে। ড্রয়িং রুমের পাশেই একটা ঘরে বসেছে আব্দুর রাহমান সপ্তমের পরিবারের মেয়েরা।

ড্রয়িং রুমে আহমদ মুসা ছাড়াও রয়েছে আব্দুর রাহমান সপ্তমের ন'বছরের মেয়ে ৫ বছরের একটি ছেলে, আবুল হাসান এবং তারও পাঁচ বছরের একটি ছেলে, আব্দুর রাহমান সপ্তম ভিতরে ছিল।

অল্পক্ষণ পর সে ড্রয়িং রুমে এসে প্রবেশ করল। বলল, আমার আম্মা, আমার স্ত্রী ও আবুল হাসানের স্ত্রী এবং আমাদের দুই বোন আহমদ মুসা ভাই ও জোয়ানকে সালাম দিয়েছেন।

সালাম বিনিময় পর আব্দুর রাহমান সপ্তম বলল, আল্লাহর হাজার শুকরিয়া যে শত শত বছরের বিচ্ছিন্নতার পর আমাদের বংশের দুটি ধারার আল্লাহ মিলন ঘটিয়েছেন। আমাদের পরিচয় হয়েছে, জানাজানি হয়নি। আমাদের সবার মন আকুল বিকুল করেছে এই জানার জন্য, আমি ভাই জোয়ানকে অনুরোধ করছি, কিছু কথা বলার জন্য। পরিবারের সবাই এ কথাগুলো শুনতে চায় এ জন্য এই ব্যবস্থা।

জোয়ান শুরু করল-আমার নাম জোয়ান ফারদিনান্দ। এই নামেই আমি বড় হয়েছি, এই নামই আমার পরিবারে, এই নামেই আমার লেখাপড়া, পরিচয়, সবকিছু। আমার পিতার নাম জন সেমেনিজ। বাড়ির কেও কোনদিন গীর্জায় যায়নি, আমাদের বাড়িতে বাইবেল নেই, কিন্তু আমরা খ্রিষ্টান ছিলাম। নিজেকে আমি খ্রিস্টান মনে করতাম। আমি মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয় এর ভাল ছাত্রদের একজন ছিলাম। সব পরীক্ষায় সব সময় প্রথম স্থানে থেকেছি। আমার জীবনের

মোড় পরিবর্তন ঘটল আমার অনার্স পরীক্ষার রেজাল্টের দিন। প্রথমবারের মত প্রথম স্থান থেকে দ্বিতীয় স্থানে নেমে গেলাম। সেই দিনই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ও শিক্ষকদের কাছে শুনলাম আমি মরিসকো, আমি ছদ্মবেশী মুসলমান। আমার এ পরিচয়ের কথা শুনে আমি আকাশ থেকে পড়েছিলাম, পরিচয়টা আমার কাছে আমার জন্যে মৃত্যুর পরোয়ানার মত ছিল। আমি ভীষণভাবে মুষড়ে পড়েছিলাম। পাগলের মত ছুটে এসেছিলাম বাড়িতে। আব্বা মারা গেছেন অনেক আগে। চাইছিলাম, আম্মা বলুন আমি মরিসকো নই, আমি ছদ্মবেশী মুসলমান নই, আমি খৃস্টান। না হলে যে আমার ২২ বছরের সাজানো জীবন মিথ্যা হয়ে যাবে। কিন্তু আম্মার কাছে, দাদির কাছে যা শুনলাম তা আমার উদ্বেগ-আতংককে আরও বাড়িয়ে দিল। তাঁরা বললেন, তাঁরা দু'জন মরিসকো, কিন্তু আমার আব্বা, আমার দাদা মরিসকো ছিলেন কিনা তা তারা জানেন না। আমার তখন মনে হলো আমার আব্বা, আমার দাদা নিশ্চয় মরিসকো ছিলেন। না হলে তারা মরিসকোকে বিয়ে করেছেন কেন। আমার ঘরে ফিরে আমি ভীষণভাবে কাঁদলাম। দুপুরে কিছু খেলাম না। গোটা দুনিয়া আমার কাছে বিষাদ হয়ে গেল। মনে হলো, আমার মরা আর বাঁচার মধ্যে আজ আর কোন পার্থক্য নেই। বিকেলে মা এলেন আমার ঘরে। তিনিও কাঁদছিলেন। তিনি আমার হাতে একটা কাঠের বাক্স তুলে দিয়ে বললেন, বেটা, এই বাক্স তোমার আব্বা তাঁর মৃত্যুকালে আমার কাছে আমানত রেখে গিয়েছিলেন। কথা ছিল, যেদিন তোমার বয়স বাইশ বছর পূর্ণ হবে, সেদিন যেন এই বাক্স তোমার হাতে তুলে দেই। বাক্সে কি আছে আমি জানি না।

বাক্স আমার হাতে তুলে দিয়ে আম্মা চলে গিয়েছিলেন। আমি পাগলের মত বাক্স খুলে ফেলেছিলাম। পেয়েছিলাম আমার কাছে লেখা আব্বার একটা চিঠি এবং একটি খাতা। চিঠির খামে লেখা ছিল 'মুসা আবদুল্লাহ ওরফে জোয়ান ফার্ডিনান্ড'। এই প্রথম জানলাম আমি জোয়ান ফার্ডিনান্ড নই, আমি মুসা আবদুল্লাহ। আব্বার চিঠি পড়লাম। মূল কথাটা যা তিনি লিখেছেন, তা হলো- এই চিঠির সাথে চামড়া বাঁধানো যে খাতা পাবে, তা আমি পেয়েছিলাম এমনি বাক্সে করে আমার আব্বার কাছ থেকে। আমার আব্বা পেয়েছিলেন তার আব্বার কাছ

থেকে। ছয় পুরুষ ধরে এই বাক্স এমনিভাবে আসছে। সপ্তম পুরুষ হিসেবে তোমার জন্যে বংশের এই পবিত্র আমানত আমি রেখে গেলাম।'

বংশের পবিত্র আমানত খাতা খানি আমি পড়লাম। ওটা ছিল আপনাদের বৈঠক খানায় যার ছবি টাঙানো আছে সেই বালক আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমানের আত্মকথা।'

জোয়ান সেই আত্মকথা ধীরে ধীরে বর্ণনা করলো। কেমন করে তাকে পিতা-মাতার কোল থেকে ছিনিয়ে আনা হয়েছিল, কি করে খৃস্টান শহর কোতোয়ালের বাড়িতে তার দাসজীবন শুরু হয়েছিল, কি মর্মন্তুদ নির্যাতন সেই বালকের উপর নেমে এসেছিল, কি শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশের মধ্যে সে বড় হয়ে উঠল, কি করে অবশেষে মুক্তি পেল, কি করে খৃস্টানের ছদ্মবেশে তার জীবন শুরু হলো, কেন তাকে শেষে পালিয়ে আসতে হলো মাদ্রিদে, কিভাবে শুরু হলো মাদ্রিদে তার ছদ্মবেশী খৃস্টান জীবন- সব কথাই জোয়ান একে একে বর্ণনা করল। বলতে বলতে বারবার কান্নায় জড়িয়ে গিয়েছিল জোয়ানের কথা। আবদুর রহমান সপ্তম, আবুল হাসান দু'জনেই কেঁদে ফেলেছিল শুনতে শুনতে। আহমদ মুসারও চোখ শুকনা ছিল না। সে আগে শুনেছিল, কিন্তু এতটা শুনেনি।

জোয়ান থামার পর অনেকক্ষণ কেউ কথা বলল না।

আবদুর রহমান সপ্তমের ৫ বছরের ছেলেটি ভেতর থেকে এসে তার আব্বার কানে কানে বলল, দাদি কাঁদছে।

আবদুর রহমান সপ্তম তার মুখ চাপা দিয়ে বলল, বেটা, তুমি যাও দাদির কাছে। তাঁর কোলে গিয়ে বস।

চলে গেল ছেলেটি।

আবদুর রহমান সপ্তম ধীরে ধীরে বলল, আল্লাহর হাজার শোকর, পূর্ব পুরুষরা এ কথাগুলো রেখে না গেলে অতীত শুধু আমাদের হারিয়ে যেত না, হারাতাম আমরা ভবিষ্যতও।

'ঠিক বলেছেন ভাই জান, পূর্ব পুরুষ আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমানের স্মৃতি কথা পড়ার পর আমি আমার অতীতকে নিয়ে গর্ব করতে শিখেছি, নিজের

পরিচয়কে ভালবাসতে শিখেছি এবং জাতির প্রতিও ভালবাসা সৃষ্টি হয়েছে।' বলল জোয়ান।

'আমাদের পূর্ব পুরুষ দরবেশ আবদুর রহমান কোন স্মৃতি কথা রেখে যাননি। রেখে গেছেন একটা ডাইরী। সেটা ঘটনার একটা দিনপঞ্জী। জাহাজ যোগে যাত্রা শুরুর পর কিভাবে ভূমধ্যসাগরের মেজর্কাদ্বীপে পৌঁছলেন, কি করে জাহাজ লুন্ঠিত হলো, কিভাবে তারা ফ্রান্সের ভেনড্রেস বন্দরে পৌঁছলেন, কিভাবে সেখান থেকে তাদের তাড়িয়ে দেয়া হলো পিরেনিজের পার্বত্য অঞ্চলের দিকে, কিভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে, গাছের ফল-মূল খেয়ে বেঁচে থেকে অবশেষে একদিন এই উপত্যকায় পৌঁছলেন। প্রতিদিনের ঘটনাই সে ডাইরীতে লিখিত আছে। সে এক হৃদয় বিদারক উপন্যাস। ডাইরীটার আমরা কপি করিয়ে বাঁধিয়ে রেখেছি। একটা কপি ভাই জোয়ান তোমাকে দেব।'

থামল আবদুর রহমান সপ্তম।

জোয়ান বলল, 'খুব খুশি হবো। আমার পূর্ব পুরুষ আবদুর রহমানের সন্তান আবদুল্লাহর স্মৃতি কথায় পড়েছি, তিনি তাঁর পিতার সন্ধানে মেজর্কা গেছেন, পিরেনিজের উত্তর পাদদেশেও ঘুরে বেরিয়েছেন দিনের পর দিন। সন্ধান পাননি তার পিতার। আমি খুশী হবো জানতে পারলে সেই কাহিনী, যা আমার পূর্ব পুরুষ জানতে পারেননি।'

'জোয়ান ভাই, দরবেশ আবদুর রহমানও তার সন্তানকে খুঁজতে গেছেন ভ্যালেনসিয়া পর্যন্ত। একবার নয়, কয়েকবার। কিন্তু পাননি সন্ধান। সে সব কথাও তাঁর ডাইরীতে আছে।' বলল আবদুর রহমান সপ্তম।

গভীর রাত পর্যন্ত চলল তাদের কথাবার্তা। ছোট ছেলেমেয়েরা সবাই সোফায় ঘুমিয়ে পড়েছিল, সেদিকে কারও খেয়াল ছিল না।

অবশেষে আবদুর রহমান সপ্তমের অসুস্থ মা ওপার থেকে বলেছিল, বেটা আবদুর রহমান, দীর্ঘ পথ তোমরা সফর করে এসেছ। সবাই তোমরা ক্লান্ত। মেহমানদের আর কষ্ট দিও না। ওঁদের শুইয়ে দাও। কালকে কথা বলা যাবে।

রাতে শোবার সময় আহমদ মুসা আবদুর রহমানকে বলল, আবদুর রহমান সপ্তম এবং আবদুল্লাহ সপ্তম, দুই সপ্তমে কাটাকাটি করলে দুই সপ্তমও শেষ হয়। সুতরাং আর সপ্তমের দরকার নেই। যে কারণে গুণাগুণি সেই প্রয়োজন শেষ।

'ঠিকই বলেছেন মুসা ভাই, আর প্রয়োজন নেই।' বলল আবদুর রহমান।

আহমদ মুসাদের শুইয়ে দিয়ে আবদুর রহমান চলে যাচ্ছিল। তাকে লক্ষ্য করে আহমদ মুসা বলল, 'আব্দুর রহমান আমরা সকালেই কিন্তু চলে যাব, কিছুতেই দেরী করা যাবে না।'

আবদুর রহমান মাথা নেড়ে চলে গেল।

পরদিন সকাল ৮টা।

আহমদ মুসা এসে গাড়িতে উঠেছে। জোয়ান তখনও আসেনি। বিদায় নিতে গেছে আবদুর রহমানের মা'র কাছে। সকালেই আরেক দফা কথা হয়েছে জোয়ানের সাথে আবদুর রহমানের মা'র। ফজরের নামাযের পর আবদুর রহমান জোয়ানকে নিয়ে গিয়েছিল অন্দর মহলে বাড়ি-ঘর এবং অন্যান্য সব স্মৃতি চিহ্ন দেখাবার জন্যে। জোয়ান ঘুরে ঘুরে গোটা বাড়ি দেখেছে।

আবদুর রহমানের মা জোয়ানকে বলেছে, জোয়ান বেটা, দরবেশ আবদুর রহমানের সম্পত্তির তুমিও অংশীদার। এ বাড়িতে তোমারও ভাগ আছে। আজ থেকে তুমিও এ বাড়ির একজন!

শুনে কেঁদে ফেলেছে জোয়ান। বলেছে, মা, আপনাদের পেয়েছি এর চেয়ে বড় সম্পত্তি আর নেই। তবু আবদুর রহমানের মা কথা আদায় করেছে যে, সে তার মা'র দেয়া প্রস্তাব প্রত্যাখান করবে না।

সোয়া আটটার দিকে ফিরে এল জোয়ান ও আবদুর রহমান। জোয়ানের মুখ ভারি, চোখ ভেজা।

পেছনে বাড়ির দরজায় মেয়েরা দাঁড়িয়ে তাদের বিদায় দেয়ার জন্যে।

গাড়িতে চড়ল জোয়ান ও আবদুর রহমান।

আহমদ মুসা আগেই ড্রাইভিং সিটে উঠে বসেছিল।

গাড়ি স্টার্ট নিল। চলতে শুরু করল গাড়ি। জোয়ান ও আবদুর রহমান দু'জনেই পেছন ফিরে দেখল বিদায় দিতে আসা আপনজনদের। বাড়ির মেয়ে ও

শিশু-কিশোর হাত নেড়ে বিদায় জানাল তাদের। আহমদ মুসা তার গাড়ির রিয়ার ভিউ-এ দেখতে পেল দৃশ্যটা। তার মনের কোথায় যেন খচ করে উঠল। মনে হল, এমন একটা গৃহস্থান তার নেই, যেখানে মা, বোনেরা একান্ত আপনজনরা তার পথ চাইবার জন্যে দাঁড়াতে পারে! আহমদ মুসার চোখে ভেসে উঠল সিংকিয়াং-এর এক গ্রামের দৃশ্য, সেই গ্রামের একটি সুন্দর বাড়ির ছবি, যা তার বাবা, মা, ভাই, বোন সকলের কলরোলে একদিন মুখরিত ছিল। কিন্তু সব হারিয়েছে, তার চোখের সামনেই তারা নিহত হয়েছে একের পর এক। আজ সে নিঃস্ব, ঠিকানাহীন! তাকে বুকে ধারণ করার জন্যে এমন কোন বাড়ি অবশিষ্ট নেই, এমন কোন আপনজন তার নেই। অজান্তেই চোখের কোণটা তার ভিজে উঠল। মনে পড়ল আমিনার কথা। তার মত সেও এক হতভাগী। কত কষ্ট পাচ্ছে কে জানে।

আনমনা হয়ে পড়েছিল আহমদ মুসা। ঢিলে হয়ে গিয়েছিল হাতের স্টিয়ারিং হুইল। গাড়িটা বেঁকে গিয়ে ধাক্কা খেতে যাচ্ছিল একটা গাছের সাথে। শেষ মুহূর্তে আহমদ মুসা গাড়িটাকে নিয়ন্ত্রনে আনতে পেরেছে।

গাড়ির এই অবস্থা দেখে বিস্মিত হলো জোয়ান। বিস্মিত হয়ে সে তাকালো আবদুর রহমানের দিকে। দেখল তারও চোখে বিস্ময়। বিস্মিত হবারই কথা। আহমদ মুসা অকল্পনীয় ধরনের সুনিপুণ ও সুদক্ষ ড্রাইভারই শুধু নন, গাড়ি চালনা যে চমৎকার একটা আর্ট সেটা আহমদ মুসার হাতেই তারা দেখেছে।

আহমদ মুসা গাড়িটা ঠিক লাইনে ফিরিয়ে এনে দাঁড় করাল। নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। বলল, 'আবদুর রহমান তুমি এস ড্রাইভিং সিটে।

জোয়ানের বিস্ময় উদ্বেগে পরিনত হলো। বলল, 'মুসা ভাই শরীর খারাপ করছে না তো আপনার?'

'না জোয়ান, এমনি একটু আনমনা হয়ে পড়েছিলাম।' মুখে হাসি টেনে বলল আহমদ মুসা।

মুখে হাসি টানলেও জোয়ান ও আবদুর রহমান আহমদ মুসার চোখের কোণে জমে উঠা সেই অশ্রু বিন্দুটা দেখতে পেল।

আবদুর রহমান পেছনের সিট থেকে নেমে ড্রাইভিং সিটের দিকে এগুলো।

'কিন্তু মুসা ভাই, এমন আনমনা হতে কোনদিন আপনাকে দেখিনি। আপনার চোখে আবার অশ্রুও দেখেছি।' বলল জোয়ান।

'ও কিছু নয় জোয়ান, হঠাৎ চীনের সিংকিয়াং-এ আমার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া গ্রামের কথা মনে পড়েছিল, মনে পড়েছিল আমার ছোট বাড়িটার কথা, মনে পড়েছিল হারিয়ে যাওয়া আব্বা, আম্মা, ভাই-বোনের কথা।'

'মুসা ভাই, আপনিও এমন করে এসব ভাবেন? ভেবে এইভাবে আনমনা হন, কাঁদেনও?'

আহমদ মুসা গাড়িতে উঠে বসেছিল। চলতে শুরু করেছিল গাড়ি আবার।

'কেন জোয়ান, একজন বাপের, একজন মায়ের আদরের সন্তান কি আমি নই? একজন ভাই, একজন বোনের স্নেহময় ভাই কি আমি না? তারা আজ কেউ নেই, স্মৃতি তো আছে।' সামনে দূর দিগন্তের দিকে উদাস দৃষ্টি মেলে বড় নরম কন্ঠে বলল আহমদ মুসা। আবার আনমনা হয়ে পড়ল সে।

জোয়ান পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইল আহমদ মুসার দিকে। কথা বলতে আর সাহস করল না জোয়ান। মনে হচ্ছে আহমদ মুসা পাশে থেকেও যেন নেই। বাল্য কিংবা কৈশোরের কোন স্মৃতি সে হাতড়ে ফিরছে কে জানে! জোয়ানের কাছে বিপ্লবী নেতা আহমদ মৃসার এ এক নতুন রূপ।

কথা বলে আহমদ মুসার এ ধ্যান-মগ্নতা ভাঙতে চাইলো না জোয়ান। বিস্ময়ের সাথে ভাবল শুধু, আহমদ মুসার সংগ্রামী জীবনের আড়ালে তার একান্ত ব্যক্তিগত একটা জীবন আছে যেখানে সে বড় দুর্বল, বড় একা। সেখানে তাকে পীড়া দেবার মত আছে অনেক অশ্রু, অনেক কান্না।

পাহাড়িয়া পথে এঁকে-বেঁকে চলছিল তখন গাড়ি। আবদুর রহমানের শক্ত হাতে ধরা স্টিয়ারিং হুইল।

প্রথমে তারা পার্বত্য শহর ভেল্লায় ফিরে যাচ্ছে। সেখান থেকে তাদের যাত্রা শুরু হবে মাদ্রিদের দিকে।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আহমদ মুসা মাদ্রিদ পৌছতে চায়।

# ৫

মাদ্রিদে ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের হেড কোয়ার্টার।

ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের প্রধান বুটাগুয়েনা ভাসকুয়েজ বিরাট কক্ষের বিশাল টেবিলে বসে আছে। তার সামনে টেবিলে একটা মেসেজ। ফ্যাক্সে এসেছে অল্প আগে। এসেছে ইটালীর ট্রিয়েস্ট থেকে।

এয়ার কন্ডিশন ঘরেও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে ভাসকুয়েজের। মনের ভেতরের অবস্থা তার আরও খারাপ। ক্রুদ্ধ অন্তর থেকে তার রক্ত ঝরছে যেন। গোটা দেহের রক্ত তার টগবগ করে ফুটছে। এতবড় পরাজয়, এতবড় বিপর্যয়ের কথা ভাবতে পারেনি ট্রিয়েস্টে। রাত আটটায় সে খবর পেল, জোয়ান যে স্যাম্পল নিয়ে গিয়েছিল তেজস্ক্রিয় পরীক্ষার জন্যে সে স্যাম্পলসহ তেজস্ক্রিয় রিপোর্ট এবং কম্পিউটার ডিস্ক ইরগুন জাই লিউমির হাতে এসেছে। সে স্যাম্পল, তেজস্ক্রিয় রিপোর্ট এবং কম্পিউটার ডিস্কসহ মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাসফরে যাওয়া দলটিকে রাত ১২টা প্লেনে মাদ্রিদে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে। ভীষণ খুশী হয়েছিল ভাসকুয়েজ আহমদ মুসার পরিকল্পনা ভন্ডুল করতে পেরে। এক ট্রিয়েস্টেই এই পরীক্ষা আহমদ মুসা করতে পারতো, কিন্তু সেটার হলো গুড়ে বালি। ট্রিয়েস্টে আর পারবে না তারা এই পরীক্ষার জন্যে যেতে। আর ইউরোপ আমেরিকার কোন গবেষণাগারে তো আহমদ মুসা কিংবা হিদেন(মুসলমান) তো ঢুকতেই পারবে না। সুতরাং বুঝতেই পারবে না, স্পেনের বাদশাহ ফয়সল মসজিদ কমপ্লেক্সসহ স্পেনের ঐতিহাসিক মুসলিম স্থাপনা কোন মহাধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এসব খুশীর চিন্তা বুকে নিয়েই ভাসকুয়েজ রাতে ঘুমিয়ে ছিল। কিন্তু সকালে ৮টায় অফিসে এসেই এই ফ্যাক্স মেসেজ পেল ট্রিয়েস্ট থেকে। ভয়ানক দুঃসংবাদ।

ট্রিয়েস্ট থেকে ইরগুন জাই লিউমি লিখেছে, 'গত রাত ১২টার দিকে সি-কুইন মোটেলের সামনে ইরগুন জাই লিউমি'র একজন গেরিলাকে হত্যা করে

শিক্ষাসফর দলের নেতা মিঃ ভিলারোয়াকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গিয়ে তার কাছ থেকে সেই স্যাম্পল, তেজষ্ক্রিয় রিপোর্ট, ডিস্ক সব কেড়ে নিয়েছে একজন লোক। এর কিছুক্ষন আগে দাউদ ইমরানের বাড়িতে আমাদের দ'জন মূল্যবান লোক খুন হয়েছে। এছাড়া রেস্ট হাউজে জোয়ানের ঘরের সামনে আরো দু'জন এবং গবেষণা কেন্দ্রের ফটকে অন্য আরো চারজন লোক আমাদের নিহত হয়েছে। ইরগুন জাই লিউমি'র মূল্যবান বিজ্ঞানী দাউদ ইসরানের পোড়া দেহ পাওয়া গেছে তার নিজ গাড়ির ধ্বংসাবশেষ থেকে। মোট আমাদের দশজন খুন হয়েছে আপনার কাজে। এর জন্যে ক্ষতিপূরণ হিসেবে আরও এক মিলিয়ন ডলার আমরা চাই।'

ইরগুন জাই লিউমি'র এই মেসেজ পড়েই এয়ার কন্ডিশন ঘরে ঘামছে ভাসকুয়েজ। কাজের কাজ কিছুই হলো না। এক মিলিয়ন ডলার যাবার পথে।

ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান ট্রিয়েস্টের পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র আই সি টি পি থেকে জোয়ানের নিয়ে যাওয়া স্যাম্পলটি, এর তেজষ্ক্রিয় রিপোর্ট এবং ডিস্ক চুরি করার দায়িত্ব দিয়েছিল ইরগুন জাই লিউমিকে। বিনিময় হিসেবে অগ্রিম দিয়েছিল এক মিলিয়ন ডলার। আরও কথা দিয়েছিল প্রতিটি লোকের ক্ষতির জন্যে দেবে এক লাখ ডলার।

মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জোয়ান পুরাতন কিছূ ইট খন্ড ও কংক্রিট খন্ডাংশের তেজষ্ক্রিয় পরীক্ষার জন্যে এসেছে ট্রিয়েস্টে-একথা ইরগুন জাই লিউমিই জানিয়েছিল ভাসকুয়েজকে। ভাসকুয়েজের ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান যে স্পেনের মুসলিম স্থাপনাগুলো ধ্বংসের জন্যে তেজষ্ক্রিয় প্রয়োগ করেছে, এখবর ইরগুন জাই লিউমি রুশ গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে জানতে পারে। ইরগুন জাই লিউমি'র এজেন্ট আই সি টি পি'র বিজ্ঞানী দাউদ ইমরান পুরোনো ইটের ভাঙা টুকরার বয়স পরীক্ষা করেই ধরে নেয় ওগুলো কর্ডোভা বা গ্রানাডার মুসলিম স্থাপত্য থেকে আনা। যেহেতু সে জানে, তার কাছে সব বিষয় পরিস্কার হয়ে যায়। সংগে সংগেই সে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং বিষয়টি ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানকে জানাবার ব্যবস্থা করে।

ভীষণ ক্রোধ ও দুঃখের সাথে বিস্ময়ও বোধ হচ্ছিল ভাসকুয়েজের। ইরগুন জাই লিউমি'র ১০জন গেরিলা এজেন্টকে খুন করল কে? জোয়ান সম্পর্কে আমরা জানি যে, সে জীবনে কোনদিন পিস্তল ধরেনি। সে নিরেট একজন

একাডেমিশিয়ান। তার কাছ থেকে এ ধরনের কাজ আশা করা যায় না। তাহলে এই হত্যাকান্ড চালাল কে? আহমদ মুসা কি!

এই সময় ইন্টারকম কথা বলে উঠল। বলল, ট্রিয়েস্ট থেকে ফিরে আসা শিক্ষা সফরকারী দলের সহকারী নেতা অধ্যাপক জোস এসেছেন।

'পাঠিয়ে দাও।' দ্রুত বলল ভাসকুয়েজ।

মিনিট খানেকের মধ্যেই মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোককে নিয়ে ভাসকুয়েজের সেক্রেটারী প্রবেশ করল।

ভদ্রলোক বসলে বেরিয়ে গেল ভাসকুয়েজের পি, এস।

কথা বলল ভাসকুয়েজ প্রথম। বলল, 'ক'টার প্লেনে উঠেন ট্রিয়েস্ট থেকে?'

'রাত বারটায়।'

'তাহলে ১২টার আগের সব খবর আপনি রাখেন।'

'সব জানি না, কিছু শুনেছি মাত্র। বিজ্ঞানী দাউদ ইমরানের বাড়িতে তার দু'জন লোক খুন হয়েছে।'

'আর কিছু?'

'জানি না।'

'কি জন্যে এসেছেন, কি বলতে চান, বলুন।'

'অধ্যাপক ভিলারোয়া আপনাকে বলতে বলেছেন, আপনার কাছে পৌঁছানোর জন্যে বিজ্ঞানী দাউদ ইমরান কিছু কাগজ ও জিনিসপত্র দিয়েছিলেন, সেগুলো একজন লোক ছিনিয়ে নিয়েছে তাকে কিডন্যাপ করে। যে তাঁকে কিডন্যাপ করেছিল, সেই লোকটিই মটেল সি-কুইনের গাড়ি বারান্দায় একজন লোককে খুন করে। খুন করার পরেই অধ্যাপক ভিলারোয়াকে কেডন্যাপ করা হয়।'

'আপনি তখন সেখানে ছিলেন?'

'ছিলাম।'

'আর কে ছিল?'

'হোটেলের কয়েকজন সহ আসরা সাত আটজন ছিলাম।'

‘একজন লোক এসে একজনকে খুন করল, আর একজনকে কিডন্যাপ করল, আপনারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি কাজটা করেছিলেন?’

‘কি ঘটল, কি ঘটছে তা আমরা বুঝে উঠার আগেই সব শেষ হয়ে গেছে তাছাড়া লোকটি সশস্ত্র, ভয়ানক ক্ষিপ্র। আমরা ছিলাম খালি হাতে’

‘আপনি খুনি লোকটাকে দেখেছেন ?’

‘দেখেছি’

‘কি রকম সে দেখতে ?’

‘গায়ের রং সাদাটে স্বর্ণাভ। কালো চুল। চেহারায় এশীয়।’

একটু ভাবল ভাসকুয়েজ। তারপর পাশের ফাইল কেবিনেট থেকে একটা ফটো বের করে অধ্যাপক জোসের সামনে তুলে ধরল। বলুন তো, ‘এই লোক কি না।’

অধ্যাপক জোস খুশী হয়ে উঠল। বলল, ঠিক এই লোক। এখানে জ্যাকেট গায়ে, আর সেখানে স্যুট পরে।’

চোখ দু’টি জ্বলে উঠল ভাসকুয়েজের। মুখের মাংস পেশীগুলো যেন শক্ত হয়ে উঠল তার।

‘ধন্যবাদ অধ্যাপক, আমার কথা শেষ। ‘ কষ্ট করে যেন কথা কয়টি উচ্চারন করল ভাসকুয়েজ।

অধ্যাপক জোস বেরিয়ে যেতেই ভাসকুয়েজ প্রচন্ড এক মুষ্টাঘাত করল টেবিলে। মুখ থেকে বেরিয়ে এল, ‘বিষ্ট আহমদ মুসা! তুমিই তাহলে গিয়েছিলে ট্রিয়েস্টে।’

বলেই ইন্টারকমে পি,এস, কে নির্দেশ দিল, ‘জুবি জারিটাকে আসতে বল, এখুনি।’

জুবি জারিটা স্প্যানিশ ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের নতুন অপারেশন চীফ। অপারেশন চীফ সিনাত্রা সেন্ডো নিহত হবার পর জুবি জারিটা এই দায়িত্বে এসেছে। মাদ্রিদের বাদশাহ ফয়সাল কমপেক্সে আহমদ মুসাদেরকে ধরার জন্যে যে অভিযান করেছিল, সেই অভিযানে সিনাত্রা সেন্ডো নিহত হয়। সিনাত্রা সেন্ডো

তার চারজন সাথীকে নিয়ে যে গাড়িতে ছিলো, সেই গাড়িটিই আহমদ মুসার বোমায় বিস্ফোরিত হয় এবং সংগীদের সমেত নিহত হয়।

মিনিট দেড়েকের মধ্যেই জুবি জাড়িটা দরজায় এসে দাঁড়াল এবং প্রবেশ অনুমতি চাইল।

অনুমতি নিয়ে দরজা ঠেলে জুবি জাড়িটা প্রবেশ করল ঘরে।

সারে পাঁচ ফিটের প্রমান সাইজের মানুষ জুবি জাড়িটা। সামরিক বাহিনীর কর্নেল ছিলেন। চাকুরী থেকে বরখাস্ত হয়েছে চরম বর্নবাদী মানসিকতার জন্যে। ন্যাটো বাহিনীতে এক মহড়া কালে একজন আমেরিকান মুসলিম নিগ্রো অফিসারের সাথে অন্যায়ভাবে মারপিট করার কারনে তাকে বরখাস্ত করা হয়। ক্লু-ক্ল্যাঙ্-ক্ল্যান তাকে লূফে নিয়েছে। মাত্র দু'বছরের মধ্যে সে অপারেশন চীফের আসন লাভ করেছে। ভাসকুয়েজ খুবই আদর করে তাকে, তার এক রোখা ও আপষহীন আচরনের জন্যে।

উত্তেজিতভাবে পায়চারি করছিল ভাসকুয়েজ। জুবি জারিটা ঘরে ঢুকতেই ভাসকুয়েজ ফিরে এল তার চেয়ারে।

চেয়ারে বসে দাঁড়ানো জুবি জাড়িটাকে বসতে বলল। জুবি জাড়িটা মেরুদন্ড খাড়া রেখে এ্যটেনশনের কায়দায় চেয়ারে বসল।

'জানো কিছু খবর?' নিরস কন্ঠে বলল ভাসকুয়েজ।

'কোন খবর স্যার?'

'এক মিলিয়ন ডলার গেছে, আরেক মিলিয়ন ডলার যাবার পথে।'

জুবি জাড়িটা কোন প্রশ্ন না করে উদ্বেগের সাথে তার প্রশ্ন বোধক দৃষ্টি তুলে ধরল।

ভাসকুয়েজই আবার মুখ খুলল। বলল, শয়তান জোয়ানই জয়ী হয়েছে। সেই স্যাম্পুল, তেজস্ক্রিয় রিপোর্ট এবং কম্পিউটার ডিস্ক যা হাত করা হয়েছিল আই সি টি পি' থেকে, তা ওরা ছিনিয়ে নিয়েছে, তার সাথে ইরগুন জাই লিউমি'র দশ জন লোক খুন হয়েছে। এক মিলিয়ন ডলার পানিতে গেল। দশজন লোকের ক্ষতিপুরণ আরও ১ মিলিয়ন ডলার দিতে হবে।'

'ওরা ছিনিয়ে নিয়েছে? ইরগুনের দশজন লোক খুন হয়েছে?'

বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে বলল জুবি জাড়িটা।

‘এই সর্বনাশ করেছে কে বলতে পার?’

‘জোয়ান তো অবশ্যই নয়, গবেষণা কেন্দ্রের কেউ হতে পারে বলে আমি মনে করি না।’

‘তাহলে?’

‘এতবড় কাজ এমন নিখুঁত ভাবে একজনেই করতে পারে, সে হলো আহমদ মুসা।’

‘ধরতে পেরেছ তাহলে। লজ্জা বোধ হচ্ছে না একজনের কাছে বার বার এভাবে হারতে।’

জুবি জাড়িটার মুখে যেন এক পোচ কালি কেউ মাখিয়ে দিল।

একটা ঢোক গিলে জুবি জাড়িটা বলল, ‘কি করতে হবে স্যার, আদেশ করুন।’

‘কি আদেশ করবো, কি করতে হবে তা শোনার জন্যেই তো তোমাকে ডেকেছি। ‘

‘স্যার আমি ট্রিয়েস্টে যেতে পারি। ওখানে নিশ্চয় আহমদ মুসার সাঙাত আছে, ওদের খুঁজে বের করে আহমদ মুসার কাছে পৌঁছার পথ করতে পারি।’

‘গর্দভ, আহমদ মুসার সাঙাত খোঁজার জন্যে ট্রিয়েস্ট যাবে, এখানে মাদ্রিদে আহমদ মুসার সাঙাত নেই?’

‘স্যার জোয়ানের পরিবারের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি অনেক চেষ্টা করেও। ওরা তাদের নিজের বাসায় থাকে না।’

‘আর কোন সাঙাত বুঝি আহমদ মুসার নেই?’ জানো, বাসক গেরিলা নেতা ফিলিপের বোনকে বাঁচিয়ে আহমদ মুসা এখন বাস্‌কদের কাছে জামাই আদর পাচ্ছে ?’

‘জি স্যার, আমি বাস্‌কদের পরিচিত ঘাটিগুলোর দিকে নজর রেখেছি। তবে, ফিলিপ ও ফিলিপের বোন মাদ্রিদে এলে এক ভাড়া বাড়িতে থাকে, সেই বাড়িটার সন্ধান এখনও আমরা করতে পারিনি।’

জুবি জাড়িটা একটু থেমেই আবার মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, ‘স্যার একটা কথা বলব।’

‘কি কথা ?’

‘ফ্রান্সিসকো জেমেনিজ সিসনারোসার মেয়ে জেন ক্যাথারিনার গতিবিধি সন্দেহজনক। তাকে শিক্ষা সফরে পাঠানো ঠিক হয়নি, বিশেষ করে জোয়ান যেহেতু সেখানে গিয়েছিল।’

‘তোমার সন্দেহ অমূলক গর্দভ। জেনের পিতার কাছ থেকেই শুনেছি, জেন শিক্ষা সফরে কিছুতেই যেতে চায়নি, তাকে সবাই জোর করে নিয়ে গেছে। তাছাড়া জোয়ান সেখানে গেছে এটা কারোই জানা ছিলো না। জেনের সম্পর্কে তোমার কথা সত্য হলে, জেন জানত যে জোয়ান ট্রিয়েস্ট গেছে এবং সেক্ষেত্রে জেন আগ্রহী হতো ট্রিয়েস্ট যাবার জন্যে।’

একটু থামল। তারপর চেয়ারে নড়ে-চড়ে বসে আবার বলল, ‘জুবি, ভবিষ্যতে জেন সম্পর্কে এইভাবে কথা বলবে না। সে ফ্রান্সিসকো জেমেনিজের মেয়ে। আর ফ্রান্সিসকোর অবদান ক্লু-ক্যাক্স-ক্ল্যানে তোমার আমার চেয়ে অনেক বেশী।’

‘স্যরি স্যার।’

‘করণীয় তো কিছু বের করতে পারলে না। এখন শুন, গোটা মাদ্রিদ ঘিরে ফেলতে হবে।’

‘ইয়েস স্যার। কিন্তু.. ..।’

কেন ঘিরে ফেলতে হবে সেটাই তো বলবে? বলত আহমদ মুসা তেজস্ক্রিয়া রিপোর্ট নিয়ে এখন কি করবে?

এর এন্টিডোট খুজবে অথবা তেজস্ক্রিয় ক্যাপসুল গুলো তুলে ফেলার চেষ্টা করবে তাদের উল্লেখযোগ্য স্থাপনা গুলো থেকে।

গর্দভ তেজস্ক্রিয়ের কোন এন্টিডোট নেই। তাদের হাতে একটাই বিকল্প। সেটা হলো তেজস্ক্রিয় ক্যাপসুল গুলো মাটির তলা থেকে তুলে ফেলা। এই কাজের জন্য প্রথমেই আহমদ মুসা আসবে মাদ্রিদ, এখন পরিষ্কার হয়েছে কেন মাদ্রিদ ঘিরে ফেলতে হবে ?

ইয়েস স্যার। এতক্ষণে হাসি ফুটে উঠল জুবি জারিটার মুখে।

শুধু ইয়েস স্যার নয়। আজকেই কাজে লেগে যাও। মাদ্রিদ প্রবেশের প্রতিটি পথে পাহারা বসাও। তোমাদের নজর এড়িয়ে একটা পিপড়াও যেন মাদ্রিদ প্রবেশ করতে না পারে। যাও এখন।

ইয়েস স্যার। বলে উঠে দাড়াল জুবি জারিটা।

চারদিন পরের ঘটনা।

ভাসকুয়েজ তার টেবিলে জুবি জারিটার রিপোর্ট পড়েছিল। জুবি জারিটা মাদ্রিদ বন্দের জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহন করেছে এ তারই রিপোর্ট। ভাসকুয়েজের ঘরে ঢুকল তার মিডিয়া অপারেটর মেয়েটি। তার হাতে সদ্য আসা একটা ফ্যাক্স মেসেজ।

পায়ের শব্দে মুখ তুলল ভাসকুয়েজ। ভ্রু কুচকে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল জরুরী কিছু?

জরুরী মেসেজ অপারেটর নিজেই সোজাসুজি নিয়ে এল ভাসকুয়েজের কাছে, এটাই নিয়ম। সাধারণ ও রুটিন মেসেজ গুলো ফাইল আকারে পি এস এর কাছে যায় পি এস সেগুলো নিয়ে আসে ভাসকুয়েজের কাছে।

জি স্যার। তুলুজ থেকে জরুরী মেসেজ।

ভাসকুয়েজ হাত বাড়িয়ে মেসেজটি নিল নজর বুলাল মেসেজটিতে তুলুজের ক্লু ক্ল্যাক্স ক্ল্যান ইউনিটের সহকারী ডুপ্লে লিখেছে।

গতকাল সন্ধ্যায় আমরা ভেনিস থেকে জানতে পারি আহমদ মুসা তার দুইজন সাথী সহ তুলুজ গামী বিমান উঠেছে। বিমান বন্দরে আমার তিনটি গাড়ির একটা ফাদ তৈরী করি। আহমদ মুসা সহ তারা তিনজনই আমাদের ফাদে পড়ে যায়। আমার ট্যাক্সিতেই ওরা ভাডায় উঠে। আমিই গাড়ি চালাচ্ছিলাম। অন্য দুটি গাডি নিয়ে আমাদের কমান্ডারসহ চারজন আমাদের গাডির পেছনে আসছিল। আমাদের টার্গেট ছিল ওদেরকে আমাদের ঘাটিতে নিয়ে আটকানো। ওরা গেবোনে হাইওয়ে হয়ে সুরেট যাবার জন্য আমার গাডিতে উঠেছিল। ওরা তিনজন কেউ রাস্তা চেনে না তবু ওদের সন্দেহ হয় আমি ঠিক পথে চলছি না। পেছনে থেকে একটা হাত এসে আমার গলা চেপে ধরে আমাকে অজ্ঞান করে ফেলে। পুলিশ

আমার জ্ঞান ফেরায়। দেখতে পাই আমাকে অজ্ঞান করে কমান্ডার সহ চারজনকে খুন করে আহমদ মুসারা পালিয়েছে। আমাকে জড়িয়ে কেস হয়েছে। আমি পুলিশ কাস্টোডিতে থেকেই একজনকে পয়সা দিয়ে এই মেসেজটি পাঠালাম।

মেসেজটি পড়ে কুইনাইন খাওয়ার মতো বিকৃত হয়ে গেল ভাসকুয়েজের মুখ। আবার আহমদ মুসার কাছে পরাজয়। কিন্তু এ পরাজয়টা হলো কি করে। একজনকে না হয় অজ্ঞান করে একটা গাড়ি দখল করল অন্য দুটি তখন কি করছিল। কিছু করতে তারা না পারুক দুটি গাড়ির সবাই আহমদ মুসার হাতে হাওয়া খেতে বেরিয়ে গুলী খেয়ে টপটপ করে ঝরে পড়েছে। মন বিষিয়ে উঠল ভাসকুয়েজের।

ভাসকুয়েজ কিছুক্ষণ পায়চারি করল। তারপর এসে দাড়াল দেয়ালে টাঙানো বিশাল মানচিত্রের সামনে। দৃষ্টি নিবন্ধ করল দক্ষিণ ফ্রান্সের উপর। তুলুজে ওদেরকে খুন করে আহমদ মুসা নিশ্চয় মুরেটে এসেছে মুরেটে কেন? আসলে মুরেট একটা স্টপেজ। সে আসছে স্পেনে সম্ভবত গোরোনে হাইওয়ে ধরে মন্টেজূ ও ম্যানোনা হয়ে বাসাক এলাকার মধ্যে দিয়ে সে স্পেনে প্রবেশ করবে। দুঃখের মধ্যেও এ হদিসটুকু পেয়ে খুশি হলো ভাসকুয়েজ।

চেয়ারে আবার ফিরে এল ভাসকুয়েজ। ইন্টারকমে যোগাযোগ করল জুবি জারিটার সাথে। বলল শুনো পিরেনিজ থেকে বিশেষ করে পিরিনিজ এর ভেল্লা এলাকা থেকে যে সব রাস্তা সে সব রাস্তার উপর বিশেষ নজর রাখতে হবে। আহমদ মুসা ঐ পথ দিয়েই স্পেনে প্রবেশ করছে। আর মাদ্রিদের উত্তর মুখি রাস্তা গুলোর উপরই পাহারা জোরদার কর।

তুলুজে ক্লু ক্ল্যাক্স ক্ল্যানের বিপর্যয় ও চারজন নিহত হবার কথা ভাসকুয়েজ জুবি জারিটার কাছে চেপে গেল। ভাসকুয়েজ চায় না যে ওদের মধ্যে একটা আতংক সৃষ্টি হোক। আত্মবিশ্বাস কমে যাক এবং আহমদ মুসাকে ভয় করতে শুরু করুক।

জুবি জারিটার সাথে কথা শেষ করে ভাসকুয়েজ সবে একটা ফাইলে মনোযোগ দিয়েছে এমন সময় ইন্টারকম কথা বলে উঠল জুবি জারিটার গলা। উদ্বিগ্ন কণ্ঠ। বলল স্যার সর্বনাশ হয়ে গেছে।

কি সর্বনাশ হয়েছে?

তুলুজে আহমদ মুসা আমাদের চারজন লোককে খুন করেছে। আহমদ মুসাকে ওরা ...।

তুমি কোথেকে জানতে পারলে এ খবর? জুবি জারিতাকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল ভাসকুয়েজ।

ফরাসি ইন্টেলিজেন্সের একটা মেসেজ এইমাত্র পেলাম।

হু করে একটা শব্দ বেরুল ভাসকুয়েজের মুখ থেকে। বলল হ্যা ওরা খুশী হয়ে খারাপ খবরটা তাডাতাডি দিয়েছে, ভাল কোন খবর ওদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না।

বলে ভাসকুয়েজ ইন্টারকম অফ করে দিল। মুখটা বিরক্তিতে ভরা।

সামনে খোলা ফাইলটি বন্ধ করে চেয়ারে গা এলিয়ে দিল ভাসকুয়েজ। চোখ বন্ধ করল। কিছুক্ষণ সব ভুলে থেকে শান্তি পেতে চায় সে কিন্তু চোখ বন্ধ করতেই ব্যর্থতার ভয়াবহ চিত্রগুলো এক এক করে ছায়াছবির দৃশ্যের মত তার সামনে এসে হাজির হতে লাগল। বিশ্রাম হলো না। উঠে দাডালো ভাসকুয়েজ।

ঘরময় আবার পায়চারি শুরু হলো তার।

তুই আমাকে বিশ্বাস করিস না। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল হান্না জেনকে।

তোকে বিশ্বাস না করলে দুনিয়াতে আর কাকে বিশ্বাস করি বলত? আমার গোটা হৃদয় তোর কাছে খোলা। বলল জেন হান্নার একটি হাত নিজের বুকে জডিয়ে ধরে।

কেন কেউ নেই? জোয়ান?

জোয়ানের সাথে তো আমার বিশ্বাসের সম্পর্ক নয় ও আমার সত্তা আমার সব। আর তুই আমার একমাত্র বন্ধু যার কাছে আমার হৃদয় খোলা।

না তুই আমাকে বিশ্বাস করিস না জেন। আবার জোর দিয়ে বলল হান্না।

তুই বাজে বকছিস।

বাজে বকছি? আচ্ছা বলত ত্রিয়েস্তে সি কুইন মোটেলের সামনে যে দিন হত্যার ঘটনা ঘটল। সেদিন রাত আটটায় তুই কোথায় গিয়েছিলি ?

প্রশ্ন শোনার পর জেন কিছুক্ষণ হান্নার দিকে নির্বাক চোখে তাকিয়ে থাকল। যেন জেন পাঠ করার চেষ্টা করছে হান্নাকে।

একটু পর ধীরে কণ্ঠে বলল তুই কত টুকু জানিস হান্না?

কিছুই জানিনা তুই কোথাই গিয়েছিলি বল? হেসে বলল হান্না।

জেনের মুখে কিন্তু হাসি নেই। হান্নার একটি হাত তুলে নিয়ে বলল না তুই জানিস। বল কতটুকু জানিস?

জেনের অবস্থা দেখে হান্নার বোধ হয় করুনা হলো বলল সেদিন বিকেলে থেকেই তোকে আমি আনমনা দেখি। তারপর রাত ৮টার দিকে তুই যখন বাইরে যেতে চাইলি এবং আমাকে সাথে নিতে চাইলি না তখন আমার সন্দেহ হলো নিশ্চয় জোয়ানের ওখানে যাচ্ছিস। তোর অভিসার যাত্রাকে অনুসরন করলাম। জোয়ানের রেস্ট হাউসের দিকে যাচ্ছিস দেখে আমার অনুমান সত্য হওয়াই ভীষণ খুশী হলাম কিন্তু শীঘ্রই আমার খুশী কৌতুহলে রূপ নিল যখন দেখলাম তুই ওঁত পেতে বসলি। ভাবলাম এই লুকোচুরি খেলার শেষ দেখতে হবে। অভিসারের এ আবার কোন রূপ, অবশ্য পরক্ষনেই জোয়ানের ঘরের দরজা খোলা দেখে আমার মনে হয়েছিল নিশ্চয় জোয়ানের ঘরে লোক আছে এ জন্য তোর এই লুকানো। মজা দেখার লোভ নিয়ে তোর থেকে সামান্য দুরে একটা ঝাউগাছের আড়ালে বসে রইলাম। মজা দেখার আনন্দ আতংকে রূপান্তরিত হলো যখন দেখলাম দু জন স্টেনগানধারী জোয়ানের ঘরের দরজায় গিয়ে স্টেনগান উদ্যত করে দাঁড়াল। তারপর তোর দিকে তাকিয়ে তো আমার বুকের কাঁপুনি ধরে গেল। দেখলাম তোর হাতে উদ্যত পিস্তল, তুই গুড়ি মেরে এগুচ্ছিস জোয়ানের ঘরের দিকে। ভয়ে আমি আড়ষ্ট, কিন্তু চোখ সরাতে পারলাম না তোর উপর থেকে। তারপর দেখলাম তোকে গুলি করতে এবং ঐ দুই স্টেনগানধারীকে পড়ে যেতে। আমি তখন কাঁপছি। আমার পাশ দিয়েই দৌড়ে চলে গেলি। কিন্তু আমি নড়তে পারছিলাম না, কথাও বলতে পারছিলাম না। তুই চলে আসার পর আমার ভয় ধরে গেল, আমি না ধরা পড়ে যাই। কম্পিত পায়ে গুড়ি মেরে ফুলের গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে

এলাম রাস্তায়। তারপর ছুটলাম। মটেলে আসতে ভয় করছিল। মনে হচ্ছিল আমিই যেন খুন করেছি, কারও সাথে দেখা হলেই ধরা পড়ে যাব। চলে এলাম নিচে। এক বেঞ্চিতে নিরিবিলি বসে থাকলাম আধা ঘন্টা। ভয় কমলে, মনটা শান্ত হলে মটেলে ফিরে এলাম। তোর সাথেও কথা বলতে ভয় হচ্ছিল। শুয়ে পড়লাম কম্বল মুড়ি দিয়ে।'

থামল হান্না।

জেনের মুখে কোন কথা নেই। মুখ নিচু।

হান্নাই আবার কথা বলল। বলল, 'এত বড় ঘটনা আমার কাছ থেকে লুকিয়েছিস, নিশ্চয় তুই আমাকে বিশ্বাস করিস না।

মুখ তুলল জেন। বলল,'তোকে বলিনি কেন জানিস, তোকে বললে তুই আমাকে যেতে দিতিস না ঐ কাজে। 'প্রায় কান্না ভেজা কন্ঠে বলল, জেন।

'অবশ্যই যেতে দিতাম না। কি সর্বনাশা পথ ওটা! যদি স্টেনগানধারীরা টের পেত, যদি কিছু ঘটত! তোর ভয় করেনি?'

'ভয়ের কথা তখন মনে হয়নি, এখন ভয় করে মনে হলে। তখন আমার সমগ্র চেতনা জুড়ে জোয়ানের নিরাপত্তার প্রশ্ন। বিকেলে দাউদ ইমরানের ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় শুনেছিলাম, রাত ৯টায় অপারেশন জোয়ানের ঘরে। সন্ধ্যায় জোয়ানের আনা স্যাম্পুল, তেজস্ক্রিয় রিপোর্ট, এমনকি ডিস্ক গায়েব হবার খবর যখন শুনলাম, তখন বুঝলাম জোয়ানকে সরানোর পরিকল্পনাও চূড়ান্ত। এটা বোঝার পর আর আমার জ্ঞান ছিল না।'

তাই বলে তুই নিজ হাতে পিস্তল ধরে খুনিদের মোকাবিলা করার সাহস করলি, খুন করতেও পারলি?'

'কেমন করে পেরেছি জানিনা, একটা চিন্তাই তখন আমার মনে ছিল, জোয়ানকে বাঁচাতে না পারলে আমার বেঁচে লাভ নেই। আমি মরেও যদি ওকে বাঁচাতে পারি।

থেমে গেল জেন। ভারি হয়ে উঠেছিল ওর কন্ঠ।

'আমি দুঃখিত জেন, এটা তোর বাড়াবাড়ি। জোয়ানের অবস্থা তুই জানিস। তার সাথে তোর জীবনকে এভাবে জড়ালে তার পরিণতি কি?

‘আমি জানিনা। আমি ওসব ভাবি না।’

না ভাবলে চলবে কি করে? ট্রিয়েস্টে তুই তাকে বাঁচালি। কিন্তু ও এখন স্পেনে ফিরবে কি করে? ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান তাকে ছাড়বে মনে করিস?’

‘জেন, মা, তোমার এ্যাটলাস বইটা একটু দাও তো দেখি’-বলতে বলতে ঘরে প্রবেশ করল জেনের আব্বা মিঃ ফ্রান্সিস্কো জেমেনিজ। ঘরে ঢুকে হান্নাকে দেখে বলে উঠল, ‘বাঃ হান্না, কখন এসেছ মা?’

‘এই অল্পক্ষণ।’ উঠে দাঁড়িয়ে বলল হান্না।

এ্যাটলাস বুক নিয়ে চলে যেতে শুরু করে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে জেনের আব্বা বলল, শুনেছ মা জেন, মা হান্না, ট্রিয়েস্টে কি ঘটেছে? তোমরা কিছু তো দেখেছও।’

জেন কিছু বলল না।

‘কি ঘটেছে চাচাজান? আমি তো একজন লোক খুন হয়েছে দেখে এসেছি। ‘বলল হান্না।

‘একজন বলছ, দশজন খুন হয়েছে এবং এই সবগুলো খুনের জন্যে আহমদ মুসা দায়ী। আর তোমাদের জোয়ান এখানে নাটের গুরু হিসেবে কাজ করেছে।’

‘মুখটা লাল হয়ে উঠল জেনের।’

হান্নাই আবার কথা বলল। বলল, ‘চাচাজান, আমরা তো তেমন কিছু দেখিনি। সে তো কি একটা কাজে আই সি টি পি’তে গিয়েছিল। ওখানে কারও সাথে তার তেমন কোন পরিচয়ও নেই’। ‘তোমরা ছেলে মানুষ কি জান। সে এক সাংঘাতিক মিশনে ট্রিয়েস্টে গিয়েছিল। ওটাকে কেন্দ করেই তো ঐসব খুন-জখম। ছেলেটা নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারল।’

‘কিভাবে চাচাজান? সে কি কাউকে খুন করেছে? কারও ক্ষতি করেছে?’

‘ওর পক্ষে এসব কথা বাইরে বলো না হান্না। সে এখন আমাদের জাতীয় শত্রু। ও স্পেনে আর ফিরতে পারবে না, ফিরতে পারলেও বাঁচবে না।’

বলে জেনের আব্বা বেরিয়ে গেল।

জেনের মুখে তখন কোন রক্ত নেই। কাঁপছে তার ঠোঁট।

হান্না তার একটা হাত ধরে বলল, 'জেন তোকে পাগলামি ছাড়তে হবে, শুনলি তো সব?'

জেন হান্নার দুই হাত জড়িয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। বলল, 'আমি পারবো না, আমি পারবো না। আমি ওসব কথা বিশ্বাস করি না। জোয়ান নির্দোষ। বরং জোয়ান ষড়যন্ত্রের শিকার।'

'এ কথা কাউকে বিশ্বাস করাতে পারবি?'

'কোন ক্ষতি নেই কেউ বিশ্বাস না করলে। আমি শুধু বিশ্বাস করতে চাই।'

'জোয়ান যদি স্পেনে না ফিরতে পারে?'

একটু চুপ করে থেকে জেন বলল, যেখানেই থাকুক, ভাল থাকলে, নিরাপদ থাকলে আমি খুশী হবো। তবে আমি কি মনে করি জানিস, জোয়ান স্পেনে আসবে, কোন বাধা তাকে রুখতে পারবে না।'

'এতবড় কথা কি করে বলছিস? ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের ক্ষমতা তুই জানিস?'

'জেনেই বলছি হান্না।'

'কিন্তু আমি কোন যুক্তি দেখছি না, জোয়ান তো শান্ত-শিষ্ট এক ছেলে। ওর মাথা আছে, কিন্তু হাত তো নেই।'

'ট্রিয়েস্টে বাকি যে আটটি খুনের ঘটনা ঘটল, তার একটিও জোয়ান করেনি। তাহলে এসব ঘটল কি করে বলতে পারিস?'

'আমারও বিরাট জিজ্ঞাসা এটা।'

'সব ঘটনা একজনে ঘটিয়েছেন না।'

'একজনে? কে সে?'

'আহমদ মুসা।'

'আহমদ মুসা? কোন আহমদ মুসা?'

'আজকের বিশ্বে সবাই চেনার মত আহমদ মুসা একজনই আছে।'

'সেই আহমদ মুসা স্পেনে এসেছে? ট্রিয়েস্টে গিয়েছিল? চাচাজানের কথা তাহলে ঠিক?' চোখ কপালে তুলে বলল হান্না।

'হ্যাঁ।'

'তুই কি করে জানলি?'

মুহূর্তের জন্যে দ্বিধায় পড়ে গেল জেন। তারপর বলল, ‘আমি তার ফটো দেখেছিলাম, ট্রিয়েস্টে দেখেই চিনতে পারি।’

‘ট্রিয়েস্টে দেখেছিস, কোথায়?’

‘মটেল সি-কুইনের সামনে তিনিই হত্যা করলেন অধ্যাপক ভিলারোয়ার সাথের লোকটিকে।’

‘ওই লোক আহমদ মুসা?’

একটা ঢোক গিলল হান্না। তারপর আবার বলল, ‘তাই হবে আমিও ভেবেছি, এতগুলো লোকের সামনে এত শান্তভাবে এতগুলো কান্ড ঘটিয়ে গেল যে লোক সে সাধারণ নয়। তাছাড়া মিঃ ভিলারোয়াকে যে লোকটি নিয়ে এসেছিল, সেই তো প্রথম পিস্তল বের করে, কিন্তু ব্যবহার আগে করতে পারেনি। আহমদ মুসা লোকটি কিভাবে কখন পিস্তল বের করল, ব্যবহার করল বোঝাই গেল না।’

আবার থামল হান্না। থেমেই আবার শুরু করল, ‘কিন্তু আহমদ মুসা জোয়ানের সাহায্যে আসবে কেন?’

‘আহমদ মুসা বিপদগ্রস্ত মানুষ, বিপদগ্রস্ত জাতির পাশে দাঁড়ান।’

‘কিন্তু জোয়ান যে বিপদে পড়েছে, সে বিপদ তো দু’চারশ’ লোকের বিরুদ্ধে লড়াই করে দূর করা যাবে না।’

‘আমি এসব কিছুই জানিনা হান্না,কিন্তু মনে হচ্ছে বড় একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে।’

‘তুই এটা বোঝার পরেও জোয়ানের সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলছিস কি করে?

‘হয়তো এটাই আমার ভাগ্য।’

‘তুই বুদ্ধিমতী, কিন্তু এই ব্যাপার নিয়ে তুই এত অবুঝ হবি, ভাবতে বিস্ময় লাগছে।’

কেঁদে ফেলল জেন। বলল, ‘ও নিরপরাধ, ওর প্রতি আমার দেশ, আমার জাতি, সরকার সবাই অবিচার করছে। আমি ওকে আঘাত দিতে পারিনি।’

‘জেন, আমি তো সাক্ষী, জোয়ান তোর কাছ থেকে সরে যেতে চেয়েছিল।’

'সরে যেতে চেয়ে ও প্রমান করেছে ও অসাধারন। কেন আমি প্রমান করব না যে, আমি ওর চেয়ে ছোট নই। থাক এসব কথা হান্না। তুই সব বুঝেও এমন করে বলছিস। জানি তুই আমার ভাল চাস। কিন্তু চরম অবিচারের শিকার হয়ে জোয়ান যদি শেষ হয়ে যায়, আমি বাচঁব না। তার চেয়ে ভাল, যতটুকু পারি ওর পাশে থেকে লড়ব জাতির অবিচারের বিরুদ্ধে। তাতে জীবন যদি আমার যায়, তাতে আমার এই কার্ডিনাল পরিবারের কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত হবে। মরিসকোদের উপর জুলুম আমার মনে হয় আমার পরিবারের চেয়ে বেশী কোন পরিবার করেনি।'

জেনের দু'চোখ থেকে দু'ফোটা অশ্রু খসে পড়ল, নেমে এল গন্ড বেয়ে।

হান্না জড়িয়ে ধরল জেনকে। বলল, 'হতভাগী বান্ধবী আমার। তোকে আমার চেয়ে কে বেশী বোঝে! আমি যাই মনে করি আমাকে তোর পাশে পাবি।'

'আমি জানি হান্না।' হান্নাকে জড়িয়ে ধরে বলল জেন।

দুই বান্ধবীর চোখেই তখন অশ্রু।

ঘরের বাইরে জেনের আম্মার কন্ঠ শোনা গেল, তার সাথে পায়ের শব্দ।

জেন ও হান্না দু'জনেই তাড়াতাড়ি তাদের চোখের পানি মুছে ফেলল।

আলবাসেট-মাদ্রিদ হাইওয়ে ধরে ছুটে চলছিল আহমদ মুসার গাড়ি মাদ্রিদের দিকে। তারা ঠিক দক্ষিন দিক দিয়ে প্রবেশ করতে যাচ্ছে মাদ্রিদে। পিরেনিজ থেকে সোজা এলে উত্তরের যে কোন পথে তাদের মাদ্রিদ প্রবেশের কথা, কিন্তু আহমদ মুসা ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানকে কাঁচ কলা দেখাবার জন্যে দিক পরিবর্তন করেছে।

চারদিক থেকে মাদ্রিদ প্রবেশের মোট হাইওয়ে আছে সাতটা। মাদ্রিদ-সারাগোসা ও মাদ্রিদ বারগোস হাইওয়ে উত্তর দিক থেকে, পশ্চিম দিক থেকে মাদ্রিদ-ভেল্লাদলিত ও মাদ্রিদ-বাজোস হাইওয়ে এবং দক্ষিনে তিনটি হাইওয়ে মাদ্রিদ-টলেড, মাদ্রিদ-আলবাসেট এবং মাদ্রিদ-ভ্যালেন্সিয়া। পিরেনিজের ভেল্লা

থেকে মাদ্রিদের সোজা পথ ছিল লেরিদা-সারাগোসা-মাদ্রিদ হাইওয়ে। এ পথে এলে তারা পূর্ব-উত্তর প্রান্ত দিয়ে মাদ্রিদ প্রবেশ করতো। কিন্তু আহমদ মুসা এ সোজা পথ পছন্দ করেনি। আহমদ মুসা পরিষ্কারই বুঝতে পেরেছিল, ভেনিস থেকে ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের লোকরা যখন তুলুজকে আহমদ মুসাদের ব্যাপারে সতর্ক করে দিতে পেরেছে, তখন তুলুজ মাদ্রিদকে অবশ্যই জানাতে পারে যে, আহমদ মুসারা গোরোনে হাইওয়ে ধরে ভেল্লার পথে স্পেনে প্রবেশ করছে। ভেল্লা থেকে আহমদ মুসারা যে সারাগোসা-মাদ্রিদ হাইওয়ে ধরে মাদ্রিদ প্রবেশ করছে, এ কথা ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান চোখ বন্ধ করেই ধরে নেবে। সুতরাং তুলুজে তারা যে জাল পেতেছিল, তার চেয়েও বড় জাল ভাসকুয়েজ পাতবে মাদ্রিদ-সারাগোসা হাইওয়েতে। সুতরাং আহমদ মুসা ভেল্লা থেকে বেরুবার সময়ই মনস্থির করে নিয়েছিল, ভিন্ন রুটে তারা মাদ্রিদ প্রবেশ করবে।

ভেল্লা থেকে উত্তর-পূর্ব স্পেনের ক্যাটালোনিয়া প্রদেশের রাজধানী লেরিদায় প্রবেশ করে ড্রাইভিং সিট থেকে আবদুর রহমান বলেছিল, ‘তখন আমরা তো পশ্চিমে সারাগোসার দিকে চলব, তাই না মুসা ভাই?’

‘না আবদুর রহমান, সোজা পূর্ব দিকে এগিয়ে উপকুল শহর টেরাগন চল।’

‘টেরাগন? আমরা মাদ্রিদ যাব না মুসা ভাই?’ চোখ কপালে তুলে বলেছিল আবদুর রহমান।

‘যাব, তবে সোজা পথে নয়। টেরাগন থেকে যাব ভ্যালেনসিয়া, ভ্যালেনসিয়া থেকে আলমানসা হয়ে অলবাসেট এবং সেখান থেকে মাদ্রিদ।’

‘এত ঘুরার কি প্রয়োজন ছিল মুসা ভাই?’

‘ছিল না। কিন্তু ওদের চোখ এড়িয়ে আমি মাদ্রিদ প্রবেশ করতে চাই। ওরা জানুক যে, আমরা মাদ্রিদে আসিনি, তাহলে কাজের একটু সুবিধা হবে। সবচেয়ে বড় কাজ এখন আমাদেরকে মাদ্রিদে করতে হবে। ওরা যত অপ্রস্তুত থাকে তত ভাল আমাদের জন্যে।’

‘কিন্তু মুসা ভাই, ভ্যালেনসিয়া থেকে সোজা একটা হাইওয়ে গেছে মাদ্রিদে, ও পথেও তো আমরা যেতে পারি?’ বলেছিল জোয়ান।

'পারি, কিন্তু তারচেয়েও আলবাসেট-মাদ্রিদ হাইওয়েটা নিরাপদ হবে বলে আমি মনে করি। সারাগোসা-মাদ্রিদ হাইওয়ের পাশেই তো অনেকটা ভ্যালেনসিয়া-মাদ্রিদ হাইওয়ে।'

একে তো ঘুরা পথ, তার উপর ভ্যালেনসিয়া এসে একদিন দেরী হয়েছিল আহমদ মুসাদের। ভ্যালেনসিয়া শহরটি জোয়ান এবং আবদুর রহমান দু'জনেরই আবেগের সাথে জড়িত। তাছাড়া আহমদ মুসাও স্পেনের পুর্ব উপকুলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর নগরী ভ্যালেনসিয়া একটু ঘুরে দেখার লোভ সামলাতে পারেনি।

এখনকার ভ্যালেনসিয়া একেবারে নতুন, আগের ভ্যালেনসিয়ার কোন চিহ্নই এখন বর্তমান নেই। তবু জোয়ান এবং আবদুর রহমান পাগলের মত ছুটে বেড়িয়েছে ভ্যালেনসিয়ার এগলি থেকে সেগলিতে। ভ্যালেনসিয়ার পুরানো এলাকার যে বাড়িই দেখেছে, মনে হয়েছে এখানেই হয়তো তাদের পুর্ব পুরুষ আবদুর রহমান থাকতেন অথবা এই বাড়িতেই শুরু হয় আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমানের দাসজীবন। তারা ঘুরে ঘুরেই জানতে পারল, অতীতের দুটো স্মৃতিই মাত্র বর্তমান। একটি হলো, আবদুর রহমান ও জোয়ানের পুর্ব পুরুষ বিজ্ঞানী আবদুর রহমানের 'দারুল হিকমা' বা বিজ্ঞান বিদ্যালয়ের স্থানেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভ্যালেনসিয়া বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়। আরেকটি হলো, ভ্যালেনসিয়া বন্দরের ইসাবেলা জেটি। বহু আশা করে জোয়ানরা গেয়েছিল বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে আধুনিক বিল্ডিং-এর সারি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায়নি জোয়ানরা। তবু সেখানে গিয়ে সজল হয়ে উঠেছিল জোয়ান ও আবদুর রহমানের চোখ। সেখানকার মাটিতে, বাতাসে দারুল হিকমার স্পর্শ তারা খুঁজছিল। বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তারা চলে এসেছিল ভ্যালেনসিয়া বন্দরে ইসাবেলা জেটিতে। এখানে জোয়ান, আবদুর রহমান, আহমদ মুসা সকলেই ভাবপ্রবন হয়ে পড়েছিল। ভ্যালেনসিয়া ও পুর্ব স্পেন থেকে উচ্ছেদকৃত মুসলিম নর-নারীদের সর্বশেষ দলটিকে নিয়ে সর্বশেষ জাহাজটি ছেড়েছিল এই জেটি থেকে। জাহাজ ছাড়লে স্বদেশভুমি স্পেনের জন্যে কান্নারত পাগল নারী-পুরুষরা চিৎকার করে অভিসম্পাত দিচ্ছিল রানী ইসাবেলা ও রাজা ফার্ডিন্যান্ডকে। এর জবাবে রানী ইসাবেলা ও ফার্ডিন্যান্ডের সৈনিকরা উপকূল থেকে কামান দেগে

জাহাজ ডুবিয়ে দেয়। নারী-পুরুষ সবাই ডুবে মরে, কাউকেই উপকূলে উঠতে দেয়া হয়নি। এই কৃতিত্বপূর্ন ঘটনার স্মরনে স্থানীয় খৃষ্টানরা এই জেটির নাম দেয় ইসাবেলা জেটি। এই জেটিতে দাঁড়িয়ে সাগরের দিকে তাকাতে গিয়ে অশ্রুতে চোখ ভরে উঠেছিল জোয়ান, আবদুর রহমান এবং আহমদ মুসা তিনজনেরই।

আহমদ মুসা তার এক হাত আবদুর রহমান আরেক হাত জোয়ানের কাঁধে রেখে সামনে সাগরের বুকের উপর দৃষ্টি রেখে বলেছিল, 'আমরা এক জাহাজের কথাই শুধু ভাবছি, কিন্তু জান কি স্পেনের মুসলিম উদ্বাস্তু বোঝাই কত জাহাজ সামনের ঐ মেজর্কা, মানর্কা দ্বীপে লুন্ঠিত হয়েছে, কত জাহাজ ডুবেছে, ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে সামনের ঐ ভূমধ্যসাগরে? স্পেনে একটি জাতি স্বত্ত্বা ধ্বংসের যে ঘটনা, ইতিহাসে তার নজীর নেই, আবার এই সাগরে মুসলিম উদ্বাস্তুদের যে পরিনতি হয়েছে ইতিহাসের কোন অধ্যায়ে তা আর ঘটেনি। অথচ এই সাগরের দুইদিক ঘিরে তখনও মুসলিম সাম্রাজ্য!'

ভেজা চোখে তারা ফিরে এসেছিল ইসাবেলা জেটি থেকে।

তিনজনেরই পর্যটকের ছদ্মবেশ। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ, কোমরে চওড়া বেল্ট। তিনজনের মুখেই দাঁড়ি ও গোঁফ লাগানো। খুব পরিচিত না হলে তাদেরকে চেনার উপায় নেই। আহমদ মুসা সাধারণত ছদ্মবেশ নেয় না, কিন্তু এবার নেয়ার প্রয়োজন বোধ করেছে। সে নিরপদ্রুপে মাদ্রিদ পৌঁছাতে চায়। তার লক্ষ্য এখন কোন সংঘাত নয়, তার লক্ষ্য তেজস্ক্রিয় সেটের পরিকল্পনার মানচিত্র উদ্ধার করা।

সাগরের কূল ছেড়ে বন্দরের অনেক খানি উপরে তারা উঠে এসেছে। পার্ক করা গাড়ির দিকে এগুচ্ছিল তারা। পাশেই এ সময় ছেলে-মেয়েদের একটা জটলা দেখতে পেয়েছিল। আহমদ মুসারা তিনজনেই সেদিকে তাকিয়ে ছিল। দেখলো, বৃদ্ধ-প্রায় একটা মহিলাকে ছেলেরা উত্যক্ত করছে। সমস্বরে তারা বলছে, মরিসকো পাগলী। বার বার একথা বলছে। সুবেশা মহিলাটা কোন ভ্রুক্ষেপই করছেনা। একমনে একটা রুটি চিবাচ্ছে।

'মরিস্কো পাগলী'র মরিস্কো শব্দটি আহমদ মুসাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

হৃদয়ে এসে ঘা দিয়েছিলো শব্দটা। মহিলাটি কি মরিস্কো জোয়ানের মনটা মোচড় দিয়ে উঠেছিল। আহমদ মুসারা এগিয়ে গিয়েছিল জটলার দিকে। জোয়ান আগে আগে।

জটলা থেকে একজন যুবক ছেলে, বয়স আঠার, উনিশ হবে, চলে যাচ্ছিল আহমদ মুসাদের পাশ দিয়েই।

জোয়ান তাকে ডেকে বলেছিল, ঐ যে মহিলাটিকে তোমরা উত্যক্ত করছ সে কে?'

কেন ওকে চিনেন না। সবাই বলে মরিস্কো পাগলী। বলেছিল ছেলেটি।

'কে ও? ওকি সত্যি পাগল? আবার জিজ্ঞাসা করে জোয়ান।

'জানি না, সবাই বলে পাগল। কখনও হাসে, কখনও কাঁদে।'

'ওঁর আপন কেউ নেই?'

'ছিল, ওর আব্বা ও ভাই ছিল। কিন্তু তারা এখন নাই। ওদের হত্যা করা হয়েছে।'

'হত্যা করা হয়েছে? কে হত্যা করেছে?'

'ওরা মরিস্কো পরিচয় গোপন করে ওদের মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিল সেই অপরাধে ওদের হত্যা করা হয় শুনেছি। আর স্বামী ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে।' ছেলেটির কন্ঠ ভারি।

'বুঝেছি, তোমরা এমন দুঃখী মেয়েকে কষ্ট দাও, খারাপ লাগে না?'

'আমি দেখতে গিয়েছিলাম, আমি কিছু বলিনি, আমি কিছু করিনি' ছেলেটির কণ্ঠ ভারি ও ক্ষুব্ধ মনে হলো।

সে কণ্ঠে চমকে উঠেছিল জোয়ান এবং আহমদ মুসারাও।

'তুমি খুব ভাল ছেলে, মানুষের প্রতি তোমার দরদ আছে। চল তুমি একটু সাহায্য করবে, আমরা ওর সাথে কথা বলতে চাই।'

ছেলেটি বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে ছিল জোয়ান এবং আহমদ মুসাদের দিকে। পরে গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিল, 'কোন লাভ নেই, ওঁ কাউকে চিনে না, কারও সাথে কথাও বলে না। যা বলে আপন মনে বলে।'

'তবুও চেষ্টা করে দেখি চল।' বলেছিল জোয়ান।

পাগলিনীকে ঘিরে ছেলেদের জটলা তখন ছিল না। চলে গিয়েছিল সবাই। মরিস্‌কো পাগলী একটা পাথরে হেলান দিয়ে বসে ঢুলছিল।

আহমদ মুসারা তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের সাথে ছেলেটি। ছেলেটি হয়ে পড়েছিল গম্ভীর, তার মুখটা হয়ে উঠেছিল কেমন যেন ফ্যাকাশে। ব্যাপারটা আহমদ মুসার দৃষ্টিতে পড়েছিল।

জোয়ান মহিলাটির সামনে গিয়ে বসে পড়েছিল। মহিলাটিকে সম্বোধন করে বলেছিল, 'মা'।

স্পষ্ট ওঁ দরদভরা কণ্ঠ ছিল জোয়ানের।

মরিস্‌কো পাগলী মহিলাটি মাথা খাড়া করেছিল অনেকটা চমকে উঠার মত করে। চোখ তুলে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল জোয়ানের দিকে। আবার ডেকে ছিল জোয়ান, 'মা।'

স্থির দৃষ্টি কাঁপছিল মহিলাটির। কাঁপছিল তার ঠোট। হঠাৎ তার কম্পিত ঠোট থেকে বেরিয় এল, মা, মা, মা।

'মা' শব্দ উচ্চারণের সাথে সাথে তার চোখের কম্পন বাড়ছিল, দৃষ্টি তীব্র হচ্ছিল। তার মধ্যে কি যেন খুঁজে পাবার আকুলি বিকুলি। অসহায়ভাবে অকূল সমুদ্রে সে যেন সাঁতরাচ্ছে, কূল খুঁজে পাচ্ছেনা।

এ সময় সেখানে দু'জন মহিলা পুলিশ এসে হাজির। তারা দু'জন দু'হাত ধরল মরিস্‌কো পাগলীর। টেনে তুলতে তুলতে তুলতে বলেছিল, চলুন ফেরার সময় হয়েছে।

মরিস্‌কো পাগলী জোয়ানের দিকে চোখ উঠিয়ে হেসে উঠেছিল উচ্চস্বরে।

পুলিশ দু'জন পাগলীকে নিয়ে চলে গিয়েছিল।

জোয়ানের বুক জুড়ে তোলপাড় করছিল, একটি কথা- 'স্পেনে মরিসকোদের হয় দাস হতে হয়, নয়তো মরতে হয়, অথবা হতে হয় পাগল'।'

চোখের দু'কোণ ভিজে উঠেছিল জোয়ানের।

ছেলেটি ভারি চোখে, পাংশু মুখে জোয়ানের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল, 'আপনি কে?'

'আমি? আমি ওঁর মতই একজন মরিস্কো ছিলাম। এখন মুসলমান।'

হঠাৎ ছেলেটি দেহ বাঁকিয়ে, মাথা ঝুকিয়ে বাও করেছিল জোয়ানকে। সেই সাথে তার দু'চোখে নেমে এসেছিল অশ্রু।

জোয়ান বিস্মিত হয়েছিল। বলেছিল, তুমি এভাবে বাও করলে কেন? তুমি কাঁদছোই বা কেন ?

'আমি একজন মরিস্কো, একজন মুসলমানকে শ্রদ্ধা জানালাম। আর কাঁদছি আমি আমার দুর্ভাগ্যের জন্যে।'

'কি দুর্ভাগ্য?'

'আমি আমার মাকে মা ডাকতে পারি না, মা বলতে পারিনা, তার কোন সাহ্যায্যে আসতে পারি না।'

বলতে বলতে কান্নায় ছেলেটির কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

আহমদ মুসা এগিয়ে এসে দু'হাত দিয়ে ছেলেটিকে কাছে টেনে বলেছিল, 'বুঝতে পেরেছি, ঐ মরিস্কো পাগলিনী তোমার মা, তুমি তোমার মাকে মা বলতে পার না, কোন সাহায্য করতে পার না সমাজের ভয়ে। সত্যিই তুমি দুর্ভাগা।'

ছেলেটি কান্না চাপতে মুখে রুমাল চাপা দিয়েছিল।

ছেলেটির সব কাহিনী শুনেছিল আহমদ মুসারা। তার বড় দুই ভাই সরকারী অফিসার, আর সে ভ্যালেনসিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ বর্ষের ছাত্র। তাদের পিতার মৃত্যু ঘটেছে অনেক দিন আগে। এরপর তারা তাদের মাকে এনে সেনিটোরিয়াসে রাখার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু মায়ের চিকিৎসার জন্যে তার কাছে মায়ের সন্তান হিসেবে হাজির হওয়া প্রয়োজন, তা তারা পারছে না। পারছে না কারন, তাতে তারাও সমাজ থেকে বিচ্যুত হবে, সব হারাবে, অন্যদিকে মায়েরও কোন উপকার করতে পারবে না। এই দুর্ভাগ্য নিয়েই তারা বেঁচে আছে। মাঝে মাঝে তারা সেনিটোরিয়াসে যায়। দূর থেকে দেখে আসে। সপ্তাহে একদিন পাগলিনী সকলকে শহরে ছেড়ে দেয়া হয়, আবার নির্দিষ্ট সময়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সপ্তাহের এ দিনটিতে তারা নিয়মিত মায়ের সান্নিধ্যে আসে, কিন্তু পরিচয় নিয়ে তার সামনে দাঁড়াতে পারে না।

কাহিনী শেষ করে ছেলেটি বলেছিল, 'একজন মরিস্‌কো পাগলিনীকে, যে সকলের ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের পাত্র, মা বলে ডাকতে পেরেছেন, আপনারা কে?'

'জোয়ান বলেছেই আমরা মুসলমান।' জবাব দিয়েছিল আহমদ মুসা।

'এদেশের মরিস্‌কো আরো আছে, মুসলমানও গোপনে আছে, কিন্তু কেউ তো এই সাহস, এই আন্তরিকতা দেখাতে পারে না?'

'তোমার ঠিকানা তো দিয়েছই, দরকার হলে তোমার সাথে পরে যোগাযোগ করব। এখন পরিচয় নিয়ে কি করবে?'

'জানি, আমাকে বিশ্বাস করতে পারবেন না। তবে একটা কথা বলি, আমরা মায়ের সন্তান, বাপের সন্তান নই। আমরা কিছুই করতে পারিনি, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও পিতাকে সমর্থন করিনি।'

'অর্থাৎ তুমি নিজেকে মরিস্‌কো মনে কর তাই না?' বলে জোয়ান জড়িয়ে ধরেছিল ছেলেটিকে। ছেলেটির পিট চাপড়ে বলেছিল, 'মরিস্‌কো হওয়া গর্বের, দুঃখের নয়।'

এই সময় আব্দুর রহমান জোয়ানের কাহিনী বলেছিল ছেলেটিকে। ছেলেটি আনন্দে জড়িয়ে ধরেছিল আবার জোয়ানকে। বলেছিল, 'আপনারা যদি আমার বড় দুই ভায়ের সাথে দেখা না করে চলে যান, তাহলে ওঁরা আমার উপর ভীষণ রাগবেন। আপনারা খুশী হবেন আমার দু'ভাইয়ের সাথে দেখা করে।'

কিন্তু আহমদ মুসারা ছেলেটিকে সময় দিতে পারেনি। বলেছিল, 'তোমাদের টেলিফোন থাকলে, আমরা কথা বলব তোমার ভাইদের সাথে।'

বিদায়ের সময় ছেলেটি ভারি কণ্ঠে বলেছিল, আপনাদের এক ঘণ্টার সঙ্গ আমার কাছে এক যুগের মত মনে হচ্ছে। আপনারা আমাকে নতুন জীবন দিয়ে গেলেন, সেই সাথে করে গেলেন অসহায়। কারণ চলার পথ আমার জানা নেই।'

আহমদ মুসা ছেলেটির কপালে চুমু খেয়ে বলেছিল, 'আমরা গোটা স্পেনের জন্যে নতুন জীবনের সন্ধান করছি, হতাশ হয়ো না।'

আলবাসেট-মাদ্রিদ হাইওয়ে ধরে চার দিকের অখণ্ড নিরবতার মধ্যে কালো রাতের বুক চিরে চলার সময় এই কথাগুলো আহমদ মুসা, জোয়ান ও আব্দুর রহমান সকলের মনকেই তোলপাড় করে তুলছিল। ভ্যালেনসিয়ার সেই

মরিস্‌কো পাগলিনী এবং সেই পাগলিনীর হতভাগ্য ছেলে জোসেফ ফার্ডিনান্ডের কথা তারা ভুলতেই পারছিল না।

মাদ্রিদ আর খুব বেশী দূরে নয়। সামনেই মাদ্রিদকে বেষ্টন করে তৈরি রিং রোড।

রিং রোডের উপর দিয়ে ফ্লাইওভার। ট্রাফিকের কোন ঝামেলা নেই।

একশ' তিরিশ কিলোমিটার বেগে চলছিল আহমদ মুসার গাড়ি। ড্রাইভ করছিল আহমদ মুসাই। তার পরনে শিখের পোশাক। মাথায় পাগড়ী, ইয়া বড় দাঁড়ি-গোঁফ।

আর জোয়ান ও আবদুর রহমান দু'জন তরুণ ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ীক কাজ সেরে তারা মাদ্রিদে ফিরছে। জোয়ানের মুখে পরিপাটি করে ছাটা দাঁড়ি-গোঁফ।

রিং রোডের ফ্লাইওভারটি তখনও পাঁচশ গজের মত দূরে। হঠাৎ ফ্লাইওভারের মুখে লাল আলো জ্বলে উঠল। দেখেই বুঝা গেল আলোটি লাইট স্টিকের। কেউ একজন উঁচিয়ে ধরে আছে।

আহমদ মুসা গাড়ির গতি কমিয়ে দিল। চলে যেতে চেষ্টা করে লাভ নেই, গুলী করতে পারে। পুলিশ হতে পারে। আবার শত্রু হওয়াও বিচিত্র নয়।

ফ্লাইওভারের প্রায় কাছাকাছি এসে থেকে গেল আহমদ মুসার গাড়ি।

গাড়ি থামতেই ছুটে এল দুইজন। মনে হলো, শিখ ড্রাইভারের উপর নজর পড়তেই ওরা একটু থমকে গেল। পরক্ষণেই বলে উঠল, 'তোমরা আরোহী ক'জন, কারা?'

'দু'জন। ব্যবসায়ী।' পাঞ্জাবী ও স্প্যানিশ ভাষা মিশিয়ে শিখ ড্রইভারদের মতই উত্তর দিল আহমদ মুসা।

'ওদের নামতে বল।'

'তোমরা কে, পুলিশ তো নও?'

'আমরা পুলিশের বাবা।'

'তাহলে গোয়েন্দা পুলিশ, কোন আসামী ফেরার হয়েছে বুঝি?'

'হ্যাঁ, কথা বাড়িও না, যা বলছি কর।'

আহমদ মুসা ভেতরের আলো জ্বেলে দিয়ে দরজা খুলে দিয়ে বলল, ‘দেখো।’

দরজা দিয়ে উঁকি দিল দু’জন। সামনেই বসে ছিল আবদুর রহমান। তারপর জোয়ান।

মাথায় হ্যাট পরা, লম্বা কালো ওভার কোটে দেহ ঢাকা লোক দু’জন পকেট থেকে ফটো বের করে আবদুর রহমান ও জোয়ানের সাথে মিলিয়ে দেখল। তারপর দরজা থেকে সরে গিয়ে ফটো পকেটে ফেলে বলল, ‘যাও।’

‘আর কত জায়গায় এভাবে আমাদের সময় নষ্ট হবে বলতো?’ জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

‘না আর চেক হবে না। মাদ্রিদের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে শুধু রিং রোড়ের পয়েন্টেই চেক করা হচ্ছে।’

‘আর ওদিকে? খুব বড় কিছু ঘটেছে নাকি?’

‘ওদিকে মানে উত্তর ও পুবদিকে মাদ্রিদে পৌঁছা পর্যন্ত বার বার চেক হচ্ছে।’

‘কি ঘটেছে তা তো বললেন না?’

‘আমরা জানি না। হুকুম হয়েছে আমরা কাজ করছি।’

‘ফটোগুলো সেই ক্রিমিনালদের বুঝি?’

‘ক্রিমিনাল কিনা জানি না।’

‘ফটো মিলিয়ে দেখছ, অথচ তারা কে জান না?’

‘জানি না কে বলল, ও আহমদ মুসা নামের একজন লোক। এত জানার তোমার কি দরকার, যাও।’

‘ধন্যবাদ’ বলে আহমদ মুসা গাড়ি স্টার্ট দিল। লাফিয়ে উঠে চলতে শুরু করল গাড়ি।

আবার সেই গতিবেগ- একশ’ তিরিশ কিলোমিটার বেগে ছুটতে লাগল গাড়ি।

রাত তখন এগারটা।

রাস্তায় গাড়ি খুব একটা দেখা যাচ্ছে না।

রাতের নিরবতায় একটানা শো শো শব্দের স্পন্দন তুলে ছুটছে আহমদ মুসার গাড়ি।

আহমদ মুসা মুখটা একটু পাশে টেনে পেছনে জোয়ানকে লক্ষ্য করে বলল, 'জোয়ান ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্লানের তালিকায় আহমদ মুসার পাশে তোমারও নাম উঠল মনে হয়। দ্বিতীয় ফটোটা ছিল সম্ভবতঃ তোমারই।'

'আমার সৌভাগ্য মুসা ভাই।' বলল জোয়ান।

'তোমার বাড়িতে থাকা তোমার জন্যে নিরাপদ হবে?'

'দ্বিতীয় বার পরিবর্তন করে যে বাসা নিয়েছি, সেটার সন্ধান ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান কিছুতেই পাবার কথা নয়।'

'তবু আজ রাতেই ফিরবে বাড়িতে?'

'অসুবিধা নেই মুসা ভাই।'

'ঠিক আছে, চল ফিলিপের ওখানে আগে যাই, তারপর তোমাকে পৌঁছে দেব।'

'ঠিক আছে। আবদুর রহমান ভাই আমার বাসাতে তো যাবেই।'

'তোমাদের সম্মিলনিতে আমিও যেতে পারলে খুশী হতাম। কিন্তু ঘুমাব। ভোর রাতে আমাকে বেরুতে হবে।'

'ভোর রাতে? কোথায় মুসা ভাই?' বলল আবদুর রহমান।

'যে বাঘ আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে, তার গুহায়।'

'তার মানে ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের হেড কোয়ার্টারে?'

'হ্যাঁ।'

'আমরাও তো যাচ্ছি।' বলল জোয়ান।

'এবার না, কাল একাই যাব।'

আবদুর রহমান এবং জোয়ান দু'জনেরই মুখটা মলিন হলো। বলল জোয়ান, 'কি ক্ষতি হবে আমাদের নিলে, আমরা বাইরে পাহারায় তো থাকতে পারবো।

'কালকে আমি সংঘাত করতে যাচ্ছি না, যাচ্ছি চোরের মত গোপনে অনুসন্ধান অভিযানে। এখানে লোক যত কম, তত ভাল।'

আবদুর রহমান ও জোয়ান আর প্রতিবাদ করলো না। কিন্তু তাদের মুখ দেখে মনে হলো, আহমদ মুসার এ যুক্তি তারা গ্রহন করতে পারেনি।

আবার নিরবতা নামল গাড়িতে।

সামনে একটু দূরে লিওন সাইনে ‘ওয়েলকাম’ শব্দটি জ্বল জ্বল করছে। ওখান থেকেই মাদ্রিদ শহরের শুরু।

অল্পক্ষণের মধ্যেই মাদ্রিদ শহরে প্রবেশ করল আহমদ মুসার গাড়ি।

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল আহমদ মুসার বুক থেকে। স্টিয়ারিং-এ হাত রেখেই সিটে হেলান দিয়ে আরাম করে বসল আহমদ মুসা।

ধীর ভাবে এগিয়ে চলল গাড়ি শহরের পথ ধরে।

তাহাজ্জত নামায শেষ করে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা। তারপর পোশাক পরে রাতের অভিযানের জন্যে প্রস্তুত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল আহমদ মুসা।

রাতেই আহমদ মুসা তার এ অভিযানের কথা ফিলিপকে বলেছিল। ফিলিপও আহমদ মুসাকে একা যেতে দিতে রাজি হয়নি। আহমদ মুসা তাকে বুঝিয়ে বলেছিল, সে যাচ্ছে একটা অনুসন্ধান মিশনে- তেজস্ত্রিয় পাতায় পরিকল্পনা- ম্যাপের সন্ধানে। এমন গোপন মিশন এক ব্যক্তির জন্যেই মানায় ভাল।’ ফিলিপ আর আপত্তি করতে পারেনি। আহমদ মুসার বিবেচনাকে সে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে।

ঘর থেকে বেরিয়ে আহমদ মুসা চলে এল দু’তালায় নামার সিঁড়ির মুখে।

বাড়িটা তিনতলা। তিনতলায় থাকে ফিলিপের পরিবার। দু’তলা জুড়ে লাইব্রেরী, স্টাডিরুম, স্টোর রুম, গেস্ট রুম ইত্যাদি। নিচের তলাটা রান্না, খাবার ও কর্মী ও কর্মচারীদের বাসের জন্যে। আর বড় ড্রইং রুমটা নিচের তলাতেই- একেবারে বাড়িতে ঢোকার মুখেই।

সিঁড়ি দিয়ে নামার জন্যে পা তুলতে গিয়ে হঠাৎ বাম দিকে তিন তলায় উঠার সিঁড়ির শেষ ধাপে একটি নারীমুর্তির উপর নজর পড়ল আহমদ মুসার।

আবছা আলো-অন্ধকারেও বুঝতে পারল ও মারিয়া। আহমদ মুসার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্থিরভাবে।

আহমদ মুসা চমকে উঠার চাইতে বিরক্তি বোধ করল বেশী। এই রাতে, এইখানে, এইভাবে সে মারিয়াকে আসা করেনি। নামার জন্যে এগিয়ে দেয়া পাটা টেনে এনে দৃষ্টি নিচু করে বলল আহমদ মুসা, 'এত রাতে এখানে? কিছু বলবে মারিয়া?' গলার স্বরটা কঠোর শোনাল আহমদ মুসার।

মারিয়ার কাছ থেকে কোন উত্তর এল না। মাথার রুমালের একটা অংশ মুখ দিয়ে কাপড় ধরে ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে উঠে গেল তিন তলার দিকে।

আহমদ মুসা মুহূর্ত কয়েক দাঁড়িয়ে পা বাড়াল সিঁড়ির দিকে দোতলা থেকে নামার জন্যে। বিরক্তির চিহ্ন তার মুখ থেকে তখনও যায়নি। মারিয়ার কাছ থেকে এই আচরণ সে মেনে নিতে পারছে না।

নিচের তলার ড্রইং রুমের দরজায় এসে আহমদ মুসা দেখল ফিলিপ সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ি বারান্দায় তাকিয়ে দেখল গাড়ি রেডি।

বিস্মিত আহমদ মুসা ফিলিপের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এমন তো কথা ছিল না ফিলিপ, তুমি এভাবে উঠে বসে আছ! আমি তো দারোয়ানকে বলে রেখেছিলাম। কোনই অসুবিধা আমার হতো না।'

ফিলিপ বলল, 'আমাকে দোষ দেবেন না মুসা ভাই। মারিয়া আমাকে ঘুমাতে দেয়নি। রাত ৩টার সময় ডেকে তুলেছে। বলেছে, 'আপনি আমাদের মেহমান, তার উপর যাচ্ছেন ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের ঘাটিতে। কিছুতেই আপনাকে একা ছেড়ে দেয়া ঠিক হবে না। তার কথা, আমি যেন আপনাকে আবার অনুরোধ করি আমাকে সাথে নেয়ার জন্যে।'

আহমদ মুসার মনটা নরম হলো। একধাপ এগিয়ে ফিলিপকে দু'হাত দিয়ে কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'এ অভিযানের জন্যে যদি এমন প্রয়োজন থাকতো, তাহলে আমি অবশ্যই বলতাম ফিলিপ। যদি পারি আজ শুধু ভাসকুয়েজের ঘরটা অনুসন্ধান করব, আর কিছু নয়। যখন প্রয়োজন হবে, তখন দেখবে ডেকে নিয়ে যাব।'

বলে আহমদ মুসা বেরিয়ে এল গাড়ি বারান্দায়।

গাড়ির ড্রাইভিং সিটের দরজা খুলে ফুয়েল মিটারের দিকে তাকিয়ে দেখল, ফুয়েল ট্যাঙ্ক ভর্তি।

আহমদ মুসা ফিরে দাঁড়িয়ে পেছনে দাঁড়ানো ফিলিপের সাথে হ্যান্ডশেক করে 'বিসমিল্লাহ' বলে গাড়িতে উঠে বসল। দরজা বন্ধ করে গাড়িতে স্টার্ট দিল।

গাড়ি একটা গর্জন করে জেগে উঠে চলতে শুরু করল।

দারোয়ান আগেই গেট খুলে দিয়েছিল।

গেট দিয়ে বেরিয়ে এল আহমদ মুসার গাড়ি।

নিস্তব্ধ রাতের নিরব রাজপথ ধরে ছুটে চলল আহমদ মুসার গাড়ি তীর বেগে। লক্ষ ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের হেড কোয়ার্টার।

সাইমুম সিরিজের পরবর্তী বই

# গোয়াদেল কুইভারে নতুন স্রোত

## কৃতজ্ঞতায়ঃ

1. Sohel Sharif
2. Monirul Islam Moni
3. Salahuddin Nasim
4. Gazi Salahuddin Mamun
5. Bondi Beduyin
6. Tariq Faisal
7. Ismail Jabihullah
8. Mohammod Amir
9. S A Mahmud
10. Anisur Rahman
11. Sharmeen Sayema
12. Arif Rahman
13. Mustafijur Rahaman
14. Mohammad Ahsanul Haque Arif
15. Nazrul Islam
16. Tareq Samsul Alam
17. Ashrafuj Jaman
18. Syed Murtuza Baker
19. Tuhin Azad
20. Md. Jafar Ikbal Jewel
21. A.S.M Masudul Alam
22. Mohammod Amir
23. Tabassum Jannat
24. Esha Siddique
25. Akramul Haq Farhad
26. Shaikh Noor-E-Alam

# সাইমুম-১৪

# গোয়াদেলকুইভারে নতুন স্রোত

আবুল আসাদ

# ১

রাত তিনটা পঁয়তাল্লিশ। ঘুমিয়ে আছে মাদ্রিদের ফার্ডিন্যান্ড এভেনিউ। পুলিশের অথবা নাইট ক্লাব ফেরত দু'একটা গাড়ী মাঝে মাঝে এই ঘুমে কিছুটা বিরক্তি উৎপাদন করছে মাত্র।

ফার্ডিন্যান্ড এভেনিউ-এর ওপর দাঁড়ানো কু-ক্ল্যাস্ক-ক্ল্যানের বিশাল পাঁচ তলা অফিসটিও জেগে জেগে অবশেষে যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। দু'একটি ঘরের জানালা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু বড় ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে ওগুলোকে। যেন ওগুলোর চোখেও ঘুমের ঝিমুনি।

কু-ক্ল্যাস্ক-ক্ল্যান হেড কোয়ার্টারটি ফার্ডিন্যান্ড এভেনিউ-এর পশ্চিম পাশে। এভেনিউটি উত্তর-দক্ষিণ প্রসারিত। আর কু-ক্ল্যাস্ক-ক্ল্যানের হেড কোয়ার্টারটি প্রসারিত পূর্ব -পশ্চিমে। পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত হেড কোয়ার্টারের গেটটি ফার্ডিন্যান্ড এভেনিউ-এর গা ছুঁয়ে দাঁড়ানো। লোহার ফোল্ডিং গেট। গেটের ভেতরে লিফট রুম ও সিঁড়ির মাঝখানে দু'জন প্রহরী চেয়ারে বসে তাদের কাঁধে স্টেনগান ঝুলছে। প্রহরী দু'জনও ঝিমুচ্ছে।

বিল্ডিং-এর বাইরে আর কোন প্রহরী নেই। ভেতরে প্রত্যেক ফ্লোরে একজন করে সশস্ত্র প্রহরী রয়েছে।

সব মিলিয়ে নিরাপত্তার মিনিমাম ব্যবস্থা। এর কারণ, যে বাঘ সব সময় শিকার ধরতেই অভ্যস্ত, সে কাউকে শিকার হওয়ার ভয় করে না। কু- ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান সবার ঘরে ঢুকে, সবাইকে তাড়া করে, তার ঘরে আবার ঢুকবে কে। এমন সাহস কারও আছে বলে তারা মনে করে না।

পূর্ব পশ্চিম লম্বা অফিস বিল্ডিং এর তৃতীয় তলার একদম পশ্চিমের রুমটি ভাসকুয়েজের। এই তলাতেই মিনাত্রা সেন্ডোর স্থলাভিসিক্ত কু-ক্লাস্ক-ক্ল্যানের নতুন অপারেশন কমান্ডার জুরি জুরিটার অফিস। তবে তার একটি বিশ্রাম কক্ষ চারতলায়। কাজের অবসরে সে এখানে বিশ্রাম নেয়, রাত বেশী হলে সেখানে মাঝে মাঝে রাত যপিনও করে। আজও যেমন সে বাড়ি যায়নি-তার বিশ্রাম কক্ষেই সে রাত কাটাচ্ছে। রাত আড়াইটায় সে ফিরে এসেছে পাহারার তদারকি থেকে।

রাত ঠিক তিনটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে আহমদ মুসার গাড়ী সাপের মত নিঃশব্দে এসে থামল কু-ক্ল্যাস্ক-ক্ল্যান বিল্ডিং-এর পশ্চিম দিকে একটা ঝাউ গাছের পাশে।

কু-ক্লাস্ক-ক্ল্যান হেড কোয়ার্টারের পশ্চিম পাশে আরেকটা অফিস। সেটাও পাঁচ তলা। দুই বিল্ডিং-এর মাঝখানে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা। সম্ভবতঃ পার্কিং প্লেস হিসেবে ব্যবহার হয়। পাশাপাশি দু'টি ঝাউগাছ থাকায় জায়গাটা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী অন্ধকার।

আহমদ মুসা একটা ঝাউ গাছ ঘেঁষে তার গাড়ীটি দাঁড় করিয়ে নিঃশব্দে গাড়ী থেকে নেমে এল।

তারপর আশ-পাশটা ঘুরে দেখল কোন প্রহরী কোথাও নেই।

আহমদ মুসা ওপর দিকে তাকিয়ে ভাসকুয়েজের অফিস রুমটা একবার দেখে নিল। ভেতর থেকে আলোর কোন রেশ কোন দিক থেকে আসছে না।

পিঠের ব্যাগ থেকে আহমদ মুসা হুক লাগানো নাইলন কর্ড বের করে নিল।

হুকটা ছুড়ে মারল তিন তলার কার্নিশে। নিখুঁত নিশানা। হুকটা গিয়ে আটকে গেল তিন তলার কার্নিশে।

আহমদ মুসা চারদিকে একবার চেয়ে নিয়ে দড়ি বেয়ে তর তর করে উঠে তিন তলার কার্নিশে গিয়ে বসল।

উত্তর দক্ষিণে বিলম্বিত বিশাল কক্ষ ভাসকুয়েজের। পশ্চিম দিকে তিনটি জানালা। আহমদ মুসা মাঝখানে জানালার মুখোমুখি উঠে বসেছে।

জানালা পুরু লোহার গরাদে ঢাকা।

'জানালা কি ভেতর থেকে লক করা?' ভাবল আহমদ মুসা।

জানালার গরাদে হাত দিতে গিয়েও হাত টেনে নিল আহমদ মুসা। ভাবল, ভাসকুয়েজ জানালাকে বিদ্যুতায়িত করে রাখতে পারে।

পকেট থেকে ডিক্টেটর স্ক্রুড্রাইভার বের করে পরীক্ষা করল গরাদ। না, জানালা বিদ্যুতায়িত নয়।

গরাদ ভেতর থেকে লক করা আছে কি না তা দেখার জন্যে আহমদ মুসা স্ক্রুড্রাইভারের ধারাল অগ্রভাগ গরাদের নিচে ঢুকিয়ে ওপরের দিকে একটা চাপ দিল।

গরাদটি নিঃশব্দে নড়ে উঠে সিকি ইঞ্চি পরিমাণ ওপরে উঠে গেল। মুখে হাসি ফুটে উঠল আহমদ মুসার। ভীষণ আত্মবিশ্বাসী ভাসকুয়েজ। তার কক্ষের নিরাপত্তার সাধারণ ব্যবস্থাটুকুও রাখেনি।

গরাদের দু'প্রান্তে দু'হাত লাগিয়ে এক টানে ওপরে উঠিয়ে ফেলল গরাদটি।

লোহার গরাদের পর জানালার কাঁচের আরো একটি গরাদ। একই ভাবে সেটিও তুলে ফেলল আহমদ মুসা।

ঘরের ভেতর ঘুটঘুটে অন্ধকার।

আহমদ মুসা স্মরণ করল, মাঝের এই জানালাটি পুব দিক থেকে অর্থাৎ ভেতর থেকে ঘরে ঢুকার একমাত্র দরজা বরাবর এবং জানালার সামনে ভেতরটা ফাঁকা।

আহমদ মুসা জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকে সন্তর্পনে পা রাখল কার্পেটের ওপর।

কার্পেটের ওপর কয়েক মুহূর্ত ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে ভেতরের অন্ধকারকে গা সহা করে নিল।

আহমদ মুসার লক্ষ্য ছিল ভাসকুয়েজের টেবিল। ধীরে ধীরে অন্ধকারের মধ্যে এক খন্ড জমাট অন্ধকারের মত ভেসে উঠল ভাসকুয়েজের টেবিলটা। ভাসকুয়েজের টেবিলের ওপাশে কম্পিউটারের সাদা পর্দা অন্ধকারের বুকে ধোয়াটে সাদা চোখের মত মনে হলো তার কাছে।

আহমদ মুসা ধীরে ধীরে এগুলো কম্পিউটারের দিকে।

অতি সন্তর্পনে টেবিল ঘুরে আহমদ মুসা গিয়ে দাঁড়াল কম্পিউটারের সামনে।

এই কম্পিউটারের জন্যেই ভাসকুয়েজের অফিসে এসেছে আহমদ মুসা। তার বিশ্বাস, মাদ্রিদের মসজিদ কমপ্লেক্স এবং অন্যান্য মুসলিম ঐতিহাসিক স্থান গুলোতে তেজস্ক্রিয় পাতার পরিকল্পণা ভাসকুয়েজ নিশ্চয় তার রেকর্ডে রেখেছে। সে রেকর্ড ভাসকুয়েজ যেখানে যেখানে রাখতে পারে, তার মধ্যে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় স্থান হলো তার কম্পিউটার মেমোরী। আহমদ মুসা তাই ভাসকুয়েজের কম্পিউটারে মেমোরী সন্ধান করে দেখার জন্যেই তার অফিসে ছুটে এসেছে।

কম্পিউটারের সামনে চেয়ারে বসে পড়ল আহমদ মুসা। অন্ধকার, কিছুই ঠাহর করতে পারল না।

আহমদ মুসার পকেট থেকে পেন্সিল টর্চ বের করে প্রথমে দেখে নিল বিদ্যুত কানেকশন ঠিক আছে কি না। তার পর দেখল কম্পিউটার স্টার্ট নেয় কি না। বোতাম টিপে দেখল ঠিক আছে। খুশী হলো আহমদ মুসা।

কিন্তু পরক্ষণেই তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। সর্বশেষ মডেলের কম্পিউটারে গোপন লক সিস্টেম আছে, যা দিয়ে কম্পুটারের মেমোরী ফাইল লক করে রাখা যায়। কোড না জানলে তা আনলক করা যায় না। যিনি লক করেন তিনি যে কোডে লক করেছেন, সেই কোডেই শুধু আনলক করা যাবে।

আহমদ মুসা দুরুদুরু বুকে বাম হাতে টর্চ ধরে, ডান হাতে মেমোরী উইনডো স্থাপন করার জন্যে নির্দিষ্ট বোতামটিতে চাপ দিল।

মিষ্টি একটা টক্ শব্দ উঠলো সুইচের। কম্পিউটারের পর্দায় স্থির ছিল আহমদ মুসার দৃষ্টি। আনন্দে নেচে উঠল আহমদ মুসার চোখ। দেখল, সুইচ টেপার সাথে সাথেই কম্পিউটারের পর্দায় ভেসে উঠল মেমোরী উইনডো। প্রশ্ন ভেসে উঠল, জানতে চাইল পরবর্তী নির্দেশ কি?

আহমদ মুসা হাপ ছেড়ে বাঁচল, মেমোরি লক করা নেই। ভাসকুয়েজ লক করার প্রয়োজন মনে করেনি। তাঁর প্রচন্ড আত্মবিশ্বাস যে, কু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের গুহায় হানা দেয়া তো দূরে থাক-এ চিন্তাও স্পেনে কেউ করতে পারে না। মনে মনে আহমদ মুসা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল, ভাসকুয়েজের এই আত্মবিশ্বাস তাকে সাহায্য করেছে।

আহমদ মুসা চিন্তা করতে লাগল কম্পিউটারকে পরবর্তী নির্দেশ তিনি কি দেবেন? মেমোরির ফাইল ডাইরেক্টরী সে চাইতে পারে, ভাবল আহমদ মুসা। ফাইল ডাইরেক্টরীতে নিশ্চয় কোন ফোল্ডার থাকবে যেখানে রেকর্ড করা আছে স্পেনে মুসলমানদের ঐতিহাসিক স্থান সমূহ ধ্বংসের সেই ঐতিহাসিক পরিকল্পনা।

আহমদ মুসা বোতাম টিপে কম্পিউটারকে মেমোরি ফাইল ডাইরেক্টরী জ্ঞাপন করতে নির্দেশ দিল।

সংগে সংগে কম্পিউটারের পর্দায় ভেসে উঠল একটা স্বতন্ত্র উইনডো। উইনডোর বুকে ভেসে উঠল বোড়া বর্ণমালার দীর্ঘ তালিকা। ওদিকে তাকিয়ে হতাশ হলো আহমদ মুসা। ফাইল বা ফোল্ডার গুলোর নাম সাংকেতিক ভাবে লেখা। দু'টি করে বর্ণ দু'টি শব্দের প্রতিনিধিত্ব করে না একটি শব্দের, তাও বোঝা মুশকিল। তালিকার শীর্ষের ফাইলটির নাম PL বর্ণে লেখা। তার পরেরটি ON এই ভাবে দশটি ফাইলের তালিকা ফাইল ডাইরেক্টরীতে রয়েছে। কোড ভাঙার জন্যে আহমদ মুসা প্রত্যেকটি ফাইলের সাংকেতিক বর্ণমালা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করল। শেষ দু'টি নামে এসে আহমদ মুসার চোখ আটকে গেল। একটির সাংকেতিক নাম EP আহমদ মুসা এর অর্থ করল Enemy Personal. আর সর্বশেষটির নাম OF সে এর অর্থ বের করল Operation Final. যেহেতু কু-ক্লাস্ক-ক্ল্যান স্পেনে কোন মুসলিম ব্যক্তিত্বকে টার্গেট করেনি, টার্গেট করেছে

মুসলমানদের ঐতিহাসিক সম্পদকে এবং এটা স্পেন থেকে মুসলমানদের চিহ্ন মুছে ফেলারই চক্রান্ত। তাই যথাযথভাবেই এটা Operation Final হতে পারে।

খুশি হল আহমদ মুসা। সেই সাথে আশাবাদের একটা প্রচন্ড শিহরণ খেলে গেল তার দেহে। অবশেষে সে দুর্লভ পরিকল্পনাটি পেতে যাচ্ছে। নিশ্চয় পরিকল্পনার সাথে ডায়াগ্রামও থাকবে।

আনন্দ কম্পিত হাতে বোতাম টিপে OF ফাইলটি নিয়ে এল আহমদ মুসা।

ফাইলটি ভেসে উঠল কম্পুটারের স্ক্রীনে।

স্ক্রীনের ওপর চোখ পড়তেই ম্লান হয়ে গেল আহমদ মুসার মুখ।

স্ক্রীনে ভেসে ওঠা উইনডোতে একটি মাত্র বাক্য লিখা, 'সাইট গুলোতে রেডিয়েশন বক্স সাফল্যজনক ভাবে স্থাপিত, ডকুমেন্ট 'ELDER' -এর কাছে নিরাপদ।'

আহমদ মুসার হতাশ চোখ দু'টি কম্পিউটারের স্ক্রীনে যেন আঠার মত লেগে আছে কিংবা চোখ সরাতে ভুলে গেছে যেন।

হঠাৎ করে ঘিরে ধরা হতাশার আঘাত হজম করছে আহমদ মুসা।

ঠিক এই সময়ই দরজার নব ঘুরাবার মত 'ক্লিক' করে একটা শব্দ হলো। শব্দটা এল তার পেছন থেকে-দরজার দিক থেকে।

এক ঝটকায় মুখ ফিরিয়ে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা। ঠিক সেই সময় ঘরের আলো জ্বলে উঠল, উজ্জ্বল আলোতে ভরে গেল ঘর।

আহমদ মুসা দেখল, স্টেনগান হাতে দরজায় দাঁড়িয়ে একজন লোক। ছুরির ফলার মত তীক্ষ্ণ তার দৃষ্টি, স্থির চোখে তাকিয়ে আছে সে আহমদ মুসার দিকে। মুখে তার বিজয়ের হাসি। তার স্টেনগানের নল আহমদ মুসার বুক লক্ষ্যে হা করে আছে।

খোলা দরজা পথে আরও চারজন ঘরে প্রবেশ করল। তাদের হাতেও উদ্যত স্টেনগান।

ঘর ফাটানো শব্দে হো হো করে হেসে উঠল দরজায় দাঁড়ানো সেই লোকটি। বলল, আমাদের খুব ভুগিয়েছ আহমদ মুসা। আমাদের জাল গলিয়ে তুমি কেমন করে মাদ্রিদে ঢুকলে?

থামল লোকটি। উত্তরের অপেক্ষা না করেই আবার শুরু করল, ভালই হলো, শিকার নিজ পায়ে হেটে এসে ফাঁদে পড়েছে।

বলেই লোকটি পাশেই দাঁড়ানো চার জনের একজনকে বলল, 'জন ওর পিঠ থেকে ব্যাগ নিয়ে ওকে একটু হালকা কর। আর পকেট আর শোল্ডার হোল্ডারও খালি কর।'

জন লোকটি গিয়ে আহমদ মুসার পিঠ থেকে ব্যাগটি নামিয়ে নিল। রিভলবার, রুমাল, চাবির রিং, এমনকি কলম হাতিয়ে নিয়ে আহমদ মুসার পকেট ও শূন্য করল।

জন ফিরে এলো ওসব নিয়ে।

সেই হেড়ে গলায় আবার হেসে উঠল লোকটি। বলল, 'আমি শুনেছিলাম তুমি খুব চালাক, কিন্তু তুমি এই বোকামিটা কি করে করলে যে, মিষ্টার ভাসকুয়েজের ঘর মানে, কু-ক্লাক্স-ক্ল্যানের হেড কোয়ার্টরের কেন্দ্র বিন্দুটা এতই অরক্ষিত। তুমি বুঝতে পারোনি, এই ঘরে তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ, এমনকি তোমার চোখের পলক পড়া পর্যন্ত নিখুঁত রিপোর্ট হয়েছে ইনফ্লারেড টেলিভিশন ক্যামেরার মাধ্যমে। আমাদের কনট্রোল রুমের সিকুরিটি এটেনডেন্ট মাঝখানে সামান্য ঘুমিয়ে পড়েছিল বলে একটু দেরি হয়ে গেছে আমাদের।'

আহমদ মুসা অবাক হলোনা। সেও আগেই একথা বুঝতে পেরেছিল, কোন সংকেত পেয়েই ওরা এসেছে। লোকটির কথা শেষ হবার সাথে সাথে আহমদ মুসার দৃষ্টি চারদিক একবার ঘুরে এল।

ক্যামেরা খুঁজছো বুঝি? লোকটির মুখে বিদ্রুপের হাসি।

'ঠিকই বলেছেন।' বোকা বোকা কন্ঠে বলল আহমদ মুসা।

হেসে উঠল লোকটি। বলল, 'উপরে দেখ ছাদের মাঝখানে একটা তিলক চিহ্ন। ওটা ক্রংক্রিটের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা শক্তিশালী একটা ইনফ্রারেড ক্যামেরার চোখ।'

‘আমার বুদ্ধির কি দোষ বলুন, অন্ধকার ঘরে তো ওটা দেখতে পাওয়ার কথা নয়।’ ঠোটে হাসি টেনে বলল, আহমদ মুসা।

‘কিন্তু বুঝতে পারার তো কথা। কু-ক্লাস্ক-ক্ল্যানের হেড কোয়ার্টারের এত অরক্ষিত থাকার কথা নয়।’

‘ঠিক আছে, আমারতো হার হয়েছে।’

‘এবার নিয়ে তিনবার তুমি আমাদের হাতে এলে। দু'বার জাল কেটে পালিয়েছো, আর সে সুযোগ তুমি পাবেনা।’

‘সুযোগ সব সময় আসেনা এটাই তো স্বাভাবিক।’

‘এমন ভাবে কথা বলছো, মনে হচ্ছে যেন তুমি শ্বশুর বাড়ী এসেছো। জান তোমার অপরাধ কত, কি শাস্তি অপেক্ষা করছে জন্য?’

‘অপরাধের কথা জানি, কিন্তু শাস্তির কথা জানিনা।’

'কি শাস্তি হওয়া প্রয়োজন বলে তুমি মনে কর?’

'আপনাদের যে শাস্তি হওয়া উচিত, তার থেকে অনেক কম।'

চোখ দু'টি জলে উঠল লোকটির। বলল, ‘খুব বেশী সাহস দেখাচ্ছ তুমি। জান আমি কে?'

'না জানিনা।' ঠোটে হাসি টেনে বলল, আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা ঠোটে হাসি দেখে লোকটির মুখ ক্রোধে আরও বিকৃত হয়ে গেল। সে দু'ধাপ এগিয়ে এল এবং ভাসকুয়েজের টেবিল থেকে পেপার ওয়েট তুলে ছুড়ে মারলো আহমদ মুসাকে লক্ষ করে।

ক্রিকেট বলের মত ছুটে আসা পেপার ওয়েট আহমদ মুসার বুকে আঘাত করত, কিন্তু আহমদ মুসা চকিতে এক পাশে সরে দাড়ানোর কারনে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে পেপার ওয়েট টি আঘাত করলো কম্পিউটারের স্ক্রীনে। কম্পিউটারের স্ক্রীন ফেটে গেল, তার একটা অংশ ফুটো হয়ে গেল।

মুহূর্তের জন্য অপ্রস্তুত ভাব দেখা দিল লোকটির চেহারায়। পরক্ষনেই হুংকার দিয়ে উঠল। ক্রোধে কাঁপছে সে। ষ্টেনগানধারী চারজনের দিকে চেয়ে নির্দেশ দিল, একে নিয়ে চল।

ষ্টেনগানধারী চারজনের দু'জন এসে আহমদ মুসার দু'হাত দু'দিক থেকে চেপে ধরে টেনে নিয়ে চলল দরজার দিকে। অন্য দু'জন ষ্টেনগানধারী আহমদ মুসার পেছনে। তাদের ষ্টেনগানের নল আহমদ মুসার পিঠ লক্ষ্যে উদ্যত। সবার পেছনে লোকটি।

ভাসকুয়েজের কক্ষ থেকে বেরিয়ে লম্বা-লম্বি করিডোর দিয়ে এগুলো তারা।

করিডোরের মাঝখানে এসে তারা লিফটে প্রবেশ করলো।

নামতে শুরু করল লিফট।

থামল এক জায়গায় এসে। আহমদ মুসা অনুভব করল তারা ইতিমধ্যেই চারতলা পরিমান স্পেস পেরিয়ে এসেছে। অর্থাৎ তাকে ভূগর্ভস্থ কোন কক্ষে আনা হল।

লিফটের দরজা খুলে গেল।

আহমদ মুসাকে নামতে সুযোগ না দিয়ে তাকে ধাক্কা দিয়ে ছুড়ে দিল কক্ষের মধ্যে। ধাক্কা দিয়েছিল স্টেনগানধারীরা নয়, সেই লোকটি। তার রাগ এখনও কমেনি।

আহমদ মুসা এমনকিছু ঘটবে তার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে ছিটকে পড়ে গেল ঘরের মেঝেতে উপুড় হয়ে।

শেষ মুহূর্তে মুখ থুবড়ে পড়া থেকে রক্ষা পেতে চেষ্টা করেছিল আহমদ মুসা। কিন্তু শেষ রক্ষা হলোনা। কপালের বাম পাশটা ঠুকে গেল কংক্রিটের মেঝের সাথে। বাম চোখের ওপরটা ফেটে গেল। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। মুখ ভেসে গেল সে রক্তে।

আহমদ মুসা উঠে বসল।

হো হো করে হেসে উঠল সেই লোকটি। তার চোখে ক্রুর দৃষ্টি। বলল, মিনাত্রা সেন্ডোকে তুমি চিনতে। আমি জুবি জুরিটা তার জায়গায়, এখন অপারেশন কমান্ডার। সেন্ডোকে হত্যা করেছ, সে হত্যার প্রতিশোধ আমরা নেব। সব হত্যারই প্রতিশোধ আমরা নেব তিল তিল করে।

আহমদ মুসা উঠে বসেছিল। সে কোটের হাতা দিয়ে চোখের ওপর আসা রক্ত মুছে নিয়ে বলল, ‘মিঃ জুবি জুরিটা আমার প্রতি রুঢ় না হয়ে আপনার কৃতজ্ঞ হওয়া দরকার। সেন্ডো বেঁচে থাকলে আপনার এ পদ জুটতোনা।’

‘ফের বিদ্রুপ করছ। দেখ এতক্ষণে তোমাকে কুকুরের মত গুলি করে মারতাম। কিন্তু কি করব, বস কথা দিয়েছেন আমেরিকার কু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানকে তাদের হাতে তোমাকে তুলে দেবার। কোটি কোটি ডলারের ব্যবসা তো’।

‘এই না বললেন বিচার আপনারাই করবেন তিলে তিলে?’

‘তা বটে, আমরা ওদের হাতে একটা সজীব কংকাল তুলে দেব মাত্র। আমাদের শাস্তি আমরা দিয়ে নেব।’

‘ঈশ্বরের যে নাম নিলেনা। কথায় আছে না, মানুষ ভাবে একটা, আল্লাহ করেন আরেকটা।’

‘ঈশ্বরের আর খেয়ে কাজ নেই, এখানে আসবেন নাক গলাতে। দু’বার পালিয়েছ, আর সে আশা করোনা। যেখানে রেখে গেলাম, তার পাথরের দেয়ালে মাথা ঠুকে মরতে পার, কিন্তু রেরুতে পারবে না।’

‘মাথা ঠুকে মরার কোন ইচ্ছা আমার নেই।’

‘তুমি মরলে তো আমাদের ক্ষতি। শাস্তি থেকে বেঁচে যাবে, আবার আমাদের ব্যবসাও মাঠে মারা যাবে। তবে তোমাকে এখানে বেশী দিন থাকতে হবে না, ভাসকুয়েজ আসা পর্যন্তই। জরুরী কাজে আজই গেল সানফ্রান্সিসকো, খবর পেলে কাল সকালেই এসে হাজির হবে। খুব বেশী হলে সন্ধ্যাতক সময় লাগবে।

জুবি জুরিটা উঠে যাবার জন্যে লিফটের বোতামের দিকে হাত বাড়িয়েও আবার হাত টেনে নিল। আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, শুন, রোবট ‘ডেভিল’ তোমাকে খাবার দিয়ে যাবে। দেখ ওর সাথে বেয়াদবির কোন চিন্তাও যেন করোনা। ও চোখের দৃষ্টি দেখেই চিন্তা ধরে ফেলতে পারে। ওর দশ চোখ, ওকে ফাকি দেবার কোন উপায় নেই। আর ও আসার পর হাত কখনও ওপরে তুলবেনা। কোন হাত যখন তার লক্ষ্যে ওপরে ওঠে, তখন সে পাগল হয়ে যায়। ও তখন

তুলাধুনো করে ছাড়বে মনে রেখ। ও কাউকে প্রাণে মারেনা, কিন্তু কেউ ওর হাতে পড়লে তাকে ছয় মাস হাসপাতালে থাকতে হয়, জীবনের মত পঙ্গু হয়ে যায় সে।'

বলে জুবি জুরিটা মুখ ফিরিয়ে লিফটের বোতামে চাপ দিল। বন্ধ হয়ে গেল লিফটের দরজা, সেই সাথে কক্ষের দরজাও।

আহমদ মুসা কোটের হাতা দিয়ে বাম চোখের পাশে জমে ওঠা রক্ত আবার মুছে নিল। তারপর ঘরের চারদিকে নজর বুলাল। সত্যিই অন্ধকূপ একটা। চারদিকেই পাথরের দেয়াল। লিফটের দরজা ছাড়া কোন দরজা জানালা নেই। ওপরে ছাদের মাঝখানে ক্রিকেট বলের মত গোলাকার একটা জায়গায় স্টিলের একটা জাল লাগানো। আহমদ মুসা বুঝল, ঐ পথ দিয়ে ঘরের শীততাপ নিয়ন্ত্রণ করা হয়, হয়তো ক্যামেরাও ওখানে সেট করা থাকতে পারে। তবে ভাসকুয়েজের ঘরের মত কোন কাল চোখ আহমদ মুসা সেখানে দেখল না।

আহমদ মুসা উঠে গিয়ে লিফটের দরজা পরীক্ষা করল। টোকা দিয়ে দেখল, পুরো স্টিলের দরজা। লিফটের সাথে এ দরজা খোলে ও বন্ধ হয়। এর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা লিফটে।

আহমদ মুসা দরজা থেকে ফিরে এসে মেঝের মাঝখানে বসল। এই অন্ধকূপের মধ্যে দুনিয়াটাকে খুব সংকীর্ণ মনে হল আহমদ মুসার। মনের দরজায় এসে উদ্বেগ উকি দিল, এ অন্ধকূপ থেকে মুক্তির উপায় কি?

আহমদ মুসা তাড়িয়ে দিল উদ্বেগটাকে মনের দুয়ার থেকে। বলল, এ চিন্তার সময় পাওয়া যাবে, ভাসকুয়েজ আসতে কমপক্ষে ২৪ ঘন্টা দেরী আছে। এখন একটু বিশ্রাম নেয়া দরকার। মেঝেয় টান হয়ে শুয়ে পড়ল আহমদ মুসা। শীঘ্রই তার দু'চোখ জুড়ে নেমে এল ঘুম।

মারিয়া গ্রাউন্ড ফ্লোরের ড্রইং রুমের দরজায় উদ্বিগ্ন ভাবে দাঁড়িয়েছিল। দৃষ্টি বাইরে লনের ওপর। লনের মাঝখান দিয়ে একটা কংক্রিটের রাস্তা বন্ধ গেটে

গিয়ে স্পর্শ করেছে। মারিয়ার দৃষ্টি বন্ধ গেটের ওপর গিয়ে বার বার আছড়ে পড়ছে।

মারিয়ার বাইরের চেয়ে ভেতরটা বেশী চঞ্চল। একটা অশুভ আশংকা এসে তার হৃদয়ে বার বার উকি দিচ্ছে। বড় কিছু ঘটেনি তো আহমদ মুসার? ভাবতে গিয়ে হৃদয় কেঁপে উঠল মারিয়ার। আহমদ মুসা যে মিশন নিয়ে কু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের হেড কোয়ার্টারে গেছে, তাতে বেশী সময় লাগার কথা নয়। বেশ রাত থাকতে এজন্যেই তিনি বেরিয়েছেন যাতে রাত শেষ হবার আগেই ফিরতে পারেন। রাত সাড়ে তিনটায় বেরোনা দেখে মারিয়া এটাই বুঝেছে। তিনি বার বারই বলেছেন, একটা বিষয় অনুসন্ধানের জন্যেই তিনি যাচ্ছেন, কোন সংঘাতে জড়াতে নয়। তাই তিনি যেমন রাতের আঁধারে গেছেন, তেমনি কাউকে সাথেও নিতে চাননি। কিন্তু এত দেরী হচ্ছে কেন? তিনি কি আর কোথাও গেলেন? না তা কেন হবে? যে বিষয়ের সন্ধানে তিনি গেছেন, সে জন্যে যদি কোথাও যেতে হয়, তাহলে ফিরে এসে সবাইকে বলে যাবেন সেটাই স্বাভাবিক। আবার সেই কাল উদ্বেগটা এসে জেঁকে বসল মারিয়ার হৃদয়ে। আর চিন্তা করতে পারেনা মারিয়া। হৃদয়ের প্রতিটি তন্ত্রীতে একটা বেদনা গুমরে উঠছে।

সিঁড়ি দিয়ে উপর থেকে নেমে এল, সুমানো। সুমানো মারিয়ার আত্মীয় এবং বান্ধবী। বেড়াতে এসেছে গতকাল।

সুমানো এসে দাঁড়াল মারিয়ার পেছনে। ধীরে ধীরে হাত রাখল মারিয়ার কাঁধে।

মারিয়া একটা হাত তুলে ধীরে ধীরে সুমানোর হাতটা ধরল। মুখ ফিরালোনা, চোখও তার ফিরালোনা পথের ওপর থেকে।

‘ওপরে চল, খাবে। ফুফু আম্মা অপেক্ষা করছেন।’ বলল সুমানো।

মারিয়া কিছু বলল না।

সুমানো মারিয়ার ঘাড়ে চাপ দিল। বলল, ‘মারিয়া চল।’

‘আমি ভাইয়ার জন্য অপেক্ষা করছি।’ না তাকিয়ে নিবির্কার কন্ঠে বলল মারিয়া।

‘সত্যিই ভাইয়ার জন্য?’ সুমানোর ঠোঁটের কোণে হাসি।

মারিয়া মুখ ফিরাল সুমানোর দিকে। অন্য সময় হলে মারিয়া হাসত কিংবা শাসন মূলক কোন কথা ছুড়ে দিত সুমানোর দিকে। কিন্তু এখন তেমন কিছুই করল না মারিয়া। একটা খবরের জন্য অপেক্ষা করছি।'

শুকনো কন্ঠস্বর মারিয়ার। চেহারাও তার পাংশু।

সুমানোর ঠোটের হাসি মিলিয়ে গেল। গম্ভীর হল সুমানো। বলল, 'ফুফু আম্মার কাছে কিছু শুনলাম। তিনি কে মারিয়া? মারিয়া এমন উদ্বিগ্ন হয়ে কারো পথ চেয়ে থাকতে পারে ভাবতে আমার বিস্ময় লাগছে।'

'তিনি আমাকে বাঁচিয়েছেন, আমাকে নতুন জীবন দিয়েছেন সুমানো।'

সুমানো মারিয়ার গলা দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল। বলল, 'শুধু সে জন্যই কি মারিয়া? আমিও তোমার মত মেয়ে, তোমার চোখ যে কথা বলছে তাতো আমি পড়ছি মারিয়া। সে জন্যই জানতে চেয়েছিলাম, কে তিনি? তিনি অবশ্যই সাধারণ মানুষ হবেন না।'

'সত্যিই সুমানো আমার চোখে তা তুমি দেখছ! কিন্তু আমি তো চাইনি আমার চোখে তা আসুক। এ আমার ব্যর্থতা সুমানো।' মারিয়ার কন্ঠ কান্নার মতই করুণ।

'কেন মারিয়া, লুকানোর এ প্রয়াস কেন তোমার?'

'থাক সুমানো।'

থামলো মারিয়া। পরক্ষণেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, 'ঐযে ভাইয়ার গাড়ী, ভাইয়া আসছেন।'

গাড়ী ধীর গতিতে এসে গাড়ী বারাসায় দাড়াঁল।

মারিয়ার চোখ ছুটে গেল গাড়ীর ভেতরে। ড্রাইভিং সিটে একজনই মানুষ- মারিয়ার ভাই ফিলিপ। ধক্ করে উঠল মারিয়ার বুকটা। তার ভাইজান কি খবর নিয়ে আসছে। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসতে চাইল মারিয়ার।

গাড়ী থেকে নামল ফিলিপ। তার সুন্দর চেহারার উপর একটি কাল মেঘ।

গাড়ী থেকে নেমেই দরজায় দাঁড়ানো বোনের দিকে তাকাল। বোনের স্লান মুখ ও চোখের শংকিত দৃষ্টির দিকে চোখ পড়তেই তার বুকের বেদনাটা আরও চিন্ চিন্ করে উঠল।

ঠোঁটের কোণে একটু হাসি টেনে এগুলো দরজার দিকে ফিলিপ। কিন্তু তার ঠোঁটের এই হাসিটা কান্নার মত করুণ মনে হলো।

মারিয়ার পাশে সুমানো নিবার্ক দাড়িঁয়েছিল। ফিলিপকে দেখে সেও একটা খারাপ খবর আঁচ করেছে।

দরজায় হেলান দিয়ে স্থানুর মত দাড়িঁয়ে থাকা বোনের একটা হাত ধরে ফিলিপ বলল, 'চল বসি।'

সোফায় এসে বসল তারা। বসে সোফায় হেলান দিয়ে মুহূর্ত কয়েক মাথা নিচু করে থেকে বলল, 'আমাদের আশংকা ঠিক মারিয়া, উনি আটকা পড়েছেন।'

মারিয়ার মুখে একটা কাল ছায়া নেমে এল।

'ফিলিপ থেমেছিল।' একটা বাক্য উচ্চারণ করে, একটু দম নিয়ে সে শুরু করল, 'বুট পালিশ কারীর ছদ্মবেশে একজন লোক পাঠিয়েছিলাম ওদের হেড কোয়ার্টারে। তাকে ঢুকতে দেয়া হয়নি ভেতরে। গেটের প্রহরী বলেছে, 'আজ অফিস বন্ধ। অফিসের লোক ছাড়া অন্য সকলের ঢোকা নিষিদ্ধ।'

'কেন? কেন? জিঞ্জেস করেছিল আমার লোক।

'রাতে বড়কর্তার ঘরে লোক ঢুকেছিল ধরা পড়েছে।'

'তো কি হয়েছে, এমনতো কতই হচ্ছে। পুলিশে দিলেই তো ঝামেলা যায়।'

'বড় কর্তার অফিস ঘরে চোর ঢুকবে নাকি, এটা অন্য ব্যাপার। যাও ভাগ।'

ফিলিপ থামল।

কিছুক্ষণ পর ধীর কন্ঠে মারিয়া বলল, 'ভাইয়া এ নিয়ে উনি তিনবার ওদের হাতে পড়লেন। আর ট্রিয়স্টের ব্যাপার নিয়ে ওরা ওঁর ওপর ভীষণ ক্ষেপে আছে। আমার......'

কথা শেষ করতে পারলোনা মারিয়া। কন্ঠ তার রুদ্ধ হয়ে এল।

'তুমি যে আশংকা করছ, ওমন কিছু ঘটেনি মারিয়া।'

একটু থামল ফিলিপ। তারপর আবার শুরু করল।

'লোকটি ফিরে এলে একটা সাপ্লায়ার কোম্পানীর এজেন্ট ছদ্মবেশে আমি গিয়েছিলাম ওদের হেড কোয়ার্টারে। আমাকে রিসেপশন পর্যন্ত যেতে দিয়েছিল। রিসেপশনের লোকটিও আমাকে ঐ কথায় বলেছিল। শুনে আমি বলেছিলাম, এ নিয়ে এত রাখ-ঢাক কেন, পুলিশে দিলেই ঝামেলা চুকে যায়।'

রিসিপশনিস্ট লোকটি বলেছিল,'পুলিশে দেব কেন? আমরা পুলিশের বাবা। ও রকম কত লোককে আমরা হজম করেছি।'

'তাহলে আর সমস্যা কি?' বলেছিলাম আমি।

'সমস্যা হলো বড় কর্তা নেই। আমেরিকা গেছেন। তার নির্দেশ ছাড়া কিছুই এখানে হয় না।'

'ও বুঝেছি, তিনি না ফেরা পর্যন্ত চোরকে রাখতে হবে, তাই এই সতর্কতা।'

'আঃ কি বললেন, ও ব্যাটা চোর না। চোর না হলে কি কোন মাথা ব্যাথা হতো।' তাহলে?

'সাংঘাতিক এক লোক সে। কি মুসা যেন নাম। আমাদের বহু লোককে খুন করেছে। বড় কর্তা এবার ওকে চিবিয়ে খাবে।'

'সাংঘতিক লোক তো তাহলে, পালাবে না তো? আপনাদের কড়াকড়ি ঠিকই হয়েছে।'

'দু'বার ও পালিয়েছিল। আর নয়। এবার মাটির নিচে অন্ধকুপে রাখা হয়েছে। স্বয়ং শয়তান এলেও উদ্ধার করতে পারবে না।'

'অন্ধকূপ? সে আবার কি জিনিস? কোথায়?'

প্রশ্ন করেই ভেবেছিলাম এমন খোলামেলা প্রশ্ন বোধ হয় ঠিক হয়নি। আমার মতলব সে ধরে ফেলতে পারে।

কিন্তু সে পারেনি ধরতে, গল্প তাকে পেয়ে বসেছিল। সে যে অফিসের খুব গুরুত্বপূর্ণ লোক, তা প্রকাশের একটা সুযোগ পাওয়ায় সে খুশী হয়ে উঠেছিল। বলল, 'অন্ধকূপ সাংঘাতিক শত্রুর জন্য কয়েদ খানা। এই অফিসের মাটির নিচেই।'

এই সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেলাম। কে যেন নামছে। আমি চলে এলাম।’

‘সুতরাং,’ বলতে শুরু করল ফিলিপ। ‘মুসা ভাইয়ের ক্ষতি হয়নি নিশ্চিত, ভাসকুয়েজ না আসা পর্যন্ত,তার কোন ক্ষতি হবারও সম্ভাবনা নেই।’

‘খবর পেলে ভাসকুয়েজ দেখো কালই চলে আসবে।’ম্লান কন্ঠে বলল মারিয়া।

‘জানি।কিন্তু কাল আসার আগেই আমারা কাজ সেরে ফেলব। আমি ওদের হেড কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে যিয়াদের ওখানে গেছিলাম। সব আলোচনা হয়েছে। আজ রাতেই আমারা হানা দেব।

মারিয়ার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তার চোখে ভেসে উঠল আহমদ মুসার চেহারা। সেই সাথে মনে পড়ল আহমদ মুসার সাথে নির্জন তার সময় গুলোর কথা। একজন মানুষ যে অমন অবিশ্বাস্য পবিত্র চরিত্রের হতে পারে, তা না দেখলে মারিয়ার কোন দিনই বিশ্বাস হতো না। তার হৃদয়ের এক গহীন প্রান্ত থেকে একটি পরিচিত বেদনা চিন চিন করে উঠল। কেঁপে উঠল মারিয়া। এই বেদনাকে সে প্রাণপণে চেপে রাখতে চায়।

ফিলিপ তাকিয়েছিল বোনের দিকে। ফিলিপ সব জানে। কিন্তু কোন দিন কিছু বলেনি অতি আদরের ছোট বোনটিকে। মারিয়া নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে এটা ফিলিপ জানে।

নিরবতা সুমানো। সে মারিয়ার পাশে বসেছিল। বলল, ‘ভাইয়া লোকটি দেখছি মারিয়াকে নিঃশেষ করেছে, তোমাকে ও পাগল করেছে। আবার অন্ধকুপে তার বন্দি হবার ভয়ানক সংবাদও তুমি দিলে। কে এই সাংঘাতিক লোকটি ভাইয়া?’

'তুমি মারিয়ার কাছে শোন। আমার কাজ আছে যাই।' বলে ফিলিপ উঠে দাঁড়াল।

'মারিয়া মুখ খুলছেনা। জান ভাইয়া, মারিয়া এখন পর্যন্ত কিছু খায়নি, নিচে থেকে উপরে উঠেনি।'

ফিলিপ চলে যাচ্ছিল। থমকে দাঁড়াল। ঘুরে দাঁড়াল মারিয়ার দিকে।

মারিয়া মুখ নিচু করে আছে।

ফিলিপ দু'ধাপ এগিয়ে গেল মারিয়ার দিকে। নরম কণ্ঠে বলল, 'বোন মারিয়া উনি শুনলে ভীষণ রাগ করবেন। চিন্তার কি আছে? তুমি তো জান, এর চেয়ে কত বড় বড় বিপদের তিনি মোকাবেলা করেছেন।'

বলে ফিলিপ আবার ঘুরে দাঁড়াল। চলতে শুরু করল সে।

ফিলিপের কথা শেষ না হতেই মারিয়া দু'হাতে মুখ ঢেকেছিল।

সুমানো ফিলিপের সাথে সাথে উঠে দাঁড়িয়েছিল। ফিলিপ চলে গেলে সুমালো মারিয়ার পাশে বসল।

ফিলিপের কথার প্রথম বাক্যটি মারিয়ার হৃদয়ের গহীনে লুকানো বেদনাকেই গিয়ে আঘাত করল। 'তিনি ভীষণ রাগ করবেন' কথাটা মারিয়াকে গত রাতের কথাটা স্মরণ করিয়ে দিল। ঐ রাতে সিড়ির গোড়ায় মারিয়াকে একা দাঁড়িয়ে থাকাকে আহমদ মুসা অন্য ভাবে নিয়েছিল। তার মনের এই ভাবটা কণ্ঠের কঠোরতার মধ্যে দিয়ে প্রকাশও পেয়েছিল। কোন কথা না বলে কান্না চেপে মারিয়া ছুটে ওপরে উঠে গিয়ে বিছানায় আছড়ে পড়ল। অনেক কান্দলো মারিয়া। এখন ফিলিপের কথায় মারিয়ার সেই কান্না উথলে উঠলো। তার মন যেন চিতকার করে বলে উঠল, মারিয়ার না খেয়ে থাকার কথা শুনে ঐভাবে উনি ভুল বুঝবেন এবং রাগ করবেনই তো?

সুমানো মারিয়ার পাশে বসেই বুঝতে পারল মারিয়া কাঁদছে।

সুমানো মারিয়ার হাত দু'টি সরিয়ে নিল তার মুখ থেকে। অশ্রুতে ভেসে যাচ্ছে মারিয়ার মুখ।

মারিয়া তাড়াতাড়ি তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রুমাল দিয়ে মুখ মুছে ফেলল।

সুমানো মারিয়াকে জড়িয়ে ধরে বুকে টেনে নিয়ে বলল, 'আমি শুধু তোর বোন না, বয়সে কিছু বড়ও। বলবিনা কি হয়েছে তোর? কিছু বুঝিনি তা নয়, কিন্তু এ কান্নার অর্থ আমি বুঝিনা।'

সোজা হয়ে বসল মারিয়া। বলল, 'আমাকে মাফ কর সুমানো। এ কিছু না। আমার একটা অন্যায়। একটা অন্যায়ের আগুনে আমি জ্বলছি। চল উঠি।'

উঠতে চাইল মারিয়া।

কিন্তু সুমানো তাকে ধরে রাখল। বলল, জানি, তুমি না বললে আর হ্যাঁ বলানো যাবে না। কিন্তু উনি কে তাকি জানতে পারবনা?

'তিনি যেমন মহৎ, যেমন বিরাট, যেমন বিস্তৃত, তেমনি হতভাগা। সর্বক্ষণ বিপদ তাঁকে তাড়া করে ফিরছে।' এক ধরণের উদাস কণ্ঠ মারিয়ার।

'মারিয়া! এটা কারো কোন পরিচয় হলো? এ পরিচয় দিয়ে কাউকে চেনা যায়?'

মারিয়া সুমানোর দিকে ফিরল। নরম কণ্ঠ বলল, 'আহমদ মুসাকে জান তুমি?'

সুমানো চোখ বন্ধ করল। ভাবল একটু। তারপর বলল, 'এই কিছুদিন আগে টাইম ইন্টারন্যাশনাল ম্যাগাজিন এক আহমদ মুসাকে নিয়ে কভারস্টোরী করেছিল। সেতো জগৎ কাঁপানো এক বিপ্লবী। তুমি কি তার কথা বলছ?'

'আমি তোমার সেই জগৎ কাঁপানো বিপ্লবীর কথাই বলছি।' মারিয়ার ঠোঁটের কোণে বেদনাময় এক হাসি।

'কি বলছ মারিয়া, ইনি তিনি?' সুমানোর কণ্ঠ কাঁপা এবং চোখে মুখে অপার বিস্ময়।

'হাঁ সুমানো, ইনিই সেই তিনি।'

সুমানো কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলনা। যেন বাক রুদ্ধ হয়ে গেছে তার।

মারিয়া কিছু বলার জন্যে মুখ খুলছিল। সুমানো বাধা দিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'একটু ভাবতে দাও মারিয়া আমাকে। কোথায় কিংবদন্তীর নায়ক হয়ে ওঠা সেই আহমদ মুসা; কোথায় মাদ্রিদ, কোথায় আমার বোন মারিয়া- আমি অংক মিলাতে পারছিনা। আমি স্বপ্ন দেখছিনা তো?'

'স্বপ্ন নয়, কিন্তু স্বপ্নের চেয়েও বিস্ময়কর।' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল মারিয়া।

'কিন্তু তোমার কান্নাকে আর বিস্ময়কর মনে হচ্ছে না আমার কাছে। শুধু এখন বড় বেশি জানতে ইচ্ছে করছে- তুমি যা বলতে চাও না সেই কাহিনী, কি করে এই অসম্ভব মিলন ঘটল। সেই কাহিনী।'

বলতে শুরু করল মারিয়া। ঘাড় ফিরিয়ে সুমানোর দিকে চেয়ে বলল, 'দুনিয়াতে যত কাহিনী সৃষ্টি হচ্ছে তার অল্পই মানুষ জানে সুমানো।'

সুমানো কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু মারিয়া এক দৌঁড়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল।

পলায়নপর মারিয়ার দিকে চেয়ে হাসল সুমানো, কিন্তু সে হাসিতে আনন্দ নয় বেদনা ঝরে পড়ল। তার মুখ থেকে স্বগতঃ উচ্চারিত হলো, 'বোন আমার কাছ থেকে পালালে, কিন্তু জীবন থেকে পালাতে পারবে না।'

বেশ আগে ঘুম থেকে উঠেছে আহমদ মুসা। অনুমান করে মাগরিবের নামাজটাও পড়ে নিয়েছে। এই অন্ধকুপে সময়ের বিচার একেবারেই অসম্ভব। নাস্তা ও দুপুরের খানা থেকে সময়ের একটু পরিমাপ করে নিয়েছে আহমদ মুসা। এই হিসেব থেকে সে যোহর ও আছরের নামায পড়েছে। আছরের নামাজ পড়ে সে আবার ঘুমিয়েছিল। ঘুম থেকে উঠে আহমদ মুসা অনুমান করেছিল দু'ঘন্টার বেশী সে ঘুমায়নি। সুতরাং সে ঘুম থেকে উঠেই মাগরিবের নামাজ পড়ে নিয়েছে।

সকালেও একবার ঘুমিয়েছে আহমদ মুসা। রোবটের পায়ের শব্দে তার ঘুম ভেঙেছিল। চোখ খুলেই সে দেখতে পেয়েছিল রোবটকে। লিফট থেকে বেরিয়ে হেঁটে আসছে মেঝের উপর দিয়ে। নিঃশব্দ গতি, তার মুখ দিয়ে অব্যাহতভাবে একটা শব্দ বেরুচ্ছে 'নাস্তা নাস্তা।' এই শব্দেই তার ঘুম ভেঙেছিল।

রোবটের হাতে ছিল একটা টিফিন বক্স। সে বক্সটি এনে আহমদ মুসার সামনে রেখেছিল। রাখার সংগে সংগেই তার মুখের কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আহমদ মুসা আগেই উঠে বসেছিল।

রোবটের উচ্চতা সাড়ে চার ফুটের মত হবে, আহমদ মুসা অনুমান করে নিয়েছিল। ঠিকই বলেছিল জুবি জুরিটা, রোবটের মাথায় দশটি চোখ। দশটি চোখেই উজ্জ্বল দৃষ্টি। রোবটের হাত দুটি দীর্ঘ এবং বলিষ্ঠ। হাতের দিকে তাকিয়েই আহমদ মুসা বুঝেছিল, হাত দু'টি সামনে পিছনে, ডানে বামে সব দিকে

সমানভাবে সক্রিয় হতে পারে। আস্থার সাথে নিখুঁতভাবে পা ফেলে সে। সবই ঠিক আছে, শুধু মুখ দেখেই বলা যায় তার 'ডেভিল' নাম স্বার্থক। কুৎসিত এবং ভয়ংকর তার মুখ। ঐ মুখ নিয়ে যখন সে এগিয়ে আসে মনে হয় খুন করতেই আসছে।

টিফিন বক্স রেখে রোবট দাঁড়িয়েছিল।

আহমদ মুসা বুঝেছিল, সে খেলে টিফিন বক্সটি ফেরত পাবে, তার পরেই রোবট যাবে।

টিফিন বক্সটি বিরাট। তার মধ্যে নাস্তা পানি সবই আছে।

বক্সটি খুলল আহমদ মুসা।

রোবট সম্পর্কে সাবধান হওয়ার ব্যাপারে জুবি জুরিটার কথা আহমদ মুসার মনে ছিল কিন্তু হঠাৎ এক সময় মাথা চুলকাবার জন্যে তার ডান হাত উপরে উঠে গেল। আঁৎকে উঠল আহমদ মুসা, এই বুঝি কি ঘটে যায়। কিন্তু কিছুই ঘটল না। বিস্মিত হলো আহমদ মুসা। পরক্ষণেই ভাবল, হাতটা বিশেষ ভংগিতে না উঠলে সম্ভবতঃ রোবট প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করবেনা। সে বিশেষ ভংগিটা কি, অনুমান করতে চেষ্টা করল আহমদ মুসা। নিশ্চয় হাত রোবটের দিকে টার্গেট হতে হবে এবং চোখও বোধ হয় রোবটের দিকে নিবদ্ধ হতে হবে। কাউকে আক্রমণের সময় মানুষের চোখ ও হাতের এমন অবস্থানই হয়ে থাকে। এমন ভাবে চিন্তা করতে পারায় আহমদ মুসা খুশী হলো। তার এই চিন্তা সঠিক কি না দুপুর বেলা আহমদ মুসা পরীক্ষা করল।

সকালে যেমন রোবট লিফটে করে একা এসেছিল দুপুরেও তাই এলো। আহমদ মুসা বুঝল রোবট লিফট চালাতেও জানে।

রোবট খাবারের বক্স ঘরের ঠিক মাঝখানে রেখে দাঁড়িয়েছিল।

রোবট যখন ঢোকে, তখন আহমদ মুসা ঘরে পায়চারি করছিল।

রোবট খাবারের বাক্স রেখে দাঁড়ালে আহমদ মুসাও খাবারের বাক্সের কাছে এসে দাঁড়ালো। তারপর সে দু'হাত তুলে গা থেকে কোট খুলে হাতে নিয়ে বসে পড়ল। এ সময় আহমদ মুসার চোখ ছিল নিচু। কি ঘটে সেই চিন্তায় তার দেহের প্রতিটি স্নায়ুতন্ত্রী টান টান হয়ে উঠল।

না, কিছুই ঘটলনা। রোবট হাত নিচু রেখে যেমন দাঁড়িয়েছিল, তেমনি দাঁড়িয়ে থাকল। আহমদ মুসা নিশ্চিত হয়ে গেল, তার চিন্তা ঠিক। হাত ও চোখ এক সাথে রোবটের দিকে টার্গেটেড না হলে রোবট সক্রিয় হবে না, শত্রুতা করবেনা। আহমদ মুসা জানে, রোবটের চোখ গুলো হলো দূরনিয়ন্ত্রিত টিভি ক্যামেরা অথবা এ চোখ গুলোর সাথে রোবটের ভেতরের কমান্ডসেল যুক্ত রয়েছে। চোখগুলো দিয়ে দেখেই কমান্ডসেল রোবটকে নির্দেশ দেয়।

এই চিন্তা সামনে রেখে আহমদ মুসা একটা পরিকল্পনা আঁটলো। রোবট খাবার বক্স নিয়ে চলে যাবার পর অন্ধকূপের মেঝেতে শুয়ে শুয়ে আহমদ মুসা তার পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত রূপ দিল। এবং স্থির করল, আল্লাহর ওপর ভরসা করে রাতেই সে তার পরিকল্পনা কার্যকর করার উদ্যোগ নেবে।

মাগরিবের নামাজের পর আহমদ মুসা ঘণ্টা খানেক ধরে হালকা ব্যায়াম করল। তারপর ঘরময় সে পায়চারি করতে থাকে।

কতক্ষণ পায়চারি করেছে, কত রাত হয়েছে কে জানে। তবে রাতের খাবার সময় পার হয়ে যায়নি, কারণ রোবট খাবার নিয়ে আসেনি। ঠিক খাবারের সময়েই রোবট খাবার নিয়ে আসবে। মনে মনে আহমদ মুসা জুবি জুরিটার প্রশংসা করল। অন্ততঃ খাবারটা সে ঠিকমত দিচ্ছে। শিকারকে খাইয়ে দাইয়ে সম্ভবতঃ মোটা তাজা করে নিতে চায় জুবি জুরিটা।

খুট করে একটা শব্দ হলো লিফটের দরজায়। খুলে গেল লিফটের দরজা ধীরে ধীরে। খোলা দরজা দিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে বেরিয়ে এল রোবট। আগের দু'বারের মত রোবট খাবারের বক্সটি এনে মেঝের ঠিক মাঝখানে রাখল।

আহমদ মুসা বিপরীত দিকের দেয়ালের কাছে তখন। লিফটের দরজা খোলার সাথে সাথে সে দাঁড়িয়ে পড়ল।

রোবট খাবারের বক্সটি মেঝেতে নামিয়ে রাখার পর আহমদ মুসা ধীরে ধীরে সেদিকে এগুলো। আহমদ মুসার দৃষ্টি রোবটের দিকে নয়, খাবারের বক্সে দিকে। আহমদ মুসা যতই খাবারের বক্সে কাছাকাছি হচ্ছে, ততই তার স্নায়ুতন্ত্রীর উত্তেজনার চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আল্লাহ তাকে সফল করবেন তো? আহমদ মুসার হিসেব যদি ঠিক না হয়ে থাকে, যা সে চিন্তা করেছে তার চেয়ে ভিন্ন ধরণের যদি

হয় রোবটের প্রকৃতি। আহমদ মুসা জীবনে বার বার ঝুঁকি নিয়েছে, কিন্তু এমন অনিশ্চিয়তার মুখোমুখি সে কোন দিন হয়নি।

রোবট খাবার বক্স থেকে এক গজেরও কম দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

আহমদ মুসা খাবারের বক্সের এক ফুটের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। তার নিম্নমুখী চোখ রোবটের পা দেখতে পাচ্ছে। সে ঠিক দুপুরের মতই চোখ নিচু রেখে হাত দু'টি তুলে কোট খুলতে লাগল। কোট খুলে দু'হাত দিয়ে ধরে সামনে নিয়ে এল। তারপর ঠিক ভাজ করার জন্যে কাপড় যেভাবে মানুষ টান করে ধরে -ঠিক সেভাবে দু'হাতে কোট টান করে সামনে ধরল। এর পরেই চোখের পলকে ঘটে গেল ঘটনাটা। আহমদ মুসা বিদ্যুত বেগে দু'হাতে ধরা কোটটি আর একটু ওপরে তুলে ছুড়ে দিল রোবটের মাথায়।

নিখুঁত টার্গেট। প্রসারিত কোটটি গিয়ে রোবটের মাথার গোটাটাই ঢেকে দিল।

কোট ছুঁড়ে দিয়েই ছুটল সে খোলা লিফটের দিকে।

লিফটে গিয়ে উঠল আহমদ মুসা।

লিফটের দরজা ক্লোজ করার বোতামে টিপ দেবার আগে আহমদ মুসা রোবটের দিকে তাকিয়ে দেখল, রোবট ঘুরছে, উথাল পাথাল করছে, কিন্তু হাতে দুটি তাঁর মাথা থেকে কোট সরাতে পারছে না। কারন চোখ বন্ধ থাকায় এ ধরনের কাজের কমান্ড সে পাচ্ছে না। রোবটের চোখ বন্ধ হয়ে যাবার সাথে সাথে ভেতরের কমান্ড সেলও অন্ধ হয়ে গেছে। রোবট বুঝতেই পারলনা আহমদ মুসা লিফটের চলে গেছে।

লিফটকে ক্লোজ করার বোতাম টিপে দিল আহমদ মুসা। কোন তলায় গিয়ে লিফট থেকে নামবে, সেটা ঠিক করতে গিয়ে সুইচ প্যানেলে দেখল, একতলা ও দোতলায় কোন স্টপেজ নেই। স্টপেজ আছে তিন, চার ও পাঁচ তলায়। আহমদ মুসা বুঝল, এটা বিশেষ লিফট, এ লিফট দিয়ে বাইরে বেরুনো যাবে না।

আন্ডার গ্রাউন্ড সেলে নামানো হয়েছিল। আহমদ মুসা তিন নম্বর বোতামটিই টিপে দিল। তিন তলায় নামবে সে।

তিন তলায় এসে লিফট থেমে গেল।

আহমদ মুসার মনে আছে, যাবার সময় লিফটের এ দরজায় একজন প্রহরী দেখেছিল। তাঁর হাতে তখন স্টেনগান ছিল। লিফটের দরজা ধীরে ধীরে খুলছে। আহমদ মুসা ভাবল, প্রহরী নিশ্চয় মনে করছে রোবট নামবে লিফট থেকে। অথবা যদি রোবট তিন তলায় নামার ব্যাপার নয়, তাহলে মনে করতে পারে কোন অফিসার আসছেন। অথবা এ সময় এখানে যদিও কারও নামার কোন ব্যাপার না হয়, তাহলে প্রহরী সন্দেহ করতে পারে। আহমদ মুসা যে কোন অবস্থার জন্য নিজেকে তৈরি করল।

লিফটের দরজা অর্ধেকটা খোলা হতেই আহমদ মুসা লিফট থেকে এক লাফে করিডোরে পড়ল।

প্রহরী দরজার এক পাশে স্টেনগান হাতে দাঁড়িয়েছিল। আহমদ মুসা গিয়ে একদম তাঁর মুখের সামনেই পড়ল।

ভুত দেখার মত আঁতকে উঠল প্রহরী। পরক্ষনেই সে নিজেকে সামলে নিল। মনে হলো সে চিনতে পেরেছে আহমদ মুসাকে। নিজেকে সামলে নিয়ে প্রহরী তাঁর স্টেনগান তুলতে যাচ্ছিল। কিন্তু সে সুযোগ আর পেল না। আহমদ মুসার ডান হাতের প্রচণ্ড এক কারাতে গিয়ে পড়ল তাঁর বাম কানের নিচে ঘাড়টায়। সঙ্গে সঙ্গেই সে সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিল।

আহমদ মুসা তাকে তাড়াতাড়ি ধরে ফেলে টেনে লিফটে নিয়ে এল। তারপর লিফট ক্লোজ করে আন্ডার গ্রাউন্ড বোতাম টিপে দ্রুত বেরিয়ে এল। তারপর পড়ে থাকা স্টেনগান টি করিডোরে থেকে তুলে নিয়ে মুহূর্তের জন্য দাঁড়াল, কোন দিকে যাবে সে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য। করিডোরে একদম ফাকা। প্রহরী শ্রেণী ছাড়া অফিসে রাতে সাধারণ কর্মচারীরা কেও থাকে না।

করিডোরের পূর্ব প্রান্তে বেরিয়ে যাবার লিফট ও সিঁড়ি। নিশ্চয় রাতে বাইরে বেরুবার গেট বন্ধ, তাঁর উপর সেখানে আছে দু জন প্রহরী। তাছাড়া তাঁর পালাবার খবর প্রকাশ হতে দেরী হবে না। সে ক্ষেত্রে প্রথমে সবাই গেটের দিকেই ছুটবে। করিডোরটি পশ্চিমে গিয়ে ভাস্কুয়েজের কক্ষে শেষ হয়েছে।

আহমদ মুসা ভাস্কুয়েজের কক্ষের দিকেই ছুটল। তাকে খোঁজার জন্য। প্রথম দিকে অবশ্যই কেও এদিকে আসবেনা।

ভাস্কুয়েজের বন্ধ দরজার সামনে দাড়িয়ে আহমদ মুসা দ্রুত জুতার গোড়ালি থেকে ল্যাসার নাইফ বের করে নিল। তারপর ল্যাসার বিম দিয়ে কয়েক সেকেন্ডে এর গলিয়ে ফেলল লোক।

আহমদ মুসা ভাস্কুয়েজের ঘরে ঢুকে ছিটকিনি লাগিয়ে দিল। মেঝেয় পা বারাতে গিয়ে, ছাঁদ থেকে তাকিয়ে থাকা ইনফারেড ক্যামেরা এর কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল বটে, কিন্তু বিকল্প সন্ধানে এর তখন কোন সময় ছিল না। তাছাড়া করিডোরেও তো ক্যামেরা থাকতে পারে। সুতরাং তাঁর গতি বিধি ধরা পড়ে যাবেই। যতক্ষণ সুযোগ আছে, তাঁর দ্রুত সদ্ব্যবহার করতে হবে।

আহমদ মুসা দৌড় দিল জানালা লক্ষ্য। দৌড় দেয়ার জন্য পা তলার পরেই তাঁর ডান পা টি কিসের সাথে ধাক্কা খেল। থেমে ঝুকে হাত দিয়েই বুঝতে পারল তাঁর ব্যগ। আহমদ মুসা র মনে পড়ল তাঁর কাছ থেকে ব্যাগ নিয়ে একজন প্রহরী দরজার সামনে ডান পাশটায় রেখে দিয়েছিল। ব্যাগটা ওখানই আছে। ওরা নিয়ে যায়নি, রেখে দিয়েছে ভাস্কুয়েজের জন্য। অথবা তারা ভুলেই গেছে ব্যাগের কথা, আহমদ মুসাকে পাওয়ার আনন্দে।

খুশী হল আহমদ মুসা ব্যাগটি পেয়ে। ব্যাগ হাতে তুলে আবার ছুটল আগের সেই জানালার দিকে।

জানালার গরাদ পরীক্ষা করে খুশী হল। আজকেও জানালার গরাদ লক করা নেই। আহমদ মুসা ধরা পড়ার পর এর প্রয়োজন বোধ হয় তারা মনে করেনি।

আহমদ মুসা জানালার গরাদ উঠিয়ে সংকীর্ণ কার্নিশটি তে নেমে এল। কার্নিশে দাড়িয়ে নিচে তাকিয়ে হতাশ হল আহমদ মুসা। সেদিন যেমন এ পাশটা অন্ধকার ছিল, আজ অন্ধকার নয়। এ পাশে নতুন একটা লাইট পোস্ট বসানো হয়েছে। তবে আহমদ মুসা খুশী হল, ছোট ঝাউ গাছটার ওপাশে তাঁর গাড়িটা সে যেখানে রেখে গিয়েছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। নিচটা ভাল করে দেখতে গিয়ে আরও হতাশ হল আহমদ মুসা। তাঁর সোজাসুজি নিছের জায়গাটা থেকে গজ তিনেক দক্ষিণে স্টেনগান হাতে একজন প্রহরী দাড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে। তবে

ভাগ্যটা এখনও এই টুকু ভাল যে, লোকটা এদিকে তাকিয়ে নেই। দক্ষিন মুখী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দক্ষিন দিকে অল্প দূরে দাঁড়ানো একটা বিল্ডিং থেকে পিয়ানোর সুন্দর সুর ভেসে আসছে। প্রহরী ওদিকে চেয়ে সম্ভবত সে সুরেই শুনছে।

আহমদ মুসা মুহূর্ত কয়েক অপেক্ষা করে সিল্কের কর্ডের হুকটি জানালায় লাগিয়ে নিল এবং বিসমিল্লাহ বলে নিঃশব্দে কর্ডে ঝুলে পড়ল। এই ঝুঁকি নেয়া ছাড়া তাঁর সামনে আর কোন বিকল্প ছিল না। অপেক্ষা করার উপায় নেই। সময় যত যাবে, বিপদ ততই বাড়বে।

স্টেনগান দাঁতে কামড়ে দ্রুত নামছে আহমদ মুসা। অর্ধেক পথ নেমেছে এমন সময় কু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান হেড কোয়ার্টার এর ভেতর থেকে সাইরেন বেজে উঠল। আহমদ মুসার গোটা দেহে একটা উষ্ণ স্রোত বয়ে গেল। সে পালিয়েছে একথা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। ঘণ্টা বাজিয়ে প্রহরীদের সতর্ক করা হচ্ছে।

আহমদ মুসা নিচে একবার তাকিয়ে কর্ড ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে পড়ল। একটু দখিনে দাঁড়ানো প্রহরী সাইরেন এর শব্দ শুনে সতর্ক হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সে তাকাচ্ছিল পূর্ব দিকে - বিল্ডিং এর যেদিকে গেট। আহমদ মুসার লাফিয়ে পড়ার শব্দ হল।

চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়াল প্রহরী। দেখতে পেল আহমদ মুসা, সেই সাথে ঝুলে থাকা কর্ডটি। শত্রুকে চিনতে তাঁর দেরী হল না। হাতের স্টেনগান টি তুলতে গেল সে।

আহমদ মুসা লাফিয়ে পড়েই স্টেনগান তুলতে গেল আহমদ মুসাকে গুলি করার জন্য, তখন আহমদ মুসাকে ট্রিগার টিপতেই হল। আহমদ মুসার স্টেনগান থেকে বেরিয়ে গেল এক পশলা গুলি।

প্রহরী যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, সেখানেই লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

আহমদ মুসা ছুটল ঝাউ গাছের ওপাশে গাড়ির কাছে। গাড়ি খোলাই রেখেছিল আহমদ মুসা, চাবিও রেখে গিয়েছিল কি হলে। চাবি কি হলে ঠিক সেভাবেই রয়ে গেছে। সে কিছুটা বিস্মিত হল। ওরা কি এদিকে কোন খোঁজ করেনি। কু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের মত সংগঠনের জন্য এটা অস্বাভাবিক মনে হল তাঁর কাছে।

আহমদ মুসা গাড়িতে উঠে গাড়ি স্টার্ট দিল। গাড়ি যখন বেরিয়ে আসছিল লন থেকে, তখন ঝাউ গাছের ওপাশে শোর-গোল শুনতে পেল। স্টেনগান বাগিয়ে কয়েকজন ছুটে এল ঝাউ গাছের এ পাশে। তারা গুলি ছুড়তে ছুড়তে গাড়ির পেছনে পেছনে ছুটে এল অনেক দূরে।

ওদের জেদ দেখে হাশ্ল সে।

আহমদ মুসা এ গলি সে গলি ঘুরে অবশেষে ফারদিনান্দ এভেনিউতে উঠে এল।

রাতের রাস্তা, গাড়ি চলাচল অপেক্ষাকৃত কম। তীব্র গতিতে ছুটছে আহমদ মুসার গাড়ি। সারাদিন পর মনে পড়ল মারিয়ার কথা, ফিলিপের কথা। নিশ্চয় ওরা উদ্বেগ শেষ হয়ে যাচ্ছে। ফিলিপ নিশ্চয় তাঁর খোঁজে এদিকে এসেছে। সে তো বসে থাকার ছেলে নয়। মারিয়া যে তাকে একা আসতে না দেবার জেদ ধরেছিল, তাও মনে পড়ল আহমদ মুসার। মারিয়ার সে আশংকাই সত্য হল। নিশ্চয় মারিয়া অনেক কথা বলবে। কেন বলবে? কেন তাকে নিয়ে মারিয়ার এত আশংকা? একথা ভাবতে গিয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল তাঁর। ভুল পথে চলেছে মারিয়া। এ ভুল পথ থেকে মারিয়াকে ফেরাতে হবে। ভোরে মারিয়াকে ঐ ভাবে শক্ত কথা বলা যদিও খারাপ হয়েছে, মারিয়া এতে নিশ্চিত কষ্ট পেয়েছে, কিন্তু মারিয়াকে শোধরাতে হলে এমন কঠোরতার প্রয়াজন আছে। আহমদ মুসার মন থেকে তৎক্ষণাৎ কে যেন বলে উঠল, মারিয়াকে এই কষ্ট দেয়া হবে, তাঁর অপরাধ কি? মারিয়ার যে বিষয়কে ভুল বলা হচ্ছে, তাঁর জন্য মারিয়া কতটুকু দায়ী ? আহমদ মুসা তৎক্ষণাৎ এর কোন জবাব দিতে পারলনা। মারিয়া ভুল পথে চলছে বলা যায়, কিন্তু তাকে তো অপরাধী বলা যায় না। মেইলিগুলিকে তো আমি অপরাধী বলিনি বরং তাকে তো আপন করে নিয়েছি। আর মারিয়া যে ভুল পথে চলছে, তাঁর জন্য ও মারিয়া তো প্রকৃত পক্ষে দায়ী নয়, সে পরিস্থিতির শিকার। আমার সাথে তাঁর দেখা, তাঁর পরিচয়, তাঁর আলাপ কোনটাই তাঁর সৃষ্ট নয়, আর আমিও এর জন্য দায়ী নই। আমিও ছিলাম অবস্থার শিকার, যে জ্ঞান ও দায়িত্ববোধ আল্লাহ্ আমাকে দিয়েছেন তাঁর নির্দেশে আমি কাজ করছি। আমি জ্ঞানত কোন সীমা লঙ্ঘন করিনি। আবার কে যেন অন্তর থেকে বলে উঠল, মারিয়া

কোন অন্যায় না করার পরও মারিয়ার প্রতি তুমি কঠোর হয়েছ এবং তাকে ভুল পথে চলার কথা বলছ তোমার স্বার্থ সামনে রেখেই। আসল কথা হল, মেইলিগুলিকে যা দিয়েছ, তাঁর অংশ তুমি কাওকে দিতে চাও না। এই কথায় আহমদ মুসা নিজেকে খুব দুর্বল অনুভব করল, তাঁর চিন্তা ঝাপসা হয়ে এল। বলল সে, আমি যা পারিনা তা না পারা কি অন্যায় ?

এই সময় আহমদ মুসার গাড়ি এসে মারিয়াদের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়াল। চিন্তার জাল ছিন্ন হয়ে গেল তাঁর।

হর্ন না বাজিয়ে গাড়ি থেকে নামল আহমদ মুসা। গেট খোলার কৌশল সে জানে। বাইরে থেকে সুইচ টিপে গেট খোলা যায়, আবার সুইচ টিপে বন্ধ করা যায়।

একটি বিশেষ স্থান দিয়ে হাত দিয়ে সুইচ টিপল। খুলে গেল দরজা। গাড়ি নিয়ে ঢুকে গেল ভেতরে।

দরজা খোলাই থাকল। মনে করল, পরে এসে বন্ধ করে দিয়ে যাবে।

আহমদ মুসার গাড়ী, গাড়ী বারান্দায় প্রবেশের আগেই ফিলিপকে ছুটে আসতে দেখল।

গাড়ী বারান্দায় প্রবেশ করল আহমদ মুসার গাড়ী।

গাড়ী দাঁড়াতেই পাশে পাশে ছুটে আসা ফিলিপ গাড়ীর দরজা খুলে ফেলল।

বলল, ‘মুসাভাই আপনি ভাল আছেন তো?’

আহমদ মুসা গাড়ী থেকে নামতে নামতে বলল, ‘ভাল আছি ফিলিপ। তোমাদের সব ভালতো?’

গাড়ী থেকে নেমেই আহমদ মুসা দেখতে পেল মারিয়াকে। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। তার শান্ত দৃষ্টি আহমদ মুসার দিকে নিবদ্ধ।

‘সব ভাল, তবে মারিয়া আজ সারাদিন এই দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।’ বলল ফিলিপ।

‘ভাইয়া তুমি সত্য বলছ না।’ প্রতিবাদ করল মারিয়া।

‘ঠিক আছে, খাবার জন্যে একবার ওপরে উঠে গিয়েছিলি, তারপর দরজা থেকে মাঝে মাঝে গিয়ে ড্রইংরুমে বসেছিস, হলো তো? সত্য কথাই বললাম।’

মারিয়া আর কিছু বলল না।

ফিলিপ আহমদ মুসার একটা হাত ধরে টেনে ভেতরে নিয়ে চলল। মারিয়া আগেই ঢুকে গিয়েছিল ড্রইং রুমে।

আহমদ মুসার বাম ভ্রুর ওপর রক্ত শুকিয়ে থাকা ক্ষতচিহ্ন এবং মুখে শুকিয়ে থাকা রক্ত প্রথম দেখতে পেল মারিয়া। দেখেই বলে উঠল, ‘ভাইয়া তুমি দেখ, উনি আহত।’ আর্তনাদের মত শোনাল মারিয়ার কন্ঠ।

শুনেই ফিলিপ মুখ তুলল আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘ইস্‌ খুশিতে এদিকে খেয়ালই হয়নি। কপালটা সাংঘাতিক ফেটে গেছে। আসুন।’

বলে টেনে আহমদ মুসাকে ড্রইংরুমের শোফায় নিয়ে বসাল।

ক্ষতটা পরীক্ষা করে ফিলিপ বলল, মারিয়া তুই যা ফাষ্টএইড বক্স নিয়ে আয়, একটু পরে ডাক্তার ডাকব।

মারিয়া এক দৌঁড়ে ওপরে উঠে গেল।

মিনিট দুয়েকের মধ্যেই ফিরে এল মারিয়া, এক হাতে ফাষ্ট এইড বক্স, অন্য হাতে একটা পাত্র, তাতে পানি।

সিঁড়ি থেকে নেমে বাইরের দরজা বরাবর এসে খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে ‘ভাইয়া’ বলে চিৎকার করে উঠল মারিয়া। মরিয়া দেখল গাড়ী বারান্দা থেকে শিকারী বিড়ালের মত পা টিপে টিপে দরজার দিকে উঠে আসছে একজন লোক। তার হাতে উদ্যত রিভলভার।

আহমদ মুসা সোফায় বসেছিল। পাশের সোফায় বসে ফিলিপ মারিয়ার অপেক্ষা করছিল, আর কথা বলছিল আহমদ মুসার সাথে।

মারিয়ার চিৎকারে দু’জনই চমকে উঠে মারিয়ার দিকে চোখ ফেরাল। তারপর তাদের চোখ গিয়ে পড়ল দরজার ওপর। দরজায় উদ্যত রিভলভার হাতে দাঁড়ানো একজন লোক। ফেল্টহ্যাটে কপালটা ঢাকা থাকলেও জুবি জুরিটাকে চিনতে আহমদ মুসার অসুবিধা হলোনা।

দরজায় রিভলভার হাতে লোক দেখেই ফিলিপ বিদ্যুত গতিতে তার রিভলভার বের করল।

ফিলিপের হাতে রিভলভার উঠতে দেখে জুবি জুরিটার রিভলভার ধরা হাতটি একটু নড়ে স্থির হলো আহমদ মুসার লক্ষ্যে।

কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে একটুও কষ্ট হলো না মারিয়ার। সে হাত থেকে ফাষ্টএইড বক্স ও পানির পাত্র ছেড়ে দিয়ে পাগলের মত ছুটে গিয়ে আহমদ মুসাকে আড়াল করে দাঁড়াল। আর ঠিক সে সময়েই জুবি জুরিটার রিভলভার অগ্নি উৎগিরণ করল। গুলি গিয়ে বিদ্ধ হলো মারিয়ার বুকে। মারিয়া বুক চেপে ধরে উল্টে পড়ে গেল ঠিক আহমদ মুসার পায়ের ওপর।

জুবি জুরিটার রিভলভার গর্জন করার সাথে সাথেই ফিলিপের রিভলভার গর্জন করে উঠল। ফিলিপের গুলি গিয়ে বিদ্ধ করল জুবি জুরিটার বুক। জুবি জুরিটাও উল্টে পড়ে গেল দরজার ওপর।

ফিলিপ গুলি করার পরই উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘মুসা ভাই আপনি মারিয়াকে দেখুন। আমি বাইরেটা একটু দেখি, আরও কেউ থাকতে পারে।’

ফিলিপ ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল।

আহমদ মুসা সোফা থেকে নেমে মারিয়ার মাথা তুলে নিল। মারিয়ার চোখ তখন বোজা।

‘মারিয়া, মারিয়া।’ আহমদ মুসা ডাকল।

মারিয়া চোখ খুলল। তার চোখে আতংক নেই, সেখানে একটা প্রশান্তি।

ধীরে ধীরে বলল, ‘আপনি ভাল আছেন, আপনার গুলি লাগেনিতো?’

‘তুমি এ কি করলে, আমাকে বাঁচাতে গিয়ে...?’

কথা শেষ করতে পারলনা আহমদ মুসা। তার বাক রুদ্ধ হয়ে গেল।

ওপর থেকে সুমানো ও অন্যান্যরা এবং বাইরে থেকে ফিলিপ এসে মারিয়ার পাশে বসল। আতংক, উদ্বেগ, আকস্মিকতায় কথা বলতেও সবাই যেন ভুলে গেছে।

মারিয়া তখন আহমদ মুসাকে বলছিল, ‘এমন সুখের মৃত্যু, এমন তৃপ্তির মৃত্যু পৃথিবীতে কদাচিৎ দু’একজনের ভাগ্যে জোটে জনাব।’

মারিয়ার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। আহমদ মুসা দ্রুত ফিলিপকে বলল, 'চল একে হাসপাতালে নিতে হবে।'

ফিলিপ উঠে দাঁড়াল।

মারিয়া আবার চোখ খুলল। ক্ষীণ কন্ঠে বলল, 'ভাইয়া তুমি আমার পাশে বস। আমার সময় বেশী নেই।'

কেঁদে উঠল ফিলিপ।

কেঁদে উঠল সবাই, আহমদ মুসা ছাড়া।

বসল ফিলিপ মারিয়ার পাশে। বলল, 'এ কি হলো বোন তোর?'

মারিয়া চোখ টেনে টেনে ফিলিপের দিকে তাকাল, বাম হাতটা তুলতে চেষ্টা করল, পারলনা। ক্ষীণ কন্ঠে বলল, 'ভাইয়া তুমি সব সময় তোমার আদরের বোনের সুখ দেখতে চেয়েছ না? আজ আমার চেয়ে সুখি আর কেউ নেই। সমগ্র দুনিয়া তুমি দিলেও এত সুখ আমাকে দিতে পারতে না। তুমি হাস ভাইয়া, তোমার হাসি দেখে যেতে চাই।'

কান্নায় আবার ভেঙে পড়ল ফিলিপ।

মারিয়া তার মুখের কাছে বসা সুমানোর দিকে চোখ তুলে ঠোঁটে হাসি টেনে বলল, 'দেখ সুমানো আমি আর কাঁদছিনা, হাসছি তাই তোমার প্রশ্নের জবাবের আর কোন প্রয়োজন নেই।' আরও ক্ষীণ হয়ে উঠল মারিয়ার কন্ঠ।

তখনও আহমদ মুসার কোলে মারিয়ার মাথা।

মারিয়া চোখ তুলে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। টেনে টেনে ক্ষীণ কন্ঠে বলল, 'মুসলমান কি ভাবে হতে হয়?'

''এক আল্লাহকে স্বীকার করা এবং মুহাম্মদ (সঃ) কে শেষ রসূল হিসেবে মেনে নেয়া।'

'আমি স্বীকার করছি আল্লাহ এক, মুহাম্মদ তার রসূল।' ক্ষীণ কন্ঠে কাঁপা গলায় বলল মারিয়া।

এতক্ষণে আহমদ মুসার দু'চোখ থেকে নেমে এল দু'ফোটা অশ্রু। বলল, 'আমি আল্লাহর কাছে সাক্ষ্য দিব মারিয়া শেষ বিচারের সেই দিনে, তুমি আল্লাহর সত্য দ্বীন গ্রহণ করেছ।'

আবার ঠোঁট নড়ে উঠল মারিয়ার। তার চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'সেখানে আপনার সাথে দেখা হবে কি আমার?'

'আশা করা যায়।' কাঁপা গলায় বলল আহমদ মুসা।

চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল মারিয়ার। প্রশান্তিতে চোখ বুজল। আবার চোখ খুলল মারিয়া। আহমদ মুসার দিকে চেয়ে বলল-

'আমার পক্ষ থেকে মেইলিগুলি আপাকে একটা কথা বলবেন?' আহমদ মুসার চোখে চোখ রেখে ক্ষীণ অনুনয় জানাল মারিয়া।

'বল, কি কথা?'

'বলবেন, আমি খুব ভালোবেসেছি তাঁকে, জগতের মধ্যে সবচেয়ে সৌভাগ্যবতী নারী তিনি।'

আহমদ মুসার চোখের অশ্রু আবার সজীব হয়ে উঠল। বলল, 'বলব।'

একটু থেমে, একটা ঢোক গিলে আহমদ মুসা বলল, 'আমাকে তুমি মাফ করে দিও মারিয়া, আমি তোমার প্রতি কঠোর হয়েছিলাম।'

'না কঠোরতা নয়, আপনি ঠিক করেছিলেন। এ না করলে অন্যায় দাবির কাছে পরাজিতের মত আপনি সাধারণ হয়ে যেতেন। তাহলে আজকের জগতের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিকে ভালোবাসার বুক ভরা গৌরব নিয়ে আমি মরতে পারতাম না।'

মারিয়ার শেষ কথা গুলো টেনে টেনে বেরিয়ে এল, ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে মিলিয়ে গেল। সেই সাথে চোখ বুজে গেল তার। যেন গভীর এক প্রশান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল সে। যে ঘুম কোনদিন ভাঙবেনা।

আহমদ মুসা 'ইন্নালিল্লাহ' পড়ে মাথাটা অতি আস্তে নামিয়ে রাখল কার্পেটে।

ফিলিপ, সুমানো কেঁদে উঠে আছড়ে পড়ল মারিয়ার দেহের ওপর।

সুমানো চিৎকার করে বলল, আজ দুপুরে বলেছিলাম, জীবন থেকে তুই পালাতে পারবিনা। কিন্তু একদিনও তুই পার হতে দিলিনা। পালিয়ে গেলি এমন করে।

ফিলিপ শান্ত হলে আহমদ মুসা বলল, 'ফিলিপ আমি যখন ওদের অন্ধকূপ থেকে বেরিয়ে আসি, কোন গাড়ী অবশ্যই আমাকে ফলো করেনি। তাহলে জুবি জুরিটা এখানে এল কি করে?'

বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা। বলল, চলো তো গাড়ীটা একটু পরীক্ষা করি, আমার মনে হচ্ছে ওরা গাড়ীতে কোন ফাঁদ পেতে রেখেছিল।'

আহমদ মুসা ও ফিলিপ গিয়ে আহমদ মুসার গাড়ীর ভেতর বাহির তন্ন তন্ন করে খুজে দেখল। পেল তারা। গাড়ীর নিচে চেসিসের সাথে টেপ দিয়ে বাঁধা একটি স্বয়ংক্রিয় অয়্যারলেস ট্রান্সমিটার। সেটাই সংকেত দিয়ে ডেকে এনেছে জুবি জুরিটাকে।

অয়্যারলেসটাকে গাড়ী থেকে খুলে নিয়ে আহমদ মুসা ওটা বন্ধ করে দিল। বলল, গাড়ীটা যথাস্থানে থাকাটা আমার কাছে অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল। কিন্তু তখন এ নিয়ে ভাবার খেয়ালও হয়নি, সুযোগও ছিলনা। আসলে জুবি জুরিটা আমাদের ঠিকানা চিহ্নিত করার জন্যেই গাড়ীতে অয়্যারলেস পেতে রেখেছিল। সে নিশ্চিত ছিল আমার খোঁজে কেউ না কেউ যাবে এবং গাড়িটা পেয়ে গেলে নিয়ে আসবে। এ থেকে আরও একটা জিনিস বুঝা যায়, শুধু আমাকে নয়, আমার সাথে আরও যারা আছে তাদেরকেও তারা খুঁজে পেতে চায়।'

'কিন্তু জুবি জুরিটা একা এল কেন, আরও কেউ এখানে আসবে বলে মনে করেন?' চিন্তিত কন্ঠে বলল ফিলিপ।

'আমার মনে হয় জুবি জুরিটা প্রস্তুতি ছাড়াই তাড়াতাড়ি চলে এসেছে, খবর পেয়ে সম্ভবতঃ অফিস থেকে আসেনি। একারণেই তার সাথে কেউ আসতে পারেনি। আর তার এ মিশনের খবর অফিস অবশ্যই জানেনা। জানলে এতক্ষণ একটা দল এসে পড়ত। আর অয়্যারলেসের সংকেতের ব্যাপারটা মনে হয় জুবি জুরিটাই জানত শুধু। সুতরাং আর কেউ এখানে আসবে বলে মনে করিনা।'

একটু থেমে আহমদ মুসা আবার বলল, 'জুবি জুরিটার লাশটা সরিয়ে ফেলতে হবে। চল ওকে ওর হেডকোয়ার্টারের সামনেই রেখে আসি।'

'ঠিক বলেছেন।' বলে উঠল ফিলিপ।

জুবি জুরিটার লাশ রেখে যখন আহমদ মুসা ও ফিলিপ ফিরে এল, তখন রাত এগারটা। এসে দেখল, যিয়াদ বিন তারিক তার লোকজন সহ এসে গেছে। পরিকল্পনা ছিল রাত ১২টায় ভাসকুয়েজের হেডকোয়ার্টারে তারা যাবে, রাত তিনটায় তারা হানা দেবে। ফিলিপের লোকরা আবদুর রহমানের নেতৃত্বে ১২টার পর ওখানে জমায়েত হবে। আহমদ মুসার মুক্তি ও জুবি জুরিটার নিহত হওয়া যিয়াদের যে আনন্দ দিতে পারতো, মারিয়ার মৃত্যু তা হতে দিল না। সবাই বিষন্ন।

সবাই গোল হয়ে বসেছিল ড্রইংরুমে।

ফিলিপ বলল, 'মারিয়ার সৎকার কিভাবে হবে মুসা ভাই, সে তো মুসলমান হয়েছে।'

'তুমি আপত্তি না করলে মুসলিম হিসেবে তার দাফন হওয়া উচিত।' বলল আহমদ মুসা।

'আপত্তির প্রশ্নই ওঠেনা, মারিয়ার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা।'

'কিন্তু মারিয়ার কবর কিভাবে হবে। স্পেনে তো প্রকাশ্যে এটা হতে পারেনা, মাদ্রিদে তো নয়ই।'

'কিছু ভাববেন না মুসা ভাই, মারিয়া আমার এবং আমার পরিবারের সবচেয়ে আদরের। ওর কবর লা গ্রীনজায় আমার বাড়ীতে হবে। ও যাতে সব সময় আমার চোখের সামনে থাকে।'

অশ্রু গড়িয়ে এল ফিলিপের চোখ থেকে।

ফিলিপ কথা শেষ করেনি, বলছিল, 'জেরামা হ্রদের তীরে লা গ্রীনজা পার্বত্য নগরীকে মারিয়া অত্যন্ত ভালবাসত। সবচেয়ে ভালোবাসত লা-গ্রীনজার আমাদের বাড়ীটাকে। মারিয়া ওখানেই ঘুমিয়ে থাকবে।'

'ধন্যবাদ ফিলিপ, কিন্তু খৃষ্টান বাড়ীতে মুসলিম কবর নিয়ে কেউ কথা তুলবেনা তো?'

হাসল ফিলিপ। হাসিটা কান্নার মত। বলল, 'মারিয়া আমার আদরের বোন, চিন্তার সাথীও। কেউ আমরা কোন কথা গোপন করতাম না। আমার মনের কথাই মারিয়া আমার আগে বলে গেছে। আমার আর মারিয়ার পথ আলাদা নয়।'

আহমদ মুসার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। এগিয়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরল ফিলিপকে। বলল, ‘বলনি তো এতদিন ফিলিপ।’

‘মারিয়ার নিষেধ ছিল। ও বলেছিল একটা উপযুক্ত সময়ে দু’ভাই বোন মিলে আপনাকে ‘সারপ্রাইজ’ দেয়া হবে।’

‘সে কথা রেখেছে ফিলিপ।’ আহমদ মুসার কন্ঠ খুব ভারি শোনাল।

এই সময় ফিলিপের সহকারী আবদুর রহমান এবং বাস্ক গেরিলাদের অন্য কয়েকজন নেতা প্রবেশ করল ড্রইং রুমে।

ফিলিপ আহমদ মুসার বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে আবদুর রহমানকে প্রশ্ন করল, লা –গ্রীনজায় যাত্রার সব রেডি হয়েছে কি না।

আবদুর রহমান মাথা নেড়ে বলল, ‘সব রেডি।’

ফিলিপ আহমদ মুসার দিকে ফিরে বলল, ‘আপনি হুকুম দিন ভাইয়া, আমরা যাত্রা করি।’

‘চল’ বলল আহমদ মুসা।

সবাই উঠে দাঁড়াল।

# ২

মাদ্রিদের সেন্টপল গীর্জার দক্ষিণ পাশের বাগান। বাগানের একদম দক্ষিণ পাশে একটা গোলাপ ঝোপের আড়ালে একটা বেঞ্চিতে একা বসে আছে জেন। নির্জন এবং অন্ধকার জায়গাটা।

সূর্য ডুবে মাত্র অল্পক্ষণই হয়েছে, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন অনেক রাত। চারদিকের গাছপালা এবং ঝোপঝাড়ই সেখানে বাড়তি অন্ধকার সৃষ্টি করেছে।

অন্ধকারে জেনকে প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। কাল স্কার্টের ওপর কাল কোট পরেছে জেন। অন্ধকারের মধ্যে গোটা দেহটাই তার হারিয়ে গেছে শুধু শ্বেত স্বর্ণাভ মুখটি ছাড়া। কিন্তু মুখটি তার বড় বিষন্ন। ঠোঁট তার শুকনো। চোখ থেকে রাজ্যের উদ্বেগ যেন ঠিকরে পড়ছে।

মাদ্রিদের সবচেয়ে প্রাচীন ও বড় গীর্জা সেন্ট পল। গীর্জার চারদিক ঘেরা বিশাল বাগান। বাগানটাকে পার্ক বলাই ভালো। বাগানের মধ্যে জালের মত বিছানো রাস্তা। মাঝে মাঝে বেঞ্চি। বাগানে বেড়ানো যায়,বিশ্রাম করা যায়। যারা গীর্জায় প্রার্থনার জন্যে আসেন, যারা গীর্জার সান্নিধ্যে সময় কাটাতে চান কিংবা যারা দেখতে আসেন গীর্জা, তাদের জন্যেই এই ব্যবস্থা। গীর্জার গেট বন্ধ হওয়া পর্যন্ত সবার জন্যে খোলা থাকে এই বাগান। গীর্জার বাগান, তাই বোধহয় লোকজন সব সময় কম থাকে, একমাত্র রোববার ছাড়া।

সন্ধ্যার পর বাগানে সেদিন লোকজন নেই বললেই চলে। বিশেষ করে গীর্জার পেছনের অংশ-দক্ষিণ অংশে কেউ নেই একমাত্র জেন ছাড়া।

জেন বেঞ্চি থেকে মাঝে মাঝে উঠে পায়চারি করছে। আর বেঞ্চির পাশ দিয়ে উত্তরে এগিয়ে যাওয়া পথের দিকে তাকাচ্ছে বার বার।

জেন অপেক্ষা করছে জোয়ানের।

ইতালির ট্রিয়েস্ত থেকে আসার পর জেন-জোয়ানের মধ্যে আর দেখা হয়নি। জোয়ানের দেখা করতে আসার তো প্রশ্নই ওঠে না, জেনও ভয়ে জোয়ানের

ওদিকে পা তুলতে পারেনি। ইতালি থেকে আসার পর জেন ভয়, উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় মুষড়ে পড়েছে। তার উদ্বেগ জোয়ানের নিরাপত্তা নিয়ে, দুশ্চিন্তা জোয়ানদের ভবিষ্যত নিয়ে।

হান্নার মাধ্যমে জোয়ানের এই সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছে জেন। জায়গাটা জেনেরই সিলেকশন।

পায়চারি থামিয়ে হঠাৎ রাস্তার ওপর সোজা হয়ে দাঁড়াল জেন। গাছ ও ঝোপ-ঝাড়ের পাশ গলিয়ে একটা ছায়ামূর্তি এদিকে এগিয়ে আসছে। মুহূর্ত খানেক ওদিকে চেয়ে জেনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, জোয়ান আসছে।

জোয়ান এলো।

জেন দু'ধাপ সামনে এগিয়ে জোয়ানের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'উঃ এলে! পথ চেয়ে অপেক্ষা করা যে কত কঠিন।'

জেনের সাথে হ্যান্ডশেক না করে জোয়ান বলল, 'মাফ কর জেন, আমি এখন শুধু জোয়ান নই, মুসা আবদুল্লাহ। আমি মেয়েদের সাথে হ্যান্ডশেক করিনা এবং পারতপক্ষে মেয়েদের সাথে আগের মত মেলামেশাও করি না।'

'মাফ কর জোয়ান, আমি ভুলে গিয়েছিলাম।' বলল জেন।

'এস বসি' বলে জেন গিয়ে বেঞ্চিতে বসল।

জোয়ান গিয়ে বসল তার পাশে।

'অনেকক্ষণ থেকে বুঝি অপেক্ষা করছ তুমি? কষ্ট পেয়েছ না?'

'এমন কষ্টের সুযোগ যদি প্রতিদিন পেতাম!' ঠোঁটে হাসি টেনে বলল জেন।

'কেমন আছ?' জোয়ান বলল।

'কেমন আছি বলে তুমি মনে কর?'

জোয়ান তৎক্ষণাৎ কোন উত্তর দিল না। গম্ভীর হয়ে উঠল তার মুখ।

'জেন?' মুহূর্ত কয়েক পরে ডাকল জোয়ান।

'বল'।

'তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাবার সুযোগ আমার হয়নি'।

'কিসের কৃতজ্ঞতা?'

‘তুমি আমাকে নতুন জীবন দিয়েছ।’

‘তুমি একথা বলতে পার? তুমি না মুসলমান? জীবন মৃত্যু কি এককভাবে স্রষ্টা-আল্লাহর হাতে নয়?’

‘ঠিক বলেছ জেন, কিন্তু নিজের জীবন বিপন্ন করে যে অবিশ্বাস্য কাজ তুমি করেছ.........।’ কথা শেষ না করে থেমে গেল জোয়ান। তার কন্ঠ ভারি হয়ে উঠল।

‘বড় কিছু কি করেছি? তুমি হলে আমার জন্যে এটা করতে না?’

জবাব দিলনা জোয়ান। একটু নিরব থেকে বলল, ‘তোমাকে নিয়ে আমার খুব ভাবনা হয় জেন?’

‘কি ভাবনা?’

‘চরম বিপদগ্রস্ত এবং অনিশ্চিত একটা জীবনের সাথে তুমি নিজেকে জড়িয়েছ।’

‘হান্নাও একথা আমাকে বলে। কিন্তু আমার কি করার ছিল। তুমি ছিলে আমার চির প্রতিদ্বন্দ্বি। কিন্তু আমি কি জানতাম অজান্তে প্রতিদ্বন্দ্বির কাছে আমার সবকিছু হারিয়ে বসে আছি। যখন তোমার বিপদ এল, আমার অজানার অর্গল ভেঙে গেল। তারপর প্রবল স্রোতের এক ঘূর্ণি আমার জীবনকে মিশিয়ে দিল তোমার জীবনের সাথে।’ ভারী গলায় বলল জেন।

‘কিন্তু এর পরিণতি কি?’

‘পরিণতির চিন্তা আমি করিনা। ওটা আল্লাহর কাজ। আমি শুধু জানি, আমি কোন অন্যায় করিনি, কোন পাপ চিন্তাও কোনদিন আমার মধ্যে জাগেনি।’ আবেগ কম্পিত কন্ঠে বলল জেন।

জোয়ান কোন কথা বলল না।

জেন একটু থেকে আবার শুরু করল, ‘কেন তোমাকে ডেকেছি জান?’

‘জানি না’।

‘একটা অনুরোধ করার জন্যে’।

‘কি অনুরোধ?’

“আমার প্রথম অনুরোধ তুমি প্রকাশ্যে চলাফেরা করো না, দ্বিতীয় অনুরোধ, তুমি আপাতত মাদ্রিদ থেকে দূরে কোথাও সরে থাক।'

'কেন?'

'কেন বলছি তুমি জান। ট্রিয়েষ্টের হত্যাকান্ডের জন্যে, যাবতীয় তৎপরতার জন্য তোমাকে মধ্যমনি ভাবা হচ্ছে। সেই থেকে ওরা তোমার উপর ভীষন ক্ষেপে আছে। এই সেদিন কু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান অফিসে আহমদ মুসার হানা এবং কু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের অপারেশন কমান্ডার জুবিজুরিটার হত্যাকান্ডের জন্য তোমাকে কেন্দ্রবিন্দু ভাবা হচ্ছে। সব মিলিয়ে আহমদ মুসা যদিও তাদের এক নাম্বার টার্গেট, তবু তুমি এদেশীয় বলে তোমার উপর রাগ তাদের শতগুণ বেশী। যেমন করেই হোক তোমাকে ওরা ধরবে। অতএব তোমাকে সরে থাকতেই হবে।'

'জেন তুমি বল, মুসা ভাই ও অন্যান্যদের মাঠে রেখে আমি জীবনের ভয়ে সরে থাকতে পারি?'

'জানি আমি-তুমি একথা বলবে। কিন্তু আমার কথা হলো, তুমি একাজের লোক নও, তুমি বিজ্ঞানী, তুমি ভিন্ন জগতের মানুষ।'

'জোয়ান বিজ্ঞানী কিন্তু মুসা আবদুল্লাহ বিজ্ঞানী নয়।'

'তুমি তর্ক করবে জানি। কিন্তু আবার বলছি তোমাকে ছোটবেলা থেকে আমি জানি। তুমি মারামারি করা ও গোলাগুলি চালানোর লোক নও।

'হতে পারিনা? জেন তুমি জাননা, একজন মুসলমানকে একই সাথে গৃহী, পুলিশ ও সৈনিকের দায়িত্ব পালন করতে হয়। একজন মুসলমান যেমন সার্বক্ষণিক গৃহী, তেমনি সার্বক্ষণিক পুলিশ এবং সৈনিকও।'

'জোয়ান সবাই কি এক ফ্রণ্টে কাজ করে, কাজের বিভাগ কি থাকে না?'

'থাকতে পারে কিন্তু সে কার্য বিভাগের দায়িত্ব তো আমার নয়।'

'যদি এ বিষয়টা আমি আহমদ মুসা ভাইকে বলি ?'

'বলার আগে জেন তুমি কি আমার দিকটা চিন্তা করবেনা, শুধু মাত্র জীবন বাঁচানোর জন্যে সংগ্রামের ক্ষেত্র থেকে আমি চলে যেতে পারি? তুমি কি চলে যেতে পারতে?'

'জেন কোন উত্তর দিল না। কিন্তু চোখ ফেটে কান্না এলো। একটু পরে কান্না জড়িত কন্ঠে বলল, তোমার কি বিপদ তোমাকে বোঝাতে পারবোনা। ওদের কাছে তোমার ব্যাপারটা অন্যদের থেকে আলাদা।'

'জানি জেন। তোমার কথা আমি বুঝেছি। তোমার কথার গুরুত্ব দিচ্ছিনা তাও না। কিন্তু ওঁদের রেখে যে আমি যেতে পারি না। তুমি জান আমার জাতির ওপর কতবড় বিপদ। ওরা সকল মুসলিম ঐতিহাসিক স্থান এবং সকল গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ও সম্পদ ধ্বংসের জন্য গোপনে মাটির তলায় তেজস্ক্রিয় স্থাপন করেছে। এর ফলে মুসলিম ঐতিহাসিক স্থান ও কেন্দ্রগুলো আপনাতেই ধ্বসে পড়ার এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার মুসলমানরাও ঐ তেজস্ক্রিয়ের প্রভাবে চিরতরে পঙ্গু,তারপর ধ্বংস হয়ে যাবে। এ তেজস্ক্রিয়ের কোন প্রতিষেধক নেই। একমাত্র উপায় ঐ তেজস্ক্রিয় গুলো তুলে ফেলা। কিন্তু তেজস্ক্রিয় গুলো ডিটেক্ট করা সম্ভব নয়। সুতরাং তেজস্ক্রিয় স্থাপনের যে প্ল্যান ও মানচিত্র কু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের কাছে আছে তা উদ্বার করা গেলেই শুধু তেজস্ক্রিয় গুলো তুলে ফেলা যাবে। ট্রিয়েষ্ট থেকে ফিরে আহমেদ মুসা পাগলের মত খুঁজে ফিরছে সেই প্ল্যান ও মানচিত্র। সেদিন ভাসকুয়েজের অফিসে আহমদ মুসা হানা দিয়েছিল ঐ দু'টি দলিলের সন্ধানেই। তুমি জান সেই অভিযানে আহমদ মুসা ধরা পড়েছিল, আহত হয়েছিল এবং পরে মারিয়া জীবন দিয়েছে আহমদ মুসাকে রক্ষা করতে গিয়ে। যে গুলিটা আহমদ মুসার মাথা গুড়ো করত, সেই গুলি মারিয়ার বক্ষ বিদ্ধ করেছে। এই অবস্থায় বল জেন -তুমি চাইতে পার আমি কাপুরুষের মত মাঠ থেকে চলে যাই!'

জোয়ান কথা শেষ করার পরও জেন অনেকক্ষণ কথা বলল না। সব শুনে তার মুখ দিয়ে কথা সরছেনা। অনেকক্ষণ পর বলল, 'আমাকে মাফ কর জোয়ান, এত কিছু আমি জানতাম না, এত বড় জঘন্য ও ভয়াবহ ষড়যন্ত্র তারা করছে। এ ষড়যন্ত্র মুসলমানের বিরুদ্বে নয়, স্পেনের স্বার্থের বিরুদ্ধেও।'

একটু থামল জেন, তারপর আবার শুরু করল, 'তাহলে জোয়ান, আমার প্রথম অনুরোধের কথা বলছি, তুমি প্রকাশ্যে চলাফেরা করোনা। তুমি যদি ধরাই পড়ে যাও তাহলে কাজ করবে কি করে।'

'গোপনেই তো এখন চলাফেরা করছি।'

'আরেকটা অনুরোধ।'

'কি?'

'প্রকাশ্যে চলাফেরা করতে না পারার কারণে তোমার যা করতে অসুবিধা হয়, সে দায়িত্ব তুমি আমাকে দেবে এবং আরও যা করা দরকার তা আমাকে নির্দেশ দিবে।'

'তুমি করবে?' জোয়ানের চোখে মুখে আনন্দ।

'কেন তোমার কাজ কি আমার কাজ নয়?'

'যতখানি আমার কথা ভাব,তার একাংশ কি ভাব নিজের কথা?'

'ভাবি বলেই তো এত সাবধানতা। কোথায় এসে তোমার সাথে সাক্ষাৎ করি দেখনা। আমি ভাবেছিলাম কি জান, এই রাতে এই নির্জনে তুমি আসতেই চাইবে না।'

'চাইতাম না তুমি ছাড়া অন্য কেউ হলে।'

'ধন্যবাদ।'

'উঠতে বলছো?'

'কেন উঠতে মন চাইছে না?'

'তোমার চাইছে?'

'আবার দেখা হবে?'

'সেটা তোমার হাতে। আন্ডারগ্রাউন্ডে ঠেলে দিচ্ছ তো আমাকে।'

'ঠিক আছে আমার হাতেই থাকল। কিন্তু কথা রইল তুমি প্রকাশ্যে কোথাও বেরুবে না।'

'আহমদ মুসা ভাইয়ের জন্য কিছু বলবে না? জান ট্রিয়েষ্টে আমার রুমের দরজায় তুমি দু'জন সন্ত্রাসীকে হত্যা করে আমাকে বাঁচালে, তখন মুসা ভাই বলেছিলেন, এ কাজ একমাত্র জেনই করতে পারে।'

'কি করে উনি বললেন?' জেনের চোখ ভরা বিস্ময়।

'আমি জানি না, মনে হয় তার তৃতীয় একটা চোখ আছে, সেটা দিয়ে তিনি অদৃশ্য সবকিছু দেখতে পান।'

'জোয়ান, আমরা তাঁকে যত বড় বলে মনে করি, তার চেয়েও তিনি বড়।'

‘সেই সাথে সকলের মত স্পর্শকাতর একটা মন তাঁর আছে।’

'কেন একথা বলছ?'

'মারিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর মনটা খুব ভারি দেখছি।'

'স্বাভাবিক, মারিয়া তাঁর জন্যে জীবন দিয়েছে।'

'আরও কথা আছে।'

'কি কথা?'

'না, থাক জেন, অহেতুক আলোচনা এখন এটা।'

'মারিয়ার কথা বলতে চেয়েছিলে তো। আমি জানি মারিয়া একটা ভুল করেছিল। এই ভুল আহমদ মুসাকে কষ্ট দিয়েছে।'

'তুমি জানলে কি করে?'

'লা-গ্রীনজায় আমাদের পার্বত্য নিবাসটা ওদের পাশের টিলায়। ছোটবেলা থেকে ওর সাথে আমার পরিচয়। মাদ্রিদে এলে ও আমার সাথে দেখা করেই।'

'তাহলে তো সব জানই। কিন্তু বলত মারিয়ার ভুল কি স্বাভাবিক ছিল না?'

'ওদের পরিস্থিতি-প্রেক্ষাপট ভিন্ন ছিল, সেখানে অস্বাভাবিকটাও স্বাভাবিক হয়ে গেছে। তবে তোমাদের ইসলামী মূল্যবোধে এতবড় ভুলের কোন সুযোগ নেই, সেখানে আবেগের সাথে অবগতিও একটা শর্ত।'

'এ শর্ত কি তুমি আমার ক্ষেত্রে মেনেছিলে?'

'পুরোপুরি জানতাম তোমাকে আমি।'

'আমি মরিস্ক তা তো জানতে না।'

'তুমিও জানতে না।'

'যখন জানলে...?'

'তখন আর করার কিছু ছিল না।'

'কতকটা তোমার ভুলের মতই ছিল মারিয়ার ভুল।'

'রাত অনেক হয়েছে। তোমার সাথে তর্ক করার এখন আর নেই। তবে সমগ্র অন্তর দিয়ে আমি কামনা করি, মারিয়ার মত অমন পরম মৃত্যুর সুযোগ যদি আমারও হতো।' কন্ঠ ভারি শোনাল জেনের।

'যাও বাজে বকো না। চল উঠি।'

'বলে জোয়ান উঠে দাঁড়াল। তার সাথে জেনও।

জেনের আব্বা জেমেনিজ ডে সিসনারোসার লাইব্রেরী কক্ষ।

একটা বিশাল কক্ষের চারদিকে ঘোরানো র‍্যাকে ঠাসা বই। সব ধরনের বইয়ের একটি সুনির্ধারিত সংগ্রহ এ লাইব্রেরী।

জেন এবং জেনের আব্বা জেমেনিজ পাশাপাশি চেয়ারে বসে। জেনের সামনে খোলা বিজ্ঞান ম্যগাজিন 'নিউ ফিজিক্স'-এর সর্বশেষ সংখ্যা, আর জেমেনিজ পড়ছে চলতি সপ্তাহের 'টাইম ইন্টারন্যাশনাল'।

লাইব্রেরীটি এই কার্ডিনাল পরিবারের একটি মিলন কেন্দ্র। ঐতিহ্যগতভাবে পরিবারের সবাই মোটামুটি পড়ুয়া। তারা ড্রইংরুমে বসে গাল-গল্পে সময় কাটানোর চাইতে লাইব্রেরীতে বসে বই পড়তে ভালবাসে। এমনকি পারিবারিক গল্প-গুজব বেশিরভাগই তাদের লাইব্রেরীতে বসেই হয়।

জেমেনিজ ডে সিসনারোসা পড়তে পড়তে পত্রিকা থেকে মুখ তুলল। জেনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, এ সংখ্যা টাইম দেখেছ?'

‘না,আব্বা।' বই থেকে মুখ তুলে বলল জেন।

'ট্রিয়েষ্টের ঘটনার ওপর মজার একটা স্টোরি করেছে।'

'ট্রিয়েষ্টের ঘটনার ওপর? কি লিখেছে?' জেনের চেহারা ম্লান হয়ে উঠল।

'স্টোরির দুইটা অংশ। প্রথম অংশে পুলিশ এবং গবেষণাকেন্দ্রের সূত্রের বরাত দিয়ে লিখেছে, 'ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর থিয়োরিটিক্যাল ফিজিক্স'গবেষণা কেন্দ্রটি একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের অর্ডার পায়। যেদিন এ পরীক্ষণটি সম্পূর্ণ হয়, সেদিনই পরীক্ষণটি হারিয়ে যায়। সেই হারিয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করেই পরীক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিক নিহত হন এবং অন্যান্য হত্যাকান্ড ঘটে। পুলিশের মতে দুই পক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এই হত্যাকান্ড সমূহ ঘটেছে। পরীক্ষণের বিষয় কি ছিল তাও পুলিশ উদ্বার করতে পারেনি। কারণ

স্যাম্পুল, পরীক্ষণ রেজাল্ট ও কম্পিউটার ডিস্ক সবই চুরি হয়ে যায়। মনে করা হচ্ছে, পরীক্ষণের সাথে সংশিস্লষ্ট বৈজ্ঞানিকের যোগসাজশেই চুরির ঘটনা ঘটে। প্রতিদ্বন্দ্বী দু'টি পক্ষ পরীক্ষণের ফল হাত করতে গিয়েই ঐ হত্যাকান্ড সমূহ সংঘটিত হয়। যারা পরীক্ষণের অর্ডার দিয়েছিল, তাদের ও পরিচয় পাওয়া যায়নি। তাদের ঠিকানা যা গবেষণাকেন্দ্রে লিপিবদ্ধ আছে তা ভুয়া প্রমাণিত হয়েছে।

ষ্টোরির দ্বিতীয় অংশটাই মজার। অপ্রকাশযোগ্য বিশেষ সুত্রের বরাত দিয়ে এ অংশে বলা হয়েছে, ট্রিয়েষ্টে যা ঘটেছে তার গোড়া স্পেনে। স্পেন ঘিরে একটা ষড়যন্ত্র দানা বেঁধে উঠেছে। এই ষড়যন্ত্রের মধ্যমনি হিসাবে কাজ করছেন আহমদ মুসা। মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যায়ের কৃতি ছাত্র জোয়ান ফার্ডিন্যান্ড এবং স্পেনের মরিস্করা তার সহযোগী হিসাবে কাজ করছে।'

জেনের মনে ভয় ও শংকার চেয়ে বিস্ময়ের সৃষ্টি হলো বেশী। এ ধরনের উল্টো ষ্টোরি টাইম ইন্টারন্যাশনালে'র মত একটা পত্রিকা করতে পারল। কারা ষড়যন্ত্র করছে, আর ষড়যন্ত্রের দায় চাপাচ্ছে কার ঘাড়ে।

জেন তার আব্বা বলা শেষ করলে বলল, 'কিন্তু আব্বা তুমিও জান, আমিও জানি, জোয়ান একজন পিওর একাডেমিশিয়ান। ছোটবেলা থেকেই পড়া শুনার বাইরে আর কোন কিছুতে আগ্রহ নেই। দেশের বিরুদ্ধে সে কোন ষড়যন্ত্র করতে পারে তুমি বিশ্বাস কর?'

'তুমি আগের জোয়ানের কথা বলছ মা। এখনকার জোয়ান আর আগের সেই জোয়ান এক নয়। নিজের মরিস্ক পরিচয় জানার পর সে ভিন্ন মানুষ হয়ে গেছে। মুসলমানদের তুমি জান না। সময় বদলায়, মুসলমানরা বদলায় না। মুসলমানরা তাদের ঈমান নষ্ট করে না।'

'কিন্তু আব্বা স্পেনে মরিস্কদের পূর্ব পুরুষ মুসলমান ছিল। এখন মুসমানিত্বের কি অবশিষ্ট আছে তাদের? নামটাও তো নেই।'

'বাইরে থেকে দেখলে এমনই মনে হয় মা। কিন্তু ওদের মনে উঁকি দিলে দেখবে, চিন্তা-চেতনার দিক দিয়ে ওরা মুসলমানই রয়ে গেছে।'

'কেউ যদি মনে মনে তার বিশ্বাস লালন করতে চায়, তাহলে ক্ষতি কি? স্পেনে মরিস্করা কয়জন? ওরা যদি পুরোপুরি মুসলিম হিসাবেও জিন্দেগী যাপন করে, তাহলে কি আর ক্ষতি করতে পারবে স্পেনের?'

'ইসলাম সংক্রামক ব্যাধি, আর মুসলমান সে ব্যাধির দক্ষ জীবানুবাহী। ওদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিলে অল্প দিনেই দেশের সকল মানুষকে মুসলমান বানিয়ে ছাড়বে।'

'কি ভাবে?'

'বললাম না ইসলাম সংক্রামক ব্যাধির মত। ওদের একটা সম্মোহনী শক্তি আছে, তার ওপর স্পেনের সাধারণ লোকদের মধ্যে স্পেনের মুসলিম শাসনকালের প্রতি একটা বিরাট মোহ আছে। তারা মনে করে, স্পেন থেকে মুসলিম শাসন চলে যাবার পরই, স্পেন ইউরোপে তার নেতৃত্ব হারিয়েছে। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সভ্যতা, কৃষি, বাণিজ্য সবদিক দিয়েই স্পেন পিছিয়ে গেছে। মুসলিম শাসন ছিল স্পেনের সৌভাগ্যের প্রতীক।'

'কথাটা কি মিথ্যা? আব্বা?

'মিথ্যা নয় বলেই তো মুসলমানদের নাম আমরা স্পেনে রাখতে চাই না।'

'তাহলে বল দোষটা জোয়ানের ওপর চাপাচ্ছ কেন ষড়যন্ত্র তো তাহলে ওরা করছে না?'

'না মা ষড়যন্ত্র ওরা করছে। না হলে আহমদ মুসা স্পেনে এসেছে কেন? তাঁর মত লোক, কোন বড় মিশন না নিয়ে কোথাও যায়না।'

'কি ধরনের ষড়যন্ত্র তারা করছে বলে মনে কর আব্বা?'

'ঐতো, তাদের মতলব কি, ষড়যন্ত্রের স্বরূপ কি, সেটারই তো আমরা সন্ধান করছি।'

'ষড়যন্ত্রই যখন এখনও চিহ্নিত হয়নি, তখন ওদেরকে ষড়যন্ত্রকারী বলে ফেলা কি ঠিক আব্বা?'

'অনেক ব্যাপার আছে, তুমি সব বুঝবে না।'

‘আব্বা, পারস্পরিক অনাস্থা, অবিশ্বাস ভূলে গিয়ে দেশের মানুষ আমরা সবাই কি এক হতে পারি না? কেউ যদি দেশের আইনের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করে, তাকে দেশের হাতে সোপর্দ করতে পারি।'

‘তুমি ছোট, সব জান না। যেমন তুমি সরল, দুনিয়াটা তেমন সরল নয় মা!’

'ঠিক এই সময়ই পাশের ইন্টারকম কথা বলে উঠল। রিসেপশন থেকে কথা বলছে। বলল, 'মিঃ ভাসকুয়েজ এসেছেন।'

জেমেনিজ চট করে ঘড়ির দিকে তাকাল। বলল, 'ভুলেই গিয়েছিলাম ভাসকুয়েজ আসার কথা।'

তারপর জেমেনিজ রিসেপশনকে বলল, 'লাইব্রেরীতে পাঠিযে দাও।'

আধ মিনিটের মধ্যেই ভাসকুয়েজ 'শুভ বিকেল' জানাল জেমেনিজকে।

'শুভ বিকেল' কেমন আছেন মিঃ ভাসকুয়েজ?'

জেনও উঠে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানাল মিঃ ভাসকুয়েজকে।

জেমেনিজও উঠে দাঁড়িয়েছিল।

ভাসকুয়েজের সাথে হ্যান্ডশেক করে জেমেনিজ ঘরের ওপাশে একটা টেবিল দেখিয়ে বলল, ‘চল আমরা ঘরের ওখানে বসি।’

জেমেনিজ ও ভাসকুয়েজ অল্প দূরে বিপরীত দিকের একটা টেবিলে গিয়ে বসল।

লাইব্রেরী ঘরের পাশেই জেমেনিজের খাস বৈঠক খানা। সম্ভবত জেমেনিজ লাইব্রেরীতে বসেছিল বলে সেখান থেকে আর বেরুতে চাইল না।'

জেমেনিজ সামনের চেয়ারে আসন নেয়ার পর, ভাসকুয়েজ বাঁকা চোখে একবার জেনের দিকে তাকিয়ে তার কথা শুরু করল, 'জরুরী একটা ব্যাপার নিয়ে এসেছি।'

ভাসকুয়েজকে নিয়ে তার আব্বাকে এ ঘরেই বসতে দেখে জেন অস্বাভাবিক বোধ করছিল। চলে যাবে কি না ভাবছিল, এই সময় ভাসকুয়েজের ‘জরুরী একটা ব্যাপার নিয়ে এসেছি’ কথাটা কানে গেল জেনের। জরুরী কথাটা কি? জোয়ানদের কথা নয়তো? জেন আগ্রহী হয়ে উঠল।

চোখটা ম্যাগাজিনের পাতায় নিবদ্ধ রেখে কানটাকে উৎকর্ণ রাখল জেন ভাসকুয়েজের দিকে।

'জরুরী তাতো বুঝতেই পারছি।' ভাসকুয়েজের কথার উত্তরে বলল জেমেনিজ।

একটু থেমে জেমেনিজই আবার প্রশ্ন করল, 'জুবিজুরিটাকে কোথায় হত্যা করল জানা গেছে?'

'না জানা যায় নি।'

'জুবি জারিটার গড়ীর সন্ধান পাওয়া যায়নি?'

'পাওয়া গেছে একটা নাইট ক্লাবের সামনে।'

'গাড়ীতে জুবিজুরিটি ছাড়া আর কারো হাতের ছাপ আছে?'

'না।'

'নাইট ক্লাব অর্থাৎ নারী ঘটিত কোন ব্যাপার নেইতো জুবিজুরিটার হত্যার পেছনে?'

'না স্যার।' প্রবল ভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল ভাসকুয়েজ। আরো বলল সে, 'অফিস থেকে টেলিফোন পেয়ে সে বেরিয়েছে। অফিসকে সে জানিয়েছে, আমি ওকে ফলো করছি, পালাতে পারবে না। আমি তোমাদের জানাব। সুতরাং নির্ঘাত আহমদ মুসাকেই সে ফলো করেছিল।'

'আছা বলত, ডেভিলের মত রোবটকে ফাঁকি দিয়ে আহমদ মুসা পালাল কি করে?'

'সে ধড়িবাজের শিরোমনি স্যার, তার বুদ্ধির শেষ নেই।'

'আচ্ছা শাহ ফয়সল মসজিদ কমপ্লেক্স পাহারা দিয়ে সব কটিকেই তো ধরা যায়।'

'পাহারা বসিয়েছি কিন্তু কোন কাক পক্ষী ওদিকে যায়নি।'

'আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না, তেজস্ক্রিয় ক্যাপসুলের ব্যাপারটা ওদের কাছে ধরা পড়ল কি করে? অত্যন্ত সুপার সিক্রেট ব্যাপার ছিল এটা। কোনও ভাবে এটা ডিটেকটেবলও নয়। জানল কেমন করে ওরা?' কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেনি তো?'

'না স্যার সেরকম কিছু সম্ভব নয়। শীর্ষ পর্যায়ের আমরা কয়েকজন ছাড়া আর কেই জানে না। যে ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে আমরা তেজস্ক্রিয় ক্যাপসুল গুলো পেতেছি, সেও জানে না। সে জানত ওগুলো প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষনার কোন ব্যাপার। তাছাড়া সে ইঞ্জিনিয়ার বেঁচে নেই।'

'তাহলে ওদের জানার রহস্য কি?'

'স্যার আহমদ মুসা সব পারে, সে যাদু জানে।'

'যাদু জানে বলছ কি তুমি?'

যাদুর মতই ব্যাপারটা স্যার। যুগোশস্লাভিয়া, ককেশাস ও মধ্য এশিয়া থেকে আমরা খবর নিয়েছি তার ভিন্ন একটা চোখ আছে। যা আমরা দেখি না, তাও সে দেখে।'

'ভাসকুয়েজ আমি পড়েছি, সব খাঁটি মুসলমানরাই নাকি ওরকম। অনেক অলৌকিক কাজ তারা করতে পারে। ওটাকে ওরা বলে আল্লাহর সাহায্য।'

'ঠিক বলেছেন স্যার, চরম বিপদের মধ্যেও তারা হাসতে পারে নাকি এই কারণেই। আমারও না দেখলে বিশ্বাস হতো না। আহমদ মুসা বন্দী হলো কয়েকবার আমাদের হাতে। মৃত্যুর মুখোমুখি তাকে দাড়াতে হয়েছে। কিন্তু তাকে সামান্য চিন্তিত হতেও দেখা যায় নি।'

'এখানেই তো আমাদের বিপদ ভাসকুয়েজ, সব মুসলমান যদি যদি খাঁটি মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে জগতের কোন শক্তিই তাদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না।'

'এটা যাতে না ঘটে তারই তো চেষ্টা হচ্ছে স্যার সব জায়গায়। স্পেন থেকে ওদের আমরা নিশ্চিহ্ন করবই।'

'এখন বল তোমার নিশ্চিহ্ন করার কাজ কতদূর? তোমার আজকের জরুরী বিষয়টা কি?'

'বলছি স্যার' শুরু করল ভাসকুয়েজ, 'স্যার ওরা হন্যে হয়ে খুজছে তেজস্ক্রিয় ক্যাপসুল স্থাপনের প্ল্যান ও ডায়াগ্রাম। আহমদ মুসা সেদিন আমার অফিসে হানা দিয়েছিল এর খোঁজে।'

'তাই কি করে বুঝলে?' চোখ দুটি বড় করে নড়ে চড়ে বসে প্রশ্ন করল জেমেনিজ।

'কম্পিউটার পরীক্ষা করে জানা গেছে। কম্পিউটারের সাবজেক্ট ফাইল থেকে সে ঐ সংক্রান্ত ফাইলটিই বের করেছে।'

কি করে জানলো অমন ফাইল ওখানে আছে?

'বলেছি না স্যার আহমদ মুসা বাতাস থেকে গন্ধ পায়!'

'কিন্তু ভাসকুয়েজ, এবার সে বাতাস থেকে গন্ধ পায়নি। এবার সে ব্যর্থ হয়েছে।'

'একেবারে ব্যর্থ সে হয়নি। কম্প্যুটারের সে ফাইলে তেজস্ক্রিয় ক্যাপসুল স্থাপনের প্ল্যান ও ডায়াগ্রাম ছিল না বটে, কিন্তু কোথায় থাকতে পারে তার একটা ক্লু সে পেয়ে গেছে। এই বিষয়টাই আমি আপনাকে জানাতে এসেছি স্যার।'

'কি বলছ তুমি?'

'জি স্যার, ফাইলে বলা আছে 'ডকুমেন্ট 'Elder' এর কাছে নিরাপদ।'

'Elder' থেকে তারা কি বুঝবে'

'কি বুঝবে বলা মুশকিল, তবে 'Elder' এর সন্ধান তারা করবে এটা নিশ্চিত।'

'আমাদের করণীয় সম্পর্কে কি বলতে চাচ্ছ?'

'আপনার এখন সাবধান হওয়া দরকার।'

'কেমন সাবধান, চলা পেরার ব্যাপারে?'

'সেটা বোধহয় দরকার হবে না। একটা প্রশংসা ওদের করতে হয়। চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি না হলে শত্রুকে ওরা চোরাগোপ্তা হামলা করে না।'

'তাহলে কি সাবধানের কথা বলছ?'

'আপনার বাসার নিরাপত্তার কথা ভাবছি, এখানে পাহারার জন্যে লোক বসাব কিনা চিন্তা করছি।'

'ও বুঝেছি ঐ কারণে।' বলে একটু থামল জেমেনিজ। তারপর আবার শুরু করল, 'তার চেয়ে ভাসকুয়েজ ডকুমেন্টটা আমার বাসা থেকে সরিয়ে নাও না'।

ম্যাগাজিনে জেনের চোখটা আটকা থাকলেও সমস্ত মনযোগ একত্রিত করে উৎকর্ণ হয়ে শুনছিল তাঁর আব্বার সাথে ভাসকুয়েজের আলাপ। ‘ডকুমেন্টটা আমার বাসা থেকে সরিয়ে নাও না' কথাটা জেনের কানে পৌছাতেই বিদ্যুত চমকিত হলো তার শরীর। যে ডকুমেন্টটা আহমদ সুসা জোয়ানরা পাগলের মত খুঁজছে সেটা তাদের বাসায়। আনন্দ উত্তেজনা- শংকায় জেনের বুকে যেন কাঁপন ধরে গেল। কিন্তু কান সে পেতে রাখল সেই কথোপকথনের দিকে।

'কোথায় নেব, অফিস আর নিরাপদ নয়। আমাদের বাসা তো ওদের শ্যোন দৃষ্টির মধ্যে।' জেমেনিজের প্রস্তাবের উত্তরে বলল ভাসকুয়েজ।

'ওগুলোর কাজ তো শেষ। এখন পুড়িয়ে ফেললে হয় না ওগুলো?'

'না, স্যার ওগুলোর সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরী। টার্গেট ধ্বংসের কাজ যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন ওগুলোকে তুলে ফেলতে হবে। না হলে ওর কার্যকারিতা চলতেই থাকবে, যা ছড়িয়ে পড়বে গোটা এলাকায়। সংশ্লিষ্ট এলাকায় যা পাবে তাকেই ঠেলে দেবে ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে।'

'সাংঘাতিক, তাহলে তো ওগুলো ভীষণ জরুরী।'

'ঠিক স্যার।'

‘তাহলে?'

'কার্ডিনাল পরিবারের আশ্রয়ের চেয়ে নিরাপদ স্থান স্পেনে আর নেই স্যার।'

'এই প্রশংসায় খুশি হলো জেমেনিজ। তার পূর্ব পুরুষ কার্ডিনাল ফ্রান্সিস জেমেনিজ ডে সিসনারোসা ছিলেন স্পেনের প্রতিষ্ঠাতা রাজা ফার্ডিন্যান্ড এবং রাণী ইসাবেলার ধর্মীয় ও রাজনৈতিক গুরু। স্পেনে খৃষ্টান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও তার সংহত করণে তার অমূল্য অবদান রয়েছে। এই জন্যে কার্ডিনাল পরিবার এখনও গোটা স্পেনের খৃষ্টান মহলে অত্যন্ত সম্মানিত। এই পরিবারের মত সম্মান স্পেনের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীরাও পান না। এখনও রাস্তা-ঘাটে বাজারে কার্ডিনাল পরিবারের কাউকে দেখলে মানুষ দাঁড়িয়ে যায়।

প্রশংসায় মুগ্ধ জেমেনিজ বলল, 'ঠিক আছে ভাসকুয়েজ, তাহলে এটা এখানে থাক।'

'চিন্তা নেই স্যার, ওগুলো আপনার এখানে একটা নিরাপদ ব্যবস্থায় রয়েছে। তাছাড়া আপনাদের ভূগর্ভস্থ কক্ষ। নিজেই সিন্ধুকের মত দুর্ভেদ্য। তার ওপর আমরা চোখ রাখব। কারও চোখ এদিকে পড়বে বলে মনে করি না।'

'না ভাসকুয়েজ, কোন প্রহরী আমি চাই না। মানুষ কি বরবে। কার্ডিনাল পরিবারের নিরাপত্তার জন্যে কোন সময়ই প্রহরী বসান হয়নি।'

'ঠিক আছে স্যার। তাহলে এখন উঠি।'

'ওদিকে জেনের ভেতরটা থর থর করে কাঁপছে। তাদের ভূগর্ভস্থ কক্ষে আছে ঐ ডকুমেন্ট!

ভাসকুয়েজের উঠার কথায় শংকিত হয়ে উঠল জেন। ওকে বিদায় দিতে হবে, তার আব্বার সাথে কথা বলতে হবে। জেনের মুখ দেখলে নিশ্চয় ওদের অভিজ্ঞ চোখ সবকিছু ধরে ফেলবে। কিছুতেই মনকে সে স্বাভাবিক করতে পারছে না।

অপ্রত্যাশিত ভাবে একটি সুযোগ জেনের জুটে গেল।

ভাসকুয়েজের উঠার কথায় জেমেনিজ বলল, মুখে কিছু না দিয়ে যাবে কি করে? বলে জেমেনিজ উঠে ইন্টারকমের দিকে এগিয়ে এল। এই সময় জেন তাড়াতাড়ি উঠে দাড়িয়ে বলল, ‘আমি যাচ্ছি আব্বা, পাঠিয়ে দিচ্ছি নাস্তা।’

বলে জেন মুখ নিচু রেখেই ছুটল।

বাইরে বেরিয়ে গেল জেন। আল্লার শুকরিয়া আদায় করল সে। আল্লাহ তাকে একটা নাজুক অবস্থার থেকে উদ্ধার করেছেন।

অনেক ভেবেই জেন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বিষয়টা জোয়ানদের জানাবে না। ওরা যদি বিষয়টার সাথে জড়িত হয়, ডকুমেন্ট উদ্ধারের জন্যে ওরা জেনদের বাড়ীতে অভিযান চালায় বাইরে থেকে এসে, তাহলে তাদের বাড়ীতে বড় ধরনের ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তার চেয়ে জেন একাই চেষ্টা করবে। সফল না হবার কোন কারণ সে দেখে না। তার নিজের বাড়ীর একটা জিনিস সে সরিয়ে ফেলতে পারবে না কেন?

এই সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে তার পিতার দিকটা এবং পরিবারের দায়িত্বের প্রশ্ন তাকে কিছুটা দোটানায় ফেলে দিল। সে কার্ডিনাল পরিবারের মেয়ে। আজ তার দেশ স্পেন যে রাষ্ট্রীয় বুনিয়াদের ওপর দাঁড়িয়ে, সে বুনিয়াদ তার পূর্ব পুরুষের হাতে গড়া। তার ওপর এই বুনিয়াদকে পাকাপোক্ত করার জন্যে সে সংগঠন কাজ করছে সেই কু-ক্ল্যাস্ক-ক্ল্যান –এর উপদেষ্টা তার আব্বা। সুতরাং তেজস্ক্রিয় ক্যাপসুল স্থাপনের প্ল্যান ও ডায়াগ্রাম জোয়ানদের হাতে পাচার করে তাদের সাহায্য করার অর্থ হবে তার পিতা, তার পরিবার এবং রাষ্টীয় বুনিয়াদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা।

কিন্তু এই যুক্তি জেনের মনে বেশীক্ষণ টিকেনি। জেনের বিবেক এই যুক্তির বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠে বলেছে, কোন অন্যায় সে করছে না, বরং অতি জঘন্য ও সর্বনাশা এক অন্যায়ের প্রতিবিধানই করতে যাচ্ছে। তার পিতা এবং তার পিতার সংগঠন একটা জাতি শুধু নয়, তার দেশের ঐতিহাসিক সম্পদের বিরুদ্ধেও এক হিংসাত্মক ও ধ্বসাত্মক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে। এর প্রতিবাদ করা, একে বানচাল করার চেষ্টা করা মানুষ হিসেবেও তার নৈতিক দায়িত্ব। তাছাড়া সে শুধু মানুষ নয়, সে জেন। জোয়ানকে সে সর্বস্ব দিয়ে সাহায্য করতে চেয়েছে।

সিদ্ধান্ত নেবার পর জেন একটা অসুবিধা অনুভব করতে লাগল। সর্বক্ষণ তার মনে হতে লাগল এই বুঝি তার মনের কথা সবাই জেনে ফেলল, ধরা পড়ে গেল বুঝি সে। বাপ, মা সহ বাড়ীর লোকদের চোখের দিকে তাকাতে তার ভয় হতে লাগল। তার মনে হতে লাগল তার চোখ দেখে সবাই তাকে বুঝে ফেলবে। আগের মত সবার সাথে সে মন খুলে কথা বলতে পারে না। মনে হয় তাদের সাথে

তার কত ব্যবধান। এই অবস্থায় শুয়ে শুয়ে অথবা পড়ার টেবিলে বসে সময় কাটাতে লাগল সে।

সেদিন শুয়ে আছে জেন। বাম হাতটা তার কপালে। চোখ দু'টি তার বোজা।

জেনের মা ঘরে ঢুকল। জেনের খাটের পাশে এসে কিছুক্ষণ দাড়াল। তার চোধ দু'টি নিবদ্ধ জেনের মুখে। জেনের মুখ ম্লান, ঠোঁট শুকনো। জেনের মা চিন্তিত মুখেই জেনের ঘরে প্রবেশ করেছে। তার চোখে দুশ্চিন্তার ছাপ।

ধীরে ধীরে গিয়ে জেনের মা জেনের মাথার পাশে বসল।

সাড়া পেয়েই চোখ খুলল জেন।

'আম্মা তুমি' বলে সে উঠে বসতে গেল।

তার মা তাক হাত দিয়ে আটকে আবার শুইয়ে দিল। বলল, ‘শুয়ে থাক মা, আমি মাথায় হাত বলিয়ে দেই।’

'আহা, আম্মা আমি ছোট নাকি যে, আমার মাথায় হাত বুলিয়ে আমাকে ঘুমিয়ে দেবে?'

'খুব বড় হয়েছ না? তাই বুঝি মাকে কোন কথা কোন চিন্তার ভাগ দাওনা?'

মায়ের কথায় চমকে উঠল জেন। মা সব বুঝে ফেলল নাকি। মায়ের দিকে না তাকিয়েই একটু শাস্ত গলায় বলল, 'তুমি কি বলছ আম্মা, আমি কোন চিন্তার ভাগ দেইনা?'

জেনের মা তার মাথায় হাত বুলাচ্ছিল। বলল, ‘মায়ের চোখ ফাঁকি দেয়া যায় না জেন। অনেক দিন থেকে বিশেষ করে গত কয়েকদিন থেকে তোমাকে অত্যন্ত মন মরা দেখছি। সেই হাসি নেই, উচ্ছলতা নেই। কথাও তেমন বল না কারো সাথে। দেখলে মনে হয় পালিয়ে বেড়াচ্ছ। ক'দিন থেকেই বুঝছি, বড় একটা কিছু হয়েছে বা ঘটেছে। কি ঘটেছে মা?'

মনে মনে শংকিত হলো জেন। মায়ের আদরে, স্নেহ মাখা নরম কথায় তার মনটা ভিজে উঠল। জেন বলল, ‘সত্যি আমার তেমন কিছু ঘটেনি মা। এমনি শরীরটা ভালো যাচ্ছে না।’

'জেন তোমার অসুখ হলে মুখ দেখলেই আমি বুঝি, তোমার শরীর খারাপ হয়নি। আমি তোমার মন খারাপ দেখছি।'

জেনের মা থামল।'

জেন নিরব। কি উত্তর দেবে মায়ের কথার। সত্যিই মায়ের চোখ ফাকি দেয়া যায় না। পাকি সে দিতে পারেনি। এখন মাকে সে কি বলে বোছাবে। কোন কথাই তার মুখে এল না। চোখ বুজল সে।

জেনের মা একটু মাথা নিচু করল। তার কপালে চুমু খেল। বলল, মা জেন তুমি আমার একমাত্র সন্তান। তোমার মলিন মুখ যে আমি সইতে পারি না। আমি বুঝতে পারছি তুমি কষ্ট পাচ্ছ। তোমার এ কষ্ট যে আমাকে কষ্ট দেয় তোমার চেয়ে বেশী।

জেনের চোখ ফেটে অশ্রু নেমে এল। মাথা তুলে মায়ের কোলে মুখ গুজল। বলল, আম্মাগো, তুমি চিন্তা করো না, কষ্ট পেয়ো না। আমি মানুষ, মানুষের জীবনে কিছু চিন্তা ভাবনা, দুঃখ কষ্ট থাকেই।

তার মা তৎক্ষনাৎ কিছু বলল না। জেনের মাথায় তখনও তার মা হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। দৃষ্টিটা তার উদাস। তার উদাস, শূণ্য দৃষ্টিটা দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেছে। এক সময় সে ধীরে ধীরে বলল, তুমি তোমার বাপের মত হয়েছ। একটা কথা বললে তা থেকে আর নড় চড় নেই।'

একটু থামল জেনের মা। থেমেই আবার শুরু করলো, 'সোনার টুকরো ছেলে জোয়ান। তোদের দু'জন কে ঘিরে আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম। সে স্বপ্ন নির্মম ভাবে ভেঙে গেল।'

জেন মুখ তুলে মায়ের দিকে একবার চাইল। দেখল মায়ের বেদনা পাংশু মুখ এবং শূণ্য দৃষ্টি। জেনের ভিতরের বিস্ময় ও আনন্দের একটা শিহরন। তার মাও ভেবেছে তাদের নিয়ে।

মায়ের কোলে আবার মাথা রেখে জেন বলল, 'মাগো, তুমি সত্যিকার মা। কিন্তু আম্মা, স্বপ্নটা ভেঙে গেল কেন?'

'সব স্বপ্ন সব সময় সফল হয় না, চাওয়ার সাথে পাওয়া সব সময় মেলে না'।

‘এই না মেলানোর অংকটা যদি গায়ের জোরে হয়, চাপিয়ে দেয়া হয়, অন্যায় হয়, তাহলেও কি সান্তনা নিতে হবে?’

‘অনেক সময় নিতে হয় মা। সবাইকে নিয়ে সমাজকে নিয়েই তো আমরা!’

‘অনেক নিতে পারে, কিন্তু সবাই তা নাও পারে।’

জেনের মা তার শূন্য চোখটা ফিরিয়ে আনলো বাইরে থেকে। তাকাল জেনের দিকে। জেনের মাথাটা বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলল, ‘মা আমার, এমন কথা বল না। অনেক অংক আছে, কোনদিনই মেলানো যায়না।’

জেন কোন কথা বলল না।

জেনের মা জেনের মুখ ঘুরিয়ে তার দিকে নিল। বলল, ‘ক’দিন থেকে তোমার মুখে হাসি দেখিনি। একটু হাস মা।’

জেন হাসতে চেষ্টা করল। হাসিটা তার কান্নার চেয়েও করুণ দেখাল।

জেনের মা মেয়ের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। বলল, ‘এত ব্যথা তোর বুকে, অথচ আমাকে কেন জানাস নি এতদিন?’ ভারি কাঁপা কণ্ঠস্বর জেনের মার।

জেনের চোখ ভরে উঠেছিল অশ্রুতে। তাড়াতাড়ি মুছে বলল, ‘আম্মা তুমি চিন্তা করো না, কষ্ট পেয়ো না আম্মা। আমাকে তুমি আমার উপর ছেড়ে দাও।’

‘কোন বাপ মা তা পারে বুঝি! যখন মা হবে...’

এই সময় পরিচারিকা দড়জায় এসে দাঁড়াল। বলল, ‘সাহেবের টেলিফোন মেম সাব।’

জেনের মা জেনের কপালে চুমু খেয়ে তাকে কোল থেকে নামিয়ে রেখে বলল, আসি মা, দেখি ওদিকে।

চলে গেল জেনের মা।

মায়ের সাথে কথা বলে, মাকে কিছু কথা বলতে পেরে অনেকটা হালকা অনুভব করছে জেন। ভালোই হলো, জোয়ানের সাথে তার ব্যাপারটা অন্তত তার মা জানে।

মন হালকা হওয়ার সাথে জেন আশংকাও অনুভব করল। তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে, বেশি দেরী করা ঠিক হবে না, কখন কি ঘটে বলা যায় না। আম্মা যেমন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে তাতে যদি বলে বসে যে, যাও কিছুদিন বেড়িয়ে এস। আম্মা কিছু বললে তাঁকে ঠেকানো যায় না, কান্নাকাটি শুরু করেন।

সবদিক চিন্তা করে জেন ঠিক করল, আজ রাতেই সে তার মিশনে হাত দেবে।

জেন তার মিশন নিয়ে ইতিমধ্যেই অনেক চিন্তা ভাবনা করেছে।

তাদের ভূগর্ভস্থ কক্ষ তাদের বাড়ীর পেছন অংশে। আব্বা আম্মা ও তার শয়ন ঘর এবং কিচেনের নিচে বিস্মৃত জায়গা নিয়ে বিশাল ভূগর্ভস্থ কক্ষটি।

ভূগর্ভস্থ কক্ষে নামার দু'টি পথ। একটি সিড়ির গোড়ায়, অন্যটি তার আব্বার ঘরের মধ্য দিয়ে। সিড়িরগোড়ায় ভূগর্ভস্থ কক্ষে নামার যে পথ আছে, তা বিশাল এক লোহার পাল্লা দিয়ে বন্ধ। লোহার পাল্লাটি দেড় ইঞ্চি পুরু। দরজাটি স্বয়ংক্রিয়, এর সুইচ আছে জেনের আব্বার ঘরে দেয়ালের এক কেবিনে লুকানো সুইচ বোর্ডে। আরেকটি দরজা দেয়ালের সাথে তৈরী একটা আলমারির মধ্যে দিয়ে।

আলমারিটি খুললেই নিচে নামার সিড়ি বেরিয়ে পড়ে। এই পথ দিয়েই সাধারণ বা প্রাত্যহিক প্রয়োজনে ভূগর্ভস্থ কক্ষে নামা হয়। আর সিঁড়ির দরজাটি কোন বিপদকালীন সময়ে পরিবারের সকলের এক সাথে ব্যাবহারের জন্যে। সিঁড়ির দরজা দিয়ে নামা যাবেনা কোন ক্রমেই। সিঁড়ির দরজা খোলার যে সুইচ জেনের আব্বার ঘরে আছে তা অন করলে সংগে সংগে বাড়ির সব প্রান্তে ছড়িয়ে পরার মত একটা সাইরেন বেজে উঠে। অতএব ভূগর্ভস্থ কক্ষে নামার একটাই পথ খোলা। সেটা তার আব্বার ঘরের সেই আলমারির মধ্য দিয়ে।

জেন ঠিক করল তার আব্বার ঘরের এই পথই ব্যবহার করবে। আই পথ দিয়ে নামার অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। বিভিন্ন কারনে কখনও একা, কখনও অন্যের সাথে বহুবার সে ভূগর্ভস্থ কক্ষে এ দরজা দিয়ে নেমেছে।

কিন্তু কখন নামবে? তার আব্বার সামনে দিয়ে ভূগর্ভস্থ কক্ষে যাওয়া যাবেনা। অহেতুক কৌতুহলী হয়ে উঠতে পারেন অথবা সাথে তিনিও নামতে

পারেন। সুতরাং নামতে হবে তার আব্বা যখন বাড়ী না থাকেন তখন এবং সব দিক দিয়ে সেই উপযুক্ত সময় সন্ধ্যারাত। জেনের আব্বা প্রায় সন্ধ্যারাতে বাইরে থাকেন। হয় কোন মিটিং এ যান, নয়তো ক্লাবে।

কিন্তু মূল সমস্যার সমাধান এখনও জেন করতে পারেনি। তেজস্ক্রিয় পাতার প্ল্যান ও ডায়াগ্রাম ভূগর্ভস্থ কক্ষের কোথায় খুঁজে পাবে সে। এই প্রশ্নের সমাধান তখনও সে করতে পারেনি।

রাত তখন ৮টা।

তার ঘরে শুয়ে ছিল জেন।

তার আব্বা-আম্মা মার্কেটে যাচ্ছে। জেনকেও বলেছিল যেতে, কিন্তু জেন রাজী হয়নি। খুব খুশী হয়েছে জেন। তার আব্বা-আম্মা একসাথে যাওয়ায় তার দারুন সুবিধা হবে। নিরাপদে কাজ সারতে পারবে। জেন তার আব্বা-আম্মাদের যাওয়া টের পেয়ে উঠে দাঁড়াল।

এক পা, দু'পা করে দরজার দিকে পা বাড়াল, বুকটা তার কেঁপে উঠল। কেমন একটা আড়ষ্টতা ও ভয় এসে তাঁকে ঘিরে ধরল। মন বলল, যা সে করতে যাচ্ছে, তা প্রকাশ হওয়ার পর কিংবা ধরা পড়লে তার কি হবে।

কিন্তু ভয় ও পরিণতির কথা মন থেকে ঝেড়ে ফেলল সে। জোয়ানকে সাহায্য করার, আহমদ মুসাকে সাহায্যে করার, মজলুমদের সাহায্য করার এর চেয়ে বড় সূযোগ আর সে পাবে না।

জেন প্রস্তুত হয়ে তার আব্বার ঘরের দরজার নব ঘুরিয়ে ঘরে প্রবেশ করল। প্রতিদিন শতবার করে এ ঘরে প্রবেশ করে কিন্তু আজকের প্রবেশটা তার সেরকম নয়। বুঝতে পারছে তার হার্ট বিট বেড়ে গেছে। গোটা দেহে অপরাধী সুলভ একটা আড়ষ্টতা।

মেঝেটা পার হয়ে ওয়াল আলমারির সামনে গিয়ে দাঁড়াল জেন।

হাতল ধরে টেনে দেখল আলমারি বন্ধ।

আলমারির কম্বিনেশন লকের কোড সে জানে। লক ঘুরিয়ে কম্বিনেশন মিলিয়ে সে খুলে ফেলল আলমারি। আলমারিতে প্রবেশ করল জেন। আলমারির

পর নিচে নামার সিঁড়ির মুখে আরেকটা দরজা। দরজাটি পুরো স্টিলের, বোমায় ভাঙবে না এমন। সে দরজাতেও কম্বিনেশন লক। কিন্তু লক করা নেই দরজা।

জেন ভারি দরজা টেনে খুলে সিঁড়িতে নামল। সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল জেন। কিন্তু সিঁড়ির গোড়ায় গিয়ে আবার উঠে এল জেন ওপরে সিঁরির দরজায়। সিঁড়ির মুখের দরজা লাগিয়ে হুড়কো এটে দিল দরজায়। সে ভেতরে থাকা অবস্থায় কেউ যাতে প্রবেশ করতে না পারে, সে জন্যেই এই ব্যবস্থা।

দরজা বন্ধ করে ভূগর্ভস্থ কক্ষে নেমে এল জেন।

বিশাল কক্ষ।

শুধু মূল্যবান জিনিসের স্টোর হিসাবে নয়, আপাতকালীন আশ্রয়স্থল হিসাবেও এই ভূগভস্থ কক্ষ তৈরী হয়েছে। বিশাল কক্ষটিতে ছয়টি শয্যাপাতা আছে। খাদ্য সংরক্ষণের জন্যে রয়েছে অনেক গুলো বিরাট রিফ্রেজারেটর। কাপড়-চোপড় রাখার জন্যে রয়েছে কয়েকটি আলমারি। কয়েকটি র‍্যাকে রাখা আছে বিভিন্ন তৈজসপত্র। র‍্যাক, আলমারি, রিফ্রেজারেটর সবগুলোই কক্ষের দেয়ালে নির্মিত কেবিনে রাখা।

কোথায় রাখা আছে ডকুমেন্টগুলো? কোথেকে খোঁজা শুরু করবে সে। হঠাৎ কক্ষের নিরাপত্তা-সিন্দুকের কথা মনে পড়ল জেনের। পরিবারের সকল মূল্যবান দলিল এবং দ্রব্য সেই নিরাপত্তা সিন্দুকে রাখা আছা। জেনের মুখ উজ্জল হয়ে উঠল, সন্দেহ নেই তেজস্ক্রিয় পাতার সেই অতিমূল্যবান ডকুমেন্ট ঐ নিরাপত্তা সিন্দুকেই থাকবে। খুশীতে তুড়ি বাজাতে গিয়ে হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল জেনের মুখ। এ নিরাপত্তা সিন্দুক কোথায় আছে, কিভাবে খুলতে হয় জানা নেই জেনের। এতক্ষনে তার মনে হল বিরাট ভূল করেছে সে। কিন্তু ফিরতেও আর মন চাইল না। সে আজ যে সূযোগ পেয়েছে, এ সূযোগ দু'চারদিনের মধ্যে আবার যে পাবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই।

সুতরাং এসে পড়েছে যখন তখন যে দায়িত্ব সে পালণ করতে চেয়েছে, তা সম্পূর্ন সে করবেই।

হঠাৎ তার মাথায় এলো, ওপরে সিঁড়ির গোড়ার ভূগর্ভস্থ কক্ষের দরজা খোলার ব্যবস্থা তো স্বয়ংক্রিয়। অন্য এক জায়গায় রক্ষিত একটা সুইচ টিপলেই

সেই দরজা খুলে যায়। নিশ্চয় নিরাপত্তা সিন্দুক খোলার জন্যে সে রকম কোন স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাই থাকবে। নিরাপত্তা সিন্দুকের সুইচ এ ঘরেরই কোথাও রয়েছে। তাকে এখন সে সুইচ খুঁজে বের করতে হবে।

কোথায় থাকতে পারে সে সুইচ? ঘরের দেয়ালে কোথাও সুইচ বক্স আছে কি? তৈজস পত্রের র‍্যাক থেকে একটা ছোট্ট হাতুড়ি নিয়া জেন হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে দেওয়াল পরীক্ষা করতে লাগল। ফাঁপা শব্দ কোথাও থেকে আসে কি না। সুইচ বাক্স খুঁজতে গিয়ে নিরাপত্তা সিন্দুকের সন্ধান সে পেল। নিরাপত্তা সিন্দুকের পাল্লার রং দেয়ালের মত হলেও হাতুড়ির ঘা পড়ায় তা ঠন্‌ ঠন্‌ করে উঠল। নিরাপত্তা সিন্দুকের আকার হবে চারফিট বাই দুই ফিটের মত। ভূগর্ভস্থ কক্ষের চার দেওয়াল জেন তন্ন তন্ন করে দেখল, কোথাও সুইচ বক্স পেল না। তারপর সে কক্ষের মেঝেতে পাতা শয্যাগুলোর তলাসহ মেঝের প্রতিইঞ্চি হাতুড়ি পিটিয়ে পরীক্ষা করল সেখানে কোন সুইচ বাক্স আছে কিনা। হতাশ হল জেন, মেঝেতে কোন সুইচ বক্স নেই।

পরিশ্রম ও উত্তেজনায় ইয়ার কন্ডিশন ঘরেও ঘেমে উঠেছে জেন। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল অনেক সময় খরচ হয়েছে। সময় নষ্ট করা যায় না। আবার লেগে গেল সুইচ বক্স তালাশে। এবার তৈজস্পত্রের র‍্যাক, কাপড় চোপড়ের আলমারি, একনকি বড় বড় রিফ্রেজারেটরের আশ-পাশ পর্যন্ত তন্ন তন্ন করে খুঁজল। না কোথাও কোন সুইচের নাম গন্ধ নেই।

ক্লান্ত জেন একটা বিছানায় এসে ধপাস করে শুয়ে পড়ল। হতাশা এসে তাকে ঘিরে ধরল। ঘরে কোন জায়গাই খুঁজতে সে বাকি রাখেনি। বহু সময় সে নষ্ট করেছে। তাঁর আব্বা আম্মা বাড়ী ফিরলে তাঁর মিশন পন্ড হয়ে যাবে। উদ্বেগ বোধ করল সে। তাহলে সে কি ব্যর্থ হতে যাচ্ছে!

জেন যে বিছানায় শুয়েছিল তার পাশেই নিরাপত্তা সিন্দুকের দেয়ালটি। জেন হতাশ দৃষ্টিতে সেদিকে তাকাল। আহমদ মুসা হলে নিশ্চয় এটা খোলার বিকল্প কোন ব্যবস্থা করতে পারতো। কিন্তু তাঁর মাথায় তো কিছু আসছে না। পিটিয়ে তো পুরু ষ্টিলের নিরাপত্তা সিন্দুক ভাঙা যাবে না। একবার জেনের মনে হলো নিরাপত্তা সিন্দুকের সুইচ তাঁর আব্বার ঘরের কোথাও তো লুকানো থাকতে

পারে! এ সম্ভাবনা জেন উড়িয়ে দিতে পারলো না। কিন্তু তাঁর আব্বার ঘর খুজে সুইচ বের করে সিন্দুক খোলার মত সময় আর নেই। তাহলে তাকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হবে? আবার কবে সুযোগ পাবে সে!

অস্থির ও ভাঙা মন নিয়ে শোয়া থেকে উঠল জেন। ধীর পায়ে আবার গিয়ে দাঁড়াল নিরাপত্তা সিন্দুকের সামনে। আবার তীক্ষভাবে নজর বুলাল সে নিরাপত্তা সিন্দুকের গায়ে। মেঝের দুই ইঞ্চি ওপর থেকে শুরু হয়েছে নিরাপত্তা-সিন্দুক ও মেঝের মাঝখানে দুই ইঞ্চি পরিমান জায়গার এক স্থান জুড়ে আঙুলের শীর্ষ ভাগের একটা ছবি দেখতে পেল জেন। কেও যেন সূক্ষ্ম পেন্সিল স্কেচে বুড়ো আঙুলের নখ এঁকে রেখেছে। ভালো করে বুঝা যায় না, দেখতে কতকটা ছায়ার মত।

জেন বসে পড়ল মেঝেয়। আরো ভাল করে নজর বুলালো স্কেচের ওপর। দেখল, অলস হাতের বিশৃঙ্খল আচড়ে কেউ বুড়ো আঙুলের শীর্ষ ভাগের স্কেচটি এঁকেছে। খুব যত্ন ও পরিষ্কার ছাপ এতে নেই। দেখলে মনে হয় খেয়ালি কেউ বসে বসে এই কাজ করেছে। হাত দিলেই যেন ওটা মুছে যাবে।

জেন স্কেচটার ওপর আঙুল দিয়ে ঘষা দিল। না মুছল না। পাকা কালির পারমানেন্ট একটা ছবি ওটা।

কেন এই ছবিটি আঁকা এখানে? এমনি এমনি কি কেউ এঁকে রেখেছে এটা এখানে? কেন?

হঠাৎ জেনের মনে হলো এটা কোন ইংগিত হতে পারে না কি? হাতের চাপ দেওয়ার কাজ একটু বড় হলে মানুষ বুড়ো আঙুল দিয়েইতো করে। আনন্দের একটা শিহরণ কেল্লে গেল জেনের দেহে।

বুড়ো আঙুলের স্কেচের শীর্ষ ভাগ ওপরের দিকে। জেন তার বাম হাতের বুড়ো আঙুল ঠিক স্কেচের ওপর সেট করে প্রচন্ড এক চাপ দিল চোখ বন্ধ করে। উত্তেজনায় তার বুক টিপ টিপ করে উঠল।

আনন্দের সাথে চোখ খুলল জেন। দেখল, নিরাপত্তা সিন্দুকের সামনের পাল্লাটা পাশের দেয়ালের ভেতরে ঢুকে গেছে। বেরিয়ে পড়েছে নিরাপত্তা সিন্দুক। নিরাপত্তা সিন্দুক বহু কক্ষ বিশিষ্ট একটি আলমারি। কক্ষ গুলির কোনটায় কি আছে তাঁর সংকেত দেয়া নেই।

জেন ঘেমে উঠেছে। যার জন্যে তার এত চেষ্টা তাকি আসলেই এখানে আছে! পাবে কি সে!

নিরাপত্তা সিন্দুকের কক্ষগুলোর কোনটাই বন্ধ নয়। একে একে খুলতে লাগল জেন। কোনটাতে অলংকার, কোনটাতে স্বর্ণ, কোনটাতে টাকা ভর্তি। জেন খুজছে কাগজ, এসব নয়। মাঝখানে কয়েকটি কেবিনে কাগজপত্র পেল। সেগুলো জেনের আব্বার কোম্পানীর ও নানা ধরনের দলিলপত্র।

অবশেষে পেল জেন তেজস্ক্রিয় পাতার সেই প্ল্যান ও ডায়াগ্রাম। একটা কেবিনে বড় খামের মধ্যে পেল ডকুমেন্ট গুলো।

ডকুমেন্টগুলো আবার খামে ভরে ভাজ করে পকেটে পুরে উঠে দাঁড়াল জেন। ঠিক এই সময়ই তাঁর আব্বার ঘরের সাথে সংলগ্ন সিড়ি মুখের ষ্টিলের দরজায় ধাক্কা দেয়ার শব্দ হলো।

চমকে উঠলো জেন।

ধাক্কা অব্যাহত ভাবে হতে লাগল।

জেন বুঝল তার আব্বা এসেছে। কিন্তু বুঝতে পারলো না, এত তাড়াতাড়ি তাঁর তো বুঝার কথা নয়। সে আসার সময় আলমারি বন্ধ করে দিয়ে এসেছে। কেউ ভেতরে ঢুকেছে এটা তার বুঝার কথা নয়। কিন্তু আসার সংগে সংগে তিনি বুঝলেন কি করে।

হঠাৎ জেনের মনে পড়ল, নিরাপত্তা সিন্দুকের ওপেনিং সিষ্টেমের সাথে অনেক ক্ষেত্রে সাইরেন যুক্ত থাকে যা চোর ডাকাতদের ধরতে সাহায্য করে। এখানেও নিশ্চয় তাহলে সাইরেন যুক্ত আছে। সুইচ টেপার সংগে সংগেই তা বেজে উঠেছে। তাঁর প্রবেশ ধরা পড়ার এটাই একমাত্র ব্যাখ্যা।

সিঁড়ি মুখের দরজায় এখন হাতুড়ী পেটার প্রচন্ড শব্দ হতে শুরু করেছে।

জেন সিদ্ধান্ত নিল এই ডকুমেন্ট সহ তাকে ধরা পড়া চলবেনা। আর ডকুমেন্ট সরাবার এই সুযোগ ব্যর্থ হলে একে আর উদ্ধার করাও যাবে না। সুতরাং যে মিশনে সে এসেছে সেখান থেকে পিছপা হবে না।

কিন্তু কিভাবে বেরুবে সে এখান থেকে। তাঁর বেরুবার পথ বন্ধ। হঠাৎ জেনের মনে পড়ল, এই কক্ষের ছাদের পেছন দিকের প্রান্তে কক্ষ থেকে বেরুবার

জরুরী দরজা আছে। সেটা ভেতর থেকে হুড়কো দিয়ে বন্ধ। এ দরজা দিয়ে বেরুলে তাদের বাড়ীর পেছন দিকের একটা করিডোরে পৌঁছা যায়।

বের হবার এ বিকল্প পথের কথা মনে হবার সাথে সাথে জেন সিদ্ধান্ত নিল এ পথেই সে বেরুবে। একবার তাঁর মনে হলো এ পথে যদি সে চোরের মত পালিয়ে যায়, তাহলে আবার সে ফিরবে কি করে! সে যে এখানে প্রবেশ করেছে তা ইতিমধ্যে প্রকাশ না হয়ে থাকলে প্রকাশ হয়ে পড়বেই। এছাড়া তার মনে হলো, বিকল্প পথে বেরুবার পথ বন্ধ করতেও কেউ আসতে পারে। কিন্তু জেন আবার ভাবল, হয়তো আসতে পারে, কিন্তু এছাড়া তো তার বেরুবার আর কোন পথ নেই। আবার তার মনে খোঁচার মত বিধল, সে এভাবে পালালে আবার ফিরবে কি করে? কিন্তু পরক্ষনে এ চিন্তা ঝেড়ে ফেলে জেন ভাবল পরিণতির চিন্তা আমি করি না। ট্রিয়েষ্টে জোয়ানকে বাঁচাবার জন্যে যখন পিস্তল হাতে বেরিয়েছিলাম, তখন মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়েই বেরিয়েছিলাম। আমি যদি জীবন দিয়েও ওদের উপকার করতে পারি, আমার পরিবারের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি, সেটাই হবে আমার জীবনের সার্থকতা।

সিদ্ধান্ত নিয়েই জেন সিঁড়ির গোড়ার দরজা দিয়ে এ কক্ষের প্রবেশের দ্বিতীয় দরজাটি হুড়কো দিয়ে বন্ধ করে কক্ষ থেকে বেরুবার জন্যে জরুরী দরজার দিকে ছুটল। যাবার সময় একটু আলমারি থেকে ওভারকোট নিয়ে গায়ে জড়িয়ে নীল।

কক্ষের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে একটা সংকীর্ণ সিঁড়ি উঠে গেছে ছাদে বেরুবার জরুরী দরজা পর্যন্ত। সিঁড়ি বেয়ে উঠে জেন হুড়কো খুলে নিচে ফেলে দিল।

জরুরী দরজাটা বর্গাকার। এখানেও স্টিলের পাল্লা, একদম এয়ার টাইট। জেন সিড়িতে দাঁড়িয়ে দু'হাত দিয়ে পাল্লা আলগা করার চেষ্টা করল। কিছুই হলো না। পরে জেন সিড়ির আরও এক ধাপ উঠে ঘাড় বাঁকিয়ে মাথা নিচু করে কাঁধ লাগাল দরজার পাল্লায়। তারপর সর্বশক্তি লাগিয়ে কাঁধ দিয়ে ঠেলল দরজা। কাঁধ ব্যাথায় টন টন করে উঠল, কিন্তু দরজা সরা দূরে থাক সামান্য নড়লও না।

জেন সিড়ির একধাপ নিচে নেমে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ভাবল, দরজা মরিচা বা অন্য কোন ভাবে আপনা আপনি আটকে যাবার কথা নয়। নিশ্চয় হুড়কো ছাড়াও আর কিছু বাড়তি ব্যবস্থা আছে দরজা বন্ধ রাখার।

জেন দ্রুত নজর বুলাল বর্গাকার দরজা এবং তার দেয়ালের চারপাশে। অত্যন্ত শ্যেন দৃষ্টি জেনে যাতে তিল পরিমান কোন অস্বাভাবিকতাও তার নজর না এড়ায়। দরজার দেয়ালে একটি বালিকার ছোট্ট মুখাবয়বের ওপর গিয়ে জেনের চোখ আটকে গেল। এ মুখাবয়বটিও পেন্সিল স্কেচে করা মনে হল। মুখবয়বটির কপালে লাল একটি ফোঁটা। স্কেচের আয়তন অনুসারে ফোঁটাটা বেশ বড়।

ফোঁটাটির দিকে তাকিয়ে জেনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। চটকরেই তার মনে হল লাল, ফোটা বা বোতাম টিকে ক্যামফ্লেজ করার জন্যেই মুখায়বটি আঁকা হয়েছে।

চিন্তার সাথে সাথেই জেন তার ডান হাতের তর্জনি দিয়ে লাল বোতামটির ওপর চাপ দিল। সংগে সংগেই অস্পষ্ট একটা শিষ দিয়ে উঠে স্টিলের বর্গাকার দরজাটা সরে গেল তার মাথার ওপর থেকে।

প্রথমে একটু মাথা তুলে জেন দেখল চার দিকটা। না কেউ কোথাও নেই। করিডোর একদম ফাকা।

এই সময় জেনদের বাড়ীর ভেতরের অংশ থেকে, একটা পায়ের শব্দ এলো কেউ যেন এদিকে এগিয়ে আসছে।

জেন লাফ দিয়ে করিডোরে উঠে এল।

যে করিডোরে জেন এসে দাঁড়াল তার একটি মাথা দক্ষিণ দিকে জেনদের বাগানের দিকে চলে গেছে। অন্য মাথাটি বাড়ীর পূবদিকে ঘুরে গাড়ী বারান্দা অর্থাৎ উত্তরের লনে গিয়ে শেষ হয়েছে।

জেন করিডোরে উঠে ওভার কোট দিয়ে গা মাথা ভাল করে ঢেকে নিয়ে দৌড় দিল গাড়ী বারান্দার দিকে।

জেন কিছুটা এগিয়েছে, এই সময় বেছন থেকে চিৎকার উঠল, কে কে?

জেন চিনতে পারল তার আব্বার কণ্ঠস্বর।

জেন দৌড়ের গতি বাড়িয়ে দিল।

পেছন থেকে পায়ের শব্দ এল। জেন বুঝতে পারল তার আব্বাও ছুটছে তার পেছনে।

জেন শেষ মুহুর্তে ধরা পড়তে চায় না। খোয়াতে চায় না ডকুমেন্ট।

জেন করিডোরের মুখে পৌঁছে দেখল তার গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে সামনেই। জেন ছুটল গাড়ীর দিকে।

জেন গাড়ীর দরজা খুলেছে। এক পা ঢুকিয়েছে গাড়ীর ভেতরে, সেই সাথে মাথাটাও। একটা পা তখনও বাইরে।

এই সময় করিডোরের মুখ থেকে চিৎকার এল, পালাল, পালা। সেই সাথে এল গুলির শব্দ।

জেন তার বাইরের পাটি তুলতে যাচ্ছিল এই সময় গুলি এসে বিদ্ধ করল সে পা। গুলি লাগল হাটুর ঠিক নিচেই।

জেনের দেহ কেঁপে উঠলো। একটা চিৎকার বেরুল মুখ থেকে। কিন্তু তার পরেই জেন নিজেকে সামলে নিল। সে দাঁতে দাঁত চেপে দু'হাত দিয়ে পাটা তুলে নীল গাড়ীর ভেতরে। তারপর ডান হাত দিয়ে টেনে দরজা বন্ধ করে দিল গাড়ীর।

কম্পিত দেহটাকে জেন গাড়ীর সিটের সাথে সেঁটে রেখে গাড়ী স্টার্ট দিল।

জেনের নজরে এল সামনেই দারোয়ান বোবার মত দাঁড়িয়ে আছে। তার দু'টি চোখ ভয়ে বিস্ফারিত।

দারোয়ানের পাশ দিয়ে তীর বেগে জেনের গাড়ী খোলা গেট দিয়ে গিয়ে পড়ল রাস্তায়।

চিৎকার কানে যেতেই জেনের আব্বা জেমেনিজ থমকে দাঁড়িয়েছিল। চিৎকার সে চিনতে পেরেছে।

পিস্তল ধরা হাতটি তার স্থির হয়ে গেল, পা দু'টি তার যেন মাটিতে আটকে গেল। চোখে বোবা দৃষ্টি।

জেনের যেখানে গুলি লেগেছে, সেখানে এক থোক রক্ত গড়াচ্ছে তখনও।

পাথরের মূর্তির মত স্থির পা চালিয়ে জেমেনিজ এসে দাঁড়াল লাল তাজা সেই রক্তের সামনে। তার চোখ সেই রক্তের উপর পাথরের মত স্থির।

জেনের মা ছুটে এল বাড়ীর ভেতর থেকে। গুলির শব্দ সেও শুনেছে।

'ওগো শুনেছ, জেন তো ঘরে নেই' বলতে বলতে জেনের মা এসে দাঁড়াল জেমেনিজের কাছে সেই রক্তের সামনে।

রক্তের সামনে জেমেনিজকে পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চোখ ভরা উদ্বেগ নিয়ে জেনের মা একবার রক্তের দিকে, একবার জেমেনিজের দিকে তাকাতে লাগল।

তারপর আর্ত কন্ঠে বলল, 'তোমার কি হয়েছে, এ রক্ত কার? শুনেছ, জেনকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

মূর্তির মত দাঁড়ানো জেমেনিজের হাত থেকে খসে পড়ল পিস্তল।

জেনের মা ছুটে এসে জেমেনিজের একটা হাত ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বলল, 'বল, এ রক্ত কার? কথা বলছ না কেন?'

জেমেনিজ রক্তের দিকে তাকিয়ে মূর্তির মত দাঁড়িয়েই রইল।

অল্পদূরে বিস্ফারিত চোখে দাঁড়িয়েছিল দারোয়ান। জেনের মা ছুটে গেল তার কাছে। কান্না জড়িত কন্ঠে বলল, 'কি হয়েছে, কি দেখেছ তুমি, এ রক্ত কার? জেন কোথায়?'

দারোয়ান দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল। হাউ মাউ করে উঠে কান্না জড়িত কন্ঠে বলল, 'খুকু মনির রক্ত, গুলি লেগেছে...।' কথা শেষ করতে পারল না দারোয়ান। একটা চিৎকার করে জেনের মা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। তখন অনেক রাত।

দূরে গীর্জার কোন পেটা ঘড়িতে ১২ টা বাজার শব্দ ভেসে এল।

জেনের ঘরে মেয়ের বিছানায় পড়ে বিছানা আঁকড়ে ধরে কাঁদছে তার মা।

বাইরের ড্রয়িং রুমে সোফায় বসে জেমেনিজ। তার পাশের সোফায় ভাসকুয়েজ।

ভাসকুয়েজ কথা বলছিল, ‘আপনি শান্ত হোন স্যার। আপনি দেশের গৌরব। আপনি সন্তানকেও রেহাই দেননি। জেনকে আপনি গুলি করেছেন- আপনার এ জাতি প্রেম সবাইকে অভিভূত করার মত।’

একটু থামল ভাসকুয়েজ। তারপর বলল, ‘জোয়ান ছেলেটাই শয়তানির মূল। সেই মা জেনের মাথা খারাপ করেছে। আমাদের এখন প্রথম কাজ আহত জেন এবং ডকুমেন্ট গুলোকে উদ্ধার করা। তারপর শয়তান জোয়ান এবং আহমদ মুসাদের পাকড়াও করা। আহত জেন নিশ্চয় কোন হাসপাতাল কিংবা ক্লিনিকে উঠবে। আমরা মাদ্রিদের সকল হাসপাতাল ও ক্লিনিকে আমাদের লোকদের সতর্ক করে দিয়েছি। আমাদের শত শত কর্মী গোটা শহরে ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের পাকড়াও করার জন্যে। সরকারের গোয়েন্দা বিভাগেরও সাহায্য কামনা করেছি আমি। আমি তাদের বলেছি, আপনার মেয়েকে আহত করে কিডন্যাপ করেছে আহমদ মুসার দল। এই সংবাদে সরকারের উচ্চ মহল উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ পূর্ণ উদ্যমে কাজে নেমেছে। চিন্তা করবেন না স্যার ধরা তাদের পড়তেই হবে।’

জেমেনিজ শুকনো মুখে বসে ছিল। তার চোখটা ভাসকুয়েজের দিকে নিবদ্ধ ছিল বটে, কিন্তু মনটা ছুটে বেড়াচ্ছে অন্য কোথাও। ভাসকুয়েজের সব কথা কানে গিয়েছে বলে মনে হলো না। কিন্তু ভাসকুয়েজের শষ কথায় জেমেনিজ নড়ে চড়ে বসল। বলল, ‘স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমাকে টেলিফোন করেছিলেন। আমি ভয় করছি, ঘটনা না প্রকাশ হয়ে পড়ে। আমি চাই না, জেন কিডন্যাপ হওয়ার কাহিনী প্রচার হোক।’ শুষ্ক ও নিরুত্তাপ কন্ঠে বলল জেমেনিজ।

‘না স্যার, সে ব্যবস্থা নিয়েছি। হোম মিনিস্টার, পুলিশ প্রধান ও আমি ছাড়া ঘটনা কেউ জানে না। অন্যদের শুধু ফটো সরবরাহ করে বলা হয়েছে, খুঁজে বের করে সসম্মানে পৌঁছে দিতে। হারিয়েছে, পালিয়েছে না কিডন্যাপ হয়েছে। কিছুই বলা হয়নি এবং জেনের পরিচয়ও প্রকাশ করা হয়নি।’

‘ধন্যবাদ ভাসকুয়েজ।’

একটু থামল জেমেনিজ। তারপর আবার বলল, ‘ডকুমেন্ট গুলো যদি ওদের হাতে যায় ভাসকুয়েজ?’

‘প্ল্যান ও ডায়াগ্রাম পেয়ে ওরা যা করতে পারে তা হলো, তেজস্ক্রীয় ক্যাপসুলগুলো ওরা তুলে ফেলার চেষ্টা করবে। কিন্তু সে সাধ্য তাদের হবে না। কাজে নামলেই ওদের টিপে টিপে মারবো আমরা।’

কথা শেষ করেই ভাসকুয়েজ বলল, ‘এখন উঠতে পারি স্যার? ওদিকে অনেক কাজ আছে।’

‘ঠিক আছে ভাসকুয়েজ, কোন খবর পেলেই আমাকে জানিও। জেনের মা একদম ভেঙে পড়েছে। কোন সান্ত্বনাই মানছে না। সবকিছুর জন্যে সে আমাকে দায়ী করছে। আমার রাজনীতিই নাকি জেনের এই অবস্থার জন্যে দায়ী।’ জেমেনিজের শুকনো কন্ঠ শেষের দিকে ভারি হয়ে উঠল।

‘মায়ের মন তো, একটু ভিন্ন রকম হবেই। ধৈর্য ধরতে বলুন স্যার, আমরা জেনকে বের করেই ফেলবো।’ বলে ভাসকুয়েজ উঠে দাঁড়াল।

জেমেনিজও উঠে দাঁড়িয়ে ভাসকুয়েজের সাথে হ্যান্ডশেক করে ভেতরের দিকে পা বাড়াল।

# ৩

ফিলিপের বাড়ির নিচতলার ড্রয়িংরুম।

আহমদ মুসা, ফিলিপ, জোয়ান, যিয়াদ, আবদুর রহমান বসে আছে সোফায়।

কথা বলছিল তখন আহমদ মুসা। বলছিল, 'Elder' সমস্যার সমাধান না করতে পারলে আমরা এক ইঞ্চিও এগুতে পারছি না।'

'Elder' অর্থ মুরুব্বী, অভিভাবক। 'কু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের মুরুব্বী বা অভিভাবক কে?' বলল ফিলিপ।

'এই মুরুব্বী কোন সংগঠনও হতে পারে, যারা স্পেনীয় কু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের অভিভাবকত্ব করছে।' বলল জোয়ান।

'তা হতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয় তেজস্ক্রীয় পাতার যে প্ল্যান ও ডায়াগ্রাম তা আমি মনে করি তারা কাছেই রাখবে, দেশের বাইরে রাখার কিংবা অন্য সংগঠনের হাতে দেবার তাদের প্রয়োজন কি?' বলল আহমদ মুসা।

'ঠিক মুসা ভাই। স্পেনের কু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান নিজেদের এত দুর্বল মনে করে না যে ডকুমেন্ট তারা নিরাপত্তার জন্যে অন্য সংগঠন বা দেশের বাইরে রাখবে।' বলল ফিলিপ।

'কিন্তু নিরাপত্তা হীনতার কারণেই তো তারা ডকুমেন্টগুলো তাদের হেড কোয়ার্টারে রাখার সাহস করেনি।' বলল জোয়ান।

'একথা ঠিক মুরুব্বী বলা হয়েছে এমন এক আশ্রয়কে যা তাদের হেড কোয়ার্টারের চেয়ে নিরাপদ।' বলল যিয়াদ।

'একথা আমি বুঝতে পারছি না তেজস্ক্রীয় পাতার ডকুমেন্ট 'Elder'-এর কাছে এ কথা ভাসকুয়েজের পারসোনাল কম্প্যুটার রেকর্ড করার প্রয়োজন হলো কেন? রেকর্ড করা যখন হলোই তখন নামটাকে আড়াল করা হলো কেন?' বলল ফিলিপ।

'এর উত্তর সম্ভবত এটাই যে, ডকুমেন্টগুলো কার কাছে আছে এটা শুধু ভাসকুয়েজই জানে। ভাসকুয়েজের যদি কিছু হয়ে যায়, তাহলেও যাতে তার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি জানতে পারে সে তথ্য এজন্যেই তার পারসোনাল কম্প্যুটারে তা রেকর্ড করা হয়েছে। আর 'Elder' এর নাম না থাকার কারণ তাকে 'Elder' নামেই কু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের দায়িত্বশীলরা সবাই জানে।'

'Elder' নাম রেকর্ড থাকলে তা অন্যের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে বলেই এটা উহ্য রাখা হয়েছে।' বলল যিয়াদ।

'বিষয়টি নিয়ে আমিও ভেবেছি, কিন্তু সমাধান খুঁজে পাইনি।' আহমদ মুসা বলল।

'এর জবাব হয়তো পরেও পাওয়া যাবে। কিন্তু এখন সামনে এগুবার পথ কি?' বলল ফিলিপ।

আহমদ মুসার মুখে চিন্তার একটা ছায়া নেমে এল। বলল, 'প্রতিটা দিন যাচ্ছে আর স্পেনে আমাদের কর্ডোভা, আল হামরা, গ্রানাডা, মাদ্রিদের মসজিদ কমপ্লেক্স প্রভৃতির জীবন থেকে একটা অংশ খসে পড়ছে। একবার ওগুলো তেজস্ক্রীয় দুষ্ট হয়ে পড়লে সেগুলো মেরামতের আর কোন উপায় থাকবে না। ওগুলো মুছে যাবে স্পেনের বুক থেকে, সেই সাথে মুছে যাবে স্পেন থেকে মুসলমানদের নাম নিশানা।'

থামল আহমদ মুসা। একটু ভাবল। তারপর বলল, 'স্পেনে খৃষ্টান কিংবা শ্বেতকায়দের মুরুব্বী বা অভিভাবক বলে সাধারণ ভাবে মনে করা হয় এমন কেউ কি আছে?'

'কার্ডিনাল পরিবারকে একবাক্যে সে ধরনের পরিবার বলা যায়।'

আহমদ মুসার মুখে হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'আশ্চর্য, ক'দিনে একবারও এ পরিবারের কথা আমার মনে হয়নি। তুমি ঠিকই বলেছ জোয়ান, স্পেনের খৃস্টানদের শীর্ষ অভিভাবক পরিবার এটি। আর এ পরিবারের সাথে কু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ঐতিহাসিক কার্ডিনাল হাউজের একটা অংশ কু-ক্ল্যাস্ক-ক্ল্যানকে দেয়াই তার প্রমাণ। কিন্তু জেনের আব্বা জেমেনিজ ডে সিসনারোসা কু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের 'Elder' কি না সেটাই জানার বিষয়।'

'হ্যাঁ মুসা ভাই, এটাই জানার বিষয়।' বলল জোয়ান।

‘মি: জেমেনিজ আমাদের প্রতিবেশী বলা যায়। লা-গ্রীনজায় আমাদের পাশেই তাদের স্বাস্থ্য নিবাসটা। ছোট বেলা থেকেই ওদের সবাইকে জানি। মি: জেমেনিজ অত্যন্ত সাধারণ ভাবে চলেন। বাড়িতে তেমন রাখ ঢাক নেই। কোন পাহারাও বাড়ীতে কখনও রাখেননি। মাদ্রিদের বাড়িও তাই। জোয়ান এটা আরও ভাল জানে। এমন লোক কিংবা এমন বাড়ী কু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের মূল্যবান দলিলের নিরাপদাশ্রয় হতে পারে বলে মন বলছে না।' বলল ফিলিপ।

'তোমার কথা ঠিক হওয়ার যুক্তি আছে। তবে সম্ভাবনাই আমাদের পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এখন বল, কার্ডিনাল পরিবারের মত অথবা জেমেনিজের মত আর কাকে কাকে আমরা এমন সম্ভাবনার তালিকায় ফেলতে পারি।' বলল আহমদ মুসা।

কথা বলার জন্য ফিলিপ মুখ তুলেছে এমন সময়, প্রহরী ছুটে এসে ডয়িং রুমে প্রবেশ করল। দ্রুত কণ্ঠে বলল, ‘একটা গাড়ী ভেতরে ঢুকতে চায়, গাড়ী দিয়ে গেট ধাক্কাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলে কোন কথা বলছে না। আমরা কি করব?’

সংগে সংগে আহমদ মুসা উঠে দাড়াল। ফিলিপও সংগে সংগে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'মুসা ভাই আপনি এবং জোয়ান থাকুন। আমরা দেখে আসি।'

'না ফিলিপ, এটা কোন শত্রুর গাড়ি নয়। শত্রুর গাড়ি এমন হয়না, এমন করে না।' বলতে বলতেই আহমদ মুসা চলতে শুরু করেছে।

সবাই পিছু নিল আহমদ মুসার।

আহমদ মুসারা গেটের সামনে গিয়ে দেখল গাড়িটি অবিরাম হর্ণ দেয়া ছাড়াও গেট ধাক্কাচ্ছে গাড়ী দিয়ে।

আমদ মুসা গেটের সিকিউরিটি উইনডো দিয়ে গাড়টির দিকে এক নজর তাকাল। দেখল গাড়ীতে একজন মাত্রই আরোহী।

আহমদ মুসা সুইচ টিপল। গেটের দু'টি পাল্লা সরে গেল দু'দিকে। গেটের সামনে জোয়ান ফিলিপ এবং অন্যান্যরা।

গেট খুলে যেতেই গাড়ী ঢুকে গেল ভেতরে। সেই সাথে গাড়ীর ভেতর থেকে এটা কণ্ঠ উচ্চারিত হল, 'আমি জেন।' কণ্ঠটা একটা দুর্বল চিৎকারের মত শোনাল।

ভেতরে প্রবেশ করেই গাড়িটা শা করে ছুটে গেল গাড়ী বারান্দার দিকে। গাড়ীর গতিটা বিশৃঙ্খল।

গাড়ীটা গাড়ী বারান্দায় স্বাভাবিকভাবে দাঁড়ালোনা। বারান্দায় গিয়ে ধাক্কা খেল।

জোয়ান জেনের নাম শুনতে পেয়েছিল এবং তার কণ্ঠও চিনতে পেরেছিল। কিন্তু জেনের এই আগমন এবং চিৎকার তাকে বিস্মিত করেছিল।

জোয়ান চুটছিল গাড়ীর পেছনে।

গাড়ী দাঁড়াতেই জোয়ান গাড়ীর জানাল দিয়ে ভেতরে এক ঝলক তাকিয়েই উদ্বিগ্নভাবে এক টানে দরজা খুলে ফেলল গাড়ীর।

গাড়ী খুলেই চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল জোয়ানের। সিটের ওপর এলিয়ে পড়েছে জেন। গাড়ী ভেসে যাচ্ছে রক্তে।

‘জোয়ান তুমি এখানে! তোমাকেই খুব আশা করছিলাম। আমার গুলি লেগেছে।’ দুর্বল কণ্ঠে বলল জেন।

এ কি করে হলো জেন? আর্তকণ্ঠে বলল জোয়ান।

আহমদ মুসা, ফিলিপ সবাই পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

আহমদ মুসা জোয়ানকে একটু পাশে ঠেলে ঝুকে পড়ে গুলিবিদ্ধ স্থানটি পরীক্ষা করল। দেখল, হাটুর নিচে মাংসল হিপটায় বিরাট ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। গুলি এক পাশ দিয়ে ঢুকে আরেক পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

'জোয়ান, ফিলিপ তোমাদের কোন বিশ্বস্ত ক্লিনিক আছে? জেনকে ক্লিনিকে নিতে হবে।' সোজা হয়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল আহমদ মুসা।

জেন ধীরে ধীরে না সূচক মাথা নাড়ল। বলল, না কোন ক্লিনিক নয়, হাসাপাতাল নয়। ওরা এতক্ষনে মাদ্রিদের সব ক্লিনিক হাসপাতালে লোক পাঠিয়েছে আস্তে আস্তে দুর্বল কণ্ঠে বলল জেন।

'মুসা ভাই, বাসাতে সব ব্যবস্থা করা যাবে।' বলল ফিলিপ।

'ঠিক আছে, জোয়ান জেনকে ভেতরে নাও।' আহমদ মুসা বলল।

সরে এল গাড়ির দরজা থেকে আহমদ মুসা।

ফিলিপ ছুটে গেল ভেতরে।

জেনের গায়ে কোট, পরনে হাটুর নিচু পর্যন্ত নামানো স্কার্ট। ডান হাতের ওপর ঠেস দিয়ে একটা কাত হয়ে সিটের ওপর গা এলিয়ে পড়েছিল জেন।

জোয়ান তাকে তুলে নেয়ার জন্যে এগুলো।

জেন স্টিয়ারিং হুইল ধরে সোজা হতে চেষ্টা করল। চাপ পড়ল তার গুলিবিদ্ধ বাম পা টায়। কঁকিয়ে উঠল জেন।

'তোমাকে উঠতে হবে না জেন, তুমি উঠো না।' বলে জোয়ান এগিয়ে গিয়ে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল জেনকে।

চোখ বন্ধ করে জেন নিজেকে এলিয়ে দিয়েছে জোয়ানের হাতের ওপর।

জোয়ান হাটতে হাটতে প্রশ্ন করল, কিছুই বুঝতে পারছিনা জেন, কোথায় কি করে এটা ঘটল?

জেন চোখ খুলল। তাকাল জোয়ানের দিকে। জেনের চোখে হাসির অস্পষ্ট প্রলেপ। বলল, 'সব শুনবে। বলেছিলাম না আমি, তোমার কিছু কাজ আমাকে দিও'।

'কিছু করতে গিয়েছিলে নাকি?' জোয়ানের চোখে বিস্ময়।

'বলব'। চোখ বন্ধ করে বলল জোন।

নিচের ড্রইং রুমের সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল ফিলিপ। জেনকে নিয়ে জোয়ান ঢুকতেই বলল তিন তলায় নিয়ে চল জোয়ান। আম্মার পাশে মারিয়ার ঘরটায় ওর জন্যে ব্যবস্থা করেছি।

দোতলার সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে ছিল ফিলিপের আম্মা।

মারিয়ার বান্ধবী জেনকে ছোটবেলা থেকেই চেনে ফিলিপের আম্মা।

জেনকে দেখেই কেঁদে উঠল, 'আমার মারিয়া গেল, তোমারও এই অবস্থা?'

'জেন চোখ খুলে মারিয়ার মা'র দিকে চেয়ে বলল, 'মারিয়ার মত করে আমি যেতে পারলাম না খালাম্মা।'

'ওকথা বলোনা মা, তুমি বেঁচে থাক।' জেনের মাথায় হাত রেখে চলতে চলতে বলল মারিয়ার মা।

জেনকে নিয়ে জোয়ান এবং অন্যান্য সকলে প্রবেশ করল ঘরে।

বেশ বড় ঘর। তক তকে চক চকে ঘর। জেন মারিয়ার কাছে এ ঘরে এসেছে।

খাটে সাদা ধবধবে নতুন বিছানা পাতা। চাদরের ওপর গোটা খাট জুড়ে একটা রাবার সিট বিছানো।

জোয়ান জেনকে বিছানায় শুইয়ে দিল।

মারিয়ার মা বসল জেনের মাথার কাছে। হাত বুলিয়ে দিতে লাগল জেনের মাথায়।

আমার এক সার্জেন বন্ধুকে বলেছি, এখনই এসে পড়বেন। ফিলিপ বলল।

ফিলিপ, তাড়াতাড়ি কিছু দুধ খাইয়ে দিতে হবে জেনকে। আহমদ মুসা বলল।

'ফিলিপের মা উঠে বলল, আমার খেয়ালই হয়নি। যাই বাবা আসছি।

বলে ফিলিপের মা বেরিয়ে গেল। জেনের গুলিবিদ্ধ ক্ষতের দিকে তাকিয়ে আহমদ মুসা বলল, ক্ষত বাধার কাপড়টা বদলে দিতে হবে, ওটা রক্তে ভিজে গেছে।

গাড়ীতেই জেন তার মাথার স্কার্ট দিয়ে ক্ষতটা বেধে নিয়েছিল। তারপর গাড়ী বারান্দায় আহমদ মুসা সেটা পাল্টে তার রুমাল দিয়ে ক্ষতস্থানটা বেধে দেয়।

'ডাক্তার এই এসে পড়ল বলে মুসা ভাই।' বলল ফিলিপ।

জোয়ান জেনের পাশে বসেছিল।

বিছানায় শোয়ার পর চোখ বন্ধ করে ছিল জেন। একটু রেস্ট নেবার পর সে চোখ খুলল।

কোর্টের পকেট থেকে ধীরে ধীরে বের করল সেই ইনভেলাপ। কাঁপা হাতে সেটা জোয়ানের হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'মুসা ভাইকে দাও।'

জোয়ান বিস্ময়ের সাথে ইনভেলাপটি হাতে নিয়ে সেটা তুলে দিল আহমদ মুসার হাতে।

আহমদ মুসার চোখেও কৌতুহল্

সে ইনভেলাপটি হাতে নিয়ে বলল, ‘কি আছে বোন এতে?’

জেন চোখ বুজেছিল। আবার চোখ খুলে বলল, 'দেখুন, বলব না।' জেনের ঠোঁটে এক টুকরো হাসি।

'আহমদ মুসা ইনভেলাপের ভেতর থেকে কাগজগুলো বের করল। কাগজগুলোর ওপর একবার চোখ বুলিয়েই 'আল্লাহু আকবার' বলে আহমদ মুসা সিজদায় পড়ে গলে মেঝের ওপর।

জোয়ান, ফিলিপ, আবদুর রহমানের চোখে মুখে বিস্ময়্

ডপলিপ কাগজুরো তুলে নিল আহমদ মুসার হাতের পাশ থেকে।

চোখ বুলিয়েই চিৎকার কওে উঠল, 'জোয়ান এতো মুসরিম ঐতিহাসিক স্থান ও মাদ্রিদের মসজিদ কমপ্লেক্সে তেজস্ক্রিয় পাতার পরিকল্পনা ও ডায়াগ্রাম।'

'বিস্ময়ে পাথর হয়ে যাওয়া জোয়ান ফিলিপের হাত তেকে কাগজগুলো নিয়ে ওগুলোর ওপর চোখ স্থাপন করল। আবদুর রহমানও এগিয়ে এল জোয়ানের কাছে। তারও চোখ কাগজগুলোতে।

জোয়ান, ফিলিপ, আবদুর রহমান নত মুখে কোন কথা নেই। যেন গভীর কোন স্বপ্নে নিমজ্জিত।

অনেক্ষণ পর সিজদা থেকে মাথা তুলর আহমদ মুসা। গন্ড দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে তার চোখের পানি, ধীরে ধীরে বলল, ‘আমরা যা আশা করতে পারিনি, তার চেয়েও বেশী সাহায্য করেছেন আল্লাহ আমাদেরকে।’

জেনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আল্লাহ তোমাকে দীর্ঘজীবি করুক বোন। আর মানুষ যা আশা করতে পারেনা, তার চেয়েও বড় পুরস্কার আল্লাহ তোমাকে দিন, যখন ওটা মানুষের জন্যে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হবে।'

আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল আহমদ মুসার।

জেনের চোখ থেকেও গড়িয়ে পড়ছিল অশ্রু। শুকনো লাল ঠোঁট তার কাঁপছিল। আহমদ মুসার সিজদা, তার কথা, জোয়ানদের সপ্রশংস বিস্ময়, জেনের

ছোট্ট হৃদয়টা ভরে দিয়েছে অসীম আনন্দ আর আবেগে। তারও মুখে কথা সরছে না।

আহমদ মুসাই আবার কথা বলল, 'আমার জীবনে আজকের মত এত খুশি কোন দিন হইনি বোন।'

জেনের দিকে চেয়ে কথাগুলো বলল আহমদ মুসা। একটু থেমেই আবার বলল জেনকে, 'তাহলে কু-ক্ল্যাক্স- ক্ল্যানের 'elder' তোমার আব্বা, তাই না?'

'জি হ্যাঁ।' চোখ মুছে বলল জেন।

'তোমার আব্বার গুলিতেই তুমি আহত হয়েছ, তাই না?'

'জি, হ্যাঁ। আপনি কি করে জানলেন ভাইয়া?' জেনের কন্ঠে বিস্ময়!

'ব্যাপারটা খুবই সহজ। তোমার গুলি লেগেছে হাঁটুর নিচে। ভাসকুয়েজ অথবা কু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের কেউ এই অবস্থায় গুলি করলে সেটা করত তারা তোমার বুকে, পিঠে অথবা মাথায়।'

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা কাগজগুলো ফিলিপের হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'এগুলো ভালো করে রাখ তুমি।'

তারপর আব্দুর রহমানের দিকে ফিরে বলল, 'তুমি এবং জিয়াদ বের হও বাইরে। কু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের তৎপরতা সম্পর্কে খোঁজ নাও। ওরা কিন্তু এখন ক্ষ্যাপা কুকুরের মত হয়ে যাবে। আর আমি নিচে যাচ্ছি, দেখি জেনের গাড়ীটা পরিষ্কার হলো কি না। গাড়ীর নাম্বার ব্লু-বুক সবই পাল্টে দিতে হবে।'

সবশেষে জোয়ানের দিকে চেয়ে বলল, 'তুমি এখানে বস।'

জোয়ান ছাড়া সবাই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

জোয়ান বিস্ময়ে বোবা হয়ে গিয়েছিল। জেন তার আব্বা, তার পরিবার, তার জাতির বিরুদ্ধে গিয়ে ডকুমেন্টগুলো উদ্ধার করেছে! তার আব্বার পিস্তলে সে গুলী খেয়েছে! জেনের এই রূপ, এই বিশালতা জোয়ানের কল্পনাকেও ছাড়িয়ে গেছে। বিস্ময়ের ঘোর যেন তার কাটছে না।

আহমদ মুসা বেরিয়ে গেলে জোয়ান তার মুখটা নিচু করেছিল। তার মনে হলো আহমদ মুসা যেন ইচ্ছা করেই তাকে এবং জেনকে এভাবে একা রেখে গেল। তা নাও হতে পারে। এটা তার একটা অমূলক চিন্তা হতে পারে। কিন্তু এই চিন্তা

তাকে কিছুটা আড়ষ্ট করেছিল। জোয়ান এবং জেনের ব্যাপারটা কারো কাছেই অপ্রকাশ্য থাকলো না।

জেন তাকিয়ে ছিল জোয়ানের দিকে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, ‘কথা বলছ না যে?’

জোয়ান মুখ তুলল। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল জেনের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে বলল, ‘ট্রিয়েস্টে তুমি আমাকে জীবন বিপন্ন করে বাঁচিয়ে ছিলে, তখনও পরো তোমাকে আমি চিনতে পারি নি। সত্যি আমার চোখ এত কম দেখে। আজ তোমাকে চিনতে পেরেছি জেন।’

বলতে বলতে জোয়ানের কন্ঠ ভারী হয়ে এল। চোখ ফেটে নেমে এল অশ্রু।

জেনের ঠোঁটে হাসি। বলল, ‘এই চিনতে না পারা তোমার দোষ নয় জোয়ান। তুমি বিজ্ঞানী। তুমি বস্তুর গভীরে বিচরণে ব্যস্ত, মানুষের মনে প্রবেশের তোমার সময় কোথায়?’

থেমে একটু দম নিল জেন। তারপর বলল, ‘আজ কতটা চিনতে পেরেছে বলত জোয়ান। তাহলে বুঝব, বিজ্ঞানী সাহেবের চিনার মধ্যে কোন ফাঁক আছে কি না?’

জেনের চোখের ওপর চোখ রেখে জোয়ান বলল, ‘না বলব না। এটা বলার জিনিস নয়। হৃদয় দিয়ে অনুভব করার জিনিস এটা।’ জোয়ানের কন্ঠ তখনও ভারী। চোখে তখন পানি।

জেনের মুখ লাল হয়ে উঠল। কাঁপছে আবেগে তার পাতলা শুকনো ঠোঁট। বলল সে, ‘একটু কাছে আসবে জোয়ান? অন্যায় না হলে তোমার চোখের পানিটা আমি আমার হাত দিয়ে মুছে দিতে চাই’।

‘তোমার পক্ষ থেকে আমিই মুছছি।’ বলে জোয়ান হেসে পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখের পানি মুছে নিয়ে রুমালটা জেনকে দিল।

জেন জোয়ানের রুমাল দু’হাত ভরে নিয়ে, সে দু’হাতের মধ্যে নিজের মুখট গুজলো।

এই সময় ফিলিপের মা দুধ নিয়ে প্রবেশ করল। তার প্রায় সাথে সাথেই ডাক্তার সহ আহমদ মুসা ও ফিলিপ ঘরে এসে ঢুকল। ডাক্তার ফিলিপের বাস্ক সম্প্রদায়েরই একজন। ডাক্তারের সাথে একজন নার্সও এসেছে।

ডাক্তার ক্ষতটি পরীক্ষা করে বলল, 'ক্ষতটি বড়, কিন্তু বুলেট বেরিয়ে যাওয়ায় এখন আর তেমন জটিলতা নেই। কিন্তু প্রচুর রক্ত গেছে ইতিমধ্যেই, রক্ত দিতে পারলে ভাল হতো।'

'সমস্যা আছে তুমি তো জান। অপরিহার্য হলে সে ব্যবস্থা এখানেই করতে হবে।'

ডাক্তার আরও পরীক্ষা করে বলল, 'প্রয়োজন আছে যদিও, কিন্তু প্রয়োজনটা অপরিহার্য নয়। দু'এক দিনেই ঠিক হয়ে যাবে।'

জেন দুধ খেয়ে শুয়ে পড়ল।

ডাক্তার নার্সকে ইশারা করল, ব্যাগ খুলে প্রয়োজনীয় সব বের করার জন্যে।

নার্স কাজে লেগে গেল।

ডাক্তার এপ্রোনটি পরে নিয়ে হাতে গ্লাভস লাগিয়ে তৈরী হলো।

হাঁটু পর্যন্ত চাঁদর দিয়ে ঢেকে দেয়া হল জেনকে।

ডাক্তার ফিলিপের মাকে বলল, 'খালাম্মা এর মাথার কাছে একটু বসেন।'

আহমদ মুসা, ফিলিপ, জোয়ান সবাই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ডাক্তার জেনকে বলল, 'তোমাকে ধৈর্য্য ধরতে হবে, একটু কষ্ট হবে বোন।' বলে জেনকে একটা ইনজেকশন দিয়ে তুলা কাঁচি ইত্যাদি নিয়ে জেনের বুলেট বিদ্ধ ক্ষতের দিকে এগুলো।

জেন দাঁতে দাঁতে চেপে চোখ বন্ধ করল।

পরের দিন সকাল।

নামাজ পড়েই তারা আলোচনায় বসল।

আহমদ মুসা জেনের ডকুমেন্ট উদ্ধারের কাহিনী শুনিয়ে বলল, ‘জেন আজকের ত্যাগ ও সাহসের একটা দৃষ্টান্ত। সে আমাদের জন্যে আল্লাহর পত্যক্ষ সাহায্য। জেনের আজ বেশ জ্বর উঠেছে। সবাই দোয়া কর, আল্লাহ জেনকে তাড়াতাড়ি সুস্থ করে তুলুন।’

একটু থামল আহমদ মুসা। থেমেই আবার শুরু করল, ‘এখন কাজের কথায় আসি। যে ডকুমেন্টের জন্যে এতদিন আমরা উন্মুখ হয়েছিলাম, আল্লাহ সেটা আমাদের জুটিয়ে দিয়েছেন। এখন বল আমরা কোন পথে এগুবো?’

‘আমাদের কাছে তো একটাই পথ। ডায়াগ্রাম অনুসারে খুঁড়ে তেজস্ক্রিয়গুলো তুলে ফেলতে হবে।’ বলল যিয়াদ বিন তারিক।

ফিলিপ, জোয়ান, আব্দুর রহমান সবাই তাকে সমর্থন করল।

‘কিন্তু এভাবে,’ বলতে শুরু করল আহমদ মুসা, ‘তুলে ফেলা কি সম্ভব? প্রথম কথা হলো ঐতিহাসিক স্থান গুলো সরকারের নজরে রয়েছে, তারা এভাবে খুড়তে দেবে কেন? সব চেয়ে বড় কথা হলো, তেজস্ক্রিয় পাতার ডকুমেন্টগুলো হারাবার পর কু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান এখন নজর রাখবে মাদ্রিদের শাহ ফয়সাল মসজিদ সহ কর্ডোভা, গ্রানাডা, মালাগা, প্রভৃতি সবগুলো মুসলিম ঐতিহাসিক স্থানের উপর। কাজ করতে গেলেই ওদের হাতে ধরা পড়তে হবে অথবা সংঘাত বাঁধবে। এসবের মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারবো না।’ কথা শেষ করল আহমদ মুসা।

ফিলিপ, জোয়ান, যিয়াদ, আব্দুর রহমান সকলেরই মুখ মলিন হয়ে উঠল। হতাশা দেখা দিল তাদের চোখে মুখে।

ফিলিপ বলল, ‘আপনি ঠিক বলেছেন মুসা ভাই। আমরা এ দিকটা চিন্তা করিনি। ওদের চোখ এড়িয়ে তেজস্ক্রিয় তুলে ফেলার কাজ কিছুতেই সম্ভব নয়।’

‘উপায় কি তাহলে এখন?’ বলল যিয়াদ।

‘ডকুমেন্ট পরীক্ষার করার পর গত রাত থেকে আমি ভিন্ন একটা চিন্তা করছি।’ বলল আহমদ মুসা।

‘কি সেটা?’ তিন জন এক সাথে বলে উঠল।

‘আমি ভাবছি, ডকুমেন্ট গুলো আন্তর্জাতিক একটি নিউজ মিডিয়া এবং মুসলিম বিশ্বের সংবাদপত্র গুলোর কাছে পাচার করে দেব’।

‘তার পর।’ বলল ফিলিপ।

‘আন্তর্জাতিক নিউজ মিডিয়া এবং মুসলিম বিশ্বের সংবাদপত্র গুলো এখবর লুফে নেবে বলে আমি মনে করি।’

‘তাতে আমাদের কি লাভ? আমাদের উদ্দেশ্য তো তাতে সিদ্ধ হবে না। তেজস্ক্রিয় গুলো তো উঠবে না।’ বলল যিয়াদ।

‘বল কি! আমরা একটা নয়, তখন তিনটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারবো।’

তিনজনই বিস্ময় ভরা দৃষ্টিতে আহমদ মুসার দিকে তাকাল।

‘প্রথম লাভ হলো, শুরু করল আহমদ মুসা, কু-ক্ল্যাক্স- ক্ল্যানের ভীষন বদনাম হবে, তার উপর সব দিক থেকে চাপ পড়বে এবং তাতে সংগঠনটাই দূর্বল হয়ে পড়বে। দ্বিতীয় লাভ মুসলিম জাতি সম্পর্কে স্পেনীয় দৃষ্টিভংগি বিশ্ববাসীর কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে, তার ফলে স্পেন সরকারের উপর প্রচন্ড চাপ পড়বে। তাছাড়া ঐতিহাসিক স্থান গুলো ধ্বংস হলে প্রতি বছর কোটি কোটি বৈদেশিক মুদ্রার আয় থেকে বঞ্চিত হবে স্পেন। স্পেন প্রতি বছর পর্যটন খাত থেকে আয় করে ১৬ বিলিয়ন ডলার, এর মধ্যে ১২ বিলিয়ন ডলার আসে মুসলিম ঐতিহাসিক স্থান গুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট পর্যটকদের কাছ থেকে। সুতরাং বদনাম ও চাপ থেকে রক্ষা পাওয়া অন্য দিকে দেশের আর্থিক স্বার্থ রক্ষার জন্যেই স্পেন সরকার সরকারী ভাবে তেজস্ক্রিয় গুলো তুলার ব্যবস্থা করবে। তৃতীয় লাভ হলো, স্পেনীয় মুসলমানদের সম্পর্কে এই সচেতনতার সুযোগে স্পেনের মুসলমানরা তাদের ন্যায্য ও গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় করে নেবার সুযোগ পেতে পারে।

থামল আহমদ মুসা।

ফিলিপদের চোখে তখন বিস্ময় ও আনন্দ ঠিকরে পড়ছে।

‘আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবি করুন।’ আপনি ক’টি কথায় একটা সোনালী স্বপ্ন ফুটিয়ে তুলেছেন আমাদের সামনে। আপনার প্রতিটি কথা সত্য হোক।’ আবেগের সাথে বলল যিয়াদ।

‘যিয়াদ স্বপ্ন বলেছে, কিন্তু আমার কাছে আপনার প্রতিটি কথা বাস্তব মনে হচ্ছে। কিন্তু একটা প্রশ্ন, কু-ক্ল্যাক্স- ক্ল্যান বা স্পেনের উপর চাপ আসবে কেন? মুসলমানদের সে রকম বন্ধু কোথায়?’ ফিলিপ বলল।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘তোমার কথা ঠিক কিন্তু তোমরা জান, প্রত্যেক জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য রক্ষার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিধান আছে। এরই অংশ হিসেবে ইউনেস্কো পৃথিবীব্যাপী জাতি সমূহের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও পুরাকীর্তি রক্ষার চেষ্টা করছে। আন্তর্জাতিক এ বিধি, নিয়ম ও মনোভাবের সাহায্য আমরা পাব। কর্ডোভা ও গ্রানাডার অমন কীর্তিসমূহ এবং আল-হামরার মত অতুলনীয় স্থাপত্য কীর্তি ধ্বংস হোক দুনিয়ার মানুষ তা চাইবে না। সুতরাং চারদিক থেকে চাপ আসবেই।’

‘কিন্তু এই লক্ষ্য অর্জন করতে হলে তো চাই ব্যাপক প্রচার এবং প্রচারের মাধ্যমে বিশ্বজনমত গঠন। এটা কি সম্ভব হবে?’ বলল ফিলিপ।

‘কতখানি সম্ভব হবে জানিনা। তবে চেষ্টা আমাদের করতে হবে। আজ ভোরেই আমি ফিলিস্তিন, মধ্য এশিয়া প্রজাতন্ত্র ও সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূতের সাথে বিষয়টা নিয়ে আলচনা করেছি। আমি তাঁদের ইংগিত দিয়েছি মুসলিম বিশ্বের কাগজ গুলোতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ডকুমেন্ট ছাপার ব্যবস্থা করতে হবে। তাদেরকে অনুরোধ করেছি কোনও ভাবে EWNA(EURO WORLD NEWS AGENCY)-এর সাথে যোগাযোগ করে ডকুমেন্টটি তাদের মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করতে। তারা কাজ শুরু করে দিয়েছে। ১০টার দিকে তাদের কাছ থেকে জানতে পারবো কতদূর তারা এগুলো। মনে রেখো তোমরা, আজ সকাল ১০টায় যিয়াদকে সেন্টপল গীর্জার গেটের পশ্চিম পাশে দাঁড়ানো ৭৮৬৭৮৬ নং গাড়িতে গিয়ে উঠতে হবে। সেই গাড়ী কোন এক জায়গায় মধ্য এশিয়া প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রদূতের সাথে তাকে দেখা করিয়ে দেবে। ডকুমেন্ট গুলো তাকে দিতে হবে, সেই সাথে আমার চিঠি। আর তিনি যে খবর দেবেন তা আনতে হবে।’

থামল আহমদ মুসা।

‘আল হামদুলিল্লাহ, আপনি তো অনেক দূর এগিয়েছেন মুসা ভাই।’ বলল আবদুর রহমান।

‘অনেক দূর কোথায়, সবে তো শুরু।’

‘যোগাযোগের কাজটা তো হয়েছে, এই কাজেই তো আমাদের লাগতো দিনের পর দিন।’

‘তা হয়েছে।’

‘মুসা ভাই, বলতে শুরু করল জোয়ান, আমি একটা কথা ভাবছি, ডকুমেন্ট গুলো দিয়ে কি আমরা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করতে পারবো যে, তেজস্ক্রিয় দিয়ে মুসলিম ঐতিহাসিক স্থানগুলো ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রটি কু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের? আর ডকুমেন্ট গুলো দিয়ে কি প্রমাণ করা যাবে যে, সেটা এক ভয়াবহ ষড়যন্ত্র? যদি তা যায়, তা’হলে আমি মনে করি বিশ্বের নিউজ মিডিয়ায় তা ভাল কভারেজ পাবে, দুনিয়ায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করবে।’ বলল জোয়ান।

‘তুমি একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট তুলেছ জোয়ান। ডকুমেন্টগুলোর নির্ভরযোগ্যতাই কিন্তু আমাদের মূলধন। এ বিষয়টা নিয়ে আমি চিন্তা করেছি। পরিকল্পনা আমরা যেটা পেয়েছি, তাতে তেজস্ক্রিয় ক্যাপসুলের কার্যকারিতার প্রকৃতি, কার্যকারিতার মেয়াদ, বিল্ডিং ও স্থাপনার প্রকৃতি ও থাকার আয়তন অনুসারে লক্ষ্য অর্জনের মেয়াদের বিভিন্নতা, কর্ডোভা, গ্রানাডা, মালাগা, মাদ্রিদ শাহ্ ফয়সল মসজিদ কমপ্লেক্স, প্রভৃতি থেকে তেজস্ক্রিয় ক্যাপসুল তুলে নেবার সময় নির্দিষ্ট, না তুললে এলাকার কি কি ক্ষতি হবে, ইত্যাদির বিবরণ সুষ্ঠভাবে দেয়া আছে। আর ডায়াগ্রামে রয়েছে কর্ডোভা, গ্রানাডা, মালাগা, প্রভৃতির ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলোর কোন কোন স্থানে তেজস্ক্রিয় পুঁতে রাখা হয়েছে তার নিখুঁত মানচিত্র।...’

আহমদ মুসার কথার মাঝখানে ফিলিপ বলে উঠল, ‘আচ্ছা পরিকল্পনা ও ডায়াগ্রামে কর্ডোভা, গ্রানাডা প্রভৃতিকে কি তাদের নামেই উল্লেখ করা হয়েছে?’

‘হ্যাঁ।’ বলল আহমদ মুসা।

‘এখন বাকি থাকল,’ আহমদ মুসা শুরু করল আবার, ‘কু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান এটা করেছে কি না তা প্রমাণ করা, এই তো? সেটাও সহজে প্রমাণ করার মত দলিল আমরা পেয়েছি। প্ল্যান ও ডায়াগ্রামের সাথে আদেশ দান সুলভ একটা চিঠি আছে। চিঠিতে কোন পটভূমিতে কি উদ্দেশ্যে কু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান এর নির্বাহী কমিটি

এ সিদ্ধান্ত নেয় তার উল্লেখ করে প্ল্যান কার্যকর করার নির্দেশ জারী করা হয়েছে। শেষে স্বাক্ষর রয়েছে ভাসকুয়েজের। আমি মনে করি, তেজস্ক্রিয় ষড়যন্ত্রের সাথে কু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের সম্পর্ক প্রমাণের জন্যে এ চিঠিই যথেষ্ট।'

ফিলিপদের মুখ খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ফিলিপ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'চলুন, নাস্তা রেডি।'

সবাই উঠে দাঁড়াল।

রাত তখন দশটা।

ফিলিপের তিনতলার ড্রইংরুমে বসেছিল আহমদ মুসা, ফিলিপ ও জোয়ান।

খুশীতে মুখ উজ্জ্বল করে বাইরের দরজা দিয়ে ড্রইংরুমে প্রবেশ করল যিয়াদ ও আবদুর রহমান।

ওদের সাথে মধ্য এশিয়া প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাতের সময় ছিল রাত ৮টায়। ডকুমেন্ট গুলো বিশ্ব সংবাদ মাধ্যমগুলোতে প্রচারের কি ব্যবস্থা হয়েছে সে বিষয়ে রাষ্ট্রদূতের যিয়াদদেরকে জানাবার কথা এ সময়।

ওদের হাসি মুখ দেখে খুশী হল আহমদ মুসারা।

ওরা এসে বসল।

'কাঁটায় কাঁটায় দশটায়, কথা শুরু করল যিয়াদ, মধ্য এশিয়া প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রদূতের সাথে আমাদের দেখা হলো। তিনি আমাদের দেখে হাসলেন। বললেন, মাই বয় ইনশাআল্লাহ্ আমরা খেলায় জিতে যাচ্ছি। সৌদি আরব, আফগানিস্তান, ইরান ফিলিস্তিন সরকার এ বিষয়টাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছে। যা কল্পনাও করতে পারিনি আমরা। দুপুরের মধ্যেই আমার সরকারের কাছ থেকে ওরা ডকুমেন্ট পেয়ে গেছে। সংগে সংগেই সৌদি আরব বিষয়টা ও আই সি সেক্রেটারিকে জানিয়েছে। খবরটা আজ শুধু মুসলিম দেশগুলোর পত্রিকায় আসবে তা নয়, খবর বেরুবার সাথে সাথে ও আই সি সহ দেশগুলোর তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার ব্যবস্থাও হয়েছে। অন্যদিকে একটা সূত্রের মাধ্যমে ডকুমেন্টগুলোর Euro World News Agency এর ফ্রান্স অফিসে পৌঁছিয়েছি। সূত্রের মাধ্যমে আমরা জানিয়েছি তারা যদি আজ রাত ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে নিউজটি ক্রিট করে,

তা’হলে মুসলিম দেশের পত্র পত্রিকা তাদের নিউজই ছাপাবে, অন্যথায় সরাসরি ডকুমেন্ট গুলো আমরা তাদের দিয়ে দেব। EWNA নিউজটার প্রতি খুব আগ্রহ দেখাচ্ছে বলে সূত্রের মারফৎ আমরা জানতে পেরেছি। যদি EWNA নিউজটি শেষ পর্যন্ত ক্রিট না করে। বিকল্প চিন্তাও আমাদের আছে। এই হলো মধ্য এশিয়া প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রদূতের খবর, আমি তার কথাতেই পেশ করলাম।’

থামল যিয়াদ।

আহমদ মুসা সহ সবারই মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আহমদ মুসা বলল, ‘মুসলিম বিশ্বের প্রতিক্রিয়ার সাথে সাথে আমরা ইউনেস্কো মানবাধিকার কমিশন, প্রভৃতি জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা এবং বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র ও মানবাধিকার গ্রুপগুলোর প্রতিবাদ, অনুকুল প্রতিক্রিয়া আমরা চাই।

‘হ্যাঁ মুসা ভাই,’ বলতে শুরু করল যিয়াদ, ‘রাষ্ট্রদূত এ ব্যাপারেও বলেছেন। বলতে ভুলে গেছি। তিনি বলেছেন, ও আই সি’র মাধ্যমে আজকেই ইউনেস্কো মানবাধিকার কমিশন সহ জাতিসংঘে ডকুমেন্টগুলো পৌঁছে দেয়া হবে। পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের কাছেও ও আই সি ডকুমেন্টগুলো পৌঁছানোর দায়িত্ব নিয়েছে।’

‘আল হামদুলিল্লাহ। প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ কাজটা মনে হচ্ছে ভালোভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। তবে একটা কথা ভাবছি, E.W.N.A. W.N.A. N.A.N.A. ইত্যাদির মত পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যমের দ্বারা যদি নিউজটা প্রচার করা না যায়, তা’হলে পশ্চিমা সংবাদ পত্রে কভারেজ পাবে না এবং তার ফলে পশ্চিমা জনমতকে অনুকুলে আনা কঠিন হবে।’ চিন্তিত ভাবে বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা কথা শেষ করার সাথে সাথেই সামনে রাখা টেলিফোনটা বেজে উঠল।

টেলিফোন ধরল ফিলিপ।

টেলিফোন ধরে ওপারে কথা শুনেই চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল ফিলিপের। তার চোখে মুখে বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠল। বলল সে, ‘Hold on please দিচ্ছি।’ বলে ফিলিপ টেলিফোনটা আহমদ মুসাকে দিয়ে দিল।

আহমদ মুসা ‘হ্যালো’ বলার পর ওপারের কথা শুনার সংগে সংগেই তার চোখ মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে রুমাল বের করে রিসিভারের স্পীকারের ওপর বসিয়ে বলল, ‘সরি, রং নাম্বারে টেলিফোন করেছেন। নাম্বার আবার চেক করুন। থ্যাংকস।’ বলে আহমদ মুসা টেলিফোন রেখে দিল।

ফিলিপের মুখ কালো হয়ে গেছে আহমদ মুসার মিথ্যা বলা দেখে। বলল, ‘এ কি মুসা ভাই ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদের সাথে কথা বললেন না। আর একেবারে...’

কথা শেষ করতে পারলনা ফিলিপ। আহমদ মুসা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল,‘মিথ্যা বললাম’ এই তো? মিথ্যা না বলে উপায় ছিলনা। মাহমুদ যে এতবড় ভুল করবে, ভাবতে আমার বিস্ময় লাগছে। সম্ভবত ডকুমেন্টগুলো পেয়ে এত খুশী হয়েছে কিংবা উত্তেজিত হয়েছিল যে, সে কাণ্ডজ্ঞান কিছুটা হারিয়ে ফেলেছিল। যা হোক, দেখো তার সাথে আমার কথা বলার অর্থ হলো, আহমদ মুসা কোন টেলিফোনে এখন আছে তা স্পেনের গোয়েন্দা বিভাগকে জানিয়ে দেয়া। আর টেলিফোন নাম্বার পেলে কম্পিউটারে মালিকের ঠিকানা বের করা কয়েক মিনিটের ব্যাপার মাত্র।’

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা কি ভেবে দ্রুত কণ্ঠে বলল, ‘আচ্ছা ফিলিপ মাহমুদ তোমাকে কি বলেছিল?’

‘বলেছিল, আমি ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ বলছি। আহমদ মুসার সাথে কথা বলব।’

চোখে চাঞ্চল্য এবং কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল আহমেদ মুসার। বলল,‘ফিলিপ নতুন বাড়ীতে উঠার তোমার কতদূর?’

‘আজ বিকেলে আম্মা এবং জেন চলে গেছে ওখানে। আম্মা কিছু জিনিষপত্রও নিয়ে গেছেন। অবশিষ্ট নিয়ে কালকেই আমরা চলে যাব।’ বলল ফিলিপ।

কাল সময় পেলে পার হওয়া যাবে, কিন্তু এখনি আমাদেরকে এখান থেকে সরতে হবে। আমার অনুমান মিথ্যা না হলে কিছুক্ষণের মধ্যেই অথবা আজ রাতে

সরকারী গোয়েন্দারা অথবা তাদের কাছ থেকে খোঁজ পেয়ে কু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান এ বাড়ীতে চড়াও হবে। আমি যদিও রং নাম্বার বলে টেলিফোন রেখে দিয়েছি, যদিও টেলিফোনের স্পিকারে রুমাল লাগিয়ে কণ্ঠ বদলের চেষ্টা করেছি, তবু এ কথা স্পেনের গোয়েন্দা বিভাগ নিশ্চিত ধরে নেবে, একটা দেশের প্রেসিডেন্ট কোন রং নাম্বারে টেলিফোন করতে পারেন না। তা'ছাড়া প্রথমে আমি অরিজিনাল পরে 'হ্যালো' বলেছি, পরে স্বর পরিবর্তন করেছি, এটাও তাদের নজর এড়াবে না। এখন 'হ্যালো' শব্দ যে আহমদ মুসার তা তারা রেকর্ডের সাথে মিলালেই বুঝতে পারবে। অতএব তারা নিশ্চিত হয়ে অথবা নিশ্চিত হবার জন্যে অবশ্যই এখানে ছুটে আসবে'।

কথা শেষ হবার সংগে সংগেই ফিলিপ উঠে দাঁড়াল। আবদুর রহমানকে লক্ষ্য করে বলল, ড্রাইভারদের গাড়ি বের করতে বল। জেনের গাড়িও।

ফিলিপ ছুটে ওপরে গেল।

'আচ্ছা মুসা ভাই, আপনার চিন্তা কি রকেটের গতিতে চলে? কোন কিছুই কি আপনার নজর এড়ায় না?' বলল যিয়াদ।

'টেলিফোনের ব্যাপারটা বলছ তো? ওটা তো একটা সাধারণ ব্যাপার ছিল'।

'কিন্তু আপনি না বললে এর মধ্যে কোন অস্বাভাবিক বা ক্ষতিকর কিছু খুঁজে পেতাম না'। বলল জোয়ান।

'এখন বলছ পেতেনা, কিন্তু দায়িত্বে থাকলে অবশ্যই পেতে'। হেসে বলল আহমদ মুসা।

'শুধু দায়িত্বের কারণে এ জ্ঞান আসে না, এমন জ্ঞান যাদের আছে তারাই দায়িত্বে আসে'। বলল যিয়াদ।

'মৌলিক ভাবে তোমার এ কথা ঠিক যিয়াদ। কিন্তু দায়িত্বে গেলে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রসারিত হয়'। বলল আহমদ মুসা।

ফিলিপ তার লোকদের সাথে কিছু জিনিসপত্র নিয়ে নেমে এল।

সবাই মিলে চারটি গাড়িতে চেপে একে একে চলে গেল। সর্বশেষ গাড়িতে আহমদ মুসা ও ফিলিপ।

তিনটি গাড়ি চলে গেল।

আহমদ মুসাদের গাড়ি ফিলিপের বাড়ীর বিপরীত পাশের পার্কিংটায় গিয়ে দাঁড়াল।

আহমদ মুসাদের খুব বেশী বসতে হলো না।

ঘন্টা খানেকের মধ্যেই চারটি পিক-আপ ফিলিপের বাড়ীর কিছুটা দুরে এসে দাঁড়াল। তারপর পিকআপ থেকে নেমে এল প্রায় চার ডজন সামরিক লোক। তারা ছুটে গিয়ে ঘিরে ফেলল বাড়ী। আহমদ মুসা ও ফিলিপ দুজনেই দূরবীনে এ দৃশ্য দেখল।

'আপনার জ্ঞান সামান্য ভুল করলে এখন কি ঘটত মুসা ভাই। ইদুর ফাঁদে পড়ার মতই আমরা ফাঁদে পড়তাম'। হেসে বলল ফিলিপ।

'চল আমাদের কাজ শেষ, ওরা খুঁজে মরুক, আমরা চলে যাই'।

ফিলিপ স্টার্ট দিল গাড়িতে।

পার্কিং থেকে বেরিয়ে গাড়ী ছুটল ফিলিপের নতুন বাড়ির দিকে।

ভাসকুয়েজ ভীষণ উত্তেজিত।

পায়চারি করছে তার অফিসে। ঘরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত। দু'টি হাত তার পেছনে মুষ্টিবদ্ধ।

সন্ধ্যায় খবর পাওয়ার পর থেকে পাগলের মত হয়ে গেছে ভাসকুয়েজ।

Euro World News Agency (ইউরো ওয়ালর্ড নিউজ এজেন্সী-EWNA) এর প্যারিস অফিসের কু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের একজন এজেন্ট ভাসকুয়েজকে টেলিফোনে সব জানিয়েছে। বলেছে, সমস্ত ডকুমেন্ট এজেন্সী কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছেছে। কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুসারে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরী হয়ে ট্রান্সমিশন এডিটরের কাছে এসেছে।

খবরটা জানার পর ভাসকুয়েজের কাছে পরিষ্কার হয়েছে, কি ঘটতে যাচ্ছে। EWNA নিউজটি ক্লিট করার অর্থ বিশ্বের সমস্ত দৈনিকে তা প্রকাশিত হবে

এবং স্পেনে মুসলিম স্থাপনা ও ঐতিহাসিক স্থানগুলো ধ্বংস করার কু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের ষড়যন্ত্র গোটা দুনিয়ায় ফাঁস হয়ে যাবে। তাতে তাদের উদ্দেশ্যই শুধু মাঠে মারা যাবে না, কু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান বিশ্বব্যাপী নিন্দিত হবে, এমনকি স্পেন সরকারের রোষদৃষ্টিতে পড়বে তারা। এ অবস্থা ঠেকাবার একমাত্র পথ EWNA কে ঐ খবর প্রচার থেকে বিরত রাখা।

সন্ধ্যার পর থেকে ভাসকুয়েজ এই চেষ্টাই করেছে। আমেরিকায় কু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের সাহায্য চেয়েছে সে। আমেরিকান কু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান এর প্রধান বিশ্ব ইহুদি কংগ্রেসের সভাপতি আইজাক আব্রাহামকে ধরেছে। আইজাক আব্রাহাম কথা দিয়েছে, EWNA এর চেয়ারম্যান মিখাইল এ্যাঞ্জেলোকে বলে দেবে যেন নিউজটি EWNA থেকে প্রচার না করা হয়। আইজাক আব্রাহাম কি করল কি করতে পারল তারই অপেক্ষা করছে ভাসকুয়েজ। ভাসকুয়েজের আশা জাগছে, EWNA-এর প্রধান মিখাইল বিশ্ব ইহুদি কংগ্রেসের সভাপতির কথা নিশ্চয় ফেলতে পারবে না।

ওদিকে ভীষণ অবস্থা তখন EWNA –এর সদর দফতরে।

বিশ্ব ইহুদি কংগ্রেসের সভাপতির টেলিফোন পাওয়ার পর মাথায় ঘাম দেখা দিল EWNA এর প্রধান মিখাইল এ্যাঞ্জেলোর। নিউজ তো অলরেডি ট্রান্সমিশন টেবিলে চলে গেছে। ওটাকে ফিরাবে কোন যুক্তিতে। আর এতবড় চাঞ্চল্যকর নিউজ EWNA তার জীবনে পায়নি। অন্যদিকে আইজাক আব্রাহামের অনুরোধ ফেলবে কি করে। তার অনুরোধ অনেকটা নির্দেশের মতই।

মিখাইল এ্যাঞ্জেলো ঠিক করলো একা এ সিদ্ধান্ত সে নেবে না। সাংবাদিকদের বুঝাবার প্রশ্ন আছে। তাদের মধ্যে যারা প্রফেশনাল এবং তার সংবাদ সংস্থার প্রাণ, তারা ঐ নিউজ পেয়ে আকাশের চাঁদ পাওয়ার মত খুশী হয়েছে।

বোর্ডের মিটিং বসল রাত আটটায়।

EWNA-এর পরিচালনা বোর্ডের মিটিং। মিটিং-এ মিখাইল সব ঘটনা উপস্থাপন করল।

পরিচালনা বোর্ডের সদস্য ৭ জন। সদস্যদের প্রত্যেকেই ইউরোপের শীর্ষস্থানীয় ধনকুবের ও রাজনীতিক।

সব শুনে জার্মানীর হেনরী হারজল বলল, 'মিটিং না ডেকেও চেয়ারম্যান নিউজ বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন। কারণ আইজাক নিষেধ করার পর এ নিউজ সার্ভিসে দেয়া যায় না। কিন্তু মিটিং ডাকা দেখে আমার মনে হচ্ছে, চেয়ারম্যান বোধ হয় আইজাকের অনুরোধের ব্যাপারে অন্য রকম চিন্তা করছেন'।

থামল হেনরী হারজল।

হেনরী হারজল থামতেই কথা বলে উঠল জার্মানীরই আরেকজন সদস্য হের গোয়োরং। বলল, সম্মানিত সদস্য হারজলের কথা শুনে মনে হচ্ছে আইজাকের কথাই যেন EWNA-এর জন্যে শেষ কথা। কিন্তু তা কিছুতেই হতে পারে না। আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে EWNA –এর স্বার্থ সামনে রেখে। যেহেতু বিষয়টা দু'দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই সম্মানিত চেয়ারম্যান সাহেব মিটিং ডেকে যথার্থ দায়িত্ব পালন করেছেন'।

'মনে হয় কোন তর্কে না গিয়ে বিষয়টা সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন করে আমাদের সিদ্ধান্ত দেয়া উচিত। বিষয়টা আসলেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিউজের দিকে থেকে এমন মূল্যবান নিউজ EWNA কখনও পায়নি। আবার EWNA আইজাকের মত লোকের কাছ থেকে এমন অনুরোধ কখনও পায়নি। আমি সম্মানিত সদস্যদের সুচিন্তিত মত দেবার জন্যে অনুরোধ করছি'। বলল EWNA এর চেয়ার্যম্যান মিখাইল।

এবার কথা বলল ফ্রান্সের পিয়েরো মিঁতেরা। বলল, 'সংবাদ সংস্থা হিসেবে নিউজ পেয়েছি, তা আমরা প্রচার করবো, এটাই আমাদের দায়িত্ব, গ্রাহকদের কাছেও এটা আমাদের কমিটমেন্ট। এখন দেখতে হবে প্রথমঃ নিউজটা নির্ভরযোগ্য কি না, দ্বিতীয়তঃ ছাপলে কি কি মন্দ দিক আমাদের জন্যে আছে। এ দু'দিকের বিচার করেই আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমার মত হলো, নাম কিনতে যেয়ে যদি আমরা ক্ষতির মধ্যে পড়ি, তা'হলে আমরা নিউজ প্রচার থেকে বিরত থাকতে পারি'।

বৃটেনের সদস্য জেমস কিট বলল, 'আমি পিয়েরেকে সমর্থন করছি। ক্ষতিকর দিকগুলোই আমাদের বিশেষ ভাবে বিবেচনা করতে হবে। আমাদের সংবাদ মাধ্যম একদিকে ব্যবসায়, অন্যদিকে আমাদের রাজনীতিও। ব্যবসার অর্থ এর মাধ্যমে আমরা লাভ করতে চাই, লাভ করার জন্যে এর ক্রমবর্ধমান প্রসার চাই। আর আমাদের রাজনীতির অর্থ হলো, আমাদের ইউরোপ, আমাদের পাশ্চত্যের স্বার্থের সংরক্ষণ আমরা করতে চাই। এই রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচ্য নিউজটি আমাদের মিত্রদেশ স্পেন এবং স্পেনের খৃষ্টান জনগণের ক্ষতি করবে। আমাদের জাতীয়তাবাদী ও জাতির সেবায় নিবেদিত কু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের ভীষণ ক্ষতি করবে। সম্ভবত আইজাক এই দিক গুলো সামনে রেখেই অনুরোধ করেছেন। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা কঠিন। কঠিন নানা কারণে। বাস্তবতা হলো, আমাদের কোম্পানী যে ব্যাংকিং সুবিধা পাচ্ছে, তা বন্ধ করার ক্ষমতা আইজাক রাখেন, এ কথা আমরা সকলেই জানি। দ্বিতীয়তঃ আইজাক চাইলে EWNA-কে অচল করে দিতে পারেন। সকলেরই জানা আছে, আমাদের সংবাদ সংস্থার ৬০ভাগ সদস্য ইহুদি। তারা ঐক্যবদ্ধ এবং সক্রিয়। সুতরাং আইজাককে ক্ষেপালে আমাদের কোম্পানীর চাকাই অচল হয়ে যাবে। অন্যদিকে লাভটা হবে এই, গ্রাহকদের কাছে আমাদের সুনাম বাড়বে, ব্যবসায়ের সম্প্রসারণও হতে পারে। কিন্তু এই লাভের চেয়ে আমাদের ক্ষতির পাল্লা অনেক ভারি হবে। সুতরাং নিউজটা প্রচার না করার মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে।

জেমস কিটের দীর্ঘ বক্তব্য শেষ হতেই হের গোয়েরিং বলল, 'জেমস যে ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছে, তাতে ইহুদিদের স্বার্থরক্ষা করে চলা ছাড়া EWNA – এর আর কোন পথ নেই। এই যদি আমাদের কোম্পানীর ব্যবস্থা হয়, তা'হলে কোম্পানীর ভবিষ্যত নিয়ে ভাবা দরকার। আমাদের ব্যবসায়, আমাদের সংবাদ সংস্থা কোন এক গ্রুপের হাতে জিম্মি হয়ে থাকবে-তা হতে পারে না। কথাটা যখন জেমস তুলেছেই তখন বলতে চাই, ইউরোপে খৃষ্টানদের সংখ্যা ৪শ' কোটিরও বেশী অথচ এখানে ইহুদিদের সংখ্যা মাত্র ১ কোটি ৪৬ লাখ। অথচ আমাদের কোম্পানীতে ইহুদি জনসংখ্যার হার ৬০ শতাংশ। এটা হলো কি করে?'

গোয়েরিং এর কথা শেষ হতেই হেনরী হারজল গোয়েরিং-এর তীব্র প্রতিবাদ করে বলল, 'গোয়েরিং সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন তুলেছে। নাজীদের কবর হওয়ার পর এ সাম্প্রদায়িক প্রশ্নেরও কবর হয়েছে। যোগ্যতার ভিত্তিতেই আমাদের কোম্পাণীতে লোক রিক্রুট হয়, এতে আপত্তি করার কিছু নেই।'

'যোগ্যতা ইহুদিদের মনোপলি আমি তা মানিনা। হারজল সাম্প্রদায়িকতার কবর হওয়ার কথা বলেছেন, কিন্তু আমি বলব যে বৈষম্য আমরা দেখছি, তা সাম্প্রদায়িকতাকে কবর থেকে আবার টেনে তুলবে। কোথাও কোথাও হয়েছে তা হারজল স্বীকার করবেন। সুতরাং উল্লেখিত ক্ষতির ও আমাদের ব্যবসায়িক সততার দৃষ্টিকোণ থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া হোক।' বলল আবার গোয়েরিং।

কথা বলল ইটালির সদস্য আলফন সো। বলল, 'আমি গোয়েরিং এর প্রস্তাবের প্রশংসা করছি। কিন্তু অস্তিত্বের প্রশ্ন যেখানে, সেখানে সততার প্রশ্ন তুলে লাভ নেই। তাছাড়া আরেকটা প্রশ্ন আমাদের বিবেচ্য, এ নিউজ প্রচার থেকে প্রকৃত অর্থে লাভবান হবে মুসলমানরা, ক্ষতিগ্রস্ত হবে স্পেনের খৃষ্টান স্বার্থ। এ সরল হিসেব থেকেই আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি।'

আলোচনা চলল আরও। যুক্তি, পাল্টা যুক্তি উঠল অনেক। অবশেষে সিদ্ধান্ত হলো নিউজ প্রচার না করার।

মিটিং তখনও শেষ হয়নি। তর্ক-বিতর্ক শেষে তাদের স্বাস্থ্যপান চলছে।

রাত তখন ৯টা ৩০ মিনিট।

একটা নোট এল EWNA-এর প্রশাসকের হাত থেকে মিখাইলের হাতে।

নোটটা পড়ল মিখাইল।

পড়তে পড়তে তার চেহারা মলিন হলো।

নোট থেকে মুখ তুলে মিখাইল বলল, 'আমাদের মিটিং এখনও শেষ হয়নি। নতুন একটা ডেভলাপমেন্ট আছে ঐ নিউজ সম্পর্কে। আপনারা চাইলে বিষয়টা আমি মিটিংয়ে পেশ করতে পারি।'

সবাই একবাক্যে সম্মতি দিল।

মিখাইল বলল, 'কথা ছিল ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে আমরা নিউজটা প্রচার করব।'

মাঝখান থেকে হারজল প্রশ্ন করল, 'কার সাথে কথা হয়েছিল?'

মিখাইল মুখ তুলে হারজলের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল, ‘আমাদের সোর্সের সাথে এই কথা হয়েছিল।'

উত্তর দেয়ার পর একটু থেমে আবার মিখাইল শুরু করল, '৯টার সময় সীমা পার হবার পর নিউজ প্রচার হতে না দেখে তারা জানতে চেয়েছে আমরা কি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। রাত ১০টার মধ্যে যদি কিছু না জানাই, তা'হলে তারা ধরে নেবে আমরা নিউজটা প্রচার করছিনা। সে ক্ষেত্রে তাদের অন্য একটা এজেন্সীর সাথে কথা হয়েছে তারা নিউজটা আজই প্রচার করবে। রাত দশটার পর ওদেরকেই ডকুমেন্ট দিয়ে দেয়া হবে। সেই সাথে ওয়ার্ল্ড প্রেসকে তারা জানিয়ে দেবে যে, EWNA নিউজটি করার পরও ট্রান্সমিশন টেবিলে তা পাঠাবার পরও ইহুদী ও ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের চাপে নিউজটি প্রচার করেনি।’

থামল মিখাইল।

সে থামতেই হারজল বলল, 'সে সংবাদ সংস্থা কোনটা যাদের সাথে ওদের কথা হচ্ছে?'

'আমি জানি না, তবে অনুমান করতে পারি সে সংস্থা WNA (World News Agency) অথবা TWNA (Third World News Agency) হবে। আমরা চাপে পড়ে নিউজটা গ্রহণ করিনি জানলে WNA নিউজটা লুফে নেবে।' বলল মিখাইল।

'তাতে আমাদের কি ক্ষতি হবে?' জিজ্ঞাসা করল আলফন সো।

'ক্ষতি হবে, আমাদের বার্তা সংস্থাকে ইহুদী এবং ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের মত হিংসাত্মক সংগঠনের স্বার্থের সংরক্ষক বলে ধরে নেয়া হবে, যা আমাদের নিরপেক্ষতা ও সুনামকে ধুলিস্মাৎ করে দেবে।' মিখাইল বলল।

'শুধু তাই না, গোটা 'থার্ড ওয়ার্ল্ড' এর দেশগুলো থেকে আমাদের পাততাড়ি গুটাতে হবে।' বলল গোয়েরিং। সে আরও বলল, তাছাড়া একটা কথা আমাদের ভাববার বিষয়। সেটা হল, আমরা নিউজটা প্রচার না করলেও তা বন্ধ থাকছেনা। কেউ না কেউ তা প্রচার করবেই যখন, তখন আমরা পেছনে থাকব কেন?

একমাত্র হারজল ছাড়া সকলেই বলল, 'গোয়েরিং এর কথায় যুক্তি আছে। একটা আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা কোন গ্রুপের স্বার্থ রক্ষাকারী বলে চিহ্নিত হলে সংবাদ সংস্থাটির ভূমিকা অকার্যকর হয়ে পড়বে। নিউজটি যখন প্রচার হচ্ছেই, তখন আমরা তা করলেই ভাল।'

'যদি তা করতেই হয়, চেয়ারম্যান সাহেব আইজাক আব্রাহামের সাথে আলোচনা করুন। আমাদেরকে বাস্তববাদী হতে হবে।' বলল হারজেল।

হের গোয়েরিং ছাড়া সকলেই হারজলকে সমর্থন করল। গোয়েরিং বলল, 'একটি স্বাধীন সংস্থার সিদ্ধান্তকে বাইরের একজন লোকের মতামত নির্ভর করে তোলা আমি ঠিক মনে করিনা।'

শেষে বিশ্ব ইহুদী কংগ্রেসের সভাপতি আইজাক আব্রাহামের সাথে আলোচনা করারই সিদ্ধান্ত হলো।

মিখাইল তুলে নিল টেলিফোন।

সংগে সংগেই পাওয়া গেল আইজাক আব্রাহামকে।

সংক্ষেপে ঘটনা বলার পর মিখাইলের সাথে কথা শুরু হলো আইজাক আব্রাহামের।

'সব তো শুনলেন এখন বলুন কি করা যায়।' বলল মিখাইল।

'আপনারা কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?'

'আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি নিউজটা প্রচার না করার।'

'সিদ্ধান্তের উপর অটল থাকুন, এটাই আমার কথা।'

'কিন্তু নিউজটা তো বন্ধ হচ্ছে না। তাছাড়া আমরা বিরাট অপপ্রচারের সম্মুখীন হব।'

'নিউজটা প্রচার হওয়ার কথা ওদের একটা ব্লাফও হতে পারে। পশ্চিমের সংবাদ মাধ্যম এটা প্রচার করবে বলে মনে হয় না। WNA এর সাথে আমাদের সম্পর্ক ভাল না, কিন্তু ওখানে আমার লোকরাই মেজরিটি মনে রেখ। আমি ছাড়বোনা ওদের।'

'কিন্তু ব্যাপারটা আপনার ব্যক্তিগত ভাবে নেয়া কি ঠিক হচ্ছে?'

'ব্যক্তিগত ভাবে তো নয়, আমি জাতীয় ভাবে নিয়েছি। কু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান আমার বন্ধু সংগঠন। কারণ তারা লড়াই করছে আমার শত্রুর সাথে। ঐ নিউজটা প্রচার হলে আমার বন্ধু ক্ষতিগ্রস্ত হবে, লাভবান হবে আমার শত্রু। ইহুদী ও খৃষ্টানদের শত্রুকে EWNA সাহায্য করবে?'

'প্রশ্নটা সাহায্য করার নয়, প্রশ্ন হলো, নিউজটা যখন বন্ধ করা যাচ্ছে না, তখন আমরা প্রচার করার মধ্যে ক্ষতি কতটুকু।'

'শত্রুকে সাহায্য করা কি ক্ষতি নয়? পশ্চিমী একটা সংবাদ মাধ্যম এ আত্মঘাতি কাজ করবে কেন?

'স্যরি, মিঃ আইজাক, আমরা ব্যাপারটাকে ঐ দৃষ্টিতে দেখছিনা।

'কি দৃষ্টিতে দেখছেন? সাংবাদিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে? এ সাংবাদিকতা কোত্থেকে পেয়েছেন? কিভাবে চালাচ্ছেন তা একবার মনে করুন মিঃ মিখাইল।'

'থ্যাংকস মিঃ আইজাক, আপনার কথা আমি বুঝেছি, আমার বোর্ডকে আমি তা বলব।'

'থ্যাংকস মিঃ মিখাইল' বলে আইজাক তার টেলিফোন রেখে দিল।

মিখাইলও টেলিফোন রাখল। তার মুখ গম্ভীর। আইজাকের শেষ কথায় মিখাইল দারুণভাবে অপমান বোধ করেছে।

আইজাক শেষে যা বলেছেন তা মিখাইল বোর্ডকে জানাল।

একমাত্র হারজল ছাড়া সকলের মুখেই একটা অস্বস্থি ফুটে উঠল। আইজাকের ক্ষমতা আছে, তবে তা এইভাবে প্রকাশ করা শোভন হয়নি। উত্তেজিত হয়ে উঠল গোয়েরিং। বলল, আইজাক যত বড়ই হোন, একটা সংবাদ সংস্থার চীফের সাথে এই ভাবে কথা তিনি বলতে পারেন না।'

মিখাইল গোয়েরিংকে শান্ত হবার অনুরোধ করে বলল, 'আমি জানি আইজাক অত্যন্ত ক্ষমতাশালী, তার সাথে ঝগড়া করে আমরা ব্যবসা চালাতে পারব না। অন্যদিকে এরপর চেয়ারম্যান হিসেবে তার সাথে আলাচনায় যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং আমি এই মুহূর্ত থেকে পদত্যাগ করছি।'

হেনরি হারজল ছাড়া অন্য সবাই মিখাইলের এই কথার পর বলল, 'এ অপমান আপনার নয় চেয়ারম্যান, গোটা কোম্পানী অপমানিত হয়েছে, আমরা

অপমানিত হয়েছি। আপনি যদি পদত্যাগ করেন, তাহলে আমাদেরও পদত্যাগ করতে হবে।'

'দেখুন, আমরা ব্যবসা করছি। মাথা গরম করলে চলবে না। দেখি আমি আলোচনা করছি আইজাকের সাথে।' বলল হারজল।

একটু থেমেই উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে হারজল বলল, 'মাফ করুন আমাকে, আমি একটু একান্তে তার সাথে আলোচনা করতে চাই। তাকে মতে আনতে হবে।'

বলে হারজল টেলিফোন করার জন্য পাশের কক্ষে চলে গেল।

ফিরে এল মিনিট দশেক পরে।

মুখে হাসি। বলল, মধ্যবর্তী একটা ব্যবস্থা হয়েছে। ১০টার মধ্যে আমরা সোর্সকে কিছু জানাবোনা। তাতে তারা বুঝবে আমরা নিউজ প্রচার করছিনা। এরপর যা তারা বলেছে সেই মোতাবেক অন্য নিউজ এজেন্সীকে তারা ডকুমেন্টগুলো দেবে। যদি দেয়, নিশ্চয় সে এজেন্সী নিউজ প্রচার করবে। সেটা দেখার পর আমরাও নিউজটা প্রচার করব।'

'আমরা তো তা'হলে পেছনে পড়ে যাব।' বলল গোয়েরিং।

'ঠিক আছে ক্ষতি নেই একটু পেছনে পড়লে', বলল মিখাইল।

মিখাইলের মুখে হাসি। বলল, 'ভয় নেই গোয়েরিং WNA এবং EWNA, নিউজ তাদের টেলিপ্রিন্টারে তোলার সংগে সংগেই আমি জানতে পারব। আমাদের সব রেডি আছে। আমরা খুব পেছনে পড়ব না।'

'মিখাইল তা'হলে গোয়েন্দা পুষছ না?' বলল জেমস কিট।

'ব্যবসায় আজ একটা কঠিন প্রতিযোগিতা। রাজনৈতিক প্রতিযোগিতায় গোয়েন্দা পুষলে, ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতায় গোয়েন্দা থাকবে না কেন?'

সবাই হেসে উঠল।

মিটিং শেষ হলো।

হাসি মুখে বেরিয়ে এল সবাই। শুধু ইহুদী হেনরী হারজলের মুখটাই ভার।

এদিকে ভাসকুয়েজ এয়ারকন্ডিশন ঘরে বসে ঘামছে।

রাত তখন ২ টা।

ইন্টারকমে অফিস প্রশাসক ভেগাকে আসতে বলল।

ভাসকুয়েজের চুল উস্কো-খুস্কো।

চোখ দু'টি লাম।

টেবিলের সামনে কয়েকটি ট্রাভেল ব্যাগ ঠিক ঠাক করে রাখা।

টেবিলের ওপর টেলিপ্রিন্টারে আসা নিউজের স্তুপ। নিউজগুলো তার তেজস্ক্রিয় ডকুমেন্ট গুলোর ওপর। WNA এবং EWNA দু'টি সংবাদ সংস্থাই নিউজ করেছে।

রাত ৮টা থেকে ৯টা পর্যন্ত নিউজ EWNA করলনা। ভাসকুয়েজ তখন খুশি হয়ে উঠেছিল। ভেবেছিল তার লবী কাজ দিয়েছে। কিন্তু রাত ১১ টায় তাকে বিস্মিত করে নিউজ প্রচার শুরু করে WNA এর পনর মিনিট পর EWNA এর টেলিপ্রিন্টার নিউজ আসতে থাকে।

একেবারে আকাশ থেকে পড়ে ভাসকুয়েজ।পশ্চিমে সংবাদপত্রসহ বিশের সংবাদ পত্র খবরটা ছাপাবে। আর এর প্রতিক্রিয়া কি হবে তা সে ভালো করেই জানে। ইতিমধ্যেই ভাসকুয়েজ খবর পেয়েছে জাতিসংঘে ডকুমেন্ট গুলো পৌছেছে। খোদ ও আই সি এ ব্যাপারে লবী করেছে। তার সাথে যোগ দিয়েছে জাতিসংঘের থার্ডওয়ার্ল্ড গ্রুপ। অর্থাৎ ভীষণ হৈ চৈ হবে বিষয়টা নিয়ে। ভাসকুয়েজের সব চেয়ে বড় ভয় স্পেন সরকারের প্রতিক্রিয়াকে। স্পেন সরকার নিজে অপবাদ থেকে বাঁচার জন্য কু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের ওপর খড়্গ হস্ত হবে। সবচেয়ে বড় টার্গেট হবে ভাসকুয়েজ।

এসব ভেবে চিন্তে ভাসকুয়েজ দেশ ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তার পরিবার ইতিমধ্যে বিমান বন্দরে পৌঁছে গেছে। ঘরে ঢুকল ভেগা। দাঁড়াল টেবিলের সামনে।

ভাসকুয়েজ চোখ তুলল তার দিকে।

‘শুনেছ তো আমি দেশের বাইরে যাচ্ছি। আমরা একটা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছি। অবস্থা ভালো হলে আমি ফিরে আসব।’

একটা ঢোক গিলল ভাসকুয়েজ। তারপর শুরু করল, ‘তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না। আমি টাকার ব্যবস্থা করে গেলাম। একাউন্টেন্ট তোমাদের যখন যা প্রয়োজন দেবে। আর অফিস থেকে মুল্যবান জিনিসপত্র আজকেই সরিয়ে নাও। কাল থেকে অফিস বন্ধ থাকবে।’

বলে উঠে দাড়াল ভাসকুয়েজ। বলল বেয়ারাকে পাঠিয়ে ব্যাগগুলো গাড়িতে দাও।

বেরিয়ে এল ভাসকুয়েজ।

ক’মিনিট পর কু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের সদর দপ্তর থেকে একটা গাড়ি বেরিয়ে বিমান বন্ধরের উদ্দেশ্যে ছুটল।

# ৪

জেনের আব্বা জেমেনিজ যে সিসনারোসা ঘরে ঢুকল তার মুখে অস্বস্তির চিহ্ন।

প্রধানমন্ত্রী তাকে ডেকেছিল। সকালে টেলিফোন করে জেমেনিজকে আনুরোধ করেছিল। প্রেসিডেন্ট এবং তিনি জেমেনিজের সাথে অত্যন্ত জরুরী কিছু কথা বলতে চান। জেমেনিজ কষ্ট করে গেলে তারা বাধিত হবেন। জেমেনিজ দেখতে পাচ্ছিল দেশ এক সঙ্কটজনক অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলছে। জেনের চুরি করা ডকুমেন্ট দুনিয়াময় প্রচার হওয়ার পর স্পেনীয় কু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের সর্বনাশ তো হয়েছেই স্পেন সরকারও ভীষণ চাপের মধ্যে পড়েছে। যার ফলাফল সে নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধ পাওয়ার পর জেমেনিজ বিস্মিত হয়ছিল প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী দেশের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করবেন কু–ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের সম্পর্কেও তাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে? এ সব চিন্তা করে জেমেনিজেরও মনে হয়েছিল আলোচনা নিশ্চয় খুব জরুরী। তাই জেমেনিজ টেলিফোন পাওয়ার পর আর দেরি করেনি।

জেমেনিজ যখন ঘরে ঢুকল জেনের আম্মা তখন শুয়ে। অত্যন্ত মলিন চেহারা। দেহের সব রস শুকিয়ে তার দেহটা যেন চুপসে গেছে। জেন চলে যাওয়ার পর জেনের আম্মা শয্যা নিয়েছে। জেন তাদের একমাত্র সন্তান। একমাত্র সন্তান গুলিবিদ্ধ হওয়া এবং তার কোন খোঁজ না পেয়ে জেনের আম্মা খাওয়া দাওয়া প্রায় ছেড়ে দিয়েছে যখন সে শুনেছিল মাদ্রিদের কোন হাসপাতালে, ক্লিনিক, ডাক্তার খানায় জেনকে পাওয়া যায়নি, পুলিশ গোয়েন্দা বিভাগ ও কু–ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান মিলে চেষ্টা করেও জেনকে বের করা যায়নি জেনের মা তখন জ্ঞান হারিয়েছিল। তারপর যেদিন সে দেখল জেনের নিয়ে যাওয়া ডকুমেন্ট বিশ্বের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর খবর হিসাবে প্রকাশ পেয়েছে বিশ্বের সংবাদ সমুহে সেদিন জেনের মা আশা ফিরে পেয়েছে যে জেন বেঁচে আছে এবং যারা এতবড় কাজ করেছে তাদের কাছে জেন

ও জোয়ান ভালই থাকবে। তাছাড়া এ বিষয়টাও জেনের মাকে আশ্বস্ত করেছে যে আহমদ মুসা শুধু অসাধারণ কুশলী একজন বিপ্লবীই নন খাটি মুসলিম চরিত্র আছে তার। আর একজন খাটি মুসলমান পরিচয় নির্বিশেষে সব মানুষকে ভালোবাসে, বিপদগ্রস্ত সকলকে সাহায্য করে। এসব চিন্তা জেনের মা'র মনকে কিছুটা সুস্থ করে তুলেছে। খাওয়া দাওয়া কিছু শুরু করেছে।

দরজার দিকে মুখ করেই শুয়েছিল জেনের আম্মা। জেনের আব্বার মুখের অস্বস্তির কালো ছায়াটা দেখতে পেল।

জেমেনিজ কাপড় ছেড়ে ফিরে এল ঘরে।

জেনের আম্মা উঠে বসল।

জেমেনিজ এসে বসল তার পাশে। বলল, 'কেমন লাগছে আজ?'

'ভালো। দেখা হলো ওদের সাথে?'

'হয়েছে।'

'কথার ফলাফল বোধ হয় খুব ভাল হয়নি।'

'একথা বলছ কেন?'

'তোমার মুখে একটা অস্বস্তির ছায়া দেখছি।'

'অস্বস্তির কথাই তো, দেশ এখন খুব অসুবিধায়।'

'কি শুনলে?'

'অনেক কথা।'

'খারাপ কিছু?'

'অবশ্যই। মাদ্রিদের শাহ ফয়সাল মসজিদ সহ মুসলিম ঐতিহাসিক স্থানগুলোতে তেজস্ক্রিয় ক্যাপসুল পুতে রাখার অভিযোগ প্রমানিত হয়েছে। জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন এবং ইউনেস্কোর যৌথ কমিটি সবগুলো ঐতিহাসিক স্থানের মাটি পরীক্ষা করেছে। সব জায়গাতেই তেজস্ক্রিয়তা পাওয়া গেছে একটা।'

'তা হলে ঐ সব স্থানের সবগুলো বিল্ডিং কি এখন ধসে যাবে?'

'না তেজস্ক্রিতার সবে প্রাথমিক অবস্থা। আরও বছর খানেক বিকিরণ চললে সে অবস্থার সৃষ্টি হতো।'

একটু থামল জেমেনিজ। তারপর আবার শুরু করল, ‘যে কথাটা বলেছিলাম। এই তেজস্ক্রিয়তা প্রয়োগকে একটা জাতির অস্তিত্ব ও ঐতিহ্য ধ্বংসের একটা জঘন্য ষড়যন্ত্র এবং মানবতার বিরুদ্ধে এক অপরাধ হিসাবে দেখছে জাতিসংঘের একটা মহল এবং বিশ্বের অনেকে মনে করছে স্পেন সরকারও এর সাথে জড়িত আছে। স্পেন সরকারকে বলা হয়েছে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে তেজস্ক্রিয় ক্যাপসুলগুলো তুলে ফেলা হবে। তবে এর সমূদয় খরচ বহন করতে হবে স্পেন সরকারকে। স্পেন সরকারকে বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিতে হয়েছে যদিও এটা অপমানকর। সবচেয়ে....’

‘অপমানকর কি করে? কথার মাঝ খানে বলে উঠল জেনের মা।’

‘স্পেন সরকার বলেছিল তারা নিজেরাই তেজস্ক্রিয় ক্যাপসুল তুলে নেবে। কিন্তু স্পেন সরকারকে বিশ্বাস করা হয়নি। এখন তারা কাজ করবে খরচ দিতে হবে স্পেনকে এটা অপমানকর নয়?’

কথা শেষ করে আগের কথায় আবার ফিরে গেল জেমেনিজ। বলল, ‘সবচেয়ে অপমানকর হলো মুসলিম ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলো এখন মুসলিম কম্যুনিটির হাতে ছেড়ে দিতে হবে। জাতিসংঘের সমাজিক সংস্থা বিপুল ভোটাধিক্যে এ সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছে।’

‘বল কি? এতবড় সিদ্ধান্ত নিল কি করে? নিতে পারল কি করে?’ বলল জেনের আম্মা বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে।

বিশ্বের ৫৫টি মুসলিম দেশ এবং তাদের সংগঠন ও আই সি এই ব্যাপারে গোটা দুনিয়া জুড়ে লবীং করেছে। তাদের সাথে যোগ দিয়েছে গোটা থার্ডওয়ার্ল্ড লবী। তারাই জাতিসংঘের এখন সামাজিক সংস্থার মত সংগঠনে তো বটেই। সুতরাং মুসলমানদের অনুকুলে সিদ্ধান্ত পাশ করাতে বেগ পেতে হয়নি। আমাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় যে যুক্তিটা কাজ করেছে, সেটা হলো আমরা ঐতিহাসিক স্থানগুলোর প্রতি বৈরী মনোভাবাপন্ন কারন ওগুলো সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থাই আমরা করিনি।’ বলল জেমেনিজ।

‘জাতিসংঘের এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে তো করডোভা, গ্রানাডা, সেভিল, মালাগা, টলেডো শুধু নয়, সারাগোসা, লিস্তন, জাহিন ও স্যালমনিকার মত শহরের বৃহত্তর অংশ ওদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে।’

‘হ্যাঁ তা যাবে।’

‘স্পেন সরকার কি মেনে নেবে?’

‘না মেনে উপায় কি?’

‘স্পেনের জন্য এটা একটা বিরাট ব্যাপার হবে।’

‘এর চেয়েও বড় ঘটনা আছে।’

‘সেটা কি?’ বিস্মিত কণ্ঠ জেনের আম্মার।

‘তুমিও তো খবর পড়েছ যে করডোভা, গ্রানাডা, মালাগা, টলেডো, সেভিল প্রভৃতি শহর ছাড়া খোদ মাদ্রিদেও মরিস্করা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে, মিছিল করেছে। তারা দাবী করেছিল মুসলিম হিসাবে তাদের সংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে সংখ্যালঘু জাতি গোষ্ঠী হিসাবে তাদের ন্যায্য অধিকার দান সহ তাদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিতে হবে। তাদের এসব দাবীর পক্ষে মুসলিম দেশগুলোর এবং ও আই সি র কূটনৈতিক তৎপরতার ফলে গোটা তৃতীয় বিশ্ব ও বিশ্বের মানবাধিকার সংস্থা গুলো সোচ্চার হয়েছে। গত পরশু জাতিসংঘের সামাজিক কমিশন আরেক প্রস্তাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, মরিস্কদেরকে সংখ্যালঘু হিসাবে সংবিধানিক ভাবে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং মুসলমানদেরকে সংখ্যালঘু হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে তাদেরকে সকল নাগরিক অধিকার দিতে হবে। তাদের সম্পত্তি ও বাড়ি ঘর ফিরিয়ে দিতে হবে।’

থামল জেমেনিজ।

জেমেনিজ থামলেও জেনের মা কোন কথা বলতে পারলোনা। বিস্ময়ে হা হয়ে গেছে তার মুখ। অনেক্ষন পর বলল, ‘এতবড় ঘটনা ঘটল কি করে? জানি তুমি বলবে মুসলিম দেশ গুলো লবীং করে জাতিসংঘকে দিয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু বলত রাজধানী মাদ্রিদসহ এতগুলো শহরে মরিস্করা বিক্ষোভ প্রদর্শন করল কি করে? যারা ভয়ে নাম প্রকাশ করে না, পরিচয় দেয়না, তারা এ ভাবে সংঘবদ্ধ হলো কি করে, এ সাহস পেল কোথায়?'

'এক কথায় তোমার প্রশ্নের উত্তরঃ আহমদ মুসা। এ সবকিছুর মূলে রয়েছে তার পরিকল্পনা ও প্রয়াস।'

'কিন্তু আহমদ মুসা তো একজন মানুষ।'

'অর্গানাইজ করতে একজন মানুষই লাগে। আহমদ মুসার নেতৃত্বে কাজ করেছে 'নিউ ফ্যালকন অব স্পেন' বলে পরিচিত গ্রানাডা অঞ্চলের যিয়াদ বিন তারিক এবং বাস্ক গেরিলা নেতা ফিদেল ফিলিপের দলে কার্যরত মুসলমানদের একটা শক্তিশালী গ্রুপ। প্রধানমন্ত্রী যা বলেছেন তাতে বুঝেছি, যিয়াদ বিন তারিকের দল ও বাস্কের মুসলমানরা স্পেনের শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে ঘুরে মরিস্কদের সংঘবদ্ধ করে ঐ সব শহরে জড়ো করে বিক্ষোভ মিছিলের ব্যবস্থা করেছে।'

'কেন তাদের ধরা যায়নি?'

'সরকার সার্বক্ষনিক শ্যেন দৃষ্টি রেখেছিল আহমদ মুসা ও জোয়ানের উপর। কিন্তু সরকারের রিপোর্ট মতে তারা মাদ্রিদ থেকে বের হয়নি। মাদ্রিদে বসে আহমদ মুসা কলকাঠি নেড়েছে। যিয়াদ বিন তারিক এবং বাস্কদের কোন মুসলমান নেতাকে আমাদের গোয়েন্দা বিভাগ চেনে না। তাই ওদের বাধা দেয়া যায় নি, ধরা যায়নি।'

থামল জেমেনিজ। থেমে পা দু'টো খাটের উপর তুলে ভালো করে বসল, জেনের আম্মার মুখোমুখি। তারপর শুরু করল, 'দেখ, সরকার আহমদ মুসাকেই মনে করছে সব নষ্টের মূল। তারা মনে করে জোয়ানকে হাত করে জোয়ানের মাধ্যমে জেনকে ফুসলিয়ে সে রাজী করিয়েছে ঐ ডকুমেন্ট চুরি করার জন্যে। জেন বন্ধু জোয়ানকে সাহায্য করেছে মাত্র। আর ডকুমেন্ট গুলোকে জেন সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ কিছু মনে করেনি। সরকার জেনকে কোন দোষ দিচ্ছে না। জেনকে উদ্ধারের জন্যে সরকার আগের চেয়ে অনেক বেশী দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কিন্তু কিছুতেই তার সন্ধান করা যাচ্ছে না।'

থামল একটু জেমেনিজ। একটা ঢোক গিলল। তারপর বলল, 'সরকার একটা পরামর্শ দিয়েছে।'

'পরামর্শ! কি পরামর্শ?' জেনের আম্মার চোখে কৌতুহল।

'তুমি খুবই অসুস্থ, এমন খবর দিয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে হবে। তাদের বলতে হবে তুমি একটি বারের জন্যে জেনকে দেখতে চাও।'

'জেন আসবে?' জেনের আম্মার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'আমার এবং সবার ধারনা সে আসবে। সে আমাদের একমাত্র সন্তান। সে একটা কাজ করেছে বটে, কিন্তু তোমার অসুস্থতার কথা শুনলে সে স্থির থাকতে পারবে না।'

'সে তো ভয় করতে পারে।'

'ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানকে ভয় করার ছিল, কিন্তু ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান তো এখন নেই। ভাসকুয়েজ দেশ ত্যাগ করেছে। উর্ধ্বতন কয়েকজন কর্মকর্তা যারা ঘটনা কিছু কিছু জানত তারা গ্রেফতার হয়েছে। সুতরাং তার তো ভয় করার কিছু নেই।'

'কেন সরকারকে ভয় করবে না?'

'তার বিষয়টা তো সরকারের জানার কথা নয়। আমরা জানি, আর খুব বেশী হলে 'ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান জানবে, এটাই সে জানে।'

'আমিও তো এটাই জানি, কিন্তু বল তো সরকার জেনের ব্যাপারে জানলো কি করে?' চিন্তিত কন্ঠে বলল জেনের আম্মা।

'ভাসকুয়েজই গোয়েন্দা বিভাগকে জানিয়ে গেছে।'

জেমেনিজ কথা শেষ করলেও জেনের আম্মা কথা বলল না। ভাবছিল সে। কিছুক্ষন পর বলল, সরকার এখন তো জানে, সরকার আহমদ মুসা ও জোয়ানের উপর খুব ক্ষ্যাপা। জেনকে আবার সরকার আটকাবে নাতো?' চিন্তিত কন্ঠ জেনের আম্মার।

'না জেনকে তারা আটকাবে কেন? হয়তো কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে। তার বেশী কিছু নয়।'

'একটা কথা বলব?

'কি কথা?'

'মেয়ের সিদ্ধান্তের সাথে আমাদের কোন দ্বিমত করা ঠিক হবে না।'

'কোন সিদ্ধান্তের কথা বলছ?'

'জেন জোয়ানকে পছন্দ করে।'

'সেটা বুঝেছি, আগে হলে বিরোধিতা করতাম। এখন তার কোন যৌক্তিকতা দেখিনা।'

'ঠিক বলেছ।'

'কিন্তু তুমি আমি কি সত্যিই সুখী হতে পারব? তুমি নিশ্চয় জান, কার্ডিনাল পরিবারের জন্যে এটা কত বড় আঘাত। যে কার্ডিনাল পরিবার মরিস্কদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নেতা, সেই কার্ডিনাল পরিবারের নয়নের মনি যাবে পরিস্ক পরিবারে।'

'জেন তো জানতো না জোয়ান মরিস্ক।'

'পরে তো জেনেছে।'

'তা জেনেছে, কিন্তু তুমি বল জোয়ান অন্য সব দিক দিয়েই উপযুক্ত কি না।'

'কিন্তু মানুষটি কে, তার রক্ত কি, এই বিবেচনাই সবচেয়ে বড় নয়কি?'

'তুমি অন্যভাবে নিওনা, মরিস্কদের মানে মুসলমানদের রক্ত তুমি ছোট মনে কর?'

'ছোট-এর সংজ্ঞা তো অনেক আছে।'

'যে সংজ্ঞাই ধর, ওরা রাজার জাতি, নেতৃত্বের গুণ ওদের রক্তের সাথে মিশে আছে, ওদের স্বাধীন সত্ত্বা কেউ ধ্বংস করতে পারে না, স্পেন শত শত বছরেও পারেনি।

'বুঝেছি মেয়ে তোমাকে ভাল ভাবেই দলে টেনেছে।'

'ওকথা বলোনা, মেয়েটা যে কার টান বেশী টানে, কাকে দু'দন্ড না দেখলে যে হাঁপিয়ে ওঠে, সে কথা আর বলিয়ে নিও না।'

জেনের আম্মার মুখের কথা শেষ করার আগেই জেমেনিজের চেহারার রং পাল্টে গেল। তার চোখ মুখ ভারী হয়ে উঠল। মুখ নিচু করল জেমেনিজ। ধীরে ধীরে তার চোখ ভিজে উঠল অশ্রুতে।

তাড়াতাড়ি চোখ মুছে বলল, 'জানি না, মা আমার কোথায় আছে, কেমন আছে। জানিনা, মা আমাকে মাফ করেছে কি না। গুলিবিদ্ধ জেনের চিৎকার এখনও আমার কানে বাজে, আমাকে পাগল করে তুলে।'

জেমেনিজের শেষ কথাগুলো রুদ্ধ হয়ে গেল কান্নায়।

জেনের আম্মার চোখও অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। বলল, 'কোন খারাপ চিন্তা তুমি করোনা, জেন নিশ্চয় ভাল আছে।'

'জেনের মা বিজ্ঞাপনটা তোমার নামে দেই, আমার নামে দিলে যদি না আসে? আমাকে মাফ করতে পেরেছে কিনা জানি না।'

'এসব বাজে চিন্তা করোনা, তুমি জেনকে চিনতে পারলে গুলি করতে পারতে না, একথা জেন জানে।'

'জানে বলছ?'

'অবশ্যই জানে।'

'কেমন করে তুমি বলছ?'

'চেনার পরেও জেনকে বাধা দেবার জন্যে যদি গুলি করতে, তাহলে জেনকে পালাতে দিতে না। তাকে আরেকটা গুলি করতে পারতে। কিংবা গাড়ির চাকা ফুটো করে দিতে পারতে, তাহলেই জেন আটকে যেত। কিন্তু তুমি তা করো নি, জেনের চিৎকার শোনার পর তুমি থেমে গিয়েছিলে। এটাই প্রমাণ করে জেনকে আগে চিনতে পারনি। চিনতে পারার পর স্নিয় বেদনায় হতভম্ব হয়ে পড়েছিলে, তোমর থেমে যাওয়ার কারণ ছিল এটাই।'

'এসব কথা জানে জেন? সত্যিই ্লছ জানে?'

'দেখ, জেন তোমার আমার চেয়ে অনেক বুদ্ধিমতি।'

'তোমার কথা সত্য হোক জেনের মা। আজ আমার মনটা খুব হালকা লাগছে। একটা দুঃখের কাল পাথর চেপে ছিল আমার মনে।'

'তুমি সুস্থ মাথায় ছিলে না, তাই বুঝনি। চল উঠি।'

বলে জেনের মা দু'টি পা নিচে নামাল।

'তাহলে আজই বিজ্ঞাপনটি দিয়ে দেই?'

'দাও।'

বিছানা থেকে নামল জেনের মা। জেনের আব্বা জেমেনিজও উঠে দাঁড়াল।

জেনের আম্মার পেছনে পেছনে ঘর থেকে বেরিয়ে এল জেনের আব্বা জেমেনিজ।

যখন সাতদিন পেরিয়ে গেল জেনের তরফ থেকে কোন যোগাযোগ হলোনা, তখন জোয়ান উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল, আহমদ মুসাও।

কথা ছিল, জেন গিয়ে টেলিফোন করবে না, কারন সে বাড়িতে ফেরার পর তাদের টেলিফোন টেপ হতে পারে। কিন্তু অন্য কোনভাবে তার খবরাখবর জোয়ানদের জানাবে। ফিলিপের মায়ের কাছে সে চিঠি লিখতে পারে। তবে চিঠি সে নিজে পোস্ট করবে না, বাড়ীর কাউকে দিয়েও না। কিন্তু সাতদিন পার হয়ে গেলেও জেন কিছুই জানাল না।

অবশেষে উদ্বিগ্ন জোয়ান আহমদ মুসার সাথে পরামর্শ করে আবদুর রহমানকে আজ পাঠিয়েছে হান্নার কাছে। একমাত্র হান্নার কাছ থেকেই জেনের সব খবর নিরাপদে পাওয়া যেতে পারে। আবদুর রহমানকে সরাসরি জেনের বাড়ীতে পাঠানো হয়নি, কারণ সেখানে গিয়ে অপরিচিত কেউ জেনের কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত হবে না।

নাস্তার পর আটটার দিকে আবদুর রহমান গেছে হান্নার বাড়ীতে। জোয়ানের চিঠি নিয়ে গেছে সে।

সেই থেকে জোয়ান ফিলিপের ড্রইং রুমে বসে আবদুর রহমানের অপেক্ষা করছে।

জোয়ান ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল বেলা ১১টা। অল্প ক্ষণের মধ্যেই আবদুর রহমান এসে পড়বে। সে কি দেখা পেয়েছে হান্নার? কি খবর আনবে সে? জেন এ পর্যন্ত কোন খবর দিল না কেন? অসুখ বিসুখ করলো নাতো? এসব প্রশ্ন তোলপাড় করছে জোয়ানের মনকে।

বাইরে থেকে এসে আহমদ মুসা প্রবেশ করল ড্রইং রুমে। জোয়ানের পাশে বসতে বসতে বলল, 'আবদুর রহমান তো এখনো আসেনি দেখছি।'

‘হ্যাঁ, বেশ দেরী করছে, বোধহয় দেখা পায়নি হান্নার।’ বলল জোয়ান।

ঠিক এই সময়ই ড্রইংরুমে এসে প্রবেশ করল আবদুর রহমান। তার মুখটা ভাবলেশহীন।

‘তুমি বহুদিন বাঁচবে আবদুর রহমান, এইমাত্র তোমার নাম করলাম আমরা।’ বলল আহমদ মুসা।

‘দোয়া করুন মুসা ভাই, আমার নবী যতদিন দুনিয়ায় ছিলেন তার বেশী যেন থাকতে না হয়।’ বলল আবদুর রহমান।

‘কি খবর ভাই, হান্নাকে পেয়েছিলেন?’ বলল জোয়ান।

‘প্রথমবার গিয়ে পাইনি, বাড়ী ছিল না। ঘুরেফিরে আবার গিয়েছিলাম, পেয়েছি।’

‘খবর কি?’ বলল জোয়ান।

‘জেন যেদিন গিয়েছিল, সেদিনই হান্নাকে টেলিফোন করেছিল। তারপর আর কোন কথা হয়নি। পরদিন হান্না জেনদের বাসায় যায়, কিন্তু বাসাটা জনশূণ্য এবং তালাবদ্ধ। গেটে দারোয়ানও নেই।’

থামল আবদুর রহমান।

কারো মুখে কোন কথা নেই।

জোয়ানের মুখ মলিন।

আহমদ মুসা গম্ভীর।

আহমদ মুসাই প্রথম কথা বলল, ‘কোথায় গেছে তারা, কোন আত্মীয় বাড়ী, অথবা মাদ্রিদের বাইরে এসব বিষয়ে কোন খবর নিতে পারেনি হান্না?’

‘হান্না বলেছে, তার ধারণা জেনরা কোন আত্মীয় বাড়ী, অথবা মাদ্রিদের বাইরে কোথাও বেড়াতে যায়নি। এমনটা ঘটলে বাড়ীর গেটে দারোয়ান থাকতো।’ বলল আবদুর রহমান।

‘হান্না ঠিক বলেছে। আমার মনে হয় জেনকে নিয়ে তার আব্বা আম্মারা আত্মগোপন করেছে। এ বিষয়টা যাতে জানাজানি না হয়, তাদের নতুন ঠিকানা যাতে প্রকাশ না হয়ে পড়ে, এজন্যেই দারোয়ানকে সরানো হয়েছে। যাতে

যোগাযোগের কোন প্রকার ক্লু কেও না পায়। এখন প্রশ্ন হলো, জেনের কি অবস্থা, সে বন্দী না মুক্ত?' বলল আহমদ মুসা।

'প্রথমদিন টেলিফোনের পর আর কোন যোগাযোগ করেনি জেন হান্নার সাথে। হান্নার ধারণা, এ ধরনের যোগাযোগের সুযোগ জেনের নেই, তাকে হয়তো এ সুযোগ দেয়া হচ্ছে না।' বলল আবদুর রহমান।

'এটাই ঠিক। আসলে জেনের যাওয়া ঠিক হয়নি, যেতে দেয়া ঠিক হয়নি। জেন যে কাজ করেছে তাতে তাকে আটকানোই স্বাভাবিক।' বলল জোয়ান।

'ওর মার অসুস্থতার খবর পাওয়ার পর আমরা তো তাকে বাধা দিতে পারি না। অসুস্থ মায়ের সাথে দেখা করার জন্যে জেনো আগ্রহী হওয়া স্বাভাবিক ছিল। বিজ্ঞাপনটা যে ফাঁদ ছিল জেনও তা মনে করেনি, আমরাও মনে করিনি। ভুলটা এখানেই হয়েছে আমাদের।' বলল আহমদ মুসা।

'বিজ্ঞাপনটা ফাদ ছিল মনে করেন মুসা ভাই?' বলল জোয়ান।

'ফাঁদ না হলে এরকমটা ঘটতো না। প্রস্তুতি ছিল বলেই জেন যাওয়ার পর দিনই তারা স্থানান্তর হতে পেরেছে। তবে একটা জিনিস বুঝতে পারছিনা, জেনকে সরালেই তারা পারতো। সবাই সরে গেছে কেন? এর তো কোন প্রয়োজন ছিল না।'

'মুসা ভাই এমনকি হতে পারে না যে, ওরা বাধ্য হয়েছে সরে যেতে।' বলল জোয়ান।

'কার দ্বারা বাধ্য হবে? কু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানতো নেই।' আহমদ মুসা বলল।

থেমেই আহমদ মুসা আবার শুরু করল, 'জেন এতবড় ঘটনা ঘটিয়েছে এটা কি স্পেন সরকার জানতে পেরেছে মনে কর জোয়ান?'

'কু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান জানে যখন, সরকারের কানে সেটা যাওয়া সেটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এদিকটা আপনি ভাবছেন কেন মুসা ভাই?' বলল জোয়ান।

'সরকারের ভূমিকা একদম বাদ দিয়ে চিন্তা করা আমাদের ঠিক নয়। স্পেন সরকার যে কারণে কু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের ওপর ক্ষেপেছে, সেই একই কারণে জেনের ওপর ক্ষেপতে পারে। কারণ এতবড় বিপর্যয়ের ঘটনা জেনের ডকুমেন্ট পাচারের ফলেই ঘটেছে। সুতরাং কু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের চেয়ে জেনকে তারা দায়ী

করবে এই ঘটনার জন্যে। তাছাড়া জেন আমাকে, তোমাকে সাহায্য করেছে, আমাদের আশ্রয়ে ছিল এটাও তার অপরাধ।'

'ঠিক বলেছেন মুসা ভাই। স্পেন সরকার এখন সবচেয়ে বেশী ক্ষ্যাপা আপনার ওপর, আমার ওপর।' বলল জোয়ান।

'হান্নাও তাই বলল। সে জানাল, জোয়ানকে খুব সাবধানে থাকতে বলবেন, পারলে মাদ্রিদ কিংবা স্পেনের বাইরে যেন চলে যায়। সরকার জোয়ানকে এবং আহমদ মুসাকে হন্যে হয়ে খুজছে। তাদের মতে এ পর্যন্ত যা ঘটেছে তা আহমদ মুসার পরিকল্পনার ফল।' বলল আবদুর রহমান।

'হ্যাঁ বুঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা। তাহলে এখন করনীয় কি আমাদের?' বলল জোয়ান।

'প্রথম কাজ জেন কোথায় জানা, দ্বিতীয় কাজ তাকে মুক্ত করা। অন্য কোন কাজ এখন আর আমাদের নেই। স্পেনের মরিস্করা জেগে উঠেছে, সাহস ফিরে পেয়েছে। মুসলিম বিশ্বও তাদের পক্ষে স্পেন সরকারকে চাপ দেবার উপযুক্ত হাতিয়ার পেয়ে গেছে। জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সমাজও স্পেনের মুসলমানদের পক্ষে এগিয়ে এসেছে। ইতিমধ্যে স্পেনের মুসলমানদের নতুন এক শক্তিশালী জাতিতে রূপান্তরিত হবার সুযোগ এনে দিয়েছে। আল হামদুলিল্লাহ! এ সুযোগ কাজে লাগাবার জন্যে যিয়াদ বিন তারিক ও ফিলিপের লোকেরা নিরলসভাবে কাজ করছে। এখন এতবড় কাজ যার সাহায্যে আমরা করলাম, সেই জেনকে উদ্ধার করা আমাদের এক নম্বর দায়িত্ব।' বলল আহমদ মুসা।

জোয়ানের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে আবদুর রহমানের দিকে চোখ তুলে চাইল। বলল, 'হান্নার মধ্যে আপনি সহযোগিতার ভাব কেমন দেখেছেন?'

'খুবই আন্তরিক মনে হয়েছে। দেখলাম, জেনকে সে খুব ভালবাসে, তোমার প্রতিও খুব সহানুভূতিশীল। সে নিজ থেকেই বলেছে জেনকে খুজে বের করার চেষ্টা সে করছে।' বলল আবদুর রহমান।

'মুসা ভাই, আমরা যদি হান্নাকে অনুরোধ করি, তাহলে সে এই কাজে আরও তৎপর হতে পারে।'

'তা আমরা করব। কিন্তু আরও পথ আমাদের বের করতে হবে।'

থামল আহমদ মুসা। তার কপাল কুঞ্চিত, চিন্তা করছে সে। এক সময় বলল, 'জোয়ান বলতে পার মিঃ জেমেনিজ নিয়মিত যান এমন কোন ক্লাব বা প্রতিষ্ঠান আছে?'

'নিয়মিত যান বলতে পারবোনা। তবে MEC ক্লাবের সদস্য তিনি এবং সেখানে তিনি যান।' বলল জোয়ান।

'MEC এর পুরা নামটা বল।'

'মাদ্রিদ এলডার্স ক্লাব।'

'তোমাকে ধন্যবাদ জোয়ান, নামটা প্রমাণ করছে তিনি সেখানে যাবেন, যান। নিশ্চয় ক্লাবটা এলিট মানে উচু তলার লোকদের জন্যে?'

'ঠিক বলেছেন, টপ পলিটিসিয়ান, টপ আমলা, টপ ব্যবসায়ীদের আড্ডা এটা।'

'কোথায় এ ক্লাবটা?'

'স্প্রিং লেকের উত্তর তীরে।'

'তুমি চেন আবদুর রহমান?' আবদুর রহমানের দিকে চেয়ে বলল আহমদ মুসা।

'ক্লাবে কোন দিন যাইনি, তবে লোকেশনটা জানি।'

'চল আবদুর রহমান ক্লাবটা থেকে ঘুরে আসি।'

'এখন তো কাউকে পাবেন না। বিকেল ৫টা থেকে সেখানে অতিথি আসা শুরু হয়।' বলল জোয়ান।

'কেন অফিস পাব না? এমন ক্লাবগুলোর অফিস বিভাগটা দিনে সক্রিয় থাকে।'

'তা পাবেন।' বলল জোয়ান।

'না, আবদুর রহমান, তুমি এই মাত্র ঘরে এলে। তুমি রেস্ট নাও, ক্লাবের লোকেশানটা আমি বুঝেছি। আমি বের করে নেব।'

বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

'না মুসা ভাই, আমি মোটেই ক্লান্ত নই। রেস্ট নেয়ার কোন দরকারই আমার নেই।' আবদুর রহমান আহমদ মুসার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানাল।

জোয়ানও সমর্থন করল আবদুর রহমানকে।

‘ঠিক আছে, আমার আপত্তি নেই।’ বলে আহমদ মুসা তার ঘরের দিকে চলল তৈরী হবার জন্যে।

আবদুর রহমানও উঠে গেল তার ঘরের দিকে।

আহমদ মুসা যখন বেরিয়ে এল দেখা গেল তার মুখে গোঁফ এবং ভ্রু দুটিকে আরোও গভীর করা হয়েছে। এতটুকু ছদ্মবেশেই আহমদ মুসাকে একদম ভিন্ন মানুষ মনে হচ্ছে।

জোয়ান হৈ হৈ করে উঠে বলল, আমিও না জানলে চমকে উঠতাম দেখে।

‘ধন্যবাদ জোয়ান, তাহলে এটুকু ছদ্মবেশে কাজ কিছুটা চলতে পারে, কি বল?’

‘চলবে মানে বেশ চলবে।’

আবদুর রহমান ড্রইং রুমে এলে দুজনে বেরিয়ে এল।

মাদ্রিদ এলডার্স ক্লাবের সামনে গিয়ে যখন আহমদ মুসা ও আবদুর রহমান পৌছল, তখন বেলা ১২টা।

মাদ্রিদ এল্ডার্স ক্লাব ক্লাসিক ডিজাইনের প্রাসাদের মত এক বিশাল বাড়ীতে অবস্থিত। সামনে প্রকাণ্ড ফটক।

ফটক খোলা। মুর্তির মত দুপাশে দুজন দারোয়ান দাঁড়িয়ে।

ভেতরে প্রবেশের অনুমতি শুধু সদস্যদের জন্যেই।

গাড়ী থেকে নেমে গট গট করে গেটের দিকে চলল আহমদ মুসা। তার পেছনে আবদুর রহমান।

কি পরিচয় দেব আমরা, ঢুকতে দেবে তো? বলল আবদুর রহমান।

আমরা সত্য কথাই বলব। বলল আহমদ মুসা।

গেটে পৌছতেই একজন দারোয়ান এগিয়ে এল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা বলল, ‘আমরা জেমেনিজ ডে সিসনারোসার কাছে এসেছি। আমরা তার বন্ধু।’

‘তিনি তো নেই এখন।’ বলল দারোয়ান।

‘আসবেন তিনি। কেন এ সময় তিনি আসেন না?’

‘সাধারণতঃ আসেন না।

‘গতকাল তিনি ক’টায় এসেছিলেন?’ বলল আহমদ মুসা।

‘গতকাল নয়, পরশু এসেছিলেন ৭টায়। তাও কয়েকদিন পর।’

‘কেন নিয়মিত আসেন না?’

‘আসেন। তবে সপ্তাহ খানেক থেকে নিয়মিত নয়।’

‘দারোয়ানদ্বয় গেট থেকে সরে দাঁড়াল।

আহমদ মুসারা প্রবেশ করল ভেতরে।

প্রবেশের পর প্রথমেই বিলাশ রিসেপশন রুম। মূল্যবান সোফায় সাজানো। ঘরের একপাশে রিসেপশন কাউন্টার। কেতাদুরস্ত একজন মহিলা বসে।

সদস্যদের সাথে কেউ দেখা করতে এলে তারা এই রিসেপশনে অপেক্ষা করেন।

আহমদ মুসা রিসেপশনে প্রবেশ করে সোজা চলে গেল কাউন্টারে। বলল, ‘ম্যাডাম আমরা জেমেনিজ ডে সিসনারোসার জন্যে অপেক্ষা করতে চাই, তাঁর আসার কথা আছে।’

আহমদ মুসা এই অভিনয়টা একটা পরিকল্পনার অংশ হিসেবে। আহমদ মুসার টার্গেট জেমেনিজের নতুন ঠিকানা, কমপক্ষে টেলিফোন যোগাড় করা। জেমেনিজের জন্যে বেশ সময় অপেক্ষা করার পর যখন তিনি আসবেন না, তখন কাউন্টারে গিয়ে সাহায্য চাইবে; তাঁর সাথে অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন, দেখা না করলেই নয়, ঠিকানাটা অথবা টেলিফোন নাম্বারটা দিন অথবা দয়া করে এখনই যোগাযোগ করে দিন। এ ধরণের অনুরোধে রিসেপশনের কাছ থেকে অবশ্যই সহযোগিতা পাওয়া যাবে। যদি নাই পাওয়া যায়, তাহলে রিসেপশনিষ্টের হাতের কাছ সযতনে রাখা ‘মেম্বারস গাইড’ বইটা সে ছিনতাই করবে।

রিসিপশনিষ্ট সসম্ভ্রমে নরম সুরে বলল, ‘আপনারা দয়া করে বসুন। খুব বেশী হলে আধ ঘন্টা আপনাদের অপেক্ষা করতে হবে। সাড়ে বারটায় অর্থ কমিটির মিটিং আছে। তার আগেই তিনি এসে যাবেন।’

আহমদ মুসা ধন্যবাদ জানিয়ে ফিরে এসে বসল সোফায়।

ধন্যবাদ জানাল বটে হাসিমুখে, কিন্তু ভেতরে চাঞ্চল্য অনুভব করল আহমদ মুসা। এযে চাওয়ার চেয়ে বেশী পাওয়া। এই পাওয়াটা কি ভাল হবে? তারা তো জেমেনিজের সাথে দেখা করতে আসেনি, এসেছে তার ঠিকানা যোগাড় করতে।

আবদুর রহমানের চোখে আশংকার ছাপ। চুপ করে থাকতে পারলনা। বলল, 'যদি এসে পড়েন, তাহলে কি হবে। আমাদের মিথ্যা কথা ধরা পড়ে যাবে? আর কি পরিচয় দেব আমরা?'

'তুমি নিশ্চিন্তে বস আবদুর রহমান। আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে তো আমরা যেতে পারবো না। ভেবনা, অনেক সময় আল্লাহ তার বান্দাকে চাওয়ার চেয়ে বেশী দিয়ে ফেলেন।' হাসি মুখে বলল আহমদ মুসা। তার নিশ্চিত মুখ। প্রথমটায় যে একটা চাঞ্চল্য এসেছিল তা কেটে গেছে।

আহমদ মুসার নিশ্চিত মুখ দেখে আবদুর রহমান আশ্বস্ত হলো। কিন্তু তার মনে খোঁচার মত বিধেই চলল কথাটা যে, জেমেনিজের কাছে তারা তাদের কি পরিচয় দেবে আর কি কথাই বা তারা বলবে তাঁকে।

আহমদ মুসা ও আবদুর রহমান দু'জনই ষ্ট্যান্ড থেকে ম্যাগাজিন নিয়ে তাতে চোখ বুলাচ্ছিল।

সময়টা যেন খুব তাড়াতাড়িই চলে গেল।

তখন ঠিক ১২টা ২০ মিনিটি।

একজন দীর্ঘদেহী প্রৌঢ় ব্যক্তি প্রবেশ করল রিসেপশন রুমে। সুন্দর-সুগঠিত দেহ। সাদা লালে মেশানো সুন্দর চেহারা।

সে প্রবেশ করতেই রিসেপমনিষ্ট উঠে দাঁড়াল।

রিসেপশনের পাশ দিয়ে ভদ্র লোক চলে যাচ্ছিল। রিসেপশনিষ্ট তাকে কিছু বলল।

ভদ্রলোক ফিরে তাকাল আহমদ মুসাদের দিকে। তার চোখে একটা তীক্ষ্ন দৃষ্টি ফুঠে উঠল। তারপর সে রিসেপশনিষ্টের দিকে ফিরে কি বলে ভেতরে চলে গেল।

রিসেপশনিষ্ট আহমদ মুসাদের কাছে এল। বলল, 'চলুন স্যার। তাঁর রুমে যেতে বলেছেন।'

আহমদ মুসারা উঠল।

'রিসেপশনিষ্ট একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, এই ঘর, যান আপনারা।' বলে চলে গেল রিসেপশনিষ্ট।

বন্ধ দরজার নব ঘুরিয়ে দরজা খুলে প্রবেশ করল আহমদ মুসারা।

একটা ফাইলের ওপর ঝুঁকে পড়ে ছিল জেমেনিজ ডে সিসনারোসা, আমার সাথে কথা বলতে চান আপনারা?

'জি হ্যাঁ।' বলল আহমদ মুসা।

'আমি কি আপনাদের চিনি?'

'আমরা জোয়ানের বন্ধু, জেনের শুভাকাঙ্খী।'

জেমেনিজ আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে ছিল। আহমদ মুসার মুখ থেকে কথা বেরুবার সংগে সংগে জেমেনিজের মুখের ওপর দিয়ে একটা পরিবর্তনের স্রোত বয়ে গেল। তার চোখে মুখে কঠোরতার চেয়ে বিস্ময়ের ভাবটাই এখন বেশী। কিছুক্ষণ এভাবে চেয়ে থাকার পর বলল, 'তোমরা জোয়ানের বন্ধু, তোমরা এখানে! তোমরা জাননা কিছু?'

'জানি, কিন্তু খুব জরুরী প্রয়োজনে আপনার কাছে এসেছি।' বলল আহমদ মুসা।

'কি প্রয়োজন?'

'জেনের কোন সংবাদ জোয়ান পাচ্ছে না।'

'আমার মেয়ে আমার কাছে ফিরে এসেছে। আর কি সংবাদ তার চাই?'

'কিন্তু আমরা মনে করছি জেনকে আটক করা হয়েছে।'

'চোখে মুখে একটা বিমর্ষের ছায়া নামল জেমেনিজের। অল্পক্ষণ একদৃষ্টিতে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'আটক হলে সেটাই কি স্বাভাবিক হবে না?

'আপনাদের দিক থেকে স্বাভাবিক।'

'তোমাদের দিক থেকে?'

‘অন্যায়।’

‘আচ্ছা সে কথা যাক, এসেছ কেন?’

‘জেনের খবরটা জানতে।’

‘বেশ জেনে গেছ।’

‘একটু বাকি আছে, আপনার ঠিকানাটা।’

‘ঠিকানা কেন দরকার?’

‘জেনের সাথে আমরা দেখা করব।’

‘এত সাহস তোমাদের? জান সেখানে পুলিশ পাহারা আছে?

‘জানি।’

‘জানার পরও তার সাথে দেখা করতে যেতে চাচ্ছ?’

‘আমাদের আর তো কোন বিকল্প পথ নেই।’

‘কেন আমার সাহায্য তো চাইলেনা? সোজা চাইলে আমার বাড়ীর ঠিকানা।’

‘কোন সাহায্য আপনি করতে পারবেন না। আপনার মেয়ে আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বন্দী আছে।’

‘অপার বিষ্ময় ফুটে উঠল জেমেনিজের চোখে মুখে। বলল, ‘জানলে কি করে?’

‘আপনার সাথে এতক্ষণ ‘আলোচনার মাধ্যমে।’ আপনার হাতে আপনার মেয়ে বন্দী থাকলে আপনার গোটা আচরণ ভিন্ন রকম হতো।’

‘বিষ্ময় ভরা চোখে জেমেনিজ বলল, ‘আমার কথা শুনে, আমাকে দেখে তোমাদের আর কি মনে হচ্ছে?’

‘আপনি অসহায় অবস্থায় আছেন, আপনি কারো সাহায্য চান।’

‘বিষ্ময়ে বিষ্ফোরিত হয়ে গেল জেমেনিজের চোখ। বলল, ‘এটা বুঝলে তোমরা কেমন করে?’

‘বিনা জিজ্ঞাসাবাদে অপরিচিত দু’জন লোকের সাথে এই ধরণের সাক্ষাতে আপনার রাজী হওয়া থেকে।’

'আমাকে তুমি হতবাক করেছ বৎস। কে তুমি! জোয়ানের বন্ধু মহলে এমন অসাধারণ কেউ আছে বলে তো জানি না। তোমার নাম কি বৎস্য?'

আমি আহমদ মুসা। আর এ আবদুর রহমান।

'কি বললে তোমার মানে, আপনার নাম আহমদ মুসা!' বিস্ময়াভিভূত কণ্ঠে কাঁপা গলায় বলল জেমেনিজ।

বলে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'ঠিক, এই দুঃসাহস, এই অসাধারণ বুদ্ধি আহমদ মুসারই হবে। কিন্তু এ আপনার ঠিক হয়নি। আপনি যান। আমার সাথে গোয়েন্দা এসেছে। গেটের সামনে তারা দাড়িয়ে আছে, কেমন করে যাবেন? আপনি জানেন না গোটা মাদ্রিদে, গোটা স্পেনে সেনা, পুলিশ, গোয়েন্দা মাছির মত ছড়িয়ে পড়েছে আপনাকে খুঁজে বের করার জন্যে। আপনি যান। অস্থির কণ্ঠ জেমেনিজের।

'আমরা যাচ্ছি। আমাদের জন্যে আপনার কোন ক্ষতি হোক তা আমরা চাই না। কেউ জানতেই পারবে না আমরা আপনার সাথে দেখা করতে এসেছিলাম। কিন্তু ঠিকানাটা?'

'জেমেনিজ খস খস করে একটা কাগজে লিখে আহমদ মুসার দিকে এগিয়ে দিয়ে বরল, 'ঠিকানা দিলাম। কিন্তু জেনের সাথে দেখা করতে আপনারা পারবেন না, সে বন্দী আছে। আমরাও আপনাদের কোন সাহায্য করতে পারবো না তাও আপনারা জানেন।'

'দয়া করে একটা কথা জেনকে বলবেন, তার কোন চিন্তা নেই। জোয়ান ভাল আছে। বলল আহমদ মুসা।

'সত্যি জেনের চিন্তার কিছু নেই।' চোখ উজ্জ্বল করে বলল জেনেনিজ।

'হ্যাঁ জনাব।'

'কিন্তু আপনারা ভাবছেন কি জেন জোয়ানের কি হবে? গোটা দেশ তাদের বিরুদ্ধে।' উদ্বিগ্ন কণ্ঠ জেমেনিজের।

'আমি এটুকু বলতে পারি, আল্লাহর চেয়ে বড় কোন শক্তি নেই' দৃঢ় কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

'আপনার কথায় আমার আস্থা আছে বৎস।'

‘তাহলে চলি জনাব।’

বলে আহমদ মুসা ও আবদুর রহমান পা বাড়াল বেরুবার জন্যে জেমেনিজের কক্ষ থেকে।

‘কিন্তু আপনারা যাবেন কি করে? গেটে তো গোয়েন্দা পুলিশ।’ ব্যাকুল কন্ঠ জেমেনিজের।

‘কোন অসুবিধা নেই, আমরা ওদের বলব মিঃ জেমেনিজ বাড়ী বদলেছেন। আমাদের কিছু লেন দেন ছিল তার সাথে। আমরা ব্যবসায়ী।’ হেসে বলল আহমদ মুসা।

ঘর থেকে বেরিয়ে এল আহমদ মুসারা। হাঁটতে হাঁটতে বলল আহমদ মুসা, ‘মেয়েকে আটকে রাখায় তার আত্মসম্মানে যেমন ঘা লেগেছে, তেমন মনের দিক থেকেও খুব দুর্বল হয়ে পড়েছেন মিঃ জেমেনিজ। এ ধরণের পরিস্থিতি তার জন্যে একেবারেই নতুন।’

‘জেনকে আটক করল কেন?’ বলল আবদুর রহমান।

‘তার মুখ থেকে কথা বের করার জন্যে। জেন তো আমাদের অনেক কিছুই জানে। তাছাড়া তারা মনে করছে, তাকে আটকে রাখলে জোয়ানকে, তার সাথে আহমদ মুসাকেও হয়তো হাজির করতে পারবে।’

‘এ পরিবারটি স্পেনে অত্যন্ত পপুলার, তাদের এ খবর প্রচার হলে সরকারের অসুবিধা হবে।’

‘অসুবিধা নেই। তারা বলবে পরিবারটির নিরাপত্তার জন্যেই এটা করেছে। শুধু মেয়েটিকেই তারা বেরুতে দিচ্ছে না, অন্য কারো উপর নিয়ন্ত্রণ নেই।’

ফটক দিয়ে বেরিয়ে আহমদ মুসা দেখল, ফটকের ডানপাশে দুজন লোকের সাথে দারোয়ান কথা বলছে। আহমদ মুসা বুঝল, এরা সেই দুই টিকটিকি।

গেটের বামপাশে ছিল আহমদ মুসাদের গাড়ী। ফটক থেকে বেরিয়ে আহমদ মুসা গাড়ীর দিকে চলল।

গাড়ীতে উঠে বসল, এমন সময় টিকটিকি দু'জন গাড়ীর জানালায় দাড়াল। একজন আহমদ মুসা কে লক্ষ্য করে বলল, মাফ করবেন, আপনাদের পরিচয়টা দয়া করে বলবেন?'

'আমরা ব্যবসায়ী। জেমেনিজের সাথে একটা লেনদেন ছিল। হঠাৎ সে বাড়ী বদল করেছে। নতুন বাড়ী আমরা চিনিনা। এখানেই উনি আসতে বলেছিলেন।'

কথা বলতে বলতেই গাড়ী স্টার্ট দিয়েছিল আহমদ মুসা। কথা শেষ হবার সাথে সাথে সাঁ করে বেরিয়ে গেল গাড়ী।

টিকটিকি দু'জন বাধা দিল না। বোধ হয় উত্তর তারা পেয়ে গিয়েছিল।

গাড়ীটা সদর রাস্তায় পড়লে স্পিডটা আর একটু বাড়িয়ে দিয়ে বলল, আবদুর রহমান এখন কি করা যায় বল, ঠিকানাটা তো পাওয়া গেল।'

'মুসা ভাই ব্যাপারটা আমার কাছে এখনও স্বপ্নের মতই মনে হচ্ছে। কার্ডিনাল পরিবারের বিখ্যাত জেমেনিজ ডে সিসনারোসা আমাদেরকে এই ভাবে সাহায্য করলেন?'

'বললাম তো তোমাকে, মেয়ে গৃহবন্দী হওয়ায় ক্রুদ্ধ হয়েছে জেমেনিজ। কারডিনাল পরিবার বলেই তাদের বংশীয় অহমিকা আকাশস্পর্শী। জেনকে গৃহবন্দী করায় সে অহমিকা বোধে ঘা লেগেছে। মনে হয় বাড়ী পরিবর্তনও জেমেনিজের মতানুসারে হয়নি। তার ওপর জেন তাদের একমাত্র মেয়ে। একমাত্র মেয়ের পছন্দে বাধ সেধে তাকে কষ্ট দিতে চায় না। গুলিবিদ্ধ হয়ে জেন যখন ডকুমেন্ট চুরি করে চলে আসে, মনে হয় তখনি তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে, জেন যখন ফিরবেনা, তখন জোয়ানের সাথেই তার বিয়ে হোক। এসব কারণ একত্রিত হয়ে জেমেনিজকে মেয়ের পক্ষ নিতে বাধ্য করেছে।'

'আপনার কি মনে হয় মুসা ভাই, কথা আদায়ের জন্যে জেনকে কি তারা কোন কষ্ট দিচ্ছে?'

'আমার মনে হয়না। সেরকম হলে মিঃ জেমেনিজ সেটা আমাদের বলতেন, এমনকি সাহায্যও চাইতেন।'

একটু থেমে আহমদ মুসাই আবার বলল, ‘ঠিকানা আমরা পেয়েছি, এখন কি করা যায় বলত? এদিকে ফিলিপ যিয়াদরা মাদ্রিদে নেই।’

‘কখন কি ঘটে যায়। আমি মনে করি, সময় ক্ষেপন ঠিক নয়, জেনকে মুক্ত করার কাজে আমরা এগুতে পারি।’

‘তোমার কথা ঠিক। তবে আমরা এগুবার আগে ঠিকানা সম্পর্কে ভালোভাবে খোঁজ খবর নেবার মত সময় আমাদের নেয়া প্রয়োজন।’ বলল আহমদ মুসা।

‘এটুকু সময় আমাদের অবশ্যই নেয়া প্রয়োজন।’ বলল আবদুর রহমান।

আহমদ মুসা কোন কথা বললনা। তার দৃষ্টি তখন সামনে প্রসারিত।

ছুটে চলছে গাড়ী তীর বেগে।

রাত দশটা।

পার্ল স্ট্রিটের বাইলেনের মুখে একটা জীপ এবং একটা কার এসে থামল।

গাড়ীদুটো থামতেই জীপ থেকে লাফ দিয়ে নামল যিয়াদ, ফিলিপ এবং আরও দুজন। ড্রাইভার গাড়ীতেই থাকল। যিয়াদ ও ফিলিপ এসে কারের সামনে জানালার কাছে দাঁড়ালো।

কারের ড্রাইভিং সিটে আবদুর রহমান। তার পাশের সিটে আহমদ মুসা। পেছনের সিটে জোয়ান।

যিয়াদ ও ফিলিপ জানালার কাছে দাঁড়াতেই আহমদ মুসা মুখ বের করে বলল তোমরা চলে যাও। ঠিক ১০ মিনিট পর আমি সামনের গেট দিয়ে ঢুকব।

পার্ল স্ট্রিটের এ বাইলেন দিয়ে ১৫ গজ ভেতরে গেলে হাতের ডান পাশে একটা গেট। এই বাড়ীতেই এনে রাখা হয়েছে জেমেনিজদের। আগে এটা জনৈক মন্ত্রীর বাড়ী ছিল। তাকে আরেকটা বাড়ীতে পার করে জেমেনিজকে দেয়া হয়েছে এ বাড়ী।

পার্ল স্ট্রিট মন্ত্রীদের পাড়া। রাস্তার দু'পাশে প্রধানত মন্ত্রীদের বাড়ী। প্রাইভেট বাড়ী আছে, ফ্ল্যাট বাড়ীও আছে। তবে তাদের সংখ্যা কম। এলাকাটা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ বলেই জেমেনিজকে এখানে এনে রাখা হয়েছে। সরকারের ভয়, জেনকে আটকাবার পর জেমেনিজ এবং কার্ডিনাল পরিবার আহমদ মুসার রোষদৃষ্টিতে পড়বে।

আহমদ মুসারা গত তিনদিন ধরে জেমেনিজের বাড়ীর উপর চোখ রাখছে। রাতে বাড়ীর এলাকায় ঢুকে নিরাপত্তা ব্যবস্থার খোঁজ নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

বিশাল এলাকা নিয়ে বাড়ী। চারদিক দিয়ে প্রাচীর ঘেরা। প্রাচীরের ভেতরে বাগানের মত প্রচুর গাছ। ঠিক মাঝখানে বাড়ী। বাড়ীটি দ্বিতল।

বাড়ীর গেটে স্টেনগানধারী দু'জন প্রহরী। স্টেনগানধারী আরও দু'জন প্রহরী টর্চ নিয়ে বাড়ীর চারদিকের বাগানে ঘুরে বেড়ায়। বাড়ীর গ্রাউন্ড ফ্লোরের রিসেপশন রুমে আরও ছয়জন পুলিশ সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকে। যাতে সংকেত পেলেই যে কোন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্যে ছুটে যেতে পারে।

আহমদ মুসা ভেতরের প্রহরীদের দায়িত্ব দিয়েছে যিয়াদ, ফিলিপ ও তাদের দলকে। প্রাচীর টপকে বাড়ীর ভেতর প্রবেশ করে তারা তাদের দায়িত্ব পালন করবে। তারা ভেতরে ঢোকার ১০ মিনিট পর আহমদ মুসা প্রধান গেট দিয়ে বাড়ীতে ঢুকবে। গেটে দু'জন পুলিশের দায়িত্ব তার।

যিয়াদ ও ফিলিপরা চলে যাবার ঠিক ১০ মিনিট পর আহমদ মুসা আবদুর রহমানকে ইশারা করলেন ঢোকার জন্যে। জীপের ড্রাইভারকে বলল আরও কিছু পরে গেটে আসতে।

লেনের বাপ পাশ দিয়ে দীর্ঘ প্রাচীর। একটা বাড়ীর পেছন দিক এটা। তাই এ প্রাচীরে কোন গেট নেই।ডান পাশ দিয়েও প্রাচীর। এ প্রাচীর জেমেনিজের বাড়ীর। এ লেন দিয়ে গজ পনের এগুলেই এই প্রাচীরের সাথেই জেমেনিজের বাড়ীর গেট।

গেটের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছল আহমদ মুসার গাড়ী। দেখা গেল, গেটের দু'জন পুলিশ গেটের দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে। গেট খোলা।

আহমদ মুসা আবদুর রহমানকে গাড়ী ঠিক গেটের উপর নিয়ে দাঁড় করাতে বলল।

গাড়ী গিয়ে দাঁড়াল ঠিক গেটের ওপরই।

গাড়ী দাঁড়াতেই দু'দিক থেকে দু'জন পুলিশ ছুটে এল। দু'জনেই এল জানালার কাছে। একটু বাঁকা হয়ে জানালা দিয়ে ভেতরে চোখ ফেলতে চেষ্টা করল ভেতরের মানুষকে দেখার জন্যে। তাদের দু'জনের হাতেই স্টেনগান বাগিয়ে ধরা।

গাড়ী গেটে দাঁড়াবার সংগে সংগেই আহমদ মুসা ও আবদুর রহমান গাড়ীর দরজা খুলে শক্ত হাতে দরজার হুক ধরে বসেছিল। দু'জন পুলিশ যেই বাঁকা হয়ে জানালা দিয়ে ভেতরে চোখ বুলাতে গেছে, অমনি আহমদ মুসা ও আবদুর রহমান একই সাথে প্রচন্ড বেগে দরজা সামনে ঠেলে দিল। ছিটকে পড়ে গেল পুলিশ দু'জন।

আহমদ মুসা ও আবদুর রহমান বেরিয়ে এল দ্রুত গাড়ী থেকে। পুলিশ দু'জন উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিল। ওদের হাতে স্টেনগান নেই, ছিটকে পড়ে গেছে।

ওদের উঠে দাঁড়াতে দিল না আহমদ মুসা ও আবদুর রহমান। কারাতের মারাত্মক ছোবল তাদের ঘুম পাড়িয়ে দিল।

ঠিক এই সময়েই বড় রাস্তার দিক থেকে দু'টি মটর সাইকেলের আওয়াজ পাওয়া গেল।

আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি জোয়ানকে গাড়িটা গাড়ি বারান্দায় নিতে ইশারা করে সংজ্ঞাহীন একজন পুলিশকে টেনে গেটের পাশে একটু আড়ালে নিয়ে গেল।

কিন্তু আবদুর রহমান সিদ্ধান্ত নিতে দেরী করে ফেলেছিল। জোয়ান গাড়ী নিয়ে চলে যাবার পর আবদুর রহমান যখন দেখল আহমদ মুসা সংজ্ঞাহীন পুলিশটিকে সরিয়ে ফেলেছে, তখন আবদুর রহমানও অপর পুলিশটিকে সরাতে গেল। কিন্তু দেরী হয়ে গেছে তখন। ছুটে আসা মটর সাইকেল একেবারে কাছে এসে পড়েছে। ফলে সে যে একজন সংজ্ঞাহীন পুলিশকে সরিয়ে ফেলছে তা ধরা পড়ে গেল।

আবদুর রহমান সংজ্ঞাহীন পুলিশকে ছেড়ে দিয়ে তার রিভলবার বের করতে গেল। কিন্তু মটর সাইকেল আরোহীদের চারটা রিভলবার তখন তার দিকে তাক করা। মটর সাইকেল আরোহীদের থেকে একজন ভারী কন্ঠে বলল, পকেট থেকে খালি হাত বের করে নাও। না হলে মাথা গুড়ো হয়ে যাবে।

আবদুর রহমান পকেট থেকে হাত বের করে নিল।

গেটে এসে চারজন মটর সাইকেল থেকে নামল। মনে হল চারজনই পুলিশের অফিসার র‍্যাংকের লোক। নেমেই একজন বলল, গেটের আরেকজন পুলিশ কোথায়?'

সম্ভবত আরেকজন পুলিশকে খোঁজার জন্য দু'জন এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। আর দু'জন এগুলো আবদুর রহমানের দিকে।

আহমদ মুসা দেখল, যারা দ্বিতীয়জন পুলিশকে খুঁজছে, তাদের দৃষ্টি গেটের এদিকে। ওরা এক্ষুনি এদিকে আসবে।

আহমদ মুসা আর দেরী করা সমীচিন মনে করল না। তার হাতে তখন দ্বিতীয় পুলিশটির স্টেনগান।

স্টেনগান বাগিয়ে বেরিয়ে এল সে আড়াল থেকে। যে দু'জন পুলিশ অফিসার এদিকে আসার জন্যে ফিরে দাঁড়িয়েছিল, তারা ভূত দেখার মত চমকে উঠল।

আহমদ মুসা গম্ভীর কন্ঠে বলল, 'রিভলবার ফেলে দাও।'

আহমদ মুসার কন্ঠে যারা আবদুর রহমান দিকে এগুচ্ছিল তারা চমকে ফিরে তাকাল।

আর সেই সুযোগে আবদুর রহমান বের করে নিল তার রিভলবার।

দু'জন পুলিশ অফিসার তাদের পিস্তল আগেই ফেলে দিয়েছিল। আবদুর রহমান অবশিষ্ট দু'জনের হাত থেকে কেড়ে নিল রিভলবার।

'আবদুর রহমান ওদের মটর সাইকেলের ইমারজেন্সী কীট থেকে হ্যান্ডকাফ গুলো বের করে পিছমোড়া করে ওদের হাতে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে দাও।' নির্দেশ দিল আহমদ মুসা।

আবদুর রহমান এগিয়ে গেল হ্যান্ডকাফ আনার জন্যে।

এই সময় যিয়াদ ছুটে এল সেখানে।

'ওদিকের কাজ শেষ?' জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

'জি হ্যাঁ।' বলল যিয়াদ।

'যে টুকু বাকি আছে, বড় ভাই (ফিলিপ) তা সারছেন। এদিকে এই দৃশ্য দেখে আমি ছুঠে এলাম।' কথা শেষ করল যিয়াদ।

আবদুর রহমান ও জোয়ান দু'জনে মিলে চার পুলিশ অফিসারকে পিছমোড়া করে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে দিল। তারপর তাদের পা বেধে, মুখে রুমাল গুজে গেটের পাশে গাছপালার আড়ালে ঠেলে দিল।

গেটের ব্যবস্থাটা শেষ করে চলে এল আহমদ মুসা গ্রাউন্ড ফ্লোরের রিসেপশনে। দেখল ওখানকার ৬ জন পুলিশকে হাত-পা বেধে ফেলে রাখা হয়েছে।

'বাগানের দু'জন প্রহরীকেও হাত-পা-মুখ বেধে ফেলে রেখে এসেছি।' বলল ফিলিপ।

'ফিলিপ তুমি ও যিয়াদ অন্য ভাইদের নিয়ে থাক। আমি, আবদুর রহমান ও জোয়ান ওপরে দেখছি।' বলে আহমদ মুসা দোতালা ওঠার সিড়িঁর দিকে এগুলো। তার পেছনে আবদুর রহমান এবং জোয়ান।

দুতালার সিঁড়ি গিয়ে শেষ হয়েছে দুতালার ড্রইং রম্নমে।

দুতালার ড্রইংরুমে পা দিতেই সামনে পড়ল একজন পরিচারিকা।

রিভলবার হাতে আহমদ মুসাদের দেখে ভয়ে পাথর হয়ে গেল পরিচারিকাটি। তার হাতে একটা চায়ের কাপ ছিল, পড়ে গেল।

'জেন কোথায়, কোন ঘরে?' জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

পরিচারিকার মুখে কথা সরলনা। আঙুল দিয়ে একদিকে ইংগিত করল।

'চল দেখিয়ে দাও।' বলে পরিচারিকাকে চলার ইংগিত করল আহমদ মুসা।

আগে আগে চলল পরিচারিকা। সে কাপঁছে। তার পেছনে আহমদ মুসা ও অন্যান্যরা।

'ভয় করছ কেন, আমরা জেনের ভাই।' একটু থেমেই আবার জিজ্ঞাসা করল, 'জেনের আব্বা আম্মা কোথায়?'

'জেনকে একজন পুলিশ অফিসার জিজ্ঞাসাবাদ করছে, তারা সেখানেই বসে আছেন।'

পরিচারিকার কথা শেষ না হতেই সামনের একটা দরজা দিয়ে একজন পুলিশ অফিসারকে বেরুতে দেখল। কিন্তু রিভলভার হাতে আহমদ মুসাদের ওপর চোখ পড়তেই ঝট্ করে সে আবার ভেতরে ঢুকে গেল।

কিন্তু ঘরের ভেতরে ঢুকে সামনের দিকে তাকাতেই আহমদ মুসাকে থমকে দাঁড়াতে হলো। দেখল, পুলিশ অফিসারটি জেনের পেছনে দাঁড়িয়ে তার মাথায় পিস্তল ঠেসে ধরে আছে।

আহমদ মুসা থমকে দাঁড়াতেই পুলিশ অফিসারটি বলল, 'তোমরা দরজা ছেড়ে দিয়ে এই মুহূর্তে সরে যাও, না হলে জেনকে হত্যা করব আমি।'

আহমদ মুসার পা আর নড়ল না। তার রিভলবারের নল পুলিশ অফিসারের দিক তাক করা, কিন্তু জেনের পেছনে পুলিশ অফিসার।

জেনের আব্বা-আম্মা বসেছিল। তারা উঠে দাঁড়িয়েছে। তাদের মুখ ফ্যাকাসে। কাঁপছে তারা।

'তিন পর্যন্ত গুনব এর মধ্যে যদি তোমরা সবাই ঘরে ঢুকে দরজা ছেড়ে না দাও তাহলে জেনকে হত্যা করব আমি।' চিৎকার করে বলল পুলিশ অফিসারটি।

আহমদ মুসারা ঘরের এক পাশে সরে গেল দরজা থেকে।

পুলিশ অফিসারটি জেনকে সামনে নিয়ে দেয়ালের ধার ঘেঁষে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। তার সাথে বেরিয়ে গেল আহমদ মুসাও।

জেনকে সামনে রেখে তার আড়ালে দাঁড়িয়ে এক পা এক পা করে পিছু হটছিল পুলিশ অফিসার।

সিঁড়ির মুখে গিয়ে পুলিশ অফিসার আবার চিৎকার করে বলল, 'তোমরা আর এক পাও এগুতে পারবে না, যদি বাঁচিয়ে রাখতে চাও জেনকে।'

পুলিশ অফিসারের এই চিৎকারে খুশী হলো আহমদ মুসা। সিঁড়ি গোড়ায় বসে আছে যিয়াদ ও ফিলিপরা। নিশ্চয় তারা শুনতে পেয়েছে পুলিশ অফিসারের এ বাজখাই কন্ঠ।

তাই হল।

অপরিচিত একটা বাজখাই কন্ঠ নিচে ফিলিপদের কানে যাওয়ার সাথে সাথে তারা উৎকর্ণ হয়ে উঠে দাঁড়াল। তাদের চোখে মুখে কিছুটা উদ্বেগ নেমে এল। কিছু একটা বিপত্তি ঘটেছে ওপরে।

'যিয়াদ তুমি বস আমি ওপরে দেখি।' বলে ফিলিপ রিভলবার বাগিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বিড়ালের মত নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। সিঁড়ির দ্বিতীয় বাঁকে গিয়ে ওপরে চোখ ফেলতেই গোটা ব্যাপারটা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল, সেই সাথে সে শিউরে উঠল। সেও যদি ঐ শয়তানের কাছে ধরা পড়ে যায়, তাহলে তাকে রিভলবার ফেলে দিতে হবে, জেনকে বাঁচাবার জন্যে। সুতরাং শয়তানটার চোখে পড়ার আগেই তাকে কাজ সারতে হবে।

চিন্তার সংগে সংগেই ফিলিপ তার রিভলবারটি তুলে নিল।

পুলিশ অফিসারটি তখন সিঁড়ির দু'ধাপ নেমে এসেছে।

ফিলিপ ধীরে সুস্থে ঠিক মাথার পেছনটা লক্ষ্য করে রিভলবারের ট্রিগার টিপল।

কোন শব্দও বেরুলনা পুলিশ অফিসারের কন্ঠ থেকে। গড়িয়ে পড়ল সিঁড়ি দিয়ে।

আহমদ মুসা তার রিভলবার পকেটে পুরল। তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল আবদুর রহমান। আর পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল জেনের আব্বা-আম্মা এবং তাদের সাথে জোয়ান।

পুলিশ অফিসার গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে যাবার সংগে সংগেই জেন ছুটে গিয়ে তার মাকে জড়িয়ে ধরল।

সিঁড়ির বাঁকে এসে আটকে যাওয়া পুলিশ অফিসারের লাশের দিকে একবার চেয়ে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে উঠে এল ফিলিপ।

'ধন্যবাদ ফিলিপ, তুমি সিদ্ধান্ত নিতে দেরী করনি।' বলল আহমদ মুসা।

'কোন অসুবিধা হয়নি তো মুসা ভাই?'

'ঐ টুকুই, আর কিছু নয়।' বলে আহমদ মুসা পেছন ফিরে জেনকে লক্ষ্য করে বলল, 'জেন তুমি নিচে যাও, জোয়ান তুমিও যাও।'

জেন তার আম্মাকে জড়িয়ে ধরে ছিল। আম্মাকে ছেড়ে দিয়ে জেন সোজা হয়ে দাঁড়াল। একবার আহমদ মুসা, আরেক বার তার আম্মা-আব্বার দিকে তাকাল। বিমূঢ় সে।

'জেন আমরা কিন্তু সময় বেশী পাব না।'

'যাচ্ছি ভাইয়া। আব্বা-আম্মার কি হবে?'

'ওঁদেরকে একটা ষ্টোরে আটকে রেখে যাব, যাতে আমরা চলে যাবার আগে ওঁরা পুলিশকে খবর দেয়ার সুযোগ না পান।'

বলেই আহমদ মুসা তার রিভলবার উঁচিয়ে জেমেনিজকে বলল, 'আপনাদের স্টোর রুমে নিশ্চয় টেলিফোন নেই, ওখানেই আপনাদের আটকে রাখতে চাই।'

বলে আহমদ মুসা তিন জন পরিচারিকা সহ জেমেনিজকে নির্দেশ দিল ষ্টোর রুমের দিকে হাঁটার জন্যে।

জেমেনিজ ও জেনের মা একবার আহমদ মুসার কঠোর মুখের দিকে, আরেকবার জেনের দিকে দিকে চেয়ে ভয় ও অপমান পীড়িত চেহারা দিয়ে ষ্টোরের দিকে হাঁটতে লাগল।

জেন, জোয়ান, আবদুর রহমান এবং ফিলিপ সকলেরই বিব্রতকর চেহারা। তাদের সকলের মুখেই বিমূঢ় ভাব।

আহমদ মুসা জেনের আব্বা-আম্মা ও তিনজন পরিচারিকাকে ষ্টোর রুমে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে ছিটকিনি তুলে দিল।

ফিরে এল আহমদ মুসা ড্রইং রুমে। বলল, ‘চল।’

তখনও সকলের চোখে-মুখে বিমূঢ় ভাব। জেনের আব্বা-আম্মার সাথে আহমদ মুসার এই রূঢ় আচরণের কোন ব্যাখ্যা তারা খুঁজে পাচ্ছে না। জিজ্ঞাসা করারও সাহস নেই।

জেন প্রথমে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল। তারপর জোয়ান।

সকলেই নেমে এল গাড়ী বারান্দায়।

কারের পাশে জীপও এসে দাঁড়িয়েছিল।

কারের ড্রাইভিং সিটে বসল আবদুর রহমান। সামনের সিটে আহমদ মুসা। তার পাশে জোয়ান। পেছনের সিটে জেন একা।

অবশিষ্টরা সবাই জীপে।

গাড়ী দু'টো বেরিয়ে এল পার্ল স্ট্রীটে।

ফিলিপের বাড়ীর গাড়ী বারান্দায় যখন তারা সবাই নামল গাড়ী থেকে, তখন রাত ১২টা।

গাড়ী থেকে নেমে সবাই ঘুরে দাঁড়িয়েছে বাড়ীতে প্রবেশের জন্যে।

আহমদ মুসার পাশেই ছিল ফিলিপ। আহমদ মুসা সামনে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'মাফ করবেন মুসা ভাই, আমার আর তর সইছেনা। আমার একটা প্রশ্ন, আমার কেন সবারই প্রশ্ন জেনের আব্বা-আম্মার সাথে এই আচারণ না করলে কি হতো না, তাদেরকে স্টোর রুমে আটকে না আসলে হতো না ?'

'কি করতে হতো তোমাদের মতে?' একটু হেসে বলল আহমদ মুসা।

'তাদেরকে আটকে রাখার দরকার ছিল না। ওদের সাথে ভাল করে কথা বলে আসতে পারতাম।'

'মন্দ হতো না, আগামী কালই ওরা গ্রেফতার হতেন। ওদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হতো, আমাদের সাথে গোপনে যোগাযোগ করে ওরা জেনকে পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং একজন পুলিশ অফিসারকে হত্যা করিয়েছেন। এটাই কি ভাল হতো?'

'ওদের সাথে আমাদের এই ব্যবহার ওরা জানত কি করে?'

'একজন পুলিশ কে আমরা মারলাম, অন্যদের মেরে সংজ্ঞাহীন করলাম, কাউকে বেঁধে রাখলাম, আর ওদের কিছুই হল না, ওদের গায়ে আঁচড় ও লাগল না একে স্বাভাবিক বলে ওরা মেনে নিত না।'

'ঠিক আছে, ওদের আটকেই রেখে আসতাম, কিন্তু ভাল করে কথা বলে আসা যেত না? শক্রর সাথে যে আচরণ, সেই আচরণ আমরা ওদের সাথে করে এসেছি।' বলল ফিলিপ।

‘তোমাদের এই ভাল আচরণ এবং আলাপ, কথা বার্তা পুলিশ এবং সরকারের কাছে গোপন থাকতো না।’

‘কি করে? কেউ তো দেখতে পেতনা। পুলিশ যারা সজ্ঞানে ছিল তারা তো সবাই নিচে।’

‘নিশ্চয় জেনে রেখ, এই ঘটনা নিয়ে ঐ তিনজন পরিচারেকা কে পুলিশ অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করবে। পরিচারিকাদের কাছে থেকেই সব কিছু বেরিয়ে যেত।’

ফিলিপ কোন কথা বলল না। তার মুখে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। জেন, জোয়ান সকলের মুখেই তখন হাসি।

‘ভাইয়া আমাকে মাফ করবেন, এতক্ষন মনে যেমন কষ্ট পেয়েছি, তেমনি আপনার উপর হয়ে উঠেছিলাম ক্ষুব্ধ, এখন বুঝতে পারছি, আপনি আমার আব্বা আম্মাকে বাঁচিয়েছেন, মান - মর্যাদা সহ তাদের বেঁচে থাকারও ব্যবস্থা করেছেন।’

‘কার্ডিনাল পরিবার এক ভয়ানক বিপদ থেকে রক্ষা পেল।’ বলতে বলতে জেনের চোখ ছল ছল করে উঠল কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে।

একটু থেমেই জেন আবার বলল, ‘আমার আব্বা বিপদগ্রশ্থ হবেন এই আশংকা করেই আমি সেখানে বলেছিলাম, ‘ভাইয়া আমার আব্বা-আম্মার কি হবে।’ আপনি এত নিখুঁতভাবে আমার উদ্বেগের সমাধান করে দিয়েছেন, তা তখন বুঝিনি। না বুঝে কষ্ট পেয়েছিলাম।’

‘কিন্তু জেন তোমার আব্বা আম্মা আমাকে এখন কি ভাববেন, বলত?’ মুখে হাসি টেনে বলল আহমদ মুসা।

‘আমরা এখন যেটা বুঝলাম তারাও এটা পরে বুঝবেন। যখন বুঝবেন তখন তারা আমাদের চেয়েও বেশী খুশী হবেন। আপনি আমাদের পরিবারের কত বড় উপকার করলেন তা আপনি বুঝবেন না মুসা ভাই।’ বলল জেন।

‘মুসা ভাই, ঐ উত্তেজনার মুহূর্তে অতদুরে চিন্তা আপনি কি করে করতে পারলেন?’ বলল যিয়াদ।

‘এ জিজ্ঞাসার জবাব কি আমি দিতে পারি যিয়াদ? এ জ্ঞান যিনি দিয়েছেন, সে আল্লাহ তো সব জানেন, সব করেন, সব পারেন। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের এ ভাবেই সাহায্য করেন।’

বলে আহমদ মুসা পা বাড়াল বাড়ির ভেতরে প্রবেশের জন্য।

তাঁর পেছনে সবাই হাঁটতে শুরু করল।

সবার পেছনে জোয়ান আর জেন।

‘আম্মার সাথে দেখা করতে গিয়ে তোমাদের খুব ভোগালাম তাই না?’ জেন বলল জোয়ানকে।

‘শুধু ভোগালে, ভোগও তো করলে।’

‘শুনিনি তো, জানলে কি করে?’

‘জানার জন্য সব সময় কি শোনার দরকার হয়?’

‘তোমরা আর দেরী করলে কি হতো জানি না। জান আজ ওরা ‘মিথ্যা ধরা’ যন্ত্র এনেছিল। পুলিশ অফিসার নিচে থেকে ঐ যন্ত্রই আনতে যাচ্ছিল, এই সময় তোমরা গেছ।’

‘তোমার কাছ থেকে ওরা কি জানতে চেষ্টা করেছে?’

‘বেশীর ভাগ প্রশ্ন তোমার, মুসা ভাই আর ফিলিপ-এর ঠিকানা নিয়ে। এছাড়া তোমাদের কি পরিকল্পনা রয়েছে, কোন কোন দেশ সাহায্য করেছে, স্পেনে আর কারা সাহায্য করেছে, ইত্যাদি প্রশ্নই বার বার ওরা করেছে।’

‘মুক্তি সম্পর্কে কি ভাবতে?’

‘আমি নিশ্চিত ছিলাম, আহমদ মুসা ভাই আমাকে মুক্ত করবেনই। তারপর আব্বার কাছ থেকে মুসা ভাই আমাদের ঠিকানা নেওয়ার খবর যখন শুনলাম, তখন থেকে প্রতিদিনই তোমাদের অপেক্ষা করেছি।’

‘তোমার আব্বা আম্মা?’

‘আমার খুব ভয় ছিল আব্বা আম্মা আমার সিদ্ধান্তকে কিভাবে গ্রহন করেন। কিন্তু দেখলাম তারা মেনে নিয়েছেন। তারা মেয়ের সিদ্ধান্তকে গ্রহন করেছেন আন্তরিকভাবে।’

‘কোন সিদ্ধান্ত?’

'জানিনা কোন সিদ্ধান্ত' বলে জেন দ্রুত পা চালিয়ে ঢুকে গেল ভেতরে। তাঁর মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে।

# ৫

মাগরিবের নামায শেষ করে ফিলিপের মা ঘুরে বসল জেনের দিকে। জেনের নামায তখন শেষ হয় নি।

ফিলিপ, ফিলিপের মা, জেন ক'দিন আগে ইসলাম গ্রহন করেছে। মনের দিক দিয়ে তাঁর তৈরি হয়ে গিয়েছিল অনেক আগেই। সে দিন শুধু সকালে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছিল। কলেমা শাহাদাৎ পড়ার পর তারা অজু করে দু রাক'আত নফল নামাজ পড়ে মুসলিম জীবনের নতুন যাত্রা শুরু করেছিল।

কলেমা শাহাদাৎ পড়ার পর আবেগে কেঁদে ফেলেছিল ফিলিপ এর মা।

'কাঁদ কেন আম্মা তুমি?' বলেছিল ফিলিপ

'মারিয়ার কথা মনে পড়ে গেল। মারিয়া থাকলে আজ কত খুশী হতো। আরেকটা আবেগময় চিত্র আমার চোখে সুখের অশ্রু এনে দিয়েছিল বেটা।' বলেছিল ফিলিপের মা।

তাঁর মা থামতেই ফিলিপ আগ্রহ ভরে প্রশ্ন করছিল, 'সেটা কি আম্মা?'

'আমার মনে হল আমার স্পেনের নতুন ইতিহাসের দিক উন্মোচন করলাম। সেই ১৪৯২ সালে গ্রানাডার পতনের মধ্যে দিয়ে মুসলমানের পতন ঘটেছিল স্পেনে। কিন্তু তারও আগে থেকে স্পেনীয়দের ইসলাম গ্রহনের ধারা বন্ধ হয়েছিল। ১৪৯২ সালের পর যে সব মুসলমান বাঁচতে চেয়েছিল, শুরু হয়েছিল তাদের খ্রিস্টান হবার পালা। শত শত বছরের কাল পরিক্রমা শেষে আজ আবার স্পেনে খ্রিস্টানদের মুসলমান হওয়ার পালা শুরু হল। এই নতুন ইতিহাসের যাত্রা শুরু আমরাই করলাম। এই সৌভাগ্যের অশ্রু আমি রোধ করতে পারিনি।' বলতে বলতে আরও অশ্রু ঢল নেমেছিল ফিলিপের মার চোখে।

আহমদ মুসা, জোয়ান, ফিলিপ, জেন কারও চোখ সেদিন শুকনো ছিল না।

'আম্মা, তুমি বিষয়টা এত আবেগ দিয়ে ভেবেছ?' বলেছিল ফিলিপ।

‘কেন ভাববো না। আমি ছাত্রী ছিলাম ইতিহাসের। মুসলিম শাসনকাল ছিল স্পেনের স্বর্ণযুগ। এই স্বর্ণযুগ ইতিহাস আমার খুব প্রিয় ছিল। পড়তে গর্বে আমার বুক ভরে উঠত যে, আজকের লন্ডন, প্যারিস, বার্লিন যখন জংগলে পূর্ণ অসভ্যতার অন্ধকারে ডুবে ছিল, তখন স্পেনের শহরগুলো ছিল আলোক প্লাবিত, চোখ ধাঁধানো হর্মরাজিতে পূর্ণ, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় হাজার হাজার ছাত্রের কল গানে মুখরিত। ব্রিটেন, জার্মান, ফ্রান্সের অসভ্য-অজ্ঞ মানুষরা তখন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে জ্ঞান ভিক্ষা করত। মুসলমানদের এই ইতিহাস আমার প্রিয় ছিল বলেই করডোভা, গ্রানাডা, আল হামরার দুর্দশা দেখে আমার কান্না আসত। আজ স্পেনের সেই স্বর্ণযুগের নির্মাতা মুসলমানদের কাতারে যখন এসে দাঁড়ালাম, তখন আমার ছাত্র জীবনের সেই অনুচ্চারিত কান্নাই যেন আমার বুকে নতুন করে ফিরে এল।’

ফিলিপ, আহমদ মুসা, জোয়ান, জেন সকলের চোখ হয়ে উঠেছিল বিস্ময় বিমুগ্ধ। ফিলিপ যেন তাঁর মাকে আজ নতুন করে দেখেছে।

‘একটা কথা বল মা, ছাত্র জীবনে থেকে যাদের জন্য তোমার এত কান্না, তাদের জন্য কিছু করার কথা তোমার মনে হয়নি?’ বলেছিল ফিলিপ।

‘আমি ছিলাম ইতিহাসের পাঠক, নিজেকে কখনও পলিটিশিয়ান ভাবিনি।’

ফিলিপ তারপর কোন কথা বলেনি।

কথা বলে উঠেছিল আহমদ মুসা। বলেছিল আবেগে জড়িত কণ্ঠে, ‘আপনার মত এই স্পেনে আর কত মা আছে আম্মা?’

তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয়নি ফিলিপ এর মা। গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। তাঁর শূন্য দৃষ্টি জানালা দিয়ে ছুটে গিয়েছিল বাইরে। বলেছিল, তা বলতে পারব না বাছা। তবে আমার বান্ধবীদের অনেকে আমার চেয়েও অনেক আবেগ প্রবন ছিল। শুধু মা নয় বাবা, অনেক পিতাও এমন তুমি পাবে। একজন প্রবীন শিক্ষক এর কথা আমার মনে পড়ে। তিনি একদিন ক্লাসে বলেছিলেন, ‘স্পেনের মুসলিম শাসন যদি আর কয়েক শত বছর থাকতো, তাহলে জ্ঞান-বিজ্ঞানে স্পেন হতো আধুনিক ইউরোপের রাজধানী।’ একজন ছাত্র তৎক্ষণাৎ একটা গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রশ্ন

করেছিল, ‘স্পেন আধুনিক ইউরোপের রাজধানী হয়তো হতো, কিন্তু খৃষ্টানদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যেত না।’ প্রশ্নটা শুনে স্যার অনেকক্ষণ চুপ করে ছিলেন। তাঁর চোখ-মুখ ভারি হয়ে উঠেছিল বেদনায়। বলেছিলেন খুব ভারি কন্ঠে, ‘তোমার প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না। কারণ, তুমি যে বই থেকে উদ্ধৃতি দিলে, তার নাম ইতিহাস হলেও ওকে রূপকথা বলাই ভাল। তবে এটুকু জেনে রাখ, মুসলমানরা আমাদের মত হলে মুসলমানদের হাত থেকে রাজ্য কেড়ে নেবার জন্যে স্পেনে একজনও খৃষ্টানও খুঁজে পাওয়া যেতো না।’ স্যারের এই কথায় আমরা সেদিন হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। স্যার তার কক্ষে ফিরলে আমি গিয়ে তাঁকে বলেছিলাম, ‘স্যার আপনার কথা কি দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে গেল না?’ তিনি ইজি চেয়ারে শুয়ে ছিলেন। তাঁর চোখ দুটি বন্ধ ছিল। তিনি চোখ বন্ধ রেখেই বললেন, ‘দেখ আমি আমার জীবনের শেষ প্রান্তে। আমার আর হারাবার কিছু নাই। যা বলিনি এখনও যদি তা না বলি কখন আর বলব?’ বাছা আমাদের এ স্যারের মত লোকের খুব অভাব নেই স্পেনে।’

এই ভাবে ইসলাম গ্রহণের অনুষ্ঠান সেদিন স্পেনের উপর এক মনোজ্ঞ আলোচনায় রূপান্তরিত হয়েছিল।

ফিলিপের মা ও জেন নামাজ পড়ছিল ফিলিপের মা’র ঘরে।

জেনের নামাজ শেষ হলে সে ফিলিপের মার দিকে ঘুরে বসল।

ফিলিপের মা চেয়েছিল জেনের মুখের দিকে।

ফিলিপের মা’র ঠোঁটে একটুকরো স্নেহ মাখা হাসি।

জেন ফিলিপের মা’র দিকে ঘুরে বসলে, ফিলিপের মা জেনের চিবুকে একটা টোকা দিয়ে আদর করে বলল, জান, আহমদ মুসা তোমাকে এবং জোয়ানকে ট্রিয়েস্টে পাঠাচ্ছে। সেখানে ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর থিওরিটিকাল ফিজিক্স (আই সি টি পি)-এ তোমাদের দু’জনেরই চাকুরী হয়ে গেছে। আমি মনে করি তার এ সিদ্ধান্ত খুবই সঠিক। এখন স্পেনে তোমার এবং জোয়ানের প্রকাশ্যে বের হওয়া সম্ভব নয়।’

‘আপনি ঠিক বলেছেন খালাম্মা। আর জোয়ানের জন্যে এটা হবে খুব খুশীর খবর।’ বলল জেন।

‘কেন তুমি খুশী হবে না?’

‘এই যাওয়াটা আমার জন্যে প্রয়োজনীয়। কিন্তু এটা আমার জন্যে খুশীর খবর নয়। খুশী হতাম যদি দেশে থাকতে পারতাম।’

‘বুঝেছি দেশকে তুমি খুব ভালবাস।’

একটু থামল ফিলিপের মা। তার চোখে মুখে চিন্তার একটা ছাপ। ফিলিপের মা’ই আবার কথা বলল। বলল, ‘তোমার সিদ্ধান্তে কোন ফাঁক নেই তো মা? পরে দুঃখ পাবে না তো?’

‘না খালাম্মা। আমি ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমার এই সিদ্ধান্ত এবং আমার দেশকে ভালবাসার মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই। দেশকে ভালবেসেই আমি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

‘আহমদ মুসা তোমাকে আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করতে বলেছে।’

‘কি কথা খালাম্মা?’

‘আহমদ মুসা তোমাদের বিয়েটা আজ-কালের মধ্যে সেরে ফেলতে চায়। তোমার মত জানতে চেয়েছে।’

‘জেনের মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। মুখ নিচু করল সে। কোন উত্তর দিল না।

ফিলিপের মার মুখে স্নেহমাখা হাসি ফুটে উঠল। সে-ই আবার মুখ খুলল। বলল, ‘বল মা তোমার মত না শুনলে তো আমরা এগুতে পারছি না।’

‘এত তাড়াহুড়োর দরকার আছে কি খালাম্মা?’ মুখ নিচু রেখেই বলল জেন।

‘আহমদ মুসা বলছে, বাপ-মা’র অভিভাবকত্ব থেকে তুমি দূরে। তাছাড়া বিপদ ঝুলছে মাথার উপর। এ সময় তোমার একা থাকা উচিত নয়। আমিও আহমদ মুসার এ মত পছন্দ করেছি।’

‘আপনারা আমার মুরুব্বী। আপনাদের মতই আমার মত’ বলে জেন লজ্জা রাঙা মুখ নিচু করেই ছুতে পালাল ফিলিপের মার সামনে থেকে।

‘সোনার মেয়ে, আজকালকার মেয়েদের এই লজ্জা দুর্লভ’- বলে ফিলিপের মা উঠে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা, ফিলিপ, জোয়ান, আবদুর রহমান, যিয়াদ বসে ছিল নিচের ড্রয়িংরুমে।

ড্রয়িংরুমে নেমে এল ফিলিপের মা। আহমদ মুসারা সবাই উঠে দাঁড়াল।

'বস তোমরা। আমি জেনের সাথে কথা বলেছি। তোমরা বিয়ের ব্যবস্থা কর।' বলল ফিলিপের মা। খুশিতে তার মুখ উজ্জ্বল।

'আল্লাহু আকবর' বলে আবদুর রহমান গিয়ে জড়িয়ে ধরল জোয়ানকে।

জোয়ানের মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

'খুব তো খুশী আবদুর রহমান, ভাইয়ের বিয়ের কথা শুনে। কিন্তু ভাইয়েরইতো মত নেয়া হয়নি। বল জোয়ান তোমার মত, জেনের মত তো পেয়েছি।' ঠোঁটে হাসি টেনে বলল ফিলিপ।

'থাক, জোয়ান বড় লাজুক ছেলে। ওকে জ্বালাসনে। তোর বিয়েতে পত জিজ্ঞেস করলে কিছু বলেছিলি তুই? শুনেই তো দৌঁড় দিয়েছিলি ঘর থেকে।' বলল ফিলিপের মা।

'ঠিক আছে আম্মা, আমরা সব ব্যবস্থা করছি।' বলল আহমদ মুসা।

'কিন্তু বাছা, বিয়েটা লা-গ্রীনজায় হতে হবে।' বলল ফিলিপের মা।

'সবাইকে এখানে নিয়ে এলেই তো হবে আম্মা।' আহমদ মুসা বলল।

'সবাইকে আনা যাবে, আমার মারিয়াকে তো আনা যাবে না।' ভারি কন্ঠ ফিলিপের মার।

ফিলিপের মার কথার সঙ্গে সঙ্গে সকলের মুখ ম্লান হয়ে গেল। বেদনার ছায়া নেমে এল সবার মুখে।

'ঠিক আছে, আপনি যা বলেছেন সেটাই হবে আম্মা।' শুষ্ক কন্ঠে বলল আহমদ মুসা। মারিয়ার প্রসঙ্গ উঠলে আহমদ মুসা আনমনা হয়ে যায়। সে বেদনা পাওয়া ছাড়াও তার মনে এক ধরনের অপরাধবোধ জাগে। তার জন্যেই মারিয়া জীবন দিয়েছে।

ফিলিপ কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল, এই সময় ড্রয়িং রুমের দরজায় এসে দাঁড়াল গেটের প্রহরী। আহমদ মুসা, ফিলিপ সবাই তার দিকে চাইল।

'স্যার গেটে একটা গাড়ী এসেছে, গাড়ীতে তিনজন লোক।...'

গেট-প্রহরীকে কথা শেষ করতে না দিয়েই প্রশ্ন করল ফিলিপ, 'কি চায়? কি বলে ওরা?'

গেট-প্রহরী এগিয়ে এসে ফিলিপের হাতে একটা নেম-কার্ড তুলে দিল।

ফিলিপ কার্ডের দিকে একবার নজর বুলিয়েই তুলে দিল তা আহমদ মুসার হাতে।

আহমদ মুসা নজর বুলাল কার্ডে। কার্ড হোল্ডারের নাম 'জো-ডোমিংডো'। পরিচয় লেখা আছে শুমারী অফিসার, গৃহ শুমারী কমিশন।

কার্ডটি পড়েই ভ্রু কুঁচকালো আহমদ মুসা। ফিলিপের দিকে চেয়ে আহমদ মুসা বলল, 'দেশে কি গৃহ শুমারী হচ্ছে? এরকম কোন ঘোষণা আছে?'

'না দেশে গৃহ শুমারী হচ্ছে না। এ রকম কোন ঘোষণাও ছিল না। তবে আজ সকালের নিউজে এবং পরে আরও বার কয়েক ঘোষণা দিয়েছে, রাজধানী মাদ্রিদে জরুরী ভিত্তিতে গৃহ শুমারী অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সবাইকে সহযোগিতা করার আবেদন জানানো হয়েছে।'

'আজ ঘোষণা, আজই গৃহ শুমারী শুরু?' বলে আহমদ মুসা ধপ করে বসে পড়ল সোফায়। আহমদ মুসার মুখে ভাবনার একটা কালো ছায়া নেমে এসেছে।

ফিলিপ অবাক হলো আহমদ মুসার ভাবান্তরে। গৃহ শুমারীর মধ্যে অস্বাভাবিকতা কি আছে!

আহমদ মুসা মুহূর্ত কয়েক চোখ বন্ধ করে থেকে তড়াক করে সোফা থেকে উঠে দাঁড়াল। বলল ফিলিপকে লক্ষ্য করে, 'আমার গাড়ীটা বাড়ীর পাশে গাছের নিচটাতেই তো পার্ক করা আছে না?'

'জি, কেন?' বলল ফিলিপ। তার চোখে উদ্বেগ।

'এই মুহূর্তে জোয়ান জেনকে নিয়ে ঐ গাড়ীতে গিয়ে বস। আর ফিলিপ তুমি গৃহ শুমারীর লোকদের নিয়ে এস।'

আহমদ মুসার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জোয়ান ছুটল। আহমদ মুসার আদেশ পালন করার জন্যে।

ফিলিপ ব্যাপারটা কিছু আঁচ করল এতক্ষণে। গেটের দিকে পা বাড়াবার আগে আহমদ মুসার দিকে চেয়ে বলল, 'আপনি নিজের কথা ভাবছেন না মুসা ভাই?'

'তুমি যাও, আমার একটা ব্যবস্থা করছি।' বলে আহমদ মুসা তার ঘরে যাওয়ার জন্যে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল।

'বড় কিছু আশংকা করছ বাছা?' আহমদ মুসার সাথে চলতে চলতে বলল ফিলিপের মা। তার চোখে মুখে উদ্বেগ।

আহমদ মুসা তার দিকে চেয়ে একটু হেসে বলল, 'আমি সন্দেহ করছি আম্মা, শুমারী-টুমারী কিছু না, ওরা বাড়ী সার্চ করতে এসেছে।'

'কেন?'

'সম্ভবত আমাকে, জোয়ানকে এবং জেনকে ওরা খুঁজছে।'

'এতক্ষণে সব বুঝেছি বাছা, আল্লাহ সহায়। তুমি একটু সাবধান হও, ওদের সামনে পড়োনা।'

দু'তলায় উঠে আহমদ মুসা চলে গেল তার ঘরের দিকে। আর ফিলিপের মা উঠে গেল তিন তলায়।

আহমদ মুসা যখন সিঁড়ি দিয়ে নিচের ড্রয়িং রুমে নামছিল, তখন ফিলিপ ও গৃহ শুমারীর তিনজন লোক সোফা থেকে উঠছিল। আহমদ মুসা সবাইকে গুড নাইট জানিয়ে আগন্তুকদের দিকে ইংগিত করে বলল, 'এঁরা কে?'

'এঁরা এসেছেন গৃহ শুমারীর পক্ষ থেকে।' ফিলিপ বলল।

'উঠছ কোথায়, ওঁদের সব তথ্য দিয়েছ?'

'ঘরে ঘরে গিয়ে সরেজমিনে গিয়ে ওরাই লিখবেন।'

'তাই বুঝি নিয়ম?' গৃহ শুমারীর লোকদের দিকে চোখ তুলে জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

'জি, এবার শুমারীতে সরকার কোন ফাঁক রাখতে চান না।' বলল আগন্তুকদের একজন।

'বেশ ভাল।' বলে আহমদ মুসা গিয়ে সোফায় বসল।

আহমদ মুসার মুখে বাস্ক পাদ্রীদের মত লম্বা দাড়ী, ইয়া লম্বা গোঁফ। মাথায় কাল হ্যাট, গায়ে লম্বা ওভার কোট। হাতে লাঠি। তাকে দেখলে মনে হচ্ছে, বাস্কদের একজন ধর্মীয়নেতা যেন পায়চারি করতে বেরুচ্ছে রাতের অপেক্ষাকৃত নিরিবিলি রাস্তায়।

ফিলিপের চোখ দেখেই আহমদ মুসা বুঝেছে, তার ছদ্মবেশ খারাপ হয়নি। ফিলিপ প্রথমে তার দিকে যে ভাবে তাকিয়েছিল তাতে আহমদ মুসা ভয় পেয়ে গিয়েছিল, ফিলিপ বেফাঁস কিছূ বলে বসে কিনা। ফিলিপ নিজেকে সামলে নিয়েছিল।

মিনিট দশেক পর ফিলিপ গৃহ শুমারীর তিনজন লোক নিয়ে নিচে ড্রইং রুমে এল।

ওরা এসে বসল সোফায়।

বসেই গৃহ শুমারীর জো ডেমিংগো লোকটি বলল, 'কষ্ট দিলঅম আপনাদের।'

'না না কষ্ট কি, আপনি আপনার কর্তব্য করেছেন। আপনাদের সহযোগিতা আমাদের দায়িত্ব।' বলল ফিলিপ।

সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে আহমদ মুসা সেদিনের 'দি ইসপানিয়া' কাগজটি সামনে তুলে ধরে ওতে চোখ বুলাচ্ছিল। ফিলিপের কথা শেষ হলে আহমদ মুসা কাগজটি মুখের সামনে থেকে একটু সরিয়ে জো ডেমিংগো'র দিকে চেয়ে বলল, 'সরকার নিশ্চয় বড় কোন প্রকল্প নিতে যাচ্ছেন যার জন্যে এই জরুরী গৃহ শুমারী।'

'আজ সকালে হুকুম পেয়ে, বেলা এগারটা থেকে কাজে নেমেছি। অত কিছু আমরা জানি না স্যার। তবে আমার মনে হয়, সরকার কোন বড় প্রকল্প নিয়ে নয়, বড় একটা সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।'

'সমস্যা? সে তো অনেক আছে।' বলল আহমদ মুসা।

'আমি বিশেষ সমস্যার কথা বলছি স্যার। মাত্র একজন লোক স্পেনে ওলট পালটের সৃষ্টি করেছে। তার সাথে আরও দুজনকে খুঁজে পাওয়ার জন্যে সরকার ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।'

'কে সেই লোক? তার সাথে আরও দুজন কারা? কি ওলট-পালট তারা করেছে?'

'ওলট-পালটের চেয়েও বেশী। মুসলমানদের ঐতিহাসিক স্থানগুলো ধ্বংসের জন্যে পাতা তেজষ্ক্রিয় ক্যাপসুল খুঁজে পাওয়ার পর সরকার প্রচন্ড চাপের মধ্যে পড়েছে এবং চারদিকের চাপে মুসলমানদেরকে স্বীকৃত সংখ্যালঘুর মর্যাদা দিতে হচ্ছে, তাদেরকে সকল নাগরিক অধিকার দিতে হচ্ছে, তাদের হাতে ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে তাদের ঐতিহাসিক স্থানগুলো। খৃস্টানদের মত তারাও স্বাধীনভাবে তাদের মত প্রকাশ, ধর্মপ্রচারের অধিকার পাবে। এটা স্পেনের জন্যে অকল্পনীয় ছিল।'

থামল জো ডেমিংগো।

'সেই একটি লোক এবং তার সাথের দু'জন কে, যারা এতবড় লন্ড-ভন্ড কান্ড ঘটাল?'

'বলা যাবে না তাদের নাম পরিচয়। তবে জেনে রাখুন তারা ধরা পড়ছেই।' বলল জো ডেমিংগো।

'যাদেরকে এতবড় লন্ড-ভন্ডের হোতা বলছেন, তারা তো নিশ্চয় কোন সাংঘাতিক কিছু। যদি তাই হয়, তাহলে তারা ধরা পড়বেই এমন কথা এত নিশ্চিত করে কি বলা যায়?'

'যায় অবস্থা দেখে। সেই লোক তিনটিকে ধরার জন্যে সরকার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। তারা এখনও রাজধানীতেই আছে। রাজধানীর ঘরে ঘরে তাদের খোঁজা হবে। রাজধানী থেকে তাদের বের হবার কোন পথ খোলা রাখা হয়নি যে, তারা পালিয়ে যাবে। সেনা বাহিনী, পুলিশ, গোয়েন্দা বিভাগ সকলকে নিয়োগ করা হয়েছে। শুধু সড়ক পথ নয়, মাদ্রিদের গোটা সীমান্ত সীল করা হয়েছে। সুতরাং বুঝতেই পারছেন।'

'সাংঘাতিক ব্যাপার। এতো তিনজন মানুষের বিরুদ্ধে একটা রাষ্ট্রের যুদ্ধ ঘোষনা। অথচ আমরা কিছুই জানিনা।'

'জানবেন কি করে, প্রকাশ হলে তো ওরা সাবধান হবার সুযোগ পাবে। তাছাড়া এই গোপনীতার আরেকটা কারন হলো, যে লোকটি সবকিছুর হোতা, তার

জগৎ জোড়া নাম আছে এবং তার পেছনে মুসলিম দেশসমূহ, বিশেষ করে মুসলিম জনগনের একচ্ছত্র সমর্থন আছে। সুতরাং পৃথিবীর সকলের অজ্ঞাতে তাকে পাকড়াও করে শেষ করে দিতে চায় সরকার।'

'লোকটি নিশ্চয় ধরা পড়বেই তাহলে।' বলল আহমদ মুসা।

'হ্যাঁ সবাই এটা আশা করছে। জানেন গত তিনদিনে লোকটিকে সন্দেহ করে প্রায় ৮'শ'র মত লোক আটক করা হয়েছে। নির্দেশ দেয়া হয়েছে সন্দেহ হলে তাকে যেন আর না ছাড়া হয়। জেলা পর্যায়ের কোন উর্ধ্বতন অফিসার পরীক্ষা করার পরই কোন লোককে শুধু ছাড়া যাবে।

'এই ব্যবস্থা শুধু কি মাদ্রিদের জন্যে?'

'না, হাইওয়ে গুলো এবং নদী পথ, রেলপথকেও এর সাথে শামিল করা হয়েছে।'

জো ডেমিংগো কথা শেষ করেই উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আপনার অনেক সময় নষ্ট করেছি, চলি এবার।'

জো ডেমিংগোর সাথী দু'জনও উঠে দাঁড়াল। ফিলিপও উঠে দাঁড়াল তাদের সাথে। ফিলিপ ওদের নিয়ে বেরিয়ে গেল। ফিলিপরা বেরিয়ে যাওয়ার অল্পক্ষণ পরেই ঘরে ঢুকল জোয়ান ও জেন।

জেনের মাথা ও গায়ে চাদর।

এক পাশে ভিন্ন এক সোফায় গিয়ে সে বসল।

জেন ও জোয়ানদের পর পরই ঢুকল ফিলিপ। ঢুকেই বলল, 'আচ্ছা মুসা ভাই আপনি কি বাতাস থেকে বিপদের গন্ধ পান নাকি? গৃহ শুমারী কমিশনের লোকদের দেখে কি করে বুঝলেন যে, ওরা বাড়ী সার্চ করতে এসেছে এবং আপনাদেরকেই খুঁজতে এসেছে ওরা।'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'এটা একটা সাধারন অনুমানের ব্যাপার। যখন ঘোষণা তখন থেকেই গৃহ শুমারী শুরু কোন দেশে কোথাও কখনও হয়নি। পূর্বাপর অবস্থা সামনে নিয়ে আমি বুঝতে পেরেছি, সরকার এই ঘোষণার মাধ্যমে প্রতিটি বাড়ী সার্চের ব্যবস্থা নিয়েছে।

জোয়ান, আহমদ মুসার খুলে রাখা দাড়ি এবং গোঁফ বসে বসে নাড়ছিল। আহমদ মুসা থামতেই সে বলল, 'আপনাকে ওরা চিনতে পারেনি তো মুসা ভাই? এই ছদ্মবেশ কি যথেষ্ঠ ছিল! আপনার ফটো নিশ্চয় ওদের কাছে ছিল।'

'শুধু আমার নয় জোয়ান। তোমার এবং জেনের ফটোও তাদের কাছে ছিল। আমার সাথে তোমাদেরও খুঁজতে এসেছিল ওরা।' বলে আহমদ মুসা জো ডেমিংগো'র কাছ থেকে পাওয়া সব কথা জোয়ন ও জেনকে শোনাল।

শুনতে শুনতে জোয়ান ও জেন দু'জনের মুখই মলিন হয়ে উঠল। তাদের চোখে মুখে ফুটে উঠল উদ্বেগ।

যিয়াদ ও আবদুর রহমান গোটা সময় গো-বেচারার মত বসেছিল পাশের এক সোফায় পাশাপাশি। এতক্ষনণে মুখ খুলল যিয়াদ। বলল, 'আল্লাহর হাজার শুকরিয়াহ। তিনি আপনার মাধ্যমে আমাদেরকে আর এক বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচিয়েছেণ। এখন বলুনতো, ওদের জাল ছিড়ে আমাদের বেরুতে হবে এবং সেটা অবিলম্বেই। সেটা কি ভাবে?

'সেটা কি ভাবে, এখনি তা ভেবে দেখিনি যিয়াদ। এবারের পরিস্থিতিটা একেবারে ভিন্নতর। সংঘাতটা এবার আমাদের ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের সাথে নয়, সংঘাত এবার খোদ সরকারের সাথে - সরকারের সেনা, পুলিশ ও ঝাঁক ঝাঁক গোয়েন্দার সাথে।'

'সরকার এই ভাবে খড়গহস্ত হওয়ার ব্যাখ্যা কি মুসা ভাই? তাদের এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না।' মুখ মলিন করে বলল জোয়ান।

'খুবই স্বাভাবিক জোয়ান। মূল অপরাধটা ক্লু-ক্ল্যাক্স ক্ল্যানের হলেও সব দায়-দায়িত্ব গিয়ে পড়েছে স্পেন সরকারের ঘাড়ে। মুসলিম সংখ্যালঘুদের প্রতি তার আচরণ এই সুত্রে প্রকাশ হয়ে পড়ায় সে ভীষণ বেকাদায় পড়েছে এবং অভিযুক্ত হয়েছে সে সাধারনভাবে সকলের কাছেই। চাপের মুখে মুসলমানদেরকে তাদের সকল অধিকার ফিরিয়ে দিতে হয়েছে। এই পরাজয়ের সকল ক্রোধ গিয়ে পড়েছে আমাদের ওপর। পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার জন্যে সে মরিয়া হয়ে উঠেছে।'

আহমদ মুসা থামতেই ঘরে প্রবেশ করল গেটের একজন সিকিউরিটি।

সে এগিয়ে এসে ফিলিপের হাতে একটা ইনভেলাপ তুলে দিল।

ইনভেলাপটির মুখ বন্ধ। কোন নাম ঠিকানা লিখা নেই ইনভেলাপে।

'কোথায় পেলে?' সিকিউরিটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল ফিলিপ।

'একটা গাড়ী থেকে একজন লোক নেমে গেটের লেটার বক্সে এটা ফেলে গেল এইমাত্র।' বলে সিকিউরিটি চলে গেল।

ফিলিপ খুলল ইনভেলাপ।

ইনভেলাপের মধ্যে ছোট্ট একটি চিরকুট। তাতে হিজি বিজি কি লিখা। সে পড়তে পারল না, চিনতেও পারল না কোন ভাষা।

ফিলিপ চিরকুটটি আহমদ মুসার হাতে তুলে দিতে দিতে বলল, 'মনে হয় কোন সাংকেতিক ভাষায় লেখা।'

'চিরকুটটি জোরে জোরে পড়ল আহমদ মুসা।

'ফরাসী রাষ্ট্রদুত মিঃ প্লাতিনি বলেছেন তিনি আপনার পরিচিত। তার অনুরোধ, আজ রাত দশটায় তিনি ফরাসী কালচারাল সেন্টারের গেটে অপেক্ষা করবেন, তিনি আপনার সাক্ষাৎ চান।

আপনার চলাচল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এ বিষয়টি বিবেচনা করে আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন, এটা আপনাদের মত।'

চিরকুটে কোন সম্বোধন নেই, আবার কে লিখেছে তারও কোন নাম-পরিচয় নেই।

'নিশ্চয় কোন সাংকেতিক ভাষা? কারা লিখেছে মুসা ভাই? মনে হচ্ছে পরিচিত কেউ?' বলল ফিলিপ।

'ফিলিস্তন মুক্ত করেছে যে আন্দোলন, সেই 'সাইমুম' এর নাম তোমরা সকলেই জান। এই সাংকেতিক ভাষা তাদের। ফিলিস্তিন দূতাবাস থেকে এই চিঠি এসেছে।' বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'এখন রাত সাড়ে ৯টা। ১০টায় দেখা করতে হলে এখনি যাত্রা করতে হয়।'

'কিন্তু মুসা ভাই চিরকুটে আপনার চলাচলকে মনে হয় নিরুৎসাহিত করেছে।' ফিলিপ বলল।

'নিরুৎসাহিত করেনি ফিলিপ, সাবধান করেছে। আমরা তো সাবধান আছিই।'

একটু থেমেই আহমদ মুসা আবার বলল, 'তোমরা কে ফ্রান্স কালচারাল সেন্টার চেন?'

'আমি চিনি।' ফিলিপ বলল।

'তাহলে তুমি তৈরী হও, আমার সাথে যাবে।'

কিন্তু মুসা ভাই, ফরাসী রাষ্টদুতকে কি এতটা বিশ্বাস করা যায় ?' বলল জেন।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'জেন, ফরাসী রাষ্টদুতকে হয়তো এতটা বিশ্বাস করা যায় না, কিন্তু ডোনার আব্বা মিঃ প্লাতিনিকে বিশ্বাস করা যায়। আমি ফরাসী রাষ্টদুতের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি না, আমি সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি ডোনার আব্বার সাথে।'

আর কেউ কোন কথা বলল না। ডোনার কাহিনী জেন ও ফিলিপ শুনেছে। অন্যেরা তো জানেই।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

তার সাথে উঠে দাঁড়াল ফিলিপ।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই দু'জন তারা তৈরী হয়ে বেরিয়ে এল।

বেরিয়ে এল ওরা গাড়ী বারান্দায়।

'ডোনার দেয়া গাড়ীটাই নাও ফিলিপ নম্বারটা পাল্টে নিও।' বলল আহমদ মুসা।

গাড়ীর ড্রাইভিং সিটে বসল ফিলিপ। পাশের সিটে বসল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা কোন ছদ্মবেশ নেয়নি। শুধু মাঝারী সাইজের গোঁফ লাগিয়েছে মুখে।

ফিলিপ গাড়ী ষ্টাট দিলে আহমদ মুসা বলল, 'এখান থেকে ফ্রান্স কালচারাল সেন্টারে পৌঁছতে কতটা বড় রোড ক্রসিং আছে?'

'আমরা যদি এই সার্কুলার রোড হয়ে যাই, তাহলে আনেক গুলো ক্রসিং পার হতে হবে। আর যদি পাশের এইট্থ ষ্ট্রিট হয়ে ইসাবেলা এভেন্যু দিয়ে যাই, তাহলে একটি মাত্র রোড ক্রসিং পার হতে হবে।'

'ঠিক আছে ইসাবেলা এভেন্যু দিয়ে যাও। '

চলতে শুরু করল গাড়ী।

বিশাল ইসাবেলা এভেন্যু। সেই তুলনায় গাড়ী অনেক কম। প্রায় ফাঁকা রাস্তা। ঝড়ের বেগে গাড়ী চালাচ্ছে ফিলিপ। স্পিডো মিটারের কাটা একশ' তিরিশে উঠে থর থর করে কাঁপছে।

'স্পিড কমাও ফিলিপ, কেউ আমাদের চলার মধ্যে কোন উদ্দেশ্য আবিস্কার করতে পারে।'

'না মুসা ভাই, মাদ্রিদের ব্যাপার অন্যরকম। যে গাড়ীর যত স্পীড, মনে করা হয় সে গাড়ী তত বড় লোকের।'

'ছোট একটা বাঁক ঘুরতেই সামনে অনেক আলোর গুচ্ছ দেখা গেল।

'ওটাই একমাত্র ক্রসিং মুসা ভাই।'

'দেখ ভালোয় ভালোয় ওটা পার হতে পারি কি না।'

ইসাবেলা এভেন্যুর ক্রসিংটিতে এক গুচ্ছ ফ্লাইওভার। তবে ইসাবেলা এভেন্যুটি ফ্লাইওভারের নিচ দিয়ে সরলভাবে সামনে চলে গেছে।

ফ্লাইওভারের কাছাকাছি আসতেই আহমদ মুসার নজরে পড়ল, ফ্লাইওভারের নিচেই একটা গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িতে হেলান দেয়া চারজন লোকও তার নজরে পড়ল।

ফ্লাইওভারের বিশ গজের মধ্যে আসতেই সামনে লাল সংকেত জ্বলে উঠল।

আহমদ মুসার বুঝতে বাকি রইলনা তাদের দাঁড়াতে বলছে ওরা কারা।

ফিলিপ আহমদ মুসার দিকে তাকাল। আহমদ মুসা বলল, 'দাঁড়ালেই ভাল ফিলিপ।'

ঠিক ফ্লাইওভারের নিচে গিয়েই দাঁড়াল আহমদ মুসার গাড়ী।

গাড়ী দাঁড়াতেই চারজন সৈনিক এসে গাড়ী ঘিরে ফেলল। তাদের হাতে উদ্যত স্টেনগান।

ফ্লাইওভারের নিচে ওদের গাড়ী থেকে আরও দু'জন নেমে এল তারা সৈনিক নয়, তাদের পরনে সাদা পোষাক। তারা দু'জন গাড়ীর দু'পাশে দুই জানালায় এসে দাঁড়াল। তাদের হাতে টর্চ।

তরা একই সংগে আলো ফেলল আহমদ মুসা ও ফিলিপের মুখে। গভীর তারা পর্যবেক্ষন করল। আহমদ মুসাকে যে দেখছিল, সে কি বুঝল। পকেট থেকে বেছে বেছে একটা ফটো বের করল। আহমদ মুসার ফটো। আহমদ মুসার মুখের পাশে এনে দেখতে লাগল একবার আহমদ মুসার মুখ, আরেকবার ফটোটির দিকে।

লোকটি হঠাৎ এক টানে আহমদ মুসার গোঁফ খুলে ফেলে চিৎকার করে উঠল 'পেয়েছি, পেয়েছি, আহমদ মুসাকে পাওয়া গেছে।'

চোখের পলকেই ঘটে গেল ঘটনা। ওরা পরীক্ষা পর্যবেক্ষণের এমন ব্যবস্থা করেছে আহমদ মুসা তা ভাবেনি। তার ছদ্মবেশ খুব সাধারন হলেও এটা কোন সাধারন চোখে ধরা সম্ভব নয়। এ নিয়ে আহমদ মুসা নিশ্চিন্তই ছিল। ধরা পড়ার পরেই সে বুঝল, আইডেনটিফিকেশন এক্সপার্টদের ওরা কাজে লাগিয়েছে।

আহমদ মুসা যখন সব বুঝল, তখন সে চারটি স্টেনগান এবং দু'টি পিস্তলের মুখে।

লোকটি চিৎকার করে উঠার সংগে সংগে চার জন সৈনিকের একজন বাঁশি বাজাল।

বাঁশি বাজার মুহূর্ত কয়েক পরেই ফ্লাইওভারের ওপর থেকে এবং সামনে থেকে ছুটে আসতে লাগল আরও সৈনিক ও সাদা পোষাকের লোক।

গাড়ীর দু'পাশে ভীড় জমে গেল।

ফিলিপের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। তার হাতে রিভলভার দেখল আহমদ মুসা। রিভলভারটা একজন সৈনিকও দেখতে পেয়েছিল। সে তার স্টেনগানের নল ফিলিপের মাথায় ঠেকিয়ে চিৎকার করে উঠল, দিয়ে দাও রিভলভার, না হলে মাথা ছাতু হয়ে যাবে এখুনি।

‘ওরা জিতে গেছে, দিয়ে দাও রিভলভার।' স্বাভাবিক কন্ঠ আহমদ মুসার, ঠেঁটে হাসি।

‘দু'জনকে নামিয়ে আগে সার্চ কর।' আরেক জন সৈনিক চিৎকার কওে উঠল।

গাড়ীর দু'পাশ থেকে দু'জন হাত বাড়িয়েছিল গাড়ী খোলার জন্যে। ঠিক এই সময়েই পেছন থেকে স্টেনগান গর্জন করে উঠল। দু'টি এবং এক সংগে।

মাত্র সেকেন্ড পাঁচেকের ঘটনা। গাড়ীর দু'পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলো লাশ হয়ে পড়ে গেল রাস্তায়। রক্তের স্রোতে ডুবে গেল তারা।

স্টেনগান থেমে যাবার সাথে সাথে আহমদ মুসা ফিলিপকে ইংগিত করল গাড়ী ষ্টার্ট দেবার জন্যে।

ইংগিত পাওয়ার সাথে সাথেই লাফিয়ে উঠল গাড়ী। তীর বেগে ছুটল ফ্লাইওভারের নীচ দিয়ে।

গাড়ীটি ফ্লাইওভার ক্রস করেছে এই সময় ফ্লাইওভারের ওপর দু'টি রিভলভার গর্জন করে উঠল। আহমদ মুসার গাড়ীর পেছনে উইন্ড স্ক্রিন গুড়ো হয়ে গেল। কিছু ভাঙা টুকরো আহমদ মুসাদের সিটে এসে আঘাত করল। কিছু মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল।

পর পরই আরো দু'টি গর্জন শুনা গেল সেই ফ্লাইওভারের উপর থেকে রিভলভারের। কিন্তু ততক্ষণে গাড়ী অনেক সামনে চলে এসেছে। গুলি দু'টো রাস্তার কংক্রিটে মুখ থুবড়ে পড়ল।

আহমদ মুসার গাড়ীর স্পীডোমিটারের কাটা তখন একশ' পঞ্চাশ কিলোমিটারে।

আহমদ মুসা পেছনে চোখ রেখেছিল অনেক্ষণ পর মুখ ঘুরিয়ে বলল, ‘না কেউ অনুসরণ করছে না। সম্ভবত অনুসরণ করার মত লোক ওদের অবশিষ্ট নেই।’

যারা পরে গুলী করেছে, তারা গাড়ীর কাছে গিয়ে গাড়ী ষ্টার্ট দিতে অনেক সময় নেবে। ‘ওরা আসছে না, যারা আমাদের মুক্ত করল ?' সামনে দুষ্টি রেখেই জিজ্ঞেসা করল ফিলিপ।

‘না ওরা আসছে না, আসবে না। আসলেও ভিন্ন পথ দিয়ে আসবে।'

একটু থামল আহমদ মুসা। থেমেই আবার বলল, ‘ভাঙা উইন্ডস্ক্রিন নিয়ে আমরা বেশী দুর এগুতে পারবো না। আর কতদূরে ফরাসী কালচারাল সেন্টার ?'

‘এসে গেছি, ঐ তো সামনে।'

ইসাবেলা এভেন্যুর ওপরেই ফরাসী দুতাবাসের কালচারাল সেন্টার।

আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকাল। ঠিক কাঁটায় কাঁটায় রাত দশটা।

ঘড়ি থেকে মুখ তুলেই আহমদ মুসা দেখল কালচারাল সেন্টারের গেটে গাড়ী। গেট খোলা। গেটে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং মিঃ প্লাতিনির মেয়ে।

আহমদ মুসা খুশী হলো তাকে দেখে।

গেটে গাড়ী আসতেই মিঃ প্লাতিনী এবং ডোনা একপাশে সরে দাঁড়াল এবং গাড়ীকে ভেতরে প্রবেশের ইংগিত করল।

গাড়ী ঢুকে পড়ার সংগে সংগে প্লাতিনি ভেতরে ঢুকে পড়ে হাতের একটা ক্ষুদ্র রেগুলেটরের সুইচ টিপে দূর নিয়ন্ত্রিত স্বয়ংক্রিয় গেটটি বন্ধ করে দিল।

পেছনের উইন্ডস্ক্রিন ভাঙা গাড়ীর দিকে নজর পড়তেই উদ্বেগ আর দূর্ভাবনার ছাপ ফুটে উঠেছিল মিঃ প্লাতিনি এবং ডোনার চোখে মুখে। গেট বন্ধ হতেই তারা দু'জন ছুটল গাড়ী বারান্দার দিকে। তারা যখন গাড়ী বারান্দায় পৌঁছল, তখন আহমদ মুসা গাড়ী থেকে নামছিল।

‘তুমি, তোমরা ভালো আছো, কোন ক্ষতি হয়নি তো?' উদ্বিগ্ন কন্ঠস্বর মিঃ পস্নাতিনির।

‘গুড নাইট ভাইয়া।' মিঃ প্লাতিনির কন্ঠ মিলিয়ে যাবার আগেই শুস্ক কন্ঠে ম্লান হেসে আহমদ মুসাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিল ডোনা।

‘গুট নাইট বোন।' ডোনার জবাব দিয়েই আহমদ মুসা মিঃ প্লাতিনির দিকে তাকিয়ে বলেছিল, ‘না জনাব আমরা ভালো আছি। শুধু মারাত্মক আহত হয়েছে ডোনার গাড়ীই।' আহমদ মুসার মুখে হাসি।

‘আমার কোথায় গাড়ী, আপনাকে দিয়ে দিয়েছি না মালিকানা?' ভ্রুকুটি করে বলল ডোনা।

‘তা ঠিক, সাবেক মালিকের নামে পরিচয় দিলাম মাত্র।'

‘গাড়ীর নাম্বার দেখি পাল্টেছেন।'

‘এখানে আসার আগে পাল্টালাম। এ নাম্বারের গাড়ীটা বিকল অবস্থায় একটা গ্যারেজে পড়ে আছে। গাড়ীর নাম্বার ওরা নিয়ে থাকলে বোকা বনবে।'

‘চল ভেতরে গিয়ে বসি।' বলে মিঃ প্লাতিনি পা বাড়াল ড্রয়িং রুমের দিকে।

ডোনা ও মিঃ প্লাতিনি পাশাপাশি বসল। দু'পাশের দু সোফায় বসল আহমদ মুসা ও ফিলিপ।

আহমদ মুসা পরিচয় করিয়ে দিল ফিলিপকে মিঃ প্লাতিনি ও ডোনার সাথে।

‘বলত কি ঘটনা, রাস্তায় বড় কিছু ঘটেছে নিশ্চয় ?' উদ্বিগ্ন কন্ঠ মিঃ প্লাতিনির।

‘ঘটনা মানে রীতি মত যুদ্ধ', শুরু করল আহমদ মুসা, ‘তবে যুদ্ধের সে ময়দানে আমরা ছিলাম বলা যায় নিরব দর্শক।'

‘খুলে বল আহমদ মুসা।' প্লাতিনির চোখে নতুন আগ্রহ।

আহমদ মুসা শুরু থেকে সব ঘটনা খুলে বলল।

সব শুনে মিঃ প্লাতিনি বিষন্ন মুখে বলল, ‘এখন বুঝতে পারছি, আমার এভাবে আসতে বলা ঠিক হয়নি। কিন্তু উপায় ছিল না বলে। পেছন থেকে ওরা সাহায্য না করলে কি হত বলত? পেছন থেকে সাহায্য করেছে ওরা কারা ছিল?'

‘আমি জানি না। জানতে পারিনি।'

‘জান না?'

‘এ ধরনের কোন শক্তি কিংবা কেউ এখানে আছে, এমন কোন ইংগিত কখনও পাইনি।'

‘আশ্চর্য ! তাহলে ওটা কি সরকার বিরোধী কোন গ্রুপ ? কিংবা কেউ তোমাদের ভুল করে সাহায্য করেনি তো?'

‘সেটাই এখন আমার কাছে অন্ধকার।'

'আচ্ছা ভাইয়া, ওরা ধরে নিয়ে আটকাতে পারতো? বহুবার তো এমন আটকা পড়েছেন।' বলল ডোনা।'

'জানি না ডোনা, বহুবার নিজেকে ছাড়াতে পেরেছি, কিন্তু সব সময় তা পারব সেটা বলা যাবে না।'

'যারা নিজের শক্তির এতটা বিবেচক, বিজয়ই তাদের ভাগ্য লেখা আহমদ মুসা। যাক, তোমাকে কয়েকটি কথা বলবার জন্যে ডেকেছি, হয়তো তুমি তা জেনেছও। তবু তোমাকে না বলে থাকতে পারছিলাম না।'

থামল মিঃ প্লাতিনি।

আহমদ মুসা কোন কথা বলল না। উদ্‌গ্রীব হলো শোনার জন্যে।

'প্রথমে তোমাকে,' শুরু করল মিঃ প্লাতিনি, 'ধন্যবাদ জানাই তোমার বিস্ময়কর সাফল্যের জন্যে। তুমি বিনা রক্তপাতে স্পেনে যে বিপ্লব করলে, আমি মনে করি, ফিলিস্তিনের বিপ্লবের চেয়ে তা ছোট নয়। যাদের অস্তিত্ব স্বীকৃত ছিল না, সেই মুসলমানরা বৈধ সংখ্যালঘু হিসাবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করেছে, লাভ করেছে ধর্মপালন ও ধর্ম প্রচারের স্বাধীনতা। সর্বোপরি তারা ফেরত পেয়েছে তাদের ঐতিহাসিক স্থানগুলো। এখন আমার কি মনে হচ্ছে জান, ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান মুসলিম ঐতিহাসিক স্থানগুলো ধ্বংসের জন্যে তেজস্ক্রিয় পেতে স্পেনের মুসলমানদের মহা উপকার করেছে। হিটলার ইহুদি নির্যাতন না করলে, যেমন ইসরাইল রাষ্ট্র এভাবে হতো না, তেমনি ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান মুসলমানদের ধ্বংসের চেষ্টা না করলে স্পেনে মুসলমানদের এই উত্থান ঘটত না। আন্তর্জাতিক সহানুভূতি ও সহযোগিতা একটা অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের ষড়যন্ত্র নিউজ মিডিয়ায় আনার যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছিলে তার ফলেই অসম্ভব সম্ভবে পরিনত হয়েছে। এ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।' থামল একটু প্লাতিনি।

সেই ফাঁকে আহমদ মুসা বলল, 'কিন্তু এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আপনারা সকলে সহযোগিতা করেছেন।'

মিঃ প্লাতিনি আহমদ মুসার কথার দিকে কর্ণপাত না করে বলে চলল, 'কিন্তু তোমার সাফল্য যত বিরাট, সে রকমই বিরাট শত্রুতা তুমি অর্জন করেছো

স্পেনের শাসক মহলের। তোমাকে, জোয়ানকে, জেনকে ধরার জন্যে বিশেষ করে তোমাকে জীবিত অথবা মৃত ধরার জন্যে তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে। আমি এ সম্বন্ধে কিছু বলার জন্যেই তোমাকে ডেকেছি।'

থামল প্লাতিনি। সতৃষ্ণ চোখে তাকাল একটু দুরে টেবিলে রাখা অভিজাত মদ শ্যাম্পেনের বোতল ও খালি গ্লাসের দিকে। তারপর ঠোঁটে একটু হাসি টেনে বলল, 'তোমরা শ্যাম্পেন, বিয়ার, কোন মদই খাও না। অবাক ব্যাপার আহমদ মুসা, তোমার সাথে সাক্ষাতের সময় থেকে ডোনাও মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। তুমি যাদু জান না কি?'

'যাদু জানলে তো আপনিও ছেড়ে দিতেন।' বলল আহমদ মুসা একটু হেসে।

'ছাড়িনি বটে, তবে এই দেখ এখন খাচ্ছি না, অথচ এক বুক তৃষ্ণা বুকে। এটাই কি কম যাদু!'

'যাদু নয় আব্বা, আম্মা বলেন, ভালো মুসলমানদের চরিত্রে এমন একটা প্রভাব আছে যা মানুষকে তার অলক্ষ্যে পরিবর্তিত করে ফেলে', বলল ডোনা

'সত্যি নাকি আহমদ মুসা?'

'মনুষ্যত্ব, সততা, সদাচার এবং স্রষ্টার প্রতি আত্মসমর্পিত মানুষের একটা বিশেষ শক্তি থাকে। এই গুণ গুলো যার মধ্যেই থাকবে সে সেই শক্তির অধিকারী হবে। ইসলাম মানুষকে এসব গুণের অধিকারী হওয়ার শিক্ষা দেয়।'

'অন্য ধর্মও তো এ শিক্ষ দেয়।' বলল মিঃ প্লাতিনি।

'দেয় বটে, কিন্তু তার পেছনে সুনির্দিষ্ট এবং প্রশ্নাতীত স্রষ্টার বিধান নেই বলে তা নিঃস্বার্থ ভাবে পালিতও হয় না, তেমনি তার পেছনে কোন নৈতিক শক্তিও সৃষ্টি হয় না।'

'অর্থাৎ তুমি বলছ, অন্য ধর্মের বিধান গুলো অসম্পুর্ন এবং বিরোধপূর্ন। তাই এর প্রতিপালনের মাধ্যে মানুষ কোন নৈতিক শক্তিও পায় না এবং নিঃস্বার্থতাও তাদের আসে না।' বলল মিঃ প্লাতিনি।

'এটা ঐ ধর্মগুলোর কোন দোষ নয়। স্বাভাবিক এটা। সব ধর্মই স্রষ্টার। কিন্তু মানুষের প্রয়োজনে তিনি এক ধর্ম বাতিল করে অন্য ধর্ম দিয়েছেন। সর্বশেষ

এবং আধুনিক ঐতিহাসিক ধর্ম ইসলাম। ইসলাম আসার পর অন্য সব ধর্ম বাতিল হয়ে গেছে। অন্য সব ধর্মের অসম্পুর্ণতা, বিরোধপূর্ণতা, ঐশি বিধান অবিকৃত অবস্থায় না থাকা, প্রভৃতি ঐ ধর্ম গুলো বাতিল হয়ে যাবারই প্রমান।'

'ঠিক আছে আহমদ মুসা, এস এবার দর্শন থেকে বাস্তবে আসি। আমি যে কথা বলছিলাম। স্পেন সরকার কার্যত তোমাদের তিনজনকে ধরার জন্যে দেশে জাতীয় অবস্থা ঘোষনা করেছে। কি টাইট পাহারার ব্যবস্থা করেছে তোমরা কিছুটা টের পেয়েছ আসার সময়। আমি মনে করি অবিলম্বে তোমাদের মাদ্রিদ ত্যাগ করা দরকার। কিন্তু ভাবছি কিভাবে। সে জন্যেই তোমাকে ডাকা।'

'আপনার পরামর্শ কি বলুন।'

'বিমান পথে যাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। নদী ও সড়ক পথে পাহারার বেড়াজাল। গোপনে ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান এবং দেশের সব ক্রিমিনালদের ব্যবহার করা হচ্ছে। ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে ফটো সবখানে - নদী বন্দর, রেলস্টেশন, বাসস্ট্যান্ড, হোটেল, রেস্তোরা কোন কিছুই বাদ রাখা হয়নি। এই অবস্থায় সড়ক, নৌপথও নিরাপদ নয়। আমি ভাবছিলাম, আমি কোন সাহায্য করতে পারি কি না।'

'কি ভাবে?'

'ডোনা বলছে, আমার গাড়িতে যদি তোমরা যাও তাহলে নিরাপদে যাওয়ার একটা হতে পারে। কুটনীতিকের গাড়ী, বিশেষ করে ইউরোপীয় কোন কুটনীতিকের গাড়ী সার্চ হবে না। তোমার মত কি বল?'

আহমদ মুসা চিন্তা করে বলল, 'সার্চ হয় না, কিন্তু যদি হয়?'

'আমি পরিবার নিয়ে সড়কপথে প্রায় যাতায়াত করি। সার্চ হবে তা মনে করি না।'

আহমদ মুসা ভাবল কিছুক্ষন। তারপর বলল, 'আপনার এ প্রস্তাবের জন্যে ধন্যবাদ।'

কিন্তু আমাদের জন্যে আপনি কোনও ভাবে বিপদগ্রস্থ হন আমি চাই না। আপনি শধু একজন ব্যাক্তি নন, আপনি একটি দেশ। আপনার কিছু হলে সেটা দেশের ঘাড়ে গিয়ে পড়বে। সেক্ষেত্রে আপনাকে দু'দিক থেকে বিপদগ্রস্থ হতে হবে।'

'প্রকাশ হলে তুমি যা ভয় করছ তা ঘটবে। প্রকাশ হওয়ার ভয় করছ কেন?'

'জনাব আপনার দেশের প্রতি, আপনার লোকজনের প্রতি সম্মান রেখে আমরা বলছি, আপনার সব লোকের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে কি আপনি শতভাগ গ্যারান্টি দিতে পারেন? আমি মনে করি পারেন না। এমনও হতে পারে, এই এ্যামবেসির অথবা সংশ্লিষ্ট কেউ আপনার প্রতিটি পদক্ষেপ মনিটর করছে।' থামল আহমদ মুসা।

মিঃ প্লাতিনি তৎক্ষণাৎ কোন কথা বলল না, বলতে পারল না। তাঁর পলকহীন দৃষ্টি আহমদ মুসার ওপর নিবদ্ধ। তার সে দৃষ্টিতে বিস্ময়, আনন্দ, শ্রদ্ধা চিক চিক করছে।

অভিভূতের মত প্লাতিনি অনেক্ষন আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে গিয়ে আহমদ মুসার কপালে চুম্বন করল। ধীর কন্ঠে বলল, 'তুমি আমার ছেলের বয়সের। কিন্তু আজ তোমার কাছে যে শিক্ষা আমি পেলাম তা কোন দিন আমি ভুলব না। তুমি যা বললে সেটা আমি জানতাম না তা নয়। কিন্তু আমার ব্যাপারে আমি ভাবিনি। তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।'

বলে মিঃ প্লাতিনি তার জায়গায় ফিরে এল। বসেই বলল, 'আহমদ মুসা তোমার সম্পর্কে আমি অনেক শুনেছি। কিন্তু যা শুনেছি তার চেয়ে তুমি বড়। তুমি আমার নিরাপত্তার কথা ভাবলে, আমার ভালোর দিকটা চিন্তা করলে, কিন্তু তোমার কথা তুমি ভাবলে না, একটা সুন্দর সুযোগ তুমি গ্রহন করলে না। অন্যের জন্যে এমন করে ভাববার মত মানুষ আজকাল চোখে পড়ে না। সত্যিকার মুসলমানেরা কি এমনই হয়ে থাকে আহমদ মুসা?'

'একজন মুসলমানের ঘোষনা হলো, আমার জীবন, আমার মরন, আমার সাধনা, আমার কোরবানী সব কিছু বিশ্ব নিয়ন্তা আল্লাহর নামে নিবেদিত। এই ঘোষনা দেয়ার মাধ্যমে একজন মুসলমান আল্লাহর স্বার্থ অর্থাৎ আল্লাহর বান্দাদের স্বার্থ, মুক্তি ও মঙ্গল চিন্তাকে অগ্রাধিকার দেয়।'

'ঐ ঘোষণাবাণী কি তোমার ধর্মগ্রন্থের?'

'জি হ্যাঁ।'

'কিছু মনে কর না, একটা অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করব। ভাল মানুষের গড়া সূখের স্বর্গরাজ্য গঠনের চিন্তাকে এখন আমরা আকাশচারী চিন্তা বলি। তোমার মত কি?'

'আমি যে ঘোষনার কথা বললাম, সে ঘোষনা দেয়ার সাথে সাথে মানুষ সোনার মানুষ হয়ে যায়। সে সোনার মানুষ দিয়ে সুখের স্বর্গরাজ্য গড়া সম্ভব এই মাটির পৃথিবীতে।'

'তুমি আমাকে সম্মোহন করছ আহমদ মুসা। মনে হচ্ছে একটা আশার আলো যেন আমি দেখতে পাচ্ছি।' মিঃ প্লাতিনির ঠোঁটে স্বচ্ছ এক টুকরা হাসি।

'আব্বা, আমি ভূমিকা সহ, 'মিনিং অব দ্যা কোরআন'- এর প্রথম খন্ড পড়ে শেষ করেছি। তুমি পড়ে দেখ, শুধু আশার আলো নয় সোনালী সুর্যোদয় তুমি দেখতে পাবে।'

'ও বইটা তো দেখিনি, কোথায় পেলি?'

'আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীতে।'

'বুঝলে আহমদ মুসা', আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করল মিঃ প্লাতিনি, 'আমি অনেক মুসলিম দেশে ছিলাম। ইসলামের ওপর কিছু কিছু বই পড়েছি। মিশেছি অনেকের সাথেই। কিন্তু তোমার সাথে মিশে, তোমাকে দেখে, তোমার কথা শুনে যে ইসলামকে পেলাম, যা আমাকে সম্মোহন করেছে বললাম, সেই ইসলাম কোথাও দেখিনি। থাক এসব কথা এখন, আসল কথায় ফিরে আসি। তুমি আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছ। যুক্তিও দিয়েছ। এ যুক্তি অস্বীকার করার সাধ্য আমার নেই। এখন বল এ সংকটের সমাধান কিভাবে? আমি খুবই উদ্বেগ বোধ করছি তোমাদের নিয়ে।'

'জেন ও জোয়ানকে আমি ট্রিয়েস্টে পাঠাতে চাই। ওখানে আই সি টি পি'তে ওদের চাকুরী হয়ে আছে। জোয়ান প্রতিশ্রুতিশীল একজন বিজ্ঞানী, জেনও বিজ্ঞানের প্রতিভাদীপ্ত ছাত্রী। এই মূল্যবান দম্পতির জন্যেই আমি উদ্বিগ্ন। চিন্তা করে দেখলাম, এই দু'জনের দায়িত্ব আপনি নিতে পারেন, ওদেরকে স্পেনের বাইরে নিতে সাহায্য করতে পারেন।' থামল আহমদ মুসা।

মিঃ প্লাতিনির চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'নিলাম দু'জনের দায়িত্ব। কিন্তু তোমার কি হবে? তুমিই তো আসল টার্গেট।'

'আল্লাহ ভরসা। আমাকে নিয়ে চিন্তার দায়িত্বটা আল্লাহর হাতে তুলে দিতে চাই। তিনি আমাকে একা স্পেনে এনেছেন, তিনিই আমাকে স্পেন থেকে বের করবেন।'

মিঃ প্লাতিনি, ডোনা, এমনকি ফিলিপের চোখেও নেমেছে আবেগাপ্লুত একটা বিষয়। কেউ কথা বলছে না। তারা যেন বোবা হয়ে গেছে। নিজের মাথার ওপর যখন বিপদের আকাশ ভেঙে পড়েছে, তখন নিজের কথা না ভেবে কর্মীর নিরাপত্তা বিধানের চিন্তায় ব্যস্ত। নিজের ভারটা ছেড়ে দিয়েছে স্রষ্টার হাতে!

আবেগাপ্লুত মিঃ প্লাতিনি উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে গিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে। বলল, 'আহমদ মুসা তুমি সার্থক নেতা, তুমি সার্থক বিপ্লবী। যে ভয়, উদ্বেগ, চিন্তা কোন কিছুই নিজের জন্যে না রেখে সব কিছু স্রষ্টার ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয় সে হয় দুর্বার, তাকে জয় করা কঠিন। তাই তুমি অজেয় আহমদ মুসা।'

ডোনার চোখে দু'ফোটা অশ্রু বিদ্যুতের আলোয় চিক চিক করে উঠল। তার গভীর নীল চোখে অখন্ড এক ভাবালুতা। যেন কোন রূপকথার রাজ্যে সে বিচরণ করছে।

গর্বে ফুলে উঠেছে ফিলিপের বুক আহমদ মুসার ভাই এবং সাথী হওয়ার গৌরবে।

মিঃ প্লাতিনি ফিরে এসে তার সোফায় বসতে বসতে বলল, 'আজ আমি ও ডোনা তোমাদেরকে দিয়ে আসব এবং বাড়িটা চিনে আসব। কাল ভোর পাঁচটায় জোয়ান ও জেনকে নিয়ে ফ্রান্সে যাত্রা করব। এখান থেকে আমি ও ডোনা ভোরে একবারেই বেরুব। ওদেরকে তুলে নিয়ে যাতে সোজা চলে যেতে পারি।'

আহমদ মুসার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'একটা সুন্দর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এতে অফিসের চোখ থেকে আপনি বাঁচবেন।'

'এই ব্যবস্থায় তুমি যেতে পার না?'

‘আমি এবং জেন ও জোয়ান এক নই। ওদের ব্যাপারে কৈফিয়ত দেয়ার অনেক আছে। আপনি বলতে পারবেন, জেন ও জোয়ান স্পেনের দু’জন সম্মানিত নাগরিক। তারা কোন ব্যাপারে অভিযুক্ত কি না তা আপনার জানা নেই, তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ পত্রিকায় কিংবা কোনওভাবে প্রকাশ হয়নি। তাই তাদের বহন করে আপনি কোন অন্যায় করেন নি।’

হাসল প্লাতিনি। বলল, ‘বুদ্ধিতে তোমার সাথে জিততে পারবো না। তবে ভালই হলো তোমার যুক্তিটা পেয়ে। হয়ত একথাটা আমার মাথায় নাও আসতে পারতো।’

আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকাল।

মিঃ প্লাতিনিও তাকাল তার ঘড়ির দিকে। বলল, ‘চল তোমাদের দিয়ে আসি।’

উঠল ডোনা।

সবাই বেরিয়ে এল।

গাড়ী বারান্দায় দাঁড়ানো মিঃ প্লাতিনির গাড়ী।

ড্রাইভিং সিটে বসল ডোনা। পাশে মিঃ প্লাতিনি। পেছনে সিটে আহমদ মুসা ও ফিলিপ।

ডোনা স্টার্ট দিল গাড়ীতে।

গাড়ী স্টার্ট দিয়ে ডোনা পেছনে না তাকিয়েই বলল, ‘ভাইয়া আপনি কোন পথে কি ভাবে স্পেন থেকে বের হবেন জানি না। কিন্তু মন্টেজুতে আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করব। আপনি না যাওয়া পর্যন্ত আমি জেন ও জোয়ানকে ছাড়ব না।’’ ভারী ও কাঁপা শোনাল ডোনার কন্ঠ।

‘কথাটা আল্লাহর কাছে বললেই ভালো হয় ডোনা।’ বলল আহমদ মুসা।

‘তাঁকে আমি বলব। আপনাকে জানালাম।’

গাড়ী রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে।

ছুটে চলল গাড়ী ইসাবেলা এভেন্যু ধরে।

ফিলিপের বিশাল বৈঠকখানা। রাত তখন ৯টা।

যিয়াদ বিন তারিকের সংগঠন 'ব্রাদার্স ফর ক্রিসেন্ট' এর উচ্চ পর্যায়ের নেতাদের বৈঠক ডেকেছে আহমদ মুসা। ফিলিপের বাস্ক গেরিলা দলের মুসলিম নেতাদেরও ডাকা হয়েছে।

আহমদ মুসা আসার পর দুই গ্রুপের মুসলিম নেতারা এক সাথে স্পেনের মুসলমানদের জন্যে কাজ করছে।

মিটিং-এ অন্য সবাই হাজির।

যিয়াদ, ফিলিপ, যোয়ান, আবদুর রহমান, ডঃ আবদুর রহমান আন্দালুসী বৈঠকে হাজির নেই।

যোয়ান স্পেনেই হাজির নেই।

আহমদ মুসা ফরাসী রাষ্ট্রদূত মিঃ প্লাতিনির ওখান থেকে যে রাতে ফিরেছিল, সে রাত শেষে ভোরেই জোয়ান ও জেন মিঃ প্লাতিনি ও ডোনার সাথে রওয়ানা হয়ে যায় ফ্রান্সের উদ্দেশ্যে।

সেদিন রাতে ফিরেই আহমদ মুসা জেন ও জোয়ানের বিয়ের কাজ সম্পন্ন করেছিল। বিয়ে পড়িয়েছিল আহমদ মুসা।

এই তাড়াহুড়ায় আপত্তি করেছিল জোয়ান ও জেন দু'জনেই।

কিন্তু আহমদ মুসা দৃঢ়কন্ঠে বলেছিল যে, একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে একটা অনাত্মীয় পরিবেশে গিয়ে তারা পড়বে। এই যাত্রায় দু'জনকে দু'জনের অভিভাবকের ভূমিকা পালন করতে হবে। বিয়ে না হলে তাদের এক পা এগুতে দিবেন না তিনি।'

আহমদ মুসার এই কথায় তারা নিরব হয়ে গিয়েছিল।

আহমদ মুসাই আবার বলেছিল, 'তোমরা তাড়াহুড়ার কথা বলছ। যাত্রার আগে একটা রাত তোমাদের সামনে। আর আমি আমার বিমান ছাড়ার কিছু আগে বিয়ে করেছিলাম। বিয়ের আসন থেকে বিয়ের পোষাকে এসে আমি বিমানে চড়েছিলাম। তোমাদের ভাবিকে আমি দেখেছিলাম বিমান বন্দরে আসার পথে গাড়ীতে।'

জেন ও জোয়ান দু'জনের মুখই লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল। এক সাথেই বলেছিল, 'মুসা ভাই আমাদের মাফ করুন। আমরা খুব ভেবে কথা বলিনি।'

'ওটা আমি বুঝেছি। এক কথায় বিয়েতে রাজী হলে নাকি তাকে লোকে নির্লজ্জ বলে। তাই বিয়ের কথায় প্রথমে না না করাটা দোষের নয়। দোষ যখন নেই মাফের প্রশ্নও ওঠে না।' হেসে বলেছিল আহমদ মুসা।

জোয়ান বসেছিল আহমদ মুসার পাশে দরজার কাছেই এক চেয়ারে। সে বলেছিল, 'তাহলে আপনিও প্রথমে না না করেছিলেন?'

আহমদ মুসা হেসে বলেছিল, 'হাঁ না না করেছিলাম। কিন্তু তোমাদের মত 'ভেতরে ইচ্ছা, বাইরে না না' এর মত নয়।'

জেন দাঁড়িয়েছিল দরজার আড়ালে। তার পাশে দাঁড়িয়েছিল ফিলিপের মা। আহমদ মুসার কথায় দু'হাতে মুখ ঢেকে ছুটে পালিয়েছিল জেন।

জোয়ানের মুখও লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল।

সে রাতে রাত ১২টার মধ্যেই জেন ও জোয়ানের বিয়ে সম্পন্ন হয়েছিল।

ঠিক ভোর ৫টায় মিঃ প্লাতিনি ও ডোনা গাড়ী নিয়ে এসে গিয়েছিল। জেন ও জোয়ানের বিয়ের কেক তারাও খেয়েছিল। অল্প সময়েই আনন্দ উজ্জ্বল ডোনা হৈচৈ করে ফিলিপের বাড়ীটা বাজিয়ে তুলেছিল। কিন্তু তার আনন্দের মধ্যে একটা ফাঁক ছিল। গাড়ি থেকে নেমে ফিলিপের বাড়ীতে প্রবেশ করে সানন্দে সোচ্চার কন্ঠে ডেকে উঠেছিল, ভাইয়া কোথায় আপনি? যখন তাকে বলা হয়েছিল, আহমদ মুসা নেই, তখন তার হাস্যোজ্জ্বল মুখে বেদনার একটা কালো দাগ ফুটে উঠেছিল। শত আনন্দের মাঝেও সে কালো দাগ আর মুছে যায়নি।

জেন ও জোয়ানের বিয়ের পর পরই সে রাতে আহমদ মুসা, আবদুর রহমান ও যিয়াদ শিক্ষা শিবিরের একটা নির্ধারিত প্রোগ্রামে চলে গিয়েছিল।

ফিলিপ বিদায় জানিয়েছিল জেন, জোয়ান, মিঃ প্লাতিনি ও ডোনাকে।

ফিলিপ, যিয়াদ, আবদুর রহমান ও ডঃ আবদুর রহমান আন্দালুসী মিটিং-এ এখনও পৌঁছতে পারেনি। ওরা গেছে সরকারের সাথে গুরুত্বপূর্ণ এক বৈঠকে যোগ দিতে।

মুসলিম সংখ্যালঘুদের দাবীর ভিত্তিতে স্পেন সরকার মুসলিম নেতাদের ডেকেছে আলাপ করার জন্যে। মুসলিম নেতাদের সাথে স্পেন সরকারের এটাই প্রথম ফরমাল আলাপ। এদিক থেকে বলা যায় আলাপটা ঐতিহাসিক। অনেক চিন্তা ভাবনা ও আলাপ আলোচনার পর তাদেরকে পাঠিয়েছে আলোচনার টেবিলে আহমদ মুসা।

মিটিং শুরু হয়নি। অপেক্ষা করা হচ্ছে ফিলিপ ও যিয়াদের জন্যে। নানা আলাপ ও প্রশ্নোত্তর চলছে।

আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকাল। বেলা ৯টা ১৫ মিনিট।

এল ফিলিপ, যিয়াদরা।

ঘরে ঢুকেই হৈ চৈ করে উঠল আবদুর রহমান। বলল, 'জিতে গেছি মুসা ভাই, আমরা জিতে গেছি।'

'আলহামদুলিল্লাহ। বস বলত শুনি কি বিজয় এনেছ।'

বসল সবাই।

'যিয়াদ তুমি বল মিটিং-এর বিবরণটা।' বলল ফিলিপ।

'শেখুল ইসলাম (ডঃ আবদুর রহমান আন্দালুসী) বলুন।' বলল যিয়াদ।

'ধন্যবাদ যিয়াদ এ দায়িত্ব তোমার। তোমাকেও বলতে হবে।' বলল শেখুল ইসলাম আবদুর রহমান আনদালুসী।

শুরু করল যিয়াদ।

'আমরা পাঁচটি দাবী নিয়ে গিয়েছিলাম। শিক্ষা ও চাকুরী বিষয়ক দাবী পুরোপুরিই মেনে নিয়েছে। উচ্চতর শিক্ষায় মুসলমানরা একটা কোটা পাবে। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্ম শিক্ষার পাশাপাশি মুসলমানদের ইসলামী ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে এবং শিক্ষা সিলেবাস থেকে নগ্ন মুসলিম বিদ্বেষ মুলক বিষয় বাদ দেয়া হবে তালিকায় মুসলিম শিক্ষা বইও শামিল করা হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের রেফারেন্স তালিকায় মুসলিম শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের প্রস্তাবিত বইও শামিল হবে চাকুরী ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য একটা কোটা থাকবে, তবে অতীতে মরিস্ক হওয়ার অপরাধে যাদের চাকরি গেছে তাদের চাকুরী ফিরিয়ে দিতে তারা অস্বীকার করেছে। অনুরুপভাবে মরিস্কদের বাড়ীঘর, সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবার দাবী তারা

মেনে নেয়নি। তবে গত এক বছরের মধ্যে এ রকম হয়ে থাকলে সে বাড়ীঘর বা সম্পত্তি ফিরে পাবে। মুসলিম ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক স্থানগুলোর ফেরত দেওয়ার আন্তর্জাতিক কমিটমেন্ট তারা রক্ষা করবে। আমাদের চতুর্থ দাবী, ইসলামী সংস্থা, সংগঠন, ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ইসলামী প্রচার মিশন গড়ার অনুমতি পাওয়া যাবে, তবে বাইরের কোনো লোক আনা যাবে না। বাইরের কোনো অর্থ নিতে হলে সরকারের অনুমতি নিতে হবে। আমাদের পঞ্চম দাবী অর্থাৎ তেজষ্ক্রিয় ক্যাপসুল বিষয়ক ঘটনাকে কেন্দ্র করে যাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে অভিযোগ আনা হয়েছে তাদের ওপর থেকে অভিযোগ প্রত্যাহার করার দাবী তারা মেনে নেয়নি। বলেছে, ওটা বর্তমান পরিবর্তন ও সরকারী প্রতিশ্রুতির আগের ঘটনা।'

থামল যিয়াদ বিন তারিক।

খুশিতে আহমদ মুসার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 'যিয়াদ আমরা এই মুহূর্তে যা আশা করছিলাম, তার চেয়ে বেশি পেয়েছি। সত্যি আমার বিস্ময় লাগছে, ওরা এতটা নমনীয় হল কি করে?'

'বোধ হয় বাইরের চাপ এবং কিছুটা লোভে পড়ে হয়েছে' বলল ফিলিপ।

'নতুন কিছু শুনেছ?'

'হ্যাঁ, আমরা যখন আলোচনা শেষে প্রধানমন্ত্রীর আফিসের ওয়েটিং রুমে বসে ছিলাম। তখন যে অফিসারটির আমাদের সংগ দিচ্ছিল সে এক সমায় আমাকে ফিস ফিস করে বলল "ও আই সি"র তরফ থেকে সুস্পষ্ট দাবীনামা সম্বলিত একটা প্রস্তাব এসেছে। সেই সাথে এসেছে প্রলোভন ও হুমকি। বলেছে ন্যায্য দাবী গুলো মেনে নিলে মুসলিম দেশগুলোতে বাণিজ্য সুবিধা পাবে আর না নিলে তার বর্তমান লেন-দেন বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এতে ঘাবড়ে গেছে বর্তমান স্পেন সরকার। সৌদি আরবের তেলের দিকে তার এখন লোলুপ দৃষ্টি। এ কারণেই তড়িঘড়ি করে কিছু দাবী মেনে নিয়েছে। যাতে সে বলতে পারে মুসলমানদের সাথে তার সমঝোতা হয়ে গিয়েছে।' থামল ফিলিপ।

'বুঝলাম' বলল, আহমেদ মুসা।

‘সৌদি আরবকে দিয়ে চাপ দিয়ে কি জেন ও জোয়ানদের উপর থেকে অভিযোগ তুলে নেওয়া যায় না?’ বলল যিয়াদ।

আহমেদ মুসা হেসে বলল ‘জেন ও জোয়ানদের বিরূদ্ধে তাদের কোনো অভিযোগ আছে স্পেন সরকার এটা স্বীকারই করবে না।’

‘স্বীকার না করলে তো ভাল, জেন ও জোয়ান চলে আসবে’ বলল যিয়াদ।

‘প্রকাশ্য সরকার কিছুই বলবেনা, কিন্তু সরকারের গুপ্ত ঘাতকদের হাত থেকে ওদের রক্ষা করবে কে?’

যিয়াদ কোনো কথা বলতে পারলনা। যিয়াদ, ফিলিপ, আবদুর রহমান সকলের মুখ কাল হয়ে গেল।

ফিলিপ বলল ‘এ কারনেই সরকার আমাদের বিরূদ্ধে এবং জেন জোয়ানের বিরূদ্ধে প্রকাশ্য কিছু বলছেনা, অভিযোগ আসছেনা।’

‘থাক এ প্রসংগ আমি যে জন্যে সবাইকে ডেকেছি, সেদিকে এবার যাই’ বলল, আহমদ মুসা।

এ সমায় গেটের সিকিউরিটি লোকটি রুমের দরজায় দাঁড়াল।

ফিলিপ তাকে ইংগিতে ডাকল।

সে এসে ফিলিপের হাতে একাটা ইনভেলপ তুলে দিল। ফিলিপ ইনভেলপটি দেখেই চিনতে পারল, এ ধরনের ইনভেলপ আগেই একদিন এসেছিল। ফিলিপ ইনভেলপটি তুলে দিল আহমদ মুসার হাতে।

ইনভেলপটি হাতে নিয়ে ভ্রু কুঁচকালো আহমদ মুসা। মধ্য এশিয়া দুতাবাসের ইনভেলপ, ফিলিস্তিন দুতাবাসের নয়। তবে একই ধরনের সাদা ইনভেলপ। ভেবে পেলনা আহমদ মুসা। মধ্য এশিয়া দুতাবাস থেকে এই সময় কি জরুরী না হলে এভাবে মেসেজ আসার কথা নয়।

ইনভেলাপ খুলল আহমদ মুসা।

চারভাঁজ চিঠি খুলে দেখল মধ্য এশিয়ার প্রেসিডেণ্ট কর্নেল কুতাইবার চিঠি। পড়তে শুরু করল আহমেদ মুসা। চিঠি পড়তে পড়তে মুখের ভাব পরিবর্তিত হয়ে গেল আহমদ মুসার। অন্ধকার একটা ছায়া নামল তাঁর সারা মুখে। ঠোঁট

শুকিয়ে গেল তাঁর। সিংহ হৃদয় আহমদ মুসার শুকনো ঠোঁট মনে হল একবার কেপে উঠল।

ফিলিপ, যিয়াদ, আবদুর রহমান সবাই অবাক বিস্ময়ে তকিয়ে আছে আহমদ মুসার দিকে। তাদের চোখে মুখেও উদ্বেগ। বুঝতে অসুবিধা হলনা তাদের, কি ধরনের খবর আহমেদ মুসার মত মানুষকে বিহবল করতে পারে। কিন্তু কি সে খবর? জেন ও জোয়ানের কোনো খারাপ খবর নয়তো!

আহমেদ মুসা চিঠি পড়া শেষ করে চোখ বুঝেছিল মুহূর্তের জন্য।

ফিলিপ আর থাকতে পারেনি। জিজ্ঞাসা করে বসল, 'কোনো খারাপ খবর মুসা ভাই?'

আহমেদ চোখ খুলল, হাসল। কিন্তু হাসিটা বড় শুষ্ক। বলল, 'ভাল মন্দ মিলিয়ে তো জীবন। মন্দ খবর তো আসতেই পারে।'

'কি খবর মুসা ভাই, বলুন। আমাদের অন্ধকারে রাখবেন না।' বলল যিয়াদ।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল আহমেদ মুসা। বলল, 'সিংকিয়াং-এ বিপর্যয় ঘটে গেছে যিয়াদ। এই চিঠিটা লিখেছেন মধ্য এশিয়ার মুসলিম প্রজাতেন্ত্রর প্রেসিডেণ্ট কর্নেল কুতাইবা। চিঠিটা পড়ছি তোমরা শুন:

মুহতারাম মুসা ভাই। আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ।

দুতাবাসের মাধ্যমে আপনার সব খবরই পাচ্ছি, তবে আপনি ভাইদের কোন খোঁজ খবর রাখেননা। যে দায়িত্ব ঘাড়ে তুলে দিয়ে গেছেন তা পালন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করছি।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার মাধ্যমে স্পেনে আমাদের যে অকল্পনীয় সাফল্য দান করেছেন, সেজন্যে তাঁর শুকরিয়া আদায় করছি। ভাইদের সবাইকে আমাদের মোবারকবাদ দেবেন।

এই আনন্দের পাশাপাশি আরেক বড় বিপদের খবর আপনাকে জানাতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। সিংকিয়াং-এ যে সুন্দর জীবন সাজিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, তা ভেঙে পড়েছে। পিকিং-এ রাজনৈতিক সংস্কার বিরোধী

জাতীয়তাবাদী হানরা     ক্ষমতায় আসার পর থেকে কম্যুনিষ্ট ‘ফ্র’ এবং ‘রেড ডাগন’ ভীষণ ভাবে মাথা তুলেছে সিংকিয়াং-এ। বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে সিংকিয়াং-এর গভর্ণর লি-ইউয়ান বন্দী হয়েছে। তাঁর সাথে বন্দী হয়েছে নেইজেন ও আহমদ ইয়াং। আমাদের সকলের সম্মানিতা বোন, মেইলিগুলি অর্থাৎ আমিনা নিখোঁজ। তাঁর আব্বা আম্মা তাঁর বাড়িতেই নিহত হয়েছেন। গোটা ইসংকিয়াং আজ গনহত্যা, গুপ্ত হত্যা ও সন্ত্রাসে আবার ভরে উঠেছে। এসব করছে জাতীয়তাবাদী হানদের নাম ভাঙিয়ে ‘ফ্র’ এবং ‘রেড ড্রাগন।’

মেইলগুলি নিখোজ এবং লী-ইউয়ানরা বন্দী হবার খবর পেয়েছি আমি দু-ঘন্টা আগে। সংগে সংগেই আমলা-আতায় কাজাখিস্তানের গভর্ণরকে খবর পাঠিয়েছি, আজই তাকে উরুমচি রোডের মুখে সিংকিয়াং সীমান্তে আমাদের শহর হারজেস -এ চলে যাবার জন্যে। সেখানে গিয়ে তাকে সব রকম খোঁজ খবর নেয়া এবং যা করণীয় তা করার নিদেশ দিয়েছি। আমি আগামীকাল আমলা-আতায় যাব। কিছুক্ষণ আগে খবর পেয়ে আমার কাছে ছুটে এসেছিল আমাদের গোয়েন্দা চীপ আলদর আজিমভ এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী যুবায়েরভ। এসেই দুটি দাবী করে বসল, তারা এখুনি সিংকিয়াং যাত্রা করবে। সেই মুহূর্তে ছুটি না পেলে তারা চাকুরী ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে বলে জানায়। তাদের আবেগে আমার চোখে পানি এসে গিয়েছিল। আমি তাদের বলেছিলাম, ‘আমি কি আহমেদ মুসার সৈনিক নই? আমি কি তাদের মত চাকরী ছেড়ে দিয়ে সিংকিয়াং যেতে পারিনা?’ আমার এ কথায় তারা শান্ত হয়েছিল। চাকরী ছাড়ার কথা বলার জন্যে মাফ চেয়েছিল। তারা তিনজন ঘন্টাখানেক আগে সিংকিয়াং রওনা হয়েছে।

মুসা ভাই, 'আপনাকে ধৈর্য্য ধরতে বলার মত ধৃষ্ঠতা আমার নেই। শুধু আমি বলব, আমরা আপনার সৈনিকরা এই সংকটে যা করার সব কিছুই করব'।

আপনার ভাই
কুতাইবা

শুকনো নির্বিকার কন্ঠে চিঠি পড়া শেষ করল আহমেদ মুসা।

ঘরে তখন পিন পতন নীরবতা।

বেদনার মালো ছায়া সবার মুখে। উদ্বেগ আর বেদনার ভারে ঠোঁট কাঁপছে ফিলিপ, যিয়াদ, আবদুর রহমানের। বোবা হয়ে গেছে তারা। মেইলিগুলি যে আহমেদ মুসার কি, নেইজেন ও আহমদ ইয়াং যে আহমদ মুসার কাছে কতখানি, তারা তা জানে। সর্বোপরি সিংকিয়াং-এর মুসলমাদের গণহত্যার খবর।

মিটিং -এ উপস্থিত কেউ কোনো কথা বলতে পারলনা বহুক্ষন।

আহমদ মুসাই নিরবতা ভাঙল, ‘আমি আপনাদেরকে ডেকেছিলাম একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার জন্য এবং একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য।’

একটু থামল আহমদ মুসা। থেমেই আবার শুরু করল, ‘গত পরশু এবং তার আগের দিন তিনটি খবর পড়লাম। একটা কাঠালানিয়া প্রদেশের তারাশায়, অন্যটি স্পেনের ভেল্লাদলিদে এবং তৃতীয়টি দক্ষিণ স্পেনের গ্রানাডায়। ঘটনা প্রায় একই রকম। তারাশায় কয়েকজন মুসলমান তাদের বলে দাবী করে খৃস্টান ধর্মাবলম্বীদের একটা দোকান দখল করেছে। ভেল্লাদলিতে কয়েকজন মুসলমান গিয়ে তাদের বলে দাবী করে একটা বাড়ী দখল করেছে। আর গ্রানাডায় কয়েকজন মুসলমান কর্তৃক কৃষি জমি দখল করার ঘটনা ঘটেছে। তিন জায়গাতেই মারপিট হয়েছে। এর জন্যে অভিযুক্ত হয়েছে মুসলমানরা। এই তিনটি ঘটনা আমাকে উদ্বিগ্ন করেছে। তিনটি ঘটনা দেশের তিন প্রান্তে ঘটেছে। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে গোটা দেশে একই মানসিকতা বিরাজ করছে। অর্থাৎ এই ধরণের অসহনশীল, হিংসাত্মক ও বেআইনি ঘটনা গোটা দেশে আরও ঘটবে।

ঘটনাগুলোকে ঘনিষ্টভাবে আমি জানি না। ঘটনা তিনটি পড়ার সংগে সংগেই আমার মনে হয়েছে এ গুলো বিরাট ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত মাত্র।’

'কিন্তু তিনটি ঘটনাই ঘটিয়েছে মুসলমানরা এবং তা তারা ঘটিয়েছে নিজেদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কারণে।' কথার মাঝখানে বলে উঠল শেখুল ইসলাম।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'ষড়যন্ত্র সব সময় ছদ্মবেশ ধরেই আসে।'

'কিন্তু এ ধরনের ঘটনা ঘটাবার ষড়যন্ত্র কে করবে, কেন করবে?' প্রশ্ন করল আবদুর রহমান।

'বলছি।' বলে শুরু করল আহমদ মুসা, 'আমাদের ভুললে চলবে না যে, স্পেন সরকার মুসলমানদের দাবী কিছু মেনে নিয়েছে বেকায়দায় পড়ে, আন্তর্জাতিক চাপে। কিন্তু কতখানি বিক্ষুব্ধ তারা সেটা বুঝা যাচ্ছে জেন, জোয়ান ও আমার উপর হিংসাত্মক আচরণ থেকে। তারা চেষ্টা করবে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবার জন্যে। তাদের এ চেষ্টা সফল করার জন্যে প্রথমেই তারা চাইবে স্পেনের মুসলমানদের ওপর বাইরের দুনিয়ায় যে সহানুভূতির সৃষ্টি হয়েছে সেটা নষ্ট করতে। এর সহজ পথ হলো মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী ও দাংগাবাজ হিসেবে চিহ্নিত করা। তিনটি ঘটনায় আমি সন্ত্রাস ও দাংগার সূত্রপাত লক্ষ্য করছি। আরো একটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে। সরকারের মতই সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশ এই পরিবর্তন মেনে নেয়নি। সুযোগ পেলেই তারা ছোবল মারবে। এই ছোবল মারার সুযোগ সৃষ্টি করবে ঐ তিনটি ঘটনার মত ঘটনা। দেশব্যাপী যদি দাংগা সৃষ্টি করা যায় এবং যদি প্রমাণ করা যায় যে, দাংগার কারণ মুসলমানরা, তাহলে এক ঢিলে স্পেন সরকার দুটি নয় তিনটি পাখি মারতে পারবে। বাইরের বিশ্বকে সরকার বুঝ দেবে মুসলমানদের সন্ত্রাস ও দাংগা মানসিকতার কারণেই দাংগা-হাংগামা ঘটছে। দ্বিতীয়তঃ দাংগার আড়ালে সরকার মুসলিম নিধনের কাজ সারতে পারবে। দাংগায় যারা মরবেনা তাদের জেলে পুরতে পারবে। তৃতীয়তঃ মুসলমানদের স্পেন সরকার যে সুযোগ দিয়েছে তা সবার চোখের আড়ালে ধীরে ধীরে প্রত্যাহার করে নিতে পারবে। এই অবস্থায় মুসলমানরা অত্যাচার ও বৈষম্য থেকে বাঁচার জন্যে আগের মতই পরিচয় গোপন করে ফেলতে বাধ্য হবে।'

থামল আহমদ মুসা।

ফিলিপ, যিয়াদ, আবদুর রহমান সহ উপস্থিত সকলের মুখ মলিন। তাদের চোখে মুখে উদ্বেগ।

'আমি বুঝতে পেরেছি মুসা ভাই। আমার মনে হচ্ছে, এটা আপনার অনুমান নয়। আপনি ভবিষ্যতে যা ঘটতে যাচ্ছে তার নিখুঁত একটা ছবি তুলে ধরেছেন। আপনি হয়তো লক্ষ্য করেননি মুসা ভাই আজকের 'দি স্পেনিয়া' কাগজের শেষ পাতায় ঐ ধরণের আরেকটি খবর প্রকাশিত হয়েছে। ঘটনাটি

ঘটেছে টলেডোর পাশে একটা গ্রামে। মুসলমানরা একটা গীর্জা দখল করতে গিয়েছিল, তারা দাবী করেছিল মসজিদের দেয়ালের ওপর ঐ গীর্জাটি তৈরী হয়েছে। সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছে। নিহত ব্যক্তি কোন দলের তা খবরে বলা হয়নি।'

'মারা গেছে একজন?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

'হ্যাঁ।' ফিলিপ বলল।

'আমরা বুঝতে পারছি মুসা ভাই আমরা একটা ষড়যন্ত্রের মুখোমুখি। কিন্তু বুঝতে পারছিনা, মুসলমানরা নিজেরা কেন এ ধরনের সংঘাত বাধাতে যাচ্ছে?' বলল যিয়াদ।

'বন্ধু সেজে কেউ অথবা সরকারী এজেন্টরা ভেতর থেকে মুসলমানদের উস্কানি দিয়ে হিংসাত্মক পথে ঠেলে দিচ্ছে।' আহমদ মুসা বলল।

'এই সময় উত্তর স্পেনের ভেল্লাদলিদ থেকে আসা মুসলিম নেতা আবদুল্লাহ মারকিস উঠে দাঁড়াল। বলল, 'জনাব আপনার কথা শুনে আমাদের ভেল্লাদলিদের কথা মনে পড়েছে। সেখানে বাড়ী দখলের ঘটনায় বাড়ী সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করেন যিনি তিনি গোয়েন্দা বিভাগের একজন চাকুরে। তিনিই কাগজপত্র এনে দেখান যে ভেল্লাদলিদের উপকণ্ঠে একটি বিশাল চারতলা বাড়ির মালিক একজন মুসলমান। তার দাদার কাছ থেকে বাড়ীটা কেড়ে নেয়া হয়েছিল। এই কাগজ পত্রের জোরেই বাড়ীটি দাবী করা হয় এবং ঐ ঘটনা ঘটে। আমরা তাকে সবাই আমাদের শুভাকাঙ্খী বলেই মনে করেছি। এখন বুঝতে পারছি ব্যাপারটা ষড়যন্ত্রই ছিল।'

'এধরণের একটা খবর', বলতে শুরু করল শেখুল ইসলাম, ‘আমার কাছেও আছে। আজ থেকে চার পাঁচদিন আগে কয়েকজন লোক গিয়েছিল আমার কাছে। আমি তাদের চিনি না। তারা পরিচয় দিল হিউম্যান রাইটস গ্রুপের লোক বলে। তারা বলল, মাদ্রিদে মুসলমানদের বেশ সম্পত্তি আছে। সেগুলো দখল করার এটাই সময়। আন্তর্জাতিক জনমত পক্ষে আছে। আর স্পেন সরকারও চাপের মধ্যে আছে। সম্পত্তিগুলোর একটা তালিকা আমাদের কাছে আছে। আপনারা এগিয়ে এলে আমরা আপনাদের সহযোগিতা করব। শুধু দাবী দাওয়া

করলে সরকার শুনবে না। কিছু শক্তি প্রদর্শনের দরকার আছে।' আমি তাদের কথায় খুশী হয়েছিলাম। তাদের সম্পত্তির তালিকা ও দলিল দস্তাবেজ দিয়ে সাহায্য করতে বলেছি। এখন আমাদের মনে হচ্ছে এটা আমাদের জন্য একটা ফাঁদ।'

থামল শেখুল ইসলাম।

'আল্লাহ আপনাকে মুসলিম উম্মার জন্যে অনেক দীর্ঘজীবি করুন মুসা ভাই। স্পেনের নবজীবন লাভকারী মুসলমানদের ধ্বংস করার ভয়াবহ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আপনি আমাদের সচেতন করলেন, সতর্ক করলেন। এজন্যে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। যে ঘটনাগুলোকে আমরা স্পেনে মুসলিম জাতির জন্যে শুভ সংবাদ মনে করছিলাম, মুসলমানদের জেগে ওঠার প্রতীক মনে করছিলাম, তা যে মুসলমানদেরকে আবার অন্ধকারে ঠেলে দেবার ষড়যন্ত্র, সেটা আমরা সর্বনাশ হয়ে যাবার আগে বুঝতাম বলে মনে হয় না। আল্লাহ আপনার তীক্ষ্ম দৃষ্টিকে আরও শক্তিশালী এবং আপনার দূরদৃষ্টি আরও প্রসারিত করুন। এখন বলুন মুসা ভাই এই সংকটে আমাদের করণীয় কি?' বলল ফিলিপ।

'সে কথা বলার জন্যেই', শুরু করল আহমদ মুসা, 'আজ রাতে সবাইকে এখানে ডেকেছি। আগামী কাল সকাল থেকে তোমাদেরকে কয়েকটা গ্রুপে বিভক্ত হয়ে গোটা স্পেনে ছড়িয়ে পড়তে হবে। সব মুসলমানকে এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত করতে হবে এবং সব রকমের শক্তি প্রদর্শন ও হিংসাত্মক ঘটনায় জড়িয়ে পড়া থেকে মুসলমানদের বিরত রাখতে হবে।'

একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর আবার শুরম্ন করল, 'স্পেনের মুসলমানদের শীর্ষ নেতাদের সকলে এখানে হাজির আছ। তোমরা ভাল করে শোন, বুদ্ধি-বিবেচনাহীন আবেগ প্রসূত হটকারী পদক্ষেপ স্পেনের সংখ্যালঘু মুসলমানদের জীবনে আবার হতাশার কালোরাত ডেকে আনতে পারে। সুতরাং অত্যন্ত সতর্কতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে সামনে এগুতে হবে। স্পেনের সংখ্যাগুরু জনগনকে আমাদের জয় করতে হবে, তাদের সাথে সংঘাত নয়। এজন্যে স্পেনের মুসলমানদের প্রথম কাজ হলো, যে আইনগত ও সাংবিধানিক অধিকার তারা লাভ করেছে তাকে সংহত করার এবং যুক্তি ও বুদ্ধির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সহায়তা

নিয়ে আরও আইনগত ও সাংবিধানিক অধিকার অর্জন করা। দ্বিতীয় কাজ হলো, প্রচার ও ব্যাপক ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য্য সংখ্যাগুরু জনগনের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে তাদেরকে সাথী অথবা সহযোগীতে পরিণত করা এবং তৃতীয় কাজ হলো, দ্বিতীয় কাজটিকে আমরা যখন সম্পূর্ণতা দিতে অথবা সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত করতে পারবো, তখন রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দিকে পা বাড়াতে হবে। তবে এই তিনটি কাজ, বিশেষ করে শেষের দু'টি কাজ সফল হবার জন্যে স্পেনের মুসলমানদেরকে প্রথমে খাঁটি মুসলমান হতে হবে। মনে রাখতে হবে স্পেনে মুসলমানদের পতন ঘটেছিল অর্থের অভাবে নয়, শক্তির অভাবে নয়, পতন ঘটেছিল ইসলামের অভাবে। সুতরাং স্পেনে মুসলমানদের নতুন যাত্রা সফল করতে হলে মুসলমানদের মধ্যে ইসলামকে ফিরিয়ে আনতে হবে পরিপূর্ণ ভাবে।'

থামল আহমদ মুসা।

ঘরে উপস্থিত সকলে একযোগে 'আল হামদুলিল্লাহ' বলে উঠল।

'আমরা সকলে আপনার এ নির্দেশকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করব মুসা ভাই।' আবেগ কম্পিত কণ্ঠে বলল যিয়াদ বিন তারিক।

'আল হামদুলিল্লাহ।' বলল আহমদ মুসা।

একটু থেমে আহমদ মুসা আবার বলল, 'আর একটি কথা আজ তোমাদের কাছে বলার আছে, তোমাদের কাছ থেকে আজ আমি বিদায় চাইছি।'

'বিদায়, আজ?' ফিলিপ, যিয়াদদের কণ্ঠ আর্ত-চিৎকার করে উঠল।

'ফিলিপ, যিয়াদ, আবদুর রহমান আহমদ মুসার পাশেই বসে ছিল। আহমদ মুসার কথা শুনে তাদের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে, চুপসে গেছে যেন এক মুহুর্তেই। ফিলিপ ও যিয়াদ দু'দিক থেকে আহমদ মুসার দুটি হাত চেপে ধরে বলল, 'একি বলছেন মুসা ভাই? আজ চলে যাবেন?'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'আমার কাজ শেষ ভাই। যে টুকু বাকি ছিল এখন শেষ করলাম। এখন আমার যাবার সময় হয়েছে।'

'যাবেন জানি, কিন্তু হঠাৎ করে এই ভাবে?' কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলল যিয়াদ।

'নতুন এক কাজের দায়িত্ব দিলেন, তার তো কিছুই এখনও হয়নি।' ভারি গলায় বলল ফিলিপ।

'আমি জানি এ দায়িত্ব তোমরা পালন করতে পারবে।' বলল আহমদ মুসা ম্লান হেসে।

'কিন্তু এ হয়না, আপনি হাজির থেকে এ কাজ শেষ করে দিন।' কান্না চাপার কসরত করে বলল আবদুর রহমান।

কক্ষে উপস্থিত সকলেই আবদুর রহমানের কথা সমর্থন করল।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। সকলের দিকে চোখ বুলিয়ে বলল, 'তোমরা আমাকে ভালবাস, তোমাদের ছাড়তে আমার খুব কষ্ট হবে। কিন্তু আমাকে যেতে হবে। সিংকিয়াং-এর অবস্থা কি তোমরা শুনেছ। সেখানেও আমার যাবার প্রয়োজন হবে। তোমরা এখন আমাকে বিদায় দাও। আমাকে তৈরী হতে হবে, আজ রাতেই আমি যাত্রা করব। তোমাদের সকলের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।'

কথা শেষ করে আহমদ মুসা ফিলিপ, যিয়াদদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমরা এস, আমি উপরে গেলাম।'

বলে আহমদ মুসা ধীর গতিতে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে গেল।

ঘরে কারোমুখে কোন কথা নেই। বজ্রাহতের মত সবাই বসে। চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে সকলের।

আহমদ মুসা যাওয়ার জন্যে ব্যাগ গুছিয়ে নিচ্ছে।

আহমদ মুসা ফিলিপ, যিয়াদ, আবদুর রহমান এ ধরনের পরিচিত কাউকেই সাথে নিতে রাজী হয়নি। বলেছে তাঁদের কাজ এখন অনেক, সময় নষ্ট করা তাদের ঠিক হবে না। সব শেষে আহমদ মুসা রাজী হয়েছে পেড্রোকে সাথে নিতে। পেড্রো ফিলিপের খুব প্রিয় এবং বাস্ক গেরিলা দলের সদস্য। রাস্তা ঘাট সম্পর্কে সে খুব অভিজ্ঞ, খুব সাহসী এবং বুদ্ধিমান। ফিলিপের অনুরোধেই তাকে সাথে নিতে হচ্ছে।

‘আপনি মাদ্রিদ থেকে যাবেন কিভাবে মুসা ভাই?’ বলল ফিলিপ।

‘আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, ‘ঠিক ভোর চারটায় গেটে ব্রেড সরবরাহ দেয়ার একটা গাড়ী আসবে। ওটারই বিশেষ এক কেবিনে আমি মাদ্রিদ পার হবো; মাদ্রিদের উপকণ্ঠে নর্থ হাওয়ে ও রিং রোডের ক্রসিংএ দু’টি ঘোড়া আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে। সে ঘোড়ায় চড়ে গ্রামের পথে অনিশ্চিত যাত্রা করব।’

ফিলিপের দু’চোখ পানিতে ভরে উঠল। বলল, ‘আমরা কিছুই করতে পারলাম না।’

আহমদ মুসা তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, ‘তোমাদেরকে ইচ্ছা করেই এসব কাজে জড়াইনি। তোমরা এখন স্পেনের মুসলমানদের নেতা। তোমাদেরকে সব সন্দেহের উর্দ্ধে থাকতে হবে।’

‘ওসব কারা করছে মুসা ভাই?’

‘ফিলিস্তিন ও মধ্য এশীয় দূতাবাস। হ্যাঁ, শুন ফিলিপ, যিয়াদ, তোমাদের যে কোন প্রয়োজনে যে কোন কথা ওদেরকে জানাবে। ওরাও তোমাদের ওপর নজর রাখবে।’

‘একটা প্রশ্ন করতে ভুলেই গিয়েছিলাম মুসা ভাই, সেদিন রাতে মিঃ প্লাতিনির ওখানে যাবার পথে যারা আমাদের বাঁচিয়েছিল সেই ষ্টেনগান ধারীরা করা?’ বলল ফিলিপ।

আহমদ মুসা সোজা হয়ে দাঁড়াল। হাসল। বলল, ‘বিষয়টা আমিও বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। ওরা ছিল ফিলিস্তিন দূতাবাসের সাথে সম্পৃক্ত সাইমুম এর লোক। সেদিনই আমি এটা সন্দেহ করেছিলাম পরে জানতে পেরেছি।’

আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, এখন বেরুতে হয়। চল। আম্মাকে তো রাতে বলেছি। তাঁকে আর বিরক্ত করে লাভ নেই।

ব্যাগ হাতে নিল আহমদ মুসা।

যিয়াদ এসে আহমদ মুসার হাত থেকে ব্যাগ নিয়ে তার সাথে চলতে শুরু করল।

বেরিয়ে এল তারা সকলে।

সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়েছিল ফিলিপের মা।

আম্মা এই রাতে এখানে কেন কষ্ট করে?' সালাম দিয়ে বলল আহমদ মুসা।

'এ আর কি কষ্ট বাছা, কষ্ট তো আমার বুকে। ঘুমোতে পারিনি সারা রাত। তোমার মুখের দিকে তাকালে তোমার মাঝে আমি আমার মারিয়াকে দেখতে পেতাম। সান্ত্বনা পেতাম। তাতে মারিয়ার সজীব এই স্মৃতি টুকু হারিয়ে গেলে বাঁচব কি করে আমি?' কান্নায় ভেঙে পড়ল ফিলিপের মা।

ফিলিপ গিয়ে তার মাকে ধরল। ফিলিপও কাঁদছে। যিয়াদ ও আবদুর রহমানের চোখ ছল ছল করছে। নির্বাক আহমদ মুসা। কি বলবে সে। কি বলে সান্ত্বনা দেবে সন্তান হারা এ মাকে। নত মুখে আহমদ মুসার চোখ ফেটে নেমে এল অশ্রু।

'ক্ষনিকের জন্যে আসা আপনার এ বিদেশী সন্তানকে মাফ করবেন মা। আমি চলি'।

বলে চোখ মুছতে মুছতে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল আহমদ মুসা।

পেছনে শুনতে পেল ফিলিপের মা'র ঢুকরে উঠা কান্নার শব্দ।

# ৬

মাদ্রিদের উত্তর পূর্বে জেবোয়া উপত্যকা ধরে মাদ্রিদ গোয়াদালাজার হাইওয়ের সমান্তরালে এগিয়ে চলেছে দু'জন ঘোড় সওয়ার পাশাপাশি। একজন আহমদ মুসা আর একজন পেট্রো।

'স্যার, আপনি কি পথের চিন্তা করেছেন'। চলতে চলতে প্রশ্ন করল পেট্রো।

'ওহো, সে কথা তো তোমাকে এতক্ষণ বলাই হয়নি'। বলে একটু থেমে আবার বলতে শুরু করল, 'আমি জোবায়া-হোনারেস উপত্যকা ধরে মাদ্রিদ গোয়াদালাজার হাইওয়ের সমান্তরালে মদিনাসেলি পর্যন্ত পৌঁছার চিন্তা করেছি। জাকা গিয়ে সম্ভবতঃ আমাদের ঘোড়া ত্যাগ করে গাড়ী যোগাড় করতে হবে। গাড়ী করে আমরা সাম্পুর গিরিপথ দিয়ে ফ্রান্স প্রবেশ করে সান্তা মারিয়া হয়ে পাউ পর্যন্ত আপাততঃ যাব। ওখানে গিয়ে পরবর্তী কথা চিন্তা করব। তোমাকে তো ফিরে আসতে হবে সাম্পু থেকেই'।

পেট্রোর চোখে মুখে বিস্ময় ফুটে উঠেছিল। সে বলল, 'স্যার এ পথে গেছেন কখনও'।

'এ পথ কেন মাদ্রিদ সারাগোসা হাইওয়েতেও কখনও আসিনি'।

'কিন্তু এ পথে না গেলে তো এ ধরনের রোড প্ল্যান সম্ভব নয়। ঘোড়া নিয়ে মাদ্রিদ থেকে সাম্পু গিরিপথে যাবার এটাই আমার মতে সর্বোৎকৃষ্ট রোড প্ল্যান। একটাই মাত্র আমার সংশোধনী প্রস্তাব আছে'।

'সেটা কি'?

'গোয়াদালাজারা পর্যন্ত পৌঁছে হাইওয়ের সমান্তরালে না গিয়ে যদি আমরা মোটামুটি ভাবে হোনারেস নদীর তীর বরাবর যাই, তাহলে মদিনাসেলি পৌঁছতে আমাদের সময় অনেক কম লাগবে'।

‘তোমার কথা ঠিক। কিন্তু হোনারেস অনেকটাই পার্বত্য নদী। ওর তীরটা সুগম হবে তো’?

‘উত্তর তীরটা দুর্গম, কিন্তু দক্ষিণ তীর সুন্দর সমতল। রাস্তাও আছে’।

‘ধন্যবাদ পেট্রো। আমরা হোনারেস এর পথেই যাব’।

‘বেলা ২টায় আহমদ মুসা ও পেট্রো হোনারেস ও সোরব নদীর সংগমস্থলে পৌঁছুল।

অপূর্ব সুন্দর এই সংগমস্থল। এই সংগমস্থলে সোরব ও হোনারেস একসাথে মিলিত হয়ে আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে দু’দিকে চলে গেছে। নদীর এমন অদ্ভুত মিলন ও বিরহ খুব কমই দেখা যায়।

সংগমস্থলের দক্ষিণ পার্শ্বে এক বাগানে এসে ঘোড়া বাঁধল আহমদ মুসা ও পেট্রো।

একটু বিশ্রাম নিয়ে আহমদ মুসা ও পেট্রো অজু করে নামাজ পড়ল। তারপর সাথে করে আনা খাবার থেকে খাবার খেয়ে নিল।

আশে পাশেই ঘোড়া চরছিল। আহমদ মুসা ও পেট্রো সবুজ ঘাসের ওপর শুয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল।

‘এদিকে তো কোন বাড়ী ঘর মানুষ দেখছিনা পেট্রো’? আহমদ মুসা জিজ্ঞাসা করল।

‘আছে স্যার একটু দক্ষিণে সেখানে ফসল ফলে, গ্রামও আছে’।

‘এ অঞ্চলে কি সবাই খৃষ্টান?’

‘এটা বলা যাবে না স্যার। মুসলমান থাকলেও আগে চেনা যেত না। খৃষ্টান পরিচয়ে খৃষ্টানের মতই বাস করত তারা। এখন জানা যাবে’।

‘তুমি কেন ইসলাম গ্রহণ করলে পেট্রো? ফিলিপ গ্রহণ করেছে তাই’?

‘ফিলিপ স্যার ইসলাম গ্রহণ না করলে, ইসলাম গ্রহণ করতে সাহস পেতাম কি না জানি না। তবে ইসলাম আগে থেকেই ভালো লাগত আমার। আবদুর রহমান স্যার এটা জানে। শুনলে আপনি হাসবেন। সুযোগ পেলেই আমি নামাজ পড়তাম, মানে নামাজের মত উঠাবসা করতাম, যা শিখেছিলাম আবদুর রহমান স্যারের কাছ থেকে’।

‘বিশ্রাম নেয়া শেষে উঠল দু’জন।

উঠেই আহমদ মুসা দেখতে পেল দূরে দু’টি গাছের ফাঁক দিয়ে দু’জন লোককে দেখা যাচ্ছে। তারা এদিকেই তাকিয়ে আছে।

পেট্রোও দেখতে পেয়েছে ওদেরকে।

আহমদ মুসা পেট্রোকে বলল ওদের ডাকার জন্যে।

পেট্রো ডাকল ওদেরকে ইশারা করে।

ওরা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল।

‘ওরা কৃষক মুসা ভাই’। বলল পেট্রো।

‘কি করে বুঝলে’?

‘ও ধরনের চোঙা প্যান্ট এদিকে কৃষকরাই শুধু পরে’।

ওরা এসে একটু দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল।

‘এদিকে কোন বাড়ী দেখছিনা, কোথায় থাক’?

দক্ষিণ দিকে ইশারা করে একজন বলল, ‘ঐ দিকে’।

‘তোমরা মরিষ্ক, মুসলমান হয়েছ না? প্রশ্ন করল ওদোর আরেকজন।

‘কি করে বুঝলে’? প্রশ্ন করল আহমদ মুসা।

‘তোমারা মুসলমানের মত প্রার্থনা করলে’।

‘এদিকে মুসলমান আছে নাকি’?

‘এদিকে নেই, মদিনাসেলিতে আছে?’

‘মুসলমানদের তোমরা কেমন মনে কর?’

‘আমরা তো ভালই দেখি, কিন্তু...’। কথা শেষ না করেই থামলো লোকটি।

‘কিন্তু কি?’ বলল আহমদ মুসা।

‘সেদিন শুনলাম, স্বাধীনতা পাওয়ার পর ওরা নাকি বিভিন্ন জায়গায় দাংগা বাধাচ্ছে’। ওদের একজন বলল।

‘কার কাছে থেকে শুনলে এ কথা?’

‘সেদিন গ্রামে একজন লোক এসেছিল শহর থেকে। সেই বলেছে।‘

‘সে আর কি বলেছে?’

লোকটি কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল। একটু পরই প্রশ্ন করল, 'তোমরা কে, এদিকে কোথায় যাবে?'

'এই তো গোয়াদালজার থেকে হোনারেস নদী ও পাহাড় এলাকায় বেড়াতে এসেছি'। চট করে বলল পেট্রো।

লোক দু'জন কথাটা বিশ্বাস করল বলে মনে হলো না। বলল ওদের একজন, গোয়াদালজারায় তোমাদের বাড়ী?'

'না'।

'সেটা বুঝেছি।'

'কি করে বুঝছ?'

'আসলে তোমরা দূর থেকে এসেছ।'

'কি করে বুঝলে?'

'তোমাদের ঘোড়া এবং তোমাদের ধূলি ধূসর দেহ। গোয়াদালাজার থেকে এলে এমন হতো না।'

আহমদ মুসা বুঝল, পেট্রোর মিথ্যা কথাটা ধরা পড়ে গেছে। আহমদ মুসা বলল, 'এদিকে রাস্তাঘাট তেমন নেই, লোকজন আসে না?' প্রসংগটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে নেবার চেষ্টা করল আহমদ মুসা।

'ভ্রমণকারী যারা আসে তারা তো চায় বন বাদাড়। তোমরা কোথায় যাবে?'

'এই তো সামনে সিংগুরেজা।'

সিংগুরেজা প্রায় ৭০ মাইল দূরে হানারেস নদীর তীরে ছোট্ট একটি পার্বত্য নগরী। ইচ্ছা করেই আহমদ মুসা তাদের লক্ষ্য মদিনাসেলির কথা এড়িয়ে গেল।

'সিংগুরেজা খুব ভাল জায়গা। কিন্তু একটা মুস্কিল হয়েছে আগন্তুকদের ওপর এখন খুব নজর রাখা হচ্ছে।'

'কেন?' কৃষকরা কতটা জানে তার জন্যে প্রশ্ন করল আহমদ মুসা।

'অত কথা না শুনাই ভাল' বলে কৃষক দু'জন পা তুলল যাবার জন্যে।

আহমদ মুসাও আর কথা বাড়ালনা। তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে, সুদূর পার্বত্য গ্রামের কৃষকরাও সবকিছু জানে।

কৃষকরা চলে গেলে আহমদ মুসা বলল, ' পেট্রো, কৃষকরা আমাদের সন্দেহ না করলেও আমরা তাদের কাছে সত্য পরিচয় দেইনি তা তারা বুঝেছে। এখন চল আমরা উঠি। ওরা গ্রামে গিয়ে কথা ছড়াবার আগে আমাদের এ এলাকা ছাড়তে হবে।'

'এ এলাকার কৃষকরা খুব স্বচ্ছল এবং শিক্ষিত। তাই চালাক তারা হতেই পারে।' বলল পেট্রো।

আহমদ মুসা ও পেট্রো যাত্রা করল। হানারেস নদীর তীর ধরে ছুটে চলল তাদের ঘোড়া। বেলা ৫টা নাগাদ তারা এসে পৌঁছিল সিংগুরেজা শহর বরাবর স্থানে। একটা পাকা রাস্তা এখানে তারা অতিক্রম করল। পাকা রাস্তাটি উত্তর দিকে এগিয়ে নদীর ঘাট পর্যন্ত নেমে গেছে। রাস্তাটি গেছে পর্যন্ত। তার দক্ষিণে গোয়াদালাজারা মদিনাসেলি হাইওয়ে থেকে নেমে এসেছে। এলাকাটা বন বাদাড়ে পূর্ণ। পাকা রাস্তাটি অতিক্রম করার পরেই একটা বড় টিলা। টিলাটাও জংগল পূর্ণ।

টিলাটার পাশ ঘুরে তাদের সামনে এগুতে হলো।

টিলার ওপাশে পৌঁছার পর দূর থেকে ভেসে আসা ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল আহমদ মুসা। ঘোড়ার লাগাম টেনে থমকে দাঁড়াল সে। শব্দ পেট্রোও শুনতে পেয়েছে। বলল সে, পাকা রাস্তা ধরে আমার মনে হচ্ছে তিনজন ঘোড়সওয়ার এগিয়ে আসছে।

'কি করে বুঝলে?' বলল আহমদ মুসা।

'ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনে।'

'ধন্যবাদ পেট্রো। তুমি সত্যই একজন বিশেষজ্ঞ।'

একটু থামল আহমদ মুসা। থেমেই আবার বলল, ' ওরা কারা দেখতে হবে।' বলে আহমদ মুসা ঘোড়া থেকে নামল।

পেট্রোও নামল।

ঘোড়ার দু'টো একটা গাছের সাথে বেঁধে দ্রুত তারা টিলার ওপরে উঠে গেল। চোখে পড়ল তিনটি ঘোড়াই।

চমকে উঠল তারা, তিনটি ঘোড়ার একটিতে সেই কৃষককে দেখে। পেদ্রোর বলল, 'সাথের লোক দু'জন পুলিশ। মফস্বল পুলিশের ইউনিফরম তাদের গায়ে বলে আহমদ মুসা তাদের চিনতে পারেনি।

'তাহলে কৃষকটি পুলিশের খবর দিয়েছে' বলল আহমদ মুসা।

'আমার মনে হয় তার গল্প শুনে পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে এসেছে আমাদের সনাক্ত করার জন্যে।'

'আমারও মনে হয় তাই হবে। দেখনা কৃষকের মুখটা মলিন। তাকে জোর করা আনা হয়েছে।'

'গ্রামের কৃষকরা সত্যই ভালো স্যার। এরা বিরোধ বা দাংগা হাংগামায় একেবারেই যেতে চায়না।'

'কিন্তু ষড়যন্ত্রনাকারীরা ওদের ভূল বুঝিয়ে বিভ্রান্ত করে গন্ডগোল ও হিংসাত্মক ঘটনায় জড়িত করার ষড়যন্ত্র করছে।'

ঘোড়সওয়ার তিনজন টিলার পশ্চিম পাশ দিয়ে পাকা রাস্তাটা ধরে সিংগুরেজা শহরের দিকে চলে গেল।

আহমদ মুসা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল। সে সিংগুরেজার কথা না বলে যদি তাদের সামনের গন্তব্য মদিনাসেলির কথা কৃষককে বলত, তাহলে ওরা আহমদ মুসাদের সন্ধান করার জন্যে এভাবেই মদিনাসেলির পথে এগুতো।

টিলা থেকে নেমে আসতে আসতে আহমদ মুসা বলল, 'আমাদের বাগে পাওয়ার জন্যে স্পেন সরকার গোটা স্পেনেই জাল বিছিয়েছে পেদ্রো। আশ্চর্য মরিয়া হয়ে উঠেছে ওরা।'

'ফিলিপ স্যার বলেছেন, স্পেন সরকার একা নয়, পশ্চিমের সরকার গুলোও এ ব্যাপারে তাকে পরামর্শ ও উৎসাহ দিচ্ছে। আপনাকে সরাতে পারলে তাদের সবারই লাভ।'

'তাই হবে পেদ্রো। আল্লাহর শুকরিয়া যে, জেন ও জোয়ানকে ঐভাবে পার করা গেছে। না হলে তাদের নিয়ে মুস্কিলে পড়তে হতো।'

আহমদ মুসা ও পেদ্রো আবার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ছুটল হানারেস নদীর তীর ধরে মদিনাসেলির দিকে। ঠিক সূর্য ডুবে যাচ্ছে, এই সময় আহমদ মুসারা মদিনাসেলি শহরের দক্ষিণ পাশে গিয়ে পৌঁছল।

মদিনাসেলি শহর থেকে একটা হাইওয়ে উত্তর পশ্চিমে সোরিয়া পর্যন্ত গেছে। আরেকটা হাইওয়ে উত্তর পূর্বে কেলাতাউদের দিকে গেছে। মদিনাসেলি কেলাতাউদ হাইওয়ের দক্ষিণ পাশ দিয়ে এর সমান্তরালে এগিয়ে গেছে জালোন নদী। হানারেস নদী মদিনাসেলীতে এসে জালোন উপত্যকায় পড়ার পর জালোন নাম ধারণ করেছে।

মদিনাসেলির দক্ষিণ পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া জালোনের তীরে আহমদ মুসারা এসে দাঁড়িয়েছিল। আহমদ মুসা যেহেতু শহরে প্রবেশ করতে চায়না এবং জালোন নদীর তীর ধরেই যেহেতু তাদের যেতে হবে, তাই মদিনাসেলির দক্ষিণে নদী তীরেই তারা রাত যাপনের সিদ্ধান্ত নিল।

আহমদ মুসা যেখানে রাত যাপনের জন্যে থেমেছিল সেটা একটা জলপাই বাগান। বাগান থেকে নদীটা ৫০গজের মত দূরে। বাগানের পাশ দিয়েই পায়ে চলার একটা রাস্তা। বাগানে ঘোড়া বেঁধে দু'জন একে একে নদী থেকে অজু করে এল। দীর্ঘ কষ্টকর পথ চলার পর নদীর ঠান্ডা পানি দিয়ে অজু করতে খুব ভালো লাগল আহমদ মুসার। কিন্তু তার চেয়ে ভালো লাগল নদী তীরটাকে নির্জন দেখে। আহমদ মুসা চায়, গন্ডগোল এড়িয়ে যতটা চলতে পারা যায়।

সূর্য তখন ডুবে গেছে। নেমে এসেছে আবছা অন্ধকার।

আহমদ মুসা ও পেদ্রোর দু'জনে নামাজে দাঁড়াল। প্রকৃতির উন্মুক্ত কোলে আহমদ মুসা ধীরে সুস্থে কেরাত করে নামাজ পড়ল।

আহমদ মুসারা যখন নামাজ শুরু করেছিল, তখন পাশের রাস্তা দিয়ে আট/নয় বছরের একটা বালকের হাত ধরে একজন তরুণী পূর্ব দিকে যাচ্ছিল। পূর্বদিকে অল্পদূরেই একটা লোকালয়।

বাগানের পাশ দিয়ে যাবার সময় কোরআন তেলাওয়াতের সুর কানে যেতেই তরুণীটি থমকে দাঁড়াল। বাগানের দিকে তাকিয়েই সে দু'জনকে নামাজরত অবস্থায় দেখতে পেল।

তেলাওয়াত অস্পষ্টভাবে শুনতে পাচ্ছিল তরুণীটি। বিস্মিত তরুণী তেলাওয়াত আরও ভালোভাবে শোনার জন্যে বাগানের দিকে এগিয়ে গেল।

তরুণী মনোযোগ দিয়ে নামাজ পড়া ও কেরাত শুনল। নামাজের তৃতীয় রাকাত যখন শুরু হলো, তখন সে ধীরে ধীরে রাস্তায় উঠে চলে গেল পূর্ব দিকে। তার চোখেমুখে বিস্ময়, কৌতূহল ও উত্তেজনা।

নামাজ শেষ করে আহমদ মুসা ব্যাগ থেকে চাদর বের করে তা বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। পেট্রো গেল ঘোড়াকে পানি খাওয়াতে এবং কিছু ঘাস সংগ্রহ করতে। পেট্রো ফিরে এলে সেও একটা চাদর বিছিয়ে শুয়ে পড়ল।

'কখন খাওয়া যাবে পেট্রো?' বলল আহমদ মুসা।

'অন্ধকারেই তো খেতে হবে, যে কোন সময় খাওয়া যাবে।'

'পাশাপাশি দু'জন শুয়ে। দু'জনেই নিরব। জমাট অন্ধকার নেমেছে তখন চারদিকে। দূরে শহরের আলো ছাড়া আর আলোর চিহ্ন কোথাও নেই। অবশ্য চারদিকে জোনাকিরা আছে। ওগুলোকে অন্ধকারের হাসি বলে মনে হচ্ছে আহমদ মুসার কাছে। চারদিকে নিরব-নিঝুম। ঝিঝি'রা না থাকলে মনে হতো প্রকৃতি

যেন শ্বাসরুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। এই নিরবতা ও অন্ধকারের মাঝে ডুবে থাকতে অদ্ভুত ভালো লাগছে আহমদ মুসার। এমন করে মাটির কোমল স্পর্শ, অন্ধকারের এই আলিঙ্গন, নিরবতার এই বোবা আহবান কতদিন যে সে পায়নি।

'কেমন লাগছে পেট্রো?' জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

'পাহাড়ে আর বনবাদাড়েই বেশী ঘুরেছি মুসা ভাই। সুতরাং ভালোও লাগছেনা, খারাপও লাগছে না।'

কথা শেষ করেই পেট্রো ঝট করে উঠে বসল। বলল, 'মুসা ভাই রাস্তা দিয়ে কারা যাচ্ছে, আলো দেখুন। আহমদ মুসাও উঠে বসল।

দু'টি আলো। লোক তাহলে অনেক কয়জন হবে। ওরা যাচ্ছে পূব দিক থেকে পশ্চিমে।

বাগান বরাবর এসে হঠাৎ আলোর গতি বেঁকে গেল, আসতে লাগল বাগানের দিকে।

‘একি মুসা ভাই, এদিকে যে আসছে?’ উদ্বেগ ঝরে পড়ল পেট্রোর কন্ঠে।

শুধু পেট্রো কেন আহমদ মুসার কপালও কুঞ্চিত হয়ে উঠল। কারা, কেন আসছে? তাদের লক্ষ্য করেই যে আসছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ আহমদ মুসা। তবে সে নিশ্চিত ওরা শত্রু নয়।

‘এখন মুসা ভাই,আমরা কি করব?’ উদ্বিগ্ন পেট্রোর দ্রুত কন্ঠ।

‘আমরা বসেই থাকবো পেট্রো। তারা যারাই হোক আমাদের শত্রু নয়।’

‘কি করে বুঝলেন?’

‘শত্রুরা এভাবে আলো জ্বালিয়ে ঢাকঢোল পিটিয়ে আসে না।’

বাগানে ওরা প্রবেশ করল।

সামনের লোকটির হাতে একটি বিদ্যুৎ লন্ঠন। বেশ পাওয়ারফুল লন্ঠন। আলোটি উঁচু করে ধরেছে সে।

সামনের যে লোকটির হাতে লন্ঠন, তার চুল পাকা, মুখে দাঁড়ি ছোট করে ছাটা। বয়স ষাট পয়ঁষট্টি হবে।

বাগানে উঠার পর পেছনের লন্ঠনটিও সামনে চলে এল। এ লন্ঠনধারী একজন তরুণ। বয়স আঠার উনিশ হবে।

ওরা সামনে চলে এল আহমদ মুসাদের। ঘাসের ওপর ফেলা চাদরে বসেছিল আহমদ মুসা ও পেট্রো। এগিয়ে আসা আলোতে তারা আলোকিত হয়ে উঠল।

‘আসসালামু আলাইকুম।’ আলো হাতে এগিয়ে আসা বৃদ্ধ সালাম জানাল উচ্চকন্ঠে।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়ে সালাম গ্রহণ করে হ্যান্ডশেক করল বৃদ্ধের সাথে। আহমদ মুসার চোখে বিস্ময় ও আনন্দ।

আহমদ মুসা আগন্তুকদের চাদরে বসার জন্যে আহবান জানাল।

'না আমরা আপনাদের নিয়ে যেতে এসেছি। পাশেই গ্রাম আপনারা এখানে কেন?' বলল বৃদ্ধ।

'পাশেই গ্রাম আমরা জানি না।' বলল আহমদ মুসা।

'হ্যাঁ, পাশেই আমাদের মুসলিম পল্লী।' বলল সেই বৃদ্ধ।

'আমরা এখানে জানলেন কি করে?'

বৃদ্ধ পেছন দিকে দাঁড়ানো সেই তরুণীকে সামনে টেনে এ বলল, 'এ আমার ছোট মেয়ে জাহারা। এ আপনার সুন্দর তেলাওয়াত ও নামাজ পড়া দেখে গেছে। তার কাছ থেকে শুনেই আমরা ছুটে এলাম। আমরা থাকতে এভাবে কেউ জংগলে শুয়ে থাকতে পারে না।'

'আমাদের কোন অসুবিধা নেই। আমরা আপনাদের কষ্ট দিতে চাই না।'

'আমাদের অসুবিধা আছে। পাশেই আমরা বাড়ীতে থাকব, আর আপনারা জংগলে থাকবেন এটা হতে পারে না। আপনাদের নিয়ে যাওয়ার আরেকটা স্বার্থ আছে, আমরা কোরআন তেলাওয়াত শুনতে পারব।'

'আমরা যেতে পারি একটা শর্তে।'

'কি শর্ত'

আমাদের উপস্থিতির বিষয়টা যথাসাধ্য গোপন রাখতে হবে।'

'কেন?'

'কারণ আমি বলব না।'

বৃদ্ধ একটু চিন্তা করল। গভীর দৃষ্টিতে তাকাল আহমদ মুসার দিকে।

তারপর বলল, 'ঠিক আছে। শর্তে আমি রাজি। কিন্তু প্রতিবেশী দু' চারজন ভাইও কি জানতে পারবে না?'

'এ শর্ত পালন করবে এমন যদি বিশ্বস্ত হয়, তাহলে জানতে পারে।'

বৃদ্ধের মুখে হাসি ফুটে উঠল। বলল তাই হবে।

গ্রাম ছোট নয় বেশ বড়।

গ্রামের কাছাকাছি এসে নদী তীরের রাস্তা ছেড়ে গ্রামে প্রবেশ করল পায়ে চলা পথ ধরে।

গ্রামের ভেতরে সমান্তরাল কয়েকটা রাস্তা। রাস্তার দু'ধারে গড়ে উঠেছে বাড়ী। গৃহবিন্যাসে পরিকল্পনার ছাপ আছে।

রাত বেশি হয়নি। কিন্তু বেশ নিরব চারদিক। রাস্তায়, বাড়ির অলিন্দে লোকজন দেখা যাচ্ছে কিন্তু কথা তেমন একটা নেই। তবে এই রাতে দু'জন শহুরে

পোষাকের লোক, দুটি ঘোড়া দেখে অনেকই রাস্তার দিকে এগিয়ে এল। পথচারীরা থমকে দাঁড়িয়ে তাদের কৌতূহল দৃষ্টি নিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল।

পথের পাশ থেকে একজন সেই বৃদ্ধকে লক্ষ্য করে এগিয়ে এসে বলল, 'বুআলীশে কোত্থেকে এলে? এরা কারা তোমাদের সাথে?'

বৃদ্ধের কপাল কুঞ্চিত হলো। বিরক্তির লক্ষণ। সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, 'আমার ভাই'।

গ্রামের ঠিক মাঝখানে বৃদ্ধের বাড়ী। বাড়ীর সামনে বিরাট উঠান। উঠানের পরে বৈঠকখানা। বৈঠকখানার সাথেই মেহমানখানা। বৈঠকখানার পাশ দিয়ে ভেতর বাড়ীতে ঢোকার রাস্তা। আরেকটা পথ আছে মেহমানখানার ভিতর দিয়ে।

আহমাদ মুসাদের নিয়ে মেহমানখানায় তোলা হলো।

বৃদ্ধ ঘরের টু'টি বেড আহমদ মুসা ও পেট্রো দু'জনকে দেখিয়ে দিয়ে সাথের তরুণীকে লক্ষ্য করে বলল, 'আবুল হাসান এঁদের টয়লেট দেখিয়ে দাও।'

টয়লেট থেকে ফিরে আহমদ মুসা ও পেট্রো দু'জনেই বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছে।

এই সময় হাতে ট্রে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল সেই তরুণী। ট্রে এনে নামিয়ে রাখল ঘরের মাঝখানের টেবিলে। ট্রেতে দুই গ্লাস ফলের জুস এবং দুই বাটি বাদাম।

তরুণীটি ট্রে নিয়ে প্রবেশের পর আহমদ মুসা ও পেট্রো দু'জনই উঠে বসছে।

তরুণী জুসের একটা গ্লাস ও একবাটি বাদাম আহমাদ মুসাকে দিল।

জুসের গ্লাস তার হাতে তুলে দিল এবং বাদামের বাটি রাখল তার পাশের বিছানায়।

পেট্রোকেও দিল।

জুস সরবরাহের শেষে মেয়েটি ভেতর বাড়ীতে ঢোকার দরজায় গিয়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। তার দৃষ্টি আহমাদ মুসার দিকে। তার চোখে মুখে অনেক প্রশ্ন। কিন্তু একরাশ সংকোচ তার চোখে মুখে।

তরুণীটির পরনে লম্বা গাউন। রং সাদাটে গোলাপী। দেহের রং এর সাথে।

মিশে গেছে।

মাথায় রুমাল।

তরুণীটির উসখুস দেখে একবার অর দিকে তাকিয়েন আহমদ মুসা প্রশ্ন করল, 'কিছু বলবে জাহরা তুমি?'

তরুণীটি মুখে লজ্জা ও আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। বলল, 'আপনি কি সব টুকু কোরআন জানেন?'

'মুখস্থ থাকার কথা বলছ?'

'জি।'

'না, সব টুকু আমার মুখস্থ নেই।'

'কোরআন আপনার কাছে আছে?'

'না, নেই। কেন এ কথা জিজ্ঞেস করলে?' মেয়েটির দিকে চোখ না তুলেই আহমাদ মুসা বলল।

'কোরআন তো দেখিনি তাই।'

'কোরআন দেখনি? কোরআন পড়া তুমি জান না?'

'আমি কেন, আমাদের এ গ্রামের কেউ জানে না।'

'কোরআন দেখনি, কোরআন পড়া জান না। কিন্তু বুঝলে কি করে আমি কোরআন তেলাওয়াত করেছি?'

'আমি রেডিওতে মক্কা ও কায়রো রেডিও'র কোরআন তেলাওয়াত নিয়মিত শুনি।'

'কোরআন শিক্ষার ব্যবস্থা তোমাদের অঞ্চলে কোথাও নেই?'

'থাকবে কি করে ? আমাদের মুসলিম পরিচয়ই তো ছিল না।'

'ঘরে এসে দাঁড়িয়ে ছিল সেই বৃদ্ধ এবং তরুণীটি। শেষের উত্তর গুল তারা শুনছে।'

'জাহরার কথা শেষ হতেই বৃদ্ধ লোকটি বলল, আল্লাহর রহমত। সেই কাল দিন গুল চলে গেছে। এখন আমরা মুসলিম পরিচয় দিতে পারছি। শুনেছি

সব অধিকারই আমরা ফিরে পাব। আমাদের মসজিদও হবে, ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থাও হবে।'

'সবাই আপনারা খুশি হয়েছেন এ পরিবর্তনে?'

'শুধু খুশি? গর্বে সকলের বুক ফুলে উঠেছে। মনে হচ্ছে দেহের শক্তি আমাদের বহু গুন বেড়ে গেছে। আমরা রাত দিন প্রার্থনা করছি আহমদ মুসা নাকি ছেলেটার নাম।'

'আপনারা কার কাছ থেকে শুনেছেন তার কথা?'

'শুনেছি মানে কেউ বলেনি আমাদের কে। ''দি জালোন'' নামে একটি পত্রিকা আসে মদিনাসেলি শহরে। একটি খ্রিষ্টান ফাউন্ডেশন এটা চালায়।

ঐ পত্রিকায় বিস্তারিত কাহিনী বেরিয়েছিল। কি করে আহমদ মুসা গোপনে স্পেনে আসে, কি কি ঘটনা সে ঘটিয়েছে, কি করে তেজস্ক্রিয় ক্যাপ্সুলের ব্যাপারটি কাজে লাগিয়ে বাইরের সাথে ষড়যন্ত্র করে স্পেন সরকারকে চাপ দিয়ে মুসলমানদের দাবী আদায় করে নিয়েছে- তার বিস্তারিত বিবরণ ঐ কাহিনীতে আছে।

সাধারণ খ্রিষ্টানদের সাথে আমাদের সম্পর্ক খুব খারাপ ছিলনা। আমাদের মরিস্ক পরিচয় কোন সময় কারো প্রকাশ হয়ে পড়লেও তারা গোপন করার চেষ্টা করতো। সমস্যা ছিল খ্রিষ্টান সংগঠনগুলো এবং প্রশাসনকে নিয়ে। প্রশাসন এখন নিরব হয়ে গেছে। আমাদের ব্যাপারে যে আইন হচ্ছে, তা তারা বাস্তবায়ন করছে। তবে ঐ খ্রিষ্টান সংগঠনগুলো, যারা সমাজ পরিচালনা করে তাদের কোন পরিবর্তন হয়নি। তারা আড়ালে আবডালে শাসাচ্ছে। আর প্রচার করে বেড়াচ্ছে, আমরা নাকি আমাদের পূর্ব পুরুষদের সব সহায় সম্পত্তি দখল করবো, এমনকি দেশটাও নাকি দখল করে নিব। অবশ্য সরকার থেকে কেউ কেউ আমাদেরকে শক্ত হতে বলছে। আমাদের হারানো সম্পদের তালিকা করতে বলছে, সে সম্পদ দখল করতে বলছে, তারা নাকি আমাদের সহযোগিতা করবে।'

এই সময় মেহমান খানায় বাইরের দরজা দিয়ে একটি যুবক ঘরে প্রবেশ করল।

বৃদ্ধ তার দিকে ইংগিত করে বলল, 'আমার বড় ছেলে আবদুর রাহমান। আবুল হাসান এবং ফাতেমাতুজ্জাহরা তো আপনার সামনে। এই তিনটি আমার সন্তান।'

তারপর যুবকটিকে বৃদ্ধ বলল, 'এঁরা আমাদের মেহমান।'

যুবক আবদুর রাহমান 'গুড নাইট' বলে অভিবাদন জানিয়ে ভিতরে চলে যাচ্ছিল। বৃদ্ধ বলল, 'গুড নাইট কেন বেটা, এঁরা মুসলিম সালাম দাও।'

যুবকটি সলজ্জ হেসে সালাম দিয়ে ভিতরে চলে গেল।

বৃদ্ধ ভেতরে চলে গেল।

ঘরে রয়ে গেল আবুল হাসান ও জাহরা।

'আপনার দেশ কোথায়, নিশ্চয় স্পেন না।' বলল আবুল হাসান।

'কি করে বুঝলে?'

'আপনার ভাষা শুনে।'

'ঠিক বলেছ। হেসে বলল আহমাদ মুসা।'

'কোথায় বাড়ী আপনার? কোথায় যাচ্ছিলেন?'

আহমাদ মুসা গম্ভীর হল। বলল, ''আবুল হাসান এ প্রশ্ন দু'টোর উত্তর না নিলে হয়না?'

'আপনার নাম তো আমরা এখনও জানিনা।' বলল জাহরা।

'একটা রাতের জন্যে এসেছি। হয়তো আর কোন দিন দেখাও হবেনা। নাম না জানলে হয়না বোন?'

একরাশ লজ্জা ছড়িয়ে পড়ল জাহরার মুখে। 'বলল, মিনিট খানেকের পরিচয়েও তো নাম বলে মানুষ।'

'ঠিক বলেছ, জাহরা, কিন্তু সব মানুষতো এক রকম হয়না।'

'একটু থামল আহমাদ মুসা।তারপর বলল, এ সব কথা থাক, এসো অন্য গল্প করি। তোমরা তো লেখা পড়া করছ, সচেতন তোমরা। বলত, স্পেনে মুসলমানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে তোমাদের কি ভাবনা?'

'আমাদের কলেজে একজন মুসলিম স্যার আছেন। তিনি সেদিন বললেন, ওরা আমাদের প্রকাশ্যে সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে, আইন ও করেছে

আমাদের জন্যে কিন্তু গোপনে আমাদের চলার সব পথ বন্ধ ওরা বন্ধ করতে চেষ্টা করছে। ওরা গোপনে গোপনে আমাদের ওপর ভীষণ ক্ষ্যাপা। তিনি আরও বললেন, শহরে বন্দরে গ্রামে গঞ্জে প্রতিটি নতুন বা আগন্তুক লোকদের ওপর নজর রাখা হচ্ছে, সন্দেহ হলেই পাকড়াও করে নিয়ে যাচ্ছে। স্পেনে মুসলমানদের অবাধ গতি বাধাগ্রস্ত করার ষড়যন্ত্র এটা।' বলল জাহরা।

'আগন্তুক লোকদের ওপর নজর রাখার হুকুম কি তোমাদের এখানেও এসেছে?'

'হ্যাঁ, সব জায়গায়।'

এ সময় ভেতর থেকে জাহরা ও আবুল হাসানের ডাক পড়ল। চলে গেল ওরা।

রাত ৯টায় খাবার খেল আহমদ মুসারা। রাত ১০টায় সবাইকে নিয়ে এশার নামাজ পড়ল আহমদ মুসা কোরআনের দীর্ঘ তেলাওয়াতসহ।

নামাজের পর উপস্থিত সকলের অনুরোধে কোরআন তেলাওয়াত করে শোনাতে হল। কোরআন নাজিলের উদ্দেশ্য, কোরআনের বিষয়বস্তু ও লক্ষ্য সম্পর্কে কিছু বলে আহমদ মুসা সূরা তাহা গোটাটাই তেলাওয়াত করলো।

প্রতিবেশী কিছু বাছাই করা লোকসহ জাহরাদের বাড়ীর সবাইকে হাজির করা হয়েছে। মেয়েরা বসেছে দরজার বাইরে চেয়ারে। আর ছেলেরা বসেছে মেঝেতে কার্পেটের ওপর।

আহমদ মুসার তেলাওয়াতের কন্ঠ কেউ বুঝেনি তবু কোরআন আলোড়িত করেছে, অভিভূত করেছে প্রতিটি হৃদয়কে। নিরব অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে প্রত্যেকের চোখ থেকে।

তেলাওয়াত শেষে কিছু কিছু অংশের অর্থও করল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা তখনও কথা বলছে, এই সময় বাইরের দরজায় নক হলো। উঠে দাঁড়িয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল আব্দুর রহমান। কয়েকমুহূর্ত পরে ফিরে এসে বলল, 'আব্বা বৈঠকখানায় লোক এসেছে, আপনাকে ডাকছে।'

বৃদ্ধ বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর ফিরে এল বিরক্ত মুখ নিয়ে। বলল, 'আগন্তুক আসার খবর পেয়ে পাঁচজন পুলিশ এসেছে খোঁজ নেবর জন্যে।'

'খবর পেল কি করে ওরা?' বলল আবুল হাসান।

'জানি না, পথে যারা দেখেছে, তাদের কেউ হয়তো খবর দিয়েছে, বলল বৃদ্ধ।'

'কার গরজ পড়বে এমন?' বলল আব্দুর রহমান।

'পথে জনপল আমাকে আগন্তুক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল আগ্রহ নিয়ে। সে এটা করতে পারে।'

'পুলিশ কি বলেছে?' জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা। তার চোখে মুখে চিন্তার রেখা।

'ওরা বলেছে, এখানে এসে এক নজর দেখেই ওরা চলে যাবে।' বলল বৃদ্ধ।

'আপনি ওদের কি বলেছেন?'

'কিছুই বলিনি, শুনেই চলে এসেছি।'

'কেন আমাদের কোথায় পেয়েছেন, কোথেকে কেন নিয়ে এসেছেন তা বলেন নি?'

'হা সেটা বলেছি।'

'ভালো হয়েছে, এটা দরকার ছিল বলা। ঠিক আছে ওদের আসতে বলুন।'

'ওদের সামনে এভাবে যাওয়া কি ঠিক হবে আমাদের?' প্রতিবাদ করে বলল পেট্রো।

'আমরা যদি না যাই বা অন্য কিছু করি, তাহলে এঁরা বিপদে পড়বেন। কোন ভাবেই এঁদের কোন অসুবিধা করা যাবে না।'

আহমদ মুসার কথা শেষ না হতেই দরজার বাইরে পুলিশের বুটের শব্দ পাওয়া গেল।

পেট্রো ছুটে এসে আহমদ মুসার হাত ধরল। বলল, 'আপনি এখনো ভাবুন এটা ঠিক হচ্ছে না।'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘আমি বলেছি তো, অন্য কিছু করলে এঁরা এবং এই গ্রাম বিপদে পড়বে।’

‘কিন্তু তার চেয়েও কি আপনি বড় নন?’ বলল পেট্রো।

‘ঠিক নয় একথা। সব মানুষ সমান। বরং নেতারা সাধারণের সেবক। সাধারণের নিরাপত্তা বিধান নেতাদের দায়িত্ব।’

বলে আহমদ মুসা দরজার দিকে পা বাড়াল।

বৃদ্ধ, আব্দুর রহমান, আবুল হাসান, জাহরাসহ ঘরভর্তি সবাই বিস্মিত, উদ্বিগ্ন। তারা এসব কথার কিছুই বুঝলনা। কিন্তু বুঝল, বড় কি একটা ব্যাপার আছে, কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে।

আহমদ মুসা দরজা পেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। তার পেছনে পেছনে পেট্রো।

পাঁচজন পুলিশ এসে তার সামনে দাঁড়াল। অফিসার লোকটি সামনেই ছিল। সে আহমদ মুসার দিকে এক নজর তাকিয়েই দ্রুত পকেটে হাত দিয়ে তিনটি ফটো বের করল। তিনটির একটি ফটোর সাথে দ্রুত মিলিয়ে দেখল আহমদ মুসাকে। পরক্ষণেই বিদ্যুত গতিতে পকেট থেকে রিভলবার বের করে আহমদ মুসার বুকে ধরে চিতকার করে উঠল, ‘পজিশন।’

সংগে সংগে চারজন পুলিশ আহমদ মুসাকে ঘিরে ফেলে ষ্টেনগান বাগিয়ে ধরল তার দিকে।

আহমদ মুসা হাসল বলল, ‘দারোগা সাহেব পজিশন নেয়ার দরকার নেই। চলুন আপনাদের সাথে আমি যাচ্ছি।’

বৃদ্ধ ছুটে এল দারোগার সামনে। বলল, ‘কি করেছেন, কি দোষ এদের?’

বৃদ্ধকে ঠেলা দিয়ে সামনে থেকে সরিয়ে চিতকার করে বলল, ‘তুমি চিনলে বুড়ো একথা বলতে না। আমি আকাশের চাঁদ পেয়েছি হাতে। প্রমোশন পাব, পুরষ্কার পাব বিরাট।’ বলে পিস্তল নাচিয়ে আহমদ মুসাকে বলল, ‘চল, হাট।’

‘স্যার আরেকজন তো বাকি থাকল।’ পেট্রোকে দেখিয়ে দারোগাকে বলল একজন পুলিশ।

দারোগা ফিরে দাঁড়িয়ে পকেটের তিনটি ফটোর সাথে পেট্রোকে মিলিয়ে দেখে বলল, ‘একে দরকার নেই, দল ভারি করবোনা।’

চলে গেল পুলিশ দলটি। আহমদ মুসাকে নিয়ে উঠানে রাখা গাড়ীতে গিয়ে উঠল ওরা।

বুক ভাঙা কান্নায় লুটিয়ে পড়লো পেট্রো উঠানের ওপর। চিতকার করে উঠল, আমাকেও নিয়ে যাও ওঁর সাথে।

উঠানে এসে দাঁড়িয়েছে সবাই। বৃদ্ধ আব্দুর রহমান, আবুল হাসান, জাহরা, এবং আরো অনেকে। বৃদ্ধের মুখ ফ্যাকাসে উদ্বেগ উত্তেজনায়। জাহরা, আবুল হাসানের চোখে জল। জাহরা ভাবছে, কে উনি? নাম বললেন না, দেশ বললেন না। অমন ভাল মানুষ কি অপরাধ করতে পারে? এখন জাহরা বুঝতে পারছে কেন ওরা জংগলে রাত কাটাচ্ছিলেন, কেন কাউকে না জানানোর শর্ত দিয়েছিলেন। আসলে ওদের এনেই বিপদে ফেলা হলো। এ দোষ তারই। সে কেন তাদের কথাটা আব্বাকে এসে বলেছিল। ভাবলো জাহরা আহমদ মুসার কথা। শুধু সে নয় ভাবছে আবুল হাসান এবং আব্দুর রহমানও। এমন মানুষ তারা কোথাও দেখেনি, শুনেওনি যে, এমন বিপদে মানুষ হাসতে পারে। সবাই যখন উদ্বেগ আতংকে আকুল তখন তার মুখে চিন্তার লেশমাত্র নেই। কে এই অদ্ভুত মানুষটি। এক সময় সবার চোখ গেল পেট্রোর দিকে। খুশীহলো তারা। সব জানা যাবে তার কাছ থেকে।

গ্রামের একটা প্রশস্ত রাস্তা ধরে এগিয়ে চলছিল পুলিশের গাড়ী। গাড়ীটি গ্রাম পেরিয়ে এগিয়ে চলল নদীর দিকে।

গাড়ীটি ছোট একটি মাইক্রোবাস। ড্রাইভিং সিটে একজন পুলিশ। আর দারোগা বসেছে ড্রাইভারের পাশের সিটে।

পেছনের সিটে আহমদ মুসার দু'পাশে দু'জন পুলিশ। আর তার পেছনের সিটে আর একজন, সবার হাতেই উদ্যাত ষ্টেনগান।

গ্রামের মধ্য দিয়ে প্রশস্ত রাস্তাটি এগিয়ে গিয়ে ব্রীজে উঠেছে। ব্রীজের পর রাস্তাটি পাকা। তীরের মত সোজা গিয়ে তা প্রবেশ করেছে মদিনাসেলি শহরে।

ব্রীজ পেরিয়ে গাড়িটি পাকা রাস্তায় এসে পড়ল। আকর্ণ হাসি হেসে দারোগা মাথা ঘুরিয়ে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার মত ভেজা বেড়ালের এত নাম কেন শুনি, আমার মত লোকের পাল্লায় কখনও তুমি পড়নি।'

'তা ঠিক।' ঠোঁটে হাসি টেনে বলল আহমদ মুসা।

'হাসছ কেন?'

'হাসছি তোমার বীরত্ব দেখে। একটি গুলি না ছুড়ে এতবড় শিকার করেছ।'

'বিদ্রুপ করছ, চল থানায়।' হুংকার দিয়ে উঠল দারোগা।

আহমদ মুসা কথা বাড়ালোনা। হাঁদারাম মার্কা লোকের সাথে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আহমদ মুসা ইচ্ছা করলে জাহরাদের বাড়িতেই এদের হাত থেকে খসতে পারত, কিন্তু তা সে ইচ্ছা করেই করেনি। তাহলে ঐ পরিবারটি নয় গ্রামশুদ্ধ সকলে বিপদে পড়তো। পুলিশ তাদের পরাজয় কিংবা ব্যর্থতার প্রতিশোধ নিত গ্রামবাসীদের ওপর। এজন্যেই আহমদ মুসা ঝুঁকি নিয়েছে। সুযোগ পেলেই এদের হাত থেকে খসতে চেষ্টা করবে এবং সেটা যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি। আহমদ মুসা জানে, তাকে থানায় রাখবেনা। খবর হওয়ার সাথে সাথে এই রাতেই মাদ্রিদে পার করবে। সুতরাং সময় বেশী নেয়া যাবে না।

থানায় কম্পাউন্ডে প্রবেশ করল গাড়ী ধীরে ধীরে এসে দাঁড়াল গাড়ী বারান্দায়। গাড়ী বারান্দায় গাড়ী থামতেই ড্রাইভার নেমে পড়ল। আর সাথে সাথেই দারোগাও নামল। নেমেই হৈ চৈ, ডাকাডাকি শুরু করেদিল দারোগা। আহমদ মুসার এ দিকের দরজাও খুলে দিল পাশের পুলিশ। দরজা খুলে হৈ চৈ করে সে নেমে পড়ল। আহমদ মুসা নড়লনা। তার ডান পাশের পুলিশ আহমদ মুসাকে দু'একবার ঠেলা দিয়ে, নামার জন্যে বলে আনন্দে যোগ দেবার জন্যে আহমদ মুসার সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

পেছনের পুলিশ নামার জন্যে উঠে দাঁড়াচ্ছিল। তার ষ্টেনগানের ব্যারেল নিচে নেমেগেছে। আহমদ মুসা বিদ্যুৎ গতিতে উঠে দাঁড়িয়ে ডান হাতের একটা কারাত ছুরে মারল তার বাঁকানো উন্মুক্ত ঘাড়ে।

তার হাত থেকে ষ্টেনগান খসে পড়ল, মাথা তার ওপরে উঠল না। সংজ্ঞাহীন দেহটি তার খসে পড়ল সিটের ওপর।

বড়শীতে বড় মাছ ধরলে যেমন একটা হৈ চৈ বাধে তেমনি হৈ চৈ বাইরে। ভেতর থেকে আরো পুলিশ এসে যোগ দিয়েছে তাদের সাথে।

দারোগা সাহেবের কন্ঠ শোনা গেল, 'তোমরা কি করছ যাও নামাও জামাই বাবুকে।'

আহমদ মুসা তখন ষ্টেনগান হাতে তুলে নিয়েছে। ওদের কথা এগিয়ে আসছে। আসছে ওরা গাড়ীর দিকে।

আর সময় নষ্ট করলনা আহমদ মুসা। আধখোলা দরজা গলিয়ে লাফিয়ে পড়ল নিচে এবং ট্রিগার টেনে ষ্টেনগানের ব্যারেল অর্দ্ধচন্দ্রাকারে একবার ঘুরিয়ে নিল। বৃষ্টির মত ছুটে গেল গুলি। গাড়ীর দিকে অগ্রসরমান লোকগুলোর ঝাঝরা দেহ পাকা ফলের মত ঝরে পড়ল মাটিতে। দারোগা কিছুদূরে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাচ্ছিল। সিগারেট মুখে নিয়েই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মাটিতে।

আহমদ মুসা কোন দিকে আর না তাকিয়ে একটানে গাড়ীর দরজা খুলে লাফিয়ে উঠে ড্রাইভিং সিটে গিয়ে বসল। ষ্টার্ট দিল গাড়ী।

গেট তখনো খোলাই ছিল। তীর বেগে মাইক্রোবাস থানা থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে পড়ল। কোন পথে এসেছিল তা মনে আছে আহমদ মুসার। এদিক সেদিক কয়েকবার বাঁক নিলেও থানার পাশ দিয়ে যাওয়া এই রাস্তাটিই ব্রীজে গিয়ে উঠেছে।

রাস্তাটি ধরে ঝড়ের বেগে ব্রীজ লক্ষ্যে ছুটে চলল আহমদ মুসার গাড়ী। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল রাত ১১টা।

ব্রীজে এসে পৌছল যখন গাড়ীটি তখন রাত ১১টা ১৫ মিনিট। ব্রীজের মাঝামাঝি জায়গায় গাড়ী দাঁড় করাল আহমদ মুসা। গাড়ী থেকে নেমে রেলিং পরীক্ষা করে দেখল এদিক দিয়ে গাড়ী ফেলে দেয়া কঠিন।

গাড়ী ব্যাক করে ব্রীজের উত্তর পাশে নিল। তারপর ব্রীজের পাশ দিয়ে গাড়ী নদীতে ঠেলে দিল। গাড়ী দিয়ে আগে ব্রীজের গোঁড়ার গার্ডার ভেঙ্গে ফেলে দিল যাতে সবাই বুঝে গাড়ী এ্যাকসিডেন্ট করে নদীতে পড়ে গেছে।

আহমদ মুসা ব্রীজ পার হয়ে ঠিক নদীর ধারে একটা গাছের নিচে ছোট ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

প্রায় ১৫ মিনিট পর মদিনাসেলি নগরীর দিক থেকে গাড়ীর হেডলাইট ছুটে আসতে দেখা গেল।

ব্রীজের মুখে এসে থমকে দাঁড়াল দু'টি গাড়ী সদ্য ভাঙ্গা গার্ডার ওদের নজরে পড়েছে। ওরা গাড়ী থেকে নেমেছে। হৈ চৈ করে কথা বলছে। ছোট নদী শোনা যাচ্ছে তাদের উত্তেজিত কথা।

'এ্যাকসিডেন্ট করেছে, কার গাড়ী, ঐ গাড়ী কি না দেখ।' একজন চিৎকার করে বলল

টর্চ জ্বালিয়ে নেমে গেল কেউ কেউ। টর্চের আলো ফেলল প্রায় ডুবে যাওয়া গাড়ীর ওপর এবং সাথে সাথে চিৎকার করে উঠল, 'আমাদের গাড়ীই স্যার। ব্যাটা নিশ্চয় তাল হারিয়ে এ্যাকসিডেন্ট করে ডুবে মরেছে।'

'গাড়ী তোলা যাবে, ভেতরটা দেখা যাবে?' ওপর থেকে কেউ বলল উচ্চ কণ্ঠে।'

'না স্যার, দিন ছাড়া কিছুই করা যাবে না। গাড়ী তুলতে ক্রেন লাগবে স্যার।'

নদীতে যারা নেমেছিল তারা টর্চ জ্বেলে কথা বলতে বলতে উঠে গেল

কিছুক্ষণ পর একটি গাড়ী ফিরে গেল, কিন্তু আরেকটা গাড়ী ব্রীজের মুখে রয়েই গেল। আহমদ মুসা বুঝল, সারা রাত ওরা থাকবে ওখানে। পাহারা দেবে ওরা ডুবে যাওয়া গাড়ী। পুলিশের নিয়ম এটাই।

ঘড়ি দেখল আহমদ মুসা। ১২টা বেজে গেছে। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল আহমদ মুসা। খোঁজ নেবার জন্যে থানা থেকে অবশ্যই কেউ গ্রামে সেই বৃদ্ধের বাড়ীতে যাবে। আরও আধঘণ্টা অপেক্ষা করল। কিন্তু কেউ এলনা। বিস্মিত হলো সে। আবার ভাবলো, নিশ্চয় ওরা ভেবেছে আহমদ মুসা বাস ডুবে মারা গেছে, অথবা এমনও হতে পারে যে, যে সব পুলিশ বৃদ্ধের বাড়ীতে গিয়েছিল তারা সবাই মারা গেছে। তার ফলে সন্ধান সূত্র পুলিশ হারিয়ে ফেলেছে। খুশী হলো আহমদ মুসা। সত্য যেটাই হোক, সবটাতেই লাভ।

আহমদ মুসা ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল। রাস্তায় উঠে ধীরে ধীরে এগুলো জাহরাদের বাড়ীর দিকে। পেট্রো নিশ্চয় ওখানেই। ঘোড়া ও ব্যাগ ব্যাগেজও ওখানেই আছে। আজ রাতেই যাত্রা করতে হবে।

আহমদ মুসা সবে গ্রামের সীমানায় প্রবেশ করেছে, এমন সময় দেখল তিনজন লোক এদিকে আসছে। আহমদ মুসা চট করে রাস্তার পাশে একটা গাছের আড়ালে সরে গেল। গ্রামের কারও সামনে সে আর পড়তে চায় না। সে আবার কোন জনপল হবে কে জানে। আবার খবর চলে যেতে পারে থানায়।

লোক তিনজন নিচুস্বরে কথা বলতে বলতে আসছে। কাছাকাছি আসতেই পেট্রোর গলা চিনতে পারলো আহমদ মুসা। আরো কাছে এলে অন্য দু'জনকেও সে চিনতে পারল। একজন আবদুর রহমান, আরেকজন আবুল হাসান। আহমদ মুসা বুঝতে পারল তারা মদিনাসেলি শহরের দিকে যাচ্ছে, সম্ভবত তারই সন্ধান নিতে।

ওরা গাছ বরাবর আসতেই আহমদ মুসা আড়াল থেকে বের হয়ে ওদের সামনে দাঁড়াল।

প্রথমটায় চমকে উঠে তিনজনই থমকে দাঁড়াল। পরে আহমদ মুসাকে চিনতে পেরে পেট্রো ছুটে এসে থাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল। বলল, 'আপনি নাকি এ্যাকসিডেন্ট করে মাইক্রোবাসসহ নদীতে ডুবে মারা গেছেন?'

'কে বলেছে?'

'গ্রামের লোক শহর থেকে ফিরে বলেছে।'

'আর কি শুনেছ তোমরা?' আবদুর রহমানের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল আহমদ মুসা।

'লোকরা বলছে, তোমাদের মেহমান ১০জন পুলিশকে খুন করে থানার গাড়ী নিয়ে পালিয়েছিল, কিন্তু ব্রীজের মুখে এ্যাকসিডেন্ট করে গাড়ী সমেত নদীতে পড়েছে।'

'ওরা ঠিক বলেছে, তবে গাড়ী নদীতে পড়েছে, আমি নদীতে পড়িনি।'

'১০জন পুলিশকে হত্যা করে আপনি চলে এসেছেন একথা ঠিক?' চোখ কপালে তুলে বলল আবুল হাসান।

‘হ্যাঁ ঠিক।’

আবুল হাসান আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। আহমদ মুসা বলল, ‘চল দেরী করা যাবে না। যেতে যেতেও কথা বলা যাবে।’ তারা দ্রুত হাটতে শুরু করল বাড়ীর দিকে।

বাড়ীর ওঠানে উঠেই আবুল হাসান দৌঁড়ে বাড়ীর ভেতরে চলে গেল মেহমানখানা খুলে দেবার জন্যে।

মেহমানখানা খুলে গেল।

বৃদ্ধ আবু আলী শেখ সহ বাড়ীর কেউ ঘুমায়নি। খবর পেয়ে সবাই ছুটে এসেছে মেহমান খানায়।

আহমদ মুসা প্রবেশ করল ঘরে। বৃদ্ধ এসে জড়িয়ে ধরল তাকে। বলল, ‘বাবা তুমি পরিচয় দাওনি। পরিচয় গোপন করে আমাদের রক্ষার জন্যে তুমি ধরা দিয়েছ কিন্তু আমাদের উচিত ছিল সমস্ত গ্রাম বিরান করে হলেও তোমাকে রক্ষা করা। বাবা, আমাদের গ্রামের মূল্য একটি গ্রামই মাত্র। কিন্তু তোমার মূল্য গোটা দুনিয়া দিয়ে হবে না। তুমি কেন পরিচয় গোপন করেছিলে? কেন তুমি আমাদের অপরাধী বানালে?’

‘না কোন অপরাধ হয়নি? সবার জন্যে যা ভাল, আমি সেটাই করেছিলাম।’

‘তোমার কথার ওপর কথা বলা বেয়াদবী, কিন্তু তুমি যদি থানা থেকে নিজেকে ছাড়াতে না পারতে?’

‘আমি নিশ্চিত ছিলাম আল্লাহ আমাকে ছাড়িয়ে নেবেনই। এখানকার থানার কতটুকু শক্তি থাকতে পারে, তা আমি ধারণা করে নিয়েছিলাম।’

‘আপনি একা দশজন পুলিশ মেরেছেন?’ বলল জাহরা।

‘হ্যাঁ জাহরা মানুষ মারা খুব সহজ। কিন্তু গোটা দুনিয়া মিলে লক্ষ কোটি বছর চেষ্টা করলেও একজন মানুষ আমরা বানাতে পারবো না।’

‘কিন্তু তবুতো মারতে হয়, মরতে হয়।’ বলল আবুল হাসান।

‘এটাই আবহমান নিয়ম। সভ্যতার স্বার্থেই এটা প্রয়োজন। বাগানে সব গাছ রাখা যায় না, কিছু উপড়ে ফেলতে হয়, কিছুর যত্ন করতে হয়, এও তেমনি।’

‘আমরা পেড্রোর কাছে সব শুনেছি। আপনি স্পেন থেকে চলে যাচ্ছেন। স্পেনের কাজ কি শেষ?’

‘আমার কাজ শেষ জাহরা। যা বাকি আছে করার, এখানকার নেতৃবৃন্দই তা পারবেন।’

‘কিন্তু আপনাকে তো কেউ ছাড়তে চায়নি।’ জাহরাই কথা বলল।

‘আমাকে ওরা ভালবাসে তাই।’

‘আপনি ভালবাসেন না?’ বলল জাহরা।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘তুমি ভাল উকিল হবে জাহরা।’

‘এ বলে আমার প্রশ্ন পাশ কাটাতে পারবেন না।’

‘না পাশ কাটাবোনা। বলছি, আজ রাতে ক’ঘণ্টার জন্যে তোমাদের সাথে দেখা এ ক’ঘণ্টাতেই কি একটা মায়ার বাধন গড়ে ওঠেনি। পরস্পর বিচ্ছিন্ন হতে কি মনটা খচ খচ করবে না? এটাই মানব মন। এর ঊর্ধ্বে কেউই নয় জাহরা।’

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা বৃদ্ধ আবু আলী শেখের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আমি এখনি চলে যেতে চাই জনাব।’

‘জানি চলে যাবে। কিন্তু খুব কষ্ট লাগছে মনে, এতবড় সৌভাগ্য হাতে পেয়েও যোগ্য মর্যাদা দিতে পারিনি। আমরা বেঁচে থাকতে, অক্ষত থাকতে আমার বাড়ী থেকেই তোমাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। কোন দিন ভুলতে পারবোনা আমাদের এ ব্যর্থতার কথা।’

‘আপনাদের এ ভালবাসার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। আমি অনুরোধ করব, স্পেনে যারা আমার পক্ষ থেকে কাজ করছে, কাজ করবে, তাদেরকে আপনারা এই ভালোবাসাই দেবেন।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আপনি বিজ্ঞ, বহুদর্শী। স্পেনে আমাদের ভবিষ্যত কি?’ বলল আবুল হাসান।

‘ভবিষ্যত নির্ভর করছে তোমাদের ওপর। এতদিন যা ছিলনা সেই জাতিগত অধিকার তোমরা আইনানুগ ভাবে পেয়েছ। এ সুযোগের সদ্ব্যবহারের ওপর তোমাদের সাফল্য নির্ভর করছে। তোমরা যদি খাটি মুসলমান হও, চরিত্র ও ইসলামী আদর্শের সুমহান মাধুর্য দিয়ে যদি এখানকার সংখ্যা গরিষ্ঠের মন জয়ে

ব্রতী হও, তাহলে দেখবে স্পেনে এসেছে নতুন জীবন, বিরান মালাগা, গ্রানাডা, কর্ডোভায় এসেছে জীবনের নতুন স্পন্দন। গোয়াদেলকুইভারের মরাগাঙে এসেছে নতুন স্রোত, এসেছে সেই স্বর্ণযুগ যা আমরা হারিয়েছি।'

কথা শেষ করে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা। জাহরা এগিয়ে এল আহমদ মুসার দিকে। তার হাতে এক খন্ড কাগজ ও একটি কলম। কাগজ ও কলম আহমদ মুসার সামনে তুলে ধরে বলল, 'আমার অনুরোধ আপনি কোনআনের একটা আয়াত এবং স্প্যানিশ ভাষায় উচ্চারণ ও তার অনুবাদ লিখে দিন। আমি এটা দেখব, পড়ব। আর এটা দেখিয়ে বলব ও চিরদিন গর্ব করব যে, আপনার সাথে দেখা হয়েছিল।' বলতে বলতে আবেগে তার দু'চোখে অশ্রু দেখা দিল।

আহমদ মুসা কোন কথা না বলে কাগজ কলমটি নিয়ে আবার বসে পড়ল।

লিখে কাগজ কলম জাহরার হাতে তুলে দিতে দিতে বলল, 'ধন্যবাদ বোন। দোয়া করি তোমাকে এবং তোমাদের সকলকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোনআন শেখার সুযোগ দিন।'

বলে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

সবাইকে সালাম জানিয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তার পেছনে পেদ্রো এবং অন্যান্যরা।

আহমদ মুসা ঘোড়ায় উঠে পাশেই দাঁড়ানো বৃদ্ধ আবু আলী শেখকে বলল, 'পুলিশ যদি আসে বলবেন, পেদ্রো ঘোড়া দুটো নিয়ে চলে গেছে। আমার ব্যাপারে তারা অন্ধকারেই থাক। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুকে যতটা বিভ্রান্ত রাখা যায়।'

বলে আহমদ মুসা তাড়া দিল ঘোড়াকে। চলতে শুরু করল ঘোড়া।

বৃদ্ধ, আবদুর রহমান, আবুল হাসান, জাহরা সবাই নির্বাক ভাবে দাঁড়িয়ে। কথা বলতে তারা যেন ভুলে গেছে। মনে হচ্ছে, সিনেমার একটা অবিশ্বাস্য দৃশ্য যেন সামনে দিয়ে ধীরে ধীরে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

গ্রাম পেরিয়ে জালোন নদীর তীর ধরে অন্ধকারের বুক চিরে উত্তর পূর্ব দিকে কেলাতাউদ শহর লক্ষ্যে এগিয়ে চলল আহমদ মুসা ও পেদ্রোর দু'টি ঘোড়া।

পরদিন বেলা ১২টায় আহমদ মুসারা কেলাতাউদ শহর অতিক্রম করল। কেলাতাউদ শহরের দক্ষিণ পাশ দিয়ে জালোন নদী প্রবাহিত। আহমদ মুসারা শহরকে বায়ে রেখে জালোনের তীর ধরে এগিয়ে চলল। কেলাতাউদ শহর পার হয়ে জালোন নদী দিক পরিবর্তন করে সোজা উত্তরে প্রবাহিত হয়ে সারাগোসা সারিয়া হাইওয়ের আলগনি পর্যন্ত পৌঁছেছে।

আহমদ মুসারা কেলাতাউদ পার হয়ে নদীর তীরে একটা নিরিবিলি জায়গায় বসে খাওয়া দাওয়া সেরে নিল। আহমদ মুসারা এখন চেষ্টা করছে যতটা সম্ভব লোকালয়কে এড়িয়ে চলতে।

খাওয়া শেষে আবার যাত্রা করল তারা। আলগনি শহরের দক্ষিণে জালোন নদীর তীরে একটা গাছের তলায় তারা রাত কাটালো। পরদিন ভোরে যাত্রার আগে ঘোড়াকে ভালো করে পানি খাইয়ে নিল। অলিগনি শহরের পর ১০০ মাইল পথ তাদেরকে নামিনকো উপত্যেকার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, যেখানে পানি পাবার কোন সম্ভাবনা নেই।

পরবর্তী ১৮ ঘন্টায় আহমদ মুসারা নামিনকো উপত্যকা অতিক্রম করে আরবা নদীর তীর বরাবর চলে এল কিছুটা পথ হোয়েসা জাকা হাইওয়ে ব্যবহার করে জাকা শহরের উপকন্ঠে গিয়ে পোছাল।

জাকা একটি ছোট্র পার্বত্য শহর। এখান থেকে ৫০ মাইল উত্তরে পিরেনিজ পর্বতমালার উপর সাম্পুর গিরিপথ স্পেন-ফ্রান্স সীমান্ত। এই গিরিপথ দিয়েই আহমদ মুসাদের ফ্রান্সে প্রবেশ করতে হবে।

জাকা শহরের পশ্চিম পাশ ঘেষে উত্তরে চলে গেছে হাইওয়েটি। আর পুব পাশ দিয়ে বয়ে গেছে গালেগো নদী।

শহরের উপকন্ঠে নদীর ধারে বৃক্ষ আচ্ছাদিত একটা টিলার গিয়ে দাঁড়াল ওরা। নামলো ঘোড়া থেকে।

'স্যার আপনি বসুন একটু। আমি শহর থেকে একটু ঘুরে আসি। বাস্কের অনেক লোক আছে এ শহরে। ওদের সাথে যোগাযোগ করতে পারলে আমাদের কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে।' বলল পেটো।

‘ঠিক প্রস্তাব করেছো পেট্রো। এই ধরনের সীমান্ত শহর ওদের শেষ ছাকনি। একটু খোঁজ খবর নিয়ে আমাদের এগিয়ে যাওয়া উচিত।’

পেট্রো চলে গেল।

আহমদ মুসা কিছুক্ষন গাছের নিচে অন্ধকারে বসে থাকার ঘাসের উপর শুয়ে পড়ল। কিন্তু শুয়েই আবার উঠে পড়ল। অন্ধকার ঘাসের উপর শুয়ে থাকতে মন চাইলো না। পাশেই গাছ। আহমদ মুসা গাছের দিকে চাইল প্রসারিত ডালপালা বিশিষ্ট গাছ। আহমদ মুসা তরতর করে গাছে উঠে গেল। গাছের ডালে সুন্দর গা এলানো যাবে।

সত্যিই গা এলিয়ে দেয়ার মত সুন্দর ডাল পেয়ে গেল আহমদ মুসা।

কেটে গেছে অনেক্ষন। চোখ ধরে আসছিল আহমদ মুসার। কিন্তু নড়ে চড়ে ঘুম তাড়াবার চেষ্টা করছে সে। হঠাৎ নিচে ফিসফিসানির শব্দ কানে এল আহমদ মুসার। প্রথমেই তার মনে হল পেট্রো হবে। আহমদ মুসা কথা বলতে গিয়েই থেমে গেল। কানে এল কথাঃ 'ঘোড়া আছে, লোক দু'টো গেল কোথায়?'

'সব দিক ভালো করে দেখা হয়েছে তো?' অন্য একজন বলল।

'তন্ন তন্ন করে দেখা হয়েছে এখানে তারা নেই।' প্রথম জন বলল।

'তাহলে ঘোড়া দু'টি এখানে লুকিয়ে রেখে ওরা শহরে ঢুকেছে। নিশ্চয় তাহলে আসল লোক এরা।

'তাই হবে। আজ সারাদিন যারা শহরে প্রবেশ করেছে, তাদের মধ্যে এদের এই আচরনই সন্দেহজনক। তাছাড়া মদিনাসেলি থেকে পাওয়া খবরের সাথে মিলে যাচ্ছে। খবরে দু'জনকেই ঘোড়সওয়ার বলা হয়েছে।'

'তাহলে চল যায়, খবরটা দিতে হবে।'

'চল, কিন্তু ঘোড়া দুটো?'

'চল নিয়ে যাই। ঘোড়ার জিনে আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া যাবে, তাতে নিশ্চত হওয়া যাবে আরও।

'ওরা শহরে ঢুকেছে, ভালোই হলো। শহর থেকে আর বেরুতে হবে না ওদের। আজ সন্ধা থেকেই সিল করা হয়েছে শহর থেকে বের হওয়ার প্রতি ইঞ্চি জায়গা। শহরে ঢুকতে পারবে সবাই, বের হতে পরিচয় প্রয়োজন।'

'আরও টাইট কাল থেকে দেখবে। মদিনাসেলি থেকে যখন ওরা বেরিয়েছে, সেই অনুসারে আগামী কাল দিনের প্রথমভাগে ওদের এখানে পৌছার কথা যদি এ পথে আসে। এই হিসেব সামনে রেখেই কাল সকালে আরও সৈন্য ও পুলিশ আসছে এখানে। সাম্পুর গিরিপথ পর্যন্ত রাস্তা একদম সিল করে ফেলা হবে।'

'কিন্তু দেরী হয়ে যাবে তো, ওরা আজকেই পৌছে গেছে বলে মনে হচ্ছে।'

'ক্ষতি নেই, জাকার পুলিশ কম নয়।আর দেরী নয়, খবরটা তাড়াতাড়ি দিতে হবে চল।'

ওরা চলে গেলে শব্দ শুনে পরিস্কার বুঝা গেল ঘোড়াও তারা সত্যি নিয়ে যাচ্ছে।

আহমদ মুসা বুঝল, ওরা জাকা শহরের পুলিশ অথবা গোয়েন্দা বিভাগের লোক। ঘোড়ায় চড়ে তারা দু'জন যে এই টিলা পর্যন্ত এসেছে, এটা ওদের নজর এড়ায়নি। তাদের অনুসরন করেই ওরা ওখানে এসেছিল। ওদের কথা তাহলে সত্য, শহরে যারা প্রবেশ করছে, তাদের উপর যেমন চোখ রাখছে, তেমনি শহর থেকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তবেই কাউকে বের হতে দিচ্ছে। আহমদ মুসা আরও বুঝল, মদিনাসেলি থেকে খবর পাওয়ার পরই তারা এতটা সতর্ক হয়েছে। মদিনাসেলি থেকে উত্তরে এসে সাম্পুর গিরিপথ দিয়ে স্পেন ত্যাগ করার সম্ভাবনা বেশী।

আরও দু'ঘন্টা কাটালো আহমদ মুসা গাছের ডালে। পেটো আসার নাম নেই। উদ্বিগ্ন হলো আহমদ মুসা, পেটোর কিছু হলো না তো? ওরা বলেছে শহর থেকে বেরুবার প্রতি ইঞ্চি পথের উপর ওরা চোখ রাখছে। পেদ্রো কি ধরা পড়ে গেল?

আরও আধা ঘন্টা পরে আহমদ মুসার টিলার গোড়া থেকে একপ্রকার পাহাড়ী সাপের মত শীষ ভেসে এল। পর পর দু'বার। ওটা বাস্কদের সংকেত। পেদ্রো ফিরে এসেছে। খুশী হলো আহমদ মুসা। আহমদ মুসাও দু'বার শীষ বাজালো।

অল্পক্ষন পরে গাছের নিচে শব্দ পাওয়া গেল। পরক্ষণেই একটা কন্ঠ ভেসে এলো, 'আমি পেট্রোর ভাই ফিলিপের সৈনিক। আমার নাম মানসেনি।'

তাহলে পেট্রো কোথায়। কিছু ঘটেছে তার। আহমদ মুসা লাফ দিয়ে গাছ থেকে নামল। 'পেট্রোর কিছু হয়েছে?'

'না কিছু হয়নি জনাব, কিন্তু তার পরিচয়পত্র নেই বলে এই রাতে তার আর শহরের বাইরে আসা সম্ভব নয়। তার পক্ষ থেকে আমি এসেছি জনাব।'

'তাহলে তুমি সব কিছু জেনেছ নিশ্চয়?'

'জি হ্যাঁ। তাছাড়া স্যার ফিলিপের কাছ থেকে আমরা ওয়্যারলেস মেসেজও পেয়েছি। আমরা আপনার অপেক্ষা করছিলাম।'

বলে সে আহমদ মুসার হাতে একটা প্যাকেট তুলে দিয়ে বলল, 'স্যার আপনি খেতে থাকুন, আমি সব বলছি।'

এক প্যাকেট গরম স্যান্ডউইচ পেয়ে আহমদ মুসা খুশী হল। দারুন ক্ষুধা পেয়েছে তার। খেতে শুরু করল।

'স্যার কোন ভাবে', বলতে শুরু করল মানসেনি, 'ওরা জানতে পেরেছে বা সন্দেহ করেছে আপনি শহরে প্রবেশ করেছেন। তাই শহরে পাহারা ও পর্যবেক্ষণ হঠাৎ করে বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। কাল সকাল পর্যন্ত শুধু জাকা শহর নয় সাম্পুর গিরিপথ ওদের লোক ছেয়ে যাবে। আমাদের মতে আজ রাত সাম্পুর গিরিপথ পাড়ি দেওয়া উপযুক্ত সময়।' থামলো মানসেনি।

'তোমার কথা ঠিক' বলে আহমদ মুসা এই গাছের তলায় ওদের দু'জনের যে কথোপকথোন শুনেছিল সব বলল মানসেনিকে।

শুনে মানসেনি বলল 'তাহলে আমাদের চিন্তা ঠিকই হয়েছে।'

'তোমাদের কি চিন্তা?'

'এই রাতেই আমরা সাম্পুর গিরিপথ পাড়ি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি।'

'কি ব্যবস্থা করেছ?'

'স্যার আমরা একটা চিন্তা করেছি, আপনি চূড়ান্ত করবেন। আমরা মনে করি, বর্তমান অবস্থায় সাম্পুর গিরিপথে পৌছার সবচেয়ে সহজ উপায় সৈনিকের ছদ্মবেশ। ঘন্টাখানেক আগে আমাদের লোকেরা জাকা সাম্পুর হাইওয়ের ওপর

থেকে দু'জন মিলিটারী এম, পিকে কিডন্যাপ করেছে এবং তাদের গাড়ি দখল করেছে। আমরা তাদের গাড়ি ও পোষাক নিয়ে খুব সহজেই সাম্পুর যেতে পারি।'

আহমদ মুসার মুখ উজ্জল হয়ে উঠল। বলল 'ধন্যবাদ মানসেনি। তোমরা ফিলিপের যোগ্য শিষ্যের মত কাজ করেছ। গাড়ী কোথায়?'

'হাইওয়ের পাশে একটি টিলার আড়ালে, পোষাকও সেখানেই আছে।'

আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল রাত ২টা বাজতে যাচ্ছে। সে বলল, 'সময় নষ্ট না করে আমরা তাহলে এখন হাইওয়ের দিকে হাঁটতে পারি, কি বল?'

'জি স্যার, আমাদের আরও একঘন্টা লাগবে গাড়ীর কাছে যেতে। শহর এড়িয়ে আমাদের সেখানে যেতে হবে।'

টিলা থেকে নেমে হাঁটা শুরু করল দু'জন। প্রথমে মানসেনি, তার পেছনে আহমদ মুসা।

গাড়ীর কাছে তারা যখন পৌছাল, তখন রাত তিনটা।

মানসেনি দু'জন মিলিটারী পুলিশের পোষাকের একটি আহমদ মুসার দিকে এগিয়ে দিয়ে একটি পরতে শুরু করল।

'মানসেনি, সাম্পুর সীমান্ত ফাড়িঁটি কেমন?'

'গিরিপথের মুখে ডান পাশের রাস্তার সাথে ইমিগ্রেশন অফিস। অফিসের পাশেই লম্বা ব্যারাক। সেখানে সৈন্য থাকে। রাস্তার উপর পড়ে থাকে কাঠের একটা ব্যরিকেড। দু'পাশে দাড়িয়ে থাকে দু'জন সৈন্য।'

'ফরাসি আউটপোষ্ট সেখান থেকে কতদূর?'

'গিরিপথটি এক কিলোমিটার দীর্ঘ গিরিপথের উত্তর মুখে ফরাসি আউটপোষ্ট। গিরিপথটি 'নো-ম্যানস ল্যান্ড' হিসাবে বিবেচিত।'

সব শুনে আহমদ মুসা একটু চিন্তা করল, 'আমি মিলিটারী পোষাক পরব না। আমার কাছে স্পেনের বৈধ পাসপোর্ট এবং ফরাসি ভি আই পি ভিসা আছে। গোঁফ দেখিয়ে বলল, আমার চেহারাকে অনেকখানি পরিবর্তন করা হয়েছে পাসপোর্টে। সাধারন দৃষ্টিতে এ থেকে আমার আসল চেহারা তাৎক্ষনিক ধরে

ফেলা সম্ভব নয়। তুমি গাড়ীতে বসে থাকবে, আমি ইমিগ্রেশন অফিসে যাব। যাই ঘটুক আমি গাড়ীতে উঠার সাথে সাথেই গাড়ী ছাড়বে।'

থেমেই আবার জিজ্ঞাসা করল, ‘ভাল কথা তোমার কাছে পাসপোর্ট, ভিসা আছে তো?'

'আছে, আমরা প্রায়ই এপার ওপার যাতায়াত করি।’

'ঠিক আছে', বলে আহমদ মুসা গাড়ীতে উঠে বসল।

মানসেনিরও পোষাক পরা হয়ে গিয়েছিল। সে উঠে বসল ড্রাইভিং সিটে।

গাড়ী টিলার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে হাইওয়ে ধরে ছুটে চলল সাম্পুর গিরিপথের উদ্দেশ্য।

পথে বেশ কয়েক জায়গায় পুলিশ ও সৈনিকদের পাহারা দেখা গেল। কিন্তু কোথাও থামতে হলো না। গাড়ী এবং ড্রাইভিং সিটে মিলিটারী পুলিশকে দেখেই তারা ক্লিয়ার সিগন্যাল দিচ্ছিল এবং সেই সাথে বুট ঠুকে কড়া স্যালুট।

রাত পৌনে চারটায় আহমদ মুসারা সীমান্ত ফাঁড়িতে এসে পৌছাল।

তাদের গাড়ী এসে দাড়াল ফাঁড়ির অফিস বরাবর রাস্তায়।

আহমদ মুসা দেখল রাস্তায় কাঠের ব্যারিকেড আছে। কিন্তু রাস্তার দু'পাশে দু'জন সৈনিক থাকার কথা তা নেই। তাদের দেখা যাচ্ছে গেট সংলগ্ন সিকুরিটি বক্সে। ফাঁড়ির অফিসের দিকে চেয়ে দেখল, বাইরে কেউ নেই, তবে ভেতরে আলো জ্বলছে।

আহমদ মুসা পাসপোর্টটি হাতে নিয়ে গাড়ী থেকে নামল। অত্যন্ত সাবলীল গতিতে গট্ গট্ করে দ্রুত হেঁটে গিয়ে ঘরে ঢুকল। দু'জন অফিসার পাশাপাশি দু'টি টেবিলে বসে। খুবই ঢিলেঢালা মুডে চেয়ারে হেলান দিয়ে হাত পা ছড়িয়ে বসে আছে। একজন তো টেবিলের উপর পা তুলে বসেছিল, আহমদ মুসা ঢুকতেই সে পা নামিয়ে নিল।

আহমদ মুসা তাদের টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তার হাতের পাসপোর্টের দিকে তাকিয়ে একজন বলল, 'স্যরি স্যার, আপনাকে সকাল ৭টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কাউকেই আজ রাতে সীমান্ত অতিক্রম করতে না দেবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। থ্যাংক ইউ।'

তার কথা শেষ হবার সংগে সংগেই আহমদ মুসা পকেট থেকে দু'হাতে দু'টি রিভলবার বের করে ওদের দিকে তুলে ধরে বলল, 'হাত তুলে পেছন ফিরে দাঁড়াও।'

লোক দু'টি সংগে সংগে আতংকগ্রস্থ হয়ে হাত তুলে পেছন ফিরে উঠে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা ওদের পিঠে পিস্তল ঠেকিয়ে বাথরূমে নিয়ে উপুড় করে শুইয়ে দিল। পিছ মোড়া করে হাত পা বেধে ফেলল ওদের। তার পর বেরিয়ে এল বাথরূম থেকে। ওদের টেবিলে এসে নিয়ম মাফিক পাসপোর্ট বহির্গমন ষ্ট্যাম্প লাগিয়ে বেরিয়ে এল। সোজা চলল গেটের সিকুরিটি বক্সের দিকে।

এদিকে মানসেনিও গাড়ী নিয়ে গেটে গেল।

মানসেনির গাড়ী এবং আহমদ মুসা একই সময়ে গেটে গিয়ে পৌছুল।

মানসেনির দিকে একবার তাকিয়েই সৈনিক দু'জন উঠে দাঁড়িয়ে বুট ঠুকে স্যালুট দিল।

'বিশেষ নির্দেশে আমি যাচ্ছি ওঁকে পৌঁছে দিতে ফরাসি সীমান্ত ফাঁড়িতে।' বলল মানসেনি।

সেই সংগে আহমদ মুসা ওদের সামনে পাসপোর্টের বহির্গমন অনুমতিও তুলে ধরল। ওরা একবার সেদিকে নজর বুলিয়েই স্যালুট দিল।

আহমদ মুসা চলে এল গাড়িতে। গেট খুলে গেল। তীর বেগে গাড়ী ঢুকে পড়ল সাম্পুর গিরিপথে।

গিরিপথের প্রায় শেষ মাথায় ফরাসি আউট পোস্টের কাছাকাছি এসে আহমদ মুসা ও মানসেনি গাড়ি থেকে নেমে সাথে করে আনা রং দিয়ে গাড়ীর সামরিক চিহ্ন ও সামরিক নাম্বার মুছে ফেলল একং গাড়ীতে লাগিয়ে দিল নতুন একটি নাম্বার প্লেট।

স্পেনীয় সামরিক গাড়ী দেখলে ওরা সন্দেহ করতে পারে এই জন্যেই এই ব্যবস্থা।

তারপর মানসেনি মিলিটারী পুলিশের পোষাক খুলে ছুড়ে ফেলে দিয়ে নিজের পোষাকে গাড়ীতে উঠে বসল।

আবার ছুটল গাড়ী।

ফরাসি আউটপোস্টে কোন ঝামেলাই হলো না। আহমদ মুসার ভিআইপি ভিসা বিধায় তাকে খুব সম্মানও দেখাল তারা।

ফরাসি আউটপোস্ট থেকে বেরিয়ে গাড়ী ছুটে চলল সেন্ট মারিয়ার দিকে।

খুশীতে গুনগুন করে গান ধরেছে মানসেনি।

'খুব সহজেই বড় একটা কাজ হয়ে গেল মানসেনি, তাই না? এর সব কৃতিত্ব কিন্তু তোমার। তোমার চমৎকার অভিনয় হয়েছে।' বলল আহমদ মুসা।

'লজ্জা দেবেন না স্যার। আপনার কথা শুনেছি সব। যুগ যুগ ধরে আপনার কাছে আমাদের শিখতে হবে। এখানেও আসল কাজটা আপনিই করে এলেন। ঐ দু' ব্যাটাকে বাথরুমে না আটকালে হাঙ্গামা বাধাত, রক্তারক্তি হতো।'

'না মানসেনি, আমি তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ। তোমাদের নেতা ফিলিপের মূল্যবান সাহায্য সহযোগিতা না পেলে স্পেনে কাজ করা আমার জন্যে কঠিন হতো।'

'এটা আপনার মহত্ব স্যার। শুনেছি আমরা, কোন কৃতিত্বই আপনি নিজের কাছে রাখেন না। কিন্তু সবাই জানে, স্রষ্টার মুর্তিমান আশীর্বাদ হিসেবে আপনি এসেছিলেন স্পেনে। বহু শতাব্দীর অন্ধকার কেটে এখানে নতুন জীবনের সূর্য উঠেছে আপনার স্পর্শে।'

'তুমি কোত্থেকে ফিরতে চাও মানসেনি?' কথার মোড় ঘুরিয়ে বলল আহমদ মুসা।

'আমি সেন্ট মারিয়া থেকে ওলোরন নদী পথে বীম পামোলোনা সড়ক পথে স্পেনে যাব।'

'তোমাকে তাহলে অনেক ঘুরতে হবে।'

'ক্ষ্যাপা কুকুরদের মধ্য দিয়ে ফেরার চেয়ে ঘুরা পথই ভাল।'

'ঠিক বলেছ।'

মানসেনি কিছু বলল না।

আহমদ মুসাও নিরব রইল। আহমদ মুসার চোখের সামনে তখন পাউ এর বিমান বন্দর ঘুরছে। ঐ বিমান বন্দর হয়েই সে সিংকিয়াং-এর পথে উড়বে।

চারদিকে নিরব নিঝুম। নির্জন পার্বত্য পথ।

আহমদ মুসা কিংবা মানসেনি কারও মুখেই কথা নেই।

পিরেনিজ পর্বতমালার আকাবাঁকা পথ বেয়ে ছুটে চলেছে গাড়ী।

# ৭

'পাউ' দক্ষিণ ফ্রান্সের একটা বড় শহর। তুলজ-এর চেয়ে ছোট, তবে মন্টেজুর চেয়ে বড়। মন্টেজুতে বিমান বন্দর নেই, এখানে বিমান বন্দর আছে।

পাউ-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ হোটেল 'পাউ প্যালেস'-এ উঠেছে আহমদ মুসা। হোটেলটি আন্তর্জাতিক মানের, তবে এখানকার কালচারটা ফরাসি। ফরাসি অভিজাতরাই এখানে আসে। তবে বিদেশীরাও আসে প্রচুর।

আহমদ মুসা ঠিক করেছে মধ্য এশিয়া হয়ে সিংকিয়াং-এ প্রবেশ করবে। টিকিট সে কিনে ফেলেছে। বন, আংকারা, তাসখন্দ হয়ে আলমা আতা পর্যন্ত তার টিকিট। চেষ্টা করেও তাড়াতাড়ি টিকিট পায়নি আহমদ মুসা। চারদিন পরে তার বিমান।

দেরীই যখন হলো, তখন আহমদ মুসা মন্ট্রেজু যাবার কথা মনে করেছিল। মন্ট্রেজু এখান থেকে মাত্র দু'শ মাইল পুবে। কিন্তু সিদ্ধান্ত পাল্টেছে সে। ওখানে গেলে ওরা দেরী করাবে, না হলে কাঁদাকাটি বাধাবে। ডোনার বাস্তববুদ্ধি এখনও আসেনি। আহমদ মুসা ঠিক করেছে যাবার আগে জেন, জোয়ান ও ডোনার সাথে কথা বলবে। ইতিমধ্যেই আহমদ মুসা ট্রিয়েষ্টের সাথে কথা বলেছে। জেন ও জোয়ান নিরাপদে ফ্রান্সে পৌঁছতে পেরেছে জেনে তারা খুশী হয়েছে। জেন ও জোয়ানকে দু'চারদিনের মধ্যেই ট্রিয়েষ্ট পৌঁছতে হবে। আহমদ মুসা ওদের এ কথা ঐ দিন কথা বলার সময় বলে দেবে ঠিক করেছে।

ঘুমিয়ে আর শহরে নিরুদ্দেশ ঘোরা ফিরা করে সময় কাটাচ্ছে আহমদ মুসা। এছাড়া হোটেলের লাউঞ্জে সে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দেয়। তার ভিআইপি ভিসা থাকায় হোটেল কর্তৃপক্ষ তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখে। হোটেল কর্তৃপক্ষ আহমদ মুসার রুম সার্ভিসের ব্যবস্থা করেছিল। তারা বলেছিল, ডাইনিং হলে ভিড় থাকলে সার্ভিসে কখনও কখনও অসুবিধা হয়। কিন্তু আহমদ মুসা রাজী হয়নি। বলেছে সবার সাথে তার খেতে ভাল লাগে। আহমদ মুসা যে সুযোগ পেয়েছে,

সেই সুযোগে এ দেশবাসির সাথে মেলা মেশার মাধ্যমে এদের রীতি নীতি ও চিন্তার সাথে পরিচিত হতে চায়। এটা করে তার লাভ হয়েছে অনেক, কিন্তু ঝামেলায় যে পড়তে হয়নি তা নয়।

ঘটনাটা ঘটেছিল দ্বিতীয় দিনেই।

আহমদ মুসা ডাইনিং হলে তার টেবিলে একাই বসে খাচ্ছিল। তার সামনের টেবিলে দু'জন ফরাসি তরুণী। আর বাঁ পাশের টেবিলে একজন কৃষ্ণাঙ্গ যুবক। তাকে দেখে আহমদ মুসার মনে হলো, সে বিদেশী হবে। হয় সে আফ্রিকার, নয়তো ক্যারিবিয়ান কোন দেশের। হাব ভাবে সে রকমই মনে হয়। আহমদ মুসার আরও মনে হলো, তার মধ্যে রয়েছে সংকুচিত ভাব। যেন নিজেকে সে আড়াল করতে চাচ্ছে, পাশের দু'টি তরুণীর মধ্যে চেহারায় ও আচার আচরনে যে স্বাচ্ছন্দ তা কৃষ্ণাঙ্গ যুবকটির মধ্যে নেই।

ডাইনিং হল মোটামুটি ভাবে ভর্তি।

আহমদ মুসা সবে খেতে শুরু করেছে। এমন সময় বাম পাশের সে টেবিল থেকে চিৎকার শুনে আহমদ মুসা ওদিকে ফিরে তাকাল। দেখল, দু'জন বিশাল বপু ষন্ডা মার্কা চেহারার শ্বেতাংগ যুবক দু'দিক থেকে কৃষ্ণাঙ্গ যুবকটির দু'টি হাত চেপে ধরে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।

কৃষ্ণাঙ্গ যুবকটির চোখে আতংক। সে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছে।

একজন শ্বেতাঙ্গ যুবক কৃষ্ণাঙ্গ যুবকের মুখে একটা ঘুষি চালাল। কৃষ্ণাঙ্গ যুবকটির ঠোঁট ফেটে গল গল করে বেরিয়ে এল রক্ত।

শ্বেতাঙ্গ দু'জন এবার কৃষ্ণাঙ্গ যুবকটিকে দু'দিক থেকে ধরে পাঁজাকোলা করে শূন্যে তুলে নিয়ে যেতে শুরু করল।

চিৎকার করে উঠল কৃষ্ণাঙ্গ যুবকটি।

ডাইনিং হল ভর্তি মানুষ।

সবার খাওয়া বন্ধ। সবার দৃষ্টি কৃষ্ণাঙ্গ যুবকটিকে হাইজ্যাক করে নিয়ে যাওয়ার দিকে। কিন্তু কেউ কিছু বলছেনা, কেউ তাদের চেয়ার থেকে উঠেনি। আহমদ মুসা খাওয়া বন্ধ করেছিল। কৃষ্ণাঙ্গ যুবকটির মুখ ফেটে যখন গল গল করে

রক্ত বেরুল আহমদ মুসার রক্তে আগুন ধরে গেল। যখন কৃষ্ণাঙ্গ যুবকটিকে নিয়ে যেতে শুরু করল, আর বসে থাকতে পারল না সে।

দ্রুত উঠে গিয়ে ওদের পথ রোধ করে চিৎকার করে বলল, 'ছেড়ে দাও ওকে'।

শ্বেতাঙ্গ যুবকদ্বয়ের একজন খারাপ একটা গাল দিয়ে বলল, 'ভালো চাইলে সরে যা সামনে থেকে।'

আগের মত সেই একই নির্দেশ দিল আহমদ মুসা আবার।

শ্বেতাঙ্গ যুবক দু'জন এবার কৃষ্ণাঙ্গ যুবককে ছেড়ে দিয়ে আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে হাত গুটাতে লাগল।

আহমদ মুসা ওদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে কৃষ্ণাঙ্গ যুবকটিকে জিজ্ঞাসা করল,কে ওরা, কেন নিয়ে যেতে চায় তোমাকে?

'আমাকে খুন করবে.......।

যুবকটি কথা শেষ করতে পারল না, শ্বেতাঙ্গ যুবকদের একজন তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়ে ঘুসি বাগিয়ে তেড়ে এলো আহমদ মুসার দিকে। আহমদ মুসা মাথাটা একটু নিচু করে দু'হাত দিয়ে তার ঘুসি পাকানো হাত ধরে এক পাক খেয়ে উঠে দাড়াল। মট করে ভেঙ্গে গেল তার কনুই। চিৎকার করে উঠল শ্বেতাঙ্গ যুবকটি। ঐ চিৎকারের মধ্যে আহমদ মুসা তার তলপেটে লাগাল লাথি। জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লো যুবকটি। দ্বিতীয় যুবকটি পিস্তল বের করছে তা দেখতে পেল আহম্মদ মুসা, সাঁ করে তার মাথা নিচ দিকে ঠেলে দিয়ে জোড়া পা ওপরে ছুড়ে মারল দ্বিতীয় যুবকটির হাত লক্ষ্যে।

দ্বিতীয় যুবকটি বুঝে উঠার আগেই গুলির মত উঠে আসা লাথি খেয়ে তার হাতের রিভলবার ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ল।

আহমদ মুসা মাটি থেকে উঠার আগেই দ্বিতীয় যুবকটি ঝাঁপ দিল তাকে লক্ষ্য করে। আহমদ মুসা বিদ্যুৎ গতিতে একপাশে নিজের দেহটাকে সরিয়ে নিল। পাশেই মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল দ্বিতীয় যুবকটি।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

যুবকটিও উঠছিল, টলতে,টলতে ঘাড়টা ওপরে একটু উঠে আসতেই ডান হাতের একটা কারাত তার ঘাড় লক্ষ্যে। উঠলনা আর যুবকটি। সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

বোবার মত দাঁড়িয়ে তখনও কৃষ্ণাঙ্গ যুবকটি। রক্ত গড়িয়ে পড়ছে তার মুখ থেকে।

আহমদ মুসা শ্বেতাঙ্গ যুবক দুটির দিকে একবার তাকিয়ে চলে গেল হোটেল কাউন্টারে। এ্যাডেনড্যান্ট যে ছিল তাকে বলল, পুলিশে খবর দেয়া হয়েছে।

'জি স্যার। আপনাকে ধন্যবাদ।' বলল আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে।

আহমদ মুসা কাউন্টার থেকে তার টেবিলে ফিরে পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছে নিয়ে, পায়ের ধুলা ঝেড়ে টেবিলে বসল খেতে।

ডাইনিং হলের সমস্ত লোকের দৃষ্টি আহমদ মুসার দিকে। তাদের চোখে বোবা বিস্ময়। বিস্ময় দু'টি কারণে। হোটেলে অনেক মারধর তারা দেখেছে, কিন্তু অন্যকে রক্ষার জন্য এর আগে আর কাউকে কখনও তারা এগিয়ে যেতে দেখেনি। দ্বিতীয়তঃ শান্ত শিষ্ট চেহারার একটা ভদ্রলোক যাদুর মত ভেল্কিবাজী দেখিয়ে বিশাল বপু গুন্ডা দু'টোকে এক নিমেষে খেলনার মত কাবু করে ফেলল।

বিভিন্ন টেবিল থেকে বিভিন্নজন উঠে এসে আহমদ মুসাকে ধন্যবাদ জানাল। একটি বৃদ্ধ দম্পতি এসে আহমদ মুসার মাথা নেড়ে বলল, 'বৎস আমাদের এতদিনের ধারণা পালটে দিলে। পরের জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করে ঝুঁকি নেবার লোক এই পাউতে এখনও আছে।'

আহমদ মুসা নিরবে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় করেছে।

সামনের টেবিলে দু'টি তরুণী সেই যে খাওয়া বন্ধ করেছিল আর খাবারে হাত দেয়নি। তারা তাকিয়ে ছিল আহমদ মুসার দিকে। তাদের চোখে রাজ্যের বিস্ময়।

ইতিমধ্যে পুলিশ এসে হোটেলের লোকদের জবানবন্দী নিয়ে শ্বেতাঙ্গ যুবক দু'টিকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে। কৃষ্ণাঙ্গ যুবকটিকেও সাথে নিয়ে গেছে

তার জবানবন্দী রেকর্ড করার জন্য। কৃষ্ণাঙ্গ যুবকটি রুম নাম্বার নিয়ে গেছে আহমদ মুসার। পুলিশও যাবার সময় ধন্যবাদ দিয়ে গেছে আহমদ মুসাকে।

আহমদ মুসার খাওয়া শেষ হলে তরুণী দু'জন উঠে এল আহমদ মুসার টেবিলে। অনুমতি চাইল বসার জন্য। আহমদ মুসা এতক্ষণে দেখতে পেল তাদের একজনের হাতে ক্যামেরা। চমকে উঠল আহমদ মুসা, ফটো তোলেনি তো!

আহমদ মুসা ওদের অনুমতি দিল বসার জন্য।

বসতে বসতে ক্যামেরা হাতে তরুণীটি বলল, 'আমি সোমা শ্যোন, সাপ্তাহিক 'দি পিরেনীজ' এর সাংবাদিক। আর ও আমার বন্ধু জোসেফাইন।'

'ধন্যবাদ, খুশী হলাম।' বলল আহমদ মুসা।

'আপনি...কি বলব আপনাকে?' বলল, সোমা শ্যোন।

'আমি আবদুল্লাহ।'

'আপনি মুসলিম?' কন্ঠ তার উচ্ছ্বসিত, নেচে উঠল তার গোটা দেহ আনন্দে।

'হ্যাঁ।'

'আমি সুমাইয়া শ্যোন।'

'তুমি মুসলিম?'

'হ্যাঁ। কিযে আনন্দ লাগছে আমার। আপনি আজ যা দেখিয়েছেন।'

'আমার এখনও মনে হচ্ছে রোমাঞ্চকর সিনেমার দৃশ্য দেখলাম। বিশ্বাসই হতে চাইছেনা বাস্তবে এটা ঘটল।' বলল জোসেফাইন।

'ঠিক বলেছিস। ঠিক উপমাটা দিয়েছিস।'

বলেই সুমাইয়া আহমদ মুসার দিকে ফিরে বলল, 'আমার পত্রিকার জন্যে আপনার কয়েকটা কথা আমি নিতে চাই।'

'কি কথা?'

'আপনার পরিচয় কি?'

'আমি একজন বিদেশী।'

'কোন দেশী?'

'দেশের নাম না হলেও তোমার স্টোরির খুব একটা ক্ষতি হবে না।'

‘কৃষ্ণাঙ্গ যুবকটিকে আপনি চিনেন?’

‘না।’

'কেন তাকে সাহায্য করতে গিয়েছিলেন, একজন বিদেশি হয়ে?'

'মানুষ মানুষকে সাহায্য করবে স্বদেশি বিদেশি পার্বক্য করে নয়।'

'যাদের গায়ে হাত তুলেছেন, তারা জাত ক্রিমিনাল, আপনার বিশ্বাস হতে পারে?'

বিপদের ভয় করে তো দায়িত্ব পালন থেকে দুরে সরে দাঁড়ানো যায় না।'

'সমাজে আজ এ দায়িত্ববোধের আভাব রয়েছে, একে আপনি কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন?'

'মানবিক মূল্যবোধের একটা অবক্ষয় এটা।'

'আপানার চিন্তায় এর কি কোনো রিমেডি আছে?'

'মানুষ আল্লাহ্‌র বিধানের প্রতি অনুগত হলে তার মধ্যে এ দায়িত্ববোধ সৃষ্টি হবে।'

'কেন এ দায়িত্ববোধ কি মানুষের মধ্যে অন্যভাবে আসতে পারে না?'

'আসতে পারে দু-চার জনের মধ্য। আর রুপ হবে স্বেচ্ছাভিত্তিক, বাধ্যতামূলক নয়।'

'ধন্যবাদ আপনাকে। একটা সুন্দর ইন্টারভিউ পেলাম'

'ধন্যবাদ, তোমার ক্যামেরাটা আমার হাতে একটু দেবে?'

'সুমাইয়া তার ক্যামেরাটা আহমেদ মুসার হাতে দিল।

'ক্যামেরাটা খুলতে পারি?' ক্যামেরাটি হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করল আহমেদ মুসা।

'খুলবেন? কেন?' আহমেদ মুসার দিকে তাকিয়ে একটু চিন্তা করে বলল সুমাইয়া।

'প্রয়োজন আছে, অনুমতি দাও।'

'খুলুন।"

আহমেদ মুসা ক্যামেরা খুলে ফিল্মটি হাতে নিয়ে বলল, ‘সুমাইয়া দু'দিনের জন্য এ ফিল্মটি আমার কাছে রাখতে চাই। যাবার দিন এটা তোমাকে দিয়ে যাব। তোমাকে না পেলে হোটালে রেখে যাব। তোমাকে দিয়ে দেবে।'

'তার মানে আপনি যাবার আগে আপনার ফটো ছাপতে দিবেন না।'

'ঠিক তাই।'

'কেন?'

'এর জবাবও তুমি পেয়ে যাবে।' একটু থেমেই আহমদ মুসা বলল;

'অনুমতি তুমি দিলে?'

'জানি না কেন, আপনার প্রস্তাবে না বলার শক্তি পাচ্ছি না। কিন্তু আমি সাংবাদিক। আমার পেশার খেলাফ এটা।'

‘আমি অস্বীকার করছিনা সুমা। কিন্তু সবকিছুরই একাটা ব্যতিক্রম আছে। মনে কর এটা একটা ব্যতিক্রম। জীবনে আর হয়তো এমনটা তোমাকে করতে হবে না।’

'আপনি কথার যাদু জানেন। কিংবা সম্মোহনী ক্ষমতা আছে আপনার। আপনি আমাকে রাজী করিয়ে ফেলেছেন।' বলে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াল সুমাইয়া।

‘সাক্ষাৎকার নেয়ার পর কোন ব্যক্তি সম্পর্কে জানার আগ্রহ কমে। কিন্তু আপনার সাক্ষাৎকার নেওয়ার পর অতৃপ্তি বেড়েছে।' বলে উঠে দাঁড়াল জোসেফাইনও।

‘ঠিক বলেছিস জোসেফাইন, আমি কথাটা প্রকাশ করতে পারছিলাম না’ বলে সুমাইয়া জোসেফাইনের পিঠে চাপড়ে দিল। ওরা উঠে দাঁড়ালে আহমদ মুসা ফিল্মের রিলটি নাচাতে নাচাতে বলল, 'কোন প্রকার অবিশ্বাস করছনা তো আমাকে?'

'আপনাকে দেখে আপনার কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে কি জানেন? আপনি মিথ্যা বলতে জানেন না, আপনি কাউকে ঠকাতে পারেন না।'

‘এটা কি বেশি অনুমান হলো না?’

'দেখুন আমি সাংবাদিক বটে, কিন্তু সাইকোলজির একজন তুখোড় ছাত্রী ছিলাম আমি।'

'তাহলে তো ভয়ের কথা। থট রিডিং করে ফেলোনা আবার।'

'ভয় করবেন না। সবার চিন্তা পড়া যায় না। আপনি সে রকম একজন মানুষ। এ আরেকটা বিষয়। সবই আমার স্টোরীতে কাজে লাগবে।'

বলে "শূভ রাত্রি" জানিয়ে যাবার জন্যে পা তুলেছিল সুমাইয়া, আহমদ মুসা বলে উঠল, 'আমি জোসেফইনকে শুভরাত্রি জানাচ্ছি কিন্তু তোমাকে জানাচ্ছি সালাম, 'আসসালামু আলাইকুম।'

সুমাইয়া শোন থমকে দাঁড়াল। তার প্রত্যয়ী মুখে একটা লজ্জার ছায়া নামল। 'সরি আমি অভ্যস্ত নই।'

তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে হাঁটা ধরল সুমাইয়া। তার সাথে জোসেইফানও।

আহমেদ মুসাও উঠল। আহমদ মুসা খুব খুশি মন নিয়ে উঠতে পারল না। তার মনের কোথায় যেন খচ খচ করছে। সুমাইয়ার মত মুসলিম মেয়েরা সালাম দেয়ার অভ্যেসও হারিয়ে ফেলেছে!

পরদিন আহমেদ মুসা নাস্তা সেরে তার রুমে ফিরে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছে। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। পাশে ফিরে আহমদ মুসা টেলিফোনটি কানে তুলল। ওপারের কন্ঠ কানে আসতেই বুঝল, সুমাইয়া। সুমাইয়া বলল, 'আমার গল্প শুনে আব্বা সারা রাত ভাল করে ঘুমায়নি। সকালেই আমাকে নিয়ে ছুটে এসেছেন। আপনার কি সময় হবে? আনুমতি দেবেন কি আসতে?'

'চলেইতো এসেছ। আস ওকে নিয়ে।' বলল আহমদ মুসা একটু হাল্কা স্বরে।

টেলিফোন রাখতেই আবার বেজে উঠল। আবার টেলিফোন হাতে তুলে নিল আহমদ মুসা। ওপারে একটি আপরিচিত পুরুষ কন্ঠ। ফরাসি ভাষায় বলল, 'আমি সেই যুবক যাকে আপনি কাল প্রানে বাঁচিয়েছেন। আপনাকে ধন্যবাদ জানানোও হয়নি। আনুমতি দিলে আমি আপনার কাছে আসতে চাই।'

‘কেন, ধন্যবাদ জানানোর জন্যে? এজন্যে আসার দরকার নেই।’ বলল আহমেদ মুসা।

‘না স্যার আমি একজন বিপদগ্রস্ত মানুষ। একবার বাঁচিয়েছেন, আরেকবার হয়তো বাঁচবোনা। বাঁচার জন্য ক্যামেরুন থেকে পালিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু তবুও বাঁচতে পারছিনা।’

'আপনার বাড়ী ক্যামেরুনে? কি নাম আপনার?'

'আমার বাড়ী ক্যামেরুনের সর্বদক্ষিন কামপোতে। সেখান থেকে এসে বাস করছিলাম উওর ক্যামেরুনের কমবায়। আমার নাম ওমর বায়া'

'তুমি মুসলমান?'

'জী হ্যাঁ। আপনি অসন্তুষ্ট হলেন?'

'না উমর তোমাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে।'

'স্যার বিদ্রুপ করছেন।'

'সবার কাছে বুঝি বিদ্রুপই পেয়েছ? শোন আমি তোমার এক ভাই। তুমি বিকেলে এস আমার এখানে চা খাবে।'

টেলিফোন রাখল আহমদ মুসা।

এই সময় দরজায় নক হল। আহমদ মুসা উঠে গিয়ে দরজা খুলল। বাইরে দাঁড়িয়ে সুমাইয়ার সাথে কেতাদুরস্ত ফরাসী এক ভদ্রলোক।

'আমি সুমাইয়ার আব্বা' বলল ভদ্রলোকটি।

'আসসালামু আলাইকুম' বলে হাসি মুখে তাদের স্বাগত জানাল আহমেদ মুসা।

পরবর্তী বই

# আবার সিংকিয়াং

## কৃতজ্ঞতায়ঃ

1. Abu Taher
2. Mohammed Ayub
3. Nazmus Sakib
4. Mohammed Sohrab Uddin
5. Hafizul Islam
6. Emrul Hasan
7. Sumon Mujib
8. Lahin New
9. Tariq Faisal
10. Syed Murtuza Baker
11. Nazrul Islam
12. Ashrafuj Jaman
13. Tuhin Azad
14. Md. Jafar Ikbal Jewel
15. A.S.M Masudul Alam
16. Esha Siddique
17. S A Mahmud
18. Anisur Rahman
19. Sharmeen Sayema
20. Monirul Islam Moni
21. Sohel Sharif
22. Gazi Salahuddin Mamun
23. Bondi Beduyin
24. Arif Rahman
25. Amin Islam
26. Kayser Ahmad Totonji
27. Tareq Samsul Alam
28. Shaikh Noor-E-Alam

সাইমুম-১৫

# আবার সিংকিয়াং

আবুল আসাদ

# ১

সুমাইয়ার আব্বা সোফায় বসতে বসতে বলল, 'দেখ তুমি আমার ছেলের বয়সের। আমি তোমাকে তুমি বলব, কিছু মনে করো না।'

সুমাইয়ার আব্বা ষাটোর্দ্ধ বয়সের। কিন্তু দেহের গাঁথুনি ভাল আছে বলে বয়স দশ বছর কম মনে হয়। নিরেট ফরাসী চেহারা। চোখে মুখে আভিজাত্যের ছাপ।

'জি না। আমি বরং খুশী হবো।' আহমদ মুসা বসতে বসতে বলল।

সুমাইয়া বসল তার আব্বার পাশে।

'সুমাইয়ার কাছে সব শুনেছি। শুনে দেখতে এসেছি। কোন মুসলিম দেশের এমন শক্তি ও সাহসের কথাতো শুনিনি!'

'কেন, মুসলমানদের শক্তি সাহসের ইতিহাস নেই?' মুখে হাসি টেনে বলল আহমদ মুসা।

'সে তো ইতিহাস।'

'কেন ফিলিস্তিন, মিন্দানাও, মধ্য এশিয়া, ককেশাস, বলকানের কাহিনী?'

‘ঠিক বলেছ। ভুলে গিয়েছিলাম ওগুলোর কথা। স্পেনের কথা বাদ দিলে কেন? সেখানে তো রক্তপাত হীন বিপ্লব ঘটে গেল। কিন্তু বৎস, তবু আমি বলব-শক্তি, সাহস ও বুদ্ধিতে মুসলমানরা অনেক পিছিয়ে।’

‘আপনার কথা ঠিক, কিন্তু সবাই পিছিয়ে একথা ঠিক নয়।’

‘হ্যাঁ, তোমার মত সম্মানজনক কিছু ব্যতিক্রম আছে।’

‘আমি ব্যর্থতাকে অসম্মানজক কিংবা অস্বাভাবিক মনে করি না।’

‘কেন?’

‘আমরা মুসলমানরা ইউরোপকে ঘুম থেকে জাগিয়ে নিজেরা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সে ঘুম থেকে সবে আমরা জেগেছি।’

‘চমৎকার বলেছ বৎস। কিন্তু মুসলমানদের এ ঘুমটা বড় দীর্ঘ হয়েছিল, না?’

‘সুখের ঘুমটা একটু গাঢ়ই হয়। তখন আমরা অর্ধ পৃথিবীর মালিক। অঢেল অর্থ ছিল আমাদের পায়ের তলায়। এই সম্পদ আমাদের গৃহবিবাদের সৃষ্টি করেছিল। গৃহবিবাদ ধ্বংস করেছিল আমাদের শক্তিকে এবং ডেকে এনেছিল শত্রুকে। সুখের ঘুম পরিণত হয়েছিল পতনের ঘুমে।’

‘চমৎকার, চমৎকার। তোমার সম্পর্কে মারিয়ার কাছ থেকে যা শুনেছিলাম তার চেয়েও তুমি চমৎকার। আমি একটা কথা বলব তোমাকে।’

‘কি কথা?’

‘আমার গরীবখানা তোমাকে নিয়ে যেতে চাই। যাবে তুমি?’

‘ফ্রান্সের একটি মুসলিম পরিবারের সাথে পরিচিত হওয়াকে আমি আমার সৌভাগ্য মনে করি। কিন্তু আমার মনে খুব লেগেছে, সুমা সালাম দেয়া ভুলে গেল কেন?’

‘এটা কি আমার দোষ? সালাম পেলাম কবে? সালাম দেয়ার সুযোগ পেলাম কবে?’ অভিমান ক্ষুদ্ধ কণ্ঠে বলল সুমাইয়া।

সুমাইয়ার আব্বা গম্ভীর হযে উঠল। তারপর ধীর কণ্ঠে বলল, ‘শুধু সালামের কথা বলছ? মুসলিম কালচারের কি আছে আমাদের জীবনে। নামাজ জানি না, রোজা করি না। সুমা ঠিকই বলেছে, এর জন্য কি আমরা দায়ী। আমার

আব্বা কুরআন শরীফ পড়া জানতেন না, আমি জানিনা, আমার সন্তান সুমাইয়াও জানে না। আমরা অবস্থার শিকার বৎস। আমরা মুসলিম নাম টিকিয়ে রেখেছি, আদম শুমারীর খাতায়। এখনও নিজেদের মুসলিম পরিচয় লিখছি, তোমাকে মুসলিম জেনে আন্তরিকভাবে আনন্দিত হয়েছি- এই যে বোধ, এটাই খুব কম?'

একটু থামল সুমাইয়ার আব্বা মোহাম্মদ দ্য গল। মুহূর্তকাল পরেই আবার বলতে শুরু করল, 'আমার ইচ্ছা ছিল একটি মুসলিম মেয়েকে বিয়ে করব। কিন্তু তা ভাগ্যে জোটেনি। বিয়ে করতে হলো এক ক্যাথলিক মেয়েকে। কিন্তু গীর্জায় গিয়ে বিয়ে করতে রাজি হইনি। অবশেষে প্যারিস গিয়ে মসজিদের ইমাম ডেকে ইসলামী মতে বিয়ে করেছি। আমার এই চেষ্টাকে কি খুব ছোট করে দেখবে বৎস?'

'ধন্যবাদ জনাব। ধর্মের প্রতি আপনার আন্তরিকতা প্রশংসনীয়। কিন্তু জনাব এতটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে জাতি হিসাবে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা যাবেনা।'

'ঠিক বলেছ, কিন্তু উপায় কি বলো। এ নিয়ে ভাববার কথা আমাদের একথা ঠিক। কিন্তু এর সমাধান কি আমাদের দ্বারা সম্ভব? কুরআন শিক্ষার সুযোগ আমি পাইনি, আমার সন্তানকেও দিতে পারিনি। এর জন্যে আমরা দায়ী, কিন্তু আর কেউ দায়ী নয়? মুসলিম দেশগুলোর কি কোনই দায়িত্ব ছিলনা আমাদের প্রতি?'

'অতীতে এটা হয়নি জনাব, ইনশাআল্লাহ এখন হচ্ছে, হবে। বিশ্ব মুসলিম লীগ (রাবেতা) এই সমস্যা মোকাবেলার জন্যে দুনিয়া ব্যাপী অনেক কিছু করেছে, করছে। এ ছাড়া বেশ কিছু মুসলিম দেশ এই ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসছে।'

'খুব খুশীর খবর এটা। এখন বল, যাচ্ছ তো আমার গরীবালয়ে? বহু চেষ্টা করে একটা কোরআন শরীফ জোগাড় করেছি। আমার স্ত্রীসহ সকলের ইচ্ছা, তোমার কাছ থেকে কুরআনের পাঠ শুনবো। আমরা মক্কা, কায়রো ও ইস্তাম্বুল রেডিও'র কুরআন পাঠ শুনি। কিন্তু স্বচক্ষে আমরা কেউ কোরআন দেখিনি বা শুনিনি।'

'অবশ্যই যাব জনাব।'

‘ধন্যবাদ বৎস। আরেকটা কথা বলব।’

‘বলুন।’

‘সুমাইয়ার ফিল্ম নাকি আটকে রেখেছে?’ হেসে বলল সুমাইয়ার আব্বা।

‘তুমি মন খারাপ করেছ সুমাইয়া। আমি আটকে রাখিনি ওগুলো। বলতে পার নিরাপত্তামূলক হেফাজতে রেখেছি। আগামী কাল দশটার মধ্যে পেয়ে যাবে।’

‘আমি তো আপত্তি করিনি। আমি আব্বাকে জানিয়েছি মাত্র।’ বলল সুমাইয়া।

‘আমারও আপত্তি নেই। তবে জানতে লোভ হচ্ছে যে, সবাই প্রচার চায়, তুমি চাওনা কেন?’ বলল সুমাইয়ার আব্বা।

‘সবই জানতে পারবেন। আগামী কাল ১০ টা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করার জন্যে আমি আপনাদের অনুরোধ করছি।’

‘তোমার কথায় যদিও আগ্রহটা বাড়ছে, তবু ঠিক আছে। কখন যাবে আমাদের বাড়িতে। এখনি চল লাঞ্চ করে চলে আসবে।’

প্রস্তাবটি ভালো লাগল আহমদ মুসারও।

সবাই উঠল।

এখন বিকাল।

সুমাইয়ার বাড়ি থেকে আসতে অনেক দেরী হয়েছে আহমদ মুসার। ফিরতে ফিরতে প্রায় ৪টা বেজে গেছে। আহমদ মুসা হোটেল রুমে আসর নামাজ পড়ে নিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছে। যোহরের নামাজ সে পড়ে ছিল সুমাইয়াদের বাড়িতে। সাবইকে নিয়ে নামাজ পড়েছে, নামাজ শিখিয়েছে ওদের। এই প্রথম সুমাইয়াদের বাড়িতে নামাজ হলো। আহমদ মুসা অবাক হয়েছিল, আবেগ অনুভূতি দিক দিয়ে পরিবারটা শতকরা একশত ভাগ মুসলমান। এমনকি সুমাইয়ার মা ক্যাথলিক ছিল, মনের দিক দিয়ে এখন সে সম্পূর্ণ মুসলমান হয়ে গেছে। কিন্তু মুসলমানের আবেগ অনুভূতি ছাড়া পরিবারে মুসলমান হওয়ার আর

কোন চিহ্ন নেই। নামাজের জন্যে প্রয়োজনীয় সুরা বা দোয়া ওরা ফরাসী ভাষায় লিখে নিয়েছে। ওরা কথা দিয়েছে ওরা নামাজ রোজা করবে। ওরা আরও কথা দিয়েছে, প্যারিসের মুসলিম দূতাবাসগুলো ফরাসী মুসলমানদের কুরআন ও হাদিস শিক্ষা দেয়ার যে ব্যবস্থা করেছে তার সুযোগ তারা গ্রহণ করবে। আহমদ মুসা ওদের কথা দিয়েছে, দক্ষিণ ফ্রান্সে অন্তত দু'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করার জন্যে সে রাবেতা ও মুসলিম দূতাবাসগুলোর মাধ্যমে উদ্যোগ নেবে। আর যোগাযোগ করতে বলেছে। 'ইয়ুথ সোসাইটি ফর ইউরোপিয়ান রেঁনেসা'- এর সাথে যুক্ত হলে সুমাইয়া সব কিছুই জানতে পারবে।

আসার সময় সুমাইয়ার মা আহমদ মুসাকে বলেছিল, ‘সত্যি বাবা কে তুমি? ছাত্র জীবন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত অনেক মুসলমানের সাথে দেখা হয়েছে, তাদের চেয়ে একদমই ব্যতিক্রম তুমি। জ্ঞান যোগ্যতা এবং আচরণ সব দিক দিয়েই তুমি, আমি মনে করি একজন পূর্ণ মানুষ। কে তুমি বাবা? সুমাইয়া ও তার আব্বার কাছ থেকে শুনলাম, তুমি তোমার পরিচয় গোপন রাখতে চাও। কিন্তু মায়ের কাছে কি কিছু গোপন রাখতে আছে?’

‘আপনি এভাবে কথা বললে আমি বিপদে পড়ে যাব আম্মা। আমার সব পরিচয় তো আপনাদের সামনে, শুধু কিছু কথা বলিনি আমি অপরিহার্য প্রয়োজনেই।’

‘তুমি দীর্ঘজীবি হও বাছা। আল্লাহ তোমাকে দীর্ঘজীবি করুন।’

আহমদ মুসাকে বিদায় দিতে এসে আহমদ মুসার গাড়ির দরজা বন্ধ করে জানালায় মুখ এনে সুমাইয়া বলেছিল, আপনি ভাগ্যবান। আমার রাশভারি মাকেও আপনি জয় করলেন। দীর্ঘজীবি হওয়ার জন্যে অমন দোয়া আমার মা কোনদিনই আমার জন্যে করেননি।’

‘যার মা নেই, তাকে আল্লাহ এমন ভাবেই মা জুটিয়ে দেন।’ হেসে বলল আহমদ মুসা।

একটু থেমে আহমদ মুসা আবার বলল, ‘ধন্যবাদ সুমাইয়া, এখন তোমাকে মুসলিম মেয়ের মত মনে হচ্ছে।’

নামাজের সময় সুমাইয়া গায়ে চাদর জড়িয়েছিল, সে চাদর এখনও তার মাথায় আছে।

'দোয়া করুন, এ চাদর যেন গা- মাথা থেকে আর না নামে।'

গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিল সুমাইয়া।

আহমদ মুসার গাড়ি তখন চলতে শুরু করেছিল। সুমাইয়া ছুটে গাড়ির জানালায় এসে উচ্চ কণ্ঠে বলল, 'আস্‌সালামু আলাইকুম।'

'ওয়া আলাইকুম সালাম। ধন্যবাদ সুমা।' হেসে বলেছিল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা হোটেলের বেড়ে শুয়ে এ সব ভেবে এবং এপাশ ওপাশ করে চোখ থেকে ঘুম তাড়াচ্ছিল। মনে হচ্ছে কারও জন্যে অপেক্ষা করছে সে।

এখন বিকেল সাড়ে চারটা।

আহমদ মুসার দরজায় নক হলো।

তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে আহমদ মুসা দরজা খুলে দিয়ে বলল, 'আস্‌সালামু আলাইকুম। এস ওমর বায়া।'

সালামের জবাব দেবার পর এক মুখ সংকোচ নিয়ে ধীর পায়ে ঘরে প্রবেশ করল সেদিন হোটেলের ডাইনিং রুমে মার খাওয়া সেই কৃষ্ণাংগ যুবক।

ওমর বায়াকে একটা চেয়ারে বসিয়ে আরেকটা চেয়ার টেনে নিয়ে তার মুখোমুখি বসল আহমদ মুসা।

ওমর বায়ার ঠোটটা তখনও ফোলা।

'বল ওমর তোমার কথা। সে দিন যে দু'জন লোক তোমাকে আক্রমণ করল তুমি চেন তাদের?' আহমদ মুসাই শুরু করল।

'না চিনি না। ওরা ভাড়াটিয়া। আমাকে কিডন্যাপ করার জন্যে ওদের নিয়োগ করা হয়েছিল।'

'কারা নিয়োগ করেছিল?'

'একটা আর্ন্তজাতিক খৃষ্টান মিশনারী সংগঠন।'

‘ওদের সাথে তোমাদের কি বিরোধ? কেন তোমাকে ওরা কিডন্যাপ করতে চায়?’

‘আমার সমস্ত সম্পত্তি ওদের নামে লিখে দিতে বাধ্য করবে, রাজী না হলে খুন করবে।’

‘ঘটনা কি বলত।’

‘ঘটনা অনেক বড়,কাহিনী অনেক দীর্ঘ।’

আহমদ মুসা নড়ে চড়ে বসল।

‘আমার বাড়ি’, শুরু করল ওমর বায়া, ‘ক্যামেরুনের একদম দক্ষিণ সীমান্তে আটলান্টিকের উপকূল ঘেঁষে দাঁড়ানো নতেম নদী দ্বারা প্রায় চারদিক থেকে ঘেরা কাম্পু উপত্যকায়। এই উপত্যকা ছিল দক্ষিণ ক্যামেরুনে মুসলমানদের সর্বশেষ বসতি। এর আগে দক্ষিণ ক্যামেরুনের আম্বা, সালাস, মলুন্ডু, দুম প্রভৃতি অঞ্চলে অনেক মুসলিম বসতি ছিল। কিন্তু নিরক্ষীয় গিনী, গ্যাবন ও কংগোর সাহায্যপুষ্ট ক্যামেরুনের খৃষ্টান মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত খৃষ্টান সম্প্রসারণের বন্যা সে সবকে কোথায় তলিয়ে দিয়েছে, তার কোন চিহ্নও এখন নেই। এরপর ওদের হাত এসে পড়ল আমাদের কাম্পু উপত্যকায়। আমাদের কাম্পু উপত্যকা ছিল সব দিক থেকেই অগ্রসর ও সমৃদ্ধ। এখানে স্কুল,কলেজ,হাসপাতাল সবই আছে। আমার আব্বা আবুবকর বায়ার অক্লান্ত চেষ্টার ফল ছিল এগুলো।

খৃষ্টান মিশনারীরা এখানে স্কুল, হাসপাতাল ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নামে জমি কেনা শুরু করল। আমার আব্বা যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন ওরা এটা পারেনি। কিন্তু আব্বা হঠাৎ একদিন খুন হলেন। আমি তখন ছোট। এই খুনকে কেন্দ্র করে যাদেরকে ধরা হলো তারা মুসলিম সম্প্রদায়ের বড় বড় প্রভাবশালী লোক। খৃষ্টান মিশনারীরা প্রশাসনের ওপর প্রভাব খাটিয়ে এটা করল। শুরু হলো ষড়যন্ত্রের যাত্রা আমাদের উপত্যকায়। নানা ভাবে মানুষকে মামলায় জড়িয়ে, বিপদে ফেলে তাদেরকে খৃষ্টানদের কাছে জমি বিক্রিতে বাধ্য করতে লাগল। ধীরে ধীরে ওদের ষড়যন্ত্র গ্রাস করল আমাদের গোটা কাম্পু উপত্যকা। মুসলমানরা জায়গা-জমি হারিয়ে, মারামারি, খুন ইত্যাদি মামলার শিকার হয়ে

উপত্যকা থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলো। সর্বশেষে হাত পড়ল আমাদের ওপর। কাম্পু উপত্যকায় আমাদের মোট দশ হাজার একর জমি আছে। এই জমির উপর এসে পড়ল ওদের চোখ। এ জমিটুকু তারা দখল করতে পারলে গোটা দক্ষিণ ক্যামেরুন মুসলিম শূণ্য হয়ে যায়। আমি তখন কলেজে উঠেছি। ওরা এসে সরাসরি আমাকে প্রস্তাব করলো, জমিটা বিক্রি করে দিতে। ওরা স্পষ্ট জানাল যে, আমরা চেষ্টা করলেও এই উপত্যকায় আর বাস করতে পারবো না।

আমি জমি বিক্রি করতে সম্মত হলাম না। ওদের তরফ থেকে হুমকি আসতে লাগল। বলাবলি হতে লাগল, হয় আমি আমার আব্বার মত খুন হবো, নয়তো ওরা কিডন্যাপ করে জোর করে জমি লিখিয়ে নেবে, যেমন অনেকের নিয়েছে। আম্মাকে নিয়ে আমি পালালাম। কাম্পু থেকে চলে এলাম উত্তর ক্যামেরুনের কুম্বা উপত্যকায় আমার দুর সম্পর্কের এক স্বজনের কাছে। ওরা আমার সব জমি-জিরাত ও ঘর-বাড়ী দখল করে নিল। আমি মামলা করলাম। এই মামলা আমার জন্যে কাল হয়ে দাঁড়াল। ওদের ষড়যন্ত্র কুম্বাতেও এসে পৌঁছাল। শুরু হলো আমাকে কিডন্যাপ অথবা হত্যা করার চেষ্টা। একদিন রাতে আমার বাড়ী আক্রান্ত হলো। আমি প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছিলাম, কিন্তু আমার মাকে ওরা খুন করে যায়। আমি কোর্টে নিরাপত্তার জন্য আপিল করলাম। কিন্তু পরে কোর্টে যাওয়াই আমার জন্য দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াল। উপায়ান্তর না দেখে আমাকে ক্যামেরুন ছাড়তে হলো। চলে এলাম ফ্রান্সে। এখানে একটি ল' কর্মীকে আমি আমার মামলা পরিচালনার জন্য নিয়োগ করলাম। ওরা জানতে পারলো সব। ছুটে এল ওরা ফ্রান্সে। খুঁজে বের করলো ওরা আমাকে। শুরু হয়ে গেল সেই খুন করা অথবে কিডন্যাপ করার পুরানো প্রচেষ্টা। কিডন্যাপের একটা প্রচেষ্টা আপনি নিজ চোখেই দেখেছেন এবং আমাকে বাঁচিয়েছেন।

থামল ওমর বায়া।

আহমদ মুসা গোগ্রাসে গিলছিল ওমর বায়ার কাহিনী। তার মন বেদনায় ভরে গেল। তার চোখে ভেসে উঠল কাম্পু উপত্যকার দৃশ্য। যেন কানে শুনতে পেল সে ভিটে মাটি ছেড়ে পালানো এবং খুন হয়ে যাওয়া হাজারো মানুষের হাহাকার আর হাহাশ্বাস। এই দুর্ভাগারা কারোরই সাহায্য পায়নি। মার খেয়ে খেয়ে

নিরবে অজানার অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। ওমর বায়া তার কথা শেষ করলেও আহমদ মুসা অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারল না। বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ওমর বায়ার দিকে।

বহুক্ষণ পর একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেলে আহমদ মুসা বলল, ‘তুমি ফ্রান্সে এলে, কিন্তু প্রতিবেশী মুসলিম দেশ নাইজেরিয়ায় তুমি যেতে পারতে।’

‘যেতে পারতাম, কিন্তু সেখানে নিরাপত্তার ভরসা পাইনি। ওখানকার প্রশাসন ও পুলিশে খৃষ্টানরা প্রভাবশালী। ওরা আমাকে নিরাপত্তা দেয়া দুরে থাক, সুযোগ পেলে ক্যামেরুনের সেই ষড়যন্ত্রকারীদের হাতেই তুলে দিত।’ বলল ওমর বায়া।

‘ক্যামেরুনের সেই গ্রুপটির নাম কি যারা তোমার জমি দখল করেছে এবং তোমার বিরুদ্ধে এই ভাবে লেগেছে?’

‘যারা আমাদের জমি দখল করেছে তারা ‘কিংডোম অব ক্রাইম’ নামের একটি সংগঠন। আর যারা ওদের পক্ষে আমাদের পেছনে লেগেছে তারা হলো ‘আর্মি অব ক্রাইম অব ওয়েষ্ট আফ্রিকা’ (AOCOWA)। সংক্ষেপে ওদেরকে ‘ওকুয়া’ বলে ডাকা হয়। এটা খৃষ্টান মিশনারীদের একটা গোপন সন্ত্রাসী সংগঠন। এরা অত্যন্ত শক্তিশালী। এদের চোখ সর্বত্র। অর্থ ও অস্ত্রের এদের অভাব নাই।’

‘এদের হেডকোয়ার্টার কোথায়?’

‘গোপন সংগঠন এটা, কিছুই আমরা জানি না।’

‘আচ্ছা মুসলমানদের ওপর অত্যাচারের কোন বিহিত ক্যামেরুন সরকার করেন না?’

‘খৃষ্টান প্রভাবিত ক্যামেরুন সরকারের সে ক্ষমতা নেই। আর তাছাড়া যে অন্যায়, অবিচার করা হচ্ছে, তা গোপনে এবং আইনের লেবেল এঁটে করা হচ্ছে। মুসলমানদেরকে ঘর-বাড়ি ত্যাগ এবং জমি বিক্রিতে বাধ্য করে হচ্ছে, এটা কিন্তু বাইরের নজরে আসছে না। সবাই দেখছে মুসলমানরা জমি বিক্রি করছে।’

‘এটা চলতে থাকলে তো ক্যামেরুনে অল্পদিনেই মুসলিম শূণ্য হয়ে যাবে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘প্রতিবেশী নিরক্ষীয় গিনি ও গ্যাবনের আদম শুমারীতে মুসলমানদের চিহ্ন নেই। এই ষড়যন্ত্র এখন ক্যামেরুনকেও গ্রাস করতে আসছে। ক্যামেরুনে খৃষ্টানদের সংখ্যা ইতিমধ্যেই শতকরা ৩৩ ভাগে উন্নীত হয়েছে, মুসলমানদের সংখ্যা দেখানো হচ্ছে শতকরা ১৬ ভাগ। এই ১৬ ভাগকে শূন্যে নামানোর চেষ্টা হচ্ছে।’

‘এখানে যারা তোমাকে কিডন্যাপ অথবা হত্যা করার চেষ্টা করছে, তারা এটা সামনেও চালাবে। তোমার পরিকল্পনা কি?’

‘ওদের ভয়ে প্যারিস থেকে পালিয়ে এসেছি পাউ-এ। এরপর আমি কি করব জানি না। আর কত পালাব, পালিয়েই বা লাভ কি?’

‘কোন মুসলিম সংস্থা-সংগঠনের সাহায্য তুমি চাওনি?’

‘প্যারিসে এসে এ ধরনের কোন সংগঠন পাইনি। এসোসিয়েশন জাতীয় যা আছে তারা এ ধরনের ঝুঁকি নিতে চায় না। আমি প্যারিসের UMA (Union of Muslim Association) কে বলেছিলাম। তারা আমাকে কিছু দিনের জন্যে আত্মগোপন করতে বলেছিলেন। তাদের পরামর্শেই আমি পাউ-এ এসেছিলাম।

আহমদ মুসা কথা বলল না। ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, ‘দেখ জরুরী প্রয়োজনে আমাকে চলে যেতে হচ্ছে আগামীকাল। না হলে আমি তোমার সাথে ক্যামেরুনে যেতাম। যাওয়ার চিন্তা আমি বাদ দিচ্ছি না। শুধু ক্যামেরুন নয় ওমর, সাহারার দক্ষিণ প্রান্তের অন্ধকার আফ্রিকা আমাকে ডাকছে। আমি তার কান্না শুনতে পাচ্ছি। আমি সে কান্নার উৎসভূমি গুলোতে যাব। কি করতে পারব আমি জানি না, অন্তত তাদের কান্নার সাথী হতে পারবো তো!’

একটু থামল। ঢোক গিলল আহমদ মুসা।

ওমর বায়া বিস্ময়বিমুগ্ধ চোখে তাকিয়ে ছিল আহমদ মুসার দিকে।

‘আমার কথা তুমি যদি রাখ, তাহলে তোমাকে আমি বলব তুমি ফ্রান্স থেকে ফিলিস্তিন চলে যাও। আপাতত ক্যামেরুনে তোমার ব্যাপারটার কিনারা না হওয়া পর্যন্ত ওখানে থাক।’

‘আমার কেসের ব্যাপারটা কি হবে। আমি এখান থেকে কেসের তদবীরও করছিলাম।’

‘সেটার অসুবিধা হবে না। প্যারিসের ফিলিস্তিন দুতাবাস কারও মাধ্যমে এ কাজ করবে।’

‘তারা কেন করবে? আর আমি ফিলিস্তিনে যাব কি করে? কারা আমাকে আশ্রয় দেবে?’

‘সে চিন্তা তোমার নয়। তুমি আজ রাতেই ফিলিস্তিন দূতাবাসে আশ্রয় নেবার জন্য তৈরি হও। কয়টায় যেতে পারবে তুমি?’

‘একটু সময় লাগবে। রাত দশটা।’

‘ঠিক আছে, আজ রাত দশটায় হোটেলের গাড়ি বারান্দায় ফিলিস্তিন দূতাবাসের গাড়ি তোমার জন্যে অপেক্ষা করবে।’

ওমর বায়ার চোখে তখন রাজ্যের বিস্ময়। তার মনে চিন্তার ঝড়।

কে এই লোক। এমন ভাবে কথা বলছে যেন ফিলিস্তিন দূতাবাস, ফিলিস্তিন সবই তার অধীন।

আমি একটি প্রশ্ন করতে পারি ? চিন্তা করে ধির কন্ঠে বলল ওমর বায়া।

‘অবশ্যই’।

‘আপনি সেদিন যেভাবে আমাকে বাঁচালেন এবং যেভাবে এ কথাগুলো বললেন, তাতে আমি নিশ্চিত আপনি সাধারণ কেউ নন। আমার কথা দ্বায়িত্বশীল অনেক মুসলিম শক্তি কাছে বলেছি কিন্তু তারা এবং আপনি আকাশ পাতাল তফাৎ। আপনি কে আমি কি তা জানতে পারি?

‘ঠিক আছে একটু ধৈর্য ধর। ফিলিস্তিন দূতাবাসে গিয়ে ওদের তুমি জিজ্ঞাসা করো। মুখে এক টুকরো স্নেহের হাসি টেনে বলল আহমদ মুসা।

তারপর আহমদ মুসা বসা থেকে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, ‘তাহলে ওমর বায়া তুমি যাও তৈরী হওগে। ঠিক রাত দশটায় অথবা তার দু’চার মিনিট আগে হোটেলের পার্কিং প্লেসে আসবে।

‘শুকরিয়া জনাব’ বলে ওমর বায়া উঠে দাঁড়াল এবং সালাম দিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে গেল।

আহমদ মুসা আবার এসে বিছানায় গা এলিয়ে দিল।

পর দিন খুব ভোরে ব্রেক ফার্ষ্ট সেরেই প্রথমে এয়ার লাইন অফিসে টেলিফোন করে টিকিট কনফার্ম করল। তারপর টেলিফোন করল মন্টেজুতে ডোনার কাছে, ডোনা, জেন ও জোয়ানের কাছে বিদায় নেবার জন্যে।

টেলিফোন করতে গিয়ে ভাবল আহমদ মুসা, ডোনা যে জেদী মেয়ে কি বলে বসে কে জানে! সে তো জানিয়েই দিয়েছিল, আহমদ মুসা মন্টেজুতে না গেলে সে জেন ও জোয়ান কে ছাড়বেনা।

আহমদ মুসা যেতে পারত মন্টেজুতে। কিন্তু তার মন চায়নি যেতে। ইসলামকে ডোনা অনেক খানিই বুঝেছে, কিন্ত পর্দার কোন বিধি-নিষেধকে সে বিন্দুমাত্রও পাত্তা দেয়নি, এটা আহমদ মুসার জন্যে খুবই অস্বস্তিকর।

'টেলিফোন ধরল ডোনাই। আহমদ মুসার গলা পেয়েই সে চিৎকার করে উঠল, আমরা এ দিকে ভেবে সারা। কখন পৌছেছেন ফ্রান্সে? কখন পৌছবেন মন্টেজুতে ? জেন ও জোয়ান ভাল আছে। ওদের হানিমুনে পাঠিয়েছিলাম সুইজারল্যান্ডে, গত রাতে ফিরে এসেছে।

এতগুলো কথা বলে দম নিল ডোনা।

আহমদ মুসা অত্যন্ত নরম ভাষায় অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে ডোনাকে জানাল যে সে আজ দশটার মধ্যে এশিয়া চলে যাচ্ছে, মন্টেজুতে যেতে সে পারছে না।

শুনেই ডোনা না না করে উঠল। বলল, আমি কোন কথাই শুনব না।

উত্তরে আহমদ মুসা তার অপারগতার জন্যে ডোনার কাছে দুঃখ প্রকাশ করল।

ওপার থেকে ডোনার আর কোন কথা শোনা গেল না। আহমদ মুসা এপার থেকে হ্যালো হ্যালো করে চলল।

বেশ কিছুকক্ষণ পর ওপার থেকে জেনের গলা পাওয়া গেল। সে সালাম দিয়ে বলল আপনি কোথা থেকে ভাইয়া? ডোনার কি হয়েছে? ওর চোখে পানি, জলভরা মেঘের মত মুখ?

আহমদ মুসা জেনকে সব কথা জানিয়ে বলল, তোমার সাথেও দেখা করতে পারলাম না।

কেন?

আজ দশটার প্লেনে না গেলে আবার কয়েক দিন দেরী হয়ে যাবে। কিন্তু এতটা দেরী আমি করতে পারছি না।

কিন্তু ডোনা তো আমাদের আটকে রেখেছে, আপনি না এলে কিছুতেই ছাড়বে না আমাদের।

‘ডোনা ছেলে মানুষ। পিতা-মাথার একমাত্র সন্তান। জেদী খুব। কিন্তু ভাল মেয়ে। ওকে দাও, বুঝিয়ে বলি ওকে।

জেন রিসিভার থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে ডাকতে লাগল ডোনাকে। আহমদ মুসা শুনতে পাচ্ছিল ডাক। এরপর জেন রিসিভার রেখে চলে গেল ডোনাকে আনতে।

বেশ কিছুকক্ষণ পর জেনের কন্ঠ শুনা গেল টেলিফোনে। স্যরি ভাইয়া ডোনা কিছুতেই এলোনা টেলিফোনে। ভীষন রাগ করেছে।

‘দুঃখিত জেন। আমার অবস্থার কথা ডোনা জানে না। জানলে সে রাগ করতো না আমি নিশ্চিত। এটাই আমার শান্ত্বনা। শুন জেন, আমি ট্রিয়েষ্টে টেলিফোন করেছিলাম। তোমাদেরকে দু’চার দিনের মধ্যেই পৌছতে হবে ট্রিয়েষ্টে। খুব খোলামেলা না হয়ে সতর্কতার সাথে তোমাদের ট্রিয়েষ্টে পৌছতে হবে। আর সেখানে তোমাদের চাকুরীর নাম ভিন্ন হবে। ওখানে গেলেই তা জানতে পারবে। আর সে ভিন্ন নামের সিটিজেনশীপ হবে ফিলিস্তিনের। নতুন পাসপোর্ট পাবে ওখানে গেলেই। খবরদার স্পেনের পাসপোর্ট নষ্ট করবে না।

‘ধন্যবাদ মুসা ভাই’ আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবি করুন, ভাই-বোনদের এভাবে ধন্য করার জন্যে। কিন্তু ভাইয়া আমরা কিছুই করতে পারলামনা আপনার জন্যে।

‘এভাবে কথা বল না, জাতির জন্যে যা করার সেটাই আমার জন্যে করা হবে। জোয়ান কোথায়? কথা হলোনা, তাকেও সালাম দিও।

‘তাহলে এখানেই শেষ? আবার কবে দেখা হবে ভাইয়া ?

‘এটা তুমিও যেমন বলতে পার না, আমিও বলতে পারি না।’ বলে সালাম দিয়ে টেলিফোন রেখে দিল আহমদ মুসা।

তখন সকাল ৮টা পার হয়ে গেছে।

আহমদ মুসার ব্যাগ গোছানো শেষ।

চেক আউট করার জন্যে বেল বয়কে ডেকে পাঠিয়েছে। নিচে গিয়ে হোটেলের বিল পরিশোধ করেই চলে যাবে।

আহমদ মুসা বসে আছে এক চেয়ারে। সামনের সোফায় বসে আছে সুমাইয়া এবং তার আব্বা। ওরা এসেছে বেশ আগে 'সি অফ' করার জন্যে।

সবাই বসে অপেক্ষা করছে বেল বয়ের।

রুমের কলিং বেল বেজে উঠল।

আহমদ মুসা বুঝলো বেল বয় এসেছে। বলল, এস খোলা আছে।

দরজা ঠেলে প্রবেশ করল বেল বয় নয়, জেন, জোয়ান এবং ডোনা।

ভূত দেখার মতো আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। তার ঠোঁট দু'টি ঠেলেই যেন শব্দ বেরিয়ে এল, জেন, জোয়ান, ডোনা তোমরা।

বিস্ময়ে হা হয়ে গেছে যেন আহমদ মুসার মুখ।

জেনের পরনে লম্বা স্কার্ট, গায়ে কোট। মাথায় ও গলায় পেছানো রুমাল। শুধু মুখ ও হাতটুকুই খোলা। ডোনার পরনে ফুল প্যান্ট, গাঁয়ে শার্ট (মাথা খোলা)।

জেন ও জোয়ানের মুখ ম্লান, অপ্রস্তুতভাব। কিন্তু ডোনার থমথমে মুখে একটা বেপরোয়া ভাব।

'মুসা ভাই, ডোনা আসছে দেখে তার গাড়ীতে আমরা চড়ে বসেছি।' আহমদ মুসার বিস্মিত উক্তির জবাবে বলল জেন।

জোয়ানের মুখ শুকনো, বিব্রতভাব। ভাবছে সে এভাবে আসা ঠিক হয় নি।

আহমদ মুসার মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠল। বলল, ভালই করেছ তোমরা, দেখা হলো। দেখা না করে যেতে খারাপই লাগছিল।

ডোনা নির্বাক। থমথমে মুখ তার। স্থির দৃষ্টি আহমদ মুসার মুখে।

আহমদ মুসা ডোনার দিকে ফিরে ঠোঁটে হাসি টেনে বলল, 'খুব রাগ করেছ ডোনা ?

‘আপনি মন্টেজু চলুন। টিকিট থাক। আমি টিকিট করে দেব। আবেগ-প্রকম্পিত কন্ঠে বলল ডোনা।

আহমদ মুসার মুখে স্বচ্ছ এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল। সে ব্যাগের পকেট থেকে চার ভাঁজ করা একটা চিঠি বের করে ডোনার হাতে তুলে দিল।

ডোনা প্রকম্পিত হাতে চিঠি নিয়ে পড়তে লাগল।

পড়ে চোখ বন্ধ করল ডোনা।

বন্ধ চোখ থেকে চোখের পাতার বাঁধন ভেঙে নেমে এলো অশ্রুর ধারা।

আহমদ মুসা জেন এবং জোয়ানকে লক্ষ্য করে বলল, জোয়ান সিংকিয়াং-এ বিপর্যয় ঘটে গেছে। সব লন্ড ভন্ড হয়ে গেছে ওখানে। তোমাদের ভাবীর আব্বা-আম্মা নিহত, তোমাদের ভাবী নিখোঁজ।

কথা শোনার সাথে সাথে জোয়ান ও জেনের মুখের আলো দপ করে নিভে গেল। ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টি তাদের আহমদ মুসার ওপর নিবন্ধ। মুখে কোন কথা নেই তাদের। যেন বোবা হয়ে গেছে।

অবাক বিস্ময়ে এ দৃশ্য দেখছে সুমাইয়া এবং তার আব্বা। সুমাইয়া পরিষ্কারই বুঝল, আগন্তুকরা সকলেই এ বিস্ময়কর লোকটির অত্যন্ত ঘনিষ্ট। কিন্তু এরা কারা। বিশেষ করে ডোনার কথা ভাবছে সুমাইয়া। মেয়েটি কে? তার সাথে কি সম্পর্ক? মেয়েটির মুখ, তার চোখের জল সুমাইয়ার হৃদয়ের কোথায় যেন একটা বেদনার সৃষ্টি করেছে। সে বেদনার সাথে ঈর্ষার তীক্ষন একটা সুরও বাজছে। চমকে উঠল সুমাইয়া।

রুমের কলিং বেল আবার বাজল।

বেল বয় প্রবেশ করল ঘরে।

সবাই বেরিয়ে এল কক্ষ থেকে।

ডোনা চোখের পানি মুছে ফেলেছে। মুখটা তার শান্ত কিন্তু থমথমে।

আহমদ মুসা লাউঞ্জে নেমে বিল কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়াল। আহমদ মুসার সাথে জেন, জোয়ান, ডোনা, সুমাইয়া সকলেই।

আহমদ মুসা দাঁড়াতেই কম্পিউটারের সামনে বসা লোকটি গুডমর্নিং জানিয়ে বলল, 'সব রেডি স্যার।' বলে একটা বোতাম টিপে একটা লম্বা একাউন্টস স্লিপ বের করে আনল। তারপর ওটা তুলে ধরল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা হাত বাড়িয়ে কাগজটি ধরে ফেলার আগেই ডোনা ছোঁ মেরে কাগজটি নিয়ে নিল। তারপর কাগজের দিকে নজর বুলিয়েই পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করল। গুনতে লাগল টাকা।

'কি করছ ডোনা?' বলে আহমদ মুসা এক ছোঁ মেরে মানিব্যাগটি কেড়ে নিল ডোনার হাত থেকে।

ডোনা একবার মুখ ফিরিয়ে তাকাল। কিছু বলল না। তার মুখ গম্ভীর। তারপর সে হিপ পকেট থেকে আরও কতগুলো নোট বের করল এবং গুণে ৭ হাজার ফ্রাঙ্ক তুলে দিল বিল-ক্লার্কের হাতে।

এবার আহমদ মুসা কোন বাধা দিলনা। জেদী মেয়েটি আবার কোন কাণ্ড করে বসে কে জানে। আহমদ মুসা খুবই বিব্রত বোধ করছে ডোনাকে নিয়ে।

লাউঞ্জ থেকে কারপার্কে এল ওরা সকলে। গাড়ী রয়েছে সুমাইয়ার ও ডোনার। ভাড়া গাড়ী আর ডাকতে হলোনা।

কারপার্কে এসেই আহমদ মুসা বলল, 'ওহো, তোমাদের তো পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়নি।' বলে আহমদ মুসা জেন, জোয়ান ও ডোনার সাথে সুমাইয়া ও সুমাইয়ার আব্বাকে পরিচয় করিয়ে দিল।

পরিচয় শেষে সুমাইয়ার সাথে সুমাইয়ার গাড়িতে উঠল জেন ও ডোনা। আর ডোনার গাড়িতে উঠল আহমদ মুসা, জোয়ান এবং সুমাইয়ার আব্বা। এই ভাবে ভাগটা আহমদ মুসাই করে দিয়েছিল।

ভাগটা পছন্দ হয়নি ডোনার, তবু সে খুশী যে, আহমদ মুসা তার গাড়ি ড্রাইভ করছে।

বিমান বন্দরে যখন আহমদ মুসারা নামল, তখন বেলা ৯ টা। সময় নেই। বিমান বন্দরে অনেক ফর্মালিটিজ বাকী।

গাড়ি থেকে নেমেই আহমদ মুসা পকেট থেকে ফিল্মে র একটি রীল বের করে সুমাইয়ার দিকে তুলে ধরে বলল, ‘নাও সুমাইয়া, তোমার ফিল্ম আটকে রেখেছিলাম কয়দিন। মাফ করে দিও।’

ফিল্ম টি হাতে নিয়ে সুমাইয়া বিস্ময় ভরা চোখে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আপনি আহমদ মুসা’ এ পরিচয় জানালে কি ক্ষতি হতো বলুনতো? খুবই বেদনা লাগছে আপনি আমাদের বিশ্বাস করেন নি।

অভিমান ফুটে উঠল সুমাইয়ার কণ্ঠে।

‘অবিশ্বাস নয় সুমাইয়া, এটা সতর্কতা। ভেবে দেখলে বুঝবে এর প্রয়োজন ছিল’ আহমদ মুসা হাসতে হাসতে বলল।

সুমাইয়ার কথা শোনার পর বিস্ময়বিমূঢ় দৃষ্টিতে সুমাইয়ার আব্বা তাকিয়েছিল আহমদ মুসার দিকে। হতবাক সে, কোন কথা সরছে না তার কণ্ঠ থেকে। দু’চোখ গোগ্রাসে যেন গিলছে আহমদ মুসাকে।

আহমদ মুসা জেন ও জোয়ানের দিকে ফিরে বলল, ‘যা বলেছি তোমরা মনে রেখ, সেই ভাবে কাজ করবে।’

‘আপনার সাথে আর দেখা হবে না, যোগাযোগ করতে পারবো না?’ কাঁদো কাঁদো কণ্ঠ জোয়ানের।

‘জোয়ান, তুমি বিজ্ঞানী। সৃষ্টিতে বন্ধনের মধ্যেও বিচ্ছিন্নতা আছে।’

বিষণ্ন হেসে বলল আহমদ মুসা।

‘এই দেখা, এত ঘটনা না হলেই ভাল হতো।’ বলল জেন ম্লান কণ্ঠে।

‘যে জীবন নাট্যের আমরা নট, তার প্রণেতা-পরিচালক তো আমরা নই।’

বলে আহমদ মুসা ডোনার দিকে ঘুরল।

পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ডোনা। যেন অনুভুতি তার ভোতা হয়ে গেছে।

আহমদ মুসা পকেট থেকে ডোনার মানিব্যাগ বের করে ডোনার দিকে তুলে ধরে বলল, ‘তোমাদের কাছে অনেক ঋণী আমি ডোনা। অনেক করেছ তোমরা আমাদের জন্যে। দুঃখিত আমি, যাবার সময় তোমার আব্বার সাথে দেখা হলো না।’

মানিব্যাগ নেবার জন্যে হাত না বাড়িয়ে বলল ডোনা, ‘ যদি আমি বলি ওটা আপনার কাছে থাক।’ অত্যন্ত ভেজা কণ্ঠে বলল ডোনা।

‘আমি কপর্দকহীন ডোনা।’ নিজের বলতে দুনিয়ায় আমার কিছু নেই। তাই বলেই হয়তো গোটা ইসলামী দুনিয়ার সম্পদ আমার সম্পদ। সত্যিই টাকার কোন প্রয়োজন আমার নেই।

‘আমি ইসলামী দুনিয়ার মধ্যে পড়ি না। তবু আমার এ মানিব্যাগ কি আপনার হতে পারে না? খুব ছোট জিনিস। কিন্তু তাছাড়া তো দেবার কিছু নেই, নেবারও কিছু নেই।’

‘ঋণ বাড়াতে চাও বুঝি?’ হেসে বলল আহমদ মুসা।

‘বাড়াতে চাই এই আশায়, ঋণ গ্রহিতা যদি আসেন ঋণ পরিশোধের জন্যে।’

বলেই ডোনা দু’হাতে মুখ ঢেকে দৌড় দিল গাড়ির দিকে।

আহমদ মুসা ডোনার মানিব্যাগ থেকে টাকা গুলো বের করে জোয়ানের হাতে তুলে দিল এবং মানিব্যাগটা নিজের পকেটে রাখল। বলল, ‘ডোনাকে বলো না যে, টাকা গুলো তোমাদের দিয়ে গেলাম।’

আহমদ মুসা তারপর জেন, জোয়ান, সুমাইয়া ও সুমাইয়ার আব্বার কাছে বিদায় নিয়ে ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে বিমান বন্দরের লাউঞ্জের দিকে এগুলো। দরজায় গিয়েও একবার পেছনে তাকালো না সে। ঢুকে গেল লাউঞ্জে।

‘জগতের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী, কিন্তু মনটা মোমের মত নরম। পেছনে ফিরে তাকাতে পারলো না একবারও।’ অনেকটা স্বাগত কণ্ঠে বলল সুমাইয়ার আব্বা।

জেন, জোয়ান ও সুমাইয়া তাকালো সুমাইয়ার আব্বার দিকে। পানি ঝরছিল জেন ও জোয়ানের চোখ দিয়ে। সুমাইয়ার চোখও ভেজা।

‘জনাব, আহমদ মুসা কখনই পেছনে ফিরে তাকান না, থামবার তাঁর অবসর নেই।’ ধীর কণ্ঠে বলল জোয়ান।

‘ঠিক, কিন্তু পেছনের স্মৃতিকে তিনি ভয়ও করেন। ভয়টা তার নিজে ভেঙ্গে পড়ার ভয়।’

‘হবে হয়তো। মাঝে মাঝে বিপ্লবী আহমদ মুসার চেয়ে মায়া মমতায় জড়ানো গৃহাঙ্গনের আহমদ মুসাকে মহত্তর বলে মনে হয়।’ হাসল জোয়ান।

সবাই তারা পা বাড়াল গাড়ীর দিকে।

ডোনার গাড়ীর কাছে এসে তারা দেখতে পেল, ডোনা তার গাড়ির সিটে মুখ গুজে পড়ে আছে। মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে উঠছে ডোনার দেহ। কাঁদছে সে।

# ২

উংফু এভেনিউয়ের গা ঘেঁষে দাঁড়ানো বিশাল একটা বাড়ি। বাড়িটা পুরানো হলেও খুব সুন্দর। মাও সেতুং এর বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত সিংকিয়াং মুসলিম বোর্ডের প্রধান অফিস ছিল এটা। তখন কার্যত মুসলমানরা স্বাধীন ভাবেই তাদের শাসন কাজ পরিচালনা করতো। এই উরুমচি ছিল তাদের রাজধানী। আর বোর্ড অফিস ছিল তাদের ধর্মীয় বিষয়াবলী পরিচালনার কেন্দ্র। মাও সেতুং ক্ষমতায় আসার পর ছলে-বলে, নানা কৌশলে মুসলমানদের হাত থেকে শাসন ক্ষমতা যেমন কেড়ে নেয়, তেমনি উল্লেখযোগ্য অনেক ধর্মীয় কেন্দ্রও তারা দখল করে নেয়। এই সময় মুসলিম বোর্ড অফিসও কম্যুনিস্টদের হাতে চলে যায়। তারপর মাও সেতুং-এর যুগ শেষ হলে পরবর্তী সরকার এক সময় অন্যান্য ধর্মীয় স্থান ছেড়ে দেয়, এর সাথে এই বোর্ড অফিসও ছাড়া পায়। ধর্মীয় বোর্ডের কাজ আবার চালু হয়। কিন্তু গভর্নর হিউ ইউয়ান ক্ষমতাচ্যুত হবার পর রেড ড্যাগন এই বাড়িটা দখল করে নেয়। এখন রেড ড্যাগনের পশ্চিমাঞ্চলীয় হেড কোয়ার্টার এটা।

বাড়িটার সামনে বিরাট এক উম্মুক্ত লন। আগে এখানে একটা সুন্দর বাগান ছিল। রেড ড্যাগনরা বাগানটিকে এখন একটা পার্কিং প্লেসে পরিণত করেছে। বাড়ির সামনে কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

রেড ড্যাগনের এই হেড কোয়ার্টারে জেনারেল বরিস ও 'ফ্র' এসে আড্ডা গেড়েছে। বস্তুত সিংকিয়াং এর গভর্নর লি ইউয়ানের ক্ষমতাচ্যুতি ও সিংকিয়াং এর মুসলিম বিরোধী বর্তমান পরিবর্তনের জন্যে মুলত রেড ড্যাগন 'ফ্র' –ই দায়ী। রেড ড্যাগনের প্রধান ডাঃ মাও ওয়াং এবং 'ফ্র' এর প্রধান জেনারেল বরিস নিজেরা নানা ভাবে এবং নানা জনকে দিয়ে বেইজিং সরকারকে বুঝিয়েছেন যে, সিংকিয়াং –এর গভর্নর লি ইউয়ান কাজাখ বংশোদ্ভূত। সে হান মেয়েকে বিয়ে করে কম্যুনিস্ট হওয়ার কথা বললেও সে একজন মুসলমান। সে তার একমাত্র মেয়ে জেনকে বিয়ে দিয়েছে সিংকিয়াং এর মুসলিম বিপ্লবী সংগঠন 'এম্পায়ার

গ্রুপ’ –এর নেতা আহমদ ইয়াংয়ের সাথে। এখন গভর্নর তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে মুসলমানদের সংঘবদ্ধ ও পুনর্বাসিত করার কাজে। সে ক্ষমতায় থাকলে খুব অল্প সময়েই সিংকিয়াং স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে যাবে।

বেইজিং এর পরিবর্তিত সরকার রেড ড্যাগনের অনেকটা চাপের মুখেই সিংকিয়াং এর গভর্নর লি ইউয়ানকে ক্ষমতাচ্যুত ও তাকেসহ তার পরিবারকে গ্রেফতার করে। নতুন গভর্নর হন লি পিং। খাঁটি হান। দৃশ্যত সে কট্টরপন্থী কম্যুনিষ্ট। কিন্তু মনে মনে সে সংস্কারবাদী-দেংজিয়াও পিং অনুসারী।

এই পরিবর্তনের সুযোগে রেড ড্রাগন এবং ‘ফ্র’ সন্ত্রাসের ঝড় বইয়ে দেয় গোটা সিংকিয়াং-এ। হত্যা করা হয় শত শত নেতৃস্থানীয় লোককে, বিরাণ হয় অসংখ্য মুসলিম জনপদ। মুসলমানদের উচ্ছেদ করে সেখানে এনে বসানো হয় হানদের।

উন্মুক্ত লনের মধ্য দিয়ে সামনে এগুলে উঁচু বারান্দা। বারান্দার পরেই বিশাল হলরুম। রেড ড্রাগন হেড কোয়ার্টারের অভ্যর্থনা কক্ষ এটা। কক্ষের ওপারে কক্ষের লম্বালম্বি একটা করিডোর। করিডোরটা দু’পাশে এবং সামনে প্রলম্বিত। দু’পাশে করিডোরের দুই প্রান্ত দিয়ে দুইটি সিড়ি দু’তলার উঠে গেছে। অভ্যর্থনা কক্ষের ঠিক উপরেই দু’তলায় ডাঃ মাও ওয়াং এর অফিস। জেনারেল বরিসের অফিসও এর পাশেই।

জেনারেল বরিস তার অফিসে বসে।

সামনেই একটা অয়াররেস সেট।

বামপাশের র‌্যাকে দুটা টেলিফোন।

তার মাথার হ্যাটটিও র‌্যাকের ওপর শোভা পাচ্ছে। পরণে কাল সুট।

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কোর্টের বাম হাতটি বেঢপভাবে ঝুলছে। এর কারণ, জেনারেল বরিসের কনুই থেকে বাম হাতটি কেটে ফেলা।

মেইলিগুলির বাড়িতে আহমদ মুসাকে কিডন্যাপ করতে গিয়ে জেনারেল বরিস এই হাতটি হারায়।

জেনারেল বরিস টেলিফোনে কথা বলছিল।

টেলিফোন রাখতেই ঘরে প্রবেশ করল ডঃ মাও ওয়াং। তার মুখ কিছুটা বিষণ্ন।

জেনারেল বরিস উঠে দাঁড়িয়ে সাগ্রহে তার সাথে করমর্দন করে বলল, 'কি খবর মিঃ ওয়াং?'

মাও ওয়াং ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল।

'হারামজাদার বাচ্চা, ক্ষমতায় বসেই সব ভুলে গেছে।' মুখ ফসকেই যেন কথাগুলো বেরিয়ে এল ডাঃ মাও ওয়াং এর মুখ থেকে।

কুইনাইন খাওয়ার মত বাঁকা ডাঃ ওয়াং এর মুখ।

'কি ব্যাপার ওয়াং, খারাপ কিছু ঘটেছে?' মুখ কালো করে বলল জেনারেল বরিস।

'কি আর ঘটবে! ব্যাটা গভর্নরের বাচ্চা লিপিং বলছে কিনা, লি ইউয়ান সরকারের হাতে বন্দী। তার এবং তার পরিবারের বিচার সরকারই করবে।'

'কেমন করে সরকারের হাতে বন্দী হলো? আমাদের লোকরাই তো তাকে এবং তার পরিবারকে আটক করেছিল। আমরা তা না করলে সরকারী বাহিনী হুকুম পেয়ে আসলে লি ইউয়ান তার পরিবার নিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যেতে পারতো।'

'তুমি ভুল বলছ জেনারেল। হুকুম পেলেও সিংকিয়াং এর সে সময়ের কমান্ড সরকারের আদেশ পালন করতো না। লি ইউয়ান তার লোক দিয়েই সরকারী বাহিনীর কমান্ড সাজিয়েছিল। দেখনি, সব জানার পরেও ওরা আমাদের বাঁধা দিয়েছে, আমাদের পাঁচ জন লোককে হত্যা করেছে। ওরা সময় পেলে আমাদেরকেও পাকড়াও করতো। বেইজিং থেকে নতুন বাহিনী না এলে কিছুই করা যেত না।'

'ঠিক বলেছেন, এ সব কথা তো গভর্নর লি পিং-এর ভুলে যাবার কথা নয়।'

'কুত্তার বাচ্চা এখন আইনের কথা বলে।'

'আইন কি? আমাদের বন্দী আমাদের হাতে ছেড়ে দেবে।'

'আমাদের ভুল হয়েছে। কুত্তার বাচ্চাদের হাতে ওদের দেয়াই আমাদের ঠিক হয়নি। সেই গন্ডগোলের মধ্যে ওদের সবাইকে নিকেশ করা আমাদের উচিত ছিল।'

'ব্যাপারটা আমরা বেইজিংকে বলতে পারি না?'

'কোন লাভ হবে না। সব শিয়ালের এক রা। মতব্বরী ফলাবার সুযোগ পেয়েছে, ছাড়বে কেন?'

'তাহলে?'

'তাহলে....।' টেবিলে মুষ্টাঘাতের সাথে কথাটা বলল ডাঃ ওয়াং, 'লি ইউয়ান ও তার পরিবারের কাউকেই ছাড়বো না। চিবিয়ে খাব সবাইকে। বেইজিং এর সে সময়ের সরকারকে ফুসলিয়ে সে আমাদের যে সর্বনাশ করেছে তার একটিও ভুলিনি। শিহেজী উপত্যকায় আমাদের বাড়া ভাতে সে ছাই দিয়েছে। সিংকিয়াং-এ আমাদের আসার দরজা সে বন্ধ করে দিয়েছিল। এর প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত আমার রক্ত শান্ত হবে না।'

'কিভাবে?'

হো হো করে হেসে উঠল ডাঃ ওয়াং। বলল, 'তোমার মুখে এমন হতাশা তো মানায় না জেনারেল। শয়তানরা এক দরজা বন্ধ করেছে, সব দরজা বন্ধ করতে পারেনি। কারাগার থেকে লি ইউয়ানদের কিডন্যাপ করব। বন্দীদের বশ করতে কিংবা কাবু করতে ডাঃ ওয়াং- এর গায়ে তেমন বাতাসও লাগবে না।'

জেনারেল বরিসের চোখ এবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'তোমার সাথে আমি একমত ওয়াং। আমার খুব খুশী লাগছে। এমন ভাবে জয় করে নিয়ে শিকার করার মধ্যে আনন্দ আছে।'

একটু থামল জেনারেল বরিস। তারপর বলল, 'আমার একটা দুঃখ ওয়াং, মেইলিগুলিকে আমি আটকাতে পারলাম না। ওকে আটকাতে পারলে আহমদ মুসাকে হাতের মুঠোয় আনা যেত।'

'শুধু দুঃখ বলছ জেনারেল। এটা তো রীতিমত বিপর্যয়। এক আহমদ মুসা শত সিংকিয়াং-এর সমান। কিন্তু মেইলিগুলি পালাল কি করে?'

‘বাড়ির চারদিকটা ঘিরে সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে আকস্মিকভাবেই মেইলিগুলির ঘরে প্রবেশ করি। ঘরে মেইলিগুলি এবং তার আব্বা পেছন দরজার দিকে যায়। সংগে সংগে আমি গুলি করি। গুলি তার লাগে। সে দরজার ওপারে পড়ে যায়। এই সময় মেইলিগুলির বাবা মা আমার পথ রোধ করে দাঁড়ায়। বাধা দুর করার জন্যে অবশেষে দু’জনকেই হত্যা করতে হয়। কিন্তু দরজার কাছে গিয়ে দেখি দরজা বন্ধ। বুঝলাম, দরজার এপারে আমাকে আটকিয়ে সে পালিয়েছে।

ছুটলাম তখন অন্য পথের সন্ধানে। এতে সময় খরচ হলো মিনিট খানেকের মত। যখন বাড়ির পেছনের বাগানে গিয়ে পৌছলাম, ঐ সময়ে বাগানের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে মেশিনগানের গুলি শুরু হলো। বুঝলাম, আহত মেইলিগুলি প্রাচীর ডিঙিয়ে পালাতে পারেনি। এখন সে বাঁচার শেষ চেষ্টা করছে। হাসি পেল আমার। প্রাচীরের বাইরে যারা পাহারায় ছিল, তাদেরকেও আমি প্রাচীরের ওপার থেকে তাকে ঘিরে ফেলতে নির্দেশ দিলাম, যাতে প্রাচীর ডিঙিয়ে কোনও ভাবে ও পালাতে না পারে। ওর গুলি ফুরিয়ে যাবে এই ভেবে আমরা ধীরে সুস্থে এগুলাম। এক সময় গুলি সত্যিই থেমে গেল। বিভিন্ন দিক থেকে আমরা হামাগুড়ি দিয়ে এগুলাম। যখন কাছাকাছি পৌছলাম, আমার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। দেখলাম মা-চু, মেইলিগুলি নিয়োজিত আহমদ মুসার রক্ষী, একটা পাথরের ওপর নির্বিকার ভাবে বসে আছে।

হতাশা, অপমানে আমার মাথায় আগুন ধরে গেল। আমি গিয়ে রিভলবারের বাট দিয়ে ওর ঘাড়ে একটা আঘাত করে বললাম, ‘বল মেইলিগুলি কোথায়? মা-চু দাঁত বের করে হাসল। বলল, ‘জানেন জেনারেল বরিস, আমাদের নবী (স.) কে মরুর কাফেররা তাঁর ঘর এইভাবে ঘিরেছিল। পরে সকাল হলে ঘরে গিয়ে দেখে হযরত আলী (রা) শুয়ে আছেন, নবী (স) নেই। তখন কাফেররাও হযরত আলীকে এমন ধরণের প্রশ্নই করেছিল। হযরত আলী কি জবাব দিয়েছিল জানেন?’ বুঝলাম সে আমাদের সময় নষ্ট করতে চাইছে, মেইলিগুলিকে পালিয়ে যেতে দেবারই এটা কৌশল। আমি তৎক্ষনাৎ রিভলবার তুলে ওর কপাল বরাবর একটা গুলি করে চিৎকার করে বললাম, ‘বাড়ি ও বাড়ির চারদিকে খোঁজ, পালাতে না পারে যাতে শয়তানী।’

কিন্তু খুঁজে পাওয়া গেল মেইলিগুলিকে নয়, মেইলিগুলি যে পথ দিয়ে পালিয়েছে সেই জায়গা। বাড়ির পেছন দিকে প্রাচীরের ঠিক উত্তর প্রান্তে প্রাচীরের নিচ দিয়ে একটা সুড়ঙ্গ পাওয়া গেল। সুড়ঙ্গের বাইরের মুখটা একটা ছোট ঝোপের আড়ালে লুকানো। মুখে ষ্টিলের একটা সাটার, ভেতর থেকেই বন্ধ ও খোলা যায়। মা-চু মেশিনগানের গুলির শব্দে আমাদের সবাইকে যখন ওদিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, সেই ফাঁকে মেইলিগুলি এদিক দিয়ে পালিয়েছে। রক্তের দাগ অনুসরণ করে দেখলাম, রাস্তায় উঠে সে গাড়ি নিয়ে পালিয়েছে। রাস্তার পেশে এক জায়গায় বেশ রক্ত জমে আছে, কিন্তু তারপর রক্তের চিহ্ন নেই। রাগে-দুঃখে নিজের চুল ছেড়া ছাড়া আর করার কিছুই থাকল না।'

'বলতেই হবে জেনারেল, মেইলিগুলি আহমদ মুসার যোগ্য স্ত্রী। দেখ আহত হবার পর কেমন করে তোমাকে বোকা বানাল। একেবারে যুদ্ধের স্ট্যাটেজী। মা-চু জীবন দিয়ে মেইলিগুলিকে বাঁচার নিরাপদ পথ করে দিল।'

'মা-চু সেনাবাহিনীতে ছিল তুমি জান। সুতরাং কায়দা কৌশল তার অজানা নয়।'

'কায়দার চেয়ে এখানে বড় মা-চু'র ত্যাগ। এই আত্মত্যাগ না থাকলে কৌশল কোন কাজে আসতো না জেনারেল।'

'তুমি ঠিকই বলেছ ওয়াং। মুসলমানরা এদিক দিয়ে সবার শীর্ষে। সোভিয়েত ইউনিয়নে তো আমরা হারলাম তাদের চরিত্রের কাছে।'

'কারণ কি বলত?'

'ওদের ধর্মের লক্ষ্য ওরা বলে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি। ইহকালীন শান্তি বলতে ওরা বুঝে ইসলামকে বিজয়ী করার মাধ্যমে দুনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। এই কাজে কেউ যদি জীবন দেয়, তাহলে পরকালীন মুক্তি সবচেয়ে বেশী নিশ্চিত হয়। শহীদরা ওদের কথায়, সর্বশ্রেষ্ঠ জান্নাত লাভ করে। এই কারণেই তারা হাসতে হাসতে জীবন দিতে পারে, যা আমরা পারিনা।'

ডাঃ ওয়াং কিছু বলতে যাচ্ছিল, এই সময় জেনারেল বরিসের ওয়্যারলেস বিপ বিপ করে সংকেত দিয়ে উঠল।

জেনারেল বরিস ওয়্যারলেসটি তুলে ধরল কানের কাছে।

কথা শুনতে শুনতে তার মুখ বদলে যেতে লাগল। ধীরে ধীরে কঠোর হয়ে উঠল তার মুখ। এক সময় সে হুংকার দিয়ে উঠল, 'সব অপদার্থের দল। আহত একটা মেয়ে লোক যাবে কোথায়? নিশ্চয় তোমাদের বোকা বানিয়ে শিহেজী থেকে আবার সে পালিয়েছে। শুন, যে প্রমাণ পাওয়া গেছে তাতে সে শিহেজীর পথেই পালিয়েছে। উরুমচি-উসু রাস্তা হয়ে পশ্চিমে কোথাও সরে পড়ার দু'টি পথই আছে। উসু-ট্যামেং পথে সে উত্তরে এগিয়ে তারবাগতায় পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে কাজাখস্তানে প্রবেশ করতে পারে। অথবা উসু-জিংগে উতাই পথে পশ্চিমে এগিয়ে হরকেস হয়ে সে সীমান্ত অতিক্রম করতে পারে। আর যদি সে তা না করতে চায় তাহলে এই দুই রাস্তার মধ্যবর্তী অথবা আশে-পাশের কোন পাহাড় উপত্যকায় আশ্রয় নেবে। তোমাদের এসব কিছু তন্ন তন্ন করে খুঁজতে হবে। আর মনে রেখ, কোন ব্যর্থতা আমি দেখতে চাই না।'

কথা শেষ করেই অয়্যারলেস বন্ধ করে টেবিলে রেখে দিল।

'শিহেজীর কি খবর জেনারেল?'

'ভাল। বিনা ঝামেলায় শিহেজী দখল হয়ে গেছে। হানরা ঠিক সময়েই এসে পৌঁছেছিল। শিহেজীতে ওদের বসানো শেষ। সবকিছু ছেড়ে মুসলমানরা আগেই পালিয়েছে। অল্প কিছু ছিল। তাদের গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়া হয়েছে। যারা বেঁকে বসেছিল তাদের জীবন্ত কবর দেয়া হয়েছে। ঐ অপদার্থদের জন্যে বুলেট খরচ ঠিক মনে করা হয়নি। কিন্তু সমস্যা হলো মেইলিগুলিকে পাওয়া যায়নি। অথচ আশা ছিল, ওখানেই তাকে পাওয়া যাবে।'

'এমন চিন্তা করাই ভুল হয়েছে। যার ফলে অন্য কোন দিকে নজর রাখা হয়নি।'

'তবে শয়তানীকে ছাড়ব না ওয়াং। সে যাবে কোথায়। সব এলাকা চষে ফেলব। তাকে না পেলে তো আহমদ মুসাকে পাবনা।'

'কি জেনারেল, আহমদ মুসার জন্যে মেইলিগুলিকে চাও, না মেইলিগুলির জন্যে মেইলিগুলিকে চাও?' ডাঃ ওয়াং-এর ঠোঁটে হাসি।

'না ওয়াং আমি চাই আহমদ মুসাকে। শত সহস্র মেইলিগুলি বাজারে পাওয়া যাবে, কিন্তু আহমদ মুসা দুনিয়াতে একজনই আছে। এই লোকটিকে

দুনিয়ায় রেখে আমি দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে চাই না। এও ঠিক, মেইলিগুলিই একমাত্র মেয়ে যে আমাকে অপমানজনকভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। এর নিকেশ আমি করব, কিন্তু তার আগে আহমদ মুসাকে দুনিয়া থেকে আমি সরিয়ে দিতে চাই। এটা শপথ আমার।'

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আহমদ মুসা পাকা ফলের মত যেন তোমার হাতে এসে পড়ছে।'

'তুমি নিশ্চিত থাক ওয়াং, সিংকিয়াং এর খবর পাওয়ার পর আহমদ মুসা স্পেনে আর একদিনও থাকবে না। তাকে আমি চিনি।'

'তাহলে তো আমাদের সতর্ক হতে হয় জেনারেল?'

'অবশ্যই। তুমি নির্দেশ পাঠাও সিংকিয়াং এর পশ্চিম সীমান্ত বিশেষ করে উত্তরে তারাবাগতাই পাহাড় থেকে দক্ষিণে তিয়েনশান পর্যন্ত গোটা সীমান্তের ওপর চোখ রাখতে হবে। আমার ধারণা, এই অঞ্চল দিয়েই আহমদ মুসা সিংকিয়াং এ প্রবেশ করতে চাইবে। আর সীমান্তের ওপারে আমার লোকদের আমি নির্দেশ দিয়েছি আলমা আতায় কান খাড়া করে রাখার জন্য। আর বিশেষভাবে উসু-টামেং রোডের মুখে ও দরজায় শহর এবং উসু-উতাই রোডের মুখে হরকেস ও পামফিলভ শহরের ওপর নজর রাখতে এবং তৈরী থাকতে।'

'ধন্যবাদ জেনারেল, তোমার সতর্কতা ও প্রস্তুতির জন্যে। আমার লোকদের আমি নির্দেশ পাঠাচ্ছি।'

ডাঃ ওয়াং এর কথা শেষ হতেই ঘরে ঢুকল ডঃ ওয়াং এর পি. এ. মিস নেইলি।

নেইলি'র বয়স বিশ একুশের বেশী হবে না। পরনে মিনি স্কার্ট, গায়ে শার্ট। শার্টের বুকে কোন বোতাম নেই। ঠোঁটে এক টুকরো পোশাকি হাসি।

'স্যার, গভর্ণর হাউজ থেকে একজন অফিসার রিসেপশনে এসেছেন। আপনার সাথে দেখা করতে চান।' বলল নেইলি।

ডাঃ ওয়াং নেইলি'র মাথা থেকে পা পর্যন্ত একবার চোখ বুলিয়ে বলল, 'এই তো স্মার্ট লাগছে।' বলে ডাঃ ওয়াং জেনারেল বরিসের দিকে চেয়ে বলল, নেইলি ক'দিন আগে কাজে যোগ দিয়েছে। তোমার পি.এ. মিস কিয়ান একে

যোগাড় করে দিয়েছে। কাজে ভাল কিন্তু সেকেলে চিন্তার। স্কার্ট কিছুতেই হাটুর ওপর তুলবে না, গলাবন্ধ ফুলহাতা শার্ট ছাড়া পরবে না। আমি বলেছি, চাকুরী করলে এসব সেকেলেপনা চলবে না। দু'দিনে লজ্জার দেয়ালটা ভেংগে দিয়েছি।'

কথা শেষ করে ডাঃ ওয়াং নেইলিকে বলল, ‘কি বললে যেন তুমি?’

নেইলি তার আগের কথার পুনরাবৃত্তি করল।

'গভর্ণর হাউজ থেকে? তুমি ঠিক শুনেছ?'

'জি স্যার।'

'কি ঝামেলা, এইনা আমি ওখান থেকে এলাম।'

'গুরুত্বপূর্ণ কোন ব্যাপার নিশ্চয় ওয়াং।'

'ঠিক আছে এখানেই আসতে বলো।' নির্দেশ দিল ডাঃ ওয়াং নেইলি'কে।

নেইলি চলে গেল ওপাশের কক্ষে- ডাঃ ওয়াং- এর রুমে, তারপর নিজের কক্ষে। তার ঠোঁটে সেই পোশাকি হাসিটি এখন আর নেই, তার বদলে সেখানে একরাশ ঘৃণা।

ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল নেইলি। ইন্টারকমে নির্দেশ দিল গেস্টকে ওপরে পাঠিয়ে দিতে।

অল্পক্ষণ পরেই একজন এ্যাটেনডেন্ট গভর্ণর হাউজ থেকে আসা অফিসারকে নেইলি'র কক্ষে পৌঁছে দিয়ে গেল।

মাঝ বয়সী মানুষ। রাশভারী চেহারা। সবদিক থেকে একজন নিরেট আমলা।

'গুড ইভিনিং স্যার।' উঠে দাঁড়িয়ে নেইলি স্বাগত জানাল অফিসারকে। বলল, 'চলুন স্যার, স্যার জেনারেল বরিসের কক্ষে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

বলে তাকে নিয়ে গেল জেনারেল বরিসের রুমে।

সম্ভাষণ বিনিময় ও আসন গ্রহণ করার পর ডাঃ ওয়াং বলল, মিঃ .........

'আমি চ্যাং ওয়া। গভর্ণরের পলিটিক্যাল সেক্রেটারী।'

'মিঃ চ্যাং ওয়া এখানে কথা বলতে তো অসুবিধা নেই?'

'জ্বি না।'

'তাহলে বলুন। আর তর সইছে না। আমি তো এইমাত্র এলাম গভর্ণরের কাছ থেকে। ভাবছি, গভর্ণরের মন গললো কি না।'

'স্যার এইমাত্র একটা মেসেজ দিয়েছেন আপনাকে পৌঁছে দেয়ার জন্যে।'

'চিঠি?' জানতে চাইল ডাঃ ওয়াং।

'জ্বি হাঁ। বলে মিঃ চ্যাং ওয়া পকেট থেকে একটা মুখ বন্ধ খাম বের করে ডাঃ ওয়াং এর হাতে তুলে দিল। বলল, 'স্যার আমি যেতে পারি?'

'যাবেন? চা যে খাওয়ানো হলো না?'

'ধন্যবাদ স্যার।' বলে উঠে দাঁড়ার চ্যাং ওয়া।

উঠে দাঁড়িয়ে ডাঃ ওয়াং ও জেনারেল বরিস হ্যান্ডসেক করল চ্যাং ওয়া'র সাথে।

বেরিয়ে গেল চ্যাং ওয়া।

ডাঃ ওয়াং ইনভেলাপ থেকে চিঠি বের করল। মেলে ধরল চারভাজ করা চিঠিটি।

টাইপ করা চিঠি।

পড়তে শুরু করল ডাঃ ওয়াং

'প্রিয় ডাঃ ওয়াং,

আমি আদিষ্ট হয়ে আপনাকে জানাচ্ছি, শিহেজী উপত্যকা এবং উরুমুচি শহর সহ ডজন খানেক জনপদে গত কয়েক দিনে যে ঘটনা ঘটেছে তার প্রতি বেইজিং সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এসব স্থান থেকে মুসলমানদের উচ্ছেদ সাধন, তাদের সহায় সম্পত্তি লুণ্ঠন, হত্যাকান্ড সংঘটিত করা, ঐ সব জনপদে হানদের বসানো, ইত্যাদি ঘটনার সাথে সরকারের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। অথচ এই ঘটনা গুলো বাইরে প্রকাশ হয়ে পড়লে সরকারকেই প্রবল চাপের মুখে পড়তে হবে। অতএব আপনাকে এমন কাজ থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করা হচ্ছে, যা বহিঃর্বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এবং যার জন্যে সরকার বেকায়দায় পড়তে পারে। আপনাদের জাতি ও দেশপ্রেম সম্পর্কে

আমাদের কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু জাতিপ্রেম ও দেশ প্রেমের এই ধরণের প্রকাশ দেশ ও জাতির ক্ষতি করতে পারে।

শুভেচ্ছান্তে-

লি পিং

গভর্ণর, সিংকিয়াং।

চিঠিটি সরকারী প্যাডে লেখা এবং চিঠির শেষে যথারীতি সরকারী সিল ছাপ্পর রয়েছে।

চিঠি টেবিলের উপর ছুড়ে ফেলে দিয়ে ডাঃ ওয়াং টেবিলে এক ঘুষি মেরে বলল, 'পার হলে সবাই বলে পাটনি শালা।'

একটু থামল ডাঃ ওয়াং শুরু করল আবার, 'ও সব নীতি কথা আমি জানি না। যদি সাধুই সাজতে হবে তাহলে লি ইউয়ান কি দোষ করেছিল। তাকে বিদায় দেয়া হল কেন? শোন জেনারেল, যা করবার, বুঝতে পারছি, তা তাড়া তাড়িই করে ফেলতে হবে। আমাদের পর্যায়ক্রমিক পরিকল্পনাকে জরুরী কর্মসূচীর রূপ দিতে হবে এবং এটা আজ থেকেই শুরু করতে হবে করতে হবে।'

বলে ডাঃ ওয়াং উত্তেজিতভাবে উঠে দাড়াল। কয়েক পা সামনে এগিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, 'না কি জেনারেল তুমি ভয় পেলে? কথা বললে না যে?'

'তোমার অবস্থান এবং আমার অবস্থান।' বলতে শুরু করল জেনারেল বরিস, 'এক নয় ওয়াং। তবে তুমি শুনে রাখ জেনারেল বরিস একবার সিদ্ধান্ত গ্রহন করলে সেখান থেকে আর ফিরে আসে না।'

'ধন্যবাদ জেনারেল।' বলে ডাঃ অয়াং ঘুরে দাড়িয়ে যাবার জন্য পা বাড়ালো।

অনেক আগেই আহমদ ইয়াং- এর ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। ঘুম ভাঙ্গার সাথে সাথে তার মাথায় এসে ভর করল হাজার চিন্তা। আজ তাদের কারাগার জীবনের দ্বিতীয় রাত। ভেবে পাচ্ছে না কেন এমন হল? বেইজিং এর ক্ষমতার হাত বদল হয়ছে ঠিক, কিন্তু সিংকিয়াং বিশেষ করে তার শ্বশুর লি ইউয়ান তো বেইজিং

এর কোন গ্রুপ পলিটিক্সের সাথেই জড়িত নন। এটা ঠিক যে মুসলমানদের তিনি সুযোগ দিয়েছেন। কিন্তু কোন প্রকার অন্যায় বা বৈষম্য চিন্তা তো সেখানে নেই। হানদের অনেক অন্যায় আবদার তিনি মেনে নেননি ঠিক কিন্তু তাদের প্রতিটি ন্যায্য অধিকার তিনি রক্ষা করেছেন। গৃহনির্মাণ খাতে হানদের তিনি এত সাহায্য করেছেন যে প্রতিটি হান পরিবার আজ নতুন বাড়ির মালিক। লি ইউয়ান প্রথম গভর্নর যিনি সিংকিয়াং এর হানদের মধ্যে কুটির শিল্পের প্রবর্তন ঘটিয়েছেন এবং তাদের প্রতিটি সন্তানের লেখা পড়ার সুযোগ নিশ্চিত করেছেন। এরপরও তার ওপর বিপর্যয় নেমে এল কেন? হঠাৎ আহমদ ইয়াং এর চোখে রেড ড্রাগনের প্রধান ডাঃ ওয়াং এবং 'ফ্র' এর প্রধান জেনারেল বরিসের চিত্র ভেসে উঠল।

সেদিন ভোরে চারটায় যারা গভর্নর ভবনের উপর হামলা চালিয়েছিল সে তো তারা- 'এফ' তাদের বাহিনী। তারাই গভর্নর ও তার পরিবারকে বন্দী করে পরে সরকারী বাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছিল। এটা পরিষ্কার বেইজিং এর পরিকল্পনা ও নির্দেশেই সব হয়েছে, কিন্তু ডাঃ ওয়াং ও জেনারেল বরিসের আগ্রহ বেশী প্রমাণিত হয়েছে। মনে হয় রেড ড্রাগন ও 'ফ্র' বেইজিং এর ঘাড়ে বন্দুক রেখে তাদের কার্যসিদ্ধি করেছে। যদি তাই হয়, তাহলে সিংকিয়াং এর অবস্থা তো আজ ভয়ানক রূপ নিয়েছে।

এই সময় দেওয়াল ঘড়িতে পাঁচটা বাজার শব্দ হলো।

এক ঝটকায় বিছানায় উঠে বসল আহমদ ইয়াং। কি ব্যাপার আযান হলো না! পৌনে পাঁচটায় আজান, কোন আজানের শব্দও কোথা থেকে এল না! শোনা যাবে না এমন তো কোথা নয়। উরুমুচির গোটা আকাশ এ সময় আজানের শব্দে গম গম করে। তাহলে কি হলো আবার! রেড ড্রাগন আর 'ফ্র' এর কালো হাত কি মসজিদের কণ্ঠরোধ করা পরজন্ত বিস্তৃত হয়েছে? মুসলমানদের অবস্থা তাহলে সেখানে কি? ভাবতে গিয়ে বুক কেঁপে উঠল আহমদ ইয়াং- এর।

হতাশ ভাবে আহমদ ইয়াং বিছানায় গা এলিয়ে দিল।

শোবার পর চোখ গিয়ে পড়লো পাশের খাটে শোয়া নেইজেনের ওপর। ভোরের আলো ঘরের অন্ধকারকে অনেক ফিকে করে দিয়েছে। নেইজেন ওপাশ ফিরে শুয়ে আছে। তার দেহটা মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে। নেইজেন কাঁদছে!

জেলখানায় আসার পর থেকেই যেন বোবা হয়ে গেছে নেইজেন। চোখে তার ফ্যাল ফেলে বোবা দৃষ্টি। যেন অনুভূতি শূন্য মাঝে মাঝে মনে হয় জেগে থেকেই যেন ঘুমাচ্ছে। এই বিপর্যয়, এই জেলখানা নেইজেন এর জন্য নতুন অভিজ্ঞতা। প্রচণ্ড ধরণের আঘাত তার পাবারই কথা।

তবে আহমদ ইয়াং যে ঘটনা আশংকা করেছিল ততটা খারাপ পরিবেশে জেলখানায় রাখা হয়নি। বিশাল উরুমুচি জেলখানার একটি বিশেষ বিভাগে ছোট ছোট অনেকগুলো বাংলো। চীনের কম্যুনিস্টদের স্বর্ণযুগ অর্থাৎ রেডগার্ড আন্দোলনের সময় বড় বড় রাজনীতিক, আমলা, বিজ্ঞানী, ভিআইপি যারা ভিন্ন মতাবলম্বী হলেও যাদের সম্পর্কে কম্যুনিস্টরা আশা ছাড়েনি, তাদেরকে স্বপরিবারে এখানে এনে অন্তরীন করে রাখা হতো এবং মগজ ধোলাই এর কাজ চলতো। এমন একটি বাংলোতেই গভর্নর লি ইউয়ান সহ তাদেরকে রাখা হয়ছে। লি ইউয়ান একক একটি কক্ষ পেয়েছেন, তার স্ত্রী ইউজিনাও তাই। আহমদ ইয়াং ও নেইজেন এর ভাগে পড়েছে একটা রুম। রুমটা সাদামাটা হলেও সুন্দর। মেঝেতে কার্পেট আছে আছে এটাস্ট বাথ। খাওয়ারও খুব অসুবিধা নেই। দুই বেলা রান্না করা খাবার দিয়ে যায় বাবুর্চিরা। সকাল ও বিকালে নাস্তা খাইয়ে যায় তারা।

আহমদ ইয়াং শোয়া থেকে উঠল। নেমে এল বিছানা থেকে, বসল গিয়ে নেইজেন এর পাশে। টেনে এ পাশ ফিরাল। মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, ‘কষ্ট হচ্ছে নেইজেন?’

কথা বলল না নেইজেন। তার কান্না আরও বেড়ে গেল। দু’হাতে মুখ ঢাকল সে।

আহমদ ইয়াং নরম কণ্ঠে বলল, ‘আমরা বন্দি বটে তবে আল্লাহ আমাদের ভালো রেখেছেন। বাইরে অবস্থা খুবই খারাপ বলে মনে হচ্ছে উঠে। চল, নামাজ পড়ি।’

নেইজেন ধড়মড় করে উঠে বসল। কান্না জড়িত গলায় বলল, ‘কেমন করে বুঝলে বাইরে অবস্থা খুবই খারাপ?’

‘উরুমুচির কোন মসজিদেই আজ ফজরের আজান হলো না নেইজেন। মনে হয় গতকাল ও কোন আজান আমি শুনিনি।’

‘তার অর্থ ?’

‘তার অর্থ নামাজিরা পালিয়েছে, ইমাম মুয়াজিন সবাই পালিয়েছে, নামাজ হচ্ছে না মসজিদে। অথবা আজান, নামাজ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।’

চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠল নেইজেনের, বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল আহমদ ইয়াং এর দিকে। এক সময় তার ঠোঁট কাপতে লাগল। বলল, ‘মেইলিগুলি আপার তাহলে সর্বনাশ হয়েছে।’ ব্যর্থ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল নেইজেন।

বিদ্যুৎ শকের মতই কথাটা এসে আঘাত করল আহমদ ইয়াংকে। মেইলিগুলির কথা সে ভুলেই গিয়েছিল। তাদের চেয়েও বড় বিপদ মেইলিগুলির জন্য বরাদ্দ এ কথা তার মনেই আসেনি। অথচ ডাঃ ওয়াং ও জেনারেল বরিসকে দেখার পর এই কথাটা তার প্রথম মনে আশা উচিৎ ছিল। জেনারেল বরিস সবাইকে ছাড়তে পারে সব ছাড়তে পারে কিন্তু আহমদ মুসা এবং তার স্ত্রীকে ছাড়তে পারে না। আতংক আশংকায় গোটা শরীর কেঁপে উঠল আহমদ ইয়াং এর সেই সাথে ভেসে উঠল তার চোখের সামনে আহমদ মুসার মুখ মেইলিগুলির যদি কিছু হয় কি জবাব দিব আমরা তাঁকে। দু’চোখ ফেটে ঝর ঝর করে নেমে এত অশ্রু। বলল, ‘সত্যি বলেছ নেইজেন মেইলিগুলির যদি কিছু হয়!’ আহমদ ইয়াং এর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল কান্নায়।

নেইজেন মুখ তুলল। আহমদ ইয়াং এর দু টি হাত চেপে ধরে বলল, ‘না, তুমি কাঁদতে পারবে না। তুমি আমাকে আসার কথা শোনাও। বল, মেইলিগুলি আপার কিছু হয়নি। ভাইয়ার জন্যেই মেইলিগুলির কোন দুঃসংবাদ আমরা সইতে পারবোনা।’

‘কেঁদোনা জেন, সবার ওপর তো আল্লাহ আছেন। তিনি আমাদের সাহায্য করবেন।’

একটু থেমে চোখ মুছে নিয়ে বলল, ‘চল নামাজ পড়ি।’

আহমদ ইয়াং ও নেইজেন দু’জনেই বিছানা থেকে উঠল।

সেদিনই নাস্তার টেবিলে।

টেবিলে নাস্তা ও প্লেট সাজিয়ে রেখে বাবুর্চি চলে গেছে। তারা চলে যাবার পর লি ইউয়ান ও অন্যান্য সকলে নাস্তা খাবার জন্য এসেছে। খেয়ে চলে গেলে ওরা এসে সব নিয়ে ও টেবিল সাফ করে চলে যাবে। এই ফাঁকে কখনো কখনো সাক্ষাত ঘটে যায়। কিন্তু কথা হয়না। কথা বলা নিষেধ তাদের জন্য। বাংলোর গেটে ২৪ ঘণ্টা দু'জন প্রহরীর পাহারা। গেট থেকে ডাইনিং রুমের প্রতিটি ইঞ্চি দেখা যায় তাদের জন্য দৃষ্টি সব সময় এদিকে নিবন্ধ থাকে।

পাহারাদর পুলিশ ও সৈনিক গোটা জেলখানায় সবাই হান।

বাবুর্চিরাও তাই। উইঘুর, হুই প্রভৃতি অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর কাউকেই বিশ্বাস করা হচ্ছে না।

নাস্তার টেবিলটি গোল।

লি ইউয়ান ডান দিকে বসেছে আহমদ ইয়াং, বাম পাশে বসেছে নেইজেন এবং নেইজেনের পাশে বসেছে তার মা ইউজিনা।

নাস্তার জন্যে টেবিলে সাজানো আছে বেকারী ব্রেড, মাখন, ডিম এবং চা।

বেতের একটা ছোট্ট সুন্দর ঝুড়িতে সাদা কাগজ বিছিয়ে তার ভেতর আট পিস ব্রেড। নেইজেন রুটি সবার প্লেটে তুলে দিল। শেষ রুটি খণ্ডটি তুলেই চমকে উঠল নেইজেন। দেখল, রুটির নিচে একটা চারভাজ করা কাগজ। তার মন যেন আপনাতেই বলে উঠল ওটা একটা চিঠি। হঠাৎ তার মনে হলো গেট থেকে চারটে শ্যেন দৃষ্টি তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে কোন দিকে মাথা তুলতেও ভয় পেল। তাড়াতাড়ি সে হাত থেকে রুটিটি ঝুড়িতে সেই চিঠির ওপর রেখে ঝুড়িটি নিজের কাছে টেনে নিল।

নেইজেন-এর মুখটা আহমদ ইয়াং এর দৃষ্টি এড়ায়নি। সে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল নেইজেন-এর দিকে। নেইজেনও তার দিকে চোখ তুলেছিল। বুঝতে পারল নেইজেন আহমদ ইয়াং এর মনের ভাব। নেইজেন তাকে চোখের ইশারায় চুপ থাকতে বলল।

খাওয়ার এক পর্যায়ে নেইজেন রুটির ঝুড়ি থেকে সেই ভাজকরা কাগজ সমেত রুটি তুলে নিয়ে নিজের প্লেটে রাখল। তারপর রুটি খেতে খেতে এক সময়

রুটির নিচ থেকে কাগজটি হাতে নিয়ে মুঠোর মধ্যে দলা পাকিয়ে ফেলল। তারপর এক ফাঁকে তা সে গাউনের পকেটে রেখে দিল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল নেইজেন। মুখ না বাড়িয়েই একটু আড় চোখে তাকিয়ে দেখল, গেট থেকে ওরা দুজন পাথরের মুর্তির মত এদিকে তাকিয়ে আছে।

নাস্তা শেষে সবাই উঠে এল নাস্তার টেবিল থেকে। লি ইউয়ান ড্রইংরুমে ঢুকতে যাচ্ছিল। নেইজেন বলল, আব্বা তুমি আমাদের ঘরে একটু এস।

সবাই চলল নেইজেনদের রুমে।

যেতে যেতে লি ইউয়ান বলল, 'নেইজেন, তোমাকে আজ খুব বেশী মলিন লাগছে। খুব চিন্তা করছ বুঝি?'

নেইজেন কোন উত্তর দিল না।

'আব্বা, ও আজ খুব কেঁদেছে।' বলল আহমদ ইয়াং।

'তুমি বুঝি কাঁদনি?' সংগে সংগে পাল্টা অভিযোগ ছুড়ে দিল নেইজেন।

'কেন, তোমরা কেঁদেছ কেন?'

'আমরা ভাবছি মেইলিগুলির কিছু হলে আহমদ মুসাকে কি জবাব দিব আমরা।' আহমদ ইয়াংই জবাব দিল।

'তাই তো। মেইলিগুলির কথা এ দুদিনে আমার স্মরণই হয়নি। ডাঃ ওয়াং আর জেনারেল বোরিসের সব ক্রোধ তো মেইলিগুলির ওপর পড়বে।'

একটু থামল লি ইউয়ান। বলল তারপর, 'আমরা তো কিছুই জানতে পারছি না বাইরের খবর। অহেতুক চিন্তা করে তো লাভ নেই। হয়তো হতে পারে কিছুই হয়নি।'

ঘরে ঢুকে লি ইউয়ান ও নেইজেন দু'টি চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। বলল লি ইউয়ান, 'তোমার ঘরে আসতে বললে কেন নেইজেন?'

নেইজেন পকেট থেকে সেই দলা পাকানো কাগজটি বের করে ধীরে ধীরে খুলে চোখের সামনে মেলে ধরল।

সবাই এটা লক্ষ্য করেছে। সবার দৃষ্টি নেইজেনের দিকে। লি ইউয়ান বলেই বসল, 'কি ওটা নেইজেন?'

কাগজের দিকে নজর পড়ার পর নেইজেনের মুখের আলো যেন হঠাৎ করে নিভে গেল। বেদনায় বিবর্ণ হয়ে গেল তার মুখ। কাগজটি তার হাত থেকে পড়ে গেল। বিছানার ওপর ধপ করে বসে পড়ল নেইজেন।

আহমদ ইয়াং নেইজেন এর পেছনেই দাড়িয়ে ছিল। সে দ্রুত এগিয়ে এসে কাগজটি তুলে নিয়ে তার ওপর চোখ বুলাল। পড়ে আহমদ ইয়াং এরও মুখের ভাব পাল্টে গেল। কপাল তার কুঞ্চিত হলো, ঠোট দুটি কেপে উঠল। বলল, সর্বনাশ হয়ে গেছে আব্বা, বলে কাগজটি আহমদ ইয়াং তুলে দিল লি ইউয়ানের হাতে।

লি ইউয়ান ও নেইজেন দুজনেই ঝুকে পড়ল কাগজের ওপর। মাত্র কয়েকটি লাইন লেখাঃ

“বাইরের অবস্থা খুবই খারাপ। শিহেজী সহ বহু জনপদ বিরাণ হয়ে গেছে। মেইলিগুলিরব আব্বা-আম্মা নিহত। আহত মেইলিগুলি পালিয়ে গেছে, অথবা নিখোজ।”

চিঠিতে যেমন কোন সম্বোধন নেই, তেমনি নেই স্বাক্ষরও।

‘চিঠি কোথায় পেলে নেইজেন?’

‘ব্রেড এর ঠোঙ্গায়।’

‘ব্রেড এর ঠোঙ্গায়?’

‘জ্বি আব্বা, ঠোঙ্গার একদম তলায়। এক খণ্ড ব্রেড এর নিচে সুন্দর ভাজ করে রাখা ছিল।’

‘কে রাখতে পারে?’

‘আমার মনে হয় বাবুর্চিদেরই কেউ একজন।’ বলল আহমদ ইয়াং।

‘কেন বড় আর কেউ হতে পারে না?’ বলল লি ইউয়ান।

‘হতে পারে। বাবুর্চিদের নজর এড়িয়ে কেউ এভাবে রাখতে পারে। কিন্তু এ সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম। কারণ তাতে ঝুকি আছে, বাবুর্চিদের কাছে ধরা পড়ার ভয় আছে। বাবুর্চিদের কেউ একজন হলে এ ভয় তার থাকে না।’

‘ঠিক বলেছ ইয়াং।’

'ডাঃ ওয়াংরা এতবড় খুনী, এতবড় জঘন্য? নিরপরাধ মানুষকে এভাবে তারা মারতে পারে?' বলল নেইজেন।

'ওরা পশু মা। তার ওপর আহমদ মুসার ওপর ওদের পর্বত প্রমাণ প্রতিহিংসা।'

'এখন কি হবে, বাইরে তো সবই শেষ। আহত মেইলিগুলি আপা কোথায় যাবেন, কে তাকে আশ্রয় দেবে?' কাঁদো কাঁদো কন্ঠে বলল নেইজেন।

নেইজেন এর এ প্রশ্নের উত্তর কে দেবে? সবারই তো একই প্রশ্ন? সবাই নির্বাক রইল। অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলতে পারলো না।

কিছুক্ষণ পর লি ইউয়ান উঠতে উঠতে বলল, 'আল্লাহর ওপর ভরসা করা ছাড়া তো আমাদের করার কিছু নেই। আল্লাহকেই আমাদের ডাকতে হবে।'

লি ইউয়ান এবং নেইজেন বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

একদিন পর। একই ভাবে আরেকটি চিঠি পাওয়া গেল। সে চিঠিতে পাওয়া গেল গুরুত্বপূর্ণ আরেকটা তথ্য। বলা হয়েছে, ডাঃ ওয়াংরা নতুন গভর্নরের ওপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ। ক্ষমতাচ্যুত লি ইউয়ান ও তার পরিবারকে এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে এটাই তার কারণ। নিজেদের হাতে শাস্তি দেবার জন্যে তারা লি ইউয়ান ও তার পরিবারের লোকদের হাতে পাওয়ার জন্যে চেষ্টা শুরু করেছে।

এ খবর বিশেষ করে নেইজেন ও তার মা ইউজিনাকে আতংকিত করে তুলল। তাদের হাতে পড়ার চেয়ে যমের হাতে পড়া ভাল।

পরবর্তী কি খবর আসে তার জন্যে তারা সকলে উদগ্রীব হয়ে উঠল।

কিন্তু একদিন, দুদিন করে চার পাচদিন গত হল কোন চিঠি আর আসে না। প্রতিদিনই তারা ব্যাকুলভাবে রুটির ঝুড়ি তালাশ করে, হতাশা ছাড়া আর কিছুই মেলে না।

অষ্টম দিন।

সকাল ৮টা।

লি ইউয়ান টয়লেটে ঢুকতেই কমোডের ঢাকনির ওপর বহু ভাজ করা এক দলা কাগজের ওপর গিয়ে নজর পড়ল। এমন কাগজ কমোডের ঢাকনির ওপর এল কি করে! বিস্মিত লি ইউয়ান গিয়ে কাগজের দলাটা তুলে নিল। সবচেয়ে বিস্মিত হলো লি ইঊয়ান যে, দুমিনিট আগে টয়লেট পরিস্কার করতে আসা লোকরা তাদের কাজ শেষ করে বেরিয়ে গেছে। তাহলে কি ওদের কেউ এটা............

মনে একটা আশার আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল লি ইউয়ানের। টয়লেটে দাড়িয়েই ঝটপট খুলে ফেলল ভাজ করা দীর্ঘ চিঠি।

উত্তেজিত লি ইউয়ান চিঠিটা হাতে ধরেই বেরিয়ে এল টয়লেট থেকে। সামনেই পেল আহমদ ইয়াং ও নেইজেনকে। ওদের দিকে তাকিয়ে 'তোমরা এস' বলে লি ইউয়ান নিজের ঘরে ঢুকে গেল।

লি ইউয়ানের হাতের খোলা কাগজটা আহমদ ইয়াং ও নেইজেন এরও চোখে পড়েছিল। একরাশ কৌতুহল নিয়ে তারাও লি ইউয়ানের পেছনে পেছনে এসে ঘুরে ঢুকল।

সবাইকে এক সাথে ঘরে ঢুকতে দেখে এবং সবার চোখ মুখের দিকে তাকিয়ে ইউজিনা চেয়ার থেকে উঠে দাড়িয়ে বলল, 'কি ব্যাপার? তোমার হাতে ওটা কি কাগজ লি?'

চেয়ারে বসতে বসতে লি ইউয়ান বলল, 'টয়লেটে কমোডের ঢাকনার ওপর এই চিঠি পেলাম। আগের সেই একই হাতে লেখা।'

'কমোডের ওপর?' সমস্বরে বলে উঠল ইউজিনা, নেইজেন এবং আহমদ ইয়াং।

ও নিয়ে আলোচনা পরে করা যাবে, এস আগে চিঠি পড়া হোক।

বলে লি ইউয়ান চিঠি পড়তে শুরু করল-

''এই যে চিঠিটা লিখছি তা আপনি পাবেন কিনা জানি না। আমার পুরানো সহকর্মী যিনি জেলের একজন কয়েদী এবং ক্লিনার। হঠাৎ করে তার সাথে দেখা

হলো। তিনি আমার এ চিঠি আপনার কাছে পৌছে দিয়ে আমার জীবনের শেষ ইচ্ছা পুরণে রাজি হয়েছেন।

আমি অধম আপনার কোন উপকার করব সে আশা করিনি। আমি শুধু চেয়েছিলাম আপনার কাছে কিছু পৌছিয়ে আমার মনের জ্বালা জুড়াতে। কিন্তু পারলাম না। তৃতীয় চিঠিটিই ধরা পড়ে গেল। আজ বিচার হয়েছে। আগামী কাল আমার কোর্ট মার্শাল। বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, সে শাস্তিই আমি পেয়েছি। মরতে আমার একটু দুঃখ নেই। কিন্তু ওরা আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলেছে, এটাই আমার বুকে লেগেছে। আমি বিশ্বাসঘাতক নই। কিন্তু কে বিশ্বাস করবে আমার একথা। আমি যা করতে চেয়েছিলাম বিশ্বাস রক্ষার জন্যেই করতে চেয়েছিলাম।

সাংহাই এর এক এতিমখানায় আমি মানুষ। যখন বুদ্ধি হলো মনে জাগল বাপ – মা কোথায়? কিন্তু কাউকে জিজ্ঞাসা করিনি। প্রায় সবারই আত্মীয় স্বজন বা আপনজন কেউ না কেউ আসত। কিন্তু আমার জন্যে কেউ আসেনি। খুব অভিমান হতো। খুব হিংসা হতো অন্যদের। কারও সাথে মিশতাম না, নিজেকে গুটিয়ে রাখতাম। মনে আনন্দ ছিল না, আত্মবিশ্বাস ছিল না। তাই লেখা পড়ায় ভাল করতে পারলাম না। ক্যাটারিং এ ট্রেনিং দায়ানো হলো। আঠার বছর বয়সে সেনাবাহিনীর ক্যাটারিং বিভাগে ভর্তি করানো হলো।

ইয়াতিমখানা থেকে বিদায় নেবার দিন ইয়াতিমখানার গ্র্যান্ডমাদার তাঁর কক্ষে আমাকে ডাকলেন। আমি গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়ালে আমার হাতে একটা বড় বাদামী ইনভেলাপ তুলে দিয়ে বললেন, ‘তোমার জন্যে তোমার মায়ের দেয়া আমানত, আমার কাছে এতদিন ছিল।’

গ্র্যান্ডমাদারের ঐ বাক্য আমার গোটা হৃদয়ে, গোটা সত্তায় কি যে এক জ্বালাময় আনন্দ ছড়িয়ে দিল! আমি চিঠি নেবার জন্যে হাত তুলতে পারলাম না। মুখ ফেটে বেরিয়ে এল, আমার মা ছিল? ‘মা’ শব্দ বেরুবার সাথে একটা ভয়ংকর উচ্ছ্বাস এসে আমাকে ভাসিয়ে দিল। আঠার বছরের সব অপেক্ষা, সব আবেগ, সব অভিমানের জমাট পাহাড় যেন অশ্রুর ঢল হয়ে নেমে এল আমার দু’ চোখ দিয়ে। আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। বসে পড়লাম দু’হাতে মুখ ঢেকে।

গ্র্যান্ডমাদার আমার মাথায় হাত বুলালেন। অনেক সান্ত্বনা দিলেন। বললেন, 'তোমার মায়ের সাথে হাসপাতালে ঘন্টা খানেকের পরিচয়। খুব ভাল মেয়ে ছিলেন।'

আমি উঠে বসলাম চেয়ারে। গ্র্যান্ডমাদার ফিরে গেলেন তাঁর আসনে।

'হাসপাতালে কেন, তিনি কি করতেন?' আমি বললাম।

'তিনি আহত হয়ে হাসপাতালে এসেছিলেন।' বললেন গ্র্যান্ডমাদার।

'কিসে কিভাবে আহত?'

'মারাত্মক ছুরিকাহত ছিলেন।'

'কেন?'

'সেটা জানার সুযোগ পাইনি বাছা। তোমাকে ইয়াতিমখানায় দেবার জন্যে তিনি শেষ মুহূর্তে আমাকে ডেকেছিলেন।'

'তাঁর আর কেউ ছিল না?'

'না, এক বছরের এক তুমি ছাড়া আর কেউ ছিল না।'

আবার আমার বুক থেকে প্রবল একটা উচ্ছ্বাস উঠে আসতে চাইলে চোখ-মুখ ফুঁড়ে। কথা বলতে পারলাম না কিছুক্ষণ। পরে বললাম, 'তারপর গ্র্যান্ডমাদার?'

'উনি তোমাকে এবং এই ইনভেলাপ আমার হাতে তুলে দিলেন।'

'তারপর কি হল?'

'ও টুকু আর শুন না বাছা।'

'আমি জানি, তারপর তিনি......।' চেষ্টা করেও সেদিন আম্মার মৃত্যুর কথাটা উচ্চারণ করতে পারিনি। গলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

অনেক পরে চোখ মুছে বললাম, 'এসব কথা এতদিন কেন বলেননি, এই ইনভেলাপ এতদিন কেন দেননি গ্র্যান্ডমাদার?'

'তোমার মা'র নির্দেশ ছিল তুমি কর্মজীবনে প্রবেশ করবার আগে যেন এ সব কথা তোমাকে না বলি, এই ইনভেলাপ তোমাকে দেই।'

ধন্যবাদ দিয়ে ইনভেলাপ নিয়ে উঠে দাড়ালাম। তিনি বললেন, ‘বাছা, ইনভেলাপে কি আছে আমি জানি না। নিজের পরিচয়কে গর্বের মনে করবে। আত্ম-পরিচয়ই মানুষের শক্তি।’

আবার ধন্যবাদ জানিয়ে আমি গ্র্যান্ডমাদারের ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। গ্র্যান্ডমাদার ঠিকই বলেছেন। আমার গোটা শূন্য জীবনটাকে ভরে দিয়েছে এই ইনভেলাপ। এতদিন যে আত্মবিশ্বাস আমার ছিল না, সেই আত্মবিশ্বাস যেন ফিরিয়ে দিল এই ইনভেলাপ।

আমার প্রথম কর্মস্থল হলো মংগোলিয়া সীমান্তের কান্ত প্রদেশে। ওখানে গিয়ে প্রথম রাতেই আমার ঘরে বসে ইনভেলাপটি খুললাম।

ইনভেলাপ থেকে বেরুল, একটা চিঠি, কোন বইয়ের দুইটি ছেড়া পাতা, ৫শ’ ইউয়ানের একটা নোট এবং একটা ফটোগ্রাফ।

আমি প্রথমে ফটো তুলে পাগলের মত হয়ে গেলাম। আমার আব্বা আম্মার ফটো কি? হ্যাঁ তাই। ফটোর নিচে ক্যাপশান – ‘তোমার আব্বা-আম্মা।’ ফটোতে হাস্যোজ্জল এক তরুণ ও তরুণী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। দু’জনেরই পরনে বিয়ের পোশাক। কতক্ষন ফটোর দিকে তাকিয়েছিলাম কে জানে। যখন সম্বিত ফিরে পালাম দেখলাম, চোখ থেকে কখন ফোটা ফোটা অশ্রু নেমে ফটোর ওপর গিয়ে পড়েছে। সে সময়ের মনের ভাব বুঝাতে পারবো না। মনে হয়েছিল, জীবনের সব চাওয়া পাওয়া যেন পূর্ণ হলো। ফটোর উল্টো পিঠে দেখলাম লেখা – আব্বার নাম উসামা চ্যাং এবং আম্মার সাযেয়া জিয়াং। নাম বিদঘুটে মনে হলো আমার কাছে।

তারপর চিঠি হাতে তুলে নিলাম আমি। সুন্দর হস্তাক্ষর। আম্মার হাতের লেখা? পড়তে শুরু করলাম-

বেটা জায়েদ চ্যাং,

আমার সময় ঘনিয়ে আসছে। দেহের সমস্ত শক্তি একত্র করে এই চিঠিটা লিখে যাচ্ছি। তুমি যদি বেঁচে থাক, তাহলে আমার পরিচয় যাতে তুমি পাও এই আশায়।

কানশুর উমেন – এ আমাদের সুখের সংসার ছিল। অভাব ছিল না কিছুরই। সময় পাল্টে গেল। আমরা মুসলমান এই পরিচয়ই হয়ে দাঁড়াল আমাদের সবচেয়ে বড় অপরাধ। ছোট খাট অনেক অত্যাচার সইলাম। অবশেষে দুর্যোগ একদিন এল। দলে দলে হানরা এসে এক রাতে চড়াও হলো আমাদের গ্রামের ওপর। হত্যা – লুন্ঠনের মহোৎসব চলল। আমার বুক ফাটা কান্না পায়ে দলে ওরা হত্যা করল তোর বাপকে। তোর বাপ ছিল হুই, আর আমি ছিলাম হান বংশোদ্ভুত। হান বলেই আমাকে ওরা মারলো না। কিন্তু সেদিন মরলেই ভাল ছিল। সেদিন রাতের আধারেই সদ্যজাত তোকে বুকে নিয়ে বিরাণ বাস্তুভিটা ছেড়ে একটা পুটলি সম্বল করে ট্রেনে উঠলাম দেশের পূর্বাঞ্চলে আসার জন্যে। বাঁচার সংগ্রাম শুরু হলো। সম্মান নিয়ে বাঁচা যে কত কঠিন হাড়ে হাড়ে টের পেলাম। শেষ পর্যন্ত সম্মান এবং জীবন এক সাথে ধরে রাখতে পারলাম না। সম্মান বাচালাম, কিন্তু জীবন হারালাম। তোমাকে আল্লাহর হাতে রেখে যাচ্ছি।

এই চিঠির সাথে পাঁচশ ইওয়ানের একটা নোট রেখে যাচ্ছি। ওটা তোমার পুণ্যবতী দাদীর স্মৃতি। যে দিন নব বধূ হয়ে আমি শ্বশুর বাড়ি এসেছিলাম, সেদিন এই উপহার তিনি আমাকে দিয়েছিলেন। শত বিপাকেও আমার পূণ্যবতী শ্বাশুড়ির স্মৃতি আমি নষ্ট করিনি। আর রেখে যাচ্ছি তোমার ধর্মগ্রন্থ আল কুরআনের দু'টো ছেড়া পাতা। বাড়ি ছেড়ে আসার সময় লুন্ঠিত, ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ির উঠান থেকে ও দু'টো পাতা আমি কুড়িয়ে এনেছিলাম। তোমার দাদার কাছ থেকে পাওয়া আমাদের কুরআন শরীফের পাতা ঐ দু'টো। এই সাথে রেখে যেতে পারলাম তোমার বাপ-মার একটা ফটো। বাপ মাকে দেখার তো ভাগ্য হলো না। অন্তত ফটো দেখে সান্ত্বনা হবে তোমার পিতা-মাতা ছিল।

আর লিখতে পারছিনা। খুবই কষ্ট লাগছে তোমাকে এভাবে রেখে যেতে। দুঃখের সান্ত্বনা এই যিনি এভাবে নিয়ে যাচ্ছেন, তিনিই তোমার জন্যে থাকলেন। আর তাঁর চেয়ে বড় হেফাজতকারী আর কেউ নেই।

তোমার মা

সাযেয়া জিয়াং"

প্রচন্ড এক ভাবালুতার মধ্যে চিঠি পড়া শেষ করলাম। কতটা সময় যে গেল তারপর অনুভূতি শুন্যতায়, তা বলতে পারবো না। যখন সম্বিত ফিরে পেলাম, তখন মনে হলো আমি নতুন মানুষ। আগে ছিলাম আমি একজন গর্বিত হান, এখন নির্যাতীত মুসলিম সমাজের একজন। আমার নতুন পরিচয় আমার জগত সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেল। একটা প্রশান্তি এসে আমার হৃদয়কে শীতল করে দিল। মনে হলো, কষ্ট, লাঞ্চনা ও অনিশ্চয়তার দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে নিজের ঠিকানা খুজে পেলাম। প্রথমে কুরআন শরীফের দু'টো পাতা তুলে নিয়ে চুমু খেলাম। পড়তে ত পারব না। দীর্ঘক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখলাম। তারপর দাদীর টাকার সে নোটটি মুখে বুকে ছোয়ালাম। সব চেয়ে আমি বিস্মিত হলাম, আম্মা যেখান থেকে এসব জিনিস নিয়ে গিয়েছিলেন, সেখানে এসেই আমি এ জিনিসগুলো ফিরে পেলাম। চাকুরীতে যোগদানের পর আমার প্রথম পোস্টিং হলো কানশুর উমেন – এ।

আমার আব্বা-আম্মার উমেন এবং আজকের উমেন এক নয়। উমেন শহরে এখন আর কোন মুসলমান নেই। বহু চেষ্টা করেও আমার আব্বা-আম্মার বাড়ির কোন চিহ্ন খুজে পাইনি।

আজ ১৭ বছর সেনাবাহিনীর ক্যাটারিং বিভাগে দক্ষতার সাথে চাকুরী করছি। আমার দায়িত্বের যেমন বিশ্বাস রেখেছি, তেমনি আমার ঈমানের প্রতিও আমি বিশ্বস্ত থাকার চেষ্টা করেছি। জাতির জন্য কোন কাজ করতে পারলে, আমার জাতির কারও উপকার করতে পারলে গৌরব বোধ করেছি, মনে অফুরন্ত তৃপ্তি ও শান্তি পেয়েছি। মনের সেই তৃপ্তি ও শান্তির জন্যেই আমি আপনার কাছে খবর গুলো পাঠিয়েছি। এতে খুব উপকার হয়নি, কিন্তু আমি শান্তি পেয়েছি। আমার যে চিঠি ধরা পড়েছে তাতে আমি আপনাকে জানাতে চেয়েছিলাম, আমি টের পেয়েছি কে বা কারা আপনাকে জেলখানা থেকে কিডন্যাপ অথবা সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করছে।

আপনার প্রয়োজন নেই এমন অনেক কথা আপনাকে আপনার প্রয়োজন নেই এমন অনেক কথা আপনাকে শুনালাম। দুনিয়াতে কেউতো নেই আমার, কার কাছে কথাগুলো রেখে যাব। না রেখে যেতে পারলে যে আমার সাথে সাথে কথাগুলো চিরতরে হারিয়ে যাবে।

আল্লাহর কাছে ফিরে যাচ্ছি। কিন্তু পাথেয় কিছু নেই। কুরআন জানিনা, নামাজ কোনদিন পড়িনি, জানিও না পড়তে। আল্লাহর কাছে মাফ চাইব, সে ভাষাও জানিনা। আমার অসহায় ঈমান কি কোন মূল্য পাবে তাঁর কাছে?

আপনার জাতির দুর্ভাগা একজন

যায়েদ উ-চ্যাং।"

লি ইউয়ান চিঠি পড়া শেষ করে রুমাল দিয়ে চোখের পানি মুছে সবার দিকে তাকাল। দেখল,সবার চোখ দিয়েই অশ্রু গড়াচ্ছে। কারও মুখে কোন কথা নেই।

'দুর্ভাগা বেচারা!' অনেক্ষণ পর কথা বলে উঠল নেইজেনের মা ইউজিনা।

'এ মৃত্যু কি শহীদের মৃত্যু নয়?' বলল নেইজেন।

'নিশ্চয় এটা শহীদের মৃত্যু, জাতির কাজেই জীবন দিল যায়েদ উ-চ্যাং।' কান্না চাপতে চাপতে বলল আহমদ ইয়াং।

'আমরা এখন যখন কথা বলছি, তখন আমাদের এই যায়েদ এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। এস আমরা দোয়া করি তার জন্যে।' নরম কন্ঠে বলল লি ইউয়ান।

বলে লি ইউয়ান তার দু'টি হাত উপরে তুলল।

তার সাথে সাথে ইউজিনা, নেইজেন ও আহমদ ইয়াং সবার হাতই উপরে উঠল।

# ৩

মেইলিগুলির গাড়িটা বিশ্রী শব্দ করে থেমে গেল। ফুয়েল ট্যাংকার শুন্য।এক ফোটাও তেল নেই।

ফুয়েল ট্যাংকারের দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল মেইলিগুলি। আঁতকে উঠার সাথে সাথে আল্লাহর শুকরিয়াও আদায় করল। এতদূর আসতে পেরেছে সে।

গাড়িটাকে সে আল্লাহর মহা দান হিসাবে পেয়েছে। ঐ ভাবে সে রাস্তায় গাড়ি পাবার কথা নয়। সুড়ঙ্গ পথে বাড়ি থেকে পালিয়ে রাস্তায় উঠেই এই প্রাইভেট ট্যাক্সিকে সে দাঁড়ানো দেখতে পায়। প্রথমে ভয় পেয়েছিল শত্রুর ট্র্যাপ ভেবে। পরে দেখে ভাড়ার ট্যাক্সি।

দ্রুত চারদিকে তাকায় মেইলিগুলি। কিন্তু কাউকে দেখে না।তাহলে নিশ্চয় ড্রাইভার পাশের কোন বাড়িতে কোন কাজে গেছে।

মেইলিগুলির আর চিন্তা করার অবসর নেই কিংবা ড্রাইভারের জন্যে সে অপেক্ষা করতে সম্মত হবে কিনা, সেও একটা প্রশ্ন।

সুতরাং মুহুর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে গাড়ির ড্রাইভিং সিটে উঠে বসে মেইলিগুলি। বাম পাটা পুড়ে যাচ্ছে যন্ত্রনায়। গুলি লেগেছে বাম পায়ের হাঁটুর নিচের গিটটায়। স্রোতের মত রক্ত নামছে আহত স্থান থেকে।মেইলিগুলি সিটের ওপর পড়ে থাকা তোয়ালে দিয়ে দ্রুত ক্ষতস্থান সাধ্যমত কষে বাঁধল। অনেক রক্ত গেছে ইতিমধ্যে, যে কোন ভাবে রক্ত বন্ধ করতে হবে।

ক্ষতস্থানটি বেঁধে স্টার্ট দিল মেইলিগুলি। বিবেক একটু বিদ্রোহ করেছিল, হয়ত কোন গরীব বেচারাকে বিপদে ফেলে সে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে। পরে মনকে সান্ত্বনা দিয়েছিল এই বলে যে, সময় এলে অবশ্যি তার সব ক্ষতিপূরণ করে দেবে।

গোটা পথে তার ফুয়েল ট্যাংকারের দিকে তাকাবার কথা মনে হয়নি। হলেই বা সে কি করত। না ছিল দাঁড়াবার সময়, না পেট্রল কেনার মত টাকা। যে

অবস্থায় সে আব্বা-আম্মার সাথে বসে গল্প করছিল সে অবস্থায় তাকে বের হয়ে আসতে হয়েছে। ভাগ্য ভাল রিভলবারটা হাতের কাছে পেয়ে নিয়ে আসতে পেরেছে। অবশ্য শিহেজী উপত্যকায় গেলে হয়তো তেল এবং আশ্রয় পাওয়া যেতো। কিন্তু মেইলিগুলি ওখানে যাওয়া ঠিক মনে করেনি। সে বুঝে নিয়েছে, বড় রকমের কোন রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন না ঘটলে তার বাড়িতে এই হামলা হওয়া সম্ভব ছিলনা। আহমদ মুসা চলে যাবার পর থেকে গভর্নর লি ইউয়ানের নির্দেশে সেনাবাহিনীর ৫ সদস্যের একটা ইউনিট সার্বক্ষণিক পাহারায় রয়েছে। সে সৈনিকরা জেনারেল বরিসদের কোনই বাধা দেয়নি। বাধা দিতে না পারলে তাদেরকে বিপদ সংকেত দিতে পারতো, তাও দেয়নি। অর্থাৎ সে সেনা ইউনিট কে প্রত্যাহার বা নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। তাই যদি হয়, বড় রকমের রাষ্ট্রীয় কোন প্রতিকুল পরিবর্তন ঘটে থাকে, তাহলে তার বাড়ির মত শিহেজীও বিপদগ্রস্ত হবে। এ কারণেই শিহেজী উপত্যকার দিকে গাড়ি ঘুরিয়েও আবার ফিরে এসেছে। ফিরে এসে সে শিহেজী উপত্যকা বাঁইয়ে রেখে উসু-তাসেং পাহাড়ী হাইওয়ের পথে অপেক্ষাকৃত দুর্গম এলাকার দিকে চলে এসেছে। এ পথে এসে উসু উতাই এর পথে সোজা পশ্চিমে গেলে কাজাখস্থানের আলমা আতা অনেক কাছে হতো। কিন্তু সে পথে যাওয়া মেইলিগুলি ঠিক মনে করেনি। পথটা যেমন জনবহুল, তেমনি তাকে প্রথমে ঐ পথেই খোঁজা হবে।

পেট্রল ফুরিয়ে গাড়ি থেমে যাবার পর স্টিয়ারিং হুইলে গা এলিয়ে দিয়ে এ সব ভাবছিল মেইলিগুলি। দুর্বলতা, ক্লান্তি ও গুলিবিদ্ধ পায়ের যন্ত্রণায় গোটা শরীর তার ভেঙ্গে পড়তে চাইছে। এখন কি করবে সে। রাত পোহাবার আর দেরী নেই। এই গাড়িতে বসে থাকলে হয় সে ধরা পড়ে যাবে, নয়তো অনাহারে, অচিকিৎসাসহ ভয়ানক পরিস্থিতির মুখোমুখি তাকে হতে হবে। তার চেয়ে তাকে চেষ্টা করতে হবে কোন আশ্রয় খুঁজে নিতে। এই পথের আশে পাশে কাজাখ ও উইঘুর পল্লী আছে। একটি অবশ্যই তাকে খুঁজে পেতে হবে।

গাড়ি থেকে নামার আগে মেইলিগুলি ক্ষতটা ভালো করে বেঁধে নিল। তোয়ালে রক্তে ভিজে গিয়েছিল। তোয়ালে ফেলে দিয়ে ওড়না দিয়ে শক্ত করে বাঁধল ক্ষতটা। তারপর গাড়ি থেকে নেমে এল।

দাঁড়াতেই মাথাটা ঘুরে গেল মেইলিগুলির। গাড়ি ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে শরীরটা ঠিক করে নিল। তারপর বিসমিল্লাহ বলে হাঁটা শুরু করল রাস্তা ধরে উত্তর দিকে।

কিন্তু কিছু দূর যেয়েই বুঝতে পারল তার পক্ষে হাঁটা সম্ভব নয়। রক্ত অনেক গেছে, গোটা শরীর তার ঝিম ঝিম করছে। তার উপর আহত পাটা ভীষণ ভারী বোধ হচ্ছে, প্রতি পদক্ষেপই তাকে যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠতে হচ্ছে।

রাস্তার উপর বসে পড়ল মেইলিগুলি। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল।

শরীরটা টেনে নিয়ে আবার সে উঠল। না উঠে উপায় নেই। যতই সময় যাবে ততই সে দুর্বল হয়ে পড়বে। সুতরাং দেহে শক্তি অবশিষ্ট থাকতেই তাকে আশ্রয় খুঁজে পেতে হবে।

মেইলিগুলি চলছিল উঁচু পার্বত্য পথের উপর দিয়ে। বুঝল সে, এটা আলাত পাহাড় শ্রেণীর সর্ব উত্তরের অংশ। তার জানা লোকালয় তোলিতে পৌছতে হলে তাকে আরও অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে।

কিন্তু উঁচু নিচু পার্বত্য পথ শীঘ্রই মেইলিগুলির দেহের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে দিল। তার চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল। তবু পাগলের মতই দু'পা টেনে নিয়ে চলল মেইলিগুলি। তাকে বাঁচতে হবে। সে প্রার্থনা করতে লাগল আল্লাহর কাছে, হে আল্লাহ তুমি ছাড়া তো আর কোন সাহায্যকারী আমার নেই। আমার দেহের শক্তি শেষ, চোখও দেখতে পাচ্ছেনা আর সামনে, এখন তুমিই আমার ভরসা। তুমি আমাকে সাহায্য কর। আমি আর কিছু চাই না, শেষ বারের মত একবার ওকে- আমার স্বামী আহমদ মুসাকে দেখতে চাই। তুমি আমার এ প্রার্থনা মঞ্জুর কর।'

এই প্রার্থনা মুখে নিয়ে টলতে টলতে অন্ধের মত এগিয়ে চলল মেইলিগুলি। পায়ের ব্যথারও তার এখন কোন পরোয়া নেই তাই।

কিন্তু এ চলার শক্তিটুকুও অবশেষে এক সময় শেষ হয়ে গেল। তার চোখের সামনের অস্পষ্ট আলোটুকুও এক সময় দপ করে নিভে গেল। ওলট পালট হয়ে গেল তার পায়ের তলার পৃথিবী। লুটিয়ে পড়ল মেইলিগুলি রাস্তার ওপরেই। শক্ত মাটির ওপর পড়ে স্থির হয়ে গেল মেইলিগুলির দেহ।

এই পথেই এগিয়ে আসছিল শিহেজী উপত্যকার বাস্তুত্যাগী উইঘুরদের পাঁচ সদস্যের এক কাফেলা-স্বামী-স্ত্রী ও ছেলে মেয়ে নিয়ে পাঁচ জন। তিনটি ঘোড়া, পাঁচ জন মানুষ।

মৃত কেউ পড়ে আছে মনে করে ওরা পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল।

'মেয়েটি মুসলিম হবে। পোশাক মুসলমানদের।' ঘোড়াকে পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে বলল কাফেলার প্রধান পুরুষ ব্যক্তি।

'আব্বা নিশ্চয় বেঁচে আছে মেয়েটি। দেখুন পায়ের ব্যান্ডেজে তাজা রক্ত। 'চিৎকার করে উঠল তার পেছনে বসা কশোর বয়সের একটি ছেলে।

সবাই ঘোড়া থেকে নামল।

বয়স্ক লোকটি ছুটে গিয়ে মেইলিগুলির হাত তুলে নিয়ে নাড়ি দেখল। নাড়ি দেখে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার। বলল, 'ঠিক বলেছ বেটা, বেঁচে আছে মেয়েটি। কিন্তু খুবই দুর্বল।'

দ্বিতীয় ঘোড়া থেকে নেমে আসা চিন্তান্বিত যুবক ছেলেটি তার পিতার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। বলল, 'আব্বা আমরা রাস্তার উপর যে রক্তাক্ত গাড়ি দেখে এলাম, এ নিশ্চয় সে গাড়িতেই আসছিল। বোধ হয় গাড়ি খারাপ হওয়ায় হেঁটেই রওয়ানা দিয়েছিল।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে। মেয়েটি শিক্ষিত ও অভিজাত ঘরের। আমাদের মতই দূর্ভাগা কেউ হতে পারে। হয়ত পালাচ্ছিল। এখন কি করি! এই অজ্ঞান মানুষ পথ চলার ভার সইতে পারবে না, মরে যাবে। কি করে একে বাঁচানো যায়?' বলল বয়স্ক লোকটি।

সেই যুবক ছেলেটি বলল, 'কেন আব্বা, এখান থেকে পশ্চিমে এক মাইলের মধ্যেই তো একটা উইঘুর পল্লী আছে।'

'উঃ তাই তো! আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। ঐ উইঘুর কবিলার সর্দার ইব্রাহিম আওয়ায় তো আমার বন্ধু লোক। আর কোন কথা নয়, ওরই হাওয়ালা করে দিয়ে আসি মেয়েটিকে।'

উঠে দাঁড়াল লোকটি। যুবকটিকে বলল, 'তুমি ঘোড়াগুলোকে একটু পাহাড়ের আড়ালে নিয়ে কাফেলা পাহারা দাও।'

এরপর কিশোর ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি বন্দুক নিয়ে আমার সাথে চলো। আমি মেয়েটিকে নিচ্ছি।'

বলে যুবকটি ঘুরে দাঁড়িয়ে সংজ্ঞাহীন মেইলিগুলিকে কাঁধে তুলে নিয়ে যাত্রা শুরু করল।

এক ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে গেল তারা সেই উইঘুর পল্লীতে। পল্লীটি একটি উপত্যকা। মাইল খানেক উত্তরের একটা ঝরণা থেকে সৃষ্ট একটা পাহাড়ী নদী এই উপত্যকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। কৃষি ও পশুপালন এই উপত্যকার মানুষের জীবিকা।

উপত্যকার পূর্ব প্রান্ত জুড়ে পাহাড়ের ঢালে গড়ে উঠেছে গ্রাম।

অনেক কৌতুহলী চোখের ওপর দিয়ে লোকটি মেইলিগুলিকে নিয়ে গ্রামের সর্দার ইব্রাহীম আওয়াং এর বাড়িতে পৌঁছল।

উঠানেই একটা দড়ির খাটিয়া পাতা ছিল। মেইলিগুলিকে তাকে শুইয়ে দিল লোকটি।

পিছে পিছে আসা কৌতুহলী ছেলেরা দৌড়ে ভেতরে গিয়ে খবর দিল ইব্রাহিম আওয়াংকে। ভেতর থেকে দ্রুত বেরিয়ে এল এক বৃদ্ধ। মেইলিগুলিকে বয়ে আনা লোকটির ওপর চোখ পড়তেই খুশীতে প্রায় চিৎকার করে উঠে বলল, 'কি বকর দিনে যে চন্দ্র উদয়! ও কে?' মেইলিগুলির দিকে ইংগিত করল ইব্রাহিম আওয়াং।

মেইলিগুলির দিকে ইংগিত করল ইব্রাহিম আওয়াং।

মেইলিগুলিকে বইয়ে আনা লোকটির পুরো নাম বকর লি শাওচি।

বকর লি শাওচি মেয়েটিকে পাওয়ার সব ঘটনা খুলে বলে শেষে অনুরোধ করল, 'মেয়েটিকে তুমি বাঁচাও। বিপদগ্রস্তা মেয়ে। আল্লাহ্ তোমার ভাল করবে। তাছাড়া তুমি হাকিম, তোমার এটা দায়িত্বও।'

ইব্রাহিম আওয়াং একজন ভাল হাকিম। নাম ডাক আছে তার পাহাড়ী অঞ্চলে।

'এত কথা বলার প্রয়োজন আছে বকর। তুমি আমাকে জান না? আমার মেয়েকে যেভাবে দেখতাম, একেও সেভাবে দেখব। আমার সৌভাগ্য আল্লাহ এমন সেবার সুযোগ দিলেন।'

বলেই বাড়ির ভেতর দিকে চিৎকার করে বলল, 'রোকেয়া, তোমার মাকে দুধ গরম করতে বলো আর তুমি তাড়াতাড়ি এদিকে এস।'

অল্পক্ষণ পরেই গায়ে মাথায় ওড়না জড়িয়ে এক তরুণী এসে হাজির হলো।

'খাটিয়ার ওমাথা ধর, একে ভেতরে নিতে হবে। তাড়াতাড়ি জ্ঞান ফেরানো দরকার।'

বকর শাওচি বলল, 'আমাকে বিদায় দাও ভাইয়া, আমার কাফেলা দাঁড়িয়ে আছে। আল্লাহ ভরসা। পারলে খোঁজ নেব।'

'যাবে? মেহমানদারী করতে পারলাম না। একটু বস না।'

'না ভাই, তোমাকে যে কাজ দিয়ে গেলাম, সেটা করো, হাজারবার খাওয়ার চেয়ে খুশী হবো।'

বলে সালাম জানিয়ে পেছন ফিরে হাঁটা শুরু করল বকর শাওচি।

আর ইব্রাহিম আওয়াং এবং তার মেয়ে ধরাধরি করে খাটিয়া সমেত মেইলিগুলিকে ভেতরে নিয়ে গেল।

তিন দিন পর।

উচু-তাসেং রোড ধরে উত্তর দিকে ছুটে আসছে আরেকটি গাড়ি। গাড়িতে চারজন আরোহী। একজন ড্রাইভিং সিটে। তার পাশের সিটে একজন। পেছনের সিটে দু'জন। তাছাড়াও রয়েছে একটি কুকুর।

এরা জেনারেল বরিস ও ডাঃ ওয়াং এর লোক। তাদের নির্দেশে খুঁজেতে বেরিয়েছে মেইলিগুলিকে। তাদের সাথে দেয়া হয়েছে শিকারী কুকুর। কুকুরটিকে মেইলিগুলির ব্যবহার্য জিনিস শুকিয়ে পরিচিত করানো হয়েছে মেইলিগুলির গন্ধের সাথে।

শুরুতেই তারা ভাল ফল পেয়েছে। উসু-এর একটু পূর্ব পাশে কোয়েতুনের আরেকটা সড়ক সোজা উত্তরে কারামে হয়ে সোমলিয়া সীমান্তের দিকে চলে গেছে। কোয়েতুনে এসে কুকুরকে গাড়ি থেকে নামানো হলো। কিন্তু কুকুর কোয়েতুন কারামে সড়কের দিকে মুখই ফিরাতে চাইল না, ছুটতে চেষ্টা করল উসু-এর দিকে। অনুরূপভাবে উসু থেকে একটা রাস্তা পশ্চিমে, আরেকটা রাস্তা গেছে উত্তর পশ্চিমে। এখানে এসেও কুকুর ছুটছে গাড়ি উত্তর পশ্চিমের রাস্তা ধরে।

রাস্তার এক পাশে মেইলিগুলির গাড়ি তখনও দাড়িঁয়ে ছিল।

বরিস ওয়াং এর প্রেরিত ঐ দলটি যখন মেইলগুলির এ গাড়ির কাছে এল কুকুরটি ভীষণ ঘেউ ঘেউ করে উৎপাত শুরু করে দিল।

গাড়ি থামাল ড্রাইভার।

ড্রাইভারের পাশে বসা লোকটি পেছনের দিকে ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, 'সু লীন, কুকুর নিয়ে নিচে যাও। আমার সন্দেহ হচ্ছে এই গাড়ির সাথে মেইলিগুলির কোন সম্পর্ক আছে। তা না হলে গাড়ির কাছে আসার পর টম ব্যাটা এত উৎপাত করছে কেন?'

সু লীন নামের লোকটার হাতেই কুকুর। সে এবং তার পাশে বসা সাথী দু'জনেই নেমে এল গাড়ি থেকে কুকুর নিয়ে।

সু লীনই এগিয়ে এসে গাড়ির বন্ধ দরজা খুলে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে কুকুর হুমড়ি খেয়ে পড়ল গাড়ির ভেতরে।

সু লীন ও তার সাথী চ্যাং ওয়া গাড়ির ভেতর ড্রাইভিং সিটের নিচে ও পা দানিতে প্রচুর শুকিয়ে যাওয়া রক্ত দেখতে পেল। সেই রক্তের ওপরই হুমড়ি খেয়ে পড়েছে কুকুর।

'হোয়াং, এস, দেখ গাড়িতে রক্ত।' চিৎকার করে উঠল সু লীন।

ড্রাইভিং সিটের পাশে বসা দলনেতা অর্থাৎ হোয়াং তার হাতের অয়্যারলেসটি সিটের ওপর রেখে দ্রুত নেমে এল।

সেও এসে দেখল শুকিয়ে যাওয়া জমাট রক্ত। গাড়ির চারদিকে একবার নজর বুলিয়ে নিয়ে বলল, কোন সন্দেহ নেই এই গাড়ি নিয়েই মেইলিগুলি

পালিয়েছিল। দেখ, ফুয়েল মিটারের কাঁটা শূন্যের কোঠায়। অর্থাৎ এখানে এসে গাড়ির তেল শেষ হওয়ায় সে নেমে গেছে।

হোয়াং তারপর গাড়ির কাছ থেকে সরে এসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রাস্তা পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। শুকিয়ে গেলেও রক্তের চিহ্ন সে খুঁজে পেল। অনেক দূর পর্যন্ত এগুলো। রক্তের চিহ্ন সব জায়গায় খুঁজে না পেলেও সে নিশ্চিত হলো, গাড়ির তেল শেষ হবার পর এ রাস্তা ধরেই সে উত্তরে এগিয়ে গেছে পায়ে হেঁটে।

হোয়াং পেছন ফিরে সাথীদের ডাক দিয়ে বলল, 'তোমরা কুকুর নিয়ে এস। রক্তের দাগ অনুসরণ করে আমাদের হেঁটেই এগুতে হবে। যদিও দাগ সব জায়গায় নেই, মুছে গেছে, টম কিন্তু ঠিকই ধরতে পারবে। অসুবিধা হবে না। গাড়িটা পেছনে আসুক।

গাড়ি ও সাথীরা এসে হোয়াং এর পাশে দাঁড়াল। হোয়াং তার সিট থেকে অয়্যারলেস সেট তুলে নিয়ে বলল, 'বস, ওয়াং ও বরিসকে কথাটা জানিয়ে দেই।'

হেড কোয়ার্টারের মিটারে টিউন করতেই পেয়ে গেল ডাঃ ওয়াং এর গলা। হোয়াং তাকে জানাল এ পর্যন্ত যা দেখেছে, পেয়েছে সব।

তারপর নির্দেশ শুনে নিয়ে অয়্যারলেস বন্ধ করে বিরাট হাসি দিয়ে বলল, 'শুন তোমরা, বস ভীষণ খুশী। আমাদের প্রত্যেকের জন্য ৫ হাজার ইউয়ান করে পুরষ্কার ঘোষণা করেছে। আর যদি মেইলিগুলিকে আমরা ধরতে পারি তাহলে আমরা প্রত্যেকে ১০ হাজার ইউয়ান করে পাব। মেইলিগুলির খোঁজ পাওয়ার সংগে সংগেই জানাতে হবে।'

কুকুরকে সামনে নিয়ে ওরা আবার যাত্রা শুরু করল।

যেখানে এসে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল মেইলিগুলি, সেখানে এসে থমকে দাঁড়াল কুকুর। শুকে চলল এক জায়গার মাটি।

হোয়াং এগিয়ে এল সেখানে। জায়গাটা রাস্তার ওপাশে। হোয়াং ঝুঁকে পড়তেই শুকিয়ে যাওয়া রক্তের চিহ্ন তার চোখে পড়ল। ফোটা ফোটা নয়, পরিমাণে বেশ। ভ্রু কোঁচকালো হোয়াং। এখানে কি তাহলে মেইলিগুলি বসেছিল! হতে পারে।

হোয়াংরা কুকুর নিয়ে আরও সামনে এগুতে চাইল। কিন্তু কুকুর কিছুতেই রাস্তা ধরে উত্তরে এগুতে আর রাজি হলো না। এবার ছুটতে চায় সে পশ্চিম দিকে।

কিন্তু হোয়াংরা বহু খুঁজেও আর রক্তের দাগ কোন দিকে পেল না। রাস্তা ছেড়ে পশ্চিম দিকে মেইলিগুলি যেতে পারে। কিন্তু রক্তের দাগ হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল কেন? রহস্যের সমাধান হোয়াংরা করতে পারলো না।

অবশেষে কুকুরের ওপরই নির্ভর করল তারা।

এবার পশ্চিমে যাত্রা শুরু হলো তাদের।

আগে আগে কুকুর দৌড়ে চলেছে। পেছনে তারা চারজন। গাড়ি লক করে একটি টিলায় তারা রেখে দিয়েছে।

বেলা দশটা নাগাদ হোয়াংরা গ্রামে গিয়ে পৌঁছল।

তখনও গ্রামে প্রবেশে দেরী আছে। হোয়াং সাথীদের বলল, 'তোমাদের পিস্তল ঠিক আছে তো?'

'হ্যাঁ।' সবাই উত্তর দিল।

'দেখ আমরা মারামারি করতে চাই না। বলব, আমরা সরকারী লোক, আসামীর খোঁজে এসেছি। আক্রান্ত না হলে আমরা কাওকে কিছু বলবনা, মেইলিগুলিকে পেলে হেডকোয়ার্টার জানিয়ে দিয়ে আমরা নির্দেশের অপেক্ষা করবো।'

'গ্রামটা মনে হচ্ছে উইঘুরদের।' বলল সু লিন।

'হ্যাঁ, উইঘুরদের।'

গ্রামে ঢোকার মুখে হোয়াং দেখল একটা বালক একটা ভেড়া তাড়িয়ে এদিকে আসছে। হোয়াংদের এবং কুকুর দেখে সে দাড়িয়ে পড়েছে।

হোয়াং একটু এগিয়ে উইগুরদের ভাষায় ছেলেটিকে কাছে ডাকল।

ছেলেটি এল, খুব কাছে এল না।

হোয়াং নরম ভাষায় জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে একজন আহত মেয়ে এসেছে না?'

'এসেছে। সে তো তিন দিন আগে।'

'আছে কোথায়?'

‘শাইখ হাকিম দাদার বাড়িতে।’

এ জিজ্ঞাসার কোন দরকার ছিল না হোয়াংদের। কুকুর তাদের ঠিকই নিয়ে যাবে মেইলিগুলি যেখানে আছে, সেখানে। তবু একটা কৌতূহল মেটাল।

ছেলেটির পিঠ চাপড়ে হোয়াং রা আবার হাটা শুরু করল। ঢুকে পড়ল গ্রামে।

গ্রামে পুরুষ লোক কেউ তেমন নেই। সবাই মাঠে। গ্রামে কুকুরসহ চারজন অপরিচিতকে ঢুকতে দেখে বালক কিশোরদের মধ্যে চাঞ্চল্য পড়ে গেছে। শুরু হয়েছে ছুটাছুটি।

বৃদ্ধ ইব্রাহিম আওয়াং উঠানে বসে কাজ করছিল। কয়েকজন কিশোর ছুটে এল তাঁর কাছে। বলল ঘটনা।

সব শুনে ভ্রু কুচকালো ইব্রাহিম আওয়াং। বলল, ‘শিকারি কুকুর নিয়ে এসেছে! লোকগুলো দেখতে কেমন?’

‘কুকুর আগে আগে হাঁটছে। পেছনে ওরা। ওরা উইঘুর নয়, হান।’

‘হান? বলেই বৃদ্ধ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘তোরা মাঠ এ যা, সবাইকে আসতে বল, এই মুহূর্তে। বলবি শত্রু গ্রামে ঢুকেছে।’

কিশোর বালকের দল সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন পথে ছুটল মাঠের দিকে।

আর ইব্রাহিম আওয়াং বৈঠকখানা থেকে তাঁর স্বয়ংক্রিয় রাইফেল টি বের করে এনে উঠানের প্রান্তে উঠানে প্রবেশের মুখে তৈরি বাড়ির প্রতীক্ষা কুঠুরিতে উঠে বসল। কুঠুরিতে রাইফেলটা চালাবার জন্য ঘুলঘুলি আছে এবং ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গুলি করার মত জায়গা আছে।

অন্যদিকে বাড়ির ভিতরে একটি অতান্ত পরিপাটি নরম এক সজ্জায় শুয়ে আছে মেইলিগুলি। তাঁর গায়ে জ্বর। ইব্রাহিম আওয়াং ক্ষতস্থানে ভাল করে পরিষ্কার করে ওষুধ দিয়ে ব্যান্ডেজ করার পরদিন থেকেই রক্ত বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু জ্বর এসেছে, তা আর ছাড়েনি। দুধ, গোস্তের সুপ সহ পুষ্টিকর যা পাওয়া সম্ভব মেইগুলিকে খাওয়াচ্ছে। কিন্তু তাঁর পরও এখনও হাটার মত শক্তি তাঁর ফিরে আসেনি। মেইলিগুলি তাঁর আসল পরিচয়, সে আহমদ মুসা স্ত্রী, একথা প্রকাশ করতে চায়নি। প্রথম দিকে গোপন রেখেছিল। কিন্তু পিতাতুল বৃদ্ধ ইব্রাহিম

আওয়াং এর কাছে মিথ্যা কথা বলতে অন্তর সায় দেয়নি মেইগুলি। ফলে, পরিচয় তাঁর প্রকাশ করতে হয়েছে। কিন্তু প্রকাশ করে আরেক বিপদে পড়েছে সে। আদর ও সম্মানের বাহুল্য সে ভীষণ অস্বস্তিতে ভুগছে। তাকে মাথায় রাখবে না কোথায় রাখবে তা তারা যেন ঠিক করতে পারছে না। আর সে গ্রামের সকলের দর্শনীয় বস্তুতে পরিণত হয়েছে। আর মাঝে মাঝে গর্বে বুক ফুলে উঠে মেইলিগুলির, দেশের এক নিভৃত কোনের এক পাহাড়ি পল্লীতেও তাঁর আহমদ মুসা এত পরিচিত, সকলের এত প্রিয় পাত্র। আবার বুক ফেটে মাঝে মাঝে কান্না আসে তাঁর, কোথায় তাঁর আহমদ মুসা। সে কি জানে তাঁর মেইলিগুলি কি হাল!

চিত হয়ে শুয়ে ছিল মেইলিগুলি। ইব্রাহিম আওয়াং এর মেয়ে রোকেয়া তাঁর মাথায় পানিপটি দিচ্ছে। জ্বর কম রাখার চেষ্টা এটা।

'আপা, আহমদ মুসা ভাইয়া কোথায়?' ভেজা কাপড়ের একটা নতুন পটি কপালে লাগাতে লাগাতে বলল রোকেয়া।

'স্পেনে।'

'সে তো বহু দূর। আসবেন না ?'

'খবর কি উনি জানেন?'

'আপনার খবর পেলে তো ছুটে আসবেন।'

মেইলিগুলি মুখ খুলেছিল কিছু বলার জন্য, রোকেয়ার মা ঘরে ঢুকল এক গ্লাস দুধ নিয়ে।

এসে মেইলিগুলির খাটিয়ার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে বলল, 'মা দুধ টুকু খেয়ে নাও মা।'

'মা, আপনি উঠুন। দুধ দিন, আমি খেয়ে নিচ্ছি।' মাথা তুলে হাত বাড়িয়ে বলল মেইলিগুলি।

'তা কি হয় মা। তুমি অসুস্থ, দুর্বল। আমি খাইয়ে দিচ্ছি।'

মেইলিগুলির আপত্তি টিকল না। রোকেয়ার মা দুধ খাইয়ে দিল। গ্লাস নিয়ে বেরিয়ে যাবে এমন সময় ঘরে ঢুকল দু'জন বালক। রোকেয়ার মা'র হাতে মুখোমুখি দাড়িয়ে তাদের একজন বলল, 'শুনছেন দাদি হুজুর, শিকারি কুকুর নিয়ে চার জন লোক গ্রামে ঢুকেছে। এদিকেই আসছে।'

‘তো কি হয়েছে বাছারা।’ বালকদের কথাকে পাত্তাই দিল না রোকেয়ার মা।

কিন্তু কথাটা শুনেই কপাল কুঞ্চিত হয়েছে মেইলিগুলির। সে মাথাটা হঠাৎ উঁচু করে বলল, ‘শিকারি কুকুর নিয়ে চার জন লোক! লোকগুলো কেমন?’

‘হান।’

‘হান?’ বলেই উত্তেজিত ভাবে উঠে বসল মেইলিগুলি। কপাল থেকে পানিপট্টির কাপড় খসে পড়ে গেল কোলের উপর।

‘জি। ওরা তো খারাপ লোক। দাদা হুজুর তো বন্দুক নিয়ে সে আছে ওদের জন্য। আমাদেরকে ওদিকে যেতে সবাই নিষেধ করেছে।’ মেইলিগুলি মুখে অন্ধকার নেমে এল। রোকেয়া এবং রোকেয়ার মা এক সাথে বলে উঠল, ‘কি ব্যাপার, ওরা কারা, চিন ওদের ?’

‘চিনি না, জানিনা কারা আসছে। তবে শুনে আমার সন্দেহ হচ্ছে, যারা আমাকে হত্যা করতে চায়, ওরা তারাই।’

রোকেয়া ও রোকেয়ার মা দু জনেই মুখে মুহূর্তে অন্ধকার হয়ে গেল। রোকেয়ার মা ফিরে এল ঘরে আবার। রোকেয়া এসে জড়িয়ে ধরল মেইলিগুলিকে। বালকরা তখন চলে গিয়েছিল।

রোকেয়ার মা রোকেয়াকে লক্ষ্য করে বলল, ‘যাও তো দেখে এস ব্যাপার কি ?’

‘আম্মা, তুমি আপার কাছে বস। আমি আসছি।’

বলে বেরিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ পড়ে ফিরে এল রোকেয়া কাঁপতে কাঁপতে।

রোকেয়ার দিকে তাকিয়ে রোকেয়ার মা আতঙ্কে উঠে দাঁড়াল।

বলল, ‘কি হয়েছে রোকি?’ আর্তনাদ এর মত শুনাল রোকেয়ার মার কণ্ঠ।

‘সর্বনাশ হয়ে গেছে। কি ঘটেছে কে জানে? বন্দুক, তীর-ধনুক, তলোয়ার-বর্শা যে যা পারছে তা নিয়ে গ্রামের সব মানুষ এসেছে, আরও আসছে। সে চারজন লোককে ঘিরে ফেলেছে সবাই। শুনলাম, ঐ চারজন দাবী করেছে, ‘আমরা সরকারী লোক। আমরা আসামী ধরতে এসেছি। আসামীকে আমাদের

হাতে তুলে দেওয়া হোক।’ আর আমাদের তরফ থেকে বলা হয়েছে, অস্ত্র ফেলে দিলে আত্মসমর্পণ না করলে চারজনকেই হত্যা করবে।’ ওদের চারজনের হাতেই রিভলবার। ওরা নাকি হুমকি দিয়েছে, সব ঘটনা তারা ওয়ারলেসে জনিয়ে দিয়েছে রাজধানীতে। ওখান থেকে হেলিকপ্টার বোঝাই সৈন্য আসছে। জবাবে আমাদের তরফ থেকে বলা হয়েছ, গ্রামের একজন লোক বেঁচে থাকা পর্যন্ত তারা লড়াই করবে। একজন লোক বেঁচে থাকা পর্যন্ত মেইলিগুলি আপাকে তাদের হাতে তুলে দেয়া হবে না। আমার মনে হচ্ছে যে কোন সময় গোলাগুলি শুরু হয়ে যেতে পারে।’

থামল রোকেয়া।

রোকেয়ার মা পাঁথরের মত স্থির হয়ে গেছে।

কিন্তু মেইলিগুলির মুখ এখন অন্ধকার নয়। চোখ দুটি তাঁর উজ্জ্বল। মুখে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় এর ছাপ। বলল, ‘রোকেয়া চাচাজান কে আমার কাছে ডাক। উনি আসতে দেরী করলে আমি সেখানে গিয়ে হাজির হব।’ অত্যন্ত স্পষ্ট ও দৃঢ় মেইলিগুলির কণ্ঠস্বর। রোকেয়া ও রোকেয়ার মা বিস্মিত হয়ে তাকাল মেইলিগুলির দিকে। তারা দেখল, রোগ কাতর মেইলিগুলি এবং এই মেইলিগুলি যেন এক মেইলিগুলি নয়।

রোকেয়া ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর তাঁর আব্বা ইব্রাহিম আওয়াং সহ ফিরে এল। তাঁর হাতে রাইফেল।

এসেই বলল, ‘মা তুমি ওখানে গিয়ে হাজির হবে এ হুমকি না দিলে আসতাম না। আসা যায় না। ওরা আমাদের কাপুরুষ ভেবেছে। আজ একটা নিকেশ হয়ে যাবে। কি বলবে তাড়াতাড়ি বল মা।’

‘চাচা জান’, বলতে শুরু করল মেইলিগুলি, ‘আপনি এ গ্রামের সর্দার, আপনি বিজ্ঞ, আপনি অন্যদের মত আবেগপ্রবন হবেন না, এই আশা নিয়েই আমি কয়েকটা কথা বলব।’

‘বল মা।’ বলে চেয়ার টেনে বসল ইব্রাহিম আওয়াং।

‘চাচাজান এ গ্রামে কোন রক্তপাত হতে পারবে না।’

‘আমরাও তাই চাই, কিন্তু ওরা তো তোমাকে ছিনিয়ে নিতে চায়। তাহলে তো রক্তপাত হবেই।’

‘চাচাজান ওদের আপনি চেনেন না। ওরা ডাঃ ওয়াং ও জেনারেল বরিসের লোক। এখন যে সরকার চলছে তা ওদেরই সরকার। ওদের সাথে এইভাবে লড়াইয়ে নামা ঠিক হবে না।’

‘আমরা তো লড়াইয়ে নামছি না। ওরাই তো লড়াই করতে আসছে। আমরা লড়াই বন্ধ করব কিভাবে?’

‘পথ আছে চাচাজান।’

‘কি পথ?’

‘আমাকে পেলেই আর ওরা কারো গায়ে হাত এখন দেবে না।’

‘কি বলছ? তোমাকে ওদের হাতে তুলে দেব? গ্রামের একটি লোক বেঁচে থাকতেও তা হবে না।’

‘চাচাজান, আপনি আবেগপ্রবণ হবেন না। আপনি গ্রামের সর্দার। গ্রামের শত শত নারী, শিশু, বৃদ্ধের কথাও আপনাকে ভাবতে হবে।’

‘আর তোমার কথা, আহমদ মুসার স্ত্রীর কথা আমরা ভাববো না বুঝি?’

‘না।’

‘যদি তাই হয়, তাহলে এমন পথ কি আমরা বের করতে পারি না যে, গ্রামবাসীও বাঁচবে, আমার বাঁচারও একটা সম্ভাবনা থাকবে।’

‘সেটা কিভাবে?’

‘ধরুন, আমাকে আপনারা ওদের হাতে দিলেন, তাতে গ্রাম বেঁচে গেল। আমি বন্দী হলাম। কিন্তু বন্দী হওয়ার মানে মৃত্যু নয়। আহমদ মুসা, আমার স্বামী, কতবার বন্দী হয়েছেন, কিন্তু আবার বেরিয়ে এসেছেন, আসতে পেরেছেন, আল্লাহ সুযোগ করে দিয়েছেন। তেমনি আল্লাহ আমাকেও সাহায্য করতে পারেন। আমি মুক্ত হতে পারি।’

থামল মেইলিগুলি।

ইব্রাহিম আওয়াং সংগে সংগে কথা বলতে পারলেন না। বিস্ময়ে তার দুই চোখ বিস্ফোরিত। এত বুদ্ধি এইটুকুন মেয়ের! এত শান্ত ভাবে, এত দূর দিয়ে চিন্তা

করতে পারল কি করে সে এই দুঃসময়ে। এখন তো তার ভয়, আশংকা, উদ্বেগে ভেঙে পড়ার কথা। কিন্তু গত কয়েকদিনের মধ্যে আজকেই সে সবচেয়ে স্বাভাবিক। যেন সে অসুস্থও নয়।

আর রোকেয়া ও রোকেয়ার মা বাক রুদ্ধ হয়ে গেছে মেইলিগুলির কথা শুনে।

অনেকক্ষণ পর কথা বলল ইব্রাহিম আওয়াং। বলল, 'তোমার কথার একটা যুক্তি আছে। কিন্তু গ্রামের কেউ এটা মেনে নেবে না। নিজেদের মেয়েকে শত্রুর হাতে তুলে দিতে রাজি হবে না কেউ।'

'গ্রামের প্রধান প্রধান লোকদের আমার কাছে ডাকুন। আমি তাদের বুঝাব।'

'কিন্তু মা এমন একটা ব্যবস্থাকে আমিও যে মেনে নিতে পারছি না।'

'চাচাজান, আপনারা সম্মত না হলে আমি নিজ সিদ্ধান্তে ওদের হাতে গ্রেফতার হব। আহমদ মুসার স্ত্রী হিসেবে এমন একক সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার আমার আছে। আমি কিছুতেই এই মুসলিম জনপদকে আমার জন্যে বিরাণ হতে দেব না।' কঠোরতা ঝরে পড়ল মেইলিগুলির কন্ঠে।

'ঠিক আছে মা, আমি বয়সে বড় হলেও তুমি আমাদের সম্মানিত নেতার স্ত্রী, আমাদের নেত্রী। ঠিক আছে, আমি গ্রামের প্রধানদের ডেকে তোমার সব কথা বলে তাদের বুঝাতে চেষ্টা করব। দরকার হলে তোমার কাছে তাদের নিয়ে আসব।'

বলে চলে যাচ্ছিল ইব্রাহিম আওয়াং।

মেইলিগুলি ডেকে বলল, 'আরেকটা কথা চাচাজান, গ্রামের প্রধানদের ডেকে নেয়ার আগে আপনি সেখানে ঘোষণা করুন, আমার পক্ষ থেকে অনুরূপ আমাদের আলোচনা শেষ হওয়ার আগে আমাদের কেউ যাতে কোন ঘটনা না ঘটায়।'

'ধন্যবাদ মা। ভালো কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছ।'

বলে চলে গেল ইব্রাহিম আওয়াং।

অনেক্ষণ পর বার-চৌদ্দজন লোককে নিয়ে ফিরে এল সে। লোকরা সবাই দরজার বাইরে উঠানে মাথা নিচু করে দাঁড়াল। শুধু দরজায় এসে দাঁড়াল ইব্রাহিম আওয়াং। বলল, লোকদের দিকে ফিরে, 'আমাদের মা, আমাদের নেত্রী আমাকে যা বলার জন্যে বলেছিলেন, আমি তা তোমাদের বলেছি। আমি তোমাদের তাঁর কথায় রাজি করাতে পারিনি। এখন বল তোমাদের কথা মা'র কাছে।'

'আমরা তাঁকে শত্রুর হাতে তুলে দিতে পারবো না। কোন অবস্থাতেই না।' সমস্বরে বলে উঠল সবাই।

মেইলিগুলি একটু শুয়েছিল। উঠে বসল। মুহূর্ত কয়েক চোখ বন্ধ করে থাকল। তারপর বলতে শুরু করল, 'আপনারা কেউ আমার পিতা, কেউ ভাইয়ের মত। সবাইকে আমার অনুরোধ, কোন ক্ষতি স্বীকার না করে কিভাবে এ সংকট থেকে বাঁচা যায় তা ভাববার জন্যে। সেদিন ওরা আমাকে ধরতে না পেরে আমার আব্বা-আম্মাকে হত্যা করেছে। এখন আমাকে ধরতে বাধা দিলে সব গ্রামবাসীকে হত্যা করতে ওরা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না। এমন যদি হতো গ্রামবাসী সবাই নিহত হওয়ার বিনিময়েও আমি বাঁচব, তাহলেও একটা কথা ছিল, কিন্তু তা হবে না। সুতরাং অনর্থক এভাবে জীবন দেয়ার আমি বিরোধী। আমি বন্দী হলে কি হবে? আসলে ওরা আমাকে বন্দী করতে চায়, আমাকে বন্দী রেখে আহমদ মুসাকে হাতে পেতে চায়। সুতরাং প্রথমেই আমাকে ওরা হত্যা করবে না। আর বন্দী করলেই কাউকে মারা যায় না। আল্লাহ আবার তাকে মুক্ত করতে পারেন। সুতরাং আপনাদের চিন্তার কিছু নেই।'

থামল মেইলিগুলি।

'আপনার কথা ঠিক। কিন্তু এসব চিন্তা করে কি কেউ তার মেয়ে বা বোনকে শত্রুর বন্দীখানায় ঠেলে দিতে পারে? আমরা তা পারব না।'

'দেখুন আহমদ মুসা এখানে নেই। তিনি থাকলে আমি যা বলছি সে কথাই তিনি বলতেন। তিনি কিছুতেই রাজি হতেন না তাঁর জন্যে নারী, শিশুসহ একটি গ্রামের মুসলিম জনপদ ধ্বংস হয়ে যাক। তিনি থাকলে যে নির্দেশ দিতেন, সেই নির্দেশই আমি দিচ্ছি, আপনারা গিয়ে বন্দী করতে আসা ঐ চারজন সহ সকলের কাছে ঘোষণা করে দিন, আহমদ মুসার স্ত্রী মেইলিগুলি স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব

মেনে নিয়েছে। সুতরাং আর কোন শত্রুতা নেই। সবাই অস্ত্র সংবরণ করে নিজ নিজ ঘরে ফিরে যান।’

থামল মেইলিগুলি।

সবাই এক এক করে নত মস্তকে চলে গেল। শুধু থাকল ইব্রাহিম আওয়াং। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে। তারও মাথা নত। চোখ থেকে গড়িয়ে আসা অশ্রুতে তার দাড়ি ভিজে যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ পর সে মুখ তুলল। ঘরের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘মা, তুমি অনেক বড় মা। আল্লাহ আহমদ মুসাকে তাঁর যোগ্য স্ত্রী দিয়েছেন।’

চলে গেল বৃদ্ধ ইব্রাহিম আওয়াং।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখছিল যেন রোকেয়া এবং রোকেয়ার মা। মেইলিগুলিকে তাদের মনে হচ্ছে একজন অতি সাহসী হিসেবে। এই নরম মেয়েটির মধ্যে এত মহত্ব, এত সাহস, এত তেজ লুকিয়ে ছিল। শ্রদ্ধায় নুয়ে গেল তাদের মাথা।

কিছুক্ষণ পর গ্রামের আকাশে শোনা গেল দুটি হেলিকপ্টারের আওয়াজ।

নেলে এল হেলিকপ্টার।

সেই চারজন আগেই অয়ারলেসে জানিয়ে দিয়েছিল সব খবর। তবু দুই হেলিকপ্টারের একটি থেকে নেমে এল স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র সজ্জিত প্রায় ডজন দুই মানুষ। অন্যটি থেমে নেমে এল ডাঃ ওয়াং এবং আরও কয়েকজন। এই অভিযানে আসার কথা ছিল জেনারেল বরিসের। কিন্তু এক মোটর এক্সিডেন্টে সে আহত বলে আসতে পারেনি।

স্ট্রেচারে করে মেইলিগুলিকে এনে তোলা হল হেলিকপ্টারে। গ্রামের মানুষ চারদিকে দাঁড়িয়ে দেখল সব। কারও মুখেই একটিও কথা নেই। সবার মধ্যেই যেন অসহ্য এক যন্ত্রণা। সে যন্ত্রণা নিরব অশ্রু হয়ে বেরিয়ে আসছে অনেকের চোখ থেকে। শুধু সেই মানুষের সারিতে হাজির ছিল না ইব্রাহিম আওয়াং, রোকেয়া এবং রোকেয়ার মা। ইব্রাহিম আগেই সরে গিয়েছিল বাড়ি থেকে। আর রোকেয়া ও তার মা কাঁদছিল ভেতর বাড়ির উঠানে লুটিয়ে পড়ে।

মেইলিগুলিকে নিয়ে ডাঃ ওয়াং ও তার দলবল হেলিকপ্টারে উঠে গেলে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ধারীরা এক সাথে আকাশে গুলী করে বিজয় ঘোষণা করে নিজেরাও উঠে গেল হেলিকপ্টারে।

আকাশে উড়ল হেলিকপ্টার দু'টি।

চক্কর দিল গ্রামের ওপর কয়েকবার।

হেলিকপ্টারের ফ্লোরে স্ট্রেচারের ওপরই শুয়ে ছিল মেইলিগুলি। সামনে এক সারি চেয়ারে বসেছিল ডাঃ ওয়াং এবং তার সাথীরা।

হেলিকপ্টার দু'টো গ্রামের উপর দিয়ে চক্কর দেয়ার এক পর্যায়ে ডাঃ ওয়াং পাশের একজনকে ইশারা করল। সংগে সংগে সে উঠে গিয়ে একটি কি বোর্ডের প্যানেলে একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর চারটি সুইচ টিপে দিল।

বিষয়টা মেইলিগুলির নজর এড়াল না। সেটা ডাঃ ওয়াংও টের পেল। মেইলিগুলির দিকে তাকিয়ে বলল, 'মন খারাপ করো না ম্যাডাম। মাত্র চারটি বোমা পড়েছে। কি আর তেমন ক্ষতি হবে। কিছু বাড়ি পুড়বে। দু'চারজন মানুষ মরতেও পারে।'

অসহ্য বিদ্রুপ ছড়িয়ে পড়ল ডাঃ ওয়াং এর কথায়। মেইলিগুলি মোটেই বিস্মিত হলো না তাদের এই বিশ্বাসঘাতকতায়। এরা যে কোন পর্যায় পর্যন্ত নামতে পারে। আপনাতেই মেইলিগুলির হাতটা গিয়ে স্পর্শ করল আন্ডারওয়্যারের পকেটে ক্ষুদ্র পিস্তলটিতে। সেবার বিদায়ের সময় আহমদ মুসা মেইলিগুলির জন্যে যে ক্ষুদ্র ব্যাগ রেখে গিয়েছিল, তার মধ্যে যে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো ছিল, তার মধ্যে ছিল এই পিস্তলটি। স্বামীর উপহার এই পিস্তলটিকে এক গোসলের সময় ছাড়া কোন সময়ই কাছ ছাড়া করতো না। দেখলে সবাই খেলনা পিস্তল মনে করবে। কিন্তু ওতে ছয়টি গুলি থাকে। গুলি গুলো দেহের ভিতর গিয়ে বিস্ফোরিত হয় বলে ক্ষতি করে বড় রিভলবারের সমান। দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ বন্ধ করল মেইলিগুলি। এক চরম অনিশ্চিতের যাত্রা তার এটা। এমন পরিস্থিতির মুখোমুখী সে কোন দিনই হয়নি। মেইলিগুলি ভাবতে লাগল, এমন পরিস্থিতিতেও আহমদ মুসা কি কি করত। ভাবতে ভাবতে চোখ ধরে এল মেইলিগুলির।

যুবায়েরভ, আলদর আজিমভ ও আবদুল্লায়েভ শিহেজী পর্যন্ত নিরুপদ্রুপে পৌঁছেছিল। সীমান্ত পাড়ি দিতেও তাদের বেগ পেতে হয়নি। তাদের কাছে আছে বৈধ পাসপোর্ট ও ভিসা।

শিহেজী পর্যন্ত পৌঁছে তারা থামে। লক্ষ্য শিহেজীর মুসলিম বসতির খবর নেয়া, সেই সাথে উরুমুচীতে কি ঘটেছে তার বিস্তারিত খবর সংগ্রহ করা।

হাইওয়ে থেকে শিহেজী উপত্যকা বেশী দূরে নয়। যুবায়েরভরা তাদের গাড়ি একটা টিলার আড়ালে রেখে পায়ে হেঁটে যাত্রা করল। তাদের পরনে হানদের পোশাক। ইচ্ছে করেই পরেছে, যাতে করে প্রথমেই তারা কারো সন্দেহের স্বীকার না হয়।

উপত্যকার মাঠ পেরিয়ে যুবায়েরভরা যখন উপত্যকার সবচেয়ে নিকটবর্তী এবং তাদের পরিচিত গ্রামের উপকন্ঠে পৌঁছল, তখন রাত আটটা। এশার আজানের সময়।

গ্রামে ঢোকার মুখেই মসজিদ। যুবায়েরভরা মনে করল মসজিদের নামাজেই সবার সাথে দেখা হবে।

কিন্তু মসজিদের কাছাকাছি যখন তারা পৌঁছল, তখন আটটা দশ মিনিট। বিস্মিত হলো আবদুল্লায়েভ আজান হলো না কেন?

মসজিদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই মনটা কেঁপে উঠল আবদুল্লায়েভ-এর। তাহলে তাদের শিহেজী উপত্যকা এখন আর তাদের নেই। যুবায়েরভরা দেখল, মসজিদের মিনার ভেঙে পড়ে আছে। তারা আরও এগিয়ে গেল মসজিদের কাছে। দেখল, মসজিদের জানালা দরজা একটিও নেই। বুঝল তারা শিহেজীতে কোন মুসলমান অবশিষ্ট নেই। তারা কার কাছে যাবে, কার কাছে খবর নেবে।

'চলুন ফিরে যাই।' বলল যুবায়েরভ।

'আমরা গ্রামের ভেতরে গিয়ে একটু দেখতে পারি না?' বলল আবদুল্লায়েভ।

‘অহেতুক ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ নেই। আমাদের আসল কাজ মেইলিগুলির সন্ধান, আমরা সে কাজ শুরুই করতে পারিনি। শিহেজী এবং অন্যান্য জায়গায় যা ঘটেছে, তার প্রতিবিধানে আমরা হাত দেব পরে।’

‘ঠিক বলেছেন, চলুন ফেরা যাক।’ বলল আবদুল্লায়েভ।

তারা ফিরে দাঁড়িয়ে আবার হাঁটতে শুরু করল সেই মাঠের মধ্যে দিয়ে।

‘কোথায় যাব আমরা, কোত্থেকে কাজ শুরু করব।’ স্বগত কন্ঠে বলল যুবায়েরভ।

‘মনে হয় আগে আমরা গাড়িতে ফিরি, তারপর চিন্তা করা যাবে।’ বলল আলদর আজিমভ।

তারা ফিরে এল শিহেজীর দক্ষিণ প্রান্তে এবং হাইওয়ের উত্তরে তাদের গাড়ি রাখা টিলাময় পার্বত্য স্থানটিতে। রাত তখন দশটা।

তারা খুঁজে খুঁজে একটা গুহা মত স্থান বের করল। সিদ্ধান্ত নিল, এশার নামাজটা এখানে পড়ে খাওয়া দাওয়া সেরে গুহায় একটু বিশ্রাম নিয়ে রাত ১২টার দিকে বেরুবে। প্রথমে তাদের উরুমচি যেতে হবে। সেখানে না গেলে বুঝা যাচ্ছে সামনে এগোবার মত তথ্য পাওয়া যাবে না।

তায়াম্মুম করে তারা সামাজ পড়ল।

নামাজে ইমামতি করল বয়সে সবার বড় আলদর আজিমভ। পাহাড়ের নিরব বুকে তার অনুচ্চ নরম তেলওয়াত যেন চারদিকে একটা করুণ মুর্চ্ছনার সৃষ্টি করে দিল।

নামাজ শেষে তারা গল্প গুজব করছে। গাড়ি থেকে খাবার ও পানি এনে আবদুল্লায়েভ তাদের সাথে বসল। তারা এখন খাওয়া শুরু করবে।

এই সময় অন্ধকার ফুঁড়ে একজন লোক এসে তাদের সামনে দাঁড়াল।

লোকটি একজন তরুণ। তার পিঠে রাইফেল ঝুলানো। পরনে উইঘুর পোষাক।

হঠাৎ যুবকটিকে এস দাঁড়াতে দেখে বিস্মিত হয়েছে জুবায়েরভরা সবাই। কিন্তু কোন উদ্বেগ বোধ করেনি। তরুণটির মধ্যে শত্রুতার কোন মতলব নেই সেতা তার ঘাড়ে রাইফেল রাখা দেখেই বুঝেছে।

তরুণটি সামনে এসে দাঁড়িয়েই সালাম দিয়ে বলল, 'আল হামদুলিল্লাহ, আপনাদের নামাজ বাঁচিয়েছে আপনাদের, আমাকেও। আমি আপনাদের হত্যা করার জন্যে গাড়ি পাহারা দিয়ে বসে আছি। আমি যখন আপনাদের দিকে রাইফেল তাক করেছি, সেই সময়েই আপনারা নামাজে দাঁড়ালেন।'

'তুমি কে? আমাদের হত্যা করতে চেয়েছিলে কেন?' বলল যুবায়েরভ।

'আমি আপনাদেরকে হানদের বন্ধু মনে করেছিলাম। আমার শপথ, হান কিংবা হান পন্থীয় কাউকে হত্যা না করে প্রতিদিনের খাবার স্পর্শ করবো না। আজ কোন হানকে আমি সুযোগের মধ্যে পাইনি।'

'তোমার পরিচয় তো বললে না।' বলল আলদর আজিমভ।

'আমি উইঘুর মুসলিম। শিহেজীর এক বাসিন্দা ছিলাম। আমরা তখন ঘুমিয়ে। শেষ রাতের দিকে হাজার হাজার হান গিয়ে হত্যা, লুন্ঠন চালিয়ে, অগ্নি-সংযোগ করে শিহেজীর সব মুসলমানকে উচ্ছেদ করেছে তারা। আমার আব্বা-আম্মা, ভাই-বোন সবাই নিহত হয়েছে ওদের হাতে।'

'তোমরা কিছূ জানতে পারনি আগে?' বলল আবদুল্লায়েভ।

'কিছুটা আঁচ করেছিলাম। গ্রাম আক্রমনের আগে অনেকেই সরে পড়তে পেরেছে। কিন্তু বেশীর ভাগই গ্রাম ছাড়েনি। তারা সন্দেহ করলেও এতটা আশা করেনি।'

'শিহেজীর অবশিষ্ট মুসলমানরা এখন কোথায়?'

'অনেকে গেছে উত্তরের আলদাই পাহাড় অঞ্চলে, তবে অধিকাংশই গেছে দক্ষিনের বাবাহরো পাহাড় এলাকায়।'

'তোমাকে ধন্যবাদ। তোমার মতই কাউকে খুঁজছিলাম। তুমি উরুমচির কোন খবর জান?'

'কিন্তু তার আগে আপনাদের পরিচয় বলুন।'

'তোমার কি ধারনা?' বলল যুবায়েরভ।

'আপনারা মুসলমান কিন্তু বিদেশী।'

'কেমন করে বুঝলে?'

'গাড়ি দেখে। ওটা কাজাখাস্থানের গাড়ি।'

‘আমাদের সম্পর্কে কি ধারণা করেছিলে?’

‘কাজাখাস্থান থেকে এসেছেন ডাঃ ওয়াং ও জেনারেল বরিসের সাহায্য করতে।’

‘জেনারেল বরিসকে চেন?’

‘সে এবং ডাঃ ওয়াং তো সমস্ত নষ্টের মূল।’

‘এখন বল উরুমচিতে কি ঘটেছে, তুমি জান?’

‘কিন্তু আপনারা বলেননি আপনাদের আসল পরিচয়। কেন আপনারা এসেছেন? কেন এ খবর আপনারা জানতে চান?’

‘আলহামদুলিল্লাহ, তুমি খুব বুদ্ধিমান ছেলে।’

বলে যুবায়েরভ একটু থামল, তারপর আবার বলতে শুরু করল, ‘সিংকিয়াং এর এই বিপর্যয়ের খবর আমরা ওপার থেকে পেয়েছি। জানতে পেরেছি, গভর্নর লি ইউয়ান তার পরিবার সমেত গ্রেপ্তার হয়েছেন। মেইলিগুলির পিতা মাতা নিহত হয়েছেন এবং মেইলিগুলি আহত ও নিখোঁজ। এটুকু খবর পেয়েই আমরা ছুটে এসেছি।’ বলল যুবায়েরভ।

‘মেইলিগুলিকে আপনারা চেনেন? কেমন করে?’ বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে বলল ছেলেটি।

‘চিনব না কেন? আমরা আহমদ মুসার সহকর্মী। আমরা অনেকেই গতবার তাঁর সাথে এখানে ছিলাম।’ বলল আবদুল্লায়েভ।

‘আহমদ মুসাকেও আপনারা চেনেন? আপনারা তার সহকর্মী!’ ছেলেটির বিস্ময়টা এবার বড় রকমের।

‘কেন, মধ্য এশিয়ার বিপ্লবে তো তিনিই আমাদের নেতা ছিলেন।’

‘বুঝলাম। মাফ করবেন আমাকে। আর কোন প্রশ্ন আপনাদের?’

বলে বসে পড়ল ছেলেটি। বলল, ‘আমার দুর্ভাগ্য আমি আহমদ মুসাকে দেখিনি।’

‘দুঃখ করো না। তিনি আসবেন। তাকে অবশ্যই তুমি দেখবে।’ বলল যুবায়েরভ।

‘দেখতে পাব? আসবেন তিনি?’ ছেলেটির চোখ আনন্দে চক চক করে উঠল।

‘বিশ্বের যেখানেই তিনি থাকুন, সিংকিয়াং এর খবর পাওয়ার সংগে সংগে তিনি চলে আসবেন।’

যুবায়েরভ কথা শেষ করতেই আলদার আজিমভ বলল, ‘তোমার নাম কি ?’

‘ওমর মা চাং।’

‘মা চাং কে ছিল জান?’

‘হুই মুসলমানদের বিখ্যাত নেতা। তার নামেই আমার নাম রেখেছেন আব্বা।’

‘তুমি মুসলমানদের নেতা হতে চাও।’

‘কিছু হবার কোন ইচ্ছা আমার নেই। আমি শুধু প্রতিশোধ নিতে চাই। যত পারি হত্যা করতে চাই হানদের।’

‘কিন্তু সব হানতো অপরাধী নয় ওমর!’

‘না, ওরা সবাই অপরাধী। সবাই মিলে ওরা মেরেছে আমাদের, মারছে এখনও।’

‘না, তা নয় ওমর, বহু হান পরিবার এমন আছে, এ সব ব্যাপারে কিছুই জানে না। ওদের গায়ে হাত তুললে তো পাপ হবে। তুমি মুসলিম। তুমি এটা করতে পার না।’

‘হয়তো আপনার কথা ঠিক। কিন্তু বাছাই করার সময় এটা নয়।’ ভারী কন্ঠে বলল ওমর।

‘ঠিক আছে এ আলোচনা পরে করা যাবে। এস আমরা খেয়ে নেই।’

‘না আমি আমার শপথ ভাঙ্গতে পারব না।’ ম্লান কন্ঠে বলল ওমর মা চাং।

‘আমরা কে তুমি জান ওমর?’ বলল যুবায়েরভ। গম্ভীর কন্ঠ তার।

‘জানি।’

'জান কি ডাঃ ওয়াং ও জেনারেল বরিসের কর্তৃত্বে হানরা মুসলমানদের যেভাবে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়েছে, আমরা সেখান থেকে তাদের উদ্ধার করতে এবং অপরাধীদের শাস্তি দিতে চাই?'

'জি বিশ্বাস করি।'

যুবায়েরভ ওমরের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'দেখি তোমার হাত দাও।'

ওমর মা চাং তার ডান হাত বাড়িয়ে দিল।

যুবায়েরভ তার হাতটি হাতে রেখে বলল, 'নতুন করে শপথ গ্রহন কর, আমি যা বলছি তা বল।'

কথা শেষ করেই যুবায়েরভ বলতে শুরম্ন করল, 'হে আল্লাহ, তুমি আমাকে যে শক্তি ও যোগ্যতা দিয়েছ তা আজ জাতির দূর্দিনে ব্যায় করব এবং নিরপরাধ মানুষের এই দূর্গতির জন্য যারা দায়ী তাদের শাস্তি বিধান করব। তুমি তওফিক দাও। আমার দূর্বলতা, অসামর্থকে তুমি মাফ কর।'

ওমর মা চাং খুব গাম্ভীর্যের সাথে এই কথাগুলো যুবায়েরভের সাথে সাথে উচ্চারন করল।

'আলহামদুলিল্লাহ। ওমর তুমি নতুন শপথ গ্রহন করেছ, আগের শপথ শেষ। এবার এস।' বলল আজিমভ।

ইতিমধ্যে আজিমভ খাবার সাজিয়ে ফেলেছে পেপার প্লেটে। খুবেই সংক্ষিপ্ত খাবার। রুটি ও পনির। তার সাথে ফল।

ওমর আর কোন কথা বলল না। সবার সাথে খাবারে বসে গেল।

খেতে খেতে ওমর মা চাং উরুমুচিতে কিভাবে মুসলমানরা লুন্ঠিত ও উচ্ছেদ হয়েছে, কিভাবে সরকার উৎখাত হয়েছে, কিভাবে মেইলিগুলির আব্বা আম্মা আহত ও নিহত হয়েছে বিস্তারিতভাবে বলে গেল। কিন্তু মেইলিগুলি কোথায়, কোন দিকে পালিয়েছে তা কেউ জানে না। কারও কাছে সে তথ্য পায়নি। তবে খাওয়া শেষ করে হাত মুছতে মুছতে ওমর একটা কাহিনী শুরু করল। ওমর মা চাং বলল, 'আজ সকালে উমুর এক সরাইখানায় ট্যামেং হয়ে আসা একজন মংগোলীয় মুসলিম সওদাগরের সাথে দেখা হলো। সে কথায় কথায় জানাল, ট্যামেং এর শিহেজী থেকে যাওয়া এক উদ্বাস্তু পরিবারের একজন তাকে বলেছে,

আলতাই পর্বত এলাকায় রাস্তার ওপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকা এক মুসলিম মহিলাকে তারা পায়। মহিলাটির বাম পা সম্ভবত গুলিতে আহত। যে জায়গায় তারা মহিলাকে পায় তার বেশ দক্ষিনে রাস্তার ওপর একটা ট্যাক্সি পায় তারা। ট্যাক্সির ড্রাইভিং সিটের নিচে রক্ত জমে ছিল। আর ট্যাক্সির ফুয়েল ট্যাংকারে কোন পেট্রল ছিল না। তাদের ধারনা, অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া মহিলাটিরই এ ট্যাক্সি। তেল শেষ হয়ে যাওয়ায় হেঁটেই সে যাত্রা করেছিল। কিন্তু প্রচুর রক্তক্ষরন ও দুর্বলতার কারনে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। অজ্ঞান অবস্থায় তাকে তারা রাস্তার পশ্চিম পাশে কিছু দূরে একটা উইঘুর পল্লীতে। পল্লীর সরদার ইব্রাহিম আওয়াং-এর বাড়িতে রেখে তারা গন্তব্যের পথে চলে যায়। ওরা মংগোলীয় সরদারকে অনুরোধ করেছে ফেরার পথে তারা যেন মেয়েটির খোঁজ নিয়ে যায়।'

কাহিনীটি শুনে যুবায়েরভ, আজিমভ ও আবদুলস্নায়েভ- এর চোখ উজ্জল হয়ে উঠল। মেইলিগুলির অবস্থার সাথে কাহিনীর ঐ মেয়েটির অবস্থা সম্পূর্ন মিলে যায়। ব্যাগ্র কন্ঠে যুবায়েরভ জিজ্ঞাসা করল, 'মহিলাটি কোন গোত্রের তা কি বলেছে?'

'জি। মেয়েটি উইঘুর।'

'আচ্ছা, ঐ গাড়িটি ঐখানে আছে কি না?'

'জি, গাড়িটি মংগোলীয় সওদাগর দেখে এসেছেন।'

'যেখানে ঐ অজ্ঞাত মেয়েটিকে রেখে গেছে সেই উইঘুর পল্লীর লোকেশন সম্পর্কে কি সওদাগর কিছু বলেছে?'

'যেখানে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে মাইল দুই উত্তরে এমন একটা জায়গা পাওয়া যাবে যেখানে থেকে দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে পশ্চিমে একটা করিডোর নেমে গেছে। ঐ করিডোর ধরে নেমে উপত্যকার মধ্যে দিয়ে পশ্চিমে দুই মাইল এগুলেই সেই পল্লী পাওয়া যাবে।'

'ধন্যবাদ ওমর, আমার মন বলছে ঐ মহিলাটিই আমাদের মেইলিগুলি হবে।' বলল যুবায়েরভ।

'সওদাগরের মুখে কাহিনী শুনে আমারও তাই মনে হয়েছে স্যার। বলল ওমর মা চাং।

যুবায়েরভ, আলদর আজিমভ ও আবদুল্লায়েভের দিকে তাকাল। তারাও মাথা নেড়ে বলল, 'আমাদের মন এটাই বলছে।'

আনন্দে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল যুবায়েরভের। বলল, 'তাহলে আর দেরি নয়, চলুন আমরা এখন যাত্রা করব।'

'আমাদেরও এটাই মত।' বলল আজিমভ ও আবদুল্লায়েভ।

'আমাকে কি দয়া করে আপনারা সাথে নেবেন ?' ম্লান মুখে বলল ওমর মা চাং।

যুবায়েরভ উঠে দাঁড়িয়ে তার পিঠ চাপড়ে বলল, 'আমরা টিমে ছিলাম তিন জন, এখন হলাম চারজন। তুমি সব সময় আমাদের সাথে থাকবে।'

যুবায়েরভের কথা শেষ হবার আগেই তরুন উইঘুর যুবক 'আলস্নাহু আকবার' বলে এমন প্রচন্ড লাফ দিয়ে উঠল যে, মনে হল সে আকাশের চাঁদ হাতে পেয়ে গেছে।'

সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে।

গাড়িতে গিয়ে উঠল সবাই।

ড্রাইভিং সিটে উঠল যুবায়েরভ। আলদর আজিমভ পাশের সিটে। আর আবদুল্লায়েভ ও ওমর মা চাং পেছনের সিটে।

গাড়ি স্টার্ট নেবার আগে ওমর মা চাং বলল, 'আপনাদের অস্ত্র শস্ত্র?'

'আমাদের যথেষ্ট অস্ত্র আছে, সময় এলে দেখবে।' হেসে বলল আবদুল্লায়েভ।

গাড়ি ষ্টার্ট দিল।

টিলার আড়াল থেকে বেড়িয়ে এবড়ো-থেবড়ো চড়াই অতিক্রম করে গাড়ি এসে হাইওয়েতে উঠল।

ছুটে চলল গাড়ি তীব্র বেগে।

ড্রাইভিং সিট থেকে যুবায়েরভ বলল, 'উসু থেকে উত্তরে বাঁক নেবার পর হাইওয়েতে কি ডানে বামে কোন রাস্তা আর আছে ওমর?'

‘না ডানে বামে কোন রাস্তা নেই। কিন্তু হাইওয়েটা খুব একটা ভাল নয় স্যার। বড় বড় বাঁক আছে যেমন,তেমনি রাস্তাও মাঝে মাঝে খুব এবড়ো-থেবড়ো।'

‘ধন্যবাদ ওমর, বলে ভাল করেছ।’

কিছুক্ষন সবাই চুপ চাপ।

‘ওমর তুমি কি রেড ড্রাগন ও ‘ফ্র' এর হেড কোয়ার্টার চেন ?’ অনেকক্ষণ পরে কথা বলল আলদর আজিমভ।

‘ডাঃ ওয়াং এর অফিস তো স্যার?’

‘হ্যাঁ।’

‘চিনি স্যার।’

‘স্যার, জেনারেল বরিসের ভিন্ন কোন অফিস নেই। ডাঃ ওয়াং এর অফিসেই তিনি বসেন।’

‘এই যে বিপ্লব হলো, তারপর ডাঃ ওয়াং এর অফিস বদলে যায়নি তো?’

‘না স্যার, এইতো গতকালও আমি গিয়েছি।’

‘গতকাল গিয়েছ? তোমাকে ওরা চিনেনি?’

‘স্যার, আমার মা হান। তাঁকে মুসলমান করে আব্বা তাকে বিয়ে করেন। আমি হানদের পোশাক পরলে আমাকে হান বলে অনেকেই ভুল করে। হানদের পোশাক পরে আমি ডাঃ ওয়াং এর অফিসে ঢুকেছিলাম। কোন অসুবিধা হয়নি।’

‘কেমন দেখলে, কারও সাথে কথা বলেছ, কিছু আন্তরিকতা?’

‘আমি গিয়েছিলাম ডা: ওয়াংকে দেখতে। ডা: ওয়াং কিংবা জেনারেল বরিস কেউই ছিলেন না। অনেকক্ষণ বসেছিলাম রিসেপশনে। জেনেছি, রিসেপশনের ঠিক ওপরেই দুতলায় ডা: ওয়াং ও জেনারেল বরিস পাশাপাশি রুমে বসেন। আমি রিসেপশনে বসে থাকার সময়েই নেমে এসেছিলেন ডা: ওয়াং ও বরিসের পি.এ. মিস নেইলি ও মিস কিয়ান। ওদের কথা থেকে বুঝলাম, ওরা তাদের বসের ওপর সন্তুষ্ট নয়।’

‘কি করে বুঝলে?’

‘তখন বেলা দু'টা। সময়টা ছিল শিফট চেঞ্জ ও লাঞ্চের। আমি আগেই রিসেপশনিষ্টকে দাওয়াত দিয়েছিলাম। মিস নেইলি ও মিস কিয়ান যাচ্ছিল লাঞ্চে। আমরা তাদের সাথে বেরিয়েছিলাম। অফিসের পাশেই একটা রেষ্টুরেন্ট। লাঞ্চ করেছি এক সাথে বসে। কথায় কথায় আলোচনা উঠেছিল চাকুরীর ভালমন্দ নিয়ে। মিস নেইলি ও মিস কিয়ান তাদের চাকুরীর ব্যাপারে তীব্র অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেছিল, তাদের খেয়ে বেঁচে থাকার কোন উপায় থাকলে ঐ অফিসে তারা আর পা দিতনা। তারা বলেছে, কয়েকটা টাকা দিয়ে বসরা মনে করে তারা আমাদের শুধু নির্দিষ্ট সময় নয়, আমাদের সবটাই তারা কিনে নিয়েছে। আমি সবার লাঞ্চের পয়সা দিয়েছিলাম। ওরা খুব খুশী।’

‘তুমি তো দারুণ ছেলে ওমর। মেইলিগুলি সম্পর্কে কোন দিক দিয়ে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসার সুযোগ পাওনি।’

‘দু:খিত, আমার ঐ সব কথা মনেই হয়নি। আমার লক্ষ্য ছিল ওদের সাথে খাতির করে ওদের অফিসের যত্রতত্র যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা এবং সুযোগ মত ডা: ওয়াং ও জেনারেল বরিসকে খুন করা।’

আলদর আজিমভ হাসল। বলল, ‘তুমি ভুলে গিয়েছিলে ওদেরকে খুন করার চেয়ে বড় কাজ আরও আছে। যাক, তোমার মিশন কিন্তু ব্যর্থ হয়নি। তোমার সাথে ওয়াং-এর অফিসের একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।’

‘গর্ভনর ইউয়ান, নেইজেন, আহমদ ইয়াংদের কোন খোঁজ জান? ওরা কোথায়?' বলল যুবায়েরভ।

‘আমাদের বিভিন্ন লোকের কাছে যা শুনেছি, তাতে তাদেরকে জেলখানার রাজনৈতিক অংশে রাখা হয়েছে। আরও শুনেছি, সাবেক গভর্নর ও তার পরিবারকে নিয়ে বর্তমান গর্ভনর অর্থাৎ সরকারের সাথে ডা: ওয়াংদের মত পার্থক্য ঘটেছে। ডা: ওয়াংরা এখনি বিচারের পক্ষপাতি। অনেকের আশংকা, ওয়াংরা জেলখানার ভেতরে অথবা বাইরে এনে তাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করবে।’

‘সাংঘাতিক কথা শোনালে ওমর তুমি। আমার মনে হচ্ছে এ আশংকাটা সত্য।’

‘ওদিকেও তাহলে ত্বরিত নজর দিতে হয় যুভায়েরব।’ বলল আজিমভ।

‘আমাদের ভাবী সাহেবের ব্যাপারটার কোন কিনারা না হলে কোন দিকেই আমরা নজর দিতে পারছিনা।’

আবার সবাই নিরব।

গাড়ি ছুটে চলেছে আলতাই এর পার্বত্য পথ ধরে। ফাঁকা রাস্তা, কিন্তু ঘন ঘন বাঁক, আর চড়াই উতরাই- এর জন্যে গাড়ি মনের মত করে চালাতে পারছেনা যুবায়েরভ।

রাত তিনটা নাগাদ যুবায়েরভের গাড়ি রাস্তার পাশে দাঁড়ানো মেইলিগুলির গাড়ির কাছে থামল। সকলেই গাড়ি থেকে নামল।

মেইলিগুলির গাড়ির দরজা বন্ধ ছিল গাড়ির দরজা খুলে টর্চ জ্বেলে তারা পরীক্ষা করল গাড়ি।

পরীক্ষা শেষে তীকষ্ন দৃষ্টি আজিমভ এক খন্ড সুতা দেখিয়ে বলল, 'এটা সিল্কের সুতা। নিশ্চয় ওড়নার। সুতার একটা অংশে রক্ত। তাহলে বুঝা যাচ্ছে ওড়না দিয়ে আহত স্থানটি বাঁধা হয়েছিল। অর্থাৎ যিনি আহত হয়েছেন ও গাড়ি চালিযেছেন তিনি মহিলা। অন্যদিকে এই ভাড়াটে ট্যাক্সির যিনি ড্রাইভার ব্লু বুক অনুসারে তিনি পুরুষ এবং তিনি যেমন গাড়ি চালাননি, তেমনি গাড়িতেও ছিলেননা। থাকলে গাড়ি এভাবে পড়ে থাকতোনা। এর অর্থ গাড়ি যিনি চালিয়েছেন সেই মহিলা ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাছ থেকে গাড়ি কেড়ে বা হাইজ্যাক করে নিয়ে এসেছেন। আর একটি জিনিস যিনি গাড়ি এভাবে নিয়ে এসেছেন তিনি ফুয়েল ইন্ডিকেটরের দিকে নজর দেবার সময় পাননি, অথবা জ্বালানি সংগ্রহের সাধ্য, সামর্থ ও সুযোগ তার ছিলনা। এটা হতে পারে এই কারণে যে, তিনি নিজে পলায়নপর ছিলেন এবং সেই সাথে ছিলেন আহত। নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়াই তার লক্ষ্য ছিল, অন্য কোন দিকে লক্ষ্য তার ছিলনা।’ থামল আজিমভ।

‘সব মিলে যাচ্ছে। নিশ্চয় তিনি আমাদের ভাবী মেইলিগুলি হবেন।’ আনন্দে শিশুর মত চিৎকার করে উঠল যুবায়েরভ।

আবার যাত্রা শুরু হল তাদের।

এবার গাড়ি আস্তে চালান। সবার চোখ রাস্তার পশ্চিম পাশে। সবাই খুঁজছে দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে পশ্চিমে এগিয়ে একটা করিডোর। সকলের

মনে আশা নিরাশার দোলা। যদি এমন করিডোর না থাকে, যদি তারা তা খুঁজে না পায়, তাহলে সব আশা যে তাদের গুড়িয়ে যাবে। মংগোলীয় সওদাগর ঠিক বলেছে তো, বলতে ভুল করেনি তো সে!

অবশেষে সকল উদ্বেগের অবসান ঘটল। এক সাথেই সকলের চোখে পড়ল করিডোরটি। থেমে গেল গাড়ি। যুবায়েরভ দূরত্ব নির্দেশক মিটারের দিকে তাকিয়ে দেখল, পরিত্যক্ত সেই গাড়িটি থেকে দুই মাইলের চেয়ে কয়েকগজ বেশী এসেছে মাত্র। ওদের হিসাব সত্যিই নিখুঁত।

গাড়িটা একটা টিলার আড়ালে লুকিয়ে রেখে তারা সেই করিডোর ধরে পশ্চিমে যাত্র শুরু করল। রিভলভার ছাড়া ভারী কোন অস্ত্র নিল না। ওমর মা চ্যাং-এর রাইফেলও গাড়িতে রেখে দেয়া হলো। তাকেও দেয়া হলো একটি রিভলবার। রিভলভার পেয়ে সে মহাখুশী। জীবনে এই প্রথম সে রিভলভার হাতে পেল। পাওয়ার সাথে সাথেই তার মন বলে উঠল, আর যদি ফেরত না দিতে হতো! এই সহজ-সরল তরুণের ইচ্ছা আল্লাহ পূরণ করলেন।

ওমরের আনন্দ দেখে যুবায়েরভ বলল, 'রিভলভার খুব ভালো লাগছে না? ঠিক আছে, আমরা তোমাকে ওটা প্রেজেন্ট করলাম।'

উইঘুর তরুণ আনন্দে 'আল্লাহ আকবার' বলে লাফ দিয়ে উঠল।

ওমরের আনন্দ থামলে যুবায়েরভ বলল, 'শুন ওমর, আমরা সাথে থাকলে তুমি কোন অবস্থাতেই প্রথমে গুলি ছুড়বে না। ঠিক আছে?'

মাথা নেড়ে সায় দিল ওমর মা চ্যাং।

নানা জায়গায় ঠেকে, নানা পথ ঘুরে ৫টার দিকে তারা গ্রামে গিয়ে পৌছল।

একটা পায়ে চলা পথ গ্রামে ঢুকে গেছে।

যুবায়েরভ চলছিল আগে। তার পেছনে ওমর। তারপর আজিমভ এবং আবদুল্লায়েভ।

যুবায়েরভ গ্রামের সীমায় পা দিয়েছে এমন সময় চারদিক থেকে অনেকগুলো রাইফেল তাদের ঘিরে ফেলল। মানুষগুলো পাশের ঝোপঝাড় ফুঁড়ে যেন বেরিয়ে এল।

যুবায়েরভ দাঁড়িয়ে গেছে। সে চারদিকে তাকিয়ে দেখল, ৫টি রাইফেল ও একটি স্টেনগান তাদের দিকে হা করে আছে।

'আপনারা কে? আমাদের এভাবে আটকালেন কেন?' উইঘুর ভাষায় বলল যুবায়েরভ।

'গ্রামে প্রবেশের অনুমতি নেই রাতে।' বলল স্টেনগানধারী লোকটি।

'আপনারা এই গ্রামের লোক?'

'হ্যাঁ।'

'আমরা আপনাদের শত্রু নই। আমরা ইব্রাহিম আওয়াং এর বাড়ি যাব।'

'ঠিক আছে, সকালের আগে যেতে পারবেন না। এ অনুমতি নেই।'

'তাহলে আমাদের একটা মসজিদে নিয়ে চলুন।'

'কেন?'

'ফজরের নামাজের সময় হয়ে গেছে।'

'দু:খিত, এ অনুমতিও নেই। খবর দেবার জন্য একজনকে পাঠিয়েছি, দেখি কি খবর নিয়ে আসে।'

'কিন্তু নামাজের সময়তো চলে যাবে। তাহলে আমরা এখানেই নামাজ পড়ি। অজু করব কোথায়?'

স্টেনগানধারী- যে কথা বলছিল, সে তার স্টেনগানটা ঠিক ধরে রেখে, চোখের পলক পর্যন্ত না ফেলে বলল, 'একজন গিয়ে আমাদের পানির মশক নিয়ে এসে এদের দাও।'

কয়েক মুহূর্তেও মধ্যে একজন পানির মশক নিয়ে এল।

যুবায়েরভরা চারজন একে একে অজু করল। তারপর নামাজে দাঁড়াল কংকরময় মাটির ওপর। প্রথমে দু'রাকাত সুন্নত নামাজ আদায় করল তারা। তারপর দাঁড়াল তারা এক সাথে ফরজ দু'রাকাত পড়ার জন্যে। ইমাম হিসাবে দাঁড়াল যুবায়েরভ।

ইতিমধ্যে গ্রামে খবর পৌছে গেছে। মসজিদে নামাজ হচ্ছিল তখন। খবর পেয়ে মসজিদের সবাই ছুটে এল কারা গ্রামে ঢুকতে এসেছে, কারা ধরা পড়েছে

তা দেখার জন্যে। এদের সাথে রয়েছে ইব্রাহিম আওয়াং, যিনি গ্রামের সর্দার হবার সাথে সাথে মসজিদের ইমামও।

গ্রামের লোকজন এসে যখন জমা হলো, তখন নামাজ চলছে। . . . . .

সেই ছয়জন অস্ত্রধারী রাইফেল উচিয়ে তখনও পাহারা দিচ্ছে যুবায়েরভদের।

নামাজে যে কুরআন তেলাওয়াত করছিল যুবায়েরভ তা উচ্চস্বরে না হলেও উপস্থিত সবার কানে পৌঁছাচ্ছিল। অত্যন্ত মধুর কুরআন তেলাওয়াত যুবায়েরভের। উপস্থিত মানুষের মধ্যে যেমন বিস্ময় ছিল, তেমনি অভিভূত হয়ে পড়ল কুরআনের এই মধুর তেলাওয়াতে।

সবার মত অভিভূত হয়ে পড়েছিল ইব্রাহিম আওয়াংও। এমন মধুর তেলাওয়াত তারা জীবনে শোনেনি। কারা এরা?

ইব্রাহিম আওয়াং প্রহরীদের রাইফেল নামিয়ে দিতে এবং পাহারা থেকে সরে দাঁড়াতে নির্দেশ দিল।

নামাজ ওদের শেষ হয়ে গেছে।

সালাম ফিরিয়েছে তারা।

তারা উঠে দাঁড়াচ্ছিল।

ইব্রাহিম আওয়াং দ্রুত তাদের দিকে এগিয়ে সালাম দিল এবং বলল, 'মাফ করবেন আমাদের, আপনাদের এভাবে কষ্ট করতে হলো। গতকাল গ্রামে একটা বড় দূর্ঘটনা ঘটে গেছে তো তাই গ্রামের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।'

ইব্রাহিম আওয়াং এর কথা শুনে মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠল যুবায়েরভের! উদ্বিগ্ন কন্ঠে বলল, 'কি ঘটনা ঘটেছে?'

'খুব বড় ঘটনা।'

'কি?'

'তার আগে বলুন আপনারা কে?'

যুবায়েরভ ওমর মা চ্যাংকে দেখিয়ে বলল, 'এ শিহেজী উপত্যকার লোক। আর আমরা তিনজন এসেছি তাসখন্দ থেকে?'

'তাসখন্দ থেকে এখানে? কেন?'

'একজন সওদাগর কি একজন সংজ্ঞাহীন মহিলাকে আপনাদের এখানে রেখে যায়নি?'

'আপনারা তাকে চেনেন?'

'সে মেইলিগুলি হলে তাকে আমরা জানি। সে আহমদ মুসার স্ত্রী। আমরা তার সন্ধানেই এসেছি।'

বৃদ্ধ কথা বলল না।

ধীরে ধীরে তার মাথা নিচু হলো।

কিছুক্ষণ পর যখন মাথা তুলল, তখন দেখা গেল তার দু'চোখ দিয়ে অশ্রু গড়াচ্ছে।

'না মা নেই, আমরা তাকে হারিয়েছি।' অশ্রুরুদ্ধ কন্ঠে বলল বৃদ্ধ।

ছ্যাত করে উঠল যুবায়েরভের বুক। অন্যদেরও এই একই অবস্থা। উৎকন্ঠা, উত্তেজনায় তাদের বুক ধড়ফড় করে উঠল। অসুস্থ অজ্ঞান মেইলিগুলি মারা গেছে কি? সেই কথাই বৃদ্ধ ওভাবে বলছে?

'নেই মানে? অসুস্থ মেইলিগুলি কি.........' কথা আটকে গেল যুবায়েরভের। উচ্চারণ করতে পারলো না সে শেষের কথাগুলো।

বৃদ্ধ চোখ মুছে বলল, 'না, তোমরা যা ভাবছ তা নয়। মরে গেলে তো আমার মা বেঁচে যেত। তার চেয়েও বড় ঘটনা ঘটেছে!'

'ওঁকে কি ধরে নিয়ে গেছে তাহলে ওরা?'

'হ্যাঁ, ডা: ওয়াং এবং তার লোকেরা।'

'কতজন লোক এসেছিল ওরা?'

'প্রথমে চারজন, তারপরে হেলিকপ্টারে করে ডাঃ ওয়াং এবং দলবল।'

'আপনারা বাধা দেননি ওদের?' যুবায়েরভের মুখ ঝড় বিধ্বস্ত পাখির নীড়ের মত। অন্যদিকে তার চোখে মুখে কিছুটা শোবা-সন্দেহ। এদের কোন যোগসাজসে কি মেইলিগুলি ওদের হাতে গিয়ে পড়ল।

যুবায়েরভের এ প্রশ্নের উত্তরে বৃদ্ধের চোখে আরেক দফা অশ্রুর ঢল নামল। বলল, সে এক কাহিনী বৎস, বলে বৃদ্ধ মেইলিগুলির আসা থেকে সে

দিনের সব কাহিনী বর্ণনা করল। তারপর বলল, গ্রাম ও গ্রামবাসীদের বাঁচাবার জন্য মা তাঁর কথা আমাদের মেনে নিতে বাধ্য করে নিজে বন্দীত্ব বরণ করে নিয়েছে। কিন্তু মায়ের মহত্বকে শয়তানরা শুরুতেই একদফা ভেঙ্গে দিয়ে গেছে। যাবার সময় হেলিকপ্টার থেকে চারটি বোমা ফেলেছে। গ্রামের তিরিশটি বাড়ি ধ্বংস এবং ৫০ জন লোক নিহত হয়েছে।'

বৃদ্ধ থামল।

যুবায়েরভ কোন কথা বলতে পারলো না। বসে পড়ল মাটিতে। দু'হাতে চেপে ধরল মাথা। গুলিবিদ্ধ, জ্বরাক্রান্ত মেইলিগুলির এখন কি অবস্থা কে জানে? কিছুই করতে পারলো না যুবায়েরভরা। ব্যর্থ হলো তাদের মিশন। রক্ষা করতে পারলো না মেইলিগুলিকে শয়তানদের হাত থেকে। ভেতরটা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে যুবায়েরভের। চোখ দিয়ে অশ্রুর বদলে বেরুচ্ছে আগুনের শিখা। হঠাৎ তার মনে হল, রেড ড্রাগন অর্থাৎ ডা: ওয়াং এর হেডকোয়ার্টার তো ওমর মা চ্যাং চেনে। সংগে সংগে গোটা শরীরে তার আগুন জ্বলে উঠল। এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল যুবায়েরভ। চিৎকার করে বলল, 'আজিমভ, আবদুল্লায়েভ, ওমর মা চ্যাং এবার ডা: ওয়াং এর হেড কোয়ার্টার। হয় সে দুনিয়াতে থাকবে, না হয় আমরা। চলো।'

ঘুরে দাঁড়াল যুবায়েরভ।

চলতে শুরু করল সে।

বৃদ্ধ ইব্রাহিম আওয়াং ছুটে এসে যুবায়েরভের পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে বলল, 'বৃদ্ধের বাড়িতে একটু চল বাবা। একটু সুযোগ দাও আমাকে।'

যুবায়েরভ দাঁড়াল। বলল, 'জনাব, এখন একটা মুহূর্ত নষ্ট করার সময় নেই। শয়তানদের হাত থেকে মেইলিগুলিকে বাঁচাতে হবে। আপনারা তো আমাদের মতই মেইলিগুলির মংগল চান।'

বৃদ্ধ মাথা নিচু করে সরে দাঁড়াল যুবায়েরভের সামনে থেকে। সেই সাথে অশ্রু রুদ্ধ কন্ঠে বলল, 'আমরা কি কোন সাহায্য করতে পারি না? আমরা মরতে ভয় পাইনি। কিন্তু মা আমাদের মরতে দেয়নি। গ্রামের প্রত্যেকে তৈরী আছে মরার জন্যে।'

‘যুবায়েরভ বৃদ্ধের একটা হাত তুলে নিয়ে চুম্বন করে বলল, ‘আমরা সেটা জানি। কিন্তু দল বল নিয়ে ওদের সাথে পারা যাবে না। যেতে হবে কম সংখ্যায়, জিততে হবে বুদ্ধির যুদ্ধে। দরকার হলেই আপনাদের ডাকব আমরা।’

‘তোমরা কে বাবা। তোমাদের মত আমরা হলে মাকে ওদের হাতে তুলে দিতাম না, মাকে বাঁচাতে পারতাম। ভুল করেছি আমরা বাঁচাতে চেয়ে।’

‘না ভুল আপনারা করেননি। মেইলিগুলি আহমদ মুসার স্ত্রী। সে ঠিকই নির্দেশ দিয়েছিল। আহমদ মুসা হলেও এটাই করতেন। আর আমাদের পরিচয়? আমরা আহমদ মুসার নগণ্য কর্মী।’

বলে আবার সালাম জানিয়ে হাঁটা শুরু করল যুবায়েরভ। তার পেছনে অন্য তিনজন।

বৃদ্ধ ঠায় দাড়িয়ে তাকিয়ে রইল ওদের দিকে। তার পেছনে গ্রামবাসীরা। যাদের হাতে রাইফেল ছিল, অনেকক্ষণ আগে তাদের হাত থেকে রাইফেল পড়ে গেছে। তাদের সকলের মুগ্ধ দৃষ্টি এগিয়ে চলা ঐ চারজনের প্রতি। সবকিছু ছাপিয়ে একটা কথা তাদের সামনে বড় হয়ে উঠছে, আহমদ মুসার নগণ্য কর্মীর চেহারা যদি এমন হয়, তাহলে আহমদ মুসা কেমন!

# ৪

আলমা আতা বিমান বন্দরে আহমদ মুসাকে স্বাগত জানাল মুসলিম মধ্যএশিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট কর্ণেল মুহাম্মদ কুতায়বা। আহমদ মুসাকে স্বাগত জানাবার জন্যেই কুতায়বা ছুটে এসেছে রাজধানী তাসখন্দ থেকে আলমা আতায়।

ফরাসী বিমানটি থামার পর বিমানে সিড়ি লাগার সঙ্গে সঙ্গে কুতায়বা তরতর করে সিঁড়ি ভেঙে উঠে গিয়েছিল বিমানে।

আহমদ মুসা সবে উঠে দাঁড়িয়েছিল।

কুতায়বা গিয়ে জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে।

বিমানের সব লোকই উঠে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু যেহেতু প্রেসিডেন্ট বিমানে উঠেছেন, তাই তিনি না নেমে যাওয়া পর্যন্ত সকলের অবতরণ বন্ধ করে দেয়া হল।

একদিকে সিংকিয়াং এর ঘটনার আকস্মিকতা, অন্যদিকে বহুদিন পর আহমদ মুসাকে পেয়ে আবেগে কেঁদে ফেলল প্রেসিডেন্ট কুতায়বা।

বিমানের সব লোক হা করে দেখছিল ব্যাপারটা। তারা ভেবে পাচ্ছিলনা, প্রেসিডেন্ট যাকে ধরে কাঁদছেন, সাধারণ সারির এই অসাধারণ লোকটি কে?

আহমদ মুসা প্রেসিডেন্ট কুতায়বাকে সান্ত্বনা দিয়ে, পিঠ চাপড়ে বলল, ‘ভুলে যেয়ো না, তুমি এখন একটা স্বাধীন, সার্বভৌম দেশের প্রেসিডেন্ট। সব কাজ তোমার সাজে না।’

‘ওসব আমি জানি না। আমি আপনার একজন কর্মী।’

‘ঠিক আছে, চল যাই। মানুষকে আটকে রেখে লাভ নেই।’

বলে আহমদ মুসা কুতায়বাকে টেনে নিয়ে চলতে শুরু করল।

বিমানের সিঁড়ি থেকেই আহমদ মুসা দেখল, বিমানের সিঁড়ির মুখ থেকেই তার পুরানো সহকর্মীদের দীর্ঘ সারি। আহমদ মুসা কুতায়বাকে বলল, ‘এ তুমি কি করেছ কুতায়বা? সবাইকে এভাবে ডেকে এনেছ কেন?’

‘আমি একজনকেও ডাকিনি। হাওয়া থেকে জেনে ওরা ছুটে এসেছে। আমি যদি এ সুযোগ তাদের না দিতাম, তাহলে আমার প্রেসিডেন্টশীপই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতো।’

আহমদ মুসা বিমানের সিঁড়ি থেকে নেমে সকলকে সালাম জানিয়ে দু'পাশের সবার সাথে হাত মিলিয়ে এগিয়ে চলল। আবেগে সবাই ভারাক্রান্ত, সবার চোখে পানি। আহমদ মুসার মুখে হাসি, কিন্তু তার চোখ থেকেও পানি গড়াচ্ছে।

আহমদ মুসা লাউঞ্জে এসে কুতায়বাকে বলল, ‘হরকেসে যাবার ব্যবস্থা রেডি তো কুতায়বা?’ হরকেস সিংকিয়াং এর উসু-উতাই রাস্তার মুখে মধ্যএশিয়া মুসলিম প্রজাতন্ত্রের কাজাখ প্রদেশের শেষ সীমান্ত শহর। এ সীমান্ত শহর থেকে উতাই-উসুর পথে সিংকিয়াং-এ প্রবেশ করা আহমদ মুসার পরিকল্পনা।

‘সব ব্যবস্থা রেডি মুসা ভাই, কিন্তু আমার ওখানে আপনার যেতে হবে। ওখানে শিরীন শবনম, রোকাইয়েভা, আরও কত কে যে এসেছে! আর বিশ্রাম না নেন, একটু কিছু মুখে দেবেন তো।’

‘জানি ছাড়বেনা। ঠিক আছে চল।’

‘আহমদ মুসারা বিমান বন্দর থেকে বেলা তিনটার দিকে বেরুলো। আশা করছিল আসরটা পড়েই কুতায়বার ওখান থেকে বেরিয়ে পড়বে। কিন্তু মাগরিবের নামাজের আগে কিছুতেই বেরুতে পারলো না।

আলোচনার সময় কুতায়বা রাষ্ট্র পরিচালনা বিষয়ে নানা কথা তুললো। সে সবের জবাব আহমদ মুসাকে দিতে হলো। এ এমন এক আলোচনা যার শেষ নেই। শেষ হয়তো হতো না। কিন্তু ভেতর থেকে কুতায়বার স্ত্রী শিরীন শবনম, আহমদ মুসার অভিভাবকত্বেই যাকে আহমদ মুসা কুতায়বার সাথে বিয়ে দিয়েছিল। বলল, ‘ভাইয়া এসেছেন কয়েক মুহূর্তের জন্যে, তার মাথায় কি এভাবে সমস্যা না চাপালে নয়! একটু বিশ্রাম নিতে দাও তাকে।’

‘বাঃ, আমি সমস্যা চাপাচ্ছি, না উনি আমার মাথায় সমস্যা চাপিয়ে গেছেন। আর তুমি জান না, কাজই তো ওঁর বিশ্রাম দেয়না।’

‘কাজ যদি বিশ্রাম না দেয়, তাহলে কাজের মধ্যেই বিশ্রাম খোঁজা ছাড়া উপায় কি থাকে?’

‘তাহলে 'কাজ পাগল' কথাটার কোন ভিত্তি নেই মনে কর?’

‘এ নিয়ে আমি তর্ক করব না। ওঁকে বলুন, যুবায়েরভের স্ত্রী রোকাইয়েভা এবং ফারহানা আপার ভাবী এখানে আমার সাথে আছেন। ওঁকে সালাম দিয়েছেন।’

ফারহানার নাম শুনার সাথে সাথে আহমদ মুসার মুখটা ম্লান হয়ে গিয়েছিল। আহমদ মুসার সাথে বিয়ের আগের রাতে আহমদ মুসা কিডন্যাপ হয় এবং ফারহানাও খুন হয়।

আহমদ মুসা ‘ওয়া আলাইকুমুস সালাম' বলে সালাম গ্রহণ করে বলল, ‘আপনারা কেমন আছেন? আব্দুল্লায়েভ ও যুবায়েরভকে আমার কাজে সিংকিয়াং এ পাড়ি জমাতে হয়েছে, এজন্যে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমি আপনাদের কাছে।’

‘না, ওটা আপনার কাজ নয়, আমাদের কাজ। অবশ্য যদি আপনি আমাদেরকে আপন ভাবেন।’ এক সাথে বলে উঠে ফারহানার ভাবী ও রোকাইয়েভা।

‘ধন্যবাদ, আমি কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি।’

‘আমি ফারহানার ভাবী, আপনি যাবেন না আর আমাদের গ্রামে বেড়াতে?’ একটু পর ভেতর থেকে কথা বলে উঠল ফারহানার ভাবী।

প্রশ্নটায় কিছুটা আনমনা হয়ে উঠল আহমদ মুসা। তারপর বলল ধীরে ধীরে, ‘যাবার ইচ্ছে হয়, কিন্তু এভাবে বেড়াবার সুযোগ এ পর্যন্ত আমার কখনোই হয়নি ভাবী।’

এভাবে টুকিটাকি আরও কিছু কথা। তার ফাঁকে নাস্তাও হয়ে গেল।

মাগরিব নামাজের পর কাজাখস্তান প্রদেশের সীমান্ত শহর হরকেসে যাবার জন্যে হেলিকপ্টারে উঠল আহমদ মুসা। বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টার।

হরকেস পর্যন্ত কুতায়বা আহমদ মুসার সাথে যেতে চেয়েছিল।

কিন্তু কুতায়বার এ ইচ্ছা শোনার পর ধমক দিয়েছে আহমদ মুসা। বলেছে, ‘তুমি তো এখন সেই আগের কর্ণেল কুতায়বা নও। তুমি পারমানবিক

শক্তির অধিকারী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা মুসলিম দেশের প্রেসিডেন্ট। তোমাকে এতটা ঢিলেঢালা হওয়া চলবেনা।'

ধমক খেয়ে কুতায়বা চুপ করে গেছে। তবে কুতায়বার জেদের ফলে আহমদ মুসা রাজি হয়েছে একজন গোয়েন্দা অফিসারকে সিংকিয়াং অভিযানে সে সাথে নিবে।

হেলিকপ্টারের পাঁচজন ক্রু সকলেই হেলিকপ্টারে ওঠার সময় আহমদ মুসাকে সালাম ও স্যালুট দিয়ে বলল, 'আমরা আপনার কর্মী স্যার। তাসখন্দে আমরা আপনার সাথে ছিলাম।'

'ধন্যবাদ, কেমন আছ তোমরা?'

'ভাল স্যার।'

হেলিকপ্টার আকাশে উড়ল। আহমদ মুসার পাশে সেই গোয়েন্দা অফিসারটি যে আহমদ মুসার সাথে যাবে।

সে অনেকক্ষণ উসখুস করার পর বলল, 'স্যার আমি জনাব আলদার আজিমভের সাথে কাজ করতাম। আমি আপনাকে দেখেছি।'

'তাহলে ভালই হলো, আমাদের অভিযানটা আমাদের জন্য আরও আরামদায়ক হবে। ভাল কথা, কুতায়বা রুট প্ল্যানটা কি বলল আমি ভুলে গেলাম।'

'স্যার সিংকিয়াং এর সীমান্তটা এখন বেশ লুজ। ভোর ৪ টায় আমরা এই হেলিকপ্টারেই আলমা আতাই পাহাড়ের পাশে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ৫ টার মধ্যে আমরা উসু গিয়ে পৌঁছব। একটা জীপ ইতিমধ্যে ওপারে পাঠানো হয়ে গেছে। জীপটি উসুতে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে।'

'বেশ ভাল।'

এক ঘন্টা লাগলো হরকেসে পৌঁছতে।

হেলিকপ্টার ল্যান্ড করাল সরকারী রেস্ট হাউজের কম্পাউন্ডে।

রেস্ট হাউজটি বাংলো সাইজের একটি বাড়ি। ভি আই পি কিংবা বিশেষ রাষ্ট্রীয় অতিথিদের জন্যে এই রেস্ট হাউজটি। এর পাশেই দ্বিতীয় আর একটি

পাঁচতলা বিশিষ্ট বিশাল রেস্ট হাউজ তৈরী হয়েছে। এখানে সাধারণ অতিথিরা থাকেন।

আহমদ মুসা হেলিকপ্টার থেকে নামার সংগে সংগে হরকেস নগরীর মেয়র ও প্রশাসক এসে অভ্যর্থনা জানাল আহমদ মুসাকে। তারপর আহমদ মুসাকে নিয়ে সে চলল রেস্ট হাউজের ভেতরে।

রেস্ট হাউজের চারদিকে প্রাচীর ঘেরা। এ ভি আই পি রেস্ট হাউজের পশ্চিম পাশে বহুতল বিশিষ্ট সাধারণ রেস্ট হাউজটি। ভি আই পি রেস্ট হাউজটির গেট দক্ষিণ বাউন্ডারী প্রাচীরের সাথে। তার পাশ দিয়েই উত্তর-দক্ষিণ রাস্তা। গেটে দন্ডায়মান স্টেনগানধারী দু'জন প্রহরী। পূর্ব দিকে বেশ বড় কৃত্রিম একটি লেক। লেকের চারদিক ঘিরে বাগান। তাতে মাঝে মাঝে বেঞ্চ পাতা। এলাকাটি সংরক্ষিত, কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা। ভি আই পিরাই শুধু এ বাগানে আসে, লেকে তারা সাঁতার কাটে।

ভি আই পি রেস্ট হাউজের উত্তর প্রাচীর ঘেঁষেই একটা টিলা।

মোটামুটি সুন্দর ও সুরক্ষিত ভি আই পি রেস্ট হাউজ।

মেয়র ভদ্রলোক আহমদ মুসাকে নিয়ে রেস্ট হাউজের ভেতর প্রবেশ করল। সাথে সাথে প্রবেশ করল আহমদ মুসার সাথী সেই গোয়েন্দা ভদ্রলোকও।

দো-তলায় একটি সুপরিসর কক্ষে আহমদ মুসার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। পাশের কক্ষেই থাকবেন গোয়েন্দা অফিসার।

কক্ষের দরজার এক পাশে স্টেনগানধারী একজন বসেছিল চেয়ারে। মেয়র আহমদ মুসাদের নিয়ে সেখানে পৌঁছতেই প্রহরী উঠে দাঁড়িয়ে কড়া স্যালুট দিল। কক্ষটির দিকে ইংগিত করে মেয়র বলল, 'এখানেই আপনি রাতটা থাকবেন স্যার।'

বলে দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করল মেয়র। তার সাথে আহমদ মুসা ও গোয়েন্দা অফিসার।

ঘর দেখিয়ে বলল মেয়র, 'স্যার, আপনি বিশ্রাম নিন। ঠিক রাত ৯ টায় খাবার আসবে। রাত সাড়ে তিনটায় আপনাকে জাগিয়ে দেব আমি নিজে এসে।'

একটু থেমে ইতস্তত করে বলল, 'স্যার, আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আপনাকে অনুরোধ করার জন্যে, আপনি যেন বাইরে না যান।'

'কেন মেয়র, আমাকে নজর বন্দী করলে নাকি?'

'মাফ করবেন স্যার, এটা সীমান্ত শহরতো। তাই এ সতর্কতা।'

'অশুভ কাউকে সন্দেহ কর তোমরা এ শহরে?'

তেমন কোন চিহ্নিত কেউ নেই স্যার। তবে সংখ্যায় যত ক্ষুদ্রই হোক কম্যুনিষ্টরা ভেতরে ভেতরে ষড়যন্ত্র করছে। ক্রিমিনালরা ওদের সহযোগী হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাশিয়া এবং বাইরের কম্যুনিষ্ট গ্রুপ তাদের উৎসাহ দিচ্ছে। তাছাড়া রাশিয়ার জাতীয়তাবাদী সরকারও ভেতরে ভেতরে আমাদের বৈরিতা শুরু করেছে। সব মিলিয়ে সীমান্ত শহরগুলোর ব্যাপারে আমাদের সাবধান থাকতে হবে।'

'ধন্যবাদ মেয়র। তোমাদের সচেতনতার প্রশংসা করছি।'

বলে আহমদ মুসা বসে পড়ল সোফার ওপর।

সালাম জানিয়ে মেয়র গোয়েন্দা অফিসারকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

হরকেস শহরের উপকণ্ঠে একটি টিলার পাদদেশে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে একটা বাড়ি। বাড়িটার বাইরের সব আলো নিভানো। শুধু একটা ঘরের দুইটা ঘুলঘুলি দিয়ে আলোর কিছুটা রেশ দেখা যাচ্ছে।

একটি বেবিট্যাক্সি এসে থামল বাড়ির সামনের রাস্তায়। বেবিট্যাক্সি থেকে নামল একজন লোক। মাঝারি গড়ন। পাহলোয়ানের মত শরীর। প্রশস্ত কাঁধ, প্রকান্ড ছাতি, মুখ দেখে বুঝার উপায় নেই কাজাখ না রুশ।

লোকটি গাড়ির ভাড়া চুকিয়ে বাড়ির সামনের উঠানটি পার হয়ে সেই অন্ধকার বাড়িতে এসে উঠল। বাইরের দরজার সামনে তিনবার নক করল দরজায়। একটু পরেই দরজা খুলে গেল। ঢুকে গেল লোকটি বাড়ির ভেতরে।

বাড়িতে ঢোকার পরেই ড্রইং রুম। সেখান থেকে ভেতরে এগুলে একটি করিডোর। করিডোর উত্তর দক্ষিণ লম্বা। তবে একটু উত্তরে এগুলে করিডোরটির একটি শাখা বাঁক নিয়ে পশ্চিম দিকে গেছে। লোকটি করিডোরের সাথে বাঁক নিয়ে পশ্চিম দিকে এগুলো। একটু এগুতেই একটি দরজা। দরজা খোলাই ছিল। ভেতরে আলো। লোকটি ঢুকে গেল ঘরের ভেতরে।

ঘরটি বিশাল। জানালা সব বন্ধ, তার ওপর ভারী পর্দায় ঢাকা। ঘরের এক পাশে একটি খাট। অন্য পাশে একটা ছোট সেক্রেটারিয়েট টেবিল, তার সাথে একটা রিভলভিং চেয়ার। টেবিল সামনে তিনদিকে ঘিরে খান ছয়েক কুশন চেয়ার।

মধ্য এশিয়া মুসলিম প্রজাতন্ত্রে 'ফ্র' এর এটাই প্রথম অফিস। এটাই এখন ওদের হেডকোয়ার্টার। সিংকিয়াং থেকে জেনারেল বরিসই একে পরিচালনা করছে।

ঘরে শয্যাটি শূন্য। কিন্তু টেবিলে বসে আছে একজন লোক। দীর্ঘকায় লোকটি। চেহারায় কাজাখ। শক্ত চোয়াল। চোখে-মুখে একটা ক্রুরতা। বারান্দায় পায়ের শব্দ শুনেই সে মুখ তুলেছিল। আগন্তুককে ঘরে ঢুকতে দেখে চাঙ্গা হয়ে উঠল। সোৎসাহে বলল, ‘এস কিরভ। তোমার জন্যেই আমি অপেক্ষা করছি।’

আগন্তুক এসে সামনের চেয়ারে বসল।

‘কি খবর বল।’ জিজ্ঞাসা করল ঘরের লোকটি। তার নাম নিকোলাস নুরভ। সে কাজাখ কম্যুনিস্ট পার্টির গুপ্ত পুলিশের একজন নিষ্ঠুর চরিত্রের অফিসার। কাস্পিয়ানের উত্তর তীরস্থ কাজাখ শহর গুরিয়েভ এর ত্রাস বলে পরিচিত ছিল সে। তার গোপন সম্পর্ক জেনারেল বরিস-এর 'ফ্র' এর সাথে। মধ্যএশিয়া স্বাধীন হবার পর বহুদিন সে পালিয়ে বেড়িয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবার পর জেনারেল বরিসের নির্দেশ অনুসারেই সে এই হরকেস শহরে এসে আড্ডা গেড়েছে। সে এখন হরকেস শহরের 'ফ্র' প্রধান।

‘খবর খুব ভালো। আহমদ মুসা এসেছে।’ নুরভের প্রশ্নের জবাবে বলল কিরভ।

‘তুমি শুনেছ, না দেখেছ।’

‘ভি আই পি রেস্ট হাউজের প্রাঙ্গণে হেলিকপ্টার ল্যান্ড করা দেখেছি, মেয়র আহমদ মুসাকে স্বাগত জানিয়ে রেস্ট হাউজে নিয়ে গেল তাও দেখেছি।’

‘কেমন করে বুঝলে সে আহমদ মুসা?’

‘কতবার ফটো দেখেছি। আর এক কপি ফটো তো আমাদের সাথেই রেখেছি।’

কিরভের পুরো নাম কুজনভ কিরভ। সে রুশ বংশোদ্ভুত। তার দাদী ছিল কাজাখ। সেই সূত্রে চেহারায় সে কিছুটা কাজাখ ধাঁচ পেয়েছে। কম্যুনিস্ট সরকারের অধীনে সে একজন গোয়েন্দা কর্মী হিসাবে কাজ করত। তারও কর্মসংস্থান ছিল গুরিয়েভ শহরে। নুরভের সাথে সেই সময় থেকেই তার পরিচয়। মধ্যএশিয়া স্বাধীন হওয়ার পর সে হরকেস-এ পালিয়ে এসে একটা নির্মাণ প্রতিষ্ঠানে চাকুরী নেয়। একদিন হঠাৎ করে নুরভের সাথে তার দেখা। তারপর কিরভ 'ফ্র' এর কর্মী হিসাবে কাজ শুরু করল। আজ নুরভ তাকে পাঠিয়ে দিল আহমদ মুসার আসাটা স্বচক্ষে দেখে আসার জন্য।

‘আহমদ মুসার সাথে আর কে আছে?’

‘একজন এসেছে, তবে সে উচ্চ পর্যায়ের কেউ নয় বলেই মনে হয়।’

‘কি করে বুঝলে?’

‘সে আহমদ মুসার সাথে সাথে হাঁটেনি, এমনকি মেয়রের সাথেও নয়। মেয়রের পেছনে পেছনে তাকে যেতে দেখেছি।’

‘তোমার বুদ্ধিকে সাবাস কিরভ।’

কিছু বলতে যাচ্ছিল কিরভ। এমন সময় বারান্দায় পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। কিরভ নেমে গেল।

একজন তরুণ এসে ঘরে ঢুকল।

তরুণকে ঢুকতে দেখেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল নুরভ। বলল, ‘পিটার, এস এস। তোমাকে নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন ছিলাম।’

পিটার ম্লান হেসে বসল এসে চেয়ারে।

পিটার ভি আই পি রেস্ট হাউজের একজন ওয়েটার। সেখানে তার নাম রশিদভ। রশিদভ তার ছদ্ম নাম। এই নামেই সে আলমা আতার ক্যাটারিং

ইন্সটিটিউট থেকে ডিগ্রি নেয়ার পর যথারীতি ইন্টারভিউ দিয়ে সে চাকরী পেয়েছে হরকেস এর ভি আই পি রেস্ট হাউজে।

রশিদ অর্থাৎ পিটার নুরভ এর ভাতিজা। নুরভের বড় ভাই অর্থাৎ পিটারের আব্বা ছিল গুরিয়েভ এর কম্যুনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী। আর পিটার কিশোর বয়সেই যোগ দিয়েছিল কম্যুনিস্ট যুব সংগঠন কসমোসলে। মধ্যএশিয়া স্বাধীন হওয়ার প্রাক্কালে এক সশস্ত্র সংঘর্ষকালে পিটারের আব্বা মারা যায়। পিটার পালিয়ে আসে আলমা-আতায়। নুরভ তাকে খুঁজে পায় এবং ভর্তি করে দেয় ক্যাটারিং ইন্সটিটিউটে।

নুরভ ভীষণ খুশী যখন তার ভাতিজা চাকুরী পেল হরকেস এর ভি আই পি রেস্ট হাউজে। এই ভি আই পি রেস্ট হাউজ হরকেস এর নার্ভ সেন্টার। রাষ্ট্রীয় ও বিদেশী বড় বড় অতিথি এখানে এসে থাকেন। অনেক খবর, অনেক গোপন তথ্যের আকর হরকেস ভি আই পি রেস্ট হাউজ। পিটারের মাধ্যমে সবই জানতে পারে নুরভ। আহমদ মুসা হরকেস আসছে এবং ভি আই পি রেস্ট হাউজেই এক রাতের জন্যে উঠবে তা সে পিটারের মাধ্যমেই জানতে পারে। এবং তা জানার পর জেনারেল বরিসকে তা অবহিত করে। অতপর জেনারেল বরিসের পরামর্শ ক্রমে একটা পরিকল্পনা আঁটে আহমদ মুসাকে কিডন্যাপ করার। এই কিডন্যাপ পরিকল্পনার ফাইনাল প্রস্তুতির ব্যাপারে তথ্য বিনিময়ের জন্যেই পিটার এসেছে নুরভের এখানে।

নুরভ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, ‘এখন রাত এগারটা, তুমি কিভাবে বেরুলে রেস্ট হাউজ থেকে? সন্দেহ করবে না তো কেউ? এখন তো ডিউটির সময়।’

‘না সন্দেহ করবে না। আমি আধাঘন্টার ছুটি নিয়ে এসেছি ওষুধ কিনব বলে।’

‘ঠিক আছে তুমি এখনি চলে যাও। শুধু তোমার কাছে একটাই জানার। তুমি তার রুম-সার্ভিসের ডিউটি পেয়েছ কি না এবং তার খাবার পানির সাথে ওষুধ মেশাতে পেরেছ কি না?’

‘হ্যাঁ আংকল। রাত ৯ টায় আমিই তার রুমে খাবার দিয়েছি, আবার আমিই তার রুম পরিস্কার করেছি। তার খাওয়ার আগেই পানিতে সে ওষুধ মিশিয়েছি। সে পানি তিনি খেয়েছেন এবং নিশ্চয় আরো খাবেন।’

‘সাবাশ ভাতিজা। শুধু আমরা এবং জেনারেল বরিস নয়, তোমার পিতা-মাতার আত্মাও এতে খুশী হবেন।’

নুরভের শেষ কথা গুলো উচ্চারণের সংগে সংগেই পিটারের মুখ শক্ত হয়ে উঠল। তার চোখে যেন জ্বলে উঠল প্রতিশোধের আগুন। বলল সে, ‘আমি ইচ্ছা করলে তাকে খুন করতে পারি আংকল।’

‘না ভাতিজা, তাঁকে জীবন্ত আমাদের ধরতে হবে। তাকে হাতে পেলে আমরা অনেক কাজ করতে পারব। যার মূল্য টাকার অংকে পরিমাপ করা যাবে না। তাকে হাতে পেলে দরকষাকষি করে আমরা এমনকি রাজ্যও পেয়ে যেতে পারি। সে হলো আমাদের সাত রাজার ধন। তাকে বিক্রি করে সাত রাজ্য না হোক এক রাজ্য তো আমরা পেতে পারি।’

চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল পিটারের।

নুরভ পকেটে হাত ঢুকিয়ে এক গুচ্ছ নোট বের করে পিটারের হাতে দিয়ে বলল, ‘তুমি বেবী ট্যাক্সি নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যাও। আজ রাতের সব পরিকল্পনা তোমার মনে আছে তো?’

‘জি আংকল।’ বলে উঠে দাঁড়াল পিটার।

তারপর ‘শুভ রাত্রি’ জানিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করল। চলে গেল পিটার।

পিটার চলে যেতেই ওয়াকি টকি বের করে একটি নির্দিষ্ট চ্যানেলে যোগাযোগ করল।

‘হ্যালো, মিং!’

ওপার থেকে মিং এর সাড়া পেল। বলল, ‘তুমি ঠিক আছ? তোমার হেলিকপ্টার রেডি?’

ওপার থেকে ইতিবাচক সাড়া পাওয়ায় তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, ‘তুমি প্রস্তুত থেকো, সব ঠিক থাকলে রাত দুইটায় আমরা পৌঁছব।’

ওয়াকি টকি বন্ধ করে রেখে দিল। তারপর ড্রয়ার থেকে বের করল তিনটি পাসপোর্ট। একটি নুরভের, একটি কিরভের এবং অন্যটি পিটারের। পাসপোর্ট গুলো শেষ বারের মত পরীক্ষা করল নুরভ। নুরভের পাসপোর্ট আলমা আতার একটা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান হিসাবে। আর পিটারের পাসপোর্ট হয়েছে ওমরভ নামে। তার পরিচয় সে নুরভের পার্সোনাল সেক্রেটারী। পাসপোর্টে কিরভের নাম হয়েছে করিমভ। তার পরিচয় সে নুরভের ব্যবসায়ের রপ্তানী উপদেষ্টা। পাসপোর্টের ভিসা গুলো একবার দেখে নিয়ে সে পাসপোর্ট গুলো পকেটে পুরল।

'হরকেস-এর সীমান্ত ফাঁড়িতে রাতে ডিউটি কার খোঁজ নিয়েছে?' কিরভের দিকে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করল নুরভ।

'হ্যাঁ, অলিয়েভের আজ ডিউটি। খুব ভাল অফিসার। কাগজপত্র ঠিক থাকলে কোনো ঝামেলা করেনা।'

'ঠিক আছে। তুমি যাও, গ্যারেজ থেকে গাড়ী বের করে সব ঠিক আছে কি না দেখ। তেল ঠিক ভাবে ভরে নিও।'

'আচ্ছা' বলে বেরিয়ে গেল কিরভ।

ঠিক সাড়ে ১২ টায় নুরভের গাড়ী বারান্দা থেকে একটা মিনি মাইক্রোবাস বেরিয়ে গেল। গাড়ীর সিটে কিরভ। এবং তার পাশের সীটে নুরভ।

রাত পৌনে একটায় তাদের গাড়ী একটা টিলার পেছনে এসে দাঁড়াল। জায়গাটা রাস্তা থেকে দুরে এবং অন্ধকার। রাস্তা ও এ স্থানটির মাঝখানে একটি মদের কারখানা। এখন পরিত্যক্ত, মধ্যএশিয়া স্বাধীন হওয়ার পর কারখানাটি বন্ধ হয়ে গেছে।

গাড়ি থেকে নামল নুরভ ও কিরভ।

টিলাটির ওপাশে ভি আই পি রেস্ট হাউজের দেয়াল। তারা টিলাটির পাশ ঘুরে রেস্ট হাউজের প্রাচীরের গোড়ায় এসে দাঁড়াল।

তারা প্রাচীরের উওর দেওয়াল ধরে পূর্ব দিকে এগুলো। একদম পূর্ব প্রান্তে যেখান দিয়ে ভেতর থেকে ড্রেন বেরিয়ে এসেছে সেখানে এসে দাঁড়াল। ঠিক ড্রেনের উপর প্রাচীরে একটা ক্ষুদ্র দরজা। স্টীলের কপাট তাতে।

নুরভ ধীরে ধীরে চাপ দিল দরজার উপর। নড়ে উঠল দরজা। নুরভের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। পিটার ভেতরের তালা যথাসময়েই তাহলে খুলে রেখে গেছে। পরিকল্পনা অনুসারে সে তাহলে কাজ করতে পেরেছে।

নুরভ দরজার উপর তার হাতের চাপ বাড়াল। ধীরে ধীরে খুলে গেল দরজা।

দরজার আশপাশটা পরিচ্ছন্ন নয়। এটা আসলে সুইপারস প্যাসেজ। প্রধানত ড্রেন পরিষ্কার জন্যই তাদের ডাকা হয়। এছাড়া নির্দিষ্ট সময় অন্তর ঘর দোর, বাথ তাদের দিয়েই সাফ করানো হয়।

দরজা দিয়ে উঁকি দিল নুরভ। সামনেই বাগান, তার পরেই অন্ধকার বাড়িটি দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে বাগানের দিকে একটি মাত্র আলো।

বাগান পেরিয়ে ওপাশে রেস্ট হাউজের গোড়ায় গিয়ে দাঁড়াবার সিদ্ধান্ত নিল। এপাশেই সুইপার সার্ভেন্টেস্‌দের সিঁড়ি।

নুরভ ও কিরভ পা বাড়াতে যাবে এমন সময় রেস্ট হাউজের পশ্চিম কোনায় টর্চ জ্বলে উঠ্‌ল।

প্রাচীরের দরজা আগেই বন্ধ করে দিয়েছিল। সুতরাং দরজা দিয়ে ঝট করে পালাবার উপায় ছিলনা। উপায়ান্তর না দেখে দু'জন শুয়ে পড়ল মাটিতে। তারপর দু'জন বুকে হেঁটে ফুল গাছের ঝোপে ঢুকে পড়ল।

প্রায় দম বন্ধ করে তারা অপেক্ষা করতে লাগল। শুনতে পেল, পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে। বুঝল, চারটি বুটের আওয়াজ। আওয়াজটা রেস্ট হাউজের পাশ দিয়ে পূর্ব দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

এক সময় পায়ের শব্দ থেমে গেল। বুঝল, পূর্বদিকে যাওয়া শেষ। কিছুক্ষণ পর বুটের শব্দ আবার পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলল। তাদের মাথার ওপর কয়েকবার আলোর ছুটাছুটি দেখল তারা। বুঝল, টর্চের আলো ফেলে তারা তাদের পাহারাদারির দায়িত্ব পালন করছে।

ধীর ধীরে তাদের পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল।

কিরভ উঠতে চাইল।

নুরভ তাকে টেনে ধরে বলল, ‘ওরা ওখানে দাঁড়িয়েও থাকতে পারে। তুমি থাক, আমি দেখছি।’

বলে নুরভ ধীরে ধীরে মাথা তুলল। দেখল না রেস্ট হাউজের পশ্চিম কোণ ফাঁকা।

তবু নুরভ আবার বসে পড়ল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, দেখতে হবে ওরা কখন ফেরে। নিশ্চয় ফিরবে। এরা গেটের প্রহরী নয়, নিশ্চয় টহল প্রহরী। রেস্ট হাউজের চারদিকেই ওরা টহল দিচ্ছে।

ঠিক দশ মিনিট পর ওরা ফিরে এল। একইভাবে ঐ একই দিক থেকে।

নুরভবলল, নিশ্চয় ওরা দুই গ্রুপে টহল দিচ্ছে। এক গ্রুপ দক্ষিণ ও পূর্বদিকে। আর এক গ্রুপটি পশ্চিম ও উত্তর দিকে। প্রতি দশ মিনিট পর ওরা ফিরে আসছে। মানে কোথাও গিয়ে দাঁড়াচ্ছে ওরা। না দাঁড়ালেই কিন্তু বিপদ। যাহোক আমাদের গণনায় ধরতে হবে পাঁচ মিনিট। কিন্তু মাঝখানের বিরতিটা যদি পাঁচ মিনিটের কম হয় তাহলেই বিপদ ঘটবে।

দ্বিতীয় রাউন্ডে ওদের চলে যাওয়ার পায়ের শব্দ মুছে যাবার সাথে সাথে নুরভ ও কিরভ হামাগুড়ি দিয়ে ফুলের গাছের মধ্য দিয়ে ছুটল রেস্ট হাউজের পূর্ব কোণের দিকে। ওখানেই ওপরে ওঠার সুইপার সার্ভেন্টদের সিঁড়ি।

আধা মিনিটেই ওরা পৌঁছে গেল ওখানে।

পেল সিঁড়িটা। সংকীর্ণ কাঠের সিঁড়ি। পা দিয়েই বুঝল মজবুত। তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল দুজন। বুক টিপ টিপ করছে নুরভের। যদি সিঁড়ি মুখের দরজা খোলা না পায়, যদি পিটার দরজা না খুলে রেখে থাকে। যদি ভুলে গিয়ে থাকে! আবার ভাবল, প্রাচীরের দরজা যখন খুলে রেখেছে, তখন পরিকল্পনা অনুসারে সব কাজই করেছে।

সিঁড়ি দিয়ে আগে আগে উঠছিল নুরভ।

দরজার মুখোমুখি হলো সে।

দাঁড়াল নুরভ।

তার মানে হলো কাঠের দরজা। কিন্তু হাত দিয়েই বুঝল পুরু স্টিল দিয়ে তৈরী। একটু চাপ দিতেই ফাঁক হয়ে গেল দরজা।

অবশিষ্ট দরজা এমনিতেই খুলে গেল।

খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল নুরভের মুখ। অবশিষ্ট দরজা খোলার কাজটা পিটার করেছে। যে ধরনের পরিকল্পনা ছিল ঠিক তাই।

খোলা দরজার সামনে দাড়িঁয়ে আছে পিটার।

‘আহমদ মূসার দরজার প্রহরীকে সরাতে পেরেছো তো?’

‘হ্যাঁ খুব সহজেই। ওকে চা অফার করতে হয়নি। পানি চেয়েছিল খেতে। পানিতেই ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিলাম। খাওয়ার অল্পক্ষণ পরেই কুপোকাত। ওকে টেনে এনে ঐ দেখুন ঐ কোণায় ফেলে রেখেছি।’

‘বাহ্ঁ! ভাতিজা, আমি যা আশা করেছিলাম, তার চেয়েও বেশী করেছ। ধন্যবাদ তোমাকে। এখন চল আহমদ মূসা কোথায়? ‘মাষ্টার কি’ যোগাড় করতে পেরেছে, না ভাঙ্গতে হবে?’

‘ওটা আমাদের পক্ষে যোগাড় করা কঠিন নয়। এনেছি ওটা।’

‘সাথে আসা পাশের লোকটির কি খবর?’

‘একই অবস্থা আংকল। ওঁকেও আমিই খাবার দিয়েছিলাম।’

‘চল তাহলে, কোন দিকে?’

সবাই এসে দাঁড়াল আহমদ মূসার রুমের দরজায়।

মাষ্টার কি দিয়ে পিটারই তালা খুলল।

নুরভ ও কিরভ দু‘জনেই রিভলভার হাতে নিয়েছে। তাদের বুক দুরু দুরু করছে। যদি ওষুধ কাজ না করে থাকে, যদি ভুল হয়ে থাকে পিটারের ওষুধ দিতে, তাহলে তো বাঘের মুখে পড়তে হবে। যার সামনে গেলে জেনারেল বরিসেরও বুক কাঁপে, তার সামনে তারা তো কিছুই নয়।

পিটারই নিঃশব্দে দরজা খুলে ফেলল।

প্রথমে ঢুকল পিটার। দরজায় একটু দাঁড়াল নুরভ ও কিরভ।

পিটার ভেতরটা দেখে এসে হাত নেড়েঁ ডাকল।

এবার নিশ্চিন্ত মনে ঘরে ঢুকল নুরভ ও কিরভ।

আহমদ মূসা শুয়ে আছে। বুঝাই যাচ্ছে গভীর ঘুমে অচেতন। চাদরটাও সে গায়ে তুলে নেয়নি।

নুরভ ও কিরভের হাতে তখনো রিভলভার তাক করা আহমদ মূসার দিকে।

কেউ তার গায়ে হাত দিতে সাহস করছে না।

নুরভ পিটারকে বলল, আমরা রিভলভার ধরে আছি। তুমি ওকে একটু কাত ফিরিয়ে দেখ, জেগে উঠে কিনা।

পিটার সসংকোচে দু'হাত লাগিয়ে আহমদ মূসাকে একদিকে পাশ ফিরাল। যেমন ফিরল তেমনই থাকল। তার হাত- পা কিংবা চোখ- মুখ কোন সচেতনতা পরিলক্ষিত হলো না। একদম শিথিল তার দেহ।

'ঘাড়ে তুলে নিতে পারবে না একে কিরভ?'

কিরভ কোন উত্তর না দিয়ে খুব সহজেই আহমদ মূসার দেহ কাঁধে নিল।

'সাবাশ কিরভ, এ না হলে তুমি পাহলোয়ান কি?'

ঘর থেকে প্রথম বেরিয়ে এল নুরভ। তার পেছনে কিরভ। সব শেষে পিটার। সিঁড়ির মুখে এসে সবাইকে দাঁড় করাল নুরভ। ঘড়ি দেখে বলল, আর মিনিট খানেকের মধ্যেই ওদের এদিকে টহলে আসার সময়। ওদের না চলে যাওয়া পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

এক মিনিট নয়, পাঁচ মিনিট পর ওরা এল। টহল শেষ করে ওরা চলে গেল।

ওদের পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাবার পর নুরভ পিটারকে বলল, 'তুমি আগে নেমে যাও। তোমার দায়িত্ব হলো নিচে দাঁড়িয়ে টহলের প্যাসেজ ছাড়বে এবং আমাদের সাথে যোগ দেবে।'

পিটার নামতে লাগল নিচে।

তার পিছে পিছে কিরভ ও নুরভ।

নিছে নেমে পিটার সিঁড়ির গোড়া থেকে একটু পশ্চিমে গিয়ে দাঁড়াল। তার হাতে রিভলভার।

কিরভ এবং নুরভ বাগানের মাঝামাঝি গেছে এমন সময় নুরভ হঠাৎ চোখ ফেরাতে গিয়ে রেস্ট হাউজের পশ্চিম কোণে টর্চ জ্বলে উঠতে দেখল।

সংগে সংগে নুরভ কিরভের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে নিয়ে শুয়ে পড়ল এবং চাপা গলায় দ্রুত বলল, 'চল টেনে নিয়ে যেতে হবে।'

তারপর দু'জনে হামাগুড়ি দিয়ে আহমদ মুসাকে টেনে নিয়ে চলল দ্রুত।

দরজার কাছে গিয়ে আঁতকে উঠল নুরভ। দরজা খুললে ওরা যদি টের পেয়ে যায়! কিন্তু উপায় কি?

ঠিক এই সময়েই রেস্ট হাউসের পশ্চিম কোণ থেকে একটা কণ্ঠ ভেসে এল, 'কে ওখানে দাঁড়িয়ে?'

নুরভ বুঝল, তারা নয়, পিটার ওদের নজরে পড়ে গেছে।

সংগে সংগেই নুরভ বসে বসেই দরজার পাল্লা ফাঁক করে আহমদ মুসাকে প্রথমে ঠেলে দিল দরজার বাইরে। তারপর তারা দু'জনে গড়িয়ে দরজার ওপারে চলে গেল।

আহমদ মুসাকে যখন নুরভরা ঠেলে দিচ্ছিল দরজার বাইরে, ঠিক সে সময়েই প্যাসেজের এদিক থেকে একটা গুলির শব্দ হলো। কিন্তু তার পরেই এক ব্রাশ ফায়ার এল পশ্চিম দিক অর্থাৎ রেস্ট হাউসের পশ্চিম কোণ থেকে।

নুরভরা যখন দরজার ওপারে গড়িয়ে পড়ল, তখনও চলছিল ব্রাশ ফায়ার।

দরজার ওপারে গড়িয়ে পড়েই নুরভ বলল, 'কিরভ, একে নিয়ে তাড়াতাড়ি যাও, আমি আসছি।'

কিরভ আহমদ মুসাকে কাঁধে করে ছুটল গাড়ির দিকে।

নুরভ প্রাচীরের দরজা টেনে বন্ধ করে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিল কি ঘটেছে তা বুঝার জন্যে। যা সে বুঝতে পারছে, তাতে টহলদার দু'জন সৈনিকের চোখে ধরা পড়ার সংগে সংগেই পিটার কাউকে গুলি করেছিল তাদের লক্ষ্য করে। সৈনিক দু'জনের কাউকে গুলি লাগুক বা না লাগুক, তাদেরই একজন ব্রাশ ফায়ার করেছিল পিটারকে লক্ষ্য করে।

নুরভ অপেক্ষা করছিল পিটারের শেষ অবস্থা জানার জন্য। পিটার এ পর্যন্ত না আসা থেকেই বুঝতে পারছে, পিটার স্বাভাবিক অবস্থায় নেই।

এই সময় একজনের উচ্চ কণ্ঠ শুনতে পেল। সে বলছে কাউকে লক্ষ্য করে, 'এদিকে এস, দেখ এক চোর ব্যাটা শেষ হয়ে গেছে।'

কথাটা শুনেই বুকটা ধ্বক করে উঠল নুরভের। তাহলে পিটার আর নেই! বুকের কোথায় যেন বেদনায় চিন চিন করে উঠল তার।

কিন্তু আর দেরী করলনা সে। ছুটল গাড়ির দিকে।

ওরা সব জেনে ফেলার আগেই ওদের নাগালের বাইরে যেতে হবে তাদেরকে।

গাড়িতে লাফ দিয়ে উঠে বসল নুরভ। ড্রাইভিং সিটেই উঠল।

কিরভ তখনও আহমদ মুসাকে বাক্সে প্যাক করার কাজে ব্যস্ত। সাত ফুট লম্বা, দুই ফুট প্রশস্ত এবং আড়াই ফুট উঁচু বিরাট কাঠের তৈরী ফলের ঝুড়িতে আহমদ মুসাকে তোলা হয়েছে। ঝুড়িতে দুটি কেবিন। উপরেরটা ফলে ভর্তি। নিচের কেবিনে আহমদ মুসা। কেউ ঝুড়ি চেক করতে গেলে দেখবে ফলের স্তুপ।

নুরভ ড্রাইভিং সিটে বসেই স্টার্ট দিল গাড়ি।

কিরভ ছুটে এল নুরভের কাছে। বলল, 'পিটার, পিটার আসবে না?'

'পিটার কোন দিনই আর আসবে না।'

'কি বলছেন স্যার!'

'পিটার ওদের ব্রাশ ফায়ারে মারা গেছে।'

'ও যেসাস!'

'পিটার জীবন দিয়ে আমাদের বাঁচিয়েছে, আমাদের পলিকল্পনাকে সফল করতে সাহায্য করেছে। পিটার টহল প্যাসেজে দাঁড়িয়ে ওদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করায় এবং ওদের চোখে পড়ার পরেও না পালিয়ে ওদের সাথে লড়াই এ লিপ্ত হওয়ার ফলেই আমরা পালানোর সুযোগ পেয়েছি। একজন চোর মারা পড়েছে বলে ওরা মনে করছে। সুতরাং প্রকৃত ঘটনা ওদের নজরে আসতে আরও সময় লাগবে। এটুকু সময়ের মধ্যেই আমাদের সরে পড়তে হবে।'

কিরভ ফিরে গেল তার কাজে।

গাড়ি চলতে শুরু করেছে তখন।

সড়কে উঠে এসে গাড়ি তীর বেগে ছুটে চলল। লক্ষ্য তাদের সীমান্ত।

হরকেস শহর- বলা যায় সীমান্তের ওপর দাঁড়ানো। শহরের সীমান্ত থেকে সীমান্ত ফাঁড়ির দূরত্ব মাত্র এক মাইল। আর শহরের কেন্দ্র থেকে মাত্র ৩ মাইল।

সুতরাং নুরভরা সীমান্ত ফাঁড়ীতে পৌঁছতে তিন মিনিটের বেশী লাগল না।

সীমান্ত ফাঁড়ির স্থানটা একটা গিরিপথ মত জায়গা। দু'পাশ থেকে পাহাড় শ্রেণী এগিয়ে এসেছে। সেখানে এসে থেমে গেছে পাহাড় এবং সৃষ্টি করেছে এক গিরিপথ। গিরিপথটা আঁকা বাঁকা দীর্ঘ এক উপত্যকার মুখ। এ উপত্যকা মুখ অর্থাৎ মধ্যএশিয়া মুসলিম প্রজাতন্ত্রের সীমান্ত ফাঁড়ি থেকে ৫০ গজ পূর্ব দিকে সিংকিয়াং এর সীমান্ত ফাঁড়ি।

মধ্যএশিয়া মুসলিম প্রজাতন্ত্রের সীমান্ত ফাঁড়ির এক পাশে একটি সিক্যুরিটি ব্যারাক, অন্য পাশে চেকপোস্ট। সীমান্ত পথটি ইস্পাতের দরজা দিয়ে বন্ধ। দরজাটি দূর নিয়ন্ত্রিত। সিক্যুরিটি ব্যারাকের সাথে লাগানো সিক্যুরিটি পোস্ট নিয়ন্ত্রনকারী সুইচ রয়েছে। সীমান্ত অতিক্রম ইচ্ছুক ব্যক্তির কাগজপত্র ঠিকঠাক থাকলে একটা পাশ পেয়ে যায়। এই পাশ সিক্যুরিটি বক্সে দেখালেই সুইচ টিপে দরজা খুলে দেয়া হয়।

নুরভদের কাগজপত্র সব ঠিক ছিল। পাশ পেতে দেরী হলো না। তাছাড়া ডিউটি অফিসার অলিয়েভ তাদের কিছুটা পরিচিত ছিল বলে আরও সুবিধা হলো তাদের। গাড়ি চেকও তেমন একটা হলোনা। গাড়িটার ভেতরে তারা রুটিন মাফিক চোখ বুলাল এবং ভেতরে একবার উঁকি দিল মাত্র।

সব মিলিয়ে পাঁচ মিনিটের মত সময় লাগল। সীমান্ত ফাড়ির খোলা গেট দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল নুরভের গাড়ি। পেছনে তাকিয়ে নুরভ সীমান্ত ফাঁড়ির গেটটাকে বন্ধ হতেও দেখল। প্রশস্ত হাসি ফুটে উঠল নুরভের মুখে। নুরভ স্টেয়ারিং হুইলের উপর এক প্রচন্ড মুষ্টাঘাত করে বলল, ‘কিরভ, তুমি বুঝতে পারছনা কি ঐতিহাসিক ঘটনা আমরা ঘটিয়েছি! সাত রাজার ধন এখন আমাদের হাতের মুঠোয়।’

কিরভ ঝুড়ি থেকে একটা আপেল নিয়ে তাতে কামড় বসিয়ে বলল, 'স্যার, আমাদের এই আনন্দ ষোল কলায় পূর্ণ হতো যদি পিটার আমাদের সাথে থাকতো।'

পিটারের নামটা শুনেই নুরভের মুখটা ম্লান হয়ে গেল। ধীরে ধীরে বলল, 'বেচারা পিটার! এ ঐতিহাসিক সাফল্যের সবটুকু কৃতিত্বই তার।'

বলে চুপ করল নুরভ। গম্ভীর হয়ে উঠল তার মুখ। তাতে বেদনার ভারী ছাপ। বাপ-মা হারা ভাতিজাকে নুরভ নিজের ছেলের মতই ভালোবাসত।

নুরভের বেদনায় ভারি হওয়া চোখ সামনে প্রসারিত।

ছুটে চলেছে গাড়ি।

জেনারেল বরিস ঘরে ঢুকে ধীরে ধীরে আহমদ মুসার শয্যার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা শুয়েছিল এক খাটের ওপর। চোখ দু'টি তার বন্ধ। জ্ঞান তার তখনো ফিরেনি। আহমদ মুসাকে সংজ্ঞাহীন করার জন্যে বিশেষ ধরনের ওষুধ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। নিরাপত্তামূলক ওষুধ ব্যবহার না করলে চব্বিশ ঘণ্টার আগে জ্ঞান ফেরে না। আহমদ মুসার জ্ঞান ফিরিয়ে আনার জন্যে সকালেই তাকে ইনজেকশন করা হয়েছে। ডাক্তার বলেছে ধীরে ধীরে তার জ্ঞান ফিরে আসবে। সকাল ১০ টার মধ্যেই সে জেগে উঠবে।

ঠিক নয়টা পঞ্চান্ন মিনিটে ঘরে ঢুকেছে জেনারেল বরিস।

আহমদ মুসার শয্যা পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিল জেনারেল বরিস।

আহমদ মুসার হাত পা বেঁধে রাখা হয়েছে। কখন জ্ঞান ফিরে আসে, কখন কি করে বসে এই ভয়ে। সিংহকে পিঞ্জরাবদ্ধ করেও ওদের স্বস্তি নেই।

জ্ঞান ফিরে আসেনি দেখে জেনারেল বরিস দরজার দিকে এগুলো। দরজার পাশের সুইচবোর্ডে একটা ক্ষুদ্র সাদা বোতামে চাপ দিল। সংগে সংগে

দরজার বিপরীত দিকের দেয়াল সরে গেল। আহমদ মুসার ছোট কক্ষটি বিশাল এক কক্ষে পরিণত হলো।

কক্ষের মাঝখানের দেয়াল সরে যাবার সংগে সংগে ওপাশের আরেক বিছানায় মেইলিগুলিকে দেখা গেল। শুয়ে আছে সে। তার এক পায়ে বিরাট ব্যান্ডেজ। তার ম্লান, কাতর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে সুস্থ নেই।

দেয়াল সরে যাবার হিস হিস শব্দেই সম্ভবত মেইলিগুলি চোখ মেলেছিল।

মেইলিগুলির শয্যাটা ছিল উত্তর দেয়াল ঘেঁষে ঘরের একদম পূর্ব প্রান্তে।

মেইলিগুলি চোখ খুলেই দেখতে পেল আহমদ মুসাকে। অলক্ষ্যেই যেন একটা চিৎকার বেরিয়ে এল মেইলিগুলির মুখ থেকে- 'ওগো, তুমি ...... তুমি ...... তুমি এখানে।'

উত্তেজনা আতংকে উঠে বসেছিল মেইলিগুলি।

জেনারেল বরিসের মুখে ক্রুর হাসি।

সে দরজার সামনে থেকে সরে আসতে আসতে বলল, 'বিস্মিত হয়েছ সুন্দরী, মনে করেছিলে তোমার বিশ্বজয়ী স্বামীর গায়ে কেউ হাত দিতে পারবেনা। শুধু দেয়া নয় একদম খাচায় এনে ভরেছি। একবার পালিয়েছিল। সে সময় আবার আর তাঁকে আমরা দেব না।

মেইলিগুলি সামনে থেকে দুনিয়ের সব আলো যেন দপ করে এক সাথে নিভে গেল। ধপ করে আবার শুয়ে পডল বিছানায়।

শ্বাসরুদ্ধকর আতংক। আর বুকের অসহ্য জ্বালা নিয়ে সে তাকিয়ে রইল আহমদ মুসার দিকে ওকি ঘুমিয়ে আছে না অজ্ঞান? এ সময় ঘুম স্বাভাবিক নয়। নিশ্চয় অজ্ঞান। অজ্ঞান মানুষকে আবার হাত পা বেঁধে রাকতে হয়েছে বেঁধে রেখেছে আবার খাটিয়ার সাথেও।

জেনারেল বরিস আবার ঘুরে দাড়িয়েছে আহমদ মুসার দিকে। হাতে তার রিভলভার। সে হাত ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে রিভলভার নল দিয়ে খোচা মারল আহমদ মুসার মাথায়।

একটু পরেই আহমদ মুসা নড়ে উঠল সম্ভবত পাশ ফিরতে চেয়েছিল, হাত পা এবং দেহটা খাটের সাথে বাধা থাকায় বাধা পেল তার স্বাধীনভাবে ঘুরবার প্রচেষ্টা। সংগে সংগে চোখ খুলে গেল তার।

চোখ খুলেই দেখতে পেল রিভলভার হাতে দাড়ানো জেনারেল বরিসকে। এবং চোখ ফিরিয়ে চাইল একবার খাটের দিকে এবং উপরের ছাদও সামনের দেয়ালের দিকে।

'কি দেখছ আহমদ মুসা?' রিভলভার নাচিয়ে ক্রুর হেসে বলল জেনারেল বরিস।

'বুঝতে চেষ্টা করছি। আগের ন্যায় এবারও তুমি আমাকে কাপুরুষের মত কিডন্যাপ করেছ কি না!' স্বাভাবিক ও অত্যন্ত স্পষ্ট কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

'কি বুঝলে?'

'বুঝলাম হরকেস এর রেস্ট হাউজে আমাকে কোনও ভাবে অজ্ঞান করে তোমার লোকেরা কিডন্যাপ করে এখানে এনেছে।'

'কোথায় তোমাকে এনেছি বলতে পার?'

'এক উরুমুচি ছাড়া তোমার জন্য নিরাপদ জায়গা আর কোথাও নেই জেনারেল বরিস।'

আহমদ মুসার কথায় জ্বলে উঠেছিল জেনারেল বরিসের চোখ। তার রিভলভারের বাট দিয়ে আহমদ মুসার কাধে একটা আঘাত করে বলল, 'এর জন্য এককভাবে তুমিই দায়ী আহমদ মুসা।'

'তোমার এত ভয় জেনারেল বরিস। একজন অজ্ঞান লোককে হাত পা বেঁধে রেখেও তোমার স্বস্তি হয়নি। তার দেহটাকেও তুমি বেঁধে রেখেছ খাটের সাথে।'

'একবার তুমি খাচা থেকে পালিয়েছ। এবার জেনারেল বরিস আর কোন ঝুকি নেবে না।'

একটু থেমেই জেনারেল বরিস আবার বলল, 'যাই হোক তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি আহমদ মুসা। আমাকে দেখে তোমার চোখ একটুও কাপেনি।

তোমার কলিজাটা গন্ডারের চামড়া দিয়ে তৈরী। তবে আহমদ মুসা তোমার কলিজা কাঁপানোর ব্যবস্থা আমি করেছি। তোমার মেইলিগুলি কোথায় জান?'

মেইলিগুলি একটু দুরে ঘরের ও প্রান্তের বিছানায় শুয়ে সব কথাই শুনছিল। ভয় উদ্বেগ উত্তেজনায় তার গোটা দেহ আড়ষ্ট। গলা শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে গেছে। কথা বলার শক্তিও যেন তা ফুরিয়ে গেছে।

জেনারেল বরিসের কথা শেষ হতেই আহমদ মুসা কঠোর দৃষ্টিতে জেনারেল বরিসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মেইলিগুলি কথায় বরিস? তার কোন ক্ষতি হলে তুমি যে শাস্তি পাবে তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।'

'সেটা পরের কথা। তবে আমি তার কোন ক্ষতি করিনি। ক্ষতি করব এবং সেটা তোমার সামনেই। এটা আমার বহুদিনের ইচ্ছা। আমি জানি তোমাকে শাস্তি দেবার এর চেয়ে বড় পথ আর নেই।'

আহমদ মুসার মুখের ওপর একটা কালো ছায়া নামল। বরিসের ইংগিত সে বুঝেছে। আহমদ মুসার গোটা দেহ শক্ত হয়ে উঠল। অসহ্য এক যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ল তার গোটা দেহে।

'কি, কথা বলছ না কেন আহমদ মুসা, ভয় পেলে? আমি জানি মেইলিগুলিই তোমার সবচেয়ে দুর্বল জায়গা। ওখানে আঘাত করলেই তুমি ভেঙ্গে পড়বে। সেই ব্যবস্থাই আজ আমি করেছি। ঐ দেখে নাও তোমার মেইলিগুলিকে।'

বলে জেনারেল বরিস খাটটা একটু ঘুরিয়ে দিল।

এবার আহমদ মুসা ঘাড় ফেরাতেই দেখতে পেল মেইলিগুলিকে।

মেইলিগুলি তাকিয়েছিল। চার চোখে মিলন হলো।

এতক্ষণের আসহায়ত্তের বোবা বাধ আহমদ মুসার দৃষ্টি স্পর্শে হঠাৎ করেই যেন ভেঙ্গে গেল। কণ্ঠে শব্দ ফুটে উঠল মেইলিগুলির। ডুকরে কেঁদে উঠল সে। গড়িয়ে নামল সে বিছানা থেকে নিচে। তারপর একটি ভাল পা ও একটি হাত দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে সে আহমদ মুসার দিকে আসতে শুরু করল।

জেনারেল বরিস আহমদ মুসার কাছ থেকে একটু সরে এল মেইলিগুলির দিকে চেয়ে কঠোর কণ্ঠে বলল যেমন আছ ঠিক তেমনিভাবে থাক। আর এক ইঞ্চি

এগুলে তোমার স্বামী আহমদ মুসার এক পা গুড়ো করে দেব, আরো একটু এগুলে আরেক পা গুড়ো করে দেব। শেষে গুড়ো করব মাথা।

মেইলিগুলি থেমে গেল।

কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল মেঝের ওপর।

আহমদ মুসা তাকিয়েছিল মেইলিগুলির দিকে।

'আমিনা।' ডাকল আহমদ মুসা।

মেইলিগুলি মুখ তুলল। কান্নারত অবস্থায় তাকাল আহমদ মুসার দিকে অশ্রুতে ধুয়ে যাচ্ছে তার মুখ।

'কেদনা আমিনা। মজলুমের অস্রু জালিমের জন্য পুরষ্কার। আমার আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো সাহায্যের মুখাপেক্ষী নই।'

হো হো করে হেসে উঠল জানারেল বরিস। বলল, 'তোমার আল্লাহ্ আর যেখানেই থাক আমাদের এখানে নাক গলাতে আসবে না। কেউ বাঁচাবার নেই তোমাদের।'

একটু থামল জেনারেল বরিস। তারপর বলল, 'জানি আহমদ মুসা, মেইলিগুলি তোমার পেয়ারের। কিন্তু আমি যদি একটু ফষ্টিনষ্টি করি ওর সাথে তাহলে কি রাগ করবে?'

'তোমার মত কাপুরুষের সাথে কথা বলতে ঘৃনা করি বোধ করি বরিস।'

'ঠিক আছে, কথা বল কি না দেখছি। তোমার সামনে তোমার মেইলিগুলিকে আজ লুণ্ঠন করব।'

বলে জেনারেল বরিস নেকড়ের মত এগুলো মেইলিগুলির দিকে।

আহমদ মুসার কথা শুনার পর মেইলিগুলি তার চোখের পানি মুছে ফেলেছে। ঠিক অশ্রু দেখলে ওরা আরও খুশী হয়। আরও ভাবল মেইলিগুলি, সে তো আহমদ মুসার স্ত্রী। জেনারেল বরিসের সামনে ইদয় হতে দেখলে যে বন্দী আহমদ মুসার চোখে সামান্য কাঁপনও জাগেনা, সে আহমদ মুসার স্ত্রী হয়ে মেইলিগুলি ভয় পাবে কেন! কেন সে মোকাবিলা করতে পারবে না পরিস্থিতিকে!

জেনারেল বরিস পা পা করে এগুচ্ছে মেইলিগুলির দিকে। তার মুখে বিজয়ের হাসি। শিকার নিয়ে খেলার ভঙ্গী তার মধ্যে।

মেইলিগুলির গায়ে উজবেক পোশাক। মাথায় ওডনা। নেমে এসেছে কোমর পর্যন্ত। বাম হাতে মাটিতে ঠেস দিয়ে বসে আছে মেইলিগুলি।আর ডান হাত ওড়নার ভেতরে।

পাঁচ গজের মধ্যে এসেছে বরিস। তার ডান হাত নেই।

বাম হাতের রিভলভারটা কোর্টের পকেটে রেখে বাম হাতটা শিকারের মত বাড়িয়ে অগ্রসর হচ্ছে বরিস।

মেইলিগুলির চোখে আর কোন ভয় নেই। সে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জেনারেল বরিসের দিকে। তার ডান হাতটি আন্ডারওয়্যারের পকেটে ক্ষুদ্র পিস্তলটির বাটে।

জেনারেল বরিস এগিয়ে আসতে আসতে বলল, 'বাঘিনীর মত ফুসে উঠছ কেন? কোন লাভ নেই। ধরা দিতেই ......

কথা শেষ করতে পারল না জেনারেল বরিস।

মেইলিগুলির ডান হাতে বিদ্যুৎ বেগে বেরিয়ে এল ওড়নার ভেতর থেকে উঠে এল জেনারেল বরিসের বুক লক্ষ্যে।

ভুত দেখার মত চমকে উঠেছিল জেনারেল বরিস।

চমক ভাঙ্গার আগেই বুকে গুলি লেগে মাটিতে ছিটকে পড়ল জেনারেল বরিস।

পূর্ব দিকে পড়েছিল তার মাথা। ডান দিকে কাত হয়ে পড়ে গিয়েছিল সে।

কিন্তু পড়ে গিয়েই বাম হাত দিয়ে পকেট থেকে পিস্তল বের করে নিল। তারপর দাঁত কামড়ে মাথাটা একটু উঁচু করে লক্ষ্য করল আহমদ মুসাকে।

গুলি করেই মেইলিগুলি হামাগুড়ি দিয়ে এগুচ্ছিল আহমদ মুসার দিকে।

কিন্তু জেনারেল বরিসের দিকে নজর পড়তেই সে আৎকে ঘুরে দাড়াল।

বরিসের রিভলভার তখন উঁচু হয়ে উঠে ছিল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে।

মেইলিগুলির হাতেও পিস্তল। কিন্তু গুলি করার সময় নেই। সে দ্রত এক ঝাপ বরিসের রিভলভারের সামনে গিয়ে দাড়াল।

বরিস ট্রিগার টিপেছিল।

গুলি গিয়ে বিদ্ধ হলো মেইলিগুলির বুকে।

এক ঝাকানি খেয়ে কাত হয়ে পড়ে গেল মেইলগুলির দেহ।

কিন্তু গুলি খেয়ে পড়ে গেলেও পিস্তল ছাড়েনি মেইলিগুলি। পড়ে থেকেই দু'হাতে পিস্তল ধরে গুলি করল মেইলিগুলি।

জেনারেল বরিস দ্বিতীয় গুলি করার জন্য মাথা তুলেছিল বহুকষ্টে। কাঁপছিল তার মাথা।

কিন্তু দ্বিতীয় বার তার হাত উঠার আগেই মেইলিগুলির দ্বিতীয় গুলি গিয়ে তার মাথা গুড়ো করে দিল।

আহমদ মুসার চোখের সামনে ভোজবাজীর মতই ঘটে গেল ঘটনাগুলি।

মেইলিগুলি যখন গুলিবিদ্ধ হলো, 'মেইলিগুলি' বলে চিৎকার করে উঠল আহমদ মুসা। এমন বুকফাটা চিৎকার বোধ হয় আহমদ মুসার জীবনে এই প্রথম।

জেনারেল বরিসকে গুলি করার পর মেইলিগুলি গুলিবিদ্ধ বুকের বাম পাশটা চেপে ধরে গড়িয়ে ফিরল আহমদ মুসার দিকে। তারপর তাকাল আহমদ মুসার দিকে।

মেইলিগুলির দিকে তাকিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল আহমদ মুসা।

মেইলিগুলি বাঁ হাতে বুকটা চেপে ধরে ডান হাতে আর ডান পা দিয়ে মাটি ঠেলে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে চলল আহমদ মুসার দিকে। বাইরে থেকে অনেক গুলো পায়ের শব্দ ছুটে আসার শব্দ পেল আহমদ মুসা। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে দেহের সমস্ত শক্তি একত্র করে গতি বাড়াতে চেষ্টা করল মেইলিগুলি। যেমন করেই হোক আহমদ মুসার বাঁধন তার খুলে দিতে হবে।

উসু-এর সরাইখানায় নাস্তা খেয়ে যুবায়েরভরা আবার এসে গাড়িতে উঠল। ছুটে চলল আবার গাড়ি উরুমুচির উদ্দেশ্যে।

মাইল দু'য়েক আসতেই যুবায়েরভের পকেটের অয়্যারলেস সংকেত দিতে শুরু করল। তাড়াতাড়ি বের করল অয়্যারলেসটি। নিশ্চয় আলমা আতা কিংবা তাসখন্দের কোন মেসেজ।

সিগারেট লাইটারের মত অয়্যারলেস সেটটি কানে তুলে ধরল যুবায়েরভ।

শুনতে শুনতে বিবর্ণ হয়ে গেল যুবায়েরভের মুখ। একটা যন্ত্রণা ফুটে উঠল তার সারা মুখে।

মেসেজ শেষ হলো।

অয়্যারলেস ধরা হাত যুবায়েরভের খসে পড়ল তার কোলের ওপর।

আজিমভ ও ওমর মা চ্যাং উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়েছিল যুবায়েরভের দিকে।

ড্রাইভিং সিটে ছিল আবদুল্লায়েভ। সেও উদ্বিগ্নভাবে বার বার তাকাচ্ছিল যুবায়েরভের দিকে।

মেসেজ শেষ হবার পর তিনজন প্রায় একই সাথে বলে উঠল, 'কি খবর? খারাপ কিছু নিশ্চয়?'

'সাংঘাতিক খারাপ খবর। আহমদ মুসা কিডন্যাপ হয়েছেন।'

'কিডন্যাপ হয়েছেন আহমদ মুসা? কোথেকে? কিভাবে?'

তিনজনে এক সঙ্গে বলে উঠল। মুখ তাদের বিবর্ণ হয়ে গেল মুহুর্তে। চোখ তাদের ছানাবড়া।

আবদুল্লায়েভ সংগে সংগেই রাস্তার পাশে নিয়ে গাড়ি দাঁড় করাল। ঘটনা না শুনে চিন্তা না করে সামনে এগুনো উচিত নয়। আবদুল্লায়েভ নিজের বুদ্ধি থেকেই এ সিদ্ধান্ত নিল।

একটু থেমেই সংগে সংগে শুরু করল, 'সিংকিয়াং-এ আসার পথে আমাদের সীমান্ত শহর হরকেস-এর ভি আই পি রেষ্ট হাউজে রাত্রিযাপন করছিলেন। সেই রাতেই ভোর চারটার দিকে তার হেলিকপ্টারে সিংকিয়াং-এ প্রবেশ করার কথা। কিন্তু তার আগেই তিনি কিডন্যাপ হয়েছেন তাঁর রেষ্ট হাউজের রুম থেকে।'

'প্রহরী ছিল না?' প্রশ্ন করল আজিমভ।

'প্রহরী ছিল, তারা কিছুই টের পায়নি। ভি আই পি রেষ্ট হাউজের পেছন দিকের সুইপার সিঁড়ি দিয়ে সুইপার প্যাসেজের পথে তাকে কিডন্যাপ করা

হয়েছে। আগেই বিশেষ ওষুধ খাইয়ে তাঁকে, তার সাথের গোয়েন্দা অফিসার ও কক্ষের দরজায় মোতায়েন প্রহরীকে সংজ্ঞাহীন করে ফেলা হয়েছিল।'

'তাহলে নিশ্চয় ভেতরের লোক জড়িত ছিল?' বলল আজিমভ।

'জি। রেষ্ট হাউজের ক্যাটারার রশিদভ ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত ছিল। সে প্রহরীর গুলিতে নিহত হয়েছে।'

'কারা এর সাথে জড়িত, আহমদ মুসাকে কোথায় নিয়ে গেছে, এ ব্যাপারে কোন কথা....।' বলল আজিমভই।

'বলছি। কিডন্যাপের ৬ মিনিটের মধ্যে একটা মাইক্রোবাস সীমান্ত অতিক্রম করে সিংকিয়াং এ প্রবেশ করেছে। গাড়িতে ছিল নিকোলাস নুরভ ও কুজনভ কিরভ নামের দু'জন লোক। তাদের পরিচয় ব্যবসায়ী। তাদের সাথে সাত ফুটের মত লম্বা একটা বড় সড় বাক্স ছিল যাতে ছিল আপেল ও অন্যান্য ফল। সারারাত আর কোন গাড়ি সীমান্ত পার হয়নি। মনে হচ্ছে, তারাই কিডন্যাপ করেছে আহমদ মুসাকে। তাদের যে ঠিকানা দেয়া হয়েছে তা ভুয়া। তাদেরকে জেনারেল বরিসের লোক মনে হচ্ছে।'

'তাহলে আহমদ মুসাকে কিডন্যাপ করে উরুমুচিতে আনার সম্ভাবনাই বেশী।'

'সম্ভাবনা নয়, নিশ্চিতভাবেই এটা হয়েছে। ওরা আহমদ মুসা ও মেইলিগুলিকে এক সাথে করতে চায়। আহমদ মুসার কাছ থেকে কিছু আদায়ের অথবা তাকে কোন ব্যাপারে বাধ্য করার জন্যে দরকষাকষির হাতিয়ার বানাতে পারে মেইলিগুলিকে।' বলল যুবায়েরভ।

যুবায়েরভ থামল। কেউ কোন কথা বললনা। যুবায়েরভের শেষ কথাগুলো সবাইকে ভীত করে তুলেছে। জেনারেল বরিসের বর্বরতা, নীচতা সম্পর্কে তারা সকলেই জানে।

একটু পর আলদর আজিমভ বলল, 'সময় নষ্ট করে লাভ নেই। ওয়াং ও বরিসের হেডকোয়ার্টারেই আমাদের হানা দিতে হবে।'

'ঠিক তাই। আবদুল্লায়েভ গাড়ি ষ্টার্ট দাও। আমাদের প্রথম টার্গেট ওয়াং ও বরিসের হেডকোয়ার্টার। ওমর মা চ্যাং তুমি আমাদের গাইড।'

আবার ছুটে চলল যুবায়েরভদের গাড়ি।

'আহমদ মুসাকে কিডন্যাপের জন্যে জেনারেল বরিসকে দায়ী করে এবং সে এই কাজে চীনের মাটি ব্যবহার করেছে বলে অভিযোগ এনে বেইজিং এর কাছে প্রতিবাদ করেছে আমাদের সরকার।' বলল যুবায়েরভ।

'ফল কিছু হবে?' বলল আজিমভ।

'আর কিছু না হোক জেনারেল বরিসের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ থাকল। আর অভিযোগটা ছোট না।'

উসু-উরুমুচি হাইওয়ে ধরে ছুটে চলছিল গাড়ি।

সাড়ে ৯ টা নাগাদ যুবায়েরভদের গাড়ি উরুমুচি শহরে প্রবেশ করল।

ওমর মা চ্যাং রাস্তা দেখিয়ে চলল। গাড়ি ছুটে চলল ওয়াং-বরিসের হেড কোয়ার্টারের দিকে।

শহরে প্রবেশের পাঁচ মিনিটের মধ্যেই গাড়ি এসে দাঁড়াল রেড ড্রাগন অর্থাৎ ওয়াং বরিসের হেড কোয়ার্টারের লনে।

গাড়ি থেকে নামতে নামতে যুবায়েরভ বলল, 'মা চ্যাং দরজায় কোন প্রহরী দেখছিনা তো?'

'নিশ্চয় রিসেপশনে বসে গল্প করছে।'

গাড়ি থেকে নেমে স্বাভাবিক হেঁটে তারা এগিয়ে চলল। প্রথমে যুবায়েরভ। তার সাথে ওমর মা চ্যাং। তাদের পেছনে আজিমভ ও আবদুল্লায়েভ।

যুবায়েরভ ও ওমর মা চ্যাং একই সাথে ঘরে প্রবেশ করল।

রিসেপশনের যুবকটি একটা টেবিল সামনে নিয়ে বসেছিল। তার টেবিলে একটা ইন্টারকম এবং একটা টেলিফোন সেট গোটা কয়েক চেয়ার তার টেবিলের সামনে। তার দু'টিতে বসে আছে দু'জন প্রহরী যাদের থাকার কথা ছিল গেটে। দু'জনের হাতেই দুটি ষ্টেনগান।

যুবায়েরভদের ঢুকতে দেখেই দু'জন প্রহরী উঠে দাঁড়াল। তারা ওমর মা চ্যাংকে চিনতে পেরেছে। তাদের দৃষ্টি ওমর মা চ্যাং এর দিকে। চোখে মুখে তাদের প্রশ্নের চিহ্ন। কিন্তু তারা কথা বলার আগেই যুবায়েরভ, আজিমভ ও আবদল্লায়েভের পিস্তল তাদের মাথা লক্ষ্য করল।

প্রথমটায় রিসেপশিনষ্ট ও প্রহরীদের মধ্যে বিস্ময় বিমূঢ়তার সৃষ্টি হয়েছিল। তারপরই ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওদের মুখ। একান্ত অনুগতের মত তিনজনেই হাত উপরে তুলল।

'মা চ্যাং, আবদুল্লায়েভ এদের বেঁধে ফেল।'

সংগে সংগেই আজিমভ, আবদুল্লায়েব, মা চ্যাং এগিয়ে গিয়ে ওদের হাত পা বেঁধে ফেলল। তারপর মুখে টেপ আটকিয়ে ওদের মুখ বন্ধ করে টয়লেটে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

এক মিনিটের মধ্যেই শেষ হলো সব কাজ।

তারপর আবদুল্লায়েভকে রিসেপশন ও নিচের সিঁড়ি মুখটা সামলাতে বলে আজিমভ ও মা চ্যাং কে সাথে নিয়ে যুবায়েরভ ছুটল দু'তালায় ডাঃ ওয়াং ও জেনারেল বরিসের অফিসের দিকে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠলে সিঁড়ি মুখেই পশ্চিমমুখি একটা করিডোর এবং দক্ষিণমুখি একটা করিডোর।

দক্ষিণমুখি করিডোরে প্রথমেই যে দরজা তা ডাঃ ওয়াং এর।

তারপরের দরজা জেনারেল বরিসের। তাদের দরজা দিয়ে ঢুকলে প্রথমেই তাদের সেক্রেটারীদের কক্ষ। সেক্রেটারীদের কক্ষ থেকে আরেকটি দরজা পেরিয়ে তাদের কক্ষ।

যুবায়েরভরা এসে দাঁড়াল প্রথম দরজার সামনে। যুবায়েরভ বলল, 'মা চ্যাং তুমি ভেতরে গিয়ে ডাঃ ওয়াং এর পি এস নেইলিকে জিজ্ঞেস করে এস ডাঃ ওয়াং ও বরিস আছে কিনা।'

মা চ্যাং ঢুকতে যাচ্ছিল ঘরে।

যুবায়েরভ তাকে থামতে বলল। তারপর আজিমভের দিকে তাকিয়ে বলল, 'খোঁজ নেবার কোন দরকার নেই। তুমি বরিসের ঘরে ঢুকে যাও। ও থাকলে যা পরিকল্পনা তাই করবে। আর না পেলে ওদিক দিয়ে ডাঃ ওয়াং এর ঘরের দিকে খোঁজ নেবে। আমি ও মা চ্যাং যাচ্ছি ডাঃ ওয়াং এর ঘরে। তোমাদের যা বললাম, আমরাও তাই করব।'

'খোদা হাফেজ' বলে যুবায়েরভ দরজা ঠেলে গেল ভেতরে। সাথে মা চ্যাং।

তারা ঢুকতেই নেইলি উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়িয়েই মা চ্যাং এর দিকে তাকিয়ে বলল, 'এভাবে না বলে হঠাৎ মা চ্যাং?'

'মাফ করবেন মিস নেইলি, খুব জরুরী প্রয়োজন। ডাঃ ওয়াং কি আছেন?' মা চ্যাং কিছু বলার আগেই কথা বলে উঠল যুবায়েরভ।

'জি, আছেন।'

'তাহলে দয়া করে আপনি আমাদের নিয়ে চলুন।'

নেইলিকে পেছনে রেখে যাওয়া যুবায়েরভের ইচ্ছা নয়।

'এভাবে তো তার সাথে দেখা করা যায় না। আমি তার অনুমতি নিয়ে আসি। আপনার পরিচয় বলুন।'

'না মিস নেইলি দেরি হয়ে যাচ্ছে। আপনি চলুন।' কঠোর কন্ঠ যুবায়েরভের। সেই সাথে পিস্তল হাতে তুলে নিয়েছে সে।

নেইলির মুখ ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল। কাঁপতে লাগল সে।

হাটতে শুরু করল।

পিস্তল সহ হাত পকেটে ঢুকিয়ে যুবায়েরভ আগে চলল।

নব ঘুরিয়ে দরজা খুলে যুবায়েরভ ঘরে ঢুকতেই ডাঃ ওয়াং তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়েছে। এমনভাবে কেউ তার ঘরে ঢুকবে এটা স্বাভাবিক নয় বলেই হয়তো।

ডাঃ ওয়াং-এর দুটি হাত টেবিলের উপরে ঝুলানো। চোখে তার একরাশ প্রশ্ন ও বিরক্তি।

ডাঃ ওয়াংকে দাঁড়াতে দেখে রিভলবার তুলল যুবায়েরভ।

ডাঃ ওয়াং-এর হাতের সাথেই একটি পেপার ওয়েট। যুবায়েরভ পিস্তল তোলার সংগে সংগে চোখের পলকে ডাঃ ওয়াং পেপার ওয়েটটা ছুঁড়ে মারল যুবায়েরভের রিভলভার লক্ষ্যে। ছুঁড়ে মারাটা এত ক্ষিপ্র ছিল যে, যুবায়েরভ কোন সুযোগই পায়নি রিভলভার তোলার অথবা সরিয়ে নেয়ার।

পেপার ওয়েটটা সরাসরি গিয়ে আঘাত করল রিভলভারে। ছিটকে পড়ল রিভলভার হাত থেকে।

মুহূর্তে চিত্র পালটে গেল। পেপার ওয়েট ছুড়েই ডাঃ ওয়াং তার রিভলভার তুলে নিয়েছে। তার নলটা যুবায়েরভকে লক্ষ্য করে স্থির ভাবে উঠানো।

নেইলি ও মা চ্যাং তখন কক্ষে প্রবেশ করেছে। ঘটনার এই পট পরিবর্তনে মা চ্যাং বিমূঢ়। সে তার পিস্তল বের করতে সুযোগ পেলনা। ডাঃ ওয়াং এর বাম হাতেও উঠে এসেছে রিভলভার।

ডাঃ ওয়াং হেসে উঠল হো হো করে।

কিন্তু হাসি থামার আগেই জেনারেল বরিসের ঘরের দিকে থেকে দরজা এক ঝটকায় খুলে গেল। দরজায় এসে দাঁড়াল আজিমভ। তার হাতের রিভলভার উদ্যত ডাঃ ওয়াং-এর লক্ষ্যে।

ক্ষিপ্র ও বেপরোয়া ডাঃ তার ডানের রিভলভার যুবায়েরভের দিকে স্থির রেখে বাম হাতের রিভলভার এক ঝটকায় ঘুরিয়ে নিয়েছিল আজিমভকে গুলি করা জন্যে।

কিন্তু মুসলিম মধ্যএশিয়ার গোয়েন্দা প্রধান আজিমভ ডাঃ ওয়াংদের চরিত্র ভাল করেই জানে। সুতরাং সে সময় নষ্ট করেনি। ডাঃ ওয়াং এর রিভলভার থেকে গুলি বেরোনোর আগেই আজিমভের রিভলভার ডাঃ ওয়াং-এর মাথা গুড়িয়ে দিল। তার দেহ গিয়ে ছিটকে পড়ল মাটিতে।

'ধন্যবাদ আজিমভ। ঠিক সময়ে এসে পড়েছিলে। জেনারেল বরিস কোথায়?' প্রশ্ন শেষ করে যুবায়েরভ মেঝে থেকে রিভলভার তুলে নিল।

'জেনারেল বরিস নেই। ওদের নাকি একটা গোপন ঘাঁটি আছে, সেখানেই এখন উনি আছেন।'

যুবায়েরভ তার রিভলভার মিস নেইলির দিকে ঘুরিয়ে বলল, 'মিস নেইলি, আপনার কথা মা চ্যাং এর কাছে শুনেছি। আপনি আমাদের শত্রু নন। আপনি আমাদের সাহায্য করুন।'

কাঁপছিল নেইলি। সে কোন কথা বলতে পারলো না।

'ওদের গোপন ঘাঁটিটা কোথায় নেইলি?'

‘শহরের বাইরে।’

‘তুমি চেন?’

‘মেইলিগুলিকে কোথায় রেখেছে জান?

‘ঐ ঘাঁটিতে।’

‘আহমদ মুসাকে ওরা কিডন্যাপ করেছে জান?’

‘ঠিক জানি না, এ খবর ডাঃ ওয়াং আজ একজনকে টেলিফোনে বলছিলেন সেটা আমি শুনেছি।’

‘আহমদ মুসাকে কোথায় রেখেছে?’

‘আমি জানি না।’

‘ধন্যবাদ মিস নেইলি। তোমার কোন চিন্তা নেই। আমরা তোমাকে সাহায্য করব। তুমি আমাদের সাথে চল। ঘাঁটিটা দেখিয়ে দাও।’

বলে যুবায়েরভ ফিরে দাঁড়াল।

সবাই বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

যুবায়েরভরা নিচে নেমে আবদুল্লায়েভকে সব জানিয়ে বলল, ‘এ দিকের খবর কি?’

‘গুলির শব্দ পেয়ে ভেতরে থেকে তিনজন ছুটে এসেছিল উপরে উঠার জন্যে। ওদেরকে ওপাশের স্টোররুমে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছি ছিটকিনি এটে।’

গাড়িতে এসে উঠল সবাই। বেরিয়ে আসার সময় হেড কোয়ার্টারের বাইরে দরজা বন্ধ করে দিয়ে এল।

এবার ড্রাইভিং সিটে বসল যুবায়েরভ। তার পাশের সিটে নেইলি। পেছনের সিটে আজিমভ, আবদুল্লায়েভ ও মা চ্যাং।

আবার ছুটতে শুরু করল গাড়ি।

দশটা বাজতে তখন পনের মিনিট বাকি।

প্রতিটি বাঁকে এসে নেইলি বলে দিচ্ছে কোন দিকে যেতে হবে।

‘তোমার কে আছে নেইলি?’

‘মা আছেন, ছোট ভাই আছে।’

‘চাকুরী না করলে তোমার চলে না?’

‘চললে এই চাকুরী করতে কিছুতেই আসতাম না।’

‘এখন কি করবে?’

‘আরেকটা খুঁজতে চেষ্টা করব।’

‘সহজে চাকুরী পাওয়া যায়?’

‘পাওয়া যায়, কিন্তু সব চাকুরী নেয়া যায় না। মান-সম্মান থাকে না।’

‘অনেকেই তো মান সম্মানের চিন্তা করে না। করে কি?’

‘তা করে না। কিন্তু আমি করি। আমার মার শিক্ষা এটা।’

‘তাহলে তো তোমার মা খুব ভাল।’

‘জি হ্যা। আমার মা মুসলিম ঘরের মেয়ে ছিলেন তো। শানসি প্রদেশে ছিল তাদের বাড়ি। হানরা আমার আম্মার আব্বা-আম্মা, ভাই সবাইকে হত্যা করে। তাদেরই এক হাত যুবক আমার মাকে নিয়ে আসে এবং বিয়ে করে।’

যুবায়েরভের বুকটা বেদনায় চিন চিন করে উঠল। কিছুক্ষণ সে কথা বলল না। ভাবল শানসি প্রদেশের সেই দৃশ্যের কথা।

এক সময় বলল, ‘নেইলি, তুমি আমাদের বোন।’

একরাশ বিস্ময় নিয়ে চোখ ফিরাল নেইলি যুবায়েরভের দিকে।

‘বোন বলায় বিস্মিত হচ্ছ? তুমি মুসলিম মহিলার মেয়ে, আমরা মুসলিম।’

‘আপনারা মুসলিম? ও গড তাই তো বলি ওয়াং শত্রু কেন আপনাদের।’

‘না নেইলি, ওয়াং আমাদের শত্রু নয়, সেই আমাদের শত্রু বানিয়েছে।’

‘আমি জানি সেটা। আমার আম্মা ডাঃ ওয়াং ও বরিস দুজনেরই বিরোধী। আমার এ চাকুরীতে তিনি মত দেননি। কিন্তু বাঁচার জন্যে বাধ্য হয়ে এ চাকুরী নিতে হয়েছে আমাকে। আমার আম্মা আপনাদের কথা শুনলে খুশী হবেন।’

‘তুমি খুশি হওনি?’

‘আম্মা মুসলমানদের পক্ষে, মুসলমানদের ভালবাসেন তাই বলছিলাম।’

‘তুমি বুঝি ভালবাসনা?’

‘মায়ের ধর্মই সন্তানকে আকৃষ্ট করে বেশী। আমার ক্ষেত্রেও তাই। কিন্তু এ নিয়ে গভীরভাবে ভাবার কোন সুযোগ হয়নি। মা আমাকে ছোট বেলা ইসলাম

ধর্মের অনেক কিছু শিখিয়েছেন। মায়ের সাথে গোপনে আমি নামাজও পড়েছি। কিন্তু বড় হবার পর সব গোলমাল হয়ে গেছে।'

'জান, মা চ্যাং মুসলমান?'

'মুসলমান? কই আমাকে তো বলেনি?' উচ্ছ্বসিত কন্ঠে বলল নেইলি। আনন্দে তার চুখ মুখ উজ্জ্বল।

একটু থেমে বলল নেইলি, 'আজ বুঝেছি, কেন ও আমার কাছে আসতো। টার্গেট ছিল ওয়াং।' মুকটা একটু যেন ম্লান নেইলির।

কথা শেষ করেই নেইলি দ্রুত চাপা কন্ঠ বলল, আমরা এসে গেছি জনাব। দক্ষিণের ঐ বাড়িটাই ওদের সেই ঘাঁটি।

পুর্ব-পশ্চিম রাস্তা। রাস্তা থেকে একটু দুরে আলো-আঁধারের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে একটি বাড়ি।

রাস্তা থেকে একটা ইট বিছানো পথ গিয়ে উঠেছে ও বাড়িতে। রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করাল যুবায়েরভ।

বাড়িটা উত্তরমূখি। বাড়ির উত্তর দিকের মাঝামাঝি কিছু অংশ ছাড়া চারদিকেই কিছু কিছু গাছ-পালা ও ঝোপ ঝাড় রয়েছে।

বাড়ির সম্মুখ দিয়ে গাড়ি বারান্দা পর্যন্ত যতটুকু দেখা যাচ্ছে তাতে কাউকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

'আমার মনে হয় গাড়ি এখানেই রেখে যাওয়া উচিত। ওদের নজর এড়িয়েই আমাদের ওখানে পৌছতে হবে। ওখানকার কোন অবস্থাই তো আমরা জানিনা।' বলল যুবায়েরভ।

'আমারো তাই মত।' বলল আজিমভ।

সবাই গাড়ি থেকে নামল। গাড়িটাকে ঠেলে দিল একটা ঝোপের আড়ালে।

'নেইলি, তুমি এখানে অপেক্ষা করতে পার, আবার ইচ্ছে করলে চলে যেতে পার।' নেইলির দিকে তাকিয়ে বলল যুবায়েরভ।

'দু'টির কোনটিই আমি করবনা। আমি আপনাদের সাথে এ অভিযানে যাব।' বলল নেইলি।

‘এতে বিপদ আছে বোন। তুমি সব জান।’

‘জানি বলে যেতে চাই। কোন দিন কোন ভাল কাজ করিনি। মা খুশি হবেন।’

আর কথা বড়ালোনা যুবায়েরভ। সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল, ‘আমরা বিভিন্ন দিক থেকে একই সাথে গিয়ে গাড়ি বারান্দার আশে-পাশে আত্মগোপন করব। শুধু আমি ও আজিমভ ওদের দরজায় গিয়ে নক করব। তারপর ইশারা করলে সবাই যাবে।’

সবাই ছড়িয়ে পড়ল ওবাড়িতে যাবার জন্য।

যুবায়েরভ ও আজিমভ দু'দিক থেকে ওবাড়ির দেয়ালের গোড়ায় পৌছে দেয়ালের পাশ ঘেঁষে অগ্রসর হয়ে গাড়ি বারান্দায় গিয়ে উঠল। গাড়ি বারান্দায় যে গাড়িটা দাঁড়ানো দেখা যাচ্ছিল তার পাশ ঘেঁষে যুবায়েরভ ও আজিমভ গিয়ে বারান্দায় উঠে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারা দেখে বিস্মিত হলো, গাড়ি বারান্দায় দাঁড়ানো গাড়িটির দরজা খোলা। শুধু তাই নয়, গাড়ির চাবিটিও কি হোলে ঝুলছে। যুবায়েরভ বলল, ‘মনে হয় ওরা এই ঘাঁটিকে খুবই নিরাপদ বলে মনে করে।’

আজিমভ মাথা নাড়ল। ‘তাই মনে হচ্ছে বটে, কিন্তু একটা রহস্য আছে।’

‘তাহলে কি মনে কর, ঘাঁটির সামনেটা দেখার জন্যে টেলিভিশন ক্যামেরা সেট করা আছে? তাই কি এরা এত নিশ্চিত?’

‘আমার মনে হয় এরকম কিছু না হলে একটা ঘাঁটিকে এরা অরক্ষিত রাখতে পারেনা।’

‘তাহলে তো নক করলে ওরা নিশ্চয় মনে করবে টেলিভিশন ক্যামেরার চোখ এড়িয়ে নিশ্চয় শত্রু কেউ এসেছে। সে ক্ষেত্রে গোটা বাহিনী এলার্ট হওয়ার সম্ভবনা।’

‘ঠিক তাই।’

‘তাহলে বিকল্প পথ হচ্ছে লক গলিয়ে প্রবেশ করা।’

বলেই যুবায়েরভ পকেট থেকে লেসার বীম স্পাই মাল্টিপুল বের করল।

এ অত্যাধুনিক অস্ত্রটি সব কাজের কাজী। ধাতব যে কোন বস্তু কাটা ও ফুটো করায় এর জুড়ি নেই। যে কোন লক এক নিমিষে আন লক করতে পারে।

যুবায়েরভ স্পাই মাল্টিপুলের লেসার বীম দিয়ে দরজার তালা হাওয়া করে দিল।

মূহূর্ত কয়েক অপেক্ষা করল। তারপর ধীরে ধীরে দরজা খুলল।

নিঃশব্দে খুলে গেল দরজা।

যুবায়েরভ উঁকি দিল ভেতরে। কেউ নেই। বিরাট হল ঘর ফাঁকা। আজিমভ দেখল দেখার পর বলল, 'কিন্তু যুবায়েরভ, ভেতরে যাবার তো কোন দরজা দেখিনা।'

কার্পেটে ঢাকা ঘর। চারদিকে সার করে পাতা সোফা।

চারদিকে তাকিয়ে যুবায়েরভ বলল, 'দরজা থাকতেই হবে। দেখা যাচ্ছেনা এটাই রহস্য। আমার মনে হয় তাদের ডাকা যাক।'

'ঠিক আছে ডাকছি,' বলে আজিমভ বেরিয়ে গেল। অল্পক্ষণ পরে এসে বলল, 'আমাদের মতই বাড়ির দেয়ালের গা ঘেঁষে ওদের নিয়ে এসেছি। ওরা এসেছে। ওরা দরজার বাইরে আপাতত থাক।'

'আমার মনে হয় আব্দুল্লায়েভ আসুক।'

আজিমভ গিয়ে আব্দুল্লায়েভকে ডেকে আনল।

চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে ওরা তিনজনে দেয়াল পরীক্ষা করতে লাগল। যুবায়েরভের বিশ্বাস, ভেতরে ঢুকার গোপন দরজা এখানেই আছে।

এই সময় মা চ্যাং ও নেইলি দরজা ঠেলে হন্ত দন্ত হয়ে ঘরে ঢুকে বলল, একটা জীপ এ গাড়ি বারান্দার দিকে আসছে।

যুবায়েরভ ততক্ষণাত সবাইকে দরজার বিপরীত দিক অর্থাৎ দক্ষিণ পাশের সোফার আড়ালে শুয়ে পড়তে বলল এবং নির্দেশ দিল রিভলভার হাতে রাখার জন্য।

সোফার আঁড়ালে শুয়ে রূদ্বশ্বাসে অপেক্ষা করছে যুবায়েরভরা।

ঘরটা সাউন্ড প্রুফের মত। গাড়ি আসার কোন শব্দ পেল না তারা। প্রায় তিন মিনিটের মত পার হয়ে গেল।

দুই সোফার ফাঁক দিয়ে যুবায়েরভ চোখ রেখেছিল দরজার ওপর। এক সময় দরজা নড়ে উঠল। খুলে গেল দরজা।

খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে দরজার লকের দিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন কন্ঠে একজন বলে উঠল, 'হোয়াং, দরজার তালা কে যেন ল্যাসার বীম দিয়ে কেটে ফেলেছে।'

তার কথার সংগে সংগেই আরো তিনটি মুখ দরজার তালার ওপর যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

সবাই মুখ তুলল। সবার মুখই বিস্ময়ে বিস্ফারিত।

দরজা বন্ধ করে দিয়ে প্রথম জন বলল, 'সন্দেহ নেই শত্রু ঘাঁটিতে ঢুকেছে, ভেতরে কি অবস্হা কে জানে?'

'চল আমাদের সাবধানে ঢুকতে হবে। শত্রুকে আঘাত করতে হবে পেছন থেকে। ভাগ্যিস আমরা কয়েকজন ফিরে এলাম। ঘাঁটি খালি করে এইভাবে সবাই ঐ অভিযানে শামিল হবার সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক হয়নি।'

ওদের চারজনের হাতেই স্টেনগান।

ওরা ধীরে ধীরে এগুলো উত্তরের দেয়ালের দিকে।

যুবায়েরভ বুঝল উত্তর দেয়ালেই গোপন দরজা আছে।

যুবায়েরভ ইংগিত করল আজিমভকে, আজিমভ আব্দুল্লায়েভকে, আব্দুল্লায়েভ মা চ্যাংকে যে, ওদের ভেতরে যেতে দেয়া যাবেনা।

ওদের চারজনের একজন হঠাৎ দক্ষিণ দেয়ালের কাছে সরে এল নেইলি তার নজরে পড়ে গেল। সংগে সংগে সে চিতকার করে উঠল। ঘুরাল তার স্টেনগান। অন্য তিনজনও চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল। যুবায়েরভ প্রস্তুত ছিল। তার রিভলভার প্রথম টারগেট করল নেইলিকে যে দেখতে পেয়েছিল তাকে। গুলি খেয়ে পড়ে গেল সে। অন্য তিনজন স্টেনগান তুলেছিল এলোপাথাড়ি গুলি করার জন্য।

তারা কাউকে দেখতে পাচ্ছিল না।

যুবায়েরভ ইতিমধ্যে দ্বিতীয় গুলি ছুঁড়েছে। তার দ্বিতীয় গুলি আরেকজনকে বিদ্ধ করেছে। অন্য দুই জন আজিমভ,আব্দুল্লায়েভ ও মা চ্যাং এর গুলি খেয়ে ঢলে পড়ল। একজনকে দুই গুলি গিয়ে পর পর বিদ্ধ করেছে।

সোফার আঁড়াল থেকে বেরিয়ে এল যুবায়েরভরা।

যুবায়েরভ ও আজিমভ ছুটে গেল উত্তর দেয়ালে। খুঁজতে লাগল দেয়ালে গোপন দরজার চিহ্ন।

দেয়ালে কিছুই পাওয়া গেল না।

কার্পেট উল্টে ফেলে দেয়ালের গোঁড়ায় খুঁজতে লাগল। অবশেষে পেল যুবায়েরভ। সাদা দেয়ালের গোড়ায়, সব সময় কার্পেটে ঢাকা থাকে, পাওয়া গেল সাদা একটা বোতাম। চাপ দিল সে বোতামে।

সংগে সংগে পাশ থেকে দেয়াল সরে গেল। সৃষ্টি হলো এক দরজা।

যুবায়েরভরা সকলে একটি করিডোরে বেরিয়ে এল। করিডোরটি গজ চারেক সামনে এগিয়ে আরেকটি করিডোরে পড়েছে। সে করিডোরটি পূর্ব পশ্চিমে লম্বা।

যুবায়েরভরা সামনে এগিয়ে পূর্ব-পশ্চিম লম্বা করিডোরে পড়তেই ডানে তাকিয়ে একটা দরজা দেখতে পেল।

সবাইকে দাঁড়াতে বলে যুবায়েরভ দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ডান হাতে রিভলবার বাগিয়ে বাম হাতে এক ঝটকায় রজা খুলে ফেলল।

ঘরের ভেতর একজন লোক টিভি স্ক্রীনের সামনে বসে ছিল। তার পিঠ দরজার দিকে। আর স্টেনগান ধারী দু'জন লোক তার পেছনে কথা বলছিল।

দরজার খোলার শব্দে চমকে উঠে ওরা পেছনে ফিরছিল। কিন্তু সে সময় তারা পেল না।

যুবায়েরভ ও আজিমভ লাফ দিয়ে ভেতরে পড়ে পেছন থেকে ওদের গলা পেঁচিয়ে ধরল। আর আবদুল্লায়েভ গিয়ে রিভলভার ধরল টিভি স্ক্রিনের সামনে বসা লোকটির মাথায়।

লোক দু'টির গলা পেঁচিয়ে ধরা যুবায়েরভ ও আজিমভের হাত সাঁড়াশির মত চেপে বসছিল তাদের গলায়। মিনিট দেড়েকের মধ্যে ওদের দেহ ঝুলে পড়ল ওদের হাতে। ছেড়ে দিতেই ঝরে পড়ল মাটিতে।

তাড়াতাড়ি টেনে বাথরুমে ঢুকিয়ে দিল ওদের প্রাণহীন দেহ।

টিভি স্ক্রিনের সামনে বসা লোকটি কাঁপছিল।

'আহমদ মুসা ও মেইলিগুলি কোথায়?' কঠোর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল যুবায়েরভ।

'করিডোর ধরে পূর্ব দিকে।' কাঁপতে কাঁপতে বলল লোকটি।

'আর জেনারেল বরিস?'

'ওদিকেই হবে।'

যুবায়েরভ মা চ্যাংকে বলল, 'একে বেধে ফেল, হাত-পা সব। মুখ বন্ধ করে দিয়ে টয়লেটে ঠেলে দাও। তারপর তুমি ও নেইলি এখানে বস। টিভি স্ক্রিন পাহারা দাও। কেউ এ বাড়ির দিকে এলে আমাদের খবর দেবে। আমরা আশেপাশে আছি।'

যুবায়েরভের কথা শেষ হতেই একটা গুলির শব্দ এল। যুবায়েরভরা উৎকর্ণ হয়ে বুঝতে চেষ্টা করল গুলির শব্দটা কোন দিক থেকে এল।

আরো অনুসন্ধান ও বুঝার লক্ষ্যে যুবায়েরভরা করিডোরে বেরিয়ে এল। ঠিক এ সময়েই আরেকটা গুলির আওয়াজ পাওয়া গেল।

এ আওয়াজটা বড় রিভলভারের আওয়াজ। আর আগেরটা মিনি পিস্তলের।

যুবায়েরভ, আজিমভ ও আবদুল্লায়েভ রিভলভার বাগিয়ে উদ্বিগ্ন ভাবে এগুলো করিডোর ধরে পূর্ব দিকে।

অল্প কিছুটা এগুতেই আরেকটা গুলির আওয়াজ হলো। আগের সেই পিস্তলের গুলি।

দৌড় দিল যুবায়েরভরা।

দুইটি বাক ঘুরার পর সামনেই একটি কক্ষের দরজা খোলা দেখা গেল।

সবাই দৌড় দিল সেদিকে।

প্রথম ঘরে ঢুকল যুবায়েরভ।

ঘরে ঢুকে দৃশ্য দেখে চিৎকার করে উঠল যুবায়েরভ 'মুসা ভাই' বলে।

যুবায়েরভের সাথে সাথেই প্রবেশ করল আজিমভ ও আবদুল্লায়েভ। তারাও দৃশ্য দেখে আর্তনাদ করে উঠল।

রক্তে ডুবে আছে জেনারেল বরিসের দেহ। রক্তে ভেজা মেইলিগুলি বুকে হেটে এগুচ্ছে আহমদ মুসার দিকে। আষ্টে-পৃষ্টে বাধা আহমদ মুসার বেদনা পিষ্ট মুখ চোখের পানিতে ভাসছে।

মেইলিগুলি আবদুল্লায়েভকে চেনে।

তাদের দেখে মেইলিগুলি এগুনো বন্ধ করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

আজিমভ ও যুবায়েরভ ছুটে গেল আহমদ মুসার বাঁধন কাটার জন্যে। আর আবদুল্লায়েভ ছুটে গেল মেইলিগুলির কাছে।

'ভাবী, একি হয়েছে' বলে ডুকরে কেঁদে উঠল আবদুল্লায়েভ।

মেইলিগুলি মাথাটা ইঞ্চি খানেক তুলে বলল ক্ষীণ কণ্ঠে, 'তাড়াতাড়ি ওর বাঁধন খুলে দাও।'

আবদুল্লায়েভ ছুটে গেল আহমদ মুসার দিকে।

তিন জনে মিলে তাড়াতাড়ি মুক্ত করল আহমদ মুসাকে।

আহমদ মুসা উঠেই ছুটে গেল মেইলিগুলির কাছে। কোলে তুলে নিল তার মাথা। তারপর যুবায়েরভদের দিকে চেয়ে ভাঙা গলায় বলল, 'হাসপাতালে কি একে নেয়া যেতে পারে যুবায়েরভ।'

যুবায়েরভ এ প্রশ্নের উত্তর তাড়াতাড়ি দিতে পারল না। কি উত্তর দেবে সে? এদেশের কিছুই যে তাদের পক্ষে নয়! অশ্রু গড়াতে লাগল যুবায়েরভের চোখ থেকে। কান্না আটকাতে পারল না আজিমভ ও আবদুল্লায়েভও।

উত্তর দিল মেইলিগুলি নিজেই। বলল, 'হাসপাতালের কথা ভেব না। সে সময় নেই। তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ, তুমি এমন জায়গায় আমার কবর দেবে যেখানে তুমি প্রতিদিন না হোক, মাসে না হোক, অন্তত বছর একবার তুমি আসতে পারো। বল রাখবে আমার এ আবেদন?' আহমদ মুসার কোলে মুখ গোজা মেইলিগুলির ক্ষীণ কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল কথা গুলো।

আহমদ মুসা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বলল, 'না আমিনা তুমি এভাবে চলে যেতে পার না।'

মেইলিগুলি বহু কষ্টে তার দুর্বল একটি হাত তুলে আহমদ মুসার হাত জড়িয়ে ধরে বলল, 'তোমার অনেক দায়িত্ব, তোমাকে ভেঙ্গে পড়লে চলবে না।'

একটু দম নিল মেইলিগুলি। ধীরে ধীরে আবার শুরু করল, 'আমার কোন অতৃপ্তি নেই। আমি তোমার কোল পেয়েছি, এটুকুই ছিল আল্লাহর কাছে আমার শেষ চাওয়া। আর তাই পার্বত্য ভূমির বিজন পথের বুকে আমার মরার কথা ছিল। জ্ঞান হারাবার আগে আমার আল্লাহর কাছে আমি সময়ের জন্যে প্রার্থনা করেছিলাম। বলেছিলাম, আমার স্বামীকে একবার দেখার মত সময়টুকু আমি তোমার কাছে চাই। আমার প্রার্থনা তিনি মঞ্জুর করেছেন। আমি পরিতৃপ্ত। আমি কাঁদছি না, তুমি কেঁদো না।'

ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে থেমে গেল মেইলিগুলির কথা। চোখ দু'টি বুজে গেল মেইলিগুলির।

অল্প পরেই চোখ খুলল মেইলিগুলি ধীরে ধীরে। আহমদ মুসার অশ্রু ধোয়া চোখে চোখ রেখে মেইলিগুলি বলল, 'তুমি আমার জীবনে আসার আগে আমার যে জীবন তা ছিল পাপে ভরা। তাতে এক ওয়াক্ত নামাজও নেই। আমার কি হবে?'

আহমদ মুসার মাথা নিচে নেমে এল। স্পর্শ করল মেইলিগুলির মাথা। নরম অশ্রু বিজড়িত কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা, 'তুমি অতীতের জন্যে তওবা করেছ আমিনা, আল্লাহ তোমাকে মাফ করবেন। আর আজ তোমার যে রক্ত ঝরল তা শহীদের রক্ত আমিনা। আল্লাহ তোমাকে শহীদের দরজা দেবেন।'

ধীরে ধীরে আবার চোখ বুজল মেইলিগুলি। তার দেহ আরও নিস্তেজ হয়ে পড়ল। আহমদ মুসার হাত থেকে মেইলিগুলির হাত খসে পড়ল।

আবার চোখ খুলে গেল মেইলিগুলির। তার শুকিয়ে যাওয়া ঠোঁট কাঁপল। অস্ফুটভাবে বেরিয়ে এল কথা, 'আমার পিতা- মাতার সম্পত্তির আমি মালিক, আমার নিজেরও সম্পত্তি রয়েছে। তুমি ছাড়া আমার আর কেউ রইল না। এই সম্পত্তি সবই তোমার।

ইসলামের জন্যে যেভাবে পার কাজে লাগিও। আর আমার একটা একাউন্ট আছে জেদ্দার ইসলামিক সোস্যাল সিকুরিটি ব্যাংকে। আমার লকেটে তার কোড-কার্ড আছে। এ অর্থ তোমার সন্তানের জন্যে।'

বলেই চোখ বুজল মেইলিগুলি। তার কাঁপা ঠোঁট থেকে ভাঙ্গা ভাঙ্গা শব্দে বেরিয়ে আসতে লাগল, 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।'

কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল আহমদ মুসা মেইলিগুলির প্রাণ হীন দেহ বুকে জড়িয়ে ধরে।

অশ্রুর বান বইছিল যুবায়েরভ, আজিমভ এবং আবদুল্লায়েভের চোখে।

যুবায়েরভ ধীরে ধীরে এগিয়ে আহমদ মুসার কাঁধে হাত রাখল। কিন্তু মুখে কিছুই বলতে পারল না। যে শোক যুবায়েরভরা সইতে পারছে না, সে শোক আহমদ মুসা সইবে কেমন করে! তাকে কি সান্ত্বনা দেবে তারা!

যুবায়েরভ কাঁধে হাত রাখার পর আহমদ মুসা সম্বিত ফিরে পেল। একবার সবার দিকে তাকিয়ে চোখ ফিরাল মেইলিগুলির দিকে। ধীরে ধীরে অতি আদরে মেইলিগুলির মাথাটা নামিয়ে রাখল মেঝের ওপর। তারপর দু'হাতে মুখ ঢেকে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

যুবায়েরভ, আজিমভ ও আবদুল্লায়েভ জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে।

চারজনের কান্না এক হয়ে মিশে গেল।

# ৫

আহমদ মুসারা কিছুটা শান্ত হয়ে যখন করণীয় চিন্তা করছে এই সময়ে পাশের কোন কক্ষ থেকে বুক ফাটা একটা আর্তনাদ ভেসে এল।

তিনজনেই উৎকর্ণ হলো।

আবার চিৎকারের শব্দ ভেসে এল। কে যেন চিৎকার করে কি বলছে।

আহমদ মুসা পকেট থেকে রুমাল বের করে মেইলিগুলির মুখটা ঢেকে দিয়ে বলল, 'চল দেখি কি ব্যাপার।'

তিনজনেই বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

এ করিডোর সে করিডোর হয়ে তারা একটা খোলা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

এ ঘর থেকেই চিৎকার আসছে। 'আল্লাহ, কোথায় তুমি, কোথায় তুমি' বলে কাজাখ ভাষায় চিৎকার করছে।

তিনজনেই ঘরে ঢুকল।

ঘরে বীভৎস এক দৃশ্য।

একজন লোককে হাত বেঁধে ছাদের ফ্যান পয়েন্টের সাথে টাঙিয়ে রাখা। আন্ডারওয়্যার ছাড়া তার গায়ে কিছু নেই। তার শরীর ক্ষত বিক্ষত,রক্তাক্ত।

মেঝেতে পড়ে আছে একজন যুবতী ও একজন তরুনীর দেহ। সম্পুণ বিবস্ত্র। পাশবিক নির্যাতন করা হয়েছে ওদের ওপর। সেই নির্যাতনে ওরা মারা গেছে।

দেখে শিউরে উঠল তিনজনেই।

চোখ বন্ধ করতে বাধ্য হলো তারা।

তারপর মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দু'খন্ড কাপড় তুলে নিয়ে আহমদ মুসা যুবতী ও তরুণীর দেহ ঢেকে দিল।

লোকটির চিৎকার বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। তার ঢলে পড়া মাথাটি কিঞ্চিত খাঁড়া করে তাকাচ্ছিল আহমদ মুসাদের দিকে। তার চোখে সংশয় সন্দেহের সাথে আশারও কিছু আলো দেখা গেল।

আহমদ মুসা ঝুলে থাকা লোকটির দিকে এগিয়ে তার হাঁটু বরাবর জায়গাটা জড়িয়ে তার দেহ উঁচু করে তুলে ধরল, যাতে করে হাতে টানটা ঢিলা হয় এবং সে কিছু আরাম পায়।

লোকটির দেহ অনেকখানি ঢলে পড়ল আহমদ মুসার কাঁধে।

এদিকে আব্দুল্লায়েভ আজিমভের ঘাড়ে চড়ে লোকটির হাতের বাঁধন কেটে দিল।

আহমদ মুসা তাকে শুইয়ে দিল মেঝেয়।

মেঝেতেই পড়ে ছিল তার কাপড়। সেগুলো কুড়িয়ে পরিয়ে দেয়া হলো তাকে।

লোকটি যেন বোবা হয়ে গিয়েছিল। তার ঠোঁট কাঁপছিল, কথা বলতে পারছিল না।

বাঁধ ভাঙার মত হঠাৎ এক উচ্ছাস বেরিয়ে এল লোকটির কন্ঠ থেকে। ‘আমার স্ত্রী’ ‘আমার মেয়ে’ বলে সে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

আহমদ মুসা তার মাথার পাশে বসে তাকে সান্তনা দিচ্ছিল। বলল, ‘এই জঘণ্য অত্যাচার কে করেছে জনাব?’

‘জেনারেল বরিস এবং তার লোকেরা।’ বলে আবার দু’হাতে মুখ ঢেকে কাঁপতে লাগল সে। বলল, ‘কেন আগে মরে গেলাম না! কেন এ দৃশ্য দেখতে হলো! এ যন্ত্রণা নিয়ে আমি বাঁচব কি করে!’ বলে পাগলের মত চিৎকার ও হাত-পা ছুঁড়তে লাগল সে।

আহমদ মুসা তাকে সান্তনা দিয়ে বলল, ‘ওরা শাস্তি পেয়েছে জনাব,জেনারেল বরিস নিহত হয়েছে।’

‘ডাঃওয়াং এবং আরো অনেকে নিহত হয়েছে।’ বলল যুবায়েরভ।

‘ওয়াং নিহত? কোথায়?’ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

‘আমরা এখানে আসার আগে রেড ড্রাগনের সদর দফতরে গিয়েছিলাম। ওখানেই সে নিহত হয়েছে।’

‘জনাব, আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করুন। ওদের মাথা গুড়ো হয়ে গেছে, দেহটা আর থাকবে না।’

লোকটা ধীরে ধীরে উঠে বসল।

‘আপনার পরিচয় কি? আপনার সাথে জেনারেল বরিসের শত্রুতার কারন কি?’ বলল আহমদ মুসা।

‘আমার সাথে জেনারেল বরিসের কোন শত্রুতা নেই। তাকে আমি চিনতাম ও না।’

‘কিভাবে আপনি এখানে এলেন?’

‘আমাকে কাজাখস্থানের সারিজু থেকে কিডন্যাপ করা হয়েছে।’

‘সারিজু কোথায়? এ নামে একটা নদী আছে শুনেছি।’

‘স্থানটি কাজাখ উচ্চ ভূমির পশ্চিম প্রান্তে। মানচিত্রে এর কোন চিহ্ন নেই। এ এক গোপন বিজ্ঞান নগরী। সোভিয়েতরা এটা তৈরী করেছিল পারমাণবিক গবেষণা ও পরীক্ষার এক নগরী হিসাবে। আজও তাই আছে। পরমাণু বিজ্ঞানী হিসাবে ঐ নগরীর গবেষণাগারে যোগ দেই আমি আজ থেকে ২৩ বছর আগে। মধ্যেএশিয়া ষাধীন হওয়ার আগে আমি ছিলাম নিউক্লিয়ার রিসার্চ প্ল্যানিং ডাইরেক্টর। স্বাধীন হওয়ার পর গোটা সারিজু বিজ্ঞান গবেষণার প্রধানের দায়িত্ত আমার হাতে ন্যাস্ত করা হয়। কিডন্যাপের আগে পর্যন্ত এই দায়িত্বই পালন করে আসেছি।’

‘কেন আপনি কিডন্যাপ হলেন? বরিস আপনাকে কিডন্যাপ করল কেন?’

‘আগে আমিও বুঝিনি, বুঝেছি পরে। আণবিক যুদ্ধাস্ত্র সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্যে তারা আমার কাছে চেয়েছিল রিসার্চ এলবাম, প্রজেক্ট এলবাম এবং স্টোরেজ এলবামের কম্পুটার কোড এবং কম্পুরেট এলবাম। এই চারটি এলবাম ওদের হাতে গেলে আমাদের গবেষণা ও শক্তি-সরঞ্জামের সবকিছু ওদের হাতে চলে যাবে। সবকিছুই ওরা আমাদের হাটিয়ে নেবে অথবা ধবংস করে দেবে।’

থামল বিজ্ঞানী লোকটা।

'তারপর?' উদ্বিগ্ন কন্ঠ আহমদ মুসার।

যুবায়েরভ এবং আজিমভের চোখও বিস্ময়ে বিস্ফারিত।তাদের আণবিক প্রকল্পের বিরুদ্ধে এতবড় ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে।

'দিনের পর দিন তারা ইন্টারোগেট করেছে আমাকে, অত্যাচার করেছে নানা ভাবে আমার কাছ থেকে কথা বের করার জন্য। কিন্তু আমি একটি কথাই বার বার বলেছি, আমাকে মেরে ফেললেও কোন কথা তারা পাবে না। তারা বলেছে, কথা বলাবার অস্ত্র তাদের আছে। দরকার হলে তারা আমার স্ত্রী কন্যাকে আমার সামনে নিয়ে আসবে আমাকে কথা বলাবার জন্য। আমি ওদের এ হুমকিতে আমল দেইনি। বলেছি, মনে করোনা তোমরা যা চাইবে তাই পারবে। কিন্তু পারল তারা। অল্প কয়েকদিন পরেই আমার স্ত্রী কন্যাকে তারা আমার সামনে হাজির করল। আমার স্ত্রী যেমন আমার জীবনের চেয়েও প্রিয়, তেমনি আমার কন্যা ছিল আমার জীবনের সব। তাদেরকে তাদের হাতের মুঠোয় আমার সামনে দেখে আমি পাগলের মত চিৎকার করে উঠলাম। জেনারেল বরিস বলল আমরা যা চেয়েছি তা যদি না দাও, তাহলে তোমার সামনে তোমার স্ত্রী কন্যার ওপর পাশবিক অত্যাচার করা হবে, তারপর তাদের হত্যা করা হবে। কথা শেষ করেই বরিস ও তার একজন লোক আমার স্ত্রী ও মেয়ের গায়ের জামা ছিড়ে ফেলল। আমি চিৎকার করে উঠলাম, তোমরা থাম। আমি যা জানি সব তোমাদের বলব। কিন্তু আমি থামতেই আমার স্ত্রী এবং কন্যা চিৎকার করে উঠল, জাতির প্রতি আপনি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেন না। জীবনের বিনিময়েও না। আমরা মরে গেছি, আমাদের বাঁচাবার চেস্টা করবেন না। আমরা যতোক্ষণ বাঁচব কুকুরদের সাথে লড়াই করে যাব। আপনি আল্লার ওয়াস্তে ধৈর্য ধরুন। সংকল্পে অটল থাকুন। বলেই আমার স্ত্রী এবং মেয়ে পাগলের মত ঝাপিয়ে পড়ল ওদের ওপর। পাগলের মত লাথি, ঘুষি, কিল চালাতে লাগল। আমি বাঁধা অবস্থায় পড়েছিলাম খাটিয়ায়। কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পারলাম। আল্লাহকে ডেকে চোখ বন্ধ করলাম। হৃদয়টা আমার ছিঁড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু প্রাণপণে শরীরের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে চোখ বন্ধ রাখলাম। এক সময় প্রচন্ড এক লাথি খেলাম পাঁজরে। চোখ খুলে গেল আমার। তখন আর কিছু অবশিষ্ট ছিলনা। আমার স্ত্রী-কন্যার বিবস্ত্র, রক্তাক্ত, প্রাণহীন দেহের দিকে

চোখ পড়তেই আবার চোখ বন্ধ করলাম। ওরা আমার বাঁধন খুলে টেনে নিয়ে গিয়ে দু'হাত বেঁধে টাঙাল ছাদের সাথে। তারপর চামরার চাবুক দিয়ে পাগলের মত প্রহার শুরু করল আমাকে। আমি দাঁতে দাঁত চেপে সব সহ্য করেছি। একটি শব্দও উচ্চারণ করিনি। আমার শহীদ স্ত্রী-কন্যা আমাকে যে পরামর্শ দিয়েছিল তা আমাকে যেন অপরিসীম শক্তি যুগিয়েছিল। এক সময় অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। তারপর আর কিছুই জানি না। এক সময় দেখলাম আমার স্ত্রী ও আমার মেয়েকে। দেখলাম অদ্ভুত সুন্দর সোনালী পোশাকে। হঠাৎ ওরা 'আমরা চললাম' বলে উড়ে আকাশে উঠতে লাগল। আমি বুক ফাটা চিৎকার দিয়ে উঠলাম। কিন্তু ওরা থামল না। ভুবন মাতানো হাসি হেসে ওরা উঠতেই লাগল। এর পরেই আমার চোখ খুলে গেল। শরীরে আমার আসহ্য যন্ত্রনা, হাত ছিড়ে যাচ্ছে যেন। চোখ বন্ধ করে ডাকতে লাগলাম আল্লাহকে। তারপর আল্লাহর রহম এল। আপনারা এলেন। আপনারা কে? কেমন করে বিশাল ও পরাক্রমশালী শক্তিকে পরাভূত করলেন?'

থামল বিজ্ঞানী।

আহমদ মুসা, আজিমভ, আব্দুল্লায়েভ সবাই হারিয়ে গেল বিজ্ঞানীর বলে যাওয়া হৃদয়বিদারক কাহিনীর মধ্যে। ওদের সকলের চোখ দিয়েই পানি ঝরছিল।

বিজ্ঞানী থামতেই আহমদ মুসা বলল, 'আপনি সত্যই দেখেছেন জনাব। আপনার স্ত্রী কন্যা সত্যই বেহেস্তী পোশাকে ও গহণা পরে এ মর্তধাম থেকে বেহেশতে চলে গেছে। ওরা শহীদ। ওদের জন্যে আমরা গর্বিত।'

কেঁদে উঠল বিজ্ঞানী। বলল, 'তাই যেন হয় মহান যুবক। তোমার কথা শুনে আমার খুব ভালো লাগছে। আমারও বুক গর্বে ফুলে উঠেছে।'

'জনাব, আপনি কি দয়া করে বলবেন, আপনার নাম কি? নামটা কি আব্দুল্লাহ আলী নাবিয়েভ?' জিজ্ঞাসা করল যুবায়েরভ।

'হ্যা। কিন্তু আপনি জানলেন কি করে? আপনারা কারা?'

'আমি আব্দুল্লাহ যুবায়েরভ। মধ্যএশিয়া প্রজাতন্ত্রের দেশরক্ষা মন্ত্রী। কিন্তু এখন নই। এখানে আসার সময় দায়িত্যটা অন্যকে দিয়ে এসেছি।'

একটা দম নিয়ে আজিমভ ও আব্দুল্লায়েভকে দেখিয়ে তাদের পরিচয় দিল।

বিজ্ঞানী নাবীয়েভ সসম্মানে তাদের সালাম জানিয়ে চোখ কপালে তুলে বলল, 'আপনারা এখানে? একটা রাস্ট্রের দেশরক্ষামন্ত্রী, গোয়েন্দা প্রধান ও একজন সেনা কমান্ডার একত্রে ভিন্ন একটা দেশে এভাবে অকল্পনীয়।'

'বললাম তো আমরা আসার এখানে সময় আমাদের দেশরক্ষা মন্ত্রী, গোয়েন্দা প্রধান ও সেনা কমান্ডারের পোশাক দেশে রেখে এসেছি। এখানে আমাদের পরিচয়, আমরা এঁর কর্মী।' আহমদ মুসাকে ইংগিতে দেখিয়ে কথা শেষ করল যুবায়েরভ।

বিজ্ঞানী নবীয়েভ তার বিস্মিত দৃষ্টি তুলে ধরল আহমদ মুসার দিকে। বলল 'আপনারা এঁর কর্মী। তাহলে ইনি কে?'

'এঁকে আপনি না চিনলেও জানেন। ইনি আমাদের আপনাদের সকলের নেতা আহমদ মুসা।' বলল যুবায়েরভ।

একবারেই চমকে উঠেছে নবীয়েভ। তার মুখ থেকে অস্ফুটভাবে বেরিয়ে এল, 'ইনি আহমদ মুসা?'

বিস্ময়ে মুখ হা হয়ে গেছে তার। চোখ স্থির আহমদ মুসার ওপর। কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারল না। ধীরে ধীরে তার বিস্ময় বেদনায় রুপান্তরিত হলো। তারপর বেদনা তরল রুপ নিয়ে নেমে এল তার চোখ দিয়ে। আবেগে কাপতে লাগল তার ঠোট। ধীরে ধীরে নবীয়েভ তার দু'টি হাত তুলে আহমদ মুসার ডান হাত তুলে নিয়ে চুম্বন করল। তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে দু'টি হাত তুলে বলল, 'আল্লাহ, আমাদের নেতাকে আরেকটু আগে পাঠাতে পারতে না?'

'জনাব উনি বেশ আগেই পৌচেছেন। আজ ভোরে। কিন্তু আপনার মত তাকেও কিডন্যাপ করে আনা হয়েছিল। তার স্ত্রীও বন্দী ছিলেন এখানে।'

'কি সাংঘাতিক!' বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলল নবীয়েভ।

'হ্যা সাংঘাতিক।' বলে যুবায়েরভ সব বলল নবীয়েভ কে।

কাহিনীর শেষ অংশ অর্থাৎ মেইলিগুলির মৃত্যুর কাহিনী শুনে নবীয়েভ অভিভূত হয়ে পড়ল। আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'জনাব, এই অসহনীয় বেদনা বুকে নিয়ে অমন স্বাভাবিকভাবে আমাকে সান্তনা দিলেন কেমন করে?'

‘জনাব, আপনাকে ক’টি সান্ত্বনার কথা বলেছি বটে, কিন্তু আপনার কাছ থেকে আমি ধৈর্য্য ধরার শক্তি পেয়েছি অনেক।’

কিছু বলতে যাচ্ছিল নবীয়েভ। ঠিক সেই সময় ঘরে একটি কন্ঠ শ্রুত হল- ‘মুসা ভাই, রোড থেকে দু'টি মাইক্রোবাস এ বাড়ীর দিকে আসছে। বাইরের দরজা কিন্তু খোলা।’

ছাদের মাঝ বরাবর লাইট পয়েন্টে লুকানো স্পিকার থেকে কথা গুলো ভেসে এল। কন্ঠ ওমর মা চ্যাং এর। পরিস্কার চিনতে পারল যুবায়েরভ। কিন্তু যুবায়েরভ বিস্মিত, তারা এ ঘরে আছে, তা টের পেল কেমন করে সে?

বিস্মিত আহমদ মুসাকে যুবায়েরভ ওমর মা চ্যাং ও নেইলি-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে বলল, ‘ওদেরকে আমরা টিভি ক্যামেরার কন্ট্রোল রুমে বসিয়ে রেখে এসেছি এ বাড়িতে আসার পথটা পাহারা দেয়ার জন্য। কিন্তু আমরা এ রুমে, আপনি মুক্ত-এসব সে জানল কি করে?’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘যাদের টিভি ক্যামেরা রাস্তা পাহারা দেয়, তারা ঘর পাহারা দেবার জন্য টিভি ক্যামেরা কি রাখে না?’

‘কিন্তু আমাদের তা মনে হয় নি। আমরা হল রুমে ঢুকেছি তা ওরা টের পায়নি।’ বলল আজিমভ।

‘হয়তো তখন ভেতরের টিভি সার্কিট বন্ধ ছিল। জেনারেল বরিস বন্দীদের ওপর যে জঘন্য নির্যাতন চালিয়েছে তা অন্যদের চোখ থেকে ঢেকে রাখার জন্য হয়তো ভেতরের সার্কিট সাময়িক ভাবে বন্ধ রেখেছিল।’ বলল আহমদ মুসা।

‘কিন্তু খুলল কে? আমরা কন্ট্রোল রুম দখল করে সেখানে মা চ্যাং ও নেইলি কে বসিয়ে তবে এখানে এসেছি।’ বলল যুবায়েরভ।

‘নেইলি ডাঃ ওয়াং এর পি এস। সুতরাং অভ্যন্তরীন টিভি সার্কিটের কথা জানতে পারে। অথবা নেইলির এ সংক্রান্ত বিশেষ ট্রেনিং আছে যার জন্যে অভ্যন্তরীন সার্কিটের সন্ধান পেয়েছে।’

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা আবার বলল, ‘এ সব আলোচনা থাক। নেইলিকে আসতে বল, সে জনাব নবীয়ভের কাছে থাকবে। আর মা চ্যাং কন্ট্রোল

রুমেই থাকুক। যুবায়েরভ ও আজিমভ তোমরা সিঁড়ির দরজা খুলে ছাদে উঠে নেমে যাও নিচে। পেছন থেকে ওদের ঘেরাও করবে যদি তারা শত্রু হয়। আর আমি ও আব্দুল্লায়েভ হল রুমে যাচ্ছি। সেই দরজায় তো খোলা। ওরা সবাই ঘরে ঢুকলে তোমরাও দরজায় আসবে আর সবাই যদি ভেতরে না আসে তাহলে বাইরের লোকদের দায়িত্ব তোমাদের। মা চ্যাং প্রয়োজন হলে তোমাদের সাহায্য করবে।'

বলে আহমদ মুসা উঠে দাড়াল।

আব্দুল্লায়েভ, যুবায়েরভ ও আজিমভ ও উঠল।

'আমাকে সাথে নিন, আমি রিভলবার চালাতে জানি।' বলল নবীয়েভ।

'মাফ করবেন, আমরা এখনও আপনাকে গবেষনার টেবিলে দেখতে চাই, রিভলবার হাতে না।'

বলেই আহমদ মুসা যুবায়েরভকে বলল, 'এখান থেকেই মা চ্যাং শুনতে পাবে।'

তৎক্ষনাৎ মা চ্যাং এর গলা শোনা গেল। বলল, 'নেইলি যাচ্ছে মুসা ভাই। ওরা গাড়ী নিয়ে মাঝামাঝি চলে এসেছে।'

'ধন্যবাদ মা চ্যাং' বলে আহমদ মুসা যুবায়েরভকে ছাদের দিকে যেতে বলে আব্দুল্লায়েভকে নিয়ে দৌড় দিল হল রুমের দিকে।

কন্ট্রোল রুম থেকে দু'টি ষ্টেনগান নিয়ে গেল যুবায়েরভ ও আজিমভ।

আহমদ মুসা ও আব্দুল্লায়েভের হাতে রিভলবার। তারা হলরুমে ঢুকে চারটি ষ্টেনগান পেয়ে গেল। কিন্তু মুশকিল হলো চারটি লাশ নিয়ে। তার বুদ্ধি বের হয়ে গেল। আহমদ মুসা ও আব্দুল্লায়েভ চারটি লাশ টেনে ভেতরের করিডোরে নিয়ে গেল এবং ভেতরের ছোট শাখা করিডোর থেকে খন্ড কার্পেটটি এনে বিছিয়ে দিল দরজার কাছের রক্ত ভেজা কার্পেটের উপর।

তারপর দু'জনে ষ্টেনগান নিয়ে উত্তর দিকের দেয়াল ও সোফার মাঝখানে শুয়ে পড়ল।

অল্পক্ষণ পরেই দরজা নড়ে উঠল। কিঞ্চিত খুলে গেল দরজা। একজন, যে সামনে ছিল, বলে উঠল, 'কি ব্যাপার দরজা খুলে রাখা কেন?'

‘নিশ্চয় কন্ট্রোল রুম থেকে আমাদের দেখে খুলে দিয়েছে।’

‘কিন্তু আমরা তো নক করিনি। প্রয়োজনীয় নক না হলে খুলে দেয়ার কথা তো নয়।’

পেছনের জন আবার বলে উঠল, ‘চল ভেতরে গিয়ে জিজ্ঞেস করব।’

দু'জন ভেতরে ঢুকে গেল। তারপর দরজা সম্পূর্ণ খুলে বলল, ‘ওদের নিয়ে এস।’

বলে দু'জন একটু পূর্ব দিকে সরে গেল।

একটু পরেই হাত পা বাধা অবস্থায় চারজনকে এনে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলল।

আহমদ মুসা দুই সোফার ফাঁক দিয়ে চোখ রেখেছিল দরজার দিকে। মেঝেরও একটা অংশ দেখতে পাচ্ছিল। হাত পা বাধা লোকদের যখন নিয়ে আসছিল, ওদের মুখ দেখতে পেল না। কিন্তু মেঝেতে ওদের ছুড়ে ফেললে একজনের মুখ তার নজরে এল। দেখে চমকে উঠল আহমদ মুসা। এ যে নেইজেন! তাহলে কি আহমদ ইয়াং লি ইউয়ান সবাই আছে এদের মধ্যে? মন আনন্দে নেচে উঠল আহমদ মুসার।

একে একে ওরা ১২ জন ঘরে এসে জমায়েত হল।

বন্দীদের নিয়ে রঙ্গরস করতে লাগল।

ওরা হাতের ষ্টেনগানগুলি কেউ সোফায় ওপর, কেউ মেঝেটে ফেলে দিয়েছে।

দরজা বন্ধ হয়ে গেল ঘরের।

যে দু'জন প্রথম ঘরে ঢুকেছিল, তাদের একজন সবাইকে লক্ষ করে বলল, ‘জেনারেল বরিস ও ডাঃ ওয়াং এতক্ষণে এখানে ছুটে আসার কথা। এল না। নিশ্চয় কোন মউজে আছে। আমরা দু'জন দেখে আসি। তোমরা এখানেই অপেক্ষা কর।’

বলে ওরা ঘুরে দাড়িয়ে উত্তর দেয়ালের দিকে হাটতে লাগল। দেয়ালের সামনে অনাকাঙ্খিত ডবল কার্পেট দেখে ওরা ভ্রু কোঁচকালো। দেয়ালের দিকে একটু ঝুঁকতেই তারা দেয়ালে রক্তের ছিটা দেখতে পেল।

চোখ ছানাবড়া করে তারা সোজা হয়ে দাঁড়াল।

দাড়াতে দাড়াতে তারা কাঁধে ঝুঁলানো ষ্টেনগান হাতে তুলে নিচ্ছিল।

আব্দুল্লায়েভকে একটা ইংগিত করেই আহমদ মুসা এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল। তার সাথে সাথে আব্দুল্লায়েভও। তাদের ষ্টেনগানের ঐ বারো জনের লক্ষ্যে তাক করা।

'সবাই হাত তোল। এক মূহুর্ত দেরি করলে সবার মাথা লুটিয়ে পড়বে মাটিতে।' চিৎকার করে বলল আহমদ মুসা।

এই সময় দরজা ঠেলে প্রবেশ করল যুবায়েরভ ও আজিমভ।

আহমদ মুসা ও আব্দুল্লায়েভ মূহুর্তের জন্যে ফিরে তাকিয়েছিল দরজার দিকে।

এরই মধ্যে ঘরের পূর্বদিকে দাড়ানো প্রথম দু'জন লোক ষ্টেনগান তুলে ধরেছিল আহমদ মুসাদের লক্ষ্যে করে। আহমদ মুসা যখন তা দেখল দেরী হয়ে গেছে তখন। শুয়ে পড়ল আহমদ মুসা ও আব্দুল্লায়েভ।

মূহুর্তের ব্যবধানে তাদের মাথার উপর দিয়ে এক ঝাঁক বুলেট চলে গেল।

যুবায়েরভের ষ্টেনগান থেকে এক ঝাঁক গুলি ছুটে গেল ঘরের পূর্বদিকে দাড়ঁনো সেই দু'জন লোকের দিকে।

দুই পক্ষের গুলি প্রায় একই সময়ে হয়েছিল।

পূর্বদিকের দু'জন লোক পড়ে গেল গুলি খেয়ে।

তাদের সাথি অবশিষ্ট দশ জনের কেউ কেউ মরিয়া হয়ে স্টেনগান তুলে নিয়েছিল। কেউ কেউ তুলে নিতে যাচ্ছিল।

ইতিমধ্যে আহমদ মুসা ও আবদুল্লায়েভ উঠে দাঁড়িয়েছিল। তাদের স্টেনগান ও আজিমভের স্টেনগান প্রায় একই সাথে গুলি করেছীল ওদের লক্ষ্য করে।

মুহূর্তেই সাঙ্গ হয়ে গেল খেলা।

আহমদ মুসা, যুবায়েরভ, আজিমভ, আবদুল্লায়েভ সবাই ছুটে এল বন্দীদের বাঁধন খুলে দেওয়ার জন্য।

আহমদ মুসা ছাড়া সবার পকেটেই চাকু ছিল। খুব তাড়াতাড়িই বাঁধন কাটা হয়ে গেল।

ছাড়া পেয়েই আহমদ ইয়াং জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে।

কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিল লি ইউয়ান। আহমদ মুসা তাকে গিয়ে সালাম দিল এবং পরিচয় করিয়ে দিল যুবায়েরভ, আজিমভ ও আবদুল্লায়েভের সাথে।

সম্বিৎ ফিরে পেল যেন লি ইউয়ান। সে আহমদ মুসা এবং সবাইকে জড়িয়ে ধরে মোবারকবাদ জানাল। বিশেষ করে কৃতজ্ঞতা জানাল যুবায়েরভ ও আজিমভকে। বলল, 'আমি জানতাম, আহমদ মুসা আসবেই, কিন্তু আপনারা যে এভাবে এসেছেন, এটা আমার কাছে অকল্পনীয় লাগছে।'

'আপনি দয়া করে আমাদেরকে আহমদ মুসার নগণ্য কর্মী হিসাবে কল্পনা করুন, তাহলে আর অকল্পনীয় মনে হবে না।'

'তা ঠিক।' বলল লি ইউয়ান।

আহমদ মুসা এগিয়ে গেল নেইজেন ও নেইজেন এর মার দিকে। তারা কাঁদছিল। আনন্দের কান্না।

আহমদ মুসা নেইজেনের মাকে সালাম দিতেই নেইজেন ও তার মা এক সাথে বলে উঠল, 'মেইলিগুলির খবর কি, সে কোথায়?'

সংগে সংগেই আহমদ মুসার মুখ ম্লান হয়ে গেল। আহমদ মুসা চেষ্টা করেও তা রোধ করতে পারলো না। প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না আহমদ মুসা

নেইজেনের চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। বলল, 'কথা বলছেন না কেন ভাইজান, আপা কোথায়?'

'এস তোমরা' বলে আহমদ মুসা উত্তর দেয়ালের গোপন দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। তার ভেতরে ঢুকল নেইজেন, আহমদ ইয়াং, নেইজেনের মা এবং লি ইউয়ান।

আহমদ মুসার পিছু পিছু চললো তারা।

আহমদ মুসার নিরবতা ও এই ধরনের রহস্যজনক ব্যবহারে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিল সবাই। ঘরে ঢুকে দু'টি লাশ দেখে কেঁপে উঠলো নেইজেন। যে ভয়াবহ আশংকা তার মনের দুয়ারে উঁকি দিচ্ছিল, তা যেন ভয়ংকর রূপে তার সামনে এসে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা বসে পড়েছিল মেইলিগুলির লাশের মাথার পাশে।

রুমালটি সরিয়ে ফেলল লাশের মাথার ওপর থেকে। নেইজেন এবং তার সাথের সবাই লাশের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। তাদের কারোরই বুঝতে বাকি ছিল না ঘটনা কি ঘটেছে। সবারই মাথা নিচু এবং বেদনা-পাংশু মুখ।

রুমাল সরাবার সংগে সংগে মেইলিগুলির মুখের ওপর নজর পড়তেই তার বুকে ঝাপিয়ে পড়লো নেইজেন। চিৎকার করে উঠল, 'এ কি হল আপা। কেন এমন হলো। পারলাম না আমি তোমাদের এক সাথে বাঁধতে! আমি হেরে গেলাম! তোমার মত করে তোমার সাথে কেন আমি যেতে পারলাম না।'

নেইজেনকে কেউ বাঁধা দিল না।

আহমদ মুসা বসেছিল পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে।

অনেক পর লি ইউয়ান গিয়ে নেইজেনকে সান্তনা দিয়ে তুলে আনল।

'কেঁদনা নেইজেন, ও কাঁদতে নিষেধ করে গেছে। যে গুলি আমার বুকে লাগার কথা, তা ও বুকে নিয়ে আমাকে বাঁচিয়ে গেছে।' ধীর কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

'ঘটনা কি ঘটেছিল আহমদ মুসা?' বলল লি ইউয়ান।

আহমদ মুসা সংক্ষেপে সব ঘটনা খুলে বলল। তারপর স্বাগত কণ্ঠেই উচ্চারন করল, 'আমার সথে দেখা হওয়ার পর থেকেই বেচারী কষ্ট করে আসছে, কষ্ট পেয়ে আসছে, দাদা, বাপ-মা সব হারিয়েছে সে আমার কারণে, অবশেষে জীবনটাও।'

'না ভাইয়া, আপনার কথা ঠিক নয়। আমার আপার চেয়ে সুখী মানুষ কেউ ছিল না। সে সব সময়ই বলত, 'যেদিন আপনি তাকে গ্রহণ করেছেন, সে দিনই তার সব চাওয়া, সব পাওয়া পূর্ণ হয়ে গেছে। আল্লাহ তার কথাই মঞ্জুর করেছেন। তাঁকে ঐ অবস্থায়ই আল্লাহ তুলে নিলেন।' বলে ফুফিয়ে কেঁদে উঠল

নেইজেন। বলল, 'কেন আল্লাহ্ তাকে ওভাবে নিয়ে গেলেন! তার জীবন সুর্য উঠল, কিন্তু সে সুর্যের আলোতে স্নাত হতে পারল না।'

'কেউ কেউ অনন্ত, অমর জগতে গিয়ে সব কিছু পায়, মেইলিগুলি সেই তাদের একজন।' বলে আহমদ মুসা মেইলিগুলির মুখ রুমাল দিয়ে ঢেকে তাকে পাজা কোলা করে তুলে নিল কোলে। তারপর চলতে শুরু করে সবাইকে বলল 'আসুন।'

বিজ্ঞানী নবীয়েভ ও নেইলি যেখানে ছিল সেই ঘরে নিয়ে এল মেইলিগুলিকে। নেইজেনরা সবাই প্রবেশ করল সে ঘরে।

নবীয়েভের স্ত্রী ও মেয়ের পাশে মেইলিগুলিকেও রাখল আহমদ মুসা। তারপর নবীয়েভ ও নেইলিকে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল সংক্ষেপে নবীয়েভের কাহিনী।

আতঙ্কে শিউরে উঠে নেইজেন বলল, 'আল্লাহর হাজার শুকরিয়া, আল্লাহ্ আমাদের উদ্ধারের ব্যবস্থা না করলে এই অবস্থাই এখানে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল।'

'এরা মানুষ রুপী নরপশু ছিল। আল্লাহ যোগ্য শাস্তি দিয়েছেন ওয়াং ও বরিসকে।' বলল নেইলি।

নেইলির কথা শেষ হতেই আহমদ মুসা বলল, 'নেইলি, তুমি এদের নিয়ে দাঁড়াও। আহমদ ইয়াং তুমি আমার সাথে এস। ওদের সাথে বসে একটু পরামর্শ করতে হবে। তিনটি কফিন দরকার এখনই। তাছাড়া এ ঘাটিতে অনেক লাশ, এগুলো পরিস্কার করতে হবে। তারপর অনেক কাজ আছে।'

'ভাইয়া কফিন কেন? শহীদদের তাড়াতাড়ি দাফন করে ফেলা কি উচিত নয়?'

'না জেন। জবান নবীয়েভ এর স্ত্রী কন্যার দেহ পাঠিয়ে দেব তার কর্মস্থল সারিজুতে। আর মেইলিগুলিকে দাফন করতে চাই মদিনা মনওয়ারায়। ও বড় একটি শর্ত দিয়ে গেছে। ওর যেখানে কবর হবে, বছরে অন্তত একটি বার সেকানে আমাকে যেতে হবে। মক্কা-মদিনা ছাড়া এমন জায়গা তো আমার নেই নেইজেন!'

‘কিন্তু আমার আকাঙ্খা ছিল ভাইয়া, মেইলিগুলি আপার দাফন হবে তাঁর জন্মভূমিতে, তাঁর বাড়িতে। যেটা হবে আপনার একটি ঠিকানা।’ কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলল নেইজেন।

‘আমাকে আর ঠিকানায় বাঁধতে চেষ্টা করোনা বোন। প্রতি বছর সিংকিয়াং এ আসতে পারব এ গ্যারান্টি আমি দিতে পারবো না। কিন্তু প্রতি বছর মক্কা মদিনায় আমি যাবো ইনশাআল্লাহ। দুঃখ করো না বোন, সিংকিয়াং থেকে নিজেকে আমি বিচ্ছিন্ন করতে পারবো না কোন দিন। সিংকিয়াং তো শুধু মেইলিগুলির জন্মস্থান নয়, এ আমারও জন্মভূমি। এর আলো বাতাসে গড়ে উঠেছে আমার শিশু কিশোর জীবন। এখানে ঘুমিয়ে আছে আমার আব্বা, আম্মা, ভাই, বোন- আমার সব আত্মজন। সময় পেলেই যেখানে আমি আসব, সেটা হলো আমার সিংকিয়াং।’

‘ধন্যবাদ ভাইয়া, আমার আর আপত্তি নেই।’ নরম কণ্ঠে বলল নেইজেন।

আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়াল। আহমদ ইয়াংকে নিয়ে বের হয়ে এল ঘর থেকে।

রেড ড্রাগনের গোপন ঘাটিটিকেই আহমদ মুসা বানালো তার হেডকোয়ার্টার। কয়েক দিনের চেষ্টায় রেড ড্রাগন ও ফ্র এর যতগুলো আড্ডা উরুমুচি ও তার আশে পাশে ছিল সব ধ্বংস করে দিল।

সিংকিয়াং-এর নতুন গভর্নর রেড ড্রাগন প্রধান ডাঃ ওয়াং ও জেনারেল বরিসের মাত্রাতিরিক্ত স্বেচ্ছাচারিতায় এমনিতেই বিরক্ত ছিল। ডাঃ ওয়াং ও বরিসের লোকরা জেলখানা থেকে সাবেক গভর্নর লি ইয়ান ও তার পরিবারকে কিডন্যাপ করায় তিনি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছেন। জেলখানার কিছু লোককে ভয় ও লোভ দেখিয়ে ঢাঃ ওয়াং তাদেরকে কিডন্যাপ করার ব্যবস্থা করে। জেলখানার লোকদের শাস্তির ব্যবস্থা গভর্নর সংগে সংগেই করেছেন এবং বেইজিংকে বলে ডাঃ ওয়াং-এর রেড ড্রাগনও জেনারেল বরিসের ফ্র এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের

আয়োজন গভর্নর করছিলেন। ঠিক এই সময় রেড ড্রগনের ঘাটিগুলো বিধ্বস্ত হতে দেখে এবং ডাঃ ওয়াং বা বরিস নিরুদ্ধেশ জেনে গভর্নর খুশীই হয়েছেন। রেড ড্রাগনের গোপন প্রধান ঘাটি, যাকে আহমদ মুসা তার ঘাটিতে পরিণত করেছে, সে সম্পর্কে সিংকিয়াং সরকার কিছুই জানতো না। সরকারী খাতায় এ বাড়ির পরিচয় জনৈক লিউশিং মিং নামক লোকের ব্যক্তিগত বসবাসের বাড়ি।

আহমদ মুসা গত কয়দিন রেড ড্রাগন ও ফ্র এর ঘাটিগুলো ধ্বংস করার সাথে সাথে আহমদ ইয়াংকে দিয়ে সিংকিয়াং এর মুসলিম সংগঠন এম্পায়ার গ্রুপকে আবার একত্রিত করল।

আহমদ মুসা রেড ড্রাগন ও ফ্র এর সবগুলো ঘাটি থেকে সব ধরনের কাগজ, ডকুমেন্ট, ফটো, ফিল্ম ক্যাসেট ইত্যাদি সংগ্রহ করে নিয়ে এল তার হেডকোয়ার্টারে। আর এ গোপন ঘাটিতেও পেয়েছিল প্রচুর।

প্রাপ্ত সব ডকুমেন্টের ভিত্তিতে একটা নিউজ পেপার রিপোর্ট তৈরী এবং যে ভিডিও ফিল্প পাওয়া গেছে তার সমন্বয়ে একটা পূর্ণাংগ ফিল্ম তৈরীর দায়িত্ব আহমদ মুসা দিয়েছিল আজিমভ, মা চ্যাং ও নেইলিকে।

প্রমানিত হয়েছে নেইলি অত্যন্ত কাজের মেয়ে। সে কম্পিউটার ও টিভি টেকনোলজিতে অত্যন্ত দক্ষ। তার মায়ের সাথে আহমদ মুসা দেখা করেছে। খুব খুশী হয়েছে তার মা সব কিছু শুনে। বলেছে, এতদিনে তার মেয়ে তার নাম ও তার মান মত একটি কাজ করছে। আহমদ মুসা ওমর মা চ্যাং- এর সাথে নেইলির বিয়ের প্রস্তাব করলে, লেইলির মা তা সানন্দে গ্রহণ করেছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছে, ওমর মা চ্যাং এর আব্বা আম্মাকে যেমন হত্যা করেছে হানরা, তেমনি আমার বাবাকেও। খুব খুশী হলাম চ্যাংকে আমার এক ছেলে হিসাবে পেয়ে। ওমর মা চ্যাং এখন নেইলির বাড়িতেই থাকছে।

মাত্র কয়েকদিন খেটে আজিমভ, মা চ্যাং ও নেইলি মূল্যবান ডকুমেন্ট সমৃদ্ধ দীর্ঘ একটি রিপোর্ট এবং একটি ভিডিও ফিল্ম সম্পূর্ন করল।

তৈরী সম্পূর্ন হলে এগুলোর একটি করে কপি পাঠিয়ে দিল আলমা আতায় মধ্যএশিয়া সরকারেরর কাছে। আর একটি করে প্রস্তুত করল "ওয়ার্ল্ড নিউজ এজেন্সি" (WNA) এবং 'থার্ড ওয়াল্ড নিউজ' (TON) এর জন্য। কিন্তু আহমদ

মুসা প্রথমেই তাদের এসব ডকুমেন্ট দেয়া ঠিক মনে করল না। প্রথমে এ নিয়ে সে সিংকিয়াং সরকারের সাথে দরকষাকষি করতে চায়। সিংকিয়াং সরকার যদি বেংজিং কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শ করে মুসলমানদের প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে তার প্রতিকার করতে রাজি হয়, উচ্ছেদকৃত মুসলমানেদর পুনর্বাসনে যদি রাজী হয়, মুসলমানেদর যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করতে যদি তারা রাজী হয়, তাহলে সংবাদ সংস্থার মাধ্যমে বাইরে এই কাহিনী প্রচার করতে আহমদ মুসা ইচ্ছুক নয়। এ জন্যে আহমদ মুসা অত্যাচার নিপীড়ন উচ্ছেদের একটা ভিডিও এবং ডকুমেন্টসহ একটা বিবরনী সিংকিয়াং সরকারকে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

ওমর মা চ্যাংকে দূত মনোনীত করল আহমদ মুসা। তার পিতা হানদেরর হাতে নিহত হয়েছে, তাদের সব কিছু লুণ্ঠিত হয়েছে এবং উচ্ছেদ হয়েছে নিজেদের বাড়ি থেকে। সবদিক থেকেই মা চ্যাং উপযুক্ত দূত।

ওমর মা চ্যাংকে সিংকিয়াং-এর গভর্ণরের কাছে পাঠানোর আগে আহমদ মুসা উদ্বাস্তুদের পক্ষ থেকে সিংকিয়াং-এর গভর্নরের সাথে কথা বলল।

ঘাটির নাম্বার বিহীন টেলিফোন থেকে আহমদ মুসা কথা বলল গভর্ণরের সাথে। ঠিক সাধরণ টেলিফোন এটা নয়। আবার অয়্যারলেসও নয়। একে বলা যায়, ওয়্যারলেস টেলিফোন। টেলিফোন তারের সাথে এ যুক্ত নয়। কিন্তু এই টেলিফোন থেকে সাধারন টেলিফোন লাইনের যে কোন টেলিফোন নাম্বারে কথা বলা যায়। এ টেলিফোন ডিটেক্ট করা যায়না।

টেলিফোন ধরেই জিজ্ঞাসা করল, ‘গভর্ণর, আমি গভর্ণর, আপনি?’

‘নাম বলবনা, মিথ্যা নামও বলবনা।’

‘এ টেলিফোন নাম্বার কোথেকে পেলেন?’

‘ডা: ওয়াং এর ডাইরী থেকে।’

‘ডা: ওয়াং কোথায়?’

‘মিথ্যা বলতে পারতাম। বলব না। উনি সংঘর্ষে নিহত।’

‘জেনারেল বরিসের খবরও নিশ্চয় আপনি বলতে পারবেন।’

‘জি হ্যাঁ। তিনিও সংঘর্ষে নিহত।’

‘সংঘর্ষ কার সাথে?’

'তাদের অত্যাচারে যারা স্বজন হারা, সম্পদ হারা, গৃহ হারা।'

'আপনি এদের পক্ষ থেকেই বলছেন?'

'ধন্যবাদ। আমি তাদের মধ্য থেকে একজন।'

'বলুন, কেন টেলিফোন করেছেন?'

'সম্পদ, স্বজন ও গৃহ হারা মুসলমানদের সম্পর্কে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে।'

'বিশেষ কোন বক্তব্য আছে?'

'আছে।'

'কি সেটা?'

'হারানো স্বজন তারা ফিরে পাবে না, কিন্তু বাড়ি-ঘর, সহায়-সম্পদ তাদের অবিলম্বে ফিরে পাওয়া উচিত।'

'দু:খিত, এ উপদেশ আমি আমার সরকারের কাছ থেকে পেতে আগ্রহী।'

'আমি জানি, এ জবাব আমি আপনার কাছ থেকে পাব। দয়া করে জানাবেন আপনার সরকার এ উপদেশ দিচ্ছেন কি না?'

'এ প্রশ্নের জবাব আমি আপনাকে দেব না।'

'একজন গভর্নরের যে জবাব দেয়া উচিত, সেই উত্তরই আপনি দিয়েছেন। সিংকিয়াং-এর গভর্নর হিসাবে আপনাকে আমি একটা প্রস্তাব করতে চাই।'

'বলুন কি প্রস্তাব?'

'আমরা আপনার কাছে একজন দূত পাঠাব।'

'কেন?'

'কিছু ডকুমেন্ট দিয়ে।'

'কি ডকুমেন্ট?'

'একটি ভিডিও এবং একটি রিপোর্ট।'

ওগুলো কিসের?

ডাঃ ওয়াং এর রেড ড্রাগন এবং জেনারেল বরিসের ফ্র বিগত দিন গুলোতে সিংকিয়াং- এর মুসলমানদের ওপর যে হত্যাকান্ড চালিয়েছে, যে লুণ্ঠন

ও অত্যাচার করেছে, যেভাবে মুসলমানরা উচ্ছেদ হয়েছে ভিডিও ফিল্ম এবং ডকুমেন্ট সমৃদ্ধ বিস্তারিত বিবরণ।'

'এগুলোর কি সত্যতা আছে?'

'ভিডিও ফিল্মের দৃশ্যাবলী এর সাক্ষ্য দেবে। সেই সাথে সাক্ষ্য দেবে ডাঃ ওয়াং ও জেনারেল বরিসেরর হাতের লেখা বিভিন্ন চিঠিপত্র, রিপোর্ট, ডাইরী ও নানা ধরনের ডকুমেন্ট।'

'এগুলোর আমার কাছে পাঠিয়ে আপনারা কি করতে চান?'

'আমরা আপনার সরকারকে সুযোগ দিতে চাই এটা চিন্তা করার যে, এগুলো বিশ্বের সংবাদ মাধ্যমে এবং জাতিসংঘের কাছে প্রকাশ করে দিলে ভালো হয়, না আপনাদের সরকার চুপে চুপে যা ঘটেছে তার একটা প্রতিবিধান করলে ভাল হয়।'

'অর্থাৎ আপনারা চাপ দিয়ে বাধ্য করতে চাচ্ছেন?'

'না, আমরা আপনাদের সাহায্য করতে চাচ্ছি।'

'আপনাদের মতলব কি বলুন তো?' লি ইউয়ান (ক্ষমতাচ্যুত গভর্নর) কোথায়? ডাঃ ওয়াং ও জেনারেল বরিসের খবর যখন জানেন, তখন তার খবরও অবশ্যই আপনার জানার কথা।'

'আমাদের প্রস্তাবের আলোচনার সাথে হঠাৎ আপনি লি ইউয়ানকে টেনে আনলেন কেন?'

'আমার প্রশ্নের আগে জবাব দিন।'

'লি ইউয়ান ভাল আছেন, সুস্থ আছেন। তবে তিনি কোন ভাবেই আপনার প্রতিবন্ধি নন। আর তিনি চলে যাচ্ছেন এদেশ ছেড়ে।'

'কেন?'

'কেন আপনি জানেন। তাঁর এ দেশে থাকার অর্থ হবে মুসলমানদের সংগঠিত করে তিনি ক্ষমতার লড়াইয়ে নেমেছেন।'

'আপনি যেই হোন, আপনি বুদ্ধিমান। কিন্তু আপনি আমার কথাকে যেভাবে নিয়েছেন, ঠিক সে অর্থে আমি কথাটা বলিনি। তবু আপনার দেয়া তথ্যের জন্যে ধন্যবাদ। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তাঁর বাইরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত সঠিক হয়েছে।'

‘আপনার এই স্পষ্ট কথার জন্যে ধন্যবাদ।’

‘বলুন আমি কি করতে পারি।’

‘আমার প্রস্তাব সম্পর্কে কিছু বলেননি।’

‘আপনি লোক পাঠাতে পারেন। যে ডকুমেন্ট গুলো পাঠাবেন, তা অবশ্যই আমি সরকারের নজরে আনব। এবং এটুকু পর্যন্তই আমার দায়িত্ব।’

‘না, আপনি সিংকিয়াং-এর গভর্নর। আপনার দায়িত্ব এটুকু পর্যন্ত নয়। আপনার মতামতের ওপর অনেক কিছুই নির্ভর করবে।’

‘আমি এ সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলব না।’

একটু থামল গভর্নর। তারপরেই আবার বলল, ‘বার বার বলেছেন আপনি মিথ্যে বলেন না। বলুন তো আপনি এই অয়্যারলেস টেলিফোন কোয়ায় পেয়েছেন যা সিংকিয়াং সরকারেরও নেই?’

‘তাহলে ইতিমধ্যেই আমার ঠিকানা চিহ্নিত করার জন্যে গোয়েন্দাগিরি করেছেন।’

‘স্বাভাবিক। এটুকু করতেই হয়।’

‘এই অত্যাধুনিক ওয়ারলেস টেলিফোন পেয়েছি আপনার ডাঃ ওয়াং এর কাছ থেকে।’

‘ডাঃ ওয়াং এর কাছ থেকে?’

‘জি হ্যাঁ। এখন দেখুন আপনার ডাঃ ওয়াংরা আপনার রাজ্যে আরেকটা সরকার কায়েম করে বসেছিলেন। সংগ্রহ করেছিলেন যা আপনাদেরও নেই এমন উপায় উপকরণও।’

‘দেখুন, ডা: ওয়াং আমার ছিলনা এবং তার সম্পর্কে সব খবরই আমরা জানি।’

‘সব আপনি জানেন না, জানানো হয়নি আপনাকে। আমাদের ডকুমেন্টগুলো পেলেই তা বুঝবেন।’

‘ধন্যবাদ। আরেকটা কথা, আপনার যে দাবী বা প্রস্তাব যা ই বলি এটা প্রতিপক্ষ হিসেবে কিনা?’

‘আমরা একটা পক্ষ বটে, তবে আপনার অর্থাৎ সরকারের প্রতিপক্ষ আমরা নই। প্রতিপক্ষ হলে এই ডকুমেন্ট বিশ্বের সংবাদ মাধ্যমে ছড়িয়ে দিতাম। সরকারের বিরুদ্ধে একটা হই চাই বাধাতাম। কিন্তু আমরা তা চাইনি। চাইনি ডা: ওয়াং ও জেনারেল বরিসের পাপের বোঝা সরকারের ওপর চাপাতে।’

‘ধন্যবাদ। আপনার লোক কবে আসবে?’

‘আজই যাবে।’

‘নাম কি?’

‘ওমর মা চ্যাং।’

‘ঠিক আছে। গভর্নর হাউজের “দর্শনার্থী” রুমে তিনি পাঁচটায় আসবেন। তাকে আমার কাছে নিয়ে আসুন।’

‘ধন্যবাদ।’

‘ধন্যবাদ।’

আহমদ মুসা টেলিফোনের স্পিকারটা রাখল টেবিলে।

আহমদ ইয়াং, যুবায়েরভ, আজিমভ, আবদুল্লায়েভ, মা চ্যাং সবাই আহমদ মুসাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছেন।

আহমদ মুসা টেলিফোনে কথা শেষ করতেই যুবায়েরভ বলে, ‘ম্যারাথন টেলিফোন টক। একজন গভর্নরের এত সময় থাকে।’

‘না, ভদ্রলোক একজন সত্যিকার রাজনীতিক। কথা শুনার ধৈর্য তার আছে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আমার শ্বশুর বলেন, হানদের মধ্যে যারা ভাল লোক তিনি তাদের একজন। দেং জিয়াও পিং এর উদারনীতির একজন সমর্থক তিনি। তার ওপর ব্যক্তিগতভাবে তিনি গণতন্ত্রের পক্ষে। ডা: ওয়াংদের সাথে বহু বিষয়ে তিনি একমত ছিলেন না। ডা: ওয়াংদের শত চাপ সত্বেও, আমরা শুনেছি, তিনি আমাদেরকে তাদের হাতে তুলে দেননি, যদিও তার প্রশাসনের অধিকাংশ এর পক্ষে ছিল। এদেরই সাহায্যে ডা: ওয়াং শেষ পর্যন্ত আমাদের কিডন্যাপ করেছিল।’ বলল আহমদ ইয়াং।

‘ঠিক বলেছ ইয়াং, তার সাথে কথা বলে সত্যিই আমার ভাল লাগল। যাক শোন তোমরা, মা চ্যাং আজ পাঁচটায় গভর্নর হাউজে যাবে।’

একটু থামল আহমদ মুসা। ভাবল একটু। তারপর বলল, ‘ওমর মা চ্যাং ভাড়া গাড়িতে যাবে এবং একটা গাড়ি ভাড়া করেই ফিরবে।’

‘কেন গাড়ি নিলে কি ক্ষতি?’

‘এক নাম্বার ক্ষতি, গাড়িটা ওদের কাছে চিহ্নিত হয়ে যাবে। এটাকে এড়ানোর জন্যে আমাদের গাড়ি নাম্বার, রঙ সবই পাল্টাতে হবে। আমরা অত ঝাক্কিতে যাব কেন? দ্বিতীয় ক্ষতি, মা চ্যাং গাড়ি থেকে নেমে যাবার পর গাড়ির কোথাও তারা ওয়্যারলেস সিগন্যাল বসিয়ে দিতে পারে। যার দ্বারা তারা আমাদের ঠিকানার সন্ধান পেয়ে যেতে পারে। সে ওয়্যারলেস সিগন্যাল আলফিনের অগ্রভাগের মতও হতে পারে। গাড়ি থেকে এদের খুঁজে বের করা খুবই মুশকিল। সুতরাং গাড়ি নেয়ার ঝুঁকি আমাদের না নেয়াই ভাল।’

‘আল্লাহু আকবার’ বলে মা চ্যাং চিৎকার করে উঠল। সপ্রশংস দৃষ্টিতে ওমর মা চ্যাং আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু আহমদ মুসা তাকে বাধা দিয়ে বলল, ‘আমার কথা শেষ হয়নি।’

‘গভর্নরের সাথে দেখা করার পর’ বলতে শুরু করল আহমদ মুসা, মা চ্যাং-এর সরাসরি ঘাঁটিতে অথবা তার বাড়িতে ফেরা চলবে না। গাড়ি ভাড়া করে তাকে সোজা শিহেজী উপত্যকায় চলে যেতে হবে। তখন নিশ্চয় রাত হবে। রাতের অন্ধকারে তাকে পাহাড়ে আত্মগোপন করতে হবে। কেউ তাকে ফলো করছে না এটা নিশ্চিত হবার পর হাইওয়ে দিয়ে নয় বিকল্প পথে তাকে ঘোড়ায় চড়ে তাকে ঘাঁটিতে ফিরতে হবে। পাহাড়ের যে স্থানে মা চ্যাং এর সাথে আমাদের দেখা হয়েছিল, ঐখানে তার জন্য একটা ঘোড়া রাখা থাকবে।’

‘আহমদ মুসা ভাই জিন্দাবাদ। মা চ্যাং কে তারা অনুসরণ করতে পারে, এ সহজ কথাটা আমার মনেই হয়নি।’

‘কিন্তু এতটা কি গভর্নর সাহেব করবেন মুসা ভাই?’ বলল যুবায়েরভ।

‘প্রতিপক্ষ কি করবে তার ভিত্তিতে নয়, প্রতিপক্ষ কি করতে পারে সেটা হিসাব করেই তোমাকে সামনে এগুতে হবে যুবায়েরভ। দেখ, গভর্নর এবং তার

প্রসাশন এক নাও হতে পারে। গভর্নরের নির্দেশ ছাড়া বা অজান্তেই তারা অনেক কাজ করে ফেলতে পারে।'

'ঠিক বলেছেন মুসা ভাই। বিষয়টা আমার কাছে এখন পরিস্কার। বলল যুবায়েরভ।

'কি আজিমভ, তুমি কথা বলছ না কেন?' আজিমভের দিকে চেয়ে বলল আহমদ মুসা।

'আমি ভাবছি মা চ্যাংকে ধরে রেখে ওরা আমাদের কথা আদায়ের চেষ্টা করে কি না?' বলল আজিমভ।

'তা করতে পারে। তবে তা করবে না বলেই আমার মনে হয়। প্রথম কারণ, শুরুতেই প্রকাশ্য বিরোধিতায় না এসে আমার পরিচয় সন্ধানকেই তারা গুরুত্ব বেশী দেবে, দ্বিতীয় কারণ, এ সময় ধরে তাদের খুব লাভ হবে না। তারা জানে, একজন ধরা পড়ার সাথে সাথে আমরা ঠিকানা চেঞ্জ করে ফেলব।'

কেউ আর কথা বলল না। আহমদ মুসাই কথা বলে উঠল। 'মা চ্যাং, তুমি যাও, তৈরী হয়ে এস।'

বলে আহমদ মুসাও উঠে দাঁড়াল।

মা চ্যাং ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে এল। দেখল তার সামনে নেইলি।

'এমন তাড়াহুড়া করে যে বেরুলে?' বলল নেইলি।

'পাঁচটায় গভর্নরের সাথে সাক্ষাত করতে যেতে হবে।'

'গভর্নরের সাথে! তুমি!'

'এটাই সিদ্ধান্ত।'

'তোমাকে পেলে কি ওরা ছাড়বে?'

'না ছাড়ল।'

'ভয় লাগছে না, খারাপ লাগছে না?'

'একটুও না।'

'তুমি আমার কথা একটুও ভাব না?'

'তোমাকে ভাবা এবং সেখানে যাওয়া পরস্পর বিরোধী বলে তো জানি না।'

‘না, আমি তা বলছি না। আমি বলছি, আমার কষ্টের কথা তুমি ভাব না। ভাবলে ‘না ছাড়ল’ কথা অত আনন্দের সাথে প্রকাশ করতে পারতে না।’

‘ও ঐ কথা! তোমার মন এত নরম?’

‘তোমার মন বুঝি নরম নয়। আচ্ছা, শত্রুর ঘাঁটিতে যদি আমাকে পাঠাতো, তাহলে তোমার মন এমন নরম হতো না?’

‘না, গৌরব বোধ করতাম, তুমি বড় দায়িত্ব পালন করতে যাচ্ছ বলে।’

‘গৌরবের পাশে হারাবার এক বেদনা জাগতো না?’

মা চ্যাং নিরব রইল। এর উত্তর দিতে গিয়ে পারল না। হারাবার কথা শুনতেই মনের কোথায় একটা বেদনা চিন চিন করে উঠল।

‘আমি জানি জবাব দিতে তুমি পারবে না। কর্তব্যবোধ অবশ্যই সবচেয়ে বড়, কিন্তু তা হৃদয়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করে নয়।’

‘হৃদয়ের কোন আরজু এসে কর্তব্যের পথ রোধ করে দাঁড়াতে পারে না?’

যদি দাঁড়ায় সেটা হবে দুর্বলতা। এ দুর্বলতার প্রশ্রয়কে ঠিক মনে করি না। কিন্তু আবার আমি বলব কর্তব্যবোধের পাশে হৃদয়ের বৃত্তির সচেতন উপস্থিতি সবসময়ই প্রয়োজন, তা বেদনাদায়ক হলেও। আমি মনে করি, সক্রিয় কর্তব্যবোধের পাশে হৃদয়ের কোন বেদনার অস্তিত্ব কর্তব্য কাজকে মহীয়ান করে তোলে।’

‘নেইলি, তোমার অনুভুতি গভীর। যতই দিন যাচ্ছে তুমি আমাকে মুগ্ধ করছ।’ নেইলির একটা হাত ধরে বলল মা চ্যাং।

মা চ্যাং এর হাতে একটা চাপ দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিল নেইলি। বলল, ‘ঘরের বাইরে এভাবে স্ত্রীর হাত ধরায় নিষেধ আছে। এভাবে প্রসংশা করাটাকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।’

‘প্রথমটি ঠিক দ্বিতীয়টি ঠিক নয়। স্ত্রীর প্রসংশা করাটা নিষিদ্ধ নয়।’

‘তবু থাক। এত সুখকে আমার ভয় করে।’ বলে মুখ নিচু করল নেইলি।

‘সত্যিই অনন্য তুমি নেইলি।’

‘আবার!’

‘ঠিক আছে, মাফ করো।’ হাসল মা চ্যাং।

হাসল নেইলি।

এগিয়ে চলল দু'জন পথ ধরে।

বেইজিং, প্রধানমন্ত্রীর অফিস। প্রধানমন্ত্রীর সাথে রয়েছেন স্বরাষ্টমন্ত্রী। তারা পাশাপাশি দু'টি সোফায়। অন্য সোফায় বসে আছেন সিকিয়াং এর গভর্নর।

তাদের সামনে দেয়ালে বিশাল একটি টিভি স্ক্রীন। তাদের সকলের দৃষ্টি ছিল টিভি স্ক্রীনের দিকে। তারা দেখছিল একটি ভিডিও ফিল্ম। শেষ হয়ে গেল ফিল্মটি।

'রিপোর্টে যা পড়লাম তা থেকে ফিল্ম তো আরো মারাত্মক। এসব ঘটনা সত্যই সেখানে ঘটেছিল।' বলল চীনের লীন পিয়াও।

'ছবি সাক্ষ্য দিচ্ছে, অস্বীকার করবার তো কোন উপায় নেই স্যার। 'বলল সিংকিয়াং-এর গভর্ণর।

'অস্বীকার করতে পারছেন না। কিন্তু এগুলো দেখেননি কেন?

'আমরা মানে আমি জানতেই পারিনি স্যার।'

'আপনার পুলিশ, আপনার গোয়েন্দা বিভাগ কি করেছে।'

এখন মনে হচ্ছে স্যার, তারা কিছু করেনি। বরং তারা ডাঃ ওয়াং ও বরিসকেই সাহায্য করেছে।'

'মিঃ হোয়াং হুয়া, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, এর ব্যাখ্যা কি?'

'স্যার, ঘটনা আমাকেও স্তম্ভিত করেছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাও এসব কোন তথ্যই আমাদের দেয়নি।

'কেন এমনটা হলো? এই ব্যাপারে আমাদের পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ ব্যর্থ হলো কেন?

'ব্যর্থ হয়নি স্যার। সিনহকিয়াং থেকে মুসলিমপন্থী সরকারের উচ্ছেদকে পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ মুসলিম বিরোধী একটা অভ্যুথান মনে করেছে। আর এই পরিবর্তনের সুযোগে ডাঃ ওয়াং-এর রেড ড্রাগন মুসলিম নিধন ও উচ্ছেদ শুরু

করেছে, তখন পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ একে অভ্যুথানের সাথে সংগতিশীল মনে করেছে। এটা তাদের ভুল, কিন্তু ভুল ধরিয়ে দেয়ার সুযোগ হয়নি।'

'ডাঃ ওয়াং এর স্বেচ্ছাচারী আচরণের কোন কিছুই কি আপনার চোখে ধরা পড়েনি?' সিংকিয়াং এর গভর্ণের দিকে চেয়ে বলল প্রধানমন্ত্রী।

'যেগুলো ধরা পড়েছে তার কিছু কিছু মোকাবিলা আমি করেছি। কিছু কিছু বিষয় কেন্দ্রে জানিয়েছিও। যেমন ডাঃ ওয়াং সাবেক লি ইউয়ান ও তার পরিবার বর্গকে আমাদের কারাগার থেকে তার হাতে নিয়ে নিজে বিচার করতে চেয়েছিল। আমি বিষয়টিকেন্দ্রে জানিয়েছি এবং তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছি।'

'কিন্তু এরপরেও লি ইউয়ানকে সে কিডন্যাপ করতে পারল!' প্রধানমন্ত্রী বললেন।

'স্যার, ডাঃ ওয়াংকে হান কর্মচারীরা তাদের ত্রাতা বলে মানে, সুতরাং সে গোপনে যে সাহায্য চায় পেয়ে যায়।'

'আমি শুনেছি সে দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। মুসলমানরাও চাচ্ছে না সে থাক। তারা মনে করছে, সে থাকলে মুসলমানরা ভুল বুঝাবুঝির শিকার হবে।'

'এটা মুসলমানদের ভালো সিদ্ধান্ত।'

'স্যার, তাদের দাবীর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই। তারা নিজ মাটি, নিজ বাড়িতে ফিরে আসতে চাচ্ছে, কোন ক্ষতিও করেনি। তারা তাদের বাড়িতে ফিরে আসুক।'

'আমরা কিছুই করিনি তা কি প্রমাণ করা যাবে? ছবিতে দেখলাম, ডাঃ ওয়াং হেলিকপ্টার ব্যবহার করেছে। রাষ্ট্রের হেলিকপ্টার সেটা। আমরা কি জবাব দেব এর।'

'স্যার, তাদের সব আবদার আমরা মানতে পারবো না। পৃথিবীর অনেক দেশেই এমনটা ঘটছে। কিন্তু কয়জন জওয়াবদিহি করে?'

'তুমি কি বল গভর্ণর?'

'ওদের দখল করা ডকুমেন্ট নিয়েই হয়েছে সমস্যা। এগুলো যদি বিশ্বের সংবাদ মাধ্যমে যায়, গোটা দুনিয়ায় তোলপাড় পড়ে যাবে। বিভিন্ন দেশের প্রতিবাদ চাপ ছাড়াও বিষয়টি জাতিসঙ্ঘে উঠবে। হয়তো কমিশন ও তদন্তের জন্য

আসবে জাতিসজ্ঘ থেকে। তখন আরও অনেক কথাই ফাঁস হয়ে যেতে পারে। এছাড়া মুসলিম দেশগুলোর সাথে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর সাথে আমাদের সম্পর্কের উন্নয়ন ও লেনদেন বাধাগ্রস্ত হতে পারে। গভর্ণর সাহেব ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার ভয়ে আমরা যদি ওদের দাবী সব মেনে নেই, তাহলে আগে যা ছিল তার চেয়ে ও খারাপ অবস্থায় পৌঁছব। একবার দুর্বলতা দেখালে ওরা মাথায় চড়ে বসবে।'

'একটা দিক বললেন, অন্যদিক বলুন। ওদেরকে ঘরে আসার সুযোগ দিয়েই যদি আমরা দায়িত্ব শেষ করি এবং তা যদি ওরা মেনে না নেয়, তাহলে আমরা কি করব। যে ভিডিও বিশ্বের সংবাদ মাধ্যমে ফিল্ম আমরা দেখলাম এবং যে রিপোর্ট আমরা পড়েছি, তা বিশ্বের সংবাদ মাধ্যমে যাক তা আমরা চাইব কিনা।'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হোয়াং হোয়া কোন উত্তর দিল না।

প্রধানমন্ত্রী লিন পিয়াও একটু নড়ে চড়ে বসল। বলতে শুরু করল, 'লাভ ক্ষতির অংক কষেই আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ডকুমেন্ট গুলোকে যদি আমরা বিশ্ব সংবাদ মাধ্যমে যেতে দেই, তাহলে আমরা যাই বলি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব অবশেষে আমাদের নিতেই হবে। আমরা যদি অস্বীকার করি, তাহলে জাতির নেতৃত্বে এন জি ওরা আসবে, আমরা বাধা দিতে পারবো না। তাতে বিশ্বব্যাপী আমরা নিন্দিত হবো, সমালোচনার সম্মুখীন এবং বিভিন্ন প্রকার অসহযোগীতার সম্মুখীন হবো, তার মূল্য এখন ওদের দাবী মেনে নিলে যে আর্থিক ক্ষতি, তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী। সুতরাং ওদের দাবী মেনে নেয়ার মধ্যেই আমি কল্যাণ দেখি।'

'ওদের দৌরাত্ম্য যে বাড়বে তার কি হবে?' বলল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

'মিঃ হোয়াং হোয়া, ওদের কিন্তু অনেক বিবেচক দেখছি। ওরা আমাদের জব্দ করতে চাইলে, যে ভয়ানক ডকুমেন্ট ওরা পেয়েছে তা বিশ্ব সংবাদ মাধ্যমে প্রচার করে আমাদের নাজেহাল করতে পারত। কিন্তু তা তারা করেনি। প্রসঙ্গটি বিশ্বের দরবারে না নিয়ে নিজেদের মধ্যেই এর সমাধান চেয়েছে। ওদের এই উদ্যোগটা প্রতিহিংসামুলক না হয়ে দেশপ্রেম মূলক হয়েছে। অতএব আপনি যে

ভয় করছেন তা হবে না। বরং ওরা যদি বিশ্ববাসীর চাপে পুনর্বাসিত হয় ও অধিকার ফিরে পায় তাহলেই ওরা বেপরোয়া হবে এবং ওদের দৌরাত্ম বাড়বে। সে ক্ষেত্রে আমরা অসহায় হয়ে পড়ব।'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হোয়াং হোয়া হাসল এবং বলল, 'স্যার আপনার যুক্তি আমি মেনে নিচ্ছি। বুঝতে পেরেছি, ওদের দাবী মেনে নেওয়াটাই আমাদের জন্য মঙ্গলজনক। ধন্যবাদ স্যার।'

'ধন্যবাদ। এখন বল গভর্নর, ওদের দাবী মেনে নিলে আমাদের কি করতে হবে এবং আর্থিক দায় কেমন হবে?'

'স্যার, আমি একটা খসড়া বাজেট ও পরিকল্পনা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে দিয়েছি।'

'ঠিক আছে গভর্নর, আজ আমরা ওটা নিয়ে বসব। আশা করি কাল তুমি সব ঠিকঠাক করে চলে যেতে পারবে। আর তুমি ওদের জানিয়ে দাও ওদের দাবী আমরা মেনে নিয়েছি।'

'ধন্যবাদ স্যার।' বলল গভর্নর।

'ধন্যবাদ' বলে উঠে দাঁড়াল প্রধানমন্ত্রী। তার সাথে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও। তাদের সাথে সাথে বেরিয়ে গেল সিংকিয়াং-এর গভর্নরও।

অপরাধীদের শাস্তি প্রাপ্য, কিন্তু এই শাস্তির মধ্যেও এক বেদনা আছে। উইঘুর মুসলমানদের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে যখন হানরা পথে নামছিল, তখন সেই বেদনাই আহমদ মুসাকে পীড়া দিচ্ছিল। মুসলমানদের সম্পদ তারা লুট করেছে। বহু মুসলমানদের জীবন তাদের হাতে শেষ হয়েছে একথা ঠিক, কিন্তু এখন পরাজয় স্বীকার করে দখল পরিত্যাগ করে চলে যাবার সময়, অনেকেই অশ্রু বর্ষণ করছে। তাদের এই অশ্রু বর্ণবাদী ডঃ ওয়াংদেরই পাপের ফল।

উরুমুচির মুসলিম বাড়িগুলো আবার আনন্দে গমগম করে উঠেছে। প্রতিটি পরিবারকেই সরকারের পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়েছে। আরেকটা

বড় কাজ হয়েছে পুলিশ বাহিনীতে মুসলমানদের রিক্রুট করার সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছে। সেনাবাহিনীতেও। সিদ্ধান্ত হয়েছে সিংকিয়াং-এ যে পুলিশ বাহিনী থাকবে তাতে জনসংখ্যার অনুপাত অনুসারে অন্তত চার ভাগের তিন ভাগ মুসলিম হবে।

শিহেজী উপত্যকায় আবার মুসলমানরা ফিরে এসেছে। আহমদ ইয়াং এসে আহমদ মুসাকে বলল, 'চলুন, সবার দাবী শিহেজী উপত্যকায় যেতে হবে আপনার।'

সবাইকে নিয়ে আহমদ মুসা চলল শিহেজী উপত্যকায়।

তিন গাড়ির একটা বহর চলল শিহেজী উপত্যকার দিকে।

উসু তখন বেশ দূরে। জনমানবহীন পার্বত্য এলাকার একটা সরাইখানার পাশ দিয়ে চলছিল তাদের গাড়ি।

হঠাৎ সরাইখানা থেকে চিৎকার উঠল, সেই সাথে ভেসে এল গুলির শব্দ।

আহমদ মুসার গাড়ি থেমে গেল। সাথের অন্য দুটি গাড়ি ও থেমে গেল সেই সাথে।

চিৎকার তখনও শোনা যাচ্ছিল।

রাত তখন ৯টা।

আহমদ মুসা গাড়ি থেকে নেমে ছুটল সরাইখানার দিকে।

সরাইখানা দুতালা। দুতালা থেকেই চিৎকারের শব্দ আসছে।

সরাইখানার লনে একটা পুলিশের গাড়ি দাঁড়ানো দেখে বিস্মিত হলো আহমদ মুসা। পুলিশ আসার পর চিৎকার ও গুলি যেন হিসাবে মিলছে না।

আহমদ মুসা সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে উপরে উঠে গেল।

সিঁড়ি গিয়ে মিলেছে একটা করিডোরে। করিডোরের পাশ দিয়ে এক সারি ঘর, বড়-ছোট নানা রকমের।

মাঝখানের একটা ঘর থেকে চিৎকার ও ধস্তাধস্তির শব্দ আসছে।

আহমদ মুসা সিড়ি মুখে উঠেই দেখতে পেল, যে ঘর থেকে চিৎকার ও ধস্তাধস্তির শব্দ আসছে, তার দরজায় দাঁড়িয়ে দু'জন পুলিশ।

আহমদ মুসা করিডোরে উঠতেই ওরা বন্দুক বাগিয়ে তেড়ে এল কয়েক ধাপ।

কয়েক ধাপ।

আহমদ মুসার হাত দুটি পকেটে। বলল, ‘কারা কাঁদছে, চিৎকার করছে আমি দেখতে চাই।’

‘তোমার কোন কাজ নেই এখানে। আর এক ধাপ এগুলে আমরা গুলি করব।’

‘তার মানে তোমরা অসৎ কিছু করছ।’

‘আর একটি কথাও নয়, গুলি করব।’

এই সময় দুটি নারী কন্ঠের চিৎকার সব কান্নাকে ছাপিয়ে উঠল।

বিদ্যুৎ বেগে আহমদ মুসার হাত বেরিয়ে এল পকেট থেকে।

দু’হাতে দু’টি রিভলভার পুলিশ দুজনের উদ্দেশ্যে উঠে এল।

পুলিশ দুজনের বন্দুক উঠে আসছিল আহমদ মুসার লক্ষ্যে। কিন্তু আহমদ মুসার রিভলভার যত দ্রুত উঠে এল তত দ্রুত নয়।

গুলি বর্ষণ হলো আহমদ মুসার রিভলভার থেকে।

পুলিশ দুজন গুলি খেয়ে পড়ে গেল করিডোরে।

গুলি করেই আহমদ মুসা দ্রুত ছুটল ঘরের দিকে।

দাঁড়াল গিয়ে দরজায়। দেখল, ঘরের মেঝেতে একজন যুবক রক্তে ভাসছে। মাঝ বয়েসি একজন লোক ও একজন মহিলা মেঝেতে পড়ে কাঁদছে। আরো কয়েকজন ছেলে লুটোপুটি করছে কান্নায়। তাদের চোখ মুখে আতংক। সবাই হান বংশীয় আর দু’জন পুলিশ অফিসার দু’জন আলু থালু বেশের তরুণীকে জড়িয়ে ধরে টেনে নিয়ে আসছে। সম্ভবত গুলির শব্দ পেয়ে ওরা বাম হাতে মেয়েদের ধরে রেখে ডান হাতে রিভলবার বের করে নিয়েছিল।

আহমদ মুসা দরজায় গিয়ে দাঁড়াতেই সামনে এগিয়ে পুলিশ অফিসারটি রিভলভার তুলল আহমদ মুসার দিকে। আহমদ মুসা দেখল ট্রিগারে তার হাত।

আহমদ মুসা প্রস্তুত হয়েই ঢুকেছিল। গুলি করতে বিন্দুমাত্র দেরী করল না। সামনে এগিয়ে আসা পুলিশ অফিসারটি উল্টে পড়ে গেল।

তার হাত থেকে খসে মেয়েটি ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল মাঝ বয়সী মেয়েকে।

গুলি করেই আহমদ মুসা শুয়ে পড়েছিল। তার হিসাব নিঁখুত ছিল। একটি গুলি তার মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। আর একমুহুর্ত দেরী করলে তার মাথা উড়ে যেত।

শুয়ে পড়ে আহমদ মুসা গুলি করল দ্বিতীয় পুলিশ অফিসারটির রিভলভার ধরা হাতে।

পুলিশ অফিসারটি তার একটি গুলি ব্যর্থ হবার পর দ্বিতীয় গুলি করার জন্যে রিভলভার ঘুরিয়ে নিচ্ছিল। কিন্তু গুলি করার সুযোগ তার আর হলো না। তার আগেই আহমদ মুসার গুলির আঘাতে তার হাত থেকে রিভলভার ছিটকে পড়ে গেল।

'জান তুমি, এ পুলিশ হত্যার পরিণাম তোমার কি হবে?'

'আমার পরিণাম নিয়ে আপনার চিন্তা করে লাভ নেই। বলুন, মেয়ে কিডন্যাপ করা কি পুলিশের দায়িত্ব?'

'জানেন কাকে হত্যা করলেন?'

'জানার প্রয়োজন নেই, আপনি মেয়েটিকে ছেড়ে দিন। দ্বিতীয়বার আর বলব না মাথা গুড়িয়ে দেব।'

সংগে সংগেই পুলিশ অফিসারটি মেয়েটিকে ছেড়ে দিল। মেয়েটি ছুটে গিয়ে আছড়ে পড়ল সেই মাঝ বয়সী মেয়েটির কোলে।

এই সময় আহমদ মুসার পেছনে এসে দাঁড়াল যুবায়েরভ, আজিমভ ও আহমদ ইয়াং।

'আহমদ ইয়াং, এর হাত বেঁধে নিয়ে যাও নিচে। থানায় সোপর্দ করতে হবে হত্যা ও কিডন্যাপের অভিযোগে।' বলল আহমদ মুসা।

আহমদ ইয়াং হাত বেঁধে তাকে নিচে নিয়ে গেল।

মাঝ বয়সী ভদ্রমহিলাটি ছুটে এসে আছড়ে পড়ল সেই নিহত যুবকটির উপর।

আহমদ মুসা এগিয়ে গিয়ে বলল, ‘নিহত যুবক নিশ্চয় আপনার সন্তান মা। কিন্তু এখন কান্নার চেয়ে বেশী প্রতিবাদী হতে হবে মা। না হলে এ স্বেচ্ছাচার আরও অনেকের ক্ষতি করবে।’

মহিলাটি একটু পর উঠল। চোখ মুছতে মুছতে বলল, ‘তুমি আমার মেয়ে দু’টিকে সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচিয়েছ বাছা। আর একটু আগে এলে আমার সোনার ছেলেও বাঁচত। ওদের বাঁধা দিতে গিয়ে সে জীবন দিয়েছে।’

‘পুলিশরা কি আপনাদের পূর্ব পরিচিত কিংবা ওদের সাথে কোন শত্রুতা আছে আপনাদের?’

গাড়ি খারাপ হওয়ায় আমরা এ সরাইখানায় আশ্রয় নিয়েছি। পুলিশের একটা গাড়ি দেখে আমরা তাদের সাহায্য চেয়েছিলাম। তারা যেন নজর রাখে, চারদিকের অবস্থা ভাল নয়। ওরা চলে যায়, কিছুক্ষণ পর আবার ফিরে আসে। মেয়ে দু’টিকে ওদের সাথে দিতে বলে। এরপর যা ঘটেছে তা দেখছ।’

‘এত জঘন্য এরা?’

‘শুধু এরা নয়, পুলিশের অধিকংশই নষ্ট হয়ে গেছে। উইঘুরদের উপর এরা যা ইচ্ছা তাই করেছে, এখন আমাদের উপরও হাত তুলছে। এ ফ্রাঙ্কেনষ্টেইন আমরাই গড়েছি।’

‘ঠিক বলেছেন মা। উইঘুর মুসলমানদের উপর অত্যাচারে যারা হাত তালি দিয়েছে, তারাও এখন এদের অত্যাচারের শিকার হবে, এটাই প্রাকৃতিক বিধান।’

‘বলতে দ্বিধা নেই, আমরা এরই শিকার।’

‘আমরা আপনাদের জন্যে কি করতে পারি বলুন, আপনারা এখানে নিরাপদ নন।’

‘আমরা কি করব? আমাদের গাড়ি খারাপ কোন গাড়িও পাইনি।’

‘আপনারা চাইলে আপনাদের আমরা উসুতে পৌঁছে দিতে পারি। আপনারা কোথায় যাবেন?’

‘শিহেজী উপত্যকায়?’

‘কোথেকে আসছেন?’

‘হুনান থেকে।’

‘শিহেজীতে কার কাছে যাবেন? কে আছে ওখানে?’

‘ওখানে আমার বড় বোন থাকেন। ওর কাছে বেড়াতে যাচ্ছি।’

‘আপনার বোন জামাই নিশ্চয় হান?’

‘জি।’

‘কতদিন তারা শিহেজী উপত্যকায় আছে?’

‘এই এক মাস। শুনলাম ভাল বাড়ি পেয়েছে, জমি-জমাও পেয়েছে অনেক।’

‘আমি মনে করি শিহেজী গেলে ওদের পাবেন না।’

‘কেন?’ মেয়েটির চোখ বড় বড় হয়ে উঠল।

‘উইঘুরদের সরিয়ে তো তারা বসেছিলেন, উইঘুররা আবার ফিরে এসেছে।’

মাঝ বয়সী সেই লোকটি এতক্ষণ আলোচনা শুনছিল। সে উঠে এল। তার চোখে মুখে উদ্বেগ। বলল, ‘তাহলে কি সংঘাত সংঘর্ষ হয়েছে? হানরা কি তাহলে পরাজিত?’

‘সংঘাত সংঘর্ষ হয়নি। সরকারই একটা আপোষ মূলক ব্যবস্থা করেছে। উইঘুরদের জায়গা তাদের ফেরত দিয়েছে। হানদের তাদের নিজের জায়গায় ফেরত পাঠাচ্ছে।

‘ও গড! তাহলে ওরা কোথায় গেল। আমরা এখন কি করব?’ বলল মেয়েটি।

‘আমরা আপনাদের উসুতে পৌঁছে দিতে পারি। সেখান থেকে কাল সকালে গাড়ি নিয়ে উরুমুচি কিংবা হান ফিরে যেতে পারেন।’

‘তাই হোক।’ পুরুষটি বলল।

‘ঠিক আছে। তাহলে আপনারা তৈরী হয়ে নিন।’ বলল আহমদ মুসা।

তারা উঠে দাঁড়াল।

মহিলাটি ইতস্তত করছিল এবং তার সন্তান যুবকটির লাশের দিকে তাকাচ্ছিল।

‘চিন্তা করবেন না, আপনাদের ছেলের দেহ আমরা সাথে নেব।’

বলে আহমদ মুসা যুবকের লাশটি পাঁজাকোলা করে তুলে নিল।

আজিমভ, আহমদ ইয়াং-এর সাথে আগেই নেমে গিয়েছিল।

নিচে নামতেই আহমদ ইয়াং ছুটে এল এবং আহমদ মুসার কাছ থেকে যুবকের লাশটি নিয়ে নিল।

গাড়িতে উঠল সবাই। পুলিশকেও গাড়িতে উঠানো হলো।

তাদের তিন গাড়ির বহরে ছিল একটি মাইক্রোবাস। সে মাইক্রোবাসের সামনের সিটে উঠল আহমদ মুসা। আর ড্রাইভিং সিটে বসর আহমদ ইয়াং।

পেছনে উঠাল যুবকটির লাশ। সেই সাথে সেই ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলা এবং তার পরিবার।

গাড়ি ছাড়তে যাবে, এমন সময় ছুটে এল যুবায়েরভ এবং আজিমভ হন্তদন্ত হয়ে।

ওদের দেখে আহমদ মুসা দরজা খুলল।

দরজায় এসে দাঁড়াল যুবায়েরভ ও আজিমভ। একটু নিচু গলায় বলল, ‘আলমাআতা থেকে এই মাত্র মেসেজ পেলাম। সারেজুর আণবিক প্রকল্প সেন্টারে আমাদের দু’জন শীর্ষ বিজ্ঞানী খুন হয়েছে গত দু’দিনে এবং একটি কম্পুটার ব্যাংক তছনছ হয়েছে। আতংক ও নিরাপত্তাহীনতা ছড়িয়ে পড়েছে গোটা সারেজুতে।’

থামল যুবায়েরভ।

খবরটি শোনার সংগে সংগে আহমদ মুসার মুখ ম্লান হয়ে গেল। মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ চিন্তা করল। তারপর মুখ ফিরাল আহমদ ইয়াং-এর দিকে। বলল, আহমদ ইয়াং, শুনেছ তো সব, তোমার শিহেজী উপত্যকায় আর যাওয়া হচ্ছে না। গাড়ি ঘুরিয়ে দাও উরুমুচির দিকে।’

তারপর ফিরল যুবায়েরভ ও আজিমভের দিকে। বলল, ‘তাড়াতাড়ি আমাদের উরুমুচিতে ফেরা দরকার। বিজ্ঞানী নবিয়েভকে সব ঘটনা জানাতে হবে। আমার মন বলছে, আজই আমাদের মায়েজ যাত্রা করা দরকার। যাও, তোমরা সব গাড়ি ঘুরাতে বল উরুমচির দিকে।’

চলে গেল যুবায়েরভ ও আজিমভ।

আহমদ মুসা পেছন দিকে ফিরে বলল, 'জনাব, আমরা যদি উসুতে না গিয়ে উরুমচিতে ফিরি, তাহলে কি আপনাদের কোন অসুবিধা আছে?'

'না না, সেটাই বরং আমাদের জন্যে ভাল। আমরা অনেকটা পথ এগিয়ে গেলাম রাতারাতি।' বলল মাঝ বয়সী ভদ্রলোক।

'ধন্যবাদ' বলে আহমদ মুসা আহমদ ইয়াংকে গাড়ি ছাড়তে বলল।

উরুমচি পৌঁছে বেধে রাখা পুলিশ অফিসারদেরকে যুবায়েরভ থানায় সোর্পদ করে সাথে নিয়ে আসা পরিবারটিকে একটি হোটলে নিয়ে গেল।

ওদের লাগেজসহ ওদেরকে হোটেলে তুলে দিয়ে আহমদ মুসা ও আহমদ ইয়াং বিদায় নিতে চাইল।

ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা দু'জনেই আহমদ মুসার পথ রোধ করে দাঁড়াল। বলল ভদ্রলোকটি, 'তুমি আমাদের জন্যে এত কিছু করবে, অথচ তোমার নাম পরিচয়টাও আমাদের জানা হয়নি।'

'আব্বা শুধু ওঁর পরিচয় নয়, ওঁকে আমাদের বাড়িতে দাওয়াত করুন। তিনি আমাদের নতুন জীবন দিয়েছেন।' বলল ভদ্রলোকটির মেয়ে দু'জনের একজন তরুণী।

'আমি আহমদ মুসা। আর এ আহমদ ইয়াং।' বলল আহমদ মুসা।

'কোন আহমদ মুসা?' এক সাথেই বলে উঠল ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা। তাদের চোখে এক সাগর প্রশ্ন।

আহমদ মুসা কিছু বলার আগে তারাই বলল, ' ঐ আহমদ মুসা নয়তো যে সোভিয়েত ইউনিয়নে বিপ্লব করেছে, সিংকিয়াং-এ গন্ডগোল করেছে এবং হানদের শত্রু?'

'জি, আমি সেই আহমদ মুসাই।'

ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলা এবং দুজন তরুণী চোখে অপার বিস্ময়। তারা ভূত দেখার মত নির্বাক চোখে তাকিয়ে রইল।

তাদের দিকে তাকিয়ে আহমদ মুসা একটু হাসল। বলল, ‘আমাদের এখুনি যেতে হবে, অনেক কাজ। শুধু বলে যাই, আমরা সিংকিয়াং-এ গন্ডগোল করিনি, আমরা হানদের শত্রুও নই।’

বলে আহমদ মুসা সামনে পা বাড়াতে চাইল। কিন্তু ভদ্রলোকটি দুই হাত প্রসারিত করে আহমদ মুসার পথ রোধ করে দাঁড়াল।

বলল, ‘না, আপনি সে আহমদ মুসা নন, যে আহমদ মুসার কথা আমরা শুনেছি।’

‘তাহলে কোন আহমদ মুসা আমি?’

‘যে আহমদ মুসা পরোপকারী এবং মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ সেই আহমদ মুসা আপনি।’

‘এক মানুষের দুই সত্ত্বা থাকে না কি?’

‘আমি তা বলি না। আমি যে আহমদ মুসার কথা শুনেছি, তাকে আমি দেখিনি। যে আহমদ মুসাকে আমি দেখেছি, তিনি আমার সেই শোনা আহমদ মুসা নন। শোনা আহমদ মুসার কোন অস্বিত্ব আমার কাছে নেই।’

‘আপনার কাছে না থাকলেও হাজারো লোকের কাছে আছে। আপনি অস্বীকার করবেন কেমন করে?’

‘হাজারো লোকের শোনা কথার সাক্ষ্যের চেয়ে একজনের দেখা কথা সাক্ষ্য বড়। যে নিজের জীবন বিপন্ন করে একটি হান পরিবারকে রক্ষা করে, যে একজন হান যুবকের লাশ বহন করে এবং সামান্য প্রশংসারও যে মুখাপেক্ষী নয়, সে হানদের শত্রু আমি মানি না।’

‘কিন্তু এটা তো সত্য যে আমি হানদের বিরুদ্ধে এবং মুসলমানদের পক্ষে কাজ করছি।’

সংগে সংগে উত্তর দিলনা ভদ্রলোক। মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বলল, ‘আজ আমার মনে হচ্ছে, যে কারণে আজ আমার পরিবারকে আপনি রক্ষা করতে ছুটে গিয়েছিলেন প্রাণ বিপন্ন করে, সে কারনেই আপনি ছুটে এসেছেন সিংকিয়াং-এর মুসলমানদের রক্ষার জন্যে।’

‘অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। এমন বাস্তব উপলব্ধি সবার মধ্যে এলে দেশটা শান্তির রাজ্যে পরিণত হতো।’

বলে আহমদ মুসা ভদ্রমহিলার দিকে ফিরে বলল, ‘আসি মা।’

‘না বাবা, যেতে পারবে না। মা বলে ডাকার আমার কোন ছেলে নেই। তুমি আমাকে মা বলে ডেকেছ। যেতে দেব না তোমাকে এত তাড়াতাড়ি।’ বলল ভদ্রমহিলা।

‘যাবার সময় হলে কেউ কাউকে ধরে রাখতে পারে না। মাও না। আমার যাবার সময় হয়েছে সিংকিয়াং থেকে।’

‘চলে যাচ্ছ সিংকিয়াং থেকে?’

‘সম্ভবত এখানকার কাজ শেষ।’

‘তোমার দেশ কোথায়?’

‘জন্মেছিলাম সিংকিয়াং-এ, এখন গোটা পৃথিবীই আমার দেশ।’

‘তাহলে বাড়ি কোথায়?’

‘আমার কোন বাড়ি নেই।’

‘বাড়ি নেই? আমি যদি তোমার ঠিকানা চাই?’

‘দিতে পারবো না।’

‘তোমার স্ত্রী, ছেলে......।’

আহমদ মুসা ভদ্রমহিলার এ প্রশ্নটির জবাব সংগে সংগে দিতে পারলো না। হঠাৎ একরাশ আবেগ এসে তার কন্ঠ রুদ্ধ করে দিতে চাইল।

আহমদ মুসা মুখ নিচু করল।

মুখ নিচু রেখেই জবাব দিল, ‘স্ত্রী ছিল। সে সিংকিয়াং-এরই মেয়ে। ডাঃ ওয়াংদের গুলিতে নিহত হয়েছে, তার পিতা মাতাও।’

‘আমি দুঃখিত বাবা, এ প্রশ্ন তোলা আমার ঠিক হয়নি।’

‘ঠিক আছে। আনন্দ-বেদনার এ পৃথিবীতে সব কিছুই থাকবে মা। আমি আসি মা।’

‘তুমি অনেক বড় বাবা, আমার কল্পনার চেয়েও বড়। কোন মাই তোমাকে ধরে রাখতে পারবে না।’

একটু থামল ভদ্রমহিলা। তারপর বলল, ‘একটা বড় সান্ত্বনা পেলাম। একটা পর্বত প্রমাণ ভুল নিয়ে বেঁচে ছিলাম। তোমার সাথে দেখা হওয়ায় সে ভুল ভেঙ্গে গেল। আচ্ছা বলত, ইসলাম কি ঠিক তোমার মত? যে হানদের হাতে তুমি তোমার প্রিয় বস্তু হারিয়েছ, সে হানদের একটি পরিবারকে রক্ষার জন্যে জীবন বিপন্ন করে এগিয়ে গিয়েছিলে। এ উদারতা তোমার না তোমার ইসলামের?

‘ইসলাম আমাকে গড়েছে মা। ইসলাম বাদ দিলে আমি ডাঃ ওয়াংদেরই একজন হয়ে যেতে পারি।’

‘ধন্যবাদ বাছা। তোমার মূল্যবান সময় অনেক নষ্ট করেছি। তোমাকে কষ্ট দিয়েছি। কিন্তু আমরা উপকৃত হয়েছি। তোমাকে, সেই সাথে তোমার ইসলামকে আমার মনে থাকবে।’

‘ইসলাম আমার নয় মা, ইসলাম গোটা মানব জাতির সম্পদ। ইসলাম আপনারও।’

‘ধন্যবাদ।’

‘ধন্যবাদ’ বলে আহমদ মুসা পা তুলতে যাচ্ছিল। ভদ্রমহিলার মেয়ে তরুণী দু’জনের একজন এগিয়ে এসে আহমদ মুসার হাতে একটি কাগজ তুলে দিল। বলল, ‘ আমরা দু’বোন আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। মৃত্যুর মুখে ঝাপিয়ে পড়ে আপনি আমাদের বাঁচিয়েছেন। সিংকিয়াং-এর কেউ এক পা এগুতে পারতোনা পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে। আপনার দ্বারাই মাত্র ওটা সম্ভব হয়েছে। কাগজে ঠিকানা দিলাম। বিপ্লবী নেতা আহমদ মুসা সম্পর্কে কিছু কিছু জানি। তবু বলছি, ঘটনাচক্রে কোন দিন কোন সুযোগ যদি পান আমাদের বাড়িতে পা দেয়ার, আমরা ধন্য হবো।’

‘হানরা তখন যদি পিত্রালয়ে না থাকে?’ মিষ্টি হেসে বলল আহমদ মুসা।

তরুণীর মুখ লাল হয়ে উঠল। বলল, ‘ যেখানেই থাকি ছুটে আসব।’

‘ধন্যবাদ’ বলে আহমদ মুসা পা বাড়াল।

‘যাবার সময় আরেকটা প্রশ্ন, ভাই, সন্তান ও স্বামী সুলভ এত মমতাময় ও অনুভূতি প্রবণ হৃদয় নিয়ে আপনি এত বড় বিপ্লবী কেমন করে?’ বলল ভদ্রলোকটি।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘মানুষের প্রতি অসীম মমতাই মানুষকে বিপ্লবী করে। মানুষের প্রতি মমতা না নিয়ে বিপ্লবী হওয়া পাপ। এটাও ইসলামের শিক্ষা।’

বলে আহমদ মুসা বেরিয়ে এল কক্ষ থেকে। হোটেলের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আহমদ মুসার মনে হলো, প্রতিটি পদক্ষেপ যেন তার আব্বা, আম্মা, বোনদের মমতামাখা স্নেহের নীড়কে পদদলিত করছে। হৃদয়ের কোথায় যেন একটা বেদনা চিন চিন করে উঠল আহমদ মুসার।

আহমদ ইয়াং বসে ছিল গাড়িতে।

আহমদ মুসা উঠে বসতেই ছেড়ে দিল গাড়ি।

কোন কথা বলল না আহমদ মুসা।

আনমান হয়ে পড়েছিল সে।

রাতের উরুমচী নগরী।

আহমদ মুসার মনে হলো, অন্ধকারের বুকে রাস্তায় আলো গুলো

আকুল প্রতীক্ষায় জেগে থাকা নিস্পলক চোখের মত জ্বল জ্বল করছে।

তার হৃদয়ের কোন দূর দিগন্তে একটা বেদনা যেন কথা বলে উঠল, ‘পৃথিবীতে লাখো গৃহ আছে, কিন্তু কোন গৃহেই কোন ঘুম জাগা চোখ এমন প্রতীক্ষায় নেই তার জন্য।’

সবাই ঘাঁটিতে এসে পৌছল।

সবাইকে আসতে বলে আহমদ মুসা হল ঘরের দিকে চলল। আহমদ মুসা হল ঘরে গিয়ে দেখতে পেল আহমদ ইয়াং এর শ্বশুর সাবেক গভর্নর লি ইউয়ান কে। বলল, চাচাজান, জরুরী আলাপ আছে, নেইজেন ও চাচীমাও এলে ভাল হয়।

ঠিক আছে ডাক ওদের।

আহমদ মুসা হল ঘরের একটা পর্দা টেনে দিল। কয়েকটি সোফা আড়াল হয়ে গেল। তারপর আহমদ মুসা ইন্টারকমে নেইলিকে বলল, তুমি নেইজেন ও চাচীমাকে হল ঘরে নিয়ে এসো।

নেইলিকে ঘাঁটির ইলেক্ট্রিসিটি ও যাবতীয় ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার দ্বায়িত্ব দেয়া হয়েছে। সেই সাথে ঘাঁটির অভ্যন্তরীণ ব্যবস্তাপনা কো- অর্ডিনেটরের দ্বায়িত্বও পালন করছে।

আহমদ মুসা, নেইলি ও ওমর মা চ্যাং এর ব্যাপারে খুব আশাবাদী। তারা আহমদ ইয়াং-এর টিমে অত্যন্ত মুল্যবান সংযোজন হবে।

নেইজেনরা এল এবং এল যুবায়েরভ ও আজিমভরাও।

আহমদ মুসা লি ইউয়ানের পাশের সোফায় বসেছিল।

বিজ্ঞানী নবীয়েভ এসে প্রবেশ করল হল ঘরে। লি ইউয়ানের পাশে।

'জনাব নবীয়েভ, আপনি যুবায়েরভের কাছ থেকে সারেজ আণবিক প্রকল্পের কথা শুনেছেন। এ ব্যাপারে আপনার মত বলুন।' বলল আহমদ মুসা।

'যতটা বুঝতে পারছি সর্বনাশের যাত্রা সেখানে শুরু হয়ে গেছে। যে দুজন বিজ্ঞানী নিহত হয়েছে শুনলাম, তারা আমাদের পরীক্ষণ ও তত্ত্ববিজ্ঞানের দু'জন শীর্ষ বিজ্ঞানী। একই সাথে দুজন শীর্ষ বিজ্ঞানী নিহত হওয়া ও কম্পিউটার ডাটা ব্যাংক বিধ্বংস হওয়া খুব তাতপর্যপূর্ণ। অত্যন্ত পরিকল্পিত উপায়ে ওরা আমাদের একমাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ আণবিক প্রকল্পকে অচল করে দিচ্ছে। কোন ডাটা ব্যাংকটি বিধ্বস্ত হয়েছে এটা জানলে আঁচ করা যেত ক্ষতির প্রকৃতিটা কেমন।'

থামল নবীয়েভ।

'সবচেয়ে উদ্বেগের হলো, দুজন বিজ্ঞানী খুন হলেন এবং একটা ল্যাবরেটরী ধ্বংস হলো, কিন্তু আমাদের গোয়েন্দা বিভাগ সন্দেহ করবার মত কাউকে পায়নি। শত্রুরা মনে হচ্ছে সবকিছু জানে। নিখুঁত ওদের কাজ।' বলল যুবায়েরভ।

'আমাকে জিজ্ঞাসাবাদকালে ওরা কিন্তু বারবারই বলেছে, তোমাদের কোন কিছুই গোপন নেই। শুধু জানি না তোমাদের ঐ কম্পুটার ফাইলগুলো কোথায়? যদি এ ফাইলগুলো না পাই, তাহলে আমরা এমন পথ অনুসরণ করব, তা তোমাদের জন্যে হবে আরো ভয়াবহ। ক্ষতি ও ধ্বংস হবে আরও বড়। জেনে রেখ, তোমাদের আণবিক শক্তি ধ্বংস করেই ছাড়ব।'

‘জেনারেল বরিস তো সামনের লোক, পেছনে কে আছে?’ বলল লি ইউয়ান।

‘আমার মনে হয় রাশিয়ার জাতীয়তাবাদী মহল। একদিন ওদেরকে আমি রাশিয়ার গোয়েন্দা চীফ এর পক্ষ থেকে পাঠানো একটি মেসেজ নিয়ে আলোচনা করতে শুনেছি।’ বলল নবীয়েভ।

‘রাশিয়ার কট্টর জাতীয়তাবাদীরা চাচ্ছে এর দ্বারা। বলল আহমদ ইয়াং।

‘চাওয়াটা পরিস্কার, আণবিক শক্তির অধিকারী একমাত্র মুসলিম দেশ মধ্যএশিয়ার আণবিক সামর্থ ধ্বংস করা। সামনের ভিক্তি ধ্বসে পড়লে তৈরী অস্ত্র কোন সমস্যা হবে না। আন্তর্জাতিক কোন সিদ্ধান্তের প্যাঁচে ফেলে অস্রগুলো এক সময় কেড়ে নেয়া হবে।’ বলল যুবায়েরভ।

‘আলমা আতা থেকে আসা মেসেজে সেখানে আমাদের যাবার কথা বলা নাই। আমরা কি সিদ্ধান্ত নেব?’ আহমদ মুসা বলল।

‘আপনি জেখানে আছেন, সেখানে আলমা আতা থেকে কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করেনি। কিন্তু পরিস্তিতি অত্যন্ত ভয়াবহ। আপনার সহ আমাদের অবিলম্বে যাওয়া দরকার।’ বলল একই সাথে যুবায়েরভ ও আজিমভ।

তাদের কথা শেষ হতেই আহমদ ইয়াং বলল, ‘অবস্থা গুরুতর সন্দেহ নেই, কিন্তু আহমদ মুসা ভাই- এর যাবার মত হলে আলমা আতার মেসেজে অবশ্যই এর উল্লেখ থাকতো। এদিকে আহমদ মুসা ভাই-এর প্রয়োজন এখানে শেষ হয়নি।’

‘আমারও তাই মনে হয়।’ বলল মা চ্যাং।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘নেইজেন, নেইলি তোমরা কিছু বললে না।’

‘আমাদের দাবী এত ছোট নয়। কদিন থাকার জন্যে আমরা বলব না। আমাদের দাবী আপনি এ দেশে থাকবেন।’ বলল নেইজেন।

‘তোমার পুরানো এ দাবী নতুন করে আর বলার দরকার ছিল না।’

হাসতে হাসতে কথা কটি বলে আহমদ মুসা একটু থামল। একটু ভাবল। মুখটা গম্ভীর হয়ে উঠল তার। তারপর মাথা তুলল। শুরু করল, ‘শুধু সারেজুর আণবিক প্রকল্পের কথা বিচ্ছিন্নভাবে না ভেবে গোটা মধ্যএশিয়া প্রজাতন্ত্রের কথা

আমাদেরকে ভাবতে হবে। আমাকে কিডন্যাপ করা হয়েছিল মধ্যএশিয়ার সীমান্ত শহর হরকেস থেকে। এটা খুব ছোট ষড়যন্ত্রের ফল নয়। আমি কোন দিন, কখন আসব, কোথায় উঠব, কিভাবে কিডন্যাপ করা হবে, ইত্যাদি প্ল্যান অনেক আগেই করা হয়েছিল। ভি আই পি রেস্ট হাউজে যেমন ওরা লোক ঢুকেছিল অনেক আগে, তেমনি তথ্য সংগ্রহের জন্যে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে ওদের লোক আছে বলেই আমাদের ধরে নিতে হবে। হরকেসের কিডন্যাপের ঘটনা প্রমান করেছে গোটা একটা ষড়যন্ত্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে।যার একটা ভয়াবহ প্রকাশ সারেজু আণবিক প্রকল্পের ঘটনা। সারেজুতে যে ষড়যন্ত্র সক্রিয় তার লক্ষ্য মধ্যএশিয়া মুসলিম প্রজাতন্ত্রের আণবিক শক্তি ও সামর্থ ধ্বংস করা।কিন্তু ষড়যন্ত্রের সামগ্রিক লক্ষ্য হলো মধ্যএশিয়া প্রজাতন্ত্রের ক্ষতি সাধন। এই ষড়যন্ত্রকে অবিলম্বে চিহ্নিত ও তা ভেঙে দিতে না পারলে বড় ক্ষতির সম্মুখীন আমাদের হতে হবে। হরকেসের কিডন্যাপ ও সারেজুর ঘটনা আমাদের জন্যে জরুরী এক সতর্ক সংকেত।

একটু থামল আহমদ মুসা। একটু নড়ে চড়ে বসে বলল, ‘আজ রাতেই আমি রওয়ানা হতে চাই।’

‘আজ রাতেই?’ বিস্মিত কণ্ঠে বলল আহমদ ইয়াং।

‘হ্যাঁ, আজ রাতেই। চিন্তা করো না ইয়াং। যে পরিকল্পনা করা হয়েছে, তার বাস্তবায়নে তোমরাই যথেষ্ট।’ বলে আহমদ মুসা যুভায়েরভের দিকে তাকাল। বলল, ‘তুমি আলমা আতার সাথে যোগাযোগ কর। রাত ৩টার দিকে সালতাই পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গের গোড়ায় যে চত্তর রয়েছে, সেখানে দু'টি হেলিকপ্টার আসবে। একটা এলিকপ্টার ফিরবে আলমা আতায়। মেইলিগুলির শবদেহ যাবে এ হেলিকপ্টারে। আলমা আতা থেকে মেইলিগুলির শবদেহ যাবে মদীনায় দু'একদিনের মধ্যে। আগামীকাল হাসান তারিক আসছে মদীনায়। সে সব ব্যবস্থা করবে দাফনের। আরেকটি হেলিকপ্টার যাবে মধ্য কাজাখাস্তানের কারসাকপে। এ হেলিকপ্টারে জনাব নবীয়েভের স্ত্রী ও মেয়ের শবদেহ থাকবে। সেই সাথে থাকবেন জনাব নবীয়েভ, আমি ও আজিমভ।এই মেসেজ তুমি আলমা আতায় পাঠিয়ে দাও।'

যুবায়েরভ বেরিয়ে গেল কক্ষ থেকে।

আহমদ মুসা ফিরল নবীয়েভের দিকে। বলল, ‘জনাব, মি যে ব্যাপারে বলেছিলাম আপনি চিন্তা করছেন?’

‘চিন্তা করছি। আমি মনে করি তোমার প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত। আপাতত কিছদিন আমাকে দেশের বাইরেই থাকা দরকার। সুতরাং আমি ও আমার স্ত্রী মধ্যএশিয়ায় যেতে রাজী আছি।’

‘কিন্তু আমরা যে সব দিক থেকেই এতিম হয়ে যাব।’ বলল আহমদ ইয়াং।

‘আহমদ ইয়াং তোমাকে আরও স্বাবলম্বী ও স্বাধীন করার জন্যেই এমন সিদ্ধান্ত আরও জরুরী।’

‘বাঃ ভাইয়া,এ কোন যুক্তি। সাঁতার শেখাতে অভিভাবকরা হাজির থাকে না?’ বলল নেইজেন।

‘আহমদ ইয়াং এবং তোমার সাতার শেখা অনেক আগে শেষ। এবার স্বাধীনভাবে সাতারের পালা।’

‘কিন্তু এখানকার আবহাওয়া কতটা প্রতিকূল, আপনি জানেন।’ নেইজেনও কথা বলল আবার।

‘খুব প্রতিকূল হবে না। সিংকিয়াং সরকার এখন মুসলমানদের সাথে ভাল ব্যবহার না করুক, খারাপ ব্যবআর অন্তত করবে না। আর বিষদাঁত যে দুটি ছিল ভেঙ্গে গেছে। রেড ড্রাগন সক্রিয় হতে চেষ্টা করলেও এর জন্যে অনেক সময় লাগবে। সুতরাং ভয়ের কিছু নেই।’

একটু থেমেই আবার বলল, একটা কথা তোমাদের বলব, হানরা এখন একটু বেকায়দায় পড়েছে, তাদের কারও কারও ক্ষোভও বেড়েছে। এই সময় তাদের সাথে ভাল ব্যবহার কর, ওদের সাহায্য কর। ওদের সাথে বিরোধ নয়, ওদেরকে আমাদের করে নেয়াই সমস্যার সমাধান। মিশনারী জাতি হিসাবে মুসলমানদের মুল দায়িত্ব এটাই।’

‘ধন্যবাদ মুসা ভাই, আপনার উপদেশ মনে রাখব।’

‘অনেক রাত হয়েছে। এবার উঠতে হয়। খাবার রেডি।’

আহমদ মুসা লি ইউয়ান ও নবীয়েভকে বলল, ‘চলুন উঠা যাক।’ বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

উঠে দাঁড়াল সবাই।

# ৬

মধ্যএশিয়া মুসলিম প্রজাতন্ত্রের কাজাখ প্রদেশের মধ্য অঞ্চলের ছোট শহর কারসাপকের ছোট বিমান বন্দরে ল্যান্ড করল আহমদ মুসাদের ছোট বিমানটি পূর্ব পরিকল্পনার ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা পর।

উরুমুচি বসে আহমদ মুসা যে পরিকল্পনা করেছিল, তাতে আলতাই পার্বত্য ভূমিতে রাত তিনটায় হেলিকপ্টারে উঠার পর কারসাপক শহরে এসে পৌঁছার কথা সকাল দশটায়। কিন্তু আহমদ মুসারা এসে পৌঁছল পরের দিন সকাল দশটায়।

সিংকিয়াং এর আলতাই পার্বত্য ভূমি থেকে হেলিকপ্টারে ওঠার পর আহমদ মুসা তার পরিকল্পনা পরিবর্তন করেছিল।

কারসাপকের পরিবর্তে তার হেলিকপ্টারকে ল্যান্ড করার নির্দেশ দিয়েছিল বলখাস হ্রদের পশ্চিম তীরের শহর বলখাসে।

আজিমভ বিস্মিতভাবে চোখ তুলেছিল আহমদ মুসার দিকে ।

'কৌশল পরিবর্তন করলাম।' হেসে বলেছিল আহমদ মুসা।

এতটুকু উত্তরে তৃপ্ত হয়নি আজিমভ এবং নবীয়েভ। তাদের চোখে প্রশ্ন রয়েই গিয়েছিল।

'আমরা আজকের দিন' আবার বলতে শুরু করেছিল আহমদ মুসা, এবং আজকের রাত এই হ্রদ শহর বলখাসেই থাকব। আগামীকাল সকালে আমরা যাত্রা করব কারসাপকের উদ্দেশ্যে।'

'নিশ্চয় বড় কোন পরিকল্পনা আপনার আছে, সেটা কি?' উন্মুখ হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল আজিমভ।

'বলছি। তুমি বলখাসে নেমেই সংবাদ মাধ্যমে খবর পৌঁছাবে, 'সারিজু আণবিক প্রকল্পের শীর্ষ বিজ্ঞানী আবদুল্লাহ আলী নবীয়েভ তার স্ত্রী ও মেয়ে সহ কিডন্যাপ হয়েছিলেন। তাদের প্রতিবেশী একটি দেশে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

দুষ্কৃতকারীরা তার স্ত্রী ও মেয়েকে হত্যা করেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানীকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞানী আজ সকাল দশটায় কারসাপকে ফিরছেন। তিনি এখানে দু'একদিন বিশ্রাম নেবার পর সারিজু প্রকল্পের কাজে যথারীতি যোগদান করবেন।' এই খবর পৌঁছাবার সাথে সাথে তুমি প্রশাসনের কাছে নির্দেশ পৌঁছাবে, আজকের সান্ধ্যকালীন ও কালকের সকালের কাগজে অবশ্যই যেন খবরটি বের হয়। বিশেষ করে এই খবর কারসাপক ও সারিজুর কাগজগুলোতে অবশ্যই যেন ওঠে।'

আহমদ মুসার কথায় হাসি ফুটে উঠেছিল আজিমভের মুখে। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠেছিল, 'বুঝেছি মুসা ভাই আপনি কি ঘটাতে চান।'

'কি?' আহমদ মুসার মুখে হাসি।

'ষড়যন্ত্রকারীদের আপনি দিনের আলোতে আনতে চান। আপনি চান তারা জনাব নবীয়েভকে কেন্দ্র করে সক্রিয় হোক।'

'ঠিক বলেছ আজিমভ। ওরা সক্রিয় না হলে ওদের নাগাল পাওয়া যাবে না।' বলল আহমদ মুসা।

'আপনাকে ধন্যবাদ মুসা ভাই। আপনি যে কৌশল বের করেছেন, আমাদের সামনে এগুবার, আমার মনে হচ্ছে, এটাই একমাত্র পথ।' বলল আজিমভ।

কারসাপক বিমান বন্দর ছোট।

সিঁড়ি লাগল গিয়ে বিমানে।

বিমান বন্দরের ভেতরে ও বাইরে অনেক লোকের সমাগম হয়েছে।

সারিজু আণবিক প্রকল্পের বিশিষ্ট কয়েকজন কর্মকর্তা এবং প্রশাসনের কয়েক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এসেছিলেন বিজ্ঞানী আবদুল্লাহ আলী নবীয়েভকে স্বাগত জানাতে। এছাড়া কিছু পুলিশ ও গোয়েন্দা কর্মকর্তা এসেছিলেন আজিমভকে স্বাগত জানাবার জন্যে।

বিমানের দরজা খুলতেই তাদের কয়েকজন উঠে এল বিমানে। সারিজু প্রকল্পের কর্মকর্তারা তাদের হারানো রত্নকে ফিরে পেয়ে জড়িয়ে ধরল। কুশল

বিনিময় ও প্রাথমিক কথাবার্তার পর তারা নামিয়ে নিয়ে গেল জনাব নবীয়েভ ও আজিমভকে।

তাদের পেছনে পেছনে চলল আহমদ মুসা। এ রকমই পরিকল্পনা ছিল। আহমদ মুসার কারসাপকে আগমন সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়েছে।

লাউঞ্জে এসে আহমদ মুসা পেল সেদিনের সকালের কাগজ। কাগজের প্রথম পাতা চোখের সামনে মেলে ধরতেই খুশী হয়ে উঠল আহমদ মুসা। বিজ্ঞানীর কিডন্যাপ ও প্রত্যাবর্তনের খবরকে পত্রিকার প্রথম বিষয় হিসাবে বিরাট আকারে ছাপা হয়েছে। দুই কলাম ব্যাপী বিরাট ফটো দেয়া হয়েছে বিজ্ঞানীর। তার জীবনী ও কৃতিত্বও ছাপা হয়েছে ঘটনার বিবরণের সাথে।

পড়ল আহমদ মুসা খবরটি।

পড়ে আনন্দিত হলো, সব কথাই খবরে এসেছে। আহমদ মুসার মনে হলো, খবরটা সাধারণ্যে ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে। বাইরের বিরাট লোক সমাগম নিশ্চয় এ কারণেই।

একজন বিমান অফিসারকে কাছে পেয়ে আহমদ মুসা জিজ্ঞাসা করল, 'বাইরে এত লোক সমাগম কেন?'

'বিজ্ঞানী সাহেবের খবর বেরুবার পর এই কান্ড ঘটেছে। তাকে দেখার জন্যে এসেছে মানুষ।' বলল বিমান অফিসারটি।

পুলিশ পরিবেষ্টিত হয়ে লাউঞ্জ থেকে বেরুল বিজ্ঞানী নবীয়েভ। তার সাথে সাথে আজিমভ। পেছনে ভীড়ের সাথে মিশে চলছে আহমদ মুসা।

মানুষ চলার পথের দুধারে দাঁড়িয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছে বিজ্ঞানীকে। পুলিশ নবীয়েভকে কর্ডন করে নিয়ে চলেছে গাড়ির দিকে।

গাড়িতে উঠল গিয়ে নবীয়েভ।

পাশের আরেকটা গাড়িতে উঠল আজিমভ।

একটু দুরে একটা গাড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল আহমদ মুসা। তার চোখ নবীয়েভদের গাড়ির দিকে।

আহমদ মুসার পাশেই আরেকটা গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। সে গাড়িতে ঠেস দিয়ে একজন লোক সিগারেট ফুঁকছিল।

লোকটির পোশাক আহমদ মুসার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। লোকটির পরনে আট সাট জিনসের প্যান্ট, আর গায়ে গেঞ্জি। গেঞ্জিতে ইয়া বড় ভল্লুকের মুখ আঁকা। রুশ-কাজাখ মিশ্র চেহারা লোকটির। লোকটির আরেকটা বৈশিষ্ট্য আহমদ মুসার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সেটা হলো, তার ভাবলেশহীন চেহারা। আহমদ মুসা সহ চারদিকের সবার বিস্মিত দৃষ্টি পুলিশ বেষ্টিত বিজ্ঞানী নবীয়েভের দিকে। একদিকে কিডন্যাপ হওয়া বিজ্ঞানীর আগমন, অন্যদিকে বিপুল পুলিশের সমারোহ। এমন দৃশ্য কারসাপক বিমান বন্দরের জন্যে নতুন। সুতরাং সবার বিস্মিত দৃষ্টি সেদিকেই। কিন্তু এসব কিছুই যেন এই লোকটির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি।

নবীয়েভদের গাড়ি গুলো চলতে শুরু করল। প্রথমে একটি পুলিশের গাড়ি। তারপর স্টার্ট দিয়েছে নবীয়েভের গাড়ি।

সামনের চত্বরের মাঝামাঝি পথ গিয়েছে পুলিশের গাড়ি। ছয় সাত গজের বেশী যায়নি নবীয়েভের গাড়ি। পেছনে আজিমভের গাড়ি সবে স্টার্ট নিয়েছে। এমন সময় প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ হলো। নবীয়েভের গাড়ি টুকরো টুকরো হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ধোয়ায় ঢেকে গেল স্থানটি।

আহমদ মুসা চমকে উঠে ঠেস দেয়া অবস্থা থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াল। হঠাৎ আহমদ মুসা তার পাশের গাড়ি স্টার্ট নেয়ার শব্দ শুনতে পেল। ঝট করে মুখ ফেরাল আহমদ মুসা। দেখতে পেল ড্রাইভিং সিটে ভল্লুকের মাথাওয়ালা গেঞ্জি পরা সেই লোকটি। ঠোঁটে তার হাসি।

ভ্রু কুঁচকালো আহমদ মুসা। নির্বিকার নিরাসক্ত লোকটির হঠাৎ করে হাসি জাগল কেন? বিস্ফোরণ দেখে কি? ঘটনা কি ঘটল না দেখে সে চলে যাচ্ছে কেন?

প্রশ্নগুলোর উত্তর হিসাবে সামনে এল জমাট এক সন্দেহ।

লোকটির গাড়ি তখন চলতে শুরু করেছে।

আহমদ মুসা যে গাড়িটিকে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল তার দিকে তাকাল। দেখল, কি হোলে চাবি। আর গাড়ির ড্রাইভার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটার পর ওদিকে এগিয়ে গেছে।

আহমদ মুসা আর কিছু ভাবল না।

গাড়ির দরজা খুলে ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল। স্টার্ট দিল গাড়ি। লোকটির গাড়ি তখন চত্বরের প্রান্ত পর্যন্ত এগিয়ে গেছে।

আহমদ মুসার গাড়ি ছুটল তার পেছনে।

বিমান বন্দর পেরিয়ে গাড়ি এসে উঠল এয়ারপোর্ট রোডে।

আহমদ মুসার গাড়ি যখন এয়ারপোর্ট রোডে উঠল, দেখল যুবকটির গাড়ি তীর বেগে এগিয়ে যাচ্ছে। লোকটির গাড়ি নতুন। যেন হাওয়ার বেগে ছুটছে গাড়িটি।

আহমদ মুসা তার মাইল মিটারের দিকে তাকিয়ে দেখল ইতিমধ্যেই গাড়িটি ৫০ হাজার মাইল চলেছে। বলা যায় বৃদ্ধ গাড়ি। তবু আহমদ মুসার স্পর্শ পেয়ে প্রাণ প্রাচুর্যে চঞ্চল হয়ে উঠল গাড়ি।

আহমদ মুসার গাড়ি ছুটছে লোকটির গাড়ির পেছনে।

আহমদ মুসার দৃষ্টি সামনে। তার চোখে ভেসে উঠল বিজ্ঞানী নবীয়েভের টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া দেহ। বেদনায় মুচড়ে উঠল হৃদয়টা। সে দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেল, মধ্যএশিয়ার আকাশে কাল মেঘ জমেছে। এ কাল মেঘের সাইক্লোন চায় মধ্যএশিয়াকে বিজ্ঞানী নবীয়েভের মতই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে তার অস্তিত্বের ইতি ঘটাতে।

দাঁতে দাঁত চাপল আহমদ মুসা।

সামনে ছুটে চলা গাড়িটাকে তার মনে হচ্ছে জমাট কাল ষড়যন্ত্রের এক কুৎসিত হাসি। সে হাসি থেকে ঝরে পড়ছে বিজ্ঞানী নবীয়েভের চাপ চাপ লাল রক্ত।

আহমদ মুসা স্পীড বাড়িয়ে দিল তার গাড়ির।

বিচিত্র সব শব্দ তুলে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে চলল গাড়িটি।

সাইমুম সিরিজের পরবর্তী বই

# মধ্য এশিয়ায় কালোমেঘ

## কৃতজ্ঞতায়ঃ

1. Nazrul Islam
2. Osman Gani
3. Ashrafuj Jaman
4. Tuhin Azad
5. Md. Jafar Ikbal Jewel
6. A.S.M Masudul Alam
7. Esha Siddique
8. S A Mahmud
9. Sharmeen Sayema
10. Monirul Islam Moni
11. Sohel Sharif
12. Gazi Salahuddin Mamun
13. Bondi Beduyin
14. Arif Rahman
15. Abu Taher
16. Mohammed Ayub
17. Nazmus Sakib
18. Mohammed Sohrab Uddin
19. Hafizul Islam
20. Lahin New
21. Kayser Ahmad Totonji
22. Ariful Islam Salim
23. Tareq Samsul Alam
24. Sagir Hussain Khan
25. Zahir Raihan
26. Syed Murtuza Baker
27. Elias Hossain
28. Abir Tasrif Anto
29. Shaikh Noor-E-Alam

# সাইমুম-১৬

# মধ্য এশিয়ায় কালোমেঘ

আবুল আসাদ

# ১

সামনের গাড়িটি একই গতিতে এগিয়ে চলেছে। আহমদ মুসা গাড়ির গতি বাড়িয়েও দেখল সামনের গাড়ির গতির কোন পরিবর্তন হলো না। তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে টের পায়নি নাকি! রাস্তায় তেমন গাড়ি ঘোড়া নেই, শুন্যই বলা যায়। টের না পাওয়ার তো কথা নয়। লোকটি অমনোযোগী নাকি! নাকি খুব বেশি আত্মবিশবাসী যে তাদের গতিবিধি কারও নজরে পড়তে পারে না!

আহমদ মুসা গাড়ির গতি স্লো করে দিল। রাস্তায় তাকে ধরে লাভ নেই, ওদের ঠিকানায় পৌঁছা দরকার। আহমদ মুসা নিশ্চিত যে, বিজ্ঞানীদের হত্যা থেকে শুরু করে নবিয়েভের গাড়ি ধ্বংস পর্যন্ত সব কাজ যে ষড়যন্ত্রের ফল তার সাথে সামনের গাড়ির লোকটি অবশ্যই জড়িত। সুতরাং তাকে অনুসরণ করে তাদের ঘাটিতে পৌঁছাতে পারলে বড় একটা কাজ হবে।

এই চিন্তা আহমদ মুসার মনকে অনেক হাল্কা করে দিল। নবিয়েভের এই মৃত্যুর জন্যে সে নিজেকে অপরাধী মনে করছিল। কাগজে নিউজ দিয়ে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে না এলে ষড়যন্ত্রকারীরা এই আগমনের খবর জানতেও পারতো না, বিজ্ঞানী নবিয়েভকে হারানোর মত এই ক্ষতি হতো না। কারসাপকের বিজ্ঞানী নভিয়েভের আগমন সম্পর্কে নিউজ করা ও এই তোড়-জোড় করে আসার মাধ্যমে

আহমদ মুসা চেয়েছিল ষড়যন্ত্রকারীদের দৃশ্যপটে নিয়ে আসতে যাতে তাদের নাগাল পাওয়ার একটা সুযোগ হয়। সে সুযোগ এসেছে বিরাট এক ক্ষতির বিনিময়ে হলেও।

কারসাপক ছোট্ট শহর। মাত্র কয়েক লাখ লোকের বাস। রাস্তায় ভীড় কম। মুল শহরেও রাস্তা ফাকাই বলা যায়। সুতরাং সামনের গাড়িটাকে অনুসরণ করে এগুতে কোনই কষ্ট হলো না আহমদ মুসার।

শহরের পুরানো অংশ।

দু'পাশে পুরানো ধাঁচের বাড়ি। মাঝখানে এবড়ো-থেবড়ো রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলছে গাড়ি। সামনের গাড়িটা দু'শ গজ এর বেশী দূরে না। একই গতিতে এগিয়ে চলছে।

আহমদ মুসা ভেবে পাচ্ছে না গাড়িটার মধ্যে প্রতিক্রিয়া নেই কেন? এতক্ষণেও গাড়িটা কোন সন্দেহ করেনি, এটা স্বাভাবিক নয়। তাহলে কি বৃথাই সে কোন ভূয়া লোককে অনুসরণ করেছে যে কোন সাত-পাঁচে নেই এবং যাকে সন্দেহ করারও কিছু নেই! কিন্তু আহমদ মুসার চোখ তো মিথ্যা বলতে পারে না। লোকটি সম্পর্কে তার যে সন্দেহ, তার মধ্যে কোন খাদ নেই।

তাহলে গাড়িটি কি তার জন্যে কোন ফাঁদ পেতেছে। কথাটা মনে হওয়ার সাথে সাথে চকিতে একবার পেছনটা দেখে নিল। না, পেছনে যতদূর পর্যন্ত চোখ যায়, তাকে ফলো করার মত কোন গাড়ি তার চোখে পড়ছে না। সামনের গাড়িটা অয়্যারলেস মেসেজ পাঠিয়ে সাহায্য ডেকে আনতে এবং ফাঁদে আটকাতে পারে তাকে।

গাড়ি তখন অনেকটা শহরতলী এলাকায় বেরিয়ে এসেছে। দু'ধারে ইতস্তত বিক্ষপ্ত বাড়ি। মাঝখান দিয়ে ভাঙা-চুরা অমসৃণ রাস্তা।

রাস্তার চেহারা দেখেই আহমদ মুসা বুঝতে পারল, বেশিদূর এগোয়নি রাস্তাটা।

সামনেই একটা মোড়। আগের গাড়িটা মোড় পেরিয়ে গেছে।

আহমদ মুসা মোড় পেরিয়ে দেখল,কিছুদূর গিয়ে সামনের গাড়িটা রাস্তা থেকে নেমে যাচ্ছে সরু একটা রাস্তা ধরে। রাস্তাটি কিছুদূর এগিয়ে গাছ-পালা ঘেরা একটা বাড়িতে গিয়ে উঠেছে।

আহমদ মুসা গাড়ি থামল। তারপর গাড়ি ব্যাক করে একটু আড়ালে চলে এল। একটা ঝোপের ফাঁক দিয়ে রাস্তা ও বাড়ির একটা অংশ দেখতে পাচ্ছিল সে। দেখল,সামনের গাড়িটা বাড়িতে ঢুকে গেল। হারিয়ে গেল গাড়িটা গাছ-পালার আড়ালে।

আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি গাড়িটা রাস্তার পাশে একটা ঝোপের আড়ালে রেখে নেমে এল গাড়ি থেকে।

তারপর রাস্তা ধরে সামনের দিকে এগুলো।

রাস্তাটি বাড়ির পাশ দিয়ে সামনে এগিয়ে ফসলের ক্ষেতে হারিয়ে গেছে।

বাড়ির সামনেটা রাস্তার দিকে।

আহমদ মুসা বাড়িটা অতিক্রমের সময় একটা সাইনবোর্ড দেখতে পেল। পড়ল,'পুরানো এ বাড়িটি বাসের জন্য বিপজ্জনক, ভেঙে ফেলার জন্য নির্দিষ্ট।'

'ভেঙে ফেলার জন্যে নির্দিষ্ট বাড়িতে এল কেন?' নিজেকে প্রশ্ন করল আহমদ মুসা। এমন বাড়িতে ক্রিমিনালরা আড্ডা গাড়তে পারতো!' ভাবল সে।

আহমদ মুসা বাড়িতে পেছনে চলে এল। বাড়ির পেছনে ঝোপ-ঝাড় ও গাছ-পালা কিছু বেশি।

একটা গাছের নিচে ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে বাড়িটার দিকে নজর করল সে।

প্রাচীর ঘেরা দু'তলা বাড়ি। খুব পুরানো বাড়ি নিঃসন্দেহে, তবে বাড়ির কোথাও কোন ভাঙা-চোরা তার নজরে পড়ল না।

বাড়িতে ঢুকবে কি না, চিন্তা করল আহমদ মুসা। ইচ্ছা করলে রাস্তাতেই লোকটাকে আটকাতে পারতো, কিন্তু সে দেখতে চায় ওদের আড্ডা, পেতে চায় ওদের ঠিকানা। ঠিকানা একটা পেয়েছে, ঢুকবে কি ভেতরে? এখন না ঢুকে রাতেও অভিযান চালানো যেতে পারে। এদের সাথে একটা-দু'টো সংঘাতের চাইতে

এদের সম্পর্কে জানাই এখন সবচাইতে বেশি প্রয়োজন। কিন্তু রাত পর্যন্ত ওদের সময় দিলে চিড়িয়া যদি উড়ে যায়।

অবশেষে ঝোপের আড়ালে বসে পর্যবেক্ষণের সিদ্ধান্ত নিল। কেউ আসে কি না, কেউ বেরিয়ে যায় কি না, এটা দেখা যাবে। প্রয়োজন হলে বেরিয়ে যাওয়া লোককে অনুসরণও করা যাবে, আর তাতে ওদের আরও ঠিকানা জানার সুযোগ হতে পারে।

আহমদ মুসা বেড়ালের মত নিঃশব্দে প্রাচীরের পাশ দিয়ে বাড়ির সামনের দিকে এগুলো।

হঠাৎ আহমদ মুসা অনুভব করল তার গায়ে যেন কিছু এসে পড়ল। বুঝে উঠার আগেই সে দেখল, পেট বরাবর দুই হাত সমেত তার দেহ বাঁধা পড়েছে ফাঁসে।

বুঝে উঠেই ফাঁসটি ঢিলা করার জন্যে সে পিছু হটতে শুরু করেছে। কিন্তু লাভ হলো না। আরও একটা ফাঁস এসে অক্টোপাশের মত গলা পেঁচিয়ে ধরল।

আহমদ মুসা স্থির দাড়িয়ে গেল। বুঝল, এখন ছুটাছুটি করার অর্থ ফাঁসকে আরও কার্যকরী করা।

আহমদ মুসা মাথাটা ঘুরিয়ে নিল পেছন দিকে। দেখল, প্রাচীরের উপর দু'জন লোক ফাঁস ধরে দাঁত বের করে হাসছে।

আহমদ মুসা তাকাতেই ওদের একজন বলল, বাঃ বুদ্ধিমানতো তুমি, ছুটাছুটি না করে সুবোধ বালকের মত দাঁড়িয়ে গেলে!

ওরা দু'জন নেমে এলো প্রাচীর থেকে।

আহমদ মুসাকে ওরা বাঁধতে বাঁধতে বলল, 'কে গো তুমি? সরকারি টিকটিকি না সৌখিন কেউ?'

আহমদ মুসা কোন উত্তর দিলো না।

ওরা আহমদ মুসাকে একটা ধাক্কা দিয়ে সামনে ঠেলে বলল, 'চল কথা বলতে হবে বাছাধন।'

বলে আহমদ মুসাকে নিয়ে চলল গেটের দিকে।

গেট দিয়ে তারা প্রবেশ করলো ভেতরে। বাড়িটাকে পুরানো, পরিত্যক্ত বলে মনে হলে কি হবে, গেটটা আধুনিক। স্বয়ংক্রিয়। ওরা গেটের কাছে যেতেই গেটটা অটোমেটিক খুলে গেল।

ভেতরটাও আধুনিক বলা যায়। বেশ সাজ-গোজ আছে।

মূল একটি হল ঘরকে কেন্দ্র করে চারদিক গড়ে উঠেছে ঘরের সারি। গেট দিয়ে প্রবেশ করার পর একটা করিডোর পেরুলেই সেই হল ঘর।

হলঘর দিয়ে পুব পাশের একটা ঘরে প্রবেশ করাল।

ঘরে প্রবেশ করেই দেখতে পেল গাড়ি ড্রাইভ করে আসা লোকটিকে। বসেছিল একটা চেয়ারে।

আহমদ মুসা ঘরে ঢুকতেই লোকটি উঠে দাড়াল। এগিয়ে এসে মুখোমখি হল আহমদ মুসার। তার কোটের কলার ধরে বলল, 'ফলো করা হয়েছিল কেন? টিকটিকি না কে তুমি?'

'ফলো করেছিলাম কে বলল?'

কোন জবাব দিল না লোকটি।

গাড়ি ড্রাইভ করে আসা লোকটি তার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করল।

আহমদ মুসা কোন জবাব দিল না।

সেই দু'জনের একজন বলল, 'কথা বলে না বস। প্যাঁচ আছে নিশ্চয়।'

'প্যাঁচ সোজা হয়ে যাবে দু'দিনেই। মুখ খুলতেই হবে। তবে ভয় পাওয়ার কিছু নেয়, কথা আদায় করার জন্যে 'মধ্যযুগীয়' ধরনের কোন শাস্তি আমরা দেইনা। ওতে ওযথা কষ্ট করতে হয়। আমরা কোন কষ্ট করতে রাজি নই, এমন ধরনের কাজে মূল্যবান বুলেট নষ্ট করতেও রাজী নই। আমাদের গ্রেট বিয়ার কথা বের করার একটা আধুনিক পন্থা বের করেছে। পন্থাটিতে কোন খরচও নেই, আবার আমাদের কোন কষ্টও নেই। যতদিন কথা না বলছ, ততদিন খাবার এবং পানি পাবে না। বল, রাজী?'

'পন্থাটা আধুনিক নয়, মধ্যযুগীয়ও নয়, একেবারে প্রাচীন যুগীয়।'

'ক্ষতি নেই। খাওয়াটা প্রাচীন যুগ থেকেই আসছে।'

বলেই লোকটি দু'জন সাথীর দিকে চেয়ে বলল, ‘এর ফটো নাও, তারপর তিন তলায় নিয়ে কুঠরীতে ঢুকিয়ে দাও।’

তিন তলার কুঠরী সিঁড়ি ঘরের একটা অংশ। বাতাস আসার জন্যে কয়েকটা ঘুল ঘুলি ছাড়া কোন জানালা নেই। একটা দরজা। কাঠের। কিন্তু আহমদ মুসার মনে হল দরজাটা লোহার চেয়েও শক্ত হবে।

আহমদ মুসাকে ঘরের ভেতর ঠেলে দিয়ে ওদের একজন বলল, ‘তোমাকে যা জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তার যদি জবাব দিতে চাও তাহলে এখান থেকেই বলবে আমরা শুনতে পাবো। তখন আমরা চিন্তা করব কি করা যায়। আর যদি জবাব দিতে না চাও তাহলে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় শুকিয়ে শুকিয়ে এখানেই মরবে। লাশ আমরা নিতে আসবো না। ভবিষ্যতে কেও তোমার মত এলে তোমার হাড়-গোড়, কাপড়-চোপড় সেই এদিক ওদিক করবে।’

কথা শেষ করেই হ্যাচকা এক টানে দরজা লাগিয়ে দিল। দরজা তালা লাগানোর শব্দ পাওয়া গেল ভেতর থেকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘরের অন্ধকার গা সহা হয়ে গেল আহমদ মুসার। ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হয়ে উঠল ঘরের ভেতরটা। ঘরের এক কোনে ভাঙা একটা চেয়ার দেখতে পেল আহমদ মুসা।

চেয়ারের দিকে কয়েক পা এগিয়ে ভালো করে তাকাতেই চমকে উঠল আহমদ মুসা। দেয়াল ও চেয়ারের মাঝখানে মানুষের মাথার দু’টি খুলি। সেই সাথে দেখতে পেল মানুষের দু’টি কংকাল। কংকালে কাপড় জড়ানো।

সোজা হয়ে দাঁড়াল আহমদ মুসা। যন্ত্রনাদায়ক এক শীতল স্রোত বয়ে গেল তার গোটা শরীরে। তাহলে ওরা ঠিকই বলেছে, ওদের কাছে আত্মসমর্পণ ছাড়া এ বন্দীখানা থেকে কারও মুক্তি নেই। কংকাল দু’টি কোন হতভাগাদের? শ্রদ্ধায় আহমদ মুসার মাথা নত হয়ে এল ওদের প্রতি। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ওরা তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেছে এবং এক সময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। তবু ওরা শত্রুও কাছে মাথা নত করেনি। অবশ্য মাথা নত করলেও কেউ ওদের হাত থেকে বাঁচার কথা নয়। হয়তো এই হতে পারতো যে, মৃত্যুটা তাদের আরও দ্রুততর ও আরামের হতো।

কারা ছিল ওরা?

তা জানার ভীষণ কৌতুহল হল আহমদ মুসার।

এগিয়ে গেল সে কংকালের দিকে।

কংকাল দু'টির জামা-কাপড় সার্চ করল আহমদ মুসা।

কিছুই পেল না।

পকেট শূন্য।

অবশেষে একজনের বেল্ট পরীক্ষা করতে গিয়ে এর গোপন পকেটে পাওয়া গেল ক্ষুদ্র একটি চিরকুট। ঘুলঘুলির সামনে নিয়ে কাগজের দিকে তাকাতেই দু'লাইন লেখা চোখে পড়ল। প্রথম লাইনে লেখা 'রক' এবং দ্বিতীয় লাইনে '৭, দক্ষিন কারসাপক এভনিউ।' পেন্সিলে লেখা। লেখার চারদিক দিয়ে বৃত্তের মত আঁকা। চিরকুটের উল্টো পৃষ্ঠায় আঁকা অর্ধ চন্দ্র, তার মধ্যে চারটি অংক '০১১১' লেখা।

পড়ার সংগে সংগেই আহমদ মুসার মনে হল, আগেরটা নিশ্চয়ই এই কংকালের নাম ঠিকানা আর অংকটা কোন কোর্ড নাম্বার।

খুশী হলো আহমদ মুসা। এই হতভাগার ঠিকানা অন্তত জানা গেল। খবর দেয়া যাবে তার আত্মীয় পরিজনদের, জানা যাবে তার এ মর্মান্তিক মৃত্যুর রহস্য।

কিন্তু পরক্ষনেই আহমদ মুসার মনে উদয় হলো, সে কি এখান থেকে বাইরে বেরুতে পারবে? না সেও পরিণত হবে ঐ রকম কংকালে!

কথাগুলো মনে হতেই হঠাৎ করে আহমদ মুসার পেটটা ক্ষুধায় জ্বলে উঠল।

এখন বেলা কত হবে? ওরা হাতের ঘড়ি খুলে নিয়েছে। তবু বলা যায়, খুব বেশী হলে বেলা বারোটা হবে। ভোরে নাস্তা করে তারা বের হয়নি বটে, তবে বিমানে হালকা নাস্তা হয়েছে। সুতরাং এতটা ক্ষুধা লাগার তো কথা নয়। ভাবল, আসলে ব্যাপারটা সাইকোলজিক্যাল। ক্ষুধা তৃষ্ণা মেটানোর কোন ব্যাবস্থা নেই বলেই হয়তো ক্ষুধা তৃষ্ণার অনুভূতি তীব্র হয়েছে।

রাতের দিকে ক্ষুধা-তৃষ্ণা সত্যিই আহমদ মুসাকে পীড়িত করে তুলল।

রাত কতটা হয়েছে কে জানে।

আহমদ মুসার চোখে ঘুম নেই। অবশ্য ঘুমাবার পরিবেশও নয়। এক ইঞ্চি, দেড় ইঞ্চি পুরু ময়লা ঘরের মেঝেতে। একটা ভাঙা চেয়ার ছিল, তাও দিনের বেলা সম্পুর্ণ ভেঙে পড়েছে তার বসার কারনে।

দেয়ালে ঠেস দিয়ে ধুলা-ময়লার ওপরেই বসে আছে আহমদ মুসা। কিন্তু এই ধুলা-ময়লার মধ্যে শোয়ার কথা মনে হতেই মনটা রি রি করে উঠল তার।

ঘরের ভেতরটায় কাক-কালো অন্ধকার। ঘুলঘুলির মুখে অন্ধকার কিছুটা স্বচ্ছ।

প্রচন্ড একটা অস্বস্তিতে বুকটা ভরে উঠেছে আহমদ মুসার। অস্বস্তি'টা ভয় নয়, উদ্বেগের। উদ্বেগ ওদের ষড়যন্ত্র নিয়ে। ষড়যন্ত্রের পিছু নিয়েছিল সে, কিন্তু এখন সে ষড়যন্ত্রের হাতেই বন্দী।

আহমদ মুসার হঠাৎই মনে হল, এভাবে পরিস্থিতির হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে বসে থাকাটা তার ঠিক নয়। একটা দেয়ালের বেড়াজাল তাকে বন্দী করে রেখেছে। এ দেয়ালটা কি অভেদ্য?

মনে পড়ল আহমদ মুসার দিনের বেলা সে দেখেছে দরজার বিপরীত দিকের দেয়ালের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় মেঝের ফুট তিনেক উপরে দেয়লের প্লাষ্টার খসে পড়েছে এক বর্গফুট পরিমান জায়গার। দেখা গেছে দেয়ালটা ইটের। ইট গুলো ক্ষয়িষ্ণু বার্ধক্যের ভারে। দুই ইটের মাঝখানের চুন-সুরকির বাঁধন আলগা হয়ে গেছে।

দিনের বেলায় দেখা এ দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই মন বলল, একটা শাবল হলে খুব সহজেই এ দেয়ালে একটা সুড়ঙ্গ বের করা যায়।

এই সময় হঠাৎ আহমদ মুসার মনে পড়ল ভাঙা চেয়ারটার কথা। চেয়ারের লোহার একটা পায়া কুশন বরাবর ভেঙে একদম আলগা হয়ে গেছে। মনে পড়ল পায়াটার ভাঙা মাথা চ্যাপ্টা এবং বেশ চোখা।

আহমদ মুসার মনটা খুব খুশী হয়ে উঠল।

আহমদ মুসা বসা থেকে উঠে দাঁড়াল। কয়েক পা এগিয়ে হাতড়িয়ে চেয়ারের ভাঙা পায়াটি তুলে নিল। হাত দিয়ে ভাঙা মাথাটা পরখ করল। যথেষ্ট তীকষ্ণ এবং মাথাটা চ্যাপ্টা হওয়ায় কারনে বেশ সূঁচালো।

আহমদ মুসা এগুলো দেয়ালের দিকে। দেয়াল হাতড়ে সে পেয়ে গেল প্লাষ্টার খসে পড়া জায়গাটা।

তারপর জায়গাটার ঠিক মাঝ বরাবর দুই ইটের মধ্যেকার ফাঁক খুঁজে নিয়ে তাতে ভাঙা পায়ার তীকষ্ণ মাথাটা ঢুকিয়ে দিল। পায়াটি চাপ দিয়ে এপাশ-ওপাশ করে দুই ইটের মাঝের ফাঁক বড় করতে এবং পায়াটি গভীরে ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা করতে লাগলো। এই ভাবে ঘন্টা খানেকের গলদ ঘর্ম প্রচেষ্টায় একটি ইট খসিয়ে ফেলতে সফল হলো সে।

আনন্দ ফুটে উঠল আহমদ মুসার চোখে মুখে। এইবার আশে-পাশের ইটগুলো খুলে ফেলা সহজ হবে।

হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছে আবার কাজে লেগে গেল আহমদ মুসা।

অবশেষে দেয়ালের গায়ে সুড়ঙ্গ একটা হয়ে গেল। আহমদ মুসার গা দিয়ে দরদর করে নামছে তখন ঘাম। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর, ক্লান্তিতে অবসন্ন শরীর তার ভেঙ্গে পড়তে চাইছে।

সত্যি দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না আহমদ মুসা! হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মেঝের ওপর। দেয়ালে মাথা ঠেস দিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল। তার পর উঠে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে এল সুড়ঙ্গ পথে। বাইরে মুক্ত-শীতল বাতাস আহমদ মুসার কাছে অমৃত মনে হল। মন চাইল ক্লান্ত দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে ছাদের ঠাণ্ডা বাতাসে ঘুমিয়ে নেয় প্রাণ ভরে। কিন্তু উপায় নেই। ভোর হবার আগেই তাকে এখান থেকে সরতে হবে। তার আগে এদের পরিচয় উদ্ধার করা তার প্রয়োজন। সে পালিয়েছে দেখতে পেলেই এরা এখান থেকে হাওয়া হয়ে যাবে , হাত ছাড়া হয়ে যাবে ওরা। বিজ্ঞানী নবিয়েভের মৃত্যু তাহলে বৃথাই যাবে।

ছাদ থেকে নামার সিঁড়ির দিকে এগুবার জন্য পা বাড়াতেই পায়ের তলায় মৃত কম্পন অনুভব করল আহমদ মুসা।

দাঁড়িয়ে পড়ল আহমদ মুসা। উৎকর্ণ হলো।

কম্পনটা বাড়ছে এবং ধীরে ধীরে একটা শব্দও ক্রমে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে।

নিশ্চিত হলো আহমদ মুসা, সিঁড়ি দিয়ে কেউ উঠে আসছে। ছাদে আসছে কি এবং তারই কাছে? তাহলে তো তার পালানো ধরা পড়ে যাবে এক্ষণি।

আহমদ মুসা চারদিকে তাকাল, কোন দিক যাবে সে, কি করবে?

একবার মনে করল, লাফ দিয়ে নিচে নেমে পড়বে। কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তা করলো, এতে ঝুকি আছে। লাফ দিলে নিচে শব্দ হবে এবং প্রহরীও থাকতে পারে। তাছাড়া অন্ধকারে লাফ দেয়া, কোথায় পড়বে, কার উপর পড়বে কে জানে।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ আরও স্পষ্টতর হলে অস্থির হয়ে উঠল আহমদ মুসা।

পাশেই একটা পুরানো, মড়চে পড়া পানির ট্যাংকি। ফুটোও হয়ে গেছে জায়গায় জায়গায়। এ চৌবাচ্চা অনেক দিন আগে পরিত্যক্ত হয়ে আছে। এর পাশেই একটা নতুন চৌবাচ্চা।

আহমদ মুসা আর কোন চিন্তা না করে ছুটল পুরানো চৌবাচ্চাটার দিকে। উঠল চৌবাচ্চার মাথায়। চোবাচ্চার ঠাকনাটা আলগা হয়ে আছে। টান দিতেই খুলে গেল। এই সময় কয়েকটি ইঁদুর দৌঁড় দিল ফুটো দিয়ে বেরিয়ে।

আহমদ মুসা নিশ্চিত হলো, অন্তত চৌবাচ্চার অন্ধকার পেটে সাপ-টাপ নেই।

আহমদ মুসা বিসমিল্লা বলে লাফ দিল চৌবাচ্চার অন্ধকার পেটে।

হুটপুট কিছু শব্দ হলো চৌবাচ্চার ভেতর। শব্দ শুনে বুঝল আরও কিছু ইঁদুর বেরিয়ে গেল।

আহমদ মুসা চৌবাচ্চার তলায় দাঁড়িয়ে আস্তে অতি কষ্টে চৌবাচ্চার ঢাকনাটা সেট করল চৌবাচ্চার মুখে। ঢাকনাটা মুখে বসল না, কিন্তু কোন রকমে সেট যে হয়েছে এতেই আহমদ মুসা আল্লার শুকরিয়া আদায় করল।

ছাদের উপর কথা শুনতে পেল আহমদ মুসা। সেই সাথে দেখতে পেল আলোর চিহ্ন। একাধিক জনের কণ্ঠ।

কয়েক মুহূর্ত পরে কথা আরও নিকটতর হলো, আলোও উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল।

ওরা চলে এসেছে। একজন চিৎকার করে উঠল, ‘একি! সর্বনাশ! শয়তানের বাচ্চা পালিয়েছে।’

এক সংগে কয়েকটি পায়ের শব্দ হলো। ওরা সকলে ছুটে গেল ঘরের দিকে। তারপর হৈচৈ করে উঠল, ‘শয়তানের বাচ্চা পালিয়েছে, দেখ কোথায় গেল কোন দিকে গেল।’

ওরা ছুটল ছাদের বিভিন্ন দিকে। ছুটাছুটি হাঁকাহাঁকি করল কিছুক্ষণ।

একটু পর একজন উচ্চ কণ্ঠে বলল, ‘থাক, বাদ দাও। যে দেয়াল ভেঙ্গে বেরিয়েছে সে ধরা দেবার জন্যে বসে নেই।’

একটু দূরে ছাদের ওপর সবাই একত্রিত হলো। লোক ওরা চারজন। ফুটো দিয়ে গুনে দেখল আহমদ মুসা।

ওদের চারজনের একজন বলল, ‘শয়তানটা দেয়াল ভেঙ্গে পালাতে পারল?’

‘দেখেই বুঝেছি ঘাগু শয়তান।’ বলল অন্য একজন।

‘না হলে একা কেউ শক্রুর ঘাটিতে পা দেয়। দেখনি, ধরা পড়ার পর ব্যাটার মুখে চিন্তার একটা রেখাও পড়েনি।’ বলল আরেক জন।

‘চিন্তার বিষয় হলো লোকটা কে ছিল? আমরা আর এক মুহূর্ত এখানে নিরাপদ নই। যে কোন মুহূর্তে এখানে হামলা হতে পারে।’ বলল চতুর্থ ব্যক্তিটি।

‘ওরা এখনি তো এসে পড়বে বলে জানাল। আমরা তো ওদের সাথে চলে যেতে পারি।’ বলল প্রথম জন।

‘সেটাই চিন্তা করছি।’ বলল আবার সেই চতুর্থ জন।

হঠাৎ তারা সবাই চুপ হয়ে গেল।

আহমদ মুসা প্রায় রুদ্ধ শ্বাসে চৌবাচ্চার ভেতরে বসে। গায়ে উঠছে আরশুলা ও নানা ধরনের পোকা-মাকড়। কয়টাকে সরাবে! নড়া-চড়া করতে পারছে না সে। কারণ ভয় পেয়ে আরশুলা-ইঁদুররা যদি ছুটাছুটি শুরু করে তাহলে এটা ওদের চোখে পড়তে পারে।

আহমদ মুসা বিস্মিত হলো, ওরা হঠাৎ চুপ করে গেল কেন! আর ওরা কাদের আসার কথা বলল? কে আসছে এক্ষুণি এখানে?

নিঃশব্দে ইঞ্চি ইঞ্চি এগিয়ে ট্যাংকির ফুটোয় চোখ লাগাল সে। সামনে ছাদের গোটা অংশ তার সামনে পরিস্কার হয়ে উঠল।

দেখলো আহমদ মুসা, ওদের চারজনের দৃষ্টি ওপরের দিকে। কি যেন দেখছে ওরা।

'কি দেখছে ওরা?' বিস্মিত মন থেকে প্রশ্ন উঠল আহমদ মুসার। ওদের অনুসরণে মুখটা একটু নিচে নামিয়ে ওপর দিকে তাকাল আহমদ মুসা।

ওপরে তাকিয়েই চোখটা আটকে গেল আহমদ মুসার। ক্ষুদ্র একটি প্লেন নেমে আসছে ছাদের ওপর। প্লেনটার আকার একটি ট্রাকের চেয়ে বড় হবে না। প্লেনে কোন আলো নেই। নিঃশব্দে আসছে।

আহমদ মুসা যেন বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেছে। এমন প্লেন তো মধ্য এশিয়ায় নেই। এই ধরনের সসার জাতীয় প্লেন রাশিয়াও তৈরী করছে বলে কোন তথ্য নেই। তাহলে? এটা কার প্লেন, কোন দেশের প্লেন, এদের কাছে আসছে কেন, এরা কারা? এসব অনেক প্রশ্ন এসে ভীড় জমাল আহমদ মুসার মনে।

অবাক বিস্ময়ে আহমদ মুসা দেখল, ছাদের ফ্লোর থেকে মাত্র গজ চারেক ওপর থাকতে প্লেনের পেট থেকে তিনটি পা নেমে এল।

নিঃশব্দে ছাদে ল্যান্ড করল সসার প্লেনটি।

মিনিট খানেক পর প্লেনের দরজা খুলে গেল। খোলা দরজা পথে নেমে এল স্যুট, টাই পরা দু'জন। ওদের চেহারা দেখে আহমদ মুসা দ্বিতীয়বার চমকে উঠার পালা। খাস রাশিয়ান চেহারা। রাশিয়ান কি?

ওদের দু'জনের একজন নেমেই দ্রুত এগিয়ে এল অপেক্ষমান চারজনের দিকে। হ্যান্ডশেক করল এবং সেই সাথে দ্রুত বলল, 'এখন এখানে আসার কথা ছিল না, তবু আসতে হলো। বন্দী কোথায়?'

'গতকাল আমরা যাকে ধরেছিলাম?'

'হ্যাঁ।'

'পালিয়েছে। ঐ দেখুন দেয়াল ভেঙ্গে পালিয়েছে।' উত্তরদাতা লোকটি আঙুল দিয়ে দেখাল বন্দীখানার দিকে।

সসার প্লেন থেকে নেমে আসা লোকটি এই উত্তর শুনেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল।

'কি ব্যাপার, কি হলো?' বলল চারজন প্রায় সমস্বরেই।

'সর্বনাশ হয়েছে। মহাধন হাতে পেয়েও আমরা হারালাম। আপনাদের পাঠানো লোকটির ফটো মস্কো পৌঁছার সংগে সংগেই আমাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আজ রাতের একমাত্র কাজ লোকটিকে মস্কোতে গ্রেট বিয়ারের হেডকোয়ার্টারে পৌঁছানো।'

'কে লোকটি।'

'আহমদ মুসা।'

'আহমদ মুসা! ও গড!' প্রায় চিৎকার করে উঠল ওরা চারজন।

'যদি জানতাম, তাহলে একদিন কেন এক'শ দিন রাত জেগে পাহারা দিতে হলেও দিতাম।' বলল একজন।

'বসে বসে পাহারা দিলেই কি ওকে আটকানো যেত? ও আহমদ মুসা, ওর অসাধ্য কিছু নেই আমি জানি।' বলল প্লেন থেকে নেমে আসা আগের লোকটি।

'কিন্তু লোকটিকে সরল, শান্ত, ভদ্র লোক বলে মনে হয়। এই লোকটিরই নাম এত, শক্তি এত?' বলল চারজেনর একজন।

'আজ জগতের বিপ্লবীদের মধ্যে এই অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য শুধু আহমদ মুসারই আছে।'

কথা শেষ করেই সসার প্লেন থেকে নেম আসা লোকটিই আবার বলল, 'মস্কোর কর্তারা এই খবর পেলে ভীষণ রাগবেন। মধ্য এশিয়ায় আহমদ মুসার আগমনে তারা ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়েছেন।'

'একজন মানুষকে নিয়ে এত উদ্বেগ?' বলল চারজনের সেই লোকটিই।

'সে একজন নয়, তার সাথে এদেশের সব মুসলমান ও সরকারকে যোগ করতে হবে।'

'ঠিক আছে, এত উদ্বেগ তাই বলে আমরা কি দূর্বল?'

'আমরা দুর্বল নই, উদ্বেগের কারণ, আমাদের পরিকল্পনা বোধ হয় আহমদ মুসা জানতে পেরেছে?'

‘কেমন করে এটা বুঝা গেল?’

‘আহমদ মুসা ছোট-খাট কাজ নিয়ে কোথাও যায় না।’

একটা ঢোক গিলেই আবার সে বলা শুরু করল, ‘আর দেরী নয়। তোমরা চার জন এস। যে কোন সময় এখানে হামলা হতে পারে। ঘাটিতে তোমাদের নামিয়ে দিয়ে আমরা কাজে যাব।’

‘আজকে আবার কি কাজ?’

‘কেন কাজের শেষ আছে?’ গত কয়েকদিন কিরগিজিয়ার তুলা ক্ষেতে স্প্রে করেছি। তারও আগে কাজ করেছি তাজিকিস্তানের তুলা ক্ষেতে। আজ কাজাখ তৃণ-ভূমি ও ভেড়ার পালের ওপর স্প্রে করব।’

‘ভেড়ার ওপরও কাজ দেবে এসব?’

‘না, ভেড়ার জন্যে স্প্রে আলাদা। খুব নির্ভরযোগ্য এ ঔষধ। এ স্প্রে নেবার পর ভেড়াগুলো তাদের শক্তির তারতম্য অনুসারে তিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে মারা যাবে। একেবারে ন্যাচারাল ডেথ। সুস্থ ভেড়াগুলো হঠাৎ করেই মারা যাবে। সাধারন কোন পরীক্ষাই তাদের রোগ চিহ্নিত করতে পারবে না।’

‘মানুষের জন্যে এমন স্প্রে নেই?’

‘আছে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে ধরা পড়ার সম্ভাবনা আছে। চেষ্ঠা হচ্ছে নিরাপদ কিছু আবিষ্কারের। গ্রেট বিয়ারের সব চেষ্টা এখন এ কাজেই নিয়োজিত।’

আহমদ মুসা রুদ্ধ শ্বাসে শুনছিল কথাগুলো। পোকা-মাকড়ের কথা সে ভুলে গেছে। তার সারা গায়ে আরশুলা, পিঁপড়া কিল-বিল করছে, কিন্তু সেদিকে কোন খেয়াল তার নেই। যেন চামড়ায় কোন অনুভূতি তার নেই। তার ভেতরটা উত্তেজনায় কাঁপছে। গা ধুয়ে যাচ্ছে ঘামে।

এক এক করে ওরা সেই সসার প্লেনটায় উঠছিল। প্লেনের ডিজাইনটা ঠিক মহাশূন্য খেয়ার মত।

আলাপরত দু’জন তখনও নিচে দাঁড়িয়ে। চার জনের একজন জিজ্ঞাসা করল, ‘আমাদের এ প্লেন ওরা এখনও দেখতে পায়নি বোধ হয়?’

‘না দেখতে পাবার প্রশ্ন নেই। ওদের রাডারে কোন দিনই এটা ধরা পড়বে না। আমরা তো নিঃশব্দে গাছের মাথা দিয়ে অথবা মাটির কয়েক গজ উপর দিয়ে বিচরণ করি। রাতে কেউ দেখতে পেলেও মনে করে, কোন বড় পাখি উড়ে গেল। আর দেখতে পেলে ক্ষতি নেই। আমাদের মত ঘন্টায় দশ হাজার মাইল গতিবেগ ওরা পাবে কোথায়। একান্তই দেখতে পেলে মনে করবে, রহস্যময় কোন উড়ন্ত সসার তারা দেখল।’

ওরা দু’জন প্লেনে ওঠার জন্যে পা বাড়াল। চার জনের একজন বলল, ‘সকালেই আমাদের সায়েজু’তে পৌছার কথা। আমাদের ঘাটিতে নয়, সায়েজু’তে পৌছে দেবেন।’

‘ঠিক আছে।’

উঠে গেল সবাই ওদের সসার প্লেন।

বন্ধ হয়ে গেল দরজা সংগে সংগেই।

তারপর ছোট শিষ দেয়ার মত একটা শব্দ হলো এবং তার সাথে সাথেই প্লেনটি তীরের মত সোজা উঠে গেল আকাশে। কোন শব্দ হলো না। কোন আলোও দেখা গেল না প্লেনে।

আহমদ মুসা ভাবল, ওদের প্লেনে সাধারন কোন ফুয়েল ব্যবহার হয়না। নিশ্চয় এ্যান্টি-ম্যাটার ফুয়েল কাজে লাগাবার জ্ঞান তারা আয়ত্ব করেছে। আর সাধারন আলোও তারা ব্যবহার করছেনা। নিশ্চয় মহাজাগতিক রশ্মি ধরনের কোন অদৃশ্য রশ্মি তারা ব্যবহার করছে।

বিস্ময়ে আহমদ মুসার মনটা একেবারে কাঠ হয়ে গেছে। ওরা কারা? মস্কোর নাম শুনা গেল, গ্রেট বিয়ার-এর নামও শুনা গেল। ওটা কি মস্কোর সরকারী কোন সংস্থা? মস্কো-সরকার এই ভয়াবহ ষড়যন্ত্রে নেমেছে?

আহমদ মুসা বেরিয়ে এল চৌবাচ্চা থেকে। ওদের কথা-বার্তা থেকে সে নিশ্চিত, এ বাড়িতে আর কেউ নেই। তবু আহমদ মুসা খুবই সন্তর্পণে ছাদ থেকে সিঁড়িতে নেমে এল।

ওদের রেখে যাওয়া বৈদ্যুতিক লন্ঠন সে ছাদ থেকে নিয়ে এসেছিল। সিঁড়িতে এসে সুইচ টিপে ওটা জ্বালাল।

সত্যিই বাড়িটি শুন্য। কেউ নেই। দু'তলা ও এক তলার সবগুলো ঘর দেখল আহমদ মুসা। সবগুলো ঘরই পরিত্যক্ত। সাজ-গোজ, ফার্নিচার সব ঠিকই আছে, কিন্তু কেউ ব্যবহার করে বলে মনে হলো না। ধুলায় সব একাকার। দেখা গেল, দু'তলার বিশাল হলঘরটাই শুধু সব দিক দিয়ে ঠিক আছে। বুঝা গেল এই হল ঘরটিই শুধু ব্যবহৃত হয়।

আহমদ মুসা বুঝল, এ পরিত্যক্ত ঘোষিত বাড়িটা থাকার জন্য নয়, গোপন-মিটিং-সিটিং এর কাজেই শুধু ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর আহমদ মুসার মত কাউকে ফাঁদে ফেলতে চাইলে তাকে জন মানবহীন এখানে আনা হয়।

আহমদ মুসা হন্য হয়ে খুঁজছিল ওদের কোন দলিল, কোন কাগজ-পত্র পায় কি না। কিন্তু বৃথা চেষ্টা, একটুকরো কাগজও কোথাও পেল না সে। সোফা, ফার্নিচার, টেবিল-ড্রয়ার সব উল্টে-পাল্টেও সে দেখল, কিন্তু ফল কিছু হলো না। আহমদ মুসা মনে মনে ওদের প্রশংসা করল, ওরা যারাই হোক খুব সতর্ক। মন এই সময় বলে উঠল, নিষ্ঠুরতার দিক দিয়েও ওদের হয়তো কোন তুলনা নেই। মনে পড়ল আহমদ মুসার না খাইয়ে শুকিয়ে মারা কংকালের কথা। কাউকে গুলি করে মারার চেয়ে এভাবে মারার জন্যে বহুগুন বেশি নিষ্ঠুরতা চাই।

আহমদ মুসা বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে।

চলে এল গাড়ি যেখানে লুকিয়ে রেখেছিল সেখানে। না গাড়ি নেই।

'তাহলে আমার এখানে গাড়ি রাখা এবং ওদের বাড়ির দিকে যাওয়া সবই টের পেয়েছিল'- ভাবল আহমদ মুসা। আরও ভাবল, আহমদ মুসাকে এইভাবে ফাঁদে ফেলার জন্যেই তাহলে ওরা তাকে এখানে নিয়ে এসেছিল ধীরে সুস্থে।

আহমদ মুসার মনটা খারাপ হয়ে গেল গাড়ি ওয়ালা বেচারার জন্যে। অন্যের গাড়ি সে নিয়ে এসেছিল। বেচারার বিরাট ক্ষতি হলো। কে জানে এই ক্ষতি তার সংসারে কোন বিপর্যয় ডেকে আনবে কি না!

গাড়ির ডাইভিং লাইসেন্সে দেখা নাম ও ঠিকানা আহমদ মুসার মনে আছে। মনে মনে আবার আওড়াল আহমদ মুসা ঐ নাম ও ঠিকানা।

এবার রাস্তায় উঠে এল আহমদ মুসা।

তারপর রাস্তা ধরে চলতে শুরু করল শহরের দিকে।

ক্ষুধা তৃষ্ণায় দূর্বল, অবসন্ন শরীর তার।

তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে।

দু'ধারে শহরতলীর বাড়িগুলো ঘুমন্ত। বাড়ির জানালা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে।

রাস্তার আলোগুলো শূন্যদৃষ্টি চোখের মত পান্ডুর।

দু'পাশে অনেক চাইল, পানির কল কোথাও চোখে পড়ল না। কোন রেষ্টুরেন্টও না।

হাতে ঘড়ি নেই।

আকাশে তারার অবস্থান দেখে আহমদ মুসা বুঝল, রাত আড়াইটার মত হবে।

শরীরটা টেনে নিয়ে হেটে চলছে আহমদ মুসা।

কোথায় যাবে কিছুই জানা নেই তার।

কারসাপক শহর তার কাছে নতুন। সরকারী বাড়ি, অফিস-আদালত, ইত্যাদি কোনদিকে কিছুই তার জানা নেই। কোন পুলিশ স্টেশন পেলেও চলত। কিন্তু কোথায় কাকে জিজ্ঞাসা করবে সে!

চলছে আহমদ মুসা।

চলতে কষ্ট হচ্ছে তার। বন্দীখানা থেকে বের হওয়ার জন্যে সুড়ঙ্গ বের করতে গিয়ে যে পরিশ্রম হয়েছে, তার ধাক্কা খাদ্য-পানি বঞ্চিত শরীর সামলে উঠতে পারছে না।

চলতে চলতে হঠাৎ পেছনে গাড়ির শব্দ পেল আহমদ মুসা। পেছনে তাকাল সে। হেডলাইট দেখে বুঝল, গাড়িটা একটা দশটনি বিরাট ট্রাক। কাছে চলে এল।।

আহমদ মুসা বুঝতে পারল না কিসের ট্রাক।

তাই থামাবার জন্য হাত তুলবে কি তুলবে না তা চিন্তা করতে করতেই ট্রাকটা তাকে অতিক্রম করল।

কিন্তু কয়েক গজ সামনে গিয়েই ট্রাকের স্পীড কমে গেল। গাড়ীর হেডলাইটে আহমদ মুসা দেখতে পেল সামনেই একটা স্পীড ব্রেকার।

আহমদ মুসা ছুটল ট্রাকের পেছনে।

ট্রাকটিতে ভেড়া বোঝাই।

ধীরে ধীরে চলছে ট্রাক।

আহমদ মুসা লাফ দিয়ে ট্রাকের পেছনের সাটার ধরে ঝুলে পড়ল এবং ধীরে ধীরে উঠে বসল। সম্ভবত অনাকাঙ্খিত অতিথীর আগমনে কয়েকটা ভেড়া ভ্যা ভ্যা করে উঠল।

প্রমাদ গুনল আহমদ মুসা। ভেড়াগুলো যদি তাদের ডাক অব্যাহত রাখে তাহলে ট্রাক থামিয়ে ওরা কি ঘটেছে তা দেখতে আসতে পারে।

আহমদ মুসা ট্রাকে উঠেই গাদাগাদি ভেড়ার পাশে শুয়ে পড়ল। মনে হয় ভেড়াকুল এটা দেখে এবং তাদের কোন ভয় নেই ভেবে চুপ করে গেল। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল আহমদ মুসা।

ট্রাকটা স্পীড ব্রেকার পেরিয়ে আবার পূর্ণ বেগে চলতে শুরু করেছে।

অনেক চলল। আহমদ মুসা অনুমান করল দশ মিনিট হবে কমপক্ষে। আহমদ মুসা অনুভব করল, ট্রাকটি বেশ অনেকক্ষণ ধরে মসৃণ রাস্তার ওপর দিয়ে চলছে। অর্থাৎ শহরতলীর সেই এ্যাবড়ো-থেবড়ো রাস্তা পেরিয়ে গাড়ি এখন মূল শহরে প্রবেশ করেছে।

আরও কিছুক্ষণ চলার পর ট্রাকের গতি আবার ধীর হয়ে এল।

আহমদ মুসা উঠে বসল। চিন্তা করল, আর নয়। তাকে এখন নামতে হবে। ট্রাকটা নিশ্চয় ভেড়াগুলো নিয়ে শহরের কোন কশায় খানাই, অথবা শহরের বাইরে কোন ফার্মে যাচ্ছে। দু'জায়গার কোনটাই তার জন্যে অনূকুল নয়। মূল শহরে সে গাড়ি-ঘোড়া পাবে, পুলিশ পেলেও তার চলবে।

আহমদ মুসা লাফ দিয়ে নেমে এল ট্রাক থেকে। নেমে আশে-পাশে সে কাউকেই দেখল না।

প্রশস্ত রাস্তা। দু'পাশে বড় বড় বাড়ি। মাঝে মধ্যে দোকানও দু'চারটা আছে।

আহমদ মুসা রাস্তা থেকে উঠে এল ফুট পাথে। পোশাক ঝেড়ে-ঝুড়ে যথাসম্ভব ধুলা-বালি থেকে মুক্ত হতে চেষ্টা করল আহমদ মুসা।

রাস্তার নাম পড়ল সে। নামটা তার পরিচিত মনে হলো। হঠাৎ তার মনে পড়ল, বন্দীখানায় কংকালের পকেট থেকে পাওয়া চিরকুটে এই রাস্তার নামই সে পড়েছে।

আহমদ মুসা পকেট থেকে চিরকুটটি বের করল। আবার পড়ল লেখাটা। রক, ৭, দক্ষিণ কারসাপক এভেনিউ।

আহমদ মুসা মনে করল 'রক' ব্যক্তিরও নাম হতে পারে, আবার হতে পারে বাড়িরও নাম।

চিরকুট থেকে মুখ তুলে সামনের বাড়ির নাম্বার প্লেটের দিকে তাকাল। দেখল বাড়িটি ৪নং দক্ষিণ কারসাপক এভেনিউ। অর্থাৎ এ বাড়িটার দু'টা বাড়ির উত্তর অথবা দক্ষিণে চিরকুটের সেই বাড়িটা হবে।

আনন্দিত হয়ে উঠল আহমদ মুসা। কংকালে পরিণত হওয়া লোকটির বাড়ি পেয়ে গেলে এবং সেখানে তার খবর পৌঁছাতে পারলে আহমদ মুসার বড় একটি দায়িত্ব পালন হবে।

আহমদ মুসা ফুটপাত ধরে উত্তর দিকে এগুলো। আরেকটা বাড়ি পেয়ে গেল। নাম্বার পাঁচ। অর্থাৎ আর একটা বাড়ি পরেই চিরকুটের সেই ৭ নাম্বার বাড়িটা।

সাত নাম্বার বাড়ির সামনে গিয়ে পৌঁছল আহমদ মুসা।

তিন তলা বিরাট বাড়ি। বাড়ির তিন পাশেই বাগান। সামনে বড় একটা লন। গ্রীলের দরজা। দরজা বন্ধ।

গেট ঘেঁষে দাঁড়াল আহমদ মুসা। নাম্বার প্লেটে শুধু লেখা, ৭, দক্ষিণ কারসাপক এভেনিউ। আহমদ মুসা ভাবল, 'রক' তাহলে বাড়ির নাম নয় কোন ব্যক্তির নাম হবে। হয়তো কোন নামের আগে-পিছের কোন অংশ এটা।

আহমদ মুসা বাড়ির দিকে তাকাল। গাড়ি বারান্দায় আলো দেখা যাচ্ছে। আলো দেখা যাচ্ছে সিড়িঁ ঘরগুলোতেও। বাড়ির ভেতর থেকে মিষ্টি ইংরেজী

বাজনা ভেসে আসছে। পা চঞ্চলকারী ছন্দ তাতে। ‘ভেতরে নাচ হচ্ছে নাকি’- ভাবল আহমদ মুসা। যাক, মানুষ যে জেগে আছে এটাই তার জন্যে সুখবর।

গেটের সাথে লাগানো দারোয়ান কক্ষ অথবা গার্ড রুম।

আহমদ মুসা নক করল গেটে।

মুহূর্ত কয়েক পরেই গার্ড রুমের ছোট গবাক্ষে একটা মুখ দেখা গেল। মাথায় একটা চুলও নেই। রুশ চেহারা। চোখে-মুখে একটা কাঠিন্য। ছ্যাৎ করে উঠল আহমদ মুসার বুক। এমন কাউকে দেখবে সে আশা করেনি।

মুখটি গবাক্ষে দেখা দিয়েই বলল, কি চাই, কাকে চাই?

আহমদ মুসা মুহূর্ত কয়েক চিন্তা করল এবং তারপর বলল, ‘রক।’

মুহূর্তেই মুখটি সরে গেল।

গার্ড রুমের ভেতর থেকে কথা ভেসে এল। মনে হলো টেলিফোনে কারও সাথে কথা বলল।

অল্প পরেই গেট রুমের সাথে লাগানো স্টিলের একটা দরজা খুলে গেল।

সেই মাথা চাঁছা লোকটি দরজায় এসে বলল, আসুন।

আহমদ মুসা ঢুকে গেল ভেতরে।

পেছনে নিঃশব্দে দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

আহমদ মুসা পেছনে তাকাল। তাকিয়েই চমকে উঠল। দুটো পিস্তল তার দিকে হা করে আছে। রুশ চেহারার দু'জন গুন্ডা মার্কা লোক। সাপের চোখের মত কুতকুতে তাদের চোখ।

আহমদ মুসা চাইতেই ওরা পিস্তল দিয়ে ইশারা করে সামনে হাঁটতে বলল।

হাঁটতে শুরু করল আহমদ মুসা। ঘটনার এই নাটকীয় পরিবর্তনে আহমদ মুসা যতখানি না চিন্তা করছে, তার চেয়ে বেশি পীড়া অনুভব করছে এই চিন্তায় যে, এরা কারা? কংকাল-লোকটির দলের বা পরিবারের লোক এরা হবে, তা এখন মনে হচ্ছে না। অবশ্য কংকাল লোকটিও যদি কোন সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপের সদস্য হয়ে থাকেন তাহলে অন্য কথা।

আগে আগে হাঁটছে আহমদ মুসা। পেছনে দুই অস্ত্রধারী। আহমদ মুসা মাথাটা একটু ঘুরিয়ে প্রশ্ন করল, এখানে একজন মেহমানকে বুঝি এভাবেই স্বাগত জানায়?

ওরা কোন কথা বলল না।

আমার নাম- পরিচয় না জেনে আমার সাথে এই আচরণ করা হচ্ছে কেন?

ওরা কোন উত্তর দিল না। আহমদ মুসা মনে পড়ল, পরিত্যক্ত ঐ বাড়িতে বন্দী হবার পরও সে এটাই দেখেছিল যে, কোন প্রশ্নের উত্তর ওরা দিচ্ছে না। তাহলে ওরা এবং এরা কি এক গ্রুপ? আবার ভাবল, এটাই বা হয় কি করে? এ ঠিকানা যে পেয়েছে কংকাল- লোকটির পকেট থেকে। এ ঠিকানাটি তার কিংবা তার পক্ষের শক্তির হওয়াই স্বাভাবিক।

আহমদ মুসাকে নিয়ে আসা হলো দু'তলায়। দু'তলার একটি ঘর থেকেই মিষ্টি ইংরেজী সুর ভেসে আসছে।

একটা দরজার সামনে এসে তারা দাঁড়াল। একজন ভেতরে চলে গেল। মুহূর্ত কয়েক পরেই সে ফিরে এল। বলল, 'চল।'

আহমদ মুসা আগে ঢুকল, পেছনে পিস্তল বাগিয়ে ঢুকল ওরা দু'জন।

বিশাল হলঘর। চার-পাঁচ'শ লোকের জায়গা খুব সহজেই হতে পারে।

ঘরের চারদিক ঘিরে সোফা সাজানো। হল ভর্তি অনেক লোক। ঘরের একদম উত্তর-প্রান্তে বিশেষ ধরনের একটা সোফা। তাতে বসে আছে দীর্ঘকায় একজন লোক। তার পাশের সোফায় একজন তরুণী।

আহমদ মুসা ঢুকতেই সোফার সেই লোকটি চিৎকার করে বলল, ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আমি দুঃখের সাথে ঘোষণা করছি, আমার মেয়ের জন্ম দিনের উৎসব আজ এখানেই শেষ। নতুন মেহমান এসেছে তার খোঁজ-খবর নিতে হবে।

চল্লিশ-পঞ্চাশটি দম্পতি হলঘরে হাজির ছিল। এক এক করে ওরা সবাই বেরিয়ে গেল। বাজনা থেমে গেছে। যন্ত্রীরাও বেরিয়ে যাচ্ছে।

সবাই বেরিয়ে গেলে পিস্তলধারী দু'জন আহমদ মুসাকে নিয়ে সোফার লোকটির সামনে দাঁড় করাল।

লোকটি সাপের মত ঠান্ডা চোখে তাকিয়ে আছে আহমদ মুসার দিকে। পাশের তরুণীটির চোখে একরাশ বিস্ময় এবং তার সাথে উদ্বেগও।

‘‘রক’-এর এই ঠিকানা তুমি কোথায় পেলে?’ চোখ ঠান্ডা হলেও লোকটির কন্ঠে যথেষ্ট উত্তাপ।

‘তার আগে বলুন, আমি কেন এসেছি না জেনে আমার সাথে এই আচরন কেন?’ বলল আহমদ মুসা।

‘আমার প্রশ্নের জবাব দাও, আমি এক প্রশ্ন দুইবার করি না।’

‘আমি এক কংকালের পকেটে একটি চিরকুট পেয়েছিলাম। তাতে এই ঠিকানা লেখা ছিল।’

‘কোথায় পেলে সে কংকাল?’

আহমদ মুসা জবাব দিল। বলল তার বন্দী হওয়ার কথা। এবং বলল, চিরকুটের উল্টো পৃষ্ঠায় পাওয়া নাম্বারটির কথা।

লোকটির মুখে মুহূর্তের জন্যে একটা বিব্রতকর ভাব ফুটে উঠেই আবার মিলিয়ে গেল। আহমদ মুসার তা নজর এড়াল না। কিন্তু পরক্ষণেই লোকটির ঠান্ডা চোখ দু'টি অগ্নিবৃষ্টি করল। বলল, ‘ও তুমি সেই পলাতক!’

তারপর হো হো করে হেসে উঠল লোকটি। বলল, ‘আল্লাহ তোমার বিরুদ্ধে গেছে। পালাতে গিয়ে ছোট খাঁচা থেকে বড় খাঁচায় এসে ঢুকেছ।’

বলেই আবার হেসে উঠল হো হো করে।

আহমদ মুসা এবার বোঝার বাকি রইল না, এরা একই দলের। তাহলে কংকাল লোকটি এদেরই ঠিকানা জোগাড় করে লিখে রেখে গিয়েছিল বেল্টের মধ্যে সম্ভবত এই আশায় পক্ষের কারো হাতে এটা পড়তে পারে। পড়েছে ঠিকই, কিন্তু আহমদ মুসা বুঝতে পারেনি। হঠাৎ আহমদ মুসার মনে পড়ল, এই বাড়ির কাছে এসে দ্বিতীয়বার যখন চিরকুটের ঠিকানার উপর চোখ বুলাল, তখন দেখেছিল ঠিকানা ঘিরে থাকা বৃত্তের মত বস্তুটি আসলে বৃত্ত নয়, ওটা ভল্লুকের একটা মুখ। ভল্লুকের এমন মুখ সে যাকে অনুসরণ করে এয়ার পোর্ট থেকে এসেছিল তার গেঞ্জিতেও ছিল। অর্থাৎ ভল্লুকের মুখ তাহলে এ দলের প্রতীক।

হাসি থামলে লোকটি মুখে একরাশ দরদ ঢেলে পাশের সোফায় তরুণীটির দিকে চেয়ে নরম কণ্ঠে বলল, ‘মা এলেনা, তুমি যাও। আমি এর ব্যবস্থা করে আসছি।’

আহমদ মুসার চোখ মেয়েটির উপর নিবদ্ধ হলো। মেয়েটার মুখ বিষণ্ণ। সে চকিতে একবার আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে মুখ নিচু করল। ধীর কণ্ঠে বলল, ‘না আব্বা, আমি তোমার সাথেই যাব।’

লোকটি আর কিছু বলল না। মুখ ঘুরিয়ে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। কঠোর কণ্ঠে বলল, ‘এখানে পলাতকের শাস্তি কি জান?’

‘জানি না।’

‘শোন, আমরা প্রথমে তার চোখ দু’টি তুলে ফেলি, তারপর সময় নিয়ে এক এক করে তার হাত-পা কেটে ফেলি। তারপর এমনিতেই সে একসময় মরে যায়। মূল্যবান বুলেট আমরা খাঁচার পাখি বধ করতে ব্যবহার করি না। কিন্তু……’

থামল লোকটি।

‘কিন্তু আমার জন্যে এই শাস্তি যথেষ্ট হচ্ছে না এইতো?’ বলল, আহমদ মুসা।

‘তুমি আমার সাথে রসিকতা করছ।’ গর্জে উঠল লোকটি।

একটা ঢোক গিলে আবার বলল লোকটি, ‘এতক্ষণ বুকফাটা চিৎকার ও কান্নাকাটি করে কূল পেতে না, বিদ্রুপ কোথায় যেত! কিন্তু……’

কথা শেষ করল না লোকটি।

‘কিন্তু মস্কো আমাকে জীবন্ত ও অক্ষত অবস্থায় চেয়েছে এইতো?’

আহমদ মুসার কথা শেষ না হতেই তড়াক করে উঠে দাঁড়াল লোকটি। আগুন ঝরা চোখে তাকিয়ে থাকল, ‘কি করে জানলে, কে বলল, তোমাকে এ কথা।’

‘আপনারা মনে করেন, ধরা ছোঁয়ার বাইরে আপনারা, কেউ কিছু জানে না আপনাদের সম্বন্ধে।’

সব জানলে এ ফাঁদে পড়তে না। বাহাদুরি ছাড়। খুব সাধ করে বানিয়েছিলে মধ্য এশিয়া মুসলিম প্রজাতন্ত্র। কিছুদিন অপেক্ষা কর সাধটা কোথায় যায় দেখবে। মস্কোর পায়ে গিয়ে পড়তে হবে আবার।'

'স্বীকার করছি, সতর্ক না হওয়ার কারণে এ ফাঁদে পড়েছি। আমি কংকাল লোকটির উপকার করতে চেয়েছিলাম। চেয়েছিলাম তার পরিবারকে তার খবর জানাতে। এ ঠিকানাকে তারই ঠিকানা মনে করেছিলাম। তবে মনে করবেন না যে এমন জেতা সব সময়ই জিতবেন। মনে করবেন না, কিছু শস্যক্ষেত আর ভেড়ার পাল ধ্বংস করলেই আমরা মস্কোর পায়ে গিয়ে পড়ব।'

লোকটির চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। রাজ্যের বিস্ময় আর উদ্বেগ সে চোখে। এগিয়ে এল সে কয়েক পা। এসে দাঁড়াল আহমদ মুসার মুখোমুখি। বলল, 'আর কি জেনেছ তুমি?' তার গলায় এবার উত্তাপ নেই। পাথরের মত ঠাণ্ডা গলা এবং পাথরের মতই শক্ত।

'মনে হচ্ছে আমি আসামী, আর আপনি বিচারক। আপনার প্রশ্নের উত্তর দেয়া আমার দায়িত্ব।'

আহমদ মুসার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে শাঁ করে একটা ঘুসি ছুটে এল আহমদ মুসার চোয়াল লক্ষে।

আহমদ মুসা বিদ্যুৎবেগে একটু নিচু হয়ে বাঁ হাত দিয়ে লোকটির ছুটে আসা হাত ধরে ফেলল। তারপর বাঁ হাতের সাথে ডান হাত যুক্ত করে প্রচণ্ড একটা মোচড় দিল তার হাতে।

লোকটি চিৎকার করে বসে পড়ল। হাতের কব্জি চেপে ধরেছে সে। যে মোচড় খেয়েছে তাতে তার হাতের কব্জি আলগা হয়ে যাবার কথা।

আহমদ মুসার পেছনে উদ্যত পিস্তল হাতে দু'জন দাঁড়িয়েছিল।

আর দু'জন দাঁড়িয়েছিল হলঘরের দরজায়।

লোকটির হাত মোচড় দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবার সাথে সাথে দু'টি ফাঁস ছুটে এসে একটা আহমদ মুসা গলা আরেকটা বুকের ওপর বাহুদ্বয়কে বেঁধে ফেলল। পরক্ষণেই এল প্রচণ্ড হ্যাচকা টান। আহমদ মুসা গোড়া কাটা গাছের মত দড়াম করে পড়ে গেল মেঝের ওপর।

ডান হাতের কব্জিটি বাম হাত দিয়ে চেপে ধরে লোকটি উঠে দাঁড়িয়েছে।

সোফায় বসা তরুণীটি ছুটে এল। লোকটি ডান হাতের কব্জিটি দেখতে চেষ্টা করে বলল, 'খুব লেগেছে, ভেঙ্গে যায়নি তো আব্বা?'

লোকটি কথা না বলে এগিয়ে গেল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা উপুড় হয়ে পড়েছিল মেঝের ওপর।

লোকটি উপর্যুপরি কয়েকটা লাথি মারল আহমদ মুসার পাঁজরে।

বলল, 'এ হলো সবচেয়ে বড় শয়তান আহমদ মুসা। এ যা করেছে, এর গায়ের চামড়া খুলে গায়ে লবণ মাখিয়ে একে টাঙিয়ে রাখা দরকার।'

তারপর মুখ তুলে লোকটি ফাঁস হাতে দরজায় দাঁড়ানো লোকদের দিকে চেয়ে বলল, 'যা একে টেনে অন্ধ কূপে ফেলে রাখ।'

তরুণীটি তার আব্বার মুখে আহমদ মুসার নাম শোনার পর থেকে বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে তাকিয়েছিল আহমদ মুসার দিকে। বিস্ময়ের সাথে বেদনার একটা ছায়া আছে তার চোখে।

আহমদ মুসাকে ওরা টেনে নিয়ে চলল। আহমদ মুসা মাথা উচু রেখে মুখ ও মাথা রক্ষা করতে চেষ্টা করল।

# ২

কারসাপক- এর রাষ্ট্রভবন।

রাষ্ট্রভবনের শোবার ঘর। শিরীন শবনম একটা বালিশে ঠেশ দিয়ে বসে আসে।

ম্লান মুখ।

শিরীন শবনম মধ্য এশিয়া মুসলিম প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্টের স্ত্রী।

শীর্ষ বিজ্ঞানী নবিয়েভের মৃত্যু এবং আহমদ মুসা নিখোঁজ হবার খবর শুনে প্রেসিডেন্ট কুতায়বা নিজেই চলে এসেছেন কারসাপকে।

জোর করেই সাথে এসেছে শিরীন শবনম। আহমদ মুসা শিরীন শবনমদের শুধু নেতা নন, বড় ভাই এবং অভিভাবকও।

তাঁর নেতৃত্বে শিরীন,* আয়েশা আলিয়েভা, রোকাইয়েভারা যেমন নতুন জীবন পেয়েছে, তাঁর অভিভাবকত্বেই তারা পেয়েছে সুন্দর ও শান্তির সংসার।

অথচ তাদের নেতা, তাদের ভাই আহমদ মুসা মৃত্যুর সাথে লড়াই করেই ফিরছে!

এ ধরনের অনেক কথা এসে পীড়া দিচ্ছিল শিরীন শবনমের মনকে।

ঘরের বাইরে পায়ের শব্দ পেল শবনম। উঠে বসল সে।

ধীর পায়ে ঘরে এসে প্রবেশ করল কুতায়বা। তাঁর মুখ শুকনো।

চোখের দৃষ্টিটা নিচের দিকে।

'কি খবর?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠ শবনমের।

'কিছুই জানা যায়নি।' বসতে বসতে বলল কুতায়বা।

'বিমান বন্দর ভর্তি মানুষ, চারদিকে গিজগিজ করছে পুলিশ। এর মধ্যে থেকে আহমদ মুসার মত মানুষ হাওয়া হয়ে গেল, কেউ দেখল না?' বলল শিরীন শবনম।

'ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ ও অনুসন্ধানের পর এটুকুই জানা গেছে যে, বিজ্ঞানী নবিয়েভের গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটার পর দেড়-দু'মিনিটের মধ্যে দু'টি গাড়ি সামান্য ব্যবধানে পাকিং প্লেসের গেট দিয়ে বেরিয়ে গেছে।'

'এর অর্থ তোমার গোয়েন্দা বিভাগ কি করেছে।'

'নিশ্চিত করে কিছুই বলা যাচ্ছেনা। হতে পারে গাড়ির বিস্ফোরণ দেখে গণ্ডগোলের ভয়ে তারা বেরিয়ে গেছে। আবার হতে পারে কাউকে সন্দেহ করে আহমদ মুসা তাঁর গাড়িকে আরেকটা গাড়ি নিয়ে ফলো করেছে। আবার এমনও হতে পারে, মধ্য এশিয়া মুসলিম প্রজাতন্ত্রের যারা শত্রু তাদের অনেকের কাছে আহমদ মুসা পরিচিত। সুতরাং তাদের দ্বারা তিনি কিডন্যাপ হয়েছেন।'

'যে দু'টো গাড়ি বিমান বন্দর থেকে বেরিয়ে গেছে বিস্ফোরণের পর, তার কোন হদিস করা যায়নি?'

'না যায়নি। পাকিং প্লেসের গেটে গাড়ির কোন লগ রাখা হয়না।'

'হায় আল্লাহ! এত বিপদ আমাদের মাথায়, তবু সাবধান নই আমরা।'

'ঠিক বলেছ শবনাম, এটা আমাদের দুর্বলতা। কিন্তু এত বড় বিপ্লব ও পরিবর্তনের পর শূন্য থেকে একটা পুর্নাংগ রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলা সহজ নয়। অভিজ্ঞতার কোন বিকল্প নেই, এই অভিজ্ঞতার সংকটেই আমরা ভূগছি। আমরা বিপ্লব করেছি, কিন্তু বিপ্লব রক্ষার জন্য তৈরি লোক আমরা খুব বেশী পাইনি। আহমদ মুসা একাই লাখো লোকের যোগ্যতা ও জ্ঞান রাখেন। বিপ্লবের পর তিনি যদি থাকতেন, তাহলে এ দূর্বলতা হয়তো থাকতো না। কিন্তু তিনি চলে গেলেন আমাদের মত অযোগ্যদের হাতে সব ছেড়ে দিয়ে।'

কান্নায় জড়িয়ে গেল কুতায়বার শেষ কথাগুলো। অশ্রু গড়িয়ে পড়ল কুতায়বার চোখ থেকে।

চোখ মুছে কুতায়বা বলল, 'আমি দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেছিলাম, কিন্তু মুসা ভাই শুনেননি।'

শিরীন শবনম এগিয়ে এসে স্বামীর একটা হাত তুলে নিয়ে বলল, 'মুসা ভাই অন্যায় করেননি, ভুল করেননি।'

'কিন্তু আমি তো পারছিনা। এর আগে হরকেস শহরের সরকারি বাংলো থেকে কিডন্যাপ হলেন আমাদের সবরকম নিরাপত্তা সত্বেও। আবারও হারিয়ে গেলেন কারসাপকে এসে। আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কোনই কাজে লাগল না। তিনি নিশ্চয় শত্রুর হাতে আটকা পড়েছেন আমার এই কারসাপক শহরেই। অথচ আমি এদেশের প্রেসিডেন্ট।'

আবার কন্নায় বুঝে আসতে চাইল কুতায়বার কন্ঠ।

'নিরাপত্তা ব্যবস্থার কোন দোষ নেই, যে ষড়যন্ত্র এ অঘটন ঘটাচ্ছে তা মনে হয় খুবই বড়। বাইরের হাতও এখানে থাকতে পারে।'

'এরকম কোন তথ্য আমরা পাইনি। যে দেশটি এরকম করতে পারে, সেই রুশ সরকার দেখছি আমাদের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল। বিজ্ঞানীদের হত্যা, বিজ্ঞানাগার ও শষ্য ধ্বংসের সন্ত্রাসী ঘটনার তারা নিন্দা করেছে এবং গোয়েন্দা সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত আছে বলে জানিয়েছে।'

'আমার মনে হয়, ষড়যন্ত্রটা যে বড় রকমের কিছু তা মুসা ভাই আঁচ করতে পেরেছিলেন। তা না হলে স্ত্রীর দাফনের জন্য মদীনা না গিয়ে তড়িঘড়ি করে কারসাপকে চলে এলেন কেন? তিনি না ভেবে-চিন্তে কোন কাজ করেন না।'

'তুমি ঠিক ধরেছ। সবাই এটাই মনে করছে।'

'একটা বিষয় আমি বুঝতে পারছিনা। কারসাপক শহরের চারদিকের রাস্তা ও সবরকমের পথ যেহেতু সীল করে দেয়া হয়েছে, তাই বলা যায় বিস্ফোরনের পর কেউ কারসাপক ত্যাগ করেনি। অর্থাৎ ক্রিমিনালরা এবং আহমদ মুসা তাহলে এই কারসাপক শহরেই রয়েছে। কারসাপক ছোট শহর। এই শহরের সব বাড়ি কি আমার সার্চ করতে পারিনা?'

'বলতে পার, মোটামুটিভাবে সেই কাজটা আমরা করেছি। কিন্তু মুস্কিল হলো, কম্যুনিষ্ট আমলে তৈরি অনেক বাড়িতেই গোপন ভূ-গর্ভস্থ প্রকোষ্ঠ আছে যার

সন্ধান স্বেচ্ছায় বলে না দিলে খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। তবে এ পর্যন্ত অনুসন্ধান করে একটা উল্লেখযোগ্য নমুনা পাওয়া গেছে, তোমাকে বলতে ভুলে গেছি।'

'সেটা কি?' উদগ্রীব কন্ঠে বলল শবনম।

'একটা পরিত্যক্ত দু'তলা বাড়ির ছাদের কুঠরীর মেঝেতে ধূলার ওপর আহমদ মুসার জুতোর মত জুতোর জীবন্ত ছাপ পাওয়া গেছে। কুঠরীটি ছিল একটি বন্দীখানা। ওখানে দুটো কংকালও পাওয়া গেছে। সবচেয়ে উলেস্নখযোগ্য হলো, কুঠরীর দেয়ালে সদ্য করা একটা সুড়ঙ্গ পাওয়া গেছে। মনে করা হচ্ছে কেউ যেন দেয়ালের ইট খসিয়ে সুড়ঙ্গ করে বন্দীখানা থেকে বেরিয়ে গেছে। সুড়ঙ্গের পাশেই ষ্টীলের চেয়ারের ভাঙ্গা পায়া পাওয়া গেছে। মনে করা হচ্ছে ঐ ভাঙ্গা পায়ার ধারালো মাথা দিয়ে ইট খসিয়ে সুড়ঙ্গ করা হয়েছে। বন্দীখানার ভাঙ্গা চেয়ার এবং সেই ভাঙ্গা পায়া নিয়ে আসা হয়েছে হাতের ছাপ পরীক্ষার জন্যে।'

থামল কুতায়বা।

'কি রেজাল্ট পাওয়া গেছে?' চোখ দু'টি বিষ্ফোরিত করে বলল শবনম।

'আজ সকালে উদ্ধার করা হয়েছে। রেজাল্ট আজই পাওয়া যাবে।'

এই সময় পাশেই রাখা লাল ফোনটি বেজে উঠল।

কুতায়বা গিয়ে ফোন ধরল।

টেলিফোন কানে ধরে সম্ভবত ওপারের কথা শুনেই তার মুখটি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'একটু দাড়াও' বলে টেলিফোন থেকে মুখ সরিয়ে কুতায়বা বলল, 'শবনম ভাঙ্গা পায়া এবং চেয়ারে যে হাতের ছাপগুলো পাওয়াগেছে তার সবগুলোই আহমদ মুসার।'

'আল হামদুলিলস্নাহ।' আনন্দে শবনমের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

শবনমকে কয়েকটা কথা বলেই কুতায়বা টেলিফোনে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, 'কিন্তু বেরিয়ে উনি কোথায় গেলেন, আবার কিছু ঘটল কি না, তোমরা কিছু অনুসন্ধান করছ?'

ওপারের কথা শুনল কুতায়বা। শুনতে শুনতে তার মুখটা মলিন হয়ে গেল।

টেলিফোন শেষ করে বসল এসে কুতায়বা।

'কি হল, কি শুনলে, কোথায় গেলেন তিনি?' বলল শবনম।

'কিছুই বুঝা যাচ্ছে না। ঐ বাড়ি থেকে যে রাস্তা শহরে ঢুকেছে তার মাইক্রোস্কপিক পরীক্ষা করা হয়েছে। রাস্তাটির এক মাইল পর্যন্ত আহমদ মুসার পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে। তারপর আর কোন ছাপ নেই। মনে করা হচ্ছে ওখানে তিনি গাড়িতে উঠেছেন অথবা তাকে গাড়িতে কেউ তুলে নিয়েছে। তবে পায়ের ছাপের গতি থেকে কোন ধস্তা-ধস্তির প্রমাণ পাওয়া যায়নি। শেষ কয়েকটি ধাপে অবশ্য দৌড় দেয়ার চিহ্ন পাওয়া গেছে।'

থামল কুতায়বা। বিষণ্নতার অন্ধকারে ছেয়ে গেছে তার মুখ।

শবনমের মুখও উদ্বেগাকুল হয়ে উঠেছে। সেও কিছু বলল না।

'তোমার কি ধারণা? আমার ভয় হচ্ছে, আবার তিনি শত্রুর হাতে পড়েছেন। তা না হলে বন্দীখানা থেকে বের হবার পর চলে আসার কথা।' বলল শবনম।

'আমার ধারণাও তোমারই মত।' বলল কুতায়বা। কিছু বলতে যাচ্ছিল শবনম। কিন্তু টেলিফোন বেজে উঠল। শবনম মুখ বন্ধ করল। কুতায়বা দ্রুত উঠে গেল টেলিফোন ধরার জন্য।

টেলিফোনটা ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। টেলিফোনটা শেষ করে কুতায়বা এসে বসল। তার মুখে কোন আলো নেই। শবনম চোখ ভরা প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে আছে কুতায়বার দিকে।

'আশার কিছু পাওয়া যায়নি শবনম। ঐ পরিত্যক্ত বাড়িটার খোজ খবর নেয়া হয়েছে। বাড়িটা পরিত্যক্ত ঘোষিত হবার পর মালিকের কাছ থেকে একজন বাড়িটা কিনে নিয়েছে। কিন্তু সেই ক্রেতার কোন হদিস মিলেনি। যে ঠিকানাটা রেজিষ্ট্রি অফিসে আছে, তা ভূয়া। সুতরাং সে পথে আর এগুনো যাচ্ছে না। আরেকটা বিষয় জানা গেছে। আহমদ মুসা ভাই-এর পায়ের চিহ্ন যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে থেমে যাওয়া যে গাড়ির চাকার দাগ পাওয়া গেছে তা একটি ট্রাক। ট্রাকটা হালকা থেমেও ছিল। মনে হচ্ছে এই ট্রাকেই আহমদ মুসাকে তুলে

নেয়া হয়েছে। ঐ ট্রাকের গতি অনুসরন করা হয়েছে, কিন্তু হাইওয়েতে উঠার পর ট্রাকের চিহ্ন আর ডিটেক্ট করা যায়নি।'

থামল কুতায়বা।

নিরব শবনম। চোখে তার শূন্য দৃষ্টি।

কিছুক্ষণ পর কথা বলল কুতায়বাই। বলল, 'আল্লাহ তাঁকে সুস্থ রাখুন, তাড়াতাড়ি তাঁকে বিপদমুক্ত করুন।'

'কিন্তু এভাবে কতদিন চলবে ওঁর? বিশ্রামের প্রয়োজন নেই তাঁর?' বলল শবনম।

'একথা আমিও মাঝে মাঝে ভাবি শবনম।'

'দেখ, মধ্য এশিয়ার ঘটনার পর একদিনও তার বিশ্রাম হলো না । বন্দী হয়ে পৌছল চীনে। সেখান থেকে ককেশাস, তারপর বলকান, বলকান থেকে স্পেন। স্পেন থেকে আবার সিংকিয়াং-এ, চীনে। ঘটনা তাকে আবার নিয়ে এসেছে মধ্য এশিয়ায়। এ যে শ্বাসরুদ্ধকর জীবন।'

'আল্লাহ যাঁদের বিশেষভাবে ভালবাসেন, তাঁদের জীবন বোধ হয় এ রকমেরই শবনম। আল্লাহর বিশেষ বাছাই করা মানুষ নবী-রাসূলরা। দেখ, তাঁদের জীবনে কোন বিশ্রাম নেই। তুমি আমাদের রাসূল (সঃ)-এর জীবনে কোন অলস দিন পাবে না।'

'তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু আমরা সাধারন মানুষ। ভাবতে খারাপ লাগে। মেইলিগুলি ভাবী মারা গেলেন। ওঁর একটা ঠিকানা গড়ে উঠেছিল। সেটাও ভেঙ্গে গেল।'

'এঘটনায় আহমদ মুসা ভাই খুবই আঘাত পেয়েছেন। শুনেছি, শিশুর মত তিনি কেঁদেছিলেন।'

'বাইরে থেকে ওঁকে দেখলে খুব শক্ত মনে হয়, কিন্তু ফারহানা আপা* বলেছেন, মনটা ওঁর শিশুর মত নরম। তাঁর মধ্যে যেমন আছে আদর্শের দৃঢ়তা, তেমনি আছে আবেগের বিস্ফোরণ।'

'সে জন্যেই তো তিনি অনন্য।'

'শুধু প্রশংসা নয়, তাঁর কথা আমাদের ভাবতে হবে।'

‘আমরা তো ভাবি।’

‘কি ভাব? এইতো ভাবী গেলেন, কি ভাবছ তাঁর সম্পর্কে?’

‘এত বড় ভাবনা কি আমরা ভাবতে পারি?’

‘তাহলে কে ভাববে? তাঁর কি পিতা-মাতা আছে, না কোন অভিভাবক আছে?’

‘ঠিক বলেছ শবনম। তবু তার সংসার নিয়ে ভাবার ক্ষেত্রে আমাদেরকে খুব ছোট মনে হয় । মনে হয়, এ ধরনের কোনো পরামর্শ দেয়া আমাদের জন্য যথার্থ নয় ।’

‘তাহলে এ দায়িত্ব কার? তিনি তো নিজেকে নিয়ে বিন্দুমাত্র ও ভাবেন না ।’

‘তিনি আল্লাহর সৈনিক। তাঁদের মতো যারা নিজেদের নিয়ে ভাবেন না, তাঁদের ভাবনা আল্লাহই ভাবেন। ফারহানা তো আমাদের সিলেকশন এ ছিল না, মেইলিগুলিকেও তো আমরা খুজে বের করিনি। মেইলিগুলির সাথে তাঁর বিয়েটাও দেখ মানুষের পরিকল্পনা অনুসারে হয়নি।’

‘ঠিক বলেছ। কিন্তু তবু তাঁর জীবনের শূন্যতায় উদ্বেগ বোধ হয়। সত্যই তাঁর কোনো স্বজন নেই। ভাবতে ভয় হয় স্বজনহীনতার কোনো বেদনা তাঁর মধ্যে গুমরে মরছে কিনা?’

শবনমের কণ্ঠ ভারী হয়ে উঠল।

‘ঠিক বলেছ। তিনি মানবিক আবেগের ঊর্ধে নন। কিন্তু তবু শবনম তাঁর জন্য কিছু করার মতো বড় আমরা নই। আমরা কর্মী। তিনি যেমন তাঁর সম্পর্কে ভাবেন না তেমন আমাদেরকেও ভাবতে দেন না। তাঁর ভাবনা তিনি আল্লাহর উপরই ছেড়ে দিয়েছেন ।’

‘আলহামদুলিল্লাহ। তাঁর চেয়ে বড় অভিভাবক তো আর কেউ নয়। আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করুন, তাঁর প্রতি আরও সদয় হোন।’

‘আমিন।’ বলল কুতাইবা।

তার কণ্ঠ বাতাসে মেলাবার আগেই বেজে উঠল টেলিফোন।

কুতাইবা উঠল টেলিফোন ধরার জন্য।

উদগ্রীব হয়ে উঠল শবনম।

একদম ঘুটঘুটে অন্ধকার। অন্ধকূপ নাম তারা ঠিকই দিয়েছে। অন্ধকূপে নামার কোন সিঁড়ি নেই। তাঁকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে নিচে। রক্ষা যে, আহমদ মুসা ধাক্কা খেলেও লাফ দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। তা না হলে মাথাটা পাকা মেঝেতে পড়লে চৌচির হয়ে যেত। অন্ধকূপটা কোথায়? মাটির নিচে তো অবশ্যই। কিন্তু কতখানি নিচে? তাকে দোতলা থেকে নিচ তলায় আনা হয়েছিল , সিঁড়ি দিয়ে টেনে সেই ফাঁস লাগানো অবস্থায়। লোকগুলো আসলে পশু। পশু না হলে মানুষকে কি কেউ পশুর মতো টেনে নিয়ে আসে? ফাঁস অবস্থায়ই তাকে অন্ধকূপে ফেলে দিয়েছে । ভাগ্যিস পা দু'টি খোলা ছিল। না হলে সে তো লাফ ও দিতে পারতো না। দু'তলা থেকে তাকে নামিয়ে এক তলার বারান্দা দিয়ে সর্ব উত্তরে একটি কক্ষে তারা প্রবেশ করে। ঐ কক্ষটিতেও দু'তলা থেকে একটি সিঁড়ি নেমে এসেছে। সিঁড়িটির গোড়ায় এসে ওরা দাঁড়ায়। একজন গিয়ে লোহার সিঁড়িটির শেষ ধাপটিতে পা দিয়ে চাপ দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ির নিচের কংক্রিটের মেঝেটা দেয়ালের ভেতর সরে যায়। বের হয়ে পড়ে আরেকটা লোহার সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়ে তাকে নামিয়ে নিয়ে আসে ওরা। এবার টেনে নয়, হাঁটিয়ে, সবার আগে আগে। ওদের শেষ লোকটি যখন শেষ ধাপটা থেকে নেমে এলো তখন সিঁড়িমুখের সরে যাওয়া মেঝেটা আবার তার জায়গায় ফিরে আসে। তারপর কক্ষটির সুইচ বোর্ডের একটা সুইচে ওদের একজন চাপ দেয়। সাথে সাথেই কক্ষের ঠিক মাঝখানে মেঝের একটা অংশ ইঞ্চিখানিক নিচে নেমে পাশে সরে যায়। মুখ ব্যাদান করে উঠে অন্ধকার এক গুহা মুখ। টেনে এনে ওই পথেই তাকে ফেলে দেওয়া হয়।

অন্ধকূপটা কতখানি গভীর? বার থেকে পনের ফুটের বেশি মনে হয়নি।

শরীরটায় খুব ক্লান্তি বোধ হচ্ছে। গত কয়েক ঘণ্টায় কম ধকল যায়নি শরীরের উপর দিয়ে। টান হয়ে শুয়ে পড়ল আহমদ মুসা মেঝেতে। চোখ বুজল।

পেছনের দৃশ্যগুলো তার সামনে ভেসে উঠল আবার। দু'তলা হতে পারে, হতে পারে তিন তলা থেকে সিঁড়ি নেমে এসেছে অন্ধকূপের উপরের কক্ষ অর্থাৎ ভূগর্ভস্থ কক্ষ পর্যন্ত। সিঁড়িটা লোহার, অবশ্যই পরে তৈরি। অন্ধকূপ পর্যন্ত এই সিঁড়ি পরে তৈরি হল কেন? অন্ধকূপে আসার জন্য কি? অবশ্যই নয়। তাহলে? লক্ষ করেছে সে, এক তলার লোহার শেষ ধাপটিতে চাপ দিতেই ভূ-গর্ভস্থ সিঁড়ি মুখের দরজা খুলে গেল, আবার ভূ-গর্ভস্থ কক্ষের যে সিঁড়ি তার শেষ ধাপে শেষ লোকটির পা পড়তেই সিঁড়ি মুখ বন্ধ হয়ে গেল। মনে হয়, এ শেষ ধাপটিতে আবার চাপ দিলে আবার ওপরের সিড়িঁ মুখ খুলে যাবে। অনুরূপভাবে একতলার সিঁড়ির শেষ সিঁড়ি ধাপটিতে চাপ দিয়ে দু'তলা উঠার সিঁড়ি মুখ বা দরজাটি হয়তো খোলা যায়, বন্ধও করা যায়। তিনতলায় উঠানামার জন্যেও বোধহয় এই একই ব্যবস্থা। কিন্তু তিনতলা থেকে এই ভূ-গর্ভস্থ কক্ষ পর্যন্ত কেন এই স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা? অন্ধকূপের সাথে যোগাযোগের জন্য এটা হতে পারে না। তাহলে, আবার সেই প্রশ্ন দেখা দিল আহমেদ মুসার মনে। এই স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তিনতলা এবং অন্যান্য ফ্লোর থেকে ভূ-গর্ভস্থ কক্ষে আত্মগোপন করা যেতে পারে। অর্থাৎ বিপদকালে আত্মগোপনের একটা পথ এটা। এই ব্যাখ্যায় আহমদ মুসার মনের সব প্রশ্নের সমাধান হল না। যেকোনো সাধারণ শত্রুর কাছেও তাদের এ আত্মগোপন ধরা পরে যাবে লোহার সিঁড়ির অস্তিত্বের কারণে। তাহলে? আহমদ মুসার মনে হঠাৎ একটা কথা ঝিলিক দিয়ে উঠল, তাহলে পালাবার পথ এটা আত্মগোপনের নয়। এই চিন্তার সাথে সাথে মনটা খুশিতে ভরে উঠল আহমদ মুসার। তাহলে অন্ধকূপের উপরের কক্ষটিতে বাইরে বেরিয়ে যাবার একটা গোপন পথ আছে এবং সে পথ নিশ্চয় অন্ধকূপের দরজা খোলার মতো কোন গোপন সুইচ বা সুইচবোর্ডের কোনো সুইচ চেপে খোলা যাবে। এখন প্রয়োজন শুধু এ অন্ধকূপ থেকে বের হওয়া। এখন এই 'শুধু বের হওয়া'র কাজটা কতটা কঠিন সেটাই দেখতে হবে।

আহমদ মুসা চোখ খুলল। মাথাটা একটু উঁচু করল উঠার জন্য। কিন্তু পারল না, মাথাটা আবার নামিয়ে ভাবল, বের হওয়ার পথের সন্ধান পরে করা

যাবে। তার আগে একটু বিশ্রাম প্রয়োজন। শরীরটা আবার মেঝের বুকে এলিয়ে দিল আহমদ মুসা।

সঙ্গে সঙ্গে ক্লান্তিতে দুটি চোখ বুজে গেল আহমদ মুসার। ঘুমিয়ে পড়ল সে।

হঠাৎ কানের কাছে নাম ধরে ডাক শুনে চোখ খুলল ও ধড়মড় করে উঠে বসল। অন্ধকূপ আলোকিত। উপর থেকে নেমে এসেছে একটা সিঁড়ি। তার সামনে সেই মেয়েটি যাকে হলঘরে সে দেখেছিল, যার নাম শুনেছিল এলেনা। আহমদ মুসার বিস্মিত দৃষ্টি মেয়েটির মুখে নিবদ্ধ হতেই মেয়েটি বলে উঠল, 'আমি এলেনা নোভাস্কায়া, কারসাপকের গ্রেট বিয়ার প্রধান আলেস্কি স্টালিনের মেয়ে। আমার ডাক নাম রক। ছোটবেলায় আমি খুব দুরন্ত, দুঃসাহসিক ছিলাম বলে আমাকে এই নাম এ ডাকা হতো।'

'গ্রেট বিয়ার?' কথাটা শোনার সাথে সাথে কপাল কুঞ্চিত হল আহমদ মুসার।

'গ্রেট বিয়ার জারের সাবেক রাজধানী পিটার দি গ্রেট এর নগরী পিটার্সবার্গ কেন্দ্রিক জংগী রুশ সংগঠন।' বলল এলেনা।

'কিন্তু ওরা কি করছে কারসাপকে?'

'আপনি তো অনেক কিছুই জানেন। ওরা মুসলিম মধ্য এশিয়ার অর্থনীতি ও স্বাধীন রাজনৈতিক শক্তিকে ধ্বংসের পরিকল্পনা নিয়েছে। দেশের সবগুলো উল্লেখযোগ্য ব্রীজ, প্রোজেক্ট ইত্যাদি ধ্বংসের ওরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

'ভল্লুকের মাথা ওদের কি?'

'ওটা ওদের প্রতীক। ওদের ব্যবহার্য সব কিছুতে ওটা দেখবেন। এমনকি ওদের প্রত্যেকটা বাড়ি ও ঘাটির গেটেও ভল্লুকের মাথা খোঁদাই করা। ওদের গেটের নিচে দাঁড়িয়ে উপর দিকে মাথা তুললে খোঁদাই করা এ প্রতীক আপনি দেখতে পাবেন।'

'আপনি আলেস্কি স্টালিনের মেয়ে, কিন্তু এখানে?'

‘আমাকে আপনি ‘আপনি’ বলে সম্বোধন করবেন না। আমি আপনার ছোট বোন। সেরগেই ওমরভের সাথে আমার বিয়ে হয়নি, কিন্তু নিজেকে আমি তার স্ত্রী বলে মনে করি।’

‘সেরগেই ওমরভ কে?’

‘সেই কঙ্কাল, যার কাছ থেকে আপনি এখানকার ঠিকানা এনেছেন।’

‘সে মুসলমান তাহলে?’

‘জি। মধ্য এশিয়ার মুসলিম মুসলিম প্রজাতন্ত্রের গোয়েন্দা বিভাগের একজন অফিসার ছিল সে।’

একটু থামল এলেনা। তারপর মুখ নিচু করে বলল, ‘আমি ওকে ভালবাসতাম। এই ভালবাসার মূল্য ওঁকে দিতে হয়েছে এক মর্মান্তিক পথে জীবন দিয়ে।’

কথা শেষ করার আগেই কান্নায় রুদ্ধ হয়ে পড়েছিল এলেনার কণ্ঠ।

‘ওমরভ কি জানতে পেরেছিল তোমার আব্বার পরিচয়?’

‘না। জানতে পারলে হয়তো তাকে মরতে হতো না, সাবধান হতে পারত সে। কিন্তু এরা বুঝেছিল যে ওমরভ সব জেনেই আমার সাথে সম্পর্ক করেছে তথ্য সংগ্রহের জন্যে।’

‘তুমি ওমরভকে সাবধান করনি?

‘এখানেই আমার ভুল হয়েছে। এমন কিছু ঘটবে আমি অনুমানও করতে পারিনি। সে যে গোয়েন্দা সেটাও আগে আমি জানতে পারিনি। যখন জানলাম, তখন আমার পরিচয় দিতে ভয় করছিলাম। সে যদি দূরে সরে যায় আমার কাছ থেকে !’

মেয়েটির কণ্ঠ আবার কান্নায় বুজে এল। মুহূর্তের জন্য থামল ।

একটা ঢোক গিলল । তারপর বলল, ‘দেরি হয়ে যাচ্ছে চলুন, আমাদের বেরুতে হবে। কেউ এখানে ঢুকেছে , এটা ওদের কাছে বেশিক্ষণ গোপন থাকবেনা।’

বলেই এলেনা উঠে দাঁড়াল । আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, ‘তুমি তোমার বিপদের কথা চিন্তা করেছ ? তুমি এখানে ঢুকেছ এটা ওদের কাছে গোপন থাকবে না ।’

‘আমি যে কোন পরিণতির জন্য প্রস্তুত । ওমরভ নেই, আমিও বাঁচতে চাইনা । আমার মৃত্যুটা যদি আপনার কোন উপকার করে হয়, তাহলে আমি ধন্য হবো , ওমরভ খুশি হবে।’

‘আমাকে তুমি চেন ?’

‘ওমরভের কাছে আপনার কাহিনী শুনেছি অনেক।’

অন্ধকূপ থেকে ওরা ভূ-গর্ভস্থ কক্ষে উঠে এল।

এলেনা আগে উঠে এসেছে । আহমদ মুসা তারপরে । আহমদ মুসা সিঁড়ির ধাপ থেকে মেঝেতে পা রাখার সাথে সাথে সিঁড়িটি উঠে এল এবং এক পাশে সরে গেল।

এলেনা ছুটে গিয়ে সুইচ বোর্ডের একটা সুইচ টিপে অন্ধকূপের মুখ বন্ধ করে দিল।

‘এই কক্ষেই তো বাইরে বেরুবার গোপন পথ আছে ।’ বলল আহমদ মুসা ।

‘আপনি জানলেন কি করে?’ বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে বলল এলেনা।

‘আমি অনুমান করেছি তিনতলা পর্যন্ত এই ঘরের সাথে সিঁড়ির লিঙ্ক দেখে।’

‘গোপন পথের সুইচ কোথায় আছে বলতে পারেন?’ মুখে হাসি টেনে বলল এলেনা।

‘বলতে পারবো না , তবে অনুমান করতে পারি। ঐ এক তলা থেকে নেমে আসা সিঁড়ির কোথাও এ সুইচটি হবে।’

‘আপনার এ  অনুমানের কারণ ?’

‘কারণ হলো, তিন তলা থেকে এই কক্ষে নেমে আসা পর্যন্ত কোথাও সুইচ টিপতে হয় না । সিঁড়ির শেষ ধাপে পা রাখার সাথে সাথে ওপরের সিঁড়ি মুখ বন্ধ হয়ে যায় এবং নীচের মুখ খুলে যায়। ঠিক তেমনভাবে আমার অনুমান হলো, এই

ভূ-গর্ভস্থ কক্ষের সিঁড়ির শেষ ধাপটিতে পা রাখার সাথে সাথে ওপরের সিঁড়ি মুখটি বন্ধ হয়ে যাবে এবং বাইরে বেরুবার এ কক্ষের গোপন দরজাটি খুলে যাবে।'

বিস্ময়ে হা হয়ে গেছে এলেনার মুখ । বলল, 'তিন তলা থেকে এখানে নেমে আশার এই ম্যাকানিজম কিভাবে আপনি জানতে পারলেন ?'

'আমাকে ওরা নামিয়ে আনার সময় এ বিষয়টা আমি লক্ষ করেছি ।'

'ভাইয়া আপনি অনন্য । ওমরভ আপনার সম্পর্কে যা বলেছে , যা আমি শুনেছি , তার চেয়ে আপনি অনেক বড় ।'

একটু থামল এলেনা । তারপর হাসিমুখে বলল, 'চলুন সিঁড়ির শেষ ধাপটিতে চাপ দিয়ে পরীক্ষা করি আপনার অনুমান সত্য কিনা ।'

ওরা সিঁড়ির গোড়ায় পৌছাতেই ওপরে ছাপা শীষ দেবার মত একটা শব্দ হল।

চমকে উঠে ওপর দিকে এক পলক তাকিয়েই আহমদ মুসা এলেনার হাত ধরে টেনে নিয়ে ছুটল সিঁড়ির তলায় লুকোবার জন্য।

সিঁড়ির নিচে গিয়ে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনতে পেল ওরা। দু'জনের পায়ের শব্দ । দ্রুত নামছে।

লোহার সিঁড়ি। ফাঁক আছে । সিঁড়ির মাঝা মাঝি পথ আসতেই ওদের পা দেখতে পেল আহমদ মুসা।

এলেনার মুখ ফ্যাঁকাসে হয়ে গেছে। সীমাহীন উদ্বেগ ঝরে পরেছে তার কাল দু'চোখ দিয়ে।

ওরা নামছে আগে একজন, পেছনে অন্যজন ।

আহমদ মুসার চোখের অপর দিয়ে প্রায় প্রথম জনের পা নেমে গেল। এল দ্বিতীয় জনের পা । আহমদ মুসার হাত দুটি বিদ্যুৎ বেগে উপরে উঠল এবং দু হাত দিয়ে দ্বিতীয় লোকটির দু'টি পা টেনে ধরেই আবার ছেড়ে দিল।

ফলে আহমদ মুসা যা চেয়েছিল তাই হল।

দ্বিতীয় লোকটি হুমড়ি খেয়ে পড়ল প্রথম লোকটি ওপর ।

দু জনেই আছড়ে পড়ল সিঁড়ির ওপর এবং গড়িয়ে পড়ে গেল নিচে।

ওরা মেঝেয় গড়িয়ে পড়ার আগেই আহমদ মুসা ওখানে গিয়ে হাজির হয়েছিল । তার পেছনে পেছনে এলেনাও ।

ওরা গড়িয়ে একজন আরেকজন এর ওপর এসে পড়েছিল। আহমদ মুসা ওপরের জনকে কলার ধরে টেনে তুলে তার কানের নীচটায় একটা কারাত চালাল । সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে গেল লোকটি। এই সুযোগে দ্বিতীয়জন উঠে দাঁড়াচ্ছিল তার স্টেনগানটা নিয়ে। কিন্তু সোজা হয়ে দাঁড়াবার সুযোগ সে পেল না । আহমদ মুসার একটা লাথি গিয়ে পড়ল তার তলপেটে হাতুড়ির মত। তার হাত থেকে খসে পড়ল স্টেনগান । সে ঢলে পড়ল মেঝের ওপর ।

আহমদ মুসা লোকটির হাত থেকে খসে পড়া স্টেনগানটি তুলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই দেখতে পেল উদ্ধত স্টেনগান হাত দু'জন সিঁড়ির মাথায় ।

আহমদ মুসা বিদ্যুৎ বেগে নিজের দেহটাকে ছুড়ে দিল মেঝের ওপর । তার দেহের ওপর দিয়ে এক ঝাক গুলি ছুটে গেল। আহমদ মুসার একটি পা কেঁপে উঠল , তার সাথে তার দেহটিও । একটা গুলি এসে আঘাত করল আহমদ মুসার পায়ে । পা দু'টি ছিল সিঁড়ি বরাবর। এ সময় এলেনার একটা চিৎকার তার কানে এল।

কিন্তু আহমদ মুসা সে দিকে কোন ভ্রুক্ষেপ না করে মাটিতে আছড়ে পড়েই স্টেনগানের ব্যারেলটা ঘুরিয়ে নিয়ে গুলি চালাল সিঁড়ি মুখ লক্ষ্যে।

ওরা আহমদ মুসা কে দ্বিতীয়বার টার্গেট করার আগেই আহমদ মুসার গুলি বৃষ্টি ওদের গিয়ে ঘিরে ধরল । মুহূর্তেই গড়িয়ে পড়ল সিঁড়ি দিয়ে ওদের দুটি গুলিবিদ্ধ দেহ।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়ে মেঝেয় লুটিয়ে পড়া এলেনার দিকে একবার তাকিয়ে ছুটে গেল সিঁড়ির গোড়ায় । শেষ ধাপটির ওপর দাঁড়িয়ে পর পর দুবার চাপ দিয়ে নেমে এল। দেখল সিঁড়ি র মুখের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে।

আহমদ মুসা এলেনার দিকে এগুবার সময় সামনে চোখ ফেলতেই দেখল সিঁড়ির বিপরীত দিকে দেয়ালের একটা অংশ সরে যাওয়ায় একটা আলোক উজ্জ্বল করিডোর উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে। খুশি হল আহমদ মুসা । এলেনা রক্তে ভাসছে ।

আহমদ মুসা ওর পাশে বসল । পরীক্ষা করল দেহ । পাঁজরে গুলি লেগেছে। আঘাত মারাত্মক ।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে এলেনা চোখ বুজে ছিল। চোখ খুলল আহমদ মুসার স্পর্শে । বলল ব্যস্ত কণ্ঠে , 'আপনি শিগগির এখান থেকে ছলে যান । সিঁড়ির শেষ ধাপটায় দুটি চাপ দিন , গোপন পথ খুলে যাবে। আমার কথা চিন্তা করবেন না ।'

'তোমাকে রেখে যেতে পারি না এলেনা।' বলল আহমদ মুসা এলেনাকে পাঁজা কোলা করে তুলে নিল, তারপর ছুটল গোপন পথের সেই করিডোরটির দিকে।

করিডোরে প্রবেশ করে কয়েক ধাপ এগুতেই পেছনে হালকা শীষ দেয়ার মত একটা শব্দ হল। চমকে পেছনে তাকাল আহমদ মুসা । দেখল, করিডোরের মুখটি বন্ধ হয়ে গেছে।

মিনিট খানেক ছুটে চলার পর আহমদ মুসা একটি সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়াল । আহমদ মুসার বুঝতে অসুবিধা হল না, এই সিঁড়িটাই ভূ-গর্ভ থেকে ওপরে উঠার পথ।

সিঁড়িতে পা দিয়ে মুহূর্ত দ্বিধা করল আহমদ মুসা । সিঁড়ি তাকে কার সামনে নিয়ে ফেলে কে জানে। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবল, এটা পালাবার গোপন পথ। সুতরাং সিঁড়ি মুখের স্থানটা কারো চোখে না পড়ার মত নিশ্চয়ই হবে ।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল আহমদ মুসা। আলোকজ্জ্বল সিঁড়ির মাঝপথ পর্যন্ত উঠে দেখতে পেল, সিঁড়ি মুখের দরজা বন্ধ । নিয়ম অনুসারে সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দেয়ার পর দরজা খুলে যাবার কথা ছিল তা খুলেনি। এই দরজা খোলার ম্যাকানিজম তাহলে ভিন্ন হয়ে। উদ্বিগ্ন হলো আহমদ মুসা। এলেনার দিকে চেয়ে বলল, 'শেষ সিঁড়ি মুখের দরজা খোলার কি ব্যবস্থা আছে এলেনা?'

এলেনা দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে চোখ বন্ধ করে ছিল। ধীরে ধীরে চোখ খুলে বলল, 'ম্যাগনেটিক লক, সামনে গেলেই খুলে যাবে।' বলেই আবার চোখ বন্ধ করল এলেনা।

ঠিক তাই। দরজার কাছাকাছি পৌছতেই দরজা আপনাতেই খুলে গেল। সিঁড়ি থেকে বাইরে বেরিয়ে এল আহমদ মুসারা। বাইরেটা বাগানের এক প্রান্তে ফুলের গাছ ঘেরা একটা সুন্দর বসার জায়গা। মাথার উপরে সুন্দর বিশাল একটি কংক্রিটের ছাতা।

সিঁড়ি থেকে বেরিয়ে আসতেই সিঁড়ি মুখের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

দরজাটার ভেতরের স্তর ইস্পাতের, কিন্তু বাইরের লেয়ারটা কংক্রিটের। সুতরাং ম্যাগনেটিক লকটি বাইরে কোন কাজ করে না।

বাইরে কংক্রিটের দরজাটির ওপর আছে ফুলের পাঁচটি টব। আহমদ মুসারা বাইরে আসার পর কংক্রিটের দরজাটি পাশ থেকে সরে গিয়ে যখন সিঁড়ি মুখ ঢেকে দিল, তখন আর কিছু বুঝার উপায় রইল না। কংক্রিটের ছাতির নিচে চার দিকে বসার চেয়ার, মাঝখানে পাঁচটি ফুলের টব। মনে হবে, বসার জায়গাটির সৌন্দর্য বর্ধনের জন্যেই এই ব্যবস্থা।

আহমদ মুসা বাইরে বেরিয়ে চারদিকে চাইল। সে ধারণা করছিল, পালাবার যখন পথ রাখা হয়েছে, তখন পালাবার মত বাহনের ব্যবস্থা অবশ্যই থাকবে।

আহমদ মুসার অনুমান সত্য হলো। বসার জায়গাটার একটু উত্তরে দুই ঝাউ গাছের মাঝখান দিয়ে একটা গাড়ি দেখতে পেল।

এলেনাকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে ছুটল আহমদ মুসা গাড়ির দিকে।

গাড়িটা আট সিটের একটা বিশাল সাইজের কার। এক হাত দিয়ে এলেনাকে জড়িয়ে রেখে অন্য হাত দিয়ে দুরু দুরু বুকে দরজা টানল, সেই সাথে মনে মনে প্রার্থনা করল, আল্লাহ দরজা যেন লক করা না থাকে।

দরজা খুলে গেল।

আহমদ মুসা এলেনাকে গাড়ির সিটে শুইয়ে দিয়ে এলেনার গলায় পেচানো ওড়না দিয়ে পাজরের ক্ষতস্থানটা বেঁধে দিল। প্রচুর রক্তপাত হচ্ছে, সে রক্তে ভিজে গেছে আহমদ মুসার বুক থেকে গোটা শরীরটা।

'আমাকে নিয়ে কষ্ট করছেন কেন? আমার সময় বেশি নেই। আপনার বাঁচা দরকার। আপনি চলে যান।' চোখ খুলে ক্ষীণ কন্ঠে বলল এলেনা।

‘কোন ভাই কি বোনকে এভাবে ফেলে রেখে যেতে পারে?’ এলেনার কপালে হাত বুলিয়ে বলল আহমদ মুসা।

মানুষের কন্ঠ কানে এল আহমদ মুসার। পেছনে চেয়ে দেখল, সেই বসার জায়গার সিঁড়ি মুখ দিয়ে লোক উঠে আসছে।

আহমদ মুসা দ্রুত গাড়ির দরজা বন্ধ করে ভেতর দিয়েই ড্রাইভিং সিটে গিয়ে বসল।

কি বোর্ডে চাবি ঘুরিয়ে ইঞ্জিন স্টার্ট দিল। সামনে চেয়ে আবছা আলোয় দেখল, উঁচু প্রাচীরের গায়ে ইস্পাতের দরজা। মনটা দমে গেল আহমদ মুসার, গাড়ির স্পীড দিয়ে ইস্পাতের ঐ দরজা কি ভাঙা সম্ভব হবে? কিন্তু কোন বিকল্প নেই। নেমে গিয়ে কিছু করার উপায় নেই।

বিসমিল্লাহ বলে স্টার্ট দিল গাড়িতে। গাড়ি চলতে শুরু করতেই আহমদ মুসা দেখল ইস্পাতের গেটটি খুলে গেল। আহমদ মুসা ভাবল, গাড়ি চলতে শুরু করার সাথে সাথে গেটটি খুলে যাবে, এই স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাই ওরা করে রেখেছিল। পালাবার পথকে সব দিক থেকেই নিষ্কন্টক করেছিল ওরা।

এই সময় পেছন থেকে এক ঝাঁক গুলি এসে ঘিরে ধরল গাড়িটিকে। মাথা নিচু করল আহমদ মুসা। সে এক ঝাঁক গুলিতে গাড়িটা ঝাঁঝরা হয়ে যাবার কথা। কিন্তু কিছুই হলো না, আহমদ মুসা বিস্ময়ের সাথে দেখল। পরক্ষণেই খুশীতে মন ভরে গেল আহমদ মুসার, গাড়িটি বুলেট প্রুফ। পালাবার জন্যে ওরা বুলেট প্রুফ গাড়ি রেখেছিল শেষ পর্যায়ের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে। যা এখন তার সাহায্যে আসবে।

আহমদ মুসার গাড়ি শাঁ করে বেরিয়ে এল গেট দিয়ে বাগান থেকে। রাস্তায় এসে পড়ল আহমদ মুসার গাড়ি। রাস্তায় পড়তে গিয়েই দেখতে পেল পরপর দু’টি গাড়ি বেরিয়ে এল এলেনাদের গেট দিয়ে। রিয়ার ভিউতে দেখতে পেল গাড়ি দু’টি ছুটে আসছে তার পেছনে। ব্যবধান বিশ গজের বেশি নয়। প্রাণপনে ছুটে আসছে পেছনের দু’টি গাড়ি। ওরা চেষ্টা করছে দু’পাশ থেকে সামনে এগিয়ে আহমদ মুসার গাড়ির পথ রোধ করতে।

এভাবে কিছু এগোবার পর ওরা পেছন থেকে গুলি শুরু করল। আহমদ মুসা জানে বুলেট প্রুফ এ ধরনের গাড়ির চাকাও অনেক ক্ষেত্রে বুলেট প্রুফ হয়ে থাকে। কিন্তু এ বুলেট প্রুফেরও সীমাবদ্ধতা আছে। কোনক্রমে টায়ারের গোড়ায় যদি একটি গুলি লাগে, টায়ার ফেটে যাবে।

আহমদ মুসাকে অনেকটা অন্ধের মত গাড়ি চালাতে হচ্ছে। কোথায় যাবে তার ঠিক নেই, রাস্তার বাঁক সম্পর্কে তাঁর কোন জ্ঞান নেই, রাস্তার পাশের ট্রাফিক সাইনগুলো ভালো করে দেখার সুযোগ নেই। তার ওপর রাত এবং রাস্তায় আলোর স্বল্পতা। ফলে আহমদ মুসা মুক্ত হাতে গাড়ি চালাতে পারছে না।

একটা বড় মোড়ে এসে পড়তেই সামনে থেকেও অনেকগুলো হেডলাইটকে সে ছুটে আসতে দেখল। পেছন থেকে সমানে গুলি বৃষ্টি চলছে তখনও। হঠাৎ সামনে থেকেও গুলি বৃষ্টি শুরু হলো। আহমদ মুসা ধরে নিল সামনে-পেছনে দুই দিক থেকেই সে শত্রুর ঘেরাও-এর মধ্যে পড়েছে।

আহমদ মুসা গাড়ি ঘুরিয়ে নিল ডান দিকে রাস্তায় প্রবেশের জন্যে।

গাড়ি ঘুরতেই সামনে থেকে যারা গুলি করতে করতে ছুটে আসছিল, তাদেরই গুলিতে সামনের বাম চাকাটা ফেটে গেল।

কতকটা হুমড়ি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়ি।

আহমদ মুসা পেছনের সিটে এলেনার দিকে একবার তাকিয়ে সিটে গা এলিয়ে দিল। ভাবল, এলেনাকে নিয়ে পালাবার চেষ্টা বৃথা। ওকে ওদের হাতে তুলে দিয়ে কাপুরুষের মত আত্মরক্ষা করবে সে কেমন করে।

আহমদ মুসা হাল ছেড়ে দিয়ে যখন বিজয়ী শত্রুর অট্টহাসিপূর্ণ আগমনের অপেক্ষা করছে, তখন গাড়ির ডানের জানালা দিয়ে দেখল তাকে অনুসরণকারী শত্রুর দু'টি গাড়ি দক্ষিণ দিকে দ্রুত চলে যাচ্ছে।

তাদের গাড়ির আলো নেভানো। আর সামনে থেকে যারা গুলি করতে করতে আসছিল, তাদের গুলি বৃষ্টি তখনও বন্ধ হয়নি ওদের লক্ষ্য করে।

আহমদ মুসা আর কিছু ভাববার আগেই দেখল তার গাড়ি ঘিরে ফেলা হয়েছে। লাথি পড়তে লাগল গাড়ির দরজার উপর। অর্থাৎ গাড়ির দরজা খোলার নির্দেশ দিচ্ছে ওরা।

আহমদ মুসা দরজা খুলে বেরিয়ে এল। বাইরের অস্ত্রধারীদের ওপর চোখ পড়তেই আহমদ মুসার গোটা শরীরে একটা আনন্দের শিহরণ খেলে গেল। ওদের গায়ে সৈনিকের পোশাক। অর্থাৎ মধ্য এশিয়া মুসলিম প্রজাতন্ত্রের সৈনিক এরা। তার শত্রুরা কেন পিছটান দিল, তাও এবার বুঝতে পারল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার গোটা দেহ রক্তাক্ত। সে বেরিয়ে আসতেই সৈনিকরা উদ্যত স্টেনগান হাতে তাকে ঘিরে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল এমন সময় ‘কি ব্যাপার এখানে, দেখি’ বলে একজন এগিয়ে এল সৈনিকদের মধ্য দিয়ে। সৈনিকরা দু’দিকে সরে গিয়ে তাকে রাস্তা করে দিল।

আহমদ মুসা এগিয়ে আসা সেনা-অফিসারের দিকে তাকিয়েই চিনতে পারল সুলতান আলীয়েভকে। প্রেসিডেন্টের গার্ড বাহিনীর সে প্রধান। কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে মধ্য এশিয়ার মুক্তি সংগ্রামে সাইমুমের একজন তরুণ কর্মী ছিল সে।

আহমদ মুসার দিকে চোখ পড়তেই মুহূর্তের জন্যে বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে থমকে দাঁড়াল সে ভূত দেখার মত করে। আর পরক্ষণেই সে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল আহমদ মুসার বুকে। আহমদ মুসাও তাকে জড়িয়ে ধরল।

কয়েক মুহূর্ত পরে সুলতান নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। কিন্তু কথা বলতে পারল না। ঠোঁট দু’টি তার কাঁপছে থর থর করে। তার দৃষ্টি আহমদ মুসার রক্তাক্ত দেহের দিকে।

আহমদ মুসা সুলতানের পিঠ চাপড়ে বলল, ‘সুলতান সৈনিককে তো আবেগ কিংবা উদ্বেগ কোনটার শিকার হয়ে পড়লে চলবে না।’

এক খন্ড কান্না এসে আছড়ে পড়ল সুলতান আলীয়েভের মুখে।

দু’হাতে মুখ ঢেকে সামলে নিয়ে সে ভাঙা গলায় বলল, ‘মুসা ভাই, স্যারকে বলে আসি।’ বলে ছুটল যেদিক থেকে সে এসেছিল সেদিকে।

আহমদ মুসাকে ঘিরে থাকা সৈনিকদের উদ্যত অস্ত্র নেমে পড়েছে। তাদের চোখে এখন বিস্ময় এবং সম্ভ্রম। তারা আহমদ মুসাকে চিনতে না পারলেও বুঝেছে সে একজন বিরাট কেউ হবে।

আহমদ মুসা ওদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ‘সুলতান ‘স্যার’ বলল কাকে?’

‘স্যার, উনি প্রেসিডেন্টের কথা বলেছেন।’ একজন উত্তর দিল।

‘প্রেসিডেন্ট, মানে কুতায়বা?’ বলল আহমদ মুসা।

‘জি, হ্যাঁ।’ সেই সৈনিকটিই জবাব দিল।

‘এই রাতে কুতায়বা কোথায় যাচ্ছিল?’

‘স্যার, আমরা সায়েজু’তে যাচ্ছিলাম।’

‘কেন ওখানে কিছু ঘটেছে?’ চিন্তিত কন্ঠে বলল আহমদ মুসা।

‘সন্ধ্যায় বড় একটা বিস্ফোরণ ঘটেছে। আণবিক চুল্লি ও মূল গবেষণাগার রক্ষা পেলেও গুরুত্বপূর্ণ কম্পিউটার কেন্দ্রের একটা অংশ ধ্বংস হয়ে গেছে।’

এই সময় হঠাৎ সৈন্যরা চঞ্চল হয়ে পড়ল। এ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল তারা সবাই। আহমদ মুসা দেখল, ছুটে আসছে কুতায়বা, মধ্য এশিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট।

ছুটে এসে আহমদ মুসাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে। কান্না জড়িত তাঁর কন্ঠে ধ্বনিত হতে লাগল, ‘আল হামদুলিল্লাহ, আল হামদুলিল্লাহ.........।’

আহমদ মুসা নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। বলল, ‘গাড়িতে পেছনের সিটে একটি মেয়ে মুমূর্ষু। তাকে বাঁচাতে হবে। ওকে হাসাপাতালে নেয়ার ব্যবস্থা কর কুতাইবা।’

‘আপনার একি অবস্থা? আপনার কিছু হয়নি তো? আপনি ভাল আছেন তো?’ আহমদ মুসার রক্তাক্ত দেহের দিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন কন্ঠে বলল কুতাইবা।

‘আমার জন্যে চিন্তা করো না। মেয়েটির ব্যবস্থা কর।’

ধীর পায়ে শবনম এসে দাঁড়িয়েছিল কুতায়বার পেছনে।

আহমদ মুসা কথা শেষ করে মুখ ঘুরাতেই তাকে দেখতে পেল। বলল, ‘ভাল আছ শবনম?’

শবনম সালাম দিল আহমদ মুসাকে। তারপর বলল, ‘জনাব আমরা সকলেই ভাল আছি, সুখে আছি, শুধু আপনি ছাড়া।’

শবনমের কন্ঠ কাঁপছে।

‘ভুল বললে শবনম, আমার চেয়ে সহস্রগুন খারাপ অবস্থায় আছে গুলিবিদ্ধ মেয়েটি।’

‘দুঃখিত জনাব, ওকে আমি দেখিনি তো? তাছাড়া আমার কথায় এই মুহূর্তের ভল থাকা খারাপ থাকা বুঝাতে চাইনি।’

ইতিমধ্যে কুতায়বার নির্দেশে সুলতান আলীয়েভ একটি গাড়িতে এলেনাকে তুলে নিল।

‘চলুন মুসা ভাই, মেয়েটিকে নিয়ে সুলতান নিজে হাসপাতালে যাবে। আপনাকে নিয়ে আমরা বাসায় ফিরব। কাল সকালে সায়েজু'তে যাব।’

‘না কুতায়বা, মেয়েটিকে এতটা অরক্ষিতভাবে পাঠানো যাবে না। গ্রেট বিয়োর রাস্তায় ওঁৎ পেতে থাকতে পারে, মেয়েটিকে কেড়ে নেয়ার সব রকম চেষ্টা করবে তারা।’

‘মেয়েটি কে? গ্রেট বিয়ার কে?’

‘সব বলব। মেয়েটি কারসাপকের গ্রেট বিয়ার নেতা আলেক্সি স্ট্যালিনের বিদ্রোহী কন্যা। এখন এতটুকুই।’

‘তাহলে চলুন। আমরা সবাই হাসপাতাল হয়ে ফিরব।’ বলল প্রেসিডেন্ট কুতায়বা।

‘সেটাই ভাল।’ বলল আহমদ মুসা।

সবাই চলতে শুরু করল।

আহমদ মুসা পা তুলতে গিয়ে তার গুলিবিদ্ধ বাম পা কে ভয়ানক ভারি মনে হলো। যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ল সারা দেহে, সারা মুখে। অলক্ষ্যেই মুখ থেকে একটা ‘উঃ’ শব্দ বেরিয়ে এল।

দাঁড়িয়ে পড়ল সবাই। তাকাল আহমদ মুসার দিকে।

ছুটে এল কুতায়বা। বলল, ‘মুসা ভাই আপনি আহত বলেননি তো?’ কুতায়বার কন্ঠ আর্তনাদের মত শোনাল।

আহমদ মুসা পা টেনে নিয়ে চলতে শুরু করে বলল, ‘ও কিছু নয়, পায়ে গুলির চোট লেগেছে।’

কুতায়বা সংগে সংগে আহমদ মুসার পায়ের কাছে বসে পড়ে ফুটো হয়ে যাওয়া রক্তাক্ত প্যান্টের প্রান্তটা সরিয়ে দেখল, হাঁটুর ইঞ্চি তিনেক নিচে স্ফীত পেশীটার একটা বড় অংশ বিধ্বস্ত হয়েছে। এক খাবলা গোস্ত সেখানে নেই। গুলি ভেতরে থাকতেও পারে, আবার বেরিয়েও যেতে পারে। তখন রক্ত গড়াচ্ছে ক্ষত দিয়ে।

কুতায়বা রুমাল বের করে বাঁধতে যাচ্ছিল। কুতায়বার পি, এস, এবং গার্ড বাহিনীর কমান্ডার সুলতান আলীয়েভ দু'জনেই এগিয়ে এল। বিনীত ভাবে বলল, 'স্যার আপনি উঠুন, আমরা বেঁধে দিচ্ছি।'

'কেন আমি প্রেসিডেন্ট বলে তোমাদের খারাপ লাগছে? প্রেসিডেন্ট এত ছোট কাজ কেন করবে, তাই?' কারো দিকে না তাকিয়ে বাঁধতে বাঁধতে বলল কুতায়বা।

কুতায়বা একটু থামল, ঢোক গিলল। তারপর মাথা তুলে আলীয়েভের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিন্তু আমি মুসা ভাইয়ের কাছে প্রেসিডেন্ট নই, আমি তাঁর একজন নগন্য কর্মী। তিনি আমার নেতা।'

'তবু তুমি প্রেসিডেন্ট কুতায়বা। দেশ ও জনগনের সম্মানের প্রতীক তুমি। তাদের অসম্মান তুমি করতে পার না।' বলল আহমদ মুসা।

'এই কাজ যদি ওঁর অসম্মানের হয়, তাহলে সেই সম্মান ওর ত্যাগ করা উচিত।' বলল শবনম। তার কন্ঠ ভারি।

'শবনম, রাষ্ট্রের একটা নিয়ম কানুন আছে। কুতায়বা যে পদে আছে, তার একটা অধিকার রয়েছে। সে পদের দাবীকে তো সম্মান দেখাতে হবে।'

'আপনার পদের চেয়ে কি সে পদ বড়?' বলল শবনমই আবার।

'আমার তো কোন পদ নেই শবনম।'

ঢিল হয়ে পড়া মুখের নেকাব টেনে দিয়ে শবনম বলল, 'আপনি আপনার ওপর অপরিসীম জুলুম করছেন।'

'নিজের ওপর জুলুম করাও পাপ। আমি সে ধরনের পাপ করছি বলে মনে কর?'

সংগে সংগে কোন জবাব এল না শবনমের কাছ থেকে।

কুতায়বা উঠে দাঁড়িয়েছিল। আহমদ মুসাকে ধরে নিয়ে হাঁটতে শুরু করে বলল, 'চলুন মুসা ভাই। ঐ অভিযোগ আমাদেরও। আপনি চরকির মত গোটা বিশ্বময় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কোন বিশ্রাম নেই, বিশ্রামের একটা ঘরও নেই।'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'হিসেব করলে দেখা যাবে আমি জীবনের এক তৃতীয়াংশ সময় ঘুমিয়ে কাটিয়েছি। এরপর আর কি বিশ্রাম চাই? তোমরা যে বিশ্রামের কথা বলছ, সে বিশ্রামের সুযোগ মুসলমানদের নেই। মুসলমান একটা বিপ্লবী কর্মীদলের নাম। জগতের প্রতিটি মানুষের মুক্তি ও কল্যান নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তারা স্থির হতে পারে না, অবকাশ নামের অহেতুক কোন বিশ্রামে তারা গা ঢেলে দিতে পারে না।'

সবাই মাথা নিচু করে শুনল আহমদ মুসার কথা। কিছু বলার জন্যে মুখ তুলেছিল কুতায়বা। কিন্তু গাড়ি এসে দাঁড়াল সামনে।

গাড়িতে উঠে বসল সবাই।

ছুটল গাড়ির মিছিল হাসপাতালের দিকে।

# ৩

ক্ষুদ্র শহর সায়েজু'র সুন্দর রেস্ট হাউজ। রেস্ট হাউজটি একটা ছোট পাহাড়ের মাথার উপর। রেস্ট হাউজের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে পূর্ব দিকে তাকালে অল্প দুরে সমতল সুবিস্তৃত মালভুমির উপর মাথা উচু করে দাঁড়ানো মহাশূন্য গবেষণা কেন্দ্রটি দেখা যায়। অতীতে এই মহাশূন্য গবেষণাকেন্দ্র ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের। এখন মহাশূন্য গবেষণা কেন্দ্রটির মালিকানা মধ্য এশিয়া মুসলিম প্রজাতন্ত্রের। আর পশ্চিম দিকে তাকালে দেখা যায় মাইল দুই দূরে একটা পার্বত্য উপত্যকায় দাঁড়িয়ে আছে পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র। এই পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র এবং মহাশূন্য গবেষণা কেন্দ্র এখন এক মহা ষড়যন্ত্রের শিকার। মহাশূন্য গবেষণা কেন্দ্রে খুব বড় ঘটনা এখন্য ঘটেনি, কিন্তু পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রে একের পর এক মারাত্মক ঘটনা ঘটে চলেছে। প্রকল্পের শীর্ষ বিজ্ঞানীসহ কয়েকজন পথম শ্রেনীর বিজ্ঞানী ইতিমধ্যেই নিহত হয়েছেন। গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ড ও কম্পিউটার ব্যবস্থা বিধ্বস্ত প্রায়। শীর্ষ বিজ্ঞানী ও আণবিক প্রকল্পের প্রধান নবিয়েভ, যিনি সিংকিয়াং থেকে আহমদ মুসার সাথে ফিরে এসেছিলেন কিডন্যাপ অবস্থা থেকে মুক্ত হবার পর, নিহত হয়েছেন সায়েজুর বাইরে। অন্য সবগুলো ঘটনাই ঘটেছে সায়জুর পারমাণবিক প্রকল্প কেন্দ্রের ভেতরে। অথচ প্রকল্পটির নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত বলে মনে করা হয়। নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরীক্ষা করে আহমদ মুসাও কোন ফাঁক খুঁজে পায়নি। কিন্তু এই নিরাপত্তার মধ্যেই নিরাপত্তাহীনতা সশরীরে অবস্থান করছে।

রেস্ট হাউজের ব্যালকনিতে একটা ছোট টেবিলের সামনে বসে আহমদ মুসা এই বিষয় নিয়েই ভাবছিল। পারমাণবিক কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরেই যে শত্রু সশরীরে অবস্থান করছে, এ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এলেনাই জানিয়ে গেছে।

এলেনাকে বাঁচানো যায়নি। আঘাতটা অত্যন্ত মারাত্মক ছিল। যতক্ষন তার জ্ঞান ছিল, গ্রেট বিয়ার এবং তার তৎপরতা সম্পর্কে জানা সব কথাই সে বলে

গেছে। তার শেষ প্রার্থনা ছিল, সে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেছে, তাকে যেন ওমরভের পাশে কবর দেয়া হয়, দ্বিতীয়ত তার মৃত্যুর খবরটা যেন তার মার ঠিকানায় পিটার্সবার্গে পাঠিয়ে দেয়া হয়। তার মা আঘাত পেলেও খুশী হবেন এই ভেবে যে তার মেয়ে গ্রেট বিয়ারের সাথে শেষ পর্যন্ত ছিল না। তার মা গ্রেট বিয়ারের লক্ষ্য ও কার্যক্রমের বিরোধী। এলেনার প্রথম প্রার্থনাটি বিপদে ফেলেছিল আহমদ মুসাদের। ওমরভের কংকাল কুড়িয়ে আনতে হয়েছিল এবং পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হয়েছিল যে, ওটা ওমরভেরই। তারপর দু'জনকে পাশাপাশি কবর দিতে হয়।

এলেনার কাছ থেকেই জানা গেছে, সায়েজুতে গ্রেট বিয়ার এ পর্যন্ত যা করেছে তা ভেতরের দু'জন লোকের মাধ্যমে যারা আণবিক কমপ্লেক্সের কাজে কোন না কোন ভাবে যুক্ত আছে। এর বেশি তাদের পরিচয় সম্পর্কে এলেনা আর কিছু জানাতে পারেনি।

আহমদ মুসার কাছে এ তথ্যটিই অশেষ মূল্যবান। শত্রুদের চরদের পরিচয় যদিও এর মাধ্যমে জানা যায়নি, তবু তাদের ঠিকানা জানা গেছে-এটাও কম গুরম্নত্বপূর্ণ নয়। পারমানবিক কমপ্লেক্সের স্টাফ তালিকা সরকারী গোয়েন্দারা পরীক্ষা করেছে, কমপ্লেক্স কর্তৃপক্ষেরও সাহায্য নিয়েছে, কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। সন্দেহ করার মত কাউকেও তারা পায়নি। পারিবারিক ইতিবৃত্ত সমেত পূর্ণ তালিকা আহমদ মুসা দেখতে চেয়েছে এবং ষ্টাফদের সাথেও সে একবার দেখা করতে চায়। এই উদ্দেশ্যেই তার সায়েজু'তে আসা।

আহমদ মুসা চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছে। চোখ দু'টি বুজা। মুখে চিন্তার একটা গভীর ছাপ।

ভাবছে আহমদ মুসা গ্রেট বিয়ারকে নিয়েই। অদ্ভুত বেপরোয়া সংগঠন। আলেক্সি স্ট্যালিনের ৭, কারসাপক রোডের ঘাটিতে সেদিন রাতেই হানা দেয়া হয়েছিল, কিন্তু ধূলা আর ভাঙা কংক্রিটের স্তুপ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি ওখানে। সরকারী সৈন্যরা পৌঁছার যথেষ্ট আগেই আলেক্সি স্ট্যালিন তার ঘাটি ধ্বংস করে পালিয়ে গেছে। একটি দলকে, একটি জাতিকে কব্জা করার ওদের পরিকল্পনাটিও সর্বাধুনিক মানের।

পায়ের শব্দে আহমদ মুসা চোখ খুলল। দেখল মধ্য এশিয়া প্রজাতন্ত্রের গোয়েন্দা প্রধান আজিমভ প্রবেশ করেছে ব্যালকনিতে। তার হাতে একটা বড় ইনভেলাপ।

আজিমভ ইনভেলপটি আহমদ মুসার হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'এতে পারমানবিক কমপ্লেক্সের লোকদের পারিবারিক ইতিহাস ও সার্ভিস রেকর্ডসহ স্টাফ লিষ্ট আছে।'

আহমদ মুসার সামনের চেয়ারে বসল আজিমভ।

স্টাফ লিস্টটি ইনভেলাপ থেকে বের করল আহমদ মুসা। তার চোখের সামনে মেলে ধরল ষ্টাফ লিস্টটি সে।

অনেকক্ষণ পর লিস্ট থেকে মুখ তুলল আহমদ মুসা এবং চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজল। আরো কিছুক্ষণ পর চোখ খুলে আজিমভকে বলল, 'কমপ্লেক্সের ডাইরেক্টর জেনারেল সাহেবকে কি এখন পাওয়া যাবে?

'জি হ্যাঁ, মুসা ভাই। উনি ড্রইং রুমে অপেক্ষা করছেন। ডাকবো তাকে ?'

'একটু পরে ডেকো।' বলে থামল আহমদ মুসা। একটু পরে আবার শুরু করল, 'তুমি কি জান, আণবিক কমপ্লেক্সে স্টাফ নিয়োগের ক্ষেত্রে কি ধরনের বিধি-নিষেধ আছে ?'

'লিখিত যে বিধান রয়েছে তাতে বলা হয়েছে সৎ, চরিত্রবান ও সর্বোচ্চ যোগ্যতা সম্পন্ন ছাড়া কাউকে এ কমপ্লেক্সে নিয়োগ করা যাবে না। কিন্তু কিছু অলিখিত বিধান কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়। সেগুলো হলো, আণবিক কমপ্লেক্স ও মহাশূন্য গবেষণা কেন্দ্রে যাকে নিয়োগ করা হবে তাকে অবশ্যই মধ্য এশিয়া বা কোন মুসলিম দেশের জন্মগত মুসলিম হতে হবে। দুই, কম্যুনিষ্ট ব্যাক গ্রাউন্ড আছে অথবা রুশ পিতা অথবা রুশ মাতার সন্তান এমন কাউকেই এই কমপ্লেক্সে চাকুরী দেয়া যাবে না। তিন, ডিভাইডেড ফ্যামিলির সদস্য অর্থাৎ যার পরিবারের এক অংশ মধ্য এশিয়ায় আছে এবং আরেক অংশ রাশিয়ায় আছে তাকেও চাকুরী দেয়া যাবে না।' থামল আজিমভ।

'চাকুরী হবার পর কি তাদের ওপর নজর রাখা হয় ?'

'তাদের গতিবিধির প্রতি নজর রাখার ব্যবস্থা আছে।'

‘তাদের পারিবারিক বিষয়াবলীর প্রতি নজর রাখার কি কোন ব্যবস্থা আছে ?'

আজিমভ একটু চিন্তা করে বলল, ‘জি না, এরকম বিশেষ কোন নির্দেশ দেয়া নেই।’

‘প্রোমোশন-ডিমোশনের ক্ষেত্রে কি সিস্টেম এখানে অনুসরণ করা হয় ?’

‘এ ব্যাপারে পরিচালনা বোর্ড সিদ্ধান্ত নেয়। ডাইরেক্টর জেনারেল সার্ভিস রেকর্ডসহ পরিচালনা বোর্ডের কাছে প্রস্তাব পেশ করেন ?’

‘কিসের ভিত্তিতে তিনি প্রস্তাব তৈরী করেন ?’

‘কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্টের ভিত্তিতে।’

‘এ রিপোর্ট কে তৈরী করেন ?’

‘প্রত্যেক বিভাগের ডাইরেক্টর তার বিভাগের স্টাফদের রিপোর্ট তৈরী করেন। এ রিপোর্ট সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রস্তাবকারী ডিজির কাছে পেশের জন্যে দায়িত্বশীল হলেন স্টাফ ডাইরেক্টর।’

‘ডাইরেক্টর জেনারেল সম্পর্কে তোমার মত কি ?’

‘আপনিও তাকে জানেন। ছাত্র জীবন থেকেই কম্যুনিজমের সাথে ভিন্নমত পোষন করতেন। তারপর বিপ্লবের সাথী হন এবং এই অপরাধে দীর্ঘ দিন তাকে বন্দী শিবিরে কাটাতে হয়। তাঁকে সবাই আমরা সব সন্দেহের উর্ধে মনে করি।’

‘আর স্টাফ ডাইরেক্টর ?’

‘স্টাফ ডাইরেক্টর সুলেমানভ কম্যুনিস্ট পক্ষ ত্যাগকারী একজন লোক। তিনি লন্ডনে এক অর্থনৈতিক প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে স্বপক্ষ ত্যাগ করেন। বিপ্লবের পরে ফিরে আসেন মধ্য এশিয়ায়। বিপ্লবের প্রতি তাঁকে আমরা আন্তরিক পেয়েছি।’

‘তার স্ত্রী আছে ?’

‘না, মারা গেছেন।’

‘কতদিন তার স্ত্রী নেই ?’

‘তিন বছর।’

‘বিয়ে করেননি কেন আর ?’

‘বড় বড় ছেলে-মেয়ে আছে, সংসারে তিনি নতুন কোন অশান্তি সৃষ্টি করতে চান না?’

‘স্বপক্ষ ত্যাগের পর তিনি বৃটেনে কতদিন ছিলেন ?’

‘পাঁচ বছর।’

‘ঠিক আছে তুমি ডাইরেক্টর জেনারেলকে ডেকে দাও। আর বলে দিয়ে এস, স্টাফ ডাইরেক্টর সুলেমানভকে এক্ষুণি আসার জন্যে।’

আজিমভ চলে গেল।

অল্পক্ষণ পর ডাইরেক্টর জেনারেল ওসমানভকে নিয়ে আজিমভ আহমদ মুসার কাছে ফিরে এল।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানাল মাঝ বয়সী ওসমানভকে।

সবাই বসল।

‘জনাব আপনাকে কষ্ট দিয়েছি কয়েকটা বিষয় জানার জন্যে।’ ওসমানভের দিকে নরম কন্ঠে বলল আহমদ মুসা।

‘এ আমার দূর্লভ সৌভাগ্য জনাব। আপনার সান্নিধ্যে এমন সৌভাগ্য যদি আমার প্রতিদিন হতো!’

‘গত দু'বছর যে প্রমোশনগুলো আপনার প্রতিষ্ঠানে হয়েছে, আপনি তাতে সন্তুষ্ট ?’

‘অসন্তুষ্ট আমি কোনটাতেই নই।’ একটু চিন্তা করে জবাব দিল ওসমানভ।

‘একজনের প্রমোশন কতদিন পরপর হওয়ার নিয়ম ?’

‘ধরাবাধা কোন নিয়ম নেই। প্রতিষ্ঠানের বয়স কম বলে কোন ঐতিহ্যও গড়ে উঠেনি। প্রয়োজনই এখন সবরকম পরিবর্তন ও সিদ্ধান্তের মানদন্ড। এদিক থেকে প্রমোশন ঘন ঘনও হতে পারে কারো ক্ষেত্রে, আবার কারো প্রমোশন দেরীতেও হতে পারে।’

‘আপনার এই মানদন্ড অনুসারে কোন প্রমোশন বা ট্রান্সফার কি একটু-আধটুও অসমীচিন বা অসংগত মনে হয়েছে, আপনার কাছে ?’

ওসমানভ মাথা নিচু করে ভাবল। অনেক্ষণ পর মাথা তুলে বলল, ‘অফিসের আভ্যন্তরীণ সিকুরিটি বিভাগের রেকর্ড কিপার আবু আমিনভ এবং গবেষণা বিভাগের লগ-এ্যাসিস্টেন্ট ইয়াসিনভ-এর ট্রান্সফার ও প্রমোশন আমার কাছে অসংগত নয়, তবে খুব প্রয়োজনীয় বিষয় ছিল না বলে আমার মনে হয়েছিল।’

আহমদ মুসার চোখের উজ্জ্বল্য যেন বেড়ে গেল। বলল, ‘এছাড়া আর কারও ?’

‘আমার মনে পড়ছে না।’ চিন্তা করে বলল ওসমানভ।

‘ঐ দুইজনের প্রমোশন ও ট্রান্সফার খুব প্রয়োজনীয় মনে হয়নি, কিন্তু তবু হলো কেন ?’

‘ট্রান্সফারের ফলে ঐ পদ দু’টি খালি হয়। কিন্তু এই ট্রান্সফার খুব প্রয়োজনীয় ছিল না।’

‘ধন্যবাদ আপনাকে। আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি।’

উঠে দাঁড়াল ওসমানভ। আহমদ মুসাও। সালাম দিয়ে হ্যান্ডশেক করে বিদায় নিল ওসমানভ।

‘সোলাইমানভ এসেছে মুসা ভাই, ডাকব তাকে ?’

আহমদ মুসা বসতে বসতে বলল, ‘বস, কথা আছে, একটু পরে ডাক ওকে।’

বসল আজিমভ।

‘জিজ্ঞাসাবাদের পর সুলাইমানভকে আণবিক কমপ্লেক্সে ফিরে যেতে দেয়া যাবে না। তাকে হয় কোথাও পাঠাতে হবে, না হয় আটকে রাখতে হবে। এ দু'টির কোনটিই যদি আমরা না করি, তাহলে তাকে যা জিজ্ঞাসা করতে চাই তা জিজ্ঞাসা করা যাবে না।’

আজিমভ চোখ ছানাবড়া করে বলল, ‘মুসা ভাই আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, কোন পথে এগুচ্ছেন আপনি। সুলাইমানভ আমাদের কি করতে পারে ?’

‘কিছুই করতে পারে না। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাসাবাদে তার যে সন্দেহ জাগবে তা কাউকে সে বলে দিতে পারে।’

‘বুঝেছি মুসা ভাই, কাউকে সাথে দিয়ে সুলাইমানভকে আমরা তাসখন্দে পাঠাতে পারি কিছু একটা কাজের কথা বলে।’

ভাবছিল আহমদ মুসা। আজিমভ কথা শেষ করলে আহমদ মুসা বলল ‘ঠিক আছে সুলাইমানভকে কোথাও পাঠিয়ে কাজ নেই। ওকে বলবে আজকের সন্ধ্যেটা তিনি আমাদের সাথেই থাকবেন।’

একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর আবার শুরু করল, ‘আণবিক কমপ্লেক্সে দ্বিতীয় সিফটের কাজ আর আধাঘন্টার মধ্য শেষ হচ্ছে। তুমি তোমার লোকদের বলে দাও, সিকুরিটি বিভাগের আবু আমিনভ এবং গবেষণা বিভাগের ইয়াসিনভ যখন অফিস থেকে বের হবে, তখন তাদের যেন চোখে চোখে রাখা হয়।’

‘আপনি কি ওদের সন্দেহ করছেন মুসা ভাই?’

‘ওদের ওপর সন্দেহটা গিয়ে পড়েছে, সেটাই পাকাপোক্ত করার চেষ্টা করছি। আবু আমিনভ -এর ব্যাপারে সন্দেহ করার একটা শক্তিশালী কারণ খুঁজে পেয়েছি, কিন্তু ইয়াসিনভের ক্ষেত্রে পায়নি। তবে তাঁর প্রমোশনও আবু আমিনভ-এর মতই অস্বাভাবিক। দু'জনেই অল্প সময়ে দু'টো করে প্রমোশন ও ট্রান্সফার পেয়েছে একই সময়ে।’

থামল আহমেদ মুসা। আজিমভ কোনো কথা বলল না। দেখল, আহমেদ মুসা গভীর ভাবনায় ডুবে আছে।

একটু পরেই আহমদ মুসা আবার মুখ খুলল। বলল, ‘তোমরা তো স্টাফদের বাইরের গতিবিধির উপর নজর রাখ, বলতে পার ইয়াসিনভ কোথায় বেশি উঠাবসা করে, কারও সাথে তাঁর বেশি সম্পর্ক আছে কি না?’

‘ওদের দু'জনের উপর চোখ রাখার কথা বলে এই খবরটা দিয়ে আসি মুসা ভাই তাহলে!’

‘যাও।’

আজিমভ উঠে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা আবার সেই স্টাফ লিস্টের উপর চোখ বুলাতে লাগল। অল্পক্ষণ পরেই আজিমভ ফিরে এল। বসতে বসতে বলল, 'ওদের চোখে চোখে রাখার কথা বলে এলাম মুসা ভাই আর ইয়াসিনভের বাইরের জীবনের ব্যাপারে খুব বেশি তথ্য দিতে পারল না। বাইরে তাঁর ঘোরাফেরা খুবই কম। তা এক মেয়ে বান্ধবী আছে, যার সাথে বিয়ে হবে। তার উঠা-বসার জায়গা একমাত্র ওটাই।'

'মেয়ে বান্ধবীর নাম কি?' নড়েচড়ে বসে প্রশ্ন করল আহমদ মুসা।

'ইভানোভা।'

'রাশিয়ান?' চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আহমদ মুসার।

'জি, হ্যাঁ, রাশিয়ান।'

আহমদ মুসা চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বলল, 'আমি এরকমটাই আশা করছিলাম আজিমভ।'

'আমি এখনো কিছু বুঝতে পারছি না মুসা ভাই। এ বিষয়টাকে আমরা কেউ গুরুত্ব দেইনি। মধ্য এশিয়ায় রাশিয়ান স্ত্রী একটা সাধারণ ঘটনা।'

'ঠিক, কিন্তু কখনো কখনো আসাধারণ হয়ে উঠতে পারে অসাধারণত্ব কিছু আছে কি না, তাই আমি জানার চেষ্টা করছি। তুমি সুলাইমানভকে ডাক।'

অল্প কয়েকটি মুহূর্ত। আজিমভ সুলাইমনভকে নিয়ে ফিরে এল।

মাথাটা একটু নিচে করে জড়সড়োভাবে সুলাইমনভ এসে দাঁড়াল আহমদ মুসার সামনে। চল্লিশোর্ধ ভদ্রলোক। বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, কিন্তু মুখের ওপর মলিন একটা ছায়া।

'বসুন।' সুলাইমানভের সাথে হ্যান্ডশেক করে বসতে বসতে উচ্চারণ করল আহমদ মুসা।

বসল সুলাইমানভ।

'আণবিক গবেষণাগার নতুন করে চালু হবার পর থেকেই তো আপনি আছেন?' আহমদ মুসার প্রথম জিজ্ঞাসা।

'জি, হ্যাঁ।' মুখ তুলে জবাব দিল সুলাইমনভ।

'আপনি তো জানেন গবেষণাগারে ইতিমধ্যই আনেকগুলো মারাত্মক ঘটনা ঘটে গেছে। এ ব্যাপারে আমরা আপনার কাছে সাহায্য চাই।'

‘অবশ্যই, সাহায্য করতে পারলে খুশী হবো । প্রতিষ্ঠান তো আমাদের।’

সুলাইমনভের কথাই কোনো খাদ নেই, আনুভব করল আহমেদ মুসা।

‘আপনি একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে রয়েছেন। প্রমোশন ও ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে অসংগত ও অস্বাভাবিক কিছু কখনও আপনার দ্বারা হয়েছে বলে আপনি কি মনে করেন? কিছু মনে করবেন না, প্রশ্নটা খুব অপ্রীতিকর হয়ে গেল।’

সুলাইমনভের মুখের মলিন ছায়াটা গভীর হল, তৎক্ষণাৎ কোন জবাব দিল না। একটু সময় নিয়ে ধীরে ধীরে বলল, ‘আপনার কাছে কিছুই লুকানো থাকবে না। এ ধরণের দু’টি কাজ আমার দ্বারা হয়েছে, যার জন্য আমি অনুতপ্ত।’

‘যেমন’ বলল আহমদ মুসা ।

‘একটি আবু আমিনভের ক্ষেত্রে, আরেকটি ইয়াসিনভের ক্ষেত্রে।’ সুলাইমানভের কন্ঠ ভারী ও কাঁপা শোনাল।

‘বুঝতে পারছি অনিচ্ছা সত্বেই হয়েছে ,কিন্তু কিভাবে হলো।’

‘আমার দুর্বলতার কারণে।’

‘সে দুর্বলতা কি?’

‘আবু আমিনভ ও তার পরিবারবর্গ আমার বাড়িতে খুব বেশি যাতায়াত করতো। আবু আমিনভ এবং ইয়াসিনভ দু’জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু।’

‘আর কিছু?’

‘আরও আছে। আপনার কাছে কিছুই আমি লুকাতে পারব না। আবু আমিনভের স্ত্রীর বড় বোন ও আসতো আমাদের বাড়ীতে। আমি তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম।’ বলে সুলাইমানভ দু’হাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

সুলাইমানভ কিছুটা শান্ত হলে আহমদ মুসা বলল, ‘তারপর।’

‘তারপর আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেছেন। ধীরে ধীরে দুর্বলতা আমি কাটিয়ে উঠতে পেরেছি।’

‘এ ব্যাপারে আপনি আবু আমিনভের ভুমিকাকে কি দৃষ্টিতে দেখেন?’

‘ওকে কোনো দোষ আমি দেই না। দুর্বলতাটা আমার নিজস্ব ছিল।’

‘তাদের প্রমোশন ও ট্রান্সফার আপনার প্রস্তাব ছিল, না তাদের অনুরোধ ছিল?’

‘তাদের অনুরোধ ছিল।’

‘যুক্তি কি ছিল তাদের?’

‘তাদের ব্যাক্তিগত পছন্দ ছিল।’

‘তাদের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে আপনার অভিমত কি??

‘এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিভাগ ভাল বলতে পারবে। তবে তাদেরকে আমার অবিশ্বস্ত মনে হয়নি।’

‘আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, কঠিন হলেও আপনি সত্য কথা বলেছেন।’

সুলাইমানভ উঠে দাঁড়াল এবং সালাম জানিয়ে চলে গেল।

আহমদ মুসা গা এলিয়ে দিল চেয়ারে। চোখ বুজল।

আজিমভ কথা বলে আহমদ মুসাকে বিরক্ত না করে পায়চারী করতে লাগল।

কিছুপর চোখ খুলল আহমদ মুসা। ডাকল আজিমভকে।

আজিমভ এসে বসল।

‘আবু আজিমভ ও ইয়াসিনভ সম্পর্কে আমাদের এ আলোচনা কোনোভাবে কি আজ কিংবা দু’একদিনের মধ্য তাদের কানে পৌছতে পারে?’ আহমদ মুসা বলল।

‘পৌছবে না একথা বলা মুস্কিল। আমরা যদি সুলাইমানভকে ধরে রাখি, তাহলে এটা তাদের কানে যেতে পারে। আর যদি কোথাও পাঠিয়ে দেই, সেখান থেকে সুলাইমানভ এদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে।’

‘আমি চিন্তা করছি এছাড়া আরও কোন পথ আছে কিনা।’

‘সেটা কি হতে পারে?’

‘দেখ, আমার সন্দেহ যে ঠিক তা এখনো যদিও প্রমাণ হয়নি, তবে ঠিক হলে এই নেটওয়ার্কে আরও লোক থাকতে পারে এবং তাদের চোখ আমাদের এই কাজগুলো লক্ষ্য করতে পারে। দ্বিতীয়ত, আমাদের শত্রুপক্ষের প্রযুক্তি আমাদের চেয়ে উন্নততর। তারা যদি ইলেকট্রনিক ইনফরমেশন নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে থাকে, তাহলে এই গুরুত্বপূর্ণ রেস্ট হাউজ তাদের নেটওয়ার্কের বাইরে নয়। অর্থাৎ

সেক্ষেত্রে আমাদের আজকের গোটা আলোচনা এতক্ষণে ওদের কাছে পৌছে গেছে।'

খুব চিন্তাক্লিষ্টভাবে কথা শেষ করলো আহমেদ মুসা।

'আপনার প্রত্যেকটা কথা সত্য হতে পারে মুসা ভাই। 'স্পাই বাগ ডিটেক্টর' দিয়ে রেস্ট হাউজটা পরীক্ষা করব?' উদ্বিগ্ন কন্ঠে বলল আজিমভ।

'করতে পার, কিন্তু চলে যাওয়া কথা গুলো আর ফিরে আসবে না। তাছাড়া এমন কিছু 'গোয়েন্দা তথ্য প্রেরক যন্ত্র' আজকাল ব্যবহার করা হচ্ছে যা প্রচলিত 'স্পাই বাগ ডিটেক্ট' দিয়ে ধরতে পারছে না।'

'তাহলে?'

'তাহলে আর কি, পাখি উড়ে গেল। ওদের নেটওয়ার্কে আর হাত দেয়া গেল না।'

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকাল। তারপর উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'তুমি মিঃ সুলাইমানভকে যেতে বল। আর চল একটু বেড়িয়ে আসি।'

আজিমভ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'কোথায়?'

'এমনি এদিক-ওদিক।' বলে আহমেদ মুসা হাঁটতে শুরু করল।

গাড়িতে উঠার জন্য গাড়ির দিকে এগিয়েও ফিরে এল আহমদ মুসা। আজিমভ এলে তাকে বলল, 'কোন ভাড়া গাড়ি পাওয়া যাবে না?'

'কেন আমার গাড়ি?'

'তোমার গাড়ির উপরও আমার আস্থা নেই। ওখানে স্পাই বাগ বসানো নেই কে বলবে।'

'রেস্ট হাউজেরও গাড়ি আছে।'

'না ওটাও নিরাপদ নয়।'

'ওরা ওদের নেট ওয়ার্ক এতটা বিস্তার করেছে বলে মনে করেন?'

'এটা আমার সন্দেহ, মিথ্যাও হতে পারে।'

আর কোন কথা না বলে আজিমভ তার ওয়াকি-টকিতে পুলিশ চীফকে বলল বেসরকারী ট্রান্সপোর্ট পুল থেকে ভাল একটা গাড়ি রেস্ট হাউজে পৌঁছে দেবার জন্যে।

গাড়ি এল। ড্রাইভারকে বিদায় দিয়ে ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল আজিমভ। তার পাশের সিটে আহমদ মুসা।

গাড়ি স্টার্ট দিতে যাবে এমন সময় আজিমভের ওয়াকি-টকি কথা বলে উঠল। বলল, 'ওদের দুজনকে আমাদের যে চারজন লোক অনুসরণ করছিল তারা ধরা পড়েছে। অনুসরণ শুরু করার পাঁচ মিনিটের মধ্যে সামনে ও পিছন থেকে দু'টি গাড়ি তাদের ঘিরে ফেলে এবং তাদের ধরে নিয়ে যায়। অফিস বন্ধ হবার ১০ মিনিট আগেই শিকার দু'জন বেরিয়ে আসে। তারা বাড়িতে না গিয়ে কারসাপক হাইওয়ে ধরে উত্তরে এগুচ্ছিল। সমস্ত পুলিশ পয়েন্টকে এ্যালার্ট করে দেয়া হয়েছে। চারদিক থেকে ওদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হচ্ছে।'

বন্ধ হয়ে গেল কথা। সায়েজুর পুলিশ চীফ কথা বলছিল ওয়াকি-টকিতে।

আজিমভের সারা মুখে নেমে এসেছে ব্যর্থতার অন্ধকার। বলল, 'আপনার সন্দেহটা এত সত্য হয়ে এত তাড়াতাড়ি সামনে আসবে তা ভাবিনি।'

'আমারও ভুল হয়েছে আজিমভ। আরও আগে সতর্ক হলে এই ক্ষতিটা হয়তো এড়ানো যেত।'

'আমরা তো এখন আবু আমিনভ-এর বাসাটা দেখতে পারি। মনে হয় তার রাশিয়ান স্ত্রীই আসল এজেন্ট।' ব্যস্ত কণ্ঠে বলল আজিমভ।

'মনে হয় বলছ কেন, সেই তো আসল। আবু আমিনভ বাহন মাত্র, ওদের হাতে ব্যবহৃত হয়েছে। সেই কারণেই আবু আমিনভের বাসায় গিয়ে সব শূন্য দেখবে। আবু আমিনভ ও ইয়াসিনভকে সাবধান করার আগেই ওরা আমিনভের স্ত্রীকে সরিয়ে নিয়েছে। তবু চল, শত্রু কোন চিহ্ন ফেলে রেখে গেছে কি না দেখা যাক।'

ছুটল গাড়ি আবু আমিনভের বাড়ির দিকে।

আবু আমিনভ আণবিক গবেষণা কমপ্লেক্সের সাধারণ কর্মচারীদের জন্যে নির্দিষ্ট রেসিডেন্সিয়াল ব্লকে থাকে। এ ব্লকটিও সুরক্ষিত। চারদিকে উঁচু প্রাচীর।

তাছাড়াও আছে পাহারার ব্যবস্থা। রেসিডেন্সিয়াল ব্লকে ঢুকতে হলে গেটে সিকুরিটি পাশ দেখাতে হয়। কর্মচারীদের সুপারিশের ভিত্তিতেই এই পাশ ইস্যু হয়ে থাকে।

গাড়ি বারান্দায় গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিস্মিত হলো আহমদ মুসা। গাড়িটা যেন ঠিক যাত্রার জন্যে তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

'গাড়িটা কি আবু আমিনভের?' বলল আহমদ মুসা।

'নাম্বার দেখে তাই মনে হচ্ছে।' আজিমভ উত্তর দিল।

'তাহলে আবু আমিনভরা অফিস থেকে অন্য গাড়িতে গেছে। কিন্তু তার স্ত্রী গেল কোন গাড়িতে?'

'কেউ এসে নিয়ে যেতে পারে, কিংবা এখনও যায়নি।'

'এসে নিয়ে যাওয়া স্বাভাবিক নয়। আর সে এখনো বাসায় থাকতে নাও পারে।'

'তাহলে?'

আহমদ মুসা গাড়ির সামনের ঢাকনা স্পর্শ করে বলল, 'গাড়িটা ফিরে এসেছে। অর্থাৎ এ বাড়িতে ফাঁদ পাতা হয়েছে আমাদের জন্যে।'

'বুঝেছি মুসা ভাই।' মুখ উজ্জ্বল করে বলল আজিমভ।

আহমদ মুসা একটু ভাবল। তারপর বলল, 'শোন, আমরা দু'জন গিয়ে এখন দরজার সামনে দাঁড়াব। তুমি দরজার ডোর ভিউ-এ হাত রাখবে। তারপর আমি চলে যাব বাড়ির পেছনে, পেছন দিয়ে আমি বাড়িতে ঢুকবো। আমি চলে যাবার দু'মিনিট পর তুমি দরজায় নক করবে। কিন্তু তোমার হাত অবশ্যই ডোর ভিউ-এ রাখতে হবে যাতে করে ভেতর থেকে দেখতে না পায় দরজায় ক'জন দাঁড়িয়ে।'

'এর কি দরকার? লুকিং হোল খোলা থাকলেও তারা দেখবে আমরা শত্রু, বন্ধ থাকলেও তারা বুঝবে আমরা শত্রু।'

'আমরা দু'জন এসেছি, ইতিমধ্যেই ওরা তা দেখেছে। তারপর দরজায় একজন দাঁড়ান দেখবে, তখন তাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে আরেকজন অন্যপথে গেছে। আমরা তাদেরকে এটা জানতে দিতে চাই না।'

আহমদ মুসা ও আজিমভ অনেকটা অলস হাঁটার ভংগিতে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়াল। আজিমভ ধীরে ধীরে তার ডানহাত ডোর ভিউ-এর ওপর রাখল।

সংগে সংগেই চোখের পলকে ভোজ-বাজীর মতই খুলে গেল দরজা।

আকস্মিকতার ধাক্কা কাটিয়ে আহমদ মুসা যখন সামনে চাইল দেখল তিনটি স্টেনগান তাদের দিকে হা করে তাকিয়ে আছে।

তাদের একটি কণ্ঠ হো হো করে হেসে উঠল। বলল, 'আসুন, আসুন, আমরা আপনাদের জন্যেই অপেক্ষা করছি।'

কথা শেষ হবার আগেই স্টেনগানধারী একজন এগিয়ে এল। ডান হাতে স্টেনগান ধরে বাম হাত দিয়ে আজিমভের পকেট থেকে রিভলবার তুলে নিল। অন্য পকেটগুলো এবং কটিদেশও হাতিয়ে দেখল।

পরে এল আহমদ মুসার কাছে। কাছে আসার কারণে তার স্টেনগানের মাথাটা একটু উঁচু হয়ে উঠেছে।

আহমদ মুসার রিভলবারটি তার ডান পকেটে। সুতরাং এ রিভলবারটি তুলে নেবার সময় স্টেনগানধারীর বাম কাঁধ একটু বেঁকে আহমদ মুসার নিকটতর হয়ে পড়েছিল। পাঁচ ছয় হাত দূরে দাঁড়ানো দুইজন স্টেনগানধারীর সাথে কিছুটা আড়াল সৃষ্টি হয়েছিল।

আজিমভের মত আহমদ মুসার হাত দু'টিও ওপরে তোলা ছিল। স্টেনগানধারী যখন আহমদ মুসার পকেট থেকে রিভলবার তুলছিল, ঠিক সেই সময় আহমদ মুসার হাত দু'টি বিদ্যুৎবেগে নেমে এল। বাম হাত দিয়ে সাঁড়াশির মত গলা পেঁচিয়ে দেহটা ঘুরিয়ে নিয়ে চেপে ধরল বুকের সাথে। আর ডান হাত তার স্টেনগান কেড়ে নিয়ে আজিমভকে দিয়ে দিল। ওরা বুঝে ওঠার আগেই আজিমভ এক লাফে সরে এল আহমদ মুসার পেছনে। ইতিমধ্যে আহমদ মুসা নিজের পকেটের রিভলবারটি বের করে নিল।

সামনে দাঁড়ানো দু'জন স্টেনগানধারী মুহূর্তের জন্যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তার পরেই তারা সক্রিয় হয়ে উঠল। কিন্তু সামনে গুলি করার উপায় ছিল না। তারা দু'পাশে দু'জন সরে গিয়ে গুলি করার সুযোগ বের করতে

চাইল। কিন্তু আজিমভ আহমদ মুসার আড়ালে দাঁড়িয়ে গুলি করে তাদের উদ্যোগ ব্যর্থ করে দিল।

আহমদ মুসার রিভলবারও ওদের দিকে তাক করা ছিল। আহমদ মুসা কঠোর কণ্ঠে ওদের স্টেনগান ফেলে দেবার নির্দেশ দিল। কিন্তু নির্দেশ তারা পালন করল না। বরং ওদের চোখকে পশুর মত জ্বলে উঠতে দেখল আহমদ মুসা। বলল, 'আমাদের সাথীকে ঢাল বানিয়ে বাঁচতে পারবে না। তোমার জন্যে আমরা একজন নয় এক'শ জন সাথীও হারাতে.........'

কথা তাদের শেষ হলো না। শেষ করতে দিল না আহমদ মুসা। আহমদ মুসার বুঝার বাকি ছিল না, এরপর ওরা কি করবে। ওদের কথা শেষ করার আর সম্ভবত দু'টি শব্দ বাকি ছিল। এটুকু
সময়ের মধ্যে আহমদ মুসার রিভলবার দু'বার অগ্নি উদ্‌গীরণ করল। স্টেনগানধারী দু'জনের স্টেনগান হাত থেকে খসে পড়ল, ওরাও আছড়ে পড়ল মেঝের ওপর।

আহমদ মুসা যাকে ধরে রেখেছিল, তাকে এবার ছুড়ে ফেলল মেঝেতে। লোকটি মেঝেতে পড়েই তার ডান হাতের মধ্যমা আঙুলের আংটি কামড়ে ধরল।

আহমদ মুসা বুঝতে পারল কি ঘটছে। সংগে সংগে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটির ওপর। তার হাতটি কেড়ে নিল মুখ থেকে। কিন্তু লাভ হলো না। সাংঘাতিক পটাসিয়াম সাইনাইড ততক্ষণে তার কাজ শুরু করে দিয়েছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল লোকটি।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'ওদের কাউকে জীবন্ত ধরতে আবার ব্যর্থ হলাম। জয় অথবা মৃত্যুই ওদের মটো। ওরা কোন অবস্থাতেই ধরা পড়তে চায় না।'

ওদের পকেট সার্চ করে কিছু পাওয়া গেল না।

আহমদ মুসা ও আজিমভ গোটা বাড়িটাই সার্চ করল। কিন্তু উল্লেখ করার মতো প্রয়োজনীয় কিছুই পেল না।

আহমদ মুসা ও আজিমভ বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। হাঁটতে হাঁটতে আজিমভ বলল, 'আমাদের জন্যে সবচেয়ে মূল্যবান ক্লু ছিল আবু আমিনভ এবং ইয়াসিনভ। আমরা ব্যর্থ হলাম ওদের ধরে রাখতে।'

বলে আজিমভ পকেট থেকে ওয়াকি-টকি বের করে বলল, 'দেখি ওরা আবু আমিনভ ও ইয়াসিনভ-এর কোন সন্ধান পেল কি না।'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'ওদের সন্ধান আর পাবে না, পেতে পারো লাশের সন্ধান।'

আহমদ মুসা কথা শেষ করতেই আজিমভের ওয়াকি-টকি কথা বলে উঠল। বলল, 'শহরের বাইরে একটা ছোট অখ্যাত রাস্তার পাশের খাদে আমাদের চারজন গোয়েন্দা কর্মীসহ আবু আমিনভ ও ইয়াসিনভের লাশ পাওয়া গেছে। সকলের লাশ পুলিশ হেডকোয়ার্টারে আনা হয়েছে।'

আজিমভের মুখ মলিন হয়ে পড়েছিল। বলল, 'ওরা খুন করল আবু আমিনভ ও ইয়াসিনভকে?'

'ওদের পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ার পর ওরা হয়ে দাঁড়িয়েছিল বোঝা, সেই বোঝাই গ্রেট বিয়ার নামিয়ে দিয়েছে। আবু আমিনভের রাশিয়ান স্ত্রীই ছিল ওদের লোক। ওকে তারা সরিয়ে নিয়েছে এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে দেখ ঠিক ভাবেই।'

'চলুন মুসা ভাই, পুলিশ হেড কোয়ার্টারে যাই। কিছু ক্লু যদি পাওয়া যায়।'

'কিছুই পাবে না আজিমভ, এমনকি ফিংগার প্রিন্টও নয়। বৃথা চেষ্টা। দেখলে না ওদের তিনজনের হাতেই গ্লাভস ছিল।'

আহমদ মুসা ও আজিমভ দু'জনেই এসে গাড়িতে উঠল। গাড়ি ষ্টার্ট দিল আজিমভ।

'যদিও দুঃখ হচ্ছে আমিনভ ও ইয়াসিনভকে জীবিত হাতে না পাওয়ার জন্যে, তবু মনটা খুব হালকা মনে হচ্ছে মুসা ভাই। আমাদের আণবিক গবেষণা কেন্দ্র রাহু মুক্ত হলো। ভেতর থেকেই ওরা সবকিছু ঘটিয়েছে বলে আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কোনই কাজে আসেনি। আমার এখন মনে হচ্ছে বিজ্ঞানী

নবিয়েভকে আনার জন্যে যে গাড়ি এয়ারপোর্টে গিয়েছিল, তাতে বোমা ফিট করা আবু আমিনভদেরই কাজ।'

'হতে পারে।' বলে আহমদ মুসা একটু ভাবল। তারপর বলল, 'আমারও মনে হচ্ছে আণবিক গবেষণা কেন্দ্রে গ্রেট বিয়ারের সোর্স এ দু'জনই ছিল। তবু আগামী কিছুদিন প্রতিটি কর্মচারীর প্রতিটি পদক্ষেপের খোঁজ নিতে হব। তাদের যোগাযোগের ক্ষেত্রকে যাচাই করে দেখতে হবে। কারও মধ্যে কোন অবৈধ অর্থনীতি ও নারীপ্রীতি যদি দেখা যায়, সংগে সংগে তাকে এখান থেকে সরিয়ে দিতে হবে। এ ধরনের চরিত্রহীনদেরকেই শত্রুরা কাজে লাগায়।'

'আল্লাহর হাজার শুকরিয়া মুসা ভাই। আপনি অদ্ভুত নিখুঁতভাবে ক্রিমিনাল দু'জনকে চিহ্নিত করেছেন। না হলে আরও কত যে ক্ষতি হতো, আরও কতদিন যে অন্ধকারে ঘুরতে হতো! বুঝতে পারছি না, আমিনভকে সন্দেহ করলেন তার রাশিয়ান স্ত্রীর জন্যে, কিন্তু ইয়াসিনভকে?'

'ওদের দু'জনের এক সাথে একাধিক প্রমোশন দেখে।'

'সুলাইমানভকে আপনার কেমন মনে হয়?'

'লোকটার দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছে আবু আমিনভরা। তবে লোকটা ষড়যন্ত্রের মধ্যে নেই। কিন্তু ওকে আণবিক গবেষণা কেন্দ্র থেকে অন্য কোন চাকুরীতে সরিয়ে নিয়ে যাও।'

আহমদ মুসা কথা বললেও তাঁকে আনমনা মনে হলো।

'কিন্তু কি ভাবছেন মুসা ভাই?' আহমদ মুসার দিকে চেয়ে গম্ভীর কন্ঠে জিজ্ঞাসা করল আজিমভ।

'হ্যাঁ ভাবছি, 'গ্রেট বিয়ার' –এর কথা। ওদের গায়ে হাত দেয়া গেল না, অথচ ওরা ওদের ধ্বংসযজ্ঞ নিরাপদেই করে চলেছে।'

আজিমভের মুখে চিন্তার ছায়া নেমে এল। কোন কথা বলল না সে।

'এখন কোথায় চলছ তুমি?' আহমদ মুসাই আবার কথা বলল।

'রেষ্ট হাউজে।'

'না রেষ্ট হাউজে নয়, কারসাপক এয়ারপোর্টে চল। আর তোমার অয়্যারলেসে বলে দাও আমার ব্যাগটা যেন সেখানে পৌঁছে দেয়।'

আজিমভের মুখটা যেন শুকিয়ে গেল। বলল, 'এখানে আর কিছু করার নেই মুসা ভাই?'

'আপাতত নেই। গ্রেট বিয়ারের মধ্য এশীয় হেড কোয়ার্টার তাসখন্দে। ওখানেই আমাকে যেতে হবে। ওদের বেশি সময় দেয়া যাবে না আজিমভ।'

'আমার এখন করণীয়?'

'কয়েকটা বড় ঘটনা ঘটলো তো এখানে? তুমি দু'দিন পরে তাসখন্দে এস।'

আহমদ মুসা চুপ করল।

আজিমভও নিরব। আজিমভের কিছু বলার নেই। কষ্ট লাগছে আহমদ মুসার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে। তবু মুসা ভাই যা বলেছেন তার বাইরে কোন কথা নেই।

দু'জনেই নিরব।

নিরবে গাড়িও এগিয়ে চলছে সামনে।

সায়েজু থেকে কারসাপক এক ঘন্টার পথ। সন্ধ্যা পার হয়ে গেল কারসাপক পৌঁছতে।

কারসাপক শহর থেকে কারসাপক বিমান বন্দরের দূরত্ব প্রায় পাঁচ মাইল।

গাড়ি এয়ারপোর্ট রোডে পড়তে যাচ্ছে এমন সময় হঠাৎ আহমদ মুসা আজিমভকে গাড়ি দাঁড় করাতে বলল। গাড়ি দাঁড় করিয়ে বিস্মিত চোখে আজিমভ তাকাল আহমদ মুসার দিকে।

'বাবা খান ষ্ট্রীট কোথায় কোনদিকে আজিমভ?'

'শহরের একদম পূর্ব প্রান্তে পুরাতন অংশে। কেন?'

'এয়ারপোর্ট থেকে যে গাড়ি নিয়ে আমি গ্রেট বিয়ারকে অনুসরণ করেছিলাম, তার মালিকের বাড়ি ঐ ষ্ট্রীটে। গাড়ি ঘুরাও, ওখানে যেতে হবে।'

'কেন?'

‘ওর গাড়ি ওকে না বলেই নিয়ে গিয়েছিলাম। হারিয়ে গেছে গাড়িটা। তার সাথে বেচারার ব্লু বুক, লাইসেন্স সবই হারিয়ে গেছে। দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সে। ক্ষতিপুরণ আমাদের করা প্রয়োজন।’

‘বাড়ির নাম্বার আপনার কাছে আছে মুসা ভাই?’

‘হ্যাঁ আছে, ড্রাইভিং লাইসেন্স থেকে আমি ঠিকানাটা মুখস্ত রেখেছি।’

‘ঠিকানাটা আমাকে দিন মুসা ভাই। আমি তার সাথে দেখা করে ক্ষতিপূরণ ও লাইসেন্সের ব্যবস্থা করে দেব। আপনার যাওয়ার প্রয়োজন নেই।’

‘হ্যাঁ এটাও হতে পারে। তবে তোমাকে নিজে গিয়ে ক্ষতিপুরণ করে আমার পক্ষ থেকে তার কাছে মাফ চাইতে হবে। গাড়িটা পাওয়ায় আমাদের অশেষ উপকার হয়েছে, কিন্তু হয়তো অসীম ক্ষতি হয়েছে তার। তার পরিবারটা নিশ্চয় ঐ গাড়ির আয়েই চলতো। গাড়ি হারিয়ে তাদের কি অবস্থা হচ্ছে জানি না। তুমি আজই ফেরার পথে খোঁজ নিয়ে যাবে।’

‘ঠিক আছে মুসা ভাই।’

আবার গাড়ি চলতে শুরু করল।

নিরব চারদিক। সামনে দেখা যাচ্ছে এয়ারপোর্ট টার্মিনালের জ্বল জ্বলে আলো।

আহমদ মুসা ও আজিমভ দু’জনের দৃষ্টিই সামনে।

ছুটে চলেছে গাড়ি শিকারকে তাড়া করার মতো এক বেপরোয়া গতিতে।

বিশাল তাসখন্দ নগরী।

এই নগরীর জনারণ্যে গ্রেট বিয়ার তার মধ্য এশীয় হেডকোয়ার্টার স্থাপন করেছে। হেড কোয়ার্টারটি আসলে একটা বাস্তবায়ন কেন্দ্র মাত্র, পলিসি-প্রোগ্রাম আসে রাশিয়ার নতুন কেন্দ্র পিটার্সবার্গ থেকে। গ্রেট বিয়ারের আসল হেড কোয়ার্টার পিটার্সবার্গ। মস্কোর প্রকাশ্য হেডকোয়ার্টারটা তার ছায়ামাত্র। পিটার্সবার্গ ছিল জারের শাসন কেন্দ্র। এই কেন্দ্রকে ভিত্তি করেই রাশিয়ার নতুন

রুশ জাতীয়তাবাদ বা জারতন্ত্র মাথা তুলেছে। এই জারতন্ত্রের লক্ষ্য হলো মধ্য এশিয়ার মুসলিম প্রজাতন্ত্র সহ সব সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের যাবতীয় অংগরাজ্যকে আবার হাতের মুঠোয় নিয়ে আসা। গ্রেট বিয়ারের মাধ্যমে এই লক্ষ্যেরই বাস্তবায়ন তৎপরতা শুরু হয়েছে মধ্য এশিয়ার মুসলিম প্রজাতন্ত্রে।

তাসখন্দের বিশাল জনারণ্যে গ্রেট বিয়ারের হেড কোয়ার্টার কোথায় খুঁজে পাবে আহমদ মুসা! গ্রেট বিয়ারের কাউকেই এ পর্যন্ত হাতের মুঠোয় পাওয়া যায়নি কিংবা পাওয়া যায়নি তাদের কাছ থেকে কোন কাগজপত্র, যা থেকে তাদের পরিকল্পনা বা ঠিকানার কোন সন্ধান পাওয়া যায়। এলেনা নোভাস্কায়া গ্রেট বিয়ারের সদস্য ছিল না তাই তার কাছ থেকে বেশি কিছু তথ্য পাওয়া যায়নি। যা সে বলেছিল তার একটি হলো, গ্রেট বিয়ারের প্রতিটি বাড়ির গেটে গ্রেট বিয়ারের মাথা উৎকীর্ণ করা থাকে। গেটের বাইরে দাঁড়িয়েই তা দেখা যায়। এলেনার এ তথ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তাসখন্দের ছয়-সাত লাখ বাড়ি সার্চ করা কি সম্ভব।

গোয়েন্দা বিভাগকে কাজে লাগানো হয়েছে। আজিমভ, যুবায়েরভ ও আবদুল্লায়েভ সহ তাদের লোকজন অর্থাৎ গোটা সামরিক বেসামরিক প্রশাসনের উপযুক্ত সবাইকে কাজে লাগানো হয়েছে, কিন্তু রেজাল্ট কিছুই পাওয়া যায়নি।

প্রেসিডেন্টের সিকুরিটি সেলের মিটিং কক্ষ।

এই সিকুরিটি সেলের প্রধান মধ্য এশিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট কুতায়বা বসে আছেন তার চেয়ারে। তার পাশেই আহমদ মুসা। আহমদ মুসার সামনে কুতায়বা প্রেসিডেন্টের চেয়ারে বসতে চায়নি। কিন্তু আহমদ মুসা তাকে জোর করে বসিয়েছে। বলেছে, চেয়ারটা তোমার নয়, প্রেসিডেন্টের। প্রেসিডেন্টকে সেখানে বসতেই হবে।

প্রেসিডেন্ট ও আহমদ মুসা ছাড়া কক্ষে উপস্থিত আছে সেনাবাহিনী প্রধানসহ তিন বাহিনীর চীফ, পুলিশ বাহিনীর চীফ, গোয়েন্দা বাহিনীর প্রধান, পার্লামেন্টের সিকুরিটি বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান, স্বরাষ্ট্র সেক্রেটারী এবং প্রেসিডেন্টের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা।

কথা বলছিলেন প্রেসিডেন্ট কুতায়বা।

সবারই শুকনো মুখ উদ্বেগে আচ্ছন্ন। প্রেসিডেন্টেরও। শুধু আহমদ মুসার মুখটাই ভাবনাহীন।

পরপর দু'টি দুঃসংবাদ এসেছে রাজধানীতে। তাজিকিস্তানের বখশ নদীর 'বাইপাজিন পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র' প্রচন্ড এক বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়ে গেছে। এর পরেই খবর এল কাজাখস্তানের বিকোনুর উপগ্রহ উৎক্ষেপণ কেন্দ্রে বিস্ফোরণের পূর্ব মুহূর্তে দু'টি শক্তিশালী ডিনামাইট উদ্ধার করা গেছে। ডিনামাইট দু'টি বিস্ফোরিত হলে মহাশূন্য কেন্দ্রের ক্ষতি হতো। দু'টি ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি, এমনকি সন্দেহও করা যায়নি।

এসব ঘটনাসহ সামগ্রিক নিরাপত্তা বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্যেই আজকের এই মিটিং।

প্রেসিডেন্ট বলছিলেন, 'আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হাজার শুকরিয়া, আহমদ মুসা ভাইকে তিনি যথা সময়ে আমাদের মাঝে পাঠিয়েছেন। তাঁর কাছ থেকেই আমরা জানতে পেরেছি, একটা ষড়যন্ত্রের কালোমেঘ আমাদের প্রিয় দেশকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তিনি আসার আগে হিংসাত্মক যে ঘটনাগুলোকে আমরা আমাদের আভ্যন্তরীণ কোন ব্যাপার বলে মনে করেছি, তা যে বৈদেশিক ষড়যন্ত্র তা আপনারা সকলেই জেনেছেন। সে বৈদেশিক ষড়যন্ত্র এখন আরও ভয়ংকর রূপ নিয়ে আমাদের সামনে এসেছে। এর মোকাবিলা আমরা কিভাবে করতে পারি, তাই ছিল আজকের আলোচ্য বিষয়। দীর্ঘক্ষণ ধরে এ বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। এখন আলোচনার উপসংহার টানার জন্যে আমি আহমদ মুসা ভাইকেই অনুরোধ করছি।

সবাইকে দীর্ঘ আলোচনা ও মতামত প্রকাশের জন্যে মোবারকবাদ জানিয়ে আহমদ মুসা শুরু করল, 'আমরা পরিস্থিতিকে যতটুকু গুরুতর মনে করছি, প্রকৃত অবস্থা তার চেয়েও গুরুতর। রাশিয়ার 'গ্রেট বিয়ার' সংগঠন সেখানকার সরকারের চেয়েও সম্ভবত শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধ সবদিক থেকে। সেখানকার শাসক মহলের কারো সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়া এমনটা হয়নি। গ্রেট বিয়ার আমাদের বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান গবেষণাগার ধ্বংস করে বুদ্ধি-বৃত্তিকভাবে আমাদের পংগু করতে চায়। বিশেষ করে একটি মুসলিম রাষ্ট্র বৈধভাবে যে পারমাণবিক

শক্তির মালিক হয়েছে তার বিলোপ ঘটাতে চায়। ওরা আমাদের পানি-বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বাঁধ ও সেচ-প্রকল্প, শস্য খেত, ইত্যাদি অর্থনৈতিক শক্তির উৎস ধ্বংস করে আমাদেরকে অন্যের করুণা-নির্ভর করতে চায়। ওরা আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের হত্যা করে দেশে নেতৃত্বের সংকট সৃষ্টি করতে চায়। এরই পাশাপাশি ওরা জাতীয়বাদী হয়ে উঠা সাবেক কম্যুনিষ্ট এবং রুশ বংশোদ্ভুতদের একত্রিত করে পাল্টা একটা রাজনৈতিক শক্তি সৃষ্টি করতে চায়, যারা মীরজাফরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে দেশকে রাশিয়ার নতুন জারদের হাতে তুলে দেবে।'

আহমদ মুসা একটু থেমে আবার শুরু করল, 'ওদের ষড়যন্ত্রের এইরূপ দেখে হতাশ হবার কিছু নেই। সব পরিকল্পনার বড় পরিকল্পনা আল্লাহর। তিনিই আমাদের ভরসা।'

থামল আহমদ মুসা। কয়েক ঢোক পানি খেল। তারপর শুরু করল আবার, 'সকলের সাথে আমি একমত তাজিকিস্তানের বখশ নদীর রুগুন ও নুরেক পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কিরগিজস্তানের চু-উপত্যকার বিশাল সেচ প্রকল্প , কাজাখস্তানের আণবিক গবেষণা ও মহাশুন্য কেন্দ্রসহ দেশের সকল অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানে সার্বক্ষণিক প্রহরা-ব্যবস্থাকে আরও শক্তশালী ও নিশ্চিদ্র করতে হবে। আমাকে বেকোনুর-এর রকেট সংরক্ষণাগার ও উৎক্ষেপণ কেন্দ্রে যেতে বলা হয়েছে, আমার আপত্তি নেই। তবে আমি মনে করি ষড়যন্ত্রের শাখা-প্রশাখা ভেঙে লাভ নেই, কারণ তা আবার গজাবে। হাত দিতে হবে ষড়যন্ত্রের গোড়ায়, হাত করতে হবে ওদের পরিকল্পনা, এ্যাকশনপ্লান ইত্যাদি। ঘা দিতে হবে ষড়যন্ত্রের শীর্ষ দেশে যারা আছে তাদের। তাহলেই শুধু ষড়যন্ত্র মুখ থুবড়ে পড়বে।'

আহমদ মুসা একটু থামতেই প্রেসিডেন্ট কুতায়বা কথা বলে উঠল, 'আমি মনে করি মুসা ভাই ঠিক বলেছেন । আমাদের মত শুধু আমরা পেশ করেছি। তাঁর পরিকল্পনাই আমাদের পরিকল্পনা।'

মিটিং-এর সবাই একযোগে প্রেসিডেন্টকে সমর্থন করল।

আহমদ মুসা আবার শুরু করল, 'আমরা তো ওদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেবার চেষ্টা করছিই, এছাড়া ওদের দূরভিসন্ধির বিষয়টা বিশ্ববাসীর কাছে ফাঁস করে দিতে হবে। যে কথা আমি আগেই বলেছি, ওরা আমাদের শস্য খেত ও পশু

সম্পদ ধ্বংস করার জন্যে যে ধীর ক্রিয়া সম্পন্ন তেজস্ক্রিয় বিষ ছড়াচ্ছে তা বিশ্ববাসীকে জানাতে হবে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চল থেকে আক্রান্ত শস্য ও পশুর নমুনা পরীক্ষার জন্যে যদিও পাঠানো হয়েছে জেনেভাস্থ আন্তর্জাতিক আনবিক শক্তি কমিশনের 'তেজস্ক্রিয় চিহ্নিতকরণ ল্যাবরেটরী'তে, কিন্তু আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে যে এ তেজস্ক্রিয়-বিষ ছড়াবার জন্যে রাশিয়ার গ্রেট বিয়ার দায়ী। এটা প্রমাণ করার মত দলিল আমাদের হাতে নেই। আমরা যদি ওদের গোপন অস্ত্র সসার প্লেন হাতে-নাতে ধরতে না পারি, তাহলে আর কোন প্রমাণে কাজ হবে না। সুতরাং গোপন অভিযানে আসা রাশিয়ার সসার প্লেন একটা আমাদের ধরতে হবে।'

'সসার প্লেন বা ঐ ফ্লাইং সসারের যে বিবরণ আপনার কাছ থেকে শুনেছি, তাতে ঐ ফ্লাইং সসারকে ধরা বা অনুসরণ করার মত টেকনোলজি তো আমাদের নেই।' বলল গোয়েন্দা প্রধান আজিমভ।

'ঠিক, টেকনোলজি আমাদের নেই। কিন্তু এই অভাবকে পূরণ করতে হবে আমাদের চেষ্টা দিয়ে।' বলল আহমদ মুসা।

'গ্রেট বিয়ার আমাদের কাছে আজ ঠিকানা বিহীন, পরিচয় বিহীন, তাই ওদের গায়ে আমরা হাত দিতে পারছি না। ওদের সসার-প্লেনের ব্যাপারটা আমাদের আওতার আরও বাইরে। চেষ্টা আমাদের কি ধরনের হবে।' বলল সেনাবাহিনী প্রধান ওমর আলী সিদ্দিকভ।

'ওদের সসার প্লেন সম্পর্কে আমরা কয়েকটা বিষয় জানি। যেমন, এক, সসার প্লেনের সর্বোচ্চ গতিবেগ দশ হাজার মাইল। দুই, প্রয়োজনে প্লেনটি মাটির দু'তিন গজ ওপর দিয়েও চলতে পারে। তিন, প্লেনটি আসে মস্কো যথা পিটার্সবার্গ থেকে। এই বিষয়গুলো আরও কয়েকটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহনে আমাদের সাহায্য করবে। যেমন, এক, যেহেতু প্লেনটি অতি দ্রুতগামী, তাই সাধারণভাবে মাটি থেকে নিরাপদ উচ্চতা দিয়ে আসতে পছন্দ করে, দুই, প্লেনটি যত মাটির কাছাকাছি আসে ততই তার গতি কমে যায়, তিন, প্লেনটি যতক্ষণ রুশ আকাশ সীমায় থাকে, ততক্ষণ অনেক উচ্চতা দিয়ে অত্যন্ত দ্রুত আসে, চার, যখন আমাদের আকাশ সীমায় আসে তখন রাডারকে ফাঁকি দেবার জন্যে নীচে নেমে

আসে এবং তার গতি নেমে আসে সাধারণ পর্যায়ে, পাঁচ,নীচে নেমে আসার কারণে সে গতিপথে সাধারণভাবে জনপদ ও পার্বত্য এলাকা এড়িয়ে চলতে চাই, ছয়, প্লেনটি যতটা বেশি সম্ভব রুশ এলাকার ওপর দিয়ে আসে, তারপর প্রবেশ করে আমাদের এলাকায়। উপরোক্ত বিষয়গুলো সামনে রাখলে চেষ্টা করার একটা পথ আমাদের সামনে উন্মুক্ত হয়।'

বলে আহমদ মুসা উঠে পেন্সিল নিয়ে দেয়ালে সেট করা বোর্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

বোর্ডে আহমদ মুসা মধ্য এশিয়া মুসলিম প্রজাতন্ত্রের পশ্চিম-উত্তর সীমান্ত অংকন করল। তারপর বলল, 'মস্কো ও পিটার্সবার্গ এলাকা থেকে আমাদের দেশে ওদের টার্গেট এলাকায় প্রবেশের এটাই সোজা পথ। এই পথের মধ্যে আবার রাশিয়ার 'ওরস্ক' এলাকা আমাদের সবচেয়ে নিকটবর্তী। আরেকটা বিষয় লক্ষ্যণীয়। এই 'ওরস্ক' এলাকা থেকে আমাদের দেশে ওদের টার্গেট এলাকা কাজাখস্তানের কারসাপক থেকে দক্ষিণ উজবেক-তাজিক সীমান্তের আমুদরিয়া পর্যন্ত হাজার হাজার বর্গমাইল এলাকা একদম অবারিত। সুতরাং এ এলাকার মধ্য দিয়ে যথেষ্ট গতি নিয়েই সসার প্লেন উজবেক, তাজিক, কিরঘিজ ও কাজাখস্তানের টার্গেট এলাকায় প্রবেশ করতে পারে। সুতরাং 'ওরস্ক' এলাকার মোটামুটি এক'শ মাইল সীমান্তকে সন্দেহপূর্ণ বলে আমরা চিহ্নিত করতে পারি।'

থামল আহমদ মুসা।

সকলে গোগ্রাসে যেন গিলছিল আহমদ মুসার কথা। উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সকলের চোখ-মুখ।

'তারপর।' বলল প্রেসিডেন্ট কুতায়বা।

'এই এক'শ মাইল সীমান্তে আমাদের পাহারা বসাতে হবে। 'লো আলটিচূড রাডার' বসাতে হবে তিনটি পর্যায়ে। প্রথম সারিটি সীমান্ত বরাবর, দ্বিতীয় সারি পঞ্চাশ মাইল ভেতরে এবং তৃতীয় সারি সেখান থেকে আরও এক'শ মাইল ভেতরে। এই রাডার গুলোর ছবি প্রমাণ করবে সসার-প্লেন রাশিয়া থেকে মধ্য এশিয়ায় প্রবেশ করেছে। এটা হবে আমাদের প্রথম প্রমাণ। এই রাডার- ফটো নেয়ার কাজ শেষ হবার পর আমাদের দ্বিতীয় পদক্ষেপ শুরু হবে। এই দ্বিতীয়

পদক্ষেপে আমরা রাশিয়ার ওরস্ক সীমান্ত থেকে এক'শ মাইল ভেতর বরাবর সীমান্তের সমান্তরালে এক'শ মাইল এলাকাকে চারটি লেসার জোনে বিভক্ত করবো। প্রতিটি লেসার জোনকে আমরা 'লেসার বীম ব্যাটারী' সাজিয়ে একটা বৃত্তে পরিণত করবো। সসার-প্লেন এই বৃত্তে প্রবেশের সংগে সংগেই রাডারের সংকেত অনুসরণে লেসার বীম ব্যাটারী চালু করা হবে। তার ফলে তৈরী হবে লেসার-বীমের দেয়াল ঘেরা লেসার বীমের একটা পিরামিড। সসার-প্লেন লেসার বীমের দেয়াল অতিক্রম করতে পারবে না। চেষ্টা ধ্বংস হবে। সুতরাং সসার-প্লেন আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে। আর যদি পালাতে চেষ্টা করেই, তাহলে ধ্বংসপ্রাপ্ত সসার-প্লেনের ধ্বংসাবশেষও সাক্ষী হিসাবে আমাদের কাজে লাগবে।'

থামল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা থামার সাথে সাথে প্রেসিডেন্ট কুতায়বা সহ উপস্থিত সকলেই 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিয়ে উঠল। তাদের সকলের মুখ হাসিতে উজ্জ্বল।

'আল হামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন মুসা ভাই। উপায়হীন অন্ধকারেও আপনি আলোর মশাল জ্বালাতে পারেন। সসার-প্লেনের বৈশিষ্ট্য আমাদের সামনেও ছিল, কিন্তু আমরা তা নিয়ে চিন্তা করতে পারিনি। এখন মনে হচ্ছে, আল্লাহ আমাদের জন্যে একটা পথ করেই রেখেছেন যা আপনি আবিষ্কার করে দিলেন।' বলল প্রেসিডেন্ট কুতায়বা।

'মুসা ভাই, চারটি লেসার জোনকে নিয়ে যে বৃত্ত হচ্ছে সীমান্তের সমান্তরালে তার প্রতিটির ব্যাস হতে হবে পঁচিশ মাইল এবং সীমান্ত থেকে লম্বাভাবে ব্যাস হবে পঞ্চাশ মাইল, তাইতো?'' বলল আজিমভ।

'লেসার জোন মোট চারটা নয়, আটটা হবে। প্রস্তাবিত তিনটি রাডার লাইনের মধ্যবর্তী স্থান দু'টি এলাকায় বিভক্ত হচ্ছে। প্রতিটি এলাকাকে চারটি লেসার জোনে বিভক্ত করতে হবে। সীমান্তের পর প্রথম যে এলাকা তার চারটি জোনের পরিধি তুমি বলেছ তাই হবে, কিন্তু পরবর্তী যে এলাকা তার চারটি জোনের প্রতিটির ব্যাস সীমান্তের সমান্তরালে পঁচিশ মাইল হবে, কিন্তু সীমান্ত থেকে লম্বের দিক দিয়ে ব্যাস এক'শ মাইল হবে। আসল কথা হলো, আটটি লেসার

জোনের মধ্যে এলাকার প্রতিটি ইঞ্চি জমি পড়তে হবে, এতে করে লেসার জোন বৃত্ত না হয়ে যদি বর্গক্ষেত্র হয় তাই করতে হবে।'

বলতে বলতে আহমদ মুসা এসে তার চেয়ারে বসল।

'আহমদ মুসা ভাই যে পরিকল্পনা দিয়েছেন, তা বাস্তবায়নের কাজ দেখাশুনার দায়িত্ব আহমদ মুসা ভাইয়ের নেয়া উচিত বলে আমি মনে করি।' বলল প্রেসিডেন্ট কুতায়বা।

'না, কুতায়বা। আমি ওদিকে গেলে গ্রেট বিয়ার ও তার ষড়যন্ত্র খুঁজে বের করার আসল কাজ আমি করতে পারবো না। ঐ দায়িত্ব তুমি অন্যদের দাও।'

'আপনি প্রস্তাব করুন। আমার চেয়ে আপনি ভাল জানেন।' বলল প্রেসিডেন্ট।

'আজিমভের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী প্রধানসহ তিন বাহিনীর প্রধানকে সদস্য করে একটা কমিটি করে দাও।' বলল আহমদ মুসা।

'আল হামদুলিল্লাহ, মুসা ভাইয়ের প্রস্তাবিত কমিটি গঠিত হলো।' বলল প্রেসিডেন্ট কুতায়বা।

'মেনে নিচ্ছি, কিন্তু একটা শর্ত, আহমদ মুসা ভাই এই কমিটির উপদেষ্টা হবেন।' বলল আজিমভ।

উপস্থিত সবাই একবাক্যে সমর্থন করল।

'দায়িত্ব ছাড়া উপদেষ্টা হতে আমি মোটেই গররাজি নই।' মুখে হাসি টেনে বলল আহমদ মুসা।

একটু থেমেই আহমদ মুসা আবার মুখ খুলল। বলল, 'উপদেষ্টার কাজ শুরু করেই, আমার প্রথম উপদেশ হলো, উল্লেখিত এলাকায় লো আলটিচুড রাডার সেট করা এবং লেসার বীম ব্যাটারী বসানোর কাজ উপযুক্ত ক্যামোফ্লেজের অধীনে করতে হবে যাতে করে রাশিয়ার উপগ্রহের চোখ কোন কিছু সন্দেহ করতে না পারে। এই সাথে ওদের গোয়েন্দাদের চোখ থেকেও সব কিছু আড়াল রাখতে হবে। এই গোপনীয়তা রক্ষা আমাদের সাফল্যের প্রথম শর্ত।'

'আল হামদুলিল্লাহ। আমাদের কমিটির কাজ শুরু হয়ে গেল। আমি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বয়োকনিষ্ঠ বিমান বাহিনী প্রধান আহমদ নুরভকে এই

কমিটির মেম্বার-সেক্রেটারী নিয়োগ করছি এবং তাকে অনুরোধ করছি আহমদ মুসা ভাইয়ের এই পরামর্শ লিখে নেয়ার জন্যে।' গম্ভীর কণ্ঠে বলল আজিমভ।

'আমার ধর্ম, আমার জাতি, আমার দেশের জন্যে এই দায়িত্ব পালনের সুযোগ পাওয়ায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি।' বলে বুদ্ধি ও তারুণ্য শক্তিতে উজ্জ্বল আহমদ নুরভ কাগজ টেনে নিয়ে লিখতে শুরু করল।

প্রেসিডেন্ট কুতায়বা আহমদ মুসার দিকে একটু ঝুঁকে ফিস ফিস করে কয়েকটা কথা বলে নিয়ে বলল, 'আমি নতুন কমিটিকে স্বাগত জানাচ্ছি। সবাইকে ধন্যবাদ। আজকের মত আলোচনা এখানেই শেষ। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।'

# ৪

একটা রিভলভিং চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছে আলেকজান্ডার পিটার। তার চোখ দু'টি বুজা, কিন্তু কপাল কুঞ্চিত। বোঝা যাচ্ছে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন সে।

পিটার গ্রেট বিয়ারের মধ্য এশীয় চীফ।

পায়ের শব্দে চোখ খুলল আলেকজান্ডার পিটার।

দীর্ঘ ও সুগঠিত শরীরের একজন লোক এগিয়ে আসছে টেবিলের দিকে।

'রিপোর্টটা এনেছ উস্তিনভ?'

উস্তিনভ পিটারের সহকারী।

'হ্যাঁ।' বলে উস্তিনভ একটি কাগজ তুলে দিল পিটারের হাতে।

সোজা হয়ে বসল পিটার।

কারসাপক ও সায়েজুর ঘটনার ওপর রিপোর্ট পাঠিয়েছে আলেক্সি স্ট্যালিন কারসাপক থেকে।

রিপোর্টে চোখ বুলিয়ে তাকাল উস্তিনভের দিকে। চোখে যেন আগুন জ্বলছে পিটারের। বলল, 'আহমদ মুসাকে ওরা চিনতে পারলো না কেন? কেন ওকে বিনা প্রহরায় চিলেকোঠায় বন্দী করে রাখল? আহমদ মুসার ছবি ওদের কাছে ছিল না?'

'ছিল, কিন্তু রাতের বেলা ওরা খেয়াল করতে পারেনি।' বলর উস্তিনভ।

'শোন এ ধরনের কোন ভুলের সুযোগ গ্রেট বিয়ারের আন্দোলনে নেই। ওদের প্রত্যাহার করে আটক করতে বল। পরবর্তী নির্দেশ আমি পাঠাচ্ছি।'

'ঠিক আছে কিন্তু আহমদ মুসা তো আলেক্সি স্ট্যালিনের বন্দীখানা থেকেও পালিয়েছে।'

'তা পালিয়েছে। কিন্তু আহমদ মুসাকে সাহায্যকারী নিজ কন্যা এলেনাকে তো আলেক্সি ছাড়েনি। প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে জীবন দিতে হয়েছে এলেনাকে।'

একটু থামল। নড়ে-চড়ে বসল। তারপর আবার বলর পিটার, ‘কিন্তু আমি বুঝতে পারছিনা আহমদ মুসা আমিনভ ও ইয়াসিনভের সন্ধান পেল কি করে? আবু আমিনভের রুশ স্ত্রী যদি এর কারণ হয়, তাহলে ইয়াসিনভ ধরা পড়ল কেন?’

‘রিপোর্ট তো আছেই, একই সাথে ওদের প্রমোশন ও ট্রান্সফার দেখে আহমদ মুসা ওকে সন্দেহ করে।’

‘এই আহমদ মুসা লোকটার চোখ এত তীক্ষ্ণ?’

‘যেমন চোখ তীক্ষ্ণ, তেমনি অদ্ভুত ক্ষীপ্র ও কুশলীও।’

‘লজ্জা করছে না এই প্রশস্তি গাইতে, সে সোনা খায়, আর তোমরা বুঝি গোবর খাও?’

‘শত্রুকে শক্তিশালী বলা নিজেকে দুর্বল ভাবা নয়।’

‘ধন্যবাদ উস্তিনভ। পারবে এবার আহমদ মুসার লীলা খেলা সাঙ্গ করতে?’

‘চেষ্টা তো করবোই।’

‘চেষ্টা করা নয়, সফল হতে হবে।কি মেসেজ এসেছে জান?’

‘কি মেসেজ?’ আগ্রহ ফুটে উঠল উস্তিনভের চোখে-মুখে।

‘আজ মস্কো থেকে জানানো হয়েছে গ্রেট বিয়ারের হত্যা-লিস্টের অগ্রাধিকার তালিকায় আহমদ মুসাকে শামিল করা হয়েছে। সময় দেয়া হচ্ছে পনের দিন।’

‘আহমদ মুসা তো এখন তাসখন্দেই।’

‘তাসখন্দেই বটে, তবে এখনও তার দেখা পাওয়া যায়নি।’

‘তাসখন্দে তার বাড়ি নেই। স্টেট গেষ্ট হাউজ কিংবা কোন সরকারী রেস্ট হাউজেই তার থাকার কথা।’

‘কি যে বল তুমি। তার বাড়ি নেই তো কি হয়েছে। তাসখন্দের যে কোন মুসলিম বাড়িই তার বাড়ি। তাকে গেস্ট হাউজ বা রেস্ট হাউজে থাকতে হবে কেন?’

‘তার ঠিকানা খুজে পাওয়া মুশকিল হবে তাহলে।’

‘প্রেসিডেন্ট হাউজে পাহারা বসাও। ওখানে সে নিয়মিত আসেই।’

‘প্রেসিডেন্ট হাউজের যতটা নিকটে পাহারা বসালে কাজ হবে ততটা নিকটে পাহারা বসানো যায় না। চেষ্টা করলে ধরা পড়তে হবে। আর দূরে পাহারা বসিয়ে লাভ নেই। গাড়িতে কে যাচ্ছে কে আসছে কিছুই বুঝা যায় না।’

কোন জবাব না দিয়ে ড্রয়ার থেকে একটা কাগজের সিট বের করে বলল, ‘তোমার দৌড় বুঝা গেছে। এই কাগজটার ওপর নজর দাও। এতে বিজ্ঞানী ও রাজনীতিকদের নাম আছে এবং আরো আছে কতকগুলো অর্থনৈতিক প্রকল্পের নাম। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সাজানো আছে তারিখ সহ।’

উস্তিনভ কাগজটির ওপর চোখ বুলাল ধীরে ধীরে। তারপর চোখ তুললো কাগজ থেকে।

‘মুখস্থ কর। দশ মিনিট পরে আমাকে ফেরত দেবে। বুঝেছো এটা কি?’

‘আমাদের পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে হত্যা ও ধ্বংস টার্গেটের তালিকা।’

‘ঠিক আছে। কিন্তু সায়েজুর আণবিক ও মহাশূণ্য গবেষণা কেন্দ্রে হাত দেয়া যাবে কিভাবে? ধারে কাছেও ঘেষা যাচ্ছে না।’

‘কা-পুরুষের মত কথা বলো না। গ্রেট বিয়ার শুধু সামনেই এগোয়, পিছু হটে না। যদি ঘেষতে আমরা না পারি, তাহলে সসার- প্লেন থেকে ওখানে আমরা ডিনামাইট বোমা ফেলব এবং ও দু’টি গবেষণা কেন্দ্র ধ্বংস আমরা করবোই।’

‘সসার-প্লেন দিয়েই তো আমরা এসব গবেষণা কেন্দ্র, বাঁধ, পানি-বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ইত্যাদি সহজে এবং একরাতেই ধ্বংস করে ফেলতে পারি, কিন্তু আমরা তা করছি না কেন?’

‘তা পারি। কিন্তু আমাদের গোপন অস্ত্র সসার-প্লেন বিশ্বের সবার কাছ থেকে মস্কো গোপন রাখতে চায়। শস্য ও পশু সম্পদের ওপর রেডিয়েশন স্প্রে করার মত যেসব কাজ অন্য কোনভাবে সম্ভব নয়, সেকাজেই শুধু সসার-প্লেন ব্যবহার করা হচ্ছে। তাছাড়া এ কাজটা অনেকটা নিরাপদ। কিন্তু বাঁধ,পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র ইত্যাদি ছোট ও নির্দিষ্ট টার্গেট ধ্বংস করতে হলে সসার-প্লেনকে এতটা নীচে নেমে আসতে হয় যে তা সকলেরই নজরে পড়বে এবং অবশ্যই তা আক্রান্ত হবে।’

‘কিন্তু এই সব আক্রমণ কি সসার-প্লেনের ক্ষতি করতে পারবে?’

‘মানুষ কিংবা কোন বস্তু যতই শক্তিশালী হোক না কেন, তার একটা দূর্বল দিক থাকেই। সসার-প্লেনও দূর্বলতার উর্ধ্বে নয়। সসার-প্লেনের চারদিকের রাডার চোখগুলো খুবই সেনসিটিভ। এ চোখের ওপর আঘাত পড়লে মাস্টার কনট্রোল বিকল হয়ে পাকা ফলের মত সসার-প্লেন ভূমি শয্যা নিতে পারে।’

উস্তিনভ কিছু বলতে যাচ্ছিল। এমন সময় আলেকজান্ডার পিটারের ইন্টারকম কথা বলে উঠল। প্রাইভেট সেক্রেটারী মেয়েটার গলা। বলল, ‘স্যার ফিল্ডার এসেছে,মেসেজ আছে।’

‘ফিল্ডার’ গ্রেট বিয়ারের তৃণমুল পর্যায়ের কর্মী। তথ্য যোগাড়, শত্রুকে অনুসরণ, স্যাবেটাজ ওয়ার্ক ইত্যাদি সহ খুন-জখম সব কিছুতেই এরা পটু।

‘তাড়াতাড়ি আসতে বল।’ নির্দেশ দিল পিটার।

কয়েক মুহূর্ত পরেই ঘরে ঢুকলো এক যুবক। চেহারাটা না রুশ না তুর্কি। সম্ভবত কোন রুশ পিতা অথবা রুশ মাতার সন্তান সে।

‘কি খবর এনেছো, ভাল খবর?’ ভ্রু-কুচকে জিজ্ঞাসা করল পিটার।

‘আহমদ মুসা থাকছেন প্রেসিডেন্ট হাউজে-প্রেসিডেন্টের অতিথি হিসাবে। তিনি কখন বের হন, কখন ফেরেন কেউ বলতে পারে না।’ বলল যুবকটি।

‘তুমি কার কাছে জানলে এ তথ্য?’ বলল পিটার।

‘একজন হকার সেজে গিয়ে প্রেসিডেন্ট হাউজের সামনের রাস্তায় প্রহরায় দাঁড়ানো একজন পুলিশকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।’

‘আহমদ মুসা কখন বের হয় কখন ফিরে আসে একথা সেখানকার প্রহরী পুলিশ জানবে না কেন?’

‘প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রীদের আসা-যাওয়া তারা জানতে পারে। কারণ তাদের সাথে পুলিশ পাহারা থাকে, গাড়িতে পতাকা থাকে। কিন্তু আহমদ মুসার এসব কিছুই থাকে না। তিনি একা চলাফেরা করেন। এমন গাড়ি অহরহই প্রেসিডেন্ট হাউজে আসছে যাচ্ছে। বুঝা যাবে কি করে যে, আহমদ মুসার গাড়ি কোনটি। তার ওপর অধিকাংশ গাড়িরই এখন শেড দেয়া কাঁচ।’

‘গেটের ভেতরের প্রহরীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, সেটার কতদূর?’ পিটারের কণ্ঠ কঠোর শুনালো।

‘আমি সে চেষ্টা করছি। আমি প্রহরী পুলিশকে অনুসরণ করে তার বাড়িতে গিয়েছি। আমি তাকে সিগারেট ও মদ উপহার দিয়ে বিপদে পড়েছিলাম। ওগুলো সে তো নষ্ট করলই উপরন্তু আমাকে প্রায় গ্রেপ্তার করেই ফেলেছিল। আমি বহু অনুনয় বিনয় করে ছাড়া পেয়েছি এই শর্তে যে, এ ধরণের কাজ আর কখনো করব না।’

‘বেশ করেছো, শুধু শর্ত দেয়া কেন, তার পদসেবায় লেগে যেতে পারতে। গর্দভ, মদ দিতে মুসলমানরা মদ খায়না, যারা খেতো তারাও এখন ছেড়ে দিয়েছে। কেন,টাকার অভাব ছিল? দশ হাজার, বিশ লাখ----একজন পুলিশকে কিনতে কত লাগে?’

‘আমরা সে চেষ্টাও করেছি স্যার। হকারের ছদ্মবেশে আরেকজন পুলিশ অফিসারের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলেছলাম এবং আমাকে পুলিশের চাকুরী জুটিয়ে দেয়ার ব্যাপারে তাকে অনুরোধ করেছিলাম। এই বাহানায় তদ্বীরের খরচা-পাতি হিসাবে আমি তাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেয়ার প্রস্তাব করেছিলাম এবং টাকা বেরও করেছিলাম ব্যাগ থেকে। আমার প্রস্তাব শুনেই সে আগুন হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল যে, আমি গরীব হকার না হলে আমাকে গ্রেপ্তার করে জেলে পুরতো। আরও বলেছিল, যে ঘুষ দেয়ার মত অসৎ তার চাকুরী পুলিশ বিভাগে তো নয়ই, কোন চাকুরী পাওয়ারই সে উপযুক্ত নয়। বলে দিয়েছে সে, আমি যদি আর কখনও তার কাছে যাই তাহলে গ্রেপ্তার করবে।’

‘এ পুলিশ দু’জনের বাসা তো তুমি চেন। ক’জনকে নিয়ে ওদের দু’জনকেই ধরে আন। দেখি ওরা নীতি কথা কত জানে।’ পিটারের চোখে জ্বলছে ঘৃণার আগুন।

‘স্যার দু’দিন থেকে ওদের ডিউটিতে দেখছিনা। তাদের বাড়িও সে জায়গায় আর নেই।’ মুখ কাঁচু-মাচু করে বলল যুবকটি।

‘কি বলছ তুমি? হাওয়া হয়ে গেল তারা?’

‘ওদের প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসা করেও কিছু জানতে পারিনি। সম্ভবত ওরা অন্যত্র বদলী হয়েছে।’

‘জাহান্নামে যাক। যাও তুমি।’

বেরিয়ে গেল ফিল্ডার যুবকটি মাথা নিচু করে।

‘এই তো হল তোমাদের লোকদের যোগ্যতা।’

‘আমাদের যোগ্যতার দোষ নেই। ও সত্যি বলেছে। আগে পুলিশের পেট থেকে কথা বের করতে বিশ পঞ্চাশ রুবলের বেশি দরকার হতো না। কিন্তু এখন সে রুবল আর কোন কাজ দিচ্ছে না ,পঞ্চাশের বদলে পঞ্চাশ হাজারও নয়, লাখও নয়।’

‘অপদার্থের মত কথা বলোনা। বলতে চাও রাতারাতি সব মানুষ ফেরেশতা হয়ে গেছে?’

‘এই প্রশ্ন আমি ওদের একজন সরকারী অফিসারকে করেছিলাম। জবাব দিয়েছিল, ফেরেশতা নয় তারা মানুষ হয়েছে।’

‘এই গল্প বলে ওরা ছাড়া আর সবাইকে পশু বলতে চাচ্ছ তুমি?’

‘তা বলছি না, কিন্তু ওই মানুষদের উচিত শিক্ষা দেবার জন্যে আজ পশু সাজার প্রয়োজন আছে।’

‘ব্রাভো, ব্রাভো, তুমি এতক্ষণে আমার সহকারীর যোগ্য একটা কথা বলেছ।’ বলে উঠে দাঁড়াল পিটার।

উঠে দাঁড়াল উস্তিনভও।

ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে পিটার বলল, ‘মনে আছে তো সময় পনের দিন। এই সময়ের মধ্যে আহমদ মুসাকে খুঁজে বের করতে হবে এবং-----’

‘বলতে হবে না, আমি জানি।’

‘জান কিন্তু ওকে পাওয়ার কি হবে?’

'আমি ঠিক করে ফেলেছি?'

‘কি ঠিক করেছো?’

‘আমাদের একজন ফিল্ডার প্রেসিডেন্ট ভবনে গোপনে ঢুকতে গিয়ে ধরা পড়বে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় বলে দেবে গ্রেট বিয়ারের হেডকোয়ার্টারের মিথ্যা

ঠিকানা। আহমদ মুসা অবশ্যই অভিযানে আসবে। আর আমাদের পাতা ফাঁদে ধরা পড়বে।’

পিটার দাঁড়াল। বলল, ‘তোমার পরিকল্পনায় যুক্তি আছে, কিন্তু সে ঠিকানা আহমদ মুসা বিশ্বাস করবে মনে কর?’

‘বিশ্বাস না করলে আরও সুবিধা। যাচাই করার জন্যে সে নিজেই সন্ধানে আসবে।’

পিটার উস্তিনভের পিট চাপড়ে বলল, ‘সাবাস উস্তিনভ। পথ একটা বের করেছো। তোমার পরিকল্পনার কাজ কবে শুরু করছো?’

‘আরও দু’একটা দিন দেখার পরে।’

‘কি দেখবে?’

‘একটা লোককে ওদের হাতে তুলে দেবার আগে আরও কটা দিন দেখবো।’

‘নেতার মত কথা বলেছো উস্তিনভ। তুমি সফল হও।’

বলে পিটার করিডোর দিয়ে তিন তলার সিঁড়ির দিকে হাটতে শুরু করল।

আর উস্তিনভ হাঁটতে শুরু করল এক তলায় নামার সিঁড়ির দিকে।

ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে আহমদ মুসা। দু’হাতে স্টিয়ারিং রেখে গা এলিয়ে দিয়েছে আহমদ মুসা সিটে। গাড়ির শেড দেয়া জানালা নামিয়ে রাখা। দুই জানালাই। ইচ্ছা করেই আহমদ মুসা জানালা খুলে দিয়েছে। তার ইচ্ছা সে গ্রেট বিয়ারের নজরে পড়ুক। আহমদ মুসারা গ্রেট বিয়ারকে খুঁজে পাচ্ছে না, গ্রেট বিয়ার যদি আহমদ মুসাকে খুঁজে পায়, তাহলে ওদের কাছে পৌঁছার একটা পথ হয়। ভাবছে আহমদ মুসা, গোটা শহরে তার আরো বেশি খোলা মেলা বেড়াতে হবে, যাতে নজরে পড়া সহজ হয়। হঠাৎ আহমদ মুসার মনে পড়ল, গ্রেট বিয়ারের নজরে পড়ার আরেকটা বড় উপায় হলো, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া এবং সেই খবর পত্রিকায় প্রকাশ পাওয়া। জনসমাবেশের মত কার্যক্রমে সে যোগদান করতে

শুরু করলে দু'এক দিনের মধ্যেই গ্রেট বিয়ারের নজরে পড়বে। গ্রেট বিয়ার তখন তৎপর হবে তাকে হত্যা করতে অথবা কিডন্যাপ করতে। এভাবে আহমদ মুসা ওদের মুখোমুখি হতে পারবে।

মনটা খুশী হয়ে উঠল আহমদ মুসার। কিছুক্ষণ আগে মনটাকে কিছুটা বিরক্ত ও ক্লান্ত মনে হচ্ছিল, সে ভাবটা কেটে গেল। ভাবলো সে, এবার সে একটা মোক্ষম পথ খুঁজে পেয়েছে গ্রেট বিয়ারকে আড়াল থেকে বের করে আনার জন্যে।

মন খুশী হবার সাথে সাথে গাড়ির গতি বেড়ে গেল আহমদ মুসার।

গাড়ি চলছিল ইমাম বোখারী এভেনিউ দিয়ে। এই ইমাম বোখারী এভেনিউটি শহরের বাইরে গিয়ে তাইমুর লং হাইওয়ে নাম ধারণ করেছে। আরও দক্ষিণে এগিয়ে তাইমুর হাইওয়ের একটা শাখা পুবে ঘুরে ফারগানার দিকে চলে গেছে, অন্য অংশটি দক্ষিণে সমরখন্দ হয়ে বোখারা অতিক্রম করে আরো সামনে অগ্রসর হয়েছে।

আহমদ মুসার গাড়ি চলছিল শহরের প্রান্ত এলাকা দিয়ে। তার হাতের ডান পাশে অর্থাৎ দক্ষিণে তাসখন্দের বিখ্যাত বোটানিক্যাল গার্ডেন। আর বাম পাশে তাসখন্দ বিশ্ববিদ্যালয়।

তখন গোধূলি বেলা। পূর্ব দিগন্তে অন্ধকারের একটা কালো রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। রাস্তাটা নির্জন। কচিৎ দু'একটি গাড়ি দেখা যাচ্ছে রাস্তায়। শুক্রবার বলেই নির্জনতা একটু বেশি।

আহমদ মুসার গাড়ি চলছিল রাস্তার বাম পাশ দিয়ে। গাড়ি তখন তার বেশ গতি পেয়েছিল।

হঠাৎ রাস্তার ডান দিক থেকে নারী কণ্ঠের একটা চিৎকার কানে এল তার।

সংগে সংগেই থেমে গেল আহমদ মুসার গাড়ি। চাইলো ডানদিকে। দেখলো কয়েকজন লোক একজন মেয়েকে গাড়িতে টেনে তুলতে যাচ্ছে। চিৎকার করছে মেয়েটি।

আহমদ মুসা গাড়ির দরজা খুলে দৌড় দির ওদিকে।

ওরা পাঁচজন।

আহমদ মুসা নিকটবর্তী হতেই একজন তেড়ে এলো। বলল, 'ফিরে যাও না হলে...........

'ছেড়ে দাও তোমরা মেয়েটিকে।' লোকটিকে কথা শেষ করতে না দিয়েই বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার কথা শেষ হবার সংগে সংগেই লোকটির দেহ শূন্যে লাফিয়ে উঠলো এবং তার দু'পায়ের উড়ন্ত লাথি ছুটে এলো আহমদ মুসার মুখ লক্ষ্যে।

আহমদ মুসা মাথাটা চকিতে সরিয়ে নিল। লোকটির দেহ পাক খেয়ে ছুটল নিচের দিকে। কিন্তু বিস্ময়করভাবে লোকটি নিজেকে সামলে নিল, পড়ে গেল না। দাঁড়িয়ে গেল সে।

কিন্তু আহমদ মুসা তাকে নতুন প্রস্তুতির সুযোগ দিল না। লোকটি দাঁড়িয়ে দেহটা সোজা করার আগেই আহমদ মুসার ডান পায়ের একটা লাথি বুলেটের মত গিয়ে বিঁধল তার তলপেটে। 'কোঁথ' করে একটা শব্দ করেই ভূমি শয্যা নিল সে।

আহমদ মুসা ছুট দিল ঐ চারজনের দিকে যারা মেয়েটিকে টেনে গাড়িতে তুলছে।

কিন্তু গজ দু'য়েকের বেশি যেতে পারল না আহমদ মুসা। দেখল, দু'জন পাশাপাশি ছুটে আসছে তাকে লক্ষ্য করে। তাদের দু'জনের হাতেই ছুরি।

ওরা নিকটবর্তী হতেই আহমদ মুসা যেন ভয় পেয়েছে এমন ভাবে কয়েক পা পিছিয়ে এলো। দেখে ওরা যখন উৎসাহের সাথে উদ্যত ছুরি ওপরে তুলে ভয় দেখাবার লক্ষ্যে শিথিল পায়ে এগিয়ে আসার জন্যে পা তুলল, অমনি আহমদ মুসার পিছিয়ে যাওয়া পা শূন্যে লাফিয়ে উঠল এবং দু'পায়ের লাথি দু'জনের বুকে গিয়ে আঘাত করল। উল্টে পড়ে গেল ওরা দু'জন। ওরা পড়ে যেতেই ওদের একজনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আহমদ মুসা। তার হাতের ছুরি কেড়ে নিয়ে দুরে ছুড়ে ফেলে একটা ঘুষি চালালো তার কানের পাশে নমর জায়গাটায়। রেজাল্টটা না দেখেই তার জামার কলার এবং একটি ঠ্যাং ধরে এক ঝটকায় মাথার ওপর তুলে নিল। দ্বিতীয় লোকটি তখন সোজা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আহমদ মুসা প্রথম লোকটির দেহটা প্রবল বেগে ছুড়ে দিল দ্বিতীয় লোকটির ওপর। দু'টি দেহই মুখ

থুবড়ে পড়ল মাটিতে। পড়ে গিয়েও কিন্তু দ্বিতীয় লোকটি ছুরি ছাড়েনি। পড়ে গিয়েই সে পাশ ফিরে ছুরি নিক্ষেপ করল আহমদ মুসার দিকে। তীরের মত ছুটে আসছে ছুরি আহমদ মুসার বুক লক্ষ্যে। উপায়ন্তর না দেখ আহমদ মুসা ওপর থেকে মাছ চেপে ধরার মত ছুরি বাম হাত দিয়ে চেপে ধরলো। তারপর ছুটে গিয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টারত লোকটির কানের নীচে লাথি চালালো।

উঠতে হলোনা আর লোকটির।

আহমদ মুসা এবার ছুটলো শেষ দু'জনে দিকে।

ওরা মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়ে রুখে দাঁড়াল। একজন ছুরি বের করলো, আরেকজন রিভলবার। মেয়েটি ওদের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। রিভলবার বের করার সংগে সংগেই মেয়েটি একটা থাবা দিয়ে তার হাত থেকে রিভলবারটি ফেলে দিল। আহমদ মুসা তার হাতের ছুরিটি সামনের ছুরি ওয়ালা লোকটির হাত লক্ষ্যে নিক্ষেপ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল রিভলবার ওয়ালা লোকটির ওপর। সে রিভলবার কুড়িয়ে নেবার জন্যে নিচু হয়ে ছিল। আহমদ মুসা তাকে জামার কলার ধরে টেনে তুলে ঘুষি চালালো কানের পাশটায়। ঘুরে উঠে পড়ে গেল লোকটি। ছুরি ওয়ালা লোকটির ডান হাতে গিয়ে বিঁধেছিল আহমদ মুসার নিক্ষিপ্ত ছুরি। রিভলবার ওয়ালা লোকটিকে পড়ে যেতে দেখে আহত হাতটি চেপে ধরে সে দিল ভোঁ দৌড়।

আহমদ মুসা মেয়েটির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, 'ধন্যবাদ আপনাকে ওর রিভলবারটা ফেলে দেয়ার জন্যে। আপনি আঘাত পাননি তো?'

মেয়েটির মুখ ফ্যাকাসে। ভয় ও উদ্বেগের ছায়া সেখানে এখনও স্পষ্ট। তার শুকনো ঠোঁট দু'টিতে তখনও ভয়ার্ত কম্পন।

মেয়েটির পরনে বাদামী স্কার্ট, বাদামী কোট। রং এবং চেহারায় একদম রুশ। লম্বা হাল্কা- পাতলা চেহারা। অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত চোখ-মুখ।

আহমদ মুসার জিজ্ঞাসার জবাবে মেয়েটি পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে আহমদ মুসার দিকে তাকাল। তার চোখে ফুটে উঠল বিস্ময় ও রাজ্যের কৃতজ্ঞতা। তার ঠোট দু'টি নড়ে উঠল, কিন্তু কথা ফুটলোনা।

আহমদ মুসাই আবার কথা বলল। জিজ্ঞাসা করল, 'কোনটা আপনার গাড়ি?'

পাশের নতুন স্পোর্টস কারটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল মেয়েটি।

আহমদ মুসা গিয়ে গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে বলল, 'উঠুন। ড্রাইভ করতে পারবেন?'

'পারব।' শুকনো ও কম্পিত কণ্ঠে বলল মেয়েটি।

'উঠুন।' আবার বলল আহমদ মুসা।

ইতঃস্তত করছিল মেয়েটি।

'একা যেতে পারবেন না?'

'ভয় করছে।' মুখ নিচু করে কম্পিত কণ্ঠে বলল মেয়েটি।

আহমদ মুসা আর কোন কথা না বলে গাড়ির পাশ ঘুরে গিয়ে ড্রাইভিং সিটে বসল। তার পাশের সিটেই উঠে বসল মেয়েটি।

স্টিয়ারিং হুইলে হাত দিতে গিয়ে তার বাম হাতের ব্যথা এবং রক্তাক্ত হাতের দিকে নজর গেল আহমদ মুসার। মনোযোগ এতক্ষণ অন্যদিকে নিবদ্ধ থাকায় ব্যথা ও রক্ত কিছুর প্রতিই নজর যায়নি তার।

আহমদ মুসা তার বুক পকেট থেকে তাড়া তাড়ি একটা রুমাল বের করে হাতের আহত স্থানটা চেপে ধরল। রক্ত বেরুচ্ছিল তখনও।

'আপনি হাতে আঘাত পেয়েছেন?' বলে মেয়েটি আহমদ মুসার কাছে এগিয়ে এল। তারপর কোন কিছু না বলেই আহমদ মুসার হাত টেনে নিতে গেল।

'ধন্যবাদ তেমন কিছু নয়।' বলে আহমদ মুসা হাত সরিয়ে নিতে চাইল। কিন্তু মেয়েটি হাত ছেড়ে না দিয়ে বলল, 'মাফ করবেন। ক্ষতটা বেধে দিলে রক্ত পড়া কিছুটা কমতে পারে।'

মেয়েটি তার ব্যাগ থেকে নিজের রুমাল বের করে আহমদ মুসার রুমালসহ একটা ব্যান্ডেজ বেধে দিল এবং বলল, 'আপনি এদিকে আসুন, আমি ড্রাইভ করতে পারব।'

'কোন অসুবিধা হবে না।' বলে আহমদ মুসা হাত ফিরিয়ে নিল ষ্টেয়ারিং হুইলে।

গাড়ী ষ্টার্ট দিল আহমদ মুসা।

চলতে শুরু করল গাড়ী।

ভয় ও উদ্বেগের চিহ্ন মেয়েটির মুখে আর নেই।

তার বিস্ময় এখন আহমদ মুসার মুখে নিবদ্ধ। তার বিস্ময় হলো, শান্ত-সুন্দর- ভদ্র চেহারার এই লোকটি খালি হাতে পাঁচ জন সশস্ত্র গুন্ডাকে কুপোকাত করল!

চলতে শুরু করার পর আরেকটা বিস্ময় এসে মেয়েটিকে ঘিরে ধরল, ঠিকানা জিজ্ঞেস না করে তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে! বলল, 'কোথায় যচ্ছেন? ঠিকানা যে নিলেন না?'

'গুলরোখ-এর ১০১ ইমাম ইসমাইল রোড তো?'

বিস্ময়ে মেয়েটির দম আটকে যাবার যোগাড়। বলল, 'আপনি চেনেন? কি করে জানলেন?'

'আপনিই জানিয়েছেন।'

'ইস! না। আমার নামও কি আপনি জানেন?'

'তাতিয়ানা। তাসখন্দ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দর্শনের শেষ বর্ষের ছাত্রী।'

মেয়েটিকে সত্যেই বিব্রত দেখাল। সে গভীর দৃষ্টিতে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। চেষ্টা করল মনে করতে আহমদ মুসা তার পূর্ব পরিচিত কিনা। কিন্তু কিছুতেই স্বরণ করতে পারল না।

মেয়েটির অবস্থা দেখে আহমদ মুসাই বলল, 'দুঃশ্চিন্তার কোন কারন নেই, ড্যাস বোর্ডে রাখা আপনার নোট বুকই আমাকে সব বলে দিয়েছে।'

মেয়েটি তাকাল ড্যাস বোর্ডের দিকে। দেখল ঠিকই তার নোট বুক সেখানে আছে। তাতে তার নাম ঠিকানাও লেখা আছে। তবে তা হঠাৎ করে চোখে পড়া সহজ নয় এবং ভালো করে তাকিয়ে না দেখলে সিটে বসে পড়াও কঠিন। কিন্তু আহমদ মুসা এভাবে ওদিকে কখনো তাকায়নি, মেয়েটি স্বরণ করল। আহমদ মুসার চোখ অসম্ভব রকমের তীকষ্ন, স্বীকার করল মেয়েটি। হবেই তো যে লোক একা খালি হাতে পাঁচজন গুন্ডাকে মাটিতে শুইয়ে দিতে পাওে, সে সাধারন লোক নয়।

তীর বেগে ছুটে চলছে গাড়ী।

গুলরোখ তাসখন্দের সবচেয়ে অভিজাত এলাকা। শহরের একদম উত্তর প্রান্তে। নতুন তৈরী হয়েছে। এই এলাকাকে তাসখন্দের কুটনৈতিক এলাকা বলে অভিহিত করা হয়। অধিকাংশ বাড়িই হয় দূতাবাস নয়তো কুটনীতিকদের বাসা।

আহমদ মুসা অনেকটা শিথিল ভংগিতে গাড়ির সিটে ঠেস দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছিল। তার দৃষ্টি সামনে, ভাবলেশহীন মুখ। যেন কিছুই হয়নি, হাওয়া খেতে বেরিয়েছে সে।

মেয়েটি কিছু বলার জন্যে উশখুশ করছিল। কিন্তু আহমদ মুসার ভাবলেশহীন মুখের দিকে চেয়ে কিছু বলার সাহস পচ্ছিল না। সে খেয়াল করেছে, আহমদ মুসা গাড়িতে উঠার পর তার দিকে একবারও তাকায়নি। মনে হয় তাতিয়ানার কোন অস্তিত্ব এখানে আছে তা সে ভুলেই গেছে। তাতিয়ানার মত সুন্দরী তরুণীর পাশে বসা একজন যুবকের এই ধরনের নির্লিপ্ততা সে কল্পনাও করতে পারে না। বরং এক্ষেত্রে এটাই স্বাভাবিক ছিল যে, উদ্ধারকারী যুবক উদ্ধার করা তরুণীর সাথে ঘনিষ্ট হতে চেষ্টা করবে। কিন্তু আহমদ মুসাকে একদম উল্টো মনে হল তার কাছে।

গাড়ি প্রবেশ করল ইমাম ইসমাইল রোডে। গাড়ির স্পীড অনেক খানি কমিয়ে দিল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা তার মুখটা অল্প একটু ঘুরিয়ে বলল, 'মিস তাতিয়ানা, এবার আমি আপনার ওপর নির্ভরশীল।' হাসির একটা আভা ফুটে উঠল আহমদ মুসার ঠোঁটে।

ঠিক এই সময়েই রাস্তা পার হতে যাওয়া একজন দ্বিধাগ্রস্থ বৃদ্ধ আহমদ মুসার গাড়ির সাথে ধাক্কা খেল। জরুরি ব্রেক কষে বৃদ্ধকে বড় রকমের আঘাত থেকে আহমদ মুসা বাঁচাতে পারল, কিন্তু ধাক্কা তবু একটা খেলই।

আহমদ মুসা গাড়ি দাঁড় করিয়ে তাড়াতড়ি নেমে পড়ল। বৃদ্ধ পড়ে গিয়েছিল। তার মাথার ফলের ঝুড়ির ফল রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছে। খাস রুশ চেহারা বৃদ্ধটির।

আহমদ মুসা বৃদ্ধটিকে মাটি থেকে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরল। বলল, 'আঘাত পেয়েছেন খুব?'

‘জি না, আঘাত লাগেনি তেমন। ভারসাম্য রাখতে না পেরে পড়ে গিয়েছিলাম। গাড়ির তেমন দোষ ছিলনা। দোষ আমারই।’

‘না দোষ আমার।’ বলে আহমদ মুসা বৃদ্ধকে ছেড়ে দিয়ে রাস্তা থেকে ফল কুড়িয়ে বৃদ্ধের ঝুড়িতে ভরতে লাগল। বৃদ্ধ বসে পড়েছিল রাস্তায়। আঘাত না পেলেও ভয় পেয়েছিল। স্বাভাবিক হতে দেরী হল তার।

গব ফল ঝুড়িতে তুলে আহমদ মুসা বৃদ্ধের কাছে এসে বলল, ‘আপনি কি বাজারে যাচ্ছেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘বাড়িতে আর কে আছে?’

‘একটি মেয়ে এবং আমার স্ত্রী।’

‘এই বয়সে আপনার ঝুড়ি বহন করা কঠিন। কোথাও দোকান নিয়ে বসতে পারেন না?’

‘সরকার একটা দোকান বানিয়ে দিয়েছে, পুঁজি সংগ্রহ করেই বসব সেখানে।’

‘কেন সরকার পুঁজি দেয় না?’

‘দেবে শুনেছি, কিন্তু প্রার্থী তো অনেক।’

আহমদ মুসা একটু ভাবল। তারপর বলল, ‘আমি আপনার ছেলের মত। ব্যবসায়ের পুঁজি আমি কিছু দিতে পারি।’ বলে পকেট থেকে পাঁচ হাজারের একটা বান্ডিল বের করে বৃদ্ধের হাতে গুঁজে দিল।

বৃদ্ধ বাকহীনভাবে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। কিছু বলতে পারল না।

আহমদ মুসা একটা গাড়ি ডেকে বৃদ্ধকে ঝুড়ি সমেত গাড়িতে তুলে দিল এবং ভাড়াও মিটিয়ে দিল গাড়ির।

বৃদ্ধ গাড়িতে উঠতে উঠতে বলল, ‘ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন বাবা, যিশু সহায় হোন তোমার।’

গাড়িতে ফিরে এল আহমদ মুসা। বলল, ‘মাফ করবেন, আপনার দেরী করে ফেললাম।’

‘লোকটিই তো দোষ করেছিল, আপনি ক্ষতি পূরণ দিতে গেলেন কেন? তার সাথে ব্যবহার দেখে মনে হল দোষটা আপনিই করেছেন।’

‘ওটা ওঁর দোষ নয়, বরং অসহায়ত্ব, অপারগতা। একজন বৃদ্ধ অসহায়কে আমিই আঘাত করেছি। আর আমি যা করেছি সেটা ক্ষতিপূরণ নয়, একজন মানুষের প্রতি একজন মানুষের সহায়তা।’

‘আপনার মন খুব নরম। পরোপকার আপনার নেশা বুঝি?’

গাড়ি তখন চলতে শুরু করেছে।

আহমদ মুসা তাতিয়ানার কথায় কান না দিয়ে বলল, ‘১০১ নাম্বারটা রাস্তার কোন ধারে?’

‘কেন শেষ এইটুকু আপনি বের করে নিতে পারবেন না?’

‘দেখুন আমি বলেছি, এ ব্যপারে আমি আপনার ওপর নির্ভরশীল। অবশ্য একা হলে আমিই খুঁজে নিতাম।’

‘তাহলে আমি প্রথমে আপনাকে একটা ডাক্তার খানায় নিয়ে যাব। পরোপকার করতে গিয়ে আপনার হাতের আরও ক্ষতি করেছেন। আবার ব্লিডিং শুরু হয়েছে।’

‘আপনাকে পৌছে দিয়েই আমি ক্লিনিকে যাব। কাছেই তো এসে গেছি মনে হয়।’

‘আপনার অনুমান ঠিক। সামনে বাম দিকের গেটটাই আমাদের।’ হেসে বলল মেয়েটি।

পাশ দিয়েই একটা খালি ট্যাক্সি যাচ্ছিল। আহমদ মুসা ইশারা করে ডাকল। বলল, ‘তুমি ঐ গেটের সামনে এস, আমি যাব।’

‘কেন আপনি বসবনে না?’ দ্রুত প্রতিবাদী কন্ঠে বলল মেয়েটি।

গাড়ি এসে পৌছুল গেটের সামনে।

‘মাফ করবেন, আজ নয়। কখনও সুযোগ পেলে আথিত্য গ্রহন করব।’

গেটের দরজা খুলে গেল।

ঢুকে গেল গাড়ি ভেতরে।

মেয়েটি লাফ দিয়ে নামল।

আহমদ মুসাও নেমে পড়ল।

নেমে তাতিয়ানা দাঁড়িয়েছিল। তার চোখে বিব্রত ও ব্যথিত দৃষ্টি। ‘মাফ করবেন, সময় হলে আসবো একদিন।’ তাতিয়ানার দিকে তাকিয়ে বলল আহমদ মুসা।

‘আমি বয়সে আপনার ছোট হবো, আমাকে আপনি ‘তুমি’ বলতে পারেন না?’ বলল মেয়েটি।

‘ঠিক আছে বলব।’ বলে ফেরার জন্য পা তুলল আহমদ মুসা।

‘আমি জানি, যে উপকার করতেই শুধু ভালবাসে, বিনিময় চায়না, তিনি অবশ্যই আসবেন না। তবু বলছি, ঋণ পরিশোধের মধ্যে আনন্দ আছে, এ আনন্দ থেকে মানুষকে বঞ্চিত করা ঠিক নয়।’

‘তোমার যুক্তিটা সুন্দর। আসি ধন্যবাদ।’ বলে আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়িয়ে পা চালাল সামনে।

আহমদ মুসা চলে গেলেও তাতিয়ানা গাড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। ভাবছিল সে। যা ঘটলো তা ভয়ংকর এক দুঃস্বপ্ন। কিন্তু সে দুঃস্বপ্নের চেয়েও বড় স্বপ্ন হলো এই লোকটি, যার নামও তার জানা হয়নি। লোকটি যেন একটি মানুষ মাত্র নয়, একটি জগৎ। পাঁচজন গুণ্ডার মধ্যে তাতিয়ানা যেন নরক জীবনকে জলজ্যন্ত দেখল, আর স্বর্গ প্রত্যক্ষ করল অপরিচিত এই যুবকটির মধ্যে। তার কপালের সিজদার চিহ্ন বলে দেয় সে মুসলমান, কিন্তু একজন রুশ-বংশোদ্ভুত খৃষ্টান বৃদ্ধকে সে বুকে জড়িয়ে ধরল নিজের ভাইয়ের মত করেই।

তাতিয়ানা গাড়িতে ঠেস দেয়া অবস্থা থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করল বাড়িতে ঢোকার জন্যে। চলতে চলতে ভাবল লোকটির যদি ঠিকানা নিতো সে। এ ভুলটা তারই। নাম ঠিকানা জিজ্ঞাসা না করে আমিই তাকে উপেক্ষা করেছি। মনটা একটা অস্বস্তিতে ভরে উঠল তাতিয়ানার।

আহমদ মুসা গেট পেরুতেই গেটের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

আহমদ মুসা রাস্তায় পা দিতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। ঘুরে দাঁড়িয়ে কয়েকদিনের অভ্যাস মত গেটের ওপর একবার চোখ বুলালো।

হঠাৎ তার চোখ আটকে গেল গেটের ঠিক শীর্ষদেশে হালকা খোদাই করা একটি স্কেচের ওপর। ভালো করে চেয়ে দেখল স্কেচটি। ভল্লুকের একটা প্রকাণ্ড মাথা। হা করে আছে ভল্লুকটি।

ভল্লুকটি চোখে পড়ার সাথে সাথেই পাওয়ার একটা প্রবল আনন্দ আচ্ছন্ন করল আহমদ মুসাকে। গোটা শরীরে উষ্ণ স্রোত বয়ে গেল তার।

বিদ্যুতের আলো উদ্ভাসিত স্কেচটির দিকে আরেকবার তাকিয়ে ঘুরে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

রাস্তায় নেমে গাড়িতে উঠতে গিয়ে আহমদ মুসা বাড়িটাকে ভালো করে একবার দেখে নিল। মনে মনে একটু হাসল। মেয়েটির আতিথ্য গ্রহণ করতে চেয়েছিল কিছু না ভেবে, কিন্তু এখন তো দেখি তা সত্যে পরিণত হতে চলছে। তবে আফসোস মেয়েটি অতিথি সেবার কোন সুযোগ পাবে না। অতিথিকে দেখবে সে অনুপ্রবেশকারী হিসাবে। তখন সেবার বদলে শত্রু নাশের জন্যে উচু হয়ে উঠবে তার রিভলবার।

আহমদ মুসার হাত সারতে কদিন সময় নিল।

সেদিন রাত ৩টা।

আহমদ মুসা তাতিয়ানাদের বাড়ির পেছনে এসে দাঁড়াল। বাড়িটি প্রাচীর ঘেরা। প্রাচীর ঘেরা জায়গার প্রায় মাঝখানে বাড়িটি দাঁড়ানো।

বাড়ির তিন দিক ঘেরা বাগান। পশ্চিম দিকে বাড়ির সম্মুখের ভাগ। সম্মুখ অংশটা ফাঁকা। ফাঁকা কম্পাউন্ডটার উত্তর অংশে গ্যারেজ। বাড়ির সম্মুখে প্রাচীরের সাথে বিরাট গেট।

বাড়ির পেছনে প্রাচীরের বাইরে প্রাচীরের গা ঘেষে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

আহমদ  মুসা একাই এসেছে অভিযানে। একা আসাই পছন্দ করেছে সে। এ অভিযানের লক্ষ্য সংঘাত বাঁধানো নয়। গোপনে গ্রেট বিয়ারের অফিসে প্রবেশ করে পরিকল্পনা ও দলিল-দস্তাবেজ হস্তগত করা। বেশি লোক এসে

সংঘাত-সংঘর্ষ বাঁধালে এই লক্ষ্য অর্জন করা যাবে না। প্রয়োজন হলে ওরা সব ধ্বংস করে দিয়ে পালিয়ে যাবে। তাই আহমদ মুসা একা আসাই ঠিক করেছে। তবে কথা হয়েছে ভোরের মধ্যে আহমদ মুসা না ফিরলে সদলবলে এসে বাড়ি ঘেরাও করে অভিযান চালানো হবে। তার আগ পর্যন্ত দু'জন গোয়েন্দা অফিসার বাড়িটির ওপর চোখ রাখবে।

চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। অমাবস্যার রাত। আহমদ মুসা মাথা তুলে চাইল প্রাচীরের মাথার দিকে। আট ফিটের মত উঁচু প্রাচীর। ইচ্ছা করলে আহমদ মুসা লাফিয়ে উঠে প্রাচীর ডিঙাতে পারে।

কিন্তু ভাবছে আহমদ মুসা, ওদের নিরাপত্তা ব্যবস্থাটা কি রকম। প্রাচীরে ওপর ফ্লাস লাইট নেই, তাহলে কি কোন বিকল্প ব্যবস্থা আছে? আহমদ মুসার মনে পড়ল সায়েজুর কাহিনী। ওরা সেখানে ইনফরমেশন সংগ্রহের জন্য লোক চক্ষুর অগোচরে সর্বাধুনিক গোয়েন্দাযন্ত্র ব্যবহার করেছে। এটা প্রমাণ করে ওদের ইলেক্ট্রনিক নিরাপত্তা সিস্টেম থাকতে পারে এবং সেটা যদি প্রাচীরে মাথায় বিছানো থাকে, তাহলে প্রাচীরে হাত বা পায়ের চাপ পড়ার সাথে সাথে কম্পিউটারে পৌছে যাবে। অথবা বেজে উঠবে এলার্ম।

এই চিন্তা করার পর আহমদ মুসা পিঠ থেকে ব্যাগটি নামাল। বের করল লম্বা সূচের মত হাল্কা-নরম একটি যন্ত্র।

যন্ত্রটি ইলেক্ট্রো রেডিয়াশন ডিটেক্টর। অত্যন্ত স্পর্শকাতর এ যন্ত্রটি। এই যন্ত্রটি যেমন ইলেক্ট্রিসিটি ও রেডিয়েশান অতি সূক্ষ্ণ পর্যায় পর্যন্ত ডিটেক্ট করতে পারে, তেমনি ডিটেক্টরটি যে সব বস্তুর মুখোমুখি হয়, তার পরিচয়ও জানিয়ে দিতে পারে। যেমন, বস্তুটি কঠিন, না নরম, ধাতব, না রাবার-প্লাষ্টিকের মত কৃত্রিম, ইত্যাদি।

সূচটিকে আহমদ মুসা এন্টেনার মত একটা সরু রডের বাঁকানো মাথায় বসিয়ে দিল। তারপর গুটানো এন্টেনা টেনে লম্বা করল। এন্টেনাটির গোড়ায় একটা ছোট্ট বাক্স। বাক্সটির একপাশে কম্পিউটার স্ক্রীন। বাক্সটি আসলে একটি কম্পিউটার। যে কোন জিনিস এন্টেনাটির এক ফুটের মধ্যে আসার সাথে সাথে জিনিসটির ছবি এবং বিশ্লেষণ কম্পিউটার স্ক্রীনে ধরা পড়ে।

এন্টেনা উঁচু করে ডিটেক্টরটি প্রাচীরে ওপর স্থাপন করল আহমদ মুসা। এন্টেনার গোড়ায় কম্পিউটার স্ক্রীনে প্রাচীরের মাথার ছবি ভসে উঠল। আহমদ মুসা যা সন্দেহ করেছিল তাই। দেখা গেল সিমেন্টের রং এর সূক্ষ্ণ তার প্রাচীরের ওপর। বুঝতে অসুবিধা হলো না, ওটা হাই-সেনসিটিভ ইলেকট্রিক তার। যার সংযোগ রয়েছে সিগন্যাল-সাইরেনের সাথে। তারের ওপর নির্দিষ্ট পরিমাণ কিংবা তার বেশি চাপ পড়লেই বেজে উঠবে সাইরেনটি।

আহমদ মুসা প্রাচীরের অনেকখানি এলাকা পরীক্ষা করল। দেখল, তারটি প্রাচীরে লম্বা লম্বি চলে গেছে।

প্রাচীরে উঠে তারটি এড়িয়ে ওপারে নামা যায়। কিন্তু অন্ধকারে তারটি দেখতে পাওয়ার কোন উপায় নেই।

কম্পিউটার স্ক্রীনে আহমদ মুসা ভালো করে আবার প্রাচীরের তারের অবস্থান প্রত্যক্ষ করল। দেখল প্রাচীরের মাথায় ঠিক মাঝ বরাবর দিয়ে তারের অবস্থান। অর্থাৎ তারের দু'পাশে মোটামুটিভাবে পাঁচ ইঞ্চি করে জায়গা আছে।

মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ হয়ে গেল আহমদ মুসার। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে।

ব্যাগ থেকে নাইলনের হুক-ল্যাডার বের করল সে। তারপর সাবধানে হুকটি ছুঁড়ল প্রাচীরের প্রান্ত লক্ষ্য করে। আটকে গেল হুকটি প্রাচীরের প্রান্তে। গাঢ় নীল পোষাকে আবৃত আহমদ মুসা নাইলনের মই বেয়ে উঠে গেল প্রাচীরের মাথা পর্যন্ত। মাথা পর্যন্ত উঠে ধীরে ধীরে আহমদ মুসা তার বাম পাটা সাবধানে প্রাচীরের প্রান্তে রাখল। পায়ের তালুর অর্ধেকটা থাকল প্রাচীরের ওপর বাকিটা বাইরে। তারপর বাম পায়ের ওপর ভর দিয়ে ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পনে ডান পা নাইলনের মই থেকে তুলে প্রাচীরের ওপাশে ভেতরের প্রান্তে রাখল। দুই পা ও দুই হাত প্রাচীরের দুই প্রান্তে রেখে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থাকার পর নাইলনের মই তুলে নিয়ে প্রাচীরের ভেতরের প্রান্তে হুক লাগিয়ে মই ছেড়ে দিল নিচে। তারপর ডান পা ও হাতের ওপর ভর দিয়ে বাম পা ঘুরিয়ে এনে নাইলনের মইয়ে রাখল এবং দ্রুত নেমে এল নিচে। মইটি খুলে নিয়ে রাখল তার ব্যাগের ভেতর।

চারদিকে চাইল আহমদ মুসা। ঘুটঘুটে অন্ধকার। বাগানে কোথাও কোন আলো নেই।

পকেট থেকে আহমদ মুসা ইনফ্রারেড গগলস বের করল। এই অন্ধকারে আর কোন ফাঁদ তারা পেতে রেখেছে কিনা দেখা দরকার।

গগলস পরল আহমদ মুসা। অন্ধকার তার সামনে ফিকে হয়ে গেল।

সতর্ক দৃষ্টিতে গোটা বাগানের ওপর চোখ বুলিয়ে নিল সে। না, বাগানে কোথাও কোন পিলার বা পোস্ট নেই, যেখানে কোন গোপন ক্যমেরা বসানো থাকতো পারে। তবু আহমদ মুসা বাগানের মাঝ দিয়ে না গিয়ে ঘোরাপথ হলেও বাগানের প্রান্ত দিয়ে যাওয়া ঠিক করলো।

বাগানের পূব দেয়ালের অবশিষ্ট প্রান্তটা ঘরের উত্তরের দেয়াল ঘেষে আহমদ মুসা হামাগুড়ি দিয়ে পশ্চিম দিকে এগোল। অর্ধেক পথটা এগিয়েছে এমন সময় মাথা তুলে উঁকি দিতেই বাগানের মাঝখানটায় একটা গাছকে অস্বাভাবিক নড়ে উঠতে দেখল। সঙ্গে সঙ্গেই বসে পড়ল আহমদ মুসা। বসে বসেই উঁকি দিতে লাগলো। হ্যাঁ গাছ পালার হঠাৎ নড়া-চড়াটা ধীরে ধীরে পুব দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এনফ্রারেড গগলস চোখে না থাকলে এটা ধরা যেত না রাতের অন্ধকারে। আহমদ মুসার কাছে পরিষ্কার হযে গেল জন্তু অথবা মানুষ যাই হোক সংখ্যায় দুইটি বা দুইজন হবে এবং তারা এগিয়ে যাচ্ছে আহমদ মুসা যে জায়গায় নেমে ছিল ঠিক সেদিকে। মুহুর্ত কয়েকের মধ্যেই আহমদ মুসা বুঝে নিল ওরা মানুষই হবে, শিকারী কুকুর হলে ওদিকে না গিয়ে এদিকেই ছুটে আসত।

ওরা যদি আহমদ মুসার সন্ধানে এসে থাকে, তাহলে বলতে হবে মুসা ওদের কাছে ধরা পড়ে গেছে। কিন্তু কিভাবে? প্রাচীরের তারে অবশ্যই তার কোন স্পর্শ পড়েনি।

একটা ঝাউ গাছের আড়ালে বেশ কিছুক্ষণ বসল আহমদ মুসা। কানে সে এ্যাম্প্লিফায়ার বসিয়েছে যাতে কিছু দুরের ছোট খাট কথা এবং শব্দও সে শুনতে পায়।

বেশ কিছুক্ষণ পর প্রাচীরের পাশ দিয়ে প্রায় মাটি কামড়ে একরাশ আলো ছুটে আসতে দেখল। ঝাউ গাছের ভিন্ন পাশে এবং পাতার আড়ালে থাকায় আহমদ মুসা রক্ষা পেয়ে গেল।

আলোটা এদিক ওদিক ছুটাছুটি করল। তারপর আবার অনেকক্ষণ চুপচাপ।

এক সময় আহমদ মুসা একটা কন্ঠ শুনতে গেল।

'না ভেতরে কেউ ঢুকেনি।' কে একজন বলল।

'কিন্তু মানুষ প্রাচীরে উঠেছে এ সিগন্যালতো কম্পিউটার দিয়েছে।' অন্য এক কন্ঠ।

'দিয়েছে বটে, কিন্তু সাইরেন তো বাজেনি। কেউ প্রাচীর পার হলে অবশ্যই তা বাজতো।'

'তাহলে কম্পিউটার সে সিগন্যাল দিল কি করে?'

'প্রাচীরের ইলেকট্রনিক তারটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। তারের প্লাস্টিক কভারে আছে সূক্ষ সূক্ষ ছিদ্র। তারের এক ফুটের মধ্যে কোন ধাতব বস্তু অথবা কোন প্রানী এলে, সঙ্গে সঙ্গে সে খবর পৌছে যায় কম্পিউটারে। কম্পিউটার স্ক্রীনে আমরা পাই তার সিগন্যাল।'

'তাহলে বলা যায় তারের কাছাকাছি কেউ এসেছিল, কিন্তু ফেরত গেছে।'

'এমন তো হতেই পারে। চোর-ছ্যাচ্চড় কতই তো ঘুরঘুর করে রাতে এ বাড়ি থেকে সে বাড়িতে। হয়তো সে রকম কেউ প্রাচীরে উঠার চেষ্টা করে ফেরত গেছে।'

আহমদ মুসা মাথাটা একটু উচিয়ে দেখছিল লোক দু'টিকে। ওরা গল্প করতে করতে বাগানের মধ্যে দিকে অগ্রসর হল।

আহমদ মুসাও হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রসর হলো প্রাচীরের পাশ ঘেষে অন্ধকারে দাঁড়ানো বাড়ির দিকে।

বাড়ির একেবারে নীচ বরাবর এসে বাগান শেষ হয়েছে। বাগান ও বাড়ির মাঝ বরারব উত্তর-দক্ষিণ বিলম্বিত একটা ঘাসে ঢাকা রাস্তা।

আহমদ মুসা বাগানের পশ্চিম প্রান্তে সেই রাস্তার মুখে এসে উকি মারলো। লোক দু'জন তাদের টর্চ জ্বেলে সেই ঘাসে ঢাকা রাস্তাটি ভালো করে দেখল। তাদের একজনের চর্ট বিল্ডিং-এর গা বেয়ে ওপরে দুতলার এক জায়গায় এসে ঘোরা-ফিরা করতে লাগল। সেখানে দু'টি এয়ার কুলার দেখা গেল।

লোক দু'জন বাড়িটির দক্ষিণ প্রান্ত ঘুরে বাড়ির ওপাশে চলে গেল।

আহমদ মুসা চোখ থেকে ইনফ্রারেড গগলস খুলে ফেলল। অন্ধকার পরীক্ষা করা তার লক্ষ্য। আহমদ মুসা খুশী হলো, চারদিকে, ঘুটঘুটে অন্ধকার।

উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

বাড়িটির গোড়ায় দাঁড়িয়ে তাকাল বাড়িটার দিকে।

তিন তলা বাড়ি।

তিন তলার কয়েকটি কক্ষ থেকে হাল্কা আলো দেখা যাচ্ছে। ডিমলাটের আলো।

দু'তলার কোন কক্ষেই আলো দেখা যাচ্ছে না। নীচ তলার দক্ষিণ প্রান্তের একটি কক্ষ থেকে উজ্জ্বল আলো দেখা যাচ্ছে।

আহমদ মুসা নিশ্চিত হলো, দু'তলাটাই ওদের অফিস অংশ। আর সম্ভবত যেখানে ওদের টর্চ লাইটের আলো স্থির হয়েছিল, এয়ারকুলার ওয়ালা সেই দু'টি কক্ষই অফিস। কম্পিউটার এবং মাইক্রোফিল্ম জাতীয় মূল্যবান দলিলাদি নিশ্চয় ও দু'টি কক্ষেই আছে। এয়ারকুলার থাকা তারই প্রমাণ।

কক্ষ দু'টি দু'তলার উত্তর প্রান্তে। আহমদ মুসা তার নিচেই দাঁড়িয়ে।

চারদিকটা একবার দেখে নিয়ে আহমদ মুসা ব্যাগ থেকে সিল্কের কর্ড বের করল। হুকটা হাতে নিয়ে দু'তলার কার্নিস লক্ষ্যে ছুড়ে দিল।

হুকটা কার্নিসে ভালোমত আটকে গেছে কিনা দেখে নিয়ে আহমদ মুসা কর্ড বেয়ে তর তর করে উঠে গেল দু'তলার কার্নিসে।

কার্নিসে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা। ভালো করে নজর বুলাল এয়ারকুলার লাগানো ঘরের দিকে। কিছু ব্যবধানে পাশা পাশি দু'টি এয়ারকুলার। ভিন্ন ভিন্ন দু'টি ঘরের দিকে, আবার ঘর একটিও হতে পারে।

স্টিলের ফ্রেম দেয়া কাঁচের জানালা। জানালায় নিশ্চয় শিকও আছে- ভাবল আহমদ মুসা।

জানালা পরীক্ষা করে হুক-এর জায়গাটা অনুমান করে নিয়ে আহমদ মুসা পকেট থেকে ‘লেসার বীম নাইফ’ বের করে লেসার বীম স্প্রে করল।

জানালা খুলে নড়ে উঠল। বুঝল আহমদ মুসা, হুক আর নেই।

জানালা খুলে ফেলল সে। তারপর লেসার বীম নাইফ দিয়ে কেটে ফেলল তিনটি শিকের গোড়া। শিকগুলো ভাঁজ করে ভেতরের দিকে ঠেলে দিল।

ভেতরে প্রবেশ করল আহমদ মুসা। পুরু কার্পেটে পা পড়ল তার। পেছনে ফিরে জানালা বন্ধ করল সে।

ঘরের ভেতরে জমাট অন্ধকার । সেই অন্ধকারে নিজের অস্তিত্বও যেন হারিয়ে ফেলল আহমদ মুসা । হঠাৎ তার মনে হলো সূর্য এবং তারার আলো যখন পৃথিবীতে পৌছেনি, সেই আদি দিনগুলোতে বুঝি অন্ধকারটা এমনি নিখাদ ছিল, নিশ্চিদ্র ছিল । সেই অন্ধকারটা ছিল পৃথিবীর নিরব-নিস্তব্ধ মৃতরূপ । অন্তহীন নি:শব্দতার সেই মৃতপুরীতে আলো আসে জীবনের বার্তা নিয়ে । আনমনা হয়ে পড়ল আহমদ মুসা। তার মনে হলো সে যেন কোন বদ্ধ কক্ষে নয়, অন্ধকার চাদরে ঢাকা আছে। পৃথিবীর জন মানবহীন অবারিত কোন প্রান্তরে যেন সে দাঁড়িয়ে।

চাপা কন্ঠের শব্দে সম্বিত ফিরে পেল আহমদ মুসা। শব্দ আসছে জানালা দিয়ে, নীচ থেকে।

আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি পকেট থেকে পেন্সিল টর্চ বের করে পরীক্ষা করল ঘরটা।

হতাশ হলো সে। বেশ বড় ঘর সোফায় সাজানো। ঘরের এক প্রান্তে বিশেষভাবে তৈরী একটা বড় সোফা আছে। আহমদ বুঝল, এটা বিশেষ একটা সভা কক্ষ।

নীচে দৌড়া-দৌড়ি-ছুটাছুটি বেড়ে গেল। আহমদ মুসা জানালায় গিয়ে দেখল টর্চের আলোর ঘুরা-ফেরা। টর্চের আলো ঘুরে-ফিরে তার সে জানালা লক্ষ্যেও এল।

আহমদ মুসার বুঝতে বাকি রইল না যে, তার আগমন ধরা পড়ে গেছে।

উদ্বিগ্ন হলো আহমদ মুসা। তার আগমন বৃথা না হয়ে যায়, এটাই তার উদ্বেগের কারণ। অফিস বা কম্পিউটার রুম তার খুঁজে পাওয়া দরকার। সে কক্ষটি কি তিন তলায় হতে পারে? তিনতলাতেও সে সম্ভবত দুটি এয়ারকুলার দেখেছে। হতে পারে গুরুত্বপূর্ণ কক্ষটি গ্রেট বিয়ার নেতা, তার শয়ন-কক্ষের পাশেই রেখেছেন।

এই চিন্তার সংগে সংগেই আহমদ মুসা কক্ষ থেকে বের হবার জন্যে কক্ষের দরজার লক গলিয়ে ফেলল।

দরজার পাল্লা টানতে যাবে এমন সময় ছুটে আসা পায়ের শব্দ পেল। কে একজন ছুটে আসছে। দরজার সামনে দিয়েই পদ শব্দটি দক্ষিনে ছুটে গেল।

আহমদ মুসা দরজা ঈষৎ ফাঁক করে দেখল স্বাস্থবান ও দীর্ঘদেহী একজন লোক মেশিন পিস্তল হাতে ছুটছে দক্ষিন দিকে।

আহমদ মুসা ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটল উত্তর দিকে। সেদিন আহমদ মুসা দেখেছিল, বাড়িতে দু'টি সিড়িঁ আছে। একটা দক্ষিন প্রান্তে, অন্যটা উত্তর প্রান্তে।

আহমদ মুসা উত্তরের সিড়িঁর দিকেই ছুটল। লক্ষ্য তার তিন তলা। পেয়ে গেল সিঁড়ি।

উঠতে গেল সিড়িঁ দিয়ে। সিড়িঁর উপর চোখ পড়তেই দেখল, সিড়িঁর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে তাতিয়ানা। বিস্ময়ে বিস্ফোরিত তার দু'টি চোখ। কথা যেন হারিয়ে ফেলেছে। ঠোঁট তার কাঁপছে।

বাড়িতে কেউ বা কোন শত্রু অনুপ্রবেশ করেছে, এই খবর পেয়ে তাতিয়ানা তার পিতার পেছনে ছুটে আসছিল কি ব্যাপার তা জানার জন্য। সামনে আহমদ মুসাকে দেখে তার পা'দুটো যেন জমে গেছে। মুখেও কথা সরছে না। অবিশ্বাস্য এ দৃশ্য তার কাছে।

'কেমন আছো তাতিয়ানা, গ্রেট বিয়ারের কম্পিউটার-অফিসটি আমাকে দেখিয়ে দাও।' দ্রুত কন্ঠে বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার কথা অনেকটা নির্দেশের মত শোনালেও, তার চোখে ছিল অবনত দৃষ্টি। তাতে সহযোগিতার আবেদন, নির্দেশ নয়।

বোবা দৃষ্টিতে তাতিয়ানা আঙুল দিয়ে সিড়িঁর পাশের দুতলার রুমটি দেখিয়ে দিল।

'সিঁড়ির পাশে এই রুম?' জিজ্ঞাসা করে নিশ্চিত হতে চাইল আহমদ মুসা।

হ্যাঁ সুচক মাথা নাড়ল তাতিয়ানা। তার চোখে রাজ্যের বিস্ময়।

'ধন্যবাদ তাতিয়ানা' বলে আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটল দরজার দিকে।

সিড়ির গোড়ায় নেমে এল তাতিয়ানা। বিস্ময় ও উদ্বেগের সাথে দেখল, কি এক অদ্ভুত যন্ত্র দিয়ে দরজার লক গলিয়ে ফেলে ভেতরে প্রবেশ করল আহমদ মুসা। ভেতরে ঢুকে আহমদ মুসা দরজার ডবল ছিটকিনি লাগিয়ে দিল তার শব্দ ও পেল।

বেশ বড় ঘর। তবে আগের ঘরটার চেয়ে বেশ ছোট। ঠিক দরজার বিপরীত দিকে একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল। টেবিলের ওপাশে রিভলভিং চেয়ার। টেবিলের বাম পাশে হাতের আওতার মধ্যে একটা ছোট্ট টেবিলের ওপর একসারি সর্বাধুনিক কম্পিউটার। আর টেবিলের ডান পাশে একটি র‍্যাকে কয়েকটা টেলিফোন এবং একটা অয়্যারলেস সেট। ঠিক চেয়ারের উপরেই দেয়ালে টাঙানো একটা পাওয়ার ফুল আগুন নির্বাপক গ্যাস সিলিন্ডার, যা গোটা বাড়ির আগুন নিভিয়ে ফেলতে পারে এবং তার পাশেই টাঙানো রয়েছে একটা গ্যাস মাস্ক।

খুশী হলো  আহমদ মুসা গ্রেট বিয়ারের হেড কোয়ার্টারে তার মূল অফিসটা যেমন হওয়া দরকার, এ অফিসটা তেমনি। প্রাচীর ডিঙাবার সময়ই আহমদ মুসা বুঝেছিল এটাই গ্রেট বিয়ারের হেড কোয়ার্টার। হেড কোয়ার্টার ছাড়া একটা সাধারণ ঘাটির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এমন ইলেক্ট্রনিক্স হতে পারে না।

আহমদ মুসা ধীরে ধীরে এগুলো টেবিলের দিকে। তার প্রথম টার্গেট কম্পিউটার সার্চ করা, তারপর একে একে সবকিছু।

ওদিকে আহমদ মুসা অফিস কক্ষে ঢোকার সংগে সংগেই করিডোর দিয়ে কয়েকজনকে ছুটে আসতে দেখা গেল। তারা সদলবলে ঢুকল প্রথম

এয়ারকন্ডিশন ঘরটায় যেখানে আহমদ মুসা প্রথমে জানালা খুলে প্রবেশ করেছিল। মিনিট খানেকের মধ্যেই বেরিয়ে এল তারা। ছুটে এল আরও সামনে। এসে দাঁড়াল আহমদ মুসা প্রবেশ করেছে যেখানে সেই অফিস কক্ষের দরজায়। একজন লক পরীক্ষা করে চিৎকার করে উঠল, লক গলিয়ে এখনি এই কক্ষে কেউ প্রবেশ করেছে, লকটা এখনও গরম।

তার চিৎকার শুনে ছুটে এল সেই স্বাস্থ্যবান ও দীর্ঘদেহী লোকটা।

এর নাম আলেকজান্ডার পিটার। খাস রাশিয়ান। মধ্য এশিয়া গ্রেট বিয়ারের প্রধান সে। এই আলেকজান্ডার পিটারেরই একমাত্র মেয়ে তাতিয়ানা। আলেকজান্ডার নিজেও লকটা পরীক্ষা করল। বলল, 'ঠিক বলেছ, এইমাত্র শয়তানটা এখানে প্রবেশ করেছে।' বলেই পিটার পাশের একজনের দিকে চেয়ে বলল, জুকভ তুমি কয়েকজনকে পাঠাও ঘরের ওপাশটা পাহারার জন্যে, যাতে জানালা ভেঙে সে পালাতে না পারে।'

জুকভ চলে গেল।

'স্যার আমরা কি দরজা ভাঙব? সে তো ভেতর থেকে ছিটকিনি লাগিয়ে দিয়েছে।' একজন বলল।

'ভাঙতে পারবে দরজা, একবার চেষ্টা করো না।' মুখে হাসি টেনে বলল পিটার।

পিটারের কথার পরেই চারজন একটু দূর থেকে দৌড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল দরজার ওপর। মৃদু শব্দ হওয়া ছাড়া সামান্য একটু কাঁপলও না দরজা।

'চারজন কেন চারগন্ডা এলেও দরজা ভাঙবে না। সেভাবেই দরজা তৈরী। ধড়িবাজ লোক এটা বুঝেই ছিটকিনি লাগিয়ে নিজেকে নিরাপদ ভাবছে কিন্তু কতক্ষণ?' বলল পিটার।

'স্যার ভেতরে আমরা আগুন কিংবা গ্যাস স্প্রে করতে পারি, তাহলে বাছাধন এখনি দরজা খুলে বেরিয়ে আসবে।' অন্য একজন বলল।

'তোমার এই কৌশল কাজে লাগবে না। ভেতরে আগুন নির্বাপন আসে, গ্যাস মাস্কও আছে।'

‘তাড়াহুড়োর কি আছে। আপনাতেই খাঁচায় উঠেছে। একটু খেলিয়ে ধীরে-সুস্থে বের করে নেব।’

তাতিয়ানা এক হাত দিয়ে সিঁড়ির রেলিং চেপে ধরে সিঁড়ির গোড়ায় মূর্তির মত দাঁড়িয়ে ছিল। প্রবল এক বিস্ময় এবং উদ্বেগের ঝড় তাকে দলিত-মথিত করছে। তাকে উদ্ধারকারী ঐ লোকটির পরিচয় সে জানে না কিন্তু লোকটি তার কাছে অনেক বড় বিস্ময়কর সুন্দর একটি চরিত্র। তাঁকে তাতিয়ানা আমন্ত্রণ জানিয়েছিল আসার জন্য। কিন্তু তিনি এভাবে এ বাড়িতে কেন? কেন তিনি প্রবেশ করেছেন অফিস কক্ষে? এমনভাবে তিনি নিজেকে ফাঁদে ফেললেন কেন? কোন বোকার মত কাজ করার লোক তিনি অবশ্যই নন। তিনি কোন সাধারণ লোকও নন অবশ্যই। কিছুক্ষণ আগে চরম বিপদগ্রস্থ অবস্থায় তাকে দেখেছে সে। কিন্তু তার চোখে-মুখে দুর্ভাবনার কোন কিছু সে দেখেনি। অসাধারণ কোন নার্ভের অধিকারী না হলে এমন বেপরোয়া কেউ হতে পারে না। তাছাড়া যে অস্ত্র দিয়ে তিনি লক গলিয়ে অফিস কে প্রবেশ করেছেন তাও অসাধারণ। কিন্তু এ কি কাজ করলেন তিনিক! কি হবে এখন! কেঁপে উঠল তাতিয়ানার হৃদয়।

পুব আকাশে সুবেহ সাদেকের আলো ফুটে উঠল।

ঠিক এই সময়েই সামনের লন থেকে স্টেনগানের আওয়াজ ভেসে এল। পরে পিস্তল ও স্টেনগানের শব্দ এল বাড়ির চারদিক থেকেই। সেই সাথে শুরু হলো দৌড়া দৌড়ির শব্দ।

আলেকজান্ডার পিটার দাঁড়িয়েছিল বন্ধ অফিসটির সামনেই। সে উৎকর্ণ হয়ে উঠল স্টেনগানের আওয়াজে। পরক্ষণেই তার মনোভাব হয়ে উঠল অত্যন্ত কঠোর। একজন ছুটে এসে বলল, ‘স্যার সৈন্যরা আমাদের বাড়ি ঘিরে ফেলেছে।’

‘জানি। যাও সভাকক্ষে আমার সোফার নীচ থেকে আমার ব্রিফকেস নিয়ে এস।’

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ব্রিফকেস এনে হাজির করল লোকটা।

ব্রিফকেস খুলতে খুলতে ঐ লোকটিকে লক্ষ্য করেই বলল, ‘দুতলায় উঠার সিঁড়ির দরজা দু’টি বন্ধ করে দিয়ে সাইরেনটা বাজিয়ে দাও। সবাই সরে

পড়ুক। আর যাও গোপন পথের দরজা খুলে দিয়ে তোমরা সবাই সরে পড়। মনে রেখ জীবন্ত কারও ধরা পড়া চলবে না। যাও।'

বিস্ময়-বিস্ফরিত চোখ মেলে তাতিয়ানা সব দেখছে এবং শুনছে। সে ভেবে পাচ্ছে না, সৈন্যরা তাদের বাড়ি ঘেরাও করল কেন? তার উদ্ধারকারী লোকটা আটকা পড়ার সাথে কি এর কোন সম্পর্ক আছে? লোকটিকে উদ্ধার করার জন্যেই কি ওদের আগমন? কিন্তু কেন?

তাতিয়ানা চমকে উঠল তার আব্বাকে ব্রিফকেস থেকে ডিনামাইট বের করতে দেখে। বুঝতে পারল তাতিয়ানা তার আব্বার পরিকল্পনা। ডিনামাইট দিয়ে গোটা বাড়িটি উড়িয়ে দিয়ে লোকটিসহ অফিস, রেকর্ড ধ্বংস করে সব চিহ্ন মুছে ফেলে সরে পড়তে চান বাড়ি থেকে।

ঠিক অফিস কক্ষের সামনে ডিনামাইট ফিট করে ছোট ফিউজটিতে অগ্নি সংযোগ করে দ্রুত উঠে দাঁড়াল আলেকজান্ডার পিটার। ছুটে এল সিঁড়ির দিকে। সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়ানো তাতিয়ানাকে লক্ষ্য করে বলর, 'মা তাতি ঐ যে জরুরী পথের দরজা খুলে গেছে তুমি চলে যাও। আমি আসছি।'

বলে আলেকজান্ডার পিটার সিঁড়ি দিয়ে তর তর করে উঠে গেল তিন তলায়।

পিতা আলেকজান্ডার পিটারের কথাগুলোর কোনটাই তাতিয়ানার মনে ক্রিয়া করেনি। তার সমস্ত চিন্তা-মনোযোগ ডিনামাইটের দিকে। ডিনামাইট ফাটলে গোটা বিল্ডিং ধ্বসে পড়বে, আর ছাতু হয়ে যাবে অফিস কটি। ডিনামাইটটি ফাটতে কত দেরী, ফিউজটি কত বড়- এ প্রশ্নগুলো ঝড় তুলেছে তাতিয়ানার মনে। তার পিতা এখনই তিন তলা থেকে নামবে। তিনি না গেলে ডিনামাইটের গায়ে হাত দেয়া যাবে না। তিন তলার সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ পেল তাতিয়ানা। সঙ্গে সঙ্গে তাতিয়ানা এক দৌড় দিয়ে বন্ধ অফিস কক্ষের পাশের কক্ষে ঢুকে গেল। তাতিয়ানা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে দেখল, তার পিতা নেমে এসে ডিনামাইটটি পরীক্ষা করল। তারপর সিঁড়ির ওপাশে দেয়ালে খুলে যাওয়া গোপন দরজার দিকে ছুটে গেল। পিটার দরজা দিয়ে ঢুকে যাবার পর দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল, দরজাটি পরিণত হলো আস্ত দেয়ালে।

ছুটে বেরিয়ে এল তাতিয়ানা। ছুটে গেল ডিনামাইটের কাছে। হাঁটু মুড়ে বসল তার পাশে। দেখল, ফিউজ শেষ হবার পথে। আতংকিত তাতিয়ানা জ্বলন্ত ফিউজটির শেষ অস্তিত্বটুকু ধরে তা খুলে ফেলল ডিনামাইট থেকে। জ্বলন্ত ফিউজের আগুনের ছোবল তাতিয়ানার অনামিকা ও বুড়ো আঙুলকে আহত করল। কিন্তু সেদিকে ভ্রুপে মাত্র নেই তাতিয়ানার।

ফিউজটি খুলে ফেলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে যাচ্ছিল তাতিয়ানা, এমন সময় দেখল ডিনামাইটের অটোমেটিক ডেটোনেটর হোলে একটা পিন বসানো। অত্যন্ত সেনসিটিভ সে পিনটি স্থিরভাবে বসে আছে। তাতিয়ানা বুঝল, কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত কমান্ড সুইচটি তার পিতার হাতে আছে। সেখান থেকে সুইচটি টেপার সাথে সাথে পিনটি ডিনামাইটের নার্ভে আঘাত করবে, সঙ্গে সঙ্গেই ঘটবে প্রলয়ংকরী বিস্ফোরণ।

উদ্বেগ-আতংক তাতিয়ানার নিঃশ্বাস বন্ধ হবার যোগাড় হলো। কাঁপতে লাগল তার বুক, সমগ্র স্নায়ু মন্ডলী। পিনটা আলগা করতে না পারলে যে কোন মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটে যাবে।

তাতিয়ানা শুয়ে পড়ল ডিনামাইটের পাশে। ধীরে ধীরে তার দু'টি আঙুল এগিয়ে দিল পিনের দিকে। তাতিয়ানার সমস্ত মনোযোগ, সমস্ত চেতনা পিনের ওপর কেন্দ্রীভূত। কম্পিত দু'টি আঙুল তার এগিয়ে যাচ্ছে পিনকে লক্ষ্য করে। কিন্তু তাতিয়ানার আঙুল পিন স্পর্শ করতে সাহস পেলনা। ভয় হলো, তুলতে গিয়ে যদি চাপ লাগে, তাহলে পিন ডিনামাইটের নার্ভে গিয়ে আঘাত করতে পারে এবং ডেকে আনতে পারে ভয়াবহ বিষ্ফোরণ।

ঘেমে উঠেছে তাতিয়ানা। কপাল থেকে দর দর করে নেমে আসছে ঘাম তার গন্ড বেয়ে।

হঠাৎ তাতিয়ানার মনে পড়ল, তার চাবির রিঙের সাথে ক্ষুদ্র চাকু আছে তাতে রয়েছে শক্তিশালী চুম্বক। এই চুম্বক সহজেই টেনে তুলে আনতে পারে পিনটিকে।

তাতিয়ানা চাবির রিংটি বের করল এবং চাকুটি বের করে আনল কেবিন থেকে। তারপর চাকুটিকে পিন সোজা অনেক ওপরে নিয়ে ধীরে ধীরে নামিয়ে

আনতে লাগল পিন লক্ষ্যে। তাতিয়ানা তখন নিঃশ্বাস ফেলতেও ভুলে গেছে। কাঁপছে তার হাত। মনে তার আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব। ঘামে ভিজে গেছে তাতিয়ানার দেহ।

তাতিয়ানার চুম্বক-চাকুটি পিনের এক ইঞ্চির মধ্যে আসতেই পিনটি লাফিয়ে বেরিয়ে এসে আঁকড়ে ধরল চুম্বক-চাকুর দেহকে।

'ওহ গড' বলে তাতিয়ানা তার মাথাটা এলিয়ে দিল মাটির ওপর। তার চোখ দুটি উর্ধমুখী হতেই দেখতে পেল চার-পাঁচ জন তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে সবার হাতেই ষ্টেনগান, পরণে সৈনিকের পোশাক। শুধু একজনের পরণে সাধারণ পোশাক। হাতে সর্বাধুনিক জাতের মেশিন রিভলবার। তাদের মুখে উদ্বেগ-আতংকের চিহ্ন তখনও মুছে যায়নি।

তাতিয়ানর সাথে চোখাচোখি হতেই সাধারণ পোশাকের সেই লোকটি বলে উঠল, 'ধন্যবাদ বোন, আপনি কে জানি না। কিন্তু ধ্বংস থেকে রক্ষা করলেন এই বাড়িকে, আমাদের সকলকে। আহমদ মুসা কি এই ঘরে?ক'

'আহমদ মুসা কে?' বিস্ময়পূর্ণ জিজ্ঞাসা ফুঠে উঠল তাতিয়নার কন্ঠে। আহমদ মুসাকে সে দেখেনি, কিন্তু জানে তাকে। আহমদ মুসা সোভিয়েত সাম্রাজ্যের এক সর্বনাশের নায়ক।

'এই বাড়িতে একজন লোক ঢুকেছিল সে .... ....'

তার কথা শেষ না হতেই সামনের দরজাটা খুলে গেল। বেরিয়ে এল আহমদ মুসা।

তাতিয়ানা ততক্ষণে শোয়া থেকে উঠে বসেছিল।

আহমদ মুসা বেরিয়ে আসতেই রিভলবার ওয়ালা লোকটি রিভলবার ফেলে দিয়ে জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে। বলল, 'আহমদ মুসা ভাই, আপনি ভাল আছেন তো?'

'হ্যা আজিমভ, গ্রেট বিয়ারের প্রধান আলেকজেন্ডার পিটারের অফিসে বসে নিশ্চিন্তে কাজ করছিলাম। জানতাম ভোরে তোমরা আসবে। কিন্তু ধ্বংসের এ আয়োজনের কথা তো ঘুর্ণাক্ষরেও ভাবিনি।' ডিনামাইটের দিকে তাকিয়ে বলল আহমদ মুসা।

‘ধন্যবাদ দিন এই মেয়েটিকে। ফিউজ না খুলে ফেললে অনেক আগেই বিষ্ফোরণ ঘটে যেত। অটোমেটিক ডেটোনেটিং-এর ব্যবস্থাও ছিল বাড়তি ব্যবস্থা হিসাবে। অটোমেটিক ডেটোনেটরের পিনটিও সে খুলেছে অবিশ্বাস্য বুদ্ধিমত্তার সাথে। রুদ্ধশ্বাসে আমরা দাঁড়িয়ে থেকে তা দেখেছি।’

তাতিয়ানা উঠে দাঁড়িয়েছিল। তার মাথা নিচু। তার হৃদয়ে বিস্ময়ের ঝড়। এই লোকটি আহমদ মুসা! আহমদ মুসা তাকে বাঁচিয়েছিল সেদিন! সেদিনের ঘটনাগুলো এক এক করে মনে পড়ল তার। সাহস, শক্তি ও চরিত্রে অসাধারণ সে। অথচ এই লোকটির কত বদনাম সে শুনেছে। নিষ্ঠুর, রক্তপায়ী, চরিত্রহীন, কত কি! কিন্তু নিজের চোখে সে দেখল কত উপকারী সে। সেদিন একজন অমুসলিম বৃদ্ধকে সে যে সাহায্য করল, আপন করে নিল, এমনটা সম্ভব নয় একজন মানুষের পক্ষে যদি তার হৃদয় মানুষের জন্য দরদ ভরা না হয়। সেদিন সে তাতিয়ানাকে বাঁচিয়েছিল। এর বিনিময়ে সে তাতিয়ানার সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়াতো দূরে থাক, তাতিয়ানার নাম-পরিচয়ও জিজ্ঞাসা করেনি। অত্যন্ত উচুমানের চরিত্র না হলে এমন কেউ হয়না। এমনি নানা কথা ভেবে চলেছে তাতিয়ানা।

সৈনিকরা চারিদিকে সার্চের জন্য বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। আহমদ মুসার পাশে শুধু দাঁড়িয়েছিল আজিমভ।

‘ধন্যবাদ তাতিয়ানা। তুমি আজ যা করেছ তার পরিমাপ কোন মানদন্ডেই হয়না।’

তাতিয়ানা একবার মুখ তুলে আহমদ মুসা দিকে তাকিয়ে আবার মুখ নিচু করল।

‘তোমার আব্বা এবং অন্যরা কোথায়?’

‘ওঁরা এখন নাগালের বাইরে।’

‘তোমাকে নিয়ে যায়নি?’

‘আমি পেছনে রয়ে গেছি তিনি জানতেন না।’

‘ডিনামাইট কে পেতেছিল?’

‘আব্বা, আলেকজেন্ডার পিটার।’

‘তোমার আব্বার অন্যায় শুধরাবার জন্য রয়ে গেল তাহলে?’

ক'কিছুক্ষণ কথা বলল না তাতিয়ানা। পরে মুখটা চকিতের জন্য একটু তুলে বলল, 'আপনি যা ইচ্ছা ভাবুন।'

তাতিয়ানার কন্ঠ ভারি।

আহমদ মুসার তৎক্ষণাতই মনে হলো, তাতিয়ানাকে ঐভাবে কথা বলা তার ঠিক হয়নি। এইভাবে মানুষের নিয়তের উপর হাত দেয়া যায় না।

'কিছু মনে করো না তাতিয়ানা, একটু মজা করলাম।' বলে আহমদ মুসা অফিস রুমে ঢুকতে ঢুকতে আবার বলল, 'একটু দাড়াও তাতিয়ানা, একটু কাজ বাকি আছে।'

আহমদ মুসা ঢুকে গেল অফিসের ভেতরে।

তাতিয়ানা করিডোরের রেলিং-এ ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। তার চোখ অফিসের ভেতরে। দেখছে সে জগৎবিখ্যাত লোকটির তৎপরতা।

# ৫

যা ঘটে আসছে, এবার ও তাই ঘটল। গ্রেট বিয়ারের কাউকে এবারও জীবন্ত ধরা গেল না। পাওয়া গেল ছয়টি লাশ।

তবে ডকুমেন্ট কিছু পাওয়া গেল। কম্পিউটারে পাওয়া গেল গ্রেট বিয়ারের পরিকল্পনা। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল হলো পরিকল্পনার বাস্তবায়ন কর্মসূচী, সেই দলিলই পাওয়া গেল না। যা পাওয়া যায়নি তার জন্য আহমদ মুসার কোন দুঃখ নেই। তার মতে পরিকল্পনা কম পাওয়া নয়। এতে ষড়যন্ত্রের বিস্তার ও লোকেশান জানা গেছে, যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তাছাড়া পাওয়া গেছে বেশ কিছু টেলিফোন নাম্বার। যার মধ্যে আছে আলমা আতা, ফ্রুঞ্জ দুশনবে, আশখাবাদ ইত্যাদির মত গুরুত্বপূর্ণ স্থানের টেলিফোন নাম্বার।

আহমদ মুসা অফিস থেকে বেরিয়ে যখন মনে মনে এই হিসেব-নিকেশে ব্যস্ত তখন তাতিয়ানা বলল, ‘আমি এখন যেতে চাই।’

আহমদ মুসা তাকালো তাতিয়ানার দিকে। বলল, ‘তোমার পেছনে থেকে যাওয়াকে তোমার আব্বা এবং তোমার আব্বার সংগঠন কি চোখে দেখবে?’

‘আপনি ভাবছেন এ নিয়ে?’ বলল তাতিয়ানা।

‘ভাবাইতো স্বাভাবিক।’

‘ধন্যবাদ।’

‘আমার জিজ্ঞাসার জবাব দাওনি।’

‘আমি আমার আব্বার একমাত্র সন্তান। তাছাড়া তিনি কোন দিনই জানতে পারবেন না ডিনামাইটের ভাগ্যে কি ঘটেছিল।’

‘কিন্তু তার জিজ্ঞাসার জবাব তো তোমাকে দিতে হবে।’

‘প্রশ্ন শুনেই আমি জবাব ঠিক করে নিব।’

‘তোমার চলে যাবার জন্যে অনুমতির কোন প্রয়োজন নেই তাতিয়ানা।’

‘জানি। আমি অনুমতি চাইনি। আমি ইনফরমেশন দিয়েছি।’ কন্ঠ কিছুটা ভারি তাতিয়ানার।

‘ধন্যবাদ, তাতিয়ানা।’

‘বিদায় দিচ্ছেন আমাকে, কিছু জিজ্ঞাসার নেই।’

‘কোন বিষয়ে?’

‘কেন আমি গ্রেট বিয়ারের মধ্য এশীয় প্রধান আলেকজেন্ডার পিটারের মেয়ে। আমাকে কিছুই জিজ্ঞাসার নেই? আমি বুঝেছি, গ্রেট বিয়ারের কোন লোককে জীবন্ত ধরার জন্য উদগ্রীব আপনারা। আমি তো তাদেরই একজন।’

‘তোমাকে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করব না, কারণ তুমি আমাদের বন্দিনী নও। তাছাড়া তুমি গ্রেট বিয়ারের একজন নও।’

‘কিন্তু আমার সম্বন্ধে তো আপনি কিছুই জানেন না।’

‘জানার মাধ্যম শুধু মুখের কথা কিংবা লেখাই নয় তাতিয়ানা।’

চমকে মুখ তুলল তাতিয়ানা। একটু সময় নিয়ে বলল, ‘বুঝলাম না।’

‘মানুষের কাজ এবং মানুষের গোটা দেহই একটা জীবন্ত ইনফরমেশন ।’

‘ধন্যবাদ কিন্তু শত্রুর মেয়ে সম্পর্কে এমন সু-ধারনা ঠিক নয়।’

‘কেউ আমাদের শত্রু নয় তাতিয়ানা।’

‘কেন আলেকজেন্ডার পিটার শত্রু নয়?’

‘তিনি আমাদের শত্রু নন, আমরা তাঁর শত্রু।’

‘একই কথা। আপনারা তাঁর শত্রু হলে তিনিও আপনাদের শত্রু হয়ে যান।’

‘এক কথা নয় তাতিয়ানা। তিনি এবং তারা আমাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করছেন, চেষ্টা করছেন আমাদের জাতির সর্বনাশ ঘটাতে। কিন্তু আমরা তাঁর বা তাদের কোন ক্ষতি করার চেষ্টা করছি না। আমরা আত্মরক্ষার চেষ্টা করছি মাত্র।’

‘ধন্যবাদ। সব পক্ষের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি যদি এমন হতো, তাহলে দুনিয়াতে শত্রুতা ও অশান্তি থাকতো না।’

‘আমরা মুসলমানরা এমন একটা শান্তির দুনিয়া চাই তাতিয়ানা।’

‘এই চাওয়াটা শুধু মুসলমানদের মধ্যে সীমিত করছেন কেন? সব মানুষই তো শান্তি চায়।’

‘চায় বটে, কিন্তু সবার কাছে এই শান্তির কর্মসূচি নেই।’

‘কেন আমরা খ্রিস্টানরাও তো শান্তির কথা বলি। যিশু তো শান্তির প্রতীক।’

‘বল। কিন্তু সেটা কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কথাকে কাজে পরিণত করে শান্তির সমাজ বিনির্মাণের কোন কর্মসূচি তোমাদের বাইবেল দেয় না। আর কোরআন নাজিলই হয়েছে মানুষেকে শান্তির পথ প্রদর্শনের জন্যে, শান্তির সমাজ গঠনের জন্যে।’

‘কিন্তু আজকের মুসলিম সমাজ কি একথার সাক্ষ্য দেয়?’

‘দেয় না। কারণ অধিকাংশ মুসলমান ও তাদের সমাজ ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত নেই।’

‘তাহলে খ্রিস্টানদের দোষ দিয়ে লাভ কি? মুসলমান ও খ্রিস্টানতো সমানই হয়ে গেলো।’

‘সমান হয় না। মুসলমানদের সঞ্চয় আছে, কিন্তু ব্যবহার নেই, অন্যদিকে খ্রিস্টানদের সঞ্চয়ও নেই, ব্যবহারও নেই। এই মৌলিক পার্থক্য নিয়ে দুই জাতি এক হতে পারে না।’

‘অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আপনাকে বিপ্লবী হিসেবে জানতাম। আজ দেখছি, আপনি আপনার ধর্মের প্রচারকও।’

‘তোমার শেষের জানাটাই আসল।’

‘কিন্তু জগতের সবাই জানে, বিপ্লবই আপনার মুখ্য কাজ।’

‘তোমার কথা সত্য হলে ব্যাপারটা এই দাড়ায় যে, আমার আদর্শের প্রচার বিপ্লবের স্বার্থে। কিন্তু তা নয়। আমার বিপ্লব আমার আদর্শের স্বার্থে।’

‘একই কথা হল না?’

‘না এক কথা নয়। আদর্শকে যদি বিপ্লবের স্বার্থে ব্যবহার করা হয় এবং বিপ্লবই যদি হয় লক্ষ্য, তাহলে সে বিপ্লব ডেকে আনে স্বেচ্ছাচারিতা। আর বিপ্লব যদি হয় আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, তাহলে সে বিপ্লব নিয়ে আসে শান্তি ও কল্যাণ।

এজন্যই মুসলমানদের উপর খোদায়ী হুকুম তাদের বিপ্লব ও পরিবর্তনের সংগ্রামসহ সব কাজ হতে হবে 'ফি সাবিলিল্লাহ' অর্থাৎ 'আল্লাহর জন্য'। 'আল্লাহর জন্য' অর্থ আল্লাহর দেওয়া আদর্শের মাধ্যমে মানুষের শান্তি, কল্যাণ ও প্রগতির জন্যে।'

আহমদ মুসার ওপর নিবদ্ধ তাতিয়ানার চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'আপনি বিপ্লবী নন। বিপ্লবীরা এমন চরিত্রের হয় না।'

'ঠিক বলেছ, লেনিন, স্টালিন, মাওসেতুং-রা বিপ্লবী হলে, আমি বিপ্লবী নই।'

'কিন্তু ওরা তো বিপ্লবী ছিলেন।'

'হ্যাঁ, এই অর্থে ছিলেন যে, ওরা শক্তি, ষড়যন্ত্র ও সন্ত্রাসের জোরে জনগণের ঘাড়ে বিপ্লব চাপিয়েছিলেন। এই বিপ্লব চাপিয়ে দেবার কাজে শুধু প্রথম পর্যায়েই লেনিন হত্যা করেছিলেন পঞ্চাশ লাখ কৃষককে এবং মাওসেতুং হত্যা করেছিলেন বিশ লাখ। পরবর্তী পর্যায়ের হিসাব এর থেকেও ভয়াবহ।'

'বিপ্লব হলে হত্যাকাণ্ড কমবেশি কিছু একটা তো হয়ই।'

'ইসলামের বিপ্লবে তা হয় না। ইসলামের বিপ্লব হয় মানুষের জন্য, মানুষের কল্যাণের জন্য, মানুষকে হত্যার জন্য নয়। এমনকি মুসলিম বিজয়ের যে ইতিহাস রয়েছে, সেখানেও দেখবে কোন হত্যাকাণ্ড নেই। খ্রিস্টানরা যখন জেরুজালেম দখল করেছিল, তখন সত্তর হাজার মুসলমানকে তারা হত্যা করেছিলো। কিন্তু এই জেরুজালেম মুসলমানরা যখন আবার জয় করলো, তখন একজন খ্রিস্টানের গায়েও তারা হাত দেয়নি। মুসলমানরা যখন স্পেন জয় করেছিল, তখন খ্রিস্টানদেরকে মুসলিম শাসকরা মুসলিম প্রজাদের থেকে বেশি সুযোগ সুবিধা দিয়েছে, কিন্তু খ্রিস্টানরা যখন স্পেন জয় করল, তখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে হত্যা ও নির্মূল অভিযান চালিয়ে মুসলিমশুন্য করেছিল স্পেনকে।'

'ধন্যবাদ আপনাকে। আপনি কথার জাদু জানেন। কিন্তু আপনার আর সময় নষ্ট করব না। চলি।'

বলে তাতিয়ানা ঘুরে দাড়িয়ে সামনে পা বাড়াতে গিয়ে আবার ফিরে দাঁড়াল। আহমদ মুসার দিকে চোখ তুলে একটু ম্লান হেসে বলল, 'গ্রেট বিয়ার সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন নি। জিজ্ঞাসাবাদ করলেও কিছু বলতে পারতাম না। আমি ঐ ব্যাপারে আগ্রহী ছিলাম না, কান ও দিতাম না।'

'তোমাকে ধন্যবাদ এ সহযোগিতার জন্য।'

'কি সহযোগিতা করলাম।'

'জানতে ইচ্ছে করছিল খুব যে, গ্রেট বিয়ারের তুমি কিছু জান কি না।'

'জিজ্ঞাসা করেন নি কেন? উত্তর দেব না তাই?' হঠাৎ ভারী হয়ে উঠল তাতিয়ানার কণ্ঠ।

'তা নয় তাতিয়ানা। না চাইতেই তুমি খুব বড় সহযোগিতা করেছো। তাই সব কিছু তোমার ইচ্ছের উপর ছেড়ে দেয়াই ঠিক মনে করেছি।'

'ধন্যবাদ। বিস্ময় লাগছে, কঠিন ও নিষ্ঠুর গুলি-গোলা নিয়ে যার কাজ, তার হৃদয়বৃত্তি এত গভীর হলো কি করে।'

'তাতিয়ানা তোমার জন্য গাড়ি রেডি। পৌঁছে দিয়ে আসবে।'

'গ্রেট বিয়ারের আরেকটা আস্তানা চিনতে চান বুঝি?' মাথা একটু ঘুরিয়ে ঈষৎ হেসে বলল তাতিয়ানা।

'তাই যদি বল, তাহলে গাড়ি নিও না। তবে জেনে রাখ তোমাকে ফলো করার ইচ্ছে আমাদের নেই।'

দাড়িয়ে গেল তাতিয়ানা। ঘুরে দাঁড়ালো। হেসে বলল, 'ফলো করেও কোন লাভ হবে না। আমি কোথায় যাব জানি না। আব্বারা কোথায় তা বলতে পারব না।'

একটু থামল। তারপর বলল, 'এই জন্যই আমি গাড়ি নিতে চাচ্ছি না। আপাতত ঠিকানাবিহীন আমাকে কোথাও পৌঁছে দেবে গাড়ি।'

'যদি ওদের খুঁজে না পাও, তাহলে যোগাযোগ করবে, আমরা তোমাকে পৌঁছে দেব রাশিয়ায়।'

'ধন্যবাদ' বলে তাতিয়ানা ঘুরে দাড়িয়ে পা চালাল সামনে।

আহমদ মুসাদের গাড়ি প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। এক এক করে সবাই এসে গাড়িতে উঠল। গ্রেট বিয়ারের ছয়টা লাশ এবং গ্রেট বিয়ারের হেড কোয়ার্টারটি পুলিশের হাওলা করে দেওয়া হয়েছে।

আহমদ মুসা গাড়িতে উঠতে উঠতেই গাড়ি ছেড়ে দিল। আহমদ মুসার পাশে আজিমভ।

ছুটে চলল গাড়ি পশ্চিম তাসখন্দে অবস্থিত প্রেসিডেন্ট ভবনের উদ্দেশ্যে।

সৈনিক থেকে শুরু করে অভিযানে অংশগ্রহণকারী সকলেই খুশী। খুশীর সবচেয়ে বড় কারণ তারা আহমদ মুসাকে ফিরে পেয়েছে। কথা মোতাবেক ভোরের মধ্যে আহমদ মুসা অভিযান থেকে না ফেরায় তার খারাপ কিছু ঘটে যাওয়ার আশঙ্কায় সবাই উদ্বেগাকুল হয়ে পরেছিল। তাদের খুশীর দ্বিতীয় কারণ হলো, তারা প্রথমবারের মত গ্রেট বিয়ারের একটা ঘাটিতে সফল অভিযান চালাতে পেরেছে।

যা আবার হেডকোয়ার্টারও।

বেলা তখন আটটা। প্রেসিডেন্ট ভবনের চত্বরে পৌঁছল আহমদ মুসার গাড়ি।

আহমদ মুসা গাড়ি থেকে নামতেই সেনাবাহিনীর প্রধান সিদ্দিকভ ছুটে এল। আহমদ মুসার পাশে আজমভকে একটা স্যালুট করে আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, 'শুভ সংবাদ স্যার।'

'কি?' আহমদ মুসা ও আজমভ একসাথেই বলে উঠল।

'ওদের একটা সসার প্লেন ধরা পড়েছে।'

'ধরা পড়েছে? কখন?' বলল আহমদ মুসা।

'আজ ভোর সাড়ে চারটায়।'

'প্লেন এর সাথে আর কি পেয়েছি আমরা?'

'তিন জন রুশ ধরা পড়েছে। আর কয়েকটি গ্যাস সিলিন্ডার।'

'আল হামদুলিল্লাহ।' আহমদ মুসা ও আজিমভ দুইজনেই বলে উঠল।

পরে আহমদ মুসা উদগ্রীব কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো, 'সসার প্লেন এর গায়ে, সিলিন্ডারের গায়ে, ইত্যাদিতে আমরা কি এমন কোন চিহ্ন পেয়েছি যা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে ওইগুলো রাশিয়ার?'

'জি, সে রকম প্রমাণ আছে। সবগুলোর গায়ে গ্রেট বিয়ারের মনোগ্রাম আছে, আর আছে সেগুলোর বিস্তারিত নির্মাণ তথ্য। যেমন, কোথায় তৈরী, কবে তৈরী, ব্যবহার শুরু করার তারিখ, ইত্যাদি।'

'রাশিয়ার আকাশ থেকে সসার প্লেনটি মধ্য এশিয়ায় প্রবেশ করছে এ ছবি তোমরা তুলতে পেরেছ?' জিজ্ঞাসা করল আজিমভ।

'এ ধরনের অনেকগুলো ছবি আমাদের হাতে স্যার।'

'ধন্যবাদ সিদ্দিকভ।' বলল আজিমভ।

'সিলিন্ডারের গ্যাসগুলো তোমরা দেখেছ?' আহমদ মুসা বলল।

'আমাদের কেমিকেল এক্সপার্ট প্রাথমিক একটা পরীক্ষা করেছে। তাতে প্রমাণ হয়েছে ওগুলো অত্যন্ত ধীরক্রিয়া সম্পন্ন রেডিয়েশন পয়জন।'

'ধরা পড়া সেই তিন জন লোক কোথায়?'

'সেনা হেড কোয়ার্টারের সিকুরিটি সেলে রাখা হয়েছে।'

আহমদ মুসা আজিমভের দিকে চেয়ে বলল, 'চল লোকগুলোকে দেখা যাক।'

'আমিও তাই মনে করছি।' আজিমভ বলল।

আবার তারা গাড়িতে উঠে বসল। সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল সিদ্দিকভও তাঁর গাড়িতে উঠল।

সেনা হেড কোয়ার্টারে নিরাপত্তা তোড়জোড় আজ সাংঘাতিক রকমের বেশি। আহমদ মুসা ও আজিমভকেও আজ নতুন করে প্রবেশ পাস নেয়ার পর ঢুকতে দেয়া হলো।

খুশি হলো আহমদ মুসা। পাশা-পাশি হাঁটতে হাঁটতে সিদ্দিকভকে বলল, 'তোমার দূর-দৃষ্টির প্রশংসা করছি সিদ্দিকভ। আমরা যে রকম শক্তিশালী ও ভয়ানক শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ছি, তাতে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় এ ধরনের কড়াকড়ি প্রয়োজন।'

‘হ্যাঁ, মুসা ভাই। নিরাপত্তা ব্যবস্থা যত উন্নত হচ্ছে, ষড়যন্ত্রও তত আধুনিকায়ন হচ্ছে। সুতরাং নিরাপত্তা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রতিদিনই আমাদের সামনে এগুতে হবে।’

গল্প করতে করতে তারা সেনা হেড কোয়ার্টারে প্রবেশ করল।

সেনা সদর দফতরে সিকুরিটি প্রধান আবুবকর আলিয়েভ এবং তাঁর সহকারী ওসমান খোদায়েভ সর্বশেষ নিরাপত্তা গেটে দাঁড়িয়েছিল আহমদ মুসাদেরকে খোশ আমদেদ জানানোর জন্যে।

আহমদ মুসা ওদের সাথে হ্যান্ডশেক করল। খোদায়েভের সাথে হ্যান্ডশেক করতে গিয়ে হঠাৎ আহমদ মুসার কপালটা কুঞ্চিত হলো এবং মনেরও কোথায় যেন খচ করে উঠল।

অল্প কিছু এগিয়ে আহমদ মুসা থমকে দাঁড়াল। তাঁর সাথে সাথে দাঁড়াল আজিমভ এবং সিদিকভও।

আহমদ মুসা মাথা নিচু করে ভাবছিল। হঠাৎ মাথা তুলে সিদ্দিকভকে বলল, ওসমান খোদায়েভ সম্পর্কে তোমার মত কি?

‘কোন ব্যাপারে?’

‘বিশ্বস্ততা।’

‘আপনি জানেন, সে আমাদের বিপ্লব সময়ের সাথী। সে একজন ত্যাগী কর্মী। সকল সন্দেহের উর্ধে সে।’ বলল সিদ্দিকভ।

‘আমার সাথে দু’একবার দেখা হয়েছে, কিন্তু ঘনিষ্ঠ কোন আলাপ হয়নি। বলতে পার, তাঁর হাতে ঠিক কব্জির নিচেই কোন ‘উলকি’ আছে?’

না আমাদের মধ্য এশিয়ায় মুসলমানদের মধ্যে উলকির প্রচলন একেবারেই নেই।

আবার চোখ বুজল আহমদ মুসা। পরক্ষণেই সিদ্দিকভের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘এই মুহুর্তে ওসমান খোদায়েভকে গ্রেপ্তার করো।’

‘ওসমান খোদায়েভকে গ্রেপ্তার?’ একই কন্ঠে উচ্চারণ করল আজিমভ এবং সিদ্দিকভ। তাদের চোখ বিস্ময়ে বিস্ফোরিত।

‘হ্যাঁ, সময় নষ্ট কর না।’ আহমদ মুসার কন্ঠে স্থির নির্দেশের সুর।

সঙ্গে সঙ্গেই হুকুম তামিল করল জেনারেল সিদ্দিকভ। ঘুরে দাঁড়াল সে। চলতে শুরু করল সেই নিরাপত্তা গেটের দিকে যেখানে দাঁড়িয়ে খোদায়েভরা আহমদ মুসাদের স্বাগত জানিয়েছিল।

আহমদ মুসা এবং আজিমভও সিদ্দিকভের পেছনে পেছনে চলল।

দেখা গেল সেই গেটে দাঁড়িয়ে সিকুরিটি প্রধান আবুবকর আলীয়েভ একজন অফিসারকে কিছু নির্দেশ দিচ্ছে। ও সময় খোদায়েভ সেখানে নেই।

জেনারেল সিদ্দিকভ এবং আহমদ মুসা ও আজিমভকে গেটের দিকে আসতে দেখে আবুবকর আলীয়েভ অফিসারটিকে বিদায় দিয়ে এল সিদ্দিকভের দিকে। সম্ভবত সিদ্দিকভের মুখের পরিবর্তন দেখে আলীয়েভ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। বলল, 'স্যার, কিছু বলবেন?'

'খোদায়েভ কোথায়?' জিজ্ঞাসা করল সিদ্দিকভ।

'এই মাত্র ভেতরের দিকে গেল, তাকে প্রয়োজন স্যার?'

'চল দেখি কোথায়?' বলে বাম দিকের করিডোর দিয়ে ভেতর দিকে অগ্রসর হলো সিদ্দিকভ।

সাথে চলল আবুবকর আলীয়েভ। তাদের পেছনে আহমদ মুসা এবং আজিমভ।

সেনা সদর দফতর একটি ১১ তলা ভবন। নিচের তলায় সিকুরিটির লোকরা থাকে। ভু-গর্ভে আরও দু'টি তলা আছে। এর প্রথমটি একটা মিনি অস্ত্রাগার। আর সর্বশেষের তলাটি বন্দীখানা, নিরাপত্তা বন্দীদের এখানেই রাখা হয়। এরই একটা ঘরে বন্দী করে রাখা হয়েছে সসার প্লেন থেকে বন্দী করে আনা তিনজন রুশকে। যারা নিঃসন্দেহে গ্রেট বিয়ারের লোক। ডান দিকের যে করিডোরের শেষ প্রান্তে একটা লিফট আছে। সে লিফট দিয়ে নামতে হয় বন্দী খানায়। আর বাম দিকের যে করিডোর দিয়ে সিদ্দিকভ এবং আহমদ মুসারা চলছে তার মধ্যবর্তী স্থানের লিফট দিয়ে মিনি অস্ত্রাগারে নামা যায়।

জেনারেল সিদ্দিকভ ও আলীয়েভ বিভিন্ন ঘর সন্ধান করে সামনে এগুচ্ছিল। করিডোরের একটা ক্রসিং পয়েন্টে এসে আলীয়েভ সেখানে দাঁড়ানো

একজন সিকুরিটিকে জিজ্ঞাসা করল খোদায়েভের কথা। সে মধ্যবর্তী করিডোর দেখিয়ে বলল, 'উনি এদিকে গেছে স্যার।'

সেই করিডোর দিয়ে সামনে এগোল তারা।

এই সময় হঠাৎ ডান দিকে একটা কক্ষ থেকে বের হয়ে এল খোদায়েভ।

কক্ষটি সেনা সদর দফতরের প্রায় মধ্যবর্তী স্থান এবং এ কক্ষই ভু-গর্ভস্থ অস্ত্রাগারে নামার লিফট রুম।

খোদায়েভের একদম মুখোমুখি হয়ে পড়ল আহমদ মুসারা। সিদ্দিকভ ও আলীয়েভ সবার আগে পাশাপাশি যাচ্ছে। তাদের পেছনেই আহমদ মুসা এবং আজিমভ।

এইভাবে মুখমুখি হয়ে পড়ায় খোদায়েভ প্রথমটায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল, তাঁর মুখটা হঠাৎ যেন কালো হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিয়ে স্যালুট দিল।

'খোদায়েভ তোমাকে গ্রেফতার করা হলো। আলীয়েভ খোদায়েভকে গ্রেফতার...'

সিদ্দিকভের কথা শেষ হবার আগেই খোদায়েভ বিদ্যুৎ গতিতে মেশিন রিভলবারটি তুলে নিল তার কোমরের হোলস্টার থেকে। দু'পা পিছিয়ে দুই হাতে রিভলবারটি তুলে ধরল সে। রিভলবারের ট্রিগারে তার শাহাদাত আঙুলটি বসে গেছে।

বিস্ময় বিস্ফোরিত চোখে আবুবকর আলীয়েভ ঝাঁপিয়ে পড়ল খোদায়েভের হাতের ওপর।

গর্জে উঠল খোদায়েভের রিভলবারটি।

গুলিবিদ্ধ আলীয়েভ লুটিয়ে পড়ল করিডোরের ওপর। সেই সাথে খোদায়েভের রিভলবার সমেত হাতটা নিচে নেমে গিয়েছিল আলীয়েভের দেহের ধাক্কায়।

খোদায়েভ তার রিভলবারসহ হাত উপরে তুলছিল। কিন্তু তার হাতটা উঠে আসার আগেই আহমদ মুসার রিভলবার গুলি বর্ষণ করল এবং তা নিখুতভাবে বিদ্ধ করল খোদায়েভের রিভলবার ধরে রাখা ডান হাতের কব্জীকে।

রিভলবার পড়ে গেল খোদায়েভের হাত থেকে। রিভলবার হাত থেকে পড়ে যাবার সঙ্গে সংগেই খোদায়েভ তার বাম হাতের অনামিকা আঙুলের আংটি কামড়ে ধরল। আহমদ মুসা খোদায়েভের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার হাত তার মুখ থেকে কেড়ে নিল। কিন্তু লাভ হলো না। খোদায়েভের দেহ ঝরে পড়ল করিডোরে। মুহূর্তেই প্রাণহীন হয়ে গেল তার দেহ।

খোদায়েভের দেহটি পরীক্ষা করে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'পারলাম না আজিমভ। গ্রেট বিয়ারের আরেকজনকে হাতের মুঠোতে পেয়েও গ্রেপ্তার করা গেল না।'

'খোদায়েভ গ্রেট বিয়ারের লোক?' এক সঙ্গে প্রায় চিৎকার করে উঠল আজিমভ এবং সিদ্দিকভ।

'বলছি সব কথা। তার আগে আলীয়েভকে হাসপাতালে পাঠাও, তার কাধটা গুড়ো হয়ে গেছে গুলিতে। আর খোদায়েভের লাশ হিমাগারে পাঠাও, পরে তার দেহটা পরীক্ষা করতে হবে। আর চল লিফট রুম এবং অস্ত্রাগার পরীক্ষা করি কেন সে এই অসময়ে এখানে এসেছিল।'

সিকুরিটির লোকরা এসে জমা হয়েছিল। তাদের সবার চোখে বিস্ময়। নির্দেশ অনুসারে তারা খোদায়েভের লাশ নিয়ে গেল। স্ট্রেচারে তুলে নিল তারা আলীয়েভের দেহ।

স্ট্রেচারে উঠে আলীয়েভ ক্ষীণ কন্ঠে বলল, 'আহমদ মুসা ভাই গুলিবিদ্ধ হওয়ার কষ্টের চেয়ে মনে কষ্ট পাচ্ছি বেশি খোদায়েভের ব্যাপারটির জন্য। তাকে গ্রেপ্তার করতে চাইলেন কেন, কেন সে রিভলবার বের করল আমাদের মারার জন্যে এবং কেনই বা সে অবশেষে পটাসিয়াম সাইনাইডের আংটি চুষে আত্মহত্যা করল?'

আহমদ মুসারা লিফট রুমের দিকে চলল। সবার আগে আহমদ মুসা।

আজিমভ এবং সিদ্দিকভ তাকে অনুসরণ করছে। দ'জনেরই চোখ-মুখ উদ্বেগে ভরা। সিদ্দিকভ তো একেবারে নির্বাক হয়ে গেছে। তার মনে হচ্ছে যা ঘটল সবই যেন কোন ফিল্মের একটা দৃশ্য। আহমদ মুসা খোদায়েভকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়েছির, তা সে পালন করতে এসেছিল বটে, কিন্তু তার মন তা যেন মেনে

নিতে পারেনি। কিন্তু খোদায়েভের রিভলবার বের করা এবং শেষে তার আত্মহত্যা থেকে সে বুঝতে পারল, আহমদ মুসার সিদ্ধান্ত কত নিখুঁত ছিল। কেমন করে তিনি খোদায়েভকে সন্দেহ করলেন? আহমদ মুসার প্রতি শ্রদ্ধায় তার হৃদয়টা নুয়ে এল। আজিমভের মনেও এই ধরনের ভাবনা। আহমদ মুসার দৃষ্টি, চিন্তা, অনুভূতি কোনটারই তুলনা বোধ হয় কোথাও নেই।

নিরবতা ভাঙল আহমদ মুসা। বলল, 'সিদ্দিকভ, তুমি রিভলবার বের না করে তাকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিবে তা আমি ভাবিনি। আলীয়েভ ঝুঁকি না নিলে আরও বড় কিছু ঘটতে পারতো।'

'দু:খিত মুসা ভাই। আমার ভুলের কারন হলো, আমি ভাবতেই পারিনি, খোদায়েভ এই ক্ষেত্রে রিভলবার বের করতে পারে।' বলল সিদ্দিকভ।

'ভুলটা তোমাদের না, আমার। আমার আগেই বলা উচিত ছিল যে, সে ওসমান খোদায়েভ নয়। গ্রেট বিয়ারের একজনকে প্লাস্টিক সার্জারি করে খোদায়েভ বানিয়ে খোদায়েভের জায়গায় বসানো হয়েছে। আর আসল খোদায়েভ নিহত হয়েছে, অথবা কোথাও বন্দী রয়েছে।'

'কিন্তু এই সাংঘাতিক বিষয়টা এত তাড়াতাড়ি আপনার নজরে পড়ল কি করে?' জিজ্ঞাসা করল সিদ্ধিকভ।

'সে যে দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায়, সে দৃষ্টিকে আমার কাছে খোদায়েভ বলে মনে হয়নি। তার দৃষ্টিতে ছিল প্রথম দেখার মত একটা বিস্ময় এবং আমাকে পরিমাপ করার একটা অনুসন্ধিৎসা। তাছাড়া তোমাদের সেনাবাহিনীর জুতার ফিতা বাঁধার যে বিশেষ ধরণ আছে, তার জুতার ফিতা সে ভাবে বাঁধা ছিল না। সব শেষে তার ডান হাতের কব্জীতে একটা উলকি দেখতে পাই যা মধ্য এশয়ার মুসলিম পরিবারে স্বাভাবিক নয়।'

'কিন্তু আমাদের চোখে তো কিছুই ধরা পড়েনি।'

'মনে হয় সে দু'একদিন হল এসেছে। বলতে পার দু'একদিনের মধ্যে খোদায়েভ কোথাও গিয়েছিল কি না?'

'গিয়েছিল। অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিন দিন তাকে সামরিক হাসপাতালে থাকতে হয়েছে। গতকাল সে যোগদান করেছে।' বলল সিদ্দিকভ।

‘তাহলে মানুষ বদলের কাজ গতকালই হয়েছে। আজিমভ তুমি তোমার লোকদের নির্দেশ দাও, খোদায়েভের হাসপাতালে যাওয়া থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত প্রতিটি মিনিটের এক হিসাব তৈরী করতে, তাহলে বুঝা যাবে কোন সময় দুর্ঘটনাটা ঘটেছে এবং খোদায়েভের সন্ধান পাওয়ারও পথ এর দ্বারা বের হতে পারে।’

‘আচ্ছা! কিন্তু মুসা ভাই হঠাৎ করে তো এটা হয়নি, প্লাস্টিক সার্জারিতে অনেক সময় নেয়।’

‘অবশ্যই অনেক সময়, অনেক প্রস্তুতি লাগে। খোদায়েভের ফটো তারা যোগাড় করেছে, তারপর খোদায়েভের উঠা-বসা, আচার-আচরণ সম্পর্কে যোগাযোগ, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, প্রভৃতি সবকিছুই তারা জানার চেষ্টা করেছে নিখুঁতভাবে। এমনভাবে একজন লোক প্ল্যান্ট করা খুবই কঠিন। এ কাজ যে তারা করেছে, এ থেকে বুঝা যাচ্ছে ওরা সাংঘাতিকভাবে আমাদের পেছনে লেগেছে।’

‘এত কিছু তারা করেছে! আমার মনে হচ্ছে খোদায়েভের কোন আত্মীয়-স্বজনের সাথে তারা একটা সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল।’ বলল আজিমভ।

‘ঠিক বলেছ আজিমভ। তুমি সন্ধান নাও। আর শোন, রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরু দায়িত্বে যারা রয়েছে, তাদের একবার তুমি যাচাই কর। তারা যখন একটা করেছে, তখন দশটাও করতে পারে।’

‘আল হামদুলিল্লাহ। খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা নির্দেশ দিয়েছেন মুসা ভাই। আমি আজই প্রথমত সকলের দৈহিক আইডেনটিফিকেশন চিহ্নগুলো পরীক্ষা করার নির্দেশ দিচ্ছি। তারপর একে একে অন্য সবকিছু।’ আজিমভ বলল।

লিফট রুমের দরজায় দাঁড়িয়ে তারা কথা বলছিল। আজিমভের কথা শেষ হতেই আহমদ মুসা লিফট রুমের দরজা খুলে প্রবেশ করল লিফট রুমে।

লিফটে প্রবেশ করতেই আহমদ মুসার ‘বিস্ফোরক স্পর্শকাতর’ ঘড়ির পরমাণু ডায়ালটি কাঁপতে শুরু করল এবং একটানা একটা সংকেত দিয়ে চলল।

চমকে উঠল আহমদ মুসা।

ততক্ষণে আজিমভ এবং জেনারেল সিদ্দিকভ ঘরে ঢুকেছিল।

আহমদ মুসা শিকারী বাজের মত সতর্ক দৃষ্টিতে ঘরের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করছিল। উদ্বেগে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল তার সারা মুখ।

আজিমভ এবং সিদ্দিকভ আহমদ মুসার দিকে চেয়ে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে মুসা ভাই?'

'এই ঘরে অবশ্যই পরমাণু জাতীয় কোন বিস্ফোরক আছে।'

আঁৎকে উঠল আজিমভ এবং সিদ্দিকভ দু'জনেই। মুহূর্তেই উৎকণ্ঠায় অন্ধকার হয়ে গেল দু'জনের মুখ।

ঘরটাকে নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করল আহমদ মুসা, কিন্তু কোথাও কিছু নেই। লিফট রুমে একটি মাত্র কুশন চেয়ার। সে চেয়ার সরিয়েও দেখা হলো। না কিছু নেই কোথাও।

'কি সন্দেহ করছেন মুসা ভাই?' বলল আজিমভ।

'নকল খোদায়েভ এদিকে এসেছিল, এ কক্ষে এবং সম্ভবত নীচের কক্ষেও গিয়েছিল। আমরা এ বিল্ডিং-এ আসার পর এ দিকে আসা তার বিনা কারণে ছিল না। এখন মনে হচ্ছে সে সাংঘাতিক কিছু করেছে।'

কথা শেষ করে আহমদ মুসা চেয়ারটা হাত দিয়ে উঁচুতে তুলে ধরে উল্টিয়ে ফেলল। উল্টিয়েই চোখ দু'টি ছানা-বড়া হয়ে গেল তার। এমনকি কেঁপে উঠল তার বুক। দেখতে পেল কুশনের তলায় টেপ দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে বর্গাকৃতির একটা বাক্স। প্লাস্টিক কভারে ঢাকা। প্লাস্টিক কভারের এক জায়গায় আয়তাকার একটা স্ক্রীনে জ্বল জ্বল করছে ডিজিটাল টাইম মিটার। সময় তখন সেখানে সাতান্ন সেকেন্ড। চোখের পলক ফেলতেই তা নেমে এল ছাপ্পান্ন সেকেন্ডে।

'পারমাণবিক ডিনামাইটের বিস্ফোরণ ঘটতে আর সময় আছে ৫৬ সেকেন্ড।' চিৎকার করে উঠল আহমদ মুসার কণ্ঠ।

কেঁপে উঠল আজিমভ এবং সিদ্দিকভ দু'জনেই। তারা জানে এই সাইজের একটা পারমাণবিক ডিনামাইটের বিস্ফোরণ ঘটলে শুধু এ বিল্ডিং নয়, আশে-পাশের বিল্ডিংও ধুলো হয়ে যাবে।

টাইম মিটারে সময় জিরো আওয়ারে পৌঁছবার সাথে সাথেই ঘটবে সেই মহা-বিস্ফোরণ। সময়ের কাঁটার সাথে যুক্ত নিউট্রন বুলেট। এক সেকেন্ড করে সময়ের কাটা পিছু হটছে, আর এক সেকেন্ড দূরত্ব এগিয়ে যাচ্ছে নিউট্রন বুলেট ডিনামাইটের স্পশকাতর নার্ভের দিকে। সময়ের কাঁটা জিরো আওয়ারে পৌঁছার সাথে সাথে নিউট্রন বুলেট জিরো দূরত্বে পৌছে যাবে এবং নিউট্রন বুলেটটি চুম্বকের মহাটানে বিদ্ধ করবে ডিনামাইটের নার্ভকে। সংগে সংগেই ঘটবে প্রলয়ংকরী বিস্ফোরণ। এ বিস্ফোরণ ঠেকাবার একমাত্র পথ টাইম মিটারে সময়ের কাটা আটকে দেয়া ইলেকট্রিক ম্যাকানিজম অফ করার মাধ্যমে।

আহমদ মুসা ডিনামাইটের প্লাস্টিক কভার ভালো করে পরীক্ষা করে বুঝল ওপর অংশের প্লাস্টিক কভার খুললে টাইম মিটারের সাথে ডিনামাইটের ইলেকট্রিকের সংযোগ ম্যাকানিজমটা পাওয়া যাবে।

পঞ্চাশ সেকেন্ড নেমে এসেছে তখন সময়।

আহমদ মুসা তার চাকুর তীকষ্ন অগ্রভাগ দিয়ে প্লাস্টিক কভারের স্ক্রু খুলতে খুলতে বলল দ্রুতকণ্ঠে, 'সিদ্দিকভ ইমারজেন্সী সাইরেন বাজিয়ে দাও। যতটা পারা যায় আমাদের সাবধান হওয়া উচিত।'

'মুসা ভাই, আমরা আপনার জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলতে পারিনা। চলুন আমরা বেরিযে যাই, ডিনামাইটটাকেও বিল্ডিং-এর বাইরে ফেলতে পারব।'

কাজের হাতকে বিন্দু মাত্র স্লো না করে আহমদ মুসা বলল, 'এ ডিনামাইটের কার্যকারিতার ক্ষেত্র দেখা যাচ্ছে চারশ বর্গগজ। কতটুকু সরাতে পারবে ডিনামাইটটাকে।'

'না, মুসা ভাই আপনি সরুন, আপনাকে সরতে হবে।' প্রায় আর্তনাদ করে বলে উঠল আজিমভ।

'এই বিল্ডিং-এর প্রায় এক হাজার স্টাফ, আশে-পাশের ভবনে হবে আরও কয়েক'শ- এদের কয়জনকে তুমি সরাতে পারবে আজিমভ?'

'আপনার সাথে তো তাদের তুলনা হয়না।'

'তুলনা হয় না বলেই তো তাদের রেখে আমি সরতে পারি না।'

একটু থেমে আহমদ মুসা বলল, ‘কেন চিন্তা করছ এভাবে আজিমভ? এত অল্পতেই তুমি আল্লাহর সাহায্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পার?’

কোন জবাব দিল না আজিমভ। তবে তার চোখের আতংকটা একটু কমল। দোয়া পড়ল সে, ‘লা-হাওলা ওয়ালা-কুওয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহ।’

দ্রুত লিফট রুমে প্রবেশ করল সিদ্দিকভ। বিপদ ঘন্টা বাজাবার নির্দেশ দিয়ে সে ফিরে এল। তার সাথে দু’জন লোক।

বলল সিদ্দিকভ, ‘দু’জন বিস্ফোরক এক্সপার্টকে এনেছি মুসা ভাই’

‘ওদের জিজ্ঞাসা কর এ ধরনের নিউক্লিয়ার ডিনামাইটকে ডিফিউজ করার সবচেয়ে সহজ পথ কি?’

‘টাইম মিটারকে ডিনামাইট থেকে বিচ্ছিন্ন করা।’ এক্সপার্টদের একজন বলল।

ডিনামাইটের ওপরের অংশের প্লাষ্টিক কভার খুলে ফেলা হয়ে গেল আহমদ মুসার। টাইম মিটারে সময় তখন ত্রিশ সেকেন্ড।

ভেতরটা দেখে স্তম্ভিত হলো আহমদ মুসা। ডিনামাইটটা দেখা যাচ্ছে বিশেষ ডিজাইনে তৈরী। মুল ডিনামাইটের সাথে টাইম মিটারের সংযোগ একটা, দুইটা তারের মাধ্যমে নন। একগুচ্ছ সূক্ষ্ম তার টাইম মিটার ও ডিনামাইটকে সংযুক্ত করেছে। তারগুলোর দুই প্রাপ্ত দুই পাশের (টাইম মিটার ও ডিনামাইটের) কোর্ডে ঢুকানো। অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেকটি তারের রং ভিন্ন ভিন্ন। আহমদ মুসার বুঝতে বাঁকি রইল না ক্যামোফ্রেজ সৃষ্টির জন্যেই এ তারের বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে। এই গুচ্ছের একটি তার আছে যা টাইম মিটার ও ডিনামাইটের নিউট্রন বুলেটকে সংযুক্ত করেছে। সেই তারটিই তাদের প্রয়োজন।

কপাল থেকে দুই গন্ড বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে আহমদ মুসার। এক গুচ্ছ তারের ক্যামোফ্রেজের কাছে নিজেকে বড় অসহায় বোধ করল সে। হৃদয়ে তার উচ্চারিত হলো- ‘লা-হাওলা ওয়ালা-কুওয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহ।’

চিন্তায় অনেকটা সময় চলে গেল। সময় বাকি তখন মাত্র পনর সেকেন্ড। কারও মুখে কোন কথা নেই নিঃশ্বাসও যেন পড়ছে না কারও। অনেক তারের

ক্যামোফ্রেজ দেখে বিস্ফোরক এক্সপার্টদের মাথাও ঘুরে গেল। তারা ভাবতেই পারল না আসল তারটা এর থেকে বের করা যাবে কিভাবে!

‘কেটে ফেলুন সব তার।’ বলল আজিমভ।

‘এতে আগাম বিষ্ফোরণ ঘটার ঝুকি শতকরা নব্বই ভাগ স্যার।’ বলল একজন এক্সপার্ট।

দোয়াটা পড়া শেষ করে তারের ওপর চোখ বুলাতেই আহমদ মুসার মনে একটা প্রশ্ন জেগে উঠল, ‘মৃত্যুর প্রতীক কি?’ মন থেকেই উত্তর এল, ‘সাদা।’

পাওয়ার আনন্দে দেহটা যেন শিউরে উঠল আহমদ মুসার। সময় তখন ৮ সেকেন্ড।

‘বিসমিল্লাহ’ বলে আহমদ মুসা তারের গুচ্ছ থেকে সাতা তারটা পৃথক করে দিল এবং ডিনামাইটের দিকের প্রান্তটা আস্তে খুলে দিল।

সংগে সংগেই থেমে গেল টাইম মিটার। পাঁচ সেকেন্ডের সময় সংকেতটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল টাইম মিটার-স্ক্রীনে।

আজিমভ এবং সিদ্দিকভ সংগে সংগে সিজদায় পড়ে গেল। দুই হাত উপরে উঠল আহমদ মুসার। এবার তার দু’গন্ড বেয়ে নেমে এল ঘামের বদলে অশ্রু।

বিপদমুক্তির ঘন্টা বেজে উঠল সেনা বন্দর দপ্তরে। মাত্র চারটি লিফট দিয়ে এ পর্যন্ত শতখানিক লোক বেরুতে পেরেছিল।

সবার মুখে হাসি ফুটল। যারা বের হয়েছিল তারা ফিরে এল।

সবাই লিফট রুম থেকে বেরুল।

একজন বিস্ফোরক এক্সপার্টের হাতে ডিনামাইটটা।

করিডোর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একজন বিস্ফোরক এক্সপার্ট সবিনয়ে আহমদ মুসাকে জিজ্ঞাসা করল, ‘স্যার ঠিক তারটি আপনি কিভাবে নির্দিষ্ট করলেন?’

‘আমাদেরও এই একই প্রশ্ন।’ একই সাথে উচ্চারণ করল আজিমভ এবং সিদ্দিকভ।

‘আল্লাহর এ এক অসীম দয়া। আমার মনে উদয় হয়েছিল, সাদা মৃত্যুর প্রতীক আর ডিনামাইটও মৃত্যুর প্রতীক। তাই সাদা তারটিই আমি বেছে নিয়েছিলাম।’

‘আল হামদুলিল্লাহ।’ আজিমভ এবং সিদ্দিকভ দু’জনেই উচ্চারণ করল।

হাঁটতে হাঁটতে সিদ্দিকভ বলল আহমদ মুসাকে, ‘আপনারা তো এখন প্রেসিডেন্ট ভবনে যাবেন মুসা ভাই?’

‘কেন তোমার অফিসে নেবে না?’

‘বলতে সাহস পাচ্ছি না।’

‘বলতে হবে না, আমরা দু’জায়গার কোথাও যাব না। আমাদের আসল কাজই তো হয়নি। আমরা এসেছিলাম সসার প্লেনের সেই তিনজন রুশের সাথে কথা বলতে। ওটা খুব জরুরী। ওখানে যাব। চল আজিমভ।’

সবশেষ নিরাপত্তা গেট থেকে ডান দিকে যে করিডোর গেছে তার প্রান্তের লিফটা দিয়ে নামতে হয় ভূ-গর্ভস্থ সিকুরিটি প্রিজনারস সেলে।

আহমদ মুসা, আজিমভ এবং সিদ্দিকভ তিনজনেই সেই করিডোর দিয়ে হাঁটতে শুরু করল সেই লিফটের দিকে।

লিফট দিয়ে তারা নামল ভূ-গর্ভস্থ কক্ষের সর্বশেষ তলায়।

ভূ-গর্ভস্থ তলার প্রবেশ পথেই এসে থামে লিফট। কিন্তু লিফটের দরজা খুললেই ভূ-গর্ভস্থ তলায় প্রবেশের দরজা খুলে যায় না। লিফটের দরজা খুলে গেলে প্রবেশ পথের দরজা সামনে এসে যায়। দরজা থাকে তালাবদ্ধ। দরজা খুলে প্রবেশ করতে হয় বন্দী খানায়।

লিফটের দরজা খুলে গেলে বন্দী খানায় প্রবেশের দরজার মুখোমুখি দাঁড়াল আহমদ মুসারা।

জেনারেল সিদ্দিকভ পকেট থেকে চাবি বের করে দু’ধাপ এগিয়ে কি হোসে ঢুকিয়ে দিল চাবি। চাবি ঘুরিয়েই চোখ ছানা-বড়া করে পেছনে তাকাল। বলল, ‘তালা খোলা।’

‘তালা খোলা? তাহলে এ তিনজনকেও আমরা হারালাম সিদ্দিকভ!’ হতাশ কন্ঠে বলল আহমদ মুসা।

‘কি বলছেন মুসা ভাই?’

‘হ্যাঁ সিদ্দিকভ। নকল খোদায়েভ নিশ্চয় এখানে এসেছিল। হয় ওদের সে পালিয়ে যেতে দিয়েছে, নয়তো হত্যা করেছে।’

সিদ্দিকভ বিহব্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আহমদ মুসার দিকে। আহমদ মুসার কথা সত্য হলে তাদের অত্যন্ত মূল্যবান তিনজন বন্দীকে তারা হারাল।

আজিমভ এগিয়ে গিয়ে হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলল।

চোখের সামনে উন্মুক্ত হলো বন্দী খানার প্রথম কক্ষটি। মেঝের ওপর এলো মেলো পড়ে থাকতে দেখা গেল তিনটি দেহ। রক্তে ভাসছে দেহ তিনটি। গুলি করে মারা হয়েছে ওদের।

আহমদ মুসা এগিয়ে গিয়ে একটি দেহে হাত রাখল। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, ‘এদের এখানে কটায় ঢুকিয়েছ তোমরা?’

‘সকাল সাতটায়।’ বলল জেনারেল সিদ্দিকভ।

‘তাহলে তোমরা এদের রেখে চলে যাবার পর পরই এদের হত্যা করা হয়েছে।’

‘এ কাজ তো নকল খোদায়েভের।’

‘হ্যাঁ। তুমি হেডকোয়ার্টার থেকে কটায় গেছ?’

‘সোয়া সাতটার দিকে।’

‘তখন নকল খোদায়েভ কোথায় ছিল।’

‘হেড কোয়ার্টারেই দেখে গেছি।’

আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, ‘চল এখানে আর কোন কাজ নেই।’

বলে লিফটে ফিরে এল আহমদ মুসা। তার সাথে সাথে আজিমভ এবং সিদ্দিকভও।

ভূ-গর্ভ বন্দীখানা থেকে উঠে এসে বেরিয়ে আসার জন্যে করিডোর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আহমদ মুসা বলল, ‘আজিমভ তুমি নকল খোদায়েভসহ ওদের চারজনের পোষ্টমর্টেমের ব্যবস্থা কর। নকল খোদায়েভের রিভলবারে দেখবে চারটি বুলেট কম আছে। তার তিনটি পাবে তিন বন্দীর দেহে, আর একটি

আবুবকর আলীয়েভের কাঁধে। পিস্তল ও বুলেটের নাম্বার, তৈরী হওয়ার স্থান সহ একটা রিপোর্ট তৈরী কর। এগুলো সবই পত্রিকায় প্রকাশ করতে হবে।'

'তাহলে হৈ চৈ পড়ে যাবে না?' বলল আজিমভ

'উপায় নেই। আজিমভ, নকল খোদায়েভের ষ্টোরিসহ ওদের নিহত হওয়ার খবর যদি পত্রিকায় না দেই, তাহলে যদি রাশিয়া ওরা কোথায় তা জানার দাবী করে বসে?'

'জানবে কি করে?'

'তোমরা সসার প্লেন আটক করেছ মানে ওদেরও গ্রেফতার করেছ।'

'আমরা তো বলিনি যে, আমরা ওদের সসার প্লেন ধরেছি।'

'বলনি, কিন্তু আজ বলতে হবে।'

'কেন?'

'না বললে যে কারণে আমরা ধরেছি, সেই উদ্দেশ্যটাই তো হাসিল হবে না। আমরা গোটা দুনিয়াকে জানিয়ে দিতে চাই রাশিয়ার গ্রেট বিয়ারের ষড়যন্ত্রের কথা। আমরা সসার প্লেনের এবং গ্যাস কনটেইনারের ছবি পত্রিকায় দিয়ে বিশ্ববাসীকে জানাতে চাই কি করে তারা এই সসার প্লেনে করে মধ্য এশিয়ায় ঢুকে আমাদের শস্যক্ষেত ও পশু সম্পদ ধ্বংস করছে। এর সাথে আন্তর্জাতিক ল্যাবরেটরী থেকে পরীক্ষা করে আনা জীবন বিধ্বংসী গ্যাসের বিবরণও থাকবে।'

'মহা হৈ চৈ পড়ে যাবে দুনিয়ায়। এ সসার প্লেন এবং গ্যাস দু'টই নতুন একটা বিষয় হবে শুধু সাধারণ মানুষের জন্যে নয়, বিজ্ঞানীদের জন্যেও।'

'যত হৈ চৈ হয়, ততই আমাদের লাভ। রাশিয়ার ওপর প্রচন্ড চাপ না পড়লে গ্রেট বিয়ারের ষড়যন্ত্র বন্ধ হবে না।'

'শুধু চাপ নয়, মানবতা ও পরিবেশের বিরুদ্ধে এই ধ্বংসাত্মক ষড়যন্ত্র করার কারণে গ্রেট বিয়ার এবং তার সাথে রাশিয়াকেও দোষী সাব্যস্ত করা হবে।'

'সেটাই তো আমাদের লক্ষ্য। ঐ ধরণের শক্তিশালী চাপ না হলে রাশিয়া এগিয়ে যাবে না এবং গ্রেট বিয়ারের তৎপরতা বন্ধ হবে না।'

'কিন্তু আজকে প্রকাশ উপযোগী করে সব কিছু ঠিক করা যাবে না মুসা ভাই।'

'ঠিক আছে আজ না হলে কাল হবে। তুমি কুতায়বার সাথে আলোচনা করে একটা সাংবাদিক সম্মেলন ডাক। সেখানেই সব ব্যাপার প্রকাশ করে দেয়া হবে।'

'চলুন, আপনিও প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করবেন।'

জেনারেল সিদ্দিকভের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আজিমভ ও আহমদ মুসা এসে গাড়িতে চড়ল।

ছুটে চলল গাড়ি প্রেসিডেন্ট ভবনের উদ্দেশ্যে।

প্রেসিডেন্ট ভবনের চত্তরে এসে গাড়ি থেকে নামল আহমদ মুসা।

প্রেসিডেন্ট কর্ণেল কুতায়বা দাঁড়িয়েছিল প্রেসিডেন্ট ভবনের গেটে। আহমদ মুসাকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে কুতায়বা নেমে এল চত্তরে। এসে জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে। বলল, 'রাত থেকে এ পর্যন্ত যা ঘটেছে সব শুনেছি মুসা ভাই। আজ আমাদের এক বিরাট বিজয় এবং বিপদ মুক্তির দিন। আর এ বিজয়ের নায়ক হিসাবে আল্লাহ আপনাকে পাঠিয়েছেন।'

'বিজয় এখনও আসেনি কুতায়বা এবং বিপদ এখনও সামনে। গ্রেট বিয়ার এখন হবে ক্ষ্যাপা কুকুরের মত। অথচ তাদের প্রতিরোধের জন্যে যা আমাদের জানা প্রয়োজন তা আমরা পাচ্ছি না।' বলল আহমদ মুসা।

'কেন ওদের পরিকল্পনা এবং কিছু টেলিফোন নাম্বার তো পেয়েছেন।'

'পরিকল্পনাটা ওদের ষড়যন্ত্র জানার জন্যে ভাল ডকুমেন্ট, কিন্তু এ দিয়ে ওদের গায়ে হাত দেবার কোন পথ হচ্ছে না। আর টেলিফোন নাম্বার দিয়ে কি ফল হবে আমি এখনও বলতে পারছি না, গ্রেট বিয়ার সত্যি একটা সাংঘাতিক দল। ওদের উদ্দেশ্য সাধনে অন্তত আন্তরিক ওরা। 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন'-এর জীবন্ত প্রতিমূর্তি ওরা। ওদের অনেককেই হাতে পাওয়া গেছে, কিন্তু এ পর্যন্ত কাউকেই বন্দী করা যায়নি।'

'কেন সসার প্লেন থেকে তিনজনকে তো বন্দী করা হয়েছিল।'

'ঠিক। কিন্তু ওরা গ্রেট বিয়ারের যোদ্ধা বাহিনীর সদস্য ছিল না। ওরা ছিল টেকনিশিয়ান।'

'কেমন করে বুঝলেন?'

‘ওদের গায়ে গ্রেট বিয়ারের যুদ্ধ-পোশাক ছিল না। গ্রেট বিয়ারের কেউ যখনই কোন অপারেশনে বের হয় তখন তাদের গায়ে যে পোশাকই থাক, তাতে আঁকা থাকবে ভল্লুকের মুখ। সবচেয়ে বড় কথা হলো ওদের হাতে পটাশিয়াম সায়ানাইডের আংটি দেখিনি, যা গ্রেট বিয়ারের সবার হাতে থাকে।’

আহমদ মুসার কথা শুনে প্রেসিডেন্ট কুতায়বার চোখে চিন্তার একটা ছায়া ফুটে উঠল।

আহমদ মুসা তার পিঠ চাপড়ে বলল, ‘প্রেসিডেন্টকে এত তাড়াতাড়ি মুখ কালো করলে চলবে কেন কুতায়বা! যে কোন বিপদে তোমাকে হাসতে হবে। তোমার এ হাসি মানুষকে শক্তি যোগাবে।’

‘মুসা ভাই আপনি জোর করে আমাকে এ আসনে বসিয়েছেন।’

‘ইসলামে নেতৃত্ব এভাবে চাপিয়েই দেয়া হয়। দেখ নির্বাচনেও জনগণ তোমাকে ভোট দিয়েছে। আমাকে দোষ দিতে পারো না।’

‘চলুন মুসা ভাই। আপনার ওপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে। আপনার জন্য নাস্তা রেডি। তারপর আপনাকে লম্বা বিশ্রাম নিতে হবে।’ বলল প্রেসিডেন্ট কুতায়বা।

‘চল’ বলে আহমদ মুসা হাঁটতে হাঁটতে আজিমভের দিকে ফিরে বলল, ‘আজিমভ নাস্তার পরেই এ টেলিফোন নাম্বারগুলো নিয়ে কাজ শুরু করতে হবে। এখন দশটা। সব জায়গায় খবর পৌঁছার আগে হানা দিতে না পারলে কোনই লাভ হবে না।’

‘মুসা ভাই, বিশ্রাম নেবার অনুরোধের বুঝি জবাব এটা?’ বলল প্রেসিডেন্ট কুতায়বা।

‘যুদ্ধক্ষেত্রে কি কোন বিশ্রাম আছে কুতায়বা! এমনও দৃষ্টান্ত আছে, তিনদিন ধরে যুদ্ধ চলছে। মুসলিম সৈনিকরা দাঁড়িয়েই শুকনো খাবার খেয়েছে, নামাজ পড়েছে। তাদের মত অত বড় বিপদ আল্লাহ আমাদের দেননি। এর পরও কাজের সময় আমরা যদি বিশ্রামের সন্ধান করি, তাহলে আল্লাহর কাছে জবাব দেয়ার কিছু কি থাকবে?’ বলতে বলতে কন্ঠ ভারী হয়ে এল আহমদ মুসার।

‘ঠিক বলেছেন। তবে সুযোগ থাকলে ক্লান্ত শরীরের দাবী অবশ্যই পূরণ করা উচিত। আল্লাহর রাসূল (সঃ) ও বিশ্রামের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এশার নামাজের পর কাজ, এমনকি কথা বলাকেও নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।’

‘ঠিক আছে কুতায়বা, তোমার পরামর্শের দিকে নজর দেব। আল্লাহর রাসূলের এ সিস্টেম কল্যাণের জন্যই। যদি আমরা পালন করতে পারতাম!’

আর কেউ কথা বলল না।

সবাই পাশাপাশি ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলল প্রেসিডেন্ট ভবনের ভেতরে।

আহমদ মুসা গ্রেট বিয়ারের তাসখন্দ ঘাঁটি থেকে যে টেলিফোন নাম্বারগুলো সংগ্রহ করেছিল, তার প্রত্যেকটি ঠিকানায় ঐ দিন বেলা ১২ টার মধ্যে অভিযান চালানো হলো। বিস্ময়ের ব্যাপার, একই খবর এল সব জায়গা থেকে। খবরটা হলো, ঠিকানায় গিয়ে ধ্বংসস্তুপ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি। আশে-পাশের লোকরা বলেছে, সকাল সাতটার দিকে বিরাট বিস্ফোরণ ঘটে, মানুষ ছুটে গিয়ে ইট-কনক্রিটের খন্ড-বিখন্ড টুকরা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায়নি। সব জায়গায় একই সময়ে এই বিস্ফোরণ ঘটেছে।

এই ঘটনা স্তম্ভিত করল আহমদ মুসা সহ সবাইকে। সবাই স্বীকার করল, গ্রেট বিয়ারের যোগাযোগের নেটওয়ার্ক অত্যন্ত শক্তিশালী ও উন্নত। আর দায়িত্ব পালনে তাদের লোকরা একদম অংকের মতই এ্যাকিউরেট।

গ্রেট বিয়ার সম্পর্কে আবার অন্ধকারে পড়ে গেল আহমদ মুসা। যে আলোর সন্ধানে আহমদ মুসা তাসখন্দে এসেছিল এবং গ্রেট বিয়ারের হেড কোয়ার্টারের সন্ধান করছিল, সে আলো আহমদ মুসা পায়নি। লাভের মধ্যে একটাই হয়েছে যে, তাদের পরিকল্পনা পাওয়া গেছে।

একমাত্র সম্বল গ্রেট বিয়ারের পরিকল্পনা নিয়ে সামনে এগুতে চেষ্টা করল আহমদ মুসা। পরিকল্পনা অনুসারে যা গ্রেট বিয়ার করতে চায় এবং যা ওরা

করেছে তার একটা হিসাব কষে আহমদ মুসা দেখল, বুকিনুর মহাশূণ্য উৎক্ষেপণ কেন্দ্রের শীর্ষ বিজ্ঞানী নূরভ বর্তমান অবস্থায় তাদের প্রথম টার্গেট। বিজ্ঞানী নূরভকে সার্বক্ষিণিক পাহারা দেয়ার এবং তাকে চোখে চোখে রাখার হুকুম দিয়েছিল আহমদ মুসা। কিন্তু এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেও ওদের ষড়যন্ত্র রোধ করা যায়নি। একদিন মহাশূণ্য কেন্দ্রের উৎক্ষেপণ পরিদর্শন শেষে মহাশূণ্য কেন্দ্র সংলগ্ন বাসায় ফেরার পথে একটি দশটনি ট্রাক তার গাড়ি এবং তাকে অনুসরণকারী নিরাপত্তা কর্মীদের গাড়ি একেবারে স্যান্ডউইচ বানিয়ে দিয়ে যায়। বিজ্ঞানী নূরভ ও তার ড্রাইভারের সংগে সংগেই মৃত্যু ঘটে এবং মারাত্মকভাবে আহত নিরাপত্তা অফিসার তিনজন মারা যায় হাসপাতালে। গ্রেট বিয়ারের পরিকল্পনায় বুকিনুরের বিজ্ঞানী নূরভের নামের পরেই ছিল তাজিকিস্তানের বখশ নদীর রুগুন জল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম।

বিজ্ঞানী নূরভ নিহত হওয়ার খবর পাওয়ার পর আহমদ মুসা সেদিন বিষন্ন মনে রুগুন জল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নিয়ে কি করা যায় ভাবছিল। সেই সময় ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকল আজিমভ।

সালাম আজিমভ। সালাম নিয়ে আহমদ মুসা জিজ্ঞাসা করল, ‘কোন খবর আছে না কি, এত ব্যস্ত দেখছি তোমাকে?’

‘হ্যাঁ, খবর আছে। আমাদের গোয়েন্দা সদর দফরে আজ একটা টেলিফোন এসেছিল।’

‘কে টেলিফোন করেছিল?’

‘একজন মহিলা!’

‘কি বলেছিলো?’

‘বখশ নদীর রুগুন জল বিদ্যুৎ কেন্দ্র আগামী ২১ তারিখে ধ্বংস করা হবে।’

‘২১ তারিখে ধ্বংস করা হবে? মেয়েটি কে?’

‘পরিচয় দেয়নি। বলেই টেলিফোন রেখে দিয়েছে।’

আহমদ মুসা একটুক্ষণ চিন্তা করল। তারপর বলল, ‘সে যেই হোক, খবর ঠিকই দিয়েছে। তারিখ ঠিক কিনা বলতে পারবো না।’

‘মেয়েটি কে? কেন আমাদের খবরটা জানাল? পথভ্রষ্ট করার জন্যেও তো হতে পারে!’

‘তা হতে পারে। কিন্তু তা হয়নি। গ্রেট বিয়ারকে যতদূর জেনেছি, তারা এ কাজ করবে না। কারণ এ কাজ করার তাদের প্রয়োজন দেখি না। আমরা যদি কোন তারিখ জানতাম, তাহলে আমাদের বিভ্রান্ত করার জন্যে এ তারিখ তারা দিতে পারতো। তাছাড়া আমরা যদি তাদের কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারতাম, তাহলে হয়তো আমাদের দৃষ্টি একটি দিনের দিকে নিবদ্ধ রেখে অন্য কোন দিনে তাদের ষড়যন্ত্র কার্যকর করতে তারা চেষ্টা করতো। কিন্তু ঘটনা তা নয়।’

‘তাহলে মুসা ভাই টেলিফোন কি আমাদের সঠিক সংবাদ দিয়েছে?’

‘আমি নিশ্চিত আজিমভ।’

‘আমার বিস্ময় লাগছে মুসা ভাই, কে, কেন টেলিফোন করল? নিশ্চয় গ্রেট বিয়ারের কেউ নয়!’

‘আমার উপলব্ধি যদি মিথ্যা না হয় তাহলে আমি বলব টেলিফোনের সে কণ্ঠটা তাতিয়ানার।’

‘তাতিয়ানার?’

‘কেন বিস্মিত হচ্ছ?’

‘বিস্মিতই বটে। সেদিন যে সহযোগিতা সে করেছে সেটা ছিল আপনাকে বাঁচানোর জন্য। কাজটা গ্রেট বিয়ারের বিপক্ষে গেছে, কিন্তু তাতিয়ানা গ্রেট বিয়ারের বিরোধী হিসাবে সে কাজটা করেনি।’

‘ঠিক বলেছ আজিমভ। তবু বলছি টেলিফোনটা তাতিয়ানারই হবে।’

‘এখন আমাদের কি করণীয় মুসা ভাই ?’

‘আজ উনিশ তারিখ, চল আজিমভ জল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে যাই।’

‘খুব ভালো হয় মুসা ভাই। দূর থেকে নির্দেশ দিয়ে কোন কাজ হবে না।’

‘আজই যাবার ব্যবস্থা কর আজিমভ।’

সালাম জানিয়ে আজিমভ চলে যাচ্ছিল। আহমদ মুসা তাকে ডেকে বলল, ‘যাওয়ার কি ব্যবস্থা করবে বলে ভাবছ?’

‘হেলিকপ্টার। একদম গিয়ে রুগুন জল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে নামা যাবে না হেলিকপ্টার?’

‘হেলিকপ্টার নিয়ে ওখানে নামার অর্থ সবাইকে জানিয়ে দেয়া যে রাজধানী থেকে বড় কেউ রুগুনে এল। আমরা কিংবা বড় কেউ রাজধানী থেকে রুগুনে যাচ্ছে একথা আমরা শত্রুদের জানতে দিতে চাই না।’

‘এ দিকটা চিন্তা করিনি মুসা ভাই। আপনাকে ধন্যবাদ।’

একটু থামল আজিমভ। তারপর বলল, ‘তাহলে কোন পথটা আমাদের জন্যে ভালো হবে মুসা ভাই?’

‘কার নিতে পার, জীপও নিতে পার।’

‘ঠিক আছে।’ বলে আজিমভ বেরিয়ে গেল।

সন্ধ্যার পরপরই আহমদ মুসা ও আজিমভ রুগুন জল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে পৌছল ।

রুগুনে জল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ঘিরে গড়ে উঠেছে একটা ছোট জনপদ । রুগুনে মাত্র একটা আবাসিক হোটেল এবং একটি সরকারী রেস্ট হাউজ। আবাসিক হোটেলটি প্রায় সব সময় পর্যটকে ঠাসা থাকে । সরকারী লোক ও রাষ্ট্রীয় মেহমান কেউ এলে তারা উঠে সরকারী রেস্ট হাউজ।

কিন্তু আহমদ মুসারা গিয়ে উঠল রুগুন জল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অফিস ও আবাসিক এলাকার ভেতরে জল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিজস্ব গেস্ট হাউজে।

আহমদ মুসাদের অভ্যর্থনা জানাল জল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রশাসক চীফ ইঞ্জিনিয়ার আলী ইব্রাহিমভ এবং চীফ সিকুরিটি অফিসার আবু জাফরভ।

ওরা সকলে গিয়ে বসল গেস্ট হাউজের ড্রইং রুমে।

আহমদ মুসা জল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রশাসক চীফ ইঞ্জিনিয়ার আলী ইব্রাহিমভ এবং চীফ সিকুরিটি অফিসার আবু জাফরভের দিকে চেয়ে বলল, ‘খুশী হলাম, আপনাদের দু’জনকেই এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন।’

আলী ইব্রাহিমভ এবং আবু জাফরভ দু’জনেই উঠে দাঁড়াল। দু’জনেই বলে উঠল এক সাথে, ‘জনাব আমাদের কে আপনি বলে সম্বোধন করলে খুব দুঃখ পাব, আমরা আপনার কর্মী । তাছাড়া ......’

আলী ইব্রাহিমভ বয়সে আহমদ মুসার চেয়ে বড় কিন্তু সাইমুমের কর্মী সে। কাজাখ অঞ্চলে সে কাজ করতো। তাঁকে আহমদ মুসা এর আগে দেখেনি। আর আবু জাফরভের নাম শুনেনি আহমদ মুসা। বয়সে আহমদ মুসার মতই।

'তাছাড়া কি?' ওদেরকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বলল আহমদ মুসা ।

'আমি শাহীন সুরাইয়ার স্বামী আর আবু জাফরভ বিয়ে করেছে ফায়জাভাকে।' বলল ইব্রাহিমভ ।

'কোন শাহিন সুরাইয়া, কোন ফায়জাভা?' এই প্রশ্ন আহমদ মুসার মুখ থেকে যেন ঝড়ের মত বেরিয়ে এল। আহমদ মুসা সোজা হয়ে বসেছে সোফায়। তার দুই চোখে বিস্ময় ও বেদনার উজ্জ্বল্য।

ওরা উত্তর দেবার আগে আহমদ মুসাই আবার কথা বলল, 'তুঘরীল তুগানের মেয়ে ফায়জাভা আর শাহীন সুরাইয়া রশীদভের বোন?'

পশ্চিম উজবেকিস্তানের বিখ্যাত সারাকায়া গ্রামের রশিদভ পশ্চিম উজেবেকিস্তানের প্রথম শহীদ। সে ছিল বিপ্লবেরএকটা স্ফুলিংগ, যে স্ফুলিংগের সমাহার পুড়িয়ে ছারখার করেছিল মধ্যে এশিয়ার কম্যুনিস্ট শাসনকে। আর তুঘরীল তুগান ঐ সারাকায়া অঞ্চলের একজন বিখ্যাত কম্যুনিস্ট কর্মকর্তা। রশিদভরা তার চোখ খুলে দেয় এবং বিদ্রোহী হিসাবে তুঘরীল তুগান কম্যুনিস্ট সরকারের হাতে শাহাদাত বরণ করে। এইভাবে ফায়জাভা হারায় তার পিতা-মাতা, বাড়ি-ঘর। পরে জীবন সাথী হিসাবে বেছে নেয় রশিদভকে। আর রশিদভের বোন শাহীন সুরাইয়া কম্যুনিস্ট সরকারের একজন গোয়েন্দা অফিসার এবং সাইমুমের কর্মী।

'জি, হ্যাঁ।' আহমদ মুসার প্রশ্নের জবাবে আলী ইব্রাহিমভ, আবু আজিমভ এক সাথে বলে উঠল।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়ে ওদের দু'জনকে এক সাথে জড়িয়ে ধরল। বলল, 'ওঁরা দুই মহান শহীদের স্মৃতি চিহ্ন। কোটি জনতার ভীড় থেকে ওদের এইভাবে আবার সন্ধান পাব ভাবিনি, তোমাদের খোশ আমদেদ জানাচ্ছি।'

আহমদ মুসা তার আসনে ফিরে এল। তার চোখের দুই কোণায় দুই ফোটা অশ্রু । কে জানে এই অশ্রু আনন্দের না বেদনার।

'ওরা কেমন আছে?' ইব্রাহিমভ ও জাফরভের দিখে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

আনন্দ ও আবেগের আতিশয্যে অশ্রু গড়াচ্ছিল ইব্রাহিমভ ও জাফরভের চোখ দিয়ে।

'ভালো আছে। ওরা এখানে এসেছে মুসা ভাই।'

'কোথায়?'

'পাশের রুমে। আপনি আসছেন শোনার পর ওদের বাধা দিয়ে আর রাখা যায়নি।'

ড্রইংরুমের পাশেই আরেকটা রুম। ওটা মেয়েদের ড্রইংরুম। মাঝখানের দরজায় ঝুলছে একটা পর্দা।

পর্দার ওপারেই দাঁড়িয়েছিল শাহীন সুরাইয়া এবং ফায়জাভা। আনন্দে–বেদনায় তাদেরও গন্ড ভেসে যাচ্ছে অশ্রুতে। অতীত যেন তাদের সামনে জীবন্ত রূপ নিয়ে হাজির । রক্তে গোসল করা শহীদ রশিদভ ও তুঘরীল তুগানদের তারা দেখতে পাচ্ছে যেন সামনে দুই চোখ দিয়ে।

চোখ মুছে সামলে নিয়ে শাহীন সুরাইয়া আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, 'আপনি আমার এবং ফায়জাভার সালাম নিন।'

সালাম গ্রহণ করে আহমদ মুসা বলল, 'খুশী হলাম বোন তোমাদের সন্ধান পেয়ে, তোমাদের সব খবর জেনে।'

'ভাবী মেইলিগুলির মর্মান্তিক খবর আমাদের সকলকে কাঁদিয়েছে। আল হামদুলিল্লাহ, আল্লাহ্ আপনাকে ধৈর্য ধারণের তৌফিক দিয়েছেন।' বলল শাহীন সুরাইয়াই।

'শুকরিয়া বোন। তুমি এখন কি করছ?'

'তাজিকিস্তানের প্রাদেশিক মহিলা গোয়েন্দা ইউনিটে আছি।'

'কোন দায়িত্বে আছ?'

'ডাইরেক্টর অপারেশন।' জবাব দিল গোয়েন্দা চীফ আজিমভ ।

'খুশী হলাম। ফায়জাভা, সারাকায়ায় তুমি যাও? সব ফেরত পেয়েছ নিশ্চয়।'

‘জি পেয়েছি। কিন্তু আমি কোন দিন সারাকায়ায় যাইনি। ভয় করে আমার অতীতের মুখামুখি ......’

কান্নায় কথা বন্ধ হয়ে গেল ফায়জাভার।

আহমদ মুসাও হঠাৎ কোন কথা বলতে পারল না। কি বলবে ভেবে পেল না।

ওদিকে দু’হাতে মুখ গুঁজে কাঁদছিল ফায়জাভা। তার মাথায় হাত বুলাচ্ছিল শাহীন সুরাইয়া।

‘কেঁদ না বোন। তুঘরীল তুগান ও রশিদভদের রক্ত আর তোমার আর সুরাইয়ার মত শত মেয়ে, শত বোন, শত স্ত্রী ও শত মায়ের অশ্রু দিয়েই তো গড়া আজকের স্বাধীন মুসলিম আবাসভূমি মধ্যে এশিয়া মুসলিম প্রজাতন্ত্র। সতরাং আর কান্না নয়।’

এই সময় ড্রইংরুমে প্রবেশ করল গেস্ট হাউজের ইনচার্জ আমিনর। বলল, ‘টেবিলে নাস্তা রেডি জনাব।’

কয়েক’শ মাইল ড্রাইভ করে এসে ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছিল আহমদ মুসাদের। নাস্তার কথা শুনেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘সুরাইয়া-ফায়জাভাদের নাস্তা দিয়েছ?’

‘ধন্যবাদ, আমরাও পেয়েছি জনাব।’ পর্দার ওপার থেকে বলল শাহীন সুরাইয়া।

আহমদ মুসার সাথে সাথে সবাই উঠে দাঁড়িয়ে চলল ডাইনিং রুমের দিকে।

নাস্তা শেষে আহমদ মুসা, আজিমভ, ইব্রাহিমভ এবং জাফরভ এসে বসল আহমদ মুসার কক্ষে, যা তার থাকার জন্য বরাদ্দ হয়েছে।

‘এখন কাজের কথা শুরু করা যাক। প্রথমে তোমরা বল, ‘এই রুগুন পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিরাপত্তার কি ব্যবস্থা তোমরা করেছ?’ বসতে বসতেই আহমদ মুসা বলে উঠল।

চীফ ইঞ্জিনিয়ার আলী ইব্রাহিমভ জাফরভের দিকে চেয়ে বলল, ‘তুমিইতো তত্ত্বাবধান করছ সবকিছু। প্রথমে তুমি বললেই ভাল হয় জাফরভ।’

জাফরভ নড়ে চড়ে বসল। আহমদ মুসার দিকে চেয়ে বলতে শুরু করল, 'রুগুন ড্যাম (বাঁধ) এলাকায় আমাদের যে স্বাভাবিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে, তাতেই ড্যাম ও ড্যাম এলাকায় কোন লোক পাশ ছাড়া প্রবেশ করতে পারে না। পর্যটকদেরকে পরিদর্শনের অনুমতি দেয়া হয়, কিন্তু পুরোপুরি চেকিং এর পর। চারটা শিফটে সার্বক্ষণিক পাহারা দেয়া হয় ড্যাম এলাকা। বিশেষ জরুরী ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে ড্যাম এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে নিশ্ছিদ্র করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ড্যাম-এর দুই প্রান্তে দুটি সিকুরিটি পোস্ট বসানো হয়েছে। ড্যামের নিচে নদীর দু'ধারে নদীর পানি স্তর বরাবর অনেকগুলো গার্ড-পোস্ট বসানো হয়েছে। ড্যাম-এর দু'পাশেই নদীর অনেকটা স্থান বরাবর এই গার্ড পোস্টগুলো দাঁড়িয়ে আছে। এই সব গার্ড পোস্ট ও সিকুরিটি পোস্টের বাইরের এলাকায় ড্যাম-এর চারদিক জুড়ে বৃত্তাকারে দৃষ্টির অগোচরে ইলেকট্রনিক তার পাতা হয়েছে কয়েকসারি। ইঁদুরও যদি তারগুলো অতিক্রম করে, তাহলে আমরা জানতে পারব। ইলেকট্রনিক ফাঁদ এলাকার বাইরে চারদিকে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে আমাদের প্রহরীরা বিভিন্ন ছদ্মবেশে। এই এলাকায় নতুন লোক প্রবেশ করলেই তাকে অনুসরণ এবং দরকার হলে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দেয়া আছে।'

থামল জাফরভ।

'নদী পথের দিকটা তোমরা ভাবনি?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'জি। বলতে ভুলে গেছি। নদী পথের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও করা হয়েছে। ড্যাম-এর দুই পারে নদীতে আধা মাইলের মধ্যে দুটি নৌ-ফাঁড়ি খোলা হয়েছে। ফাঁড়ির প্রত্যেকটিতে অর্ধ-ডজন করে স্পীড বোট। পরিচিত ও অপরিচিত কোন নৌ-যানই ফাঁড়ি অতিক্রম করে ড্যাম-এর দিকে যেতে পারবেনা, এ ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফাঁড়ির স্পীড বোটগুলো ফাঁড়ি থেকে ড্যাম পর্যন্ত সার্বক্ষণিকভাবে ঘোরা-ফেরা করছে।'

কথা শেষ করল জাফরভ।

নিরাপত্তা বর্ননা শুনে চোখ-মুখ উজ্জ্বল হলো আহমদ মুসার। খুশী হল সে। বলল, 'যে ব্যবস্থা তোমরা করেছ তাঁকে নিশ্ছিদ্রই মনে হচ্ছে।'

বলে চোখ বন্ধ করল আহমদ মুসা। মুহুর্তকাল পরে চোখ খুলে বলল, 'কবে থেকে এই ব্যবস্থা তোমরা গ্রহন করেছ?'

'আজ দশ দিন।' বলল আলী ইব্রাহিমভ।

'দশ দিন। কিন্তু আজ সকালে আমরা জানতে পেরেছি রুগুন ড্যাম ধ্বংসের দিন হলো একুশ তারিখ।'

একুশ তারিখ উচ্চারণ করতেই ইব্রাহিমভ ও জাফরভের মুখের ওপর একটা কালোছায়া নামল।

'আমি মনে করি' বলে চলল আহমদ মুসা, 'এই একুশ তারিখটা নির্ধারণ করেছে তারা দশ দিন আগে নয়, পরে। অর্থাৎ তোমরা জরুরী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণের পরও তারা নিশ্চিত যে তারা ড্যাম ধ্বংস করতে পারবে। অথবা এমনও হতে পারে দশ দিন আগেই তারা ড্যাম ধ্বংসের সময় একুশ তারিখ নির্ধারণ করেছে। তোমরা জরুরী নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের পরও তারা এই তারিখ পরিবর্তনের কোন চিন্তা করেনি। কারণ লক্ষ্য অর্জনের ব্যাপারে তারা নিশ্চিত।'

'কিন্তু কিভাবে? আপনি নিরাপত্তা ব্যবস্থার কথা তো শুনলেন।' বলল আলী ইব্রাহিমভ শুকনো কন্ঠে।

'সেটাই তো সমস্যা। এসমস্যার সমাধান হলে তো আর কোন কথাই ছিল না।' বলল আহমদ মুসা।

'আবার আমাদের মুল্যায়ন করতে হবে, নিরাপত্তা ব্যবস্থা যা করা হয়েছে তাতে কোন ফাঁক আছে কিনা।' বলল আজিমভ।

'যাদের নিয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে তারা সবাই ঠিক আছে কিনা?' আহমদ মুসা বলল।

'এ ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। হেড কোয়ার্টারে নির্দেশ পাবার পর আমরা সবাইকে পরীক্ষা করেছি।' বলল ইব্রাহিমভ।

'তাছাড়া আমরা এখানে একটা নিয়ম অনুসরণ করছি। যেই এখান থেকে বাইরে যাক, তাকে সিকুরিটির একজন লোক অনুসরণ করে থাকে। সে কোথায় যায়, কার সাথে দেখা করে, এ রেকর্ড আমরা রাখি।' বল জাফরভ।

‘বাঃ চমৎকার। বর্তমান জরুরী পরিস্থিতিতে এটা খুবই দরকার। ড্যাম-এর মত স্পর্শকাতর জায়গায় যারা কর্মরত, তাদের ক্ষেত্রে এটুকু খোঁজ বোধ হয় রাখা দরকার। তবে সাধারনভাবে এ ধরনের খোঁজ-খবর নেয়া ঠিক নয়। এতে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের ওপর হস্তক্ষেপ করা হয়, তার মৌলিক অধিকার লংঘিত হয়। সব সময় মানুষকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা, খুঁজে খুঁজে কারও দোষ বের করা, ইত্যাদির মত কাজকে ইসলাম অনুমোদন দেয় না।’

‘সমস্যার তো সমাধান হলো না মুসা ভাই, ওরা তাহলে কোন ভরসায় একুশ তারিখকে ড্যাম ধ্বংসের তারিখ ঠিক করল?’ বলল আজিমভ।

‘সেটাইতো প্রশ্ন, এখানে যদি সব ঠিকই থাকে,তাহলে ওরা এতবড় আশা করছে কিসের ভিত্তিতে!’

আহমদ মুসা থামল।

কেউ কোন কথা বলল না।

সবাই নিরব। ভাবছে সবাই।

অনেক্ষণ পর মুখ খুলল আহমদ মুসাই। বলল, ‘আজ আর কোন কথা নয়। ভাব সবাই। কালকে ভোরে আমি ড্যাম এলাকা দেখব। ইব্রাহিমভ তুমি আমাকে ড্যাম ও ড্যাম এলাকার ছবি ও মানচিত্র দিয়ে যাবে।’

আহমদ মুসা বাদে সবাই উঠে দাঁড়াল।

পরদিন ফজর নামাজের পর আহমদ মুসা সবাইকে নিয়ে ড্যাম এলাকা ঘুরে ফিরে দেখল। দেখে খুশী হলো সে। নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোন ফাঁক দেখতে পেল না।

প্রায় সারাদিন চিন্তা করে এবং চারদিক ঘুরে কাটিয়ে দিল আহমদ মুসা। ড্যাম এবং চারদিকের এলাকার প্রতি ইঞ্চি জায়গা তারা সন্ধানী চোখ দিয়ে দেখেছে। কিন্তু সন্দেহের কোথাও কিছু পায়নি। রুগুন ড্যাম প্রকল্প শুধু নয়, রুগুন জনপদটিতে যারা বাস করছে, তাদের তালিকা এবং পরিচয়ও আহমদ মুসা পরীক্ষা করেছে, কিন্তু তাদের কারও পরিচয়ের মধ্যে সন্দেহজনক কিছু পায়নি।

তখন পড়ন্ত বিকেল। আহমদ মুসা, আজিমভ, ইব্রাহিমভ ও জাফরভ দাঁড়িয়েছিল ড্যামের ওপর।

বখশ নদী সেখানে উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত।

ড্যামের দক্ষিণ দিকে আটকে থাকে পানি সৃষ্টি করেছে বহু মাইল বিস্তৃত হ্রদের। দেখে মনেই হয় না এটা কোন নদী। ড্যামের এই দক্ষিণ পারে পানির স্তর প্রায় ত্রিশ ফুট নিচুতে। আর উত্তর পারে নদীতে পানির স্তরও ত্রিশ ফুট নিচে।

আহমদ মুসা ড্যাম-এর রেলিং-এ দুই কনুইয়ের ঠেস দিয়ে একটু ঝুকে পড়ে দক্ষিণের বিস্তৃত জলরাশির দিকে তাকিয়ে ছিল।

আহমদ মুসার মনে চিন্তার ঝড়। বাঁধ ভেঙ্গে গেলে এ ধরণের বাঁধ তৈরী করতে লাগবে হজার হাজার কোটি টাকা। বাঁধে আটকে থাকা পানি ফ্লাস ফ্লাড আকারে অবিশ্বাস্য গতিতে অগ্রসর হয়ে শতজনপদ ও শস্যক্ষেত নিশ্চিহ্ন করবে। বাঁধের উজানের সেচ-প্রকল্পের আওতাধীন লাখ লাখ একর জমি বিরাণভুমিতে পরিণত হবে। সেই সাথে বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ হবার ফলে অন্ধকারে ডুবে যাবে তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান ও তুর্কেমেনিস্তানের একটা অংশ। সদ্যজাত মধ্য এশিয়া মুসলিম প্রজাতন্ত্রের এই ক্ষতিই করতে চাচ্ছে গ্রেট বিয়ার। এইভাবেই অর্থনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ পঙ্গু করে দিতে চায় এ মুসলিম প্রজাতন্ত্রটিকে। ইতিমধ্যেই অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।

উদ্বেগে ভরে গেল আহমদ মুসার মন। আর মাত্র কয়েক ঘন্টা সময়। রাত বারটার পরই শুরু হবে একুশ তারিখ। তারা যদি তাদের সময় রক্ষার ব্যাপারে সিরিয়াস হয়, তাহলে রাত বারটার পর যে কোন সময় তারা আঘাত হানবে। গ্রেট বিয়ারকে সে এ পর্যন্ত যতটা জেনেছে, তাতে বুঝেছে ওরা যা বলবে তা জীবন দিয়ে করার চেষ্টা করবে। সুতরাং তারা এই রুগুন ড্যাম-ধ্বংস করার জন্যে অগ্রসর হবেই। ওরা যেমন শক্তিশালী ও সাহসী, তেমনি বিজ্ঞান ও কারিগরী দিক দিয়ে অনেক বেশী উন্নত।

বেদনায় ভরে গেল আহমদ মুসার হৃদয়। তাহলে কি চোখের সামনে এই রুগুন ড্যাম-এর ধ্বংস তাদেরকে দেখতে হবে!

বখশ নদীর নীল অথৈ পানির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল আহমদ মুসার।

হঠাৎ আহমদ মুসা দৃষ্টির প্রান্তসীমায় নদীর বুকে কয়েকটা বিশাল বুদবুদ উঠল। বুদবুদগুলো ভেঙ্গে মিশে গেল পানির সাথে। মনে হলো বিশাল কোন তিমি

তার বুক ভরা নিঃশ্বাস ছুড়ে দিল ওপরে, পানির বাইরে। আহমদ মুসার হঠাৎ মনে হলো, পানির নীচে শুধু তিমি কিংবা মাছই থাকে না, থাকতে পারে, যেতে পারে আরও অনেক কিছু। পানির ভেতরটা স্বতন্ত্র একটা জগৎ। এই যে ড্যাম যার ওপর সে দাঁড়িয়ে আছে, তা যেমন রয়েছে পানির ওপরে, তেমনি পানির নিচেও এর বড় একটা অংশ রয়েছে।

একটা অংশ রয়েছে। সংগে সংগেই আহমদ মুসার মনে ঝড়ের বেগে এসে প্রবেশ করল, পানির ওপরের এলাকা তো তারা তন্ন তন্ন করে দেখেছে, কিন্তু পানির তলার কথা তো তাদের মনে হয়নি!

কথাটা মনে হবার সাথে সাথে আহমদ মুসা সোজা হয়ে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা গভীর চিন্তায় ডুবে আছে, এটা আজিমভ, ইব্রাহিমভ, জাফরভ সবাই খেয়াল করেছিল। কথা বলতে চেয়েছিল জাফরভ, ইশারায় আজিমভ তাকে নিষেধ করেছিল।

আহমদ মুসা হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়াতেই সবাই তাকাল তার দিকে।

'আলী ইব্রাহিমভ তোমাদের এখানে ডুবুরীর কমপ্লিট সেট আছে?' জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

'আছে।' বলল ইব্রাহিমভ।

'চল এখন যাই। ঠিক মাগরিবের পর আমি নামবো নদীতে।' বলে আহমদ মুসা হাঁটতে শুরু করল।

'ষড়যন্ত্র পানির নিচে পরিব্যাপ্ত হতে পারে বলে কি আপনি মনে করছেন মুসা ভাই?' জিজ্ঞাসা করল আজিমভ।

'এটা খুবই সম্ভব আজিমভ। পানির নিচটা না দেখলে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না।'

কথাটা শেষ করেই জাফরভের দিকে চেয়ে আহমদ মুসা বলল, 'তোমাদের সংগ্রহে কি 'New world of Explosives' বইটা আছে?'

'জি জনাব।'

'বইটা এখনি আমি চাই জাফরভ।'

'ঠিক আছে, আমি নিয়ে আসছি এখনি।' বলে দৌড় দিল জাফরভ।

মাগরিবের নামাজের পর আহমদ মুসাসহ ওরা চারজন নদীর ধারে এসে দাঁড়াল। তারপর স্পীড বোটে চড়ে নদীর মাঝ বরাবর চলে এল। প্রয়োজনীয় যা পরামর্শ দেবার আগেই দিয়েছিল। ডুবুরীর পোশাকে সজ্জিত হয়ে নদীতে নেমে পড়ল আহমদ মুসা।

নদীর বুকে তখন অন্ধকার। ড্যামে যে সার্চ লাইট রয়েছে তার আলো এ পর্যন্ত পৌঁছেনি।

নদীর যে স্থানে বিকেলে বুদ্‌বুদ উঠতে দেখেছিল, সেখানেই নামল আহমদ মুসা। আহমদ মুসার অবচেতন মনে শুরুতেই একটা সন্দেহ দানা বেঁধে উঠেছিল যে, বিশাল ঐ বুদ্‌বুদ মাছ বা জলজ কোন প্রাণী থেকে উৎপন্ন হয়নি কিংবা নদী-তলার কোন গ্যাসীয় ক্রিয়াকান্ড নয়। কিন্তু এর কোন পরিস্কার ধারণা আহমদ মুসার কাছে ছিল না। কিন্তু 'New world of Explosives' বইটা বিকেলে পড়তে গিয়ে তার মনে পড়েছে সর্বাধুনিক এক ধরনের ডুবুরীর পোশাক আছে যা থেকে নিঃশ্বাস বুদ্‌বুদের আকারে সরাসরি ওপরে উঠে যায় না। একটা প্লাস্টিক টিউব এর মধ্যে দিয়ে তা দূরের একটি গ্যাস-মশকে গিয়ে জমা হয়। এই গ্যাস-মশক তার ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত বায়ু মাঝে মাঝে ছেড়ে দেয় যা বুদ্‌বদ আকারে ওপরে উঠে যায় এবং সেটা ঘটে প্রতি তিন ঘন্টা পরপর। আর এ বুদ্‌বদ উঠার ধরনটা এমন যা থেকে আঁচ করা যাবে না যে, এটা কোন ডুবুরীর নিঃশ্বাস। মনে হবে ব্যাপারটা নদীতলা বা সমুদ্রতলের কোন গ্যাস ম্যাকানিজম- এর ফল। এসব জানার পর আহমদ মুসা এখন নিশ্চিত যে পানির তলায় শত্রু পক্ষের আগমন ঘটেছে।

পানিতে নামার পর আহমদ মুসা সোজা নেমে গেল নদীর তলায়। অন্ধকার পানির তলায় ডুবুরীরা যে ওয়াটার টর্চ ব্যবহার করে, আহমদ মুসা সে ওয়াটার টর্চ জ্বালায়নি। শত্রুদের নজর এড়াবার জন্যেই আহমদ মুসা এই কৌশল অবলম্বন করেছে। ওয়াটার টর্চের বদলে আহমদ মুসা ব্যবহার করছে অন্ধকার

পানির তলায় ব্যবহারের উপযোগী বিশেষ ধরনের ইনফ্রারেড ওয়াটার গগলস। এই গগলস অন্ধকার পানির তলাকে দিনের মতই স্বচ্ছ করে তোলে।

নদীর তলা পর্যন্ত নেমে সবে আহমদ মুসা চারদিকে নজর বুলাতে শুরু করেছে, এমন সময় দেখল, বাঁধের দিক থেকে দুটো অগ্নি গোলক একটু এঁকে বেঁকে তার দিকেই এগিয়ে আসছে। দেখেই আহমদ মুসা বুঝল ও দু'টো ডুবুরীর টর্চ।

ধক্ করে উঠল আহমদ মুসার বুকটা। ওরা কি দেখতে পেয়েছে আহমদ মুসাকে।

আহমদ মুসা দ্রুত সরে গেল নদীর পশ্চিম কিনারায়। পেয়ে গেল দু'টো বড় বড় পাথর। পাথরের আড়ালে দেহটা লুকিয়ে ফেলে তাকিয়ে রইল মাঝ নদীর দিকে। দেখতে পেল, ঠিকই অগ্নি গোলক দু'টি দুইজন ডুবুরীর হাতের দু'টি টর্চ।

আহমদ মুসা কিছুক্ষণ আগে মাঝ নদীতে যেখানে নেমেছিল ডুবুরী দুক'জন সে জায়গাটা অতিক্রম করে আরও দক্ষিণে চলে গেল। আহমদ মুসা দেখল, তাদের ডুবুরী-পোশাক বিশেষ ধরনের যার পেছনে রয়েছে গ্যাস-মশক।

হাফ ছেড়ে বাঁচল আহমদ মুসা। ওরা দেখতে পায়নি তাকে। তার চোখে ইনফ্রারেড গগলস ছিল বলেই আলো দু'টোকে অত কাছে মনে হয়েছিল। আসলে ওদের ঐ টর্চের আলো অত দূরে আসার কথা নয়।

আহমদ মুসা যেমন খুশী হলো ওরা দেখতে না পাওয়ায়, তেমনি আবার উদ্বেগে ভরে গেল তার মন। শত্রুরা পানি পথেই তাদের রুগুন ড্যাম ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করেছে।

ডুবুরী দু'জন চলে গেলে আহমদ মুসা ভাবল, ওরা কি ওদের কাজ শেষ করে চলে গেল? নদীর পানিতে সেই বড় বুদ্‌বুদটা দেখেছে সে বেলা পাঁচ টায়। এখন রাত সাড়ে সাতটা। যদি ধরা যায় তারা ঐ পাঁচটার সময়ই এসেছিল এখানে, তাহলে আড়াই ঘন্টা সময় তারা এখানে ছিল। এই আড়াই ঘন্টা সময়ে কি ড্যাম ধ্বংসের ব্যবস্থাপনা শেষ করল এবং তারপর চলে গেল? কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভাবল ড্যাম ধ্বংসের ব্যবস্থাপনা শেষ না করেই কি তারা ড্যাম ধ্বংসের তারিখ

ঘোষণা করেছিল? ব্যবস্থা যদি তারা আগেই করে থাকে, তাহলে তারা আজ পাঁচ টায় এসেছিল কেন এবং এতক্ষণ এখানে কি করল?

প্রশ্নগুলোর সমাধান এই মুহূর্তে আহমদ মুসার কাছে নেই।

আহমদ মুসা নদী তীরের কাছাকাছি এসে ধীরে ধীরে এগুলো ড্যামের দিকে।

নদীর যেখানে নেমেছিল, সেখান থেকে ড্যামের দূরত্ব প্রায় তিন'শ গজ।

এই তিন'শ গজ অতিক্রম করতে আহমদ মুসার সময় লাগল ১০ মিনিট।

আহমদ মুসা ড্যামের গোড়ায় পৌছে পরীক্ষার জন্যে প্রথমে ড্যামের মাঝের মূল পিলারটাকে বেছে নিল। পিলারের শীর্ষদেশ থেকে পিলারের গায়ে সতর্ক নজর বুলিয়ে নামতে থাকল নিচের দিকে।

একদম পিলারের গোড়ায় গিয়ে আহমদ মুসা পেয়ে গেল তার আকাঙ্খিত বস্তুটা। পিলার এবং ড্যামের যে কৌণিক মিলন কেন্দ্রটা রয়েছে সেখানে পিলারের বেদির ওপর পাতা রয়েছে বিশাল আকারের ভয়াবহ এক প্লাস্টিক ডিনামাইট। ওজন পাঁচ কেজির কম হবে না। এ ধরনের একটি ডিনামাইট দিয়ে কয়েকটি ড্যামকে একসাথে ধুলায় পরিণত করা যায়।

বুকটা কেঁপে উঠল আহমদ মুসার।

ডিনামাইটের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে চারদিকে চাইতে গিয়েই দেখতে পেল সেই দু'জন ডুবুরী তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। তাদের দু'হাতে দু'টি টর্চ, অন্য হাত দু'টিতে ওয়াটার গান।

আহমদ মুসা সংগে সংগেই নিজের দেহটাকে পিলারের দরজার কৌণিক ভাঁজটার দিকে ছুঁড়ে দিল। আর সাথে সাথেই বুকের ওপর ঝুলে থাকা টেনিস বলের মত ব্ল্যাক স্পোক বোমা টান দিয়ে ছিড়ে নিয়ে ভেঙে ফেলল।

এক সেকেন্ড সময়ের মধ্যেই গাঢ় অন্ধকারে ছেয়ে গেল চারদিকটা।

ঠিক এই সময়েই মনে হয় ফিট খানেক দূরে স্টীলের দরজার গা থেকে ধাতব শব্দ ভেসে এল। আহমদ মুসা বুঝল, ওদের ওয়াটার গান থেকে আসা গুলির শব্দ ওটা।

‘ব্ল্যাক স্পোক বোমা’ ওদের টর্চ, চোখ সব কিছুকেই অকেজো করে দিয়েছিল। কিন্তু আহমদ মুসা ‘ইনফ্রারেড গগলস’- এর জন্যে কোন সমস্যা সৃষ্টি হয়নি।

আহমদ মুসা নিঃশব্দে এগিয়ে গেল।

ওরা ব্ল্যাক স্পোক বোমার আওতা থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে দ্রুত পিছু হটছিল।

আহমদ মুসা ওদের কাছাকাছি গিয়ে ওয়াটার গান তাক করে বলল, ‘তোমরা গান... ...’

আর এগুতে পারল না আহমদ মুসার কথা।

আহমদ মুসার মুখ থেকে শব্দ বের হবার সাথে সাথেই তাদের কান খাড়া হলো, তার সাথেই শব্দ লক্ষ্যে ওদের বন্দুক উঠে এল এবং গুলি বর্ষিত হলো।

অবিশ্বাস্য দ্রুততা এবং অদ্ভুত নিশানা ওদের। আহমদ মুসা দু’পায়ে পানি টেনে দেহের ভারসাম্য রক্ষা করছিল, আর দু’হাতে তাক করেছিল বন্দুক। কথা বলা অবস্থাতেই তার দেহটা বামদিকে একটু সরে গিয়েছিল। এই সরাটাই বাঁচিয়ে দিল আহমদ মুসাকে। তবু একটা গুলি গিয়ে আঘাত করল ডান বাহুর গোড়ার পেশিতে। পেশির একটা অংশকে যেন গুলিটা খাবলা দিয়ে তুলে নিয়ে গেল। আরেকটা গুলি তার মাথা ও বুকের নিচ দিয়ে ছুটে গিয়ে পায়ের সাথে লাগানো ডুবুরী পোশাকের লেজটার একটা অংশ ছিড়ে নিয়ে গেল। চিন চিন করে উঠল ডান পায়ের কনিষ্ঠ আঙুল। গুলি আহত করেছে আঙুলটাকে।

ওদের অকল্পনীয় ক্ষিপ্রতা এবং শব্দ লক্ষ্যে তাদের অবিশ্বাস্য নিশানা দেখে আহমদ মুসা সত্যিই বিস্মিত হলো। পানির ভেতরেই যদি ওরা এরকম তাহলে ডাঙ্গায় ওরা কেমন!

কিন্তু ওরা দ্বিতীয় গুলি করার সুযোগ পেল না । আহমদ মুসার ওয়াটার গান থেকে পরপর দু’টি গুলি নিক্ষিপ্ত হল। গুলি দু’টি দু’জনের মাথা গুড়িয়ে দিল। ওদের হাত থেকে টর্চ এবং বন্দুক খসে পড়ল। ধীরে ধীরে ওদের দেহও নেমে যেতে লাগল নিচে, নদীর তলায়।

আহমদ মুসা কিছুক্ষণ ওদের দিকে চেয়ে থেকে তারপর নিশ্চিত হয়ে এগুলো ড্যামের সেই পিলারের দিকে যেখানে পাতা রয়েছে প্লাস্টিক ডিনামাইট ।

যেতে যেতে আহমদ মুসা আহত ডান বাহুতে হাত বুলাল এবং মনে মনে বলল, ওদেরকে আগে গুলি করতে দেয়া ঠিক হয়নি।

প্রথমেই সে তাদেরকে আঘাত না করে ভুল করেছে। কিন্তু আবার ভাবল, শত্রু কে শান্তির একটা সুযোগ না দিয়ে আঘাত করা বা হত্যা করা ইসলামের মৌল নীতিমালার সাথে মিলে না। আহমদ মুসা তাদেরকে সেই সুযোগই দিতে গিয়েছিলেন। সুতরাং আহমদ মুসা অন্যায় করেনি। মন থেকে আবার পাল্টা জবাব উঠল, যুদ্ধ ক্ষেত্রে কিন্তু এ নিয়ম খাটে না। মন আবার বলল, খাটে না একথা ঠিক তবে মানুষকে একবার শেষ সুযোগ দেয়ার মধ্যে আল্লাহর বাড়তি অনুগ্রহ আশা করা যায়।

আহমদ মুসা গিয়ে পৌঁছল ডিনামাইটটির কাছে।

আবার সে পরিপূর্ণভাবে তাকাল ডিনামাইটটির দিকে। চরম এক বিস্ময় এসে তাকে আচ্ছন্ন করল, এত বড় প্লাস্টিক ডিনামাইট সে এর আগে কোথাও দেখেনি।

আহমদ মুসা ডিনামাইটটি পর্যবেক্ষণ করে বুঝল, ডিনামাইটটি দূর নিয়ন্ত্রিত নয়। ডিনামাইট এর ঘড়িতে তখন ৩টা ৩০ মিনিট, এসে দেখেছিল ৩টা ৩৩মিনিট । আহমদ মুসা নিজের ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল ৮টা ৩১মিনিট। এই হিসাবে ডিনামাইট এর ঘড়িতে ‘জিরো’ আওয়ারে অর্থাৎ ঠিক ১২টা ১মিনিট স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিস্ফোরণ ঘটবে ডিনামাইটটির । ডিনামাইট টি দূর নিয়ন্ত্রিত না হওয়ায় খুশী হল আহমদ মুসা। দূর নিয়ন্ত্রিত হলে ইচ্ছামত যে কোন সময় ওরা বিস্ফোরণ ঘটাতে পারত।

কিন্তু আহমদ মুসার মনে প্রশ্ন জাগল , ডিনামাইটটি স্বয়ংক্রিয়, তাহলে শত্রু পক্ষের ওরা দু’জন এখানে কি করছিল? জবাব পরক্ষণেই পেয়ে গেল। ডিনামাইট ঠিকমত আছে, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পাহারা দিয়ে ওরা এটাই নিশ্চিত হতে চেয়েছিল।

আহত ডান হাত ভারী মনে হচ্ছে। সেই সাথে একটা যন্ত্রণাও ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেহে। এই অবস্থায় ডিনামাইটকে 'ডিফিউজ' করার চেষ্টা না করে এটাকে আস্ত তুলে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল সে। সময় যেহেতু বেশ আছে, তাই অসুবিধা নেই এতে।

পিলারের বেদিতে ড্রিল করে তাতে পেরেক বসিয়ে পেরেকগুলোর সাথে বেঁধে রাখা হয়েছিল ডিনামাইটকে।

আহমদ মুসা বাঁধন কাটতে গিয়ে ভাবল, তার আগে সবগুলো পিলার এবং জায়গা সার্চ করে দেখা দরকার আর ডিনামাইট তারা পেতেছে কিনা । আহমদ মুসা তাই করল। ড্যাম এর প্রতিটি পিলার, প্রতিটি দরজা তন্ন তন্ন করে খুঁজতে গিয়ে ড্যামের সিলিং এ আর দুটি ডিনামাইট পেল। এ ডিনামাইট গুলো এমন কৌশলে পাতা হয়েছিল যে সাধারন অনুসন্ধানে তা কিছুতেই চোখে পড়ার মত নয়। এক প্রকারের জল শ্যাওলার আড়ালে তা লুকানো ছিল। এ ডিনামাইট গুলোও স্বয়ংক্রিয়।

আহমদ মুসা আল্লাহ্‌র অশেষ শুকরিয়া আদায় করল আর দুটি ডিনামাইট খুঁজে পাওয়ার জন্য। আল্লাহ্‌ই তাকে আর অনুসন্ধানের পথে ঠেলে দিয়েছিলেন, তা না হলে প্রথম ডিনামাইটটি নিয়ে তার উঠে যাবার কথা।

তিনটি ডিনামাইট খুলে নিয়ে তার একার পক্ষে ওপরে উঠে যাওয়া সম্ভব নয়, নিরাপদ ও নয়। সুতরাং ওপর থেকে সাহায্য আনতে হবে।

এদিকে ড্যামের সামনের এলাকায় নদীতে স্পীড বোটে অস্থির ভাবে বেড়াচ্ছে আজিমভ , ইব্রাহিমভ এবং জাফরভ । দেড় ঘণ্টা হল আহমদ মুসা নেমেছে পানিতে, এখনও তার কোন খবর নেই। অনুসন্ধান কাজে এতটা সময় লাগার কথা নয় । কিছু ঘটেছে কি নিচে।

'আর অপেক্ষা করা যায় না, আমাদের উচিত নিচে।' বলল জাফরভ।

‘আমাদের নামাটা ভালও হতে পারে, খারাপও হতে পারে। আহমদ মুসা ভাই এর সংকেত এখন আমরা পাইনি। তার পরিকল্পনার বাইরে আমাদের না যাওয়াই ভাল জাফরভ।’

‘তারও তো বিপদ হতে পারে?’ বলল ইব্রাহিমভ।

‘তবুও তার দেয়া সময় সীমা রাত ৯টার আগে আমরা নামবো না।’

‘তিনি নেতা, তিনি কেন প্রথমেই এসব ঝুকি নিতে এগিয়ে যান?’ বলল জাফরভ।

‘তিনি সত্যিকারের নেতা বলেই। বুদ্ধি ও শক্তির চূড়ান্ত লড়াইকালে তিনি কোন সময় কোন কর্মীকে সামনে এগিয়ে যেতে দেন না।’

ঠিক এই সময় তাদের বোট থেকে অল্প একটু দূরে ছোট ছোট দুটি রেডিয়াম বেলুন ভেসে উঠল । একটা শ্বেতাভ সবুজ, আরেকটা গাঁড় কমলা।

বেলুন দু’টির ওপর চোখ পড়তেই বোটের ওরা তিন জনেই আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিয়ে উঠল। আহমদ মুসার পাঠানও সংকেত তারা পেয়েছে। এই সংকেতেরই তারা অপেক্ষা করছিল চরম উৎকণ্ঠা নিয়ে।

তারা বেশি খুশী হয়েছে সংকেতের ধরন দেখে। শ্বেতাভ সবুজ সঙ্কেতটি তাদের বিজয়ের প্রতীক। অর্থাৎ শত্রুর ওপর তারা বিজয় লাভ করেছে। আর কমলা রংয়ের সংকেতটির অর্থ হল বিস্ফোরক সংক্রান্ত বিপদ আছে, সাহায্য দরকার।

সংকেত দেখেই জাফরভ নদীর তীরে বোট অপেক্ষমান সিকুরিটি বিভাগের বিস্ফোরক কর্মীদের উদ্দেশ্য সংকেত দিল । সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে এল ওরা ।

‘আলি ইব্রাহিমভ তুমি এখান অপেক্ষা কর। ওদের চারজনকে নিয়ে আমি এবং জাফরভ নেমে যাচ্ছি।’

বলে আজিমভ নেমে পড়ল নদীত । তার সাথে সাথে ওরা চারজন এবং জাফরভ।

পানিতে ডুব দেবার পরেই আজিমভ ডুবুরির পোশাক এর সাথে যুক্ত ওয়াটার-ওয়্যারলেস চালু করল। বলল, 'মুসা ভাই, আমরা এসেছি আপনি কোথায়?'

'ধন্যবাদ আজিমভ, ড্যাম এর গোঁড়ায় চলে এস।' ভেসে এল আহমদ মুসার কণ্ঠ। আজিমভরা দ্রুত নেমে গেল ড্যাম-এর গোঁড়ায়।

দেখা হল আহমদ মুসার সাথে ।

আজিমভদের সালাম নিয়ে আহমদ মুসা বলল, 'আজিমভ তিনটি প্লাস্টিক ডিনামাইট পাতা হয়েছে। এস তোমাদের দেখিয়ে দেই। এগুলো এখানেই অকেজো করে দিতে হবে অথবা এখনি তুলে নিয়ে যেতে হবে।'

আহমদ মুসা তিনটি ডিনামাইট দেখিয়ে দিল। কাজে লেগে গেল নিরাপত্তা বিভাগের বিস্ফোরক এক্সপার্টরা ।

আজিমভ বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করল, আহমদ মুসার ওয়াটার গানটা তার বাম হাতে, যা সাধারনত দেখা যায় না । তাছাড়া আহমদ মুসার দান হাতটা প্রায় নড়ছেই না । ভালো করে দেখতে গিয়ে আজিমভ দেখল, আহমদ মুসার কাঁধ এবং দান বাহুর সন্ধিস্থলের পোশাকটা ছেড়া এবং রক্তাক্ত । আশে-পাশের পানির রং লাল।

বুকে ভীষণ ধাক্কা খেল আজিমভ। মুসা ভাই তাহলে আহত! কতক্ষণ আগে আহত হয়েছে ? কতটা আহত হয়েছে? কতটা রক্তপাত হয়েছে? ইত্যাদি প্রশ্ন আজিমভের মনকে ব্যাতিব্যস্ত করে তুলল। বলল, 'আপনি আহত বলেননি তো মুসা ভাই। কতটা আহত আপনি?'

'ওটা পড়ে শুনলেও হবে। তোমরা এস।' বলে আহমদ মুসা এগিয়ে গিয়ে দু'টি লাশ দেখিয়ে বলল, 'এদের তুলে নেবার ব্যবস্থা কর।'

'এদের আমরা দু'জন তুলে নিচ্ছি মুসা ভাই। আপনি ওপরে চলুন।' বলল আজিমভ।

'ডিনামাইট তুলে না নেয়া পর্যন্ত আমি আছি। তুমি ওপরে গিয়ে পানির তলায় এখানে সার্বক্ষণিক পাহারা বসাবার ব্যবস্থা কর। বিশেষ করে আজ রাতে এই এলাকার গোটা নদীতল পাহারা দিতে হবে । আর ড্যামের ওপারের অংশে

সন্ধানী দল পাঠাবার ব্যবস্থা কর। ড্যামের প্রতি ইঞ্চি অংশ তাদের পরীক্ষা করতে হবে। ওপারের নদীর তলায় সার্বক্ষণিক পাহারা বসাবে।'

'জি আচ্ছা।' বলে আজিমভ জাফরভ লাশ দু'টি তুলে নিয়ে ওপরে উঠে গেল। ওরা চলে গেলে আমদ মুসা ডিনামাইট পাতা তিনটি স্থানেই ঘুরে ঘুরে বিস্ফোরক কর্মীদের কাজ দেখল। তিনটি ডিনামাইট নিষ্ক্রিয় করা হয়ে গেল। আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করল আহমদ মুসা। ইতিমধ্যে ড্যাম ও নদীতল পাহারা দেবার জন্য নিরাপত্তা কর্মীদের নিয়ে পৌঁছে গেল জাফরভ।

'ওপারটা চেক করার ব্যবস্থা করেছ?' আহমদ মুসা জিজ্ঞেস করল।

'জি হ্যাঁ।' উত্তর দিল জাফরভ।

'ঠিক আছে, ছয় ঘন্টা পর এদের ডিউটি পরিবর্তনের ব্যবস্থা করেছ তো?'

'জি হ্যাঁ।'

'মনে রেখ, আজকের রাত এবং আগামী কাল দিনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

'জি হ্যাঁ। দোয়া করবেন। আপনি তাড়াতাড়ি উপরে যান মুসা ভাই। সবাই উদ্বিগ্ন।'

'ধন্যবাদ জাফরভ।' বলে আহমদ মুসা ওপরে উঠতে শুরু করল। তার সাথে তিনটি ডিনামাইট নিয়ে ওরা চারজনও উঠতে লাগল।

আহমদ মুসা বোটের কাছে আসতেই আজিমভ, আলী ইব্রাহিমভ তাকে টেনে তুলল বোটে। বোটে তোলার পর তাড়াতাড়ি আহমদ মুসার গা থেকে ডুবুরীর পোশাক খুলে ফেলা হলো। পোশাক খুলে আঁৎকে উঠল ওরা সবাই।

'আপনার পায়েও গুলি লেগেছে, অথচ এ কথাও আপনি বলেন নি মুসা ভাই।' ভারী কন্ঠে বলল আজিমভ।

'ভুলেই গিয়েছিলাম।'

'তাহলে দু'টি গুলি লেগেছিল আপনার?'

'হ্যাঁ, ওদের দুজনের বন্দুক থেকে ওরা একই সাথে দু'টি গুলি করেছিল।'

আহমদ মুসাকে তাড়াতাড়ি অ্যাম্বুলেন্সে তুলে নিয়ে আসা হলো গেস্ট হাউজে তার কক্ষে। সেখানেই তার আহত দু'টি জায়গায় ডাক্তার ব্যান্ডেজ বেঁধে

দিল। ডাক্তার বলল, ‘অনেক রক্ত গেছে। রক্ত দেয়ার প্রয়োজন নেই, তবে কয়েকদিন রেস্ট নিতে হবে।’

‘দোয়া কর ডাক্তার, আগামী কালের মধ্যে যাতে আল্লাহ আমাকে সুস্থ করেন। পরশু দিন আমাকে তাসখন্দ যেতেই হবে।’

‘অসম্ভব’ বলল ডাক্তার।

ডাক্তারের কথার দিকে কান না দিয়ে আহমদ মুসা আজিমভকে বলল, ‘তুমি তাসখন্দকে জানিয়ে দিয়েছ যে, আমাদের প্রতিটি ড্যাম ও সেচ প্রকল্পে আজ রাত থেকেই পানির তলায় পাহারা বসাতে হবে?’

‘জানিয়ে দিয়েছি মুসা ভাই। কিন্তু আজ রাত থেকেই করতে হবে জানাইনি।’

‘তাহলে এখনি জানাও। এখানকার ব্যর্থতার প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করবে ওরা।’

‘ঠিক বলেছেন। আমি এখনি জানাচ্ছি।’

একটু থামল আজিমভ। তারপর বলল, ‘প্রেসিডেন্ট কুতায়বা আপনাকে সালাম দিয়েছিলেন। আপনার গুলিবিদ্ধ হবার কথা শুনে উনি ঘাবড়ে গেছেন। উনি আসতে চাচ্ছিলেন। আমি বহু কষ্টে তাঁকে বিরত রেখেছি।’

‘তোমরা পাগল হয়েছো, সব আহতদের নিয়ে কি তোমরা এমন ব্যতিব্যস্ত হও?’

‘আহমদ মুসা তো একজনই মুসা ভাই! তার বিকল্প তো আল্লাহ এখনও আমাদের দেননি। আপনাকে আপনার হয়তো প্রয়োজন নেই, কিন্তু জাতির যে খুব বেশি প্রয়োজন।’

আজমভের কথাগুলো ভারি হয়ে কন্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। তার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল অশ্রু। তৎক্ষণাৎ আহমদ মুসা কোন জবাব দিল না। একটু পরে ধীরে ধীরে বলল, ‘তোমরা এভাবে কথা বলো না আজিমভ। তোমাদের এই ভালোবাসাকে খুব ভয় করি আমি।’ আহমদ মুসার কন্ঠ ভারি শোনাল।

‘খাবার এসে গেছে।’ পর্দার ওপার থেকে কথা বলে উঠল শাহীন সুরাইয়া।

‘খাবার এসে গেছে মুসা ভাই।’ বলল ইব্রাহিমভ।

‘কোত্থেকে? কি খাবার?’

‘কেন আপনি ভুলে গেছেন, শাহীন সুরাইয়া ও ফায়জাভার যৌথ দাওয়াত ছিল আজ জাফরভের বাড়িতে?’ বলল আজিমভ।

‘একদম ভুলে গেছি তো! কিন্তু ওরা কষ্ট করে আবার খাবার আনল কেন? আমি তো যেতে পারতাম।’

‘না ওরাই রাজি হয়নি। খাবার নিয়ে এসেছে ওরা।’ আজিমভ বলল।

আহমদ মুসা উঠে বসল। বলল, ‘চল খেয়ে নেই, সত্যি খুব ক্ষুধা লেগেছে।’

সকলে উঠে খাবারের ঘরের দিকে চলল।

আহমদ মুসা যা বলেছিল তাই হলো। একদিন পরেই আহমদ মুসা বিদায় নিল রুগুন ড্যাম থেকে।

বিদায় দিতে গিয়ে আলী ইব্রাহিমভ ও জাফরভ কেঁদে ফেলল।

বলল, ‘আপনার কাছ থেকে দেড় দিনে আমরা দেড় যুগের শিক্ষা লাভ করেছি। রুগুন আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আপনি না এলে এ ড্যাম বাঁচত না।’

আহমদ মুসা বলল, ‘এভাবে কথা বললে যিনি আমাদেরকে এ সংকট থেকে বাঁচালেন তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।’

‘আল্লাহ আমাদের মাফ করুন। আপনার বিদায় আমাদের মনকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে।’ বলল ইব্রাহিমভ।

‘পৃথিবীটা আগমন-নির্গমনের এক পান্থশালা। এখানে আগমন-নির্গমন কোনটাকেই বড় করে দেখা ঠিক নয়। অন্তত মুসলমানদের জন্য এ দুর্বলতা সাজে না।’

‘কেন মুসা ভাই, জন্মস্থান মক্কা ছেড়ে যাবার সময় মহানবী (সঃ)-এর চোখ থেকেও তো অশ্রু গড়িয়ে পড়েছিল।’ বলল জাফরভ।

'এ ভালোবাসা আল্লাহর এক পবিত্র দান তাঁর বান্দার জন্যে। কিন্তু ভালোবাসা আর মনকে বিপর্যস্ত করে ফেলা এক জিনিস নয় জাফরভ।'

'ধন্যবাদ মুসা ভাই, আপনি একজন মহান শিক্ষক।'

'ধন্যবাদ' বলে সবার সাথে হ্যান্ডশেক করে গাড়িতে উঠল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার পাশে উঠল আজিমভ। আর সামনের ড্রাইভিং সিটে বসল রুগুন নিরাপত্তা বিভাগের একজন ড্রাইভার।

গাড়ি স্টার্ট দিল ড্রাইভার।

কিন্তু গাড়ির সামনে একটা পাঁচ বছরের শিশু বসে আছে, ড্রাইভার হর্ন বাজাল তবুও তার উঠার নাম নেই। জাফরভ এসে তাকে সরাতে চাইল, সরে যেতে অস্বীকৃতি জানিয়ে শিশুটি কেঁদে উঠল।

ঘটনাটা লক্ষ্য করে আহমদ মুসা নামল গাড়ি থেকে। শিশুটির কাছে এসে সে শিশুটির দু'চোখের পানি মুছে দিয়ে বলল, 'গাড়ি যেতে দেবে না তুমি?'

'আমি যাব।'

'তুমি যাবে, কোথায়?'

'ঐ শহরে।'

'কেন?'

'আমি আহমদ মুসা হবো।'

'আহমদ মুসা হবে কেন?'

'আমি লড়াই করব দৈত্যের সাথে।'

'আহমদ মুসা কি দৈত্যের সাথে লড়াই করে?'

'হ্যাঁ, অনেক দৈত্যের সাথে।'

'কে বলেছে?'

'কেন মা, দাদু সবাই তো বলে, তুমি জান না?'

এই সময় একজন লোক ছুটে এল। বলল, 'স্যার মাফ করবেন। ছেলেটা আমার ভীষণ জেদী, আমরা অস্থির একে নিয়ে।' বলে ছেলেটিকে নিয়ে যাবার জন্যে তার হাত ধরল।

আহমদ মুসা তাকে নিষেধ করল। তারপর আবার ছেলেটির দিকে মনোযোগ দিয়ে বলল, ‘আমি কে বলত?’

শিশুটি আহমদ মুসার দিকে একবার মুখ তুলে বলল, ‘তুমি মানুষ।’

‘আমার নাম কি?’

‘জানি না।’

‘যদি বলি আমি আহমদ মুসা।’

ছেলেটি অবাক হয়ে কিছুক্ষণ আহমদ মুসার দিকে চেয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, ‘তুমি মানুষ, আহমদ মুসা ই-য়া বড়। তোমার বন্দুকও নেই, বোমাও নেই।’

আহমদ মুসা হাসল। শিশুটিকে একটু আদর করে কপালে একটা চুমু দিয়ে বলল, ‘তোমার এখন কি চাই বলত?’

‘বন্দুক, বন্দুক দিয়ে দৈত্য মারব।’

আহমদ মুসা পকেট থেকে কলম বের করে বলল, ‘আমার কাছে বন্দুক নেই, এই কলম তোমাকে দিলাম। আহমদ মুসা যদি হতে চাও তাহলে এই কলম তোমার লাগবে।’

শিশুটি কলম হাতে নিয়ে কৌতুহলী চোখ মেলে বলল, ‘সত্যি?’

‘একদম সত্যি। আহমদ মুসাও আগে কলম হাতে নিয়েছিল, তারপর বন্দুক।’

‘তুমি তাকে চেন বুঝি?’

‘হ্যাঁ চিনি।’

‘কতবড় আহমদ মুসা?’

‘আমার মত।’

আবার চোখ তুলল শিশুটি আহমদ মুসার দিকে। তার চোখ ভরা সন্দেহ, অবিশ্বাস।

আহমদ মুসা হেসে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'ঠিক আছে, আহমদ মুসা ই-য়া বড়।’

ছুটে আসা সেই লোকটি শিশুটিকে কোলে তুলে নিল। বলল, ‘স্যার আমি প্রকল্প অফিসের একজন সুইপার। আমার ছেলেটিকে দোয়া করবেন।’

‘ফি আমানিল্লাহ। আপনার ছেলেটি খুব ভাল, খুব চালাক।’ বলে আহমদ মুসা ফিরে এল আবার গাড়িতে।

গড়ি ধীরে ধীরে চলতে শুরু করল।

দু’পাশে জমেছিল অনেক মানুষের ভীড়।

শত মুগ্ধ দৃষ্টির মাঝে নিজেকে খুবই বিব্রত বোধ করল আহমদ মুসা। আহমদ মুসা মানুষের চোখের অশ্রু যতটুকু সইতে পারে, প্রশংসা-দৃষ্টি ততটুকু সইতে পারে না।

গাড়ি রুগুন ড্যাম কমপ্লেক্স থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে পড়ল।

আহমদ মুসা সিটে গা এলিয়ে চোখ বুঝেছিল। আজিমভও হেলান দিয়েছে সিটে, কিন্তু তার সতর্ক দৃষ্টি সামনে।

প্রায় নিঃশব্দে গাড়ি এগিয়ে চলল সামনে তাসখন্দের উদ্দেশ্যে।

# ৬

আলেকজান্ডার পিটারের চোখ-মুখ লাল। ব্যাক ব্রাশ করে রাখা তার চুল উস্কো-খুস্কো।

তার প্রকান্ড অফিস টেবিল। বসার রিভলভিং চেয়ারটাও রাজ সিংহাসনের মত।

গ্রেট বিয়ারের মধ্য এশিয়ার প্রধান আলেকজান্ডার পিটার একবার চেয়ারে বসছে, আবার উঠে পায়চারী করছে। মুষ্টিবদ্ধ তার হাত।

ভীষন উত্তেজিত সে।

ক'দিন থেকে আলেকজান্ডার পিটার এমনিতেই উত্তেজিত হয়ে আছে। তাদের একটা সসার প্লেন ধরা পড়েছে মধ্য এশিয়ায় মুসলিম প্রজাতন্ত্রের হাতে। এর ফলে অপূরণীয় ক্ষতি হলো, সসার প্লেনের মনোপলি টেকনোলজি রাশিয়ার হাতে আর থাকল না। মুসলিম বিশ্বও এর মালিক হয়ে গেল। কিন্তু এর চেয়েও বহু ক্ষতি হলো, রুশীয় গ্রেট বিয়ারের ষড়যন্ত্রটা এবার হাতে-কলমে মধ্য এশীয় মুসলিম প্রজাতন্ত্রের হাতে ধরা পড়ে গেল। সসার প্লেনে তেজস্ক্রিয় গ্যাস ভর্তি সিলিন্ডার ছিল যা দেখে যে কেউই বুঝবে ওগুলো রাশিয়ার তৈরী। আর ভয়ানক তেজস্ক্রিয় পরীক্ষা করলেই আমরা ধরা পড়ে যাব যে, আমরা ওদের পশু সম্পদ ও উদ্ভিদ সম্পদকে ধ্বংস করতে যাচ্ছি। এইভাবে ধরা পড়ে যাওয়ায় রুশ সরকার দারুণ অসুবিধায় পড়ে গেছে। এই ষড়যন্ত্রের দায় নেয়া তার জন্যে যেমন অসম্ভব, তেমনি এ ষড়যন্ত্রের দায় অস্বীকার করাও তার পক্ষে কঠিন। মধ্যএশীয় মুসলিম প্রজাতন্ত্রের সাথে তার চিড় ধরা সম্পর্ক এখন মারাত্মক সংকটে পড়েছে।

এই দুঃসংবাদের পর দুইদিন পার না হতেই পিটারের কাছে রুগুন ড্যাম ধ্বংসে তাদের ব্যর্থতার খবর এল। এ ধরনের বড় ব্যর্থতা গ্রেট বিয়ারের আকাশস্পর্শী অহংকারকে আহত করেছে। সসার প্লেন ধরা পড়ার ব্যাপারটা স্তম্ভিত করেছে খোদ রাশিয়াকে। সসার প্লেনকে তারা অজেয় মনে করেছিল। মধ্য

এশীয় মুসলিম প্রজাতন্ত্রের মত সদ্যজাত ও পেছন কাতারের একটি দেশ রাশিয়ার গোপন অস্ত্র সসার প্লেনে হাত দিতে পারবে তা অকল্পনীয় ছিল। যা কল্পনায় আসেনি, তা বাস্তবে রূপ নিয়ে এল। অসহনীয় এই ব্যর্থতা।

তবে আলেকজান্ডার পিটারের আজকের এমন উত্তেজিত হয়ে উঠার কারণ ভিন্ন।

তার এ উত্তেজিত হবার কারণ আজকের কাগজ।

ছানাবড়া হয়ে গেছে তার চোখ আজকের পত্রিকা দেখে।

'ওয়ার্ল্ড নিউজ এজেন্সী'র সূত্রে আজকের সমস্ত দৈনিক সসার প্লেন থেকে শুরু করে গ্রেট বিয়ারের যাবতীয় ষড়যন্ত্রের কাহিনী প্রকাশ করেছে। এ কাহিনী নিছক কল্পকথা হিসাবে ছাপেনি, তথ্য-প্রমাণ ও দলিল দস্তাবেজ দিয়ে কাহিনীকে সবদিক থেকে সমৃদ্ধ করেছে। সসার প্লেনের ছবি, গ্যাস সিলিন্ডারের ছবি, প্লাস্টিক ডিনামাইটের ছবি ইত্যাদি ডকুমেন্টকে ওগুলোর গায়ের লেখা, মার্কা ও নাম্বার সমেত এমনভাবে ছেপেছে যা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাছাড়া গ্রেট বিয়ারের গোটা পরিকল্পনা ছেপে দিয়েছে পত্রিকা।

পিটারের সবচেয়ে দুঃশ্চিন্তার বিষয় হলো, WNA যেহেতু খবরটা প্রচার করেছে, তাই গোটা দুনিয়ায় তা ছড়িয়ে পড়েছে। পৃথিবীর সব পত্রিকায় কম বেশী এ খবর আজ প্রকাশিত হয়েছে। গোটা দুনিয়া আজ জেনে ফেলেছে এ খবর। আগামীকাল থেকেই গোটা দুনিয়া জুড়ে এর বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ উঠবে, তা প্রকাশ হতে শুরু করবে।

এ চিন্তাই আজ আলেকজান্ডার পিটারকে পাগল করে তুলেছে। সে বুঝতে পারছে, মধ্য এশীয় মুসলিম প্রজাতন্ত্র সরকার এ সব প্রচার করে রাশিয়ার উপর চাপ সৃষ্টি করতে চাচ্ছে। যাতে গ্রেট বিয়ারের কাজ বন্ধ হয়ে যায় মধ্য এশিয়ায়।

ক্রোধে রক্তবর্ণ আলেকজান্ডার পিটার টেবিলে একটা প্রচন্ড মুষ্ঠাঘাত করে বলল, 'আমরা দুনিয়ার কাউকে পরোয়া করিনা। আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জন করবই। চাপে পড়ে রুশ সরকার গ্রেট বিয়ারের সাথে অসহযোগিতা যদি করে, তাহলে সরকার একদিনও ক্ষমতায় থাকতে পারবে না।'

কঠিন হয়ে উঠল পিটারের মুখ।

আবার পায়চারি করতে লাগল সে। শত চিন্তার ভীড় তার মাথায়। ভাবছে সে, অনেক ধীরে চলছে গ্রেট বিয়ার। এভাবে আর চলবে না। পরিকল্পনা চুলোয় যাক। এবার শুধুই আঘাত হানতে হবে, আঘাতের পর আঘাত।

তাসখন্দে গ্রেট বিয়ারের নতুন হেডকোয়ার্টারে পিটারের অফিস কক্ষ এটা। আগের মত এটাও তিন তলা বিল্ডিং। এখানেও আলেকজান্ডার পিটার তার মেয়ে তাতিয়ানাকে নিয়ে থাকে তৃতীয় তলায়।

তাতিয়ানা আস্তে দরজা খুলে পিটারের অফিসে প্রবেশ করল।

অতটুকু শব্দও পিটারের কানকে ফাঁকি দিতে পারল না। পায়চারিরত পিটার থমকে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে না তাকিয়েই বলল, ‘তাতিয়ানা তুমি এ সময় এখানে কেন?’

‘না দেখে তুমি কেমন করে বললে আব্বা?’

‘মাকে তো দেখে চিনতে হয় না। মায়ের কাজের শব্দ, গতি ইত্যাদি অনুভব করেই বলে দেয়া যায়।’ পিটারের উত্তেজিত চেহারা হঠাৎ করেই শান্ত হয়ে উঠল।

‘ধন্যবাদ আব্বা। এখন ক’টা বাজে জান?’

‘জানি, চারটা।’

‘আর তোমার খাবার সময় ছিল একটায়।’

‘আজ আমার ক্ষুধা নেই মা।’

‘ক্ষুধা নেই সংবাদপত্র পড়ে?’

চমকে উঠল পিটার। তার মুখ দেখে তাতিয়ানা সব বুঝে ফেলেছে। অল্প একটু সময় নিয়ে বলল, ‘না মা তা নয়। তবে....’

কথা শেষ করল না পিটার।

তাতিয়ানার কাছে পিটার খুব দুর্বল। খুব ভালবাসে পিটার তার একমাত্র এই মেয়েটিকে। তাই তাকে কাছ ছাড়া করে না কখনও।

অতি আদরের এই মেয়েটির সাথে কিন্তু পিটার গ্রেট বিয়ারের কাজ নিয়ে আলোচনা করে না। তবে পিটার চায় তাতিয়ানা রাজনীতি সচেতন হয়ে গড়ে উঠুক।

পিটার থামলে সংগে সংগেই কথা বলল না তাতিয়ানা। ধীরে ধীরে সে এগিয়ে এল পিতার কাছে। বলল, 'আব্বা, তোমাকে একটা কথা বলব।'

'বল।'

'তুমি গ্রেট বিয়ারকে এ পথ থেকে সরিয়ে নাও আব্বা।'

'কোন পথ থেকে?' মেয়ের দিকে পরিপূর্ণভাবে তাকিয়ে বলল পিটার।

'বিজ্ঞানী হত্যার পথ থেকে, ড্যাম ধ্বংসের পথ থেকে, পশু ও উদ্ভিদ সম্পদ বিরাণ করার পথ থেকে।' বলতে বলতে আবেগে তাতিয়ানার কন্ঠ ভারী হয়ে উঠল।

'এসব আজকের কাগজে দেখেছ তো!'

'কাগজের কথা কি মিথ্যা আব্বা?'

'তাতিয়ানা তুমি এসবের মধ্যে এসোনা মা।'

'পিতা যার মধ্যে থাকে, সন্তান তাতে না থেকে পারে কি করে?'

'তবু এসব বোঝার বয়স তোমার হয়নি মা!'

'তোমার মেয়ে ভালো-মন্দটা অন্তত বুঝতে পারে আব্বা।'

'তা আমি জানি। কিন্তু ভালো-মন্দের সংজ্ঞা সব জায়গায় এক রকম নয়। কোথাও লোক হত্যা ভয়ানক অপরাধ, কোথাও আবার লোক হত্যা অপরিহার্য হয়ে ওঠে এবং এ কাজের জন্যে মানুষ পুরস্কারও পায়।'

'মধ্য এশিয়ায় বিজ্ঞানী হত্যা, ড্যাম ধ্বংস, তেজস্ক্রিয় বিষ দিয়ে পশু হত্যা ও শষ্য ক্ষেত্র ধ্বংস কি ভয়ানক অপরাধের মধ্যে পড়ে না আব্বা?'

'না মা,এটা একটা যুদ্ধের অংশ। যুদ্ধে এগুলো অপরাধ নয়।'

'কিন্তু রাশিয়ার সাথে তো মধ্য এশিয়ার কোন যুদ্ধ নেই। গ্রেট বিয়ার যা করছে, সেটা গুপ্ত হত্যা এবং নাশকতামূলক কাজের শামিল। তাকে তো যুদ্ধ বলে না আব্বা।'

‘তুমি খুব কঠিন মন্তব্য করেছ মা। তুমি জান না, জাতীয় যুদ্ধ রাষ্ট্রীয় যুদ্ধের চেয়ে ভিন্নতর হয়।’

‘কিন্তু আব্বা, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের বাইরে যে যুদ্ধই চলুক, তার নাম যা-ই দেয়া হোক, তা বেআইনি এবং আসলেই তা সন্ত্রাস।’

আলেকজান্ডার পিটারের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল বলল, ‘বলেছি মা, তুমি এসবের মধ্যে এস না। এসব তুমি বুঝবে না।’

‘কিছু মনে করো না আব্বা, আমার মন চায় আমার আব্বা এই ধরনের অন্যায় কাজে যুক্ত না থাকুক।’

‘তোমার আব্বা তার জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। আমি আমার স্বার্থে নয় আমি যা করছি জাতির স্বার্থে করছি।’

‘জাতির এ স্বার্থ দেখার দায়িত্ব রাষ্ট্রের, আমার আব্বার নয় বলে আমি মনে করি।’

‘রাষ্ট্র নানা কারনে জাতির সব স্বার্থ দেখতে পারে না মা।’

‘রাষ্ট্রীয় সরকার যদি জাতির কোন ন্যায্য স্বার্থ দেখতে না পারে, তাহলে বলতে হবে সে সরকার দূর্বল। তার ক্ষমতায় থাকার অধিকার নেই। আর যদি কোন শক্তিশালী জাতীয় সরকার জাতীয় কোন স্বার্থ রক্ষা বা অর্জন করতে সাহস না পায়, তাহলে বলতে হবে জাতির সে স্বার্থটা কোন ন্যায্য বা বৈধ্য স্বার্থ নয়। বর্তমান রুশ সরকারের ক্ষেত্রে প্রথমটা যদি সত্য হয়, তাহলে এ সরকারকে সরিয়ে নতুন সরকার গঠন করুন। আর যদি দ্বিতীয়টা সত্য হয়, তাহলে বর্তমান সরকারের ভূমিকা ঠিক আছে। গ্রেট বিয়ারই বাড়াবাড়ি করছে।’

‘ধন্যবাদ মা, আমি খুব খুশি হলাম। তুমি অনেক শিখেছ। কিন্তু এ শিক্ষার পরেও আরও শিক্ষা আছে। বয়স এবং সময়ের কাছ থেকেই সে শিক্ষা আসে। জাতির দাবীকে নিঃশর্ত কোন নীতিবোধের মানদন্ডে বিচার করে তুমি অস্বীকার করতে পার না।’

‘জাতির সে স্বার্থ যদি আরেক জাতির সর্বনাশ করতে চায়?’

‘যদি তা চায়, তাহলে চিন্তা-ভাবনা করেই চাইবে এবং তা তোমাকে মেনে নিতে হবে।’

‘দুঃখিত আব্বা, কারও সর্বনাশের বিনিময়ে কারও পোষ মাস হবে, এটা সভ্য সমাজের নীতি হতে পারে না।’

হাসল পিটার। বলল, ‘আহমদ মুসা আমাদের সর্বনাশ করেছে। বর্তমান সর্বনাশের মূলেও সেই নষ্টের গুরু। এই সর্বনাশের যাতে প্রতিকার হয় এবং ভবিষ্যতে এর পুনরাবৃত্তি না হয়, আমরা শুধু তা-ই চাচ্ছি।’

‘কিন্তু আব্বা আহমদ মুসার গোটা কাজটাই আত্মরক্ষামূলক। তিনি আক্রমনাত্মক ছিলেন না, এখনও নেই।’

‘থাক মা, এ বিষয়টা। তুমি যাও আমি আসছি।’

‘না, আব্বা, তুমি আমার সাথে যাবে।’

‘ঠিক আছে চলো, খেয়েই আসি।’

বলে বেরিয়ে এল দু’জন অফিস থেকে।

করিডোর দিয়ে তিন তলার দিকে চলতে চলতে তাতিয়ানা বলল, ‘আব্বা, এ হিংসার পথ রাশিয়ার পরিত্যাগ করা উচিত। পৃথিবীর ইতিহাসে আক্রমণকারী জাতি সব সময় নিন্দিত হয়েছে।’

‘ইতিহাস বড় কথা নয়। ইতিহাস নির্ভর করে তার লেখক এবং তার পরিবেশের ওপর। জাতির সামগ্রিক স্বার্থে যা করা হয় তা অন্যায় নয় মা।’

‘ব্যক্তির ওপর ব্যক্তির জুলুম যেমন অপরাধ, তেমনি এক জাতির ওপর অন্য জাতির জুলুমও অপরাধ।’

‘জাতির স্বার্থে এটা সব সময় হয়েছে। আমরা আজ যা করছি, আমাদের গ্রেট রাশিয়ার জন্যে তা প্রয়োজন।’

‘জুলুম-অত্যাচারের পক্ষেও যুক্তির অভাব হয় না আব্বা। আমরা যাই বলি, যা আমরা করছি তা ঘৃণ্য সাম্রাজ্যবাদ।’

আলেকজান্ডার পিটার মেয়ের পিঠ চাপড়ে আদর করে বলল, ’তুমি খুব রেগে গেছ মা। ভুলে যেও না, তুমি ‘পিটার দি গ্রেট'-এর বংশের মেয়ে। রশিয়ার স্বার্থই এ বংশের স্বার্থ।’

‘আব্বা, এ বংশের মেয়ে বলেই আমার দায়িত্ব রয়েছে কোন নতুন অন্যায় –অবিচার করা থেকে রাশিয়াকে বিরত রাখার এবং অতীত অন্যায়ের কিছু প্রতিকার করার।’

মেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে পিটার বলল, ‘একঘেয়েমী নিশ্চয় তোমাকে খুব ক্লান্ত করে ফেলেছে। তুমি কিছুদিন বেড়িয়ে এস ইউরোপ থেকে। তৈরী হও। আমি সব ব্যবস্থা করছি।’

পিতার প্রস্তাবের কোন জবাব দিল না তাতিয়ানা। গম্ভীর হয়ে উঠল তার মুখ।

খাবার কক্ষে ওরা এসে প্রবেশ করল।

ক’দিন পর।

তাতিয়ানা রাজধানী তাসখন্দের ন্যাশনাল সিকুরিটি হেডকোয়াটারে প্রশস্ত গেট দিয়ে প্রবেশ করল। দৃঢ়পায়ে সে এগিয়ে চলল বিল্ডিং- এ প্রবেশের মূল গেটের দিকে।

গেটের আগেই একজন স্মার্ট অফিসার এগিয়ে গিয়ে তার সামনে দাঁড়াল। বলল, ‘আমি কি জানতে পারি ম্যাডাম, আপনি কে, কোথায় যাবেন।’

তাতিয়ানার পরনে উজবেক পোশাক। মাথার রুমালটাও উজবেক স্টাইলে বাধা।

বাঁধা পেয়ে তাতিয়ানা দাঁড়িয়ে পড়ল। অফিসারটির প্রশ্নের জবাবে বলল, ‘আমার পরিচয়ের প্রয়োজন নেই। আমি আহমদ মুসার সাথে দেখা করতে চাই।’

উজবেক পোশাকে তাতিয়ানার রুশ চেহারা দেখে সিকুরিটি অফিসার বিস্মিত হয়েছিল, সেই সাথে তার মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিল। বলল সে, ‘মাফ করবেন ম্যাডাম, আপনার পরিচয় না বললে আপনাকে সাহায্য করতে পারবো না।’

‘দেখুন আমার পরিচয় আমি বলব না। এই মূহুর্তে আমি আহমদ মুসার সাক্ষাত চাই।’

‘দুঃখিত ম্যাডাম। আপনাকে কোন সাহায্য করতে আমি পারছি না।’

ঠিক এই সময়েই একটি কার এসে থামল গেটের সামনে।

গাড়িটি দেখেই অফিসারটি এ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল।

গাড়ি থেকে নেমে এল মধ্যএশিয়া মুসলিম প্রজাতন্ত্রের গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান আজিমভ।

অফিসারটি তাকে সালাম দিল। তারপর মার্চ করে আজিমভের দিকে এগিয়ে পা ঠুকে এ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে তাতিয়ানার সব কথা তাকে বলল।

সব শুনে আজিমভের মনে পড়ল তাতিয়ানার কথা। আহমদ মুসার কাছে সে শুনেছে রুগুন ড্যাম ধ্বংসের তারিখটি যে মেয়েটি তাদেরকে টেলিফোনে জানিয়েছিল, সেই মেয়েটি তাতিয়ানা। এই তাতিয়ান আহমদ মুসাকে বাঁচিয়েছিল গ্রেট বিয়ারের হেড কোয়ার্টারে। আজিমভও তাকে দেখেছে সেদিন। কিন্তু উজবেক পোশাক পরা এবং অন্যদিকে তাকিয়ে থাকার কারনে তাতিয়ানাকে সে চিনতে পারল না।

‘খারাপ ব্যবহার করনি তো তাঁর সাথে?’ অফিসারটিকে জিজ্ঞাসা করল আজিমভ।

‘না স্যার। উনি পরিচয় দিচ্ছেন না। আর আমি পরিচয়ের জন্যে চাপ দিচ্ছিলাম।’

‘ধন্যবাদ।’

বলে আজিমভ তাতিয়ানার দিকে এগুলো।

মুখ ফিরিয়ে আজিমভের দিকে তাকাল তাতিয়ানা। তাকিয়েই চিনতে পারল আহমদ মুসার সেদিনের সাথী আজিমভকে।

আজিমভও চিনতে পারল তাতিয়ানাকে।

তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলল, ‘সব শুনেছি আমি। আপনার অসুবিধা হওয়ার জন্যে দুঃখিত। আহমদ মুসা ভাই এখন এ অফিসেই আছেন। চলুন আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি।’

আজিমভ তাতিয়ানাকে হেডকোয়ার্টারের ভেতরে নিয়ে গেল। গ্রাউন্ড ফ্লোরের বড় একটি কক্ষের সুদৃশ্য দরজা দেখিয়ে বলল, 'আপনি যান, মুসা ভাই এ কক্ষ আছেন। ভেতরে গেলেই অফিস সেক্রেটারিকে পাবেন। তিনি আপনাকে আহমদ মুসার কাছে নিয়ে যাবেন। ওদের জানানো হয়েছে। মুসা ভাই আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

দরজা খুলেই তাতিয়ানা দেখতে পেল সেক্রেটারিকে। তাতিয়ানাকে দেখেই সে উঠে দাঁড়াল এবং তাতিয়ানাকে স্বাগত জানিয়ে তাকে নিয়ে পৌঁছে দিল আহমদ মুসার কক্ষে।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানাল তাতিয়ানাকে। বিস্মিত হলো সে তাতিয়ানাকে উজবেক পোশাকে দেখে।

বসতে বসতে আহমদ মুসার বিস্মিত দৃষ্টির চেয়ে তাতিয়ানা বলল, 'পোশাকটাকে ভালবেসে এ পোশাক আমি পরিনি, পরেছি নিজেকে আড়াল করার জন্যে।'

'তা আমি বুঝেছি। তবে এ পোশাক তুমি ভালবাসনা বটে, কিন্তু ঘৃণা অবশ্যই কর না। ঘৃণা না করাও এক ধরনের ভালবাসা।'

'আপনি কথার যাদু জানেন। জড়িয়ে পড়লে আর উঠতে পারব না।' ম্লান হেসে বলল তাতিয়ানা।

'তোমাকে এখানে দেখছি, এটা বাস্তবতা কিন্তু সত্যিই এটা একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার।'

'শত্রুকে এখানে অবশ্যই দেখার কথা নয়। সুতরাং অবিশ্বাস্য ভাববারই কথা।'

' কিন্তু তুমি শত্রু নও তা প্রমাণ করেছ এখানে এসে।'

'আমার প্রমাণ করা, আর আপনার বিশ্বাস করা এক জিনিস নয়।'

কথা শেষ করেই তাতিয়ানা আবার উঠে বলল, 'আমার হাতে একটুও সময় নেই, ফিরতে হবে এক্ষুণি।'

থামল তাতিয়ানা। গম্ভীর হয়ে উঠল তার মুখ। বলল, ‘শির দরিয়ার তীরের ছোট্ট শহর জা কুরগাতে গ্রেট বিয়ারের কংগ্রেস বসছে আজ মধ্যরাতে। মধ্য এশিয়া এলাকার সব প্রতিনিধি আজ এখানে আসছে।’

বলে তাতানিয়া তার পকেট থেকে একটা কাগজ আহমেদ মুসার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, ‘ঠিকানাটা এখানে লেখা আছে। কোন কারণে যদি এই ঠিকানায় ওদের পাওয়া না যায়, তাহলে নিচের বিকল্প ঠিকানায় ওদের অবশ্যই পাবেন।’

কন্ঠ যেন কাঁপছিল তাতিয়ানার।

কথা গুলো বলে একটা ঢোক গিলল তাতিয়ানা। তারপর আবার শুরু করল, ‘এ কংগ্রেস গ্রেট বিয়ারের অত্যন্ত গুরুত্বপর্ণ কংগ্রেস। এ কংগ্রেস ওদের যুদ্ধ ঘোষণার শেষ প্রস্তুতি। এরপর ওরা হত্যা ও ধ্বংসের একটা প্রবল ঝড় শুরু করবে।’

আহমদ মুসা রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে তাতিয়ানার দিকে। বাক রোধ হয়ে গেছে যেন আহমদ মুসার। গ্রেট বিয়ারের প্রধান আলেকজান্ডার পিটারের মেয়ে তাতিয়ানা তুলে দিচ্ছে তাদের হাতে গ্রেট বিয়ারের মৃত্যুবাণ!'

তাতিয়ানা তার কথা শেষ করলেও আহমেদ মুসা কথা বলতে পারছিল না। তাতিয়ানা যে আল্লাহর মূর্তিমান সাহায্য হয়ে তার সামনে হাজির। তাতিয়ানার প্রতি নিবদ্ধ আহমদ মুসার দৃষ্টিতে বিস্ময়-বিমুগ্ধার সাথে অঢেল কৃতজ্ঞতা।

তাতিয়ানা কথা বলে উঠল। বলল, ‘আমি উঠি।’

বলে উঠতে গেল তাতিয়ানা।

‘তাতিয়ানা।’ ডাকল আহমেদ মুসা

‘বলুন’ পূনরায় বসতে বসতে বলল তাতিয়ানা।

‘রুগুন ড্যাম রক্ষায় তুমি আমাদের সহযোগিতা করেছ। আজ যে সাহায্য তার কোনো পরিমাপ নেই।’ গম্ভীর আহমদ মুসার কন্ঠ।

তাতিয়ানা মাথা নিচু করল। বলল, ‘আমি এ কৃতজ্ঞতা চাইনি।’

‘এ কৃতজ্ঞতা নয়, তাতিয়ানা আমার মনের একটা প্রকাশ। একটা কথা জিজেস করতে পারি?’

'করুন।' একবার আহমদ মুসার দিকে চেয়ে চোখ নামিয়ে উত্তর দিল তাতিয়ানা।

'গ্রেট বিয়ারের কোন খোঁজই তো রাখ না। এ গুরুতর তথ্য পেলে কি করে'

সংগে সংগে উত্তর দিল না তাতিয়ানা। একটু সময় নিয়ে বলল, 'আব্বার ওয়্যারলেস ও টেলিফোনে আঁড়ি পেতেছিলাম। তাছাড়া ফ্যাক্স মেসেজগুলোও আমি পড়েছি।'

'আপনি অনেক কষ্ট করেছেন আমাদ........।'

'মাফ করবেন, এই মূল্যের জন্য আমি এ কাজ করিনি।' আহমেদ মুসার কথায় বাধা দিয়ে একথা বলতে বলতে তাতিয়ানা উঠে দাঁড়াল।

'ধন্যবাদ জানানো কি দোষের?' বলল আহমদ মুসা।

'যে তার জাতির সাথে বিশ্বাস ভংগের কাজ করেছে তার জন্য ওটা প্রাপ্য নয়।'

বলে তাতিয়ানা ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।

সে চলে গেলেও স্তম্ভিত আহমদ মুসা তার যাত্রা পথের দিকে চেয়ে রইল। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল তাতিয়ানার নতুন মুখটি। মনে হলো দুঃসহ এক সংঘাতে বিপর্যস্ত হচ্ছে সে।

মনটা খারাপ হয়ে গেল আহমদ মুসার।

ধীরে ধীরে চোখটা টেনে নিয়ে আহমদ মুসা তাকাল ইন্টারকমের দিকে। যোগাযোগ করল আজিমভের সাথে। বলল, 'তুমি তাড়াতাড়ি এখানে এস। অনেক কাজ আছে। আজ মধ্যরাতের আগে আমাদেরকে শির দরিয়ার তীরে কুরগা পৌঁছেতে হবে।'

আজিমভের সাথে কথা শেষ হলে আহমদ মুসা লাল টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিল হাতে। এ টেলিফোনের সাথে আছে প্রেসিডেন্টের ডাইরেক্ট লাইন। প্রেসিডেন্টের সাথে যে ওয়্যারলেস থাকে সার্বক্ষণিকভাবে, তার সাথেও যুক্ত আছে এই টেলিফোনটি।

শির দরিয়া থেকে পঞ্চাশ গজের মত দূরে একটা বিরাট বাড়ি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। চারিদিক থেকে প্রাচীর ঘেরা। বাইরে কোনো আলো নেই। বাড়ীর নিচের তলায় জানালা দিয়ে আলোর রেশ পাওয়া যাচ্ছে।

রাত তখন ১২টা ৩০ মিনিট। চারিদিক থেকে চারটা দল এসে বাড়িটা ঘিরে ফেলল। মাত্র দ'জন ছাড়া সকলের পরনে সৈনিকের পোশাক। এই দু'জনের একজন আহমদ মুসা, আরেকজন আজিমভ।

এই বাড়িটিরই ঠিকানা দিয়েছিল তাতিয়ানা। যেখানে মধ্যরাতে গ্রেট বিয়ারের কংগ্রেস অধিবেশন বসার কথা।

শির দরিয়ার উত্তর তীরে 'জা-কুরগা' শহরটি। ছোট শহর, কিন্তু অর্থ-বিত্তে সমৃদ্ধ। এখানে নদীর পাড়ে শত শত মাইল জুড়ে গড়ে উঠেছে বড় বড় কৃষি ফার্ম।

এই ঠিকানা খুঁজে পেতে দেরি হয়নি আহমদ মুসাদের।

মিউনিসিপ্যাল রেকর্ডে বাড়িটির লোকেশন পাওয়া গেছে, সেই সাথে বাড়িটির নক্সাটাও। খুব উপকার হয়েছে এতে। আগে থেকে কোন পথে এগুবে তার একটা পরিকল্পনা করে নিয়েছে আহমদ মুসা।

বাড়িটি ঘিরে ফেলার জন্য গোটা একটি ব্যাটেলিয়ন ইউনিট নিয়োগ করেছে আহমদ মুসা। গ্রেট বিয়ারকে ভাল করে চিনেছে আহমেদ মুসা। শেষ পর্যন্ত লড়াই করে ওরা। জয় এবং মৃত্যুর বাইরে কোন বিকল্প কথা ওরা জানেনা। ওদের অনেককেই আহমদ মুসা তার নিজের চোখের সামনে মরতে দেখছে। ওদের আর মরতে দিতে চায়না সে, ধরতে চায় জীবন্ত। বিশেষ করে এ কংগ্রেসে যারা এসেছে তারা সকলেই গ্রেট বিয়ারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি । ওদের ধরতে পারলে গ্রেট বিয়ারের গোটা নেটওয়ার্ককে হাতের মুঠোয় আনা সম্ভব হবে।

বাড়িটি ঘিরে ফেলার পর আহমদ মুসার পরিকল্পনা ছিল নীরব প্রাচীর ডিঙিয়ে ভেতরে প্রবেশ ওদের সম্মেলন কক্ষে ক্লোরোফরম বোমা পাতা। যাতে কোনো প্রকার ক্ষতি ও লোক হত্যা ছাড়াই সকলকে গ্রেপ্তার করা যায়।

পরিকল্পনা অনুসারে বাড়ির পেছন দিকে প্রাচীর ডিঙাবার যখন প্রস্তুতি নিচ্ছে আহমদ মুসা, ঠিক সেই সময়ই বিপরীত দিকের প্রাচীরের প্রধান গেট

এলাকা থেকে প্রচন্ড গোলা-গুলির শব্দ ভেসে এল। অনেকগুলো সাব মেশিনগান একসাথে গুলি বর্ষণ করছে।

ওয়াকিটকিতে কমান্ডারের কন্ঠ ভেসে এল। বলল, ‘হঠাৎ প্রধান গেট খুলে যায়। সাব মেশিনগান থেকে গুলি করতে করতে ওরা দশ বার জন বেরিয়ে এসেছে। নিরুপায় হয়ে আমাদেরও গুলি করতে হয়েছে। ওদের দশ বার জনের কেউ বোধ হয় বেচেঁ নেই। আমরা কি ভেতরে ঢুকবো?’

‘হ্যাঁ, তোমরা ভিতরে ঢুকে হল ঘিরে ফেল। গ্যাসের মুখোশ পরতে নির্দেশ দাও সকলকে। গুলি করে কাঁচের জানালা ভেঙে ফেলে ক্লোরোফরম বোমা নিক্ষেপ কর, বাইরের বেষ্টনী যেন না ভাঙে দেখবে, ওদের কাউকে পালাতে দেয়া যাবেনা।’

এই নির্দেশ দেবার পর আহমেদ মুসা প্রাচীর ঘুরে এগিয়ে কারা মারা গেল দেখতে হবে। এরা গ্রেট বিয়ারের কর্মী না কংগ্রেস সদস্য? এর মধ্যে আলেকজান্ডার পিটার নেই তো!

আহমদ মুসা বুঝল, তাদের সদল-বলে উপস্থিতি ওরা টের পেয়েছে। টের পাবার পর দুঃসাহসী ওরা বেরিয়ে এসেছিল প্রাচীরের বাইরে আমাদের গতি থামিয়ে দিতে এবং অবরোধ ভেঙে ফেলতে।

আহমদ মুসা গেটে পৌঁছার আগেই ভেতরে আবার গোলা-গুলি শুরু হয়ে গেল।

গেটে পৌঁছল আহমদ মুসা। গেটে যারা নিহত হয়েছে, তাদের দিকে নজর বুলাল সে। না, তাদের মধ্যে আলেকজান্ডার পিটার নেই, থাকার কথাও নয়।

ভেতরে প্রবেশ করল আহমদ মুসা। গোলা-গুলি তখনও চলছিল।

আহমদ মুসা হামাগুড়ি দিয়ে এগুলো হলের গ্রাউন্ড ফ্লোরের প্রধান হলের দিকে, যেখানে গ্রেট বিয়ারের কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হচ্ছিল।

অভিযানের কমান্ডার ও আজিমভ হামাগুড়ি দিয়ে ছুটে এল আহমদ মুসার কাছে। বলল কমান্ডার, স্যার আমরা ঘর সম্পূর্ণ ঘিরে ফেলেছি। ওরা বের

হবার সুযোগ পায়নি। হলের জানালা সব চূর্ণ হয়ে গেছে। ক্লোরোফরম বোমা আমরা ছুড়েছি চারদিক থেকে। ওদের গুলি প্রায় থেমে গেছে।

হলের প্রধান গেটে গিয়ে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা। দরজা টানল। ভেতর থেকে বন্ধ।

পাশের জানালা দিয়ে উঁকি দিল। দেখল, বিপর্যস্ত কক্ষ। মানুষগুলো ঘুমিয়ে পড়েছে, যে যেখানে যেভাবে ছিল সেভাবেই। বিচিত্র সে দৃশ্য যেন লাশের বিভৎস-বিশৃঙ্খল এক মিছিল।

ভাঙা জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকল আহমদ মুসা। তারপর খুলে দিল দরজা। বলল আজিমভকে, 'ঘন্টা খানেকের মধ্যেই তো এদের জ্ঞান ফিরবে। আপাতত এদেরকে নিয়ে আটকে রাখতে বল। কিন্তু আজ রাতেই এদের সরিয়ে নিতে হবে তাসখন্দে।'

বলে আহমদ মুসা দ্রুত চলল মঞ্চের দিকে। আলেকজান্ডার পিটার মঞ্চেই থাকার কথা।

কিন্তু মঞ্চে যাদেরকে সংজ্ঞাহীন দেখল, তাদের মধ্যে আলেকজান্ডার পিটারকে পেল না।

মন খারাপ হয়ে গেল আহমদ মুসার। আসল লোকটাই তাদের হাতছাড়া হয়ে গেল। কিন্তু পালাল কিভাবে? আজকের ঘেঁরাও ফাঁকি দিয়ে অবশ্যই কেউ যেতে পারেনি। তাহলে?

হঠাৎ আহমদ মুসার নজরে পড়ল মঞ্চে চেয়ারের সারিতে ঠিক মাঝখানের একটা চেয়ার নেই। জায়গাটা ফাঁকা পড়ে আছে। হঠাৎ আহমদ মুসার মনে একটা আশার আলো ঝিলিক দিয়ে গেল।

আহমদ মুসা ছুটে গেল যেখানে চেয়ার নেই সেই ফাঁকা জায়গায়। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে ধরল কাঠের পাটাতনের নির্দিষ্ট সেই জায়গাটায়। টেবিলের প্রান্ত সীমার বরাবর নিচে যেখানে সাধারণত পা থাকে সেখানে কাঠ রংয়ের একটা বোতাম দেখতে পেল। চেয়ারের স্থানে দাঁড়িয়ে বাম পা দিয়ে বোতামে চাপ দিল আহমদ মুসা। সংগে সংগে পায়ের নিচের কাঠটা নড়ে উঠল এবং চোখের পলকে আহমদ মুসাকে নিয়ে কাঠের অংশটুকু দ্রুত নিচে নামতে লাগল। যখন নামা শেষ হলো

সে নিজেকে দেখল একটা উম্মুক্ত কক্ষে। আহমদ মুসা বুঝল, আলেকজান্ডার পিটার এই পথেই পালিয়েছে। কোথায় পালাল?

হঠাৎ আহমদ মুসার মনে পড়ল তাতিয়ানার দেয়া দ্বিতীয় ঠিকানার কথা। বিকল্প এই ঠিকানা অল্প কিছুটা পশ্চিমে এই শির দরিয়ার তীরেই। সিটিম্যাপে লেখা ঠিকানাটি আহমদ মুসার চোখের সামনে জ্বল জ্বল করে ভেসে উঠল।

আহমদ মুসা কক্ষ থেকে বের হয়ে দক্ষিণে নদীর দিকে ছুটল। নদীর তীর ঘেষে যে সুন্দর রাস্তা তৈরী হয়েছে তার ডান পাশে রাস্তার সাথে লাগানো সেই বাড়িটা।

আহমদ মুসা বাড়িটার পাশে পৌঁছতেই গুটি গুটি পায়ে একজন এসে আহমদ মুসার সামনে দাঁড়াল। বলল, 'স্যার মিনিট দুই আগে একজন এসে এ বাড়িতে ঢুকেছে। তার হাতে স্টেনগান ছিল। হুকুম না পেলে কিছু করার নির্দেশ নেই বলে আমরা কিছু করিনি।'

'ঠিক আছে। পাহারা ঠিকমত চলছে তো?' বলল আহমদ মুসা।

'জি স্যার।'

'যাও, নির্দেশ না পেলে কিছু করবে না।'

চলে গেল প্রহরী সৈনিকটি।

আহমদ মুসা ধীরে ধীরে গিয়ে গেটের সামনে দাঁড়াল।

বাড়িটি ছোট্ট একটি দু'তলা বাড়ি বলে মনে হবে। কিন্তু ছোট নয় বাড়িটি। এক তলায় অনেকগুলো ঘরসহ বিশাল একটি হলঘর। দু'তলায় মাত্র গোটা দুই তিনেক কক্ষ। উঁচু প্রাচীর ঘেরা বাড়িটির বাইরে থেকে দু'তলাটাই শুধু দেখা যায়।

সন্দেহ নেই আহমদ মুসার, আলেকজান্ডার পিটারই এসে এ বাড়িতে ঢুকেছে।

গেটের দরজা ঠেলে দেখল আহমদ মুসা। দরজা বন্ধ।

দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকা যায়। কিন্তু তা করলে এখনি সংঘাত শুরু হয়ে যাবে আলেকজান্ডার পিটারের সাথে। কিন্তু আহমদ মুসা তার সাথে সংঘাত নয়, গ্রেপ্তার করতে চায় গ্রেট বিয়ারের চীফ আলেকজান্ডার পিটারকে।

গেটের পাশেই প্রাচীর ডিঙিয়ে আহমদ মুসা ভেতরে গিয়ে পড়ল। ভেতরে পড়েই আহমদ মুসা দ্রুত গিয়ে দরজা খুলে দিল।

দরজা খুলে দিয়ে চারদিকটা একবার দেখে নিয়ে এগুতে যাবে এমন সময় দেখল এক তলার ছাদে একটা ছায়া মূর্তি। আহমদ মুসা সংগে সংগেই নিজের দেহটা মাটির ওপর ছুড়ে দিয়ে গড়িয়ে গিয়ে দরজার দক্ষিণ পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা একটা গাড়ির আড়ালে লুকাল।

আহমদ মুসা মাটিতে পড়ার সংগে সংগেই স্টেনগানের একপশলা গুলি তার ওপর দিয়ে চলে গেল। দাঁড়িয়ে থাকলে আহমদ মুসার মাথা ও বুক ঝাঝরা হয়ে যেত।

আহমদ মুসা গাড়ির আড়ালে লুকানোর পর গাড়ির ওপর বৃষ্টির মত গুলি বর্ষণ হতে শুরু করল। মুহুর্তেই গাড়ির কাঁচ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল।

গাড়িটার সামনের দিকটা পশ্চিমে। পশ্চিম দিক থেকেই গুলি আসছে। সুতরাং গাড়িতে উঠার কোন উপায় নেই।

আহমদ মুসা গাড়ির পেছনে কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে ধীরে ধীরে গাড়ির পাশ দিয়ে তাকাল এক তলার ছাদের দিকে। দেখল, ছায়া মূর্তিটি গুটি গুটি করে এগুচ্ছে ছাদের দক্ষিণ অংশের দিকে। আহমদ মুসার বুঝার বাঁকি রইল না যে, লোকটি গাড়ির পেছন দিকটাকে তার স্টেনগানের আওতায় আনতে চাচ্ছে।

আহমদ মুসা তার স্টেনগান থেকে লক্ষ্যহীন এক পশলা গুলি করে গড়িয়ে সরে এল গাড়ির উত্তর পাশে। লক্ষ্যহীন গুলি করার পর, আহমদ মুসা নিশ্চিত হলো যে ছায়ামূর্তিটিই আলেকজান্ডার পিটার। আহমদ মুসা তাকে হত্যা নয়, জীবন্ত ধরতে চায়।

আহমদ মুসার গুলির জবাবে আলেকজান্ডার পিটারের তরফ থেকে গুলির বৃষ্টি ছুটে এল আবার গাড়ি লক্ষ্যে।

গুলি বৃষ্টি থামলে আহমদ মুসা উচ্চ কণ্ঠে আলেকজান্ডার পিটারকে লক্ষ্য করে বলল, ‘পিটার এ বাড়িটাও ঘিরে ফেলা হয়েছে। পালাবার আপনার আর কোন পথ নেই। আপনি আত্মসমর্পণ করুন।’

জবাবে এল আবার বৃষ্টির মত গুলি। আলেকজান্ডার পিটার গুলি করতে করতে ছাদের উত্তরদিকে ছুটে এল।

আহমদ মুসা আবার গড়িয়ে গাড়ির পেছনে চলে গেল।

হঠাৎ ওপাশ থেকে গুলি থেমে গেল।

আহমদ মুসা মাথা তুলে দেখল, আলেকজান্ডার পিটার ছাদের এ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। বুঝল, ওর স্টেনগানের গুলি শেষ।

'পিটার আত্মসমর্পণ কর।' উচ্চ কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

'ভালই হলো, শেষ লড়াইটা তোমার সাথেই হচ্ছে। আমি এটাই চাচ্ছিলাম।' চিৎকার করে কথাগুলো বলে আলেকজান্ডার পিটার হাত থেকে স্টেনগানটা ছাদের ওপর ফেলে দিয়ে লাফিয়ে পড়ল নিচে চত্তরে।

তার কাঁধে ঝুলানো একটা ব্যাগ।

নিচে লাফিয়ে পড়ার পর কাঁধ থেকে ব্যাগটাও মাটিতে ফেলে দিল। আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়েছিল। সে তার হাত থেকে স্টেনগানটা ফেলে দিল। পিটারকে মারা নয়, ওকে ধরতে হবে।

আহমদ মুসা স্টেনগান ফেলে দিয়ে সহজভাবে আলেকজান্ডার পিটারের দিকে চেয়ে নরম কণ্ঠে বলল, 'পিটার প্রত্যেক কাহিনীরই একটা শেষ আছে। আজ আপনার হিংসাত্মক আন্দোলন শেষ দৃশ্যে পৌঁছেছে। আপনি আত্মসমর্পণ করুন।'

কোন জবাব দিল না আলেকজান্ডার। শিকারী নেকড়ের মত সে এক পা এক পা করে আহমদ মুসার দিকে এগুচ্ছে।

আহমদ মুসা আলেকজান্ডার পিটারের দিকে কয়েক ধাপ এগোবার পর স্থির দাঁড়িয়ে আছে। আক্রমণের কোন পোজ তার দেহে নেই। শুধু তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটি আলেকজান্ডার পিটারের হাত, পা, চোখের প্রতিটি নড়া চড়া লক্ষ্য করছে।

কাছাকাছি পৌঁছে আলেকজান্ডার পিটার হঠাৎ কোমরে লুকানো ছুরি বের করে নিল তার হাতে। হেসে উঠল হাঁ হাঁ করে।

একেবারে কাছে এসে পৌঁছে গেছে আলেকজান্ডার পিটার। ডান হাতে সে ছুরিটাকে বাগিয়ে ধরেছে।

আহমদ মুসা তার পা দু'টি ঈষৎ ফাঁক করে স্থির দাঁড়িয়ে। তাঁর অপলক চোখ আলেকজান্ডার পিটারের চোখের ওপর।

আলেকজান্ডার পিটার যখন ঝাঁপিয়ে পড়ার পজিশনে এসে দাঁড়িয়েছে, সে সময় আহমদ মুসার মাথা হঠাৎ নিচে নেমে গেল। আর নিচের থেকে তার পা দু'টি বিদ্যুৎ গতিতে ওপরে উঠে এল। তার জোড়া লাথি গিয়ে পড়ল আলেকজান্ডার পিটারের ডান হাতে। তার হাত থেকে ছুরিটি ক্রিকেট বলের মত উড়ে গিয়ে অনেক দূরে পড়ল।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াচ্ছিল। তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আলেকজান্ডার পিটার।

এ অংক আহমদ মুসার আগে থেকেই কষা ছিল। সে তার প্রস্তুত দেহটাকে একটু সরিয়ে নিল এক পাশে।

আলেকজান্ডার পিটার আছড়ে পড়ল মাটির ওপর।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়েছিল। অপেক্ষা করছিল আলেকজান্ডার পিটার উঠা পর্যন্ত। কিন্তু আলেকজান্ডার পিটারের উঠার কোন লক্ষন নেই।

পড়ে জ্ঞান হারিয়া ফেলল নাকি? এই চিন্তা করে আহমদ মুসা তার দিকে এগিয়ে গেল। পা দিয়ে আলেকজান্ডারের একটা পায়ে আঘাত করল। না কোন সাড়া নেই।

চমকে উঠল আহমদ মুসা। সেই পটাসিয়াম সাইনাইডের কাজ নয়তো?

দ্রুত আহমদ মুসা আলেকজান্ডার পিটারের দেহটা ঠেলা দিয়ে চিৎ করল। দেখল যা ভেবেছিল তাই। আলেকজান্ডার পিটার তার ডান হাতের মধ্যমা আঙুলের আংটিটি কাঁমড়ে ধরে আছে।

আহমদ মুসা আলেকজান্ডার পিটারের দেহটা পরীক্ষা করে উঠে দাঁড়াচ্ছিল, এই সময় গেট দিয়ে সেখানে ঝড়ের বেগে প্রবেশ করল তাতিয়ানা।

সে তার পিতা আলেকজান্ডার পিটারের দেহের দিকে মুহুর্তকাল অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার প্রাণহীন পিতার বুকে। চিৎকার উঠল তার কন্ঠ চিরে, 'আব্বা। আমার আব্বা।'

উঠে দাঁড়িয়েছিল আহমদ মুসা। ঐ দৃশ্যের দিকে একবার তাকিয়ে দু'হাতে মুখ ঢাকল।

রাতের নিঃশব্দ প্রহর। বাপ হারা মেয়ের বুক ফাটা কান্না সে নিঃশব্দের মাঝে যেন এক হৃদয় বিদারক সংগীত।

আজিমভ এবং অন্যান্যরা এসে আহমদ মুসার পেছনে দাঁড়িয়েছিল।

তখন অনেকখানি শান্ত হয়ে এসেছে তাতিয়ানার কান্না। পড়েছিল সে পিতার বুকে।

আহমদ মুসা এগিয়ে গিয়ে একটু ঝুকে পড়ে ধীরে ধীরে হাত রাখল তাতিয়ানার পিঠে।

মুখ তুলে তাকাল তাতিয়ানা আহমদ মুসার দিকে। চোখের পানিতে ভেসে গেছে তার সারা মুখ। আলু-থালু তার চুল।

আহমদ মুসা কোন কথা বলতে পারল না। শুধু তাকিয়ে রইল তাতিয়ানার সাগরের মত গভীর নীল চোখের দিকে।

আবার ফুপিয়ে কেঁদে উঠল তাতিয়ানা। দু'হাতে মুখ ঢাকল সে।

আহমদ মুসা নির্বাক। তাতিয়ানাকে সান্ত্বনা দেবার সাধ্যও সে যেন হারিয়ে ফেলেছে।

অনেকক্ষণ পর তাতিয়ানা কিছুটা শান্ত হলো। চোখ মুছল সে। উঠে দাঁড়াল। তারপর চারদিকে চাইল। দেখতে পেল দূরে তার আব্বার কালো ব্যাগ।

ধীরে ধীরে এগুলো তাতিয়ানা সেদিকে।

ব্যাগ খুলল। খুঁজে বের করে নিল ভাজ করা কাগজ। তারপর ব্যাগটা নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল আহমদ মুসার কাছে।

এসে দাঁড়াল তার সামনে।

চোখ তুলে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। তারপর ভাজ করা কাগজটি আহমদ মুসার দিকে তুলে ধরে বলল, 'গ্রেট বিয়ারের গোটা নেটওয়ার্কের বিস্তারিত সব এখানে আছে।' অত্যন্ত শান্ত কন্ঠস্বর তাতিয়ানার। কিন্তু কথাগুলো ভাসছে যেন অশ্রুর সাগরে। একটু নাড়া লাগলেই তা যেন অথৈ অশ্রুতে হারিয়ে যাবে।

আহমদ মুসার দু'গন্ড বেয়ে নেমে এল অশ্রুর দু'টি ধারা।

হাত পেতে নিল আহমদ মুসা সে কাগজটি। তারপর তা এগিয়ে দিল মধ্যএশিয়া মুসলিম প্রজাতন্ত্রের গোয়েন্দা প্রধান আজিমভের হাতে।

# ৭

আহমদ মুসা তার ঘরে প্রবেশ করে দেখল, তাতিয়ানা সোফায় বসে আছে। মাথা তার নিচু। চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে।

ধীরে ধীরে আহমদ মুসা গিয়ে তার পাশের সোফায় বসল।

চমকে উঠে মুখ তুলল তাতিয়ানা।

চেয়ে রইল আহমদ মুসার দিকে গভীর দৃষ্টিতে।

চোখ নামিয়ে আহমদ মুসা বলল, 'আমি দুঃখিত তাতিয়ানা, তোমার আব্বা বেঁচে থাকুন আমি চেয়েছিলাম।'

'আমি কি অভিযোগ করেছি?' চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল তাতিয়ানা।

'এ অভিযোগ করতে হয় না তাতিয়ানা, অশ্রুর চেয়ে গভীর অর্থবহ ভাষা আর নেই।'

'অশ্রুর সে ভাষায় কি কোন অভিযোগ ছিল?'

'অশ্রুর উৎস যে বেদনা তা আঘাত থেকেই উৎপন্ন হয় তাতিয়ানা।'

'সে আঘাতের উৎস তো আমিই।'

'কিন্তু এর পেছনে আপনার সামান্য অনুরোধও ছিল না।'

'সে জন্যেই দুঃখটা আমার বেশি। তুমি নিজের বুলেটে নিজেকে বিদ্ধ করেছ। কেন করেছ বলতে পার?'

তাতিয়ানা চোখ নামিয়ে নিল আহমদ মুসার দিক থেকে। অনেকক্ষণ কোন জবাব দিল না তাতিয়ানা। মনে মনে ভাবল সে, হতে পারে রাশিয়ার পিটার দি গ্রেটের বংশ একটা পূণ্য এবার করল।

দাঁড়াল তাতিয়ানা। একটা ঢোক গিলল। তারপর আবার শুরু করল, 'দুঃখটা আপনার কেন? এটা কি পিটার দি গ্রেটের বংশের একটা অসহায় মেয়ের প্রতি করুণা?'

‘না তাতিয়ানা, তুমিই করুণা করেছ আমাদের প্রতি। যা করেছ তার প্রতি আমাদের কোন দাবী ছিল না।’

‘না আমি করুণা করিনি। কেন করুণা করবো?’ আবেগে কাঁপল তাতিয়ানার কন্ঠ।

দরজায় নাক হলো এ সময়।

‘এস।’ আহমদ মুসা বলল।

দরজা খুলে দরজায় এসে আজিমভ বলল, ‘মুসা ভাই একটা জরুরী চিঠি।’

চিঠিটা আহমদ মুসার হাতে দিয়ে আজিমভ চলে যাচ্ছিল।

‘দাড়াও আজিমভ। চিঠিতে কি আছে দেখি।’

আজিমভ দাঁড়াল।

‘মাপ কর তাতিয়ানা।’ বলে আহমদ মুসা চিঠির দিকে মনোযোগ দিল।

চিঠির খামে ফিলিস্তিন দূতাবাসের সীলমোহর। আর খামের ডান কোণে লাল কালিতে লেখা ‘জরুরী’।

খাম ছিড়ে চিঠি বের করে মেলে ধরল চোখের সামনে।

তাতিয়ানা এবং আজিমভ দুজনেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ আহমদ মুসার মুখের ওপর।

চিঠি পড়তে পড়তে ম্লান হয়ে গেল আহমদ মুসার মুখ। একটা বেদনার কালো ছায়া নেমে এল আহমদ মুসার মুখের ওপর।

চিঠি পড়া শেষ করে চোখ বুঝল আহমদ মুসা।

‘কোন দুঃসংবাদ মুসা ভাই?’ আজিমভের কন্ঠে উদ্বেগের সুর।

চোখ খুলল আহমদ মুসা।

ম্লান হাসল। বলল, ‘দুঃসংবাদ আজিমভ। ফ্রান্সে হতভাগা ওমর বায়া আবার কিডন্যাপ হয়েছে।’

‘কারা কিডন্যাপ করেছে?’

‘ক্যামেরুনের সেই সন্ত্রাসীদের পক্ষে ফ্রান্সের কোন ভাড়া করা গ্রুপ নিশ্চয়।’

একটু থামল আহমদ মুসা। আবার বুজে এল তার চোখ। পরক্ষণেই আবার চোখ খুলে বলল ‘জানি না বেচারা বেঁচে আছে কি না, বেঁচে থাকবে কি না।’ খুব ভারী শোনাল আহমদ মুসার কন্ঠ।

মুহুর্তে চেহারাটা পাল্টে গেছে আহমদ মুসার। মনে হচ্ছে সে যেন এদেশে আর নেই।

‘কিন্তু ওমর বায়ার জন্যে ওরা এতটা মরিয়া হয়ে উঠেছে কেন?’ বলল আজিমভ।

‘ওমর বায়া এখন ব্যক্তিমাত্র নয় আজিমভ। এখন ক্যামেরুনের মজলুম একটা জাতির প্রতীক। তারা ভাবছে আজ, ওমর বায়ার কাছে যদি তারা পরাজিত হয়, তাহলে ক্যামেরুনে তাদের জুলুমও পরাজয় বরণ করবে। তাই ওমর বায়াকে তারা কব্জা করবেই, নয়তো হত্যা করবেই।’ বলতে বলতে আহমদ মুসার চোখ আবেগে ও বেদনায় নীল হয়ে গেল।

তাতিয়ানা অপলকে তাকিয়েছিল আহমদ মুসার দিকে।

কথা শেষ করে আহমদ মুসা দেয়ালের ক্যালেন্ডারের দিকে চাইল। তারপর বলল, ‘আজিমভ প্যারিসের একটা টিকিটের ব্যবস্থা কর। সবচেয়ে আগে যে ফ্লাইটটি ওখানে পৌঁছবে সেই ফ্লাইটের।’

‘আজই!’ আজিমভের কন্ঠে অনেকটা প্রতিবাদের সুর।

‘এমনিতেই যথেষ্ট দেরী হয়ে গেছে।’

‘কিন্তু আপনার মদিনা শরীফ যাওয়ার কথা।’ স্মরণ করিয়ে দিল আজিমভ।

আহমদ মুসা মুখ নিচু করল। একটা বেদনার ছায়া খেলে গেল তার মুখের ওপর দিয়ে।

ভাবল আহমদ মুসা। তারপর বলল, ‘ঠিক আছে, তুমি মদিনা শরীফ হয়ে প্যারিসের একটা টিকিট কর।’

আজিমভ বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

তাতিয়ানা মুখ নিচু করে বসে ছিল। বেদনায় জর্জরিত তার মুখ।

আজিমভ বেরিয়ে গেলে আহমদ  মুসা তাতিয়ানার দিকে চেয়ে বলল, ‘দুঃখিত তাতিয়ানা, পৃথিবীটাকে আমরা দুর্যোগময় করে তুলেছি। সমস্যা এবং সংকটের শেষ নেই।’

কোন কথা বলল না তাতিয়ানা। মাথাও তুলল না।

‘ফ্রান্সে যেতে হবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি আমি।’ বলল আহমদ মুসাই আবার।

‘আপনি ওখান থেকে ফিরছেন কবে?’ গম্ভীর কন্ঠে জিজ্ঞেস করল তাতিয়ানা।

তৎক্ষণাৎ জবাব দিল না আহমদ মুসা। একটু পর বলল, ‘ আমি জানি না তাতিয়ানা। ফ্রান্সে যাবার পরিকল্পনা ছিল না, কিন্তু যাচ্ছি। সেইভাবে আসতেও পারি আবার।’

আবার মুখ নত করল তাতিয়ানা।

‘তাতিয়ানা।’ ডাকল আহমদ মুসা।

‘বলুন।’ মুখ না তুলেই জবাব দিল তাতিয়ানা।

‘আমাকে মাফ করে দিও তাতিয়ানা। তোমার সাথে আমার দেখা আমাদের উপকৃত করেছে, কিন্তু ক্ষতি করেছি তোমার।’ ভারী এবং নরম কন্ঠস্বর আহমদ মুসার।

তাতিয়ানা মুখ তুলে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। তার দু’চোখ ভরা অশ্রু। কাঁপছিল তার ঠোঁট।

কথা বলতে পারলো না। আবার চোখ নামিয়ে নিল সে।

তাতিয়ানার এই নিরবতা ও নিরব অশ্রুর সামনে আহমদ মুসা নিজেকে খুবই বিব্রতবোধ করল। বিপর্যস্ত এই মেয়েটার প্রতি হৃদয়ের কোথায় যেন একটা বেদনা চিন চিন করে উঠল। তার দু’চোখ ভরা অশ্রুর মধ্যে একান্ত আপন এক আশ্রয়ের আকুতি আছে। হৃদয়ের চিন চিনে বেদনাটার পাশে আহমদ মুসা একটা অস্বস্তিও অনুভব করল।

সে অস্বস্তিটা দূরে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করে আহমদ মুসা বলল, ‘ তাতিয়ানা মধ্যএশিয়া মুসলিম প্রজাতন্ত্র চিরদিন তোমার কাছে কৃতজ্ঞতার পাহাড়

প্রমাণ ঋণে বাধা থাকবে। প্রেসিডেন্ট আমাকে জানিয়েছেন, তারা তোমাকে মধ্যএশিয়ার নাগরিকত্ব দিয়েছেন। তাসখন্দের সবচেয়ে অভিজাত এলাকায় তোমাকে একটা বাড়ি দিয়েছেন। চাকুরী কিংবা ব্যবসায় বা যা তুমি করতে চাও তার ব্যবস্থা করে দেবেন তারা। আর.........'

আহমদ মুসাকে বাধা দিল তাতিয়ানা। বলল, ' না এসব বলবেন না। অন্তত আপনি বলবেন না। সইতে পারবো না।' বলে কান্নায় ভেঙে পড়ল তাতিয়ানা।

কাঁদতে কাঁদতে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আমি চলি।'

'কোথায় যাবে?'

'আমি জানি না।' মুখ নিচু করে বলল তাতিয়ানা।

'তাতিয়ানা।' ডাকল আহমদ মুসা।

অশ্রু ধোয়া মুখ তুলে ধরল তাতিয়ানা। কথা বলল না।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। তাতিয়ানার দিকে কয়েক পা এগিয়ে বলল, ' তোমার জন্যে আমাদেরকে কিছু ভাববার, কিছুই করার সুযোগ দেবে না তাতিয়ানা?'

'না, আমার জন্যে আর কারও কিছু করার নেই।'

'আমারও তো একটা মন আছে। কি সান্ত্বনা নিয়ে আমি যাব তাতিয়ানা?'

তাতিয়ানা দু'ধাপ এগিয়ে এল আহমদ মুসার দিকে। মুখোমুখি হলো সে আহমদ মুসার। তার অশ্রু ভরা চোখ দু'টি তুলল সে আহমদ মুসার চোখের দিকে। কাঁপছিল রক্তাভ ঠোঁট দু'টি তাতিয়ানার। বলল, 'ভাববেন পিটারদের মেয়ে পিটারদের দেশে ফিরে গেছে। তারপর আর কিছু ভাববেন না। ভাবলেও রক্তের লাল রংয়ের ভেতর দিয়ে হৃদয়ের সবুজ কান্না আপনি দেখতে পাবেন না। আর মনের কথা বলছেন? বিপ্লবীদের মন থাকে না, থাকতে নেই।' কান্নায় ভেঙে পড়া তাতিয়ানা দু'হাতে মুখ ঢেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে দৌঁড়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

অনুভূতি শূন্য অবস্থায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আহমদ মুসা ধপ করে বসে পড়ল সোফায়। মাথা নিচু করে দু'হাতে চেপে ধরল মাথা।

আজিমভ ঘরে ঢুকল। ধীরে ধীরে এসে বসল আহমদ মুসার পাশে।

'তাতিয়ানা চলে গেল মুসা ভাই, আমাদের দেয়া গাড়িটিও সে নিয়ে যায়নি।' নরম কন্ঠে বলল আজিমভ।

আজিমভের কথার কোন জবাব এল না আহমদ মুসার কাছ থেকে। অনেকটা স্বগত কন্ঠের মত বেরিয়ে এল আহমদ মুসার মুখ থেকে 'পৃথিবীর এত বিপদ এত বেদনা কেন আজিমভ?' ভারী এবং কম্পিত কন্ঠ আহমদ মুসার।

মুসা ভাই আপনিই তো সেদিন এ হাদীসটা বলেছিলেন, 'বিপদ আর বেদনার সাগর দিয়ে জান্নাত ঘেরা। জান্নাতে পৌঁছতে হলে সবাইকে পাড়ি দিতে হবে এই বিপদ আর বেদনার সাগর।'

মুখ তুলল আহমদ মুসা। তার দু'চোখের কোণায় অশ্রু। আজিমভের দিকে চেয়ে ম্লান হেসে বলল, ' ধন্যবাদ আজিমভ। আমি ভুলে গিয়েছিলাম এ হাদীসটার কথা।

কথা বলল না আজিমভ।

দু'জনেই নিরব।

এক সময় নিরবতা ভেঙে ভেজা কন্ঠে বলল আজিমভ, 'প্যান ইসলামিক এয়ার লাইন্সের আজকের রাতের ফ্লাইটের টিকিট পাওয়া গেছে। টিকিট তাসখন্দ জেদ্দা, মদিনা, প্যারিসের। মক্কা শরীফে ওমরার জন্যে দু'দিন। একদিন মহানবী (সঃ) এর কবর যেয়ারত ও ভাবীর কবরে দোয়া। ৪র্থ দিন ভোরে মদিনা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে সোজা প্যারিস।'

'তোমার কন্ঠ শুনে মনে হচ্ছে তুমি খুব বেজার আজিমভ।'

'আমি একা কেন, সবাই ক্ষুব্ধ। কেউ মেনে নিতে পারছে না আপনার এই সিদ্ধান্ত। অন্তত কয়েকটা দিন আপনার বিশ্রাম প্রয়োজন।'

'কেন বিশ্রামের জন্যে আল্লাহ রাত তো দিয়েছেনই।'

আজিমভ কিছু বলতে যাচ্ছিল। এই সময় টেলিফোন বেজে উঠল।

আজিমভ ধরল টেলিফোন। ধরেই বলে উঠল, 'মুসা ভাই, প্রেসিডেন্ট কথা বলবেন।'

আহমদ মুসা উঠে গেল টেলিফোন ধরার জন্যে।

সেদিনই রাত ১১টা ৪০মিনিট।

তাসখন্দ এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে আছে প্যান ইসলামিক এয়ার লাইন্সের বিশালাকার প্লেনটি।

সারি বেধে দাঁড়িয়ে থাকা অশ্রু সজল সব সাথীদের একে একে বুকে জড়িয়ে ধরে বিমানের সিড়িঁর দিকে এগুলো আহমদ মুসা।

সিড়িঁর একদম মুখে দাঁড়িয়ে স্বয়ং প্রেসিডেন্ট কুতায়বা।

আহমদ মুসা সেখানে পৌঁছতেই কুতায়বা জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে।

বলল, 'সুদিনে তো আপনাকে পাব না। দুর্দিনে যেন আল্লাহ আপনাকে এভাবেই সব সময় আমাদের কাছে এনে দেন।'

অশ্রু গড়াচ্ছিল কুতায়বার চোখ থেকে। আহমদ মুসা হেসে বলল, 'অশ্রু মুছে ফেল কুতায়বা। প্রেসিডেন্টকে এভাবে কাঁদতে নেই।'

সবাই আবার সালাম জানিয়ে বিমানের সিড়িঁ দিয়ে উঠে গেল আহমদ মুসা।

কিন্তু বিমানের দরজায় গিয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। হাত দিয়ে ইশারা করে ডাকল আজিমভকে।

বিমানের সিড়িঁ দিয়ে তর তর করে উঠে এল আজিমভ। চোখের পানিটাও মোছেনি সে।

আহমদ মুসা রুমাল দিয়ে তার চোখের পানি মুছে দিয়ে বলল, 'তাতিয়ানা কিছুই নেবে না, কিন্তু তার প্রতি দায়িত্ব রয়েছে তোমাদের। রাশিয়া কিংবা যেখানেই সে থাক তার প্রতি তোমরা নজর রাখবে। কোনও অসুবিধায় যেন সে না পড়ে।'

কথা শেষ করে আজিমভের পিঠ চাপড়ে বলল, 'যাও।'

'আপনার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করব মুসা ভাই।'

বলে সালাম জানিয়ে সিড়িঁ দিয়ে নেমে গেল আজিমভ।

আহমদ মুসা প্রবেশ করল বিমানে।

প্লেন ছাড়ল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই তাসখন্দের সহস্র আলোক বিন্দু, সুন্দর মেঘমালা হারিয়ে গেল চোখ থেকে। তারপর আবার সামনে এসে দাঁড়াল ঘন অন্ধকার। সেই অন্ধকারে অনেক পরিচিত মুখ, পরিচিত ঘটনা ও পরিচিত কথা ঢাকা পড়ে গেল। শুরু হলো যেন এক নতুন অধ্যায়ের। কালো অন্ধকারের বুকে ফুটে উঠল আলোক নগরী প্যারিস। ওখানেই কোথাও আছে ওমর বায়া, আর আছে ভয়ংকর সংগঠন 'আর্মি অব ক্রাইস্ট ওকুয়া।' নতুন অধ্যায়ের অন্ধকারে আরও কে আছে কে জানে!'

আহমদ মুসার চোখ দু'টো যেন আঠার মত লেগে গেল অন্ধকারের কালো দেহের সাথে। সেই অন্ধকারের দেহে সাপের জিহ্বার মত লক লক করে উঠল 'ব্ল্যাক ক্রস।' চমকে উঠল আহমদ মুসা।

চোখ ফেরাতে পারল না আহমদ মুসা সেদিক থেকে।

বিমানের সিটে হেলান দিয়ে আহমদ মুসা তাকিয়ে রইল জানালা দিয়ে সেই অন্ধকারের বুকে।

ভেসে চলল বিমান জেদ্দার উদ্দেশ্যে।

**পরবর্তী বই**

# ব্ল্যাক ক্রসের কবলে

# কৃতজ্ঞতায়ঃ


1. Shaikh Noor-E-Alam
2. Ariful Islam Salim
3. Tareq Samsul Alam
4. Sagir Hussain Khan
5. Zahir Raihan
6. Ek phota Shisir
7. Amin Islam
8. Masud Khan
9. Abir Tasrif Anto
10. Monirul Islam Moni
11. Sohel Sharif
12. Gazi Salahuddin Mamun
13. Bondi Beduyin
14. Arif Rahman
15. Mohammed Ayub
16. Nazmus Sakib
17. Mohammed Sohrab Uddin
18. Hafizul Islam
19. Abu Taher
20. Lahin New
21. Kayser Ahmad Totonji
22. Syed Murtuza Baker
23. Nazrul Islam
24. Md. Jafar Ikbal Jewel
25. A.S.M Masudul Alam
26. Esha Siddique
27. Sharmeen Sayema

সাইমুম-১৭

# ব্ল্যাক ক্রসের কবলে

আবুল আসাদ

# ১

গেরিলা সদৃশ ওয়াট তার চাবুক থামাল। চিৎকারও থেমে গেল ওমর বায়ার। চিৎকার রূপান্তরিত হলো গোঙানিতে।

ওমর বায়ার দেহটা ওবু করে টাঙানো ঘরের ছাদের সাথে। ঝুলে পড়েছে তার দু'টি হাত নিচের দিকে। দেহ তার রক্তাক্ত। তার হাত, তার চুল বেয়ে ফোটা ফোটা রক্ত গিয়ে পড়ছে মেঝেতে।

ওয়াট তার চাবুকের রক্ত স্পঞ্জে মুছে চামড়ার তৈরী চাবুকের সাপের মত লকলকে লেজটা হাতে গুটিয়ে নিল। বাম হাত দিয়ে এ্যাসট্রে থেকে জ্বলন্ত সিগারেট তুলে নিয়ে এগুলো ওমর বায়ার দিকে। ওয়াটের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। চোখে-মুখে চরম অধৈর্য্যের ভাব।

বাম হাতের সিগারেটটা সে চেপে ধরল ওমর বায়ার কাঁধে।
কেঁপে উঠল ওমর বায়ার দেহ। চিৎকার করে চোখ খুলল ওমর বায়া।
হো হো করে হেসে উঠল ওয়াট। মুখ বিকৃত করে সে বলল, এমন পেটানো হাতিকে পেটালেও সে কথা বলত। শেয়ালের বাচ্চা তোর মুখ খুলতে পারলাম না, তোর বিড়ালের বংশে জন্ম নেয়া উচিত ছিল।

একটু থাকল ওয়াট। তারপর গলার স্বরটা একটু নামিয়ে বলল, সামান্য দু'টো কথা বলে দিলে এসব তোর কিছুই হতো না। বল, তোর জমি জমার কাগজ-পত্র কার কাছে, কোথায় রেখেছিস? অথবা বল, ক্যামেরুনের কোর্ট থেকে তোর কেসটা তুই তুলে নিবি।

সমগ্র দক্ষিণ ক্যামেরুনের একমাত্র অবশিষ্ট মুসলিম ল্যান্ড ওমর বায়ার জমিদারী কুক্ষিগত করার এ দু'টি পথই খোলা আছে 'কিং ডোম অব ক্রাইস্ট' (KOC-কোক) এবং 'আর্মি অব ক্রাইস্ট অব ওয়েস্ট আফ্রিকা' (AOCOWA-ওকুয়া) এর কাছে। ওমর বায়ার জমি জমার কাগজপত্র যদি পেয়ে যায়, তাহলে ওমর বায়া প্রমাণ করতে পারবে না যে জমি জমা গুলো তার। তাছাড়া কাগজ-পত্র প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন করে নিজেরা কাজে লাগাতে পারবে। ওমর বায়ার কাগজপত্রের যে কপি ক্যামেরুনের সহকারী সেরেস্তায় জমা ছিল তা ওকুয়া ইতিমধ্যেই গায়েব করে ফেলেছে। সুতরাং ওমর বায়ার কাছের কাগজপত্র একবার হাত করতে পারলেই কেল্লাফতে।

ওমর বায়া ধীরে ধীরে ডান হাতটা তুলে কাধের ফোস্কাটার উপর হাত বুলিয়ে বলল, তোমাদের আমি চিনি না। তোমাদের সাথে আমার কোন শত্রুতা নেই, তোমরা এসব চাও কেন?

ওমর বায়ার ঝুলন্ত হাতটার উপর ফুটবলের মত একটা লাথি চালিয়ে ওয়াট বলল, আবার বলছিস সেই একই কথা। দুনিয়ার কেউ আমাদের মিত্র নয়, আমাদের মিত্র আমাদের স্বার্থ। আমাদের স্বার্থেই 'ওকুয়া' এখন আমাদের মিত্র, আর তুই আমাদের শত্রু। এবার আমার প্রশ্নের জবাব দে।

'জবাব আমি বহুবার দিয়েছি'।

'কি জবাব দিয়েছিস?'

'তোমরা যা চাও তার কোনটাই পাবে না'।

চোখ দু'টি জ্বলে উঠল ওয়াটের। কিন্তু পরক্ষণেই শান্ত হয়ে বলল, তুই কি পাগল? জংগল ভরা ক্যামেরুনের কাম্পু উপত্যকায় ১০ হাজার একর জমি বড় হলো, না তোর জীবন বড়?

'তুমি ফরাসী না?'

‘হ্যা। কেন?’

’১০ হাজার নয়, তোমার ফ্রান্সের ১০ একর জমি কি তুমি বৃটিশের হাতে তুলে দিতে পার?’

‘বৃটেন ভিন্ন রাষ্ট্র, তার হাতে আমার দেশের মাটি তুলে দেব কেন?’

‘তাহলে আমি দেব কেন?’

‘ওকুয়া’ কিংবা ‘কোক’ তো ভিন্ন রাষ্ট্র নয়। তোমার এ তুলনা ঠিক নয়।

‘ভিন্ন রাষ্ট্র নয় কেন? খৃষ্টান জাতিস্বার্থ নিয়ে ওকুয়া ক্যামেরুন ভুমি দখলের যে অভিযান চালাচ্ছে, তা পুরোপুরিই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রসূত। এ রাজনীতির উদ্দেশ্য হলো ক্যামেরুনে একক খৃষ্টান জাতি স্বার্থ প্রতিষ্ঠার জন্যে মুসলিম জাতি-স্বার্থের সম্পূর্ণ বিনাশ সাধন করা। সুতরাং আমার যে দশ হাজার একর জমি তা শুধু জমি নয়, আমার অস্তিত্ব, আমার জাতির অস্তিত্ব। আমাকে তোমরা যা ইচ্ছা তাই করো, আমার জাতির অস্তিত্ব তোমাদের হাতে তুলে দিতে পারি না’।

চোখ জ্বলে উঠল ওয়াটের। হাতের চাবুক নাচিয়ে সে বলল, দিতে হবে তোমাকে। ‘ওকুয়া’ নয়, ব্ল্যাক ক্রসের হাতে তুমি পড়েছ। কথা তোমাকে বলিয়েই ছাড়ব।

‘ওকুয়ার হাতে মৃত্যু একটা, তোমাদের হাতে দুইটা মৃত্যু আছে না কি?’

‘বিদ্রুপ করছ ব্ল্যাক ক্রসকে?’ চোখ থেকে আগুন ঝরল ওয়াটের। লাফিয়ে উঠল তার চাবুক। বিদ্যুতের গতি নিয়ে ছোবল মারল ওমর বায়ার দেহে। এই ছোবলে ফিনকি দিয়ে রক্ত নামছে ওমর বায়ার দেহ থেকে। আঘাতের সাথে সাথে ওমর বায়ার মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে চিৎকার।

দু’হাতে বাট ধরে চাবুক চালাচ্ছে ওয়াট। ওমর বায়ার চিকার ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে এল। থেকে গেল একসময়। চোখ দু’টি তার বুজে গেল, ঝুলে পড়ল হাত দু’টি নিঃসাড় হয়ে। জ্ঞান হারিয়েছে ওমর বায়া।

থামল ওয়াট।

ঘরে দ্রুত প্রবেশ করল পিয়েরে পল। ব্ল্যাক ক্রসের প্রধান। বলল, ‘কি ওয়াট, মেরে ফেললে নাকি?’

‘ও কুত্তার বাচ্চা কথা বলবে না’।

‘কথা ওকে বলাতেই হবে, ওকে মেরে কোন লাভ নেই আমাদের মক্কেলদের’।

‘কেন ও ব্যাটা মরে গেলেই তো সব শেষ, ওদের বংশে তো আর কেউ নেই। সুতরাং ওর জমি পাকা ফলের মত এসে পড়বে আমাদের মক্কেল ‘ওকুয়া’দের হাতে’।

‘সেটা হলে ভালই হতো। কিন্তু সে পথ ও ব্যাটা বন্ধ করে রেখেছে। সে আদালতে যেমন দলিল পেশ করে রেখেছে যে, সে ক্যামেরুনের আদালতে হাজির হয়ে জমি হস্তান্তর না করলে কোন হস্তান্তর দলিল বৈধ বলে গণ্য হবে না, তেমনি সে আদালতে উইল রেজিষ্ট্রি করে রেখেছে যে, তার মৃত্যু ঘটলে বা সে ৫ বছরের বেশি নিখোঁজ থাকলে তার সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ‘ক্যামেরুন মুসলিম ট্রাস্টের’ হস্থান্তর যোগ্য মালিকানায় চলে যাবে। সুতরাং তাকে বাচিয়ে রাখতে হবে এবং আমরা যা চাই তা আদায় করতে হবে’। ঘরে প্রবেশ করতে করতে কথাগুলো বলল, ফাদার ফ্রান্সিস বাইক। ফাদার বাইক ‘কিংডোম অব ক্রাইস্ট’ (কোক) এর প্রধান এবং ‘আর্মি অব ক্রাইস্ট অব ওয়েস্ট আফ্রিকা’ (ওকুয়া)- এর প্রধান উপদেষ্টা।

‘ও কুত্তার বিড়ালের জীবন। নিশ্চিন্ত থাকুন ও মরবে না’। বলল ওয়াট।

পিয়েরে পল ওমর বায়ার নিশ্বাস পরীক্ষা করে বলল, ‘একে নামিয়ে নিতে বল ওয়াট’।

বলে পিয়েরে পল ফাদার বাইককে নিয়ে বেরিয়ে এল।

ওরা এসে প্রবেশ করল পিয়েরে পলের অফিস কক্ষে। বসল ওরা। চিন্তা করছে পিয়েরে পল।

‘কি ভাবছেন মিঃ পিয়েরে?’ বলল ফাদার বাইক।

‘ভাবছি ওয়াট ঠিকই বলেছে শয়তানটা কথা বলবে না। বৈদ্যুতিক আসনে বসিয়েও তার কাছ থেকে বথা আদায় করা যায়নি বৈদ্যুতিক। বৈদ্যুতিক শকও যে হজম করে, বাগে আসে না, তাকে আর কি শাস্তি দেয়া যাবে?

‘শয়তানটা এত শক্ত? অবিশ্বাস্য’।

‘অবিশ্বাস্য হলেও সত্য’।

‘কিন্তু কেমন করে?’

‘মুসলমানদের তো আপনি জানেন। শত্রুর হাতে মৃত্যু ওদের কাছে শাহাদাত। শাহাদাত ওদের পরম কাম্য বস্তু। মৃত্যুকে যারা এইভাবে আলিংগন করে, তাদের বাগে আনা কঠিন’।

‘তাহলে?’

‘সেটাই ভাবছি’।

‘শয়তানটা যে ব্যবস্থা করে রেখেছে তাতে তাকে রাজী করানো ছাড়া কোন পথ নেই’।

‘এই কাজটাই অত্যন্ত কঠিন। আচ্ছা বলুন তো, সবই তো আপনাদের দখলে এই দশ হাজার একর জমি না হলে আপনাদের হয় না?’

‘জমি দখল আমাদের লক্ষ্য নয়, আমাদের লক্ষ্য হলো মুসলমানদের উচ্ছেদ করা। দক্ষিণ ক্যামেরুনের কাম্পু উপত্যকার এই দশ হাজার একর জমি আমরা ছাড়তে পারি না দু’টো কারণে। এক, মুসলমানরা বসে থাকার জাতি নয়। তারা ঐ দশ হাজার একরকে কেন্দ্র করে যে শক্তি গড়ে তুলবে, তার মোকাবিলা করা আমাদের জন্যে কঠিন হতে পারে। কারণ দক্ষিণ ক্যামেরুনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুসলমানদের যে জমি আমরা দখল করেছি, তার আইনগত কোন ভিত্তি নেই। সুতরাং মুসলমানরা যদি ঐ দশ হাজার একর এলাকাকে কেন্দ্র করে সোজা হয়ে একবার দাঁড়াতে পারে তাহলে শক্তি না হলেও আইনের যুদ্ধে তারা নামবে। সে যুদ্ধে আমরা খৃষ্টানরা পারবো না। দুই, আমরা জানতে পেরেছি ওমর বায়ার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে রাবেতা ও ওয়ামির মত মুসলিম সংস্থা। ওরা ক্যাম্প ভ্যালিতে ওমর বায়ার ঐ দশ হাজার একর জমিকে ভিত্তি করে নিরক্ষীয় গিনী ও গ্যাবন (যেখানে থেকে মুসলমানদের উচ্ছেদ প্রায় সম্পন্ন) এলাকার জন্যে শক্তিশালী একটি ইসলামী ঘাটি গড়ে তুলতে চায়। যে কোন মূল্যে এর পথ আমরা বন্ধ করতে চাই। সুতরাং ওমর বায়ার দশ হাজার একর জমি আমাদের কাছে আজ সমগ্র দক্ষিণ ক্যামেরুন, নিরক্ষীয় গিনী ও গ্যাবন এলাকার সমান মূল্যবান’।

থামল ফাদার ফ্রান্সিস বাইক।

‘বুঝেছি, মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। ওমর বায়ার জমি আপনাদের পেতেই হবে’। বলল পিয়েরে পল, ব্ল্যাক ক্রস-এর প্রধান।

‘হ্যাঁ পেতেই হবে’।

‘এবং পেতে হবে ওমর বায়ার সম্মতিতে। তাকে ক্যামেরুনের কোর্টে গিয়ে নিজে সাক্ষ্য দিতে হবে যে, সে জমি হস্তান্তর করছে’।

‘ঠিক বলেছেন’।

‘অথচ জীবন দিতে হলেও ওমর বায়া জমি হস্তান্তরে সম্মত হবে না, একথা এ কয়েকদিন পরিষ্কার বুঝা গেছে’।

‘কিন্তু পথ একটা বের করতেই হবে?’

‘সে কথাই ভাবছি’। কথাটা বলা শেষ করেই পিয়েরে পল সোজা হয়ে বসল। আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখ। খুশীতে চকচকে দেখাল তার চোখ দু’টোকে। যেন হঠাৎ বড় কিছু পেয়ে গেছে সে।

বলল, ‘মিঃ ফ্রান্সিস বাইক, পেয়ে গেছি’।

‘কি বলেন?’ খুশী হয়ে বলল ফাদার ফ্রান্সিস বাইক।

‘পেয়েছি সন্ধান এক অব্যর্থ অস্ত্রের’।

‘কি সেই অস্ত্র?’

‘বলব না, দেখাব’। বলে উঠে দাঁড়াল পিয়েরে পল।

তার সাথে সাথে ফ্রান্সিস বাইকও।

দরজা খোলার শব্দে চোখ খুলল ওমর বায়া।

দরজা খোলার সাথে সাথে আলো জ্বলে উঠল ঘরে। ঘরের আলোর সুইচটি সম্ভবঃত কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল বোর্ডে। ওরাই ইচ্ছমত আলো জ্বালায় এবং নিভায়।

ওমর বায়ার ঘরটি ছোট্ট একটা সেল। ছাদ বিরাট উঁচুতে। উঁচু ছাদটির গায়ে লুকানো বৈদ্যুতিক বাল্ব থেকে আলো আসছে ঘরে। ঘরে একটা খাটিয়া এবং পানির একটা প্লাষ্টিকের জাগ ছাড়া আর কিছু নেই। খাটিয়াটা প্লাষ্টিকের, মেঝের সাথে এটে দেয়া।

ঘরের সাথে এটাস্ট একটা টয়লেট। অটোমেটিক ফ্লাস সিস্টেমের টয়লেট টিস্যু পেপার ছাড়া আর কিছুই নেই।

অর্থাৎ ঘরে এমন কিছু রাখা হয়নি যা দিয়ে আক্রমণাত্মক কোন কাজ বা মুক্তির কোন চেষ্টা ওমর বায়া করতে পারে।

দরজা খুলে গেলে ওমর বায়া শোয়া থেকে উঠে বসল। সে লক্ষ্য করল, আজ শোয়া থেকে উঠতে আর ব্যথা লাগল না গায়ে। ঘাগুলো সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেছে। কিন্তু দেহের দুর্বলতা যায়নি। এ দুর্বলতার একটা বড় কারণ হলো, ওমর বায়া অনশন করেছিল শুকরের গোশত এবং শুকরের চর্বি দেয়া খাবারের বিরুদ্ধে। ব্ল্যাক ক্রস কর্তৃপক্ষ প্রথম দিকে খাবারের মেনু পাল্টাতে রাজী হয় নি। কিন্তু ওমর বায়া তিনদিন অনশনের পর তারা নতি স্বীকার করেছে। শুকরের গোশত ও শুকরের চর্বিযুক্ত খাবার সরবরাহ বন্ধ করা সহ হালাল খাদ্য সরবরাহ করার পর ওমর বায়া অনশন ভেঙেছে।

খাবার নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল ডুপ্লে। কয়েকদিন পর ডুপ্লেকে দেখে বিস্মিত হলো ওমর বায়া।

ডুপ্লেই শুরু থেকে ওমর বায়ার ঘরে খাবার সরবরাহ করে। কিন্তু ওমর বায়া অনশন করার সময় থেকে সে বেশ কয়দিন ছিল না। ডুপ্লে বেশী কথা বলে। ওমর বায়া তাকে পছন্দ করে। তার তুলনায় অন্যেরা যন্ত্রের মত। যন্ত্রের মত নীরবে খাবার দিয়ে যায় এবং পরে থালাবাসন নিয়ে যায়। জিজ্ঞাসা না করলে একটা কথাও বলে না।

ডুপ্লে ঘরে ঢোকার পর ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ডুপ্লে খাবারের বাক্স নিয়ে এগুলো ওমর বায়ার দিকে।

এগুতে এগুতে বলল, তুমি জিতে গেছ হিদেন।

ডুপ্লে ওমর বায়ার অনশনের দিকে ইংগিত করল।

‘জয় কোথায়, মৃত্যু থেকে রক্ষা। তুমি যে ক’দিন ছিলে না?’

ডুপ্লের মুখটা কালো হয়ে উঠল। খাবার বাক্সটা ওমর বায়ার খাটিয়ার উপর রাখতে বলল, ‘আমার মায়ের অসুস্থতার খবর শুনে বাড়ি গিয়েছিলাম’।

‘তারপর?’ উদগ্রীব কন্ঠে বলল ওমর বায়া।

‘আমার মাকে দেখতে পাইনি যাওয়ার আগেই....’।

কথা শেষ করতে পারলো না ডুপ্লে। কান্নায় জড়িয়ে গেল তার কথা।

ওমর বায়া সান্ত্বনার সুরে বলল, দুঃখ করো না ডুপ্লে। তোমার চেয়েও বড় দুর্ভাগা আমি। আমি আমাকে বাঁচাতে গিয়ে আম্মাকে বাঁচাতে পারিনি। হত্যা করেছে ওরা আমার আম্মাকে’।

‘কারা হত্যা করেছে তোমার মাকে?’

‘ওকুয়া’। যাদের পক্ষে তোমরা কাজ করছ’।

ডুপ্লে এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ওমর বায়ার দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর খাবার বাক্স ফেরত নিতে এল।

খাবার বাক্স গুছিয়ে নিচ্ছিল ডুপ্লে। তার চোখে-মুখে চিন্তার ছাপ। চোখে নরম দৃষ্টি। একবার ওমর বায়ার দিকে চকিতে তাকিয়ে মুখ নিচু করে নিচু স্বরে বলল, ‘তুমি যদি কাউকে কোন কথা পৌঁছাতে চাও, তাহলে লিখে রেখ ঠিকানা সমেত’।

বলেই ডুপ্লে খাবার বাক্স নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

সে উঠে দাঁড়াবার সাথে সাথে তার কোল থেকে একটা দামী সিগারেটের প্যাকেট পড়ে গেল। ডুপ্লে উঠেই ঘুরে দাড়িয়ে দরজার দিকে চলল।

‘ডুপ্লে তুমি সিগারেট ফেলে গেলে’।

কিন্তু ডুপ্লে ওমর বায়ার কথা যেন শুনতেই পেল না এইভাবে বেরিয়ে গেল।

ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল ওমর বায়া সিগারেটের প্যাকেট হাতে তুলে নিল। অত্যন্ত দামী সিগারেটের প্যাকেট। খুব হালকা মনে হলো। অর্থাৎ সিগারেট

নেই বা দু'একটা আছে। ওমর বায়া খুলল সিগারেটের প্যাকেট। খুলে বিস্মিত হলো ওমর বায়া, সিগারেটের একটা শলাও নেই, আছে ছোট্ট একটা পেন্সিল।

পেন্সিল দেখার সাথে সাথে ডুপ্লের শেষ কথাটা মনে পড়ল, কোথাও কোন কথা যদি পৌছাতে চাই তাহলে ঠিকানা সমেত যেন লিখে রাখি।

শিউরে উঠল ওমর বায়া। ব্ল্যাক ক্রসের ডুপ্লে তার পক্ষে এই কাজ করবে!

কিন্তু ওমর বায়া লিখবে কিসে? পরক্ষনেই খুশী হয়ে উঠল ওমর বায়া। প্যাকেটের ভেতরের সিগারেটের মোড়ক কাগজটিতে যথেষ্ট বড় একটা চিঠি সে লিখতে পারে।

ওমর বায়া প্রশংসা করল ডুপ্লের বুদ্ধির।

খুশি হয়ে ওমর বায়া তখনই প্যাকেটের ভেতর থেকে মোড়ক কাগজটি বের করে ফিলিস্তিন দুতাবাসের নামে একটা চিঠি লিখে ফেলল। দুতাবাসের ঠিকানাও লিখল। লিখার পর কাগজটি পেন্সিল সমেত আবার প্যাকেটে ঢুকিয়ে রাখল। তারপর প্যাকেটটিকে খাটিয়া ও দেয়ালের ফাঁক দিয়ে নিচে ফেলে দিল। ডুপ্লে এলে ওখান থেকে তুলে নেবে।

মনটা একটু হাল্কা হলো ওমর বায়ার। ওমর বায়া কোথায় ও কার হাতে বন্দী আছে এটা যদি ফিলিস্তিন দুতাবাস জানতে পারে, তাহলে তারা সাহায্যের ব্যবস্থা করতে পারবে এবং জানাতে পারবে আহমদ মুসাকেও।

মেঝেয় কিছুক্ষণ পায়চারী করল ওমর বায়া। হাত ও পা শিকল দিয়ে বাঁধা। এক ফুটের বেশী হাত-পা ফাঁক করা যায় না। এই অবস্থায় কিছুক্ষণ হাঁটাহাটি করে ওমর বায়া এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

কিন্তু খাটিয়ায় শুয়ে তামাকে অনভ্যস্ত ওমর বায়া তামাকের গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। বুঝল ঠিক মাথার কাছাকাছি খাটিয়ার নিচের সিগারেটের প্যাকেট থেকে এই গন্ধ আসছে।

ওমর বায়া খাটিয়ার নিচে হাত দিয়ে সিগারেটের প্যাকেটটাকে খাটিয়ার পেছন দিকে ছুড়ে দিল। এতে গন্ধের তীব্রতা একটু কমল।

ঘুমিয়ে পড়েছিল ওমর বায়া।

দরজা খোলার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল তার।

চোখ খুলে দেখল, ঘরে প্রবেশ করছে মশিয়ে লিলি, ব্ল্যাক ক্রস প্রধান পিয়েরে পলের দক্ষিণ হস্ত। লোকটির সাপের মত ঠান্ডা কথা এবং তাপমাত্রায় ভদ্র ব্যবহার দেখে ওমর বায়া বুঝেছে লোকটা ভীষণ বুদ্ধিমান। ওয়াটের ঠিক বিপরীত। ওয়াট চাবুক দিয়ে কথা বের করতে চায়, আর এ সুন্দর কথার পরশ বুলিয়ে কাজ হাসিল করতে চায়।

মশিয়ে লালি দু'একদিন পরপরই আসে। এসে বার বার একই কথা বলে, ওমর বায়ার জমি হস্তান্তর সমস্যাকে এতদুর আনা ঠিক হয়নি ওকুয়া'র। ভালো ব্যবহার করলে উপযুক্ত দামে ওমর বায়া জমি অবশ্যই দিয়ে দিত। সবাই যখন কাম্পু উপত্যকা থেকে চলে গেছে, তখন সে একা থেকে আর লাভ কি! যাই হোক, বিষয়টা নিয়ে আবেগমুক্ত মন নিয়ে ওমর বায়ার ভাবা দরকার। দশ হাজার একর জমির জন্যে জীবন দেয়ার কোন মানে হয় না। ব্ল্যাক ক্রস ওকুয়া'কে কথা দিয়ে বিপদে পড়েছে। এ বিপদ থেকে ওমর বায়া ব্ল্যাক ক্রসকে উদ্ধার করলে ব্ল্যাক ক্রস ওমর বায়াকে অন্যান্য সাহায্য যা সে চায় দিতে রাজী আছে। ইত্যাদি...।

ওমর বায়া বিছানায় উঠে বসল। ভাবল, ঘন্টা খানেক সময় এখন তাকে ঐ একই বকবকানি শুনতে হবে।

ঘরে ঢুকে ওমর বায়ার দিকে নজর ফেলেই বলে উঠল মশিয়ে লালি, বাঃ তোমার স্বাস্থ্য তো বেশ ইমপ্রুভ করেছে। তিন দিন আগে এসেছিলাম, সেদিনের চেয়ে আজ তুমি অনেক ভাল। মনও ভাল আছে নিশ্চয়।

কিন্তু দরজা থেকে ওমর বায়ার দিকে কয়েক ধাপ এগুতেই মশিয়ে লালির চোখটা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। দু'একবার নাক টেনে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, তোমার ঘরে ভি.আই.পি কেউ আজ এসেছিল?

'না, কেন?'

'ইম্পিয়াল সিগারেটের গন্ধ পাচ্ছি। কেউ খেয়েছে এখানে, তোমাকে কেউ কি দিয়েছে?'

'আমি তো সিগারেট খাই না'।

'তুমি ঠিক বলছ না'।

বলে মশিয়ে লালি এগিয়ে এসে বিছানার কম্বল, বালিশ, ইত্যাদি উঠিয়ে দেখতে লাগল। কিছুই পেল না। এরপর সে বসে খাটের তলায় উকি দিল। দেখতে পেল সে সিগারেটের প্যাকেট। মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার। বলল, 'ভেবেছিলাম তুমি খাটিঁ মুসলমান, নিশ্চয় মিথ্যা কথা বল না। কিন্তু ধরা পড়ে গেলে। সিগারেট খেতে শুরু করেছ। পেলে কোথায় সিগারেট? আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় নিশ্চয় কোথায় ফাঁক আছে'।

এসব কথা বলতে বলতে খাটিয়ার তলা থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে আনল মশিয়ে লালি।

উঠে দাঁড়াল সে।

খুলল সে সিগারেটের প্যাকেট।

ওমর বায়ার মুখটা ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল।

সিগারেটের প্যাকেট খুলে চোখ ছানাবড়া হয়ে গিয়েছিল মশিয়ে লালির।

সিগারেটের প্যাকেট থেকে সে ছোট্ট পেন্সিলটা বের করে হাতে নিল। তারপর মোড়ক কাগজটি বের করে মেলে ধরল চোখের সামনে।

মিনিট খানেক পর সে ধীরে ধীরে চোখ তুলল ওমর বায়ার দিকে। তার সেই সাপের মত ঠান্ডা চোখ।

ওমর বায়ার ভয় তখন কেটে গিয়েছিল। তার চোখে তখন বেপরোয়া ভাবের একটা স্ফুলিংগ।

'ওমর বায়া, সিগারেটের এই প্যাকেট এবং এই পেন্সিল তোমাকে কে এনে দিয়েছে?' ঠান্ডা অথচ অত্যন্ত শক্ত কন্ঠে জিজ্ঞাসা করল মশিয়ে লালি।

ওমর বায়া তার চোখ নিচু করল। কথা বলল না।

'তোমাকে কথা বলতে হবে ওমর বায়া। তোমার চিঠি আমাদের কাছে দোষণীয় নয়, তুমি সুযোগ পেলে এটা করতেই পার। কিন্তু আমরা জানতে চাই কোন শয়তান তোমাকে সাহায্য করেছে'। চিবিয়ে চিবিয়ে অত্যন্ত কঠোর কন্ঠে বলল মশিয়ে লালি।

কোন উত্তর দিল না ওমর বায়া।

চোখ দু'টি জ্বলে উঠল মশিয়ে লালির। বারুদের ঘরে যেন আগুন লাগল।

ওমর বায়া শেকল বাঁধা দু'টি পা মেঝেতে রেখে খাটিয়ার উপর বসেছিল। মশিয়ে লালি ছুটে এসে জুতার গোড়ালী দিয়ে ওমর বায়ার ডান পায়ের আঙুলের উপর প্রচন্ডভাবে আঘাত করল। চিৎকার করে উঠে মেঝের উপর বসে পড়ল ওমর বায়া। পায়ের আঙুলগুলো একদম থেতলে গেছে তার। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে থেতলানো জায়গা দিয়ে।

'দাড়াও তোমাকে কথা বলতে হবে'। বলে মশিয়ে লালি মুখ দরজার দিকে ফিরিয়ে হাততালি দিল। দু'জন প্রহরী প্রবেশ করল ভেতরে।

'তোমরা ওয়াটকে আসতে বল। আর বল, গত পরশু থেকে এ ঘরে যারাই এসেছে তাদের এখানে হাজির করতে'। গর্জে উঠল মশিয়ে লালির কন্ঠ।

কয়েক মিনিটের মধ্যে সবাই এসে হাজির হলো ঘরে।

গত পরশু থেকে ওমর বায়া ঘরে খাদ্য পরিবেশনকারী তিনজন, চারজন প্রহরী, একজন ডাক্তার এবং টয়লেটের জন্যে একজন ফিটার প্রবেশ করেছে। সবাইকে হাজির করা হয়েছে মশিয়ে লালির সামনে।

সবার মুখই ভয়ে ফ্যাকাসে। ব্ল্যাক ক্রসের সাথে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করলে শাস্তি একটাই- মৃত্যুদন্ড। সকলেরই বুক দুরু দুরু করছে। ওমর বায়া সত্য-মিথ্যা যার নামই বলুক, তার আর রক্ষা নেই। সবাই ভয়ে ভয়ে চোরা চোখে তাকাচ্ছে ওমর বায়ার দিকে। ডুপ্লের অবস্থায় সবচেয়ে বেশী খারপ। তার চোখের সামনে মৃত্যু এসে নাচছে। বাড়িতে স্ত্রী ও মেয়ে আছে। তাদের ছবি এসে ভাসছে তার চোখে। সে মশিয়ে লালির চোখ এড়িয়ে ঘন ঘন তাকাচ্ছে ওমর বায়ার দিকে। কিন্তু ওমর বায়ার চোখ কারও দিকে নেই। সে মুখ নিচু করে পাথরের মত বসে আছে।

'শোন ওমর বায়া, সবাইকে হাজির করেছি। এই আটজনের কেউ একজন তোমাকে সিগারেটের প্যাকেট সরবরাহ করেছে। দেখিয়ে দাও কে সেই কুত্তা'। শান্ত কিন্তু অত্যন্ত কঠোর কণ্ঠে বলল মশিয়ে লালি।

মুখ তুলল ওমর বায়া। তার শান্ত চোখ, ঠোটে এক টুকরো হাসি। বলল, 'এত আয়োজন বৃথাই করেছেন মিঃ মশিয়ে লালি। সিগারেটের প্যাকেট কেউ আমাকে দেয়নি। আমি মেঝেতে কুড়িয়ে পেয়েছি'।

‘মিথ্যা কথা। পেন্সিল কোথায় পেলে তুমি’।

‘পেন্সিলও ঐভাবেই পেয়েছি’।

‘শয়তানের বাচ্চা তুমি। কথা তোমাকে বলতে হবে। ওয়াট তোমার কাজ শুরু কর’।

ওয়াট এক গাল হেসে এগিয়ে এল ওমর বায়ার দিকে। হাতে তার বিখ্যাত অপারেশন বাক্স।

‘তোমাকে যখন বাচিয়েঁ রাখা আমাদের দায়িত্ব, তখন তোমার গা আর পচাব না’। বলতে বলতে ওয়াট ওমর বায়ার হাত বিশেষ ভাবে তৈরী কাঠের জালির মধ্যে ঢুকিয়ে হাত সমেত ওটাকে খাটিয়ার সাথে বেঁধে ফেলল। বলল, ‘ওমর বায়া আজ বড় কিছু নয়, কথা বলানোর ক, খ পদ্ধতি প্রয়োগ করব’।

বলে ক্রুব হেসে ওয়াট তার বাক্স থেকে লম্বা সুচ বের করে আনল। বলল, ‘বাম হাত থেকেই শুরু করা যাক’।

বলে ক্রুর হেসে ওয়াট তার বাক্স থেকে লম্বা সুচ বের করে আনল। বলল, ‘বাম হাত থেকেই শুরু করা যাক’।

ওমর বায়ার হাত তো দূরে আঙুলগুলোও নড়াবার কোন উপায় ছিল না।

ওয়াট ওমর বায়ার বাম হাতের মধ্যমাটি বাম হাতে শক্ত করে ধরে ডান হাত দিয়ে নখের নিচ দিয়ে সুচ ঢুকিয়ে দিল।

ওমর বায়া চোখ বন্ধ করে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে চুপ থাকার চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারল না। আর্তনাদ করে উঠল। যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেল তার মুখ।

ডুপ্লে এবং ডেকে আনা অন্যান্যরা ভয়ে চোখ বুজেছিল। তাদের কারও মুখে রক্ত ছিল না।

মশিয়ে লালি বলল, ‘আমরা তোমার উপর এই অত্যাচার করতে চাইনি তুমি আমাদের বাধ্য করেছ। এখনও নাম বল সেই শয়তারটার, যে তোমাকে ওগুলো সরবরাহ করেছিল’।

ওমর বায়া যন্ত্রণায় ধুকছিল। কোন উত্তর দিল না।

‘এ শয়তানের শয়তান মশিয়ে’। বলে ওয়াট আরেকটা সুচ ওমর বায়ার তর্জনিতে ঢুকিয়ে দিল।

আবার সেই বুক ফাটা চিৎকার করে উঠল ওমর বায়া। দেহ তার কাঁপছে যন্ত্রণায়। হাত ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করছে বাঁধন থেকে। কিন্তু বাঁধন চুল পরিমাণ ঢিলাও হচ্ছে না।

ওয়াট ওমর বায়ার যন্ত্রণা কাতর মুখে একটা ঘুষি চালিয়ে বলল, 'কথা বল শয়তানের বাচ্চা শয়তান'।

নাক ফেটে রক্ত বেরিয়ে এল ওমর বায়ার। চোখ খুলল সে। বলল, তোমরা আমাকে মেরে ফেল, কিন্তু যা বলেছি তার বাইরে আমার কোন কথা নেই'।

'ওরে নেড়ি কুত্তা' বলে ওয়াট এবার সুচ ঢুকিয়ে দিল বাম হাতের বুড়ো আঙুলে। আবার ওমর বায়ার সেই বুক ফাটা আর্তনাদ। প্রচন্ড এক ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল সে। হাতটা খুলে নেবার চেষ্টা করল। কিন্তু কোন ফল হলো না। নাইলনের সরু দড়ি বরং কেটে বসল তার হাতে। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল রক্ত। আঙুলের রক্তের সাথে সে রক্ত একাকার হয়ে গেল।

ডুপ্লেরা আটজন ভয়ে আঁৎকে গুটিয়ে গিয়েছিল। ওমর বায়া দিশেহারা হয়ে কার নাম করে বসে, এই তাদের বড় ভয়। তাদের প্রতি মুহুর্তেই মনে হচ্ছে এই বুঝি নাম করে বসে। কেউ কেউ ভাবছে, ওমর বায়ার পর নির্যাতন তাদের উপর শুরু হবে কি? ডুপ্লের মনে তখন প্রবল ঝড়। তার মনে এখন ভয়ের চেয়ে অপরাধ বোধই বেশী। সে ভাবছে, তার কারণেই বেচারা ওমর বায়ার এই দুর্দশা। অযাচিত ভাবেই সে তাকে চিঠি দেয়ার কথা বলেছে এবং পেন্সিল ও সিগারেটের প্যাকেট সরবরাহ করেছে।

ওমর বায়া আবার হৃদয় বিদারক চিৎকার দিয়ে উঠল। চমকে উঠে চোখ তুলল ডুপ্লে ওমর বায়ার দিকে। আরেকটা সুচ ঢুকানো হয়েছে ওমর বায়ার অনামিকায়। যন্ত্রণায় বিকৃত ওমর বায়ার মুখ। তার চোখ দু'টি বোজা। মুখে কোন কথা নেই। মশিয়ে লালি ও ওয়াটের হুমকি-ধমকি নির্যাতন তার মুখ খুলতে পারছে না। ডুপ্লের সমগ্র অন্তর ওমর বায়ার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তিতে নুয়ে পড়ল।

'তোকে কথা বলতেই হবে শয়তান। ব্ল্যাক ক্রস পরাজয় মানে না। তোর হাত-পায়ের সব আঙুল শেষ করব। তারপর চামড়া কাটব। কথা বলতে হবে

তোকে’। চিৎকার করে বলল ওয়াট। তারপর টেনে নিল ওমর বায়ার অন্য একটা আঙুল।

চলল এই নির্যাতন।

ক্লান্ত দেহ নেতিয়ে পড়েছে ওমর বায়ার। চিৎকার শক্তিও কমে যাচ্ছে তার। মেঝের অনেকখানি জায়গা ওমর বায়ার লাল রক্তে ভাসছে।

হাত শেষ করে যখন ওয়াট ওমর বায়ার পায়ের দিকে এগুচ্ছে, এই সময় ঘরে দ্রুত প্রবেশ করল পিয়েরে পল ব্ল্যাক ক্রসের প্রধান। বলল, ‘থাম ওয়াট’।

সুচ সমেত হাত সরিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল ওয়াট। মশিয়ে লালি বলল, ‘শুনেছেন সব কিছু?’

‘হ্যাঁ শুনেছি লালি। এভাবে তাকে কথা বলানো যাবে না। তাকে নিয়ে অন্য কিছু ভাবছি’। তারপর ওয়াটের দিকে ফিরে বলল, ওকে ছেড়ে দাও ওয়াট। ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা কর। তুমি এস লালি। এদের যেতে বল’।

বলে ফিরে দাড়িয়েঁ দরজার দিকে হাঁটা শুরু করল পিয়েরে পল। মশিয়ে লালিও বেরিয়ে এল পিয়েরে পলের সাথে সাথে।

‘নতুন কি ভাবছ শয়তানটাকে নিয়ে?’ বলল মশিয়ে লালি।

‘দৈহিক শাস্তি দিয়ে ওর কাছ থেকে কিছুই পাওয়া যায় নি তুমি ফুসলিয়েও দেখেছ, কোন লাভ হয় নি’।

‘তাহলে উপায় কি?’

‘উপায় আছে। ওর মাথাটা আমাদের দখল করতে হবে’।

‘মাথা? কিভাবে?

‘সবই জানবে, মানুষ যদি চাঁদ জয় করতে পারে, তাহলে মানুষের মাথা দখল করতে পারবে না কেন?’

‘কোন সাইকিয়াট্রিক পদ্ধতি কি?

‘তার চেয়েও উন্নত ও নিরাপদ। সেটা কম্পিউটার পরিচালিত ইলেকট্রোয়েনস ফিলোগ্রাম ও ইলেকট্রমিওগ্রাম’।

‘ওতো সাংঘাতিক জটিল ব্যাপার। মানুষের ক্ষেত্রেও ওটা কাজ করে?’

‘তাই শুনেছি। কিন্তু কয়েকজন বিজ্ঞানীই এটা পারেন। তাদের সন্ধান করছি। যাক একথা। শোন, আজকেই ওমর বায়াকে এখান থেকে সরিয়ে নাও আমাদের এক নম্বর ঘাটিতে। আর যে আটজনকে সন্দেহ করছ, তাদের এই মুহুর্তে কিছু বলার দরকার নেই। আটজনের বাইরেও এটা কেউ করতে পারে। ওমর বায়াকে ইচ্ছানুসারে কথা বলাতে পারলেই সব জানা যাবে’।

‘কিন্তু এটা এখনও তো সম্ভাবনার ব্যাপার’।

‘তা বটে। কিন্তু বিজ্ঞানীকে পাওয়া যাবে’।

কথা বলতে বলতে দু’জন পিয়েরে পল-এর অফিসে এসে প্রবেশ করল।

বিশাল অফিস। ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রীর কক্ষও এত বড় নয়। তা হবে, কারণ ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী শুধুই ফ্রান্সের। কিন্তু পিয়েরে পল গোটা দুনিয়া জোড়া সংগঠনের নেতা। ব্ল্যাক ক্রস-এর হাত দুনিয়ার সব জায়গায়। যেখানেই খৃষ্টান এনজিও কিংবা মিশনারীরা বাধার সম্মুখীন হয় এবং পেছন দরজা দিয়ে সাহায্যের তাদের প্রয়োজন হয়, সেখানেই গিয়ে হাজির হয় ব্ল্যাক ক্রস। ‘ব্ল্যাক ক্রস’ নামকরণ এই কারণেই যে এ সব সময় পর্দার আড়ালে অর্থাৎ অন্ধকারে থেকেই কাজ করে। বিশাল এর নেটওয়ার্ক, বিরাট এর শক্তি এবং বিপুল এর সম্পদ। বসনিয়ার যুদ্ধে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও সার্বীয়দের অস্ত্রের কোন অভাব হয়নি এদের কারণেই। এরা কালো বাজারে পিস্তল থেকে ট্যাংক পর্যন্ত যোগান দিতে পারে। খৃষ্টান সরকারগুলোর উপর এদের বিরাট প্রভাব। কোন সরকারের কোন বেয়াড়া সিদ্ধান্তকে অনুরোধে না হলে হুমকি দিয়েও বাগে আনতে পারে এরা। এদের ভরসাতেই বসনিয়ার সার্বীয়রা লন্ডন, প্যারিসে বোমা ফাটানোর হুমকি দিতে পেরেছিল। এ হুমকিতে কাজও হয়েছিল। ইউরোপীয় দেশগুলো কোন সময়ই মজলুম বসনীয় মুসলমানদের জন্যে কার্যকর কিছু করতে পারে নি কিছুটা এদের ভয়েই।

পিয়েরে পল তার চেয়ারে বসেই টেলিফোনটা টেনে নিল। বলল, বিজ্ঞানীকে পাওয়ার ব্যাপারে কতদুর এগুতে পারল দেখি।

দক্ষিণ প্যারিসের আবাসিক এলাকায় ১০ তলার একটা ফ্ল্যাট। ফ্ল্যাটটি ডুপ্লের।

ডুপ্লে শুয়ে আছে তার বেডরুমে। চোখ বুজে শুয়ে আছে সে। বাম হাতটি তার কপালের উপর ন্যস্ত।

মুখের ফ্যাকাসে ভাব এখনও তার কাটেনি।

একটি তরুণী ঘরে প্রবেশ করে ধীরে ধীরে ডুপ্লের পাশে এসে দাঁড়াল। বলল, আব্বু শরীর খারাপ করেছে?

তরুনীটি ডুপ্লের মেয়ে রোসা। ডুপ্লের মেয়ে এবং স্ত্রী দু'জনেই বিস্মিত হয়েছিল ডুপ্লেকে অসময়ে অফিস থেকে এসে শুয়ে পড়তে দেখে। এ সময় ডুপ্লে অফিস থেকে কখনই ফিরে না, তার উপর এসে শুয়ে পড়েছে।

'না মা শরীল খারাপ করেনি'। কপাল থেকে হাতটা নামিয়ে বলল ডুপ্লে।

'না, আব্বু এভাবে এসে তোমার শুয়ে পড়া...' কথা শেষ করল না রোসা।

এ সময় ঘরে এসে প্রবেশ করল রোসা'র মা ডুপ্লের স্ত্রী। বলল, 'কি তোমার শরীর খারাপ করেনিতো ডুপ্লে?'

'না শরীর খারাপ নয়, মনটা খুব খারাপ লেটি'। ডুপ্লের স্ত্রীর নাম লেটিছিয়া।

'কেন? কিছু ঘটেছে?'

'সাংঘাতিক একটা ঘটনা ঘটেছে লেটি'।

'কি ঘটেছে?' উদ্বেগে চোখ বড় বড় করে বলল লেটিছিয়া।

উদ্বিগ্ন রোসা তার আব্বার মাথার কাছে মেঝেতে বসল।

'একটা নিগ্রো বন্দীর কথা তোমাদের বলেছিলাম না? তাকে নিয়ে বড় ঘটনা ঘটেছে'।

'কি ঘটনা?' জিজ্ঞাসা করল ডুপ্লের স্ত্রী।

ওমর বায়ার কাগজ ও পেন্সিল পাওয়া, তার চিঠি লেখা, ধরা পড়া তার উপর অমানুষিক নির্যাতন, তবুও সরবরাহকারীর নাম না বলা সব ঘটনা বলল ডুপ্লে।

উদ্বিগ্ন ভাবে শুনলো কথাগুলো মা ও মেয়ে। ডুপ্লে কথা শেষ করলেও কিছুক্ষণ কথা বলল না ওরা দু'জন। পরে তরুণী রোসা বলল, 'আমাদের এক ম্যাডামের কাছে গল্প শুনেছি, মিথ্যা না বলা ও ওয়াদা রক্ষা করা মুসলমানদের ধর্ম। তোমার এ নিগ্রো বন্দী তো মুসলমান'।

'ঠিক বলেছ মা। লোকটির সততা আমাকে অভিভূত করেছে। আমরা কেউ হলে নাম বলে দিতাম। সত্য না বললেও মিথ্যা-মিথ্যি কারো নাম বলে ভয়ানক নির্যাতন থেকে বাঁচার চেষ্টা করতাম। শত্রু বিশেষ করে ব্ল্যাক ক্রস- এর সবাই প্রকৃত পক্ষে শত্রু। সুতরাং তাদের কারও উপর দোষ চাপিয়ে বাঁচার পথ খুজতাম'।

'শুধু ঐ নির্যাতন দেখেই কি তুমি এতটা মুষড়ে পড়েছ?' বলল ডুপ্লের স্ত্রী লেটি।

'ওর ঐ নির্যাতনের জন্যে আমি দায়ী লেটি'।

'কেমন করে?'

'আমিই ওকে চিঠি লেখার প্রস্তাব দিয়েছিলাম, আমিই ওকে পেন্সিল ও সিগারেটের প্যাকেটে কাগজ দিয়েছিলাম'।

'তুমি?' আতংকে চোখ দু'টি বিস্ফোরিত হয়ে উঠল লেটিছিয়ার। তরুণী রোসারও মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গিয়েছিল।

লেটিছিয়া খাটের এক পাশে বসতে বসতে বলল, 'তুমি ব্ল্যাক ক্রসকে চেন না? নিগ্রো লোকটা যদি মুখ খুলতো তাহলে তো এতক্ষণে কিয়ামত হয়ে যেত'।

'হঠাৎ করেই লোকটার প্রতি মমতা এসে গিয়েছিল। লোকটা একদম বিনা অপরাধে নির্যাতন ভোগ করছে'।

'লোকটার উপর যদি আবারও নির্যাতন হয়, বলে দেয় যদি লোকটা তোমার নাম?' রোসার মুখ থেকে ভয়ের ছাপ এখনও যায়নি।

‘জানি না কি হবে। তবে মনে হয় লোকটাকে নির্যাতন নয়, অন্য কোনভাবে হাত করার চেষ্টা করবে’।

‘লোকটা চিঠিতে কি বলতে চেয়েছিল, তাও জান না?’

‘জানি না। একথা জিজ্ঞাসা করছ কেন?’

লেটিছিয়া কিছু বলার আগেই রোসা বলল, ‘আব্বু লোকটা তোমার নাম বলে দিতে পারে বলে মনে কর?’ রোসার কন্ঠস্বর ভারি।

ডুপ্লে মেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে কপালে একটা চুমু খেয়ে বলল, চিন্তা করো না মা। ওমর বায়া মুসলমান না হয়ে অন্য জাতির লোক হলে আমি ভয় করতাম। কিন্তু মুসলমান ওমর বায়ার কাছ থেকে এ ভয় নেই। জান, মুসলমানরা সত্যিকার মুসলমান হলে লোহার চেয়ে শক্ত হয়, পাহাড়ের চেয়ে ওজনদার হয়, আকাশের চেয়ে উঁচু হয় এবং স্বর্ণের চেয়ে সুন্দর হয়। ওদের থেকে কোন ভয় নেই মা’।

‘ওমর বায়া কি সত্যিকার মুসলমান?’ বলল রোসা।

‘আমার তাই মনে হয়। হাত-পা শিকল বাঁধা অবস্থাতেও সে নামায পড়ে। ইসলাম ধর্মে শুকর খাওয়া এবং আল্লাহর নাম নিয়ে জবেহ নয় এমন গোশত খাওয়াও নিষেধ। ওমর বায়া ক’দিন না খেয়ে থেকেছে তবু এসব জিনিস খেতে রাজী হয়নি’।

‘লোকটাকে আমরা কোন সাহায্য করতে পারি না?’ ফিস ফিস কন্ঠে বলল লেটিছিয়া।

‘সাহায্য করতে তো চেষ্টা করেছিলাম’।

‘এখন কিছু করার নেই? দেখ, তাকে সাহায্য করলে আমাদের দু’টো লাভ। একটা ভালো মানুষের উপকার হলো এবং আমরা তোমার নাম প্রকাশ হওয়ার ভয় থেকে বাঁচলাম’।

একটু ভাবল ডুপ্লে। বলল, ‘পেয়েছি। তাকে কিডন্যাপ করার আগে সে ফিলিস্তিন দুতাবাসে ছিল। সুতরাং ফিলিস্তিন দুতাবাস অবশ্যই তাকে চেনে’। আনন্দে মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল ডুপ্লের।

‘ঠিক। তুমি একটা চিঠি লিখে ওমর বায়ার কথা ওদের জানিয়ে দাও’। বলল লেটি।

‘গিয়ে সব বললে ভালো হয় না’।

‘তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, ব্ল্যাক ক্রস নিশ্চয় দুতাবাসের উপর চোখ রাখছে। খবরদার ওমুখো হবে না’।

ডুপ্লে স্তম্ভিত ভাবে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বলল, ‘তোমার এত দুরদৃষ্টি লেটি। এ সহজ কথাটা ঘুর্নাক্ষরেও আমার মনে আসেনি। ধন্যবাদ তোমাকে’।

‘ধন্যবাদ দরকার নেই। তুমি ব্ল্যাক ক্রস- এর একজন। তুমি আগুনের মধ্যে দাড়িয়েঁ। তোমাকে আরও সাবধান হতে হবে’। বলল লেটি।

ডুপ্লের স্ত্রী লেটি থামতেই মেয়ে রোসা বলে উঠল, ‘ব্ল্যাক ক্রস তুমি ছেড়ে দাও আব্বু’।

ডুপ্লের মুখটি ম্লান হয়ে উঠল। বলল, ‘ব্ল্যাক ক্রসে ঢোকার পথ আছে মা বের হবার কোন পথ নেই’।

‘কিন্তু তুমি এক সময় বলেছিলে এটা একটা মহান সংগঠন। যারা নির্দোষ মানুষের রক্তপাত করে, হিংসাই যাদের মুলধন, তারা আবার কিসের মহান সংগঠন?’ ক্ষোভে ফুসে উঠল ডুপ্লের স্ত্রী।

‘সংগঠনের কি দোষ? আমাদের খৃষ্টান ধর্মের স্বার্থেই তো এ সংগঠনের সৃষ্টি’। বলল ডুপ্লে।

‘দেখ ব্ল্যাক ক্রস নামটাই খারাপ। ক্রস ব্ল্যাক হবে কেন? ব্ল্যাক তো শয়তানের প্রতীক’। বলল লেটি।

‘এ ব্ল্যাক সে ব্ল্যাক নয়। এ ব্ল্যাক অর্থ ‘গুপ্ত’-‘আন্ডার গ্রাউন্ড’।

‘কিন্তু একটা ন্যায়নিষ্ঠ দল কেন আন্ডার গ্রাউন্ড হবে? তোমরা কি শত্রু দেশে না শত্রু পরিবেশে কাজ করছ?’

‘না তা নয়। কিন্তু জাতীয় স্বার্থের এমন অনেক কাজ এসে পড়ে যা প্রকাশ্যে করা যায় না’।

‘থাকতে পারে। কিন্তু ব্ল্যাক ক্রস খৃষ্টান স্বার্থের প্রতিপক্ষকে নির্মূল করার যে নীতি গ্রহণ করেছে সেটা কি জাতীয় স্বার্থ? ওমর বায়াকে তোমরা যে নির্যাতন করছ, পৃথিবীর কোন আইনে তা বৈধ?’

‘লেটি, অতীতে ব্যাপারটা এমন ছিল না। নানা প্রয়োজন ও বিবেচনা থেকে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে’।

দেখ, খুঁজলে অজুহাত, যুক্তি সব কাজের পক্ষেই পাওয়া যাবে। যাক, এসব কথা। রোসা যা বলেছে, আমারও সেটাই কথা। সরাসরি সরে আসতে পারবে না। ধীরে ধীরে নিস্ক্রিয় হয়ে পড়। ওদের কাছে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়লে বেরিয়ে আসার একটা পথ হয়ে যাবে’। বলল লেটি।

লেটিছিয়ার কথা শেষ হলেও ডুপ্লে কিছুক্ষণ কথা বলল না। পরে ধীরে ধীরে বলল, শারীরিক ও পারিবারিক বিভিন্ন কারণে আমি এক মাসের ছুটি চেয়েছিলাম। মঞ্জুরও হয়েছে। কিন্তু অফিসের এ গন্ডগোলের কারণে দু’একদিন অপেক্ষা করে তারপর ছুটিতে যেতে চাচ্ছি, ‘তোমরা যা বললে ছুটির এ সময়ে আরও চিন্তা করতে পারব’।

তার আব্বার ছুটির খবরে ভীষণ খুশী হয়ে উঠল রোসা। বলল, আব্বু আমাদেরও কলেজ বন্ধ হচ্ছে। চল না আব্বু আমাদের গ্রামে গিয়ে কিছুদিন থেকে আসি’।

ডুপ্লে ও লেটি পরস্পরের দিকে চাইল। তাদেরও মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

‘ধন্যবাদ রোসা। তোমার প্রস্তাব আমাদের খুব পছন্দ হয়েছে’। বলল লেটি।

রোসা ছুটে এসে তার আব্বা ও আম্মার মাঝখানে বসে দু’জনকেই জড়িয়ে বলল।

# ২

প্যারিসে যখন ল্যান্ড করল বিমানটি রাত তখনও বাকি।

ছোট্ট একটি এ্যাটাসি কেস হাতে লাউঞ্জে বেরিয়ে এল আহমদ মুসা।

চারদিক তাকাল।

তার চোখ দু'টি সন্ধান করল ফিলিস্তিন এ্যামবেসির কাউকে। কিন্তু কাউকে দেখল না। বিস্মিত হলো আহমদ মুসা।

প্যারিস যাত্রার এক ঘন্টা আগেও ওদের সাথে যোগাযোগ হয়েছে। এ্যামবেসিতেই আহমদ মুসার প্রথম যাবার কথা। ওখান থেকেই কিডন্যাপ হয়েছে ওমর বায়া। সামনে এগুতে হলে কিছু জানতে হবে ফিলিস্তিন দুতাবাস থেকে।

বিস্মিত আহমদ মুসা বেরিয়ে এল বিমান বন্দর থেকে।

যাত্রীরা প্রায় সবাই চলে গেছে। লাউঞ্জে বেশ দেরী করেছিল আহমদ মুসা।

বাইরে এসে ট্যাক্সির জন্যে সে সামনের দিকে নজর করতেই একটা হর্ণ কানে এল আহমদ মুসার। চমকে উঠে সেদিকে তাকাল। বুঝল ওটাই ফিলিস্তিন এ্যামবেসির গাড়ি। ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থা সাইমুমের কোডে হর্ণ দিয়েছে।

আহমদ মুসার কাছে সবটা পরিস্কার হয়ে গেল। শত্রুপক্ষের নজর এড়াবার জন্যেই এ্যামবেসির পরিচিত কেউ বিমান বন্দরে আসেনি। সম্ভবঃত যে গাড়িটা এসেছে তাও এ্যামবেসির নয় এবং এ্যামবেসি থেকে আসা নয়।

আহমদ মুসার মুখে স্বস্তির হাসি ফুটে উঠল। গাড়ির দিকে এগুলো আহমদ মুসা।

গাড়ির কাছাকাছি যেতেই আবার হর্ণ বাজিয়ে গাড়িটা নড়ে উঠল। কোডেড এ হর্ণের অর্থ হলো- স্বাগতম।

আহমদ মুসা গাড়ির কাছে দাঁড়াতেই গাড়ির দরজা খুলে গেল। জ্বলে উঠল গাড়ির ভেতরের আলো।

আহমদ মুসা দেখল, ড্রাইভিং সিটে একজন এবং তার পাশের সিটে আরেকজন বসা। দু'জনেই অপরিচিত, কিন্তু দু'জনেই আরব।

আহমদ মুসা গাড়িতে উঠে বসল। পেছনের সিটে।

আহমদ মুসা সালাম দিল। উত্তর দিল ওরা দু'জনেই।

গাড়ি লাফিয়ে উঠে যাত্রা শুরু করল।

বিমান বন্দর এলাকা থেকে বেরিয়ে এল গাড়ি।

'আমরা নিশ্চয় এ্যামবেসিতে যাচ্ছি?' প্রথমে নীরবতা ভাঙল আহমদ মুসা।

'জি, জনাব'। পাশের লোকটি বলে উঠল।

'গাড়িটা নিশ্চয় এ্যামবেসি থেকে আসেনি?'

'জনাব ঠিকই বলেছেন'।

'ওরা কি এ্যামবেসির উপর খুব নজর রাখছে?'

'সম্ভবঃত ব্যাপারটা তেমন নয়, কিন্তু সাবধানতার জন্যেই এটা করা'।

'তোমরা?'

'আমরা আপনার সাইমুমের খুব নগণ্য কর্মী। প্যারিসের দু'টি ফার্মে আমরা দু'জন চাকরী করি। আপনাকে এ্যামবেসিতে পৌছে দেয়া আমাদের উপর নির্দেশ'।

এয়ারপোর্ট-হাইওয়ে ধরে ছুটে চলল সাইমুমের গাড়ি আহমদ মুসাকে নিয়ে।

নীরব চারদিক। হাইওয়েতেও গাড়ির ভীড় খুব কম। একশ পচিঁশ কিলোমিটার বেগে ঝড়ের গতিতে ছুটে চলেছে গাড়ি।

'সুন্দর ড্রাইভিং কর তো দেখছি। তোমার নাম কি?' ড্রাইভিং সিটের দিকে চেয়ে হাসি মুখে বলল আহমদ মুসা।

'জনাব পর্বত কি টিলার প্রশংসা করতে পারে? আপনার ড্রাইভিং-এর কথা শুনেছি স্যার'।

একটু থেমেই লোকটি বলল, ‘আমার নাম আবু আবদুল্লাহ আমর। আর ওর নাম আহমদ জিয়াদ’।

‘তোমরা কতদিন আছ প্যারিসে?’

‘পাঁচ বছর’।

‘অবস্থা কেমন মনে হচ্ছে তোমাদের কাছে?’

‘কোনদিক দিয়ে স্যার?’

‘এখানকার সংখ্যালঘু জাতি গোষ্ঠী বিশেষ করে মুসলমানদের কথা বলছি’।

‘তাদের অধিকারের সীমানা ক্রমশঃ সংকীর্ণতর হয়ে উঠছে’।

‘তোমার মতে এর কারণ কি বলত?’

‘গভীরভাবে ব্যাপারটাকে আমি কখনও ভেবে দেখতে চেষ্টা করি নি। তবে আমার মনে হচ্ছে, এরা ধর্মনিরপেক্ষ আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ থেকে সরে আসছে’।

‘সরে কোথায় আসছে?’ কথার সাথে আহমদ মুসার চোখ দু’টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

‘ধর্মীয় জাতীয়তার দিকে’।

‘তোমার এ চিন্তার কারণ?’

গাড়িটা হঠাৎ ডান দিকে টার্ন নিল এবং আবার ছুটতে শুরু করল।

‘হাইওয়ে ছাড়লে কেন? কোন পথে যাবে?’ বলল আহমদ মুসা বাইরের দিকে নজর বুলিয়ে।

‘আমরা যাচ্ছি শহরের এ প্রান্তের ডিপ্লোম্যাটিক জোনে। এ রাস্তাটি নিরিবিলি ও সংক্ষিপ্ত হবে’। বলল আবু আবদুল্লাহ আমর। সত্যিই এ রাস্তাটা একেবারেই জনশূন্য। একটা গাড়িও দেখা যাচ্ছে না।

আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে চাইল। সূর্য উঠার আরও দেড় ঘন্টা বাকি। ‘আর কতক্ষণে আমরা পৌঁছব আমর?’ বলল আহমদ মুসা।

‘পনের মিনিট স্যার’।

কথা শেষ করেই ড্রাইভার আবু আবদুল্লাহ আমর দ্রুতকণ্ঠে বলে উঠল, ‘স্যার রাস্তায় একজন লোক পড়ে আছে’।

আহমদ মুসারও চোখে পড়ে গেছে। বলল, ‘হ্যাঁ লোকটার হাত-পা চোখ বাঁধা মনে হচ্ছে’।

বলতে বলতে গাড়িটা লোকটার সমান্তরাল এসে পৌছল।

‘গাড়ি থামাও’। দ্রুতকন্ঠে বলল আহমদ মুসা।

লোকটার প্রায় পাশে এসে গাড়ি থামল।

গাড়ি থেকে নামল আহমদ মুসা। তার সাথে আহমদ জিয়াদও।

পড়ে থাকা লোকটি উঠে বসেছে। সত্যিই তার দুই হাত-পা ও চোখ বাধা। বয়স সত্তরের বেশী হবে। মাথায় টাক। টাকের প্রান্ত দিয়ে চুলগুলো তুলোর মত সাদা। চোখ-মুখে দৃঢ় ব্যক্তিত্বের ছাপ।

আহমদ মুসা ও আহমদ জিয়াদ দু’জনেই গিয়ে দ্রুত তার চোখ ও হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিল।

‘ধন্যবাদ ইয়ংম্যান তোমাদের সাহায্যের জন্যে’। লোকটি উঠে দাড়িয়েঁ কোটের কলার ও টাই ঠিক করতে করতে বলল।

‘ধন্যবাদ। আপনাকে আমরা আর কি সাহায্য করতে পারি? কোথায় যেতে চান আপনি?’ বলল আহমদ মুসা।

‘এ সময় বোধহয় গাড়ি পাব না। আমাকে বাড়ি পৌছে দিলে খুশী হবো’।

‘নিশ্চয় পৌছে দেব। আসুন’। বলে আহমদ মুসা গাড়ির দরজা খুলে ধরল।

গাড়িতে উঠে বসল বৃদ্ধ।

আহমদ মুসা গাড়ির দরজা বন্ধ করে ওপাশ দিয়ে বৃদ্ধের পাশে উঠে বসল।

‘শার্লেম্যান সার্কেল। এখান থেকে বেশ দুর। অসুবিধা হবে না তো তোমাদের?’ বলল বৃদ্ধটি।

‘না, কোন অসুবিধা নেই। আমর তুমি চেননা শার্লেম্যান সার্কেল?’ বলল আহমদ মুসা।

‘চিনি জনাব’। বলল ড্রাইভার।

গাড়ি ঘুরে আবার এয়ারপোর্ট হাইওয়েতে ফিরে এল। তারপর আবার ছুটে চলল শহরের দিকে। শার্লেম্যান সার্কেল শহরের একেবারে বিপরীত প্রান্তে। শহরের একটা অভিজাত এলাকা ওটা।

‘তোমরা তো সবাই বিদেশী দেখছি। কিন্তু তুমি তো এই রাতে প্যারিসে ল্যান্ড করলে?’ আহমদ মুসার দিকে একটু মুখ ঘুরিয়ে প্রশ্ন করল বৃদ্ধটি।

‘কি করে বুঝলেন?’ আহমদ মুসার কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর।

‘খুব সহজ ইয়ংম্যান, তোমার দিক থেকে একটা সেন্ট আসছে। সে সেন্টটা প্যান ইসলামিক এয়ারলাইন্সের রিফ্রেসারেই শুধু পাওয়া যায়। এবং এ সেন্ট এক ঘন্টার বেশী থাকে না। সুতরাং ...’।

আহমদ মুসা বিস্ময়ের সাথে বৃদ্ধের দিকে তাকাল। মনে মনে ভাবল, লোকটিকে সে যতটা অসাধারণ মনে করেছিল, তার চেয়ে অনেক বেশী অসাধারণ।

‘জি, ঠিকই বলেছেন। আমি এক ঘন্টার মত হলো ল্যান্ড করেছি’।

‘তোমার খুব কষ্ট হলো। তোমরা তো যাচ্ছিলে ডিপ্লোম্যাটিক জোনে। এতক্ষণ তুমি রেস্টে যেতে পারতে’।

আহমদ মুসার আবার বিস্মিত হবার পালা। বলল, ‘কেমন করে বুঝলেন আমরা ডিপ্লোম্যাটিক জোনে যাচ্ছিলাম?’

‘খুব সোজা। প্যারিসের ম্যাপ তোমার সামনে থাকলে তুমিও বলতে পারতে। এ রাস্তায় যারা আসে, তারা হয় ডিপ্লোম্যাটিক জোনে যায়, নয়তো শহর পেরিয়ে ওদিকে চলে যায়’।

শার্লেম্যান সার্কেলে প্রবেশ করল গাড়ি। বৃদ্ধ আমরকে বুঝিয়ে দিল কোন পথে কোথায় যেতে হবে।

বাগান ঘেরা সুন্দর একটা বাঙলোর সামনে এসে গাড়ি থামল।

গেট বক্স থেকে দু’জন পুলিশ ছুটে এল।

উকি দিয়ে বৃদ্ধকে দেখেই লম্বা স্যালুট দিল তাকে। তাদের চোখে-মুখে বিস্ময় ও আনন্দের বিচ্ছুরণ।

স্যালুট শেষ করে একজন ছুটে গেল ভেতরে।

বৃদ্ধ নামল গাড়ি থেকে। আমন্ত্রণ জানাল আহমদ মুসাদেরকেও নামার জন্যে।

'ধন্যবাদ জনাব, আপনাকে আর কষ্ট দেব না'। বলল আহমদ মুসা।

'দেখ, তোমার রেস্ট নেবার জায়গা এখানেও আছে। নেমে এস'।

নামল আহমদ মুসারাও।

বাড়ির ভেতর থেকে প্রায় ছুটে বেরিয়ে এল পঞ্চাশোর্ধ একজন মহিলা এবং এক তরুণী।

বৃদ্ধকে এসে জড়িয়ে ধরল মহিলা ও তরুণীটি।

আহমদ মুসা ও তার সাথের দু'জন বসেছিল ড্রইং রুমে। মিনিট পাচেঁক পর বৃদ্ধটি ড্রইং রুমে ফিরে এল। তার সাথে মহিলা ও তরুনীটিও।

ওরা ড্রইং রুমে ঢুকতেই আহমদ মুসা বলল, 'আমাদের ফজর নামাযের সময় হয়েছে। আমরা কি...'।

'ফজর নামায?' বাধা দিয়ে প্রশ্ন করল বৃদ্ধটি।

'মর্নিং প্রেয়ার'। বলল আহমদ মুসা।

'বুঝেছি, কি দরকার বল'।

'কিছু নয়। আমরা একটু টয়লেট ব্যবহার করব। এই কার্পেটে কিংবা করিডোরেও নামায হতে পারে'।

'ঠিক আছে। এস'। বলে মহিলাটি হাসি মুখে গিয়ে টয়লেট দেখিয়ে দিল'।

ড্রইং রুমের এক পাশে তিনজনে ওরা নামায পড়ল।

ওরা তিনজন নীরবে বসে নামায দেখছিল। ওদের সবার মুখ বিস্ময়ে বিমুগ্ধ।

নামায শেষ করে আহমদ মুসারা এসে বসল।

'এদের সাথে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়নি ইয়ংম্যান'। তারপর মহিলাকে দেখিয়ে বলল, 'এ আমার স্ত্রী, আর ও আমার মেয়ে ক্লাউডিয়া'।

বৃদ্ধ কথা শেষ করতেই মহিলাটি বলল, 'তোমাদের প্রেয়ার তো খুবই সুন্দর। তুমি উচ্চারণ করলে ওটা কোন ভাষা?' আহমদ মুসার দিকে লক্ষ্য মহিলাটির।

'ওটা আরব ভাষা'।

'মাতৃভাষা?'

'মাতৃভাষা যাই হোক, প্রার্থনার ভাষা আরবী'।

'সামনে যে দাঁড়ায় তিনি বুঝি নামায পরিচালনা করেন?' বলল ক্লাউডিয়া।

'হ্যাঁ'। বলল আহমদ মুসা।

'আপনি কি ধর্ম নেতা, যেমন আমাদের বিশপ, ফাদার?'

'না। মুসলমানদের নামায পরিচালনা যে কোন মুসলমানই করতে পারে'।

ক্লাউডিয়া কিছু বলতে যাচ্ছিল। তাকে বাধা দিয়ে বৃদ্ধ বলল, 'ওরা খুব টায়ার্ড। কিছু দাও এদের'। বৃদ্ধের দৃষ্টি মহিলার দিকে।

'বলে দিয়েছি। আসছে'। বলল মহিলা।

কথা শেষ করেই আহমদ মুসাদের দিকে চেয়ে বলল, 'আমরা তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ বাবারা। ওকে উদ্ধার করে কষ্ট করে নিয়ে এসেছ'। মহিলার কণ্ঠস্বর ভারি।

'এইটুকু কাজের জন্যে এভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে ছেলেদের প্রতি অন্যায় করা হয় মা'। বলল আহমদ মুসা।

'তোমরা সত্যিই ভাল ছেলে। তোমরা ঈশ্বরের প্রার্থণা কর। এমনটা তো আজ দুর্লভ'। বলল মহিলা।

'এই দেখ তোমাদের নামটাও জানা হয়নি'। বলল বৃদ্ধ।

আহমদ মুসা মুহুর্তকাল দ্বিধা করল। তারপর ওদের দু'জনের নাম বলে নিজের নাম বলল, আহমদ মুসা।

হঠাৎ করেই চোখটা কিছুটা তীক্ষ্ম হয়ে উঠল বৃদ্ধের।

এই সময় নাস্তা এল। নাস্তা বলতে কিছু স্ন্যাকস এবং শ্যাম্পেন।

আহমদ মুসারা সবার সাথে স্ন্যাকস খেল। কিন্তু মদ স্পর্শ করল না।

'কি, তোমরা শ্যাম্পেন খাও না?' বিস্ময়ের সাথে প্রশ্ন করল মহিলাটি।

'না, আমরা মদ খাই না'।

'খাও না?' মহিলাসহ সবার চোখে এক রাশ বিস্ময়।

কিন্তু বৃদ্ধের চোখে বিস্ময় নেই। তার চোখে আগের সেই তীক্ষ্নতা এবং দুর্লভ কোন জিনিস খুজেঁ পাওয়ার ঔজ্জ্বল্য।

'তোমরা খুবই ভাল ছেলে। এমনটা আমি চোখে দেখিনি'। বলল মহিলাটি।

'মুসলমানদের কয়েকজনকে তো আমি মদ খেতে দেখেছি বিশ্ববিদ্যালয়ে?' বলল ক্লাউডিয়া।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'আইন ও নীতি তো সবাই মানে না'।

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা বলে উঠল, 'আপনাদের আর কষ্ট দেব না। আমরা এখন উঠতে চাই'।

বৃদ্ধের ঠোটেঁ হাসি। একটু নড়ে-চড়ে বসে বলল, 'কিন্তু তোমরা তো আমার কথা আমার পরিচয় কিছুই জিজ্ঞাসা করলে না?'

আহমদ মুসা সলজ্জ হেসে বলল, 'আপনাকে কিডন্যাপ করা হয়েছিল। তবে যারা কিডন্যাপ করেছিল তারা মনে হয় আপনাদের শত্রু নয়'।

'কি করে বুঝলে এসব কথা?' বৃদ্ধের মুখে হাসি।

'আপনার পোষাক-পরিচ্ছদ, কলম, ঘড়ি, চশমা, হ্যাটসহ যে ভাবে আপনাকে পেয়েছি তাতে এটাই মনে হয়েছে'। বলল আহমদ মুসা।

একটু থেমেই আবার শুরু করল, 'আপনি ফরাসি গোয়েন্দা বিভাগের উচ্চপদস্থ একজন সাবেক সদস্য'।

'কি করে বুঝলে?'

'পুলিশের স্যালুট দেয়া এবং আপনাকে দেখে'।

মহিলাটি এবং ক্লাউডিয়া নীরবে শুনছিল। তাদের চোখে বিস্ময়।

আহমদ মুসাই আবার কথা বলল, 'আমার কিন্তু জানতে ইচ্ছা করছে, শত্রু নয় অথচ ওরা আপনাকে কিডন্যাপ করল কেন?'

‘বলব আমি কিন্তু তার আগে বল, তোমাকে আমি যা ভাবছি তুমি তাই কিনা?’

আহমদ মুসা মুখ তুলে পূর্ণভাবে তাকাল বৃদ্ধের দিকে।

বৃদ্ধের এই কথায় তার স্ত্রী এবং কন্যা ক্লাউডিয়া বিস্ময় দৃষ্টি নিয়ে তাকাল একবার বৃদ্ধের দিকে আরেকবার তাকাল আহমদ মুসার দিকে।

‘আপনার ভাবনা ঠিক হতেই হবে’। মুখ নিচু করে বলল আহমদ মুসা।

সঙ্গে সঙ্গেই বৃদ্ধ উঠে দাঁড়াল। হাত বাড়িয়ে দিয়ে আহমদ মুসার সাথে হ্যান্ডশেক করে বলল, ‘ওয়েলকাম। তোমাকে ‘তুমি’ বলার জন্যে আমি দুঃখিত। কিছু মনে করো না। আমি তোমার পিতার বয়সের’।

মহিলা এবং ক্লাউডিয়া দু’জনেরই চোখ বিস্ফোরিত হয়ে উঠেছে।

‘আব্বা, কি বলছ আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না’। বলল ক্লাউডিয়া।

‘মা, তোমরা যাকে চোখে দেখছ, যার সাথে কথা বলছি, তিনি বিস্ময়কর চরিত্র, কিংবদন্তির নায়ক আহমদ মুসা’।

‘কি বলছেন আব্বা!’- বলে বিস্ময়ে দাড়িয়েঁ গেছে ক্লাউডিয়া। আর তার মা’র চোখে বোবা দৃষ্টি।

‘অবিশ্বাস্যই মা’।

‘আমাকে এভাবে লজ্জা দেবেন না। আমি আমার জাতির একজন নগণ্য কর্মী’। বিব্রত আহমদ মুসার মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

‘আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি আহমদ মুসা তোমার সাথে পরিচিত হতে পেরে। অনেক ভেবেছি আমি তোমার কথা। আমার বাড়িটা সত্যিই ধন্য হলো। এটা আমার জন্যে একটা ঐতিহাসিক ঘটনা’।

একটু থেমেই আবার বলল, ‘কিছু মনে করো না। আমার কৌতুহল হচ্ছে, ফ্রান্সে তোমার আগমন কেন? বড় কিছু না ঘটলে তুমি কোথাও যাও না। এই কিছুদিন আগে তো ফ্রান্স থেকে গেলে’।

সঙ্গে সঙ্গেই কথা বলল না আহমদ মুসা।

বৃদ্ধ, ক্লাউডিয়া এবং তার মা সকলের উদগ্র দৃষ্টি আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসার মুখ নিচু।

ক্লাউডিয়া এবং তার মা ভেবে পাচ্ছে না, এমন শান্ত ও সলজ্জ মানুষ এত বড় বিপ্লবী কি করে হতে পারে।

আহমদ মুসা একটু মুখ তুলল। বলল, 'বড় কোন ঘটনা ঘটেনি। আমাদেরই এক ভাইকে কিডন্যাপ করা হয়েছে'।

'কিন্তু এই ঘটনায় তোমার আসাটা......'।

কথা শেষ না করেই থামল বৃদ্ধ।

'সে একজন ব্যক্তি মাত্র নয়। তার ধ্বংস হওয়ার মধ্যে দিয়ে গোটা দক্ষিণ ক্যামেরুনকে মুসলিম স্বার্থের ধ্বংস সম্পূর্ণ হয়ে যাবে'।

'বুঝেছি। তাকে কারা কিডন্যাপ করল?'

'ঠিক জানি না। তবে পশ্চিম আফ্রিকার খৃষ্টান মিশনারী এবং সেখানকার গোপণ খৃষ্টান জংগ সংগঠন তাকে তাড়া করে ফিরছে'।

'ঐ সংগঠন কি 'কোক' (কিংডোম অব ক্রাইস্ট) এবং 'ওকুয়া' (আর্মি অব ক্রাইস্ট অব ওয়েস্ট আফ্রিকা)?'

'জি'।

একটু চিন্তা করল বৃদ্ধ। তারপর বলল, 'কোক' কিংবা 'ওকুয়া'র কোন ক্ষমতা নেই ফ্রান্সে কোন অপারেশন চালাবার'।

থামল। একটু ভাবল বৃদ্ধ। বলল আবার, 'কোত্থেকে কিভাবে তাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে?'

'ফিলিস্তিন দুতাবাসের গাড়ি থেকে। দিনের বেলা। দুতাবাসের সামনের রাস্তা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়'। বলল আবু আবদুল্লাহ আমর।

'আহমদ মুসা, আমি নিশ্চিত এ কাজ 'ব্ল্যাক ক্রস'-এর, তবে এরা কোন অপরাধী সংগঠন নয়'।

'ব্ল্যাক ক্রস?' প্রশ্ন আহমদ মুসা। তার কপাল কুঞ্চিত।

'ইউনিভারসাল হোলিক্রস- নামক এন.জি.ও'এর নাম নিশ্চয় তুমি জান'।

'জি'।

‘এই ইউনিভারসাল হোলিক্রস’- এরই আন্ডার গ্রাউন্ড নাম ‘ব্ল্যাস ক্রস’। এক সংগঠনের দুই মুখ। ইউ এইচ সি (UHC)-এর নামে তারা দুনিয়ায় সেবামূলক কাজ করে এবং ব্ল্যাক ক্রস-এর নামে তারা খৃষ্টান স্বার্থে যা প্রয়োজন তাই করে’।

‘এরা কি অপরাধী সংগঠন নয়?’

বৃদ্ধ হাসল। বলল, ‘হ্যাঁ আমি বলেছি ওরা অপরাধী সংগঠন নয়। তার অর্থ হলো, নিছক অর্থ-সম্পদের জন্যে এরা সন্ত্রাস বা খুনোখুনি করে না। অর্থ-সম্পদ এদের লক্ষ্য নয়। এদের লক্ষ্য গোটা বিশ্বের খৃষ্টকরণ। খৃষ্টান বিশ্বাসের, অন্যকথায় খৃষ্টান নিয়ন্ত্রণ প্রসারের জন্যে কোন কিছু করতেই তারা পিছপা হয় না। সুতরাং সাধারণভাবে অপরাধী বলতে যা আমরা বুঝি, সে ধরণের অপরাধী তারা নয়’।

‘ব্ল্যাক ক্রসের সাথে যাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে, সেই ওমর বায়ার তো কোন শত্রুতা নেই। তাহলে তারা তাকে কিডন্যাপ করলো কেন?’

‘আমি মনে করছি, ‘ওকুয়া’ ব্ল্যাক ক্রসের সাহায্য চেয়েছে। ব্ল্যাক ক্রস এতে সাড়া দিয়ে তাকে সাহায্য দিচ্ছে। এবং এটা খুবই স্বাভাবিক। খৃষ্টান ধর্মের সম্প্রসারণ উভয়েরই লক্ষ্য। তাছাড়া কিছু অর্থযোগও থাকতে পারে’।

‘বুঝেছি জনাব। আমাদের সংঘাতটা তাহলে ব্ল্যাক ক্রস- এর সাথে’।

‘ঠিক। কিন্তু তুমি কি ব্ল্যাক ক্রস-এর সাথে লড়াইয়ে নামতে চাও? বাঘদের রাজ্যে কি বাঘের সাথে লড়াইয়ে নামা উচিত?’

‘উচিত কি না সে বিচার তখন করা যায়, যখন বিকল্প থাকে। আমাদের সামনে কোন বিকল্প নেই জনাব’।

‘ঠিক বলেছ বৎস। কিন্তু আমি ভাবছি জেনেশুনে আগুনে ঝাঁপ দেয়া কি ঠিক? তুমি বোধ হয় জান না, ফরাসি পুলিশ অফিসারদের উপর ‘ব্ল্যাক ক্রস’- এর প্রভাব। বলতে পার, ব্যক্তিগত ভাবে পুলিশ ও পুলিশ অফিসাররা তাদের প্রতি অনুগত বা সহানুভূতিশীল। সুতরাং পুলিশের সত্যিই কোন সাহায্য পাবে না। আর ব্ল্যাক ক্রস- নাজীদের গেষ্টাপো বাহিনীর মতই সর্বব্যাপী এবং তাদের মতই

নিষ্ঠুর। ফ্রান্সে এসে তুমি ওদের সাথে লড়াইয়ে নাম, আমার মন এতে কিছুতেই সায় দিচ্ছে না'।

'আপনার শুভেচ্ছার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমি জয়ের জন্যে ওদের সাথে লড়াইয়ে নামছি না জনাব। আমার কাজ একজন মজলুম মানুষকে ওদের হাত থেকে উদ্ধার করা। এটা আত্মরক্ষার লড়াই। জয়ের জন্যে যে লড়াই সেখানে অনেক হিসাব-নিকাশের প্রয়োজন হয়, আত্মরক্ষার লড়াইয়ে তার কোন হিসেব-নিকেশের অবকাশ থাকে না'।

আহমদ মুসা কথা শেষ করতেই বৃদ্ধ উঠে দাঁড়াল। দু'পা এগিয়ে এসে আহমদ মুসার পিঠ চাপড়ে উচ্ছ্বসিত কন্ঠে বলল, আবিস্মরণীয় একটা কথা বলেছ বৎস। তুমি শুধু বিপ্লবী নও, বিপ্লবীর চেয়ে বড় তুমি মানুষ। ভালবাসা ছাড়া শুধু দায়িত্ববোধ মানুষকে এতবড় করতে পারে না'।

'ধন্যবাদ জনাব। মানুষের এইভাবে ভালবাসা আমাদের ধর্মের শিক্ষা'।

'এ শিক্ষা তো খৃষ্টেরও'। বলল ক্লাউডিয়া। ক্লাউডিয়া এবং তার মা মন্ত্রমুগ্ধের মত এতক্ষণ এই আলাপ শুনছিল।

আহমদ মুসা মুখ তুলে ক্লাউডিয়ার দিকে তাকাল। ঠোটেঁ এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল তার। বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন, কিন্তু খৃষ্টের এ শিক্ষার সাথে দায়িত্বরোধের তাগিদ নেই। আমাদের ধর্মে মানুষকে ভালবাসার সাথে সাথে অন্যায়কে প্রতিরোধ করারও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ অর্পিত দায়িত্বের দাব হলো, অসীম ভালবাসা নিয়ে মানুষের দুঃখে বসে বাসে আমি শুধু কাঁদব না, দুঃখের যা কারণ তার প্রতিরোধেও এগিয়ে যাব'।

'এতে দায়িত্ব পালন হবে ঠিকই, কিন্তু এই দায়িত্ব পালন আবার অনেক দুঃখ, অনেক অশ্রু এবং এমনকি অনেক জীবনহানিরও কারণ ঘটাবে'। বলল ক্লাউডিয়া। সামনে দিয়ে আড়াআড়ি রাখা ডান হাতের উপর ঠেস দেয়া বামহাতের তালুতে রাখা ক্লাউডিয়ার মুখ। তার মুগ্ধ দৃষ্টি আহমদ মুসার উপর নিবদ্ধ।

বিশ-একুশ বছরের মত বয়স ক্লাউডিয়ার। পরনে কাল প্যান্ট, সাদা শার্ট। প্রথমে নাইট গাউন পরেই ছুটে বাইরে এসেছিল। পরে ভেতরে গিয়ে বদলে

ফেলেছে। ক্লাউডিয়ার সোনালী চুলের নিচে নীল চোখ এবং নীল-সাদায় মিশানো মুখ।

‘গাছ রক্ষার জন্যে আগাছা নির্মূলের প্রয়োজন হয়। একজন অপরাধীকে শাস্তি দিয়ে শত অপরাধের পথ বন্ধ করতে হয়। গোটা প্রকৃতি জুড়েই এই দৃশ্য মিস ক্লাউডিয়া। সূর্যের আলো প্রতিবিম্বিত করে পৃথিবীকে বাঁচানোর জন্যেই চাঁদকে মরতে হয়েছে’।

ক্লাউডিয়ার চোখে বিস্ময় বিমূঢ়তা। ক্লাউডিয়ার মা এবং তার আব্বা বৃদ্ধের চোখেও সপ্রশংস দৃষ্টি।

আপনি বিপ্লবী না দার্শনিক। আমি পলিটিক্যাল সাইন্সের ছাত্রী। জগতের পরিচিত বিপ্লবীদের আমি জানি। তাদের মধ্যে আমি দেখেছি বিপ্লবের জন্যে স্বেচ্ছাচারিতা। কিন্তু আপনার লক্ষ্য দেখছি সত্যনিষ্ঠার জন্যে বিপ্লব। এ হলো দার্শনিক বা ভাববাদীর দৃষ্টি। ক্লাউডিয়া বলল।

‘আমি কিছুই নই মিস ক্লাউডিয়া। আমি মুসলিম। সব ভাল দৃষ্টি, সব ভাল গুণ নিয়েই একজন মানুষ মুসলিম হয়। একজন মুসলিমের সাথে তাই অন্য বিপ্লবীদের পার্থক্য হবেই’। গম্ভীর কন্ঠ আহমদ মুসার।

‘মুসলিম ছাড়াও তো কেউ এই গুণগুলো অর্জন করতে পারে’। বলল ক্লাউডিয়াই। তারও গম্ভীর কন্ঠ।

‘তা পারে। কিন্তু সেটা তার নিছক ইচ্ছার অধীন। ইচ্ছার পরিবর্তন ঘটলে সব কিছুরই পরিবর্তন ঘটতে পারে। অন্যদিকে মুসলমানদের এই পারাটা ঐশী আইনের অধীন। যা মুসলমানরা ভংগ করতে পারে না। কারণ ঐশী বিধানই বলেছে, প্রত্যেক কাজের জন্যে তাকে পরকালে জওয়াবদিহি করতে হবে।। যার ফল হিসেবে সে পাবে অনন্ত পুরস্কার, অথবা সম্মুখীন হবে অনন্ত শাস্তির’।

ক্লাউডিয়া আর কথা বলল না। তার চোখে আনন্দ, বিস্ময় আর গভীর ভাবনার ছাপ।

কথা বলল ক্লাউডিয়ার আব্বা সেই বৃদ্ধ। বলল, ‘আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি তোমার সাথে পরিচিত হতে পেরে। তোমার সবচেয়ে বড় পরিচয় মনে হচ্ছে আমার কাছে পৃথিবীর শত কোটি মানুষের ভীড়ে দৃষ্টান্ত

হওয়ার মত একজন মানুষ তুমি। ধার্মিকতা, চরিত্র, সাহস ও সংগ্রাম সবই আছে যার মধ্যে। তাই আমার কষ্ট হচ্ছে তোমার সামনের অন্ধকার পথের দিকে তাকিয়ে'।

একটু থেমেই বৃদ্ধ আবার শুরু করল, আমার বয়স হয়েছে। করণীয় কিছুই ভাবতে পারছি না। দেখ, আমি ক্লাউডে বেবিয়ার, দশ বছর ফরাসি গোয়েন্দা বিভাগের চীফ ছিলাম। তিনদিন আগে আমাকে কিডন্যাপ করা হয়। যদিও এই তিন দিনই আমার চোখ বাঁধা ছিল, যদিও লাউড স্পিকারে আমার সাথে ওরা কথা বলেছে, তবু আমার বুঝতে কষ্ট হয়নি ওরা 'ব্ল্যাক ক্রস'- এর লোক। কতখানি...।

আহমদ মুসা বৃদ্ধ মিঃ ক্লাউডে বেবিয়ারের কথায় বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'ব্ল্যাক ক্রস আপনাকে কিডন্যাপ করেছিল? কেন?'

হাসল বৃদ্ধ ক্লাউডে বেবিয়ার। বলল, 'আমি নাকি এমন 'থট রিডিং' জানি এবং এমন সম্মোহন আমি জানি যে, মানুষের মনের কথা বের করে আনতে পারি এবং মানুষকে বশে এনে যা ইচ্ছা বলাতে পারি। তারা চেয়েছিল আমি তাদেরকে এ ব্যাপারে সাহায্য করি'।

'কিন্তু কিডন্যাপ করল কেন? এমনিতেই তো সাহায্য চাইতে পারতো'।

'এ ধরনের কোন কাজে সাহায্য আমি তাদের করব না, এটা তারা জানে। তাছাড়া পেশায় থাকতে যা আমি করেছি, তা এখন আর আমি করি না এটাও তারা অবগত'।

'আপনি নিশ্চয় ওদের সাহায্য করেননি, তাহলে ওরা ছাড়ল কেন আপনাকে?'

'অনুরোধসহ চাপ, হুমকি, সবই তারা শুরু করেছিল, আরও কি করতো জানি না। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হঠাৎ তাদের মর্তের পরিবর্তন ঘটে। তাদের আচার-আচরণে বুঝেছি তাতে যে কারণে আমাকে ওরা নিয়ে গিয়েছিল, সে প্রয়োজন তাদের মিটেছে'।

'হতে পারে। ব্ল্যাক ক্রসের সাম্রাজ্য তো শুধু ফ্রান্স নয়'।

আহমদ মুসা চিন্তা করছিল। একটু পরে বলল, তারা কার থট রিডিং বা কাকে তারা সম্মোহন করতে চেয়েছিল তা কি আপনি জানতে পেরেছেন?'

'না বৎস। কেন?'

'আমার অনুমান মিথ্যা না হলে তাদের সেই টার্গেট লোকটি ওমর বায়া, আমাদের লোক যাকে ওরা কিডন্যাপ করেছে'।

'হতে পারে, তাদের টার্গেটকে ওরা বিদেশী একজন ঘোর শত্রু বলে পরিচয় দিয়েছে'।

আহমদ মুসার মুখটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ওমর বায়া বেঁচে আছে এ ব্যাপারে সে অনেকখানি নিশ্চিত হলো।

বৃদ্ধ ক্লাউডে বেবিয়ার কথা শেষ করতেই টেলিফোন বেজে উঠল।

মিঃ ক্লাউডে উঠে গেল টেলিফোন ধরতে।

সবাই চুপচাপ।

ক্লাউডিয়া এবং তার মা তাকিয়ে টেলিফোনের দিকে। তাদের চোখে-মুখে প্রশ্ন। এই সাত সকালে টেলিফোন এখানে অস্বাভাবিক।

আহমদ মুসাও সেদিকে তাকিয়েছিল। আহমদ মুসা দেখল টেলিফোন ধরেই মিঃ ক্লাউডের ভ্রু কুঁচকে গেল। দু'এক কথা বলছে, শুনছেই বেশী। ধীরে ধীরে তার মুখ উদ্বেগে ভরে গেল।

টেলিফোন শেষ করে ফিরে এল মিঃ ক্লাউডে। তার বিব্রত, উদ্বিগ্ন দৃষ্টি আহমদ মুসার দিকে।

ক্লাউডিয়া ও তার মা দু'জনের চোখেই উদ্বেগ এবং একরাশ প্রশ্ন।

মিঃ ক্লাউডে বসতে বসতে বলল, 'ব্ল্যাক ক্রসের কাছে আমাদের সব কথা চলে গেছে আহমদ মুসা'। গম্ভীর মুখ ক্লাউডের।

'খুবই স্বাভাবিক'। নিরুদ্বিগ্ন কন্ঠ আহমদ মুসার।

'স্বাভাবিক বলছ? তাহলে ওরা এখানে কোথাও কোন গোয়েন্দা ফোন ট্রান্সমিটার রেখে গেছে?'

'রেখে গেছে নয়, পাঠিয়েছে'।

‘বলছ, আমার দেহে কোথাও গোয়েন্দা ট্রান্সমিটার চিপস আমি বহন করছি?’

‘আমি তাই মনে করছি জনাব’।

একটু ভাবল মিঃ ক্লাউডে। বলল, ‘বহনকারী সে স্থান সম্বন্ধে তুমি সন্দেহ করেছ?’

‘আপনার চুল ধুয়ে ফেলবেন, পোষাক পাল্টাবেন, জুতাও। সুতরাং এগুলো ট্রান্সমিটার চিপস-এর জন্যে নিরাপদ নয়। আপনার দেহে নিরাপদ জিনিস একটাই, সেটা হলো আপনার আংটি। ওখানেই আছে ওদের গোয়েন্দা চিপসটা’।

মিঃ ক্লাউডের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, ধন্যবাদ। তুমি অনন্য আহমদ মুসা। এত দ্রুত তুমি সিদ্ধান্ত করতে পার!’

বলেই ক্লাউডে হাত থেকে আংটি খুলে রুমালে জড়িয়ে বলল, ‘আমি এখনি রেডিও সিগন্যাল ও বিকিরণ টেষ্টের জন্যে পাঠিয়ে দিচ্ছি’।

‘আপনার পোষাক এবং জুতাও পাল্টে ফেলা দরকার জনাব’।

‘ঠিক বলেছ’ বলে উঠে গেল মিঃ ক্লাউডে।

পোষাক পাল্টে দু’মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল।

কথা বলছিল তখন বিস্ময় বিমূঢ় ক্লাউডিয়া। ‘আপনি তো গোয়েন্দা কর্মী নন। শীর্ষ নেতারা গোয়েন্দা কর্মী ব্যবহার করেন এসব কাজে কিন্তু আপনি কি করে এতবড় অনুমান করতে পারবেন?’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘গোয়েন্দা, অগোয়েন্দা সকলের একই চোখ, একই মাথা’।

মিঃ ক্লাউডে ফিরে আসতেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘আমাদের এবার উঠতে হবে জনাব’।

মিঃ ক্লাউডে চোখ কপালে তুলে বলল, ‘ব্ল্যাক ক্রস কি বলল সেটা বলাই হয়নি’।

‘কি বলেছে জানি জনাব’।

আহমদ মুসাকে বসতে বলে নিজে বসতে বসতে বলল মিঃ ক্লাউডে, ‘জান তুমি? বলত কি বলতে পারে?’

আপনাকে ‘আহমদ মুসা নামক লোকটিকে জানাতে বলেছে, আদার ব্যাপারি হয়ে জাহাজের সন্ধান যেন না করি। ওমর বায়ার ব্যাপারে নাক গলালে, নাক নয় জীবনটাই ছিড়েঁ ফেলা হবে। ইত্যাদি’।

‘বিস্ময় বোধ করছি না আহমদ মুসা। তোমার কাছে বোধ হয় অসম্ভব কিছু নেই। তবে আরেকটি কথা ওরা বলেছে। আমাকে ধন্যবাদ দিয়েছে আমি তোমাকে সহযোগিতা করতে চাইনি বলে। আর আমার কাছে ওরা মাফ চেয়েছে’।

একটু থামল মিঃ ক্লাউডে। তার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, ‘তোমাকে সহযোগিতা করার আমার সত্যিই কিছু নেই। শুধু তোমাকে কয়েকটা তথ্য দিচ্ছি এক, ওদের প্রত্যেকের গলায় ব্ল্যাক ক্রস ঝুলানো থাকে। ওটাই ওদের চিহ্ন। দুই, ওরা অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী, নিজেদের শক্তি সম্পর্কে অতি উচ্চ ধারণা। এটাই ওদের দুর্বলতা এবং তিন, কোন শত্রুকে হাতে পেলে আর বাচিয়েঁ রাখে না’।

‘ধন্যবাদ জনাব। তিনটাই অত্যন্ত মূল্যবান ইনফরমেশন’।

আহমদ মুসা থামতেই ক্লাউডিয়ার মা নরম কন্ঠে বলে উঠল, ‘তোমার কে আছে? বাবা, মা, ভাই, বোন, স্ত্রী ...’।

আহমদ মুসা মুখ নিচু করল। হঠাৎ করেই যেন বেদনার একটা ছায়া নেমে এল তার সারা মুখ জুড়ে। বলল, ‘আমার কেউ নেই মা। কিন্তু সবই আছে। পৃথিবী জুড়ে সব মা’ই আমার মা, সব বাবাই আমার আব্বা, সব ভাই-বোনই আমার ভাই-বোন’।

‘কেউ নেই? তোমার বাড়ি কোথায় বাবা?’

‘যার কেউ নেই তার বাড়ি থাকারও প্রয়োজন হয় না মা। যখন যেখানে থাকি সেটাই আমার বাড়ি’।

‘কি বলছ তুমি, আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। এতবড় আহমদ মুসা এত একা, এত নিঃসব!’

‘মায়েরা এভাবেই ভাবে কিন্তু আমি নিঃস্ব, একা নই মা’। নরম কন্ঠ আহমদ মুসার।

‘মায়েদের ভাবনাকে কি বেঠিক বলবে?’

‘না তা পারি না মা। কিন্তু মেনে নেয়াও উচিত মনে করি না’।

‘দায়িত্ব দিয়ে হৃদয়ের দহনকে তুমি আড়াল করতে পার, কিন্তু অস্বীকার করতে পার না বাছা’।

‘ধন্যবাদ মা, সন্তানকে মায়েদের চেয়ে আর কেউ ভালো জানতে পারে না’। ম্লান হাসি আহমদ মুসার ঠোটে, আর কষ্টকর এক বেদনা তার মুখে।

ক্লাউডিয়া নিষ্প্রাণ মূর্তির মত বসে আছে আহমদ মুসার দিকে চেয়ে। তার ঠোঁট শুকনো। দু’চোখে তার সজল বেদনার একটা আস্তরণ। একজন অনন্য বিপ্লবীর এক অন্তহীন নিঃস্বতার বেদনা তার হৃদয়কে মুষড়ে দিয়েছে। এই নিঃস্ব আহমদ মুসাকেই তার সবচেয়ে বড় সব চেয়ে কাছের, সবচেয়ে স্বচ্ছ মনে হচ্ছে।

আহমদ মুসা কথা শেষ করেই মিঃ ক্লাউডের দিকে চেয়ে বলল, ‘এবার আমাদের উঠতে হয়’।

‘আপনি আপনার বিপদ বুঝতে পারছেন? রাস্তায় নামলেই আপনি আক্রান্ত হতে পারেন। আব্বাকে ওরা প্রকাশ্যে দিবালোকে কিডন্যাপ করেছিল’। শুকনো কন্ঠে বলল ক্লাউডিয়া।

আহমদ মুসা তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, ‘আমি তো এটাই চাচ্ছি। আমি ওদের চিনি না। ওরা আমার কাছে না এলে, আমার পক্ষে ওদের কাছে পৌছা মুস্কিল হবে’। ম্লান হাসি আহমদ মুসার ঠোটেঁ।

‘আপনি তো শুনলেন, ওরা কোন শত্রুকেই জীবিত রাখে না’।

‘এটা ওদের চেষ্টা। ওদের সব চেষ্টাই কি সফল হয়েছে, না হবে?’

বলেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

উঠে দাঁড়াল সবাই।

মিঃ ক্লাউডে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে ধরল।

বেরিয়ে এল সকলে।

করিডোর দিয়ে হাঁটছিল সবাই। সবার আগে হাঁটছিল মিঃ ক্লাউডে। তার ডান পাশে আহমদ মুসা। আহমদ মুসার ডান পাশে মিস ক্লাউডিয়া।

‘আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ভোর আজ। আপনার জীবনে তো অজস্র বড় ঘটনা, এমন দিনের কথা অবশ্যই আপনার মনে থাকবে না’।

‘অধিকাংশ স্মৃতিই কষ্টের হয়। সুতরাং ভুলে যাওয়ার মধ্যেই তো মঙ্গল’।

‘কিন্তু এই কারণে যারা ভুলে যেতে চায়, তারা কিন্তু ভুলতে পারে না’।

আহমদ মুসা চোখ তুলে তাকাল মিস ক্লাউডিয়ার দিকে। বলল, ‘আপনি কিসের ছাত্রী?’

‘বলেছি আমি রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ছাত্রী’।

এই সময় কথা বলে উঠল মিঃ ক্লাউডে। বলল, ‘ব্ল্যাক ক্রস শুধু হিংস্র নয়, ওরা অত্যন্ত ক্ষীপ্র। সময় নষ্ট ওরা করে না। সুতরাং ক্লাউডিয়ার কথা ফেলে দিও না। রাস্তায় তোমাকে সাবধান হতে হবে’।

গাড়ির কাছে ওরা পৌছে গিয়েছিল।

‘ধন্যবাদ জনাব মনে থাকবে’। বলে ক্লাউডিয়ার মা’র দিকে তাকিয়ে বলল, ‘মা, অসময়ে আপনাদের কষ্ট দিয়ে গেলাম’।

তারপর মিঃ ক্লাউডে’র সাথে হ্যান্ডশেক করে গাড়ির দিকে ফিরল।

আমররা গাড়িতে উঠে বসেছিল।

আহমদ মুসা গাড়ির দিকে ঘুরতেই মিস ক্লাউডিয়া গাড়ির দরজা খুলে ধরল।

আহমদ মুসা ওর দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে বলল, ‘ধন্যবাদ’।

বলে গাড়িতে উঠে বসল আহমদ মুসা।

মিস ক্লাউডিয়া একটু নিচু হয়ে মুখটা গাড়ির দরজার ফাকেঁ এনে বলল, ‘সৃষ্টির চলার পথ কিন্তু বৃত্তাকার। সুতরাং দেখা তো হবারই কথা’।

মিস ক্লাউডিয়ার মুখে হাসি নয়, গাম্ভীর্য।

‘ঠিক, কিন্তু মানুষ আকাশের কোন গ্রহ বা জ্যোতিস্ক নয়। তাই পৃথিবীতে মানুষের চলার পথ কিন্তু ঠিক বৃত্তাকার নয়।

‘সত্য। কিন্তু চলার পথটা বুনানো কাপড়ের মত এতটাই একে অপরকে স্পর্শ করে আছে যে জীবনের অজস্র মোড়ে দেখা হওয়ার অজস্র সম্ভাবনা’। বলল ক্লাউডিয়া।

‘চলার পথ কিন্তু বুনানো সুতার মত নিয়ম মেনে চলে না’। বলল আহমদ মুসা।

‘এই অনিয়ম আশংকারও তেমনি সম্ভাবনারও। সম্ভাবনার স্বপ্নই মানুষ বেশী দেখে’।

বলেই ক্লাউডিয়া একটা হাত তুলে অভিবাদন জানিয়ে গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিল।

গাড়ি নড়ে উঠে চলতে শুরু করল।

সূর্যের আলোতে চারদিক তখন ঝলমল করছে।

যে কোন কারনেই হোক ঘন কুয়াশা আজ নেই।

‘ওরা কি পথে ওৎ পেতে থাকতে পারে? আপনি কি ভাবছেন?’ বলল আমর।

‘ব্ল্যাক ক্রসকে কোন আঘাত না করলে আমরা তাদের টার্গেট হবো না। যেহেতু ওদের টার্গেট ওদের হাতে তাই এই ব্যাপারে কোন ঝামেলায় জড়াতে না হয় সেটাই তারা চাইবে’।

‘ঠিক বলেছেন স্যার, তাহলে এটাই কি ঠিক যে ব্ল্যাক ক্রসই ওমর বায়াকে কিডন্যাপ করেছে? ‘ওকুয়া’রাও তো বিভ্রান্ত করার জন্যে এটা বলতে পারে’।

‘তোমার কথায় যুক্তি আছে আমর। কিন্তু মিঃ ক্লাউডে যেটা বলেছেন, সেটাই সত্য। এখন বিষয়টা পরিষ্কার। যারা ক্লাউডেকে কিডন্যাপ করেছিল, তারাই ওমর বায়াকে কিডন্যাপ করেছে’।

‘বুঝতে পেরেছি জনাব’।

আহমদ মুসা আর কোন কথা বলল না।

ওরা দু’জনও নীরব।

সবারই দৃষ্টি সামনে।

সকালের গাড়ি-বিরল রাস্তা দিয়ে তীব্র বেগে ছুটে চলেছে আহমদ মুসার গাড়ি।

ডুপ্লের চিঠি পড়া শেষ করে মুখ তুলেই জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা, এ চিঠি তোমরা কবে পেয়েছ?

প্যারিসের ফিলিস্তিন দূতাবাসের বিশাল কক্ষ। একটা বড় টেবিল ঘিরে বসে আছে আহমদ মুসা, ফিলিস্তিনের রাষ্টদুত ফারুক আল আশরাফ এবং দুতাবাসের আরও দু'জন দায়িত্বশীল।

আহমদ মুসা কথা বলছিল ফারুক আল-আশরাফের দিকে লক্ষ্য করে।

'চিঠি গতকাল পেয়েছি জনাব'। বলল ফারুক আল-আশরাফ।

'কিভাবে পেলে?'

'আমাদের ডাক বাক্সে পেয়েছি'।

'আল-হামদুলিল্লাহ। শুরুটা আমাদের ভাল বলতে হবে আশরাফ। তোমার এখানে পৌছার আগেই মিঃ ক্লাউডে'র কাছ থেকে জানলাম ব্ল্যাক ক্রস সম্পর্কে কিছু তথ্য এবং নিশ্চিত হওয়া গেল ব্ল্যাক ক্রসই ওমর বায়াকে কিডন্যাপ করেছে 'ওকুয়া'র পক্ষে। আবার দেখ, তোমার এখানে পৌছেই খোদ ব্ল্যাক ক্রস-এর একজনের কাছ থেকে চিঠি পেলাম'।

'কিন্তু লোকটি তো তার এই পরিচয় দেয়নি'।

'পরিচয় না দেয়াই প্রমাণ করে সে ব্ল্যাক ক্রস-এর লোক। তাছাড়া যে ইনফরমেশন সে দিয়েছে এবং যেখানে দিয়েছে তাও প্রমাণ করে সে ব্ল্যাক ক্রয়-এর লোক'।

ডুপ্লে তার চিঠিতে ওমর বায়াকে যেখানে নিয়ে প্রথমে বন্দী করে রাখা হয় সেখানকার ঠিকানা দিয়েছে এবং জানিয়েছে ওমর বায়াকে প্যারিসেরই অজ্ঞাত কোন একটি জায়গায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

'আপনি ঠিক বলেছেন জনাব, একমাত্র ব্ল্যাক ক্রস-এর লোকরাই জানে যে ওমর বায়াকে ফিলিস্তিন দুতাবাসের আশ্রয় থেকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। পত্র

প্রেরক অন্য কেউ হলে ওমর বায়ার খবর ফিলিস্তিন দুতাবাসে পাঠাতো না'। বলল ফারুক আল আশরাফ।

প্যারিসের মানচিত্রের উপর তখন নজর বুলাচ্ছিল আহমদ মুসা।

ডুপ্লের চিঠিতে লিখা রোডটি পাওয়া গেল একদম দক্ষিণ প্যারিসে। এটা প্যারিসের একটা নতুন এলাকা। বিশ বছরের বেশী বয়স নয়।

রাস্তাটির নাম লা ম্যাজারিন। ঠিকানা '৭৭, লা ম্যাজারিন'।

আহমদ মুসা তার কাঠ পেন্সিলের মাথা ঠিকানায় স্থাপন করে বলল, 'চিঠি সত্য হলে এটাই হবে ব্ল্যাক ক্রস-এর একমাত্র ঘাটিঁ যা আমাদের জানার মধ্যে এল। এটাই হবে 'ব্ল্যাক-ক্রস'-এর অন্ধকার রাজ্যে প্রবেশের আমাদের দরজা'।

একটু থামল আহমদ মুসা।

তারপর আবার শুরু করল, 'কিন্তু ওরা ওখান থেকে ওমর বায়াকে অন্যত্র সরিয়ে নিল কেন?' প্রশ্নটা ছিল আহমদ মুসার স্বগত ধরণের উক্তি।

'মনে হয় আরও নিরাপদ জায়গায় তাকে সরিয়ে নিয়েছে'। বলল আল-আশরাফ।

'কিন্তু ব্ল্যাক ক্রস ওমর বায়াকে প্রথমে কম নিরাপদ স্থানে তুলেছিল এটা যুক্তি বলে না। আমার মনে হয়, কোন কারণে সেখানে নিরাপত্তার অভাব ঘটেছিল। নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এ হুমকিটা কোত্থেকে এসেছিল তা বলা মুস্কিল। ঐ চিঠি পাঠানো থেকে মনে হচ্ছে, নিরাপত্তার অভাব ভেতরের দিক থেকেই ঘটেছিল'। বলল আহমদ মুসা।

'সেটা কেমন?'

'বলা কঠিন। তবে অবিশ্বস্ততার ঘটনা সেখানে ভেতরে থেকেই ঘটেছে বলে মনে হয়'।

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকাল। দেখল রাত ১১টা।

'আশরাফ তুমি একটা ট্যাক্সির ব্যবস্থা করে দাও। আমি লা-ম্যাজারিনে যাব। ব্ল্যাক ক্রস-এর দরজায় নক করে দেখি কিছু পাই কিনা'। আল-আশরাফের দিকে চেয়ে বলল আহমদ মুসা।

‘ট্যাক্সি কেন জনাব, এমবেসির সব গাড়ি আপনার’। বলল আল-আশরাফ।

‘হ্যাঁ। তোমার এমবেসির গাড়ি নিয়ে গিয়ে পা বাড়াবার আগেই ওদের নজরে পড়ে যাই’।

‘ঠিক বলেছেন জনাব। আমি ভুলে গিয়েছিলাম। এই কারণেই তো আমরা এয়ারপোর্টে এমবেসির গাড়ি পাঠাইনি’।

ঘন্টা খানেক পরে আহমদ মুসা ট্যাক্সি করে রাস্তায় নেমে এল। একাই। কাউকে সাথে নিতে রাজী হয়নি। এমবেসি জেদ ধরলে আহমদ মুসা বলেছিল, এ অনিশ্চিত, গোপন ও অনুসন্ধানী অভিযানে একা যাওয়াই নিরাপদ বেশী। এমসেবি আহমদ মুসার কথার উপর কথা বলতে পারেনি। এমবেসেডর আল-আশরাফ সাইমুমের একজন অনিয়মিত ছাত্র-কর্মী ছিল ফিলিস্তিনের বিপ্লবের সময়। তার কাছে আহমদ মুসা পর্বত প্রমাণ উঁচু। তার সাথে সে কথা বলতে পারছে-এই বেশী। আহমদ মুসার কথার উপর কথা বলার তার সাহস আসবে কোত্থেকে। তার উপর ফিলিস্তিনের স্বয়ং প্রেসিডেন্ট টেলিফোনে তাকে বলে দিয়েছে, ফিলিস্তিন এমবেসির সব সম্পদ, সব মানুষ এবং সব শক্তি আহমদ মুসা যে ভাবে চাইবেন সেভাবেই চলবে। সুতরাং আহমদ মুসার সিদ্ধান্তের সাথে আল-আশরাফ একমত হতে না পারলেও আহমদ মুসার কথা সে অবনত শিরে মেনে নিয়েছে।

গাড়ি চলছিল।

আহমদ মুসার চেখে তন্দ্রার ভাব এসেছিল।

গাড়ি থামার ঝাকুনিতে তন্দ্রা ছুটে গেল আহমদ মুসার।

‘এসে গেছি জনাব। পাশের বাড়িটাই ষাট নম্বার, এটা গীর্জা। এর আশে-পাশেই আপনার নম্বারটা পেয়ে যাবেন’।

আহমদ মুসা ড্রাইভারকে বাড়ির নম্বার বলেনি। বলেছিল, বাড়ি দেখলেই চিনতে পারব। নম্বারটা ষাট-বাষট্টি ধরনের কিছু হবে।

ভাড়া চুকিয়ে গাড়ি থেকে নামল আহমদ মুসা।

খুজেঁ বের করল ৭৭ নম্বর বাড়ি। বাড়িটি প্রধান রাস্তা থেকে একটু ভেতরে। প্রধান রাস্তা থেকে একটা ছোট্ট রাস্তা গিয়ে বাড়িটির গেটে শেষ হয়েছে।

বাড়িটা তিনতলা এবং বেশ বড়। গেটের দরজা স্টিল শিটের তৈরী।

গেটের পাশে গেটম্যান বক্স নেই। আহমদ মুসা বুঝল গেটটা দুরনিয়ন্ত্রিত। তাহলে কি গেটে ক্যামেরাও থাকতে পারে?

আহমদ মুসা গেট থেকে দুরে একটা বিল্ডিং-এর ছায়ায় আলো-আঁধারির মধ্যে দাড়িয়েঁছিল।

আহমদ মুসা ভাবছিল গেটের এদিক দিয়ে বাড়িতে ঢুকা যাচ্ছে না। শুরুতেই হাঙ্গামা বাধালে তার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে। আহমদ মুসার প্রথম কাজ, ওদের সম্পর্কে বিশেষ করে ওমর বায়া সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ। তারপর ওমর বায়ার খোঁজ পাওয়া গেলে সেখানেই দ্রুত আঘাত হানতে হবে। যাতে শত্রুদের সাবধান হওয়ার আগেই ওমর বায়াকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

এসব চিন্তা করে আহমদ মুসা বাড়ির পেছন দিকে যাবার জন্যে পা তুলতে যাচ্ছিল। এই সময় সেই ছোট রাস্তার উপর আলোর একটা ফ্লাশ জ্বলে উঠল।

আহমদ মুসা থমকে দাঁড়াল। তার বুঝতে বাকি রইল না একটা গাড়ি আসছে, সম্ভবতঃ তার টার্গেট-বাড়িটাই লক্ষেই।

আহমদ মুসার গোটা শরীরে একটা উষ্ণতার আমেজ বয়ে গেল। ব্ল্যাক ক্রসের কেউ কি আসছে? তাহলে সে কি দেকতে পেতে যাচ্ছে ব্ল্যাক ক্রসের কাউকে?

হঠাৎ আহমদ মুসার দেহটা বৈদ্যুতিক শক খাওয়ার মত যেন ঝাকুনি খেল। এখানে দাড়িয়েঁ থাকলে তো সে এখনি ধরা পড়ে যাবে চারদিকে একবার নজর বুলিয়েই আহমদ মুসা কয়েক গজ সামনের বর্জ ফেলা বাক্সের পেছনে গিয়ে বসে পড়ল।

কয়েক মুহুর্তের মধ্যেই বর্জ ফেলা বাক্সের সামনেটাসহ গোটা রাস্তা আলোর বন্যায় ভেসে গেল।

দ্রুত একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল সেই গেটের সামনে।

আহমদ মুসা দেখল, ক্যারিয়ার ধরনের গাড়ি। পেছনের ক্যারিয়ারে একটা বড় বাক্স ছাড়া আর কিছু নেই। লোকজন কেউ নেই। বাড়তি লোকজন থাকলে সম্ভবতঃ তারা ড্রাইভারের সাথে সামনের সিটগুলোতে থাকতে পারে।

চট করে আহমদ মুসার মাথায় এল, সে ক্যারিয়ারের পেছনটায় সওয়ার হয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে পারে।

যেমন চিন্তা তেমনি কাজ।

বর্জ বাক্সটা থেকে ক্যারিয়ারের পেছনের শেষ প্রান্তটা আট দশ গজের বেশী হবে না।

আহমদ মুসা দুই হাতে দু'পায়ের বুড়ো আঙুল ধরে শরীরটা বাঁকিয়ে পা এবং মাথা এক সমতলে এনে ফুটবলের মত গড়িয়ে চোখের নিমিষে ক্যারিয়ারের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর অপেক্ষা করল গাড়ি স্টার্ট নেয়ার।

গাড়িটা গেটের সামনে দাড়িয়েঁ নির্দিষ্ট বিরতিতে তিনবার হর্ণ দিল। তার কয়েক সেকেন্ড পরেই খুলে গেল দরজা।

গাড়ি স্টার্ট নেয়ার শব্দ হলো। নড়ে উঠল গাড়ি।

গাড়ি নড়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গেই আহমদ মুসা একজন এ্যাক্রোব্যাটের মত দেহটাকে কুন্ডলি পাকিয়ে ক্যারিয়ারের তলায় ঝুলে পড়ল এমনভাবে যাতে গেটে ক্যামেরা থাকলেও তা যেন তার নাগাল না পায়।

গাড়ি এসে দাঁড়াল গাড়ি বারান্দায়। আহমদ মুসা শুয়ে পড়ল গাড়ির তলায় গাড়ি বারান্দার উপর।

গাড়ি দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে দু'জন গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। একজন বলল, দুবোয়া তুমি এস, ট্রলি ও কয়েকজনকে নিয়ে এসে বাক্সটা নামিয়ে নিয়ে যাবে।

আহমদ মুসা দেখল, জিনস পরা জ্যাকেট গায়ে একজন প্রায় দৌড়ে গিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। লোকটি দরজার গায়ে যে নব তাতে হাত দিতেই দরজা খুলে গেল।

তাহলে এ দরজাও কি স্বয়ংক্রিয়, এ দরজাতেও কি ক্যামেরার পাহারা আছে? নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করল আহমদ মুসা।

ইতিমধ্যে গাড়ি থেকে নামা দ্বিতীয় লোকটিও দরজার দিকে এগুলো। সেও গিয়ে দরজার নবে হাত দিলেই দরজা খুলে গেল। সে দরজার পাল্লা টান দিয়ে খুলে রেখে ভেতরে গেল।

আহমদ মুসা নিশ্চিত হলো, দরজা স্বয়ংক্রিয় নয় এবং তাহলে ক্যামেরার পাহারাও নেই। নিশ্চয় নবের কোন গোপন অংশে কোন সুইচ বা বোতাম আছে। লোকটি ট্রলি নিয়ে আসার জন্যেই দরজা খোলা রেখে গেছে।

আহমদ মুসা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল।

গড়িয়ে সে বেরিয়ে এল গাড়ির তলা থেকে। তারপর স্প্রিং-এর মত উঠে দাড়িঁয়েই ছুট দিল সে দরজার দিকে। ভাবল, ভেতরে ঢোকার এর চেয়ে সুবর্ণ সুযোগ আর পাওয়া যাবে না।

কিন্তু দরজায় পা দিয়েই আহমদ মুসা মুখোমুখি হয়ে গেল তিনজন লোকের। একজন ট্রলি ঠেলে নিয়ে আসছিল, আর দু'জন ছিল দু'পাশে।

আহমদ মুসাকে দরজায় দেখে ওরা প্রথমটায় ভুত দেখার মত আঁৎকে উঠল। কিন্তু তার পর মুহূর্তেই দু'জন চোখের নিমিষে বাঘের মত ঝাপিয়েঁ পড়ল আহমদ মুসার উপর।

আহমদ মুসাও ওদেরকে দেখে মুহুর্তের জন্যে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। ওরা ঝাপিয়ে পড়লে আহমদ মুসা চকিতে ডান দিকে একটু সরে ডান দিকে থেকে যে আসছিল তাকে বাঁ হাত দিয়ে ঠেকিয়ে ডান হাত দিয়ে তার কোমরের বেল্ট ধরে হ্যাচকা টানে শূন্যে তুলে আছড়ে ফেলল বাঁ দিক থেকে আসা লোকটির উপর।

লোকটিকে ছুড়ে দিয়েই মাথা নিচু করে আহমদ মুসা ঝাপিয়ে পড়ল ট্রলি ঠেলে আসা লোকটির উপর। সে রিভলবার তুলেছিল গুলি করার জন্যে।

গুলি সে করল। তার আগেই আহমদ মুসা ঝাপিয়ে পড়েছিল তার উপর। কিন্তু গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গিয়ে আঘাত করল আহমদ মুসার উপর ঝাপিয়েঁ পড়া দু'জনের একজনকে। ওরা তখন উঠে দাঁড়াচ্ছিল।

আহমদ মুসা ট্রলি সমেত লোকটিকে নিয়ে পড়ে গেল। রিভলবার ছিটকে পড়ে গেল লোকটির হাত থেকে।

লোকটি পড়ে থেকেই তার হাত থেকে ছিটকে পড়া রিভলবার কুড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছিল প্রাণপণে। কিন্তু রিভলবারটি আহমদ মুসার নাগালের মধ্যে। সে রিভলবারটি তুলে নিল।

এই সময় দেখল তার উপর ঝাপিয়ে পড়া দ্বিতীয় লোকটি ছুড়ে মারছে একটা ছুরি। রিভলবার তাক করার সময় তখন পার হয়েছে। কোন উপায় না দেখে আহমদ মুসা দেহটা একদিকে বাঁকাতে চেষ্টা করে বাম হাত দিয়ে ধরে ফেলল ছুরিটা। ধরে ফেলল মানে ছুরিটি এসে বিধল আহমদ মুসার বাম হাতের তালুতে।

বেদনায় বিকৃত হয়ে উঠল আহমদ মুসার মুখ। কিন্তু এর মধ্যেই আহমদ মুসার ডান হাতটি বিদ্যুতগতিতে উপরে উঠেছিল এবং নিক্ষিপ্ত গুলী গিয়ে বিদ্ধ হলো ছুরি ছুড়ে মারা লোকটির বুকে।

ঠিক এই সময়েই আহমদ মুসার নিচে পড়ে থাকা লোকটির একটা মুষ্টাঘাত এসে পড়ল আহমদ মুসার ডান হাতে। আহমদ মুসার হাত থেকে রিভলবার ছিটকে পড়ল। লোকটি রিভলবার তুলে নিল সংগে সংগেই।

কিন্তু আহমদ মুসা তার হাত থেকে রিভলবার ছিটকে পড়ে যাবার সংগে সংগেই বাম হাতের তালু থেকে ছুরিটি খুলে নিয়ে আমুল বসিয়ে দিল লোকটির বুকে।

ছুটে এল ৫জন লোক এই সময় ঘরে। তাদের সকলের হাতেই উদ্যত স্টেনগান।

একজন স্টেনগান তুলেছিল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে। একজন হাত তুলে নিষেধ করে বলল, গুলী খরচ নয়।

আহমদ মুসা ছুরিটি ছুড়ে ফেলে দিয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করে বাম হাতের আহত তালু চেপে ধরল। ওখান থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছিল।

যে লোক গুলী করতে নিষেধ করেছিল, সে আহমদ মুসার দিকে এগিয়ে এসে বলল, আমাদের তিন লোককে খুন করেছিস। কে তুই?

'তিনজন নয় দুইজনকে'। শান্ত কন্ঠে বলল আহমদ মুসা।

'আমাকে শিক্ষা দিচ্ছিস। সাংঘাতিক শেয়ানা তো দেখছি'। বলেই সে বিদ্যুতগতির একটা কিক লাগালো আহমদ মুসার কাঁধ এবং পাঁজরের সন্ধিস্থলে।

কাত হয়ে পড়ে গেল আহমদ মুসা।

'একে বেঁধে ফেল আমি আসছি'। বলে লোকটি ভেতরে চলে গেল।

দু'জন এগিয়ে এল। আহমদ মুসা উঠে বসছিল। একজন লাথি দিয়ে আবার ফেলে দিল এবং বলল, 'মরতে এসেছিস শয়তান, গুলীতে মরলে তোর ভালই হতো। বস মনে হয় তোর জন্যে বড় পরিকল্পনা করেছেন'।

আহমদ মুসাকে বেঁধে ফেলল ওরা।

মিনিট পাচেক পরে ফিরে এল লোকটি। লোকটি বার্নেস। ব্ল্যাক ক্রসের এই ঘাটির প্রধান। সে গিয়েছিল ব্ল্যাক ক্রসের প্রধান পিয়েরে পলের সাথে আলোচনা করতে। শুনেই পিয়েরে পল বলেছে, যে দিন ওমর বায়ার চিঠি ধরা পড়ল সেদিনই এ ঘাটি ত্যাগ করা দরকার ছিল। আমাদের ভুল হয়েছে। নির্দেশ দিয়েছে এ ঘাটিঁ এখনই ছেড়ে দিতে। ব্ল্যাক ক্রসের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট গোপনীয়তা। পুলিশ তাদের শত্রু না হলেও ফরাসি পুলিশ ব্ল্যাক ক্রস-এর কোন ঘাটি এবং লোককে চেনে না। কোন ঘাটিতে শত্রুর স্বাধীন স্পর্শ পড়লে সে ঘাটি তারা এক মুহুর্ত রাখে না। বার্নেস বন্দী অর্থাৎ আহমদ মুসাকে কি করবে জানতে চেয়েছিল। পিয়েরে বলেছিল, তুমি নানতেজ যাচ্ছ, ওকে নিয়ে যাও। আমাদের বধ্যভুমি হাঙ্গর রাজ্যের ভাল শিকার হবে সে। বার্নেস বলেছিল, তার পরিচয় কি জেনে নেয়া দরকার নয়? পিয়েরে পল বলেছিল, দেখ আমরা কোন গোয়েন্দা সংস্থা নই, এর জন্যে ভিন্ন সংস্থা আছে। আমরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে আছি। শত্রু সাফ করে এগিয়ে যাওয়া আমাদের কাজ। শত্রুকে যখনই হাতে পাবে, হত্যা কর। এতে ঝুকি কম আছে। গোটা দুনিয়ার ইতিহাস তুমি সামনে আনলে দেখবে, কোন বড় শত্রু ধরা পড়লে তাকে প্রথমেই হত্যা করা না হলে পরে খুব কমই তাদের হত্যা করা গেছে। এভাবে কিংবা সেভাবে তারা ছাড়া পেয়ে গেছে'। পিয়েরে পল আরও উপদেশ দিয়ে বলেছে, ওমর বায়া মনে হয় আমাদের ভোগাবে। তাকে উদ্ধারের মিশন নিয়ে আহমদ মুসা ফ্রান্সে এসেছে। সে একা এলেও তার একটা গ্রুপ নিশ্চয় এখানে এসেছে। আমাদের ঘরে তাকে আমরা ভয় করি না। কিন্তু ঘাটিগুলোকে আরও সাবধান থাকতে হবে।

ঘরে প্রবেশ করেই বার্নেস বলল, শয়তানটাকে আমার গাড়িতে তুলে দাও। ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে তারপর তুলবে গাড়িতে। আমার সাথে যারা যাচ্ছ তারা বাদে সকলে পাশের নতুন ঘাটিতে চলে যাও। লাগেজ পরে সরিয়ে নেয়া হবে।

সংজ্ঞাহীন করে আহমদ মুসাকে গাড়িতে তোলা হলো। বার্নেস এবং ড্রাইভার সামনের সিটে। আহমদ মুসার পাশে উঠে বসল আরেকজন।

গাড়ি বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে।

ছুটে চলল গাড়ি নানতেজ শহর-অভিমুখে। শহরটি লোরে নদীর মুখে অবস্থিত। নদীটি পশ্চিমে আরও কিছু এগিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে পড়েছে।

তখন রাত ৩টা। ঘুমন্ত প্যারিস নগরী। প্রায় ঘুমন্ত তার রাজপথও।

এরই মাঝে ব্ল্যাক ক্রস-এর গাড়ি সংজ্ঞাহীন আহমদ মুসাকে নিয়ে এগিয়ে চলল রাতের নিঃশব্দ বুক চিরে।

# ৩

বার্নেস টেলিফোন রাখতেই দরজায় দাঁড়ানো তার মেয়ে লেনা বলে উঠল, 'কোথায় যাচ্ছ আব্বা?'

'এই একটু ঘুরে আসি'।

'একটু ঘুরে আসার জন্যে বুঝি কেউ জাহাজ সাজায়?

'না মানে শার্ক বে'তে যাব'।

'শার্ক বে'তে কেন আব্বা?' বলে একটু কাছাকাছি সরে এসে বলল, 'আবার হাঙ্গরের কোন খোরক নিয়ে যাচ্ছ আব্বা?'

'লেনা?' বকুনির স্বর বার্নেসের কন্ঠে। পরক্ষণেই স্বরটা নামিয়ে নিয়ে নরম কন্ঠে বলল, 'এ সব বিষয় নিয়ে কোন ভাবনা তোমার ঠিক নয়। তোমার সে বয়স হয়নি'।

লেনা বার্নেসের বড় মেয়ে এবং কলেজের ছাত্রী।

'তোমার কথা ঠিক আব্বা। এসব চিন্তাকে কোন সময়ই আমি ওয়েলকাম করি না। কিন্তু আপনাতেই কানে প্রবেশ করে পীড়া দেয় আব্বা'।

'কান না দিলেই তো হলো'।

'আমার আব্বা জড়িত না থাকলে কান দিতাম না'।

'তুমি বিষয়টাকে যেভাবে দেখছ, বিষয়টা তেমন নয়। অপরাধীকে শাস্তি দেবার বিধান সব যুগেই ছিল'।

'কিন্তু তার আগে তো অপরাধ নির্ধারণের প্রশ্ন আছে'।

'নিরপরাধ কারও গায়ে আমরা হাত দেই না। আজ যে আসামীকে আমরা নিয়ে যাচ্ছি, সে আমাদের তিনজনকে খুন করেছে।

'আমি যে বিষয় জানি না, তা নিয়ে আমি তর্ক করবো না আব্বা। আমার বক্তব্য শাস্তি দেয়ার নামে হৃদয়হীনতা নিয়ে। অন্ধকার স্বৈরতন্ত্রের যুগে এক সময়

রাজা-সম্রাটরা তাদের প্রতিপক্ষকে বন্যজন্তুর মুখে ছেড়ে দিয়ে মজা দেখতো। শার্ক বে'তে এই ঘটনাই ঘটছে'।

বার্নেস কোন জবাব দিল না। তার চোখে বিস্ময়। পরে গম্ভীর কন্ঠে বলল, 'এসব কথা তুমি জানলে কোথায় মা?'

'অনেকেই জানে আব্বা'।

'অসম্ভব'।

'অসম্ভব নয় আব্বা। আমি কলেজে একাধিকজনের কাছ থেকে এই কথা শুনেছি'।

'কিন্তু কিভাবে?'

'যারা অপরাধ করে, তারাই অপরাধের কথা ছড়ায় আব্বা। এর কারণ নানা হতে পারে'।

'তুমি একে অপরাধ বলছ?' বার্নেসের কন্ঠে বিরক্তি। অন্য কোন ক্ষেত্রে হলে বার্নেস একথাগুলোর কণামাত্র বরদাশত করতো না। কিন্তু এই মা মরা মেয়েটিকে সে অত্যন্ত ভালবাসে, তার এমন কোন আবদার নেই যা সে পুরণ করে না। এই সুযোগে মেয়েটি তাকে শাসন করতেও শিখেছে। মায়ের মতই চোখ রাখে তার উপর। এতে বার্নেস গর্বিত আনন্দিত। এই কারণেই বার্নেস লেনার কথায় রাগ করতে পারলো না, কিন্তু বিরক্ত বোধ করল ব্ল্যাক ক্রস-এর ব্যাপারে মেয়ে এতদুর জড়িয়ে পড়ায়।

'আইন হাতে তুলে নেবার প্রতিটি ঘটনাই অপরাধ আব্বা, তুমিই প্রথম আমাকে এটা শিখিয়েছ'।

'তুমি ঠিকই বলেছ মা। কিন্তু জাতীয় ব্যাপারে কিছু কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে আইন হাতে তুলে নেয়া জাতির জন্যে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়'।

'মাফ কর আব্বা, জাতির যে অধিকার অর্জন করার জন্যে আইন হাতে তুলে নিয়ে বা গোপনে তা অর্জন করতে হয়, সেটা জাতীয় অধিকার নয়। নিশ্চয় কোন গ্রুপ স্বার্থকে জাতীয় অধিকার বলে চালিয়ে দেয়া হয়'।

'মা তুমি বয়সের চেয়েও বড় হয়েছ দেখছি। যাক এসব কথা বাইরে বলাবলি করবে না'। বলে হাসি মুখে উঠে দাঁড়াল বার্নেস।

লেনা পিতার আরও কাছে সরে এল। মাথা নিচু করে বলল, 'তোমার না গেলে হয় না আব্বা। তুমি এই কাজে যাও আমার কষ্ট লাগে'।

বার্নেস আবার চেয়ারে বসে পড়ল। মেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করল। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'দশ বছর আগে যদি মায়ের কন্ঠ এভাবে বাধা দিতে পারতো, তাহলে জীবন হয়তো অন্য রকম হতো। কিন্তু এখন আর কোন উপায় নেই মা। তুমি এসব ভেবে মন খারাপ করো না। তুমি একে এক ধরনের যুদ্ধ বলে ধরে নাও। তাহলে সান্ত্বনার যুক্তি পাবে'।

'কিন্তু যুদ্ধ গোপনে হয় না আব্বা। আর যুদ্ধও একটা আইনের অধীন। তার বন্দীদের জন্যে আন্তর্জাতিক আইন আছে'।

'ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, আরও জ্ঞান ঈশ্বর তোমাকে দিন। আমার মায়ের জন্যে আমার গর্ব হচ্ছে'। বলতে বলতে বার্নেস উঠে দাঁড়াল।

মেয়ের কপালে একটু চুমু দিয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

ব্ল্যাক ক্রস-এর ঘাটিতে এসে পৌছাল বার্নেস। এখানেই আহমদ মুসাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। এখান থেকেই সবাই গিয়ে উঠবে জাহাজে।

হাত-পা বাঁধা আহমদ মুসাকে বন্দীখানা থেকে বের করে আনা হলো।

বার্নেস দেখল, আহমদ মুসার বামহাত রক্তাক্ত। তালুর ক্ষতস্থানটিতে রক্ত জমাট হয়ে আছে। আরও বুঝল, আহমদ মুসাকে কোন খাবার দেয়া হয়নি। হঠাৎ মনে পড়ল মেয়ে লেনার কথা। মনে পড়ল তার শেষ উক্তিঃ 'যুদ্ধবন্দীদের জন্যেও আন্তর্জাতিক আইন আছে'। লেনা বন্দীর এই অবস্থা দেখলে নিশ্চয় চিৎকার করে উঠত।

'বন্দীকে তোমরা খেতে দাওনি?' সামনে দাঁড়ানো ঘাটির পরিচালককে বার্নেস কতকটা আনমনেই জিজ্ঞাসা করল।

'এমন বন্দীকে খেতে দেয়ার কোন নিয়ম নেই'। বলল ঘাটির পরিচালক লোকটি।

'ঠিক আছে। তোমরা খেতে দাও বন্দীকে। আর ওর আহত হাতটা ধুয়ে ওষুধ লাগিয়ে বান্ডেজ করে দাও'। বার্নেসের কন্ঠ নরম।

'ধন্যবাদ'। বলল আহমদ মুসা বার্নেসকে লক্ষ্য করে।

‘কোন বন্দীর ধন্যবাদ আমরা গ্রহণ করি না’। বলে বার্নেস উঠে দাড়িয়েঁ পাশের কক্ষে চলে গেল।

বার্নেস চলে গেলে ঘাটির পরিচালক স্বগত বলল, ‘স্যারের মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি’।

তারপর পাশে দাঁড়ানো লোকদের নির্দেশ দিল, একে নিয়ে যাও। আর আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, নির্দেশ হয়েছে সেবা একটু করতে হবে কিন্তু কোন চালাকি করার চেষ্টা করো না, ফল খুব খারাপ হবে।

রাত ১২টায় সকলে জাহাজে উঠল। জাহাজ ছাড়ার আগে সব ঠিক-ঠাক আছে কিনা চেক করতে গিয়ে বার্নেস নানতেজ ঘাটির পরিচালক ডান্টনকে জিজ্ঞাসা করল, ‘একজন ফাদারকে নিতে বললাম, নিয়েছ?’

‘নিয়েছি। কিন্তু কেন এই বাড়তি ঝামেলা বলুন তো?’

‘হাঙ্গরের মুখে ফেলার আগে লোকটির ব্যাপটাইজ করা হবে। অন্ততঃ মৃত্যুর আগেও ব্যাপটাইজ যদি হয়, তাহলে তার আত্মা শান্তি পাবে’।

‘তার আত্মা শান্তি না পেলে আমাদের কি?’

‘দেখ, আমাদের সবারই মরতে হবে। খৃষ্টের দয়া তো আমাদের সবারই দরকার’।

‘অতীতে কোন সময়ই তো এমনটা করা হয়নি’।

‘হলে ভালই হতো’।

একটু থেমেই আবার বলল বার্নেস, ‘ফাদারকে কি বলে এনেছ? সে আবার ঝামেলা করবে না তো?’

‘একজন প্রফেসনাল ফাদারকে নিয়ে এসেছি। সে টাকা ছাড়া আর কিছু চেনে না’।

‘ধন্যবাদ ডান্টন’।

জাহাজ ছাড়ল। ছুটে চলল লোরে নদীর প্রশান্ত বুক চিরে পশ্চিম দিকে আটলান্টিক মহাসাগরের উদ্দেশ্যে।

জাহাজের লক্ষ্য ‘শার্ক বে’ অর্থাৎ হাঙ্গর সাগর। পূর্ব-উত্তর আটলান্টিকের মধ্যে সবচেয়ে বেশী হাঙ্গরের সমাবেশ এখানে। এই কারণেই এর নাম দেয়া

হয়েছে ‘শার্ক বে’। স্থানটি লোরে নদীর মোহনা থেকে পশ্চিমে তিনশ’ মাইল এবং রিলে আইল্যান্ড থেকে দক্ষিণে দু’শ মাইল দুরে অবস্থিত।

এই স্থানটাই ব্ল্যাক ক্রস-এর ‘বিনোদন বধ্যভূমি’। শত্রু বন্দীদের এখানে তারা হাঙ্গরের মুখে ছেড়ে দিয়ে হাঙ্গরদের মানুষ শিকারের মহোৎসব দেখে। ক্রেনে বেঁধে শিকারকে নামিয়ে দেয়া হয় সাগরে। শিকার একবারে হাঙ্গরের মুখে তুলে দেয়া হয় না। হাঙ্গররা একটু একটু করে কেটে নেয়, ছিড়েঁ নেয় মানুষের দেহ। এই দূর্লভ দৃশ্য তারা দেখে মহা উৎসাহে। ব্ল্যাক ক্রস-এর কাছে এর চেয়ে বড় বিনোদন আর নেই।

ভোর চারটার দিকে জাহাজ শার্ক বে’তে গিয়ে পৌছল।

জাহাজের খোলে দরজা জানালাহীন একটা কেবিনে বন্দী ছিল আহমদ মুসা। বাতাস যাওয়া-আসার জন্যে কয়েকটা গবাক্ষ আছে মাত্র। কেবিনটা দরজাহীন এই অর্থে যে, দরজাটা কেবিনের দেয়ালের সাথে মিশে আছে। দূর নিয়ন্ত্রিত দরজাটার নির্মাণ এতই নিখুঁত যে একবার না দেখলে দরজার স্থান চিহ্নিত করা অসম্ভব।

হাত পিছমোড়া করে বাঁধা, পাও বাঁধা। এমন সেলে বন্দী করে রেখেও তারা নিশ্চিন্ত হয়নি হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখেছে আহমদ মুসাকে। মিঃ ক্লাউডের কথা মনে পড়ল আহমদ মুসার। তিনি বলেছিলেন বলেছিলেন ব্ল্যাক ক্রস’রা খুবই আত্মবিশ্বাসী। খুব আত্মবিশ্বাসী যারা তারা তো একটু কম সতর্ক হয়। কিন্তু ব্ল্যাক ক্রসকে খুবই সতর্ক দেখা যাচ্ছে। তাকে প্যারিস থেকে আনার সময় হাত-পা বাঁধার পরেও সংজ্ঞাহীন করেছে। তারপর প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে তারা সামান্য ঝুকিরও অবকাশ রাখছে না।

মানুষ হিসেবেও ব্ল্যাক ক্রস এর লোকেরা জঘন্য, এ পর্যন্ত এটাই মনে হয়েছে আহমদ মুসার। ব্যতিক্রম শুধু বার্নেস নামক লোকটার আজকের রাতের ব্যবহার। তাকে ব্যান্ডেজ করে দেয়া এবং খেতে দেয়ার আদেশ দেয়া গোটা পরিবেশের সাথে বিদঘুটে মনে হয়েছে।

যাই হোক বার্নেসের কাছে কৃতজ্ঞ সে। হাতের ক্ষতস্থানে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল। ব্যান্ডেজ করে দেবার পর অনেকটা ভাল লাগছে।

অন্ধকার সেলের মেঝেয় শুয়ে ভাবছিল আহমদ মুসা। নিজের চেয়ে ওমর বায়ার কথাই তার মনে পড়ছিল বেশী। বেচারার কোনই সন্ধান করা এখনও গেল না। মাঝখানে সেও আটকা পড়ে গেল। তার নিরুদ্দেশ হওয়ার খবর ফিলিস্তিন এমবেসি নিশ্চয় সব জায়গায় জানিয়ে দিয়েছে। প্যারিসে খোঁজও করবে তারা। কিন্তু কিছুই পাবে না। যে ঘাটির সন্ধান এমবেসি জানে, সে ঘাটিতো ব্ল্যাক ক্রস গত রাতেই ছেড়ে দিয়েছে। আহমদ মুসা ভাবল, তার মত করে ওমর বায়াকেও কি ওরা প্যারিসের বাইরে কোথাও নিয়ে গেছে। আহমদ মুসাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ওরা? নানতেজ থেকে তাকে ওরা স্টিমারে তুলেছে। স্টিমারটি নিশ্চয় পশ্চিমে আটলান্টিকের দিকে যাচ্ছে। আটলান্টিকের তীরে কোন শহরে বা ঘাটিতে নিয়ে যাচ্ছে তাকে? না কোন দ্বীপে? আবার মিঃ ক্লাউডের কথা মনে পড়ল। তিনি বলেছিলেন, কোন শত্রুকে হাতে পেলে ব্ল্যাক ক্রস তাকে বাচিয়েঁ রাখে না। একথা ঠিক হলে ব্ল্যাক ক্রস তাকে কোন ঘাটি বা দ্বীপে বন্দী করে রাখতে নিয়ে যাবে, তা ঠিক নয়। তাহলে?

হঠাৎ আহমদ মুসার মনে পড়ল ডোনার কথা। সে ফ্রান্সে আসছে বা এসেছে, একথা ডোনাকে জানানো হয় নি। জানতে পারলে সে নিশ্চয় ভীষণ রাগ করবে অথবা কাঁদবে? ভীষণ জেদি আর দুষ্টু মেয়ে। তেমনি আবার সাহসীও। কাউকে পরোয়া করে কোন কাজ করে না। মনটা কিন্তু তার শিশুর মত সরল। ডোনার দেয়া মানিব্যাগটা এখনও আহমদ মুসার পকেটে। যদি কখনও দেখা হয়, তাহলে তাকে চমকে দেয়া যাবে।

কিন্তু ডোনাকে চমকে দেয়ার কথা ভাবতে গিয়ে আহমদ মুসা নিজেই চমকে উঠল। কেন সে এতদিন এ মানিব্যাগটা বহন করছে? তাসখন্দ থেকে আসার সময় অনেক কিছুই সে ছেড়ে এসেছে, কিন্তু টাকাহীন এ মানিব্যাগটাকে কেন সে পকেটে তুলেছে? কোন উত্তর আহমদ মুসার জোগাল না। তার বদলে হৃদয়ের গভীর কোণ থেকে ভেসে উঠল ডোনার সজল জেদি একটা মুখ। তার সাথে হৃদয়ে গোটা সত্তা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল অব্যক্ত একটা যন্ত্রণা। এ যন্ত্রণার সাথে পরিচিত আহমদ মুসা। আমিনার বিচ্ছেদ তাকে এ যন্ত্রণাই দেয়। চমকে উঠল আহমদ মুসা।

পায়ের শব্দে চিন্তায় ছেদ পড়ল আহমদ মুসার। পায়ের শব্দ কেবিনের বাইরে। একাধিক লোকের। আহমদ মুসার সেলে আলো জ্বলে উঠল। সেই সাথে খুলে গেল দরজা।

আহমদ মুসা দেখল, বাইরে দাড়িয়েঁ বার্নেস, ডান্টন এবং আরও দু'জন। বার্নেস ছাড়া সকলের হাতে স্টেনগান। বার্নেসের হাতে পিস্তল।

বার্নেস বলল, একজন গিয়ে ওর হাতের বাঁধন খুলে দাও।

হাতের বাঁধন খুলে দিলে আহমদ মুসা উঠে বসল।

'চালাকির কোন চেষ্টা করো না। ব্ল্যাক ক্রস-এর নিশানা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না মনে রেখ'। বলল বার্নেস।

একটু থেমেই আবার শুরু করল, 'তোমার জন্যে খারাপ খবর। খারাপ আর কি, মৃত্যুটা জন্মের মতই স্বাভাবিক। তবে পদ্ধতি একটু বেসুরো এই যা। শোন, এই সমুদ্রে আমাদের একটা বধ্যভুমি আছে। নির্দেশ হয়েছে এই বধ্যভূমিতে তোমাকে ফেলে দেয়ার। ক্ষুধার্ত হাঙ্গরগুলো অনেকদিন হয় মানুষের স্বাদ পায়নি। তোমার এই ছোট্ট দেহে তাদের ক্ষুধার কিছুই হবে না, তবে স্বাদ গ্রহণটা হবে'।

অচঞ্চল চোখে শুনল আহমদ মুসা কথাগুলো। আহমদ মুসার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল তাকে সাগরে নিয়ে আসার রহস্য। মনে মনে শিউরে উঠল ব্ল্যাক ক্রস-এর পশুসুলভ জিঘাংসা দেখে।

বার্নেস কথা শেষ করে একটু থেমেছিল। পরে আবার শুরু করল, 'তুমি বধির নাকি, শুনতে পেয়েছ তোমার মৃত্যুদন্ডের কথা'।

'শুনেছি, বলুন আপনার আর কি বলার আছে'।

'কি ব্যাপার, তোমার ভয় করছে না? তোমার ভাব দেখে মনে হচ্ছে আমার কোন কথাই তুমি বুঝনি'।

'ভয় কেন? ভয় কি কাউকে মৃত্যু থেকে বাঁচাতে পারে?'

বার্নেস বিস্ময়ের সাথে আহমদ মুসার দিকে চাইল। মৃত্যুকে সামনে দেখার পর কি কেউ এভাবে নির্বিকার থাকতে পারে! কি সাংঘাতিক নার্ভ এই লোকটার, ভাবল বার্নেস। আহমদ মুসার কথার উত্তরে বলল সে, 'ভয় কাউকে

মৃত্যু থেকে বাঁচায় না, কিন্তু ভীত মানুষ মাফ চেয়ে, কান্না-কাটি করে অনেক সময় বেঁচে যায়’।

‘দেখুন, সব বাঁচাই বাঁচা নয়, সব জীবন জীবন নয়’।

‘তোমাকে মনে হচ্ছে দার্শনিক সক্রেটিস কিংবা ধর্মগুরু পোপ। তবে কেন মরতে এসেছিলে আমাদের ঘাটিতে, কেন খুন করলে আমাদের তিনজন মানুষ?’

‘খুন করিনি, খুন হয়েছে। সব সময় আক্রমণকারী জেতে না, আক্রান্তও জিততে পারে’।

‘মনে হচ্ছে ওরা তোমার বাড়িতে ডাকাতি করতে গিয়েছিল?’ মুখ বাকিয়েঁ কথাগুলো বলল বার্নেস। তারপর সাথীদের দিকে ফিরে নির্দেশ দিল, ‘একে নিয়ে চল হল রুমে। আর আহমদ মুসার দিকে লক্ষ করে বলল, ‘শুনে খুশী হবে, আমরা তোমার ব্যাপটাইজ করব। তোমার আত্মার সদগতি হবে। মনে শান্তি পাবে’।

আহমদ মুসার ঠোটেঁ হাসি ফুটে উঠল। কিছুই বলল না।

‘এরপরও হাসছিস, তোর মাথা খারাপ নাকি?’- বলে ডান্টন আহমদ মুসাকে পা ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলল হল রুমের দিকে।

হল ঘর ভর্তি লোক। জাহাজের পাচক-বয়-বেয়ারা থেকে শুরু করে সবাই এসেছে ব্যাপটাইজ দেখতে। ঘরের একপ্রান্তে একটা বেদি। সেখানে বসেছেন একজন ফাদার। তার গলায় ঝুলছে একটা সোনালী ক্রস।

আহমদ মুসাকে তার সামনে নিয়ে রাখা হলো। তার পা তখনও বাঁধা।

‘ওর পা খুলে দিন। মুক্ত মানুষ না হলে ব্যাপটাইজ হয় না’।

হল ঘরের অন্য তিনদিক ঘিরে দাড়িয়েঁ আছে ব্ল্যাক ক্রস-এর লোক। তাদের প্রত্যেকের হাতে ঝুলছে স্টেনগান। তাদের পেছনে অন্যান্য লোক। আহমদ মুসার কাছে বেদির পাশে আরেকজন দাড়িয়ে। তার হাতের স্টেনগান আহমদ মুসার দিকে তাক করা।

বার্নেসের নির্দেশে একজন এসে আহমদ মুসার পায়ের বাঁধা খুলে দিল।

বার্নেস আর ডান্টন দাড়িয়েছিল ঘরের মাঝখানে। তাদের হাতে রিভলবার।

বাঁধ খুলে দেয়ার পর আহমদ মুসা দু'পায়ের উপর ভর দিয়ে সোজা হয়ে বসল।

ফাদারও একটু নড়ে-চড়ে বসে বাইবেল হাতে নিয়ে আহমদ মুসার দিকে লক্ষ্য করে বলল, 'একটু এগিয়ে এস বৎস'।

আহমদ মুসা মুখ তুলে চাইল ফাদারের দিকে।

মাত্র গজ খানেক দুরে বেদির পাশে দাঁড়ানো স্টেনগান ধারীর দিকেও তার নজর পড়ল। তার স্টেনগানের ব্যারেল ১২০ ডিগ্রী এ্যাংগেলে উপরে উঠানো।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল ফাদারের দিকে এগিয়ে যাবার জন্যে। কিন্তু দু'পা এগিয়েই ঝাপিয়ে পড়ল স্টেনগানধারীর উপর।

বাম হাত দিয়ে তার স্টেনগান কেড়ে নিয়ে ডান হাত দিয়ে একই সাথে তার কানের নিচে একটা কারাত চালাল। তারপর স্টেনগানের ট্রিগার চেপে ধরেই ঘুরে দাড়াল আহমদ মুসা এবং চোখের নিমেষে স্টেনগানের ব্যারেল ঘুরিয়ে নিল গোটা ঘরে।

বার্নেস এবং ডান্টন আহমদ মুসার উপর ঝাপিয়ে পড়েছিল সে স্টেনগান কেড়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গেই। কিন্তু তারা গুলী বৃষ্টির মুখে পড়ে গিয়েছিল। ঝাঁঝরা হয়ে গেল তাদের দেহ।

ঘরের চারদিকে যারা দাড়িয়েঁছিল, তারা সবাই মেঝেয় লুটোপুটি খাচ্ছে। রক্তে ভাসছে তারা।

ব্ল্যাক ক্রস-এর লোকরা সবাই সামনেই দাড়িয়েছিল। তারা কেউ বেচে নেই বলেই আহমদ মুসার মনে হলো।

ফাদার ভয়ে যেন পাথর হয়ে গেছে। তার মুখ কাগজের মত সাদা। সে হাত দিয়ে বাইবেল তুলেছিল। বাইবেল ধরেই বসে আছে।

আহমদ মুসা তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'আপনার কোন ভয় নেই। আপনি উঠুন। মৃত ও আহতদের আলাদা করুন'।

তারপর আহমদ মুসা ঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, যারা বেচে আছ তারা উঠে দাড়াও। দেরী করলে আবার গুলী চালাব।

আহমদ মুসা কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই পাচজন লোক উঠে দাড়াল। এবং সমস্বরে বলল, আমরা জাহাজে ছোট চাকুরী করি। আমাদের কোন দোষ নেই।

আহমদ মুসা তাদের একজনকে ডেকে বলল, 'তুমি ব্ল্যাক ক্রস-এর সংজ্ঞাহারা এই লোকটাকে বেধে ফেল। আর তোমরা ফাদারের সাথে ওদের পরীক্ষা করে দেখ। আহতদের আলাদা কর এবং সমস্ত অস্ত্র এনে ঘরের মাঝখানে জড়ো কর'।

আহত পাওয়া গেল চারজনকে। মৃত দশজন।

'জাহাজে আর কেউ আছে?' ওদের সবাইকে জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

'মাষ্টার সারেং আছেন'। একজন জবাব দিল।

'ওকে ডাক'। বলল আহমদ মুসা।

সঙ্গে সঙ্গেই একজন গিয়ে ডেকে আনল।

'মাষ্টার সারেং পঞ্চাশোর্ধ বয়সের। কাঁপতে কাঁপতে সে এসে প্রবেশ করল।

'আপনি এঘরে আসেননি যে?' তাকে জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

'এসব দেখতে আমার ভাল লাগে না'।কাঁপা গলায় সে বলল।

'কোন সব দেখতে ভাল লাগে না'।

'খুনোখুনি, হাঙ্গরের মুখে মানুষ ফেলা ইত্যাদি।

'কত বছর চাকুরী করেন এখানে'।

'পাঁচ বছর'।

'ভাল না লাগলে এতদিন কেউ থাকে?'

'ইচ্ছা করলেই কেউ এখান থেকে চাকুরী ছাড়তে পারে না। কান্না জড়ানো সুরে বলল সারেং।

'তোমাদের কেউ একজন গিয়ে জাহাজের 'মেডিকেল কিট' নিয়ে এস।

যে লোকটি সারেংকে ডাকতে গিয়েছিল সেই ছুটে গেল।

‘মেডিকেল কিট’ নিয়ে এলে আহমদ মুসা ওদের নির্দেশ দিল আহতদের ব্যান্ডেজ বেঁধে দিতে।

ব্যান্ডেজ বাঁধা শেষ হলে আহমদ মুসা সারেংকে বলল আহত ও ফাদারসহ সবাইকে বেঁধে ফেলতে। বলল, ‘আমি ভয় করছি না, কিন্তু কোন ঝুকিঁ নিতে চাই না’।

তারপর অস্ত্রগুলো সাগরে ফেলে দিয়ে এবং সবাইকে হল ঘরে রেখে হল ঘর বন্ধ করে দিল। শুধু একটা রিভলবার এবং একটা স্টেনগান নিজের কাছে রাখল। রিভলবার পকেটে ফেলে স্টেনগানটি হাতে নিয়ে সারেংকে বলল, ‘চলুন জাহাজ স্টার্ট দেবেন’।

জাহাজ স্টার্ট নিলে আহমদ মুসা সারেংকে কনট্রোল চেয়ারে বসিয়ে নিজে তার পেছনে চেয়ার নিয়ে বসল।

জাহাজ চলতে শুরু করল।

‘হাঙ্গরের এই বধ্যভূমিতে ওরা কত মানুষকে খুন করেছে?’ জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

‘আমার চাকুরীকালে শ’খানেক হবে’।

‘আমি কে, আমাকে কেন ওরা খুন করতে চেয়েছিল জানেন আপনি’।

‘কোন সময়ই আমাদের কিছু জানানো হয় না’।

‘ব্ল্যাক ক্রস-এর চীফ কে, এদের হেড কোয়ার্টার কোথায় জানেন?’

‘বলেছি জনাব, আমাদের কিছুই জানতে দেয়া হয় না’।

‘জানলেও আপনি বলতে পারবেন না। জিজ্ঞাসা করাই ভুল হয়েছে’।

‘ভুল বুঝবেন না জনাব, আমরা এখানে ক্রীতদাস শ্রমিকের মত। এই জাহাজের বাইরে আমরা কিছুই চিনি না। ছুটি পেলে চোখ বন্ধ করে বাড়ি যাই এবং চোখ বন্ধ করে বাড়ি থেকে ফিরে আসি। কোন জাহাজে চাকুরী করি, তাও কাউকে বলতে পানি না’।

বেলা ৮টার দিকে লোরে নদীর মোহনায় এসে পৌছাল জাহাজ।

‘জাহাজ নানতেজে নেব, না সেন্ট নুজায়েরে নোঙ্গর করব?’ জিজ্ঞাসা করল সারেং।

‘নানতেজ পর্যন্ত যাওয়ার প্রয়োজন নেই। সেন্ট নুজায়েরে নোঙ্গর করুন’।

জাহাজ নোঙ্গর করার পর আহমদ মুসা সারেংকে বেঁধে ফেলল। বলল, আপনাকে বেঁধে রাখা আপনার জন্যেই প্রয়োজন। এতে ওরা বুঝবে আপনি আমাকে কোন সাহায্য করেননি।

কেবিন থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে আহমদ মুসা পা বাড়ালে সারেং বলল, ‘আপনি কে জানি না। কিন্তু শত্রু এমনও হতে পারে, তা আপনাকে না দেখলে কোনদিনই জানতাম না। আপনার জীবনের চরম বৈরী আহত শত্রুর আপনি চিকিৎসা-শুশ্রুসার ব্যবস্থা করেছেন। এমন শত্রুর কথা আমার কাছে অকল্পনীয়। আপনি বিদেশী। বলবেন কি, আপনি কে?’

আহমদ মুসা না ফিরেই বলল, ‘আমি আহমদ মুসা’। বলে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল সে।

সেন্ট নুজায়ের ছোট্ট সমুদ্র শহর। লোরে নদীর শেষ প্রান্তে অবস্থিত।

এ শহর থেকে বাইরে যাবার একটাই পথ। সে পথটা সেন্ট নুজায়ের থেকে নানতেজ গেছে।

আহমদ মুসা নানতেজ যাওয়াই স্থির করল।

নানতেজ ব্ল্যাক ক্রস-এর ঘাটি সে দেখেছে। সেখানে গিয়ে সামনে এগুবার কোন পথ পাওয়া যায় কিনা তা দেখতে হবে।

জুতার শুকতলির নিচ থেকে ২’শ ডলারের একটা নোট বের করে তা ভাঙিয়ে আহমদ মুসা ট্যাক্সিতে করে নানতেজ যাত্রা করল।

সেন্ট নুজায়ের থেকে নানতেজ মাত্র একশ’ কিলোমিটার। নয়টার মধ্যেই আহমদ মুসা পৌছে গেল নানতেজ।

নানতেজের ব্ল্যাক ক্রস-এর যে ঘাটি আহমদ মুসা চেনে তা নানতেজ বন্দরের কাছাকাছি।

আহমদ মুসা সোয়া ৯টার দিকে ব্ল্যাক ক্রস-এর ঘাটিতে পৌছাল।

ঘাটি সুন্দর দোতলা একটা বাড়ি। একটাই মাত্র গেট। গেটে ভারি দরজা।

আহমদ মুসা গাড়ি থেকে নেমে ড্রাইভারকে বলল, 'আমি কি আপনাকে ভাড়া মিটিয়ে দেব, না আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন?'

'কতক্ষণ দেরী হবে আপনার?'

'বলতে পারি না। পনের-বিশ মিনিট দেরী হতে পারে, আমার নাও ফিরতে পারি'।

'আপনি সুন্দর কথা বলেন তো! বুঝা যাচ্ছে, আপনি বাড়িটাতে গিয়ে বিপদে পড়তে পারেন। যাতে এমনকি আপনার জীবনও যেতে পারে। এই তো?'

'হতে পারে'।

'তাহলে আমি অপেক্ষা করব। আপনি বিদেশী। শেষ না দেখে আমি যেতে পারছি না'।

'ধন্যবাদ। একটা কাজ করি, আমার কাছে চৌদ্দশ ফ্রাঙ্ক আছে। আপনার কাছে জমা রেখে যাই। ফিরে এলে পেয়ে যাব, না ফিরে এলে আপনি চলে যাবেন, তাতে টাকাগুলো শত্রুর হাতে পড়ল না'।

'আমি যদি টাকা নিয়ে পালিয়ে যাই?'

'আপনার কিছু উপকার হলে তাতে আমার মন খারাপ হবে না'।

'আপনি আশ্চর্য মানুষ তো?'

আহমদ মুসা কোন জবাব না দিয়ে বাড়িটার দিকে পা বাড়াল।

ব্ল্যাক ক্রস-এর ঘাটির দিকে যেতে যেতে আহমদ মুসা ভাবল, ঘাটির পরিচালক ডান্টন নেই। নিশ্চয় আরও দু'চারজন এখান থেকে গেছে ডান্টনের সাথে। সুতরাং ঘাটিতে খুব বেশী লোক থাকার কথা নয়। আহমদ মুসার লক্ষ্য হলো, বাড়িটা সার্চ করা, ব্ল্যাক ক্রস-এর কোন তথ্য, দলিল দস্তাবেজ পাওয়া যায় কিনা তা দেখা।

আহমদ মুসা গিয়ে সরাসরি গেটে নক করল। শত্রুর উপর জয়ী হবার এটাও একটা বড় কৌশল। কেউ সাধারণত মনে করে না যে, তার কোন শত্রু এভাবে দরজা নক করে আসবে। সুতরাং অনেক ক্ষেত্রেই তাদের অপ্রস্তুত অবস্থায় পাওয়া যায়।

কয়েকবার নক করার পরেও ভেতর থেকে কোন জবাব এল না।

আহমদ মুসা ধীরে ধীরে দরজার উপর চাপ দিল। খুলে গেল দরজা। বিস্মিত হলো আহমদ মুসা। কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে কয়েক ধাপ সামনে এগিয়ে যাবার পর আহমদ মুসার বুকটা হঠাৎ ছ্যাৎ করে উঠল। কোন ফাঁদ নয় তো?

সঙ্গে সঙ্গেই আহমদ মুসা পকেট থেকে রিভলবারটা তুলে নিল হাতে।

আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে করিডোরের মুখে গিয়ে পৌছল সে।

পেছনে পায়ের শব্দ পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল আহমদ মুসা। ঘুরেই দেখল, লোহার একটা বিরাট রড তার মাথা লক্ষ্যে নেমে আসছে।

আহমদ মুসা মাথাটা দ্রুত সরিয়ে নিল। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। রডটি কপালের বাম পাশের বেশ খানিকটা চামড়া খুলে নিয়ে প্রচন্ড বেগে আহমদ মুসার ডান হাতে গিয়ে আঘাত করল। হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল রিভলবারটি।

আহমদ মুসা দেহের ভারসাম্য রাখতে পারল না। পড়ে গেল। পড়ে গিয়েই দেখল, দ্বিতীয়জনের আর একটি রড নেমে আসছে আবার তার মাথা লক্ষ্যে।

আহমদ মুসা দ্রুত গড়িয়ে নিজেকে সরিয়ে নিল। রডটা গিয়ে আঘাত করল পাথরের মেঝেতে। আগুন জ্বলে উঠল প্রবল ঘর্ষণে।

লোকটি তার রডটি পুনরায় হাতে তুলে নেবার আগে রডের নিচের মাথাটা ধরে ফেলল আহমদ মুসা এবং শুয়ে থেকেই হ্যাচকা টানে কেড়ে নিল রডটি। লোকটি ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেল মেঝের উপর।

আহমদ মুসা উঠে দাড়াল বিদ্যুতগতিতে। প্রথম লোকটি আবার রড তুলেছিল মারার জন্য। আহমদ মুসা হাতের রড দিয়ে তার ছুটে আসার রডের আঘাত ঠেকিয়ে দিয়ে সংগে সংগেই ডান পায়ের একটা লাথি চালাল তার তলপেটে। তলপেট ধরে পড়ে গেল লোকটি।

তৃতীয় লোকটি রিভলবার বের করেছিল, আর অন্যদিকে যার হাত থেকে রড সে কেড়ে নিয়েছিল, সেও উঠে দাড়াচ্ছিল।

কিন্তু আহমদ মুসা ওদের সময় দিল না। আহমদ মুসা হাতের রড চালাল রিভলবার তুলে নেয়া হাতের উপর। সাপ মারার মতো আরও কয়েকবার রড চালাল তার উপর। রিভলবার তার আগেই হাত থেকে ছিটকে পড়েছিল। সেও মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

কিন্তু সময় পেয়ে গিয়েছিল উঠে দাড়ানো লোকটি। সে ঝাপিয়ে পড়ল আহমদ মুসার উপর। আহমদ মুসা পড়ে গেল এবং সেই সাথে সে লোকটাও।

দু'জনে লুটোপুটি, ধ্বস্তা-ধ্বস্তি চলল কিছুক্ষণ। লোকটি হাতের কাছে রিভলবার পেয়ে গেল। কিন্তু আহমদ মুসা তার রিভলবার ধরা দু'হাত তার দিকেই ঘুরিয়ে দিল। চার হাতের চাপা-চাপিতে ফায়ার হলো রিভলবার থেকে। কানের পাশ দিয়ে গুলী ঢুকে গেল লোকটির মাথায়।

রিভলবার নিয়ে উঠে দাড়াল আহমদ মুসা।

পেটে লাথি খাওয়া লোকটি উঠে দাড়াচ্ছিল টলতে টলতে।

আহমদ মুসা রিভলবার বাম হাতে নিয়ে ডান হাতের প্রচন্ড একটা কারাত চালাল লোকটির ঘাড়ে।

লোকটি অর্ধেক পর্যন্ত উঠে দাড়িয়েছিল। আবার লুটিয়ে পড়ল জ্ঞান হারিয়ে।

আহমদ মুসা পড়ে থাকা দ্বিতীয় রিভলবারটি পকেটে পুরে, আরেকটি রিভলবার হাতে নিয়ে এগুলো ঘরগুলো অনুসন্ধান করে দেখার জন্যে।

বাড়িতে সব মিলিয়ে ১২টা ঘর। কোন ঘরেই কিছু পেল না আহমদ মুসা। এক টুকরো কাগজও কোথাও নেই। কোন কাপড়-চোপড়ও নেই। তবে অন্য সবকিছু ঠিক আছে। টেলিফোনও আছে, কিন্তু টেলিফোন গাইড নেই এবং টেলিফোনের সেটে যে নাম্বার কোর্ড থাকে তাও নেই। অর্থাৎ ব্ল্যাক ক্রস পরিকল্পিত ভাবেই এ ঘাটি পরিত্যাগ করেছে। কেন? জাহাজের সব খবর তাহলে এখানে পৌছেছে কি? প্যারিসের যে ঘাটিতে আহমদ মুসা প্রবেশ করেছিল, সে ঘাটিও ব্ল্যাক ক্রস ছেড়ে দেয়। বুঝা যাচ্ছে, শক্রুরা তাদের কোন ঘাটি চিনে ফেললে সে ঘাটি আর তারা রাখে না।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, জাহাজের খবর এত তাড়াতাড়ি এখানে পৌছাল কি করে?

নিশ্চয় জাহাজের লোকেরা ছাড়া পেয়েছে। তারাই এখানে খবর পৌছিয়েছে টেলিফোনে। তারপরই ঘাটি ছেড়ে দেয়া হয় এবং ফাঁদ পেতে রাখা হয় তাকে ধরার জন্যে। ভাবল আহমদ মুসা।

কিন্তু একটা বিষয় বুঝতে পারল না সে, তাকে এত বড় শত্রু মনে করল কি করে! তাহলে কি তাকে খুব বড় শত্রু বলে তারা মনে করেছে, যে শত্রু প্রতিশোধ নেবার জন্যে ঘাটিতেও হানা দিতে পারে? কিন্তু কেন তা মনে করবে? জাহাজের ঘটনার পর কি তাদের ধারণা পাল্টে গেছে?

টেলিফোন বেড়ে উঠল।

টেলিফোনের রিসিভার উঠাল আহমদ মুসা।

'হ্যালো, আমি লেনা'। ও প্রান্ত থেকে এক নারী কন্ঠের এই আওয়াজ শুনতে পেল আহমদ মুসা। কন্ঠকে একটা কিশোরীর বলে মনে হলো আহমদ মুসার কাছে।

'কি চাও, কাকে চাও তুমি?' জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

সম্ভবতঃ আহমদ মুসার কথা শুনে ও প্রান্তের মেয়েটা একটু দ্বিধা করল। কথা বলল না কয়েক মুহুর্ত। একটু সময় পরে বলল, 'আপনাকে মনে হচ্ছে বিদেশী। আপনি কি ওখানকার কেউ নন?'

'হ্যা বিদেশী। কেউ নই এখানকার'।

'কোথায় ওরা? ওদের কাউকে দিন'।

'কেউ নেই ওরা। সবাই চলে গেছে'।

'সবাই তো যেতে পারে না'।

'ওরা এ বাড়ি পরিত্যাগ করেছে'।

'বাড়ি পরিত্যাগ করে...' কথা শেষ করতে পারল না মেয়েটি। কন্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল তার।

বিস্মিত হলো আহমদ মুসা। হঠাৎ ভাবল, মেয়েটি কি এ ঘাটির কারও কেউ হবে? জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কে বোন? তুমি কি জানতে চাও। বল, আমি তো আছি'।

'আমি বার্নেসের মেয়ে। আমার আব্বা ফিরেছেন কিনা বলতে পারেন? মনটা খুব অস্থির লাগছে আব্বার জন্যে'।

আহমদ মুসার বুকটা ধক করে উঠল। এ কোন বার্নেসের মেয়ে! যে বার্নেসকে সে জাহাজে হত্যা করেছে সেই বার্নেসের মেয়ে? বুক থর থর করে কেঁপে উঠল আহমদ মুসার। নিশ্চিত হবার জন্যেই আহমদ মুসা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার আব্বা কোথায় গেছেন? কখন ফেরার কথা বোন?' নরম কন্ঠ আহমদ মুসার।

'শার্ক বে'র দিকে গেছেন। এতক্ষণ ফেরার কথা'।

আহমদ মুসার আর কোন সন্দেহ রইল না, সেই বার্নেসের মেয়েই এই লেনা।

নিশ্চিত হবার সাথে সাথেই বেদনার কালো আঁধারে ছেয়ে গেল তার গোটা হৃদয়টা। মুহুর্তের জন্যে বাকহারা হয়ে গেল আহমদ মুসা। শুনতে পাচ্ছে, ওপার থেকে মেয়েটি হ্যালো, হ্যালো বলে চিৎকার কর চলেছে।

কিন্তু কি জবাব দেবে সে পিতার প্রতীক্ষমান এই মেয়েকে! কেমন করে বলবে যে তার পিতা নিহত। কেমন করে বলবে যে তার হাতেই তার পিতা নিহত হয়েছে!

কিংকর্তব্যবিমূঢ় আহমদ মুসা মুহুর্তের জন্যে সম্বিত হারিয়ে ফেলেছিল। আর শিথিল হাত রিসিভার সমেত নেমে এসেছিল।

সম্বিত ফিরে পেয়েই রিসিভার কানে তুলল আহমদ মুসা। শুনতে পেল টেলিফোন একটানা পিপ পিপ শব্দ। লাইন কেটে গেছে। চিৎকার করে করে অস্থির, উদ্বিগ্ন মেয়েটি টেলিফোন রেখে দিয়েছে।

ওপারের একটা দৃশ্য ফুটে উঠল আহমদ মুসার চোখে। টেলিফোন রেখে দিয়ে নিশ্চয় চিৎকার করে জড়িয়ে ধরেছে মাকে অথবা বিছানায় লুটিয়ে পড়ে কাদছে উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তার তীব্র বেদনায়।

আহমদ মুসা ধীরে ধীরে রিসিভারটি রেখে দিল। দু'চোখ থেকে দু'ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল তার।

চোখ মুছল আহমদ মুসা।

চোখ মুছতে গিয়ে আঙুলে রক্ত লাগল।

এতক্ষণে তার মনে পড়ল কপালের ডান পাশটা তার থেতলে যাবার কথা।

মুখের পাশ দিয়ে গড়িয়ে আসা রক্ত রুমাল দিয়ে মুছে ফেলল। কপালের ক্ষতে রুমাল ঠেকাতে গিয়ে বেদনায় কেপে উঠল শরীরটা।

এতক্ষণে লক্ষ্য করলো তার জ্যাকেটের উপরও রক্ত গড়িয়ে পড়েছে। তাছাড়া বাম হাতের তালুর ক্ষত থেকেও রক্ত ঝরছে।

আহমদ মুসা বেরিয়ে এল ব্ল্যাক ক্রস-এর ঘাটি থেকে।

দেখল ট্যাক্সি ঠিক জায়গায় দাড়িয়ে আছে।

আহমদ মুসা কাছে যেতেই গাড়ির ড্রাইভার বেরিয়ে এল গাড়ি থেকে। আহমদ মুসার সর্বাঙ্গে নজর বুলিয়ে বলল, 'ইস কপালটা থেতলে গেছে, আপনি ভাল আছেন তো? আমার কাছে ফাস্ট এইড বক্স আছে। ব্যান্ডেজ করে দেব?'

'ধন্যবাদ' বলে আহমদ মুসা গাড়িতে উঠে বসতে বসতে বলল, 'ফাস্ট এইড বক্সটা আমাকে দাও। আর গাড়ি স্টার্ট দাও তুমি'।

'ফাস্ট এইড বক্স আহমদ মুসার হাতে তুলে দিয়ে ড্রাইভিং সিটে নড়ে-চড়ে বসে ড্রাইভার বলল, কোথায় যাব স্যার?'

প্রশ্ন শুনে আহমদ মুসার মনেও প্রশ্ন জাগল, এখন কোথায় যাবে সে? ব্ল্যাক ক্রস-এর সন্ধান পাবার সকল সুত্রই সে আবার হারিয়ে ফেলেছে। এখন কোথায় খুজবে তাদের, কোথায় খুজে পাবে ওমর বায়াকে। প্যারিসেই কি আবার ফিরবে সে?

মনস্থির করে আহমদ মুসা বলল, 'প্যারিসের পথ কোনটা তুমি ভাল মনে কর?'

‘অনেক পথ আছে। তবে এ্যানজার, তুরস ও অরিয়েনস হয়ে যে রাস্তা প্যারিস গেছে, সেটাই সবচেয়ে ভাল রাস্তা। অর্ধেকটা পথ লোরে নদীর পাশাপাশি যাওয়া যাবে। পথে পাহাড়, বন, গ্রাম প্রভৃতি সব ধরণের দৃশ্যই চোখে পড়বে।

গাড়ি স্টার্ট দেবার আগে ড্রাইভার আহমদ মুসার দেয়া ১৪শ’ ফ্রাংক আহমদ মুসার দিকে তুলে ধরে বলল, ‘আপনার টাকা নিন স্যার’।

‘ঠিক আছে তুমি রাখ’। গন্তব্যে পৌছে তোমার ভাড়া রেখে আমাকে দিয়ে দেবে’।

‘আপনি রাখলেও সেটাই হবে। পৌছে আমার ভাড়াটা দিয়ে দেবেন’।

আহমদ মুসা টাকা রাখল।

গাড়ি চলতে শুরু করল।

বেলা ১২টার দিকে আহমদ মুসার গাড়ি লোরে নদীর পশ্চিম পাশে তুরেন উপত্যকা পার হয়ে তুরস শহরের সন্নিকটবর্তী সুর লোরে পাহাড়ী এলাকায় প্রবেশ করল। ‘সুর লোরে’ পশ্চিম ফ্রান্সের একটি উল্লেখযোগ্য পর্যটন কেন্দ্র। পরিকল্পিত সবুজ বনে আচ্ছাদিত পাহাড়গুলো। এই পাহাড় অঞ্চলের মধ্যে একে-বেকে এগিয়ে গেছে হাইওয়েটি তুরস শহরের দিকে।

আহমদ মুসা ড্রাইভারের পাশের সিটে বসেছিল।

আহমদ মুসা ‘সুর লোরে’তে প্রবেশের আগেই লক্ষ্য করছিল একটা গাড়ি তার গাড়ির সমান স্পীডে এগিয়ে আসছে অনেকক্ষণ ধরে একই গতিতে।

কিন্তু ‘সুর লোরে’ এলাকায় প্রবেশের পর গাড়িটা দ্রুত কাছাকাছি চলে এল এবং বার কয়েক হর্ণ দিল। তার পরপরই আহমদ মুসার গাড়িও হর্ণ দিয়ে উঠল। পেছনের হর্ণ শুনে আহমদ মুসার মনে হয়েছিল, গাড়িটা ওভারটেক করার জন্যে রাস্তার ভিন্ন চ্যানেলে চলে যেতে চায়। কিন্তু গাড়িটির গতিতে ওভারটেক করার কোন লক্ষণই দেখতে পেল না। তারপরও তার গাড়ির হর্ণ শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। দুই গাড়ির হর্ণ একই মাপের একই টোনের। শুনেই আহমদ মুসার মনে হল তার গাড়ির হর্ণ পেছনের গাড়ির হর্ণের জবাব দিয়েছে। কিন্তু এটা তো স্বাভাবিক নয়। ট্রাফিক নিয়ম পেছনের গাড়ির ওভার টেকের সাথে তার পেছনের গাড়ির সম্পর্ক, সামনের গাড়ির নয়।

অল্প কিছুক্ষণ পর পেছনের গাড়িটি শটওয়েভ ভংগীতে এক নাগাড়ে কয়েকটি হর্ণ বাজাল।

আহমদ মুসা তাকাল ড্রাইভারের দিকে। দেখল, তার মুখটা বিষন্ন হয়ে উঠেছে এবং লক্ষ্য করল, ড্রাইভারের আঙুল হর্ণ-সুইচে কয়েকবার উঠানামা করল। এবারও হর্ণ বাজাল পেছনের গাড়ির মত করেই।

এবার আহমদ মুসার বিস্ময় সন্দেহে রুপান্তরিত হলো। এ দু'টি গাড়ির মধ্যে কি কোন সম্পর্ক আছে? কিংবা দু'টি গাড়ি কি কোন একই গ্রুপের? সে গ্রুপটি কি? হঠাৎ আহমদ মুসার মনে পড়ল। সেদিন রাতে প্যারিসে ব্ল্যাক ক্রস-এর ঘাটির গেটে ব্ল্যাক ক্রস-এর ক্যারিয়ারকে সে এই একই মাপ ও টোনে হর্ণ দিতে শুনেছিল।

আহমদ মুসার গোটা শরীরে একটা উষ্ণ স্রোত বয়ে গেল। তাহলে কি এ দু'টি গাড়ি তার সন্ধান পেল কি করে? এই গাড়ি কি তার সন্ধান দিয়েছে? কিন্তু এ ড্রাইভার জানবে কি করে যে আমি কে? নানতেজে ব্ল্যাক ক্রস-এর ঘাটিতে ঢুকেছিলাম, তাদের সাথে লড়াই হয়েছে-এ থেকেই কি? কিন্তু ড্রাইভার ব্ল্যাক ক্রস-এর লোক হলে ঐ ঘাটিতে তার কোন ভূমিকা ছিল না কেন?

আহমদ মুসা বিপরীত মুখী চিন্তায় জড়িয়ে পড়ল। কোন সমাধান খুজে পেল না।

এই সময় ড্রাইভার বিষন্ন মুখে মুহুর্তের জন্যে আহমদ মুসার দিকে মুখ ফিরাল এবং বলল, 'স্যার আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?' ড্রাইভারের কন্ঠে উদ্বেগ।

'অবশ্যই'। আহমদ মুসার চোখে-মুখে প্রবল উৎসুক্য।

'স্যার ব্ল্যাক ক্রস কি আপনার শত্রু?'

'এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছ কেন?' আহমদ মুসার চোখ-মুখ শক্ত হয়েছে। তার কন্ঠও খুব কাটখোট্টা শুনাল।

'ব্ল্যাক ক্রস এর গাড়ি এই গাড়িকে ফলো করছে?'

'কি করে জানলে তুমি?'

'ওরা সিগন্যাল দিয়েছে'।

‘কি সিগন্যাল দিয়েছে?’

‘ওরা হাইওয়ে থেকে পাশে কোথাও নেমে যেতে বলেছে’।

‘তুমি কে?’

‘আমি ব্ল্যাক ক্রস-এর অনিয়মিত বাহিনীর একজন কর্মী। কিন্তু এই মুহুর্তে আমি আপনার নিয়োজিত একজন ড্রাইভার’।

‘আমি নানতোজ ব্ল্যাক ক্রস-এর ঘাটিতে যখন ঢুকলাম তখন এবং তারপরেও তো তুমি কিছু বলোনি?’

‘ওটা ব্ল্যাক ক্রস-এর ঘাটি ছিল আমি জানি না। শুধু ওদের আদেশ পালন ছাড়া ওদের কোন কিছুই আমরা অনিয়মিতরা জানি না’।

ড্রাইভার একটা ঢোক গিলল। তারপর আবার শুরু করল, স্যার ওরা আপনাকে খুন করবে। ওদের হাত থেকে কেউ বাচে না। স্যার আমাকে একটা আঘাত করে অজ্ঞান করে, রাস্তায় ফেলে দিয়ে আপনি গাড়ি নিয়ে চলে যান। চেষ্টা করুন বাচার’।

‘তুমি কেন আমাকে সাহায্য করবে?’ আহমদ মুসার কন্ঠে বিস্ময়।

‘আপনি বিদেশী। আপনাকে কোন অপরাধী বলে আমার মনে হয়নি। তাছাড়া আমার একমাত্র ছেলে হাসপাতালে এখন মুমূর্ষু। ঈশ্বর তাকে রক্ষা করুন। আমি কোন খুনোখুনির মধ্যে যেতে পারবো না’।

‘আমি তোমাকে আঘাত করতে পারবো না। এই চলন্ত গাড়ি থেকে ফেলে দিলে তুমি মারাত্মক আহত হবে।

‘স্যার, ঐ ফাস্ট এইড বক্সটা আমাকে দিন’।

আহমদ মুসা তাকে এগিয়ে দিল বক্সটা।

ড্রাইভার বাক্সটি খুলে এর একটা গোপন পকেট থেকে একটা ছোট শিশি বের করে নাকে চেপে ধরল।

আহমদ মুসা মুহুর্তেই ব্যাপারটা বুঝতে পারল। ড্রাইভার ক্লোরোফরম করছে নিজেকেই। আহমদ মুসা দ্রুত দিয়ে স্টেয়ারিং হুইলটা ধরে ফেলল। গাড়ি কয়েক মুহুর্ত একটু একে-বেঁকে আবার ঠিক হয়ে গেল।

আহমদ মুসা নিজের পকেট থেকে এক হাজার ফ্রাংকের একটা নোট বের করে সংজ্ঞাহীন ড্রাইভারের পকেটে গুজে দিল। তারপর গাড়ির গতি একটু স্লো করে ড্রাইভারকে গড়িয়ে নামিয়ে দিল রাস্তায়।

পেছনের গাড়িটি একেবারে কাছাকাছি এসে গিয়েছিল।

ড্রাইভারকে গড়িয়ে দেবার পর আহমদ মুসার গাড়ি পূর্ণ গতি পাওয়ার আগেই পেছন থেকে এক ঝাক গুলী ছুটে এল আহমদ মুসার গাড়ি লক্ষ্যে।

একটা টায়ার সশব্দে ফেটে গেল আহমদ মুসার গাড়ির। আহমদ মুসার গাড়ি পাক খেয়ে রাস্তা থেকে নেমে এল। যেখানে নেমে এল সেটাও একটা রাস্তা। দুই পাহাড়ের মাঝ দিয়ে এগিয়ে গেছে পাহাড় শ্রেণীর আরও গভীরে।

আহমদ মুসা ফেটে যাওয়া টায়ার নিয়েই কিছুটা এগিয়ে গেল। আর যাওয়া সম্ভব নয়। ওরা গুলী করতে করতে পেছনে পেছনেই আসছে।

আহমদ মুসা রাস্তার একটা বাকে এসে বাক সংলগ্ন পাহাড়ের গা ঘেষে গাড়িটাকে রাস্তার আড়াআড়ি দাড় করিয়ে দিল এবং গাড়ির আড়ালে গিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। পকেট থেকে হ্যান্ড গ্রেনেডটি বের করে নিয়েছিল। গাড়ি থেকে নেমেই সে হ্যান্ড গ্রেনেডটি ছুড়ে মারল পেছনে এসে দাড়ানো গাড়ি লক্ষ্যে।

আহমদ মুসার গাড়ি দাড়িয়ে পড়ার সংগে সংগেই পেছনের গাড়িটাও আহমদ মুসার গাড়ির পেছনে এসে দাড়িয়ে পড়েছিল। গাড়ি থেকে নেমে পড়েছিল ওরাও। এই সময় আহমদ মুসার হ্যান্ড গ্রেনেড গিয়ে আঘাত করল গাড়িটাকে।

মুহুর্তেই বিস্ফোরণে টুকরো টুকরো হয়ে গেল গাড়ি।

কিন্তু দু’জন বেচে গিয়েছিল বিস্ফোরণ থেকে। তারা চলে এসেছে আহমদ মুসার গাড়ির এ পাশে।

আহমদ মুসা যখন ওদের দেখতে পেল, তখন ওরা ওদের স্টেনগান উচিয়ে তুলছে।

আহমদ মুসা গাড়ির সামনের প্রান্তে দাড়িয়ে ছিল। সে ঝাপিয়ে পড়ল গাড়ির ওপাশে গাড়ির আড়াল নেবার জন্যে।

এক ঝাক গুলী উড়ে গেল গাড়ির ওপর দিয়ে। একটা গুলী গিয়ে বিদ্ধ করল জুতা সমেত আহমদ মুসার পা’কে।

প্রবল ঝাকুনি দিয়ে উঠল আহমদ মুসার গোটা দেহ। কিন্তু ওদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ না করে আহমদ মুসা গাড়ির ওপাশে আছড়ে পড়ার পরেই শরীরটাকে বাকিয়ে গাড়ির এ প্রান্তে নিয়ে এল নিজের মাথাকে। উকি দিয়ে দেখল ওরা দু'জন ছুটে আসছে এদিকে। আহমদ মুসা দু'হাতে রিভলবার ধরে গুলী করল পর পর দুটো। গুলী খেয়ে দু'জনই প্রায় এক সাথেই আছড়ে পড়ল।

আহমদ মুসা সেদিকে একবার তাকিয়ে উঠে দাড়াবার উদ্যোগ নিল। এমন সময় হাইওয়ের দিক থেকে হর্ণের শব্দ ভেসে এল। সেই আগের মতই একই মাপে এবং একই টোনে।

আহমদ মুসা বুঝল, ব্ল্যাক ক্রস-এর আরেকটা গাড়ি আসছে।

আহমদ মুসা পাহাড়ের উপর তাকাল। দেখল, উপরে গাছপালা ক্রমশঃই ঘন। পাহাড়ের এদিকটা খুব খাড়াও নয়।

আহমদ মুসা আহত পা'টাকে টেনে টেনে ক্রলিং করে পাহাড়ের উপরে উঠতে লাগল।

মিনিট দুয়েকের মধ্যেই বড় কয়েকটি গাছের আড়ালে একটা ঘন ঝোপে গিয়ে পৌছাল। জায়গাটা সমতল। ক্লান্ত আহমদ মুসা শুয়ে পড়ল জায়গাটায়। অবিরাম রক্ত ঝরছে পা থেকে ঝিম ঝিম করছে তার গোটা শরীর।

কয়েক মুহুর্ত পর একটা গাছে হেলান দিয়ে পাহাড়ের নিচের দিকে তাকাল। দেখল, একটা গাড়ি এসে থেমেছে আহমদ মুসার গাড়ির সামনেই। গাড়ি থেকে নেমেছে চারজন লোক ওদের সবার হাতে স্টেনগান। ওরা ঘুরে ঘুরে লাশগুলো পরীক্ষা করছে। আহমদ মুসা ভাবল, আহমদ মুসার লাশই তারা খুজছে।

খোজা শেষে ওরা এক সাথে দাড়িয়ে কিছু আলোচনা করল। তারপর ওরা এক সাথেই পাহাড়ের উপরের দিকে তাকাল।

আহমদ মুসা নিশ্চিত হলো, ওরা সন্দেহ করছে পাহাড়ের ওপরে কোথাও সে লুকিয়ে আছে। ওরা এখন ওপরে উঠবে।

আহমদ মুসা পাহাড়ে উঠে আসার সময় ওদের একজনের স্টেনগান নিয়ে এসেছিল। ওটাকে হাতে তুলে নিল সে।

ওরা পাহাড়ে উঠতে শুরু করেছে। ওদের উঠার লাইন দেখে আহমদ মুসা বুঝল ওরা রক্তের দাগ অনুসরণ করেই এগিয়ে আসছে।

ওরা গুলীর বিরামহীন দেয়াল সৃষ্টি করে এগিয়ে আসছে। ওদের প্রত্যেকের স্টেনগানেই সাইলেন্সার লাগানো। সুতরাং কোন শব্দ হচ্ছে না, শুধু দেখা যাচ্ছে আগুনের ঝলক এবং পাওয়া যাচ্ছে বারুদের গন্ধ।

দু'একটা করে গুলী আহমদ মুসার আশেপাশে এসে পড়তে লাগল।

আহমদ মুসা একটা মোটা গাছের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে। এতে ওদের গুলীর হাত থেকে বাচা যাচ্ছে, কিন্তু স্টেনগান নিয়ে গাছের আড়াল থেকে বেরুতে না পারলে ওদের রোধ করা যাবে কেমন করে? ওরা একদম কাছে চলে এসেছে। এখন গুলী বৃষ্টি ঘিরে ধরেছে তাকে। কি করা যায় ভাবছে আহমদ মুসা। ওদের গুলীর বিরতি না হলে ওদের তাক করাও তো সম্ভব নয়। প্রথম গুলী মিস হলে পরে গুলী করার সুযোগ সে নাও পেতে পারে।

পায়ের কাছেই একটা বড় পাথর দেখতে পেল আহমদ মুসা। সঙ্গে সঙ্গেই বুদ্ধিটা মাথায় এল। সে পাথরটি তুলে নিয়ে ছুড়ে মারল পাশের ঝোপটার দিকে।

কাজ হলো। পাথরটি ঝোপটাকে সশব্দে আন্দোলিত করার সাথে ওদের চারজনের স্টেনগানই ঘুরে গেল সেদিকে।

এই সুযোগের অপেক্ষা করছিল আহমদ মুসা। সে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে স্টেনগানের ট্রিগার চেপে তার ব্যারেলটা একবার ঘুরিয়ে আনল ঐ চারজনের উপর দিয়ে।

তারপর স্টেনগান ফেলে দিয়ে পাহাড় থেকে গড়িয়ে নেমে আসল নিচে।

দাড়াতে পারছিল না আহমদ মুসা। অসীম ক্লান্তি ও দুর্বলতায় তার দেহ ভেংগে আসছিল। বুঝতে পারল আহমদ মুসা রক্তক্ষরণ দুর্বল করে দিয়েছে তার দেহ।

দাড়াতে গিয়ে দেখল দেহ তার টলছে, চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে তার।

সে হামাগুলি দিয়ে গাড়ির ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল। কোন রকমে তাকে হাইওয়েতে পৌছাতে হবে, ভাবল আহমদ মুসা।

ড্রাইভিং সিটে বসে মাথা ঠিক মত খাড়া করে রাখতে পারছিল না আহমদ মুসা।

গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে আহমদ মুসা চলতে শুরু করল। কিন্তু সে বুঝতে পারল না, তার গাড়ি হাইওয়ের দিকে না গিয়ে উল্টো দিকে চলছে।

যে পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিল আহমদ মুসা, সে পাহাড়ের পাশ দিয়ে পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলল তার গাড়ি। ভারসাম্য রক্ষা করতে পারছিল না আহমদ মুসা। একটা পা অকেজো, অসহ্য যন্ত্রণা তাতে। একে-বেকে এগিয়ে চলছিল গাড়ি। তাও বেশী দুর এগুতে পারলো না।

সামনেই ছিল আরেকটা পাহাড়। সেখান থেকে রাস্তাটা বাঁক নিয়েছিল উত্তর দিকে।

আহমদ মুসা সংজ্ঞা হারিয়ে ঢলে পড়ল সিটের উপর। গাড়িটি পাহাড়ের ঢালে ধাক্কা খেয়ে এদিক সেদিক একেঁ-বেঁকে অবশেষে থেমে গেল।

দূরবীণে চোখ রেখেই চিৎকার করে উঠল জিনা লুইসা, 'দেখ দেখ আব্বা, আম্মা, মার্ক'।

জিনা লুইসা যাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তারাও দূরবীণ চোখে লাগিয়ে তাকাল জিনা লুইসার দৃষ্টি অনুসরণে।

চারজন দূরবীণ চোখ লাগিয়ে নির্বাকভাবে দেখছিল জীবন দেয়া-নেয়ার একটি বীভৎস দৃশ্য।

'ও গড, ছবির দেখা দৃশ্যের চেয়েও ভয়ংকর'। দূরবীণে চোখ রেখেই আর্ত কন্ঠে বলে উঠল ফ্রাংক মরিস, জিনা লুইসার আব্বা।

'ওরা যে লোকটাকে তাড়া করে এনেছিল, সেই ওদের গাড়ি উড়িয়ে দিল। গাড়ি থেকে যারা নামছিল তারাও বাঁচল না'। দূরবীণে চোখ রেখেই বলল জিনা লুইসা।

‘কিন্তু দেখ, মরল লোকটা, দু’জন তাকে স্টেনগান তাক করেছে’। দূরবীণ চোখে রেখেই চিৎকার করে উঠল মার্ক মরিস, জিনার ছোট ভাই।

‘আঃ লোকটা গুলী খেয়ে পড়ে গলে নাকি?’ বলল জিনা লুইসা।

‘না, আগেই লাফ দিয়েছে। দেখ লোকটার পায়ে গুলী লেগেছে। রক্ত বেরুচ্ছে, কাঁপছে পা’। বলল মিসেস গাব্রিয়েলা, জিনা ও মার্কের মা।

‘মার্ক দেখ, লোকটা বেঁচে আছে। এদিকে ফিরে লোকটা ওর দিকে এগিয়ে যাওয়া লোক দু’জনকে তাক করছে। হুররে দেখ, গুলী করেছে এ দু’জনকে। দেখ পড়ে গেছে দু’জন লোক’।

‘আহত লোকটি পাহাড়ের উপর দিকে উঠে যাচ্ছে। লোকটা বিদেশী’। বলল ফ্রাংক মরিস।

‘আব্বা, আরেকটা গাড়ি আসছে। ওরা কোন পক্ষের?’ বলল জিনা লুইসা।

‘ওরা চারজনই ফরাসি, দেখ ওরা নিশ্চয়ই আহত লোকটাকেই খুঁজছে’। বলল ফ্রাংক মরিস।

‘সর্বনাশ, ওরা আহত লোকটার খোজে পাহাড়ের উপরে উঠছে’। বলল মার্ক মরিস।

‘নিশ্চয় ওরা আহত লোকটার রক্তের দাগ অনুসরণ করছে’। বলল মিসেস গাব্রিয়েলা।

‘ওরা আহত লোকটাকে হত্যাই করতে চায়, দেখ স্টেনগান থেকে গুলী করতে করতেই ওরা উঠছে’। বলল জিনা লুইসা।

‘ঐ ঝোপেই তো লোকটা লুকিয়ে আছে। নিশ্চয় লোকটা এতক্ষণে মরে গেছে। ওদের গুলী তো এক ফুট জায়গাও বাদ রাখছে না’। বলল মার্ক মরিস।

‘না না দেখ, ওরা চারজন পড়ে গেল। নিশ্চয় আহত লোকটা গুলী করেছে’। বলল জিনা।

‘হ্যাঁ, ঐ তো আহত লোকটা বেঁচে আছে। গড়িয়ে নামছে পাহাড় থেকে’। বলল মিসেস গাব্রিয়েলা।

‘লোকটি দেখ দুর্বল হয়ে পড়েছে, দাঁড়াতে পারছে না। গাড়িতে উঠছে কেন? আহত পা। চালাতে পারবে গাড়ি?’ বলল জিনা লুইসা।

‘সর্বনাশ গাড়ি চালাতে পারছে না একসিডেন্ট করবে’। বলল ফ্রাংক মরিস।

‘চল আব্বা, ওর গাড়ি থামাতে হবে’। চোখ থেকে দূরবীণ নামিয়ে বলল জিনা।

সবাই চোখ থেকে দূরবীণ নামিয়ে ফেলেছে। তারা দেখল তারা যে পাহাড়ে দাড়িয়ে সেই পাহাড়ে এসেই ধাক্কা খেল গাড়িটা।

‘ওরা চারজনই নিচে নেমে এল গাড়ি যেখানে দাড়িয়ে পড়েছে সেখানে।

ফ্রাংক মরিসের এই পরিবার সুর লোরে এসেছিল পিকনিক করতে। যদিও দিনটা ছিল বুধবার। ফ্রাংক মরিস ছুটি ভোগ করছিল বলেই এদিন তারা এসেছিল সুর লোরে’তে। সুর লোরের গোটা এলাকা মানুষে গম গম করে সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে। সারাদিন কাটিয়ে যায় মানুষ এখানে গোটা পরিবার নিয়ে।

ফ্রাংক মরিসের পরিবার বাস করে সুর লোরে থেকে ৫ মাইল দক্ষিণে লোরে নদীর ওপারে দ্বিজন গ্রামে। শস্য ভান্ডার এক বিশাল উপত্যকার মাথায় ফ্রান্সের বিখ্যাত একটি জনপদ এই দ্বিজন।

মিঃ ফ্রাংক মরিস একটি মিডল স্টান্ডার্ড স্কুলের অধ্যাপক।

তার মেয়ে জিনা লুইসা এবং ছেলে মার্ক মরিস দু’জনেই কলেজে পড়ে। তাদের মা মিসেস গাব্রিয়েলা একটা সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানের একজন নির্বাহী পরিচালক।

গাড়ির দরজা খুললো ফ্রাংক মরিস। দেখল, তাদের দেখা সেই আহত লোকটির মাথাটা সিটের উপর, আর দেহের বাকি অংশটা গড়িয়ে পড়েছে সিটের নিচে।

‘লোকটি বেঁচে আছে আব্বা?’ উদ্বিগ্ন কন্ঠ জিনা লুইসার।

মিঃ ফ্রাংক মরিস নাড়ী ও নিঃশ্বাস পরীক্ষা করে বলল, ‘হ্যাঁ বেঁচে আছে। তবে তাড়াতাড়ি চিকিৎসা হওয়া প্রয়োজন’।

বলে মিঃ ফ্রাংক আহমদ মুসাকে পাঁজাকোলে করে বের করে আনল। শুইয়ে দিল।

'একেবারে ছেলে মানুষ তো! শিশুর মত সরল চেহারা। এ এত খুনোখুনি করল?' বলল গাব্রিয়েলা।

'এমন গোল্ডেন কালার এশিয়ার কোন দেশের লোকের হয় আব্বা?' বলল জিনা লুইসা।

'এশিয়ার অনেক দেশেই আছে। তবে এর মধ্যে তুর্কি ও মংগোলীয় চেহারার সংমিশ্রণ দেখা যাচ্ছে।

মিঃ ফ্রাংক মরিস ইতিহাসের অধ্যাপক।

কথা শেষ করেই মিঃ ফ্রাংক স্ত্রী গাব্রিয়েলাকে বলল, 'তুমি মার্ককে নিয়ে পাহাড়ের উপর থেকে জিনিসপত্র সহ ওপারে গাড়ির কাছে যাও। আমরা একে এই গাড়িতে করে আমাদের গাড়ির কাছে যাচ্ছি'।

বলে মিঃ ফ্রাংক দ্রুত আহমদ মুসাকে গাড়ির পেছনের সিটে তুলে নিল। তারপর ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল। জিনা বসল পেছনের সিটে সংজ্ঞাহীন আহমদ মুসার মাথার কাছে।

'আব্বা, এ জ্ঞান হারিয়েছে কি অধিক রক্তক্ষরণের জন্যে?'

'আশু কারণ হয়তো তাই। কিন্তু তার শরীরের উপর দিয়ে আরও ধকল গেছে মনে হচ্ছে। হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা। বড় ধরণের আঘাত বলে মনে হচ্ছে। তার কপালের ক্ষতটাও খুবই তাজা। কাঁচা রক্তের দাগ আছে ব্যান্ডেজে'।

'আব্বা, ঘটনাকে আপনার কি মনে হয়?'

'বলা খুব মুস্কিল। একজন লোককে এত লোক তাড়া করা বিস্ময়কর। যারা তাড়া করে এসেছিল, তাদেরকে চেহারা-ছুরতে ভাল লোক বলে মনে হয়নি কিন্তু তার চেয়ে বিস্ময়কর হলো, অল্প বয়সী একজন যুবক এত লোককে মোকাবিলা করে জয়ী হলো। সাধারণ কেউ হলে এটা সম্ভব হতো না'।

'বিদেশী কোন গুপ্তচর কিংবা মাফিয়া চক্রের কোন সদস্যের মত অসাধারণ কেউ কিনা আব্বা?'

‘প্রতিপক্ষ যদি পুলিশ হতো, তাহলে গুপ্তচর ধরণের কিছু ভাবা যেত। অন্যদিকে মাফিয়া চক্রের সদস্য সর্বনিম্ন যে চেহারার হয়, তা এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। মানুষের মুখের দিকে তাকালে তার পাপ-পূণ্য দেখা যায়। কিন্তু এর চেহারায় কোন পাপ নেই মা’।

‘আব্বা, এঁর পকেটে একটা রিভলবার। একটা গুলীও খরচ হয়নি’।

‘এটা তাহলে দ্বিতীয় রিভলবার। একটা রিভলবার দিয়ে তো গাড়ির আড়ালে শুয়ে গুলী ছুড়েছিল এবং তাতে দু’জন লোক মারা যায়’।

‘একজনের কাছে দুই রিভলবার? তাহলে এও তো সাংঘাতিক কেউ আব্বা?’

‘বললাম না, অসাধারণ কেউ। লড়াই দেখেই তা বুঝা গেছে’।

‘আব্বা, পকেটে পরিচয় পাওয়ার মত কিছু নেই, একটা পকেটে ৪শ’ ফ্রাংক মাত্র’।

গাড়ি গিয়ে পৌছাল পাহাড়ের ওপাশে। মিঃ ফ্রাংক মরিসদের গাড়ির কাছে। মিসেস গাব্রিয়েলারা তখনও এসে পৌছায়নি।

মিঃ ফ্রাংক ও জিনা লুইসা গাড়ি থেকে নেমে পড়ল।

মিঃ ফ্রাংক মরিসদের গাড়ি একটা ছোট মাইক্রোবাস। পেছনে আটটা সিট, সামনে দু’টা।

মিসেস গাব্রিয়েলারা এসে পৌছাল।

আহমদ মুসাকে তোলা হলো মাঝের চারটা সিটে। পেছনে জিনিসপত্র নিয়ে বসল মিসেস গাব্রিয়েলা। সামনে ড্রাইভিং সিটে মিঃ ফ্রাংক, তার পাশের সিটে জিনা এবং মার্ক।

‘ও গাড়িটা দেখছি ভাড়ার ট্যাক্সি?’ বলল জিনা।

‘হ্যাঁ, গাড়িটা নানতেজ-এর একজন ট্যাক্সি চালকের’।

‘তাহলে গাড়িগুলো সব নানতেজ থেকেই এসেছে’ বলল মার্ক।

‘হতে পারে’। বলল ফ্রাংক।

দশ মিনিটের মধ্যে ওরা দ্বিজন গ্রামের বড় ক্লিনিকটিতে এসে হাজির হলো। ক্লিনিকটির পরিচালক মিঃ ফ্রাংকের ভাই।

ইমারজেন্সিতে প্রাথমিক পরীক্ষার পর ডাক্তার জানাল, শুধু রক্তক্ষরণ নয়, না খাওয়া, দুর্বলতা, ক্লান্তি সব মিলিয়ে জ্ঞান হারিয়েছে। একে দীর্ঘ সময় বেঁধে রাখা হয়েছিল। হাত-পায়ে প্লাষ্টিক কর্ডের গভীর দাগ দেয়া যাচ্ছে। লোহার রড জাতীয় কোন শক্ত জিনিস দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয়েছিল। আঘাতটা কপাল ও ডান বাহুর উপর দিয়ে পিছলে গেছে। কপালের থেতলে যাওয়া এবং ডান বাহুর কালশিরা বড় ধরণের আঘাতেরই সাক্ষ্য দিচ্ছে। আর বাম হাতের তালুর আঘাতটা ধারাল ছুরি জাতীয় কিছুর। হাতের তালু এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে হয়েছিল।

পরনের ট্রাউজার ছাড়া গা থেকে সব কাপড় খুলে নেয়া হয়েছিল আহমদ মুসার। জুতাও। জুতার ভেতর থেকে পাঁচশ' ডলারের একটা নোট পাওয়া গেল।

সবাই আহমদ মুসার টেবিল ঘিরে দাড়িয়েছিল।

ডাক্তার আহমদ মুসার খোলা শরীরটার দিকে তাকিয়ে সপ্রশংস দৃষ্টিতে বলল, 'এ রকম ভারসাম্যপূর্ণ পেশীর শরীর আমি দেখিনি। ডাক্তারী শাস্ত্রে একে মিরাকল কম্বিনেশন বলা হয়। এ শরীর অসম্ভব, অসাধ্যকে সম্ভব এবং সাধ্যের মধ্যে আনতে পারে। এ দেহ ইস্পাতের মত শক্ত হতে পারে, আবার মোমের মত নরমও হতে পারে'।

'তোমার অপরাধ বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে কি দেখছ?' বলল ফ্রাংক।

'অপরাধীর কোন চিহ্ন কোথাও দেখি না'।

'পায়ের আঘাত কি দেখলেন?' বলল জিনা লুইসা।

'ও খুব ভাগ্যবান লোক। পায়ের গোড়ালির সবটুকু গোশত বুলেট তুলে নিয়ে গেছে, কিন্তু হাড় স্পর্শ করেনি'।

ডাক্তার নার্সের দিকে তাকিয়ে বলল, 'নার্স ইনজেকশনটা এখন দিয়ে দাও। স্যালাইন শেষ হলে অপারেশন থিয়েটারে নিতে হবে। আমি আসছি'। বলে ডাক্তার পাশের কক্ষে চলে গেল।

জিনা লুইসা মার্ককে বলল, মার্ক তুমি ওঁর জুতাটা প্লাষ্টিক ব্যাগে নাও। পরিষ্কার করে আনতে হবে'।

'চল আমরা বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। জিনিস পত্র রেখে আসা যাবে'। সবার দিকে চেয়ে বলল মিঃ ফ্রাংক।

‘না আব্বা, ব্যাপার খুব স্বাভাবিক নয় তো। কেউ একজন আমাদের থাকা দরকার। বলল জিনা।

‘আমি থাকছি, লাঞ্চ করেই জিনা তুমি এসে যেও, তারপর আমি যাব’। বলল মিসেস গাব্রিয়েলা।

‘ধন্যবাদ মা’। বলল জিনা লুইসা।

সকলে বেরিয়ে এল ক্লিনিক থেকে।

মিসেস গাব্রিয়েলা বসল একটা চেয়ার টেনে নিয়ে আহমদ মুসার টেবিলের পাশে।

# ৪

রাত তখন নয়টা পেরিয়ে গেছে। প্যারিসে জুনের আরামদায়ক রাত।

ডোনা বসে আছে তার টেবিলে। পাশের জানালা খোলা। বাগান, করিডোর পেরিয়ে শোন নদীর স্নিগ্ধ বাতাস এসে প্লাবিত করছে ঘরকে।

ডোনার রেশমের মত সোনালী চুল সেই বাতাসে বার বার এসে আছড়ে পড়ছে দানিয়ুবের মত নীল চোখ এবং নীলাভ-শুভ্র গন্ডের উপর।

কিন্তু কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই ডোনার। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

চোখ থেকে নেমে আসা অশ্রুর ধারায় গন্ড ভেজা। চোখ দু'টি তার লাল। অনেক কেঁদেছে সে। কিন্তু এত কান্নার পরেও বুক ভরা রয়েছে তার ক্ষোভে, আর সমগ্র সত্তা জুড়ে রয়েছে যন্ত্রণার উত্তাপ। সেই উত্তাপেই ঘামছে সে।

বাতাসে উড়ে আসা কয়েকটা সোনালী চুল অশ্রুতে ভিজে গিয়ে গন্ডের সাথে লেপ্টে গেছে। স্থির বসে থাকতে পারছে না ডোনা। মাঝে মাঝে উঠে পায়চারি করছে।

বারবারই একটা কথা ডোনার মনে তীরের মত এসে বিদ্ধ হচ্ছে। আহমদ মুসা প্যারিসে এসেছে, কিন্তু তাকে জানায়নি, সে জানতে পারেনি। ক্লাউডিয়া না বললে ডোনা জানতেই পারত না আহমদ মুসার ফ্রান্সে আসার কথা। ক্লাউডিয়ার বাবাকে নিয়ে ক্লাউডিয়ার বাসায় যেতে পেরেছে কিন্তু তার কাছে আসতে পারেনি কেন? ক্লাউডিয়ার কাছ থেকে শুনতে হবে কেন তাকে আহমদ মুসার কথা? ফ্রান্সে আসবে কিন্তু তাকে আগে জানাবে না কেন?

এই ধরণের শত প্রশ্ন এসে ক্ষত-বিক্ষত করছে ডোনার কোমল হৃদয়টাকে। আহত হৃদয়ের রক্তটাই বেরিয়ে আসছে চোখ দিয়ে অশ্রু হয়ে।

আহমদ মুসা সম্পর্কে ক্লাউডিয়ার প্রশংসার কথাও অন্তরে তার তীর ফুটাচ্ছে। ক্লাউডিয়ার মত কোন সুন্দরী তরুণীর কাছে আহমদ মুসার কোন প্রশংসা সে শুনতে চায় না।

আহমদ মুসা বড় কাজ নিয়ে ফ্রান্সে এসেছে, একথা সে ক্লাউডিয়ার কাছে শুনেছে। কিন্তু কাজ যত বড়ই হোক, ডোনার সে খোঁজ নেবে না, দেখা করবে না ডোনার সাথে?

আবার ক্ষুব্ধ মন বলে উঠছে, দেখা করবে কেন ডোনার সাথে? ডোনা তার কে? কেউ তো নয়।

এই কথা ভাবতে গিয়ে অশ্রু উথলে উঠল দুই চোখে। বিছানায় নিজেকে ছুড়ে দিয়ে বালিশে মুখ গুজে পড়ে রইল ডোনা।

ডোনা ক্লাউডিয়ার বন্ধু। দু'জন এখন একই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। দু'জনই তুখোড় ডিবেটার ও টেনিস প্লেয়ার। এই হিসেবে দু'জনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এই সূত্রেই ক্লাউডিয়া তার জীবনের অদ্বিতীয় একটা ঘটনা হিসেবে আহমদ মুসার কথা গল্প করেছে ডোনার কাছে।

'ডোনা' 'ডোনা' বলে ডাকতে ডাকতে তার আব্বা মিঃ চার্লস প্লাতিনি ডোনার ঘরে প্রবেশ করল।

ঘরের মাঝখানে এসে দাড়িয়েছে ডোনার আব্বা।

ডোনা তখনও বালিশে মুখ গুজে পড়েছিল। বালিশে মুখ ঘষে ডোনা মুখ তুলল। উঠে বসল সে।

চোখ দু'টি লাল। অশ্রুতে ভেজা। গন্ডেও অশ্রুর দাগ। বেশ কিছু ভেজা চুল গন্ডের উপর তখনও লেপ্টে আছে।

'কি হয়েছে ডোনা?' বলে উদ্বিগ্ন মিঃ প্লাতিনি- এগিয়ে এসে ডোনার পাশে তার খাটে বসল।

'কিছু হয়নি আব্বা'। মাথার রুমাল দিয়ে চোখ ভালো ঘসে বলল ডোনা।

ডোনা এখন মাথায় রুমাল পরে। বিশ্ববিদ্যালয়েও। এ নিয়ে আপত্তি উঠেছিল। কিন্তু কোন বাধা মানেনি। বিশ্ববিদ্যালয় অবশেষে মেনে নিয়েছে। এটা ডোনার বড় বিজয়। কিন্তু ডোনা এ বিজয়কে আহমদ মুসার বিজয় বলে মনে করে। এই রুমাল বা হেড ড্রেস আহমদ মুসাই তার মাথায় তুলে দিয়েছে। গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরোধিতা আহমদ মুসার কাছে পরাজিত হয়েছে। কিন্তু ডোনা এসব কথাকে তুড়ি মেড়ে উড়িয়ে দিয়ে বলেছে, আমার মূল এবং মৌলিকতা

অবশ্যই আছে, আমার পরিবার ফ্রান্সের সমাজ ও ইতিহাসের একটা মৌল অংগ। তাই মৌলবাদী হতে আমি রাজী।

ডোনার পিঠে হাত বুলিয়ে তার আব্বা বলল, ‘আমার শক্ত মা ডোনা বুঝি এমনিতেই কাদে?’

‘আমার খুব খারাপ লাগছে আব্বা’। বলে দু’হাতে মুখ ঢাকল।

‘কেন কি হয়েছে?’

‘ঘটনা ছোট, কিন্তু আমার খারাপ লাগছে’।

‘কি ঘটনা?’

‘ক্লাউডিয়ার কাছে শুনলাম, আহমদ মুসা এসেছে। কিন্তু সে আমাকে....’ কথা শেষ করতে পারলো না ডোনা। আরো রুদ্ধ হয়ে কন্ঠ তার থেমে গেল।

‘জানায়নি, এই তো! পাগল মেয়ে। তার কথাও তো ভাবা দরকার, জানাতে পারেনি কোন তাও তোমার ভাবা প্রয়োজন’।

‘আমাদের প্যারিসের ঠিকানা না জানতে পারেন, কিন্তু গ্রামের বাড়ি মন্ট্রেজুর ঠিকানা ও টেলিফোন উনি জানেন। ফ্রান্সে আসার আগেও তিনি জানাতে পারতেন’।

‘তুমি তাকে হৃদয় দিয়ে দেখেছ, মাথা দিয়ে চেননি মা। সে শাটল কর্কের মত। সে তো স্থির হবার সময়ই পায় না। তার উপর অবিচার করো না’।

একটু থামল ডোনার আব্বা। তারপর বলল, ‘ওর কিছু খারাপ খবর আছে মা’।

‘কার খারাপ খবর? আহমদ মুসার? কি খবর, কি হয়েছে?’ উদ্বেগ-রুদ্ধ কন্ঠে বলল ডোনা। মুহুর্তে অন্ধকার হয়ে গেল তার মুখ।

‘আজ এক অনুষ্ঠানে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রদুতের সাথে দেখা হয়েছিল। আমি তাকে আহমদ মুসার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি জানালেন যে, আহমদ মুসা এসেছেন কিন্তু নিখোঁজ হয়ে গেছেন। তাকে খুব উদ্বিগ্ন মনে হলো। তিনি বললেন, মিঃ ক্লাউডের ওখান থেকে আহমদ মুসা সকালে দুতাবাসে পৌছেন। সারাদিন তিনি বিশ্রাম নেন এবং ব্ল্যাক ক্রস সম্পর্কে পড়াশুনা করেন। সেদিন রাত ১২টায় তিনি বেরিয়ে যান ব্ল্যাক ক্রস-এর একটা ঘাটির উদ্দেশ্যে। আর....’

বাধা দিয়ে ডোনা বলল, ‘কেউ তার সাথে যায়নি’।

‘বলছি, এ ধরণের অনুসন্ধানমূলক অপারেশনে সে কাউকে সাথে নেয় না। সেদিনও কাউকে সাথে নিতে রাজী হয়নি’।

একটু হাসল মিঃ প্লাতিনি।

‘আর তিনি ফিরেননি?’ অধৈর্য্য ও উদ্বেগের সাতে ডোনা বলল।

‘না আর ফিরেননি’।

‘ঐ ঘাটিতে কেউ খোজ নেন নি?’

‘নিয়েছে। ভোর রাতে দুতাবাসের লোক সেই ঘাটিতে গিয়ে তিনটি লাশ দেখেছে এবং পেয়েছে পুলিশকে। কিন্তু আহমদ মুসা সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেনি’।

‘ঐ লাশ কাদের আব্বা?’

‘ব্ল্যাক ক্রস-এর লোকদের। সেই রাত থেকে আহমদ মুসা নিখোজ’।

ডোনা ঠোট কামড়ে তার পিতার কাধে মুখ গুজল। তার চোখ ছল ছল করছে, কাঁপছে তার ঠোঁট।

মিঃ প্লাতিনি মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, ‘চিন্তার কথা মা, ব্ল্যাক ক্রস দুনিয়া ব্যাপী খৃষ্টানদের স্বার্থ রক্ষা করছে। এই ক্ষেত্রে তারা করতে পারে না এমন কোন কাজ নেই। প্রকৃতপক্ষে ব্ল্যাক ক্রস রেডক্রস-এর বিপরীত একটা খুনি সংগঠন’।

‘ওদের সাথে আহমদ মুসা কেন সংঘাতে জড়িয়ে পড়ল?’ ভাঙা গলায় বলল ডোনা।

ডোনার আব্বা মিঃ প্লাতিনি ওমর বায়ার ঘটনা ডোনাকে সব জানিয়ে বলল, ‘ব্ল্যাক ক্রস-এর হাত থেকে ওমর বায়াকে উদ্ধার করার জন্যেই আহমদ মুসা ফ্রান্সে ছুটে এসেছে’।

ডোনা কিছুক্ষণ নীরব থেকে ধীরে ধীরে বলল, ‘তুমি কি ভাবছ আব্বা, ব্ল্যাক ক্রস কি আহমদ মুসাকে আটক করেছে, না...’

কথা শেষ করতে পারলো না ডোনা। কন্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল তার।

‘চিন্তা করো না মা। ঈশ্বর তাকে রক্ষা করবেন। সে শুধু একজন মজলুম মানুষকে নয়, একটা মজলুম জাতিকে রক্ষার জন্যে ঝাপিয়ে পড়েছে’।

একটু থামল মিঃ প্লাতিনি। তারপর বলল, ‘আহমদ মুসা অনেক বড়। সে ব্ল্যাক ক্রস-এর চেয়েও অনেক বড় বড় শক্তির মোকাবিলা করেছে’।

এই সময় পাশের টিপয়ে রাখা কর্ডলেস টেলিফোন সংকেত দিয়ে উঠল। মিঃ প্লাতিনি টেলিফোন তুলে নিল হাতে।

কথা বলল টেলিফোনে। বলল ঠিক নয় শুনলই শুধু। শুনতে গিয়ে মাঝে মাঝেই তার ভ্রু কুচকে গেল এবং চিন্তা নতুন রেখা ফেলল তার কপালে।

গম্ভীর মুখে টেলিফোনটা রেখে বলল মিঃ প্লাতিনি, ‘ফিলিস্তিন দুতাবাসের টেলিফোন মা’।

মাথা তুলে উদগ্রীব হয়ে উঠল ডোনা।

‘না মা ভাল খবর নেই। তবে খবরগুলো আমার আশাব্যঞ্জক মনে হচ্ছে’।

‘কি খবর আব্বা?’ ডোনার চোখে আশার আলো।

‘দুতাবাস জানাল, পশ্চিম ফ্রান্সে কয়েকটা বড় ঘটনা ঘটেছে। লোরে নদীতে এক জাহাজে দশটি লাশ পাওয়া গেছে। ঐ দিনই নানতেজ শহরের একটি বাড়ীতে দুটি লাশ পাওয়া গেছে এবং ঐ দিন সুর লোরের পর্যটন স্পটে একটা গ্রেনেড বিধ্বস্ত গাড়িসহ ৬টি লাশ পাওয়া গেছে। মনে করা হচ্ছে গাড়ি বিধ্বস্ত হওয়ায় যারা মারা গেছে তাদের সংখ্যা তিন হবে’।

‘কিন্তু এগুলোর সাথে...’।

‘বলছি, ফিলিস্তিন দুতাবাস অনুসন্ধান করে জেনেছে সবগুলো লাশই ব্ল্যাক ক্রস-এর। তারা মনে করছে, আহমদ মুসার হাতেই এ ঘটনাগুলো ঘটতে পারে’।

ডোনার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, ‘ওদের ধারণাকে ঈশ্বর সত্য করুন। কিন্তু ও যোগাযোগ করছে না কেন তাহলে?’

‘সে কি অবস্থায় আছে, সেটা তো আমরা জানি না মা। ঘটনাগুলো প্রমাণ করে, আহমদ মুসা ব্ল্যাক ক্রস-এর সাথে কঠিন সংঘাতে জড়িয়ে গেছে। দূতাবাস আরও জানাল, তাদের বিশেষজ্ঞরা ঘটনাগুলো দেখেছে, জাহাজের হত্যাকান্ড

আগে ঘটেছে, তারপর নানতেজ শহরের এবং তারপর সুর লোকের। এই বিশ্লেষণ থেকে বলা হচ্ছে, ঈশ্বর করুন আহমদ মুসা ঐসব ঘটনার সাথে জড়িত থাকলে তিনি লোরে নদী থেকে সুর লোরের দিকে এসেছেন বা আনা হয়েছে'।

থামল মিঃ প্লাতিনি।

'তারপর কি আব্বা?'

'এটাই বিস্ময়ের। সুর লোরের পর ঘটনা থেমে গেছে। ফিলিস্তিন, মধ্য এশিয়া প্রজাতন্ত্র, সৌদি আরব, মিন্দানাও দূতাবাসের লোকেরা এলাকা সফর করেছে, কিন্তু কোন সুত্র তারা খুজে পায়নি'।

আবার মুখ অন্ধকার হয়ে গেল ডোনার।

ভাবছিল ডোনার আব্বা মিঃ প্লাতিনি।

অনেকক্ষণ পর ডোনা মুখ তুলে বলল, আমি সুর লোরে একবার যেতে চাই'।

'কেন মা?'

'আমার মন বলছে আমি ওখানে ওর কোন চিহ্ন খুজে পাব'। ডোনার শেষের কথা ভেঙ্গে ভেঙ্গে বেরিয়ে এল। তার দু'চোখ থেকে ঝর ঝর করে নেমে এল অশ্রু।

মিঃ প্লাতিনি মেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে যাব মা। ওদিকে অনেকদিন যাইনি। আমাদের এস্টেটটাও দেখে আসা হবে। কয়েকদিন সেখানে থাকতেও পারি আমরা'।

ডোনা চোখ মুছে বলল, 'আব্বা, ও কি কোনদিন স্থির হবে না? একের পর এক বিপদের মুখে সে ঝাপিয়ে পড়বেই? একজন মানুষকে উদ্ধারের জন্যে ছুটে আসবে চীন থেকে ফ্রান্সে?' আবেগে কন্ঠস্বর কাঁপছিল ডোনার।

'পৃথিবীতে অনেক মানুষ আসেন যারা নিজের জন্যে জন্মগ্রহণ করেন না মা। যারা নিজের চোখের পানিতে ভেসেও অন্যের চোখের পানি মুছে দেন'।

একটু থামল। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল মিঃ প্লাতিনি। তারপর বলল, 'আহমদ মুসার আরও খারাপ খবর আছে মা'।

আহত হরিণীর মতই চমকে উঠে মুখ তুলল ডোনা। অশ্রুতে লেপটে যাওয়া তার মুখ। একরাশ প্রশ্ন তুলে ধরল সে চোখে। মুখে কিছুই বলল না।

আবার কথা বলল ডোনার আব্বাই। বলল, 'সিংকিয়াং-এ আহমদ মুসারই জয় হয়েছে। কিন্তু তার স্ত্রীকে বাঁচাতে পারেনি, জীবিত উদ্ধার করতে পারেনি। নিহত হয়েছে গুলীবিদ্ধ হয়ে'।

'কি বলছ আব্বা, আহমদ মুসা তো এই আঘাত সইতে পারবে না'। বলে দু'হাতে মুখ ঢাকল ডোনা।

'আহমদ মুসা শুধু নয়, এই আঘাত সকলকেই কাদিয়েছে। ফিলিস্তিন রাষ্ট্রদূত এই খবর দিতে অশ্রু রোধ করতে পারেন নি। সবচেয়ে বেদনার কি জান, বিয়ের পর দু'জনের আর সাক্ষাত হয়নি। বিয়ের আসর থেকে আহমদ মুসা চলে এসেছিল ককেশাস, সেখান থেকে স্পেন। শেষের ইতিহাস তো আমরা জানি'।

থামল মিঃ প্লাতিনি।

কোন কথা এল না ডোনার কাছ থেকে।

দু'হাতে মুখ ঢেকে বসেছিল ডোনা। কাঁপছিল তার শরীর। আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়ছিল অশ্রু।

মিঃ প্লাতিনি মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'আমি শুনেছি, আহমদ মুসা মেইলিগুলিকে হারিয়ে শিশুর মত কেদেছে কিন্তু ভেংগে পড়ে নি সে। কর্তব্যের ডাকে স্ত্রীর লাশ নিয়েই চলে এসেছিল মধ্য এশিয়ায়। তারপর ডুবে গিয়েছিল কাজের মধ্যে'।

'আব্বা, ওর এই কাজ নিজেকে আড়াল করার একটা কৌশল'। মুখ থেকে হাত নামিয়ে মাথা সোজা করে বলল ডোনা।

'হতে পারে। তবে এই গুণ দূর্লভ মা'। বলে ডোনার আব্বা মিঃ প্লাতিনি উঠে দাড়াল। বলল, 'মা তুমি তৈরী হয়ে নিও। আমরা কাল সকালেই সুর লোরের দিকে যাত্রা করতে পারি।

বেরিয়ে গেল ডোনার আব্বা।

ডোনা শুয়ে মুখ গুজল বালিশে।

তার হৃদয়ে ঝড় বইছে। বিধ্বস্ত বুক আহমদ মুসার সামনে সে গিয়ে দাড়াবে কিভাবে। ডোনাকে দেখে তার হৃদয়ের ঘাটা আরও যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠবে না? যদি ঘুর্নাক্ষরেও সে ভাবে যে ডোনা তার প্রিয়তমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, তাহলে আমি দাঁড়াব কোথায়? কি করে বুঝাব তাকে যে, ডোনার হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও স্বার্থ চিন্তা ছিল না। মেইলিগুলি ভাবীর বিষয়টা জানার পর ডোনা একবারের জন্যেও আহমদ মুসাকে ফ্রান্সে থাকতে বলেনি। সমগ্র অন্তর দিয়েই তাদের সুখি দেখতে চেয়েছে। হ্যাঁ, ডোনা চেয়েছে আহমদ মুসা ফ্রান্সে আসুন। কিন্তু সেটা ছিল হৃদয়ের অপ্রতিরোধ্য আবেগের একটা অর্থহীন চাওয়ারই প্রকাশ।

আবার ভাবে ডোনা, আহমদ মুসার মত সুন্দর সুবিবেচক কাউকে সে দেখেনি। ওর চেয়ে নরম হৃদয়ও ডোনার চোখে পড়েনি। তিনি ডোনার প্রতি অবিচার করবেন না। বুঝবেন তিনি ডোনাকে।

পাশ ফিরল ডোনা।

দেখল ঘড়িতে দশটা বাজে।

উঠে বসল সে।

সফরের ব্যাগটা রাতে গুছিয়ে রাখাই ভাল। সকালে উঠেই যাত্রা করা যাবে।

দ্বিজন গ্রাম।

দিগন্ত প্রসারিত উপত্যকার মাথায় বেশ কয়েকটি সমতল পাহাড় নিয়ে গড়ে উঠেছে গ্রামটি।

ছবির মত সুন্দর সবুজ গ্রাম দ্বিজন। বাড়িগুলো আরও সুন্দর।

গ্রামের পাশ দিয়ে পাহাড়গুলোর পা ঘেঁষে বয়ে গেছে নীল পানির এদরে নদী।

গ্রাম থেকে উপত্যকার মধ্যে দিয়ে দিগন্তের দিকে বয়ে যাওয়া 'এদেরে' নদীকে উপত্যকার সবুজ মাথায় সাদা ফিতার মত সুন্দর দেখায়।

গ্রামের একটি পাহাড়ের মাথায় একটি সুন্দর গীর্জা। গীর্জার মাথায় স্থাপিত ক্রসটি বহুদুর থেকে দেখা যায়।

সেদিন রোববার। গীর্জা মানুষে প্রায় পূর্ণ। প্রার্থনা সংগীত চলছে। হাত তুলে সবাই প্রার্থনায় শামিল। সবারই আনত দৃষ্টি।

গীর্জার এক প্রান্তে পাশাপাশি আসনে বসে জিনা লুইসা এবং ফ্রান্সিস বুবাকের।

জিনা লুইসা দু'হাত তুলে চোখ বন্ধ করে প্রার্থনায় মগ্ন।

ফ্রান্সিস বুবাকের প্রথমে তার হাত উঠায়নি। কিন্তু চারদিকে সবাই হাত উঠানোর পর দ্বিধাগ্রস্থভাবে সেও দু'হাত তুলে ধরেছে।

প্রার্থনা সংগীত শেষ। সবাই বেরিয়ে আসছে গীর্জা থেকে।

জিনা লুইসা এবং ফ্রান্সিস বুবাকেরও চলে আসার জন্যে বেরুল এক দরজা দিয়ে।

গীর্জার একজন কর্মী এসে তাদের সামনে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস বুবাকেরকে বলল, 'তোমাকে ডাকছেন ফাদার'।

বলে চলে গেল গীর্জার কর্মীটি।

ফ্রান্সিস বুবাকের তাকাল জিনা লুইসার দিকে।

জিনা লুইসার মুখ শুকনো। তার চোখে উদ্বেগের ছায়া।

'ফাদার কেন ডাকলেন আমাকে?' চিন্তিত কন্ঠে বলল ফ্রান্সিস বুবাকের।

'আমারই ভুল, ফাদার নিষেধ করেছিলেন তোমাকে গীর্জায় আনতে'। শুকনো কন্ঠে বলল জিনা লুইসা।

'ও...'। একটা বেদনার ছায়া নেমে এল ফ্রান্সিস বুবাকের চোখে-মুখে।

জিনা লুইসা ফ্রান্সিস বুবাকেরের হাত ধরে বলল, 'ডেকেছেন, চল। আমিও যাব তোমার সাথে'।

দু'জনে চলল ফাদারের কক্ষের দিকে।

জিনা এবং ফ্রান্সিস দ্বিজন গ্রামের একটি মানিক জোড়। ফ্রান্সিস জিনার চেয়ে বছর দুয়েকের বড়। দু'জনের বাড়ি পাশাপাশি নয় কিন্তু কাছাকাছি। দু'জন তারা খেলার সাথী, এখন কলেজের সাথীও।

জিনা ও ফ্রান্সিস গিয়ে হাজির হলো ফাদারের কক্ষে।

ফাদারের বয়স চল্লিশের কোঠায়। পুরোপুরি যুবকই বলা যায়। বসে আছেন তিনি একটা বিশাল চেয়ারে।

জিনা ও ফ্রান্সিস তাঁর সামনে গিয়ে নতমুখে দাঁড়াল।

'জিনা, তোমাকেও আসতে বলেছে? তোমাকে তো ডাকিনি'।

জিনার মুখ লাল হয়ে উঠল। একটা বিব্রত ভাবও ফুটে উঠল তার মুখে। বলল, 'আমি ওঁর সাথে এসেছি। আসতে বলেনি কেউ ফাদার'।

ফাদার জিনার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল ফ্রান্সিস বুবাকেরের দিকে। বলল গম্ভীর কন্ঠে, 'ফ্রান্সিস তোমাকে একথা বলার জন্যে ডেকেছি যে, তুমি পবিত্র হওনি, তোমার গীর্জায় আসা ঠিক নয়। গীর্জা ঈশ্বরের পবিত্র সন্তানদের জন্যে'।

থামল ফাদার।

একটু থেমে আবার বলল, 'দুঃখিত ফ্রান্সিস, একথাগুলো তোমাকে সরাসরি না বলতে পারলেই ভাল হতো'।

জিনা ও ফ্রান্সিস বেরিয়ে এল ফাদারের কক্ষ থেকে।

ফ্রান্সিসের গোটা মুখ লাল। ঠোট কামড়ে ধরেছে সে। আর বেদনায় পাংশু হয়ে উঠেছে জিনার মুখ। শক্ত করে ধরেছে ফ্রান্সিসের হাত নিজের মুঠোর মধ্যে। কিন্তু জিনা তাকাতে পারছে না ফ্রান্সিসের মুখের দিকে।

গীর্জার গেট পেরুবার সময় জিনা ভয়ে ভয়ে একবার তাকাল ফ্রান্সিসের মুখের দিকে। দেখল, চোখ দিয়ে তার অশ্রু গড়াচ্ছে। বেদনায় ও অপমানে নিধ্বস্ত তার সুন্দর মুখ। ঠোঁট কামড়ে ধরে আছে সে। যেন নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছে।

জিনা যে হাত দিয়ে ফ্রান্সিসের হাত ধরেছিল সে হাত দিয়ে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'ফ্রান্সিস কেঁদ না, তুমি অপবিত্র হলে আমিও অপবিত্র। আমি আর গীর্জায় আসব না'।

এই সময় পেছন থেকে ডাক এল, 'জিনা-ফ্রান্সিস'।

জিনা মুখ ফিরিয়ে দেখল, 'ওল্ড ফাদার'-এর প্রাইভেট সেক্রেটারী। জিনা ফিরে চাইতেই সে বলল, 'ফাদার ফ্রান্সিসকে ডাকছেন'।

'ওল্ড ফাদার' এই দ্বিজন-গীর্জার পরিচালক। বয়স নব্বই-এর কাছাকাছি। পশ্চিম ফ্রান্সের সবচেয়ে প্রবীণ এবং সবচেয়ে সম্মানিত ধর্মনেতা তিনি। ভ্যাটিকান কাউন্সিলের তিনি একজন সদস্য। সম্প্রতি তিনি দ্বিজন গীর্জার দৈনন্দিন কাজ থেকে রিটায়ার করেছেন।

ফ্রান্সিসকে থামিয়ে দিয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে নরম কন্ঠে অনুরোধ করল জিনা, 'ওল্ড ফাদার ডেকেছেন। চল। উনি খুব ভাল মানুষ। উনার সময় দেখ কোন প্রবলেম হয়নি আমাদের'।

বলে জিনা ফ্রান্সিসকে টেনে ওল্ড ফাদারের অফিসের দিকে নিয়ে চলল।

ওল্ড ফাদার তার অফিসে ইজি চেয়ারে শুয়ে আছেন।

জিনা ও ফ্রান্সিস কক্ষে ঢুকে দু'জনেই মাথা ঝুকিয়ে ফাদারকে বাও করে তাঁর সামনে মাথা নত করে দাঁড়াল।

জিনা ও ফ্রান্সিস দু'জনের চোখেই অশ্রু।

ওল্ড ফাদার সেদিকে তাকাল। তার ঠোটে ফুটে উঠল ঈষৎ হাসি। বলল, 'ফ্রান্সিসের কান্না জিনা তোমাকেও কাদিয়েছে। এটা খুবই পবিত্র। ঈশ্বর এই মিলনের অশ্রুকে খুবই ভালবাসেন'।

জিনা ফাদারকে আবার বাও করে বলল, 'ফাদার আমাদের আশীর্বাদ করুন'। জিনার চোখে অশ্রুর বেগ বাড়ল। আবার বলল, 'ফাদার, ফ্রান্সিস অপবিত্র হবে কেন?'

'এসব কথাকে শাব্দিক অর্থে ধরো না। ভাষার পার্থক্য, জাতীয়তার পার্থক্য বুঝাতে যেমন কিছু শব্দ ব্যবহার হয়, তেমনি ধর্মীয় পার্থক্যের ক্ষেত্রেও কিছু শব্দ ব্যবহার করতে হয় মাত্র'।

বলে ওল্ড ফাদার চেয়ার দেখিয়ে দু'জনকে বসতে বলল।

কিন্তু জিনা ও ফ্রান্সিস চেয়ারে না বসে ওল্ড ফাদারের সামনে কার্পেটের উপর বসে পড়ল।

কথা শেষ করেই ওল্ড ফাদার চোখ বুজেছিল। ধীরে ধীরে চোখ খুলল ফাদার। তাকাল ফ্রান্সিসের দিকে। বলল, 'ইন্টারকমে আমি সব কথাই শুনেছি ফ্রান্সিস। কিন্তু তুমি কাঁদছ কেন? অপমানে? অপবিত্র বলার কারণে?'

ফ্রান্সিস কোন জবাব দিল না।

ওল্ড ফাদারই আবার কথা শুরু করল। বলল, 'বোকা ছেলে। তুমি, তোমাকে জাননা বলেই কেঁদেছ, অপমান বোধ করেছ। যদি জানতে তুমি কে, তাহলে এই 'অপবিত্র' হওয়াটাই তোমার জন্যে গৌরবের হতো'।

থামল ফাদার। একটু নড়ে-চড়ে শুয়ে চাদরটা গায়ের উপর ভালো করে তুলে নিয়ে বলল, 'শুনলাম তুমি কাঁদছ। তাই তোমাকে ডেকেছি দু'টো কথা বলার জন্যে। আহত হৃদয়ের কান্না ঈশ্বর সইতে পারেন না'।

আবার থামল ওল্ড ফাদার। চোখ দু'টি ওপরের দিকে নিবদ্ধ করে ভাবল কয়েক মুহূর্ত। তারপর শুরু করল, 'ফ্রান্সিস তোমার ধর্ম ইসলাম, মহান ধর্ম। মহত্তম ধর্ম। আমি তোমাদের ধর্মগ্রন্থের অনেক অংশ পড়েছি। জীবনের শেষ প্রান্তে দাড়িয়ে আজ স্বীকার করতে আনন্দ লাগছে, আমাদের প্রভু যেখান থেকে বাণী পেয়েছিলেন, তোমাদের নবী ইসলামের নবী মোহাম্মদও সেখান থেকেই বাণী পেয়েছিলেন। একজন খৃষ্টান ধর্মনেতা হয়েও আমি স্বীকার করছি, ফ্রান্সিস তোমার গর্ব করা উচিত তোমাদের ধর্মই একমাত্র যুগের দাবী পূরণ করছে, সময়ের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করছে এবং অনাগত কালের প্রয়োজনও তোমাদের ধর্ম পূরণ করার সামর্থ রাখে। একথাগুলো স্বীকার করতে আমার লজ্জা বোধ হচ্ছে না। কারণ আমি ঈশ্বরের পূজক। আর আমার ঈশ্বরেরই শেষ ধর্ম হলো ইসলাম। তুমি জাননা ফ্রান্সিস, পৃথিবীর ১২৫ কোটি মানুষ তোমার ধর্মের অনুসারী এবং অত্যন্ত সক্রিয় অনুসারী'।

থামল ফাদার।

এক নাগাড়ে কথাগুলো বলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল ফাদার।

জিনা এবং ফ্রান্সিস বিস্ফোরিত চোখে শুনছিল ওল্ড ফাদারের কথা। পৃথিবীতে মহান এক সভ্যতার জন্ম দিয়েছে, যেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং বিশ্বাস একে-অপরের পরিপূরক। ফ্রান্সিস, তোমাদের সভ্যতাই আমাদের অন্ধকার ইউরোপে জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করেছিল। আজকের ইউরোপের বিজ্ঞানের যে অহংকার, তার জন্মদাতা তোমাদের ধর্ম ইসলাম। শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞান নয়, রাজনৈতিক শক্তিতেও তোমাদের ধর্ম অপ্রতিরোধ্য। মৌলবাদী, সাম্পদায়িক, পশ্চাতপন্থী ইত্যাদি অপবাদ দিয়ে এই শক্তির অগ্রগতি রোধ করার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু আমি বলছি, রোধ করা যাবে না। পৃথিবীর বিশেষ করে আমাদের পশ্চিমের মানুষ অন্তরের ক্ষুধায় যেভাবে অস্থির হয়ে উঠছে, অনৈতিকতা ও অনাচারের হাত থেকে বাঁচার জন্যে যেভাবে পাগল হয়ে উঠেছে, তাতে ইসলামের মৌলবাদ অর্থাৎ ইসলামের পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন নৈতিক জীবনই তাদের কাছে একমাত্র বিকল্প হয়ে দাঁড়াচ্ছে'।

থামল ওল্ড ফাদার আবার। হাপিয়ে উঠছেন তিনি।

অপার বিস্ময় এসে গ্রাস করেছে জিনা ও ফ্রান্সিসকে। তারা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছে ওল্ড ফাদারের কথা। তাদের চোখের পানি কখন যেন শুকিয়ে গেছে।

ইজি চেয়ারে একটু সোজা হয়ে বসে শুরু করল আবার ওল্ড ফাদার। বলল, 'আমি যে পাহাড়ে, যে দ্বিজন গ্রামে বসে কথা বলছি, সেটা ছিল, ফ্রান্সিস, তোমার ধর্ম ইসলামের বিশাল সাম্রাজ্যের উত্তর সীমান্ত দাঁড়ানো একটা শক্ত ঘাটি। লোরে নদী ও এদেরে নদীর মর্ধবর্তী এই দ্বিজনে ছিল ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষা কেল্লা। যে পাহাড় শীর্ষের উপর বসে আমি কথা বলছি, সে পাহাড় শীর্ষে গীর্জার একটু উত্তরে বিরাট স্থান জুড়ে ইট-সুরকি আর পাথরের তৈরী যে বেদী তোমরা দেখ ওটা ছিল মুসলিম দুর্গ দ্বিজনের একটা পর্যবেক্ষণ টাওয়ার। সে সময়টা ৬শ বছর আগের। দক্ষিণ ফ্রান্স এবং পশ্চিম ফ্রান্সের বিশাল এলাকা জুড়ে তখন একটা মুসলিম সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যদিও এই দ্বিজনে মুসলিম উপস্থিতি বেশী দিন ছিল না কিন্তু মুসলিম সালতানাতটি প্রতিষ্ঠিত ছিল প্রায় একশ' বছর। এখান থেকে ৫৫ মাইল দক্ষিণে ক্লেন নদীর তীরে আজকের পোয়েটার নগরীর জায়গায় ইউরোপের সাথে মুসলিম সালতানাতের যে যুদ্ধ হয়েছিল, সেই

যুদ্ধের পরই এই এলাকা মুসলমানদের হাত ছাড়া হয়। ফ্রান্সের পূর্ব-দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী নারবো ছিল ফ্রান্সের মুসলিম সালতানাতের রাজধানী। দক্ষিণ ফ্রান্সের সবচেয়ে বড় নদী গেরনের সাথে খাল কেটে নারবো'র সংযোগ সাধন করা হয়েছিল এক সময়। ফলে মিলে গিয়েছিল আটলান্টিক এবং ভূমধ্যসাগর। সেই বিখ্যাত খালটিই পরিবর্ধিত হয়ে আজ নারবো থেকে পশ্চিম প্রান্তের লংগন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে'।

থামল ওল্ড ফাদার। চোখ বুজে কথা বলছিল ফাদার। তার কপালে জমে উঠেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। গা থেকে ফাদার তার চাদর নামিয়ে দিল। হাঁপাচ্ছিল ওল্ড ফাদার। এক সংগে অনেক কথা বলেছেন।

জিনা এবং ফ্রান্সিস নিজেদের হারিয়ে ফেলিছিল ওল্ড ফাদারের এই কাহিনীর মধ্যে। দ্বিজন এবং ফ্রান্সের সেই অতীতটা তাদের চোখের সামনে বর্তমান হয়ে উঠেছিল। তারা যেন দেখতে পাচ্ছিল দ্বিজনের সেই পর্যবেক্ষণ যুদ্ধক্ষেত্র। বিশেষ করে ফ্রান্সিস বুবাকের যেন নবজন্ম লাভ করল ওল্ড ফাদারের কথায়। ফ্রান্সিস জানতো খৃষ্টান থেকে তার ধর্ম আলাদা। কিন্তু দেখত তার ক্ষুদ্র ধর্মটির কোন নাম-ধাম কোথাও নেই। বরং ছোটবেলা থেকেই সে শুনে আসছে মুসলমানরা এক খুনে জাতি, আচার-আচরণে অসভ্য ও বর্বর তারা। তার মনে পড়ে একবার সে উত্তর ফ্রান্সের এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিল। বন্ধুর বোন তাকে বলেছিল, আমি শুনেছি, আমাদের ইতিহাসের শিক্ষক বলেছেন, মুসলমানরা মানুষ খেকো। কিন্তু তোমাকে দেখে তো তেমন মনে হচ্ছে না? ছোটবেলা থেকে সর্বত্র সব জায়গায় এ সব শুনে তার ধর্মের জন্যে এবং নিজে মুসলিম হওয়ার জন্যে সে লজ্জা বোধ করতো। অপরিচিত কাউকেই সে নিজের পরিচয় দিত না। এমনকি মায়ের কাছেও ধর্ম সম্বন্ধে কোন কথা তুলতে সে সাহস পেত না। ফ্রান্সিস বাবাকে হারিয়েছে অনেক আগে। শুনেছে তার মা খৃষ্টান থেকে মুসলিম হয়ে তার আব্বাকে বিয়ে করে। ফ্রান্সিস যুক্তি খুজেঁ পেত না কেন তার মা মুসলমান হয়। তবে ফ্রান্সিসের মনে মনে গর্ব হতো, তার মা এখন মুসলমান হলেও এক সময় খৃষ্টান ছিল। পরিচিত বন্ধুদের সবাইকে সে একথা বলতো। তার আব্বাকে খুবই মনে পড়ে ফ্রান্সিসের। খুব ভালো, খুব সুন্দর মানুষ ছিলেন তিনি। মুসলমানকে কেউ

গালি দিলে খুব দুঃখ পেতেন তার আব্বা। কোন এক হলিডে'তে এক খোশগল্পের আসরে একজন তার দেশপ্রেম দেখাবার জন্যে একটা কাগজে অর্ধচন্দ্র একে এবং আরেকটা কাগজে মুসলিম ধর্মগ্রন্থের নাম লিখে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিয়েছিল। আব্বা সে আসর থেকে তাকে নিয়ে নীরবে চলে এসেছিলেন। ধর্ম নিয়ে সেদিনই শুধু তার চোখকে অশ্রু সিক্ত হতে দেখেছে ফ্রান্সিস। মনে পড়ে তার আব্বা বলেছিলেন, 'আমি আমার ধর্মগ্রন্থ দেখিনি, ইসলামের অর্ধচন্দ্র খচিত পতাকাও দেখিনি। কিন্তু তবু তো এগুলো আমাদের'। ফ্রান্সিস কোন দিনই তার পিতার এই অশ্রুর কথা ভুলতে পারেনি। নিজ ধর্মের ব্যাপারে হতাশ ও দুর্বল হয়ে পড়লেই পিতার এই কথা তার মনে পড়তো। এখান থেকেই সে শক্তি পেত নিজ ধর্ম যত তুচ্ছই হোক তার উপর টিকে থাকার। কিন্তু ওল্ড ফাদারের কথা শুনে আজ গর্বে তার বুক ভরে গেল। বুঝল, তার ধর্ম শুধু বড় নয়, খৃষ্টান ধর্মের চেয়েও এবং মহত্তর। তার আরও গর্ববোধ হলো, তার মাতৃভুমি এই ফ্রান্সেও তার ধর্মের রাজত্ব ছিল। ফ্রান্সিস সবচেয়ে খুশী হলো ওল্ড ফাদারের এই কথায় যে, অন্ধকার ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়েছিল তার ধর্মই।

অনেকক্ষণ পর চোখ মেলল ওল্ড ফাদার।

জিনা ও ফ্রান্সিস এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল তার দিকে।

ওল্ড ফাদারের ঠোটে এক টুকরো হাসি। তার চোখ নিবদ্ধ হলো ফ্রান্সিস বুবাকের উপর। বলল, 'আর গীর্জায় যাওয়ার তোমার প্রয়োজন হবে বৎস? এত কথা বললাম তুমি কে তা বুঝাবার জন্যে'।

ফ্রান্সিস উঠে দাড়িয়ে ওল্ড ফাদারকে মাথা ঝুকিয়ে বাও করে বলল, 'প্রয়োজন হবে না ফাদার। আপনি আমাকে নতুন জীবন দিয়েছেন'।

ফাদারের ঠোটের হাসি আর একটু প্রসারিত হলো। বলল, 'বৎস ফ্রান্সিস, তোমার ধর্মে একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া কোন মানুষের কাছে মাথা নত করার বিধান নেই। তোমার ধর্ম ইসলাম সব মানুষকে সমান করে দিয়েছে'।

আবার বাও করল ফ্রান্সিস।

জিনা উঠে দাড়াল। তার মুখ ভরা হাসি।

ওল্ড ফাদার এক টুকরো স্নেহের হাসি হেসে বলল, 'ফ্রান্সিসের ধর্মের প্রশংসায় তুমি যে খুশী জিনা?'

জিনার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, 'ফাদার আপনি ফ্রান্সিসের অবনত মাথাকে আজ উন্নত করে দিয়েছেন। তার হৃদয়ের অসহনীয় এক যন্ত্রণার আপনি উপশম ঘটিয়েছেন। আমার বিশ বছর জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিন আজ ফাদার। ফাদার, ওকে গীর্জায় এনে সান্ত্বনা দেয়ার এবং বড় করার এতদিন ব্যর্থ চেষ্টা করতাম!' জিনার কন্ঠ ভারি হয়ে উঠেছিল।

ওল্ড ফাদার তার ঠোটে স্নিগ্ধ হাসি ফুটিয়ে বলল, 'যে অন্যের জন্যে কাঁদতে পারে, হাসতে পারে, সে মানুষের মধ্যে মহত্তম মানুষ। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন বৎস'। বলেই চোখ বন্ধ করল ওল্ড ফাদার। বলল, 'এস তোমরা'।

জিনা ও ফ্রান্সিস দু'জনেই ওল্ড ফাদারকে বাও করে বেরিয়ে এল কক্ষ থেকে।

জিনা ফ্রান্সিসের হাত ধরে হাঁটছিল। হাঁটতে হাঁটতে হাতে চাপ দিয়ে বলল, 'তোমার ধর্মে বাও করা নেই, বাও যে করলে আবার?'

'আমি তো জানিনা জিনা, আমার ধর্মে কিভাবে সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখাতে হয়'।

'এবার তো খুশী! তোমার ধর্মকে ওল্ড ফাদার মহত্তম ধর্ম বলেছেন!'

'আরেকজন মানুষকেও ফাদার মহত্তমদের একজন বলেছেন'।

জিনার মুখ লাল হয়ে উঠল লজ্জায়। কথা বলল না।

ফ্রান্সিস জিনার হাতকে আরও শক্ত করে ধরে বলল, 'আজ আমার চেয়ে সুখী আর কেউ নেই। আমি আজ দুই 'মহত্তম'-এর মালিক'।

'দুই 'মহত্তম'?' মুখ না তুলেই লজ্জা রাঙা মুখে বলল জিনা।

'হ্যাঁ দুই 'মহত্তম'। একটা আমার ধর্ম, অন্যটা আমার তুমি'।

জিনা তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'আমার মালিকানা তোমাকে দিয়ে দিয়েছি বুঝি?'

'এই তো এক্ষুণি ওল্ড ফাদারের কাছে কাদো কাদো ভাবে কি বললে?'

'যা বলেছি, ওল্ড ফাদারকে বলেছি। তোমাকে তো বলিনি!'

‘গীর্জা থেকে বেরুবার পর বললে না যে, আমি অপবিত্র হলে, তুমিও অপবিত্র? বলনি যে, আমি গীর্জায় যেতে না পারলে তুমিও যাবে না?’

‘ওটা তো সমবেদনা’।

‘সেদিন কলেজ-ফেস্টিভ্যালে আমার সাতে জোড় না হওয়ায় তুমি নাচনি। কেন বলব?’

‘তুমি নাচনি কেন?’

‘তোমার সাথে জোড় না হওয়ায় নাচিনি। কারণ তুমি আমার’।

জিনা কোন উত্তর দিল না।

‘তোমার উত্তরটা দাও’। চাপ দিল ফ্রান্সিস।

জিনা ফ্রান্সিসের হাত আবার হাতে তুলে নিয়ে বলল, ‘জবাব দেব না’।

‘জবাব দরকার নেই’।

‘কেন?’

‘হাতটা হাতে তুলে দেবার পর আবার মুখের জবাব কি দরকার’।

‘আচ্ছা, এই কথা’। বলে হাত খুলে নিয়ে দৌড় দিল জিনা।

‘শোন, শোন জিনা, কথা আছে’। ডাকল ফ্রান্সিস।

‘এখন নয়, বিকেলে দেখা হবে’। চিৎকার করে বলল জিনা।

‘জরুরী কথা। তুমি না শুনলে আমি এখানেই বসে থাকব সারাদিন’। বলে রাস্তার উপরেই বসে পড়ল ফ্রান্সিস।

দাড়িয়ে পড়ল জিনা। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে এল ফ্রান্সিসের কাছে।

জিনা ফ্রান্সিসের কাছে হাটু গেড়ে বসে অভিমান ক্ষুব্ধ কন্ঠে বলল, ‘তুমি জান তোমাকে এভাবে রেখে আমি যেতে পারব না, তাই তোমার এই জেদ!’

‘মাফ কর জিনা। তোমাকে সত্যিই আমার প্রয়োজন। আজ মা’র সাথে আমি ঝগড়া করব তিনি কেন আমাকে অন্ধকারে রেখেছিলেন। তুমি আমার সাথে থাকবে’।

জিনা একটুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, ‘ঠিক আছে যাব। কিন্তু ঝগড়া কেন? ওল্ড ফাদার যা জানেন, তোমার আম্মাও তা জানবেন, এটা তুমি জানলে কি করে?’

ফ্রান্সিস উঠে দাড়াতে দাড়াতে বলল, 'তুমি ঠিক বলেছ জিনা। তোমাকে এই জন্যেই তো প্রয়োজন'।

জিনাও উঠে দাড়িয়েছিল।

দু'জন হাটতে শুরু করল ফ্রান্সিসের বাড়ির দিকে।

'একই পাড়া অর্থাৎ একই পাহাড়ে জিনা ও ফ্রান্সিসের বাড়ি। জিনাদের বাড়ি পাহাড়ের পূর্ব প্রান্তে, আর ফ্রান্সিসদের বাড়ি পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্তে।

ছোট্ট দু'তলা বাংলো বাড়ি ফ্রান্সিসদের। এ তুলনায় জিনাদের বাড়ি বলা যায় প্রাসাদ।

উপত্যকায় ফ্রান্সিসদের কয়েকখন্ড জমি আছে। এটাই তাদের আয়ের প্রধান উৎস। এছাড়া তুরস শহরে ফ্রান্সিসের আব্বা একটা ফ্যাক্টরী চালাত। সেটা এখনও আছে। তা থেকেও আয় আসে। সব মিলিয়ে ফ্রান্সিসরা ধনী না হলেও স্বচ্ছল পরিবার।

ফ্রান্সিস তার পিতা-মাতার একমাত্র ছেলে। বাড়িতে তার আম্মা এবং কয়েকজন কাজের লোক ছাড়া কেউ নেই।

বাড়িতে পৌছে ফ্রান্সিস তার আম্মাকে তার আম্মার ঘরে খুজে পেল।

ফ্রান্সিস এবং জিনা ঘরে ঢুকতেই ফ্রান্সিসের মা মরিয়ম মার্গারেটা বলল, 'দু'জন কোত্থেকে আসা হচ্ছে? গীর্জা?'

'হ্যাঁ, চাচী আম্মা'। জবাব দিল জিনা।

ফ্রান্সিস গম্ভীর।

'ফ্রান্সিস গীর্জার রেগুলার সদস্য হয়ে গেল নাকি? লক্ষণ ভাল নয় তো!' হেসে বলল ফ্রান্সিসের মা।

'তার যাওয়াটা দেখা ছাড়া আর কিছু নয় চাচী আম্মা। চুপ করে বসে থাকে। কিছুই করে না'।

ফ্রান্সিসের গম্ভীর মুখের দিকে তার মা'র দৃষ্টি এতক্ষণে নিবদ্ধ হলো চুপ করে থাকা দেখে। একটু বিস্ময়ের দৃষ্টি নিয়ে বলল, 'কথা বলছিস না যে। মুখটা ভারি দেখছি। কারো সাথে ঝগড়াঝাটি করেছিস নাকি?'

'না আম্মা ঝগড়া করিনি'। গম্ভীর কন্ঠে কথাগুলো বলে কয়েক ধাপ এগিয়ে মাকে চেয়ারে বসিয়ে নিজে তার পাশে বসে বলল, 'তোমার সাথে কথা আছে আম্মা'।

'এত আয়োজন করে কি কথা বলবিরে মা'কে?'

'তোমার সাথে ঝগড়া আছে আম্মা?' গম্ভীর কন্ঠে বলল ফ্রান্সিস।

ফ্রান্সিসের মা মরিয়ম মার্গারেটা মুখ টিপে হাসল। বলল, 'খুব বড় ঝগড়া বুঝি! তাই জিনাকে এনেছিস বুঝি সাহায্যের জন্যে?'

ফ্রান্সিসের মুখে হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'জিনাকে আমি ডাকব সাহায্যের জন্যে! কথা বলার আগেই তো সে তোমার পক্ষ নেবে। দেখো এখনি গিয়ে সে তোমার পেছনে দাড়িয়েছে'।

সত্যিই ফ্রান্সিসের মা মরিয়ম মার্গারেটা চেয়ারে বসলে জিনা গিয়ে চেয়ারের পেছনে দাড়িয়ে পেছন থেকে গলা জড়িয়ে ধরে আছে ফ্রান্সিসের মা'র।

ফ্রান্সিসের মা জিনার হাত ধরে সামনে টেনে এনে কোলে বসিয়ে চিবুকে একটা চুমু খেয়ে ফ্রান্সিসের দিকে চোখ রাঙিয়ে বলল, 'চুপ, জিনার সাথে ঝগড়া বাধাব না বলছি'।

'ও কথা আমাকে না বলে ওকেই তোমার বলা দরকার আম্মা। ঝগড়া ওই-ই বাধায়। বাইরে বেরুলেই মনে হয় ও বুঝি তোমার কাছ থেকে গভর্নরশীপ নিয়েছে'।

'চাচীমা দেখুন, ঝগড়া কে বাধায়?' জিনা ফ্রান্সিসের মা'র কোল থেকে উঠে আবার তার চেয়ারের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল এবং গলা জড়িয়ে ধরে ফ্রান্সিসের মা'র কাধে মুখ রাখল।

ফ্রান্সিস কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার মা বাধা দিয়ে বলল, 'থাক ঝগড়াটা আমার সাথেই কর'।

ফ্রান্সিস চুপ করল। মাথা নিচু করে রাখল একটুক্ষণ।

তারপর মাথা তুলে গম্ভীর কন্ঠে বলল, 'আম্মা, তুমি আমার গীর্জায় যাওয়ার কথা তুলেছ। কিন্তু গীর্জায় যেতে কখনও বাধা দাওনি। কখনও বলনি আমাদের পৃথক গীর্জা আছে কিনা'।

ফ্রান্সিসের মা'র মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। উত্তর দিল না সঙ্গে সঙ্গেই। অল্পক্ষণ পর বলল, 'আমাদের তো কিছু নেই বাছা, কিসের কথা তোমাকে বলব, কোথায় তোমাকে যেতে বলব। ব্যথায় হাত দিলে ব্যথা আরও বাড়ে। আমি চাইনি কখনও ব্যথা বাড়াতে'।

'কি নেই আমাদের? সবই তো আছে। আমাদের অতীত আছে, আমাদের বর্তমানও আছে'।

'আছে। কিন্তু আমাদের ফ্রান্সের মুসলমানদের কি আছে?' থাকলে তোকে গীর্জায় যেতে হতো না, মসজিদে যেতিস'।

'মসজিদ কি আম্মা?' উৎসুক্য ফুটে উঠল ফ্রান্সিসের চোখে।

'মুসলমানরা যেখানে দিনে পাঁচবার প্রার্থনা করে এবং যেখানে প্রতি শুক্রবার সকলের উপস্থিতিতে বিরাট প্রার্থনা সমাবেশে প্রার্থনা এবং সমসাময়িক বিষয়ের উপর বক্তৃতা হয়'।

'আমি তো এই মসজিদ কোথাও দেখিনি। তুরস, নানতেজ, আজার- এসব শহরেও মুসলমান দেখেছি। কিন্তু মসজিদ তো দেখিনি?'

'এটাই তো বেদনার কাহিনী ফ্রান্সিস। আমরা আমাদের ভুলে গেছি, ভুলতে বাধ্য করা হয়েছে'।

থামল মরিয়ম মার্গারেটা। বেদনার ছায়া নেমেছে তার সমগ্র মুখ জুড়ে। চেয়ারে একটু হেলান দিয়ে কথা শুরু করল আবার, 'তোর আব্বার কাছ থেকে শুনেছি। এই পশ্চিম ও দক্ষিণ ফ্রান্সে চারশ' বছর আগেও প্রচুর মুসলমান ছিল। তাদের হয় হত্যা করা হয়েছে, নয়তো দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে, অথবা তাদের মুসলিম পরিচয় বিলুপ্ত করতে বাধ্য করা হয়েছে। তোমার আব্বা বলেছেন, তোমার পূর্ব পুরুষ, আমাদের নবী মোহাম্মদ (স)-এর দেশ আরবের অধিবাসী ছিলেন। সেনাধ্যক্ষ হিসেবে দেশ জয়ে এসে তোমার এক পূর্ব পুরুষ আলজিরিয়ায় থেকে যান। সেই মুসলিম দেশ আলজিরিয়ায় যখন অষ্টাদশ শতকে ফরাসিরা উপনিবেশ স্থাপন করে, তখন হাজার হাজার মুসলমানের সাথে তোমার এক পূর্ব পুরুষকেও ফ্রান্সে ধরে আনা হয়। সেই হতভাগ্য ছিলেন তোমার দাদার আব্বা। এদেরকে ধরে এনে শুধু বাধ্যতামূলক শ্রমেই লাগানো হয় না, এদের ধর্মীয়

পরিচয়ও বিলুপ্ত করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়। সুতরাং মসজিদ গড়ে উঠবে কি করে? কি করে দেখবি তুই আজ মসজিদ? মসজিদ কেন, তুই কি তোর ধর্মগ্রন্থ চোখে দেখেছিস? দেখিসনি প্রতিদিন পাঁচবার প্রার্থনা করা মুসলমানদের জন্যে বাধ্যতামুলক। তুই কি প্রার্থনা করতে পারিস? জানিস কিভাবে প্রার্থনা করতে হয়? আমি জানিনা, তোর আব্বাও জানতেন না, তুইও জানিস না। সুতরাং আমাদের কি আছে? কিছুই নেই'।

থামল ফ্রান্সিসের মা। তার চোখ থেকে দু'ফোটা অশ্রু নেমে এসেছিল।

ফ্রান্সিসেরও চোখ-মুখ আবেগে ভারি হয়ে উঠেছে। ছল ছল করে উঠেছে তার চোখও। সে কামড়ে ধরেছে তার ঠোঁট। তার পূর্ব পুরুষ নবীর দেশ আরবের মানুষ এই কথা হৃদয়কে তার তোলপাড় করে তুলেছে। তার পূর্ব পুরুষের দুর্ভাগ্য, তার জাতির দুর্ভাগ্য, তার হৃদয়ে হাতুড়ির ঘা দিচ্ছে। তার আম্মা থামলে ফ্রান্সিস বলল, 'আম্মা, তুমি দেখনি আমাদের ধর্মগ্রন্থ? কিংবা আব্বা?'

'না বেটা, উনি দেখলে হয়তো আমিও দেখতে পেতাম'। চোখ মুছে বলল ফ্রান্সিসের মা।

'আমাদের প্রার্থনা শেখার কি কোন উপায় নেই আম্মা? তোমরা কি কোনই চেষ্টা করনি?'

'তোর আব্বা ছোট একটা বই জোগাড় করেছিলেন। যাতে প্রার্থনার কথা বলা আছে, ধর্মের শিক্ষা সম্পর্কেও সংক্ষেপে বলা আছে। কিন্তু প্রার্থনার বিস্তারিত নিয়ম কিছু নেই। তাছাড়া প্রার্থনার মধ্যে ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ অপরিহার্য। সুতরাং ধর্মগ্রন্থের কিছু মুখস্থ না থাকলে তো প্রার্থনাই হয় না'।

তার আব্বার বইয়ের কথা শুনে ফ্রান্সিসের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তার আম্মা থামতেই বলল, 'সেই বইটি কোথায় আম্মা?'

'তোর আব্বার বাক্সে আছে'।

'দেখাও না আম্মা'।

'দেখতে চাইলে কাপড় ছেড়ে পরিস্কার কাপড় পরে আসতে হবে এবং ওজু করতে হবে'।

'ওজু কি?'

‘তোর দাদীর কাছে এটা শুনেছি। ‘ওজু’ মানে হাত, মুখ, মাথা ও পা পানি দিয়ে ধোয়া। এর একটা নিয়ম আছে যা আমরা জানি না। আমরা এসব এমনি ধুয়ে বইটি হাতে নিয়েছি’।

‘ঠিক আছে, আমি কাপড় বদলে এবং হাত মুখ মাথা ধুয়ে আসছি’।

ফ্রান্সিসের মা’ও উঠে গেল কাপড় বদলাতে এবং ওজু করতে।

বাক্সের ভেতর আরেকটি সুন্দর কাগড়ে মুড়ে বইটি রাখা। ফ্রান্সিসের মা মরিয়ম মার্গারেটা বইটি হাতে তুলে নিয়ে টেবিলে বসল। টেবিল ঘিরে আরও চেয়ারে বসল ফ্রান্সিস এবং জিনা।

ফ্রান্সিসের মা কাগজের মোড়ক খুলে চুমু খেল বইটিকে।

‘বইটি ধরার জন্যে পরিস্কার কাপড় এবং ওজু করা শর্ত কেন আম্মা?’

‘এই বইটি ধরার জন্যে এ সব শর্ত নেই। বইটি প্রাথমিক ধরণের, খুব গুরুত্বপূর্ণ বই নয়। কিন্তু এই বইতে আমাদের ধর্মগ্রন্থের ভাষায় ধর্মগ্রন্থের হরফে, ধর্মগ্রন্থের কিছু উদ্ধৃতি আছে। ধর্মগ্রন্থ এবং ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি যুক্ত বই স্পর্শ করতে হলে ঐ সব শর্ত পালন করতে হয়’।

বইটির পাতার সংখ্যা ৫০-এর মত হবে। নাম, ‘বেসিক বিলিফস ইন ইসলাম’।

বইটির শিরোনাম-পাতার পরই প্রথম পাতার শুরু আরবীতে ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম’ লেখার মাধ্যমে। তারপর আরবীতেই দুই লাইন আল্লাহর প্রশংসা এবং নবী (স)-এর প্রতি শান্তি বর্ষণমূলক দোয়া লেখা রয়েছে আরবীতে।

ফ্রান্সিসের মা লেখাগুলোকে চুমু খেয়ে বলল, ‘এগুলো ধর্মগ্রন্থের অংশ’।

ফ্রান্সিসও চুমু খেল ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতিতে। চুমু খেতে গিয়ে তার চোখ ছল ছল করে উঠল।

গোটা বইতে আরও ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি আছে, সেগুলোও দেখাল ফ্রান্সিসকে।

‘উদ্ধৃতিগুলো তো পড়তে পার না আম্মা’।

‘না ফ্রান্সিস, তোর আব্বাও পারত না। প্রথমেই যে উদ্ধৃতি দেখছ, তোমার আব্বাই বলেছেন মুসলমানদের প্রত্যেক কাজের আগেই এটা পড়তে হয়’।

‘কথাটা কি আম্মা?’

‘আমি জানি না। ইংরেজিতে অর্থ লেখা আছে’।

‘আমি তো ইংরেজী জানি না, তুমি তো কিছু জান। পড়ে শোনাও না আম্মা’।

‘তোর আব্বার কাছে অল্প অল্প শিখেছি’। বলে ফ্রান্সিসের মা কোন রকমে বিসমিল্লাহর অর্থ বলে দিল।

‘সুন্দর কথা তো আম্মা। ধর্মগ্রন্থের ভাষা জানি না, এই কথা ফরাসী ভাষায় বললে হবে না?’

‘আমি জানি না বাছা। ধর্মের কোন নিয়ম কানুন বলা তো আমার সাজে না’।

‘আমার মনে হয় আমাদের ওল্ড ফাদার তোমাদের ধর্মগ্রন্থের এই উদ্ধৃতি পড়তে পারবেন’। বলল জিনা।

‘জিনা ঠিক বলেছে আম্মা। ফাদার আজ বলেছেন, তিনি আমাদের ধর্মগ্রন্থ পড়েছেন’। বলল ফ্রান্সিস সোৎসাহে।

‘কিন্তু বইটা তো তোর আব্বা অন্য কারও হাতে দিতেন না। আমিও দিতে পারবো না’। বলল ফ্রান্সিসের মা।

ফ্রান্সিসের মা বইটির পাতা উল্টিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটা সুন্দর রঙীন ছবি বেরিয়ে পড়ল।

‘কিসের ছবি আম্মা ওটা?’ ফ্রান্সিস অনেকটা হুমড়ি খেয়ে পড়ল ছবির উপর।

‘মুসলমানদের গীর্জা অর্থাৎ মুসলমানদের কয়েকটা বিশ্ববিখ্যাত মসজিদের ছবি দেয়া আছে বইতে। প্রথম এই মসজিদটা মক্কার কা’বা শরীফ’।

‘মক্কার কা’বা শরীফ? যেখানে হজ্জ করতে হয়, যেখানে নবী (স)-এর জন্ম?’

‘হ্যাঁ, এ সেই’।

ফ্রান্সিস গভীর আবেগে চুমু খেল কা'বা শরীফকে এবং বলল, 'মদিনার মসজিদ নেই আম্মা?'

'হ্যাঁ আছে'। বলে পাতা উল্টাল ফ্রান্সিসের আম্মা। পরের পৃষ্ঠাতেই মসজিদে নব্বী।

ফ্রান্সিস এ মসজিদকেও চুমু খেল এবং বলল, 'আম্মা এখানেই আমাদের নবী (স)-এর কবর'। বলতে গিয়ে আবেগে ভারি হয়ে উঠল ফ্রান্সিসের গলা।

'তুই এত কথা জানলি কোত্থেকে, কেমন করে?' বলল ফ্রান্সিসের মা।

'মক্কার কা'বা শরীফ-এর নাম শুনেই বহু আগের এ কথাগুলো হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেছে মা। চার বছর আগে তুরস-এর একটা লাইব্রেরীতে একটা বই দেখেছিলাম। তার নাম ছিল 'পূর্বদেশীয় ধর্মীয় স্থানসমূহ'। অনেক সময় ধরে সেদিন লাইব্রেরীতে বসেছিলাম। সেই সময়ে এ দু'টি স্থানের বিবরণও পড়েছিলাম। কিন্তু তখন এতটা বুঝিনি'।

শেষ পাতায় গিয়ে ফরাসী ভাষায় হাতের লেখা কয়েকটা বাক্যের প্রতি এক সাথেই গিয়ে নজর পড়ল ফ্রান্সিস এবং তার মা'র।

লেখাটা ছিল একটা নাম। নামটা হলো, 'ফ্রান্সিস আবু বকর'।

লেখাটা পড়েই ফ্রান্সিস বলল, 'এটা তো আব্বার হাতের লেখা'। কি লিখেছেন আম্মা?'

লিখাটা দেখেই আনমনা হয়ে পড়েছিল ফ্রান্সিসের না মরিয়ম মার্গারেটা। ধীরে ধীরে তার চোখ বুজে গিয়েছিল।

ফ্রান্সিস এবং জিনা কারোই তা নজর এড়ালো না।

'কি হলো আম্মা? অসুস্থবোধ করছ?' ফ্রান্সিস জিজ্ঞাসা করল উদ্বিগ্ন কন্ঠে।

চোখ খুলল ফ্রান্সিসের মা। তার চোখ দু'টো ভারি। বলল, 'না কিছু হয়নি বেটা। লেখাটা আমাকে অনেক দুর অতীতে টেনে নিয়ে গিয়েছিল'।

থামল ফ্রান্সিসের মা। মাথা নিচু করে একটু দম নিল যেন। তারপর আবার শুরু করল, 'তখন তুই আমার পেটে। বইটা পড়া যেদিন শেষ করল তোর আব্বা বলল, আমাদের যদি ছেলে সন্তান হয়, তাহলে তার নাম রাখব 'ফ্রান্সিস

আবুবকর'। বলে তিনি নামটা এখানে লিখে রাখলেন। তুই হওয়ার পর এই নামই তোমার রাখা হয়'।

'আমার নাম তাহলে ফ্রান্সিস আবুবকর?'

'হ্যাঁ বেটা। স্কুলে যখন তোকে দিলাম, তারা 'আবুবকর' বাদ দিয়ে লিখল 'বুবাকের'। সেই থেকে তুই হয়ে গেছ ফ্রান্সিস 'বুবাকের'। নামটা রেখেও আমরা ঐ নামে ডাকতে পারিনি'।

'কেন?'

'আবুবকর নামটা এতটাই পরিচিত যে, এখানকার স্কুল-কলেজ একে ভালো চোখে দেখে না। তাছাড়া এই নামে তুই পরিচিত হলে, আমরা ভয় করেছি, তোর কোন ক্ষতি হতে পারে। বিপদে পড়তে পারিস মাঝে মাঝেই'।

'আবুবকর নামটা পরিচিত কেন আম্মা?'

'আবুবকর হলেন আমাদের নবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাথী। নবী (স)-এর মৃত্যুর পর তিনিই নবীর প্রতিনিধি বা 'ধর্মনেতা'র পদে আসীন হন এবং ইসলামী জগতের শাসকও হন তিনি। তাঁর কাছেই রোমান সম্রাটের বাহিনী প্রথম পরাজয় বরণ করে এবং বিশাল এলাকাও হারায় তার কাছে'।

ফ্রান্সিস-এর চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। গর্বে ভরে উঠল তার মন। নবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাথী এবং এতবড় মহান লোকের নামে তার নাম।

ফ্রান্সিস সোজা হয়ে বসে বলল, 'এই নাম রাখার জন্যে তোমাকে এবং আব্বাকে ধন্যবাদ আম্মা'।

তারপর জিনার দিকে ফিরে বলল, 'নামটা পছন্দ হয়? আমাকে কিন্তু এই নামেই ডাকবে'।

'বড় নাম শুধু নিলে হবে না, বড় কাজও করতে হবে'। বলল জিনা।

'তুমি সে বড় কাজের সাথী হবে'।

জিনার মুখ লাল হয়ে উঠল লজ্জায়। উঠে দাঁড়াল সে। বলল, 'চাচী আম্মা, আমি আসি'। বলে ঘুরে দাড়িয়ে হাঁটা শুরু করল।

কথাটা বলে কিন্তু ফ্রান্সিস জিব কেটেছিল। তার মা'র সামনে জিনাকে এই কথা বলা ঠিক হয়নি। কথাটা বলে লজ্জা পেয়েছিল ফ্রান্সিস নিজেও।

‘জিনাকে এভাবে যখন তখন রাগাও কেন?’ বকুনির স্বরে বলল ফ্রান্সিসের মা।

‘জিনা শোন, শোন জিনা’। বলে ডাকতে ডাকতে ফ্রান্সিসও বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

ঘর থেকে বেরিয়ে জিনাকে দেখতে পেল না ফ্রান্সিস। ভাবল, নিশ্চয় দৌড়ে পালিয়েছে। বাড়ির গেটে গিয়েও দেখতে পেল না তাকে। হঠাৎ তার মনে হল জিনা নিশ্চয় লুকিয়েছে।

ফিরতে যাবে এমন সময় পিঠে এসে একটা কিল পড়ল। ফিরে দাড়ানোর আগেই দেখল ছুটে পালাচ্ছে জিনা। চিৎকার করে বলছে, ‘আজকের মত মাফ করে দিলাম’।

‘কিলটা তাহলে কিন্তু বাড়তি হয়ে থাকল। পিঠটা রেডি রেখ’। চিৎকার করে বলল ফ্রান্সিস।

‘ঠিক আছে’।

ছুটে চলে গেল জিনা।

যতক্ষণ তাকে দেখা গেল তাকিয়ে রইল ফ্রান্সিস। তার চোখে স্বপ্ন। সুন্দর, পবিত্র এক স্বপ্ন।

# ৫

চোখ খোলার আগেই আহমদ মুসা অনুভব করল সে নরম বিছানায় শুয়ে। তার মনে পড়ল, সে গাড়ি চালাচ্ছিল, গাড়ির নিয়ন্ত্রণ সে রাখতে পারছিল না। তারপর আর কিছু মনে নেই তার। গাড়ি কি এ্যাকসিডেন্ট করেছিল?

সে এখন কোথায়, ভাবল আহমদ মুসা। ব্ল্যাক ক্রস-এর হাতে সে ধরা পড়েনি তা বুঝা যাচ্ছে এই নরম শয্যা দেখে। তাহলে সে কোথায়? গাড়ি থেকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় কেউ তাকে অবশ্যই তুলে এনেছে। তারা কারা? ব্ল্যাক ক্রস-এর কেউ নয়তো? ঐ ট্যাক্সির ড্রাইভার যদি ব্ল্যাক ক্রস-এর লোক হয়, তাহলে যে কেউ তা হতে পারে।

সে কি হাসপাতালে? বিছানার যে বৈশিষ্ট সে অনুভব করছে এবং নাকে যে গন্ধ আসছে, তাতে বুঝা যাচ্ছে এটা কোন হাসপাতাল বা ক্লিনিকের কক্ষ।

চোখ খুলে সে কাকে দেখতে পাবে?

ধীরে ধীরে চোখ খুলল আহমদ মুসা। চোখ খুলে আহমদ মুসা দেখতে পেল একজন নার্সকে। আহমদ মুসাকে চোখ মেলতে দেখে এগিয়ে এল নার্স।

ঘরের অন্যপাশে চেয়ারে বসা একজন তরুনীকে দেখতে পেল। তরুনীটি আহমদ মুসাকে তাকাতে দেখেই উঠে দাড়াল। মেয়েটির চোখে-মুখে আনন্দ, বিস্ময় এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা।

আহমদ মুসা চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে তাকাল নার্স-এর দিকে। বলল, 'নার্স, দয়া করে বলবেন কি আমি কোথায়?'

'আপনি দ্বিজন গ্রামের একটি ক্লিনিকে'। বলল নার্স।

'এই দ্বিজন গ্রাম কোথায়?'

'নানতেজ-তুরস হাইওয়ের পাশে এদরে নদীর তীরে এবং তুরানে উপত্যকার মাথায় এই গ্রাম।

'আজ কয় তারিখ এবং কি বার নার্স?'

নার্স জবাব দিল। তারপর বলল, 'আপনি কেমন বোধ করছেন?'

'ভালো'।

'আপনাকে যারা এনেছেন এবং সবকিছু করছেন, আপনি তাদের সাথে কথা বলুন' বলে নার্স চেয়ার থেকে দাড়িয়ে পড়া মেয়েটিকে কাছে ডেকে নিয়ে আহমদ মুসাকে বলল, 'এ হলো জিনা লুইসা। এর আব্বা মিঃ ফ্রাংক মরিস। এদের পরিবার পিকনিকে গিয়েছিলেন 'সুর লোরে'-এর এক পাহাড়ে। আপনাকে আহত ও সংজ্ঞাহীন পেয়ে তারা আপনাকে নিয়ে এসেছেন তাদের গ্রামের এই ক্লিনিকে'।

কথা শেষ করেই নার্স আবার বলল, 'আপনারা কথা বলুন, আমি ডাক্তারকে খবর দেই'।

বসে নার্স বেরিয়ে গেল কেবিন থেকে।

'ধন্যবাদ বোন। আপনাকে বোন বললে কি আপত্তি করবেন?'

জিনার কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাব এখনও যায়নি। এই অপরিচিত ও বিস্ময়কর লোকটির সাথে কিভাবে কথা বলবে, কি কথা বলতে হবে, ইত্যাদি নিয়ে তার ভয়, দ্বিধা, সংকোচ এখনও কাটেনি।

আহমদ মুসা বোন ডেকে ধন্যবাদ দিলে উজ্জ্বল হয়ে উঠল জিনার চোখ। জিনা অনুভব করল, লোকটির কন্ঠে কৃত্রিমতা নেই, আর চোখে তার পবিত্র দৃষ্টি। জিনার মনে পড়ল, ওল্ড ফাদারের চোখে এই পবিত্র দৃষ্টি সে দেখেছে। এ দৃষ্টি শত্রুকে মিত্র করে, দুরের মানুষকেও আপন করে নেয়।

জিনা মাথা নেড়ে জানাল, না তার আপত্তি নেই। তারপর জিনা বলল, 'আমি আব্বা-আম্মাকে খবর দেই, তারা খুশী হবেন'।

বলে জিনা ঘুরে দাড়াতে গেল।

'শুনুন বোন'। ডাকল আহমদ মুসা।

জিনা থমকে দাড়াল।

'নার্স যে পিকনিকের কথা বললেন, সেটাতে আপনি ছিলেন?'

'জি, কেন?'

‘আমি যে গাড়িতে ছিলাম, সে গাড়ি কি ভেঙ্গে গেছে বা তার ক্ষতি হয়েছে?’

‘জি না। ও গাড়ি ড্রাইভ করেই আব্বা ও আমি আপনাকে নিয়ে পাহাড়ের এপাশে আমাদের গাড়ির কাছে এসেছিলাম। কেন বলছেন গাড়ির কথা?’

‘আমি গাড়িটা এক ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাছ থেকে ভাড়া নিয়েছিলাম। গাড়ি ভেঙ্গে গেলে লোকটির অনেক ক্ষতি হবে’।

বিস্মিত হলো জিনা। লোকটা তার এই বিপদে নিজের কথা না ভেবে ভাবছে দরিদ্র ট্যাক্সি ড্রাইভারের ক্ষতির কথা। যে বিপদ থেকে তিনি বেচেছেন, যে অনিশ্চয়তার মধ্যে তিনি পড়েছেন, তাতে ট্যাক্সি কেন উড়োজাহাজের ক্ষতির কথাও এই মুহুর্তে তার মনে আসার কথা নয়। আশ্চর্য লোক তো!

হঠাৎ ওল্ড ফাদারের কথা মনে পড়ল, ‘যারা অন্যের হাসিতে হাসে, অন্যের কান্নায় কাদে, তারা মানুষের মধ্যে মহত্তম’।

জিনা শ্রদ্ধার সাথে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। নব্বই বছরের শুদ্ধ ধর্মনেতার জ্ঞান ও দৃষ্টি যে নব্য যুবকটির মধ্যে দেখা যাচ্ছে, সে কে?- এই প্রশ্নটি আবারও মাথা তুলল জিনার মনে।

বলল জিনা, ‘গাড়িটা ভাল আছে। দুর্ঘটনার স্থান থেকে গাড়ি দুরে থাকায় নিরাপদেই থাকবে’।

এই সময় এক সাথে ঘরে প্রবেশ করল, জিনার আব্বা, আম্মা এবং ছোট ভাই।

জিনা বলে উঠল, ‘আমি যাচ্ছিলাম তোমাদের খবর দিতে। কি করে খবর পেলে?’

‘নার্স টেলিফোন করেছে’।

জিনা তার আব্বা, আম্মা ও ছোট ভাই এর পরিচয় দিল আহমদ মুসাকে।

আহমদ মুসা উঠে বসতে বসতে বলল, ‘আমি নার্স ও জিনা বোনের কাছে কিছু শুনেছি। আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আপনারা আমাকে বাঁচতে সাহায্য করেছেন’। অত্যন্ত নরম কন্ঠস্বর আহমদ মুসার।

আহমদ মুসাকে উঠতে বাধা দিয়ে জিনার আব্বা ফ্রাংক মরিচ বলল, ‘ঈশ্বরই সব কিছু করেন, মানুষ নিমিত্ত মাত্র। তুমি এখন কেমন বোধ করছ?’

‘ভাল’।

‘আমি ডাক্তারের সাথে কথা বলে এলাম। কোন কমপ্লিকেসি নেই। এখনই তোমাকে আমরা নিয়ে যেতে পারি’।

‘আপনাদের কষ্ট দেয়া হবে। সুস্থ হওয়া পর্যন্ত ক্লিনিকেই থাকতে পারি কিনা। কিছু মনে করবেন না। এখানে সিটরেন্ট কত?’

‘সিটরেন্টের প্রশ্ন নেই। এটা আমার ভাইয়ের ক্লিনিক। বাড়িতে নিলে তুমি ভাল থাকবে’।

আহমদ মুসা কিছু না বলে মুখ নিচু করল।

জিনার আব্বা মিঃ ফ্রাংক তার ছেলে মার্ক-এর দিকে তাকিয়ে বলল, দেখ, এ্যাম্বুলেন্স রেডি কিনা। ওদের আসতে বল’।

জিনার আম্মা এ সময় একশ’ ডলারের কয়েকটা নোট আহমদ মুসার দিকে এগিয়ে ধরে বলল, ‘বাছা, এ টাকাগুলো তোমার জুতার মধ্যে পাওয়া গেছে’।

লজ্জার একটা ছায়া নামল আহমদ মুসার চোখে-মুখে। বলল, ‘আমার তো রাখার কিছু নেই, ওগুলো কি আপনার কাছে থাকতে পারে না?’

জিনার মা’র মুখ প্রসন্নতায় ভরে গেল। বলল, ‘ঠিক আছে বাছা’।

জিনাদের বাড়িতে এল আহমদ মুসা।

তাদের ফ্যামিলি গেস্টরুমের একটা সুন্দর সুসজ্জিত কক্ষে তাকে থাকতে দেয়া হলো। প্রতিদিন ডাক্তার এসে তাকে একবার দেখে যায়। জিনা এবং মার্ক তার দেখাশুনা করে।

আহমদ মুসা ঠিক করেছে তার মুসলিম পরিচয় আপাতত গোপন রাখবে। ব্ল্যাক ক্রস-এর লোকেরা সুর লোরের চারপাশে ঘুর ঘুর করতে পারে। ওদের তো পাগল হয়ে ওঠার কথা। একদিকে সে আহত, তার উপর তার মুসলিম পরিচয়ের প্রকাশ তার পরিচয় প্রকাশ করে দিতে পারে। ঘরে গোপনে সে নামায পড়ে।

সেদিন ভোর পাঁচটার সময় জিনা ও মার্ক বেরিয়েছে তুরস যাবার জন্যে। ছয়টায় তুরসে তাদের একটা প্রোগ্রাম আছে।

আহমদ মুসার রুমের পাশ দিয়ে যাবার সময় মধুর সুরেলা কন্ঠ শুনে দু'জনেই থমকে দাঁড়াল। কান পেতে শুনল সুরটা আহমদ মুসার রুম থেকেই আসছে। দু'জনেরই তীব্র কৌতুহলের সৃষ্টি হলো।

জিনা গিয়ে দরজা বন্ধ কিনা তা দেখার জন্যে ধীরে ধীরে চাপ দিল। দরজা আস্তে আস্তে ফাঁক হয়ে গেল।

ঘরের দরজা পশ্চিম দিকে। দরজা ফাঁক হলে তারা দেখল আহমদ মুসা কার্পেটের উপর একটা পরিষ্কার তোয়ালে ফেলে পূর্ব-দক্ষিণ কোণে মুখ করে দাড়িয়ে আছে তার হাত দু'টি বুকে বাঁধা। সুর করে দুর্বোধ্য ভাষায় অনুচ্চ স্বরে কি যেন পড়ছে। তারপর তারা আহমদ মুসাকে কোমর পর্যন্ত খাড়া রেখে ভাঁজ হতে দেখল। দেখল, কার্পেটের উপর কপাল রেখে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়তে। মাঝখানে একবার বিরতি দিয়ে চার বার তাকে তারা একই কাজ করতে দেখল।

সবশেষে দেখল দু'হাত তুলে প্রার্থনা করতো।

দরজা আস্তে আস্তে ভেজিয়ে জিনা ও মার্ক বেরিয়ে এল। মার্ক বলল, 'আপা, তুমি অবাক হচ্ছো! আমি আরও দু'বার তাকে এই কাজ করতে দেখেছি'।

'কোন সময় দেখেছিস?'

'দু'দিনই দেখেছি রাত দশটার পরে'।

'এমন ধরণের শরীরচর্চা তো কোথাও দেখিনি'।

'শরীরচর্চার পরে ঐ প্রার্থনাও তো অবাক ব্যাপার?'

'কিন্তু এই শরীরচর্চা এমন সময়ে এবং বন্ধ ঘরে গোপনে কেন? তাছাড়া ঐ সব কি পাঠ করেন উনি?'

'আসলে কিন্তু খুবই মজার ঘটনা আপা'।

'ঠিক। একদিন জিজ্ঞাসা করতে হবে'।

সেদিন জিনাদের ফ্যামিলি ড্রইং রুমে জিনা, তার আব্বা, মা এবং ভাই মার্ক বসে।

কথা বলছিল জিনার মা। বলছিল, 'শোন জিনার আব্বা, এই মুসায়েভ ছেলেটাকে না দেখলে আমার বিশ্বাসই হতো না এমন মানুষ দুনিয়াতে থাকতে পারে। এত লাজুক যে অধিকাংশ সময়ই মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে না, আমাদের মানে মেয়েদের সাথে। জিনাকে সে বোন ডেকেছে, কিন্তু জিনার মুখের দিকে তাকে তাকাতে দেখিছি বলে আমার মনে পড়ে না'।

'ঠিক বলেছ, আম্মা। আমার মাঝে মাঝে কিন্তু হাসি পায়'।

'শুধু জিনা ও আমার ক্ষেত্রেই নয়, পাড়ার মেয়েরাও এসেছে। তাদের কেউ সামনে এলেই সে চোখ নামিয়ে নেয়'।

'আমিও এটা লক্ষ্য করেছি। প্রথম দিকে ভাবতাম, এটা তার এক ধরনের নার্ভাসনেস। সুন্দরী ও সমবয়সী মেয়েদের সামনে পড়লে অনেকের এমন হয়। কিন্তু আহমদ মুসার ক্ষেত্রে এর লেশমাত্র নেই। তার কন্ঠ নরম কিন্তু অত্যন্ত পৌরুষদীপ্ত। তার কথার মধ্যে কোথাও সামান্য দুর্বলতা কিংবা দ্বিধার লেশমাত্র থাকে না'। বলল জিনার আব্বা।

'তার বড় একটা গুণ সে অত্যন্ত স্বাবলম্বী। অসুস্থ অবস্থাতেই নিজের কাজ সে নিজ হাতে করতে চেয়েছে। সেদিন আমি ওষুধ খাওয়ার সময় তার গ্লাসে পানি ঢালতে গিয়েছিলাম। সে বলে উঠল, 'সন্তান থাকতে মাকে যদি এসব কাজ করতে হয়, তাহলে সন্তানের অপরাধ হয় মা'। এমন সচেতনতা, এমন দৃষ্টিভংগি, মাকে এমন মর্যাদা দিতে আমি কাউকে দেখিনি'।

'উনি সত্যিই অদ্ভুত মা। সেদিন উনি টয়লেটে ছিলেন, বিছানা-টেবিল দেখলাম আগোছালো। মনে করলাম, আমি গুছিয়ে দেই। গোছানো প্রায় শেষ করেছিলাম। উনি বেরিয়ে এলেন। আমাকে দেখে উনি একটু হাসলেন বটে। কিন্তু চারদিকে চেয়ে তার চোখ ও চেহারায় যে ভাব ফুটে উঠল তাতে বুঝলাম, তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তিনি অত্যন্ত ভদ্রভাবে বলেই ফেললেন, বড় ভাইয়ের যা করা উচিত, তা ছোট বোনের করে দেয়া ঠিক নয়'।

আমি বলেছিলাম, 'ঠিক নয়, কিন্তু করে দেয়া তো অন্যায় নয়'।

উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'অন্যায় সম্পর্কে ধারণা সব সময় মূল্যবোধের উপর নির্ভরশীল। আমি যাকে অন্যায় বলব, তাকে তুমি অন্যায় মনে নাও করতে পার'।

'এ কথাটুকুর মধ্যে তিনি বিরাট কথা বলেছিলেন। হজম করতে আমার সময় লেগেছিল। একটু পরে আমি বলেছিলাম, 'বুঝেছি, আমাদের আলাদা মুল্যবোধের কথা বলছেন, আমি এ বিষয়টা ভাল বুঝি না'। বলে আমি চলে এসেছিলাম। আমার কিছুটা রাগ হয়েছিল, অপমানও বোধ করেছিলাম কিছুটা। সেদিনই যখন তাঁর সাথে আমার আবার দেখা হলো, তিনি বলেছিলেন, জিনা বোন, তুমি রাগ করেছ আমি বুঝতে পেরেছি। মনে রেখ, এই পৃথিবীতে যে জীবন ও জগৎ তুমি দেখছ, সেখানে সবাইকেই কিছু গ্রহণ এবং কিছু বর্জন করে চলতে হয়। এই গ্রহণ বর্জনের জন্যে তোমার ভ্যালু জাজমেন্ট (মাপকাঠি) থাকতে হবে। একে তুমি নীতিবোধ বা দৃষ্টিভংগিও বলতে পার। এটা না থাকলে গ্রহণ-বর্জনের গুরুত্বপূর্ন কাজে ভুল হতে পারে?'

আমি বলেছিলাম, বুঝেছি। আপনি বিরাট দার্শনিক কথা বলেছেন। কিন্তু এর দ্বারা আমাকে কি বুঝাতে চাইছেন'।

'তোমার চোখে আমি অসন্তুষ্টি দেখেছিলাম, তাই একথাগুলো আমার বলা। আমি তোমাদের অল্প সময়ের অতিথি। আমার আচরণ যদি তোমাদের কষ্ট দেয়, তাহলে সেটা আমার জন্যে বড় কষ্ট হয়ে থাকবে'।

'তাঁর কণ্ঠস্বর ভারি ছিল। আমার খুব খারাপ লেগেছিল। বুঝলাম, আমার কথায় তিনি আহত হয়েছেন। আমি বললাম, আমি আমার কথার জন্যে মাফ চাচ্ছি। কিন্তু আমি জানতে চাই, আমার কাজটুকুকে আপনি অন্যায় মনে করেছিলেন কেন?'

কিছুক্ষণ তিনি চুপ করে থাকলেন পরে বললেন, 'অনেক কথা আছে বোন যা স্পষ্ট করে বলা যায় না। আসল ব্যাপার হলো, আমি যথা সম্ভব চাই না আমি একা থাকা অবস্থায় আমার বদ্ধ ঘরে একা এমন কোন মেয়ে প্রবেশ করুন যিনি আমার মা নন, সহোদর বোন, খালা নন, ফুফি নন। এটা আমার দুর্বলতা নয়, দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে এটা আমার সতর্কতা'।

তিনি থামলেও আমি অনেকক্ষণ কথা বলতে পারিনি। আমি স্তম্ভিতভাবে তাকিয়েছিলাম তাঁর দিকে। তাঁর কথা আমি পুরোপুরিই বুঝতে পেরেছিলাম। হঠাৎ করেই আমার যেন মনে হয়েছিল, যাকে আমি দেখছি, তিনি আমার দেখা মানুষের মত কোন মানুষ নন।

কোন ভাবে আমি বলতে পেরেছিলাম, ধন্যবাদ ভাইয়া। আপনাকে ভাই বলে ডাকতে পারায় আমার গর্ববোধ হচ্ছে।

মাথা ঝুকিয়ে তাকে একটা বাও করে চলে এসেছিলাম।

সবাই অবাক বিস্ময়ে শুনছিল জিনার কথা।

'আসলে এই ছেলেটা কে? চরিত্র, সাহস, শক্তি সবদিক দিয়েই বিস্ময়কর। কে এই ছেলেটি?' বলল জিনার মা।

'সুস্থ হয়ে উঠেছে, এখন জিজ্ঞাসা করা যায়'। বলল জিনার আব্বা।

'আব্বা, তাকে আমি অদ্ভুত এক ধরণের ব্যায়াম করতে দেখেছি। জিনা আপাও দেখেছে'। বলল মার্ক মরিস।

'অদ্ভুত কেমন?' বলল জিনার মা।

'মার্ক ঠিকই বলেছে মা। আমিও দেখেছি'। বলল জিনা।

'বলত শুনি'। বলল জিনার আব্বা।

মার্ক তার দেখা সব কাহিনী খুটিয়ে খুটিয়ে বলল। সব শুনে ভ্রু কুচকালো জিনার আব্বা ফ্রাংক মরিচ। বলল, 'মার্ক তুমি নিজে করে দেখাও দেখি ব্যাপারটা'।

মার্ক নিখুতভাবে তা দেখাল।

মার্ক-এর ডেমোনেস্ট্রেশন শেষ হবার আগেই জিনার আব্বা বলে উঠল, আর দরকার নেই মার্ক। এটা মুসলমানদের প্রার্থনা'। প্যারিসের মসজিদে একদিন এ প্রার্থনা আমি দেখেছি'।

'এটা মুসলমানদের প্রার্থনা? তাহলে...'। প্রায় এক সংগেই বলে উঠল জিনার মা, জিনা এবং মার্ক।

'তাহলে মুসায়েভ মুসলমান'- এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই'। বলল জিনার আব্বা মিঃ ফ্রাংক।

‘এবং তাহলে প্রার্থনায় দুর্বোধ্য ভাষায় তাকে যেটা পড়তে শুনেছি, সেটা ওদেঁর ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি, তাই না আব্বা?’ সোৎসাহে বলে উঠল জিনা।

জিনা উঠল। বলল, ‘আমি যাই, এ সুখবর ফ্রান্সিসকে দিতে হবে’।

‘ফ্রান্সিসকে দিতে পার। কিন্তু যেহেতু সে ব্যাপারটা গোপন রেখেছে, তাই এটা প্রচার না হওয়াই ভাল’। বলল মিঃ ফ্রাংক।

‘ঠিক আছে’। বলে দৌড় দিল জিনা।

ফ্রান্সিসের বাড়িতে ঢুকেই পেল ফ্রান্সিসের মাকে। বলল, ‘চাচী আম্মা, ফ্রান্সিস কোথায়?’

‘কেন বাইরে নেই?’

‘নেই’।

‘তাহলে কোথাও গেছে’।

‘ও কি বাইরে কোথাও গিয়েছিল। ক’দিন দেখছি না যে’।

‘না কোথাও যায়নি। তোমার উপর মনে হয় খুব রেগে আছে। কাল তোমাকে ডাকতে যেতে বলেছিলাম আমার কম্পিউটারটা তোমাকে একটু দেখাব বলে। বলল, কারো বাড়িতে আমি যেতে পারব না। আমি ঠিক করে দেব’।

‘কেন রাগ করেছে চাচী আম্মা?’

‘সেদিন জন্মদিনে তুমি আসনি’।

‘ও এই’।

বলে জিনা বেরিয়ে গেল ফ্রান্সিসের খোজে।

পেল তাকে বাড়ির নিচেই ওদের বাগানে।

যেতে যেতে জিনা ভাবছিল, সত্যি কয়দিন থেকে জিনারও আসা হয়নি এদিকে। জন্মদিনে আসতে পারেনি আহত ও সংজ্ঞাহীন মেহমান নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে। ঐ দিনই পিকনিক থেকে তাকে তাদের বাড়িতে নিয়ে আসা হয়।

ফ্রান্সিস বসে আছে তাদের সবজি ও ফুলের বাগানে। বাগানটিতে ফুল গাছের ফাকে ফাকে প্রচুর সবজিও ফলানো হয়েছে।

বসে বসে একটা সবজি গাছের পরিচর্যা করছিল ফ্রান্সিস।

জিনা ফ্রান্সিসের একদম পিঠের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। খেয়াল করল না ফ্রান্সিস।

জিনা তর্জনি দিয়ে টোকা দিল ফ্রান্সিসের মাথায়।

ফ্রান্সিস চমকে ফিরে তাকাল। ঠোটে তার এক ঝলক হাসি ফুটে উঠেও মিলিয়ে গেল। মুখ গম্ভীর করে বলল, 'এদিকে কি মনে করে?'

'চাচী আম্মা ঠিকই বলেছেন। খুব তো রাগ দেখছি!' ঠোটে দুষ্টুমী হাসি টেনে বলল জিনা।

'রাগ কিসের? আমি জিজ্ঞাসা করছি, এদিকে কেন রাজপুত্তুরকে ছেড়ে?' ক্ষোভে মুখ লাল করে ফেলল ফ্রান্সিস।

জিনার মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেল। মুখে ফুটে উঠল তার অপমানের চিহ্ন। তীব্র কন্ঠে বলল, 'ফ্রান্সিস তুমি কি বলছ জান?'

'জানি, রাজপুত্তুরের কথা। ময়ুরপংখীতে চড়ে আসা রাজপুত্তুরের কথা'।

'চুপ কর ফ্রান্সিস, ওর সম্পর্কে একটা কথাও বলবে না'। কঠোর কন্ঠ জিনার। রাগে, ক্ষোভে তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে। কাঁপছে তার ঠোট।

ফ্রান্সিসের চোখ-মুখ আরও কঠোর হয়ে উঠল। বলল অনেকটা ব্যাংগ করেই, 'জানতাম তোমার খুব লাগবে'।

'তুমি পাগল হয়ে গেছ। কমনসেন্স হারিয়ে ফেলেছ ফ্রান্সিস'। তীব্র ক্ষোভে চিৎকার করে উঠল জিনার কন্ঠ।

'এখানে চিৎকারের কোন প্রয়োজন নেই। তুমি যাও। আমি রাজপুত্তুর নই, ছোট্ট জাতির সামান্য মানুষ আমি'। বলে আবার বসে পড়ল ফ্রান্সিস।

'ঠিক আছে আমি যাচ্ছি। আমাকে তুমি এত ছোট করবে, তুমি এত ছোট হবে আমি ভাবিনি'। কান্নায় ভেঙে পড়ল জিনা। তারপর দু'হাতে মুখ ঢেকে ঘুরে দাড়িয়ে পাগলের মত দৌড় দিল সে।

কয়েক গজ গিয়েই বাগানের লাইট পোস্টের সাথে ধাক্কা খেল জিনা। একটা ছোট্ট আর্তনাদ তুলে পড়ে গেল সে।

দেখতে পেল ফ্রান্সিস। একটু দ্বিধা করল। তারপর ছুটে গেল জিনার কাছে। টেনে তুলল জিনাকে মাটি থেকে। এক হাতে জড়িয়ে রেখে মাথা পরীক্ষা

করে বলল, 'কেটে গেছে'। পকেট থেকে রুমাল বের করে আহত স্থানটা চেপে ধরল এবং বলল, 'চল বাসায়'।

জিনা নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে বলল, 'ছেড়ে দাও আমাকে। আর মায়া দেখাতে হবে না। যেতে দাও আমাকে তোমার রাজপুত্তুরের কাছে'।

'মায়া দেখাচ্ছি না। যাবে। তার আগে বাসায় চল'। বলে ফ্রান্সিস জিনাকে টেনে নিয়ে চলল বাসার দিকে।

বাসায় ঢুকতেই ফ্রান্সিসের আম্মা বলল, 'কি হয়েছে জিনার?'

'ইলেকট্রিক পোলের সাথে ধাক্কা লাগিয়ে মাথা কেটে ফেলেছে আম্মা'। বলল ফ্রান্সিস।

'কিভাবে ধাক্কা খেল? খুব কেটে গেছে?'

'ও রাগলে কিছু চোখে দেখে না আম্মা'।

'আবার আমাকেই দোষ দিচ্ছ?' তার কন্ঠে কান্নার সুর।

'ফ্রান্সিস তুই এখান থেকে যা। তোর কান্ডজ্ঞান কোনদিন হবে না'। বলে ফ্রান্সিসের মা জিনাকে কাছে টেনে নিল। বলল, 'দেখি মা কেমন কেটেছে'।

ফার্স্ট এইড বক্স নিয়ে ফিরে এল ফ্রান্সিস।

আঘাতটা বড় কোন কাটার পর্যায়ে যায়নি। চামড়া একটু ছিড়ে গিয়ে একটু রক্ত বেরিয়েছে। তবে জায়গাটা ফুলে উঠেছে বেশ। কিচুক্ষণ বরফ দেয়ার পর তুলা দিয়ে ওষুধ লাগিয়ে দিল ফ্রান্সিস।

'এ কিছু নয়, দু'এক দিনেই সেরে যাবে। মাথায় চিরুনিটা একটু সাবধানে কোরো'। বলল ফ্রান্সিসের আম্মা।

'আসি চাচী আম্মা'। বলে জিনা চলতে শুরু করল।

ফ্রান্সিস হাত পরিষ্কার করে রুমাল দিয়ে হাত মুছতে মুছতে বাড়ির গেটে জিনার সামনে দাঁড়াল।

জিনা মুখ তুলে চাইল ফ্রান্সিসের দিকে। মুহুর্তকাল চেয়ে থেকে বলল, 'আর কি অপমান করার তোমার বাকি আছে?' থাকলে করো'।

ফ্রান্সিসের চোখে এখন আর রাগ নেই। চোখে-মুখে কিছুটা অনুশোচনার ভাব। বলল, 'সব দোষ আমার, তোমার কোন দোষ নেই?'

‘দোষ তো আছেই। তাই তো যা তা বলেছ, আরও বল’। বলে জিনা ফ্রান্সিসকে পাশ কাটিয়ে চলতে শুরু করল।

গেট থেকে বেরিয়ে এসে জিনা ফিরে তাকাল। ফ্রান্সিস দাড়িয়ে ছিল গেটে মুখ ভার করে।

ফ্রান্সিসের দিকে না তাকিয়ে মুখ নিচু করে বলল, ‘আমি তোমাকে এমন একটা সুখবর দিতে এসেছিলাম, যা এই গ্রামে, এই দেশে তোমাকেই খুশী করত সবচেয়ে বেশী। কিন্তু তুমি বলতে দিলে না। চাপালে আমার মাথায় অপবাদের বোঝা’। বলে জিনা ঘুরে দাড়িয়ে চলতে শুরু করল।

ফ্রান্সিস ছুটে গিয়ে জিনার সামনে দাঁড়াল। বলল, ‘ঠিক আছে তুমি যাও কিন্তু একটা কথা বল, আমি যা তোমাকে বলেছি, তা আমি কি বিশ্বাস করি?’ ভারি কন্ঠ ফ্রান্সিসের।

‘আমি যা উত্তর দেব, তা তুমি জান। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি এমন কথা তুমি বলতে পার কেমন করে?’

‘এমন অবস্থায় পড়লে তোমার রাগ হতো না?’

‘হয়তো হতো। কিন্তু এমন জঘন্য কথা তোমাকে বলতে পারতাম না’। আবেগে রুদ্ধ হয়ে গেল জিনার কন্ঠ।

অশ্রু নেমে এল ফ্রান্সিসের চোখে।

জিনার পথ থেকে সরে দাড়িয়ে ফ্রান্সিস বলল, ‘ঠিক আছে যাও জিনা’।

জিনা নড়ল না। বলল, ‘কথাটা শুনবে না?’ ফ্রান্সিসের দিকে না তাকিয়েই বলল জিনা।

উত্তর দিল না ফ্রান্সিস। দাড়িয়ে রইল চুপ করে।

জিনা পকেট থেকে রুমাল বের করে ফ্রান্সিসের দিকে তুলে ধরে বলল, ‘চোখ মুছে এস আমার সাথে’।

‘কোথায়?’

‘তোমার রাজপুত্তুরের কাছে’।

‘আমাকে শাস্তি দেবার আর কোন পথ কি তোমার নেই জিনা?’

জিনার মুখে হাসি ফুটে উঠল। বলল, ‘আবার ঝগড়া বাধাবে? আমাকে চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করতে পার না?’

‘ঠিক আছে, চল জিনা’। চোখ মুছে নিয়ে বলল ফ্রান্সিস।

দু’জনেই হাঁটতে শুরু করল জিনার বাড়ির দিকে।

‘রাগ করে হোক, যেভাবেই হোক তুমি একটা সাংঘাতিক সত্য কথা বলেছে ফ্রান্সিস’। বলল জিনা।

‘কি বলেছি?’

‘আমাদের মেহমান সত্যিই রাজপুত্তুর। এমন বিস্ময়কর মানুষ চোখে দেখতে পাব তা কোনদিন ভাবিনি’।

‘যতই বল রাগ আর আমার আসবে না’।

‘তোমার রাগের কথা নয়। কথাটা আমি সত্যিই বলছি। চল গেলেই বুঝতে পারবে। জান সে কে?’

‘কে?’

‘মুসলমান’।

‘মুসলমান? মুসলমান?’ বলতে বলতে দাড়িয়ে পড়ল ফ্রান্সিস।

‘এস, দাঁড়াবার দরকার নেই’ বলে টেনে নিয়ে যেতে যেতে জিনা বলল, ‘উনি পরিচয় দেননি। ব্যাপারটা আমরা গোপনে দেখেছি। গোপনে আমরা তাকে প্রার্থনা করতে দেখেছি, তোমাদের ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি পাঠ করতেও শুনেছি’।

আনন্দ ও বিস্ময়ে মনটা ভরে গেল ফ্রান্সিসের। বলল, ‘কিন্তু পরিচয়টা গোপন করেছে কেন?’

‘বললাম না লোকটা বিস্ময়কর। আমরা নিজ চোখে দেখলাম, আক্রান্ত হওয়ার পর দশজন লোককে পরাজিত ও হত্যা করে বিজয় লাভ করল। কিন্তু এ শক্তির চেয়ে বিস্ময়কর হলো তার চরিত্র। একটা কেন একশ’টা জিনা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে না, তা জানো গর্দভ’।

‘তুমি সত্যিই আমার সাথে রসিকতা করছ জিনা’।

‘ঠিক আছে চল’।

আহমদ মুসার ঘরে তাকে পেল না জিনা। বলল, 'চল ফ্রান্সিস, নিশ্চয় ভেতরের ড্রইং রুমে আছেন তিনি'।

ড্রইং রুমে প্রবেশ করল জিনা ও ফ্রান্সিস। দেখল জিনা, তার আব্বা, আম্মা, মার্ক ও আহমদ মুসা বসে গল্প করছে।

জিনা ফ্রান্সিসকে দেখিয়ে আহমদ মুসাকে বলল, 'মুসায়েভ ভাইয়া এ ফ্রান্সিস, আমার বন্ধু'।

আহমদ মুসা হাত বাড়াল ফ্রান্সিসের দিকে। হ্যান্ডশেক করল দু'জনে।

ফ্রান্সিস প্রথম দৃষ্টিতেই আহমদ মুসা সম্পর্কে যে উপলব্ধি করল তা হলো, লোকটা একদম স্বচ্ছ। তার মুখের দিকে তাকাতেই তার হৃদয়টাকে দেখা যায়। ফ্রান্সিসের দ্বিতীয় অনুভূতিটা হলো, লোকটা যেন তার শত বছরের চেনা। কোন অপরিচয়ের ব্যবধান তাদের মধ্যে যেন নেই। মুহুর্তেই আপন হয়ে গেছে। আহমদ মুসার সাথে যখন হ্যান্ডশেক করল তার মনে হলো, আত্মশক্তির একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ যেন খেলে গেল তার গোটা সত্ত্বায়।

জিনা গিয়ে বলল তার আব্বার পাশে। আর ফ্রান্সিস বসল মার্ক-এর সোফায়।

'যে কথা বলতে যাচ্ছিলাম বৎস', বলে শুরু করলো জিনার আব্বা, 'সেদিন সুর লোরে'তে তোমাকে যেভাবে আমরা মোকাবিলা করতে দেখলাম, তারপর গত কয়েকদিন তোমাকে যা দেখলাম, তাতে, সত্যি বলছি, তোমাকে সাধারণ কেউ বলে আমাদের মনে হয়নি, এজন্যে আমাদের বিরাট কৌতুহল তোমাকে জানার'।

একটু থামল জিনার আব্বা। থেমেই আবার শুরু করল, 'আমরা বুঝতে পারছি, তুমি এশিয়ান। তোমার দেশ কোথায়?'

আহমদ মুসা মুখ নিচু করল। তারপর বলল, 'একজন অপরিচিত সম্পর্কে এই কৌতুহল স্বাভাবিক জনাব। কিন্তু বুঝতে পারছি না আপনার প্রশ্নের উত্তরে কি বলব আমি। চীনের তুর্কিস্থান (সিংকিয়াং) প্রদেশে আমি জন্মগ্রহণ করি। কিন্তু আজ আমার কোন দেশ নেই'। শান্ত ও নরম কন্ঠ আহমদ মুসার।

'কেন, তোমার বাড়ি নেই?'

‘না, আমার কোন বাড়ি নেই’।

‘কেন বাপ, মা, ভাই, বোন…’।

‘না, আমার কেউ নেই জনাব’। একটা ম্লান হাসি ফুটে উঠল আহমদ মুসার ঠোটে। তাতে বেদনাই ঝরে পড়ল বেশী। চোখ নিচের দিকে রেখে কথা বলছিল আহমদ মুসা।

কারও মুখে কোন কথা নেই। আহমদ মুসার উত্তরগুলো সবাইকে স্তম্ভিত করেছিল। তাদেরকে কিছুটা বেদনার্তও করেছে। সবার দৃষ্টি আহমদ মুসার ম্লান মুখের দিকে।

‘এমনটা কি করে হয় বৎস?’ বলল জিনার আম্মা।

‘হয় আম্মা। সিংকিয়াং থেকে হাজার হাজার মুসলিম পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। আমার পরিবার তার একটি। বিতাড়িত হবার সময় সব হারিয়েছি। কেউ মারা গেছেন, কেউ নিহত হয়েছেন’।

‘তাই বলে তোমার দেশ থাকবে না, বাড়ি থাকবে না?’

‘সব দেশই আমার দেশ। আর বাড়ির প্রয়োজন হয়নি আমার’।

‘কিন্তু তোমার পাসপোর্ট?’

‘ওটা কোন সমস্যা হয় না। মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে যখন যে দেশের পাসপোর্ট চাই দিয়ে দেয়’।

বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলল জিনার আব্বা মিঃ ফ্রাংক মরিচ। এ কথা সবাইকেই বিস্মিত করর। ফ্রান্সিস শুধু বিস্মিত নয়, তার হৃদয়টা একটা অপরিচিত বেদনায় ভরে গিয়েছিল। সে ভাবতে পারছিল না, এমন মূলহীন অসহায় মানুষ দুনিয়াতে থাকে! আর জিনা ভাবছিল, কি অদ্ভূত! রাজপুত্তুরের ভেতরে এক চরম ‘নিঃস্বতার বেদনা!’

‘সেদিন সুর লোরে’তে কাদের সাথে তোমার সংঘর্ষ হলো?’ বলল জিনার আব্বা।

আহমদ মুসা মুখ তুলে একবার চারদিকে চাইল। মিঃ ফ্রাংক মরিচ আহমদ মুসার দ্বিধা বুঝতে পারল। বলল, ‘এখানে সবাই আমরা তোমার মংগলকামী’।

‘ধন্যবাদ’, জানিয়ে আহমদ মুসা বলল, ‘ওরা ‘ব্ল্যাক ক্রস’-এর লোক’।

‘ব্ল্যাক ক্রস’-এর লোক?’ জিনার আব্বার কন্ঠে ভয় ও বিস্ময় দুটোই ফুটে উঠল।

‘ব্ল্যাক ক্রস’ কি আব্বা? তুমি চেন?’ পাশ থেকে বলে উঠল জিনা।

‘চিনি না। সম্প্রতি ওদের সম্পর্কে জেনেছি। ওটা একটা গোপন খৃষ্টান সংগঠন। বিশ্বজোড়া ওদের কাজ। ক্রুসেড চালাচ্ছে ওরা অন্য ধর্ম বিশেষ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে। ওদের সুনামও আছে, আবার সবাই জানে ওটা খুনে সংগঠন, পশুর চেয়েও নাকি নৃশংস। ওদের শত্রুর খাতায় নাম উঠলে তার আর রক্ষা নেই’।

‘আপনি ঠিক বলেছেন জনাব’। বলল আহমদ মুসা।

সকলের চোখেই ভয় এবং আতংক।

ড্রইং রুমের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এস। কোন কথা বাইরে না যাওয়াই ভাল।

‘ওদের সাথে তোমার এই সংঘাতের কারণ কি? তুমি শত্রু হলে কেমন করে ওদের?’ বলল জিনার আব্বাই।

আহমদ মুসা ম্লান হাসল। বলল, ‘আমার সাথে তাদের কোন শত্রুতা নেই। ক্যামেরুনের একজন যুবককে তারা প্যারিস থেকে কিডন্যাপ করেছে। সে আমার বন্ধু, তাকে আমি উদ্ধারের চেষ্টা করছি’। এরপর আহমদ মুসা একটু থেমে ওমর বায়াকে কেন্দ্র করে যা ঘটেছে সব কথা খুলে বলল।

সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনল ওমর বায়ার সেই কাহিনী। সবার চোখে-মুখে ফুটে উঠল অসহনীয় এক বেদনার ছাপ। আর জিনা এবং ফ্রান্সিসের চোখ সিক্ত হয়ে উঠেছিল অশ্রুতে। আহমদ মুসা তাদের সকলের কাছে আরও মহত্তর রূপ নিয়ে আবির্ভূত হলো। নিজ জাতির জন্যে এমন ভালবাসা, একজন ব্যক্তি জন্যে এইভাবে বিপদে ঝাপিয়ে পড়ার কথা তারা বইতেই পড়েছিল কিন্তু তাকে আজ তারা চোখের সামনে মূর্তিমান দেখতে পাচ্ছে।

‘ওমর বায়ার কোন সন্ধান পেয়েছ?’ বলল জিনার আব্বা।

‘আমি মাত্র কয়েকদিন আগে প্যারিস এসেছি। প্যারিসে ওদের একটা ঘাটির খোঁজ পাই। যে রাতে আমি আসি, তার পরের রাতেই ওদের ঘাটিতে যাই আমি ওমর বায়ার....’।

আহমদ মুসাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই জিনার আব্বা জিজ্ঞাসা করল, ‘একা গেলে?’

‘জি, হ্যাঁ’।

আহমদ মুসা এরপর ব্ল্যাক ক্রস-এর সাথে তার যা ঘটেছে সব কথা বলল। ‘সুর লোরে’-এর ঘটনা পর্যন্ত।

আহমদ মুসা কথা শেষ করলেও কেউ কথা বলল না। বলতে পারল না। সবার মুখ ভয়ে, বিস্ময়ে হা হয়ে গেছে। যা তারা শুনল ফিল্মের কাহিনীর চেয়ে চমৎকার, ফিল্মের কাহিনীর চেয়েও যেন ভয়ংকর।

জিনা ও মার্ক-এর মনে হলো তাদের সামনের লোকটি একজন জীবন্ত রবিনহুড কিংবা তার চাইতেও বড়। আর ফ্রান্সিসের বুকটা অসীম এক আবেগে ভরে গেছে। আহমদ মুসাকে তার মানুষ বলে মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে শত্রু নিধনের জন্যে স্বর্গ থেকে পাঠানো গ্রীক দেবতাদের একজন তিনি।

‘ব্ল্যাক ক্রস-এর ২৪জন এ পর্যন্ত তোমার হাতে নিহত হয়েছে?’ বিস্ময়-রুদ্ধ কন্ঠে বলল জিনার আব্বা।

‘আত্মরক্ষার প্রয়োজন ছাড়া কাউকে আমি মারি না। মারতে চাইলে জাহাজে আরও সাত আটজন লোক মরত’।

সবাই চুপ চাপ।

নীরবতা ভাঙল জিনার আম্মা। বলল, ‘আমরা যা ভেবেছি তাই, তুমি সাধারণের মধ্যে পড় না। কিন্তু তুমি কে? তুমি যে মুসলমান, তোমার প্রার্থনা করা থেকে আমরা বুঝেছি এবং আজ তুমিও বললে। তোমার আর পরিচয় কি?’

আহমদ মুসা মাথা নিচু করল। তৎক্ষণাৎ কোন কথা বলল না। তারপর ধীরে ধীরে মাথা তুলে বলল, ‘আপনারা আমাকে মৃত্যুর মুখ থেকে বাচিয়েছেন এবং আপনাদের কাছে যে স্নেহ পেয়েছি তাও কোনদিন ভুলবার নয়। আপনাদের কাছে কোন কিছু গোপন করা ঠিক নয়’। বলে একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর

আবার শুরু করল, ‘আমি আপনাদের কাছে আমার মিথ্যা নাম বলেছি। আমার নাম আহমদ মুসা।

জিনার আব্বার ভ্রু কুঞ্চিত হলো। বলল, আমি এক আহমদ মুসা সম্পর্কে পড়েছি। তিনি অতি বড় বিপ্লবী। ফিলিস্তিন, মিন্দানাও, মধ্য এশিয়া বিপ্লবের নায়ক তিনি। ককেশাস, বলকান এবং মাত্র কিছুদিন আগে স্পেনেও তিনি মুসলমানদের পক্ষে বিরাট পরিবর্তন এনেছেন। তাকে তুমি মানে তুমি..’।

কথা শেষ না করেই থেমে গেল জিনার আব্বা মিঃ ফ্রাংক মরিচ। যা তিনি বলতে চান তা যেন বলতে পারছেন না। তার চোখে মুখে বিস্ময় মিশ্রিত বিব্রত ভাব।

আহমদ মুসা তার নত মুখটা ঈষৎ উপরে তুলে শান্ত কন্ঠে বলল, ‘জি, আমি সেই আহমদ মুসা’।

কথাটা কানে যাওয়ার সাথে সাথেই জিনার আব্বা অজ্ঞাতেই যেন উঠে দাড়াল। আবার বসল। বিস্ফোরিত তার দু’টি চোখ। একটা অপ্রস্তুত, কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাব তার মধ্যে। জিনা, ফ্রান্সিস, মার্ক স্বপ্ন দেখছে যেন। হঠাৎ করেই পরিচিত পৃথিবীটা উল্টে গিয়ে যেন তারা এক রূপকথার দেশে হাজির হলো এবং দিগ্বিজয়ী এক রূপকথার রাজপুত্তুর তাদের সামনে। চোখ ভরে দেখছে তারা সেই রাজপুত্তুরকে।

জিনার মা বিস্মিত হয়েছে, কিন্তু তার প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছে। বলল, ‘তাই বলি, অতবড় মানুষ না হলে মানুষ এমন হয় না। এসব কাজ অন্য কার সাধ্য!’

‘আমি কোন দিক দিয়েই কোন বড় মানুষ নই আম্মা। আমি আমার জাতির সেবক, মজলুম মানুষের সেবক’। শান্ত ও নরম কন্ঠে বলল আহমদ মুসা।

জিনার আব্বা মিঃ ফ্রাংক নিজেকে সামলে নিয়েছিল। বলল, ‘মিঃ আহমদ মুসা ‘তুমি’ বলে আপনাকে যে অসম্মান করেছি তার জন্যে আমি লজ্জিত। আপনি যে কত বড় তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না’।

আহমদ মুসা সংগে সংগেই উঠে দাঁড়াল। অভিমান ক্ষুব্ধ কন্ঠে বলল, ‘আপনি যদি এভাবে কথা বলেন, ‘আপনি’ বলে সম্বোধন করেন, তাহলে এখানে

আমি এক মুহুর্তও থাকতে পারবো না। এ ধরনের সম্মান আমার কাছে বন্দুকের গুলীর চেয়েও কষ্টকর'। আহমদ মুসার কন্ঠ ভারি হয়ে উঠেছিল।

জিনার আব্বাও উঠে দাড়িয়েছিল। অবাক বিস্ময়ে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকল আহমদ মুসার দিকে। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে আহমদ মুসার দুই কাধে হাত দিয়ে বসিয়ে দিল। বলল, 'তুমি আরও বড় হবে। এমন মানুষরাই বড় হয়'।

সোফায় ফিরে এল জিনার আব্বা।

আহমদ মুসা জিনা, মার্কদের দিকে চেয়ে বলল, 'তোমাদের চোখ-মুখ দেখে মনে হচ্ছে, আমি তোমাদের পর হয়ে গেলাম হঠাৎ করে। দেখ, রক্তের সম্পর্কের আপন কেউ নেই তো আমার, তাই পর হওয়ার বেদনাটা আমি বেশী বুঝতে পারি'।

জিনা ও মার্ক দু'জনেরই চোখে-মুখে নেমে এল লজ্জা। জিনা মুখ ঢাকল।

'তা নয় বাছা, বিস্ময়ের ধাক্কা ওরা সামলাতে পারেনি'। বলল জিনার মা।

'ঠিক বলেছ আম্মা'। বলে জিনা আহমদ মুসার দিকে চেয়ে ফ্রান্সিসকে দেখিয়ে বলল, ভাইয়া, এই ফ্রান্সিসের আরেকটা পরিচয় আছে, সে মুসলমান। নাম ফ্রান্সিস আবুবকর।

'মুসলমান?'

'হ্যাঁ ভাইয়া'।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়ালো। এগুলো ফ্রান্সিসের দিকে। ফ্রান্সিসও উঠে দাড়িয়েছিল। আহমদ মুসা জড়িয়ে ধরল ফ্রান্সিসকে। অনেকক্ষণ জড়িয়ে ধরে থাকল। তারপর চুমু খেল তার কপালে একটা। বলল, 'এমন এক স্থানে কোন ভাইকে দেখব ভাবিনি'।

ছেড়ে দিল ফ্রান্সিসকে। আনন্দ, বিস্ময় ও আবেগে চোখ অশ্রু সিক্ত হয়ে উঠেছে ফ্রান্সিসের।

আহমদ মুসা ফ্রান্সিসকে ছেড়ে গিয়ে পাশেই বসে থাকা মার্ক মরিসের কপালে চুমু খেয়ে বলল, 'মনে করো না ফ্রান্সিসের চেয়ে তোমাকে কম ভালবাসি'।

‘ধন্যবাদ ভাইয়া’। মার্ক বলল হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে।

ফ্রান্সিসের এই গৌরবে সবচেয়ে খুশী হয়েছিল জিনা। আনন্দের অপরিসীম ঔজ্জ্বল্য ঠিকরে পড়ছিল জিনার চোখ মুখ থেকে।

আহমদ মুসা তার আসনে ফিরে এলে জিনা বলল, ‘ভাইয়া, ফ্রান্সিস শুধু নামেই মুসলমান। ও ধর্মগ্রন্থই দেখেনি, প্রার্থনা করতেও জানে না এবং মুসলমান ধর্মের কিছুই পালন করে না’।

‘এটা ওর দোষ নয় জিনা, এ দোষ মুসলিম জাতির। জাতি ফ্রান্সিসদের প্রতি তার দায়িত্ব পালন করেনি’। বলল আহমদ মুসা।

‘ভাইয়া, আপনি ফ্রান্সিসকে সাংঘাতিক উপরে তুললেন। ও এখন জাতির ঘাড়ে দোষ দিয়ে বগল বাজাবে’। জিনা বলল ফ্রান্সিসের দিকে চেয়ে।

‘সে সুযোগ হবে না। আমি ওকে সব শিখিয়ে দেব। তারপর সে সব পালন করবে’।

‘আমাকেও শিখিয়ে দিতে হবে ভাইয়া। তা না হলে ও বাহাদুরি দেখাবে’।

‘ঠিক আছে’।

‘বাঁকা কথা বলে ঝগড়া বাধানো ওর একটা অভ্যাস ভাইয়া’। বলল ফ্রান্সিস।

‘আবার ফ্রান্সিস, সব কথা কিন্তু ভাইয়াকে বলে দেব’।

এই কথার সংগে সংগে ফ্রান্সিসের মুখটা চুপসে গেল। করুণ চোখে তাকাল জিনার দিকে। কিছুক্ষণ আগে আহমদ মুসাকে নিয়ে জিনার সাথে যা ঘটেছে তা তার মনে পড়ে গেছে। লজ্জায় লাল হয়ে উঠল তার মুখ।

‘থামাও তোমাদের ঝগড়া’। বলে জিনার আম্মা আহমদ মুসার দিকে চেয়ে বলল, ‘কিছু মনে করো না বাছা, ‘ঝগড়াই এ দু’জনের সংস্কৃতি। আগে মারামারি করত, এখন তার বদলে করে ঝগড়া’।

আহমদ মুসা হাসল। আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই কথা বলে উঠল জিনার আব্বা মিঃ ফ্রাংক। বলল, ‘এখন তোমার কি পরিকল্পনা আহমদ মুসা’।

আহমদ মুসার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, ‘সুস্থ হয়ে উঠেছি। এবার ওমর বায়ার সন্ধদনে বেরুব’।

‘আবার? একা?’ আৎকে উঠল জিনার কন্ঠ।

‘একাই বেরুতে হবে। ওমর বায়া কোথায় জানি না। জানলে অন্যের সাহায্য নেয়া যেতো’।

‘কিন্তু ব্ল্যাক ক্রস বিরাট দল, বিপুল জনশক্তি। আবার তো বিপদে পড়বে তুমি’। বলল জিনার আব্বা।

‘হয়তো পড়বো। কিন্তু অন্য পথ তো নেই ওমর বায়াকে উদ্ধারের’।

‘পুলিশকে বললে?’

‘ফরাসি পুলিশ ব্ল্যাক ক্রস-এর কেশও স্পর্শ করবে না। পুলিশের কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না’।

‘ব্ল্যাক ক্রস ভীষণ ক্ষেপে আছে তোমার উপর। এই অবস্থায় ওদিকে অগ্রসর হওয়া মানে মৃত্যুর কোলে ঝাপিয়ে পড়া’। বলল জিনার আব্বা।

‘ঝুকি তো নিতেই হবে, আর মৃত্যু আল্লাহর হাতে। আল্লাহর নির্দিষ্ট করা সময়েই তা আসবে। সুতরাং এ নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই’। নিশ্চিন্ত কন্ঠে শান্ত ভাষায় জবাব দিল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা থামল।

কেউ কোন কথা বলল না।

সবার দৃষ্টি আহমদ মুসার উপর নিবদ্ধ।

দৃষ্টিতে তাদের বিস্ময়। সম্পর্কহীন একজন মানুষের জন্যে একজন মানুষ এইভাবে জীবন বিলিয়ে দিতে এগিয়ে যেতে পারে।

ভাবছিল জিনার আব্বা। বলল, ‘ক’দিন আগে একটা গল্প শুনেছিলাম। সেটাও কিডন্যাপের কাহিনী। তোমার কাহিনী শুনে সে কথাটা আমার মনে পড়ছে। বিস্ময়করভাবে আমার শোনা সে কাহিনীর বন্দীও মুসলিম’।

‘কি সেই কাহিনী জনাব’। আগ্রহের সাথে জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

‘কাহিনীটা বেশী বড় নয়। সেই মুসলিম বন্দীকে কিডন্যাপ করে তার কাছ থেকে কথা আদায় ও তাকে বশে আনার জন্যে তার উপর অকথ্য নির্যাতন

চালায়। দয়া পরবশ হয়ে একজন গোপনে তার খবর তার লোকদের কাছে পৌছাবার একটা সুযোগ করে দেয়। কিন্তু ধরা পড়ে যায় কৌশলটি। ধরা পড়ার পর কে তাকে সাহায্য করেছে এটা জানার জন্যে তার উপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। কিন্তু মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও সে তার সাহায্যকারীর নাম প্রকাশ করেনি। সাহায্যকারীর প্রতি লোকটির বিস্ময়কর দায়িত্ববোধের কথা বলতে গিয়েই এই গল্পটি আমার কাছে করেছে'।

'ঘটনাটা কোথায় ঘটেছে?'

'প্যারিসে'।

'গ্রুপটির কিংবা লোকটির কি নাম জানা গেছে?'

'নাম বলেনি, জিজ্ঞাসাও করিনি'।

'গল্পটি যে বলেছে সে কোথায়?'

'প্যারিস চলে গেছে'।

'গল্প বলা লোকটির নাম কি?'

'নাম ডুপ্লে'।

'ডুপ্লে?' আহমদ মুসার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'মনে হচ্ছে তুমি লোকটিকে চেন?'

'চিনি না। কিন্তু এই নামের সাথে আমি পরিচিত। এই নামের একজন লোক ফিলিস্তিন দুতাবাসে একটা চিঠি দিয়ে জানায় যে, ব্ল্যাক ক্রস ওমর বায়াকে কিডন্যাপ করেছে। ওমর বায়াকে যেখানে প্রথমে বন্দী করে রেখেচিল তার ঠিকানাও সে দেয়'।

'সেই ডুপ্লে এবং এই ডুপ্লে কি এক মানুষ হবে বলে তুমি মনে কর?'

'আমার তাই মনে হচ্ছে। কারণ ঘটনা ও নাম মিলে যাচ্ছে'।

কিন্তু এই ডুপ্লে 'ব্ল্যাক ক্রস'-এর খবর জানবে কি করে?'

'আমি মনে করি ডুপ্লে স্বয়ং 'ব্ল্যাক ক্রস'-এর লোক'।

'জানলে কি করে?'

'তার চিঠি পড়েই আমি অনুমান করেছি। আপনি কি এই ডুপ্লেকে কখনও খালি গায়ে দেখেছেন?'

‘একদম খালি গায়ে দেখিনি। তবে খেলার সময় গেঞ্জি গায়ে দেখেছি’।

‘তার গলায় কোন ক্রস ঝুলানো দেখেছেন?’

‘হ্যাঁ দেখেছি’।

‘রং কি কালো?’

‘হ্যাঁ। কিন্তু তুমি জানলে কি করে?’

‘ব্ল্যাক ক্রস-এর এটা চিহ্ন। ব্ল্যাক ক্রস-এর প্রত্যেক সদস্যকে কার্বনের তৈরী কাল ক্রস পরতে হয়’।

জিনার আব্বা মিঃ ফ্রাংক সহ সকলের মুখ বিস্ময়ে হা হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ পর জিনার আব্বা বলল, ‘একদম আমাদের গায়ের ব্ল্যাক ক্রস! ভয় এবং বিস্ময় তার চোখে।

‘আমার একটা অনুমানের কথা বলি জনাব, ডুপ্লে মনের দিক দিয়ে দায়িত্বশীল ও দয়ালু লোক। ব্ল্যাক ক্রস-এর সাথে তার সম্পর্ক খারাপ হয়ে গেছে। ব্ল্যাক ক্রস- এর হাতে ডুপ্লেকে প্রাণ দিতে হতে পারে’।

আঁৎকে উঠল মিঃ ফ্রাংক এবং সবাই।

কেউ কথা বলতে পারলো না।

আহমদ মুসাই আবার মুখ খুলল। বলল, ‘ডুপ্লে খুন হওয়ার আগেই তার সাথে আমার দেখা হওয়া প্রয়োজন। এই মুহুর্তে সেই আমার অবলম্বন। সে ব্ল্যাক ক্রস-এর কোন ঘাটি অথবা হেডকোয়ার্টার-এর ঠিকানা দিয়ে আমাকে সাহায্য করতে পারে’।

‘ডুপ্লে সম্পর্কে এতটা নিশ্চিত তুমি কেমন করে হচ্ছে?

‘ঘটনার গতি তাই বলছে’।

একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর বলল, ‘ডুপ্লের প্যারিসের ঠিকানা আমি কেমন করে পাব জনাব?’

‘ওর স্ত্রী ও মেয়েও চলে গেছে, তবে তার ভাই-ভাবীরা এখানে আছে, তাদের সাথে দেখা করবে?

‘এটা ওদের জন্যেও ঠিক হবে না, আপনাদের জন্যেও ঠিক হবে না’।

‘কেন?’

'ব্ল্যাক ক্রস যদি ওদের উপর চোখ রেখে থাকে কিংবা ওদের কেউ যদি ব্ল্যাক ক্রস-এর হয়ে থাকে?'

'এ রকম কি হয়?'

'ওমর বায়াকে তাদের ভাষায় যে 'বিশ্বাসঘাতক' সাহায্য করেছে, তাকে তারা খুজে বের করবেই। যদি বের করতে না পারে, তাহলে যাদের উপর তাদের সন্দেহ হবে প্রত্যেককেই তারা শেষ করে দেবে। এর আগ পর্যন্ত সন্দেহজনকদের উপর তারা চোখ রাখবেই'।

'মনে হচ্ছে আপনি সব জানেন। কিভাবে ওদের কথা আপনি বলতে পারেন? বলল জিনা।

'শত্রু সম্পর্কে কিছু অনুমান করতে না পারলে সেই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করব কেমন করে?'

'এ পর্যন্ত ৭টি দেশ বা অঞ্চলের বিপ্লব বা পরিবর্তনে আপনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। অতীতের ঘটনার মধ্যে এমন ঘটনা কি আছে যা আপনার খুব মনে পড়ে বা আপনাকে কাঁদায়?' জিনা প্রশ্ন করল।

আহমদ মুসা ম্লান হাসল। মুখ নিচু করল। বলল, 'এমন সহস্র ঘটনা আছে বোন। আমি সে সব ভুলে থাকতে চাই'।

'কিন্তু ভুলে থাকা কি যায়? আমাদের তুমি ভুলতে পারবে?' বলল জিনার আম্মা।

'ভুলা যায় না আম্মা। কিন্তু দৃষ্টি যদি সামনের দিকটা নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তাহলে দৃষ্টিটা অতীতে ফেরার সময় খুব কম পায়'।

'আমাদের ভুলে যাবেন?' জিনা বলল।

'জীবন এমন একটা ফিল্ম বোন, এখানে যে ঘটনা একবার দাগ ফেরে তা আর মুছে যায় না'।

'কিন্তু ফিল্মের ঘটনা দেখার জন্যে তা ঘুরাতে হয়'।

'জীবন নামের ফিল্মটা সরল রেখার মত লম্বা, জন্ম থেকে মৃত্যুর দিকে ধাবিত। এ ফিল্মকে ঘুরাতে হয় না। চোখ মেললেই দেখা যায়'।

‘ভাইয়া কিছু মনে করবেন না, আপনাকে দেখলে এবং আপনার কথা শুনলে আপনাকে একজন বন্দুকধারী মনে হয় না, মনে হয় আপনার হাতে আছে শিল্পীর কলম, চোখে আছে দার্শনিকের দৃষ্টি এবং মুখে আছে শিক্ষকের কথা’। জিনা বলল।

‘আমি এসব কিছু নই, আমি মানুষ এবং মানুষ বলেই আমি সবকিছু’।

‘ভাইয়া, আপনি আপনার এই কথাটা আবার বলুন। আমি লিখে নেব। লিখে আমি টাঙিয়ে রাখব’। বলে জিনা কলম বের করে কাগজ টেনে নিল। জিনা লিখে নিল কথাটা।

জিনার আব্বা বলল, ‘তুমি ঠিক বলেছ, ডুপ্লের বাড়িতে যাওয়া তোমার ঠিক নয়। কিন্তু আমরা গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে ক্ষতি কি?’

‘ক্ষতি কিছু নেই। কিন্তু তাদের মনে একটা স্বাভাবিক প্রশ্ন জাগবে কেন আপনারা তা চাচ্ছেন। ভবিষ্যতে কি ঘটবে জানি না। কিন্তু কিছু যদি ঘটে, তাহলে এই ঠিকানা চাওয়াটা বড় হয়ে দেখা দিতে পারে’।

জিনার আব্বা কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে চেয়ে রইল আহমদ মুসার দিকে। তারপর বলল, ‘সত্যিই তুমি বিস্ময়। এতদুর ভবিষ্যত তুমি দেখতে পাও?’

একটু থামল। তারপর আবার বলল, ‘ঠিকই বলেছ তুমি। কিন্তু ঠিকানা সংগ্রহের কি করা যায়?’

‘আব্বা, সেদিন ‘কম্যুনিটি ইনভেস্টমেন্ট ফোরাম’-এর তিনি সদস্য হলেন। ওখানে তো তাঁর প্যারিসের ঠিকানা থাকতে পারে’। বলল মার্ক।

‘ঠিক বলেছ মার্ক। নিশ্চয় ওখানে আছে’। চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল জিনার আব্বার।

‘ঠিকানা তাড়াতাড়ি পেলে আমি বাধিত হবো জনাব’। বলল আহমদ মুসা।

‘অত তাড়া কেন? তুমি তো পুরোপুরি সুস্থ হওনি’। বলল জিনার আব্বা।

‘এত বিশ্রাম আমি বহুদিন নেইনি। শত্রুর হাতে একজন মানুষের দুঃসহ সময় কাটছে, তখন বিশ্রাম আরও বাড়ানো ঠিক নয়’।

‘তবুও ডাক্তারের মত তোমার নেয়া দরকার’। বলল জিনার আব্বা। বলে উঠে দাড়াল সে। সেই সাথে আহমদ মুসাও। জিনার আব্বা ভেতর বাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করে বলল, ‘নিশ্চিন্ত থাক, ঠিকানা তাড়াতাড়িই পেয়ে যাব’।

জিনার আব্বার সাথে জিনার আম্মাও চলে গেল।

জিনা, মার্ক ও ফ্রান্সিসও উঠে দাড়িয়েছে।

আহমদ মুসা তার ঘরের দিকে হাঁটা শুরু করল।

‘ভাইয়া, আমাদের আপনি সবকিছু শিখিয়ে দিতে চেয়েছেন’। মুখ ভরা সংকোচ নিয়ে বলল ফ্রান্সিস।

আহমদ মুসা তার পিঠ চাপড়ে বলল, ‘আমি তোমাদের বাসায় যাব। গিয়ে শিখিয়ে দেব। লিখে দেব’।

‘তাহলে এখনি চলুন। আম্মা খুব খুশী হবেন’।

জিনা এবার বক্র দৃষ্টিতে ফ্রান্সিসের দিকে চাইল। অন্য সময় হলে ঝগড়া বাধিয়ে দিত। কিন্তু তা করল না। গম্ভীর সে। মুখটা অনেকখানি ভারি হয়ে উঠেছে। এক সাথে হাঁটতে হাঁটতে বলল, ‘ভাইয়া, আপনি বললেন জীবনটা সরল রেখার মত প্রলম্বিত, যদি এটা বৃত্তাকার হতো!’

‘কেন?’

‘তাহলে আবার দেখা হতো আপনার সাথে’।

আহমদ মুসা থমকে দাঁড়াল। বলল, সরল রেখার পরিসরেও অনেক বৃত্ত রেখা আছে। যার ফলে জীবন পথে মানুষের ঘুরে-ফিরে দেখা হয়’।

‘দেখা হবে কি তাহলে আমাদের আবার?’

‘বৃত্তটির অংকন তোমার, আমার, আমাদের কারো হাতে নেই জিনা’।

‘কেন তাহলে স্নেহ-প্রীতির সৃষ্টি করা হলো? কেন আমরা ভাই, বোন ইত্যাদি সম্পর্ক গড়ি তাহলে?’

‘এটাই আমাদের আনন্দ এবং বেদনার পৃথিবী’।

‘কিন্তু এই বেদনা স্রষ্টা কেন দিলেন?’

‘মানুষের জন্যে যে চিরন্তন পুরষ্কার আল্লাহ রেখেছেন তার যোগ্য কে, তা দেখার জন্যে তো বেদনার পরীক্ষা প্রয়োজন’।

‘কিন্তু প্রভূ যিশু তো সবার পক্ষ থেকে বেদনার সে পরীক্ষা দিয়ে গেছেন’।

‘না জিনা, কেউ কারো পরীক্ষা দিতে পারে না। ফল যার পরীক্ষাও তার’।

‘ঠিক বলেছেন ভাইয়া, কিন্তু খৃষ্টান বিশ্বাস.....’। কথা শেষ না করেই থেকে গেল জিনা।

‘খৃষ্টান বিশ্বাস সম্পর্কে কোন মন্তব্য আমি করব না, ইসলামের বিশ্বাসের কথা তোমাকে আমি বললাম’। বলল আহমদ মুসা।

‘ধন্যবাদ ভাইয়া’। বলে জিনা ফ্রান্সিসের দিকে চেয়ে বলল, ‘স্বার্থপরের মত ভাইয়াকে যেন একা নিয়ে যেও না। ভাইয়া সেখানে যে পাঠ দেবেন, সে পাঠশালায় আমি এবং মার্ক যোগ দেব’।

‘ওয়েলকাম বোন’।

তারপর মুখ টিপে একটু হেসে আহমদ মুসা বলল, ‘ফ্রান্সিসের সাথে তোমার খুব ঝগড়া তো। আমিই তোমাদের সাথে করে নিয়ে যাব’।

‘ঝগড়ার সৃষ্টি করে কিন্তু ফ্রান্সিস, ভাইয়া। আজকেই কিছু আগে...’।

‘জিনা, তোমার কান্ডজ্ঞান লোপ পাচ্ছে’। বলে জিনার কথায় বাধা দিল ফ্রান্সিস।

‘কান্ডজ্ঞান কার লোপ পাচ্ছে, এ প্রমাণ আজ তুমি দিয়েছ’। তীব্র কন্ঠে প্রতিবাদ করল জিনা।

আহমদ মুসা দু’হাত তুলে ওদের থামিয়ে দিয়ে হেসে বলল, ‘আমার খুব ইচ্ছা, তোমাদের ঝগড়া যেদিন এক মোহনায় এসে মিটে যাবে সেই শুভদিনে আমি যদি তোমাদের এক সাথে দেখতে পেতাম!’

ফ্রান্সিস মুখ নিচু করল। আর ‘ভাইয়া’ বলে চিৎকার করে উঠে লজ্জারাঙা মুখ লুকোতে দৌড় দিল জিনা।

আজ পালিয়ে গেলেও আহমদ মুসার বিদায়ের দিন জিনা চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে বলেছিল, ‘সেদিন আপনার ডাকার জন্যে আমি ও ফ্রান্সিস আপনাকে কোথায় খুজে পাব ভাইয়া?’

তিনতলা বিরাট বাংলোর সামনের সবুজ চত্তরে বেরিয়ে এল মিঃ প্লাতিনি এবং ডোনা। এই কিছুক্ষণ আগে তারা এসে পৌছেছে দ্বিজন গ্রামে তাদের বাংলোতে। ক্লান্তির সুস্পষ্ট চিহ্ন তাদের চোখে-মুখে।

তারা দ্বিজনে আসার আগে সুর লোরেতে বহু সময় কাটিয়েছে। বিভিন্ন জনকে জিজ্ঞাসা করে তারা ঘটনাস্থলে যায়। গাড়ি থেকে নেমে ঘটনার স্থান ও পাহাড় তারা দেখে। তারপর আশপাশের নানাজনকে জিজ্ঞাসা করেও আহমদ মুসা সম্পর্কে কোন তথ্য জোগাড় করতে তারা পারেনি। অবশেষে তারা চলে এসেছে দ্বিজন গ্রামে তাদের এস্টেটের খামার বাড়িতে।

তাদের আসার খবর পেয়ে গ্রামের গণ্যমান্য লোক এবং তাদের রায়ত (বর্গা প্রজা) এসেছে তাদের সাথে দেখা করার জন্যে। তাই বিশ্রাম না নিয়েই তাদের বেরিয়ে আসতে হয়েছে।

মিঃ প্লাতিনি এবং ডোনা বেরিয়ে আসতেই উপস্থিত সবাই সামনে ঝুকে মাথা নত করে বাও করল তাদের দু'জনকে। সকলের চোখে-মুখেই শ্রদ্ধার ভাব। তাদের মধ্য থেকে প্রবীণ একজন বলল, 'আমি আমার গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে আমাদের মহান রাজার স্মৃতি প্রিন্স মিশেল প্লাতিনি ডি বেরী লুই এবং তাঁর কন্যা প্রিন্সেস মারিয়া জোসেফফাইন লুইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের সকলের শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন'।

উল্লেখ্য, ডোনার পারিবারিক নাম প্রিন্সেস মারিয়া জোসেফাইন লুই। কিন্তু কাগজে-কলমে সে ডোনা জোসেফাইন নামে পরিচিত আর ডোনার আব্বার পারিবারিক নামের সাথে ডি বেরী যুক্ত আছে অফিসিয়াল নামে নেই।

ডোনাদের পরিবার ফ্রান্সের অত্যন্ত পুরাতন শাসক পরিবার। ফ্রান্সের প্রাচীন বুরবো রাজবংশের উত্তরাধিকারী তারা। ফরাসী বিপ্লবোত্তর কালে ১৮১৫ সালে ফ্রান্সে রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে বুরবো রাজবংশের অষ্টাদশ লুই ক্ষমতায় আসেন। তিনি রাজতন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসলেও রাজতন্ত্রীদের তিনি পছন্দ করেননি, যথাসাধ্য তাদের আমল দেননি। বরং তিনি সাহায্য সহযোগিতা

করেছেন গনতন্ত্রীদের। তার ফলে রাজতন্ত্রীদের প্রবল চাপের মধ্যে থাকলেও তাঁর শাসনকালের অধিকাংশ সময় মানুষের গণতান্ত্রিক সুযোগ-সুবিধা প্রতিষ্ঠিত ছিল। সম্রাট অষ্টাদশ লুইয়ের উত্তরাধিকারী যুবরাজ ডিউক ডি বেরী ছিলেন পিতার চেয়েও গণতন্ত্রী। তিনি রাজতন্ত্রীদের হাতে নিহত হন। এই যুবরাজ ডিউক ডি বেরী ডোনাদের প্রত্যক্ষ উত্তরসূরী। ডিউক ডি বেরীর উত্তরসূরী এই পরিবারকে ফ্রান্সের লোকেরা ভালোবাসে। পরিবারটি প্যারিসের বদলে অধিকাংশ সময় জনগণের মধ্যে গ্রামে বাস করে। দক্ষিণ ফ্রান্সের মন্ট্রেজুতে ডোনাদের একটা বাড়ি আছে।

মিঃ প্লাতিনি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ডোনাকে নিয়ে তাদের জন্যে নির্দিষ্ট চেয়ারে গিয়ে বসলো। তাদের সামনে অনেকগুলো চেয়ার পাতা। মিঃ প্লাতিনি সবাইকে বসতে বললেন।

সবাই বসল। কিন্তু বরাবরের মত সবাই চেয়ারে না বসে সবুজ চত্তরের উপর বিছানো কার্পেটে গিয়ে বসল।

মিঃ প্লাতিনি ও ডোনা এতে আপত্তি করে তাদেরকে চেয়ারে উঠে বসার অনুরোধ করল।

তাদের মধ্য থেকে প্রবীণ সেই বৃদ্ধ উঠে দাড়িয়ে বলল, 'আমাদের মাফ করবেন। আমরা আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে সম্মান প্রদর্শন করছি। আমনারা একটা প্রতীকমাত্র'।

গ্রামবাসী গণ্যমান্যদের মধ্যে জিনার আব্বা মিঃ ফ্রাংক মরিসও ছিল।

কুশল বিনিময় শেষে কিছু গল্পগুজবের পর সবাই উঠল।

একে একে সবাই এসে বাও করল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ফাঁকা হয়ে গেল ডোনাদের সবুজ চত্তর।

'আব্বা, ওদের কাউকে সুর লোরের ঘটনার কথা জিজ্ঞাসা করলে হতো না'।

'হতো। কিন্তু কথাটা আমি তুলবো সবার সামনে। আমরা একটু বিশ্রাম নেই। তারপর ডেকে 'খোঁজ-খবর নেয়া যাবে'।

মিঃ প্লাতিনি এবং ডোনা বাংলোর ভেতরে এল। উঠে এল তারা দু'তলায়। ডোনা তার আব্বাকে দু'তলায় তার কক্ষে রেখে নিজে উঠে গেল তিন তলায় তার কক্ষে।

তিন তলার সর্ব দক্ষিণে ডোনার শোয়ার ঘর। ঘরটির দক্ষিণে একটা ব্যালকনি। ডোনা কাপড় চেঞ্জ করে হাত-মুখ ধুয়ে সাজানো নাস্তা খেয়ে নিয়ে ব্যালকনির ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিল।

ডোনা চেয়েছিল চোখ বন্ধ করে একটু রেস্ট নেবে। কিন্তু বাইরের দৃশ্যের দিকে চোখ পড়ার পর সে আর চোখ ফিরিয়ে নিতে পারল না।

বলা যায় তাদের বাড়ির গা ঘেষেই বয়ে যাচ্ছে এদেঁরে নদী। তারপর দিগন্ত প্রসারিত সবুজ উপত্যকা। আর তাদের বাড়ির দু'পাশ দিয়ে উঁচু-নিচু পাহাড়, টিলার উপর ছবির মত সুন্দর গ্রাম। ঘন সবুজ গাছের ফাকে ফাকে বাড়িগুলিকে পটে আকা ছবির মতই সুন্দর মনে হচ্ছে।

ডোনা সম্মোহিতের মত তাকিয়ে রইল এই অপরূপ দৃশ্যের দিকে।

হঠাৎ কয়েকটা শব্দ এসে ডোনার কানে প্রবেশ করল। একটা নারী কন্ঠ বলছে, 'আবার হাত দিবি না, এতে কোরআনের উদ্ধৃতি আছে'।

তড়াক করে শোয়া অবস্থা থেকে লাফিয়ে উঠল ডোনা। মুসলমানদের কোরআনের কথা বলছে ওরা কারা?

ডোনা এক লাফে গিয়ে রেলিং ঘেঁষে দাঁড়াল। নিচে তাকিয়ে দেখতে পেল, ডোনাদের বাড়ির ধার ঘেঁষে নদী তীরের রাস্তা দিয়ে তিনজন তরুণ-তরুণী এগিয়ে যাচ্ছে। তরুণীটির হাতে একটা বই। ডোনা বুঝতে পারল বই হাতে মেয়েটিই কথা বলে দু'জন তরুণের কাউকে হয়তো বারণ করেছে বইয়ে হাত দিতে। ডোনা ভাবল, এদের কেউ মুসলমান অথবা তিনজনই মুসলমান। এটা ভাবার সাথে সাথেই ডোনার মনে একটা কথা ঝিলিক দিয়ে উঠল, এরা মুসলমান যখন, তখন আহমদ মুসা আশে পাশে কোথাও থাকলে এরা অবশ্যই জানবে। তাছাড়া আহমদ মুসাকে খোঁজার ব্যাপারে এদের কাজে লাগানোও যাবে।

ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই ডোনা রেলিং থেকে মুখ বাড়িয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে, 'হ্যালো, আপনারা কি দয়া করে একটু উপরে আসতে পারেন?'

তিনজনেই এক সঙ্গে উপর দিকে তাকাল এবং দেখতে পেল ডোনাকে। দেখতে পাওয়ার সংগে সংগে নিচে থেকেই তারা সামনের দিকে ঝুঁকে এক সাথে বাও করলো ডোনাকে।

তারপর তিনজনের মধ্যে থেকে মেয়েটি উপরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সম্মানিতা প্রিন্সেস, আপনি ইচ্ছা করলে আমরা অবশ্যই আসব'।

'ওয়েলকাম। খুব খুশী হব আপনারা এলে'।

তারপর ডোনা ব্যালকনি থেকে তার ঘরে ফিরে এসে ইন্টারকমে নিচতলার সার্ভিস পুলকে নির্দেশ দিল ঐ তিনজন মেহমানকে তার ঘরে নিয়ে আসতে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ডোনা তার কক্ষের বাইরে অনেকগুলো পায়ের শব্দ পেল।

ডোনা বেরিয়ে এল ঘর থেকে। দেখল, বেয়ারা ড্রইং রুম খুলে দিচ্ছে। তার পেছনে দাড়িয়ে দু'জন তরুণ ও একজন তরুণী। তিনজন প্রায় সমবয়সী। ডোনাকে দেখেই তাদের চোখে-মুখে একটা সংকোচ ও শ্রদ্ধার ভাব ফুটে উঠল। তারা বাও করলো ডোনাকে।

'ওয়েলকাম, ফ্রেন্ডস'। বলল ডোনা।

ওদেরকে নিয়ে ডোনা তার ড্রইং রুমে গিয়ে বসল।

'আপনারা তো এই গ্রামেরই?' প্রথমেই কথা বলল ডোনা।

'জি'। উত্তর দিল জিনা। তারপর নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, 'আমি জিনা লুইসা' মার্ককে দেখিয়ে বলল, 'ও মার্ক মরিস, আমার ছোট ভাই' এবং ফ্রান্সিসকে দেখিয়ে বলল, 'ও ফ্রান্সিস, আমার বন্ধু'।

আমি 'ডোনা জোসেফাইন'। বলল ডোনা।

'মাফ করবেন প্রিন্সেস, আপনি আমাদের কাছে 'প্রিন্সেস মারিয়া জোসেফাইন লুই'। বলল জিনা সসংকোচে।

'একই কথা'। বলল ডোনা।

'সরি। এক কথা নয় প্রিন্সেস। আপনার পারিবারিক নামের মধ্যে আমাদের জন্যে একটা গৌরব আছে। এর দ্বারা আমাদের অতীত ইতিহাস-ঐতিহ্যের সাথে আমাদের বর্তমানের একটা সংযোগ ঘটে'। বলল জিনা।

'আপনি খুব সুন্দর কথা বলেন। কিন্তু দেখুন, রাজতান্ত্রিক ইতিহাস স্মরণ করার মধ্যে কতটুকু গৌরব আছে?' বলল ডোনা।

'রাজতন্ত্রের যুগে রাজতন্ত্র ছিল, আজ গণতন্ত্রের যুগে গণতন্ত্র। দুইয়ের ঐতিহাসিক মুল্য একই। তাছাড়া মহামান্য সম্রাট অষ্টাদশ লুই সত্যিকার অর্থে গণতন্ত্রীই ছিলেন, সেই যুগে যতটুকু সম্ভব ছিল। আর তাঁর সন্তান এবং আপনাদের প্রত্যক্ষ পুরুষ মহামান্য যুবরাজ ডিউক ডি বেরীকে তো গণতন্ত্রী হওয়ার কারণেই জীবন দিতে হয়েছে। তাকে গোটা দেশ শ্রদ্ধা করে, স্মরণ করে প্রিন্সেস'।

'ধন্যবাদ'। বলল ডোনা।

মুহুর্ত কয়েক চুপ করে থাকল ডোনা। তারপর ওদের দিকে একবার নজর বুলিয়ে বলল, 'আপনাদের নাম শুনে কাউকে মুসলমান বলে মনে হলো না? কিন্তু আপনার মুখ থেকে আমি মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ 'কোরআন'-এর নাম শুনেছি'।

জিনাসহ তিনজনের মুখই মুহুর্তে অন্ধকার হয়ে গেল। নিচু হলো তাদের মুখ। কথা বললো না তারা।

'আপনারা বা আপনাদের মধ্যে কেউ বা গ্রামে কোন মুসলমান আছে?' 'কোরআন'-এর নাম আপনারা কোত্থেকে জানতে পারলেন?'

জিনাসহ তিনজনের মুখই শুকনো হয়ে উঠেছে। তাদের চোখে-মুখে প্রবল একটা অস্বস্তি।

'দেখুন, আমি খারাপ দৃষ্টিতে এ প্রশ্ন করছি না। এ বিষয়টা জানা আমার খুবই প্রয়োজন। আপনারা আমাকে সাহায্য করুন'। এবার অনুরোধ ঝরে পড়ল ডোনার কন্ঠে।

জিনার চেহারায় কিছুটা উজ্জ্বলতা ফিরে এল। কিন্তু ফ্রান্সিসের মুখ তখনও অন্ধকার।

জিনা ফ্রান্সিসের দিকে ইংগিত করে বলল, 'এ মুসলিম। নাম ফ্রান্সিস আবুবকর। আমাদের গ্রামে এই একটা পরিবারই মুসলমান'।

‘ওয়েলকাম’। ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বলল ডোনা। ডোনার মুখে ঈষৎ হাসি। বলল, ‘কিছু মনে করবেন না, আমার প্রশ্নে আপনারা অস্বস্তিবোধ করছিলেন কেন?’

জিনার ঠোটেঁ সলজ্জ হাসি ফুটে উঠল। বলল, ‘সম্মানিতা প্রিন্সেস, আপনি সব জানেন। মুসলিম পরিচয় দেয়া আগের মত আর নিরাপদ নয়। সাম্প্রতিক ফরাসি সরকারগুলো মুসলমানদের একটু বৈরিতার দৃষ্টিতে দেখছে। অতীতে এমনটা ছিল না। আপনি জানেন, স্কুল-কলেজে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের প্রার্থনা করার অধিকার, মাথায় ওড়না দেয়ার অধিকার ইত্যাদি হরণ কথা হয়েছে’।

‘আরো আছে, মুসলমানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় বক্তৃতার উপরও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হচ্ছে, তাদের ধর্মীয় বক্তৃতার উপরও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হচ্ছে, তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তৈরীকে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে’। ঈষৎ হেসে কথাগুলো যোগ করল ডোনা।

জিনাসহ তিনজনের চোখে-মুখেই ফুটে উঠল বিস্ময়। কোন কথা তারা বলল না।

ডোনাই আবার কথা বলল, ‘এর প্রকৃত কারণ কি জানেন? প্রকৃত কারণ হলো, ফ্রান্সের নীতি নির্ধারকরা মনে করেছিলেন মুসলমানদেরকে ইসলাম ভুলিয়ে দেয়া যাবে। কিন্তু শত চেষ্টার পরেও দেখা যাচ্ছে মুসলমানদের মধ্যে ইসলাম আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। তাই ফ্রান্সের ষাট লাখ মুসলমানকে ফ্রান্সের একটা মহল হিংসা করতে শুরু করেছে। এই হিংসারই ফল ঐ পদক্ষেপগুলো’।

‘আপনি প্রিন্সেস মারিয়া জোসেফাইন হয়ে এই কথা বলছেন?’ বলল মার্ক।

‘কেন বলব না? আমি তো ঐ হিংসুকদের দলে নই?’

সেই বইটি তখনও জিনার হাতে।

সে নাড়াচাড়া করছিল বই।

ডোনা কয়েকবার তাকিয়েছে বইটির দিকে। এবার মার্কের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ডোনা বলল, ‘বইটা একটু দেখতে পারি আমি?’

জিনা যেন একটু অপ্রস্তুত হলো। সে এক নজর ফ্রান্সিসের দিকে চেয়ে বইটি তুলে দিল ডোনার হাতে। ডোনা তো অজু করেনি, তার হাতে বই দেবে কিনা এটাই ছিল জিনার দ্বিধা।

ডোনা বইটি হাতে নিয়ে পাতা উল্টাল। প্রথম কভার-পাতা উল্টাতেই কয়েক শিট কাগজ বেরিয়ে পড়ল। শিটগুলো ভর্তি লেখা। হাতের লেখা। লেখাগুলোর দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠল ডোনা। পরিচিত হস্তাক্ষর। আরো একটু ভালো করে দেখল। মুসলমানদের কিছু রীতি-নীতির বিষয়ে লিখা।

লেখাগুলো ভালো করে দেখতে গিয়ে সমগ্র শরীরে একটা তড়িৎপ্রবাহ খেলে গেল। একদম আহমদ মুসার লেখার মতই লেখাগুলো। বুকটা ধক ধক করে উঠল ডোনার। তার কন্ঠ চিরেই যেন বেরিয়ে এল, 'এই লেখা কার?' আর্ত চিৎকারের মত ডোনার কন্ঠ।

জিনা এবং ওরা চমকে উঠল ডোনার কন্ঠস্বরে। চমকে ওঠা ভাব কেটে গেলে ডোনার চেহারায় উত্তেজনা ও অস্থির ভাব ফুটে উঠতে দেখল। ওরা সত্যিই ভয় পেয়ে গেল। কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে ওরা তাকাল ডোনার দিকে।

প্রথম প্রশ্ন শেষ করেই ডোনার আরেকটা প্রশ্ন, 'এটা কি আপনাদের কারও লেখা?'

'না'। শুকনো কন্ঠে জিনা বলল।

'এ গ্রামের কারও'।

'না'।

'তাহলে কে লিখেছে?'

জিনা তৎক্ষণাৎ জবাব দিল না। তার মুখটা পাংশু হয়ে উঠেছে। আহমদ মুসার কথা তারা কাউকে জানায়নি। এটা এর কাছে প্রকাশ করা কি ঠিক হবে। এদের যোগাযোগ সরকারের সাথে আছে, ব্ল্যাক ক্রসের সাথেও থাকতে পারে।

জিনার এসব চিন্তার মধ্যেই ডোনার আরেকটা প্রশ্ন ছুটে এল 'কে লিখেছে, দয়া করে বলুন'।

'আমাদের একজন মেহমান লিখেছিলেন?'

'মেহমান? কি নাম?'

জবাব দিল না জিনা। কি জবাব দেবে সে?

অস্থির ডোনাই আবার প্রশ্ন করল, 'তিনি কি মুসলমান?'

'জি'। জিনা বলল।

'তিনি কি এশিয়ান?'

'জি'। ডোনার প্রশ্নে বিস্ময়ে বিস্ফোরিত হয়ে উঠেছে জিনার চোখ। তার সাথে ভয়ও। তবে সে আশ্বস্ত হচ্ছে ডোনার চোখ-মুখ দেখে। সেখানে ক্রোধ নেই, বিদ্বেষ নেই বরং আছে আশার একটা আকুলতা।

'সে কি আহত ছিল?'

বিস্ময়ে প্রায় বাক-রুদ্ধ জিনা বলল, 'আপনি... আপনি... জানলেন কি করে এসব কথা?'

জিনার এ কথার দিকে ডোনা ভ্রুক্ষেপ মাত্রও করল না। আবেগে-উত্তেজনায় তার ঠোঁট কাঁপছে। কম্পিত কন্ঠে বলল, 'তাঁর নাম কি আহমদ মুসা?'

কোন কথা যোগাল না জিনার কন্ঠে। সে, মার্ক এবং ফ্রান্সিস ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল ডোনার দিকে। জগতের সব বিস্ময় এসে যেন জমা হয়েছে তাদের চোখে। কি করে এটা সম্ভব! কোথায় প্রিন্সেস মারিয়া জোসেফাইন লুই, আর কোথায় বিদেশী মুসলিম মুক্তি সংগ্রামী আহমদ মুসা! আহমদ মুসার নাম কি করে আসে তাদের প্রিন্সেসের মুখ থেকে। শুধু নাম আসা নয়, তাদের প্রিন্সেসের চোখে যে আবেগ এবং আকুলতা তারা দেখতে পাচ্ছে তা নাটকে রোমিওর জন্যে জুলিয়েটের এবং ফরহাদের জন্যে শিরির আকুলতায় তারা দেখেছে।

ডোনা উঠে দাড়িয়ে ছুটে গেল ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকা জিনার কাছে। তারপর কার্পেটের উপর হাঁটু গেড়ে বসে জিনার দু'টি হাত চেপে ধরে বলল, 'বলুন, আমি ঠিক বলেছি'।

জিনা তাড়াতাড়ি চেয়ার থেকে নেমে মাথা ঝুকিয়ে ডোনাকে বাও করে তার পায়ের কাছে বসে বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন, তিনি আহমদ মুসা'।

তারপর উঠে দাড়িয়ে ছুটে গেল ইন্টারকমের কাছে।

মার্ক এবং ফ্রান্সিস চেয়ার থেকে উঠে দাড়িয়ে অভিভূতের মত তাকিয়ে আছে তাদের প্রিন্সেসের দিকে। তারা কিছুতেই ডোনার সাথে আহমদ মুসার কোন হিসেব মেলাতে পারছে না।

ডোনা টেলিফোনে উত্তেজিত কন্ঠে বলল, 'আব্বু, আহমদ মুসার সন্ধান মিলেছে, তুমি এস'।

ইন্টারকম থেকে সরে এসে সবাইকে দাড়িয়ে থাকতে দেখে বলল ডোনা, 'আপনারা বসুন'।

কিন্তু কেউ বসল না। তারা মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে দরজার দিকে। তারা ডোনার আব্বা মিঃ প্লাতিনির অপেক্ষা করছে।

ডোনা বসল তার চেয়ারে।

এই সময় ঘরে প্রবেশ করল মিঃ প্লাতিনি।

জিনা, মার্ক, ফ্রান্সিস ঝুকে পড়ে সসম্মানে বাও করল প্রিন্স মিশেল প্লাতিনি ডি বেরী লুইকে।

ডোনা উঠে দাড়িয়ে তার আব্বাকে স্বাগত জানিয়ে জিনাদের সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দিল এবং বইয়ের ভেতর পাওয়া শিটগুলোর লেখা দেখিয়ে বলল, 'এটা আহমদ মুসার লেখা'। তারপর ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল তার আব্বাকে।

চোখ ভরা বিস্ময় নিয়ে ডোনার আব্বা চেয়ারে বসল এবং সবাইকে বসতে বলল।

ডোনা বসল তার চেয়ারে এবং জিনারা বসল গিয়ে কার্পেটের উপর।

'ও কোথায়?' ডোনার দিকে চেয়েই প্রশ্ন করল ডোনার আব্বা।

'ওঁর এই খোঁজ পেয়েই তোমাকে ডেকেছি আব্বা। আমি ওদের জিজ্ঞাসা করিনি এখনও'। বলে ডোনা তাকাল জিনার দিকে।

জিনা উঠে দাঁড়াল। ডোনা ও ডোনার আব্বার দিকে মাথা ঝুকিয়ে একবার বাও করে বলল, 'মহামান্য স্যার, আহমদ মুসা ভাইয়া গতকাল সকালে চলে গেছেন'।

'চলে গেছেন?' ডোনা ও ডোনার আব্বা এক সাথেই বলে উঠল।

ডোনার আব্বার মুখটা ম্লান হয়ে গেল। আর হঠাৎ করেই যেন চুপসে গেল ডোনার মুখ। হতাশার একটা কালো মেঘ যেন এসে ছেয়ে ফেলল তার চেহারাকে।

'জি হ্যাঁ, স্যার'। বলল জিনা।

'কোথায় গেছেন?' বলল ডোনা। চোখে-মুখে তার আকুল ব্যগ্রতা।

'প্যারিসে'।

'প্যারিসে কোথায়?' বলল ডোনার আব্বা।

'তা বলে যাননি। তবে তিনি একটা ঠিকানা নিয়ে গেছেন'।

'কার ঠিকানা?' বলল ডোনা।

'ঠিকানাটা ব্ল্যাক ক্রস-এর একজন লোকের, যিনি ওমর বায়া সম্পর্কে খোঁজ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন ফিলিস্তিন দুতাবাসকে'।

'ঠিকানাটা কি পাওয়া যাবে?' জিজ্ঞাসা করল ডোনা।

'ঠিকানাটা আব্বা দিতে পারেন'। বলল জিনা।

'কে তোমার আব্বা?' জিজ্ঞাসা করল ডোনার আব্বা।

'মিঃ ফ্রাংক মরিস'। জবাব দিল জিনা।

'ও আচ্ছা'। বলল ডোনার আব্বা।

ডোনা ও ডোনার আব্বা নিচু স্বরে মত বিনিময় করল। তারপর ডোনার আব্বা জিনাকে বলল, 'তোমার বাড়িতে তোমার আব্বার কাছে আমাকে কি নিয়ে যাবে?'

জিনা সলজ্জ মুখে ডোনার আব্বাকে বাও করে বলল, 'লজ্জা দেবেন না মহামান্য স্যার, আমার আব্বাই আসবেন। কখন আসতে হবে স্যার?'

'এখনি হলে ভাল হয়'। বলল ডোনার আব্বা।

মার্ক জিনাকে বলল, 'আপা, আমি ও ফ্রান্সিস যাই আব্বাকে নিয়ে আসি'।

'ধন্যবাদ মার্ক, তাহলে এখনি তোমরা যাও'।

মার্ক ও ফ্রান্সিস ডোনা ও ডোনার আব্বাকে বাও করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ডোনার আব্বা উঠে দাড়াল। বলল, 'তোমরা বসে গল্প কর। একটা জরুরী কাজ সেরে আসছি'। বলে ডোনার আব্বা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ডোনাও উঠল। জিনাকে কার্পেট থেকে তুলে তাকে নিয়ে সোফায় বসল।

জিনা তার পাশাপাশি বসতে অস্বীকার করে বলল, 'যার যে স্থান তাকে সে স্থান দেয়াই সভ্যতা। আমরা ফরাসীরা অসভ্য নই'। বসে জিনা ডোনার পাশ ঘেঁষে কার্পেটে বসে পড়ল।

ডোনা জিনার একটা হাত হাতে নিয়ে বলল, 'তোমার কাছে আমার অনেক জিজ্ঞাসা'।

'বলুন'। বলল জিনা।

'আহমদ মুসা তোমাদের ওখানেই ছিল তাই না?'

'হ্যাঁ, কি করে জানলেন?'

'তাকে তোমার ভাই বলা থেকে। এখন বল ওর কাহিনী'।

'আমরা সুর লোরের এক পাহাড়ে পিকনিক করছিলাম। আম্মা, আব্বা, আমি ও মার্ক। দূরবীণে দেখছিলাম চারদিকটা। হঠাৎ দেখলাম একটা গাড়িকে আরেকটা গাড়ি তাড়া করে এল। সামনের পাহাড়ে তারা নামল। তারপর সংঘাত হলো দীর্ঘ আধ ঘন্টা ধরে। একদিকে একজন, অন্য দিকে আর সবাই। জিতে গেল একজনের পক্ষটাই। ও পক্ষে দশজন নিহত হলো। কিন্তু ঐ একজন পায়ে গুলীবিদ্ধ হয়ে আহত হলো। আমরা দূরবীণে সব দেখলাম। শেষে দেখলাম, ঐ একজন হামাগুড়ি দিয়ে গাড়িতে উঠে গাড়ি চালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। গাড়িটা এসে ধাক্কা খেল আমাদের পাহাড়ের গোড়ায়। আমরা সবাই ছুটে গেলাম। দেখলাম লোকটি ড্রাইভিং সিটে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। আমরা উদ্ধার করে নিয়ে এলাম তাকে। ইনিই যে আহমদ মুসা তা আমরা জানতে পারলাম তিনি চলে যাবার দু'দিন আগে'।

'ঔ সংজ্ঞাহীন হয়েছিলেন কেন?' ভারী ও কাঁপা কন্ঠস্বর ডোনার।

কন্ঠস্বরে চমকে উঠে জিনা তাকাল ডোনার দিকে। দেখল, তার দু'চোখ দিয়ে নিঃশব্দে অশ্রু গড়াচ্ছে। জিনা আগেই বুঝেছিল ব্যাপারটা। কিন্তু সম্পর্কটা এত গভীর তা কল্পনা করেনি। তার মনে একটা প্রশ্ন কাঁটার মত বিঁধছিল, সেটা আরও তীব্র হয়ে উঠল। তাদের প্রিন্সেস-এর সাথে বিদেশী ও মুসলিম আহমদ মুসার সম্পর্ক হলো কি থেঁতলানো....'।

জিনা কথা শেষ করতে পারলো না। ডোনা তার মুখে হাত চাপা দিয়ে বন্ধ করে দিল তার কথা। বলল, 'এসব আর শুনতে পারছি না বোন। তার চেয়ে বল কিভাবে ছিলেন, কি কি করেছেন। তোমরা তাকে কেমন দেখেছ'।

জিনা ধীরে ধীরে তার মনে থাকা প্রতিদিনের সব কাহিনী, সব কথা বর্ণনা করল। আহমদ মুসাকে কেন্দ্র করে ফ্রান্সিসের সাথে তার গন্ডগোলের কথা, পরে ফ্রান্সিস লজ্জিত হবার কথা কিছুই সে বাদ দিল না। তারপর বলল, 'সবাই একমত, ওঁর চেয়ে বিস্ময়কর মানুষ কেউ কোথাও দেখেনি। মানুষকে আপন করে নেবার অদ্ভুত ক্ষমতা তার'।

থামল জিনা।

এই সময় ইন্টারকম কথা বলে উঠল। ডোনার আব্বার কন্ঠঃ 'মা, জিনার আব্বা মিঃ ফ্রাংক এসেছিলেন। ঠিকানা পাওয়া গেছে'।

'তাহলে এখনই আমরা প্যারিস রওয়ানা হবো আব্বা। তুমি ড্রাইভারকে রেডি হতে বল'।

'ঠিক আছে মা'।

বন্ধ হয়ে গেল ইন্টারকম।

'আপনারা এখনি যাবেন প্রিন্সেস?'

'দেখ, তুমি আহমদ মুসার বোন নও?'

'হ্যাঁ'। বলল জিনা।

'তাহলে তুমি আমার বোন নও?'

'হ্যাঁ'।

'এরপর প্রিন্সেস আর বলবে?'

জিনা মাথা ঝুকিয়ে বাও করল ডোনাকে এবং বলল, 'বলব না'।

একঘন্টার মধ্যে ডোনা ও ডোনার আব্বা তৈরী হয়ে বেরিয়ে এল।

গাড়ি প্রস্তুত।

মার্ক ও ফ্রান্সিস দাড়িয়ে আছে চত্তরের এক পাশে। গ্রামের কয়েকজন গণ্যমান্য লোকও এসেছে। জিনা ডোনার পাশে।

সবাই বাও করে বিদায় জানাল তাদের প্রিন্স এবং প্রিন্সেসকে।

জিনা বাও করে সোজা হয়ে দাড়াল ডোনা তাকে জড়িয়ে ধরে কানে কানে বলল, ‘আহমদ মুসাকে দাওয়াত দিয়েছ, আমাকে দিলে না?’

‘কিসের দাওয়াত?’ বলল জিনা।

‘তোমার ও ফ্রান্সিসের শুভদিনের?’

মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে উঠল জিনার। বলল, ভাইয়া কি ভাবীকে ছেড়ে আসতে পারেন?

‘ওরে দুষ্ট’ বলে পিঠে একটা কিল দিয়ে ডোনা গাড়িতে গিয়ে উঠল।

# ৬

পূর্ব প্যারিস। শোন নদীর প্রথম ব্রীজ থেকে দু'শ গজ উত্তরে একটা অখ্যাত গলির মুখে দাড়িয়ে সুদৃশ্য প্রাসাদ তুল্য একটা বাড়ি। দাড়িয়ে আছে শোনের দিকে মুখ করে। এই বাড়িরই শীর্ষ তিনটি ফ্লোর নিয়ে ব্ল্যাক ক্রস-এর প্যারিস হেডকোয়ার্টার। নিচের ফ্লোরগুলোকে বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করছে ব্ল্যাক ক্রস।

শীর্ষ ফ্লোরের একটা বিরাট কক্ষ।

সেই কক্ষের বিরাট টেবিলের পেছনে দৈত্যাকার রিভলভিং চেয়ারে ঠেস দিয়ে দাড়িয়ে ব্ল্যাক ক্রস এর প্রধান পিয়েরে পল রাগে ফুসছে। আর টেবিলের ওপাশে ধরাপড়া চোরের মত পাংশু মুখে দাড়িয়ে আছে ফ্রান্স এলাকার ব্ল্যাক ক্রস অপারেশন কমান্ডার মিঃ জিয়ান টুর্গো।

মিঃ পিয়েরে পল ক্রোধে চোখ-মুখ লাল করে তীব্র কন্ঠে বলছিল, 'কে একজন লোক প্যারিসে আমাদের তিনজনকে মারল, জাহাজে হত্যা করল দশজনকে, নানতেজের ঘাটিতে আরও তিনজনকে এবং সুর লোরেতে হত্যা করল আরও নয় জনকে, আর তোমরা বসে ঘোড়ার ঘাস ঘাটছ!'

'স্যার লোকটাকে ঘরেও আটকানো যায়নি'। মুখ কাঁচু-মাচু করে বলল জিয়ান।

'আটকানো যাবে কেন? তোমরা তো শেয়ালের বাচ্চা, আর সে সিংহের বাচ্চা। লজ্জা করে না এসব কথা বলতে?'

'স্যার, আমাদের লোকদের চেষ্টার কোন ক্রুটি ছিল না। তাদের জীবন দেয়াই তো তার প্রমাণ'।

'আর বলো না এসব কথা। মরে তো গরু ছাগল ধরনের লোকরাই'।

'লোকটা ভয়ানক ধূর্ত স্যার?'

'এর অর্থ তোমরা ভয়ানক বোকা? তার নামে তোমরা জানতে পেরেছ?'

‘না স্যার’।

‘অপদার্থের দল। গোটা একটা রাত, একটা দিন তোমাদের হাতে ছিল লোকটা, আর তার নাম জানতে পারনি!’

‘স্যার, যারা তার সাথে কথা বলেছে তারা কেউ বেঁচে নেই স্যার।

‘লজ্জা করছে না এসব কথা বলতে। তাকে খুজে বের করার কি ব্যবস্থা করলে?’

‘তার চেহারার সঠিক বর্ণনা কেউ দিতে পারছে না স্যার। ব্ল্যাক ক্রস-এর যে ড্রাইভার তাকে সুর লোরে নিয়ে গিয়েছিল, সে বলছে লোকটির চেহারার দিকে ভালো করে সে তাকায়নি। আর জাহাজের যারা বেঁচে আছে, তারা বিভিন্ন বর্ণনা দিচ্ছে। তারা বলছে তারা নাকি লোকটার মুখের দিকে তখন তাকাবারই সাহস পায়নি’।

‘তোমার লোকেরা এমন অপদার্থ হলে তুমি কি? বড় অপদার্থ নও? জান লোকটা কোন দেশী?’

‘স্যার, কেউ বলে তুর্কি, কেউ বলে চীনা, কেউ বলে আরবী, কারও কারও মতে সে বলকান কিংবা ইউরোপেরও হতে পারে’।

টেবিলে একটা প্রচন্ড ঘুষি মেরে চোখে আগুন ঝরিয়ে বলল, ‘গর্দভ, একজন লোকের এত দেশের চেহারা হয় কি করে?’

‘স্যার, ফরাসি গোয়েন্দা দফতরের সাহায্য নিলে হয় না। ওদের হাতে সব ক্রিমিনালের ছবি আছে। সেগুলো দেখলে হয়তো আইডেনটিফাই করা যাবে’।

‘ও! তুমি দেখছি একজন ফুঁচকে খুনিকে কার্লোস বানাতে চাও!’

এই সময় দরজায় নক হলো।

মিঃ পিয়েরে সোজা হয়ে দাড়িয়ে চেয়ারে ফিরে এল। তাকাল পাশের ছোট্ট টিভি স্ক্রিনের দিকে। তার মুখটা প্রষন্ন হয়ে উঠল। চেয়ারের হাতলের সাথে সেট করা একটা বোতাম চাপ দিল পিয়েরে পল। অমনি দরজা খুলে গেল।

ঘরে প্রবেশ করল ‘ওকুয়া’ প্রধান মাইকেল সোম্বা।

‘যাও কাজ করগে। জিয়ান টুটোর দিকে তাকিয়ে বলল পিয়েরে পল।

জিয়ান বেরিয়ে গেল।

মিঃ পিয়েরে উঠে দাড়িয়ে স্বাগত জানাল মাইকেল সোম্বাকে।

দু'জন বসল।

প্রথমেই কথা বলল সোম্বা, 'কেমন আছেন মিঃ পল?'

'না, ভালো নেই মিঃ সোম্বা। গত কয়েকদিন আমরা আমাদের তিন ডজন লোক হারিয়েছি'।

'হ্যাঁ, আমি শুনলাম এই কথা। উপদ্রবটি কোত্থেকে আমদানি হলো?'

'আমরা বুঝতে পারছি না। আমাদের ঘাটিতে ঢুকেছিল চুরি বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে। আমাদের হাতে ধরা পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত ওর হাতে আমাদের ৩৪ জন লোক মারা পড়ল, কিন্তু তাকে আমরা কিছুই করতে পারলাম না'।

'সাংঘাতিক ব্যাপারতো!'

'হ্যাঁ, এ ব্যাপার নিয়েই এতক্ষণ ধমকালাম আমাদের অপারেশন কমান্ডারকে। যাক, কাজের কথায় আসা যাক'।

'ফাদার ফ্রান্সিস বাইককে যে কথা বলেছিলেন, সে ব্যাপারে নাকি অনেকদুর এগিয়েছেন?'

'অনেকদুর মানে আসল কাজ হয়ে গেছে'।

'সেটা কি?'

'ব্যাপারটা আমিও ঠিক বুঝি না। মানুষের উপর মনোদৈহিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাকে হাতের মুঠোয় আনার বৈজ্ঞানিক কৌশল আবিস্কৃত হয়েছে। ওমর বায়ার উপর আমরা এই কৌশলই প্রয়োগ করতে চাচ্ছি। এতে সে স্বেচ্ছায় আমাদের হাতে চলে আসবে এবং আমরা তাকে যে আদেশ করব তাই সে পালন করবে'।

'এটা সম্ভব?' চোখ কপালে তুলে বলল মাইকেল সোম্বা।

'সম্ভব' কিন্তু এই জটিল কাজের জন্যে উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ কয়েকজন মাত্র দুনিয়াতে আছেন। এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন বিজ্ঞানী বেনহাম। তিনি ৪০ বছর ধরে ইহুদিদের এই প্রজেক্টের প্রধান হিসেবে কাজ করছেন'।

'এর উপর ইহুদিদের প্রজেক্ট আছে?'

‘হ্যাঁ আছে’।

‘কেন?’

হাসল পিয়েরে পল। বলল, ‘আপনি শিশুর মত প্রশ্ন করলেন মিঃ সোম্বা। জুইস ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন (JIO) ইহুদিবাদ বিরোধীদের কুপোকাত করার জন্যে ‘মনোদৈহিক নিয়ন্ত্রণ’কেই প্রধান অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। আরব ও মুসলিম জগতের শত শত নেতার উপর তারা এই পদ্ধতির প্রয়োগ করেছে। এটা আমার বানানো কথা নয় মিঃ সোম্বা। ফিনল্যান্ডের ‘হেলসিংকি বিশ্ববিদ্যালয়’- এর অধ্যাপক B. Kwan Choe তার ‘The Social Reality of Artificial Mind and Body Control’ শীর্ষক ১৩৪ পৃষ্ঠার এক নিবন্ধে বলেছেন, ‘ইহুদিবাদীরা তাদের নিজেদের হাত নিরাপদ রাখার জন্যে ‘মনোদৈহিক নিয়ন্ত্রণ’ ব্যবস্থার মাধ্যমে অন্যকে তাদের বাঞ্ছিত হত্যা ও অন্যান্য অপরাধ সংঘটনে বাধ্য করে। কেনেডি, রবার্ট কেনেডি, মার্টিন লুথার কিং, জর্জ ওয়ালেস-এর হত্যাকান্ড এই ব্যবস্থারই ফল। ইহুদিবাদ বিরোধী বহু আরব নেতাকে তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা বিসর্জন দিতে হয়েছে, এমনকি তারা জীবন দিয়েছে এই ব্যবস্থার ফাদে পড়েই। এসব দ্বারা ইহুদিবাদীরা তাদের বড় বড় স্বার্থ হাসিল করেছে। সুতরাং ‘কেন’ তাদের প্রজেক্ট, এ জিজ্ঞাসার কোন অবকাশ নেই’।

‘কিন্তু এত বড় অস্ত্র ইহুদিরা মনোপলি করে রেখেছে। আমরা এর সন্ধান পাইনি কেন?’

‘মিঃ সোম্বা, বুঝতে পারছেন এসব কাজও তো ওদের মনোপলি। ওরা যেভাবে ওদের জাতির জন্যে কাজ করে, আমরা করিনা। জাতির জন্যেই তারা এ অস্ত্রের সন্ধান করেছে এবং প্রয়োগ করছে’।

‘কেন, জাতির জন্যে তো আমরাও কাজ করছি? গোটা দুনিয়াতেই আমাদের খৃষ্টান মিশন আছে, আমাদের এনজিও আছে। কিন্তু আমরা তো এ অস্ত্রের চিন্তা করি নি’।

‘না করার একটা কারণ হলো, আমাদের খৃষ্টানদের সংখ্যা বেশী, শক্তিতেও বড়। সুতরাং আমরা যা চাই তা এমনিতেই করতে পারি। কিন্তু

ইহুদিদের সংখ্যা খুব অল্প। ধর্মান্তরের মাধ্যমে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধিরও কোন উপায় নেই। কারণ বনি ইসরাইল বংশের লোক হওয়া ছাড়া কেউ ইহুদি হতে পারে না। সুতরাং খুব কম সংখ্যক মানুষ নিয়ে তারা তাদের দুনিয়া জোড়া স্বার্থ সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের চেষ্টা করছে। এজন্যে বৃদ্ধিই তাদের প্রধান হাতিয়ার। 'মনোদৈহিক নিয়ন্ত্রণ' এই বুদ্ধিবৃত্তিক হাতিয়ারেরই একটি'।

'চমৎকার, চমৎকার বলেছেন মিঃ পিয়েরে পল। ইহুদিদের মত প্রয়োজন এখন আমাদেরও দেখা দিয়েছে'।

'ঠিক বলেছেন। প্রয়োজন আমাদেরও দেখা দিয়েছে। আমাদের সংখ্যা, সামর্থ, অর্থ সবই আছে। কিন্তু মুসলমানদের আদর্শ- বিশ্বাসের মোকাবিলা করার কোন অস্ত্র আমাদের নেই। এই ক্ষেত্রেই আমরা প্রচন্ড রকম মার খেয়ে যাচ্ছি। আমাদের এই পরাজয় এড়াবার জন্যেই ইহুদিদের পথ আমাদের অনুসরণ করা দরকার। এই ক্ষেত্রে ওমর বায়া হবে আমাদের প্রথম শিকার'।

'ধন্যবাদ মিঃ পিয়েরে। আমরা এ জন্যে আপনার কাছে চির কৃতজ্ঞ থাকব। আমরা যদি, ওমর বায়াকে হাতের মধ্যে এনে তাকে দিয়েই কাজ সারাতে পারি, তাহলে সেটা যে কি আনন্দের হবে। আমাদের বদনামও অনেক চলে যাবে। মুসলমানরা প্রপাগান্ডা করে, আমরা নাকি নানা ছলে বলে কৌশলে মুসলমানদের ভুমি দখল করে চলেছি। ওমর বায়া যদি নিজেই গিয়ে তার জমি আমাদের লিখে দেয়, তাহলে ঐ প্রপাগান্ডার মুখে প্রথমবারের মত কিছু ছাই গিয়ে পড়বে'।

'কিন্তু এই লাভের জন্যে বিরাট মূল্যও দিতে হবে মিঃ সোম্বা'।

'কি মুসা?'

'আমাদের সাথে আপনাদের যে টাকার চুক্তি, বিজ্ঞানী বেনহামের সম্মানী তার বাইরে হবে'।

'আমরা রাজি। কত টাকা?'

'আনুসঙ্গিক সব খরচ সমেত মাত্র দুই লাখ ডলার'।

'রাজী, মিঃ পিয়েরে'।

'চলুন, উঠা যাক'।

'কোথায়?'

‘বিজ্ঞানী ডঃ বেনহামের সাথে দেখা করতে’।

‘ডঃ বেনহাম? কোথায় উনি?’

‘উনি তো এসেছেন। আনা হয়েছে তাকে। তিনি হোটেলে আমাদের অপেক্ষা করছেন’।

‘হিপ হিপ হুররে। চলুন তাহলে’। বলে শিশুর মত চিৎকার করে উঠে দাঁড়াল মিঃ সোম্বা।

উঠল মিঃ পিয়েরে পলও। হোটেলে পৌছাল তারা। নক করল গিয়ে ডঃ বেনহামের কক্ষে।

ভেতর থেকে কোন সাড়া না পেয়ে মিঃ পিয়েরে চাপ দিল দরজায়।

দরজা খোলাই ছিল। খুলে গেল।

ঘরে প্রবেশ করল মিঃ পিয়েরে পল এবং মিঃ মাইকেল সোম্বা।

বিজ্ঞানী ডঃ বেনহাম তার টেবিলে বসে বই পড়ছিল।

ডঃ বেনহাম দীর্ঘকায়। হাল্কা-পাতলা গড়ন। সেমেটিক চেহারা। অর্থাৎ ডঃ বেনহাম একজন ইহুদি।

বইয়ের মধ্যে ডুবেছিল ডঃ বেনহাম।

মিঃ পিয়েরে তার দিকে এগিয়ে বলল, ‘গুড মর্নিং ডঃ বেনহাম’।

ডঃ বেনহাম মাথা তুলে বলল, ‘গুড মর্নিং’। কিন্তু আসন থেকে উঠলেন না ডঃ বেনহাম। ইংগিতে বসতে বলল সামনের সোফায়। ডঃ বেনহামের প্রশ্ন বোধক দৃষ্টি গিয়ে পড়ল মাইকেল সোম্বার উপর।

মিঃ পিয়েরে বলল, ‘ইনি মিঃ মাইকেল সোম্বা। যে কাজের জন্যে আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি, সে কাজটা এদেরই’।

ডঃ বেনহাম ঘড়ির দিকে চেয়ে বলল, ‘কাজের কথায় আসা যাক মিঃ পিয়েরে’।

‘জি, আমরা প্রস্তুত’।

‘আমি কিছু শুনেছি, তবু এখন বলুন আপনারা কি চাচ্ছেন?’

‘ওমর বায়া একজন মুসলিম যুবক। তার বাড়ি ক্যামেরুন। সোম্বাদের এস্টেটের মাঝখানে ওমর বায়ার দশ হাজার একর জমি আছে। এই জমিটা ওমর

বায়া স্বেচ্ছায় গিয়ে ‘আর্মি অব ক্রাইস্ট অব ওয়েস্ট আফ্রিকা’র কাছে হস্তান্তর করবে। এই ব্যবস্থা আপনি করবেন’।

‘জমি হস্তান্তরে কেন রাজী নয় ওমর বায়া?’

‘প্রথম কারণ জমি বিক্রির কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু আসল কারণ হলো, তারা বলছে খৃষ্টানরা এই ভাবে ভুমি কিনে বা দখল করে গোটা দক্ষিণ ক্যামেরুন শুন্য করে ফেলেছে। এখন ওমর বায়ার জমিটুকু বিক্রি হয়ে গেলেই গোটা দক্ষিণ ক্যামেরুনে মুসলমানদের অস্তিত্ব শেষ হয়ে যায়। এই কারণেই ওমর বায়া জমি বিক্রিতে রাজী নয়। অন্যদিকে এই জমি না হলে খৃষ্টানদের পরিকল্পনা পূর্ণ হয় না, শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে অস্তিত্বও হুমকির সম্মুখিন হতে পারে’।

‘বুঝেছি। এখন বলুন ওমর বায়া লেখা পড়া কি জানে?’

প্রশ্নটির উত্তর মিঃ পিয়েরে পলের জানা নেই। সে তাকাল মিঃ সোম্বার দিকে।

সোম্বার মুখেও বিব্রত ভাব ফুটে উঠল। বলল, ‘এ ব্যাপারে সঠিক কোন তথ্য আমার জানা নেই’।

‘সে কি বিবাহিত’।

‘জি না’। বলল সোম্বা।

‘এক্ষেত্রে তার কোন চয়েস আছে? অর্থাৎ কাউকে সে ভালবাসে কিনা?’

‘এটাও আমাদের জানা নেই’।

‘সে নিয়মিত প্রার্থনা ও ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে কিনা?’

‘এটাও জানা নেই’ বলল সোম্বাই।

‘এছাড়া অন্য কোন ধরণের লেখা ও সাহিত্য সে পছন্দ করে?’

‘জানা নেই জনাব’।

‘আনন্দের সময় কাকে সে সাথী হিসেবে নেয়? আবার দুঃখ ও বিপদের সময় কার উপর সে নির্ভর করে?’

‘আমরা জানি না’।

‘এই যে জমি সে দিচ্ছে না, এটা তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত, না কারও বুদ্ধিতে সে এটা করছে?’

‘এই ক্ষেত্রে সে তার পিতাকে অনুসরণ করছে। তার পিতাও এ ব্যাপারে আপোশহীন ছিল’।

‘সে অন্তঃমুখী ধরণের লোক, না বহিঃমুখী?’

‘সে খুব চাপা ধরণের ছেলে। কম কথা বলা অভ্যাস’।

‘জীবন যাপনের ব্যাপারে ইসলাম ধর্মের বহু বিধি-বিধান ও আদেশ-নিষেধ আছে। সে কি এসব পুরোপুরি মেনে চলে?’

‘বন্দী অবস্থায় নামায তাকে পড়তে দেখা যাচ্ছে। তবে নিয়মিত পড়ে কিনা জানি না। ধর্মের সব নীতি ও বিধান মেনে চলে কিনা বলতে পারব না। তবে একথা ঠিক যে, ইসলাম ধর্মের প্রকৃত ও পূর্ণ শিক্ষা অর্জনের সুযোগ ক্যামেরুনে নেই’।

‘সে কি হজ্জ করেছে?’

‘আমরা জানি না’।

‘কতকগুলো মানুষের প্রকৃতি এমন আছে যারা শক্তিকেও প্রতিরোধ করতে পারে, আবার আদর এবং প্রশংসাকেও প্রতিরোধ করতে পারে। আবার কেউ আছে শক্তিকে সে প্রতিরোধ করতে পারে, কিন্তু আদর বা প্রশংসার কাছে ভেঙে পড়ে। ওমর বায়া কোন ধরণের লোক?’

‘শক্তি প্রয়োগকে ওমর বায়া পরাভূত করেছে কিন্তু আদরের ব্যাপারটা পরীক্ষা করা হয় নি’।

‘ওমর বায়া যে স্কুল বা কলেজে পড়তেন, সেখানে তিনি নিয়মিত ছিলেন কিনা?’

‘আমরা এটা পরীক্ষা করিনি’।

‘পোষাক-পরিচ্ছেদ, চলা-ফিরা ও সাজান-গোছানোতে সে কি টিপ-টপ?’

‘এ তথ্যও আমাদের কাছে নেই’।

‘সে কোন রংয়ের পোষাক পরে কিংবা কোন রং পছন্দ করে তা কি আপনারা জানেন?’

‘খোঁজ না নিয়ে বলা যাবে না’।

‘কোন ধরণের খাবার সে পছন্দ করে?’

'এটাও আমাদের জানা নেই'।

'আচ্ছা আপনারা তো তার উপর অনেক দৈহিক নির্যাতন চালিয়েছেন। সে কি মুখ বুজে সব সহ্য করার ক্ষমতা রাখে, না মাঝে মাঝে চিৎকার করে?'

'মাঝে মাঝে চিৎকার করেছে'।

'তার হাতের লেখা দেখেছেন? তার হাতের লেখা কি পরিচ্ছন্ন, স্পষ্ট ও সমমাত্রিক, না বিশৃঙ্খল? একই সময়ে বা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের লেখা হয় কিনা, বানান ভুল করা তার অভ্যেস কিনা?'

'দুঃখিত এ তথ্য আমাদের জানা নেই'।

'তার হার্টবিট, রক্তচাপ, হরমোন, চোখের তারার মাপসহ দৃষ্টিশক্তি ইত্যাদি আপনারা রেকর্ড করেছেন কি?'

'না, এগুলো আমরা প্রয়োজন মনে করিনি'।

বিজ্ঞানী ডঃ বেনহাম আর কোন প্রশ্ন করল না। একটুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, 'মুসলমানদের বিরুদ্ধে আপনাদের লড়াইয়ে আমি আপনাদের সাহায্য করতে রাজী হয়েছি এবং সাহায্য করব। কিন্তু আমার এ সাহায্যের পথটা খুবই জটিল। এজন্যে আপনাদেরকেও কিছু কাজ করতে হবে'।

একটু থামল ডঃ বেনহাম। তারপর আবার শুরু করল, 'মনোদৈহিক নিয়ন্ত্রণ আরোপের ব্যাপারটা একটা জটিল প্রক্রিয়া। যাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাই, ব্রেনওয়েভ ট্রান্সমিশন এবং অপটো-ইলেক্ট্রনিক্যাল কনট্রোল কৌশলের মাধ্যমে ভেতর থেকে তার মনোদৈহিক পরিবর্তন আনতে হবে। এজন্যে তার স্বভাব-প্রকৃতি, মেজাজ-মর্জি, বিশ্বাস-কর্ম ইত্যাদি সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। তাহলে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার কাজটা সহজ হয়ে যায়। সুতরাং যে প্রশ্নগুলো আমি করলাম তার জবাব সংগ্রহের চেষ্টা করুন। ওমর বায়াকে আপনারা কোথায় রেখেছেন?'

'আমাদের এক ঘাটিতে বন্দী আছে'।

'বন্দী যখন হয়ে গেছে, তখন ছেড়ে দিলে তার উপর কাজ করার সুযোগ হবে না। সুতরাং বন্দী তাকে রাখতে হবে কিন্তু তাকে বন্দী পরিবেশে বাঁধা যাবে না। অর্থাৎ ঐ পরিবেশে থাকলে সে অহরহ বন্দীত্বের চাপ অনুভব করবে এবং

একটা প্রতিরোধ স্পৃহা তার মধ্যে জাগরুক থাকবে, সে পরিবেশে তাকে রাখা যাবে না’।

‘সেটা কিভাবে সম্ভব?’ বলল পিয়েরে পল।

‘বলছি। তাকে এমন জায়গায় রাখতে হবে যেখান থেকে তার পালাবার সুযোগ থাকবে না। কিন্তু ভেতরে সে তার বাড়ির মতই স্বাধীন পরিবেশে থাকবে। এ ঘর থেকে সে ঘরে যাওয়া, টয়লেট ড্রইং রুমে যাওয়া, ব্যায়াম পায়চারী করা, ইচ্ছা ও পছন্দমত খাওয়া, বই পড়া, গান-বাজনা করা, গল্প ও হাসি-ঠাট্টা করা, ফিল্ম দেখা, ইত্যাদির তার সুযোগ থাকতে হবে। যাতে করে তার মনের উপর কোন চাপ না থাকে। আর তাকে একজন উপযুক্ত সংগী দিতে হবে। সে সুন্দরী, বুদ্ধিমতি ও বাকপটু হবে। তাকে নিয়োগ করা হবে ওমর বায়ার পরিচারিকা হিসেবে। কিন্তু ওমর বায়াকে দৈহিক ভাবে জয় করাই হবে তার কাজ। ওমর বায়ার চরিত্র যদি নষ্ট করা যায়, তাহলে তার আদর্শিক প্রতিরোধ ধ্বসে পড়বে। সেই পরিবেশে তার উপর মনোদৈহিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার কাজ সহজ হবে। আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি, আদর্শবাদী মুসলমান, এমনকি আধা আদর্শবাদী মুসলমানকেও ইচ্ছামত মনোদৈহিক নিয়ন্ত্রণে আনা যায় না। তাদের মানসিক প্রতিরোধটা এতটা সবল ও সক্রিয় থাকে যে বিপরীতমুখী ব্রেনওয়েভ ট্রান্সমিশন এবং অপটো-ইলেক্ট্রনিক্যাল কনট্রোল প্রচেষ্টা বার বার তার কাছে ধ্বসে পড়ে। এ জন্যে সব ক্ষেত্রেই প্রথম প্রদ্যোগ নেয়া হয়েছে মুসলমানদের চরিত্র নষ্ট করার। মদ, টাকা, সুন্দরী নারী- এই তিনটিকেই ব্যবহার করা হয়েছে তাদের নষ্ট করার জন্যে। সত্যিকার আদর্শবান মুসলমান যারা, তাদের ক্ষেত্রে এ অস্ত্রও কোন কাজ দেয়নি। তবে আধা আদর্শনিষ্ঠরা আদর্শহীনদের মতই কিছুটা সুযোগ সন্ধানী হয়। তাদের ক্ষেত্রে এই তিনটি অস্ত্র ব্যবহার করে ফল পাওয়া গেছে। তাদের চরিত্র নষ্ট করার পর তাদেরকে খুব সহজেই মনোদৈহিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এনে যা ইচ্ছে তাই করানো হয়েছে। ওমর বায়ার ক্ষেত্রে অর্থ ও মদ কোন কাজ দেবে না। সুন্দরী ও বুদ্ধিমতি নারী দিয়ে তাকে সহজেই জয় করা যাবে, কারণ সে অবিবাহিত। আপনাদের এই চেষ্টাই করতে হবে’।

‘আপনার কাজ কখন শুরু হবে?’ বলল মিঃ পিয়েরে পল।

‘ওমর বায়াকে নতুন পরিবেশে স্থানান্তর করার পর আমার কাজ শুরু হবে। যে মেয়েকে ওমর বায়ার সংগী নির্বাচন করবেন, তার কাছ থেকে আমি যদি সহযোগিতা পাই, তাহলে দ্রুত ফল পাওয়া যাবে। সুতরাং মেয়েটির সিলেকশন ভাল হওয়া চাই’।

‘চিন্তা করবেন না, ব্ল্যাক ক্রস-এর মহিলা স্কোয়াড সবদিক দিয়েই যোগ্য। তাছাড়া তাদের যোগাযোগের মধ্যে বহু ভালো মেয়ে রয়েছে। টাকা হলে বাঘের চোখ মিলে মিঃ বেনহাম’। বলল পিয়েরে পল।

‘আর কিছু?’ বলল ডঃ বেনহাম।

‘আর কিছু নেই ধন্যবাদ’। বলে মিঃ পিয়েরে পল উঠে দাঁড়াল। উঠল মিঃ সোম্বাও।

বিজ্ঞানী ডঃ বেনহাম আবার মনোযোগ দিল তার বইতে।

ওমর বায়া লক্ষ্য করছিল, তার সাথে ব্ল্যাক ক্রস-এর লোকদের খারাপ ব্যবহার কমে গেছে। একটু ভালো খাবার-দাবারও পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ ব্ল্যাক ক্রসের লোকরা তার সাথে খুবই ভালো ব্যবহার করতে লাগলো। খাবারের মানও হঠাৎ উন্নত হয়ে গেল। সে বিস্মিত হয়ে ব্ল্যাক ক্রসের একজন লোককে, যে তাকে সেদিন খাবার দিতে এসেছিল, জিজ্ঞাসা করল। লোকটি বলল, ‘আমরা কিছু জানি না স্যার। মানুষের মমতা সব সময় এক রকম থাকে না। শত্রু মিত্র হয়ে যায়, মিত্রও শত্রু হয়ে যায়’।

ওমর বায়া ভেবে পেল না, তার সম্পর্কে ব্ল্যাক ক্রসের মত পরিবর্তন কিভাবে সম্ভব। ওমর বায়া কিভাবে ব্ল্যাক ক্রস-এর মিত্র হতে পারে? সব ভাবনার পর ভাবল, আল্লাহর সাহায্যও তো কোনভাবে আসতে পারে!

সেদিন রাত ১২টা। ওমর বায়া শুয়ে পড়েছে কিন্তু ঘুমায়নি। পিয়েরে পল প্রবেশ করল তার ঘরে। দাঁড়াল এসে ঘরের মাঝখানে।

ওমর বায়া শুয়ে থেকেই তার দিকে পাশ ফিরল।

ওমর বায়া পাশ ফিরতেই পিয়েরে পল বলল, 'আমি দুঃখিত ওমর বায়া। তোমাকে কষ্ট করতে হবে। আমরা এ জায়গা বদলে ফেলতে চাই। আজ রাতেই। একটু পরে তোমাকে নিয়ে যাবে'।

ওমর বায়া কোন কথা বলল না। তবে পিয়েরে পলের কথায় অবাকই হলো। পিয়েরে পল কোন ব্যাপারে ওমর বায়ার কাছে দুঃখ প্রকাশ এই প্রথম করল।

পিয়েরে পল কথা শেষ করে যাবার জন্যে ঘুরে দাড়িয়েই আবার থমকে গেল। ওমর বায়ার দিকে আবার ঘুরে দাঁড়াল সে। বলল, 'ওমর বায়া, তোমার বড় ধরনের কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?'

'আটক ব্যক্তির এসব নিয়ে ভাবার অবকাশ কোথায়?'

'দেখ, তোমার প্রতি অবিচার হয়েছে। আমরা এখন মত পাল্টেছি। কোন কিছুতে তোমাকে বাধ্য করা আমাদের দায়িত্ব নয়। 'ওকুয়া'র সাথে আমাদের চুক্তি ছিল, আমরা তোমাকে আটকে রাখার দায়িত্ব পালন করব, তোমাকে দিয়ে যদি কিছু করাতে হয় তারা তা করাবে। আমরা নই। শুরুতে অর্থের প্রলোভনে আমাদের লোকদের তারা মিসগাইড করেছে। আমরা আর সেটা হতে দিচ্ছি না। তাদের কাজ তারা করবে, আমাদের কাজ আমরা করব। তোমার সাথে আমাদের কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই। সুতরাং তোমাকে আটকে রাখা ছাড়া তোমার প্রতি আমাদের পক্ষ থেকে আর কোন অবিচার হবে না'।

কথা শেষ করেই ঘুরে দাড়িয়ে চলে গেল পিয়েরে পল। ওমর বায়ার কোন কথা শুনার অপেক্ষাও করল না।

ওমর বায়া সত্যিই অবাক হলো পিয়েরে পলের কথায়। একটু খুশীও হলো। যাক, পিয়েরে পলের কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে ব্ল্যাক ক্রসের খারাপ আচরণ থেকে অন্তত বাঁচবে সে। কিন্তু পিয়েরে পল কি সত্য কথা বলেছে? মিথ্যা বলবে কেন? ওমর বায়াতো তাদের কাছ থেকে কিছু চায়নি। তাছাড়া পিয়েরে পলের কথা যে সত্য, তার প্রমাণও তো ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। ব্ল্যাক ক্রস এখন থেকে তাকে ভাল খাবার দিচ্ছে এবং ব্ল্যাক ক্রস-এর লোকেরা তার সাথে

বলা যায় ভালই ব্যবহার করছে। অবশেষে সে ভাবল পিয়েরে পলের কথা সত্যি হোক মিথ্যা হোক তার হারাবার কিছু নেই। যে খারাপ অবস্থায় সে পৌছেছে, মৃত্যু ছাড়া এর চেয়ে বড় আর কিছু আছে!

নিজের অবস্থার কথা ভাবতে গিয়ে তার মনে পড়ল তার মায়ের কথা, তার আব্বার কথা, ছোটবেলার স্মৃতি বিজড়িত তাদের সেই সবুজ উপত্যকার কথা এবং সহজ-সরল তার জাতির লোকদের কথা। এখন সে সব কিছুই নেই। তার আব্বার মৃত্যুর পরই খৃষ্টান মিশনারী ও খৃষ্টান এনজিওদের দৌরাত্ম বেড়ে যায়। তার পিতার স্থান সে পূরণ করতে পারে নি। ফলে খৃষ্টান মিশনারী ও খৃষ্টান এনজিওদের গোপন সন্ত্রাসবাদী সংগঠন 'আর্মি অব ক্রাইস্ট অব ওয়েস্ট আফ্রিকা' (ওকুয়া)-এর হাতে পরাজিত হতে লাগল মুসলমানরা। জমি ও ঘর-বাড়ি হারিয়ে মুসলমানরা বিতাড়িত হলো দক্ষিণ ক্যামেরুন থেকে। ওমরা বায়াকেও পালাতে হলো। তার মা নিষ্ঠুরভাবে নিহত হলো 'ওকুয়া'র হাতে। আজ সে নিজেও 'ওকুয়া'র হাতে বন্দী। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল ওমর বায়া। 'ওকুয়া'দের পেছনে, খৃষ্টান মিশনারী ও খৃষ্টান এনজিওদের পেছনে রয়েছে পাশ্চাত্যের দেশগুলো। অসহায় মুসলমানদের কোন সাহায্যকারী নেই। ইসলামের নামে, মুসলমানদের নামে কোন সাহায্য করাকে 'মৌলবাদ' বলা হচ্ছে, বলা হচ্ছে একে সাম্প্রদায়িকতা। এটা বলা হচ্ছে এই কারণে যাতে ইসলাম ও মুসলিম নামের সংগঠনগুলো কাজ করার সুযোগ না পায়। মুসলিম বিশ্বের অনেক সরকার তাদের ফাদে পড়ে 'মৌলবাদ' ও 'সাম্প্রদায়িকতা' বিরোধিতার নামে ইসলাম ও মুসলমানদের অগ্রগতি রুদ্ধ করছে।

পাশ ফিরল ওমর বায়া। ভাবনা তার অন্যদিকে মোড় নিল, সেকি কোন দিন মুক্তি পাবে এদের কবল থেকে। ব্ল্যাক ক্রস কয়দিন তার সাথে এই ভাল ব্যবহার করবে। এক সময় নিশ্চয় তাকে তুলে দেবে 'ওকুয়া'র হাতে। 'ওকুয়া' তাকে কি করবে সে ভালো করেই জানে। মনে পড়ল আহমদ মুসার কথা। তিনি কি জানতে পেরেছেন ওমর বায়ার কথা? জানতে পারলে কি হবে, তিনি কতদিক সামলাবেন। ফিলিস্তিন দূতাবাসের লোকদের কাছ থেকে সে আহমদ মুসার গল্প শুনেছে। কত বড় বড় কাজ তিনি করেছেন এবং করছেন। এক ওমর বায়ার কথা

ভাববার কি তার সময় আছে! এমন আশা করাও স্বার্থপরতা। একজন ব্যক্তির চেয়ে জাতি অনেক বড়। সেই জাতির কাজে তিনি ব্যস্ত। না, তার আসার দরকার নেই।

ভাবনা আর এগুতে পারল না ওমর বায়ার। পায়ের শব্দে সে ফিরে তাকাল। দেখল ঘরের ভেতরে চারজন লোক। ওমর বায়া তাদের দিকে তাকাতেই বলল, 'আপনি উঠুন। আমরা এখনি যাত্রা করব'।

উঠল ওমর বায়া।

ওমর বায়া বিস্মিত হলো, তাকে এবার ওরা বাধল না। এ পর্যন্ত সে তিনবার স্থান পরিবর্তন করেছে। প্রত্যেক বারই তার হাত-পা বেধে পশুর মত গাড়িতে ছুড়ে ফেলে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

চারজন তাকে চারদিক থেকে ঘিরে নিয়ে চলল। তাদের প্রত্যেকেরই পকেটে হাত। অর্থাৎ তাদের প্রত্যেকেরই হাতে রিভলবার। বাড়ির ভেতরের চত্তরে দাড়িয়েছিল গাড়ি। মাইক্রোবাস। জানালাগুলোতে রঙীন কাঁচ লাগানো।

বাইরে আরো দু'জন দাড়িয়েছিল। তাদের হাতে স্টেনগান।

ওমর বায়াকে গাড়ির মাঝখানে বসিয়ে চারদিকে ঘিরে থাকল ওরা পাঁচজন। স্টেনগান ধারী একজন ড্রাইভারের পাশে বসেছিল।

গাড়ি চলতে শুরু করল। সাত ঘন্টা ধরে চলল গাড়ি।

কোথায় তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? ফ্রান্সের বাইরে কোথাও? ওমর বায়া জিজ্ঞাসা করেও এর জবাব পায়নি। ভদ্র কন্ঠের উত্তর পেয়েছে, 'আমাদের কিছু বলার হুকুম নেই। আপনি কর্তাকে জিজ্ঞাসা করলেই ভাল করতেন'।

অবশেষে গাড়ি থামল।

গাড়ির দরজা খুলে গেল।

ওমর বায়া গাড়ি থেকে নেমে দেখল একটা বাড়ির চত্তরে সে নামল। চত্তরটির চারদিক দিয়েই বাড়ির দেয়াল। একটা করিডোর দিয়ে গাড়ি প্রবেশ করেছে এ চত্তরে। করিডোরটির মুখেও দরজা।

'চলুন'। বলে একজন স্টেনগানধারী ওমর বায়াকে সামনের একটা দরজার দিকে যাবার ইংগিত করল।

ওমর বায়া চলল সেদিকে।

দু স্টেনগানধারীর একজন ওমর বায়ার আগে, অন্যজন তার পেছনে।

ঠেলা দিতেই দরজা খুলে গেল।

তারা একটা করিডোর ধরে এগিয়ে চলল। করিডোরটি শেষ হলো আর একটা গেটে। গেটে তারা দাড়াল। স্টেনগানধারীদের একজন ওমর বায়াকে বলল, এই বাড়িতে আপনি থাকবেন। সম্মানের সাথে রাখা হবে। কিন্তু আপনি যদি পালাবার কোন প্রকার চেষ্টা করেন, তাহলে আপনি ভয়ানক বিপদ ডেকে আনবেন। আপনাকে অসম্মান করার হুকুম নেই কিন্তু পালাতে চেষ্টা করলে হত্যা করার হুকুম আছে। চেয়ে দেখুন, বাড়িটার চারদিক স্টেনগানধারী সার্বক্ষণিক প্রহরী দাড়িয়ে আছে। বাড়ির ভেতরে রয়েছে বাবুর্চী ও ফায়ফরমাস খাটার লোকজন। তারা সকলেই ব্ল্যাক ক্রস-এর লোক। আর আপনাকে দেখা শুনার জন্য রয়েছে একজন পরিচারিকা। আপনি গন্ডগোল না করলে খুব ভালই থাকবেন'।

কথা শেষ করে দরজায় নক করল লোকটি।

দরজা খুলে গেল।

দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে সমান একজন ভীমাকৃতির লোক খোলা দরজায় দাড়িয়ে। তার দেহটা যত বড় তার মাথাটা তত ছোট। ছোট মাথাটি কামিয়ে বেল করা। অথবা মাথায় কোন দিন চুলই ওঠেনি। মুখটি তার মালভূমির মত এবড়ো-থেবড়ো। সাপের মত কুতকুতে ছোট দুটি চোখ।

লোকটিকে দেখে ওমর বায়ার কিছু ভয়ও হলো, তার সাথে সৃষ্টি হলো প্রবল এক বিতৃষ্ণার। এই ক্রিমিনালটার সাথেই তাকে থাকতে হবে।

স্টেনগানধারী সেই লোকটি দরজায় দাড়ানো মানুষ নামক পিন্ডটাকে লক্ষ্য করে বলল, 'মশিয়ে লিটল, ইনিই আমাদের মেহমান। একে মিস এলিসা গ্রেস-এর কাছে নিয়ে যাও'। বলে ওমর বায়াকে ইংগিত করল ভেতরে যাওয়ার।

ওমর বায়া ঢুকে গেল ভেতরে।

ভেতরে ঢুকে দেখতে পেল, ফাঁকা চত্বরের উপর ছবির মত সুন্দর একটা বাংলো। চারদিক দিয়ে প্রাচীর ঘেরা। উপরে সুন্দর নীল আকাশ। বাতাসে সমুদ্রের লোনা গন্ধ। সেকি তাহলে সমুদ্রের তীরে কোথাও?

চত্তরটাকে ভূমি সমতল থেকে অনেক উচু বলে মনে হচ্ছে ওমর বায়ার কাছে। তাহলে চত্তরের নিচেও কি বাড়ি-ঘর আছে। না পাহাড়ের কোন টিলায় বাড়িটা?

খুব ভালো লাগল বাড়িটা ওমর বায়ার।

ওমর বায়া হাটছিল মশিয়ে লিটল নামক মানুষ পিন্ডটার পেছনে পেছনে।

এক জায়গায় এসে লোকটি ওমর বায়ার সামনে থেকে এক পাশে সরে হাঁটতে লাগল আবার সেই গেটের দিকে।

মশিয়ে লিটল- এর দেয়াল সামনে থেকে সরে যেতেই ওমর বায়ার চোখ গিয়ে পড়ল সামনের একটা ঘরের দরজায় দাঁড়ানো একটা তরুণীর উপর।

প্রথম দৃষ্টিতেই ওমর বায়ার মনে হলো সে পটে আকা একটা নিখুঁত ছবি দেখছে। কিন্তু ছবিটির যখন ঠোঁট নড়ে উঠল ভুল ভাঙল ওমর বায়ার। কষ্ট করে চোখ সে নামিয়ে নিল তার দিক থেকে।

‘আসুন। আমার নাম এলিসা গ্রেস। ভেতরে আসুন। আপনার কক্ষে আপনাকে পৌছে দিয়ে আসি’। মিষ্টি কন্ঠে স্বাগত জানাল মেয়েটি।

মশিয়ে লিটল নামক লোকটিকে দেখে ওমর বায়ার মনটা যতখানি খারাপ হয়ে উঠেছিল, সেটা এখন আর নেই।

মেয়েটি দরজার এক পাশে সরে দাড়িয়েছিল।

ওমর বায়া প্রবেশ করল কক্ষটিতে।

পরবর্তী বই

# ব্ল্যাক ক্রসের মুখোমুখি

## কৃতজ্ঞতায়ঃ Md. Jafar Ikbal Jewel

সাইমুম-১৮

# ব্ল্যাক ক্রসের মুখোমুখি

আবুল আসাদ

# ১

উল্টে-পাল্টে কাগজটা আহমদ মুসা বার বার পড়ল। না পরিষ্কার লেখা। লেখায় বিন্দুমাত্র দ্ব্যর্থবোধকতা নেই। '১৩১-এর সি, রূয়ে আনাতলে ডেলা ফর্গ'- স্পষ্টাক্ষরে লেখা। কিন্তু এই নাম্বারে কোন বাড়ি নেই।

গতকাল দু'বার এসে সে তন্ন তন্ন করে খুঁজে গেছে। খোঁজায় কোন ফাঁক রাখেনি। কিন্তু বাড়িটা পাওয়া যায়নি। একশ' একত্রিশ-এর এ,বি,সি, কিছুই নেই।

কিন্তু মন তার মানছে না। পরাজয় স্বীকার করে নিতে রাজি হচ্ছে না তার মন।

গতকাল দু'বারই দিনের বেলা খুঁজেছে। আর রাতে খুঁজবে মনে করে রুয়ে আনাতলে রোডের সেই নির্দিষ্ট স্থানে এসে নামল আহমদ মুসা ট্যাক্সি থেকে। রাত তখন ৯টা।

ঠিকানার সন্ধানে কিছুক্ষণ ঘুরাঘুরির পর আহমদ মুসা ঠিক করল লোকদের আজকে সে জিজ্ঞেস করবে। ১৩১নং বাড়িতে গিয়ে নক করল আহমদ মুসা। মুহূর্ত কয়েক পরে দরজা খোলার শব্দ হলো। দরজা অল্প ফাঁক করে একটা মুখ বলল, 'কি সহযোগিতা করতে পারি আপনাকে। কাকে চাই আপনার?'

‘আমি একজন বিদেশী। ‘১৩১-এর সি’ বাসাটা আমি খুঁজছি। দয়া করে সাহায্য করতে পারেন?’ বিনীতভাবে বলল আহমদ মুসা।

দরজাটা এবার খুলে গেল।

একজন তরুণী খোলা দরজায় এসে দাঁড়াল। বলল, ‘নাম্বারটা আপনি কোথায় পেলেন?’

‘নাম্বারটির মালিক যিনি তারই লেখা ঠিকানা থেকে তুলে নিয়েছি’।

‘যাই হোক, আপনার ভুল হয়েছে। এ ধরণের কোন নাম্বার এ রাস্তায় নেই। এ রাস্তায় কোন নাম্বারের সাথেই এ,বি,সি ইত্যাদি ধরণের কোন কিছুর সংযোজন নেই।’

আহমদ মুসা ভাবছিল। মেয়েটির কথার জবাবে কিছু বলল না।

‘আপনার অসুবিধার জন্যে দুঃখিত। ওকে’। বলে দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছিল মেয়েটি। আহমদ মুসা বলল, ‘দয়া করে কি বলবেন, আপনার আব্বার নাম কি?’

মেয়েটির মুখ মুহুর্তের জন্যে মলিন দেখা গেল। তারপরই হেসে উঠে বলল, ‘বুঝতে পেরেছি আপনি জানতে চাচ্ছেন এ বাড়িটাই আপনার বাঞ্ছিত বাড়ি কিনা। না তা নয়। আমি ও আমার আম্মা ছাড়া এ বাড়িতে আর কেউ থাকেন না’।

‘ধন্যবাদ’ বলে আহমদ মুসা সরে এল তাদের বাড়ির গেট থেকে। পিতার নাম জিজ্ঞেস করায় মেয়েটির মুখ মলিন হওয়া থেকে আহমদ মুসা বুঝল, তার আব্বা নেই। ওরা ‘সিংগল’ প্যারেন্ট ফ্যামেলি। এমন বিয়ে বহির্ভূত মা ও সন্তানের সিংগল ফ্যামিলি এখন পাশ্চাত্যে হাজার হাজার। কিন্তু বিরাট এক দুর্ভিক্ষ তাদের মনে। মেয়েটির ম্লান মুখে দেখা গেছে তারই একটা প্রতিচ্ছবি।

রাস্তায় নেমে এল আহমদ মুসা। কিন্তু কোথায় যাবে সে!

আহমদ মুসা শিথিল পায়ে আনমনে সামনের দিকে হাঁটতে লাগল। ডুপ্লের ঠিকানা নিয়েই সে ভাবছে। তার মন কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না যে, মি. ফ্রাংক তাকে ভুল ঠিকানা দিয়েছে কিংবা ডুপ্লে ভুল ঠিকানা লিখেছে। কিন্তু সে নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছে ১৩১-এর সাথে কোন এ,বি,সি নেই এবং মেয়েটিও তাই বলল। তাহলে?

ঠিকানা লেখা কাগজটির ওপর আবার নজর বুলাল আহমদ মুসা। দেখল, ১৩১-এর 'সি' লিখে তার পাশে আবার '+' চিহ্ন দেয়া আছে। চমকে উঠল আহমদ মুসা। এখানে '+' চিহ্ন কেন? এর অর্থ কি এই যে, ১৩১ থেকে 'প্লাস' অর্থাৎ সামনের দিকে 'সি' অর্থাৎ তিন নাম্বার বাড়িটাই ডুপ্লের হবে? সংকেতে কি এটাই বুঝাতে চেয়েছে?

আহমদ মুসা মুখ তুলে দেখল। সে যে বাড়ির সামনে এসে দাড়িয়েছে, সেই বাড়িটিই ১৩১-এর পর তিন নাম্বার বাড়ি। তাহলে এখানেই কি ডুপ্লে থাকেন?

কিন্তু আবার ভাবল, ডুপ্লে ঠিকানা এভাবে লিখবে কেন? না, এখানে ঠিকানা লেখার এরকম একটা প্রচলন আছে, যা অনেকেই ইচ্ছা হলে লিখে থাকে।

হঠাৎ একাধিক নারী কন্ঠের চাপা চিৎকারে আহমদ মুসা চমকে উঠল। আহমদ মুসা যাকে ডুপ্লের বাড়ি বলে ভাবছে, সেখান থেকেই এই চিৎকার আসছে। ধ্বস্তাধ্বস্তির একটা শব্দও কানে আসছে আহমদ মুসার।

রাস্তা থেকে ছুটল আহমদ মুসা বাড়িটার দিকে।

বাড়ির সামনে দু'টো গাড়ি দাড়িয়ে আছে। একটা সাধারণ মাইক্রোবাস, আরেকটা অত্যন্ত দামী গাড়ি।

আহমদ মুসা গাড়ি বারান্দা পার হয়ে লাফ দিয়ে বারান্দায় গিয়ে উঠল। সামনেই একটা দরজা। সম্ভবত বাড়ির ড্রইং রুম। ধ্বস্তাধ্বস্তি থেমে গেছে। ভয়ার্ত নারী কন্ঠ এবার চিৎকারের বদলে কেঁদে কেঁদে জীবন ভিক্ষার জন্যে অনুনয়-বিনয় করছে।

আহমদ মুসা দরজায় মৃদু চাপ দিল। দরজা নড়ে উঠল। খুশি হলো আহমদ মুসা, দরজা খোলা আছে দেখে। দরজা ঠেলে কৌতুহলী আগন্তুকের মত ঘরে প্রবেশ করল আহমদ মুসা। যখন আহমদ মুসা ঘরের ভেতর পা রাখল, তখন একটি কন্ঠ চিৎকার করে বলছে, 'শোরগোল না থামালে তোমাদেরও বেঁধে নিয়ে যাব আমরা। তাতে আমাদের মজাই হবে। আহমদ মুসা দেখতে পেল, একজনের পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে একজন মহিলা কাঁদছে। পাশেই আরেকটি তরুণী গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছে। এদেরকে লক্ষ্য করেই ঐ কন্ঠটি চিৎকার করে উঠেছিল।

আর আহমদ মুসা, তার সামনেই দেখতে পেল হাত-পা বাঁধা একজন লোককে দু'জন লোক নিয়ে আসছে। একজন ধরেছে দুই পা, আরেকজন হাত।

আহমদ মুসাকে ঢুকতে দেখেই লোক দু'টি বাঁধা লোকটিকে ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। অন্য দিকে পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়া মহিলাকে শাসাচ্ছিল যে লোকটি সেও ফিরে দাঁড়াল।

মোট ওরা তিনজন।

'কে তুই? কি চাস এখানে?' সামনে দাড়ানো দু'জনের একজন চিৎকার করে বলল।

তার চিৎকারে মেঝেয় গড়াগড়ি দেয়া মেয়ে দু'টি এদিকে ফিরে তাকিয়েছে।

'রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম, কান্নাকাটি দেখে এলাম'। অত্যন্ত শান্ত কন্ঠে গোবেচারা ভংগীতে বলল আহমদ মুসা।

'ঠিক আছে প্রাণের ভয় থাকলে যেদিক দিয়ে এসেছিস সেদিক দিয়ে কেটে পড়'। বলল ওদের একজন।

'কিন্তু বুঝতে পারছি না আমি, এখানে কি হচ্ছে?'

'আবার কথা' বলে একজন তেড়ে এল আহমদ মুসার দিকে। কাছাকাছি এসে বলল, 'তুই কি কানে শুনতে পাস না? আমরা কি বলেছি?'

'শুনতে পেয়েছি। কিন্তু লোকটির কি অপরাধ? তাকে এইভাবে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছেন কেন?'

'ছুঁচোটা দেখছি বড় পাজি, বলে কাছাকাছি এসে দাঁড়ানো লোকটি আহমদ মুসার নাক লক্ষ্যে প্রচন্ড এক ঘুষি চালাল।

আহমদ মুসা মাথা একটু নিচু করে তার ঘুষি চালানো হাতটাকে বাঁহাত দিয়ে কনুই বরাবর ধরে ফেলে ডান হাত দিয়ে তার কোমরের বেল্টটা ধরে তাকে একটানে শূন্যে উঠিয়ে নিল এবং ছুড়ে মারল তার সামনের দ্বিতীয় লোকটির ওপর। ওরা দু'জনেই আছড়ে পড়ল মাটিতে।

তৃতীয় জন যে মহিলাকে শাসাচ্ছিল সে হাতে রিভলবার তুলে নিয়েছে।

কিন্তু আহমদ মুসা লোকটিকে ছুঁড়ে ফেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ল ঐ লোকটির ওপর। সে রিভলবার তাক করার আগেই আহমদ মুসা তার ওপর গিয়ে পড়ল।

আহমদ মুসা পড়ে গিয়েই তার হাত থেকে রিভলবার কেড়ে নিল। সাইলেন্সার লাগানো রিভলবার।

ততক্ষণে ঐ দু'জন লোক উঠে দাঁড়িয়েছে। তারা ছুটে আসছে আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা রিভলবার হাতে নিয়েই তা ঘুরিয়ে ধরল ঐ দু'জনের দিকে। পর পর দু'বার ফায়ার হলো। নিঃশব্দে দু'টো গুলী গিয়ে বিদ্ধ করল ওদের দু'জনকে। বুক চেপে ধরে ওরা গিয়ে আছড়ে পড়ল হাত-পা বাঁধা মেঝেয় পড়ে থাকা লোকটির ওপর।

সময় পেয়েছিল আহমদ মুসা যার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেই লোকটি। সে চাকু বের করে নিয়েছিল। চাকু উঠাচ্ছিল সে আহমদ মুসার পাঁজর লক্ষ্য করে।

এই সময় একটা নারী কণ্ঠ চিৎকার করে উঠল, 'আহমদ মুসা, পেছনে চাকু'।

শব্দটি এল কক্ষের বাইরে বাড়ির ভেতরের দিক থেকে।

চিৎকারটি কান স্পর্শ করার সাথে সাথেই আহমদ মুসা স্প্রিং-এর মত ছিটকে উঠল উপরের দিকে। চাকুর আঘাতটাকে সম্পূর্ণ এড়াতে পারল না আহমদ মুসা। মারাত্মক চাকুটা পাঁজরের বদলে আঘাত করল আহমদ মুসার ডান হাঁটুর নিচের মাসলটাকে।

কেঁপে উঠেছিল আহমদ মুসার দেহটা। অবচেতনভাবেই আহমদ মুসার দেহ সামনে একটু বেঁকে গিয়েছিল। কিন্তু রিভলবারটা হাতে স্থির ছিল।

চাকু মেরেই লোকটা এক ঝটকায় উঠে দাঁড়িয়েছিল। পকেট থেকে বের করে নিয়েছিল আর একটা চাকু। ঝাঁপিয়ে পড়ছিল আহমদ মুসার ওপর।

আহমদ মুসার রিভলবার স্থির করাই ছিল লোকটির দিকে। শুধু আঙুলের চাপ পড়ল ট্রিগারের ওপর। সরাসরি বুকে গুলী খেয়ে দু'হাতে বুক চেপে ধরে উল্টে পড়ে গেল লোকটি।

ছুটে ঘরে এসে প্রবেশ করল একটি মেয়ে। বসল আহমদ মুসার পায়ের কাছে। পেশীর মধ্যে গেঁথে যাওয়া ছুরিটা টান মেরে বের করে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। চেপে ধরল দু'হাতে আহমদ মুসার আহত জায়গাটা।

'ডোনা তুমি ঐ লোকটির বাঁধন আগে কেটে দাও তো ঐ ছুরি দিয়ে'। বলল আহমদ মুসা।

মেঝেয় গড়াগড়ি যাওয়া ক্রন্দনরত মহিলা ও তরুণীটি ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে কাঁপছিল। এখনও কাঁপছে তারা। কন্ঠে তাদের কোন কথা নেই। যেন বোবা হয়ে গেছে তারা।

বাঁধা অবস্থায় মেঝেয় পড়ে থাকা লোকটি এতক্ষণ আতংকিত চোখে নির্বাকভাবে সবকিছু দেখছিল। দু'জন লোক গুলী খেয়ে তার ওপর পড়ে গেলেও সে একটুও সরার চেষ্টা করেনি। যেন ওদের সাথে সেও মরে গেছে।

এবার সে লাশের নিচ থেকে সরে এল এবং বলল, 'লেটিছিয়া তোমরা ওদের সাহায্য কর, আমার বাঁধনটা খুলে দাও'।

কাঁপতে কাঁপতে ঘরের কোণে দাঁড়ানো বড় মেয়েটি এগোলো বাঁধা অবস্থায় পড়ে থাকা লোকটির দিকে ছুরি বা চাকু ছাড়াই।

তার সাথের তরুণীটি ছুটে এসে চাকু কুড়িয়ে নিয়ে তুলে দিল মহিলাটির হাতে।

দরজায় এসে দাড়িয়েছিল সৌম্য দর্শন একজন বৃদ্ধ। ঝড়-বিধ্বস্ত চেহারা তার।

সেই বৃদ্ধের দিকে চেয়ে দু'হাত দিয়ে আহমদ মুসার আহত স্থান ধরে রাখা ডোনা বলল, 'আব্বা, দেখ এদের ফাস্ট এইড বক্স কোথায়, প্রচুর তুলা দরকার। প্রচুর রক্ত আসছে'।

বৃদ্ধটি কিছু করার আগেই মহিলাটির সাথের তরুণীটি বলল, 'মাফ করুন প্রিন্সেস, আমি নিয়ে আসছি।' বলে মেয়েটি ছুটে গেল বাড়ির ভেতরে।

ডোনা ওপর দিকে মুখ তুলে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, আমার মাথার রুমালটা আমাকে দাও'।

‘ব্যস্ত হয়ো না ডোনা। ওরা তুলা নিয়ে আসছে’। ঠোঁটে হাসি টেনে বলল আহমদ মুসা।

ডোনা আর কিছু না বলে এক হাতে ক্ষতস্থানটা চেপে ধরে অন্য হাতে রুমাল টেনে নিল মাথা থেকে।

এই সময় ফার্স্ট এইড বক্স নিয়ে তরুণীটি ছুটে এল।

মেঝেয় পড়ে থাকা লোকটি বাঁধনমুক্ত হয়েছিল।

সে ছুটে এল ডোনার কাছে এবং ঝুকিয়ে ডোনাকে একটা বাউ করে বলল, ‘মাননীয়া প্রিন্সেস আমাদের আর অপরাধী করবেন না। আমাকে দিন। আপাতত চলার মত ব্যান্ডেজ আমি বাঁধতে পারব’।

ডোনা কথা বলল না। মাথাও তুলল না। আহমদ মুসার প্যান্ট হাটু পর্যন্ত ওপরে তুলে অত্যন্ত দ্রুত ও দক্ষ হাতে বাইরের রক্ত মুছে ফেলে এন্টি সেপটিক ক্রিম মাখানো এক মুঠো তুলা আহত স্থানে লাগিয়ে রুমাল দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিল। তুলায় ক্রিম মাখিয়ে দিয়েছিল এবং ডোনাকে সাহায্য করছিল তরুণীটি। উঠে দাঁড়ালো ডোনা।

‘ডোনা ওকে বসিয়ে দাও সোফায়’। বলল বৃদ্ধটি, ডোনার আব্বা মি. প্লাতিনি।

‘ধন্যবাদ। আমি ভালো আছি জনাব। লাশগুলোর ব্যবস্থা হওয়া দরকার। পুলিশে খবর দেয়া দরকার কিনা?’ বলে আহমদ মুসা তাকাল সদ্য বাঁধনমুক্ত লোকটির দিকে।

‘পুলিশে খবর দেয়া যাবে না। আমাদের এই বাড়ি থেকে সরে পড়তে হবে এখনি। আর এক ঘন্টার মধ্যে এ বাসায় আক্রমণ হবে বলে আমি আশংকা করছি’। বলল লোকটি।

আহমদ মুসা মুহুর্ত কয়েক লোকটির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, ‘আপনি কি ডুপ্লে, ব্ল্যাক ক্রসের লোক?’

প্রশ্ন শুনেই লোকটির মুখ মলিন হয়ে গেল। বলল, ‘জি হ্যাঁ, আমি একজন হতভাগ্য। আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন, আমার পরিবারকে বাঁচিয়েছেন। কে আপনি? চিনলেন কি করে আমাকে?’

আহমদ মুসা তার কথার কোন জবাব না দিয়ে বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকাল ডোনার দিকে, তারপর ডোনার আব্বার দিকে।

ডোনার আব্বার ঠোঁটে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'সবই জানবে। এতটুকু শুনে রাখ, আমরা দ্বিজন থেকে আসছি। তুমি ডুপ্লের ঠিকানা যেখান থেকে নিয়েছ, আমরাও সেখান থেকে নিয়েছি। তোমার খোঁজ পাবার জন্যেই আমরা এখানে এসেছিলাম। তার পরপরই এই বিপদ'।

'আপনারা দ্বিজনে কেন?' আহমদ মুসার কন্ঠে তখনও বিস্ময়।

'তোমার সন্ধানে'। বলে ডোনার আব্বা তাকাল ডোনার দিকে। আহমদ মুসাও তাকাল ডোনার দিকে।

ডোনা মুখ নিচু করল। বলল, 'এখন কোনো কথা নয়। চলুন, ডাক্তারকে দেখাতে হবে'।

'ঠিকই বলেছে ডোনা। তোমার চিকিৎসা প্রয়োজন। চল আমরা যাই'।

এই সময় ডুপ্লে ছুটে ডোনার আব্বার সামনে এসে বাউ করে বলল, 'সম্মানিত প্রিন্স, আমাকে একটু সময় দিন'। বলে ঝপ করে আহমদ মুসার পায়ের কাছে বসে পড়ল। তারপর আহমদ মুসার পায়ে কপাল ছুঁইয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমার পরম সৌভাগ্য আহমদ মুসাকে আমি দেখলাম এবং আরও সৌভাগ্য যে তিনি আমাকে বাঁচিয়েছেন'।

'কেউ কাউকে বাঁচাতে পারে না। এ ক্ষমতার মালিক শুধু আল্লাহ। আর শুনুন, কোন মানুষের মাথা কোন মানুষের কাছে নত হওয়া ঠিক নয়, পা পর্যন্ত তো চলতেই পারে না'। বলল আহমদ মুসা ডুপ্লেকে লক্ষ্য করে।

ব্যাগ-ব্যাগেজ নিয়ে লেটিছিয়া এবং সেই তরুনী বেরিয়ে এল ড্রইং রুমে।

'চলুন, আমরাও চলে যাব'। বলল ডুপ্লে।

'কোথায় যাবেন আপনারা? আপনার সাথে আমার জরুরি কথা আছে'। বলল আহমদ মুসা ডুপ্লেকে লক্ষ্য করে।

'আমি একটা ফ্ল্যাট ঠিক করে রেখেছি। দু'একদিনের মধ্যেই সেখানে চলে যেতাম। সেখানেই এখন যাব। আপনি কি আমাদের ওখান হয়ে যাবেন কিংবা ঠিকানা রাখবেন?'

‘ঠিকানা দিন। পরে যোগাযোগ করা যাবে’। বলল ডোনা, আহমদ মুসা কিছু বলার আগেই।

‘না ডোনা, বিষয়টা অন্য একটা দিনের জন্যে ফেলে রাখার মত নয়’। বলল আহমদ মুসা ডোনার দিকে চেয়ে।

একটু থামল। থেমেই আবার ডোনার আব্বার দিকে চেয়ে বলল, ‘আপনারা না হয় চলে যান, আমি ওর বাড়ি হয়ে যাব’।

‘না তা হবে না। আমরাও যাব আপনার সাথে। চলুন’। গলা উপচানো একটা ক্ষোভ ফুটে উঠল ডোনার কন্ঠে। চোখ-মুখটা ভারী হয়ে গেলে তার।

সবাই বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে।

‘আপনার বোধ হয় গাড়ি নেই’। ডুপ্লের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করর আহমদ মুসা।

‘নেই। কিন্তু এদের মাইক্রোবাসটাই নিয়ে যাব’। বলল ডুপ্লে।

‘ব্ল্যাক ক্রসের এই মাইক্রোবাসটা তো?’

‘জি হ্যাঁ’।

‘না এ গাড়ি আপনার নতুন বাড়িতে নেয়া চলবে না। এতে আপনার নতুন বাড়িটা এদের নজরে পড়তে পারে। তাছাড়া রাস্তায়ও এ মাইক্রোবাস এদের নজরে পড়তে পারে’।

ডুপ্লে বিস্ময়ে বিস্ফোরিত চোখে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘ঠিক বলেছেন আপনি। আমি সর্বনাশ করতে যাচ্ছিলাম’।

একটু ঢোক গিলল ডুপ্লে। একটু থেকে সে বলল, ‘এ জন্যেই আপনি আহমদ মুসা। কিছুই আপনার নজর এড়ায় না’।

‘তাহলে মি. ডুপ্লে আমার গাড়িতেই চলুন। অসুবিধা হবে না’। বলল ডোনার আব্বা।

‘ধন্যবাদ। আপনার অনুগ্রহ’।

আহমদ মুসা ড্রাইভিং সিটে উঠতে যাচ্ছিল ডোনা বাধা দিয়ে বলল, ‘আপনি অসুস্থ। বিশ্রাম নিন। আমি ড্রাইভ করব’।

‘আমার অনুরোধ ডোনা। আমিই বসি। পাশের সিটে তুমি বস’।

কোন কথা না বলে ডোনা মাথা নিচু করে মুখ ভার করে গাড়ি ঘুরে পাশের সিটের দিকে চলে গেল।

আহমদ মুসা গাড়ি স্টার্ট দিয়েও তা আবার বন্ধ করে দিয়ে নেমে গেল গাড়ি থেকে। নেমে পকেট হাতড়িয়ে কিছু খুঁজল। পেল না। গাড়ি ঘুরে ডোনার জানালায় এসে বলল, 'তোমার রুমাল আছে?'

'আছে' বলে ডোনা রুমাল বের করে আহমদ মুসার হাতে তুলে দিল।

আহমদ মুসা রুমাল নিয়ে গাড়ির পেছনে চলে গেল। গাড়ির নাম্বার প্লেটটি সে ঢেকে দিল রুমাল দিয়ে।

ফিরে এল সে তার সিটে। সিটে বসে তাকাল পাশের মাইক্রোবাসটির দিকে। তারপর পকেট থেকে সাইলেন্সার লাগানো সেই রিভলবার বের করল। গুলী করল মাইক্রোবাসের সামনের একটা টায়ার লক্ষ্যে। শব্দ করে ফেটে গেল টায়ার।

ভ্রু কুঞ্চিত করল ডোনা। কিন্তু কিছু বলল না। একটু পরে জিজ্ঞেস করল, 'রুমালটা কি করলেন?'

'গাড়ির নাম্বার প্লেটটা ঢেকে দিয়েছি ওটা দিয়ে'।

আবার সেইভাবে ভ্রু কুঞ্চিত হলো ডোনার। কিন্তু কোন প্রশ্ন করল না। ডোনার আব্বা ও ডুপ্লেসহ সকলের মনেই ডোনার মত প্রশ্ন উকি দিয়েছে। কিন্তু সবাই নীরব থাকল।

আহমদ মুসার গাড়ি যখন ডুপ্লের বাড়ির গেট দিয়ে বেরুচ্ছে, সেই সময় আহমদ মুসা দেখল, রাস্তা থেকে একটা গাড়ি এদিকে নেমে আসার জন্যে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। তার সাথে গাড়িটার হর্ন বেজে উঠল কয়েকবার। বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল আহমদ মুসার। ব্ল্যাক ক্রসের কোডে হর্ন দিয়েছে গাড়িটি।

আহমদ মুসার চোখ-মুখ শক্ত হয়ে উঠল। ও গাড়িটা নিশ্চয় দেখেছে আমরা ডুপ্লের বাড়ি থেকে বেরুচ্ছি। সুতরাং....।

আহমদ মুসা মুখ না ফিরিয়েই দ্রুত বলল, 'ডোনা এবং আপনারা সবাই মাথা নিচু করুন'। বলে আহমদ মুসা রিভলবারটা তার ডান হাতে তুলে নিল আবার।

ডোনা সামনের গাড়িটা দেখতে পেয়েছিল এবং আহমদ মুসার মধ্যেকার পরিবর্তনটাও লক্ষ্য করেছিল। এবার আহমদ মুসার কথা শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। তার বুকের হার্ট বিট বেড়ে গেল। সে উদ্বেগের সাথে আহমদ মুসার আহত পায়ের দিকে তাকাল।

রাস্তা থেকে গাড়িটা নেমে আসছিল নব্বই ডিগ্রি এ্যাংগেলে ডুপ্লের বাড়ির গেটের দিকে।

আহমদ মুসা গেট থেকে বেরিয়ে গাড়ি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এ্যাংগেলে নিয়ে রাস্তায় উঠার জন্যে ছুটল। আহমদ মুসার বাম হাত ছিল স্টেয়ারিং হুইলে এবং ডান হাতে ছিল রিভলবার।

আহমদ মুসার গাড়ির গতি দেখে ঐ গাড়িটাও তার গতি চেঞ্জ করল। আহমদ মুসা বুঝল ওরা গাড়ির সামনে এসে পথটা ব্লক করতে চায়।

আহমদ মুসা গাড়িটাকে সে সুযোগ দিতে চাইল না। প্রথম গুলীটি ছুঁড়ল সে ঐ গাড়িটার সামনের বাম চাকা লক্ষ্য করে। সাইলেন্সার লাগানো রিভলবারের অবশিষ্ট দু'টি গুলীর একটি এটি। মূল্যবান গুলীটি ব্যর্থ হলো না। টায়ারটি ভীষণ শব্দে ফেটে গেল। গাড়িটি একদিকে কাত হয়ে গেল। গতি স্লো হয়ে গেল গাড়িটির।

এই সুযোগে আহমদ মুসা তার গাড়ি বের করে নিয়ে এল ঐ গাড়িটির সামনে দিয়ে।

আহমদ মুসার গাড়ি ঐ গাড়িটি পার হবার সাথে সাথেই থেমে গেল ঐ গাড়িটি। ডান দিকের দরজা দিয়ে লাফ দিয়ে নামল দু'জন স্টেনগানধারী। নেমেই ব্রাশ ফায়ার করল আহমদ মুসার গাড়ি লক্ষ্যে।

কিন্তু এতক্ষণে আহমদ মুসার গাড়ি রাস্তায় উঠে দ্রুত চলতে শুরু করেছে। মাত্র দু'তিনটা গুলী এসে আঘাত করল আহমদ মুসার গাড়ির পেছনটাতে। যা গাড়ির গায়ে কয়েকটা ফুটোর সৃষ্টি করল, কিন্তু টায়ার অক্ষত থাকল।

আহমদ মুসা মোড় ঘুরাবার আগে মুখ বাড়িয়ে পেছনের দিকে চাইল। দেখল, এরা সবাই গাড়ি থেকে বেরিয়ে ডুপ্লের বাড়ির গেটের দিকে ছুটছে। আহমদ মুসা বুঝল ওদের টার্গেট ডুপ্লের গাড়ি বারান্দায় ব্ল্যাক ক্রসের সেই

মাইক্রোবাস। হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'ডোনা ওরা মাইক্রোবাসটার জন্যে ছুটছে। ওদের আশা, ঐ মাইক্রোবাসটা নিয়ে আমাদের ফলো করবে'।

স্তম্ভিত ডোনা তাকাল আহমদ মুসার দিকে। এতক্ষণে ডোনা বুঝল কেন আহমদ মুসা মাইক্রোবাসটির টায়ার ফাটিয়ে দিয়েছিল। ভক্তি, শ্রদ্ধা ও আনন্দে হৃদয় ভরে গেল ডোনার।

আরও কিছুটা এগিয়ে জনবিরল একটা জায়গায় রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করাল আহমদ মুসা। তারপর নেমে গিয়ে রুমালটা খুলে নিয়ে এল গাড়ির নাম্বার প্লেট থেকে।

রুমাল নিয়ে ফিরে ডোনার কাছের দরজায় এসে বলল, 'ডোনা এবার তুমি ড্রাইভিং সিটে যাও'।

ডোনা মুখ তুলে আহমদ মুসার দিকে একবার চেয়ে ঠোটে এক টুকরো হাসি নিয়ে চলে গেল ড্রাইভিং সিটে।

আহমদ মুসা তার সিটে উঠে বসে পেছন দিকে চাইল। দেখল, ডুপ্লে, তার স্ত্রী এবং তাদের মেয়ে ডোনার আব্বার পাশে গাড়ির সিটে বসে নেই। সিটের নিচে বসে আছে তারা। বিস্মিত হলো আহমদ মুসা।

একটু সামলে নিয়ে বলল, 'মিঃ ডুপ্লে এবার ডোনাকে আপনার বাড়ির লোকেশন বলুন'।

ডুপ্লের বাড়ির সামনে আহমদ মুসাদের গাড়ি এসে দাঁড়াল, তখন রাত সাজে দশটা।

গাড়ি থেকে নামল সবাই।

ডুপ্লের নতুন বাসা বহুতল ভরনের একটা ফ্ল্যাট।

প্রবেশ করল তারা ফ্ল্যাটে।

ড্রইং রুম এলোমেলো।

'ডোনার আব্বা, ডোনা ও আহমদ মুসাকে স্বাগত জানিয়ে ডুপ্লে বলল, আসুন, কোন কিছুই ঠিক অবস্থায় নেই। আপনারা দয়া করে বসুন'।

বসল ওরা তিনজন সোফায়।

ডুপ্লে, ডুপ্লের স্ত্রী ও মেয়ে বসল সোফার সামনে কার্পেটের ওপর।

বসেই বলল ডুপ্লে, ‘জনাব আহমদ মুসার সাথে এঁদের পরিচয় করিয়ে দেই’। বলে তার স্ত্রী ও মেয়ের না পরিচয় দিল আহমদ মুসার কাছে।

‘জনাব আমৃত্যু আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব আমরা। আপনি শুধু ডুপ্লেকে নয়, একটা পরিবারকে ধ্বংস থেকে বাচিয়েছেন’। ডুপ্লের স্ত্রী লেটিছিয়া আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল।

‘কল্পনা করতে পারি না এতক্ষণ আমাদের কি হতো, কোথায় থাকতাম আমরা। বেঁচে থাকলেও সে জীবনটা হতো মৃত্যুর চেয়েও যন্ত্রণাদায়ক’। বলে ডুপ্লের মেয়ে রোসা ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল।

‘আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর রোসা। যে আল্লাহ তোমার মধ্যে মায়ার সৃষ্টি করেছেন, সেই আল্লাহই ওকে রক্ষা করেছেন’। বলল আহমদ মুসা।

‘আপনি ছিলেন সেই ঈশ্বরের দুত’। বলল রোসা।

‘না রোসা, তোমাদের যিশু আমাদের মোহাম্মদ স. এবং এ ধরণের নবী-রসূল যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা ঈশ্বরের দূত। আমি আল্লাহর একজন বান্দা মাত্র’।

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা ডুপ্লের দিকে চেয়ে বলল, ‘মি. ডুপ্লে আমি আপনার কাছে এসেছি ব্ল্যাক ক্রসের হেড কোয়ার্টার কোথায় তা জানার জন্য। আপনি সাহায্য করলে বাধিত হবো’।

ডুপ্লের মুখ মলিন হয়ে উঠল। বলল, ‘আমার খুব কষ্ট লাগছে। আপনি হয়তো ভাববেন আমি মিথ্যা বলছি। এই আমার মেয়ের মাথা ছুঁয়ে বলছি, বলে ডুপ্লে মেয়ে রোসার মাথায় হাত দিয়ে বলল, ‘হেড কোয়ার্টার কোথায় আমি জানি না। শুধু এইটুকু জানি ‘একটা ঐতিহাসিক গীর্জা’কে কেন্দ্র করে ওদের হেড কোয়ার্টার গড়ে উঠেছে। গীর্জাটি ইংলিশ চ্যানেলের মুখে আটলান্টিকের তীরে কোন একটি শহরে’।

‘ধন্যবাদ মি. ডুপ্লে। আপনাকে বিশ্বাস না করলে আপনার কাছে আসতাম না’।

‘মাফ করবেন, আমার একটা প্রশ্ন, আপনি কি করে জানলেন আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি?’ কৌতুহল ডুপ্লের চোখে।

‘ফিলিস্তিন দূতাবাসে যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন সে চিঠি পড়ে’।

‘আরেকটি প্রশ্ন’ বলল ডুপ্লে, ‘আমি এখনও বুঝতে পারিনি, কেন আপনি ব্ল্যাক ক্রসের মাইক্রোবাসের টায়ার নষ্ট করলেন এবং কেন গাড়ির নাম্বার প্লেটের ওপর রুমাল লাগিয়েছিলেন?’

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘ব্যাপারটা খুবই সাধারণ। আমি খুব খারাপটাই চিন্তা করেছিলাম, আমরা বের হবার সময়ই ওরা আসবে এবং ওদের সাথে সংঘাত বাঁধবে আমাদের। তারই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছিলাম ও দুটি কাজ করে। ওদের গাড়ি নষ্ট হলে যাতে মাইক্রোবাসটি নিয়ে ওরা আমাদের অনুসরণ না করতে পারে সেজন্যই টায়ার নষ্ট করেছিলাম। আমাদের অনুসরণ করতে না পারলে চেষ্টা করবে আমাদের গাড়ির নাম্বার নিয়ে ওয়্যারলেসে তাদের দলের লোকদের জানিয়ে দিতে, যাতে ওরা আমাদের পিছু নিতে পারে। এই পথ বন্ধের জন্যই নাম্বার প্লেট ঢেকে দিয়েছিলাম’।

ডোনার আব্বা, ডোনা, ডুপ্লে, তার স্ত্রী ও মেয়ে রোসা অভিভূতের মত তাকিয়েছিল আহমদ মুসার দিকে।

‘আজ বুঝলাম দুনিয়ায় এত বড় বড় কাজ আপনি কিভাবে করেছেন। বুঝলাম, ব্ল্যাক ক্রসের প্রায় তিন ডজন লোক আপনার হাতে মরল কি করে’। নীরবতা ভেঙে বলল ডুপ্লে।

‘ঈশ্বর ওকে দিয়ে করান। তা না হলে খালি হাতে এভাবে সশস্ত্র তিনজনকে কুপোকাত করা অবিশ্বাস্য’। বলল রোসা।

‘ঠিক বলেছ তুমি রোসা’। হেসে বলল আহমদ মুসা। তারপর ডোনার আব্বার দিকে চেয়ে বলল, ‘জনাব আমার কাজ শেষ। আমরা এবার উঠতে পারি’।

‘চল উঠি’। বলে ডোনার আব্বা উঠে দাঁড়াল।

তার সাথে সবাই উঠে দাঁড়াল।

উঠে দাঁড়িয়ে আহমদ মুসা বাইরে বেরুবার জন্যে দরজার দিকে পা বাড়াতে বাড়াতে বলল, ‘মি. ডুপ্লে আপনার পরিকল্পনা কি? ব্ল্যাক ক্রসের সাথে এবার আপনার প্রকাশ্য সংঘাত শুরু হলো’।

মুখ ম্লান হয়ে গেল ডুপ্লেসহ তার স্ত্রী ও মেয়ে সকলের।

‘ঠিক করেছি, আজ ভোরের মধ্যেই বৃটেন চলে যাব। সেখান থেকে আমেরিকা। আমেরিকায় ব্ল্যাক ক্রসের কাজ কম। ওখানে ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান শক্তিশালী’। শুকনো কন্ঠে বলল ডুপ্লে।

‘আমরা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ ডুপ্লে। আমরা তোমার শুভ কামনা করছি’। বলল ডোনার আব্বা।

ডোনার আব্বা ও ডোনা দরজায় পৌছে গিয়েছিল বাইরে বেরুবার জন্যে। ডুপ্লেরা তিনজন মাথা নিচু করে শরীর সামনে বাঁকিয়ে বাউ করল ডোনার আব্বা ও ডোনাকে। তাদের চোখে সম্মান ও শ্রদ্ধা ঠিকরে পড়ছিল। আহমদ মুসা আগের মতই বিস্মিত হলো সম্মান প্রদর্শনের এই বাদশাহী কায়দা দেখে। আবার আহমদ মুসা যখন চলে আসছিল, তখন সাধারণভাবেই তাকে বিদায় দিল ‘গুড ইভিনিং’ বলে। এই পার্থক্য আহমদ মুসাকে খুবই বিস্মিত করল।

সামনে হাঁটছিল ডোনা ও ওর আব্বা। ওরা লিফটের কাছাকাছি পৌছে গিয়েছিল। আহমদ মুসার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল। স্বাভাবিকভাবে হাঁটার চেষ্টা করেও খোঁড়াতে হচ্ছে তাকে।

হঠাৎ ডোনা পেছনে তাকিয়ে দেখতে পেল আহমদ মুসাকে। ছুটে এল সে। একটা হাত ধরে বলল, ‘খুব কষ্ট হচ্ছে আপনার? ধরি আপনাকে একটু?’ নরম বেদনাভরা কন্ঠ ডোনার।

‘আমাকে নির্ভরশীল করো না ডোনা। তোমাকে তো সব জায়গায় পাব না’। ঠোঁটে হাসি টেনে বলল আহমদ মুসা।

‘আমার সে যোগ্যতা নেই। কিন্তু যতটুকু পারি করতে দেবেন না?’ ভারী কন্ঠে বলল ডোনা।

‘অতটা অচল হইনি। সে রকম হলে তো তুমি আমাকে জিজ্ঞেস না করেই ধরে ফেলতে’।

ডোনার আব্বাও দাঁড়িয়েছিল।

আহমদ মুসারা সেখানে এলে বলল, ‘খুব কষ্ট হচ্ছে আহমদ মুসা?’

‘জি না। সেই অর্থে কোন কষ্টই হচ্ছে না জনাব’।

লিফটে নেমে এল ওরা নিচে।

লিফট থেকে নেমে ডোনা আহমদ মুসার হাত ধরতে যাচ্ছিল।

আহমদ মুসা হাতটা টেনে নিয়ে মাথা চুলকালো। যেন মাথা চুলকাবার জন্যেই সে তাড়াতাড়ি হাতটা টেনে নিয়েছে।

কিন্তু ডোনার কাছে ব্যাপারটা বোধ হয় ধরা পড়ে গেছে। সে একবার চকিতে আহমদ মুসার দিকে মুখ তুলে চাইল। আহমদ মুসা দেখল ডোনার মুখে ক্ষোভের চিহ্ন।

'ডোনা গাড়িতে টেলিফোন আছে?' মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল আহমদ মুসা।

'আছে, কেন?'

'ফিলিস্তিন এমবেসিকে গাড়ির জন্যে বলতে হবে। তোমাদের গাড়ি নিয়ে এমবেসিতে যাওয়া ঠিক হবে না'।

'এমবেসিতে যেতে হবে কেন?' ক্ষোভ এবং গম্ভীর কণ্ঠ ডোনার। গাড়ির কাছে সবাই এসে পৌছল।

'কে এমবেসিতে যাবে?' জিজ্ঞেস করল ডোনার আব্বা ডোনাকে।

ডোনা কোন উত্তর দিল না।

মাথা নিচু করে সে গিয়ে ড্রাইভিং সিটে বসল। আষাঢ়ের মেঘের মত তার মুখ থমথমে।

'আমি বলছিলাম এমবেসিতে ফেরার কথা'। আহমদ মুসা বলল।

'কেন? এমবেসিতে কেন?'

'ছিলাম তো ওখানে। আর আপনাদের কষ্ট দেয়া হবে'।

হাসল ডোনার আব্বা মি. মিশেল প্লাতিনি। বলল, 'কোনটা আমাদের জন্যে কষ্টের হবে? তোমার আমাদের সাথে যাওয়া বা না যাওয়া? বল তো তুমি?'

আহমদ মুসা কোন কথা বলল না। উঠে বসল ডোনার ড্রাইভিং সিটের পাশের সিটে।

ডোনার আব্বা পেছনের সিটে উঠে বসেছে।

ডোনা দু'হাতে স্টিয়ারিং হুইল ধরে চুপ করে বসে আছে।

'কই চল মা?' বলল ডোনার আব্বা পেছনের সিট থেকে।

‘কোথায় আব্বা?’

‘কেন বাড়িতে?’

‘উনি তো কিছু বলেননি’। মুখ নিচু রেখেই গম্ভীর কন্ঠে বলল ডোনা।

‘পাগল মেয়ে। সব কথা ধরতে হয়। এমবেসিতে ছিল, ওখানে ফেরার কথা তো বলবেই। আমি এখনি টেলিফোনে বলে দিচ্ছি, আহমদ মুসা আমার ওখানে থাকছে’। ডোনার আব্বার মুখে স্নেহপূর্ণ হাসি।

আহমদ মুসা ডোনার আষাঢ়ে মুখের দিকে চাইল। কিছু বলল না। চাপা গর্জন করে উঠে স্টার্ট নিল ইঞ্জিন। চলতে শুরু করল বাড়ি। কিছু দূর এগোনোর পর ডোনা বলল, ‘আব্বা ডাক্তারকে বলে দাও আমরা বাড়িতে পৌছেই যেন তাঁকে পাই’।

‘ঠিক বলেছ মা’। বলে টেলিফোনটা পাশ থেকে আবার তুলে নিল।

এক মনে গাড়ি চালাচ্ছে ডোনা। একবারও সে ফিরে তাকায়নি আহমদ মুসার দিকে। অবস্থা অন্ধকারেই দেখা যাচ্ছে তার সে আষাঢ়ে মুখের কোন পরিবর্তন হয়নি।

আহমদ মুসার ঠোঁটে একটা মিষ্টি হাসি ফুটে উঠল। ভাবল, ডোনার কোন পরিবর্তন হয়নি। সেই প্রচন্ড অভিমানী আর জেদী এখনও সে। তবে রক্ষা যে, এই রাজকীয় অভিমান ও জেদের পাশে রাজকীয় ধরনের বড় একটা মন তার আছে বলেই তার জেদ ও অভিমানটাও সুন্দর হয়ে উঠেছে।

একটা বিশাল গেটের সামনে এসে গাড়ির গতি স্লো হয়ে পড়ল।

‘আমরা এসে গেছি’। আহমদ মুসার দিকে চেয়ে বলল ডোনা।

‘ধন্যবাদ’। বলল আহমদ মুসা।

বিশাল গেট পেরিয়ে বিরাট চত্বরের সুন্দর বাগানের মধ্যে দিয়ে বিরাট একটা রাজকীয় ভবনের গাড়ি বারান্দায় গিয়ে বাড়ি থামল।

আহমদ মুসা বিস্মিত হলো বিরাট গাড়ি এবং তার বিশাল এরিয়া দেখে। এমন বাড়ি তো দূরে থাক, প্যারিসে ডোনাদের কোন বাড়ি আছে বলেও আহমদ মুসা জানতো না।

গাড়ি দাঁড় করিয়েই ডোনা নেমে পড়ল। তারপর গাড়ি ঘুরে আহমদ মুসার দরজার সামনে এল। আহমদ মুসা ততক্ষণে গাড়ির দরজা খুলে ফেলেছিল। বাম পাটা নামিয়ে দিয়েছিল। ডান পাটা নাড়তেই ব্যথা করে উঠল।

ডোনা এসে আহমদ মুসার একটা হাত ধরে নামিয়ে নিল তাকে গাড়ি থেকে।

'ধন্যবাদ ডোনা। পা'টা সত্যিই কাজ করছে না'।

'গালি দিন, ধন্যবাদ দেবেন না। জোর করে নিয়ে এসেছি'। ফিস ফিস করে বলল ডোনা। একটু থামল। তারপর কণ্ঠ একটু চড়িয়ে বলল, 'আঘাতটা ডিপ ছিল, তাই বেদনা একটু বেশি হবেই'।

আহমদ মুসাকে নিয়ে ডোনা ও তার আব্বা লিফটের দিকে এগিয়ে চলল।

দু'পাশে দাঁড়ানো কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারী মাথা নত করে শরীর বাঁকিয়ে বাউ করল তাদের। যেন রাজারা ঢুকছেন রাজ দরবারে।

এই দৃশ্য আগের মতই বিস্মিত করল আহমদ মুসাকে।

# ২

আহমদ মুসার ঘরের বন্ধ দরজায় নক করল ডোনা। তিনবার নক করার পর দরজাটা ঈষৎ ফাঁক করে ডোনা বলল, 'আসতে পারি?'

'এস'। ভেতর থেকে ভেসে এল আহমদ মুসার কন্ঠ।

ঘরে প্রবেশ করল ডোনা।

পেছন থেকে দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দে ডোনা থমকে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, 'ও হো দরজা তো বন্ধ হওয়া চলবে না'। বলে ফিরে এসে ডোনা দরজা খুলল এবং খুলে রাখল।

দরজা থেকে ফিরে আসতে আসতে ডোনা বলল, 'সত্যিই কি এর প্রয়োজন আছে? আমরা কি একে অপরকে বিশ্বাস করতে পারি না? দরজা খোলা রেখে লোকভয়ের পাহারা দাঁড় করাবার সত্যিই কোন প্রয়োজন আছে কিনা?'

'শুধু আমাদের বিশ্বাসের প্রশ্ন নয় ডোনা, অন্যের বিশ্বাসের কথাও আমাদের ভাবা উচিত। লোকভয়ের পাহারার কথা বলছ কেন, দরজা খোলা রাখার অর্থ অন্যের সন্দেহ ও অবিশ্বাসের দরজা বন্ধ রাখা। তোমাকে আরেকটা কথা ভাবতে হবে, দুনিয়ার সবাই আমি এবং তুমি এক অবশ্যই নই। তাছাড়া বন্ধ ঘরে আমি তুমি একা থাকি না। আরেকজনও থাকে। সে হলো শয়তান। বন্ধ দরজা তাকে সাহায্য করতে পারে আমাদের পরাজিত করার জন্যে'।

আহমদ মুসার কথায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল ডোনার মুখ। আহমদ মুসা কথা শেষ করলেও ডোনার বিস্মিত-বিমুগ্ধ দৃষ্টি আটকে থাকল আহমদ মুসার চোখের ওপর। কিছুক্ষণ পর বলল, 'সব বুঝার বিরাট অহমিকা আমার আজ আপনি ভেঙে দিলেন। এই মুহুর্তে আমার মনে হচ্ছে, আমাকেই আমি খুব বেশি চিনি না। আমি বুঝতে পারছি, আপনি যে শয়তানের কথা বললেন, তা তো আমার আপনার সকলের মধ্যেই আছে। সুযোগ পেলেই জেগে ওঠে বীভৎস রূপ নিয়ে। এই নতুন বোধ জাগিয়ে দেয়ার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ'।

বলে ডোনা হাতে করে নিয়ে আসা একটা বই আহমদ মুসার দিকে তুলে ধরে বলল, ‘এটাই মিনিং অব দি কুরআন। এর সবগুলো ভলিয়ম পড়ে আমি শেষ করেছি’।

আহমদ মুসা বইটা হাতে নিয়ে বলল তোমার চয়েসটা সুন্দর হয়েছে ডোনা। কুরআনের যতগুলো ইংরেজি তাফসীর আছে, তার মধ্যে এটাই সব দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ।

‘কুরআনের তাফসীর পড়তে গিয়ে একটা ছোট বিষয় আমার কাছে আজকের দুনিয়ার জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। সেটা হলো পরিবার ব্যবস্থা। আজ আমাদের মত দেশের সমাজগুলোতে পরিবার ব্যবস্থা প্রায় ধ্বংসই হয়ে গেছে। কিন্তু কুরআন সন্তানের প্রতি পিতামাতার কর্তব্য ও দায়িত্ব এবং পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য ও দায়িত্ব সুস্পষ্ট করে দিয়ে এবং একে মৃত্যু পরবর্তী জীবনের পুরস্কার ও শাস্তির সাথে অবিচ্ছেদ্য করে দিয়ে মানুষের পরিবার ব্যবস্থাকে অক্ষয় করে দিয়েছে’।

‘একে তুমি ছোট বিষয় বলছ কেন ডোনা? মানুষের ইহজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান এই পরিবার। এ জন্যেই পৃথিবীর শয়তানী শক্তি এর প্রতি আঘাত করার মাধ্যমেই মানুষ ও মানব সমাজকে বিকৃত করতে চেয়েছে এবং এখনও সে চেষ্টাই করছে’।

থামল আহমদ মুসা। থেমেই আবার প্রশ্ন করল ডোনাকে, ‘একটা ছোট প্রশ্ন করি তোমাকে ডোনা?’

‘করুন’।

‘সমাজ ও পরিবারে নারীদের যে স্থান চিহ্নিত করেছে কুরআন, সে ব্যাপারে তোমার মত কি?’

হেসে উঠল ডোনা। বলল, এটা ছোট প্রশ্ন বুঝি। এটা নিয়েই তো তোলপাড় হচ্ছে গোটা দুনিয়া’।

হ্যাঁ, প্রশ্নটাকে বড়ও বলতে পার, আবার ছোটও বলতে পার’।

‘ঠিক বলেছেন। প্রশ্নটা নিয়ে আমি অনেক চিন্তা করেছি। সুরা নিসা ও সুরা নুরসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশ বার বার পড়েছি এবং বর্তমান অবস্থার আলোকে

বুঝতে চেষ্টা করেছি। এই চেষ্টা করতে গিয়ে আমি দেখেছি, আমাদের ইউরোপ যখন নারীকে মানুষ মনে করতো না এবং যখন নারীকে শয়তানের বাহন মনে করতো, সেই সময় কুরআন 'মায়ের পায়ের তলায় সন্তানের বেহেশত' বলে নারীকে পুরুষের চেয়ে উঁচুতে স্থান দিয়েছে। আবার 'স্বামী-স্ত্রী একে অপরের অভিভাবক' বলে তাদের সমমর্যাদার আসনে সমাসীন করেছে। কিন্তু আবার বিভিন্ন দিকের বিবেচনায় আমার মনে হয়েছে নারী বঞ্চনার শিকার এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ। পারিবারিক ও সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষকে নারীর চেয়ে অগ্রাধিকার দেয়াই আমার এই মনে করার কারণ। আমি অনেক চিন্তা করেও এই বৈষম্যের যৌক্তিকতা পাইনি। অবশেষে এই যৌক্তিকতা আমি খুঁজে পেয়েছি চারপাশের প্রকৃতি থেকে এবং তা পেয়েছি একটা ঘটনার মাধ্যমে। একদিন আমি ভিডিওতে 'সাগর বক্ষের জীব' এ ধরণের প্রকৃতি বিষয়ক একটা ফিল্মে দেখলাম, একটা পুরুষ অক্টোপাশ নারী অক্টোপাশকে তাড়া করছে এবং নারী অক্টোপাশ ক্লান্ত হবার পর পুরুষ অক্টোপাশ তাকে বশে নিয়ে এল। ঐ ফিল্মের জানলাম, এটাই অক্টোপাশদের জীবন-প্রকৃতি। এই ঘটনায় হঠাৎ একটা নতুন দৃষ্টি আমি লাভ করলাম। দেখলাম প্রাণী জগতে সর্বত্র এই একই দৃশ্য। একে কি আমি বৈষম্য বলব? মানুষের ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি না হয় ধরা যাক কুরআন কিংবা অন্য কোন ধর্ম করল, কিন্তু প্রাণী জগতের ক্ষেত্রে এই বৈষম্য সৃষ্টি কে করল? উত্তর পেলাম এ বৈষম্য প্রকৃতি থেকেই। এ বৈষম্য কেউ করেনি। এটাই প্রকৃতি। মানুষও এক ধরণের প্রাণী। সুতরাং মানুষের নারী-পুরুষের মধ্যকার এই পার্থক্যটাও প্রাকৃতিক। এই উপসংহার থেকেই আমি পারিবারিক ও সামাজিক কোন কোন ক্ষেত্রে কুরআনে উল্লেখিত পুরুষের অগ্রাধিকারের যুক্তি খুঁজে পেয়েছি'। থামল ডোনা।

তার দিকে বিস্ময় ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েছিল আহমদ মুসা। বলল, 'ধন্যবাদ ডোনা। চমৎকার যুক্তি তুমি এনেছ। এ দিকটির দিকে সম্ভবত খুব অল্প মানুষই দৃষ্টি দিয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্র আছে যেমন বোনের চেয়ে ভাই পিতার সম্পত্তির দ্বিগুণ অংশ পায়, আল কুরআনের এই বিধানটাকে তুমি কোন দৃষ্টিতে দেখ?'

'আমার পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে বুঝি?' মুখ টিপে হেসে বলল ডোনা।

তারপর আহমদ মুসার সামনে বসা ডোনা সোফায় একটু নড়েচড়ে বসে গম্ভীর কন্ঠে বলল, 'প্রথমে ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই আপত্তিকর ঠেকেছিল। একদিন আমি আমার কলেজের সমাজতত্ত্ব বিভাগের প্রবীণ শিক্ষক ম্যাডামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম এ বিষয়ে। তিনি বললেন, 'এই ধরণের ভাগের কথা শুনতে খারাপই লাগে। কিন্তু এর বুনিয়াদ তো মানব মনের স্বাভাবিক প্রবণতা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। মানব সমাজ-তত্ত্বের গোটা ইতিহাস ঘাটলে তুমি দেখবে অনুল্লেখযোগ্য ও অস্বাভাবিক কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া মেয়েরা বিয়ের পর পিতার পরিবার ছেড়ে স্বামীর পরিবারের একজন হয়ে গেছে, আর ছেলেরা গ্রহণ করেছে পিতামাতার দায়িত্ব। পিতামাতাও তাদের ছেলের সংসারকেই নিজের সংসার মনে করে, মেয়ের সংসারকে নয়। আজ আমাদের পাশ্চাত্য সমাজ ছেলে সন্তান ও মেয়ে সন্তানের পার্থক্য মুছে ফেলার শত চেষ্টার পরেও পিতামাতারা তাদের জামাই বাড়িকে নিজের বাড়ি মনে করে না। আমার কথাই ধর, তোমার মতই আমি আমার পিতামাতার একমাত্র সন্তান। বিয়ের পর স্বামীর সাতে স্বতন্ত্র বাড়িতে উঠে এলাম। আমার স্বামীর আব্বা-আম্মা অন্য এক শহরে থাকতেন তাদের আরেকজন ছেলের সাথে। আমি আমার বৃদ্ধ আব্বাকে আমাদের সাথে থাকতে বলেছিলাম। তিনি রাজি হননি। তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন আমাদেরকে তার সাথে গিয়ে থাকতে। কিন্তু আমার স্বামী এটা মেনে নিতে পারেনি। এ নিয়ে মনোমালিন্য হওয়ায় আমি একাই আবার আব্বার কাছে চলে যাই। আমি আমার স্বামীকে তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত নিই। কিন্তু আব্বা বাধা দিয়ে বলেছিলেন, আমি তোমাকে বিয়ে বহির্ভূত জীবন যাপনের সিদ্ধান্ত নিতে দেব না। যদি তাই হয়, যদি আবার বিয়ে কর তুমি, তাহলে নতুন জামাই এখানে এসে থাকবে, এই গ্যারান্টি তুমি দিতে পার না। সুতরাং এই ইস্যুতে স্বামীকে তালাক দেয়া তোমার ঠিক হবে না। তুমি তোমার স্বামীর কাছে ফিরে যাও। আমার কথা ভেব না। আমি ঠিক করেছি, ভাতিজা 'জন' আমার এখানে থেকে কলেজে পড়বে। বাস্তবতা মেনে নিয়ে আমি আমার স্বামীর ঘরে ফিরে এসেছিলাম। সুতরাং দেখ, আমি আর্থিকভাবে স্বামীর ওপর নির্ভরশীল না হওয়ার পরেও পিতার সংসারকে আমি আপন সংসার বানাতে

পারিনি এবং পিতা আমার সংসারকে তার সংসার বানাতে পারেনি। ডোনা, এই বাস্তবতার কারণেই মোহামেডানদের পরিকল্পিত সমাজে ছেলে সন্তানকে পিতামাতার সম্পদের বেশি অংশ দেয়া হয়েছে মেয়ে সন্তানের চেয়ে'। থামল ডোনা। হাসল সে।

হেসে বলল, 'ম্যাডাম যে কথা বলেছেন, সেটা আমারও কথা'।

আহমদ মুসার মুগ্ধ দৃষ্টি ডোনার ওপর নিবদ্ধ। ফুলহাতা শুভ্র গাউন পরেছে ডোনা। মাথায় শুভ্র রুমাল। রুমালের নিচের প্রান্তদ্বয় গলায় পেঁচানো। ডোনার চোখে-মুখেও একটা শুভ্র পবিত্রতা।

আহমদ মুসা তার দৃষ্টি নামিয়ে নিল। বলল, 'ডোনা, আমার মনে হচ্ছে কি জান, তোমরা ইউরোপীয়রা যদি ইসলামকে বুঝতে চেষ্টা কর, তাহলে আমাদের চেয়ে ভালো বুঝতে পারবে। আর যদি তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, তাহলে ইসলামের আহ্বানকে তোমরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি যোগ্যতার সাথে দুনিয়াবাসীর সামনে পেশ করতে পারবে'।

'ধন্যবাদ। কিন্তু সূর্য বুঝি চাঁদের এভাবে প্রশংসা করতে পারে?' একটা বিচ্ছুরিত আবেগ ঠিকরে পড়ছে ডোনার চোখ-মুখ থেকে।

'তোমরা চাঁদ, কে বলল ডোনা? প্রতিটি মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ মানবিকতার অধিকারী। প্রত্যেকেই একেকটি সূর্য'।

একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর সোফায় সোজা হয়ে বসল। বলল গম্ভীর কন্ঠে, 'সত্যি বলছি ডোনা, তোমরা পাশ্চাত্যের লোকেরা যে বুদ্ধিবৃত্তিক মানে পৌছেছ তার সাথে ইসলামের শিক্ষা যদি যুক্ত হয় তাহলে আজ হতে পার তোমরা দুনিয়ার শিক্ষক'।

'ধন্যবাদ আপনাকে। বড় যারা তারা ছোটদের এভাবে বড় করেই ভাবে'। ঠোঁটে হাসি টেনে বলল ডোনা।

'না ডোনা, বড়রা বড়দেরই চিহ্নিত করে'।

'কিন্তু ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করার মত বুদ্ধি কি পাশ্চাত্যের আছে?'

'ডোনা তো পাশ্চাত্যেরই একজন'।

'আহমদ মুসা কি পাশ্চাত্যের পথভ্রষ্ট সব ডোনার কাছে যেতে পারবেন?'

হাসল আহমদ মুসা।

কিন্তু গাম্ভীর্য নেমে এল তার মুখে সব মুহূর্তেই। বলল, 'ঠিক বলেছ ডোনা। ইসলামের সবচেয়ে বড় অসুবিধা এটাই। পাশ্চাত্যের কাছে তার আহ্বান পৌঁছাবার উপযুক্ত এবং প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণের বড় অভাব'।

'তাহলে কি দাঁড়াল, অভাব কি আহ্বানের প্রতি সাড়া দেয়ার মত উপযুক্ত মনের, না অভাব আহ্বান পৌছাবার মত উপযুক্ত মানুষ ও মনের?'

'দ্বিতীয়টাই ঠিক ডোনা। আহ্বান উপযুক্ত হলে আজকের ইউরোপে আদর্শিক শূণ্যতায় আহ্বান গ্রহণের উপযুক্ত মন সহজেই সৃষ্টি হতে পারে'।

'ধন্যবাদ'। বলল ডোনা।

বলে ডোনা উঠে দাঁড়াল। বলল, এখন কি করবেন?

'কেন বলছ?'

'চলুন ঘুরে আসি। আমাদের বেজমেন্টেতো যাননি। মজার কিছু জিনিস আছে'।

'মাটির তলায় কতগুলো রুম আছে তোমাদের? বিল্ডিং-এর সবটা জুড়েই কি?'

'বলা যায়'।

'চল যেতে পারি'। বলে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

ডোনা ও আহমদ মুসা পাশাপাশি হাঁটছিল।

'বেজমেন্টে তো অবশ্যই কেউ থাকে না?' বলল আহমদ মুসা।

'ভয় নেই, ওখানে এখন আব্বা আছেন'। ঠোঁটে একটা দুষ্টুমির হাসি টেনে বলল ডোনা।

'নিশ্চয় উনি কাজে আছেন, আমরা তাকে বিরক্ত করবো না তো?'

'কাজ কি! প্রতিদিন একটা সময় তিনি বেজমেন্টে কাটান'।

বাড়ির অভ্যন্তরের একটা স্বতন্ত্র লিফটে তারা মাটির তলায় একটা হলঘরে গিয়ে নামল।

হলঘরেই মাঝ বরাবর একটা টেবিলে বসে কিছু কাগজপত্র নাড়াচাড়া করছিল ডোনার আব্বা মি. প্লাতিনি।

তারা লিফট থেকে নামতেই ডোনার আব্বা চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে কয়েক ধাপ সামনে এগিয়ে স্বাগত জানাল আহমদ মুসাকে। বলল, 'আজকেই মনে করেছিলাম তোমাকে আমাদের ফ্যামেলি জাদুঘরে নিয়ে আসব। এসে ভালো করেছ'।

'না আব্বা, উনি আসেননি। আমি নিয়ে এসেছি'।

ডোনার আব্বা হাসল। বলল, 'তোমাকে ধন্যবাদ ওকে নিয়ে আসার জন্যে'।

বলে আহমদ মুসার দিকে চেয়ে বলল, 'আমার এই মা'র কিছুর অভাব নেই, ভিখারী শুধু স্নেহের এবং প্রাপ্য স্নেহ সে আদায় করে ছাড়ে'।

'ভিখারী বললে আব্বা? আমি তো ঋণ গ্রহণ করি না, প্রাপ্য নেই'।

'স্নেহের মতে বিষয়গুলো কি বিনিময় যোগ্য পণ্য? তা না হলে প্রাপ্য হয় কি করে?'

'হয়। একতরফা কাজে আমি বিশ্বাস করি না। এখানেই প্রাপ্যতার প্রশ্ন আসে। তবে আপনার 'পণ্য' শব্দ ব্যবহারের সাথে আমি একমত নই'।

'কেন?'

'স্নেহের মত অরূপ জিনিসগুলো পরিমাপ যোগ্য নয়, টাকার অংকে বিনিময় যোগ্য নয়। সুতরাং পণ্য শব্দের ব্যবহার এক্ষেত্রে অমর্যাদাকর'।

ডোনার আব্বা হাসল। বলল, 'তোমাকে ব্যারিষ্টার না বানিয়ে ভুলই করেছি। যাক, মা তুমি আহমদ মুসাকে জাদুঘরের জিনিসগুলো দেখাও'।

লিফট থেকে আহমদ মুসারা যে হলে নেমেছে, সেটা বিরাট একটা হলঘর। হলের চারদিকের দেয়াল জুড়ে শোকেস। হলের মধ্যখানে ডিম্বাকৃতি আরেকটা শোকেস।

ডোনা আহমদ মুসাকে নিয়ে শোকেসের দিকে এগোলো।

শোকেসগুলোতে পরিধেয় বস্ত্রাদি, জুতা থেকে শুরু করে শিরস্ত্রাণ পর্যন্ত নানা উপকরণ, অলংকারাদি এবং হাতে ব্যবহৃত অস্ত্রাদি সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

কয়েকটি শোকেসে আহমদ মুসা দেখল ফ্রান্সের সম্রাট ষষ্ঠ হেনরী ও ত্রয়োদশ লুইয়ের পোশাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য উপকরণাদি। তার সাথে তাঁর একটা তৈলচিত্র।

এভাবে সে পরবর্তী শোকেসগুলোতে দেখল সম্রাট চতুর্দশ লুই, পঞ্চদশ লুই, ষোড়শ লুইয়ের পোশাক-পরিচ্ছদ, তৈলচিত্র, ব্যবহার্য উপকরণাদির সংগ্রহ। আহমদ মুসা মনে মনে হিসেব করল ফরাসি বিপ্লবোত্তর ২০ বছরের ইতিহাস বাদে ২৩৫ বছরের ইতিহাস সংরক্ষণ করা হয়েছে এখানে। এই সময়ে ফ্রান্সে বুরবো রাজবংশে রাজত্ব করেছে। লুই সম্রাটেরা এই বংশেরই শাসক ছিলেন।

আহমদ মুসা প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল ডোনার দিকে। বলল, 'এতো দেখছি বুরবো সম্রাটদের স্মৃতির সংরক্ষণ'।

'আপনি বুরবোদের ইতিহাস জানেন?' বলল ডোনা।

'ইতিহাস যখন, কিছু তো জানতেই হবে'।

'কেমন লাগে সে ইতিহাস?'

'সম্রাট অষ্টাদশ লুইকে আমি শ্রদ্ধা করি। তিনি ছিলেন গণতান্ত্রিক রাজতন্ত্রী। গণতন্ত্রের পক্ষে তাঁর উদ্বেগ ও কাজকে ইতিহাস কোনদিনই ভুলবে না'।

'ইউরোপীয় ইতিহাসের এত বিস্তারিত খবর রাখেন আপনি?'

আহমদ মুসা ডোনার প্রশ্নের দিকে না গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বুরবো সম্রাটদের সবার স্মৃতি এখানে ধরে রাখা হয়েছে, কিন্তু শেষ সম্রাট দশম চার্লসের কোন কিছু এখানে নেই কেন?'

'দশম চার্লসকে আমরা বুরবো বলে মনে করি না। তাঁকে আমরা ভুলতে চাই'।

'কেন?'

'সম্রাট অষ্টাদশ লুইয়ের উত্তরাধিকারী ফরাসী গণতন্ত্রের মানসপুত্র যুবরাজ ডিউক ডি বেরী লুইকেই সে শুধু হত্যা করেনি, হত্যা করেছিল ফরাসী গণতন্ত্রকে'। বলল ডোনা।

ডোনার আব্বাও এ সময় তাদের সাথে এসে যোগ দিল।

আরেকটু সামনে এগোলো তারা।

শুরু হলো অশাসক বুরবোদের চিত্র কাহিনী।

প্রথমেই দুটি শোকেসে নিহত যুবরাজ ডিউক ডি বেরীর ব্যবহৃত পোশাক-পরিচ্ছদ, তৈলচিত্র ইত্যাদি।

আহমদ মুসা বিস্মিত হলো, শুধু বুরবো রাজবংশ ছাড়া ফ্রান্সের আর কোন রাজবংশের স্মৃতি সংরক্ষণ এখানে করা হয়নি। আহমদ মুসা ডোনার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বুরবো রাজ বংশের আগে আরও তো রাজবংশ ছিল, তাদের কোন চিহ্ন ও স্মৃতি তো এখানে দেখছি না?'

'কারণ এটা আমাদের ফ্যামিলি জাদুকর'। বলল ডোনা।

'ফ্যামিলি জাদুঘরে কি শুধু এক রাজবংশের কথাই থাকতে হবে?'

'তুমি যে অর্থে ভাবছ, সে অর্থে সে রকম কোন ফ্যামিলি জাদুঘর এটা নয়। এখানে আমরা আমাদের পরিবারের অতীতকেই শুধু ধরে রাখার চেষ্টা করেছি'। বলল ডোনার আব্বা।

আহমদ মুসার চোখে-মুখে নেমে এল এক রাশ বিস্ময়। বলল, 'অর্থাৎ আপনারা বুরবো রাজবংশের মানে বুরবো রাজাদের আপনারা উত্তর পুরুষ?'

ডোনার আব্বা মিশেল প্লাতিনির ঠোঁটে একটা ম্লান হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'এটাই ইতিহাস'।

বলে মি. প্লাতিনি আহমদ মুসাকে আরেকটু সামনে এগিয়ে নিয়ে একটা বড় শোকেসের সামনে দাঁড় করালো।

শোকেসটিতে ফ্রান্সের বুরবো রাজবংশের বিস্তৃত বংশ তালিকা। ১৫৮৯ সালে সম্রাট ষষ্ঠ হেনরী থেকে এই রাজবংশের শুরু। বংশ তালিকায় প্রথম নাম সম্রাট ষষ্ঠ হেনরীর। বংশ তালিকায় প্রত্যেক নামের সাথে ছবি রয়েছে।

গোটা বংশ তালিকার ওপর নজর বুলালো আহমদ মুসা। সর্বশেষ নাম সে দেখল 'প্রিন্সেস মারিয়া জোসেফাইন লুই'। তার আগের নাম প্রিন্স মিশেল প্লাতিনি লুই। আহমদ মুসা বুঝল প্রিন্স মিশেল প্লাতিনি লুই ডোনার আব্বা। কিন্তু শেষ নামের সাথে যে ফটো সে দেখেছে, সেটা ডোনার, কিন্তু নাম মেলে না।

আহমদ মুসা ডোনার আব্বার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, ‘প্রিন্সেস মারিয়া জোসেফাইন লুই কে?’

‘ওটাই ডোনার পারিবারিক নাম’। হেসে বলল ডোনার আব্বা।

উত্তরটা দিয়েই ডোনার আব্বা ডোনার দিকে চেয়ে বলল, ‘আমি ওপরে যাচ্ছি, ওষুধ খেতে হবে। লিফটের পাশের ঘরে দু’জন কনডিশনার কাজ করছে। ওদের চেকিং-এর কাজ হয়ে গেছে। ক’মিনিট পরে ওরা চলে যাবে। ওদের বিদায় দিয়ে পরে তোমরা এস’।

বলে ডোনার আব্বা লিফটের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

চলে গেল ডোনার আব্বা।

ডোনার চোখে-মুখে কিছুটা লজ্জা ও বিব্রতকর অবস্থার ছাপ।

ডোনার আব্বা চলে যেতেই আহমদ মুসা মাথা নিচু করে শরীরটা সামনে ঝুঁকিয়ে ‘বাউ’ করল ডোনাকে এবং বলল, ‘তাই তো বলি, ডুপ্লেরা তোমাদেরকে অত ‘বাউ’ করছিল কেন, কেন ডুপ্লেরা তোমার আব্বার পাশে গাড়ির সিটে বসেনি এবং কেন ডুপ্লেরা ড্রইং রুমে সোফায় না বসে কার্পেটে বসেছিল। প্রশ্ন তখনি মনে জেগেছিল আমার। জবাব পাইনি’।

ডোনার মুখটা আরও লাল হয়ে উঠেছে। বলল, ‘আব্বা, আমি-আমরা কেউ চাই না, আমাদের সাথে ওরা এই আচরণ করুন। আমরা তাদের পাশে বসাতে চাই। প্রজার স্টাইলে বাউ করতে আমরা নিষেধ করি সব সময়। কিন্তু কেউ শুনে না। আমরা কি এর জন্যে দায়ী?’ ডোনার কন্ঠে প্রতিবাদের সুর।

‘নিষেধ করবে কেন? ওরা তো অন্যায় কিছু করছে না। একটা বাস্তবতাকেই তারা স্বীকৃতি দিচ্ছে মাত্র’।

‘আপনিও বিদ্রুপ করছেন? যে যা নয় তাকে তা বলা তার জন্যে অপমানকর’।

‘তুমি কি বুরবো বংশের রাজকুমারী নও?’

‘কুমারী, কিন্তু রাজকুমারী নই। ওদের সাথে রক্তের সম্পর্ক ছাড়া আর কোন সাদৃশ্য নেই’।

‘এটা তোমার কথা। মানুষের কথা নয়। মানুষের কাছে তুমি বুরবো বংশের রাজকুমারী। মানুষের কাছে মর্যাদা তোমাদের এ কারণেই’।

‘এ মর্যাদা আমরা কারও কাছে কখনও চাইনি’। ক্ষুব্ধ কন্ঠে বলল ডোনা।

‘চাওনি বলেই নিষেধও করতে পার না’।

‘সুতরাং মুখ বুজে আপনার ‘বাউ’ গ্রহণ করে আমাকে প্রিন্সেস সেজে বসে থাকতে হবে বুঝি’। ডোনার কন্ঠে প্রচন্ড ক্ষোভ।

‘একটা বাস্তবতাকে তুমি অস্বীকার করতে চাইছ কেন ডোনা?’

‘আমি ‘ডোনা’ আমি ‘মারিয়া’ হতে চাই না’। ডোনার কন্ঠে ক্ষোভের উত্তাপের চেয়ে এবার অশ্রুর সিক্ততা বেশি।

‘মারিয়া ও ডোনার মধ্যে সংঘাত কোথায় ডোনা?’

‘মারিয়া রাজকুমারী, বুরবোদের এক ধ্বংসাবিশেষ। আর ডোনা আপনার অনেক পরিচিত এক নির্দোষ বালিকা’। আবেগে কাঁপল ডোনার কন্ঠ।

‘কিন্তু ডোনা, মারিয়ার মধ্যে তো আমি কোন দোষ দেখি না। রাজকুমারী হওয়া তার কোন অপরাধ নয়’।

‘কেন, বুরবোদের রক্তাক্ত রাজদন্ড কি রাজকুমারী মারিয়াকেও স্পর্শ করে না?’

‘যার ধর্ম শুধু তার ওপর বর্তায় ডোনা, রক্তের ওপর বর্তায় না। তাছাড়া বুরবোদের রক্তাক্ত রাজদন্ডকে তোমাদের সাক্ষাৎ পূর্বপুরুষ বুরবো যুবরাজ ডিউক ডি বেরী নিজের রক্ত দিয়ে মুছে দিয়ে গেছেন। বুরবোদের সর্বশেষের এই গৌরব রাজকুমারী মারিয়াকেও উজ্জ্বল করেছে’।

‘আপনি ভালো, তাই ভালোটাই আপনি দেখতে পান। কিন্তু সত্যই কি বুরবোদের প্রিন্সেস মারিয়া জোসেফাইন লুই ডোনা জোসেফাইনকে অপরিচয়ের অন্ধকারে ঠেলে দেয় না?’ ভেজা কন্ঠ ডোনার। তার দু’চোখ থেকে দু’ফোটা অশ্রু নেমে এল তার দু’গন্ড বেয়ে।

‘এই নতুন পরিচয় ডোনাকে আমার কাছে আরও সুন্দরতর করেছে’।

ডোনা দুহাতে মুখ ঢাকল। কয়েক মুহুর্ত চুপ থাকল। তারপর বলল, ‘বাঁচালে তুমি আমাকে’।

আহমদ মুসা শোকেসগুলোর দিকে মনোযোগ দিল। ডোনা ধীরে ধীরে সামনে এসে দাঁড়ালে আহমদ মুসা বলল, 'বাঁচলে কি করে ডোনা?'

এতক্ষণে হাসল ডোনা। বলল, 'সবকিছু আপনাকে জানতে হবে না'।

'সব কিছু জানব না কিন্তু কিছু তো জানতে পারি?'

'কি?'

'তুমি' কিংবা 'আপনি' যে কোন একটা বলা দরকার। দুটোই তো বলছ তুমি'।

'কখনও না, আপনার সাথে এ বেয়াদবী করতে পারি না'।

আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়াল। মুখোমুখি হলো ডোনার। বলল, 'এই তো এখনি বললে'।

ডোনা মুখ নিচু করল।

মুখটা তার গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, 'মাফ করবেন। হয়তো হয়ে গেছে। আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম'।

'মাফ চাইছ কেন? অপরাধ মনে করছ?'

'তা নয়, কিন্তু....'।

কথা শেষ করেই হলের ও প্রান্তের দিকে চেয়ে বলল, 'ঐ যে কন্ডিশনাররা চলে গেল। চলুন আমরা যাই'।

বলে হাঁটা শুরু করল ডোনা।

আহমদ মুসাও চলল।

উপরে উঠে গেল তারা লিফটে।

ফ্যামিলি জাদুঘরের লিফট রুমটা মি. প্লাতিনি ও ডোনার বেডরুমের মাঝখানের করিডোর।

ডোনার বেডরুমের সামনে এসে আহমদ মুসা বলল, 'আসি ডোনা'।

'চলুন, আপনাকে পৌছে দিয়ে আসি'।

চলতে শুরু করল দু'জনে।

দু'জনেই নীরবে মাথা নিচু করে হাঁটছিল। এক সময় ডোনা তার চোখ নিচু রেখেই বলল, 'আপনার প্রশ্নের জবাব পুরো করতে পারিনি কিছু মনে করেছেন?'

'কেন পারনি?'

'অনেক সময় অনেক কিছু পাওয়া যায় না'।

আহমদ মুসারা হাঁটছিল ডোনাদের ফ্যামিলি ড্রইং রুমের সামনে দিয়ে।

ডোনার আব্বা ড্রইং রুমে বসে কাগজে নজর বুলাচ্ছিল। আহমদ মুসাদের যেতে দেখে বলল, 'আহমদ মুসা একটু এস'।

আহমদ মুসা ও ডোনা দু'জনেই প্রবেশ করল ড্রইং রুমে।

আহমদ মুসা বসলে ডোনার আব্বা খবরের কাগজের লাল পেন্সিলে মার্ক করা একটা অংশ তাকে দেখিয়ে বলল, 'ছোট্ট বিজ্ঞাপনটা পড়'।

আহমদ মুসা পড়ল। বলল, 'জি, একটা ফার্ম ছোট খাট ভাঙা ও ফুটো হওয়া গাড়ি ক্রয় মুল্য থেকে দশ পারসেন্ট ডিসকাউন্টে কিনছে'।

'হ্যাঁ, এটাই। খুব লোভনীয় সুযোগ। এ ধরণের গাড়ি শতকরা ৩০ ভাগ ডিসকাউন্ট ছাড়া কেউ নেয় না। এই সুযোগে আমাদের সেদিনের ফুটো হয়ে যাওয়া গাড়িটাকে বিক্রি করে দিতে পারি। আমরা গাড়িটা এখন ব্যবহার করছি না'।

'অন্যের চেয়ে ২০ পারসেন্ট কম ডিসকাউন্টে নিচ্ছে। এটা স্বাভাবিক নয়'।

'অস্বাভাবিক হলে তার কারণ কি হতে পারে?' বলল ডোনার আব্বা।

আহমদ মুসা একটু ভাবল। বলল, 'আপনি আপনার এই গাড়ি ভুয়া নাম্বার ও ভুয়া ঠিকানা দিয়ে সার্ভিস সেন্টারে পাঠিয়ে দিন। তারপর এই পত্রিকায় এই কলামে একটা বিজ্ঞাপন দিন। তাতে বলুন, গাড়ি আপনি বিক্রি করবেন। পেছনের বডিতে কয়েকটা ফুটো হওয়া ছাড়া নিখুঁত গাড়ি। উপযুক্ত কমিশনে বিক্রি হবে'।

'ঠিক আছে। বিজ্ঞাপন দিলাম। গাড়ি পাঠালাম। কিন্তু ভুয়া নাম্বার ভুয়া ঠিকানা কেন?'

‘এই বাড়ি এবং আপনাদেরকে দৃশ্যপটে না আনার জন্যে’।
‘ঠিক আছে। দু’টি কাজই আজ করাচ্ছি’।
‘ধন্যবাদ’। বলে আহমদ মুসা উঠল।
ডোনাও উঠল।

আহমদ মুসা তার ড্রইং ১৯ রুমের সোফায় বসে পত্রিকার বিজ্ঞাপনটার কথাই ভাবছিল। সে নিশ্চিত যে, বিজ্ঞাপনটা ব্ল্যাক ক্রসই দিয়েছে। এর অর্থ ব্ল্যাক ক্রস মরিয়া হয়ে উঠেছে তাদের বুলেটে বিদ্ধ গাড়িটা খুঁজে পাবার জন্যে। গাড়িটা তারা খুঁজে পেতে চায় ডুপ্লেকে ধরার জন্যে, না ডুপ্লের সাহায্যকারীদের ধরার জন্যে? ডুপ্লে যদি ইতিমধ্যে ধরা না পড়ে থাকে, তাহলে ডুপ্লেই তাদের প্রধান টার্গেট। আহমদ মুসা নিশ্চিত, ডুপ্লে ধরা পড়েনি। তাদের প্রধান টার্গেট ধরা পড়লে তারা গাড়ি খোঁজার এত গরজ করতো না। আহমদ মুসা যে ডুপ্লেকে উদ্ধার করার ঘটনার সাথে জড়িত আছে, এ কথা ব্ল্যাক ক্রস জানে না। এছাড়া শার্কবে’র জাহাজ, নানতেজ এবং সুরলুরের ঘটনা আহমদ মুসার কাজ, একথাও ব্ল্যাক ক্রস নিশ্চয় জানে না। মুখে হাসি ফুটে উঠল আহমদ মুসার। মি. ক্লাউডে ঠিকই বলেছেন, ব্ল্যাক ক্রস অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী। অন্যকে পরোয়া খুব কম করে, তাই শত্রু সম্পর্কে অনুসন্ধানেও তারা যায় না। আহমদ মুসার ক্ষেত্রেও তারা তাই করেছে।

আহমদ মুসা একটা বই নাড়াচাড়া করছিল আর ভাবছিল এই সব কথা। দরজায় নক হলো।

আহমদ মুসা মাথা তুলে একবার দরজার দিকে চাইল। তারপর উঠে গিয়ে দরজা খুলল।

দরজায় দাঁড়িয়ে ডোনার আব্বা ও ডোনা।

‘আসুন’ বলে আহমদ মুসা দরজাটা ঠেলে দরজার পাশে কিছুটা সরে এল।

সবাই এসে বসল সোফায়।

ডোনার আব্বা মি. প্লাতিনির চোখে-মুখে কিছুটা উত্তেজনার ছাপ।

বসেই বলে উঠল, 'গাড়ি নিয়ে ঘটনা সাংঘাতিক পর্যায়ে যাচ্ছে'।

'এমনটাই ঘটার কথা। দয়া করে বলুন কি ঘটেছে?' বলল আহমদ মুসা।

'তুমি কি ঘটার কথা বলছ?'

'আমাদের গাড়ির খোঁজ পাবার জন্যে ব্ল্যাক ক্রস একদম হন্যে হয়ে উঠবে'।

'ব্ল্যাক ক্রস?'

'জি। ঘটনা কি ঘটেছে আগে আপনি বলুন, আমি বলছি ঐ ব্যাপার!'

'তোমার কথা মত ক্রেতার ছদ্মবেশে একজনকে পাঠিয়েছিলাম সেই সার্ভিস সেন্টারে। সে লোক গিয়ে গ্যারেজ কর্তৃপক্ষকে গাড়ির কথা বলতেই তারা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছেন। বলেছেন, মশাই গাড়ি কেনার কথা আর বলবেন না। আমরা মহাবিপদে। একটা পার্টি এসেছিল গাড়ি কিনতে। ওরা গিয়েছিল গাড়ির মালিকের বাড়িতে। ঐ নামের গাড়িওয়ালা সেখানে কেউ থাকে না। ক্রুদ্ধ ক্রেতারা এখন আমাদের ঘাড়ে এসে চেপেছে। গাড়ির মালিককে আমাদের খোঁজ করে দিতে হবে। এসব শুনে এসেছে আমাদের লোক। এখন আমাদের কি করণীয়?'

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলল ডোনার আব্বা।

'ঐ ক্রেতারা ব্ল্যাক ক্রসের লোক। গাড়ির মালিকের সন্ধানে ওরা হন্যে হয়ে উঠেছে'।

'বুঝলে কি করে তুমি?'

'সেদিন বিজ্ঞাপন দেখেই বুঝেছিলাম। আজ আপনি তথ্য দিলেন, তাতে আরও নিশ্চিন্ত হলাম'।

'যদি তাই হয়, তাহলে গাড়িটা ঐভাবে ওখানে দিয়ে আমরা কি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লাম না?'

'অজ্ঞাতসারে যে বিপদে আমরা জড়িয়ে পড়তাম, পরিকল্পিতভাবে আমরা সে বিপদের মুখোমুখি হয়েছি'।

‘অর্থাৎ’।

‘ব্ল্যাক ক্রসের হাত ফসকে ডুপ্লে বেরিয়ে যাওয়া, তার ওপর ডুপ্লের বাড়িতে সেদিন ব্ল্যাক ক্রসের তিনজন লোক নিহত হওয়া তাদের শক্তি ও মর্যাদাকেই শুধু আহত করেনি, তাদের গোপনীয়তার যে বৈশিষ্ট্য তাকেও হুমকির সম্মুখীন করেছে। সুতরাং ডুপ্লেকে তারা সন্ধান করবেই। আর ডুপ্লেকে খুঁজে পাওয়ার একটা সহজ পথ হলো আমাদের গাড়িটা খুঁজে বের করা। মানুষ লুকানো যায়, গাড়ি লুকানো যায় না। বুলেটে ফুটো হওয়া গাড়ি হয় আমরা বিক্রি করে দেব, নয়তো সার্ভিস সেন্টারে দেব মেরামতের জন্যে। আমার ধারণা প্যারিসের শুধু নয়, দেশের সবগুলো সার্ভিস সেন্টারে তারা চোখ রাখছে এবং বাড়তি ব্যবস্থা হিসেবে পত্রিকায় দিয়েছে ঐ বিজ্ঞাপন। যাতে বিক্রি করতে চাইলে, তারও সুযোগ যাতে তারা নিতে পারে’।

আহমদ মুসার ওপর নিবদ্ধ চোখ দু’টি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ডোনার আব্বার। বলল, ‘তুমি তো ঠিকই বলেছ আহমদ মুসা। আমাদের গাড়ি যখন সার্ভিস সেন্টারের লোকরা দেখে, তখন বলল, ‘গাড়ি আপনারা বিক্রি করতে চাইলে তাড়াতাড়ি বিক্রি হবে। আমাদের সেন্টারে একটা পক্ষ এসে বলে গেছে পেছনে ফুটো হওয়া এবং এ ধরণের ক্রুটিওয়ালা গাড়ির খবর কিংবা গাড়ির ঠিকানা যেন আমরা তাদের দেই। তারা এ ধরণের গাড়ি কিনতে আগ্রহী’। মধ্যস্থতার কমিশন হিসেবে তারা আগাম একটা ফান্ডও দিয়ে গেছে। সুতরাং তোমার কথা ঠিক যে, আমরা সজ্ঞানে এই পদক্ষেপ না নিলে অজ্ঞাতসারে এবং অপ্রস্তুতভাবে ওদের হাতে গিয়ে পড়তাম। তোমাকে ধন্যবাদ আহমদ মুসা’।

ডোনার মুগ্ধ দৃষ্টি আহমদ মুসার ওপর নিবদ্ধ। বলল, ‘আপনি ভবিষ্যৎকে এতটা নিখুঁতভাবে দেখতে পান কেমন করে? আপনি ভবিষ্যত গণনা জানেন?’

‘আল্লাহ ছাড়া ভবিষ্যৎ কেউ জানে না। ভবিষ্যৎ গণনার মত প্রতারণামূলক কাজ ইসলামে নিষিদ্ধ। আমি যেটা করি সেটা নিছক অনুমান। এই অনুমান সবক্ষেত্রে করা যায় না, সব সময় ঠিকও হয় না। যেমন দেখ, গাড়িকে কেন্দ্র করে এখন কি ঘটতে যাচ্ছে আমি বলতে পারবো না’।

‘এখন বল গাড়ি নিয়ে কি করব। গাড়ি কি নিয়ে আসব?’ বলল ডোনার আব্বা।

‘ব্ল্যাক ক্রস এটাই চাচ্ছে। মালিকের কেউ গাড়ি নিতে গেলে তার পিছু নিয়ে সে মালিকের সন্ধান লাভের চেষ্টা করবে’।

‘সর্বনাশ! এসব ঝামেলার চেয়ে গাড়ি ছেড়ে দেওয়াই ভালো’।

‘তার দরকার হবে না। আমি যাব’।

শুনেই ডোনার মুখ মলিন হয়ে গেল।

ভ্রু কুচকালো ডোনার আব্বা। বলল, ‘তুমি যাবে? কেন? কি দরকার?’

‘জনাব, ওমর বায়াকে উদ্ধারের জন্যে আমাকে ব্ল্যাক ক্রসের কাছে পৌছাতে হবে। এ পর্যন্ত ব্ল্যাক ক্রসকে যতবার পেয়েছি, হারিয়ে ফেলেছি। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের সুযোগ পাইনি। আমি ওদের কাছে পৌছাতে চাই’।

‘এ কাজে আরও লোকের সাহায্য নেয়া যায় না?’ গম্ভীর কন্ঠে বলল ডোনা।

‘অভিযানের মত কাজ হলে সাহায্য নেয়া যায়। অনুসন্ধানমুলক কাজে এমন সাহায্য খুব কাজে আসবে না।

‘কেন?’ প্রশ্ন করল ডোনা।

‘ধর, বর্তমান ক্ষেত্রে আমি যদি কারও সাহায্য নিতে চাই, তাহলে সেই লোককে গাড়ির কাছে পাঠাতে হবে কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ব্ল্যাক ক্রস আজ যে পরিমাণ হন্যে হয়ে উঠেছে, তাতে সে লোক যতটুকু অগ্রসর হতে পারবে, তার চেয়ে অনেক বেশি বিপদগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে’।

‘এ কথা কি আপনার ক্ষেত্রেও সত্য নয়?’ ডোনার কন্ঠে ক্ষোভ ও বেদনার একটা উচ্ছ্বাস ফুটে উঠল। তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল না আহমদ মুসা। একটু পরে ধীরে ধীরে বলল, ‘কথাটা আমার ক্ষেত্রেও সত্য। কিন্তু মূল দায়িত্ব যিনি গ্রহণ করেন, তাকেই মূল কাজ করতে হয়। তা না হলে লাভের চেয়ে ক্ষতি বাড়ে’।

ডোনা উত্তরে কিছু বলল না। নিচু করল তার ম্লান মুখটি।

‘তোমার তাহলে পরিকল্পনা কি?’ বলল ডোনার আব্বা।

‘আমি সার্ভিস সেন্টারে যাব। সন্ধান করব ব্ল্যাক ক্রসের লোকদের’।

‘আমাদের কিছু করার নেই?’

‘আপনারা আমার জন্যে অনেক করেছেন। গাড়িটি ব্ল্যাক ক্রসের কাছে পৌছার আমার একটি সেতুবন্ধ’।

মুখ তুলল ডোনা। তার চোখে-মুখে বেদনা ও ক্ষোভের একটা বিস্ফোরণ। বলল, ‘আমাদের প্রাপ্য বোধ হয় আমাদের দিয়ে দিলেন?’

সংগে সংগে উত্তর এল না আহমদ মুসার কাছ থেকে। গম্ভীর হয়ে উঠল তার মুখ।

মুখ তুলেছিল আহমদ মুসা কিছু বলার জন্যে। কিন্তু আহমদ মুসা কিছু বলার আগেই ডোনার আব্বা বলল, ‘বাবা, এসব ব্যাপারে তোমার কথার উপরে আমাদের কোন কথা চলে না। তোমার ওপর পূর্ণ আস্থা আমাদের আছে। কিন্তু বাবা, ব্ল্যাক ক্রস তোমার ওপর ভীষণ ক্ষেপে আছে, এটাই আমাদের চিন্তার বিষয়’।

‘আমার যতটুকু সাধ্য, আমার ব্যাপারে আমি সতর্ক, বাকিটুকু আল্লাহর হাতে। তাঁর চেয়ে বড় নেগাহবান আর কেউ নেই’।

ডোনার আব্বা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, ‘ঈশ্বর তোমার সহায় হোন। তুমি কখন বেরুচ্ছ?’

আহমদ মুসাও উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘এখনি জনাব’।

ডোনার আব্বা মি. প্লাতিনি বের হয়ে গেল ঘর থেকে। তার সাথে ডোনাও বেরিয়ে গেল মাথা নিচু করে।

ওরা চলে গেলে আহমদ মুসা শুয়ে পড়ল। চোখ বন্ধ করে নিজেকে সঁপে দিল গভীর বিশ্রামের কোলে।

প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে এল আহমদ মুসা।

বেরুবার সময় ডোনাকে না দেখে তার ঠোঁটে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল। তার ঐ কথায় রাগ করেছে ডোনা। ডোনার কথা ভাবতে গিয়ে আহমদ মুসার মনে হলো বুকের কোথায় যেন ছোট্ট একটা অস্বস্তি বোধ করছে সে। মনে হচ্ছে ডোনা সামনে এসে দাঁড়ালে এ অস্বস্তি আনন্দে রূপান্তরিত হতো।

আহমদ মুসা মনের এ ভাবনাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে সামনের পদক্ষেপ দ্রুত করল।

লিফট থেকে নেমেই আহমদ মুসা দেখতে পেল ডোনা দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

পরনে তার সাদা গাউন। মাথা ও গায়ে সাদা ওড়না পেঁচানো।

আহমদ মুসার পায়ের শব্দে তার দিকে ফিরে তাকাল ডোনা। বেদনা মাখা মুখ, সজল চোখ।

'তুমি এখানে?' ম্লান হেসে বলল আহমদ মুসা।

ঠেস দেয়া অবস্থা থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াল ডোনা। দাঁড়াল মুখ নিচু করে। কোন কথা বলল না।

'রাগ করার মত খুব বড় কথা বলেছি বুঝি আমি?'

মুখ তুলল ডোনা। তার সজল চোখ থেকে গড়িয়ে নেমে এল অশ্রু। বলল, 'আমরা অনেক করেছি আপনার জন্যে, আর তো কিছু করার নেই'।

'আমি কি সত্যিই একথা বলতে চেয়েছি?'

ডোনা আহমদ মুসার কথায় কোন উত্তর না দিয়ে সামনের দিকে পা বাড়িয়ে বলল, 'চলূন'।

'কোথায়?'

'অনেক করেছি তো, আরও কিছু করে আসি'।

বলে হাঁটতে শুরু করল ডোনা। তার ডান হাতে গাড়ির চাবি।

আহমদ মুসা ডোনার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'তোমরা যা করেছ, তোমাদের যা প্রাপ্য তাকি এর ধন্যবাদ দিয়ে শোধ করলাম! না শোধ করা যায়?'

'তা জানি না। কিন্তু ঐ ধরণের ধন্যবাদ অনেক ক্ষেত্রে অসহনীয় বেদনার হতে পারে'। চোখ মুছে ডোনা বলল।

'আমি তোমাকে ব্যথা দিতে চাইনি ডোনা'।

কথা বলতে বলতে তারা গাড়ি বারান্দায় এসে পৌছল।

গাড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে ডোনার গাড়ি।

ডোনা গাড়ির দিকে এগিয়ে গাড়ির দরজা খুলে ধরে বলল, 'আসুন'।

কপাল কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে আহমদ মুসার। আহমদ মুসা ডোনার মতলব বুঝতে পেরেছে। বলল, 'ডোনা, তুমি তো জান আমি কোথায় যাচ্ছি'।

'অবশ্যই জানি'। গম্ভীর কন্ঠ ডোনার।

'এবং এও জান যে, তোমার কিংবা তোমাদের পরিবারের সাথে সম্পর্কিত কোন গাড়িতে আমি সেখানে যাব না'।

'জানি'।

'জানার পরেও বলছ আমাকে গাড়িতে উঠতে?'

'এ গাড়ি এখন আমার পরিবারের গাড়ি নয়'।

'অর্থাৎ'। বিস্ময়, আহমদ মুসার কন্ঠে।

'আমি গাড়ির নাম্বার পাল্টে দিয়েছি। নতুন ব্লু বুকও আছে'।

আহমদ মুসার মুখে হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'গোয়েন্দা কর্ম তাহলে শুরু করে দিয়েছ ডোনা?'

'শিখছি'। মুখ ভার তখনও কাটেনি ডোনার।

আহমদ মুসা গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থাকা ডোনার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। গম্ভীর হয়ে উঠেছে আহমদ মুসার মুখ। ডাকল, 'ডোনা'।

ধীর শান্ত কন্ঠ আহমদ মুসার। এ ডাকের মধ্যে একটা আবেগও ছিল।

ডোনা মুখ তুলল। চোখ রাখল আহমদ মুসার চোখে। ডোনার চোখে-মুখে লজ্জার একটা লাল প্রবাহের ঢেউ খেলে গেল। তার ঠোঁটে ফুটে উঠল হাসির একটা ছোট্ট কম্পন। বলল, 'বুঝেছি আপনি কি বলবেন'।

'কি বলব?'

'বলবেন যে, ডোনা ওখানে যাওয়া কি তোমার জন্যে ঠিক?'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'সত্যি ডোনা গোয়েন্দা কর্মে তুমি অনেক দূর এগিয়েছে'।

'অযথা প্রশংসা করা হচ্ছে। এটা তো কমনসেন্সের ব্যাপার'। মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল ডোনা।

‘কমনসেন্সের ব্যাপার নয়, স্ট্রং কমনসেন্সের ব্যাপার। আর স্ট্রং কমনসেন্সই গোয়েন্দা কর্মের পুঁজি’।

‘ধন্যবাদ। উঠুন গাড়িতে’।

‘ডোনা, পাগলামি করো না। ওখানে তোমার যাওয়া হবে না’।

‘কেন?’ গম্ভীর কন্ঠ ডোনার।

‘এক অনিশ্চিত পরিস্থিতির মধ্যে আমি তোমাকে নিয়ে যেতে পারি না।

‘নিতে হবে না, আমার দায়িত্বে আমি যাব’।

‘দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেই কি তুমি যেতে পার?’

‘কেন পারি না? মেয়ে বলেই কি?’

অভিমান ক্ষুব্ধ একটা আবেগ এল ডোনার কন্ঠ থেকে।

‘ইসলামে মেয়েরা যুদ্ধ করতে পারে, যুদ্ধ করেছে। কিন্তু আমি কোন যুদ্ধে যাচ্ছি না। তাছাড়া তুমি শুধু মেয়ে নও, তুমি প্রিন্সেস মারিয়া জোসেফাইন লুই। আমি চাই না তোমাদের পরিবারটা কোন সংকটে পড়ুক’।

‘আমি প্রিন্সেস মারিয়া হতে চাই না। আমি সাধারণ মেয়ে ডোনা’।

‘তার পরেও তুমি প্রিন্সেস মারিয়া। নাম বদলালে তুমি বদলে যাবে না’।

‘আমি তো লড়াইয়ে নামছি না। আমি আপনাকে পৌছে দেব মাত্র’।

‘তারপর কি করবে?’

মারিয়া মুখ নিচু করল, কিছু বলল না।

আহমদ মুসার ঠোঁটে ছোট্ট হাসি ফুটে উঠল। বলল, ‘তারপর তুমি গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করবে এই তো?’

‘কেন, লড়াইয়ে যোগ দিতে পারব না, অপেক্ষা করতেও কি পারবো না?’ কান্নায় রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল ডোনার কন্ঠ।

একটা ঢোক গিলল, থেমে গিয়েছিল তার কথা। আবার শুরু করল। বলল, ‘আপনার ওপর আস্থা আছে আমার। কিন্তু তারপরও সব কাজ একা করা, সব কাজে একা যাওয়া ঠিক নয়’। গলাটা স্বাভাবিক করে তোলার চেষ্টা করে বলল ডোনা।

কথা শেষ করেই ডোনা গাড়ির এ দরজাটা খোলা রেখেই গাড়ি ঘুরে ড্রাইভিং সিটে এসে বসল সে। দুই হাত ষ্টিয়ারিং হুইলের ওপর রেখে তার ওপর কপাল ন্যাস্ত করল।

সেদিকে চেয়ে হাসি ফুটে উঠল আহমদ মুসার ঠোঁটে। ভাবল সে, বুরবো রাজবংশের মেয়েদের রাজকীয় বৈশিষ্ট্য ঠিকই আছে। যা ভালো মনে করে তা করেই ছাড়বে।

আহমদ মুসা সিটে বসে গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলল, 'আমি একা সব কাজ করি না। তবে একজনের কাজে দু'জনকে শামিল করাও ঠিক মনে করি না ডোনা। প্রকাশ্য শক্তির লড়াইয়ে লোক বেশি হলে সুবিধা। কিন্তু বুদ্ধির লড়াইয়ে, বিশেষ করে যা লুকোচুরির মধ্যে দিয়ে চলে, লোক বেশি হলে উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হয়'।

মুখ তুলল ডোনা। তখনও তার মুখ গম্ভীর। চোখটা অশ্রুতে লেপটানো। বলল, 'আপনি অন্যকে যতটা ভালবাসেন নিজেকে ততটা ভালোবাসেন না'।

গম্ভীর হয়ে উঠল আহমদ মুসার মুখ। বলল, 'না ডোনা, নিজেকে খুব বেশি ভালোবাসি বলেই তো আমি এই পথে আসতে পেরেছি'।

'এত জটিল কথা আমি বুঝতে পারি না'।

'আমি মানুষের ভালো চাই, আমি আমার জাতির ভালো চাই, মুক্তি চাই এই জন্যে যে, এই দায়িত্ব পালনের জন্যে আল্লাহ আমার ওপর সন্তুষ্ট হবেন যার ফলে আমি লাভ করব অসীম পুরষ্কার এবং অনন্ত শান্তি'।

'ওতো পরকালের পুরস্কার ও কল্যাণ, শান্তি ও সুস্থতা ইহকালের জন্যেও চাই'।

'সেটাও আল্লাহ আমাকে অনেকের চেয়ে অনেক বেশি দিয়েছেন। দেখ দ্বিজনে কয়েকদিন কি আরামে থাকলাম। আবার দেখ এখানে কি রাজার হালে আছি'।

'শান্তি বুঝি এটুকুরই নাম?'

'শুধু এটুকু নয়, উদাহরণ দিয়েছি মাত্র'। মুখ টিপে হেসে আহমদ মুসা বলল।

‘ধন্যবাদ, জবাব আজ দেব না’। থামল ডোনা।

ইঞ্জিন গর্জন করে উঠল তার গাড়ির। গাড়ি নড়ে উঠল। চলতে শুরু করল গাড়ি।

‘কোথায় যেতে হবে জান?’

‘আস্থা রাখুন’।

‘ধন্যবাদ’। বলে চোখ বন্ধ করে আহমদ মুসা গা এলিয়ে দিল গাড়ির সিটে। ডোনার শেষ কথাটা তখনও তার কানে ভাসছে। সত্যিই নিশ্চিন্ত নির্ভরতার মধ্যে রয়েছে অপার আনন্দ। ভালো লাগছে ডোনার ওপর নির্ভর করতে। অন্তত কিছু সময় তো নিশ্চিন্ত থাকা যাচ্ছে।

গাড়ি থেমে যাবার ঝাঁকুনিতে তন্দ্রাবস্থা ভেঙে গেল আহমদ মুসার।

চোখ খুলে সোজা হয়ে বসল আহমদ মুসা। চারদিকে একবার চোখ বুলাল। দেখল, তার লক্ষ্য সার্ভিস সেন্টারটির বিপরীত দিকে যে সুপার মার্কেট তার কার পার্কিং-এ এসে দাঁড়িয়েছে গাড়ি। চমৎকার জায়গা। এখান থেকে সার্ভিস সেন্টারের গেট দিয়ে সেন্টারের ভেতরের অনেকখানি দেখা যায়। সার্ভিস স্টোর এবং সুপার মার্কেটের মাঝখানে ক্রস-লেন সার্ভিস সেন্টারের গেটের সামনের রোড দিয়ে যে কোন দিকে চলে যেতে পারে।

চোখ ফিরিয়ে তাকাল ডোনার দিকে। ডোনা দুই হাত ষ্টিয়ারিং হুইলে রেখে সামনের দিকে তাকিয়ে বসে আছে।

‘ধন্যবাদ ডোনা, তোমার চমৎকার সিলেকশন’। সপ্রশংস দৃষ্টিতে বলল আহমদ মুসা।

ডোনা স্টিয়ারিং হুইলে মাথা রেখে মুখ কাত করে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। মুখ গম্ভীর। কোন কথা বলল না।

‘এখন তোমার কি পরিকল্পনা ডোনা?’

‘জানি না’।

আহমদ মুসা মাথা নত করল। বলল, ‘ডোনা, এক ঘন্টার মধ্যেও যদি না ফিরি, তাহলে চলে যাবে’।

অন্ধকারের একটা ঢেউ আছড়ে পড়ল ডোনার চোখে-মুখে। বলল, ‘এভাবে বলো না। বলো, এক ঘন্টার মধ্যে ফিরে আসবে’। কাঁপছিল ডোনার কন্ঠ।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘দোয়া করো ডোনা’।

‘ফি আমানিল্লাহ’। বলল ডোনা ষ্টিয়ারিং থেকে মাথা তুলে।

‘আলহামদুলিল্লাহ’।

বলে আহমদ মুসা গাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

# ৩

আইফেল সার্ভিস সেন্টার।

ম্যানেজারের কক্ষ। ম্যানেজার বসে আছে তার চেয়ারে।

তার সামনে বসে চারজন। চারজনের চেহারাই এমন যে, দেখে মনে হবে এই মাত্র ওরা কাউকে খুন করে এসেছে। ওদের সামনে বসা ম্যানেজারকে চোরের মত অপরাধী মনে হচ্ছিল।

কথা বলছিল ওদের চারজনের মধ্যে থেকে সর্দার গোছের লোকটা। বলছিল, আপনি একটা কথাও সত্য বলছেন না। প্রতারণা করছেন আপনি আমাদের সাথে।

'বিশ্বাস করুন, এই গাড়ির ব্যাপারে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছে, গাড়িটা বিক্রি করবে, এসব আমি কিছুই জানি না। নিছক সার্ভিসিং এর জন্যেই গাড়িটা রেখে গেছে। এই প্রতারণায় আমার কি লাভ?'

'সে হিসেব আমাদের নয়। এখন থেকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আমরা এ গাড়ির মালিককে চাই। আপনি হয় তাকে ডেকে আনবেন, নয়তো তার সঠিক ঠিকানা আমাদের দেবেন। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কিছু যদি না করেন, তাহলে আমরা কি করব তা আমরাই জানি'।

ম্যানেজারের মুখ ফাঁসির আসামীর মত চুপসে গেল।

এই সময় ম্যানেজারের কক্ষের দরজায় এসে দাঁড়াল আহমদ মুসা। বলল, 'আসতে পারি?'

ভীত ম্যানেজারের মুখ এবার বিরক্তিতে ভরে গেল। সামনে বসা চারজনের দিকে একবার সে তাকাল। তারপর বলল, 'আসুন?'

আহমদ মুসা ঘরে প্রবেশ করলে ম্যানেজার লোকটি তাকে বসতে বলে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল।

আহমদ মুসা বসে বলল, 'মাফ করবেন আপনি নিশ্চয় ম্যানেজার?'

‘জি’। বলল ম্যানেজার।

‘আমি বিদেশী। আপনার সার্ভিস সেন্টারের এই গাড়িটি আমি কিনে নিয়েছি’। বলে আহমদ মুসা সার্ভিস সেন্টারের দেয়া ডোনাদের সেই গাড়িটার সার্ভিস রিসিট ম্যানেজারকে দেখাল।

আহমদ মুসা পরিকল্পনা করেই এসেছে। সে গাড়ির ক্রেতার পরিচয় দেবে। তার কাছে গাড়ি বিক্রি হওয়ার দলিল পত্রও নিয়ে এসেছে। সে নিশ্চিত জানে, ক্রেতা হিসেবে গাড়ির ডেলিভারি চাইলেই বিপদগ্রস্থ ম্যানেজার ব্ল্যাক ক্রসের লোকদের খবর দেবে অথবা গাড়ি সে নিয়ে যেতে লাগলেই ওঁত পেতে থাকা ব্ল্যাক ক্রসের লোকদের মুখোমুখি হওয়ার সে সুযোগ পাবে এবং ব্ল্যাক ক্রসের লোকদের মুখোমুখি হওয়ার সে সুযোগ পাবে এবং ব্ল্যাক ক্রসের ঠিকানা জানা অথবা পারলে তাদের কাছ থেকে ওমর বায়ার অবস্থান সম্পর্কে কথা বের করার একটা পথা সে পাবে।

গাড়ির সার্ভিস-রিসিটের দিকে তাকাতেই চোখ দু’টি ছানাবড়া হয়ে উঠল ম্যানেজারের। সামনের চারজনের দিকে একবার তাকিয়ে সে বলল, ‘গাড়ির মালিককে কোথায় পেলেন?’

‘কেন তার বাড়িতে?’

‘কিন্তু সার্ভিস সেন্টারে দেয়া এবং পত্রিকায় ছাপানো ঠিকানায় তো তার পাত্তা পাওয়া যায়নি’।

বলে ম্যানেজার সামনে বসা চারজনের দিকে চোখ ফিরিয়ে উৎসাহের সাথে বলল, ‘আপনারা যে গাড়ির মালিকের খোঁজ করছেন, সেই গাড়ি ইনি মালিকের কাছ থেকে কিনেছেন বলছেন।’

চারজন লোকই এক সংগে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। তাদের চোখের দৃষ্টি এমন যেন আহমদ মুসাকে তারা গিলে খাবে। সেই সর্দার গোছের লোকটি বলল, ‘আমরা গাড়িটা কেনার জন্যে ক’দিন থেকে ঘুরছি। ঠিকানা কোথায় পেলেন তার?’

‘কেন কাগজের বিজ্ঞাপনে!’ বিস্মিত হওয়ার ভান করে বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা বুঝল এরা ব্ল্যাক ক্রসের সেই লোক যারা ক'দিন ধরে গাড়ির মালিকের সন্ধানে রয়েছে।

'বিজ্ঞাপনের ঠিকানায় গিয়ে কাউকে পাওয়া যায়নি।'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'পরের দিনের কাগজে একই জায়গায় বিজ্ঞাপনের সংশোধনী ছিল। সে সংশোধনীটা আমি না পড়লে আমারও ভুল হতো।'

'দেখুন আমরা খুব ভুগেছি এবং নিজেদের প্রতারিত মনে করছি। আপনার কাছে পরের দিনের সেই সংশোধিত বিজ্ঞাপনটি কি আছে?'

'না, সে বিজ্ঞাপনটি নেই। তবে ঠিকানা চাইলে দিতে পারব। গাড়ি বিক্রির দলিলে তাঁর ঠিকানা আছে। কিন্তু ঠিকানা দিয়ে কি করবেন? আমি তো গাড়ি কিনে ফেলেছি।'

'আমরা তো গাড়ির কেনা-বেচা করি। এ রকম গাড়ি যারা রাখেন, তারা গাড়ি-বিলাসে ভোগেন। তাদের সাথে পরিচয় থাকলে ভবিষ্যতে সুযোগ আমরা পেতে পারি।'

আহমদ মুসা মনে মনে লোকটির বুদ্ধির প্রশংসা করল। উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে খাসা একটা যুক্তি বের করেছে।

আহমদ মুসা পকেট থেকে বড় সাইজের একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করে কাগজের ভাঁজ খুলে লেখার দিকে একবার নজর বুলিয়ে একটা স্লিপ পেপার টেনে তাতে একটা ঠিকানা লিখে ব্ল্যাক ক্রসের সেই লোকটির হাতে তুলে দিল।

আহমদ মুসা যে ঠিকানা লিখে দিল, সেটাও আগের ঠিকানার মতই ভুয়া। এই ভুয়া ঠিকানা দেয়াও আহমদ মুসার পরিকল্পনার একটা অংশ। আহমদ মুসার লক্ষ্য হলো, ঠিকানা পেয়ে তারা ছুটবে ঐ ঠিকানার উদ্দেশ্যে। আহমদ মুসা তাদের অনুসরণ করবে। ব্ল্যাক ক্রসের লোকেরা ভুয়া ঠিকানায় গিয়ে ব্যর্থতার দুঃখ নিয়ে সব কিছু রিপোর্ট করার জন্যে অবশ্যই তাদের কোন ঘাঁটিতে ফিরবে। ওদের অনুসরণ করে আহমদ মুসা ব্ল্যাক ক্রসের একটা ঘাঁটিতে পৌঁছতে পারবে।

আহমদ মুসার লেখা ঠিকানা হাতে নিয়ে ব্ল্যাক ক্রসের সেই লোকটি বলল, 'ধন্যবাদ, আপনার কি আর একটু সাহায্য পেতে পারি?'

'কি সাহায্য?'

'আপনি আমাদের সাথে চলুন, তাহলে সহজেই আমরা ঠিকানাটা খুঁজে পাব।'

মনে মনে চমকে উঠল আহমদ মুসা। তাহলে কি আহমদ মুসাকে ওরা সন্দেহ করছে। মনে করছে কি যে, তাদেরকে ঠিক ঠিকানা দেয়া হয়নি? যাই হোক, ওরা খুব সিরিয়াস। ব্যর্থতার কোন অবকাশ তারা রাখতে চাচ্ছে না। কিন্তু তার যে পরিকল্পনা সে দিক থেকে এ ধরনের সহযোগিতা সে করতে পারে না। তাছাড়া ঠিকানাটি খুঁজে পাওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। ঠিকানা খুঁজে না পেলে যে সংঘাত বাধবে তাদের সাথে, সেটা আগে বাধাই ভালো।

'এই ঠিকানা বের করার জন্যে কোন সহযোগিতার প্রয়োজন নেই।' বলল আহমদ মুসা।

'আমরা ঠিকানা তো চাই না, চাই ঠিকানার মানুষকে। সে মানুষকে চিনেন আপনি। সুতরাং আপনি আমাদের সাথে থাকলে সুবিধা হবে।'

আহমদ মুসা তাদের যুক্তির বহর দেখে মনে মনে হাসল। বলল, 'আমি তো প্রথমে তাকে চিনতাম না, না চিনেও তো তাঁকে খুঁজে পেয়েছি।'

'দেখুন, ওসব যুক্তি-টুক্তি আমরা বুঝি না। আমদের সাথে আপনাকে যেতে হবে।'

ওদের মুখে এ ধমকের সুর শুনে আহমদ মুসা বুঝল, ওদের ত্বর সইছে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওরা ঠিকানায় পৌঁছতে চায়। আহমদ মুসাকে কার্যত ওরা পণবন্দী করতে চাচ্ছে। ঠিকানা খুঁজে না পেলে কিংবা ঠিকানায় সংশ্লিষ্ট কাউকে না পেলে আহমদ মুসাকে ধরা হবে ওদের খুঁজে বের করার জন্যে। আহমদ মুসা নিশ্চিত যে, ওদের হুমকিমূলক কথার উপযুক্ত জবাব দিলে এখনি মারামারি শুরু হয়ে যাবে কিন্তু আহমদ মুসা ওদের সাথে এখনি মারামারি বাধাতে চায় না। ওদের যেমন টার্গেট গাড়ির মালিক অর্থাৎ ডোনাদের ঠিকানা বের করা, তেমনি আহমদ মুসার টার্গেট হলো ব্ল্যাক ক্রসের কোন ঠিকানা খুঁজে পাওয়া।

আহমদ মুসা বলল, 'তাহলে সময় নষ্ট করে লাভ নেই চলুন।'

বলে আহমদ মুসা ম্যানেজারকে গাড়ি সার্ভিসের পয়সা পরিশোধ করে গাড়ির ডেলিভারি স্লিপ নিয়ে নিল।

ম্যানেয়াজার দারুণ খুশি। বলল, 'যা সংকটে পড়েছিলাম। আপনি আসায় ওদের কাজ হলো এবং আমিও বাঁচলাম।'

'ফিরে এসেও গাড়ি ডেলিভারি নিতে পারতেন। আমদের গাড়িতে সকলের জায়গা হতো।' বলল সেই চারজনের সর্দার গোছের লোকটা।

'কি দরকার এখানে ফেরার।'

বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। ওরা চারজন আগেই উঠে দাঁড়িয়েছিল।

ওরা বেরিয়ে এল কক্ষ থেকে।

আহমদ মুসা তার অর্থাৎ ডোনাদের গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিল।

ওদের চারজনের সেই সর্দার গোছের লোকটা বলল, 'মাফ করবেন। আপনি আমদের গাড়িতে উঠুন। গাড়ির মালিককে না পাওয়া পর্যন্ত এ গাড়ি আপনার নয়।'

ক্রোধে আহমদ মুসার অন্তরটা জ্বলে উঠল। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ঝগড়া বাধাতে চাইল না সে।

আহমদ মুসা কোন কথা না বলে ওদের গাড়িতে গিয়ে উঠল। পেছনের সিটের এক প্রান্তে এসে বসল সে। তার পেছনে বসল দু'জন। আর দু'জনের একজন ড্রাইভিং সিটে, আরেকজন তার পাশের সিটে।

ওদের মুখ প্রসন্ন। যেন বিশ্বজয় করে ফেলেছে ওরা।

সর্দার গোছের সেই লোকটি তার আসনে বসতে বসতে বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, 'আপনার গাড়ির মালিক আমাদের খুব ভুগিয়েছে। তাই কোন অনিশ্চয়তার ঝুঁকি আমরা নিতে চাই না।'

আহমদ মুসা ভাবছিল তখন অন্য বিষয়। যা ঘটতে যাচ্ছে, তা ঘটতে দেয়া যায় না। ভুয়া ঠিকানা পর্যন্ত পৌঁছতে দিলে ব্যাপারটা জটিল হয়ে দাঁড়াবে। ওদের কোন ঘাঁটির ঠিকানা সংগ্রহ তার যে লক্ষ্য সেটা অনিশ্চিত হয়ে পড়তে পারে। সুতরাং আগেই কিছু একটা করতে হবে।

লোকটির কথায় আহমদ মুসার চিন্তায় ছেদ পড়ল। মুখ তুলল আহমদ মুসা। গাড়ির ইনসাইড লাইট তখনও জ্বলে আছে।

চোখ তুলতে গিয়ে সামনের দুই সিটের মাঝখানের জায়গায় কাগজের মোড়কের ওপর হঠাৎ আহমদ মুসার চোখ আটকে গেল।

কাগজের বড় ইনভেলাপ। বেশ পেট ফোলা। তার মধ্যে কাপড় কিংবা বই জাতীয় কিছু আছে। কিন্তু সেদিকটা আহমদ মুসার আগ্রহের বিষয় নয়। তার দু'টি চোখ নিবদ্ধ ইনভেলাপটির ওপরের লেখার ওপর। ফরাসী ভাষায় হস্তাক্ষরে লেখা। পড়ল আহমদ মুসা, 'রলফ এইচ ফ্রিকে, ২১১, 'রো আনাতল ডেলা ফর্গ', প্যারিস ১৯।'

পড়ে চমকে উঠল আহমদ মুসা। এটা ব্ল্যাক ক্রসের কোন ঠিকানা? কাগজের এই কভারে করে সেখানে কোন কিছু এসেছিল? অথবা ব্ল্যাক ক্রসের ঘাঁটি থেকে কেউ এই কভারে করে কোন কিছু ঐ ঠিকানায় পাঠাচ্ছে? কোনটি ঠিক? এই প্রশ্নের সমাধানের একটা উপায় চিন্তা করল আহমদ মুসা।

লোকটির কথার জবাব দিতে সে বলল, 'ধন্যবাদ। ঘটনা যাই হোক। একজন ভদ্রলোকের সাথে ভালো আচরণ করতে পারতেন আপনারা।'

'আমরা খুব খারাপ কিছু করেছি?' বলল সেই সর্দার গোছের সেই লোকটি।

'গাড়ি সম্পর্কে আপনারা অশোভন আচরণ করেছেন। আমি ওদিক দিয়ে 'রো আনাতল ডেলা ফর্গে' যেতে পারতাম। উল্টো আমাকে এখানে আবার ফিরে আসতে হবে।'

কথাটা বলে মনে মনে খুব খুশি হলো আহমদ মুসা। ওদেরকে তাদের ঠিকানা সম্পর্কে কথা বলতেই হবে এবার।

কথা বললও তারা।

আহমদ মুসা কথাটা বলার সাথে সাথে চমকে উঠে সেই সর্দার গোছের লোকটা আহমদ মুসার দিকে ফিরে বলল, 'আপনি রো আনাতল ডেলা ফর্গে থাকেন?'

গাড়ি তখন সার্ভিস সেন্টার থেকে বেরিয়ে অনেক দূর এগিয়ে এসেছিল। দ্রুত চলছিল গাড়ি।

‘হ্যাঁ। চেনেন ওদিকটা?’

‘চিনব না কেন? আমরা তো ঐ রোডেই থাকি।’

‘আপনারা সবাই?’ যেন খুশি হয়ে-আহমদ মুসা বিস্তারিত জানার লক্ষ্যে প্রশ্ন করল।

‘সবাই বলতে পারেন।’

‘ওখানে আপনাদের অফিস, না বাসা?’

‘অফিস। বাসাও আছে।’

আহমদ মুসা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল। নিশ্চিত হলো সে, ২১১ রো আনাতল ওদের একটা ঘাঁটির ঠিকানা।

দ্রুত চিন্তা করছিল আহমদ মুসা। ভুয়া ঠিকানাটা নির্মানাধীন একটা সরকারি ভবনের। ওখানে পৌঁছলে তাকেই অসুবিধায় পড়তে হবে। সুতরাং অবিলম্বে এদের আটকাতে হবে এবং তাকে ওদের রো আনাতল-এর ঘাঁটিতে পৌঁছতে হবে।

গাড়ি তখন ‘লিটল ইল ডেলা সাইট’ নামক বিখ্যাত পার্কের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল।

সেদিকে একবার তাকিয়ে আহমদ মুসা বলল, ‘পার্কে একটু গাড়ি দাঁড় করান, আমাকে একটু টয়লেট করতে হবে।’

সর্দার গোছের লোকটি আহমদ মুসাকে কি যেন বলতে শুরু করেও থেমে গিয়ে ড্রাইভ যে করছিল তার দিকে ফিরে বলল, ‘ঠিক আছে দাঁড় করাও।’

গাড়ি পার্কে প্রবেশ করল।

বিশাল পার্ক। দিনের অফিস চলাকালীন এ সময়ে পার্কে লোক থাকে না বললেই চলে।

পার্কে কিছু পাবলিক টয়লেট আছে। টয়লেটগুলো একটা করে যেন সবুজ দ্বীপ। টয়লেট ঘিরে সবুজ ঝোপ সৃষ্টি করা হয়েছে। মাঝখানে টয়লেট বিল্ডিং। টয়লেটগুলো আসলে বিশ্রাম কেন্দ্রও।

একটা টয়লেটের মাঝে গিয়ে গাড়ি দাঁড় করানো হলো।

আহমদ মুসা গাড়ি থেকে নেমে টয়লেটে প্রবেশ করল।

আহমদ মুসা নেমে যেতেই সর্দার গোছের সেই লোকটি অন্যদের বলল, ‘তোমরা ভেতরে যাও। সাবধানের মার নেই।’

ড্রাইভিং সিটে বসা লোকটিসহ ওরা তিনজন গাড়ি থেকে নেমে আহমদ মুসার পিছু পিছু টয়লেটে ঢুকে গেল।

আহমদ মুসা টয়লেটে ঢুকে দাঁড়িয়েছিল। টয়লেটের বারান্দায় ওদের তিনজনকে উঠে আসতে দেখে আহমদ মুসা দরজার আড়ালে দাঁড়াল।

ওদের চারজনকেই আহমদ মুসা টয়লেটে আশা করছিল। তার হিসেব মেলেনি। সর্দারটাই আসেনি। এর অর্থ তার ওপর সর্দার লোকটির সন্দেহটা খুব পাকাপোক্ত নয়।

ওরা তিনজন হুড়মুড় করে টয়লেটে প্রবেশ করল।

সংগে সংগেই আহমদ মুসা পেছন থেকে দরজা বন্ধ করে রিভলবার বের করে হাতে নিল।

দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দে ওরা তিনজনই ঘুরে দাঁড়াল।

উদ্ধত রিভলবার হাতে আহমদ মুসাকে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওরা ভূত দেখার মত আঁৎকে উঠল।

আহমদ মুসা বলল, ‘তিনটা গুলী ছুঁড়তে এক সেকেন্ডের বেশি সময় লাগবে না। রিভলবারে সাইলেন্সার আছে। আপনারা খুন হলে কেউ জানতে পারবে না।’

বলে আহমদ মুসা বাম হাত দিয়ে পকেট থেকে পেস্টিং টেপের একটা রোল সামনের লোকটার হাতে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, ‘তুমি ঐ দু’জনকে পিছমোড়া করে হাত-পা বেঁধে ফেল।’

ইতস্তত করছিল লোকটা।

আহমদ মুসা ট্রিগার টিপল রিভলবারের। নিঃশব্দে একটা গুলী লোকটার মাথার হ্যাট উড়িয়ে নিয়ে গেল। বলল আহমদ মুসা, ‘দ্বিতীয় গুলী তোমার কপাল ফুটো করে দেবে।’

সংগে সংগেই লোকটা কাজে লেগে গেল। বেঁধে ফেলল দু'জনকে।

পরে আহমদ মুসা অবশিষ্ট লোকটাকে বেঁধে দরজা লক করে বেরিয়ে এল।

আহমদ মুসা টয়লেট বুশ থেকে বেরুতে বেরুতে দেখল সেই সর্দার লোকটা গাড়ি থেকে বেরিয়ে বুশের দিকে এগিয়ে আসছে।

আহমদ মুসার দিকে এক পলক তাকিয়েই জিজ্ঞেস করল, 'ওরা কোথায়?'

'কেন টয়লেটে?'

'তিনজন টয়লেটে কি করছে?' তার চোখে-মুখে সন্দেহ।

'যে জন্যে ওরা গেছে টয়...।'

আহমদ মুসা কথা শেষ করার আগেই সর্দার সেই লোকটা তার পকেটে রাখা হাতটা বের করে আনল। হাতে রিভলবার। আহমদ মুসা কথা শেষ না করেই লোকটার পকেট থেকে বেরিয়ে আসা রিভলবার ধরা হাতটির ওপর এক লাথি ছুঁড়ে মারল।

লোকটা প্রস্তুত ছিল না এর জন্যে। আচমকা লাথি খেয়ে হাত থেকে রিভলবার ছিটকে পড়ে গেল।

মুহূর্তের জন্যে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল লোকটা। কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিয়ে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল আহমদ মুসার ওপর।

প্রায় সাড়ে ছয়ফুট লম্বা বিশাল বপু লোকটা আছড়ে পড়ল মাটিতে আহমদ মুসাকে নিয়ে। লোকটা দু'হাতে গলা চেপে ধরেছিল আহমদ মুসার।

দু'পা গুটিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গিয়েছিল আহমদ মুসা। পড়ে যাবার পর জোড়া দু'টি পা লোকটির কোমরে গেঁথে ছুঁড়ে দিল তার দেহের পেছনের অংশকে।

লোকটার দেহ উল্টে গিয়ে ছিটকে পড়ল আহমদ মুসার মাথার ওপাশে। তার হাতটা নেমে গেল আহমদ মুসার গলা থেকে।

লোকটার দেহ ছুঁড়ে দেবার পর আহমদ মুসা নিজের দেহকে উল্টো মুখে ছুঁড়ে দিল একজন অতি দক্ষ এ্যাক্রোব্যাটের মত।

আহমদ মুসা গিয়ে পড়ল লোকটার ওপর। লোকটা তখন মাথা তুলছিল। আহমদ মুসা গিয়ে তার ওপর পড়ায় তার মাথাটা আবার নিচে নেমে গিয়েছিল। কিন্তু সক্রিয় হয়ে উঠেছিল তার হাতটা। তার ডান হাতের প্রচণ্ড একটা ঘুষি ছুটে গেল আহমদ মুসার চোয়াল লক্ষ্যে।

আহমদ মুসা মাথা সরিয়ে এবং বাম হাত দিয়ে ঘুষিটা ঠেকিয়ে ডান হাত দিয়ে পাল্টা ঘুষি চালাল লোকটার কানের পাশের নরম জায়গাটায়।

পাল্টা আক্রমণ এল না লোকটার দিক থেকে। দেখল লোকটা সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছে।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়ে লোকটাকে টেনে বুশ টয়লেটের ভেতর নিয়ে একটা টয়লেটে ঢুকিয়ে লক করে বেরিয়ে এল।

এসে উঠল গাড়িতে।

ছুটতে শুরু করল গাড়ি 'রো আনাতল ডেলা ফর্গে'র ব্ল্যাক ক্রসের আস্তানার দিকে।

এলাকাটা অনেক দূর।

বেশ সময় লাগল পৌঁছতে।

২০৯ নাম্বার বাড়ির সামনে একটা কার পার্কিং-এ গাড়ি দাঁড় করিয়ে আহমদ মুসা হেঁটে এগিয়ে চলল ২১১ নাম্বার বাড়ির দিকে। গাড়ি ২১১ নাম্বারে না নিয়ে যাবার কারণ ব্ল্যাক ক্রসের গাড়ি থেকে সে নামলে শুরুতেই ওরা তাকে সন্দেহ করে বসবে।

২১১ নাম্বার একটা তিনতলা বাড়ি। এলাকাটা পুরানো প্যারিসের একটা অংশ। দেয়াল ঘেরা বাড়ি। গেট পেরুলেই ছোট্ট সবুজ চত্বর। তারপর উঁচু বারান্দা। বারান্দার পরেই একটা দরজা। দরজা দিয়ে যে ঘরে প্রবেশ করা যায়, সেটা একটা বড় হলঘর বলে মনে হয়। দরজার দু'পাশে দুটি জানালা। জানালা দুটি খোলা। দরজা বন্ধ।

বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল আহমদ মুসা। ধীরে ধীরে চাপ দিল দরজায়। দরজা বন্ধ।

দরজায় নক করল আহমদ মুসা। হাতে তুলে নিল রিভলবার।

আহমদ মুসা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সময় বেশি নেয়া যাবে না। যারা ঘাঁটিতে আছে তাদের কাবু করেই যা জানার জেনে নিতে হবে এবং ঘাঁটিটা একবার খুঁজে দেখতে হবে।

দরজাটা নড়ে উঠল। কেউ দরজা খুলছে। উৎকর্ণ ছিল আহমদ মুসা। কিন্তু ভেতরে কারও পায়ের শব্দ পেল না সে। তাহলে কি আগে থেকেই লোক ছিল।

দরজা খুলে গেল।

শক্ত-সমর্থ দীর্ঘকায় একটা লোক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে।

আহমদ মুসা তার বুক বরাবর পিস্তল তুলে ধরল এবং বাম হাত দিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিল।

লোকটা নির্বিকারভাবে পিছু হটতে লাগল। অবাক হলো আহমদ মুসা যে, লোকটার চোখে-মুখে ভয়ের চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

লোকটাকে লক্ষ্য করে আহমদ মুসা চাপা কণ্ঠে বলল, 'উপুড় হয়ে মেঝেয় শুয়ে পড়। এক আদেশ আমি দু'বার করি না।'

লোকটা সংগে সংগেই শুয়ে পড়ল।

আহমদ মুসা বাম হাত দিয়ে পকেট থেকে পেস্টিং টেপের রোলটি বের করে এগোলো শুয়ে পড়া লোকটির দিকে।

এই সময় ঘরের দু'প্রান্ত থেকে দু'টি কণ্ঠ হো হো করে হেসে উঠল। বলে উঠল দু'টি কণ্ঠই, 'রিভলবার ফেলে দাও সম্মানিত অতিথি। আমরা এক আদেশ দু'বার করি না।'

রিভলবার হাতে রেখেই আহমদ মুসা মুখ ফিরিয়ে দেখল, স্টেনগানধারী দু'জন ঘরের দু'প্রান্তে দাঁড়িয়ে। তাদের স্টেনগান আহমদ মুসার দিকে উদ্যত।

বুঝল আহমদ মুসা, তাকে ফাঁদে ফেলা হয়েছে। এরা আগেই তৈরি ছিল। লোকটির মুখে ভয় ও উদ্বেগ দেখিনি এই কারণেই। কিন্তু এরা জানতে পারল কেমন করে?

আহমদ মুসা রিভলবার ছুঁড়ে ফেলে দিল হাত থেকে।

দুই স্টেনগানধারী এগিয়ে এল আহমদ মুসার দিকে। মেঝেয় শুয়ে পড়া লোকটি উঠে দাঁড়াল। একজন স্টেনগানধারী স্টেনগানের নল দিয়ে আহমদ মুসার ঘাড়ে আঘাত করে হাত থেকে পেস্টিং টেপের রোল কেঁড়ে নিয়ে মেঝে থেকে উঠে দাঁড়ানো লোকটির দিকে তুলে ধরে বলল, 'বেঁধে ফেল শয়তানকে।' বহুত ঘড়েল এক লোক। ওরা আসুক তারপর বিহিত করা যাবে।

এই সময় জানালার দিক থেকে দুপ করে মৃদু একটা শব্দ হল।

আহমদ মুসার বাম পাশের স্টেনগানধারী উল্টে গিয়ে আছড়ে পড়ল মেঝেতে।

আহমদ মুসা মুখ ফিরাল জানালার দিকে। সেই সময়ই তার কানে এসে বাঁজল সে 'দুপ' শব্দ আবার। দুর্বোধ্য এক গোঙ্গানি তুলে আহমদ মুসার ডান পাশের লোকটি লুটিয়ে পড়ল মেঝের উপর।

আহমদ মুসা দেখল, দু'হাতে পিস্তল ধরে জানালায় দাঁড়িয়ে ডোনা।

আহমদ মুসা ঘটনার আকস্মিকতার ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার আগেই দেখল ডোনার পিস্তল ধরা হাত শক্ত হয়ে উঠেছে। সেই সাথে চিৎকার করে উঠল ডোনার কণ্ঠ, 'বসে পড় তুমি।'

সঙ্গে সঙ্গেই আহমদ মুসা নিজের দেহটাকে ছুঁড়ে দিল মেঝের উপর। দেখল, যে লোকটি তাকে বাঁধতে আসছিল, সে লোকটি মেঝে থেকে রিভলবার নিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু সেই 'দুপ' শব্দ আবার তার কানে এসে বাজল। ডোনা গুলী করেছে আবার।

লোকটি আর রিভলবার তুলে উঠে দাঁড়াতে পারল না। গুলী তার মাথা গুঁড়ো করে দিয়েছে। যেমনভাবে সে উঠে দাঁড়াচ্ছিল, তেমনভাবেই সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাটির ওপর।

দরজা ঠেলে ডোনা প্রবেশ করল ঘরে। এখনও সে দু'হাতে পিস্তল ধরে আছে। তার দৃষ্টিতে বিহ্বল ভাব। শিথিল পায়ে সে এগিয়ে আসছে। টলছে সে।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়েছে।

দ্রুত এগিয়ে সে ধরল ডোনাকে।

ডোনার হাত থেকে পিস্তল পড়ে গেল। সে জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসার বাহু শক্ত করে। মাথা রাখল সে আহমদ মুসার কাঁধে।

আহমদ মুসা ডোনার পিঠে হাত বুলিয়ে সান্তনা দিল। বলল, 'এই সময় সাহস হারাতে নেই। তুমি তো জিতে গেছ ডোনা।'

অল্পক্ষণ পরে আহমদ মুসা আবার বলল, 'আমরা এখানে বেশি সময় পাব না ডোনা। ওরা এসে পড়বে।'

ডোনা কাঁধ থেকে মাথা তুলল। সরে দাঁড়াল। তার চোখ-মুখের দিশেহারা ভাব এখনও কাটেনি। বলল, 'আর কি কাজ আছে এখানে?'

'ঘাঁটিটা সার্চ করব। কোন কাগজপত্র, দলল-দস্তাবেজ পাই কিনা। কথা আদায় করার কোন লোক তো অবশিষ্ট থাকল না।'

বলে আহমদ মুসা মেঝে থেকে ডোনার পিস্তলটি তুলে নিয়ে চুমু খেল পিস্তলটায়। তারপর ডোনার হাতে তুলে দিল পিস্তলটা।

ডোনার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

রক্তিম ঠোঁটটা নড়ে উঠল কিছু বলার জন্যে। কিন্তু কথা ফুটল না।

আহমদ মুসা তখন চলতে শুরু করেছে ভেতর বাড়ির দিকে। বলল, 'এস ডোনা।'

দশ মিনিট পরে আহমদ মুসা এবং ডোনা বেরিয়ে এল বাইরের সেই হল ঘরটায়।

আহমদ মুসার চোখে-মুখে বিস্ময়। বাড়িতে সব আসবাবপত্রই আছে। কিন্তু এক টুকরা কাগজও নেই। টেলিফোন আছে। কিন্তু টেলিফোন সেটে নাম্বার স্লিপ নেই, টেলিফোন গাইডও নেই। নানতেজের ঘাঁটিতেও আহমদ মুসা এটাই দেখেছে, মনে পড়ল আহমদ মুসার। অর্থাৎ ব্ল্যাক ক্রস তাদের ঘাঁটিতে এমন কিছুই রাখে না বা থাকে না যা দেখে এদের কোন হদিস পাওয়া যেতে পারে। এদের কোন ব্যক্তিও তা অন্য সহযোগী কিংবা অন্য কোন ঘাঁটি সম্পর্কে কিছু জানে না, জানতে দেয়া হয়না। অদ্ভুত সিকিউরিটি ব্যবস্থা এদের। মনে মনে প্রশংসা না করে পারল না আহমদ মুসা।

হলঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা থেকে চত্বরে নামতে নামতে আহমদ মুসা বলল, 'অদ্ভুত সংগঠন এই ব্ল্যাক ক্রস। ঢুকতেই পারছি না ওদের ভেতরে, যে পথ ধরছি, সে পথই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।'

ডোনা তাকাল আহমদ মুসার দিকে।

নরম সহানুভূতি তার চোখে-মুখে। কিন্তু মুখে কিছু বলল না।

গেটের বাইরেই দাঁড় করানো ছিল ডোনার গাড়ি।

গাড়িতে উঠে বসল দু'জন। ডোনা আগেই ড্রাইভিং সিটের পাশের সিটে গিয়ে বসল। আহমদ মুসা বসল ড্রাইভিং সিটে।

চলতে শুরু করল গাড়ি।

'দেখবেন, পার্কের বুশ টয়লেটে ওদের পাওয়া যায় কিনা?' বলল ডোনা।

আহমদ মুসা ডোনার 'তুমি' পর্যায় থেকে 'আপনি' পর্যায়ে উঠে আসা লক্ষ্য করল। ঈষৎ হেসে তাকাল ডোনার দিকে।

অল্প পরে বলল, 'লাভ হবে না। ওরাই ঘাঁটিতে খবর পাঠিয়ে এদের সাবধান করেছিল। সুতরাং ওরা এতক্ষণে মুক্ত হয়েছে বা মুক্ত করা হয়েছে।'

থামল আহমদ মুসা। একটু পরে আবার শুরু করল, 'তুমি আমাকে বোকা বানিয়েছ ডোনা। তুমি আমাকে ফলো করবে তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি।'

'রাগ করেছ তুমি? আমি চুপ করে থাকতে পারিনি।' অপার্থিব এক আবেগে উপচে পড়ছে ডোনার চোখ-মুখ থেকে।

ডোনার এ প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে আহমদ মুসা বলল, 'তুমি এত সুন্দর পিস্তল চালাতে পার, ভাবতেও আমার অবাক লাগছে?'

'ঠিক নয়, আমি ভালো পিস্তল চালাতে পারি না। আজ কি ঘটেছে বলতে পারবো না। মনে হয় সজ্ঞানে আমি কিছু করিনি।'

'তাহলে প্রিন্সেস মারিয়া জোসেফাইন জেগে উঠেছিল। হাজার হলেও বুরবো রাজকুমারী। তার নিশানা অব্যর্থ না হয়ে পারে না।' আহমদ মুসার ঠোঁটে হাসি।

'বুরবো রাজকুমারী হলে অমন ভেঙে পড়তো না। আপনাকে অবলম্বন না পেলে আমি সংজ্ঞা রাখতে পারতাম না।'

ডোনার ‘আপনি’ ও ‘তুমি’ আবার লক্ষ্য করে হাসল আহমদ মুসা। কিন্তু এ প্রসঙ্গে না গিয়ে বলল, ‘অবলম্বন ছিল বলেই ভেঙে পড়েছিলে। না থাকলে প্রতিরোধ শক্তি আরও বৃদ্ধি পেত।’

‘হবে হয়তো। আমি বুঝি না।’

বলে ডোনা একটু হাসল। তারপর গাড়ির সিটে গা এলিয়ে দিয়ে দু’চোখ বন্ধ করে বলল, ‘আপনি মারিয়া জোসেফাইনকে বেশি কৃতিত্ব দিতে চান। মারিয়া জোসেফাইনের প্রতি আপনার পক্ষপাতিত্ব আছে।’

‘আর তুমি মারিয়া জোসেফাইনকে আড়ালে রাখতে চাও।’

‘কারণ আপনার পরিচয় ডোনা জোসেফাইনের সাথে।’

‘আমার পরিচয়ের ডোনা জোসেফাইন আজ আবির্ভূত হয়েছে মারিয়া জোসেফাইন রূপে।’

‘এখানেই আপত্তি।’

‘তোমার কাছে যা অপত্তির, আমার কাছে তা অলংকার।’

‘অলংকার?’ চোখ খুলল ডোনা।

‘হ্যাঁ। বুরবো রাজ-ঐতিহ্য ডোনা জোসেফাইনকে মনোহর সৌকর্য ও সম্মানের আলোকে উদ্ভাসিত করেছে।’

ডোনা ধীরে ধীরে বলল, ‘আপনি এমন কথা আগেও বলেছেন। কিন্তু আমার ভয় করে। বুরবোদের কাল পাপ না আবার ডোনাকে ঢেকে দেয়। ইসলামকে যতদূর বুঝেছি তাতে শিরকের পরেই ইসলাম সবচেয়ে ঘৃণা করে অবিচারকে।’

‘ভয় তোমার অমূলক ডোনা। বুরবোদের নীল-রক্তের তুমি উত্তরাধিকারী, তাদের কাল-কর্মের উত্তরাধিকার তোমার নেই। দেখ জাগতের শেষ নবী আমাদের রসূল মুহাম্মদ স। পৌত্তলিক কোরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পৌত্তলিকতাকে তিনি উচ্ছেদ করেন, কিন্তু কোরাইশ বংশধারাকে তিনি সম্মান করতেন, এজন্য গর্বও করতেন।’

থামল আহমদ মুসা। ডোনা জবাব দিল না। অনেক্ষণ কথা বলল না। অবশেষে মুখ খুলল। বলল, ‘ধন্যবাদ। ডোনা আর মারিয়া হতে আপত্তি করবে না।’ ডোনার কণ্ঠ আবেগে কাঁপল।

বলেই ডোনা পকেট থেকে একটা লাল গোলাপ বের করে দু’হাতে আহমদ মুসার দিকে তুলে ধরে বলল, ‘মারিয়ার এই অভিষেক মুহূর্তে তার পক্ষ থেকে তোমাকে দেবার মতো এছাড়া আর কিছুই নেই।’

ফুলটি হাত পেতে নিল আহমদ মুসা। একদম তাজা গোলাপ। একবার গন্ধ নিয়ে আহমদ মুসা বলল, ‘মনে হচ্ছে সদ্য তোলা। কোথায় পেলে এই তাজা গোলাপ?’

‘পার্কে তুমি যখন বুশ টয়লেট থেকে বেরিয়ে শেষ লোকটিকেও কুপোকাৎ করলে, তখনই এ গোলাপ আমি তুলেছিলাম। আমি তখন বসেছিলাম একটা গোলাপ ঝাড়ের আড়ালে।’

এ প্রসংগে আহমদ মুসা আর কিছু বলল না। মুহূর্ত কয়েক চুপ থাকার পর বলল, ‘একটা কথা বলি ডোনা?’

‘আপনি’ এবং ‘তুমি’-এর দ্বন্দ্ব তোমার কবে কাটবে?’ মুখে হাসি আহমদ মুসার।

ডোনা মাথা নিচু করল। উত্তর দিল না।

অল্পক্ষণ পরে বলল, ‘পারছি না।’

‘কেন?’

‘হৃদয়ের চাওয়া এবং বিবেকের দণ্ড তো পাশাপাশি থাকে।’

‘হৃদয়ের চাওয়া যদি বিবেকের রায়সম্মত হয়, তাহলে বিবেক দণ্ড উচায় না।’

‘কিন্তু এই চাওয়া এবং এই রায়ের মাঝে সংঘাত আছে। হৃদয়ের চাওয়া কোন শর্ত বিচার করে না, কিন্তু বিবেক তো বাস্তবতা, সম্ভাব্যতা ও ন্যায্যতা সবই পরখ করে দেখে। হৃদয় আকাশের চাঁদ চাইতে পারে, কিন্তু বিবেকের কাছে এটা হাস্যকর।’

মুখ নিচু রেখেই কথা বলছিল ডোনা। তার কন্ঠ ভারী। যেন অশ্রুর কোন সরোবর থেকে তা উঠে আসছে।

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল আহমদ মুসা। কিন্তু বলা হল না। সামনে রাস্তায় পুলিশ দেখে ওদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হল।

সামনেই রাস্তার ডান পাশে প্যারিসের বিখ্যাত লুক্সেমবার্গ প্রাসাদ। সে প্রাসাদের সামনেই পুলিশের বিরাট সমারোহ। বিস্মিত দৃষ্টি সেদিকে ঘুরিয়ে সামনে রাস্তার পাশে চাইতে আহমদ মুসা দেখল রাস্তার ফুটপাত কার পার্কিং জুড়ে অনেক মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে তাদের প্ল্যাকার্ড। সব মেয়ের মাথায় ওড়না। দেখেই আহমদ মুসা বুঝল এরা মুসলিম মেয়ে। ভাল করে দৃষ্টি দিল ওদের প্ল্যাকার্ডের দিকে। প্রথমেই দৃষ্টি দিল যে প্ল্যাকার্ডের দিকে তাতে লেখাঃ 'ধর্মীয় ঐতিহ্যিক অধিকার জাতসঙ্ঘ সনদও নিশ্চিত করেছে।' অন্য একটিতে লেখাঃ 'মুসলমানদের ধর্মীয় অধিকার ফরাসী সরকার পদদলিত করেছে।' অপর একটিতে আহমদ মুসা পড়ল, 'মুসলিম মেয়েদের ওড়না কেড়ে নেয়া মানে তাদের নিশ্বাসকে হত্যা করা।'

ডোনা দ্রুত উচ্চকণ্ঠে বলল, 'ওহো, লুক্সেমবার্গ প্রাসাদে আজ ইউরোপীয় ইউনিয়নের মানবাধিকার কমিশনের বৈঠক বসেছে। মুসলিম মেয়েরা এসেছে ফরাসী সরকার কর্তৃক তাদের অধিকার দমনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে।'

'ইউরোপীয় হিউম্যান রাইটস কমিশন কি ফ্রান্সে বসে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে টু'শব্দ করবে?' বলল আহমদ মুসা।

'ফ্রান্সে বসে কেন, অন্য কোন জায়গায় বসেও করবে না। আসলে একে ওরা মানবাধিকার লঙ্ঘন মনেই করছে না।' বলল ডোনা।

'অধিকারটা মুসলমানদের বলেই কি?'

'ওটা একটা কারণ। সবচেয়ে বড় কারণ হল ধর্মীয় মূল্যবোধ, শালীনতা, এমনকি সাধারন নৈতিকতা সম্পর্কেও ওরা কোন জ্ঞান রাখে না। ওদের বড় বড় ডিগ্রি, সুন্দর সুন্দর পোশাক নিয়ে আর পালিশ করা পরিবেশের মধ্যে মানুষ রূপী যাদের ঘুরে বেড়াতে দেখছেন তারা বলতে পারেন পশু। ফরাসী বিপ্লবের পর এডমন্ড বার্ক কি বলেছিলেন আপনার মনে আছে?'

‘কি বলেছিলেন?’

‘তথাকথিত উদার নৈতিকতাবাদীরা যুক্তি ও বাস্তববাদের দোহাই দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে যখন ধর্মকে ছেঁটে ফেলল, তখন বার্ক বলেছিলেন, ‘যুক্তি মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ। তবে যুক্তিবাদের শক্তি যত বেশিই হোক না কেন, এটা সীমাহীন নয়।মানুষের জানা দরকার, এ অনন্ত বিশ্বে শান্ত প্রানী হিসেবে তার সবটা সে কখনও জানতে পারবে না। সব জেনে ফেলার দাবী যুক্তিবাদী মানুষের ক্ষমতার বিপজ্জনক অতিরঞ্জন। যুক্তিবাদ হল কাহিনীর অর্ধাংশ মাত্র। মানুষ্কে তার নিজের ওপর ছেড়ে দিলে অদৃশ্য প্রবৃত্তির বলে জীবন তার দুঃখময় হয়ে উঠবে এবং অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে সে নিজেকে ও অন্যদেরকে ধ্বংস করবে। মানুষকে তার নিজের প্রবৃত্তির উপর ছেড়ে দিলে সে পশুরও অধম হয়ে পড়বে।’ থামল ডোনা।

‘বার্কের সে বক্তব্যের প্রয়োজনীয় অংশের কয়েকটা কথা বাদ রাখলে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘কি সেটা?’

বার্ক আরও বলেছিলেন, ‘সভ্যতা নিরবচ্ছিন্ন সামাজিক প্রক্রিয়ারই ফল। সামাজিক ঐতিহ্য হল ব্যক্তি প্রকৃতিকে নিজস্ব সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করার শক্তি। এটা সভ্যতার অগ্রগতির ভিত্তি।’

‘ধন্যবাদ, দেখুন, বার্ক কথিত সেই যুক্তিবাদীরাই ক্ষমতার বিপজ্জনক অতিরঞ্জন। আজ তাদেরকে এবং সমাজকে পশুর স্তরে নামিয়ে দিয়েছে। যা সভ্যতার অগ্রগতি রূদ্ধ করে একে দ্রুত অধঃগতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে।’

‘তোমাদের বার্কের বক্তব্য কোথাও কোথাও আমাদের ধর্মগ্রন্থ আল কুরআনের শিক্ষার প্রতিধ্বনি, আবার কোথাও তিনি ভুল করেছিলেন।’

‘যেমন?’

‘সপ্তম শতকের প্রথম শতকে নাযিল হওয়া আল কুরআনের ৯৫ নম্বর সূরা আত-ত্বীনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন যে, ‘মানুষ মহত্তম সৃষ্টি। কিন্তু সে যখন বিশ্বাসের পথ পরিত্যাগ করে তার সুস্থ যোগ্যতা ও প্রকৃতির বিকৃতি ঘটায়, তখন তাঁকে নিকৃষ্টতম পর্যায়ে নামিয়ে দেয়া হয়।’ আল-কুরআনের এই

কথার কিছুটা প্রতিধ্বনি মেলে সপ্তদশ শতকের শেষে বলা বার্কের ‘পশুতত্ত্ব’-এর মধ্যে। কিন্তু বার্ক ভুল করেছেন যখন তিনি যুক্তি ও ধর্মকে পৃথক ভেবেছেন এবং এ দুয়ের মধ্যে সমন্বয় বা সহাবস্থান চেয়েছেন। ইসলাম বলে, যুক্তিই হল ধর্ম। ধর্মহীনতা হল যুক্তি ও বিবেকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।’

‘আপনার শেষ কথাটা খুব ভারী।’

‘আসলে ভারী নয়। কুরআনের তফসীর পড়েছ তো সব পরিষ্কার হয়ে যাবে তোমার কাছে।’

‘তবে একটা কথা, যুক্তিই ধর্ম একথা বোধ হয় সব ধর্মের ক্ষেত্রে খাটে না। যেমন খৃস্টান ধর্ম। যুক্তির বিরুদ্ধেই খৃস্টান ধর্মের লড়াই। দশম শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ৩৫ হাজার বিজ্ঞানীকে খৃস্টান চার্চ পুড়িয়ে মেরেছে।’

‘অথচ দেখ ইসলাম বিজ্ঞানকে ছড়িয়ে দিয়েছে। যে ধর্ম যুক্তি, বিবেক এবং সত্যিকার বিজ্ঞান চিন্তাকে ভয় করে সে ধর্ম ধর্ম নয় অথবা সে ধর্ম তার সঠিক অবস্থানে নেই।’

গাড়ি এসে গিয়েছিল মেয়েদের কাছাকাছি।

মেয়েদের বিক্ষোভ অবস্থানের পাশেই কার পার্কিং-এ গাড়ি দাঁড় করাতে অনুরোধ করে ডোনা বলল, ‘আমার দাঁড়াতে ইচ্ছা করছে। একটু দেখি।’

আহমদ মুসা গাড়ি দাঁড় করিয়ে বলল, ‘ওদের সাথে যোগ দেবে নাকি?’

‘কেন আমার মাথায় ওড়না আছে, এ দাবি নিয়ে আন্দোলন আমিও আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে করেছি, তাহলে যোগ দিতে পারবো না কেন?’

কথা শেষ করেই ডোনা তাদের গাড়ির পাশ দিয়ে চলে যাওয়া দু’টি গাড়ির দিকে তাকিয়েই দ্রুত কণ্ঠে বলে উঠল, ‘কিছু একটা অঘটন ঘটবে।’

‘কেন বলছ?’ দ্রুত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘দু’টি গাড়িতে করে স্কিন হেডেডদের যেতে দেখলাম। ওদের উপস্থিতি বিনা কারণে ঘটে না। যেখানে ওরা যায়, সেখানে একটা কিছু ঘটে।’

‘ওরা কারা?’

‘কিছু কিছু দেশে ওদের পরিচয় ওরা আল্ট্রা ন্যাশনালিস্ট।’

‘ওদের সাম্প্রতিক আরেকটা পরিচয়, ওরা ব্ল্যাক ক্রসের সহযোগী। আব্বা এটা বলেছেন। ওরা অ্যান্টি সেমেটিক ব্ল্যাক ক্রসের প্রভাবে এখন অ্যান্টি ইসলামও হয়ে দাঁড়িয়েছে।’

কথা শেষ করেই ডোনা ভয় ও বিস্ময়ের সাথে বলে উঠল, ‘দেখলেন ওরা আর্কাইভসে ঢুকল।’

‘আর্কাইভসে ঢুকল কেন?’

মেয়েদের পেছনেই আর্কাইভস বিল্ডিং। বিশাল আর্কাইভস বিল্ডিং। মেয়েরা আর্কাইভস বিল্ডিং-এর গোড়া বরাবর দাঁড়িয়ে আছে।

আহমদ মুসা ডোনার উত্তরে কিছু বলল না। চিন্তা করছিল সে।

ডোনা গাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। একটু এগিয়ে একটা মেয়ের সাথে কথা বলতে শুরু করেছিল। পোশাকে-আশাকে এবং বয়সেও সে মেয়েদের সাথে মিশে গিয়েছিল।

ঠিক এই সময়েই মেয়েদের অবস্থানের লম্বা সারির মাঝখানে চিৎকার, হৈ চৈ ও হুটোপুটি শুরু হয়ে গেল। কিছু মেয়ে ছুটে ওদিকে চলে গেল, কিচু এল এদিকে, মাঝখান ফাঁকা হয়ে গেল। কিছু মেয়ে ছুটতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিল। আর কাতরাচ্ছিল।

প্রাথমিক আতঙ্ক ও বিভ্রান্তির পর কয়েকজন মেয়ে ঘটনাস্থলের দিকে ছুটে গেল।

ডোনা ছুটে এসেছিল আহমদ মুসার কাছে।

আহমদ মুসা তাকে তুলে নিয়ে আহত মেয়েদের কাছে গাড়ি দাঁড় করাল। নামল গাড়ি থেকে আহমদ মুসা ও ডোনা দু’জনেই।

বেশ কয়েকজন মেয়ে পুড়ে গেল পুড়ে গেল বলে যন্ত্রণায় চিৎকার করছে। কিন্তু পোড়ার কোন চিহ্ন নেই। পুড়বেই বা কিসে। কিছুই তো ঘটে নি। হাঁটু থেকে নিচের দিকেই যন্ত্রণা বেশি।

আহমদ মুসা ঝুঁকে পড়ে কয়েকজনকে পরীক্ষা করল। তারপর ছুটে গেল ঘটনার জায়গায়। কিন্তু সেখানে কিছুই নেই।

ফিরে এল আহমদ মুসা।

‘কিছু বুঝলেন?’

‘কিছু।’

বলে আহমদ মুসা ছুটাছুটিরত নেত্রী গোছের একটি মেয়েকে ডেকে ববলল, ‘আমার মনে হচ্ছে এরা হিট ক্যাপসুলের আঘাতে আহত হয়েছে। এদের তাড়াতাড়ি ক্লিনিকে নেয়া দরকার।’

আহমদ মুসাদের ছাড়াও আরেকটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছিল।

‘হিট ক্যাপসুল কি?’ সে মেয়েটি বলল।

‘বলছি, এদের আগে ব্যবস্থা করুন।’

‘আমার গাড়ি আছে, আর ওই গাড়িটা হলেই হয়ে যায়।’ বলল ডোনা।

‘ওটা আমাদের গাড়ি। অন্য গাড়িগুলো আধ ঘন্টা পরে আসার কথা।’ সেই মেয়েটি বলল।

কথা শেষ করেই সে নির্দেশ দিল আহত মেয়েদের গাড়িতে তোলার জন্য এবং বলল,’আমি এদের সাথে ক্লিনিকে যাচ্ছি তোমরা মিছিল নিয়ে চলে এস।’

দুই গাড়িতে সাতজন মেয়েকে তোলা হলো।

আহমদ মুসা ড্রাইভিং-এ বসল। পাশের সিটে ডোনার পাশে বসল সেই নেত্রী গোছের মেয়েটি। পেছনের ছয়টি সিটে ৪ জন আহত মেয়েসহ আরেকজন মেয়ে উঠেছে।

ডোনার গাড়ি ৬ দরজার বিশাল এক বিলাশবহুল কার।

ইতোমধ্যে পুলিশ এসে গিয়েছিল। তারা জানতে চাইল কোন ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আহতদের। আরও বলল, আহতদের জবানবন্দী নিতে হবে।

সেই নেত্রী গোছের মেয়েটি ক্লিনিকের নাম জানিয়ে বলল,’কিসের জবানবন্দী নিতে হবে তাদের?’

‘পুলিশকে নিশ্চিত হতে হবে তারা অস্ত্র বহন করছিল না।’

‘ধন্যবাদ ইন্সপেক্টর। দুর্বল মারও খাবে আসামীও হতে হবে তাদের।’

বলে গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিল মেয়েটি।

চলতে শুরু করল গাড়ি।

ডোনাই প্রথম কথা বলল।

মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল,'আপনার নাম কি?'

'ফাতমা।'

'কোথায় পড়েন?'

'লুই ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে।'

একটু থেমেই মেয়েটি প্রশ্ন করল,'আপনার নাম?'

'মারিয়া জোসেফাইন।'

'আপনি মুসলমান নন? আপনাকে আমি মুসলমান মনে করেছিলাম।'

'কেন মারিয়া জোসেফাইন মুসলমান হতে পারে না?'

'পারে, কিন্তু সাধারণত ফ্রান্সের মুসলমানরা তাদের নামের সাথে অন্তত একটা আরবী নাম যুক্ত করে। তাই বলছিলাম। তাছাড়া...।'

'তাছাড়া কি?'

মেয়েটি মানে ফাতমা ডোনার দিকে ভালো করে চেয়ে বলল,'আপনাকে কোথাও দেখেছি, নামটাও আমার পরিচিত।'

'আমাকে দেখেছেন? কোথায়?'

ফাতমা চোখ বন্ধ করে চিন্তা করছিল। হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে বলল,'পেয়েছি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের জাদুঘরে দেখেছি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট অষ্টাদশ লুই। বিশ্ববিদ্যালয়ের জাদুঘরে রুইদের সচিত্র বংশ তালিকা আছে। এ বংশ ধারার লেটেস্ট ইনফরমেশনও এর সাথে যুক্ত থাকে। আমি ইতিহাসের ছাত্রী তো, তাই এসব ঘাটাঘাটি করি। দু'দিন আগেও আমি দেখেছি, এ বংশের শেষ নামটি লেখা প্রিন্সেস মারিয়া জোসেফাইন লুই। তার ফটো যুক্ত আছে। যার সাথে আপনার হুবহু মিল।'

'চেহারার মিল তো থাকে।'

'নাম ও চেহারার মিল এক সাথে এভাবে হয় না। সত্যি বলুন আপনি কে? তাছাড়া এ ধরনের গাড়িও ফ্রান্সে বিশেষ ভিআইপি'রা ছাড়া ব্যবহার করে না।'

ডোনা উত্তর দিল না। সে কিছুটা বিব্রত।

আহমদ মুসার ঠোঁটে হাসি। বলল,'আপনার সন্দেহ ঠিক। উনি মারিয়া জোসেফাইন লুই। কিন্তু নিজের রাজকীয় পরিচয় উনি চান না। তাই ওর ডাক নাম হয়েছে ডোনা জোসেফাইন।'

আহমদ মুসার কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই ফাতমার চোখ-মুখে একটা বিস্ময় ও বিব্রতকর ভাব ফুটে উঠল। সে ডোনার কাছ থেকে একটু সরে বসতে চেষ্টা করে ছোট্ট একটা বাউ করল এবং ডোনাকে বলল,'মাফ করবেন। চিনতে না পেরে আপনার সাথে অন্য রকম ব্যবহার করেছি।'

ডোনা দু'হাতে ফাতমাকে জড়িয়ে ধরে বলল,'লুই বংশে জন্মগ্রহণ করা কি আমার অপরাধ যে আমার কাছ থেকে সরে বসতে হবে, আমাকে দূরে রাখতে হবে।'

ফাতমার মুখের বিস্ময়-বিমূঢ়তা তখন কাটেনি। বলল,'মাফ করবেন। আমি বুঝতে পারছি না আপনার মাথায় ওড়না কেন? ফ্রান্স কেন ইউরোপের কোন অমুসলমান মেয়ে এই স্টাইলে ওড়না ব্যবহার করে না।'

'হতে পারে তারা এবং আমি এক নই।' ফাতমাকে ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে বসতে বসতে ডোনা বলল।

এই সময় আহমদ মুসা পেছনে আহত মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বলল,'ক্লিনিক কতদূর?'

'আরও দশ মিনিট লাগবে।'

'ক্লিনিকটা আপনাদের পরিচিত বোধ হয়?'

'আমার আব্বা একজন পার্টনার। ভাইয়াও সেখানে ডাক্তার।'

কথা শেস করে পরক্ষণেই মেয়েটি আবার বলল,'আপনি হিট ক্যাপসুল সম্পর্কে বলতে চেয়েছিলেন।'

'হিট ক্যাপসুল নতুন আবিষ্কার। ক্যাপসুলগুলো বাতাসের সংস্পর্শে আসার সাথে সাথে ক্যাপসুলের মোড়ক গলে যায়। ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে প্রচন্ড হিটওয়েভ। সে হিটওয়েভ আগুন সৃষ্টি করে না, কিন্তু মানুষের চামড়া ও গোশতের ওপর অসম্ভব ক্রিয়াশীল। চামড়ায় ফোস্কা পড়ে না, কিন্তু চামড়ার

ভেতরের সেলগুলোকে পুড়িয়ে শেস করে দেয়। যথাসম্ভব ভালো চিকিৎসা না হলে মানুষ পঙ্গু কিংবা জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হতে পারে।'

ভয় ফুটে উঠল ফাতমার চোকে-মুখে। বলল,'বুঝতে পারছি না এটা ঘটল কি করে?'

ক্যাপসুলগুলো নিক্ষিপ্ত হয়েছে আরকাইভস বিল্ডিং-এর নিচতলার এক কক্ষ থেকে। এক প্রকার বিশেস বন্দুকে ক্যাপসুলগুলো ভরে ট্রিগার টিপে তা ছুঁড়ে দেয়া যায়। জল রংয়ের ক্যাপসুল মাটির কাছাকাছি দিয়ে বাতাসে ভেসে আসে। মিছিল ও বিক্ষোভকারীদের শায়েস্তা করার জন্যেই বিশেষভাবে এ অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে তাদের শায়েস্তাও করা হয়, আবার তাদের পাকড়াও করা যায় এই অভিযোগে যে তারা কোন অস্ত্র বহন করছিল যার বিস্ফোরণ ঘটে ঐ দুর্ঘটনার সৃষ্টি হয়েছে।'

'সাংঘাতিক অস্ত্র তো।'

কিন্তু ফাতমার চোখে বিস্মিত দৃষ্টি। আহমদ মুসার দিকে চেয়ে সে বলল,'আপনি আর্মস এক্সপার্ট না ডাক্তার?'

'দুটোর কোনটাই নই।' ঠোঁটে হাসি টেনে উত্তর দিল আহমদ মুসা।

নারী কণ্ঠের একটা 'বাঁচাও বাঁচাও' চিৎকার ভেসে এল এ সময় রাস্তার বাম পাম থেকে।

আহমদ মুসা ওদিকে চোক ফিরিয়ে দেখল, একজন মেয়েকে দু'জন লোক জোর করে গাড়িতে তোলার চেষ্টা করছে।

আহমদ মুসা গাড়ির মাথা ঘুরিযে সেই গাড়িটার পাশে নিয়ে দাঁড় করাল।

লাফ দিয়ে নামল গাড়ি থেকে।

আহমদ মুসা ওদের কাছে যেতেই একজন মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়ে আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল,'এশিয়ান ভূত ভাগ, না হলে মাথা গুঁড়ো করে দেব।'

'ছেড়ে দাও মেয়েটাকে। কি ঘটেছে শুনতেদাও আমাদের।'

আহমদ মুসার কথা শেষ না হতেই লোকটা এক ধাপ এগিয়ে এসে ঘুষি চালাল আহমদ মুসার চোয়াল লক্ষ্যে।

আহমদ মুসা একটু নিচু হয়ে তার ঘুষি পাশ কাটিয়ে তার কোমরের বেল্ট ধরে এক হ্যাঁচকা টানে তাকে মাথায় তুলে নিয়ে আছড়ে ফেলল মাটিতে।

ইতোমধ্যে দ্বিতীয় লোকটি তার সাথীর এই অবস্থা দেখে মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়ে পিস্তল বের করেছিল। আহমদ মুসার দিকে পিস্তল বাগিয়ে সে বলল,'বিদেশী শয়তান এই মুহূর্তে ভাগ। না হলে মাথা ফু...।'

তার কথা শেষ হলো না।

মুহূর্তে আহমদ মুসার মাথা নিচে চলে গেল। তাঁর ডান পা ছুটে গেল লোকটার পিস্তল ধরা হাত লক্ষ্যে। তার হাত থেকে পিস্তল ছিটকে পড়ে গেল।

বিমূঢ় লোকটা কিছু বুঝে ওঠার আগেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

লোকটাও ছুটে এল ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে আহমদ মুসার ওপর।

আহমদ মুসা বাম হাতটা লাঠির মত সোজা করে তাকে ঠেকিয়ে দিয়ে ডান হাত দিয়ে তার বেল্ট ধরে টেনে নিয়ে শূন্যে তুলে ছুঁড়ে মারল প্রতম লোকটার ওপর। সে তখন উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে আসছিল আহমদ মুসার দিকে। দু'জনেই আছড়ে পড়ল মাটিতে।

আহমদ মুসা ওদের লক্ষ্য করে বলল,'উঠতে চেষ্টা করো না। কুকুরের মত গুলী খেয়ে মরবে।'

আক্রান্ত মেয়েটি আহমদ মুসার পাশে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল।

'আপনি ওদের চেনেন বোন?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা মেয়েটিকে।

'না।' বলর মেয়েটি।

'কেন আপনাকে ওরা কিডন্যাপ করেছিল?'

'কাফেতে চা খেতে খেতে ওদের সাথে দেখা। ওরা আজ রাতে আমাকে ডিনার অফার করেছিল। আমি রাজি হইনি। তারপর ওরা আমাকে তাদের সাথে যেতে বলেছিল। আমি যেতে চাইনি। তাই আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল।'

একটু থামল মেয়েটি।

তারপর মেয়েটি বলল,'আপনি আমাকে রক্ষা করেছেন। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।'

পুলিশ এল এ সময়।

আহমদ মুসা সব ঘটনা পুলিশকে জানিয়ে বলল, ‘আপনারা দেখুন ব্যাপারটা।’

বলে আহমদ মুসা চলে আসছিল।

পুলিশ হাতকড়া পরাচ্ছিল দু’জন দুর্বৃত্তকে।

‘দেখুন আমি শান্তিতে থাকতে চাই, কোন মামলায় জড়াতে চাই না। আমার নিরাপত্তাহীনতা তাতে আরও বাড়বে।’ ভয়ার্ত কন্ঠে বলল মেয়েটি।

আহমদ মুসা দাঁড়াল।

একজন পুলিশ মেয়েটির কাছে এসে বলল, ‘আপনার ঠিকানা আমাদের দিয়ে চলে যান। আপনাকে বেশি কিছুতে না জড়াতে আমরা চেষ্টা করব।’

আহমদ মুসা চলে এল।

ডোনা, ফাতমা ও পেছনের মেয়েটি সবাই গাড়ি থেকে বেরিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফাতমা ও অন্য মেয়েটির চোখে বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টি।

‘দুঃখিত, কয়েক মিনিট দেরি হলো।’ ফাতমার দিকে চেয়ে কথা কয়টি বলে তাড়াতাড়ি এসে বসল ড্রাইভিং সিটে আহমদ মুসা।

ডোনা, ফাতমারাও উঠল গাড়িতে।

গাড়িতে উঠে বসেই ফাতমা বলল, ‘আমার মনে হয়ে দেরিতে হয়তো কিছু ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু লাভ হয়েছে অনেক বড়।’

একটু থেমেই ফাতমা আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে আবার বলা শুরু করল, ‘আপনি আমাদের অবাক করেছেন, যা দেখলাম এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না। মনে হচ্ছে সিনেমার একটা দৃশ্য দেখলাম। রিভলবারওয়ালা দু’জন গুন্ডাকে আপনি একদম পুতুলে পরিণত করলেন, আশ্চর্য!’

ফাতমার চোখ থেকে বিস্ময়ের ঘোর কাটছে না। মন তার তোলপাড় করছে শান্ত-শিষ্ট, ভদ্র ও কোমল চেহারার এই লোকটি

৭৭

অমন ইস্পাতের মত কঠিন আর আগুনের মত অমন জ্বলে উঠতে পারল কেমন করে?

ডোনার ঠোঁটে হাসি। কিছু বলল না সে।

সেদিকে চেয়ে ফাতমা বলল, ‘বারে, আপনি হাসছেন, যেন কিছুই হয়নি।’

‘ও কিছু না। আসুন আমরা খারাপ অতীতকে ভুলে যাই।’ বলে আহমদ মুসা পেছনের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘বোনেরা কেমন আছেন?’

‘যন্ত্রণা আগের চেয়ে বাড়েনি।’ বলল পেছনের মেয়েটি।

‘আলহামদুলিল্লাহ, বেদনা না বাড়াটা খুবই ভালো লক্ষণ। পোড়া আরও গভীর না হওয়ারই লক্ষণ এটা।’

ফাতমা বুঝল, তার জিজ্ঞাসাকে মারিয়া এবং আহমদ মুসা দু’জনেই এড়িয়ে গেল। সুতরাং ফাতমা এ বিষয়ে আর কোন কথা বলল না। কিন্তু মনের আকুলি-বিকুলি কমল না। বরং যখন জানল আহমদ মুসা মুসলমান, তখন হৃদয়ে যেমন একটা গর্বের ভাব সৃষ্টি হলো, তেমনি মনে জিজ্ঞাসাও বেড়ে গেল। কিন্তু কিছুই বলল না। তার দৃষ্টি রইল সামনে নিবদ্ধ।

ডোনা ফাতমার অস্বস্তিটা বুঝতে পারছে। কিন্তু সে ভাবছে জিজ্ঞাসাটা আরও বাড়ুক। এক সময় বলা যাবে সব কথা। ডোনারও দৃষ্টি সামনে।

আহমদ মুসার দুই হাত স্টিয়ারিং হুইলে। দৃষ্টি তার রাস্তার ওপর নিবদ্ধ।

তারও মনে চিন্তার তোলপাড়।

ফ্রান্সের মুসলিম মেয়েরা রাস্তায় নেমেছে তাদের বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক অধিকার আদায়ের জন্যে।

তাদের এই শান্তিপূর্ণ চাওয়ার জবাব তারা পেল ‘হিট ক্যাপসূল’ এর আঘাতের মাধ্যমে। ফ্রান্সের মানবাধিকার যেমন তাদের ওপর এই অত্যাচারে কোন অপরাধবোধ করছে না। তেমনি ইউরোপীয়

৭৮

মানবাধিকার কমিশন এ বিষয় নিয়ে টু শব্দও করবে না। বরং উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর মত করে হিট ক্যাপসূলের যে আক্রমণ তার দায় মুসলমানদের ঘাড়েই চাপানোর চেষ্টা করবে। এই অসহনীয় অবস্থা থেকে মুসলমানদের মুক্তি কবে আসবে?

কারো মুখে কোন কথা নেই। এগিয়ে চলছে গাড়ি।

প্যারিস ক্রিসেন্ট ক্লিনিকের এমারজেন্সি ওয়ার্ড।

অনেকগুলো ছেলে ও মেয়ে ডা.ক্তার ব্যস্ত হয়ে উঠেছে আহত মুসলিম ছাত্রীদের নিয়ে। এদের মধ্যে ফাতমার ভাই যুবায়েরও রয়েছে।

ইমারজেন্সি ওয়ার্ডের একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল ফাতমা।

ইমারজেন্সি ওয়ার্ডের চীফ সার্জন ডা. ওমর ফ্লেমিং এবং ডা. যুবায়ের এগিয়ে এল ফাতমার দিকে।

ওমর ফ্লেমিং বৃটিশ মুসলিম। বয়স পঞ্চাশের মত। তার চোখে-মুখে বিস্ময়।

'তুমি নাকি ডা. যুবায়েরকে বলেছ 'হিট ক্যাপসূল' থেকে আঘাত পেয়েছে মেয়েরা?' ফাতমাকে লক্ষ্য করে বলল ডা. ওমর ফ্লেমিং।

'জি, বলেছি।'

ওমর ফ্লেমিং-এর কপাল কুঞ্চিত হলো। বলল, 'অসম্ভব, তুমি জানলে কি করে? ক্লিনিক্যাল টেস্টের পর গত সপ্তাহে এই গোপন অস্ত্র বাজারে ছাড়া হয়েছে। আমি এ কথাটা শুনেছি রেডিয়েশন চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ প্রফেসর গিলস ডে বোর-এর কাছে গতকাল। ডা. যুবায়ের না বললে আমি জানতে পারতাম না এগুলো 'হিট ক্যাপসুল'- এর আঘাত।'

'আমি কিছুই জানি না। যিনি গাড়িতে আহতদেরসহ আমাদের নিয়ে এসেছেন তিনি আমাদের একথা বলেছেন।'

'কে তোমাদের নিয়ে এসেছে?'

'একজন যুবক। তাঁর সাথে আছেন বুরবো রাজকুমারী প্রিন্সেস মারিয়া জোসেফাইন লুই। ঐ যুবকটি মুসলমান।'

‘কি বলছ তুমি? বুরবো রাজকুমারী এখানে এসেছেন? ঐ যুবকটির সাথে এসেছেন? এবং ঐ যুবকটি মুসলমান? অবিশ্বাস্য কথা। তুমি সত্যই জান মেয়েটি বুরবো রাজকুমারী এবং যুবকটি মুসলমান?’

‘কোন সন্দেহ নেই। রাস্তায় ঘটনা আরও মজার ঘটেছে। একটা মেয়েকে কিডন্যাপ করছিল দু’জন পিস্তলধারী সন্ত্রাসী। যুবকটি গাড়ি থামিয়ে নেমে গিয়ে পিস্তলধারী দু’জনকে খালি হাতে নাস্তানাবুদ করে মেয়েটিকে উদ্ধার করেছে। বিশালদেহী সন্ত্রাসী দু’জনকে যুবকটির কাছে খেলার পুতুল বলে মনে হয়েছে।’

চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠল ডা. ফ্লেমিং ও ডা. যুবায়েরের।

কোন কথা বলল না তারা।

ফাতমাই কথা বলল আবার। বলল, ‘হিট ক্যাপসূল’-এর শুধু নাম বলাই নয়, এটা কি দিয়ে কিভাবে ছুঁড়তে হয়, কিভাবে যায়, কিভাবে ক্রিয়া করে, প্রতিক্রিয়া কি কি হয় ইত্যাদি সব কথাই তিনি বলেছেন।’

‘ওরা কোথায়?’

‘ওয়েটিং রুমে বসে আছেন।’

‘আছেন এতক্ষণ?’

‘আমি অনুরোধ করেছি।’

ডা. ওমর ফ্লেমিং ডা. যুবায়েরের দিকে চেয়ে বলল, ‘এরা কাজ করছে। চল আমরা একটু কথা বলে আসি।’

ওয়েটিং রুমে নয়, আহমদ মুসা ও ডোনা বসেছিল ডা. ওমর ফ্লেমিং এর অফিস কক্ষেই।

ফাতমা ডা. ফ্লেমিং ও ডা. যুবায়েরকে নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করল।

৮০

উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা ও ডোনা।

ফাতমা ডা. ফ্লেমিং এবং ডা. যুবায়েরকে পরিচয় করিয়ে দিল তাদের সাথে।

ডা. ফ্লেমিং এবং ডা. যুবায়ের দু’জনে ঠিক বাউ করলো না, কিন্তু সামনের দিকে একটু মাথা ঝুঁকাল। ডা. ফ্লেমিং সসম্মানে ডোনাকে উদ্দেশ্য করে বলল,

'আমাদের সৌভাগ্য যে, এক উপলক্ষে আপনাকে দেখার সৌভাগ্য আমার হলো। আমরা খুশি হয়েছি। আপনার সম্মানিত পিতার জন্যে আমাদের শ্রদ্ধা।'

'আমি আপনার মেয়ের বয়সের। আমাকে ঐভাবে সম্বোধন করলে আমি এখানে বসতে পারবো না।'

'ধন্যবাদ তোমাকে।' বলে বসতে বসতে ডা. ফ্লেমিং আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, 'ইতিমধ্যেই ফাতমা আপনার সম্পর্কে যা বলেছে তাতে আমরা চমৎকৃত হয়েছি। পরিচিত হতে এসেছি আপনার সাথে। ভীষণ খুশি হয়েছি জেনে যে আপনি মুসলমান।'

থামল ডা. ফ্লেমিং। আহমদ মুসা ও ডোনার দিকে একবার চেয়ে বলল, 'একটা পার্সোনাল প্রশ্ন করলে কি রাগ করবেন আপনারা?'

'মোটেই না, করুন।' বলল আহমদ মুসা।

'কিছু মনে করবেন না, আপনাদের পরিচয় যেহেতু দুই প্রান্তের, তাই আমার জানতে ইচ্ছা করছে আপনাদের দু'জনের মধ্যে কি সম্পর্ক?'

প্রশ্নটা বিদঘুটে এবং একেবার নগ্ন।

ডোনা তাকাল আহমদ মুসার দিকে। তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে লজ্জায়। আহমদ মুসার ঠোঁটে ফুটে উঠেছে ছোট্ট এক টুকরো হাসি।

আহমদ মুসার দিকে তাকানোর পর মুখটা একটু নত করেছিল ডোনা। পরক্ষণেই মুখ তুলে সলজ্জ হেসে বলল, 'কি উত্তর দেব আমি বুঝতে পারছি না।' বলে আবার মুখ নামিয়ে নিল ডোনা।

ফাতমাসহ সবারই চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ডোনা উত্তর দিতে না পারলেও ডোনার লাজরাঙ্গা মুখ জিজ্ঞাসার জবাব দিয়ে দিয়েছে।

'ঠিক আছে। বেশ। তাতে কি।' মুখে স্নেহের হাসি টেনে বলল ডা. ফ্লেমিং।

ডা. ফ্লেমিং-এর কক্ষের দরজায় পর্দার আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছিল বয়স্ক একজন ভদ্রলোক এবং একজন ভদ্রমহিলা। তারা শুনছিল কথাগুলো। কক্ষে ঢুকবে কি ঢুকবে না চিন্তা করছিল। তারা ওয়ার্ডে একজন মেয়ের কাছ থেকে দু'জন অতিথির কথা শুনেছে পথের সব কাহিনীসহ। জেনেছে অতিথিদের

একজন মুসলিম যুবক, আরেকজন প্রিন্সেস মারিয়া। সাগ্রহে তাদের সাথে দেখার করার জন্যেই এসেছে। পর্দার দু'ভাগের মাঝখান দিয়ে তারা দু'জনকেই দেখতে পাচ্ছে।

ডা. ফ্লেমিং থামতেই আহমদ মুসা ঈষৎ হেসে জড়তাহীন অত্যন্ত সরল কন্ঠে বলল, 'একটা দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওর সাথে আমার পরিচয়। তারপর স্পেন ও ফ্রান্সে বেশ কিছু ঘটনা-দুর্ঘটনা আমাদের বার বার দেখা করিয়েছে। সামনে আরও কিছু ঘটবে কিনা আমরা দু'জন কেউ তা জানি না।'

পর্দার এপারে দাঁড়ানো ভদ্রলোকের চোখে-মুখে আনন্দ উপচে উঠল।

'চমৎকার, চমৎকার জবাব। এটা পৃথিবীর যে কোন উন্নত সাহিত্যের একটা অংশ হতে পারে!' কথাগুলো বলতে বলতে ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা দু'জন পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকল।

ভদ্রলোকটি আবু আমের আব্দুল্লাহ। বয়স সত্তরের কাছাকাছি। ফাতমার আব্বা এবং ভদ্রমহিলার নাম খাদিজা। ফাতমার আম্মা। বিক্ষোভ মিছিলে গন্ডগোল্লের খবর শুনে তারা ছুটে এসেছে ক্লিনিকে।

তারা প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে ডা. ফ্লেমিং ও যুবায়ের উঠে দাঁড়াল। তাদের সাথে অন্যে সকলেই। প্রবেশ করেই বলল, 'সকলের কাছে মাফ চাচ্ছি, এই অসৌজন্যমূলক প্রবেশের জন্যে। আরও মাফ চাচ্ছি, পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে কথা শোনার জন্যে।'

ফাতমা এসে তার আব্বা-আম্মার মাঝখানে দাঁড়াল। আহমদ মুসা ও ডোনাকে লক্ষ্য করে বলল, 'আমার আব্বা, ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। ফরাসী ভাষায় কবিতা ও গল্পও লেখেন। কয়েক বছর আগে রিটায়ার করেছেন অধ্যাপনা থেকে। আমার আম্মা ও আমরা চার জেনারেশন ধরে ফ্রান্সে আছি।'

ফাতমা আহমদ মুসাদের সম্পর্কে বলতে যাচ্ছিল। বাধা দিয়ে তার আব্বা বলল, 'বলতে হবে না, নাবিলা ন্যান্সির কাছে সব শুনেছি ইতিমধ্যেই।'

নাবিলা ন্যান্সিও আহত মেয়েদের সাথে আহমদ মুসার গাড়িতে এসেছিল।

বসল সবাই।

ডা. ফ্লেমিং বলল, 'এই যুবকই আহতদের দেখে বলেছে 'হিট ক্যাপসূলে' মেয়েরা আহত হয়েছে। উনি না বললে এতক্ষণও আমরা বুঝতে পারতাম না যে, কিসে এমনটা ঘটল। তার ফলে যথাসময়ে উপযুক্ত চিকিৎসা আমরা শুরু করতে পারতাম না। তাই আমি কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছিলাম সেই সাথে আমার জানার আগ্রহ হয়েছিল, সপ্তাহ খানেক আগে বাজারে চালু হওয়া এই মারণাস্ত্র সম্পর্কে এতটা বিস্তারিত কিভাবে জানতে পারলেন?'

'সপ্তাহ খানেক আগে বাজারে এসেছে ঠিক, কিন্তু 'স্ট্রাটেজিক জার্নাল' এবং 'ওয়ার্ল্ড সাইন্স' এক বছর আগে এই আবিষ্কার সম্পর্কে লেখে।'

'জার্নাল দুটির নাম শুনেছি। কোনদিন দেখিনি। এ দু'টি দুর্লভ জার্নাল তাহলে আপনি নিয়মিত পড়েন?'

'জি।'

'আমার মত এক্টু-আধটু পড়ুয়া এবং জ্ঞান-গবেষণায় ব্যস্ত যারা, তারা তো কুংফু, কারাত বা মারামারি থেকে দশ যোজন দূরে থাকে।কিন্তু বাছা শুনলাম তুমি পিস্তলধারী দুই গুন্ডাকে খালি হাতেই সাবাড় করেছ। দুইতে তো মিলছে না বৎস!'

আহমদ মুসা একটু হাসল এবং বলল, 'মানুষ বলতে পরিপূর্ণ মানুষ বুঝায়। মানুষকে পূর্ণ হতে হলে তো তাকে সব যোগ্যতাই অর্জন করতে হবে। মুসলমানদের ক্ষেত্রে এটা আরও বেশি সত্য। মুসলমানদের আল্লাহ উত্থান ঘটিয়েছেন পৃথিবীর মানুষকে ভালো কাজের নির্দেশ দেয়া এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্যে। অন্য কথায় পৃথিবীর নেতৃত্ব দেয়ার জন্যে। নেতৃত্ব দিতে হলে তো সব যোগ্যতাই তাদের অর্জন করতে হবে। অন্তত প্রতিটি মুসলমানকে একই সাথে গৃহী, পুলিশ ও সৈনিকের ভূমিকা পালনের মত যোগ্যতা অর্জন করতেই হবে। ইতিহাস বলে এই যোগ্যতা যখন আমরা হারিয়ে ফেলতে শুরু করেছি, মুসলমানদের পতন শুরু হয়েছে তখন থেকেই। আর......।'

'থাম থাম বৎস! বলে ফাতমার আব্বা আহমদ মুসাকে থামিয়ে দিল। বলল, 'একটু দাঁড়াও একথাগুলো আমি লিখে নিই। আমার জীবনে এমন কথা শুনিনি।' বলে কাগজ-কলম বের করল ফাতমার আব্বা।

এরপর ফাতমার আব্বাই প্রথম কথা বলল, ‘কোটেশনের সাথে যার কোটেশন তার নাম থাকতে হয়। নামটা তোমার বল বৎস!’ বলে চোখ তুলে তাকাল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা একটু দ্বিধা করল। তাকাল ডোনার দিকে। তারপর ফাতমার আব্বার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘লিখুন, আহমদ মুসা।’

ফাতমার আব্বা মাথা নিচু করল লেখার জন্যে। কিন্তু লিখতে শুরু করেই হঠাৎ মাথা তুলে জিজ্ঞেস করল, ‘কোন আহমদ মুসা?’ তার কন্ঠে বিস্ময় ও জিজ্ঞাসার উচ্ছ্বাস।

আহমদ মুসা ও ডোনা ছাড়া সবার চোখে-মুখেই এই একই বিস্ময় এবং জিজ্ঞাসা।

আহমদ মুসা কোন জবাব দিল না।

ডোনার দৃষ্টি আহমদ মুসার দিকে নিবদ্ধ। ঠোঁটে তার গৌরবের হাসি।

‘বাড়ি তোমার কোন দেশে?’ ফাতমার আব্বাই প্রশ্ন করল।

‘কোন দেশেই আমার বাড়ি নেই।’

‘নেই? তোমার দেশ?’

‘আমার কোন দেশ নেই।’

‘দেশও নেই? তুমি কোন দেশের নাগরিক?’

‘প্রায় সকল মুসলিম দেশের নাগরিকত্ব আমার আছে।’

শুধু ফাতমার আব্বার নয় অন্যে সকলের দৃষ্টিও বিস্ময়ে বিস্ফারিত। পিনপতন নীরবতা।

‘কোন দেশ থেকে তুমি ফ্রান্সে এসেছিলে?’

‘মধ্যএশিয়া থেকে।’

‘মধ্যএশিয়ার কোন দেশ থেকে?’

‘সিংকিয়াং থেকে।’

‘সিংকিয়াং-এ কোন দেশ থেকে?

‘স্পেন অথবা বলা যায় ফ্রান্স থেকে।’

‘স্পেনে এসেছিলে কোত্থেকে?’

‘বলকান বা যুগোশ্লাভিয়া থেকে।’

‘সেখানে?’

‘ককেশাস থেকে।’

‘ককেশাসে?’

‘মধ্যএশিয়া থেকে।’

‘সেখানে?’

‘মিন্দানাও।’

‘আর মিন্দানাওয়ে?’

‘ফিলিস্তিন।’

‘ফ্রান্স থেকে কোথায় যাবে?’

‘জানি না, ঘটনা যেখানে নিয়ে যায়।’

ঝট করে উঠে দাঁড়াল ফাতমার আব্বা।

ফাতমা, ডা. যুবায়ের, ডা. ফ্লেমিং সবাই বিস্ময় বিমূঢ়।

ফাতমার আব্বা উঠে এসে সবাইকে অবাক করে দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল আহমদ মুসার চেয়ারের পাশে। আহমদ মুসার একটি হাত নিয়ে চুমু খেল এবং হু হু করে কেঁদে উঠল। বলল, ‘তুমি আমাদের স্বপ্নের আহমদ মুসা! আল্লাহ নিয়ে এসেছেন আমাদের মাঝে। তাঁর অপার করুণা।’ বলে বৃদ্ধ দু’হাত ওপরে তুলল মোনাজাতের জন্যে।

সবার চোখ সিক্ত হয়ে উঠেছে। ডোনারও। ফাতমারও। বৃদ্ধের বাঁধ ভাঙ্গা আবেগ সকলের হৃদয়কেই স্পর্শ করেছে।

‘মাফ করবেন, আমি খুবই বিব্রত বোধ করছি। যে ভালবাসা আমি আপনাদের কাছে পেয়েছি, বিনিময়ে আমি কিছুই করতে পারিনি।’ ভারী কন্ঠ আহমদ মুসার।

‘বিনয় তোমার মহত্ব। তুমি তো এখনই বললে, তোমার বাড়ি নেই, দেশ নেই। কেন নেই? জাতির জন্যেই তো। জাতিকে তুমি তোমার সবটুকুই দিয়ে দিয়েছো।’ বলল ফাতমার আব্বা।

সবাই নীরব।

ফাতমা, যুবায়ের, ওমর ফ্লেমিং কারও মুখে কোন কথা নেই, সবাই যেন বোবা হয়ে গেছে। সবার অনিমেষ দৃষ্টি আহমদ মুসার প্রতি নিবদ্ধ।

বৃদ্ধই আবার কথা বলল, 'কি যে আনন্দ লাগছে! জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ঈদ আমার আজ। তোমার কাহিনী শুনেছি আর কত যে ভেবেছি, আমার বয়স থাকলে তোমার সাথী হতাম তোমার ফায়ফরমাস খাটার জন্যে।'

'আমি দুঃখিত, এ ধরনের কথা বলে আমাকে কষ্ট দেবেন না।'

বলে আহমদ মুসা একটু থেমেই আবার বলল, 'আপনাদের সাথে পরিচিত হয়ে আমার খুব আনন্দ লাগছে। এর আগেও ফ্রান্সে এসেছি, কিন্তু এখানকার মুসলিম কমিউনিটির সাথে মেশার সুযোগ পাইনি। এবার সে সুযোগ হলে আপনাদের সাথে এবং অন্যদের সাথে দেখা অবশ্যই করব। আমি এখন উঠতে চাই।'

'অসম্ভব এভাবে আমরা তোমাকে ছাড়তে পারি না।' বলল বৃদ্ধ। সঙ্গে সঙ্গেই ফাতমা বলল, 'কিছুক্ষণের মধ্যেই সিটি হলে আমাদের একটা প্রতিবাদ সভা হচ্ছে। সেখানে আপনাকে না নিয়ে ছাড়বো না আমরা।'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'বোন আমি খুশি হতাম ওখানে যেতে পারলে। কিন্তু যাওয়া হবে না। আমি এসেছি সে কথা ফরাসী সরকার ও পুলিশকে আমি এখনো জানতে দেইনি। ছদ্মনামে আমি এয়ার পোর্টে নেমেছি। এর পরও ওখানে গেলে যে আমার পরিচয় প্রকাশ হবে, সেটা আমি ভাবছি না। ওখানে গেলে তোমাদের ক্ষতি হবে, এ জন্যেই আমি সেখানে যাব না।'

'ঠিক আছে ওখানে নয়, আমার গরিবালয়ে যেতে হবে। আমার গরিবালয়ের কপালে ইতিহাসের এক তিলক পরাতে চাই। আমার এ আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করতে পারবে না।' ফাতমার আব্বার কন্ঠে অনুনয়ের সুর ফুটে উঠল।

'আমাকে অপরাধী করবেন না। একটু অবসর হলেই আমি আসব। এখন আমার সমস্ত চিন্তা মনোযোগ অন্য একটা বিষয়ের প্রতি নিবদ্ধ। এখন থেকে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই আমি প্যারিস থেকে বেরিয়ে যাব।'

কথাটা শুনেই ডোনা তাকাল আহমদ মুসার দিকে। তার মুখটা ম্লান হয়ে গেল।

‘একটা প্রশ্ন করতে পারি?’ বলল ডা. যুবায়ের, ফাতমার ভাই।

‘অবশ্যই।’ হেসে বলল আহমদ মুসা।

‘দু’টি প্রশ্ন। এক, আমি পড়েছি এবং শুনেছি, বড় ও গুরুতর কিছু ঘটলেই আপনি সেখানে যান। স্পেনে যে বিরাট কাজ করেছেন, সে উপলক্ষেই গতবার আপনি ফ্রান্সে এসেছিলনে। আপনি যখন ফিরে এসেছেন, নিশ্চয় গুরুতর কিছু ঘটেছে। আপনার কথা থেকেও সেটা বুঝলাম। বিষয়টা কি?’

দুই, আপনার প্যান্ট ও জুতায় রক্তের ছিটা দেখেছি, এটা কোন ঘটনার ইংগিত দেয়। আমার কৌতূহল সেটা কি?’

‘দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবটাই প্রথম দেই।’ বলে শুরু করল আহমদ মুসা, ‘শত্রুর ঠিকানা যোগাড় করতে গিয়ে সেই শত্রুর ফাঁদে পড়েছিলাম। তারা আমাকে একটা গাড়িতে নিয়ে যাচ্ছিল। ওরা ছিল চারজন। পথে একটা পার্কের বুশ টয়লেটে ওদের আটকে রেখে আমি ওদের ঘাঁটিতে যাই। কিন্তু......।’

আহমদ মুসাকে বাধা দিয়ে ফাতমা বলল, ‘ওরাই তো আপনাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, আপনি ওদের আটকালেন কিভাবে?’ ফাতমা এবং অন্যদের চোখে আগ্রহ ও জিজ্ঞাসা ঠিকরে পড়ছে।

আহমদ মুসা কাহিনীটা বলে আবার শুরু করল, ‘কিন্তু আমি যাদের আটকে রেখে গিয়েছিলাম তারা ওয়্যারলেসে আমি তাদের ঘাঁটিতে পৌঁছার আগেই আমার কথা জানিয়ে দিয়েছিল। সুতরাং ঘাঁটির লোকরা আমার জন্যে ফাঁদ পেতে বসে ছিল। আমি তাদের ফাঁদে পড়ে যাই। তারা তিনজন যখন আমাকে বাঁধতে যাচ্ছিল, তখন ডোনা মানে আপনাদের প্রিন্সেস মারিয়া জোসেফাইন পিস্তলের গুলীতে ঐ তিনজন লোককে হত্যা করে আমাকে উদ্ধার করে। তাদেরই রক্তের ছিটা আমার প্যান্টে ও জুতায়।’

‘প্রিন্সেস তো আপনার সাথে ছিল না, তাহলে কিভাবে......?’

জিজ্ঞাসা অসমাপ্ত রেখেই চুপ করল ডা. ফ্লেমিং।

‘আমি বিপদে পড়ব- এই আশংকায় সম্ভবত ডোনা আমার অলক্ষ্যে আমাকে ফলো করছিল।’ বলে আহমদ মুসা সার্ভিস সেন্টারে আসার সময়ের কাহিনী জানাল।

ডোনার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল লজ্জায়। সে মুখ নিচু করে বসেছিল।

'আপনি বুশ টয়লেটে বন্দী রেখে ওদের ওয়্যারলেস করা সুযোগ দিলেন কেন?' জিজ্ঞেস করল ডা. যুবায়ের।

'ওদের বিপজ্জনক মনে না করা এবং তাদের সার্চ না করা আমার ভুল হয়েছিল। আর বন্দী না রেখে হত্যা করতে পারতাম, তাহলে সব বালাই চুকে যেত। কিন্তু আমি নিজের জীবন বাঁচানোর প্রয়োজন ছাড়া হত্যাকান্ড ঘটাই না।'

'কেন কথা আছে না, শত্রুর শেষ রাখতে নেই!' বলল ফাতমার আব্বা বৃদ্ধটি।

'ওটা ইসলামের নীতি নয়।' বলল আহমদ মুসা।

'বুঝিয়ে বলুন।' বলল ফাতমা।

'ইসলাম চায় মানুষের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির জন্যে দুনিয়ার সবাইকে আল্লাহর বান্দায় পরিণত করতে। শত্রুও এর মধ্যে শামিল।সুতরাং শুধু শত্রুর বিনাশ নয়, তাকে যতটা সম্ভব আল্লাহর বান্দা হবার সুযোগও দিতে চায় ইসলাম।'

'ফ্রান্সের যাদের সাথে আপনার এই সংঘাত, সেই শত্রু কারা?'

'ব্ল্যাক ক্রস।'

'ব্ল্যাক ক্রস?' এক সাথে ফাতমার আব্বা, ডা. ফ্লেমিং এবং ডা. যুবায়েরের কন্ঠ আঁৎকে উঠে উচ্চারণ করল।

আঁৎকে ওঠা কন্ঠ মিলিয়ে না যেতেই ডা. যুবায়ের বলে উঠল, ব্ল্যাক ক্রস সাংঘাতিক বড় প্রভাবশালী এবং সাংঘাতিক শক্তিশালী খুনী সংগঠন। প্রথম দিকে একে নির্দোষ এনজিও মনে করতাম। কিন্তু প্রমাণ হয়েছে, খৃস্টানদের ন্যায়-অন্যায় যে কোন স্বার্থে রক্ষা এবং মুসলমানদের ক্ষতি বা বিন্যাশ করার ব্যাপারে তাদের জুড়ি ইউরোপে নেই। মুসলিম ছাত্রীদের ওপর আজ যা ঘটল, আমি মনে করি এটাও ব্ল্যাক ক্রসের পরিকল্পনা।'

'ঠিকই বলেছেন।' বলল আহমদ মুসা।

'কিন্তু কিভাবে এদের সাথে আপনার যোগাযোগ ও সংঘাত বাঁধল?' বলল যুবায়ের।

'প্রথম প্রশ্নের জবাবেই এটা পেয়ে যাবেন।' বলে আহমদ মুসা ওমর বায়ার সাথে তার দেখা হওয়া থেকে শুরু করে ওমর বায়ার সমস্ত কাহিনী, তার সর্বশেষ কিডন্যাপ হওয়া, তাকে উদ্ধারের জন্যে তার ফ্রান্সে আসা, ব্ল্যাক ক্রসের সাথে তার সংঘাতের সব কাহিনী বর্ণনা করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'এ পর্যন্ত ব্ল্যাক ক্রসের প্রায় জনা চল্লিশেক নিহত হয়েছে, কিন্তু ওমর বায়ার সন্ধান এখনও পাইনি, তাকে উদ্ধারের কাজ এখনও শুরুই করতে পারিনি।'

ফাতমার আব্বা আবু আমের আবদুল্লাহ, ডা. ওমর ফ্লেমিং, ডা. যুবায়ের, ফাতমা সকলেই বলা যায় রুদ্ধশ্বাসে শুনছিল আহমদ মুসার কাহিনী।

আহমদ মুসা থামার পর ধীরে ধীরে মুখ খুলল ফাতমার আব্বা আবু আমের আব্দুল্লাহ। বলল, 'তোমার জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করি, আল্লাহ তোমাকে আরও বড় দিল দিন, আরও যোগ্যতা দিন এবং আরও বড় সাফল্য দিন। তুমি মাত্র একজন মানুষ, একজন ভাইকে উদ্ধারের জন্যে ফ্রান্সে এসেছে এবং এত বড় বিপদে জড়িয়ে পড়েছে!'

'জনাব, ওমর বায়া এখন একজন ব্যক্তি মাত্র নয়। সে সমগ্র ক্যামেরুনের মুসলিম স্বার্থের প্রতীক। তার বিজয় সেখানে নতুন বিজয়ের যাত্রা সূচিত করবে। আর পরাজয় সেখানকার মুসলিম ভবিষ্যতকে গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে দেবে। এই অস্তিত্বের সংগ্রামে আমরা বিনাযুদ্ধে পরাজয় মেনে নিতে পারি না।'

'আল্লাহ আপনাকে সফল করুন। আমাদের কিছু করণীয় নেই?' বলল ডা. যুবায়ের।

'আপাতত নেই। ওমর বায়ার সন্ধান পাবার পর এমন কিছুর প্রয়োজন দেখা দিতেও পারে। তবে আমি চাই না এখনকার কম্যুনিটিকে এর সাথে সংশ্লিষ্ট করে ব্ল্যাক ক্রসকে তাদের বিরুদ্ধে আরও বেশি খেপিয়ে তুলতে।'

'আপনি প্যারিসের বাইরে কোথাও যাবেন বললেন?' বলল ফাতমা।

'ব্ল্যাক ক্রসের হেড কোয়ার্টারের সন্ধানে।'

'কোথায়?' ফাতমাই বলল।

'কোথায় যদি জানতে পারতাম!'

'তাহলে কোথায় যাবে?' বলল ফাতমার আব্বা।

‘ইংলিশ চ্যানেলের মুখে কোন এক শহর, সেই শহরের এক ঐতিহাসিক গীর্জায় ব্ল্যাক ক্রসের হেড কোয়ার্টার। আমি সেই শহর এবং সেই গীর্জা খুঁজে বের করব।’

‘কি বললে ইংলিশ চ্যানেলের মুখে শহর এবং সেখানকার ঐতিহাসিক গীর্জা?’

স্বগতোক্তির মত কথাগুলো বলে চোখ বন্ধ করল বৃদ্ধ আবু আমের আবদুল্লাহ।

অল্পক্ষণ পরে চোখ খুলে বলল, ‘তুমি কিভাবে এগোবে ঠিক করেছ?’

‘গীর্জার ডাইরেক্টরি থেকে দেখব ইংলিশ চ্যানেল মুখের কয়টি শহরে ঐতিহাসিক গীর্জা আছে। তারপর গীর্জা ভিত্তিক অনুসন্ধান চালাব।’

‘এজন্যেই তুমি আহমদ মুসা। ভুল পথে তুমি চল না।’

একটু থামল বৃদ্ধ। তারপর একটু নড়েচড়ে বসে বলল, ‘ঐ এলাকায় ব্যাপক ঘুরেছি। থেকেছিও অনেক সময়। তোমাকে বোধ হয়ে কিছু সাহায্য করতে পারি। শহরটি যদি ইংলিশ চ্যানেলের মুখে হয়, তাহলে এ শহর সন্ধান করতে হবে উত্তরে সেন্ট মালো উপসাগর থেকে দক্ষিণে ফ্রান্সের পশ্চিম উপকূলের শীর্ষ পর্যন্ত। আর যেহেতু বলা হয়েছে শহরটি সাগর উপকূলের মুখে, তাই এ শহরটিকে অবশ্যই সাগর তীরে হতে হবে। এই বৈশিষ্ট্য দু’টিকে সামনে রেখে ঐ অঞ্চলের চারটি শহর আমাদের বিবেচনায় আসে। সর্ব উত্তরে পামপুল,তাঁর পরের শহরগুলো হলো, পেরেজ গিরেক,সেন্ট পোল ডে লিউন এবং প্লেগেমো। এখন দেখতে হবে এ শহরগুলোর কোনটিতে কি কি ঐতিহাসিক গীর্জা রয়েছে। ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে ফ্রান্সের পুরাকীর্তি আমার একটি পাঠ্য বিষয় ছিল। সেই জ্ঞান থেকে আনি বলতে পারি, এ চারটি শহরে কোথাও কোন ঐতিহাসিক গীর্জা নেই। থাকতে পারে না। কারন শহর চারটি বলা যায় সাম্প্রতিক কালের। কোনটারই বয়স ‘একশ’ বছরের বেশি নয়। প্লেগেমো শহরের পূর্ব দিকে বিখ্যাত শহর ব্রিস্টে তিনটি ঐতিহাসিক গীর্জা রয়েছে। কিন্তু শহরটিকে ইংলিশ চ্যানেলের মুখে বলা যায় না।

থামল বৃদ্ধ। শুরু করল আবার। বলল, 'তবে ঐ চারটি শহরে ঐতিহাসিক গীর্জা না থাকলেও ঐতিহাসিক নামের গীর্জা আছে, যাদের বয়স খুব কম নয়'।

'কয়টি গীর্জা এমন আছে? বলল আহমদ মুসা। তাঁর চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

'এরকম গীর্জা দু'টি আছে। একটি পেরেজ গিরেকে। নাম সেন্ট অগাস্টাস। অন্যটি সেন্ট পোল ডে লিউন-এ। নাম চার্চ শার্লেম্যান'।

চোখের ওজ্জ্বল্য গোটা মুখে ছড়িয়ে পড়ল আহমদ মুসার। বলল, 'আলহামদুলিল্লাহ্। ধন্যবাদ আপনাকে। অমুল্য সাহায্য আপনি আমাকে করলেন। পথ আমি পেয়ে গেছি। আমি মনে করি চোখ বন্ধ করে আমি এখন অগ্রসর হতে পারবো'।

'কোনটার ব্যাপারে আপনি কি নিশ্চিত হতে পেরেছেন?' বলল ডাঃ জুবায়ের।

'আমার ফার্স্ট প্রাইওরিটি 'চার্চ শার্লেম্যান' এবং সেকেন্ড প্রাইওরিটি 'সেন্ট অগাস্টাস'।

'চার্চ শার্লেম্যান ফার্স্ট প্রাইওরিটি কেন?' বলল ফাতমার আব্বা আবু আমের আবদুল্লাহ।

'কারন শার্লেম্যান-এর আদর্শ ও লক্ষ্যের সাথে ব্ল্যাক ক্রসের আদর্শ ও লক্ষ্য মিলে যায়'।

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা সবার দিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, 'অনুমতি দিন আমাদের এবার উঠতে হবে'।

'আমার একটা কথা আছে'। বলল ফাতমা।

'বল'। বলল আহমদ মুসা।

'ভেনিসে আপনি মেয়েদের সম্মেলনে গিয়েছিলেন এবং সেখানে জুমার জামাতেও আপনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তাহলে আমাদের সম্মেলনে যেতে আপনার অসুবিধা কি?'

'একথা তুমি জানলে কেমন করে?'

'আয়েশা আপা আমাকে বলেছেন। মনে আছে আপনার তাঁর কথা?'

‘অবশ্যই। কিন্তু তাঁর সাথে তোমার পরিচয় ও দেখা কিভাবে?’

‘উনি আমি সকলেই তো ‘ইয়ুথ সোসাইটি অব ইউরোপিয়ান রেনেসাঁ (YSOUR)-এর সদস্য। ডাঃ জুবায়ের ভাইয়াও সদস্য’।

‘খোশ আমদেদ তোমাদের’-বলে আহমদ মুসা উঠে দাড়িয়ে হ্যান্ডশেক করল ডাঃ জুবায়েরের সাথে। আনন্দের বন্যায় উজ্জ্বল আহমদ মুসার চোখ-মুখ। বসতে বসতে সে বলল, ‘এই ইয়ুথ সোসাইটির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি খুব আশাবাদী। ইউরোপে এ এক নতুন রেনেসাঁ নিয়ে আসবে ইনশাআল্লাহ্’।

ডাঃ ফ্লেমিং, জুবায়ের, ফাতমা এবং ফাতমার আব্বা আম্মা এক সাথে আমীন বলে উঠল।

আহমদ মুসা বলল, ‘আমি ভেনিসে মেয়েদের সম্মেলনে গিয়েছিলাম, জুমআর জামাতেও বক্তৃতা দিয়েছিলাম, কারন তখন আমার কর্মক্ষেত্র স্পেনে। ফ্রান্সের সরকার কিংবা ফ্রান্সের কারো সাথে আমার তখন সংঘাত ছিলনা। সুতরাং আমার উপস্থিতি তখন ক্ষতিকর ছিল না, যেমনটা এখন হতে পারে’।

‘তাহলে আমাদের সম্মেলনে আপনি লিখিত একটা বানী দিন’। বলে ফাতমা এক শিট কাগজ ও একটা কলম তুলে ধরল আহমদ মুসার সামনে।

কাগজ হাতে নিয়ে বানী লিখল তাতে আহমদ মুসা। লেখা শেষ করে কাগজ তুলে দিল ফাতমার হাতে।

ফাতমা দাড়িয়ে লেখা দেখছিল।

‘ধন্যবাদ’ বলে ফাতমা কাগজ হাতে নিল।

‘পড়তো মা। ম্যাসেজটি আমরাও শুনি’। বলল ফাতমার আব্বা আবু আমের আবদুল্লাহ।

ফাতমা তাঁর সীটে ফিরে গিয়ে দাড়িয়ে থেকেই পড়া শুরু করলঃ

‘এক ভাইয়ের পক্ষ থেকে ফ্রান্সের ভাইবোনদের প্রতি।

অমুসলিম সমাজে মুসলমানদের উপস্থিতি বা আগমন, মরুভূমির অতিমুল্যবান দুর্লভ বৃষ্টির মতো। কিন্তু মরুভূমির আগুনে আগ্রাসী বাতাস যেমন শুষে নেয় মরুভূমির বৃষ্টির ধারাকে, অমুসলিম সমাজের শান ও পরিবেশও তেমনি চায় মুসলিম নামক শান্তির নির্ঝরণীকে নিরস্তিত্ব করতে। ন্যায়ের সাথে অন্যায়ের,

সত্যের সাথে মিথ্যার এ এক নিরন্তন সংঘাত। এই সংঘাত মুসলিম জীবনের শুধু অলংকার বা অহংকার নয়, জান্নাতের সোনালী সড়কও।

মাথায় ওড়না পড়া নিয়ে ফ্রান্সের মুসলিম মেয়েরা যে বিপদে পড়েছে, তাঁকে আমি বিপদ মনে করি না, কোন সংকট মনে করি না। যাকে আমি বিপদ ভাবছি, সংকট মনে করছি, তা আমাদের আত্মোপলব্ধিকে শাণিত করতেই সাহায্য করবে এবং সৃষ্টি করবে এমন এক সক্রিয়তা যা সেই শাণিত উপলব্ধিকে দান করবে অপরুপ রুপময়তা। অন্যদিকে এই বিপদ অমুসলিম সমাজের এক বিরাট অংশের মধ্যে নিয়ে আসবে আগ্রহ, অনুসন্ধিৎসা ও সহানুভূতি। এই দুটি দিকের পরিপুরকতা এগিয়ে দিবে দেবে মুসলিম সমাজকেই। সুতরাং এই ধরনের বিপদ মুসলিম সমাজের জন্যে অগ্রগতির রজত সিঁড়ি। এই অগ্রগতির পথে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় শত্রু অধৈর্য ও হঠকারিতা। আইন ভাঙ্গা নয়, আইনের পরিবর্তনের জন্যেই সংগ্রাম করতে হবে মুসলমানদের। এই সংগ্রামে নির্যাতন যত বাড়বে মুসলমানরা ততো লাভবান হবে এবং ক্ষতি হবে নির্যাতনকারী সংখ্যাগরিষ্ঠদের এবং এভাবেই বিজয় আসবে ফ্রান্সের মুসলমানদের এবং একদিন তারা সংখ্যালঘিষ্ঠতা থেকে উপনীত হবে সংখ্যাগরিষ্ঠতায়।

এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন আল্লাহ্‌র রহমত এবং তাঁর সাহায্যের। আল্লাহ্‌র সাহায্য লাভের জন্যে যোগ্যতা অর্জনের প্রশ্নটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। জ্ঞানে-মানে, ঈমানে-আমলে, দূরদর্শিতা ও দক্ষতা সব দিক দিয়েই যোগ্যতা অর্জন করতে হবে মুসলমানদের। এই যোগ্যতা অর্জনের দিকেই আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ইসলামই আজ একমাত্র জ্ঞান ও যুক্তির ধর্ম। জ্ঞান ও যুক্তি দিয়েই আমাদের বিশ্ব জয় করতে হবে। ইসলামের এই বিশ্ব জয়ের সংগ্রামে আপনাদের, ইউরোপীয় মুসলমানদের, অগ্রণী ভুমিকা আমি প্রত্যাশা করি। আল্লাহ আপনাদের সহায় হোন। আমীন'।

পড়া শেষ করল ফাতমা। তাঁর আমীন উচ্চারনের সাথে সকলে 'আমীন' বলে উঠল। ডোনাও।

'আমি খুব খুশি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের মহান ভাইকে। তাঁর এই বানীর প্রতিটি শব্দ স্থির,প্রদীপ্ত ধ্রুবতারার মত আমাদের দিক নির্দেশনা দিবে'। বলল ফাতমা।

'ওয়েলকাম বোন'। বলল আহমদ মুসা।

কথা বলল ফাতমার আব্বা আবু আমের আবদুল্লাহ। বলল, 'আহমদ মুসা তোমার বানী তোমার মতই। এতে এক সাগর কথাকে তুমি আটকে ফেলেছ। সময় থাকলে আমার অনেক জিজ্ঞাসা ছিল'।

'দোয়া করুন, সময় যেন আল্লাহ্ দেন'। বলে আহমদ মুসা ফাতমার দিকে চেয়ে বলল, 'তোমরা ডোনাকে মানে মারিয়া জোসেফাইনকে তোমাদের সোসাইটির সদস্য বানিয়ে নিও'।

আহমদ মুসা কথা শেষ করতেই ডোনা বলল, 'নিও' নয় 'নাও' বলুন এবং আজ থেকেই'।

ফাতমা আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। বলল, 'আমরা শুধু খুশি হবো না, আমরা আকাশের চাঁদ হাতে পাব। এই ঘটনা আমাদের জন্যে ' এ গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ড(একটি বৃহৎ উল্লস্ফন)' এবার তাহলে উঠি'। বলে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা। ডোনাও।

'আর একটি কথা'। বলে উঠল ফাতমা।

'কি?' বলল আহমদ মুসা।

ডোনার দিকে চেয়ে ফাতমা বলল, 'যে পিস্তল দিয়ে তিনজন লোক মেরে মহান ভাই আহমদ মুসাকে আপনি উদ্ধার করেছেন, সেই পিস্তলটা আমি একটু দেখতে চাই'।

'অবশ্যই দেখাব'। বলে ডোনা পিস্তল বের করল।

ফাতমা হাত বাড়াল পিস্তলের দিকে।

ডোনা পিস্তল দিল তাঁর হাতে।

ফাতমা পিস্তলটি হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে চুমু খেল পিস্তলটায়। বলল, 'আমি গর্বিত যে, একটি ফরাসী মেয়ে এবং একটি বুরবো রাজকুমারী এই পিস্তল ব্যবহার করেছেন ইসলামের পক্ষে'।

বলে ফাতমা পিস্তলটি ফিরিয়ে দিল ডোনার হাতে।

পিস্তল হাতে নিয়ে ডোনা সেটা আবার ফাতমার দিকে তুলে ধরে বলল, ‘পিস্তলটা তোমার জন্যে উপহার আমার পক্ষ থেকে’।

‘আমাকে?’ বিস্ময়-আনন্দ মিশ্রিত কণ্ঠ ফাতমার।

‘হ্যাঁ তোমাকে’।

ফাতমা পিস্তলটা হাতে নিয়ে আবার তাতে একটা চুমু দিয়ে জড়িয়ে ধরল ডোনাকে। বলল, ‘আপনি আমাদের সম্মানিত রাজকুমারী। আপনি আমাদের এক মহান ভাইয়ের একান্ত আপন। আপনার এই ঐতিহাসিক উপহার আমাকে ধন্য করেছে’। ভারী কণ্ঠ ফাতমার, চোখের পাতা ভিজে উঠেছে তাঁর।

ফাতমা ডোনাকে ছেড়ে দিয়ে চোখ মুছে হেসে বলল, ‘কিন্তু পিস্তল তো আপনারই বেশি প্রয়োজন ছিল’।

হাসল ডোনা। বলল, ‘একেবারে নিঃস্ব হয়ে তোমাকে দান করিনি’। বলে নিচু হয়ে মোজার ভেতর থেকে কালো রংয়ের ছোট্ট একটা পিস্তল বের করল।

‘আপনার তো সাংঘাতিক বুদ্ধি!’ মোজার ভেতরে পিস্তল, কল্পনারও অতীত’। বলল ফাতমা।

ডোনাকে মোজার ভেতর থেকে পিস্তল বের করতে দেখে বিস্মিত হয়েছে আহমদ মুসাও। কিন্তু তাঁর বিস্ময় দৃষ্টির মধ্যে গভীর বেদনারও একটা প্রলেপ আছে।

ফাতমার উত্তরে ডোনা আহমদ মুসার দিকে এক পলক তাকিয়ে বলল, ‘বুদ্ধি আমার নয়। ওর বুদ্ধির সামান্য একটা অনুসরন মাত্র’।

‘চাঁদ সূর্য থেকে আলো পায়। কিন্তু আমাদের কাছে আলোটা চাঁদেরই’। বলল বৃদ্ধ আবু আমের আবদুল্লাহ।

‘ধন্যবাদ জনাব’। সলজ্জ হাসল ডোনা।

আহমদ মুসা সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল। সবাই এগিয়ে দিল তাঁদের গাড়ি পর্যন্ত।

আহমদ মুসা বসল ড্রাইভিং সীটে। ডোনা তাঁর পাশে।

চলতে শুরু করল গাড়ি।

সবাই হাত নাড়ছিল।

আহমদ মুসা গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হেসে বলল, ‘আমি বিদায় নিচ্ছি না’।

গাড়ি অনেকখানি এগিয়েছে। আহমদ মুসা শুনতে পেল; ওঁরা চিৎকার করে বলছে, ‘আমরাও বিদায় দিচ্ছি না’।

# ৪

এলিসা গ্রেস ওমর বায়ার দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। বরাবরের মতই দরজা বন্ধ। আজ আর ঠেলা দিয়ে দেখল না, দরজা বন্ধ কিনা। ভাবল দরজা অবশ্যই বন্ধ আছে।

এলিসা গ্রেস প্রথম দিন থেকেই দেখছে মিঃ বায়া সব সময় তার দরজা বন্ধ রাখে, যতক্ষণ ঘরে থাকে। অথচ বাইরে বেরুলে দরজা বন্ধ করে না। এলিসা গ্রেস এ ব্যাপারটার অর্থ বুঝে না। অথচ তাঁদের তদারককারী মিঃ বেনহাম চান ওমর বায়ার দরজা খোলা থাকুক। যাতে বুঝা যায়, তাঁর মধ্যে কোন ভয় বা উদ্বেগ নেই বা কোন প্রকার সন্দেহ সে কাউকে করে না।

মিঃ বেনহাম অর্থাৎ বিজ্ঞানী বেনহাম ওমর বায়ার ফ্ল্যাটের পাশের আর একটা ফ্ল্যাটে থাকেন। এলিসা গ্রেসের কাছে তাঁর পরিচয় সে ব্ল্যাক ক্রসেরই একজন নেতা।

বিজ্ঞানী বেনহামের থাকার ঘরটি ওমর বায়ার ঘরের সোজা দক্ষিনে প্রাচীরের মধ্যেই। একটু দুরে, তা না হলে ওমর বায়ার ঘরের জানালা দিয়ে মিঃ বেনহামের ঘরের লোকজনকে দেখা যেত। বিজ্ঞানী বেনহাম তাঁর ভিশনের অংশ হিসাবেই পরিকল্পিতভাবে ঐ ফ্ল্যাটের ঐ ঘর বেছে নিয়েছে।

এলিসা গ্রেস ভাবছিল, মিঃ বেনহাম চান ওমর বায়া দরজা খুলে রাখুক। কিন্তু তিনি এও চান যে, এই কথা ওমর বায়াকে না বলা হোক। নির্দেশ হয়েছে, এলিসাকে পরোক্ষ চেষ্টা করতে হবে যাতে সে দরজা খোলা রাখে। সরাসরি তাঁকে দরজা খোলা রাখতে বললে ওমর বায়া আরও সন্দিগ্ধ হয়ে পড়তে পারে।

এলিসা ওমর বায়ার দরজায় নক করল। বরাবরের মতই তিনবার নক করল সে।

দরজা খুলে গেল। দরজা খুলে দিল ওমর বায়া। তাঁর গায়ে চাদর জড়ানো।

খালি গায়ে কিংবা শুধু গেঞ্জি গায়ে এলিসা কোন সময়ই ওমর বায়াকে দেখেনি। এলিসার মনে হয়েছে ওমর বায়া খুব লাজুক।

এলিসা গ্রেসের হাতে ছিল দুধের গ্লাস।

দুধের গ্লাস নিয়ে এলিসা গ্রেস ঘরে প্রবেশ করল। দরজা খুলে দিয়েই ওমর বায়া গিয়ে চেয়ারে বসেছে।

এলিসা গ্রেস দুধের গ্লাস টেবিলে রাখল। প্রথম দিকে দুধের গ্লাস ওমর বায়ার হাতে দেয়ার চেষ্টা করত। কিন্তু ওমর বায়া কোন জিনিসই হাত পেতে নেয় না। এলিসা এখন আর চেষ্টা করে না হাতে দেয়ার।

'একটা কথা বলতে পারি?' চলে যাবার জন্যে হাঁটতে শুরু করেও আবার ঘুরে দাড়িয়ে বলল এলিসা।

'বলুন'। বলল ওমর বায়া।

'সব সময় ঘরের দরজা লক করে রাখেন কেন?'

'ও কিছু না। অভ্যাস বলতে পারেন'।

'না আমাকে ভয় করেন?'

'আপনাকে?'

'তাছাড়া আর কে? আমি ছাড়া এখানে আর যারা আছে চাকর বা পরিচারিকারা তাঁদের তো ভয় করার কোন প্রশ্নই উঠে না'।

'না আপনাকে ভয় পাই না'।

'তাহলে?'

'ওই তো বললাম, অভ্যাস'।

'না, অভ্যাস নয়, অভ্যাস হলে বেরিয়ে যাবার সময় ঘর বন্ধ করেন না কেন?'

সংগে সংগে উত্তর দিল না ওমর বায়া। একটু পরে ধীরে ধীরে বলল, 'ভয়ের কারন আমি নিজেই। অর্থাৎ আমি আমাকেই ভয় পাই'।

'কেন?'

'অনেক কারন থাকতে পারে। একটা কারন হলো, আমি নিজে দুর্বল'।

'কোন দিক দিয়ে?'

‘মনের দিক দিয়ে’।

‘মনের দিক দিয়ে আপনি দুর্বল নন আমি জানি। তবে হ্যাঁ, আপনি আমাকে ভয় করেন। এটা মনের ভয়’।

‘আপনাকে ভয় করি তার প্রমাণ?’

‘চাকর-পরিচারিকাদের কাছ থেকে হাত পেতে জিনিস নেন কিন্তু আমার কাছ থেকে নেন না। গায়ে চাদর চাপানো বা জামা পড়া ছাড়াই চাকর-পরিচারিকাদের সাথে আপনি দেখা করেন, কিন্তু আমার সাথে করেন না’।

এলিসা গ্রেস কথা শেষ করলে ওমর বায়া নীরব থাকল। ওমর বায়া মুখ নিচু করল। বেশ সময় নিয়ে বলল, ‘কিন্তু আপনাকে কেন ভয় করব আমি?’

‘সে প্রশ্নতাই তো আমি করেছি’।

‘এর উত্তর আমি জানি না’। মুখ নিচু রেখেই ধীরে ধীরে বলল ওমর বায়া।

‘কারন আপনি সম্ভবত আপনাকেও জানেন না’। বলে এলিসা গ্রেস বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

যাবার সময় এলিসা নিজেই নব টিপে দরজা নক করে গেল।

এলিসার শেষ কথাটা মনের কোথায় যেন কাঁটার মতো বিধতে লাগল ওমর বায়ার। ওমর বায়া কি সত্যি নিজেকে জানে না! না জানলে এতো নির্যাতন এবং এই বন্দী জীবন যাপন করছে সে কেন? ওদের কথায় সে রাজি হতে পারছে না কেন? একটিই কারন, ওমর বায়া নিজেকে, নিজেদের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং বোধ, বিশ্বাসকে জানে বলেই। তবে হ্যাঁ এলিসা গ্রেস সম্পর্কে সে নিজের মনের গভীর থেকে ভয় পায়। প্রথম দৃষ্টিতেই এলিসা গ্রেসকে সে শুধু অপরূপা নয়, আরও বেশি কিছু যেন মনে করেছে। অবশ্য সে সংগে সংগেই বুঝেছে এলিসা শক্রর অতি ধারাল এক তরবারি। এই দ্বন্দের পরিণতির দিকে তাকালে ওমর বায়া ভয় পায়। এই ভয়ই ওমর বায়ার কাছে এলিসা গ্রেসকে অন্য সব থেকে আলাদা করেছে। যার কারনে এলিসা গ্রেসের সাথে তাঁর আচরণও আলাদা হয়েছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলিসার আজ বেশ ভালো লাগছে, কতকগুলো কথা বলা গেছে তাঁকে। কথাগুলো ভালই বলতে পেরেছে এলিসা। তাঁর ওপর নির্দেশ পরোক্ষ চেষ্টার মাধ্যমে ওমর বায়ার সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তুলতে হবে।

এসব কথা ভাবতে গিয়ে এলিসা গ্রেসের অবাক লাগছে। সত্যিই ওমর বায়া তাঁর কাছে এক অদ্ভুত যুবক। মাঝে মাঝে তাঁর সন্দেহ হয়, ওর মধ্যে কোন আবেগ, কোন সজীব মন আছে কিনা। কোন যুবক যে এমন স্বাত্তিক বা এমন চরিত্রের হতে পারে, তা কল্পনারও বাইরে ছিল তার। কিন্তু আজকের আলোচনায় এলিসার মনে হয়েছে ওমর বায়ার বাইরের কঠিন আবরণের নিচে সুন্দর সবুজ একটা মন আছে। বাইরের এ কঠিন আবরন ভাঙ্গাই আমার এ্যাসাইনমেন্ট, আমার দায়িত্ব।

এ সময় মিশেল লিটল নামক সেই মাংশ পিণ্ডটি হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলল, তাল পাতার সেপাই কি যেন নাম, হ্যাঁ, বেনহাম আপনাকে ডাকছে।

মিঃ লিটল মোটেই দেখতে পারে না বিজ্ঞানী বেনহামকে। সে বেনহামকে পাথরের মানুষ মনে করে। লিটলের মন্তব্য, বেনহামের চোখ দেখলে মনে হয় সবাইকে সে ঘৃণা করে, যেমনটা দেখা যায় ইহুদীদের চোখে। ব্ল্যাক ক্রসের কোন নেতাই তাঁর মত নয়।

ব্ল্যাক ক্রস চরিত্রগতভাবে ইহুদী বিদ্বেষী। স্কিনহেড জাতীয়তাবাদীরা ব্ল্যাক ক্রসের সাথে মিলিত হবার পর ব্ল্যাক ক্রসের এই প্রবণতা আরও বেড়েছে। মশিয়ে লিটল এই মনোভাবেরই প্রতিধ্বনি করে।

মশিয়ে লিটল-এর এই মনোভাব এলিসা গ্রেসকেও স্পর্শ করেছে। সেও বেনহামকে খুব একটা পছন্দ করে না। তাকে দেখলেই এলিসার মনে হয় কি এক ষড়যন্ত্র তার চোখে-মুখে। সে যা বলে, তার পেছনে যেন আরও কথা থাকে। ব্ল্যাক ক্রসের লোকরা নিষ্ঠুর খুনী। কিন্তু এই কাজে তারা রাখ-ঢাক করে না। তাদেরকে বুঝা যায়, কিন্তু বেনহাম দূর্বোধ্য। ব্ল্যাক ক্রসের হয়েও সে এমন কেন।

বেনহামের পরিচয় এলিসা এবং অন্য কেউ জানে না। ব্ল্যাক ক্রসের একজন হিসাবে ওমর বায়ার তদারকির জন্যে পৃথক একটা ভিলায় তাকে রাখা হয়েছে।

এলিসা গ্রেস গিয়ে বিজ্ঞানী বেনহামের দরজায় নক করল।

ভেতর থেকে ভারী কণ্ঠের আওয়াজ এল, 'এস।'

দরজায় চাপ দিল এলিসা গ্রেস। খুলে গেল দরজা।

বিজ্ঞানী বেনহাম ছিল পড়ার টেবিলে। একটা মোটা বইয়ের উপর ঝুঁকে পড়েছিল সে।

এলিসা গ্রেস ঘরে ঢুকে একটু দাঁড়াল। বিজ্ঞানী বেনহামের চোখ বইয়ের উপর নিবদ্ধ।

এলিসা গ্রেস বসবে কি বসবে না চিন্তা করছিল।

এই সময় বিজ্ঞানী বেনহাম মাথা না তুলেই বলল, 'তোমাকে ধন্যবাদ এলিসা গ্রেস।'

'আমি কিছু বুঝতে পারছি না স্যার।' বলল এলিসা গ্রেস।

'তুমি ওমর বায়াকে অনেক কাছে এনেছ।'

'কখন, কিভাবে স্যার?'

'না, তুমি আজ চমৎকার কথা বলেছ ওমর বায়ার সাথে।'

'আজকের কথা?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কি করে জানলেন স্যার?' এলিসা গ্রেসের চোখে-মুখে বিস্ময়।

'শুনেছি। সে কথা যাক। তুমি কেমন বুঝছ ওমর বায়াকে?'

'খুব শক্ত স্যার।'

'যেমন?'

'সে সব সময় দরজা বন্ধ করে রাখে, এমনকি আমার হাতে থেকে কোন জিনিস পর্যন্ত নেয় না। চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে না।'

'কিন্তু আজকের তার সব কথার মধ্যে দিয়ে তাকে অতটা শক্ত মনে হয়নি।'

'সব কথা আপনি শুনেছেন স্যার?' আবারও বিস্ময় ফুটে উঠল এলিসার কথায়।

কিন্তু বিস্মিত এলিসা গ্রেস একটু মাথা খাটালেই বুঝতে পারতো, এই জানার মধ্যে কোন বাহাদুরি নেই। ওমর বায়ার টেবিলের তলায় অত্যন্ত পাওয়ারফুল কিন্তু অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটা ট্রান্সমিটার বসানো হয়েছে।

‘তুমি কিভাবে এগোবে মনে করছ?’ এলিসার প্রশ্নের দিকে কান না দিয়েই বলল মি. বেনহাম।

‘চেষ্টা করছি। আগের চেয়ে অনেকখানি ওপেন হয়েছে সে। কিন্তু ঘর বন্ধ করে একা থাকতেই ভালোবাসে। তার এ একাকীত্ব দূর করতে না পারলে তার মনকে সম্পুর্ণ ফ্রি করা যাবে না।’

‘তাঁর এ একাকীত্ব দূর করার জন্যে তো তুমি।’

‘কিন্তু কিভাবে? ঐভাবে যদি সে দরজা বন্ধ করে থাকে। কোন চাপ দিতেও তো আপনি নিষেধ করেছেন।’

‘অবশ্যই চাপ দেয়া চলবে না। স্বাভাবিক চেষ্টার মাধ্যমেই তোমাকে ওর ঘনিষ্ঠ হতে হবে। ওকে হাসি-খুশিতে ভরে দিয়ে মনের দিক দিয়ে সম্পুর্ণ ফ্রি করে তুলতে হবে।’

‘সর্বক্ষণ মেশার সুযোগ না পেলে এটা সম্ভব কিভাবে?’

‘সর্বক্ষণ মেশার সুযোগ তোমাকেই সৃষ্টি করতে হবে।’

‘জানি। আজ তো ওকে দরজা খুলে রাখার কথা বলেছি।’

‘তোমার উপস্থাপনা খুব সুন্দর হয়েছে। ওর কাছে এই কথা তুলে ধরার দরকার ছিল। দেখবে আগামী দু’দিনের মধ্যে ওর দরজা আপনাতেই খুলে যাব।’

‘দু’দিনের মধ্যে?’

‘হ্যাঁ, দু’দিনের মধ্যে।’

‘আর কি ঘটবে?’

‘পরবর্তী দু’দিনের মধ্যে তোমার হাত থেকে সরাসরি জিনিসপত্রও নেবে। তবে শর্ত একটা। আজ থেকে দু’দিন পর রাতে যখন দুধ দিতে যাবে, তখন তার হাতে দুধ দিতে চেষ্টা করবে। যখন দুধ নেবে না, তখন তোমাকে তাকে কিছু বলতে হবে।’

‘এটাও দু’দিনের মধ্যে? আপনি কি মনোবিজ্ঞানী স্যার?’ এলিসার চোখে বিস্ময় মিশ্রিত অনুসন্ধান।

‘তারপর তুমি কি করবে?’ এবারও বেনহাম এলিসার প্রশ্ন পাশ কাটিয়ে গেল।

‘সর্বক্ষণ মেশার সুযোগ পেলে তাকে মনের দিক দিয়ে প্রফুল্ল ও ফ্রি করে তোলা যাবে।’

‘আমাদের চাওয়া কিন্তু আরও অনেক বেশি।’

‘কি সেটা?’

‘চারদিন পরে বলব। তবে এটুকু জেনে রেখ, তুমি যা বলবে সে তাই করবে, এ পর্যায়ে তাকে নিয়ে আসতে হবে।’

কথা শেষ করে বিজ্ঞানী বেনহাম বইটা টেনে নিয়ে তাতে আবার মনোনিবেশ করল।

এলিসা গ্রেস কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর বুঝল, কথা শেষ।

ঘর থেকে বেরিয়ে এল এলিসা গ্রেস।

ঘর থেকে বেরিয়ে নিজেদের ফ্ল্যাটে ফিরে আসতে আসতে ভাবল এলিসা গ্রেস, সৌজন্যবর্জিত লোকটা নিশ্চয় বেশি কথা বলে না।

কিন্তু দু’দিন পর রাত দশটায় এলিসা গ্রেস হাতে দুধের গ্লাস নিয়ে যখন ওমর বায়ার দরজায় গিয়ে চাপ দিল দরজা খুলে গেল, তখন এলিসা গ্রেস সত্যিই বিস্মিত হলো। মি. বেনহামের কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে অন্তত এই ক্ষেত্রে।

ঈষৎ ফাঁক হওয়া দরজায় দাঁড়িয়ে এলিসা গ্রেস বলল, আসতে পারি?’

‘আসুন।’ বলল ওমর বায়া।

ভেতরে প্রবেশ করল এলিসা গ্রেস। এগোলো ওমর বায়ার দিকে।

আজ দুধের গ্লাসটা টেবিলে না রেখে ওমর বায়ার দিকে বাড়িয়ে দিল।

ওমর বায়া তার হাত না বাড়িয়ে বলল, ‘টেবিলে রাখুন।’ এলিসা গ্রেসের দিকে না তাকিয়ে কথাগুলো বলল ওমর বায়া।

এলিসা গ্রেস দুধের গ্লাস রাখল টেবিলে। তারপর বলল, ‘আপনি আমার হাত থেকে কিছু নেন না, আমাকে অথবা আপনি নিজেকেই ভয় করেন বলে। এ ভয় কি যাবে না?’

‘সেদিনও আপনি এ কথাই বলেছেন। আসলে ভয় আমি কাউকে করি না। এটা আমার বিশ্বাস ও সংস্কৃতির প্রশ্ন। যা আপনি বুঝবেন না।’

‘ধন্যবাদ। কোন সংস্কৃতিই কিন্তু মানুষকে ছোট করতে বলে না।’

‘এটা ছোট করা নয়, আরও মর্যাদা দেয়া।’

‘প্রত্যাখ্যানকে কি মর্যাদা বুঝায়?’

‘অন্যায়কে প্রত্যাখ্যানের অর্থ অবশ্যই ন্যায়কে মর্যাদা দান।’

‘বা! আপনি সুন্দর কথা বলেন। আজ আর কথা বাড়াব না। চলি। শুভরাত্রি।’ বলে এলিসা গ্রেস বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

দু’দিন পর রাত দশটায় দুধের গ্লাস হাতে এলিসা গ্রেস ঘরে প্রবেশ করল। দু’দিন আগের সেই সময় থেকে ওমর বায়ার দরজা আর লক হয় না।

বিজ্ঞানী বেনহাম কথিত দ্বিতীয় পর্যায়ের দ্বিতীয় দিন। তার বক্তব্য অনুসারে আজ ওমর বায়ার এলিসার হাত থেকে জিনিস অর্থাৎ এখন দুধের গ্লাস নেবার কথা।

দোদুল্যমান মন নিয়ে এলিসা গ্রেস দুধের গ্লাস নিয়ে এগোলো ওমর বায়ার দিকে। বলা যায় কম্পমান হাতেই সে দুধের গ্লাস বাড়িয়ে দিল ওমর বায়ার দিকে।

দুধের গ্লাস সামনে যেতেই ওমর বায়া চকিতে একবার তাকাল এলিসা গ্রেসের দিকে। তারপর ডান হাত বাড়িয়ে ওমর বায়া এলিসাকে অবাক করে দিয়ে তার হাত থেকে দুধের গ্লাস নিয়ে নিল।

এলিসা গ্রেসের চোখ বিস্ময়ে ছানাবড়া হয়ে উঠল। ওমর বায়ার দৃষ্টি নিচু না থাকলে সেও এলিসার বিস্ময় বিমূঢ় চেহারা দেখতে পেত।

এলিসার মুখে কোন কথা যোগাচ্ছিল না। সে ভাবছিল, মি. বেনহামের দু’টি কথাই একেবারে অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। এটা কি করে সম্ভব। অনুমান করে বা কার্যকারণ দেখে অথবা মানস-প্রবণতা লক্ষ্য করে কেউ ভবিষ্যৎ বাণী

করতে পারে কিন্তু এভাবে দিনক্ষণ বলা সম্ভব নয়। কিন্তু এই অসম্ভব কাজ মি. বেনহাম সম্ভব করলেন কিভাবে?

প্রাথমিক বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিয়ে এলিসা গ্রেস বলল, ‘ধন্যবাদ।’

‘কেন?’

‘আমি খুশি হয়েছি।’

‘কেন?’

‘আপনার হাতে কিছু তুলে দেবার সৌভাগ্য হলো।’

‘এতে অস্বাভাবিকতার কি আছে?’

ওমর বায়ার কথায় বিস্মিত হলো এলিসা গ্রেস। ওমর বায়ার সেদিনের এবং আজকের কথার মধ্যে কত পার্থক্য! সেদিন যাকে ওমর

বায়া তার বিশ্বাস ও সংস্কৃতির অংগ বলল, আজ সে ওমর বায়াই তার বিশ্বাস ও সংস্কৃতি ভংগ হওয়ার মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা দেখছে না। মাত্র দু’দিনে কি পরিবর্তন! কোন যাদুমন্ত্র যেন ভোজবাজী ঘটিয়েছে।

‘ধন্যবাদ। অস্বাভাবিকতা নেই বরং এটা স্বাভাবিক।’ বলল এলিসা গ্রেস।

ওমর বায়া দুধ খেয়ে গ্লাস ফেরত দিল এলিসা গ্রেসের হাতে। এই প্রথম ওমর বায়া এলিসা গ্রেসের হাতে সরাসরি কিছু দিল।

বিস্মিত এলিসা গ্রেস ওমর বায়ার দিকে চোখ তুলে বলল, ‘ধন্যবাদ।’

গ্লাস হাতে নিয়ে ঘরের চারদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে বলল, ‘কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো আপনার?’

‘অসুবিধা নেই, কষ্ট আছে।’

‘কি কষ্ট?’ উদ্বিগ্ন কন্ঠে জিজ্ঞেস করল এলিসা গ্রেস।

‘ব্ল্যাক ক্রস আমাকে বিনা কারণে বন্দী করে রেখেছে। অথচ ওদের কোন স্বার্থ নেই।’

ওমর বায়ার কথা শুনে এলিসা গ্রেসের উদ্বেগ কেটে গেল। হেসে উঠল। হাসল প্রাণ খুলে।

'হাসছি আপনার অমূলক কষ্টের কথা শুনে। আপনি বরং বাইরে থাকার চেয়ে এখানে ভালো আছেন। ব্ল্যাক ক্রস আপনাকে নিরাপদে রেখেছে। বাইরে থাকলে ওকুয়া'র ভয়ে হয় পালিয়ে বেড়াতে হতো, নয়তো ওদের হাতে বন্দী হতে হতো।'

'এখনো তো আমি বন্দী আছি।'

'সত্যিই কি এখন আপনার বন্দী থাকার মত মনে হয়?'

'তা হয় না। এজন্যে ধন্যবাদ ব্ল্যাক ক্রসকে। কিন্তু তবুও তো আমি বন্দী।'

'ব্ল্যাক ক্রস আপনার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছে। আপনি শীঘ্রই ছাড়া পেয়ে যাবেন। ব্ল্যাক ক্রসকে বন্ধু ভাবুন।'

'হ্যাঁ, আমিও এখন এ রকম ভাবছি।'

'তাহলে বলুন আপনি বন্দী এ চিন্তা মনে রাখবেন না। আপনি কষ্ট পেলে আমার কষ্ট লাগে।'

ওমর বায়া চোখ তুলে তাকাল এলিসা গ্রেসের দিকে। তার মনে হলো, এত সুন্দর কথা কারো কাছ থেকে সে শোনেনি। এমন সুন্দরও কাউকে সে দেখেনি।

চোখ নামিয়ে নিল ওমর বায়া। কোন কথা বলল না।

'আসি আজকের মত। রাত আপনার জন্য আরামদায়ক হোক। শুভ রাত্রি।'

বলে এলিসা গ্রেস বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

আসতে আসতে ভাবল এলিসা গ্রেস এমন সুন্দর, সংযমী মানুষও দুনিয়াতে আছে। ওর বাইরের রূপ যত কালো, ভেতরটা ততই সুন্দর। তার ভেতরের পবিত্র সৌন্দর্যের কাছে এলিসার আগুনের মত জ্বালাময়ী সৌন্দর্য খুবই নিস্প্রভ।

এলিসা তার ঘরে এসে বসতেই টেলিফোন বেজে উঠল।

এলিসা গ্রেস ধরল টেলিফোন।

'হ্যালো।'

'ধন্যবাদ এলিসা।' ওপার থেকে বিজ্ঞানী বেনহামের কণ্ঠ।

'ওয়েলকাম স্যার। কোন আদেশ?'

'না এলিসা কোন আদেশ নয়। কাল সকালে এস, নির্দেশ তখন দেব। এখন টেলিফোন করেছি তোমাকে ধন্যবাদ দেয়ার জন্যে। আমরা তোমার কাছে যা আশা করেছি, তুমি তার চেয়েও ভালো করছ। তোমার ফিনিশিং আজ চমৎকার হয়েছে। তোমাকে পারিশ্রমিক আমরা দ্বিগুণ করে দেব।'

'ধন্যবাদ স্যার।'

'বেশ রাখি। কাল এস।'

টেলিফোন রেখে দিল বেনহাম।

আবার মনে খোঁচা খেল এলিসা গ্রেস। লোকটার কোন সৌজন্য বোধ নেই। এরা অধস্তনদের সামান্য 'শুভ রাত্রি' বলতেও জানে না।

টেলিফোন রাখল এলিসা গ্রেস।

আবার মনে এসে সেই বিস্ময়ই বাসা বাঁধল। লোকটা সর্বদ্রষ্টা নাকি! যা বলে তাই ঘটে, আবার ওখানে যা কথা হয় সবই শুনতেও পায়।

পরদিন ভোর।

সেদিন একটু ভোরেই উঠেছিল এলিসা গ্রেস। জগিং করে ফিরছিল সে।

লম্বা করিডোরটায় পা দিয়েই দেখল, ওমর বায়া বাইরে থেকে তার ঘরে ঢুকে গেল।

ওমর বায়ার ঘরের সামনে দিয়েই যেতে হবে এলিসা গ্রেসের ঘরে।

ওমর বায়ার দরজার সামনে এসে দাঁড়াল এলিসা গ্রেস। এগোলো দরজার দিকে। কৌতুহলবশতই দরজার নব ঘুরাল। খুলে গেল দরজা।

একটা সুরেলা কন্ঠ ভেসে এল ভেতর থেকে। ওমর বায়া কিছু পড়ছে বা বলছে।

খুব আস্তে দরজা আরেকটু ফাঁক করে ভেতরে উঁকি দিল এলিসা গ্রেস। দেখতে পেল, ওমর বায়া কার্পেটের ওপর তার বড় তোয়ালেটা ফেলে দক্ষিণ-পূর্বমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাত দু'টি আড়াআড়ি করে বুকের ওপর রাখা। অনুচ্চ কন্ঠে সুর করে কি যেন পড়ছে সে। বেশ মিষ্টি সুর। ভালো লাগছে শুনতে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর হাঁটুতে দু'হাত রেখে কোমর পর্যন্ত বাঁকিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ওমর বায়া। তারপর উঠে দাঁড়াল। পরক্ষণেই নিচু হয়ে মাটিতে মাথা রাখল। একটু পরেই উঠল। পরক্ষণেই আবার মাথা রাখল মাটিতে। পরে উঠে দাঁড়াল আবার।

এলিসা গ্রেস বুঝল, ওমর বায়া প্রার্থনা করছে। কিন্তু কি ধরণের প্রার্থনা এটা?

হঠাৎ এলিসা গ্রেসের মনে পড়ল বেশ অনেকদিন আগে দেখা টিভি'র একটা দৃশ্যের কথা। সে দৃশ্যে এভাবেই লোকদেরকে প্রার্থনা করতে দেখেছিল। তার মনে পড়েছে, এটা মুসলমানদের প্রার্থনার দৃশ্য।

মনে এক প্রচণ্ড ধাক্কা খেল এলিসা গ্রেস। ওমর বায়া তাহলে কি মুসলমান? তার মাতৃধর্মের লোক?'

এলিসা গ্রেস আস্তে আস্তে নব ঘুরিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে সরে এল দরজা থেকে।

মনে একটা তোলপাড় তখন এলিসা গ্রেসের।

এলিসা গ্রেস একজন মিশ্র রক্তের মেয়ে।

এলিসার নানী আরেফা নূর তার বালিকা বয়সে আলিজিরিয়ায় ফরাসী শাসন প্রতিষ্ঠার শুরুর দিকে একজন ফরাসী যুবক কর্তৃক অপহৃত হয়ে আসে রোমে। সেখান থেকে ফ্রান্সে। এলিসা গ্রেসীর মা আনিসা গ্রেস ছিল সেই আরেফা নূরের একমাত্র মেয়ে।

এলিসা গ্রেসের মনে পড়ল তার মায়ের কথা। তার মা আনিসা গ্রেস মারা গেছে অনেক দিন আগে। নানী আরিফা নূরকে এলিসা দেখেনি। কিন্তু তার সম্পর্কে সব সময় অনেক গল্প শুনেছে এলিসা। তার মায়ের কাছ থেকেই শুনেছে তার নানীর ধর্ম ছিল ইসলাম। তার মাও তার নানীর ধর্মকে নিজের ধর্ম বলে মনে

করতেন। তার মা কোন দিনই গীর্জায় যায়নি। সুতরাং তার মাতৃধর্ম ইসলাম বা মুসলমান ধর্ম। ওমর বায়া সেই ধর্মেরই অনুসারী।

এলীশা গ্রেস ধীরে ধীরে শিথিল পায়ে তার ঘরে ফিরে এল। নিজেকে সোফায় ছুঁড়ে দিয়ে গা এলিয়ে দিল সোফার বুকে।

চোখ বুজে এল তার।

মনটা ছুটে গেল তার অনেক দুরের অতীতে। যখন ব্রিষ্ট নগরীর একটা ছোট্ট ফ্লাটে তার আব্বা, আম্মা এবং বড় এক ভাই নিয়ে ছিল তার পৃথিবী। মায়ের এ্যালবামে ছিল তার নানীর একটা ফটো। অবসর পেলেই তার মা বের করতেন তার নানীর সেই ফটো। মায়ের কাছে কত গল্প শুনেছে তার নানীর। ওমর বায়া যেমন বন্দী হয়েছে, তেমনি তার নানী ফুলের মত এক বালিকা অপহৃত হয়েছিল আলজিরিয়া দখলকারী ফরাসী সৈন্যদের একজনের হাতে। সেই সৈনিক ছিলেন তার নানা।

তার নানী সবই পেয়েছিলেন, কিন্তু চোখের পানি তার কোনদিন শুকায়নি। তার নানা তার নানীকে সব স্বাধীনতায় দিয়েছিল। নানী তার নিজের ধর্ম যথাসাধ্য পালন করতেন, নানা তাতে বাধা দেননি। কিন্তু নানী তার জন্মভূমি এবং তার আপনজনদের দেখার সুযোগ কোন দিন পাননি। এই বেদনাই অশ্রু হয়ে ঝরেছে তার চোখে আমৃত্যু।

এলিসা গ্রেস তার মায়ের কাছে তার নানীর বলা অনেক কাহিনী শুনেছে। শীতের দীর্ঘ রাতে মায়ের বুকে মুখ রেখে এলিসা গ্রেস শুনতো সে কাহিনীগুলো। তার নানী আরেফা নূর আলজিয়ার্সের একটি বিখ্যাত ও প্রভাবশালী পরিবারের সন্তান। কিন্তু ফরাসীরা আলজিরিয়া দখলের পর এই পরিবার ফরাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে এই অভিযোগে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ সত্ত্বেও আলজিয়ার্স শহরতলীর এক বাড়িতে সব হারানোর পরেও তাদের পরিবার স্নেহ ঘেরা এক সুন্দর পরিবেশে স্বর্গীয় সুখে বাস করতো। আব্বা-আম্মা ছাড়াও তাঁর নানীর ছিল দু'বোন এবং চার ভাই। এই সময়ই একদিন দূর্ভাগ্য নেমে এল তার নানীর জীবনে।

সেদিন তার চার ভাইয়ের কেউই বাড়িতে ছিল না। হঠাৎ তার মা অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার আব্বার বাইরে যাওয়া নিরাপদ ছিল না। তার বড় দু'বোনকেও লুকিয়ে রাখা হয়েছে। সুতরাং বাইরে যাবার কেউ ছিল না। তখন তার বয়স ছিল পনের। মুমূর্ষু মাকে রক্ষার জন্যে মায়ের অশ্রুরুদ্ধ নিষেধ সত্ত্বেও পাগলের মত বেরিয়ে আসে বাড়ি থেকে ওষুধ সংগ্রহের জন্যে।

সেই যে সে বেরিয়ে আসে আর ফিরতে পারেনি। শহরের সব ওষুধ দোকান বন্ধ করে হয়েছিল, যাতে বৈরী ও বিদ্রোহীরা কোন ওষুধ না পায়। ওষুধ পাওয়া যেত শুধু ফরাসী সৈন্যের চৌকিগুলোতে।

সে ফরাসী সৈন্যের চৌকি কোথায় চিনতো না। অনেক খোঁজা-খুঁজির পর সে রাস্তায় পাহারারত একজন সৈন্যকে জিজ্ঞেস করে ওষুধ কোথায় পাওয়া যাবে।

শুনেই সৈনিকটি বলে যে, সে ওষুধের সরবরাহ কেন্দ্র দেখিয়ে দিতে পারে এবং তাঁকে গাড়িতে উঠতে বলে। সে অস্বীকার করে গাড়িতে উঠতে এবং বলে যে, কেন্দ্রটি কোথায় তা বললেই চলবে।

কিন্তু সৈনিকটি জোর করে তাকে গাড়িতে তুলে নেয়। সে চিৎকার করে সাহায্য চায়। কিন্তু কেউ সাহায্য করতে আসেনি। গাড়ি চলতে শুরু করলে একজন বৃদ্ধ ছুটে এসেছিল এবং গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে গাড়ির গতিরোধের চেষ্টা করেছিল। বৃদ্ধের ওপর দিয়েই গাড়ি চালিয়ে দেয় সৈনিকটি। গাড়ির চাকা পিষ্ট করে বৃদ্ধের দেহ।

এরপর শুরু হয় অসহায় সেই বালিকার জীবন-পরিক্রমার এক দীর্ঘ কাহিনী।

এসব কাহিনী বলতে বলতে এলিসার মা কেঁদে ফেলত। নানীর সে কাহিনী কাঁদাত এলিসা গ্রেসকেও। তার সামনে ভেসে উঠতো তার অদেখা নানীর অশ্রু সজল ছবি, ভেসে উঠতো তার সামনে রোম এবং আলজিয়ার্সের কল্পিত দৃশ্য। সে প্রশ্ন করে একদিন তার মাকে, আলজিয়ার্সে নানীর কেউ নেই? তাদেরকে পৌছে দেয়া যায় না নানীর কথা যে, নানী মৃত্যু পর্যন্ত ভোলেনি তাদের কথা এবং আমরাও তাদের স্মরণ করি।

এলিসা গ্রেসের মা কাঁদতে কাঁদতেই জবাব দিয়েছিল, সে চেষ্টা করেছি কিন্তু খোঁজ পাওয়া যায়নি। ফরাসী শাসনে সেখানে নিরন্তর যে ঘূর্ণিঝড় বয়েছে, তাতে আলজিরিয়ার সবকিছুই লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। সে ঝড়ে ওরা কোথায় হারিয়ে গেছে কে জানে!

নানীর কাহিনী শোনা সেই বয়স বহু দিন আগে চলে গেছে এলিসার। কাহিনী বলা সেই মাও গত হয়েছে অনেক দিন। জীবন যুদ্ধের ভিড়ে এই অতীতকে এলিসা গ্রেস খুব কমই স্মরণ করতে পারে। আজ ওমর বায়ার ঘটনা সময়ের দেয়াল ভেঙে দিয়েছে। অতীত বর্তমানের রূপ নিয়ে এসে ভিড় জমিয়েছে তার চোখের সামনে। মায়ের বুকের সেই উষ্ণ পরশ যেন সে অনুভব করছে, মায়ের সেই কন্ঠ যেন শুনতে পাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছে যেন মায়ের নীরব অশ্রুও।

চোখ দিয়ে অশ্রু গড়াচ্ছিল এলিসা গ্রেসের।

টেলিফোন বেজে উঠল।

এলিসা গ্রেস উঠে চোখের পানি মুছে গিয়ে টেলিফোন ধরল।

টেলিফোন বিজ্ঞানী বেনহামের। বেনহাম তাঁকে নির্দেশ দিল তার কাছে আসার জন্যে।

'আসছি স্যার!" বলে টেলিফোন রাখল এলিসা গ্রেস।

টেলিফোন রেখেই এলিসার মনে পড়ল ওমর বায়ার কথা। নিশ্চয় ওমর বায়া সম্পর্কেই নতুন নির্দেশ শুনতে হবে মি. বেনহামের কাছ থেকে।

এই ব্যাপারে এলিসা গ্রেস আগে যতোটা উৎসাহ বোধ করেছে, এই মুহূর্তে তা যেন পাচ্ছে না। তার মনে হচ্ছে তার হতভাগিনী নানীরই যেন এক প্রতিচ্ছবি ওমর বায়া।

এলিসা গ্রেস প্রস্তুত হলো মি. বেনহামের কাছে যাবার জন্যে। কান্না ও মলিনতার ছায়া চোখ-মুখ থেকে মুছে ফেলার জন্যে হালকা মেকআপ নিল। তারপর জোর করেই হাসল কিছুক্ষণ সজীব হয়ে উঠার জন্যে। ব্ল্যাক ক্রসের লোকদের সাথে তার প্রায়ই দেখা হয়। এলিসা ব্রিষ্টের সবচেয়ে অভিজাত ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোরের সেলস গার্ল। ষ্টোরের মালিক ব্ল্যাক ক্রসের একজন অর্থ যোগানদাতা। সেই সূত্রেই ব্ল্যাক ক্রস নেতাদের সেখানে যাতায়াত। ষ্টোর

মালিকের অনুরোধেই এলিসা গ্রেস ব্ল্যাক ক্রসের কিছু কিছু কাজ করে দেয়। সে অনেক ব্ল্যাক ক্রস নেতাকে দেখেছে কিন্তু বেনহামের মত বাজ চক্ষু আর অভদ্র কাউকে দেখেনি।

এলিসা গ্রেস বেরিয়ে গেল কক্ষ থেকে।

নক করল মি. বেনহামের দরজায়।

'এস।' সংক্ষিপ্ত এক কাঠ-খোট্টা কণ্ঠ ভেসে এল ভেতর থেকে। বেনহামের কন্ঠ।

ঘরে প্রবেশ করল এলিসা গ্রেস।

আগের মতই ঘরের মাঝাখানে গিয়ে দাঁড়াল। বসার চিন্তা আজ আর করল না সে। সৌজন্য বোধহীন অভদ্র লোকটা বসতে বলবে না।

মিনিট খানেক পরে বই থেকে মাথা তুলে বলল, 'কেমন, সে এখন দরজা খুলে রাখে, তোমার হাত থেকে জিনিসও নেয় তাই না?'

'জি, স্যার।'

'হ্যাঁ, আমরা যা চাই, সবই তাকে করতে হবে।'

'সেগুলো কি স্যার?' প্রথম বারের মত আজ এলিসা গ্রেসের মনে কৌতূহল দেখা দিল জানতে যে, ওমর বায়াকে নিয়ে তারা কি করতে চায়।

'সবই জানতে পারবে, সব তো তোমাকেই করতে হবে। এখন তোমার প্রয়োজন তাকে জয় করা।'

'সে তো এখন কথা শুনছেই স্যার।'

'না আমরা শুধু এতটুকু চাই না। তুমি যা বলবে তা সে অন্ধভাবে করবে, এ পর্যায়ে তাকে নিয়ে আসতে হবে।'

'সেটা কি সম্ভব স্যার? তাকে আমি একদম অন্য ধরণের মানুষ দেখছি।'

'তুমি কি ভাবতে পেরেছিলে যে সে আপনাতেই দরজা খুলে রাখবে, তোমার হাত থেকে ঐভাবে এত সহজেই জিনিস নিতে রাজি হবে?'

'না স্যার, তা ভাবিনি। এখনও আমি বুঝতে পারছি না কিভাবে এমনটা ঘটল।'

‘যেমন ভাবে ঘটেছে, তেমন ভাবেই সব ঘটবে। শুধু চাই, তুমি তাকে হাসি-খুশি রাখবে, তার মনকে ফ্রি রাখবে, যাতে কোন প্রকার নেতিবাচক কিছু তার মনে বাসা বাঁধতে না পারে।’

‘চেষ্টা করব স্যার।’

‘চেষ্টার জন্যে আমরা বেশি সময় দিতে পারব না। আমরা চাই তাড়াতাড়ি রেজাল্ট।’

‘কিন্তু কিভাবে?’

‘সেটাও কি বলে দিতে হবে? তোমার মত সুন্দরীকে কেন আনা হয়েছে তুমি জান।’

মাথা নিচু করল এলিসা গ্রেস। এক ঝলক রক্ত এসে জমা হলো তার চোখে মুখে। লজ্জা এবং অপমান দু’য়েরই প্রকাশ এতে আছে।

মাথা নিচু রেখেই বলল এলিসা, ‘জানি স্যার।’ কণ্ঠটা স্বাভাবিক রাখলেও এই কথা বলার সময় তার অন্তরটা কেঁপে উঠেছিল। কারও শয্যাসঙ্গী হওয়া তার জন্যে নতুন নয়। কিন্তু তার মাতৃধর্মের এবং তার হতভাগিনী নানীর প্রতিচ্ছবি ওমর বায়া ইতিমধ্যেই তার অন্তরের অনেক উঁচু আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। এমন লোকের সাথে প্রতারণা করা যায় না।

‘বেশ।’ বলল মি. বেনহাম। তারপর একটু থেমেই আবার শুরু করল, তোমার সাফল্য লাভের অর্থ তার মানসিক প্রতিরোধ ধসে পড়া। সে শুধু তোমাকে ভালোবাসবে না, বন্ধু ভাববে ব্ল্যাক ক্রসকে। এর পরের কাজটা আমাদের। তারপর তুমি যা বলবে সে তা করবে, এই আমরা চাই।’

কথা শেষ করেই মি. বেনহাম বই টেনে নিয়ে তার ওপর ঝুঁকে পড়ল।

এলিসা গ্রেস বুঝল এটাই কথা শেষ হওয়ার সংকেত এবং চলে যাবার নির্দেশও এটা।

এলিসা বেরিয়ে আসার জন্যে পা বাড়িয়েছিল। পেছনে টেলিফোন বেজে উঠল। মাথা ঘুরিয়ে দেখল মি. বেনহাম টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিচ্ছে।

চলে আসার জন্যে আবার পা চালাল এলিসা গ্রেস। বেরিয়ে আসতে আসতে শুনল মি. বেনহামের কণ্ঠঃ ‘হ্যালো, মি. পিয়েরে পল, আপনাকে খুঁজে পাচ্ছি না, সুখবর আছে।’

সুখবর শোনার জন্যে হঠাৎ করেই কৌতুহল জাগলো এলিসার মনে।

দরজা বন্ধ হয়ে গেলে দরজার সামনে দাঁড়াল এলিসা। বেশ পুরনো দরজা। ঢিলা ও আলগা হয়ে যাওয়ায় ভেতরের কথা বেশ শোনা যাচ্ছে।

শুনতে পেল বেনহামের কণ্ঠঃ ‘আমাদের ‘ইলেক্ট্রয়েন্স ফ্যালোগ্রাম’ এবং ‘ইলেক্ট্র মিয়োগ্রাম’ কাজ শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই ওমর বায়ার ব্রেন আমাদের ‘ইলেক্ট্রয়েন্স ফ্যালোগ্রাম’ ও ‘ইলেক্ট্র মিয়োগ্রাম’-এর দু’টো ডিটেকশন গ্রহণ করেছে এবং কাজে পরিণত করেছে। সে দরজা বন্ধ করে রাখতো এখন রাখে না, আগে এলিসাকে এড়িয়ে চলতে চাইত, তার হাত থেকে কিছু নিত না, এখন নিতে শুরু করেছে। ... হ্যাঁ হ্যাঁ, শুভ বিগিনিং। আমরা যতটা কঠিন মনে করেছিলাম, কাজটা ততটা কঠিন হবে না। আজ এলিসাকে যে নির্দেশ দিয়েছি তা হয়ে গেলে ওমর বায়ার মন ও মাথাকে সম্পূর্ণ ফ্রি পাব। সে মাথা ও মন দিয়ে আমাদের ‘ইলেক্ট্রয়েন্স ফ্যালোগ্রাম’ এবং ‘ইলেক্ট্র মিয়োগ্রাম’ আমরা যা চাচ্ছি তা সহজেই করে ফেলবে। তবে এলিসা গ্রেসকে ওমর বায়ার সাথে ক্যামেরুন পর্যন্ত নিতে হবে।’

এলিসা গ্রেস আর দাঁড়াতে পারল না। মাথা ঘুরছে তার। ওদের টার্গেট কি, কি করতে চায় ওরা ওমর বায়াকে নিয়ে! ‘ইলেক্ট্রয়েন্স ফ্যালোগ্রাম’ এবং ‘ইলেক্ট্র মিয়োগ্রাম’ কি? ওরা কি কোন অজানা অস্ত্র প্রয়োগ করছে ওমর বায়ার ওপর? এলিসা গ্রেস কি সে অস্ত্রের বাহন?

এলিসা গ্রেস তার ফ্ল্যাটে ফিরে ছুটে গেল তার নিজের কক্ষে। বুক সেলফ থেকে বের করল ‘ইনসাইক্লোপেডিয়া অব সাইন্স’। বইটি নিয়ে বসল গিয়ে সোফায়।

বের করলো ‘ইলেক্ট্রয়েন্স ফ্যালোগ্রাম’ এবং ‘ইলেক্ট্র মিয়োগ্রাম’ শব্দ দু’টি ইনসাইক্লোপেডিয়া থেকে।

গোগ্রাসে পড়ল। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উদ্বেগের কালোছায়া নামল এলিসা গ্রেসের চোখে-মুখে। ইলেক্ট্রয়েন্স ফ্যালোগ্রাম এমন একটা কৌশল যা কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত সিলিকন চিপ ব্যবহার করে অনেক দূর থেকে একজন মানুষের মস্তিষ্কের বিদ্যুৎ-তরঙ্গের প্রকৃতি পরিবর্তন করে তার মাথায় ইচ্ছামত ধারণা ও চিন্তা প্রবিষ্ট করা যায়। ইলেক্ট্র মিয়োগ্রামও অনুরূপ একটি অস্ত্র যা ব্যবহার করে মানুষের চোখে দর্শন-ধর্ম নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে কোন বিশেষ চিন্তা বা কাজের জন্যে তার মন ও মস্তিষ্ককে প্রস্তুত করা যায়।

এলিসা গ্রেস বইটি ছুঁড়ে ফেলে দিল সোফার ওপর। বুকটা কাঁপছে তার। তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, ব্ল্যাক ক্রস এক জটিল বৈজ্ঞানিক উপায়ে ওমর বায়ার মন ও মস্তিষ্ককে পরিবর্তন করছে। ইতিমধ্যেই কিছুটা করে ফেলেছে তারা। এখন সে বুঝতে পারছে, বেনহাম কেমন করে দিনক্ষণসহ অমন ভবিষ্যত বাণী করতে পেরেছিল। আসলে ওটা ছিল 'ইলেক্ট্রয়েন্স ফ্যালোগ্রাম' ও 'ইলেক্ট্র মিয়োগ্রাম'-এর কাজ।

শিউরে উঠল এলিসা গ্রেস। ব্ল্যাক ক্রসের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত হলে দেহের দিক থেকে ওমর বায়া ঠিকই থাকবে, কিন্তু মন-মানসিকতার দিক দিয়ে সে হয়ে যাবে ভিন্ন মানুষ। আর এই জঘন্য কাজে এলিসা গ্রেস মূল্যবান বাহন হিসেবে কাজ করছে। এখন সে পরিষ্কার বুঝতে পারছে, ওমর বায়ার মনকে প্রফুল্য ও ফ্রি রাখার প্রয়োজন পড়েছে এজন্যে যে যাতে তার মন ও মস্তিষ্ক ইলেক্ট্রনিক ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে আসা অনুপ্রবেশকারী চিন্তা ও ধারণার বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ দাঁড় করাতে পারবে না।

দু'হাতে মাথা চেপে ধরে সোফায় গা এলিয়ে দিল এলিসা গ্রেস। মন তার বিদ্রোহ করে উঠল, না সে ওমর বায়ার এত বড় সর্বনাশ হতে দিতে পারে না। হৃদয়ের কোথায় যেন ওমর বায়ার জন্যে তীব্র এক বেদনা অনুভব করল সে।

কিন্তু কি করবে সে? কি করে রক্ষা করবে তাকে? ব্ল্যাক ক্রস যা চায় তাই করে। তার হাত থেকে কেউ রক্ষা পেয়েছে বলে সে জানে না। ব্ল্যাক ক্রসের বিরুদ্ধে টু-শব্দ করার সাহসও কারও নেই। এলিসা তো দুর্বল মেয়ে মানুষ। তার ওপর সে এখানে দায়িত্ব নিয়ে এসেছে ব্ল্যাক ক্রস ওমর বায়ার ব্যাপারে যা করতে বলে তাই

করার। এক পা এদিক-সেদিক করলে তার নিজের জীবনই বিপন্ন হবে। ব্ল্যাক ক্রসের কাছে বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি মৃত্যু ছাড়া আর কিছু নেই। ভাবতে গিয়ে হৃদয়টা কেঁপে উঠল এলিসার।

ঘরে ঢুকল একজন পরিচারিকা। বলল, 'ম্যাডাম, সাহেবের নাস্তা রেডি।'

'যাও আসছি।' বলল এলিসা গ্রেস।

চলে গেল পরিচারিকা।

এলিসা গ্রেস সোজা হয়ে বসল সোফায়। তার মনে হলো, যে নাস্তা সে নিয়ে যাবে তা তো নাস্তা নয়। ভালো খাবার, সুন্দর পরিবেশ এবং সুন্দর নারীর ভোগ দিয়ে ওমর বায়ার ওরা সর্বনাশ করছে।

তবু নাস্তা তাকে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু অভিনয়ের প্রবৃত্তি আর যে তার হচ্ছে না। মন বলছে সত্য কথাটা ওমর বায়াকে বলা উচিত। কিন্তু কিভাবে বলবে? ও ঘরে এ ব্যাপারে টু শব্দও করা যাবে না। নিশ্চয় শব্দ ট্রান্সমিটার বসানো আছে। ওখানকার প্রতিটি কথা চলে যায় বেনহামের কাছে। ওখানে এলিসাকে অভিনয়ের কথাই বলকে হবে। ওমর বায়াকে ঘরের বাইরে অন্য কোথাও সব কথা বলতে হবে। একথা চিন্তা করতে গিয়েও আবার ভয় হলো এলিসা গ্রেসের। আসল ঘটনা জানার পর যদি ওমর বায়ার কথায় বা কাজে কোন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়, তাহলে তার এবং ওমর বায়ার দু'জনেরই বিপদ হবে।

তাহলে কি করবে সে?

হঠাৎ এলিসার মাথায় বুদ্ধি এল, ওমর বায়াকে সব কথা না বলে এলিসা সম্পর্কেই ওমর বায়াকে সন্দেহপ্রবণ করে তুলতে হবে, তাহলেই তার মধ্যে ভয় ও সন্দেহ দানা বাঁধবে এবং সৃষ্টি হবে তার মধ্যে একটা সতর্ক মনোভাব যা তার জন্যে একটা প্রতিরোধ শক্তি হিসেবে কাজ করবে। কিন্তু পরক্ষণেই এলিসা আবার ভাবল, ওমর বায়া তাকে ভুল বুঝলে সে সহ্য করবে কেমন করে। সমগ্র অন্তর দিয়ে এবং নিজের জীবন দিয়ে যার সে ভালো চায়, তাঁর ঘৃণা নিয়ে সে বাঁচবে কেমন করে? প্রেম এলিসা অনেকের সাথেই করেছে, ভেঙেছেও। কিন্তু এলিসা কাউকে তার হৃদয় দেয়নি, সুতরাং হৃদয় ভাঙার বেদনাও তার নেই। আজ অভিনয় করতে এসে, তার এই মূহুর্তে মনে হচ্ছে, সেই হৃদয়টাই সে হারিয়ে ফেলেছে তার

মাতৃধর্মের কালো যুবক ওমর বায়ার মধ্যে। এই হৃদয়টাকে সে আজ ভাঙবে কেমন করে? তাছাড়া ওমর বায়া তাকে সন্দেহ করলে বেনহামের নির্দেশ সে পালন করবে কেমন করে? সন্দেহ নিয়ে ওমর বায়া তার শয্যাসঙ্গী হতে চাইবে না!

কিন্তু এলিসা গ্রেস আর কোন বিকল্প পেল না। পরোক্ষভাবে এলিসা সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করাই ওমর বায়াকে রক্ষার সবচেয়ে নিরাপদ পথ। উঠল এলিসা গ্রেস।

বেরুল ঘর থেকে ওমর বায়ার কাছে নাস্তা নিয়ে যাওয়ার জন্যে। ঠিক করল নাস্তা দেয়ার সময় অভিনয়ের সময়েই সে ওমর বায়াকে আমন্ত্রণ করবে ঘরের বাইরে এক সাথে বেড়ানোর। এ প্রস্তাব ওমর বায়া নিশ্চয় গ্রহণ করবে। অন্যদিকে বেনহামও এতে খুশি হবে যে, আমি ওমর বায়াকে আরও কাছে আনার চেষ্টা করছি।

সেদিনই সন্ধ্যার পর। এলিসা ও ওমর বায়া পাশাপাশি হাঁটছিল আবছা আবছা আলো-আঁধারীর মধ্যে, সুইমিং পুলের পাশ দিয়ে। হাঁটতে হাঁটতে এলিসা গ্রেস ওমর বায়াকে লক্ষ্য করে বলল, 'একটা কথা বলি?'

'কথা তো বলছেনই। আবার কি কথা? বলুন।'

'আপনি খুব সরল।'

'কেমন?'

'চিন্তা-ভাবনা না করেই সবাইকে আপনি বিশ্বাস করেন।'

'এ কথার অর্থ?'

'আমি যা বলি তা কি আপনি বিশ্বাস করেন?'

'হ্যাঁ, আপনি বললে করি।'

'কিন্তু আমার কথা আমার নয়, একথা আপনার জানা উচিত। আমি তো অন্যের পুতুল।'

'আপনাকে ধন্যবাদ।' বলে চুপ করল ওমর বায়া।

এলিসা গ্রেসও নীরব। সে কি বলবে ঠিক করতে পারছে না। সে বুঝতে পারল, ওমর বায়া তার কথা বুঝতে পেরেছে এবং গ্রহণও করেছে। অর্থাৎ এখন

ওমর বায়ার কাছে এলিসা গ্রেসের কানাকড়িও মূল্য নেই। মনটা এলিসার হু হু করে কেঁদে উঠতে চাইল।

কিছুক্ষণ পর কথা বলল ওমর বায়াই, 'ওরা পুতুল নাচিয়ে কি করতে চায়?'

ওমর বায়ার 'পুতুল' শব্দ উচ্চারণ ভীষণ খোঁচা দিল এলিসা গ্রেসের হৃদয়ে। ঠোঁট কামড়ে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'পুতুল তো নাচার জন্যে। যারা নাচায় তাদের কথা সে বলবে কেমন করে?' কথাগুলো এলিসার গলায় আটকে যাচ্ছিল। কিন্তু এই মিথ্যাগুলো না বলে তার তো উপায় নেই।

'ঠিক বলেছেন।'

ফিরছিল তারা ঘরের দিকে।

ঘরের ছায়ায় অন্ধকারটা একটু গাঢ়। এলিসা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে ওমর বায়ার একটা হাত চেপে ধরে বলল, 'আপনি আমার কথাগুলো হালকাভাবে নেননি তো? বিশ্বাস করেছেন তো?' একটা অবরুদ্ধ আবেগ ভেঙ্গে পড়তে চাইল এলিসার কন্ঠে।

'বলেছি তো আপনার কথা আমি বিশ্বাস করি।'

'কিন্তু আমার সব কথা তো আমার কথা নয়।'

'সেটা আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আপনার প্রতি বিশ্বাস আমার বেড়েছে।'

'কেন?'

'কারণ, কোন পুতুল যখন স্বেচ্ছায় প্রকাশ করে সে কারো পুতুল, তখন সে আর পুতুল থাকে না। আপনি আমার কাছে পুতুল নন।'

'এমনভাবে বলবেন না। সইতে পারব না আমি। আমি সত্যিই অসহায় এক পুতুল।'

বলে ওমর বায়ার হাত ছেড়ে দিয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে দৌড় দিল করিডোরের দিকে।

করিডোর পেরিয়ে সে এসে প্রবেশ করল নিজের ঘরে। নিজেকে ছুঁড়ে দিল সে বিছানায়। বালিশে মুখ গুজল সে। হৃদয় ছাপিয়ে কান্না আসছে তার। সে

যা চেয়েছিল তা হলো না। ওমর বায়া তাকে ঘৃণা করে, সন্দেহ করে দূরে সরিয়ে দিল না। কেন দিল না? এলিসা গ্রেস পাপে ভরা একটা খোলস। ওমর বায়ার মত মাতৃধর্মের মহান লোকদের তার দেবার কিছু নেই। সে ঘৃণা করলে, সন্দেহ করলে দায়িত্বের ভার থেকে কিছুটা বাঁচত সে। এখন সে কি করবে? কি করার ক্ষমতা আছে তার?

টেলিফোন বেজে উঠল।

উঠে, চোখ মুছে ধরল টেলিফোন এলিসা গ্রেস।

'হ্যালো, এলিসা। কনগ্রাচুলেশন।'

'বুঝতে পারছি না স্যার।'

'তুমি ওমর বায়াকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলে শুনলাম।'

'জ্বি স্যার।'

'ওয়েলকাম এলিসা। তুমি বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে।'

'চেষ্টা করছি স্যার।' খুব কষ্ট করেই উচ্চারণ করল শব্দ দু'টি এলিসা।

'তুমি সফল হবে। তোমার মত মেয়ে সফল হবার জন্যেই।' বেনহামের কথা শেষ হবার সাথে সাথেই ওপার থেকে কট করে শব্দ হলো। টেলিফোন রেখে দিয়েছে বেনহাম।

এলিসা গ্রেস টেলিফোন রাখল।

টেলিফোন রেখেই দু'হাতে মাথা চেপে ধরল। অস্ফুট কন্ঠে বলল, 'সফলতা, ওটা সফলতা! ওটা সফলতা হলে আমার মৃত্যু কোনটা হবে!'

বলতে বলতে শ্লথ পা দু'টি টেনে নিয়ে ধপ করে বসে পড়ল সোফায়।

তার মনে হলো চারদিক অন্ধকার।

আলো নেই, পথ নেই কোথাও।

মনে পড়ল ছোটবেলার কথা।

মা বলতেন, তাঁদের আল্লাহ এক এবং সর্বশক্তিমান।

মাতৃধর্মের সেই আল্লাহ কি আসবেন এলিসাকে সাহায্য করতে, তার জন্যে না হলেও অন্তত ওমর বায়ার স্বার্থে!

# ৫

ডোনার আব্বার কাছে বিদায় নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকল আহমদ মুসা। দেখল তার ছোট ব্যাগটা কোলে নিয়ে তাতে মুখ গুঁজে বসে আছে ডোনা।

সেদিকে তাকিয়ে আহমদ মুসা একটু হাসল। বলল, 'ব্যাগটাকে পণবন্দী করেছ বুঝি?'

ডোনা কোন কথা বলল না। মাথাও তুলল না।

আহমদ মুসা গিয়ে বসল।

'ব্যাগ বেশ মোটা লাগছে। এত কি ভরেছ ব্যাগে?' বলল আহমদ মুসা।

ধীরে ধীরে মুখ তুলল ডোনা। বলল, 'আমার ব্যাগ ভরার পর যা বাকি থেকেছে এখানে তুলেছি।' গম্ভীর কন্ঠে বলল ডোনা।

'এর অর্থ?'

'অর্থ পরিষ্কার। আমি যাচ্ছি পেরেজ গিরেক অথবা সেন্ট পোল ডে লিউন এ।'

'তারপর?'

'তারপর, আমার সাথে যাচ্ছে কেয়ারটেকার হিসেবে পরিচারিকা নেকা টুগোনা।'

'বিষয়টা নিয়ে তুমি কি গভীরভাবে চিন্তা করেছ?'

'গত ক'ঘন্টা ধরে করেছি।'

'না করনি, তোমার বিবেচনার প্রতি আমার আস্থা আছে।'

'অনাস্থা সৃষ্টি হওয়ার মত কিছু করেছি?'

'করনি, কিন্তু বলছ।'

'যাওয়ার মধ্যে কি দোষ দেখছ তুমি?'

'ওটা যুদ্ধ ক্ষেত্র। আমি তোমাকে সেখানে নেব না।'

'যুদ্ধ ক্ষেত্র কি মেয়েদের জন্যে নিষিদ্ধ?'

‘নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু তোমার জন্যে নিষিদ্ধ।’

‘এ দুর্ভাগ্য আমার হল কি করে? আমি এটা মেনে নেব কেন?’

‘দুর্ভাগ্য তোমার নয়, আমার।’ একটা দীর্ঘ নি:শ্বাস বেরিয়ে এল আহমদ মুসার বুক থেকে।

ডোনা তাকাল আহমদ মুসার দিকে। আহমদ মুসার মুখের দিকে তাকিয়ে ডোনার মুখ-চোখ থেকে জেদের ভাবটা উঠে গিয়ে সেখানে মমতার ছাপ ফুটে উঠল।

ডোনা নীরবে কিছুক্ষণ আহমদ মুসার মুখের দিকে চেয়ে রইল। বলল এক সময়, ‘একটা কথা জিজ্ঞেস করব তোমাকে?’

‘কর।’

‘সেদিন তোমাকে ফলো করে ব্ল্যাক ক্রসের আড্ডায় গিয়েছিলাম তোমার বিনা অনুমতিতে। তুমি ওটা পছন্দ করনি ঠিক আছে। কিন্তু ফাতমাদের ওখানে যখন দ্বিতীয় পিস্তলটি বের করেছিলাম মোজার ভেতর থেকে, তখন তোমার চোখে-মুখে আমি কষ্ট লক্ষ্য করেছি। কেন এমন কষ্ট পেয়েছিলে তুমি?’

আহমদ মুসা তৎক্ষণাৎ জবাব দিল না। তার মুখটি গম্ভীর হয়ে উঠল। তাতে একটা বেদনার ছায়াও পড়ল। মুখ নিচু করেছিল আহমদ মুসা।

ডোনা এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল আহমদ মুসার দিকে।

‘আমি তোমার হাতে পিস্তল দেখতে চাই না ডোনা।’ বেশ সময় নিয়ে বলল আহমদ মুসা।

ডোনার চোখে-মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল। বলল, ‘কেন, যে পিস্তলকে তুমি জীবনের সাথী বানিয়েছ, তা আমার হাতে থাকবে না কেন?’

‘পিস্তলকে আমি সাথী বানাইনি। পিস্তল আমার আত্মরক্ষার একটা উপকরণ মাত্র।’

‘কথা একই হল না?’

‘না। পিস্তল আমার সাথী বা লক্ষ্য নয়, পিস্তল আমার লক্ষ্য অর্জনের দুঃখজনক উপকরণ, যার দ্বারা মানুষ আহত হয়, নিহত হয়। রক্তপায়ী এ উপকরণ

আমি ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাই, কিন্তু পারছি না, পরিবেশ পরিস্থিতি তা পারতে দিচ্ছে না।'

'আমার হাতের পিস্তলকেও তুমি ঐভাবে দেখতে পার।'

'না, আমি তা দেখতে চাই না।'

'কিন্তু কেন?'

আহমদ মুসা মুখ নিচু করে কথা বলছিল। মুখ তুলে সে তাকাল ডোনার দিকে। তার শুন্য দৃষ্টিতে গভীর বেদনার ছাপ।

ডোনাও তাকিয়েছিল আহমদ মুসার দিকে।

চার চোখের মিলন হলো।

আহমদ মুসা চোখ নামিয়ে নিল। ধীর কণ্ঠে বলল, 'কারণ আমিনার যা ঘটেছে, তোমার ক্ষেত্রে তা ঘটতে দিতে চাই না।' আহমদ মুসার ভারী কণ্ঠ কেঁপে উঠল বলার সময়।

সঙ্গে সঙ্গেই লজ্জাবতী লতার মতই চোখ দু'টি ডোনার নিচে নেমে গেল, মাথা নুয়ে পড়ল তার। সুখময় এক প্রবল যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ল ডোনার হৃদয়ে, তার দেহের প্রতিটি কোষে, তার দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে। এমন একটি কথা শোনার জন্যে কত যে মাস, দিন, প্রহর সে গুণেছে! সে ভাবে নি, আশাও করে নি যে, আমিনার পাশাপাশি দাঁড়াবার সৌভাগ্য তার হবে। কৃতজ্ঞতায় মন তার ভরে গেল। চোখ দু'টি তার সিক্ত হয়ে উঠল আনন্দের অশ্রুতে।

অনেক্ষণ কথা বলতে পারল না ডোনা। মাথা তুলতে পারছিল না সে।

মাথা না তুলেই ডোনা বলল, 'আমিনা আপা পিস্তল হাতে তুলে নিয়েছিলেন?' সিক্ত কণ্ঠস্বর ডোনার।

'তোমার মত করে নয়। দু'তিনবার পিস্তল ব্যবহার করেছে নিছক আত্মরক্ষার জন্যে।'

'কিন্তু তার পরেও তো মর্মান্তিক ঘটনা এড়ানো যায় নি।'

'যায়নি। কারণ সে পরিচিত হয়ে পড়েছিল। আমার শত্রুর টার্গেট হয়ে পড়েছিল সে। আমার কাছে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছিল তার ওপর।'

'এমন ঘটনা কি ভবিষ্যতে এড়ানোর উপায় আছে?'

‘জানি না। কিন্তু শত্রুর সামনে কোন সুযোগ সৃষ্টি করতে চাই না। তুমি ইতিমধ্যেই আমার ঘটনার সাথে নিজেকে অনেকখানি জড়িয়েছ। আর নয়।’

‘তোমার ঘটনা কি আমার ঘটনা নয়?’

‘তোমার ঘটনা অবশ্যই। কিন্তু সে ঘটনার সাথে তোমার জড়ানোর প্রয়োজন নেই।’

‘এটা বাস্তব নয়।’

‘একেবারে অবাস্তবও নয়। তবে ইসলামের সোনালী যুগের খলিফাগণ এবং সেনানীদের স্ত্রীরা সব সময় তাঁদের সহযাত্রী ছিলেন না।’

‘কোন সময়ই ছিলেন না তা নয়। স্বামীর বিপদ দেখে, স্বামীর সাহায্যের প্রয়োজন অনুভব করেও তাঁদের স্ত্রীরা বাড়িতে চুপ করে বসেছিলেন, এমন নজীর আছে কী?’

‘ঐ ধরণের বিপদ মোকাবিলা এবং প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা সব সময় থাকতো, সুতরাং স্ত্রীদের এ নিয়ে মাথা ব্যথার প্রয়োজন হয়নি।’

‘কিন্তু আমার সেনাপতির তো সে ব্যবস্থা নেই।’

আহমদ মুসা ম্লান হাসল। বলল, ‘আমি ফ্রান্সের মুসলিম দূতাবাসগুলোর সাথে কথা বলেছি। তারা ঘটনাবলীর দিকে নজর রাখবে। তাছাড়া সাইমুমের ইউনিট আশে-পাশেই থাকবে। ডাকলেই পাব তাদের।’

‘তোমার এ কথাগুলো সান্ত্বনার জন্যে ভালো, কিন্তু কাজের কথা নয়। অভিযানের সঙ্গী হওয়া এক কথা, আর ডাকলেই পাওয়া যাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা।’

‘তুমি বুঝছ না ডোনা। অভিযানে গেলে দলবল নিয়ে যেতে হয়। কিন্তু আমি অভিযানে যাচ্ছি না। আবার জয়ের শর্ত যদি শক্তি হয়, তাহলেও দল ভারী করে যেতে হয়। কিন্তু আমি যেখানে যাচ্ছি, সেখানে বুদ্ধির যুদ্ধে জিততে হবে। ফ্রান্সে ব্ল্যাক ক্রসের রাজধানীতে শক্তি নিয়ে অগ্রসর হলে ওদের সাথে পারা যাবে না। সুতরাং বুদ্ধির যুদ্ধেই ওদের পরাজিত করতে হবে। এজন্যেই আমি একা যাচ্ছি। শক্তির প্রয়োজন যদি পড়েই, তাহলে যথাসময়ে যাতে তাদের পাই সে ব্যবস্থাও থাকবে।’

থামল আহমদ মুসা।

ডোনা কিছু বলল না। মুখ নিচু করে রইল।

একটু পর মুখ না তুলেই বলল, 'ঠিক আছে, অভিযানের শরীক হলাম না। তোমার সাথেও গেলাম না। পেরেজ গিরেক এবং সেন্ট পোল ডে লিউন-এ বেড়াতেও তো যেতে পারি!'

হাসি ফুটে উঠল আহমদ মুসার ঠোঁটে। বলল, 'আজ আমাকে ফলো করেছিলে সে তো কিছুটা কৌতুহল, কিছুটা বেড়াবার ছলেই। কিন্তু ঘটনা কি হয়েছিল? যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলে তুমি।'

'আমি মনে করি, আল্লাহই আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং এর প্রয়োজন ছিল তা প্রমাণিত হয়েছে।'

আহমদ মুসা একটু ঘুরে মুখোমুখি হল ডোনার। গম্ভীর হয়ে উঠেছে তার মুখ। ধীর এবং নরম করণ্ঠ বলল, 'তুমি বুরবো রাজকুমারী মারিয়া জোসেফাইন লুই। ফ্রান্স শাসনকারী রাজরক্ত তোমার শরীরে। তোমার শক্তি, সাহস, বুদ্ধি সবই আছে। তোমার সাহায্য আমার জন্যে মূল্যবান হবে। কিন্তু আমি যে ভিন্নভাবে পেতে চাই তোমাকে। আমিনা আমাকে বিরাট শিক্ষা দিয়ে গেছে। তার বিদায়ের দৃশ্য আমি ভুলতে পারি না। আমি কিছুতেই তোমাকে তার পরিণতির দিকে যেতে দেব না। মেনে নিতে পারবে না এটা? আহমদ মুসার নরম কণ্ঠ অশ্রুসিক্ত মনে হলো।

ডোনার মাথা নুয়ে পড়েছে।

বলল, 'পারব। কিন্তু বাইরে যখন তুমি জীবন-মৃত্যুর লড়াইয়ে ব্যস্ত থাকবে, তখন ঘরে আমার প্রতিটি মুহূর্ত হবে যন্ত্রণার।' কান্নায় জড়িয়ে পড়ল ডোনার কথা। আহমদ মুসা হাত তুলল ডোনার মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে। কিন্তু কেঁপে উঠল তার হাত। এই ভাবে ডোনাকে স্পর্শ করার অধিকার তার আসে নি। হাত সরিয়ে নিল সে। বলল, 'আমি জানি ডোনা। আমি আমার অন্তর চোখে তোমার এই রূপ দেখতে পাব এবং এটা হবে আমার জন্যে শক্তি, সাহস ও প্রেরণার একটি উৎস।'

'ধন্যবাদ' বলে ডোনা মুখ তুলল। রুমাল দিয়ে চোখের পানি মুছে বলল, 'কিন্তু একটা অধিকার আমি চাই।'

‘কি সেটা?’

‘যদি তিন দিন তুমি প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে আমার সাথে যোগাযোগ না কর কোন পূর্ব ইনফরমেশন ছাড়া, তাহলে আমি স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারব।’

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘এ অধিকার তোমাকে দিলাম। খুশি?’

হাসল ডোনা। বলল, ‘খুশি। তোমাকে আমিও একটা খুশির খবর দিতে পারি।’

‘কি?’

‘আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি।’

‘কবে? কখন?’ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল আহমদ মুসা।

‘আজ তুমি যখন ঘুমিয়ে ছিলে। আব্বার সাথে প্যারিস মসজিদে গিয়েছিলাম। আগেই যোগাযোগ করে রেখেছিলেন আব্বা।’

‘বা’রে! আমাকে বলনি?’

‘হ্যাঁ, তোমাকে সাথে করে নিয়ে যাই, আর লোকে বলুক যে, তোমাকে বিয়ে করার জন্যেই আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। তোমাকে ভালবেসে নয়, ইসলামকে ভালবেসেই আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম। এটুকু বলতে পার যে, তোমাকে ভালবেসে আমি ইসলামকে ভালবাসার সুযোগ পেয়েছি।’

‘আলহামদুলিল্লাহ। আমি তোমার কাছে এটাই চেয়েছিলাম ডোনা।’

‘আর কিছু চাওনি?’

‘ঠিক চাওয়া নয়, ভেবেছিলাম। প্রায় ৬শ’ বছর আগে সার্বিয়ার রাজা স্টিফেনের বোন লেডি ডেসপিনা ইসলাম গ্রহণ করে গোটা বলকান অঞ্চলে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তেমনি ফ্রান্সের বুরবো রাজকুমারীও পারবেন ফ্রান্স এবং এই পশ্চিম ইউরোপে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিতে।’

একটা আবেগের স্ফুরণ ঘটল ডোনার চোখে-মুখে। তার কোলে রাখা আহমদ মুসার ব্যাগটার ওপর মাথা রেখে বলল, ‘ভাবনাটা কি খুব বেশি দূর গড়াল না? লেডি ডেসপিনার ছিল রাজদণ্ড, কিন্তু তোমার কথিত বুরবো রাজকুমারী ফ্রান্সের সব হারানো এক নাগরিক মাত্র।’

‘বুরবো রাজকুমারীর রাজ্য নেই, রাজদণ্ড নেই সত্য, কিন্তু আমি দেখেছি ফরাসীদের হৃদয় জুড়ে তার একটি সাম্রাজ্য আছে। সে সাম্রাজ্য সম্মান এবং ভালোবাসার। রাজদণ্ডের চেয়ে সম্মান এবং ভালোবাসার শক্তিই বেশি কার্যকর।’

একটা ভাবাবেগ এবং লজ্জার প্লাবন ডোনার মুখ ভারী করে তুলেছে। ব্যাগের ওপর রাখা মুখ তুলে একবার আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে আবার মুখ নামিয়ে নিল। বলল, ‘তুমি এমনভাবে কথা বল, তাতে মনে হয় আমি আমাকে নতুন করে দেখছি। সেই আমি যেন আমার কাছেও অপরিচিত। আসলে তুমি অনেক বড়, হৃদয়টা তোমার আকাশের মত বিশাল। তাই এমন বড় করে দেখতে পার।’

‘না। যে ‘তুমি’-কে তোমার অপরিচিত মনে হয়, সেটাই আসল ‘তুমি’। সেই আসল ‘তুমি’ই পারবে এক দুই তিন করে ফ্রান্সকে ইসলামের আলোয় উদ্ভাসিত করতে।’

ডোনা কোলের ব্যাগটা সোফায় রেখে ঝুপ করে গিয়ে কার্পেটের ওপর আহমদ মুসার পায়ের কাছে বসল। বলল, ‘সত্যি বলছ আমি পারব? পারব লেডি ডেসপিনার মত কিছু করতে?’

‘অবশ্যই পারবে। কিন্তু পিস্তল ছেড়ে দিয়ে হাতে তুলে নিতে হবে কলম ও বই এবং মুখে তুলে নিতে হবে মনোহরা বক্তৃতা। ফ্রান্সের মানুষ তোমর হাতে পিস্তল নয় এসব দেখলেই খুশি হবে।’

‘তোমার কথা মানলাম। ইসলামেরও পথ এটাই। কিন্তু আমার পিস্তলের প্রতি তোমার এই বিদ্বেষ কি ভালো, বিশেষ করে তোমার জন্যে তুমি পিস্তলকে যখন এতই ভালবাস?’

পিস্তলকে আমি ভালোবাসি না। কিন্তু ভালোবাসি আমার আত্মরক্ষার পিস্তলকে। তোমার আত্মরক্ষার পিস্তলও আমার প্রিয়।’

হাসল ডোনা। বলল, ‘তোমার আত্মরক্ষার পিস্তল নিয়ে তুমি পেরেজ গিরেক অথবা সেন্ট পোল ডে লিউন-এ যেতে পার, কিন্তু আমি আমার আত্মরক্ষার পিস্তল নিয়ে যেতে পারছি না। তাহলে এই দুই পিস্তলের মধ্যে পার্থক্য কি?’

‘পার্থক্য কর্মক্ষেত্র ও কর্ম প্রকৃতির। আমি করছি জালেমের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। আর তোমার সংগ্রামের পথ ইতিবাচক, যে পথে চলছে ‘ইয়ুথ সোসাইটি অব ইউরোপিয়ান রেনেসাঁ।’ এক্ষেত্রেও ব্যক্তি পর্যায়ে আত্মরক্ষার পিস্তলের প্রয়োজন হতে পারে।’

‘অর্থাৎ আমার মিশনারীর পথ।’ মুখ টিপে হেসে বলল ডোনা।

‘তোমার বোধ হয় পছন্দ নয়?’ আহমদ মুসাও হাসল মুখ টিপে।

‘পছন্দ হবে না কেন? ইসলাম তো মিশনারী ধর্ম। পৃথিবীব্যাপী ইসলামের বিস্তার তো মিশনারীদের দ্বারাই।’

‘ধন্যবাদ। তুমি তো সবই জান।’

থেমেই আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকাল। বলল, ‘ডোনা এখন উঠি।’

বলে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার ব্যাগ হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল ডোনাও। তার মুখ ভারী হয়ে উঠেছে।

নেমে এল তারা গাড়ি বারান্দায়।

আহমদ মুসা ডোনার হাত থেকে ব্যাগ নিতে চাইল। ডোনা দিল না। সে নিজে গিয়ে গাড়ির দরজা খুলে ড্রাইভিং সিটের পাশের সিটে ব্যাগটি রাখল। তারপর গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিয়ে এস দাঁড়াল আহমদ মুসার পাশে।

‘তোমার জিনিসপত্র বের করে নিয়েছ তো ব্যাগ থেকে?’ হাসতে চেষ্টা করে বলল আহমদ মুসা।

ডোনা কথা বলল না। মাথা নেড়ে জানাল নিয়েছে।

‘কথা বলছ না যে?’ গাড়ির দরজা খুলতে খুলতে বলল আহমদ মুসা।

ডোনা চোখ তুলে চাইল আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘মনে থাকে যেন তিন দিন তুমি নীরব থাকলে চতুর্থ দিন আমি হাজির হবো।’

‘ইনশাআল্লাহ তার দরকার হবে না ডোনা।’

‘আবার বলছি তুমি নিজের ব্যাপারে যথেষ্ট সাবধান নও। তাই তো বলছিলাম.......।’

আহমদ মুসা হাতের কোটটা স্টেয়ারিং হুইলের উপর রেখে ফিরে দাঁড়াল ডোনার দিকে। বলল, 'তোমার এ কথায় আমিনার একটা কথা মনে পড়ল। আমি সিংকিয়াং-এ যেদিন একটা অভিযানে বেরুচ্ছিলাম। এমনি আশঙ্কা করে আমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা দেখার জন্যে মা-চু নামে একজনকে সাথে দিয়েছিল।'

'আপা পেরেছিলেন, কিন্তু আমি পারলাম না।'

'তোমার আপা পেরেছিলেন, কারণ সে অভিযানে আমার সাথে আরও অনেকে ছিল। তাদের সাথে মা-চু'ও শামিল হয়েছিল। আর দেখ, আমিনার মা-চু যেমন আমার সাথে ছিল, আজ তেমনি তোমার গাড়ি আমার সাথে থাকছে। বলে হাসল আহমদ মুসা। তারপর সালাম দিয়ে গাড়িতে ঢুকে গেল।

আহমদ মুসার কথার ভংগিতে ডোনাও হাসি বোধ করতে পারেনি। সে হেসে গাড়ির জানালায় মুখ এনে বলল, 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম। ফি আমানিল্লাহ।'

গাড়ি স্টার্ট নিল আহমদ মুসার।

বেরিয়ে গেল ডোনাদের বিশাল গেট দিয়ে।

সেদিকে তাকিয়ে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে ছিল ডোনা। তার মনে হচ্ছে, তার সব শক্তি, সব হাসি-আনন্দ যেন ঐ গাড়ি ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

পেছন থেকে ধীরে ধীরে এস ডোনার আব্বা হাত রাখল ডোনার কাঁধে।

ডোনা মুখ ফিরিয়ে তার আব্বাকে দেখে তার কাঁধে মুখ গুজল।

ডোনার আব্বা ডোনার পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, 'বুরবো মেয়েরা তাদের আপনজনদের যুদ্ধে বিদায় দিতে কখনো কাঁদে না মা।'

'কিন্তু ও অত্যন্ত বেপরোয়া আব্বা।' চোখের পানি মুছতে মুছতে বলল ডোনা।

'মুসলমানরা যখন যুদ্ধে নামে, তখন তাদের সামনে দু'টি লক্ষ্য থাকে; গাজী হওয়া অথবা শহীদ হওয়া। সুতরাং বেপরোয়া তারা হতেই পারে। এটা তাদের দোষ নয়, গুণ।'

বলে ডোনার আব্বা যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল।

ডোনাও ফিরল তার আব্বার সাথে।

ওদিকে প্যারিস পেরিয়ে আহমদ মুসার গাড়ি হাইওয়ে ধরে এগিয়ে চলছিল।

প্যারিস থেকে বেরিয়ে যে হাইওয়েটি লা-ম্যান, রেনে ও মোরলেন্স হয়ে সেন্ট পোল ডে লিউন-এ পৌঁছেছে সেই হাইওয়ে বেছে নিয়েছে আহমদ মুসা সেন্ট পোল ডে লিউন-এ যাবার জন্যে।

আহমদ মুসা প্রথমে সেন্ট পোল ডে লিউন-এ যাওয়াই ঠিক করেছে। তার বিশ্বাস পেরেজ গিরেক-এর সেন্ট অসাস্টাস নয়, ডে লিউন এর শার্লেম্যান গীর্জায় ব্ল্যাক ক্রসের হেড কোয়ার্টার হওয়া সব দিক থেকে যুক্তিযুক্ত। শার্লেম্যান ইউরোপে একক একটি খৃস্টান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতীক। ব্ল্যাক ক্রসও এই লক্ষেরই একটি অস্ত্র। তবে এখন লক্ষ্যটা শুধু ইউরোপ নয়, গোটা বিশ্ব।

তৃষ্ণা পেল আহমদ মুসার।

রাস্তার পাশে একটা পার্কিং দেখে গাড়ি দাঁড় করাল আহমদ মুসা। পাশের সিট থেকে ব্যাগ টেনে নিল ওর ভেতর থেকে ফলের জুস বের করার জন্যে।

ব্যাগ খুলতেই আহমদ মুসার চোখে পড়ল রেশমি কাপড়ের একটা থলে। এ থলে আহমদ মুসার নয়। হাতে তুলে নিল সে। একটা সেন্ট পেল থলের ভেতর থেকে। এ সেন্ট ডোনা ব্যবহার করে থাকে। আহমদ মুসা নি:সন্দেহ হলো থলেটা ডোনার। শেষ মূহুর্তে ওর জিনিসপত্র বের করে নেয়ার সময় এটা নিতে ভুলে গেছে নিশ্চয়।

থলের মুখটা চেন দিয়ে আটকানো।

থলেটা রেখে দিতে যাচ্ছিল আহমদ মুসা। কিন্তু ভেতরে কাগজ আছে দেখে আহমদ মুসা থলের চেন খুলে ফেলল। ভেতরে দেখতে পেল দু'টো ফোল্ডার, একটা মানিব্যাগ এবং ভেলভেটের ক্ষুদ্র একটা বাক্স।

ফোল্ডার দু'টি হাতে নিয়ে আহমদ মুসা দেখল, সেন্ট পোল ডে লিউন এবং পেরেজ গিরেক শহরের পর্যটন গাইড। এতে রাস্তা, হোটেল এবং পুরাতন ও

নতুন দর্শনীয় স্থানের লোকেশন, পরিচয় ইত্যাদি দেয়া আছে। খুশি হলো আহমদ মুসা দরকারি এ জিনিস পেয়ে। সে মনে করেছিল, শহরে গিয়ে সে এ গাইড যোগাড় করে নেবে। আহমদ মুসা ভাবল, ডোনা তার নিজের জন্যে এটা যোগাড় করেছিল।

মানিব্যাগটাও হাতে তুলে নিল আহমদ মুসা। মনে মনে একটু হাসল। দেখা যাক কত টাকা ডোনা সাথে নিচ্ছিল।

কিন্তু মানিব্যাগটার ভাঁজ খুলেই আহমদ মুসা দেখতে পেল মানিব্যাগের নেম-হোল্ডারের কার্ডটিতে আহমদ মুসার নাম লেখা। ডোনার হস্তাক্ষর, দেখেই চিনতে পারল আহমদ মুসা।

মানিব্যাগের পকেটে নজর বুলিয়ে দেখল, এক হাজার ফ্রাংকের নোটে মানিব্যাগের পকেট ঠাসা।

এবার আহমদ মুসা বুঝল রেশমী কাপড়ের এ থলেটা ডোনা তার জন্যেই রেখে গেছে এই ব্যাগে। কিন্তু ঐ ভেলভেটের বাক্সটা কেন? দামী ঐ বাক্সটা বুঝা যাচ্ছে দামী কোন অলঙ্কারের জন্যেই। ডোনার নিশ্চয়ই।

কি আছে ওতে ডোনার? খুলল আহমদ মুসা বাক্সটা। ছাই রংয়ের একটা আংটি বাক্সে। দেখেই আহমদ মুসা বুঝল আংটিটা প্লাটিনামের। খুবই সাধারণ আংটিটা। বেশি দামী বা কম দামী কোন পাথর বসানো নেই।

‘এমন একটা আংটি ডোনা কেন এনেছিল সাথে?’ মনে মনে একথা বলতে বলতে আহমদ মুসা আংটিটা হাতে তুলে নিল। আংটির সাথে একটা স্লিপ বাঁধা। তাতেও আহমদ মুসার নাম লেখা।

স্লিপ পড়ার পর আহমদ মুসা সচেতন হলো। ডোনার মত সতর্ক ও দূরদর্শী কেউ বিনা কারণে এ ধরণের আংটি এভাবে রাখেতে পারে না।

উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগল সে আংটিটাকে। হঠাৎ আহমদ মুসা আংটির টপে সূচের অগ্রভাগের মত সূক্ষ্ম নীল মুখো একটা বিন্দু দেখতে পেল। দেখতে পেয়েই মনটা নেচে উঠল আহমদ মুসার। ভয়ঙ্কর লেসার রিং এটা। রিং টপের নীল বিন্দুটির ওপর নির্দিষ্ট পরিমণ চাপ নির্দিষ্ট সময় ধরে প্রয়োগ করলে ভয়ঙ্কর লেসার রে বেরিয়ে আসে। সে রে দিয়ে যে কোন জিনিস কাটা যায়, যে কোন

মেটাল গলিয়ে ফেলা যায়। আর মানুষের দেহে এই লেসার রে বুলেটের মতই কাজ করে।

বহুমূল্য দুর্লভ এই লেসার রিং। ডোনা তার জন্যে যোগাড় করেছে। হৃদয়টা ভরে গেল আহমদ মুসার অনির্বচনীয় এক প্রশান্তিতে। ডোনার বুদ্ধিদীপ্ত জেদি মুখটা ভেসে উঠল আহমদ মুসার চোখের সামনে। হাসি ফুটে উঠল আহমদ মুসার ঠোঁটে। ডোনা তাকে সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছে রিংটি এভাবে রেখে।

আংটিটি ডান হাতের মধ্যমায় পরাল আহমদ মুসা। একদম ঠিকমত লাগল আংটিটি মধ্যমায়। বিস্মিত হলো আহমদ মুসা। কখন ডোনা মাপ নিল তার মধ্যমার! এই আংটি একমাত্র মধ্যমাতেই পরতে হয়, একথা জানল কি করে সে!

থলেটির মুখে চেন এঁটে ব্যাগে রাখতে রাখতে আহমদ মুসা ভাবল, ডোনা সত্যিই প্রতিভাবান। একজন সংগ্রামীর সব বৈশিষ্ট্যই তার মধ্যে আছে।

আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল আহমদ মুসার মন। আল্লাহ ডোনাকে লেডি ডেসপিনার সৌভাগ্য দিন!

পানি খেয়ে গাড়ি রাস্তায় তুলে নিল আহমদ মুসা।

ছুটল তার গাড়ি আবার।

সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত আহমদ মুসা শার্লেম্যান গীর্জার সামনে ঘুর ঘুর করছে এবং চোখ রাখছে গীর্জার গেটের দিকে।

গীর্জার পাশাপাশি দু'টি গেট। একটা সরাসরি গীর্জায় ঢোকার। অন্যটি মূল গীর্জা ভবনের দক্ষিণ দেয়ালের পাশ দিয়ে চলে গেছে ভেতর দিকে।

দ্বিতীয় দরজাটিকে দরজা না বলে বিশাল গেট বলাই ভালো। বড় গাড়িও এ গেট দিয়ে চলাচল করতে পারে।

দু'দরজা দিয়েই সারাদিন লোক যাওয়া আসা করছে। তবে গীর্জার গেট দিয়ে বেশি, পাশের গেট দিয়ে অনেক কম। গীর্জার গেট দিয়ে যারা প্রবেশ করছে তারা ভক্ত শ্রেণীর লোক, দেখেই বুঝা যায়। আর পাশের গেট দিয়ে যারা প্রবেশ

করছে, তাদের প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এদের কাউকে ব্যবসায়ী, কাউকে অফিস কর্মচারী, কাউকে আবার সৈনিকের মত বেপরোয়া প্রকৃতির মনে হয়।

আহমদ মুসা গীর্জায় প্রবেশ করেছে গত দু'দিনে কয়েকবার। কিন্তু একদমই কিছু না জেনে হুট করে ঢুকে পড়াকে যুক্তিযুক্ত মনে করেনি। গীর্জায় ব্ল্যাক ক্রসের অফিস মানে গীর্জার ভেতরে অবশ্যই নয়, গীর্জার কভার নিয়ে গীর্জা কমপ্লেক্সকে তারা অফিস হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। সে ক্ষেত্রে গীর্জার পুরো নিয়ন্ত্রণও তাদের হাতে থাকার কথা।

শার্লেম্যান গীর্জার এই কমপ্লেক্স কত বড়, সেখানে কি আছে, কারা থাকে, ইত্যাদি খবর পেলেই সে বুঝতে পারবে ব্ল্যাক ক্রস এখানে আছে কিনা।

চারদিক ঘুরে যতটুকু দেখেছে, তাতে চমৎকার লেগেছে সেন্ট পোল ডে লিউন শহরটাকে। আটলান্টিকের ওপর এ শহরটা ছবির মতই সুন্দর। বিশেষ করে শার্লেম্যান গীর্জার এদিকটা যেন সাগরের ওপর ভাসছে, অবিরাম নাচছে, যেন সাগর-ঢেউয়ের তালে তালে।

সবটা আহমদ মুসা দেখেনি। দেখলে আরও চমৎকৃত হতো। গীর্জার পশ্চিম প্রান্তটা যেন সাগরের বুক থেকে উঠে এসেছে। সাগরের বিশাল বিশাল ঢেউ আছড়ে পড়ছে গীর্জার দেয়ালে। এবং পশ্চিম প্রান্তে গীর্জার নিজস্ব একটি জেটিও রয়েছে। চার-পাঁচটা জাহাজ সেখানে নোঙ্গর করতে পারে। শুধু তাই নয় সে বিশাল জেটিতে ছোট প্লেন ও হেলিকপ্টার নামার ব্যবস্থাও রয়েছে। জেটিতে নিজস্ব সিগন্যাল বডিও রয়েছে। গীর্জার সাথে এই আয়োজন কিছুতেই মেলে না। আহমদ মুসা এসব দেখলে সঙ্গে সঙ্গেই পেয়েছি বলে লাফিয়ে উঠতো। কিন্তু গীর্জার এ পশ্চিম অংশ দেখার তার কোন সুযোগ নেই। সাগর পথে না এলে এদিকটা কিছুতেই দেখা যাবে না।

গীর্জা কমপ্লেক্সের গা ঘেঁষেই একটা রেস্টুরেন্ট দক্ষিণ দিকে। আহমদ মুসা গত দু'দিন এই রেস্টুরেন্টেই বেশি সময় কাটাচ্ছে। রেস্টুরেন্টের পূর্ব প্রান্তে জানালার ধারের টেবিলটায় বসলে গীর্জার দু'টো গেট দিয়ে সকলের যাওয়া-আসাই প্রত্যক্ষ করা যায়। গত দু'দিনের বড় একটা সময় আহমদ মুসা এখানে বসেই কাটিয়েছে।

রেস্টুরেন্টের ওয়েস্ট্রেসদের বিশেষ করে তার টেবিলের ওয়েট্রেস মেয়েটির দৃষ্টি সে ভালো করেই আকৃষ্ট করতে পেরেছে। আহমদ মুসা মদ খায় না এবং গোশত ও চর্বি জাতীয় কিছুই খায় না। এরকম খদ্দের ওয়েট্রেস মেয়েটি এই রেস্টুরেন্টে দেখেনি। এতে ওয়েট্রেস মেয়েটি বেজার নয়, খুশিই। খুশির কারণ, গোশতের বদলে যে মাছ ও সবজী আহমদ মুসা খায়, তার দাম গোশতের চেয়ে বেশি। আবার মদের বদলে যে মিনারেল ওয়াটার সে খায়, তারও দাম মদের চেয়ে কম নয়। তবে আহমদ মুসার ব্যবহারই ওয়েট্রেস মেয়েটির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বেশি। অন্য খদ্দেরদের চোখ এবং আহমদ মুসার চোখ সম্পূর্ণ আলাদা। অন্য খদ্দেরদের চোখে যেখানে থাকে লালসা অথবা তাচ্ছিল্যপূর্ণ ভাব, সেখানে আহমদ মুসার চোখে সে দেখে সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টি। যখন সে কথা বলে তখন মনে হয় সে যেন বোন বা কোন সম্মানিত ব্যক্তির সাথে কথা বলছে। এ বিস্ময়কর লোকটি রেস্টুরেন্টে এলে খুশিই হয় ওয়েট্রেস মেয়েটি। আরও খুশি এই কারণে যে, সে একই টেবিলে এবং তার সার্ভিস টেবিলেই সবসময় বসছে।

সেদিন বেলা ১১টা। বিরাট রেস্টুরেন্টে লোকজন নেই বললেই চলে।

আহমদ মুসা কফি খাচ্ছে এবং তাকিয়ে আছে গীর্জার সেই গেটের দিকে।

আহমদ মুসার টেবিলের ওয়েট্রেসটি এগিয়ে এল। এসে দাঁড়াল আহমদ মুসার টেবিলের সামনে।

নিরেট ফরাসী তরুণী। তবে চুল কালো এবং চোখ কটা নয়। বয়স বিশ একুশ হবে। চেহারায় চটপটে ও সপ্রতিভ ভাব।

ওয়েট্রেস মেয়েটি এসে আহমদ মুসার দিকে তাকাল।

মেয়েটা একটু দ্বিধা করল। তারপর বলল, 'বসতে পারি?'

'বসুন।' আহমদ মুসার চোখে কিছুটা বিস্ময় ভাব।

'আপনি বুঝি মুসলমান?' বসেই মেয়েটি অনুচ্চ কন্ঠে বলল।

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি জানলেন কি করে?'

'আপনার খাদ্য তালিকা দেখে এবং ব্যবহার দেখে।'

'আপনি কি মুসলমানদের খাদ্য তালিকা চেনেন? মিশেছেন কখনও মুসলমানদের সাথে?'

‘মুসলমানদের খাদ্য তালিকা চিনি না এবং কোন মুসলমানের সাথেও মিশিনি। তবে আমার এক বান্ধবীর মা মুসলমান ছিলেন। বান্ধবীটির কাছেই সব শুনেছি।’

‘মুসলমানদের বুঝি খারাপ লাগে?’ ঠোঁটে হাসি টেনে বলল আহমদ মুসা।

‘না, নাম শুনেই আমার ভালো লাগে। আপনি কি কাউকে খুঁজছেন?’

‘কি করে বুঝলেন?’

‘কয়েক দিনে আমি বুঝেছি আপনি কাউকে খুঁজছেন। আপনার চোখ দু’টিকে সবসময় কিছু অনুসন্ধান করতে দেখছি। আপনি বুঝি নতুন এ শহরে?’

‘হ্যাঁ, ক’দিন আগে এসেছি।’

একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর আবার বলা শুরু করল, ‘আমার এক বন্ধুকে খুঁজছি। সে আমাকে এই গীর্জার ঠিকানা দিয়েছিল। তার নাম-পরিচয় ভুলে গেছি। শুধু গীর্জার ঠিকানার কথাই মনে আছে। গীর্জায় ক’দিন ধরে ঘুরছি। কিন্তু তাকে খুঁজে পাচ্ছি না।’

একটু হাসল মেয়েটি। বলল, ‘এভাবে বুঝি কোন মানুষকে খুঁজে পাওয়া যায়?’

বলেই মেয়েটি একটু গম্ভীর হলো। বলল, ‘আপনার বন্ধু নিশ্চয় মুসলমান নয়?

‘কেন একথা বলছেন?’

‘বলছি এ কারণে যে, কোন মুসলমান এ গীর্জার ঠিকানা দিতে পারে না। এ গীর্জার আশ-পাশেও কোন মুসলমান থাকতে পারে না।’

মেয়েটির কথায় আহমদ মুসা রহস্যের গন্ধ পেল। বলল, ‘কেন পারে না?’ কৃত্রিম একটা বিস্ময় ফুটিয়ে তুলল আহমদ মুসা তার চোখে।

‘বাইরের কেউ জানে না, শার্লেম্যান এখন নামমাত্র একটা গীর্জা। আসলে গোটাটাই ব্ল্যাক ক্রসের হেড কোয়ার্টার। এ রেস্টুরেন্টও তাদের নিয়ন্ত্রণে। চিনেন আপনি ব্ল্যাক ক্রসকে?’ গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল মেয়েটি।

‘বলুন কে এরা?’না জানার ভান করে থাকল আহমদ মুসা।

‘ক্লু ক্ল্যাক্স ক্ল্যান কে জানেন? সে রকমই একটা জঙ্গী সংগঠন। ক্লু ক্ল্যাক্স ক্ল্যান দেখে শ্বেতাংগদের স্বার্থ, আর ব্ল্যাক ক্রস দেখে খৃস্টানদের স্বার্থÑ বৈধ-অবৈধ যাই হোক। এই কারণে ব্ল্যাক ক্রস প্রচণ্ডভাবে মুসলিম বিদ্বেষী।’

কথা শেষ করে একটা দম নিয়েই আবার বলল, ‘ঐ যে ওদের একজন আসছে। সাংঘাতিক লোক। উঠি।’

বলে দ্রুত উঠে গেল মেয়েটি।

আহমদ মুসা তাকাল রেস্টুরেন্টের দরজার দিকে। দেখল একজন লোক রেস্টুরেন্টে প্রবেশ করছে। প্রায় ছয় ফুট লম্বা। তাগড়া চেহারা। রুচিসম্মত পোশাকে তার দেহটা ঢাকা থাকলেও তার চেহারা থেকে অপরাধীর ছাপ মুছে যায়নি।

আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল আহমদ মুসা, আর মনে মনে ধন্যবাদ দিল মেয়েটিকে। অযাচিতভাবে মেয়েটি যে মূল্যবান তথ্য দিয়ে গেল, যার জন্যে গত দু’দিন ধরে সে হাপিত্যেস করছে, তা আল্লাহরই এক বিশেষ দয়া। আর ব্ল্যাক ক্রসের এ লোকটিকে চিনিয়ে দেয়ায় তার অশেষ উপকার হয়েছে। সে সর্বান্তকরণে প্রার্থনা করছিল এমন একটি সুযোগের।

লোকটি বেশিক্ষণ বসল না। এক পেগ মদ খেয়েই যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল।

উঠে দাঁড়িয়ে যে মেয়েটি তাকে সার্ভ করছিল তাকে ডাকল।

মেয়েটি সামনে এসে দাঁড়ালে তাকে কি যেন বলল। মেয়েটি হাসল। তারপর লোকটি মেয়েটির গালে একটি টোকা দিয়ে বেরিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়াল।

আহমদ মুসাও উঠে দাঁড়িয়েছিল।

কফির বিল আগেই শোধ করে দিয়েছিল সে।

লোকটি বেরিয়ে এলে আহমদ মুসাও বেরিয়ে এল।

লোকটি রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে একটি কারে উঠল। চলতে শুরু করল তার গাড়ি।

আহমদ মুসার গাড়িও দাঁড়িয়েছিল একটু দূরে।

আহমদ মুসা লোকটিকে অনুসরণ করল।

ব্ল্যাক ক্রসের একজন লোককে আহমদ মুসার এখন খুব দরকার। ব্ল্যাক ক্রসের হেড কোয়ার্টারের সন্ধান সে পেয়েছে। এখন তার জানা দরকার ওমর বায়া এখানে আছে কিনা। নিছক লড়াইয়ে নেমে তার কোন লাভ নেই। ওমর বায়া আছে নিশ্চিত হলে তাকে উদ্ধারের পরিকল্পনা তাকে নিতে হবে।

আগের গাড়িটা যে কার পার্কে গিয়ে দাঁড়াল, সেটা আহমদ মুসার চেনা। এর সামনের বাড়ির একটা ফ্ল্যাট সে ভাড়া নিয়েছে।

আহমদ মুসা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করল তার ফ্ল্যাট ভাড়া নেয়া বাড়িতেই লোকটি প্রবেশ করল।

পেছনে পেছনে আহমদ মুসাও প্রবেশ করল বাড়িতে।

আহমদ মুসার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল যখন সে দেখল তিন তলায় তার ফ্ল্যাটের বিপরীত দিকের ফ্ল্যাটেই লোকটি প্রবেশ করছে।

ফ্ল্যাটটি লক করা ছিল। চাবি দিয়ে খুলে লোকটি প্রবেশ করছে ফ্ল্যাটে।

আহমদ মুসা বুঝল, নিশ্চয় এই মুহুর্তে আর কেউ নেই ফ্ল্যাটে।

আহমদ মুসা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। দেরি করলে ঝামেলা বাড়তে পারে।

পকেটে হাত দিয়ে রিভলবারের স্পর্শ অনুভব করল। তারপর গিয়ে নক করল দরজায়।

একটু পরেই দরজা খুলে গেল।

দরজায় দেখা গেল সেই লোকটিকে। লোকটি বাম হাতে খোলা দরজা ধরে আছে, ডান হাতে তার উদ্ধত রিভলবার।

আহমদ মুসার জন্যে দৃশ্যটা অভাবিত। এমনটি সে আশাই করেনি। নক করা দেখেই সম্ভবত বুঝেছিল তার কোন মিত্র আসেনি। সুতরাং সে প্রস্তুত হয়েই দরজা খুলেছে।

দরজা খুলেই লোকটি বলল, ‘কে তুমি, কি চাও?’

আহমদ মুসা ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। একধাপ এগিয়ে বাম হাতটা দরজার চৌকাঠে রেখে হাসি মুখে বলল, ‘আমাকে চিনবেন না। এখানে নতুন ভাড়ায় এসেছি। কয়েকটা কথা বলতে চাই আপনাকে।’

সন্দেহ ও বিরক্তিতে লাল হয়ে ওঠা লোকটির মুখ আরও লাল হয়ে উঠল। বলল, 'ফেরেববাজীর কোন জায়গা পেলেন না। যান, এখান থেকে। না হলে...।'

লোকটি বুঝে ওঠার আগেই তার হাত থেকে রিভলবার ছিটকে পড়ে গেল। কিন্তু লোকটি রিভলবার হারালেও অ™ভুত ক্ষিপ্রতার সাথে আহমদ মুসার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আহমদ মুসাকে নিয়ে পড়ে গেল লোকটি।

লোকটি দু'হাতে আহমদ মুসার গলা চেপে ধরেছিল। পড়ে গিয়েও সে গলা ছাড়েনি।

আহমদ মুসা নিচে পড়ে গেলেও তার দেহের কোমর থেকে পেছন দিকটা বাইরে ছিল। সে এই পেছন দিকটা প্রচণ্ড বেগে ওপর দিকে ছুঁড়ে ধনুকের মত ডান পাশে নিয়ে এল। গতির প্রচণ্ড ধাক্কায় লোকটির দেহ উল্টে নিচে পড়ে গেল এবং আহমদ মুসার দেহ ওপরে উঠে এল। লোকটির হাত খুলে গেল আহমদ মুসার গলা থেকে।

আহমদ মুসা ওপরে উঠেই কারাত চালাল লোকটির কানের পাশে নরম জায়গাটায়। পর পর দু'বার।

কয়েক মুহুর্তের মধ্যে লোকটির দেহ নিস্তেজ হয়ে এল।

আহমদ মুসা সময় নষ্ট না করে দ্রুত তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে লোকটির ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে নিজের ফ্ল্যাটের দরজায় এসে দাঁড়াল।

এসেই দরজা খুলে রেখেছিল।

আহমদ মুসা দরজার নব ঘুরিয়ে দরজা খুলে ফ্ল্যাটে প্রবেশ করল। তারপর দরজা লক করে লোকটিকে রাখল নিয়ে ঘরের মেঝের কার্পেটের ওপর।

লোকটির দু'হাত পিছ মোড়া করে বাঁধল। দু'পাও বাঁধল তার।

অল্পক্ষণ পরেই জ্ঞান ফিরে এল লোকটার। জ্ঞান ফিরে পেতেই উঠে বসল। বলল, 'তুমি কে জানি না, কিন্তু মনে রেখ কেউ তোমাকে বাঁচাতে পারবে না।'

'সেটা আমিও জানি। যিনি আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন এবং ভবিষ্যতেও বাঁচাবেন তিনি আল্লাহ, দুনিয়ার কোন মানুষ নন তিনি।' হেসে আহমদ মুসা বলল।

'ব্ল্যাক ক্রসকে বিদ্রুপ করছ। জান না তুমি ব্ল্যাক ক্রসকে।'

আহমদ মুসা সাইলেন্সার লাগানো রিভলবার বের করল। বলল, 'দেখ তোমার ব্ল্যাক ক্রসকে আমার জানা দরকার। আমি যা জানতে চাই তা ঠিক ঠিক বলবে। আমি দু'বার জিজ্ঞেস করি না, কোন জিজ্ঞাসার জবাব না পেলে দ্বিতীয় বার গুলি করব, কথা নয়।'

বলে আহমদ মুসা রিভলবার তুলল। গুলি করল। গুলিটা লোকটার বাম কানের লতি ছুঁয়ে চলে গেল। লতির ক্ষুদ্র আহত স্থান থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুল।

লোকটা ভীষণ চমকে উঠে কানের লতি চেপে ধরল। ভয়ে মুখ তার ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

আহমদ মুসা বুঝল, লোকটা দেহে বড়, কিন্তু মনে খুব ছোট। এ ধরনের লোকদের মানসিক প্রতিরোধ কিছুমাত্র থাকে না।

আহমদ মুসা তার রিভলবার কপাল বরাবর তুলে কঠোর কণ্ঠে বলল, 'বল, ওমর বায়া কোথায়?'

লোকটা ফ্যাকাসে দৃষ্টি তুলে আহমদ মুসার দিকে একবার চেয়ে বলল, 'হেড কোয়ার্টারের এক বাংলোতে আছে।'

'বাংলো কেন? ওটা তোমাদের বন্দীখানা?'

'না তাকে আমরা বন্দী রাখিনি। মুক্ত মানুষের মত তিনি আছেন।'

'মুক্ত মানুষের মত?'

লোকটা অনেকখানি সহজ হয়েছে। তার ভয় একটু কেটে গেছে। বলল, 'ওমর বায়ার আপনি কেউ? উনি তো এখন আমাদের মানুষ।'

'তার অর্থ?'

'ওমর বায়ার মন ও মাথা ধোলাই হচ্ছে। এখন তাকে যা কমান্ড করা হচ্ছে তাই করছে।'

চমকে উঠল আহমদ মুসা। হঠাৎ করেই তার মনে পড়ল কম্পিউটার পরিচালিত 'ইলেক্ট্রয়েন্স ফ্যালোগ্রাম' এবং 'ইলেক্ট্র মিয়োগ্রাম'-এর কথা। তাহলে কি ওমর বায়ার ওপর এই নিউরোলজিক্যাল অস্ত্র প্রয়োগ করা হচ্ছে? মনটা কেঁপে উঠল আহমদ মুসার। ইতিমধ্যেই আহমদ মুসার কতটা ক্ষতি হয়েছে কে জানে!

বলল আহমদ মুসা, ‘সেই বাংলোটা হেড কোয়ার্টারের কোথায়?’

‘শুনে লাভ নেই, একটা সৈন্য বাহিনী ছাড়া ব্ল্যাক ক্রসের হেড কোয়ার্টারে ঢোকা কারও পক্ষে সম্ভব নয়।’

আহমদ মুসা রিভলবার তুলল। গুলী করল। এ গুলীটা লোকটার ডান কানের লতির অগ্রভাগ সামান্য আহত করে চলে গেল। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুল কানের লতি থেকে।

লোকটা আগের মতই ভীষণ চমকে উঠে কানের লতি চেপে ধরল। তাড়াতাড়ি বলল, ‘বাংলোটি হেড কোয়ার্টারের এক তলাতেই। সাগর বক্ষের ওপর ভাসমান তিনটি বাংলোর একটিতে রাখা হয়েছে ওমর বায়াকে। কিন্তু হেড কোয়ার্টার তিন তলায়।’

‘সৈন্য বাহিনী ছাড়া তোমাদের হেড কোয়ার্টারে ঢোকা যাবে না, একথা বললে কেন?’

‘কারণ কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত তিন ইঞ্চি স্টিল শিটের প্রধান গেট কামান দাগা ছাড়া ভাঙ্গা বা খোলা যাবে না।’

‘ভেতরে কত জন প্রহরী আছে?’

‘গেটের ‘সিকিউরিটি পুল’-এ সব প্রহরী থাকে। ইন্টারকম ও ওয়াকিটকির মাধ্যমে তাদের প্রয়োজন মত ডাকা হয়। তবে ওমর বায়ার বাংলোর চার ধারে প্রহরী আছে।’

‘কোথায় প্রহরী প্রয়োজন জানা যায় কি করে?’ গোটা হেড কোয়ার্টারে কি টিভি ক্যামেরা সেট করা আছে?’

‘প্রধান গেট ছাড়া আর কোথাও নেই। হেড কোয়ার্টারে প্রত্যেক দায়িত্বশীলের কাছে ওয়াকিটকি আছে। ইন্টারকম তো রয়েছেই।’

‘তোমাদের চীফ কোথায় থাকেন?’

‘হেড কোয়ার্টারে। আজ নেই তিনি।’

‘ধন্যবাদ’ বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমাকে ঘুমিয়ে থাকতে হবে। তারপর দেখা যাবে।’

আহমদ মুসা ব্যাগ থেকে একটা বিশেষ ক্লোরোফরম ভেজা তুলা এনে লোকটার নাকে চেপে ধরল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই লোকটি সংজ্ঞা হারিয়ে ঢলে পড়ল।

আহমদ মুসা ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে এল।

ছুটল তার গাড়ি।

গাড়ি এনে দাঁড় করাল রেস্টুরেন্টের সেই কার পার্কিং-এ।

ব্যাগ গাড়িতে রেখে গাড়ি লক করে এসে প্রবেশ করল রেস্টুরেন্টে আবার। আহমদ মুসার টার্গেট সেই ওয়েট্রেস। তার কাছ থেকে আরও কিছু তার জানা দরকার।

আহমদ মুসার সেই টেবিলটি তখন খালি। খুশি হলো আহমদ মুসা। বসল গিয়ে টেবিলে।

কিন্তু সেই ওয়েট্রেসকে দেখল না কোথাও।

আহমদ মুসা ভেজিটেবল স্যুপ নিয়ে ধীরে ধীরে খেল এবং অপেক্ষা করল অনেকক্ষণ। কিন্তু সে এল না।

দুপুরের খাওয়াটাও খেয়ে নিল আহমদ মুসা।

খাবার পরেও কফি নিয়ে অপেক্ষা করল অনেকক্ষণ। কিন্তু সেই ওয়েট্রেস এল না। আহমদ মুসা জিজ্ঞেসও করল না কাউকে।

আহমদ মুসা উঠবে উঠবে ভাবছে, এ সময় রেস্টুরেন্টে ঢুকেই মেয়েটি সোজা চলে গেল তাদের ডিউটি কাউন্টারের দিকে।

বেশ কিছুক্ষণ পর বের হলো।

তারপর সোজা চলে এল আহমদ মুসার কাছে। হাসল। বলল, 'খেয়ে নিয়েছেন নিশ্চয়? আমার সেই বান্ধবীর কাছে গিয়েছিলাম। অনেক খবর আছে। রাতে এলে বলব।'

বলে সে কফির খালি কাপ নিয়ে চলে গেল।

ঠিক এই সময়েই জনা পাঁচেক ভীমাকৃতি লোক প্রবেশ করল রেস্টুরেন্টে। প্রবেশ করেই তারা পকেট থেকে রিভলবার বের করল। তাক করল আহমদ মুসাকে।

দ্রুত এগিয়ে এল আহমদ মুসার দিকে।

উঠে দাঁড়িয়েছিল আহমদ মুসা।

সবার চেয়ে লম্বা কুস্তিগীর মার্কা লোকটা আহমদ মুসার সামনে আকাশ ফাটানো শব্দে হেসে উঠল। বলল, ‘সোনার চাঁদ, এবার তোমাকে হাতে পেয়েছি। তুমি আমাদের চল্লিশ জনকে খুন করেছ।’

তার আকাশ ফাটানো হাসি এবং চিৎকারে গোটা রেস্টুরেন্টের কাজ থেমে গেছে। সকলের চোখে-মুখে আতংকের ছাপ। যে ওয়েট্রেস আহমদ মুসার কাছ থেকে কফির কাপ নিয়ে চলে যাচ্ছিল, সেও দাঁড়িয়ে পড়েছে কাপ হাতে মূর্তির মত নিশ্চলভাবে।

একটু থেমেছিল লোকটি।

কিন্তু পরক্ষণেই আবার শুরু করল, ‘তুমি আমাদের একজন লোককে কিডন্যাপ করেছিলে। কিন্তু ভাবনি এই কিডন্যাপই তোমার জন্যে কাল হয়ে দাঁড়াবে। জান কেমন করে কাল হলো?’

‘তখন বুঝিনি এখন বুঝেছি।’ অত্যন্ত স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

‘কি বুঝেছ?’

‘তোমাদের ফ্ল্যাটের গেটে মুভি ক্যামেরা ফিট করা ছিল। ছবি দেখেই তোমরা তাকে উদ্ধার করেছে এবং আমাকে চিনতে পেরেছ।’

‘আমরা জানি তুমি সাংঘাতিক বুদ্ধিমান। বলত, তোমাকে না হয় চিনলাম ছবি দেখে, কিন্তু তোমাকে এখানে খুঁজে পেলাম কি করে?’

‘আমার অনুমান সত্য হলে, তোমাদের সাথীর যে রিভলবার আমি পকেটে রেখেছি, তাতে ‘ট্রান্সমিটার চিপ’ আছে যা তোমাদের পথ দেখিয়েছে।’

লোকটার মুখ হা হয়ে গেল। অবিশ্বাস্য এক বিস্ময় তার চোখ-মুখে।

কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই সে বিস্ময়ের স্থানে জ্বলে উঠল খুনের আগুন। বলল, ‘তোর এই বুদ্ধি আমাদের বিনাশ করেছে।’

বলে তার হাতের রিভলবারের বাট দিয়ে আঘাত করল আহমদ মুসার মাথায়।

মাথা সে কিছুটা সরিয়ে নেয়ার সময় পেয়েছিল। তার ফলে আঘাতটা মাথার বাম পাশ দিয়ে পিছলে গেল। পিছলে গেলেও মাথার এক খণ্ড চামড়া ও চুল তুলে নিয়ে গেল। ফিনকি দিয়ে বেরুল সেখান থেকে রক্ত।

'হা হা করে সেই আগের মতই আকাশ ফাটানো হাসি হেসে উঠল লোকটি।

হাসি থামলে বলল, 'চল শালা। ব্ল্যাক ক্রস কি এবার দেখবি।'

আহমদ মুসাকে ওরা চারদিক দিয়ে ঘিরে রেস্টুরেন্ট থেকে বের করে নিয়ে চলল।

'পিনপতন' নীরবতা রেস্টুরেন্টে।

সবাই মূর্তির মত দাঁড়িয়ে।

ব্ল্যাক ক্রসকে ওরা যমের চেয়েও বেশি ভয় করে। জানে ওরা এসব ব্যাপারে ওদের সামান্য দোষ পেলে কুকুরের মত গুলী করে মারবে।

কিন্তু আহমদ মুসার সেই ওয়েট্রেসের এখন আর কোন ভয় নেই, তার জায়গায় ফুটে উঠেছে গভীর বেদনার ছাপ। তার মন শত মুখে বলছে, লোকটি নিশ্চয় ভালো কেউ, না হলে ব্ল্যাক ক্রসের শত্রু হবে কেন? তার বান্ধবী এলিসা গ্রেসের কাছে শোনা ওমর বায়ার মত এ লোকও বিপদগ্রস্ত কেউ কিনা! যেই হোক এই লোক, ব্ল্যাক ক্রসের সাথে টেক্কা দেবার সামর্থ্য রাখে। সাংঘাতিক বিপদেও তার মুখে ভয়ের কোন ছায়া পড়েনি। মাথায় অত বড় আঘাতেও তার ভ্রু পর্যন্ত কুঞ্চিত হয়নি।

কোথায় নিয়ে গেল লোকটাকে? নিজের মনেই প্রশ্ন করল ওয়েট্রেস। ইচ্ছা হলো বাইরে গিয়ে দেখে আসে কিন্তু পা তোলার সাধ্য তার হলো না।

ওয়েট্রেসের খুব দুঃখ হলো, লোকটাকে ওমর বায়ার কথা বলা হলো না। তার এই বিপদ না হলে নিশ্চয় তার কাছ থেকে ওমর বায়াকে উদ্ধারের কাজে মূল্যবান সাহায্য পাওয়া যেতো আজ।

ওয়েট্রেস বিমর্ষভাবে ফিরে গেল তার কাউন্টারে।

ব্ল্যাক ক্রসের লোকরা আহমদ মুসাকে নিয়ে গীর্জার পাশের দরজা দিয়ে ব্ল্যাক ক্রসের হেড কোয়ার্টারে প্রবেশ করল।

প্রথম দরজাটা লোক দেখানো। এর পরের দরজাটাই আসল। স্টিল শীটের বিশাল দরজা।

দরজার কাছাকাছি হতেই দরজা খুলে গেল।

তারা প্রবেশ করতেই দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

আহমদ মুসা দরজা দেখেই বুঝল এটা দুর নিয়ন্ত্রিত। টিভি স্ক্রিনে সবাইকে দেখে চিনেই দরজা খুলে দেয়া হয়।

গেট পেরিয়ে আহমদ মুসা সিকিউরিটি পুল দেখার জন্যে আশে পাশে তাকাতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রিভলবারের বাটের একটা গুঁতা গিয়ে পড়ল আহমদ মুসার মাথায়। পেছন থেকে একজন বলল, 'এদিক ওদিক তাকালে মাথা গুড়ো করে দেব।'

অনেক ওঠা-নামা ও অনেক পথ ঘুরিয়ে একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল তারা আহমদ মুসাকে নিয়ে।

একজন এসে আহমদ মুসার হাতে হাত কড়া ও পায়ে বেড়ি পরিয়ে ছুড়ে দিল দরজা দিয়ে একটা ঘরে।

দরজা বন্ধ করতে করতে একজন চিৎকার করে বলল, 'ঘুমাও যাদু ভালো করে। কর্তা এলে কাল মজার খেলা হবে তোকে নিয়ে।'

কথা শেষ করেই আকাশ ফাটানো শব্দে হেসে উঠল। হাসি না বলে একে শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া ক্ষুধার্ত বাঘের হুংকার বলাই ভালো।

# ৬

আহমদ মুসা ঘুম থেকে জাগল। মনে হল দীর্ঘক্ষণ সে ঘুমিয়েছে। ঘড়ির রেডিয়াম ডায়ালের দিকে তাকাল আহমদ মুসা। রাত ২টা। দুঃখের মধ্যেও খুশি হলো আহমদ মুসা ব্ল্যাক ক্রসের লোকদের ওপর। ওরা তাকে সার্চ করে রিভলবার ও ছুরি নিয়ে গেছে কিন্তু ঘড়ি নিয়ে যায়নি। রিভলবারের চেয়েও যা এখন তার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

আরও খুশি হলো এই জন্য যে তাকে ওরা পিছমোড়া করে বাঁধেনি। সম্ভবত ওরা হতে লোহার হাতকড়া পরিয়েই নিশ্চিত হয়েছিল। এ ধরনের হাতকড়া ভাঙা এবং খোলা দুই-ই অসম্ভব। পিছমোড়া করে না বাঁধায় ঘড়ি দেখতে পাবার ফলে যে আনন্দ হয়েছিল, শীঘ্রই তা উবে গেল। লোহার এ হাতকড়া সে ভাঙবে কি করে! আজকের এ রাতটা তার জন্যে মহামূল্যবান। সকালে ব্ল্যাক ক্রসের প্রধান আসবে, তার আগেই কিছু একটা করার সুবর্ণ সুযোগ।

কিন্তু হাতকড়া খোলার কোন পথ পেল না। হাতকড়া হাতের সাথে এমনভাবে লাগানো, যার ফলে হাতকড়ায় আঘাত করলে সে আঘাত গিয়ে লাগে হাতে।

ইতিমধ্যে রাত বাজল আড়াইটা। ঘড়ি দেখে অস্থির হয়ে উঠল।

কিন্তু উপায় কি?

হঠাৎ তার মনে পড়ল ডোনার দেয়া আংটির কথা। সাথে সাথে গোটা দেহ একটা আনন্দের স্রোত বয়ে গেল।

সংগে সংগে ডান হাতের মধ্যমা থেকে আংটি খুলে ফেলল। অন্ধকারের মধ্যেও আংটির সেই ভয়ংকর বিন্দুটি দেখা যাচ্ছে। নিশ্চয় বিন্দুটিকে পরিকল্পনা করেই রেডিয়াম করা।

আহমদ মুসা আংটিকে পায়ের দুই বুড়ো আঙুলের ফাঁকে ধরে তারপর জোরে জোরে আংটির বিন্দুটার উপর চেপে ধরল হাতকড়ার লকটিকে।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড। লক উড়ে গেল বোধ হয় হাওয়ায়। আলগা হয়ে গেল হাতকড়া। খুলে পড়ে গেল হাত থেকে।

পায়ের বেড়িও খুলে ফেলল সে। আংটি আবার পরে নিল হাতে।

অন্ধকারের মধ্যে দেয়াল ধরে এগিয়ে গিয়ে পেয়ে গেল দরজা। হাত দিয়ে বুঝল দরজা স্টিল শিটের।

খুঁজে খুঁজে আহমদ মুসা দরজার লক বের করল। পরীক্ষা করে বুঝল দরজা দু'দিক থেকেই লক করা যায়।

আহমদ মুসা তার মধ্যমা চেপে ধরল দরজার লকের ওপর। চার-পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যেই দরজা নড়ে উঠল। দরজা খুলে গেছে বুঝল আহমদ মুসা। ধীরে ধীরে টানল দরজা।

একটু ফাঁক হতেই এক ঝলক আলো এসে ঢুকল ভেতরে। ঠিক এই সময়ই পায়ের শব্দ পেল দরজার বাইরে। একজনের পায়ের শব্দ। থেমে গেছে পায়ের শব্দটি।

সংগে সংগেই বুঝল আহমদ মুসা, দরজা খুলে যাওয়া নিশ্চয় প্রহরীর নজরে পড়ে গেছে। বুঝার সাথে সাথেই আহমদ মুসা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, ওকে প্রস্তুতির এক মুহূর্তও সময় দেয়া যাবে না। এখন আক্রমণই সবচেয়ে বড় আত্মরক্ষা।

আহমদ মুসা এক ঝটকায় দরজা খুলে ফেলল। দেখল, বিস্ময়- বিমুঢ় লোকটা তার স্টেনগান তুলছে।

আহমদ মুসা দরজা খুলেই লোকটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

বাম হাতে তার গলা পেঁচিয়ে ধরে ডান হাত দিয়ে তার স্টেনগান কেড়ে নিয়ে তাকে দ্রুত টেনে নিয়ে এল ঘরে।

লোকটি ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। তাকে ঘরে তোলার সময় আহমদ মুসার বাম হাতটা অনেকখানি ঢিলা হয়ে পড়েছিল।

লোকটি দু'হাতে আহমদ মুসার বাম হাত ধরে এক মোচড় দিয়ে নিজেকে খুলে নিল এবং আহমদ মুসার বাম হাতকে মুচড়ে তাকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করল।

কিন্তু তার আগেই আহমদ মুসা স্টেনগানটি ডান হাত থেকে ফেলে দিয়ে ডিগবাজী খেয়ে এক পাক ঘুরে বাম হাতের মোচড়টা আলগা করে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েই ডান হাতের একটা প্রচণ্ড কারাত চালাল লোকটার ঠিক কানের ওপর।

মুহূর্তেই লোকটা আহমদ মুসার বাম হাত ছেড়ে দিয়ে পাক খেয়ে পড়ে গেল।

আহমদ মুসা দ্রুত তার ইউনিফরম খুলে নিয়ে পরে নিল এবং লোকটির জামা খুলে তা দিয়ে তাকে পিছমোড়া করে বাধল। স্টেনগানের ফিতা খুলে নিয়ে বাঁধল তার পা এবং তার মুখে রুমাল ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে এল। প্রহরীর ইউনিফরম ও তার হ্যাট পরার পর আহমদ মুসাকে দূর থেকে চেনার আর কোন উপায় রইল না। কোন দিকে যাবে সে?

তার মনে আছে, প্রধান গেট থেকে অল্প কিছু আসার পর একটা সিঁড়ির নিচে একটা স্টিল স্ল্যাব সরিয়ে একটা সিঁড়ি পথে তাকে আন্ডার গ্রাউন্ডে নামিয়ে এনেছিল।

উপরে উঠার জন্যে এই একটা পথই তার জানা। তাকে ওপরে উঠতে হবে, তিন তলার বাংলোতে আছে ওমর বায়া।

ভূগর্ভ থেকে উঠার সিঁড়ির খোঁজে চলল আহমদ মুসা।

যে পথে তাকে নিয়ে আসা হয়েছিল সেই পথেই সে এগিয়ে চলল।

চলার পথে কাউকে পেল না আহমদ মুসা। ভাবল, তাকে পাহারা দেয়ার জন্যে তাহলে ওখানে একজনকেই রাখা হয়েছিল। আহমদ মুসার মনে পড়ল যাকে সে কিডন্যাপ করেছিল তার কথা। সে বলেছিল, ওমর বায়ার ওখানে ছাড়া আর কোন প্রহরী নেই। প্রধান গেটের সামনে সিকিউরিটি পুলে সব প্রহরী থাকে। ইন্টারকম বা ওয়াকিটকি'তে তাদের প্রয়োজন মত নির্দেশ দেয়া হয়।

খুশি হলো আহমদ মুসা। সিকিউরিটি পুলকে যদি নিষ্ক্রিয় করে দেয়া যায়, তাহলে তার পথ অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে যাবে।

সিঁড়ি অবশেষে খুঁজে পেল আহমদ মুসা।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠল সে।

সিঁড়ির মুখ স্টিল স্ল্যাব দিয়ে বন্ধ করা। এ স্ল্যাব সরিয়েই তাকে ভূগর্ভে নামানো হয়েছিল।

আহমদ মুসা স্টিল স্ল্যাবে কোন 'কি হোল' খুঁজে পেল না। স্টিল স্ল্যাবটা প্রধান গেটের মতই কি দূর নিয়ন্ত্রিত?

ভাল করে মনে করতে চেষ্টা করল আহমদ মুসা। একটা সিঁড়ির নিচে অবস্থিত স্ল্যাবটির কাছাকাছি তারা পৌঁছার সংগে সংগেই স্ল্যাবটি খুলে যায়নি তার পরিষ্কার মনে পড়ছে, একজন লোক একটু অগ্রবর্তী হয়ে স্ল্যবটির এক প্রান্তে দু'পা জোড় করে দাঁড়িয়েছিল কেন? দূর-নিয়ন্ত্রকদের জন্যে এটা কোন সিগন্যাল, না দু'পা জোড় করে দু'পা বা দু'বুড়ো আঙুল দিয়ে কারও ওপর নির্দিষ্ট পরিমাণ চাপ দিয়েছিল সে?

দূর-নিয়ন্ত্রিত হলে এ রকমটা হতো না, সুতরাং শেষোক্ত সম্ভাবনাকেই আহমদ মুসা ঠিক মনে করল।

পা দিয়ে চাপ দেয় সেই প্রান্ত কোনটা ছিল, মনে করতে চেষ্টা করল আহমদ মুসা। স্ল্যাবটি পূর্ব-পশ্চিম লম্বা। পূর্ব প্রান্ত ছিল সিঁড়ির গোঁড়ার দিকে। এর বিপরীত প্রান্তে দাঁড়িয়ে লোকটি চাপ দিয়েছিল পরিষ্কার মনে পড়ল আহমদ মুসার।

উপরের দৃশ্যটা আহমদ মুসা নিচে এসে সেট করল এবং এ সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে, সিঁড়ির মুখ ও স্ল্যাব যেখানে একত্রিত হয়েছে সেটাই পূর্ব দিক। তাহলে চাপ দেয়ার জায়গাটা দাঁড়াচ্ছে আহমদ মুসার মাথার ওপর কোথাও।

আহমদ মুসা এক ধাপ নিচে নেমে মাথার ওপরের জায়গাটা পরীক্ষা করল। দেখতে পেল, স্টিল স্ল্যাবটি নিখুঁতভাবে সিঁড়ির কংক্রিট ছাদে ঢুকে যাওয়া ছাড়া আর কোন চিহ্ন কোথাও নেই।

আহমদ মুসা স্পষ্ট মনে পড়ছে, চপ দেয় হয়েছিল স্ল্যাবের ওপর নয়, স্ল্যাব-প্রান্তের ফ্রেমের ওপর। ফ্রেম এবং স্টিল স্ল্যাবের রং ছিল একই রকমের। কিন্তু এখানে তো স্ল্যাবের কোন ফ্রেম নেই।

আহমদ মুসা স্টেনগানের মাথা দিয়ে টোকা দিতে লাগল স্ল্যাব এবং কংক্রিটের ছাদের ওপর। খুশি হলো আহমদ মুসা। স্টিল স্ল্যাব যেখানে কংক্রিটের

ছাদে ঢুকে গেছে, সেখানে কংক্রিটের প্রান্তে টোকা দিলে ধাবত শব্দ পেল। বুঝল আহমদ মুসা রংটা কংক্রিটের মত হলেও ওটাই আসলে স্ল্যাব মুখের স্টিল ফ্রেম। আহমদ মুসার অনুমান অনুসারে এই ফ্রেমে চাপ দিলেই সিঁড়ি মুখের স্ল্যাব সরে যাওয়ার কথা।

আহমদ মুসা স্টেনগানটা বাম হাতে নিয়ে ডান হাত ওপরে তুলে চাপ দিল ফ্রেমটিতে। কিন্তু বার বার চাপ দিয়েও সিঁড়ি মুখের স্ল্যাবের কোন নড়াচড়া লক্ষ্য করা গেল না।

মনে পড়ল আহমদ মুসার। লোকটি দু'পা লাগিয়েছিল, তাকেও তাহলে দু'পা লাগাতে হবে।

কিন্তু না দু'পায়ে চাপ দিয়েও কোন ফল হলো না।

আহমদ মুসা সিঁড়ির ওপর বসে চোখ বন্ধ করে ভাবল, তার কিছু কি ভুল হচ্ছে? না তার অনুমান গোটাটাই ভুল?

হঠাৎ আহমদ মুসার মনে প্রশ্ন জাগল, লোকটা দু'পা জোড় করে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু কোথায় দাঁড়িয়েছিল?

লোকটার ছবি ভেসে উঠল আহমদ মুসার চোখের সামনে। সে দু'পা জোড় করে ফ্রেমের ওপর রেখেছিল এবং জায়গাটা ছিল ফ্রেমের ঠিক মাঝখানে।

চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল আহমদ মুসার। উঠে দাঁড়াল বসা থেকে।

ছাদ রঙা ফ্রেমটা অনুমানে মেপে নিয়ে আহমদ মুসা ঠিক মাঝখানে দু'হাত লাগিয়ে চাপ দিল। সংগে সংগেই স্ল্যাবটা আহমদ মুসার চোখের সামনে থেকে সরে ছাদের ভেতরে ঢুকে গেল।

এক ঝলক তাজা বাতাস এসে আহমদ মুসার মুখ চোখ জুড়িয়ে দিয়ে গেল।

এই সাথে আহমদ মুসা মানুষের কথা শুনতে পেল। ঠিক মাথার ওপরেই।

আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি উঠে সিঁড়ির নিচে গিয়ে দাঁড়াল।

বুঝল আহমদ মুসা, কেউ দু'জন কথা বলতে বলতে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছে।

একজন বলছে, 'কর্তা এই রাতেই আসছেন যে! আগামী কাল না আসার কথা?'

অন্যজন বলছে, 'কোন বড় পরিকল্পনা আছে নিশ্চয়ই। তাছাড়া যে শত্রু ধরা পড়েছে, সে অত্যন্ত ভয়াবহ। এই-ই নাকি আহমদ মুসা, তার ছবির সাথে নাকি এ মিলে গেছে। এটা জানতে পেরেই কর্তা রওয়ানা দিয়েছেন।'

চমকে উঠল আহমদ মুসা। তার পরিচয় তাহলে এতদিনে ব্ল্যাক ক্রসের কাছে ধরা পড়ে গেল! ওরা তো এখন পাগল হয়ে যাবে!

আহমদ মুসা ভাবল, পিয়েরে পল তাহলে আসছে! রওয়ানা দিয়ে দিয়েছে। কয়টায় কে জানে? যে কোন সময়ই এসে পৌছতে পারে সে। সে আসা মানে একটা বড় দলবল নিয়েই সে আসবে, বিশেষ করে যখন আহমদ মুসার খবর পেয়েছে।

আহমদ মুসা আরও ভাবল, তার আসা অর্থাৎ বাড়তি শক্তি এখানে এসে পৌঁছার আগের এই সময়টাই ওমর বায়াকে উদ্ধারের সুবর্ণ মুহূর্ত।

আহমদ মুসা নিশ্চিত, এই এক তলারই কোন এক স্থানে বন্দী আছে ওমর বায়া। ব্ল্যাক ক্রসের যে লোককে সে কিডন্যাপ করেছিল, তার কথা মনে পড়ল আহমদ মুসার। ওমর বায়া বন্দী আছে এক তলার ভাসমান একটা বাংলোতে। অতএব আহমদ মুসা সিদ্ধান্তে পৌঁছল, সাগর যেহেতু গীর্জার পশ্চিম দিকে, তাই সে যে চত্বরে দাঁড়িয়ে আছে, এখান থেকে পশ্চিম দিকে গেলেই ভাসমান বাংলো এলাকা সে পেয়ে যেতে পারে।

সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে আহমদ মুসা ছোট্ট চত্বরটার চারদিকে নজর বুলাল। চত্বর থেকে তিনটা করিডোর তিনদিকে গেছে। পূর্ব দিকের করিডোরটা গেট পর্যন্ত গেছে বুঝল আহমদ মুসা। আর উত্তরেরটা বাড়ির উত্তর অংশে গেছে। তাহলে পশ্চিমের করিডোরটাই গেছে সাগরের দিকে। এ পথেই তাকে যেতে হবে।

তিনটি করিডোরের মুখেই দরজা আছে। কিন্তু তিনটি দরজাই খোলা।

আহমদ মুসা পশ্চিম দরজার দিকে এগোলো।

যাওয়ার সময় তার মনে জাগল, সিকিউরিটি পুল নিষ্ক্রিয় না করে তার এগোনো ঠিক হচ্ছে কিনা। কিন্তু আবার পরক্ষণেই ভাবল, সময় খুব কম।

সিকিউরিটি পুলের ওখানে গিয়ে হাঙ্গামায় পড়লে ওমর বায়ার কাছে পৌঁছানো কঠিন হয়ে যেতে পারে। আগে ওমর বায়াকে উদ্ধার, পরে বের হবার পথ আল্লাহ একটা বের করে দেবেন।

দরজা পেরিয়ে করিডোর দিয়ে এগিয়ে চলল আহমদ মুসা।

কয়েকটা বাঁক ঘুরে একটা করিডোরের মুখে এসে দাঁড়াল। এ মুখেও একটা দরজা আছে, তাও খোলা।

করিডোরের মুখই তিন তলা বিল্ডিংএর শেষ প্রান্ত। তারপরেই উন্মুক্ত আকাশের নিচে ফাঁকা চত্বর। চত্বরটি উঁচু প্রাচীর ঘেরা। আহমদ মুসার সোজা সামনে প্রাচীরের বড় একটি দরজা।

প্রাচীরের ভেতরে বাংলোর চালাগুলো দেখতে পেল আহমদ মুসা। খুশি হলো তার মন। ঐ বাংলোর কোন একটিতে ওমর বায়া বন্দী আছে।

প্রাচীরের বাইরের পাশ বরাবর চত্বরটি ফাঁকা। আহমদ মুসা দেখল প্রাচীরের এ পাশ বরাবর প্রহরী নিযুক্ত রয়েছে। চারজনকে সে দেখতে পাচ্ছে। দু'জন গেটে। আর দু'জন গেটের ডান ও বাঁ পাশে বেশ কিছু দূরে দাঁড়িয়ে।

দরজায় দাঁড়ানো প্রহরী দু'জন স্টেনগান হাতে ঝুলিয়ে দরজার দু'পাশে দাঁড়িয়ে গল্প করছে।

এই সময় আহমদ মুসা শুনতে পেল তার পেছন থেকে অনেকগুলো পায়ের শব্দ ভেসে আসছে। অনেকটা চমকে উঠেই পেছনে ফিরে তাকাল আহমদ মুসা। কাউকে দেখল না, কিন্তু পায়ের শব্দ তার কাছে আরও স্পষ্টতর হলো। ওদের কথা বার্তাও শুনা যাচ্ছে। আহমদ মুসা বুঝল ওরা খুব কাছে চলে এসেছে। বাঁকের আড়াল না থাকলে এতক্ষণ সে তাদের চোখে পড়ে যেত।

আহমদ মুসা চারদিকে তাকিয়ে দ্রুত দরজার আড়ালে গিয়ে লুকালো।

দরজার আড়াল থেকে আহমদ মুসা দেখল, জনা দশেক প্রহরী এগিয়ে আসছে করিডোর দিয়ে গল্প করতে করতে।

একজন লোক বলছে, একজন বন্দী লোক নিয়ে কর্তাদের এত ভয় কেন, বুঝলাম না?

গর্দভ, আহমদ মুসা একজন নয়, সে একাই একশ। বলল অন্য একজন।

ঠিক আছে। সে তো বন্দী। আমাদের কি কাজ এখানে? প্রহরী তো আছেই। বলল আগের লোকটি।

আমাদের কিছু কাজ নেই। শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওমর বায়ার ঘর পাহারা দেয়া। কর্তা এসে ওমর বায়াকে নিয়ে যাবে, তারপরেই আমাদের দায়িত্ব শেষ। বলল দ্বিতীয় লোকটি।

দরজা বরাবর চলে এসেছে ওরা।

আহমদ মুসা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল।

ওদের শেষ লোকটি যখন দরজা বরবর তখন আহমদ মুসা দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে তাদের পেছনে পেছনে চলতে লাগল। মাথার হ্যাটটাকে কপাল পর্যন্ত নামিয়ে ওদের পেছনে একটু আলগা হয়ে চলতে লাগল আহমদ মুসা।

দলটি দরজার কাছে পৌছতেই দরজা খুলে গেল। গেটের প্রহরী দু'জন দরজার দু'পাশে দাঁড়িয়ে থাকল। আর ওরা ঢুকে গেল ভেতরে।

আহমদ মুসা ইচ্ছা করেই একটু পেছনে পড়েছিল।

গেটের প্রহরীদের একজন বলল, তাড়াতাড়ি কর দরজা বন্ধ করে দেব।

বলেই লোকটি তার সঙ্গী প্রহরীর লাইটারে সিগারেট ধরাতে গেল। তার সঙ্গী তখন সিগারেট ধরাচ্ছিল।

তাদের তাড়া খেয়ে লাফ দিয়েই যেন দরজায় গিয়ে পৌছল আহমদ মুসা।

সুযোগ সে নষ্ট করল না।

আকস্মাৎ সে প্রহরী দু'জনের কাছাকাছি গিয়ে তাদের দু'জনের মাথা ধরে ভীষন জোরে ঠুকে দিল। পরপর দু'বার।

ওরা সংগে সংগেই সংজ্ঞা হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল।

আহমদ মুসা দ্রুত ওদের বেল্ট থেকে দু'টি রিভলবার নিয়ে দু'পকেটে পুরে স্টেনগানটা হাতে নিয়ে দরজা পেরিয়ে ঢুকল ভেতরে।

খোলা চত্বরটিতে তিনটি বাংলো। একটি দক্ষিণ প্রান্তে, আরেকটি উত্তর প্রান্তে এবং মাঝখানে একটি। মাঝখানেরটি ওই দু'টি বাংলোর সাথে এক লাইনে না হয়ে কিছুটা পশ্চিমে এগিয়ে।

মাঝখানের বাংলোতেই থাকে ওমর বায়া। আহমদ মুসাও এটা বুঝতে পারল মাঝখানের বাংলোর সামনে সেই দশ প্রহরীর জটলা দেখে।

আহমদ মুসা ধীরে ধীরে এগুলো সেদিকে। তার স্টেনগানের ব্যারেল নামানো কিন্তু তার আঙুলটি স্টেনগানের ট্রিগার স্পর্শ করে আছে।

ওদের কাছাকাছি পৌছেছে এই সময় পেছনে ফেলে আসা গেটের দিক থেকে কথার শব্দ পেল। চকিতে পেছনে ফিরেই দেখল গেট দিয়ে কয়েকজন প্রবেশ করছে। তৎক্ষণাৎ চোখ ঘুরিয়ে সামনে তাকাল আহমদ মুসা। দেখল, সামনের দৃশ্যপটও পাল্টে যাচ্ছে। একজন ওয়াকি-টাকিতে কথা বলছে, অন্যরা এ্যাটেশনের ভংগিতে দাঁড়াচ্ছে।

আহমদ মুসার বুঝতে বাকি রইল না যে, সে ধরা পড়ে গেছে। সংগে সংগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে।

চোখের পলকে শরীরটা সামনের দিকে একটু বাঁকিয়ে স্টেনগানের মাথা উঁচু করে ট্রিগারে আঙুল চেপে সামনের ওদের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিল।

স্টেনগানের ব্যারেল ওদের ওপর দিয়ে ঘুরে আসার পর কাউকেই দাঁড়ানো দেখা গেল না।

গুলী করেই আহমদ মুসা শুয়ে পড়েছে।

গড়িয়ে চলল ওমর বায়ার বাংলোর দিকে। সামনের মাটিতে লুটোপুটি খেয়ে পড়ে থাকা ঝাঁঝরা লাশগুলোর কাছে না পৌছাতেই গেটের দিক থেকে গুলী বৃষ্টি শুরু হলো।

কিন্তু গেটের সে স্থান থেকে আহমদ মুসার দুরত্ব স্টেনগানের পাল্লার জন্যে খুব অনুকূল নয়।

এ সুযোগে আহমদ মুসা চরকির মত গড়িয়ে ওমর বায়ার বাংলোর বারান্দায় গিয়ে উঠল। যাবার সময় আহমদ মুসা ওদের একটা স্টেনগান ও এল এম জি টেনে নিয়ে গেল।

বারান্দায় উঠে একটা থামের আড়াল নিল সে।

ওরা গুলী করতে করতে এগিয়ে আসছে। আহমদ মুসা জবাব দিল না ওদের গুলীর।

আহমদ মুসা ওদের বিভ্রান্ত করতে চায়, সাহসীও করে তুলতে চায়। ওদের এই ধারনা দিতে চায় যে আহমদ মুসা ওদের ঠেকানোর চাইতে এখন ওমর বায়াকে উদ্ধার করতে ব্যস্ত।

এটা ছিল আহমদ মুসার কৌশল।

ওদের একজন বলল, নিশ্চয় শয়তানটা ভেতরে ঢুকে গেছে, এখন ওমর বায়াকে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করবে। দৌড় দাও।

ওরা তিনজন মাথা নিচু করে দৌড় দিল ওমর বায়ার বাংলোর দিকে।

ওদেরকে আসতে দিল আহমদ মুসা।

কাছাকাছি এলে পিলারের আড়াল থেকে মাথা বের করে আবার এক পশলা গুলী বৃষ্টি করল স্টেনগান থেকে।

মাটির ওপর ঝরে পড়ে গেল ও তিনজন ও।

কিন্তু এ তিনজনের কাহিনী সাঙ্গ হতে না হতেই প্রাচীরের সেই গেটে এসে দাঁড়াল আরও বেশ কয়েকজন।

ঠিক এই সময় আহমদ মুসা পেছনে পায়ের শব্দ পেয়ে পেছনে ফিরল। দেখল উদ্যত রিভলবার হাতে একটি মেয়ে। তার পিস্তলের নল আহমদ মুসার কপাল ছুই ছুই করছে। বলল মেয়েটি কে আপনি? কোন পক্ষের?

মেয়েটি এলিসা গ্রেস।

ব্ল্যাক ক্রসের লোকদের সাথে লড়াই করতে দেখেও তাদের মারতে দেখেও যখন আপনি এই প্রশ্ন করেছেন, তখন আমি নিশ্চয় আপনার পক্ষের। আমি ওমর বায়াকে মুক্ত করতে এসেছি।

আহমদ মুসার কপাল থেকে মেয়েটির রিভলবার নেমে গেল। বলল, আপনি কি আহমদ মুসা?

হ্যাঁ, এ নাম জানলেন কি করে?

ওমর বায়ার কাছে শুনেছি। শুনেছি, তাকে উদ্ধার করতে আপনিই আসতে পারেন।

ওমর বায়া কোথায়?

এই তো উনি আসছেন।

ওমর বায়া বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

আহমদ মুসা ও ওমর বায়া সালাম বিনিময় করে একে ওপরকে জড়িয়ে ধরল। কেঁদে উঠল ওমর বায়া।

আহমদ মুসা ওমর বায়ার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, এই সংগ্রামের নামই তো জীবন।

এই সময় গেটের দিক থেকে অব্যাহত গুলীর শব্দ ভেসে এল। ওরা এগোচ্ছে।

আহমদ মুসা স্টেনগান তুলে ওদের দিকে এক পশলা গুলী বৃষ্টি করল।

ভাই জান আমি পালানোর একটা ব্যবস্থা করেছি। ওদের সংখ্যার কাছে আমরা দাঁড়াতে পারব না। চলুন আমরা যাই।

কোন পথে স্টেনগান থেকে গুলী করতে করতেই জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা?

গেট থেকে যারা অগ্রসর হচ্ছিল তারা শুয়ে পড়েছে। ওদের সামনে অগ্রসর হওয়া বন্ধ হয়েছে।

এই চত্বর থেকে সাগরে নামার একটা গোপন পথ আছে। সেখানে আছে একটা গোপন জেটি। মি. লিটল পথ চেনে। আমি একটা বোটের ব্যবস্থা করেছি।

ধন্যবাদ বোন। মি. লিটল কে?

সে এই বাংলোর একজন পরিচালক। এখনকার একজন পুরানো লোক।

গোপন জেটিতে নামার পথ কোথায়?

সামনে সুইমিং পুলের ঐ যে টাওয়ার। টাওয়ারের গোড়ায় নিচে নামার একটা সিঁড়ি আছে। সিঁড়ি দিয়ে নামলে কিছু টয়লেট ও ভিডিও গেম স্টল। এখানকার একটা গোপন কক্ষ থেকে একটা সিঁড়ি নেমে গেছে জেটিতে। লিটল চেনে। সে এখন টাওয়ারের নিচে অপেক্ষা করছে।

গার্ড নেই?

গার্ড নেই। তবে জেটিতে ঢোকার যে দরজা সেটার লক দূর নিয়ন্ত্রিত। কোন চাবি দিয়ে ওটা খোলা যাবে না। ভাঙতে হবে। ওটাই এখন প্রধান সমস্যা।

আপনারা প্রস্তুত?

জি, হ্যাঁ। বলল, এলিসা গ্রেস।

সংগে সংগেই আহমদ মুসা স্টেনগান তুলে গুলী করল চত্বরের লাইট পোস্টের বাল্ব লক্ষ্যে। তারপর ভেঙে দিল সুইমিং টাওয়ারের বাল্বগুলোও।

ওমর বায়ার বাংলোর আলো আগে থেকেই নেভানো ছিল।

গোটা এ দিকটা অন্ধকারে ঢেকে গেল।

আহমদ মুসা দেখল, গেটের দিক থেকে এগিয়ে আসায়ে ওরা দু'ভাগ হয়ে এক ভাগে দক্ষিণের বাংলো এবং অন্য ভাগ উত্তরের বাংলোর দিকে এগোবার উদ্যোগ নিচ্ছে। ঠিক এই সময় আরও কয়েকজন এসে সেই গেটে দাঁড়াল। আহমদ মুসা বুঝল, ওরা পাশের দু'বাংলোর কভার নিয়ে দু'পাশ ও সামনে এই দিক থেকেই আহমদ মুসাদের ঘিরে ফেলতে চায়।

ওদের এই উদ্যোগে বাঁধা দেয়ার জন্যে আহমদ মুসা লাইট মেশিনগান পেতে দিয়ে ওমর বায়া ও এলিসা গ্রেস কে বলল, তোমরা গড়িয়ে গিয়ে টাওয়ারের নিচে নেমে যাও। আমি ওদের দেখছি।

আপনি? বলল, এলিসা।

আমি ওদের কিছুটা পিছু হটিয়ে দিয়ে আসছি।

বলেই আহমদ মুসা তার লাইট মেশিনগান থেকে গুলী বৃষ্টি শুরু করল।

আহমদ মুসা আড়াল নিয়ে গুলী করছে। ওদের আড়াল নেয়ার কিছু নেই। আর ওদের অবস্থান তখন পুরোপুরি লাইট মেশিনগানের আওতায়।

আহমদ মুসার লাইট মেশিনগান ব্যবহার খুবই কার্যকরী হলো।

ওরা দ্রুত পিছু হটল। যারা দু'পাশের বাংলোর দিকে যাচ্ছিল, তারাও দৌড় দিল গেটের দিকে।

আহমদ মুসা গুলী বন্ধ করে দ্রুত ক্রলিং করে এগোলো টাওয়ারের দিকে।

টাওয়ারের সিঁড়ি মুখেই দাঁড়িয়ে ছিল ওমর বায়া। আহমদ মুসা তাকে নিয়ে দ্রুত নিচে গেল। যাওয়ার সময় সিঁড়ি মুখের দরজা লক করে গেল।

তারা নামতেই এলিসা গ্রেস ডাকল।

সে দাঁড়িয়ে ছিল পশ্চিম প্রান্তের একটা খোলা দরজার সামনে।

আহমদ মুসা ও ওমর বায়া দৌড় দিয়ে সেখানে পৌছল।

এলিসা গ্রেস ঘরের দিকে ইংগিত দিয়ে তার বিপরীত দিকের একটা দরজা দেখিয়ে বলল, ওটা খুললেই জেটির সিঁড়ি। লিটলকে পাঠিয়েছি জেটি মুখের তালা ভাঙার জন্যে।

এই সময় ওপরের চত্বরে অব্যাহত গুলী বৃষ্টির শব্দ শুনতে পেল তারা।

চল তাড়াতাড়ি। ওরা সম্ভবত বুঝতে পেরেছে। অল্পক্ষনের মধ্যেই এসে পড়বে। জেটিতে বোট কখন আসবে? বলল, আহমদ মুসা।

এলিসা গ্রেস দ্রুত ঘড়ির দিকে চেয়ে বলল, এতক্ষণে এসে গেছে। জেটি থেকে একটু দূরে অপেক্ষা করবে, সিগন্যাল দিলেই এসে ভিড়বে।

প্রায় মাথার ওপরেই এ সময় গুলীর শব্দ হলো। ওরা তাহলে টাওয়ারের গোড়ায় এসে গেছে

ওমর বায়া ও এলিসা গ্রেসের মুখে ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল।

তোমরা নেমে যাও। আমি এ দরজায় আছি। ওদের লক্ষ্য করে বলল আহমদ মুসা।

ওমর বায়া ও এলিসা দ্রুত নিচে নেমে গেল।

টাওয়ারের গোড়ায় তখন অব্যাহত গুলীর শব্দ হচ্ছে। গুলীর শব্দ নিচে নেমে আসছে। আহমদ মুসা নিশ্চিত হলো, ওরা দরজা ভেঙে সিঁড়ি দিয়ে নামছে।

আহমদ মুসা স্টেনগান বাগিয়ে জেটিতে নামার সিঁড়ি মুখের দরজায় বসল। তার মাথা ছাড়া পেছন দিকটা সিঁড়িতে। অন্ধকারের কারণে সামনের করিডোর থেকে তার মুখও দেখা যাবে না।

মূহুর্ত কয়েক পরেই গুলী করতে করতে নেমে এল ওরা একদল। সাত আটজন।

নেমেই ওরা এগোলো আহমদ মুসা যেখানে বসে অপেক্ষা করছে সেই ঘরের দিকে। সমানে তারা গুলী করছে।

এবার ট্রিগার টিপল আহমদ মুসা। কয়েক সেকেন্ড ধরে গুলী বৃষ্টি করল তার স্টেনগান। যারা করিডোরে নেমেছিল তারা কেউ বাঁচল না।

আহমদ মুসা এবার দ্রুত নামল সিঁড়ি দিয়ে এবং ছুটল সিঁড়ির জেটির গেটের উদ্দ্যেশে।

বিশাল গেট।

আহমদ মুসা সেখানে পৌছে দেখল সবার মুখ ভয়ে ফ্যাঁকাসে হয়ে গেছে। এলিসা গ্রেস বসে পড়েছে মেঝেতে অসহায়ভাবে। তীক্ষ্ণ মুখ বিশিষ্ট শাবল দিয়ে গেটের তালা ভাঙার চেষ্টা করছে হস্তি দেহ লিটল।

আহমদ মুসা পৌছতেই এলিসা গ্রেস উঠে দাঁড়িয়ে বলল, সর্বনাশ দূর নিয়ন্ত্রিত এ লক খোলা যাবে না।

আবার ওপরে শোনা গেল স্টেনগানের অব্যাহত গুলীর শব্দ। মনে হলো ওরা টাওয়ারের নিচের করিডোর দিয়ে জেটিতে নামার সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছে।

এবার ভয়ে লিটলেরও হাতুড়ি থেমে গেছে। কাঁপতে কাঁপতে এলিসা গ্রেস বসে পড়ল আবার মেঝেতে।

আহমদ মুসার মুখে হাসি ফুটে উঠল। বলল, তোমরা ভয় করছ কেন? ব্ল্যাক ক্রসের কয়েকটা স্টেনগানের চেয়ে কি আল্লাহর শক্তি বড় নয়?

বলে আহমদ মুসা এগোলো সেই লকের দিকে।

লকটা পরীক্ষা করে বুঝল এটা কোন জটিল লক নয়। কোন প্রকারে লকের হুকটা সরিয়ে দিতে পারলেই দরজা খুলে যাবে।

আহমদ মুসা তার ডান হাতের মধ্যমা ধীরে ধীরে গোটা লকের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিল।  কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল গোটা লক। আর সংগে সংগেই দরজা শিথিল হয়ে গেল।

হাত দিয়ে দরজা টেনে ফাঁক করল আহমদ মুসা।

লাফিয়ে উঠল এলিসা গ্রেস। তার এবং লিটলের চোখে ভূত দেখার মত বিস্ময়।

গুলীর শব্দ কাছে চলে এসেছে। জেটিতে নামার সিঁড়ি পেরিয়ে এসেছে ওরা।

আহমদ মুসা দ্রুত ওদের জেটিতে চলে যাবার নির্দেশ দিয়ে এলিসা গ্রেসকে বলল, আপনার বোটকে দেখুন। আমাদের হাতে সময় নেই।

সবাই চলে গেল জেটিতে।

আহমদ মুসা কাঁধ থেকে স্টেনগান নামিয়ে হাতে নিল। দরজা টেনে দিয়ে সামান্য খোলা রেখে তার সামনে একটা ক্রেন টাওয়ারের কভার নিয়ে বসল সে।

অল্পক্ষনের মধ্যেই দরজার ওপাশটা গুলীতে ভরে গেল। অবিরাম গুলীর আঘাতে স্টিলের দরজা অদ্ভূত এক বাদ্যযন্ত্রের রূপ নিল।

আহমদ মুসা কোন গুলী করল না।

কিছুক্ষণ গুলী করার পর ওদের কয়েকজনকে এক সাথে ছুটে আসতে দেখা গেল।

আহমদ মুসা ধীরে সুস্থে ওদের তাক করল। ট্রিগারে চাপ দিল আঙুল দিয়ে। ছুটে গেল এক পশলা গুলী ওদের দিকে।

দরজার কয়েক হাত দূরে ওরা আছড়ে পড়ল স্টিলের মেঝের ওপর।

কয়কজন ছুটে আসছিল। ওরা শুয়ে পড়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পিছু হটে গেল।

গুলী বন্ধ করল আহমদ মুসা। কিন্তু ওদের তরফ থেকে গুলী আসছে অবিরাম।

আহমদ মুসা ভাই, আসুন। সব রেডি। চাপা চিৎকার করে বলল ওমর বায়া।

আহমদ মুসা পেছন দিকে একবার চাইল। আবার সামনে তাকিয়ে আরও এক পশলা গুলী বর্ষণ করল। তারপর পিছন ফিরে ছুটল বোটের দিকে।

সবাই উঠেছে বোটে। বেশ বড় বোট।

আহমদ মুসা যখন বোটে উঠছিল তখন ওদের গুলীর আওয়াজ অনেকটা নিকটবর্তী মনে হলো। আহমদ মুসা ভাবল ওরা গুলী করতে করতে জেটির গেট পার হয়ে ছুটে আসছে।

আহমদ মুসা বোটে উঠার সংগে সংগে বোট ছেড়ে দিয়েছে। বোটের আলো নেভানো।

আহমদ মুসা বোটের চেয়ারে গা এলিয়ে চোখ বন্ধ করে রেষ্ট নিল কিছুক্ষণ।

তারপর চোখ খুলল।

বোট চালাচ্ছিল বিশ বাইশ বছরের এক তরুন। আহমদ মুসার অচেনা।

এছাড়া বোটে আরও চারজনকে দেখল। একজন ওমর বায়া, অন্যজন এলিসা গ্রেস। তৃতীয় জন একটি তরুনী। এলিসা গ্রেসের গা ঘেঁষে বসে আছে। মাথা নিচু করে বসা। চিনতে পারল না আহমদ মুসা। চতুর্থ জন বিশাল বপু লিটল।

পেছনে ফেলে আসা ব্ল্যাক ক্রসের জেটি এবং চারদিকে একবার চেয়ে আহমদ মুসা এলিসা গ্রেসকে লক্ষ্য করে বলল, ধন্যবাদ আপনাকে, সুন্দর ব্যবস্থা আপনি করেছেন। এমন পরিকল্পনার জন্যে আপনাকে আবার ধন্যবাদ।

ধন্যবাদ পাওয়া উচিত লিটলের। সেই আমাকে এ বুদ্ধি দিয়ে সাহায্য করেছে। সাহসও দিয়েছে। আর এই পিয়েরা পেরিন এবং সাহায্য না করলে কিছুই করতে পারতাম না।

ওদেরকেও ধন্যবাদ। বলে একটু থেমে আবার জিজ্ঞেস করল এলিসা গ্রেসকে, কোথায় যাচ্ছি আমরা?

পিয়েরা পেরিন নামক তরুনী মুখ তুলল। আহমদ মুসার সাথে চোখাচোখি হলো।

আপনি? বলল আহমদ মুসা। তার কন্ঠে বিস্ময়!

জি আমি। ছোট্ট করে বলল মেয়েটি।

আপনারা পরস্পরকে চেনেন? কেমন করে? বলল এলিসা গ্রেস।

আমি তো ওদের রেস্টুরেন্টেই কয়েকদিন খানা খেয়েছি। ব্ল্যাক ক্রস তো আমাকে ওখান থেকেই ধরে নিয়ে আসে।

সেটা শুনেছি। তাহলে সেই আপনি? এলিসা গ্রেস বলল।

মিস পিয়েরাও আমাকে তার মুসলিম বংশোদ্ভূত একজন বান্ধবীর কথা বলেছিলেন, তাহলে সেই আপনি? এলিসা গ্রেসকে লক্ষ্য করে বলল আহমদ মুসা।

পিয়েরা জবাব দিল জি হ্যাঁ।

তাহলে মিস এলিসা গ্রেস আপনার মা মুসলিম ছিলেন?

এলিসা গ্রেস মাথা নেড়ে তার মা ও তার নানীর কথা বলল। তারপর জানাল, পিয়েরা আমার কথা বলেছে কিন্তু তার কথা বলে নি। তার দাদাও একজন একজন আলজেরীয় মুসলিম পিতার সন্তান।

ঠিক। কিন্তু সেই শিকড়ের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি সব ভুলে গেছি। বলল পিয়েরা।

শিকড় থেকে কেউ বিচ্ছিন্ন হতে পারে না, বিশেষ করে মুসলিমরা। আমি পারিনি। তুমিও তো পারলে না। যদি পারতে তাহলে জীবন বিপন্ন করে কেন এসেছ ওমর বায়াকে সাহায্য করতে?

হয়তো হবে। আমি আমাকেই জানি না। এটা ঠিক যে, একে যখন রেস্টুরেন্টে মুসলিম বলে জানলাম এবং যখন মি. ওমর বায়া মুসলিম হওয়ার কথা তোমার কাছে শুনলাম, তখন আমার যে আনন্দ হয়েছিল তার সাথে অন্য কোন আনন্দের তুলনা চলে না।

আপনারা দু'জনে আমার হৃদয়ের একান্ত শুভেচ্ছা গ্রহন করুন। নিজের বোনকে অনেকদিন পরে কাছে পেলে যে আনন্দ হয়। আপনাদের দেখে সে আনন্দই আমার হচ্ছে। বলল, আহমদ মুসা এলিসা গ্রেস ও পিয়েরাকে লক্ষ্য করে।

এলিসা গ্রেস ড্রাইভিং সিটে বসা তরুনের দিকে চেয়ে বলল, ও লুই ডোমাস। খাস ফরাসি। ও পিয়েরার বন্ধু।

বলেই পিয়েরার দিকে চেয়ে বলল, নাকি আরও কিছু পিয়েরা?

তোমার মুখে কিছু বাধে না। এটা কি সময় এসব বলার? আমি বলব তোমার কথা? যাক ওমর বায়াকে আমি লজ্জায় ফেলতে চাই না।

এলিসা গ্রেসের মুখ লাল হয়ে গেছে। ওমর বায়া তার মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে।

আহমদ মুসার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল। সে এলিসা গ্রেস ও ওমর বায়ার দিকে এক পলক চেয়ে ড্রাইভিং সিটে বসা তরুনের দিকে চেয়ে বলল, ওয়েলকাম ব্রাদার লুই ডোমাস। আমি খুব খুশি হয়েছি তোমাকে দেখে।

ধন্যবাদ স্যার। আপনার পরিচয় এলিসার কাছে শুনলাম। গর্ববোধ করছি আপনার পাশে বসতে পেরে। আমার জীবনে এটা সবচেয়ে স্মরণীয় দিন হবে।

তোমার জীবন সুন্দর হোক ডোমাস। বলে আহমদ মুসা পিয়েরার দিকে চেয়ে বলল কোথায় যাচ্ছি আমরা বোন।

পিয়েরা সামনের দিকে চেয়ে বলল, আর মাইল খানিক পরে আমরা একটা প্রাভেট জেটিতে নামব। সেখানে আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সেই গাড়িতে করে আমরা আমার বাড়িতে উঠব। ছোট ফ্ল্যাট, কষ্ট হবে আপনাদের। কিন্তু আমি খুশি হব।

আমাদের জন্যে ও এটা খুশির খবর। কিন্তু এই বিপদে জড়ানো কি তোমার ঠিক হবে। এলিসা গ্রেসকে তো বাধ্য হয়ে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে।

এলিসার জড়িয়ে পড়া আর আমার জড়িয়ে পড়া একই কথা। তাছাড়া আমাদের পাড়াটা নিরাপদ। এলিসারও বাড়ি সেখানে। এই পাড়ায় আলজেরিয়া বংশোদ্ভূত অনেকগুলো পরিবার আছে।

তাহলে পিয়েরা ঐ পাড়ায় বিপদ ডেকে আনা ঠিক হবে না। বিনা কারনে, বিনা অপরাধে অনেক পরিবার বিপদে জড়িয়ে পড়তে পারে।

ব্ল্যাক ক্রস মনে করতে পারে আমার প্রতি, ওমর বায়ার প্রতি সকলের সহযোগিতা আছে।

তাহলে?

বলে পিয়েরা একবার এলিসা গ্রেস এবং একবার লুই ডোমাসের দিকে তাকাল।

কোন খালি বাড়ি বা কোন রেস্টহাউজ নেই, যেখানে গিয়ে আপাতত উঠা যায়?

একটা রেস্টহাউজ আছে চার পাঁচটা ঘর। নাম লা আটলান্টিক। একটা ছোট টিলার ওপরে সাগরের তীরে। একদম নির্জন। পর্যটকদের খুব প্রিয় জায়গাটা। কিন্তু ভাড়াটা অত্যন্ত বেশী।

খালি আছে? খুশি হয়ে বলল, আহমদ মুসা।

খালি থাকার কথা। সন্ধ্যা রাতেও খালি ছিল।

ধন্যবাদ লুই ডোমাস। আপাতত ঐখানেই আমরা উঠব।

লুই ডোমাস মাথা ঝুকিয়ে সায় দিয়ে সামনের দিকে নজর দিল।

ঘড়ির দিকে একবার তাকাল।

বোটের স্পীড বাড়িয়ে দিল সে।

# ৭

শুয়ে পড়লেও আহমদ মুসার ঘুম এলো না চোখে।

কেমন একটা অস্বস্তি মনে।

উঠে বসল। বসেও ভাল লাগল না। উঠে ব্যালকনিতে এল সে। দু'তলার ব্যালকনি। পশ্চিম দিকে দিগন্ত বিস্তৃত আটলান্টিক। সত্যিই সুন্দর এই রেস্ট হাউসটা।

উপরে চারটা বেড রুম, নিচের তলায় চারটা।

গোটা ওপর তলাটাই দখল করেছে আহমদ মুসারা।

এক রুমে মশিয়ে লিটল। অন্য রুমে ওমর বায়া এবং লুই ডোমাস। তৃতীয় রুমটিতে এলিসা গ্রেস এবং পিয়েরা পেরিন এবং অন্যটিতে আহমদ মুসা।

সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। রাত তখনও অনেকটা বাকি।

আহমদ মুসার ঝুলন্ত ব্যালকনি থেকে পশ্চিম, দক্ষিণ উত্তর তিন দিগই দেখা যায়।

আটলান্টিকের অন্ধকার সৌন্দর্যে চোখ আটকে গিয়েছিল আহমদ মুসার। চাঁদ বিহীন রাতের তারকা খচিত অন্ধকার আকাশ যেমন আহমদ মুসার ভালো লাগে, তেমনি ভালো লাগে রাতের অন্ধকার সমুদ্র। এ অন্ধকার সমুদ্রে আকাশের গভীরতা তো আছেই, তার সাথে আছে সমুদ্রের সরব কথা বলা। অন্ধকার থেকে উঠে আসা এ কথাকে অনন্তের একটা কন্ঠ বলে আহমদ মুসার মনে হয়। এর যে কত অর্থ করা যায়, কত যে মহাকাব্য রচনা করা যায়।

হঠাৎ উত্তর থেকে ভেসে আসা গাড়ির হর্নে চমকে উঠে আহমদ মুসা উত্তর দিকে তাকাল।

কিছুই দেখতে পেলনা।

কিছুক্ষণ নিরবতা।

তারপর সেই হর্ন আবার বেজে উঠল। পরপর দু'বার। সেই সাথে টিলার নিচের সমভূমিতে একটি গাড়ির হেডলাইট দেখতে পেল আহমদ মুসা। গাড়ীর গতি টিলার দিকেই।

গাড়িটির হর্ন এই দ্বিতীয় বার শোনার সাথে সাথেই আহমদ মুসার গোটা দেহ প্রবল এক উষ্ণ স্রোত বয়ে গেল।

ব্ল্যাক ক্রসের গাড়ি? আসছে এই রেস্ট হাউসের দিকে?

সংগে সংগেই আহমদ মুসার মনে হলো যেমন করে তার সন্ধান পেয়েছিল ওরা, সেভাবেই কি এখানকার সন্ধান ওরা পেল? তাহলে ওমর বায়া কিংবা এলিসার পোশাক পরিচ্ছদ বা অন্য কোন কিছুতে ট্রান্সমিটার চীপ সেট করা আছে?

আর ভাবতে পারল না আহমদ মুসা।

ব্ল্যাক ক্রসের গাড়ী দ্রুত ঢাল বেয়ে উঠে আসছে টিলার শীর্ষে অবস্থিত রেস্ট হাউসের দিকে।

আহমদ মুসা ছুটল তার ঘরের দিকে। ঘুমাবার পোশাক পাল্টাবার সময় নেই। তাড়াতাড়ি সে স্টেনগান ও রিভলবারটা তুলে নিয়ে ছুটল নিচে। ব্ল্যাক ক্রসকে কিছুতেই রেস্ট হাউসে ঢুকতে দেয়া যাবে না। এখানে এসে একবার ওরা ভেতরে ঢুকতে পড়তে পারলে ওদের ঠেকানো কঠিন হবে সুতরাং আগেই ঠেকাতে হবে ওদের।

নেমে গেল আহমদ মুসা নিচে।

কেউ জেগে নেই।

আহমদ মুসা গাড়ী বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

রেস্ট হাউসের একটি মাত্র গেট সেটা উত্তর দিকে। নিচে উপত্যকা থেকে এঁকে বেঁকে উঠে আসা রাস্তা গেটে এসে ঠেকেছে। গেটটা বড় এবং মজবুত।

একজন সার্বক্ষণিক দারোয়ান থেকে গেটে।

সব সময় সকল মেহমানের জন্যেই গেট খোলা। সুতরাং কেউ চাইলে সংগে সংগেই গেট খুলে দেয়া হয়।

আহমদ মুসা একবার মনে করল গেটম্যান নিষেধ করবে খুলতে। কিন্তু তার আর সময় হলো না। ওরা এসে গেছে।

আহমদ মুসা চারদিকে তাকিয়ে গাড়ি বারান্দার দক্ষিণ দিকে পশ্চিম প্রান্ত ঘেঁষে পাথরের উঁচু প্লাটফর্মের ওপর একটা ভাস্কর্য দেখতে পেল।

আহমদ মুসা ছুটে গিয়ে ভাস্কর্যের বেদির আড়ালে বসল।

খুশি হলো আহমদ মুসা। সেখানে বসে গেট থেকে গাড়ি বারান্দা পর্যন্ত গোটা রাস্তা এবং গাড়ি বারান্দা থেকে রেস্ট হাউসের রিসিপশন পর্যন্ত সবটুকু জায়গা পরিষ্কার নজরে পড়ছে।

রেস্ট হাউসের বাইরের সেই গেটটা খুলে যেতে দেখল আহমদ মুসা।

গেট দিয়ে এক এক করে ভেতরে প্রবেশ করল ওরা সাত জন লোক।

গাড়ি ভেতরে না নেয়া থেকে আহমদ মুসা বুঝল, ওরা দ্রুত কাজ সেরে ফিরতে চায়।

সাত জনের হাতেই স্টেনগান।

আহমদ মুসাদের গাড়ি গেটের ভেতরে গাড়ি পার্কিং এ দাঁড়িয়ে ছিল।

এই সময় একজন বাইরে গেল। পরক্ষনেই পাজাকোলা করে কাউকে এনে ফেলে দিল গেটের ভেতরে। লোকটি দারোয়ান। তার হাত পা বেঁধে ফেলা হয়েছে।

যে লোকটি তাকে বাইরে থেকে নিয়ে এল সেই তাকে আহমদ মুসাদের গাড়ির দিকে ইংগিত করে কি যেন জিজ্ঞেস করল।

তারপরেই সেই লোকটি পকেট থেকে সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল বের করে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। গাড়ির সামনের দু'টি চাকায় গুলী করে ফুটো করে দিল।

আহমদ মুসা ভাবল, এই লোকটিই সম্ভবত দলের সর্দার।

গাড়ির চাকা ফুটো করে দেয়ার পরই তারা একসাথে দ্রুত বিড়ালের নিঃশব্দে ছুটে এল গাড়ি বারান্দার দিকে।

আহমদ মুসা মনে মনে খুবই কষ্ট পেল ওদের অসহায়ত্ব দেখে।

একটা ব্রাস ফায়ারে ওরা সবাই শেষ হয়ে যাবে।

আহমদ মুসার স্টেনগানটা উঠতে চাইল না। এই ভাবে মানুষ হত্যায় তার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠে। যদিও জানে এদের না মারলে ওরাই মারবে তবুও।

ওরা সবাই গাড়ি বারান্দায় এসে পৌঁছেছে।

আহমদ মুসা ভাস্কর্যের পেছনে উঠে দাঁড়াল। তারপর ওদের উদ্দেশ্য করে বলল, তোমরা ধরা পড়ে গেছে। ঘেরাও হয়েছ তোমরা। স্টেনগান ও রিভলবার মাটিতে ফেলে ..................।

আহমদ মুসার কথার শব্দ পেতেই ওরা সাঁ করে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল আহমদ মুসার দিকে। সংগে সংগেই স্টেনগানের ব্যারেল উঁচু হয়েছে তাদের। গুলীর বৃষ্টি ছুটে এল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা সে গুলীর স্রোতের মধ্যে কথা শেষ না করে বসে পড়ল। ভাস্কর্যের আড়ালে না থাকলে আহমদ মুসার দেহ ঝাঁঝরা হয়ে যেত। ভাস্কর্যের গায়ে লেগে ছিটকে পড়া বুলেটের স্তূপ গড়ে উঠল ভাস্কর্যের গোড়ায়।

আহমদ মুসা বসে পড়েই স্টেনগান চালাল ওদের লক্ষ্য করে। ওপক্ষের গুলীতে কিছুটা ছেদ পড়ল।

সংগে সংগে আহমদ মুসা চকিতে ওদিকে একবার তাকিয়ে স্টেনগানের ব্যারেল কিছুটা ঘুরিয়ে নিল। গাড়ী বারান্দায় কোন আড়াল নেই। গাড়ী বারান্দা থেকে রিসেপশনে ঢুকার আগে আড়াল পাওয়ার কোন উপায় নাই।

আহমদ মুসার গুলির মুখে ওরা সেই চেষ্টাই করেছিল। কিন্তু গুলী তাদের রেহাই দেয় নি। গাড়ী বারান্দা ও রিসেপশনের দরজা পর্যন্ত ৬টি লাশকে আহমদ মুসা পড়ে থাকতে দেখল।

আরেকজন কোথায়? চমকে উঠল আহমদ মুসা।

সংগে সংগে সে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

দেখল, একজন সাপের মত এগিয়ে আসছে ভাস্কর্যের দিকে। সে এসে পৌছে গেছে ভাস্কর্যের গোড়ায় পাথরের প্ল্যাট ফরমের কাছে।

আহমদ মুসা নিঃশব্দে পাথরের প্ল্যাট ফরমটির ওপর উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল নিচে ব্ল্যাক ক্রসের লোকটির ওপর।

ঝাঁপিয়ে পড়েই আহমদ মুসা তার হাতের পিস্তল কেড়ে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল।

লোকটি প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে আহমদ মুসাকে গায়ের ওপর থেকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে প্রবল বেগে উঠে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা ছিটকে পড়ে গেল।

লোকটা ব্ল্যাক ক্রসের এই অভিযানের নেতাই হবে। এই লোকটাই আহমদ মুসাদের গাড়ির টাওয়ার ফুটো করে দিয়েছিল এবং ব্ল্যাক ক্রসের লোকদের সামনে এগোবার সময় এই লোকটিই নেতৃত্ব দিয়েছিল।

লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল আহমদ মুসার ওপর।

আহমদ মুসা গড়িয়ে সরে গেল।

লোকটার বিশাল বপু আছড়ে পড়ল মাটিতে।

আহমদ মুসা গড়িয়ে সরে গিয়েই উঠে দাঁড়াল।

লোকটা শুয়ে থেকেই একটু গড়িয়ে এসে চোখের পলকে দু'টি পা ছুড়ে মারল আহমদ মুসার দুই পা লক্ষ্যে।

আকস্মিক এই আঘাতে গোড়া কাঠা গাছের মত পড়ে গেল আহমদ মুসা।

উঠে দাঁড়িয়ে ছিল লোকটা। সে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল আহমদ মুসার ওপর।

লোকটা এসে পড়ার আগেই আহমদ মুসা তার দু'টি পা বুকের কাছে গুটিয়ে নিয়েছিল। লোকটা গায়ের ওপর এসে পড়ার সংগে সংগেই আহমদ মুসা পা দু'টি দিয়ে তাকে ছুড়ে ফেলল।

উল্টে গিয়ে আহমদ মুসার পেছনে পড়ে গেল লোকটা।

উঠে দাঁড়িয়েছিল আহমদ মুসা।

লোকটা পড়ে গিয়েই এবার রিভলবার বের করল। কিন্তু রিভলবার তাক করার আগেই আহমদ মুসা লাথি ছুড়ল তার রিভলবার ধরা হাত লক্ষ্যে।

ছিটকে পড়ে গেল লোকটার হাত থেকে রিভলবার।

আহমদ মুসা ছুটে গিয়ে তুলে নিল তার রিভলবার।

কিন্তু রিভলবার নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই দেখল আহমদ মুসা, লোকটার হাত উদ্যত হয়েছে একটা ছুরি ছুড়ে মারার জন্যে।

আহমদ মুসা তাকে সে সুযোগ আর দিল না। ট্রিগার টিপল রিভলবারের। একটা বুলেট গিয়ে তার কপাল ফুটো করে ঢুকে গেল।

অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ে গেল লোকটা।

আহমদ মুসা সে লাশের দিকে একবার তাকিয়ে ফিরে দাঁড়াল এবং চলল রেস্ট হাউসের দিকে।

রেস্ট হাউসের ল্যান্ড লেডি মহিলাসহ ওমর বায়ারা পাঁচজন এসে দাঁড়িয়েছে রিসেপশন কক্ষের দরজার বাইরে।

ভয়ে, বিস্ময়ে তাদের চোখ ছানাবড়া। ফ্যাকাসে হয়ে তাদের সবার মুখ। আহমদ মুসা নিকটবর্তী হতেই ল্যান্ড লেডি বৃদ্ধা মহিলাটি চোখ কপালে তুলে বলল, এসব কি? এরা কারা?

হয়তো ডাকাত হবে।

দারোয়ান কোথায়?

গেটের কাছে দারোয়ানকে বেঁধে ফেলে রেখেছে।

তুমি বৎস খুব সাহসী। এতগুলো ডাকাতকে সামাল দিয়েছ। থামল একটু। তারপর আবার বলা শুরু করল, তুমি দেখছি নাইট ড্রেস পরেই বেরিয়েছ। টের পেলে কি ভাবে।

ইশ্বর সাহায্য করেছেন।

‘কিভাবে?’ বিস্ময় ল্যান্ড লেডির চোখে-মুখে।

আহমদ মুসা বলল সব কাহিনী। শেষে বলল, ‘আমাদের এখনি চলে যেতে হবে।’

‘কেন? কেন?’

‘আমি তো ডাকাতদের মেরেছি। ওদের সাথীরা আমাদের ওপর চড়াও হতে পারে।’

‘তুমি ফরাসী পুলিশের ওপর আস্থা রাখ না? তাছাড়া পুলিশকে এদের কথা বলবে কে, তুমি ছাড়া?’

‘দারোয়ান আমার চেয়ে বেশি জানে। আপনি বিল রেডি করুন ম্যাডাম।’

বলে আহমদ মুসা ওমর বায়াদের বলল, ‘তোমরা তৈরি হও। এখনি বেরুতে হবে।’

আহমদ মুসারা সবাই ওপরে উঠতে লাগল।

আহমদ মুসা ভাই আমার জন্যে আপনার এত কষ্ট। সহ্য হচ্ছে না আমার।’ উঠতে উঠতে বলল ওমর বায়া।

আহমদ মুসা থমকে দাঁড়াল। সবাই দাঁড়াল তার সাথে।

আহমদ মুসা তাকাল ওমর বায়ার দিকে। বলল, ‘একজন মুসলমানের মত কথা বল ওমর বায়া। জীবনটাই একটা সংগ্রাম। এ সংগ্রামে হাসি আছে কান্নাও আছে।’

‘স্যরি।’ বলল ওমর বায়া।

‘ওরা কারা জনাব? সত্যিই ডাকাত?’ বলল এলিসা গ্রেস।

‘না, ব্ল্যাক ক্রস।’

‘ওরা কি আবার হামলা করতে আসবে এখানে?’

‘না। কারণ আমরা চলে যাচ্ছি।’

পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে বেরিয়ে এল সবাই।

রিসেপশনে দাঁড়িয়েছিল ল্যান্ড লেডি।

আহমদ মুসা যেতেই একটা স্লিপ তুলে দিল আহমদ মুসার হাতে।

আহমদ মুসা নজর বুলিয়ে দেখল, এক হাজার ফ্রাংক।

আহমদ মুসা ল্যান্ড লেডির হাতে পাঁচশ’ ফ্রাংকের তিনটি নোট তুলে দিল।

তিনটি নোটের দিকে তাকিয়েই বৃদ্ধা ল্যান্ড লেডি আকর্ণ হাসল। বলল, ‘তুমি খুব ভালো ছেলে। তোমার যেমন সাহস, তেমনি মন। তুমি ঈশ্বরকে ভালবাস, তাই না বাছা?’

‘নিশ্চয়।’

‘বেশ বেশ। খুব ভালো। আমিও গীর্জায় যাই। অনেকেই যাই না। বলে, সমস্যা বাড়িয়ে লাভ কি?’

‘অন্ধেরা তা বলবেই। ধর্মকে যারা বাদ দিয়েছে, তাদের সমস্যা শত সহস্র গুণ বেড়েছে।’ বলে আহমদ মুসা ল্যান্ড লেডিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে পা বাড়াল বাইরে বেরুবার জন্যে।

সবাই বেরিয়ে এল আহমদ মুসার সাথে।

‘আমাদের গাড়ির টায়ার তো ওরা নষ্ট করে গেছে। এক্সট্রা টায়ার তো নেই গাড়িতে।’ বলল এলিসা গ্রেস।

‘ওদের গাড়ি গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। ও গাড়িতেই আমরা যাব।’

সকলের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

গাড়িতে উঠে এল সবাই।

গাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজল আহমদ মুসা। এক টুকরো কাগজও কোথাও পেল না। এমনকি গাড়ির ব্লু বুক এবং ড্রাইভিং লাইসেন্সও না।

ড্রাইভিং সীটে উঠে বসেছিল আহমদ মুসা।

পাশেই বসেছিল লুই ডোমাস। বলল, ‘এখন আমরা পিয়েরা কিংবা আমার বাসায় যেতে পারি।’

‘এখন সিদ্ধান্ত নেয়ার একটা সময়!’ প্রথমে লুই ডোমাসের দিকে, পরে পেছনে তাকিয়ে বলতে শুরু করল আহমদ মুসা, ‘লুই ডোমাস যে প্রস্তাব দিয়েছে, সে জন্যে তাকে ধন্যবাদ। কিন্তু আমরা, মানে আমি, ওমর বায়া এবং এলিসা গ্রেস যেখানেই যাবো, সেটাই ব্ল্যাক ক্রসের টার্গেট হয়ে উঠবে ওরা জানতে পারলেই। অথচ বিপদ যত কমানো যায়, ততই ভালো। সুতরাং লুই ডোমাস কিংবা পিয়েরা যাতে ব্ল্যাক ক্রসের সন্দেহের বাইরে থাকে, এজন্যে এখন তাদের বাড়িতে ফিরে যাওয়া দরকার।’

কথাটা শুনে পিয়েরার মুখটা ছোট্ট হয়ে গেল। বলল, ‘যুক্তি হিসেবে আহমদ মুসা ভাইজানের সাথে আমি একমত। কিন্তু যুক্তিই সবকিছু নয়। আমি ও লুই ডোমাস কিছুতেই আপনাদেরকে এই অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারি না। আহমদ মুসা ভাই হলেও পারতেন না।’

‘আপনার পরিকল্পনা কি জনাব?’ বলল লুই ডোমাস।

‘আমি এখন প্যারিসে যেতে চাই। সেখানে গিয়ে পরবর্তী কার্যক্রম ঠিক করব।’

‘তাহলে আমরাও প্যারিস যাব।’ বলল পিয়েরা।

‘এখন কোথাই যাচ্ছি?’ বলল লুই ডোমাস।

‘সেটা তুমিই বলবে। আপাতত শহরের আশেপাশে বা প্যারিসের পথের ওপর কোন রেস্ট হাউসে উঠতে চাই। বিশ্রাম হবে। সেই সাথে এ গাড়ি বাদ দিয়ে অন্য কোন গাড়ি জোগাড় করতে হবে। আমার গাড়িটা পড়ে আছে পিয়েরার রেস্টুরেন্টের সামনে। ওটা আনলে নতুন কোন গাড়ি আর লাগবে না। কিন্তু তার আগে এলিসা গ্রেস ও ওমর বায়ার পোশাক পাল্টাতে হবে। আমারও। এগুলোতে ‘ওয়্যারলেস ট্রান্সমিটার চিপ’ আছে বলে আমি নিশ্চিত। এই ট্রান্সমিটার চিপই রেস্ট হাউসে ব্ল্যাক ক্রসকে ডেকে এনেছিল।’

‘আমার বাসায় এ ধরনের পোশাক পাওয়া যাবে। যাবার পথে নিয়ে যাব।’ বলে পিয়েরা একটু থেমে আবার শুরু করল, ‘আপনার সে গাড়ি ওখানে নেই। আমার বান্ধবীকে অন্য কোথাও সরিয়ে রাখতে বলেছি।’

‘ধন্যবাদ পিয়েরা। কখন করেছ এটা?’

‘আপনার গাড়ি আমি চিনতাম। আপনাকে ধরে নিয়ে যাবার পর আমার এক বান্ধবীকে দিয়ে এটা করেছি আমি।’

‘তুমি খুব বুদ্ধিমতী। তোমাকে আবার ধন্যবাদ।’

‘ওয়েলকাম ভাইজান।’

‘আমাদের এ শহর থেকে দশ মাইল দূরে ইলের নদীর তীরে প্যারিস গামী রোডের ওপরই কয়েকটা রেস্ট হাউস আছে। ওগুলোরই কোন একটিতে উঠতে পারি আমরা।’ বলল লুই ডোমাস।

‘ধন্যবাদ লুই ডোমাস। সুন্দর সিলেকশন তোমার।’

ইলের ছোট একটা নদী।

পূর্বে অল্প দূরের পাহাড় থেকে বেরিয়ে আটলান্টিকে গিয়ে পড়েছে।

সুন্দর নদী।

নদীর দু'তীরেই ট্যুরিস্ট রেস্ট হাউস। অনেকগুলো।

দুর্ভাগ্য আহমদ মুসাদের। রেস্ট হাউসগুলো একদম ফুল। উইকএন্ড হওয়ার কারণেই এই দশা।

অবশেষে তিন রেস্ট হাউসে তাদের ছয়জনের জায়গা হলো। একটিতে দুই, আরেকটিতে তিন এবং অন্যটিতে একজন।

তিনটি রেস্ট হাউসই পাশাপাশি।

দু'টি রুম যেখানে পাওয়া গেল, সেখানে থাকল এলিসা গ্রেস এবং পিয়েরা। তিন কক্ষ যেখানে পাওয়া গেল সেখানে থাকল ওমর বায়া, লুই ডোমাস ও লিটল এবং তৃতীয়টিতে থাকল আহমদ মুসা স্বয়ং।

ব্ল্যাক ক্রস প্রধান পিয়েরে পল ক্রোধে উন্মত্ত প্রায়। তার হেড কোয়ার্টারের গোটা জনশক্তিই প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে ওমর বায়াকে আটকাতে গিয়ে আহমদ মুসার হাতে। পিয়েরে পল বিশাল সভাকক্ষের বিশাল টেবিলের সামনে বসে নিজের চুল নিজেই ছিঁড়ছে যেন।

তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা অফিসার ডান্তন। তার মাথা নিচু।

'বল কি করে এত বড় ঘটনা ঘটল?'

'স্যার এর উত্তর দেবার জন্যে কোন দায়িত্বশীল অফিসার হেড কোয়ার্টারে অবশিষ্ট নেই।' মাথা নিচু রেখেই বলল ডান্টন।

'আমি বুঝতে পারছি না ডান্টন, ব্ল্যাক ক্রসের অপরাজেয় অপারেশন কমান্ডার আবে দুরুয়া-এর মত লোক তার বাছাই করা আড়াই ডজন গার্ডসহ নিহত হলো হেড কোয়ার্টারে। তবু একজন আহমদ মুসাকে ওরা প্রতিরোধ করতে

পারল না, ওমর বায়াকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলই। এমন অবিশ্বাস্য ঘটনা কিভাবে ঘটল?'

'স্যার, আমাদের লোকেরা এবং আবে দুরুয়া চেষ্টার ক্রটি করেনি। না হলে তাদের সবাইকে এভাবে জীবন দিতে হতো না।'

'গর্দভ ডান্টন, এটাই তো জ্বালার কারণ। একজন আহমদ মুসা বন্দী হয়েও এত বড় ঘটনা ঘটিয়ে চলে গেল।'

'স্যার সবাই বলে, ওর সাথে মুসলমানদের আল্লাহ স্বয়ং নাকি কাজ করেন।'

'গর্দভ, আমদের সাথে ঈশ্বর পুত্র যিশু নেই?'

'স্যার, ঈশ্বর পুত্র মানুষ মাত্র। আর ওদের সাথে খোদ ঈশ্বর আছেন। তার ওপর আমরা গীর্জায় যাই না।'

'আবার গ্রেট গর্দভ। আমি তুমি গীর্জায় যাই না, কিন্তু অনেকেই তো যায়। তাছাড়া আমরা তো বিশ্বব্যাপী যিশুর সাম্রাজ্য কায়েমেরই চেষ্টা করছি।'

এই সময় পিয়েরে পলের ইন্টারকম কথা বলে উঠল। কথা বলছে ইনফরমেশন চীফ। তার কণ্ঠ: 'স্যার এই মাত্র জানা গেল, রেস্ট হাউস লা আটলান্টিক-এ আমাদের সাতজন লোককে নিহত পাওয়া গেছে। তাদের মধ্যে আমাদের সহকারী কমান্ডার ভলতেয়ারও রয়েছে।'

থামল কণ্ঠ।

মুহূর্তে পিয়েরে পলের চোখ-মুখ আগুনের মত লাল হয়ে উঠল। গর্জে উঠল তার কণ্ঠ, 'খবর এটুকুই? আরো বলেনি যে, মুসলমানদের আল্লাহ স্বয়ং নেমে এসে ওদের হত্যা করে গেছে! যত্ত সব গর্দভ।'

পিয়েরে পলের হাতে সিগারেটের একটা পাইপ ছিল। সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। পায়চারি করতে লাগল। তার চোখ দু'টি লাল এবং চুল উস্কু-খুস্কু। উন্মত্তের মত দেখাচ্ছে তাকে।

এক সময় পাইচারি থামিয়ে ডান্টনের দিকে চেয়ে বলল, 'ডান্টন, বুঝতে পারছ, ব্ল্যাক ক্রস সত্যিই আজ দারুণ সংকটে। বলতে গেলে ব্ল্যাক ক্রসের হাত-

পা সব ভেঙে গেছে। ওমর বায়া শনির মতই আমাদের হাতে এসেছিল। শনিটাকে আবার যদি হাতে পেতাম, তাহলে গোটাই চিবিয়ে খেতাম।'

বলে পিয়েরে পল এসে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল।

'ওমর বায়া শুধু নয় স্যার, ওকুয়াই তো আমাদের এ বিপদে ফেলেছে।' ধীরে ধীরে বলল ডান্টন।

'চুপ গর্দভ, ওকুয়া তো তার স্বার্থে কিছু করছে না। যা করছে তা ঈশ্বর পুত্র যিশুর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যেই।'

পিয়েরে পলের টেলিকম আবার কথা বলে উঠল। কণ্ঠ ইনফরমেশন চীফের। তার কণ্ঠে উত্তেজনা। বলল, 'স্যার, আমাদের ওয়্যারলেস ট্রাফিক কনট্রোল জানাল, 'আমাদের সহকারী অপারেশন কমান্ডার ভলতেয়ার যে গাড়ি নিয়ে 'লা আটলান্টিক' রেস্ট হাউসে গিয়েছিল, সেই গাড়িটা মোরলেক্স গামী রোড ধরে এগিয়ে এখন ইলের নদীর তীরে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রায় ৩০ মিনিট ধরে ওয়্যারলেসের ভূ-প্রান্তিক বিমিং স্থির রয়েছে।'

'সে জায়গা কোনটা চিহ্নিত করো।' টেবিলে এক দারুন মুষ্ঠাঘাত করে বলল পিয়েরে পল।

'চিহ্নিত করা হয়েছে স্যার। গাড়িটি দাঁড়িয়ে আছে ইলের নদীর তীরে 'লা উলের' রেস্ট হাউসে।' বলল ইনফরমেশন চীফ।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল পিয়েরে পল। বলল, 'ডান্টন, তুমি গিয়ে গাড়ি রেডি কর। আমি আসছি।'

'আপনি নিজেই যাবেন স্যার?'

'আর কে আছে গর্দভ?'

দু'তিন মিনিটের মধ্যেই পিয়েরে পলের গাড়ি যাত্রা করল ইলের নদীর 'লা ইলের' রেস্ট হাউসের উদ্দেশ্যে।

পিয়েরে পলের গাড়ি যখন 'লা ইলের' রেস্ট হাউসের সামনে পৌঁছল, তখন রাত বেশ বাকি।

গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নামল পিয়েরে পল।

ঠিক 'লা আটলান্টিকে' যে গাড়িটা তাদের গিয়েছেল, সেটা দাঁড়িয়ে আছে।

পিয়েরে পল তার 'মাস্টার কি' দিয়ে গাড়িটা খুলে ভেতরে একবার নজর বুলিয়ে গাড়ির দরোজা বন্ধ করে ছুটল রেস্ট হাউসের রিসেপশনের দিকে।

রিসেপশনে বসেছিল একটি মেয়ে।

পিয়েলে পল মেয়েটির সামনে নিজের কার্ড মেলে ধরে বলল, 'গত এক ঘণ্টায় রেস্ট হাউসে কে কে এসেছে জানতে চাই।'

মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়ে একটা স্যালুট করে বলল, 'এক মিনিট স্যার বলছি।'

মেয়েটি রেজিস্টারের ওপর নজর বুলিয়ে বলল, 'এক ঘণ্টার মধ্যে এসেছে একজন নিগ্রো। নাম ওমর। হস্তি আকৃতির একজন এসেছে, নাম লিটল।' নামটা উচ্চারণ করতে গিয়ে মেয়েটি হাসল।

কিন্তু পিয়েরে পলের চোখ দু'টি জ্বলে উঠল আগুনের মত। আর নিগ্রোর নাম ওমর শুনে চোখ দু'টি তার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল বিজয়ের আনন্দে।

'গত এক ঘণ্টার মধ্যে আরেকজন তরুণ এসেছে। নাম লুই ডোমাস।' বলল রিসেপশনিস্ট মেয়েটি।

'গোল্লায় যাক তোমার লুই ডোমাস। তুমি বল, 'নিগ্রো' ওমর এবং 'লিটল' নামের লোকটি কোথায় আছে।' অধৈর্য কণ্ঠে বলল পিয়েরে পল।

'ওরা পাশাপাশি দুই কক্ষে রয়েছেন। সাত তলায়। নাম্বার ৭১৫ এবং ৭১৬।'

মেয়েটিকে ধন্যবাদটুকুও না জানিয়ে পিয়েরে পল তার পেছনের লোকদের বলল, 'তোমরা এস আমার সাথে।'

বলে পিয়েরে পল ছুটল লিফটের দিকে।

পিয়েরে পলের হাতে রিভলবার। অন্য সকলের হাতে স্টেনগান।

ওরা লিফটে উঠে গেলে রিসেপশনিস্ট মেয়েটির সহকারী কাঁপতে কাঁপতে এসে রিসেপশনিস্ট মেয়েটিকে বলল, 'পুলিশে টেলিফোন কর তাড়াতাড়ি।'

রিসেপশনিস্ট মেয়েটির মুখ ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। বলল, ‘পুলিশের বাপ ওরা। পুলিশকে বললে কোন ফল হবে না।’

‘কে ওরা?’

‘কথা বাড়িও না। কাজে যাও। ঝামেলা করলে আমাদের জানটাও যাবে।’

রিসেপশনিস্টের কথা শেষ না হতেই ব্রাস ফায়ারের শব্দে গোটা রেস্ট হাউসটাই যেন কেঁপে উঠল।

রিসেপশনিস্ট তার ফ্যাকাসে মুখ এবং চোখ ভরা আতংক নিয়ে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল।

ব্রাস ফায়ারের আবারও শব্দ হলো এবং তার পরেই লিফটের দরজা খুলে গেল। নেমে এল পিয়েরে পল।

তার পেছনে কয়েকজন স্টেনগানধারী ওমর বায়াকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে বেরিয়ে এল লিফট থেকে।

তারা দ্রুত রিসেপশন থেকে বেরিয়ে গাড়ির দিকে ছুটল।

রিসেপশন থেকে বেরিয়ে যাবার সময় পিয়েরে পল রিসেপশনিস্টকে লক্ষ্য করে বলল, ‘রিসেপশনিস্ট, কষ্ট করে তোমরা ‘লিটল’-এর লাশটা সরিয়ে ফেলো। পুলিশকে বলতে পার যে, ‘ব্ল্যাক ক্রস একজন বিশ্বাসঘাতককে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে।’

পিয়েরে পল ওমর বায়াকে নিয়ে তার গাড়িতে উঠল। বলল, ‘তোমরা সবাই এ গাড়িতে ওঠ। শুধু একজন আমাদের ঐ গাড়িটা ড্রাইভ করে পেছনে পেছনে এস।’

পিয়েরে পলের গাড়ি চলতে শুরু করল।

স্টেনগানের শব্দ থেমে যেতেই লুই ডোমাস দরজা খুলল। প্রথমে সে বুঝতে পারেনি কোন রুমে কি ঘটছে। ঘুম ভাঙার পর মনে হয়েছিল গোটা রেস্ট

হাউসই যেন বুলেটে ঝাঝরা হচ্ছে। কিন্তু পাশেই যখন কক্ষের দরজায় স্টেনগানের গুলী বৃষ্টি হলো, তখন ব্যাপারটা বুঝতে পারল সে। এরপর সে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করেছে যে, পরবর্তী আক্রমণ তার ঘরেই আসছে। কিন্তু আসেনি। স্টেনগানের গুলী থেমে যাবার পর সে ধীরে ধীরে দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে। বুদ্ধিমান লুই ডোমাস দেখল, ওমর বায়ার ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া ঘরের দরজা খোলা। ঘর খালি। ছ্যাত করে উঠল লুই ডোমাসের মন। ব্ল্যাক ক্রস আবার ধরে নিয়ে গেল ওমর বায়াকে!

লুই ডোমাস 'লিটলে'র ঘরের সামনে এসে দেখল, লিটলের ঝাঝরা হয়ে যাওয়া দেহ মেঝেতে পড়ে আছে। তার ঘরের দরজাও বুলেটে ঝাঝরা হয়ে যাওয়া।

হঠাৎ আহমদ মুসার কথা মনে হলো লুই ডোমাসের। তিনি এখানে থাকলে নিশ্চয় এই ঘটনা ঘটত না। কি বলবেন তিনি এসে দেখলে। বিশেষ করে লুই ডোমাসকে অক্ষত দেখে! সত্যি লুই ডোমাস কিছুই করতে পারেনি।

বিরাট একটা আবেগ লুই ডোমাসের বুক ফুঁড়ে আসতে চাইল। সেই আবেগে তার চোখ ফেটে এল অশ্রু।

এই সময় পাশের দু'টি ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল সৌম্য দর্শন একজন ভদ্রলোক এবং একজন তরুণী।

লুই ডোমাসকে ভাঙা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করল, 'কি ঘটেছে? ঘটনা কি?'

ভদ্রলোকের প্রশ্নে লুই ডোমাসের আবেগ আরও যেন উথলে উঠল। সে কথা বলতে পারল না। চোখে অশ্রু বেড়ে গেল।

ভদ্রলোক একটু এগিয়ে এসে ঘর দু'টির দিকে নজর বুলিয়ে লুই ডোমাসকে হাত ধরে টেনে তার ঘরে প্রবেশ করল।

তরুণীটিও তার ঘরের দরজা টেনে এ ঘরে এসে ঢুকল।

তারা সন্ধ্যায় প্যারিস থেকে সেন্ট পোল ডে লিউন যাবার পথে এখানে এসে উঠেছে। গত চারদিন আহমদ মুসার কোন খবর ডোনা পায়নি। উদ্বিগ্ন ডোনা আহমদ মুসার সন্ধানে পিতাকে নিয়ে এসেছে।

ঘরে প্রবেশ করে মিশেল প্লাতিনি চেয়ারে বসল।

ডোনা গিয়ে তার আব্বার বিছানায় বসল।

মি. প্লাতিনি লুই ডোমাসকে অবশিষ্ট চেয়ারটিতে বসতে বলল।

কিন্তু লুই ডোমাস মিশেল প্লাতিনির সৌম্য দর্শন অভিজাত চেহারার দিকে তাকিয়ে চেয়ারে বসতে গেল না। দাঁড়িয়েই থাকল।

কি ঘটেছে বল?' বলল মিশেল প্লাতিনি।

'আপনি দেখলেন, একজনকে ওরা হত্যা করে গেছে।

আরেকজনকে ধরে নিয়ে গেছে।'

'ওরা কারা?'

লুই ডোমাস মিশেল প্লাতিনির দিকে তাকাল। তার চোখে-মুখে শংকা। উত্তর দিল না প্রশ্নের।

'ভয় করো না, রেস্ট হাউস কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশকে আমি টেলিফোন করেছি। ওরা এসে যাবে।' মিশেল প্লাতিনি অভয় দিয়ে বলল।

'ওরা ব্ল্যাক ক্রস।'

'ব্ল্যাক ক্রস?' মিশেল প্লাতিনি এবং ডোনা এক সাথেই উচ্চারণ করল। তাদের চোখ-মুখেও ফুটে উঠল শংকার ছাপ।

'ব্ল্যাক ক্রসের সাথে তোমাদের কি বিরোধ? তোমরা কারা?'

'অনেক কথা স্যার।'

'বল। পুলিশকেও তো জানাতে হবে!' বলল মিশেল প্লাতিনি।

'আমরা ঘণ্টা খানেক আগে এ রেস্ট হাউসে এসে উঠেছি। আমরা পাঁচজন। তিন জন এখানে ছিলাম। দু'জন মেয়ে আছে পশ্চিম পাশের রেস্ট হাউসে এবং আরেকজন পূর্ব পাশের রেস্ট হাউসে।'

'ওদের খবর দিয়েছ?'

'না স্যার। মাথা আমার গুলিয়ে গেছে। আপনার টেলিফোন ব্যবহার করতে পারি।'

'অবশ্যই।'

লুই ডোমাস টেলিফোন করল আহমদ মুসার রেস্ট হাউসে। রেস্ট হাউসের এক্সচেঞ্জ ধরলে ১১ নং কক্ষে দিতে বলল।

কিছুক্ষণ পর এক্সচেঞ্জ জানাল, 'টেলিফোন ধরছে না।'

লুই ডোমাস অনুরোধ করল, 'খুবই জরুরি, দয়া করে ডেকে দিন। এখানে দুর্ঘটনা ঘটেছে।'

'দুর্ঘটনার কথা আমরা শুনেছি। ধরুন, ডেকে দিচ্ছি।'

অল্পক্ষণ পরেই ওপার থেকে জানাল, 'ঘরে কেউ নেই। গোলাগুলীর শব্দের পরপরই উনি বেরিয়ে গেছেন।'

টেলিফোন রেখে ধপ করে বসে পড়ল মেঝের ওপর লুই ডোমাস। উদ্বেগ ও হতাশায় ভেঙে পড়েছে সে।

'কি হলো, আরো কিছু দুঃসংবাদ?'

'সর্বনাশ হয়েছে স্যার, ঐ রেস্টুরেন্টে যিনি ছিলেন তিনিও নেই। গোলাগুলীর শব্দ পাবার পর পরই তিনি বেরিয়ে গেছেন।'

'এতে সর্বনাশের কি আছে? উনি আছেন। আসবেন। কোথাও হয়তো পালিয়ে আছেন।'

'না স্যার। দুনিয়ার সব লোক পালালেও উনি পালাতে পারেন না। আর যখন তিনি বেরিয়েছেন, তখন এখানে অবশ্যই আসতেন। তাঁর কিছু ঘটল কিনা আমার ভয় হচ্ছে।'

একটু থামল লুই ডোমাস। তারপর বলল, 'স্যার আমি উঠি। পাশের রেস্ট হাউসে আমাদের সাথী দু'টি মেয়ে আছে। ওদের কিছু হলো কিনা দেখি। ওদের একজন খুবই বিপদগ্রস্ত। দেখা মাত্র ব্ল্যাক ক্রসের লোকেরা ওকে সামনের ঘরের এই লোকের মতই হয় খুন করবে, না হয় ধরে নিয়ে যাবে।'

বলে উঠে দাঁড়াল লুই ডোমাস।

ডোনার মুখে গভীর চিন্তার ছাপ। অনিশ্চিতের অন্ধকারে কি যেন হাতড়ে বেড়াচ্ছে সে। বার বার আহমদ মুসার মুখ তার হৃদয়ে এসে উঁকি দিচ্ছে। লুই ডোমাস উঠে দাঁড়ালে ডোনা দ্রুত বলল, 'আপনি যে বিপদগ্রস্ত মেয়েটির কথা বললেন তার নাম কি, রুম নাম্বার কত?'

‘নাম এলিসা গ্রেস। নাম্বার ৩৩৩। পশ্চিম পাশের রেস্ট হাউসটিই।’

লুই ডোমাস বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

লুই ডোমাস বেরিয়ে যেতেই ডোনা বলল, ‘আব্বা আমার মন খারাপ লাগছে খুব। আমি কোন প্রমাণ দিতে পারবো না। কিন্তু এসব ঘটনার মধ্যে আমি কেন জানি আহমদ মুসাকে দেখতে পাচ্ছি।’

‘তুমি এমনিতেই উদ্বিগ্ন। তাই এমন মনে হচ্ছে। ব্ল্যাক ক্রস কত ঘটনার সাথে জড়িত। সে ধরনেরই একটা কিছু এটা।’

‘ঐ অসহায় মেয়েটার কাছে যেতে ইচ্ছে করছে আব্বা। মনে হচ্ছে ওমর বায়ার মতই সে ব্ল্যাক ক্রসের একজন অসহায় শিকার।’

‘তুমি তো জান, ব্ল্যাক ক্রসের কোন ব্যাপারে তুমি, আমরা জড়াই, আহমদ মুসা তা পছন্দ করে না।’

‘এটা ওর অতি সাবধানতা। কিন্তু নিজের বেলায় উনি মোটেই সাবধান নন।’

‘মা তবুও তার অনুপস্থিতিতে ঐ ধরনের কোন কিছুতে জড়ানো ঠিক হবে না।’

‘জড়াব না আব্বা, আমি শুধু কথা বলব ওর সাথে। দেখুন, যতই অসুবিধা হোক আহমদ মুসা অসহায়ের সাথে থাকেন, বিপদ-আপদের তোয়াক্কা না করেই ছুটে যান তার সাহায্যে।’

‘ও তো সাধারণ নয় মা। ও একাই একটা আন্দোলন। ঠিক আছে মা, সকাল হোক ওখানে যাওয়া যাবে।’

চিন্তা ও উদ্বেগ-পীড়িত মন নিয়ে ডোনা ফিরে গেল তার কক্ষে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, ফজর নামাজের সময় হয়ে গেছে।

ডোনা ওজু করার জন্যে টয়লেটে চলে গেল।

সকালে নিচে নেমে মিশেল প্লাতিনি দেখল, রেস্ট হাউসের পার্কিং-এ তাদের গাড়ি ছিল, সে গাড়ি এখন নেই। বিস্মিত হয়ে সে ডোনার দিকে তাকাল। ডোনারও চোখে-মুখে বিস্ময়। বলল, 'গাড়ি কে নিয়ে যাবে আব্বা? লক করাও ছিল।'

ডোনা ও ডোনার আব্বা সিকিউরিটি বক্সে গিয়ে জিজ্ঞেস করল গাড়ির কথা।

সিকিউরিটির লোক বলল, 'ব্যাপারটা আমরা রেস্ট হাউস কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। আমাদের কিছু করার ছিল না স্যার।'

'কি করার ছিল না? কি ঘটেছে?' বলল মিশেল প্লাতিনি।

'স্যার, যারা আমাদের রেস্ট হাউসে হামলা করেছিল, তারা চলে যাবার সময় পূর্ব পাশের রেস্ট হাউসের দিক থেকে একজন ছুটে আসে। সে আপনাদের গাড়িটি খুলতে চেষ্টা করে। খুলতে না পেরে জানালার কাঁচ ভেঙে ফেলে ভেতরে ঢুকে গাড়িটা নিয়ে যায়। তার হাতে রিভলবার ছিল। আমরা কিছুই করতে পারিনি ভয়ে।'

মিশেল প্লাতিনি ও ডোনা অবাক-বিস্ময়ে পরস্পরের দিকে তাকাল।

চলে এল তারা।

পশ্চিম পাশের রেস্ট হাউসের দিকে চলছিল ডোনা এবং তার আব্বা।

দু'জনের কারও মুখেই কোন কথা নেই।

এক সময় ডোনা বলল ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছ আব্বা? এ ঘটনার অর্থ কি দাঁড়ায়?

'কিছু কিছু বুঝতে পারছি। পূর্ব পাশের রেস্ট হাউসের যে লোকটি ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে বলে শুনেছিলাম আমরা, সেই সম্ভবত আমাদের গাড়ি নিয়ে গেছে।'

'ঠিক বলেছ আব্বা। আমারও তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু আব্বা একটা অঙ্ক মিলছে না।'

'কি অঙ্ক?'

'থাক আব্বা।চল তাড়াতাড়ি এলিসাদের ওখানে।'

তিন তলায় ৩০ নাম্বার কক্ষ এলিসা গ্রেসের। এ কক্ষের পাশেরটিই সম্ভবত দ্বিতীয় মেয়েটির।

ডোন নক করল ৩৩ নাম্বার কক্ষের দরজায়।

দরজার ডোর ভিউ রয়েছে।

নক করার প্রায় সংগে সংগেই দরজা খুলে গেল কক্ষের।

দরজা খুলে দিয়ে 'গুড মর্নিং' বলে পাশে সরে দাঁড়াল লুই ডোমাস।

'গুড মর্নিং' বলে ঘরে প্রবেশ করল ডোনা। তার আব্বা মি. প্লাতিনি ডোনার পরে প্রবেশ করল ঘরে।

এলিসা গ্রেস কাঁদছিল।

চোখ মুছে সোজা হয়ে বসল সে। তার পাশেই বসে আছে পিয়েরা।

লুই ডোমাস দু'টি চেয়ার টেনে বসতে দিল মি. প্লাতিনি এবং ডোনাকে।

মি. প্লাতিনি বসল।

ডোনা বসার আগে এলিসা গ্রেসের দিকে চেয়ে বলল, 'আপনি নিশ্চয় এলিসা গ্রেস। আপনার কথা শুনেছি। কথা বলতে এলাম। আমাদেরকে বিশ্বাস করতে পারেন।'

বলে একটু থেমে ডোনা আবার বলা শুরু করল, 'উনি আমার আব্বা মিশেল প্লাতিনি লুই এবং আমি মারিয়া জোসেফাইন লুই।'

নাম শুনেই এলিসা গ্রেস, পিয়েরা পেরিন এবং লুই ডোমাসের চোখে-মুখে উৎসুক্য ফুটে উঠল। তাকাল তারা পরস্পরের দিকে।

বলল পিয়েরা, 'মাফ করবেন। নাম দু'টি আমাদের পরিচিত। আমাদের বুরবো রাজবংশের নামগুলোর মত। আমাদের এ ধারণা কি সত্য?'

'হ্যাঁ সত্য। এ প্রসংগ থাক। এখন বলুন, পূর্ব দিকের রেস্ট হাউস থেকে আপনাদের যে লোক বের হয়ে গিয়েছিল, তিনি ফিরেছেন কি?'

ডোনা যখন একথাগুলো বলছিল, তখন ওরা তিনজন উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে বাউ করল প্লাতিনি এবং ডোনাকে।

বাউ করে ওরা দাঁড়িয়ে থাকল। ডোনার প্রশ্নের জবাব দিল লুই ডোমাস। বলল, 'না, ফেরেননি।'

‘ওর নাম কি?’

ওরা সবাই একটু দ্বিধা করল। তারপর এলিসা গ্রেস বলল, ‘নাম আহমদ মুসা।’

‘যিনি কিডন্যাপ হয়েছেন তিনি কি ওমর বায়া?’ দ্রুত কাঁপা কণ্ঠে বলল ডোনা।

‘হ্যাঁ।’ বলল এলিসা গ্রেস। বলেই দু’হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠল এলিসা গ্রেস।

ওদিকে ডোনা দ্রুত উঠে তার আব্বার কোলে মুখ গুজল। অল্পক্ষণ পর মুখ তুলে বলল, ‘শুনেই বুঝেছিলাম, আহমদ মুসা না হলে মানুষের জন্যে বিপদের পেছনে এমন করে কেউ ছুটতে পারে না আব্বা।’ ডোনার মুখ অশ্রু ধোয়া। বলতে গিয়ে তার কন্ঠ কান্নায় ভেঙে পড়ল।

ডোনার এই কান্না দেখে থেমে গিয়েছিল এলিসা গ্রেসের কান্না।

এলিসা গ্রেস, পিয়েরা ও লুই ডোমাস সকলের চোখেই অপার বিস্ময়।

তারা বুঝতে পারছে না, তাদের রাজকুমারী ওমর বায়ার নাম জানল কি করে, আহমদ মুসার কথা বলে কাঁদছেই বা কেন?

পরবর্তী বই

# ক্রস এবং ক্রিসেন্ট

# কৃতজ্ঞতায়ঃ

1. Jafar Jewel
2. Kayser Ahmad Totonji
3. Neehon Forid
4. Nazmus Sakib
5. Mujtahid Akon
6. Abu Taher
7. Hafizul Islam
8. Md Amdadul Haque Swapan
9. Neehon Forid
10. Kayser Ahmad Totonji
11. Sohel Shazuli
12. Ashrafuj Jaman
13. Misbah Ahmad Chowdhury Fahim
14. Shaikh Noor-E-Alam

সাইমুম-১৯

# ক্রস এবং ক্রিসেন্ট

আবুল আসাদ

# ১

ডোনা তার আব্বার কোল থেকে মুখ তুলল।

অশ্রু ধোয়া তার মুখ।

কিন্তু চোখে তার অনেকটা লড়াকু ও বেপরোয়া দৃষ্টি।

তার এই দৃষ্টি গিয়ে পড়ল এলিসা গ্রেসদের উপর। তাদের চোখ-মুখের বিস্ময়ভাবের দিকে চেয়ে ডোনা বলল, 'আপনারা ভাবছেন, আহমদ মুসার কথা বলে কাঁদছি কেন? ভাবছেন, ওমর বায়ার নাম জানলাম কি করে?'

একটু থেমে একটা ঢোক গিলে নিয়ে ডোনা বলল, 'আহমদ মুসা আমার সব, আমার জীবন। আর তার কাছেই আমি ওমর বায়ার নাম শুনেছি। তিনি ওমর বায়াকে উদ্ধার করতেই সেইন্ট পোল ডে লিউন-এ এসেছিলেন।'

বলে ডোনা উঠে দাঁড়াল এবং এলিসা গ্রেস ও পিয়েরাকে টেনে নিয়ে গিয়ে বিছানায় বসাল। তারপর লুই ডোমাসের দিকে চেয়ে বলল, 'আপনি ঐ চেয়ারটায় বসুন। দেখুন, এখানে কোন রাজা-প্রজা নেই, আমরা সবাই সমান। বসুন আপনি।'

পিয়েরা বসা থেকে উঠে দাঁড়াল এবং ডোনাকে নিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসতে বসতে বলল, 'এখানে রাজা-প্রজা নেই ঠিক, কিন্তু রাজা-প্রজার পরিচয় মিথ্যা হয়ে যায়নি, সময়ের পরিবর্তনে রক্ত পাল্টে যায় না।'

ডোনাকে বসিয়ে দিয়ে লুই ডোমাসের দিকে চেয়ে পিয়েরা বলল, 'তুমি এস, বিছানায় বস।'

বলে পিয়েরা এলিসা গ্রেসের পাশে গিয়ে বসল।

লুই ডোমাসও বিছানার এক প্রান্তে গিয়ে বসল।

এলিসা গ্রেস, পিয়েরা, লুই ডোমাস তিনজনের চোখেই ডোনাকে ঘিরে একটা নতুন দৃষ্টি, মনে চিন্তার নতুন স্রোত। ডোনার ঋজুতা ও স্পষ্টবাদিতায় তারা মুগ্ধ। ডোনা ও আহমদ মুসার প্রতি তাদের মন নুয়ে পড়ল অফুরান ভালোবাসা এবং ভক্তিতে।

তারা বসতেই ডোনা বলল, 'গত চারদিন ধরে আহমদ মুসার কোন খবর পাইনি। তাই ছুটে এসেছি আমরা প্যারিস থেকে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, খুব কাছে এসেও দেখা পেলাম না।'

কণ্ঠটা কেঁপে উঠল ডোনার। থামল সে। একটা ঢোক গিলে নিজেকে সামলে নিয়ে আবার বলল, 'তবু আমরা খুশি এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি যে, আপনাদের দেখা পেয়েছি, যারা তার সাথী ছিলেন।'

আবার থামল ডোনা। এলিসা গ্রেসদের দিকে গভীরভাবে তাকাল এবং বলল, 'এখন দয়া করে কি ঘটেছে বলুন?' পিয়েরা এবং লুই ডোমাস দু'জনেই এলিসা গ্রেসের দিকে তাকাল। পিয়েরা বলল, 'এলিসাই সব বলবে। আহমদ মুসা সম্পর্কে শুরুর যেটুকু ঘটনা আমি বলছি।' একটু থামল পিয়েরা।

তারপর শুরু করল, 'আমার নামটাই বলা হয়নি। আমি পিয়েরা পেরিন।'

একটু থেমে লুই ডোমাসকে দেখিয়ে বলল, 'এ হলো লুই ডোমাস। আমার বন্ধুর চেয়েও বড়। এলিসার অনুরোধে ওমর বায়ার অভিযানে আমি জড়িয়ে পড়ি। লুই ডোমাস আমাকে স্বতস্ফূর্তভাবে সাহায্য করে।' আবার থামল পিয়েরা।

চোখটা একটু নিচু করল। যেন ভাবল এবং গুছিয়ে নিল কথা। তারপর শুরু করল, 'ব্ল্যাক ক্রস-এর হেডকোয়ার্টার সংলগ্ন তাদেরই নিয়ন্ত্রিত রেস্টুরেন্টের সামান্য পরিচারিকা আমি। খদ্দের হিসেবে আহমদ মুসা আমাদের রেস্টুরেন্টে আসেন।'

তারপর কিভাবে আহমদ মুসার খাওয়া, আচার-আচরণ পিয়েরা পেরিন-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করল, কিভাবে গতকাল এগারটার দিকে পিয়েরা আহমদ মুসার টেবিলে গিয়ে আহমদ মুসার পরিচয় জানতে পারে এবং তাকে ব্ল্যাক ক্রসের হেডকোয়ার্টারের পরিচয় বলে, কিভাবে একজন ব্ল্যাক ক্রসের নেতৃস্থানীয় লোককে দেখিয়ে দেয়, কিভাবে আহমদ মুসা তাকে অনুসরণ করে বেরিয়ে যায় এবং আবার ফিরে আসে এবং আহত হয়ে ব্ল্যাক ক্রসের হাতে বন্দী হয়- সব কথা পিয়েরা পেরিন বলল ডোনাকে।

শুনতে শুনতে ডোনার মুখ মলিন এবং চোখ ছলছলে হয়ে উঠেছিল। পিয়েরা থামতেই ডোনা বলল, 'খুব বেশি আহত হয়েছিলেন উনি?' ডোনার কণ্ঠে উদ্বেগ।

'খুব বেশি না হলেও তার মাথার এক পাশের চামড়া উঠে গিয়েছিল। রক্তে তার মুখের একপাশ এবং শরীরের একটা দিক প্রায় ভিজে গিয়েছিল।' বলল পিয়েরা পেরিন।

'কোন চিকিৎসা হয়নি, না?' দু'হাতে চেয়ারের দু'টি হাতল আঁকড়ে ধরে মাথাটা চেয়ারে ঠেস দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসল ডোনা।

'ঐ অবস্থায় তাকে ধরে নিয়ে গেছে। ব্ল্যাক ক্রস-এর অভিধানে তার শত্রুর জন্যে হত্যা-নির্যাতন-নিষ্ঠুরতা ছাড়া আর কিছু লেখা নেই।' বলল পিয়েরা।

ডোনা কোন কথা বলল না। চোখও খুলল না সে।

পিয়েরাই বলল আবার, 'কিন্তু আমি বিস্মিত হয়েছি, মাথায় অতবড় আঘাত পাওয়ার পরও তার মুখে বেদনার সামান্য ভাঁজও পড়েনি কিংবা বন্দী হবার সময় ভয়-বিহ্বলতার বিন্দুমাত্র চিহ্নও তার চোখে-মুখে আমি দেখিনি।'

'নিজের ভালো চিন্তা করলে, তবেই তো কারো মনে তার মন্দ চিন্তা নিয়ে ভয় জাগবে। উনি সবার ভালো নিয়ে ভাবেন নিজেরটা ছাড়া।' চোখ খুলে বলল

ডোনা। বলতে গিয়ে তার ঠোঁটে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল যা কান্নার চেয়েও করুণ।

বলে একটু থেমেই এলিসা গ্রেসের দিকে চেয়ে বলল, ‘আপনি বলুন।’

‘গত রাতটা ছিল আমার জীবনের স্মরণীয় রাত। এই রাতেই আমি ওমর বায়াকে নিয়ে পালাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। তখন রাত আড়াইটা কিংবা তার কিছু বেশি হবে। আমি লিটলকে পালাবার পথ টাওয়ারের বেজমেন্টে পাঠিয়ে দিয়ে...।’

কান্নায় আটকে গেল এলিসা গ্রেসের কথা।

অল্পক্ষণ পরেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, ‘মাফ করবেন, ‘লিটল’-এর জন্যে দুনিয়াতে কাঁদার কেউ নেই। আমাকে এবং ওমর বায়াকে সাহায্য করতে গিয়ে নির্মমভাবে নিহত হলো সে। ওমর বায়াকে সাহায্য করার পেছনে আমার স্বার্থ ছিল, ওমর বায়া আমার মাতৃধর্মের লোক এবং আমি অভিনয় করতে গিয়ে ওকে ভালোবেসে ছিলাম। কিন্তু ‘লিটল’-এর তিলমাত্র কোন স্বার্থ ছিল না। সে মিঃ বেনহামকে দু’চোখে দেখতে পারতো না। সে মনে করতো, আমাকে দিয়ে ওমর বায়ার কাছ থেকে কাজ উদ্ধার করার পর আমাদের দু’জনকেই মেরে ফেলবে। এই চিন্তা থেকেই সে নিজে একদিন আমার কাছে প্রস্তাব করল, ওমর বায়া এবং আমার পালানো উচিত। সে সাহায্য করবে। জেটি হয়ে সমুদ্রপথে পালাবার গোপন পথটির সন্ধান সে-ই আমাদের দিয়েছিল। তার সাহায্য ও সাহস না পেলে পালাবার কথা আমরা কল্পনাও করতে পারতাম না।’ থামল এলিসা গ্রেস।

চোখ মুছে শুরু করল আবার, ‘‘লিটল’কে পাঠিয়ে আমি এবং ওমর বায়া বাইরের ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে লিটলের সংকেতের অপেক্ষা করছিলাম। বাংলোর প্রাচীরের গেট থেকে গোটা চত্বর আমাদের চোখের সামনে ছিল।

হঠাৎ দেখলাম, স্টেনগান ও লাইট মেশিনগান সজ্জিত সাত-আটজনের একটা দল আমার বাংলোর সামনে এসে অবস্থান নিল। দেখে ভয়ে ও হতাশায় আমার ভেঙে পড়ার দশা। আমি ভাবলাম, হয় ‘লিটল’ ধরা পড়ে গেছে, না হয় অন্য কোনভাবে আমাদের প্ল্যান তারা জানতে পেরেছে। ব্ল্যাক ক্রস-এর ভয়ংকর মূর্তি আমি মনে মনে কল্পনা করলাম। কাঁপতে শুরু করেছিলাম আমি।

এই সময় দেখলাম, ব্ল্যাক ক্রস-এর গার্ডের পোশাক পরা একজন লোক এগিয়ে আসছে। তার মাথায় ব্ল্যাক ক্রস-এর গার্ডদেরই হ্যাট। ঠিক এ সময়েই আরও কয়েকজন লোক গেট দিয়ে আমাদের চত্বরে প্রবেশ করল। তাদের দ্রুত এগিয়ে আসতে দেখা গেল। তারা সকলেই ব্ল্যাক ক্রস-এর গার্ড।

যে লোকটি একা এগিয়ে আসছিল, সে একবার পেছনে তাকিয়েই শরীরটাকে সামনের দিকে একটু বাঁকিয়ে স্টেনগানের গুলি ছুঁড়ল আমার বাংলোর সামনে বসা লোকদের লক্ষ্য করে।

গুলি করেই চোখের পলকে গড়িয়ে এসে উঠল আমাদের বারান্দায়। আসার সময় যারা ব্রাশফায়ারে মারা গিয়েছিল, তাদের লাইট মেশিনগানও নিয়ে এসেছিল।

যারা গেট থেকে এগিয়ে আসছিল, তারা গুলির শব্দ হবার সাথে সাথেই শুয়ে পড়েছিল এবং ক্রলিং করে এদিকে এগিয়ে আসছিল। তারা কাছাকাছি এগিয়ে এলে তারাও আমার বারান্দায় উঠে আসা লোকটির লাইট মেশিনগানের শিকারে পরিণত হলো।

ঠিক এই সময় দশ-বারো জনের আরেকটি বড় দল গেট দিয়ে প্রবেশ করল।

পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থেকে সবকিছু দেখছিলাম। বুঝতে পারছিলাম না, কে কাকে মারছে। কিন্তু ভাবছিলাম, কিছু একটা করা দরকার। তাছাড়া আজ পালাতে না পারলে আর সুযোগ নাও আসতে পারে বুঝতে পারছিলাম।

অনেকটা মরিয়া হয়েই পিস্তল বাগিয়ে বাইরে গেলাম। লোকটি স্টেনগান বাগিয়ে বসেছিল গেটের দিক থেকে যারা এগিয়ে আসছিল সেদিকে লক্ষ্য করে।

আমি তার মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কে আপনি? কোন পক্ষের?'

লোকটি স্টেনগান ছেড়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। আমার দিকে এক নজর তাকিয়েই বলল, 'ব্ল্যাক ক্রস-এর লোককে মারছি দেখেও যখন এতক্ষণ আমাকে গুলি করেননি, তখন আমি আপনার পক্ষের।'

তার মুখে ভয় কিংবা বিস্ময়ের বা অপ্রস্তুতির কোন চিহ্নই লক্ষ্য করলাম না। ঠোঁটে এক টুকরো নিষ্পাপ হাসি।

হঠাৎ আমার মনে হলো, এমন লোক আহমদ মুসা না হয়ে যায় না। ওমর বায়ার কাছে আহমদ মুসার কথা শুনেছিলাম, আরও শুনেছিলাম, শুধু আহমদ মুসাই আসতে পারে তাকে উদ্ধার করতে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি আহমদ মুসা?'

এরপরই ওমর বায়া বেরিয়ে এল। জড়িয়ে ধরল দু'জন দু'জনকে।'

থামল এলিসা গ্রেস।

তারপর এলিসা ধীরে ধীরে কি করে আহমদ মুসা গেটের দিক থেকে অগ্রসরমান লোকদের লাইট মেশিনগান দিয়ে চত্বরের বাইরে তাড়িয়ে দিল, কিভাবে লাইটের বাল্বগুলো নষ্ট করে তাদের টাওয়ারের বেজমেন্টে যাওয়ার পথ পরিষ্কার করে দিল, কি করে আহমদ মুসা বেজমেন্টে এবং জেটিতে নামার সিঁড়িতে একা মেশিনগান নিয়ে বসে ব্ল্যাক ক্রসের লোকদের ঠেকিয়ে রেখে এলিসা গ্রেস ও ওমর বায়াদের যাবার পথ নিরাপদ করেছিল, কি অলৌকিকভাবে জেটির দরজা চোখের নিমেষে খুলে দিয়েছিল, কিভাবে এই দরজায় ব্ল্যাক ক্রস-এর লোকদের ঠেকিয়ে রেখে এলিসা গ্রেসদের বোটে ওঠার সুযোগ করে দিয়েছিল, কি অবিশ্বাস্যভাবে 'লা আটলান্টিক' রেস্টহাউসে ব্ল্যাক ক্রসের আক্রমণকে সে একাই ঠেকিয়েছিল- সবকিছু বর্ণনা করে বলল, 'গত রাতেই ব্ল্যাক ক্রস-এর তিরিশ জন লোক আহমদ মুসার হাতে নিহত হয়েছে। কি ধরনের ভয়াবহ সংঘাত হয়েছে আপনি চিন্তা করে দেখুন।'

ডোনা চোখ বন্ধ করে বাম হাতের উপর মুখ ঠেস দিয়ে কথা শুনছিল। তার দৃষ্টিতে গভীর শূন্যতা। বলল, 'ওর জীবনে এমন সংঘাত কিছুই নয়। ব্ল্যাক ক্রস-এরই প্রায় সাড়ে তিন ডজন লোক নিহত হয়েছে ওর হাতে এই রাতের আগে।' তার কণ্ঠ অনেকটা স্বগতোক্তির মত।

একটু থামল। তারপর আবার বলল, 'ওর আহত স্থানের কোন চিকিৎসা হয়নি, না?' ভেজা কণ্ঠস্বর ডোনার।

‘না রাজকুমারী, ‘লা আটলান্টিক’ রেস্টহাউসের লবির আলোতেও আমি ওর মুখে ও মাথার চুলে রক্তের দাগ দেখেছি। তারপর আর খেয়াল করিনি।’

ডোনা আবার চোখ বুজল। তার মুখজুড়ে রাতের অন্ধকার।

‘ওমর বায়াকে কিডন্যাপ করে ব্ল্যাক ক্রস কোথায় নিয়ে যেতে পারে? সেইন্ট পোল ডে লিউন-এর হেডকোয়ার্টারে?’ বলল ডোনার আব্বা।

‘না, জনাব। আমি শুনেছি, ব্ল্যাক ক্রস-এর কোন অফিস বা আস্তানায় শত্রুর পা পড়লে সে অফিস বা আস্তানা তারা সংগে সংগেই পরিত্যাগ করে।’ বলল পিয়েরা পেরিন।

‘নিশ্চয় সেইন্ট পোল ডে লিউন-এ ওদের আরও আস্তানা আছে?’ ডোনার আব্বাই আবার জিজ্ঞেস করল।

‘জনাব, আমার তা জানা নেই।’ বলল পিয়েরা।

‘আমাদের এখন কি করণীয়? আমি ও পিয়েরা ব্ল্যাক ক্রস-এর সন্দেহের মধ্যে এখনও আসিনি। আমাদের বাসা সেইন্ট পোল ডে লিউন-এ। আমরা এলিসাকেও নিয়ে যেতে পারি।’ ডোনার আব্বার দিকে চেয়ে বলল লুই ডোমাস।

‘আমার মতে, আহমদ মুসার কোন নির্দেশ না আসা পর্যন্ত যে যেমন আছি সেভাবে রেস্টহাউসেই থাকা উচিত।’ বলল ডোনা।

একটু থামল, একটু ভাবল ডোনা। তারপর আবার বলল, ‘আহমদ মুসার অতিথি বা আশ্রয়ে ছিল এলিসা। আহমদ মুসা কোন নতুন সিদ্ধান্ত না নেয়া পর্যন্ত এলিসা গ্রেস আমার অতিথি। তার সব দায়িত্ব আমার। আপত্তি নেই তো?’

বলে ডোনা এলিসা গ্রেস, পিয়েরা, লুই ডোমাস সবার দিকে তাকাল।

এলিসা গ্রেস-এর চোখে-মুখে কৃতজ্ঞতার চিহ্ন ফুটে উঠল। সে মাথা নিচু করল। কিন্তু মুখ খুলল পিয়েরা। বলল, ‘সম্মানিতা রাজকুমারী, আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু শুধু এলিসা গ্রেসেরই কি এ সৌভাগ্য হলো?’

‘না, আপনারা সবাই আমার অতিথি। আমি বিশেষভাবে এলিসা গ্রেসের নাম করেছি মাত্র।’

‘ধন্যবাদ।’ পিয়েরা বলল।

‘ওয়েলকাম।’ বলল ডোনা।

‘সম্মানিতা রাজকুমারী, আমি কি আপনাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারি?’ দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলল পিয়েরা।

‘অবশ্যই।’ বলল ডোনা।

‘আমাদের রাজকুমারীর মাথায় ওড়না কেন? টিভিতে দেখেছি, এ ধরনের ওড়না মৌলবাদী মুসলিম মেয়েরা পরে।’

‘কেন পরেছি বলুন তো?’ বলল ডোনা। তার ঠোঁটে হাসি।

‘আমাদের বিস্ময় লাগছে, তাই তো জিজ্ঞেস করছি।’

‘আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি।’

‘আপনি বুরবোঁ রাজকুমারী ইসলাম গ্রহণ করেছেন!’ পিয়েরার কণ্ঠে বিস্ময়।

‘কেন, বুরবোঁ রাজকুমারী ইসলাম গ্রহণ করতে পারে না?’

‘ফরাসীদের কাছে এটা বিস্ময়ের হবে।’

‘শুধু এটাই কি বিস্ময়ের হবে? এটা কি বিস্ময়ের হবে না যে, নিশ্চয় ইসলাম আরও বড় বিস্ময়ের?’

‘তাও হবে। অনেককে ইসলামের ব্যাপারে অনুসন্ধিৎসুও করে তুলবে।’

‘আপনার এবং এলিসার মাতৃধর্ম ইসলাম। আপনারা তো পক্ষে কিছু বলবেনই। মিঃ ডোমাস, আপনার মত কি?’ বলল ডোনা।

লুই ডোমাস ডোনাকে একটা বাউ করে একটু নড়ে-চড়ে বসে বলল, ‘আপনি সত্য বলেছেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস হতে চাইছে না।’

‘কেন?’

‘সভ্য পাশ্চাত্যের একটি শীর্ষ পরিবারের মেয়ে অসভ্য প্রাচ্য দেশের ধর্ম গ্রহণ করবে, এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়।’

‘ভুলে যাবেন না, খৃস্টধর্মও ‘অসভ্য প্রাচ্য’ দেশের। যিশুখৃস্ট একটি ‘অসভ্য’ প্রাচ্য দেশেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেখানেই বড় হয়েছিলেন, ধর্ম প্রচার করেছিলেন এবং মৃত্যুবরণ করেছিলেন।’

‘আমিও শুনেছি।’

‘তাহলে?’

‘কিন্তু ইসলাম প্রাচ্য দেশের ধর্ম বলেই পরিচিত, আর খৃস্টধর্ম পাশ্চাত্যের।’

‘পাশ্চাত্য গ্রহণ করলেই তা পাশ্চাত্যের ধর্ম হয়ে উঠবে।’

‘কিন্তু পাশ্চাত্য এককভাবেই বলা যায় খৃস্টধর্মের দখলে।’

‘সত্যিই কি তাই? তাহলে শত শত গীর্জা আজ অব্যবহৃত বা পরিত্যক্ত কেন? শত শত গীর্জা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে কেন?’

‘মানুষের ক্রমবর্ধমান ধর্মহীনতার কারণেই এটা ঘটছে।’ কারণ দেখাল ডোমাস।

‘ঠিক ধর্মহীনতা নয়, যারা গীর্জায় যাচ্ছে না, তারা কিন্তু নিজেদের খৃস্টানই বলছে। আসল কথা হলো, সময়ের প্রয়োজন মেটাবার মত কিছুই নেই খৃস্টান ধর্মে।’

‘সময়ের এই প্রয়োজনের অর্থ?’

‘পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আইনগত বিধিবিধান যা প্রাত্যহিক জীবন-পরিচালনায় প্রয়োজন।’ বলল ডোনা।

‘এসব প্রয়োজন কি ধর্মকেই পূরণ করতে হবে?’

‘তা না করলে ধর্ম মানুষের জীবন পরিচালনা করবে কি করে? ধর্মকে গীর্জায় রেখে জীবনের সব ক্ষেত্রে অধর্মের রাজত্ব চলতে দিলে ধর্মজীবন আর থাকে না। এই কারণেই আমাদের পাশ্চাত্যে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ধর্মহীনতা বাড়ছে।’

‘আবার উত্থানও তো ঘটছে।’

‘ঘটছে। কিন্তু সেটা একটা রাজনৈতিক রূপ। ব্ল্যাক ক্রস-এর মত যে সব খৃস্টান ধর্মের সর্বব্যাপী প্রতিষ্ঠার জন্যে কাজ করছে, দেখবেন তাদের জীবনাচরণে কোন ধর্ম নেই।’

‘ঠিকই বলেছেন। ব্ল্যাক ক্রস-এর নেতৃবৃন্দের কাউকে গীর্জায় যেতে দেখিনি। ধর্মভীরু লিটলের তাদেরকে ঘৃণা করার একটা বড় কারণ ছিল এটা।’ বলল এলিসা।

‘যা খৃস্টান ধর্মে নেই, সেই জীবনযাপন প্রণালী কি ইসলামে আছে?’

'আছে এবং এ কারণেই ইসলাম জীবন্ত ও পূর্ণ ধর্ম। ইসলামের প্রতি আমার আকৃষ্ট হবার কারণ এটাই।' বলল ডোনা।

দরজায় নক করার শব্দ হলো, ডোনার কথা শেষ করার সাথে সাথেই।

ডোনা একবার তাকাল তার আব্বার দিকে। তারপর উঠে দাঁড়াল। দরজার দিকে হাঁটতে হাঁটতে ডোনা তার হাত দিয়ে পকেটের রিভলভার একবার স্পর্শ করল।

দরজা খুলে দিল ডোনা।

দরজায় দাঁড়িয়ে একজন পুলিশ অফিসার।

'গুড মর্নিং।' বলল ডোনা।

'গুড মর্নিং।' বলল পুলিশ অফিসারটিও। মুখে সে শব্দ ক'টি বললেও তার চোখ একবার গোটা কক্ষে ঘুরছিল।

তার চোখ গিয়ে আটকে গেল ডোনার আব্বা মিশেল প্লাতিনীর মুখে।

প্রথমে বিস্ময়! তারপর আনন্দ মিশ্রিত শ্রদ্ধা নেমে এল তার চোখে।

সে দু'ধাপ সামনে এগিয়ে মাথা নুইয়ে বাউ করল মিশেল প্লাতিনীকে। বলল, 'স্যার, আপনিই এখানে উঠেছেন বুঝতে পারিনি।'

'ওয়েলকাম।' বলে উঠে দাঁড়িয়ে মিশেল প্লাতিনী হ্যান্ডশেকের জন্যে তার হাত বাড়িয়ে দিল।

পুলিশ অফিসার দ্বিধাগ্রস্থভাবে হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডশেক করল।

ডোনার আব্বা তাকে ডোনার চেয়ারটা দেখিয়ে দিল বসার জন্যে।

কিন্তু পুলিশ অফিসারটি বসল না। বলল, 'মাফ করুন স্যার। আমরা দারুণ বিপদে। গত কয়েকদিনের ঘটনা আমাদের দিশেহারা করে তুলেছে। একের পর এক ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড ঘটছে। আজকের ঘটনা সে রকমই একটা হত্যাকাণ্ড। নিহত ও আহতদ্বয় যখন রেস্টহাউসে এসেছিলেন, সেই সময় লুই ডোমাস নামের একজন যুবকও রেস্টহাউসে আসেন। খবর পেলাম, তিনি এখানে এসেছেন। তার কাছে কোন সাহায্য পাওয়া যায় কিনা, এ জন্যেই আপনাদের বিরক্ত করছি। দুঃখিত।' কথা শেষ করে পুলিশ অফিসারটি তাকাল লুই ডোমাসের দিকে।

‘আমিই লুই ডোমাস।’ লুই ডোমাস মাথা খাড়া করে বলল।

‘আপনি কি কোন সাহায্য করতে পারেন?’

‘কি সাহায্য?’

‘নিহত ও অপহৃতদের পরিচয় কি?’

‘দুঃখিত, তারা কেউ আমার পরিচিত নন।’

উত্তর দিয়ে একটু থেমেই লুই ডোমাস পাল্টা প্রশ্ন করল, ‘ওদের পরিচয়ের চেয়ে এখন তো জরুরি খুনিদের পরিচয় বের করা?’

‘ঠিকই বলেছেন।’ বলে হাসল পুলিশ অফিসারটি। তারপর মিশেল প্লাতিনীর দিকে চেয়ে সশ্রদ্ধ কণ্ঠে বলল, ‘মাফ করবেন স্যার। বিরক্ত করলাম।’ বলে সে ফিরে দাঁড়াতে চাইল ঘর থেকে বের হওয়ার জন্যে।

‘লুই ডোমাস যে কথা বলল, তাতে খুনিদের পরিচয় কিছু জানতে পেরেছেন অফিসার?’

পুলিশ অফিসার ফিরে না দাঁড়িয়ে স্থির হলো। তারপর ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকাল মিশেল প্লাতিনীর দিকে। কিন্তু কিছু বলল না।

মুহূর্ত কয়েক পরে বলল, ‘জানতে পারিনি বললে ভুল হবে স্যার।’

‘কারা সে খুনি?’

পুলিশ অফিসার একবার লুই ডোমাসদের দিকে চোখ বুলিয়ে বলল, ‘আপনার কিছুই অজানা থাকবে না স্যার। এখানে খুনি ব্ল্যাক ক্রসের লোকেরা।’

‘ও, শক্তিমান খুনি।’ বলল মিশেল প্লাতিনী।

‘শক্তিমান স্যার। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার স্যার, তারা ইদানিং অবিরাম মার খেয়েই চলেছে। গত কিছুদিনের কথা বাদ দিলাম, আজ রাতেই ওদের তিরিশ-চল্লিশজন লোক মারা গেছে এবং মনে হচ্ছে, ওদের হেডকোয়ার্টারটাই ধ্বংস হয়ে গেছে আজ রাতে।’

একটু থামল পুলিশ অফিসার। বলল আবার, ‘বিস্ময়ের ব্যাপার, মারা গেছে সব ব্ল্যাক ক্রসের লোক, তাদের প্রতিপক্ষের একজন লোকও মারা যায়নি। এটা একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা। মাত্র রেস্টহাউসের এই একটি ঘটনায় মারা গেল একজন ব্ল্যাক ক্রসের হাতে। সুতরাং এই নিহতের পরিচয়টা আমাদের কাছে খুবই

গুরুত্বপূর্ণ। হয়তো তার পরিচয়ের সূত্র ধরে আজকের ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের এবং অতীতের হত্যাকাণ্ডগুলোর খুনিপক্ষ কারা তা জানা যেত।'

'ব্ল্যাক ক্রসের চেয়ে শক্তিশালী কিংবা ব্ল্যাক ক্রসকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে এমন কেউ এদেশে আছে নাকি? আপনি কি মনে করেন, অফিসার?' বলল মারিয়ার আব্বা।

'এ বিষয়টাই আমাদের বিস্মিত করেছে সবচেয়ে বেশি। কিন্তু ভেবে কোন কূল পাচ্ছি না আমরা। শুনলাম, পাশের রেস্টহাউসের আরেকজন যুবক ঘটনার সময় থেকেই নেই। যা জানা গেছে তাতে বোঝা যাচ্ছে, সে ব্ল্যাক ক্রসের লোক নয়, ব্ল্যাক ক্রসকেই সে একটা গাড়ি হাইজ্যাক করে নিয়ে ধাওয়া করেছে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, নিহতরা সংখ্যায় কমপক্ষে তিনজন ছিল।'

'কোন পথে ওরা গেছে, তা কি আপনারা জানতে পেরেছেন?'

'না, এখনও নয় স্যার। তবে তারা কাছের পেরেজ গিরেক কিংবা সেইন্ট পল ডে লিউন শহরের দিকে যায়নি। এদিকে আমাদের কড়া পাহারা ছিল।'

'আপনারা কি ওদের পিছু নেবার কোন চেষ্টা করছেন অফিসার?'

'সে সুযোগ হয়নি। তাদের গাড়ির নাম্বার বা কোন চিহ্ন পেলে আমরা ওদের লোকেট করার ব্যবস্থা করতাম। তবু দুটো গাড়ি সম্পর্কে একটা জেনারেল ইন্সট্রাকশন আমরা চারদিকে পাঠিয়েছি।'

'ব্ল্যাক ক্রস সম্পর্কে কোন ইন্সট্রাকশন পাঠিয়ে কি কোন লাভ আছে?'

'আপনি যা জানেন স্যার। তারাও আইনের ঊর্ধ্বে নয়। তবে বিশেষ ফেভার পায় তারা আমাদের মত অফিসারদের ব্যক্তিগত দুর্বলতার কারণে। সবচেয়ে বড় কারণ হলো রাজনীতি।'

'রাজনীতি? কি সেটা?'

'সব আপনি জানেন স্যার। আগে ওরা কমিউনিজমের বিরুদ্ধে বিরাট অস্ত্র ছিল। এই কারণে সুযোগ দেয়া হতো, সাহায্য করা হতো। এখন কমিউনিজম কোন বড় সমস্যা নয়, ওদেরকে এখন কাজে লাগানো হচ্ছে ইসলামের বিরুদ্ধে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে। সরকার অনেক কিছু পারে না বাইরের প্রতিক্রিয়ার ভয়ে।

সরকারের না পারা এসব কাজ ব্ল্যাক ক্রস করছে। সুতরাং ফেভার তাদের পাবারই কথা।’

‘তাহলে তো সরকারের এখন উচিত, ব্ল্যাক ক্রস-এর বিরুদ্ধে যে বা যারা লেগেছে, তাদের বিরুদ্ধে তৎপর হওয়া।’

‘সরকার এবং পুলিশ সে চেষ্টা করছে স্যার।’ বলেই পুলিশ অফিসার একটু হাসল এবং বলল, ‘মাফ করবেন স্যার। কিছুই আপনার অজানা নয়।’

‘ধন্যবাদ। গুড মর্নিং’- বলে উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়াল মিশেল প্লাতিনী।

‘গুড মর্নিং’- বলে ঘুরে দাঁড়াল পুলিশ অফিসারটি। চলে গেল।

‘তাহলে তো ওরা পেরেজ পিরেক কিংবা ডে লিউন শহরের দিকে যাননি। কোথায় গেলেন ওরা?’ পুলিশ অফিসার বেরিয়ে যেতেই বলে উঠল ডোনা।

‘ওমর বায়া ব্ল্যাক ক্রসের জন্যে অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ। সুতরাং তাকে নতুন কোন সুরক্ষিত স্থানে নিয়ে গেছে। হেডকোয়ার্টারে তারা ওমর বায়াকে রেখেছিল। হেডকোয়ার্টার ধ্বংস হবার পর তাকে তারা এমন জায়গায় নিয়ে যাওয়া স্বাভাবিক যাকে তারা হেডকোয়ার্টারের মর্যাদা দিতে পারে।’

‘তেমন জায়গা অনেক দূরেও তো হতে পারে?’

‘দূরে হওয়াই স্বাভাবিক।’

‘খুব দূরে?’

‘হতে পারে তা দেশের একদম ভিন্ন প্রান্তে।’

মুখ মলিন হয়ে গেল ডোনার তার আব্বার কথায়। বলল, ‘তাহলে আমরা কি করব?’

ডোনার কথা শেষ না হতেই টেলিফোন বেজে উঠল।

ডোনা দ্রুত উঠে গেল টেলিফোনের কাছে।

‘হ্যালো।’

‘ইয়েস, মিস ডোনা বলছি।’

‘কে?’

‘ঠিক আছে, লাইন দিন।’

‘তুমি... তুমি! কোথায়... তুমি?’

আবেগে-আনন্দে মুখ লাল হয়ে উঠেছে ডোনার। গলা তার কাঁপছে। বহু কষ্টে কথাগুলো যেন ডোনার গলা থেকে বেরুলো।

'কুমেট-এর কাছাকাছি থেকে বলছি।'

'কুমেট?'

'তুমি কবে এলে, কার সাথে এলে?'

'সে কথা পরে। তুমি ভাল আছ?'

হঠাৎ কথা বন্ধ হয়ে গেল ডোনার। চোখ দু'টি তার আতংকে বিস্ফারিত হয়ে উঠল। তার পরেই চিৎকার করে উঠল, 'হ্যালো, ...হ্যালো... কথা বলছো না কেন?'

কিন্তু মুহূর্তেই তার কণ্ঠ ক্ষীণ হয়ে এল। তার হাত থেকে টেলিফোন পড়ে গেল। জ্ঞান হারিয়ে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল ডোনা।

আতংক ছড়িয়ে পড়েছিল মিশেল প্লাতিনীসহ সবার চোখে-মুখে। এলিসা গ্রেস, পিয়েরা পেরিন এবং লুই ডোমাস বুঝল, ভয়ানক কিছু ঘটেছে। আর ডোনার আব্বা ডোনার কথা শুনেই বুঝেছিল, সে আহমদ মুসার সাথে কথা বলছে। কিন্তু কি হল? কি ঘটেছে টেলিফোনের ঐ প্রান্তে!

মিশেল প্লাতিনীসহ সবাই ছুটে এল ডোনার দিকে।

শীঘ্রই জ্ঞান ফিরে পেল ডোনা। জ্ঞান ফিরে কেঁদে উঠল।

'কি ঘটেছে বল মা, টেলিফোন তো আহমদ মুসার ছিল?' বলল ডোনার আব্বা।

'আব্বা তুমি বল, তার মত একজন পরোপকারী মানুষকে আল্লাহ দীর্ঘজীবী করবেন?' বলল ডোনা কান্নাজড়িত কণ্ঠে।

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'বল, শত্রুর বোমাও তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না?'

'কি বলছ এসব মা?'

'না বল, তার কোন ক্ষতি হয়নি, তার কোন ক্ষতি হতে পারে না।' পিতার দু'টি হাত জড়িয়ে ধরে বলল ডোনা। তার চোখে-মুখে বিহ্বল ভাব।

'কি হয়েছে বল মা।'

'হঠাৎ তার কথা বন্ধ হয়ে গেছে। তারপরেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ। মনে হলো যে, টেলিফোনের উপরই বিস্ফোরণ।'

ডোনার কথা শোনার সাথে সাথে উদ্বেগের ছায়া নামল মিশেল প্লাতিনীর মুখে। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'ঘটনার এতটুকু দিয়ে নিশ্চিত করে কোন কিছুই বলা যায় না মা। তুমি চিন্তা করো না।'

'না আব্বা, তুমি বল ওর কিছুই হয়নি।'

'আল্লাহ তা-ই করুন মা।'

বলে একটু থামল ডোনার আব্বা। পরক্ষণেই মুখ খুলল। বলল, 'কুমেট-এর কথা তুমি কি বললে?'

মুখ তুলল ডোনা। তার দু'চোখে নতুন চাঞ্চল্য ফুটে উঠল। বলল, 'ও 'কুমেট' থেকে টেলিফোন করেছিল। আমরা তো এখন 'কুমেট' যেতে পারি আব্বা।'

'পারি। যেতেই হবে। তবে আহমদ মুসার টেলিফোনের জন্যে আমাদের আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা উচিত। তার অসমাপ্ত কথা বলার জন্যে আবার টেলিফোন সে নিশ্চয়ই করবে।'

'কিন্তু উনি যদি সে অবস্থায় না থাকেন?'

'কিন্তু আমরা কিছুটা সময় দেখি।'

'এটাই মনে হয় ভাল হবে। ইতোমধ্যে ওর নতুন লোকেশন জানা যেতে পারে।' বলল এলিসা গ্রেস।

ডোনা কোন কথা বলল না। চোখ বন্ধ করে চেয়ারে গা এলিয়ে দিল। গণ্ডে তার অশ্রুর দাগ। ঠোঁট দু'টি শুকনো। সূক্ষ্ম একটা কম্পন তাতে। অন্তরে তার যে ঝড় বইছে তারই প্রকাশ এটা।

ডোনার আব্বা উঠল।

এগোলো টেলিফোনের দিকে। বলল, 'ভুলেই গেছি যে, আমাদের কারো নাস্তা হয়নি।'

ছুটে চলছিল আহমদ মুসার গাড়ি। সামনের গাড়িটি দু'শ গজের বেশি দূরে নয়। রাতের অন্ধকার কেটে যাবার পর এখন পরিষ্কারভাবে গাড়িটা দেখতে পাচ্ছে। আট সিটের একটা বাঘা ল্যান্ড ক্রুজার। আহমদ মুসার এই পিছু নেয়া ওদের কাছে ধরা পড়েছে কিনা আহমদ মুসা বুঝতে পারছে না।

আহমদ মুসা ইচ্ছে করেই ওদের কাছাকাছি হওয়ার কিংবা ওদের ধরে ফেলার চেষ্টা করেনি। আহমদ মুসা আগে ওদের বুঝতে চায়। গাড়িতে ওমর বায়া আছে। তার নিরাপত্তার কথাও তাকে ভাবতে হচ্ছে।

কোথায় যাচ্ছে ওরা? দক্ষিণগামী হাইওয়ে ধরে গাড়ি চলার পর পুবদিকে টার্ন নিয়েছে। আহমদ মুসা বুঝতে পারছে, গাড়ি এখন ফ্রান্সের দক্ষিণ উপকূল ধরে পূর্ব দিকে এগিয়ে চলেছে। বিস্মিত হলো আহমদ মুসা, ফ্রান্সের এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় শহর ব্রিস্টে ওরা গেল না, তাহলে কোথায় যেতে চায় ওরা? ডে লিউনের মতই কোন অখ্যাত শহরের কোন বড় ঘাঁটিতে কি?

চার ঘণ্টা সময় পার হয়ে গেছে। কোথায় তাদের গাড়ি এখন? ব্রিস্ট শহর পেছনে ফেলার পর যে সময় গেছে তাতে তারা নিশ্চয় পরবর্তী বড় শহর 'কুমেট'-এর কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে। এ সময় একটা রোড-মাইলের উপর নজর পড়ল আহমদ মুসার। দেখল, কুমেট শহর আর পঁচিশ মাইল।

গাড়ি তখন একটা সংরক্ষিত বন এলাকার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। দু'ধারেই ঘন বন।

হঠাৎ আহমদ মুসা দেখল, সামনের গাড়িটি তার স্পীড ডাবল বাড়িয়ে দিয়েছে। তীর বেগে ছুটে গাড়িটি আহমদ মুসার নজরের বাইরে চলে যাচ্ছে।

আহমদ মুসাও গাড়ির স্পীড ডাবল করতে বাধ্য হলো। কিন্তু সামনে বাঁক থাকায় সামনের গাড়িটি চোখের আড়ালে চলে গেল।

কিন্তু বাঁক ঘুরে মুশকিলে পড়ে গেল আহমদ মুসা। এখানে রাস্তার একটা শাখা ডানে গেছে সমুদ্র তীরের দিকে। আর একটা সামনে এগিয়েছে। সামনে আরও একটা বাঁক। কোন রাস্তায়ই ব্ল্যাক ক্রস-এর গাড়ি দেখতে পেল না।

আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি পকেট থেকে ওয়্যারলেস রিমোট সেন্সর বের করল। আইডি কার্ডের মত ছোট যন্ত্রটির বিশেষ একটি বোতামে চাপ দিতেই এর স্ক্রীনে সোজা সামনের দিক নির্দেশ করে একটা লাল অ্যারো মার্ক ফুটে উঠল।

সোজা রাস্তাটি ধরে ছুটে চলল আহমদ মুসার গাড়ি। প্রসন্ন হয়ে উঠল আহমদ মুসার বুক।

আহমদ মুসা ব্ল্যাক ক্রস-এর পিছু নেবার পর পরই একটা 'মাইক্রো ট্রান্সমিটার চিপ' ছুঁড়ে দিয়েছিল তাদের গাড়ি লক্ষ্যে। এটা ছোঁড়ার একটা বিশেষ পিস্তল রয়েছে। রাবার বুলেটের গায়ে ট্রান্সমিটার চিপ সেট করা থাকে। বুলেটটি গাড়ির গায়ে আঘাত করার সাথে সাথে 'ট্রান্সমিটার চিপ' চুম্বকীয় প্রভাবে গাড়ির গায়ে সেঁটে যায়। এই চিপ পঞ্চাশ মাইল দূর পর্যন্ত সংকেত পাঠাতে পারে, যা বিশেষভাবে তৈরি রিমোট সেন্সর-এ ধরা পড়ে এবং রিমোট সেন্সর তখন কোনদিক ও কতদূর থেকে 'ট্রান্সমিটার চিপ' সংকেত পাঠাচ্ছে, সেই দিক নির্দেশ করে থাকে।

অল্প কিছুদূর চলার পরেই আহমদ মুসা ব্ল্যাক ক্রসের গাড়ি দেখতে পেল।

আহমদ মুসা ফ্রান্সের এই এলাকার একটা মানচিত্রের প্রয়োজনীয়তা খুবই অনুভব করল। আহমদ মুসা জানে, ট্যুরিস্টরা ও গাড়িতে সব সময় সফরকারীরা হাতের কাছে মানচিত্র রাখে। এই আশাতেই আহমদ মুসা গাড়ির চারদিকে নজর বোলাল। তারপর সে গাড়ির ড্যাশবোর্ডের রেকর্ড ড্রয়ারটা খুলে ফেলল। দেখতে পেল বেশ কিছু কাগজপত্র। প্রথমেই নজর পড়ল ফরাসি ভাষায় ছোট একটা বইয়ের দিকে। নাম পড়ে ভীষণভাবে চমকে উঠল আহমদ মুসা। বইটি হাতে তুলে নিল সে। নামঃ Towards Understanding Islam.

রাস্তায় একটা বড় বাঁক।

আহমদ মুসার মনোযোগ স্টিয়ারিং হুইলের দিকে। তীব্র গতিতে চলছে গাড়ি, সামনের গাড়ির সাথে সমান বেগে। আহমদ মুসা ওমর বায়াকে অপহরণকারী গাড়িটাকে কিছুতেই ছেড়ে দিতে রাজি নয়। দরকার হলে সে লড়াই

করবে, যা এতক্ষণ সে এড়িয়ে এসেছে। আর লড়াইয়ের উপযুক্ত স্থান এই বনভূমি। আহমদ মুসা গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিল।

স্টিয়ারিং হুইল ধরা বাম হাতে তখনো বইটি। এমন একটি জায়গায় ইসলামের উপর এমন একটি বই! বিস্ময় কাটছে না আহমদ মুসার।

ডান হাত স্টিয়ারিং হুইলে রেখে বাম হাতে কষ্ট করেই একটা পাতা উল্টাল আহমদ মুসা। ভেতরের টাইটেল পেজে হাতে লেখা একটা নামের প্রতি নজর পড়তেই ভূত দেখার মত চমকে উঠল আহমদ মুসা। পরিষ্কার অক্ষরে 'মারিয়া জোসেফাইন'-এর নাম লেখা। হস্তাক্ষরটি ডোনার, তাও চিনতে পারলো। এতক্ষণে তার মনে পড়ল, গাড়িতে উঠার পর থেকে একটা পরিচিত সেন্টের সে গন্ধ পাচ্ছে। এ রাজকীয় সেন্ট ডোনাই সব সময় ব্যবহার করে। তাছাড়া এখন সে চিনতে পারছে, এ গাড়িটাও ডোনাদের।

উত্তেজনার আকস্মিকতায় আহমদ মুসার দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো। ডোনা তাহলে চলে এসেছে! ঐ রেস্টহাউসে সে ছিল। হৃদয়ের কোন এক গভীরে প্রশান্তির এক স্নিগ্ধ প্রলেপ অনুভব করল আহমদ মুসা। সেই সাথে একটা উদ্বেগও মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। সে কি একা তার ঐ পরিচারিকা নিয়ে চলে এসেছে, যেমন সে বলেছিল! ভীষণ জেদী মেয়ে- মনটা একটু বেসুরো হয়ে উঠল আহমদ মুসার। কিন্তু পরক্ষণেই মন স্বীকার করল, না, ডোনা কোন অন্যায় ও অযৌক্তিক জেদ করে না। সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় জীবনের সাথে জড়িয়ে থাকবে- জীবনসঙ্গিনী তো এরই নাম!

বইয়ের ভেতর থেকে একটা নেইম কার্ড খসে পড়ল আহমদ মুসার কোলের উপর।

বইটা পাশে রেখে নেইম কার্ডটা তুলে নিল আহমদ মুসা। নেইম কার্ডটা 'লা ইল' রেস্টহাউসের যেখানে ওমর বায়ারা ছিল এবং যার সামনে থেকে আহমদ মুসা গাড়িটা নিয়ে এসেছে। নেইম কার্ডে 'লা ইল' রেস্টহাউসের ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার।

হঠাৎ আহমদ মুসার মনে ঝিলিক দিয়ে উঠল কথাটা। এ গাড়ির ড্যাশবোর্ডে টেলিফোন সেট করা, সে তো ডোনাকে টেলিফোন করতে পারে! যেই ভাবা সেই কাজ।

সামনেটা একবার দেখে নিল আহমদ মুসা। দূরত্ব কমছে সামনের গাড়ি থেকে।

আহমদ মুসা ডান হাতে স্টিয়ারিং-এর গোটা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বাম হাতে টেলিফোনের সুইচ অন করে নাম্বার নবগুলোতে চাপ দিল তর্জনী দিয়ে।

'লা ইল' রেস্টহাউসকে পাওয়া গেল। পিএবিএক্স অপারেটর লাইন দিল ডোনার সাথে।

'আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছ ডোনা?'

'কুমেট।'

'তুমি কবে, কিভাবে, কার সাথে এলে?'

টেলিফোনের ইন্টারকম সিস্টেম। এতে আলাদা কোন রিসিভার নেই।

আহমদ মুসা কথা বলছিল। কিন্তু চোখ ছিল সামনে। গাড়িটা অনেক কাছে চলে এসেছে। সেদিক থেকে চোখ দু'টি গাড়ির সামনে রোডের উপর এসে পড়তেই ভূত দেখার মত আঁৎকে উঠল আহমদ মুসা। একদম গাড়ির মুখের সামনে রাস্তা জুড়ে কয়েক ডজন চকোলেট ছড়ানো। ওগুলো চকোলেট তো নয়, বিধ্বংসী বোমা। ওগুলোর উপর চোখ পড়তেই আহমদ মুসা বুঝতে পারল, ব্ল্যাক ক্রস তাকে পেছন থেকে সরিয়ে দেবার অতি সহজ একটা পথ অবলম্বন করেছে।

গাড়ি ব্রেক করার অথবা ঘুরিয়ে নেবার সময় পার হয়ে গেছে। আহমদ মুসা চকোলেট বোমার অবস্থান দেখার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝেছিল, এখন ব্রেক বা ঘুরিয়ে নিতে গেলে গাড়ি বোমার উপর গিয়ে পড়বে। সুতরাং কি করতে হবে সে সিদ্ধান্ত আহমদ মুসা নিয়ে নিয়েছিল।

স্টিয়ারিং হুইল থেকে তার ডান হাত বিদ্যুৎ বেগে গিয়ে দরজার ইমার্জেন্সী এক্সিট সুইচে চাপ দিল। সঙ্গে সঙ্গে দরজা ছিটকে খুলে গেল। আহমদ মুসাও সুইচে চাপ দিয়েই লাফিয়ে পড়েছিল। প্রায় দরজার সাথেই তার দেহ

বাইরে ছিটকে পড়ল। তার দেহ তখনও মাটিতে পড়ে সারেনি, এই সময় প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ কানে এল আহমদ মুসার।

মাটিতে পড়ার সময় হাত দিয়ে মাথাটা বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল আহমদ মুসা। কিন্তু তবু পারল না। মাথার সেই আহত জায়গাটাই আবার ঠোকা খেল রাস্তার কনক্রিটের সাথে। ব্যথায় কঁকিয়ে উঠল আহমদ মুসা তার অজান্তেই।

কিন্তু দম নেবার সুযোগ নেই। মাটিতে পড়েই তাকাল গাড়ির দিকে। দেখল, বিস্ফোরণের পর গাড়ির ধ্বংসাবশেষ তার দিকে ছুটে আসছে। চকোলেট বোমার পরপর বিস্ফোরণ ঘটছে।

সুতরাং মাটিতে পড়েই নিজের দেহকে গড়িয়ে সরিয়ে নিল। রাস্তার পাশের একখণ্ড ঝোপের আড়ালে গড়িয়ে পড়ল দেহটা।

যখন তার দেহটা রাস্তার উপর স্থির হল, বুঝলো, তার দু'হাতের তালুতেও প্রচণ্ড ব্যথা। মাথার আহত স্থানে প্রচণ্ড ব্যথা। মনে হলো, উঠতে চেষ্টা করলে সবগুলো ব্যথাই যেন শতগুণে বেড়ে যাবে। সব চিন্তা বাদ দিয়ে নিজেকে সেই মুহূর্তে অবস্থার উপর ছেড়ে দিয়ে গভীর ক্লান্তিতে চোখ বুজল আহমদ মুসা। কোথা থেকে রাজ্যের ঘুম যেন নেমে এল চোখে। সে সময় একটা গাড়ি পেছন দিক থেকে ছুটে আসছিল। নিকটতর হচ্ছিল জ্বলন্ত গাড়িটার।

# ২

কুমেট অভিমুখে ছুটছিল পিকআপ কারটি। মোট পাঁচজন আরোহী। পাঁচজনই মহিলা। সামনের সিটে দু'জন এবং পেছনের সিটে তিনজন। তাদের পেছনে পিকআপে কিছু ব্যাগ-ব্যাগেজ।

তাদের সকলের মুখে ক্লান্তির চিহ্ন।

তারা ফিরছে 'অল ফ্রান্স গার্লস ক্যাডেট কোর'-এর সাতদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত জাম্বুরী থেকে। জাম্বুরী অনুষ্ঠিত হয়েছে কুমেট-এর সংরক্ষিত বনে।

এই বনের মাঝখানে একটা বিশাল লেক আছে। সেই লেকের চারদিক ঘিরে সুন্দর সবুজ পাহাড়। এই পাহাড় এবং হ্রদ মিলিয়ে এই অপরূপ জায়গার নাম দেয়া হয়েছে 'ড্রিমল্যান্ড'। আদিগন্ত বনরাজির মাঝে এই 'ড্রিমল্যান্ড' ফ্রান্সের একটা শ্রেষ্ঠ ট্যুরিস্ট স্পট। এখানে এলে মানুষ আধুনিক নগর সভ্যতার ইট-পাথর-সিমেন্টের উত্তাপ এবং কোলাহল থেকে মুক্তি লাভ করে নীরব-স্নিগ্ধ-প্রশান্তির আদিম যুগে যেন ফিরে যায়।

এখানেই ফ্রান্সের গার্লস ক্যাডেট কোর-এর ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো।

আজ ছিল সমাপ্তি দিবস।

ইতোমধ্যে সবাই চলে গেছে কুমেট বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে।

শতাধিক গাড়িবহরের সর্বশেষ হলো পিকআপ কারটি।

এ গাড়ি ড্রাইভ করছে মিস ক্লাউডিয়া। সে ছিল এই জাম্বুরীর চীফ কোর কমান্ডার। চীফ হিসেবেই সে সব শেষ করে সবার শেষে যাচ্ছে। সাথের চারজনই তার সহকারী-সহকর্মী। তবে তারা সকলে বিভিন্ন পেশার এবং বিভিন্ন এলাকার।

'মিস ক্লাউডিয়া' প্যারিসের এবং একজন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী। অন্য চারজনের একজন ডাক্তার। নাম 'জিয়ানা বার্নেস'। উত্তর ফ্রান্সের মেয়ে। আরেকজন 'রিশলা', ইঞ্জিনিয়ার। পূর্ব ফ্রান্সের লিওন এলাকার মেয়ে সে। অন্য

দু’জন পেশায় সাংবাদিক। একজন দক্ষিণ ফ্রান্সের পাউ শহরের ‘সুমাইয়া’, অন্যজন তুলু এলাকার ‘নেকা’।

ফুল স্পীডে গাড়ি চালাচ্ছিল ক্লাউডিয়া। তার পাশের সিটে জিয়ানা বার্নেস।

‘এত তাড়াহুড়া করছ কেন ক্লাউডিয়া? সময় তো প্রচুর আছে। প্লেন তো সেই বারটায়।’ বলল জিয়ানা।

‘সবার পেছনে পড়ে গেছি তো, তাই।’ গাড়ির গতি স্লো করতে করতে বলল ক্লাউডিয়া।

‘আমার ফ্লাইট তো সেই ইভেনিং-এ’ বলল সুমাইয়া।

‘এতটা সময় তুমি কোথায় কাটাবে?’ বলল ক্লাউডিয়া।

‘বিমানবন্দরে গিয়ে বোর্ডিং কার্ড নিয়ে শহরে ঘুরতে বেরুব। একজন ফ্রেন্ড ছিল, তাকে খুঁজে দেখব।’ বলল সুমাইয়া।

‘বয়ফ্রেন্ড?’ বলল রিশলা।

‘বয়ফ্রেন্ড কোন কালেই ছিল না, এখনও নেই।’ সুমাইয়া বলল।

‘জানো না তুমি রিশলা, ও তো মুসলিম।’ বলল নেকা।

‘কেন, মুসলিম মেয়েদের বয়ফ্রেন্ড থাকে না?’ বলল জিয়ানা।

‘ছেলেদের সাথে অবাধ মেলামেশাই নিষিদ্ধ। বয়ফ্রেন্ড থাকবে কি করে?’ উত্তর দিল নেকা।

‘অসম্ভব কথা। কোন ফ্রেন্ড থাকবে না?’ বলল জিয়ানা।

‘কেন, গার্লফ্রেন্ড থাকবে।’ বলল সুমাইয়া।

হো হো করে হেসে উঠল জিয়ানা ও রিশলা। ক্লাউডিয়ার ঠোঁটেও হাসি।

‘তাহলে মুসলমানদের কি প্রেম নিষিদ্ধ?’ বলল ক্লাউডিয়া।

‘প্রেম নিয়ে তো কথা হচ্ছে না। কথা হচ্ছে, মেলামেশার জন্যে বয়ফ্রেন্ড থাকা না থাকা নিয়ে।’ বলল সুমাইয়া।

‘একই কথা হলো না?’ বলল জিয়ানা।

‘না, এক কথা নয়। বয়ফ্রেন্ড তো অহরহ বদল হচ্ছে। কিন্তু প্রেমের তো এমন পাত্র বদল সম্ভব নয়।’ সুমাইয়া বলল।

'তাহলে মুসলিম মেয়েরা বয়ফ্রেন্ড শূন্য! কি সাংঘাতিক!' বলল রিশলা।

'মুসলিম মেয়েদের বয়ফ্রেন্ড থাকে না, থাকে হাজব্যান্ড-ফ্রেন্ড।' বলল সুমাইয়া।

জিয়ানা, রিশলা, নেকা হো হো করে হেসে উঠল। এ হাসিতে যোগ দিল না ক্লাউডিয়া।

'ব্যাপারটা হাসির মনে হচ্ছে ঠিকই, তবে মনে হয় ঐ জীবনে শান্তি আছে, স্বস্তি আছে এবং নিখাদ প্রেমও আছে, এ কথা বোধ হয় আমাদের স্বীকার করতে হবে।' গম্ভীর কণ্ঠে বলল ক্লাউডিয়া।

'অমুসলিম মেয়েদের জীবনে এসব নেই বলছ?' বলল রিশলা।

'অমুসলিম মেয়েদের কথা বলিনি, আমি বলছি পশ্চিমী মেয়েদের কথা। পশ্চিমী মেয়েদের জীবনে আজ ওসব সাধারণভাবে নেই, এ কথা সত্য।' বলল ক্লাউডিয়া।

'পশ্চিমী পরিবারে শান্তি, স্বস্তি ও নিখাদ প্রেম নেই বলছ?'

'দেখ, আমাদের পশ্চিমা দেশে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক অনেকটা দুই বন্ধুর সম্পর্কের মত। অতি সামান্য কারণেও তা ভেঙে যাচ্ছে। কিন্তু প্রাচ্যে বিশেষ করে মুসলিম সমাজে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ভক্তি, শ্রদ্ধা, দায়িত্ব ও প্রেম- সবকিছু মিলে গভীর এক আত্মিক ভিত্তির উপর গড়ে ওঠে, যা কদাচিৎ ভেঙে থাকে। এমন স্বস্তি এবং এমন আত্মিক সম্পর্কের কথা আমরা কল্পনাই করতে পারি না।' ক্লাউডিয়া বলল।

'নেগেটিভ দিকও তো রয়েছে।' বলল জিয়ানা।

'একঘেঁয়েমি, নতুনত্বের অভাব, নির্যাতনের সুযোগ ইত্যাদিকে নেগেটিভ লিস্টে আনতে পার। আসলে এ নেগেটিভ দিকগুলো ওদের জীবনে খুবই কম। নির্যাতন সেখানে আছে, কিন্তু এমন নির্যাতন আমাদের সমাজেও আছে। তবে ওদের সমাজে আত্মিক সম্পর্কের কারণে নির্যাতনটা আমাদের সমাজের চেয়ে কম। ওদের মেয়েদের অনেক কিছুকে আমরা নির্যাতন বলি, সে সব আসলে ওদের সংস্কৃতি, রীতি, নিয়ম- যা ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে সবাই মেনে নেয়। আর একঘেঁয়েমি ও নতুনত্বের কথা?'

বলে থামলো ক্লাউডিয়া। হাসলো মুখ টিপে। তারপর বলল, ‘আমাদের অবাধ মেলামেশার কালচার, সত্যি বলতে কি, আমাদেরকে একটা ঘরে স্থির হতে দিচ্ছে না। উড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে আমাদের এ ঘর থেকে সে ঘরে। এতে নতুনত্বের একটা বাহ্যিক স্বাদ আছে, কিন্তু নেই শান্তি, স্বস্তি এবং পারস্পরিক বিশ্বাস ও নির্ভরতা- যা আমরা মুসলিম সমাজের স্থিতিশীল পরিবারে পাই।’

‘আমাদের সভ্যতার মুণ্ডপাত করছো ক্লাউডিয়া? আর যে বড় লোভ দেখছি মুসলিম পরিবারের প্রতি!’ বলল রিশলা।

‘দেখ, একটা সভ্যতার সবকিছু ভাল হয় না। আমাদের সভ্যতা পৃথিবীকে বিজ্ঞান দিয়েছে, কিন্তু স্বীকার করতেই হবে, জীবন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দিতে পারেনি। আমরা গ্রীক দর্শনকে অনুকরণ করছি, তাও আবার বিকৃত করে। ধর্ম ও নৈতিকতার বাঁধন যে আকারেই হোক গ্রীকদের ছিল, আমরা তা ছিঁড়ে ফেলেছি।’

ক্লাউডিয়ার কথাগুলো ভারি। সবাই গম্ভীর হয়ে উঠেছে। কয়েক মুহূর্ত নীরবতা। জিয়ানাই মুখ খুলল প্রথমে। বলল, ‘জীবনের এ জ্ঞান কি মুসলিম সমাজ দিয়েছে? দেখবে, ওদের অনেক বাড়াবাড়ির কোন যুক্তি নেই। যেমন, সামান্য ওড়নার ব্যাপার নিয়ে ওরা কি হাঙ্গামাই না বাঁধাচ্ছে। তুমি কিছু মনে করো না সুমাইয়া।’

সুমাইয়া হাসলো। সে মুখ খোলার আগেই কথা শুরু করল ক্লাউডিয়া। বলল, ‘ওড়নাকে সামান্য বলছ কেন জিয়ানা? ওটা ওদের কালচার, যা তাদের বিশ্বাসের সাথে গভীরভাবে যুক্ত।’

‘তা আমি অস্বীকার করছি না ক্লাউডিয়া। এই বিশ্বাসের দিক ছাড়া এর ইউটিলিটি কি?’ বলল জিয়ানাই।

হাসল ক্লাউডিয়া। বলল, ‘এর ভাল জবাব সুমাইয়া দিতে পারবে। তবে আমি যেটা বুঝি সেটা হলো, মেয়েদের সৌন্দর্যের স্থানগুলোকে ছেলেদের চোখ থেকে গোপন রাখা বা আড়ালে রাখা এর লক্ষ্য।’

থামল ক্লাউডিয়া। ক্লাউডিয়া চুপ করতেই সুমাইয়া বলল, ‘ঠিক বলেছ ক্লাউডিয়া। এটাই আমারও কথা।’

‘ঠিক আছে। কিন্তু মেয়েদের একতরফাভাবে এটা করার দরকার কি? ছেলেদের এভাবে তো কিছু ঢাকা-ঢাকি নেই।’ বলল নেকা।

‘এর জবাব হলো, মেয়েরা প্রকৃতিগতভাবেই আত্মরক্ষাকারী পক্ষ এবং ছেলেরা আক্রমণকারী পক্ষ। অন্য কথায়, মেয়েরা সাধারণভাবে নিষ্ক্রিয় পক্ষ এবং ছেলেরা সক্রিয় পক্ষ। ইতিহাসের সেই আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত ছেলেরাই মেয়েদের উপর চড়াও হয়েছে। এ ধরনের অবাঞ্ছিত ঘটনার বিরুদ্ধে একটা স্বাভাবিক প্রতিরোধ হিসেবেই মেয়েদের সৌন্দর্য আড়াল করে রাখার ব্যবস্থা বলেই মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে আমার মনে হয়।’ বলল সুমাইয়া।

‘এতে কি অবাঞ্ছিত ঘটনা বন্ধ হয়েছে?’ বলল রিশলা।

‘বন্ধ হয়নি, কিন্তু মুসলিম সমাজে এই ধরনের অবাঞ্ছিত ঘটনা আমাদের তুলনায় বহুগুণ কম। এটা আমি ক্রাইম স্ট্যাটিস্টিকস-এ দেখেছি।’ বলল ক্লাউডিয়া।

‘শুধু ওড়না বা পর্দাতেই এই অবাঞ্ছিত ঘটনা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যাবার কথা নয়। সম্পূর্ণ বন্ধ করার জন্যে এ সংক্রান্ত অপরাধের অত্যন্ত কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।’ বলল সুমাইয়া।

‘ওরে বাবা, দোররা মারার কথা বলছ? আমি মেডিকেল জুরিসপ্রুডেন্সে মুসলিম সমাজের এ শাস্তি বিধানের কথা পড়েছি।’ বলল জিয়ানা।

‘ওরে বাবা বলছ কেন? নিরপরাধদের গায়ে তো দোররা পড়ার কথা নয়। অপরাধীর শাস্তি হোক চাও না?’

‘চাই, কিন্তু প্রকাশ্য জনসমক্ষে ঐ দোররা মারার ব্যাপারটাকে বর্বরতা বলে মনে হয় যেন।’ বলল জিয়ানা।

‘এটা বর্বরতা নয়, আইনসঙ্গত কঠোরতা। বরং বলতে পার, অপরাধটা অত্যন্ত বর্বর। এই বর্বর অপরাধের মূলোচ্ছেদ করতে হলে কঠোর শাস্তি অবশ্যই প্রয়োজন।’

‘মূলোচ্ছেদ কি সম্ভব?’ বলল নেকা।

‘কোন অপরাধেরই একেবারে মূলোচ্ছেদ সম্ভব নয়। কিন্তু শূন্য পর্যায়ে আনা সম্ভব।’ বলল সুমাইয়া।

‘সম্ভব?’

‘সম্ভব। যেখানে মেয়েদের পর্দার বিধানসহ শাস্তির বিধান কার্যকরী আছে, সেখানে অপরাধ এই পর্যায়ে নেমে এসেছে। সৌদি আরব এর একটি দৃষ্টান্ত।’ বলল সুমাইয়া।

‘এই তোমরা সামনে দেখ!’ ড্রাইভিং সিট থেকে হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো ক্লাউডিয়ার কণ্ঠ।

সবাই একসংগে তাকাল সামনে। ইতোমধ্যেই তাদের কানে এসেছিল পর পর অনেক ক’টি বিস্ফোরণের শব্দ। তারা দেখল, সামনে একটা গাড়ি বিস্ফোরণে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে, জ্বলছে দাউ দাউ করে।

‘ক্লাউডিয়া, আমাদের কোন গাড়ি নয়তো?’ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল সুমাইয়া।

‘না, আমি লক্ষ্য করেছি, ওটা আমাদের গাড়ি নয়।’ বলল ক্লাউডিয়া।

‘বিস্ফোরণ কিভাবে ঘটল? কোন টেররিজম নয়তো? ইঞ্জিনের বিস্ফোরণ পরে ঘটল। এর অর্থ, প্রথম বিস্ফোরণগুলো বোমা থেকে হয়েছে।’ বলল জিয়ানা।

‘আমারও তা-ই মনে হয়। আরোহীদের কাউকে তো বেরুতে দেখা গেল না।’ বলল ক্লাউডিয়া।

‘যেভাবে বিস্ফোরণ ঘটেছে, তাতে মানুষ বেরুবে কি করে! গাড়ি স্লো করে দিলে ক্লাউডিয়া?’ জিজ্ঞেস করল জিয়ানা।

‘একটু দেখতে দাও, বুঝতে দাও। ব্যাপারটা টেররিজম হলে তো ভয়ের কথা।’

‘আশংকা করছ কিছু?’ বলল রিশলা।

‘ভেতরের বোমাতেও বিস্ফোরণ ঘটে এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। সুতরাং টেররিজমের ঘটনাই ঘটেছে, একথা নিশ্চিত করে বলা যাবে না।’ বলল জিয়ানা।

বিস্ফোরণটা রাস্তা জুড়েই ছড়িয়ে পড়েছে। পাশ কাটিয়ে যেতে হলে রাস্তার পাশে নামতে হবে।

‘আমাদের কি নামা উচিত নয়, কি ঘটেছে দেখা উচিত নয়?’ ক্লাউডিয়া বলল। গাড়ির গতি একদম থেমে যাবার পর্যায়ে নেমে এসেছে।

পেছন থেকে সুমাইয়া, রিশলা, নেকা একবাক্যে বলল, ‘নেমে কাজ নেই। চল, আমরা গিয়ে পুলিশে খবর দেব।’

‘কিন্তু দেখা প্রয়োজন কোন মানুষ বেঁচে আছে কিনা? সাহায্য করার কোন সুযোগ আমাদের আছে কিনা?’ বলল জিয়ানা।

‘অসম্ভব, কোন মানুষ বেঁচে থাকার কথা নয়। মোটামুটি দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে সব কিছু।’

‘ঠিক আছে, আমরা যখন গাড়ি রাস্তার পাশ দিয়ে নিয়ে যাব, তখন জিয়ানা নেমে এক নজর চারদিকটা দেখে নেবে।’ বলল ক্লাউডিয়া।

‘নাইস।’ বলল জিয়ানা।

জিয়ানা নামতে যাবে এমন সময় তারা দেখল, বিপরীত দিক থেকে দুটো গাড়ি প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসছে। তাদের গতির মধ্যে কোন দ্বিধাগ্রস্থতা নেই। মনে হচ্ছে, বিস্ফোরণের বিষয়টা তারা জানে।

জিয়ানা নামল না গাড়ি থেকে। ক্লাউডিয়াও নিষেধ করল তাকে।

ছুটে আসা গাড়িটা এসে জ্বলন্ত গাড়িটার সামনে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে কয়েকজন নামল। একজন ছাড়া সবার হাতে স্টেনগান।

তারা এসে দাঁড়াল জ্বলন্ত গাড়িটার সামনে।

‘ফুয়েল ট্যাংকের বিস্ফোরণ সামনের সিট দুটোকে দেখো নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। আর দেখো, চকোলেটগুলো সবই বিস্ফোরিত হয়েছে। খেলা সাঙ্গ হয়েছে শয়তানটার, যদি সে এ গাড়িতে এসে থাকে।’ মুখে ক্রুর হাসি টেনে বেশ উচ্চকণ্ঠেই বলল খালি হাতে নেমে আসা সরদার গোছের লোকটি।

অন্য চারজনও তার পাশে দাঁড়িয়ে তাকে সায় দিল।

লোকটি তার পকেট থেকে টেবিল টেনিস বলের মত ডিম্বাকৃতি বস্তু বের করে ছুঁড়ে দিল জ্বলন্ত গাড়িটার দিকে।

প্রচণ্ড শব্দে হাত বোমাটি বিস্ফোরিত হলো। আরেক দফা ছিটকে পড়ল জ্বলন্ত গাড়িটার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

সেদিকে তাকিয়ে হো হো করে হেসে উঠল লোকটা। তারপর সে চোখে দূরবীন লাগিয়ে ক্লাউডিয়ার গাড়িটাকে দেখল।

ফিরে গেল ওরা গাড়িতে। গাড়ি দুটো ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার সেই ঝড়ের গতিতেই ছুটে চলল কুমেট-এর দিকে।

গাড়ির ভেতরে ক্লাউডিয়ারা পাঁচজন বসেছিল পাথরের মত। চোখ ভরা আতংক। ঠোঁট তাদের শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

ওরা চলে গেলেও ক্লাউডিয়াদের মুখে কিছুক্ষণ কথা ফুটল না।

প্রথম কথা বলল ক্লাউডিয়াই। বলল, 'ওরাই তাহলে বোমা পেতে গাড়ি ধ্বংস করেছে এবং গাড়ির আরোহীকে হত্যা করেছে।'

'সেটা তো পরিষ্কার। কি নৃশংসতা! ধ্বংস হওয়া গাড়ি লক্ষ্যে আবার বোমা নিক্ষেপ! হিংস্রতা পশুর মতই।' বলল জিয়ানা।

'জিয়ানা, তোমার আর নামবার দরকার নেই। চল এবার আমরা যাই।'

বলে ক্লাউডিয়া গাড়িতে স্টার্ট দিল।

বিস্ফোরণ রাস্তার কিনারা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। এটা পাশ কাটাতে গিয়ে ক্লাউডিয়া রাস্তার পাশে নেমে এল।

রাস্তার ছোট ঝোপটার পাশ মাড়িয়ে চলার সময় ক্লাউডিয়া ঝোপের ভেতর পড়ে থাকা আহমদ মুসাকে দেখতে পেল। সংগে সংগে গাড়ি ব্রেক কষে চিৎকার করে উঠল ক্লাউডিয়া, 'এখানে একজন মানুষ পড়ে আছে, জিয়ানা!'

গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

জিয়ানা গাড়ির দরজা খুলে ছুটে বেরিয়ে এল। ক্লাউডিয়া গাড়ির দরজা খুলেছে, কিন্তু নামেনি। পেছনের তিনজনও তাই। তারা ভাবছে, নিশ্চয় কেউ মরে পড়ে আছে। জিয়ানা ডাক্তার, সেই ব্যাপারটা দেখুক।

জিয়ানা আহমদ মুসার গায়ে হাত দিয়েই চাপা কণ্ঠে বলে উঠল, 'লোকটা বেঁচে আছে, তোমরা এস।'

ক্লাউডিয়াই প্রথম গিয়ে দাঁড়াল।

'বিদেশী ক্লাউডিয়া, মনে হচ্ছে এশিয়ান যুবক।'

চিৎ হয়ে পড়ে থাকা আহমদ মুসার মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল ক্লাউডিয়া। অজ্ঞাতসারেই মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'এ কি!'

মুখে উদ্বেগ ফুটে উঠল ক্লাউডিয়ার।

জিয়ানা বিস্মিত চোখে ক্লাউডিয়ার দিকে চেয়ে বলল, 'তুমি চেন একে ক্লাউডিয়া?'

ক্লাউডিয়া জবাব দেবার আগেই সেখানে এসে হাজির হলো ওরা তিনজন। এসে ঝুঁকে পড়ল ওরা আহমদ মুসার উপর। সুমাইয়া তার মুখের দিকে একনজর তাকিয়ে আর্তকণ্ঠে বলে উঠল, 'এ কি, কি সর্বনাশ!'

বেদনায় চুপসে গেছে সুমাইয়ার মুখ।

জিয়ানা অবাক বিস্ময় নিয়ে সুমাইয়ার দিকে চেয়ে বলল, 'তুমি চেন একে? ক্লাউডিয়াও দেখছি চেনে!'

সুমাইয়া ক্লাউডিয়ার দিকে চেয়ে বলল, 'সত্যি তুমিও চেন?'

'এসব পরে হবে জিয়ানা, মনে হয় ইনি মারাত্মকভাবে আহত, জ্ঞান হারিয়েছে। তুমি দেখ একে।'

জিয়ানা আহমদ মুসার ডান হাত ধরেই ছিল। বলল, 'যুবকটি জ্ঞান হারায়নি, প্রচণ্ড অবসাদে ঘুমিয়ে পড়েছে।'

'আঘাত কেমন?' বলল সুমাইয়া।

'একটু বড় আঘাত মাথায় ঐ এক জায়গাতেই। তবে দেখে আমার মনে হচ্ছে, আঘাতটা আগে থেকেই ছিল। তার উপর নতুন করে আঘাত লেগেছে।' বলল জিয়ানা।

'কি মনে করছ তুমি, আঘাতটা কিভাবে পেয়েছে?' বলল ক্লাউডিয়া।

'ব্যাপারটা খুবই পরিষ্কার। দেখ, ইনি পড়ে আছেন ধ্বংস হওয়া গাড়িটার বরাবর পাশেই। গাড়িটা বিস্ফোরিত হওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ইনি ঝাঁপিয়ে পড়েন গাড়ি থেকে। সেই সময় মাথার আহত জায়গায় আবার আঘাত লাগে।'

একটু থামল জিয়ানা। জ্বলন্ত গাড়িটার দিকে একবার তাকিয়ে বলল, 'আমি বিস্মিত হচ্ছি, ঠিক বিস্ফোরণের মুহূর্তে গাড়ি থেকে বের হতে পারলেন কি করে? দেখ, উনি বিস্ফোরণের পাঁচ সেকেন্ড আগেও যদি বের হতেন, তাহলে

গাড়ি বর্তমান স্থানে নয়, আরও সামনে এগিয়ে বিস্ফোরিত হতো। কিন্তু তা হয়নি। অর্থাৎ তার নামা এবং বিস্ফোরণ একই সাথে ঘটেছে।'

'তার মানে, উনি বিস্ফোরণ ঘটার ব্যাপারটা দুই-পাঁচ সেকেন্ড আগেও টের পাননি। আক্রমণটা তাহলে তার অজান্তে আকস্মিকভাবে হয়েছে। এই অবস্থায় এই ধরনের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা সত্যি দুঃসাধ্য।' বলল রিশলা।

'ওর অভিধানে মনে হয় অসাধ্য বলে কিছু নেই।' বলল ক্লাউডিয়া।

'ঠিক বলেছে ক্লাউডিয়া। একটা বিস্ময় উনি।' বলল সুমাইয়া।

'কিন্তু তোমরা বলছ না কে উনি, এদেশী তো উনি নন। তোমরা চেন কেমন করে তাকে?' বলল রিশলা ও নেকা প্রায় একসাথেই।

'সবই জানবে তোমরা। প্রথমে এর চিকিৎসা দরকার।' বলল ক্লাউডিয়া।

'একে এখান থেকে সরিয়ে নেয়া প্রয়োজন।' বলল জিয়ানা।

'ওকে তাহলে তো জাগাতে হবে।' বলল ক্লাউডিয়া।

'সেটাই আগে দেখি চেষ্টা করে। জোর করে জাগানো ঠিক হবে না। সহজে উঠেন কিনা দেখি।' বলে জিয়ানা পকেট থেকে চিরুনি বের করে আহমদ মুসার পায়ের তালুতে খুব আলতোভাবে সুড়সুড়ি দিল।

কাজ হলো।

খুব ধীরে ধীরে চোখ খুলল আহমদ মুসা। মনে হলো, চোখ খোলার আগে চিন্তা করল।

চোখ খোলার পর প্রথমে তার চোখ গিয়ে পড়ল গলায় স্টেথিস্কোপ ঝোলানো জিয়ানার দিকে। তারপর তাকাল ক্লাউডিয়ার দিকে। ক্লাউডিয়ার উপর চোখ পড়তেই তার চোখ চঞ্চল এবং চোখে-মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল। এরপর সে দ্রুত সবার উপর চোখ বোলাল। চোখ গিয়ে পড়ল তার সুমাইয়ার উপর।

আহমদ মুসা এক ঝটকায় উঠে বসল। ক্লাউডিয়া ও সুমাইয়ার দিকে চেয়ে বলল, 'ক্লাউডিয়া, সুমাইয়া আপনারা? এখানে?'

'হ্যাঁ, আমরা এখানে।' বলে ক্লাউডিয়া জিয়ানা, রিশলা ও নেকাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'এখান থেকে প্রথমে সরে যাওয়া প্রয়োজন, তারপর আপনার চিকিৎসা প্রয়োজন।'

‘ওরা একবার ফিরে এসেছিল। আবারও আসবে আশংকা করছেন?’ বলল আহমদ মুসা।

‘কেমন করে জানলেন ওরা এসেছিল?’ প্রায় সমস্বরে বলে উঠল সকলে। তাদের চোখে-মুখে বিস্ময়।

‘আমার মনে হচ্ছে, ওরা ফিরে না এলে আপনারা আমাকে এখান থেকে সরাবার জন্যে তাড়াহুড়া করতেন না।’

‘কেন এটা মনে করছেন?’ বলল জিয়ানা।

‘এই জন্যে করছি যে, ওরা ফিরে না এলে আপনারা বুঝতেনই না কিভাবে দুর্ঘটনাটা ঘটল কিংবা কি ধরনের লোক এটা ঘটিয়েছে। অতএব আপনাদের ভয়ও জাগতো না।’

‘ভয় করছি কি আমরা?’ বলল জিয়ানা।

‘আমার তাই মনে হচ্ছে। প্রাথমিক চিকিৎসা করার আগেই যখন আপনারা এ স্থান থেকে সরতে চাচ্ছেন, তখন এটাই ধরতে হয় যে, ভয়টাই আপনাদের কাছে প্রথম বিবেচ্য।’ বলল আহমদ মুসা।

জিয়ানা, রিশলাদের চোখে-মুখে বিস্ময়ের পাশাপাশি সপ্রশংস অনুভূতির স্ফূরণ ঘটল।

‘ধন্যবাদ।’ জিয়ানা বলল। তারপর বলল, ‘আপনাকে গাড়িতে উঠতে হবে।’

‘উঠবো। কিন্তু তার আগে প্লিজ আমাকে বলুন, ওরা কতক্ষণ আগে গেছে, কোনদিকে গেছে এবং আপনারা কোনদিকে যাবেন?’

‘পাঁচ মিনিটের বেশি হবে না ওরা গেছে। ওরা কুমেটের দিকে গেছে, আমরাও কুমেটের দিকেই যাব।’

‘ধন্যবাদ।’ বলে আহমদ মুসা উঠল। আহমদ মুসার মনে হলো, তার শরীরটা আগের চেয়ে অনেক ভারি। বেশ দুর্বল মনে হচ্ছে নিজেকে।

আহমদ মুসা হাঁটতে শুরু করেছিল গাড়ির দিকে।

আহমদ মুসার মুখে হঠাৎ নেমে আসা মলিন ছায়া নজর এড়ালো না ডাক্তার জিয়ানা বার্নেসের। বলল, ‘আপনাকে কি আমি সাহায্য করতে পারি?’

‘থ্যাংকস। হাঁটতে অসুবিধা হচ্ছে না।’

‘আপনি শেষ খাবার কখন খেয়েছেন?’

‘গতকাল দুপুরের পর। কেন বলছেন একথা?’

‘আমার মনে হচ্ছে, আপনার খালি স্টমাকই এখন বড় সমস্যা।’

গাড়ির দরজায় এসে ক্লাউডিয়া আহমদ মুসাকে বলল, ‘আপনি পেছনের সিটে বসুন।’

‘কিছু মনে করবেন না, এটাই কি ভাল নয় যে, আমি সামনের সিটে বসলাম? পেছনে আপনারা চারজন বসলেন?’

ক্লাউডিয়া সংগে সংগেই হেসে বলল, ‘একটু ভুল হয়েছিল আমার। ঠিক আছে।’ মনে মনে লজ্জিত হলো ক্লাউডিয়া। আহমদ মুসা মুসলিম এবং মেয়েদের সাথে অবাধ মেলামেশা ও সংগ এড়িয়ে চলে, এ কথা সে ভুলে গিয়েছিল।

‘থ্যাংকস।’ বলে আহমদ মুসা সামনের সিটে গিয়ে বসল।

ক্লাউডিয়া এসে বসল ড্রাইভিং সিটে।

জিয়ানা পেছনের পিকআপ থেকে একটা ক্যান এনে আহমদ মুসার হাতে দিয়ে বলল, ‘প্রথমে এটা খেয়ে নিন। শরীরটা ভাল লাগবে। তারপর স্ন্যাকস খেয়ে নিন।’ বলে স্যান্ডউইচের একটা ঠোঙাও তার হাতে দিল।

ক্যানটি হাতে নিয়ে আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই ক্লাউডিয়া বলল, ‘তুমি ভুল করেছ জিয়ানা। ইনি মুসলিম,ব্র্যান্ডি কেন, মদ জাতীয় কিছু খান না। তুমি জুস এনে দাও।’

‘স্যরি।’ বলে জিয়ানা ব্র্যান্ডির ক্যান ফিরিয়ে নিল এবং জুস এনে দিল।

পিকআপ থেকে ফাস্ট এইড বক্স নিয়ে জিয়ানা গাড়ির পেছনে প্রবেশ করল।

আহমদ মুসা বুঝল, গাড়ি অন্য কোথাও সরিয়ে নিয়ে তার আহত স্থানের শুশ্রুষা করা ওদের ইচ্ছা।

গাড়ি তখন চলতে শুরু করেছে।

‘ডাঃ জিয়ানা, আমি কি ফাস্ট এইড বক্সটা পেতে পারি?’ বলল আহমদ মুসা।

‘অবশ্যই। কিন্তু ফাস্ট এইড বক্সের আপনি কি চান?’ বলল জিয়ানা।

‘গোটা বক্সটাই।’

জিয়ানা ফাস্ট এইড বক্স বাড়িয়ে ধরল আহমদ মুসার দিকে।

‘থ্যাংকস’ বলে বক্সটি নিল আহমদ মুসা।

‘আমরা সামনে কোথাও দাঁড়াব। আপনার ক্ষতস্থানটা ড্রেসিং করতে হবে।’ বলল জিয়ানা।

‘ঠিক আছে। আপনার কাজটা যতদূর পারি এগিয়ে দিচ্ছি।’ বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা স্পিরিটে তুলা ভিজিয়ে মাথার ক্ষতটা পরিষ্কার করতে লাগল।

‘ক্লাউডিয়া, ওর পরিচয় দিলে না, তোমাদের পরিচয়ের কথাও বললে না।’ বলল রিশলা।

ক্লাউডিয়া একটু হাসল। স্টিয়ারিং হুইলে হাত রেখে সামনের দিক থেকে দৃষ্টিটা ফিরিয়ে এনে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘জনাব, ওরা সকলে আমার এবং সুমাইয়ার বন্ধু। আপনার পরিচয় যদি বলি আপত্তি নেই তো?’

‘পরিচয়টা আনন্দদায়ক হবে না। তবু নিরানন্দের ভাগ ওদের দিতে পারেন।’ আহমদ মুসা বলল।

‘বাহ, আপনি বুঝি সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন? সুন্দর সাহিত্যের ভাষায় কথা বলেন।’ বলল জিয়ানা।

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল। কথা বলে উঠল ক্লাউডিয়া। বলল, ‘সুমাইয়া, তুমি ওদের একটু ব্রিফ করো।’

বেশ কিছুক্ষণ নীরবতা। আহমদ মুসা তুলা দিয়ে মাথার আঘাত পরিষ্কার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। আর সুমাইয়া রিশলা, নেকা ও জিয়ানার মাথা দু’হাত দিয়ে কাছে টেনে নিয়ে আহমদ মুসার কাহিনী বলছিল। অন্যদিকে ক্লাউডিয়ার শূন্য দৃষ্টি সামনে প্রসারিত।

এক সময় সুমাইয়ার ব্রিফ শেষ হলো। জিয়ানা, রিশলা ও নেকার মাথা খাড়া হলো। তাদের মুখ গম্ভীর, চোখে-মুখে বিস্ময়! ব্রিফ শোনার শুরুতে তাদের

যে চটুলতা ছিল, হালকা মনোভাব ছিল, তা এখন নেই। সবাই ভাবছে, আর যতটুকু পারে দেখছে আহমদ মুসাকে।

ক্লাউডিয়া তার শূন্য দৃষ্টিটা এক সময় ফিরিয়ে নিল আহমদ মুসার মুখের উপর। আবার ফিরিয়ে নিল তার দৃষ্টিটা। ধীর কণ্ঠে বলল, 'ডোনা কেমন আছে?'

'ডোনা? ডোনাকে আপনি চেনেন?'

'আমাদের 'আপনি' না বললেই কি নয়?'

একটু থেমে আবার শুরু করল, 'ডোনা আমার বন্ধু, একই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি।'

'ডোনার সাথে আমার পরিচয়ের কথা কি করে জানলেন?'

'শুধু পরিচয় নয়, ডোনার সৌভাগ্যের কথাও জানি।'

'কি সৌভাগ্য?'

মিষ্টি হাসি ফুটে উঠল ক্লাউডিয়ার ঠোঁটে। বলল, 'থাক ওসব কথা। আপনার মাথার ড্রেসিংটা হয়ে যাক।' বলে ক্লাউডিয়া গাড়ি রাস্তা থেকে নামিয়ে নিল এবং ঝোপ ঘেরা একটা ফাঁকা জায়গায় দাঁড় করাল।

জায়গাটা নিরিবিলি সুন্দর। দক্ষিণ পাশ দিয়ে হাইওয়েটা পূর্বে কুমেটের দিকে চলে গেছে। কিন্তু রাস্তার পাশ দিয়ে গাছ এবং ঝোপ এত ঘন যে, রাস্তা থেকে এ জায়গাটা দেখাই যায় না। পূর্ব পাশ দিয়ে একটা পাকা রাস্তা হাইওয়ে থেকে বেরিয়ে উত্তরে বনের ভেতরে চলে গেছে। হাইওয়ে থেকে বেরুবার পর প্রথম দিকে রাস্তাটার দু'পার্শ্ব বনাচ্ছাদিত হলেও পরে তা ফাঁকা এবং জায়গাটার পূর্ব পাশ ঘেঁষে চলে গেছে। ফাঁকা জায়গার মাঝখানে একটা সুন্দর সবুজ টিলা।

নামল ক্লাউডিয়া গাড়ি থেকে। বলল, 'এস জিয়ানা, ড্রেসিংটা করে দাও।'

সুমাইয়ার কাছ থেকে জিয়ানা, রিশলা ও নেকা আহমদ মুসার পরিচয় পাবার পর প্রায় নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। অবাক হয়ে তারা দেখছিল আহমদ মুসাকে।

আহমদ মুসা বেরিয়ে এল। বলল, 'ক্লাউডিয়া, তোমাদের সব কথা বলা হয়নি। খুব সংকটে আছি। এক সেকেন্ড সময়ও নষ্ট না করলে ভাল হতো।'

‘সংকটটা আমাদের বলুন। ইতোমধ্যে জিয়ানা মাথার ড্রেসিংটা করে দেবে।’ বলল সুমাইয়া।

সুমাইয়া, জিয়ানা, রিশলা, নেকা সবাই গাড়ি থেকে নেমে এসেছিল।

জিয়ানা গাড়ি থেকে ফাস্ট এইড বক্স নিয়ে এসে আহমদ মুসার সামনে দাঁড়াল। মুখে তার কোন কথা নেই। বিস্ময়-বোবা দৃষ্টি তার চোখে। জিয়ানার মধ্যে দ্বিধাগ্রস্থতা।

‘রোগী যে-ই হোক, সে ডাক্তারের অধীন।’ জিয়ানার দিকে চেয়ে ঠোঁটে এক টুকরো হাসি টেনে বলল ক্লাউডিয়া।

‘না, তা নয়। আমি ভাবছিলাম আমার সৌভাগ্যের কথা।’ বলে জিয়ানা আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘জনাব, আপত্তি না থাকলে আপনি বসুন। আমার সুবিধা হবে।’

ফাস্ট এইড বক্স খুলে কাজ শুরু করল জিয়ানা।

‘এবার আপনার সংকটের কথা বলুন।’ কিছু হালকা সুরে বলল সুমাইয়া।

‘এ সংকট জীবন-মৃত্যুর একটা বাজি খেলা সুমাইয়া।’

‘জানি জনাব, আপনি সামান্য কিছুতে জড়ান না।’ গম্ভীর কণ্ঠে বলল সুমাইয়া। তার কথায় তারল্য আর নেই।

‘খুব সামান্যের মধ্যে অসামান্য দুঃখ-বেদনা থাকতে পারে সুমাইয়া।’ বলল আহমদ মুসা।

‘সামান্য আমি সে অর্থে বলিনি।’ বলল সুমাইয়া।

‘সামান্যের হস্ত স্পর্শেও সামান্য অনেক সময় অসামান্য হয়ে ওঠে।’ বলল ক্লাউডিয়া।

‘সামান্যের কাছে যা যায়, তা প্রকৃতই অসামান্য নয়।’ বলল আহমদ মুসা।

একটু থেমেই আহমদ মুসা আবার বলল, ‘থাক এসব। ক্লাউডিয়া তুমি ওমর বায়ার কথা শুনেছ। আর সুমাইয়া তুমি ওমর বায়াকে দেখেছও।’

‘হ্যাঁ, তাকে কেন্দ্র করেই তো আপনার সাথে পরিচয়। কোন দিনই যা ভোলার নয়।’ বলল সুমাইয়া।

‘ওমর বায়াকে ব্ল্যাক ক্রস কিডন্যাপ করেছিল। গত রাতে তাকে উদ্ধার করেছিলাম। ভোর রাতেই তাকে আবার ওরা দ্বিতীয়বার কিডন্যাপ করতে সফল হয়েছে। ওদেরই পিছু...।’

কথা শেষ করতে পারলো না আহমদ মুসা। উত্তর-পূর্ব বনের দিক থেকে গুলির শব্দ এল। শব্দ এল একের পর এক।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

জিয়ানা আহত জায়গাটার উপর তুলার একটা লেয়ার দিয়ে টেপ দিয়ে আটকে দিচ্ছিল। কাজটা অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছিল।

আহমদ মুসা দাঁড়ালেও জিয়ানা টেপ আটকে দেয়ার কাজ শেষ করল।

‘ধন্যবাদ জিয়ানা, ডাক্তার আপনি।’ বলে আহমদ মুসা আবার মনোযোগ নিবদ্ধ করল গুলির শব্দের দিকে।

‘মনে হচ্ছে, গাড়ি করে গুলি করতে করতে কেউ বা কারা এগিয়ে আসছে। সম্ভবত কেউ কাউকে তাড়া করেছে।’

বলে একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর বলল দ্রুত কণ্ঠে, ‘ওরা এসে গেছে। ক্লাউডিয়া, তোমরা একটু গাড়ির আড়ালে যাও।’

ক্লাউডিয়া, জিয়ানা, সুমাইয়া, রিশলা, নেকা- সবার মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল ভয়ে।

আহমদ মুসার কথা শুনেই নেকা ও রিশলা ছুটে গাড়ির আড়ালে চলে গেল। কিন্তু ক্লাউডিয়া, সুমাইয়া ও জিয়ানা তাকিয়েছিল আহমদ মুসার মুখের দিকে উদ্বিগ্নভাবে। বলতে চাচ্ছিল, আপনি বিপদগ্রস্থ, আপনি আহত, আপনারই প্রথম সরে যাওয়া দরকার। কিন্তু আহমদ মুসার মুখের দিকে চেয়ে কিছু বলার সাহস হলো না।

আহমদ মুসার কথা শেষ হবার পর মুহূর্তও গেল না। তীরের বেগে একটা কার বেরিয়ে এল রাস্তা ধরে বনের দিক থেকে। পাগলের মত তীব্র গতিতে ছুটে গাড়িটা হাইওয়েতে উঠতে চাচ্ছিল।

আবার গুলির শব্দ হলো। একই সাথে দুই গুলি।

বিকট শব্দ উঠলো টায়ার ফাটার। এবং তার সাথে সাথে ছুটে আসা গাড়িটা একটা পাক খেয়ে রাস্তা থেকে মাঠে প্রবেশ করে মুখ থুবড়ে পড়ে থেমে গেল আহমদ মুসার কাছ থেকে মাত্র অল্প কিছু দূরে।

ঠিক সেই মুহূর্তে আরেকটি গাড়ি তীব্র বেগে প্রবেশ করল মাঠে।

আগেই মাঠে ঢোকা মুখ থুবড়ে পড়া গাড়ি থেকে একজন তরুণ ও একজন তরুণী বেরিয়ে এল। তাদের চোখে-মুখে প্রবল শংকা। মৃত্যু যেন নাচছে তাদের দৃষ্টিতে।

গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা তরুণটি একবার চারদিকে চেয়ে দৌঁড় দিল আহমদ মুসার দিকে।

ততক্ষণে পেছনে এসে দাঁড়ানো গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে দু'জন রিভলভারধারী। তাদের একজন রিভলভার তুলল তরুণটির উদ্দেশ্যে।

আহমদ মুসা দাঁড়িয়েছিল স্থির দৃষ্টিতে ওদিকে তাকিয়ে। দুই পকেটে তার দুই হাত।

তার পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল ক্লাউডিয়া, সুমাইয়া এবং জিয়ানা। ঘটনার এই আকস্মিতায় তারা যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল। গাড়ির পেছনে পালাবার নির্দেশ তারা ভুলে গিয়েছিল। তাদের চোখে-মুখে ভয়-উদ্বেগ ঠিকরে পড়ছে।

আহমদ মুসা তরুণটিকে বাঁচাবার জন্যে চেষ্টার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল।

ঠিক সময়েই তার ডান হাত রিভলভারসমেত বেরিয়ে এল পকেট থেকে। আহমদ মুসা তরুণকে লক্ষ্য করে উদ্যত হয়ে উঠা রিভলভারধারী লোকটির হাত লক্ষ্যে গুলি করল। অব্যর্থ লক্ষ্য। লোকটার হাত থেকে রিভলভার পড়ে গেল। লোকটা বাম হাত দিয়ে চেপে ধরল ডান হাত।

কিন্তু আহমদ মুসার গুলির শব্দ মিলিয়ে যাবার আগেই পেছনের গাড়ি থেকে নামা দ্বিতীয় ব্যক্তির রিভলভার উদ্যত হলো আহমদ মুসার লক্ষ্যে।

আহমদ মুসার রিভলভারের নলও চোখের পলকে ঘুরে গেল তার দিকে। কিন্তু এবার আহমদ মুসা দ্বিতীয় লোকটির হাতের দিকে লক্ষ্য স্থির করার সময় পেল না। রিভলভারের নল ঘুরে এসেই স্থূল লক্ষ্যে গুলি বর্ষণ করল।

গুলিটি লোকটির বক্ষ ভেদ করল। উদ্যত হয়ে উঠা তার হাতের রিভলভারসমেতই ঢলে পড়ে গেল সে।

হাতে গুলিবিদ্ধ লোকটি গুলি খাওয়ার পর মুহূর্তেই সক্রিয় হয়ে উঠেছে। বাম হাত দিয়ে পকেট থেকে সে বের করে এনেছে টেবিল টেনিস বলের মত একটা হ্যান্ড গ্রেনেড। হাত উঠে আসছে তার মাথার উপর।

দ্বিতীয় গুলি ছোঁড়ার পর সেকেন্ডের মধ্যেই তৃতীয় গুলি বেরিয়ে এল আহমদ মুসার রিভলভার থেকে।

গুলিটা সম্ভবত আবার লোকটির হাতেই আঘাত করল। শব্দ উঠলো ভয়াবহ বিস্ফোরণের। বিস্ফোরিত হয়েছে হ্যান্ড গ্রেনেডটি লোকটির হাতেই। তারপর যা ঘটল তা দেখার মত নয়। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল লোকটির দেহ।

ক্লাউডিয়াদের চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে। হ্যান্ড গ্রেনেডটি তাদের উপর এসে পড়লে এতক্ষণে তাদের অবস্থাও ঐ দেহের মতই হতো।

আহমদ মুসা রিভলভার পকেটে রাখতে রাখতে বলল, 'ওদের আমি চিনি না। আমি এ ছেলেটিকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম, মারতে ওদের আমি চাইনি। কিন্তু...'

ক্লাউডিয়া, সুমাইয়া, জিয়ানা পেছন থেকে আহমদ মুসার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। রিশলা এবং নেকাও এসেছে। তাদের চোখে-মুখে আগের সেই মৃত্যুভয় নেই। কিন্তু উদ্বেগে বিবর্ণ তাদের মুখ।

'কিন্তু কি?' প্রশ্ন করল জিয়ানা শুষ্ক কণ্ঠে।

'কিন্তু আমি না মরে ওদের বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না। জানি না ওরা কারা। সাংঘাতিক বেপরোয়া। সাধারণত এমনটা দেখা যায় না।' বলল আহমদ মুসা।

সেই তরুণ-তরুণী দু'জন মাটিতে শুয়ে পড়েছিল। তারা ছুটে এসে আহমদ মুসার পায়ের উপর পড়ে গেল। কেঁদে উঠল। বলল, 'আপনি আমাদের বাঁচিয়েছেন।'

আহমদ মুসা ওদের হাত ধরে তুলল। বলল, 'কাউকে বাঁচাবো সাধ্য কি আমার! আল্লাহ তোমাদের বাঁচিয়েছেন। আমি আমার কর্তব্য করেছি।'

তরুণ-তরুণী দু'জন তখনও কাঁপছিল। তরুণীটি ক্লাউডিয়াদের বয়সের। তরুণটি আহমদ মুসা থেকে দুই-চার বছরের ছোট। দেখে তাদের দু'জনকেই ছাত্র মনে হচ্ছে। সহজ-সরল মুখের ভাব। জীবনসংগ্রামের চিহ্ন তাতে নেই।

ক্লাউডিয়া ও সুমাইয়া গিয়ে তরুণীটিকে কাছে টেনে নিল।

আর আহমদ মুসা কথা শেষ করে তরুণটির কাঁধে হাত দিয়ে বলল, 'এত ভয় কেন? ওরা এখন নেই।'

'না, ওরা আছে। ওরা অনেক।'

'ওরা কারা? কি শত্রুতা ওদের সাথে তোমাদের?'

'সে অনেক কথা। ওরা...'

'থাক এখন।'

বলে তরুণটিকে থামিয়ে ক্লাউডিয়ার দিকে চেয়ে বলল, 'এখান থেকে এখনি আমাদের চলে যাওয়া দরকার। অযথা ঝামেলায় জড়িয়ে লাভ নেই।'

'ঠিক বলেছেন।'

বলে সে গাড়ির দিকে এগোলো।

তার সাথে সকলে।

গাদাগাদি করে সবাই ক্লাউডিয়াদের গাড়িতেই উঠল।

ড্রাইভিং সিটে বসল আবার ক্লাউডিয়াই।

মাঠ থেকে গাড়ি বেরিয়ে ছুটল কুমেট-এর দিকে।

# ৩

গাড়িটি কুমেট শহরের প্রবেশ মুখে পৌঁছলে আহমদ মুসা পকেট থেকে রিমোট সেন্সর বের করল।

রিমোট সেন্সরটি দুই ইঞ্চি বাই এক ইঞ্চি একটি আয়তাকার পাত। এর নিচের দিকে ক্ষুদ্রাকার কয়েকটি বোতাম আছে। এবং উপরের দিকে একটি স্ক্রীন।

আহমদ মুসার মনে একটা দুশ্চিন্তা উঁকি দিয়ে আছে। যদি ব্ল্যাক ক্রসের গাড়িটা কুমেটে না ঢুকে বন্দর অথবা হাইওয়ে ধরে 'কুমপেল'-এর দিকে চলে গিয়ে থাকে, তাহলে এতক্ষণে সেটা রিমোট সেন্সরের নাগালের বাইরে চলে গেছে।

দুরু দুরু মন নিয়েই আহমদ মুসা রিমোট সেন্সর-এর একটা নির্দিষ্ট বোতামে চাপ দিল।

আনন্দে চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আহমদ মুসার। সেন্সর কথা বলেছে। সেন্সরের স্ক্রীনে লাল অ্যারো বাম পাশ ইন্ডিকেট করল।

আহমদ মুসা বলল, 'ক্লাউডিয়া, বামে কুমেট, ডানের রাস্তা উপকূলীয় শহর অ্যাবে ও গালভিনেক এবং সামনের হাইওয়ে পুবে কুমপারলে নগরীর দিকে গেছে, তা-ই কিনা?'

ড্রাইভিং সিটে বসা ক্লাউডিয়া এবং আহমদ মুসার পাশে বসা তরুণ, দু'জনের দৃষ্টি সে সময় আহমদ মুসার হাতের দিকে নিবদ্ধ ছিল। সব ব্যাপারটা তারা না বুঝলেও এটুকু বুঝেছিল যে, ওটা সূক্ষ কোন ইলেকট্রনিক যন্ত্র।

আর তরুণটির চোখে-মুখে বিস্ময়-বিমূঢ়তা এবং সেই সাথে প্রবল একটা ভীতির ভাব লেগেই ছিল। এখনও তার কাছে স্বপ্নই মনে হচ্ছে যে, তার পাশে বসা মাঝারি গড়নের প্রায় তার সমবয়সী এই যুবক প্রায় পাখি শিকারের মত করে ভয়ানক দুই লোককে হত্যা করেছে। তার আব্বার কাছ থেকে সে শুনেছে, এই

ভয়ানক লোকরা বিশ্বজোড়া অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অসীম শক্তিশালী একটা দলের সদস্য। এদের গায়ে হাত দেবার সাহস কারো নেই। এরা যা চাইবে তাই করতে পারে। অথচ ওদের দু'জন এমনভাবে মরল যে, গুলি ছোঁড়ারও সময় পেল না। পরক্ষণেই আবার ভাবল সে, লোকটি সাধারণ বটে, কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি ও মুখের ভাবের দিকে তাকালেই মনে হয়, সে অসাধারণ। লাখো লোকের মধ্যে দাঁড়ালেও তাকে আলাদা করা যাবে। তার দেহের স্পর্শ এবং তার হাত দু'টি দেখতে মনে হচ্ছে খুবই কোমল, কিন্তু গুলি ছোঁড়ার ঐ সময় তাকে মনে হয়েছিল ঋজু এক ইস্পাতের খণ্ড। আর কথা শুনে তাকে মনে হচ্ছে অত্যন্ত সপ্রতিভ এবং নরমভাষী কোন অধ্যাপক।

'আপনি ঠিক বলেছেন। কিন্তু এ খোঁজ কেন?' আহমদ মুসার প্রশ্নের জবাবে বলল ক্লাউডিয়া।

আহমদ মুসা ক্লাউডিয়ার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল, 'তোমরা কোথায় যাবে?'

'যাওয়ার কথা ছিল কুমেট এয়ারপোর্টে।'

'ও, তোমরা কোন প্রোগ্রামে এসেছিলে, এখন যে যার বাড়িতে ফিরছো?'

'কেমন করে বুঝলেন?'

'তোমাদের লাগেজ এবং 'অল ফ্রান্স গার্লস ক্যাডেট কোর'-এর স্টিকার দেখে।'

'যাওয়ার কথা ছিল এয়ারপোর্টে, কিন্তু এখন যাচ্ছি না।'

'কোথায় যাবেন?'

'কারও আপত্তি না থাকলে আমাদের ক্যাডেট কোরের রেস্টহাউসে উঠবো।'

আহমদ মুসা তরুণের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'আপনার নাম কি? আপনারা কোথায় যাবেন?'

'আমি রালফ ফ্রিক আর ও আমার স্ত্রী ডেবরা ল্যাসজার। প্যারিসের ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বর্ষের ছাত্র। আমরা ভ্যাকেশনে গিয়েছিলাম

আমেরিকা। প্যারিস ফেরার পথে কুমেটে এসেছিলাম খালার সাথে দেখা করতে। আমরা এখন প্যারিস ফিরব।'

'কিন্তু এখন কোথায় যেতে চান?'

মুহূর্তখানেক ভাবল। তারপর বলল, 'খালা আম্মার ওখানে যেতে চাই না। ওখানে ওরা চোখ রাখবে নিশ্চয়। কিন্তু ওখানে টিকেট, লাগেজ সব আছে।'

কথা শেষ না করেই চুপ করল তরুণটি। আহমদ মুসা বুঝল, কোথায় যাবে ঠিক করতে পারছে না। ভয় করছে?

'তাহলে এদের সাথে ক্যাডেট কোরের রেস্টহাউসে গিয়ে উঠুন। এরা আপনাদের সহযোগিতা করবে।'

'আপনার কথায় মনে হচ্ছে, আপনি আমাদের সাথে যাচ্ছেন না।' পেছন থেকে বলল সুমাইয়া।

'হ্যাঁ বোন, আমাকে এখানে নামতে হবে।'

'কিন্তু আপনি আহত, অসুস্থ। আপনার চিকিৎসার কিছুই হয়নি এখনও।' বলল ক্লাউডিয়া।

'কিন্তু ক্লাউডিয়া, আমার চেয়ে খারাপ অবস্থা ওমর বায়ার, যাকে ওরা ধরে নিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, ওরা এখনও এই শহরে রয়েছে।'

'ঠিক আছে। আমরা শহরেই ঢুকছি। কোথায় যেতে হবে, কি করতে হবে বলুন।' ক্লাউডিয়া বলল।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'কোথায় যেতে হবে জানি না। কি করতে হবে সে ব্যাপারে এটুকুই জানি যে, এখানে নেমে একটা ট্যাক্সি নিয়ে কিডন্যাপকারী সেই গাড়িকে খুঁজে বের করব। তারপর দেখতে হবে কি করা যায়।'

'আমাদের গাড়ি আছে। আমরা খোঁজায় তো আপনাকে সহযোগিতা করতে পারি।'

'এসব কাজ দল বেঁধে হয় না। তোমরা এদের নিয়ে রেস্টহাউসে যাও। টিকেট ও লাগেজ এনে দাও ওদের। আমার মনে হয়, তোমরা একসাথেই প্যারিস যেতে পারবে।'

বলে আহমদ মুসা একটু থেমেই আবার বলল, 'তোমাদের কারও কি জেন্টস ডিজাইন এর হ্যাট আছে?'

'আমার আছে, যদি আপনি পছন্দ করেন।' বলল জিয়ানা।

বলে সে হ্যাট আহমদ মুসার দিকে তুলে ধরল।

আহমদ মুসা হ্যাটটি হাতে নিতে নিতে বলল, 'ধন্যবাদ, খুব ভাল হ্যাট।'

'ওয়েলকাম।' বলল জিয়ানা।

'সামনে গাছতলাটায় আমাকে নামিয়ে দাও ক্লাউডিয়া।'

ক্লাউডিয়ার মুখ গম্ভীর। এভাবে আহমদ মুসার নেমে যাওয়াটাকে সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। মনের কোথায় যেন খচ খচ করে উঠছে একটা বেদনা।

ক্লাউডিয়া গাছের ছায়ায় নিয়ে দাঁড় করাল গাড়ি। গাড়ি দাঁড় করিয়েই ক্লাউডিয়া গাড়ি থেকে নেমে গাড়ি ঘুরে এসে আহমদ মুসার দরজা খুলে ধরল।

ডেবরা ছাড়া জিয়ানা, সুমাইয়ারাও নেমে এসেছে।

আহমদ মুসা নেমে এল। সুমাইয়া বলল, 'আমাদের কি কিছুই করার নেই?'

'দোয়া কর বোন।' বলল আহমদ মুসা।

জিয়ানা আহমদ মুসার হাত থেকে হ্যাটটি নিয়ে আহমদ মুসার মাথায় বসিয়ে দিয়ে বলল, 'বাহ, আমার চেয়ে আপনার মাথা বড় নয়।'

'ডাক্তারদের মাথা কারো চেয়ে ছোট হয় না।' হেসে বলল আহমদ মুসা।

'আমি মগজ বড়োর কথা বলিনি।'

'না মাপার আগে ছোটও বলতে পার না।'

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা ক্লাউডিয়ার ভার হয়ে থাকা মুখের দিকে চেয়ে বলল, ' রেস্টহাউস কোথায়?'

'সাগর থেকে উঠে আসা খাঁড়ির একদম উত্তর মাথায় পুবপাশের প্রথম পাহাড়টায়।'

'থ্যাংকস। তোমরা যাও। আমি একটা ট্যাক্সি ডেকে নেব।'

ক্লাউডিয়া আহমদ মুসার কথার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে রাস্তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই একটা ট্যাক্সি মিলল। হাত তুলে ডাকল ক্লাউডিয়া।

ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো ক্লাউডিয়ার গাড়ির পেছনে। আহমদ মুসা সেদিকে এগিয়ে বলল, 'শহরটা একটু ঘুরব। ঠিক আছে?'

মাথা নেড়ে ট্যাক্সিওয়ালা বলল, 'ওয়েলকাম স্যার।'

আহমদ মুসা উঠল গাড়িতে।

ছেড়ে দিল গাড়ি।

'ওদে' নদী কুমেট শহরের ঠিক মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত হয়ে শহরের দক্ষিণ প্রান্তে আটলান্টিক থেকে উঠে আসা খাঁড়িতে গিয়ে পড়েছে। নদী ও খাঁড়ির মিলনস্থল থেকে সোজা সিকি মাইল পশ্চিমে একটা ছোট টিলার উপর দেয়াল ঘেরা একটা তিনতলা বাড়ি।

একটা রাস্তা বাড়ির গেটে গিয়ে শেষ হয়েছে। বাড়িতে একটাই গেট।

গেট পেরোলে একটা লাল ইট বিছানো রাস্তা গাড়ি বারান্দায় গিয়ে শেষ হয়েছে। গাড়ি বারান্দা থেকে সিঁড়ির তিনটি ধাপ পেরিয়ে উঠলে কাঠের একটা সুদৃশ্য দরজা। দরজা পার হলে একটা করিডোর। দু'দিকে কক্ষ। করিডোর কিছুদূর সামনে এগিয়ে একটা বিশাল হল ঘরের দরজায় গিয়ে শেষ হয়েছে।

হল ঘরটি সুন্দরভাবে সাজানো। হল ঘরের দু'প্রান্ত থেকে দু'টি সিঁড়ি উঠে গেছে উপরে। ডানদিকে অর্থাৎ পশ্চিম দিকের সিঁড়ির গোড়া থেকে দক্ষিণ দেয়ালের সাথে একটা দরজা খুললেই দেখা যাবে, একটা সিঁড়ি নেমে গেছে বেজমেন্টে। বেজমেন্টেও উপর তলার মত হল ঘর এবং কক্ষের সারি।

সেই কক্ষগুলোরই একটি। একেবারে এক প্রান্তে। ওমর বায়া চেয়ারে বসা। তার হাতদু'টি চেয়ারের হাতলের সাথে বাঁধা। মাথার চুল উষ্কখুষ্ক। ঠোঁটের কোণ বেয়ে রক্ত ঝরছে। তার মাথাটা চেয়ারের উপর নেতিয়ে পড়া।

একটা গরিলা সদৃশ লোক দাঁড়িয়ে ছিল ঘরের একপাশে। তার চোখ দু'টি জ্বলছিল যেন হিংসার আগুনে।

পিয়েরে পল বলছিল, 'তোর জন্যে আমাদের যে লোকক্ষয় হয়েছে, যে ক্ষতি হয়েছে, তাতে তোর প্রতি অণু কেটে কেটে জ্বালিয়ে দিলেও আমাদের জ্বালা মিটবে না। কিন্তু তোকে মারবো না। মারলে তুই জিতে যাবি। আর আমরা হেরে যাব, ব্ল্যাক ক্রস হেরে যাবে। কিন্তু পবিত্র ক্রস হারবে না।'

বলে একটু দম নিল পিয়েরে পল। কয়েক রাউন্ড পায়চারি করল মেঝেতে। তারপর ওমর বায়ার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'জানিস, তোকে আর কেউ কোন দিন উদ্ধার করতে আসবে না। শয়তানের শয়তান আহমদ মুসাকে আমরা ধ্বংস করেছি।'

ওমর বায়া তার বন্ধ চোখটা খুলল। তার চোখে অনেকটা বিদ্রুপের ভাব ফুটে উঠেছে। বলল, 'তার কেশ স্পর্শ করার সাধ্য আপনাদের নেই। উনি হলেন ক্রিসেন্টের বিজয়ের প্রতীক। এই প্রতীককে ধ্বংস করার সাধ্য আপনাদের নেই।'

হো হো করে হেসে উঠল পিয়েরে পল। বলল, 'তোমাদের ক্রিসেন্টের প্রতীক একেবারে গুঁড়িয়ে গেছে। শয়তানের শয়তান আহমদ মুসা তোমাকে উদ্ধারের আশায় গাড়ি নিয়ে আমাদের অনুসরণ করছিল। আমাদের চকোলেট বোমা তাকে গাড়িসুদ্ধ শেষ করে দিয়েছে।'

'আমি বিশ্বাস করি না। ক্রিসেন্টের প্রতীককে তোমরা ধ্বংস করতে পার না।'

'আহমদ মুসার সাথে লড়াইয়ে কিছু ভুল ব্ল্যাক ক্রস করেছে। কিন্তু এবার ভুল হয়নি। আমরা 'লা ইল' থেকে খবর পেলাম, রেস্টহাউস থেকে যে লোকটি গাড়ি নিয়ে আমাদের অনুসরণ করেছিল, তার বিছানার 'স্মেল টেস্ট' প্রমাণ করেছে, অনুসরণকারী লোকটি আহমদ মুসা ছিল। সুতরাং, তোমাদের ক্রিসেন্ট অস্তমিত।'

ওমর বায়ার চোখে-মুখে অন্ধকার নেমে এল। কুমেটে প্রবেশের কিছু আগে সেও তাদের গাড়ির পেছনে ভয়ানক বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছে এবং খুশিতে

ওদের উল্লাসও সে দেখেছে। দুর্বল হয়ে পড়ল তার মন। তবু বলল সে, 'মিঃ পল, ক্রস ভেঙে যায়, কিন্তু ক্রিসেন্ট অস্তমিত হয় না।'

ওমর বায়ার কথা শেষ হবার আগেই ফুঁসে উঠল পিয়েরে পল। কয়েক ধাপ এগিয়ে ওমর বায়ার মুখে একটা থাপ্পড় ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'শয়তানের বাচ্চা, সব দেখে-বুঝেও এ কথা বলছিস? পাঁচশ' বছর আগে ক্রিসেন্টের তেজ নিভে গেছে এবং ক্রসের পায়ে দলিত হয়েছে। কোথায় তোমার ক্রিসেন্ট? ক্রসের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ কেন বাড়ি-ঘর সব ফেলে?'

'আর পালিয়ে বেড়াব না। নিজেকে এবার মুক্ত করতে পারলে বাড়িতে ফিরে যাব।'

'ওয়েলকাম। আমরা এটাই চাই। তবে মুক্ত হয়ে নয়, আমাদের সম্মানিত অতিথি হয়ে যেতে হবে।' বিদ্রুপের হাসি ফুটে উঠল।

এসময় ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল একজন।

পায়ের শব্দে ফিরে তাকাল পিয়েরে পল। লোকটিকে দেখেই বলল, 'ফ্রান্সিস বাইক এসেছেন?'

লোকটি রুশো ডান্টন। ব্ল্যাক ক্রসের কুমেট অঞ্চলের প্রধান।

এই বাড়িটি ব্ল্যাক ক্রসের একটা বড় ঘাঁটি। রুশো ডান্টন এই ঘাঁটিরও প্রধান। 'কোক' প্রধান ও 'ওকুয়া'-এর উপদেষ্টা ফ্রান্সিস বাইক ব্ল্যাক ক্রসের এ ঘাঁটিতে ছিল বলেই পিয়েরে পল ওমর বায়াকে নিয়ে এখানে এসেছে। পিয়েরে পল এসে ফ্রান্সিস বাইককে পায়নি। রুশো ডান্টনকে লাগিয়েছিল পিয়েরে পল তাকেই খুঁজে বের করতে।

পিয়েরে পল কক্ষ থেকে বের হলো। রুশো ডান্টনকে নিয়ে সে উঠে এল বেজমেন্ট থেকে এবং প্রবেশ করল একতলার সেই বড় হল ঘরটায়।

ফ্রান্সিস বাইক বসেছিল সোফায়। পিয়েরে পল ঘরে ঢুকতেই সে উঠে দাঁড়াল।

দু'জন হ্যান্ডশেক করল এবং পিয়েরে পল পাশের সোফায় ফ্রান্সিস বাইকের মুখোমুখি বসল।

বসেই ফ্রান্সিস বাইক বলল, ‘আমি দুঃখিত মিঃ পল, সব কথা আমি রুশোর কাছে শুনলাম।’

‘অপূরণীয় ক্ষতি স্বীকার করেও আমরা ওমর বায়াকে ছাড়িনি।’

‘আমি কৃতজ্ঞ মিঃ পল। এ ক্ষতি পূরণ করা ‘কোক’ (KOC-Kingdom of Christ) ও ‘ওকুয়া’ (AOCOWA-Army of Christ of West Africa)-এর পক্ষে সম্ভব নয়। তবু আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আর্থিক ক্ষতির দিকটা আমরা পূরণ করবো।’

‘থ্যাংকস ফ্রান্সিস। মানসিকভাবে আমি বিপর্যস্ত। ফ্রান্সে আমাদের প্রথম শ্রেণীর যে জনশক্তি ছিল তার অর্ধেকেরও বেশি শেষ হয়ে গেছে।’

‘আমি বুঝতে পারছি না মাত্র একজন লোক...।’

কথা শেষ না করেই ফ্রান্সিস বাইক থেমে গেল।

‘আমাদের লোকেরা অনেকে বলে, তার পাশে তার আল্লাহও নাকি যাদু করে। তবে জেনে খুশি হবেন, তার আল্লাহ তাকে বাঁচাতে পারেনি। আমাদের অনুসরণ করছিল। রিজার্ভ ফরেস্টের রাস্তায় তাকে আমরা তার গাড়িসুদ্ধ খতম করে দিয়েছি।’

খুশি হওয়ার চেয়ে ফ্রান্সিস চমকে উঠলই বেশি। বলল, ‘সত্যিই মরেছে?’

‘অবশ্যই। বাঁচবার চেষ্টা করারও সুযোগ আমরা দেইনি।’

‘ঘটনা যদি সত্যি হয়, তাহলে এ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় ঘটনা আজ সংঘটিত হলো। আহমদ মুসা মুসলমানদের কাছে বিজয়ের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।’

‘যদি সত্যি হয় বলছেন কেন? আপনি কি বিশ্বাস করতে পারছেন না?’

‘মিঃ পল, অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়। ঘটনা এত বড় যে ‘যদি’ শব্দ ব্যবহার না করলে এর প্রতি যথার্থ মর্যাদা দেয়া হয় না। ব্ল্যাক ক্রস ইচ্ছে করলে এই খবর বিক্রি করে ইহুদী, চীন, রাশিয়া ও পশ্চিমের কাছ থেকে কোটি কোটি ডলার আদায় করতে পারে।’

‘ধন্যবাদ ফ্রান্সিস। সে চিন্তা আমাদের আছে।’

‘এখন বলুন, আমরা কি করতে যাচ্ছি?’

‘আমরা ওমর বায়ার মাইন্ড কন্ট্রোল প্রচেষ্টার পাশাপাশি আরেকটা বিকল্প ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করছিলাম। প্যারিসের ‘ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অব ল’-এর গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান ডঃ ডিফরজিস ক্যামেরুনের চীফ জাস্টিস ডঃ উসাম বাইকের পালক পিতা। তিনি যদি চীফ জাস্টিসকে বলে দেন, তাহলে ওমর বায়ার স্বাক্ষরযুক্ত দরখাস্ত নিয়ে গিয়ে গোটা কেসটাই প্রত্যাহার করানো যেতে পারে। আমি ক্যামেরুনের শাসনতন্ত্র ও আইন বিষয়ে এক্সপার্ট একজন আইনজ্ঞের সাথে আলোচনা করেছি। তিনি বলেছেন, ওমর বায়া যদি এখন গোটা কেসটাই উইথড্র করতে চান, তাহলে কোর্টের মাধ্যমে তার সম্পত্তির যে বিধি ব্যবস্থা করেছে সবই বাতিল হয়ে যাবে, ঠিক উইল বাতিল করার মত। তবে এ ব্যাপারে হ্যাঁ বা না বলার এখতিয়ার চীফ জাস্টিসের। তিনি ইচ্ছে করলে ওমর বায়ার হাজিরা ছাড়াই তার নিয়োগকৃত এ্যটর্নির হিয়ারিং নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন।’

‘খুব ভাল কথা। এ চেষ্টার কতদূর?’

‘ডঃ ডিফরজিস আমাদের কথায় এ পর্যন্ত রাজি হননি। আমরা একটা মোক্ষম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। এখন তিনি আমাদের কথায় আসতে বাধ্য হবেন।’

ঠিক এ সময় রুশো ডান্টন দ্রুত হল রুমে প্রবেশ করল। তার চোখে-মুখে প্রবল উত্তেজনা।

পিয়েরে পল এবং ফ্রান্সিস বাইক দু’জনেই তার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইল।

‘কি হয়েছে রুশো? কি ঘটেছে?’ বলল মিঃ পল।

‘ডঃ ডিফরজিস–এর ছেলে রালফ ফ্রিক ও তার স্ত্রী পালিয়েছে। আমাদের পেরী ও লেভী নিহত।’

‘রালফরা পালিয়েছে! পেরী-লেভী নিহত!!’ বলতে বলতে উঠে দাঁড়িয়েছে মিঃ পল। বিস্ময় ও ক্রোধ মিশ্রিত হয়ে তার মুখ বিকৃত করে তুলেছে। ধীরে ধীরে প্রতিহিংসার আগুন সেখানে ধক ধক করে উঠল।

মুহূর্ত কয়েক পরে সোফায় বসে পড়ল পিয়েরে পল। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল রুশো ডান্টন।

'রালফ–এর মতো এক দুগ্ধপোষ্য ছেলে এবং এক বালিকা হত্যা করেছে পেরী ও লেভীকে, এ কথা বিশ্বাস করতে বল?'

'মনে হয় তা নয়। ওদের লাশ পাওয়া গেছে আমাদের ফরেস্ট ঘাঁটি থেকে সাত মাইল দক্ষিণে কুমেট হাইওয়ের পাশে এক মাঠে। মাঠে পাওয়া গেছে পর পর দুটো গাড়ি। দুটোই আমাদের।'

'কিভাবে মারা গেছে?'

'লেভীর বুকে গুলির আঘাত। আর সম্ভবত গ্রেনেডের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে পেরীর দেহ।'

'দু'টি গাড়িই আমাদের কেন? গাড়ি পরীক্ষা করেছ?'

'গাড়ি দু'টি পনের গজ আগে-পিছে দাঁড়ানো। আগের গাড়িটির পেছনের ডানদিকের চাকা গুলিবিদ্ধ এবং টায়ার ফেটে গেছে।'

'গাড়ি দু'টি কি রাস্তায়?'

'না, দুটোই মাঠে প্রবেশ করা।'

চোখ বন্ধ করে মুহূর্ত কয়েক ভাবল পিয়েরে পল। তারপর চোখ খুলে সোজা হয়ে বসল। বলল, 'আগের গাড়ির টায়ার ফুটো হয়েছে পেরী কিংবা লেভীর গুলিতে। সামনের গাড়ি লক্ষ্যে ব্ল্যাক ক্রসের গুলি সব সময় পেছনের ডান চাকাতেই লাগে।'

একটু থেমে নিয়ে আবার শুরু করল পিয়েরে পল, 'পেছনের গাড়িতে ছিল পেরী এবং লেভী। আর সামনের গাড়িতে ছিল রালফ এবং তার স্ত্রী। রালফরা পালাচ্ছিল এবং পেরীরা ওদের তাড়া করেছিল। আমার মনে হয়, রালফরা হত্যা করেনি পেরীদের। কোন তৃতীয় পক্ষ হত্যা করেছে লেভীকে। কিন্তু পেরী নিজের হ্যান্ড গ্রেনেডেই মারা পড়েছে। কোন শত্রুপক্ষ হ্যান্ড গ্রেনেড ছুঁড়লে তারা শুরুতেই গাড়িসমেত পেরীদের উড়িয়ে দিত। এখন কে এই তৃতীয় পক্ষ!'

‘আপনি ঠিক বলেছেন স্যার। পেরীদের মৃতদেহের দশ গজেক দূরে আয়োডিন মাখা কিছু তুলা পাওয়া গেছে। আয়োডিন ও তুলা রালফরা যোগাড় করতে পারার কথা নয়।’

‘কিন্তু কে এই তৃতীয় পক্ষ?’

বলে মুহূর্তকাল চিন্তা করেই মিঃ পল বলল, ‘রুশো, তুমি যাও এখনি, স্থানটা দেখে এস, কোন ক্লু পাও কিনা।’

‘অলরাইট, স্যার। আর কোন নির্দেশ?’

‘না। তুমি যাও।’

রুশো ঘুরে দাঁড়িয়ে কয়েক পা এগিয়েছিল। এমন সময় প্রায় চিৎকার করে উঠল পিয়েরে পল, ‘দাঁড়াও রুশো। গিয়ে কাজ নেই।’

থমকে দাঁড়িয়ে ঘুরল রুশো। তাকাল প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে পিয়েরে পলের দিকে।

‘ডঃ ডিফরজিসের কুমেট পৌঁছার কথা ক’টায়?’ দ্রুত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল পল।

‘সময় তিনি জানাননি স্যার। বলেছেন, কুমেট পৌঁছে তিনি আমাদের নির্দিষ্ট জায়গায় সংকেত পৌঁছাবেন।’

‘আজ প্যারিস থেকে কুমেটে আসার কয়টা ফ্লাইট আছে?’

‘বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের চারটা ফ্লাইট আছে। একটা ভোর ছ’টায়, দ্বিতীয়টা বেলা বারটায়, তৃতীয়টা ছয়টায় এবং চতুর্থটি রাত বারটায়।’

পিয়েরে পল ঘড়ির দিকে চেয়ে বলল, ‘এখন বেলা সাড়ে এগারোটা। এখনি তুমি তোমাদের লোকদের নিয়ে যাও। ডঃ ডিফরজিসকে কিডন্যাপ করে এখানে নিয়ে আসবে। আমার বিশ্বাস, ভোর ছ’টার ফ্লাইটে তিনি আসেননি। সামনের যে কোন একটা ফ্লাইট তিনি ধরবেন। এ তিনটা ফ্লাইট তোমাদের পাহারা দিতে হবে। ডঃ ডিফরজিসকে হাতে পাওয়াই এখনকার প্রথম ও সবচেয়ে জরুরি কাজ।’

‘অলরাইট, স্যার।’ বলে বেরিয়ে গেল রুশো ডান্টন।

চোখ বুজল পিয়েরে পল সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে।

মুহূর্ত কয়েক পরে চোখ খুলে সোজা হয়ে বসল সোফায়। বলল, 'ছেলে হারিয়ে বাপকে পাওয়া মন্দ হবে না। তৈরি হোন মিঃ ফ্রান্সিস, আগামী কালই আমরা ক্যামেরুন যাব ওমর বায়া এবং ডঃ ডিফরজিসকে নিয়ে।'

'কালকে? কেন? কি পরিকল্পনা?' বিস্ময় ফুটে উঠল ফ্রান্সিস বাইকের চোখে।

'বলেছি না যে, ডঃ ডিফরজিসের পালক পুত্র ক্যামেরুনের চীফ জাস্টিস ডঃ উসাম বাইক। দেখবেন কি ঘটে। চীফ জাস্টিস উসাম বাইকের কাজ আদায় পানির মত তরল হয়ে যাবে। ছেলেকে হারিয়ে বাপকে পেয়ে বরং ভালই হলো।'

ফ্রান্সিস বাইকের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'ধন্যবাদ মিঃ পল। ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়েছে আমার কাছে।'

'চলুন তাহলে উঠি। মা মেরীকে ডাকুন, রুশো ডান্টন যাতে সফল হয় ডঃ ডিফরজিসকে হাতে পেতে।'

উঠল তারা দু'জনেই।

রিমোট সেন্সরটি আহমদ মুসার হাতেই ছিল। রিমোট সেন্সরের ইন্ডিকেটরের উপর নজর রেখেই নির্দেশ দিচ্ছিল ড্রাইভারকে কোন পথে কোন দিকে যেতে হবে।

'স্যার, আপনি শহরের দর্শনীয় স্থানগুলো দেখবেন, না কোন ঠিকানায় যাবেন?' বলল ড্রাইভার।

'আমার এক পুরানো বন্ধুর ঠিকানা খুঁজছি। চিন্তা করো না, তোমাকে আমি ঠিকই নিয়ে যাব।'

'ধন্যবাদ স্যার।'

'গাড়ি কোথায় থাকতে পারে'– ভাবছিল আহমদ মুসা। ব্ল্যাক ক্রসের কোন বাড়িতে বা ঘাঁটিতে থাকাটাই স্বাভাবিক। যেখানেই থাক, বোঝা যাচ্ছে, গাড়িটা স্থির দাঁড়িয়ে আছে।

রিমোট সেন্সরে দেখা যাচ্ছে, গাড়িটা এক মাইল দূরে রয়েছে।

লোকেশন ইন্ডিকেটর অনুসরণ করে আরও দুটো রাস্তা পরিবর্তন করল আহমদ মুসা।

রিমোট সেন্সরের ডিস্ট্যান্ট ইন্ডিকেটরে দ্রুত দূরত্ব কমে আসল।

'আর পাঁচশ' গজ' দেখল আহমদ মুসা। মন চঞ্চল হয়ে উঠল তার।

তখন বেশ প্রশস্ত একটা রাস্তা দিয়ে চলছিল গাড়ি দক্ষিণ দিকে। লোকেশন ইন্ডিকেটরের 'অ্যারো হেড' তখন বিশ ডিগ্রী অ্যাংগেলে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে বাঁকানো।

যতই দূরত্ব কমছে, ডিগ্রী বেড়ে যাচ্ছে। আহমদ মুসা বুঝল, এই রাস্তার পুবপাশের কোন বাড়িতে রাখা আছে গাড়িটা।

এক সময় স্থান নির্দেশক তীর চিহ্নের কৌণিক দূরত্ব নব্বই ডিগ্রীতে উঠল। দূরত্বজ্ঞাপক নির্দেশকে দূরত্ব তখন পঞ্চাশ গজ।

আহমদ মুসা গাড়ি দাঁড় করাতে নির্দেশ দিল। আহমদ মুসা জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল, বাড়িটা একটা 'অটোমোবাইল সার্ভিস সেন্টার।' বুঝতে বিলম্ব হলো না আহমদ মুসার, সার্ভিসিং–এর জন্যে সার্ভিস সেন্টারে রেখে যাওয়া হয়েছে গাড়ি।

তেতো হয়ে উঠল আহমদ মুসার মন। পরক্ষণেই মনটা আবার সজীব হয়ে উঠল, একটু সময় বেশি যাবে তাতে কি? সার্ভিস সেন্টার থেকে ঠিকানা নিয়ে সামনে অগ্রসর হওয়া যাবে। আশংকার একটা কাল মেঘ মনের কোণায় উঁকি দিল, ব্ল্যাক ক্রসের ওরা যদি গাড়ি বদল করে কুমেট থেকে চলে গিয়ে থাকে! গাড়ির ঠিকানা নিয়ে সে কি করবে!

আহমদ মুসা মন থেকে এসব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে মনে মনে বলল, পরের কাজ পরে। এখনকার কাজ হলো, গাড়ির মালিক ব্ল্যাক ক্রস–এর ঠিকানা যোগাড় করা।

আহমদ মুসা গাড়ি থেকে নামল।

ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে প্রবেশ করল সার্ভিস সেন্টারে।

সার্ভিস সেন্টারে আট-দশটার মত গাড়ি আছে। আহমদ মুসা ঢুকেই ব্ল্যাক ক্রসের গাড়িটা চিনতে পারল।

চত্বর পেরোলে সামনেই সার্ভিস শেড। সার্ভিস শেডের বাম পাশে অফিস বিল্ডিং। মাল্টি স্টোরিড।

সার্ভিস সেন্টারের সেলস ম্যানেজারের অফিস নিচতলায়, নেমপ্লেট দেখেই তা বুঝল আহমদ মুসা।

গট গট করে হেঁটে গিয়ে আহমদ মুসা প্রবেশ করল সেলস ম্যানেজারের অফিসে।

'গুড মর্নিং।' বলে শুভেচ্ছা জানাল আহমদ মুসা টেবিলের পেছনে বসা মাঝবয়সী লোকটিকে লক্ষ্য করে।

'গুড মর্নিং।' লোকটি আহমদ মুসার জবাব দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হ্যান্ডশেক করে বসল। তারপর বলল, 'বসুন।'

'থ্যাংকস। বসতে পারছি না। তাড়া আছে। 'প্যারিস-৯--৮৭৫৬২১' নং গাড়ির মালিক আমাকে পাঠালেন সার্ভিস লিস্টে আরও কয়েকটা বিষয় যোগ করার জন্যে। দয়া করে অর্ডার ফর্মটা দিন, লিখে দেই।'

'স্যরি, উনি কোন অর্ডার ফর্ম ফিলআপ করেননি। শুধু ওয়াশিং-এর জন্যে দিয়ে গেছেন। এর জন্যে আমাদের কোন অর্ডার শীট পূরণ করতে হয় না। শুধু ওয়াশিং টোকেন নিয়ে গেলেই চলে। টোকেনের ডুপ্লিকেট আমরা রাখি।'

বলে সেলস ম্যানেজার একটা ডুপ্লিকেট টোকেন বের করে টেবিলে রেখে বলল, 'এটাই ওর ডুপ্লিকেট টোকেন।'

আহমদ মুসা সেদিকে তাকিয়ে দেখল, টোকেনে নাম্বার ছাড়া আর কিছু নেই।

হঠাৎ করে একরাশ হতাশায় ছেয়ে গেল আহমদ মুসার মন।

মনের ভাবটা গোপন করে আহমদ মুসা বলল, 'তাহলে দয়া করে নতুন অর্ডারটায় লিখে নিন।'

সেলস ম্যানেজার অর্ডার শীট বের করল। আহমদ মুসা বলে গেল এবং সে লিখল। তারপর টোকেনের সাথে অর্ডার শীটকে অ্যাড করে রেখে দিল।

‘থ্যাংকস। গুড মর্নিং’ বলে বেরিয়ে এল আহমদ মুসা।

সার্ভিস সেন্টার থেকে বেরিয়ে আসার সময় আহমদ মুসা নিজেকে খুব দুর্বল ভাবল। আবার ব্ল্যাক ক্রস তার নাগালের বাইরে চলে গেল। ওমর বায়াকে হাতে পেয়েও রাখতে পারল না সে। বেচারার এখন কি অবস্থা কে জানে! আল্লাহ তাকে রক্ষা করুন।

‘সান্ত্বনার কথা এই, ওমর বায়াকে তারা হত্যা করবে না’- ভাবল আহমদ মুসা। ওমর বায়া বেঁচে থাকলেই শুধু তার সম্পত্তির আইনগত অধিকার ছিনিয়ে নেয়ার সুযোগ থাকে। এ অধিকার আদায়ের জন্যে ব্ল্যাক ক্রস এবার কোন পথে এগোবে কে জানে।

আহমদ মুসারও মাঝে মাঝে আজকাল বিস্ময় সৃষ্টি হচ্ছে, ওমর বায়ার দশ হাজার একরের একখণ্ড জমিকে ‘কোক’, ‘ওকুয়া’ এবং ‘ব্ল্যাক ক্রস’ এত গুরুত্ব দিচ্ছে কেন? এটা কি একটা জেদে পরিণত হয়েছে তাদের! ওমর বায়াকে কেন্দ্র করে এ পর্যন্ত ব্ল্যাক ক্রস-এর যে ক্ষতি হয়েছে, তার পরিমাণ ওমর বায়ার জমির মত শত খণ্ড জমির মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি। অনুন্নত ক্যামেরুনের ম্যালেরিয়া ও পীতজ্বর পীড়িত এবং ভয়ানক সিসি মাছি অধ্যুষিত একখণ্ড জমি নিয়ে জেদ এতদূর পর্যন্ত যাওয়া কিছুতেই স্বাভাবিক নয়।

‘আসল কারণ খৃস্টবাদের স্বার্থ। ‘কোক’, ‘ওকুয়া’ এবং ‘ব্ল্যাক ক্রস’ সবাই তাদের ভাষায় যিশুর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যে কাজ করছে- ভাবল আহমদ মুসা। এই দিক দিয়ে বিচার করলে তবেই তাদের জেদের তাৎপর্য বোঝা যাবে। এ বিষয়ে ভাবতে গিয়ে আহমদ মুসার চোখে ভেসে উঠল আফ্রিকার মানচিত্র। খৃস্টানদের তৈরি মানচিত্র। এই মানচিত্রে ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে আফ্রিকাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। মুসলিম মেজরিটি অঞ্চল, খৃস্টান মেজরিটি অঞ্চল এবং গোত্র-ধর্ম মেজরিটি অঞ্চল। সুদান, চাদ ও নাইজেরিয়া থেকে উত্তরে গোটা উত্তর আফ্রিকা মুসলিম মেজরিটি এলাকা। এই মুসলিম মেজরিটি এলাকার দক্ষিণে বিশাল আফ্রিকার পূর্ব উপকূল ও পশ্চিম উপকূলের দু’টি পকেটে গোত্র-ধর্ম বিশ্বাসীরা মেজরিটি। পূর্ব উপকূলের দক্ষিণাংশে মোজাম্বিক, জাম্বিয়া ও বতসোয়ানা এবং পশ্চিম উপকূলের মধ্য অঞ্চলে গ্যাবন ও ক্যামেরুন অঞ্চলে

গোত্র-ধর্ম বিশ্বাসীরা সংখ্যাগুরু। তবে বতসোয়ানা খৃস্টানদের হাতে চলে যাবার মুখে। সেখানে খৃস্টান ও গোত্র-ধর্মের অনুসারীদের সংখ্যা সমান সমান। এই দুই পকেটসহ ইথিওপিয়া, তাঞ্জানিয়া ও সোমালিয়াকে (ইথিওপিয়া ও তাঞ্জানিয়ায় মুসলিম ও খৃস্টান সমান সমান এবং সোমালিয়ায় প্রায় সবাই মুসলমান) বাদ দিলে মুসলিম উত্তর আফ্রিকার দক্ষিণে এগারটি রাষ্ট্রে খৃস্টানরা সংখ্যাগুরু। আফ্রিকার ধর্মীয় মানচিত্রে আরেকটা বিষয় লক্ষ্যণীয়। আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের সব দেশেই মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি আছে। যেমন মোজাম্বিকে দশভাগ, তাঞ্জানিয়ায় তেত্রিশ ভাগ, কেনিয়ায় ছয় ভাগ এবং ইথিওপিয়ায় চল্লিশ ভাগ মুসলিম দেখানো হয়েছে খৃস্টান মানচিত্রে। কিন্তু পশ্চিম উপকূল প্রায় মুসলিম শূন্য হয়ে পড়েছে। পশ্চিম উপকূলের নামিবিয়া, অ্যাংগোলা, কংগো, গ্যাবন ও নিরক্ষীয় গিনি- এই কয়টি দেশে মুসলিম নেই বললেই চলে। কংগোতে যে দুই পারসেন্ট মুসলমান দেখানো হয়েছে, সেটাও মনে হয় উত্তর কংগোর সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক সন্নিহিত অঞ্চলে। সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিকে ছাব্বিশ পারসেন্ট মুসলমান। আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলীয় ধর্মীয় মানচিত্রের এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি গভীর দৃষ্টি দিলে বোঝা যায়, খৃস্টানদের মুসলিম শূন্যকরণ বা মুসলিম নির্মূলকরণ অভিযান অব্যাহত গতিতে উত্তরে অগ্রসর হচ্ছে। খৃস্টানদের মুসলিম নির্মূলকরণ এই অভিযান আজ ক্যামেরুনে এসে উপস্থিত হয়েছে। দক্ষিণ ক্যামেরুনকে মুসলিম শূন্য করার কাজ তাদের প্রায় সম্পূর্ণ। ওমর বায়ার দশ হাজার একর জমির এলাকা খৃস্টানরা পেয়ে গেলেই দক্ষিণ ক্যামেরুন দখল তাদের সম্পূর্ণ হয়ে যায়। এই কারণেই ওমর বায়ার জমি নিয়ে 'কোক', 'ওকুয়া' ও 'ব্ল্যাক ক্রস' এই জেদ করছে এবং এই কারণেই তারা জমিটা হাত করার জন্যে সর্বাত্মক শক্তি প্রয়োগ করেছে। সুতরাং, আসল সংঘাতটা ক্রস ও ক্রিসেন্টের মধ্যে। ওমর বায়ার জমি দক্ষিণ ক্যামেরুনে ক্রিসেন্ট-এর এক অসহনীয় অস্তিত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে খৃস্টানদের কাছে। ওমর বায়ার জমি দখল পাকাপোক্ত করার সাথে ক্রস-এর বিজয় একাত্ম হয়ে পড়েছে।

সার্ভিস সেন্টার থেকে বেরিয়ে এসব ভাবতে ভাবতে আহমদ মুসা ফুটপাত ধরে অনির্দিষ্টভাবে হাঁটছিল। কোথায় যাবে সে? 'ব্ল্যাক ক্রস'-এর

নিকটবর্তী হবার সূত্র তার ছিঁড়ে গেছে। আবার নতুন করে সূত্র তাকে তৈরি করতে হবে। এ জন্যে আরও ভাবা প্রয়োজন। তার এখন ক্লাউডিয়ার ওখানে ফিরে যাওয়াই ভাল। ভাবল আহমদ মুসা।

একটা ট্যাক্সি ডাকল সে।

ট্যাক্সিতে চড়ে বলল, 'খাঁড়ির মুখে পুব পাশের পাহাড়ে মহিলা ক্যাডেট কোরের রেস্টহাউস।'

গাড়ি স্টার্ট নিল। চলতে শুরু করল গাড়ি।

বিরাট এক ঘুম দিয়েছিল আহমদ মুসা।

যখন ঘুম থেকে উঠল, দেখল, আসরের নামায যায় যায় অবস্থা। তাড়াতাড়ি আসরের নামায সেরে রেস্টহাউসের কমন লাউঞ্জটাতে এসে বসল।

সেখানে আগে থেকেই বসেছিল সুমাইয়া, জিয়ানা এবং ডেবরা।

আহমদ মুসা বসতেই জিয়ানা বলে উঠল, 'সুমাইয়া কিন্তু আপনার মতই নামায পড়ে।'

'নতুন কথা হলো বুঝি, গতবার পাউয়ে তো ভাইয়াই আমাদের গোটা পরিবারকে নামায শিখিয়েছিলেন। তারপর আমরা কেউ নামায ছাড়িনি। অনেক কষ্ট করে কিছু সূরা শিখেছি আমরা।'

এ সময় লাউঞ্জে প্রবেশ করল ক্লাউডিয়া। লাউঞ্জে ঢুকতে ঢুকতেই বলল, 'ম্যারাথন ঘুম দিয়েছেন আপনি।'

বসল ক্লাউডিয়া। বসেই বলল, 'বলতে পারি, আপনি ক'রাত নিশ্চয় ঘুমাননি। কি বল জিয়ানা তুমি?'

'ক্লান্তি কিংবা অন্য কারণেও এমন বড় ঘুম দিতে হতে পারে।' বলল জিয়ানা।

'ক্লাউডিয়া ঠিকই বলেছে। গতকাল বিকেল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত আমি বন্দী ছিলাম। তারপর ভোররাত পর্যন্ত লড়াই হয়েছে। সে লড়াইয়ে মারা গেছে

জনাতিরিশেক লোক। ওমর বায়াকে মুক্ত করেছিলাম অবশেষে। কিন্তু ভোররাতেই তাকে আবার কিডন্যাপ করা হয়। কিডন্যাপকারীদের অনুসরণ করেই এখান পর্যন্ত এসেছি। সুতরাং, ঘুমাবার প্রথম সুযোগ পেয়েই এখানে এসেছি।'

ইতোমধ্যে রালফ ফ্রিক ও অন্য দু'জন এসে লাউঞ্জে বসেছিল। রালফ অবাক চোখে গিলছিল কথাগুলো। ডেবরা এবং রালফ ফ্রিক রেস্টহাউসে আসার পর ক্লাউডিয়ার কাছে আহমদ মুসার সব কথা শুনেছে।

'আপনার সব কথা আমরা শুনেছি। দু'টি সৌভাগ্যের আমরা মালিক হয়েছি। এক. আপনাকে দেখার এবং আপনার সাথে কথা বলার দুর্লভ সৌভাগ্য আমাদের হলো। দুই. আপনার মত বিশ্ববিখ্যাত মানুষের সাহায্যে আমরা প্রাণে বেঁচেছি- এ কাহিনী আমরা বংশানুক্রমে বলতে পারব।' বলল ডেবরা।

'আমাকে এভাবে ভাবলে আমি কষ্ট পাই। এমন বড় লোকদের মাথার উপরে বসানো যায়। তারা মানুষের বন্ধু বা সাথী হতে পারে না।' বলল আহমদ মুসা।

'আপনি খুব সুন্দর বলেছেন। কিন্তু নেতৃত্ব যারা দেন তাদের স্থান তো মাথার উপরেই হয়।' বলল ক্লাউডিয়া।

'মাথার উপরে একজনই আছেন। তিনি আল্লাহ, তিনি স্রষ্টা। আমাদের সর্বকালের নেতা যিনি সেই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের হৃদয়ের মানুষ। বন্ধু তিনি, সাথী তিনি আমাদের। পথপ্রদর্শককে পথযাত্রীদের একজন হয়ে সবার সাথেই থাকতে হয়।' আহমদ মুসা বলল।

'কঠিন কথাগুলো আপনি সুন্দর করে বলতে পারেন। আমাদের যিশুও কি তাই?' বলল ডেবরা।

'অবশ্যই। যিশু আমাদের রাসূল (সাঃ)-এর পূর্বসূরী মাত্র।'

কফি এল এ সময়।

সুমাইয়া গিয়ে কফি নিয়ে এসেছিল। সে বলল, 'দীর্ঘ ঘুমের পর কফি আপনার ভাল লাগবে।'

'ধন্যবাদ বোন। জানি না এমন সুখের ঘুম আবার কখন ঘুমাতে পারব।'

আহমদ মুসার এ কথার সাথে সাথে সুমাইয়া, ক্লাউডিয়া, জিয়ানা সবার মুখ ম্লান হয়ে গেল। তারা জেনেছে, শুনেছে, আহমদ মুসার নিশ্চিন্ত বিশ্রামের সুযোগ খুব কমই হয়। শাটল কর্কের মতই অস্থিরভাবে সে দেশ থেকে দেশে, এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে ছুটে বেড়াচ্ছে।

'মাফ করবেন, শান্তির, স্বস্তির একটা স্থির গৃহাঙ্গনের স্বপ্ন আপনি দেখেন না? কিংবা এর প্রতি লোভ আপনার জাগে না?' বেদনার্ত চোখে বলল ক্লাউডিয়া।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'শান্তি ও স্বস্তির সংজ্ঞা কি ক্লাউডিয়া? শান্তি ও স্বস্তি দু'ধরনের আছে। দেহের শান্তি-স্বস্তি এবং মনের শান্তি-স্বস্তি। দেহের শান্তি ও স্বস্তির জন্যে প্রয়োজন বিশ্রাম। এর জন্যে আল্লাহ রাত এবং রাতের ঘুমকে নির্দিষ্ট করেছেন। কিন্তু মনের শান্তি ও স্বস্তি দিনের বিশ্রাম ও রাতের ঘুম থেকে আসে না। স্থির গৃহাঙ্গনও মনের এ শান্তি-স্বস্তি দিতে পারে না।'

'তাহলে এ শান্তি ও স্বস্তি কোথা থেকে আসবে?' বলল ডেবরা।

'মানব জীবনের স্রষ্টা নির্ধারিত একটা লক্ষ্য আছে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে মানুষের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্যও নির্দিষ্ট রয়েছে। মানব বিবেকের প্রবণতা এই দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের সাথে সংগতিশীল। মানুষ যখন এই দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করে, তখন সমাজে, পরিবারে ও ব্যক্তির জীবনে শান্তি ও স্বস্তির সৃষ্টি হয়। সমাজ ও পরিবারকে বাদ দিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্তির জীবনে শান্তি ও স্বস্তি আসতে পারে না।'

'কথাগুলো খুব ভারি। ব্যক্তির শান্তি ও স্বস্তি কি পরিবার ও সমাজের সাথে এতটাই সম্পর্কিত?' বলল ক্লাউডিয়া।

'দেহের বিভিন্ন অংশ ও অঙ্গ আছে। সব অঙ্গের সুস্থতাই দেহের শান্তি ও সুস্থতা। অনুরূপভাবে ব্যক্তি, পরিবার ও রাষ্ট্র বা সমাজ মানবজীবনের বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন অংশ হলেও অখণ্ড জীবনেরই সে সব অংশ। সুতরাং, সবগুলোর সুস্থতাই জীবনের বা ব্যক্তি জীবনের শান্তি ও সুস্থতা।' বলল আহমদ মুসা।

'এক কথায় আপনি কি বলতে চাচ্ছেন?' বলল ডেবরা।

'বলতে চাচ্ছি, সুস্থ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের জন্যে সুস্থ পরিবার এবং তার মাধ্যমে সুস্থ ব্যক্তি গঠনের আবার অন্য কথায়, সুস্থ ব্যক্তি গঠনের মাধ্যমে সুস্থ

পরিবার ও সুস্থ সমাজ গঠনের যে আন্দোলন বা যে কাজ তা আঞ্জাম দেয়ার মধ্যেই মানসিক শান্তি ও স্বস্তি নিহিত। অন্য কথায়, এই কাজকে সুকৃতির প্রতিষ্ঠা ও দুষ্কৃতির প্রতিরোধও বলা যেতে পারে।'

'আপনি বোধ হয় শেষ কাজটাই করছেন?' বলল রালফ ফ্রিক।

'এ কাজ কমবেশি সবাই করে, তোমরাও কর।'

'বিন্দুও পানি, সিন্ধুও পানি। কিন্তু তাই বলে বিন্দু কখনই সিন্ধু নয়।'

'তুমি বুঝি হাইড্রোলজির ছাত্র?'

'হ্যাঁ। আপনি জানলেন কি করে?' বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে বলল রালফ ফ্রিক।

'তোমার বিন্দু ও সিন্ধুর সুন্দর তুলনা দেখে। যাক এসব। তোমাদের ঘটনা এখনও জানতে পারিনি আমি।'

'ঠিক আছে, বলছি।' বলে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল রালফ। তারপর শুরু করল, 'আমার আব্বা ডঃ ডিফরজিস। আমার পিতা আইনের অধ্যাপক এবং প্যারিসের সবচেয়ে নামকরা আইন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা। একটা আন্তর্জাতিক চক্র তাকে দিয়ে একটি কাজ করাতে চাচ্ছিল। কিন্তু রাজি হননি তিনি। আমাদের কিডন্যাপ করা হয় আব্বার উপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে। আমাদের পণবন্দী রেখে আব্বাকে রাজি হতে বাধ্য করতে চেয়েছিল ওরা।' থামল রালফ।

আহমদ মুসার চোখে-মুখে গভীর ঔৎসুক্য। বলল, 'কি কাজ করাতে চেয়েছিল বলতে পার কি?'

'ক্যামেরুনের চীফ জাস্টিস ডঃ উসাম বাইক আমার আব্বার পালক পুত্র এবং ছাত্র। তারা চাচ্ছিল, আব্বার মাধ্যমে চীফ জাস্টিসকে দিয়ে একটা কাজ করাতে।'

'সেই কাজটা কি?'

'আমি ঠিক জানি না, তবে এটুকু শুনেছি যে, সেটা একটা সম্পত্তি হস্তান্তরের ব্যাপার।'

'সম্পত্তি!' আহমদ মুসার কণ্ঠে বিস্ময়ের যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটল।

'তাই শুনেছি।' আহমদ মুসার কণ্ঠ রালফকে অবাক করেছে এবং অন্য সবাইকেও।

'সেই আন্তর্জাতিক চক্র কারা? 'ব্ল্যাক ক্রস' কি?'

আহমদ মুসার কণ্ঠে ব্ল্যাক ক্রস-এর নাম উচ্চারিত হবার সাথে সাথেই রালফ ফ্রিক ও ডেবরার চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল ভয়ে।

রালফ সোজা হয়ে বসে ভয়ার্ত কন্ঠে বলল, 'ঠিক বলেছেন, কিন্তু আপনি জানলেন কি করে?'

'ঠিক বলছ, ব্ল্যাক ক্রস?' বলতে বলতে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। তার চোখে-মুখে উত্তেজনার ছাপ।

কয়েকবার এদিক-ওদিক পায়চারী করল। তারপর এসে সোফায় বসে বলল, 'রালফ, তোমার আব্বাকে এখনি টেলিফোন কর। তোমাদের খবর জানাও এবং তাকে সাবধানে থাকতে বল।'

'কেন বলছেন এ কথা?'

'যা বলছি, দয়া করে শোন।'

রালফ আর কোন কথা বলল না। উঠে গেল তার কক্ষে। দু'মিনিটও যায়নি, ফিরে এল সে। লাউঞ্জে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'আব্বা কুমেট চলে এসেছেন।'

'কুমেট চলে এসেছেন? কবে?'

'আজ। সন্ধ্যা ছয়টায় পৌঁছার কথা।'

আহমদ মুসা সময় শোনার সঙ্গে সঙ্গেই তার ঘড়ির দিকে তাকাল। বেলা সোয়া ছয়টা। আহমদ মুসা বলল, 'রালফ, তৈরি হয়ে নাও। এয়ারপোর্ট যেতে হবে।'

আহমদ মুসার মুখের দিকে তাকিয়ে রালফ কোন কথা না বলে উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'মাফ করবেন, আপনি কি কোন আশংকা করছেন?'

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'আমি ব্ল্যাক ক্রসকে যতটা জানি, তাতে আমার অনুমান, তোমার আব্বাকে তারা কিডন্যাপ করবে।'

রালফ এবং ডেবরার মুখ ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল। কোন কথা রালফের মুখে যোগাল না। মুহূর্ত কয়েক ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল আহমদ মুসার দিকে।

ক্লাউডিয়ারাও উঠে দাঁড়িয়ে ছিল। ক্লাউডিয়া বলল, 'আমরা যেতে পারি না? গাড়ি আছে।'

ক্লাউডিয়ার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আহমদ মুসা রালফের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার আব্বা তোমার খালাম্মার ওখানে উঠতে পারেন?'

'জ্বি, হ্যাঁ।' বলল রালফ।

'তোমার খালু সাহেব, খালাম্মা নিশ্চয় এয়ারপোর্টে যাবেন তোমার আব্বাকে রিসিভ করতে?'

'অবশ্যই।'

'তাহলে ক্লাউডিয়া, তোমরা যেতে পার।' বলল আহমদ মুসা ক্লাউডিয়ার দিকে চেয়ে।

ক্লাউডিয়া, জিয়ানা, সুমাইয়াদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আনন্দে। এরকম একটা মুহূর্তে আহমদ মুসার পাশে থাকতে পারাকে তারা তাদের সৌভাগ্য মনে করছে।

সবাই প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে এল।

আহমদ মুসা ও রালফ উঠল এক গাড়িতে এবং ক্লাউডিয়ার নেতৃত্বে মেয়েরা উঠল অন্য গাড়িতে।

আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেরি হয়ে গেল রালফ। প্লেনের যদি দেরি না হয়, ঠিক সময়ে পৌঁছা আমাদের জন্যে কঠিন হবে।'

বলে আহমদ মুসা গাড়িতে স্টার্ট দিল।

দুইটি গাড়ি ছুটে চলল এয়ারপোর্টের দিকে।

শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে এয়ারপোর্ট।

প্রায় এসে গেছে আহমদ মুসারা এয়ারপোর্টে।

আহমদ মুসার গাড়ি আগে এবং পেছনে ক্লাউডিয়ার গাড়ি।

আহমদ মুসা সামনের সিগন্যাল দেখে বুঝল, তাকে একটু সামনে গিয়ে বাঁয়ে ঘুরতে হবে ‘আগমন’ টার্মিনালের কারপার্কে গাড়ি রাখার জন্যে।

আহমদ মুসা গিয়ারে হাত রাখল গাড়ি স্লো করে মোড় নেবার জন্যে।

ঠিক এই সময়েই আহমদ মুসা দেখল, আগমন টার্মিনালের কারপার্কের দিক থেকে রাস্তার নির্গমন লেন দিয়ে একটা গাড়ি পাগলের মত ছুটে বেরিয়ে আসছে। সামনের গাড়ি ওভারটেক করতে গিয়ে হর্নও দিল অত্যন্ত দ্রুত তালে।

হর্ন শুনে চমকে উঠল আহমদ মুসা। ব্ল্যাক ক্রসের কোড। তাহলে কি...।

চিন্তার সাথে সাথেই আহমদ মুসা রিয়ার ভিউ-এর দিকে একবার তাকিয়ে দ্রুত গাড়িটা ডান দিকে ঘুরিয়ে রাস্তার পাশে নিয়ে নিল। কিন্তু রাস্তার নির্গমন লেনে যাওয়ার কোন উপায় নেই। মাঝখানে লোহার জালের ডাবল বেড়া। পেছনে গাড়ির সারি। কোনদিকে নড়ার উপায় নেই।

সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল আহমদ মুসা।

গাড়ির দরজা খুলে এক ঝটকায় বেরিয়ে এল সে। হাতে সাদা নলের একটা পিস্তল। পিস্তলের বাঁটের দিকটা হাতের মধ্যে, শুধু লম্বা নলটাই দেখা যায়।

গাড়ি থেকে বের হবার সঙ্গে সঙ্গেই তার ডান হাতটি বিদ্যুৎ গতিতে উপরে উঠল।

নির্গমন লেনের পাগলা গতির গাড়িটা তখন আহমদ মুসার সমান্তরাল থেকে অনেকখানি সামনে এগিয়ে গেছে। পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী কৌণিক অবস্থান নিয়ে আহমদ মুসার হাত উপরে উঠেছিল। পর পর দু’টি দুপ দুপ শব্দ উঠল।

রাস্তার দু’টি লেনই মহাব্যস্ত। কারও ভ্রূক্ষেপ এদিকে নেই। দু’একজনের দৃষ্টি এদিকে পড়লেও তাদের মনে সামান্য অলস ঔৎসুক্য জাগল মাত্র।

আহমদ মুসা সাইলেন্সার ও পিস্তলটি পকেটে ফেলে গাড়ির দিকে ফিরল।

আহমদ মুসার গাড়ি রাস্তার পাশে চলে আসার সাথে সাথেই ক্লাউডিয়া তার গাড়িটিও আহমদ মুসার গাড়ির পেছনে রাস্তার পাশে এনে দাঁড় করিয়েছিল।

রালফ, ক্লাউডিয়া, ডেবরা, জিয়ানা, সুমাইয়াসহ সকলেরই চোখ-মুখ উদ্বেগে ভরা। ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে সকলের। তারা বুঝতে পারছে না কি ঘটেছে। ভেলকিবাজীর মতই মনে হচ্ছে আহমদ মুসার গোটা কাজ।

রালফ গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। ক্লাউডিয়ারাও এসে দাঁড়াল সেখানে। কিন্তু তাদের মুখে কোন কথা নেই।

'চল আমরা অ্যারাইভাল টার্মিনালে যাই। সেখানে গেলে সব জানতে পারব। এদিক দিয়ে পাগলের মত যে গাড়িটা গেল সেটা ব্ল্যাক ক্রসের বলে আমি মনে করছি।'

'তার অর্থ...।' কথা শেষ করতে পারল না রালফ। রুদ্ধ হয়ে গেল তার কণ্ঠ।

আহমদ মুসা রালফের পিঠ চাপড়ে বলল, 'ভেংগে পড়ো না। চল আমরা টার্মিনালে যাই।'

বলে আহমদ মুসা গাড়ির দিকে অগ্রসর হল।

সবাই গিয়ে গাড়িতে উঠল।

পৌঁছল গিয়ে টার্মিনালে।

পুলিশে-মানুষে মিলে সেখানে ছোট-খাট একটা জটলা।

আহমদ মুসা, রালফ এবং ডেবরা সেখানে গাড়ি থেকে নামল। তারা নামতেই একজন মধ্যবয়সী মহিলা এসে জড়িয়ে ধরল রালফকে। চিৎকার করে বলল, 'তোরা কোত্থেকে এলি বাবা? তোদের জন্যে তোর আব্বা এসেছিলেন, কিন্তু সর্বনাশ হয়ে গেছে!'

মধ্যবয়সী একজন ভদ্রলোক এসে দাঁড়াল ডেবরার পাশে। কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'তোমরা কোত্থেকে এলে? কিভাবে মুক্তি পেলে? বাসায় গিয়েছিলে?'

ডেবরা আহমদ মুসাকে দেখিয়ে বলল, 'উনি আমাদের মুক্ত করেছেন। বাসার উপর ওরা চোখ রেখেছে বলে আমরা বাসায় যাইনি।'

রালফের খালাম্মা রালফের কাছ থেকে এসে জড়িয়ে ধরল ডেবরাকে। বলল, 'কেমন ছিলে মা তোমরা? তোমার শ্বশুর কি যে খুশি হতো তোমাদের দেখলে! কিন্তু সর্বনাশ হয়ে গেল। এখন কি হবে?'

আহমদ মুসা এগিয়ে গেল মধ্যবয়সী সেই ভদ্রলোকের দিকে। এ সময় রালফও এগিয়ে এল তার খালুর দিকে। আহমদ মুসাকে দেখিয়ে বলল, 'ইনি আমাদের জীবন বাঁচিয়েছেন এবং আমাদের মুক্ত করেছেন।'

'তোমার নাম কি? তুমি কে বাবা? ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।' বলল রালফের খালু।

রালফের খালাও তাদের কাছে এগিয়ে এসেছিল।

রালফ মুখ খুলেছিল তার খালু সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে কিছু বলার জন্যে। কিন্তু তার আগেই আহমদ মুসা বলল, 'এসব পরে হবে। দয়া করে বলুন, যে গাড়িতে করে রালফের আব্বাকে ওরা নিয়ে গেছে, তার নাম্বার কি আপনি দেখেছেন?'

'দেখেছি। কিন্তু...।' বলে একটু থামল। বোঝা গেল, স্মরণ করার চেষ্টা করছে গাড়ির নাম্বার। বলল, 'কুমেট-২৩৫...।' থেমে গেল। স্মরণ করতে পারল না।

'২৩৫৪৫৬ কি?' বলল আহমদ মুসা।

'ঠিক এ রকমই। তুমি জানলে কি করে?'

'গাড়ির রং কি নীল?' বলল আহমদ মুসা।

'হ্যাঁ, নীল। তুমি দেখেছ গাড়ি?'

'দেখেছি।' বলে আহমদ মুসা একটু থামল। তারপর বলল, 'আমরা এখান থেকে যেতে পারি।'

'হ্যাঁ, পুলিশ গাড়ির নাম্বার নিয়েছে। ওরা কি করল খোঁজ নিতে হবে।'

গাড়ি থেকে ক্লাউডিয়ারা সবাই নেমে এসেছিল। সবারই উদ্বেগ ভরা মুখ।

'গাড়ির নাম্বারটা ভুয়া। পুলিশ কিছুই খুঁজে পাবে না।'

'ভুয়া? বুঝলে কি করে তুমি?' বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে বলল রালফের খালু ভদ্রলোকটি।

'গাড়িতে ঠিক নাম্বার প্লেটটি রেখে কি কেউ কিডন্যাপের মত কাজ করতে আসে জনাব?' বলল আহমদ মুসা।

‘ঠিক বলেছ তুমি। তোমার তো সাংঘাতিক বুদ্ধি! গাড়ির নাম্বার কেমন গড় গড় করে বলে গেলে!’

‘তাহলে আমরা এখন যেতে পারি’ আহমদ মুসা বলল।

‘যেতে পারি। একবার পুলিশ অফিসে যাওয়া দরকার কিনা। ওরা কি করছে দেখা দরকার। তাড়াও দেয়া দরকার।’

‘ঠিক আছে যেতে পারেন। আমার একটু ভিন্ন কাজ আছে।’

‘ঠিক আছে। আমি তাহলে রালফ ও ডেবরাকে নিয়ে পুলিশ অফিসের দিকে যাই।’

আহমদ মুসা কিছু বলার আগেই রালফ ফ্রিক তার খালু ভদ্রলোককে উদ্দেশ্য করে বলল, ‘খালু সাহেব, আপনি একে জানেন না। পরে বলব আপনাকে। কোন উপকার করলে ইনিই করতে পারেন। ডেবরা আপনার সাথে যাক। আমি এর সাথে থাকতে চাই।’

‘আমার ভয় করছে। দু’জন একসাথে থাকব।’ বলল ডেবরা।

‘আমার মনে হয়, রালফের আব্বাকে তাদের কাজ করিয়ে দিতে বাধ্য করার জন্যে ওরা সব উপায়েরই সদ্ব্যবহার করবে। সুতরাং, রালফ এবং ডেবরাকে একটু সরেই থাকা দরকার।’ বলল আহমদ মুসা।

রালফের খালু ও খালাম্মার চোখে নতুন করে ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল। তার খালাম্মা বলল, ‘সেটাই ভাল। ওরা একটু সরে থাক। সব সময় যোগাযোগ রাখলেই চলবে।’ বলে স্বামীর দিকে চেয়ে বলল, ‘চল, আমরা দু’জন পুলিশ অফিস দিয়ে যাই।’

কথা শেষ করে ভদ্রমহিলা ডেবরাকে একটু চুমু খেয়ে ক্লাউডিয়াদের দিকে চেয়ে বলল, ‘তোমরা বোধ হয় একসাথেই থাকছ? ওদের দেখো বাছারা।’

বলে সে গাড়ির দিকে এগোলো। রালফের খালুও গিয়ে গাড়িতে উঠল।

আহমদ মুসারাও গাড়িতে উঠল তাদের সাথে সাথেই।

তিনটি গাড়িই একসাথে ছাড়ল। এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে তারা দু’টি ভিন্ন পথে এগিয়ে চলল।

# ৪

গার্লস ক্যাডেট কোরের রেস্টহাউস। রেস্টহাউসের লাউঞ্জ।

লাউঞ্জে বসে আছে রালফ, ডেবরা, ক্লাউডিয়া, জিয়ানা, সুমাইয়া এবং অন্যান্যরা। শুধু হাজির নেই আহমদ মুসা। সে টয়লেটে।

কথা বলছিল ডেবরা, 'আহমদ মুসা সম্পর্কে গল্প শুনে বুঝতে পারতাম না তিনি কত বড়। আজ চোখে দেখে বুঝলাম।'

'কোন ঘটনার কথা বলছ?' ক্লাউডিয়া জিজ্ঞেস করল।

'কোন ঘটনার কথা বলব! সব ঘটনাই একটা করে বিস্ময়। মনে হয়, যেন যাদুবলে আগে থেকেই তিনি সব জানতে পারেন। দেখ, তিনি আব্বার কিডন্যাপ হওয়ার কথা বললেন, ঠিক ঠিক তা ঘটে গেল। আবার দেখ, আমরা কিছুই বুঝলাম না, উনি ব্ল্যাক ক্রস-এর গাড়ি চিনে ফেললেন। তার নাম্বারও মুখস্থ করলেন কখন যেন। পরে প্রমাণ হলো, ঠিকই ব্ল্যাক ক্রস-এর গাড়ি।'

'আমরা সবাই গাড়ি দেখেছিলাম, কিন্তু রং না শুনলে এখন বলতে পারতাম না।' বলল ক্লাউডিয়া।

'ঠিক, শোনার পর আমার মনে পড়েছিল গাড়িটা নীল ছিল।' বলল জিয়ানা।

'আমি তো ওর পাশে ছিলাম। কোন কিছু বুঝতে, সিদ্ধান্ত নিতে এবং তা সম্পাদন করতে কোন সময় তার নষ্ট হয় না। এমন ব্রেইন খুবই দুর্লভ, খুব অল্পই এরা পৃথিবীতে আসেন।' বলল রালফ।

'অদ্ভুত ঠাণ্ডা মানুষ তিনি। কোন কিছুই যেন তাকে উত্তেজিত করতে পারে না। প্রথম পরিচয় তার সাথে এক হোটেলে। একজন নিগ্রোকে বাঁচাবার জন্যে একদল গুণ্ডার সাথে লড়ে তাদের মেরে ফ্ল্যাট করে দিলেন। খেতে খেতে উঠে গিয়েছিলেন, মারামারির পর আবার এসে খেলেন। যেন কিছুই ঘটেনি।' বলল সুমাইয়া।

এ সময় আহমদ মুসা প্রবেশ করল লাউঞ্জে। তার মাথায় টুপি। এশার নামায পড়ে এলো সে।

বসল আহমদ মুসা গদিওয়ালা একটা মোড়ায়। চার সোফাই অকুপাইড। পাঁচটি সিঙ্গেল সোফায় বসেছে রালফ, ডেবরা, নেকা, রিশলা ও জিয়ানা এবং ট্রিপল সিটের দু'টি সোফার একটিতে বসেছে ক্লাউডিয়া, অন্যটিতে সুমাইয়া। তাদের দু'জনের পাশেই দুটো করে সিট খালি। আহমদ মুসা সেখানে বসলো না।

'মাফ করবেন জনাব, ক্লাউডিয়া ও সুমাইয়া আপার মত আপনার ঘনিষ্ঠজনদের পাশে বসাও কি নিষেধ?' বলল ডেবরা।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'এমন প্রশ্ন তুললে কেন?'

'তুললাম এ কারণে যে, ক্লাউডিয়া এবং সুমাইয়া আপার পাশে দু'জনের জায়গা খালি থাকতেও সেখানে না বসে আপনি তাদের অপমান করেছেন।' বলল ডেবরা।

'কি বলছ তুমি ডেবরা?' ক্লাউডিয়া এবং সুমাইয়া দু'জনেই বলে উঠল।

'না আপা, ওকে জবাব দিতে দাও।' বলল ডেবরা জেদের স্বরে।

মিষ্টি একটা হাসি আহমদ মুসার ঠোঁটে। বলল, 'ঘনিষ্ঠজনদের নিকটবর্তী হওয়ার ব্যাপারেই নিষেধ বেশি।'

'কেন?' বলল ডেবরা।

'ছেলে ও মেয়েদের ঘনিষ্ঠ হওয়ার মধ্যে বিপদ রয়েছে।' বলল আহমদ মুসা।

'যে বিপদের কথা বলছেন বুঝতে পেরেছি। ছেলে-মেয়েদের নিজস্ব শক্তির প্রতি এটা অনাস্থা নয় কি? মাফ করবেন, আপনি, ক্লাউডিয়া ও সুমাইয়ার প্রতি এই অনাস্থা কি কেউ পোষণ করতে পারে?'

গম্ভীর হলো আহমদ মুসা। বলল, 'দেখ ডেবরা, আইন বিশেষ করে খোদায়ী আইন তৈরি হয়েছে ব্যক্তিকে সামনে রেখে নয়। আল্লাহ্ তাঁর আইন দিয়েছেন মানুষের প্রকৃতি ও প্রবণতা সামনে রেখে, যা তিনিই সৃষ্টি করেছেন।'

'মানুষের প্রকৃতি ও প্রবণতার গতি কি সব সময় মন্দের দিকে?' বলল ডেবরা।

‘তুমি একটা জটিল প্রসংগ তুলেছ ডেবরা। মানুষের মধ্যে ভালো প্রকৃতি ও প্রবণতা এবং মন্দ প্রকৃতি ও প্রবণতা দুই-ই সুপ্ত আছে। বাইরের কোন দৃশ্য বা কথা বা ঘটনা মন্দ প্রবণতাকে উস্কে দেয়, আবার কোন দৃশ্য বা কথা বা ঘটনা ভালো প্রবণতাকে জাগিয়ে তোলে। আল্লাহ্‌র আইনের লক্ষ্য হলো, যে দৃশ্য বা যে কথা বা যে ঘটনা বা পরিবেশ মন্দ প্রবণতাকে উস্কে দেয়, তাকে বন্ধ করা। এটা মেনে চললে মানুষ সুস্থ থাকে, সমাজ সুস্থ থাকে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আপনাদের মত অনড় নৈতিকতা ও দৃঢ় চরিত্রের লোকদের এসব মেনে চলা কি জরুরি?’ বলল ডেবরা।

‘একজন সুস্থ–সবল ব্যক্তির শরীরে রোগ-জীবাণু কখন প্রবেশ করে, সে জানতে পারে না। যখন জানতে পারে, তখন দেখে সে আক্রান্ত। এভাবেই একজন দৃঢ় চরিত্রের লোকও ঘটনা ও পরিবেশের কারণে তার অজান্তেই মন্দ প্রবণতায় আক্রান্ত হতে পারে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আপনার নিজের প্রতিও এ অনাস্থা আপনার আছে?’ ডেবরা বলল।

‘মানবসুলভ সকল দোষ–গুণ নিয়ে আমি একজন মানুষ। অন্যদের মধ্যে যে দুর্বলতাগুলো রয়েছে, সে সব আমার মধ্যেও আছে। আল্লাহর আইন মেনে চলে আমি সে দুর্বলতা থেকে বাঁচতে চাই।’

‘আমাদের পশ্চিমী সমাজে এই নৈতিকতা নেই। মাথায় রুমাল পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রে সহ্য করা হচ্ছে না। আপনি যে দুর্বলতা থেকে বাঁচতে চাচ্ছেন, সে দুর্বলতা থেকে বাঁচার কোন সুযোগ পাশ্চাত্য সমাজে নেই। এই অবস্থায় পাশ্চাত্যের মেয়েদের জন্যে আপনার বক্তব্য কি?’ বলল জিয়ানা।

‘এদিক থেকে পাশ্চাত্যের মেয়েরা অবস্থার একটা অসহায় শিকার। তবে সমাজ ব্যবস্থা যা-ই হোক, রীতি–সংস্কৃতি যা-ই হোক, প্রতিটি মানুষের মনে স্রষ্টার মোতায়েন করা বিবেক নামক এক প্রহরী আছে, যে সব সময় ভাল কোনটা বলে দেয়, ন্যায় কোনটা বলে দেয় এবং সকল অনুচিত কাজ ও অন্যায়ের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। ছেলেমেয়েদের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও বিবেকের এই খবরদারি আছে। পাশ্চাত্যের যে মেয়েরা বিবেকের এই নির্দেশ মেনে চলতে পারে, তারা পাশ্চাত্য সমাজে থেকেও অনন্য চরিত্রের অধিকারী হয়।’

‘নর-নারীর মধ্যে হৃদয়ের সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়ার যে স্বাভাবিকতা, তাকে তাহলে অস্বীকার করতে হবে?’ বলল ডেবরা।

‘না, ডেবরা। স্বাভাবিক হলে তা অস্বীকার করা যাবে না।’ বলল আহমদ মুসা।

‘এর মধ্যে স্বাভাবিক–অস্বাভাবিক বলে কি দুই ভাগ আছে?’ জিয়ানার প্রশ্ন।

‘অবশ্যই আছে। ঘনিষ্ঠ না হবার পরেও হৃদয়ের সম্পর্ক কখনও সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু তা নীতি–সংস্কৃতির সীমা যদি লংঘন না করে এবং যদি তা কোন পরিবার ও সমাজ–সম্পর্কের প্রতি হস্তক্ষেপকারী না হয়, তাহলে একে স্বাভাবিক বলা যাবে।’

‘মানুষ ও সমাজ সম্পর্কের এত গভীরে গিয়ে আপনি ভাবেন?’ বলল জিয়ানা।

‘খুব গভীরের কথা এটা নয় ডাঃ জিয়ানা। মানুষ কে, কি দায়িত্ব নিয়ে সে দুনিয়ায় এসেছে এবং কোথায় কেন সে যাচ্ছে- এই প্রশ্নগুলোর উত্তর সন্ধান করলে মানুষ ও সমাজ সম্পর্কের এ বিষয়গুলো একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের হয়ে দাঁড়ায়।’

‘বিপ্লবী হতে আপনাকে কে বলেছিল? কেন আপনি দার্শনিক কিংবা ধর্মপ্রচারক হননি?’ সোফা থেকে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল ক্লাউডিয়া।

সোফা থেকে উঠে ক্লাউডিয়া আহমদ মুসার কাছে এসে বলল, ‘আপনি ওখানে গিয়ে বসুন।’

‘আমি বসে আছি, এটা কি আসন নয়?’ বলল আহমদ মুসা।

‘দেখুন, তাহলে আমি মেঝেতে বসে পড়ব।’

আহমদ মুসার ঠোঁটে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল। সে উঠে গিয়ে ক্লাউডিয়ার সোফায় গিয়ে বসতে বসতে বলল, ‘এ জেদটা ঠিক ডোনার মত হলো।’

‘আকাশের চাঁদের সাথে মাটির প্রদীপের তুলনা করা ঠিক হলো না।’ বলল ক্লাউডিয়া ম্লান হেসে।

‘চাঁদ এবং মাটির প্রদীপের এই তুলনা তুমি ঠিক করলে না।’ বলল আহমদ মুসা।

‘কেন? সে রাজকুমারী এবং একজন বিশ্ববিপ্লবীকে জয় করে নেয়ার মত দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী।’ ক্লাউডিয়া বলল।

‘হয়তো এতে সে জেতেনি। অনিশ্চিত ও দুঃখের এক জীবন সে বেছে নিয়েছে।’

‘এ যদি জিত না হয়, তাহলে এ পরাজয় লাখো জয়ের চেয়ে মধুর।’ বলল জিয়ানা।

এদিকে আহমদ মুসা তার মোড়ার সিট থেকে উঠার সঙ্গে সঙ্গে ডেবরা ছুটে এসে সেখানে বসে বলল, ‘আপা, আপনি ঐ সোফায় গিয়ে বসুন।’

‘বেশ ভাল, আমি রালফের পাশে গিয়ে বসি, তাই না? ওর সামনেই ওর কথা ভায়োলেট করতে বল?’

ডেবরা হাসল। বলল, ‘থ্যাংকস। আমি ভুলে গিয়েছিলাম।’ বলে ডেবরা উঠে তার সোফায় ফিরে গেল।

ক্লাউডিয়া বসল আহমদ মুসার সিটে।

আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিল।

‘ভাইয়া, আপনি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ক্লাউডিয়া আপার প্রশ্ন চাপা দিতে পারবেন না।’ আহমদ মুসাকে উদ্দেশ্য করে বলল ডেবরা।

‘আমাকে বেরুতে হবে বোন।’ বলে একটু থামল আহমদ মুসা। শুরু করল আবার, ‘ক্লাউডিয়ার প্রশ্নের উত্তর খুবই সোজা। আল্লাহর জীবন বিধান ইসলামে প্রত্যেকেই বিপ্লবী, প্রত্যেকেই ধর্মপ্রচারক এবং দার্শনিক। ইসলামী সমাজে ধর্মপ্রচারের দায়িত্ব পালনে যিনি শীর্ষে, তিনিই রাষ্ট্রপ্রধান হন, তিনিই যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতিত্বের দায়িত্ব পালন করেন।’

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা বলল, ‘রাত একটু ভারি হওয়ার অপেক্ষা করছিলাম। এখন রাত এগারটা। বেরুতে হবে আমাকে এখন।’

‘কোথায়?’ সুমাইয়া বলল।

‘ব্ল্যাক ক্রসের ঘাঁটিতে।’

‘ব্ল্যাক ক্রসের ঘাঁটি? কোথায়?’ বলল ক্লাউডিয়া।

আহমদ মুসা পকেট থেকে মাইক্রো রিমোট সেন্সর বের করল। বোতামে চাপ দিয়ে দেখল, লাল অ্যারো ইন্ডিকেটরটি ঠিক পশ্চিম দিকে ইংগিত করছে। আহমদ মুসা বলল, ‘পশ্চিম দিকে।’

আহমদ মুসাকে ছোট বস্তুটি নিয়ে ব্যস্ত হতে দেখে সবাই উঠে এসেছিল। ঘিরে দাঁড়িয়েছিল আহমদ মুসাকে। মাইক্রো স্ক্রীনে রেড অ্যারোটি সবারই নজরে পড়েছিল।

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই ক্লাউডিয়া বলে উঠল, ‘অ্যারো হেডের মাথা দেখে কি পশ্চিম দিকের কথা বললেন?’

‘হ্যাঁ।’ বলল আহমদ মুসা।

‘কি জিনিস এটা?’ বলল ক্লাউডিয়া।

‘মাইক্রো সেন্সর।’

‘কিভাবে কাজ করে?’

‘এখান থেকে পঞ্চাশ বর্গমাইলের যে কোন স্থানের মাইক্রো ট্রান্সমিটারের লোকেশন এ বলে দিতে পারে দূরত্বসহ।’

‘ব্ল্যাক ক্রসের ঘাঁটি এখান থেকে কতদূর?’ বলল রালফ।

‘সাত পয়েন্ট ছয় শূন্য কিলোমিটার।’

‘কি করে এটা সম্ভব হলো? ওখানে মাইক্রো ট্রান্সমিটার এল কোত্থেকে?’

‘তোমাদের মনে আছে, এয়ারপোর্ট টার্মিনালের সামনে যখন আমি গাড়ি থামিয়ে নেমেছিলাম, তখন ব্ল্যাক ক্রসের ঐ গাড়ি লক্ষ্যে দু’বার গুলি ছুঁড়েছিলাম। ঐ গুলিতে ছিল রাবার বুলেট। রাবার বুলেটে জড়ানো ছিল মাইক্রো ট্রান্সমিটারের চিপ। রাবার বুলেট গাড়িতে আঘাত করার সাথে সাথে চুম্বক আকর্ষণে তা সেঁটে গেছে গাড়ির বডি বা কোন পার্টসের গায়ে। সেই মাইক্রো ট্রান্সমিটারকেই এ সেন্সর এখন চিহ্নিত করছে।’

সকলের চোখে বিস্ময়! আহমদ মুসা থামলেও কারও মুখেই যেন তৎক্ষণাৎ কথা যোগাল না।

মুহূর্ত কয়েক পরে ডেবরা মুখ খুলল। বলল, ‘চোখের পলক পড়ার মত ঐ অল্প সময়ে এই বুদ্ধি আপনার মাথায় এল কি করে?’

ডেবরা থামতেই জিয়ানা বলল, ‘বলা যায়, এই সেন্সর লোকেট করছে গাড়িটাকে। কিন্তু গাড়িটা যদি হেডকোয়ার্টারে না থাকে?’

‘তাহলে অনিশ্চয়তার এক সমুদ্রে পড়ে যাব।’

‘কিছু মনে করবেন না, আমার কৌতুহল, সেই অবস্থায় আপনি কি করবেন?’ বলল ডেবরা।

‘কি করব, কি করব! গাড়ির জানালা ভেঙ্গে ঢুকে গাড়ির মালিকের ঠিকানা জেনে নেব লাইসেন্স অথবা ব্লু বুক থেকে। এ চেষ্টা ব্যর্থ হলে গাড়ির নাম্বার কাজে লাগিয়ে ভেহিকেল রেজিস্ট্রেশন অফিস থেকে গাড়ির মালিকের ঠিকানা জেনে নেব। এ উদ্যোগ কোন ফল না দিলে বিপদেই পড়ব। সে ক্ষেত্রে রালফের নাম ও ঠিকানাসহ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেব তার বাবার সন্ধান চেয়ে। নিশ্চয় ব্ল্যাক ক্রস তখন হানা দেবে রালফের ঠিকানায়। পালানো শিকার ধরে তাদের দু’জন লোক হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্যে। ব্ল্যাক ক্রস ব্যর্থ হবে, কিন্তু তাদের অনুসরণ করে আমি তাদের ঘাঁটিতে পৌঁছতে পারব।’

শ্বাসরুদ্ধভাবে ওরা শুনছিল আহমদ মুসার কথা। ওদের চোখে অপার বিস্ময় এবং আনন্দ।

‘দুনিয়ার সব বুদ্ধি আপনার মাথায় কম্পিউটারের মত প্রোগ্রাম করে ঢোকানো আছে নাকি?’ বলল ডেবরা।

‘সব মাথাই এক আল্লাহর সৃষ্টি ডেবরা।’ বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘আমি একটু তৈরি হয়ে আসি। বেরুবো এখনই।’

‘শুধু আপনি তৈরি হবেন, আমরা তৈরি হবো না?’ বলল রালফ।

আহমদ মুসা দু’পা এগিয়ে থমকে দাঁড়াল। একটু হাসল। বলল, ‘না, তোমরা যাবে না।’

‘তা হয় না।’ বলল রালফ।

‘আপনাকে একা আমরা কি করে ছাড়ব?’ বলল ক্লাউডিয়া।

‘দেখো, আমি যাচ্ছি অনেকটা অনিশ্চিতভাবে। গাড়ি কোথায় আছে জানি না। তোমাদের যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ক্ষতি তো নেই।’ বলল জিয়ানা।

‘ক্ষতি আছে। বেশি লোক গেলে বেশি লোকক্ষয়ের সম্ভাবনা।’

‘এখানে কম লোকক্ষয় হলে যে ক্ষতি হবে সেটাই বেশি ক্ষতিকর।’ বলল ক্লাউডিয়া।

‘তোমরা বুঝছ না, এটা যুদ্ধক্ষেত্র।’ বলল আহমদ মুসা।

‘দেখুন, আমাদের প্রত্যেকের পিস্তল আছে। আমরা পিস্তল চালাতে জানি।’

‘তোমাদের বাপ-মা আছে। সাময়িক আবেগ থেকে এমন সিদ্ধান্ত তোমরা নিতে পারো না।’

‘সাময়িক আবেগ এটা আমাদের নয়। ওমর বায়া আপনার কে? তার জন্যে আপনি জীবন বাজি রেখেছেন। ডঃ ডিফরজিস আপনার কেউ নয়, কিন্তু তার জন্যে আপনি ছুটছেন মৃত্যু ভয় মাড়িয়ে। এসব কি আমাদের কোনই শিক্ষা দেয় না?’ বলল ক্লাউডিয়া আবেগপ্লাবিত স্বরে।

আহমদ মুসা সোফায় বসে পড়ল পিছিয়ে এসে। বলল, ‘আমি তোমাদের বোঝাতে পারছি না। এটা দল বেঁধে যুদ্ধ করার ক্ষেত্র নয়। দুই কারণে। এক. ওরা সংখ্যায় বেশি, দুই. ওরা আগে জানতে পারলে বন্দীদের সরিয়ে নিতে পারে অথবা বন্দীদের জীবন বিপন্ন হতে পারে।’

‘ঠিক আছে। আমরা বাইরে কোথাও অপেক্ষা করতে পারি না?’ বলল রালফ।

একটু ভাবল আহমদ মুসা। তারপর বলল, ‘ঠিক আছে। পারো। পাঁচ মিনিটের মধ্যে তোমরা তৈরি হয়ে নাও।’

ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ওরা দুই গাড়িতে করে রেস্টহাউস থেকে বেরিয়ে এল।

সবুজ টিলার উপর অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে ব্ল্যাক ক্রসের সেই বাড়িটি। বাড়িটার আশেপাশে বাড়ি নেই বলে এবং গাছপালা থাকার কারণে আশপাশটা অন্ধকার। অন্ধকারের আরও একটা কারণ, বাড়ির বাইরের অংশে কোন আলো জ্বালানো নেই।

তিনতলার বিশাল ঘরটির পাশে বড় একটা অফিস কক্ষ। একটা সুদৃশ্য সেক্রেটারিয়েট টেবিল সামনে রেখে বসে আছে পিয়েরে পল। তার মুখে তৃপ্তির ভাব। চোখ দু'টি আনন্দে উজ্জ্বল।

পিয়েরে পল টেবিলের কয়েকটা কাগজ গুছিয়ে ব্রিফকেসে রেখে ইন্টারকমের সুইচ টিপে বলল, 'রুশো, তুমি ওমর বায়াকে তিনতলায় এনে ডঃ ডিফরজিসের পাশের রুমে রাখ। দরকার হলে ডক্টরকে ওমর বায়ার অবস্থাটা একবার দেখাবে।'

পিয়েরে পল উঠে দাঁড়াল কথা শেষ করে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল রাত বারটা।

পিয়েরে পল ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। মুখোমুখি পাশের ঘরটাতেই রাখা হয়েছে ডঃ ডিফরজিসকে।

পিয়েরে পল গিয়ে ডঃ ডিফরজিসের দরজার সামনে একটু দাঁড়াল। তারপর দরজার নব ঘুরিয়ে ধীরে ধীরে প্রবেশ করল ঘরে।

ঘরের এক প্রান্তে খাটে বিছানা পাতা রয়েছে। খাটের অল্প দূরে টিপয়ের দু'পাশে মুখোমুখি দু'টি সোফা পাতা রয়েছে। তারই একটিতে বসে রয়েছে ডঃ ডিফরজিস। সত্তরেরও বেশি বয়স ভদ্রলোকের। কিন্তু দেখে মনে হয় ষাট অতিক্রম করেননি। দেহের শক্ত গড়ন। তীক্ষ্ণ চোখ। উদ্বেগের একটা ছায়া ছড়িয়ে আছে তার সারা মুখে।

'হ্যালো ডক্টর' বলে পিয়েরে পল এগোলো ডঃ ডিফরজিসের দিকে।

ডঃ ডিফরজিস মুখ তুলে তাকাল পিয়েরে পলের দিকে। তার চোখে-মুখে বিস্ময়, বেদনা এবং কৌতুহলের সংমিশ্রণ। বলল, 'হ্যালো, বসুন।'

‘ধন্যবাদ।’ বলে পিয়েরে পল ডঃ ডিফরজিসের সামনের সোফায় বসে পড়ল। বলল, ‘আপনি একজন মহৎপ্রাণ মানুষ, ডক্টর। আপনাকে কষ্ট দেয়ার জন্যে দুঃখিত।’

‘আপনি কে? আমার সন্তান ও আমার বৌমাকে আপনারাই কি কিডন্যাপ করেছেন?’

পিয়েরে পলের মন খুশিতে ভরে গেল। সে নিশ্চিত হলো যে, রালফ-ফ্রাংকদের পালাবার কথা ডঃ ডিফরজিস এখনো জানতে পারেনি। এই না জানা তাদের কাজ উদ্ধারে অনেক সাহায্য করবে। বলল পিয়েরে পল, ‘কিডন্যাপ করেছি নয়, নিরুপায় হয়ে বাধ্য হয়েছি ঐ মন্দ কাজটা করতে।’

‘মন্দ কাজ করেছেন, সেটা বোঝেন তাহলে?’

‘বুঝি। কিন্তু মন্দ সব সময় মন্দ থাকে না। বৃহত্তর স্বার্থে, বৃহত্তর কল্যাণের জন্যে আমরা যেটা করেছি, সেটা এখন আর মন্দ নেই।’

‘আমাকে তো ধরেছেন, আমার সন্তানদের এখন ছেড়ে দিন।’

‘দেব। আপনাকেও আমরা ধরে রাখবো না। কিন্তু এ সব কিছুই নির্ভর করছে আপনার উপর।’

‘আমার উপর কেন?’

‘আপনাকে তো আমাদের পক্ষ থেকে সবই বলা হয়েছে।’

‘ও, ক্যামেরুনের বিচারপতি উসাম বাইককে তোমরা যা চাও সেই ভাবে কাজ করতে বলতে হবে।’

‘ঠিক। তবে ‘আমরা যা চাই’ তা নয়, ‘জাতি যা চায়’ তা-ই আমরা করতে বলছি।’

‘জাতিকে ব্যবহার করছেন কেন? ঐ জমি কি জাতি নিচ্ছে?’

‘জমি ‘কিংডম অব ক্রাইস্ট’ নিচ্ছে চার্চের নামে।’

‘আপনার কথা সত্য হলেও ‘কিংডম অব ক্রাইস্ট’-এর অন্যায়কে সমর্থন করা যায় না। অন্যান্য জাতির পক্ষ থেকে করলেও অন্যায়, ব্যাক্তি করলেও অন্যায়।’

‘আপনি বাস্তবতাকে অস্বীকার করছেন, ডক্টর।’

‘কোন বাস্তবতার কথা বলছেন?’

‘ক্রস এবং ক্রিসেন্ট-এর লড়াইয়ের কথা।’

‘এটা তো একটা পুরানো ব্যাপার।’

‘পুরানো ব্যাপার। কিন্তু নতুন করে তীব্র হয়ে উঠেছে।’

‘কিংডম অব ক্রাইস্টের ঐ অন্যায় কর্মের সাথে ক্রস এবং ক্রিসেন্টের এই যুদ্ধের সম্পর্ক কি?’

হাসল পিয়েরে পল। বলল, ‘‘কিংডম অব ক্রাইস্ট’ (KOC) এবং ‘আর্মি অব ক্রাইস্ট অব ওয়েস্ট অফ্রিকা’ (AOCOWA) আফ্রিকায় ক্রস-এর পক্ষের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সফল শক্তি।’

‘হতে পারে। কিন্তু তারা অন্যায় করছে। লুণ্ঠনের কাজ করছে।’

‘যদি স্বীকারও করি যে তারা এটা করছে, তবু সত্য এই যে, তারা নিজের জন্যে এটা করছে না, করছে আফ্রিকায় খৃস্টকে একচ্ছত্র বিজয়ের আসনে বসাবার জন্যে। এটা এমন বাস্তবতা যা অস্বীকারের কোন সুযোগ নেই।’

বলে একটু দম নিল পিয়েরে পল। শুরু করল আবার, ‘আফ্রিকার ধর্মীয় মানচিত্রের দিকে একবার লক্ষ্য করুন। ইসলাম বা ক্রিসেন্ট আফ্রিকায় যাত্রা শুরু করেছিল উত্তর থেকে। তারপর ক্রমশ এগিয়েছিল দক্ষিণে। আফ্রিকার যতই দক্ষিণে যাওয়া যায় মুসলমানদের সংখ্যা ততই কম। তবু আফ্রিকার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ এলাকায় ইসলাম সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল। অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ অঞ্চলেও মুসলমানরাই ছিল সবচেয়ে সক্রিয় প্রভাবশালী গ্রুপ। এ কারণেই একমাত্র আফ্রিকা মহাদেশই ‘মুসলিম মহাদেশ’ আখ্যা লাভ করেছিল। মিঃ ডিফরজিস, প্রভূত সম্ভাবনাময় এই মুসলিম মহাদেশেই খৃস্টের রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যে খৃস্টের ক্রস তার যাত্রা শুরু করে। আফ্রিকার দক্ষিণ থেকে এই যাত্রা শুরু হয়। যুদ্ধ শুরু হয় ক্রিসেন্টের সাথে ক্রসের। ডক্টর ডিফরজিস, আফ্রিকার ধর্মীয় মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখবেন, আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত থেকে মধ্য আফ্রিকা পর্যন্ত মাত্র চারটি রাষ্ট্র ছাড়া অন্যান্য সবগুলোতেই ক্রস আজ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। মধ্য আফ্রিকায় চলছে আজ ক্রস এবং ক্রিসেন্টের মধ্যে লড়াই। এই মধ্য আফ্রিকা ছিল ক্রিসেন্টের শক্ত মুঠোর মধ্যে। কিন্তু সেই মধ্য আফ্রিকায় ক্রস

আজ ক্রিসেন্টের শক্ত মুঠি ভেঙে দিচ্ছে। মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য সেখানে ধ্বসে পড়ছে। চাদে মুসলিম সংখ্যা শতকরা ৮৫ ভাগ থেকে ৪৪ ভাগে, নাইজেরিয়ায় ৬৫ ভাগ থেকে ৫০ ভাগে এবং ক্যামেরুনে ৫৫ ভাগ থেকে ১৬ ভাগে নেমে এসেছে। এছাড়া নাইজেরিয়ার উত্তরে উপকূল বরাবর মুসলিম দুর্গ অঞ্চলের কয়েকটি পকেটে আমরা বিস্ময়কর অগ্রগতি অর্জন করেছি। ঘানায় মুসলমানের সংখ্যা ৪৫ ভাগ থেকে ১৩ ভাগে, গিনি বিসাও ও সিয়েরালিওনে ৮০ ভাগ থেকে ৩০ ভাগে এবং বুরকিনা ফাসোতে ৫৫ থেকে ৪০ ভাগে নেমে এসেছে। সবচেয়ে বড় কথা, নামিবিয়া থেকে ক্যামেরুনের মধ্য অঞ্চল পর্যন্ত বিশাল এলাকায় মুসলিম উচ্ছেদকরণ আজ সম্পূর্ণ হয়েছে। 'ক্রস'-এর এই যে অকল্পনীয় সাফল্য, তার জন্যে সবচেয়ে বেশি কৃতিত্বের দাবি KOC এবং AOCOWA করতে পারে। দক্ষিণ ক্যামেরুনে ওমর বায়ার দশ হাজার একর জমি KOC দখল করতে পারলেই দক্ষিণ ক্যামেরুন থেকে মুসলিম উচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয়ে যায়। ডঃ ডিফরজিস, আপনি এই জমিটুকু দখলে সহায়তা করে আফ্রিকায় ক্রস-এর বিজয় অভিযানে ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখতে পারেন। ভেবে দেখুন, এই সহায়তা আপনি KOC বা AOCOWA কে করছেন না, সাহায্য করছেন প্রভু খৃস্টের ক্রসকে।'

'আপনি বাস্তব অবস্থা তুলে ধরেছেন, আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু সহায়তার জন্যে আপনারা ভুল জায়গায় এসেছেন। আমি আইনের ছাত্র, সারাটা জীবন আইন নিয়েই কাজ করে আসছি। আমি আপনাদের বেআইনী কাজে শরীক হতে পারবো না। আমি অনুরোধ করছি, আমাকে ও আমার সন্তানদের অহেতুক আটকে না রেখে ছেড়ে দিন।'

'ডক্টর ডিফরজিস, আপনি জ্ঞানী মানুষ। আপনাকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। আমরা যে কাজে হাত দেই, তা শেষ না করে ছাড়ি না। আপনি যদি বিচারপতি ডক্টর উসাম বাইককে চিঠি দিতেন, টেলিফোন করে দিতেন, তাহলে আপনি এখানেই থাকতে পারতেন। কিন্তু এখন আপনাকে আমাদের সাথে ক্যামেরুন যেতে হবে।'

পিয়েরে পল কথা শেষ করলে ডঃ ডিফরজিস অনেকক্ষণ কথা বলল না। ভাবছিল সে। বলল বেশ পরে, 'এখানে যা করছি না, ওখানে গিয়ে তা কি করব?'

'সেটা ওখানে গিয়ে আমরা দেখব। রাজি করার আরও কিছু উপায় আমাদের আছে। তাছাড়া আপনাকে পণবন্দী দেখিয়ে ক্যামেরুনের বিচারপতিকেও আমরা আমাদের হাতের মুঠোয় আনতে পারি।'

'জানি না সেটা আপনারা পারবেন কিনা। তবে আমাকে ভয় দেখিয়ে কোন লাভ হবে না।'

'সেটা আমাদের ব্যাপার। আমরা ভোরেই ক্যামেরুন যাচ্ছি। তাই এখানে কোন ঝামেলা করতে চাই না। তা না হলে রাজি করার দু'একটা পদ্ধতি এখানেও প্রয়োগ করা যেত।'

কথা শেষ করেই হাতের ওয়াকি-টকির একটা বোতাম টিপে মুখের কাছে তুলে ধরে বলল, 'রুশো, দু'টো কফিন কমপ্লিট?'

'হ্যাঁ।' ওপাশ থেকে উত্তর এল।

'তিনতলায় নিয়ে এস।'

'এখনি নিয়ে যাচ্ছি স্যার।'

'ওকে। এখন সাড়ে বারোটা। ভোর পাঁচটায় প্লেন। আমাদের ডক্টর সাহেব ও ওমর বায়াকে সসম্মানে কফিনে প্যাক করে ফেল, যেভাবে বলেছি, সেই ভাবে।'

ওয়াকি-টকি গুটিয়ে পকেটে রেখে উঠে দাঁড়াল পিয়েরে পল। বলল, 'ডক্টর, সব তো শুনলেন। আশা করি, আমাদের সাথে সহযোগিতা করবেন। আমার মতো আমার লোকগুলো কিন্তু ভাল নয়। মানীর মান তারা বোঝে না।' বলে পিয়েরে পল বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

মাইক্রো সেন্সরের সংকেত অনুসরণ করে আহমদ মুসারা ব্ল্যাক ক্রস-এর টিলা বাড়িতে ঠিকই পৌঁছে গিয়েছিল।

অন্ধকারে ঢাকা বাড়িটি।

আহমদ মুসা টিলার গোড়ায় একটা ঝোপের আড়ালে গাড়িসমেত ক্লাউডিয়াদের রেখে আসে। আসার সময় আহমদ মুসা ওদের বলে, 'দু'ঘণ্টার মধ্যেও যদি আমি না ফিরি, তাহলে তোমরা চলে যাবে।'

কথা শেষে একটু থেমেছিল আহমেদ মুসা। তারপর ক্লাউডিয়াকে লক্ষ্য করে বলেছিল, 'ডোনাকে টেলিফোন করতে চেয়েছিলাম, ভুলে গেছি। ডোনার টেলিফোন নাম্বারটা তুমি রাখ।' বলে আহমদ মুসা টিলা বেয়ে উঠে আসে।

ক্লাউডিয়াসহ সবাই দাঁড়িয়ে দেখছিল আহমদ মুসাকে। ক্লাউডিয়া, সুমাইয়া এবং জিয়ানার মুখে নতুন এক ঔজ্জ্বল্য এবং রহস্যময়তা।

আহমদ মুসা প্রাচীরের গোড়ায় এসে বাড়ির চারদিকটা একবার ঘুরে এল। প্রাচীর দিয়ে ঘেরা বাড়ি। ছয় ফুটের মতো উঁচু হবে প্রাচীর। একটাই মাত্র গেট। লোহার দরজা। গেটের দু'পাশে দু'টি আলো উপর থেকে শেডে ঢাকা।

গেটের পাশে কোন গেটরুম নেই।

'তাহলে গেট কি দূর নিয়ন্ত্রিত কোন পদ্ধতিতে খোলা হয়?' ভাবল আহমদ মুসা প্রাচীরের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে। 'গেটে টিভি ক্যামেরাও পাতা থাকতে পারে'– আরও ভাবল আহমদ মুসা। প্রাচীর টপকে কি সে ভেতরে ঢুকবে? কিন্তু সেখানেও অ্যালার্ম কয়েল পাতা থাকতে পারে।

আহমদ মুসা পিঠে ঝোলানো থলে থেকে এন এন্ড এস (নাইট এন্ড স্মোক) গগলস বের করে চোখে পড়ল। তারপর পকেট থেকে 'স্মোক টিউব' বের করে প্রাচীরের গা ঘেঁষে পা পা করে গেটের অনেকখানি নিকটবর্তী হলো এবং টিউবের 'উইন্ডপ্রুফ নিল' ছিঁড়ে ছুঁড়ে দিল দরজার সামনে।

মুহূর্তের মধ্যে কুয়াশার মতো সাদা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল গেট এলাকা।

আহমদ মুসা দ্রুত গিয়ে দাঁড়াল গেটের সামনে। ভাবল, টিভি ক্যামেরার চোখ অন্ধ করা গেছে কিন্তু দরজার সাথে অ্যালার্ম থাকতে পারে। আহমদ মুসা জানে, গেটের অ্যালার্ম সব সময় দরজা খোলার সাথে সম্পর্কিত থাকে। তার অর্থ, অ্যালার্ম দরজার কব্জার সাথে সংযুক্ত করা হয়, যাতে দরজা খুলতে গেলেই অ্যালার্ম বেজে উঠে।

আহমদ মুসা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল।

পকেট থেকে বের করল ল্যাসার কাটার এবং দরজার ঠিক মাঝখানে দুই বর্গফুট জায়গার ইস্পাত প্লেট কেটে ফেলল।

ভেতরে প্রবেশের আগে আরেকটা স্মোক টিউব ছুঁড়ে দিল ভেতরে। আহমদ মুসা সন্দেহ করছিল, ভেতরের দিকে মুখ করা ক্যামেরাও থাকতে পারে। দূর নিয়ন্ত্রিত গেটে তা-ই থাকে।

কয়েক মুহূর্ত সময় নিয়ে আহমদ মুসা ঢুকে গেল ভেতরে।

ভেতরের চত্বরটায় সুন্দর ফুলের বাগান। গেট থেকে লাল ইটের একটা প্রশস্ত রাস্তা চলে গেছে গাড়ি বারান্দা পর্যন্ত।

আহমদ মুসা পকেটের রিভলভারের বাঁটে হাত রেখে বেড়ালের মত নিঃশব্দে দ্রুত এগিয়ে চলল।

আহমদ মুসা সবে গাড়ি বারান্দায় পা রেখেছে, এমন সময় পেছন থেকে আসা প্রচণ্ড ধাক্কায় উপুড় হয়ে পড়ে গেল সে।

কিন্তু পড়ে গেলেও পকেট থেকে তার হাত সাইলেন্সার লাগানো রিভলভারসমেত বেরিয়ে এসেছে।

আহমদ মুসা বুঝল, পেছন থেকে অন্তত দু'জন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

আহমদ মুসা পড়ে গিয়েই নিজের শরীরটাকে বাম দিকে উল্টে নিল ওরা তার উপর চেপে বসার আগে।

আহমদ মুসা তার শরীর বাম দিকে উল্টে নেবার ফলে তার শরীরটা পেছন থেকে আসা চাপের মূল কেন্দ্র থেকে একপাশে সরে এল, যার কারণে আক্রমণকারীদের একজন ডানপাশে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। শুধু তা-ই নয়, আহমদ মুসার ডান হাতে ধরা রিভলভারের মুখেও এসে পড়ল।

শরীরটা উল্টে নেবার পর গুলি করতে মুহূর্তও বিলম্ব করেনি আহমদ মুসা। সাইলেন্সার লাগানো রিভলভার থেকে অস্পষ্ট 'দুপ' করে একটা শব্দ উঠল। বুকটা এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গিয়েছিল লোকটার।

এদিকে দ্বিতীয় লোকটা আহমদ মুসার উপর চেপে বসেছিল। তার শক্ত দুই হাত সাঁড়াশির মত বসে যাচ্ছিল আহমদ মুসার গলায়।

আহমদ মুসার মনে হচ্ছিল, গলাটা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে তার। চোখ দু'টি তার বিস্ফারিত হয়ে উঠছিল।

আহমদ মুসার ডান হাত উঠে এল। তার ডান হাতের রিভলভারটি এসে স্পর্শ করল লোকটির মাথা।

লোকটি চমকে উঠে চকিতে এদিকে একবার চোখ ঘুরিয়েই একটু কাত হয়ে মাথাটা সরিয়ে নিতে গেল। কিন্তু আহমদ মুসার আঙুল ট্রিগারে চাপ দিয়েছে তার আগেই।

আহমদ মুসার উপর থেকে উল্টে পড়ে গেল লোকটা। গুঁড়ো হয়ে গিয়েছিল তার মাথা।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। একটু সরে এসে একটা থামের আড়ালে দাঁড়াল সে।

প্রায় মিনিটখানেক অপেক্ষা করল। না, কোন দিক থেকে কেউ এল না। আহমদ মুসা বুঝল, প্রাচীর বরাবর এই দু'জনই ছিল পাহারায়।

থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল আহমদ মুসা। গাড়ি বারান্দার চারদিকে তাকাল। দেখল, একটু পশ্চিম দিকে পাকা শেড আকারের একটা ঘর। গাড়ি বারান্দা থেকে লাল ইটের একটা রাস্তা ঐ ঘর পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। আহমদ মুসা বুঝল, ওটাই গ্যারেজ। ঐ গ্যারেজেই তার টার্গেট গাড়িটা রয়েছে।

আহমদ মুসা লক্ষ্য করল, লাল ইটের একটা সরু রাস্তা বিল্ডিং-এর পেছন দিক থেকে এসে গ্যারেজের সামনে দিয়ে প্রাচীরের দিকে চলে গেছে।

আহমদ মুসা গাড়ি বারান্দা থেকে তিনটি ধাপ ডিঙিয়ে বিল্ডিং-এর বারান্দায় উঠল।

বিরাট দরজা। দেখেই বুঝল, কাঠের দরজা। কিন্তু দরজার চার প্রান্তই ইস্পাতের পাত দিয়ে মোড়া। 'কী-হোল' পরীক্ষা করে দেখল। নিশ্চিত হলো আহমদ মুসা, এ দরজাও দূর নিয়ন্ত্রিত।

আহমদ মুসা মুশকিলে পড়ল। ল্যাসার কাটার দিয়ে কাঠের দরজা ধীরে ধীরে পোড়ানো যায়, কিন্তু কাটা যায় না। পোড়ানোর ব্যাপারটা সময়সাপেক্ষ। তাহলে?

আহমদ মুসার মনে পড়ল বাড়ির পেছন থেকে আসা রাস্তার কথা। ওটা ক্লিনার প্যাসেজ নয়তো?

আহমদ মুসা নেমে এল বারান্দা থেকে।

লাল ইটের সরু রাস্তা ধরে এগোলো বাড়ির পেছন দিকে।

সেই রাস্তাটি আহমদ মুসাকে একটা ছোট সাইজের দরজার সামনে নিয়ে দাঁড় করাল। ভারি ইস্পাতের তৈরি দরজা। পরীক্ষা করে দেখল, অটো লক সিস্টেম। বাইরে থেকে চাবি দিয়ে খোলার কোন ব্যবস্থা নেই। তবু খুশি হলো আহমদ মুসা। এ লকগুলো কাটা ল্যাসার কাটার দিয়ে খুব সহজ। দরজার গায়ে কী-লকের চিহ্ন দেখে 'লক'-এর অবস্থান চিহ্নিত করল আহমদ মুসা। তারপর সেই স্থানে দরজা ও চৌকাঠের মাঝ বরাবর ল্যাসার কাটারের বীম প্রবেশ করাল।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড। নড়ে উঠল দরজা। 'লক' কেটে গেছে।

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে ধীরে ধীরে দরজা ঠেলে প্রবেশ করল আহমদ মুসা।

জায়গাটা করিডোরের একটা প্রান্ত। আহমদ মুসা ফিরে দাঁড়িয়ে দরজাটা বন্ধ করতে গিয়ে চমকে উঠল। দেখল, 'লক'-এর সাথে একটা অ্যালার্ম ট্রান্সমিটার লাগানো। এর অর্থ, 'লক'-এর উপর আঘাত এলে তা আহত করবে ট্রান্সমিটারকেও। সঙ্গে সঙ্গেই তা সংকেত পাঠাবে অ্যালার্ম-এর গ্রাহক যন্ত্রে বা বাজিয়ে দেবে অ্যালার্ম।

দরজা বন্ধ না করেই ঘুরে দাঁড়াল আহমদ মুসা। সে নিশ্চিত, এতক্ষণে অ্যালার্ম বেজে গেছে এবং ব্ল্যাক ক্রস-এর লোকেরা এতক্ষণে সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

আহমদ মুসা রিভলভার হাতে নিয়ে বেড়ালের মত সামনে এগোলো।

করিডোরের দুই পাশের রুমগুলোকে বিভিন্ন জিনিসের স্টোর বলে মনে হলো আহমদ মুসার।

করিডোরটি একটি বড় ঘরে গিয়ে শেষ হয়েছে। কক্ষে কয়েকটি কাটিং টেবিল এবং কয়েকটি ওয়াশ বেসিন। আহমদ মুসা বুঝল, এটা কুকিং প্রিপারেশন রুম।

কক্ষে এসে শেষ হওয়া করিডোর-মুখ থেকে বিপরীত দিকে কক্ষটিতে আরেকটা দরজা আছে। সেখান থেকে আরেকটা করিডোরের শুরু।

করিডোরে উঁকি দিতেই অনেকগুলো পায়ের শব্দ শুনতে পেল আহমদ মুসা।

চকিতে সরে এসে দরজা ঘেঁষে দেয়ালের আড়ালে দাঁড়াল সে।

ছুটে আসা প্রথম লোকটি ঘরের ভেতরে পা বাড়ালে আহমদ মুসা তার ডান পা এগিয়ে দিল ছুটে আসা পায়ের সামনে। লোকটি হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। তার স্টেনগানটা ছিটকে চলে এল আহমদ মুসার পায়ের কাছে।

আহমদ মুসা স্টেনগান তুলে নিয়েই গুলি চালাল। পড়ে যাওয়া লোকটি উঠে দাঁড়াচ্ছিল এবং ইতোমধ্যে আরেকজন লোক এসে ঘরে ঢুকেছিল। তারা দু'জনেই গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে গেল।

ওদের উপর গুলি চালিয়ে স্টেনগানের ব্যারেলটা ঘুরিয়ে নিল করিডোরের দিকে।

করিডোর দিয়ে ছুটে আসা চারজন একদম গুলির মুখে পড়ল। কোন কিছুর আড়াল নেবার কোন সুযোগ ছিল না তাদের। চারজনই গুলি খেয়ে বোঁটা ছেঁড়া ফলের মত করিডোরের উপর ঝরে পড়ল।

আহমদ মুসা করিডোরে উঁকি দিয়ে দেখল, কেউ নেই আর করিডোরে।

স্টেনগান বাগিয়ে করিডোরের মুখে গিয়ে দাঁড়াল। অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ। বিস্মিত হলো, কোন তৎপরতা তাদের নেই কেন? আশংকার এক মেঘ দ্রুত মনে উদয় হলো, তারা কি আক্রমণের পথ পরিবর্তন করেছে?

মনের এ চিন্তাটা শেষ না হতেই তার কানে এল পেছন থেকে পায়ের শব্দ।

সঙ্গে সঙ্গেই বোঁ করে ঘুরল আহমদ মুসা। কিন্তু স্টেনগান তোলার সুযোগ হলো না। দেখল, তার মাত্র দুই গজ পেছনে ঘরের মেঝেতে দাঁড়িয়ে একজন। তার স্টেনগানের নল আহমদ মুসার বুক বরাবর উঠানো।

আহমদ মুসার প্রাথমিক বিমূঢ়তা তখনও কাটেনি। এমন সময় রিভলভারের একটা গুলির শব্দ শুনতে পেল আহমদ মুসা। আর সাথে সাথেই সামনের স্টেনগানধারী লোকটির দেহ ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে পেছন দিকে উল্টে পড়ে গেল।

আহমদ মুসা দেখতে পেল পিস্তল হাতে ক্লাউডিয়াকে এবং তার পেছনে ওপাশের করিডোরের মুখে সুমাইয়া ও জিয়ানাকে। তাদের হাতেও পিস্তল। ক্লাউডিয়া এবং ওরা তাকিয়েছিল আহমদ মুসার দিকে। আহমদ মুসা ওদিকে এগোবার জন্যে পা একধাপ বাড়িয়েছিল। এই সময় রিভলভারের গর্জন শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে ক্লাউডিয়া বুক চেপে ধরে মাটিতে পড়ে গেল।

আহমদ মুসা শব্দ শুনেই তাকাল ঘরের উত্তর দিকে। দেখল, সেখানে একটা দরজা খুলে গেছে। এ দরজা আহমদ মুসার নজরে পড়েনি আগে। দরজার এপারে দাঁড়িয়ে একজন লোক। তার রিভলভারের নল ঘুরে আসছে ক্লাউডিয়ার দিক থেকে আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা স্টেনগান তুলেই তাকিয়েছিল শব্দ লক্ষ্যে। লোকটির উপর তার নজর পড়ার সাথে সাথেই আহমদ মুসার স্টেনগান গুলি বৃষ্টি করল।

লোকটি গুলি খেয়ে ঝাঁঝরা দেহ নিয়ে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই পড়ে গেল।

আহমদ মুসা গুলি করেই ছুটে গেল ক্লাউডিয়ার কাছে। রক্তপ্লাবিত ক্লাউডিয়ার মাথাটা হাতে তুলে নিল।

জিয়ানা ও সুমাইয়াও ছুটে আসছিল ক্লাউডিয়ার দিকে। ডাঃ জিয়ানা ছিল সামনে। ঘরের মাঝখানে যখন সে, উত্তরের দরজার দিকে শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখতে পেল, দরজায় দাঁড়িয়ে একজন লোক। তার হাতের ভয়ংকর মেশিন রিভলভার উঠেছে আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে।

ডাঃ জিয়ানা একটা চিৎকার তুলে ছুটে গিয়ে নিজের দেহ দিয়ে আহমদ মুসার দেহ ঢেকে দিল। প্রায় সাথে সাথেই মেশিন রিভলভার থেকে এক ঝাঁক গুলি ছুটে এল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে। সবগুলো গুলিই এসে বিদ্ধ করল জিয়ানাকে।

ওদিকে সুমাইয়া জিয়ানাকে উত্তরের দরজার দিকে তাকিয়ে আহমদ মুসার দিকে চিৎকার করে ছুটতে দেখে উত্তরের দরজার দিকে চাইল। সে দেখতে পেল, একজন লোকের রিভলভার আহমদ মুসার দিকে উদ্যত। সে মুহূর্তে তার মেশিন রিভলভার গুলিবর্ষণ করল।

সুমাইয়াও তার রিভলভার তুলেছিল। কিন্তু দেরি হয়ে গিয়েছিল। সুমাইয়ার গুলি যখন লোকটির বুক এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল, তখন যা হবার হয়ে গেছে। ঝাঁঝরা হয়ে গেল ডাঃ জিয়ানার দেহ।

আহমদ মুসা ধীরে ধীরে জিয়ানার নিষ্প্রাণ দেহ মেঝেয় রাখল।

দেখল, ক্লাউডিয়া কিছু বলতে চাচ্ছে। সুমাইয়া ছুটে এসে ক্লাউডিয়ার মাথাটা তুলে ধরেছে।

আহমদ মুসা একটু এগিয়ে ক্লাউডিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'এ তোমরা কি করলে ক্লাউডিয়া! কি ঘটে গেল এসব!'

ক্লাউডিয়া ঠোঁট নাড়ল। শুকনো ঠোঁট দু'টো ভিজিয়ে নিতে চেষ্টা করে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, 'আমি এবং জিয়ানা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, আমরা ইসলাম গ্রহণ করব। আমাদের জন্যে আল্লাহর কাছে প্রা-র্থ-না ক-রো।' ক্ষীণ হয়ে এসে তার কণ্ঠ থেমে গেল। কণ্ঠ থেমে যাওয়ার সাথে সাথে মুখ একদিকে ঢলে পড়ল তার। স্থির হয়ে গেল তার দেহ।

আহমদ মুসা কয়েকবার ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকল ক্লাউডিয়াকে। তারপর মাথাটা নিচু করে দু'হাতে মুখ ঢাকল।

সুমাইয়া ক্লাউডিয়ার মাথা জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল।

'রুশো' 'রুশো'- এই শব্দগুলো কানে প্রবেশ করল আহমদ মুসার।

আহমদ মুসা মুখ থেকে হাত সরিয়ে শব্দ লক্ষ্যে উত্তরের দরজার দিকে তাকাল। আহমদ মুসার দু'টি গণ্ড চোখের পানিতে ধোয়া। সুমাইয়ার গুলিতে নিহত লোকটার পকেটে ওয়াকি-টকি দেখতে পেল আহমদ মুসা। ঐ ওয়াকি-টকিই শব্দের উৎস।

আহমদ মুসা দ্রুত উঠে গিয়ে ওয়াকি-টকি তুলে নিল। তখনও ওয়াকি-টকিতে কেউ বলছিল, 'ওদিকে কি খবর, কথা বলছ না কেন, রুশো?'

আহমদ মুসা বুঝল, এই লোকটার নাম রুশো। নিশ্চয় পিয়েরে পল কিংবা কোন বড় নেতা কথা বলছে।

আহমদ মুসা একটু চিন্তা করে বলল, 'আমরা ব্যস্ত স্যার। আমি লাইনে আছি, বলুন।'

'বুঝেছি। শোন, আমরা দু'টো কফিন নিয়ে চলে যাচ্ছি। তোমরা এ ঘাঁটি ছেড়ে দাও। ক্যামেরুনে যোগাযোগ করবে।'

বন্ধ হয়ে গেল ওয়াকি-টকি।

আহমদ মুসা দ্রুত কণ্ঠে বলল, 'সুমাইয়া, আমার সাথে এস। ওরা পালাচ্ছে।'

বলে আহমদ মুসা করিডোর ধরে ছুটল ভেতরে। তার লক্ষ্য বাইরে বেরুবার সেই বড় গেট।

আহমদ মুসা এ করিডোর, সে করিডোর ঘুরে বাইরে বেরুবার গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দেখল, সে দরজা আগের মতই বন্ধ।

এই সময় আহমদ মুসা মাথার উপর থেকে ইঞ্জিন স্টার্ট নেবার শব্দ শুনতে পেল। একটু শুনে আহমদ মুসা বলল, 'নিশ্চয় ছাদের উপর একটা হেলিকপ্টার স্টার্ট নিচ্ছে।'

বলে পেছন ফিরে ছুটল হল ঘরের দিকে উপরে উঠার জন্যে।

পেছনে ছুটল সুমাইয়াও।

যখন আহমদ মুসা ছাদের উপর উঠল, তখন হেলিকপ্টারটি স্টার্ট নিয়ে ছাদ ছেড়ে বেশ উপরে উঠেছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বাড়ির এলাকা ছেড়ে চলে গেল হেলিকপ্টারটি।

ক্লান্ত দেহ নিয়ে আহমদ মুসা বসে পড়ল ছাদে। বলল, 'ওমর বায়া এবং ডঃ ডিফরজিসকে নিয়ে পিয়েরে পল পালিয়ে গেল সুমাইয়া। পারলাম না ওদের কাছে পৌঁছতে। জানতাম না, ছাদে ওরা হেলিকপ্টার রেখেছে।'

একটু দম নিল আহমদ মুসা। তারপর বলল, 'ওরা হাতের বাইরে চলে গেল সুমাইয়া।'

'হাতের বাইরে? কোথায়?'

‘পিয়েরে পল ওমর বায়া এবং ডঃ ডিফরজিসকে নিয়ে ক্যামেরুন চলে গেল।’

একটু থামল। বলল আবার, ‘কিন্তু বুঝতে পারছি না, ওমর বায়া ও ডঃ ডিফরজিসকে কফিনে করে নিয়ে গেল কেন?’

কথাটা বলেই আহমদ মুসা ভাবল, নিশ্চয় ওদেরকে বিমানে করে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু অস্বীকৃত এবং কিডন্যাপ করা দু’জন লোককে বিমানে মুক্তভাবে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

এই কথা মনে হওয়ার সাথে সাথেই আহমদ মুসার মনে হলো, বিমানবন্দরের সাহায্যে তো দুটো কফিনকে চেক করানোর ব্যবস্থা করা যায়! চেক করা গেলেই তারা ধরা পড়ে যাবে।

নতুন আশার আনন্দে আহমদ মুসার মন সজীব হয়ে উঠল। বলল, ‘চল সুমাইয়া, এদের ঘাঁটিটা একটু পরীক্ষা করে আমরা চলে যাব।’

কিছু অস্ত্র ছাড়া গোটা ঘাঁটিতে কোন কাগজপত্র পেল না। কোন টেলিফোন গাইডও নয়। টেলিফোনগুলোতেও কোন নাম্বার নেই।

আবার পুরানো বিস্ময়টাই আহমদ মুসাকে আচ্ছন্ন করল, আশ্চর্য এই দল! কোন চিহ্ন এরা পেছনে রেখে যায় না।

আহমদ মুসা ও সুমাইয়া বেরিয়ে এল ব্ল্যাক ক্রসের ঘাঁটি থেকে। সাথে নিল ক্লাউডিয়া এবং জিয়ানার নিষ্প্রাণ দেহ।

সকাল নয়টায় ঘুম থেকে উঠল আহমদ মুসা।

ভোর রাতেই ক্লাউডিয়া ও জিয়ানার লাশ আহমদ মুসা পাঠিয়ে দিয়েছিল তাদের বাড়িতে। সাথে আহমদ মুসা লিখে দিয়েছিল চিঠি। রালফ এবং ডেবরারা পরামর্শ দিয়েছিল গুণ্ডা-বদমাইশদের হাতে আক্রান্ত হয়ে দুর্ঘটনা ঘটার কাহিনী লিখতে। কিন্তু আহমদ মুসা তাতে রাজি হয়নি। কারণ, তাতে তাদের আত্মত্যাগের কাহিনী সবার অজানা থাকবে। সত্য জানার পর তাদের বাপ-মা যদি আহমদ

মুসার প্রতি বিরূপ হয়, গালি দেয়, তাহলে আহমদ মুসা তার প্রাপ্য বলে সেটা মাথা পেতে নেবে। এটুকু গালমন্দ খেয়ে আহমদ মুসা তাদের বিরাট আত্মত্যাগকে বুলন্দ করতে যদি পারে, তাহলে এটা হবে আহমদ মুসার জন্যে বিরাট সান্ত্বনা। খুব অল্প সময়ে তারা পৃথিবী থেকে চলে গেছে, কিন্তু তারা বেঁচে থাকবে তাদের এই ত্যাগের আদর্শের মধ্যে। এসব চিন্তা করে আহমদ মুসাকে ক্লাউডিয়ারা উদ্ধার করা থেকে শুরু করে তাদের ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত পর্যন্ত সব কথাই আহমদ মুসা লিখে দিয়েছে।

পরে আহমদ মুসার এ সিদ্ধান্তের সাথে সবাই একমত হয়েছে। বলেছে, ‘সত্যের এমন একটা শক্তি আছে যা মানুষকে জয় করতে পারে।’

আহমদ মুসা ঘুম থেকে উঠে লাউঞ্জে গেল। সেখানে আগে থেকেই রালফ, ডেবরা, সুমাইয়া বসেছিল। নেকা, রিশলা ভোরেই চলে গিয়েছিল।

‘স্যরি রালফ, ঘুমিয়ে অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট করেছি। সকালেই বিমানবন্দরে খোঁজ নেয়া দরকার ছিল। রালফ, বিমানবন্দরের কার্গো সেকশনে লাগাও দেখি।’

‘কি বলব ভাইয়া?’

‘ক্যামেরুনের ‘দুয়ালা’ অথবা রাজধানী ‘ইয়াউন্ডি’তে আজ ফ্লাইট কখন? ফ্লাইট থাকলে জিজ্ঞেস করবে, ঐ ফ্লাইটের জন্যে দুটো কফিন বুক হবার কথা ছিল, হয়েছে কিনা। ব্যস।’ বলল আহমদ মুসা।

‘বুঝেছি।’ বলে রালফ পাশ থেকে মাইক্রো টেলিফোন তুলে নিয়ে উঠে গেল পাশের কক্ষে।

মিনিটখানেক পরেই ফিরে এল রালফ। তার মুখ মলিন। বলল, ‘আজ ভোর পাঁচটায় ক্যামেরুনে ডাইরেক্ট ফ্লাইট ছিল। সে ফ্লাইটে দুটো কফিন গেছে।’

‘ফ্লাইটটা ‘দুয়ালা’ না ‘ইয়াউন্ডি’তে?’

‘দুয়ালা।’

‘আর কোন খবর?’

‘আজ আর কোন ফ্লাইট ক্যামেরুনে নেই। তবে নাইজেরিয়ার লাগোস-এ একটা ফ্লাইট আছে। লাগোস থেকে কানেক্টিং ফ্লাইট আছে দুয়ালা’র জন্যে।’

‘ক’টায়?’

‘বারটায়।’

আহমদ মুসা কথা বলল না। মাথা নিচু করে ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর মাথা তুলে সোফায় হেলান দিয়ে বলল, ‘রালফ, আরেকটু কষ্ট কর। এয়ারপোর্টের বুকিং–এ টেলিফোন করে একটা সিট বুক করো লাগোসগামী ফ্লাইটে।’

‘কেন? কে যাবে?’

‘আমি।’

‘আপনি?’ বলল রালফ। সুমাইয়া, ডেবরা এবং রালফ- সবারই বিস্ময় দৃষ্টি আহমদ মুসার উপর নিবদ্ধ।

কিছুক্ষণ তারা কথা বলতে পারলো না। কথা বলল অবশেষে সুমাইয়া, ‘আপনি ক্যামেরুনে যাবেন- এ চিন্তা আমার মাথায় এসেছিল। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যাবেন, তা ভাবিনি।’

‘ওদের ষড়যন্ত্র আমাদের সবার কাছে পরিষ্কার। ওরা ডক্টর ডিফরজিসকে বাধ্য করবে অথবা তাকে পণবন্দী করে বাধ্য করবে ক্যামেরুনের চীফ জাস্টিসকে তাদের ষড়যন্ত্র সফল করতে। এ সুযোগ তাদের দেয়া যাবে না।’

‘তাহলে টিকেট একটা নয়, দু’টি করতে হবে।’ বলল রালফ।

‘কেন?’

‘আমিও যাব।’

‘না, তোমার যাওয়া হবে না।’

‘কেন, আমার পিতাকে মুক্ত করার অভিযানে আমি যাব না?’

‘গেলে ভালই হতো। কিন্তু ডেবরাকে একা রেখে বর্তমান অবস্থায় তোমার যাওয়া হবে না।’

‘এখানে আমার মন মানবে না।’

‘দেখ, প্রয়োজন হলে তোমাকে জোর করেই নিতাম। প্রয়োজন যদি হয় তোমাকে ডাকব।’

‘কিন্তু আমার পিতার মুক্তির জন্যে আপনি যাবেন, আমি যাব না, এ কেমন কথা হবে?’

'কিন্তু আমার স্বার্থই বড়। ব্ল্যাক ক্রস-এর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করতে পারলে একটা যুদ্ধে আমার জাতির বিজয় হবে, না পারলে পরাজয়ের গতি আরও তীব্রতর হবে। সুতরাং, তোমার পিতাকে উদ্ধার করা আমার স্বার্থের অংগ হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'ঠিক আছে, আমার অনুরোধ, আমাকে ডাকার কথা বলেছেন, সেটা রাখবেন।' বলে রালফ উঠল টেলিফোনে বিমানবন্দরে কথা বলার জন্যে।

রালফ উঠে গেলে কিছুক্ষণ নীরবতা। তিনজনই নীরব। চোখ বন্ধ করে কিছু ভাবছে আহমদ মুসা।

'কি হলো, কি হচ্ছে সুমাইয়া আপা! পৃথিবীর রূপটা আমার কাছে পাল্টে যাচ্ছে।' বলল ডেবরা।

আহমদ মুসা চোখ খুলেছিল। সুমাইয়া কিছু বলার আগে আহমদ মুসা বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না সুমাইয়া, ব্ল্যাক ক্রসের ঘাঁটিতে ঢোকার সাংঘাতিক সিদ্ধান্ত তোমরা কেমন করে নিয়েছিলে?'

সুমাইয়ার মুখ ম্লান হয়ে গেল।

কথা বলল ডেবরা, 'ক্লাউডিয়া এবং জিয়ানার জেদে এটা ঘটেছে। তাদেরকে রালফ এবং আমরা রুখতে পারিনি। শেষে তাদের সাথী হয় সুমাইয়া।'

সুমাইয়া বলল, 'তবে আমরা ঘাঁটিতে ঢুকব, এ কথা তারাও প্রথমে ভাবেনি। ক্লাউডিয়া বলেছিল, আমরা কি হচ্ছে তা দেখব মাত্র। কিন্তু এগিয়ে গাড়ি বারান্দায় যখন দুটো লাশ দেখা গেল, তখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। আপনাকে ঐ দু'জনের আক্রমণ এবং তাদের সাথে আপনার লড়াই আমরা গেটের আড়ালে থেকে দেখেছি। আপনি যখন বাড়ির পেছন দিকে এগোলেন, আমরাও এগোলাম। ঐ দু'জনের লাশ দেখে ক্লাউডিয়া এবং জিয়ানা দু'জনেই বলল, 'আমাদের ওর পেছনে থাকা উচিত, যাতে এই ঘটনার মত আর কেউ তাকে পেছন থেকে আক্রমণ করতে না পারে।' এরপরই আমরা আপনার পেছনে পেছনে ঘাঁটিতে ঢুকেছি।' থামল একটু সুমাইয়া।

সুমাইয়া তার চোখের কোণায় জড়ো হওয়া অশ্রু ওড়না দিয়ে মুছে আবার শুরু করল, 'ইসলামের জন্য ক্লাউডিয়া ও জিয়ানার মধ্যে কি যে আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল! গত রাতে আপনার পিছে পিছে এগোবার সময় ক্লাউডিয়া বলেছিল, সে

ফ্রান্সের সব মুসলিম ছাত্রীকে গার্লস ক্যাডেট কোরে নিয়ে আসবে এবং তাদেরকে ফ্রান্সের একটা সক্রিয় শক্তি হিসেবে গড়ে তুলবে। জিয়ানা বলেছিল, মুসলিম ছাত্রীদের নিয়ে সে একটা গার্লস হিউম্যান রাইটস ফোরাম গড়ে তুলবে, যারা লড়াই করবে ফরাসী সরকারের সাংস্কৃতিক নির্যাতন ও বৈষম্যনীতির বিরুদ্ধে। এসব কথা আমাকে এখন খুব পীড়া দিচ্ছে। তাদের এই স্বপ্ন কে বাস্তবায়ন করবে!'

থামল সুমাইয়া। তার দু'গণ্ড বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল।

'তুমি, আমি কি ক্লাউডিয়া এবং জিয়ানা হতে পারি না? পারি না তাদের স্বপ্ন সফল করতে?' বলল ডেবরা ভারি কণ্ঠে।

আহমদ মুসা চোখ বন্ধ করে শুনছিল তাদের কথা।

রালফ ফিরে এসে বসেছিল ডেবরার পাশে। সে ডেবরার একটা হাত মুঠোর মধ্যে নিয়ে বলল, 'পারবে ডেবরা এটা! তাহলে সবচেয়ে খুশি হবো আমি। আমি তোমাদের সহযোগিতা করব সকল শক্তি দিয়ে।'

'পারব আমরা। ডোনা আপা আমাদের নেতৃত্ব দেবে। তার মত সাহসী ও প্রাণবন্ত মেয়ে আমি ফ্রান্সে আর দেখিনি।' বলল সুমাইয়া।

আহমদ মুসা চোখ খুলল। তার চোখের কোণা ভেজা। বলল, 'আমি ফরাসি নই, তবু কিছু সহযোগিতা তোমাদের করতে পারব।'

'কে বলল আপনি ফরাসি নন? ডোনা আপা ফ্রান্সের একজন শীর্ষ নাগরিক। আপনি ফরাসি হবেন না কেন?' বলল ডেবরা।

ব্রেকফাস্ট রেডি হওয়ার খবর এল এ সময়।

ব্রেকফাস্ট শেষে আবার এসে বসল তারা।

বসেই সুমাইয়া বলল, 'আপনাকে বলতে ভুলে গেছি, ক্লাউডিয়াকে যে নাম্বার দিয়েছিলেন সেই নাম্বারে আমি ডোনাকে টেলিফোন করেছিলাম।'

'কখন?'

'আটটার দিকে। কিন্তু ডোনা ভাবীকে পাইনি। ওর আব্বা ওকে নিয়ে একটু বাইরে বেরিয়েছেন।'

'কার সাথে কথা বলেছ?'

‘এলিসা গ্রেস নামের কে একজনের সাথে। আপনি টেলিফোন করুন ওখানে। ডোনা ভাবী গতকাল থেকে কান্নার উপরে আছে। সবাই উদ্বিগ্ন সেখানে। ডোনা ভাবী বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছেন। ডোনাকে একটু সান্ত্বনা দেবার জন্যেই ওর আব্বা ওকে একটু বাইরে নিয়ে গেছেন।’

‘আমার ভুল হয়েছে, গতকালই ওকে টেলিফোন করা উচিত ছিল। তুমি এলিসাকে আর কি বলেছ?’

‘আমি শুধু আপনার খবর দিয়েছি, আর কিছু নয়।’

‘তোমাদের আপত্তি না থাকলে একটা রিং করি লা-ইলে।’

‘আমাদের আপত্তি নেই, আপনার যদি আপত্তি না থাকে আমাদের মাঝে বসে কথা বলতে।’ বলল ডেবরা।

বলে ডেবরাই রিং করল লা-ইলে। লা-ইল রেস্টহাউসের পিএবিএক্স অপারেটরের কাছে ডেবরা লাইন চাইল ডোনাদের কক্ষের। কয়েক সেকেন্ড নীরবে অপারেটরের কথা শুনে টেলিফোন কানে রেখেই মুখ সরিয়ে নিয়ে ডেবরা বলল, ‘অপারেটর বলছে, ওরা আজ হোটেল ছেড়ে দিয়েছে।’

শুনেই আহমদ মুসা ডেবরার কাছ থেকে টেলিফোন হাতে নিল। টেলিফোনের স্পীকার মুখের কাছে এনে দ্রুত কণ্ঠে বলল, ‘ক’টায় ওরা হোটেল ছেড়েছেন?’

‘দশটায়।’

‘কোন মেসেজ রেখে গেছেন তারা?’

‘একটু ধরুন, দেখি।’

আধ মিনিট পরেই ওপার থেকে কণ্ঠ ভেসে এল। বলল, ‘একটা মেসেজ আছে স্যার। আমি পড়ছি, ‘সকাল আটটায় টেলিফোন পেয়ে আমি সেখানে চলে গেলাম।’-মারিয়া জোসেফাইন।’

‘ধন্যবাদ।’ বলে আহমদ মুসা রেখে দিল টেলিফোন।

আহমদ মুসার দিকে উদগ্রীব হয়ে তাকিয়েছিল সুমাইয়া, ডেবরা এবং রালফ।

‘ডোনারা এখানে আসছে।’ বলেই আহমদ মুসা সুমাইয়ার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি কি এই রেস্টহাউসের ঠিকানা দিয়েছিলে?’

‘দিয়েছি।’ বলল সুমাইয়া।

‘ডোনা দেখছি সাংঘাতিক চালাক হয়ে উঠেছে।’

‘কি ঘটেছে?’ বলল ডেবরা।

‘সে একটা মেসেজ রেখে এসেছে। তাতে সে বলেনি যে, সে কুমেট আসছে। বলেছে, ‘আটটার টেলিফোন পেয়ে সেখানে চলে গেলাম।’ অত্যন্ত বুদ্ধিমতীর কাজ করেছে সে।’

‘কেন করবে না? একে রাজরক্ত, তার উপর সুপারম্যানের সাহচর্য্য।’ বলল ডেবরা।

আহমদ মুসা আর এদিকে কান না দিয়ে ঘড়ির দিকে চেয়ে বলল, ‘এখন তো সাড়ে দশটা। আমাকে অন্তত এগারটায় এয়ারপোর্ট রওয়ানা হতে হবে।’

‘কিন্তু কোন সময় নষ্ট না করে খুব ভাল স্পীডেও যদি ডোনা আসেন, তবুও সাড়ে এগারটার আগে তিনি পৌঁছতে পারবেন না।’ বলল সুমাইয়া।

‘ঠিক। সব আল্লাহর ইচ্ছা। ঘটনার উপর আমাদের আর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই।’

‘কেন, ক্যামেরুন যাত্রা একদিন পেছানো যায় না? উনি আসছেন জানার পর এভাবে চলে যাওয়াটা শোভন নয়।’ বলল ডেবরা।

‘ঠিক বলেছ ডেবরা, কিন্তু ওমর বায়া এবং ডঃ ডিফরজিস যে অবস্থায় ওদের হাতে আছে এবং যে ষড়যন্ত্র নিয়ে ওরা এগোচ্ছে, তাতে একদিনও তো নষ্ট করা যায় না। ডোনার সাথে দেখা হওয়াটা একান্তই একটা পারসোনাল ব্যাপার, কিন্তু ক্যামেরুনের ব্যাপারটা জাতীয় এবং অনেকটা জীবন-মরণের প্রশ্ন।’

‘জিজ্ঞেস করি, আপনার জীবনে আপনি কি নিজের জন্যে কোন সময় রেখেছেন? আপনি ডোনার প্রতি অবিচার করছেন।’ বলল সুমাইয়া।

‘এই মুহূর্তে ক্যামেরুন যাত্রা স্থগিত করা ঠিক হবে না। ডোনাও এটা পছন্দ করবে না।’ বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘তোমরা বস, আমি তৈরি হয়ে নেই।’

আহমদ মুসা চলে গেল তার কক্ষের দিকে।

মিনিট পাঁচেক পরেই তৈরি হয়ে এল আহমদ মুসা। তার পিঠে ঝুলিয়ে রাখার মত একটা ট্যুরিস্ট ব্যাগ।

বসল আহমদ মুসা সুমাইয়ার মুখোমুখি সোফাটায়।

বসেই বলল, 'সুমাইয়া, তুমি সাংবাদিক। তোমাকে একটা বড় কাজের দায়িত্ব দিয়ে যাব।'

'কি সেটা?' খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল সুমাইয়ার মুখ।

'তোমাকে একটা নিউজ করতে হবে।'

'নিউজ?'

'হ্যাঁ।'

'কি নিউজ, কেন?'

'দক্ষিণ ক্যামেরুনে মুসলমানদের ভূমি আত্মসাৎ এবং তাদের উচ্ছেদ চলছে- এই বিষয়ের উপর একটা রিপোর্ট তোমাকে করতে হবে। দৃষ্টান্ত হিসেবে ওমর বায়ার সম্পত্তি ঘিরে যে ষড়যন্ত্র হচ্ছে, তা নিয়ে আসতে হবে। বলতে হবে, ওমর বায়াকে পণবন্দী করে রাখা হয়েছে, তার যে জমি আত্মসাৎ করা হয়েছে তাকে বৈধ করিয়ে নেবার জন্যে। ক্যামেরুনের প্রধান বিচারপতি উসাম বাইকের আদালত থেকে নানা কৌশলে এই বৈধকরণ রায় লাভের চেষ্টা ষড়যন্ত্রকারীরা শুরু করে দিয়েছে।' থামল আহমদ মুসা।

আনন্দে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সুমাইয়ার। বলল, 'সাংঘাতিক বুদ্ধি করেছেন। তাদের ষড়যন্ত্রকে ব্লক করার জন্যে মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে কাজ করবে এটা, এ চিন্তা আপনার মাথায় এল কি করে? পারব আমি এ রিপোর্ট করতে। তবে এ জন্যে আরও কিছু তথ্যের প্রয়োজন হবে।'

আহমদ মুসা তার পকেট থেকে ফোল্ডিং করা একখণ্ড কাগজ বের করে সুমাইয়ার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, 'প্রয়োজনীয় তথ্য তুমি এ থেকে পাবে।'

সুমাইয়া কাগজটি হাতে নিয়ে ভাঁজ খুলে গোটা কাগজটার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'ধন্যবাদ। প্রয়োজনীয় সাহায্য এ থেকে পাব আশা করি।'

সুমাইয়া একটু থামল। ভাবল। সে-ই আবার শুরু করল কথা, ‘পরবর্তী নির্দেশ কি? কি করব আমি এই নিউজ? আমার কাগজে ছাপব কি?’

‘না, তোমার কাগজে ছাপাবে না। আমি চাই একে আন্তর্জাতিক নিউজ করতে, যাতে ক্যামেরুনেও পৌঁছে।’

আহমদ মুসা একটু থামল। সোজা হয়ে বসল সোফায়। বলল, ‘তুমি তো ‘ওয়ার্ল্ড নিউজ এজেন্সি’ (WNA) এবং ‘ফ্রি ওয়ার্ল্ড টেলিভিশন’ (FWTV)-এর একজন প্রতিনিধিও, তাই না?’

‘জি, আমি প্রতিনিধি। কিন্তু আপনি তো ওদের মাথার মণি।’ বলল সুমাইয়া।

‘শেষ কথাটা ওভাবে না বললেই ভালো হতো। বিশেষণের ব্যবহার কোন সময়ই সঠিক হয় না। আচ্ছা থাক এ কথা। তুমি যখন WNA এবং FWTV-তে নিউজ পাঠাবে, তখন নিউজের শেষে ‘RFAM-7’-এই কোডটি লিখে দেবে।’

সুমাইয়া হাসল। বলল, ‘বুঝলাম, ঐ দুই সংবাদমাধ্যমের জন্যে এটা আপনার কোড। কিন্তু কোডটা যে খুবই স্পষ্টঃ নাম্বার সেভেন রিকোয়েস্ট ফ্রম আহমদ মুসা।’

‘খুবই সহজ। কিন্তু শেষের নাম্বারটাই আসল। রিকোয়েস্টের সিরিয়াল নাম্বার তারা এবং আমি জানি। সুতরাং, সহজ হলেও এই কোড অন্য কারও পক্ষেই ব্যবহার করা সম্ভব নয়।’

কথা শেষ করে ঘড়ি দেখল আহমদ মুসা। বলল, ‘এখন উঠতে হয়।’

‘কিন্তু আরেকটা জিনিস আপনি বলেননি, রিপোর্টটা কবে পাঠাব।’ সুমাইয়া বলল।

‘হ্যাঁ, ঠিক কথা মনে করেছ। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমি চাই, ব্ল্যাক ক্রস চীফ জাস্টিস উসাম বাইকের সাথে যোগাযোগ করার পর এ রিপোর্টটা ছাপা হোক। সুতরাং, এ রিপোর্টটা তুমি আজ থেকে ঠিক তৃতীয় দিনে পাঠাবে, তাহলে চতুর্থ দিনে রিপোর্টটা ছাপা হবে।’ বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

‘কিন্তু এর মধ্যে যদি বিচারপতি উসাম বাইকের সাথে ওদের যোগাযোগ বা দেখা না হয়?’ উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল সুমাইয়া।

'নাও হতে পারে। তবে যোগাযোগ করার জন্যে খুব বেশি সময় নেবার তাদের প্রয়োজন আছে কি? তারা চাইবে কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করতে, এটাই স্বাভাবিক।'

উঠে দাঁড়িয়েছে রালফ এবং ডেবরাও।

'তাহলে সুমাইয়া, ডেবরা, সময় যদি থাকে ডোনাকে এয়ারপোর্টে নিয়ে যাবে।'

'কেন, আমরা এয়ারপোর্টে যাচ্ছি না?' বলল সুমাইয়া।

'না, আমার সাথে রালফ যাবে। তোমাদের এখানে থাকা উচিত, অন্তত ডোনার জন্যে।'

'ঠিক আছে, থাকব। তাহলে আপনার সাথে আর দেখা হচ্ছে না?' বলল ডেবরা।

'যদি এয়ারপোর্টে যাও, দেখা হবে।'

'সেটা 'যদি'-এর প্রশ্ন।' বলল ডেবরা।

'একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাজ ছাড়া দুনিয়ার সব কাজ, সব সাফল্য-ব্যর্থতাই তো এই 'যদি'-এর মুখাপেক্ষী।'

'ঠিক আছে। 'যদি'সহই আমার প্রশ্নের জবাব হতে পারে।' বলল ডেবরা।

'যদি লাগিয়েও অনেক প্রশ্নের জবাব দেয়া যায় না। তবুও বলছি, যখন আল্লাহ ফ্রান্সে নিয়ে আসবেন এবং যদি আল্লাহ্ সুযোগ দেন, তাহলে দেখা হবে।' বলে হাসল আহমদ মুসা।

কিন্তু ডেবরার মুখ গম্ভীর। সে বলল, 'গত দু'দিনের সম্পর্ক স্মৃতির সামান্য খেলাঘর হলেও একে ভেঙে যেতে আপনার কষ্ট লাগছে না?'

আহমদ মুসা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। গম্ভীর হয়ে উঠল তার মুখ। তারপর সেই গাম্ভীর্যের উপর সজল বেদনার একটা আস্তরণ নেমে এল। তার উদাস দৃষ্টি জানালা দিয়ে দূর আকাশে নিবদ্ধ হলো। মুখ দিয়ে তার খুব ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল, 'ডেবরা, বোন, জীবন একটা বড় গ্রন্থের নাম। এর পেছনের সব পাতা কখনোই উল্টানো হয় না। কিন্তু আনন্দ অথবা বেদনার অশরীরী আঙুল

কতকগুলো পাতাকে বার বার উল্টিয়ে দেয়। কুমেট আমার জীবনের এমনই একটা পাতা। ক্লাউডিয়া এবং জিয়ানার গৌরবময় ত্যাগের অমূল্য লাল রক্ত এ পাতাকে চিরকালের জন্যে চিহ্নিত করেছে। এদিকে তাকিয়ে মানুষকে আমি আরও ভালবাসতে শিখব, দায়িত্ব পালনে আরও উদ্বুদ্ধ হবো আমি।'

থামল আহমদ মুসা। শেষের কথাগুলো তার ভারি হয়ে ভেংগে পড়ার মত হলো। তার দুই চোখের কোণাও সিক্ত মনে হলো।

ডেবরা, সুমাইয়া, রালফ-এর মুখেও বেদনার ছায়া নেমে এসেছে।

'আমি বুঝতে পারিনি। যাবার সময় আপনাকে এভাবে আঘাত করা আমার ঠিক হয়নি। আমাকে মাফ করুন।' মুখ নিচু করে ভারি কণ্ঠে বলল ডেবরা।

ডেবরার কথাগুলো মনে হয় আহমদ মুসার কানে পৌঁছতে পারেনি। সে নির্বিকারভাবে তার চোখ দু'টি সরিয়ে নিল জানালা থেকে। তাকাল ডেবরা ও সুমাইয়াদের দিকে। পকেট থেকে এনভেলাপ বের করে সুমাইয়ার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এ চিঠিটা ডোনাকে দিও। আর তোমরা তাকে বলো, সে যেন আমার পক্ষ থেকে ক্লাউডিয়া এবং জিয়ানার আব্বার সাথে কথা বলে।'

কথা শেষ করে আহমদ মুসা রালফকে বলল, 'চল, দেরি হয়ে যাবে।'

বলে আহমদ মুসা পা বাড়াল।

তার সাথে রালফও।

ডেবরা এবং সুমাইয়াও তাদের সাথে নিচে গাড়ি বারান্দায় নেমে এল আহমদ মুসাদের বিদায় জানাবার জন্যে।

# ৫

নাইজেরিয়ার রাজধানী লাগোস-এর বিমানবন্দরে নেমে যখন আহমদ মুসা জানতে পেরেছিল, 'দুয়ালা'র বিমান ধরার জন্যে তিন ঘণ্টা বসে থাকতে হবে, তখন মনটা তার তেতো হয়ে গিয়েছিল। পরে কিন্তু এই তেতো ভাবটা আর থাকেনি।

টার্মিনাল লাউঞ্জের উত্তরের জানালা দিয়ে গরানের সবুজ বুকের উপর দৃষ্টি ফেলতে গিয়ে হারিয়ে গিয়েছিল আহমদ মুসার মন। এই নাইজেরিয়া আবু বকর বালেবা তাফাওয়ার নাইজেরিয়া, আহমদ বেল্লুর নাইজেরিয়া। আবু বকর বালেবা তাফাওয়া ছিলেন নাইজেরিয়ার প্রধানমন্ত্রী এবং আহমদ বেল্লু ছিলেন উত্তর নাইজেরিয়া প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। এ দু'জন ছিলেন ইসলামের অকুতোভয় সৈনিক। তাদের শাসনামলে সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের সুবাতাস নাইজেরিয়ায় এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল। ইসলামের কল্যাণ রূপ মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। মাত্র এক বছরে নাইজেরিয়ায় নয় লাখ উপজাতি ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ক্রিসেন্টের এই অগ্রগতি হিংসায় উন্মত্ত করে তুলেছিল ক্রসকে। ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী মাসের এক কালো দিন। এ দিন গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হলো নাইজেরিয়ার এই দুই মহান নেতা। ক্ষমতায় আসেন জেনারেল জনসন ইরোনসি এবং শান্ত হয় ক্রসের হিংসার আগুন।

গরান বনের উপর দিয়ে দিগন্তে চোখ নিবদ্ধ করতে গিয়ে ইতিহাসের সে ঘটনাগুলো আহমদ মুসার চোখে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। তার চোখে ভেসে উঠেছিল নাইজেরিয়ার মানচিত্র। সামনের এই গরান বন পেরিয়ে একটু এগোলেই পাবে ওকুতা নামের নগর। সেখানে ট্রেনে চাপলেই নতুন নানা জায়গা পেরিয়ে পৌঁছা যাবে ঐতিহাসিক নগরী 'কানো'তে। উত্তর নাইজেরিয়ার এই 'কানো' নগরী ছিল নাইজেরিয়ায় ইসলামের সিংহদ্বার।

উত্তর থেকে ইসলামের আলো এই দ্বারপথেই নাইজেরিয়াকে আলোকিত করে। উত্তর নাইজেরিয়া এখনো ইসলামের দুর্গ। আবু বকর বালেবা তাফাওয়া এবং আহমদ বেল্লু ছিলেন এই দুর্গের সেনাধ্যক্ষ। তাদের হত্যা করা হয়েছিল এই দুর্গে ধ্বস নামানোর জন্যেই।

আযানের একটা মিষ্টি সুর আহমদ মুসার চিন্তায় ছেদ ঘটাল। চারদিকে তাকিয়ে বুঝল, আযানটা টার্মিনাল ভবনের উপর তলা থেকে আসছে।

হাতঘড়ির দিকে তাকাল আহমদ মুসা। দেখল, বেলা সাড়ে বারটা। এ সময় আযান কেন? হঠাৎ আহমদ মুসার মনে পড়ল, আজ শুক্রবার, জুময়ার নামাজ। খুশি হলো আহমদ মুসা।

উৎকর্ণ হয়ে গভীর মনোযোগের সাথে আযান শুনল আহমদ মুসা। বেশ ক'দিন পর এমন মুক্তকণ্ঠের আযান শুনছে সে। অমুসলিম অনেক দেশের মত ফ্রান্সেও মুক্ত কণ্ঠ আযানের উপর বিধি-নিষেধ রয়েছে।

আহমদ মুসা ওপরে উঠে গেল মসজিদের সন্ধানে।

বড় একটি হল ঘর নিয়ে মসজিদ।

বেশ সুন্দর ওজুখানাও।

আরবীতে খুৎবা হলো।

নামায শেষে আহমদ মুসা ইমামের সাথে দু'টি কথা বলার জন্যে অপেক্ষা করল।

ইমাম বয়সে যুবক।

আহমদ মুসা তার সাথে আরবী ভাষায় কথা বলল। আহমদ মুসা সময় চাইতেই সে আহমদ মুসার দিকে একবার গভীর দৃষ্টিতে চাইল। রাজি হলো সে এবং আহমদ মুসাকে তার কক্ষে নিয়ে গেল।

দু'টি সোফায় মুখোমুখি দু'জন বসল।

'আমি আবদুর রহমান ইরোহা। আপনার পরিচয় বলুন।' বলল ইমাম সাহেব।

ইমাম আবদুর রহমান ইরোহা মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছেন। এবং সৌদি সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত একজন মুবাল্লেগ।

ইমামের প্রশ্নের পর আহমদ মুসা তার মুখের দিকে আরেকবার তাকাল। বলল, 'আমি আহমদ মুসা।'

ইমাম আবদুর রহমান মুখ তুলে একবার আহমদ মুসার দিকে তাকাল। তার চোখে সামান্য একটু কৌতুহল। বলল, 'বলুন, আপনি কি বলতে চান?'

'আমার দু'টি প্রশ্ন। একটি হলো, নাইজেরিয়ায় মুসলিম জনসংখ্যার শতকরা হার কমেছে কেন?'

'প্রকৃতপক্ষে সংখ্যা কমেনি। কিন্তু কম যে দেখানো হচ্ছে তার রহস্য হলো, নাইজেরিয়ার দক্ষিণ ও পূর্ব এলাকা থেকে মুসলমানদের বিভিন্ন কৌশলে ব্যাপক উচ্ছেদ করা হয়েছে। ফলে এই অঞ্চলে মুসলমানদের হার কমে গেছে। পশ্চিমী বা খৃস্টানদের পরিসংখ্যানে নাইজেরিয়ার মুসলিম জনসংখ্যা থেকে এদের কম দেখানো হয়েছে। কিন্তু এরা যে পশ্চিম ও উত্তরে গিয়ে সেখানকার মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি করেছে, সেটা আর পরিসংখ্যানে দেখানো হয়নি।'

'ধন্যবাদ। আমি ক্যামেরুনে যাচ্ছি। আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন ক্যামেরুন সংক্রান্ত। সমগ্র দক্ষিণ ক্যামেরুন মুসলিমশূন্য হয়ে পড়েছে, এটা আপনারা জানেন কিনা? জানলে আপনারা এ ব্যাপারে কি করেছেন?'

'আমরা জানি। নাইজেরিয়ার দক্ষিণ ও পূর্বে মুসলিম জনসংখ্যার ক্ষেত্রে যা ঘটেছে, সেটাই পরিপূর্ণ রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে ক্যামেরুনে।'

একটু থামল ইমাম আবদুর রহমান। তার বুক থেকে একটা ছোট-খাট দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এল। বলল, 'আমরা নাইজেরিয়াতেই কিছু করতে পারছি না, ক্যামেরুনের জন্যে আর আমরা কি করব?'

'মাফ করবেন, কি করা যেত বলে আপনি মনে করেন?'

'মুসলমানদের সচেতনতা ও ঐক্যের অভাব এবং তাদের দারিদ্র্য ও অভিভাবকহীনতার কারণেই এমনটা ঘটতে পারছে। এই দুর্বলতাগুলো দূর করা যেত।'

'অভিভাবকহীনতা বলতে আপনি কি বোঝাতে চাচ্ছেন?'

'উপরোক্ত দুর্বলতা দূর করার জন্যে বাইরে থেকে সুনির্দিষ্ট ও স্থায়ী সাহায্য। খৃস্টানদের জন্যে যা হচ্ছে।'

কথাগুলো শেষ করেই ইমাম আবদুর রহমান আহমদ মুসার উপর দৃষ্টি স্থির করে বলল, ‘দেখুন, আমার তিরিশ বছরের জীবনে এমন প্রশ্ন কেউ আমাকে করেনি, আমিও এ প্রশ্ন কাউকে কখনও করিনি। আপনিই প্রথম এমন প্রশ্ন তুললেন। কে আপনি?’

‘হতভাগ্য জাতির একজন সেবক।’ বলল ম্লান হেসে আহমদ মুসা।

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা বলল, ‘আমি উঠি, প্লেনের সময় হয়ে এল।’

বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

ইমাম আবদুর রহমানের স্থির দৃষ্টি তখনও আহমদ মুসার দিকে নিবদ্ধ। বলল, ‘আপনাকে কোথাও যেন আমি দেখেছি।’

হঠাৎ তার চোখ দু’টি উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠল। সাংঘাতিক কি যেন মনে পড়েছে তার। উঠে দাঁড়াল সে সোফা থেকে এক লাফে। মুখোমুখি হলো সে আহমদ মুসার। বলল, ‘চিনতে পেরেছি, আপনি আহমদ মুসা- আমাদের সেই স্বপ্নের মানুষ!’

বলে আহমদ মুসার দু’হাত ধরে তাতে চুমু খেল। বলল, ‘কি সৌভাগ্য, আমার ঘরে আপনার দেখা পেলাম!’

কথাগুলো বলতে বলতে আনন্দের আতিশয্যে কেঁদে ফেলল যুবক ইমাম। আরও বলল, ‘আমাকে মাফ করবেন, আরো আগে আপনাকে চেনা আমার উচিত ছিল। আমি আপনার যে ছবি দেখেছি তাতে ছিল আপনার আরবীয় পোশাক। এ কারণেই আমি কিছুটা বিভ্রান্ত হয়েছি।’

‘তাতে কি! ধন্যবাদ আপনাকে। খুব খুশি হলাম আপনার সাথে পরিচিত হয়ে। জানতে পারলাম মূল্যবান কিছু আপনার কাছ থেকে। এখন আমাকে যেতে হবে।’

‘এ সৌভাগ্য আমার আর হয়তো হবে না। আমার ঘরে আসলেন, আমি মেহমানদারী করলাম না, এ হতে পারে না। সুতরাং...’

আহমদ মুসা তাকে বাঁধা দিয়ে বলল, ‘মাফ করুন, এয়ারপোর্টের বেশ কিছু ফরমালিটি এখনো বাকি আছে। সময় বেশি নেই।’

কয়েক মুহূর্ত কিছু বলল না ইমাম আবদুর রহমান। তাকিয়েছিল সে আহমদ মুসার দিকে। যেন সমস্ত মনোযোগ উজাড় করে সে দেখছিল আহমদ মুসাকে। বলল, ‘আমি জানি, আপনার মতই আপনার সময় মূল্যবান। আপনার স্বাধীন গতিতে বাঁধা দেয়া ঠিক নয়। নিশ্চয় বড় কোন কাজ নিয়ে আপনি ক্যামেরুনে যাচ্ছেন?’

‘কাজটা অবশ্যই বড়।’

‘আপনি কি প্রথম ক্যামেরুনে যাচ্ছেন?’

‘প্রথম।’

‘কেউ পরিচিত আছে আপনার সেখানে?’

‘ক্যামেরুনের একজনকে মাত্র চিনি। কিন্তু সে এখন পণবন্দী। তাকে উদ্ধার করতেই যাচ্ছি।’

বলে আহমদ মুসা খুব সংক্ষেপে তাকে ওমর বায়ার কথা জানাল।

শুনে আবেগে ইমাম আবদুর রহমানের চোখ দু’টি আবার অশ্রু সজল হয়ে উঠল। বলল, ‘আল্লাহ আপনাকে সৃষ্টি করেছেন জাতির জন্যে। আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন।’

একটু থেমে আবার শুরু করল, ‘রাজধানী ইয়াউন্ডির বেলাল জামে মসজিদের ইমাম ‘উসমান বাহনাজ সঙ্গ’ আমার ক্লাসমেট। মদিনায় দু’জন একসাথে পড়েছি। উনিও একজন সৌদি মুবাল্লেগ। খুব তেজী ঈমানের মানুষ। তাকে আপনি পাশে পেতে পারেন। আমি কথা বলব তার সাথে টেলিফোনে।’

আহমদ মুসা নাম নোট করে নিয়ে বিদায় নেবার জন্যে হাত বাড়াল হ্যান্ডশেকের জন্যে।

ইমাম আবদুর রহমান ইরোহা হ্যান্ডশেক করে হাত ছেড়ে দিল না। হাত ধরে মসজিদের বাইরে এসে সে বিদায় জানাল আহমদ মুসাকে।

আহমদ মুসা ফিরে এল লাউঞ্জে তার জায়গায়। কিন্তু দেখল, তার যে কয়জন সহযাত্রী ছিল তারা চলে গেছে। আহমদ মুসা টিভি স্ক্রীনের ফ্লাইট ইনফরমেশনের দিকে তাকাল। দেখল, বোর্ডিং শুরু হয়ে গেছে।

আহমদ মুসা তার ব্যাগটা ঠিক করে নিয়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে পাশের দুই চেয়ারের পাশে চোখ পড়তেই দেখল, একটা মানিব্যাগ পড়ে আছে।

মানিব্যাগটি হাতে তুলে নিল আহমদ মুসা। মানিব্যাগের ভাঁজ খুলতেই আহমদ মুসা নেমকার্ডের পকেটে একটা কার্ড দেখতে পেল। পড়ল, থমাস নিকানো, কাস্টমস কমিশনার, দুয়ালা, ক্যামেরুন।

আহমদ মুসা দেখল, মানিব্যাগে একটা রিসিট এবং আড়াই হাজার পাউন্ড ছাড়া আর কিছু নেই।

আহমদ মুসা মানিব্যাগটি পকেটে রাখতে রাখতে ভাবল, ক্যামেরুনে পৌঁছার আগেই আল্লাহ বড় দুটো সাহায্য করলেন। একটি হলো, ইয়াউন্ডির বেলাল মসজিদের উসমান বাহনাজ সঙ্গ-এর সাথে পরিচিত হবার সুযোগ। দুই, থমাস নিকানোর সাথে পরিচিত হবার একটা মাধ্যম। এই শেষ সুযোগটি আহমদ মুসার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

আহমদ মুসা বিমানে উঠল।

যাত্রীদের অধিকাংশই আফ্রিকান। আহমদ মুসার সারিতে সবাই আফ্রিকান।

লাগোস থেকে ক্যামেরুনের দুয়ালা পাকা তিন ঘণ্টার পথ।

আহমদ মুসা বিমানের সিটে বসেই আসরের নামায পড়ে নিল। নামায পড়ার আগে পাশের ভদ্রলোককে আহমদ মুসা বলেছিল, 'আমার এখন প্রার্থনার সময়, আপনার কোন অসুবিধা হবে না তো?'

ভদ্রলোকটি মধ্যবয়সী আফ্রিকান। গায়ে ইউরোপীয় পোশাক। চেহারা পরিচ্ছন্ন ও বুদ্ধিদীপ্ত। আহমদ মুসার কথা শুনে বলল, 'না, না, ওয়েলকাম, আমার কোন অসুবিধা হবে না।'

আহমদ মুসা নামায পড়ল।

তার নামায শেষ হলে ভদ্রলোকটি বলল, 'আপনি মুসলিম?'

'জ্বি, হ্যাঁ।'

'কোথায় দেশ?'

'সেন্ট্রাল এশিয়া।'

‘কোথায় যাবেন?’

‘দুয়ালা। তারপর ক্যামেরুন দেখব।’

‘ওয়েলকাম।’

এ সময় বিমানের পক্ষ থেকে ঘোষণা এল, দুয়ালায় নামতে যাচ্ছি আমরা অল্পক্ষণের মধ্যেই। সিটবেল্ট বাঁধতে হলো সকলকে।

আহমদ মুসা সিটবেল্ট বেঁধে বলল, ‘ক্যামেরুন আপনার দেশ বুঝি?’

‘হ্যাঁ। আমি থমাস নিকানো। থাকি দুয়ালায়।’

নামটা শুনেই চমকে উঠল আহমদ মুসা। ‘মানিব্যাগের নেমকার্ডে এই নামই লেখা আছে’- ভাবল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা তার দিকে তাকাল। জিজ্ঞেস করল, ‘আপনি কিছু হারিয়েছেন আজ?’

প্রশ্ন শুনেই লোকটি চমকে উঠে আহমদ মুসার দিকে তাকাল। মুখটা তার হঠাৎ করে মলিন হয়ে গেছে। যেন খারাপ কিছু তার মনে পড়ে গেছে।

‘হারিয়েছি। মানিব্যাগ। কিন্তু আপনি জানলেন কি করে, আমার কিছু হারিয়েছে?’ বলল লোকটি।

আহমদ মুসা পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে লোকটির দিকে তুলে ধরে বলল, ‘দেখুন, এটা কিনা।’

লোকটির চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আনন্দে। মানিব্যাগটি হাতে নিয়ে বলল, ‘হ্যাঁ, এটা আমার মানিব্যাগ। অনেক ধন্যবাদ, আপনি কোথায় পেলেন?’

‘লাউঞ্জে ফেলে এসেছিলেন। ওতে কত টাকা ছিল আপনার?’

‘আড়াই হাজার পাউন্ড। কিন্তু আড়াই হাজার পাউন্ডের চেয়ে আমার কাছে মূল্যবান রশিদটা। ওটা হারালে দশলাখ টাকার একটি সম্পত্তি হাতছাড়া হবার সম্ভাবনা ছিল।’

‘টাকাটা ঠিক আছে কিনা দেখে নিন।’

‘ঠিক আছে।’

‘না দেখেই বলছেন কেমন করে?’

'মানিব্যাগ ফেরত পাওয়াই এর প্রমাণ। যিনি টাকা এদিক-সেদিক করতে পারেন, তিনি মানিব্যাগ ফেরত দিতেন না।'

আহমদ মুসা তৎক্ষণাৎ কোন কথা বলল না। থমাস নিকানোই আবার কথা বলল, 'আপনি দুয়ালার কোথায় যাবেন? এর আগে আপনি এসেছেন ক্যামেরুনে?'

'না, আসিনি। ঠিক করিনি। কোন হোটেল-টোটেলে উঠব।'

একটু থেমে আহমদ মুসাই আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু বিমান ল্যান্ড করল ঐ সময়। সবাই নামার জন্যে তোড়জোড় শুরু করল। থমাস নিকানো বলল, 'চলুন, নামি।'

থমাস নিকানো আহমদ মুসার সাথেই বিমান থেকে নেমে এল।

তাদের কারো সাথেই লাগেজ ছিল না। ইমিগ্রেশনের ফর্মালিটি সারতেও কোন দেরি হলো না। লাইনেও দাঁড়াতে হলো না আহমদ মুসাকে। আহমদ মুসা দেখল, সর্বত্রই থমাস নিকানোর সাংঘাতিক প্রভাব। তাকে দেখে সব অফিসারই ভয় অথবা বিনয়ে মোমের মত নরম হয়ে যাচ্ছে।

খুশি হলো আহমদ মুসা। তার যে সাহায্য এখন প্রয়োজন, তা এই লোকটি করতে পারবে।

ডিপারচার লাউঞ্জে এসে আহমদ মুসা বলল, 'ক্যামেরুনের একজনের সাথে কুমেটে আমার পরিচয় হয়েছিল। কথা হয়েছিল। দুর্ভাগ্য, নামটা ভুলে গেছি। আজ ভোরে দুয়ালা এসেছে। তার খোঁজ পেলে ভাল হতো।'

'কুমেট থেকে সে ফ্লাইটে অনেকেই আসতে পারে। নাম না জানলে বের করা মুশকিল।'

আহমদ মুসা নিশ্চিত, পিয়েরে পল ও ফ্রান্সিস দু'জনেই দুয়ালা এসেছে। কিন্তু আহমদ মুসা ওদের নাম নিতে চায় না। তাছাড়া কি নামে ওদের পাসপোর্ট, সেটাও আহমদ মুসা জানে না। ওদের নামের চেয়ে আহমদ মুসার কাছে কফিন দুটোই বড়। আহমদ মুসার টার্গেট কফিন দুটো। কফিন কোথায় গেছে সেটা জানা। কিন্তু কফিনের প্রতি তার এই আগ্রহ সে প্রকাশ করতে চায় না। আহমদ মুসা ভাবল, এখন কফিনের কথা বলা যায়।

‘তার সাথে দুটো কফিন এসেছে।’

‘কফিন? তার কেউ মারা গিয়েছিল? এ জন্যেই বুঝি তার সাথে দেখা করতে চান?’

বলে একটু থামল। তারপর বলল, ‘কোন চিন্তা নেই, এখন ওদের ঠিকানা বের করা যাবে। আমি টেলিফোনে জেনে নেব সেটা। এখন চলুন।’

‘কোথায়?’

‘দুয়ালায় ভালো হোটেল আছে, সেখানে আপনি খুব ভালো থাকবেন। কিন্তু আমি খুব খুশি হতাম, যদি আপনাকে মেহমান হিসেবে পেতাম। পশ্চিমে মেহমানদারী নেই। কিন্তু অতিথিকে এখনও আমরা ভুলতে পারিনি।’

‘পশ্চিম থেকে এটা উঠে গেছে এই কারণে যে, মেহমানদারীতে কষ্ট আছে, বাড়তি ঝামেলা অনেক সময় খুবই কষ্টকর হয়।’

‘এটা অনেকটা মানসিকতার ব্যাপার। আপনাদের ধর্মে তো এটা খুবই গৌরবের। মেহমানদারী আমাদের আফ্রিকারও একটা কালচার। সুতরাং আপনি রাজি হলে খুশি হবো।’

আহমদ মুসার প্রতি থমাস নিকানোর এই আহবানটা আন্তরিক। আহমদ মুসার দুর্লভ সততা খুবই মুগ্ধ করেছে থমাস নিকানোকে। বিমানের সিটে আহমদ মুসার প্রার্থনার চিত্রটিও থমাস নিকানোর মনে পড়েছে। চার্চের ফাদারদের মতই নিষ্পাপ এবং পবিত্রতার ছাপ সে দেখেছে আহমদ মুসার চেহারায়। সব মিলিয়ে আহমদ মুসার প্রতি একটা সম্ভ্রমের ভাবও সৃষ্টি হয়েছে থমাস নিকানোর মনে।

‘ঠিক আছে। আপনাদের সবার সাথে পরিচিত হলে খুশিই হবো।’

থমাস নিকানোর গাড়ি এসেছিল তাকে নেবার জন্যে। এসেছিল থমাস নিকানোর স্ত্রী, তার মেয়ে এবং ড্রাইভার।

পরিবারটি নিগ্রো। তবে রক্তের সংমিশ্রণের কারণে তাদের কালো রংয়ে এবং দেহের গড়নে নিগ্রোদের চেয়ে অনেক ভিন্নতা এসেছে। আকার-আকৃতিতে ওরা অনেকটা ‘কালো ইউরোপীয়ান’ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পোশাকও তাদের ইউরোপীয়ান।

থমাস নিকানো তার স্ত্রী ও মেয়ের সাথে আহমদ মুসাকে পরিচয় করিয়ে দিল। আহমদ মুসা যে মুসলমান এবং দয়া করে তার মেহমান হতে রাজি হয়েছেন, তাও বলে দিল।

থমাস নিকানোর স্ত্রী ও মেয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল হ্যান্ডশেকের জন্যে।

'স্যরি। মাফ করবেন। আমাদের মুসলিম কালচার এর অনুমতি দেয় না।'- কথাগুলো আহমদ মুসা বলেছিল বিনীতভাবে হাত না বাড়িয়ে।

'ঠিক আছে। ধন্যবাদ।' বলেছিল থমাসের স্ত্রী।

কিন্তু বিস্মিত হয়েছিল থমাসের মেয়ে। সে তো অনেক মুসলমানকে এমন হ্যান্ডশেক করতে বহুবার দেখেছে।

'মেরী, তুমি সামনের সিটে বস। মুসা সাহেব আমাদের সাথে আসুন।'

থমাস নিকানোর মেয়ের নাম মেরী আকামি এবং স্ত্রীর নাম নিদিপা আকামি।

থমাস নিকানো গাড়িতে বসার যে ব্যবস্থা করেছে, চলমান কালচার হিসেবে সেভাবেই বসতে হয়। কিন্তু বিব্রত বোধ করল আহমদ মুসা। এটা মুসলিম কালচার নয়।

আহমদ মুসা নরম কণ্ঠে আবার বলল, 'আমি যদি সামনে বসতে চাই!'

'না, তার দরকার নেই। মেরীই ওখানে বসবে।' থমাস নিকানো আহমদ মুসাকে সম্মান দেখাতে চাইল নিজের কাছে বসিয়ে।

'আমি সামনে ভিন্ন সিটে বসে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবো বেশি। এটা আমার কালচার সম্মত হবে।' বলল আহমদ মুসা।

থমাস নিকানো এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পারলো। হেসে উঠল সে। বলল, 'ভুলে গিয়েছিলাম আপনাদের পর্দার বিষয়। ওয়েলকাম। আপনি সামনে বসুন। মা মেরী, তুমি এস।'

'ধন্যবাদ।' বলে হাসল আহমদ মুসা। সে সামনের সিটে উঠে বসল।

মেরী আকামি গিয়ে পেছনে মায়ের পাশে বসল। তার চোখে আবার সেই পুরানো বিস্ময়, 'দুয়ালা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম ছেলে-মেয়ে আছে। কই, তাদের মেলামেশা, উঠাবসার কোথাও তো এই কালচার দেখি না!'

গাড়ি স্টার্ট নিল। চলতে শুরু করল গাড়ি।

দুয়ালার অভিজাত এলাকায় বিরাট এলাকা জুড়ে সুন্দর বাড়ি থমাস নিকানোর। আমদানিবহুল উন্নয়নশীল দেশে 'কাস্টমস কমিশনার' খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারা সাধারণত পয়সার মালিক হয়ে থাকেন।

রাত দশটা।

থমাস নিকানো মেয়ে মেরীকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'মা, একটু দেখে এস, মেহমান শুয়েছে কিনা। তার কোন অসুবিধা আছে কিনা।'

'তোমার আজীব মেহমান আব্বা। এমন মুসলমান তো আমার চোখে পড়েনি।'

'ক'জন মুসলমানই বা তুমি দেখেছ। ভাল মুসলমানরা এ রকমই হয়।'

'কিন্তু আব্বা, সৌজন্যের খাতিরেও তো কিছু অ্যাডজাস্ট করতে হয়!'

'কিন্তু মা, নীতির ক্ষেত্রে এই অ্যাডজাস্ট পরিণামে বড় ক্ষতিরই কারণ হয়। আমরা খৃস্টানরা ধর্মীয় ক্ষেত্রে এই ক্ষতির শিকার হয়েছি।'

'দেখলে তো, মাছ ছাড়া কিছুই খেলেন না। শূকর হারাম, ঠিক আছে। কিন্তু গরু ও মুরগী কোন দোষ করল?'

'দোষ আছে মা। তাদের জন্যে হালাল কোন প্রাণীও যদি আল্লাহর নাম নিয়ে জবাই না করা হয়, তাহলে তা হারাম হয়ে যায়। তারা সেটা খায় না।'

'এটা উৎকট একটা গোঁড়ামী আব্বা।'

'না, মা। এর পেছনে একটা বিরাট দর্শন রয়েছে। আমিও একদিন তোমার মতই মনে করতাম, তারপর মত পাল্টেছি।'

'দর্শনটা কি?'

'দর্শনটা হলো, দুনিয়ার সব কিছু ঈশ্বরের সৃষ্টি। ঈশ্বর এসব সৃষ্টি করেছেন মানুষের জন্যে, ঈশ্বরের দান এগুলো মানুষের জন্যে। পশু প্রাণীও তা-ই। মানুষ এগুলো হত্যা করে খায়। এ হত্যা করে খাওয়ার অধিকার ঈশ্বর মানুষকে

দিয়েছেন। জবাই করার সময় আল্লাহর নাম নেয়ার মাধ্যমে মুসলমানরা একদিকে এই অধিকারের কথা স্মরণ করে, অন্যদিকে আল্লাহর কৃতজ্ঞতাও জ্ঞাপন করে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, সব কিছুই যে আল্লাহর, তার নয়, সে ভোগ করছে মাত্র- এই অনুভূতিও এর মাধ্যমে তীব্র হয়।'

'তুমিও দেখছি কম দার্শনিক নও। সত্যি আব্বা, এভাবে তো দুনিয়াকে কখনও আমি দেখিনি। ঠিক আছে আব্বা, ওদিক থেকে তাহলে আসি।'

বলে মেরী আকামি চলতে শুরু করেছে।

'শোন মা, ওকে বলো, ওর তথ্যটা নেবার জন্যে কয়েকবার টেলিফোন করেছি। সংশ্লিষ্ট লোক নেই বলে তথ্য দিতে পারেনি। দশটায় ওরা টেলিফোন করতে বলেছে। এখনি টেলিফোন করছি।'

'আচ্ছা বলব।' বলে চলে গেল মেরী।

আহমদ মুসা বেড-সাইড টেবিলে বসে কোরআন শরীফ পড়ছিল।

মেরী আকামি উঁকি দিয়ে এটা দেখল। কিন্তু প্রবেশ না করে দরজায় নক করল।

আহমদ মুসা উঠে এসে দরজা খুলে ধরল। মেরী আকামিকে দেখেই আহমদ মুসা বলল, 'আপনি? ওয়েলকাম। আসুন।'

আহমদ মুসা দরজা খোলা রেখেই তাকে ঘরের ভেতরে নিয়ে এল।

মেরী আকামি দরজা বন্ধ করতে গিয়েছিল। এয়ার কন্ডিশন করা ঘরের দরজা বন্ধ রাখাই নিয়ম।

'দরজা খোলা থাকলেই ভাল হয়।' মেরীকে লক্ষ্য করে বলল আহমদ মুসা অনেকটা অনুরোধের স্বরে।

'কেন ভাল হয়?'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'এটাও আমাদের একটা কালচার।'

'দরজা খুলে রাখা? সব সময় কি দরজা খুলে রাখা যায়, না খুলে রাখা উচিত?'

আহমদ মুসা একটু গম্ভীর হলো। বলল, 'সব সময়ের জন্যে এটা নয়। কোন মহিলা মেহমান যদি ঘরে আসেন বা কোন আগন্তুক মহিলা যদি ঘরে থাকেন, তাহলে ঘরের দরজা খুলে রাখা নিয়ম।'

কথা শুনে মেরী কিছুক্ষণ বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল আহমদ মুসার দিকে। তার মুখে কিছুটা গাম্ভীর্য নেমে এসেছে। বলল, 'মিঃ মুসা, খুব বিস্ময়কর লাগছে আমার কাছে এই নিয়ম। পৃথিবীতে কোথাও কোন ধর্মে এই নিয়ম আছে বলে আমার জানা ছিল না। কিন্তু খুবই ভাল লাগছে এই নিয়ম আমার কাছে।'

'ধন্যবাদ।' বলে আহমদ মুসা টেবিলের কোরআন শরীফ বন্ধ করে টেবিলের একপাশে রেখে সোফার দিকে ইংগিত করে মেরীকে বসতে বলে নিজে বসল টেবিলের চেয়ারে। বলল, 'একটু চিন্তা করলে আমাদের সব কালচারই আপনার ভালো লাগবে।'

মেরী সোফায় বসছিল। বসে বলল, 'জানি না। কিন্তু পর্দা নামক 'অবরোধ' সমর্থনযোগ্য নয় কোনক্রমেই।'

'পর্দার প্রকৃতি, পরিমাণ, আকৃতি, আকার প্রভৃতি নিয়ে বিভ্রান্তি কিছু আছে। কিন্তু নারীদেহ শোভনভাবে ঢেকে রাখা মানব-প্রকৃতির সাথে সংগতিশীল, এটা অসমর্থনযোগ্য হতে পারে না।'

'পুরুষের দেহ ঢেকে রাখা নয় কেন? যে কারণে নারী তার দেহ ঢাকবে, সে কারণে পুরুষেরও তার দেহ ঢাকা উচিত।'

'নারী দেহ ও পুরুষ দেহের বৈশিষ্ট্য এক রকম নয়। তাছাড়া আত্মরক্ষার কথা তাকেই বেশি চিন্তা করতে হয় যে অপেক্ষাকৃত দুর্বল বা যার ক্ষতির আশংকা বেশি।'

মেরী আকামি উত্তর দিল না সংগে সংগেই। তার কপাল কুঞ্চিত হয়েছে। আবার সেই বিস্ময় তার চোখে-মুখে। ধীরে ধীরে তার মুখে একটা সলজ্জ মিষ্টি হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'ধন্যবাদ আপনাকে। আপনি কি সাইকোলজি বা সমাজতত্ত্বের ছাত্র?'

'কেন?'

‘উত্তরগুলোকে আপনি মনস্তত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের এমন সব অলংঘনীয় যুক্তি দিয়ে সজ্জিত করেন, যার পাল্টা কিছু বলার সুযোগ থাকে না। আপনাকে আবার ধন্যবাদ। আপনি একটা বিরাট গ্রন্থকে দু’টি বাক্যের মধ্যে নিয়ে এসেছেন।’

‘কৃতিত্ব আমার নয়। এ যোগ্যতা আমাকে দিয়েছে আমার ধর্মগ্রন্থ আল-কোরআন।’

‘ঐটা কি পড়ছিলেন?’ টেবিলের কোরআন শরীফের দিকে ইংগিত করে বলল মেরী আকামি।

‘ওটাই কোরআন শরীফ।’

‘ধর্মগ্রন্থ সব সময় আপনি সাথে রাখেন?’

‘হ্যাঁ, সময় পেলেই পড়ি।’

‘আপনি খুব ধার্মিক। কি উদ্দেশ্যে আপনি ক্যামেরুন সফর করছেন?’

আহমদ মুসা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতে পারল না। একটু ভাবল, মিথ্যা কিভাবে এড়ানো যায়। অবশেষে বলল, ‘বিপদগ্রস্থ এক ভাইকে সাহায্য করতে এসেছি।’

‘আচ্ছা।’ বলে উঠে দাঁড়াল মেরী আকামি। বলল, ‘আব্বা জানতে পাঠিয়েছেন, সব ঠিক আছে কিনা, কোন অসুবিধা নেই তো আপনার?’

‘এত সুবিধা পেয়েছি, আমার কপাল!’

‘বিদ্রুপ করবেন না। অন্ধকার আফ্রিকার অন্ধকার ক্যামেরুনের একজন আমলার অতি সামান্য আয়োজনকে ‘এত সুবিধা’ বলছেন!’

‘বিদ্রুপ করিনি মিস মেরী। আমার জাতিকে আপনি চেনেন। অন্ধকার আফ্রিকার চেয়ে আলোকিত নয় আমার জাতি। আমি সেই জাতিরই একজন।’

‘আপনার জাতিকে আপনি খুব ভালবাসেন, তাই না?’

‘আমি জাতির মিশনকে বেশি ভালবাসি। মিশনকে ভালবাসি বলেই জাতিকে ভালবাসি।’

‘অন্য সব জাতি বা মানুষকে বাদ দিয়ে বিশেষ এক জাতিকে এরকম ভালবাসা কি সাম্প্রদায়িকতা নয়?’

'আমি তো বলেছি মিস মেরী, জাতির মিশনের জন্যেই আমি জাতিকে ভালবাসি এবং এই মিশন আমার জাতির জন্যে শুধু নয়, পৃথিবীর গোটা মানব সমাজের মঙ্গল ও মুক্তির জন্যে। সুতরাং, আমার জাতির মিশনকে ভালবাসি অর্থ গোটা মানব সমাজকেই আমি ভালবাসি। এটা সাম্প্রদায়িকতা নয়, এটা মানবতা।'

' চমৎকার! চমৎকার!! আপনার পেশা আমি জানি না, কিন্তু আপনার অধ্যাপনা করা প্রয়োজন ছিল। যাক, আপনি যে মিশনের কথা বললেন, তেমন মিশনের কথা তো সব জাতি প্রেমিকরাই বলতে পারে। তাহলে তো সাম্প্রদায়িকতাই আর থাকে না।'

'সবাই বলতে পারে না মিস মেরী। মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত মিশনই শুধু মানবিক হতে পারে- সব মানুষের জন্যে সমান কল্যাণকর হতে পারে।'

মেরী হাসল। বলল, 'আমি জানি এরপর কি বলবেন। এখন আমার মনে হচ্ছে, মিশনারী হলেই আপনি সবচেয়ে ভাল করতেন। যাক, আমি চলি। গুড নাইট।'

বলে দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে চলে গেল।

মেরী যখন ফ্যামিলি ড্রইং রুমে প্রবেশ করছিল, তখন দেখল, তার আব্বা টেলিফোনের রিসিভার রাখছে ক্র্যাডলের উপর। তার মনে হলো, তার আব্বার হাত যেন কাঁপল টেলিফোন রাখার সময়। তার আব্বার মুখটাও মলিন। সেখানে ভয়ের সুস্পষ্ট চিহ্ন।

শংকিত হলো মেরী। তার আব্বা কি অসুস্থ হয়ে পড়লেন? তার আব্বা ইতোমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে টেলিফোন রেখে।

মেরী তার দিকে এগিয়ে বলল, 'আব্বা, তুমি কি অসুস্থ?'

'না মা। দেখি, তোমার মা কোথায়?'

বলে থমাস নিকানো দ্রুত বেরিয়ে গেল ড্রইং রুম থেকে।

মেরীর মনে হলো, কথা বলার সময় তার আব্বার গলা কেঁপেছে।

কেন, কি হলো তার আব্বার হঠাৎ! কোনো খারাপ সংবাদ!

মেরী ঘুরে দাঁড়াল। তার আব্বা যে পথে গেছে, সেই পথে সেও ছুটল।

মেরী ঘরে ঢুকতে গিয়েও থেমে গেল। তার আব্বা-আম্মা কথা বলছিল। মেরী ঘরে ঢোকা ঠিক মনে করল না। পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে রইল মেরী।

'বিপদ, কি বিপদ?' বলছিল মেরীর মা নিদিমা আকামি।

'আজ ভোরে কুমেট থেকে বিমানে দু'টি কফিন বুক হয়ে এসেছিল। ও দুটো কফিন আমাদের মেহমানের স্বল্প পরিচিত লোকের। তার নাম ভুলে যাওয়ায় কফিনের অ্যাড্রেস দেখে সে তার ঐ বন্ধুর ঠিকানা যোগাড় করতে চেয়েছিল। সেই ঠিকানা যোগাড় করতে গিয়েই এমন বিপদ ঘটেছে।'

'কেমন বিপদ?'

'ও দুটো কফিন নাকি 'ওকুয়া' এবং 'ব্ল্যাক ক্রস'-এর। কফিনের ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও গোপনীয়। যে অফিসারকে আমি কফিনের ঠিকানা সংগ্রহ করতে বলেছিলাম, সে তা করতে গিয়েই বিপদ সৃষ্টি হয়েছে।'

'কিন্তু তুমি বিপদটার কথা বলছ না।'

'বলছি। ব্ল্যাক ক্রস ও ওকুয়া মনে করছে, তাদের শত্রুপক্ষ কফিনের খোঁজ করছে। সুতরাং, তারা এখন আমার মানে আমাদের মেহমানের সন্ধানে হন্যে হয়ে উঠেছে। অফিসারটি জানাল, 'ওকুয়া' এবং 'ব্ল্যাক ক্রস'-এর লোকরা নাকি বলেছে, কফিনের যে-ই খোঁজ করুক, সে অত্যন্ত ভয়ংকর লোক। 'ওকুয়া' এবং 'ব্ল্যাক ক্রস' তাকে যে কোন মূল্যে ধরবেই।'

'কফিনের খোঁজ করায় একজন লোক ভয়ংকর হয়ে গেল কিভাবে?'

'সেটাই তো কথা। নিশ্চয় কোন রহস্য আছে।'

'এখন কি হবে?'

''ওকুয়া' এবং 'ব্ল্যাক ক্রস'-এর লোকরা নাকি আমার বাড়ির ঠিকানা নিয়েছে।'

'তারা কি এখানে আসবে?'

'তারা আমাদের মেহমানকে ধরতে চায়। আমাদের কোন ভয় নেই। মেহমানটি এখানে কিভাবে এল সব ওরা শুনেছে।'

‘‘ওকুয়া’কে আমি চিনি। গোপন সশস্ত্র সংগঠন। খ্রিস্টান মিশনারীদের বিপদে-আপদে এরা সাহায্য করে। খ্রিস্টানদের শত্রু এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের এরা নির্মূল করে। কিন্তু ‘ব্ল্যাক ক্রস’ কি?’

‘আমিও খুব বেশি জানি না। তবে শুনলাম, ‘ওকুয়া’র মতই ওটা খ্রিস্টানদের একটা গোপন সশস্ত্র সংগঠন। তবে ‘ওকুয়া’ পশ্চিম আফ্রিকায় সীমাবদ্ধ, আর ব্ল্যাক ক্রস গোটা দুনিয়াজুড়ে কাজ করছে।’

‘এখন কি করবে? ওরা কখন আসবে এদিকে? মেহমানকে সাবধান করা যায় না?’

‘যায়। কিন্তু তাতে বিপদ হবে আমাদের। অফিসার আমাকে জানাল, ব্ল্যাক ক্রস ও ওকুয়া’র সাথে গণ্ডগোলে আমরা যেন জড়িয়ে না পড়ি। ওরা এসে যদি মেহমানকে না পায়, তাহলে আমরা তাকে পালিয়ে যেতে দিয়েছি বলে ওরা ধরে নেবে। সে ক্ষেত্রে ওদের ক্রোধ এসে পড়বে আমাদের উপর।’

‘তাহলে?’

‘সেই চিন্তাই করছি। মেহমান লোকটিকে আমার খুব ভাল মনে হয়। কোন খারাপ লোক সে হতেই পারে না।’

‘কিন্তু তাহলে ব্ল্যাক ক্রস ও ওকুয়া’র সাথে তার বিরোধ বাঁধল কেন?’

‘ওদের বিরোধ ভাল লোকদের সাথেই বেশি বাঁধে। বিশেষ করে মেহমান মুসলমান। ক্যামেরুনে তো এখন ‘ওকুয়া’ ও ‘কোক’-এর মত খ্রিস্টান সংগঠনগুলো মুসলমানদের নাম্বার ওয়ান শত্রু মনে করে। এই দিক থেকেও আমাদের মেহমান তাদের শত্রু হতে পারেন।’

‘মেহমান ভদ্রলোক ওদের হাতে পড়লে নির্ঘাত মারা পড়বে।’

‘কিন্তু আমি কি করব ভেবে পাচ্ছি না। ভাল লোকটি বাঁচুক আমি চাই, আবার বাঁচাবার জন্যে পালিয়েও যেতে দিতে পারছি না। কারণ, তাতে আমরা মারা পড়ব।’

‘কি সংকট ঈশ্বর আমাদের উপর চাপালেন!’

‘ভয়ানক সংকট।’

দু'জনেই নীরব এরপর। অনেকক্ষণ পরে মুখ খুলল মেরীর আম্মা নিদিপা আকামি। বলল, 'আমার মনে হয়, আমরা কিছুই জানি না, এভাবে চুপ করে থাকি। যা ঘটবার তা-ই ঘটবে। মনে কর, অফিসার তোমাকে কিছুই জানায়নি।'

'হয়তো এছাড়া আমাদের কাছে দ্বিতীয় পথ নেই। কিন্তু বিবেকের কাছে অপরাধী হবো এর ফলে।'

'হয়তো কিছুটা হবো। তাকে বাঁচাতে গেলে আমাদের গোটা পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।'

থমাস নিকানো আর কিছু বলতে পারলো না। দু'হাতে মাথাটা চেপে ধরে বসে থাকল।

নিদিপা আকামি তার স্বামীকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে তার কাঁধে হাত রাখল।

মেরী আকামি নিঃশব্দে সরে এল পর্দার আড়াল থেকে।

হৃদয়ে তখন ঝড় বইছে মেরী আকামির। লোকটি এভাবে জীবন দেবে ওদের হাতে? তার আব্বা-আম্মার সিদ্ধান্ত সে বুঝে ফেলেছে, ওরা চুপ করে থাকার পথ অনুসরণ করবেন। অন্য কথায়, ওরা মেহমানকে তুলে দেবেন 'ওকুয়া'র হাতে।

মনটা বিদ্রোহ করে উঠল মেরী আকামির। মেহমান ভদ্রলোকের সাথে সে যেটুকু আলাপ করেছে তাতে বুঝেছে, লোকটা অবশ্যই ভালো লোক। জ্ঞান ও চরিত্রের অত সুন্দর সম্মিলন কোথাও তার চোখে পড়েনি। ঘরের দরজা বন্ধ রেখে একজন বেগানা মহিলার সাথে কথা বলা শোভন নয়- এমন অপরিচিত নীতিবোধ যিনি মেনে চলেন, তিনি কোন অন্যায় করতে পারেন না, কোন অপরাধী হতে পারেন না।

কিন্তু কি করবে সে? বলে দেবে কি মেহমানকে সব কথা! কিন্তু তার পরিবারের কি হবে? পরিবার যদি এই কারণে তাদের জুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়!

কিন্তু পরক্ষণেই ভাবল, তার পরিবার জুলুম-নির্যাতনের শিকার হবে কি হবে না, সেটা অনেকটা অনিশ্চিত। কারণ তাদের বলা যাবে, খাওয়া-দাওয়া

করেই মেহমান চলে গেছে। কিন্তু মেহমান ওদের হাতে পড়লে তার আর রক্ষা হবে না।

এসব ভেবে মেরী আকামি মেহমানকে সব কথা বলে তাকে চলে যেতে অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো।

ধীরে ধীরে এগোলো সে আহমদ মুসার ঘরের দিকে।

দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দরজার উপর একটু চাপ দিয়ে বুঝল, দরজা বন্ধ।

দরজায় টোকা দিল সে।

মুহূর্তের মধ্যেই ভেতর থেকে কণ্ঠ ভেসে এল, 'দাঁড়াও মিস মেরী, খুলে দিচ্ছি।'

ভ্রূ কুঞ্চিত হলো মেরী আকামির, 'আমি দরজায় নক করেছি, এটা বুঝল কি করে সে?'

দরজা খুলে গেল।

দরজার সামনে আহমদ মুসা দাঁড়িয়ে। তার চোখে-মুখে বিস্ময়!

কিন্তু মেরীর মুখের দিকে তাকিয়ে আহমদ মুসার মুখভাবে পরিবর্তন ঘটল। বলল, 'কিছু ঘটেছে মিস মেরী? আসুন, ভেতরে আসুন।'

এবারও দরজা খোলা রাখল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা আগেই টেবিলের চেয়ারে বসল এবং মেরী গিয়ে বসল সেই সোফায়।

মেরীর মুখ গম্ভীর, ম্লান।

'কিছু ঘটেছে অবশ্যই, বলুন।' বলল আহমদ মুসা।

'তার আগে বলুন, আপনি কি করে বুঝলেন, আমি দরজায় নক করেছি? নাকি জানতেন আমি আসব?'

'জানতাম না। আপনার নক করা দেখে চিনেছি।'

'কেমন করে?'

'প্রথমবারও আসার সময় আপনি দরজায় নক করেছিলেন। সুতরাং, এবার নক করা শুনেই বুঝতে পেরেছি, এ আপনার নক।'

‘অদ্ভুত মানুষ আপনি। চিরদিন মনে রাখার মত একজন মানুষ আপনি।’

‘এখন বলুন, আপনি কি বলতে এসেছেন।’

‘কি করে বুঝলেন আমি কিছু বলতে এসেছি?’

‘যে কেউ আপনার মুখ দেখে এ কথা বলবে।’

‘যে কেউ নয়, আপনার মত কেউ।’

‘বলুন।’

তৎক্ষণাৎ কিছু বলল না মেরী। মুখ নিচু করল সে। মুখটা আরও ম্লান হয়ে উঠেছে তার।

কিছুক্ষণ পর মুখ তুলল মেরী। তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘এই রাতে এখনি এখান থেকে আপনার চলে যেতে হবে।’

আহমদ মুসার ঠোঁটে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল। বলল, ‘কফিনের ঠিকানা সন্ধান করতে গিয়ে তোমার আব্বা নিশ্চয় কিছু শুনেছেন। কি শুনেছেন?’

মেরী স্তম্ভিত হলো যে, মেরীর কথা শুনে আহমদ মুসার মুখভাবের সামান্য পরিবর্তনও হয়নি। কোন প্রশ্ন বা কোন উদ্বেগের সামান্য চিহ্নও দেখা গেল না তার মুখে। বরং ফুটে উঠল তার মুখে হাসি। যে হাসিতে দুর্ভাবনার সামান্য ক্লেদও ছিল না।

মেরী পর্দার আড়ালে তার পিতার কাছ থেকে যা শুনেছিল, সব খুলে বলল আহমদ মুসাকে। শুধু জানাল না তাদের পরিবারের বিপদের কথা এবং তার পিতা-মাতার সিদ্ধান্তের কথা। কথা শেষ করে মেরী আবার অনুরোধ করল, ‘ওরা যে কোন সময় চলে আসতে পারে। আপনার চলে যাওয়া উচিত।’

আহমদ মুসা আগেই আঁচ করেছিল, কফিনের সন্ধান নিতে গেলে শত্রুপক্ষ টের পেয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। কারণ, বিমানবন্দরে ব্ল্যাক ক্রস বা ওকুয়া’র লোক অবশ্যই আছে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি খবরটা পিয়েরে পল পর্যন্ত পৌঁছবে, তা সে মনে করেনি। মেরীর তাকে এইভাবে সাবধান করতে আসা এবং তার আব্বা থমাস নিকানোর তাকে কিছু না বলার ব্যাপার নিয়েও ভাবল। তারপর বলল, ‘ধন্যবাদ মিস মেরী। পরিচিত এক ভাইয়ের প্রতি আপনার এই আন্তরিকতা চিরদিন আমার মনে থাকবে। কিন্তু আমার চলে যাওয়া কি ঠিক হবে?’

মেরীর লাবণ্যময় কালো মুখ এবং উজ্জ্বল দু'টি চোখে একসাথে যেন সহস্র প্রশ্ন জেগে উঠল। বলল, 'কেন, ঠিক হবে না কেন?'

'কারণ, যারা আমাকে ধরতে আসবে বলে ভয় করছেন, তাদের আমি চিনি। তারা আমাকে না পেলে আপনাদের দায়ী করবে।'

'আপনি কি করে জানেন? আপনার এ ধারণা ঠিক নয়।'

'জানি। আপনার আব্বাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন। উনিও জানেন। জানেন বলেই উনি নিজের মুখে আমাকে এ খবর দিতে ভয় করেছেন।'

বিস্ময়ে 'হা' হয়ে উঠেছে মেরীর মুখ। বলল, 'আপনার কাছে কোন কথা লুকানো নিরর্থক। কিন্তু এ বিষয়টা আপনি জানলেন কেমন করে?'

'কারণ, ওদেরকে আমি চিনি। ওরা আপনার আব্বাকে কি বলতে পারে, এই অবস্থায় তা বোঝা কঠিন নয়। তাছাড়া আপনার আব্বা সরাসরি এ খবরটা আমাকে না দিতে পারায় বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়েছে।'

'যাক, সবই আপনি জানেন। আপনার চলে যাওয়া উচিত এ মুহূর্তেই।'

'মিস মেরী, নিজের বিপদ অন্যের ঘাড়ে তুলে দিয়ে আমি চলে যাই না।'

'কি বলছেন আপনি! ওদের হাতে পড়লে আপনার জীবন বাঁচবে না।' আর্তকণ্ঠ মেরীর।

'একই দশা হতে পারে আপনাদের। ওদের আপনারা চেনেন না।'

'দেখুন, আমাদের সাথে তাদের কোন শত্রুতা নেই। আর আপনি চলে যাবার ব্যাপারে দেবার মত আমাদের যথেষ্ট যুক্তি আছে। আপনার এ দিকটা চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই।'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'মিস মেরী, আপনি ওদের চেনেন না। আপনার আব্বা কিছুটা চেনেন। কিছু চেনেন বলেই উনি ভয় করেছেন তারা অসন্তুষ্ট হয় এমন কিছু করতে। সুতরাং, আপনি যান, নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ুন। পারলে দরজা লক করে যান, তারা এতে খুশি হবে।'

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই মিস মেরী উঠে দাঁড়াল। তার চোখে-মুখে অপমানের চিহ্ন। বলল, 'আপনি আমাদের হৃদয়হীন অমানুষ মনে করছেন। মনে করছেন, আমরা আমাদের জীবন বাঁচাবার জন্যে আমাদের একজন অতিথিকে

তার শত্রুর হাতে তুলে দেবার জন্যে উম্মুখ হয়ে আছি। যাচ্ছি আমি আব্বার কাছে।' বলে মেরী খোলা দরজা পথে এক দৌঁড়ে বের হয়ে গেল। আবেগ-অভিমানে তার গলা কাঁপছিল। কথা বলার সময় ভারিও হয়ে উঠেছিল তার কণ্ঠ।

মেরী ভুল বুঝলেও আহমদ মুসা অন্তর থেকেই কথাগুলো বলেছিল। আহমদ মুসার কাছে গোটা ব্যাপারটাই পরিষ্কার হয়ে গেছে। ব্ল্যাক ক্রস এবং ওকুয়া নিশ্চিত হয়েছে যে, ওমর বায়া এবং ডঃ ডিফরজিসকে কফিনে করে নিয়ে আসার ব্যাপারটা ধরা পড়ে গেছে এবং তাদের ফলো করা হয়েছে। এখন ব্ল্যাক ক্রস ও ওকুয়ার প্রথম কাজ হলো, যে বা যারা ফলো করছে তাদেরকে শেষ করে তাদের পরিকল্পনার বাস্তবায়নকে নিষ্কণ্টক করা। সুতরাং তারা নিশ্চয় এ বাড়ির দিকে এখন ছুটে আসছে এবং এসে তাকে না পেলে তাকে পালিয়ে যেতে দেয়ার জন্যে দায়ী করবে এই পরিবারকে। সুতরাং একটা পরিবারকে ব্ল্যাক ক্রস ও ওকুয়ার মত জঘন্য সংগঠনের রোষের মুখে তুলে দিয়ে পালিয়ে যেতে তার বিবেকে বাঁধছে। সে মনে করছে, যদি পালাতে হয় ওদের হাত থেকে পালানোই ভাল। আরেকটা বড় আশার বিষয় হলো, তাকে আহমদ মুসা বলে তারা মনে করেনি। আহমদ মুসা গাড়ি বিস্ফোরণে নিহত- এটাই এখনো তাদের ধারণা। সেদিন কুমেটে ব্ল্যাক ক্রসের ঘাঁটিতে ওমর বায়া ও ডঃ ডিফরজিসকে উদ্ধারের যে অভিযান হলো, সেটা আহমদ মুসার দ্বারা হয়েছে তা তারা বুঝতে পারেনি। সুতরাং তুলনামূলকভাবে তাদের কম সতর্কতার একটা বেনিফিট সে পাবে।

এসব চিন্তা করে শোবার জন্যে উঠে দাঁড়াল এবং দরজা বন্ধ করে এগোচ্ছিল বেডের দিকে। পেছনে দরজায় আবার সেই পরিচিত টোকার শব্দ। আহমদ মুসা বুঝল, এবার মেরী নিশ্চয় তার আব্বাকে সাথে করে নিয়ে এসেছে।

ফিরে গিয়ে দরজা খুলে দিল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার অনুমানে দেখা গেল ভুল হয়েছে। শুধু মেরী ও তার আব্বা নয়, মেরীর আম্মাও এসেছে।

আহমদ মুসা তাদেরকে সহাস্যে স্বাগত জানিয়ে বলল, 'আপনারা কষ্ট করেছেন। আমাকে ডাকলেই তো যেতাম।'

আহমদ মুসার নিশ্চিন্ত হাসির দিকে চেয়ে বিস্মিত হলো তারা তিনজনই।

মেরীর আব্বা-আম্মাকে আহমদ মুসা নিয়ে গিয়ে সোফায় বসাল এবং মেরীকে টেবিলের পাশের চেয়ারে বসতে বলে নিজে বেডের দিকে এগোলো। কিন্তু মেরী তার আগেই বেডের এক পাশে গিয়ে বসল। আহমদ মুসা ফিরে এসে বসল চেয়ারে।

'আমরা দুঃখিত মিঃ মুসা। মেরীর কাছ থেকে আপনি সব শুনেছেন, আমরাও তার কাছ থেকে সব শুনলাম। প্রকৃতপক্ষে আমার ভুলের কারণে এই সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। আপনি কোথায় আছেন, সে কথা বলা আমার ঠিক হয়নি। অন্যভাবেও কফিনের ঠিকানা যোগাড় করা যেত।'

'না মিঃ থমাস, আপনার কোন ভুল নয়, কফিনের ঠিকানা যোগাড় করতে গিয়েই এই সংকট সৃষ্টি হয়েছে। এই ঠিকানা যোগাড়ের কথা আমিই আপনাকে বলেছিলাম। সুতরাং সংকট সৃষ্টির প্রকৃত দায়িত্ব আমার।'

'কিন্তু মেরী ঠিকই বলেছে। আমাদের বিপদটা নিশ্চিত নয়। অন্যদিকে তাদের কথা শুনে যা মনে হয়েছে, আপনাকে পেলে ওরা ছাড়বে না। সুতরাং আমাদের একান্ত অনুরোধ, আপনি অবিলম্বে স্থান পরিবর্তন করুন। আমার এক আত্মীয়কে বলে এলাম। আপনি ওখানে গিয়ে থাকবেন। মেরী আপনাকে সেখানে পৌঁছে দেবে।'

থমাস নিকানো কথা শেষ করতেই মেরী উঠে দাঁড়াল। সামনে এসে দাঁড়াল আহমদ মুসার। বলল, 'আব্বার অনুরোধ আপনি না করবেন না। আপনি চলুন।'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'ধন্যবাদ মেরী।' বলে আহমদ মুসা ঘুরল থমাস নিকানোর দিকে। বলল, 'মিঃ থমাস, আপনারা সংকটটাকে ছোট করে দেখছেন। আমি 'ব্ল্যাক ক্রস' এবং 'ওকুয়া'কে ভালো করে চিনি। আপনাদের কারণে ওদের শিকার হাতছাড়া হলে ওরা আপনাদের ছাড়বে না।'

একটু থেমে আহমদ মুসা আবার বলল, 'আপনার সব জানেন না। ব্ল্যাক ক্রস-এর প্রধান পিয়েরে পল স্বয়ং কফিন দু'টি নিয়ে এসেছেন ক্যামেরুনে অত্যন্ত গোপনে। সুতরাং, এর গোপনীয়তা লংঘন তাদের কাছে খুব বড় বিষয়।'

মেরীসহ থমাস নিকানো ও নিদিপা আকামির চোখে-মুখে নতুন উদ্বেগের ছাপ ফুটে উঠেছে। থমাস নিকানো বলল, 'কফিন দু'টি এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?'

'আসলে মৃতের কোন কফিন ছিল না ওদুটো। কফিন দুটোতে দু'জন লোককে কিডন্যাপ করে আনা হয়েছে।'

'দু'জন লোক? অসম্ভব। চেকিং-এর তো সর্বাধুনিক ব্যবস্থা আছে কুমেটে এবং আমাদের দুয়ালাতেও।' চোখ কপালে তুলে বলল থমাস নিকানো। তার এবং মেরী ও মেরীর মায়ের মুখ ভয়ে পাংশু হয়ে গেছে।

'সবখানেই ওদের লোক আছে। সবাই জানে। চেকিং হয়নি।' বলল আহমদ মুসা।

'কিন্তু আপনার সাথে শত্রুতা কেন? কেনই বা আপনি কফিনের ঠিকানা চেয়েছিলেন?'

'কফিনে যে দু'জন লোককে ওরা কিডন্যাপ করে এনেছে, ওদের আমি মুক্ত করতে চাই।'

আহমদ মুসা কথা শেষ করলেও ওরা তিনজন কেউ কথা বলতে পারল না। ওদের পাংশু মুখের বিস্ময়-দৃষ্টি আহমদ মুসার মুখে নিবদ্ধ।

অনেকক্ষণ পর কথা বলল থমাস নিকানো। বলল, ''ব্ল্যাক ক্রস' ও 'ওকুয়া'র বিরুদ্ধে লড়াই করবেন? আপনি? একা?'

'প্রয়োজন একাকীত্ব কিংবা অসম্ভাব্যতা কিছুরই তোয়াক্কা করে না।'

'ওদের যদি উদ্ধার করতেই এসে থাকেন, তাহলে ওদের হাতে ধরা দিতে চাচ্ছেন কেন? সরে যেতে রাজি হচ্ছেন না কেন?'

'সরে যাচ্ছি না। কিন্তু ওদের হাতে ধরা দেব তা বলিনি।'

আহমদ মুসার কথায় এবং তার নির্বিকার-নিশ্চিন্ত চেহারা দেখে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল ওরা তিনজন। ভাবল তারা, বিপদ তাদের হতে পারে, কিন্তু ওর দিকে বিপদ ধেয়ে আসছে, সাংঘাতিক বিপদ। অথচ তাকে দেখে মনে হচ্ছে তার কিছুই ঘটেনি। কিছুই ঘটবে না। আশ্চর্য কঠিন নার্ভের মানুষ।

কিছু বলতে যাচ্ছিল থমাস নিকানো। এ সময় গাড়ি দাঁড়ানোর শব্দ এল গাড়ি বারান্দা থেকে। এবং তারপরই পাওয়া গেল অনেকগুলো পায়ের দ্রুত এগিয়ে আসার শব্দ।

'ওরা এসেছে মিঃ থমাস।'

আহমদ মুসার কথা শেষ হতে না হতেই ভয়ালমূর্তি নিয়ে চারজন এসে দাঁড়াল ঘরের দরজায়।

দু'জনের হাতে স্টেনগান এবং দু'জনের হাতে রিভলভার। সবগুলোই তাক করা আহমদ মুসার দিকে।

মিঃ থমাস, তার স্ত্রী নিদিপা আকামি এবং মেয়ে মেরী আকামি সকলের চোখ ভয়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে। মেরী গিয়ে জড়িয়ে ধরেছে তার মাকে।

চারজন ওরা ঘরে ঢুকল। ঘিরে দাঁড়াল এসে আহমদ মুসাকে। স্টেনগানধারী দু'জন আহমদ মুসার দু'পাশে এবং রিভলভারধারী দু'জন সামনে।

মেরীদের ভয়ার্ত দৃষ্টি আহমদ মুসার দিকে। কিন্তু তারা দেখল, আহমদ মুসা চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে মাত্র, তার মুখে সামান্য কোন ভাবান্তরও নেই। শেষ কথাটি বলার সময় তার ঠোঁটে যে হাসি ফুটে উঠেছিল, সে হাসি তার মুখে এখনও লেগেই আছে।

রিভলভারধারীদের একজন এসে আহমদ মুসার পকেট ও দেহ পরীক্ষা করল, কোথাও কোন অস্ত্র লুকানো আছে কিনা। কিছু পেল না।

তারপর সে থমাস নিকানোর দিকে চেয়ে বলল, 'এ শয়তান যে পালাবার সুযোগ পায়নি, এ জন্যে ধন্যবাদ স্যার।'

কথা বলেই ঘুরল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'চল শয়তানের বেটা শয়তান। বস তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন তুমি যে কফিনের সন্ধান করছিলে সেই কফিন নিয়ে। তোমাকে একদম স্বর্গে পাঠিয়ে দেবে।'

'স্বর্গ বোধহয় তোমাদের বসের একদম হাতের মুঠোয়?' সামনে পা বাড়াতে বাড়াতে বলল আহমদ মুসা। তার ঠোঁটে এক টুকরো হাসি।

আহমদ মুসার কথা শুনে বিস্ময়ের সীমা থাকল না মেরীদের। আহমদ মুসা যেন বন্ধুদের সাথে রসিকতা করছে! মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও এ কি কাণ্ড তার!

রিভলভারধারীদের একজন থমকে দাঁড়াল। প্রায় মুখোমুখি হলো আহমদ মুসার। বলল, 'বিদ্রুপ করছ আমাদের। কিন্তু বস-এর শিকারে আমরা সহজে হাত দেই না।'

বলে সামনে ফিরে আবার সে হাঁটতে শুরু করল।

স্টেনগানধারী দু'জন তার পাশাপাশি হাঁটছে। আর রিভলভারধারী দু'জন তার সামনে। ঘর থেকে তারা বেরিয়ে এল।

মেরীরাও উঠে দাঁড়িয়েছিল। আহমদ মুসাকে নিয়ে ওরা বেরিয়ে গেল। মেরীরাও পেছনে পেছনে হাঁটতে শুরু করল।

ওদের চারজনের সাথে হাঁটতে হাঁটতে আহমদ মুসা ওদের একটা অ্যাসেসমেন্ট করে ফেলল। চারজনের দু'জন ব্ল্যাক আফ্রিকান এবং রিভলভারধারী দু'জন সাদা ইউরোপীয়ান। দ্বিতীয়ত, আহমদ মুসা বুঝল, এরা ব্ল্যাক ক্রসের লোক নয়। এদের শক্তির তুলনায় বুদ্ধি কম। তৃতীয়ত, আহমদ মুসার সাথে ওদের হাঁটা দেখে বুঝল, ওরা যথেষ্ট সতর্ক নয়। স্টেনগানধারী দু'জন তার সমান্তরালে হাঁটার সময় মাঝে মাঝেই ওদের স্টেনগানের ব্যারেল নিচে নেমে যাচ্ছে।

থমাস নিকানোর বিশাল ড্রইং রুম থেকে বাইরে বেরুলে একটা প্রশস্ত বারান্দা, বারান্দা থেকে তিন ধাপের একটা সিঁড়ি পেরিয়ে গাড়ি বারান্দায় নামতে হয়।

আহমদ মুসারা এ সিঁড়ির প্রান্ত পর্যন্ত এসেছে। রিভলভারধারী দু'জন গাড়ি বারান্দায় নেমে গেছে। আহমদ মুসা এবং তার দু'পাশের স্টেনগানধারী দু'জন সিঁড়ির প্রথম ধাপে নামার জন্যে পা বাড়াতে যাচ্ছে। তারা দু'জন সিঁড়ির প্রথম ধাপে নামার জন্যে সামনের দিকে একটু ঝুঁকেছে। ওদের স্টেনগানের ব্যারেলও অনেকখানি নিচে নেমেছে। বামদিকের লোকটির ডান হাতের স্টেনগান আহমদ মুসার বাম হাতের নাগালের মধ্যে।

আহমদ মুসা তার ডান পাশের লোকটির পা ফেলার দিকে লক্ষ্য রেখে নিখুঁত হিসেব করে পা ফেলছিল। ডান পাশের স্টেনগানধারী যখন তার বাম পা টা নামিয়ে দিচ্ছিল সিঁড়িতে, আহমদ মুসা তার ডান পা একটু ডান দিকে বাড়িয়ে এগিয়ে দিল তার বাম পায়ের সামনে। আহমদ মুসার বাড়িয়ে দেয়া ডান পায়ের সাথে ডান পাশের স্টেনগানধারীর বাম পা মৃদু একটু ধাক্কা খেল এবং সংগে সংগেই লোকটি মুখ থুবড়ে পড়ে গেল গাড়ি বারান্দার উপর। তার দু'পা থাকল সিঁড়ির উপর।

আহমদ মুসা এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করেনি। ডান পাশেরজন যখন পড়ে যাচ্ছিল, তখন বাম পাশের স্টেনগানধারী চমকে উঠে বোঝার চেষ্টা করছিল। আহমদ মুসা ততক্ষণে তার বাম হাত দিয়ে কেড়ে নিল তার স্টেনগান এবং বাম পা দিয়ে লোকটির বাম হাঁটুর পেছন দিকে একটা শক্ত কিক চালাল। সেও উল্টে পড়ে গেল সিঁড়ির উপর। তারপর গড়িয়ে পড়ল গাড়ি বারান্দায়।

আহমদ মুসা এক ধাপ পেছনে সরে এসে স্টেনগান তাক করল রিভলভারধারী দু'জনের দিকে। পেছনে শব্দ শুনে ওরা ফিরে দাঁড়াচ্ছিল। আহমদ মুসা বলল, 'যে যেভাবে আছ, সেইভাবে থাক। একটু সরার চেষ্টা করলে সবাই ঝাঁঝরা হয়ে যাবে।'

পড়ে যাওয়া দু'জন উঠে দাঁড়াচ্ছিল। তারা আহমদ মুসার দিকে একবার তাকিয়ে আর উঠার চেষ্টা করল না। রিভলভারধারী দু'জন আর ঘুরে দাঁড়াল না। কিন্তু রিভলভার ফেলে দিল না। আহমদ মুসা বলল, 'দেখ, আমি দু'বার নির্দেশ দেই না, অহেতুক হত্যাও আমি পছন্দ করি না। রিভলভার ফেলে দাও।'

ওরা নির্দেশ পালন করল। ফেলে দিল তাদের রিভলভার।

আহমদ মুসা গাড়ি বারান্দায় নেমে এল। রিভলভারধারীদের একজনকে তার জামা খুলে ফেলতে বলল। জামা খোলার পর জামা ফালি ফালি করে ছিঁড়ে ফেলতে বলল। ছেঁড়া হলে তিনজনকে পিছমোড়া করে হাত-পা বেঁধে ফেলার নির্দেশ দিল। তিনজনকে বাঁধা হয়ে যাবার পর চতুর্থজনকে আহমদ মুসা বাঁধল।

ড্রইং রুমের দরজায় দাঁড়িয়ে থেকে মেরীরা তিনজন অবাক-বিস্ময়ে আহমদ মুসার কাজ দেখছিল। মনে হচ্ছিল তাদের, তারা যেন সিনেমার কোন দৃশ্য দেখছিল। দু'চোখকে তারা বিশ্বাস করতে পারছিল না।

বেঁধে ফেলার পর উঠে দাঁড়িয়ে তাদের উদ্দেশ্য করে বলল, 'তোমরা তোমাদের নেতা পিয়েরে পল ও ফ্রান্সিস বাইককে বলো, জুলুমের একটা সীমা আছে। সে সীমা অতিক্রম করলে জুলুম জালেমকেই গিয়ে ঘিরে ধরে। সেদিন তাদের আসছে।'

বলে আহমদ মুসা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তাকাল মেরীদের দিকে। কোন কথা বলল না। হাত নেড়ে বিদায় নিয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠল।

হতভম্ব মেরীরা আহমদ মুসার জবাবে হাতও নাড়তে পারল না।

আহমদ মুসা গাড়ি চালিয়ে চলে গেলে মেরীর আব্বা থমাস নিকানো বলল, 'চল যাই, আমরা ওদের খুলে দেই, না হলে আমরা দোষে পড়ব।'

থমাস নিকানো এসে সকলের বাঁধন খুলে দিল। ওরা মুক্ত হয়েই থমাসকে একটা ধন্যবাদ দিয়ে যে যার অস্ত্র নিয়ে ছুটল গাড়ি যেদিকে গেছে সেদিকে।

ওদের চলে যাওয়া পথের দিকে বোবা দৃষ্টিতে চেয়ে তাকিয়ে ছিল থমাস নিকানো।

মেরী ও তার মা তার পাশে এসে দাঁড়াল।

'আব্বা, অতিথি তার ব্যাগ-পত্র রেখে গেছে।'

'নিয়ে যাবার সময় পায়নি। যাও, ওগুলো নিয়ে এস। ভালো করে রেখে দিতে হবে।'

মেরী ছুটল আহমদ মুসার ঘরের দিকে। থমাসরাও ফিরে এল তার ঘরের দিকে।

মেরী আহমদ মুসার কোরআন ও ব্যাগ নিয়ে এল তার আব্বার কাছে।

'লোকটি কে সেটাই জানা গেল না।' বলল থমাস।

'যেই হোক, ভাল মানুষ আব্বা।'

'শুধু ভালো মানুষ নয়, কোন বড় কেউ মা। তার আত্মবিশ্বাসটা দেখেছ! চারজন অস্ত্রধারীর চার অস্ত্রের মুখে তার চেহারায় ভয়ের কোন ছায়া পড়েনি। তারপর দেখ, চারজনকে কেমন পুতুলের মত কাবু করে চলে গেল।'

'এতটুকু বয়সে কত দূরদৃষ্টি, কত বিবেচনা দেখ। আমাদের বিপদ হতে পারে ভেবে নিজেকেই বিপদের মধ্যে ঠেলে দিল। এমন মানুষ দুনিয়াতে খুব কম দেখা যায়।' বলল মেরীর মা।

এ সময় টেলিফোন বেজে উঠল।

মেরী গিয়ে টেলিফোন ধরল।

'হ্যালো, কে?' বলল মেরী।

'আমি। হতভাগ্য অতিথি। আপনাদের কোন অসুবিধা হয়নি তো?'

'না, কোন অসুবিধা হয়নি। আপনি ভাল আছেন?'

'আল্লাহ ভাল রেখেছেন। আজ যে কোন সময় গিয়ে ব্যাগটা নিয়ে আসব।'

'আমাদের সকলের একটা প্রশ্ন।'

'কি প্রশ্ন?'

'আপনি আসলে কে?'

'আমি মানুষ।'

'আমাদের মত কোন মানুষ নয় তা আমরা দেখলাম। বিশেষ মানুষ। সুতরাং...।'

'সুতরাং, আমি কে জানতে চান। বলব। টেলিফোনে নয়। আসি। শুভরাত্রি।'

বলে টেলিফোন রেখে দিল আহমদ মুসা।

মেরী টেলিফোন রাখতেই তার আব্বা থমাস নিকানো বলল, 'নিশ্চয় আমাদের অতিথি? পরিচয় কিছু বলল?'

'না, আব্বা। বললেন, টেলিফোনে বলা যাবে না।'

'ব্যাগের কথা কি বলল?'

'ব্যাগ নিতে আসবে।'

টেলিফোন বেজে উঠল আবার।

এবার টেলিফোন ধরল থমাস নিকানো।

‘হ্যালো। কে?’

‘চিনবেন না। আমাদের নেতার তরফ থেকে ধন্যবাদ দেয়ার জন্যে টেলিফোন করেছি।’

‘কিসের জন্যে?’

‘যদিও সে ভয়ানক শত্রুকে আমাদের লোকেরা ধরে রাখতে পারেনি, তবু এ ব্যাপারে আপনার সাহায্য আমাদের খুশি করেছে।’

‘ও, বুঝেছি। সে শত্রুটি কে?’

‘আমরা এখনো নিশ্চিত নই। তবে সন্দেহ করা হচ্ছে তাকে আহমদ মুসা বলে। কারণ, সে ছাড়া এমন ঠাণ্ডা মাথার, এমন ভয়ানক, এমন অপ্রতিরোধ্য, আবার সেই সাথে এমন হিসেবী আর কেউ হতে পারে না।’

‘‘হিসেবী’ অর্থ?’

‘অহেতুক খুন-জখম থেকে সে সব সময় বিরত থাকে। আপনাদের ঐখানে আমাদের চারজন লোককেই তার খুন করা উচিত ছিল তার মিশন অনুসারে, কিন্তু তা সে করেনি। আচ্ছা রাখি।’

বলে টেলিফোন রেখে দিল ওপার থেকে।

ওপার থেকে টেলিফোন রাখলেও থমাস নিকানো টেলিফোন রাখতে যেন ভুলে গেল। তার কানে বাজছে তখনো আহমদ মুসার নাম এবং তার সম্পর্কে কথাগুলো।

মেরী তার আব্বার হাত থেকে টেলিফোন নিয়ে বলল, ‘কি শুনলে আব্বা, কোন দুঃসংবাদ?’

‘না, মা।’ বলে থমাস নিকানো সোফায় বসে যা শুনল সব কথা ওদের জানাল এবং বলল, ‘বিশ্বজোড়া নামের বিপ্লবী পুরুষ আহমদ মুসা আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন?’

মেরী এবং তার মা’র মুখে কোন কথা যোগাল না। কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলো না তারা। অপার বিস্ময়ের খেলা তাদের চোখে-মুখে।

অনেকক্ষণ পর ধীরে ধীরে মুখ খুললো মেরী। বলল, ‘তিনি আহমদ মুসা হলেই শুধু তার কথা, তার আচরণ, তার ধার্মিকতা, তার মানবিকতা, তার ক্ষিপ্রতা, তার সাহস ইত্যাদির ব্যাখ্যা পাওয়া যায় আব্বা।’ কথাগুলো বলতে গিয়ে আহমদ মুসার সাথে তার কথা বলার সময়কার দৃশ্য তার চোখের সামনে ভেসে উঠল এক সুখ স্বপ্নের মত।

মনে হলো তার, এ দুর্লভ সুখ স্বপ্ন যদি তার না ভাঙত!

# ৬

লা স্যামসন রোড ধরে আহমদ মুসার নতুন নাম্বার প্লেটওয়ালা গাড়িটা যখন একাত্তর নাম্বার বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছল, তখন রাত ঠিক বারটা।

এই গাড়িতে করেই পিয়েরে পল ও ফ্রান্সিস বাইকের লোকরা থমাস নিকানোর বাড়িতে আহমদ মুসাকে ধরতে গিয়েছিল। একটা গ্যারেজে পড়ে থাকা পুরানো জীপের নাম্বার প্লেট খুলে এনে আহমদ মুসা এ জীপে লাগিয়েছে।

একাত্তর নাম্বার বাড়িটার বিপরীত দিকে অন্ধকারে রাস্তার একটা গাছের আড়ালে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে আহমদ মুসা নামল গাড়ি থেকে।

'লা স্যামসন' পূর্ব দুয়ালার বিখ্যাত আবাসিক এলাকার একটি রাস্তা। ফরাসি দখলদারিত্বের সময় আবাসিক এলাকার পত্তন হয়। রাস্তার নামটা একজন ফরাসি জেনারেলের নাম অনুসারে।

গাড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আহমদ মুসা একাত্তর নাম্বার বাড়িটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।

বাড়িটার ঠিকানা পেয়েছে ব্লু বুকের সাথে গাড়ির ড্যাশবোর্ডের এক কেবিনে।

আহমদ মুসা থমাসের বাড়ি থেকে গাড়িটা নিয়ে পাঁচ মিনিট ড্রাইভ করে আসার পর একটা বিল্ডিং-এর পাশে অন্ধকার মত জায়গা দেখে গাড়িটা দাঁড় করিয়েছিল। তারপর তন্ন তন্ন করে সার্চ করেছিল গাড়িটা। কিন্তু সাহায্যে আসার মত তেমন কিছুই পায়নি। শুধু পেয়েছিল একটা ব্লু বুক, একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং সাথে একটা এনভেলাপ।

এনভেলাপে যে ঠিকানা সে পেয়েছিল, সেই একই ঠিকানা ছিল ব্লু বুক ও ড্রাইভিং লাইসেন্সে, শুধু ব্যক্তির নাম ছিল ভিন্ন।

আহমদ মুসা নিশ্চিত হয়েছিল, নিশ্চয় এ বাড়িটা ব্ল্যাক ক্রস অথবা 'ওকুয়া'র একটা ঘাঁটি বা ঠিকানা হবে। তবে ঠিকানা বা ঘাঁটিটা ওকুয়ার হওয়ার

সম্ভাবনাই বেশি। কারণ, যে লোকগুলো তাকে ধরতে গিয়েছিল মিঃ থমাসের বাড়িতে, তারা ব্ল্যাক ক্রস-এর লোক নয়।

বাড়িটা তিনতলা। প্রাচীর ঘেরা বাড়ি। প্রথমেই একটা গেট। গেট পেরুলে প্রাচীরের ভেতরে ঢোকা যাবে।

দূর থেকে গেটটিকে লোহার বলেই মনে হচ্ছে।

আহমদ মুসা রাস্তা পার হয়ে গেটটার সামনে ফুটপাতে গিয়ে দাঁড়াল।

গেটের সাথে একটা গার্ড রুম আছে। একটা কলিং বেল দেখল আহমদ মুসা গেটের নেমপ্লেটের ঠিক উপরে। গার্ড রুমের বাইরের দেয়ালের মাথা বরাবর উঁচুতে একটা লুকিং হোল রয়েছে। আহমদ মুসা বুঝল, কলিং বেলের শব্দ শুনে লুকিং হোল দিয়ে আগন্তুককে দেখে পরে দরজা খুলে দেয়। গেট নিয়ন্ত্রণের এই সাবেকি কায়দা দেখে আহমদ মুসা বুঝল, 'ওকুয়া' বা 'ব্ল্যাক ক্রস'- এর কোন ঘাঁটি এটা হলে বুঝতে হবে, পশ্চিমের মত আধুনিক ব্যবস্থাপনার কোন ছোঁয়াই এখানে লাগেনি।

আহমদ মুসা একবার মনে করল, কলিং বেল টিপে গার্ডের কাছে এনভেলাপে দেখা নামটির খোঁজ করে ভেতরে ঢোকার একটা পথ সে করতে পারে। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবল, আগে গণ্ডগোল বাঁধিয়ে লাভ নেই। গোপনে ঢুকে ওমর বায়াদের অবস্থান খুঁজে বের করাই হবে সবচেয়ে জরুরি।

গাছপালার ছায়ার ঘন অন্ধকারের আড়াল নিয়ে আহমদ মুসা বাড়িটার পেছনের অংশে প্রাচীরের গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

প্রাচীর ছয় ফিটের মত উঁচু।

প্রাচীর টপকে ভেতরের ঘাসওয়ালা চত্বরে লাফিয়ে পড়ল আহমদ মুসা। ভেতরের চত্বরটা অনেকটা বাগানের মত। ছোট-বড় মিলে অনেক গাছ রয়েছে।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়ে কয়েক পা এগোতেই ভয়ানক শব্দ করতে করতে ছুটে এল একটা কুকুর। বিশাল তার সাইজ।

আহমদ মুসা সাইলেন্সার লাগানো রিভলভার হাতে তুলে নিয়েছে।

কুকুরটি একেবারে সামনে এসে মুহূর্তের জন্যে তার শিকারের দিকে রক্তচক্ষু নিক্ষেপ করল। তারপরই শিকার লক্ষ্যে লাফ দেবার জন্যে তার দেহকে

একটা ঝাঁকুনি দিল। কিন্তু আহমদ মুসার রিভলভার থেকে ছুটে যাওয়া বুলেট তার দেহের সেই ঝাঁকুনিকে আরও প্রবল করে তুলল। মাটি থেকে আর উঠল না কুকুরটি।

আহমদ মুসা কুকুরকে পাশ কাটিয়ে পনের-বিশ হাত এগিয়েছে, এমন সময়ে সামনে সে পায়ের শব্দ পেল। দেখল, অন্ধকার ঠেলে দুই অন্ধকার মূর্তি ঝড়ের গতিতে ছুটে আসছে।

আহমদ মুসা চট করে পাশের এক গাছের আড়ালে আশ্রয় নিল। ওরা নাক বরাবর এ পথেই ছুটে আসছে।

গাছের পাশ দিয়েই ওরা ছুটে যাচ্ছিল। ঠিক গাছ বরাবর আসতেই আহমদ মুসা বাম পা বাড়িয়ে দিল।

সংগে সংগেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সামনের লোকটা। পেছনের লোকটা পড়ে গেল তার উপর।

ওরা উঠে দাঁড়িয়েছিল। আহমদ মুসা বলল, ‘উঠতে চেষ্টা করলে ঐ কুকুরের মতই গুলি খেয়ে মরবে। তোমরা উপুড় হয়ে শুয়ে পড়।’

ওরা হুকুম তামিল করল।

আহমদ মুসা ওদের কাছে এগিয়ে ওদের গায়ের গেঞ্জি ছিঁড়ে ওদের হাত-পা বেঁধে ফেলল।

তারপর একজনের মাথায় রিভলভার ঠেকিয়ে বলল, ‘আমি যা জিজ্ঞেস করব সংগে সংগে জবাব দেবে। এক মুহূর্ত দেরি হলে মাথায় বুলেট ঢুকে যাবে।’

অন্ধকারেও আহমদ মুসা বুঝল, দু’জনেই কৃষ্ণাংগ।

‘বল, এ বাড়িতে কারা থাকে?’

কোন উত্তর এল না।

আহমদ মুসার তর্জনী ট্রিগারে চাপ দিল। লোকটির দেহ প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে গেল।

আহমদ মুসা এবার তার রিভলভারের নল দ্বিতীয় লোকটির মাথায় ঠেকিয়ে বলল, ‘দেখলে তো, আমি এক কথা দু’বার বলি না। এখন বল, এই বাড়িতে কারা থাকে?’

‘এটা ‘ওকুয়া’র একটা ঘাঁটি।’

‘এখন এখানে কয়জন লোক আছে?’

‘আমরা দু’জন ছিলাম, আর গেটে একজন আছে।’

‘কুমেট থেকে পিয়েরে পল এসেছে, সে কোথায়?’

‘এখানেই ছিল। চলে গেছে।’

‘কোথায় গেছে, কখন গেছে?’

‘এইতো কিছুক্ষণ আগে চলে গেল।’

‘কোথায় গেল?’

‘ইয়াউন্ডিতে।’

‘কুমেট থেকে দু’জন লোক ধরে এনেছে, তারা কোথায়?’

‘তাদেরও নিয়ে গেছে।’

‘ঠিক বলছ, তাদের নাম জান?’

‘জানব না কেন, একজন তো পরিচিত। ওমর বায়া। অন্যজন ডিফরজিস।’

‘ওরা কিসে গেছে?’

‘সবাই মিলে দু’টি গাড়ি নিয়ে গেছে।’

‘ইয়াউন্ডির কোথায় ওদের ঠিকানা?’

‘মঁশিয়ে, আমি তা জানি না। এক ঘাঁটির লোককে অন্য ঘাঁটির ঠিকানা বলা হয় না।’

‘তুমি যদি কোথাও গিয়ে ‘ওকুয়া’র অফিস খুঁজে পেতে চাও, তাহলে কি করবে?’

লোকটি কথা বলল না।

আহমদ মুসা তার রিভলভারের নল দিয়ে তার মাথায় চাপ দিয়ে বলল, ‘বলেছি, দ্বিতীয়বার আদেশ আমি করি না।’

‘‘ওকুয়া’র অফিস বা ঘাঁটির কোন একটি দর্শনীয় জায়গায় কালো ক্রস হাতে ‘ব্ল্যাক আর্মি’-এর একটা মূর্তি অংকিত থাকবে।’

‘সে দর্শনীয় জায়গা কোনটা?’

‘আমি জানি না, তবে আমাদের এখানে বাড়ির নামফলকের ঠিক উপরে।’

আহমদ মুসা তার পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে বলল, ‘চল, তোমাদের এ বাড়িতে কেউ আছে কি না, তুমি ঠিক বলেছ কি না দেখব।’

লোকটি আগে আগে চলল।

আহমদ মুসা তার মাথায় রিভলভার ঠেকিয়ে পেছনে পেছনে চলল।

প্রথমে একতলা, তারপর দোতলা এবং সব শেষে তিনতলার সবগুলো ঘর তন্ন তন্ন করে দেখল আহমদ মুসা। কিন্তু কোথাও এমন কোন কাগজপত্র পেল না যা দিয়ে ওকুয়া’র পরবর্তী ঘাঁটির সন্ধান করা যায়।

‘কোন টেলিফোন গাইড নেই তোমাদের?’

‘আমাদের টেলিফোন করা এবং ধরা, দুই-ই নিষিদ্ধ। ঘাঁটির কর্তাই টেলিফোন ব্যবহার করতে পারেন। তাদের গাইডের প্রয়োজন হয় না। ওদের পকেট কম্পিউটারে সবকিছু নোট করা থাকে।’

‘এখান থেকে টেলিফোন করা যাবে না?’

‘যাবে না। কোড-লক দিয়ে বন্ধ করা আছে।’

‘ওমর বায়াদের নিয়ে ওরা ইয়াউন্ডি গেছে কেন?’

‘আমি জানি না মঁশিয়ে।’

‘যে দু’টি গাড়ি ওরা নিয়ে গেছে তার নাম্বার?’

‘বিশ্বাস করুন, নাম্বার জানি না। গাড়ি দু’টি আজ কোত্থেকে যোগাড় করেছে।’

‘সহযোগিতার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।’ বলে তাকে দু’খণ্ড রশি দিতে বলল।

রশি পেলে আহমদ মুসা তাকে পিছমোড়া করে হাত-পা বেঁধে বলল, ‘তোমার হাত-পা বাঁধা না থাকলে তুমি সন্দেহের শিকার হবে।’

বলে আহমদ মুসা বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। এল গেটে। দেখল, গেটম্যান ঘুমুচ্ছে চেয়ারে বসে।

আহমদ মুসা রিভলভার দিয়ে গুঁতো মারল। ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। একবার আহমদ মুসার রিভলভারের নল আর একবার আহমদ মুসার মুখের দিকে চেয়ে দু'হাত উপরে তুলল।

'হাত উপরে তোলো না। গেট খোল।' বলল আহমদ মুসা।

লোকটা কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে গেট খুলে দিল।

আহমদ মুসা রাস্তা পার হয়ে গাড়ির কাছে চলে আসার আগে গেটের নামফলকের উপরে কালো ক্রস হাতে কালো সৈনিকের ছবি দেখে নিল।

আহমদ মুসা এসে গাড়িতে উঠতে উঠতে ভাবল, ওকুয়া'র লোকদের সাথে দু'বার দেখা হওয়া থেকে বোঝা গেল, ওরা মারতেই অভ্যস্ত। লড়াই-এর অভ্যেস এদের খুব কম। এর অর্থ, এদের মুসলিম প্রতিদ্বন্দ্বীরা এখানে এতই দুর্বল যে, লড়াইয়ের প্রয়োজন তাদের কোন সময়ই হয়নি। এই উপলব্ধি আহমদ মুসাকে একদিকে খুব আহত করল, অন্যদিকে আনন্দিত করল যে, তাদের এই দুর্বলতা আমাদের মিশনকে সহজ করতে পারে।

গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসে আহমদ মুসা হাতঘড়ির দিকে তাকাল। সময় রাত একটা। সমগ্র দুয়ালাতে এই মুহূর্তে তার যাবার কোন জায়গা নেই, সুতরাং ইয়াউন্ডি যাত্রা করাই ভাল, ভাবল আহমদ মুসা। মনে হলো একবার মেরীদের বাড়ির কথা। কিন্তু ওখান থেকে সে বিদায় নিয়ে এসেছে। যদিও আসার সময় ওরা বলেছে, তাদের বাড়ির দুয়ার সব সময় আহমদ মুসার জন্যে খোলা। বিপদের কথা জানার পরেও তার প্রতি ওদের এই আন্তরিকতা আহমদ মুসার হৃদয় স্পর্শ করেছে। আহমদ মুসা ওদের জিজ্ঞেস করেছিল, তারা তো তাদের জাতির বিরুদ্ধে কাজ করছে। মেরীর মুখে ফুটে উঠেছিল রহস্যময় হাসি। তার আব্বার দিকে একবার চেয়ে নিয়ে সে বলেছিল, 'রক্তের একটা টান আছে। আব্বা ফ্রান্সে পড়ার সময় খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু আমাদের পরিবারের অবশিষ্ট সকলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তারা বাস করছেন নাইজেরিয়ার লাগোসে। আব্বা ওখান থেকেই আজ আসলেন।'

দূরে কোথাও পুলিশের বাঁশি আহমদ মুসার সম্বিত ফিরিয়ে আনল।

গাড়ি স্টার্ট দিল আহমদ মুসা। তার কল্পনার চোখে ইয়াউন্ডিগামী সড়কটার একটা চিত্র ফুটে উঠল। দুয়ালা থেকে পুবের হাইওয়ে ধরে বেরিয়ে যেতে হবে, তারপর পূর্ব-দক্ষিণে একটু বেঁকে ইদিয়া পর্যন্ত। সেখান থেকে সোজা পুবদিকে ইয়াউন্ডি মালভূমির চিরহরিৎ বনাঞ্চলের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে ইয়াউন্ডি।

আহমদ মুসার গাড়ি তখন ইদিয়া পার হয়ে প্রবেশ করেছে ইয়াউন্ডি মালভূমির চিরহরিৎ বনাঞ্চলে। বনাঞ্চলের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলছিল আহমদ মুসার গাড়ি। রাস্তার দু'পাশে মাঝে মাঝেই উন্মুক্ত মাঠ, আবার দিগন্ত প্রসারিত চিরহরিৎ বৃক্ষরাজির সারি। গাড়ি তখন প্রবেশ করেছে একটা উন্মুক্ত এলাকা পেরিয়ে বনের ভেতর।

এই সময় আযানের একটা দরাজ কণ্ঠ এসে প্রবেশ করল আহমদ মুসার কানে।

আহমদ মুসা হাতের ঘড়ির দিকে তাকাল। ভোর সাড়ে চারটা।

গাড়ির ব্রেক কষল আহমদ মুসা। থেমে গেল গাড়ি।

রাস্তার বাম দিক অর্থাৎ উত্তর দিক থেকে আসছে আযানের আওয়াজ।

আহমদ মুসা খুব খুশি হলো। সিদ্ধান্ত নিল, সে ঐ মসজিদে গিয়ে নামায পড়বে। ক্যামেরুনে প্রথমবারের মত মুসলমানদের সাথে দেখা হবে তার।

খুঁজে রাস্তা বের করল আহমদ মুসা উত্তর দিকে যাবার। তারপর হাইওয়ে থেকে নেমে আযানের শব্দ লক্ষ্যে চলল উত্তরের রাস্তা ধরে।

রাস্তা থেকে অল্প অগ্রসর হবার পরেই রাস্তার দু'ধারে কোথাও দেখল পাম গাছের সারি, কোথাও কফি গাছের সারি, আবার কোথাও কোকো গাছের ক্ষেত। মনে পড়ল আহমদ মুসার, এ অঞ্চলে এগুলোই প্রধান ফসল। আগে এখানকার যাযাবর কালো মানুষরা বন কেটে গম-যবের মত দানাদার ফসল ফলাতো। কিন্তু যুগ-যুগের এই অভ্যাসের ফলে মাটির উর্বরতা শেষ হয়ে যায় পর্যাপ্ত বৃষ্টি এবং ভূমি পরিচর্যার অভাবে। এ কারণে রাষ্ট্রের আইন এবং অবস্থার কারণে বাধ্য হয়ে এ অঞ্চলের মানুষ পাম তেল, কফি এবং কোকোর মত গাছজাত

ফসলের চাষে ফিরে এসেছে মাটির সেই উর্বরতা আবার ফিরিয়ে আনার জন্যে। অর্থকরী এ ফসল উৎপাদনে এ অঞ্চলের মানুষ আগের চেয়ে লাভবানই হয়েছে।

আহমদ মুসা রাস্তার দু'ধারে দিগন্তপ্রসারী এই গাছজাত ফসলের ক্ষেত দেখে ভাবল, ইয়াউন্ডি মালভূমির নিশ্চয় খুব উর্বর এলাকা এটা।

মাইলখানেক চলার পর পাম গাছের ফাঁকে ফাঁকে গুচ্ছ গুচ্ছ বাড়ি তার নজরে এল। বাড়িগুলো কাঠের বেড়া দিয়ে তৈরি। তার উপর টিনের চালা। দু'একটা বাড়িতে পাতার চাল দেখতে পেল। কোন কোন বাড়ি আবার টিনের বেড়া এবং টিনের চালা বিশিষ্ট। বাড়ি-ঘরের চেহারা দেখে আহমদ মুসার মনে হলো, এ এলাকার মানুষ তুলনামূলকভাবে স্বচ্ছল এবং ক্যামেরুনের এক সমৃদ্ধ এলাকা এটা।

আহমদ মুসা তখন চলছে পুবপাশের পাম গাছ আচ্ছাদিত গ্রাম এবং রাস্তার পশ্চিম পাশের দিগন্ত বিস্তৃত কফি ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে। তার গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ এবং মাঝে মাঝে হর্নের আওয়াজ শান্ত ভোরের অখণ্ড নিস্তব্ধতাকে নিষ্ঠুরভাবে যেন ভেঙে দিচ্ছে। চারদিকের ঘুমন্ত নীরব পরিবেশের মাঝে একে খুব বেসুরো মনে হচ্ছে।

আহমদ মুসা হঠাৎ তার সামনের পথ রুদ্ধ দেখতে পেল। একদল লোক দাঁড়িয়ে আছে তার পথ রোধ করে। সুবহে সাদেকের স্বচ্ছতায় তাদের হাতের বর্শা, তীর-ধনুক এবং কয়েকটি বন্দুক বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে।

তারা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, তার বরাবর রাস্তার পুবপাশে একটা চত্বর এবং তারপরেই একটা বড় ঘর। ঘরটি পূর্ব-দক্ষিণে কোণাকুণি করে তৈরি। চত্বরের গেটে কাঠের তৈরি মিনারের মত একটা স্থাপনা। তার মাথায় চারদিকে চারটা মাইক্রোফোনের হর্ন।

আহমদ মুসা দেখেই বুঝল, এটা মসজিদ। এই মসজিদের এই মিনারের হর্নগুলো থেকেই নিশ্চয় দরাজ কণ্ঠের আযান ধ্বনিত হচ্ছিল।

আহমদ মুসা নিশ্চিতই বুঝতে পারল, মসজিদের এত কাছে নিশ্চয়ই ওরা মুসলিম। ওরা তাকে শত্রু ভেবেছে এবং মোকাবিলার জন্যে অস্ত্রসজ্জিতভাবে

দাঁড়িয়ে আছে। আহমদ মুসা দেখল, পুরুষদের একটু পেছনে মাথা ও গায়ে কাপড় জড়িয়ে তীর-ধনুক হাতে মেয়েরাও দাঁড়িয়ে আছে।

বিস্মিত হলো আহমদ মুসা, একটা গাড়ির শব্দ শুনে বা একটা গাড়িকে আসতে দেখে এত বড় প্রতিক্রিয়া ওদের মধ্যে হলো কেন!

আহমদ মুসা ওদের কাছাকাছি গিয়ে গাড়ি দাঁড় করাল।

তারপর সে গাড়ি থেকে নামল। এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল গাড়ির সামনে। প্রথমে সবাইকে সালাম দিল। তারপর বলল, 'আমি একজন বিদেশী। যাচ্ছিলাম ইয়াউন্ডি। আযান শুনে এলাম ফজরের নামায পড়তে।'

সামনে দাঁড়ানো লোকদের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল একজন যুবক। বিশ-বাইশ বছরের হবে। পরনে ফুলপ্যান্ট, গায়ে টি-শার্ট। মাথায় টুপি। শুধু সে নয়, পুরুষ সকলের মাথায় টুপি ছিল।

যুবকটি সালাম গ্রহণ করে বলল, 'আপনার নাম কি? কোন দেশে বাড়ি?'

'নাম আহমদ মুসা। বাড়ি মধ্য এশিয়ায়।'

'সূরা বাকারার কয়েকটা আয়াত পড়ুন।'

আহমদ মুসা একটু হাসল। তারপর সূরা বাকারার প্রথম একটা রূকুই মুখস্ত পড়ল।

কোরআন পাঠ শুনে যুবকসহ সকলের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তাদের সকলের উদ্যত অস্ত্রগুলো নেমে গেছে।

সামনের যুবকটি এসে আহমদ মুসাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমাদের মাফ করুন ভাই। আমরা বড় বিপদে, তাই পরিচিত নয় এমন সবাইকে আমরা সন্দেহ করি, শত্রু ভাবি।'

বলে আহমদ মুসাকে হাত ধরে এনে লোকদের সারির মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা পাকা চুল ও শ্মশ্রুমণ্ডিত সৌম্যদর্শন বৃদ্ধের সামনে দাঁড় করিয়ে বলল, 'ইনি আমার আব্বা আবুবকর বিগোভিট। কুন্তা কুম্বে এলাকার ইনি সরদার।'

বৃদ্ধ হাত বাড়িয়ে আহমদ মুসার সাথে হ্যান্ডশেক করল এবং ফরাসি ভাষায় স্বাগত জানাল। বৃদ্ধ তারপর যুবকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'নামাযের দেরি হয়ে গেছে।'

বলে বৃদ্ধ মসজিদের দিকে পা বাড়াল। তার সাথে সবাই চলল মসজিদের দিকে। যুবকটি আহমদ মুসার হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে চলল।

সুন্নাত নামায পড়া হয়ে গেছে সবার। বসে আছে সবাই। সামনে পুরুষরা। মেয়েরা বসেছে পেছনে।

বুদ্ধ আবুবকর বিগোভিট উঠে দাঁড়াল। সবার দিকে একবার তাকিয়ে আহমদ মুসার দিকে চেয়ে বলল, 'আমাদের ইমামকে আমাদের শত্রুরা পণবন্দী করে রেখেছে। আমি সম্মানিত অতিথিকে নামায পড়াবার জন্যে সবার তরফ থেকে অনুরোধ করছি। তার মত কোরআন পাঠ আমরা কেউ জানি না।'

আহমদ মুসার মনে পড়ল যুবকের উক্তি, 'আমরা বড় বিপদে, তাই অপরিচিত সবাইকে শত্রু ভাবি।' এই সাথে 'শত্রুরা ইমামকে পণবন্দী করে রেখেছে' শীর্ষক সরদারের কথার মধ্য দিয়ে বড় একটি দুর্ঘটনার আঁচ পেল সে।

কোন কথা না বলে আহমদ মুসা ইমামের আসনে গিয়ে দাঁড়াল।

ইমামের আসনে দাঁড়িয়ে আহমদ মুসার মন আবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। আফ্রিকার হৃদয়ের গভীরে ইয়াউন্ডি মালভূমির চিরহরিৎ বনের মধ্যে জ্বলে আছে ইসলামের আলো। কারা কত কষ্ট করে এখানে ইসলামের আলো পৌঁছিয়েছিল কে জানে! আফ্রিকার অজ্ঞাত-অপরিচিত এ কালো মানিক ভাই-বোনদের সাথে নামাযে দাঁড়াতে গিয়ে চোখ দু'টি অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল আহমদ মুসার।

নামাযে কোরআন পাঠের সময় আবেগ আরও উথলে উঠল তার। সূরা আর-রাহমান ও সূরা মুজাম্মিল- এই দুই সূরা দিয়ে দুই রাকাত নামায পড়ল আহমদ মুসা। তার হৃদয় নিংড়ানো ক্বেরাতের মর্মস্পর্শী সুরে প্রত্যেক নামাযীর চোখই অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল।

নামাযের পর অবতারণা হলো এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের। প্রথমে বৃদ্ধ আবুবকর এসে জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে। বলল, 'কোরআন শরীফকে আজ নতুন করে চিনলাম, উপলব্ধি করলাম।'

একে একে সবাই এসে আহমদ মুসার হাতে চুমু খেল।

মেয়েরা পেছনে স্থির বসেছিল। তাদেরও চোখ ভেজা। কোরআনের তেলাওয়াত মানুষের মনকে আল্লাহর প্রতি ভয়, ভক্তি, ভালোবাসায় কতখানি উদ্বেলিত করতে পারে, এই অভিজ্ঞতা তাদের এই প্রথম হলো।

আহমদ মুসার একপাশে বসেছিল যুবকটি।

'তোমার নাম কি?' আহমদ মুসা তাকে জিজ্ঞেস করল।

'মুহাম্মাদ ইয়েকিনী।'

'তুমি যে বিপদের কথা বললে এবং তোমার আব্বা যে তোমাদের ইমাম পণবন্দী থাকার কথা বললেন, এ বিষয়টা আমি জানতে চাই।'

মুহাম্মাদ ইয়েকিনীর চোখ তখনও পানিতে ভরা। সে চোখ দুটো মুছে বলল, 'ঠিক আছে, আব্বাকে বলছি।'

বলে সে তার আব্বার কাছাকাছি হলো এবং কথা বলল।

বৃদ্ধ আহমদ মুসার কাছে এগিয়ে এল। বলল, 'সে অনেক কথা। শুনবে আমাদের দুঃখের কাহিনী? শুনতে পার। আবার অপেক্ষা করলে আমাদের সংকটটা দেখতেও পাবে।'

'কেমন?'

'শত্রুরা আজ সকাল পর্যন্ত শেষ সময় দিয়েছে। ওরা সকালেই আসবে।'

'শত্রু আপনাদের কে?'

'কিংডম অব ক্রাইস্ট (KOC)।'

'কিংডম অব ক্রাইস্ট?' কপাল কুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার।

'হ্যাঁ।'

'তারা কি করেছে, তাদের সাথে কি হয়েছে?'

'সে অনেক কথা।' বলে বৃদ্ধ আবুবকর বিগোভিট একটু দম নিল।

তারপর শুরু করলঃ 'ইদিয়া থেকে ইয়াউন্ডিগামী যে সড়ক দিয়ে তুমি এলে, সে সড়কের দক্ষিণ দিকের গোটা ক্যামেরুন বলা যায় ওরা দখল করে নিয়েছে। কিছু কিছু জমি ও এলাকা মুসলমানদের ও গোত্র ধর্মানুসারীদের এখন রাস্তার আশে-পাশের অঞ্চলে আছে। কিন্তু সেগুলো না থাকার শামিল। তাদের

সাধ্য নেই ঐ জমিগুলোর দখল তারা নেয়। দক্ষিণ এলাকার অনেক মুসলমান আমাদের কুন্তা কুম্বে এলাকাতেও এসে আশ্রয় নিয়েছে।

ওদের সাথে আমাদের প্রথম বিরোধ ওদের এক প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে। ওরা আমাদের কুন্তা কুম্বে এলাকায় তাদের স্বনির্ভর কর্মসূচি প্রকল্পের জন্যে বিশ একর জমি কিনে নেয়ার প্রস্তাব দেয়। প্রস্তাবে আমরা রাজি হই না। কারণ, ওদের ভূমিদখল কৌশলের এটা প্রথম পদক্ষেপ। তাদের এ ধরনের ফাঁদে পা দিয়ে দক্ষিণ ক্যামেরুনের মুসলমানরা যে ভুল করেছে, তার পুনরাবৃত্তি আমরা করতে চাই না।

ওদের প্রস্তাব গ্রহণ না করায় ওরা ক্ষেপে যায়। এরপর ওরা গোপনে একটা গোত্র-ধর্মানুসারী পরিবারের কাছ থেকে প্রতারণার মাধ্যমে চার একর জমি কিনে নিয়ে একটা গীর্জা তৈরির উদ্যোগ নেয়। জমিটা আমাদের এলাকার মাঝ বরাবর। আমরা তাদেরকে জমি দখল নিতে বাঁধা দেই এবং জমিটা আমাদের একটা মাদ্রাসা-সংলগ্ন বিষয়। জমিটা আমরা কেনার জন্যে দেশের আইন অনুসারে কোর্টে টাকা জমা দেই।

ভীষণ ক্ষেপে যায় ওরা। এর মধ্যে আরেকটা ঘটনা ঘটে। ওদের এলাকার দু'টি গোত্র-ধর্মানুসারী পরিবার স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে এবং আমাদের এলাকায় এসে আশ্রয় নেয় সপ্তাহখানেক আগে। কোক(KOC)-এর লোকরা দলবল নিয়ে এখানে আসে এবং ঐ দু'টি পরিবারকে তাদের হাতে তুলে দেবার দাবি জানায়। আমরা তাদেরকে বুঝিয়ে বলি যে, তারা ইসলাম গ্রহণের পর আর তাদের হাতে তুলে দেয়া যায় না। কিন্তু তারা কিছুই শোনে না। তারা তিনদিনের মধ্যে পরিবার দুটোকে তাদের হাতে তুলে দেবার দাবি জানিয়ে চলে যায়।

তাদের দাবি দেশের আইনে বেআইনী বিধায় তিনদিনের মধ্যেই আমরা থানায় মামলা দায়ের করি এবং ঠিক তিনদিনের মাথায় আমাদের ইমামের নেতৃত্বে পাঁচজনকে আমরা কোক(KOC)-এর এলাকায় পাঠাই তাদেরকে একথা বলে আসার জন্যে যে, তারা যেন না আসে।

ইমাম সাহেবরা ওখানে গেলে সব শোনার পর ইমাম সাহেবকে তারা আটক করে। তার সাথী পাঁচজন এতে বাঁধা দিতে গেলে তিনজনকে তারা গুলি করে হত্যা করে। অবশিষ্ট দু'জন কোনমতে পালিয়ে আসে।

পাঁচদিন আগে তারা খবর পাঠিয়েছে, এবার যদি ইসলাম গ্রহণকারী ঐ দু'টি পরিবারকে আমরা ফেরত দেই এবং সেই চার একর জমিসহ তাদের দাবিকৃত বিশ একর জমি ছেড়ে দিতে রাজি হই, তাহলে তারা ইমাম সাহেবকে ছেড়ে দেবে। তাদের এ প্রস্তাবের চূড়ান্ত জবাব জানার জন্যে তারা আজ সকালে আসবে।'

থামল বৃদ্ধ।

'চার একর জমির ব্যাপারে আপনারা যে টাকা জমা দিয়েছিলেন তার কি হয়েছে?' বলল আহমদ মুসা।

'কিছুই হয়নি। 'কোক'-এর মত খৃস্টান সংগঠনের বিরুদ্ধে মামলা করে কোনই ফল পাওয়া যায় না কোন সময়ই। আইনজীবী, বিচারক কেউই ওদের বিরাগভাজন হতে চায় না।' বলল বৃদ্ধ।

'ইমামকে আটক এবং তিনজনকে হত্যা করার পর কোন মামলা দায়ের করা হয়নি?'

'হয়েছে। কিন্তু পুলিশ ঘটনাস্থল একবার দেখতেও যায়নি।'

'না যাক, কেস দু'টি করে অত্যন্ত ভাল কাজ করেছেন। ওরা সেদিন এখানে কি নিয়ে এসেছিল? কতজন লোক ছিল সাথে?'

'দু'টি গাড়িতে করে ওরা সেদিন দশজন এসেছিল।' বলল বৃদ্ধ সরদার।

'ওদের সাথে কি অস্ত্র ছিল?'

'রাইফেল, স্টেনগান।'

'আপনারা তো অবশ্যই পরিবার দু'টিকে দেবেন না। ওরা সেক্ষেত্রে কি করতে পারে?'

'ওরা আমাদের ইমাম সাহেবকে ফেরত দেবে না। আবার দু'টি পরিবারকে জোর করে কেড়ে নিয়ে যেতেও চেষ্টা করতে পারে। ওদের অসাধ্য

কিছু নেই। থানা-পুলিশ ওদেরই হাতে। কোর্টেও ওদের বিরুদ্ধে কথা বলতে কেউ সাহস করে না।'

'আপনারা ওদের মোকাবিলা কিভাবে করবেন ঠিক করেছেন?'

'যে পরিণতিই হোক আমরা তাদের মোকাবিলা করব। ইমাম সাহেবকে আমরা মুক্ত করতে চাই। আবার ঐ দু'টি পরিবারকেও আমরা ফেরত দেব না।'

'মোকাবিলা কিভাবে করবেন?'

'ওদের কাছে আধুনিক অস্ত্র আছে। রাইফেল তো আছেই। রিভলভার ও স্টেনগানও আছে। আমরাও আধুনিক অস্ত্র যোগাড়ের চেষ্টা করছি। কিন্তু সমস্যা হলো, ওরা চেষ্টা করছে কোন অস্ত্র-কালোবাজারী যেন আমাদের কাছে অস্ত্র বিক্রি না করে। দ্বিতীয়ত, কালোবাজারে অস্ত্র কিনতে ক্যাশ ডলারের প্রয়োজন হয়। ডলারের বড় অভাব আমাদের।'

'আত্মরক্ষার জন্যে অস্ত্র প্রয়োজন। কিন্ত নিছক অস্ত্রের উপর নির্ভর করলে ওদের সাথে পারা যাবে না।'

একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর বলল, ''কোক'-এর সাথে কোন সংঘর্ষ অতীতে মুসলমানদের হয়েছে?'

'ব্যক্তিগত পর্যায়ে কেউ তাদের সাথে সংঘাতে গেছে। ব্যাপক পর্যায়ের কোন সংঘর্ষ হয়নি। কৌশলে তারা একেকজনের সম্পত্তি একেকবার গ্রাস করেছে এবং তাদের উচ্ছেদ করেছে। ঐক্যবদ্ধ সংঘাত সৃষ্টি হওয়ার কোন সুযোগই দেয়নি। কারণ, শুরুতে তারা এলাকায় অনুপ্রবেশ করেছে দু'চার খণ্ড জমি কিনে। তারপর বিভেদ সৃষ্টি করেছে এবং এই বিভেদের সুযোগ নিয়ে একজন একজন করে উচ্ছেদ করেছে। বহুদিন পর আমাদের এখানে এসে ওরা একটা সমস্যায় পড়েছে। ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ মোকাবিলা করতে হচ্ছে তাদের। তাই ভীষণ ক্ষ্যাপা তারা।'

'আজ ওরা এলে কি করবেন আপনারা?'

'আমরা যদি ওদের কথায় রাজি না হই, তাহলে আজ ওরা সংঘর্ষ বাঁধাতে পারে। সেক্ষেত্রে আমরা আত্মরক্ষা করব।'

'পুলিশে খবর দিলে তারা কোন ভূমিকা পালন করবে না?'

'করার কথা। কিন্তু বাস্তবে এ ধরনের সংঘাতে তারা ভূমিকা পালন করে না। একে তারা রাজনৈতিক দাংগা বলে চালিয়ে দেয়।'

'রাজনৈতিকভাবে এর কোন প্রতিকার করা যায় না?'

'দেশে একদলীয় শাসন। আমাদের এলাকার এম.পি. একজন গোত্র ধর্মীয় কৃষ্ণাংগ। সে নিরপেক্ষ থাকতে চায়। খৃস্টানদের চটাতে সে ভয় করে। আবার আমাদের বিরোধী সে নয়।'

পুরুষরা সবাই তখনও মসজিদে বসেছিল। দু'একজন ছাড়া মহিলারা সবাই চলে গিয়েছিল।

কথা শেষ করে সরদার আবুবকর বিগোভিট সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'তোমরা সবাই এখন যাও। মসজিদের মিনার থেকে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিলে তোমরা এসে যাবে। ওরা আমাদের এলাকায় প্রবেশ করলেই এ ধ্বনি দেয়া হবে।'

সবাই সালাম জানিয়ে চলে গেল।

'ওরা আপনাদের এলাকায় প্রবেশ করলে জানতে পারবেন কেমন করে?' বলল আহমদ মুসা।

'আমাদের সীমান্তে বড় গাছের মাথায় আমাদের পর্যবেক্ষণ টাওয়ার আছে। সেখান থেকে রাতের বেলা আলোকসংকেত দেয়ার ব্যবস্থা আছে এবং দিনের বেলা ধোঁয়া সৃষ্টি করা হয়। আমাদের মসজিদের মিনার থেকে এসব পর্যবেক্ষণের সার্বক্ষণিক ব্যবস্থা রয়েছে।'

কথা শেষ করে বৃদ্ধ আবুবকর বিগোভিট তার ছেলে মুহাম্মাদ ইয়েকিনীর দিকে চেয়ে বলল, 'মেহমানকে তুমি বাড়িতে নিয়ে যাও। আমি আসছি।'

মুহাম্মাদ ইয়েকিনী উঠল।

উঠল আহমদ মুসাও।

মুহাম্মাদ ইয়েকিনীদের বাড়ি দোতলা। টিনের বেড়া এবং টিনের চাল। নিচের তলায় বসার ঘর।

সেখানে আহমদ মুসা এবং মুহাম্মাদ ইয়েকিনী গিয়ে প্রবেশ করল।

আহমদ মুসাকে বসিয়ে ভেতরে গেল মুহাম্মাদ ইয়েকিনী।

অল্পক্ষণ পর ফিরে এসে বসল মুহাম্মাদ ইয়েকিনী আহমদ মুসার পাশে।

প্রায় তার সাথে সাথে নাশতা নিয়ে প্রবেশ করল একজন তরুণী। বয়স বিশ-একুশ বছর হবে।

তরুণী সালাম দিল ঘরে ঢুকে।

তার পরনে ঢিলা আফ্রিকান পোশাক। মাথায় রুমাল বাঁধা। মুখ ছাড়া গোটা দেহই আবৃত।

আহমদ মুসা অবাক হলো, মুহাম্মাদ ইয়েকিনী এবং তরুণীটির চেহারায় নিগ্রো ছাপ নেই। রং কিছুটা কালো বটে, চেহারার অন্য বৈশিষ্ট্য নিগ্রোদের মত নয়।

তরুণীর দিকে ইংগিত করে মুহাম্মাদ ইয়েকিনী বলল, 'এ আমার ছোট বোন 'ফাতেমা মুনেকা'।'

ফাতেমা মুনেকা নাশতা রেখে দাঁড়িয়েছিল।

'বস ফাতেমা।' বলল আহমদ মুসা।

ফাতেমা মুনেকা বসলে আহমদ মুসা মুহাম্মাদ ইয়েকিনীর দিকে চেয়ে বলল, 'তোমরা ক'ভাই বোন?'

'দু'ভাইবোন আমরা। আব্বা ও আম্মা মিলে চারজন নিয়ে আমাদের সংসার।'

একটু থেমেই আবার সে বলল, 'আমরা দু'ভাইবোন ইয়াউন্ডি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি। আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে, আর ফাতেমা পদার্থবিজ্ঞানে।'

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল। এমন সময় মসজিদের মাইক থেকে 'আল্লাহু আকবার' শব্দ ভেসে এল।

সঙ্গে সঙ্গে মুহাম্মাদ ইয়াকিনী এবং ফাতেমার মুখ মলিন হয়ে গেল। তারা উঠে দাঁড়াল।

'উঠলে কেন তোমরা? শত্রু আগমনের সংকেত শুনে?' বলল আহমদ মুসা।

‘হ্যাঁ, এটাই নিয়ম। নারী-পুরুষ সবাইকে এখন যার যে অস্ত্র আছে তা নিয়ে হাজির হতে হবে মসজিদে।’ মুহাম্মাদ ইয়েকিনীর কথায় উত্তেজনা এবং তার ও ফাতেমার চোখে-মুখে উদ্বেগের চিহ্ন।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘দেখ, খাবার পরিবেশিত হলে নামায পড়ারও হুকুম নেই। এর অর্থ, খাবার খেয়ে তারপর নামায পড়তে হবে। অতএব তোমরা বস। খেয়ে তারপর আমরা যাব।’

আহমদ মুসার নিশ্চিন্ত চেহারার দিকে বিস্মিতভাবে তাকিয়ে তারা ধীরে ধীরে বসল।

আহমদ মুসাই ওদের হাতে খাবার তুলে দিল। তারপর নিজে খেতে শুরু করল।

‘আমাদের দেরি দেখলে আব্বা চিন্তা করবেন। আহবান শোনার পর দেরি করা এখানকার নিয়মও নয়।’ খেতে খেতে বলল মুহাম্মাদ ইয়েকিনী।

‘দেরি হবে না, আমরা ঠিক সময়ে পৌঁছব। এখনও ওরা দু’মাইল দূরে আছে। এ রাস্তায় ঘণ্টায় বিশ মাইলের বেশি জোরে গাড়ি আসবে না। সুতরাং, ওরা পৌঁছতে ছয় মিনিটের মত লাগবে। আর আমরা পাঁচ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাব।’ বলল আহমদ মুসা।

‘অঙ্কটা আপনি কিভাবে কষলেন?’ বিস্মিত কণ্ঠে বলল ফাতেমা।

‘তুমিও পারবে। শত্রুপক্ষকে এ রাস্তায় প্রবেশ করতে দেখেই ওরা সংকেত পাঠিয়েছে। সুতরাং যখন সংকেত এসেছে, ওরা তখন দু’মাইল দূরে ছিল। কাঁচা রাস্তায় ওদের গাড়ির স্পীড বিশ মাইলের বেশি হবে না। অতএব বিষয়টা পরিষ্কার।’

‘কোন বিষয়কে আপনি এত নিখুঁতভাবে দেখেন!’ বলল ফাতেমা।

আহমদ মুসা এ কথার দিকে কান না দিয়ে বলল, ‘চল একটু তাড়াতাড়ি যাই। রাস্তার উপর আমার গাড়িটা সরিয়ে রাখতে হবে। ওরা গাড়ি না দেখাই ভাল।’

ওরা তিনজন চলে এল। আহমদ মুসা তার গাড়িটা রাস্তা থেকে একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে চলে এল মসজিদে।

মসজিদ এবং মসজিদের চত্বর তখন ভরে গেছে।

আহমদ মুসারা মসজিদে ঢুকতেই তাকে সবাই সরদারের কাছে যাওয়ার জন্যে জায়গা ছেড়ে দিল।

এলাকার প্রধানদের নিয়ে সরদার আবুবকর তখন করণীয় বিষয় নিয়ে আলাপ করছিল।

আহমদ মুসা বসলে সরদার সবার দিকে একবার চেয়ে বলল, 'আমরা করণীয় বিষয় নিয়ে আলাপ করছি। সময় বেশি নেই। তুমি সম্মানিত মেহমান। তোমার মূল্যবান পরামর্শ আমরা চাই।'

আহমদ মুসা একটু ভাবল। তারপর উঠে দাঁড়াল। বলল, 'সম্মানিত ভাই ও বোনেরা। মুহতারাম সরদারের কাছে আমি সব কথা শুনেছি। 'কোক' এবং 'ওকুয়া'দের সম্বন্ধে আমি আগে থেকেই জানি। আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে আমি আপনাদের পক্ষ থেকে ওদের সাথে কথা বলতে চাই।'

বলে আহমদ মুসা থামল এবং সরদারের দিকে চাইল। সরদার সবার দিকে চেয়ে বলল, 'আপনাদের মত আছে?' সবাই একবাক্যে সম্মতি দিল। তবে সেই সাথে অনেকে বলল, সরদার পাশে থাকবেন এবং ভুল হলে তিনি শুধরে দেবেন।

আহমদ মুসা বলল, 'ঠিক আছে। তাই হবে। এরপর, আপনাদের সবার কাছে আমার অনুরোধ, তারা আপনাদের এলাকায় আসছে। সুতরাং তারা মেহমান। কথাবার্তায় যাই হোক, তারা আঘাত করতে না এলে আপনারা আঘাত করবেন না।'

আহমদ মুসা থামল। এবং আবার তাকালো সরদারের দিকে। সরদার আবার আগের মত করেই সবার মত চাইলেন। সবাই একবাক্যে সম্মতি দিল।

আহমদ মুসা খুব খুশি হলো এদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি দেখে। আফ্রিকার গভীর জংগলে যে গণতন্ত্র সে দেখছে, সভ্য সমাজের শহুরে রাজনীতিকদের মধ্যে এর চিহ্নও দেখা যায় না।

মসজিদ চত্বরের উত্তর পাশে একটা ফাঁকা জায়গায় দু'পক্ষের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আহমদ মুসাসহ গোত্রের প্রধানগণ সবাই মসজিদ থেকে বেরিয়ে এসেছে। ওদের গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল। সরদার এবং অন্যান্য সকলের মুখে উদ্বেগ এসে নতুন করে ছায়া ফেলল। উত্তেজনায় চোখ তাদের চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

আহমদ মুসা পেছন ফিরে সকলের উদ্দেশ্যে বলল, 'ভাই-বোনেরা, আপনারা একটুও ভাববেন না। আল্লাহর সাহায্য আমাদের সাথে আছে।'

দুইটি ছোট মাইক্রোবাস এসে ঠিক মসজিদের সামনে দাঁড়াল।

দাঁড়ানোর সাথে সাথে গাড়ি থেকে স্রোতের মত নেমে এল প্রায় জনা বিশেক মানুষ। ওদের কারও হাতে রাইফেল, কারো হাতে স্টেনগান।

ওরা নেমে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল এবং কয়েক পা এগিয়ে এল আহমদ মুসাদের দিকে।

এদিকে আহমদ মুসা সামনের সারির মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল। তার একপাশে সরদার, অন্যপাশে মুহাম্মাদ ইয়েকিনী। তাদের পেছনে অন্যান্য লোকজন। মেয়েরা পাশে মসজিদের চত্বরে দাঁড়িয়ে। তাদের হাতে তীর-ধনুক, কিন্তু নিচু করে রাখা।

আহমদ মুসা কয়েক পা এগোলো। বলল, 'আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা বসার জায়গা করেছি। আসুন, বসুন।'

'আমরা বসতে আসিনি। আমরা জবাব শুনতে এসেছি।' আহমদ মুসার স্বাগত সম্ভাষণের কোন জবাব না দিয়ে নিরেট অভদ্রের মত কথাগুলো বলল ওপক্ষের একজন। লোকটি কৃষ্ণাংগ। তবে আশে-পাশের চার-পাঁচজন সবাই শ্বেতকায়।

'জবাব অবশ্যই আমরা দেব। কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলা কি শোভন হবে!'

'আমাদের কথা বলার কিছু নেই। আমরা জবাব শোনার জন্যে এসেছি। জবাবও খুব বড় হবে না। এক বাক্যে কিংবা এক শব্দেও বলা যায়।'

আহমদ মুসারা এবং ওদের মধ্যেকার দূরত্ব চারগজের মত। ওপক্ষের যে কৃষ্ণাংগ কথা বলছে তার পাশেই দীর্ঘদেহী এক শ্বেতকায় দাঁড়িয়ে। আহমদ মুসার

মনে হলো, সেই হলো আসল নেতা। কৃষ্ণাংগকে ব্যবহার করা হচ্ছে। সেই শ্বেতকায়ের দু'পাশে দাঁড়িয়ে দু'জন স্টেনগানধারী।

'এক কথায় জবাব সব কিছুর হয় না। আমাদের কিছু জানার এবং বলার আছে।' বলল আহমদ মুসা।

'আমরা নতুন কোন দরকষাকষি করতে আসিনি। আমাদের প্রস্তাবে রাজি থাকলে এক্ষুণি দু'টি পরিবারকে আমাদের হাতে তুলে দিতে হবে। আর সে দু'টি ভূ-খণ্ডের দখল আমরা যেদিন পাব, সেদিন আপনাদের ইমামকে আমরা ছেড়ে দেব।'

'আমাদের ইমাম বেঁচে আছেন, তার কি নিশ্চয়তা আছে এবং আপনারা যে কথা রাখবেন, তার কি গ্যারান্টি দেবেন?'

আহমদ মুসা চাচ্ছিল সময় বাড়াতে এবং কোনভাবে আজকের মত আলোচনা স্থগিত রাখতে।

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই দীর্ঘকায় শ্বেতাঙ্গটি মুখ খুলল। বলল, 'তোমাকে একজন চালাক এশিয়ান মনে হচ্ছে। শোন, আমরা এখানে খোশগল্প করতে আসিনি। আমি এক থেকে তিন পর্যন্ত গুণবো। এর মধ্যে যদি আমি আমার প্রস্তাবের হ্যাঁ সূচক জবাব না পাই, তাহলে পরবর্তী ঘটনার জন্যে আমরা আর দায়ী হবো না।'

তার কথা শেষ হতেই তার দু'পাশের দুই স্টেনগানধারী তাদের স্টেনগান তাক করল আহমদ মুসাদের দিকে।

সরদার আবুবকর এবং মুহাম্মাদ ইয়েকিনী দু'জনেই তাকাল আহমদ মুসার দিকে। আহমদ মুসার দুই রিভলভার তার দুই পকেটে। সে সরদারের দিকে না তাকিয়েই বলল, 'ধৈর্য্য ধরুন।'

শ্বেতকায় সেই লোকটি 'তিন' পর্যন্ত গোণা শুরু করেছে।

এক....

দুই...

দুই বলার সঙ্গে সঙ্গে স্টেনগানধারীদের হাত স্টেনগানের ফায়ারিং পয়েন্টে চলে গেল, লক্ষ্য করল আহমদ মুসা।

সরদার, মুহাম্মাদ ইয়েকিনী এবং পাশের সকলের ব্যাকুল চোখ আহমদ মুসার দিকে নিবদ্ধ। পেছনে সকলের মধ্যে মৃত্যুর নিস্তব্ধতা।

আহমদ মুসার স্থির দৃষ্টি সামনে।

শ্বেতকায় লোকটি উচ্চারণ করল-

তিন...।

স্টেনগানধারী দু'জনের দেহ নড়ে উঠল একটু, এরপরই ছুটে আসার কথা গুলির দেয়াল।

কিন্তু 'তিন' বলার সাথে সাথেই আহমদ মুসার দুই পকেট থেকে বিদ্যুৎ গতিতে বেরিয়ে এল দু'টি রিভলভার। সেই সাথে দু'টি গুলি বেরিয়ে এল তার দুই রিভলভার থেকে এবং তক্ষুণিই দেখা গেল, আহমদ মুসার দেহ কুণ্ডলি পাকিয়ে সামনে ছিটকে পড়ল। যখন তার দেহটি উঠে দাঁড়াল, দেখা গেল, তার দুই হাতের দুই রিভলভারের নল সেই শ্বেতকায় ও কৃষ্ণকায় লোক দু'জনের বুকে।

'তোমরা তোমাদের সব লোককে অস্ত্র ফেলে দিতে বল, নইলে এক্ষুণি দু'জনের বুক এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যাবে।' গর্জে উঠল আহমদ মুসার কণ্ঠ তাদের উদ্দেশ্যে।

সেকেন্ডের মধ্যেই এতগুলো ঘটনা ঘটে গেল। ভানুমতির খেলার মত। সেকেন্ডের খেলা যখন শেষ তখন সরদার আবুবকর, মুহাম্মাদ ইয়েকিনী এবং সকলে বিস্ফারিত চোখে দেখল, দুই স্টেনগানধারীর রক্তাক্ত দেহ মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছে এবং তাদের মেহমান দাঁড়িয়ে আছে ওপক্ষের দুই সরদারের বুকে রিভলভার ধরে। এক মুহূর্তেই দৃশ্যপট পাল্টে গেছে। কিন্তু এই অসাধ্য সাধন করল কি করে তাদের মেহমান আহমদ মুসা!

বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিল সেই কৃষ্ণকায় ও শ্বেতকায় দু'জনেরও চোখ। প্রথমে তাদের কাছে স্বপ্ন মনে হয়েছে। কিন্তু সাথী দু'জনের রক্তাক্ত লাশ ও রিভলভারের নলের শক্ত স্পর্শ তাদের বলে দিল স্বপ্ন নয়, সবই বাস্তব। আহমদ মুসার চোখের দিকে একবার চেয়েই তারা বুঝেছিল, এ লোকের অসাধ্য কিছু নেই। সুতরাং, আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই শ্বেতকায় লোকটি চিৎকার করে

উঠল, ‘তোমরা সবাই অস্ত্র ফেলে দাও।’ তার চিৎকার আর্ত-চিৎকারের মত শোনাল।

তার আদেশের সাথে সাথেই তার দলের সবাই অস্ত্র ফেলে দিল।

আহমদ মুসা তাদের বুকে রিভলভার ধরে রেখে উচ্চস্বরে বলল, ‘মুহাম্মাদ ইয়েকিনী, তোমার লোকজন দিয়ে অস্ত্রগুলো কুড়িয়ে নাও। সকলের পকেট সার্চ করবে, রিভলভার থাকতে পারে তাদের পকেটে।’

আদেশের সাথে সাথে মুহাম্মাদ ইয়েকিনী কয়েকজনকে ডাক দিয়ে নিজেই ছুটল। প্রথমে সার্চ করল সেই শ্বেতকায় ও কৃষ্ণাংগ লোক দু’জনকে। তাদের পকেটে রিভলভার পেল।

সমস্ত অস্ত্র সংগ্রহ করে মসজিদের চত্বরে স্তুপীকৃত করা হলো।

রিভলভার পকেটে রেখে আহমদ মুসা হাতে তুলে নিয়েছে স্টেনগান। ওদের দিকে স্টেনগান বাগিয়ে আহমদ মুসা নির্দেশ দিল, ‘তোমরা সবাই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়।’

সঙ্গে সঙ্গে সবাই তার নির্দেশ পালন করল।

আহমদ মুসা মুহাম্মাদ ইয়েকিনীকে বলল, ‘তোমরা ওদের সবাইকে পিছমোড়া করে হাত-পা বেঁধে ফেল।’

ওদের সবাইকে বেঁধে ফেলা হলো।

মুহাম্মাদ ইয়েকিনীকে আবার নির্দেশ দিল আহমদ মুসা, ‘ওদের গাড়ির সব জায়গা চেক করে এস।’

গাড়ি থেকে পাওয়া গেল আরও দু’টি স্টেনগান এবং চার বাক্স গুলি।

অস্ত্র ও গোলা-বারুদের দিকে তাকিয়ে পাশের সরদার ও অন্যান্যদের বলল, ‘ওরা ছোটখাট একটা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিল।’

‘এতক্ষণ যা দেখলাম, যা দেখছি সব যে সত্য একথা বিশ্বাস করতে মন চাইছে না। অলৌকিক কোন কিছু দেখিনি কোনদিন। আজ চোখের সামনে তা দেখলাম। তোমাকে কি বলে কৃতজ্ঞতা জানাব তা আমি জানি না।’ বলতে বলতে বৃদ্ধের চোখ থেকে ঝর ঝর করে পানি নেমে এল।

বৃদ্ধের মতই সকলের অবস্থা। সকলে আহমদ মুসাকে দেখছে এমন দৃষ্টিতে যেন সে কোন অলৌকিক জীব।

আহমদ মুসা বৃদ্ধ সরদারকে বলল, 'একখণ্ড ভাল সাদা কাগজ দরকার।'

বৃদ্ধ সরদার তাকাল ইয়েকিনীর দিকে। ইয়েকিনীর পাশেই দাঁড়িয়েছিল ফাতেমা মুনেকা। সে বলল, 'আমি নিয়ে আসছি ভাইয়া।' বলে ছুটল বাড়ির দিকে।

একটা প্যাড নিয়ে ফিরে এল ফাতেমা মুনেকা দ্রুত।

প্যাড ও কলম নিয়ে আহমদ মুসা গেল সেই শ্বেতাঙ্গ লোকটির কাছে। খুলে দিল তার হাতের বাঁধন।

উঠে বসল শ্বেতাঙ্গ লোকটি।

আহমদ মুসা তার প্যাড ও কলম এগিয়ে দিয়ে বলল, 'লিখুন সেখানকার দায়িত্বশীলকে, পত্রবাহকদের হাতে ইমাম সাহেবকে দিয়ে দিতে। দেরি করবেন না। আমার সময় খুব কম।'

বৃদ্ধ সরদার, মুহাম্মাদ ইয়েকিনী, ফাতেমা এবং আরও কয়েকজন প্রধান ব্যক্তি আহমদ মুসাদের চারদিকে এসে দাঁড়িয়েছিল। তারা বুঝতে পারল আহমদ মুসা কি করতে যাচ্ছে।

শ্বেতাঙ্গ লোকটি প্যাড ও কলম হাতে তুলে নিল। তারপর পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি কে?'

'এ প্রশ্নের জবাব আমি দেব না। আপনি লিখুন।'

'আমি জানি, আমাকে লিখতেই হবে। কিন্তু আপনার মত একজন মানুষ এই প্রথম দেখলাম। বলবেন কি, আপনার নাম কি?'

'আমার নামও আমি বলব না।'

'মনে হচ্ছে, কোথাও দেখেছি আপনাকে।'

'দেখুন, আমি আপনার কোন প্রশ্নেরই জবাব দেব না। লিখুন তাড়াতাড়ি। আর শুনুন, কোন সঙ্কেত পাঠাবার চেষ্টা করবেন না।'

লিখল লোকটি।

প্যাড ও কলম সে ফেরত দিল আহমদ মুসার হাতে। বলল, 'আপনাদের এ প্রতারণার ফল ভালো হবে না।'

হো হো করে হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'প্রতারণা আমরা করেছি? না আপনাদের প্রতারণা, ব্ল্যাকমেইল ও জঘন্য ষড়যন্ত্রের মোকাবিলার আমরা চেষ্টা করছি? তবে কিছু একটা করব আমরা। সব অন্যায়ের প্রতিবিধান না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের ছাড়ব না।'

শ্বেতাঙ্গ লোকটির চোখে চোখ রেখে অত্যন্ত কঠোর কণ্ঠে কথা কয়টি বলল আহমদ মুসা।

লোকটির মুখ ম্লান হয়ে গেল। সে বিশ্বাস করল আহমদ মুসার প্রতিটি কথা।

আহমদ মুসা সরে এল ওদের কাছ থেকে। সরদারকে লক্ষ্য করে বলল, 'একটু পরামর্শ দরকার, চলুন মসজিদে বসি।'

এলাকার প্রধানগণ সকলে মসজিদে বসল।

দাঁড়াল আহমদ মুসা। বলল, 'এখন তিনটি আশু করণীয় কাজ আছে। এক, বন্দী লোকদের কোথাও কোন নিরাপদ জায়গায় রাখতে হবে। দুই, পুলিশ স্টেশনে কেউ গিয়ে মামলা দায়ের করে আসতে হবে যে, আমাদের ইমামকে কিডন্যাপ করে রাখার পর ইসলাম গ্রহণকারী দু'টি পরিবারকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে ওরা মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হামলা করেছিল আমাদের পল্লীতে। রক্তক্ষয়ী সংঘাতের পর ওদের পরাজিত করা হয়েছে। সংঘর্ষে মারা পড়েছে তাদের কয়েকজন নেতা এবং তাদের বেশ কিছু লোক। ওদের চরমপত্রের একটা কপি পুলিশকে দিতে হবে। তিন নাম্বার কাজ হলো, কয়েকজন যেতে হবে ইমাম সাহেবকে খুলে আনতে।'

আহমদ মুসা বলল।

মুখ খুলল আবুবকর বিগোভিট। বলল, 'আলহামদুলিল্লাহ! এ কাজগুলো আমাদের মাথায় ছিল না। সম্মানিত মেহমানকে মোবারকবাদ। তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। আমার এখন মনে হচ্ছে, আল্লাহ মেহমানকে পাঠিয়েছেন এক গুরুতর সঙ্কটে আমাদের সাহায্য

করতে। কল্পনা করতে ভয় হয়, তিনি আজ না থাকলে আমাদের কি ঘটত! এখনও আমার মনে হচ্ছে, যা দেখলাম সব যেন স্বপ্ন দেখলাম। বিপর্যয়কে তিনি যেভাবে বিজয়ে পরিণত করলেন, তা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব বলে আমার জানা ছিল না।'

উপস্থিত সবাই আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে উঠল।

বৃদ্ধ সরদার থেমে গিয়েছিল। আবার বলতে শুরু করল, 'আমাদের যে বন্দীশালা আছে, সেখানে বন্দীরা আপাতত থাকবে। আমাদের এলাকার নিরাপত্তার দায়িত্বশীল 'আলী ওকোচা' কয়েকজনকে নিয়ে থানায় যাবেন। ইতোপূর্বের মামলাগুলো তিনিই করেছেন। আর ইমাম সাহেবকে উদ্ধার করতে কে যাবেন, এটা সম্মানিত মেহমান ঠিক করলে ভালো হয়। এই উদ্ধার কাজ কেমন করে কিভাবে হবে তা আমার মাথায় আসছে না।'

থামল বৃদ্ধ।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'ইমাম সাহেবকে উদ্ধার করতে আমি যাব। আমার সাথে থাকবে দু'জন। তাদের একজন মুহাম্মাদ ইয়েকিনী। আরেকজনকে ঠিক করে দেবেন সরদার।'

আহমদ মুসার পাশেই বসা মুহাম্মাদ ইয়েকিনীর মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মেহমান নিজে তাকে সঙ্গী হিসেবে নির্বাচন করেছেন- এই আনন্দ তার বুকে ধরছে না। আবেগ-উচ্ছ্বাসে তার দু'চোখের কোণায় অশ্রু দেখা দিল।

আহমদ মুসার কথা শেষ হলে সরদার চারদিকে চেয়ে বলল, 'হাসান ইকোকু, তুমি দাঁড়াও।'

সঙ্গে সঙ্গে সুগঠিত দেহের একজন বলিষ্ঠ কৃষ্ণাংগ নব্য যুবক উঠে দাঁড়াল। বিনয়ের ভাব তার মুখে, একটা সলজ্জ দৃষ্টি তার চোখে। নিরেট নিগ্রো যুবক সে।

সরদার বলল, 'খুব ভালো ছেলে হাসান ইকোকু। আমাদের একজন সেনাধ্যক্ষ সে।'

'খোশ আমদেদ।' যুবকটির দিকে চেয়ে সহাস্যে বলল আহমদ মুসা।

বৃদ্ধ সরদার আহমদ মুসার দিকে চেয়ে বলল, 'কিন্তু তিনজনে কি হবে? শত্রুদের একদম মাঝখানে গিয়ে তো পড়তে হবে।'

'কম লোক যেতে হবে। ওদের বোঝাতে হবে, আমরা যুদ্ধ করতে আসিনি।'

'কিন্তু কিছু যদি ঘটে?'

'আল্লাহ্ সাহায্য করবেন।'

বৃদ্ধ সরদার আহমদ মুসার পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, 'আলহামদুলিল্লাহ। তোমার কাছ থেকে আল্লাহ্ আমাদের অনেক শিক্ষা লাভের সুযোগ দিয়েছেন।'

'আমাদের এখন ওঠা দরকার।' বলল আহমদ মুসা।

উঠে দাঁড়াল বৃদ্ধ সরদার।

পরে উঠে দাঁড়াল সবাই।

হাসান ইকোকু মুহাম্মাদ ইয়েকিনীর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছিল।

ফাতেমা মুনেকা বাইরে থেকে বাড়ির দিকে আসছিল। হাসান ইকোকুকে দেখে সে দাঁড়াল। বলল, 'ইয়াউন্ডি বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার পদে দরখাস্ত করার কথা, করেছ দরখাস্ত?'

'রাগ করো না, দরখাস্ত আমি করিনি।'

'করনি? কেন?'

'বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসারী করার সময় কি আমাদের এটা? ক্রস এবং ক্রিসেন্টের এ লড়াই না মিটলে...।'

ফাতেমা মুনেকা বাঁধা দিয়ে বলল, 'প্রফেসারী করে এ লড়াই করা যাবে না, কে বলেছে?'

'সেটা পার্টটাইম হবে। কিন্তু জাতি যে ফুলটাইম চায়। তুমিও কি এটা চাও না মুনেকা?'

ফাতেমা মুনেকার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, ‘চাই। কিন্তু লড়াই-এর ক্ষেত্র কি একটাই? বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই কি লড়াই নয়? বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে আমাদের লোক নেই!’

‘তোমার সাথে আমি একমত মুনেকা। কিন্তু আগ্রাসনের মুখে জাতির অস্তিত্ব যখন বিপন্ন হয়, তখন সশস্ত্র লড়াইটাই অগ্রাধিকার পায়। আমি সেটাই করেছি।’

‘তুমি দরখাস্ত করনি, সে কথা আগে কেন বলনি?’

‘তুমি এটা পছন্দ করবে না, তাই বলিনি।’

‘কেন, জাতিকে আমি ভালোবাসি না?’

‘না, তা আমি বলিনি।’

‘দেখ, আমিও জাতিকে ভালোবাসি। জাতির জন্যে জীবন দিতে হলে তোমার চেয়ে পেছনে থাকবো না। কিন্তু আমি মনে করি, সবার অগ্রাধিকার এক রকমের হওয়া ঠিক নয়।’

‘তুমি ঠিক বলেছ। এ সংকটটা কেটে যাক, তুমি যা চাও তা-ই করব।’

ফাতেমা মুনেকার মুখে একটা সলজ্জ হাসি ফুটে উঠল। বলল, ‘এভাবে কথা বলো না। আমি তোমার পাশে থাকতে চাই, পথপ্রদর্শক হতে চাইনি কখনও।’

হাসান ইকোকু কথার মোড় ঘুরিয়ে নেবার জন্যে বলল, ‘খুশি হওনি, আমি আহমদ মুসার সঙ্গী হতে পারছি অভিযানে?’

‘আমার হিংসে হচ্ছে। তুমি যে সৌভাগ্য পেলে আমার তা জুটল না।’

‘আচ্ছা, আমাদের মেহমান এই আহমদ মুসা কে?’

‘আমারও প্রশ্ন এটা। উনি যে পরিচয়টুকু দিয়েছেন, সেটা আসল পরিচয় নয়। যে বুদ্ধি, যে সাহস এবং যে ক্ষিপ্রতা উনি দেখিয়েছেন, সেটা অলৌকিকের মত। গোটা পৃথিবীতে দু’চারজন লোক এমন থাকে।’

হাসান ইকোকু কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু বলতে গিয়ে থেমে গেল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছে আহমদ মুসা এবং মুহাম্মাদ ইয়েকিনী।

ওরা কাছাকাছি আসতেই ফাতেমা মুনেকা সালাম দিল আহমদ মুসাকে এবং বলল, ‘জনাব, এ ধরনের অভিযানে মেয়েদের অংশগ্রহণ কি নিষিদ্ধ?’

‘না, নিষিদ্ধ নয়। তবে মেয়েদেরকে প্রথমেই আক্রমণকারী শক্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয় না। প্রথমে তারা প্রতিরক্ষা শক্তি, পরে তারা আক্রমণকারী শক্তি। আর ছেলেরা সব সময় আক্রমণকারী শক্তি, যদি আক্রমণের প্রয়োজন হয়।’

‘আক্রমণে মেয়েরা দ্বিতীয় পর্যায়ের শক্তি কেন?’

‘ছেলেদের আক্রমণ ব্যর্থ হলে মেয়েরা তাদের সহযোগিতায় আসবে, এটাই সবদিক দিয়ে স্বাভাবিক।’

‘ধন্যবাদ। আমি বুঝেছি। কিন্তু মাঠে যখন লড়াই, তখন ঘরে থাকা কত কষ্টকর বুঝবেন না।’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘বোন, ঘরে করার মত অনেক কাজ আছে। আমি তোমাকে একটা কাজ দিয়ে যেতে চাই।’

‘কাজ চাওয়ার পরে তো বলছেন!’ ফাতেমা মুনেকার কণ্ঠে অভিমানের সুর।

‘সত্যি ভুলে গিয়েছিলাম। তুমি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছ।’

‘ধন্যবাদ। বলুন।’ হেসে বলল ফাতেমা মুনেকা।

‘তুমি একটা রিপোর্ট তৈরি কর। এখানকার মুসলিম অধিবাসীরা কি ধরনের জুলুম ও ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে KOC-এর পক্ষ থেকে, এর প্রতিবিধানের জন্যে তোমরা সরকারের কাছে কিভাবে কতবার গেছ এবং তার কোন ফল হয়নি-এসবসহ ইসলাম ধর্মগ্রহণকারী দু’টি পরিবারকে কিভাবে ফেরত চাইল ওরা, কিভাবে ইমাম সাহেবকে পণবন্দী করল, কি করে দু’টি ভূখণ্ড দাবি করল, কি চরমপত্র তারা দিল এবং সর্বশেষে আজকের ঘটনা- সবই তোমার রিপোর্টে থাকতে হবে।’

বলে আহমদ মুসা পিঠের ব্যাগ থেকে ক্ষুদ্র একটা অটো-ক্যাসেট বের করে ফাতেমা মুনেকার হাতে দিয়ে বলল, ‘রিপোর্ট লেখার পর এই ক্যাসেটে সেটা রেকর্ড করবে। সবশেষে তোমার পরিচয় বলবে, ‘ফাতেমা মুনেকা, ইয়াউন্ডি, ক্যামেরুন, কোডঃ এ, এম-১১ এবং আর, এফ, এ, এম-৮।’’

‘কিন্তু কিছুই বুঝলাম না। রেকর্ড করবো কেন, আমার পরিচয় কি দরকার, কোড নাম্বার কি এবং কেন?’

‘রেকর্ড করবে। কারণ, তোমার এই রেকর্ড যাবে ‘ওয়ার্ল্ড নিউজ এজেন্সী’ (WNA) এবং ‘ফ্রি ওয়ার্ল্ড টেলিভিশন’ (FWTV)-এর কাছে। তোমার পরিচয় দরকার। কারণ, পরিচয়হীন কারও রিপোর্ট তারা পড়েও দেখে না। আর কোড নাম্বার দরকার। কারণ, কোড নাম্বার না হলে তারা রিপোর্ট বিশ্বাস করবে না।’

‘রিপোর্ট কি করবে তারা?’

‘ওয়ার্ল্ড নিউজ এজেন্সী ও ফ্রি ওয়ার্ল্ড টেলিভিশনের মাধ্যমে গোটা পৃথিবীতে তা ছড়িয়ে পড়বে।’

‘আমার এই রিপোর্ট?’

‘হ্যাঁ।’

‘কিন্তু তারা তা করবে কেন? আমার পাঠানো এই রিপোর্টের প্রতি তারা গুরুত্ব দেবে কেন?’

‘এই জন্যে তো কোড নাম্বার।’

‘এ, এম-১১ -এর অর্থ কি?’

‘আহমদ মুসা-১১। এর অর্থ, আহমদ মুসা তার এগারোতম রিপোর্টার হিসেবে ফাতেমা মুনেকাকে রিকমেন্ড করছে।’

‘ঐ দুই নিউজ মিডিয়ার তাহলে আমি সাংবাদিক হয়ে যাব!’ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ফাতেমা মুনেকার চোখ-মুখ।

‘অবশ্যই।’

‘শেষোক্ত কোডটার অর্থ কি?’

‘আর, এফ, এ, এম-৮ -এর অর্থ হলো, আহমদ মুসার পক্ষ থেকে অষ্টম রিপোর্ট।’

‘আগের কোড এবং এই কোডের মধ্যে পার্থক্য বুঝলাম না।’

‘আগেরটা তোমার নিজস্ব সাংবাদিক কোড। আর দ্বিতীয়টা আমার নিজস্ব রিপোর্টের কোড।’

‘কিন্তু রিপোর্টটি তো আমি পাঠাচ্ছি।’

‘তুমি পাঠাচ্ছ বটে। তবে রিপোর্টটি আমার নির্দেশে পাঠানো হয়েছে বলে তারা ধরে নেবে এবং জরুরি ভিত্তিতে তখনই রিপোর্টটা প্রচার করবে।’

‘তাহলে আমাদের নিজস্ব পাঠানো রিপোর্ট এই ধরনের জরুরি বিবেচিত হবে না, তাই না?’

‘তোমাদের রিপোর্টের প্রচার নির্ভর করবে গুরুত্বের উপর। সঙ্গে সঙ্গেও প্রচার হতে পারে, আবার পরেও হতে পারে।’

‘আমরা যদি আপনার কোড ব্যবহার করি?’

‘তা পারবে না। কারণ, আমার কোড এবার ৮ হয়েছে, পরে কত হবে তুমি জানবে না।’

‘বুঝেছি। আরেকটা কথা।’

‘কি?’

‘আপনি আমাকে ঐ দু’টি নিউজ মিডিয়ার সাংবাদিক বানালেন, আপনার রিপোর্টকে ওরা তক্ষুণি প্রচার করবে- এসবের কারণ কি? আপনার সাথে ওদের সম্পর্ক কি?’

‘এসব কথা পরে হবে। এখন সময় নেই। তুমি রিপোর্ট রেকর্ড কর।’ বলে আহমদ মুসা তাকাল মুহাম্মাদ ইয়েকিনীর দিকে। বলল, ‘চল।’

‘আল্লাহ্ হাফেজ হাসান, আল্লাহ্ হাফেজ মুহাম্মাদ ইয়েকিনী।’ বিদায় জানাতে গিয়ে বলল ফাতেমা মুনেকা।

‘সত্যি হিংসে হচ্ছে। এমনভাবে বিদায় কেউ আমাকে দেয় না।’ বলল আহমদ মুসা। হাসি তার মুখে।

‘কেন আব্বা, আম্মা, ভাই, বোন, কিংবা নিজস্ব কেউ নেই আপনার?’

‘যখন ছিল, তখনকার কথা প্রায় ভুলেই গেছি।’

‘বাড়িতে তাহলে কে আছে আপনার?’

‘বাড়ি থাকলে তবেই তো সেখানে কারও থাকার প্রশ্ন আসে।’ হেসে বলল আহমদ মুসা।

কিন্তু এই হাসি ফাতেমা মুনেকা, হাসান ইকোকু ও মুহাম্মাদ ইয়েকিনীর কাছে কান্নার চেয়েও করুণ মনে হলো। বিস্মিত দৃষ্টিতে তারা তাকাল আহমদ মুসার দিকে।

'এস' বলে হাঁটতে শুরু করেছে।

'খোদা হাফেজ, আহমদ মুসা ভাইয়া।' মুখে হাসি টেনে বলল ফাতেমা মুনেকা।

আহমদ মুসা মুখ ফিরিয়ে ফাতেমা মুনেকার দিকে চেয়ে বলল, 'ফি আমানিল্লাহ্ বোন।' আহমদ মুসার ঠোঁটেও হাসি। কিন্তু চোখে নিঃসীম তৃষ্ণার একটা ছায়া। হঠাৎ করেই তার চোখে ভেসে উঠেছিল সিংকিয়াং-এর এক মরু-পল্লীর দৃশ্য। যেখানে নিজেকে সে দেখতে পেল মায়ের কোলে, পিতার বাহুবন্ধনে এবং ছোট ভাই ও বোনের মিষ্টি ডাকে পরিপ্লাবিত অবস্থায়।

আনমনা হয়ে পড়েছিল আহমদ মুসা মুহূর্তের জন্যে। ওদের তিনজনের কারোরই তা নজর এড়াল না।

পরক্ষণেই আহমদ মুসা হেসে উঠল। বলল, 'স্মৃতির আক্রমণের শিকার হয়েছিলাম। চল।'

বলে হাঁটতে শুরু করল আহমদ মুসা।

মুহাম্মাদ ইয়েকিনী এবং হাসান ইকোকুও হাঁটতে শুরু করল তার পেছনে।

'কোক'দের নিয়ে আসা একটি গাড়ি নিল আহমদ মুসা।

মাইক্রোবাসটির ড্রাইভিং সিটে বসল সে।

মুহাম্মাদ ইয়েকিনী এবং হাসান ইকোকু বলল পাশের সিটে।

'ইদেজা, যেখানে আমাদের যেতে হবে, কতদূর হবে?'

'হাইওয়ে থেকে দক্ষিণে বিশ মাইলের মত হবে।'

'তোমরা দু'জনেই তো চেন, তাই না?'

'হ্যাঁ।' বলল মুহাম্মাদ ইয়েকিনী।

'তোমাদের দু'জনের কাছে কাগজ-কলম আছে?'

'আছে।' বলল তারা দু'জনেই।

‘‘ইদেজা’য় ‘কোক’-এর যে ঘাঁটি, তার বিল্ডিংগুলোর লোকেশন তোমাদের মনে আছে?’

‘আছে।’ বলল তারা একসাথে।

‘তাহলে তোমরা দু’জনে ওদের ঘাঁটির দু’টি স্কেচ আঁক। তাতে যতদূর সম্ভব রাস্তা, ফাঁকা জায়গা, বিল্ডিং, দরজা ইত্যাদির অবস্থান দেখাবে।’

খুশি মনে ওরা দু’জন পকেট থেকে কাগজ বের করে স্কেচ আঁকায় মনোযোগ দিল।

গাড়ি ছুটে চলল দক্ষিণে কোক-এর উত্তরাঞ্চলীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি ইদেজার উদ্দেশ্যে।

ইয়াউন্ডিগামী হাইওয়েতে উঠার পর হাইওয়ে ধরে কিছুটা পুবে এগিয়ে ইদেজাগামী সড়কে উঠল আহমদ মুসারা। সড়কটি সম্প্রতি পাকা করা হয়েছে।

ইদেজা ছোট একটা শহর।

সুঙ্গা নদীর একটা শাখার তীরে এই শহরটি। শহরের পূর্ব প্রান্তে নদীর তীরে একটা এলাকা জুড়ে ‘কোক’-এর আঞ্চলিক সদর দফতর।

‘কোক’-এর দফতরটির দক্ষিণ পাশ দিয়ে নদী আর উত্তর পাশ দিয়ে ইয়াউন্ডির দিক থেকে আসা সড়ক।

সড়ক থেকে গজ পাঁচেক দূরে একটা বড় গেট। গেটে একটা বড় নামফলকঃ ‘কিংডম অব ক্রাইস্ট’।

গেটটি খোলা। গেটের দু’পারে দু’জন গার্ড দাঁড়িয়ে। তাদের হাতে রাইফেল।

আহমদ মুসার সামনে ড্যাশবোর্ডে হাসান ও মুহাম্মাদের আঁকা দুইটি স্কেচই মেলে রাখা।

স্কেচ দেখেই জায়গাটা আহমদ মুসা ঠিক চিনল।

যে গতিতে আহমদ মুসা সড়ক দিয়ে এসেছিল, সে একই গতিতে সে গেটের দিকে অগ্রসর হলো।

গাড়িটি দেখেই গেটম্যানরা গাড়িটিকে প্রথমে ক্লিয়ারেন্স দিয়েছিল। কিন্তু গেটের কাছাকাছি হলে আহমদ মুসাদের দেখার পর তারা হাত তুলে গাড়ির গতিরোধ করে দাঁড়াল।

গাড়ি দাঁড় করাল আহমদ মুসা।

গেটম্যান দু'জন শ্বেতাংগ।

তারা দু'দিক থেকে দু'জন গাড়ির জানালায় দাঁড়াল।

'জন স্টিফেন আমাদের পাঠিয়েছেন। তিনি চিঠি দিয়েছেন ফ্রাসোয়া বিবসিয়েরের কাছে।' বলল আহমদ মুসা।

'দেখি চিঠি?' বলল গার্ডদের একজন।

'চিঠি তো ফ্রাসোয়ার জন্যে, আপনার জন্যে নয়।'

'কিন্তু আমরা দেখতে পারি।'

'দেখতে হলে তাকে ডাকুন, তিনিই দেখাবেন।'

গার্ড দু'জন পরস্পরের দিকে তাকাল। তারপর তারা সরে দাঁড়াল গাড়ির রাস্তা থেকে।

ভেতরে ঢুকল আহমদ মুসার গাড়ি।

সামনের দিকে তাকিয়ে বলল আহমদ মুসা, 'তোমাদের স্কেচ অনুসারে প্রথম গাড়ি বারান্দাই মূল অফিস বিল্ডিং-এর প্রবেশপথ, তাই না?'

'হ্যাঁ।' বলল মুহাম্মাদ ইয়েকিনী।

গাড়ি বারান্দায় আহমদ মুসার গাড়ি এসে দাঁড়াতেই করিডোরের মুখে দরজায় দাঁড়ানো স্টেনগানধারী ছুটে এল। বলল, 'কাকে চাই?'

'ফ্রাসোয়া বিবসিয়ের। তার জন্যে 'জন স্টিফেন'-এর চিঠি নিয়ে এসেছি।'

'ওয়েলকাম। চলুন, তিনি অফিসে।'

স্টেনগানধারী আহমদ মুসাদেরকে এ করিডোর সে করিডোর ঘুরিয়ে একটা দরজার সামনে এনে দাঁড় করিয়ে বলল, 'এখানেই তিনি বসেন। চেনেন মঁশিয়ে ফ্রাসোয়াকে?'

'চিনি না।' বলল আহমদ মুসা।

‘তিনি জন স্টিফেনের ডেপুটি।’

বলে স্টেনগানধারী তার জায়গায় ফিরে গেল।

আহমদ মুসা দরজায় নক করতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। ফিরল হাসান ইকোকু এবং মুহাম্মাদ ইয়েকিনীর দিকে। বলল, ‘হিসেবে একটা ভুল করেছি আমরা।’ একটু আনমনা আহমদ মুসা।

‘কি ভুল হয়েছে?’ উদ্বিগ্ন হাসান ইকোকু প্রশ্ন করল।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘পেছনের কথা ভেবে আর লাভ নেই। চল, সামনে এগোই।’

দরজায় নক করতেই প্রশস্ত দরজাটি খুলে গেল।

ঘরের ভেতর চোখ পড়তেই আহমদ মুসা দেখল, তিনটি স্টেনগান হা করে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। আর তাদের পেছনে বিশাল টেবিলের ওপারে বিরাট এক রাজাসনে বসে আছে একজন শ্বেতাংগ। আহমদ মুসা ভাবল, এই-ই হবে ফ্রাসোয়া বিবসিয়ের।

শ্বেতাংগ লোকটি হো হো করে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘তোমরা হাত তুলে দাঁড়াও।’

আহমদ মুসা নিজে হাত তুলল। দেখে মুহাম্মাদ ইয়েকিনী এবং হাসান ইকোকুও হাত তুলল। অপরিসীম উদ্বেগ এবং আশংকা এসে তাদেরকে ঘিরে ধরেছে। তারা তাকাল আহমদ মুসার দিকে। দেখল, আহমদ মুসার মুখে ভয়-ভাবনার কোন চিহ্নই নেই। যেন কিছুই ঘটেনি। বিস্মিত হলো তারা আহমদ মুসার নার্ভের শক্তি দেখে।

ফ্রাসোয়া এগিয়ে এল। আহমদ মুসার সামনে এসে দাঁড়াল। ফ্রাসোয়ার হাতে রিভলভার। বলল আহমদ মুসার দিকে রিভলভার নাচিয়ে, ‘কই চিঠি, দাও? জন স্টিফেনের চিঠি।’

‘তার আর প্রয়োজন নেই মিঃ ফ্রাসোয়া।’ বলল আহমদ মুসা খুব স্বাভাবিক কণ্ঠে।

‘কেন?’

‘চিঠি দিয়ে যে কোন লাভ হবে না তা আপনি প্রমাণ করেছেন।’

‘তবু আমি দেখতে চাই স্টিফেনকে দিয়ে তোমরা কি লিখিয়েছ।’

‘একটাই কথা, আমাদের ইমাম সাহেবকে আমাদের হাতে তুলে দেবেন।’

আবার হো হো করে হেসে উঠল ফ্রাসোয়া। হাসি থামলে বলল, ‘মনে করেছ স্টিফেনকে দিয়ে লিখিয়ে নিলেই আমরা বিশ্বাস করবো?’

‘বিশ্বাস করবেন না তা জানি। কিন্তু চিঠি ছিল আপনার কাছ পর্যন্ত আমাদের পৌঁছার মাধ্যম।’

‘বেশ মজার লোক তো তুমি। কথা বলছ এমনভাবে যেন আমরা দুই বন্ধু। তোমার ভয় করছে না?’

‘ভয় করার মধ্যে কোন লাভ আছে? বিপদ তাতে কিছু কি কমবে?’

‘খুব সাহসের কথা বলেছ। মনে হয়, এ লাইনে তুমি খুব নতুন। ভয়ের কোন কিছু এখনও দেখনি।’

বলে ফ্রাসোয়া মুখ ঘুরিয়ে স্টেনগানধারীদের একজনের উদ্দেশ্যে বলল, ‘তোমরা একজন এসে এদের সার্চ...।’

ফ্রাসোয়া তার কথা শেষ করতে পারলো না। আহমদ মুসা বিদ্যুৎ গতিতে এক ধাপ এগিয়ে ফ্রাসোয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এক হাত দিয়ে তার হাতের রিভলভার কেড়ে নিয়ে অন্য হাত দিয়ে তার গলা পেঁচিয়ে ধরে তার মাথায় রিভলভারের নল ঠেকিয়ে বলল, ‘ওদের স্টেনগান ফেলে দিতে বল ফ্রাসোয়া। দ্বিতীয়বার নির্দেশ দেব না। তার বদলে তোমার মাথা ছাতু হয়ে যাবে।’

ঘটনার আকস্মিকতায় ফ্রাসোয়ার দু’চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে। সে নির্দেশ দিল তার তিনজন লোককে স্টেনগান ফেলে দেবার জন্যে।

ওরা স্টেনগান ফেলে দিতেই মুহাম্মাদ ইয়েকিনী ও হাসান ইকোকু দৌঁড়ে গিয়ে স্টেনগানগুলো কুড়িয়ে নিল।

‘ধন্যবাদ তোমাদের। তোমরা এখন তিনজনকে ঘরে ঢোকাও।’ মুহাম্মাদ ইয়েকিনী ও হাসান ইকোকুকে উদ্দেশ্য করে বলল আহমদ মুসা।

ইয়েকিনী ও ইকোকু স্টেনগান বাগিয়ে ওদের ঘরে ঢোকাল। দু’হাত তুলে সুবোধ বালকের মত ওরা ঘরে ঢুকল।

আহমদ মুসা ফ্রাসোয়ার মাথায় রিভলভার ধরে রেখেই তাকে ঠেলে নিয়ে ঘরে ঢুকল।

দরজা বন্ধ করে দিল। বলল ইয়েকিনীদের উদ্দেশ্য করে, 'টেবিলে ঐ দেখ কস্টিক টেপ। ওদেরকে বেঁধে ফেল।'

হাসান ইকোকু স্টেনগান ধরে ওদের পাহারা দিল। আর ইয়েকিনী পিছমোড়া করে ওদের হাত-পা বেঁধে ফেলল।

এবার আহমদ মুসা ফ্রাসোয়াকে ছেড়ে দিল। বলল, 'তুমি টেবিলের উপর বস।'

বসল ফ্রাসোয়া টেবিলের উপর। ভয়ার্ত দু'টি চোখ তার।

আহমদ মুসা তার বুকের উপর রিভলভার নাচিয়ে বলল, 'দেখ মিঃ ফ্রাসোয়া, আমার হাতে সময় খুব কম। একটা আদেশ একবার করব এবং তা তুমি তামিল করবে। অন্যথা হলে রিভলভারের বুলেট এর জবাব দেবে।' বলল আহমদ মুসা ফ্রাসোয়ার চোখের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে।

'ইমাম সাহেব কোথায়?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

ফ্রাসোয়া ভয়ার্ত চোখে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। ঠোঁট তার নড়ল, কিন্তু কথা বলল না।

আহমদ মুসার সাইলেন্সার লাগানো রিভলভারের নল বিদ্যুৎ গতিতে উঠে এল। নিঃশব্দে অগ্নি উদগীরণ করল। ফ্রাসোয়ার বাম কানের একাংশ নিয়ে তা বেরিয়ে গেল।

কান চেপে ধরে ফ্রাসোয়া বলল, 'বলছি। আমাকে মের না তোমরা।'

ইয়েকিনী এবং হাসান অবাক বিস্ময় নিয়ে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। আহমদ মুসার এই চেহারা তাদের কাছে নতুন।

একটু থেমে ফ্রাসোয়া আবার শুরু করেছিল, 'এই বিল্ডিং-এর একটা আন্ডারগ্রাউন্ড ঘরে বন্দী আছে।'

'সেখানে নামার পথ কোথায়?'

ফ্রাসোয়া আহমদ মুসার দিকে এক পলক তাকিয়ে ত্বরিত জবাব দিল, 'পাশের হল ঘর থেকে একটা সিঁড়ি নেমে গেছে আন্ডারগ্রাউন্ডে।'

‘পাশের হল ঘরে যাবার রাস্তা কোন দিকে?’

তার অফিস ঘরের একটা পার্টিশন ডোরের দিকে ইংগিত করে বলল, ‘ঐ দরজা দিয়ে হল ঘরে যাওয়া যাবে।’

‘মিঃ ফ্রাসোয়া, উঠে দাঁড়াও। তোমাকে আমাদের সাথে যেতে হবে আন্ডারগ্রাউন্ডে। কোন চালাকির সামান্য ইংগিত পেলে তোমার মাথা গুঁড়ো হয়ে যাবে।’

বলে আহমদ মুসা ইয়েকিনীকে নির্দেশ দিল, ‘এ অফিস ঘরের বাইরের দরজাটা লক করে দাও। তোমরা দু’জন চারদিকে চোখ রেখে স্টেনগান নিয়ে আমাদের পেছনে পেছনে এস। কোন মানুষকে দেখলে নির্বিচারে গুলি চালাবে।’

ফ্রাসোয়াকে নিয়ে আহমদ মুসা হল রুমে প্রবেশ করল। দেখেই আহমদ মুসা বুঝল, এটা সভা কক্ষ। অনেকগুলো দরজা চারদিকে।

আহমদ মুসা হল রুমে ঢুকেই ইয়েকিনী ও ইকোকুকে বলল, ‘তোমরা হল রুমের প্রত্যেকটা দরজা লক করে দাও।’

আন্ডারগ্রাউন্ডে নামার সিঁড়িপথটা একটা দরজার আবরণে ঢাকা। দরজা খুলতেই সিঁড়ি বেরিয়ে পড়ল।

সিঁড়ি দিয়ে আন্ডারগ্রাউন্ডে নামল তারা। আন্ডারগ্রাউন্ডে কোন প্রহরী দেখা গেল না।

ফ্রাসোয়া রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে গেল ইমাম সাহেবের কক্ষে।

ইমাম সাহেব মধ্যবয়সী মানুষ। কৃষ্ণাংগ। স্বাস্থ্য সুন্দর। থুতনিতে অল্প একটু দাড়ি। উজ্জ্বল ও বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। পবিত্র চেহারা। দেখলেই বোঝা যায়, একজন আল্লাহওয়ালা লোক।

প্রথমেই ইমাম সাহেব ফ্রাসোয়া এবং আহমদ মুসাকে দেখতে পেয়েছিল। ফ্রাসোয়ার মাথায় অপরিচিত একজন লোককে রিভলভার ধরে রাখার দৃশ্য দেখে সে ভীত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু পেছনে ইয়েকিনী ও হাসানকে আসতে দেখে তার মুখে হাসি ফুটে উঠেছিল। সে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল ইয়েকিনী ও হাসানকে। আনন্দের অশ্রু এসে জমেছিল ইমাম সাহেবের দুই চোখে।

ইমাম সাহেবকে নিয়ে তারা ফিরে এল ফ্রাসোয়ার সেই অফিস কক্ষে।

মেঝেয় পড়ে থাকা তৃতীয় স্টেনগানটি তুলে নিয়ে কাঁধে রাখল আহমদ মুসা। তারপর সে ইয়েকিনী ও হাসানকে বলল, 'তোমরা পেছনটা দেখবে।'

বলে আহমদ মুসা রিভলভারের নল দিয়ে ফ্রাসোয়ার কাঁধে একটা খোঁচা দিয়ে বলল, 'দরজা খুলুন।'

দরজা খুলে দিল ফ্রাসোয়া।

আহমদ মুসা ফ্রাসোয়ার ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে। তার রিভলভারের নল ফ্রাসোয়ার মাথায়।

দরজা খুলতেই আহমদ মুসা দেখল, উদ্যত স্টেনগান হাতে দু'জন দাঁড়িয়ে।

'স্টেনগান তোমরা ফেলে দাও।' বলল আহমদ মুসা।

স্টেনগান তাদের হাত থেকে পড়ল না।

আহমদ মুসার বাম হাত বেঁকে গিয়ে পেঁচিয়ে ধরল ফ্রাসোয়ার গলা এবং ডান হাতে ধরা তার রিভলভার সরে গেল তার মাথা থেকে। পর পর দু'বার গুলি বর্ষণ করল তার রিভলভার। স্টেনগানধারী দু'জন গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে গেল দরজার সামনেই।

রিভলভার দিয়ে ফ্রাসোয়াকে সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, 'এগোন সামনে, চলুন গাড়ি বারান্দায়।'

একটু থেমেই আহমদ মুসা আবার বলল, 'ইয়েকিনী, হাসান, স্টেনগান দু'টি তুলে নাও। শত্রুকে যত নিরস্ত্র করা যায়, ততই ভাল।'

ইয়েকিনী ও ইকোকু স্টেনগান দু'টি তুলে নিয়ে কাঁধে ঝোলাল।

এগিয়ে চলল ছোট দলটি গাড়ি বারান্দার দিকে।

আহমদ মুসা ফ্রাসোয়ার ঠিক পেছনে। তার রিভলভারের নল ফ্রাসোয়ার পিঠে সেঁটে আছে।

আহমদ মুসার পেছনেই ইমাম সাহেব।

ইমাম সাহেবের পেছনেই স্টেনগান বাগিয়ে পেছন ফিরে হাঁটছে মুহাম্মাদ ইয়েকিনী এবং হাসান ইকোকু। চোখে তাদের সতর্ক দৃষ্টি। মুখে তাদের প্রসন্ন ভাব, কোন উদ্বেগের চিহ্ন সেখানে নেই। তাদের এই ধরনের অভিযান এই প্রথম,

তবু তাদের মনে হচ্ছে, এই এক অভিযানে এসে আহমদ মুসার কাছে তারা এত কিছু শিখেছে যা বছরের পর বছরের চেষ্টায় শেখা সম্ভব ছিল না। এই সাংঘাতিক অবস্থাতেও তাদের মনে কোন উদ্বেগ নেই। কারণ, ইতোমধ্যেই তাদের বিশ্বাস জন্মেছে, তারা এমন একজন লোকের সাথী যিনি অলৌকিক বুদ্ধি, শক্তি ও সাহসের অধিকারী।

করিডোরের শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌঁছল আহমদ মুসারা। এরপরেই বারান্দা, তারপর সিঁড়ির তিন ধাপ নামলেই গাড়ি বারান্দা।

বারান্দায় করিডোরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল আরও চারজন স্টেনগানধারী।

আহমদ মুসা বাম হাত দিয়ে ফ্রাসোয়ার গলা পেঁচিয়ে ধরে রিভলভারের নল দিয়ে ফ্রাসোয়ার মাথায় একটা চাপ দিয়ে বলল, 'তোমার লোকদের নির্দেশ দাও স্টেনগানগুলো মাইক্রোবাসের সামনে রাখতে।'

আহমদ মুসাকে ইতোমধ্যেই চিনে ফেলেছে ফ্রাসোয়া। সুতরাং আহমদ মুসার নির্দেশের সংগে সংগেই সে তার লোকদের মাইক্রোবাসের সামনে নিয়ে অস্ত্র রাখার নির্দেশ দিল।

ওরা চারজন অস্ত্র রাখার জন্যে মাইক্রোবাসের দিকে চলল। আহমদ মুসাও ফ্রাসোয়াকে নিয়ে তাদের পেছন পেছন গাড়ি বারান্দায় নেমে এল।

ওরা অস্ত্র রাখলে ওদের উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে নির্দেশ দিল আহমদ মুসা। সংগে সংগেই ওরা নির্দেশ তামিল করল।

আহমদ মুসা গাড়ির আড়ালে এসে ইয়েকিনীকে গাড়ির গোটা ভেতরটা এবং ইঞ্জিনের স্টার্টার পরীক্ষা করতে বলল।

ইয়েকিনী সবটা পরীক্ষা করে বলল, 'ঠিক আছে ভাইয়া।'

'তাহলে স্টেনগানগুলো এবং ইমাম সাহেবকে তুলে নাও গাড়িতে।'

ওরা উঠলে আহমদ মুসা ফ্রাসোয়াকে টেনে নিয়ে সামনের সিটে উঠে এল। আহমদ মুসা ড্রাইভিং সিটে বসল এবং ফ্রাসোয়াকে তার পাশে সামনের সিটে বসাল।

হাসান ইকোকু বাইরে স্টেনগান বাগিয়ে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখছিল।

আহমদ মুসা ইঞ্জিনের সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নিয়ে বলল, ‘হাসান ইকোকু, তুমি উঠে এসে ফ্রাসোয়ার পাশে বস।’

হাসান ইকোকু উঠে এসে ফ্রাসোয়ার পাশে বসল। আহমদ মুসা সুইচ টিপে সবগুলো দরজা লক করে দিল।

তারপর হাতের রিভলভারটা ড্যাশবোর্ডের উপরে রেখে ফ্রাসোয়ার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, ‘আশা করি, কোন চালাকির চেষ্টা করবেন না।’

আহমদ মুসা গাড়ি ঘুরিয়ে ছুটে চলল গেটের দিকে।

দূর থেকে আহমদ মুসা দেখল, গেটের দরজা বন্ধ।

আহমদ মুসা কার-মাইক্রোফোনের সুইচ বাম হাতে অন করে বাম হাতেই স্পীকারটা ফ্রাসোয়ার হাতে তুলে দিয়ে বলল, ‘তোমার গার্ডদের বলে দাও গেট খুলে দিতে।’

গাড়ি ততক্ষণে গিয়ে দাঁড়িয়েছে একেবারে গেটের সামনে।

রাইফেলধারী গার্ড দু’জন গেটের পাশে ফ্রাসোয়ার দিকে ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল।

আহমদ মুসা মাইক্রোফোনের স্পীকার ফ্রাসোয়ার হাতে তুলে দেবার সাথে সাথে সে গেট খুলে দেবার নির্দেশ দিল।

গেট খুলে গেল।

শাঁ করে বেরিয়ে এল গাড়ি গেট দিয়ে। উঠে এল হাইওয়েতে।

আহমদ মুসা তার রিয়ার ভিউতে দেখল, আরেকটা গাড়ি কোক-এর গেট দিয়ে বেরিয়ে এসে তাদের পেছনে পেছনে হাইওয়েতে উঠল।

আহমদ মুসা আবার স্পীকারটা ফ্রাসোয়ার হাতে তুলে দিয়ে বলল, ‘তোমাদের গাড়ি পিছু নিয়েছে আমাদের। গাড়িটাকে ফিরে যেতে বল। না হলে গাড়ি আমি ওদের দিকে ঘুরিয়ে নেব। তোমাদের আরো লোকের প্রাণ যাবে, গাড়িটাও নষ্ট হবে, ফলে কিছুই করতে পারবে না।’ শান্ত অথচ কঠোর তার কণ্ঠ।

ফ্রাসোয়া আগের মত করেই তাদের গাড়িকে ঘাঁটিতে ফিরে যেতে নির্দেশ দিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই গাড়িটাকে আবার ঘাঁটির দিকে ফিরে যেতে দেখা গেল।

‘ধন্যবাদ ফ্রাসোয়া। এ ধরনের সহযোগিতা যদি করেন এবং অতীতের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে রাজি হন, তাহলে আপনাদের সাথে আমাদের সহজেই ‘নো-ওয়ার’ প্যাক্ট হতে পারে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আমাকে কোথায় নিয়ে যাবেন?’

‘কেন, জন স্টিফেনের সাথে কিছুদিন আমাদের মেহমান হতে আপত্তি আছে?’

‘আপনি কে জানি না, কিন্তু এটাই শেষ ঘটনা নয় মনে রাখবেন।’

‘কোন ঘটনাই শেষ ঘটনা নয়। তবে ভবিষ্যতের ঘটনা অতীতের মতই ঘটতে থাকবে, এমনটা ভাবাও ঠিক হবে না।’

‘দেখুন, আপনি সব জানেন না, কিংডম অব ক্রাইস্ট (KOC) একা নয়।’

‘তা আমি জানি, ‘ওকুয়া’ আছে, ‘ব্ল্যাক ক্রস’ আছে।’

‘‘ব্ল্যাক ক্রস’-এর কথা আপনি জানেন কি করে?’

‘জানা কি অসম্ভব?’

‘অসম্ভব নয়, কিন্তু ব্ল্যাক ক্রস-এর সাথে আমাদের সম্পর্ক আছে, এটা জানলেন কি করে?’

‘সেটাও কি জানা অসম্ভব?’

‘অসম্ভব নয়, কিন্তু একটু অস্বাভাবিক বৈকি! এটা খুবই গোপন ব্যাপার।’

‘দেখুন, আপনাদের কোন আঁতাত, কোন ষড়যন্ত্রই গোপন নেই।’

‘তা বুঝতে পারছি। কিন্তু আপনি... আপনি কে?’

‘সময়ে সবই জানতে পারবেন।’ কথা শেষ করে আহমদ মুসা সামনের দিকে মনোযোগ দিল। এবং মুহাম্মাদ ইয়েকিনী ও হাসান ইকোকুকে উদ্দেশ্য করে বলল, ‘আমরা জন স্টিফেনের চিঠি নিয়ে ইমাম সাহেবকে উদ্ধার করতে গিয়ে কি ধরনের আতিথ্য পেলাম, তা তোমরা কেউ লিখে ফেলো। ফাতেমা মুনেকার রিপোর্টের সাথে এটা যুক্ত করা যাবে।’

মুহাম্মাদ ইয়েকিনী ও হাসান ইকোকু আহমদ মুসা এবং ফ্রাসোয়ার মধ্যেকার কথাবার্তা উদগ্রীব হয়ে শুনছিল। তাদের কাছে আরও পরিষ্কার হয়ে গেল, তাদের মেহমান আহমদ মুসা 'কোক', 'ওকুয়া'দের জানে আগে থেকেই অনেক বেশি। এমনকি 'ব্ল্যাক ক্রস', যার নাম তারা শোনেনি, তাকেও আহমদ মুসা জানে। এসব নতুন করে জানার পর ফ্রাসোয়ার মত তাদের মনেও এ প্রশ্নটা খুব বড় হয়ে দেখা দিল, তাদের এই অতিথি আসলে কে? তাদের আরও মনে হলো, ক্যামেরুনের মুসলমানদের সাহায্যের জন্যে তারা 'ক্যামেরুন ক্রিসেন্ট' নামে যে যুব সংগঠন গড়ে তুলেছে, তার জন্যে এ রকম একজনের নেতৃত্ব পেলে মুসলমানদের বাঁচানো যেত 'ক্রস'–এর আগ্রাসন থেকে।

আহমদ মুসার কথা তাদের চিন্তায় ছেদ নামাল। তারা একটু নড়ে-চড়ে বলল, 'ঠিক আছে ভাইয়া।'

তাদের এই উত্তর আহমদ মুসার কানে বোধ হয় পৌঁছল না। তার মনে তখন অন্য চিন্তা। ক্রস যে সংঘাত চাপিয়ে দিয়েছে ক্রিসেন্টের উপর, সে রক্তক্ষয়ী সংঘাত অন্ধকার আফ্রিকায় কোন ইতিহাসের সৃষ্টি করবে! ইসলামের আলো আফ্রিকার অন্ধকার বুকে যে আলোর বন্যা সৃষ্টি করেছিল, তাকে কি আবার এবং আরও প্রোজ্জ্বলতর করে তোলা যাবে না!

# ৭

সরদার আবুবকর বিগোভিট এর বৈঠকখানা।

কথা বলছিল মুহাম্মাদ ইয়েকিনী। ইমাম সাহেবকে উদ্ধারের কাহিনীটাই সে বলছিল। শুনছিল বসে তার আব্বা-আম্মা এবং বোন ফাতেমা মুনেকা।

এই কাহিনী ইয়েকিনী ইতোপূর্বে কয়েকবার বলেছে। কিন্তু শুনে যেন কারও তৃপ্তি নেই। স্বাদ যেন কাহিনীর বাড়ছেই। পিতার নির্দেশে তাই তাকে কাহিনীটা আবার বলতে হচ্ছে।

বিশাল বৈঠকখানাটি আজ সুন্দর পরিপাটি করে সাজানো। আজ সরদার আবুবকর বিগোভিট আহমদ মুসার সম্মানে এলাকার গণ্যমান্যদের দাওয়াত করেছে।

কেউ এসে এখনও পৌঁছায়নি। আহমদ মুসা গেছে হাসান ইকোকুকে সাথে নিয়ে এলাকাটা ঘুরে দেখতে। গত দু'দিন আহমদ মুসা শুধু বেড়িয়েই কাটিয়েছে। মুসলমানদের ঘরে ঘরে গেছে। বাচ্চাদের কোলে নিয়েছে। রোগীদের পাশে গিয়ে তাদের সান্ত্বনা দিয়েছে। কুন্তা কুম্বে এলাকায় একটা ভালো ক্লিনিক করার জন্যে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এলাকাটা দেখে, এলাকার মুসলমানদের সাথে কথা বলে আহমদ মুসা মন্তব্য করেছে, ক্রস-এর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ক্যামেরুনে সংঘবদ্ধ যে প্রতিরোধ এতদিন হতে পারেনি, এখান থেকে তা শুরু হতে পারে।

'কোক'-এর কাছ থেকে যে অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে, তা দিয়ে একটা প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলার ব্যবস্থা আহমদ মুসা করেছে।

জন স্টিফেন, ফ্রাসোয়াসহ 'কোক'দের যাদেরকে আটক করা হয়েছে, তাদের কুন্তা কুম্বে এলাকার অনেক উত্তরে একটা মুসলিম এলাকায় আটক রাখা হয়েছে। তাদের মাধ্যমে কোককে জানানো হয়েছে, চারটি শর্ত পূরণ করলে তাদেরকে মুক্তি দেয়া হবে। কিন্তু কতজন এবং কারা বন্দী আছে, সে কথা

‘কোক’কে জানতে দেয়া হয়নি। অন্যদিকে পুলিশকে বলা হয়েছে, আক্রমণকারী প্রায় সবাই মারা গেছে। এই সতর্কতার মাধ্যমে বাইরের প্রতিক্রিয়া এড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে। অন্যদিকে জন স্টিফেন ও ফ্রাসোয়াকে আরও চাপের মধ্যে ফেলা হয়েছে, যাতে তারা দাবি মেনে নিতে তৎপর হয়।

প্রথম শর্ত হলোঃ কুন্তা কুম্বে এলাকার যে জমিখণ্ড ‘কোক’ প্রতারণামূলকভাবে কিনে নিয়েছে এবং ইয়াউন্ডিগামী হাইওয়ের দক্ষিণে ইদেজা অঞ্চলের যে হাজার হাজার একর মুসলিম ভূমিখণ্ড ‘কোক’ গত পাঁচ বছরে জাল দলিল, জবরদস্তিমূলক ক্রয় এবং নানা প্রতারণার মাধ্যমে দখল করে নিয়েছে, তা ফেরত দিতে হবে। দ্বিতীয় শর্তঃ ইদেজা অঞ্চল থেকে গত পাঁচ বছরে উচ্ছেদকৃত মুসলমানদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে যাতে তারা আবার বাড়ি-ঘর তৈরি করে পুনর্বাসিত হতে পারে। তৃতীয় শর্তঃ প্রকৃত খ্রিস্টান মিশনারীরা তাদের কাজ চালাতে পারবে, কিন্তু সেবার নামে ষড়যন্ত্ররত সকল এনজিও-এর কাজ বন্ধ করে দিতে হবে। এবং চতুর্থ শর্ত হলোঃ ‘কোক’কে তার অতীতের সকল দুষ্কর্ম স্বীকার করে লিখিতভাবে মুসলমানদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। ‘কোক’ যতদিন এ শর্তগুলো পূরণ না করবে, ততদিন ‘কোক’-এর লোকদের আটক রাখা হবে।

সরদার আবুবকর বিগোভিট এবং তার পরিবারের সদস্যরা বৈঠকখানায় বসে মেহমানদের অপেক্ষা করছে এবং ইয়েকিনীর কাছ থেকে কাহিনী শুনছে ইমাম সাহেবকে উদ্ধারের।

কাহিনী শেষ করে থামল মুহাম্মাদ ইয়েকিনী।

‘সেদিনের সে ভোর থেকে আজ পর্যন্ত আহমদ মুসা ভাইয়ার সবকিছুই আমার কাছে রূপকথা মনে হচ্ছে। আর তিনি যেন রূপকথার সর্বজয়ী এক রাজপুত্র।’ বলল ফাতেমা মুনেকা।

‘কিন্তু রাজপুত্রের রাজকন্যা তো নেই।’ বলল মুহাম্মাদ ইয়েকিনী।

‘থাকবে না কেন, তার রূপকথার জগত তো আমরা দেখিনি, আমরা চিনি না।’ বলল ফাতেমা মুনেকা।

‘সত্যি বলেছিস মা, তার আমরা কিছুই চিনি না, কিছুই জানি না। মাঝে মাঝে আমার মনে কি হচ্ছে জানিস, ও আসলে ফেরেশতা। আল্লাহ পাঠিয়েছেন

আমাদের মত অসহায়দের জন্যে। দেখ না, কি দুঃসময়ে সে নাযিল হয়েছে, আর কিভাবে সব ঘটনার মোড় আমাদের অনুকূলে ফিরিয়ে দিল।' বলল সরদার আবুবকর বিগোভিট।

তার কথা শেষ না হতেই হেসে উঠেছিল ফাতেমা মুনেকা। তার আব্বা থামতেই সে বলল, 'আব্বা তুমি মজার কথা মনে করিয়ে দিয়েছ। আমি কালকে যাচ্ছিলাম স্কুলের দিকে। 'মোকাচি' চাচাজানের চার বছরের মেয়েটি ছুটে আমার কাছে এসে বলল, 'ফেরেশতা কোথায়? আসেনি?'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'ফেরেশতা কোথায়? আসবে কোত্থেকে?'

'ইশ, মিথ্যে বলছ। বল না।'

আমি বললাম, 'বোকা মেয়ে। আমি ঠিক বলছি। ফেরেশতা কোত্থেকে আসবে?'

এই সময় চাচী মা এলেন। তিনি শুনছিলেন আমাদের কথা। হেসে বললেন, 'আয়েশা ঠিকই বলেছে।'

'কি ঠিক বলেছে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'তুমি জান না? তোমাদের যে মেহমান, তাকে তো সবাই ফেরেশতা বলছে।'

'কেন?'

'এমন মানুষ হঠাৎ কোত্থেকে আসবে? আর এমন সময়ে? আল্লাহ তো ফেরেশতা পাঠান এভাবে।'

উত্তরে আমি কিছু বলিনি আব্বা। হাসতে হাসতে চলে গিয়েছিলাম। এখন দেখছি, তুমিও একই কথা বলছ।'

'ওদের কোন দোষ নেই, আমারও দোষ নেই। যখন কোন ঘটনার কোন বোধগম্য ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, তখন এভাবে একটা উত্তর যোগাড় করে নিতে হয়। তাছাড়া এভাবে ফেরেশতা তো আল্লাহ পাঠাতে পারেন মানুষের সাহায্যে।'

ফাতেমা মুনেকা গম্ভীর হলো। বলল, 'ঠিকই বলেছ আব্বা, ব্যাখ্যা না পেয়েই আমি তাকে রূপকথার রাজপুত্র বলেছি। একইভাবে ফেরেশতাও তাকে বলা যেতে পারে। কিন্তু আসলেই উনি কে আব্বা?'

এই সময় বাইরে গলার শব্দ পাওয়া গেল।

মুহাম্মাদ ইয়েকিনী তাড়াতাড়ি উঠে গেল। বাইরে একটু নজর বুলিয়ে ভেতরে মুখ বাড়িয়ে বলল, 'ইমাম সাহেব এসেছেন।'

ফাতেমা মুনেকা এবং তার মা সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আমরা পর্দার ওপাশে যাচ্ছি।' বলে চলে গেল পর্দার ওপাশে।

বৈঠকখানার বিরাট হল ঘরের একটা অংশকে পর্দা টাঙিয়ে আলাদা করা হয়েছে।

ইয়েকিনী ইমাম সাহেবকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল।

মধ্যবয়সী ইমাম সাহেবের নাম আলী উকেচুকু। সে লেখাপড়া করেছে নাইজেরিয়ার ঐতিহাসিক মুসলিম নগরী 'কানো'র 'আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া' বিশ্ববিদ্যালয়ে।

ইমাম আলী উকেচুকু শুধু ইমামের দায়িত্বই পালন করেন না, এখানকার মাদ্রাসায় তিনি শিক্ষকতাও করেন। সরদারের তিনি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উপদেষ্টারও দায়িত্ব পালন করেন।

ইমাম সাহেব বসলে সরদার ইমাম সাহেবকে লক্ষ্য করে বলল, 'আপনি আসার আগের মুহূর্তে ফাতেমা মুনেকার প্রশ্ন ছিল, অলৌকিক মেধা ও বুদ্ধিসম্পন্ন আমাদের মেহমানের আসল পরিচয় কি?'

ইমাম আলী উকেচুকুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আনন্দে। বলল, 'আমিও দু'দিন ধরে এ বিষয়টা ভেবেছি। আমি মনে হয় তাকে চিনতে পেরেছি সরদার।'

'আপনি তাকে চিনতে পেরেছেন হুযুর?' পর্দার ওপার থেকে বলল ফাতেমা মুনেকা।

'হ্যাঁ মা, আমি তাকে চিনতে পেরেছি। আমি এখানে আসার আগে টেবিলের কাগজপত্র গোছাতে গিয়ে গত বছর 'কানো'র আন্তর্জাতিক সেমিনার থেকে যে কাগজপত্র এনেছিলাম, তা হাতে পড়ল। সে কাগজপত্র ঘাঁটার সময় যত্ন করে একটা এনভেলাপে তুলে রাখা ফটো পেয়ে গেলাম। ফটোটা ওখানকার দৈনিক থেকে কেটে নিয়েছিলাম। এই ফটোর দিকে নজর পড়ার সাথে সাথে সব কিছু মনে পড়ে গেছে আমার।'

‘ফটোটা কার?’ ইয়েকিনীর কণ্ঠে অধৈর্য্যের সুর।

‘এই ফটোটাই আমাদের মেহমান আহমদ মুসার।’

‘এতে আর কি হলো? কি বোঝা গেল?’ বলল ইয়েকিনী।

‘বলছি বাবা।’ বলে হাসল ইমাম সাহেব। তারপর একটু থামল। গম্ভীর হলো তার মুখ। বলল, ‘আসলে আমি বড় বোকা। মেহমানের নাম শুনে এবং তার কাজ দেখেই আমার বোঝা উচিত ছিল ইনি কে? কিন্তু আমি পারিনি। কারণ, নাম একইরকম হলেও বহু বিপ্লবের নায়ক, বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিত্ব যে আমাদের এই কুন্তা কুম্বেয় আমাদের মাঝে আসবেন তা ভাবতেই পারিনি।’

ইমাম সাহেবের কথা শেষ না হতেই ইয়েকিনী ছিটকে উঠে দাঁড়াল এবং পর্দার ওপার থেকে ফাতেমা মুনেকা ছুটে বেরিয়ে এল মাথা ও গায়ের চাদর জড়িয়ে ধরে। বলল দু’জনেই, ‘হুযুর, এ আপনি কি বলছেন, ইনিই কি সেই আহমদ মুসা?’ তাদের দু’জনের চোখে-মুখে আকাশজোড়া বিস্ময় উপচে পড়ছে।

‘কোন আহমদ মুসার কথা বলছ? তোমরা চেন তাকে?’ বলল সরদার আবুবকর।

‘আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে মক্কার রাবেতা জার্নালে তার সম্পর্কে পড়েছি। অন্যান্য কাগজেও পড়েছি। আব্বা, ফিলিস্তিন, মিন্দানাও, মধ্য এশিয়া, ককেশাস, বলকান, স্পেন প্রভৃতি বিপ্লব ও পরিবর্তনে তিনিই নেতৃত্ব দিয়েছেন।’

বৃদ্ধ আবুবকর বিগোভিট-এর চোখে-মুখে নেমে এল প্রথমে একরাশ বিস্ময়! তারপর সে বিস্ময়ের স্থানে ফুটে উঠল উজ্জ্বল এক আনন্দের দ্যুতি। বলল, ‘ঠিকই বলেছ তোমরা। যাকে ফেরেশতা ভেবেছি, তিনি ফেরেশতা না হলেও জগতের শ্রেষ্ঠ মুজাহিদ অবশ্যই হবেন।’

ইমাম আলী উকেচুকু পকেট থেকে খবরের কাগজ থেকে কেটে নেয়া একটি ছবি টেবিলে রাখল।

ইয়েকিনী ও ফাতেমা মুনেকা ঝুঁকে পড়ল ছবির উপর। সাদা শার্টের উপর কোট-টাই পরা একজন যুবক। ছবিটির নিচে ক্যাপশনঃ ‘আহমদ মুসা-গ্রেটেস্ট রিভ্যুলুশনারী অব দ্য এজ’।

ফাতেমা মুনেকা ছবিটি নিয়ে ছুটে তার পিতার কাছে গিয়ে বলল, 'দেখ আব্বা, আমাদের মেহমান। কোন পার্থক্য নেই। ইউরোপীয় পোশাক বাদ দিয়ে দেখ।'

বাইরে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। ঘরের সবাই সেদিকে তাকাল।

ঘরে এসে প্রবেশ করল আহমদ মুসা এবং হাসান ইকোকু। দরজায় পা দিয়েই আহমদ মুসা সালাম দিয়েছিল।

সালাম নিয়ে ফাতেমা মুনেকা ছুটল হাসান ইকোকুর দিকে। তার সামনে ছবিটি মেলে ধরল। ছবি ও ক্যাপশনের দিকে তাকিয়ে ভ্রু কুঞ্চিত হলো হাসান ইকোকুর। সে ছবি থেকে চোখ তুলে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। তার চোখে অফুরান বিস্ময় ও শত জিজ্ঞাসা।

আহমদ মুসা তার এই পরিবর্তন দেখে তার দিকে এগিয়ে গেল এবং ছবিটি নিল মুনেকার হাত থেকে। ছবির দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা সে বুঝল। হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটে।

কিন্তু সে তাকিয়ে দেখল, কারও মুখে হাসি নেই। শুধু তাই নয়, আহমদ মুসা ঘরে ঢোকার সাথে সাথে সরদার আবুবকর, ইমাম আলী উকেচুকুসহ সবাই দাঁড়িয়ে গেছে এবং দাঁড়িয়ে আছে। সবাই বিস্ময়-বিহ্বলতা নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

আহমদ মুসা ছবিটা ফাতেমা মুনেকার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে চেয়ারে এসে বসল এবং সবাইকে বসতে অনুরোধ করে বলল, 'বুঝতে পারছি, আমার পরিচয় আপনারা জেনে গেছেন। আমিও গোপন রাখতাম না।'

সবাই বসল। কিন্তু মুহাম্মাদ ইয়েকিনী ও হাসান ইকোকু আগে হলে যেভাবে কাছে এসে বসত, সেভাবে তারা বসল না। বসল দূরে গিয়ে।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'ইয়েকিনী, হাসান ইকোকু, আমার পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ার পর আমি কি পর হয়ে গেলাম, দূরে সরে গেলে এমন করে!'

কিন্তু তাদের মুখভাবের পরিবর্তন ঘটল না। তারা কথা বলল না। বলতে পারল না।

বিস্ময় ও সংকোচের জড়তা সবাইকে জড়িয়ে আছে।

অস্বস্তিকর নীরবতা ভাঙল সরদার আবুবকর। বলল, ‘কি বলব, কিভাবে বলব বুঝতে পারছি না। ইমাম সাহেবের কাছে ছবি দেখে আমরা আপনার পরিচয় জানতে পেরেছি। ইয়েকিনী ও ফাতেমাও আপনার সম্পর্কে অনেক পড়েছে শুনলাম। এত বড় অতিথি যে আমাদের মাঝে, বুঝতে পারিনি আমরা। কত যে বেআদবি হয়েছে আমাদের!’ আবেগে রুদ্ধ হয়ে গেল বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর। তার দু’চোখ দিয়ে বেরিয়ে এল দু’ফোঁটা অশ্রু।

আহমদ মুসা বৃদ্ধের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, ‘আপনি আমার পিতার মত। আপনি এভাবে কথা বললে আমি দুঃখ পাব। আমার প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন আমাকে খুব পীড়া দেয়। আপনাদের কাছে আমার পরিচয় না দেয়ার একটা বড় কারণ এটাই। আমার সবচেয়ে বড় পরিচয়, আমি মুসলিম, আমি আপনাদের কারও সন্তান, কারও ভাই- এ পরিচয়কেই আমি সবচেয়ে ভালবাসি।’ আহমদ মুসার কথাগুলো খুব শান্ত, খুব ভারি শোনাল।

আহমদ মুসার হৃদয় নিঃসৃত কথাগুলো অন্তর স্পর্শ করল সকলের। এক আনন্দময় আবেগ ফুটে উঠল তাদের চোখে-মুখে।

কিন্তু কথা কেউ বলতে পারল না। এবারও বৃদ্ধ সরদারই মুখ খুলল। বলল, ‘আপনি কত বড়, একথাগুলোও তার প্রমাণ...’

কথা শেষ করতে পারলো না সরদার আবুবকর। বাইরে অনেকগুলো পায়ের শব্দ এবং অনেকের কণ্ঠ শোনা গেল।

বৃদ্ধ সরদার চোখ মুছে মুহাম্মাদ ইয়েকিনীকে বলল, ‘মেহমানদের নিয়ে এস, বসতে দাও।’

ফাতেমা মুনেকা উঠে চলে যাচ্ছিল পর্দার ওপারে মেয়েদের জন্যে নির্দিষ্ট জায়গায়। তার চোখের দুই কোণ অশ্রুসিক্ত।

‘ফাতেমা বোন।’ ডাকল আহমদ মুসা।

ফাতেমা থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়েছিল। ফাতেমা মুনেকার দিকে এক ধাপ এগিয়ে বলল, ‘রিপোর্টের রেকর্ড সম্পূর্ণ করেছ?’

ফাতেমা মুনেকা চোখ তুলে তাকাতে পারল না আহমদ মুসার দিকে। মুখ নিচু রেখেই বলল, 'জ্বি, সম্পূর্ণ করেছি।' ফাতেমা মুনেকার কথা সংযত ও সম্ভ্রমপূর্ণ।

'ইদেজার রিপোর্টও রেকর্ড করেছ?'

ফাতেমা মুনেকা আহমদ মুসার দিকে এক পলক তাকিয়ে বলল, 'জ্বি, করেছি।'

'ধন্যবাদ, ফাতেমা।' বলে আহমদ মুসা তার চেয়ারে ফিরে এল।

ফাতেমা চলে গেল।

সব মেহমান আসার পর খাওয়ার আগে সরদার আবুবকর বিগোভিট আহমদ মুসার নতুন পরিচয় প্রকাশ করল সকলের কাছে। সকলেই আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মত খুশি হলো। সকলে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিয়ে স্বাগত জানাল আহমদ মুসাকে।

আহমদ মুসাও বর্তমান সংকটকালের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে কিছু বলল।

খাবার শেষে সকলে চলে যাবার পর সরদার আবুবকরের বৈঠকখানায় বসে থাকল আহমদ মুসা, মুহাম্মাদ ইয়েকিনী, হাসান ইকোকু, সরদার আবুবকর। পরে ফাতেমা মুনেকা এবং তার মা'ও এসে বসল।

এবার প্রথম কথা বলল হাসান ইকোকু। বলল আহমদ মুসাকে উদ্দেশ্য করে, 'কিছু মনে করবেন না। মনে হচ্ছে, আপনি এক নিমেষে আকাশে উঠে গেছেন এবং আমরা মাটিতে রয়েছি। কিছুতেই যেন আপনার নাগাল পাচ্ছি না।'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'এটা আমার দুর্ভাগ্য।'

'তা মনে করতে পারেন। কিন্তু জাতির জন্যে এটা সৌভাগ্য।' বলল ফাতেমা মুনেকা।

'তাহলে সবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকাটাই আমার ভাগ্য?'

'উপরে থাকাকে বিচ্ছিন্ন বলে না।' বলল ইয়েকিনী।

'আপনার সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু জানতে চাই।' বলল হাসান ইকোকু।

‘কিছুই জানার নেই। বলেছি, আমার জন্ম মধ্য এশিয়ার সিংকিয়াং-এ। আর নাম তো আমার জানই। অন্য সব কথাই শুনেছ।’

আহমদ মুসা একটু থামল। শুরু করল আবার, ‘জনাব, আজ আমি ইয়াউন্ডি যেতে চাই।’ সরদারকে উদ্দেশ্য করে বলল আহমদ মুসা।

সকলের মুখ ম্লান হয়ে গেল আহমদ মুসার একথায়। হঠাৎ পাল্টে গেল ঘরের পরিবেশ।

বৃদ্ধ সরদার দ্রুত কণ্ঠে বলল, ‘যাবেন? কেন? আজই? এদিকে যে সমস্যা থেকেই গেল?’

‘এত তাড়াতাড়ি কেন? নিশ্চয় অসন্তুষ্ট হয়েছেন?’ বলল মুহাম্মাদ ইয়েকিনী।

‘না, আপনার যাওয়া হবে না। গত দু’দিন যিনি ছিলেন, তিনি প্রকৃত আহমদ মুসা নন। আজ আমরা প্রকৃত আহমদ মুসাকে পেলাম। কমপক্ষে দু’দিন থাকতে হবে।’ বলল ফাতেমা মুনেকা।

হাসল আহমদ মুসা। সকলেই হাসল মুনেকার একথায়।

‘ফাতেমা বোন, যদি সব কথা জানতে, দু’দিন নয়, দু’ঘণ্টাও থাকতে বলতে পারতে না।’ একটু থামল আহমদ মুসা। টেবিলে রাখা গ্লাস থেকে পানি খেল। তারপর বলল, ‘যে ভোরে আমি এখানে এসেছি, সেই ভোরেই আমি ইয়াউন্ডি পৌঁছতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আযান শুনে নামায পড়তে এসে আটকে গেলাম। আল্লাহই এখানে আমাকে নিয়ে এসেছিলেন। এখানকার জরুরি কাজগুলো শেষ হয়েছে। আর দেরি করা যায় না।’

‘দেখুন, কত বড় ভুল আমাদের! আপনাকে জিজ্ঞেস করা হয়নি, ক্যামেরুনে আসার আপনার উদ্দেশ্য কি? ইয়াউন্ডিতে কেন যাচ্ছিলেন?’ বলল সরদার আবুবকর।

‘ঠিক বলেছ আব্বা। এমন জিজ্ঞাসা আমাদের মনে জাগা উচিত ছিল। আমি আমেরিকান জার্নালের এক রিপোর্টে পড়েছিলামঃ ‘আহমদ মুসা ঝড়ের ডাকে ঝড় নিয়েই কোথাও যায়। তার প্রতিটি পদক্ষেপ ইতিহাস।’ বলল ফাতেমা মুনেকা।

'একদিক দিয়ে ঠিকই বলেছে ওরা। ঝড়ো পরিস্থিতিই আমাকে টেনে নিয়ে যায়, অথবা ঠেলে নিয়ে যায়। ক্যামেরুনে মুসলিম জাতিসত্তা বিলোপের যে ঝড় উঠেছে, 'ক্রস'-এর আগ্রাসী বন্যা 'ক্রিসেন্ট'কে ভাসিয়ে নেয়ার যে পরিস্থিতি-তা-ই আমাকে ক্যামেরুনে টেনে এনেছে।'

থামল আহমদ মুসা। সকলের চোখ আহমদ মুসার উপর নিবদ্ধ।

গম্ভীর হয়ে উঠেছে আহমদ মুসার মুখ। শুরু করল তার কথা আবার, 'দু'জন লোককে ফ্রান্স থেকে কিডন্যাপ করে আনা হয়েছে ক্যামেরুনে। মূলত তাদের উদ্ধারের জন্যেই আমি তাদের পেছনে পেছনে ছুটে এসেছি ক্যামেরুনে।

এই কিডন্যাপের পেছনে জড়িয়ে রয়েছে ক্যামেরুনের দক্ষিণাঞ্চল থেকে মুসলিম উচ্ছেদের বিরাট এক কাহিনী। সমগ্র দক্ষিণ ক্যামেরুনের মত উপকূলীয় কাম্পু উপত্যকা থেকেও মুসলমানদের উচ্ছেদ করা হয়েছে। এই কাম্পু ছিল দক্ষিণ ক্যামেরুনের সর্বশেষ মুসলিম বসতি। কিন্তু কাম্পু উপত্যকা থেকে সব মুসলিম পরিবার উচ্ছেদ হলেও দশ হাজার একরের একটা ভূখণ্ডের মালিক ওমর বায়া খ্রিস্টানদের ভয়, হুমকি, নির্যাতন কোন কিছুর কাছে নতি স্বীকার করেনি। তার আব্বাকে খুন করা হয়। যখন কাম্পু এলাকায় তার এক পরিবারের জন্যে বাস করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, সে পালিয়ে আসে উত্তর ক্যামেরুনের পশ্চিমাঞ্চলে। তবু সে জমি খ্রিস্টানদের দেয়নি। 'কোক'-এর সন্ত্রাসবাদী সহযোগী সংগঠন 'ওকুয়া' ছুটে আসে ওমর বায়ার পেছনে পেছনে। তারা ওমর বায়াকে খুন করার জন্যে হামলা করে, ওমর বায়া প্রাণ বাঁচাতে সমর্থ হয়। কিন্তু খুন হয় তার মা। প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ওমর বায়া পালিয়ে যায় ফ্রান্সে। 'ওকুয়া'ও ছুটে যায় ফ্রান্সে। 'ব্ল্যাক ক্রস'-এর সাহায্য নিয়ে তারা চেষ্টা করে ওমর বায়াকে কিডন্যাপ করতে।'

এইভাবে আহমদ মুসা কিভাবে এক হোটেলে ওমর বায়াকে বাঁচাতে গিয়ে তার সাথে আহমদ মুসার পরিচয় হয়, কিভাবে ব্ল্যাক ক্রস পরে ওমর বায়াকে কিডন্যাপ করে, কিভাবে আহমদ মুসা তাকে উদ্ধার করে, কিভাবে ওমর বায়া আবার কিডন্যাপ হয় এবং তাকে কিভাবে কফিনে করে ক্যামেরুনে নিয়ে এসেছে, তার বিস্তারিত কাহিনী বর্ণনা করে আহমদ মুসা বলল, ''ব্ল্যাক ক্রস' ও 'ওকুয়া' ক্যামেরুনের চীফ জাস্টিসের এক প্রিয়জনকেও কিডন্যাপ করে এনেছে। তাদের

লক্ষ্য, তাকে পণবন্দী রেখে চীফ জাস্টিসকে বাধ্য করে ওমর বায়ার জমি তারা হস্তান্তর করে নেবে এবং তারপর ওমর বায়াকে খুন করে সব সমস্যার ইতি ঘটাবে।'

থামল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা থামলেও কেউ কোন কথা বলল না। সকলের বিস্ময় ও বেদনাপীড়িত দৃষ্টি আহমদ মুসার উপর নিবদ্ধ। আর তাদের চোখে ভাসছে আহমদ মুসা বর্ণিত কাহিনীর দৃশ্যগুলো।

বেশ কিছু পর কথা বলল মুহাম্মাদ ইয়েকিনী, 'আপনি এসেছেন, 'ব্ল্যাক ক্রস' এবং 'ওকুয়া' কি জানে?'

'বোধ হয় জানে না। আমি মরে গেছি- এই ধারণা তারা নিশ্চয় এখনও পোষণ করে।' বলল আহমদ মুসা।

'কেন?' বলল হাসান ইকোকু।

'ফ্রান্সের লা-ইল থেকে যখন তারা ওমর বায়াকে কিডন্যাপ করে, আমি তাদের পিছু নিয়েছিলাম। পথে এক জায়গায় ওরা আমার গাড়িতে বোমা হামলা চালায়। বোমা বিস্ফোরণের পূর্ব মুহূর্তে আমি গাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে সমর্থ হই। বোমা বিস্ফোরণে গাড়ি টুকরো টুকরো হয়ে যায়। আমি যখন পথের পাশে ঝোপের আড়ালে অবসাদগ্রস্তের মতো নির্জীব হয়ে পড়েছিলাম, তখন ওরা প্রজ্জ্বলিত গাড়ি দেখে নিশ্চিত হয়ে যায় যে, আমি গাড়ির সাথে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছি।'

'কিন্তু তারপরও তো ওদের সাথে আপনার সংঘাত হয়েছে?'

'হয়েছে। কিন্তু সেটা যে আমি ছিলাম সেটা তারা সম্ভবত বোঝেনি।'

আহমদ মুসা থামলেও কেউ কথা বলল না।

ফাতেমা মুনেকা একটু পর বলল, ''ব্ল্যাক ক্রস' ও 'ওকুয়া' এখানে 'কোক'-এর লোকদেরও সহায়তা পাবে। এদের মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে আপনি একা।'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'শত্রু কত বড়, কত শক্তিশালী সেটা ভাবার সময় নয় এটা। আমি এখন যুদ্ধক্ষেত্রে। আমার লক্ষ্য আমার ভাইকে মুক্ত করা,

শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রতিরোধের চেষ্টা করা। সাফল্য-ব্যর্থতা আমার হাতে নয়, সে চিন্তাও আমার নেই।'

'বাবা, এই আল্লাহ নির্ভরতাই আপনাকে জগতজোড়া নাম দিয়েছে, সাফল্য দিয়েছে। আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন।'

'আমাদের একটি ছোট্ট সংগঠন আছে।' বলল হাসান ইকোকু।

'সংগঠন? কি নাম?' মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আহমদ মুসার।

'ক্যামেরুন ক্রিসেন্ট।' বলল মুহাম্মাদ ইয়েকিনী।

'বাহ, সুন্দর নাম! কবে করেছ? কোথায় অফিস? কতজন সদস্য? কি উদ্দেশ্য?' প্রশ্নের বান ডাকল আহমদ মুসার আনন্দিত মুখে।

'ইয়াউন্ডির মুসলিম ছাত্র-যুবক মিলে আমরা করেছি। দুয়ালাসহ কয়েকটি শহরে আমরা শাখা করেছি। সব মিলে আমাদের সদস্য সংখ্যা এখন পাঁচশ'। ইয়াউন্ডিতে আমাদের মূল অফিস। আমাদের লক্ষ্য, মুসলমানদেরকে আর্থিক ও আইনগত সহায়তা দেয়া এবং তাদের পুনর্বাসনে সাহায্য করা।'

'চমৎকার। তোমাদের নেতা কে?'

চট করে জবাব দিল মুহাম্মাদ ইয়েকিনী। বলল, 'আমাদের হাসান ইকোকু সেক্রেটারি জেনারেল।'

মুহাম্মাদ ইয়েকিনীর কথা শেষ না হতেই আহমদ মুসা উঠে গিয়ে হাসান ইকোকুকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খেয়ে বলল, 'মোবারকবাদ হাসান।'

লজ্জিত হাসান ইকোকু মাথা নত করে বলল, 'দোয়া করবেন।'

বলেই হাসান ইকোকু ইয়েকিনীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'নিজের কথা বলেনি ও। ইয়েকিনী আমাদের সংগঠনের পরিকল্পনা সম্পাদক।'

আহমদ মুসা ইয়েকিনীকে কাছে টেনে নিয়ে তার পিঠ চাপড়ে বলল, 'আসল পদটা তুমি পেয়েছ ইয়েকিনী।'

'তোমাদের সভাপতি কে?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'গারুয়ার রাজপুত্র আবদুল্লাহ রাশিদি ইয়েসুগো। সেও ইয়াউন্ডি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।'

''গারুয়ার রাজপুত্র' কথার অর্থ পরিষ্কার হলো না।' বলল আহমদ মুসা।

‘উত্তর ক্যামেরুনের মান্দারা পর্বতের দক্ষিণে নাইজেরিয়া ও চাদ-এর মাঝখানে বেনু নদী এবং বেনুর উপনদীগুলো দ্বারা বিধৌত বিশাল উপত্যকার নাম গারুয়া। এই গারুয়া উপত্যকার মাঝখানে বেনু নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত ‘গারুয়া’ নগরী। নাইজেরিয়ার ‘কানো’ যেমন নাইজেরিয়ার ঐতিহাসিক মুসলিম নগরী, তেমনি ‘গারুয়া’ ক্যামেরুনের ঐতিহ্যবাহী মুসলিম শহর। এই শহর ছিল ‘গারুয়া’ উপত্যকা, লেক চাদ পর্যন্ত ক্যামেরুনের গোটা এলাকা এবং চাদ ও নাইজেরিয়ার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত মুসলিম সালতানাতের রাজধানী। উনবিংশ শতকে ফরাসি শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার সময় ইয়েসুগো রাজবংশের মুসলিম শাসকের সাথে তাদের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। শেষ পর্যন্ত ফরাসীরা তাদের স্বায়ত্তশাসন স্বীকার করে নেয়। পরে ঔপনিবেশিক ষড়যন্ত্রে ইয়েসুগো মুসলিম সালতানাতের অবলুপ্তি ঘটলেও ইয়েসুগো পরিবার উত্তর ক্যামেরুনের গারুয়া উপত্যকায় অত্যন্ত প্রভাবশালী। ভূখণ্ডগত সালতানাত তাদের না থাকলেও মানুষের মনের সালতানাতে তারা এখনও বাদশাহ। আবদুল্লাহ রাশিদি ইয়েসুগো গারুয়ার এই রাজবংশের সন্তান। ইতিহাসের ছাত্র সে। আপনার দেখা পেলে সে আকাশের চাঁদ পাওয়ার মত খুশি হবে।’ দীর্ঘ বক্তব্যের পর থামল ইয়েকিনী।

‘ইয়েকিনীর বর্ণনার মধ্যে উৎসাহ যেন একটু বেশিই ছিল, তাই না হাসান? তবে রক্ষা, রাজকন্যার বিবরণ আসেনি।’ মুখ টিপে হেসে বলল ফাতেমা মুনেকা।

মুহাম্মাদ ইয়েকিনীর মুখে লজ্জার একটা ছায়া নামল। তাদের আব্বা-আম্মা যেখানে বসেছিল সেদিকে এক পলক চেয়ে বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে ইয়েকিনী বলল, ‘চোরের সাক্ষী বানানো হচ্ছে গাঁইট কাটাকে। বলব তোদের দু’জনের কথা আহমদ মুসা ভাইকে?’

ইয়েকিনীদের আম্মা কিছু আগে ভেতরে গিয়েছিল এবং তাদের আব্বাও সম্ভবত উঠে গিয়েছিল টয়লেটে।

‘ক্ষেপছ কেন? আমি মিথ্যা বা খারাপ কিছু বলিনি।’ বলল ফাতেমা মুনেকা।

ইয়েকিনীর কথায় ফাতেমা মুনেকা ও হাসান ইকোকু দু'জনের মুখেই বিব্রতকর ভাব ফুটে উঠেছিল।

ইয়েকিনী কিছু বলতে যাচ্ছিল, আহমদ মুসা তাকে বাঁধা দিয়ে হেসে বলল, 'আমি জানি, তোমরা মিথ্যা কেউ বলনি। ফাতেমা ও হাসানকে আমি দেখছি। তাদের কথা না বললেও চলবে। ইয়েসুগো রাজকন্যার কথা আরেকদিন শুনব।'

মুহাম্মাদ ইয়েকিনী, ফাতেমা মুনেকা, হাসান ইকোকু তিনজনের চোখে-মুখেই এক ঝলক লজ্জা নেমে এল। মুখ নিচু করেছিল তারা তিনজনেই।

কথা শেষ করে একটু থামল আহমদ মুসা। গম্ভীর হলো তার মুখ। বলল, 'তোমাদের 'ক্যামেরুন ক্রিসেন্ট'-এর কথা শুনে কি খুশি হয়েছি বোঝাতে পারবো না। আমি আফ্রিকার এ অঞ্চলের অন্ধকার বুকে একে আলোর সূর্য মনে করছি। ইয়াউন্ডি গিয়ে নিশ্চয় এ সংগঠনের সাথে আরও পরিচিত হতে পারব।'

'ইনশাআল্লাহ।' বলল ইয়েকিনী এবং হাসান দু'জনেই।

এ সময় সরদার আবুবকর বিগোভিট প্রবেশ করল বৈঠকখানায়।

আহমদ মুসা তাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'জনাব, আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে যাত্রা করতে চাই, আপনি অনুমতি দিন।'

'এ কি বাবা! তুমি আমাদের সকলের সরদার। তুমি বিশ্বের মজলুম মুসলমানদের মাথার মণি। তুমি অনুমতি চাচ্ছ আমার কাছে! আর অপরাধী করো না বাবা।' বৃদ্ধের শেষ কথাগুলো ভেঙ্গে পড়ল বুক উপচানো আবেগে।

একটু দম নিল। তারপর আবার শুরু করল, 'অবশ্যই তুমি যাবে বাবা। সবকিছুর চেয়ে মূল্যবান তোমার সময়। বিশেষ কাজেই আল্লাহ তোমাকে এখানে এনেছিলেন। কাজ না থাকলেও তুমি আমাদের দেখতে আসবে, এ আশা আমরা অবশ্যই করব।'

'দোয়া করুন, এমন অবসর যেন আমার হয়। শান্তি যেন আসে সব দেশে, গোটা দুনিয়ায়।'

'তুমি একা যাবে ইয়াউন্ডি?'

‘একাই এসেছিলাম, একা যেতে কোন অসুবিধা নেই। তবে কেউ সাথে গেলে খুশি হবো।’

‘কাকে সাথে নিতে চাও? বল?’

‘হাসান ইকোকুর এখানে প্রয়োজন আছে। ইয়েকিনীকে ছাড়তে পারেন কিনা।’

‘তুমি যাকে ইচ্ছা নিয়ে যাবে, জিজ্ঞাসার কোন প্রয়োজন নেই বাবা।’

আহমদ মুসা ইয়েকিনীর নাম করার সাথে সাথে ইয়েকিনী লাফিয়ে উঠেছিল ‘আল্লাহু আকবার’ বলে। ছুটে গিয়েছিল ফাতেমা মুনেকার কাছে। তার মাথায় একটা শক্ত টোকা দিয়ে বলেছিল, ‘কেমন এখন, দেখলি তো?’

‘এভাবে বলছ কেন? তোমার সাথে আমার প্রতিযোগিতা নাকি?’ বলল মুনেকা মুখ ভার করে।

বৃদ্ধ সরদার সস্নেহ হাসিতে বলল, আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, ‘তুমি কিছু মনে করো না বাবা। পিঠাপিঠি এ দু’ভাই-বোনের গণ্ডগোল সব সময় লেগেই থাকে।’

‘মুনেকাই সব সময় লেগে থাকে আব্বা, আমি কিছু বলি না।’ বলল ইয়েকিনী।

‘আমি লেগে থাকি? আমার সব কথা, সব কাজে তুমি বাগড়া দাও।’ তীব্র প্রতিবাদ করে বলল ফাতেমা মুনেকা।

‘ধন্যবাদ ইয়েকিনী, ফাতেমা। ভাই-বোনের মধুর ঝগড়া আমার খুব ভাল লাগছে। সত্যি বলছি, আমার কাছে এ এক দুর্লভ দৃশ্য। আমার মত একা এক পৃথিবীর বাসিন্দা যারা তারা ছাড়া কেউ এটা বুঝবে না।’ হাসিমুখে কথাগুলো বলতে শুরু করেছিল আহমদ মুসা। কিন্তু যখন কথা শেষ করল, কণ্ঠ তখন প্রায় রুদ্ধ হয়ে এসেছিল তার।

আহমদ মুসার কণ্ঠস্বরে ফাতেমা মুনেকা, ইয়েকিনী, হাসান সকলেরই চেহারা হঠাৎ পাল্টে গিয়েছিল। তাদের মুখে ফুটে উঠেছিল একটা বেদনাময় বিস্ময়ের চিহ্ন।

পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে হেসে উঠল আহমদ মুসা। বলল, ‘ইয়েকিনী, আমার সঙ্গী হওয়ার মধ্যে তুমি যেমন আনন্দ দেখছ, তেমনি নিরানন্দও আছে। আমার সাথী হওয়া মানে সাক্ষাৎ বিপদের সাথী হওয়া, মনে রেখ। ব্ল্যাক ক্রস ও ওকুয়া যখন জানবে, আমি বেঁচে আছি এবং ক্যামেরুনে এসেছি, তখন পাগল হয়ে উঠবে ওরা আমাকে ধরা অথবা মারার জন্যে।’

মুহাম্মাদ ইয়েকিনী উঠে আহমদ মুসার পায়ের কাছে এসে বসল। বলল, ‘আপনার সাথী হয়ে আমি আগুনেও ঝাঁপ দিতে পারব।’

আহমদ মুসা তাকে টেনে নিয়ে কপালে চুমু খেয়ে বলল, ‘আগুনে ঝাঁপ দেয়া নয়, আমরা জয়ী হয়ে গাজী হতে চাই।’

বলেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘সময় বেশি নেই। তৈরি হতে হবে। তুমি তৈরি হয়ে নাও ইয়েকিনী।’

ঘরের দিকে হাঁটতে হাঁটতে আহমদ মুসা ফাতেমা মুনেকাকে উদ্দেশ্য করে বলল, ‘রিপোর্টের রেকর্ডগুলো আমাকে দিয়ে যাও, ফাতেমা।’

আহমদ মুসা হাঁটছিল গাড়ির দিকে। তার আগে আগে চলছিল ইয়েকিনী, বড় এক ব্যাগ হাতে।

আহমদ মুসার পাশাপাশি চলছিল ফাতেমা মুনেকা এবং হাসান ইকোকু।

কথা বলতে বলতে এগোচ্ছিল তারা।

ফাতেমা মুনেকা বলল এক সময়, ‘ভাইয়া, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?’

‘কি কথা?’

‘দেখুন, আমরা মায়ের জাতি। ঘরই আমাদের পৃথিবী, ঘরই আমাদের সব।’

বলে একটু থামল ফাতেমা। একটু দ্বিধা করল। ঢোক গিলল একটা। তারপর বলল, ‘আপনি সেদিন বলেছিলেন, আপনার ঘর নেই, বাড়ি নেই এবং

কেউ নেই। আজ আবার বললেন, এই পৃথিবীতে আপনি একা। কথাগুলো ভুলতে পারছি না। ঘর নেই কেন আপনার?'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'ওটা আমি কথার কথা বলেছি। ঘর থাকা খুব বড় কথা নয়। আমার একটা ঘর নেই, কিন্তু দুনিয়ার শত ঘর আমার ঘর হয়েছে।'

'এসব কথা বলে প্রশ্ন পাশ কাটাতে পারেন, কিন্তু এক বোনের চোখকে ফাঁকি দিতে পারেন না। ঘর নিজের একটাই হয়, শত ঘর নিজের ঘর হয় না ভাইয়া। এবং একটি ঘর থাকা মানুষের মৌলিক অধিকার।' বলল ফাতেমা।

'বোনের কথা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু ঘর থাকা বড় কথা নয়, ঘরে যিনি থাকবেন তিনি ঘরে থাকা বড় কথা। তিনি যদি ঘরে না থাকেন, ঘর আর ঘর থাকে না।'

'ঘরে তিনি থাকবেন না কেন? ঘর ছাড়া জীবন হয় না।'

'তোমার একথাও ঠিক বোন। কিন্তু ব্যতিক্রম থাকতে পারে। কিছু লোককে যেমন প্রয়োজনে দেশ ছাড়তে হয়, তেমনি কিছু লোককে ঘর ছাড়তে হতে পারে।'

'কিন্তু দেশ ছাড়া আর ঘর ছাড়া এক কথা নয়। দেশ ছাড়লেও ঘর সবারই থাকে। মানুষ ঘর ছাড়তে পারে না। কোন সময়ের জন্যে বা বহু সময়ের জন্যে কেউ ঘরে না থাকলেও ঘর থাকে, ঘরে আলো জ্বলে এবং একজোড়া বা দুইজোড়া কিংবা তারও বেশি চোখ ঘরে ফেরার পথ চেয়ে অপেক্ষার প্রহর গোনে।'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'ফাতেমা, তোমাকে আমি সাংবাদিক বানাতে চাচ্ছি। আমি আশাবাদী, তুমি ভাল লেখিকাও হবে।'

কিন্তু ফাতেমা হাসল না। বলল, 'না ভাইয়া, আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দিন।'

গম্ভীর হলো আহমদ মুসা। দূর দিগন্তের দিকে চোখ তুলে চাইল। বলল ধীরে ধীরে, 'সিংকিয়াং-এ তোমারই মত আর এক বোন নাছোড়বান্দা হয়ে একটা ঘর করে দিয়েছিল। কিন্তু সে ঘরের বাতি নিভে গেছে, প্রবল ঝড় সে ঘর উড়িয়ে

নিয়েছে বোন।’ আহমদ মুসার কথাগুলো এত নরম, এত বেদনাসিক্ত যে তা ফাতেমা মুনেকা এবং হাসান ইকোকুর হৃদয়কেও আলোড়িত করল।

তৎক্ষণাৎ কোন উত্তর দিতে পারলো না ফাতেমা। পরে ধীরে ধীরে বলল, ‘সে কাহিনী এখনও আমরা জানি না ভাইয়া। তবে নিভে যাওয়া বাতি আবার জ্বলে উঠে, ভেঙ্গে যাওয়া ঘর আবার উঠে দাঁড়ায়, এটাই দুনিয়ার নিয়ম।’

‘আমি সে বাতি জ্বলে উঠার অপেক্ষা করছি না, তা বলতে পার না বোন।’

‘ধন্যবাদ ভাইয়া। জ্বলে উঠবে যে আলোকখণ্ড, তার সন্ধানও তো ভাইয়ার জানার কথা।’

‘সব কথা একদিনে শেষ করা ঠিক হবে না বোন।’ বলে হেসে উঠল আহমদ মুসা।

ইয়েকিনী গাড়ির কাছে দাঁড়িয়েছিল।

আহমদ মুসারা সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল।

আহমদ মুসার কথার উত্তরে ফাতেমা মুনেকা কিছু বলতে যাচ্ছিল। ইয়েকিনী তাতে বাঁধা দিয়ে বলল, ‘ভাইয়া, ফাতেমার কথার প্যাঁচে পড়লে এখানেই রাত কাবার হবে। আর বিপ্লব ছেড়ে সাহিত্যও করতে হতে পারে। ও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিবেটে এক নাম্বার।’

‘দেখুন, সে গায়ে পড়ে আমার সাথে লাগছে। আমি তো তার সাথে কথা বলিনি। আব্বার কাছে তখন সে কি ভালটাই সাজল!’ তীব্র প্রতিবাদ করে বলল ফাতেমা মুনেকা।

সঙ্গে সঙ্গেই কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল ইয়েকিনী। আহমদ মুসা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, ‘আজ থাক, একদিন আয়োজন করে তোমাদের দু’জনের ডিবেট শুনবো।’

বলে আহমদ মুসা ফাতেমার দিকে চেয়ে বলল, ‘ঠিক আছে বোন?’

‘ঠিক আছে। কিন্তু আসল কথাই ভাইয়ার না বলা থাকল।’ একটু হেসে ওড়নাটা কপালের উপর আরও টেনে দিতে দিতে বলল ফাতেমা।

‘ধৈর্য্যে পুরস্কার ডাবল হয়।’ বলল আহমদ মুসা।

‘সেটা কি শোনার বদলে দেখা?’ আনন্দে নেচে উঠল ফাতেমার চোখ।

‘তা আমি বলতে পারব না।’ বলে হাসতে হাসতে আহমদ মুসা গাড়িতে উঠার জন্যে সেদিকে এগোলো।

ফাতেমা ও হাসান ইকোকুর কাছে বিদায় নিয়ে আহমদ মুসা ও ইয়েকিনী গাড়িতে উঠল।

গাড়িটা ‘দুয়ালা’ থেকে আনা ‘কোক’-এর সেই জীপ।

আহমদ মুসা বসল ড্রাইভিং সিটে এবং তার পাশের সিটে বসল ইয়েকিনী।

‘বিসমিল্লাহ’ বলে চাবি ঘুরিয়ে গাড়ির ইঞ্জিন অন করল আহমদ মুসা।

জেগে উঠল ইঞ্জিন। স্টার্ট নিয়ে চলতে শুরু করল গাড়ি।

পেছনে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে ফাতেমা ও হাসান।

জবাবে ইয়েকিনী হাত নাড়ল গাড়ি থেকে।

ড্রাইভিং সিটে বসা আহমদ মুসার দৃষ্টি তখন সামনে- ইয়াউন্ডির দিকে। সে চোখে একটা স্বপ্ন, কুন্তা কুম্বেয় যে আলোর বীজ বপিত হলো তা যদি ইয়াউন্ডিতে প্রজ্জ্বলিত করা যায়, তাহলে সেটা আজকের অন্ধকার আফ্রিকার জন্যে হবে এক মহান সূর্যোদয়।

সাইমুম সিরিজের পরবর্তী বই

## অন্ধকার আফ্রিকায়

কৃতজ্ঞতায়ঃ

1. Abu Taher
2. Lahin New
3. Kayser Ahmad Totonji
4. Sagir Hussain Khan
5. Ek phota Shisir
6. Masud Khan
7. Abir Tasrif Anto
8. A.S.M Masudul Alam
9. Bondi Beduyin
10. Syed Murtuza Baker
11. Md. Jafar Ikbal Jewel
12. Hm Zunaid
13. Nazrul Islam
14. Esha Siddique
15. Arif Rahman
16. Ashrafuj Jaman
17. Sharmeen Sayema
18. Monirul Islam Moni
19. Sohel Sharif
20. Gazi Salahuddin Mamun
21. Hafizul Islam
22. Mohammed Ayub
23. Mohammed Sohrab Uddin
24. Amin Islam
25. Meah Imtiaz Zulkarnain
26. Shaikh Noor-E-Alam

সাইমুম-২০

# অন্ধকার আফ্রিকায়

আবুল আসাদ

# ১

কর্ডলেস টেলিফোন থেকে মুখ তুলে ফ্রান্সিস বাইক পিয়েরে পলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'পি. এ. সাহেব বলেছেন চীফ জাষ্টিস এভাবে কথা বলেন না।'

'বলবে না মানে? টেলিফোনটা আমাকে দিন।' বলে টেলিফোন নেয়ার জন্যে হাত বাড়াল পিয়েরে পল। টেলিফোন মুখের কাছে এনেই বলল, 'পি. এ. সাহেব?'

'জি বলুন, বলছি আমি।' বলল টেলিফোনের ওপ্রান্ত থেকে পি. এ.।

'আপনাকে বলতে ভুলে গেছে, চীফ জাষ্টিসের সাথে ডঃ ডিফরজিস কথা বলবেন।'

'কোন ডঃ ডিফরজিস? প্যারিসের?'

'ঠিক। চীফ জাষ্টিস সাহেবের শিক্ষক।'

'সব জানি। স্যরি স্যার। ওনাকে বলছি একটু ধরুন।'

পিয়েরে পল টেলিফোন থেকে মুখ একটু সরিয়ে ডঃ ডিফরজিসের দিকে চেয়ে বলল, 'ডঃ গো ধরে থাকলে কোন লাভ হবে না। চীফ জাষ্টিসকে বলুন আমাদের সহযোগিতা করতে।'

বলেই মুখ টেলিফোনের কাছে নিয়ে বলল, 'মাই লর্ড ডক্টর সাহেবকে দিচ্ছি।' বলে পিয়েরে পল টেলিফোন ডঃ ডিফরজিসের হাতে তুলে দিল।

'হ্যালো, উসাম কেমন আছ?'

'ভালো। কিন্তু আমি কিছু বুঝতে পারছিনা। আমি আকাশ থেকে পড়েছি। না জানিয়ে আপনি ক্যামেরুন এসেছেন। বাসায় না এসে টেলিফোন করছেন। আপনি কোথায়? আমি আসব।'

'আমি আসিনি, আমাকে আনা হয়েছে। আমি কোথায় আমি জানিনা।'

'কি বলছেন আপনি? এটা বিশ্বাস করা যায়?'

'যা চোখের সামনে উপস্থিত। তা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন ওঠে না উসাম। আমাকে ওরা কিডন্যাপ করে এনেছে ক্যামেরুনে।'

'কিডন্যাপ?'

ওপারের কথা শেষ হয়নি বুঝা যায়। কিন্তু কোন কথা ওপার থেকে শোনা গেল না। বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে নিতে নিশ্চয় সময় লাগছে চীফ জাষ্টিসের।

আবার শোনা গেল ওপারের কণ্ঠ, 'আমি কিছু বুঝতে পারছি না জনাব। কি ঘটেছে বলুন।'

'আমাকে কারা যেন কিডন্যাপ করে এনেছে।'

'কেন?'

'আমাকে পণবন্দী করেছে ওরা।'

'পণবন্দী? কিসের জন্যে?'

'তোমার কাছ থেকে একটা কাজ চায় ওরা।'

'আমার কাছে? কিন্তু আপনাকে পণবন্দী করে কেন?'

'কাজটা বেআইনি। আমাকে ওরা বলেছিল তোমাকে বলে কাজটা করিয়ে দিতে। রাজী না হওয়ায় কিডন্যাপ করেছে। আমাকে পণবন্দী করে কাজটা বাগিয়ে নিতে চায়। তাদের ধারণা আমার জীবন বাঁচাবার জন্যে তুমি কাজটা তাদের করে দেবে।'

'কাজটা কি?' ওপারে চীফ জাষ্টিসের কণ্ঠ বড় শুকনো শুনাল।

'কাজের কথা আমি তোমাকে বলব না এবং কোন অন্যায়ের কাছে নতি স্বীকার তুমি কর, এটা আমি চাইব না।'

'স্যার, ওদের কেউ আছে? আমি কথা বলতে চাই। শুনতে চাই ব্যাপারটা কি?'

'ঠিক আছে। দিচ্ছি কথা বল।'

টেলিফোন হাতে নিল পিয়েরে পল। বলল, 'মাই লর্ড, বলুন।'

'ডঃ ডিফরজিসের মত একজন বৃদ্ধ, সম্মানী, দরদী মানুষকে আপনারা কিডন্যাপ করেছেন! কে আপনারা?'

'মাই লর্ড, পরিচয়টা এই মুহূর্তে দিতে পারছিনা।'

'কেন তাঁকে আপনারা কিডন্যাপ করেছেন?'

'আমরা দুঃখিত মাই লর্ড। আমাদের উপায় ছিল না। ছোট একটা সহযোগিতা করতে তিনি রাজী হননি। কাজটা মোটেই বড় নয়।'

'কাজটা কি?'

'দুঃখিত, টেলিফোনে বলা যাবে না। মনে হয় টেলিফোনে এ ধরনের আলোচনা শোভনও হবে না।'

'কিন্তু আমি এ মুহূর্তে শুনতে চাই।'

'তাতে আমরা খুব খুশী হবো। কিন্তু টেলিফোনে নয়।'

'তাহলে?'

'মাই লর্ড, আজ কোর্ট ছিল না। আপনার সান্ধ্য ভ্রমনের অভ্যাস আছে। আপনি 'ইন্ডিপেনডেনস পার্ক' -এর গেটে আসুন। গেট পেরুলে প্রথম যে বেঞ্চ সেখানে আমরা বসব।'

'এটা সম্ভব নয়। আমার বাড়িতে আসুন। আমার বাগানের নিরিবিলিতে কোথাও বসে কথা বলব।'

'আমার আপত্তি নেই। এখন ৬টা। আমি সাড়ে ৬টায় বাগানের গেটে পৌঁছব। ৭টা পর্যন্ত থাকব।'

'ঠিক আছে আসুন।'

'মাই লর্ড, সাড়ে ছয়টায় বাগানের বাইরের গেটটা খোলা রাখতে হবে। গাড়ি বাগানের মধ্যে নিয়ে আমি গাড়ি থেকে নামব। চামড়া রংয়ের মুখোশ থাকবে মুখে।'

'অলরাইট।'

'আর একটা কথা। আশা করি অন্য কিছু ঘটবে না। আমি যদি ৮টার মধ্যে ফিরে না আসি তাহলে ডঃ ডিফরজিসের জীবন বিপন্ন হবে।'

'আমি বিচারক। আপনার সাথে লড়াই-এ নামিনি আমি। একটি বিষয় জানার জন্যে আমি আপনাকে ডাকছি।'

'ধন্যবাদ, মাই লর্ড।'

'ধন্যবাদ।'

টেলিফোন রেখে পিয়েরে পল বলল, 'মিঃ ফ্রান্সিস বাইক আমি তৈরী হতে গেলাম। আপনি ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে খবর দিন।

তারপর ডঃ ডিফরজিসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার পক্ষ থেকে তাকে কিছু বলার আছে?'

'নেই। তবে আমার একটা জিজ্ঞাসা আছে।'

'কি?'

'আমার সন্তান ও বৌমাকে কোথায় রেখেছেন আপনারা?'

'দুঃখিত, আমাদের কথায় রাজী না হওয়া পর্যন্ত বলব না।'

'আরেকটা কথা। কুমেটে যে বাড়িতে আপনারা আমাদের রেখেছিলেন, সেখান থেকে আমাদের আসার মুহূর্তে গোলা-গুলি হয়েছিল কেন? আমাদের সন্তানদের কোন ক্ষতি হয়নি তো?'

'বলেছি, কোন সহযোগিতাই আমরা আপনাকে করব না।'

বলে পিয়েরে পল বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

চীফ জাষ্টিসের বাড়ি এবং বাড়ির রাস্তা পিয়েরে পলের মুখস্থ। ইয়াউন্ডি আসার পর বেশ কয়েকবার এখানে এসেছে।

পিয়েরে পল যখন চীফ জাষ্টিস উসাম বাইকের বাগানের গেটে পৌঁছল, তখন ঠিক সাড়ে ছয়টা।

গেট খোলা ছিল বাগানের।

গেট দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে গাড়ি থেকে নামল পিয়েরে পল। তার আগে গাড়িতে বসেই মুখে মুখোশ লাগিয়ে নিয়েছিল।

গাড়ি থেকে নেমেই পিয়েরে পল দেখতে পেল অল্প দূরে বড় একটি আলো-শেড-এর নিচে একটা চেয়ারে একজন বসে আছে। চারদিকের আলোর মাঝখানে সেখানে অন্ধকারের একটা পাতলা আবরণ।

পিয়েরে পল ওদিকে চলল।

পিয়েরে পল সেখানে পৌঁছতেই উঠে দাঁড়াল চেয়ারে বসা সেই লোকটি।

'গুড ইভেনিং, আসুন।' বলে পিয়েরে পলকে বসার জন্য চেয়ার দেখিয়ে দিল।

বসল দু'জনে।

চীফ জাষ্টিস মধ্য বয়সী একজন লোক। রঙে সে খাস আফ্রিকান নিগ্রো। কিন্তু চোখ, চুল, ঠোঁট ইত্যাদির গড়ন তার বলে দেয় সে আফ্রো-ইউরোপীয় অথবা আফ্রো-এশীয় মিশ্র পরিবারের সন্তান। তার চেহারার মধ্যে একটা পবিত্র প্রসন্নতা।

চীফ জাষ্টিস বসেই বলল, 'আমি ফ্রাংকোইস উসাম বাইক। আমি আপনার কথা শোনার জন্যে প্রস্তুত। বলুন।'

'মাই লর্ড, আপনাকে কষ্ট দেয়ার জন্যে আমি প্রথমেই ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমরা নিরুপায় হয়েই এই অবস্থায় পৌঁছেছি। আপনার সাথে আমাদের কোন পরিচয় নেই। তাই চেয়েছিলাম ডঃ ডিফরজিস আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন।কিন্তু স্বেচ্ছায় তিনি তা করেননি।'

বলে একটু থামল পিয়েরে পল। সম্ভবত কথাগুলো একটু গুছিয়ে নিল। শুরু করল আবার, 'প্রথমেই বলে রাখি, আমার কিংবা কারও ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যে আমি আসিনি। আমরা যা করতে চাই তা করতে পারলে লাভবান হবে জাতি, কোন ব্যক্তি নয়।'

একটু দম নিল পিয়েরে পল।

'শুনছি, বলুন' বলল চীফ জাষ্টিস।

'মাই লর্ড, দক্ষিণ ক্যামেরুনের উপকূলীয় কাম্পু উপত্যকার দশ হাজার একরের একটা জমি খন্ড নিয়ে গন্ডগোল। ঐ জমি খন্ডের চারদিকের সব জমিই চার্চের। মাঝখানের ঐ জমি খন্ড একজন মুসলমানের। এই এক খন্ড জমি নানা দিক দিয়ে আমাদের অসুবিধা সৃষ্টি করছে এবং আরও অসুবিধার কারণ হতে পারে। তাই অনেক বছর ধরে আমরা ঐ জমির মালিককে অনুরোধ করে আসছি, জমির যা মূল্য তার চেয়ে কয়েকগুন বেশী মূল্য দেবো। কিন্তু জমি হস্তান্তরে সে রাজী হয়নি। পরে আমরা জানতে পেরেছি, তার এ অস্বাভাবিক অস্বীকৃতির মূলে একটা ষড়যন্ত্র রয়েছে। মক্কা ভিত্তিক ইসলামী সংগঠন রাবেতায়ে আলম আল-ইসলামী সেখানে বড় রকমের একটা ঘাঁটি বানাতে চায়। এই পরিস্থিতি আমাদের ভীষণ উদ্বিগ্ন করে। কারণ, তারা শান্তিপূর্ণ এ অঞ্চলে সংঘাত বাধাবার জন্যেই এটা করতে চায়। এসব জেনে আমরা নতুন করে যখন তাকে অনুরোধ করলাম, তখন সে রাবেতার পরামর্শে আপনার কোর্টে একটা উইল করে দেশ থেকে পালিয়ে যায়। আসলে জমি তার লক্ষ্য নয়, গন্ডগোল বাধানোই তার লক্ষ্য। আমরা জাতীয় স্বার্থেই এটা হতে দিতে পারি না।'

থামল পিয়েরে পল।

'বলুন।' বলল চীফ জাস্টিস উসাম বাইক।

'এই অবস্থায় আমরা চাই, আপনি আমাদের সাহায্য করুন।'

'উইলে কি আছে?'

'সে কোর্টে হাজির হয়ে জমি হস্তান্তর না করলে তার জমি হস্তান্তর বৈধ হবে না। দ্বিতীয়তঃ সে যদি দুই বছর পর্যন্ত নিখোঁজ থাকে, তাহলে জমি ক্যামেরুন মুসলিম ট্রাস্টের সম্পত্তি বলে গণ্য হবে।'

'আমার কাছে কি সাহায্য চান?'

'জমি হস্তান্তর দলিলে ওমর বায়ার দস্তখতকে তার উপস্থিতি বলে ধরে নিতে হবে।'

'ওমর বায়া কোথায়?'

'আমাদের হাতে আছে।'

'তাহলে ওকে কোর্টে হাজির করিয়ে দস্তখত নিন।'

'কোর্টে হাজির করে তার কাছ থেকে দলিলে দস্তখত পাওয়া যাবে না।'

'তার উইল অনুসারে তাকে কোর্টে হাজির না করে তার জমি হস্তান্তর হবে না।'

'ধরুন, সে জমি হস্তান্তর করল না। এর বদলে সে যদি আগের উইল বাতিল করার আবেদন করে কিংবা নতুন উইল করে!'

'তার জন্যেও উপস্থিতি একটা শর্ত।'

'কিন্তু এ শর্তটা জমি হস্তান্তরের মত অত কঠিন নয়।'

'শর্ত শর্তই, কঠিন-সহজ হয়না।'

'তাহলে আপনার সাহায্য আমরা কিভাবে পাব?'

'আপনিই বলুন।'

'আমি দুইটা পথের কথা বলেছি। এক, জমি হস্তান্তর দলিলে তার দস্তখত উপস্থিতি হিসেবে ধরে নিতে হবে। অথবা দুই, তার আগের উইল বাতিল করার আবেদন গ্রহন করতে হবে।'

'হাজির না করে দুই পদ্ধতির কোনটাই আইনসিদ্ধ নয়।'

'মাই লর্ড, আমরা সেটা জানি। জানি বলেই আপনার দ্বারস্থ হয়েছি। এখন বলুন আপনি আমাদের সাহায্য করবেন কিনা?'

'এ অন্যায় সাহায্য না করলে কি করবেন?'

'প্রথম কাজ হবে, আমরা পণবন্দীকে হত্যা করব। আরও কি করব সেটা আমরা এখন বলব না। শুধু জেনে রাখবেন, যত রক্তপাতের প্রয়োজন হোক, 'ক্রস' পরাজিত হবে না।'

'আপনারা ওমর বায়ার জমির কি পরিমান মূল্য দিতে রাজি আছেন?'

'ক্যামেরুনের সর্বোচ্চ যে রেট তার দ্বিগুন দিতে রাজি আছি।

'এই টাকা কোর্টের সামনে অথবা কোর্টকে পরিশোধ করতে হবে।'

'আমরা রাজি।'

'দ্বিতীয়ত, ওমর বায়াকে কোর্টে এতটুকু হাজির করতে হবে যাতে আমরা তাকে দেখতে পাই। তার কথার কোন প্রয়োজন নেই।'

'ঠিক আছে, এতে অসুবিধা নেই।'

'তৃতীয়ত, ডঃ ডিফরজিস ও ওমর বায়াকে উইল রেজিস্ট্রির পর ছেড়ে দিতে হবে এবং চেম্বারে পৌঁছাতে হবে।'

'আমরা ডঃ ডিফরজিসকে পৌঁছাব, কিন্তু ওমর বায়াকে নয়। তাকে আমরা ছাড়ব আমাদের জমির দখল সম্পূর্ণ হওয়ার পর। প্রয়োজন বোধ করলে আমরা তাকে দলিল সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপনের শেষ মেয়াদতক রাখতে পারি।'

'ঠিক আছে, আপনারা প্রসেস করুন। আপনার উকিল যেন আমার অফিস থেকে কেসের তারিখটা ঠিক করে নেয়।'

'ইয়েস মাই লর্ড। আমার একটা শর্ত আছে। আজকের কথাগুলো এবং জমি সংক্রান্ত ব্যাপার আপনার কান ছাড়া যতগুলো কানে পৌঁছবে তারা আমাদের হত্যা তালিকায় থাকবে।'

'এ কথাগুলো আমাকে না বললেও চলতো। বিচারপতিরা ক্যামেরুনের পুলিশ কিংবা গোয়েন্দার দায়িত্ব পালন করেন না।'

'থ্যাংকস মাই লর্ড। উঠি।'

বলে পিয়েরে পল উঠে দাঁড়াল।

চীফ জাস্টিস উসাম বাইক মাথা নাড়ল, মুখে কোন কথা বলল না।

ইয়াউন্ডি সুপার মার্কেট থেকে ফিরছিল ডোনা, ডোনার আব্বা এবং এলিসা গ্রেস।

আজ সকালেই তারা কুমেট থেকে ইয়াউন্ডি এসেছে।

সেদিন আহমদ মুসা কুমেট বিমান বন্দরে চলে যাবার এক ঘন্টা পর ডোনারা কুমেটে গার্লস ব্রিগেডের রেস্ট হাউসে সুমাইয়াদের কাছে পৌছে।

আহমদ মুসার প্লেন ১২টায় ক্যামেরুনরে উদ্দেশ্যে ছাড়ার কথা। সুতরাং ডোনাদের এয়ারপোর্টে নেয়ার সময় ছিল না।

আহমদ মুসার চলে যাবার সংবাদে ডোনা বিস্মিত হয়নি, কিন্তু আহত হয়েছিল। আহমদ মুসার সন্ধানে সে ছুটে এসেছিল প্যারিস থেকে সেন্টপোল ডে-

লিউন-এ। কিন্তু অল্পের জন্যে দেখা পায়নি। আবার তারা ছুটে আসে কুমেটে। এক ঘন্টা দেরীর জন্যে এখানেও দেখা হয় নি।

আহমদ মুসার চলে যাবার খবর যখন সুমাইয়া দ্বিধাগ্রস্থ কন্ঠে ডোনাকে দিয়েছিল, তখন ডোনা মুহূর্তের জন্যে চোখ বুজে আঘাতটা সামলে নিয়েছিল।

পরে সুমাইয়া আহমদ মুসার রেখে যাওয়া চিঠি ডোনাকে দিয়েছিল।

কম্পিত হাতে ডোনা চিঠি নিয়েছিল। তার কাছে আহমদ মুসার এটাই প্রথম চিঠি। কি লিখেছে! প্যারিস থেকে তার চলে আসার জন্যে রাগ করেনি তো!

চিঠি নিয়ে ডোনা পাশের ঘরে চলে গিয়েছিল। চিঠিতে সে পড়েঃ

"মারিয়া,

আমি আমার কথা রাখতে পারিনি বলেই তোমাকে কষ্ট করে ডে-লিউন পর্যন্ত ছুটে আসতে হয়েছে। আবার কুমেট থেকেও টেলিফোন করতে পারিনি তোমাকে। করতে পারিনি ঠিক নয়, ভুলে গিয়েছিলাম। এ ভুলের মাশুল তোমাকেই দিতে হচ্ছে। তবু কুমেটে আমাদের দেখা হবে বলে মনে হচ্ছে না। এ সব কিছুর জন্যে নিজেকে দোষী ভাবার সাথে সাথে কিছুটা আনন্দবোধও আমার হচ্ছে। বুক ভরা উদ্বেগ নিয়ে কেউ কখনও এভাবে আমার পেছনে ছুটে আসেনি। কারও দুটি সজল চোখ এইভাবে কখনও আমাকে খুঁজে ফেরেনি। কিন্তু আমার জন্যে যা আনন্দ, তোমার জন্যে সেটা কষ্ট। তোমার এ কষ্টের জন্যে দুঃখ প্রকাশ ছাড়া আর কি করতে পারি আমি বলো।"

চিঠি শেষ করেও অনেক্ষন চিঠি থেকে চোখ সরাতে পারেনি ডোনা। তারপর তার চোখ দু'টি সরে গিয়ে দক্ষিনের জানালা দিয়ে নিবদ্ধ হয়েছিল দক্ষিন দিগন্তে। যেন দেখতে পাচ্ছে সে ক্যামেরুনের পথে ছুটে চলা আহমদ মুসার প্লেন। কান্নার মত এক টুকরো হাসি ফুটে উঠেছিল ডোনার ম্লান ঠোঁটে। ঠোঁটের বাঁধন ডিঙিয়ে বেরিয়ে এসেছিল তার স্বগত উচ্চারনঃ 'তুমি যাকে আমার কষ্ট বলছ, তা আমার কত আনন্দের, কত তৃপ্তির, কত প্রশান্তির সেটা তুমি কি বুঝ!'

কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে ডোনা তার আব্বাকে বলেছিল, 'ও আমাদের ক্যামেরুন যেতে নিষেধ করেনি।'

'যেতে কি বলেছে?' বলেছিল ডোনার আব্বা।

'তার নিষেধ না করাটাই যেতে বলা আব্বা।'

'হ্যাঁ, এটাও ঠিক।' বলে মিষ্টি হেসেছিল ডোনার আব্বা।

'আব্বা তুমি ইয়াউন্ডির ফরাসী দুতাবাসকে বলে দাও আমার ও এলিসার জন্যে একটা ভাল ব্যবস্থা করতে।'

'ওখানে রাষ্ট্রদূত হিসেবে আছেন আমার বন্ধু তোমার আংকেল 'জিন মিশেল ব্রেন্ডার'। বাড়ির মতই থাকতে পারবে। কিন্তু তোমার আব্বাকে বাদ রাখছ কেন?' হেসে বলেছিল ডোনার আব্বা।

'লং জার্নিতে তোমার কষ্ট হবে আব্বা।' বলেছিল ডোনা।

'তার চেয়েও বেশী কষ্ট হবে মা কাছে না থাকলে।' বলেছিল ডোনার আব্বা সস্নেহে হেসে।

ডোনা উঠে গিয়ে তার আব্বার পাশে বসে তার কাঁধে মাথা রেখে বলেছিল, 'ঠিক আছে তুমিও যাবে।'

বলে একটু হেসেছিল ডোনা। তারপর ধীরে ধীরে বলেছিল, 'মাঝে মাঝে ভেবে আমার কষ্ট হয় আব্বা আমি তোমাকে বিরাট টেনশনে ফেলেছি।'

'দুনিয়াতে অনেক টেনশন আছে, যা সুখ স্বপ্নের চেয়েও মধুর।'

'ধন্যবাদ আব্বা। আমার আব্বা দুনিয়ার সেরা আব্বা।' বলেছিল ডোনা তার আব্বার কাঁধে কপাল ঘষতে ঘষতে।'

ডোনারা ক্যামেরুন যাবার আগে সুমাইয়া, ডেবরা ও রালফের সাথে অনেক কথা হয়েছে তাদের। শুনেছিল ক্লাউডিয়া ও ডাঃ জিয়ানার আত্মত্যাগের কাহিনী। শুনে কেঁদেছিল ডোনা। তার মনে পড়েছিল আহমদ মুসার কাছে শোনা রুশ কন্যা তাতিয়ানার কাহিনী, কেঁপে উঠেছিল ডোনার মন। কত ভাঙা হৃদয়ের কত দাবী যে আহমদ মুসাকে ঘিরে আছে! ডোনার ছোট্ট হৃদয়ের দুর্বল দাবী কি অবশেষে তার প্রিয়তম ঠিকানা খুঁজে পাবে!'

ডোনার আব্বা ঠিক বলেছিল। ক্যামেরুনের ফরাসী রাষ্ট্রদূত জিন মিশেল ব্রেন্ডার ডোনাদেরকে পরম আত্মীয়ের মতই গ্রহন করেছে। এ্যামবেসির গেস্ট হাউসে তাদের থাকতে দেয়নি। বাড়ির একটা বিরাট অংশ ছেড়ে দিয়েছে

এ্যামবেসেডর ডোনাদের জন্যে। জিন মিশেল ব্রেন্ডারের কুটনৈতিক জীবনের শুরু ডোনার আব্বা মিশেল প্লাতিনীর পারসোনাল সেক্রেটারী হিসেবে।

ইয়াউন্ডিতে এসে খাওয়া দাওয়া শেষে দীর্ঘ ঘুম দেবার পর জরুরী কিছূ কেনা কাটা এবং শহর দেখার জন্যে ডোনারা বেরিয়েছিল।

মার্কেট থেকেই ফিরছিল তারা।

এ্যামবেসেডর জিন মিশেল একটা গাড়ি দিয়েছিল ডোনাদের স্বাধীনভাবে ব্যবহারের জন্যে। তার সাথে ডোনা চেয়েছিল ইয়াউন্ডির একটা রোড ম্যাপ। ড্রাইভারও দিয়েছিল। কিন্তু ডোনা ড্রাইভার নেয়নি। ডোনা দেখেছিল, যে মিশন নিয়ে সে ক্যামেরুনে এসেছে তাতে ড্রাইভার নিলে ঝামেলার সম্ভাবনা আছে। আহমদ মুসার সাক্ষাৎ না পাওয়া পর্যন্ত তাকেই তার দায়িত্ব বহন করার মত যোগ্যতা দেখাতে হবে।

গাড়ি ড্রাইভ করছিল ডোনা।

গাড়ি চলছিল ইয়াউন্ডির সেন্ট্রাল রোড ধরে।

বেলা তখন ৩টা।

ডোনা দেখল, রাস্তার পাশে একটা সুন্দর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িটির পাশে দাঁড়িয়ে আছে একজন তরুনী। ইউরোপীয়ান পোশাক। মেয়েটি কালোও নয় আবার সাদাও নয়। কালো ও সাদার মাঝখানে অব্যক্ত এক রঙের সুষমা তার দেহে।

মেয়েটি গাড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে অসহায়ভাবে এদিক-ওদিক চাইছে।

ডোনা গাড়িটির পাশাপাশি এসে ব্রেক কষল গাড়িতে। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ফরাসি ভাষায় ডোনা জিজ্ঞেস করল, 'গুড ইভনিং, কোন সমস্যা?'

'গুড ইভনিং, গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না।' বলল মেয়েটি বিব্রত কন্ঠে।

'আমি কি চেষ্টা করে দেখতে পারি?' বলল ডোনা।

'ওয়েলকাম। আমি বাধিত হবো।'

ডোনা তার গাড়িটি রাস্তার পাশে নিয়ে দাঁড় করাল। বলল, 'আব্বা, আমার মনে হচ্ছে মেয়েটি বিপদে পড়েছে। একটু দেখি।'

'যাও দেখ।' পেছনের সিট থেকে বলল ডোনার আব্বা।

ডোনা এবং এলিসা গ্রেস দুজনেই নামল গাড়ি থেকে।

ডোনা গিয়ে হ্যান্ডশেক করল মেয়েটির সাথে। বলল, 'নামটা কি জানতে পারি?'

'ভেনেসা রোসেলিন। আপনি?'

'আমি মারিয়া জোসেফাইন। আর এ এলিসা গ্রেস।'

ডোনা প্রথমে ড্রাইভিং সিটে বসে সব কিছু চেক করে বলল, 'দোষটা ইঞ্জিনে।'

বলে বেরিয়ে এল গাড়ি থেকে।

তারপর গাড়ির সামনে গেল ডোনা। রোসেলিন চাবি দিয়ে কভার আনলক করল এবং কভারটি তুলে ছিটকিনিতে ঠেস দিয়ে রাখল।

ইঞ্জিন পরীক্ষা করে রোসেলিন-এর দিকে মুখ তুলে বলল, 'বড় কিছু ঘটেনি। আমি ঠিক করে দিচ্ছি।'

স্ক্রুড্রাইভার নিয়ে এল ডোনা নিজের গাড়ি থেকে। দু'মিনিটের মধ্যে ঠিক হয়ে গেল।

কাজ শেষ করে রোসেলিনকে বলল, 'স্টার্ট দিয়ে দেখুন ঠিক আছে কিনা।'

রোসেলিন ড্রাইভিং সিটে গিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিল। মিষ্টি গর্জন করে জেগে উঠল ইঞ্জিন।

হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল রোসেলিন। বলল, 'ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। গাড়ির কিছু আমি বুঝি না। কি যে বিপদে পড়তাম আপনাকে না পেলে।'

বলে একটু থামল রোসেলিন। কিন্তু ডোনাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই বলল, 'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি ফরাসি। তাই কি?'

'ঠিক বলেছেন, আজ সকালেই আমরা ক্যামেরুন এসে পৌঁছেছি।'

'কোথায় উঠেছেন?' বেড়াতে এসেছন বুঝি?'

'ফরাসি রাষ্ট্রদূতের অতিথি আমরা।'

‘তাহলে তো আমরা শহরের একই এলাকায় আছি। আমি কি আপনাদের চায়ের দাওয়াত করতে পারি?’

‘ধন্যবাদ। কেন নয়?’

রোসেলিন খুশীতে ডোনার সাথে হ্যান্ডশেক করল।

‘গাড়ির ফ্ল্যাগ স্ট্যান্ডে একটা পতাকা ঢাকা দেখছি। কি পতাকা?’

রোসেলিন একটু সলজ্জ হাসল। বলল, ‘আমার আব্বা চিপ জাস্টিস তো। ওঁর গাড়ি। ওটা ক্যামেরুনের জাতীয় পতাকা।’

‘ও, ওয়ান্ডারফুল। সৌভাগ্য যে, আপনার সাথে পরিচিত হবার সুযোগ হলো।’ উচ্ছ্বসিত কন্ঠে বলল ডোনা। তার মনে পড়েছিল ব্ল্যাকক্রস ডঃ ডিফরজিস্কে কিডন্যাপ করেছে এই চীফ জাস্টিসকে বাগে আনার জন্যে। খুশী হলো। ঘটনার একটা পক্ষের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ তো অন্তত হলো!

‘সৌভাগ্য আমারও।’ বলে হেসে রোসেলিন বলল, ‘একটা কথা জিজ্ঞেস করি?’

‘অবশ্যই।’ বলল ডোনা।

‘আপনাদের পোশাক, বিশেষ করে গায়ে মাথায় ওড়না – এ ধরনের পোশাক তো ফরাসীরা পরে না।’

‘ফরাসীরা সবাই পরে না তা নয়। মুসলিম ফরাসীরা পরে।’ হেসে বলল ডোনা।

‘তাহলে আপনারা মুসলিম?’ বিস্ময় মিশ্রিত কন্ঠে বলল রোসেলিন।

‘খুশী হননি বুঝি?’ বলল ডোনা।

হাসিতে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল রোসেলিনের। বলল, ‘আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বান্ধবী মুসলিম।’ কথাগুলো বলতে গিয়ে আবেগ-অনুরাগের একটা ঢেউ খেলে গেল রোসেলিনের মুখে।

ডোনা তাকিয়েছিল রোসেলিনের মুখের দিকে। সে বিস্মিত হলো রোসেলিনের মুখ ভাবের এই পরিবর্তনে। ডোনার মনে হলো রোসেলিন যেন কথা শেষ করেও করল না।

‘ও! নাইস! কি নাম আপনার বান্ধবীর?’ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল ডোনা।

‘লায়লা ইয়েসুগো। ইয়েসুগো রাজ পরিবারের মেয়ে। ইয়াউন্ডি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ক্লাসমেট।’

‘ইয়েসুগো রাজপরিবার ক্যামেরুনের?’ বলল ডোনা।

‘হ্যাঁ। ক্যামেরুনের একদম উত্তরে গারুয়া উপত্যকা থেকে ‘লেক চাঁদ’ পর্যন্ত এক সময় ওদের রাজত্ব ছিল।’

‘ও! খুশী হবো যদি আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন।’

‘অবশ্যই। ওরাও খুশী হবে।’

বলেই রোসেলিন পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে ডোনার দিকে তুলে ধরে বলল, আমার ‘নেম কার্ড’। যে কোন প্রয়োজনে টেলিফোন করবেন।

ডোনা কার্ড হাতে নিয়ে বলল, ‘আসুন আমার আব্বা গাড়িতে। তার সাথে পরিচয় করিয়ে দেই।’

বলে রোসেলিনের একটা হাত ধরে এগুল সে তার গাড়ির দিকে।

ওদেরকে গাড়ির দিকে আসতে দেখে ডোনার আব্বা মিশেল প্লাতিনি গাড়ি থেকে নেমে এল।

‘আব্বা, এ ভেনেসা রোসেলিন। ক্যামেরুনের চীফ জাস্টিস উসাম বাইকের মেয়ে।’

তারপর রোসেলিনের দিকে মুখ তুলে ডোনা বলল, ‘ইনি আমার আব্বা মিশেল প্লাতিনি লুই।’

দু’জন শুভেচ্ছা বিনিময় করছে, তখন ডোনা ড্যাশ বোর্ডের কার্ড কেস থেকে তার ‘নেম কার্ড’ নিয়ে এল।

কার্ড রোসেলিনকে দিয়ে বলল, ‘এতে এখানকার টেলিফোন নম্বারও আছে।’

‘ধন্যবাদ।’

বলে রোসেলিন ডোনার আব্বার দিকে চেয়ে বলল, ‘আংকেল, এখনকার মত চলি। আমি কিন্তু চায়ের দাওয়াত দিয়েছি।’

'ঠিক আছে মা। আমরা খুশী হয়েছি।' বলল ডোনার আব্বা।

তারপর রোসেলিন ডোনা ও এলিসা গ্রেসের সাথে হ্যান্ডশেক করে বলল, 'চলি, মনে থাকে যেন চায়ের দাওয়াতের কথা। আমি টেলিফোন করব।'

রোসেলিন এবং ডোনার গাড়ি এক সাথেই ছাড়ল।

'খাওয়ার সব ব্যবস্থা ঠিক-ঠাক আছে তো মা?' চীফ জাস্টিস উসাম বাইক জিজ্ঞেস করলো রোসেলিনকে।

রোসেলিন ড্রইং রুমে প্রবেশ করছিল। সে এসে তার আব্বার পাশে বসতে বসতে বলল, 'সব ঠিক-ঠাক আব্বা, কোন চিন্তা করো না।'

রোসেলিন ডোনাদের দাওয়াত দিয়েছিল চায়ের। কিন্তু চীফ জাস্টিস ডোনার আব্বার পরিচয় পেয়ে শুধু চায়ের দাওয়াত দিতে রাজী হয়নি। ডোনার কার্ড দেখেই চীফ জাস্টিস চিনতে পেরেছিল ডোনার আব্বা মিশেল প্লাতিনি ডি-বেরী লুইকে।

'জানো তো মা, ফ্রান্সের সম্রাট লুই-এর পরিবারের লোক ওরা। রাজত্ব না থাকলেও ঐ পরিবারের মান একটুও কমেনি। ওদের রুচি তো জানি না।' বলল চীফ জাস্টিস।

'তুমি কিছু ভেবনা আব্বা। আম্মাও তো ফরাসী মেয়ে। সব তিনি দেখেছেন। আর সেদিন আমি আংকেলকে দেখেছি, মারিয়াদের সাথে কথা বলেছি। খুব খোলা-মেলা ওঁরা। রাজকীয় মেজাজ বা গাম্ভীর্যের চিহ্ন ওদের মধ্যে নেই। আমার খুব ভালো লেগেছে। বলত আব্বা, মিস মারিয়া তোমার ভাষায় রাজকুমারী হয়েও যেভাবে শ্রমিকের মত আমার গাড়ি ঠিক করে দিয়েছে, ক্যামেরুনের গাড়ির মালিক কোন মেয়ে কি এটা করতো?'

'বড়দের বড় হৃদয় হওয়া উচিত। ওঁদের ওটা আছে।'

কাঁটায় কাঁটায় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় এল ডোনা, ডোনার আব্বা এবং এলিসা গ্রেস।

রোসেলিন, তার আম্মা এবং তার আব্বা চীফ জাস্টিস উসাম বাইক তাদেরকে স্বাগত জানালেন বাড়ির গেটে।

ডিনার হলো রাত আটটায়।

ডিনার শেষে চীফ জাস্টিস উসাম বাইক এবং ডোনার আব্বা মিশেল প্লাতিনি বসে আলাপ করছে ড্রইং রুমে।

তখন কথা বলছিল চীফ জাস্টিস উসাম বাইক, হ্যাঁ, আমার জন্ম ক্যামেরুনে বটে, কিন্তু আমি মানুষ হয়েছি ফ্রান্সে। আমি তখন ১০ বছরের বালক। ডঃ ডিফরজিস আমাকে ফ্রান্সে নিয়ে যান। তাঁর বাড়িতে রেখে তিনি আমাকে লেখাপড়া শেখান। আইন শাস্ত্রে ডক্টরেট করার পর ২৫ বছর বয়সে আমি ক্যামেরুনে চলে আসি। ফ্রান্সে তিনি আমাকে বিয়েও করান।'

'কোন ডঃ ডিফরজিস? সাবেক কুটনীতিক এবং প্যারিস আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ ডিফরজিস? তিনি তো আমার বন্ধু।'

'জি, হ্যাঁ, তিনিই।'

ডোনার আব্বা একটু দ্বিধা করল। কিন্তু শেষে বললই, 'ডঃ ডিফরজিসের খবর কিছু জানেন?'

চমকে উঠল চীফ জাস্টিস উসাম বাইক। বলল, তাঁর সম্পর্কে কিছু জানেন আপনি?

'জানি।'

'তাকে কিডন্যাপ করে ক্যামেরুনে আনা হয়েছে, জানেন আপনি?'

'জানি। ব্ল্যাকক্রস ও ওকুয়া তাঁকে কিডন্যাপ করেছে।'

'আর কিছু জানেন?'

'মনে হয় সবটাই জানি। তাঁকে পণবন্দী করে আনা হয়েছে। চীফ জাস্টিসের কাছ থেকে কিছু আদায় করার জন্যে।'

'কি আদায় করতে চায়, সেটাও কি আপনি জানেন?'

‘জানি। ওমর বায়ার জমি আত্মসাতকে তারা বৈধ করে নিতে চায়।’

‘আপনি সবই জানেন। এসব কি ডঃ ডিফরজিস কিংবা র‍্যালফ–এর কাছে আপনি শুনেছেন?’

‘এখানে আসার আগে কুমেটে র‍্যালফ, ডেবরা এবং আমরা এক রেস্ট হাউসে এক সাথেই ছিলাম। কিন্তু ওমর বায়ার ঘটনা আমি আগে থেকেই জানি।’

‘আগে থেকে?’

‘আপনি হয়তো জানেন, ব্ল্যাক ক্রস র‍্যালফ এবং ডেবরাকেও কিডন্যাপ করেছিল। পরে তাকে উদ্ধার করা হয়েছে।’

চমকে সোজা হয়ে বসল চীফ জাস্টিস উসাম বাইক। বলল, ‘তারাও কিডন্যাপ হয়েছিল? কেন?’

‘তাদেরকে কিডন্যাপ করে ডঃ ডিফরজিসকে তারা বাধ্য করতে চেয়েছিল যাতে তিনি আপনাকে বলে তাদের কাজটা করিয়ে দেন। কিন্তু র‍্যালফরা মুক্ত হওয়ায় তাদের উদ্দেশ্য বানচাল হয়ে যায়। তখন তারা খোদ ডঃ ডিফরজিসকেই পণবন্দী করে ক্যামেরুনে নিয়ে এসেছে।’

বিস্ময় ও বেদনায় চীফ জাস্টিসের চেহারা ভারি হয়ে উঠেছে। কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলো না। কথা বলল অনেকক্ষণ পর। বলল, ‘এত কিছু ঘটেছে, কিছুই জানতে পারিনি আমি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। তিনি আপনার সাথে দেখা করিয়ে দিয়েছেন।’

‘আমি আরও কিছু জানি মিঃ চীফ জাস্টিস।’

ডোনার আব্বার কথা শেষ হতেই চীফ জাস্টিস বলল, ‘দেখুন আপনি আমার সবচেয়ে সম্মানিত গুরুজনের বন্ধু। আপনিও আমার গুরুজন। মিষ্টার বলে সম্বোধন করলে আমি দুঃখ পাব। আর এখানে চীফ জাস্টিস হিসেবে কথা বলছি না।’

একটু থামল চীফ জাস্টিস। তারপর বলল, ‘এ সম্পর্কে যা জানেন দয়া করে বললে বাধিত হবো।’

ডোনার আব্বা র‍্যালফদের উদ্ধারের কথা, ডঃ ডিফরজিসের কিডন্যাপ এবং তাকে ও ওমর বায়াকে উদ্ধার প্রচেষ্টার সব কাহিনী বর্ণনার পর বলল, ‘যিনি

র‍্যালফদের উদ্ধার করেছিলেন এবং ডঃ ডিফরজিসদের উদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন, তিনি এখন ক্যামেরুনে।'

'ক্যামেরুনে? কে তিনি?' চীফ জাস্টিসের চোখে একরাশ বিস্ময়।

'তিনি একজন সমাজসেবী। যেখানে মানুষের বিপদ সেখানে তিনি।'

'র‍্যালফ কি তাকে নিয়োগ করেছে?'

'আসলে তিনি চেষ্টা করছেন ওমর বায়াকে উদ্ধার করতে। এখন তো ওমর বায়া এবং ডঃ ডিফরজিস এক হয়ে গেছেন।'

'তাহলে লোকটি মুসলমান।'

'হ্যা। কিন্তু আপনি বুঝলেন কি করে?'

'কোন খৃষ্টান ব্ল্যাক ক্রস ও ওকুয়া'র বিরোধিতার মুখে ওমর বায়াকে সাহায্য করতে যাবে না বা যেতে পারবে না। দ্বিতীয়ত, আপনারা তাকে চেনেন। আপনারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন এটা রোসেলিনের কাছে শুনেছি।'

'আপনার অনুমান ঠিক।'

'আপনার খবর আমার জন্যে পরম সুসংবাদ। কিন্তু তিনি একা কি করবেন বিরাট শক্তির বিরুদ্ধে!'

'এটা বলা মুস্কিল। তবে তার অতীত হলো, 'তিনি যেখানে যান একাই এক বিশ্ব হয়ে দাঁড়ান।'

'তার সাফল্য কামনা করি। যে কাজ আমার করার ছিল, তা তিনি করছেন। জানেন, তিনি কোথায় কি করছেন?'

'আপনার সবই জানা দরকার। আসলে আমরা এসেছি তাঁরই সন্ধানে। আমরা জানি না তিনি কোথায়।'

'কিন্তু আপনাদের সাথে তাঁর সম্পর্ক কি? আপনারা তাঁর খোঁজে কেন আসলেন?'

ডোনার আব্বা উত্তর দিল না তৎক্ষণা। একটু ভাবল। তারপর মুখ তুলে তাকাল চীফ জাস্টিসের দিকে। বলল, 'একটু স্বার্থের সম্পর্ক আছে। মারিয়া (ডোনা) আমার একমাত্র মেয়ে। তার স্বার্থেই এসেছি।'

চীফ জাস্টিসের মুখে এক টুকরো প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠল। বলল, ‘মাফ করবেন। আপনাদের পারিবারিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছি। কিন্তু একটা কৌতুহল আমি চেপে রাখতে পারছি না।’

‘বলুন।’

‘ঐ মুসলিম ছেলেটি কে, যার সাথে ‘লুই’ রাজকুমারীর বিয়ে হচ্ছে এবং যার জন্যে ‘লুই’ পরিবারের একমাত্র উত্তরাধিকারীরা ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আর ছেলেটি কে যে, বিনা স্বার্থে অন্যের জন্যে এ ভাবে জীবনের ঝুঁকি নেয়।’

ডোনার আব্বা চুপ করে থাকল। কোন উত্তর দিলনা তৎক্ষণাৎ। পরে ধীরে ধীরে বলল, ‘আমি বুঝতে পারছি না, তার পরিচয়ের প্রকাশ, তার, আপনার এবং আমাদের সকলের জন্যে কল্যাণকর হবে কিনা।’

‘আমি এখানে আপনাদের সাথে আলোচনা করছি আপনাদের একজন এবং ডঃ ডিফরজিসের একজন দত্তক সন্তান হিসেবে, চীফ জাস্টিস হিসেবে কিংবা সরকারী কোন লোক হিসেবে নয়।’

‘ধন্যবাদ। আপনি কি আহমদ মুসার নাম শুনেছেন?’

চীফ জাষ্টিস ভ্রু কুঁচকে কিছুক্ষণ চিন্তা করল। তারপর বলল, ‘একটা নাম শুনেছি। মানে তার সম্পর্কে অনেক পড়েছি। সে তো একজন ভয়ানক বিপ্লবী। ফিলিস্তিন থেকে শুরু করে অনেক দেশের অনেক পরিবর্তনের সাথে সে জড়িত। এর কথা বলছেন কেন?’

‘আপনি যে ছেলেটির পরিচয় জানতে চাচ্ছেন সেই ছেলেটিই আহমদ মুসা।’

ডোনার আব্বার শেষ দু’টি শব্দ বিদ্যুত শকের মত কাজ করল যেন চীফ জাস্টিসের উপর। তাঁর চেহারায় হতবাক ও হতবুদ্ধির ভাব ফুটে উঠল। অনেকক্ষণ সে বিহ্বল চোখে তাকিয়ে থাকল ডোনার আব্বার দিকে। অনেক সময় নিয়ে সে ধীরে ধীরে বলল, ‘আপনি কি সত্যি বলছেন? তাঁর মত বিপ্লবী কেন কোন কাজে এ ঘটনায় জড়াবে? লুই পরিবারই বা তাঁর সাথে জড়িয়ে পড়বার হেতু কি?’

‘সে এক দূর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে। যখন আহমদ মুসা স্পেনে কাজ করছিল, তখন সে আমার মেয়েকে অবধারিত কিডন্যাপ হওয়ার হাত থেকে

বাঁচায়। সেই থেকেই তার সাথে আমাদের পরিচয় ঐ সময়ই সে ওমর বায়ার সাথে পরিচিত হয় তাকে গুন্ডাদের হাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে।'

তারপর ডোনার আব্বা ওমর বায়ার সাথে আহমদ মুসার পরবর্তী সম্পর্কের বিষয় তুলে ধরে বলল, 'আসলে আহমদ মুসার ব্যক্তি, দেশ ও জাতি প্রেম সবই অমূল্য।'

'ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন। আপনার শেষ সুখবরটি শুনে আমি মনে বল পাচ্ছি, একটা বড় সংকট থেকে হয়তো আমি বাঁচবো এবং ডঃ ডিফরজিসেরও জীবন বাঁচবে। কিন্তু উদ্বেগ বোধ হচ্ছে, সে তো একা। অন্যদিকে 'ব্ল্যাক ক্রস', 'ওকুয়া' এবং 'কোক'-এর মিলিত শক্তি তার বিরুদ্ধে।'

'সে কোথায় জানি না। কি করছে জানি না। প্রার্থনা ছাড়া আমাদের আর কি করার আছে!'

'তার যদি সন্ধান পাওয়া যেত।'

ডোনার আব্বা ও চীফ জাস্টিস উসাম বাইক যখন এই আলোচনা করছিল, তখন বাড়ির বাগান ঘেরা একটা ছোট্ট লনে ডোনা, রোসেলিন এবং এলিসা গ্রেসদের মধ্যে গল্প চলছিল।

ডোনা বলছিল, 'রোসেলিন আপনার সাথে দেখা হয়ে কি যে ভালো লাগছে! কখনও কোন প্রয়োজন বোধ করলে আপনাকে টেলিফোন করা যাবে, ক্যামেরুন সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলে আপনাকে টেলিফোন করা যাবে'।

'আর আমাদের পরিবারের সাথে আপনাদের পরিচয় আমার জন্যে ঈশ্বরের আশীর্বাদের মত হয়েছে'।

'কেমন করে?' বলল ডোনা।

'লুই' পরিবারের উত্তরাধিকারীরা মুসলমান হয়েছে এটা আব্বার জানা এবং আপনাদের দেখা আব্বার প্রয়োজন ছিল।'

'কেন? কেন?' বিস্ময় ভরা কন্ঠে বলল ডোনা।

'এ 'কেন'-এর উত্তর অনেক বড়। আজ থাক।' বলল রোসেলিন সলজ্জ হেসে।

‘কিন্তু আপনার জন্যে এটা আশীর্বাদ হলো কি করে, এর উত্তর আপনি এক বাক্যেও দিতে পারেন।’ বলল ডোনা।

কথা বলল না রোসেলিন। মুখ সে নিচু করল। তার ঠোঁটে এক টুকরো সলজ্জ হাসি।

ডোনা এই হাসি দেখে লায়লা ইয়েসুগোর কথা বলতে গিয়ে সেদিন রোসেলিনের মুখে যে হাসি দেখেছিল তার কথা মনে পড়ল। অনুরাগরঞ্জিত সলজ্জ এই হাসি ডোনার অপরিচিত নয়।

‘আজ থাক, আরেকদিন বলব।’ নীরবতা ভেঙে বলল রোসেলিন।

‘দেখুন মিস রোসেলিন, আমি কুটনীতিকের মেয়ে। কথার কুটনীতি দিয়ে ঠিক বের করে ফেলব কথা।’ হেসে বলল ডোনা।

‘ঠিক আছে বের করুন। শুধু তো কুটনীতিক নয়, আপনি রাজারও মেয়ে।’ হাসতে হাসতে বলল রোসেলিন।

ডোনা একটু ভাবল। তারপর বলল, ‘নিশ্চয় আপনার আব্বা কোন মুসলিমের সাথে আপনার সম্পর্ককে ভালো চোখে দেখেন না বা দেখবেন না, এমন আশংকা আছে।’

রোসেলিনের মুখ ভরা হাসিতে একটু ভাটা পড়ল তার চোখের দৃষ্টিতে কিছুটা বিস্ময় ফুটে উঠল। ঠোঁটে সেই সলজ্জ হাসি ছড়িয়ে বলল, ‘এটুকু ঠিক আছে।’

‘নিশ্চয় সেই সম্পর্কের সাথে আপনার এবং আপনার আব্বার একটা স্বার্থের প্রশ্ন জড়িত আছে।’ রোসেলিনের চোখে চোখ রেখে ব্যারিস্টারের মত প্রশ্ন করল ডোনা।

‘এমন প্রশ্ন করছেন কোন যুক্তিতে?’ মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য টেনে প্রশ্ন করল রোসেলিন।

‘না, আগে প্রশ্নের ‘হ্যাঁ’ অথবা ‘না’ উত্তর দিন। আপনার প্রশ্নের জবাব পরে দিচ্ছি।’ ঝানু উকিলের মত ডোনা চাপ দিল রোসেলিনকে।

রোসেলিন হেসে উঠল। বলল, ‘উত্তর ‘হ্যাঁ’।’

‘এখন আপনার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। স্বার্থের সম্পর্ক না থাকলে আপনার আব্বা এমন আচরণ কেন করবেন যাতে আপনার আহত হওয়ার সম্ভাবনা আছে? দ্বিতীয়ত বড় কোন স্বার্থের সম্পর্ক না থাকলে আপনার আব্বার মনোভাব পরিবর্তনের সম্ভবনাকে অবশ্যই আপনি আশীর্বাদ বলতেন না।’

রোসেলিন হেসে উঠল। বলল, ‘খুব সুন্দর যুক্তি। আপনার ব্যবসায় বা যুডিসিয়াল প্রফেশনে আসা উচিত। আমি আংকলকে বলব।’

‘ধন্যবাদ। আমার তৃতীয় প্রশ্ন হলোঃ ঐ স্বার্থের সম্পর্ক যার সাথে তিনি অবশ্যই লায়লা ইয়েসুগো কিংবা কোন মেয়ে নন’।

ডোনার এই প্রশ্নের সাথে সাথে রোসেলিনের মুখের হাসি বিব্রতকর লজ্জায় রুপান্তরিত হল। বলল, ‘এই প্রশ্ন কেন আসে?’

‘এ প্রশ্নেরও জবাব পাবেন। কিন্তু আগে উত্তর দিন ‘হ্যাঁ’ অথবা ‘না’।’

রোসেলিন নিচু হয়ে পড়া তার চোখ তুলে তাকাল ডোনার দিকে। তারপর একটু সলজ্জ হেসে বলল, ‘হ্যাঁ।’

মুখ টিপে হাসল ডোনা। বলল, ‘এবার আপনার প্রশ্নের উত্তর: কোন মেয়ের সাথে কোন মেয়ের স্বার্থের সম্পর্ক এমন হয় না যার বিরোধিতায় নামতে হবে আংকলকে এবং যে সম্পর্কের রক্ষাকে আপনি আর্শীবাদ মনে করবেন।’

উজ্জ্বল হাসিতে ভরে উঠল রোসেলিনের মুখ। বলল, ‘আপনি চমৎকার। এরপরের প্রশ্নে আপনি কি বলেন, দেখি।’

ডোনা হাসল, বলল, ‘এটাই শেষ প্রশ্ন। বলুন প্রশ্নটা করবো তো?’

‘অবশ্যই।’ রোসেলিনের মুখের হাসিতে এবার লজ্জা মেশানো।

‘ঠিক আছে, আমার দিকে তাকান।’ ডোনা বলল রোসেলিনকে। রোসেলিন তাকাল ডোনার দিকে।

ডোনা তার চোখে চোখ রেখে মুখ টিপে হেসে বলল, ‘মুসলিম ছেলেটি কে?’

রোসেলিন দু’হাতে মুখ ঢেকে উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘চলুন যাই, আংকলরা একা আছেন।’

ডোনা উঠে দাঁড়াল। রোসেলিনকে কাছে টেনে নিল হাত ধরে। বলল,‘প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আপনি উত্তর দেবার জন্যে।’

‘আপনি শুনতে খারাপ লাগছে। আমরা তো বন্ধু।’ বলল রোসেলিন ডোনার একটা হাত আঁকড়ে ধরে।

ডোনা রোসেলিনের কাঁধে হাত রেখে বলল, ‘ঠিক আছে বন্ধু। উত্তর দাও এবার প্রশ্নের।’

রোসেলিন ডোনাকে জড়িয়ে ধরে বলল, ‘প্লিজ আজ থাক। চল ওদিকে যাই।’

‘বেশ চল।’ বলে তিনজনই হাঁটতে লাগল ড্রইং রুমের দিকে। হাঁটতে হাঁটতে এলিসা গ্রেস বলল, ‘মারিয়া আপার প্রশ্ন শেষ। আমি একটা প্রশ্ন করি?’

হাসল রোসেলিন। বলল, ‘ভয় করছি এখন প্রশ্নকে।’

‘খুব সহজ প্রশ্ন। মুসলিম ছেলেটা লায়লা ইয়েসুগোর কেউ?’

দৌড়ে পালাতে যাচ্ছিল রোসেলিন। ধরে ফেলল ডোনা। বলল, ‘ধরা পড়ে গেছ, আর পালিয়ে লাভ কি?’

দাঁড়িয়ে পড়ল রোসেলিন। লজ্জায় রাঙা গোটা মুখ। বলল, ‘কি বলব, বোধহয় একটা অসম্ভব সুখ স্বপ্ন দেখছি আমি।’ কথাগুলো শেষের দিকে ভারি হয়ে উঠল তার।

ডোনা রোসেলিনের পিঠে হাত দিয়ে কাছে টেনে নিয়ে বলল, ‘স্বপ্ন সফল হওয়ার আগে এমনটাই মনে হয়। নাম কি ছেলেটার? জানতে পারি না আমরা?’

রোসেলিন মুখ নিচু করল। ঠোঁটে লাজ-রাঙা হাসি ফুটে উঠল। বলল, ‘আবদুল্লাহ রাশিদি ইয়েসুগো, লায়লার ভাই।’

বলেই রোসেলিন দৌড় দিল ড্রইংরুমের দিকে।

পেছনে পেছনে ছুটল ডোনা এবং এলিসা গ্রেস।

# ২

ইয়েসুগো প্যালেস।

ইয়াউন্ডির অন্যতম প্রধান সড়ক 'নর্থ এ্যাভেনিউ'-এর পশ্চিম পাশে পূর্বমূখী হয়ে দাঁড়ানো বিশাল বাড়ি। বাড়ির সামনে একটা বিশাল গেট। ইয়েসুগো রাজ পরিবার এই বাড়িটি তৈরী করে ক্যামেরুনে ফরাসি শাসনের মাঝামাঝি সময়ে, যখন ফরাসী শাসকদের ষড়যন্ত্রে ইয়েসুগো সালতানাতের উপর একের পর এক বিপদ নেমে আসতে থাকে। বাড়িটি তৈরী করা হয় রাজ-পরিবারের একটা বিকল্প বাসস্থান হিসেবে। লেখাপড়া উপলক্ষ্যে আবদুল্লাহ রাশিদি ইয়েসুগো এবং তার বোন লায়লা ইয়েসুগোর বসবাস এই বাড়িতে এখন প্রায় স্থায়ী হয়ে গেছে। ইয়েসুগো প্যালেসে ইয়েসুগো পরিবারের পারিবারিক একটা ড্রইংরুম। ঘরটা খুব বড় নয়, কিন্তু খুব ছোটও নয়। ঘরের গোটা মেঝে লাল কার্পেটে মোড়া। সোফা সেট দিয়ে সাজানো ড্রইংরুম। ড্রইংরুমের এক পাশে একটা বড় টিভি সেট। তার পাশে একটা রেডিও। সে পাশেরই এক কোনায় রয়েছে ছোট্ট একটা ফ্রিজ এবং অন্য কোণায় রয়েছে ছোট্ট একটা বুক সেলফ। বুক সেলফে আছে দেশি-বিদেশী ম্যাগাজিন।

টিভি'র ঠিক বিপরীত দিকে তিন সোফায় পাশাপাশি তিনজন বসে।

মাঝখানে আহমদ মুসা।

তার বাম পাশে মুহাম্মদ ইয়েকিনি। এবং ডান পাশে আরেকজন নব্য যুবক। চুল কোঁকড়া কিন্তু রং প্রায় ফর্সা। ঠোঁট পাতলা। তার চেহারায় আরবীয় একটা ভাব আছে।

এই যুবকই আবদুল্লাহ রাশিদি ইয়েসুগো।

সে ইয়েসুগো রাজপরিবারের ৭ম পুরুষ। ৫ম পুরুষ পর্যন্ত তাদের রাজত্ব টিকে ছিল। রাশিদির আব্বা আমীর আবদুল্লাহ ইয়েসুগো যখন যুবরাজ, তখন তাদের হাত থেকে ক্ষমতা চলে যায়

রাশিদি ইয়েসুগোর মা মিসরীয় এবং দাদিও মিশরীয় ছিলেন।

গতকাল আহমদ মুসা এসেছে।

তারপর থেকে শুধু গল্পই শুনছে রাশিদি ইযেসুগো আহমদ মুসার কাছ থেকে। অসীম তার উৎসাহ।

আজ ক্যামেরুনের সাধারণ ছুটির দিন। অফিস-আদালত-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সব বন্ধ। আজ সকাল থেকেই রাশিদি ইয়েসুগো আহমদ মুসাকে নিয়ে বসেছে।

মাঝখানে তারা যোহরের নামায সেরেছে এবং লাঞ্চ করেছে। তারপর আবার এসে বসেছে সোফায়।

রাশিদি বলছিল, 'বড় ভুল করেছি। কাল থেকে যদি রেকর্ডার কাছে রাখতাম, তাহলে একা ইতিহাস রেকর্ড হয়ে যেত।'

'ঠিক বলেছেন, আহমদ মুসা ভাইয়ের ভয়েসও রেকর্ড হয়ে যেত।'

বলল ইয়েকিনি।

'সত্যি বিরাট একটা লস হলো' বলল ইয়েসুগো।

'অতীতের কথা নয়, এস ভবিষ্যতের কথা ভাবি।' বলল আহমদ মুসা।

'আমার কাছে ভবিষ্যতের চেয়ে অতীতই বেশী প্রয়োজনীয়।' বলল রাশিদি ইয়েসুগো।

'কেন?' বলল আহমদ মুসা।

'ইতিহাস না জনালে ইতিহাস গড়াও যায়না। অতীত না জানলে ভবিষ্যত বুঝাও যায় না। আমরা অতীত জানি না, তাই আমাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে আমরা অসচেতন।' বলল রাশিদি ইয়েসুগো।

'তোমার কথা ঠিক। কিন্তু ইতিহাসের এই অতীত এবং একজনের কাহিনী এক জিনিস নয়।' বলল আহমদ মুসা।

'বিষয়টাকে এইভাবে দেখা আমি মনে করি ঠিক নয়। মুসলমানদের বিপ্লব ও পরিবর্তনের এই ঘটনাগুলোকে এক ব্যক্তি মূখ্য ছিলেন বটে, কিন্তু কাজটা ছিল মুসলিম জনগণের জন্যে আত্মবিশ্বাস ও প্রেরণার উৎস। আজ বেশীর ভাগ মুসলিম সমাজে অবস্থার স্রোতে গা ভাসিয়ে চলার দৃশ্য দেখা যায়। এর কারণ, অনেকের ধারণা অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়, চেষ্টা করে লাভ নেই। বিপ্লব ও

পরিবর্তনের কাহিনী এদের জন্যে বিরাট শিক্ষকের কাজ করবে এবং নতুন প্রাণের সঞ্চার করবে এদের দেহে। সুতরাং আমার মতে এই কাহিনীগুলোর সংগ্রহ ও প্রচার খুবই জরুরী।’

‘ঠিক আছে, জাগরণ সৃষ্টির এটাও একটা পথ। কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা জাগরণ নয় এ্যাকশন প্রোগ্রামে আছি।’

‘ঠিক। কিন্তু কি করণীয় তা মাথায় আসছে না।’ বলল রাশিদি ইয়েসুগো।

‘ব্ল্যাক ক্রস কিংবা ওকুয়ার সাক্ষাত না পেলে তো আমরা কাজ শুরুই করতে পারছি না।’ বলল ইয়েকিনি।

‘পথ বেরিয়ে যাবে। আজ একটু বেরুব। অন্ততঃ চীফ জাস্টিসের বাড়ি এবং সুপ্রীম কোর্ট দেখে আসব।’

বলে আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, ‘রাশিদি ইয়েসুগো ফ্রি ওয়ার্ল্ড টিভি’র সময় হয়ে এল। আর দশ মিনিট। টিভি’টা খুলে দাও।’

‘কিন্তু বললেন না ভাইয়া, FW টিভির আজকের অনুষ্ঠানের জন্যে এত উদগ্রীব কেন আপনি?’

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘না শুনলেই আনন্দ পাবে বেশী। তোমার আনন্দ কমাতে চাই না।’

একটু থেমেই আবার বলল, ‘আজ তোমাদের পত্রিকাও দেরীতে বেরুচ্ছে।’

‘গুরুত্বপূর্ণ কিছু ন্যাশনাল ডে’তে সকালের জাতীয় অনুষ্ঠানের খবর নিয়ে পত্রিকা বের হয় তো তাই এ রকম দিনে বিকেল তিনটায় বেরোয়। পরের দিন পত্রিকা বের হয় না বলেই এই ব্যবস্থা।’ বলল ইয়েসুগো।

‘বাইরের দৈনিক পত্রিকা ইয়াউন্ডিতে কি আসে?’

‘নিয়মিত পাওয়া যায় ফ্রান্সের ‘লা মন্ডে’ এবং মিসরের আল-আহরাম।’ বলল ইয়েসুগো।

আহমদ মুসা সোজা হয়ে বসল। বলল, ‘তুমি কাউকে পাঠিয়ে ঐ দু’টিসহ আজকের এখানকার পত্রিকাগুলো আনাও। ৩টা তো বেজে যাচ্ছে।’

‘পাঠাচ্ছি, বিশেষ কিছু কি থাকবে পত্রিকায়?’ বলল ইয়েসুগো।

‘আশা করি বিশেষ কিছু থাকতে পারে।’

‘কি?’

‘যদি থাকে। খুশী হবে। অপেক্ষা কর।’

রাশিদি ইয়েসুগো উঠে গিয়ে টিভি অন করে এসে আবার সোফায় বসল।

টেলিফোন বেজে উঠল এ সময়।

ইয়েসুগো উঠে গিয়ে টেলিফোন ধরল।

‘হ্যাঁ, লায়লা?’

‘হ্যাঁ, ভাইয়া।‘

‘এসে গেছ? কোথায় তুমি?’

‘এই তো শহরে ঢুকলাম। গাড়ি থেকে টেলিফোন করছি। জরুরী কিছু? খবর দিয়েছ কেন?’

‘বড় ঘটনা ঘটেছে।’

‘কি?’

‘বলব না, আসলে চোখে দেখবে।’

‘আমার টেনশন হচ্ছে। বল, খারাপ কিছু না আনন্দের।’

‘আনন্দের, তবে তার সাথে উদ্বেগের খবরও আছে।’

‘তুমি না বললেই ভাল করতে। এখন খারাপ লাগছে।’

‘আম্মা আসছেন তো?’

‘আসছেন কিন্তু একটু পরে পৌছবেন।’

‘ও. কে। ফি আমানিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম।’

‘ওয়া আলাইকুমসসালাম।’

ইয়েসুগো টেলিফোন রেখে তার জায়গায় ফিরে এল।

‘আহমদ মুসা ভাইয়ের কথা লায়লাকে বলেছ?’ বলল ইয়েকিনি।

‘না বলিনি।’

‘এখন বললে না?’

‘ওকে একটা সারপ্রাইজ দেয়া যাবে।’

ফ্রি ওয়ার্ল্ড টিভি'র প্রোগ্রাম শুরু হয়ে গেল। এই টিভির প্রোগ্রামে প্রথমে ৫ মিনিট আগের দিনের বিশ্ব সংবাদের প্রধান বিষয় গুলোর ফলোআপ হয় তারপর দিনের প্রো প্রোগ্রামের বিবরন দেয়া হয়।

খবর প্রায় শেষ সেই সময় একজন তরুণী প্রবেশ করল ড্রইং রুমে। ফুলহাতা পা পর্যন্ত নামানো আরবীয় স্টাইলের গাউন পরা। মাথায় একটা সাদা রুমাল বাঁধা। তার উপর দিয়ে পরেছে চাদর। তরুণীটির রংও ফর্সা। তরুণী ড্রইং রুমে প্রবেশ করে সালাম দিয়েই আহমদ মুসার উপর নজর পড়ল। অপরিচিত লোককে দেখে সংকুচিত হয়ে উঠল এবং মাথার ওড়নাটাকে কপালের উপর আরও টেনে দিল।

রশিদি ইয়েসুগো উঠে দাঁড়িয়েছিল। মেয়েটি আরও এগিয়ে এলে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে মেয়েটিকে দেখিয়ে বলল, 'এই আমার সেই বোন।' আর লায়লাকে আহমদ মুসাকে দেখিয়ে বলল, 'ইনি আমাদের সম্মানিত মেহেমান।'

'নাম তো লায়লা ইয়েসুগো না? লায়লার আগে-পিছে তো আর কোন শব্দ নেই।' বলল আহমদ মুসা।

কথা শেষ করেই রশিদি ইয়েসুগো বসে পড়েছিল। লায়লাকে ইংগিত করেছিল বসতে। লায়লা গিয়ে ওদের তিনজনের বিপরীত দিকে একটা সোফায় ভিন্ন হয়ে বসল।

'বল লায়লা। তোমার পুরো নামটা।' বলল রশিদি ইয়েসুগো।

রশিদির কথায় লায়লা মনে মনে বিরক্ত হলো। কপালটা কুঞ্চিত হলো অসন্তুষ্টির প্রকাশ হিসাবে। না চেনা, না জানা একজন লোকের তার নাম সংক্রান্ত প্রশ্নের তাকে জবাব দিতে হবে কেন? ভাইয়া নিজে না বলে তাকে জবাব দিতে বলল কেন? ভাইয়ার এই আচরন তার কাছে নতুন মনে হচ্ছে। অপরিচিত জনের সামনে এভাবে বসা তাদের ঐতিহ্যেই নেই। তার উপর তাকে অপরিচিত জনের প্রশ্নের জবাব দিতে হবে এবং সেটা তার ব্যক্তিগত বিষয়ে।

লায়লা বিস্মিত দৃষ্টিতে একবার ভাইয়ার দিকে তাকাল। তারপর চকিতে একবার আহমদ মুসার দিকে চোখ তুলল। দেখল আহমদ মুসার মুখ নিচু। একবারই তার দিকে তাকিয়েছিল। আর সে তাকায়নি। লায়লা মনে হল

মেহমানটি ভদ্র এবং ভালো। ক্যামেরুনের মুসলিম সমাজে চোখের পর্দা খুব কমই দেখা যায়। আসল পর্দা তো চোখের পর্দাই।

‘‘লায়লা’র পর একটি শব্দ আছে। আমার নাম ‘লায়লা নুর ইয়েসুগো’।’

‘ধন্যবাদ বোন’, মাথা না তুলেই বলা শুরু করল, ‘খুব ভাল নাম। লায়লা নুর অর্থ নুরের বা আলোর মত রাত। এই অর্থের দিক দিয়ে বিজয়ের রাত বা সফল্যের রাতও বলা যায়।’

‘আমিন। সামনের দিন গুলো আমাদের সাফল্যের হোক।’ বলল রশিদি ইয়েসুগো।

বিব্রত লায়লা কিছু বলতে যাচ্ছিল।

এই সময় ফ্রি ওয়ার্ল্ড টিভিতে দিনের পরবর্তী প্রোগামের বিবরণ দিতে শুরু করেছে।

সঙ্গে সঙ্গেই আহমদ মুসা সবাইকে থামিয়ে দেয়ার ভঙ্গিতে দু’হাত তুলে বলল, ‘এস আমরা টিভি প্রোগামের দিকে মনযোগী হই।’

আহমদ মুসার আকস্মিক এবং নির্দেশমূলক আচরন লায়লার কাছে অসৌজন্যমুলক বলে মনে হলো। কিন্তু সবাইকে টিভির প্রতি মনোযোগী হতে বলে সেও টিভির দিকে তাকাল। লায়লার মনে প্রশ্ন জাগল। টিভিতে এমন কি প্রোগ্রাম আছে যে ওরা সবাই এভাবে টিভিমুখী হলো।

অনুষ্ঠানসুচির শুরুতেই ঘোষক বলল, ‘আজকের অনুষ্ঠানে নিউজ ফিচার পর্যায়ের শুরুতেই রয়েছে ক্যামেরুনের জাতিগত অবস্থার উপর একটা আনুসিন্ধান রিপোর্ট। এতে আপনারা শুনবেন দক্ষিণ ক্যামেরুনের মুসলিম জাতি গোষ্ঠী কি ধরণের নির্মূল অভিযানের শিকার হয়েছে।’

ঘোষনা শুনে রশিদি ইয়েসুগো সোজা হয়ে বসল। তার চোখে মুখে বিস্ময়ের একটা ঢেউ আছড়ে পড়ল। সে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘একি শুনছি মুসা ভাই। সত্যি শুনছি তো? আপনি কি এ প্রোগ্রামের কথাই বলেছিলেন?’

লায়লার চোখে-মুখেও প্রশ্ন।

'হ্যাঁ, রশিদি। আমি এ প্রোগ্রামের কথাই বলছিলাম। এস দেখি, সব কথা ঠিক ভাবে এসেছে কিনা?' বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার কথার ধরনে বিস্মিত হলো লায়লা। কথায় মনে হচ্ছে টিভি অনুষ্ঠানটির সব আয়োজনই যেন মেহেমান লোকটি করেছে। কে লোকটি!

টিভি'র অনুষ্ঠানসুচি শেষ হলো। শুরু হলো ক্যামরুনের নিউজ ফিচারটি।

আহমদ মুসাদের আটটি চোখ টিভি পর্দার উপর স্থিরভাবে নিবন্ধ।

ফ্রি ওয়ার্ল্ড টিভি (FWTV) তার দীর্ঘ দশ মিনিটের নিউজ ফিচারে যে রিপোর্ট পেশ করল তা সংক্ষেপে এইঃ

"আফ্রিকার কথিত অন্ধকারের আড়ালে জাতি নির্মূলের নীরব অভিযান চলছে। এই অভিযানের প্রধান চাপ আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের মধ্যাঞ্চলে কেন্দ্রীভুত হয়েছে। দক্ষিণ ক্যামেরুন ইতিমধ্যেই এই নির্মূল অভিযানের পূর্ণ গ্রাসের মধ্যে এসে পড়েছে। পেছন থেকে এই অভিযানে নেতৃত্ব দিচ্ছে কিংডোম অব ক্রাইস্ট বা 'কোক'। আর 'কোক'-এর পেছনে রয়েছে জঙ্গি খৃষ্টান সংগঠন 'ওকুয়া'।

কোক তার পুরনো কৌশল নিয়ে সামনে এগুচ্ছে। ওয়াকিফহাল মহলের বরাত দিয়ে আমাদের প্রতিনিধি জানাচ্ছেন, দক্ষিণ ক্যামেরুনের সব জমি স্বেচ্ছা বিক্রয়, জবরদস্তি ক্রয় এবং ভুয়া দলিলের মাধ্যমে 'কোক' দখল করে নিয়েছে। দক্ষিণ ক্যামেরুনের ৪০লাখ একর মুসলিম মালিকানাধীন জমির মধ্যে মাত্র ২ লাখ একর জমি তারা মালিকের কাছ থেকে স্বেচ্ছা বিক্রয়ের মাধ্যমে কিনেছে। অবশিষ্ট জমির ষাট ভাগ তারা কিনেছে জবরদস্তি ক্রয়ের মাধ্যেমে। বাকি ৪০ ভাগ জমি তারা মালিকেদের উচ্ছেদ করে তাড়িয়ে দিয়ে ভুয়া দলিলের মাধ্যমে আত্মসাৎ করেছে। গত পাঁচ বছরে 'কোক' দক্ষিণ ক্যামেরুন থেকে ১০ লাখ মুসলমানকে সম্পত্তি ও ঘর বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করেছে। খৃস্টান সংগঠন 'কোক' দৃশ্যের আড়ালে থেকে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং নানা নামের এনজিও-এর মাধ্যমে দক্ষিণ ক্যামেরুনে এই ভুমি দখলের কাজ সম্পন্ন করেছে। 'কোক' এর এই ভুমি দখল এবং মুসলিম নির্মল অভিযানে শত শত মুসলিম জীবন দিয়েছে, শত শত পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে। কারন এরা আপোসে জমি তাদের হাতে তুলে দিয়ে

নীরবে এলাকা ত্যাগ করতে রাজী হয়নি। ভুমি দখলে তারা কত বেপরোয়া তার দৃষ্টান্ত হিসাবে আমাদের প্রতিনিধি দক্ষিণ ক্যামেরুনের একটি মুসলিম পরিবারের মর্মান্তিক কাহিনী তুলে ধরেছেন।

সমগ্র দক্ষিণ ক্যামেরুনে একটি মাত্র মুসলিম পরিবার অবশিষ্ট ছিল। ওমর বায়ার পরিবার। ক্যাম্পু উপত্যাকায় তাদের বাড়ি। উপত্যকায় একটি সম্মানিত পরিবার ছিল এটা। দশ হাজার একরের একটা প্লটের মালিক ছিল এই পরিবার। শুর থেকেই ‘কোক’ এর নজর পড়ে এই জমি খণ্ডের উপর। কিন্তু যখন ওরা বুজল ওমার বায়ার আব্বার কাছ থেকে এ জমি তারা হস্তগত করতে পারবেনা, পরিবারটিকে দুর্বল ও ভিত করার পথ হিসাবে কোক হত্যা করল ওমার বায়ার আব্বাকে।

পিতা নিহত হবার পর ওমার বায়ার উপর অব্যাহতভাবে চাপ দিতে থাকল তারা। আশে পাশের মুসলমানরা উচ্ছেদ হয়ে যাবার পর ওমর বায়ার পরিবার একা পড়ে গেল। বিপন্ন হয়ে উঠল তাদের জীবন। ওমর বায়া তার মা’কে নিয়ে জীবন বাঁচাবার জন্যে উত্তর ক্যামেরুনের কুম্বায় পালিয়ে গেল পালিয়ে গিয়েও তারা বাঁচতে পারল না। ‘কোক’ ও ‘ওকুয়া’র লোকেরা ওমর বায়াকে হত্যা প্রচেষ্টা চালায়। ওমর বায়া পালাতে সমর্থ হলেও নিহত হয় তার মা। কিন্তু এরপরও তার সম্পত্তি ওমর বায়া খৃস্টানদের হাতে ছেড়ে দিতে রাজী হয় না। ক্যামেরুনে থেকে তার জীবন বাঁচানো অসম্ভব হয়ে উঠল। অবশেষে ক্যামেরুনের একটা উচ্চ আদালতে তার সম্পত্তির ব্যাপারে একটা উইল রেজিস্ট্রি করে তার অনুপস্থিতিতে তার সম্পত্তি হস্তান্তর ও দখলের সকল পথ বন্ধ করে সে ফ্রান্সে পালিয়ে গেল।

কিন্তু রক্ষা পায়নি সে। জানা গেছে কয়েকদিন আগে ওমর বায়াকে কিডন্যাপ করে ক্যামেরুনে আনা হয়েছে। এখন তারা ওমর বায়াকে হাতে রেখে সংশ্লিষ্ট আদালতের বিচারকের উপর চাপ প্রয়োগ করে ওমর বায়ার জমিটা হস্তগত করতে চায়। সংশ্লিষ্ট বিচারককে বাধ্য করার জন্যে তার এক অতি আপনজনকে কিডন্যাপ করেছে তারা।

আমরা যখন এই রিপোর্ট সম্পুর্ন করছি, তখন ইয়াউন্ডির কুন্তে কুম্বা এলাকার ভীতিকর একটা রিপোর্ট আমরা পেলাম। কুন্তে কুম্বা এলাকায় কোক জবরদস্তি জমি কেনা শুরু করেছে। 'কোক'কে তার দাবীকৃত একটি ভূমিখন্ড দিতে রাজী না হওয়ায় কোক কুন্তে কুম্বার দু'জন লোককে হত্যা এবং সেখানকার মসজিদের সম্মানিত ইমামকে কিডন্যাপ করে। এছাড়াও কোক কয়েকবার ঐ এলাকায় হামলা চালায়। ৪ দিন আগে অনুরুপ একটি হামলা সংঘটিত হয়। দু'টি মাইক্রোবাসে বোঝাই পনের বিশ জনের একটি সশস্ত্র দল খুব ভোরে এই হামলা চালায়। স্থানীয় মুসলমানদের পক্ষ থেকে সব সময় এসব বিষয় পুলিশকে যথারীতি অবহিত করা হয়। কিন্তু অজ্ঞাত কারনে পুলিশ 'কোক'-এর বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহন করে না। দক্ষিন ক্যামেরুনের ক্ষেত্রেও এটাই দেখা গেছে।

ক্যামেরুনের সরকার এবং বিশ্বের মানবতাবাদী সংস্থাসমুহের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক। 'কোক'-এর জাতি নির্মূল অভিযান অবিলম্বে বাদ এবং তাদের অতীত কৃতকর্মের প্রতিকার হওয়া উচিত।"

দশ মিনিটের প্রোগ্রামটি শেষ হলো ফ্রি ওয়াল্ড টিভি"র। আহমদ মুসা উঠে গিয়ে টিভি অফ করে দিয়ে এল।

টিভি প্রোগ্রাম শেষ হলেও রশিদি ইয়েসুগো এবং লায়লা টিভি স্ক্রিন থেকে তাদের চোখ সরায়নি। বিস্ময়ে যেন তারা পাথর হয়ে গেছে। ফ্রি ওয়ার্ল্ড টিভি'তে ক্যামেরুনের মুসলমানদের এই বিবরন তাদের কাছে স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে। কি করে সম্ভব হলো এটা। রাশিদি ভাবল, টিভি'তে এই প্রোগ্রাম আজ হবে আহমদ মুসা তা আগাম জানল কি করে!

এই সময় একটি অল্প বয়সের ছেলে কতগুলি খবরের কাগজ নিয়ে ড্রইংরুমে প্রবেশ করল।

রাশিদি ইয়েসুগো সেদিকে তাকিয়ে শান্ত স্বরে বলল, 'যা বলেছিলাম, সব কাগজ পেয়েছ?'

'পেয়েছি।' বলল ছেলেটি।

ছেলেটি কাগজগুলো এনে রাশিদি ইয়েসুগোর কাছে খুব সম্মানের সাথে রেখে বেরিয়ে গেল।

লায়লা ছাড়া আহমদ মুসারা তিনজন সংগে সংগে টেবিল থেকে কাগজ তুলে নিল।

আহমদ মুসা তুলে নিয়েছিল ফ্রান্সের 'লা-মন্ডে'। আহমদ মুসা প্রথম পাতার উপর একবার নজর বুলিয়েই বলল, 'ইয়েসুগো লা-মন্ডে এই খবর প্রথম পাতায় ডাবল কলাম হেডিং-এ ছেপেছে।'

'কোন খবর?' পত্রিকা থেকে মুখ তুলে বলল ইয়েসুগো। সে আল আহরামের উপর নজর বুলচ্ছিল।

'ক্যামেরুনের যে রিপোর্ট টিভিতে দেখলে সেই রিপোর্ট। '

আহমদ মুসর কথা শেষ না হতেই ইয়েসুগো চিৎকার করে উঠল, 'কি আশ্চর্য, টিভি'র এই খবর আল আহরাম প্রথম লিড আইটেম হিসাবে ছেপেছে।'

রাশিদি ইয়েসুগোর কথা শেষ না হতেই কথা বলে উঠল ইয়েকিনি। বলল, 'দেখ দেখ, আমাদের 'দি লিবার্টি'ও সিঙ্গল কলামে খবরটি ছেপেছে।'

দেখা গেল ক্যামেরুনের স্থানীয় অন্যান্য কাগজও সংক্ষেপে সিংগল কলামে হলেও খবরটি ছেপেছে। শুধু 'কোক'-এর সিজার পত্রিকা 'দিস ক্রস' খবরটি ছাপেনি।

'কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না কিভাবে এটা সম্ভব হলো? টিভি এবং খবরের কাগজে এক সাথে খবরগুলো এলো?' বিস্মিত কন্ঠে বলল রাশিদি ইয়েসুগো।

রাশিদি ইয়েসুগো, লায়লা, ইয়েকিনি সবার দুষ্টি আহমদ মুসার উপর নিবদ্ধ। লায়লা বুঝতে পারছেনা, তার ভাইয়া রাশিদি, ইয়াকিনি সবাই মেহমানকে এত গুরুত্ব দিচ্ছে কেন? মেহমানের সামনে তাদের আচরনকে অনেকটা জড়োসড়ো বলে মনে হচ্ছে। কে এই মেহমান?

'আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি যে, কাজটা পরিকল্পনা মোতাবেক হয়ে গেছে।' বলল আহমদ মুসা।

'পরিকল্পনা? কার পরিকল্পনা?' বলল রাশিদি ইয়েসুগো।

'ওমর বায়ার খবরটা পাঠিয়েছে ফ্রান্স থেকে আমাদেরই এক সাংবাদিক বোন।'

‘সে জানল কি করে?’

‘আমি তাকে নিউজটা করতে বলেছিলাম আর কুন্তে কুম্বা’র রিপোর্ট লিখেছে ইয়েকিনির বোন ফাতেমা মুনেকা। তোমাদের সামনেই তো গতকাল আমি তা পাঠালাম।’ বলল আহমদ মুসা।

‘কিন্তু টিভি ও নিউজ মিডিয়া রিপোর্ট পেলেই কি এভাবে প্রচার করে? কিভাবে এটা হলো?’ বলল রাশিদি ইয়েসুগো।

‘FWTV এবং ওয়ার্ল্ড নিউজ এজেন্সী (WNA)-এর সাথে আমাদের সুসম্পর্ক আছে। এ ধরনের নিউজ প্রচার করা ওদের একটা দায়িত্ব।’

‘তার মানে সংস্থা দু’টি কি মুসলমানদের?’ বলল লায়লা। তার চোখে-মুখে বিস্ময়।

‘মুসলমানদের। কিন্তু বাইরে এ পরিচয় নেই। মুসলিম পুঁজি এ সংস্থা দু’টি গড়ে তুলেছে এবং পরিচালনা করছে। কিন্তু কাজ-কামে এর মুসলিম পরিচয়কে মূখ্য করা হয় না। এটা সম্পুর্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। মুসলিম স্বার্থের পক্ষে কাজ করে, কিন্তু সেটা বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার দৃষ্টিকোণ থেকেই করা হয়।’ বলল আহমদ মুসা।

‘বুঝা গেল, আপনার পরিকল্পনাতেই এটা হয়েছে। কিন্তু কি লক্ষ আমরা অর্জন করতে চাচ্ছি এর দ্বারা?’ বলল রাশিদি ইয়েসুগো।

‘প্রথমত, নীরব জাতি নির্মূলের এই ঘটনা বিশ্ববাসীকে জানানো। চক্ষু লজ্জার খাতিরে হলেও বিশ্বের মানবাধিকার সংস্থাগুলো এখানে কি ঘটেছে তা এখন জানতে চেষ্টা করবে। দ্বিতীয়ত, ক্যামেরুন সরকারকে সক্রিয় করা, যাতে তারা মুসলমানদের অভিযোগগুলোর দিকে নজর দেয়। বিশ্বব্যাপী এই প্রচারের ফলে ক্যামেরুন সরকার নিজেদেরকে কিছুটা অপরাধী ভাবতে বাধ্য হবে এবং কিছুটা হলেও নিরেপেক্ষ হবার চেষ্টা করবে। তৃতীয়ত, ওমর বায়ার সম্পত্তি হস্তান্তরে একটা বাধার সৃষ্টি হবে।’

‘ঠিক বলেছেন। ব্যাপারটাকে কোনদিন তো আমরা এই ভাবে চিন্তা করিনি। এভাবে এক ঢিলে যে বহু পাখি মারা যায়, তা আমাদের কখনও মাথায় আসেনি।’

'দেখ, আনবিক বোমার চাইতে মিডিয়া অস্ত্র অনেক বেশী পাওয়ারফুল। একটা আনবিক বোমা একটা শহরে বা একটা এলাকায় আগুন লাগাতে পারে, কিন্তু একটা মিডিয়া আগুন লাগাতে পারে গোটা দুনিয়ায়।'

'FWTV'এবং 'WNA' কি এই লক্ষ্য সামনে রেখেই মুসলমানরা করেছে?'

'অবশ্যই।'

'কিন্তু আমরা তো জানি না।'

'আজ জানলে। এভাবেই যাদের জানা উচিত তারা জানবে। এ সংস্থা দু'টি মুসলমানরা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে করেছে। তা যদি সবাই জেনে ফেলে, তাহলে এ সংস্থা দু'টির ক্রেডিবিলিটি নষ্ট হয়ে যাবে। সবাই এর বক্তব্যকে দলীয় ভাষ্য হিসেবে ভাববে।'

'ঠিক। এই কৌশল যে আমারা নিতে পেরেছি, এ জন্যে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি।'

লায়লা ইয়েসুগোর বিস্ময় তখন চরমে। কে এই মেহমান? দেখতে অনেকটা তুর্কিদের মত চেহারা। তাদের পরিবারের পরিচিত এমন তো কেউ নেই! মনে হচ্ছে সে অনেক জানে, অনেক প্রভাব-প্রতিপত্তি তার!

লায়লা একটু পাশে ঝুঁকে রাশিদি ইয়েসুগোর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'ভাইয়া, মেহমানের পরিচয় দাওনি।'

রাশিদি ইয়েসুগো হেসে উঠল। বলল,'স্যরি, লায়লা। তোমাকে সারপ্রাইজ দেব বলে ওঁর পরিচয় রিজার্ভ রেখেছিলাম।'

বলে একটু থামল রাশিদি ইয়েসুগো। গম্ভীর হলো সে। বলল, 'ইনি আমাদের অতি সম্মানিত ভাই বিশ্ব-বিশ্রুত আহমদ মুসা।'

শক খাওয়ার মত চমকে উঠল লায়লা। তার চোখ প্রথমে ছুটে গেল আহমদ মুসার দিকে। তারপর এসে নিবদ্ধ হলো রাশিদি ইয়েসুগোর উপর। বলল, 'কি বলছ ভাইয়া! তিনি! তিনি ক্যামেরুনে! আমাদের এখানে।'

'যখন ইয়েকিনি ওঁকে আমার এখানে নিয়ে এল, তখন ব্যাপারটা তার চেয়েও অবিশ্বাস্য ঠেকছিল আমার কাছে। কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, আল্লাহ

আহমদ মুসাকে ক্যামেরুনে এনেছেন। তাঁর আসার সাথে সাথে আমাদের সৌভাগ্যের যাত্রাও আলহামদুলিল্লাহ শুরু হয়েছে। এই মাত্র ক্যামেরুনের উপর যে টিভি রিপোর্ট শুনলাম এবং সংবাদপত্রে যে রিপোর্ট দেখেছি, এগুলো তারই প্রমান। কুন্তে কুম্বায় আরও কি ঘটেছে ইয়েকিনির কাছে শুনবে। দেখবে কিভাবে রাতের অন্ধকার দিনের আলোতে রুপান্তরিত হয়েছে।'

থামল রাশিদি ইয়েসুগো।

লায়লা ইয়েসুগো সংগে সংগে উঠে দাঁড়াল। আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আসসালামু আলাইকুম। মাফ করবেন। আমি যা শুনলাম, আমি যা দেখছি সব আমার কাছে স্বপ্ন মনে হচ্ছে।'

আহমদ মুসা সালাম গ্রহন করে মুখ না তুলেই বলল, 'কোন কাউকে অস্বাভাবিকভাবে বড় কল্পনা করলে বাস্তবে তার যখন সাক্ষ্য পাওয়া যায়, তখন এ রকমই হয়। তাই কোন কাউকে খুব বড় করে দেখা ঠিক নয়।'

'বড়কে ছোট করে দেখাও বোধহয় ঠিক নয়।' বলল লায়লা।

'যে যা তাকে তাই ভাবা উচিত।'

'সেটা ভাবতে গেলে তো ডিকশনারীতে যত বিশেষণ তার অধিকাংশই তো আপনার নামের আগে বসাতে হয়।' বলল ইয়েকিনি।

'থাক, এসব কথা। এস কাজের কথা ভাবি। আমার ক্যামেরুনে আসার চতুর্থ দিন আজ। কিন্তু এখনও আসল কাজ শুরু করতে পারিনি।' বলল আহমদ মুসা।

'মাফ করবেন। গতকাল থেকে ভাইয়ারা আপনার অনেক কাহিনী শুনেছেন। আমি কিন্তু বঞ্চিত হলাম।' বলল লায়লা।

'আমি আশা করি রাশিদি সব বলবে তোমাকে।' বলল, আহমদ মুসা মুখ না তুলেই।

'অবশ্যই বলব।' এসব কাজে ওর খুব আগ্রহ বলেই তো জরুরী খবর দিয়ে নিয়ে এসেছি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটি সত্ত্বেও। বলল রাশিদি ইয়েসুগো।

'আপনার ক্যামেরুন মিশনের লক্ষ্য কি?' বলল লায়লা আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে।

‘আমার ক্যামেরুন মিশনের লক্ষ্য ছিল ওমর বায়া এবং ড. ডিফরজিসকে উদ্ধার করা এবং ওমর বায়ার সম্পত্তি তার দখলে আনার ব্যবস্থা। করা কিন্তু ক্যামেরুন আসার পর, বিশেষ করে কুন্তে কুম্বায় দু’দিন কাটিয়ে যে ক্যামেরুনকে দেখলাম, তাতে লক্ষ্য আরও বড় হয়েছে।’

‘ক্যামেরুনের সৌভাগ্য এটা।’ বলল রাশিদি ইয়েসুগো।

‘এমন কিছু যদি ক্যামেরুনে না ঘটত, সেটাই হতো ক্যামেরুনের সৌভাগ্য।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ঘটে গেছে বলেই তো আমরা দূর্ভাগ্যের শিকার। এখন আমরা সন্ধান করছি সৌভাগ্যের।’ বলল লায়লা।

‘এ সন্ধানকে আল্লাহ সফল করুন।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আপনার সম্পর্কে আমাদের সীমাহীন কৌতুহল। কিছু প্রশ্ন করতে পারি?’ বলল লায়লা।

‘অবশ্যই।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আপনার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন।’ বলল লায়লা।

‘আমার ব্যক্তিগত তেমন কিছু নেই, যা কিছু আছে বোন ফাতেমা মুনেকা মনে হয় সব কিছু জেনেছে। তুমি তাকে জিজ্ঞেস কর।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আপনার বোন তো একটা নয়।’ বলল লায়লা।

‘তা হবে কেন। হাজারো বোন, হাজারো ভাই নিয়ে আমার পৃথিবী।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আমার জানার খুব ইচ্ছা, এই কঠিন পথে আপনার যাত্রা কিভাবে?’

‘এ প্রশ্নের উত্তর আমার জন্য কঠিন। ফিলিস্তিনের উদ্বাস্তু ক্যাম্পে সংঘাত-সংঘর্ষের মধ্যে বেড়ে উঠা একজন ফিলিস্তিনি বলতে পারবেন তার বিপ্লবী শুরু কিভাবে। আমার ব্যাপারটাও ঐ রকম। আমার চোখের সামনে আমার মা জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। আরও হাজারো জনের সাথে আব্বা ও ছোট ভাইয়ের দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়েছে বোমায়, ক্ষুধা-তৃষ্ণা-শীতে সাথীদের একে একে ঢলে পড়তে দেখেছি মৃত্যুর কোলে হিমালয়ের উপত্যকায়। তাদের সকলের একটা অপরাধ

ছিল, তারা মুসলমান। এই বোধ কখন যে কিভাবে আমাকে দূর্ভাগা মুসলিম সমাজের একজন সেবকে পরিনত করেছে আমি জানিনা।' আহমদ মুসা বলল।

'আপনি সবচেয়ে খুশী হন কিসে?' বলল লায়লা।

'যখন কারো মুখে আমি নির্মল হাসি দেখি।' বলল আহমদ মুসা।

'সবচেয়ে দুঃখিত হন কিসে?'

'যখন মানুষের চোখে অশ্রু দেখি।'

'তাহলে মানুষকে কেন্দ্র করেই আপনার সব কিছু। মানুষকে এত ভালোবাসেন কেন?'

'মানুষকে ভালোবাসলে আল্লাহ সবচেয়ে খুশী হন বলে।'

'সত্যিই খুশী হন? কেন?'

'মানুষকে দিয়েই তো আল্লাহর সব আয়োজন। এই দুনিয়া, এই মহা-বিশ্ব, সব কিছুই আল্লাহ করেছেন মানুষের জন্যেই।'

'মানুষকে এই নির্বিচার ভলোবাসা কি সেকুলার ভালোবাসা নয়?'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'মানুষকে নির্বিচারে ভালোবাসতে না পারলে পথভ্রষ্ট মানুষকে, দূর্ভাগা পাপীদের কিভাবে আলোর পথে, মুক্তির পথে নিয়ে আসবো?'

'তাহলে মুসলিম এবং অমুসলিমকে ভালোবাসায় কোন পার্থক্য থাকবে না?'

'মুসলিমরা তোমার দেহের অংগ, আর অমুসলিমরা তোমার আশ্রিত অসহায় জন। পার্থক্য বুঝেছ?'

'বুঝেছি। বড় একটা বিভ্রান্তি আমার দূর হলো।'

'লায়লার মধ্যে যে একটা ভ্রান্তি ছিল তার স্বীকৃতি অনন্ত পাওয়া গেল। কী বল ইয়েকিনি।' বলল রাশিদি মুখ টিপে হেসে।

'যাই বল আমি কিছু বলব না আজ। তবে ইয়েকিনিকে সাক্ষী মানা ঠিক হয় নি। ভুল স্বীকারকে সে কুইনাইনের চেয়েও তেতো মনে করে।' বলল লায়লা।

'দোষ করলে রাশিদি তুমি, লায়লা শোধ নিল আমার ওপর।' বলল ইয়েকিনি। 'নিরাপদ জায়গা কোনটা লায়লা চিনে।'

লায়লা কিছু বলতে চাচ্ছিল।  তার আগে আহমদ মুসা বলল, 'তোমাদের মধুর বিতর্ক আপাতত স্থগিত। আমার ঘুম পাচ্ছে। তোমাদের এখানে আরামের জীবন আমাকে অলস করে তুলল মনে হচ্ছে।'

'স্যরি, না, ঠিক আছে। খাওয়ার পর একটু রেষ্ট নেওয়া প্রয়োজন।' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল রাশিদি ইয়েসুগো।

'আরামের জীবন মানে কি অলস জীবন?' বলল লায়লা।

'আরামের জীবন মানে অলস জীবন নয়। তবে আরামের জীবন যদি লক্ষ্যহীনতা ও নিশ্চিন্ততায় আক্রান্ত হয়, তাহলে জীবন কাজ না পেয়ে অলস হয়ে দাঁড়াতে পারে।'

'নিশ্চিন্ততা ও লক্ষ্যহীনতা দ্বারা আপনি কি বুঝতে চাচ্ছেন?' লায়লা বলল।

'মানব জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে উদাসিনতা এবং মানুষ হিসেবে নিজের দ্বায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে কোন চিন্তা না করা।'

'মাফ করবেন। এক কথায় মানব জীবনের লক্ষ্যকে আপনি কিভাবে বর্ণনা করবেন?' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে লায়লা বলল।

'মানুষের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির জন্যে কাজ করা।'

'সব মানুষের কল্যাণ সব মানুষের মুক্তির জন্য?'

'অবশ্যই, আল্লাহর কোন বান্দা কি তোমার পর যে তার কল্যাণ ও মুক্তির কথা ভাববে না? তবে প্রথম ভাবতে হবে আয়ুর কথা, পরে আশ্রিত'দের কথা।'

'আমার মনে হচ্ছে কি জানেন, আমাদের মত আপনার ভাই-বোনদের শিক্ষিত করার জন্যে গোটা দুনিয়ায় আপনার শিক্ষা কোর্স চালানো দরকার। আমরা অনেক কিছুই জানি না।' লায়লা বলল, ইয়েসুগোদের পেছনে হাঁটতে হাঁটতে।

সাংঘাতিক দামী কথা বলেছ লায়লা তুমি। বলল রাশিদী ইয়েসুগো।

'রাশিদী তুমি আরও স্বীকার করবে, আমাদের মেয়েরা দামী কথাই বেশী বলে। আসলে ইসলামের প্রতি ওদের চিন্তা আন্তরিকই বেশী।' বলল ইয়েকিনি।

'আচ্ছা ইয়েকিনি, লায়লা তোমাকে অতবড় আঘাত করল, আর তুমি তাকে এত বড় সমর্থন দিলে?' মুখ টিপে হেসে বলল রাশিদী।

'সমর্থন নয়, সত্যের প্রতি স্বীকৃতি।' বলল লায়লা। লজ্জার একটি ঢেউ তার মুখের ওপর দিয়ে বয়ে গেল।

ইয়েসুগো ও আহমদ মুসার পেছনে পাশাপাশি হাটছিল লায়লা এবং ইয়েকিনি।

কথা শেষ করেই লায়লা তাকাল ইয়েকিনির দিকে। ইয়েকিনি কিছু বলতে যাচ্ছিল। যেন মুখ ফস্কে বেরুচ্ছিল কিছু কথা।

লায়লা ঠোঁটে আঙ্গুল চাপা দিয়ে আহমদ মুসাদের দিকে ইংগিত করে কিছু না বলার জন্যে অনুরোধ করল।

লায়লার চোখে-মুখে রক্তিম লাজ-নম্রতা।

লায়লা কথা শেষ করার পর মূহুর্ত কয়েক নিরবতা। নিরবতা ভাঙল আহমদ মুসার কন্ঠ। বলল, 'ইয়েকিনি ঠিকই বলেছে। প্রমাণিত হয়েছে প্রতিকূল পরিবেশে মেয়েরাই ইসলামকে ধরে রাখতে পারে বেশী। ইসলামের শিক্ষাও তাদের মাধ্যেমে বেশী সম্প্রসারিত হয়। সাবেক কম্যুনিষ্ট দেশগুলোতে এটা আমরা দেখেছি। আফ্রিকাতেও তোমরা এটা দেখবে।'

'ব্যাস লায়লা, তোমার আর কি চাই, দলিল পেয়ে গেছ।' পেছনে তাকিয়ে হেসে বলল রাশিদি ইয়েসুগো।

'দেখ ভাইয়া ধর্মের কল এভাবেই বাতাসে নড়ে।'

লায়লার কথায় হেসে উঠল ওরা তিনজন সকলেই এক সাথে।

ইয়াউন্ডির বাণিজ্যিক এলাকায় একটা চারতলা ভবন। ভবনের তিনতলার একটা প্রশস্ত কক্ষ। কক্ষের বড় একটা টেবিলকে সামনে রেখে এক চেয়ারে বসে আছে পিয়েরে পল। তার ডানপাশে ফ্রান্সিস বাইক, ওকুয়ার প্রধান।

তাদের সামনের টেবিল ঘিরে আরো অনেকগুলো চেয়ার।

টেবিল থেকে অল্পদূরে দেয়ালে আটা একটা টিভি স্ক্রীনে ফ্রি-ওয়াল্ড টিভি'র প্রোগ্রাম চলতে দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু সেদিকে পিয়েরে পলের কোন খেয়াল নেই। তার চোখ-মুখ আগুনের মত লাল। ফ্রান্সিস বাইকের মুখ নিচু। আষাঢ়ের মেঘের মত ভারী। কথা বলছিল পিয়েরে পল 'এতবড় ঘটনা কিভাবে ঘটল। ফ্রিওয়াল্ড টিভির মত একটা বিখ্যাত আন্তর্জাতিক মিডিয়া ১০মিনিট ধরে মুসলিম উচ্ছেদ এবং 'কোক' এর কুকীর্তি বর্ণনা করল! এটা কি করে সম্ভব হলো? রীতিমত এটা মিডিয়া জগতে বিপ্লবের মত। ওমর বায়ার কাহিনী সর্বস্তরে বর্ণনা করেছে। কত লাখ একর জমি কিভাবে দখল হয়েছে তাও বলেছে। বলতে গেলে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছে। নিশ্চয় এর তীব্র প্রতিক্রিয়া হিসেবে ও.আই.সি, রাবেতা সহ মুসলিম দেশ গুলো চিৎকার করবেই। পশ্চিমা অনেক মানবধিকার সংস্থা দেখবেন সোচ্চার না হয়ে পারবে না। এখানকার সরকারও এখন চাপের মুখে পড়বে। তাদের কাছ থেকে যে সহযোগিতা আমরা পাচ্ছিলাম, ভবিষ্যতে তা পাওয়া আর আগের মত সহজ হবে না। সবচেয়ে বড় কথা ওমর বায়ার জমি হস্তান্তরের কাজটাও জটিলতায় পড়বে।'

থামল একটু পিয়েরে পল। সে আবার মুখ খোলার আগেই কথা বলে উঠল ফ্রান্সিস বাইক। বলল, 'এ রকম কত নিউজ হয়। চীফ জাস্টিস কি তার কথা থেকে সরবেন? সরলে আমাদের অস্ত্র তো আছেই। চীফ জাস্টিস তার জীবনের চাইতেও ডঃ ডিফরজিসকে ভালবাসেন। সুতরাং.........'

'সুতরাং কাজটা সহজ হতেও পারে।' ফ্রান্সিস বাইককে বাধা দিয়ে বলতে শুরু করল পিয়েরে পল, 'কিন্তু সরকার যদি বাইরের চাপে এনিয়ে ঘাটাঘাটি শুরু করে, তাহলে কাজটা কঠিন হতে পারে।'

'তা হতে পারে। তাই চীফ জাস্টিস কে দিয়ে কাজটা আমাদের আগেই সেরে ফেলতে হবে। তাছাড়া সরকার চাপে পড়লেই যে সরকার সঙ্গে সঙ্গে গলে যাবে, ব্যাপার তা নয়। সরকারের দু'একজন মানবতাবাদী ছাড়া সকলেই আমাদের পক্ষে। সরকার চাপে পড়ে তদন্তের কথা বলতে পারে, কিন্তু সেটা লোক

দেখানোই হবে। তাদের ভাই-ভাতিজা ও পুত্র-কন্যা-জামাইদের আমাদের এনজিওগুলো বড়বড় বেতন দিয়ে পুষছে।'

'সুখবরের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকার কমিশন কিংবা পশ্চিমের অন্যান্য মানবাধিকার সংস্থা সরেজমিন তদন্তের জন্যে আসতে পারে। বলা যায় আসবেই। ও. আই. সি. এবং মুসলিম দেশগুলো অবশ্যই এর ব্যবস্থা করবে।'

'সেগুলো মোকাবিলার পথ করা যাবে। কাগজে কলমে কোথাও আমাদের কোন ত্রুটি নেই। দক্ষিণ ক্যামেরুনের কোথাও মুসলিম জনপদ ছিল তা কেউ প্রমাণ করতে পারবে না। কোন মসজিদই আস্ত রাখা হয়নি। ভেঙ্গে সেখানে গীর্জা তৈরী করা হয়েছে।'

একটু থামল ফ্রান্সিস বাইক। তারপর বলল, 'অন্য একটা কথা ভেবে আমি বিস্মিত হচ্ছি, রিপোর্টের কোথাও ব্ল্যাক ক্রস-এর নাম নেই। ডঃ ডিফরজিস এবং চীফ জাস্টিস এর আদালতের উল্লেখ নেই। বোধহয় এ ব্যাপারগুলো পুরো জানেনা যে রিপোর্ট পাঠিয়েছে।'

'আমার তা মনে হয় না। সংশ্লিষ্ট বিচারকের আত্মীয়কে ফ্রান্স থেকে কিডন্যাপ করে আনা হয়েছে, সে কথা রিপোর্টে বলেছে। এ তথ্য যারা জানে, তারা ঐসব ব্যাপারও জানে। আমার মনে হচ্ছে, যারা এখবর প্রচারের পেছনে আছে তারা খুব ঠান্ডা মাথার লোক। তারা গোটা রিপোর্টে সরকারের জন্যে সামনে এগুবার কোন ক্লু রাখেনি। চীফ জাস্টিস এবং ডঃ ডিফরজিসের নাম করলে সরকার ক্লু পেয়ে যেত। আমার মনে হয় যারা খবর প্রচারের পেছনে আছে তারা চাচ্ছে নিজেরাই ব্যাপারটা হ্যান্ডেল করতে। তারা সরকারকে মনে হয় বিশ্বাস করে না।'

'ঠান্ডা মাথার এ লোকটা কে হতে পারে, যে ফ্রিওয়ার্ল্ড কে দিয়েও নিউজ করিয়ে নিতে পারে।'

'এটাই তো বুঝতে পারছিনা। এ ধরণের একজন লোক আহমদ মুসাই। কিন্তু সে কি বেঁচে আছে? অবশ্য দুয়ালা'য় যে লোকটি আমাদের পরাজিত করে পালাতে সমর্থ হয়, তার চেহারার যে বিবরণ পাওয়া গেছে তাতে আহমদ মুসার

সাথে মিলে যায়। আবার আমাদের দুয়ালা ঘাঁটি থেকে আমরা চলে আসার পর যে লোকটি হানা দেয় তার চেহারাও আহমদ মুসার মতই। সব মিলিয়ে আমার মনে হচ্ছে লোকটি আহমদ মুসাই। কিন্তু ভাবছি, সে বাঁচল কি করে ধ্বংস হওয়া মটর থেকে।'

একটা ঢোক গিলল পিয়েরে পল। থামল একটু। শুরু করল আবার, 'রিপোর্টে কুন্তে কুম্বা'র কি শুনলাম? কি ঘটেছে সেখানে?'

এই সময় ইন্টারকম কথা বলে উঠল, 'মিঃ ফ্রান্সিস বাইক, ইদেজা থেকে লোক এসেছে। জরুরী মেসেজ।'

'নিয়ে এস।' ফ্রান্সিস বাইক বলে উঠল, 'এখনি জানা যাবে সব কিছু। কুন্তে কুম্বার সবচেয়ে কাছের ঘাটি ইদেজা থেকে লোক এসেছে।' ফ্রান্সিস বাইকের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের পাশে রক্ষিত ইন্টারকমে একটা নীল বাতি জ্বলে উঠল। ফ্রান্সিস ইন্টারকমের দিকে মুখ নিয়ে বলল, 'গেটে কে?'

ইন্টারকমেই উত্তরটা ধ্বনিত হলো। বলা হলো, 'স্যার ইদেজার লোককে নিয়ে এসেছি।'

'এস।' বলল ফ্রান্সিস বাইক।

দরজা খুলে গেল। প্রবেশ করল একজন শ্বেতাঙ্গ যুবক। খৃষ্টান ফাদারের পোশাক পরা।

'মিঃ পিয়েরে পল, যুবকটি আমাদের ইদেজা গীর্জার একজন ফাদার এবং 'কোক'-এর ইদেজা-ঘাঁটির ইনফরমেশন ডাইরেক্টর।'

যুবকটি টেবিলের সামনে এলে ফ্রান্সিস বাইক উঠে দাঁড়িয়ে যুবকটির সাথে হ্যান্ডশেক করে বলল, 'বসুন ফাদার জেমস।'

ফাদার জেমস পিয়েরে পলের সাথেও হ্যান্ডশেক করল। তারপর বসল।

ফাদার জেমস হ্যান্ডশেক করার সময় হাসার চেষ্টা করছিল। কিন্তু হাসিটা কান্নার চেয়েও কাল হয়ে উঠেছিল।

'বলুন ফাদার জেমস। নিশ্চয় ইদেজা'র কিছু দুঃসংবাদ আমাদের শুনাবেন।'

'শুধু দুঃসংবাদ নয়, বিপর্যয় ঘটে গেছে।' বলল ফাদার জেমস।

'বিপর্যয়! কেমন বিপর্যয়?'

'কুন্তে কুম্বার ওরা ইদেজা'র 'কোক' প্রধান জন স্টিফেনসহ আমাদের ১৬জনকে বন্দী করেছে এবং তাদের সাথের দু'জনকে হত্যা করেছে। পরে ইদেজা থেকে ওদের ইমামকে মুক্ত এবং ইদেজার ডেপুটি 'কোক' প্রধান ফ্রাসোয়া বিবসিয়ের'কে বন্দী করে নিয়ে গেছে।' থামল ফাদার জেমস।

'কি বলছ তুমি? তোমার মাথা ঠিক আছে তো?' বলল ফ্রান্সিস বাইক।

মাথা নিচু করল ফাদার জেমস। বলল, 'অবিশ্বাস্য বটে, কিন্তু যা বলেছি তাই ঘটেছে।'

'ইদেজায় ওরা কয়জন লোক এসেছিল?'

'তিনজন।'

'কি বলছ? তিনজন লোক এসে আমাদের ঘাটিতে ঢুকে তাদের ইমামকে খুলে নিয়ে গেল। আর ফ্রাসোয়াকেও বন্দী করে নিয়ে গেল। তোমরা কি করছিলে?'

'বাধা দিতে গিয়ে আমাদের দু'জন খুন হয়েছে ইদেজায়।'

'এবং কুন্তে কুম্বায় দু'জন। ওদের কেউ মারা যায়নি?'

'না। ওদের কেউ মারা যায়নি।'

'আচ্ছা, বলত ঘটনা। শুনি কি করে ঘটতে পারল এই অসম্ভব ঘটনা।'

ফাদার জেমস কুন্তে কুম্বার সব ঘটনা এবং ইদেজাতে যেভাবে যা ঘটেছিল সবিস্তারে সব বর্ণনা করল।

ফাদার জেমস কথা শেষ করে থামতেই পিয়েরে পল বলে উঠল, 'দেখা যাচ্ছে গোটা বিপর্যয়, ঘটেছে মাত্র একজন লোকের হাতে।'

'তাই তো দেখছি। কিন্তু কুন্তে কুম্বা তো দুরে, ক্যামেরুনের কোথাও তো এ ধরণের লোক গত দশ বছরে আমাদের চোখে পড়েনি।' বলল ফ্রান্সিস বাইক।

'লোকটিকে আপনি দেখেছেন?' জিজ্ঞেস করল পিয়েরে পল ফাদার জেমস কে।

দেখেছি।

'বলুন তো লোকটা কেমন?' বল পিয়েরে পল।

‘লোকটা ফর্সা এশিয়ান। তুর্কিদের সাথেই তার চেহারার মিল বেশী।’

‘ঘন কাল চুল মাথায়?’ বলল পিয়রে পল।

‘হ্যাঁ।’

‘চুল কিছু কোকড়ানো?’

‘ঠিকই বলেছেন।’

‘মুখের চেহারায় কি শিশু সুলভ সহজ ভাব?’

‘হ্যাঁ।’ বলল জেমস।

পিয়েরে পল মুখ ঘুরিয়ে তাকাল ফ্রান্সিস বাইকের দিকে। বলল, ‘তাহলে আহমদ মুসা সেদিনের গাড়ি বিস্ফোরণে মরেনি। এই চেহারা নিঃসন্দেহে আহমদ মুসার। বুঝা যাচ্ছে, কুমেটে আমাদের ঘাটিতে সেদিন আহমদ মুসাই তাহলে হানা দিয়েছিল।’

‘আমি বুঝতে পারছিনা মিঃ পল এই ওমর বায়ার সাথে আহমদ মুসার কি সম্পর্ক? আহমদ মুসার সাথে আমাদের কোন শত্রুতা নেই! তাহলে সে আমাদের পিছু ছাড়ছে না কেন?’

‘মিঃ ফ্রান্সিস বাইক আহমদ মুসাকে আপনি চিনতেই পারেননি। সে তো জাতির জন্যে কাজ করছে। ওমর বায়া তার জাতির একজন। আমরা ওমর বায়ার শত্রু মানে তার শত্রু।’ বলল পিয়েরে পল।

পিয়েরে পল আবার ফিরল ফাদার জেমসের দিকে। বলল, ‘ফ্রাসোয়া বিবসিয়ের’কে ওরা ইদেজা থেকে ধরে নিয়ে গেছে, দু’জনকে হত্যা করে গেছে, জন স্টিফেনসহ ১৬জনকে কুন্তে কুম্বায় বন্দী করে রেখেছে-এই বিষয়গুলো আপনারা পুলিশকে জানিয়েছেন তো?’

মুখটা ম্লান হয়ে গেল ফাদার জেমসের। বলল, ‘আমরা গিয়েছিলাম থানায় মামলা দায়ের করতে। কিন্তু দেখা গেল, তারা আগেই মামলা দায়ের করে গেছে।’

‘ওরা কি মামলা দায়ের করেছে?’ বলল পিয়েরে পল।

‘ওরা ঐদিন পরপর দুইটি মামলা দায়ের করেছে। প্রথমটিতে মূল অভিযোগ, জন স্টিফেন ও ফ্রাসোয়া বিবসিয়েরের নেতৃত্বে জনা বিশেক সশস্ত্র

লোক কুন্তে কুম্বার উপর আক্রমণ চালায়। এলাকাবাসী চারদিক থেকে ছুটে এসে ওদের প্রতিরোধের চেষ্টা করে। প্রতিরোধের মুখে ওরা কয়েকটি লাশ সহ পালিয়ে গেছে। ওদের দুটি গাড়ি আটক করা হয়েছে। আর ২য় মামলায় বলেছে, ওরা ইদেজা থেকে কুন্তে কুম্বায় আক্রমণ করতে এলে সুযোগ পেয়ে ওরা কিডন্যাপ করে রাখা আমাদের ইমাম আলী ওকেচুকু ওদের দু'জন লোককে পরাভুত করে পালিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছে। আমরা তার নিরাপত্তাহীনতার ভয় করছি।'

'তার মানে ওরা জন স্টিফেন সহ আমাদের ১৬জন লোককে যে বন্দী করে রেখেছে এবং ইদেজা ঘাটিতে এসে আমাদের দু'জনকে হত্যা করে ফ্রাসোয়া বিবসিয়েরকে ধরে নিয়ে গেছে সব অস্বীকার করছে।' চিৎকার করে উঠল ফ্রান্সিস বাইক।

ফাদার জেমস কোন কথা বলল না।

'সাংঘাতিক ব্যাপার। আপনারা ওদের মুক্ত করার জন্যে ওখানে আর অভিযান করেননি?' বলল পিয়েরে পল।

'আমরা লুলমডোর, ম্যালমায়া, ইবোলোয়া এবং ক্রিবি ঘাঁটির সাথে আলোচনা করেছি। তারা সব শুনে বলেছে, বড় ধরনের যুদ্ধ ছাড়া কুন্তে কুম্বায় এখন ঢোকা যাবে না। ওদের হাতে অনেকগুলো মেশিনগান, সাব মেশিনগান ও গোলা-গুলী চলে গেছে। এখন ওদের মোকাবিলা করতে গেলে বিরাট ক্ষয়-ক্ষতি হতে পারে। বড় ধরনের সিদ্ধান্ত ছাড়া এটা করা যাবে না। ইতিমধ্যে আমরা খবর পেলাম আপনারা ক্যামেরুন ফিরেছেন। ইয়াউন্ডি এসেছেন। তাই শুনেই এখানে ছুটে এলাম।'

'কি মনে করেন, বন্দীদেরকে কি ওরা মেরে ফেলতে পারে? বন্দী করার কথা যখন ওরা গোপন করেছে, তখন মেরে ফেলাই ওদের জন্যে স্বাভাবিক।' বলল পিয়েরে পল।

'না মেরে ফেলেনি। ইতিমধ্যে আরও কিছু ঘটনা ঘটেছে স্যার। যার কারণে আরও বেশী ছুটে আসা এখানে?' বলল ফাদার জেমস।

'খারাপ কিছু? কি ঘটনা?' বলল ফ্রান্সিস বাইক।

‘কুন্তে কুম্বা থেকে ভায়া-মিডিয়া মেসেজ এসেছে, তাদের চারটি দাবী পূরণ হলে ওরা বন্দীদের ছেড়ে দেবে।’

‘চারটি দাবী কি?’ বলল ফ্রান্সিস বাইক।

‘তাদের প্রথম দাবী ইয়াউন্ডি হাইওয়ে থেকে দক্ষিণে ইদেজা অঞ্চলে জবরদস্তি ও ভুয়া দলিলের মাধ্যমে আত্মসাতকৃত সকল মুসলিম জমি ফেরত দিতে হবে। দুই, গত পাঁচ বছরে যাদেরকে এই অঞ্চল থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, তাদের ক্ষতিপূরণসহ পূনর্বাসন করতে হবে। তিন, গোটা দক্ষিণ ক্যামেরুনে খৃষ্টানদের সত্যিকার মিশনারী সংস্থাগুলো থাকবে, কিন্তু সেবার নামে ষড়যন্ত্ররত এনজিও-দের তৎপরতা বন্ধ করে দিতে হবে। চার, ‘কোক’ কে তার সকল দুস্কর্ম লিখিতভাবে স্বীকার করতে হবে।’

‘দাবীগুলো ও প্রতিশ্রুতি কি তারা লিখিতভাবে দিয়েছে? আমাদের দলিল প্রয়োজন, যাতে প্রমাণ হয় স্টিফেনরা তাদের হাতে বন্দী আছে।’ বলল পিয়েরে পল।

‘ওরা লিখিত কিছু দেয়নি। একটা অডিও ক্যাসেটে জন স্টিফেন তাদের দাবীগুলো আমাদের শুনিয়েছে। তারপর ক্যাসেট তারা ফেরত নিয়ে গেছে।’ বলল ফাদার জেমস।

‘জন স্টিফেনকে দিয়ে ওরা কথা বলিয়েছে?’

‘হ্যাঁ।’

‘আর কিছু বলেছে?’

‘পনের দিন ওরা সময় দিয়েছে। দাবী পূরণ না হলে বন্দীদের তারা কি করবে তা তারাই জানে।’

‘ওদের কাজগুলো নিখুঁত দেখছি। আইনের দিক দিয়ে ওদের ধরার কোন পথ তারা রাখেনি। শক্তি প্রয়োগ করতে গেলেও ঝুঁকি আছে। বন্দীদের ওরা খুন করে ফেলতে পারে।’ বলল পিয়েরে পল।

‘কিন্তু এমন বুদ্ধি ওরা কোথায় পেল? ক্যামেরুনে বহুদিন কাজ করছি। এমন তো ঘটেনি?’ বলল ফ্রান্সিস বাইক।

‘ভুলে যাচ্ছ কেন, ওদের মাঝে এখন আহমদ মুসা। তারই কাজ এসব।’

‘আমরা এখন কি করব মিঃ পল?’

‘চিন্তা করতে হবে। তবে অন্য কিছুর দিকে মন দেবার আগে ওমর বায়ার সম্পত্তির ফয়সালা করে ফেলতে হবে। আহমদ মুসা কুন্তে কুম্বায় ব্যস্ত থাকতে থাকতে আমাদের এই কাজটা শেষ করতে হবে।’

‘ঠিক বলেছেন মিঃ পল।’ বলল ফ্রান্সিস বাইক।

বলে ফ্রান্সিস বাইক ফাদার জেমসের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘জন স্টিফেনদের ওরা কোথায় আটকে রেখেছে?’

‘এটা জানার কোন উপায় নেই। ওদের এলাকায় এখন এমন পাহারা অপরিচিত কোন লোক সেখানে প্রবেশ করতে পারছে না।’ বলল ফাদার জেমস।

‘পুলিশ পাঠানো যায় না?’

‘পুলিশের সাথে আলোচনা করেছি। তারা ওদের কম্যুনিটি সেন্টার মসজিদ পর্যন্ত যেতে পারে। পুলিশ বলেছে, ওদের এলাকা সার্চের কোন সুযোগ পুলিশের নেই। কারণ, কেস গেছে ওদের পক্ষে। ওরা বাদী।

‘বুদ্ধিতে আপনারা পরাজিত হয়েছেন। এখন তার মাশুল তো দিতেই হবে।’ তীব্র ক্ষোভ ঝরে পড়ল ফাদার ফ্রান্সিস বাইকের কন্ঠে।

একটু থেমে একটু শান্ত হয়ে ফ্রান্সিস বাইক বলল, ‘ঠিক আছে মিঃ জেমস আপনি যান। পরে কথা হবে আপনার সাথে।’

ফাদার জেমস চলে গেলে ফ্রান্সিস বাইক পিয়েরে পলের দিকে চেয়ে বলল, ‘আমি বুঝতে পারছি না ওমর বায়ার লোকরা এত বড় ‘মিডিয়া ক্যু’ করল কি করে?’

‘তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল না পিয়েরে পল। শূন্য দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ বাইরে তাকিয়ে থাকার পর বলল, ফ্রি ওয়ার্ল্ড টিভি এবং ওয়ার্ল্ড নিউজ এজেন্সীকে এ ধরনের নিউজ মাঝে মাঝেই করতে দেখা যাচ্ছে। এটা ওদের নিছক ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ না ওরা কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কাজ করছে তা দেখা প্রয়োজন। আপনি একটা ভালো বিষয়ের দিকে ইংগিত করেছেন। ও দু’টি সংবাদ মাধ্যমকে ভালো করে এক্স-রে করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে আমাদের ব্ল্যাক-ক্রস

ইনটেলিজেন্স এবং ইসরাইলি ইনটেলিজেন্স এক সাথে কাজ করতে পারে। আমি এখনি আমাদের ইনটেলিজেন্স চীফ সাইরাস শিরাককে টেলিফোন করে দিচ্ছি।'

বলে টেলিফোন তুলল পিয়েরে পল।

সাইরাস শিরাক থাকেন প্যারিস। 'হ্যালো, শিরাক।' টেলিফোন সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হলে বলল পিয়েরে পল।

'ইয়েস স্যার।' ওপার থেকে বলল সাইরাস শিরাক।

'আজকের FWTV দেখেছ?'

'মনিটর করা হয়েছিল, আমি দেখলাম।'

'কি বুঝলে?'

'উদ্দেশ্যমূলকভাবে তারা এটা প্রচার করেছে।'

'তুমিও বলছ একথা?'

'কেউ নিশ্চয় করিয়েছে এটা।'

'কিন্তু সি এন এন কে দিয়ে কেউ করাতে পারে এটা?'

'না পারে না।'

'তাহলে কি বুঝছ?'

'বুঝতে পারছি FWTV-তে ইসলামী মৌলবাদের জীবাণু ঢুকেছে।'

'এই জীবাণু তোমাকে ধ্বংস করতে হবে।'

'বুঝেছি।'

'কাজ শুরু করে দাও। প্রথমে সন্ধান, তারপর চিহ্নিতকরণ এবং শেষ কাজ ধ্বংস করা।'

'শুরু করছি। ওদিকের কি খবর?'

'চীফ জাষ্টিসের সাথে যোগাযোগ হয়েছে। কাজ হবে।'

'খুশীর খবর স্যার।'

'প্রভু যিশু সদয় হোন। রাখি।'

'ও, কে স্যার।'

'ও, কে। বাই।'

টেলিফোন রেখে ফ্রান্সিস বাইকের দিকে চেয়ে বলল, 'আমাদের শিরাক করিতকর্মা। সেও ব্যাপারটা ধরে ফেলেছে।'

'ভালই হলো, সব দিকেই আমাদের নজর দেয়া দরকার।' বলল ফ্রান্সিস বাইক।

'কিন্তু সবচেয়ে বেশী নজর রাখতে হবে রেডিও, টিভি, সংবাদ সংস্থা ও সংবাদপত্রের দিকে। এ চারটি সংবাদ মাধ্যমের আন্তর্জাতিক কোন চ্যানেলে মুসলমানদের ঢুকতে দেয়া যাবে না।

'কিন্তু ওদের টাকার জোর তো কম নেই। আন্তর্জাতিক চ্যানেল তো ওরাও গড়তে পারে।'

'পারে। কিন্তু সেগুলোকে বাঁচতে দেয়া হবে না। যেমন ওদের 'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক নিউজ এজেন্সী' (IINA) এবং ওদের মক্কা ভিত্তিক 'ভয়েস অব ইসলাম' বেঁচে থেকেও মৃতপ্রায়।'

কথা শেষ করেই উঠে দাঁড়াল পিয়েরে পল। বলল, 'বসুন, আমি আসছি। চীফ জাষ্টিসের সাথে কথা বলতে হবে।'

চীফ জাষ্টিস উসাম বাইকের ড্রইং রুম।

পাশাপাশি দু'টি সোফায় বসেছিলেন চীফ জাষ্টিস এবং ল'সেক্রেটারী লাউস মেইডি।

ল'সেক্রেটারী নতুন নিয়োগ লাভের পর চীফ জাষ্টিসের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতের জন্যে এসেছে। লাউস মেইডি এর আগে ছিলেন স্বরাষ্ট্র সেক্রেটারী।

চা খেতে খেতে দু'জনে গল্প করছিলেন।

FWTV- এর প্রোগ্রাম শুরু হলে তাদের গল্প থেমে গেল। ক্যামেরুন সংক্রান্ত ফিচার নিউজের ঘোষণা শুনে তারা অবাক হয়ে গিয়েছিল।

পুরো ফিচার নিউজটি তারা দু'জনে সম্মোহিতের মত দেখল।

চীফ জাষ্টিসের মুখে একটা প্রবল উত্তেজনার ছাপ। আর ল'সেক্রেটারীর চোখ তো রীতিমত ছানাবড়া হয়ে উঠেছে।

নিউজ ফিচারটি শেষ হলে প্রথমে কথা বলল ল' সেক্রেটারী লাউস মেইডি। বলল, 'স্যার, ক্যামেরুনের মান-ইজ্জত সব ধুলায় লুটিয়ে দিয়েছে। এ ভয়ানক রিপোর্ট তারা কোথায় পেল।'

চীফ জাষ্টিসের মনে তখন অন্য চিন্তার ঝড়। তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠেছে পিয়েরে পলের মুখ এবং পণ-বন্দী হিসেবে আটক ডঃ ডিফরজিসের মুখ। তার মনে পড়ল পিয়েরে পলের সাথে তার কথোপকথন এবং ডঃ ডিপরজিসের মুক্তির জন্যে পিয়েরে পলের প্রস্তাবে তার মৌন স্বীকৃতির কথা। এই নিউজ তো সব লন্ড-ভন্ড করে দেয়ার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি করল, ভাবল সে। মিশেল প্লাতিনির কথা তার মনে পড়ল। মনে পড়ল আহমদ মুসার কথাও। ওরা কি ওমর বায়া ও ডঃ ডিফরজিসকে সথাসময়ে উদ্ধার করতে পারবে? পুলিশের সাহায্য নেয়ার কথাও তার মনে হলো। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবল, তাতে নিস্ফল হৈ চৈ বাড়বে এবং ডঃ ডিফরজিসের জীবন তাতে বিপন্ন হতে পারে। তার পিতৃপ্রতিম ডঃ ডিফরজিসের মুখ তার মনের আকাশে ভেসে উঠল। কেঁপে উঠল উসাম বাইকের হৃদয়। সে কোন ভাবেই তার প্রিয় এ লোকটির জীবন বিপন্ন হতে দিতে পারে না। আবার তার কাছে FWTV এর নিউজ যে সঙ্কট সৃষ্টি করল তাও বড় হয়ে উঠল। 'কোক' এবং খ্রিস্টান এনজিও'রা খ্রিস্টান স্বার্থে বেআইনি কিছু করেছে এটা তার অজানা নয়, কিন্তু তার প্রকৃত রুপ যে এত ভয়াবহ তা সে কোনদিন কল্পনাও করেনি।

ল'সেক্রেটারি লাউস মেইডির প্রশ্নে চীফ জাস্টিস উসাম বাইকের চিন্তায় ছেদ পড়ল।

লাউস মেইডি থামার পর সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিল না চীফ জাস্টিস। একটু ভাবল। বলল তারপর, 'এ ভয়ানক রিপোর্ট তারা কোথায় পেল তার চেয়ে বড় কথা হল, যা বলল তা সত্য কিনা। যদি সত্য হয়, তাহলে ইজ্জত আর আছে কোথায়?'

'সব কথা সত্য বলাও কঠিন, মিথ্যা বলাও সম্ভব নয় স্যার।'

‘কেন?’

‘তদন্ত ছাড়া নিশ্চিত করে কিছুই বলা যাবে না।’

‘স্পেসিফিক ঘটনার সত্য-মিথ্যা তদন্ত-সাপেক্ষে হতে পারে। কিন্তু মূল অভিযোগ সত্য কিনা? কোক দক্ষিণ ক্যামেরুন থেকে মুসলমানদের সমূলে উচ্ছেদ করেছে কিনা? জোর করে মুসলিম ভূমি ক্রয় ও আত্মসাৎ করেছে কিনা?’

‘এই মূল অভিযোগ সত্য স্যার। তিন বছর আমি স্বরাষ্ট্র বিভাগের দায়িত্বে ছিলাম। আমার অনেক সরেজমিন অভিজ্ঞতা রয়েছে।’

‘কিন্তু প্রশাসন এর প্রতিকার কি করেছে?’

‘স্যার অন্য কোন জায়গায় হলে বলতাম, প্রশাসন এর কাছে এসব ঘটনা আসেনি, প্রশাসন কি করবে? কিন্তু এ কথা আপনার কাছে বলতে পারি না। আসলে প্রশাসন দেখেও না দেখার ভান করেছে। এ না করে উপায়ও ছিল না।’

‘একথা কি আসলেই সত্য?’

‘স্যার, আমাদের দলে ও সরকারে ওরা সংখ্যা গরিষ্ঠ নয়, কিন্তু প্রভাব-প্রতিপত্তির দিক দিয়ে নিরঙ্কুশ। তাছাড়া দেশের খ্রিস্টান এনজিও এবং সংস্থা-সংগঠনসমূহ গ্রাম ও শহরের অধিকাংশ ভোট নিয়ন্ত্রণ করেছে। সুতরাং এরা যা চায়, সরকার এবং দল তার বাইরে যেতে পারে না। দ্বিতীয়ত, বাইরের দাতা দেশ ও সংস্থা গুলো প্রায় সবই খ্রিস্টান। তারা খ্রিস্টান এনজিও ও সংস্থাগুলোকেই বেশি বিশ্বাস করে। সুতরাং সরকার ঘরে বাইরে সব দিকে থেকেই অব্যাহত চাপের শিকার, যা উপেক্ষা করার সাধ্য সরকারের নেই।’

‘এ সবের কিছু কিছু আমিও জানি। কিন্তু এখন ঐ পশ্চিমা দাতা দেশগুলো এবং তাদের সংস্থা-সংগঠনগুলোই তো মানবাধিকার এর স্লোগান তুলে সরকারের উপর চড়াও হবে। যে কারন আপনি শুরুতেই সরকারের ইজ্জতের ভয় করেছেন।’

‘না, পশ্চিম এর সবাই এটা নিয়ে হৈচৈ করবেনা। দেখুন না আমেরিকার ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বোমা পড়ল। তাতে কয়েকজন লোক মারা গেল, কিন্তু গায়ে কোন আঁচড় পড়ল না বিল্ডিং এর। এটা নিয়ে কি হৈচৈ। ঘটা করে অপরাধীর বিচার হল, শাস্তি হল। কিন্তু সেই আমেরিকায় ওকলাহোমার সিটি সেন্টারে বোমা পড়ল। লোক নিহত হল প্রায় শ-এর কাছাকাছি। বিল্ডিং এমন ক্ষতিগ্রস্ত হল যে, বহুতল

বিশিষ্ট বিল্ডিং ধ্বসিয়ে দিতে হল। কিন্তু ঘটনার ঘটা করে তদন্তও হল না। ঢাক-ঢোল পিটিয়ে বিচারও হল না। এরকমটা কেন হল? কারন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের ঘটনায় আসামি ছিল মুসলমান এবং ওকলাহোমার ঘটনায় আসামি ছিল খ্রিস্টান। আমাদের ক্ষেত্রেও এটাই ঘটবে। কথা, সমালোচনা কিছু হবে না তা নয়, কিন্তু সেটা হবে অনেকটা লোক দেখানো। তবে ভয় হল মুসলিম দেশগুলোকে নিয়ে। তারা অথবা তাদের সংস্থা-সংগঠনগুলো বিরাট রকমের হৈচৈ করবে। বিষয়টা জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনে উঠবে এবং জাতিসংঘের উদ্বাস্তু কমিশনও সক্রিয় হয়ে উঠবে। তাদের সাথে সাথে ইসলামি সম্মেলন সংস্থার প্রতিনিধিরাও ক্যামেরুনে ছুটে আসবে। আমি আমাদের বেইজ্জতির কথা বলেছি এসব ভেবেই।'

'এই পরিস্থিতিতে কি ভাবছেন? দুটো বিষয় এখন আমাদের সামনে। একটা দক্ষিণ ক্যামেরুন থেকে মুসলিম উচ্ছেদের বিরাট অভিযোগ। অন্যটি ওমর বায়ার পরিবার সম্পর্কিত ঘটনা।'

'আমাদের মাথা কিছু ঘামাতে হবে প্রথম বিষয়টা নিয়ে। ওমর বায়ার পরিবারের ব্যাপারটা ওরা রিপোর্টে বললেও আমাদের সামনে নেই। এব্যাপারে বন্দী হিসেবে কেউ আমাদের কাছে আসছে না। সুতরাং ঐ ব্যাপারে আমরা চুপ থাকতে পারি স্যার।'

চীফ জাস্টিস ওসাম বাইক একবার ভাবল, ওমর বায়ার ঘটনা ল'সেক্রেটারি লাউস মেইডিকে বলেই ফেলি। কিন্তু পরক্ষনেই তার মনে হল, এ নিয়ে সরকারিভাবে কোন তৎপরতা শুরু হলে ওরা ডঃ ডিফরজিসকে মেরেই ফেলবে। প্রশাসন শুধু হৈচৈ ছাড়া তাকে উদ্ধারের কিছুই করতে পারবে না। তার কাছে এখন ডঃ ডিফরজিসের উদ্ধারই সবচেয়ে বড়।

'প্রথম বিষয়টা নিয়ে এখন কি করার আছে?'

'প্রতিকারমূলক কিছু করার সুযোগ আমাদের কমই আছে। ইচ্ছা করলে কিছু করতে পারে কোক এবং অন্যান্য খ্রিষ্টান সংস্থাগুলো। আমরা উদ্বাস্তু সম্পর্কিত অভিযোগের খোঁজ-খবর নিতে পারি, ভুমি রেজিস্ট্রি রেকর্ড আমরা চেক করতে

পারি এবং বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে সরেজমিনে তদন্ত করতে পারি, অভিযোগ শুনতে পারি।'

'তাছাড়া বিভিন্ন থানায় মুসলমানদের অভিযোগগুলোর খোঁজ-খবর নিয়ে দেখা যেতে পারে।'

'জি স্যার, এটাও আমরা পারি।'

'আমার মনে হয়, এসব যদি আমরা করি, কোকসহ খ্রিষ্টান এনজিও এবং মিশনারিদের উপর একটা চাপ পড়বে। তারা এ ব্যাপারে আমাদের দোষ দিতে পারবে না। কারন তারা বুঝবে আমরা চাপে পড়ে করছি। অন্য দিকে এসব করে আমরা জাতিসংঘ ও মুসলিম দেশগুলোকেও একটা বুঝ দিতে পারবো।'

'ঠিক বলেছেন স্যার।'

বলে লাউস মেইডী হাতের ঘড়ি দেখল। তারপর বলল, 'স্যার আজকের মত উঠি।'

'ঠিক আছে। খুব খুশি হলাম আপনি এসেছেন।'

দু'জনেই উঠে দাঁড়াল।

ল'সেক্রেটারি লাউস মেইডিকে বিদায় দিয়ে চীফ জাস্টিস উসাম বাইক এসে তার স্টাডিতে ঢুকলেন। বসলেন পড়ার টেবিলে।

ঠিক এসময়েই তার টেলিফোন বেজে উঠল। কর্ডলেস টেলিফোন হাতে তুলে নিলেন তিনি।

টেলিফোনে পার্সোনাল সেক্রেটারির কণ্ঠ পেয়ে তিনি বললেন, 'বল'।

'স্যার, ফ্রান্স থেকে আসা সেই লোকটি কথা বলতে চায়।' বলল চীফ জাস্টিসের পার্সোনাল সেক্রেটারি।

'দাও লাইন।'

'গুড ইভেনিং। আমি পিয়েরে পল মাই লর্ড। সেদিন আপনার বাসায় গিয়ে কথা বলেছিলাম।'

'গুড ইভেনিং। বলুন।'

'মাই লর্ড, আমি জানতে চাচ্ছি, আমরা কবে আমাদের কাজটা শেষ করতে পারি।'

‘FWTV আজ ক্যমেরুন এর  উপর যে ফিচার নিউজ প্রচার করেছে, সেটা দেখেছেন?’

‘ইয়েস মাই লর্ড।’

‘এই নিউজে আমাকে, আমার আদালতকে টার্গেট করা হয়েছে বুঝতে পেরেছেন?’

‘কিন্তু তার চেয়ে বড় টার্গেট করা হয়েছে আমাদের।’

‘স্বার্থের কারনে সেটা আপনারা বরদাশত করতে পারছেন।’

‘মাই লর্ড স্বার্থ আমাদের নয়, স্বার্থ প্রভু খ্রিষ্টের, তাই সবার।’

‘আমি তর্ক করব না। তারপর বলুন।’

‘মাই লর্ড আমি বলেছি। কাজটা আমরা তাড়াতাড়ি শেষ করতে চাই। ডেটটা কবে হতে পারে?’

‘FWTV এর আজকের নিউজের পর সত্তর কিছু করা যাবে না। অপেক্ষা করতে হবে।’ ‘কিন্তু আপনার পিতা ডঃডিফরজিসের মুক্তি তাতে বিলম্বিত হবে। তাছাড়া অনির্দিষ্ট ভাবে তাকে এইভাবে আমরা রাখতে চাই না। হয় আপনি তাড়াতাড়ি তাকে মুক্ত করবেন। না হলে আমরা তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় দিয়ে মুক্ত হবো।’

পিয়েরে পলের কথা শুনে কেঁপে উঠল চীফ জাস্টিস উসাম বাইকের হৃদয়। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলল, ‘তার ক্ষতি করে আপনারা কি লাভ করবেন?’

‘লাভ করার পথ বের করব। দেখুন, আপনি অত্যন্ত সম্মনিত বাক্তি। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য অর্জনে আপনি বাঁধা দিলে সব ধরনের অসম্মানের কাজ আমরা করতে পারবো।’

আবার বুকটা কেঁপে উঠল চীফ জাস্টিসের। তার বুঝতে বাকি রইলনা পিয়েরে পল কি বলতে চাচ্ছে।

চীফ জাস্টিসের উত্তর দিতে একটু দেরি হল। কথা বলল আবার পিয়েরে পলই। বলল, ‘আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম হিসেবে এক ডঃ ডিফরজিস

নয়, শত ডঃ ডিফরজিসকে কিডন্যাপ করতে পারি। আমার অনুরোধ মাই লর্ড, আপনি FWTV কি বলল সেটা একদম ভুলে যান।'

'আমি ভুলে গেলেই তো বিষয়টা মিথ্যা হয়ে যাবে না। কিংবা যারা ওটা করিয়েছে তারা বসে যাবে না।'

'ওসব নিয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই মাই লর্ড। আমাদের সমস্যা আপনি, আপনি ঠিক হয়ে গেলে আর কোন চিন্তা নেই।'

একটু থামল পিয়েরে পল। একটা ঢোঁক গেলার জন্য। পরক্ষনেই আবার শুরু করল, 'কথা আর বাড়াতে চাই নি মাই লর্ড। আমরা কাজ শুরু করে দিচ্ছি। আমাদের লোকরা ওমর বায়ার পক্ষ থেকে তার মামলা প্রত্যাহার এবং উইল বাতিলের একটা দরখাস্ত দেবে। আমরা চাই আপনি সত্তর একটা ডেট দেবেন।'

কথা শেষ করে 'থ্যাংস মাই লর্ড' বলে চীফ জাস্টিসকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে টেলিফোন রেখে দিল।

অপমানে-উদ্বেগে পাথরের মত হয়ে গেলেন চীফ জাস্টিস।

টেলিফোনটা কানে যেভাবে ধরেছিল, সেভাবেই ধরে থাকল। চোখে-মুখে অসহনীয় অপমান ও প্রবল উদ্বেগের কালোছায়া।

চীফ জাস্টিসের মেয়ে রোসেলিন ঘরে প্রবেশ করল। সে তার পিতাকে দেখে ভীত হয়ে পড়ল।

সে দ্রুত এগিয়ে তার পিতার কাঁধে হাত রাখল। ডাকল, 'আব্বা।'

চীফ জাস্টিসের হাত থেকে টেলিফোনটা পড়ে গেল। চমকে উঠে নড়ে-চড়ে বসল চীফ জাস্টিস উসাম বাইক।

রোসেলিন টেলিফোনটা মেঝে থেকে তুলে নিয়ে বলল, 'তোমার কি হয়েছে আব্বা? অসুস্থ বোধ করছ?' রোসেলিনের চোখে-মুখে উদ্বেগ।

চীফ জাস্টিস হাসতে চেষ্টা করে বলল, 'না মা আমি ভাল আছি।'

'তাহলে নিশ্চয় তুমি খারাপ টেলিফোন পেয়েছো?'

'হ্যাঁ মা।'

'সত্যি? কি সেটা? কোত্থেকে?' আবার উদ্বেগ ঝরে পড়ল রোসেলিনের কন্ঠে।

মেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করে বলল, ‘কত রকম কেস করি মা। তুমি এসব নিয়ে ভেব না।’

‘তুমি ভাববে, আর আমি ভাবব না?’

‘মেয়ের ভাবনা তো তার পিতারাই ভাবেন মা।’

‘তা ঠিক। কিন্তু অনেক ক্ষেত্র আছে যখন মেয়েরা ভাবনার কিছু অংশ পাওয়ার দাবী করতে পারে।’

‘তুমি একটা সহযোগিতা আমাকে করবে মা?’

‘সেটা কি?’

চীফ জাস্টিস মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, ‘তোমাকে একটু সাবধানে থাকতে হবে মা।’

‘কেমন সাবধানে?’

‘বাইরে একটু কম বেরুবে। বেরুলে রাতে বেরুবে না, সম্ভব হলে একা বেরুবে না। এই রকম।’

রোসেলিন পিতার দিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন কন্ঠে বলল, ‘তুমি খারাপ কিছু আশংকা করছ? কিন্তু তোমার আমার তো কোন শত্রু নেই!’

‘বললাম তো। কত রকম কেসের সাথে আমি জড়িত। আমি কাউকে শত্রু না ভাবলেও, কেউ আমাকে তার স্বার্থের শত্রু ভাবতে পারে।’

‘বুঝেছি আব্বা।’ ম্লান কন্ঠে বলল রোসেলিন।

‘ভেবনা মা, সব ঠিক হয়ে যাবে।’

বলে একটু থামল চীফ জাস্টিস। তারপর বলল আবার, ‘মারিয়াদের সাথে এর মধ্যে কথা বলেছ? লাগাও তো টেলিফোন ওদের ওখানে। আমি মশিয়ে প্লাতিনির সাথে একটু কথা বলব।’

রোসেলিন বলল, ‘নাম্বারটা নিয়ে আসি আব্বা। আমি কালকেই কথা বলেছি মারিয়ার সাথে।’ বলে রোসেলিন ছুটে বেরিয়ে গেল স্টাডি রুম থেকে।

# ৩

ইয়াউন্ডি বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানিক্যাল গার্ডেন।

ছোট, কিন্তু সুন্দর বাগানটি।

গোটা বাগান জুড়ে মাকড়সার জালের মত লাল সুড়কির রাস্তা। মাঝে মাঝে বেঞ্চ পাতা।

একটা বেঞ্চিতে বসে রোসেলিন, লায়লা ইয়েসুগো এবং ডোনা।

আজ বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছে। রোসেলিন ডোনাকে নিয়ে এসেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে।

তিনজন গল্প করছে।

ডোনা চোখ কপালে তুলে বলছিল, 'বেনু নদীর তীরের গারুয়া শহর? সে তো আফ্রিকার বুকের গভীরে, চাদ হ্রদের তীরে প্রায়।'

'প্রায় নয়, 'লেক চাদ'-এর পশ্চিম তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল ইয়েসুগো রাজবংশের রাজত্ব।' বলল লায়লা ইয়েসুগো।

'কিন্তু আফ্রিকার এত গভীরে একটি মুসলিম রাজত্বের প্রতিষ্ঠা কিভাবে হলো?' বলল ডোনা।

'লেক চাদ-এর তীরে ইসলামকে দেখে বিস্মিত হচ্ছেন? আমাদের ক্যামেরুনের দক্ষিণে, গ্যাবনের পুবে কাম্পুর উত্তরাংশ যেখানে সভ্যতার কোন আলোই এখনও পড়েনি, সেই 'এনডোকি' এলাকাতে গেলেও 'আল্লাহ' এবং 'মুহাম্মাদ (সঃ)'-এর নাম (যদিও ভাঙা উচ্চারণে) আপনি শুনতে পাবেন। আমাদের গারুয়া উপত্যকা তো ভাগ্যবান। নাইজেরিয়ার 'লাগোস' এবং 'বেনু' নদীর পথে এবং উত্তর নাইজেরিয়ার ঐতিহাসিক মুসলিম মহানগরী 'কানো' থেকে নদী ও সড়ক পথে ইসলাম এখানে পৌঁছেছে।'

'যাই বলুন। যতই ভাবছি, ততই বিস্মিত হচ্ছি, কিভাবে আফ্রিকার এই গভীরে, অকল্পনীয় দুর্গম অঞ্চলে ইসলাম প্রবেশ করল। আমি জানি আফ্রিকার

এই অঞ্চলে ইসলামের বড় ধরনের কোন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাহলে ইসলাম কিভাবে, কিসের জোরে পাহাড়-জংগল-নদীর দুর্গম গভীরে পথ করে নিল?'

'আমাদের এই আফ্রিকা অঞ্চলে কোন সাম্রাজ্য বা রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা তো নয়ই, এমনকি কোন মিশনারী সংগঠন বা পেশাদার মিশনারীদের দ্বারাও ইসলাম প্রচার হয়নি। স্ট্যানলি লেনপুলের বইতে আমি পড়েছি। 'The Preaching of Islam' বইতে তিনি বলেন, 'ইসলাম প্রচারের জন্যে গঠিত কোন সংস্থা বা এই উদ্দেশ্যে তৈরী কোন প্রচারবিদের দ্বারা ইসলামের প্রচার কাজ পরিচালিত হয়নি। মুসলমানদের প্রত্যেকেই ছিলেন একজন করে সক্রিয় মিশনারী।' বলল লায়লা ইয়েসুগো।

'বিস্ময়টা আমার এই জন্যেই বেশী। এই অবস্থায় ইসলাম কি করে আফ্রিকার এই অঞ্চলে প্রবেশ করল।' বলল ডোনা।

'সেই কাহিনী লিখলে আমার মনে হয় পৃথিবীর বৃহত্তম মহাকাব্য রচিত হতো।'

বলে একটু দম নিল লায়লা। তারপর শুরু করল, 'আরবী অশ্বারোহী সৈনিকের বিজয়ী পদক্ষেপ মরক্কো-মৌরতানিয়ায় এসে থেমে গিয়েছিল। আরও দক্ষিণে সেনেগালের বিজন জংগলে তারা প্রবেশ করেনি। পরবর্তীকালে সেনেগালের উপকূল ধরে ইসলামের যাত্রা শুরু হয় মুসলমানদের ব্যক্তিগত উদ্যোগের আকারে। সুদান ও লিবিয়ার মরুভূমি পাড়ি দিয়ে বাণিজ্য-কাফেলার পথ ধরে যেভাবে স্থলপথে ইসলামের দক্ষিণ মুখী যাত্রা শুরু হয়, সেভাবে সেনেগাল থেকে উপকূলের পথ ধরে ইসলাম দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত হতে থাকে। সেনেগাল থেকে গাম্বিয়া, গাম্বিয়া থেকে গিনি বিসাউ, গিনি, তারপর সিয়েরা লিওন- এভাবে ধীরে ও নিরবে ইসলাম অগ্রসর হয়েছে এক জনপদ থেকে আরেক জনপদে, এক দেশ থেকে আরেক দেশে।'

একটু থামল লায়লা ইয়েসুগো। একটু নড়ে বসল। তারপর বলল, 'ব্যক্তি উদ্যোগে ইসলামের এই প্রচার কত যে অমর ঘটনা, কত যে অপরূপ কাহিনী এবং অশ্রু ভেজা কত যে গাঁথা সৃষ্টি করে। কিন্তু সবই হারিয়ে গেছে, তার সাথে হারিয়ে

গেছে সংখ্যাহীন ত্যাগী মানুষের উজ্জ্বল জীবনচিত্র। আপনার মত আমারও ইচ্ছা করত এসব জানবার। অনেক বই ঘাটাঘাটি করেছি আমাদের ঐ মহান অতীতকে জানার জন্যে। যা পেয়েছি তা সামান্য ইংগিতমাত্র।’

‘সেটা কেমন?’ বলল ডোনা।

‘মুসলমানরা যখনই এ অঞ্চলে কোন নতুন ভূখন্ডে এসেছে ব্যবসার উদ্দেশ্যে কিংবা বসবাসের জন্যে, তারা প্রথমেই গেছে স্থানীয় গোত্র সরদারের কাছে। আবেদন করেছে তাদের প্রার্থনা গৃহ (মসজিদ) তৈরীর অনুমতি দানের। এইভাবে তারা মসজিদ গড়েছে, স্কুল তৈরী করেছে। শীঘ্রই তাদের সততা ও নিষ্ঠা এবং উন্নত সাংস্কৃতিক আচার-ব্যবহার স্থানীয় বিধর্মী নিগ্রোদের অভিভুত করেছে।’ এই কথাগুলো লিখেছেন, ‘Islam and Mission’ বইতে একজন ইউরোপীয় ঐতিহাসিক। আর ‘Rise of British West Africa’ বইতে জর্জ ক্লাউডে যে বিবরণ দিয়েছেন তা হলোঃ ‘মুসলমানদের স্কুলগুলো ছিল স্থানীয় আফ্রিকানদের জন্যে বিস্ময়কর। স্কুলে যে সব বিষয় ও আচার-ব্যবহার শিক্ষা দেয়া হতো, তা মুগ্ধ ও অভিভুত করত তাদেরকে। আফ্রিকান ছাত্ররা এই শিক্ষা ও আচার-ব্যবহার ছড়িয়ে দিত, এখান থেকে সেখানে, এক এলাকা থেকে আরেক এলাকায়। ইসলামের মেসেজ ছড়িয়ে পড়ে তার সাথে। ইসলামের আরও দু’টি বিষয় আফ্রিকার নিগ্রোদের সম্মোহিত করে। তার একটি হলো দাস ব্যবসার প্রতি মুসলমানদের বিরোধিতা। অন্যটি হলো আইন-শৃংখলার প্রতি মুসলমানদের গুরুত্ব দান। সে সময় উপকূল জুড়ে ছিল প্রচন্ড নৈরাজ্য। যার কারণে আফ্রিকান নিগ্রোরা তাদের উপকূল থেকে সব সময় দূরে থাকতে চেষ্টা করতো। মুসলমানরা যেখানেই গেছে এবং কিছুটা শক্তি অর্জন করতে পেরেছে, সেখানেই তারা শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছে এবং মানুষের নিরাপত্তা বিধান করেছে। এর ফলে নিগ্রো মানুষেরা ছুটে এসেছে শান্তি ও স্বস্তির সন্ধান পেয়ে। এভাবে মুসলমানদের ইমেজ বিধর্মী নিগ্রোদের মধ্যে এতটাই বেড়ে যায় যে গোত্র সর্দাররা মুসলমান না হয়েও মুসলিম নাম গ্রহণ করতে গৌরব বোধ করত। নাম গ্রহণ করার সাথে সাথে তারা ইসলামও গ্রহণ করে বসতো। আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের শ্রেষ্ঠ নিগ্রো গোত্রগুলো

যেমন ‘ফুলবি’, ‘ম্যানডিংগো’, ‘হাউসা’ এবং ‘ফুলানি’ ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নেয় এইভাবে।’

থামল লায়লা ইয়েসুগো।

‘চমৎকার। বিস্ময়কর ইতিহাস।’ বলল ডোনা।

‘পশ্চিমা ঐতিহাসিক ‘ব্লাডেন’ এবং ‘ওয়াস্টারম্যান’ কি বলেছেন জানেন? বলেছেন, সেনেগাল এবং নাইজেরিয়ার উপকূল পর্যন্ত দু’হাজার মাইল উপকূল রেখায় এমন কোন শহর দেখা যেত না যা মসজিদের গম্বুজে শোভিত ছিল না। এই বিপ্লব সংঘটিত হয় উনিশ ও বিশ শতকে এবং গিজ গিজ করা খৃস্টান মিশনারীদের চোখের সামনেই।’

‘কি সর্বনাশা, এই বিপ্লব উনিশ-বিশ শতকের? পশ্চিমা আধিপত্যের কালে?’

‘অবশ্যই। আপনি শুনে বিস্মিত হবেন, উনিশ ও বিশ শতকের মাঝা-মাঝি সময় পর্যন্ত, মুসলমানদের রাজনৈতিক সৌভাগ্য সূর্য যখন অস্তমিত, যখন অধিকাংশ মুসলিম দেশ দুর্ভাগ্যের অন্ধকারে নিমজ্জিত, ঠিক তখনই আফ্রিকার এই অঞ্চলে কালো মানুষদের জীবনে সৌভাগ্য সূর্য দীপ্ত হয়ে উঠে। ইসলাম এই সময় কত দ্রুত বিস্তার লাভ করে তার একটা হিসেব দিচ্ছিঃ

| দেশের নাম | উনিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম জনসংখ্যার হার | বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত মুসলিম জনসংখ্যার হার |
|---|---|---|
| সেনেগাল | ৪০% | ৯৫% |
| গিনি বিসাউ | ৩০% | ৮০% |
| গিনি | ১৫% | ৬৫% |
| সিয়েরা লিওন | ১০% | ৮০% |
| লাইবেরিয়া | ৫% | ৪৫% |
| আইভরি কোস্ট | ৫% | ৫৫% |

| ঘানা | ২% | ৪৫% |
|---|---|---|
| টোগো | ৩% | ৫৫% |
| বেনিন | ০% | ১১% |
| নাইজেরিয়া | ৩০% | ৬৫% |
| ক্যামেরুন | ১% | ৫৫% |

এই হিসেবে দেখা যাবে, উনিশ ও বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে সেনেগানল থেকে ক্যামরুন উপকূল পর্যন্ত একটা বিপ্লব ঘটে গেছে।'

'কিন্তু কেন, কিভাবে?' বলল ডোনা।

লায়লা ইয়েসুগো মুখ খোলার আগেই কথা বলে উঠল রোসেলিন। বলল, 'আমার মনে হয় এর সবচেয়ে বড় কারণ হলো, পশ্চিমীরা এ সময় নিগ্রোদেরকে পশুতে পরিণত করেছিল দাস ব্যবসায়ের মাধ্যমে আর ইসলাম এসেছিল তাদেরকে মানুষের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে। আরেকটা কারণ হলো, যেটা লায়লা বলল, মুসলমানদের চরিত্র মাধুর্য এবং শান্তিপ্রিয়তা।'

'কি রোসেলিন, তুমি খৃষ্টানদের বদনাম করছ আর মুসলমানদের প্রশংসা করছ তোমার মুখে?' মুখ টিপে হেসে বলল ডোনা।

'করবে না? রাশিদি ইয়েসুগো মুসলমান না?' বলল লায়লা দুষ্টুমি হেসে।

'তোমার মুহাম্মদ ইয়েকিনির কথা কেউ জানে না বুঝি?'

'ঠিক আছে। সবাই জানুক। আমি তো অস্বীকার করছি না।' বলল লায়লা।

'মুহাম্মদ ইয়েকিনি কে রোসেলিন?' বলল ডোনা।

'ইয়াউন্ডি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। কুন্তে কুম্বায় বাড়ি।'

এ সময় ওরা তাদের পেছন থেকে কাশির আওয়াজ পেল।

ফিরে তাকাল তিনজনেই।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে রাশিদি ইয়েসুগো।

রাশিদি ইয়েসুগোর দিকে ইংগিত করে লায়লা ডোনাকে বলল, 'আমার ভাই রাশিদি ইয়েসুগো।'

বলেই লায়লা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'তোমরা একটু বস। আমি আসছি।'

লায়লা ছুটলো রাশিদির দিকে। সেখানে পৌছে বলল, 'কিছু বলবে ভাইয়া?'

'রোসেলিনকে একটু দরকার। কিন্তু নতুন মেয়েটা কে? এ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন কেউ নাকি?' কিন্তু মাথায় ওড়না কেন?'

'বিশ্ববিদ্যালয়ের কেউ না ভাইয়া। ও ফ্রান্সের মেয়ে। কিন্তু মুসলমান। নাম মারিয়া। এখানকার ফরাসি রাষ্ট্রদূতের মেহমান। ওঁর আব্বাসহ বেড়াতে এসেছেন।'

'মুসলমান জেনে খুশী হলাম। কিন্তু শোন, আহমদ মুসা সম্পর্কে একটি কথাও ওঁকে কিংবা রোসেলিনকে এক কথায় বাইরের কাউকেই বলবে না।'

'এটা আমি জানি।'

বলে একটু থেমেই আবার বলল, 'চল ওঁর সাথে তোমার পরিচয় করিয়ে দেই।'

'না উনি কিছু মনে করতে পারেন। পর্দা করেন মনে হচ্ছে।'

'ঠিক আছে। একটু দাঁড়াও। রোসেলিনকে পাঠাচ্ছি।' বলে এক দৌড়ে ফিরে গেল।

লায়লা রোসেলিনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গম্ভীর কন্ঠে বলল, 'রোসেলিন, যাও ভাইয়ার হুকুম।'

'কি হুকুম? কোথায় যাব?' বলল রোসেলিন।

'ভাইয়া তোমাকে ডাকছেন।'

'আমি কেন যাব। উনি তো আসতে পারেন।'

'আসবেন না। আমি মারিয়া আপার কথা ভাইয়াকে বলেছি। আমি পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্যে আসতে বললে তিনি বললেন, মারিয়া নিশ্চয় এটা ভালোভাবে নিবেন না।'

'কেন?' বলল রোসেলিন।

‘কারণ, মারিয়া আপার গায়ে আমার মত চাদর দেখেই ভাইয়া বুঝেছেন মারিয়া পর্দা করেন।’

‘বুঝেছি।’ বলে উঠে দাঁড়াল রোসেলিন।

ধীরে ধীরে সে গিয়ে দাঁড়াল রাশিদি ইয়েসুগোর সামনে। বলল, ‘বল তোমার এত জরুরী বিষয়টা কি?’

‘আমি দুঃখিত রোসেলিন, তোমাদের জমজমাট গল্পের আসরে ছেদ টানার জন্যে। কিন্তু আমি কি জরুরী বিষয় ছাড়া তোমাকে ডাকতে পারি না।’

‘কোন দিন ডাক না। তুমি আমাকে এড়িয়ে চলতেই ভালবাস। ভাই বলছিলাম।’

‘এড়িয়ে চলি কথাটা ঠিক নয় রোসেলিন। কারণ এর মধ্যে উপেক্ষার ভাব আছে। তুমি কি বলতে পার আমি তোমাকে উপেক্ষা করি?’

‘না সেটা অবশ্যই নয়। কিন্তু তোমার আলগা চলার হেতু কি? সেদিন দেখ ডিপার্টমেন্টাল পিকনিকে সবাই কিভাবে সময় কাটাল, আর আমি-তুমি কিভাবে সময় কাটালাম। প্রায় সকলেই যখন জোড়ায় জোড়ায় ঘুরে বেড়িয়েছে, তখন তুমি তাঁবুর পাশে গাছতলায় বসে বই পড়ে সময় কাটিয়েছ, আর আমি একটু দূরে একটা ঝোপের পাশে বসে তোমার দিকে তাকিয়ে সময় কাটিয়েছি। আমার কান্না পাচ্ছিল। কেন তুমি এমন নিষ্ঠুরতা কর?’ আবেগে কাঁপল রোসেলিনের গলা।

রাশিদি ইয়েসুগো একটু হাসার চেষ্টা করল। বলল, ‘তুমি ব্যথা পেয়েছ। আমি দুঃখিত রোসেলিন। তোমার কোন কষ্ট আমাকেও কষ্ট দেয়।’

রাশিদি ইয়েসুগো একটু থামল। গম্ভীর হয়ে উঠল তার মুখ। বলল, ‘কিন্তু সমস্যা হলো রোসেলিন, আমাদের ধর্ম ইসলাম বিবাহ-পূর্ব এ ধরনের অবাধ মেলামেশার সুযোগ দেয় না এবং এই না দেয়াটা সবদিক থেকে যুক্তিসংগত।’

‘আমি জানি রাশিদি। আমার ভালো লাগে তোমাদের এই কালচার। কিন্তু ভুলে যাই, যখন হৃদয়ের এক সাগর অবুঝ তৃষ্ণা উন্মুখ হয়ে ওঠে।’

একটু থামল রোসেলিন। তারপর মুখে এক টুকরো হাসি টেনে বলল, ‘বল, কি বলতে ডেকেছ?’

রাশিদি ইয়েসুগো হেসে বলল, ‘তেমন কিছু না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধ গেল। কেমন ছিলে তাই জানতে চাচ্ছিলাম।’

‘ভালই ছিলাম। তবে আমার বাইরে বেরুনোর ব্যাপার নিয়ে মনে হচ্ছে আব্বা খুব চিন্তিত।’

‘কেন? তিনি কিছু বলেছেন?’

‘আমাকে একটু সাবধানে থাকতে বলেছেন। একা একা আমাকে বাইরে বেরুতে বলা যায় নিষেধ করেছেন। দেখ না আজ আমার নতুন বান্ধবী মারিয়াকে নিয়ে এসেছি!’

‘কারণ কি?’

‘আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। উত্তরে বলেছেন, সময় ভালো যাচ্ছে না তো তাই।’

‘কিন্তু তেমন খারাপ কিছু তো দেখা যাচ্ছে না। তোমাদের পারিবারিক কিংবা কোর্টের কোন ঘটনার কারণে কোনো অসুবিধা নেই তো?’

‘না, পারিবারিক কোন সমস্যা নেই। তবে আব্বা কারণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে এ কথাও বলেছিলেন যে, তাকে কত রকম বিচারের সাথে জড়িত থাকতে হয়, বিচারে কত মানুষের কত স্বার্থের হানি ঘটে।’

রোসেলিনের শেষ কথায় রাশিদির মনকে চঞ্চল করে তুলল। সে ভাবল, পিয়েরে পল কিংবা তার লোকেরা চীফ জাস্টিসের সাথে তাহলে অবশ্যই যোগাযোগ করেছে। চীফ জাস্টিসের মত কি, প্রতিক্রিয়া কি তা জানার জন্যে তার মন আকুলি-বিকুলি করে উঠল। কিন্তু জানার উপায় নেই। বুঝা যাচ্ছে, রোসেলিনও কিছু জানে না। অবশ্য জানার কথাও নয়। চীফ জাস্টিস তার মেয়ের সাথে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন তা স্বাভাবিক নয়। যাক তবু এটুকু জানা গেল যে, পিয়েরে পলরা চীফ জাস্টিসের সাথে যোগাযোগ করেছে। এ খবরটা আহমদ মুসাকে এখনই জানানো দরকার। খুশী হলো রাশিদি ইয়েসুগো, আহমদ মুসার প্রথম এ্যাসাইনমেন্ট পুরো না হলেও কিছুটা সমাধা করতে পেরেছে।

রোসেলিনই আবার কথা বলল, ‘মনে হচ্ছে তুমি কিছু ভাবছ?’

‘হ্যাঁ। তুমি তো একটা খারাপ খবর শোনালে।’

‘এ নিয়ে তুমি ভেব না। আমিও ভাবছি না।’

‘কিন্তু তোমার সাবধান থাকা দরকার।’

‘না থাকলে তোমার কোন ক্ষতি হবে?’ মুখ টিপে হেসে বলল রোসেলিন।

‘না, কিছু ক্ষতি হবে না।’ রাশিদিও হেসে জবাব দিল।

‘জান, কেউ আমাকে নিয়ে ভাবলে আমার খুব ভালো লাগে।’

‘এই ‘কেউ’ একজন না বহুজন?’

‘বলব না।’ হাসি চাপতে চাপতে বলল রোসেলিন।

কথা শেষ করেই ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, ‘আসি। ওদিকে লায়লা দুষ্টটা কত গল্প ফাঁদছে কে জানে।’

বলে দৌড় দিলে রোসেলিন।

আহমদ মুসা, রাশিদি ইয়েসুগো এবং মুহাম্মদ ইয়েকিনি যখন সুপ্রীম কোর্ট ভবনে পৌঁছল, তখন বেলা ১১ টা।

কোর্ট ভবনে নেমে আহমদ মুসা চীফ জাস্টিসের এজলাসের দিকে এগুলো। উদ্দেশ্য চীফ জাস্টিসকে একনজর দেখা। তবে তাদের লক্ষ্য চীফ জাস্টিসের রেজিস্টার অফিসে গিয়ে খোঁজ-খবর নেয়া।

রাশিদি ইয়েসুগোর কাছে রোসেলিনের কথা শুনেই আহমদ মুসা নিশ্চিত হয়েছিল পিয়েরে পলরা চীফ জাস্টিসের সাথে যোগাযোগ করেছে। কিন্তু এই যোগাযোগের ফলাফলটা যে কি তা রোসেলিনের কথায় বুঝা যায়নি, তবে চীফ জাস্টিস তার মেয়ের চলাচলে সাবধানতা অবলম্বন করায় বুঝা গেছে তিনি পিয়েরে পলদেরকে ভয় করছেন। কিন্তু ভয়টা পিয়েরে পলদের প্রস্তাব প্রত্যাখান করা জনিত, না এটা কোন বাড়তি সাবধানতা তা পরিস্কার হয়নি। তবে আহমদ মুসা খুশী রোসেলিন রাশিদিদের পরিচিত হওয়ায়। প্রয়োজনে চীফ জাস্টিসের সাথে যোগাযোগের একটা মাধ্যম সে হতে পারে। আহমদ মুসার মনে প্রশ্ন জাগল, রোসেলিন ও রাশিদি ইয়েসুগোর মধ্যে প্রেম আছে এটা চীফ জাস্টিস জানেন

কিনা? তিনি যদি মেয়ের এ সম্পর্ককে গ্রহণ করতেন, তাহলে বড় একটা লাভ হতো। চীফ জাস্টিস মুসলমানদের ভালবাসতেন।

আহমদ মুসা, রাশিদি ইয়েসুগো এবং মুহাম্মদ ইয়েকিনি পাশাপাশি হাঁটছিল। আহমদ মুসা রাশিদি ইয়েসুগোর দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, রাশিদি তোমার রোসেলিনের সম্পর্কের ব্যাপারটা চীফ জাস্টিস সাহেব জানেন?

প্রশ্ন শুনে রাশিদির চোখে-মুখে লজ্জার একটা আবরণ নেমে এল। রাশিদির ঠোঁটে এক টুকরো লজ্জা-পীড়িত হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'না উনি জানেন না।'

'জানলে তার প্রতিক্রিয়া কি হবে তুমি অনুমান করতে পার?'

'রোসেলিন বলে, ইয়েসুগো রাজ-পরিবার সম্পর্কে চীফ জাস্টিসের খুব সুধারণা আছে। এ ব্যাপারটা আমিও জানি। 'ইয়েসুগো রাজ পরিবার বনাম রাষ্ট্র' শীর্ষক একটা বড় মামলায় রায় দিয়েছিল হাইকোর্ট বছর পাঁচেক আগে। রায়টা এসেছিল ইয়েসুগো রাজ পরিবারের পক্ষে। এই রায়ের ফলে গারুয়া উপত্যকায় বেনু নদী তীরের বিশাল এলাকা ইয়েসুগো রাজ পরিবার ফিরে পেয়েছে। হাইকোর্টের যে বেঞ্চ এই রায় দিয়েছিল, সে বেঞ্চের চেয়ারম্যান ছিলেন বর্তমান চীফ জাস্টিস। তবে রোসেলিন বলেছে, একটা মুসলিম পরিবারে নিজের মেয়েকে বিয়ে দেয়ার ব্যাপারটা চীফ জাস্টিস হয়তো সহজভাবে নেবেন না।'

'এটা স্বাভাবিক।'

চীফ জাস্টিসের এজলাসের দরজায় পৌঁছে গিয়েছিল আহমদ মুসা।

চীফ জাস্টিস তাঁর বেঞ্চসহ এজলাসে।

ক্যামেরুনে সুপ্রীম কোর্টে 'ওয়ানম্যান বেঞ্চ' বেঞ্চে বসে। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়েই শুধু ফুল বেঞ্চ গঠিত হয়। আজ ফুল বেঞ্চ বসেছে। শাসনতান্ত্রিক একটা বিষয়ে তাদের রায় দিতে হবে।

প্রধান বিচারপতিকে চিনিয়ে দিল রাশিদি ইয়েসুগো। রঙে খাস আফ্রিকান নিগ্রো, চেহারায় নয়।

'ওঁর স্ত্রী বোধ হয় ইউরোপীয়?'

'হ্যাঁ, ওঁর স্ত্রী ফরাসী। কেন বলছেন এ কথা?' জিজ্ঞেস করল রাশিদি।

'রোসেলিনের যে বিবরণ তোমার কাছে শুনেছি, তাতে তার মা অবশ্যই শ্বেতাংগ বা নন-আফ্রিকান হবেন।'

কথা শেষ করেই আবার আহমদ মুসা বলল, চল রেজিস্ট্রার অফিসে যাওয়া যাক।

বেরিয়ে এল তারা চীফ জাস্টিসের কোর্ট রুম থেকে।

রেজিস্ট্রার অফিসে প্রবেশ করল তারা।

ওয়েটিং রুমে গিয়ে বসল।

বসেই রাশিদি ইয়েসুগো আহমদ মুসাকে ফিস ফিস করে বললো, 'ভাইয়া রিট সেকশনে 'ক্যামেরুন ক্রিসেন্ট'-এর একজন ভাই আছেন। একজন সেকশন অফিসার সে। আমরা তার সাহায্য নিতে পারি না?'

'অবশ্যই পার।'

'তাহলে তার সাথে গিয়ে আলোচনা করি। তার সময় হলে তাকে নিয়ে আসি?'

'হ্যাঁ, যাও।'

'তাহলে আমি ও ইয়েকিনি একটু ঘুরে আসি। আপনি একটু বসুন।' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল রাশিদি।

বেরিয়ে গেল ওরা দু'জন ওয়েটিং রুম থেকে।

ওয়েটিং রুমে বসেছিল আরও দু'জন। আহমদ মুসার পাশের সোফাতেই।

সামনে লম্বা একটা টিপয়।

টিপয়ের উপর কয়েকটা ম্যাগাজিন।

আহমদ মুসার পাশের দু'জন কৃষ্ণাংগ। বয়সে যুবক। একজন আহমদ মুসার কিছু বড় হবে, আরেকজন সমান সমান। আহমদ মুসার পাশে বসা লোকটির হাতে একটা কলম। সে কলমটা দিয়ে একটা ম্যাগাজিনের মলাটে লিখছিল, আঁচড় কাটছিল। দেখলেই বুঝা যায় সে উদ্দেশ্যহীন ভাবে এটা করছে। যেন সময় কাটাচ্ছে সে।

আহম্মদ মুসারও করার কিছু ছিল না। গল্প করার মত দু'জন ছিল, তাও চলে গেল।

আহমদ মুসা পাশের লোক দু'জনের দিকে তাকাল। তাদের দিকে তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিতে পারল না আহমদ মুসা। হাতের পেশি, ঘাড়ের গঠন, মুখের চোয়াল, আর ঋজু শরীর দেখে মনে হলো যেন স্টিলের তৈরী কোন রোবট।

আহমদ মুসার মুগ্ধ দৃষ্টি একসময় পাশের লোকটির হাত বেয়ে নেমে গেল তার লেখার উপর।

তার লেখাগুলোয় চোখ বুলাতে গিয়ে একটা স্কেচের উপর নজর পড়তেই ভূত দেখার মত চমকে উঠল আহমদ মুসা। কলমের কালি দিয়ে তৈরী মানুষের একটা স্কেচ। কালো কালি দিয়ে তৈরী কালো একটা মনুষ্য মূর্তি। মূর্তিটির বাম হাতে কালো কালির ক্রস। খুব সাধারণ একটা স্কেচ।

কিন্তু স্কেচটার উপর নজর পড়তেই আহমদ মুসার মনে পড়ল 'ওকুয়া'র প্রতীক চিহ্নের কথা। একজন সৈনিকের ছবি, হাতে তার একটি ক্রস।

আহমদ মুসা দেখল, লোকটির কলম সৈনিকের সেই স্কেচটির উপর আবার উঠে এল। কালো কালির গভীর আঁচড়ে শীঘ্রই সৈনিকের স্কেচটি কালো সৈনিকে রূপ নিল। হাতে তার কালো ক্রস।

আহমদ মুসার কোন সন্দেহ রইল না, ওকুয়ার প্রতীক চিহ্ন এটা।

আহমদ মুসার বিস্মিত দৃষ্টি উঠে এল লোকটির মুখের উপর। লোকটি ওকুয়ার কেউ?

এ সময় তাদের দু'জনের ওপাশের জন উঠে দাঁড়াল। বলল, 'পাওল তুই বস। কাজটা কতদূর একটু খোঁজ নিয়ে আসি।'

বলে লোকটি রেজিস্ট্রার অফিসের ভেতরে ঢুকে গেল।

আহমদ মুসা ভাবল, লোকটি নিশ্চয় 'ওকুয়া'র কেউ। আনমনে কাগজে আঁচড়াতে গিয়ে প্রিয় প্রতীক চিহ্ন সে এঁকে ফেলেছে। লোকটির চেহারাও বলে ওকুয়ার মত সংগঠনের সাথেই তাকে মানায়।

ওকুয়ার এই লোকরা নিশ্চয় ওমর বায়ার কেসের ব্যাপারে এসেছে! ওর সাথের লোকটা কি এই কাজেই ভেতরে গেছে?

ঠিক এ সময় সেই লোকটা বেরিয়ে এল।

আহমদ মুসার পাশের লোকটাকে লক্ষ্য করে বলল, ‘পাওল, রেজিস্ট্রার সাহেব দুইদিন পরে একবার খোঁজ নিতে বললেন। আমাদের ব্যাপারটা চীফ জাস্টিসের আগামী পরশুদিনের কর্মসূচীতে উঠেছে। পরদিন এলেই ডেট জানা যাবে। চল।’

আহমদ মুসার পাশের লোকটিও উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘চল।’

ওরা কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

মন চঞ্চল হয়ে উঠল আহমদ মুসার। এখন কি করবে সে? ‘ওকুয়া’র লোককে তো ছাড়া যায় না। মোক্ষম একটা সুযোগ। ওদের ফলো করে নিশ্চয় ওকুয়া’র কোন এক ঠিকানায় পৌঁছা যাবে। তার ফলে ওমর বায়া ও ডঃ ডিফরজিসের সন্ধান পাওয়া অথবা উদ্ধার করার একটা সুযোগ পাওয়া যাবে।

কিন্তু রাশিদিরা দু’জন নেই, ভাবল আহমদ মুসা।

লোক দু’জন কক্ষের বাইরে চলে গেছে।

আর চিন্তা করতে পারলো না আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা দ্রুত উঠে দাঁড়াল।

বেরিয়ে এল কক্ষ থেকে। দেখল, ওকুয়ার ওরা দু’জন পাশা-পাশি হেঁটে এগোচ্ছে সিঁড়ির দিকে।

আহমদ মুসা পিছু নিল ওদের।

ওদের অনুসরণ করে আহমদ মুসা নিচে লনে নেমে এল।

সুপ্রীম কোর্টের গাড়ি বারান্দা থেকে বেরুলেই হাতের বাম দিকে বিশাল পার্কিং প্লেস।

অনেকগুলো গাড়ি পার্ক করা আছে।

ওকুয়া’র ওরা দু’জন গাড়িগুলোর দিকে এগুচ্ছে। আহমদ মুসা বুঝল, ওরা নিজস্ব গাড়ি নিয়ে এসেছে।

আহমদ মুসার হাতে রাশিদির গাড়ির চাবি। সেদিকে একবার তাকিয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল আহমদ মুসা। গাড়ি না থাকলে ওদের পিছু নেয়া

মুস্কিল হতো। রাশিদির গাড়ি আহমদ মুসা ড্রাইভ করেছিল বলে চাবিটা তার হাতেই রয়ে গিয়েছিল।

ওরা তাদের গাড়ির কাছে গিয়ে থামলে আহমদ মুসা চাবির রিংটা আঙুলে নাচাতে নাচাতে আনমনাভাবে গুণ গুণ করে গাড়ির দিকে এগুলো।

ওদের গাড়ি লন পেরিয়ে যখন গেটের কাছাকাছি পৌঁছল, তখন আহমদ মুসার গাড়ি স্টার্ট নিল।

ওদের পিছু পিছু বেরিয়ে এসে রাস্তায় পড়ল আহমদ মুসার গাড়ি।

সুপ্রীম কোর্ট লন থেকে বেরিইয়ে ওদের গাড়ি 'ইয়াউন্ডি সার্কুলার' ধরে দক্ষিণে এগিয়ে চলল।

'ইয়াউন্ডি সার্কুলার'কে রাজধানী ইয়াউন্ডির 'মাদার রোড' বলা হয়। রোডটি ইয়াউন্ডিকে চারটি বৃত্তে ভাগ করেছে। চারটি বৃত্ত শহরের কেন্দ্রে এসে মিলিত হয়েছে। এই কেন্দ্রেই সুপ্রীম কোর্ট। বৃত্তগুলো থেকে দু'পাশে ডজন ডজন রোড বেরিয়ে রাজধানী শহরকে মাকড়শার জালের মত ভাগ করেছে। বৃত্ত চারটিকে এ, বি, সি, ডি- এই চার নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। বৃত্ত থেকে বের হওয়া বাইরোডগুলোকে এক, দুই, তিন- এইভাবে নামকরন করা হয়েছে।

আহমদ মুসা রাস্তার রোড সাইন দেখে বুঝল তারা 'ইয়াউন্ডি সার্কুলার সি' ধরে এগিয়া চলছে। 'ওকুয়া'র গাড়িটি তার দু'শ গজ সামনে।

প্রায় পনের মিনিট চলার পর ওকুয়ার গাড়ি বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে একটা বাইরোডে প্রবেশ করল। রোড সাইনে দেখল 'সি-৭', অর্থাৎ সি নম্বর বৃত্তের সাত নম্বর বাইরোড।

মিনিট পাঁচেক চলার পর সামনের গাড়িটি হঠাৎ দাড়িয়ে পড়ল।

বিপদে পড়ল আহমদ মুসা। তারা কি তার গাড়িকে সন্দেহ করছে? নাকি কোন প্রয়োজনে তারা দাঁড়িয়েছে। যেখানে সামনের গাড়িটি দাঁড়িয়েছে, সেটা একটা রাস্তার মুখ, সি-৭ থেকে বেরিয়ে সামনের দিকে চলে গেছে।

সে কি দাঁড়াবে, ভাবল আহমদ মুসা। দাঁড়ানো ঠিক মনে করল না। তারা যদি সন্দেহ করেই থাকে, তাহলে দাঁড়ানোর অর্থ তাদের সন্দেহ পাকাপোক্ত করা।

সুতরাং আহমদ মুসা না দাঁড়িয়ে একি গতিতে গাড়ি চালিয়ে 'ওকুয়া'র গাড়ি পাশ কাটিয়ে সামনে এগিয়া দু'শ গজের মত গিয়ে একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে পড়ল।

দাঁড়িয়েই পেছনে ফিরে তাকাল। 'ওকুয়া'র গাড়িটি তখনও দাঁড়িয়ে।

আধা মিনিটও গেল না। 'ওকুয়া'র গাড়িটি দক্ষিন গামী সেই রাস্তায় ঢুকে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে আহমদ মুসা তার গাড়িটি ঘুরিয়ে নিয়ে ছুটল সেই রাস্তার দিকে।

আহমদ মুসা লক্ষ্য করল না, তার গাড়িটি দাঁড়াবার পর পরই আরেকটা নীল রঙের গাড়ি তার গাড়িকে পাশ কাটিয়ে দু'শ-আড়াইশ গজ দূরে একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। গাড়িতে দু'জন আরোহী। তারা চোখ রাখছিল আহমদ মুসার উপর। আহমদ মুসা যখন তার গাড়ী নিয়ে ছুটল 'ওকুয়া'র গাড়ী যে রাস্তার ঢুকেছে সে রাস্তার দিকে, তখন দু'জনের মুখেই একটা ক্রুর হাসি ফুটে উঠল। একজন বলল, ভাব দেখেই বুঝা গিয়েছিল বেটা ফেউ হবে। এখন আর সন্দেহ রইল না। ও ঐ গাড়িকেই ফলো করছে। আহমদ মুসার গাড়ি চলতে শুরু করার পর তারা আহমদ মুসার গাড়ির পিছু নিল।

ওকুয়ার গাড়িটি বেশ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছিল। আগের চেয়ে গতিটা এখন অনেক বেশি।

প্রায় দশ মিনিট চলার পর বেশ প্রশস্ত রাস্তায় উঠে এল গাড়ি। রাস্তাটি ইয়াউন্ডি সার্কুলার সি-র অপর একটি অংশ।

ওকুয়া’র গাড়ি ‘ইয়াউন্ডি সার্কুলার সি’-কে পাশ বরাবর ক্রস করে আরেকটি বাইরোডে প্রবেশ করল।

আহমদ মুসার গাড়িও সেই বাইরোডে প্রবেশ করল। রোড় সাইন দেখে আহমদ মুসা বুঝল বাই রোডটি 'সি-৪১'। আহমদ মুসা লক্ষ্য করল না সেই নীল গাড়িটিও বিড়ালের মত তার পিছু পিছু প্রবেশ করছে 'সি-৪১' বাইরোডে।

আরও দশ মিনিট চলল গাড়ি।

একটানা একই গতিতে এগিয়ে চলছিল ওকুয়ার গাড়ি। এই রাস্তায় গাড়িও কম। আহমদ মুসা নিশ্চিন্তে অনুসরন করছিল ওকুয়ার গাড়িটার। এই নিশ্চিন্ততায় আনমনা হয়ে পড়েছিল সে।

সামনের গাড়িটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আনমনা ভাবটি মুহুর্তে কেটে গেল। হার্ড ব্রেক কষল আহমদ মুসা। তবু তার গাড়িটা গিয়ে 'ওকুয়া'র গাড়ির ঠিক পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো।

দ্রুত আহমদ মুসা নজর বুলালো সামনে-ডাইনে-বামে।

রাস্তার দু'পাশে জংগল। চারপাশের পরিবেশটা কোন পরিত্যক্ত এলাকার মত বিশৃংখল। শহরের কোন মসৃণতা নেই।

ভ্রু কুঞ্চিত হল আহমদ মুসার। ওকুয়ার গাড়িটা এখানে এল কেন? এতো লোকালয়হীন পরিত্যক্ত এক শহরতলী!

ঠিক এই সময়ই পেছনের নীল গাড়িটি আহমদ মুসার গাড়ির পেছনে এসে দাঁড়াল। আহমদ মুসা সেই গাড়িটাকে দেখল।

হঠাৎ করেই প্রচন্ড এক চিন্তার ঝলক নামল আহমদ মুসার দেহে।

সে কি ট্র্যাপে পড়েছে? তাকে কি পরিকল্পনা করে এই নির্জন শহরতলী এলাকায় নিয়ে আসা হয়েছে?

মূহুর্তেই শক্ত হয়ে উঠল আহমদ মুসার দেহ। অজান্তেই তার হাতটা ছুটে গেল পকেটে রাখা পিস্তলের বাটে। কিন্তু বিস্ময়ের সাথে সে সময় সে দেখল পেছনের নীল গাড়ীর দু'পাশের দু'দরজা দিয়ে দু'জন নেমে ছুটে আসছে তার গাড়ীর দিকে।

দ্রুত আহমদ মুসার হাত রিভলবার সমেত পকেট থেকে বেরিয়ে এল।

গাড়ী থেকে বেরুবার জন্য আহমদ মুসা মুখ ফিরাতেই দেখল, তার গাড়ীর দু'পাশের দুই দরজায় দু'জন তার দিকে রিভলবার তাক করে দাঁড়িয়ে আছে। দেখেই ওদের চিনতে পারল আহমদ মুসা সুপ্রীম কোর্ট থেকে এ দু'জন লোককে অনুসরন করেই সে আসছে।

ডান হাতে রিভলবার ধরে রেখে ওদের একজন একটানে গাড়ীর দরজা খুলে ফেলল। হেসে উঠল হো হো করে। বলল, ‘ও! তোমাকেই তো বসে থাকতে

দেখেছিলাম সুপ্রীম কোর্টে আমাদের পাশে। তুমিই ফলো করছ তাহলে আমাদের!’

‘পাওল চেন একে?’ পেছনের নীল গাড়ী থেকে আসা দুজনের একজন বলল।

'না, চিনি না, আজ একবার দেখেছি। সুপ্রীম কোর্টের রেজিস্ট্রার অফিসে আমাদের পাশে বসেছিল।'

চারটি রিভলবারই আহমদ মুসার দিকে তাক করা। নীল গাড়ী থেকে নেমে আসা পুর্বের সেই লোকটিই আবার বলল, 'তাহলে ব্যাটা টিকটিকি নাকি? আমরা যদি পেছনে পাহারায় না থাকতাম, ধরাই হয়তো পড়তনা ব্যাটা। ফাদারকে ধন্যবাদ যে, তিনি বুদ্ধিটা করেছিলেন। পিছনে নজর রাখতে হবে এমন কথা আমাদের চিন্তাও আসেনি।'

নীল গাড়ীর সেই লোকটি পকেট থেকে ওয়াকিটকি বের করল। বলল, ‘তোমরা একটু দাঁড়াও, ফাদারের সঙ্গে কথা বলে নেই।’

বলে লোকটি ওয়াকিটকির বোতাম টিপে মুখের কাছে তুলে ধরল।

ওয়াকিটকি থেকে কন্ঠ ভেসে এল 'আমি পল'।

'গুড ইভেনিং স্যার। আমি ‘অপারেশন সুপ্রীম’-এর রজার।

ফাদারকে চাচ্ছিলাম।'

'ফ্রান্সিস বাইক ইদেজা গেছেন। আমাকে বল। আমি তোমাদের কলের অপেক্ষা করছি।'

'ধন্যবাদ স্যার, কোর্ট থেকে আমাদের ফলো করে আসছিল একজন, আমরা তাকে ধরেছি।'

‘ধরেছ? ব্রাভো! ব্রাভো! টিকটিকি নাকি?’

'তাই মনে হচ্ছে স্যার'

‘সর্বনাশ তাহলে চীপ জাস্টিস উসাম বাইক আমাদের পেছনে গোয়েন্দা লাগিয়েছে।’

'তাই মনে হচ্ছে, চীপ জাস্টিসেরই টিকটিকি এ। কোট রুম থেকে আমাদের ফলো করছে।'

'ঠিক আছে। চীপ জাস্টিসের কপাল মন্দ। আমাদের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে। আমরা এর প্রতিশোধ নেব।'

'হ্যাঁ, প্রতিশোধ নিতে হবে স্যার। আমরা এখন কি করব স্যার?'

'তোমরা ওকে আটকে রাখ। কাল সকালে ফ্রান্সিস বাইক ফিরবে। দু'জন একসাথে টিকটিকির পেটটাকে একবার সাফ করব। কি কথা আছে ওর পেটে দেখব। তারপর...'

'তাহলে কাল সকালে ফাদার ফ্রান্সিস বাইক ফেরা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে স্যার।'

'হ্যাঁ', বলে একটু থেমে গুড ইভেনিং বলে লাইন কেটে দিল ওপাশ থেকে।

এই আকস্মিক কথা বন্ধে রজার লোকটা আহত হল মনে হয়। হঠাৎ তার কপালটা কুঞ্চিত হল। অস্ফুটে তার মুখে উচ্চারিত, 'ব্যাটা শ্বেতাংগের বাচ্চা, গুড ইভেনিংটাও দিতে দিল না।'

বলে এন্টেনা গুটিয়ে রেখে ওয়াকিটকি পকেটে রাখল।

উদ্যত রিভলবারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আহমদ মুসা ওয়াকিটকিতে কথা বলা শুনতে পেল। খুব লো ভয়েসে কথা বলছিল না তারা।

আহমদ মুসা নিশ্চিত হলো যে, তাকে ওরা টিকটিকি অর্থাৎ সরকারী গোয়েন্দা মনে করছে।

আহমদ মুসা চিন্তা ভেঙে পড়ল কথার শব্দে।

ওয়াকিটকিওয়ালা বলছিল, ‘পাওল টিকটিকি ব্যাটার পকেট সার্চ করে ওর হাত-পা বেঁধে গাড়িতে তোল।’

ওয়াকিটকিওয়ালা ওয়াকিটকি পকেটে রেখে রিভলবার হাতে তুলে নিল।

'পাওল' নামের লোকটি তার ডান হাতের রিভলবার আহরদ মুসার পিঠে ঠেকিয়ে তার বাম হাত দিয়ে আহমদ মুসার পকেট সার্চ করল। একটা রিভলবার ছাড়া আর কিছুই পেল না আহমদ মুসার পকেটে।

তারপর আহমদ মুসাকে বেঁধে আহমদ মুসার গাড়িতে তুলল।

আহমদ মুসার পাশে 'পাওল' নামের লোকটি বসল হাতে রিভলবার নিয়ে। আর এ গাড়ির সিটে বসল ওয়াকিটকি ওয়ালা 'রজার' নামের লোকটি।

গাড়ি স্টার্ট নিয়ে চলতে শুরু করল।

তিনটি গাড়িই একসাথে চলল।

ভাবছিল আহমেদ মুসা। 'ওকুয়া'র বুদ্ধিমত্তা ও সতর্কতার ব্যাপারে আহমেদ মুসার নিম্নমানের ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু গত কয়েক মিনিটের ঘটনাগুলো থেকে আহমেদ মুসার পুর্বের ধারণা পাল্টে গেল। ওরা যথেষ্ট সতর্ক ও বুদ্ধিমান। তাকে ঘিরে ফেলা থেকে শুরু করে বেঁধে গাড়িতে তোলা পর্যন্ত কোন ভুল বা অসতর্কতা ছিল না।

কো্থায় নিয়ে যাচ্ছে আহমেদ মুসাকে ওরা? এই বিপদের মাঝেও আহমেদ মুসার মনে আনন্দ। এভাবে সে নিশ্চয় 'ওকুয়া'র কোন ঘাটিতে পৌছতে পারবে। ওদের কাছে পৌছা খুব প্রয়োজন।

‘টিকটিকি মহাশয় আপনার নাম কি?’ আহমদ মুসাকে পাশের লোকটা প্রশ্ন করল।

‘টিকটিকি।’ নির্বিকার কন্ঠে বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই ‘পাওল’ নামের লোকটি গভীর দৃষ্টিতে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘সাহস তো খুব দেখছি। আমাদের যতটা ভদ্র দেখাচ্ছে, তার এক ভাগ ভদ্রও আমরা নই। কিন্তু কি করব, ফাদার বাইকের শিকারে তো আর আমরা হাত দিতে পারি না।’

‘পাওল টিকটিকিকে বলে দে, কোন টিকটিকি আমাদের পিছু নিলে তার একটাই শাস্তি- মৃত্যুদন্ড।’ ড্রাইভিং সিট থেকে বলল রজার।

‘কিন্তু এক টিকটিকি মরলে আরেক টিকটিকি আসবে। টিকটিকি মেরে শেষ করা যায় না।’ বলল আহমদ মুসা।

‘তুমি বোধ হয় নতুন রিক্রুট। তাই জাননা যে তোমাদের বস’রা আমাদের নেতাদের ড্রইংরুমে একটু বসতে পারলে কৃতার্থ হন। তোমরা মত দশটা মরলেও তারা রা করবে না।’

‘বস’রা শেষ কথা নয়, সরকারও আছে।’

হো হো করে হেসে উঠল পাওল ও রজার দু'জনেই। পাওল বলল, 'টিকটিকি সব খবর রাখ, এ খবর রাখ না যে, আমাদের এনজিওগুলোর আশীর্বাদ ও অর্থ না হলে সরকার সরকার হতে পারবে না, সরকার সরকার থাকবে না।'

শহরের পূর্ব প্রান্তে শহরতলীর একটা পুরনো বাড়ির সামনে গিয়ে তিনটা গাড়ি দাঁড়াল।

প্রাচীর ঘেরা বিশাল এলাকার মধ্যে দু'তলা একটা বাড়ি। বেশ বড়।

বাড়িতে প্রবেশের একটা মাত্র গেট।

সিংহ দুয়ারের মত বিশাল। বন্ধ।

সামনের গাড়ি যে ড্রাইভ করছিল সে নেমে দরজা খুলে দিল। এর অর্থ এ বাড়িতে গেটের দরজা খুলে দেবার কেউ নেই।

গেট দিয়ে প্রবেশ করল তিনটি গাড়ি।

ভেতরটা আরও বেশী অপরিষ্কার।

এক সময়ের পাথর বিছানো রাস্তাটা ধুলা-ময়লায় একদম ঢেকে গেছে।

তিনটি গাড়ি গিয়ে দাঁড়াল বাড়িটির সামনে। একটা সিংহ দরজার মুখে।

'আপনাদের বস ফাদার বাইক এই পোড়ো বাড়িতে থাকে?' প্রশ্ন করল আহমদ মুসা।

হো হো করে হেসে উঠল 'পাওল' নামের পাশের লোকটা। বলল, 'টিকটিকি মশায়, এটা কোর্ট ও বন্দীখানা। এখানে বিচার হয় এবং শাস্তি বাস্তবায়ন হয়।'

'বন্দীখানা, কিন্তু লোক তো দেখছি না। পাহারাদার কোথায়? এত ময়লা-আবর্জনা কেন?'

'যখন প্রয়োজন পাহারাদার থাকে। প্রদর্শনীর জন্যে কোন পাহারাদার রাখা হয় না।'

পায়ের বাঁধন খুলে আহমদ মুসাকে ওরা গাড়ি থেকে নামাল।

আহমদ মুসা যতই বাড়িটা দেখছে স্তম্ভিত হচ্ছে। চুন-কাম, প্লাষ্টার খসে পড়েছে বাড়িটির, ইটও অনেক জায়গা থেকে খসে গেছে। কিন্তু বাড়িটার নির্মাণ

শৈলী অপরূপ। মনে হচ্ছে সে যেন স্পেনের কোন ভাঙা প্রাসাদের সামনে দাঁড়িয়ে।

দেয়ালের ইট দেখে আহমদ মুসার মনে হলো এক বা একাধিক শতাব্দীর বেশী বয়স হবে বাড়িটার।

অনেকগুলো সিঁড়ি ভেঙে সিংহ দরজার সামনে প্রশস্ত উঠানে গিয়ে দাঁড়ালো তারা। সিঁড়ি দেখে আহমদ মুসা বুঝল দামী পাথর লাগানো ছিল সিঁড়ির ধাপগুলোতে। খুলে নেয়া হয়েছে সেগুলো। সিংহ দরজা ও দেয়ালের চেহারা দেখেও আহমদ মুসা বুঝল এক সময় সেগুলোতেও দামী পাথর লাগানো ছিল।

দরজায় নক করল রজার।

কয়েক বার একরাশ ভয়ংকর গর্জন শোনা গেল। তারপরই দরজা খুলে গেল।

দরজায় দেখা গেল নেড়ে মাথা পর্বতাকৃতি একজনকে। কয়লার মত কালো গায়ের রং। তিনটি ভীষণাকৃতির ব্লাক-হাউন্ড তার সাথে। কুকুরগুলো চেন দিয়ে বাঁধা। চেনগুলো গরিলা-লোকটির হাতে।

তিনটি ব্লাক-হাউন্ডের চোখই আহমদ মুসার উপর নিবদ্ধ। চোখে আগুন তাদের। আহমদ মুসার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার মত পোঁজ তাদের।

কুকুরগুলো টেনে নিয়ে প্রশস্ত করিডোরের এক পাশে সরে দাঁড়াল গরিলা লোকটা।

গরিলা লোকটি মাথা ঝুকিয়ে অভিবাদনের জবাবে রজার বলেছিল 'ব্ল্যাক-বুল তোমার আরেকটা শিকার নিয়ে এলাম। তবে বিচার এখনো হয়নি, কাল ফাদার আসবেন।'

বলে ভেতরে প্রবেশ করল ওরা আহমদ মুসাকে নিয়ে।

বাইরের থেকে বাড়ির ভেতরের অবস্থা ভাল। পাথর তুলে নেয়ায় দেয়ালের গা ক্ষতবিক্ষত, কিন্তু অধিকাংশ জায়গায় প্লাস্টার টিকে আছে।

করিডোর আরেকটা বড় দরজার সামনে নিয়ে গেল। দরজার দিকে তাকাতে গিয়ে দরজার অনেকখানি উপরে ভেন্টিলেটরে আটকে গেল আহমদ মুসার চোখ। ভেন্টিলেটরটায় লতা-পাতার সুন্দর জ্যামিতিক ডিজাইন।

ডিজাইনের কেন্দ্রে একটা অর্ধচন্দ্র। অর্ধচন্দ্রের পেটে একটা ভাঙা ডিজাইন। যাকে একটা গম্বুজের অর্ধাংশ বলে মনে হচ্ছে।

চমকে উঠল আহমদ মুসা। ক্রিসেন্ট এল কোথেকে এখানে?

আনমনা হয়ে পড়ায় চলার গতি কমে গিয়েছিল আহমদ মুসার।

পেছন থেকে পাওলের রিভলবারের বাঁট আহমদ মুসার মাথা সামনের দিকে ঠেলে দিল।

সম্বিত ফিরে পেয়ে আবার চলতে শুরু করল সে।

দরজাটা পেরুলেই দেখা গেল ডিম্বাকৃতির একটা বিরাট হলঘর। ডিম্বাকৃতি হলঘরের দৈর্ঘ্যের একটা প্রান্ত শুরু হয়েছে এই দরজা থেকে। দরজায় দাঁড়িয়ে সামনে তাকালে নাক বরাবর সোজা আরেক প্রান্তে একটা বড় সিংহাসন। আর সিংহাসনের সামনে হল ঘরের দুই প্রান্ত দিয়ে ধনুকের মত সারিবদ্ধ গদী আঁটা আসন। কিন্তু সিংহাসন কিংবা এসব আসনের সবগুলোই ক্ষত-বিক্ষত, কংকাল মাত্র।

হল ঘরটিকে আহমদ মুসার একটা দরজার কক্ষ বলে মনে হলো। সিংহাসনের উপর নজর বুলাতে গিয়ে আহমদ মুসা আবার সেই বিস্ময়ের মুখোমুখি হলো। সিংহাসনের শীর্ষে সে একটা অর্ধচন্দ্র খোদিত দেখল।

আগে আগে হাঁটছিল আহমদ মুসা। পেছনে রজার, পাওল এবং তাদের সাথী দু'জন ও ব্ল্যাক বুল নামের লোকটি তার পিছনে তিনটি কুকুর হাতে।

আহমদ মুসা হলঘরের মাঝামাঝি পৌঁছতেই পেছন থেকে রজার বলল, 'বাঁয়ের বড় দরজা দিয়ে।'

আহমদ মুসা বাঁয়ে ঘুরে দরজার মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াল। দরজায় চাপ দিতেই দরজা খুলে গেল। দরজাটি একটা সিঁড়ির মুখে। সিঁড়িটা নেমে গেছে নিচের দিকে, ভূগর্ভে।

আহমদ মুসা দাঁড়ালো সিঁড়ি মুখে।

পেছন থেকে রজার বলে উঠল, 'ব্ল্যাক বুল টিকটিকির হাতে-পায়ে বেড়ি পরিয়ে রেখে এসো নিচে।'

এগিয়ে এল ব্ল্যাক বুল। প্রথমে সে লোহার বেড়ি পরিয়ে দিল আহমদ মুসার পায়ে। তারপর হাতের বাঁধন খুলে হাতে লোহার বেড়ি পরিয়ে দিল।

আহমদ মুসা বিস্মিত। হাত-পায়ের বেড়িগুলোর প্রাচীন ডিজাইন, কিন্তু তাতে মডার্ন তালা সিস্টেম।

হাতে-পায়ে বেড়ি পরিয়ে ব্ল্যাক বুল লোকটি খেলনার মতই আহমদ মুসাকে কাঁধে তুলে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামল নিচে।

সিঁড়ির দু'টি বাঁক ঘুরে ব্ল্যাক বুল মেঝেয় নামল, লক্ষ্য করল আহমদ মুসা। তার মনে হলো তারা পনের ফুট নিচে নেমেছে।

মেঝেতে নেমেই ব্ল্যাক বুল কাঁধ থেকে আহমদ মুসাকে ছুঁড়ে দিল মেঝেতে।

আহমদ মুসা এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় শক্ত মেঝের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষারও কোন উপায় ছিল না।

কাত হয়ে আঁছড়ে পড়েছিল শক্ত মেঝের উপর। শেষ মুহূর্তে শ্বাস বন্ধ করে আঘাত সামলে নেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তবু ঘাড় ও পাঁজরটা তার যেন থেঁতলে গেল। আঘাতের তীব্র প্রতিক্রিয়ায় মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠল।

ধীরে ধীরে মাথাটা সে মেঝের উপর রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে আঘাতটা হজম করার চেষ্টা করলো।

'তুই বিদেশী কি করে টিকটিকি হলি?' ভাঙা ফরাসীতে বলল ব্ল্যাক বুল।

আহমদ মুসা কোন জবাব দিল না। চোখ বুজে ছিল সে।

ব্ল্যাক বুল তার থামের মত পা দিয়ে আহমদ মুসার শরীরটাকে বলের মত গড়িয়ে বলল, 'রেষ্ট নে, কাল তো যমের বাড়ি যেতে হবে!'

আহমদ মুসা হতাশ হয়ে পড়েছিল। তার আশা বন্দী হবার পর ওকুয়ার কোন ঘাটিতে যাবার সুযোগ হবে এবং ওমর বায়াদের মুক্ত করার একটা পথ সে পাবে। কিন্তু এটা ওকুয়া'র কোন ঘাটি নয়। মনে হচ্ছে এ পোড়ো বাড়িটা ওদের নিকৃষ্ট ধরনের কোন বন্দী খানা এবং এ ধরনের বন্দীখানায় ওমর বায়া এবং ডঃ ডিফারজিসকে তারা রাখবে না। ব্ল্যাক বুল-এর কথা আহমদ মুসার চিন্তায় নাড়া

দিল। ব্ল্যাক বুলের মত মোটা বুদ্ধির লোকের কাছ থেকে কিছু কথা বের করা যেতে পারে।

এসব চিন্তা করে আহমদ মুসা ব্ল্যাক বুলের কথার জবাবে বলল, 'যম বুঝি তোমাদের বলে গেছে?'

'এই অন্ধ কুঠরিতে ঢোকার পর কেউ এখান থেকে বের হয়নি। এখান থেকে গেছে সোজা যমালয়ে।'

'মনে হচ্ছে মিছিল করে মানুষ এখানে আসে যমালয়ে যাবার জন্যে!'

'এই অন্ধ কুঠরিতে কংকাল ও নরমুন্ডের মিছিল দেখলেই সেটা বুঝতে পারবে।'

আহমদ মুসা চারদিকে তাকাল।

অন্ধ কুঠরিটি বিশাল। দু'প্রান্তের শেষটা বেঁকে গেছে বলে দেখা যাচ্ছে না।

মেঝের এখানে-সেখানে ছড়িয়ে আছে নরকংকাল এবং মানুষের মাথার খুলি।

অন্ধ কুঠরির বাতাস নাকে লাগতেই একটা তীব্র গন্ধ পেয়েছিল আহমদ মুসা। এখন সে বুঝতে পারল গন্ধের উৎস কি।

আহমদ মুসার কাছে পরিষ্কার হলো, খুনে 'ওকুয়া' এই পুরানো বাড়িটাকে অতীতে রাজা-বাদশাহদের মতো বধ্যভুমি হিসাবে ব্যবহার করছে। যাকে তারা হত্যা করবে তাকে এখানেই নিয়ে আসে। জিজ্ঞাসাবাদ বা নির্যাতেনের পর তাদের হত্যা করা হয় বা তিলে তিলে তাদের মৃত্যুবরণ করতে হয়।

'এত লোককে তোমরা হত্যা করেছ?' ব্ল্যাক বুলের কথার জবাবে বলল আহমদ মুসা।

'এ আর কত! বড় ও বিপজ্জনক শিকার ছাড়া এখানে কাউকে আমরা আনি না।'

'বড় ও বিপজ্জনক বন্দী এখন তাহলে তোমাদের নেই দেখছি, আমি একা এখানে!'

'নেই কেন? আছে অন্য জায়গায়।'

‘আরও জায়গা তোমাদের আছে?’

‘অবশ্যই আছে।’

‘এই ইয়াউন্ডিতেই?’

‘এত প্রশ্ন করছ কেন? ও, তুমি তো টিকটিকি। আচ্ছা কত বেতন পাও যে, এভাবে মরতে এসেছ? সরকারের বেশীর ভাগ লোকই তো ‘ওকুয়া’কে ঘাটায় না। তোমার ভীমরতি হলো কেন?’

‘মনে কর কি যে, তোমরা ঠিক কাজ করছ?’

‘অবশ্যই। আমরা খৃষ্টের সৈনিক।’

‘কিন্তু তোমরা একজন বিখ্যাত ফরাসী লোককে পণবন্দী করে রেখেছো। অথচ সে নির্দোষ-নিরপরাধ। এটা কি খৃষ্টের সৈনিকের কাজ?’

‘এটা নেতাদের ব্যাপার। তাঁরা যা করেন খৃষ্টের জন্যেই করেন।’

‘ফরাসি ঐ ভদ্রলোককে তোমরা নিশ্চয় আমার মত করে রাখনি।’

‘তুমি তো দেখি সাংঘাতিক লোক, যমের বাড়ির দুয়ারে দাঁড়িয়ে অন্যকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ।’

‘কেন তুমিও কি মানুষ নও? তোমার মন নেই? মানুষের দুঃখ তোমার মনকে নাড়া দেয় না?’

‘দেখ ওসব কিছু আমরা বুঝি না। চৌদ্দ পুরুষ ধরে আমাদের পেশা খুন করা।’

‘বাপের মত ছেলে হয় না। চৌদ্দ পুরুষের কথা বলছ কেন?’

হো হো করে হেসে উঠল ব্ল্যাক বুল। বলল, ‘আমাদের ক্ষেত্রে ওসব নীতিকথা খাটে না। খুন আমাদের বিজনেস। তাই আমরা সব সময় শক্তিমানের হাতে থাকি। একটা গল্প বলি  শোন। এই বাড়ির যিনি নির্মাতা ও মালিক, তিনি আমার দাদাকে নিয়েছিলেন বডি গার্ড হিসেবে। ফরাসীরা এলে তারাই শাসনের মালিক হয়। আমার দাদা তাদের একটা মিশনারী পক্ষের সাথে যোগ দিয়ে এই বাড়ি লুট করায় এবং বাড়ির বৃদ্ধ মালিক ও তার স্ত্রীকে হত্যা করে। এই ঘর তাদের ছিল ধন ভান্ডার। পরে ফরাসী দেশীয় মিশনারী ঐ সংস্থা দাদাকে দিয়ে ঐ বৃদ্ধ ও তার স্ত্রীকে খুন করায়। সেই থেকে আমরা ঐ মিশনারী পক্ষের পেশাদার খুনি।’

‘তোমার এ মিশনারী পক্ষের নাম কি?’

‘তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি এখানে আসিনি। তুমি মর, আমি চললাম।’ বলে ব্ল্যাক বুল ঘুরে দাঁড়াল চলে যাওয়ার জন্যে।

আহমদ মুসা বলল, ‘মিঃ ব্ল্যাক বুল প্রশ্নের উত্তর দিও না ঠিক আছে। কিন্তু তুমি তোমার দাদা ও আব্বার মত নও। হলে দাদার ঐ গল্প তুমি করতে না।’

ব্ল্যাক বুল ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল।

তার চোখ দু’টি নিবদ্ধ হলো আহমদ মুসার দিকে।

চোখ দু’টি শান্ত। কয়লার মত কালো মুখে পাপের কুৎসিত আবরণ ভেদ করে নিষ্পাপ বিস্ময়ের একটা আভা ফুটে উঠল।

একইভাবে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল আহমদ মুসার দিকে।

অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে ধীর কন্ঠে বলল, ‘তুমি টিকটিকি নও, তুমি কে?’

‘কেন? এ প্রশ্ন কেন?’

‘টিকটিকিদের আমি চিনি। ওরা তোমার মত করে কথা বলে না। তোমার কথায় সংস্কারকের কন্ঠ, তোমার চোখে সংস্কারকের দৃষ্টি। বল তুমি কে?’

‘তার আগে আমার প্রশ্নের জবাব দাও।’

হো হো করে হেসে উঠল ব্ল্যাক বুল। কিন্তু তার শুকনো হাসিকে একটা জমাট বিদ্রুপ বলে মনে হলো। বলল সে, ‘দাদা ও আব্বা মিলে যত খুন করেছে, আমি তার দ্বিগুণ খুন করেছি। সুতরাং বুঝতেই পারছ তোমার কথা সত্য নয়।’

‘পেশা এবং মন আলাদা হতে পারে মিঃ ব্ল্যাক বুল।’

‘রক্তের সাগর সে মনকে রাখেনি, চাপা দিয়েছে। যাক। তোমার জন্যে দুঃখ হচ্ছে। তুমি কে?’

‘আমি টিকটিকি নই। আমি বাইরে থেকে এসেছি দু’জন লোককে বন্দীদশা থেকে উদ্ধারের জন্যে।’

‘কিন্তু এদের পিছু নিয়েছিলে কেন?’

‘এদের হাতেই ওঁরা দু’জন বন্দী আছেন।’

‘আমার মনে হচ্ছে, তুমি একজন ভাল মানুষ। কিন্তু তোমার ভাগ্য খারাপ। তোমাকে হত্যা করতে আমার কষ্ট হবে।’

‘তাহলে আমার কথাই ঠিক। তোমার পেশা এবং মন আলাদা।’

ব্ল্যাক বুল বসে পড়ল। তার চোখে শুন্য দৃষ্টি। বলল, ‘সত্যি বলছ আমার মন নামক কিছু আছে?’ তার কথা খুব ভেজা শোনাল।

‘কেন মন তোমার নেই মনে কর?’

‘না নেই। আমার দাদার ছিল না, আব্বার ছিল না, আমারও নেই।’

‘আবার তুমি পেশা এবং মনকে এক করে দেখছ।’

‘তুমি সব জান না। লোভ, বিশ্বাসঘাতকতা, নেমকহারামি ইত্যাদি পেশা হতে পারে না। তাহলে শোন।’

বলে একটু থামল ব্ল্যাক বুল। তারপর শুরু করল, ‘আমার পিতৃপুরুষের বাসভূমি ছিল মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রের ‘সলো’ শহরে। সংঘ নদীর তীরে ছিল আমাদের বাড়ি। আমার দাদু ‘কমন্ড কাল্লা’ তখন নব্য যুবক। কুস্তিগীর হিসেবে বিখ্যাত। সংঘ নদী তখন দাস ব্যবসায়ীদের আনাগোনায় বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। এক ভোরে আমাদের নদী তীরের বাড়ি আক্রান্ত হলো দাস ব্যবসায়ীদের দ্বারা। ওদের বন্দুকের কাছে আমাদের তীর এবং বর্ষার প্রতিরোধ বেশিক্ষণ টিকল না। দাদুর আব্বা-আম্মা নিহত হলো। আর বন্দী হলেন দাদু। হাত-পা বেঁধে দাদুকে আরও অনেকের সাথে নৌকার খোলে ফেলে রাখা হলো। সংঘ নদী বেয়ে তাদের আনা হলো কংগোর ‘ওয়েসু’ শহরে। দাস-ব্যবসায়ীদের বড় কেন্দ্র ছিল এটা।

নিয়ম ছিল, দাস ব্যবসায়ের জন্যে বন্দীদের না খাইয়ে রেখে দুর্বল করে ফেলা হতো।

দাদুরা যখন ‘ওয়েসু’তে পৌঁছলেন, তখন তারা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় জর্জরিত। মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রের ‘সলো’ থেকে ‘ওয়েসু’ পর্যন্ত এক সপ্তাহের পথ এসেছে। সাত দিনের মধ্যে মাত্র একদিন একবেলা খেতে দিয়েছে। পানি খেতে দিয়েছে প্রতিদিন একবার।

দাদুরা যখন ‘ওয়েসু’তে পৌঁছল, তখন তারা শয্যাশায়ী।

ওয়েসু’তে আসার পর দাস ব্যবসায়ীরা মনে হয় কিছু সদয় হলো বন্দীদের প্রতি। ওদের খেতে দেয়া হলো এবং খোলের বাইরে মুক্ত বাতাসে নিয়ে

আসা হলো তাদেরকে। পায়ের বেড়ি খুলে দেয়া হলো খোলের উপর হাঁটাহাঁটি করার জন্যে।

নৌকার দুই প্রান্তে দুইজন রাইফেলধারী তাদের পাহারা দিচ্ছিল।

দাদু মুক্তির জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। এইটুকু সুযোগও তিনি নষ্ট করলেন না। নৌকা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি পানিতে।

দাদু সাঁতরে নদীর উত্তর পাড়ে ওঠার জন্যে ছুটেছিলেন। ওদের দু'জনও পানিতে ঝাঁপিয়ে দাদুর পিছু নিলেন। পরে একটা ছোট বোটও দাদুকে ধরার জন্যে ছুটল।

অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাঁতারু ছিলেন দাদু। সুতরাং সাঁতারে ওরা পারল না দাদুর সাথে।

তীরে উঠার পর দৌঁড়েও তারা পারল না দাদুর সাথে। নদীর তীর ধরে পশ্চিম দিকে পাগলের মত ছুটছিলেন দাদু।

দৌঁড়ে ওরা যখন দাদুর সাথে পেরে উঠল না, তখন গুলী করল। গুলী গিয়ে বিদ্ধ হলো দাদুর পায়ে।

সামনেই একটা মোটর বোট বাঁধা ছিল ঘাটে। দাদু গুলীবিদ্ধ হয়ে পড়ে গেলেন নৌকার সামনের তীরটায়।

ওরা ছুটে গিয়ে গুলী বিদ্ধ যন্ত্রণা কাতর দাদুকে ঘিরে দাঁড়াল।

এই সময় বোট থেকে নেমে এলেন মধ্য বয়সী একজন ভদ্রলোক। ভদ্রলোকটি কৃষ্ণাংগ, কিন্তু ঠিক নিগ্রো নয়। নাক খাড়া, চুল সরল, মুখে এশিয়ান বা ইউরোপীয় চেহারা।

ভদ্রলোক বোট থেকে নেমে চারজন শ্বেতাংগকে একজন গুলী বিদ্ধ কৃষ্ণাংগকে ঘিরে থাকতে দেখে এগিয়ে এলেন এবং পরিষ্কার ফরাসী ভাষায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার? কি ঘটেছে?'

দাস ব্যবসায়ী শ্বেতাংগরা তার কথার দিকে কর্ণপাত না করে দাদুকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যেতে শুরু করল।

ভদ্রলোক ছুটে এসে ওদের পথ রোধ করে দাঁড়ালেন।

ওদের একজন বলল, 'পথ ছেড়ে দিন। এ আমাদের ক্রীতদাস।'

‘আমি ওকে জিজ্ঞেস করব, ও ক্রীতদাস কিনা। তোমরা ওকে কোথা থেকে কিনেছ, ও বলুক।’

দাদু চিৎকার করে উঠল, ‘ওরা ধরে এনেছে আমাকে আমার আব্বা-আম্মাকে হত্যা করে।’

সঙ্গে সঙ্গে ওরা পিস্তল তুলল ভদ্রলোককে লক্ষ্য করে। ভদ্রলোকের হাতে ছিল ষ্টেনগান। বিদ্যুত গতিতে তা উঠে এসে গুলী বৃষ্টি করল।

এ রকমটা ওরা ভাবেনি। কোন কৃষ্ণাংগ শ্বেতাংগকে এইভাবে গুলী ছুড়তে সাহস পাবে তা তারা চিন্তা করেনি। সম্ভবত পিস্তল তুলেছিল ভয় দেখাবার জন্যে। গুলীতে ওদের চারজনের দেহ ঝাঁঝরা হয়ে গেল।

ভদ্রলোক দাদুকে পাঁজাকোলা করে তুলে বোটে নিয়ে এল এবং সঙ্গে সঙ্গেই ষ্টার্ট দিল বোট। বলল, ‘খবর পাবার পর ‘ওয়েসু’ থেকে দাস ব্যবসায়ী শয়তানরা এক জোট হয়ে ছুটে আসবে।’

‘কিন্তু কোথায় পালাবেন। নদী পথে কি ওদের হাত থেকে বাঁচা যাবে?’ জিজ্ঞেস করেছিল ক্রু।

‘আমি সংঘ নদী দিয়ে যাব না। আমি ক্যামেরুনের দিজা নদীতে ঢুকব। দিজার মত ছোট ও দুর্গম নদীতে ওরা ঢুকবে না’।

এই ভাবেই দাদু ভদ্রলোকটির আশ্রয় লাভ করলো। ভদ্রলোক দীর্ঘ পনের দিন এ নদী সে নদী বেয়ে ইয়াউন্ডিতে এসে হাজির হলেন। যেদিন তিনি ইয়াউন্ডিতে পৌঁছিলেন, সেদিনই পনের ষোল বছরের তাঁর একমাত্র ছেলে মারা গেল।

ছেলেটির কবর দেয়া হলো ইয়াউন্ডিতে। কবর দেয়ার সময় আমার দাদু বুঝলেন ভদ্রলোকটি মুসলমান।

ভদ্রলোকের গন্তব্য ছিল নাইজেরিয়ার লাগোস অথবা ‘কানো’ শহর এবং সেখান থেকে হজ্জে চলে যাওয়া এবং হজ্জ শেষে মদিনায় স্থায়ী হওয়া।

কিন্তু ছেলে মারা যাওয়ার পর একেবারে ভেঙে পড়লেন ভদ্রলোক। নিজেও অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ঠিক করলেন, ছেলের কবরের পাশেই গড়ে তুলবেন

স্থায়ী নিবাস। দাদুকে বললেন, তুমি সম্পূর্ণ মুক্ত। বাড়িতে ফিরে যাও। কিংবা তোমার যেখানে ভালো লাগে যেতে পার।

দাদু বললেন, বাড়িতে আমার কেউ নেই। আপনি আমাকে নতুন জীবন দিয়েছেন। আপনার ধর্মও আমার ভালো লেগেছে। আমি ইসলাম গ্রহণ করে আপনার পায়ের কাছেই থাকতে চাই।

ভদ্রলোক দাদুকে সন্তান হিসেবে বুকে টেনে নিয়েছিলেন। এবং একমাত্র মেয়ে আয়েশাকে বিয়ে দিয়েছিলেন দাদুর সাথে।'

থামল ব্ল্যাক বুল।

'কিন্তু তোমার এ কাহিনীতে কি বুঝা গেল?' বলল আহমদ মুসা।

'শেষ করতে দাও।' বলে আবার শুরু করল ব্ল্যাক বুল, 'আসল কাহিনী শুরুই হয়নি। ভদ্রলোক ছিলেন মহৎ হৃদয় এক রাজপুত্র। তার নাম ছিল যায়দ রাশিদি। উত্তর ক্যামেরুনের মারুয়া উপত্যাকায় এদের রাজত্ব ছিল। পার্শ্ববর্তী চাদ ও নাইজেরিয়ারও কিছু এলাকা ছিল এই রাজত্বের অধীন। পিতার মৃত্যুর পর যায়দ রাশিদি রাজ্যের সুলতান হন। কিন্তু রাজত্বের অভিলাসী ছোট ভাইয়ের ষড়যন্ত্রে অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে ছোট ভাইকে সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে পরিবার সমেত নিরুদ্দেশ হন। প্রথমে যান চাদে, তারপর মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রের দুর্গম অঞ্চল 'বোমাসায়' বসবাস করতে থাকেন। সংঘ নদী তীরবর্তী 'বোমাসা' বন্দরটি ক্যামেরুন, মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র ও কংগোর সংগম স্থলে। দীর্ঘ ২০ বছর এখানে বসবাস করার পর হজ্জের উদ্দেশ্যে 'বোমাসা' ত্যাগ করেন। তারপর 'ওয়েসু'তে অবস্থান কালে দাদুর সাথে তার সাক্ষাত হয়।'

থামল ব্ল্যাক বুল।

'থামলে কেন। চমৎকার তোমার কাহিনী। কিন্তু তুমি কি বলতে চাও এখনো বুঝিনি।' বলল আহমদ মুসা।

'বলছি। এর পরের কাহিনী আমার দাদুর বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী। যায়দ রাশিদি ইয়াউন্ডির বিশাল এলাকা কিনে অল্পদিনেই বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন এবং ব্যবহার ও বদান্যতার গুণে তিনি স্থাণীয় লোকদের হৃদয় জয় করেছিলেন। কিন্তু তার এই জনপ্রিয়তা তার জন্যে কাল হয়ে দাঁড়ায়। ক্যামেরুনে

পশ্চিমী শাসকদের সাথে খৃষ্টান মিশনারী সংগঠন সমূহেরও আগমন ঘটে। যায়দ রাশিদি তাদের চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়ায়। আমার দাদু খৃষ্টান মিশনারীদের প্রলোভনের শিকার হয়ে পড়েন। অর্থ বিশেষ করে নারী দিয়ে ফাঁদে ফেলে তাকে সম্পূর্ণ বশীভূত করা হয়। খৃষ্টান মিশনারীদের টার্গেট ছিল যায়দ রাশিদির ধর্ম প্রচার বন্ধ করা এবং তাঁর অর্থ ও সম্পত্তি আত্মসাত করা। দাদুকে দিয়ে অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে এ কাজটি আঞ্জাম দেয়া হয়।

একদিন ভোরে প্রার্থনারত অবস্থায় যায়দ রাশিদি ও তার স্ত্রীকে হত্যা করেন দাদু ছুরি দিয়ে নিজ হাতে।

চিৎকার শুনে পাশের রুম থেকে প্রার্থনারত দাদী প্রার্থনা ছেড়ে ছুটে আসেন। পিতা-মাতার রক্তে ভাসমান দেহ এবং দু'হাতে ছুরি নিয়ে দাদুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান।

যায়দ রাশিদি ও তার স্ত্রীর হত্যার পর বাড়ি ও সমগ্র সম্পত্তি দখল করে খৃষ্টান মিশনারীরা। এবং দাদীকে বন্দী করে রাখা হয় এই অন্ধ কুঠরীতে। তার উপর নির্যাতন চলে দিনের পর দিন।

যায়দ রাশিদির সব সম্পদ-সম্পত্তিই খৃষ্টান মিশনারীরা পেয়ে যায়, কিন্তু যায়দের স্বর্ণ মুদ্রার বিশাল বাক্সটি কোথাও পাওয়া যায় না। ঐ বাক্সটির সন্ধানে সবগুলো ঘরের মেঝে এবং দেয়ালের সন্দেহজনক সব জায়গা খুড়ে ও ভেঙ্গে দেখা হয়। এই অন্ধ কুঠরীর মেঝে কয়েকবার খুঁড়ে দেখা হয়। কিন্তু কোথাও সেই বাক্স খুঁজে পাওয়া যায়নি। এই বাক্সের সন্ধানেই দাদীর উপর নির্যাতন চলে।

দাদী সেই যে জ্ঞান হারিয়েছিলেন, তারপর তিনি যেন একদম বোবা হয়ে গিয়েছিলেন। কথা বলতেন না। তাঁর উপর নির্যাতন চলার প্রথম দিকে একদিন একটি মাত্র বাক্য দাদুর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'তুমি গলায় ক্রস পরেছ, ঐ অর্থ ক্রিসেন্টের জন্য, ক্রসের জন্যে নয়।'

এই কথাটুকুর পর দাদী আবার বোবা হয়ে গিয়েছিলেন। তার উপর নির্যাতন চালাত দাদু এবং দাদুর সাথী ফ্লোরেন্স নামের মিশনারীদের একটি মেয়ে। শত নির্যাতনেও দাদী আর মুখ খোলেননি। শুধু আব্বাকে দেখলে ডুকরে কেঁদে উঠতেন। আব্বা তখন সাত-আট বছরের ছেলে। আব্বাকে দাদীর কাছে

আনা হতো টোপ হিসেবে, যাতে তিনি কথা বলেন। দাদী কাঁদতেন, কিন্তু কথা বলতেন না। একদিন ফ্লোরেন্স মেয়েটি কথা বলতে দাদীকে বাধ্য করার জন্যে আব্বার গলায় ছুরি ধরেছিল। দাদী চিৎকার করে চোখ বুজেছিলেন, কিন্তু মুখ খোলেননি।

নির্যাতন, রোগ-শোক এবং অনাহারে দাদী এই অন্ধ কুঠরিতেই একদিন প্রাণ ত্যাগ করেন।

দাদুও পরবর্তীকালে সুস্থ ছিলেন না। দাদীর মৃত্যুর পর ফ্লোরেন্স ও মিশনারীদের কাছে দাদুর প্রয়োজন আর থাকে না। দাদু পরিণত হন তাদের চাকরে। ধীরে ধীরে তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন।

এই বাড়ি ও এই অন্ধ কুঠরি পরিণত হয় খৃষ্টান মিশনারীদের বধ্যভূমিতে। আর দাদু পরিণত হন তাদের অসহায় এক জল্লাদে।

জল্লাদি করে আব্বাও প্রায়শ্চিত্ত করে গেছেন দাদুর পাপের। আমিও করছি। এ পাপ আমাদের ঘাড় থেকে কখনই নামবে না। পেশা এবং পাপক্লিষ্ট মন আমাদের এক হয়ে গেছে। তুমি পেশা ও মনকে আলাদা করছ, আমাদের ক্ষেত্রে এটা সত্য নয়।'

একটু থামল ব্ল্যাক বুল। শেষ দিকে তার মুখে ফুটে উঠেছিল কান্নার মত হাসি।

পরে গম্ভীর হয়ে উঠল তার মুখ। বলল, 'জানো, আমি আমার পেশা নিয়ে খুশি আছি। কারণ এই বাড়ি ছাড়তে চাই না। যায়দ রাশিদির এই বাড়ি আমার কাছে স্বর্ণের টুকরার চেয়েও মূল্যবান। আর এই অন্ধ কুঠরী ঘর আমার সবচেয়ে বেশী প্রিয়। এখানে এলে আমি দাদীর গন্ধ পাই, কথা শুনি।'

বলে উঠে দাঁড়াল ব্ল্যাক বুল।

আহমদ মুসা কাহিনী শুনে নিজেই যেন বোবা হয়ে গিয়েছিল। হৃদয়ের গভীরে একটা ব্যথা চিন চিন করে উঠেছিল তার। যায়দ রাশিদির সেই অতীত তার কাছে ভেসে উঠতে চাচ্ছিল।

ব্ল্যাক বুলের উঠে দাঁড়ানো দেখে সম্বিত ফিরে পেল আহমদ মুসা।

একটু নড়ে বসল আহমদ মুসা। বলল, ‘তোমার এই কাহিনী বলা, এই বাড়ি এবং এই অন্ধ কুঠরীকে তোমার ভালোবাসা প্রমাণ করে, তোমার কাছে তোমার পেশার চেয়ে তোমার মন বড়। যাক সে কথা। তোমার মত করে এই বাড়ি এবং এই অন্ধ কুঠরীকে যে আমিও ভালোবেসে ফেললাম!’

‘কেন? বিদ্রুপ করছ?’ বলল ব্ল্যাক বুল।

‘না, বিদ্রুপ করিনি। তোমার হতভাগ্য যায়দ রাশিদি এবং তোমার হতভাগ্য দাদী তো আমার ভাই-বোন!’

‘কি বলছ তুমি?’

‘হ্যাঁ। এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই। সেই হিসেবে তারা আমার ভাই-বোন।’

‘তুমি মুসলমান?’ চোখে একরাশ বিস্ময় নিয়ে জিজ্ঞেস করল ব্ল্যাক বুল।

মুহূর্তকাল থামল। তারপর সেই বিস্ময় নিয়েই জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি মুসলিম, তুমি টিকটিকি নও। তাহলে তুমি আমাদের লোকদের পিছু নিয়েছিলে কেন?’

জবাব দিতে মুহূর্তকাল দেরী করল আহমদ মুসা। একটু সময় নিয়ে বলল, ‘তোমার সংগঠন ‘ওকুয়া’ আমার এক মুসলিম ভাই এবং নিরপরাধ এক ফরাসী ভদ্রলোককে বন্দী করে রেখেছে। তাদের মুক্ত করার জন্যে ‘ওকুয়া’র ঘাটির সন্ধানে আমি ওদের পিছু নিয়েছিলাম।’

‘কেন ওদের বন্দী করেছে?’

‘যায়দ রাশিদির মতই ওমর বায়াকে ওরা বন্দী করেছে তার দশ হাজার একর সম্পত্তি আত্মসাত করার জন্যে।’

‘এটা ওদের খুব সাধারণ একটা কৌশল। কিন্তু ওদের বাধা দিয়ে কেউ কোনদিন সফল হতে পারেনি। যারা বেশী বেয়াড়া, তাদের এই অন্ধ কুঠরীতে আনা হতো। আর তাদের জীবন যেত আমার হাতে। কিন্তু কোন বুদ্ধিতে তুমি একা এদের বিরুদ্ধে লড়তে এসেছ?’

‘একা নই। সাথে আল্লাহ আছেন। এবং আরও অনেকে আছেন। যাক একথা। তুমি কি বলতে পার ওদের কোথায় আটকে রাখা হয়েছে?’

'আমি এই বাড়িটা ছাড়া ওদের কিছুই চিনি না, কিছুই জানি না।'

বলেই উঠে দাঁড়াল ব্ল্যাক বুল। বলল, 'এই প্রথম কোন বন্দীর জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে। মনে হচ্ছে জীবন দিয়ে হলেও তোমাকে সাহায্য করি। কিন্তু জীবন দিয়েও এখান থেকে তোমাকে মুক্ত করতে পারবো না। ওরা চারজন পাহারায় আছে। কাল দুই সাহেব আসার পর তোমার বিচার করবে। আমাকে দিয়ে তোমাকে খুন করাবে। তারপর যাবে।'

'আমার জন্যে তুমি ভেবনা। একটা কথা বল, যায়দ রাশিদির এই বাড়ি এবং তার সকল সম্পত্তির বৈধ মালিক যে তুমি, একথা তোমার মনে জাগে না?'

'জাগে। আরও জাগে, আমার দেহে মুসলিম রক্ত আছে। কিন্তু পাপের জগদ্দল পাথর ঠেলে তা বেরিয়ে আসতে পারে না। আমি একজন পাপিষ্ঠ।'

'পাপ যেমন হয়, পাপ তেমনি মোচনও হয়।'

'কিন্তু আমার পাপ?'

'সব পাপই মোচন হয়।'

'আমি মানুষের মধ্যে গণ্য হতে পারব বলে তুমি মনে কর?'

'তোমার চেয়ে বড় পাপী শুধু মানুষ হওয়া নয়, মহামানুষও হতে পারে।'

'সত্যি পারব?'

বলে ব্ল্যাক বুল এগিয়ে এল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'এখন আমার মনে হচ্ছে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারব।'

ব্ল্যাক বুল তার পকেট থেকে চাবী বের করে আহমদ মুসার হাত ও পায়ের বেড়ি খুলে দিল।

ঠিক এই সময়েই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল।

আহমদ মুসা এবং ব্ল্যাক বুল দু'জনেই সেদিকে চোখ ফিরাল। দেখল, ব্ল্যাক ক্রসের সেই চারজনের দু'জন উদ্যত রিভলবার হাতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে। তাদের চোখে আগুনের ফুলকি।

ব্ল্যাক বুল ওদের দিকে তাকিয়ে যেন পাথর হয়ে গেছে। আহমদ মুসাও উঠে দাঁড়িয়েছে। তারও স্থির দৃষ্টি ওদের দিকে।

ওরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। দাঁড়াল আহমদ মুসা ও ব্ল্যাক বুলের মাঝখানে।

ওদের একজনের রিভলবার ব্ল্যাক বুলের দিকে এবং আরেকজনের আহমদ মুসার দিকে।

ব্ল্যাক বুলের দিক হয়ে দাঁড়ানো লোকটি চিৎকার করে উঠল, 'জান বিশ্বাসঘাতকতার কি শাস্তি এখানে? দেখা মাত্র হত্যা করা। ঈশ্বরের নাম নাও। তিন গোণা পর্যন্ত সময় পাবে।'

বলে সে এক..... দুই..... করে গোণা শুরু করল।

আহমদ মুসা বুঝতে পারছিল ওরা ফাঁকা ভয় দেখাচ্ছে না। আফ্রিকার গোত্রীয় ঐতিহ্য সে জানে, বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি তাদের সর্বোচ্চ এবং তাৎক্ষণিক। ওরা ব্ল্যাক বুলকে হত্যা করবে।

আহমদ মুসার মনে নানা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল। তার স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল তার দিকে রিভলবার উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটির দিকে।

ব্ল্যাক বুলের দিকে বন্দুক উঁচানো লোকটি যখন এক..... দুই.... গুনছিল, তখন আহমদ মুসার সামনের লোকটি সম্ভবত অপ্রতিরোধ্য কৌতূহল বশতই ব্ল্যাক বুলের অবস্থা দেখার জন্যে মুখ ঘুরিয়েছিল মুহূর্তের জন্যে।

এমন একটি সুযোগের জন্যেই অপেক্ষা করছিল আহমদ মুসা।

লোকটি তার মুখ ঘুরিয়ে নেবার সাথে সাথেই আহমদ মুসা তার হাত থেকে রিভলবার কেড়ে নিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'রিভলবার ফেলে দাও, হাত তুলে দাঁড়াও।'

আহমদ মুসার হুকুম তামিল হলো না।

যার রিভলবার আহমদ মুসা কেড়ে নিয়েছিল, সে তার মুখ ঘুরিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল আহমদ মুসার উপর। আহমদ মুসার লক্ষ্য তখন ব্ল্যাক বুলের সামনের রিভলবারধারী লোকটি। এই সময় রিভলবারধারী লোকটিও রিভলবার ফেলে না দিয়ে ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল।

আহমদ মুসাও সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছিল।

তার হাতের রিভলবার চোখের পলকে দু'বার অগ্নিবৃষ্টি করল। যে লোকটি আহমদ মুসার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল, সে গুলী খেয়ে উল্টে পড়ে গেল। আর ব্ল্যাক বুলের কাছের যে লোকটি আহমদ মুসার দিকে ঘুরিয়ে নিচ্ছিল তার রিভলবার, সে মাথায় গুলী খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল ব্ল্যাক বুলের পায়ের কাছে।

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় কঠোর একটি কণ্ঠে ধ্বনিত হলো, 'হাত থেকে রিভলবার........।'

প্রথম শব্দ শোনার সাথে সাথেই আহমদ মুসা বিদ্যুৎ গতিতে মাথা তুলেছিল। দেখল, স্টেনগান হাতে সেই চারজনের অবশিষ্ট দু'জন রজার এবং পাওল সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে। সামনে আছে রজার তার স্টেনগানটি আহমদ মুসার দিকে উদ্যত।

আহমদ মুসার চোখ ওদের উপর পড়ার সংগে সংগেই উঠে এসেছিল তার রিভলবার। রজারের কথা শেষ হবার আগেই আহমদ মুসা দু'বার ট্রিগার টিপল তার রিভলবারের। দু'টি গুলী পর পর গিয়ে বিদ্ধ করল রজার ও পাওলকে। দু'জনের দেহই গড়িয়ে পড়ল সিঁড়ি দিয়ে নিচে।

'ব্ল্যাক বুল চল আমরা যাই।' বলল আহমদ মুসা।

ব্ল্যাক বুল তখন রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে আহমদ মুসার দিকে। মনে হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে বিস্ময়কর বস্তুর সামনে সে যেন দাঁড়িয়ে। ধীরে ধীরে সে বলল, 'থ্রি মাসকেটিয়ারের গল্প আমি শুনেছি, আমেরিকার বিখ্যাত পিস্তলবাজদের গল্পও আমি জানি। কিন্তু মনে হচ্ছে তোমার মানে আপনার কাছে তারা শিশু। এত দ্রুত রিভলবার তুলে লক্ষ্যভেদ করা যায়, না দেখলে আমার বিশ্বাস হতো না। এখন স্বীকার করছি, 'ওকুয়া' এর সাথে আপনি লড়তে পারবেন।'

'থাক এসব কথা। চল আমরা যাই।'

'কোথায়?'

'আমি যেখানে যাব।'

'কিন্তু এই বাড়ি তো আমি ছাড়ব না।'

'ওকুয়া, কোকদের তুমি আমার চেয়ে ভাল চেন। এখানে আর এক মুহূর্ত তুমি নিরাপদ নও।'

'তা জানি। কিন্তু.....'

'কিন্তুটা বুঝেছি। বাপ, দাদা, দাদীদের স্মৃতি বিজড়িত বাড়ি তুমি ছাড়তে চাও না।'

'এই বাড়িতে টিকে থাকা হৃদয়হীন পেশাটা গ্রহণের একটা বড় কারণ।'

'আমরা এ বাড়িটা ছাড়ছি না। আবার ফিরে আসব। ইয়াউন্ডিতে এটাই আমার মনে হয় প্রথম মুসলিম বসতি। সুতরাং এ বাড়িটার ঐতিহাসিক মূল্যও আছে। সেই অতীত সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু জানতে চাই।'

বলে আহমদ মুসা সামনে পা বাড়িয়ে বলল, 'এসো।'

'জানতে চান? তাহলে তার কিছু বইপত্র আছে দেখতে পারেন।' বলল ব্ল্যাক বুল।

'কোথায়?'

'এই সিঁড়ির নিচে একটা ট্রাংকে ঢুকিয়ে রেখেছি। চলুন দেখবেন।'

ট্রাংক খুলে বই বের করতে করতে বলল, 'সব বই ওরা পুড়িয়ে ফেলেছে। একটা সুযোগ পেয়ে এ কয়টা আমি সরিয়ে রেখেছি।'

আহমদ মুসা এক এক করে সবগুলো বই দেখল। অধিকাংশই আরবী ভাষায়। অবশিষ্ট কয়েকটি ফরাসী ভাষায় লেখা। আর দু'টি সুহাইলী ভাষায় লেখা। বইগুলো ইতিহাস, কোরআন, হাদীস, ভ্রমণ কাহিনী ইত্যাদি বিষয়ক। ডাইরীর মত একটা নোট বুক দ্রুত তুলে নিল আহমদ মুসা।

পাতা উল্টিয়ে দেখল, প্রথম পাতায় আরবী ভাষায় লেখা নাম: যায়দ রাশিদি। তার নিচে লেখা: মারুয়া খিলাফত।

তারপর আরও পাতা উল্টাল আহমদ মুসা। দেখল, স্মৃতি কথা ধরনের একটা দিনপঞ্জী। আরবী ও সুহাইলী এই দুই মিশ্র ভাষায় লেখা।

আগ্রহ হলো আহমদ মুসার নোট বুকটি পড়ার। আফ্রিকার এ অঞ্চলের অনেক কছুই জানা যেতে পারে একজন মুসলিমের লেখা এই দিনপঞ্জী থেকে।

শেষ পাতাটিতে নজর বুলাতেই চমকে উঠল আহমদ মুসা। চমকে উঠার কারণ লেখার একটি শিরোনাম। যার অর্থ হলোঃ 'যিনি এই ডায়েরিটি পড়বেন তার প্রতি।'

শিরোনামের নিচের লেখাও পড়ল আহমদ মুসা। ছোট একটা অনুচ্ছেদে লেখাঃ

"বুক ভরা অভিমান নিয়ে মারুয়া খিলাফত থেকে চলে আসার সময় আমার ন্যায্য পাওনা কিছু স্বর্ণমুদ্রা সাথে নিয়ে এসেছিলাম। যা আমার কোন প্রয়োজনে খরচ করিনি। আমার সাধ ছিল, আমার স্বর্ণ মুদ্রা আল্লাহর ঘর কাবা এবং নবীর মসজিদের রং ও রূপ বৃদ্ধিতে কাজে লাগাব। কিন্তু তা হলো না। তারপর ভেবেছিলাম, এ দেশীয় দুঃখী মুসলমানদের স্বার্থে এ স্বর্ণমুদ্রা কাজে লাগাব। তারও সুযোগ পেলাম না। নাসারা মিশনারীরা যেভাবে এগুচ্ছে তাতে আমি এবং আমার অর্থ সবই গিয়ে তাদের গ্রাসে পড়বে আশংকা করছি। এই আশংকায় আমার অর্থগুলো হেফাজতের একটা চেষ্টা করে গেলাম। আমার একান্ত আশা, যিনি ডাইরির এই অংশ পাঠ করবেন তিনি একজন দায়িত্বশীল মুসলিম হবেন। তিনি নিম্নলিখিত নক্শা অবলম্বনে মাটির তলা থেকে ৩ বর্গ ঘনফুট আয়তনের স্বর্ণমুদ্রা ভর্তি বাক্সটি উদ্ধার করবেন। স্বর্ণমুদ্রার মালিক তিনি হবেন এবং তার বিবেকের রায় অনুসারে স্বাধীনভাবে খরচ করবেন।"

অনুচ্ছেদটির নিচে একটা বৃত্ত আঁকা। তার মাঝখানে একটা পাখির বাসা। সে পাখির বাসার ডানে অল্প দূরে একটা বর্গক্ষেত্র। তার মাঝখানে পাখির প্রাণহীন একটা ছানা। পাখির ছানাটির ঠোঁটের কাছে একটা গোলাপ ফুল। মনে হচ্ছে যেন ফুলটি ছানাটির ঠোঁটে ছিল, পড়ে গেছে।

কথিত নক্শা এটুকুই।

নক্শাটির উপর একবার নজর বুলিয়েই মুখে হাসি ফুটে উঠল আহমদ মুসার। ভাবল, যায়দ রাশিদি এত সহজ ধাঁ ধাঁ'র চাবী দিয়ে তার অর্থ লুকিয়ে রেখেছেন।

আহমদ মুসা নোট বুক বন্ধ করল। বলল ব্ল্যাক বুলের দিকে তাকিয়ে, 'এটা তোমার দাদীর আব্বার ডাইরী। আমরা সাথে নিতে পারি?'

‘ডাইরি কেন সব বই-ই নিতে পারেন।’

‘সবই নেব। আবার যখন ফিরে আসব তখন।’

‘সত্যিই তাহলে ফিরে আসবেন?’

‘অবশ্যই ফিরে আসতে হবে।’

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়াল। বলল , ‘চল।’

আহমদ মুসার গাড়ি অন্য দু’টি গাড়ির সাথে বাইরেই ছিল। গাড়িতে উঠল তারা দু’জন।

ওরা দু’জন বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে।

বেরিয়ে আসার আগে ব্ল্যাক বুল তিনটি কুকুরের গলা থেকে চেন খুলে নিয়ে ওদের গা নেড়ে আদর করে বলল, 'তোরা স্বাধীন চলে যা।'

কিন্তু কুকুর তিনটি চলে না গিয়ে অবাক হয়ে তাকাল ব্ল্যাক বুলের দিকে। যেন চেন খুলে নিয়ে স্বাধীনতা দেয়ার তারা বিস্মিত হয়েছে।

ককুর তিনটিকে আবার আদর করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে এসেছিল বাড়ি থেকে।

বাড়ির ভাঙ্গা গেট দিয়ে বেরুবার সময় পেছনে তাকাল ব্ল্যাক বুল। তাকিয়ে বিস্মিত হলো, কুকুর তিনটি তাদের স্ব স্ব চেন মুখ দিয়ে ধরে গাড়ির পিছু পিছু আসছে।

ব্ল্যাক বুল আহমদ মুসাকে ডাক দিল।

আহমদ মুসাও তাকিয়ে দৃশ্যটা দেখে বিস্মিত হলো। বলল, 'ব্ল্যাক বুল তুমি ওদের ছাড়তে চাইলও ওরা তোমাকে ছাড়তে চাইছে না। দেখ, ওরা চেন নিয়ে এসেছে। চেয়ে দেখ ওদের চোখের নির্বাক ভাষা বলছে, চেন দিয়ে বেঁধে আমাদের সাথে নিয়ে চল, স্বাধীনতা আমরা চাই না।'

'সেই ছোট থেকে ওদের মানুষ করেছি, ট্রেইনিং দিয়েছি।' ব্ল্যাক বুলের কণ্ঠ ভারী শোনাল।

কুকুর তিনটিকে গড়িতে তুলে নিল ব্ল্যাক বুল।

তাপর বাড়িটা পেছনে রেখে ছুটে বলল গাড়ি।

# ৪

রাশিদি ইয়েসুগোর ড্রইং রুমে রাশিদি, মুহাম্মাদ ইয়েকিনি ও লায়লা ইয়েসুগো বসে।

তাদের সবার মুখ মলিন। মুখে উদ্বেগের ছাপ।

'উনি জরুরী প্রয়োজনে হঠাৎ যদি কোথাও যেয়ে থাকেন, তাহলে এতক্ষণ কি আসবেন না?' চিন্তান্বিত কণ্ঠে বলল লায়লা ইয়েসুগো।

'কিন্তু তার নিজস্ব প্রয়োজনে গাড়ি নিয়ে তিনি যাবেন কোন কিছু না বলে, তা আমি মনে করতে পারছি না।' বলল রাশিদি ইয়েসুগো।

'আমারও তাই মনে হয়।' বলল ইয়েকিনি।

'তাহলে তিনি কি কোন শত্রুর কবলে পড়েছেন?' তাঁর তো শত্রু চারদিকেই।' বলল লায়লা।

'তা হতে পারে। কিন্তু গাড়ি? শত্রু তাকে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু গাড়ি কোথায় গেল?' বলল রাশিদি ইয়েসুগো।

'হয়তো শত্রু আগে থেকেই ফলো করছিল। সে গাড়িও দেখেছিল।' বলল লায়লা।

'কিন্তু এটা কি সম্ভব যে, আহমদ মুসার মত মানুষকে ঐ কক্ষ থেকে প্রকাশ্য দিবালোকে ধরে এনে গাড়িতে তুলে হাইজ্যাক করে নিয়ে যাবে?' বলল রাশিদি ইয়োসুগো।

'সম্ভব নয়, কিন্তু সমস্যার সমাধান কি ভাইয়া? বলল লায়লা।

রাশিদি ইয়োসুগো কোন জবাব দিল না।

কথা বলল মুহাম্মাদ ইয়েকিনি। বলল, 'আমি আহমদ মুসাকে যতটুকু চিনেছি, তাতে আমার মনে হয়, তিনি স্বেচ্ছায় কোথাও গিয়েছেন। এবং আমাদের জানিয়ে যাবার তাঁর সময় ছিল না।'

'স্বেচ্ছায় কোথায় যাবেন, 'আপনার অনুমান কি?' বলল লায়লা ইয়েসুগো।

'অনুমান করা মুস্কিল। তবে আমার মনে হয় তিনি কিছু দেখে বা কিছু শুনে তার পিছু ছুটছেন। বলে যাবার মত সময় তাঁর ছিল না।' বলল ইয়েকিনি।

'সেই কিছু'টা কি হতে পারে?' লায়লা বলল।

'ওমর বায়ার কথা হতে পারে। ডঃ ডিফরজিসের কোন তথ্য হতে পারে।' বলল ইয়েকিনি।

'হতে পারে। কিন্তু তবু প্রশ্ন জাগে তিনি যদি স্বেচ্ছায় গিয়ে থাকেন, তাহলে খবর জানিয়ে যাবার মত দুই মিনিট সময় পাবেন না কেন?' লায়লা বলল।

'লায়লা, আমাদের রুটিনে বাধা শান্তির জীবন দিয়ে আহমদ মুসার জীবনকে বিচার করছ বলেই এমন প্রশ্ন জাগছে। আসলে প্রয়োজন নামের চাবুক একজন বিপ্লবীকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। তার কাছে অন্যসব বিবেচনাই গৌণ হয়ে যায়।'

দরজায় এসে দাঁড়াল গার্ডদের একজন। তার চোখে-মুখে আনন্দের স্ফুরণ। বলল, 'বড় সাহেব এসেছেন।'

'মেহমান বড় সাহেব।'

বাড়ির আর সবাই আহমদ মুসাকে বড় সাহেব বলে ডাকে। কেউ তাদেরকে একথা বলে দেয়নি। তারা সম্ভবত সবার কাছে আহমদ মুসার সম্মান ও প্রতিপত্তি দেখেই তাকে বড় সাহেব নাম দিয়েছে।

'কি বলছিস? আমাদের মেহমান? কোথায় তিনি?'

'বাইরে দাঁড়িয়ে।'

'বাইরে কেন?'

'সাথে ইয়ামোটা একজন লোক এবং তিনটি কুকুর।

'সাথে একজন লোক এবং তিনটি কুকুর!'

রাশিদি সবার আগেই উঠে দাঁড়িয়েছিল। রাশিদি চলতে শুরু করে দিয়েছিল। এই সময় ঘরে প্রবেশ করল আহমদ মুসা।

রাশিদি ইয়েসুগো এবং মুহাম্মাদ ইয়েকিনি গিয়ে জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে।

'টেনশনে আমরা শেষ হয়ে যাচ্ছি। কি ঘটনা ঘটেছিল? আপনি ভাল আছেন তো?' বলল রাশিদি ইয়েসুগো।

'হঠাৎ করেই 'ওকুয়া'র দু'জন লোককে চিনে ফেলি।' তারা চলে যাচ্ছিল। ওদের ঘাটির ঠিকানা জানার উদ্দেশ্যে ওদের ফলো করেছিলাম। তোমাদের জানানোর সুযোগ হয়নি। দুঃখিত।'

'দুঃখ প্রকাশ করে লজ্জা দেবেন না। আমাদের কোনই কষ্ট হয়নি। আমরা উদ্বেগের মধ্যে ছিলাম আপনাকে নিয়ে।'

কথা শেষ করেই রাশিদি ইয়োসুগো আহমদ মুসাকে সোফার দিকে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলল, 'তার পর কি হলো বলুন।'

আহমদ মুসা রাশিদি ইয়োসুগোকে বাধা দিয়ে সোফার দিকে না এগিয়ে বলল, 'আমি ওদের হাতে আটকা পড়েছিলাম। সব বলছি। কিন্তু তার আগে চারজন মেহমানের ব্যবস্থা করতে হবে।'

'সব ব্যবস্থা করছি। কিন্তু চারজন কোথায়? শুনলাম তো একজন!' বলল রাশিদি।

'একজন মানুষ আছে এবং তিনটি কুকুর।' বলল আহমদ মুসা।

লাললাসহ সবাই হেসে উঠল আহমদ মুসার কথা বলার ভংগিতে।

আহমদ মুসা, ইয়োসুগো, ইয়েকিনি বাইরে গেল। ব্ল্যাক বুল ও কুকুরগুলোকে ভেতরে নিয়ে এল। তাদের সব ব্যবস্থা করে দিয়ে ঘটা খানেক পর আহমদ মুসা, রাশিদি ইয়োসুগো এবং মুহাম্মাদ ইয়েকিনি ড্রইং রুমে আবার ফিরে এল।

ইতিমধ্যেই ব্ল্যাক বুলকে নিয়ে নাস্তার কাজও তারা সেরেছে।

আহমদ মুসা সোফায় বসতে বসতে বলল, ‘ওকুয়া'র লোকদের পিছু নেবার পর যা যা ঘটেছে সব তো তোমাদের শোনা হয়ে গেছে। ওকুয়া'র কোন ঘাটির সন্ধান পাইনি বটে, তবে ব্ল্যাক বুলকে উদ্ধার করেছি। তার সাথে হারিয়ে যাওয়া থেকে একটা ইতিহাসকে উদ্ধার করেছি।’

‘ইতিহাস উদ্ধার করেছেন? সেটা কি?’ বলল রাশেদি ইয়েসুগো।

'ব্ল্যাক বুল সম্পর্কে তোমরা যেটুকু জেনেছ, তা তার পরিচয়ের সবটুকু নয়। যে ইতিহাসের কথা বলছি, ব্ল্যাক বুল সে ইতিহাসের অংশ।' বলল আহমদ মুসা।

'তার পরিচয় কি?' বলল রাশিদি ইয়েসুগো।

'শুনলে বিস্মিত হবে 'ওকুয়া'র কশাই ব্ল্যাক বুলের দেহে মুসলিম রাজরক্ত রয়েছে।' আহমদ মুসা বলল।

‘মুসলিম রাজরক্ত?’ সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করল রাশিদি ইয়োসুগো।

'হ্যাঁ মুসলিম রাজরক্ত।'

একটু থামলো আহমদ মুসা। তারপর বলল আবার, 'মারুয়া' খিলাফতের কথা জান রাশিদি?'

'হ্যাঁ, জানি, মানে শুনেছি। কিন্তু এ প্রশ্ন কেন? আমাদের ইয়েসুগো পরিবারেরই এ ব্রাঞ্চ ‘রাশিদি পরিবার’ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে আমাদের গারুয়া সালতানাত দ্বিখন্ডিত করে, মারুয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠা করে।' বলল রাশিদি ইয়েসুগো।

'মারুয়া খিলাফত তোমাদের বংশেরই?' আহমদ মুসার কণ্ঠে বিস্ময়।

'হ্যাঁ। তবে তাদের সাথে আমাদের পরিবারের সম্পর্ক প্রথম দিকে ভাল ছিল না। কিন্তু পরে ভাল হয়। শেষে আবার খারাপ হয়ে যায়। এখন বলুন মারুয়া খিলাফতের কথা কি বলছিলেন?' বলল রাশিদি ইয়েসুগো।

'যায়দ রাশিদিকে চেন?'

'মারুয়া খিলাফতের?'

'হ্যাঁ।'

'চিনি। রাশিদি পরিবারের সবচেয়ে ভাল মানুষ। কিন্তু সবচেয়ে আবেগ প্রবণ। তার কাহিনী বড় করুণ।'

'ব্ল্যাক বুল তার মেয়ের একমাত্র নাতি।'

'কি বলছেন আপনি। ব্ল্যাক বুল যায়দ রাশিদীর মেয়ের নাতি!' বিস্ময়ে সোজা হয়ে উঠল ইয়োসুগো।

'হ্যাঁ। তাঁর একমাত্র ছেলে কিশোর বয়সে এই ইয়াউন্ডিতে এসেই মারা যায়। অবশিষ্ট থাকে একটি মাত্র মেয়ে আয়োশা। আয়েশার নাতি ব্ল্যাক বুল। বড় করুণ কাহিনী যায়দ রাশিদীর এবং তার পরিবারের।'

'তিনি ভাইয়ের উপর অভিমান করে সিংহাসন ছেড়ে স্ত্রীকে নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। তারপর কোন খবর আর পাওয়া যায়নি। এটুকুই আমরা শুনেছি।' বলল রাশিদি ইয়েসুগো।

'তার পরের কাহিনী শুন।' বলে আহমদ মুসা ব্ল্যাক বুলের কাছ থকে শোনা এবং ডাইরী থেকে পড়া কাহিনী বর্ণনা করল।

অদম্য আবেগ আর বিস্ময় নিয়ে রাশিদি ইয়োসুগো এবং ইয়েকিনি এই কাহিনী শুনল। লায়লাও এসে হাজির হয়েছিল। সেও শুনল।

কাহিনী শেষ হলো আহমদ মুসার।

কিন্তু রাশিদি ইয়োসুগো এবং লায়লা কারও মুখেই কোন কথা নেই। বেদনা এবং বিস্ময়ে তারা যেন পাথর হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ পর উঠে দাঁড়াল রাশিদি ইয়েসুগো। 'চলুন ভাইয়া ব্ল্যাক বুলের কাছে' -বলে সে চলতে শুরু করল। বলল, 'আল্লাহর হাজার শোকর যে, মরহুম যায়দ রাশিদির উত্তরসূরীকে তিনি আমার ঘরে এনেছেন। মারুয়ার রাজপরিবার এবং আমাদের পরিবার কত যে খুঁজেছে যায়দ রাশিদিকে। কিন্তু কোথাও পাওয়া যায়নি। অথচ এত কাছে তারা ছিলেন। বিপর্যয়ের এত সাইক্লোন তাদের উপর দিয়ে বয়ে গেছে।' বলতে বলতে ইয়েসুগোর গলা আবেগে রুদ্ধ হয়ে গেল।

আহমদ মুসা এবং ইয়েকিনিও উঠে দাঁড়িয়ে ছিল। তারাও চলতে শুরু করেছে ইয়েসুগোর পিছু পিছু।

লায়লা উঠে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু আবার সে বসে পড়ল সোফায়। চোখের প্রান্ত পর্যন্ত নামিয়ে দেয়া মাথার চাদর সরিয়ে নিয়ে শিথিল বসনা হয়ে একটু গা এলিয়ে বসল সে সোফায়।

ড্রইং রুমের দরজা পেরুবার আগে ইয়েকিনি একবার পেছন ফিরে চাইল। হয়তো বিনা কারণেই। তার চোখ গিয়ে পড়ল লায়লার উপর।

লায়লা তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে বসে কাপড় ঠিক করে মাথার চাদর আবার টেনে নিল। মুখে ফুটে উঠল তার লজ্জা রাঙা একটা কৃত্রিম ক্রোধ। ডান হাতের মুষ্টি উঠিয়ে শাসন করল সে ইয়োকিনিকে।

ইয়েকিনি সলজ্জ মিষ্টি হেসে জোড় হাতে মাফ চাওয়ার ভংগি করে ঘুরে দাঁড়িয়ে আহমদ মুসার পিছু পিছু চলা শুরু করলো।

ইয়েকিনির চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে রইল লায়লা। হারিয়ে গেল তার মন ইয়েকিনির মধ্যে। অন্তরে একটা অস্বস্তিও জেগে উঠল। এমন করে ভাবা কি পাপ? আবার সে ভাবল, ইয়েকিনিকে নিয়ে সে ভাবে, তাকে জীবন সংগী হিসেবে পেতে চায় বটে। কিন্তু কোন সীমা লংঘন তো সে করেনি।

আবার সোফায় গা এলিয়ে দিল লায়লা ইয়েসুগো।

'চীফ জাস্টিস উসাম বাইক তাহলে আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে?' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল ফ্রান্সিস বাইক।

'তাই তো প্রমাণ হচ্ছে, হাইকোর্টের রেজিস্টার রুম থেকেই টিকটিকি পিছু নিয়েছে আমাদের লোকদের। ওমর বায়ার কেসের ব্যাপার নিয়ে আমাদের লোকরা যাবে, এটা চীফ জাস্টিসই জানতেন। তিনি গোপনে লোক লাগিয়ে আমাদের ঠিকানা যোগাড় করে ডঃ ডিফরজিসকে উদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন।' বলল পিয়েরে পল।

'এটা পরিস্কার। চীফ জাস্টিস একটা শয়তান। এখন কি করা যায় বলুন তো?'

'আগে চলুন টিকটিকির কাছে আরও কি জানা যায় দেখা যাক। তারপর ওটার ব্যবস্থা করে চীফ জাস্টিসের কেস হাতে নেয়া যাবে।'

ফ্রান্সিস বাইক ওয়াকিটকি তুলে নিল হাতে।

নির্দিষ্ট চ্যানেলে রজারের সাথে যোগাযোগ করল ফ্রান্সিস বাইক। কিন্তু রজারের কাছ থেকে কোন সাড়া পেল না। বার বার চেষ্টা করল। না উত্তর নেই।

'কি ব্যাপার রজাররা কোন জবাব দিচ্ছে না যে?'

'হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে কিংবা টয়লেটে গেছে।'

'না, টয়লেটে গেলে ওয়াকিটকি সাথে নেবার কথা।'

'তাহলে ঘুমিয়েছে নিশ্চয়।'

'ফ্রান্সিস বাইক ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, না এই বেলা দশটায় কোন সময়ই ঘুমানোর কথা আমাদের অভিধানে নেই।'

একটু থামল ফ্রান্সিস বাইক। তারপর বলল, 'ওদের সাথে সর্বশেষ কখন আপনার যোগাযোগ হয়েছে?'

'আমি ওদের সাথে যোগাযোগ করিনি। ওরাই গতকাল মধ্যাহ্নের পর যোগাযোগ করে। কথা হয় টিকটিকিকে ওরা বন্দী করে রাখবে। আপনি সকালে এলে খোজ-খবর নিয়ে ব্যবস্থা করা হবে। তারপর ওরা কিংবা কেউ আর যোগাযোগ করেনি।'

'কিছুই বুঝা যাচ্ছে না। এই দীর্ঘ সময়ে ওরা যোগাযোগ করবে না, এটা বিস্ময়কর। চলুন দেখা যাক।' বলল ফ্রান্সিস বাইক।

ফ্রান্সিস বাইক উঠে দাঁড়াল। তার সাথে পিয়েরে পলও উঠল। গাড়ি তাদের ছুটে চলল 'ওকুয়া'র সেই জেলখানার উদ্দেশ্যে।

ব্ল্যাক বুলের বাড়ির সেই ভাঙা গেট দিয়ে প্রবেশ করেই ফ্রান্সিস বাইক বাড়িতে প্রবেশের মূল গেটটাকে খোলা দেখতে পেল। চমকে উঠল ফ্রান্সিস বাইক।

গোটা বাড়ি ওরা খুঁজল। শেষে আন্ডার গ্রাউন্ড কক্ষে গিয়ে চারজনের লাশ পেল।।

'টিকটিকির হাতেই এরা খুন হয়েছে। এদের খুন করেই সে পালিয়েছে।' বলল পিয়েরে পল।

'কিন্তু কি করে এটা সম্ভব হলো? ব্ল্যাক বুল কোথায় গেল?' ফ্রান্সিস বাইক বলল।

'আমার মনে হয় টিকটিকির শক্তির ওরা অবমূল্যায়ন করেছিল। তারই সুযোগ গ্রহণ করেছিল টিকটিকি। আর ব্ল্যাক বুলকে আমার মনে হয় ওরা ধরে নিয়ে গেছে, কথা বের করার জন্যে।'

'চীফ জাস্টিস জঘন্যভাবে বিশ্বাস ভংগ করেছে মিঃ পল।'

'অবশ্যই। তাকে শিক্ষা দিতে হবে এবং এখনই।'

দু'জনে বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে।

গাড়িতে উঠতে উঠতে ফ্রান্সিস বাইক বলল, 'কি করা যায় এখন?'

'আপনার সাহসী লোকজন কেমন আছে?'

'সব কাজ করার মত লোক আমাদের আছে।'

'তাহলে এই মুহূর্তেই চলুন, আপনার লোকদের নির্দেশ দিন চীফ জাস্টিসের পরিবারের একান্ত আপনজন কাউকে কিডন্যাপ করতে হবে এবং আজই করতে হবে।'

ফ্রান্সিস বাইকের মুখে হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'ঠিক আছে মিঃ পল। তার টিকটিকি লেলিয়ে দেবার উপযুক্ত জবাব এটাই। কিন্তু চীফ জাস্টিসকে কিডন্যাপ করি না কেন? তাকে দেখিয়ে দেয়া যেত বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি কি?'

'আমাদের লক্ষ্য তাকে শাস্তি দেয়া এবং সেই সাথে কাজও উদ্ধার। চীফ জাস্টিসকে কিডন্যাপ করলে তো আমাদের কাজ উদ্ধার হবে না, শাস্তি হয়তো পাবে। আর তার মেয়েকে কিডন্যাপ করলে তাকে শাস্তিও দেয়া যাবে, কাজও করিয়ে নেয়া যাবে।'

ওরা পৌছল 'ওকুয়া'র অফিসে।

ফ্রান্সিস বাইকের বিশাল টেবিলের পাশে ওরা বসল দু'জন।

টেলিফোনে প্রয়োজনীয় কথা শেষ করে এবং নির্দেশাবলী দিয়ে পিয়েরে পলের দিকে ঘুরে বসে বলল, 'সব ঠিক-ঠাক মিঃ পল। এখনই ওরা কাজ শুরু করবে।'

'কি কাজ শুরু করবে?'

'কেন, চীফ জাস্টিসের পরিবারের ডসিয়ার আমাদের কাছে আছে। প্রতি 'উইক এন্ড'-এ (সাপ্তাহিক ছুটির দিন) চীফ জাস্টিস তার মেয়েকে নিয়ে

ইন্ডিপেনডেন্স পার্কে গিয়ে দু'ঘন্টা সময় কাটান। ঠিক দশটায় যান, বারটায় চলে আসেন। তাদের সাথে থাকে মাত্র একজন আরদালি।'

পিয়েরে পল খুশী হয়ে উঠল। বলল, 'ধন্যবাদ ফ্রান্সিস বাইক। চমৎকার সুযোগ। আপনাদের পরিকল্পনা কি?'

'ঠিক বারোটায় ইন্ডিপেনডেন্স পার্কের গেটে ওরা যখন গাড়িতে উঠতে যাবে, ঠিক সেই সময় কিডন্যাপ করা হবে চীফ জাস্টিসের মেয়েকে।'

'গেটে পুলিশ থাকে না?'

'দু'জন পুলিশ থাকে। তার মধ্যে একজন ট্রাফিক পুলিশ। ওদের আগেই ম্যানেজ করা হবে।'

'ওয়ান্ডারফুল।' বলে ঘড়ির দিকে তাকাল পিয়েরে পল। বলল, 'এখন এগারটা। তাহলে সুখবরের জন্যে আমাদের আরও সোয়া ঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে।'

'হ্যাঁ। যিশু আমাদের সহায় হোন।' বলে ফ্রান্সিস বাইক তার ইন্টারকমের দিকে মুখ ঘুরাল। বলল, 'দেখি ওরা বেরোল কিনা।'

'আজই এমনটা ঘটবে বলে আশংকা করছেন ভাইয়া?' বলল মুহাম্মাদ ইয়েকিনি।

'আমি ওদের কথা শুনে যতটা বুঝেছি, তাতে আজ সকালে ফ্রান্সিস বাইক কোথাও থেকে ফিরে আসবে। তারপরই ওরা আমার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিত। কিন্তু আজ সকালে যখন ওরা দেখবে, আমি নেই, তার সাথে ওদের চারজন নিহত এবং ব্ল্যাক বুলকে আমরা ধরে নিয়ে এসেছি, তখন ওরা ক্ষ্যাপা কুকুরের মত হয়ে যাবে।'

ব্ল্যাক বুল ওরফে 'আবদুলল্লাহ রাশিদি'কে আমরা ধরে নিয়ে এসেছি বুঝবে কি করে ওরা?'

ব্ল্যাক বুল-এর পিতৃদত্ত নাম ছিল 'জর্জ রাশেদি'। 'ওকুয়া'র কসাই পদ পাওয়ার পর ওরা তার নামকরণ করা হয় ব্ল্যাক বুল। আহমদ মুসা তার 'জর্জ' নাম পাল্টিয়ে করেছে আবদুল্লাহ। তার সাথে 'রাশিদি' মিলে হয়েছে 'আবদুল্লাহ রাশেদি'। ব্ল্যাক বুল নামটি সানন্দে গ্রহণ করে বলেছে, ‘আমি খৃষ্টানও ছিলাম না, মুসলিমও ছিলাম না। কিন্তু গৌরব বোধ করতাম আমাদের দাদীর জন্যে। তার ধর্ম ইসলাম আমার কাছে আপন বলে মনে হতো।’ ব্ল্যাক বুল মহা খুশী হয়েছে রাশিদি ইয়েসুগোর পরিচয় পেয়ে। তার এখন মনে হচ্ছে সে নতুন মানুষ। সে সব ফিরে পেয়েছে- তার ধর্ম, তার পরিবার- সবকিছু। তার সাথে তার মনে হয়েছে 'ওকুয়া'র মত খৃষ্টান সংগঠন তার প্রতিদ্বন্দ্বী এবং তার দাদীর আব্বা যায়দ রাশিদির হত্যা প্রতিশোধ নেবার দায়িত্ব এসে বর্তেছে তার উপর।

আহমদ মুসা বলল, ‘ওরা নিশ্চিত, আবদুল্লাহ রাশিদি পালাতে পারে না। ওকে না পাওয়ার অর্থই আমরা তাকে ধরে এনেছি।’

‘ওরা যে ক্ষেপা কুকুর হবেই। ওরা প্রতিশোধ নেবে বললেন। কি প্রতিশোধ নিতে পারে?’ বলল রাশিদি ইয়েসুগো।

‘ওদের যতটা চিনেছি, তাতে চীফ জাস্টিসের পরিবারের কাউকে কিডন্যাপের চিন্তাই প্রথমে করবে।’

‘কিডন্যাপ? চীফ জাস্টিসকে? তাহলে তো সাংঘাতিক হবে।’

‘না চীফ জাস্টিসকে কিডন্যাপ করলে তাদের আসল উদ্দেশ্যই ভন্ডুল হয়ে যাবে। ওমর বায়ার সম্পত্তি হস্তান্তর তাহলে কাকে দিয়ে করাবে?’

‘তাহলে?’

‘আমার মনে হয় চীফ জাস্টিসের সবচেয়ে প্রিয় কাউকেই তারা কিডন্যাপের চেষ্টা করবে।’

বৈঠক খানায় তাদের মাঝে এসে দাঁড়িয়েছিল লায়লা। সে বলল, ‘ভাইয়া আমি রোসেলিন-এর কাছে শুনেছি তাকে তার আব্বা একা চলা ফেরা করতে নিষেধ করেছে। রোসেলিন এখন একা চলাফেরা করেনা।’

‘ঠিক, রোসেলিন আমাকেও এ ধরনের কথা বলেছে। বলতে ভুলে গেছি আহমদ মুসা ভাইকে।’ বলল রাশিদি।

‘রোসেলিন কে?’

‘চীফ জাস্টিসের মেয়ে এবং ভাইয়ার....।’

লায়লা কথা শেষ করতে পারলনা। রাশিদি ইয়েসুগো তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল। বলল, ‘ওসব কথার সময় বুঝি এটা!’

আহমদ মুসার ঠোঁটে মিষ্টি হাসি ফুটে উঠল। বলল, ‘লায়লা অপ্রাসঙ্গিক কিছু বলেনি। সে রোসেলিনের পরিচয় সম্পূর্ন করতে চেয়েছিল মাত্র।’

থামল আহমদ মুসা। মুখটা তার গম্ভীর হয়ে উঠল। শুরু করল আবার, ‘তাহলে বুঝা যাচ্ছে চীফ জাস্টিস আগেই সন্দেহ করেছেন।’

‘নিশ্চয় ব্ল্যাক ক্রস ও ওকুয়া তাকে ভয় দেখিয়েছে এবং তিনি মেয়ে রোসেলিনের নিরাপত্তা সম্পর্কেই উদ্বিগ্ন ছিলেন বেশী।’

‘আমারও মনে হচ্ছে, চীফ জাস্টিসের সবচেয়ে স্পর্শকাতর স্থান তার মেয়ে। সুতরাং ওকুয়া ও ব্ল্যাক ক্রস চীফ জাস্টিসকে শাস্তি দেবে এবং তাকে বাগে আনার জন্য রোসেলিনের গায়েই হাত দিবে।’

রাশিদি ইয়েসুগোর চোখে-মুখে নেমে এল উদ্বেগ। বলল, ‘ওরা যা করবে, দ্রুতই করবে মনে হয়।’

‘অবশ্যই। কিন্তু আমি জানি না কোন সুযোগ তারা নেবে কিংবা কোন পথে তারা এগুবে। আমাদের এটা একটা সুযোগ। আমরা চীফ জাস্টিসের বাড়ী এবং বাড়ির সদস্যদের উপর নজর রাখি, তাহলে ওকুয়া এবং ব্ল্যাক ক্রস-এর লোকদের সাক্ষাত আমরা পেতে পারি এবং তাদের মাধ্যমে আমরা পৌছাতে পারি তাদের ঘাটিতে।’

‘তাহলে এখনি আমাদের কিছু করার দরকার। আমরা যেতে পারি চীফ জাস্টিসের বাসার দিকে। নজর রাখতে পারি তাদের বাড়ির উপর।’ বলল মুহাম্মাদ ইয়েকিনি।

‘হ্যা, আমরা যেতে পারি। চেন তুমি তাদের বাসা?’

‘চিনি।’

‘তাহলে উঠ, চল যাই।’

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, ‘রাশিদিকে সাথে নিচ্ছিনা।’

‘কেন?’ বলল রাশিদি ইয়েসুগো। ‘তোমাকে ওদের কেউ কেউ চিনে। তোমাকে ঘুর ঘুর করতে দেখলে, তার অন্য অর্থ হতে পারে।’

রাশিদি কিছু বলল না। তার মুখটা মলিন হয়ে গেল।

লয়লা মুখ টিপে হাসল। বলল, ‘বড়ই দুঃখের কথা। রাজপুত্র যেতে পারবে না রাজকন্যাকে রক্ষার অভিযানে।’ বলেই লায়লা এক দৌড়ে পালিয়ে গেল ড্রইং রুম থেকে।

লজ্জায় রাশিদি ইয়েসুগোর মুখ লাল হয়ে উঠল। মুখ নিচু করে বলল, ‘লায়লাটা বড় দুষ্টু হয়ে গেছে ভাইয়া।’

‘ও কিছু না, একটু আনন্দ করছে।’

‘না, ওকে বিদায় করতে হবে।’

‘বিদায় করবে? কোথায়?’

‘এটা ইয়েকিনি জানে।’

ইয়েকিনির মুখে বিব্রত ভাব আর ঠোঁটে সলজ্জ হাসি ফুটে উঠল। মুখ নিচু করল। কিছু বলল না।

আহমদ মুসা ইয়েকিনির পিঠ চাপড়ে হেসে বলল, ‘মুহাম্মাদ ইয়েকিনি খুব ভাল ছেলে। তোমার বিপদে সে না দেখে পারেনা।’

কথা শেষ করেই ইয়েকিনিকে লক্ষ্য করে বলল, ‘চল ইয়েকিনি।’

‘চলুন।’ বলল ইয়েকিনি।

দু ‘জন বেরিয়ে এল।

রাশিদি ইয়েসুগোর গাড়ি প্রস্তুত ছিল। ড্রাইভিং সিটে বসল আহমদ মুসা। মুহাম্মাদ ইয়েকিনি তার পাশের সিটে।

‘পথ বলে দিও। সংক্ষিপ্ত পথে যাব।’

‘সংক্ষিপ্ত পথটায় খুব বেশী ট্রাফিক পয়েন্ট আছে। আর সময়টাও খুব জ্যাম-এর সময়। তার চেয়ে আমরা যদি ইয়াউন্ডি নদী তীরের হাইওয়ে ধরে ইন্ডিপেনডেন্স পার্কের পাশ দিয়ে যাই, তাহলে পথ একটু লম্বা হবে কিন্তু ট্রাফিক ও জ্যামের হাত থেকে বাঁচব। পৌছতেও পারব আমরা অনেক আগে।’

‘এটাইতো চাই।’ বলে আহমদ মুসা গাড়িতে স্টার্ট দিল।

ছুটে চলল গাড়ি।

ইয়াউন্ডি নদীর তীর ঘেঁষে পরিকল্পিতভাবে লাগানো গাছের সারি। তার পাশ দিয়ে প্রশস্ত হাইওয়ে। হাইওয়ের অন্য পাশ দিয়েও সারিবদ্ধ গাছের লাইন।

'চমৎকার রাস্তা ইয়েকিনি।'

'একে ট্যুরিস্ট রোড বলে ভাইয়া।'

'সার্থক নাম।'

'নদীর ধার দিয়ে ১৫ মাইল রাস্তা এইভাবে গেছে। মাঝখানে রয়েছে ইন্ডিপেনডেন্স পার্ক।'

'ইন্ডিপেনডেন্স পার্ক আর কতদূর?'

'প্রায় এসে গেছি।'

ইন্ডিপেনডেন্স পার্কের কাছে এসে হাইওয়েটি বেঁকে ইন্ডিপেনডেন্স পার্কের তিন প্রান্ত ঘুরে আবার নদীর তীর ঘেঁষে সামনে এগিয়ে গেছে।

আহমদ মুসার গাড়ি ইন্ডিপেনডেন্স পার্কের প্রান্ত দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

ইন্ডিপেনডেন্স পার্কের প্রধান গেটের পাশ দিয়েই এগিয়ে গেছে হাইওয়েটি।

ইন্ডিপেনডেন্স পার্কের প্রধান গেট অতিক্রম করছে আহমদ মুসার গাড়ি।

নারী কণ্ঠের একটা চিৎকার শুনতে পেল আহমদ মুসা গেটের দিক থেকে।

একটা হার্ড ব্রেক কষল আহমদ মুসা।

ইয়েকিনি গাড়ির ড্যাশ বোর্ডের উপর মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। তার দু'টি হাতের প্রানান্ত প্রচেষ্টা তাকে রক্ষা করেছে।

আহমদ মুসা তাকিয়েছে চিৎকার লক্ষ্য করে। দেখল, দু'জন লোক একজন তরুণীকে টেনে পাশে দাঁড়ানো গাড়ির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আর একজন ষ্টেনগান ধরে আছে মূর্তির মত দাঁড়ানো দু'জন লোকের দিকে। লোক দু'টির পরণে পুলিশের পোষাক। মাথায় হ্যাট। কপাল ঢেকে গেছে হ্যাটে। আর একজন লোককে দেখা গেল গাড়িটির ড্রাইভিং সিটে, যে গাড়িটির দিকে মেয়েটিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

আহমদ মুসা গাড়ি থেকে নেমেছে এই সময় একটা গুলীর শব্দ হলো।

গুলীর শব্দ লক্ষ্যে তাকিয়েছিল আহমদ মুসা। দেখল, হ্যাট পরা পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকা ভদ্রলোক দু'জনের পেছনে একটু দূরে দাঁড়ানো একটি মেয়ে গুলী করেছে। মেয়েটার গায়ে-মাথায় ওড়না।

মেয়েটি গুলী করেছে ষ্টেনগানধারীকে। ষ্টেনগানধারী গুলী খেয়ে পড়ে গেছে। ছিটকে পড়েছে তার হাত থেকে ষ্টেনগান।

গুলীর শব্দ শুনেই যে দু'জন লোক তরুণীকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, তাদের একজন মেয়েটিকে টেনে নিয়ে ঢাল হিসেবে সামনে ধরে বিদ্যুত গতিতে ঘুরে দাড়ালো। তার হাতে রিভলবার। সে রিভলবার তুলল রিভলবারধারী মেয়েটিকে লক্ষ্য করে। মেয়েটির হাতে উদ্যত রিভলবার। কিন্তু তার গুলী করার পথ বন্ধ। কারণ গুলী করলে সে গুলি সামনে ধরে রাখা তরুনীটির বুক এফোঁড় ওফোঁড় করবে।

রিভলবাধারী মেয়েটিকে দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠেছিল আহমদ মুসা। একি সম্ভব। কিন্তু চিন্তার তার সময় ছিল না। লোকটি ট্রিগার টিপছে।

আহমদ মুসার হাতে রিভলবার উঠে এসেছিল আগেই। উদ্যত ছিল তার রিভলবার। খুব সাবধানে বিপজ্জনক গুলীটা করল আহমদ মুসা।

পর পর দু'টি গুলী বের হলো আহমদ মুসার রিভলবার থেকে।

প্রথম গুলীটা গিয়ে বিদ্ধ করল রিভলবারধারী লোকটির ঠিক কানের উপর। কিন্তু তার সাথে সাথেই লোকটির রিভলবারও গর্জন করে উঠেছিল। শেষ মূহূর্তে তার হাতটি কেঁপে গিয়েছিল। তার কাঁপা হাতের গুলী কিছুটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বিদ্ধ হলো রিভলবারধারী মেয়েটির বাম বাজুতে।

আর আহমদ মুসার দ্বিতীয় গুলীটা গিয়ে বিদ্ধ করেছিল যে লোকটি তরুণীটিকে ধরে গাড়ীতে উঠাচ্ছিল তার পৃষ্ঠদেশকে।

গুলী বিদ্ধ দু'জনই সামান্য টলে উঠে মাটিতে আছড়ে পড়েছিল।

ওড়না পরা গুলীবিদ্ধ মেয়েটি আর্ত চিৎকার করে ডান হাতে বাম বাজুটি চেপে ধরে বসে পড়েছিল।

আহমদ মুসা ছুটে গিয়েছিল মেয়েটির দিকে। মেয়েটির মাথা থেকে উড়না সরে গিয়েছিল।

মেয়েটি যে সত্যিই ডোনা, তা এক অবিশ্বাস্য বাস্তবতা নিয়ে হাজির হলো আহমদ মুসার কাছে।

আহমদ মুসার হাতে তখনও রিভলবার।

আহমদ মুসা ছুটে গিয়ে হাটু গেড়ে বসল ডোনার সামনে। বলল, ‘কি দেখছি আমি! ডোনা তুমি! কোথায় লেগেছে?’

‘গুলী গুলী’ বলে চিৎকার করে উঠল ডোনা। তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল হাইজাক কারীদের গাড়ির দিকে।

তার চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘুরিয়ে আহমদ মুসা দেখল, হাইজাকারদের গাড়ী থেকে একজন লোক বেরিয়ে এসেছে। তার হাতের রিভলবারটি উঠে এসেছে তাদের লক্ষ্যে।

আহমদ মুসা মাথা না ঘুরিয়ে সেই অবস্থাতেই বাম হাতে ডোনাকে নিয়ে শুয়ে পড়ল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটি গুলী ছুটে গেল তাদের উপর দিয়ে।

আহমদ মুসার ডান হাতে রিভলবার ধরাই ছিল। সে শুয়ে পড়েই গুলী চালাল সেই রিভলবারধারী লোকটিকে লক্ষ্য করে। অব্যর্থ লক্ষ্য। লোকটি দ্বিতীয় বার লক্ষ্য ঠিক করার আগেই গুলী বিদ্ধ হয়ে ছিটকে গিয়ে পড়ল গাড়ির উপরে।

ডোনা ছিটকে এসে পড়েছিল আহমদ মুসার বাম কাঁধের উপর।

পড়ে থাকা অবস্থাতেই ডোনা মুখ ঘুরিয়ে ছিল। তার মুখটা এসে পড়েছিল আহমদ মুসার কানের কাছে। ডোনা বলল, ‘তুমি কি আহত? তোমার কিছু হয়নি তো?’

আহমদ মুসা সে কথার কোন জবাব না দিয়ে ডোনাকে নিয়েই উঠে বসল।

ডোনার শরীরের বাম দিকটা রক্তে ভেসে যাচ্ছিল।

আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি ডোনার গাউন এর হাতাটা ছিড়ে ফেলে ডোনার ওড়নাতেই গজের মত বানিয়ে তাঁর বাম বাজুটা বাঁধতে লাগল। ইতিমধ্যে সেই

তরুণী এবং হ্যাটধারী দুই ভদ্রলোক ও মুহাম্মাদ ইয়েকিনী, তাদের চারদিকে এসে দাঁড়াল।

তরুণীটি রোসেলিন, হ্যাটধারীদের একজন চিফ জাস্টিস উসাম বাইক, অন্যজন ডোনার আব্বা মিশেল প্লাতিনি।

ডোনার আব্বা রাজ্যের আনন্দ ও বিস্ময় নিয়ে আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, 'বাবা তুমি! ঈশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

আহমদ মুসা ডোনার হাত বাঁধতে বাঁধতে বলল, 'আমার মনে হচ্ছে আমি এখনও স্বপ্ন দেখছি। আপনারা আসবেন তা কল্পনাতেও ভাবিনি।'

রোসেলিন বসে পড়ে ডোনাকে জড়িয়ে ধরেছে। আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে আর্তস্বরে বলল, 'খুব সিরিয়াস কি?'

আহমদ মুসা মুহূর্তের জন্যে রোসেলিনের দিকে মুখ তুলল। বলল, 'খুব ব্লিডিং হচ্ছে। ওকে তাড়াতাড়ি ক্লিনিকে নেয়া দরকার।'

রোসেলিন তাদের আবদালির দিকে মুখ তুলে বলল, 'গাড়ী রেডি?'

'হ্যাঁ ম্যাডাম।' বলল আবদালি।

বাঁধা হয়ে গিয়েছিল। আহমদ মুসা ইয়েকিনির দিকে মুখ তুলে বলল, 'মুহাম্মাদ ইয়েকিনি ওদের সকলের পকেট এবং গাড়ী খুঁজে দেখ কোন প্রকার কাগজ পাও কিনা।'

ছুটল ইয়েকিনি।

ইয়েকিনির দিকে তাকিয়ে ভ্রু কুঁচকালো রোসেলিন। এতক্ষণে সে খেয়াল করেছে তাকে। রাশিদি ইয়েসুগোর বন্ধু ইয়েকিনিকে সে চেনে।

আহমদ মুসা পাঁজাকোলা করে তুলে নিল ডোনাকে। চলল গাড়ির দিকে।

ডোনা মুখ গুঁজল আহমদ মুসার বুকে। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

'খুব কষ্ট হচ্ছে ডোনা।' বলল আহমদ মুসা।

ডোনা চোখ বুজে ছিল। চোখ খুলল। বলল ফিসফিসিয়ে, 'একটুও না। তোমাকে এমনভাবে পেলে আমি শতবার আহত হতে পারি।' ডোনার চোখে অশ্রু আর ঠোঁটে একটা পরিতৃপ্তির হাসি।

গাড়ির কাছে এসে গিয়েছিল।

গাড়ির পেছনের সিটে ডোনাকে শুইয়ে দিল আহমদ মুসা। রোসেলিন আহমদ মুসাকে সাহায্য করল। সে আহমদ মুসার পাশে পাশেই ছিল। সে দেখেছে ডোনার কান্না, শুনতে পেয়েছে ডোনার কথা। রোসেলিন বিস্ময় ও কৌতুহল ভরা দৃষ্টি নিয়ে দেখছে আহমদ মুসাকে। তাঁর বিস্ময় আরও এ কারণে যে, আহমদ মুসা যেভাবে তিনজন অপহরণকারীকে, বিশেষ করে শেষ জনকে হত্যা করল, সেটা তাঁর কাছে এক অবিশ্বাস্য ঘটনা।

চিফ জাস্টিস ওসাম বাইক পুলিশের সাথে কথা বলে গাড়ির কাছে ছুটে এসেছিল। বলল রোসেলিনকে, 'সামরিক হাসপাতাল তুমিতো চেন, ওখানে নিয়ে যেতে হবে। ওখানে নিরাপত্তাও পাওয়া যাবে।'

তারপর ঘুরল চিফ জাস্টিস আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'গাড়িতে পুলিশ দেব?'

'না দরকার হবে না।'

'ধন্যবাদ।' বলে তার পাশে দাঁড়ানো ডোনার আব্বাকে বলল, 'চলুন আমরা গাড়িতে উঠি।' বলে সে হাটা শুরু করল।

ডোনার আব্বা আহমদ মুসার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'বাবা তুমি যাও ডোনার পাশে বস। তাকে দেখ। ওর কি খুব কষ্ট হচ্ছে?'

এতক্ষণে ডোনার আব্বার কণ্ঠ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

আহমদ মুসা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'মারাত্মক কিছু ঘটতে পারত, তা হয়নি। বাহুর একটি অংশ ছিড়ে নিয়ে গুলী বেরিয়ে গেছে মনে হচ্ছে। কোন চিন্তা করবেন না।'

বলে আহমদ মুসা ইয়েকিনীর দিকে তাকিয়ে উচ্চ কণ্ঠে বলল, 'তুমি এস আমাদের সাথে। ওদের গাড়ির নম্বরটাও নিয়েছ তো?'

'জি, নিয়েছি।' বলল ইয়েকিনী।

মিশেল প্লাতিনি চলে গিয়েছিল চিফ জাস্টিস উসাম বাইক এর সাথে।

আহমদ মুসা গাড়িতে উঠে ডোনার মাথার কাছে বসল।

রোসেলিন নির্দেশ দিল ড্রাইভারকে গাড়ী ছাড়ার জন্য।

গাড়ির সিটের সাথে বামপাশটা ঠেস দিয়ে ঈষৎ কাত হয়ে শুয়ে আছে ডোনা। তার আহত বাম বাহুটাকে তার গায়ের উপর যেভাবে রেখেছিল, সেভাবেই আছে।

ডোনার আহত বাম হাতটি কাঁপছে।

মাথার চুল তার এলোমেলো হয়ে গেছে। কয়েক গুচ্ছ চুল গিয়ে পড়েছে কপাল পেরিয়ে মুখের উপর। চোখ দু'টি বোজা ডোনার। বোঝাই যাচ্ছে দাঁতে দাঁত চেপে ব্যাথা হজম করার চেষ্টা করছে।

আহমদ মুসা ধীরে ধীরে ডোনার মুখ থেকে চুল সরিয়ে দিতে দিতে বলল, 'খুব কষ্ট হচ্ছে ডোনা?'

ডোনার ডান হাতটা ধীরে ধীরে উঠে এল। হাত রাখল আহমদ মুসার হাতে। চেপে ধরে থাকল অনেকক্ষণ। তারপর সে ধীরে ধীরে আহমদ মুসার হাত নামিয়ে আনল মুখের উপর। ডোনার অশ্রুর উষ্ণ ছোঁয়া অনুভব করল আহমদ মুসা তার হাতে।

ইচ্ছে করেই আহমদ মুসা তার হাত সরিয়ে নিল না। কাঁদছে ডোনা।

ডোনার চোখের পানিতে ভিজে গেল আহমদ মুসার হাত।

রোসেলিন বসে ছিল সামনের সিটে।

আহমদ মুসা একবার রোসেলিনের দিকে চাইল। কেউ না বললেও আহমদ মুসা বুঝছে মেয়েটি রোসেলিন। বলল, 'মিস রোসেলিন, হাসপাতাল আর কত দূরে?'

'আর অল্প।' বলে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার নাম রোসেলিন জানলেন কি করে?'

'অনুমান করেছি।'

'অনুমান করা নাম বলা সম্ভব নয়।'

'আমি রাশিদী ইয়েসুগোর মেহমান। লায়লার কাছে এ নাম শুনেছি।'

ডোনা তার মুখ থেকে আহমদ মুসার হাত সরিয়ে নিল। অশ্রু ধোয়া চোখ আহমদ মুসার দিকে টেনে দুর্বল কণ্ঠে বলল, 'তুমি লায়লাকে চেন? তুমি লায়লাদের ওখানে ছিলে? তাহলে ওরা কিছু বলেনি কেন?'

আহমদ মুসা বলল, ‘তুমি চেন লায়লাকে?’

‘খুব ভাল মেয়ে লায়লা। আমার সাথে বন্ধুত্ব হয়েছে।’

‘আপনার পরিচয় তো পেলাম না!’ আহমদ মুসাকে লক্ষ করে বলল রোসেলিন।

এ সময় গাড়ির গতি স্লো হয়ে এসে থেমে গেল। গাড়ী পৌঁছে গেছে হাসপাতালে।

গাড়ী থামতেই গাড়ী থেকে লাফ দিয়ে নামল রোসেলিন।

পেছনের দুটি গাড়ীও এসে দাড়িয়ে পড়েছিল।

চিফ জাস্টিসের গাড়ী থেকে তার আবদালী নেমেই ছুটল ইমার্জেন্সির ডিউটি রুমে। তার পেছনে পেছনে রোসেলিন।

কয়েক মুহূর্ত পরেই ডিউটিরত ডাক্তারও ছুটে এল।

চিফ জাস্টিস গাড়ী থেকে নেমেছে তখন।

ডাক্তার তাকে অভিবাদন করে বলল, ‘স্যার সব ব্যবস্থা করছি স্যার। আপনি দয়া করে ভেতরে বসুন।’

ডাক্তারের পেছন পেছনেই প্যাশেন্ট ট্রলি নিয়ে ছুটে এসেছিল চারজন।

আহমদ মুসা ডোনাকে গাড়ী থেকে নামিয়ে শুইয়ে দিল ট্রলিতে।

ট্রলি চলতে শুরু করতেই ডোনা আহমদ মুসার হাত চেপে ধরে বলল, ‘তুমি থাকবে আমার পাশে।’

‘চল আমরা সবাই থাকব। ভয় নেই ডোনা।’

ট্রলি ছুটে চলল। তার সাথে আহমদ মুসা, রোসেলিন এবং ডাক্তার। পেছনে পেছনে হাঁটতে শুরু করল চিফ জাস্টিস ওসাম বাইক এবং মিশেল প্লাতিনি।

মুহাম্মাদ ইয়েকিনি ওদের বলেছিল, ‘স্যার আমি গাড়ির কাছে আছি।’

‘ঠিক আছে বাবা। এটা দরকার।’ বলেছিল চিফ জাস্টিস উসাম বাইক।

হাঁটতে হাঁটতে চিফ জাস্টিস মিশেল প্লাতিনির কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, ‘আমি কিছু বুঝতে পারছি না মিশেল প্লাতিনি। এই বিস্ময়কর ছেলেটা কে?

এমন ক্ষিপ্র, এমন নিপুণ, এমন নির্ভীক মানুষ এবং এমন অবিশ্বাস্য ঘটনা শুধু সিনেমাতেই দেখা যায়। মনে হচ্ছে ছেলেটার সাথে আপনারা ঘনিষ্ঠ?'

হাসি ফুটে উঠল মিশেল প্লাতিনির মুখে। বলল, 'এই ছেলেটার কথাই তো আমি আপনাকে বলেছিলাম। এইতো সেই কিংবদন্তির আহমদ মুসা।'

থমকে দাঁড়াল চিফ জাস্টিস। বিস্ময়-বিমূঢ়তায় তার মুখ যেন শক্ত হয়ে উঠেছে।

দাঁড়াল মিশেল প্লাতিনিও। হেসে বলল, 'কল্পনার আহমদ মুসা এবং বাস্তবের আহমদ মুসা মিলছেনা না?'

'মিলছে। তবে চেহারায় এতটা সুশীল, সুন্দর হবে ভাবিনি। ধারণা ছিল, চোখের দৃষ্টি হবে তীকষ্ন, শরীর হবে শক্ত, পেটা এবং আচরণ হবে দারুণ ভারিক্কি ও রহস্যময়তায় ভরা।'

'ঠিক বলেছেন। এই দিকগুলো বিচার করলে সে বিপ্লবীদের তালিকায় পড়ে না।'

'আমি সৌভাগ্য বোধ করছি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ঈশ্বরের কাছে। হয়তো তার মত ব্যাক্তি এসে হাজির না হলে আমার মেয়েকে দুর্দান্ত দুর্বৃত্তদের হাত থেকে রক্ষা করা যেত না।'

'আমার মেয়েও চিরতরে হারিয়ে যেত। দুর্বৃত্তটি গুলী খাওয়ার মুহূর্তে গুলী করায় গুলী কিছুটা লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়েছে। তা না হলে গুলীটা ঠিক বক্ষ ভেদ করতো। আল্লাহ ঠিক সময়েই সাহায্য পাঠিয়েছেন।'

হাসপাতালের বারান্দায় গিয়ে উঠল দু'জন।

ইমার্জেন্সী ওয়ার্ডের প্রশাসনিক অফিসার স্বাগত জানাল চীফ জাস্টিসকে। বলল, 'স্যার প্যাশেন্টকে অপারেশন কক্ষে নেয়া হয়েছে। আসুন আপনারা বসুন।'

চীফ জাস্টিস উসাম বাইক এবং মিশেল প্লাতিনি প্রবেশ করল বিশেষ ড্রইং রুমটিতে।

ডোনার জন্যে সামরিক হাসপাতালে বিশেষ কেবিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ্যাটেনড্যান্টের বিছানাসহ সোফা-ফ্রিজে সুসজ্জিত রুম।

ডোনা তার বিছানায় চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। এ্যাটেনড্যান্টের বিছানায় হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে রোসেলিন। মিশেল প্লাতিনি সোফায় গা এলিয়ে দিয়েছে।

চীফ জাস্টিস উসাম বাইক টয়লেট থেকে বেরিয়ে এসে সোফায় বসতে বসতে বলল, 'আহমদ মুসা কোথায়?'

রোসেলিন ইতিমধ্যে আহমদ মুসার পরিচয় পেয়েছে। অপারেশনের আগে এক সুযোগে ডোনা আহমদ মুসার পরিচয় বলেছে রোসেলিনকে। খবরটা শুনে হঠাৎ শক পাওয়া রোগীর মত অনেকক্ষণ আহমদ মুসার সাথে স্বাভাবিকভাবে রোসেলিন কথা বলতে পারেনি। বিস্ময়ের ধাক্কা কাটার পর রোসেলিন গৌরব বোধ করেছে এই ভেবে যে, তাকে আজ বাঁচাবার মাধ্যমে এবং ইয়েসুগোর মেহমান হয়ে এই বিশ্ববিপ্লবী তাদের জীবনের সাথে মিশে গেছে।

পিতার প্রশ্নের জবাব রোসেলিন সংগে সংগেই দিল, 'উনি মুহাম্মদ ইয়েকিনির খোঁজে বাইরে গেছেন।'

'সাথের ঐ ছেলেটা কি মুহাম্মদ ইয়েকিনি? তুমি চেন তাকে?' বলল রোসেলিনের আব্বা।

'জি, আব্বা। ও তো রাশিদি ইয়েসুগোর বন্ধু।'

'আহমদ মুসা রাশিদির মেহমান হলো কি করে?'

'শুনিনি আব্বা।'

'ঈশ্বরের অনেক দয়া যে, ওরা ঠিক সময়ে এসে পড়েছিল।'

'ঘটনা তো বাস্তবে ঘটেছে। তবু আমার কাছে এখনও অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। তিনজন হাইজ্যাককারী চোখের পলকে নিহত হলো, আমি মুক্ত হয়ে গেলাম।'

'আরেকজনকে তো মারিয়া মা শেষ করেছে। সত্যি আমাদের মারিয়া মা'র সাহস আছে।'

‘থাকবে না, আহমদ মুসার কিছু গুণ তো মারিয়ার মধ্যে থাকতে হবেই।’ বলেই কিন্তু লজ্জা পেল রোসেলিন। মুখ নিচু করল।

‘ডোনা কি মারিয়ার ডাক নাম প্লাতিনি?’ প্রসঙ্গটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিল চীফ জাস্টিস উসাম বাইক।

‘ঠিক ডাক নাম নয়। ‘মারিয়া জোসেফাইন লুই’ ওর অফিসিয়াল নাম। কিন্তু ফ্যামিলি নাম হয়ে গেছে ওর ‘ডোনা জোসেফাইন লুই।’ বলল মি: মিশেল প্লাতিনি।

‘দু’টোই সুন্দর নাম।’

‘শুধু নাম সুন্দর নয় আব্বা, ওর সব সুন্দর।’

ডোনা এদিকে তাকিয়েছিল। ডোনার দিকে তাকিয়েই কথাগুলো বলে রোসেলিন মুখ টিপে হাসল।

লজ্জা পেল ডোনা। বোধহয় প্রসংগ ঘুরিয়ে নেবার জন্যেই ডোনা বলল, ‘তুমিই এখন মেজবান রোসেলিন, মেহমানরা কোথায় খোজ নেবার দায়িত্ব তোমার।’

‘জো হুকুম’ বলে মুখ টিপে হাসল রোসেলিন। উঠে দাঁড়াল বাইরে যাবার জন্যে। কয়েক পা এগিয়ে ছিল।

ঠিক এ সময়ে কেবিনে এসে প্রবেশ করল আহমদ মুসা এবং মুহাম্মাদ ইয়েকিনি।

রোসেলিন আহমদ মুসার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, ‘মারিয়া আপা বললেন, ‘আমি প্রধান মেজবান। অতএব আপনাদের খোঁজ-খবর নেবার দায়িত্ব আমার। তাই যাচ্ছিলাম।’

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘ধন্যবাদ রোসেলিন। উনি ঠিকই বলেছেন। আপনি মহামান্য চীফ জাস্টিসের মা। সুতরাং প্রধান মেজবান তো হবেনই।’

রোসেলিন ডোনার দিকে মুখ ঘুরিয়ে কৃত্রিম রাগের সাথে বলল, ‘মারিয়া আপা, ওনাকে বলে দাও ছোট বোনকে কেউ ‘আপনি’ বলে না।’

ডোনা হাসল।

হাসল আহমদ মুসাও। বলল, ‘ধন্যবাদ বোন, তুমি বস।’

বলে আহমদ মুসা চীফ জাস্টিস উসাম বাইক এবং মিশেল প্লাতিনি পাশাপাশি যে দুটো সোফায় বসেছিলেন, তার বিপরীত সোফার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, ‘আমি বসতে পারি জনাব?’

‘ও শিয়র। অবশ্যই বসবে, বস বাবা।’ বলল চীফ জাস্টিস ওসাম বাইক।

মুহাম্মদ ইয়েকিনি দাঁড়িয়েছিল সোফার পেছনে।

রোসেলিন তার দিকে ঘুরে বলল, ‘তুমি বস ইয়েকিনি। লায়লা ভাল আছে?’

‘থ্যাংকস। ভাল আছে।’ বলে ইয়েকিনি গিয়ে আহমদ মুসার পাশের সোফায় বসল।

রোসেলিন গিয়ে বসল ডোনার বিছানায়, ডোনার পাশে।

আহমদ মুসা উসাম বাইক এবং মিশেল প্লাতিনির দিকে চেয়ে নরম ভাষায় বিনয়ের সাথে বলল, ‘আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই জনাব।’

‘বল বাবা।’ বলল ওসাম বাইক।

‘আমার মনে হয় আপনি সব জানেন কারা এই কিডন্যাপের চেষ্টা করেছিল এবং কেন করেছিল। আমি মনে করি, তাদের এই ব্যর্থতা ও লোক ক্ষয়ের পর তারা আরও হিংস্র হয়ে উঠবে এবং প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবে।’

‘তুমি ঠিক বলেছ। কিন্তু কি ধরনের প্রতিশোধ নেবার তারা চেষ্টা করবে বলে মনে কর?’

‘কিডন্যাপ, হত্যা ইত্যাদি যে কোন পথই তারা বেছে নিতে পারে।’

চীফ জাস্টিস উসাম বাইকসহ সকলের চোখে-মুখেই একটা উদ্বেগের ছায়া পড়ল।

আহমদ মুসাই আবার কথা বলল, ‘আপনি কি পুলিশকে কিছু জানিয়েছেন?’

‘না জানাইনি। ওদের বিরুদ্ধে পুলিশ খুব কার্যকরী হয়তো হবে না। তাছাড়া ভয় হলো, পুলিশকে জানালে ডঃ ডিফরজিসের ক্ষতি হতে পারে।’

‘ঠিক বলেছেন। আমিও মনে করি, গোটা বিষয়টা পুলিশকে জানানোর প্রয়োজন নেই। তবে এই কিডন্যাপের প্রচেষ্টার কথা বলে বাড়িতে বিশেষ পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করুন।’

‘বাড়ি পর্যন্ত তারা হামলা চালাতে পারে বলে তুমি মনে কর?’

‘তারা এটা করতে পারে। এই ঘটনার পর তাদের অবস্থা ক্ষ্যাপা কুকুরের মত হবার কথা।’

‘তোমার আর কি পরামর্শ?’

‘রোসেলিনের কয়েকদিন বাড়ি থেকে বের না হওয়াই ভাল। আর সম্ভব হলে আপনি এক সপ্তাহের ছুটি নিন।’

‘নিলাম। কিন্তু তারপর কি হবে?’

আহমদ মুসা একটু হাসল। বলল, ‘ভবিষ্যৎ আমরা কেউ বলতে পারি না। তবে আমি মনে করি এ সময়ের মধ্যে পরিস্কার হয়ে যাবে তখন আমাদের কি করণীয়।’

‘সুন্দর বলেছ।’

‘ডোনা সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত হলো। সে এখানে থাকবে, না বাড়িতে যাবে?’ একবার চীফ জাস্টিসের দিকে আরেকবার ডোনার আব্বার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘তোমার কি পরামর্শ?’ বলল ডোনার আব্বা।

‘ডাক্তার ছাড়তে চাইলে বাসায় নিয়ে যাওয়াই ভাল।’

‘তুমি কি কিছু আশংকা কর এখানে?’ বলল চীফ জাস্টিস উসাম বাইক।

‘হাসপাতালে যতই পাহারা থাক, এখানে যা ইচ্ছা তাই করা সম্ভব।

‘ঠিক বলেছ। মারিয়া মাকে বাসায় নিয়ে যাওয়াই উচিত।’ বলল চীফ জাস্টিস উসাম বাইক।

‘তাহলে তো এখনি ওদের জানাতে হয়, কখন ওরা রিলিজ করতে পারবে।’ বলল ডোনার আব্বা।

‘যদি রিলিজ তাড়াতাড়ি করে, তাহলে আমরা পৌছে দিয়ে যেতে পারতাম। আমাদেরও একটু তাড়া আছে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘কোথাও যাবে তুমি?’ বলল ডোনার আব্বা।

‘আমরা ওদের গাড়িতে দু’টি ঠিকানা পেয়েছি। একটা গাড়ির ব্লু বুকে, আরেকটা একজনের পকেটে পাওয়া লন্ড্রীর একটা স্লীপে। এর কোন একটা ‘ওকুয়া’র কোন ঘাটির হতে পারে, কিংবা ঐ দু’টো ঠিকানার সূত্র ধরে ওদের ঘাটির সন্ধান পেতে পারি। এই সন্ধানেই আমরা বেরুব।’

‘তোমরা কারা যাবে?’ জিজ্ঞেস করল মি: প্লাতিনি।

‘প্রথমত, আমি একাই যাব।’

‘কিভাবে? ‘ওকুয়া’ বা ‘কোক’- এর ঘাটিতে কেউ কিভাবে একক অভিযান চালাতে পারে?’ বলল চীফ জাস্টিস।

‘শত্রু এতটা শক্তিশালী যে দলবদ্ধ ও প্রকাশ্য অভিযান করে ওদেরে সাথে পারা যাবে না।’

‘একা কি করে পারা যাবে? বলল চীফ জাস্টিস।

শক্তিতে নয় কৌশলে ওদের উপর জয়ী হতে হবে। ছোট বা একক গোপন অভিযান এ জন্যেই প্রয়োজন।’

‘ব্যাপারটা বাজি ধরার মত। জয় অথবা পরাজয় যে কোন একটা হবে। উদ্ধারের জন্যে ওমর বায়া এবং ডঃ ডিফরজিসকে পাবে কিনা এই অনিশ্চয়তা নিয়ে এত বড় ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবেনা।’ বলল চীফ জাস্টিস উসাম বাইক।

‘চীফ জাস্টিস সাহেব ঠিকই বলেছেন।’ বলল ডোনার আব্বা মিশেল প্লাতিনি।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘ঝুঁকি না নিলে এসব ক্ষেত্রে কোন কাজই হয় না, করা যায় না। এ ধরনের ঝুঁকি এড়িয়ে চললে ডঃ ডিফরজিসদের উদ্ধার করা যাবে না কোন দিনই। আমরা উদ্ধার করতে চাইলে অন্যায়ের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে।’

‘পুলিশের সাহায্য নেয়া যায়।’ বলল রোসেলিন।

‘তাতে লাভ নেই। মাঝখানে নিহত হবেন ডঃ ডিফরজিসরা।’ বলল চীফ জাস্টিস।

‘তুমি চীফ জাস্টিস হয়ে এই কথা বলছ আব্বা?’

হাসল চীফ জাস্টিস ওসাম বাইক। বলল, 'বলছি কারণ, এমন এবং এরচেয়েও ভয়াবহ হাজারো ঘটনা ঘটেছে আমি জানি।'

'তাহলে তোমার জাস্টিস কোথায় থাকে আব্বা?'

'জানা এবং প্রমান করতে পারা এক জিনিস নয়। বিচারের জন্যে প্রমাণের দরকার হয় মা।'

আহমদ মুসা প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে বলল, 'তাহলে আমরা এখন উঠতে চাই।'

'কিন্তু আমার কয়েকটা প্রশ্ন আছে।' বলল চীফ জাস্টিস।

'আমার কৌতুহল হচ্ছে, তোমরা কিভাবে কোথেকে ঠিক সময় সেখানে এসে পড়েছিলে?'

'আমরা আপনার বাসার দিকে যাচ্ছিলাম।'

'আমার বাসার দিকে? কেন?'

'আমরা বুঝতে পেরেছিলাম, আপনার পরিবারের রোসেলিন বা গুরুত্বপূর্ণ কাউকে ওরা কিডন্যাপ করবে।'

'তোমরা জানতে?'

'ঠিক জানা নয়। অনুমান করেছিলাম।'

'কিভাবে?'

'গতকাল আমরা সুপ্রিমকোর্টে এসেছিলাম ওদের সন্ধানে।'

'সুপ্রিমকোর্টে ওদের সন্ধানে কেন?'

'বাধ্য হয়ে আপনি ওদের কাজ করে দিতে রাজী হলেও সুপ্রিমকোর্টে ওদের আসতে হবে কেসটা তোলার জন্যে।'

'বুঝেছি। বল।'

'সুপ্রিম কোর্টে ওদের দু'জনের সুন্ধান পাই এবং ওদের ঘাটির সন্ধানে ওদের অনুসরণ করতে গিয়ে বন্দী হই। বন্দী অবস্থায় সব জানতে পারি।'

'গতকাল তুমি ওদের হাতে বন্দী হয়েছিলে?' চোখ কপালে তুলল মিশেল প্লাতিনি।

'কিভাবে ছাড়া পেলেন, কিভাবে বন্দী হলেন? খুব জানতে ইচ্ছে করছে।' বলল রোসেলিন।

আহমদ মুসা হাসল। চাইল ডোনার দিকে।

ডোনা চেয়ে আছে আহমদ মুসার দিকে। তার চোখে বেদনার প্রশ্রবণ।

'দুঃখের কথা শোনায় কি আনন্দ আছে?' বলল আহমদ মুসা।

'দুঃখের কথা ওটা নয়, জয়ের কথা, বীরত্বের কথা।'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'জয়, এখনও অনেক দূরে। বলতে পার, আমি বেঁচে এসেছি। আজ সকালে আমার প্রাণদন্ড হবার কথা ছিল। তা হয়নি।'

'প্রাণদন্ড দিয়েছিল?' সভয়ে বলল রোসেলিন।

'হ্যাঁ। আমাকে রেখেছিল ওদের মাটির নীচের এক বধ্যভূমিতে। ওখানে যারা যায়, আর বের হয় না। আজ সকালে 'ওকুয়া' এবং 'ব্ল্যাক ক্রস' নেতারা ওখানে যাওয়ার কথা প্রাণদন্ড অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে।'

ডোনার মুখে নেমে এসেছিল অন্ধকার। আর রোসেলিনের মুখটা ভরে উঠেছিল উদ্বেগে।

ওরা কেউ কিছু বলল না।

আহমদ মুসা আবার কথা বলা শুরু করল। বলল গোটা কাহিনী।

গোগ্রাসে গেলার মত করে কাহিনী শুনল ওরা চার জন।

আহমদ মুসা থামল।

আহমদ মুসা থামলেও অনেকক্ষণ কেউ কথা বলল না। নীরবতা ভাঙল চীফ জাস্টিস উসাম বাইক। বলল, 'অপরূপ এক রূপকথা শুনলাম। রহস্য, রোমাঞ্চ, আনন্দ, অশ্রু, সবই এর মধ্যে আছে। লিখলে এক অমর উপন্যাস হবে।'

'কিন্তু এই কাহিনী শোনার পর আমার ভয় আরও বেড়ে গেল।' বলল ডোনার আব্বা।

'কেন?' বলল চীফ জাস্টিস।

'এবারও আহমদ মুসা আগের মতই একা যাচ্ছে।'

'এ ধরনের অভিযানে আশংকা ও ভয় সব সময়ই থাকে। তবে এ সবকে প্রশ্রয় দিলে সামনে এগুনো যায় না।' বলল আহমদ মুসা।

'আমরা সাধারণরা এভাবে এগুনোর কথা কল্পনা করতেও পারি না।' বলল চীফ জাস্টিস।

‘এ জন্যেই দুনিয়াতে আহমদ মুসাদের সংখ্যা মাত্র দু’চারজনই থাকে।’ বলল রোসেলিন।

‘আমরা স্বীকার করি।’ বলে চীফ জাস্টিস উঠে দাঁড়াল এবং মিশেল প্লাতিনিকে লক্ষ্য করে বলল, ‘চলুন মারিয়াকে কখন ছাড়তে পারে খোঁজ নিয়ে আসি।’

ইয়েকিনি এবং রোসেলিন প্রায় এক সংগেই বলে উঠল, ‘আপনারা বসুন আমি খোঁজ নিয়ে আসছি।’

‘ঠিক আছে যাও। আমরা তাহলে ততক্ষণ একটু ঘুরে ফিরে দেখি।’

বলে চীফ জাস্টিস উসাম বাইক এবং ডোনার আব্বা মিশেল প্লাতিনি বেরিয়ে গেল।

ইয়েকিনি এবং রোসেলিনও উঠে দাঁড়িয়েছে।

‘রাশিদি আসেনি কেন ইয়েকিনি।’ জিজ্ঞেস করল রোসেলিন।

‘রাজ কুমারীকে রক্ষার অভিযানে রাজ কুমারের আসার কথা ছিল। কিন্তু আহমদ মুসা ভাই তার ইচ্ছে পূরণ হতে দেয়নি।’

মুখে-চোখে লজ্জার ছাপ নেমে এল রোসেলিনের। আহমদ মুসার দিকে এক পলক চেয়ে ইয়েকিনিকে লক্ষ্য করে বলল, ‘রাজ কুমারের দুর্ভাগ্য, তার ভাগ্যে কোন রাজ কুমারী নেই।’ বলে রোসেলিন পা বাড়াল বাইরে যাবার জন্যে।

ইয়েকিনিও পা বাড়ালো।

রোসেলিন দরজা দিয়ে বেরুতে বেরুতে বলল, ‘মারিয়া আপা হাসপাতালের দরজা খোলা রাখা যায় না। বন্ধ করে গেলাম।’

লজ্জা মিশ্রিত একটা মিষ্টি হাসি ফুটে উঠল ডোনার মুখে।

‘মেয়েরা এ রকম দুষ্টুই হয়।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ছেলেরা বুঝি হয় না? ইয়েকিনি খোঁচা মারেনি রোসেলিনকে?’ বলল ডোনা।

কিছুক্ষণ নীরবতা। দু’জনেরই চোখ নীচু। নিজের চোখে নিজের উপরই নিবদ্ধ।

অনেকক্ষণ পর আহমদ মুসা চোখ নীচু রেখেই ধীরে কন্ঠে বলল, ‘আজ পার্কের-গেটে তোমাকে দেখার মত বিস্মিত জীবনে কখনও হইনি।’

‘ক্ষমা করেছ আমরা অপরাধকে?’ চোখ নীচু রেখেই বলল ডোনা।

‘অপরাধ কোথায় করলে?’

‘তোমার পিছু নিয়ে এই ক্যামেরুন পর্যন্ত এলাম।’

‘মারিয়া জোসেফাইনের যা করা উচিত ছিল তাই করেছে।’

‘আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, তুমি এ কথা বলছ।’ মুখে হাসি ডোনা জোসেফাইনের।

‘সত্যি বলছি। ক্যামেরুনে আসার অনুমতি চাইলে আমি তোমাকে অনুমতি দিতাম না। কিন্তু তোমাকে ক্যামেরুনে পেয়ে খুশী হয়েছি।’

‘কথা দু’টি কিন্তু বিপরীত মুখী হলো।’

‘বিপরীত মুখী নয়। একটা অতীতে কি ঘটতো সেই কথা, অন্যটা বর্তমানের কথা।’

‘সময়ের পরিবর্তনে নীতিগত অবস্থানের কি পরিবর্তন ঘটে?’

‘মৌল-নীতির ক্ষেত্রে ঘটে না। যে সব নীতিগত অবস্থান অবস্থা নির্ভর, সে সব ক্ষেত্রে পরিবর্তন অবশ্যই ঘটে থাকে।’

‘ধন্যবাদ। আজ আমর বুক থেকে ভয়ের একটা পাথর নেমে গেল।’ চোখ বুজে বলল ডোনা।

‘এত ভয় নিয়ে অত বড় সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিলে কেমন করে?’

‘কিভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম বলতে পারি না।’

‘এলিসা গ্রেসকে নিয়ে আসার তোমার সিদ্ধান্ত খুবই ভাল হয়েছে। আমি তোমাকে অভিনন্দিত করছি।’

‘আমি জানতাম ওমর বায়ার হাতে তাকে তুলে দিতে পারলে তুমি খুশী হবে।’

‘ধন্যবাদ। আমার মারিয়া জোসেফাইন যে দায়িত্ব পালন করার তাই করেছে।’

নিচু করে রাখা চোখ দু'টি বুজে গেল ডোনার। পরিতৃপ্তির একটা আনন্দ ফুটে উঠল মুখে। 'ধন্যবাদ তোমাকে। তোমার মারিয়ার প্রতি তোমার অনেক অনুগ্রহ।'

'তোমাকে অনুগ্রহ করেছি বলছ?'

ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল মুখে। চোখটা একটু খুলে আহমদ মুসার দিকে না তাকিয়েই বলল, 'কি বলব একে তাহলে?'

'তুমি জান না?'

মুখ লাল হয়ে উঠল ডোনার লজ্জা ও অনুরাগের লাল রঙে দু'হাতে মুখ ঢাকল ডোনা। কোন উত্তর দিল না।

আহমদ মুসা হাসল। প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে বলল, 'আমি কিন্তূ রাগও করেছি ডোনা?'

মুখ থেকে দু'টি হাত সরিয়ে আহমদ মুসার দিকে এক পলক তাকিয়ে দ্রুত কন্ঠে বলল, 'কেন রাগ করেছ?'

'তোমার হাতে রিভলবার উঠেছে। রিভলবার ব্যবহার করেছ।'

'আত্মরক্ষার জন্য রিভলবার রাখার তো আনুমতি আছে।'

'কিন্তু বিপজ্জনক একটি ক্ষেত্রে তুমি রিভলবার ব্যবহার করেছ।'

'না করে কি উপায় ছিল?'

'তোমার বুলেট একজন শত্রুকে শেষ করেছে এজন্য তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কিন্তু আমার উদ্বেগ কি ঘটতে যাচ্ছিল তা নিয়ে। যে গুলীটা তোমার বাহুতে লেগেছে সেটা তো বুকে লাগার কথা ছিল।'

'আল্লাহ তো রক্ষা করেছেন। যথা সময়ে তোমাকে পাঠিয়েছেন। আর এমন ঘটনা না ঘটলে তোমার দেখা হয়ত পেতাম না।'

'আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। তিনি রক্ষা করেছেন। কিন্তু ডোনা তুমি জান, আমি বারুদের গন্ধ থেকে তোমাকে দূরে রাখতে চাই।'

'নিজেকে বারুদের গন্ধে ডুবিয়ে রেখে তা কি তুমি পারবে?'

'আমার এটা আকাঙ্ক্ষা। বারুদের গন্ধ-মুক্ত একটা শান্তির গৃহাঙ্গণ আমি চাই।'

‘জানি আমি। তোমার এ আকাঙ্ক্ষা আমাকে কষ্ট দেয়। সংগ্রামের যে জীবন তুমি বেছে নিয়েছ, সে জীবন থেকে আমি বিচ্ছিন্ন থাকব কেমন করে?’ ভারি কণ্ঠস্বর ডোনার। তার চোখের কোণা ভিজে উঠেছে।

‘বিচ্ছিন্ন থাক, আমি চাই না। কিন্তু সংগ্রামের ক্ষেত্র তো আরও আছে। কলমের সংগ্রাম, বুদ্ধির সংগ্রাম। আজ এগুলো অস্ত্রের সংগ্রামের চেয়ে লক্ষগুণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ।’

‘জানি, আমি মানি। কিন্তু সংগ্রামের সে পথ তোমার মারিয়ার জন্য নয়। তোমার পথ থেকে তার পথ বিচ্ছিন্ন হবে কি করে? যে আগুনে তুমি পা দাও, সে আগুন তাকে স্পর্শ করবেই।’

‘জানি আমি, ডোনা। কিন্তু তারপরও সেটা আমার প্রিয় আকাঙ্ক্ষা।’

এ সময় দরজায় শব্দ হল।

আহমদ মুসা মনে করল রোসেলিনরা ফিরে আসছে।

কিন্তু শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দরজা এক ঝটকায় খুলে গেল।

ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল দু’জন লোক, তাদের হাতে ভয়ানক আকারের দু’টি মেশিন রিভলবার।

দু’জন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। দু’জনের হাতের মেশিন রিভলবার দু’টি উদ্যত।

ওদের দেখার সাথে সাথেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়েছে।

ওদের একজন চিৎকার করে উঠল, ‘কোথায় শালার চিফ জাস্টিস, কোথায় তার মেয়ে?’

‘ওরা একটু বাইরে গেছে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘তোমরা কে?’ বলল দু’জনের একজন।

‘আমি একজন এশিয়ান তরুণ, আর ও ফরাসী তরুণী।’ আহমদ মুসার কথায় বিদ্রুপ।

আহমদ মুসা দাঁড়িয়েছিল একটি লম্বা ‘টিপয়’-এর ধারে। আর ডোনা শুয়েছিল কম্বল মুড়ি দিয়ে। তার দু’হাতই কম্বলের ভেতরে।

বালিশের তলায় ডোনার রিভলবার। কম্বলের ভিতরে ডোনার ডান হাতটা অতি সন্তর্পণে এগিয়ে রিভলবারটা স্পর্শ করল।

ওদের দ্বিতীয়জন বলল, 'চিনেছি এদের। এরা শয়তান চীফ জাস্টিসের সাথে ছিল। এরাই হত্যা করেছে আমাদের...।'

তার কথা শেষ হতে পারল না। একটা গুলীর শব্দ হলো। গুলী বিদ্ধ হয়ে লোকটি লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

কম্বলের তলা থেকে ডোনার ডান হাত গুলী করেছিল লোকটিকে।

গুলীর শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম লোকটি তার মেশিনগান ঘুরিয়ে নিচ্ছিল ডোনার দিকে।

সেই মুহূর্তে আহমদ মুসার ডান পা'টা সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। চোখের পলকে 'টিপয়' টা বুলেটের মত গিয়ে আঘাত করল মেশিন রিভলবার সমেত প্রথম লোকটিকে।

লোকটি আঘাতটা সামলাবার জন্য পেছনের দিকে বেঁকে গিয়েছিল। তার হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল মেশিন রিভলবার।

আঘাত সামলে নিয়ে লোকটা সোজা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। ততক্ষণে আহমদ মুসা ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার উপর।

লোকটি ভারসাম্য হারিয়ে মেঝেয় আছড়ে পড়ল। তার সাথে আহমদ মুসাও।

আহমদ মুসা গিয়ে পড়েছিল লোকটির উপর। পড়ে স্থির হবার সঙ্গে সঙ্গেই আহমদ মুসা দুইটি ঘুষি চালাল লোকটির চোয়ালে।

তারপর তার শার্টের কলার ধরে তাকে মাটি থেকে তুলল।

মাটিতে পড়ে থাকা গুলিবিদ্ধ লোকটি এক হাতে বুক চেপে ধরে মাথা তুলেছে। তার মেশিন রিভলবার উঠে এসেছে আহমদ মুসার লক্ষ্যে।

ডোনার দৃষ্টি ছিল আহমদ মুসার দিকে।

শেষ মুহূর্তে লোকটির উদ্যত রিভলবার দেখতে পেল ডোনা এবং আহমদ মুসা দু'জনেই।

আহমদ মুসা মাটি থেকে টেনে তোলা লোকটির গলায় হাত পেঁচিয়ে তার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল এবং তার গলা সাঁড়াশির মত চেপে ধরল নিজের দেহের সাথে।

অন্যদিকে রিভলবার তুলেছিল ডোনাও।

প্রায় একসঙ্গেই দু'টি গুলীর শব্দ হলো।

ডোনার গুলী মাথা গুড়িয়ে দিল মাটিতে পড়ে থাকা লোকটির। আর এ লোকটির মেশিন রিভলবারের কয়েকটি গুলী গিয়ে ঝাঁঝরা করে দিল আহমদ মুসার ধরে থাকা লোকটির দেহ।

আহমদ মুসা লোকটিকে ছেড়ে দিল। পড়ে গেল লোকটি মেঝের উপর।

বাইরে অনেকগুলো পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। প্রথমেই ঘরে এসে প্রবেশ করল মুহাম্মাদ ইয়েকিনি এবং রোসেলিন। তারপর দু'জন গার্ড পুলিশ এবং ডোনার আব্বা ও রোসেলিনের আব্বা চীফ জাস্টিস প্রবেশ করল ঘরে। এরপরে হাসপাতালের একদল স্টাফ।

মুহাম্মাদ ইয়েকিনি, রোসেলিন, চীফ জাস্টিস এবং ডোনার আব্বা, সকলের চোখ বিস্ময়ে ছানাবড়া। তাদের মুখে নিদারুণ উদ্বেগের ছাপ।

সব শুনে গার্ডদের একজন টেলিফোন করল পুলিশ স্টেশনে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই পুলিশ এসে হাজির হলো।

তারা ঘটনার বিবরণ রেকর্ড করে দু'টি লাশ নিয়ে গেল। পুলিশ অফিসার সবিনয়ে দুঃখ প্রকাশ করল যে, পুলিশের সংখ্যা আরও বেশি না করে এবং আরও সতর্ক না থেকে তারা ভুল করেছে। হাসপাতালের প্রশাসনিক অফিসার এসেও ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং ডোনাকে অন্য কক্ষে অবিলম্বে সরিয়ে নেবার নির্দেশ দিল।

চীফ জাস্টিস উসাম বাইক প্রশাসনিক অফিসারকে জানাল, 'ডাক্তার সম্মত হয়েছেন, আমরা মিস মারিয়াকে বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি।'

'স্যার তাহলে এক ভ্যান পুলিশকে সাথে যাবার অনুমতি দেবেন।', বলল পুলিশ অফিসারটি।

'ঠিক আছে।', বলল চীফ জাস্টিস।

‘স্যার, আপনার বাড়িতেও মোতায়েন কৃত পুলিশের সংখ্যা বাড়াবার নির্দেশ হয়েছে।’, বলল পুলিশ অফিসারটাই আবার।

‘ধন্যবাদ’, বলল চীফ জাস্টিস।

ডোনাকে ইতিমধ্যে রিলিজ করে নেয়া হয়েছিল। গাড়িও রেডি ছিল।

রোসেলিন ডোনাকে ধরে তুলে নিয়ে চলল।

আহমদ মুসাও তাদের পাশে পাশে চলছিল।

‘আমাকে পৌঁছে দিবে না?’ চলতে চলতে বলল ডোনা।

‘অবশ্যই।’

‘আবার পিস্তলের ব্যবহার করেছি। রাগ করেছ?’ ডোনার ঠোঁটে হাসি।

আহমদ মুসা কিন্তু হাসল না। বলল, ‘তোমাকে ধন্যবাদ, সঠিক সময়ে তুমি রিভলবারের সঠিক ব্যবহার করেছ।’

একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর বলল, ‘আমি তো বলেছি ওটা আমার আকাঙ্ক্ষা, আদেশ নয়।’

ডোনা কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আব্বাকে দাঁড়াতে দেখে ঠোঁট আর খুলল না ডোনা।

কাছাকাছি ডোনার আব্বা আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, ‘বাবা, তুমি আমাদের সাথে যাচ্ছ তো?’

‘জ্বি, আমরা পৌঁছে দিয়ে যাব।’

ডোনাদের গাড়ির পেছনের সিটে উঠল ডোনা এবং রোসেলিন।

ড্রাইভিং সিটে বসল আহমদ মুসা। আর তার পাশের আসনে ডোনার আব্বা মিশেল প্লাতিনি।

ক্যামেরুনের ফরাসী দূতাবাস ডোনাদের ব্যবহারের জন্য একটা গাড়ি দিয়েছে। এই গাড়ি ডোনাই ড্রাইভিং করে এসেছিল পার্কে।

তিনটি কার ও একটি পুলিশভ্যানের একটা গাড়ি বহর এগিয়ে চলল চীফ জাস্টিসের বাড়ির দিকে। ঠিক হয়েছে ডোনা সুস্থ না হয়ে ওঠা পর্যন্ত চীফ জাস্টিসের ওখানে রাসেলিনের সাথে থাকবে।

চীফ জাস্টিসের গাড়ি বারান্দায় সকলে নামার পর চীফ জাস্টিস উসাম বাইক আহমদ মুসাকে বলল, ‘আমার বাড়িতে পাঁচ মিনিট বসে এক কাপ কফি খেলে আমি নিজেকে খুব ধন্য মনে করব।’

রোসেলিন ডোনাকে ধরে নিয়ে এগিয়ে চলল। তার পেছনে সকলে।

রোসেলিনের ফ্যামিলি ড্রয়িংরুম।

ডোনা ছাড়া সবাই বসে।

কথা বলছিল তখন চীফ জাস্টিস, ‘আহমদ মুসা, তোমার আশংকা এবং তোমার কথা যে আমরা হাসপাতালে থাকতে থাকতেই ফলে যাবে, তা ভাবতে বিস্ময় বোধ হচ্ছে।’

‘আমাদের খুঁজতেই এসেছিল। আমি ও আব্বা থাকলে কি ঘটত তা ভাবতেও ভয় করছে।’, বলল রোসেলিন।

‘যা ঘটেছে এটাই ঘটতো।’ বলল আহমদ মুসা।

‘মারিয়া আপার দারুণ সাহস ও বুদ্ধি। সেখানেও একজনকে মেরেছে, এখানেও একজনকে।’, বলল রোসেলিন।

‘সত্যি, ডোনা ধন্যবাদ পাবার যোগ্য।’, বলল আহমদ মুসা।

বলেই কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে কফির পেয়ালা টেবিলে রেখে বলল, ‘আমি এখন উঠি।’

আহমদ মুসার কথার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে রোসেলিনের আব্বা চীফ জাস্টিস ওসাম বাইক বলল, ‘আমার প্রতি তোমার আর কি পরামর্শ? পুলিশকে কি সব জানাব?’

‘পুলিশকে জানিয়ে খুব লাভ হবে না, বরং ক্ষতি হতে পারে। আপনার সাথে যদি ‘ওকুয়া’র কথা হয়, তাহলে আপনি আপনার তরফ থেকে কথা ভঙ্গ হয়নি, পুলিশকে আপনি বলেননি, এই কথাই ওদের বলবেন। বলবেন যে, আপনি আগের কথার উপরই আছেন। 'ফ্রি ওয়ার্ল্ড টিভি' (FWTV) এবং 'ওয়ার্ল্ড নিউজ এজেন্সী' (WNA)- এর নিউজের বরাত দিয়ে আপনি তাদের জানাবেন যে, নিশ্চয় তৃতীয় কোন পক্ষ তাদের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছে। এই ভাবে আপনি তাদের কিছুটা

কিংকর্তব্যবিমূঢ় করতে পারবেন। তাতে নিরুপদ্রব আরও কিছু সময় পাওয়া যাবে।'

'তোমাকে ধন্যবাদ বাবা। চমৎকার পরামর্শ তুমি দিয়েছ। কিন্তু তারা কি টেলিফোন করবে?' বলল চীফ জাষ্টিস ওসাম বাইক।

'নিশ্চয় করবে। কাজ উদ্ধার তাদের টার্গেট। আপনার উপর চাপ সৃষ্টির জন্যেই তারা এসব কিছু করছে।' আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আমি চলি।'

রোসেলিনও উঠে দাঁড়াল। বলল, 'মারিয়া আপা অসুস্থ, ওকে বলে যাবেন......'

রোসেলিন কথা শেষ করার আগেই আহমদ মুসা বলল, 'ও কোথায়?'

'আমার ঘরে, আসুন।'

বলে রোসেলিন ঘুরে দাঁড়িয়ে উপরে উঠার সিঁড়ির দিকে চলল।

রোসেলিন ডোনাকে নিয়ে নিজের ঘরে একেবারে নিজের খাটে জায়গা দিয়েছে। তার পাশে ক্যাম্প খাট পেতে নিজের থাকার ব্যবস্থা করেছে।

ডোনা এতে আপত্তি করেছিল। রোসেলিন বলেছিল, 'ফ্রান্সের রাজকুমারী, সেই সাথে আহমদ মুসার বাগদত্তা- এমন দূর্লভ মানবীর ছোঁয়া যদি আমার বেড পায়, সেটা হবে সারা জীবন স্মরণ করার মত আমার সৌভাগ্য। আমি এ সুযোগ ছাড়ব কেন?'

রোসেলিন ও আহমদ মুসা যখন রোসেলিন-এর ঘরে পৌঁছল, তখন ডোনা কম্বল মুড়ি দিয়ে চোখ বুঁজে শুয়ে ছিল।

'মারিয়া আপা দেখ কাকে নিয়ে এসেছি।' বলল রোসেলিন।

ডোনা চোখ খুলল।

কথা শেষ করেই একটা চেয়ার বেডের পাশে টেনে আহমদ মুসাকে বসতে দিয়ে বলল, 'আমার ঘরে এই দূর্লভ দৃশ্য স্মরণীয় করে রাখার জন্যে আমার ক্যামেরা নিয়ে আসি। আপনি বসুন।'

বলে রোসেলিন বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আহমদ মুসা দাঁড়িয়ে থেকেই বলল, 'এখন কেমন বোধ করছ ডোনা?'

'ভাল। তুমি বস।'

'না, আর বসব না। অনেক দেরী হয়ে গেছে।

'না, তোমার সময় নষ্ট করব না। এখানে তোমার মিশন কি, জানতে ইচ্ছা করছে।'

আহমদ মুসা বসল। বলল, 'ওমর বায়া ও ডক্টর ডিফরজিসকে ওদের হাত থেকে উদ্ধার করা এবং খৃষ্টান সংস্থা-সংগঠনের হাত থেকে মুসলমানদের বিষয়-সম্পত্তি উদ্ধার করে তাদের বাড়ি-ঘরে তাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা।'

'প্রথমটার চেয়ে দ্বিতীয় কাজটা অনেক বেশী কঠিন। কিভাবে এই অসাধ্য সাধন করবে?'

'ওকুয়া ও কোক-এর মত সংগঠনের ঘৃণ্য কাজের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করে এবং ঐ খৃষ্টান সংগঠনগুলোকে বাধ্য করে।'

'বুঝেছি জনমতকে সচেতন করার কাজ FWTV ও WNA-এর মাধ্যমে করছ। কিন্তু ওদের বাধ্য করবে কিভাবে?'

'কোক-এর কয়েকজন আঞ্চলিক বড় নেতাকে আমরা বন্দী করে রেখেছি, মাথার ক'জন হাতে পেলেই এ কাজটা আমরা করতে পারব।'

'এতটুকুতে কাজ হবে?'

'হবে। কারণ ইতিমধ্যেই ক্যামেরুন সরকার চাপের মধ্যে পড়েছে। তাদেরকে বাধ্য হয়ে তদন্তে নামতে হচ্ছে। আর আমরা আশা করছি, চীফ জাষ্টিসের মাধ্যমে আইন মন্ত্রণালয়ের সাহায্য আমরা পাব। আইন মন্ত্রী এবং আইন সচিব দু'জনই তার ঘনিষ্ঠ মানুষ।'

'ধন্যবাদ'। অনেক এগিয়েছ তুমি।

'আল-হামদুলিল্লাহ। উঠি তাহলে?'

'একটা কথা দাও।'

'কি?'

'নিজের নিরাপত্তার প্রতি সবচেয়ে বেশী খেয়াল রাখবে।'

'কিন্তু নিজের কথা এত ভাবলে অন্যের ভাবনাটা যে গৌণ হয়ে যায়।'

'কিন্তু তুমি নিজে ঠিক না থাকলে অন্যকে সাহায্য করবে কেমন করে?'

'এদিকে আমার নজর অবশ্যই আছে ডোনা।'

'তাহলে বল একা কোন অভিযানে যাবে না।'

'এমন কথা আমার কাছ থেকে আদায় কর না ডোনা। রক্ষা করতে পারবো না।'

'আমি কি উদ্বেগে থাকি তুমি বুঝবে না।' ডোনার দু'চোখের কোণ থেকে দু'ফোটা অশ্রু নেমে এল।

'আমি দুঃখিত ডোনা, আমি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছি। কিন্তু কি করব আমি! আমরা গোটা মুসলিম জাতি একটা বিপজ্জনক সময় অতিক্রম করছি।'

'না, তুমি কষ্ট দাওনি। আমি আমার অবুঝ মন নিয়ে কষ্ট পাচ্ছি। হয়তো তোমার ক্ষতি করছি।'

'না ডোনা, তোমার এই উদ্বেগ, হৃদয় নিঙড়ানো তোমার এই শুভ কামনা, অসীম ভালবাসার অশ্রু ভেজা তোমার দু'চোখের অপেক্ষমান দৃষ্টি আমার শক্তি ও সাহসের একটা উৎস-বাঁচারও একটা প্রেরণা।' আবেগে ভারী হয়ে উঠেছে আহমদ মুসার কন্ঠ।

ডোনা দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুপিয়ে কেঁদে উঠল। বলল, 'আমার চেয়ে সৌভাগ্যবতী দুনিয়ায় কেউ নেই।'

'আল্লাহ তোমার কথা গ্রহণ করুন।' বলে আহমদ মুসা একটু থেমেই বলল, 'ডোনা তাহলে উঠি।'

ডোনা দু'হাত সরাল মুখ থেকে। তার চোখ ও গন্ড চোখের পানিতে সিক্ত।

ঘরে প্রবেশ করেছে রোসেলিন। ক্যামেরা হাতে। দু'টি স্ন্যাপ নিয়েছে সংগে সংগেই। বলল, 'আমি দুঃখিত অসময়ে প্রবেশের জন্যে। কিন্তু একটা ঐতিহাসিক ছবি তুলেছি।'

ডোনা চোখ মুছল।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা রোসেলিনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিন্তু 'ঐতিহাসিক' ছবিটি যেন তোমার বাইরে না যায়।'

'আমি সেটা জানি। আহমদ মুসার সাথে কয়েক ঘন্টা থেকে অনেক বুদ্ধি আমার হয়েছে।' বলল রোসেলিন।

'ধন্যবাদ।' বলল আহমদ মুসা। তারপর চলে আসার জন্য ঘুরে দাঁড়াবার আগে সালাম দিল ডোনাকে। ডোনা সালাম গ্রহণ করে দ্রুত কন্ঠে বলল, 'ওদের ঘাঁটির যে দু'টি ঠিকানা পেয়েছ, তা কি আমাকে দেবে?'

আহমদ মুসা থমকে দাঁড়িয়ে ভাবল। তারপর বলল, 'দেব। কিন্তু এই শরীর নিয়ে বাইরে বেরুবে না কথা দিতে হবে।'

'কথা দেয়ার দরকার নেই। তোমার ইচ্ছার আদেশই আমার জন্যে যথেষ্ট।'

'ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদ। ইয়েকিনিকে বলব সে রোসেলিনকে ঠিকানা দু'টি দিয়ে যাবে।'

আবার সালাম দিয়ে আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়াল।

বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

তার সাথে সাথে রোসেলিন।

ডোনার তৃষ্ণার্ত চোখ দু'টি অনুসরণ করল আহমদ মুসাকে।

# ৫

ইয়াউন্ডির বাণিজ্যিক এলাকায় 'ওকুয়া'র সেই ঘাঁটি।

পিয়েরে পল এবং ফ্রান্সিস বাইক সোফায় পাশাপাশি বসে।

কথা বলছিল ফ্রান্সিস বাইক, 'টেলিফোনে সব কথা বলা যাবে না বলে আপনাকে বিশ্রাম থেকে তুলে এনেছি এখানে। আমি দুঃখিত।'

'ধন্যবাদ বাইক' বলুন। আপনাকে খুব বিষণ্ণ মনে হচ্ছে। অভিযানের কোন খবর এসেছে?' বলল পিয়েরে পল।

'এসেছে সেটা বলার জন্যেই তো ডেকেছি।'

'বলুন। খারাপ কিছু?' উদগ্রীব কন্ঠ পিয়েরে পলের।

'খুবই খারাপ। চীফ জাষ্টিসের মেয়েকে কিডন্যাপ করার জন্যে যে চারজনকে আমরা পাঠিয়েছিলাম, তারা সবাই খুন হয়েছে।'

'খুন হয়েছে! চারজনই?' সোজা হয়ে বসল পিয়েরে পল। তার চোখে বিস্ময়।

'হ্যাঁ, চারজনই খুন হয়েছে।'

'পুলিশের হাতে? তুমিতো বলেছিলে পুলিশ আমাদেরই সহযোগিতা করবে!'

'পুলিশ আমাদের সহযোগিতা করেছে। তারা সরেছিল এলাকা থেকে। মেয়েটিকে ধরে গাড়িতে ওঠাবার সময় তার চিৎকারে রাস্তা দিয়ে চলমান একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ে। সেই গাড়ি থেকে একজন যুবক নেমে এসে সব ভন্ডুল করে দেয়। আমাদের চারজন লোককে হত্যা করে। চীফ জাষ্টিসের মেয়ের একজন শ্বেতাংগ বান্ধবী মাত্র আহত হয়েছে, আমাদের লোকদের গুলিতে।'

'একজন যুবক গাড়ি থেকে নেমে এসে এ কান্ড ঘটাল, কি করছিল আমাদের লোকেরা?'

'একটু দূরে মোতায়েন করা আমাদের লোকদের কাছে যা শুনেছি তা উদ্বেগজনক।'

'কি সেটা?'

'মনে হচ্ছে যে লোকটি দুয়ালা, কুম্ভে কুম্বা এবং ইদেজা'য় আমাদের সর্বনাশ করেছে, এ যুবকটি সেই লোক ছিল।'

'আমাদের লোকেরা তার চেহারার কথা কি বলেছে?'

'ফর্সা এশিয়ান।'

'তাহলে এখানেও আহমদ মুসা? ঘটনাস্থলে সে কি করে এল? চীফ জাস্টিসের সাথে তার কোন যোগ আছে? সেদিন তোমাদের বন্দীখানায় যে চারজন মারা গেল, সেটাও কি তাহলে আহমদ মুসার কীর্তি?'

'হতে পারে। তবে চীফ জাস্টিসের সাথে আহমদ মুসার কোন যোগ আছে, তার কোন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। আমাদের লোক এবং পুলিশের মতে এশিয়ান যুবকটির গাড়ি মেয়েটির চিৎকার শুনে তার সাহায্যের জন্যে থেমেছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।'

'এখন কি ভাবছ?'

ফ্রান্সিস বাইক সোফায় ঠেস দিয়ে বসল। তারপর বলল, 'আহত শ্বেতাঙ্গ মেয়েটিকে নিয়ে ওরা সবাই চলে যায় সামরিক হাসপাতালে। হাসপাতাল থেকে আমাদের লোক জানায়, সেখানে চীফ জাস্টিস, তার মেয়ে, সেই এশিয়ান যুবক সবাই আছে।'

'এশিয়ান যুবকটি কেন?'

'সেই-ই আহত শ্বেতাঙ্গিনীকে তুলে নিয়ে গাড়িতে উঠিয়েছে। সাথেও গিয়েছিল।'

একটু থেমে ফ্রান্সিস বাইক আবার শুরু করল, 'হাসপাতাল থেকে আমাদের লোক আরও জানায়, অপারেশনের পর শ্বেতাঙ্গ মেয়েটিকে এক নম্বর ভিআইপি কেবিনে তুলেছে। সেখানে চীফ জাস্টিস ও তার মেয়েও রয়েছে। গেট ছাড়া তেমন কোন পাহারা নেই। আমি সংগে সংগে গেটের দু'জন গার্ডকে ম্যানেজ করার নির্দেশ দিয়ে ইয়াউন্ডির খোদ অপারেশন কমান্ডার এবং তার সহকারীকে

হাসপাতালে পাঠিয়েছি চীফ জাস্টিসের নাকের ডগার উপর দিয়ে তার মেয়েকে ধরে আনার এবং সেই এশিয়ান যুবককে দেখার সাথে সাথে হত্যা করার জন্যে।'

'তোমার এই ত্বরিৎ এ্যাকশনের জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ। কিন্তু দু'জন লোক কি কম হয়নি অভিযানের জন্যে?'

'গেটের গার্ড ম্যানেজ হয়ে যাবার পর সেখানে আর কোন ভয় নেই। তাছাড়া যে দু'জনকে পাঠিয়েছি তারা দু'জন দু'ডজনের সমান।'

'চমৎকার। ধন্যবাদ তোমাকে। যিশু আমাদের সহায় হোন।'

'আমিন।'

এই সময় ইন্টারকমে ফ্রান্সিস বাইকের একান্ত সচিবের কন্ঠ শোনা গেল।

ফ্রান্সিস বাইক দ্রুত উঠে টেবিলে গেল। চেয়ারে বসে বলল, 'বল শুনছি।'

'স্যার এইমাত্র হাসপাতাল থেকে জানাল...'

'কি জানাল?'

'জানাল আমাদের দু'জন লোক নিহত হয়েছে।'

কথা শোনার সাথে সাথে ফ্রান্সিস বাইকের চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠল। কথা যোগাল না কিছুক্ষন।

একটু সময় নিয়ে বলল, 'কিভাবে নিহত হলো? কার হাতে নিহত হলো?'

'এক এশিয়ান যুবকের হাতে।'

'এশিয়ান যুবকের হাতে?'

'জি স্যার। যে সময় আমাদের দু'জন লোক এক নম্বর ভিআইপি রুমে প্রবেশ করে, তখন সে ঘরে শুধু এশিয়ান যুবক এবং আহত মেয়েটি ছিল। আমাদের দু'জনেই গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছে।'

আর কোন কথা না বলে ফ্রান্সিস বাইক টলতে টলতে এসে ধপ করে সোফায় বসে পড়ল। সোফায় মাথাটা ঠেস দিয়ে চোখ বুজে দু'হাতে মাথা চেপে ধরল।

'কি বলল, ওরা দু'জনই এশিয়ান যুবকটির হাতে মরেছে?'

চোখ না খুলেই ফ্রান্সিস বাইক বলল, 'হ্যাঁ। সব তো শুনলেন। কি সাংঘাতিক ঐ লোকটি!'

'বিস্মিত হচ্ছ ফ্রান্সিস বাইক! তুমি তো জান ফ্রান্সে 'ব্ল্যাক-ক্রস' এর অর্ধশতেরও বেশী লোক ওর হাতে মারা গেছে। বলতে গেলে আমাদের কার্যকরী জনশক্তি ও নিঃশেষ করে দিয়েছে।'

'আমাদের ও সেই অবস্থা হতে যাচ্ছে। আমাদের যে দশজন লোক এই দু'দিনে মারা গেল, তারা ছিল 'ওকুয়া'র হাত পা। তাদের মানের একজনও আর ক্যামেরুনে নেই।'

'এখন কি ভাবনা হওয়া উচিত আমাদের?'

'দেখছি ঐ যুবকটিই আমাদের পথে এখন প্রধান বাধা। তাকে সরাতে না পারলে বোধ হয় আমরা এগুতে পারবো না।'

'ঠিক বলেছ। তবে আমি চীফ জাস্টিসের সাথে একটু আলোচনা করে দেখি আহমদ মুসা বা এশিয়ান যুবকটির সাথে তার কোন যোগ আছে কিনা। থাকলে ভয় দেখিয়েও তাকে দিয়ে এমন কিছু করা যাবে না।'

'কিভাবে বুঝবেন যোগ আছে কিনা?'

'তার সাথে কথা বললেই বুঝা যাবে। তার কথা যদি সহযোগিতামূলক হয়, তিনি যদি তার আগের কথার উপর থাকেন, তাহলে বুঝব আহমদ মুসার সাথে তার কোন যোগাযোগ হয়নি। আর যদি তাকে শক্ত দেখা যায় এবং সহযোগিতা করতে তিনি যদি রাজি না হন, তাহলে পরিস্কার বুঝা যাবে তিনি আর আমাদের হাতে নেই।'

'তার মেয়েকে কিডন্যাপের চেষ্টার কথা যদি তিনি তোলেন?'

'বলব, ওটা আমাদের কাজ নয়। কোন নারীলোভীদের চেষ্টা ওটা। আমরা কিছূ করলে তা ঠেকাবার ক্যামেরুনে কেউ নেই।'

হাসি ফুটে উঠল ফ্রান্সিস বাইকের ঠোঁটে। বলল, 'ভাল যুক্তি। তাকে যদি বুঝানো যায়, তাহলে তো আমরা আমাদের পরিকল্পনা নিয়ে এগুতে পারি। আর এই সাথে এশিয়ান যুবকটির উপরও চোখ রাখতে পারি।'

'হ্যাঁ আমরা তাই করব।'

ফ্রান্সিস বাইকের ইন্টারকম কথা বলে উঠল। তার একান্ত সচিব জানাল, 'ইদেজা থেকে ফাদার জেমস এসেছেন।'

'পাঠিয়ে দাও।' ফ্রান্সিস বাইক জানাল একান্ত সচিবকে।

মিনিট খানেকের মধ্যেই ফাদার জেমস প্রবেশ করল ঘরে।

ফ্রান্সিস বাইক এবং পিয়েরে পল দু'জনেই উঠে দাঁড়িয়ে তাকে স্বাগত জানাল। হ্যান্ডশেক করতে করতে পিয়েরে পল বলল, 'আপনি তো খারাপ খবর নিয়ে আসেন। আজ কি এনেছেন?'

ফাদার জেমস পাশের সোফায় বসতে বসতে বলল, 'দুর্ভাগ্য আমার, আজকের খবরটাও খারাপ।'

'অসময়ে এবং কোন খবর না দিয়ে হঠাৎ আসাতেই বুঝতে পেরেছি খবর খারাপই হবে। বলুন সেটা কি? খারাপ খবর শুনতে শুনতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছি।' বলল ফ্রান্সিস বাইক।

'কুন্তে কুম্বার প্রস্তাবে আমাদের ইদেজা নেতৃবৃন্দ রাজী হয়েছেন।'

'কারা রাজী হয়েছে বললেন?'

'ইদেজার নেতৃবৃন্দ।'

'ইদেজার নেতৃবৃন্দ কারা?'

'কেন জন স্টিফেন, ফ্র্যাঁসোয়া বিবসিয়েররা।'

'কুন্তে কুম্বার কি প্রস্তাবে তারা রাজী হয়েছেন?'

'সেদিন তো আমি বলে গিয়েছিলাম। লিখেও পাঠিয়েছি।'

'সেগুলো ফাইলে অবশ্যই আছে। কুন্তে কুম্বার প্রস্তাব মনে হচ্ছে, মনে রাখা উচিত ছিল। বলুন প্রস্তাব গুলো।' বলল ফ্রান্সিস বাইক।

'সংক্ষেপে প্রস্তাবগুলো হলো, ইয়াউন্ডি হাইওয়ের দক্ষিনে ইদেজা পর্যন্ত সকল মুসলিম ভূ-খন্ড তাদেরকে ফেরত দেয়া, গত পাঁচ বছরে উচ্ছেদকৃত মুসলমানদের পূনর্বাসন এবং ক্ষতিপূরণ দান, সত্যিকার খৃস্টান মিশনারীরা থাকবে, কিন্তু এন.জি.ওদের ষড়যন্ত্রমূলক কাজ বন্ধ করতে হবে এবং 'কোক'কে লিখিতভাবে তার অপরাধের স্বীকৃতি দিতে হবে।'

'এ প্রস্তাবগুলো জন স্টিফেন এবং বিবসিয়েররা মেনে নিয়েছেন?'

'জি নিয়েছেন।'

'কি করে নিশ্চিত হলেন?'

'আমার সাথে তাদের দেখা হয়েছে।'

'দেখা হয়েছে! আপনার সাথে?'

'হ্যাঁ, আমার সাথে দেখা হয়েছে।'

'অসম্ভব ব্যাপার! কিভাবে দেখা হলো?'

'গতকাল সকালে স্টিফেন-এর চিঠি পেলাম। তাতে তিনি লিখেছিলেন, জরুরী কথা আছে। পত্র বাহকের সাথে এসে আমার সাথে দেখা করবেন। আমি গিয়েছিলাম।'

'ভয় করেনি? আপনাকেও যদি আটকে রাখতো?'

'আমি আমার সন্দেহের কথা পত্রবাহককে বলেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, আমরা যদি আপনাকে আটকাতে চাই, কিডন্যাপ করতে চাই, যে কোন সময়ে তা করতে পারি। এর জন্যে কোন ছলনার প্রয়োজন হয় না। আমি তার কথা বিশ্বাস করেছিলাম।'

'কোথায় আটকা আছে, আপনি জেনেছেন তাহলে।'

'না জানতে পারিনি। চোখে টেপ এঁটে গগলস পরিয়ে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।'

'স্ট্রেঞ্জ! আপনি এতে রাজি হয়েছিলেন?'

'রাজি হয়েছি স্টিফেনের সাথে সাক্ষাতের স্বার্থে।'

'জায়গাটা কোথায় কতদুর কিছুই বুঝতে পারেননি?'

'সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত জীপ গাড়িতে চলার পর আমি সেখানে পৌঁছি। যেখানে নিয়ে আমার চোখ খোলা হয়, সেটা একটা কক্ষ। একটাই মাত্র দরজা। ঘরটি পরিপাটি করে সাজানো। আরামদায়ক বসবাসের মত সবকিছুই সেখানে রয়েছে।'

'জায়গাটা কি কুন্তে কুম্বার কোন স্থানে হবে?'

'না। কুন্তে কুম্বার ডাবল দুরত্বে আমি গিয়েছি।'

'কুন্তে কুম্বার রাস্তা পাকা, তুমি যে পথে গিয়েছ সেটা কেমন ছিল?'

'অধিকাংশই কাঁচা।'

'বল দেখা হওয়ার পর কি হলো? সেখানে কে কে ছিল?'

'জন স্টিফেন এবং ফ্রাঁসোয়া বিবসিয়ের।'

'কি কথা হলো?'

'প্রথমে স্টিফেন আপনাদের কথা জিজ্ঞেস করেছেন। বাইরের পরিস্থিতি কি জানতে চেয়েছেন। তার পর বললেন, 'আমরা অনেক ভেবে দেখলাম ওদের প্রস্তাবে রাজি হওয়া ছাড়া কোন পথ নেই।' আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, ‘আপনাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে কি একথা বললেন?’ তারা উত্তরে বলেছিলেন, 'না তা নয়।' তারপর তারা জানতে চেয়েছিলেন, আমরা FWTV-এর প্রোগ্রাম এবং WNA-এর নিউজ দেখেছি কিনা। আমি হ্যাঁ বলেছিলাম। তারা বলেছিলেন, 'এধরনের প্রোগ্রাম এবং নিউজ আরও আসবে। জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন, উদ্বাস্তু কমিশন এবং দুনিয়ার মানবাধিকার সংস্থাগুলোর সাথে তথ্য প্রমাণ সহ লবীং করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ক্যামেরুন সরকার এসব সংস্থার কাছ থেকে চিঠি পাওয়া শুরু করেছে। আমরা কিছু চিঠির কপি দেখেছি। ফলে ক্যামেরুন সরকার বাধ্য হবে তদন্তে নামতে। আমরা জানতে পেরেছি, মুসলিম উদ্বাস্তুদের একত্র করা হচ্ছে তাদের জমি-জমার দলিল-দস্তাবেজ সহ। তারা ইয়াউন্ডিতে বিশাল মিছিল ও দাবীনামা দেবার ব্যবস্থা করবে। আমরা মনে করি, এসব হলে ‘কোক’ এবং ‘ওকুয়া’র বদনাম হবে। সব গোমর ফাঁস হয়ে যাবে। তার ফলে শুধু ক্যামেরুন নয়, পার্শ্ববর্তী অন্যান্য দেশ, এক কথায় গোটা আফ্রিকায় আমাদের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এ ক্ষতি এড়ানোর জন্যে যদি ওঁদের চার দফা মেনে নেই তাতে ক্ষতির পরিমাণ আমাদের কম হবে এবং পৃথিবী জোড়া বদনাম এবং ভেতরের ঘটনা ফাঁস হওয়া থেকে আমরা রক্ষা পাব। আমি তাদের এ কথার উত্তরে বলেছিলাম, তাদের দাবী খুব ছোট নয়। জবাবে তারা বলেছিলেন, কিছু দরকষাকষি করার সুযোগ আছে। যেমন তারা দাবী জানিয়েছে, ইয়াউন্ডি হাইওয়ের দক্ষিণের সব মুসলিম ভুখন্ড ফেরত দিতে হবে। এখানে আমি বলেছি, যেসব জমির হস্তান্তর সন্দেহ যুক্ত সেসব জমি ফেরত দেয়া হবে এবং যাদের জমি ফেরত দেয়া হবে না তাদের ক্ষতিপূরণ দেয়ার মাধ্যমে পুনর্বাসন করা হবে। চার দফা দাবীর সংশোধনীর একটা প্রিন্টেড কপি আমি তোমাকে দেব। সব কিছু বিচার করে তাদের চার দফা দাবী আমাদের মেনে নেয়া উচিত।’ কথা শেষে

স্টিফেন থেমেছিলেন। তারপর বলেছিলেন, ‘আমার এ প্রস্তাব তুমি আমাদের নেতৃবৃন্দকে জানাবে!’

‘স্যার আমি সেই জানাবার দায়িত্ব পালনের জন্যেই এসেছি।’ থামল ফাদার জেমস!

কথা বলল ফ্রান্সিস বাইক! বলল, ‘তোমাদের মধ্যে যখন কথা হয়, তখন সেখানে ওদের কেউ ছিল?’

‘না ছিল না। আমাকে পৌছে দিয়েই ওঁরা চলে গেছে। যদি আড়ি পেতে থাকে, কিংবা কোনভাবে কথা যদি রেকর্ড করে থাকে সেটা ভিন্ন কথা।’

‘জন স্টিফেনরা তাহলে ওদের অনুপস্থিতিতেই এসব কথা বলেছে। তাদের চোখে-মুখে, কথা-বার্তায় কোন ভয়ের চিহ্ন ছিল? মানে, আমি বলতে চাচ্ছি কথাগুলো তাদের আন্তরিক, না শেখানো?’ বলল ফ্রান্সিস বাইক।

‘কথাগুলো তাদের আন্তরিক বলেই মনে হয়েছে।’

‘আপনার মত কি এ সম্বন্ধে?’

‘একক মতামতের কি প্রয়োজন। দরকার সম্মিলিত সিদ্ধান্ত।’

‘তবু আপনি কি ভাবছেন এ নিয়ে? সকলের ভাবনা নিয়েই তো সিদ্ধান্ত হবে।’ বলল ফান্সিস বাইক।

‘আমার মনে হয় স্টিফেনরা ঠিকই বলেছে। শত্রুরা আঁট-ঘাঁট বেধেই কাজ শুরু করেছে। ওদের দাবী মেনে না নিলে বড় ধরনের কেলেংকারীর মধ্যে আমরা পড়তে পারি।’

‘দাবী মেনে নিলে কি কেলেংকারী এড়ানো যাবে? আর ঐ চারটি দাবী মেনে নিলেই কি তাদের দাবী শেষ হয়ে যাবে?’ ফ্রান্সিস বাইক বলল।

‘কুন্তে কুম্বার দাবী তো এটুকুই!’

‘কিন্তু কুন্তে কুম্বাকে যারা বুদ্ধি ও শক্তি দিচ্ছে, তাদের দাবী কিন্তু এটুকুই নয়। তাদের লক্ষ্য সমগ্র দক্ষিণ ক্যামেরুনের সকল মুসলিম ভুখন্ড ফেরত নেয়া এবং তাদের পুনর্বাসন করা।’ ফান্সিস বাইক বলল।

'আমি একথা স্টিফেনকে বলেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, সে দাবী এখনো উঠেনি। যদি তা উঠেই যুক্তি-প্রমাণ সহকারে, তাহলে আমরা তা অস্বীকার করতে পারবো না।'

'এটা তার কথা, সকলের কথা নয়।' বলল ফ্রান্সিস বাইক।

'তাহলে বলুন, এখন কি করণীয়?'

'করণীয় হলো, এক শয়তান এশিয়ান প্রবেশ করেছে ক্যামেরুনে তাঁকে ধ্বংস করা।'

'কে সে? তাকে ধ্বংস করলেই কি সব ঠিক হয়ে যাবে?'

'আপনি জানেন না কুন্তে কুম্বাকে সেই জাগিয়েছে। কুন্তে কুম্বা যা করেছে সবই তার পরামর্শ। ফ্রি ওয়ার্ল্ড টিভি, ওয়ার্ল্ড নিউজ এজেন্সী যে সংবাদ প্রচার করেছে তাও তারই গোপন হাতের কারসাজি। সর্বোপরি, এ পর্যন্ত প্রায় ২০ জনের মত লোক তার হাতে নিহত হয়েছে।'

'অবিশ্বাস্য কথা বলছেন। এমন বিশ্বকর্মা কে সে?'

'হ্যাঁ তাকে বিশ্বকর্মা বলতে পার। গোটা বিশ্বেই সে কাজ করছে। কিন্তু একশ ভাগ নিশ্চিত না হয়ে তার নাম আমরা বলব না।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ থাকল ফাদার জেমস। তারপর বলল, 'আমি তাহলে কি জানাব মিঃ স্টিফেনদের?'

'জানাবেন তাদের প্রস্তাবে কেউ রাজি নন। আরও জানাবেন, কি করতে হবে না হবে তা মুক্তরা ঠিক করবে, বন্দীরা নয়।'

'এইভাবে কথা বলা কি ঠিক হবে? আমরা তাদের মুক্তির জন্যে কিন্তু কিছুই করতে পারিনি।'

'সব সময় সবকিছু সহজে করা যায় না। এক্ষেত্রে ধৈর্য ধরতে হয়। মুক্ত হতে পারছি না বলে জাতিকে বিক্রি করে দিয়ে মুক্ত হতে হবে তা ঠিক নয়।'

'ওরা কিন্তু নিজের মুক্তির জন্যে এ কথা বলেনি, জাতির স্বার্থেই এটা ছিল ওদের সুচিন্তিত অভিমত।'

উত্তর দিতে যাচ্ছিল ফ্রান্সিস বাইক। কিন্তু তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে দীর্ঘক্ষণ পরে মুখ খুলল পিয়েরে পল। বলল, 'বিষয়টা যদিও আপনাদের

সংগঠনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার, তবু বিষয়টা যেহেতু জাতীয়, তাই কথা না বলে পারছি না।’

বলে একটু থামল পিয়েরে পল। তারপর আবার শুরু করল, ‘পশ্চাতাপসরণকে জাতীয় স্বার্থ বলছেন ফাদার জেমস! জাতীয় স্বার্থ সামনে অগ্রসর হওয়ার মধ্যে। যিশুর ক্রস দক্ষিণ ক্যামেরুন থেকে ক্রিসেন্টকে বিতাড়িত করেছে। এখন ‘ক্রস’ – এর টার্গেট উত্তর ও পূর্ব ক্যামেরুনকে ক্রিসেন্ট এর স্পর্শ থেকে মুক্ত করা। এরপর ক্রস অগ্রসর হবে নাইজেরিয়া ও চাদ হয়ে আরও উত্তরে, আরও পুবে।’

টেবিল চাপড়ে ফ্রান্সিস বাইক বলল ‘ফাদার জেমস মিঃ পিয়েরে পল যে কথা বলেছেন, এটাই জাতির কথা, জাতির স্বপ্ন। এ স্বপ্ন বাস্তবায়নের আমরা সৈনিক। আমরা কোন নীতি-দুর্নীতির পরোয়া করি না। উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে, স্বপ্ন সার্থক করার জন্যে যা করা দরকার তা করেছি এবং করব।’

‘আমি মনে করি স্টিফেনরাও এটাই, মনে করেন স্যার। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষ কেবল সামনেই অগ্রসর হয় না। কৌশলগত কারণে তাকে অনেক সময় পিছাতেও হয়। স্টিফেনরা এই কৌশলের কথাই বলেছেন।’

‘যুক্তি হিসেবে আপনার কথা ভাল। কিন্তু পিছানোর কৌশল নেয়ার সময় এসেছে বলে আমি মনে করি না। বলতে গেলে লড়াই এখন একজনের সাথে। একজনের ভয়ে আমরা পিছু হটব, এটা কি সুস্থ পরামর্শ হতে পারে মিঃ জেমস?’ বলল পিয়েরে পল।

‘একজন কিংবা কয়জন সেটা বোধ হয় বিবেচ্য বিষয় নয় স্যার। বিবেচ্য বিষয় হলো, আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় দিক দিয়েই প্রথম বারের মত এমন এক সংকটে আমরা পড়েছি যা সত্যিই আমাদের বিপদে ফেলতে পারে।’

একটু দম নিল ফাদার জেমস। তারপর বলল, ‘দেখুন স্যার, জন স্টিফেন এবং ফ্রাঁসোয়া বিবসিয়ের আফ্রিকায় খৃষ্টের সৈনিক-বাহিনীর সবচেয়ে আত্ম-নিবেদিত, নিঃস্বার্থ এবং সাহসী সেনাধ্যক্ষ। সেই দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ক্রসের যে অগ্রাভিযান শুরু হয়েছে, তাতে মিঃ জন স্টিফেন এবং ফ্রাঁসোয়া বিবসিয়ের সব সময় অগ্র-বাহিনী পরিচালনার ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। স্যার আমরা

জানি ইদেজা এখন ক্রসের উত্তর ও পুবমুখী যাত্রার অগ্রবর্তী ঘাঁটি এবং এ ঘাঁটির দায়িত্বে রয়েছেন জন স্টিফেন এবং ফ্রাঁসোয়া বিবসিয়ের। সুতরাং আমি মনে করি, তাদের মতামতের একটা মুল্য আছে।'

চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছে পিয়েরে পলের। তাতে অসন্তুষ্টির একটা বিস্ফোরণ। বলল সে, 'জবাব দিন ফাদার ফ্রান্সিস বাইক।'

ফ্রান্সিস বাইকের মুখ গম্ভীর। সে বলল, 'আরও একটা কথা বলেননি ফাদার জেমস। সেটা হলো, আপনি অগ্রবর্তী ইদেজা ঘাঁটির তথ্য প্রধান। অতএব আপনার মতামতেরও মূল্য আছে।'

একটু থামল ফ্রান্সিস বাইক।

ফ্রান্সিস বাইকের কথায় ফাদার জেমস এর চোখ-মুখও লাল হয়ে উঠেছে। তার চোখে-মুখে অপমানিত হওয়ার চিহ্ন।

ফ্রান্সিস বাইক আবার শুরু করল, 'দেখুন ফাদার জেমস, আমরা জন স্টিফেন এবং ফ্রাঁসোয়া বিবসিয়েরকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু আমরা বন্দীদের কথায় পরিচালিত হতে পারি না। বন্দী হওয়ার পর তারা আর আপনার কিংবা কারো নেতা নন। সুতরাং আমরা তাঁদের মতামতের কানা-কড়ি মূল্য দিতে রাজী নই। কথাটা আপনার কাছে পরিষ্কার?'

'জি স্যার।' মুখ নিচু করে বলল ফাদার জেমস।

'এখন থেকে আপনার নেতৃত্বে চলবে ইদেজা ঘাঁটি। আর আমাদের না জানিয়ে কোন কথা বলবেন না জন স্টিফেনদের সাথে। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে স্যার।' মুখ না তুলেই বলল ফাদার জেমস। মুখ তুললে দেখা যেত, তার মুখে প্রবল অসন্তুষ্টির চিহ্ন। একটা পুরানো ঝড় তার মনে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছেঃ 'আমরা কি সত্যই খৃষ্টের আধ্যাত্ম-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছি, না ভুমি-লিপ্সা বা সাম্রাজ্য লিপ্সা চরিতার্থ করছি!'

কিছু বলতে যাচ্ছিল ফাদার জেমস। এই সময় মুখ খুলল ফ্রান্সিস বাইক। বলল, 'মিঃ পিয়েরে পল, বসে থাকা তো যায় না। আমরা এখন কি করতে পারি?'

'শয়তানটাকে খুঁজে বের করা এখন প্রধান কাজ।'

'কিন্তু কিভাবে? তার কি কোন ফটো আছে?'

‘আছে। ফ্রান্সে।’

‘আপনি তো দেখেছেন।’

‘ফটো দেখেছি। কিন্তু সমস্যা হলো এক পোশাকে এবং এক মুখাবয়বে সে থাকে না।’

‘তবু আমরা মোটামুটি একটা বর্ণনা সহ একজন এশিয়ানের সন্ধানে লোক লাগাতে পারি।’

‘হ্যাঁ, তাই করতে হবে।’

কিছু বলতে যাচ্ছিল ফ্রান্সিস বাইক।

তার আগেই ইন্টারকম কথা বলে উঠল, ‘নাস্তা রেডি। মেহমান নিয়ে আসুন।’

ফ্রান্সিস বাইক এবং পিয়েরে পল উঠে দাঁড়াল। তার সাথে ফাদার জেমসও।

রোড ম্যাপ অনুসরণ করে আহমদ মুসা যখন ‘লা-ফ্যাংগ’ রোডে পৌছল তখন সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা।

রাশিদি ইয়েসুগোর বাড়ি থেকে মাগরিবের নামায পড়ে ‘ওকুয়া’র গাড়ি থেকে পাওয়া ঠিকানা নিয়ে আহমদ মুসা বেরিয়েছে ওকুয়া অথবা কোক-এর ঘাঁটির সন্ধানে। আহমদ মুসা নিশ্চিত নয় যে ঠিকানা সে পেয়েছে তা ওকুয়া না কোক-এর ঘাঁটি, না তাদের কোন লোকের ঠিকানা ওটা।

আহমদ মুসার ইচ্ছা ছিল দিনের আলোতে ‘লা-ফ্যাংগ’ রোডে পৌছা, যাতে ঠিকানা খুঁজে পাওয়া সহজ হয়। কিন্তু চীফ জাস্টিসের বাড়ি থেকে ফিরে গোসল করে খেয়ে রেষ্ট নিতে গিয়ে আহমদ মুসা ঘুমিয়ে পড়েছিল।

রাশিদি ইয়েসুগো ইচ্ছা করেই তাকে ডাকেনি। লায়লা ইয়েসুগো স্মরণ করিয়ে দিলে সে বলেছিল, ‘ঘুম তার প্রয়োজন বলেই এসেছে। যে ধকল গেছে গত কয়েক ঘন্টায়, ওর বিশ্রাম দরকার।’

‘কি মজা না ভাইয়া, মারিয়া জোসেফাইন আহমদ মুসার বাগদত্তা!’ বলেছিল লায়লা ইয়েসুগো।

‘ডাক নাম তো ডোনা জোসেফাইন, না?’

‘হ্যাঁ ভাইয়া, ফরাসী রাজকুমারী বলে নয়, তিনি আহমদ মুসার সত্যিই উপযুক্ত সঙ্গিনী।’

‘এত কিছু জেনে ফেলেছিস তুই?’

‘কেন, মুহাম্মাদ ইয়েকিনির কাছে তুমিও তো শুনলে! শুনলে না যে, তিনি আহমদ মুসার সন্ধানে একক সিদ্ধান্তে ফ্রান্স থেকে ক্যামেরুন চলে এসেছেন। শুনলে না, আজকের দু’টি ঘটনায় কি সাংঘাতিক পরিস্থিতিতে মারিয়া জোসেফাইন ‘ওকুয়া’র দু’জন লোককে হত্যা করেছে। কত বড় সাহস থাকলে এটা পারে বলত।’

‘কিন্তু তুই তো পিস্তল চালাতেও পারিস না।’

‘এর জন্যে তোমরা দায়ী। ইয়েসুগো পরিবারের মেয়েদের কাজ করা, পরিশ্রম করা তোমরা নিষিদ্ধ করে রেখেছ। কিন্তু আজ তোমাকে বলছি ভাইয়া, আমি শুধু পিস্তল নয়, মেশিন গানও চালাতে জানি। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সুটিং ক্লাবের সদস্য।’

‘তোকে অভিনন্দন লায়লা। ঐ নিষিদ্ধের কাজটা আমি করিনি। সংগ্রামের যে সময় এসেছে, তাতে ঐ অতীত ঐতিহ্য আর মানা যাবে না। ইসলামের সোনালী যুগে মেয়েরাও যুদ্ধ করেছে।’

‘ধন্যবাদ ভাইয়া’, বলে একটু থেমেছিল লায়লা। বলেছিল তারপর, ‘আমরা সত্যিই ভাগ্যবান ভাইয়া, কিংবদন্তির আহমদ মুসা আমাদের মেহমান এবং তার বাগদত্তা মারিয়া জোসেফাইন আমরা বন্ধু’।

‘তা বটে। তবে সত্যিকার আনন্দ আমাদের তখনই হবে, যখন তিনি বিজয়ী হবেন, মিশন যখন তার সফল হবে, যে সংগ্রামের মিশন নিয়ে তিনি ক্যামেরুনে এসেছেন।’

‘ক্যামেরুনে মুসলিম জাতির অস্তিত্ব যে বিনাশের মুখে, এ বিষয়টা তো আমরা এমন করে ভাবিনি যেমন করে ভেবে ছুটে এসেছেন আহমদ মুসা।’

‘ভেবেছি হয়ত আমরা। কিন্তু এ পরিণতি আমরা মেনে নিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, এভাবে ধ্বংস হওয়াটাই আমাদের ভাগ্য, করার কিছু নেই।’

‘কিন্তু আহমদ মুসা তা ভাবেননি। তিনি জয়ের কথা ভেবেছেন, বিজয়ের জন্যেই তিনি ছুটে এসেছেন।’

‘এখানেই আহমদ মুসার সাথে আমাদের পার্থক্য।’

‘কিন্তু ভাইয়া, কিভাবে তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করবেন?’

‘সামনে কি হবে আল্লাহই জানেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই তিনি যা ঘটিয়েছেন, তাতে সম্ভাবনার দ্বার খুলে গেছে। তুই তো শুনেছিস, কুন্তে কুম্বার চার দফা প্রস্তাব ইন্দেজার বন্দী নেতারা মেনে নিয়েছেন। তাদের নেতারা এটা মানবেন কিনা জানি না। তবে তারা এখন আক্রমণাত্বক অবস্থান থেকে রক্ষণাত্মক ভূমিকায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে।’

আহমদ মুসা যখন বাদ মাগরিব রাশিদি ইয়েসুগোর বাড়ি থেকে বের হচ্ছিল, তখন সেখানে রাশিদি এবং ইয়েকিনি হাজির ছিল। রাশিদি ইয়েসুগো মুখ ভার করে বসেছিল, ‘আপনার যুক্তি খন্ডন করার সাধ্য আমাদের নেই। কিন্তু একা বের হচ্ছেন অভিযানে, আমার খুব খারাপ লাগছে আপনাকে একা ছেড়ে দিতে।’

‘ধন্যবাদ’ দিয়ে কোন কথা না বলে হেসে বিদায় নিয়েছিল আহমদ মুসা।

‘লা-ফ্যাংগ’ রোডের মাঝামাঝি জায়গায় নেমে গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছিল আহমদ মুসা।

‘লা-ফ্যাংগ’ ইয়াউন্ডির পুরানো এলাকার রাস্তা হলেও বেশ প্রশস্ত এবং সুন্দর সাজানো গুছানো।

মধ্য ক্যামেরুনের বিখ্যাত ‘ফ্যাংগ’ গোত্রের নাম অনুসারে এই রাস্তার নামকরণ। শহরের এই অঞ্চলে ‘ফ্যাংগ’ গোত্রের নিবাস।

আহমদ মুসা গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির ভাড়া চুকিয়ে দিতে যাচ্ছে, এমন সময় সমবেত কন্ঠের হৈ চৈ ও চিৎকার শুনতে পেল। তাকিয়ে দেখল, পনের বিশজন লোক মহা হৈ চৈ-এর সাথে একজন লোককে তাড়া করছে। সবাই কৃষ্ণাংগ।

যাকে তাড়া করেছে সে পাগলের মত প্রাণপণে ছুটছে বাঁচার জন্যে। কিন্তু পারছে না। আক্রমণকারীদের সাথে তার দূরত্ব কমে আসছে।

কাছাকাছি এলে আহমদ মুসা দেখল, লোকটি আহত। কপাল দিয়ে নেমে আসা রক্তের ধারা মুখ প্লাবিত করে গড়িয়ে পড়ছে।

হৃদয়টা কেঁদে উঠল আহমদ মুসার।

ভাড়ার টাকাটা পকেটে রেখে আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ফরাসী ভাষায় বলল, 'দাঁড়াও তোমরা।'

আহমদ মুসার কথা শুনে পলায়নরত লোকটি আহমদ মুসার দিকে একবার তাকিয়েই ছুটে এল এবং আহমদ মুসার পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে আর্তনাদ করে ফরাসী ভাষায় বলল, 'আমাকে বাঁচান। মেরে ফেলবে ওরা আমাকে।'

আক্রমণকারী লোকেরা মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়িয়েছিল। তারপরেই ওরা সমবেতভাবে এগুলো আবার আহমদ মুসার পায়ের কাছে পড়ে থাকা লোকটির দিকে। লোকগুলোর কারো হাতে লাঠি, কারো হাতে ছোরা।

আহমদ মুসা পায়ের কাছে এসে পড়া লোকটিকে বাঁ হাত দিয়ে টেনে তুলে পাশে দাঁড় করাল। লোকটি দাঁড়িয়ে আহমদ মুসার পেছনে সরে এল।

আহমদ মুসা তার দিকে অগ্রসরমান লোকদের উদ্দেশ্য করে বলল, 'তোমরা আর এক পা এগুবে না। এভাবে তোমরা আইন হাতে তুলে নিতে পার না।'

কিন্তু ওরা আহমদ মুসার কথা শুনল না। আগে কয়েকজন এগিয়ে আসছিল, এবার সকলেই এগিয়ে আসতে শুরু করল।

আহমদ মুসা তার জ্যাকেটের পকেট থেকে মেশিন রিভলবার বের করে তাদের দিকে তাক করে কঠোর কন্ঠে বলল, 'আর এক পা এগুলে গুলী চালাব। সবাইকে লাশ বানাব।'

এবার থমকে গেল ওদের এগিয়ে আসা।

ওদের মধ্যে একজন ফরাসী ভাষায় চিৎকার করে বলল, 'ওকে আমাদের হাতে ছেড়ে দাও। ও আমাদের মেয়েকে কিডন্যাপ করেছে।'

'একে তোমরা চেন?'

'চিনি', ওদের একজন বলল।

'নাম জান?'

'জানি।'

'ঠিকানা জান?'

'জানি।'

'তাহলে তার বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নাও। তোমাদেরকে আইন হাতে তুলে নিতে দেব না।'

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা আহত লোকটিকে গাড়িতে উঠতে বলল এবং নিজেও পিছু হটে গাড়ির দিকে চলল।

আহমদ মুসারা চলে যাচ্ছে দেখে আক্রমণকারী লোকরাও এগিয়ে আসতে লাগল সতর্কতার সাথে।

আহত লোকটি আগেই গাড়িতে উঠে বসেছিল। আহমদ মুসাও উঠে বসল।

ওরা ছুটে এসে গাড়ি ঘেরাও করতে অগ্রসর হলো।

আহমদ মুসা গাড়ি ছাড়তে বলল ট্যাক্সিওয়ালাকে।

'স্যার ওরা 'ফ্যাংগ' গোষ্ঠী। আমার গাড়ির নাম্বার দেখে ফেলেছে। পরে আমাকে ধরবে।' গাড়ি স্টার্ট না দিয়েই বলল একথাগুলো।

'দেখ আমি কাউকে দুইবার নির্দেশ দেই না। তোমার দোষ হবে কেন? তুমি নির্দেশ পালন করছ মাত্র।' শান্ত অথচ কঠোর কন্ঠে বলল আহমদ মুসা।

ট্যাক্সিওয়ালা আহমদ মুসার দিকে একবার চেয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল।

ইতিমধ্যেই গাড়িতে লাথি ও লাঠির বাড়ি এসে পড়তে শুরু করেছে।

কিন্তু সহজেই ওদের ঘেরাও ভেদ করে গাড়ি বেরিয়ে গেল।

আহমদ মুসা আহত লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম কি?'

'অগ্যাস্টিন ওকোচা।'

'বল, তুমি কোথায় যাবে?'

'লা-ফ্যাংগ' রোডের মুখে 'ওয়ান্ডি এ্যাভেনিউ'তে আমার বাড়ি।'

‘ওয়ান্ডি এ্যাভেনিউতে নিয়ে চল ড্রাইভার’, ট্যাক্সিওয়ালার দিকে চেয়ে বলল আহমদ মুসা।

‘ওরা যে অভিযোগ করল, সেটা সত্য কিনা ওকোচা?’ আহত লোকটির দিকে চেয়ে আহমদ মুসা বলল।

‘ওরা মিথ্যা কথা বলেছে। আমি কিডন্যাপ করিনি। আমরা পরস্পরকে বিয়ে করেছি।’

‘তাহলে ওদের ওরকম কথা বলা এবং সাংঘাতিক ক্রোধের কারণ কি?’

‘কারণ ওরা ‘ফ্যাংগ’ গোত্রের এবং আমি ‘ওয়ান্ডি’ গোত্রের।’

‘শত্রুতা কিসের দুই গোত্রের মধ্যে?’

‘শত্রুতা নয়, আত্মসম্মানের প্রশ্ন।’

‘আত্মসম্মানের প্রশ্ন?’

‘এই দুই গোত্র অন্য গোত্রের মেয়ে নেয়াকে বিজয়ের এবং মেয়ে দেয়াকে পরাজয়ের মনে করে। আমরা শিকার হয়েছি এই মর্যাদা-সংকটের। আমার গোত্র আমার বিয়েকে স্বাগত জানিয়েছে, কিন্তু ‘ফ্যাংগ’ গোত্র মেয়েটিকে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। ব্যর্থ হওয়ায় আমাকে হত্যার উদ্যোগ নিয়েছে।’

‘এ ধরনের সব বিয়েতেই কি এমন হয়?’

‘এতটা হয় না। আমার স্ত্রী ‘ফ্যাংগ’ গোত্রের সরদারের মেয়ে। তাদের গোত্র ও সরদারের অপমানে তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে। আপনি আশ্রয় না দিলে ওরা আজ আমাকে হত্যা করত।’ বলতে বলতে কেঁদে ফেলল ওকোচা।

‘এই যখন অবস্থা তুমি সাবধান হওনি কেন?’

ওকোচা চোখ মুছে বলল, আমি সব সময় সাবধান। ‘ফ্যাংগ’ এরিয়ায় আমি আসি না। ফ্যাংগ গোত্রের আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু মৃত্যু শয্যায়। গোপনে তাকে দেখতে এসেছিলাম। কিন্তু ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে পড়ায় আমি বিপদে পড়ে যাই।’

‘দুই গোত্রের মধ্যেকার এই বিরোধ বা ভুল বুঝাবুঝির সমাধান কি?’

‘শিক্ষিত হওয়া এবং সামাজিক রীতি-নীতির কিছু পরিবর্তন হওয়া।’

‘দুই গোত্র কোন ধর্মের অনুসারী?’

‘ফ্যাংগ গোত্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তাদের গোত্র ধর্মের অনুসারী। কিন্তু ওয়ান্ডী গোত্রের অর্ধেকই খৃস্টান। বাকি অর্ধেকের তিন ভাগের দুই ভাগ গোত্র ধর্মের এবং এক ভাগ মুসলমান। কিন্তু ফ্যাংগ গোত্রে খৃস্টানদের সংখ্যা খুবই নগন্য। সে গোত্রে গোত্র ধর্মের বাইরে যারা আছে তাদের চার ভাগের তিন ভাগই মুসলমান। তবে ফ্যাংগ গোত্রের খৃস্টানরা সংখ্যায় নগণ্য হলেও তারা শিক্ষিত বিত্তবান এবং প্রভাবশালী।’

‘ফ্যাংগ গোত্রে খৃস্টানের সংখ্যা কম এবং ওয়ান্ডি গোত্রে খৃস্টানের সংখ্যা বেশি কেন?’

‘ফ্যাংগ গোত্রের সাথে উত্তরের মুসলিম প্রধান ফুলানি গোত্রের ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে। ফলে যে কারণে খৃস্টানরা উত্তরের ফুলানী গোত্রের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেনি, সে কারণেই সম্ভবত ফ্যাংগ গোত্রের উপর খৃস্টানদের প্রভাব কার্যকর হয়নি।’

আহমদ মুসার বুঝতে বাকি রইল না ওয়ান্ডি গোত্র পুরোপুরিই খৃস্টান প্রভাবিত, ফ্যাংগ গোত্র তা নয়। কিন্তু আহমদ মুসা ওকুয়া’র যে দুটি ঠিকানা নিয়ে এসেছে তার একটি ‘ফ্যাংগ’ রোডে, অন্যটি ‘ওয়ান্টি’ এ্যাভেনিউতে। খৃস্টান প্রভাবের দৃষ্টিকোণ থেকে তো ‘ফ্যাংগ’ রোডে ওকুয়া’র কোন ঘাঁটি থাকার কথা নয়। আহমদ মুসার মনে পড়ল ‘ওকোচা’র কথা। ‘ফ্যাংগ’ গোত্রে খৃস্টানদের সংখ্যা কম হলেও কম সংখ্যক খৃস্টান যারা আছে তারা বুদ্ধিমান, বিত্তবান ও প্রভাবশালী। সুতরাং তাদের আশ্রয়ে ‘ওকুয়া’র ঘাঁটি গড়ে উঠতেই পারে।

‘ওয়ান্ডি’ এ্যাভেনিউ-এর বিশাল বাড়ির গেটের সামনে আহমদ মুসার গাড়ি দাঁড়াল।

‘ওকোচা’ গাড়ি থেকে মুখ বের করে একটা সংকেত দিল। সংকেতটাকে আহমদ মুসার কাছে গেরিলার বন্ধু বৎসল ডাক-এর মত মনে হলো।

ওকোচা’র সংকেতের সাথে সাথেই গেটের দরজা খুলে গেল।

আহমদ মুসা বলল, ‘ভেতরে যাবার তো প্রয়োজন নেই।’

‘একটু কষ্ট করুন।’ বলল ওকোচা।

গাড়ি গিয়ে গাড়ি বারান্দায় প্রবেশ করল।

গাড়ি থেকে নামল ওকোচা।

গাড়ি ঘুরে এসে আহমদ মুসার দরজা খুলে ধরে ওকোচা বলল, ‘দয়া করে একটু নামুন।’

‘ওকোচা, আমি জরুরী কাজে বেরিয়েছি। আমি সময় নষ্ট করতে পারবো না। আমাকে মাফ কর।’

‘তুমি বলে সম্বোধন করে আমাকে ছোট ভাইয়ের মর্যাদা দিয়েছেন, আমার বাড়িতে একটু পদধুলি দিয়ে আমাকে ধন্য করুন।’

আহমদ মুসা নামল গাড়ি থেকে।

ওকোচা আহমদ মুসাকে নিয়ে প্রবেশ করল ড্রইংরুমে।

ততক্ষনে রক্তাক্ত ওকোচার খবর বাড়ির ভেতরে পৌঁছে গিয়েছিল। ব্যস্তভাবে বাড়ির সকলেই এসে প্রবেশ করল ড্রইংরুমে।

একজন মাঝ বয়সী মহিলা আর্তনাদ করে জড়িয়ে ধরল ওকোচাকে। আরেকজন তরুণী, এক বাক্যেই যাকে ব্ল্যাক বিউটি বলা যায়, তাকিয়ে ছিল উদ্বেগ ও বেদনা পীড়িত দৃষ্টি নিয়ে ওকোচার দিকে। আরও অনেকের মধ্যে সর্বাগ্রে এসে দাড়িয়েঁছিল অটুট স্বাস্থ্যের একজন মাঝ বয়সী ভদ্রলোক। আহমদ মুসার বুঝতে অসুবিধা হলো না, মাঝ বয়সী মহিলাটি ওকোচার মা, তরুণীটি স্ত্রী এবং প্রৌঢ় ভদ্রলোক তার আব্বা।

‘ওকোচা ঘটনা কি, আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা।’ উদ্বেগ মেশানো গম্ভীর কণ্ঠে বলল ভদ্রলোকটি।

ওকোচা তার মা’কে শান্ত করে তার আব্বার দিকে তাকাল এবং আহমদ মুসাকে দেখিয়ে বলল, ‘আব্বা, এই ভদ্রলোককে আমি জানি না, তার নামও এখনো আমি শুনিনি। কিন্তু তিনি দেবদূতের মত আর্বিভূত হয়ে আমাকে বাঁচিয়েছেন। তিনি বাঁচাতে এগিয়ে না এলে এখন আমার লাশ পড়ে থাকতো ‘লা ফ্যাংগ’ রোডে।’

‘কেন? ব্যাপার কি? ফ্যাংগ’রা তোমাকে . . ..

‘হ্যাঁ, আব্বা। ওরা টের পেয়ে যায় যে, আমি বন্ধুর বাড়িতে গেছি। ওরা পনের বিশ জন আমাকে আক্রমণ করে ফেরার পথে ওবাড়ি থেকে বের হবার

পরই। আহত অবস্থায় আমি দৌড়ে পালাচ্ছিলাম। ইনি বিদেশী বলেই বোধ হয় সাহায্য করতে আসেন। এঁর হাত থেকেও ওরা আমাকে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছিল। ইনি রিভলবার বের করে ওদের মাথা গুঁড়িয়ে দেবার হুমকি না দিলে আমাকে ছিনিয়েই নিয়ে যেত।'

চোখ লাল হয়ে উঠল ওকোচার আব্বার। ভয়ংকর হয়ে উঠল তার কাল মুখ। বলল, 'তুমি চেন তাদের?'

'কয়েকজনকে চিনি।'

'তাদের বাড়ি?'

'আমার বন্ধু 'সেবজী'র বাড়ির পাশের ওরা।'

'আজ রাতেই এর প্রতিশোধ আমি নেব।' হুংকার দিয়ে উঠল অগাষ্টিন ওকোচার আব্বা।

বলে সে কয়েক ধাপ সামনে এগিয়ে এসে আহমদ মুসার সামনে দাড়িয়ে তার একটা হাত তুলে নিয়ে চুমু খেয়ে বলল, 'আমরা আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব। তুমি একটু বসো বাবা। আমি একটু বেরুব।'

আহমদ মুসা দেখল ওকোচার আব্বা শান্তভাবে কথা বলতে চেষ্টা করলেও তার মুখের ভয়ংকর ভাব যায়নি এবং তার চোখে জ্বলছে প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে।

আহমদ মুসা বুঝল সে কোথায় যাচ্চে। বাইরে যাচ্ছে দল গুছাতে। তারপরই যাবে অভিযানে।

'আমি একটা কথা বলতে পারি আপনাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে?' ওকোচার আব্বার দিকে তাকিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

'অবশ্যই বলবে।' ওকোচার আব্বা চলতে শুর করেও থমকে দাঁড়িয়ে বলল।

'আমার মত হলো এ ধরণের পাল্টা অভিযানে না যাওয়াই ভালো।'

'কেন?'

'এতে বিরোধ আরও বিস্তৃত হবে।'

'তা হবে। কিন্তু আমার প্রতিশোধ নেয়া হযে যাবে।'

‘আইনের মাধ্যমে প্রতিশোধ নেয়া যায়। ওদের চেনেন। ওদের বিরুদ্ধে মামলা দিন।’

হাসল ওকোচার আব্বা। বলল, ‘তুমি সভ্য দেশের মানুষ, জংগলের আইন জান না। এখানে শক্তি দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হয়, আইন দিয়ে নয়।’

‘কিন্তু এরপরও আমি বলব, যে ইস্যু নিয়ে এই বিরোধ, তাতে এই বিরোধ মিটিয়ে ফেলার মধ্যেই কল্যাণ আছে।’

‘আমি এটাই চেয়েছিলাম। কিন্তু ফ্যাংগরা আজ বুঝিয়ে দিয়েছে তারা বিরোধ চায়, রক্তারক্তি চায়। আমি আজ রাতেই ওদের শতজনকে হত্যা করে ওদের চাওয়া পূরন করতে চাই। আমি অনেক ধৈর্য ধরেছি। আমি চাইলে ফ্যাংগদের মাথা অনেক আগেই গুড়িয়ে দিতে পারতাম। এবার তাই করব।’

‘আমার একটা প্রস্তাব আছে।’

‘কি প্রস্তাব?’

‘আপনি যদি এই মূহুর্তে কিছু করতেই চান, তাহলে সশস্ত্র অভিযানে না গিয়ে সশস্ত্রভাবে সোজা ফ্যাংগদের সর্দার অর্থাৎ ওকোচার শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে উঠুন এবং ওকোচার রক্ত মাখা শার্ট ওকোচার শ্বশুরকে উপহার দিন। কোন কথা তাকে বলবেন না। শুধু জানাবেন ‘ফ্যাংগদের আক্রমনে আহত ওকোচার শার্ট।’ ফেরার সময় পারলে একটা সাদা গোলাপ পা দিয়ে মাড়িয়ে আসবেন।’

শেষের বাক্যটা বলতে গিয়ে হাসল আহমদ মুসা।

কিন্তু আর কেউ হাসল না। ওকোচার আব্বা, ওকোচা, তার তিন বড় ভাই, ওকোচার মা ও স্ত্রী সকলেই স্তম্ভিত আহমদ মুসার কথায়। যেন তারা অবিশ্বাস্য কোন দৃশ্য দেখছে, এইভাবে তাকিয়ে আছে আহমদ মুসার দিকে।

চোখভরা বিস্ময় নিয়ে ওকোচার আব্বা দু’ধাপ এগিয়ে এল আহমদ মুসার একদম মুখোমুখি। তারপর ডান হাত দিয়ে আহমদ মুসার মুখ ঈষত তুলে ধরে বলল, ‘তুমি কে বাবা? এমন অদ্ভুত চিন্তা তোমার মাথায় এল কি করে? আমার মনে হচ্ছে, শতজনকে হত্যা করার চাইতেও এটা তৃপ্তিদায়ক হবে।’

কথা শেষ করেই সে ঘুরে দাঁড়াল এবং ছেলেদের উদ্দেশ্য করে বলল, 'আমি এখনি যাব। সকলকে খবর দাও। তিনটি গাড়িতে যাব। সবাই সব রকমের অস্ত্রসজ্জিত হবে।'

ওকোচার আব্বা কথা শেষ করতেই আহমদ মুসা বলল, 'আমাকে এবার বিদায় দিন।'

ওকোচার দিকে চেয়ে বলল, 'চলি আমি।'

ওকোচার আব্বা কথা শুনেই হৈ চৈ করে উঠল। বলল, 'যাবে মানে? তুমি তো বসোইনি। মেহমানদারী কিছুই হয়নি।'

বলেই সে তাড়া দিল সেই মাঝ বয়সী মহিলা ও তরুণীটিকে। কিন্তু পরক্ষণেই বলল, 'দাঁড়াও দাঁড়াও, কারো সাথেই তো পরিচয় হয়নি।'

ওকোচার আব্বা একে একে স্ত্রী, পুত্রবধু এবং ওকোচার তিন ভাইয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল।

পরিচিত হবার পর ওকোচার মা বলল, 'বাছা, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুক।' আর ওকোচার স্ত্রী বলল, 'আমরা আপনার কাছে ঋণী থাকব চিরদিন।'

আহমদ মুসা তাদেরকে ধন্যবাদ দিয়ে ওকোচার আব্বার দিকে চেয়ে হাত জোড় করে বলল, 'মাফ করুন আজ আমি যাই। জরুরী কাজ আছে।'

'তাহলে যাবেই? কথা দাও আসবে আরেকদিন।'

'কথা দিতে পারবনা। যদি সম্ভব হয় আসব।'

বলে আহম্মদ মুসা সকল কে শুভেচ্ছা জানিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করল।

তার পাশাপাশি হাঁটতে লাগল ওকোচা।

ওকোচার আব্বাও ড্রইং রুমের দরজা পর্যন্ত তাদের এগিয়ে দিল।

ওকোচা আহমদ মুসার গাড়ির দরজা খুলে ধরে বলল, 'কোথায় যাবেন?'

আহমদ মুসা গাড়িতে ঢোকার জন্যে নিচু হয়েও আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'বন্ধুদের একটা আড্ডায় যাব।'

বলে আহমদ মুসা ঢুকে গেল গাড়িতে।

ওকোচা গাড়ির জানালায় মুখ রেখে বলল, ‘ভাইয়া কবে আশা করব আপনাকে আমাদের বাড়িতে?’

‘গড নোজ।‘ হেসে বলল আহমদ মুসা।

গাড়ি স্টার্ট নিল। চলতে শুরু করল।

ওকোচা হাত নেড়ে বিদায় জানাল।

গাড়ি চলে গেলেও ওকোচা দাড়িয়ে ছিল।

তার আব্বা এসে তার পাশাপাশি দাঁড়াল। বলল, ‘ওকোচা, নাম কি পরিচয় কি জেনেছ?’

ওকোচা ঝট করে ঘুরে দাড়াল তার পিতার দিকে। দুঃখিত কণ্ঠে বলল, ‘কিছুই জিজ্ঞেস করা হয়নি। নাম কি, কি পরিচয়, কোথায় উঠেছেন, কিছুই জানি না।’

‘ভুল আমাদের হয়েছে। আমরা কিছু জিজ্ঞেস করলাম না কেন?’

‘এ যে কত বড় ভুল, উনি কি মনে করবেন ভাবতে আমার লজ্জা লাগছে।’

‘ওর সম্পর্কে যা শুনলাম তোমাকে বাঁচাবার ব্যাপারে এবং যা বুঝলাম অল্প সময়ে, ও কোন সাধারণ ছেলে নয়। কিছুই মনে করবে না। কিন্তু ওর পরিচয় ও নাম জানা একটা সাধারণ সৌজন্যের জন্যেও প্রয়োজন ছিল।’

‘সত্যি খুব খারাপ লাগছে আব্বা। বলতে গেলে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে উনি আমাকে নতুন জীবন দিয়েছেন।’

‘কোথায় গেল জান?’

‘বন্ধুদের আড্ডায়, ঠিকানা বলেননি।’

‘চাইলে সেও তার নাম ও পরিচয় জানাতে পারত কিন্তু সে ইচ্ছা তার ছিল না।’

বলে একটু থামল। তারপর বলল, ‘চল ভেতরে। ডাক্তার এখনি এসে পড়বে।’

দুজনেই আবার ড্রইং রুমে প্রবেশ করল।

ওকোচার বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় আহমদ মুসা ভাবল তার তো ইচ্ছা ছিল লা ফ্যাংগ রোডের ওকুয়া'র ঘাটিতে প্রথম হানা দেয়া। কিন্তু ঘটনাচক্র তাকে নিয়ে এসেছে ওয়ান্ডি এ্যাভেনিউতে। সুতরাং ওয়ান্ডি এ্যাভেনিউর ওকুয়া'র ঠিকানায় প্রথম যাবে সে।

৭০ নম্বর ওয়ান্ডি এ্যাভেনিউ আহমদ মুসার টার্গেট, কিন্তু গাড়ি থেকে নামল ৬৫ নম্বরে।

ট্যাক্সিওয়ালাকে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে আহমদ মুসা ফেল্ট হ্যাটটা মাথায় তুলে ধীরে ধীরে এগুলো ৭০ নাম্বারের দিকে।

৭০ নাম্বার একটি বড় চার তলা বিল্ডিং। উত্তর মুখী বাড়িটির পূর্ব পাশ দিয়ে একটা রাস্তা ওয়ান্ডি এভেনিউ থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ দিকে চলে গেছে।

বাড়িটির দিকে একবার নজর বুলিয়ে নিয়ে আহমদ মুসা বাড়ির সামনে দিয়ে একবার হেঁটে গেল। দেখল বাড়িটার পশ্চিম পাশে দিয়েও একটা গলি দক্ষিণ দিক থেকে এসে ফুটপাতে মিশেছে। দেখেই বুঝা যায় গলিটা গাড়ি-ঘোড়া চলার জন্যে নয়, মাত্র পায়ে হাঁটার পথ।

আরও দেখল বাড়িটার সামনে একটা লন। লনের দু'পাশে গাড়ি দাড়ানো। লনটা প্রাচীর ঘেরা। প্রাচীর চার ফুটের মত উচু। তার উপর তিন ফুটের মত গ্রিলের প্রাচীর।

বিশাল গেট পেরিয়ে লনে প্রবেশ করতে হয়। গেট পুরু ইস্পাতের প্লেট দিয়ে ঢাকা।

গেটের এক পাশে গার্ড রুম।

লন থেকে প্রশস্ত সিড়ির প্রায় ৬টির মত ধাপ পেরিয়ে তবেই এক তলার মেঝেতে উঠা যায়।

বাড়িটির দিকে তাকিয়েই আহমদ মুসার মনে হলো এটা একটা অফিস বিল্ডিং।

আহমদ মুসা বাড়িটার পশ্চিম পাশের লেন দিয়ে বাড়ির পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকটা ঘুরে এল। দক্ষিণ দিকের গলি পথটা আসলে একটা সুয়ারেজ প্যাসেজ।

আহমদ মুসা ফুটপাতে দাড়িয়ে এখন কি করবে তা ভাবতে গিয়ে ঘড়ির দিকে তাকাল। সবে সাড়ে ৭টা।

কিন্তু পরক্ষনেই সে ভাবল। কি করবে তা ভাবার আগে তাকে নিশ্চিত হতে হবে যে এই বাড়িটা সত্যিই ওকুয়া'র কোন ঘাঁটি বা তাদের কোন লোকের বাড়ি বা অফিস কিনা।

জানার উপায় কি?

গেটে জিজ্ঞেস করা নিরাপদ নয়। ওকুয়া ক্ষ্যাপা কুকুরের মত হয়ে আছে। সব বিদেশী, বিশেষ করে এশিয়ানকে তাদের সবাই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখবে।

আহমদ মুসার মনে পড়ল ওকোচার কথা। তাকে এঠিকানার কথা জিজ্ঞেস করলে নিশ্চয় জানা যেত। কিন্তু যা গত হয়ে গেছে তা নিয়ে ভেবে আর লাভ নেই।

বাকি থাকে বাড়িতে প্রবেশ করে জানা। বাড়িতে প্রবেশ করার কথাই ভাবল আহমদ মুসা।

কিন্তু পরক্ষনেই ভাবল গেটম্যানকে একবার বাজিয়ে তো দেখা যায়।

ভাবনার সাথে সাথেই আহমদ মুসা পকেটে থেকে একটা কাঁচা-পাকা গোঁফ বের করে পরে নিল। এবং পকেট থেকে ফোল্ডেড লাঠি বের করে লাঠি বানিয়ে স্বাস্থ্যসন্ধানী সন্ধ্যা ভ্রমণকারী সাজলো।

ধীরে ধীরে এগুলো ফুটপাত ধরে গেটের দিকে। তার হাতের লাঠি ফুটপাতের শক্ত বুকে ঠক ঠক শব্দ তুলল।

গেটে গিয়ে সে দাড়াল।

গেট এলাকা উজ্জ্বল আলোতে প্লাবিত।

আহমদ মুসা গেটের মুখোমুখি হয়ে গোটা গেটের উপর চোখ বুলালো। যেন সে সাইনবোর্ড সন্ধান করছে।

গেটের গার্ড রুমের একটি জানালা বাইরের দিকে।

জানালা দিয়ে গার্ড মুখ বাড়িয়ে বলল, 'মশায় কি খুঁজেন?'

'অফিসের সাইনবোর্ড নেই?'

'না, এটা অফিস নয়। কোন অফিস খুঁজছেন?'

'কিংডম অব ক্রাইস্ট কে চেনেন? একজন বলেছিল এখানে কোথাও তার অফিস।'

'চিনি। কিন্তু এখানে কোথাও তো তাদের অফিস নেই। কত নম্বর বলেছিল?'

'যতদূর মনে পড়ে ৭০ নম্বর বলেছিল।'

'না এটা কিংডম অব ক্রাইস্ট এর অফিস নয়। কে ঠিকানাটা দিয়েছিল?'

'গির্জার একজন ভাল খৃস্টান কর্মীর কাছ থেকে পেয়েছিলাম। খৃস্টের জন্য আমি কিছু উইল করে যেতে চাই।'

'গার্ড উত্তরে তৎক্ষনাৎ কিছু বলল না। কয়েক মুহূর্ত ভাবল। তারপর বলল উনি কিছুটা ঠিকই বলেছিলেন। এটা কিংডম অব ক্রাইস্ট (কোক) এর অফিস নয়, তবে ঐ সংস্থার বন্ধুরা এখানে থাকেন। তাদেরকে বললেই আপনার কাজ হয়ে যাবে। সব ব্যবস্থা করে দেবেন তারা। কালকে একবার আসুন।'

'কেন সন্ধ্যায় ওঁরা থাকেন না?'

'থাকেন, আছেন কিন্তু রাতে দেখা হবে না।'

'ও আচ্ছা। কখন এলে পাওয়া যাবে? এটা কি ওদের বাড়ি?'

'বাড়ি না ঠিক। কালকে আসুন। বলে গার্ড সরে গেল জানালা থেকে।'

ও চলে গেলে ক্ষতি নেই আহমদ মুসার। যা জানবার তা জানা হয়ে গেছে। এটা ওকুয়া'র একটা ঘাঁটি তাতে কোন সন্দেহ নেই এখন আহমদ মুসার। আরো একটা জিনিস মনে হল, চার তলা বাড়ির বিশালত্ব প্রমান করে এটা ওকুয়া'র কোন ছোটখাট ঘাঁটি নয়।

আহমদ মুসা সরে এল বাড়িটার সামনে থেকে। তারপর সিদ্ধান্ত নেবার জন্য দাড়াল ফুটপাতের এক প্রান্তে।

বাড়িটাতে প্রবেশ করা দরকার দুইটা কারনে। ওমর বায়াকে ওরা কোথায় বন্দি করে রেখেছে তা জানার একটা পথ হতে পারে। অথবা ওমর বায়াদের পেয়েও যেতে পারে।

সময় সম্পর্কে চিন্তা করল আহমদ মুসা। এ ধরনের অভিযানের জন্যে দুইটা সময় ভাল। এক হলো সন্ধ্যা রাত, দুই গভীর রাত। আহমদ মুসা সন্ধ্যা রাতকেই পছন্দ করল।

চোখ বন্ধ করে বাড়ির চার দিকের দৃশ্যটা সামনে এনে বাড়িটিতে ঢুকার পথ সম্পর্কে চিন্তা করল।

বাড়িটার দুই পাশে এবং পেছনের দিকে কোন ব্যালকনি নেই। পেছনে চাকর-বাকরদের একটা দরজা থাকে, সেটাও নেই। বেয়ে উপরে উঠার মত পানির পাইপও নেই।

দুইটা পথই মাত্র খোলা আছে বাড়িতে ঢোকার, ছাদের কার্নিশে হুক আটকিয়ে কর্ড বেয়ে ছাদে উঠা অথবা সামনে একদম সদর দরজা পথে।

সন্ধ্যা রাতে কর্ড বেয়ে ছাদে উঠা বিপজ্জনক। সুতরাং পথ একটাই খোলা সামনে দিয়ে সদর দরজা পথে।

চোখ বন্ধ করে বাড়ির সামনেটা আবার সামনে নিয়ে এল আহমদ মুসা।

সামনে দিয়ে প্রবেশের দুইটা পথ। গেটের গার্ডকে পরাভূত করে তার পোশাক পরে বাড়িটে প্রবেশ করা। দ্বিতীয় গার্ডের চোখ এড়িয়ে পুব অথবা পশ্চিম দিকের প্রাচীর যেখানে একতলার বারান্দার সাথে মিশেছে সেখান দিয়ে প্রবেশ করা। অবশ্য এ জায়গায় প্রাচীরের উচ্চতা সাত ফিটের মত এবং তার উপর চার ফিট গ্রিলের বেড়া। এখানে বারান্দা থেকে প্রাচীরের শীর্ষ দেশ মাত্র চার ফুটোর মত উঁচু। অর্থাৎ চার ফিটের গ্রীলের বাধা পার হলেই বারান্দা। আরেকটা সুযোগ হলো, গ্রীলের ফাঁক দিয়ে আহমদ মুসা দেখেছে রেলিং-এর ধার ঘেঁষে বারান্দায় ফুলের টব সাজানো। অনেক টবে পাতা ওয়ালা বেশ বড়-সড় গাছও আছে,যা আড়াল হিসেবে কাজ করতে পারে। প্রাচীরের শীর্ষদেশ পর্যন্ত ওঠা সহজ। লাফ দিয়ে উঠে প্রাচীরের গ্রীল ধরতে পারলে নিমিষেই বারান্দায় চলে যাওয়া যাবে।

সামনে দিয়ে প্রবেশের এই দ্বিতীয় পথটাই পছন্দ করল আহমদ মুসা।

হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল রাত ৮টা।

আহমদ মুসা ধীরে ধীরে এগুলো পশ্চিম প্রাচীরের সেই দক্ষিন প্রান্তের দিকে। বাড়ির পশ্চিম দিকের লেনটাতে দু'একজন লোক ক্বচিত দেখা যায়।

কোন দেয়ালের গা বেয়ে পাঁচ সাত ফিট লাফিয়ে ওঠা আহমদ মুসার কাছে নস্যি।

আহমদ মুসার কোনই কষ্ট হলো না প্রাচীরের গা বেয়ে লাফিয়ে উঠে গ্রিল ধরে বারান্দায় গিয়ে নামতে।

বারান্দায় টবের পাশে বসে তাকাল গেটের দিকে এবং বারান্দার দিকে। দেখল গেট রুমের কোন দরজা বা জানালা দক্ষিন দিকে নেই। বুঝল, একটাই জানালা উত্তর দিকে আর দরজা পশ্চিম পাশে গেটের পাশাপাশি।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল আহমদ মুসা। দেখল বারান্দায়ও কেউ নেই।

টবের পাশে নিজেকে গুটিয়ে রেখে ভেতরে প্রবেশের উপায় সম্পর্কে চিন্তা করল।

তার সামনে পুব-পশ্চিম লম্বা বারান্দা।

বারান্দা থেকে ভেতরে প্রবেশের তিনটি দরজা। মাঝ বরাবর একটি। দু'প্রান্তে দুটি।

আহমদ মুসা লক্ষ্য করল তার প্রান্তে যে দরজা রয়েছে, তার লক পয়েন্টে বড় ধরনের একটা লাল বিন্দু জ্বল জ্বল করছে। কিন্তু অন্য দু'টি দরজায় তা নেই। তার বদলে ঐ দু'টি দরজার লক পয়েন্টে রয়েছে জ্বলজ্বল সবুজ চোখ।

আহমদ মুসার কাছে এই আলোক সংকেতের সরলার্থ দাঁড়ায়, লাল সংকেতের দরজায় নক করা যাবে না, প্রবেশের জন্যে এ দরজা নয়। সবুজ চিহ্নিত দরজা দু'টি প্রবেশের।

গেটের দিক থেকে শব্দ পেয়ে আহমদ মুসার চিন্তায় ছেদ পড়ল। তাকাল আহমদ মুসা গেটের দিকে।

দেখল, একটা গাড়ি ঢুকছে গেট দিয়ে।

গাড়িটি এসে দাঁড়াল বারান্দার সিঁড়ির গা ঘেঁষে।

গাড়ি থেকে নামল তিনজন লোক, একজন স্বেতাংগ, দু'জন আফ্রিকান কৃষ্ণাংগ।

তারা সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল বারান্দায়।

আহমদ মুসার হাতে রিভলবার আগে থেকেই ছিল। আশংকিত হবার চেয়ে খুশী হলো সে ওদের দেখে। ওরা কিভাবে দরজা খোলে দেখা যাবে।

আহমদ মুসা পকেট থেকে মাইক্রো দূরবীণ বের করে হাতে নিল। আহমদ মুসা লক্ষ্য করল, ওরা তিনজন বারান্দায় আহমদ মুসার প্রান্তের দিকে এগিয়ে আসছে।

বিস্মিত হলো আহমদ মুসা। তার মেশিন পিস্তলের ট্রিগারে আঙুল রাখল সে।

কিন্তু ওরা তিনজন গিয়ে দাঁড়াল লাল সংকেতওয়ালা আহমদ মুসার প্রান্তের দরজার সামনে।

আহমদ মুসা মাইক্রো দূরবীণ তার চোখে লাগাল।

মাইক্রো দূরবীণ একটি বিশেষ আধারে স্থাপিত একটা ক্ষুদ্র কাঁচ খন্ড। পেন্সিল কাটারের মত এ ক্ষুদ্র দূরবীণ দিয়ে পাঁচ ফিট থেকে সিকি মাইল দূর পর্যন্ত স্থানের আলপিনের মরিচাও সুস্পষ্টভাবে চোখে পড়ে।

তিনজনের মধ্যকার শ্বেতাংগ লোকটি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে লাল সংকেতের ঠিক উপরে দরজার গায়ে তর্জনি দিয়ে টোকা দিল ছয়টি।

আহমদ মুসা পরিস্কার দেখতে পেল, লাল সংকেতের ঠিক উপওে দরজার রঙের সাথে মিশানো আয়াতকার একটা ছক। তাতে শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত অংকগুলো ক্রমিকভাবে সাজানো। অংকগুলোও ঠিক দরজার রঙের। সতর্ক দৃষ্টি না হলে খুঁজে পাবার কথা নয়। আহমদ মুসা আবারও দেখল, শ্বেতাংগ লোকটির তর্জনি তিন, ছয় ও নয়-এর উপর ক্রমিকভাবে দুইবার ঘুরে এল। একবার উর্ধ ক্রমিক, একবার নিম্ন ক্রমিক।

শ্বেতাংগ লোকটির ছয়টি টোকা সম্পন্ন হবার সাথে সাথে লাল সিগন্যালটি নিভে গেল। সেখানে জ্বলে উঠল সবুজ সংকেত। আর তার সাথে সাথেই খুলে গেল দরজা।

ওরা তিনজন ভেতরে ঢুকে গেল।

বিস্ময়ের সাথে আরেকটা বিষয় লক্ষ্য করল আহমদ মুসা, এ দরজার লাল আলো নিভে যাওয়ার সাথে সাথে মাঝের দরজার সবুজ সংকেত নিভে গিয়ে লাল সংকেত জ্বলে উঠল। অল্পক্ষণ পরে পূর্ব প্রান্তের দরজাটিরও সবুজ সংকেত নিভে লাল সংকেত জ্বলে উঠল। পরে সবগুলো সংকেতই একে একে তার সাবেক অবস্থায় ফিরে এল।

ঐ দুই দরজার রং পরিবর্তনের খেলা আহমদ মুসা কিছুই বুঝল না।

ওরা তিনজন চলে যাবার পর আহমদ মুসা মিনিট দশেক অপেক্ষা করল। তারপর গেটের দিকে তাকাল। দেখল দরজা বন্ধ। গার্ড রুমের দরজা খোলা। কিন্তু গার্ডকে দেখা যচ্ছে না।

বিসমিল্লাহ বলে আহমদ মুসা দ্রুত বেরিয়ে এল টবের আড়াল থেকে। কয়েক ধাপে পৌঁছে গেল দরজার সামনে। দ্রুত হাতে সে লাল সংকেতের উপরের ছকটায় শাহাদাত আঙুলি দিয়ে আঘাত করল উল্লেখিত তিনটি নম্বরে, যেমন সে দেখেছিল।

সংগে সংগেই লাল সংকেতের জায়গায় জ্বলে উঠল সবুজ সংকেত।

খুলে গেল দরজা।

আহমদ মুসা প্রবেশ করল ভেতরে।

পেছনে দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

ভেতরটা দেখেই অবাক হয়ে গেল আহমদ মুসা। লিফট রুমের মত একটা কক্ষ। তার তিন দিকেই দেয়াল, পেছনে বাইরে যাবার দরজা।

মনে চিন্তা উদয় হলো আহমদ মুসার, সে কি তাহলে ফাঁদে পড়ল!

পরক্ষণেই ভাবল, জ্বলজ্যান্ত তিনজন লোক এই মাত্র ঢুকল, তারা চলে গেছে, নিশ্চই এর আরো দরজা আছে।

চারদিকে তীক্ষ্মভাবে নজর বুলাতে গিয়ে আহমদ মুসা পুব দিকের দেয়ালে ৪ ফুটের মত উচ্চতায় কাঠ রঙা দুই অংকের একটা ছক খুঁজে পেল। অংক দু’টি হলো তিন এবং ছয়।

খুশীতে মনটা নেচে উঠল আহমদ মুসার। দরজা খোলারই 'কি' বোর্ড এটা। কিন্তু দুইটা অংক কেন?

হঠাৎ আহমদ মুসার মনে এ চিন্তা উদয় হলো যে, তিন কোড সংকেতের একটি 'নয়', এখানে নেই। তাহলে 'নয়' কে বাদ দিয়ে অন্য সিস্টেম কি এখানে রাখা হয়েছে?

চিন্তার সাথে সাথেই আহমদ মুসা অংক দু'টিতে ঠিক আগের মতই একবার উর্ধ ক্রমিক, একবার নিম্ন ক্রমিকে টোকা দিল।

সাথে সাথেই খুলে গেল দরজা। দরজার পরে যে কক্ষে আহমদ মুসা প্রবেশ করল, তা আগের ন্যায়ই লিফট রুমের মত একটা কক্ষ।

হঠাৎ আহমদ মুসার মনে পড়ল বাইরে পরের দু'টি দরজার সবুজ সংকেত লাল হয়ে যাওয়া ও পরে তা আবার সবুজ হয়ে যাবার কথা। বুঝল আহমদ মুসা, বাইরের তিনটি দরজার পেছনেই তিনটি লিফট রুমের মত কক্ষ আছে যাতে রয়েছে বাইরের মতই কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত দরজা। প্রথম দরজা যখন সবুজ সংকেত জ্বলে, তখন দ্বিতীয় দরজায় লাল সংকেত জ্বলে ওঠে। প্রথম কক্ষ থেকে যখন দ্বিতীয় কক্ষে প্রবেশ করা হয়, তখন বাইরে দ্বিতীয় সবুজ সংকেত জ্বলে ওঠে, আর তৃতীয় দরজায় জ্বলে লাল সংকেত। যখন দরজা খুলে তৃতীয় কক্ষে প্রবেশ করা হয় তৃতীয় অর্থাৎ শেষ দরজায় সবুজ সংকেত জ্বলে ওঠে।

প্রথম কক্ষের মতই দ্বিতীয় কক্ষের পুব দিকের দেয়ালের ঠিক একই স্থানে এক অংকের একটা ছক খুঁজে পেল আহমদ মুসা। সে অংকটা 'তিন'। হিসাবে 'তিন'-ই হওয়া উচিত। 'তিন' না হলেই বিপদে পড়ত আহমদ মুসা।

'তিন' অংকটি তর্জনি দিয়ে পুর্বের রীতি অনুসারে দুই বার টোকা দিল আহমদ মুসা।

দরজা খুলে গেল আগের মতই সংগে সংগে। তৃতীয় কক্ষে প্রবেশ করল আহমদ মুসা।

কিছুক্ষণ দাঁড়াল কক্ষটির মাঝখানে। সে নিশ্চিত এই কক্ষেরই ভেতরে প্রবেশের পথ আছে।

আহমদ মুসা কক্ষটির বিশেষ করে দক্ষিণ দেয়ালের উপর সতর্ক দৃষ্টি বুলাল। আহমদ মুসার ধারণা ভেতরে যাবার দরজা এই দেয়ালেই থাকবে। ভাগ্যবান আহমদ মুসা, দেয়ালের ঠিক মাঝখানে সেই চার ফুট উপরে কাঠ রংয়ের একটা 'শূন্য' খুঁজে পেল।

খুঁজে পেয়ে খুশী হলো আহমদ মুসা। কিন্তু চিন্তায় পড়ল 'কোড' ভাঙা নিয়ে । দরজা খোলার জন্যে 'শূন্য' অংকে কয়টা টোকা দিতে হবে? যুক্তি বলে, আগের তিন দরজার ক্রমিক অনুসারে হয় একটা টোকা দিতে হবে, নয়তো সর্বোচ্চ নয়টি টোকা দিতে হয়।

আহমদ মুসা প্রথমে শূন্য অংকে একটা টোকা দিল। তারপর অপেক্ষা করল। না, দরজা খোলার নাম নেই। পরে গুনে গুনে শূন্যের উপর নয়টি টোকা দিল। এবার অপেক্ষা করতে হলো না। শেষ টোকা পড়ার সাথে সাথেই সামনে থেকে কক্ষের গোটা দক্ষিণ দেয়ালটাই সরে গেল।

কিন্তু দেয়াল সরে যাওয়ায় যা তার চোখে পড়ল, তাতে একরাশ বিস্ময় এসে তাকে ঘিরে ধরল।

প্রায় অর্ধ ডজন স্টেনগান তার দিকে 'হা' করে তাকিয়ে আছে। তারা গোটা ঘরে অর্ধ বৃত্তাকারভাবে দাঁড়িয়ে।

বৃত্তের মাঝখানে দু'জন লোক। একজন শ্বেতাংগ, আরেকজন কৃষ্ণাংগ। তাদের হাতে একদম লেটেস্ট মডেলের মেশিন রিভলবার। দু'টিই উদ্যত তার দিকে।

আকস্মিকতায় বিমূঢ় হয়ে পড়া আহমদ মুসার দিকে চেয়ে হো হো করে হেসে উঠল শ্বেতাংগ লোকটি। বলল, 'ওয়েলকাম আহমদ মুসা তোমার জন্যে আমরা অপেক্ষা করছি।'

বলেই আবার হো হো করে হাসল সে। শুরু করল আবার, 'তোমার প্রশংসা করছি আহমদ মুসা। পৃথিবীতে তোমার তুলনা শুধু তুমিই। আমাদের চারটা দরজার যে কোড তুমি পানির মত ভেঙে বেরিয়ে এলে তা ভাঙবার সাধ্য আর কারও নেই। তোমাকে কনগ্রেচুলেশন।'

শ্বেতাংগ লোকটি থামতেই কৃষ্ণাঙ্গ লোকটি বলে উঠল, 'কিন্তু তুমি বোকাও আহমদ মুসা। তুমি তোমার শত্রুকে, ওকুয়া'কে অবমূল্যায়ন করেছ। তুমি কি করে ভাবলে যে ওকুয়ার হেড কোয়ার্টার এত অরক্ষিত, তুমি গার্ডকে ফাঁকি দিয়ে প্রাচীর টপকে প্রবেশ করবে আর কেউ দেখতে পাবে না?'

আহমদ মুসা মনে মনে স্বীকার করল, ঠিকই সে ওকুয়া'কে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়নি। তাদের ঘাঁটির নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ইউরোপীয় মানে বিচার করেনি। প্রাচীর এবং তার গ্রীলের গায়ে যে অতি সূক্ষ্ম 'এলার্ম' তার জড়ানো থাকতে পারে, এটা সে ভাবেইনি। তারপর দরজার আলোক সংকেতের পাশাপাশি কক্ষগুলোতে টিভি ক্যামেরার চোখ তার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে, এ বিষয়টার দিকেও সে ভ্রুক্ষেপ মাত্র করেনি। আহমদ মুসার এখন মনে হচ্ছে, এলার্ম তার বা অন্য কোন কৌশলের মাধ্যমে তারা তার প্রবেশ টের পেয়ে গেছে এবং দরজা ও কক্ষগুলোর টিভি ক্যামেরার মাধ্যমে তাকে দেখেছে।

ছাদ ফাটা অট্টহাসি হাসল শ্বেতাংগ লোকটি। বলল, 'কি ভাবছ আহমদ মুসা। তোমার ভুলের কথা ভাবছ? তোমার ভুল মানে আমাদের বিজয়। কিন্তু এ বিজয় অনেক মূল্যে আমরা অর্জন করলাম। তুমি আমাদের কত লোক মেরেছ, কত ক্ষতি করেছ, তার কোন পরিমাপ নেই। এর পরেও আজ আমি আনন্দিত আহমদ মুসা। তোমার মূল্য তুমি জাননা। তোমাকে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ধনাগারের মূল্য বিক্রি করা যায়, আবার তোমাকে পনবন্দী বানিয়ে কয়েকটি রাষ্ট্রের কোষাগারের সমুদয় অর্থ হাতে আনা যায়।'

'ঠিক বলেছেন। আমার সব ক্ষতি পূরণ হয়েছে। সামনের প্রতিবন্ধকতার দেয়ালও ভেংগে পড়েছে। এখন চীফ জাস্টিস শয়তান সুড় সুড় করে সব লিখে দেবে। ফ্রি ওয়ার্ল্ড টিভি এবং ওয়ার্ল্ড নিউজ এজেন্সিও এখন আমাদের ঘাঁটতে আসবে না। ও! এখনি আমার ইচ্ছা করছে চীফ জাস্টিসকে একটা টেলিফোন করতে।'

আহমদ মুসা অনুমান করল এরা কে, তবু প্রশ্ন করল, 'এত খুশি হচ্ছেন, আপনারা কারা? মনে হচ্ছে অনেকদিন থেকে আপনাদের সাথে আমার সম্পর্ক।'

'ওর উৎসুক্যটা মিটিয়ে দাও ফাদার।' বলল, শ্বেতাংগ লোকটি।

‘তার উৎসূক্য মেটানোর আমাদের কি দায়িত্ব। আর আমাদের পরিচয় নিয়ে তার কি।’ বলল, কৃষ্ণাংগ লোকটি।

‘উৎসুক্য নয়, পরীক্ষা করলাম আপনাদের সাহসের মাত্রাকে। চিনি আমি আপনাদের। ব্ল্যাক ক্রসের প্রধান পিয়েরে পল এবং ‘কোক’ এবং ‘ওকুয়া’র প্রধান ফ্রান্সিস বাইকের ছবি আমি দেখেছি ফ্রান্সের ক্রিমিনাল লিস্টে।’

‘ক্রিমিনাল লিস্টে! মিথ্যে কথা। মুখ সামলে কথা বল আহমদ মুসা।’ ‘ক্রোধে’ ফুঁসে উঠল পিয়েরে পল।

‘মিথ্যে কথা আমি বলিনি। পুলিশ এবং প্রশাসন আপনাদের ফেবার করে, সুযোগ দেয়। এটা তাদের বেআইনি দুর্বলতা। কিন্তু আইনের চোখে আপনারা ক্রিমিনাল। লিস্টে নাম থাকবে না কেন?’

‘এর জবাব তুমি পাবে আহমদ মুসা।’ রক্ত চক্ষু তুলে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলে পিয়েরে পল একজন স্টেনগানধারীর দিকে তাকিয়ে বলল, ‘ওর পকেট সার্চ করে অস্ত্র কেড়ে নাও। ওর হাতে হাতকড়া, পায়ে বেড়ি পরিয়ে দাও। দেখাব কে ক্রিমিনাল।’

স্টেনগানধারী এ নির্দেশ পালন করল।

‘হাতকড়া এবং পায়ে বেড়ি দিয়ে মানুষকে ক্রিমিনাল বানানো যায় না মিঃ পিয়েরে পল, ক্রিমিনাল হয় মানুষ অপরাধের কারনে।’

শান্ত ও স্বভাবিক কন্ঠে বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার কথার উত্তরে কিছু না বলে নির্দেশ দিল পিয়েরে পল, ‘একে এক নম্বর সেলে নিয়ে ভরো।’

‘ডঃ ডিফরজিস এবং ওমর বায়াকে কোথায় রেখেছেন পিয়েরে পল?’

ক্রুদ্ধ পিয়েরে পল এবং ফ্রান্সিস বাইক কেউই এ প্রশ্নের উত্তর দিল না।

চারজন প্রহরী আহমদ মুসার হাত পা ধরে নাগর-দোলার মত করে নিয়ে চলল।

আহমদ মুসার চোখ তারা বাঁধেনি। সুতরাং সব কিছুই দেখল পথের আশে-পাশের।

আহমদ মুসাকে ভূগর্ভস্থ কক্ষে নামানো হলো।

তাকে প্রবেশ করানো হলো একটি সেলে। সেল বলতে যা বুঝায় কক্ষটি তা নয়।

বেশ প্রশস্থ ঘর। তবে একটি দরজা ছাড়া কোন জানালা নেই। ছাদ অনেক ওপরে। ছাদের কোডে ঢাকা বাল্ব থেকে ম্লান আলো ছড়িয়ে পড়েছে ঘরে।

আহমদ মুসাকে মেঝেয় ফেলে ওরা চলে যাচ্ছিল।

আহমদ মুসা বলল, 'কি ব্যাপার, তোমাদের বন্দীখানা যে একেবারে শূন্য।'

ওরা চারজনই থমকে দাঁড়াল। একজন বাঁকা হেসে বলল, 'কেন একা থাকতে ভয় করবে? ভয় নেই সাথী আছে।'

'কোথায়, কাউকে তো দেখছিনা?'

'আছে তোমার আশে-পাশেই।'

'তোমরা একজন শ্বেতাংগকে বন্দী করে রেখেছ।'

'কোন শ্বেতাংগ বন্দী আমাদের নেই, মেহমান আছে।'

একজন প্রহরীর এই কথা শেষ হতেই অন্যজন দ্রুত বলে উঠল, 'এর সাথে খোশ গল্প কি, চল।'

বলে সে চলতে শুরু করল। তার সাথে অন্যরাও।

তারা চলে যাওয়ার সাথে সাথে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। দরজাটি তালাবদ্ধ হবারও শব্দ পেল আহমদ মুসা।

বন্দীখানা খুব খারাপ নয়। ঘরের একপাশে মেঝের সাথে আঁটা স্টিল ফ্রেমের খাটিয়ায় বিছানা পাতা। ঘরের এক কোণে বেসিনে পানির টেপ। এটাসড টয়লেট।

খুব খুশি হলো আহমদ মুসা।

কিন্তু খুশিটা উবে গেল, যখন মনে পড়ল যে ওদের কাছ থেকে আসল কথাটাই আদায় করা যায়নি। ওদের কথায় বুঝা গেলনা ডঃ ডিফরজিস ও ওমর বায়া কোথায়। ওরা বলল কোন শ্বেতাংগ বন্দী নেই আছে মেহমান। এ কথা বলল কেন? আমি তো মেহমানের কথা জিজ্ঞেস করি নি। তাদের তো কত মেহমানই থাকতে পারে। তার কথা আমাকে বলবে কেন? তাহলে সে শ্বেতাংগ মেহমান কি

আলাদা ধরনের মেহমান? সে কি ডঃ ডিফরজিস? এই শ্বেতাংগ মেহমানকে প্রহরী কোথায় দেখেছে? এ বাড়িতে?

অনিশ্চয়তার মধ্যেও আহমদ মুসা নিশ্চিত হলো সে ডঃ ডিফরজিস ও ওমর বায়ার কাছাকাছি পৌছেছে, খুবই কাছাকাছি।

আহমদ মুসায় খাটিয়ায় উঠে শুয়ে পড়েছিল। ওমর বায়াদের বিষয়ে চিন্তা করতে করতেই কখন যেন ঘুমের কোলে ঢলে পড়ল সে।

# ৬

রাত ১  টার দিকে রাশিদি ইয়েসুগো জোর করে লায়লা এবং ফাতেমা মুনেকাকে শুতে পাঠিয়েছে।

ফাতেমা মুনেকা সন্ধ্যার পর কুন্তে কুম্বা থেকে এখানে এসেছে।

ওদের সান্তনা ও সাহস দিয়ে শুতে পাঠালেও রাশিদি এবং মুহাম্মাদ ইয়েকিনি সান্তনা পাচ্ছিল না। তারা লায়লা ও ফাতেমা মুনেকাকে বলেছে বটে যে, আহমদ মুসার কত অভিযানে এ রকম কত দেরী হয়েছে, কত রাত কাবার হয়ে গেছে, এ নিয়ে চিন্তার কিছু নেই, কিন্তু তারা নিজেরাই এসব কথায় সান্ত্বনা পাচ্ছিল না। শত্রুর দুই ঠিকানায় খোঁজ নিতে গেছে আহমদ মুসা। শুধু খোঁজ করতেই এতটা দেরী কিছুতেই হবার কথা নয়। তাহলে দেরী হচ্ছে কেন, এই  চিন্তা করতে গেলে হৃদয় তাদের কেঁপে উঠছে। আহমদ মুসা কোন বিপদে পড়েছে, এমন কথা ভাবতেও তাদের হৃদয় চৌচির হয়ে যাচ্ছে।

এই দূর্বহ ভাবনার ভারে নিমজ্জিত রাশিদি ও ইয়েকিনির রাত কোন দিক দিয়ে পার হয়ে গেল তারা টেরই পেল না। ফজরের আযানের শব্দে চমকে উঠল দু'জনেই। তাকাল একে অপরের দিকে।

'ভোর যে হয়ে গেল রাশিদি, উনি ...............কথা শেষ না করেই থেমে গেল ইয়েকিনি।'

উত্তরে রাশিদি ইয়েকিনির দিকে তাকাল। উদ্বেগ-বেদনায় জর্জরিত তার চোখ। কোন উত্তরই দিতে পারল না রাশিদি। মূহুর্ত কয়েক পরে বলল, 'চল নামায পড়ে আসি।'

দু'জনেই নামাযের জন্যে বেরিয়ে গেল।

নামায শেষে ফিরে ড্রইং রুমে ঢুকে তারা দেখল লায়লা ও ফাতেমা মুনেকা বসে আছে।

রাশিদিরা ঢুকতেই তারা উঠে দাঁড়াল।

তাদের দু'জনের চোখে সহস্র প্রশ্নের বন্যা। মুখ ফুটে তারা কিছুই বলল না। প্রশ্ন যেন তারা উচ্চারণই করতে পারছে না।

রাশিদি এবং ইয়েকিনি কোন কথা না বলেই বসে পড়ল । লায়লারা যে প্রশ্ন নিয়ে ছুটে এসেছে, তার কি উত্তর দিবে তারা। আপনাতেই তাদের মাথা নিচু হয়ে গেল।

লায়লারাও বসে পড়েছে। নির্বাক জবাব থেকেই তারা বুঝে ফেলেছে। নুয়ে পড়েছে তাদের মাথাও।

চারজনের মধ্যে অসহনীয় এক নিরবতা।

কথা বলতে যেন তারা ভয় করছে।

অনেকক্ষণ পর লায়লা মুখ তুলল। বলল, 'ভাইয়া ওনার কিছু একটা হয়েছে, কোন সন্দেহ আছে কি আর এ ব্যাপারে?'

'এ কথা ভাবতেও আমার বুক কাঁপছে লায়লা। নিজেকে খুব অপরাধী মনে হচ্ছে, কেন তাকে একা যেতে দিলাম? কিংবা কেন তাকে ফলো করিনি?' ভারী গলায় বলল রাশিদি ইয়েসুগো।

'না, এতে অপরাধের কিছু নেই। তাঁকে ফলো করা তিনি পছন্দ করেন না। কুন্তে কুম্বাতে আমরা দেখেছি, যে কাজ তিনি মনে করেন তাঁর একার করার, সেখানে কাউকেই তিনি সাথে নেন না।' ফাতেমা মুনেকা বলল।

'আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি মারিয়া আপার কাছে একথা শুনেছি। তবে মারিয়া আপাই শুধু ব্যতিক্রম, তিনি কোন কোন সময় ফলো করেছেন। তিনি যে ক্যামেরুনে এসেছেন, তাও আহমদ মুসা ভাইয়ের অজান্তে।' বলল লায়লা।

'সত্যি? এত বড় সিদ্ধান্ত না বলে নিতে পেরেছেন তিনি? তারপর আহমদ মুসা ভাইয়ের প্রতিক্রিয়া কি হয়েছে?' ফাতেমা বলল।

'আমি রোসেলিনের কাছে শুনেছি আহমদ মুসার অনুপস্থিতিতে ন্যায় ও যুক্তির দাবী যা সে অনুসারেই মারিয়া আপা সিদ্ধান্ত নেন। আমার মনে হয় এ অধিকার তাঁরই থাকা উচিত এবং তাঁর আছে।' বলল লায়লা।

'একটা ঘটনা ঘটেছে।' ইয়েকিনি বলল।

'কি ঘটনা?' বলল লায়লা।

'আহমদ মুসা ভাই যে দু'টি ঠিকানায় গেছেন, সে দু'টি ঠিকানা মারিয়া আপা চেয়েছিলেন। আহমদ মুসা দিতে চেয়েছিলেন। আমার কাছে তাঁকে ঠিকানা দু'টো দিতে বলেছিলেন মারিয়া আপা। পরে আমি যখন আহমদ মুসা ভাইয়ের কাছে ঠিকানা চাইলাম, তিনি হাসলেন। বললেন, 'ও বিষয়টা তুমি ভুলে যাও, আমিও ভুলে যাই।' মারিয়া আপার কাছে দেয়া কথার বিষয়টা উল্লেখ করে আমি যখন তাকে চাপ দিলাম, তিনি বললেন, 'তোমরা মারিয়া জোসেফাইনকে চেন না। ঠিকানা পেলে কোন কারণ ঘটলে সে ঐ ঠিকানায় ছুটতে পারে। সে অসুস্থ। তার ওঠা নিষেধ।' আমি বলেছিলাম, 'আপনি নিষেধ করলেও?' শুনে তিনি হেসেছিলেন। বলেছিলেন, 'আমার ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত আমি তার উপর চাপিয়ে দিতে পারব না। এক্ষেত্রে সে তার বিচার-বুদ্ধি অনুসারে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারী। সুতরাং তাকে ঠিকানা না দেওয়াটাই সমাধান।'

থামল মুহাম্মাদ ইয়েকিনি।

'তারপর কি ঘটেছিল?' জিজ্ঞেস করল লায়লা।

'পরে টেলিফোনে মারিয়া আপা ঠিকানার কথা বললে আমি তাঁকে ঘটনা জানিয়েছিলাম। তিনি শুনে অনেকক্ষণ চুপ করেছিলেন। তারপর বলেছিলেন, আমি জানতাম উনি ঠিকানা দিতে চাইবেন না। দুনিয়ার সব বিপদ তিনি একা মাথায় তুলে নেবেন, আর তিনি চাইবেন তার বিপদে কেউ এগিয়ে গিয়ে বিপদে না পড়ুক। বলতে বলতে প্রায় কেঁদে ফেলেছিলেন মারিয়া আপা।'

'মারিয়া আপা সত্যিই আহমদ মুসা ভাইয়ের যোগ্য সাথী। তার দুরদৃষ্টির কারণেই তিনি ঠিকানা দু'টি চেয়েছিলেন। ঠিকানা পেলে এখন কিছু করা যেত। মারিয়া আপাকে সব কিছু জানানো দরকার।' বলল লায়লা।

'ঠিক বলেছ লায়লা। টেলিফোন নয়, চল আমরা সেখানে যাই। সেখানে মারিয়া আপার আব্বা আছে, রোসেলিন আছে। পরামর্শ করা যাবে।'

'আমারও তাই মত। ইতিমধ্যে আমাদের সব লোকদের সতর্ক করা কি দরকার নয়। আহমদ মুসাকে খোঁজার জন্যে এবং তাকে উদ্ধার করার জন্যে আমাদের সব শক্তিকে কাজে লাগানো দরকার।'

‘ফজরের নামাযের পর সে নির্দেশ আমি দিয়ে দিয়েছি। সকালের মধ্যেই সকলকে আমরা পেয়ে যাব।’

‘চল ওঠা যাক, ভাইয়া।’ বলল লায়লা।

ওরা চারজন উঠে দাঁড়াল।

বেরুবার আগে দেখল, ব্ল্যাক বুল বাইরে থেকে ফিরছে।

রাশিদিদের দেখে দাঁড়াল ব্ল্যাক বুল।

লায়লা এবং ফাতেমা মাথার কাপড় আরও টেনে কপালের আরেকটু নিচে নামিয়ে পাশে সরে গেল।

‘কিছু জানা গেল?’ রাশিদির দিকে চেয়ে শুকনো কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ব্ল্যাক বুল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাশিদি বলল, ‘কিছু জানতে পারিনি, কিছুই বুঝতে পারছি না।’

‘চিন্তা করবেন না শাহজাদা, বন্দী আহমদ মুসাকে আমি দেখেছি। বন্দী করলে চিন্তার কোন দাগও পড়তে দেখিনি তার কপালে। এই মানসিক শক্তিকে পরাভূত করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। আমি মনে করি মুক্ত আহমদ মুসার মতই বন্দী আহমদ মুসা অপ্রতিরোধ্য।’

‘আল্লাহ আপনার কথা কবুল করুন।’ একটু থামল রাশিদি।

তারপর বলল, ‘আমাকে শাহাজাদা বলছেন কেন? ইয়েসুগো রাজ পরিবারের সন্তান হিসেবে আমি যদি শাহজাদা হই তাহলে আপনিও তো শাহজাদা।’

কথা শেষ করে রাশিদি ইয়েসুগো না থেমেই বলল, ‘আমরা চীফ জাষ্টিসের ওখানে যাচ্ছি। আপনি এদিকে খেয়াল রাখবেন।’

বলে রাশিদি গাড়ির দিকে এগুতে যাচ্ছিল। ব্ল্যাক বুল বলল, ‘আমার কোন প্রয়োজন হলে আমাকে বলবেন। আমার তিনটি অস্ত্র আছে, কুকুর তিনটি আহমদ মুসার গন্ধের সাথে পরিচিত। তারা আমাদের খোঁজার ব্যাপারে মূল্যবান সাহায্য করতে পারে।’

রাশিদি থমকে দাঁড়িয়েছিল। শুনে বলল, ‘ধন্যবাদ আবদুল্লাহ, অবস্থা তেমন হলে দরকার হতেও পারে।’ বলে তারা গাড়ির দিকে এগুলো।

গাড়ির ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল রাশিদি। তার পাশের সিটে ইয়েকিনি। পেছনের সিটে বসল লায়লা ইয়েসুগো এবং ফাতেমা মুনেকা।

রোসেলিনদের ফ্যামিলি ড্রইং রুমে বসেছে সবাই।

ব্যান্ডেজ বাঁধা বাম হাত ডান হাত দিয়ে ধরে সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে বসে আছে ডোনা জোসেফাইন। সাদা গাউন আর সাদা চাদরে আবৃত তার দেহ। কপালের নিচে থেকে মুখের অবশিষ্ট অংশটাই শুধু দেখা যাচ্ছে। ক্লান্তি ও বেদনায় জর্জরিত তার মুখ। যেন অপরূপ এক ফুল বিধ্বস্ত হয়েছে ঘূর্ণি ঝড়ের চতুর্মূখী দোলায়। তার দু’পাশে বসে রোসেলিন এবং লায়লা। আর রোসেলিনের পাশে এলিসা গ্রেস। আর লায়লার পাশে ফাতেমা মুনেকা।

তাদের মুখোমুখি সোফায় বসে আছে ডোনার আব্বা এবং রোসেলিনের আব্বা।

পাশের সোফায় পাশাপাশি বসে রাশিদি ইয়েসুগো এবং মুহাম্মাদ ইয়েকিনি।

রাশিদির দেয়া দুঃসংবাদ শুনে ডোনা একটি কথাও বলেনি। শুধু চোখটা বুজে গিয়েছিল তার। আর মুখটা শক্ত হয়ে উঠেছিল। সম্ভবত ভেতরের বিস্ফোরণের প্রকাশ ঠেকাবার জন্যে বাধার শক্ত দেয়াল খাড়া করতে চেয়েছিল সে।

ডোনার আব্বাও নীরব। তার চোখে-মুখে দুর্ভাবনার গাঢ় কাল ছায়া।

‘থানা, হাসপাতাল ইত্যাদি চেক না করে কি বলতে পারি আহমদ মুসা শত্রুর হাতে পড়েছে?’ বলল চীফ জাস্টিস।

এই সময় চীপ জাস্টিসের টেলিফোন বেজে উঠল।

রোসেলিন উঠে গিয়ে টেলিফোন ধরল।

টেলিফোনে কথা বলেই সে তার আব্বাকে বলল, ‘আপনার টেলিফোন।’

চীফ জাস্টিস উসাম বাইক উঠে গিয়ে টেলিফোন ধরল।

টেলিফোন ধরেই চীফ জাস্টিসের মুখ ম্লান হয়ে গেল। সে কথা বলল না, শুধু শুনলই। শুনতে শুনতে তার চোখ-মুখ উদ্বেগে ভরে গেল।

সবশেষে 'ভেবে উত্তর দেব' বলে টেলিফোন রেখে দিল চীফ জাস্টিস।

চীফ জাস্টিস উসাম বাইকের মুখ-ভাবের মারাত্মক পরিবর্তন সবাই লক্ষ্য করেছিল। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল সবাই।

চীফ জাস্টিস টেলিফোন রাখতেই ডোনার আব্বা মিশেল প্লাতিনি বলে উঠল, 'কি খবর মিঃ জাস্টিস? খারাপ কিছু?'

চীফ জাস্টিস তার নিচু মুখ না তুলেই বলল, 'আহমদ মুসা ওকুয়া'র হাতে বন্দী।'

খবরটা বজ্রপাতের মতই ধ্বনিত হলো সকলের কাছে। সকলের মাথাই নুয়ে পড়েছে প্রচন্ড আঘাতে। শুধু ডোনার মুখটাই খাড়া। সে চোখ খুলেছে। মুখটা তার আরও শক্ত হয়ে উঠেছে।

অসহ্য এক নীরবতায় ছেয়ে গেছে গোটা ড্রইং রুম।

রোসেলিন, লায়লা ও ফাতেমা ধীরে ধীরে তাদের নত চোখটা তুলে তাকাল ডোনার দিকে।

তারা ডোনার খাড়া মাথা, চোখ-মুখের অদ্ভুত দৃঢ়তা দেখে বিস্মিত হলো। কিন্তু পরক্ষণেই তাদের মনে পড়ল, ডোনা জোসেফাইন ফ্রান্সের রাজকুমারী এবং আহমদ মুসার বাগদত্তা, আর দু'দশটা মেয়ের সাথে তার তুলনা চলে না।

নীরবতা ভাঙ্গলেন চীফ জাস্টিস নিজেই। বললেন তিনি, 'আরও কিছু খারাপ খবর আছে।'

'কি সে খবরগুলো।' ফ্যাকাশে ত্বরিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রোসেলিন।

চীফ জাস্টিস উসাম বাইক সবার উপর একবার চোখ বুলালেন। তারপর বললেন, 'এখানে বাইরের লোক নেই। সব কথাই আমি এখানে বলতে পারি।'

থামলেন চীফ জাস্টিস। একটু ভেবে নিয়ে তিনি বললেন, 'টেলিফোন করেছে 'ওকুয়া'র পক্ষ থেকে ব্ল্যাক ক্রসের প্রধান পিয়েরে পল।'

তারপর চীফ জাস্টিস ডঃ ডিফরজিস এবং ওমর বায়াকে বন্দী রেখে চাপ দিয়ে কিভাবে ওমর বায়ার সম্পত্তি তারা গ্রাস করতে চাচ্ছে তার বিবরণ দিয়ে বলল, 'আগামী কাল তারা উকিলের মাধ্যমে তাদের কেস আমার কোর্টে নিয়ে আসবে। আমি যদি ওমর বায়ার সম্পত্তি তাদের হাতে তুলে দেয়ার ব্যবস্থা না করি, তাহলে তার ডঃ ডিফরজিসকে আগামী কালই খুন করবে এবং ওমর বায়াকে আপাতত পঙ্গু করে দেবে। দ্বিতীয়ত বলেছে, কুন্তে কুম্বার মুসলমানরা যদি আগামী পরশুর মধ্যে সেখানে আটক কোক'এর লোকদের ছেড়ে না দেয়, তাহলে আহমদ মুসাকে তারা হত্যা করবে।'

থামলেন চীফ জাস্টিস উসাম বাইক।

আবার নেমে এল সেই নীরবতা। সকলের চোখে-মুখে উদ্বেগ ও বিষাদের ছায়া।

বেশ কিছুক্ষণ পর রোসেলিন বলল, 'তারা দেশের চীফ জাস্টিসকে এইভাবে হুমকি দিতে পারল?'

'পারল। কারণ আমি পুলিশের সাহায্য নিতে পারছি না। পুলিশকে বললেই ওরা হত্যা করবে ডঃ ডিফরজিসকে। তাঁর প্রতি আমার দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছে তারা।' বলল চীফ জাস্টিস শুষ্ক কণ্ঠে।

'তুমি কি জবাব দেবে আব্বা ওদের?' বলল রোসেলিন।

'ওদের দাবী আমি মেনে নেব না। যে পরিণতিই হোক।' বলল চীফ জাস্টিস।

'এখন কি করনীয় আমাদের? বলল রাশিদি ইয়েসুগো।'

'পুলিশকে যদি সব ব্যাপার জানানো হয়, তাতে কি লাভ হবে?' বলল চীফ জাষ্টিস।

'ওকুয়া'র কোন ঠিকানা আমাদের কাছে নেই। পুলিশ নিশ্চয় ওদের কিছু ঠিকানা জানে। তারা যদি সত্যিই সক্রিয় হয়, তাহলে কিছু ফল হতে পারে।' বলল ডোনার আব্বা মিশেল প্লাতিনি।

'আমিও এযুক্তির সাথে এক মত।' বলল মুহাম্মাদ ইয়কিনী।

‘আমাদের কাছে যখন ‘ওকুয়া’র কোন ঠিকানা নেই, তখন পুলিশের সাহায্য ভাল মনে করি।’ বলল রাশিদি ইয়েসুগো।

‘পুলিশকে জানানোর মধ্যে ঝুঁকি আছে। তাছাড়া পুলিশকে সব কথা যেমন আহমদ মুসার কথা বলা যাবে না। সুতরাং পুলিশকে আমি না জানানোই ঠিক মনে করি।’ বলল ডোনা।

‘কিছু তো আমাদের করতে হবে, কিন্তু কোন পথে এগুবো আমরা?’ বলল রাশিদি ইয়েসুগো।

‘আহমদ মুসা যে দু’টো ঠিকানার সন্ধানে গেছে, সে দু’টো ঠিকানা আমি ওঁর কাছে চেয়েছিলাম। উনি দেননি। আমার মনে হয় আল্লাহর কোন ইচ্ছা এর মধ্যে আছে। আহমদ মুসা নিজের স্বার্থে কিছু করছেন না। আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং মানুষের কল্যাণের জন্যে তিনি কাজ করছেন। সুতরাং আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করবেন। আমি অপেক্ষা করার পক্ষপাতি।’

একটু থামলো ডোনা। একটা ঢোক গিলে আবার শুরু করল, ‘ইতিমধ্যে এটা কাজ করা যায়। যে গাড়ি নিয়ে ওরা পার্কে হাইজ্যাক করতে গিয়েছিল, সেই গাড়ির নাম্বার আমার কাছে আছে। নতুন গাড়ি, লেটেষ্ট মডেলের। সুতরাং নাম্বার নিয়ে রেজিষ্ট্রেশন অফিসে গিয়ে গাড়ির মালিকের ঠিকানা বের করা কঠিন হবে না। এভাবে একটা ঠিকানা ওদের আমরা বের করতে পারি।’

কথা শেষ করে ডোনা তার হাত ব্যাগ থেকে এক টুকরো কাগজ তুলে ধরল রাশিদি ইয়েসুগোর দিকে।

রাশিদি কাগজটি হাতে নিয়ে গাড়ির নাম্বারের দিকে এক চোখ বুলিয়ে পকেটে রেখে দিয়ে বলল, ‘আলহামদুলিল্লাহ, চলার একটা পথ পেয়েছি আমরা।’

বলে রাশিদি উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘আমি এবং ইয়েকিনি এখন রেজিষ্ট্রেশন অফিসে যাচ্ছি। লায়লা তোমরা বাড়ি চলে যেও। আমরা গাড়ি রেখে যাচ্ছি।’

‘না, তুমি তোমার গাড়ি নিয়ে যাও। আমি লায়লাদের বাড়ি পৌঁছে দেব।’

‘না রোসেলিন, তোমার এখন বাইরে বেরুনো চলবে না। সংকট না কাটা পর্যন্ত তুমি ওদের টার্গেট।’ বলল ডোনা।

‘বাহ! আপা। আপনি যে আহমদ মুসার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন।’ হেসে বলল রোসেলিন।

‘মারিয়া মা ঠিকই বলেছে। রাশিদি যেভাবে বলেছে, সেটাই ভাল।’ বলল চীফ জাষ্টিস উসাম বাইক।

‘ঠিক আছে, তাই হবে।’ বলে রাশিদি ইয়েসুগো ডোনার আব্বা এবং চীফ জাষ্টিসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলতে শুরু করল।

তার পিছু নিল মুহাম্মাদ ইয়েকিনি।

ডোনার আব্বা মিশেল প্লাতিনি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ‘আমি বিদায় চাচ্ছি। ফরাসী দূতাবাসে এবং ফ্রান্সে জরুরী কয়েকটা কথা বলতে হবে।’

চীফ জাষ্টিসও উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘মা তোমরা বস। অফিসে যাওয়ার আগে আমাকে কিছু জরুরী কাজ সারতে হবে।’

ওরা উঠে যাবার পর প্রথম কথা বলল ফাতেমা মুনেকা। বলল, ‘মারিয়া আপা, আমরা উদ্বেগে-আতংকে শেষ হয়ে যাচ্ছিলাম। আপনার কথা আমাদের সাহস ফিরিয়ে দিয়েছে।’

‘ধন্যবাদ। উদ্বেগ-আতংক আমার মধ্যেও আছে। প্রকাশ হলে তা আরও বাড়বে। তাই সাহস দিয়ে তা ঢেকে রাখছি।’ ম্লান হেসে বলল ডোনা।

‘দেখছি, আহমদ মুসা ভাইয়ের অনেক গুণ আপনি পেয়েছেন।’ বলল লায়লা।

‘না কিছুই না। আর উনি চান না, তাঁর মত কেউ বন্দুক হাতে নিক।’ ডোনা বলল।

‘কেন?’ বলল লায়লা।

‘তাঁর মতে আজ অস্ত্রের যুদ্ধের চেয়ে বুদ্ধির যুদ্ধ বেশী জরুরী।’

‘কিন্তু শক্তি ও অস্ত্রের যুদ্ধে হেরেছি বলেই তো আমরা ক্যামেরুন থেকে উচ্ছেদ হতে চলেছি। আমাদের শক্তি ও অস্ত্রই আমাদের ভাগ্য ফেরাতে পারে।’ বলল ফাতেমা মুনেকা।

‘কিন্তু উনি বলেন, জ্ঞান, বুদ্ধি ও সংস্কৃতির যুদ্ধে পরাজিত হবার পর অস্ত্রের যুদ্ধে পরাজয়ের পর্যায় আসে। বুদ্ধির যুদ্ধে শক্তিশালী হলে অস্ত্রের যুদ্ধের

প্রয়োজনই হয় না। বিশেষ করে বর্তমান বিশ্বে, যখন সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক যুদ্ধ প্রথম ও প্রধান বিষয় হিসেবে কাজ করছে।'

'এসব উনি বলেন। আপনি কি বলেন?' বলল লায়লা।

'এই ক্ষেত্রে আমার অভিজ্ঞতা কম। তবে সত্য যেটা তা হলো, প্রকৃত পক্ষে অস্ত্র যুদ্ধ করে না, যুদ্ধ করে বুদ্ধি। যুদ্ধ করার যতগুলো অস্ত্র বুদ্ধির রয়েছে, তাদের মধ্যে অস্ত্র মাত্র একটি। সুতরাং সবক্ষেত্রেই বুদ্ধিরই প্রধান ভূমিকা। সুতরাং আমি তার সাথে একমত। কিন্তু ... ...'

'কিন্তু কি?'

'কিন্তু শত্রুর হাতে অস্ত্র যখন উদ্যত হয়, যখন তাঁর হাতেও অস্ত্র থাকে, তখন আমাকে তিনি অস্ত্র হাতে নিতে নিষেধ করবেন আমি তা মানি না।' বলতে বলতে ডোনার কন্ঠ ভারি হয়ে উঠল।

'আপা, আমার মনে হয় এটা আপনি ও তাঁর মধ্যকার নিজস্ব ব্যাপার। আপনার কাছ থেকে তাঁর এটা বিশেষ চাওয়া, সাধারন কোন নীতি নয়।' বলল ফাতেমা মুনেকা।

'এটা আমি বুঝি।' বলে ডোনা আমিনার করুন কাহিনী তাদের জানাল এবং বলল, 'এখন উনি এমন একটা শান্তির গৃহাঙ্গন চান যা বারুদের গন্ধে পীড়িত হবে না।'

'এই চাওয়া তার সঙ্গত নয় কি?' বলল রোসেলিন।

'সংগত, কিন্তু স্বাভাবিক নয়। তিনি এবং তাঁর গৃহাঙ্গন পরস্পর বিচ্ছিন্ন বা আলাদা হতে পারে না। তিনি যদি বারুদের গন্ধে প্লাবিত হন, তাহলে সে গন্ধ তার বাড়ির পরিবেশকে প্লাবিত করবেই।' বলল ডোনা।

'আপনিও সংগত কথা বলেছেন আপা।' বলল লায়লা।

'তিনিও এটা মানেন। তাই তিনি নির্দেশ দেন না আকাঙ্খা করেন মাত্র।' ডোনা বলল।

লায়লা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার কাছ থেকে উঠতে ইচ্ছা করছে না, কিন্তু উঠতে হয় আমাদের।'

‘আমার সৌভাগ্য। আপনাকে দেখার আকাঙ্খা আমার পূরণ হলো।’ বলল ফাতেমা মুনেকা।

‘আমাকে দেখার আকাঙ্খা? কিভাবে জানলেন আমার কথা?’ ডোনা বলল।

‘আহমদ মুসা ভাই কুন্তে কুম্বা থেকে আসার সময় বলেছিলেন, ভাগ্য ভাল হলে ক্যামেরুনে তাকে দেখতেও পার।’ বলল ফাতেমা।

‘আমার প্রসঙ্গ উঠলো কি করে?’

‘তার কথায় আমি বুঝেছিলাম।’ বলল ফাতেমা মুনেকা।

‘বলেছিলেন উনি, যে আমাকে ক্যামেরুনে দেখতেও পার! কিন্তু আমি যে ক্যামেরুনে আসব, তা আসার আগের দিন পর্যন্ত আমি ভাবতেও পারিনি। উনি জানলেন কি করে!’

থামল ডোনা। তার চোখ দু’টি বুজে এল। একটা আবেগের আবেশ তার অপরূপ লাবণ্যকে যেন শতগুণ বাড়িয়ে দিল। ধীরে ধীরে অনেকটা স্বগত কন্ঠে বলল, ‘এ জন্যে তিনি আহমদ মুসা। কি কি হলে কি ঘটে বা ঘটতে পারে, তা যেন সূর্য উঠার মতই তিনি দেখতে পান!’

ডোনা যেন নিজের মধ্যে নিজে হারিয়ে যাচ্ছে। তাকে বিরক্ত করতে দ্বিধা হলো লায়লার। তবু বলল, ‘আপা অনুমতি দিন, উঠব।’

চোখ খুলে সোজা হয়ে বসল ডোনা। বলল, ‘তোমরা যাবে? কিন্তু বিকেলে আসবে তো? আমার কথাই শুধু বললাম। তোমাদের কথা কিছুই শোনা হয়নি।’

‘আসব আপা।’ বলে উঠে দাঁড়াল লায়লা। তার সাথে উঠল ফাতেমা মুনেকা।

ডোনা উঠতে যাচ্ছিল। রোসেলিন তাকে ধরে তুলল।

লায়লা ডোনাকে বাধা দিয়ে বলল, ‘না আমাদের এগিয়ে দিতে হবে না আপনার।’ তারপর লায়লা রোসেলিনের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘তুমি ওঁকে নিয়ে শুইয়ে দাও। বহুক্ষণ উনি বসে আছেন।’

‘ঠিক আছে আমি এগুচ্ছি না। কিন্তু তোমরা বিকেলে আসবে।’

‘আসব আপা’ বলে লায়লা ও ফাতেমা মুনেকা বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

সামনে বোমা ফাটলেও এতটা বিস্মিত হতো না ওকোচা'র আব্বা-আম্মা, যতটা বিস্মিত হলো তারা তাদের রাতের মেহমান, তাদের ওকোচার জীবন রক্ষাকারী বিস্ময়কর লোকটির আটক হওয়ার কথা শুনে।

ওকোচা'র স্ত্রী তার কথা শেষ না করতেই ওকোচা'র আব্বা-আম্মা ছুটল ওকোচা'র ঘরের দিকে। তাদের পিছনে পিছনে ওকোচা'র স্ত্রীও।

ঘরে ঢুকে তারা দেখল, ওকোচা মাথায় হাত রেখে শুয়ে আছে। তার মুখ চুপসে গেছে। সেখানে দুঃখও আছে, আতংকও আছে।

তার আব্বা-আম্মাকে ঘরে ঢুকতে দেখে সে উঠে বসল।

'বৌমা'র কাছে একি শুনলাম! তুই নাকি বলেছিস, আমাদের গত রাতের মেহমান কোথাও আটক হয়েছে? ওটা ফ্যাংগ গোষ্ঠীর কাজ না তো?' বলল ওকোচা'র আব্বা।

'হ্যাঁ, উনি আটক হয়েছেন, তবে ফ্যাংগরা তাকে আটক করেনি।'

'তাহলে কারা তাকে আটক করেছে?'

ওকোচা মুখ তুলে পিতার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল। তারপর বলল, 'সেটা খুব খারাপ খবর আব্বা?'

'কি বলতে চাচ্ছিস? কারা আটক করেছে তাঁকে?'

'ওকুয়া' তাঁকে আটক করেছে।'

'ওকুয়া?' মুখটা ফেঁকাশে হয়ে গেল ওকোচা'র আব্বার।

কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না ওকোচা'র আব্বা। বিস্ময় ও উদ্বেগে কন্ঠ রুদ্ধ হয়ে এসেছিল তার।

পরে শুষ্ক কন্ঠে সে বলল, 'ওকুয়া'র লোকদের সাথে তাঁর কি ঝগড়া হয়েছিল?'

'না, এ কারণে তিনি আটক হননি।'

'তাহলে তুই ফাদার ফ্রান্সিস বাইককে টেলিফোন কর। ওঁকে ছাড়িয়ে আনতে হবে। এ খবর শুনে তুই এসে শুয়ে পড়েছিস কেন? তোর দায়িত্বটাই বড়।'

'ফ্রান্সিস বাইককে টেলিফোন করে কোন লাভ হবে না। তিনি এবং মিঃ পিয়েরে পল স্বয়ং তাকে আটক করেছেন।'

কথাটা শোনার সাথে সাথে ওকোচা'র আব্বা ভয়ে ও বেদনায় যেন একেবারে কুঁচকে গেল।

পাশের চেয়ারে সে ধপাস করে বসে পড়ল। যেন এক নিমিষেই তার শরীরের সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে।

ওকোচা'র গোটা পরিবার 'কোক'(কিংডোম অব ক্রিস্ট)-এর সাথে জড়িত। ওকোচা'র আব্বা জোসেফ বেল 'কোক'-এর আঞ্চলিক একজন দায়িত্বশীল। ওকোচা এবং তার ভাইরাও 'কোক'-এর সদস্য। ওকুয়া'র প্রধান ফাদার ফ্রান্সিস বাইক 'কোক'-এরও প্রধান হওয়ার পর দুই সংস্থা প্রায় এক হয়েছে। কার্যত 'ওকুয়া'ই এখন সব কিছু চালাচ্ছে। সুতরাং জোসেফ বেলের পরিবারও আজ কার্যত ওকুয়া'র অধীন।

চেয়ারে বসে পড়ার পর ওকোচা'র আব্বা জোসেফ বেল দুর্বল কন্ঠে বলল, 'তুই কি ভাল করে খোঁজ নিয়ে একথা বলছিস? তুই জানতে পারলি কি করে?'

'কোক-এর কর্মীদের আজ হেড কোয়ার্টারে ডেকেছিল ফাদার ফ্রান্সিস বাইক। উদ্দেশ্য ছিল, ইদেজা'র ঘটনা এবং সাম্প্রতিক সব বিপর্যয়ে হতাশ কর্মীদের উৎসাহিত করা। আমি গিয়েছিলাম।

স্বয়ং ফাদার ফ্রান্সিস বাইক এবং মিঃ পিয়েরে পল আমাদের সাথে কথা বললেন। শুরুতেই ফাদার জানালেন, 'ইদেজা ও কুন্তে কুম্বায় যে বিদেশীর কারণে আমাদের বিপর্যয় ঘটেছে, যে বিদেশীর হাতে এ পর্যন্ত আমাদের জনা তিরিশেক লোক নিহত হয়েছে, সেই বিদেশী আজ আমাদের হাতে ধরা পড়েছে। তোমরা জেনে খুশী হবে, এই লোকটি ক্যামেরুনে আসার পর আমাদের শুধু বিপর্যয় নয়, আমাদের অস্তিত্বও বিপন্ন হয়ে উঠেছিল, তাকে বন্দী করার পর আমরা সকল বিপদ থেকে মুক্তি পেলাম।'

তারপর তিনি মিঃ পিয়েরে পলের সাথে আলোচনা করে আমাদের বললেন, 'চল তোমাদেরকে সেই ভয়ংকর লোকটিকে দেখানো হবে।' বলে আমাদের  নিয়ে যাওয়া হলো নিয়ন্ত্রণ কক্ষে। সেখানে বসে বিভিন্ন টিভি স্ক্রীণে বাড়ির প্রত্যেকটি অংশ দেখা যায়।

আমাদেরকে একটা টিভি স্ক্রীণের সামনে বসানো হলো। টিভি স্ক্রীণে নজর পড়তেই আমি চমকে উঠলাম। দেখলাম আমাদের মেহমানকে। তার হাতে হাতকড়া এবং পায়ে বেড়ি পরানো।'

থামল ওকোচা। মুখ নিচু করল সে।

ওকোচার আব্বা জোসেফ বেল বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে ওকোচার দিকে। তার চোখে যেন বিস্ময় ও বেদনা পাগলের মত নৃত্য করছে।

'তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগগুলো কি সত্য?'

'সত্য মনে হয় না, কিন্তু সত্য।'

'অনেক বছর হলো আমি পৃথিবীতে এসেছি। কত মানুষ দেখেছি। মানুষের চোখের দিকে তাকালেই বলে দিতে পারি সে কেমন মানুষ। আমি রাতের মেহমানকে দেখেছি। দুনিয়া এক বাক্যে বললেও আমি বিশ্বাস করবো না যে, সে ক্রিমিনাল। তার চোখে মুখে কোন পাপের স্পর্শ আমি দেখিনি। গতকাল 'ফ্যাংগ'দের ব্যাপারে যে পরামর্শ সে আমাকে দিয়েছে, সে ধরণের পরামর্শ কোন ক্রিমিনালের মাথা থেকে বের হওয়া অসম্ভব।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন আব্বা। আজ টিভি স্ক্রীণে বন্দী অবস্থায় তাকে দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। দেখলাম তিনি দেয়ালে হেলান দিয়ে খাটিয়ায় বসে আছেন। তিনি যে বন্দী মুখ দেখে তা বুঝা যায় না। মনে হয় তিনি যেন ড্রইং রুমে নিশ্চিন্তে বসে আছেন। প্রসন্ন মুখ তার। নিশ্চিন্ত তাঁর দৃষ্টি। সমগ্র চেহারায় একটা পবিত্রতা। কিন্তু আব্বা তবু অভিযোগগুলো সত্য।'

'অসম্ভব ওকোচা।'

'আব্বা, তাঁর আরও পরিচয় আছে।'

'কি পরিচয়?'

‘তিনি আহমদ মুসা। কোক, ওকুয়া’র সাথে লড়াই করার জন্যেই তিনি ক্যামেরুনে এসেছেন।’

‘আহমদ মুসা? মুসলিম বিপ্লবী, যার সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী পত্র-পত্রিকায় অনেক লেখালেখি হয়েছে, সেই আহমদ মুসা?’ বিস্ময় বিজড়িত কন্ঠে বলল ওকোচা’র আব্বা জোসেফ বেল।

‘হ্যাঁ আব্বা, কোন সন্দেহ নেই।’

উত্তরে কিছু বলল না জোসেফ বেল। তার শুণ্য দৃষ্টি ওকোচার দিকে নিবদ্ধ। অনেকক্ষণ কথা বলল না সে।

এক সময় গা এলিয়ে দিল চেয়ারে। বলল,’ঠিক বলেছিস ওকোচা। উনি আহমদ মুসা হলে তবেই তার সব কজ, সব কথা, সব আচরণের যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায়।’

একটু থামল। থেমেই আবার শুরু করল জোসেফ বেল, ‘তুই লড়াই-এর কথা বললি। ‘কোক’ ও ওকুয়া’র সাথে তাঁর কিসের লড়াই?’

‘আমি সব জানিনা। তবে শুনেছি, মুসলমানদের সম্পত্তি উদ্ধারই মূল বিষয়। তাছাড়া ‘ওকুয়া’র হাতে বন্দী দু’জনকে উদ্ধার করতে চায় আহমদ মুসা।’

‘তাই হবে। আহমদ মুসা যে দেশেই গেছে, এ ধরণের কাজ নিয়েই গেছে।’

থামল জোসেফ বেল।

ওকোচাও কোন কথা বলল না।

কিছুক্ষণ নীরবতা।

নীরবতা ভাঙ্গল ওকোচার মা। বলল, ‘লোকটাকে ওরা বন্দী রেখে কি করবে?’

‘যা শুনলাম, তাতে বুঝলাম। তাকে বন্দী রেখে ‘ওকুয়া’ কুন্তে কুম্বায় ‘কোক’-এর বন্দী লোকদের মুক্ত করবে। তারপর তাকে হত্যা করবে অথবা বিক্রি করে দেবে।’

‘বিক্রি করে দেবে?’ বলল জোসেফ বেল।

'হ্যাঁ। আমি শুনলাম ইহুদিদের সংগঠন সিনবেথ, ইরগুন জাই লিউমি, বামপন্থী সংগঠন 'ফ্র' এবং শ্বেতাঙ্গ সংগঠন ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান তাকে কোটি কোটি ডোলার দিয়ে কিনে নিতে রাজী আছে।'

'কিনে ওরা কি করবে?' জিজ্ঞেস করল ওকোচার মা।

'কি বল মা, ও নাকি দুনিয়ার সব চেয়ে বড় মানুষ। ওকে হাতে রেখে বড় বড় মুসলিম রাষ্ট্রকে ব্ল্যাকমেইল করা যায়। যা ইচ্ছে তা আদায় করা যায়।'

থামল ওকোচা। আবার নীরবতা।

এবার নীরবতা ভাঙ্গল ওকোচা'র স্ত্রী। বলল,'আমাদের কি কিছু করণীয় আছে?'

কেউ উত্তর দিল না। ওকোচার আব্বা জোসেফ বেল এবং ওকোচা দুজনেরই মুখ নিচু।

'লোকটির পরিচয় যাই হোক, সে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওকোচাকে বাঁচিয়েছে। আবার ফ্যাংগ'দের সাথে আমাদের বড় ধরণের সঙ্ঘাত বাধত, সেটাও সে রোধ করেছে। তার পরামর্শে সঙ্ঘাত ও রক্তারক্তি থেকে যে ফল পেতাম তার চেয়ে বেশী ফল পেয়েছি। তাকে সাহায্য করা কি আমাদের মানবিক দায়িত্ব নয়?' বলল ওকোচার স্ত্রী।

এবার কথা বলল জোসেফ বেল। বলল, 'বৌমা তোমার প্রত্যেকটা কথা সত্য। তাকে সাহায্য করা অবশ্যই আমাদের দায়িত্ব। ইচ্ছা হচ্ছে, এখনি ছুটে যাই তাকে উদ্ধার করে আনি, তাতে আমার যে ক্ষতি হয় হোক। কিন্তু তা পারছিনা।'

থামল জোসেফ বেল। তার শেষের কথাগুলো ভারী হয়ে উঠল।

একটু থেমেই আবার শুরু করল, 'লড়াইটা 'কোক' এবং 'ওকুয়া'র সাথে। সঙ্গঠন দুটো আমাদের অর্থাৎ জাতির। জাতির বিরুদ্ধে আমরা কেমন করে যাব? ধর্মের বিরুদ্ধে আমরা কেমন করে যাব? যদি যাই আমাদের তাহলে মানবতা কেউ দেখবে না। বলবে বিশ্বাসঘাতক। বলবে আমরা শত্রুর কাছে অর্থের বিনিময়ে বিক্রি হয়ে গেছি। নিজেদের ধ্বংস করার মত এই দায়িত্ব আমি কেমন করে নেব, কেমন করে আমি তোমাদের নিতে বলব।'

থামল জোসেফ বেল।

একটা অসহায় ভাব তার চোখে-মুখে। কাঁপছিল তার কন্ঠ।

ওকোচা'র স্ত্রী মুখ নিচু করেছে। ওকোচার মুখে কোন কথা নেই। সে মাথা নিচু করে বসে আছে।

ওকোচা'র আব্বা জোসেফ বেলই আবার বলতে শুরু করল, 'আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি আহমদ মুসার প্রতি সদয় হোন, মুক্ত করুন তাকে বন্দীদশা থেকে।'

বলে চোখের কোণ দু'টো মুছে উঠে দাঁড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তার সাথে সাথে বেরিয়ে গেল ওকোচার মা'ও।

তারা বেরিয়ে যাবার সাথে সাথে অগাস্টিন ওকোচা আবার শুয়ে পড়ল। বাম হাতটা এনে রাখল কপালের উপর। চোখ দু'টি তার বন্ধ। মুখের চেহারা তার বিধ্বস্ত।

ওকোচার স্ত্রী গিয়ে ওকোচার মাথার কাছে বসল। ওকোচার মাথায় হত রেখে তার চুল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, 'কি ভাবছ তুমি?'

ওকোচা স্ত্রীর একটা হাত হাতের মুঠোয় নিয়ে চোখ না খুলেই বলল, 'তুমি যা ভাবছ তাই।'

'তুমি যে কিছু বললে না?'

'আমি ভাবছি।'

'ভাবনার ফল কি হবে?'

ওকোচা চোখ খুলল। স্ত্রীর হাতটা বুকে চেপে ধরে বলল, 'আমি সে সময়ের কথা কিছুতেই ভুলতে পারছি না। রক্তাক্ত ও অবসন্ন আমাকে এক হাতে ধরে অন্য হাতে রিভলবার বাগিয়ে তেড়ে আসা লোকদের তিনি বলেছিলেন, আর এক পা এগুলে নির্বিচারে গুলী চালাব। তোমাদেরকে আইন হাতে তুলে নিতে দেব না। এ দোষী হলে তোমরা আইনের কাছে যাও। এই কথা যিনি বলতে পারেন তিনি কোন আইন ভাঙ্গতে পারেন না। আসলে তিনি অন্যায়ের প্রতিকার করতে এসেছেন। আমি আব্বার মত করে জাতির অন্যায়কে ভালোবাসতে পারব না।'

ওকোচা'র শেষের কথাগুলো আবেগের অশ্রুতে সিক্ত হয়ে উঠেছিল।

'তাহলে কি করবে তুমি?'

‘কি করব আমি জানি না।আমাকে ভাবতে দাও।’

ওকোচার স্ত্রী ওকোচার একটা হাত তুলে নিয়ে চুমু খেয়ে বলল, ‘তুমি বিপদে ঝাঁপিয়ে পড় আমি তা চাইব না। কিন্তু তোমার সাথে আমি এক মত। এবং আমি মনে করি, কর্তব্যের চেয়ে নিজেদের নিরাপত্তার ভয় বড় হতে পারে না।’

ওকোচা ম্লান হাসল। স্ত্রীর হাত মুঠোয় নিয়ে চাপ দিয়ে বলল, ‘তোমাকে বাছাই করতে পেরে, ভালোবাসতে পেরে আমার গর্ব হচ্ছে। ফ্যাংগ-সর্দারের মেয়ের উপযুক্ত কথাই তুমি বলেছ।’

‘দেখ, ফ্যাংগদের হয়তো অনেক দোষ আছে। কিন্তু ‘ফ্যাংগ’রা অর্থ-বিত্ত, সুযোগ-সুবিধার কাছে তাদের নীতিবোধকে খুব কমই বিক্রি করে।’ স্বামীর হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে হেসে বলল ওকোচার স্ত্রী।

‘তার মানে বলতে চাচ্ছ, ‘ওয়ান্ডী’রা অর্থের কাছে তাদের নীতিবোধ বিক্রি করে?’ এক টুকরো মিষ্টি হেসে বলল ওকোচা।

‘আমার স্বামীর গোত্রকে আমি তা বলব না। কিন্তু তুমিই দেখ, ‘ওয়ান্ডী’রা খৃস্টান ধর্ম ও পশ্চিমী সভ্যতার দিকে সাংঘাতিকভাবে ঝুঁকে পড়েছে।’

‘ফ্যাংগ’রাও তো মুসলিম ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। তোমার নানার পরিবার তো মুসলমান।’ হেসে বলল ওকোচা।

‘ফ্যাংগরা ঐতিহাসিক ভাবেই মুসলিম ‘ফুলানী’দের সাথে সম্পর্কিত। সুতরাং তারা নীতি বিক্রি করে ওদিকে যাচ্ছে না। তাছাড়া বিক্রি করবে কিসের বিনিময়ে? মুসলিম হলে তো সুযোগ-সুবিধা কমে, বাড়ে না।’

হেসে উঠল ওকোচা। বলল, ‘তোমার পরীক্ষার রেজাল্ট হোক। তোমাকে আইন বিভাগে ভর্তি করে দেব। উকিল বানাব তোমাকে।’

ওকোচার স্ত্রী হেসে উঠে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ওকোচা ঘুমায়নি।

ভোর ৪টা বাজতেই উঠল ওকোচা।

পাশে স্ত্রী অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

স্ত্রীর স্খলিত বসন ঠিক করে দিয়ে বিছানা থেকে উঠল ওকোচা।

স্পোর্টস-এর পোশাক পরে দু'তিন মিনিটের মধ্যেই তৈরী হয়ে গেল সে। ড্রয়ার খুলে রিভলবার বের করে জ্যাকেটের পকেটে রাখল।

তারপর ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিল।

গার্ড রুমে দারোয়ান অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

ওকোচা গেট খুলে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

পেছনে অটোমেটিক গেট আপনাতেই বন্ধ হয়ে গেল।

ওকোচার গাড়িটা ছয় সিটের একটা জীপ।

ওকোচার গাড়ি ওকুয়া'র হেড কোয়ার্টারের পুব পাশের গলি দিয়ে প্রবেশ করল।

গাড়িটা গিয়ে দাঁড়াল হেড কোয়ার্টারটির দক্ষিণে দুই বাড়ির পরের একটা বাড়ির গেটে।

গাড়িটি রাস্তার এক পাশে দাঁড় করিয়ে ওকোচা গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল এবং গেরিলার আনন্দ ধ্বনির মত একটা শীষ দিয়ে উঠল।

গেরিলার এই আনন্দ ধ্বনি 'কোক'দের এবং 'ওকুয়া'রও নিজস্ব পরিচিতি সংকেত।

সংগে সংগে গেট খুলে গেল।

ওকোচা ভেতরে ঢুকে পকেট থেকে বের করে একটা মুখোশ পরে নিল মুখে। তারপর রিভলবার হাতে নিয়ে সোজা প্রবেশ করল গার্ড রুমে।

গার্ড রুমে গার্ড একজন। সে তার রিভলবারটা টেবিলে রেখে একা একা তাস খেলছিল।

ওকোচার বাম হাতে ছিল একটা রুমাল। ওতে আগেই ক্লোরোফরম ঢেলে নিয়েছিল সে।

ওকোচার পায়ের শব্দে গার্ড লোকটি ঝট করে মুখ তুলল। সেই সাথে তার হাত চলে গিয়েছিল রিভলবারের উপর।

ওকোচার রিভলবার তার দিকে তাক করা ছিল। এবার স্বরটা বিকৃত করে বলল, ‘হাত তুলে দাঁড়াও।’

হাত তুলে দাঁড়াল গার্ড লোকটি।

তার মুখ ভয়ে চুপসে গেছে।

ওকোচা তার বুকে রিভলবার ধরে নাকে চেপে ধরল ক্লোরোফরম মাখানো রুমাল।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড। গার্ড লোকটি সংজ্ঞাহীন হয়ে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল।

ওকোচা তার হাত-পা বেঁধে দরজা লক করে বেরিয়ে এল।

বাড়িটা ছোট-খাট একটা গীর্জা।

গীর্জাটা আবাসিক নয়। শুধু রোববারেই খোলা হয়। গীর্জায় থাকে শুধু একজন গার্ড বা প্রহরী, আরেকজন কেয়ারটেকার।

আসলে বাড়িটার গীর্জা-পরিচয়টা একটা মুখোশ মাত্র। ওকুয়া’র একটা গোপন অফিস এটা। গেটম্যান এবং কেয়ারটেকার দু’জনেই ওকুয়া’র লোক।

ওকোচা গার্ডরুম থেকে বেরিয়ে প্রবেশ করল গীর্জায়।

গীর্জার কেয়ারটেকার থাকে গীর্জার মঞ্চের পেছনে ফাদারের জন্যে নির্দিষ্ট কক্ষটিতে।

ওকোচা গিয়ে কক্ষটির দরজায় দাঁড়াল। খুব আস্তে দরজার নব ঘুরিয়ে দরজায় চাপ দিল। দরজা খুলে গেল।

ওকোচার ডান হাতে উদ্যত রিভলবার।

দরজা খুলে দেখল কেয়ারটেকার চেয়ারে বসে ঘুমুচ্ছে।

ওকোচা ক্লোরোফরম ভেজানো রুমাল তার নাকের সামনে ধরল। দু’তিন সেকেন্ডের মধ্যেই তার শরীর আরো নেতিয়ে পড়ল। গাঢ় হলো তার নিঃশ্বাসের শব্দ।

ওকোচা তাকে বেঁধে বাথরুমে ঢুকিয়ে লক করে দিল।

তারপর ওকোচা ঘরটির টেবিলের পাশে দেয়ালের সাথে সেঁটে রাখা আলমারির দিকে এগুলো।

কেয়ারটেকারের কাছ থেকে নেয়া চাবীর গোছা থেকে একটা একটা করে চাবী লাগিয়ে দেখল কোনটা দিয়ে আলমারি খোলা যায়। অবশেষে একটা চাবীতে আলমারির তালা খুলে গেল।

ওকোচা সেই চাবিটি চাবির গোছা থেকে খুলে পকেটে রাখল। তারপর খুলল আলমারির দরজা।

আলমারির দরজা খুলতেই দেখা গেল একটা আলোকোজ্বল সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে।

এই সিঁড়ি আসলে একটা সুড়ঙ্গ পথ। এই সুড়ঙ্গ পথ গিয়ে উঠেছে ওকুয়া'র হেড কোয়ার্টারে ওকুয়া'র প্রধান ফ্রান্সিস বাইকের অফিস রুমের টয়লেটে।

ফ্রান্সিস বাইকের অফিস এবং তার শয়ন কক্ষ পাশাপাশি। মাঝের দেয়ালে রয়েছে দরজা।

ওকোচা আলমারির দরজা বন্ধ করে ডান হাতে রিভলবার বাগিয়ে পা রাখল সিঁড়িতে।

নামতে শুরু করল সিঁড়ি দিয়ে।

ওকোচার চোখে স্থির সংকল্পের চিহ্ন। মুখ হয়ে উঠেছে শক্ত।

আহমদ মুসাকে সাহায্য করার, তাকে মুক্ত করার এই উদ্যোগের সিদ্ধান্ত সে একাই নিয়েছে। এমনকি স্ত্রীকেও জানায়নি।

সে ওকুয়া'কে চেনে তাদের একজন হিসেবে। জানে সে, ধরা পড়লে তার মৃত্যু অবধারিত। কিন্তু এ উদ্যোগে, এই ঝুঁকি নেয়া ছাড়া আহমদ মুসাকে সাহায্যের আর কোন পথ ছিল না। তার প্রাণ রক্ষাকারী আহমদ মুসার সাহায্যে এগিয়ে না গিয়ে বসে থাকা ছিল তার জন্যে অসম্ভব।

সিঁড়ি দিয়ে সুড়ঙ্গে নামতে নামতে ওকোচা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল। আর ধন্যবাদ দিল গীর্জার কেয়ারটেকার তার বন্ধু 'মেডলি'কে। মেডলির কাছ থেকেই সে সুড়ঙ্গ পথের কথা শুনেছে এবং তাকে সাথে নিয়ে একদিন সুড়ঙ্গ পথ দেখেছেও এর শেষ মাথা পর্যন্ত।

সুড়ঙ্গ পথের শেষ মাথায় এসে পৌঁছল ওকোচা। শেষ মাথা থেকে আরেকটা সিঁড়ি উঠেছে উপরের দিকে।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে ওকোচা একটা প্ল্যাটফরমের উপর দাঁড়াল।

ঠিক তার সামনেই একটা দরজা।

সে জানে দরজার পরেই ফ্রান্সিস বাইকের অফিস টয়লেট। টয়লেটে কেউ নেই তো!

ঈশ্বরের নাম নিয়ে ওকোচা দরজার নব ঘুরিয়ে আস্তে আস্তে চাপ দিয়ে দরজা খুলল।

না, টয়লেট ফাঁকা। টয়লেট থেকে বাইরে বেরুবার দরজা বন্ধ।

টয়লেট থেকে বাইরে বেরুবার দরজা খুলতে যাবে এমন সময় গোলাগুলীর শব্দ পেল ওকোচা। কয়েক মুহূর্ত পরে স্টেনগানের আবার সেই ব্রাশ ফায়ার।

চমকে উঠে ওকোচা সরে এল দরজা থেকে।

অপেক্ষা করল মুহূর্ত কয়েক। তারপর এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলল। দেখল ফ্রান্সিস বাইকের অফিস রুম ফাঁকা। তবে অফিস ও ফ্রান্সিস বাইকের শয়ন কক্ষের মাঝের দরজা খোলা।

ওকোচা রিভলবার বাগিয়ে গুটি গুটি পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে চলল।

আহমদ মুসার যখন ঘুম ভাঙল দেখল গোটা ঘর ঘুটঘুটে অন্ধকার।

অন্ধকার কেন?

তাহলে কি ওরা বন্দীরা ঘুমানোর পর লাইট বন্ধ করে দেয়!

আলো নেই মানে টিভি ক্যামেরার চোখও বন্ধ হয়ে গেছে। কেন ওরা এটা করল? আহমদ মুসার হাতে হাতকড়া, পায়ে বেড়ি এবং এক ইঞ্চি পুরু স্টিলের দরজায় তাকে আটকে কি তাহলে ওরা নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে?

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল আহমদ মুসা। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল সে। এই অন্ধকার তার কাজের অনেক সুবিধা করে দেবে।

আহমদ মুসা জুতার সোলের পকেট থেকে ল্যাসার বীম পেন্সিল বের করল। প্রথমে হ্যান্ডকাফের তালা গলিয়ে হ্যান্ডকাফ খুলে ফেলল। তারপর ল্যাসার বীম দিয়ে কেটে ফেলল পায়ের বেড়ি। এগুলো দরজার দিকে।

প্রায় দুই রাত এবং পুরো একদিন তার গত হয়েছে এই বন্দীখানায়। এই বন্দীখানার সবকিছুই তার জানা হয়ে গেছে।

অন্ধকার হলেও খুব সহজেই আহমদ মুসা দরজার লক পয়েন্ট বের করে ফেলল। দিনের বেলা হিসেব করেই রেখেছিল আহমদ মুসা। লক বরাবর দরজার চৌকাঠ ও পাল্লার মাঝ দিয়ে আহমদ মুসার ল্যাসার বীমের তীব্র রে প্রবেশ করাল। কয়েক সেকেন্ডের মাথায় দরজার পাল্লা ঈষৎ কেঁপে উঠল।

খুশী হলো আহমদ মুসা। দরজা খুলে গেছে।

দরজার বাইরে জুতার শব্দ ভেসে এল। শব্দটা ক্রমশ দুর্বল হতে লাগল।

আহমদ মুসা ধীরে ধীরে দরজা ফাঁক করে দেখল, স্টেনগান কাঁধে একজন প্রহরী করিডোর দিয়ে পূব প্রান্তের দিকে চলে যাচ্ছে।

করিডোরের প্রান্তে পৌছার পর প্রহরী ঘুরে দাঁড়াল এবং ফিরতি হাঁটা আবার শুরু করল।

আহমদ মুসা দরজা ভেজিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

প্রহরীর পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে। আহমদ মুসার দরজার সামনে এসে পায়ের শব্দ বন্ধ হয়ে গেল।

প্রহরীটি দাঁড়িয়েছে বুঝতে পারল আহমদ মুসা। সে কি কিছু সন্দেহ করেছে? দরজা ঠেলে দেখবে কি সে?

না, পায়ের শব্দ শুরু হলো আবার।

নিশ্বাস স্বাভাবিক হলো আহমদ মুসার।

প্রহরীর পায়ের শব্দ দরজা পার হতেই আহমদ মুসা এক ঝটকায় দরজা খুলে করিডোরে নেমে এল। তারপর এক লাফে প্রহরীটির পেছনে গিয়ে পৌছল।

প্রহরী পায়ের শব্দে চমকে উঠে পেছনে ফিরছিল। কিন্তু তার আগেই আহমদ মুসা তার স্টেনগান ধরে ফেলেছে এবং এক হ্যাচকা টানে কেড়ে নিল তার স্টেনগান। ততক্ষণে প্রহরী ঘুরে দাঁড়িয়েছিল।

আহমদ মুসা এবং সে তখন মুখোমুখি। আহমদ মুসার হাতে স্টেনগান। প্রহরী হাত দিচ্ছিল তার কোমরে ঝুলানো রিভলবারে।

আহমদ মুসার স্টেনগানের নল চোখের পলকে উপরে উঠল,তারপর বিদ্যুৎ বেগে গিয়ে পড়ল প্রহরীটির মাথায়।

একটা চিৎকার দিয়ে প্রহরী লোকটি আছড়ে পড়ল করিডোরের উপর। আহমদ মুসা আঘাত করেই ঘুরে দাঁড়াল।

দৌড় দিল সিঁড়ির দিকে।

আহমদ মুসার মনে আছে তাকে সিঁড়ি দিয়েই নিচে নামানো হয়েছিল। দরজা ছিল না সিঁড়ির মুখে।

সিঁড়ি মুখ একটা ঘরের মধ্যে। নিচে নামার লিফটও এর পাশেই। আহমদ মুসা দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে মেঝেতে পার রাখতেই সিঁড়ি মুখ বন্ধ হয়ে গেল। ঘরের মেঝের ভেতর থেকে একটা পুরু স্টিল প্লেট গিয়ে ঢেকে দিল সিঁড়ির মুখ।

আহমদ মুসা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল। আর কয়েক মুহুর্ত দেরী করলে সে নিচে আটকা পড়ে যেত।

আহমদ মুসা সিঁড়ি ঘর থেকে বেরুতে যাবে, এমন সময় বাইরে অনেকগুলো পায়ের শব্দ শুনল।

লুকোবার একটা জায়গার জন্যে আহমদ মুসা চারদিকে চাইল। কিন্তু ঘরের কোথাও এক ইঞ্চি আড়ালও নেই। আছে শুধু দরজার পাল্লা যা দেয়ালের সাথে সেঁটে আছে।

আহমদ মুসা ছুটে গিয়ে দরজার পাল্লাটা একটু টেনে তার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল।

অনেকগুলো লোক দৌড়ে প্রবেশ করল ঘরে।

আহমদ মুসা উকি মেরে দেখল, ওরা ছয়জন। দৌড়ে ওরা গিয়ে উঠল লিফটে।

আহমদ মুসা নিশ্চিত, তার খোঁজেই ওরা ছুটছে নিচে। কিসে ওরা টের পেল, প্রহরীটির চিৎকার, না টিভি ক্যামেরার মাধ্যমে? টিভি ক্যামেরার মাধ্যমে হলে আহমদ মুসার উপরে উঠে আসা টিভি ক্যামেরা টের পায়নি কেন? তাহলে কি মনিটরকারীরা আগে কিছু টের পায়নি? ওরা যখন টের পেয়েছে, তখন কি আহমদ মুসা করিডোর পেরিয়ে এসেছিল? সিঁড়ি মুখের দরজা বন্ধ করা দেখেও তাই মনে হয়।

এই সিঁড়ি ঘরও কি টিভি ক্যামেরার আওতায় আছে, ভাবল আহমদ মুসা। যদি থাকে, তাহলে তো সে তাদের নজরে পড়ে যাবার কথা। এবং তাহলে তার সন্ধানে লোক এখনি ছুটে আসবে।

রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করল আহমদ মুসা। চার পাঁচ সেকেন্ডও পার হয়নি। আগের মতই দরজার বাইরে পায়ের শব্দ পেল আহমদ মুসা। অনেকগুলো পায়ের শব্দ।

স্টেনগান বাগিয়ে একই সাথে চারজন ঘরে ঢুকেছে। ঘরের চারদিকে তারা তাকাচ্ছে।

আহমদ মুসা বুঝল, ওরা এই ঘরে তার সন্ধানেই এসেছে।

ওরা দরজা পেরিয়ে ঘরের মধ্যে ফুট দু'কয়েকের মত সামনে এগিয়েছে। আহমদ মুসা ওদের চোখে পড়ে যেতে বাকি নেই।

আহমদ মুসা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে। এসব ক্ষেত্রে আগে আক্রমণই আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়।

আহমদ মুসা চোখের পলকে দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল।

একই সাথে উদ্যত স্টেনগান থেকে বেরিয়ে এল এক ঝাঁক গুলী।

ওদের চারজনের স্টেনগান এদিকে মোড় নেবার আগেই ওদের চারজনের লাশ পড়ে গেল মেঝের উপর।

আহমদ মুসা কি করবে ভাবছিল। এমন সময় সিঁড়িতে অনেকগুলো পায়ের দ্রুত উঠে আসার শব্দ পেল সে। সিঁড়ির মুখ থেকে সেই স্টিল-প্লেটটি সরে গেছে সে দেখল।

আহমদ মুসা বুঝল, তার অবস্থান ওরা জানতে পেরেছে কনট্রোল রুম থেকে ওয়াকিটকির মাধ্যমে। অথবা ওরা স্টেনগানের শব্দ পেয়ে উঠে আসছে। তবে সিঁড়ি মুখের দরজা খুলে যাওয়ায় প্রমাণ হচ্ছে কনট্রোল রুম থেকেই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।

আহমদ মুসা বাইরের দরজার দিকে একবার তাকিয়ে নিচু হয়ে দৌড় দিল সিঁড়ির মুখের কাছে।

সিঁড়ি মুখে গিয়ে হাঁটু গেড়ে এমন পজিশন নিল যাতে সিঁড়ি ও দরজা দু'দিকেই সে চোখ রাখতে পারে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসা লোকদের প্রথম জনের মাথা নজরে এল আহমদ মুসার।

আহমদ মুসা তার স্টেনগানের ব্যারেল নিচু করে সিঁড়ির সমান্তরালে নিয়ে ট্রিগার চেপে ধরল। বেরিয়ে গেল বৃষ্টির মত একরাশ গুলী।

তাকিয়ে দেখল আহমদ মুসা, সিঁড়িতে কোন মানুষ দাঁড়িয়ে নেই। ছয়জনই কি সিঁড়িতে উঠেছিল এবং ছয়জনই কি স্টেনগানের গুলীর মুখে পড়েছে?

একটু অপেক্ষা করল আহমদ মুসা। কিন্তু না কেউ আর নিচু থেকে উঠছে না।

আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়াল দরজার দিকে। গুটি গুটি এগুলো দরজার দিকে। দাঁড়াল গিয়ে চৌকাঠের আড়ালে। উঁকি দিল বাইরে।

এই দরজা দিয়েই সেদিন প্রবেশ করানো হয়েছিল তাকে। দরজার পরের ছোট চত্বর পার হয়ে সোজা করিডোর উত্তর দিকে এগিয়ে গেছে, তা বাইরে বেরুবার দরজায় গিয়ে শেষ হয়েছে।

আহমদ মুসার লক্ষ্য বাইরে বেরুবার দরজা নয়। সে পৌছুতে চায় ফ্রান্সিস বাইক এবং পিয়েরে পলের কক্ষে। তাদের কক্ষের পাশেই কোন এক কক্ষে বন্দী করে রাখা হয়েছে ওমর বায়া এবং ডঃ ডিফরজিসকে।

গত এক দিন দুই রাতের চেষ্টায় খাবার দিতে যাওয়া লোক এবং প্রহরীদের সাথে কথা বলে আহমদ মুসা যেটুকু জানতে পেরেছে তা হলো, দুই কর্তা বন্দীখানার উপরেই থাকেন এবং মেহমানরা থাকেন তাদের পাশেই।

অর্থাৎ ফ্রান্সিস বাইক এবং পিয়েরে পল থাকেন বাড়ির দক্ষিণ প্রান্তে এবং এক তলায়।

বিস্মিত হয়েছে আহমদ মুসা। প্রবেশ এবং বের হবার পথ থেকে দূরে এবং এক তলার একটা স্থানকে তারা তাদের জন্যে নিরাপদ বা সবদিক থেকে ভাল মনে করলেন কেমন করে?

আহমদ মুসার লক্ষ্য বাড়ির দক্ষিণ প্রান্ত।

আহমদ মুসা দরজা দিয়ে বের হতে গিয়েও ফিরে এল।

বাইরের নিঃশব্দতাকে একটা ঝড়ের সংকেত বলে তার কাছে মনে হলো। নিয়ন্ত্রণ কক্ষ তাকে আক্রমণের নতুন পথ বের করছে নিশ্চয়। তার মনে হলো সামনের চত্বরে যেন ফাঁদ পাতা।

আহমদ মুসা ঘরটির চারদিকে আবার চাইল বিকল্প পথের সন্ধানে। একবার ভাবল, লিফটে সে অন্য তলায় গিয়ে অন্যপথে আবার একতলায় ফিরে আসতে পারে। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবল, লিফটে টিভি ক্যামেরার চোখ পাতা আছে নিশ্চয় এবং লিফটের নিয়ন্ত্রণও কন্ট্রোল কক্ষে থাকতে পারে।

ভাল করে নজর বুলাতে গিয়ে হঠাৎ আহমদ মুসার চোখে পড়ল ঘরের পুব দেয়ালে চাবীর ছিদ্র।

আহমদ মুসা দরজার দিকে স্টেনগান বাগিয়ে ধরে পিছু হটে সেই চাবীর ছিদ্রের কাছে পৌছুল।

আহমদ মুসা তর্জনি দিয়ে নক করে বুঝল, ওটা স্টিলের একটা দরজা।

খুশী হলো আহমদ মুসা।

ডান হাতে স্টেনগান বাগিয়ে ধরে বাঁ হাতে পকেট থেকে ল্যাসার বীম বের করে আন্দাজেই চাবীর ছিদ্রে সেট করে সুইচ টিপল।

আহমদ মুসা একটি পায়ের গোড়ালী ঠেস দিয়ে রেখেছিল দরজায়। কয়েক সেকেন্ড পর অনুভব করল তার পায়ের গোড়ালীতে দরজার পাল্লার মৃদু কম্পন। দরজা খুলে যাবার লক্ষণ এটা।

আহমদ মুসা দরজার উপর তার পায়ের গোড়ালির চাপ শিথিল করতেই দরজার পাল্লা ডান পাশের দেয়ালের ভেতর ঢুকে গেল।

সাথে সাথেই চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল আহমদ মুসা। দেখল সেটাও একটা সিঁড়ি ঘর। সিঁড়ি উপর দিকে উঠে গেছে।

আহমদ মুসার উপরে উঠার প্রয়োজন নেই।

সিঁড়ির বিপরীত দিকে ঘরের দক্ষিণ দেয়ালে একটা বন্ধ দরজা দেখতে পেল আহমদ মুসা। দক্ষিণের দরজা পেয়ে খুশী হলো সে।

এই মাত্র পার হয়ে আসা দরজার দিকে স্টেনগান বাগিয়ে আস্তে আস্তে পিছু হটে বন্ধ দরজার কাছে পৌঁছল।

আহমদ মুসা এই মাত্র পেরিয়ে আসা দরজা দিয়ে প্রথম সিঁড়ি ঘরের বাইরের দরজাও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল।

হঠাৎ তার নজরে পড়ল প্রথম সিঁড়ি ঘরের বাইরের দরজায় একটা মুখ উঁকি দিয়েই সরে গেল। আহমদ মুসা বুঝল ঐ দরজার বাইরে নিশ্চয় আরও লোক আছে। ওরা সুযোগ খুঁজছে।

আহমদ মুসা আরো সতর্কভাবে ঐ দরজার দিকে তার স্টেনগান তাক করল।

এদিকে দক্ষিনের দরজাটি খোলার জন্যে আহমদ মুসা দ্রুত পকেট থেকে সেই মাইক্রো ল্যাসার টর্চ (বীম টর্চ) বের করল। আগের দরজা যেভাবে খুলেছিল, সেভাবে এ দরজাও খুলে ফেলল। কিন্তু আগের অভিজ্ঞতা থেকে এবার সে দরজার পাল্লার উপর পায়ের গোড়ালির চাপ শিথিল করে দিল না।

প্রথম সিঁড়ি ঘরের বাইরের দরজার দিকে একবার তাকিয়ে পায়ের গোড়ালি দরজার পাল্লা থেকে টেনে নিয়েই ট্রিগারে আঙুল রেখে উদ্যত স্টেনগান নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

দরজার পাল্লা সামনে থেকে সরে যেতেই আহমদ মুসা চারজনের মুখোমুখি হল। ওরা আসছিল দরজার দিকে।

ওরা আহমদ মুসাকে দেখার মত দৃশ্যের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। ওদের স্টেনগানের ব্যারেল নামানো। ওরা মুহুর্তের জন্যে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল।

আহমদ মুসার সিদ্ধান্ত নেয়াই ছিল। ট্রিগারের আঙুলটা চাপল মাত্র। গুলী বেরিয়ে গেল একঝাঁক। ওরা চারজন স্টেনগান তোলারও সুযোগ পেল না। ওদের দেহ ঝাঁঝরা হয়ে গেল।

গুলী করেই আহমদ মুসা যে করিডোর ধরে ওরা চারজন এগিয়ে আসছিল, সেই করিডোর ধরে দক্ষিন দিকে দৌড় দিল।

করিডোরটির দু'পাশে দু'টি ঘর। ঘর পার হবার পরেই করিডোরটি শেষ হয়েছে একটা ছোট্ট আয়তাকার চত্বরে এসে।

চত্বরে মুখ বাড়াতেই আহমদ মুসা দেখল, চত্বরের ওপারে একটা দরজা দিয়ে একজন বেরিয়ে আসছে। তার হাতে রিভলবার।

আহমদ মুসা তার উপর চোখ পড়ার সাথে সাথেই গুলী চালাল। লোকটি দরজার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

আহমদ মুসা চত্বরে প্রবেশ করল।

ঠিক এই সময়েই পেছনে স্টেনগান গর্জন করে উঠল। করিডোরে থাকলে তার দেহ ঝাঁঝরা হয়ে যেত।

আহমদ মুসা যে দরজায় লাশ পড়েছিল, সে দরজা লক্ষ্যে এক ঝাঁক গুলী করে সেদিক সম্পর্কে আপাতত নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে এক লাফে করিডোরের মুখে দেয়ালের আড়ালে হাঁটু গেড়ে বসল। ওদিক থেকে গুলী আসা বন্ধ ছিল।

এরই সুযোগ গ্রহন করলো আহমদ মুসা।

ট্রিগারে আঙুল রেখে ব্যারেলটা করিডোরে নিয়েই গুলী চালাল আহমদ মুসা।

ওরা কয়েকজন দ্বিতীয় সিঁড়ি ঘরের দ্বিতীয় দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। আকস্মিক গুলীর মুখে ওরা ছুটে পালায় ভেতরে। একজন গুলী বিদ্ধ হয়ে দরজার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

আহমেদ মুসা আড়ালে সরে এসে বিড়ালের মত নিশব্দে এক দৌড়ে ছোট্ট চত্বরটা পেরিয়ে সেই দরজায় ফিরে এল, যেখানে গুলী বিদ্ধ লাশটা পড়ে ছিল।

দরজাটা ছিল আধ-খোলা।

মুহূর্তকাল সে দাঁড়াল দরজায়।

তারপর ডান হাতে স্টেনগান ধরে তর্জনি ট্রিগারে চেপে বাঁ হাতে অর্ধখোলা দরজাটি তীব্র বেগে ঠেলে দিল এবং সেই সাথে ট্রিগার চেপে ধরে স্টেনগান ঘুরিয়ে নিল গোটা ঘরে।

ঘর ফাঁকা, কিন্তু দরজার পাল্লার প্রচন্ড ধাক্কায় ভারী কি যেন দেয়ালের সাথে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল।

আহমদ মুসা একটু এগিয়ে দরজার পাল্লা সরিয়ে নিল। দেখল, একজন লোক রিভলবার কুড়িয়ে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াচ্ছে।

আহমদ মুসা স্টেনগানের ব্যারেল দিয়ে তার হাতে আঘাত করল। তার হাত থেকে রিভলবার দূরে ছিটকে পড়ল।

আহমদ মুসা লোকটির দিকে ভালো করে তাকাতেই চমকে উঠল, এ যে 'ওকুয়া' ও 'কোক'-এর চীফ ফাদার ফ্রান্সিস বাইক।

আহমদ মুসা মুহূর্তের জন্যে আনমনা হয়ে পড়েছিল।

ফ্রান্সিস বাইকের কাছে পড়েছিল একটা লোহার বার। নিরাপত্তার বাড়তি ব্যবস্থা হিসেবে এই ঘরের দরজা বন্ধে লোহার এই বার ব্যবহার করা হয়।

ফ্রান্সিস এই লোহার বার তুলে আকস্মিক আঘাত করল আহমদ মুসার ডান হাতে।

আহমদ মুসা এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না। তার হাত থেকে স্টেনগানটা ছিটকে পড়ে গেল।

ইতিমধ্যে ফ্রান্সিস বাইক ছুটে গিয়ে তুলে নিয়েছে রিভলবার। তার রিভলবার উদ্যত হল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে।

আহমদ মুসা কিছু ভাববার আগেই একটা রিভলবারের গুলীর শব্দ হলো।

ফ্রান্সিস বাইক 'আ!' বলে চিৎকার করে উঠে বাম হাত দিয়ে ডান হাত চেপে ধরে বসে পড়ল। তার হাত থেকে রিভলবার ছিটকে পড়ল।

আহমদ মুসা ফ্রান্সিস বাইকের রিভলবার কুড়িয়ে নিয়ে পিছন দিকে ফিরে তাকাল। দেখল মুখোশ পরা একজন লোক।

আহমদ মুসা বিস্মিত হলো এই ধরনের একজন লোককে দেখে। ভাবল, লোকটি যেই হোক তার বন্ধু- তার পক্ষের লোক।

'ধন্যবাদ আপনাকে। জীবন রক্ষায় আমাকে সাহায্য করেছেন।' বলল আহমদ মুসা মুখোশধারী লোকটিকে লক্ষ্য করে।

বলে আহমদ মুসা এগুলো ফ্রান্সিস বাইকের দিকে। বাম হাতে তাকে টেনে তুলে ডান হাতের রিভলবারটা তার মাথায় ঠেকিয়ে বলল, 'কোন ঘরে আছে ওমর বায়ারা বলুন।'

ফ্রান্সিস বাইক কথা বলল না।

'দেখুন, এক আদেশ আমি দুই বার করি না। আপনাদের ১৭টি লাশ আমি পেছনে ফেলে এসেছি। তিন পর্যন্ত গুনার মধ্যে কথা না বললে আপনি ১৮ তম লাশ হবেন।'

'তুমি পিয়েরে পলকে হত্যা করেছ, এর জন্যে চরম মুল্য তোমাকে দিতে হবে।'

'কোথায় পিয়েরে পল?'

'এই দরজায় যে লাশ পড়ে আছে, সে পিয়েরে পল।'

আহমদ মুসা সেদিকে একবার তাকিয়ে দেখল সত্যই পিয়েরে পলের লাশ। এতক্ষন খেয়াল করেনি আহমদ মুসা।

'পিয়েরে পলের জন্যে আমি দুঃখিত।' বলে এক, দুই... গুনতে শুরু করল।

দুই পর্যন্ত গুনতেই ফ্রান্সিস বাইক বলল, 'পাশের কক্ষে ওঁরা আছেন।'

মুখোশধারী এগিয়ে এল। বলল অনেকটা ফিসফিসে কন্ঠে, 'আমি দরজা আগলাচ্ছি। আপনি ওদের মুক্ত করুন।' বলে মুখোশধারী আহমদ মুসার স্টেনগান তুলে নিল।

'ধন্যবাদ।' বলল মুখোশধারীকে লক্ষ্য করে আহমদ মুসা।

তারপর আহমদ মুসা রিভলবারের বাট দিয়ে ফ্রান্সিস বাইকের মাথায় একটা খোচা দিয়ে বলল, ‘আমাকে নিয়ে চলুন সে ঘরে।’

ঘরটির দক্ষিন দেয়ালের পার্টিশন দেয়ালের দিকে এগুলো ফ্রান্সিস বাইক।

# ৭

আহমদ মুসা যখন ওমর বায়া ও ডঃ ডিফরজিসকে মুক্ত করে মুখোশধারীর সাথে মিলিত হলো আগের সেই কক্ষে, তখন কেবিন মাইক্রোফোনে ঘোষনা হচ্ছিল, 'আহমদ মুসা তুমি ফাদার বাইককে কতক্ষন আটকে রাখবে, তোমার বের হবার পথ বন্ধ। কিছু লোক মেরেছ, কিন্তু এখানে যত লোক আছে তার ১০ ভাগ মারার মত বুলেট তোমার কাছে নেই। আমাদের নেতাকে সসম্মানে ছেড়ে দিলে এবং আত্মসমর্পন করলে তোমার প্রতি সদয় ব্যবহার করা হবে। তোমাকে ১০ মিনিট সময় দিচ্ছি। এর মধ্যে সারেন্ডার না করলে আমরা এমন পদক্ষেপ নেব যে তুমি বুঝতেই পারবে না তুমি কখন আমাদের হাতে এসেছ। তুমি পিয়েরে পলকে হত্যা করেছ। এর প্রতিশোধ শুধু তোমার উপর নয়, যত জায়গায় পারি যেভাবে পারি এর প্রতিশোধ তোমাদের উপর নেয়া হবে।'

থেমে গেল মাইক্রোফোনের কন্ঠ।

'ঠিকই বলেছে ওরা আহমদ মুসা। তুমি অনেক দূর এগিয়েছ। আর এগোবার পথ তোমার জন্যে বন্ধ। গোটা বিল্ডিং-এর মধ্যে এই জায়গাটা আমাদের জন্যে নিরাপদ। এই নিরাপদ জায়গায় কোন শত্রু যখন পৌঁছে, তখন তার জন্যে এটা হয়ে দাঁড়ায় সাংঘাতিক আপদ। সেই আপদ তোমাদের ঘিরে ফেলেছে।' বলল ফ্রান্সিস বাইক অনেকটা ব্যাঙ্গ করে।

আহমদ মুসা কথা বলার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিল।

কিন্তু তার আগেই মুখোশধারী ফ্রান্সিস বাইকের দিকে এগুলো।

আহমদ মুসা দেখল, মুখোশধারী তার পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে ফ্রান্সিস বাইকের নাকে চেপে ধরল।

আহমদ মুসা বুঝল। ফ্রান্সিস বাইককে ক্লোরোফরম করা হলো।

আহমদ মুসা রহস্যময় লোকটির দিকে বিস্ময় দৃষ্টি মেলে তাকাল। কিন্তু তার কাজে বাধা দিল না। কারন, এ পর্যন্ত রহস্যময় লোকটি দুইটি কাজ করেছে, দুইটিই ছিল অপরিহার্য প্রয়োজন।

ফ্রান্সিস বাইক সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে গেল। সংগে সংগেই মুখ থেকে মুখোশ খুলে ফেলল মুখোশধারী।

'ওকোচা তুমি?' বিস্ময়ে প্রায় চিৎকার করে উঠেছিল আহমদ মুসা।

ওকোচা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ থাকার ইংগিত করে ফিসফিসে কন্ঠে বলল, 'আস্তে, আমার নাম করবেন না।'

'ও, তুমি ফ্রান্সিস বাইকদের কাছে তোমার পরিচয় গোপন করার জন্য মুখোশ পরেছিলে?'

ওকোচা মাথা নাড়ল।

'তাহলে তুমি চেন এঁদের? এঁরা চেনে তোমাকে?'

ওকোচা নীরবে মাথা নাড়ল। তারপর বলল, 'আসুন আমার সাথে।'

বলে হাঁটা শুরু করল।

'কোথায়? কোন পথে?'

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ওকোচা বলল, 'আসুন আমার সাথে।'

বলে আবার হাঁটতে শুরু করল।

আহমেদ মুসা ফ্রান্সিস বাইককে দেখিয়ে বলল, 'একে আমি সাথে নিতে চাই।' বলে আহমেদ মুসা নিচু হয়ে কাঁধে তুলে নিতে গেল ফ্রান্সিস বাইককে।

ওকোচা ছুটে গেন এবং আহমেদ মুসাকে বাধা দিয়ে নিজেই ফ্রান্সিস বাইককে কাঁধে তুলে নিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করল।

আহমেদ মুসারাও শুরু করল ওকোচার পেছেনে হাঁটতে। আহমেদ মুসা আন্দাজ করল, ওকোচা হয় এদের লোক, না হলে এদের ঘনিষ্ঠ কেউ। এখান থেকে বেরুবার কোন গোপন পথ তার জানা আছে।

সম্ভবত গোপন পথেই সে এখানে এসেছে। এ কারণেই ওকোচাকে প্রথমে ঘরের ভেতর দিকের দরজায় দেখা গেছে।

প্রথমে হাঁটছিল ওকোচা ফ্রান্সিস বাইককে কাঁধে নিয়ে। তার পেছনে ড. ডিফরজিস এবং ওমর বায়া। সবার পেছনে আহমেদ মুসা।

সিড়ি ভেঙে যখন সুড়ঙ্গ নামছিল তারা তখন উৎসুক হয়ে উঠল আহমেদ মুসার মন। বলল, 'এ গোপন পথেন সন্ধান তুমি জান কি করে?'

এবার কথা বলল ওকোচা। বলল, 'ভাইয়া ওদের ঘরে ভয়েস রেকর্ডার আছে। তাই আমি কথা বলিনি। আমার গলা চিনতে পারলে আমাদের সর্বনাশ।'

বলে একটু থেমে ওকোচা বলল, 'ভাইয়া আমাদের গোটা পরিবার 'কোক'-এর কার্যক্রমের সাথে জড়িত। আর এ গোপন সুড়ঙ্গের কথা জানতে পেরেছি আমার বন্ধুর কাছে। সে এই সুড়ঙ্গের বাইরের মুখের একজন পাহারাদার।'

গোটা ব্যাপারটা আহমেদ মুসার কাছে এখন পরিষ্কার হয়ে গেল।

'আমার আটকা পড়ার খবর তুমি জানলে কি করে?'

'সে অনেক কথা পরে বলব, ফাদারকে কাঁধে নিয়ে বলা যাবে না।'

'এ বিপদজনক কাজে তোমার আব্বা তোমাকে একা ছেড়েছেন?'

'তিনি এবং পরিবারের কেউ জানে না আমি এসেছি।'

'জানালে কি হত?'

'আমার আব্বা আপনার মুক্তির জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন, কিন্তু ওকুয়া'র বিরুদ্ধেতিনি কিছু করতে পারবেন না। আর আব্বা মনে করেন, আপনার মুক্তির জন্য কিছু না করা আমানবিক হবে। তবে এজন্য আমি বিপদে পড়ি তিনি তা চান না।'

হাসল আহমেদ মুসা। বলল, 'তুমি বুদ্ধিমান এবং বিবেচক।'

সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এসে সেই কেয়ারটেকারের ঘরের কাছে পৌঁছে ওকোচা টয়লেটের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'আমার বন্ধুটি এখনে সংজ্ঞাহীন ও হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে।'

'আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ ওকোচা।' বলল, আহমেদ মুসা।

'আহমেদ মুসা ওকোচাকে কৃতজ্ঞাতা জানানো কি শোভন হয়।'

কথা শেষ করেই ওকোচা বলল, ‘আপনারা এখানে একটু দাঁড়ান, আমি গেটটা দেখে আসি।’

বলে সে বাইরে চলে গেল।

কিছুক্ষন পর ফিরে এসে বলল, ‘সব ঠিক আছে চলুন।’

গাড়িতে উঠতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল আহমেদ মুসা। বলল, ‘ওকোচা গাড়ী ঠিক আছে তো?’

‘তার মানে? গাড়ীতে কেউ কিছু পেতে রেখেছে কিনা।’

‘সে রকমই।’

‘ওকোয়া কিংবা 'কোক' সেক্ষেত্রে এ ধরনের কিছু করতে পারে না।’

‘তারা আসত ডাইরেক্ট এ্যাকশনে। তারা যদি এ গাড়ীকে সন্দেহ করত, তাহলে এতক্ষনে শুধু গাড়ী নয়, আমরা তদের হাতে গিয়ে পড়তাম, নয়তো বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে যেতো আমাদের দেহ।’

গাড়িতে উঠে বসল সবাই।

গাড়ি চলতে শুরু করল।

ড্রাইভিং সিটে ওকোচা। তার পাশে আহমেদ মুসা। পেছনের সিটে ড. ডিফরজিস ও ওমর বায়া। আর গাড়ির মেঝেতে রাখা হয়েছে হাত-পা বাঁধা ফ্রান্সিস বাইককে।

গাড়ি চলছে।

আহমেদ মুসার মন আজ খুব হালকা হতে পারত। ওমার বায়া এবং ড. ডিফরজিস মুক্ত। সবচেয়ে ভয়ংকর, সবচেয়ে বড় শত্রু পিয়েরে পল নিহত এবং 'ওকুয়া' ও 'কোক' -এর প্রধান হাতের মুঠোয়।

কিন্তু এরপরও আহমেদ মুসার মনে দুঃসহ এক ভার। ওমর বায়া মুক্ত হয়েছে, মুক্ত হয়েছে ড. ডিফরজিস, কিন্তু ক্যামেরুনের লাখো মানুষের মক্তি এখনও আসেনি।

একাজে তাকে এখনি ব্রতী হতে হবে।

আহমেদ মুসার মনে পড়ল কেবিন মাইক্রোফোনে দেয়া হুমকির কথা, ওরা প্রতিশোধ নেবে।

আহমেদ মুসার সমস্ত হৃদয় উথলে উঠেছে ক্যামেরুনের মুসলমানদের অন্ধকার জীবনে আগামী সুর্যোদয় দেখার জন্য।

সাইমুম সিরিজের পরবর্তী বই

# কঙ্গোর কালো বুকে

## কৃতজ্ঞতায়ঃ


1. A.S.M Masudul Alam
2. Bondi Beduyin
3. Syed Murtuza Baker
4. Md. Jafar Ikbal Jewel
5. Nazrul Islam
6. Esha Siddique
7. Arif Rahman
8. Ashrafuj Jaman
9. Sharmeen Sayema
10. Monirul Islam Moni
11. Sohel Sharif
12. Gazi Salahuddin Mamun
13. Hafizul Islam
14. Abu Taher
15. Mohammed Ayub
16. Mohammed Sohrab Uddin
17. Kayser Ahmad Totonji
18. Sagir Hussain Khan
19. Masud Khan
20. Abir Tasrif Anto
21. Jamirul Haqe
22. M-g Mustafa
23. Tamanna Chowdhury
24. Mohammad Ahsanul Haque Arif
25. Shaikh Noor-E-Alam

সাইমুম-২১

# কঙ্গোর কালো বুকে

আবুল আসাদ

# ১

আহমদ মুসার গাড়ি যখন চলছিল ক্যামেরুন ক্রিসেন্টের অফিসের দিকে, সেই সময় আহমদ মুসার কানে আযানের শব্দ ভেসে এল 'ক্যামেরুন ক্রিসেন্ট' – এর মসজিদ থেকে।

আহমদ মুসা ব্রেক কষল গাড়ির।

'আমাদের সবাইকে এখানে নামতে হবে?' বলল ওমর বায়া।

'হ্যাঁ। তবে আমরা শুধু নামায পড়ব এখানে'। বলল আহমদ মুসা।

'সময় আছে, গন্তব্যে পৌঁছে আমরা নাময পড়তে পারতাম না?' ওমর বায়া বলল।

'পারতাম। কিন্তু নামাযের আহবান যে কানে এল?'

'যেখানে এ আহবান কানে আসবে, সেখানে নামাযের জন্যে দাঁড়ানো কি অপরিহার্য?'

'অপরিহার্য নয়, কিন্তু এই মুহূর্তে অপরিহার্য মনে হচ্ছে'।

'এই মুহূর্তে? কেন?'

‘এমন একটা বিজয় হাতে নিয়ে ফিরছি, যা চাওয়ার চেয়ে বেশী। যিনি এ বিজয় দিয়েছেন, তার ইবাদতের আহবান উপেক্ষা করে এগুতে পারছি না। তাঁর কাছে হাজির হওয়ার এ সুযোগ আমার কাছে অমূল্য মনে হচ্ছে’।

বলল আহমদ মুসা ডঃ ডিফরজিস-এর দিকে চেয়ে বলল, ‘প্লিজ ডক্টর, একটু কষ্ট করুন’। তারপর ওকোচার দিকে চেয়ে বলল, একটু বস কেমন?’

আহমদ মুসা ও ওমর বায়া গাড়ি থেকে নামল।

পুরো ৪৫ মিনিট সময় লাগল আহমদ মুসাদের ফিরে আসতে।

মুসল্লিদের অনেকেই, যারা খবর জানে, বিস্মিত হয়েছে এবং মৌমাছির মত ছেঁকে ধরেছে আহমদ মুসাকে। তাদের প্রশ্নের জবাব দিয়ে ফিরতে সময় আরও বেশী খরচ হলো।

গাড়িতে উঠতে উঠতে আহমদ মুসা ডঃ ডিফরজিসকে বলল, ‘মাফ করবেন, বেশ দেরী হয়ে গেল’।

‘একটি সম্মিলিত প্রার্থনার জন্যে ৪৫ মিনিট সময় কি বেশী?’ বলল ডঃ ডিফরজিস।

‘ধন্যবাদ। তবে প্রার্থনার জন্যে সময় বেশী লাগে না। কিন্তু ‘আযান’ বা আহবানের পর প্রার্থনায় যোগদানের জন্যে আধাঘন্টার মত সময় দেয়া হয়। এতেই সময় বেশী যায়’। আহমদ মুসা বলল।

‘তোমার অবিশ্বাস্য ধরনের কাজ এবং সাহস আমাকে বিস্ময়বিমূঢ় করেছে, কিন্তু তার চেয়েও বিস্মিত হয়েছি ইশ্বরের প্রতি তোমার ভালোবাসা দেখে। আজ তো আধুনিকতা ও ধার্মিকতা পরস্পর বিরোধী হয়ে দাঁড়িয়েছে’। বলল ডঃ ডিফরজিস।

‘আধুনিকতা যদি হয় আধুনিক জ্ঞানে সজ্জিত হওয়া, তাহলে সে আধুনিকতা স্রষ্টার প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি করে। আর আধুনিকতা বলতে যদি বুঝানো হয় জ্ঞান ও বুদ্ধির দুয়ারে তালা মের আধুনিক পণ্য-সম্ভারের মধ্যে নিমজ্জিত থাকা, তাহলে এই আধুনিকতা অবশ্যই স্রষ্টাকে ভুলিয়ে দেবে’। আহমদ মুসা বলল।

‘সুন্দর বলেছ’। বলে একটু থামল ডঃ ডিফরজিস। তারপর আবার বলল, ‘তুমি আমার ছেলের বয়সের। শুরু থেকেই একটা তীব্র কৌতুহল মনে জাগছে। জিজ্ঞেস করব?’

‘ছেলের মতও বলতে পারেন। কুমেটে আপনর ছেলে এবং আপনার বৌমা ডেবরার সাথে আমার দেখা হয়েছে’।

‘দেখা হয়েছে? তাদের সাথে? কিন্তু ওরা তো ব্ল্যাক ক্রস-এর হাতে বন্দী’।

‘ক্যামেরুনে আসার আগে তাদের সাথে আমি একই রেষ্টহাউসে ছিলাম কয়েকদিন’।

বলে আহমদ মুসা তাদেরকে কিভাবে উদ্ধার করে তার কাহিনী বলল।

বিস্ময়ে প্রায় বাকরোধ হয়ে গেল ডঃ ডিফরজিসের। কিছুক্ষণ পর বলল, ‘তুমি... তুমি উদ্ধার করেছ তাদেরও! কবে?

আহমদ মুসা তারিখ বলল।

ডঃ ডিফরজিস বলল, ‘আমি তো ঐ তারিখেই কিডন্যাপ হই’।

‘আমরা জানি। কিডন্যাপ ঠেকাবার জন্যে আমরা বিমান বন্দরে গিয়েছিলাম। কিন্তু দেরী হয়েছিল। যখন ওরা কিডন্যাপ করে পালাচ্ছিল, তখন আমরা রাস্তায়। আমরা ব্যর্থ হয়েছিলাম’।

‘আমার কিডন্যাপ হওয়ার বিষয় আগেই জানতে?’

‘অনুমান করেছিলাম’।

‘কিভাবে’?’

‘সে অনেক কথা’।

‘আমার ছেলে ও বৌমাকে উদ্ধার করার পর কি করলে?’

আহমদ মুসা সংক্ষেপে কাহিনী বর্ণনা করল। তারপর বলল, ‘উদ্ধারের পর যখন ওদের কিডন্যাপ করার কারণ জানতে পারলাম এবং যখন জানলাম আপনি কুমেটে আসছেন, তখন নিশ্চিত হয়েছিলাম আপনার ছেলে ও বৌমা ওঁদের হাতছাড়া হবার পর ওরা আপনাকে কিডন্যাপ করবে’।

‘অসাধারণ বুদ্ধি তোমার। প্রশংসা করে তোমাকে খাটো করবো না। আমার ছেলে ও বৌমা কেমন ছিল? ওদের কোন প্রকার ক্ষতি হয়নি তো? শয়তানরা যে বার বার বলেছে আমার ছেলে ও বৌমা ওদের হাতে রয়েছে?’

‘আপনাকে দুর্বল করার জন্যে মিথ্যা কথা বলেছে। আপনার ছেলে ও বৌমা ভালই ছিল’।

‘ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। তোমার এসব কথা শুনে আমার কৌতুহল আরও বেড়েছে। আমার প্রশ্নের কি জবাব দেবে?’

‘কি প্রশ্ন?’

‘তোমার সম্পর্কে সামান্য কিছু শুনেছি ওমর বায়ার কাছে। সে বলতো, ‘একজন লোক আছে, সেই শুধু পারে আমাদের উদ্ধার করতে। অবশেষে সেই ‘একজন’ তুমি আমাদের উদ্ধার করলে। তুমি কে বৎস?’

‘দেবার মত বিশেষ পরিচয় আমার নেই। কোন দেশের কোন পদে আমি ছিলাম না। কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলাম এমন পরিচিতি আমার নেই। আমার ছোট্ট একটা নাম আছে- আহমদ মুসা’।

ভোরের ফাঁকা রাস্তা ধরে তীব্র গতিতে চলছিল গাড়ি।

গাড়ি পূর্ণ গতিতে চলা শুরু করলে আহমদ মুসা ও ডঃ ডিফরজিসের মধ্যে কথা আর চলল না।

গাড়ি চালাচ্ছিল আহমদ মুসাই।

গাড়ি প্রথমে চীফ জাষ্টিসের বাসায় নেওয়াই ঠিক করেছে আহমদ মুসা। সেখানে ডঃ ডিফরজিসের সাথে ওমর বায়াকে রেখে ফ্রান্সিস বাইককে রাখার জন্যে যাবে রাশিদীর বাড়িতে। রাশিদীর বাড়িতে নয় অন্য কোথাও তাকে রাখতে হবে।

অন্ধকার তখনো পুরোপুরি কাটেনি।

আহমদ মুসার গাড়ি চীফ জাষ্টিসের গেটে গিয়ে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা দেখল, চীফ জাস্টিসের বাড়ির চারদিক ঘিরেই পুলিশ পাহারা।

গেটে পুলিশের একটি গাড়ি দাঁড়িয়ে। গাড়িতে বসে আছে চারজন পুলিশ।

আহমদ মুসার গাড়ি দাঁড়াতেই গাড়ি থেকে চারজন পুলিশ তড়াক করে নেমে ষ্টেনগান বাগিয়ে এগিয়ে এল।

আহমদ মুসা লাফ দিয়ে নামল গাড়ি থেকে। পুলিশের সামনে গিয়ে বলল, 'আমাকে গেটম্যানের কাছে নিয়ে চলুন'।

পুলিশ আহমদ মুসাকে সার্চ করল। পকেটে কোন অস্ত্র পেল না।

পকেটের রিভলবারটি আহমদ মুসা ওকোচা'র কাছে রেখে এসেছে।

পুলিশ আহমদ মুসাকে নিয়ে গেল গেটের দারোয়ানের কাছে।

দারোয়ানটি আহমদ মুসার অপরিচিত। আহমদ মুসা সেদিন বিকেলে যে দারোয়ানকে দেখেছিল সে এ নয়। আহমদ মুসা গেটম্যানকে বলল, 'আপনি চীপ জাস্টিস সাহেবকে জানান, ডঃ ডিফরজিসকে আনা হয়েছে'।

'তাঁকে এখন টেলিফোন করা যাবে না'।

'তাহলে কাকে করা যাবে?'

'পি,এ, সাহেব এলে পর'।

'জাস্টিস সাহেবের সরাসরি টেলিফোন নেই?

'আমি জানি না'।

'আমার কাছে আছে নম্বারটা। নিন'। বলে আহমদ মুসা টেলিফোন নম্বারটা গেটম্যানকে দেবার জন্যে হাত বাড়াল।

'এ সময় স্যারকে টেলিফোন করতে পারবো না'।

আহমদ মুসা পুলিশ অফিসারের দিকে চেয়ে বলল, 'আপনি করুন, ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ'।

'গুরুত্বটা আমাকে বুঝতে হবে'। বলল পুলিশ অফিসার।

এই সময় গেটম্যান তড়াক করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনার গেট থেকে একটু সরে দাঁড়ান। ছোট ম্যাডাম এদিকে আসছেন'।

বলেই গেটের জানালা থেকে সে সরে দাঁড়াল।

গেটের মাঝ বরাবর তিন ফিট ষ্টিল শিটে ঢাকা। নিচের এক ফিট এবং উপরের এক ফিট ফাঁকা। গেটের পাশে এলে মোটা ষ্টিলবারের পাশ দিয়ে ভেতরের সবকিছুই দেখা যায়।

আহমদ মুসা দেখল, রোসেলিন ছুটে আসছে। তার পরনে ট্র্যাক স্যুট। তার পেছনে পেছনে আসছে আরেকজন। তার গায়ে-মাথায় চাদর দেখেই বুঝল, ও ডোনা হবে।

আহমদ মুসা ছুটে আসা রোসেলিনের কণ্ঠ শুনতে পেল। সে চিৎকার করে বলছে, 'খুলে দাও দরজা, খুলে দাও দরজা'।

গেট খুলে গেল।

'আহমদ মুসা ভাই আপনি ফিরেছেন?' বলে গেটের কাছে এসে রোসেলিন হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাত উপরে তুলে উর্ধ্বমূখী হয়ে বলল, 'ঈশ্বর তুমি দয়ালু, তুমি আমাদের কথা শুনেশ'। আবেগ রুদ্ধ তার কণ্ঠ।

ডোনা এসে রোসেলিনের পেছনে দাঁড়াল। তার স্থির দৃষ্টি আহমদ মুসার উপর নিবদ্ধ। তার চোখে অশ্রু, ঠোঁটে হাসি।

আহমদ মুসা রোসেলিনের দিকে এগিয়ে বলল, 'শুধু আমি আসিনি রোসেলিন, ডঃ ডিফরজিস এবং ওমর বায়াকেও উদ্ধার করে এনেছি। তোমার আব্বাকে খবরটা জানাও'।

'কি ডঃ ডিফরজিস মুক্ত? কোথায় তিনি? গাড়িতে? যাই আব্বাকে খবর দেই'। বলে রোসেলিন দৌড় দিল বাড়ির দিকে।

আহমদ মুসা তার গাড়ির পেছন দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওকোচা তুমি গাড়ি ড্রাইভ করে গাড়ি বারান্দায় নিয়ে এস'।

গাড়ি চলতে শুরু করল।

আহমদ মুসা ও ডোনা পাশাপাশি হাঁটতে লাগল।

ডোনার মুখ নিচু।

আহমদ মুসার মুখও নিচু।

ডোনা তার ডান হাত দিয়ে তার আহত বাম হাতটা ধরে ছিল। আস্তে হাতটা ছেড়ে দিয়ে ডান হাত দিয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছে নিয়ে বলল, 'তুমি ঠিক আছ তো? তুমি ভাল আছ তো?'

'আলহামদুলিল্লাহ। একদম ভাল। তুমি কেমন আছ?'

ডোনা কোন জবাব দিল না। তার মুখ নিচু। হঠাৎ করেই তার মুখটা আবার বেদনাক্লিষ্ট হয়ে উঠেছে।

আহমদ মুসা একবার সেদিকে চাইল।

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল আহমদ মুসা।

কিন্তু তার আগেই ডোনা বলল, 'তুমি ঠিকানা দিয়ে যাওনি কেন?' ডোনার কণ্ঠ ভারি।

আহমদ মুসা আরেকবার চকিতে ডোনার দিকে চাইল। তারপর বলল, 'আমি দুঃখিত ডোনা। কিন্তু তুমি জান কেন আমি অন্যায়টা করেছি'।

'সেই জন্যেই দুঃখটা আমার বেশী। তুমি শুধু ডোনার নও, তুমি কোটি মজলুম মানুষের। তাহলে কেন তুমি এক ডোনার নিরাপত্তার কথা এমন করে ভাববে তোমাকে বিপদগ্রস্ত করেও'।

'কেন ভাবি সেটাও তুমি জান। ঘোর যুদ্ধক্ষেত্রেও শান্তির একটা তাঁবু থাকে, জীবনের থাকবে না কেন?'

'আমি তোমার সাথে এখন তর্কে যাব না। কিন্তু বলব, তোমার পেছনে যারা থাকবে, তাদের চলার পথ চিহ্নিত করে যাওয়া তোমারই দায়িত্ব, ডোনাকে অন্ধকারে রাখ ক্ষতি নেই'। ডোনার ভেজা কণ্ঠ।

'আমি শুরুতেই দুঃখ প্রকাশ করেছি। তুমি ক্ষমা করতে পারনি ডোনা?'

'আমি নিজের জন্যে কিছুই বলছি না, বলছি কোটি মজলুমের পক্ষে। তাদের স্বার্থেই তুমি কোথায় কি করছ তোমার পেছনের লোকদের তা জানা দরকার'।

'তোমার রক্তে রয়েছে রাজ্য পরিচালনা, প্রজা পরিচালনার অভিজ্ঞতা। তুমি সুন্দর বলেছ ডোনা। আমি চাইলে কি হবে, তুমি একজনের নও সবার হয়ে উঠছ'। ম্লান হাসল আহমদ মুসা।

‘না, আমি ডোনা জোসেফাইন নারী হিসেবে একজনের। কিন্তু সমাজ ও জাতির একজন সদস্য হিসেবে সকলের প্রতি দায়িত্ব আছে, যে দায়িত্ব তুমিও পালন কর। আমার এ দায়িত্ব পালনও তোমার চাওয়ার বাইরে হতে পারে না’।

‘আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল। ডোনা বাধা দিয়ে হেসে বলল, ‘আর কিছু বলতে হবে না। দেখ, রোসেলিনের, আব্বা আসছেন’।

গাড়ি তখন গাড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়ে গেছে।

রোসেলিনের আব্বা চীফ জাস্টিস উসাম বাইক নেমে আসছেন গাড়ি বারান্দায়।

আহমদ মুসা ও ডোনাও গিয়ে পৌঁছল সেখানে।

চীফ জাস্টিস উসাম বাইক আহমদ মুসাকে দেখতে পেয়েই ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল। বলল, ‘বাবা তুমি মানুষ নও, দেবদূত। স্বয়ং ঈশ্বর তোমার হাত দিয়ে কাজ করেন’।

বলে আহমদ মুসাকে ছেড়ে দিয়ে বলল, ‘কোথায় আমার স্যার, আমার পিতা’।

ততক্ষণে ডঃ ডিফরজিস, ওমর বায়া এবং ওকোচা গাড়ি থেকে নেমেছে।

আহমদ মুসাকে ছেড়ে দিয়েই উসামবাইক গিয়ে জড়িয়ে ধরল ডঃ ডিফরজিসকে।

তার অনেকক্ষণ একে অপরকে জড়িয়ে ধরে থাকল। উসাম বাইকের দুই চোখ অশ্রুতে ভরে উঠেছে।

ডঃ ডিফরজিস উসাম বাইকের পিঠ চাপড়ে সান্ত্বনা দিয়ে তাকে ছাড়ল এবং বলল, ‘আমার কিডন্যাপ যেমন আকস্মিক, মুক্তিও তেমনি আকস্মিক’।

‘ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আর ধন্যবাদ এই বিস্ময়কর যুবককে’। আহমদ মুসাকে দেখিয় বলল চীফ জাস্টিস উসাম বাইক।

‘তার বিস্ময়কর কীর্তির কথা আরও শুনেছি। পরিচয় এখনও জানতে পারিনি’।

‘কি বলনি’। বলে চীফ জাস্টিস তাকাল আহমদ মুসার দিকে।

‘সে বলা যাবে’। বলে আহমদ মুসা ওমর বায়াকে পরিচয় করিয়ে দিল চীফ জাস্টিসের সাথে।

তারপর ‘ওকোচা’কে দেখিয়ে বলল, ‘ওর নাম ওকোচা। ওর সম্পর্কে অনেক কথা আছে। ও আমাদের মূল্যবান সাহায্য করেছে’।

ওকোচা’র পিঠ চাপড়াতে গিয়ে চীফ জাস্টিসের চোখ পড়ল গাড়ির ভেতরে। সে দেখতে পেল, গাড়ির মেঝেয় পড়ে আছে হাত-পা বাঁধা সংজ্ঞাহীন বা ঘুমন্ত একজন লোক।

চীফ জাস্টিস বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা বুঝল। বলল, ‘আপনি না দেখলেই ভাল ছিল। যাক, উনি ‘ওকুয়া’ এবং ‘কোক’-এর প্রধান ফ্রান্সিস বাইক। প্রয়োজনে ওকে আনা হয়েছে, প্রয়োজন শেষ হলে ছেড়ে দেয়া হবে’।

বলে আহমদ মুসা ‘ওকোচা’র দিকে চেয়ে বলল, ‘ওকোচা তুমি গাড়িতে ওঠ। ওর পাশে বস। আমি ড্রাইভিং সিটে বসছি’।

তারপর চীফ জাস্টিসের দিকে চেয়ে বলল, ‘ওমর বায়া এখন এখানে থাকছে। আমি ফিরে এসে নিয়ে যাব’।

‘তোমরা কোথায় যাচ্ছ?’ বলল চীফ জাস্টিস।

‘রাশিদীর ওখানে যাই। ফ্রান্সিস বাইককে কোথায় রাখব তার পরামর্শ নিতে হবে’।

‘ঠিক আছে যাবে। দু’মিনিট বস। চল ভেতরে’। বলে হাঁটতে শুরু করল চীফ জাস্টিস ডঃ ডিফরজিসকে নিয়ে।

‘এই অবস্থায় বসা কেমন হবে?’

‘তোমার জন্যে সব অবস্থাই মানিয়ে যায়। চিন্তা করো না। চল’।

ডোনা এবং রোসেলিন আগেই ভেতরে চলে গিয়েছিল।

‘গাড়ির দরজাগুলো লক কর। চল গিয়ে একটু বসি। তোমার অসুবিধা হবে না তো?’ বলল আহমদ মুসা ওকোচাকে।

ওকোচা চাবি হাতে গাড়ির দিকে এগুতে এগুতে বলল, ‘না অসুবিধা হবে না। আমার খুব আনন্দই বোধ হচ্ছে’।

‘ওকোচা গাড়ি লক করে ফিরে এলে আহমদ মুসা, ওকোচা ও ওমর বায়া চীফ জাস্টিসের পিছে পিছে প্রবেশ করল বাড়ির ভেতরে।

চীফ জাস্টিস উসাম বাইক ও ডঃ ডিফরজিসের অনুরোধে আহমদ মুসাকে অভিযানের গোটা কাহিনী বলতে হলো।

তাছাড়া আছে যে কথা আহমদ মুসা বলতে পারেনি। কারণ আহমদ মুসা বসে তার কথা শুরু করার আগেই রাশিদী ইয়েসুগো, মুহাম্মদ ইয়েকিনি, লায়লা ইয়েসুগো, ফাতেমা মুনেকা এসে গিয়েছিল।

রোসেলিন তার আব্বাকে ডাকতে এসেই লায়লাকে টেলিফোন করে দিয়েছিল। টেলিফোন পেয়েই ওরা ছুটে এসেছে।

আহমদ মুসা তার অভিজান কাহিনী শেষ করে থামতেই চীফ জাস্টিস উসাম বাইক ওকোচাকে উদ্দেশ্য করে বলল, ‘বাবা আমরা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। তুমি বিরাট ত্যাগ স্বীকার করেছ’।

‘আহমদ মুসা ভাই আমাকে নতুন জীবন দিয়েছেন, আমাদের পরিবারকে, গোত্রকে বিরাট এক হানাহানি থেকে বাঁচিয়েছেন। তার তুলনায় আমি যা করেছি তা খুবই সামান্য’। বলল ওকোচা লজ্জিত কণ্ঠে।

ডঃ ডিফরজিস আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, ‘আমি ও ওমর বায়া তোমার রক্তের কেউ নই। এরপরও সাক্ষাৎ মৃত্যুকে হাতে নিয়ে ঐভাবে শত্রুপুরীতে প্রবেশ করেছিলে তুমি। ওদের হাতে বন্দী হবার পর আফসোস হয়নি তোমার?’

‘এটা খুব বড় হলো? মানুষ মানুষের জন্যে জীবন দেয়র দৃষ্টান্ত ইতিহাস ভরা’। বলল আহমদ মুসা।

‘প্রায় এক কুড়ি লোককে তোমার হত্যা করতে হয়েছে। তোমার কিছু মনে হয়নি, কিছু মনে হচ্ছে না?’ বলল চীফ জাস্টিস।

আহমদ মুসা মথা নিচু করল। তৎক্ষণাৎ জবাব দিল না।

একটু পর মুখ তুলল। বলল, 'একটা অত্যন্ত নাজুক প্রশ্ন করেছেন জনাব। এ নিয়ে ভাবতে আমাকে ভয় করে। ওদের ১৮ জনের সবার নিশ্চয় মা, স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে আছে। ওরা হয়তো উম্মুখ হয়ে থাকবে তাদের প্রিয়জন কখন ফিরবে সে অপেক্ষায়। কিন্তু যখন শুনবে ঐ হৃদয় বিদারক খবর, তখন সেখানে সৃষ্টি হবে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের। সন্তান হারা মা, স্বামী হারা স্ত্রী, পিতা হারা সন্তানদের বুক ফাটা কান্না থামবে কিভাবে, সান্ত্বনা পাবে তারা কিসে, কেমন করে?'

আহমদ মুসার শেষ কথাগুলো কাঁপছিল প্রবল এক উচ্ছ্বাসে। চোখ দু'টি সিক্ত হয়ে উঠেছিল তার।

আহমদ মুসা থেমেছিল।

কারো মুখে কোন কথা নেই। সকলের বিস্ময় জড়িত ভারি দৃষ্টি আহমদ মুসার উপর নিবদ্ধ।

আহমদ মুসা তার চোখ মুছে বলল, 'আমি এ জন্যে পেছনে তাকাই না জনাব। তাকালে সামনে এগুতে পারবো না'।

'এত অনুভুতিপ্রবন মন ও আবেগ সিক্ত হৃদয় নিয়ে তুমি কিভাবে এত বড় কঠিন দায়িত্ব পালন কর আহমদ মুসা?' বিস্ময় জড়িত কণ্ঠে বলল চীফ জাস্টিস উসাম বাইক।

'অন্যায়ের প্রতিবিধান ও সুবিচারের দাবী সহজাত সব অনুভুতি ও আবেগের চেয়ে বড় বলেই হয়তো'।

'মানবিক অনুভুতি ও আবেগের দাবীকে কি কখনই বড় করে দেখা যাবে না?' বলল রোসেলিন।

'যাবে, যদি তা সুবিচারের পরিপন্থী না হয় এবঙ অন্যায়ের সাহায্য না করে'। বলল আহমদ মুসা।

'তাহলে মানবিকতা তো কন্ডিশনাল হয়ে যাচ্ছে'। রোসেলিন বলল।

'অবশ্যই কন্ডিশনাল হবে। কন্ডিশনাল না হলে মানুষ যা করবে, ভাববে তাই যদি মানবিকতার নামে বৈধ হয়ে যায়, তাহলে মানব সমাজ বন্য সমাজে পরিণত হবে'।

‘ন্যায়-অন্যায়ের সংঘাত অর্থাৎ হানাহানির হাত থেকে তাহলে তো বাঁচা যাচ্ছে না। রক্তপাত, মানবতার ক্রন্দন তো তাহলে দেখেই যেতে হবে। সমাধান কোথায়?’ বলল রোসেলিন আবার।

‘যাকে তুমি মানবতার ক্রন্দন বলছ, সেটা মানুষের ক্রন্দন, মানবতার নয়। মানবতার ক্রন্দন আসে শুধু জালেমের জুলুম থেকে। এ জুলুমে মজলুমের মানবতাও কাঁদে, জালেমের মনুষত্ব বা মানবতাও কাঁদে। মানবতা বা মনুষত্বের এই ক্রন্দনের সাথে মানুষের ক্রন্দনের পার্থক্য আছে। বেকায়দায় পড়লে জালেমরাও কাঁদে। এই ক্রন্দন মানুষের, মানবতা বা মনুষত্বের ক্রন্দন নয়’। একটু থামল আহমদ মুসা।

তারপর আবার শুরু করল, ‘তুমি সংঘাতের অবসান চেয়েছ। এটা সকলেরই কাম্য। অন্যায়ের শক্তিকে পরাভুত করে এবং পরাভুত রেখে ন্যায় ও সুবিচারের প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই শুধু এই কামনা পুরণ হবে।

কিন্তু এই আদর্শ পরিবেশ কোনদিন আসবে বলা মুস্কিল। কারণ শয়তানি শক্তির পদচারণা কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত থাকবে। সেই সাথে থাকবে মানুষের লোভ, লালসা এবং স্বার্থপরতার শক্তিশালী প্রবণতা। মানুষের এ কু-প্রবণতাকে শয়তান তার স্বার্থে ব্যবহার করে সংঘাত বাধাবেই’।

‘তাহলে আর করার কি থাকল?’ বলল রোসেলিন।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘কেন করার মত কাজ তো আরও বাড়ল। অমঙ্গলের শক্তি শয়তান অন্যায়-অবিচারের রাজত্ব কায়েমে যত তৎপর হবে, মঙ্গলের শক্তিকে ন্যায় ও সুবিচার কায়েমে ততই তৎপর হতে হবে। করার কিছু থাকল না বলছ কেন?’

‘তাহলে সংঘাতই মানুষের অবধারিত ভাগ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে’।

‘এবং এটাই জীবন’।

‘তাহলে শান্তি?’

‘মঙ্গলের শক্তি ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠায় যে সংগ্রাম করে, তা শান্তির জন্যেই। কিন্তু শান্তি যদি না আসে, তবুও শান্তির সংগ্রামের মধ্যেই মানব জীবনের

সাফল্য। এবং এর জন্যে মানুষ পরকালে পাবে পরম পুরষ্কার, অনন্ত এক শান্তির জীবন'।

'আপনি জীবন থেকে পরজীবনে চলে গেলেন'।

'স্বাভাবিক। অতি সংক্ষিপ্ত এই জীবন তো অনন্ত পরজীবনে প্রবেশের একটা টিকিট ঘর মাত্র'।

'ধন্যবাদ্ বন্দুক হাতে আপনি যতটা দক্ষ, ধার্মিকতার দিক দিয়ে আপনি ততটাই দক্ষ'।

'ঠিক বলেছ মা। আমার প্রশ্নেরও জবাব পেয়ে গেছি। বিপ্লবী হিসেবে আহমদ মুসা যত বড়, তার মানবতাবোধও তত বড়'। বলল রোসেলিনের আব্বা উসাম বাইক।

টেলিফোন বেজে উঠল।

রোসেলিন গিয়ে টেলিফোন ধরল। টেলিফোন ধরেই বলল, 'আব্বা তোমার টেলিফোন'।

বলে কর্ডলেস টেলিফোন এনে রোসেলিন তার আব্বার হাতে দিল।

'মাফ করবেন, টেলিফোনটা ধরে নেই'। সবার দিকে চেয়ে কথা কয়টি বলে চীফ জাস্টিস টেলিফোনে কথা বলতে শরু করল।

অনেকক্ষণ ধরে টেলিফোনে কথা হলো। চীফ জাস্টিস কথা বলল কম, 'ইয়েস', 'নো' ধরনের দু একটা। অধিকাংশ সময়ই শুনলো।

শুরুতেই চীফ জাস্টিসের চেহারায় কিছু পরিবর্তন এসেছিল। তাকিয়েছিল আহমদ মুসার দিকে।

তার দিকে চীফ জাস্টিসকে তাকাতে দেখেই আহমদ মুসা বুঝতে পেরেছিল নিশ্চয় কথার মধ্যে আহমদ মুসার কথা এসেছে।

তার সম্পর্কে কে কথা বলছে ওঁর সাথে? প্রশ্ন জাগল আহমদ মুসার মনে। ওকুয়ার কেউ? না, পিয়েরে পলের মৃতু্য এবং ফ্রান্সিস বাইক বন্দী হবার পর চীফ জাস্টিসের সাথে তার সম্পর্কে আলোচনার কেউ নেই।

তাহলে?

এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেল না আহমদ মুসা।

টেলিফোনে কথা বলা শেষ হলো চীফ জাস্টিস উসাম বাইকের।

টেলিফোন পাশে রাখল চীফ জাস্টিস।

প্রথমে আহমদ মুসার দিকে তাকাল। তারপর ডঃ ডিফরজিসের দিকে একবার তাকিয়ে বলল, 'আহমদ মুসার জন্যে কিছু ভাল খবর রয়েছে'।

'কার টেলিফোন ছিল জনাব?' বলল আহমদ মুসা।

'আমাদের ল' সেক্রেটারী লাউস মেইডি'র'।

'ল' সেক্রেটারী? কি কথা তিনি বললেন?'

নড়ে-চড়ে বসল চীফ জাস্টিস। তারপর বলল, 'আহমদ মুসার পরিচয় পাবার পর আমি মনে করেছিলাম সে মুসলিম বিশ্বে অত্যন্ত জনপ্রিয়, কিন্তু সে যে অমুসলিম রাষ্ট্রগুলোরও এত প্রিয় তা ভাবতে পারিনি'।

'কি হয়েছে? উনি কি বললেন আব্ব?' বলল রোসেলিন।

'বলছি। ফিলিস্তিন, সৌদি আরব, মিন্দানাও, মধ্য এশিয়া মুসলিম প্রজাতন্ত্র, আফগানিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্র, বলকান প্রজাতন্ত্র, আজার বাইজান প্রজাতন্ত্র প্রভৃতি দেশের প্রেসিডেন্ট গতকাল আমাদের প্রসিডেন্টের সাথে এবং প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলেছেন। তারা জানিয়েছেন, মুসলিম জনগণের প্রিয় নেতা আহমদ মুসাকে ওকুয়া এবং ব্ল্যাক ক্রস ক্যামেরুনে এনে বন্দী করে রেখেছে। আহমদ মুসার মুক্তির ব্যাপারে তারা ক্যামেরুন সরকারের সাহায্য চেয়েছে।

'ল' সেক্রেটারী তোমাকে এঁটা জানাল কেন?' বলল ডঃ ডিফরজিস।

'ল' সেক্রেটারী আমার পুরনো বন্ধু। সে টেলিফোন করেছিল সরকারের সংকট জানানোর জন্যে। এই তো ক'দিন আগে ফ্রি ওয়ার্ল্ড টিভি এবং ওয়ার্ল্ড নিউজ এজেন্সী নিউজ করল যে, ওকুয়া সমগ্র দক্ষিণ ক্যামেরুন থেকে মুসলমানদের উচ্ছেদ করেছে, সমগ্র ক্যামেরুনে মুসলমানদের উপর জুলুম চালাচ্ছে ওকুয়া। তার সাথে সাথেই এই খবর যে মুসলিম বিশ্বের প্রিয় ব্যক্তিত্ব আহমদ মুসাকে ওকুয়া বন্দী করে এনেছে। সরকারের কাছে খুবই বিব্রতকর হয়েছে ব্যাপারগুলো। সউদি আরবের বাদশাহ সহ সাতজন রাষ্ট্র প্রধান টেলিফোন করা কম কথা! সরকার সাংঘাতিক চাপের মধ্যে পড়েছে'।

আহমদ মুসার চোখে-মুখে গভীর চিন্তার রেখা। ভাবছিল। চীফ জাস্টিস থামতেই সে বলল, 'কিন্তু সাতটি মুসলিম দেশ এত তাড়াতাড়ি এই ব্যাপারটা জানল কি করে?'

'হ্যাঁ, ল' সেক্রেটারী লাউস মেইডি এ সম্পর্কে বলেছেন। ব্ল্যাক ক্রসের পরিচয় দিয়ে গত পরশু রাতে কারা নাকি এ খবর জানিয়েছে ঐ মুসলিম দেশগুলোকে'।

'বুঝেছি, ব্ল্যাক ক্রস বিজয়ের বাহদুরিও দেখাতে চায় এবং ব্ল্যাক মেইলও করতে চায়'। বলল আহমদ মুসা।

'ব্ল্যাক মেইল কিভাবে?' বলল চীফ জাস্টিস।

'আহমদ মুসাকে মুক্তি দেয়ার ভোয়া টোপ দিয়ে তারা ঐ মুসলিম রাষ্ট্রগুলো থেকে টাকা খসাতে চায়'।

'সাংঘাতিক ব্যবসায়'। বলল ডঃ ডিফরজিস।

'তাদের এ ব্যবসার একদিক দেখলেন, আরও দিক আছে'। বলল আহমদ মুসা।

'সেটা কি?' বলল ডঃ ডিফরজিস।

'ব্ল্যাক ক্রস এ খবর শ্বেতাংগ সন্ত্রাসবাদী সংস্থা ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান, ইহুদি বিশ্ব গোয়েন্দা নেট ওয়ার্ক 'ইরগুন জাই লিউমি' এবং ধ্বংসাবশিষ্ট বাম গোপন সংগঠন 'ওয়ার্ল্ড রেড ফোর্স' (W.R.F) কে জানাবে এবং তারা কে কতত বিলিয়ন ডলার দিয়ে আমাকে কিনতে পারে তার দরকষকষি করবে'। আহমদ মুসা বলল।

'তারা কিনবে কেন?' বলল চীফ জাস্টিস।

'কারণ তাদের বড় বড় পরাজয় ঘটেছে আমার হাতে। আমাকে হাতে পেলে তারা তার শোধ নিতে পারবে এবং আমাকে হাতে রেখে কিছু মুসলিম দেশকে বেকায়দায় ফেলে অতীতের ক্ষতিপূরণ করার চেষ্টা করবে'।

'তারা বেকায়দায় পড়বে কিভাবে?' বলল ডঃ ডিফরজিস।

'কিছু মুসলিম রাষ্ট্র আছে যারা বৈষয়িক যে কোন মূল্যের চেয়ে আমার নিরাপত্তাকে বড় বলে মনে করে'।

'বুঝেছি। তুমি ভাগ্যবান আহমদ মুসা'। বলল ডঃ ডিফরজিসই আবার।

‘ঠিক। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ্ তিনি বড় বিপদ থেকে তোমাকে এবং তোমার জাতিকে রক্ষা করেছেন’। একটু থেমে চীফ জাস্টিস বলল, ‘ক্যামেরুনে তোমার আমার লক্ষ্য তো অর্জিত হয়েছে। এখন তোমার পরিকল্পনা কি?’ বলল চীফ জাস্টিস।

‘প্রথম লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে দ্বিতীয় লক্ষ্য এখনো অর্জিত হয়নি’।

‘দ্বিতীয় লক্ষ্য কি? বলুন’। চীপ জাস্টিস বলল।

‘উচ্ছেদ হওয়া মুসলমানদের তাদের সহায়-সম্পত্তি ফিরে পাওয়া এবং তাদের পুনর্বাসন’।

‘এ তো বিরাট কাজ। এটা কিভাবে সম্ভব হবে?’ চীফ জাস্টিসই বলল।

‘সে পরিকল্পনা করেছি। ফ্রান্সিস বাইককে এ জন্যেই বন্দী করে এনেছি’।

‘ঈশ্বর তোমাকে সাহায্য করুন’।

‘আমিন’।

বলে আহমদ মুসা তাকাল রাশিদী ইয়েসুগোর দিকে। বলল, রাশিদী ফ্রান্সিস বাইককে তোমার গাড়িতে পার করে নাও। ওকোচা অনেক কষ্ট করেছে, আর নয়। ওর বাড়িতে এতক্ষণ নিশ্চয় কান্নার রোল পড়ে গেছে’।

‘না আহমদ মুসা ভাই, আমার কোন কষ্ট হয়নি। আমাকে নিয়ে তাড়াহুড়া করবেন না’। বলল ওকোচা।

‘কিন্তু বাড়ির সবাই তোমার জন্যে কষ্ট পাচ্ছে। শেষ রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছ। স্ত্রীকেও বলনি। বাড়িতে গিয়ে দেখ কি সাংঘাতিক অবস্থা। থানাতেও খবর হয়ে গেছে এতক্ষণ’।

‘কিন্তু আপনাকে সাথে নিয়ে যেতে চাই। সবাই খুশী হবে’।

‘আমি জানি। আমি যাব, তবে তোমার সাথে নয়। তুমি যে আমাকে সাহায্য করেছ, একথা তোমাকে গোপন রাখতে হবে’।

‘কেন?’

‘কারণ আমি চাই না তোমাদের পরিবার বিপদগ্রস্ত হোক’।

‘ওকুয়া জানবে কি করে?’ বলল ওকোচা।

‘তোমার পরিবারের কেউ ওকুয়াকে বলবে না। কিন্তু এমন কেউ জেনে ফেলতে পারে যার কাছ থেকে ওকুয়ার কানে কথা পৌঁছতে পারে’।

‘বুঝলাম। মানলাম। তাহলে আপনি কবে কখন যাচ্ছেন?’

‘সেটা বলা মুস্কিল। তবে যাব। তোমার সাহায্য আমার দরকার হতে পারে’।

‘ধন্যবাদ ভাইয়া। আপনি শুধু আমাকে নতুন জীবন দেননি। আমার মনে হচ্ছে নতুন দৃষ্টিও আপনার কাছ থেকে পাব’। বলে উঠে দাঁড়াল ওকোচা।

রাশিদী ইয়েসুগো এবং মুহাম্মাদ ইয়েকিনিও উঠে দাঁড়িয়েছিল।

আহমদ মুসা উঠে হ্যান্ডশেক করল ওকোচার সাথে। তারপর তার পিঠ চাপড়ে বলল, ‘তুমি অবিশ্বাস্য কাজ করেছ ওকোচা। আমি কৃতজ্ঞ’।

‘ছোট ভাইকে এভাবে কেউ বলে?’ আহমদ মুসার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ক্ষোভ ভরা কণ্ঠে বলল ওকোচা।

আহমদ মুসা ওকোচাকে বুকে জড়িয়ে ধরল বলল, ‘ঠিক আছে, আর বলল না।’

ওকোচা, রাশিদী এবং ইয়েকিনি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ওরা বেরিয়ে গেলে ডঃ ডিফরজিস বলল, ‘তুমি ঠিক বলেছ আহমদ মুসা। ছেলেটা অবিশ্বাস্য কাজ করেছে।’

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল। এই সময় ঘরে প্রবেশ করল ডোনার আব্বা মিশেল প্লাতিনি।

মিশেল প্লাতিনি প্রবেশ করতেই ডঃ ডিফরজিস উঠে দাঁড়াল। মিশেল প্লাতিনি এবং ডঃ ডিফরজিস পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল।

তারপর উভয়ের মধ্যে কুশল বিনিময় হলো, কথা হলো।

এক পর্যায়ে চীফ জাস্টিস উসাম বাইক মিশেল প্লাতিনিকে উদ্দেশ্য করে বলল, ‘বিরাট লস করেছেন। অপরুপ কাহিনী থেকে বঞ্চিত হলেন।’

‘হ্যাঁ, দুর্ভাগ্য আমার।রোসেলিন মা, ডোনা মা দু’জনেরই টেলিফোন পেয়েছি। কিন্তু ড্রাইভার ছিল না। আমাকে একা বেরুতে দিলেন না এ্যামবেসেডর।’ বলল মিশেল প্লাতিনি।

ড্রইং রুমে প্রবেশ করল রাশিদী ইয়েসুগো এবং মুহাম্মদ ইয়েকিনি।

রাশিদী ও ইয়েকিনি এসে বসতেই আহমদ মুসা রাশিদীকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ওকোচাকে তোমার বাড়ির ঠিকানা দাওনি তো?' আহমদ মুসা চোখে-মুখে কিছুটা শংকার মিশ্রণ।

রাশিদী সেদিকে চেয়ে বলল, 'না' কেন জিজ্ঞেস করছেন? দেয়া কি উচিত ছিল?'

'ধন্যবাদ। না দিয়ে ঠিক করেছে।'

'কেন। তাকে সন্দেহ করেন? এ জন্যেই কি তাকে আমাদের সাথে আমাদের বাড়ি পর্যন্ত নিলেন না?'

'তাকে সন্দেহ করি বলে তাকে তোমার বাড়ি পর্যন্ত নিলাম না, তা নয়। আসলে এটা একটা সাবধানতা। আমি মনে করি সে সন্দেহের উর্ধ্বে। কিন্তু সে কারো হাতে পড়তে পারে এবং চাপে পড়ে ফ্রান্সিস বাইকের একটা হদিস হিসেবে তোমার বাড়ির ঠিকানা বলে দিতেও পারে। এমন সম্ভাবনার দরজা এই পর্যায়ে বন্ধ রাখা দরকার।

'বুঝেছি আহমদ মুসা ভাই। ধন্যবাদ আপনাকে।' বলল রাশিদী ইয়েসুগো।

'এতদূর পর্যন্ত সামনে দেখে তুমি পথ চল আহমদ মুসা! আমি হলে তো এক ঠিকানা কেন, সবকিছু তাকে জানাতে দ্বিধা করতাম না।' বলল চীফ জাস্টিস ইসাম বাইক।

'এই জন্যেই আহমদ মুসাই শুধু আহমদ মুসা।' বলে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে ডঃ ডিফরজিস বলল, 'এখন কিছু কিছু করে বুঝতে শুরু করেছে তুমি এত সফল কেন?'

আহমদ মুসার চোখে-মুখে লজ্জার একটা ভাব ফুটে উঠেছিল। সম্ভবতঃ কথার মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেবার জন্যে বলল, 'আমাদের এখন উঠতে হয়।'

বলে চীফ জাস্টিস উসাম বাইকের দিকে চেয়ে বলল, 'অনুমতি দিন।'

উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

রোসেলিনের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আমরা গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি, লায়লা ও ফাতেমা মুনেকা থাক। পরে গাড়ি পাঠানো হবে, বা তুমি পৌঁছে দিও।’

রোসেলিন মাথা নেড়ে বলল, ‘আমি পৌঁছে দেব।’

‘ধন্যবাদ।’ বলে আহমদ মুসা তাকাল ওমর বায়ার দিকে। বলল, ‘রাশিদীরা এসেছে, ওমর বায়া তুমি আমাদের সাথে চল।’

ওমর বায়া এলিসা গ্রেসের দিকে একবার চেয়ে উঠে দাঁড়াল। এলিসা গ্রেসও চেয়েছিল ওমর বায়ার দিকে।

ব্যাপারটা নজর এড়াল না আহমদ মুসার। বলল, ‘রোসেলিন, এলিসা গ্রেসকে লায়লাদের সাথে বেড়াতে নিয়ে যেতে পার।’

‘মারিয়া আপাকে?’ বলল রোসেলিন।

আহমদ মুসা একবার ডোনার দিকে চাইল। তারপর রোসেলিনের দিকে চেয়ে বলল, ‘ও সুস্থ হয়ে ওঠেনি। ওর ‘মুভ’ না করাই ভাল।’

ডোনার ঠোঁটে তখন হাসি।

আহমদ মুসা কথা শেষ করতেই ডোনার আব্বা মিশেল প্লাতিনি আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, ‘এখন তোমার পরিকল্পনা কি?’

‘পিয়েরে পল নিহত হয়েছেন, ফ্রান্সিস বাইককে আমরা বন্দী করেছি। ওকুয়া যে অবিচার করেছে তার প্রতিকারের জন্যে কিছু করতে হবে জনাব। ফ্রান্সিসের একটা ব্যবস্থা করে আপনাদের সাথে দেখা করবে। সব বলব তখন।’

বলে আহমদ মুসা সকলকে সালাম জানিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। চলতে শুরু করল। তার সাথে সাথে রাশিদী, ইয়েকিনি এবং ওমর বায়া।

ওদের চলার পথের দিকে তাকিয়ে ছিল সবাই।

চীফ জাস্টিস উসাম বাইক তার পথের দিকে চোখ রেখেই বলল, ‘যন্ত্রের মত কর্তব্য পরায়ন অদ্ভুত মানুষ।’

‘যন্ত্রের কোন অন্তর থাকে না। কিন্তু ওর আছে সাগরের মত গভীর, আকাশের মত উদার একটা মন।’ বলল রোসেলিন।

‘আমি ভেবে পাই না, সার্বক্ষণিক টেনশন নিয়ে ও বাঁচে কি করে?’ বলল চীফ জাস্টিস।

‘না, ও কোন টেনশনে ভোগে না। ওর মধ্যে কোন টেনশন দেখিনি।’ বলল মিশেল প্লাতিনি।

‘উনি নিজেকে নিয়ে ভাবেন না। ফল নয়, কাজ উনার বড়। উনি মনে করেন, কাজ করা, চেষ্টা করার দায়িত্ব তার, ফল দেবেন আল্লাহ। সুতরাং টেনশন তার কাছে আসতে পারে না।’ বলল মিশেল প্লাতিনি।

‘তুমি কিছু বল মারিয়া আপা।’ ঠোঁটে একটা সুক্ষ্ম হাসি টেনে বলল রোসেলিন।

ডোনার মুখে সলজ্জ হাসি ফুটে উঠল। সে উঠে দাঁড়াল। বলল ‘আমার ওষুধ খাবার সময় হয়েছে। আমি চললাম।’

বলে দু’তলার সিঁড়ির দিকে এগুলো।

তার পেছনে পেছনে ছুটল রোসেলিন।

লায়লা এবং ফাতেমা মুনেকাও উঠে দাঁড়াল। তারাও হাঁটতে শুরু করল সিঁড়ির দিকে।

চীফ জাস্টিস উঠে দাঁড়িয়ে মিশেল প্লাতিনির দিকে চেয়ে বলল, ‘আপনি আমার স্টাডি রুমে আসুন। কথা আছে।’

এরপর ডিফরজিসের দিকে চেয়ে বলল, ‘আসুন, আপনি রেস্ট নেবেন।’

ডঃ ডিফরজিস এবং মিশেল প্লাতিনিও উঠে দাঁড়াল।

সবাই চলল দু’তলার সিঁড়ির দিকে।

# ২

ইয়েসুগো প্রাসাদের ছাদে একটা ইজি চেয়ারে আধাশোয়া আহমদ মুসা।

তার খোলা স্থির চোখ দু'টি লাখো তারার আলো জ্বলা দূর আকাশে নিবদ্ধ।

আকামে চাঁদ তখনো উঠেনি। চাঁদের অভাব পুরণ করতে আকাশে লাখো তারার উজ্জ্বলতার হাসি। কালো আকাশে বুকে আলোর এক উৎসব।

প্রাসাদের আশেপাশে উচু কোন বিল্ডিং নেই। তার ফলে আকাশে আদিগন্ত দৃশ্য চোখে পড়ছে আহমদ মুসার।

ছাদের আলো শেডে ঢাকা হলেও ছাদে অন্ধকার কোথাও নেই।

সিঁড়ির খোলা দরজা পথে ছাদে উঠে এল লায়লা, ফাতেমা মুনেকা, ডোনা এবং রোসেলিন।

ডোনা ও রোসেলিন হাসপাতালে এসেছিল ডোনার চেকিং-এর জন্যে। সেখান থেকে যাবার পথে তারা উঠেছে লায়লার বাড়িতে এইমাত্র। আহমদ মুসা ছাদে লায়লা ডোনাদের নিয়ে এসেছে ছাদে।

সিঁড়ি ঘরটি ছাদের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে। তারা সিঁড়ি ঘরের দক্ষিণমুখী দরজা দিয়ে বেরিয়ে আহমদ মুসার সামনেই পড়ে গেল।

অল্প দুরেই আহমদ মুসা আধাশোয়া। সে পশ্চিমমুখী, কিন্তু মাথাটা তখন উত্তর দিকে একটু কাত হয়ে আছে।

চারজন মানুষ ছাদে প্রবেশ করল প্রায় আহমদ মুসার সামনে দিয়ে। কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়া নেই আহমদ মুসার মধ্যে।

ওরা একটু এগুলো। দেখল, আহমদ মুসার দৃষ্টি উপরে আকাশের দিকে নিবদ্ধ।

লায়লা কথা বলতে গিয়েছিল। ডোনা তার মুখ চেপে ধরে কথা বলতে দিল না। বলল, 'দেখা যাক না, কখন আমরা ওর চোখে পড়ি।'

লায়লারা ছাদে ঘুরাঘুরি করল। আহমদ মুসার আশপাশ দিয়েও ঘুরে গেল। আহমদ মুসার দৃষ্টি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হলো না।

অবশেষে তারা আবার এসে দাঁড়াল সিঁড়ি ঘরের সেই দরজার কাছে।

'অবাক ব্যাপার! ওর সংজ্ঞা আছে তো?' বলল রোসেলিন।

'না, ইচ্ছা করেই উনি চোখে না পড়ার ভান করছেন আমরা মহিলা বলে।' বলল লায়লা ইয়েসুগো।

ডোনা হাসল। বলল, 'না এরকম উনি করতে পারেন না। উনি তাকাবেন না ঠিক আছে, কথা বলবেন না কেন? কিংবা এতগুলো মানুষ তার আশে পাশে ঘোরার প্রতিক্রিয়া হবে না কেন?'

'তাহলে?' বলল ফাতেমা মুনেকা।

'আসলে উনি এ জগতে নেই।' হেসে বলল ডোনা।

'তার মানে?' ফাতেমা মুনেকাই বলল।

'প্রকৃতির মাঝে বিশেষ করে আকাশের অন্তহীন নীলের বুকে হারিয়ে যাবার তাঁর অভ্যাস আছে।' বলল ডোনা।

'হো হো করে হেসে উঠল রোসেলিন।

এবার নড়ে উঠেছে আহমদ মুসা।

সে মথা তুলে তাকিয়েছে লায়লাদের দিকে।

'ডোনা, উনি জগতে ফিরেছেন। যাও খোঁজ নিয়ে এস।' বলল রোসেলিন।

'এস, তোমরাও দেখবে ঘটনাটা কি।' বলে ডোনা পা বাড়াল আহমদ মুসার দিকে।

লায়লারাও ডোনার পিছু নিল।

'ডোনা, তোমরা? এ সময় কোত্থেকে?' ইজিচেয়ারে সোজা হয়ে বসে বলল আহমদ মুসা।

'উত্তরটা পরে দিচ্ছি। আগে বল, আমরা এখানে কখন এসেছি?

'এখানে মানে এ বাড়িতে, না ছাদে?'

'ছাদে।'

‘ও, তোমরা অনেক্ষণ এসেছ বুঝি। খেয়াল করিনি। আমি আকাশটা দেখছিলাম।’ হেসে বলল আহমদ মুসা।

‘দেখছিলেন, না হারিয়ে গিয়েছিলেন?’ বলল রোসেলিন।

হাসর আহমদ মুসা। বলল, ‘মিথ্যে নয় রোসেলিন, আজ ইয়াউণ্ডির আকাশটা হারিয়ে যাবার মতই। আকাশে চাঁদ নেই, মেঘ নেই, কুয়াশা নেই, ধুলোবালিও ইয়াউণ্ডির আকাশে কম, তার উপর এই এলাকার গ্রাউণ্ড লাইনে উজ্জ্বল আলোর কোন ফ্লাশ নেই। যার ফলে তারার যে স্বচ্ছ হাসি আকাশে আমি দেখছি, তা বহুকাল দেখিনি।’

‘কেন ইউরোপে তো আমি এই আকাশ দেখেছি, এই তারার মেলাই দেখেছি।’ রোসেলিন বলল।

‘না দেখনি রোসেলিন।’

বলে আহমদ মুসা উত্তর দিগন্তে বিশ ডিগ্রীর মত কৌণিক অবস্থানের দিকে আংগুলি সংকেত করে বলল, রোসেলিন ঐ দেখ ‘এন্ড্রোমেডা’ গ্যালাক্সি। ইউরোপ থেকে কখনও একে আমি এই ভাবে দেখতে পাইনি। ওর দিকে তাকিয়ে সত্যিই আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। ও আমাদের এই ‘ছায়াপথ’ গ্যালাক্সি থেকে কতদূরে জা?’

‘না তো। বলল রোসেলিন।

‘বিশ লাখ আলোক বর্ষ দূরে। জগতের অত দূরের একটা অংশকে দেখছি ভাবতেই মনটা শিউরে ওঠে না!’ ধোঁয়ার পাতলা একটা পিন্ডের মত দেখাচ্ছে। ওর নাম ‘এ্যান্ড্রোমেডা?’ বলল লায়লা।

‘হ্যাঁ। কিন্ত ওটা ধোঁয়া নয়। আমাদের মাঝার উপর যে তারা জগৎ দেখছি, তার চেয়েও বিশাল তারার জগৎ ওটা। দূরত্বের কারণেই ধোঁয়ার মত আমরা দেখছি।

‘বিশ লাখ আলোক বর্ষ দূরে ওটা! তার পর কি আছে?’ প্রশ্ন করল রোসেলিন।

‘ঐ ‘এ্যান্ড্রোমেডা’র চেয়েও বড় আরও লাখো গ্যালাক্সি আছে, যেগুলো ‘এ্যান্ড্রোমেডা’র থেকেও কোটি কোটি আলোক বর্ষ দূরে।’

বলে আহমদ মুসা দক্ষিণ দিগন্তের দিকে চোখ ফিরাল। তারপর দক্ষিণ দিগন্তের দুটি স্থানের দুইটি ধোঁয়া পিন্ডের দিকে আঙুল স্থির করে বলল, 'দেখ ঐটা 'বড় ম্যাজেলানিক', আর ওটা 'ছোট ম্যাজেলানিক' গ্যালাক্সি। বড়টি আমাদের 'ছায়াপথ' গ্যালাক্সি থেকে ষোল লাখ আলোক বর্ষ এবং ছোটটি আঠাল লাখ আলোক বর্ষ দূরে।

'কোটি কোটি আলোক বর্ষ দূরে শেষ যে গ্যালাক্সি, তারপর কি আছে?' বলল লায়লা ইয়েসুগো।

গোখ বুজল আহমদ মুসা।

অনির্বাচনীয় এক আবেগ এসে তার মুখে চায়া ফেলল। সুক্ষ্ণ একটা কম্পন জেগে উঠল তার ঠোঁটে। ধীরে ধীরে বলল, 'এর উত্তর বিজ্ঞানী জানে না লায়লা। জানেন শুধু এই মহা সৃষ্টির যিনি মালিক।'

আহমদ মুসার ভারি গলা থেকে কথাগুলো কেঁপে কেঁপে বেরিয়ে এল।

তার চখের কোণায় বেরিয়ে আসা অশ্রু ম্লান আলোতেও চিক করে উঠল।

আহমদ মুসার আকষ্মিক এই পরিবর্তনে বিস্মিত লায়লারা।

আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি চোখ খুলে চোখের কোণ মুছে নিয়ে মেখে হাসি টানতে চেষ্টা করে বলল, 'কিছু মনে করো না তোমরা। চারদিকে অন্তহীনভাবে ছড়ানো সৃষ্টির বিশালত্বের মুখোমুখি দাঁড়ালে আমার নিজেকে শিশুর মত অসহায় মনে হয়। কান্না আসে নিজের ক্ষুদ্রতা এবং এই ক্ষুদ্র ও অসহায় সৃষ্টি মানুষের প্রতি মহানসৃষ্টির মহান স্রষ্টা আল্লাহর দয়ার কথা ভেব।'

আহমদ মুসার ঠোঁটে হাসি, কিন্তু কণ্ঠ তার আবেগ রুদ্ধ, ভারি।

লায়লাদের মুখেও আগের সেই চটুল হাসি এখন আর নেই। তাদের চোখ-মুখও বিস্ময়ে ভারি হয়ে উঠেছে।

আহমদ মুসা থামলেও ওরা তৎক্ষণাৎ কথা বলতে পারল না। তাদের বিস্মিত দৃষ্টি আহমদ মুসার উপর নিবদ্ধ।

একটু পরে লায়লা ধীর কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু ভাইয়া, মানুষ তো আশরাফুল মাখলুকাত-সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, ক্ষুদ্র নয়।'

‘বিস্ময়তো এখানেই লায়লা। ক্ষুদ্র, দূর্বল মানুষকে করা হয়েছে আশরাফূল মুখলুকাত। শুধু তাই নয় মুখলুকাতকে মানুষের জন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে। ক্ষুদ্র মানুষের প্রতি কেন এত দয়া স্রষ্টার? তাঁর এ দয়াই মানুষকে আশরাফুল মুখলুকাত করেছে।’

ধীর নরম কণ্ঠ আহমদ মুসার। বলতে বলতে চোখ দু’টি বুজে গিয়েছিল আহমদ মুসার।

তৎক্ষণাৎ কেউ কথা বলল না লায়লাদের।

‘আপনার এই ‘কেন’-এর উত্তর কি আহমদ মুসা ভাই? অন্তহীন এই মহাবিশ্বের মানুষের অস্তিত্ব পরমাণু কণা’র মতও নয়। তবু কেন তার এই গুরুত্ব, কেন তার প্রতি এই দয়া/ বলল ধীর কণ্ঠে রোসেলিন।

‘আল্লাহ প্রিয় বান্দাহ এবং নবী দাউদ (আ) অশ্রুসজল চোখে আকুল কণ্ঠে এই প্রশ্নই করেছিলেন নিঃসীম আকাশের দিকে চেয়ে। মানুষের কৃতজ্ঞ ও পরিতৃপ্ত হৃদয়ের এই অবাক জিজ্ঞাসা থাকবে সব সময়। এ শুধু জিজ্ঞাসাই, জবাব প্রয়োজন নেই রোসেলিন।’

‘সত্যিই প্রয়োজন নেই। বোধ হয় মানুষের সৃষ্টি কাহিনীই এর জবাব।’ বলল লায়লা ইয়েসুগো।

‘আমার একটা বিস্ময় লাগছে।’ অনেকক্ষণ পর বলল ফাতেমা মুনেকা।

‘কি?’ বলল আহমদ মুসা।

‘মহাবিশ্বের অন্তহীন রাজ্যে প্রবেশ করার এবং তার মাঝে হারিয়ে যাবার মত তাহলে আপনার আছে?’ বলল ফাতেমা মুনেকা।

‘থাকবে না কেন?’

‘বারুদের গন্ধ এবং রক্ত স্রোতের তলায় এমন নরম ও সংবেদনশীল মন বাঁচতে পারে না।’ বলল ফাতেমা মুনেকা।

‘তারপর?’ বলল আহমদ মুসা।

‘আপনার সে মন বাঁচল কি করে, সেটাই আমার বিস্ময়!’ ফাতেমা মুনেকা বলল।

‘হয়তো বেঁচে নেই।’ বলল আহমদ মুসা।

‘শুধে বেঁচে থাকা নয়, সে মন আপনার সাংঘাতিক সজীব এবং সক্রিয়। বংর বলতে পারেন, সে মনটা আমাদের নেই, অথবা ছিল মরে গেছে। সে কাণেই ‘এ্যান্ড্রোমেডা’ ও ‘ম্যাজিলানিক’ গ্যালাক্সিগুলো আমরা দেখতে পাই না, লাখো তারার মিট মিটে চোখে আমরা কখনও চোখ রাখি না, আকাশের অন্তহীন রহস্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না।’ থামল ফাতেমা মুনেকা।

সে থাকতেই রোসেলিন বলল, ‘ফাতেমা ঠিকই বলেছে, ইয়াউন্ডির যে রাত এবং রাতের যে আকাশ আপনার কাছে অনন্য আকারে ধরা দিয়েছে, সে রাত তো আমরা দেখি, কিন্তু আমাদের মনে তো সাড়া জাগয় না!’

‘আচ্ছা এসব থাক রোসেলিন, তোমাদের কোন খবর আছে? আর কি ব্যাপার, ডোনা, লায়লাদের মত করে তুমি চাদর পরেছ দেখছি।’ বলল আহমদ মুসা রোসেলিনকে লক্ষ্য করে।

রোসেলিনের মাথায় গায়ে চাদর জড়ানো। চাদরের মাথার প্রান্তটা কপাল পর্যন্ত নেমে আসা। তার পরণের স্কার্টও আর মিনি ধরনের নয়, পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত নামানো।

‘কেন চাদর পরা কি ডোনা-লায়লাদের মনোপলি যে আমার পরা চলবে না?’ হেসে বলল রোসেলিন।

‘পরা চলবে না বলিনি, পরেছ যে তাই বলছি?’ আহমদ মুসা বলল।

‘ভাইয়া ওতে অনেক আগে থেকেই মনে মনে চাদর পরে আছে, আজ প্রকাশ্যে পরেছে মাত্র। এরকম একটা চাদর সেদিন আমি রাশিদী ভাইয়াকে কিনতে দেখেছি।’ মুখ টিপে হেসে বলল লায়লা ইয়েসুগো।

লায়লার কথা শেষ করার আগেই রোসেলিন কিল তুলেছিল লায়লাকে লক্ষ্য করে। পিঠে কিল পড়ার আগেই পিঠ বাঁকিয়ে ছুটে পালাল লায়লা।

‘লায়লা খুব দুষ্টু হয়েছে ভাইয়া। ওর মুখে কিচ্ছু বাধে না।’

বলে একটু থামল রোসেলিন। তাপর আবার শুরু করল, ‘ভাইয়া ফাতেমা যে জিজ্ঞাসা তুলে ধরেছিল, তার কিন্তু জবাব আপনি দেখনি।’

‘সেটা কি?’

বারুধের অবিরাম গন্ধ আর ভয়াবহ রক্ত স্রোতের তলায় যে মন আপনার বাঁচার কথা নয়, তা বাঁচলো কি করে? বলল রোসেলিন।

আহমদ মুসা হাসল।

ইজি চেয়ারে আরেকটু সোজা হয়ে বসল। বলল, 'যদি তা বেঁচেই থেকে থাকে বলে তোমরা মনে কর, তাহলে সেটা বাঁচার কারণ বোধ হয় এই যে, আমি আমার ব্যক্তিগত কোন শত্রুতা, ব্যক্তিগত কোন ক্রোধ, ব্যক্তিগত কোন লাভ বা স্বার্থে কখনও বন্দুক ধরিনি, এক ফোটা রক্তপাতও কারও করিনি, যা কিছু করেছি আল্লাহর বান্দাহ মজলুম মানুষের স্বার্থে। অন্য কথায়, যা করেছি আল্লাহর পথে আল্লাহর জন্যেই করেছি। এই কাজে আত্মরক্ষার প্রয়োজন ছাড়া কাউকে আমি আঘাত করিনি, হত্যা করিনি। এই কারণেই হয়তো লোভের যে অগ্নিদৃষ্টি মনের সবুজ সৌন্দর্যকে পুড়িয়ে দেয়, তা আমার মনের ওপর পড়েনি, স্বার্থপরতার যে কালিমা মনকে অন্ধ করে দেয়, তা আমার মনের ওপর কার্যকরী হয়নি এবং হিংসার যে ক্রুর কৃপাণ মনকে টুকরো টুকরো করে কাটে, তা আমার মনের ওপর আপতিত হয়নি।' স্বাগত ধরনের নরম কণ্ঠ থামলো আহমদ মুসার।

মুহূর্তকাল নীরবতা।

উচ্ছ্বাসিত রোসেলিন-লায়লারা কিছু বলার জন্যে সবাই এক সংগে মুখ খুলেছিল।

আহমদ মুসা ওদের থামিয়ে দিয়ে বলল, 'এবার আমার পালা। ডোনাকে যে প্রশ্ন করেছি তার জবাব এখনও পাইনি।'

'কি প্রশ্ন করেছ?' ডোনা বলল মিষ্টি হেসে।

'তোমরা এ সময় কোত্থেকে এলে?'

'হাসপাতালে গিয়েছিলাম আঘাতের জায়গাটা চেক করাতে।'

আহমদ মুসার ভ্রু কুঞ্চিত হলো। বলল, 'এর কি দরকার ছিল?'

'হাসপাতাল থেকে যে ডাক্তার দেখতে আসত, সেই ডেট দিয়েছিল।'

'তোমরা দু'জন গিয়েছিলে শুধু?'

'না ড্রাইভার ছিল। কেন ঠিক হয়নি মনে করছ?'

‘আমার তাই মনে হচ্ছে। হাসপাতালে ‘ওকুয়া’র লোক আছে। আমার ধারণা তাদের কাছ থেকে খবর পাবার ফলেই ‘ওকুয়া’র পক্ষে সম্ভব হয়েছিল সেদিন হাসপাতালে আমাদের উপর আক্রমন করা।’

ডোনা ও রোসেলিন দু’জনের মুখ ম্লান হয়ে গেল। শুকিয়ে উঠল তাদের ঠোঁট।

তারা কোন কথা বলল না।

আহমদ মুসাই আবার কথা বলল, ‘গাড়ি নিয়ে ফেরার পথে কোন কিছু সন্দেহ করেছ? কেউ ফলো করেনি তো?’

‘না করেনি। আমি ভালোভাবে এটা লক্ষ্য রকেছি। অবশ্য হাসপাতাল থেকে এ পর্যন্ত রাস্তাও খুব অল্প।’ বলল ডোনা।

‘গাড়ি কোথায় ছিল? ড্রাইভার কোথায় ছিল?’

ডোনা উত্তর না দিয়ে তাকাল রোসেলিনের দিকে। রোসেলিন বলল, ‘আমরা ড্রাইভারকে গাড়ির কাছে রেখে গিয়েছিলাম। তারপর আর কিছু জানি না।’

এ সময় সেখানে এসে দাঁড়াল রাশিদী ইয়েসুগো। বলল, ‘চলুন ভাইয়া সময় হয়ে গেছে।’

বলে রাশীদি রোসেলিনের দিকে চেয়ে আস্তে বলল, ‘তোমরা এ সময়ে? কখন এলে?’

‘অনেক কথা। ভাইয়াকে বলেছি’। বলল রোসেলিন আস্তে।

রাশিদীর কথা শুনে আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকিয়েছিল। সময় দেখে বলল, ‘হ্যাঁ সময় হয়ে গেছে। কিন্তু বেরুবার আগে চল রোসেলিনের ড্রাইভারের সাথে একটু কথা বলি।’

‘কেন? কিছু ঘটেছে?’ বলল রাশিদী ইয়েসুগো।

‘ওরা দু’জনে হাসপাতালে গিয়েছিল। হাসপাতালে ‘ওকুয়া’র লোক আছে নিশ্চয়। সুতরাং সবদিক থেকে নিশ্চিত হওয়া দরাকার। বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়েছিল।

‘তোমরাও এস।’ রোসেলিনের দিকে চেয়ে কথাগুলো বলে চলতে শুরু করল আহমদ মুসা।

রাশিদী ইয়েসুগো তার পাশে পাশে হাঁটতে শুরু করলো। রোসেলিনরা সকলে তাদের পিছু পিছু চলল।

রোসেলিনের গাড়ির ড্রাইভার গাড়ির পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। আহমদ মুসাদের গাড়ির দিকে আসতে দেখে সে একটা স্যালুট দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

আহমদ মুসাকে দেখিয়ে রোসেলিন ড্রাইভারকে বলল, ‘এঁকে তো তুমি চেন ড্রাইভার?’

‘জি ম্যাডাম।’ বলল ড্রাইভার।

‘ইনি তোমার সাথে একটা বিষয়ে আলাপ করবেন।’

‘ইয়েস ম্যাডাম।’ বলে ড্রাইভার আহমদ মুসার দিকে বিনীতভাবে চাইল।

‘তেমন কোন কথা নয়, আমি জানতে চাচ্ছিলাম হাসপাতালের সামনে গাড়ি পার্ক করার পর তুমি কোথাও গিয়েছিলে কিনা?’ আহমদ মুসা জিজ্ঞেস করল ড্রাইভারের দিকে চেয়ে।

‘না, স্যার। গাড়ি ছেড়ে কোথাও যাইনি।’

‘কেউ তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করেছিল কিনা?’

‘না স্যার।’

‘দীর্ঘ সময়টাতে কেউ তোমার কাছে আসেনি, কারও সাথে তোমার কথা হয়নি?’

‘না, স্যার। শুধুমাত্র হাসপাতালের বেয়ারা ম্যাডামের ওষুধর একটা প্যাকেট আমাকে দিয়ে গিয়েছিল।’

চমকে উঠল রোসেলিন। তার দুই চোখে উত্তেজনা। দ্রুত বলল, ‘ওষুধের প্যাকেট? কি বলেছিল, কোথায় প্যাকেট?’

‘ড্যাস বোর্ডের কেবিনে রেখেছি। বেয়ারা বলেছীল, ম্যাডাম রোসেলিন ওষুদ পাঠিয়েছেন গাড়িতে রাখার জন্যে।’

রোসেলিনের চোখ দু’টি তখন বিস্ফারিত।

ডোনার চোখেও বিস্ময়!

'তুমি ওষুদ কিংবা কোন প্যাকেট পাঠাওনি রোসেলিন?' দ্রুত কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

'না পাঠাইনি।' কাঁপা কণ্ঠে বলল রোসেলিন।

আহমদ মুসা দ্রুত ড্রাইভারের দিকে চেয়ে বলল, 'গাড়ির সামনের দরজা এবং ড্যাশবোর্ডের কেবিন লক করা নেই তো?'

'না, স্যার।' শুকনো কণ্ঠে বলল ড্রাইভার।

আহমদ মুসা সকলের দিকে চেয়ে বলল, 'জানি না প্যাকেটে কি আছে, তবু সাবধান হওয়া ভাল। তোমরা সরে দাঁড়াও।'

বলে আহমদ মুসা গাড়ির দিকে এগুলো।

ডোনা ছুটে এসে আহমদ মুসার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে বলল, 'না তুমি যাবে না, আমি নিশ্চিত প্যাকেটে বোমা আছে।'

'প্লিজ ডোনা সময় নষ্ট করো না। ওটা যদি বোমা হয়ে থাকে, তাহলে এখানে ফাটা ঠিক হবে না। এ বাড়িটা 'ওকুয়া'র কাছে চিহ্নিত হয়ে যাবে।' দৃঢ় নির্দেশের সুরে বলল আহমদ মুসা।

ডোনা আহমদ মুসার দিকে একবার চেয়ে ফ্যাকাসে, বিক্ষুব্ধ মুখ নিয়ে সরে দাঁড়াল আহমদ মুসার সামনে থেকে। ক্ষোভে-দুঃখে তার চোখ দু'টি ভারি হয়ে উঠেছে।

ধীরে ধীরে আহমদ মুসা গাড়ি দরজা খুলে মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়াল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে রোসেলিনকে বলল, 'কয়টায় হাসপাতাল থেকে গাড়ি স্টার্ট নিয়েছে? হাসপাতাল থেকে তোমরা বাড়ি ক'মিনিটের পথ?'

রোসেলিন বিমুঢ়ভাবে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। কোন উত্তর এল না তার কাছ থেকে। অসহায়ভাবে তাকাল সে ডোনার দিকে, ডোনারও নির্বাক চোখ নিবদ্ধ হলো আহমদ মুসার দিকে।

ড্রাইভার নড়ে-চড়ে দাঁড়াল। ব লল, 'স্যার ৭টা ৩৫ মিনিটে গাড়িতে চড়েছি। সন্ধ্যার ব্যস্ত সময়ে বাসায় পৌঁছতে সময় লাগার কথা আধাঘন্টা।'

'প্যাকেট তুমি কখন পেয়েছিলে?'

‘স্যার, ম্যাডামরা আসার দু’মিনিট আগে।’

‘এখানে পৌছেছো ক’টায়?’

‘সাতটা চল্লিশ মিনিটে।’

আহমদ মুসা তার হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল সময় তখন ৯টা ১০ মিনিট। অর্থাৎ প্যাকেটটি গাড়িতে আসার পর সময় গেছে ৩৭ মিনিট।

হাসি ফুটে উঠল আহমদ মুসার মুখে। ‘ধন্যবাদ ড্রাইভার’ বলে আহমদ মুসা গাড়ির ভেরত মাথঅ ঢুকিয়ে ড্যাশ বোর্ডের কেবিন খুলে অতি সন্তর্পনে প্যাকেটটা বের করে নিয়ে এল এবং আস্তে মাটিতে রাখল। বলল, ‘যদি এতে বোমা থেকে থাকে, তাহলেও আপাততঃ ভয় নেই। এটা অটো টাইমার মনোবা নিশ্চয় নয়।’

বলে আহমদ মুসা পকেট থেকে ছোট্ট একটা চাকু বের করে প্যাকেটের বাধন কেটে কভারের কাগজটি নামিয়ে ফেলল প্যাকেটের গা থেকে। বেরিয়ে এল চার ইঞ্চি বর্গ আয়তনের একটা পেপার বোর্ডের বাক্স। বাক্সের টপটি উপরের মোড়ক কাগজ খূলে ফেয়লার সাথে সাথেই খুলে গিয়েছিল। এবার আহমদ মুসা চাকুর ব্লেডের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ দিয়ে বক্সের চার কোণ লম্বাভাবে কেটে ফেলল।

সবাই রুদ্ধশ্বাসে দেখছীল আহমদ মুসার কাজ। ডোনার কপালে জমে উঠেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। ভয়ে তার মুখ পাংশু হয়ে উঠেছে।

চার কোণ কাটার পর বক্সটির কভঅর চার ভাগ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। তার সাথে পড়ে গেল স্পঞ্জের চারটি টুকরা। শুধু দাঁড়িয়ে থাকল ঠিক আপেলাকৃতির বড় একটা গোলক।

‘বোমা’-সবার মুখ থেকেই অস্ফুটে বেরিয়ে এল।

আহমদ মুসা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করল বোমাটিকে। নতুন ধরনের গাড়ি-বোমা। বোমার মত শীর্ষ দেশে একটা মাইক্রো কম্পুটার বসানো। কম্পুটারে সেট করা প্রোগ্রাম অনুসারে কম্পুটারটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বোনার বিস্ফোরণ ঘটায়। কম্পুটারের প্রোগ্রামটি সেট করা থঅকে সময়ের উপর নয়, কিলোমিটারের উপরে। কিলো মিটারের যে সংখ্যার উপর প্রোগ্রাম সেট করা থাকে, সেই দূরুত্বে গাড়ি পৌছার সংগে সংগে বোমার বিস্ফোরণ ঘটে।

কম্পুটারের ডিজিটাল প্যানেলে আহমদ মুসা দেখল লাল ডিজিটাল নাম্বারটি আট। অর্থাৎ রোসেলিনের গাড়ি আট কিলোমিটার যাবার পর বোমার বিস্ফোরণ ঘটতো।

কম্পুটারের রানিং ডিজিটাল প্যানেলে চার সংখ্যাটি স্থির হয়ে আছে। এর অর্থ গাড়িটি হাসপাতাল থেকে রাশিদী ইয়েসুগোর বাড়ি পর্যন্ত চার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে এসেছে।

আহমদ মুসা সবাইকে কাছে ডাকল। নতুন ধরনের এ গাড়ি বোমার পরিচয় দিয়ে ওদের বলল, রোসেলিন গাড়িটা আট কিলোমিটার যাবার পর এ বোমার বিস্ফোরণ ঘটতো। আট কিলোমিটারের মধ্যে এ বাড়ি পর্যন্ত গাড়ি চার কিলোমিটার এসেছে। এখান থাকে আবার গাড়ি ছারার চার কিলোমিটারের মাথায় বোমার বিস্ফোরণ ঘটে গাড়িটা ধ্বংস হয়ে যেত।

কারও মুখে কোন কথা নেই। পাথরের মত যেন স্থির হয়ে গেছে সকলে। রোসেলিন ও ডোনার মুখ চোখের অবস্থা কান্নার চেয়েও করুণ।

হঠাৎ রোসেলিন পাশের লায়লাকে জড়িয়ে ধরে কেদে উঠল। বলল, ‘ঈশ্বর ডোনাকে রক্ষা করেছেন। তোমার এখানে এসে বেচে গেলাম। না হলে এতক্ষণ সর্বনাশ হয়ে যেত।’

‘এভাবেই আল্লাহ মানুষকে রক্ষা করেন। দেখ, আহমদ মুসা ভাই যদি সন্দেহ না করতেন, যদি ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা না করতেন, তাহলে এখান থেকে চার কিলোমিটার যাবার পর গাড়ি ধ্বংস হয়ে যেত।’ বলল লায়লা।

রোসেলিন লায়লাকে ছেড়ে দিয়ে ছুটে গিয়ে আহমদ মুসার কাছে হাটু গেড়ে বসল। দুই হাত জোড় ভংগিতে তুলে বলল,’আপনি মানুষ না ভাইয়া। নিশ্চয় ঈশ্বর আপনার সাথে কথা বলেন। আপনি এত জানেন, এত বুঝেন কি করে! ভাইয়া সেদিন দুর্বৃত্তদের হাত থেকে বাচিয়েছিলেন, আজ আবার নতুন জীবন দিলেন আমাদের। কি বলে কোন ভাষায় কৃতজ্ঞতা জনাব আমি?’

আহমদ মুসা হাসল। বলল,’কৃতজ্ঞতা আমাকে নয় বোন, আল্লাহকে জানাও। আমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা সবই তো তারই দেয়া। সব প্রশংসা, সব কৃতজ্ঞতা তারই প্রাপ্য।’

'যে ধর্ম আপনাকে এই মহত্ব দিয়েছে, এই দৃষ্টি দিয়েছে, সে ধর্মে কি আমাকে গ্রহণ করবেন ভাইয়া?' বলল আবেগ রুদ্ধ কণ্ঠে রোসেলিন।

'অবশ্যই। ওয়লকাম বোন। এ ধর্ম তো আমার কিংবা কারও নয়, সমগ্র মানব জাতির।'

বলে আহমদ মুসা উঠে দাড়ালো। বলল,'ওঠ বোন।'

উঠে দাড়িয়ে আহমদ মুসা রাশিদীকে লক্ষ্য করে বলল,'তোমাদের পূর্বপাশে পরিত্যক্ত ডিপটিউব ওয়েলের পাইপ বসানো দেখিছি। পাথর চাপা আছে। তুমি বোমাটি পাইপের মধ্যে ফেলে দিয়ে এস। কবরস্থ হয়ে থাকবে।'

আহমদ মুসা বোমাটি রাশিদীর হাতে তুলে দিল। বলল, 'ভয় করো না চার কিলোমিটার না পেরুলে বোমা ফাটবে না।'

রাশিদী চলে গেল।

আহমদ মুসা রোসেলিনের দিকে চেয়ে বলল,'আমাদের জুরুরী কাজ 'ক্যামেরুন ক্রিসেন্ট' এর অফিসে। চল তোমাদের বাড়িতে পৌছে দিয়ে আমরা সেখানে যাব।'

রাশিদী ফিরে এসেছে।

গাড়িতে উঠতে যাচ্ছে আহমদ মুসারা।

এই সময় লায়লা আহমদ মুসাকে বলল,'একটা জিজ্ঞাসা ধরে রাখতে পারছি না ভাই।'

'কি জিজ্ঞাসা?' আহমদ মুসা বলল।

'ড্রাইভারের কাছ থেকে সময় সম্পর্কে শোনার পর আপনি হেসেছিলেন। আমার মনে হয়েছিল, বোমা ফাটবে না বলে সে সময় নিশ্চিত হয়েছিলেন। এটা ঠিক কিনা? ঠিক হলে কেমন করে আপনি তা জেনেছিলেন?'

'খুব সোজা হিসেব। ড্রাইভারের কাছে হিসেব নিয়ে জানলাম, হাসপাতাল থেকে রোসেলিনের বাড়ি যেতে লাগে ৩০ মিনিট। কিন্তু হাসপাতাল থেকে রোসেলিনের গাড়ি বের হবার পর তখন পর্যন্ত পার হয়েছিল ৩৭ মিনিট। গাড়িতে টাইম বোমা পেতে রাখলে ৩০ মিনিটের মধ্যে তার বিস্ফোরণ ঘটার কথা। তা যখন ঘটেনি, তখন প্যাকেটে বোমা থাকলেও তা টাইম বোমা নয়।'

‘সাইত্রিশ মিনিট আপনি কোথায় পেলেন?’

‘কেন, রোসেলিনরা হাসপাতাল থেকে গাড়িতে উঠার ২মিনিট আগে প্যাকেট এসেছিল গাড়িতে। ৫মিনিট সময় লেগেছিল হাসপাতাল থেকে তোমাদের বাড়িতে আসতে, আর রোসেলিনরা তখন পর্যন্ত তোমাদের বাড়িতে সময় খরচ করেছিল ৩০ মিনিট। এখন হিসেব করে দেখ।’

লায়লার বিষ্ময়-বিমুঢ় দৃষ্টি আহম মুসার দিকে নিবদ্ধ। বলল,’রোসোলিন ঠিক বলেছে, আল্লাহ আপনার সাথে কথা বলেন। না হলে চরম টেনশনের সময়ও এই সব বিবেচনা, হিসেব আপনার মাথায় আসে কি করে?’

‘অন্যায় বলেছ লায়লা। আল্লাহ এইভাবে কথা বলেন না। তিনি তার বান্দাদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেচনা দিয়ে সাহায্য করেন।’

‘আল্লাহ আমাকে মাফ করুন। তবে আল্লাহ আপনার প্রতি তার অনুগ্রহ বেহিসেব ঢেলে দিয়েছেন।’

‘আল-হামদুলিল্লাহ।’

বলে আহমদ মুসা রাশিদীর দিকে তাকাল। বলল,’রোসেলিনের গাড়ির ড্রাইভারকে তোমার সাথে তোমার গাড়িতে নাও। রোসেলিনের গাড়ি আমি ড্রাইভ করব।’

রোসেলিন ও ডোনা গাড়িতে উঠলে আহমদ মুসা গিয়ে ড্রাইভিং সিটে বসল।

গাড়ি দুটি স্টার্ট নিল।

‘ওরা পিছু নিতে পারে বলে সন্দেহ করছেন ভাইয়া?’ বলল রোসেলিন।

‘গাড়ি বোমা সেট করার পর তারা অনুসরণ করবে বলে আমি মনে করিনা। তাছাড়া ‘ওকুয়া’র সে সাহস অবশিষ্ট আছে বলে মনে হয় না।’

‘কিন্তু এত বড় কাজ যে তারা করতে পারল?’

‘এ কাজে সাহস ও শক্তির দরকার হয় না, দরকার হয় বুদ্ধির। যা একজন দূর্বলও করে বসতে পারে।’

‘এই কাজটা কি পরিকল্পিত ভাইয়া?’ ডাক্তারের যোগসাজস কি থাকতে পারে?’

‘আমার মনে হয়না। ডাক্তারের যোগসাজস থাকলে হাসপাতালের ভেতরেই কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। গাড়িতে বোমা সেট করার মত অনিশ্চিত পথ তারা বেছে নিত না।’

‘ঠিক বলেছেন ভাইয়া।’

পথে আহমদ মুসা ও রোসেলিন অনেক কথা বলল। ডোনা একটা কথাও বলেনি। বোমার ঘটনার পর থেকে নির্বাক হয়ে গেছে। তার চোখে মুখে ভয় নয়, বেদনার চিহ্ন।

রোসেলিনের গাড়ি গিয়ে তাদের গাড়ি বারান্দায় দাড়ালো।

আহমদ মুসা গাড়ির দরজা খুলতে যাবে, এ সময় কথা বলে উঠলো ডোনা। বলল,’আমি দু:খিত, হাসপাতালে যাবার সিদ্ধান্ত নেবার আগে তোমাকে জনানো উচিত ছিল আমার। বুঝতে পারছি আমার ভুল হয়েছে।’ গম্ভীর, ভারী কণ্ঠস্বর ডোনার।

আহমদ মুসা পিছন ফিরে ডোনার দিকে তাকাল। বলল নরম কণ্ঠে,’এই জন্যে বুঝি কথা বলছ না, মন খারাপ করে বসে আছ?’

একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর শুরু করল আবার,’না তোমার ভুল হয়নি। সিদ্ধান্ত তোমার ঠিকই হয়েছে। তবে সুযোগ থাকলে পরামর্শ করা সব সময় ভাল, বিশেষ করে বর্তমান পরিস্থিতে।’

‘ধন্যবাদ। কিন্তু এই সাংঘাতিক ব্যাপারে আমাদের প্রতি তোমার আরও কঠোর হওয়া উচিত ছিল।’

‘কিন্তু আমি মনে করি ভলের চেয়ে পরমুখাপেক্ষী প্রবণতা আরও ক্ষতিকর। ভুলের মধ্যে সংশোধনের শিক্ষা আছে। এই শিক্ষাই যোগ্যতার সৃস্টি করে।’

‘ধন্যবাদ। এতক্ষণে বুক ভরে বাতাস নিতে পারছি।’ বহুক্ষণ পর ডোনার ঠোটে হাসি ফুটে উঠল। থামল ডোনা।

আহমদ মুসাও নীরব।

‘আমি নেমে যাই, আপনারা কথা বলুন।’ বলে রোসেলিন নামতে যাচ্ছিল। তার ঠোটে দুষ্টুমির হাসি।’

‘না যেওনা, তোমার সাথে কথা আছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কি কথা?’ স্থির হয়ে বসে রোসেলিন তাকাল।

‘তোমাকে বকুনি দেব।’

‘বকুনি? কেন?’ কণ্ঠে কৃত্রিম কান্নার সুর টেনে বলল রোসেলিন।

‘তোমাদের হাসপাতালে যাওয়ার কথা তোমার আব্বাকে বলনি কেন?’

বিস্ময় ফুটে উঠল রোসেলিনের মুখে। বলল বলিনি যে কেমন করে জানলেন?’

‘বললে যে, তোমার আব্বা দু’জনকে একা বেরুতে দিতেন না।’

রোসেলিন মুহূর্ত কয়েক কথা বলতে পারল না। আরও বেশী বিস্ময় এসে তার উপর ভর করেছে।

অল্পক্ষণ পরে বলল,’বুঝতে পারছি কেন আপনি অজেয়। বাতাসেও বোধ হয় সত্যের গন্ধ পান।’

বলে একটু থেমেই আবার দ্রুত কণ্ঠে বলল,’কিন্তু যাই হোক, বকুনি কি আমার জন্যই বরাদ্দ? ডোনা আপাতো বকুনি খেল না। কৃত্রিম ক্ষোভ রোসেলিনের চোখে মুখে।’

‘কারণ তোমাকে আদরটা বেশী করেন। কথায় বলে শাসন করা তারেই সাজে সোহাগ করে যে গো।’ ঠোটে হাসি টেনে বলল ডোনা।

‘তাহলে যাকে তিনি প্রাণের চেয়ে ভালবাসেন, তার তরে কি গো...?’ বলে রোসেলিন গাড়ির দরজা খুলে হাসতে হাসতে ছুটে পালাল।

মুখ ভরা রক্তিম হাসি নিয়ে ডোনা বেরিয়ে যাচ্ছিল। আহমদ মুসা হেসে বলল,’রোসেলিনের প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাবে না?’

‘উত্তরটা আমার নয়, তোমারই দেবার কথা।’ বলে ডোনাও হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল।

আহমদ মুসা গাড়ি থেকে বর হলো।

পেছনে রাশিদীর গাড়ি তখন এসে প্রবেশ করল গাড়ি বারান্দায়।

গাড়ি দাড়াতেই গাড়ি থেকে রোসেলিনের ড্রাইভার নেমে এল। রাশিদী ও নামছিল।

আহমদ মুসা সেদিকে এগুতে এগুতে বলল, ‘আর নেম না রাশিদী। চল আমরা যাই।’

ছুটে এল রোসেলিন। বলল, ‘এত বড় ঘটনা ঘটল আব্বার সাথে দেখা করে যাবেন না, কথা বলে যাবেন না?’

‘আমাদের দেরী হয়ে গেছে। তুমি খবরটা দিও। আমি পরে দেখা করব।’ ‘বলল আহমদ মুসা।

‘আপনাদের অনেক দেরী করে ফেলেছি। আর নয়। খোদা হাফেজ।’

‘খোদা হাফেজ।’ বলে আহমদ মুসা এসে গাড়িতে রশিদীর পাশে বসল।’

স্টার্ট নিল গাড়ি।

গাড়ি ছুটে বেরিয়ে এল রোসেলিনদের গেট দিয়ে।

ক্যামেরুন ক্রিসেন্টের হেড কোয়ার্টার। ভূগর্ভস্থ একটি কক্ষ।

ফ্রান্সিস বাইক এবং আহমদ মুসা মুখোমুখি সোফায় বসে।

ফ্রান্সিস বাইককে এই কক্ষে বন্দী রাখা হয়েছে।

আহমদ মুসার দু’পাশের আরও দু’টি সোফায় বসে রাশেদী ইয়াসুগো এবং মুহাম্মদ ইয়োকিনি।

ফ্রান্সিস বাইককের মুখ বিসন্ন। মাথা নিচু।

কথা বলছিল আহমদ মুসা। ‘মিঃ বাইক আপনাকে চিন্তা করার যে সময় দেয়া হয়েছিল, তা শেষ।’

ফ্রান্সিস বাইক মুখ তুলল না, কথাও বলল না।

‘মিঃ বাইক আপনি যদি উত্তর দেয়ার মত ভদ্রতা না দেখান, তাহলে আমাদেরকে অভদ্র হতে হবে।’ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ কঠোর শোনাল আহমদ মুসার কন্ঠ।

মুখ তুলল ফ্রান্সিস বাইক তার চোখে চাঞ্চল্য, ভয়ের চিহ্নও। বলল ‘আপনার কি চান বলুন?’

‘আপনাকে তা বলা হয়েছে।’

‘সে তো অনেক কথা বলেছেন।’

‘বেশী নয় আমরা তিনটি কথা বলেছি। এক, সমগ্র দক্ষিণ ক্যামেরুনে উচ্ছেদকৃত মুসলমানদের ক্ষতিপূরণসহ তাদের স্ব স্ব বাড়িতে পূনর্বাসন, দুই, তাদের সম্পত্তি তাদের ফেরত দান এবং তিন, আপনারা যারা বিদেশ থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন গায়ের জুরে, তাদের ক্যামেরুন থেকে চলে যাওয়া।’

‘কিন্তূ আপনাদের দাবী তো ছিল ইয়াউন্ডি হাইওয়ের দক্ষিণে ইদেজা পর্যন্ত অঞ্চলের মুসলমানদের পূর্নবাসন এবং তাদের সম্পত্তি ফেরত পাওয়া।’

‘সে দাবী ছিল জনস্টিফেন এবং ফ্রাসোয়া বিবসিয়েরের কাছে। তাঁরা ঐ অঞ্চলের দায়িত্বে, তাই তাদের কাছে তাঁরা যেটুকু করতে পারেন, সেটুকুই দাবি করা হয়েছিল। আপনি গোটা ক্যামেরুনের দায়িত্বে শুধু নন, গোটা পশ্চিম আফ্রিকার দায়িত্বে, তাই আপনার কাছে আপাতত দক্ষিন ক্যামেরুনের মুসলমানদের প্রতি যে অবিচার করেছেন, তার নিরাময় দাবী করা হচ্ছে।’

‘এরপর কি গোটা পশ্চিম আফ্রিকার দাবী তুলবেন?’

‘আমরা ভবিষ্যত নিয়ে এখন মাথা ঘামাচ্ছি না, আপনি বর্তমানের কথা বলুন।’

‘আমি কি বলব। আমি আপনাদের বন্দী, একজন বন্দীর কথা বাইরের ওরা মানবে কেন?’

‘সে মাথা ব্যথা আপনার নয়।’ কঠোর হয়ে উঠল আহমদ মুসার কন্ঠ।

মাথা নিচু করে চুপ থাকল ফ্রান্সিস বাইক।

কথা বলল আহমদ মুসা আবার। বলল, ‘শুনুন মিঃ ফ্রান্সিস বাইক, আপনাকে দেয়া সময় আমাদের উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আমরা আর এক মুহুর্ত নষ্ট করবো না। আমরা আপনার প্রতি অবিচার করিনি। আমাদের বিচার ট্রাইবুন্যালে আপনাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ দেয়া হয়েছিল। আপনি আপনার অন্যায় স্বীকার করেছেন, তবে বলছেন অপরাধ আপনার একার নয়। সেটা আমরা জানি সব অপরাধিই তার শাস্তি পাবে। আপনার দন্ড আপনাকে পেতে হবে, তা

আমরা আপনাকে বলছি। এ দন্ড এড়ানোর আপনার একমাত্র পথ অন্যায়ের প্রতিবিধানে আপনার রাজী হওয়া।' থামল আহমদ মুসা।

'আমাকে কি করতে হবে?' বলল ফ্রান্সিস বাইক।

'আমাদের তিনটি দাবীর বাস্তবায়ন হবে?'

'সেটা পরে জানতে পারবেন।'

'আমার একটা প্রশ্ন।'

'বলুন।'

'আমি একজন বন্দী। আমি স্বীকার করার পরও আমার করণীয় কিছু থাকবে না। কি করবেন তাহলে আপনারা আমার স্বীকারুক্তি নিয়ে?'

'এ প্রশ্নের উত্তর আপনার প্রয়োজন নেই।'

'ঠিক আছে, আমি রাজী হলেই যদি সব হয়ে যায়, তাহলে বলছি তিনটি দাবী মেনে নিতে আমার আপত্তি নেই।'

'ধন্যবাদ ফ্রান্সিস বাইক।' বলে আহমদ মুসা রাশিদীকে লক্ষ্য করে বলল, 'কাগজটা দাও।'

রাশিদী ব্যাগ থেকে ভাঁজ করা এক শিট কাগজ করে আহমদ মুসার হাতে তুলে দিল।

আহমদ মুসা কাগজটি ফ্রান্সিস বাইকের হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'পড়ুন এবং সই করুন।'

কাগজটি হাতে নিয়ে ফ্রান্সিস বাইক তাতে নজর বুলাল। দেখল, তিন দফা দাবীর স্বীকৃতি পত্র।

ফ্রান্সিস বাইকের হাতে একটি কলম তুলে দিল আহমদ মুসা।

ফ্রান্সিস বাইক মুখ তুলে আহমদ মুসার দিকে একবার তাকাল। তারপর স্বীকৃতি পত্রে দস্তখত করল।

'এই স্বীকৃতি পত্রটি কিছুই নয়। এতে দস্তখত করেও আপনি সব কিছু অস্বীকার করতে পারেন। তবু লাভ এইটুকু যে আপরাধ আপনারা করেছেন, আপনার দস্তখতে লিখিত তার একটা দলিল থাকল।'

কথা শেষ করে আহমদ মুসা রাশেদীর কাছে থেকে একগুচ্ছ কাগজ নিয়ে ফ্রান্সিস বাইকের হাতে তুলে দিল।

ফ্রান্সিস বাইক কাগজগুলোর উপর চোখ বুলাল। বিস্ময় ফুটে উঠল তার চোখে মুখে। বলল 'এই স্বীকৃতিপত্রগুলো পেলেন কি করে? দক্ষিন ক্যামেরুনের আমাদের সব ঘাটির সব নেতা উপনেতাকে তাহলে আপনারা আটক করেছেন?'

'হ্যাঁ, করতে হয়েছে।'

'কিভাবে?'

'আপনার ক্ষেত্রে যা হয়েছে, সেইভাবে। তবে রক্তপাত হয়নি। বিশটি ঘাটির ৪০ জনকে আটক করতে কোন প্রানহানি ঘটেনি।'

'সকলের কাছ থেকে নেয়া নিছক এই স্বীকারুক্তি আপনাদের কোন কাজে আসবে?'

দক্ষিন ক্যামেরুনের ১২টি অঞ্চলের ১২টি আঞ্চলিক প্রধানের কাছে থেকে চিঠি নিয়ে তাদের অফিস থেকে মুসলমানদের থেকে নানাভাবে আপনারা যে ভূমি দখল করেছেন, তার বিস্তারিত রেকর্ড আমরা নিয়ে এসেছি।'

'বুঝলাম। এরপর আপনারা কি করবেন?'

আপনাদের ভূমি ক্রয় বা দখলের এই তালিকা নিয়ে আপনার ঘাটি প্রধানদের সাথে আলোচনা করেছি। তাতে আমরা দেখেছি, মুসলমানদের কাছ থেকে অবৈধভাবে ক্রয় বা দখলকৃত জমির শতকরা ৯০ ভাগ রেজিস্ট্রি হয়েছে কোক ও ওকুয়া'র সদস্যদের নামে। এই সদস্যদের নামের তালিকাও আমারা তৈরী করেছি। তাদের দখল করা জমির বিবরণও পাওয়া গেছে।' বলে থামল আহমদ মুসা।

একটু পরে বলল, 'আমাদের কাজ শেষ, এবার কাজ আপনাদের। আপনারা যা মেনে নিয়েছেন, সে অনুযায়ী আপনাদের কাজ করতে হবে।'

'কি রকম?'

'আপনাদের দু'টি কাজ করতে হবে। তার একটি করবে সংগঠন হিসাবে 'কোক' ও 'ওকুয়া'। আরেকটি করবে 'কোক' ও 'ওকুয়া'র সদস্যরা ব্যাক্তিগতভাবে।'

‘কোক’ ও ‘ওকুয়া’ কি করবে?

‘উদ্বাস্তু মুসলমানদের স্ব স্ব ভিটায় পুনর্বাসনের জন্যে ক্ষতিপূরণের টাকা নগদ পরিবেশন করবে ‘কোক’ বা ‘ওকুয়া’।’

‘আর ‘কোক’ ও ‘ওকুয়া’র সদস্যদের ব্যাক্তিগতভাবে কি করতে হবে?’

‘তাদের নামের রেজিস্টি জমিগুলো তার যাদের জমি সেই মুসলমানদের নামে রেজিস্ট্রি করে দেবে।’

হো হো করে হেসে উঠল ফ্রান্সিস বাইক। বলল, ‘আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে সব কিছু পাকা ফলের মত আপনার হাতে এসে পড়বে।’

আহমদ মুসা মুখভাবের কোন পরিবর্তন হলো না। যেভাবে সে কথা বলছিল, সেভাবেই বলল, ‘হ্যাঁ, পাকা ফলের মতই এসে পড়বে। এবং আজ থেকেই তা শুরু হবে, শেষ হবে তিন দিনের মধ্যে।’

‘চমক সৃষ্টি করার জন্যে হলে আপনার কথা ঠিক আছে।’

‘চমক সৃষ্টি করা বা রঙ্গ-রস করার মত সময় আমার নেই মিঃ ফ্রান্সিস।’ গম্ভীর কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

তারপর রাশিদীর দিকে চেয়ে বলল, ‘তুমি ওদের নিয়ে এস এবং কাগজ পত্রও।’

রাশিদী বের হয়ে কয়েক মুহূর্ত পরে ‘কোক’ এবং ‘ওকুয়া’র অর্থ পরিচালক ‘ফিনিদি’ এবং ট্রেজারার ‘সিয়া সিয়া’কে সাথে নিয়ে ঘরে করল।

‘এদের চেনেন মিঃ ফ্রান্সিস?’

ওদের ঘরে ঢুকতে দেখেই ভূত দেখার মত তার চোখ ছানাবাড়া হয়ে গিয়েছিল। বিস্ময়ের ধাক্কায় কথা বলতে পারেনি ফ্রান্সিস বাইক কিছুক্ষণ পর সে বলল, ‘এদেরও গ্রেফতার করেছেন। এরা তো কোন সাতে-পাঁচে নেই।’

‘ওদের কেন আটক করেছে নিশ্চয় বুঝেছেন। ওরা হাতে থাকলে ক্ষতি পূরণের টাকা আদায় সহজ হবে।’

ফ্রান্সিস বাইক কোন কথা বলল না।

আহমদ মুসাই কথা বলল, লা-ফ্যাংগ রোডে আপনাদের প্রশাসনিক সদর দফতরে গিয়ে এদের পেয়েছি। নগদ অর্থসহ ওদের নিয়ে এসেছি। নগদ ৫

মিলিয়ন ডলার এবং ১০ মিলিয়ন ফ্রাংক পাওয়া গেছে। ভয় করবেন না। টাকাগুলো 'ফিনিদি' ও 'সিয়া সিয়া'র তত্ত্বাবধানেই রেখেছি। আপনার সাথে আমাদের হিসেব নিকেশ না হওয়া পর্যন্ত এভাবেই থাকবে।

'আপনারা দস্যুতা করেছেন। এর ফল ভোগ করতে হবে না ভাববেন না।' ক্ষোভে-দুঃখে ভেংগে পড়া গলায় কথাগুলো বলল ফ্রান্সিস বাইক।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'আমরা দস্যুতা করিনি। দস্যুদের কাছ থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্যে ক্ষতিপূরণ উদ্ধারের চেষ্টা করছি আমরা।'

বলে একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর আবার শুরু করল, 'শুনুন মি: ফ্রান্সিস বাইক, আমরা হিসেব করে দেখেছি তিন লাখ উদ্বাস্তু মুসলমানকে পুনর্বাসন করতে কমপক্ষে তিন'শ মিলিয়ন ক্যামেরুন ফ্রাংক প্রয়োজন। নগদ যা পেয়েছি তাতে ৫ মিলিয়ন ডলার থেকে আসবে ১৫০ মিলিয়ন ফ্রাংক। আর এর সাথে ১৫ মিলিয়ন ফ্রাংক মিলে হবে ১৬৫ মিলিয়ন ফ্রাংক। আর প্রয়োজন ১৩৫ মিলিয়ন ফ্রাংক। এই টাকার ব্যবস্থা করে দিন, তাহলে ক্ষতিপূরণ আদায়ের প্রথম কাজ আমাদের শেষ হয়।'

'এভাবে আমাদের পণবন্দী বানিয়ে আদায় করতে চান টাকা?' বলল ফ্রান্সিস বাইক।

'দস্যুরা আইনের কথা মানে না, যুক্তির কথা মানে না। তাদের সাথে এই আচরণই করতে হয়।' কঠোর কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

'আমি বন্দী আমি কোত্থেকে কিভাবে টাকা দেব?' বলল ফ্রান্সিস বাইক।

'ব্যাংকের সমস্ত রেকর্ডপত্রসহ আমরা ফিনিদি ও সিয়া সিয়াকে নিয়ে এসেছি। আমরা দেখেছি, ইয়াউন্ডির চারটা ব্যাংকে ওকুয়া'র নামে তিনশ' মিলিয়ন ফ্রাংক রয়েছে। চারটা ব্যাংকের জন্যে আমাদের চারটা চেক দেবেন। চার চেকে টাকার মোট পরিমাণ হবে ১৩৫ মিলিয়ন ফ্রাংক। আপনি ব্যাংকে টেলিফোন করবেন, টাকা এনে দেবে সিয়া সিয়া আমাদের লোকদের সাথে গিয়ে।'

'সে যদি গিয়ে আর না আসে, পুলিশে সব বলে দেয়।'

'সেটা মি: সিয়া সিয়া নিশ্চয় করবেন না। তার কোমরে বাঁধা থাকবে বেল্টের বদলে কম্পুটার নিয়ন্ত্রিত বোমা বেল্ট। কম্পুটারটা থাকবে আমাদের

লোকদের হাতে। তার বিশ্বাসঘাতকতার সামান্য ইংগিত পেলেই বোমা ফাটিয়ে দেয়া হবে সুতরাং মি: সিয়া সিয়া আমরা যেভাবে বলব সেভাবে আমাদের সহযোগিতা করবেন।'

ভয়ে চুপসে যাওয়া সিয়া সিয়া সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।

'মি: সিয়া সিয়া আপনি চেকবইগুলো বের করুন এবং চারটি চেক লিখুন।'

সংগে সংগেই সিয়া সিয়া হাতের ফোল্ডার থেকে চারটি চেক বের করল, তারপর তাকাল ফ্রান্সিস বাইকের দিকে।

এটা লক্ষ্য করে আহমদ মুসা বলল, 'মি: ফ্রান্সিস বাইক মি: সিয়া সিয়া আপনার অনুমতি চাচ্ছেন। চেক লেখার অনুমতি দিয়ে দিন।'

'টাকা আমার নয়, আমি পারবো না।' বলল ফ্রান্সিস বাইক।

'আপনার টাকা আমরা চাই না। 'কোক' ও 'ওকুয়া'র টাকা আমাদের প্রয়োজন এবং এগুলো তাদেরই টাকা।

ফ্রান্সিস বাইক কোন কথা বলল না।

আহমদ মুসার মুখ লাল হয়ে উঠল। রিভলবার বের করল পকেট থেকে। সবাইকে চমকে দিয়ে রিভলবার থেকে একটা গুলী ফ্রান্সিস বাইকের বাম কান স্পর্শ করে চলে গেল। রক্তের ক্ষীণ একটা ধারা নামল কানের আহত স্থান থেকে।

ফ্রান্সিস বাইক কানে হাত বুলিয়ে সিয়া সিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এটা আমার অফিস নয়, নির্দেশের প্রয়োজন নেই। যা বলে লিখে দাও।'

চেক লিখল সিয়া সিয়া।

'মি: সিয়া সিয়া মি: ফিনিদি ও মি: ফ্রান্সিস- এর কাছ থেকে দস্তখত নিন চেকে।'

চেকে তাদের দস্তখত হয়ে গেলে আহমদ মুসা বলল, 'মি: সিয়া সিয়া দস্তখত ঠিক আছে তো? চেক যদি ফেরত আসে, তাহলে আপনি কিন্তু ফেরত আসবেন না।'

সিয়া সিয়া মাথা নেড়ে বলল সব ঠিক আছে।

‘ধন্যবাদ। কাল ৯টায় আপনি ব্যাংকে যাবেন আমাদের লোকদের সাথে।’

একটু থেমেই আবার শুরু করল, ‘রাশিদী দলিলগুলো মি: ফ্রান্সিসকে দেখতে দাও।’

রাশিদী হ্যান্ড ব্যাগ থেকে কতকগুলো কাগজ বের করে ফ্রান্সিসের হাতে তুলে দিল।

ফ্রান্সিস বাইক কাগজগুলোর উপর নজর বুলাল। কাগজগুলো জমির বিক্রয় দলিল। রেজিস্ট্রির জন্যে তৈরী।

‘মি: ফ্রান্সিস দলিলগুলো ভালো করে দেখুন। আমরা খোঁজ নিয়ে নিশ্চিত হয়েছে, আপনার নামে রেজিস্ট্রি এই বিপুল মুসলিম সম্পত্তির কোনটিই টাকা দিয়ে কেনা নয়। সুতরাং এই সম্পত্তি মালিকদের ফেরত দিতে হবে। সব দলিল রেডি। কালকে ৯টায় আমাদের লোকদের সাথে আপনি রেজিস্ট্রি অফিসে যাবেন। সব ঠিকঠাক আছে। আপনি পৌঁছলেই রেজিস্ট্রি শুরু হবে।’

‘যদি সেখানে গিয়ে রাজী না হই?’

‘রাজী হবেন। আপনারও কোমরে বাধা থাকবে কম্পুটার নিয়ন্ত্রিত বোমা। সুতরাং অবশ্যই আপনি আমাদের কথার বাইরে যাবেন না।’

‘সকলের কাছ থেকে এই ভাবেই কি আপনারা জমি রেজিস্ট্রি করে নেবেন?’

‘শতকরা আশি জনই স্বেচ্ছায় জমি ফিরিয়ে দিচ্ছে। অবশিষ্ট বিশ জনের ক্ষেত্রেই আপনার মত ব্যবস্থার আশ্রয় নিতে হচ্ছে।’

কথা শেষ করেই রাশিদীর দিকে তাকিয়ে আহমদ মুসা বলল, ‘চারটি চেক এবং দলিলগুলো তুমি রাখ এবং মি: ফিনিদি ও মি: সিয়া সিয়াকে রেখে এস।’

রাশিদী ওদের রেখে ফিরে এল।

‘তাহলে আজকের মত চলি ফ্রান্সিস বাইক। কাল সকালে আপনার দু’টো কাজ। এক, চারটি ব্যাংকে টেলিফোন করা এবং দুই, সকাল ৯টায় রেজিস্ট্রি অফিসে যাওয়া।’

‘আমি কিডন্যাপড হয়েছি ব্যাংক জানে না?’

‘থানায় কিংবা ব্যাংকে জানায়নি কেউ। আর জানাবার লোক বোধ হয় নেই। যারা আপনার খবর জানত, তাদের সবাইকে আমরা আটক করতে পেরেছি বলে মনে হয়।’

‘অসম্ভব। কিভাবে?’

‘আপনাকে নিয়ে আসার পর ওরা ‘ইয়াউন্ডি’ রোডের ঘাটি ছেড়ে দেয়। পরের দিন সন্ধ্যায় ওরা সকলে মিটিং-এ বসেছিল লা-ফ্যাংগ রোডের প্রশাসনিক ঘাটিতে। ওখান থেকে আমরা সবাইকে হাতে পেয়েছি।’

বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

উঠে দাঁড়াল তার সাথে রাশিদী এবং মুহাম্মদ ইয়েকিনি।

বের হয়ে এল তারা ঘর থেকে।

ঘরের দরজার বাইরে দাঁড়ান স্টেনগানধারী দু’জন প্রহরী আহমদ মুসাদের সালাম দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

ঘর থেকে বের হয়ে আহমদ মুসা বলল, ‘চল চীফ জাস্টিসকে টেলিফোন করে অগ্রগতিটা জানাতে হবে।’

‘ল’ সেক্রেটারীর কাছ থেকে সহযোগিতা নেয়ার যে কথা চীফ জাস্টিস সাহেব বলেছিলেন, সেটা কতদূর?’ বলল রাশিদী।

‘আলোচনাটা এগিয়েছে। ফ্রি ওয়ার্ল্ড টিভি এবং ডব্লিউ এন এ খবর প্রচারের পর বিষয়টা সরকারের গোচরে গেছে এবং সরকার ‘কোক’ ও ওকুয়াকে চাপ দিয়েছেন, তার ফলে মুসলমানদেরকে জমি ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং তাদের পুনর্বাসনও হচ্ছে ক্ষতিপূরণ দিয়ে। এই রিপোর্ট সরকারের পক্ষ থেকে জাতিসংঘ, হিউম্যান রাইটস কমিশন ও সংস্থাসমূহ এবং সংবাদ মাধ্যমসমুহের কাছে পাঠানো হবে। এতে সরকারের লাভ হবে যে, সবাই জানবে সরকার অভিযোগের ব্যাপারে ত্বরিৎ পদক্ষেপ নিয়েছে। অন্যদিকে আমাদেরও লাভ হবে যে, এখানে মুসলমানদের সম্পত্তি ফিরে পাওয়া এবং ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন হওয়া আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করল। ভবিষ্যতে তাদেরকে কোন প্রকার হয়রানি করা কঠিন হবে। এখন আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হলো জমি হস্তান্তর ও

পুনর্বাসনের তথ্যগুলো সরকারকে দিতে হবে যাতে সরকার তাদের রিপোর্ট এগুলো দেখাতে পারে।'

'সব তথ্য দিতে হবে? সে তো বিরাট ব্যাপার।' বলল মুহাম্মদ ইয়েকিনি।

'না সব চায়নি। উদাহরণ হিসেবে কিছু দিতে হবে।'

'কিভাবে হস্তান্তরের কাজ হচ্ছে, তা কি সরকার জানতে পেরেছে?' বলল রাশিদী।

'না, পারেনি।'

'সরকারের মধ্যে 'কোক' ও 'ওকুয়া'র প্রচুর লোক আছে, তারা তো জানতে পারে।'

'যারা আটক হয়েছে তারা ছাড়া আসল ব্যাপারটা বাইরের কেউ জানে না। তারা বুঝছে যে, রেডিও, টিভি ও সংবাদপত্রে জমি আত্মসাৎ ও মুসলিম উচ্ছেদের ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যাবার পর 'কোক' ও 'ওকুয়া' কর্তৃপক্ষ সরকার ও বাইরের চাপে মুসলমানদের সম্পত্তি ফেরত দিতে সম্মত হয়েছে। সরকারের ভেতরে যারা আছে, তারাও এটাই জানছে।'

কথা বলতে বলতে আহমদ মুসারা ভূগর্ভ থেকে উপরে উঠে এল। বসল অফিসের ড্রইং রুমে।

টেলিফোন টেনে নিল আহমদ মুসা।

ডায়াল করল চীফ জাস্টিস ওসাম বাইকের নম্বারে।

# ৩

যায়দ রাশিদীর লুকানো বাক্স থেকে সোনার যে মোহর বের হলো তার পরিমাণ দাঁড়ালো এক কোটি ডলার। ক্যামেরুনের টাকায় যার পরিমাণ হয় ৩০০ কোটি ফ্রাঙ্ক।

তিনশ' কোটি ফ্রাঙ্ক মূল্যের সোনার মোহরের স্তুপের দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রাশিদী ইয়েসুগো, মুহাম্মদ ইয়েকিনি, ব্ল্যাক বুল এবং অন্যান্যরা।

'আমার একটা বিস্ময় কিন্তু যায়নি।' মোহরের দিক থেকে চোখ ঘুরিয়ে আহমদ মুসার দিকে চেয়ে বলল রাশিদী ইয়েসুগো।

'কী?' বলল আহমদ মুসা।

'ডায়েরীতে লুকানো বাক্সের যে সংকেত আছে, তা আমি দেখেছি। কিন্তু আমি কিছু বুঝিনি। আপনি কি করে জায়গাটা ঠিক ঠিক চিহ্নিত করে ফেললেন?'

'এ জিজ্ঞাসা আমারও মনে।' বলল ব্ল্যাক বুল।

'ব্যাপারটা খুবই সহজ ছিল। পাখির বাসা বলতে বুঝানো হয়েছে যায়দ রাশিদীর বাড়ী, মৃত পাখির বাসা বলতে বুঝানো হয়েছে যায়দ রাশিদীর সমাধিকে। আর মোহর ভর্তি বাক্স হলো মৃত পাখির মুখের গোলাপ ফুল। সুতারাং বুঝতেই পারছ, সংকেতের মধ্যে কোন জটিলতা ছিলনা।'

'এখন কোন জটিলতা দেখছি না, তবে পাখিকে যায়দ রাশিদী, পাখির বাসাকে তার বাড়ি, মৃত পাখির অবস্থান কে সমাধি এবং গোলাপ ফুলকে লুকানো ধন কল্পনা করা হাজার চেষ্টা করেও পারতাম না।' বলল রাশিদী ইয়েসুগো।

'থাক, এসব কথা। এখন বল, এই টাকা নিয়ে কী চিন্তা করছ?'

'কেন যায়েদ রাশিদীর উইল অনুসারে এ টাকার মালিক আপনি।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, টাকার মালিক আমি হলে এ টাকা আমি তোমাদের দিয়ে দিলাম। এখন বল এ টাকা তোমরা কি করবে?'

‘আমরা জানিনা, আপনিই বলুন এ টাকা দিয়ে আমরা কি করব?’

‘ফ্রান্সিস বাইকের কাছ থেকে যে সম্পত্তি ফেরত পাওয়া গেছে তার সাথে যায়দ রাশিদীর বাড়িও আছে। এ টাকার একটা অংশ দিয়ে ঐ বাড়িটাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে। ব্ল্যাক বুলের নামে বাড়িটা কেনা হয়েছে সে, বাড়িটার মালিক থাকবে। আর...’

আহমদ মুসার কথার মাঝখানে ব্ল্যাক বুল বলে উঠল, ‘কিন্তু আমি মনে করি যায়দ রাশদীর এই সম্পত্তির মালিক হওয়ার যোগ্যতা আমার নেই। বাড়িটার একজন সেবক হতে পারলেই আমি খুশি হবো। আমি....’

আহমদ মুসা তাকে বাধা দিয়ে বলল, ‘ঠিক আছে, তোমার কথা আমরা বুঝেছি। শুনে রাখ, সন্তান অযোগ্য হলেই সে তার উত্তরাধিকার হারায় না।’

বলে একটু থামল আহমদ মুসা, তারপর আবার শুরু করল, ‘অবশিষ্ট টাকা ক্যামেরুন ক্রিসেন্ট পাবে। ক্যামেরুন ক্রিসেন্ট এই টাকা ইসলাম প্রচার এবং মানুষের সেবায় ব্যয় করবে। জাগতিক ও ইসলামী শিক্ষার প্রসার এবং দারিদ্র্য বিমোচন- এই লক্ষ্যে যদি ক্যামেরুন ক্রিসেন্ট কাজ করতে পারে, তাহলে পশ্চিম আফ্রিকায় এনজিও দের ষড়যন্ত্র বানচাল করে তোমরা ইসলামের আলো নতুন করে এ অঞ্চলে প্রজ্জ্বলিত করতে পারবে।’

‘ধন্যবাদ আহমদ মুসা ভাই। আপনি যে কাজের প্রস্তাব করেছেন সেটাই আমাদের আসল কাজ হওয়া উচিত। কিন্তু এই সাথে আমার কথা হলো আপনি বিশ্বব্যাপী কাজ করছেন। যায়দ রাশিদীর টাকার একটা অংশ যদি আপনার কেন্দ্রীয় তহবিলে যায়, তাতে আমি মনে করি তার পূন্য আরও বেশী হবে।’ বলল রাশিদী।

হাসল আহমদ মুসা, ‘বলল, আমার কোন কেন্দ্র নেই, কেন্দ্রীয় অফিসও নেই, কেন্দ্রীয় তহবিলও নেই। আমি যখন যেখানে থাকি সেটাই, আমার কেন্দ্র। সে কেন্দ্র থেকেই আমার খরচ চলে। সুতরাং আমার কোন তহবিল দরকার নেই।’

রাশিদী ইয়েসুগো নাছোড়বান্দা। বলল, ‘ইসলামের বিশ্বব্যাপী যে কাজ হচ্ছে, তার তো একটি কেন্দ্রীয় তহবিল আছে। যেমন ধরুন ‘সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক’ -এর বারবারেতি শহরে আন্তর্জাতিক সম্মেলন হচ্ছে। সেখানে বিশ্বের

মুসলমানদের সবচেয়ে সক্রিয় ও শক্তিশালী সংগঠন ওয়ার্ল্ড মুসলিম কংগ্রেস-এর প্রধানসহ বিশ্ব বরেণ্য অনেক মুসলিম নেতা এসেছেন। এসব কাজে তো বিরাট খরচ। যায়দ রাশিদীর অর্থের একটা অংশ যদি এসব কাজে খরচ হয়, তিনি অনেক বেশী পূণ্য পাবেন।' বলল রাশিদী ইয়েসুগো।

'তুমি ঠিকই বলেছ। 'বারবারেতি' শহরে 'ডার্ক আফ্রিকা ব্রাইট হার্ট' -এর উদ্যোগে 'আফ্রিকা এবং ইসলাম' বিষয়ের উপর যে আন্তর্জাতিক সেমিনার হচ্ছে, তার জন্যে যদি অর্থের প্রয়োজন হতো তাহলে আমি তোমার কথা মেনে নিতাম। আসলে 'ডার্ক আফ্রিকা ব্রাইট হার্ট' আফ্রিকায় 'ওয়ার্ল্ড মুসলিম কংগ্রেস' পরিচালিত একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন। তাদের যাবতীয় খরচ 'ওয়ার্ল্ড মুসলিম কংগ্রেস' বহন করে থাকে। তবু তোমরা চাইলে তাকে সাহয্য করা যাবে। কিন্তু এ জন্য এখনই বাজেটের প্রয়োজন নেই। আমি ওদের সাথে কথা বলে সে ব্যবস্থা করব।'

'আপনার তো বিরাট খরচ। আপনি কি আপনার এ টাকা থেকে কিছুই নিতে পারেন না?' মুখ ভার করে বলল রাশিদী ইয়েসুগো।

আহমদ মুসা হাসল। রাশিদীর পিঠ চাপড়ে বলল, 'মন খারাপ করছ কেন? সত্যিই আমার প্রয়োজন নেই। এই যে আমি তোমাদের এখানে এসেছি, কোন খরচ আমাকে তোমরা করতে দিয়েছ? এর বাইরে যে টাকা আমার প্রয়োজন তার ব্যবস্থা আছে। ফিলিস্তিন সরকার 'আল জাজিরা ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল'-এর একটা 'কোডেড ক্রেডিট নাম্বার' আমাকে দিয়েছে। আমি পৃথিবীর যে কোন ব্যাংকে গিয়ে এই নাম্বার দিয়ে টাকার যে কোন অংক চাইলে দিয়ে দিবে। দরকার পড়লে এই নাম্বার আমি ব্যাবহার করি। ঠিক আছে? এবার খুশী?'

হাসল রাশিদী। বলল 'ঐ নাম্বার যে কেউ ব্যাংককে দিলে টাকা দিয়ে দিবে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আমিও তো ঐ নাম্বার দিয়ে টাকা তুলতে পারি।' বলল রাশিদী।

'নাম্বার পাবে কোথায়?'

'আপনি দেবেন।' বলল রাশিদী।

‘এ ধরনের নাম্বার যাকে দেয়া হয়, সে যদি কাউকে এটা জানায়, তাহলে সেদিন সে এটা ব্যাবহারের অধিকার হারায়।’

‘বুঝলাম। দায়িত্বটা এরকম না হলে সুযোগটা অতবড় হতো না। কিন্তু একটা প্রশ্ন, ব্যাংক তো কোডেড নাম্বারটা জানতে পারে, তারা যদি এটা অন্যকে জানিয়ে দেয় বা নিজেরা ব্যবহার করে?’ বলল রাশিদী।

‘না পারবে না কোডেড নাম্বার এর সাথে একটা সিরিয়াল সংকেত আছে। এই সংকেত প্রত্যেকবার পৃথক হয় এবং সিরিয়াল অনুসারে হয়, যেভাবে আল জাজিরা ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল-এর রেকর্ডে সংরক্ষিত আছে।’

‘কিন্তু এ ব্যাপারটা তো স্থানীয় এবং বিভিন্ন ব্যাংকের জানার কথা নয়, তারা যদি ভূল করে টাকা দিয়ে দেয়?’ বলল রাশিদী।

‘প্রত্যেক ব্যাংকের কম্পিউটারের পেমেন্ট সেকশনে ইন্টারন্যাশনাল কাউন্টার আছে। যেসব আন্তর্জাতিক ব্যাংক ক্রেডিট কার্ড ও কোডেড নাম্বার-এ পেমেন্ট করে, তারা সবসময় প্রতি মহুর্তে কম্পিউটারের ইন্টারন্যাশনাল পেমেন্ট কাউন্টারে আপ টু-ডেট-রাখে। সুতরাং যখনি কেউ কোডেড নাম্বার ব্যাংকে দেয়, তখন তারা সেটা কম্পিউটারে প্রবেশ করায়। পেমেন্ট সেকশনের ইন্টারন্যাশনাল কাউন্টার থেকে গ্রীন সিগনাল পেলেই তবেই তারা পেমেন্ট করে।’

‘বাঃ চমৎকার ব্যবস্থা।’ বলল রাশিদী।

রাশিদী থামতেই মুহাম্মদ ইয়েকিনি বলল, ‘আমার ভিন্ন একটা প্রশ্ন, এত বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সেমিনার বারবারেতি শহরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে কেন?’

‘হতে পারেনা কেন মনে করছ?’ বলল আহমদ মুসা।

‘জায়গাটা তেমন খ্যাতনামা নয়। মুসলিম স্বার্থের উপস্থিতির দিক দিয়েও গুরুত্বপূর্ণ নয়।’ বলল মুহাম্মদ ইয়েকিনি।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, তুমি ঠিকই বলেছ। জায়গাটা বিখ্যাত এবং মুসলিম স্বার্থের দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণও নয়। কিন্তু নতুন নতুন জায়গাতেই তো ইসলাম যাবার কথা। অন্ধকারেই তো আলোর আগমন বেশী প্রয়োজন।’

থামল একটু আহমদ মুসা। একটু গম্ভীর হয়ে উঠল তার মুখ। বলল, ‘একটা ঘটনা এবং একটা স্মৃতি সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিকের এই বারবারেতিকে স্মরণীয় করে রেখেছে। প্রায় দু’শ বছর আগে সংঘ নদী তীরের ঐ বারবারেতিতে আকস্মিকভাবে উদয় হয়েছিলেন সুলতানুল আউলিয়া আহমদ বিন আহমদ আবদুর রহমান। উদয় হয়েছিলেন বলা হয় এ জন্যই যে, উনি কিভাবে কোথেকে এসেছিলেন, কেউ বলতে পারেনা। কেউ বলে মালি, নাইজেরিয়া ও ক্যামেরুন হয়ে মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রের এই দুর্গম স্থানে তিনি এসেছিলেন, কারো মতে সুদান থেকে মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রে তিনি প্রবেশ করেছিলেন, কেউ মনে করেন সোমালিয়া, কেনিয়া, উগান্ডা ও জায়ার হয়ে এখানে তিনি এসেছিলেন। আবার কেউ বলেন, তিনি বাঁশের ভেলায় চড়ে কংগো নদী হয়ে সংঘ নদী পথে বারবারেতি এসেছিলেন। সত্য যেটাই হোক ঘোর এক দুর্দিনে বারবারেতির মানুষ স্বর্গের সাহায্য রূপে তাকে দেখতে পেয়েছিল।‘‘কথিত আছে, একদিন ভোরে ইউরোপীয় দাস ব্যাবসায়ীরা একটা স্টীম বোটে করে বারবারেতি এলাকায় প্রায় দেড় শ’ যুবককে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। ইউরোপীয়দের গুলি বৃষ্টিরে মুখে যুবকদের আত্মীয় স্বজনরা নদীর তীরে গড়াগড়ি দিয়ে আহাজারি করছিল। তারা বিস্ময়ের সাথে দেখল নদীর তীরে দাঁড়ানো বাঁশের ভেলায় বসে ধ্যানরত একজন সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধ উঠে দাড়ালো এবং দরাজ কণ্ঠে স্টিম বোটকে থামার নির্দেশ দিল। বোট থামল না। বৃদ্ধ তাঁর ডান হাত ঊর্ধ্বে উত্তোলন করল। সঙ্গে সঙ্গে বোট সব শক্তি হারিয়ে নিশ্চল হয়ে গেল। ইউরোপীয়দের বন্দুকগুলো তাক করল বৃদ্ধকে। কিন্তু বন্দুকগুলো থেকে ধোয়া বেরুল, শব্দ হলো, গুলি বেরুল বটে, কিন্তু গুলিগুলো ঝরে পড়ল বৃদ্ধের দেহ থেকে। বৃদ্ধ হাত দিয়ে ইঙ্গিত করল বোটটিকে কূলে ভেড়ার জন্য। ইঞ্জিন স্টার্ট হওয়া ছাড়াই নিঃশব্দে বোটটি কূলে এসে ভিড়ল। বৃদ্ধ তাঁর সেই দরাজ গলায় ইউরোপীয়দের তাদের বন্দুকগুলো নদীর তীরে ফেলে দিতে বলল এবং বন্দীদের ছেড়ে দিতে নির্দেশ দিল। ইউরোপীয়রা পাথরের মত হয়ে গিয়েছিল। তারা পুতুলের মত হুকুম পালন করল। বারবারেতির দেড়শ’ বন্দী মুক্তি পেয়ে তীরে নেমে এল। এরপর বৃদ্ধ ইউরোপীয়দের চলে যাবার নির্দেশ দিল এবং সাবধান করেদিল আর যেন দাস ব্যবসায় তারা না করে।

স্টার্ট নিয়ে বোট চলে গেল।

বৃদ্ধটি বাঁশের ভেলা থেকে ধীরে ধীরে তীরে নেমে এল। বারবারেতির সকল মানুষ তাঁর সামনে উপুড় হয়ে পড়ল। তারা মনে করল স্বয়ং ঈশ্বর মানুষের রূপ ধরে তাদের সামনে এসেছে। কিন্তু বৃদ্ধ 'অমানুষ' নামে অভিহিত কালো মানুষগুলোকে পা থেকে বুকে টেনে তুলল। জড়িয়ে নিল বুকে।

যা হোক, বৃদ্ধ আহমদ বিন আব্দুর রহমান বারবারেতিতেই তাঁর নিবাস বানাল। তিনি আসার পর দাস সংগ্রহের আর কোন হামলা বারবারেতিতে হয় নি।

চারিদিকে নাম ছড়িয়ে পড়ল বৃদ্ধের। ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রতিভু হয়েও তিনি মাটির মানুষ, প্রাণের মানুষ। দাস ব্যবসায় তিনি আসায় বন্ধ হয়ে গেছে। অন্যায়-অশান্তি ও হানাহানিও তিনি কমিয়ে দিয়েছেন। এই কাহিনী আমি পড়েছি পশ্চিমি পরিব্রাজকের এক বইতে। তিনি স্থানীয় ভাষায় লিখিত একটা পুস্তিকার বরাত দিয়ে এই কাহিনী লিখেছেন।

বৃদ্ধ আহমদ বিন আব্দুর রহমান বারবারেতিতে জ্বালালেন ইসলামের আলো। ইসলাম প্রচারের এক কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ালো বারবারেতি।

বারবারেতিকে কেন তিনি বেছে নিয়েছিলেন?

সেই সময়ের আফ্রিকার অবস্থার দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখব বারবারেতি আলো এবং অন্ধকারের মাঝে একই সীমারেখা। নাইজেরিয়া থেকে যে রাস্তা উত্তর ক্যামেরুন হয়ে দক্ষিণে অগ্রসর হয়েছিল, তা বারবারেতি এসে থেমে গিয়েছিল। এর দক্ষিণে বাইরের কোন কাফেল তখনও পা রাখেনি। বারবারেতির পশ্চিমে দক্ষিণ ক্যামেরুন তখন মুসলিম শূন্য, আর বারবারেতির পুবে মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রের দক্ষিণাঞ্চলও তখন কোন মুসলিমের পদচারণায় ধন্য হয়নি। আর দক্ষিণে অবস্থিত কংগো,গ্যাবন, জায়ার তো তখন একেবারেই তিমির অন্ধকারে ঢাকা। মানুষ এবং পশু তখন সে অঞ্চলে একাকার।

এই বিশাল জমাট অন্ধকারের প্রান্তে দাঁড়ানো বারবারেতি ছিল সোনালী সিংহদ্বারের মত। সেখান থেকে উত্তরের সাথে স্থল পথে যোগাযোগ করা যায়, আর অন্ধকার দক্ষিণের সাথে সংযোগ গড়ে তোলা যায় নদী পথে। অন্ধকারের সোনালী

সিংহদ্বার এই বারবারেতিকে কেন্দ্র করে বৃদ্ধ আহমদ বিন আব্দুর রহমান অন্ধকার দক্ষিণে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

এই হলো বারবারেতির স্মৃতি।

আর যে ঘটনার কথা বলেছি, বারবারেতির সেই ঘটনা হলোঃ

আহমদ বিন আব্দুর রহমান স্থানীয় জনগণের পাশে থাকতে গিয়ে এবং ইসলাম প্রচারের কারণে পশ্চিমী খৃষ্টান মিশনারী এবং উদীয়মান ফরাসী ঔপনিবেশিক শক্তির শত্রুতে পরিণত হয়েছিলেন। ঠিক এই সময়ি আহমদ বিন আব্দুর রহমান বারবারেতিতে একটা আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। এ সম্মেলনে তুরস্কের ওসমানিয়া খেলাফতের প্রতিনিধি ও মিসরের গ্র্যান্ড মুফতিসহ মালি খিলাফত, নাইজেরিয়া সালতানাত এবং উত্তর ক্যামেরুনের ইয়েসুগো সুলতানের প্রতিনিধিকে দাওয়াত দেয়া হয়েছিল। এই মহামান্য মেহমানদের এনে আহমদ বিন আব্দুর রহমান তিমিত অন্ধকারে ঢাকা এক আফ্রিকাকে দেখাতে চেয়েছিলেন এবং বলতে চেয়েছিলেন এই অন্ধকারের বাসিন্দাদের প্রতি তাদের দায়িত্বের কথা।

কিন্তু তাঁর এ ইচ্ছা পূরণ হয়নি। সম্মেলনের চারদিন আগে এক রাতে সম্মেলন কেন্দ্রে যখন তিনি কর্মরত ছিলেন, তখন এক অগ্নিকাণ্ডে সম্মেলন কেন্দ্রে ভস্মীভূত হয় এবং তিনি নিহত হন। অগ্নিদগ্ধ আহমদ বিন আব্দুর রহমানের পৃষ্ঠদেশে গভীর ছুরিকাঘাতের চিহ্ন ছিল। স্থানীয় মুসলিমরা মনে করত, খৃষ্টান মিশনারী ও ঔপনিবেশিকরা যোগসাজস করে তাঁকে হত্যা করেছে এবং সম্মেলন পণ্ড করেছে। আর স্থানীয় অন্যান্য অধিবাসীরা বিশ্বাস করত, দাস ব্যবসায়ী শয়তানরা হত্যা করেছে তাদের স্বর্গীয় পিতাকে। এক মাস ধরে শোক পালন করেছে স্থানীয় অধিবাসীরা। তাঁর নিহত হবার দিনকে স্থানীয় অধিবাসীরা শোক দিবস হিসেবে পালন করে আসছে গত দু'শ বছর ধরে।

এই বারবারেতি শহরেই 'ডার্ক আফ্রিকা ব্রাইট হার্ট'- এর উদ্যাগে আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বলা যায়, দু'শ বছর আগের একটা অসমাপ্ত কাজ আজ সমাপ্ত হচ্ছে। এখন বল ইয়েকিনি, জায়গাটার সিলেকশন ঠিক হয়েছে কিনা?'

আহমদ মুসার কথা গোগ্রাসে গিলছিল ইয়েকিনি রাশিদীরা।

আহমদ মুসার প্রশ্ন শুনে হাসল ইয়েকিনি। বলল, 'কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এত কথা আপনি জানলেন কি করে?'

'ঠিক। আমরা আহমদ বিন আব্দুর র।হমান সম্পর্কে অনেক কথা জানি। আমার আব্বা ওখানে একবার গিয়েছেন। কিন্তু আমরা যা জানি, আপনার তুলনায় তা সামান্য।' বলল রাশিদী ইয়েসুগো।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, রাশিদী তোমাদের পারিবারিক লাইব্রেরীতে 'মধ্য আফ্রিকায় উপনিবেশ-এর সূচনা পর্ব' নামে ফরাসী ভাষায় একটি বই পড়লাম। বইটি এর আগেও একাধিক লাইব্রেরীতে দেখেছি, কিন্তু পড়ার সুযোগ হয় নি। এবার পড়লাম। এ বইয়ের কাহিনীর সাথে যদি 'আফ্রিকায় প্রাথমিক যুগের সুফি-সাধক এর বিবরণ যোগ কর, তাহলে আমি যে কাহিনী বললাম তার চেয়েও বেশি জানতে পারবে।'

এ সময় ব্ল্যাক বুল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমার একটা কাজ আছে। আমি আছি আমার ঘরে।'

বলে ঘর থেকে বেড়িয়ে গেল ব্ল্যাক বুল। তার পর পরই ঘরে প্রবেশ করল লায়লা। তার হাতে একটা ইনভেলাপ। ইনভেলাপটি রাশিদীর হাতে তুলে দিতে দিতে বলল, 'ভাইয়াকে দাও, রোসেলিনের আব্বার চিঠি।'

রাশিদী ইনভেলাপটি আহমদ মুসার হাতে তুলে দিল।

বন্ধ ইনভেলাপ থেকে চিঠি বের করল আহমদ মুসা। পড়ল চিঠি। চিঠি পড়ে তার ঠোঁটে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'রাশিদী, রোসেলিনের আব্বা তোমার সাথে রোসেলিনের বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন।'

'আপনার কাছে?' ঠোঁটে হাসি টেনে বলল লায়লা।

'হ্যাঁ। সম্ভবত আমাকেই এখন রাশিদীর যথার্থ অভিভাবক মনে করেছেন।' হাসল আহমদ মুসা।

'তাঁর মনে করাটা সত্য। আপনার চেয়ে আমার বড় অভিভাবক এই দুনিয়ায় আর কে হতে পারেন?'

'আম্মা মানে তোমার আম্মার অধিকার অস্বীকার করোনা, রাশিদী।' বলল আহমদ মুসা হাসতে হাসতে।

'আম্মাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, এ অধিকার আম্মা আপনার হাতেই তুলে দিয়েছেন।' বলল রাশিদী।

'তাহলে এ অধিকার কিন্তু আরও অনেক জায়গায় খাটাব।'

'যেমন?' বলল রাশিদী।

'রোসেলিনের আব্বা একটা প্রস্তাব দিয়েছেন, আমারো একটা প্রস্তাব আছে।'

রাশিদীর মুখ মলিন হয়ে উঠল।

আহমদ মুসা ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে হেসে বলল, 'ভয় করো না, তোমার বিয়ের পাল্টা প্রস্তাব নয়, অন্য বিয়ের একটা প্রস্তাব আমার আছে।'

রাশিদী লজ্জায় মুখ নিচু করল। পরক্ষণেই মুখ তুলে বলল, 'প্রস্তাবটা বলুন।'

'বলব?' বলে একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর বলল, 'এলিসা গ্রেস এর সাথে ওমর বায়া এবং বোন লায়লার সাথে ভাই মুহাম্মাদ ইয়েকিনির বিয়ে তোমাদের সাথে একই সময়ে হয়ে যেতে পারে।'

শুনেই রাশিদী সোৎসাহে বলে উঠল, 'এক সাথে মানে, এদের বিয়েই আগে হবে।'

মুহাম্মাদ ইয়েকিনি লজ্জায় মুখ নিচু করল। আর দু'হাতে মুখ ঢেকেছে লায়লা।

'আগে হওয়ার যুক্তি কি?' হেসে বলল আহমদ মুসা।

'প্রধান যুক্তি হলো, লায়লা সব সময় কথা বলা, দাবী আদায়, খাওয়া-সব ব্যাপারে আমার উপরে এবং আগে থাকতে চায়, সুতরাং এ ব্যাপারেও...।'

'চাইলে কি হবে, তুমিই তো আগে থাক।' লজ্জা রাঙা মুখে লায়লা তীব্র প্রতিবাদ করল।

'ঠিক আছে, আর আগে থাকব না।'

লায়লা মুখ খুলতে যাচ্ছিল। আহমদ মুসা বাধা দিয়ে হেসে বলল, ' তোমাদের ভাইবোনের ঝগড়া আপাতত বন্ধ। আগে-পরের ব্যাপারটা আমি দেখব।' বলে থামল আহমদ মুসা।

কিছু বলতে যাচ্ছিল আহমদ মুসা। তার আগেই মুখ খুলল লায়লা। বলল, 'চিঠি তো অনেক বড় দেখছি, আর কি লিখেছে,ভাইয়া?'

আরও কিছু আছে নাকি?' বলল আহমদ মুসা।

'আছে বলে মনে হয়'। লায়লা বলল।

'কেমন করে জান? পড়েছ নাকি চিঠি?'

'তওবা। এটা আমি করতে পারি না। রোসেলিন আমাকে টেলিফোনে বলেছে'।

'রোসেলিন কি করে জানে?'

'তার আব্বা এবং মারিয়া আপার আব্বার কথা সে শুনেছে'।

'রোসেলিন কি বলেছে লায়লা? বলল রাশিদী একটু ফাঁকা পেয়ে।

'বলব ভাইয়া?' আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে মুখ টিপে হেসে বলল লায়লা।

জবাব না দিয়ে আহমদ মুসা চিঠিটা এগিয়ে দিল রাশিদীর দিকে ম্লান হেসে।

রাশিদী ইয়েসুগো চিঠিতে চোখ বুলিয়ে লাফিয়ে উঠল খুশীতে। প্রায় চিৎকার করে বলল, 'মারিয়া আপা ও আহমদ মুসা ভাইয়ের ঐতিহাসিক বিয়ে যদি ক্যামেরুনে হয়, ধন্য হবে ক্যামেরুন'।

'ঠিক বলেছ ভাইয়া। ক্যামেরুনের মুসলিম সমাজের জন্যে এর চেয়ে বড় আনন্দ আর কিছু হয়নি, আর হবেও না। তবে ভাইয়া বিয়েটা কিন্তু আমাদের বাড়িতে হতে হবে। রোসেলিন চাইবে বিয়ে, তাদের বাড়িতে হোক। তুমি রোসেলিনের পক্ষে যেতে পারবে না'। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল লায়লা।

আহমদ মুসা গম্ভীর। কোন কথা বলল না।

এ সময় এদিনের খবরের কাগজ দিয়ে গেল বেয়ারা এসে।

খবরের কাগজ রাশিদী ইয়েসুগোই তুলে নিল প্রথম হাতে। কাগজ হাতে নিয়ে প্রথম পাতায় চোখ বুলিয়েই চিৎকার করে উঠল রাশিদী।

'ভাইয়া সর্বনাশ হয়ে গেছে'। কেঁপে উঠেছিল রাশিদীর কণ্ঠ।

'কি হয়েছে রাশিদী? কিসের সর্বনাশ?' আহমদ মুসার কণ্ঠে বিস্ময়।

রাশিদী তখন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে একটা নিউজের উপর। পড়ছে নিউজ সে। মুহূর্ত কয়েক পরে কিছু না বলে শুকনো মুখে কাগজটি এগিয়ে দিল আহমদ মুসার দিকে।

খবরের কাগজ হাতে নিয়ে প্রথম পাতায় চোখ বুলাতেই চোখে পড়ল নিউজটা। হেডিংটা পড়ে বেদনায় পাংশু হয়ে গেল আহমদ মুসার মুখ।

নিউজের হেডিং-এ বলা হয়েছেঃ

ভয়াবহ বিস্ফোরণে বারবারেতির ইসলামী সম্মেলন কেন্দ্র উড়ে গেছে। সম্মেলনের সকল মেহমান ও নেতৃবৃন্দ নিহত।

রুদ্ধশ্বাসে নিউজটা পড়ল আহমদ মুসাঃ 'সম্মেলনের অধিবেশন চলাকালে গতকাল রাত ৯টা ৩ মিনিটে ভয়াবহ এক বিস্ফোরণে গোটা সম্মেলন কেন্দ্র উড়ে গেছে এবং বিশ্ব মুসলিম কংগ্রেসের প্রধান শেখ আবদুল্লাহ আলী আল রাশিদ মাদানীসহ উপস্থাত সকল মেহমান নিহত হয়েছেন।

ঘটনার বিবরণে বলা হয়েছে, 'সম্মেলনের দ্বিতীয় রুদ্ধদ্বার সেশনের সমাপ্তি পর্বে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। সম্মেলনে দুই শতাধিক ডেলিগেট এবং প্রায় একক ডজন বিদেশী বিশিষ্ট মেহমানের সকলেই বিস্ফোরণে নিহত হয়েছেন বলে নিশ্চিত জানা গেছে। রুদ্ধদ্বার হলে উপস্থিত কেউ বেঁচেছে বলে প্রত্যক্ষ দর্শীর কোন বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু মূল সম্মেলন কক্ষ নয়, ঐ সম্মেলন ভবনে যারা ছিল, তাদের দেহও বিস্ফোরণে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ও ভষ্মিভূত হয়েছে। ভবনের আশেপাশের লোকদের আহত অবস্থায় পাওয়া গেছে। সম্মেলনের প্রোগ্রাম থেকে জানা যাচ্ছে, অধিবেশন সমাপ্ত হবার কথা রাত ৯টায়। তারপেরই এশার নামায হবার কথা। মনে করা হচ্ছে, নামাযের জন্যে সম্মেলনের মেহমান ও নেতৃবৃন্দ যখন মঞ্চের পেছনে এসছিলেন এবং ডেলিগেটরাও যখন তৈরী হচ্ছিল নামাযের জন্যে, সেই সময় বিস্ফোরণটি ঘটে। সম্মেলনের প্রোগ্রাম থেকে দেখা যাচ্ছে,

বিস্ফোরণের সময় সম্মেলন কক্ষে বিশ্ব মুসলিম কংগ্রেসের প্রধান শেখ আবদুল্লাহ আলী আল রাশিদ মাদানী, মুসলিম যুব সম্মেলনের প্রেসিডেন্ট কামাল ইনুনু, মিসরের আল আজহারের গ্রান্ড শেখ সাইয়েদ আলী কুতুব প্রমুখ ১২জন বিশ্ব বরেণ্য মুসলিম ব্যক্তিত্ব হাজির ছিলেন। তাছাড়া ছিলেন 'ডার্ক আফ্রিকা ব্রাইট হার্ট' সংগঠনের সভাপতি তারেক আল মাহদি সুদানী সহ কয়েকজন নেতা। অনুমান করা হচ্ছে বিস্ফোরণে সকলের মর্মান্তিক প্রাণ বিয়োগ ঘটেছে। প্রায় ধুলো হয়ে যাওয়া ধ্বংস স্তুপে কোন জীবনের অস্তিত্ব তো দূরে থাক, কোন আস্ত দেহের অস্তিত্বও কোথাও আছে বলে মনে করা হচ্ছে না।

এই ধরনের ধ্বংসাত্মক বিস্ফোরণের ঘটনা আফ্রিকার সাম্প্রতিক ইতিহাসে নেই। স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের ধারণা, সম্পূর্ণ নতুন ধরনের দূরনিয়ন্ত্রিত বোমায় ভবনটিক ধ্বংস করা হয়েছে।

ঘটনাকে নাশকতা বলে সবাই মনে করছেন। কিন্তু কারা এই নাশকতামূলক কাজের সাথে জড়িত থাকতে পারে, এ ব্যাপারে কেউ কিছু বলতে পারছে না। উদ্যোক্তা 'ডার্ক আফ্রিকা ব্রাইট হার্ট' এবং স্থানীয় মুসলিম সংগঠনের যাদের পাওয়া গেছে, তারা বলেছেন এ ধরনের কাজ করতে পারে, এমন সন্দেহজনক কেউ তাদের নজরে নেই। সম্মেলনের ব্যাপারে কারো বিরোধিতা তো দূরে, সামান্য অসন্তুষ্টি বা দ্বিমতও কারও মধ্যে তারা দেখেননি'।

খবর পড়া শেষ হলেও আহমদ মুসার চোখ কাগজের উপর থেকে সরে এল না। যেন তার চোখ দু'টি আটকে গেছে কাগজের সাথে।

বিস্ময় ও বেদনার ধাক্কায় তার চিন্তার শক্তি যেন থেমে গেছে, বোবা হয়ে গেছে যেন সে।

এক সময় তার হাত থেকে কাগজটা পড়ে গেল।

সম্বিত ফিরে পেয়ে আহমদ মুসা একটু নড়ে-চড়ে উঠে সোফায় গা এলিয় দিল। একটা ক্লান্তি এসে তাকে ঘিরে ধরল। চোখ বুজল সে। চোখ বুজতেই তার মনটা ছুটে গেল দু'শ বছর আগের একটা ঘটনার দিকে সেদিনও একটা বিস্ফোরণ এ ধরনেরই একটা সম্মেলন পন্ড করে দিয়েছিল। দুই ঘটনার মধ্যে পার্থক্য হলো, দু'শ বছর আগের বিস্ফোরণ সংঘটিত সম্মেলনের আগে এবং তাতে বিদেশী

মেহমান কেউ মারা যায়নি। আর এ বিস্ফোরণ সংঘটিত হলো সম্মেলন চলাকালে এবং তাতে নিহত হলেন ডজন খানেক গুরুত্বপূর্ণ মেহমান।

এটুকু পার্থক্য থাকলেও দু'টি ঘটনা একই ধরনের এবং উদ্দেশ্যও নিঃসন্দেহে এক। তাহলে কি ধরে নয়া যায়, একই ধরনের লোক এই দুই ঘটনা ঘটিয়েছে?

চোখ খুলল আহমদ মুসা।

রাশিদী, ইয়েকিনি, লায়লা বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। তাকিয়েছিল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসাই প্রথমে মুখ খুলল। বলল, 'দু'শ বছর আগের ঘটনারই আবার পুনরাবৃত্তি ঘটল'।

অনেকটা স্বগত কণ্ঠে উচ্চারণ করল আহমদ মুসা।

'তাহলে কি একই ধরনের শত্রুর কাজ?' বলল রাশিদী ইয়েসুগো।

সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু নিউজে ওখানকার দায়িত্বশীলরা এটা সরাসরি স্বীকার করেননি'। আহমদ মুসা বলল।

'দুর্ভাগ্য বারবারেতির বিশেষ কোন দুর্ভাগ্য নয়। ক্যামেরুনে মুসলমানদের যে দুর্ভাগ্য বারবারেতির। এমন দুর্ভাগ্য মনে হয় আফ্রিকার আর কোন নগরীর হয়নি'। বলল রাশিদী ইয়েসুগো।

'বারবারেতির বিশেষ কোন দুর্ভাগ্য নয়। ক্যামেরুনে মুসলমানদের যে দুর্ভাগ্য দেখছ, তারই অন্য একটা রূপ দেখতে পাচ্ছ বারবারেতিতে। মৌলিক কোন পার্থক্য নেই দুইয়ের মধ্যে'। আহমদ মুসা বলল।

'বিরাট ক্ষতি হলো মুসলিম বিশ্বের। বিশ্ব মুসলিম কংগ্রেসের প্রধান আবদুল্লাহ আলী, আল আজহারের গ্রান্ড শেখ সাইয়েদ আলীর ক্ষতিপূরণ হবে কি দিয়ে? বিশেষ করে 'ডার্ক আফ্রিকা ব্রাইট হার্ট'-এর তারেক আল মাহদীর মত আগুনের ছেলেকে মুসলিম আফ্রিকা আবার কবে পাবে কে জানে!' বলতে বলতে রাশিদী ইয়েসুগোর গলা ভেঙ্গে পড়ল কান্নায়।

‘হ্যাঁ রাশিদী, এ দিক থেকে এটা যে কত বড় ক্ষতি তা পরিমাপ করা যায় না। মন চাচ্ছে, ওদিকে একবার যাই। এতবড় ঘটনা ঘটাতে যারা সাহস পেল তারা অনেক বড় শত্রু’।

‘কে এই বড় শত্রু বুঝতে পারছি না আহমদ মুসা ভাই। ‘ওকুয়া এবং ‘কোক’ মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকার সবচেয়ে বড় সংগঠন। মনে হচ্ছে এই দু’টো সংগঠন আজ যে অবস্থায় পড়েছে, তাতে ঐ ঘটনা ওরা ঘটায়নি। আর যতদূর জানি, মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রে বড় ধরনের কোন সন্ত্রসী সংগঠন নেই’।

‘কিন্তু ঘটনা তো ঘটেছে। কোন বড় কেউই তা ঘটিয়েছে’।

বলে আহমদ মুসা একটু থামল। তারপর বলল, ‘চল, ক্যামেরুন ক্রিসেন্টের অফিসে যাই। ফ্রান্সিস বাইকদের সাথে একটু কথা বলে দেখি, কোন কথা বের করা যায় কিনা’।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

তার সাথে সাথে সবাই।

ক’দিন পরের ঘটনা।

রাশিদী ইয়েসুগো একটা খবরের কাগজ হাতে ঘরে ঢুকে কাগজটা আহমদ মুসার হাতে তুলে দিল। একটা নিউজের দিকে ইংগিত করে বলল, ‘নিউজটা পড়ুন আহমদ মুসা ভাই, সুন্দর নিউজ’।

আহমদ মুসা সোফায় গা এলিয়ে বসেছিল। কাগজটা হাতে নিয়ে সোজা হয়ে বসল। নিউজের উপর নজর দিল আহমদ মুসা।

হেডিং পড়লঃ

‘‘এক সাক্ষাৎকারে আইনমন্ত্রী’’

‘‘ক্যামেরুনে বর্তমানে মানবাধিকার পরিস্থিতি চমৎকার’’

পড়ল আহমদ মুসা খবরটা। খবরে বলা হয়েছে, ‘‘ক্যামেরুনের গণতান্ত্রিক সরকার দেশের প্রতিটি নাগরিকের নাগরিক অধিকারের প্রতি সতর্ক

দৃষ্টি রেখেছে। ক্যামেরুনে বর্তমানে মানবাধিকার পরিস্থিতি অত্যন্ত চমৎকার। সরকার দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ'। ক্যামেরুনের আইনমন্ত্রী মিঃ হাম আগবো 'সানস অব অ্যাডাম' নামক একটা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার একটি প্রতিনিধি দলকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এই মন্তব্য করেন। সম্প্রতি সংবাদ মাধ্যম ও সংবাদপত্রের প্রচারিত দক্ষিণ ক্যামেরুনে মুসলমানদের উচ্ছেদ ও তাদের সম্পত্তি গ্রাসের বিষয়ে আইন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, এই ধরণের ঘটনা কিছু ঘটেছে। এর সাথে জড়িত বেসরকারী দু'একটা সংগঠন। সরকার এ সবের কিছুই জানত না। এ সংক্রান্ত খবরটি বের হবার পর সরকার এ ব্যাপারে খোঁজ খবর নিয়েছে এবং উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন, তাদের জমি তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া এবং এমনকি তাদের ক্ষতি পূরণেরও ব্যবস্থা হয়েছে।' এ ধরণের দু'চারজন পুনর্বাসিত উদ্বাস্তুর সাথে কি তারা দেখা করতে পারে না- এমন একটি প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, দু'চারজন কেন আমরা লিস্ট দিয়ে দিতে পারি, আপনারা যত ইচ্ছা দেখা করতে পারেন।' এমন ঘটনা ভবিষ্যতে যাতে ঘটতে না পারে, তার জন্যে আপনারা কি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন- এই প্রশ্নে আইন মন্ত্রী বলেন, 'হ্যা বিষয়টা নিয়ে আমরা চিন্তা করেছি। আমরা আইন করতে যাচ্ছি, সংখ্যালঘু বিশেষ করে মুসলমানদের জমি হস্তান্তর করতে হলে জাতীয় ধরণের কেন্দ্রীয় কোন মুসলিম সংগঠনের অফিসিয়াল সার্টিফিকেট লাগবে। কোন অমুসলিম এ ধরণের সার্টিফিকেট ছাড়া কোন মুসলমানের সম্পত্তি কিনতে পারবে না। তাছাড়া বাস্তুভিটা ক্রয়-বিক্রয় আমরা নিষিদ্ধ করতে যাচ্ছি।' সম্পত্তি হস্তান্তর এবং উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন করতে গিয়ে আপনারা শক্তিশালী এনজিওদের পক্ষ থেকে কোন বাধার সম্মুখীন হয়েছেন কিনা, এ প্রশ্নের জবাবে আইন মন্ত্রী জানান, এনজিওদের পক্ষ থেকে কথা উঠেছিল, কিন্তু তাদেরকে আমরা দেখিয়েছি যে, জমি হস্তান্তরের ব্যাপারটা শান্তিপূর্ণ ও স্বেচ্ছা প্রণোদিত ছিল। কোন জোরাজুরির ঘটনা ঘটেনি।''

খবরটা পড়া শেষ করে আহমদ মুসা বলল, 'সানস অব অ্যাডাম' সংস্থাকে ধন্যবাদ জানাতে হয়। প্রয়োজনীয় সব কথাই ওরা বের করে নিয়েছে সরকারের মুখ থেকে। রোসেলিনের আব্বা চীফ জাস্টিসের অবদানই অবশ্য

এক্ষেত্রে বেশী। তিনিই সরকারকে এভাবে তৈরী করার ব্যবস্থা করেছেন আইন সচিব লাউস মেইডি'র মাধ্যমে।'

'তবে 'সানস অব অ্যাডাম'ও আমাদের যথেষ্ট উপকার করল। কে এই 'সানস অব অ্যাডাম'?' বলল রাশিদী ইয়েসুগো।

'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক একটা মানবাধিকার সংস্থা।' বলল আহমদ মুসা।

'এ টুকুই কি এর পরিচয়?' বলল রাশিদী ইয়েসুগো।

'তুমি ঠিকই ধরেছ। এ টুকুই এর পরিচয় নয়। এটা আমেরিকার একটা মুসলিম মানবাধিকার সংস্থা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আফ্রো-আমেরিকান মুসলিম কম্যুনিটি এই সংস্থাটির প্রতিষ্ঠা করেছে। তবে তারা সামনে নেই। খৃষ্টান ও মুসলিম কিছু শিক্ষাবিদ ও আইনবিদকে নিয়ে এই সংস্থাটি গঠিত হয়েছে। এই সংস্থাটির মূল শ্লোগান হলোঃ 'আদমের সন্তান আমরা সকরে সমান'।'

'তারা কি ক্যামেরুনের সব জেনেই এখানে এসেছে।' বলল মুমাম্মাদ ইয়েকিনি।

'হ্যা।'

'আপনি কি জানতেন তারা আসবে?' বলল মুহাম্মাদ ইয়েকিনিই আবার।

'জানি, আবার জানিও না।'

'সেটা কেমন?' বলল রাশিদী ইয়েসুগো।

'FWTV এবং WNA –এর মাধ্যমে নিউজ করা, মুসলিম মানবাধিকার সংস্থার এ ধরণের সফর ইত্যাদি 'মুসলিম শ্লোগান প্রোপাগান্ডা প্লানিং' (MGPP) এর অংশ। সুতরাং বলা যায়, আমি জানি তারা আসবে।'

'তাদের সাথে আপনি কথা বলবেন না?' বলল ইয়েকিনি।

'এ ধরণের সাক্ষাৎ কৌশলগত কারণে সব সময় নিষিদ্ধ। যার কাজ সে করবে, এটাই নিয়ম।'

'বুঝলাম।'

‘আহমদ মুসা কথা বলছিল আর কাগজে নজর বুলাচ্ছিল। হঠাৎ তার চেহারা পাল্টে গেল। কোন কিছুর প্রতি তার নজর হঠাৎ করেই যেন আটকে গেল। কিছু পড়ছে সে।

মুহূর্ত কয়েক পরে কাগজ থেকে মুখ তুলে আহমদ মুসা বলল, ’দেখ অদ্ভুত একটা বিজ্ঞাপন।’

বলে আহমদ মুসা কাগজের ঐ অংশটি সবার সামনে তুলে ধরল।

সবাই পড়ল বিজ্ঞাপনটা। ছোট্ট বিজ্ঞাপন, কিন্তু শিরোনামটা বেশ বড়। পাতার উপর চোখ বুলালে প্রথম দৃষ্টিতেই চোখে পড়ে। বিজ্ঞাপনের শিরোনাম হলোঃ

‘বারবারেতির ভয়াবহ বিস্ফোরণ সম্পর্কে আগ্রহীদের জ্ঞাতব্য।’

এই শিরোনামের অধীনে বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, ‘‘বিজ্ঞাপন-দানকারী ‘নিউজ ব্যাংক’ একটি সৌখিন সংস্থা। এই সংস্থা দাতব্য কাজে সহযোগিতার লক্ষ্যে নিউজ এবং নিউজ উপকরণ বিক্রি করে থাকে। এই উদ্দেশ্যে বড় বড় ঘটনা এক দেশ, জাতি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ নিউজ, নিউজ পটভূমি ও নিউজ উপকরণ ‘নিউজ ব্যায়’ সংগ্রহ করে থাকে। বারবারেতি’র ভয়াবহ ঘটনা সম্পর্কেও করেছে। আগ্রহী ক্রেতাগণ নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।’’

বিজ্ঞাপনের নিচে ঠিকানা বলতে দু’টি টেলিফোন নম্বার দেয়া হয়েছে। একটা নাইরোবির, আরেকটা মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রের রাজধানী বাংগুই-এর।

বিজ্ঞাপনটি পড়ে রাশিদী ইয়েসুগো বলল, ‘মজার বিজ্ঞাপন। এমন সংস্থান নাম কোনদিন শুনিনি।’

কিন্তু রাশিদী ইয়েসুগোর কথা আহমদ মুসার কানে প্রবেশ করল বলে মনে হলো না। সে সোফায় গা এলিয়ে দিয়েছে। চোখে তার শূণ্য দৃষ্টি। যেন কোথাও হারিয়ে গেছে তার মন।

মুহাম্মাদ ইয়েকিনি কিছু বলতে যাচ্ছিল। রাশিদী ইয়েসুগো আংগুল তুলে থামিয়ে দিল ইয়েকিনিকে।

ইয়েকিনিও ব্যাপারটা লক্ষ্য করল। চুপ করে গেল সে। দু’জনেই বুঝল গুরুত্বপূর্ণ কোন চিন্তায় ডুব দিয়েছে আহমদ মুসা। কিছুক্ষণ পর আহমদ মুসা ঘুম

থেকে জেগে ওঠার মত নড়ে উঠল। রাশিদী ইয়েসুগোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'গোটা বিজ্ঞাপনটা একবার পড়তো।'

রাশিদী ইয়েসুগো পড়ল বিজ্ঞাপনটা।

পড়া শেষ করেই বলল, 'বিজ্ঞাপন নিয়ে ভাবছেন কিছু আহমদ মুসা ভাই? কিছু কি আমরা কিনব ওদের কাছ থেকে?'

'দেখ তো সবগুলো কাগজে এ বিজ্ঞাপন আছে কিনা।' বলল আহমদ মুসা।

রাশিদী এবং ইয়েকিনি দু'জনে মিলে সবগুলো কাগজ তন্ন তন্ন করে দেখল। বলল রাশিদী, 'ফরাসী ভাষায় সবগুলো কাগজে আছে। স্থানীয় ভাষায় কোন কাগজে নেই।'

'আমাদের হাতের 'দি লাইট' ছাড়া অন্য কাগজগুলো বিজ্ঞাপনটা কোন পাতায় ছেপেছে?' আহমদ মুসা বলল।

'শেষ পাতায়।' বলল রাশিদী।

'অর্থাৎ একমাত্র 'দি লাইট' বিজ্ঞাপনটি প্রথম পাতায় ছেপেছে।' বলল আহমদ মুসা।

'তাই। কিন্তু এতে কি হয়েছে?' বলল রাশিদী।

'বলব।' বলে একটু থামল আহমদ মুসা। একটু পর বলল, 'রাশিদী বিজ্ঞাপনে নাইরোবির যে টেলিফোন নম্বার দেয়া হয়েছে, সেখানে টেলিফোন কর। জানতে চাও কি কি নিউজ রিপোর্ট এবং ফটোগ্রাফ তাদের কাছে পাওয়া যাবে। পরিচয় জিজ্ঞেস করলে বলবে, ক্রিসেন্ট ফটোগ্রাফিক সোসাইটি।'

'কিন্তু নাইরোবিতে কেন? 'বাংগুই' তো আমাদের কাছেই।' বলল রাশিদী ইয়েসুগো।

'প্রয়োজন আছে। যা বলেছি তা করো।'

রাশিদী তার পাশ থেকে সেলুলার টেলিফোনটি তুলে নিল। ডায়াল করল। কথা বলল।

কথা শেষ করে টেলিফোন অফ করে দিল রাশিদী।

আহমদ মুসার ঠোঁটে এক টুকরো হাসি। বলল রাশিদীকে লক্ষ্য করে, ‘ওরা বিজ্ঞাপন সম্পর্কে কিছুই জানেনা না?’

‘ঠিক বলেছেন। আপনি তাহলে ধরে ফেলেছেন। কিন্তু জানে না কেন?’

‘কারণ বিজ্ঞাপন দাতারা ধরণাই করেনি যে, বাংগুই ছেড়ে কউ নাইরোবিকে জিজ্ঞেস করতে যাবে।’

‘কিছুই বুঝতে পারছি না আহমদ মুসা ভাই।’ বলল ইয়েসুগো।

‘বলব। তুমি বাংগুই-এর নম্বারে টেলিফোন কর। ‘ক্রিসেন্ট ফটোগ্রাফিক সোসাইটি’র ঠিকানা তাদের জানাবে না।’

‘সোসাইটি নেই, ঠিকানা থাকবে কি করে?’ হেসে বলল রাশিদী।

রাশিদী বাংগুই-এর নম্বারে ডায়াল করল। কথা বলল।

কথা শেষ করে টেলিফোন অফ করে রাশিদী মুখ ঘোরাল আহমদ মুসার দিকে।

‘ওখানে তাহলে কিছুই মিলল না?’ হেসে বলল আহমদ মুসা।

‘মিলেছে। ইয়াউন্ডির ওদের একটা পোস্ট বক্স নম্বার।’ বলল রাশিদী ইয়েসুগো।

‘এই ঠিকানায় বুঝি সব জেনে নিতে বলেছে? আর কি বলল ওরা?’ আহমদ মুসা বলল।

‘ঠিক ধরেছেন। পোস্ট বক্স নম্বার দিয়ে বলেছে, ওখানে যোগাযোগ করলেই সব জানা যাবে।’

উত্তরে কোন কথা বলল না আহমদ মুসা। তার কপাল কুঞ্চিত। চিন্তা করছিল। ধীরে ধীরে গা সোফায় এলিয়ে দিল সে। চোখও তার বুজে গিয়েছিল।

‘কিছু ভাবছেন আহমদ মুসা ভাই?’ বলল রাশিদী ইয়েসুগো।

‘একটা রহস্যের সন্ধান করছি।’

‘রহস্য? কোথায়?’ রাশিদী ইয়েসুগো বলল।

‘বিজ্ঞাপন থেকে শুরু করে তোমার শেষ কথা পর্যন্ত একটা রহস্য ছড়িয়ে আছে।’

‘বুঝলাম না।’ রাশিদী ইয়েসুগো বলল।

‘আমিও।’ ইয়েসুগোর কথায় সায় দিল মুহাম্মাদ ইয়েকিনি।

‘শেষটার কথাই ধর। ও ধরণের একটা সংস্থার কোন একটা রাজধানীর ‘যোগাযোগ’ পয়েন্টে টেলিফোন থাকবে না, এটা বিশ্বাস যোগ্য নয়। সাধারণভাবে মনে করা হয় যারা তাদের ঠিকানা আড়ালে রাখতে চায় তারা পোস্ট বক্স নম্বরের ব্যবস্থা করে। তারা তাই করেছে। কিন্তু ও ধরনের একটা সংস্থা এই ভাবে লুকোচুরি খেলবে কেন?’ থামল আহমদ মুসা।

‘ঠিক, এটা একটা রহস্য। তারপর?’ বলল মুহাম্মাদ ইয়েকিনি।

‘নাইরোবির কথা চিন্তা কর। ওরা ওই বিজ্ঞাপন সম্পর্কে কিছুই জানে না। কিন্তু এটা স্বাভাবিক নয়। এ থেকে প্রমাণ হয়, নাইরোবিতে কেউ যোগাযোগ তা তারা মনে করেনি কিংবা চায়নি যে কেউ সেখানে যোগাযোগ করুক। তাই তারা নাইরোবিকে কিছুই জানায়নি।’

‘তাহলে নাইরোবির ঠিকানাটা দিল কেন?’ বলল রশিদী ইয়েসুগো।

‘নাইরোবি একটা আন্তর্জাতিক শহর। তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা সৃষ্টির জন্যই তারা নাইরোবির সুনামকে কাজে লাগিয়েছে।’

‘অর্থাৎ এই বিজ্ঞাপনের টার্গেট গোটা দুনিয়া নয়, বরং একটা বিশেষ অঞ্চল।’ বলল মুহাম্মদ ইয়েকিনি।

‘ঠিক বলেছ। কিন্তু বলত সেই অঞ্চল কোনটা?’ বলল আহমদ মুসা।

ইয়েকিনি মুখ খোলার আগেই রাশিদী ইয়েসুগো বলল, আমার মনে হয় আফ্রিকার মধ্য পশ্চিমাঞ্চল সেটা।’

‘ধন্যবাদ রাশিদী। ঠিক ধরেছ।’

‘এবার বিজ্ঞাপনের রহস্যের কথা বলুন আহমদ মুসা ভাই।’

‘একটু মনোযোগী হলে রহস্যটা তোমাদেরও নজরে পড়তো। দেখ, বিজ্ঞাপনটা প্রকাশ হয়েছে শুধু ফরাসী ভাষার কাগজে। দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় হলো, বিজ্ঞাপনটা শুধু দি লাইট পত্রিকার পাতায় ছাপা হয়েছে, ফরাসী অন্যান্য পত্রিকায় ছাপা হয়েছে শেষ পাতায়।’ একটু থামল আহমদ মুসা।

এই সুযোগে রাশিদী ইয়েসুগো বলল, ‘এই দু’টি বিষয় থেকে আমরা কি বুঝতে পারি?’

‘ভাষার সিলেকশন থেকে বুঝা যায় বিজ্ঞাপনটি বিদেশীদের জন্যে প্রচার করা হয়েছে। আর ‘দি লাইট’ কে গুরুত্ব দেয়া থেকে বুঝা যায়, বিজ্ঞাপনটির লক্ষ্য মুসলিম সমাজ।’

‘বিজ্ঞাপনটি মুসলিম সমাজের জন্য হবে কারণ বিস্ফোরণের সাথে মুসলিম স্বার্থ জড়িত। কিন্তু তাহলে বিজ্ঞাপনটি বিদেশীদের জন্যে হবে কেন?’ বলল রাশিদী ইয়েসুগো।

‘প্রশ্ন আরও একটা আছে, তাদের নাইরোবি অফিস বিজ্ঞাপন সম্পর্কে কিছু না জানা থেকে বুঝা যায়, বিজ্ঞাপনটা বাইরের বিদেশী মুসলমানদের জন্য নয়। টার্গেট হলো, এই অঞ্চলের বিদেশী মুসলমান। এর অর্থ কি?’

‘প্রশ্নগুলো সত্যি রহস্যের সৃষ্টি করছে। এই রহস্যের সমাধান কি?’ বলল মুহাম্মদ ইয়েকিনি।

‘সমাধান করতে হবে।’

‘কিভাবে?’ রাশিদী ইয়েসুগো বলল।

‘অবলম্বন হলে বাংগুই থেকে পাওয়া পোস্ট বক্স নম্বর। ঐ নম্বরে একটা চিঠি ফেলে দাও। তবে তোমরা নাম ঠিকানা দেবে না, দেবে পোস্ট বক্স নম্বর।’

‘আমরা ঠিকানা দেব না কেন?’ বলল মুহাম্মাদ ইয়েকিনি।

‘কিছু না। ওদের সমান থাকা আর কি।’

‘যোগাযোগ করে ওদের কি বলব?’ বলল রাশিদী ইয়েসুগো।

‘লিখে ওদের জানাও কি কি ফটো এবং নিউজ আছে। তারপর অবস্থা বুঝে যা হয় তা করা হবে।

বলে আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকাল। সময়টা দেখে নিয়ে বলল, ‘চল উঠি, আমাদের একটা প্রোগ্রাম আছে না?’

‘চিঠিটা তাহলে তো লিখে ফেলতে হয়।’ বলল রাশিদী ইয়েসুগো।

‘অবশ্যই। চল আমাদের দেরী হয়ে যাচ্ছে।’

বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। তার সাথে সবাই।

পোস্ট বক্সে চিঠি ছাড়ার পঞ্চম দিনেই পোস্ট বক্সের মাধ্যমে ফিরতি চিঠি পেয়েছিল আহমদ মুসারা। চিঠিতে মাত্র কয়েকটা বাক্য লেখা ছিলঃ "আমাদের

সংস্থা ইয়াউন্ডিতে নতুন। অস্থায়ীভাবে এক জায়গায় বসছি। টেলিফোন নেই। ইয়াউন্ডি সার্কুলার বি-৩ এর ৬৩ নম্বর ঠিকানায় যোগাযোগ করলে সব জানতে পারবেন।"

চিঠি পড়ে একটু ভেবেছিল আহমদ মুসা। তারপর ইয়েকিনির দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'তাদের সাথে কথা বলার দায়িত্ব তুমি গ্রহণ কর।'

দায়িত্ব পেয়ে আনন্দিত হয়েছিল ইয়েকিনি। ধন্যবাদ দিয়েছিল আহমদ মুসাকে। সব দায়িত্বই সব সময় আহমদ মুসা নিজের কাঁধে তুলে নেয়। তার কাছ থেকে দায়িত্ব পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার। ইয়েকিনি আরও আনন্দিত হয়েছিল এই কারণে যে, বিষয়টার সাথে রহস্যের গন্ধ আছে।' ভাড়া গাড়ি নিয়েছিল মুহাম্মাদ ইয়েকিনি।

ইয়াউন্ডি শহরটা মুহাম্মাদ ইয়েকিনির প্রায় মুখস্থ। ইয়াউন্ডি সার্কুলার বি-৬৩ সড়কটি শহরের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে। আর ৬৩ নম্বরটি হবে সড়কটির মাঝ বরাবর।

গাড়িটা মুহাম্মাদ ইয়েকিনি ঠিক ঠিক ৬৩ নম্বরেই নিয়ে দাঁড় করাল।

একটা গেটের সামনে গিয়ে গাড়ি দাঁড়াল। গেট বন্ধ।

ইয়েকিনি গাড়ি থেকে নেমে গেট রুমের দিকে এগিয়ে গেল।

গেটম্যান গলা বাড়াল গেট রুমের জানালা দিয়ে।

'এখানে তো 'নিউজ ব্যাংক'-এর অফিস'। বলল ইয়েকিনি।

'হ্যা। কেন?' বলল গেট ম্যান।

'ওদের সাথে আমার এখন দেখা করার কথা।'

কয়েক মুহুর্তের জন্যে তার মাথাটা গেটের ভেতরে চলে গেল।

তারপর মাথাটা মুহুর্তের জন্যে বের করে বলল, 'আসছি।'

গেট খুলে গেল।

ইয়েকিনি গাড়ি ছেড়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

সামনে একটা চত্ত্বর। তারপরেই বারান্দা। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল একজন কৃষ্ণাঙ্গ।

সে এগিয়ে এসে ইয়েকিনিকে স্বাগত জানাল। বলল, 'আপনি মিঃ ইয়েকিনি?'

'হ্যাঁ।'

'আসুন, আমরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি।'

লোকটির সাথে এগিয়ে গিয়ে ইয়েকিনি প্রবেশ করল একটা কক্ষে। কক্ষটি বেশ প্রশস্ত। কক্ষটির চারদিকে একবার তাকিয়েই বুঝতে পাল নতুন বা তাড়াহুড়ো করে সাজানো একটা অফিস।

একটা বড় টেবিলের ওপাশে একটা চেয়ারে বসে একজন শ্বেতাংগ যুবক।

ইয়েকিনি ঘরে ঢুকতেই যুবকটি উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে এসে স্বাগত জানাল ইয়েকিনিকে।

খাতিরটা একটু বেশীই মনে হলো, অন্তত আফ্রিকান স্ট্যান্ডার্ডে। ভাবল আবার ইয়েকিনি, নতুন অফিস তো। ক্লায়েন্টের প্রতি খাতির তাই বেশীই হতে পারে।

শ্বেতাঙ্গ যুবকটি হ্যান্ডশেক করে বলল, 'আমি আয়ান ফ্লেমিং।'

বসার পর কথা শুরু হলো।

'আপনার সংস্থার নাম কি যেন? হ্যাঁ, ক্রিসেন্ট ফটোগ্রাফিক সোসাইটি। আপনারা কি মুসলমানদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ফটোগুলোই শুধু যোগাড় করেন?' বলল যুবকটি, আয়ান ফ্লেমিং।

'প্রধানত তাই।' বলল ইয়েকিনি।

'দেশের বাইরে থেকে কিভাবে ফটো যোগাড় করেন?' আয়ান ফ্লেমিং বলল।

'আমরা খুবই সূচনা পর্বে। সবে কাজ শুরু করেছি। বাহিরকে নিয়ে এখনও খুব চিন্তা আমরা করিনি।'

মুখে কথাগুলো বললেও মনে মনে বলল, ক্রিসেন্ট ফটোগ্রাফিক সোসাইটিই নেই, তার আবার ফটো যোগাড়।

মিথ্যা কথাগুলো যে অবলীলাক্রমে বলতে পারল ইয়েকিনি, তাতে নিজেই বিস্মিত হলো সে। তবে সান্ত্বনার কথা এই যে, আহমদ মুসা ভাই বলেছেন, শত্রুর কাছে বা সন্দেহজনক কারো কাছে সত্য গোপন করা অন্যায় নয়।

'ফটো সংগ্রহের জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন যোগাযোগ। কোথায় কি হচ্ছে, নিউজ মেকার কে আসছে, কে যাচ্ছে, তা নখদর্পণে রাখতে হয়। আপনাদের এ কাজগুলো করার ধরন কি?' বলল আয়ান ফ্লেমিং।

'কয়েকজন ফটোগ্রাফার মাত্র আমাদের অবলম্বন।' বলল ইয়েকিনি।

'আমাদের 'নিউজ ব্যাংক'-এর কাজ আপনাদের মতই। পার্থক্য হলো, আপনারা শুধু কেনেন, আর আমরা ক্রয়-বিক্রয় দু'টাই করি। গুরুত্বপুর্ণ ফটো কেনার জন্যে আমরা এমনকি বিদেশেও ছুটে যাই।'

থামল আয়ান ফ্লেমিং। মুহুর্ত কয়েক পর আবার শুরু করল, 'আপনাদের সংগ্রহে কি তেমন ফটো আছে যা আমরা কিনতে পারি? থাকলে আমরা যেমন আপনার কাছে বিক্রি করছি, তেমনি কিনতেও পারি।'

'বুঝতে পারছি না, কি ধরনের ফটোর কথা বলছেন?'

'যেমন ধরুন আহমদ মুসার মত দুর্লভ কোন ব্যাক্তিত্বের সাথে কোন ঘটনার ছবি। তিনি বিশ্ব ব্যাপী আকর্ষণের কেন্দ্র।'

আয়ান ফ্লেমিং-এর মুখে আহমদ মুসার নাম শুনে বিস্ময়ের চেয়ে ভয়ই বেশী পেল ইয়েকিনি। বিজ্ঞাপন ঘিরে যে সব রহস্যের কথা বলেছেন আহমদ মুসা তা মনে পড়ে গেল। আপনা থেকেই তার মন বলল নিশ্চয় সামনে বড় কোন ঘটনা আছে। সতর্ক হলো ইয়েকিনি। বলল, আপনারা আহমদ মুসাকে চেনেন, জানেন?

'চিনি না, তবে জানি। আমাদের কেন্দ্রীয় সংগ্রহে তার অনেক ছবি আছে।'

আয়ান ফ্লেমিং থামল। একটা ঢোক গিলল। শুরু কলল কথা আবার, 'শুনেছি তিনি ক্যামেরুনে এসেছেন। তার জন্যে আমাদের একটা এ্যাপ্রেসিয়েশন লেটার আছে অনেকদিন ধরে। ঠিকানা না পাওয়ায় দিতে পারি না। আপনি কি জানেন তার সম্পর্কে কিছু?'

ইয়েকিনির মনে তখন চিন্তার ঝড়। আয়ান ফ্লেমিং এর কথা শুনে মনে হচ্ছে তারা আহমদ মুসার দারুণ ভক্ত। যা স্বাভাবিক নয়। কেমন করে স্বাভাবিক হবে যে তারা আহমদ মুসাকে এ্যাপ্রেসিয়েশন লেটার দেবে? এসব প্রশ্ন থেকে ইয়েকিনি ভাবল, ওদের আরও বাজিয়ে দেখা দরকার।

আয়ান ফ্লেমিং এর প্রশ্নের উত্তরে ইয়েকিনি বলল, 'তেমন কিছু জানা নেই। ইয়াউন্ডি কেন্দ্রীয় মসজিদে এক প্রোগ্রামে তাকে দেখেছিলাম। ফটোও তুলেছিলাম।'

ভীষণ খুশি হয়ে উঠল আয়ান ফ্লেমিং এবং তাদের কৃষ্ণাংগ লোকটি।

'কতদিন আগে?' আয়ান ফ্লেমিং-এর কন্ঠ দ্রুত। ভেতরের উত্তেজনা চাপা দিতে চাইলেও বেরিয়ে পড়েছে অনেকখানি।

'বেশী দিন নয়। চারদিন আগে।'

'তাহলে উনি ইয়াউন্ডি আছেন নিশ্চয়?' কথার সাথে সাথে ফ্লেমিং এর চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

'থাকতে পারেন?'

'উনি কোথায় উঠেছেন জানেন?'

'না জানি না।'

'ঐ মসজিদের কেউ জানেন নিশ্চয়?'

'ঠিক বলতে পারবো না। কারণ মসজিদ কর্তিপক্ষ সেদিনের অনুষ্ঠান করেননি।'

'অনুষ্ঠান কারা করেছিলেন?'

'আমি ঠিক জানি না। বন্ধুর মুখে খবর শুনে গিয়েছিলাম। ফটো তোলাই ছিল আমার টার্গেট।'

কয়েক মুহূত চুপ থাকল আয়ান ফ্লেমিং। তার বলল 'ধরুন আমরা যদি মসজিদ কর্তৃপক্ষকে আহমদ মুসার জন্যে একটা চিঠি দেই, কিংবা আপনাকেই যদি এ কাজের জন্যে অনুরোধ করি, তাহলে কি সে চিঠিটা কোনওভাবে তাঁর কাছে পৌছানো সম্ভব?

ইয়েকিনি ভাবল, চিঠি নেয়া দরকার। চিঠিটা যে কোন ‘লেটার অব এ্যাপ্রেসিয়েশন নয়’ সে নিশ্চিত। তাহলে চিঠিটা কি জানা দরকার।’

ভাবতে গিয়ে ইয়েকিনির দেরী হলে একটু উত্তর দিতে। এই ফাঁকে আবার কথা বললো আয়ান ফ্লেমিং। বলল, দেখুন ব্যপারটা আমাদের আবেগের সাথে জড়িত। বিশ্বে কোথাও ও কোন ঠিকানা নেই। খবরের কাগজও যোগাযোগের একটা মাধ্যম। কিন্তু আহমদ মুসা এবং এক ব্যাক্তিত্ব যাকে খবরের কাগজের কোন শিরোনামে আনা নিরাপদ নয়। এই জন্যেই অনুরোধ করছিলাম। খোঁজ করলে নিশ্চয় আপনি তার খোঁজ পাবেন।’

‘আমি চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু কোন নিশ্চয়তা নেই। না পারলে চিঠি ফেরত কিভাবে দেব?’

আশা করি তার দরকার হবে না। হলে আমাদের পোষ্ট বক্সের ঠিকানায় ফেলে দেবেন।’

বলে একটু থেমেই আবার শুরু করল, ‘এবার আসুন কাজের কথায় আসি। আমাদের নিউজ ফাইল ও ফটো এ্যালবামের শিরোনামগুলো দেখুন। তারপর আপনার চয়েস অনুসারে নিতে পারবেন।’

বলে একটু থেমেই আবার শুরু করল, এবার আসুন কাজের কথায় আসি। আমাদের নিউজ ফাইল ও ফটো এ্যালবামের শিরোনামগুলো দেখুন। তারপর আপনার চয়েস অনুসারে নিতে পারবেন।’

আয়ান ফ্লেমিং কথা শেষ করতেই কৃষ্ণাংগ লোকটি পাশের ফাইল ক্যাবিনেট থেকে এ্যালবাম ও একটা বড় ফাইল বের করল।

ফটোগ্রাফ বা নিউজ কেনা ইয়েকিনির আসার প্রধান টার্গেট ছিল না। আহমদ মুসা তাকে পাঠানোর লক্ষ্য ছিল বিজ্ঞাপন ঘিরে যে রহস্য আঁচ করা যাচ্ছে, সেটার একটা কিনারা করা। এই কিনারা করার কাজ হয়তো সে এখনও করতে পারেনি, তবে তার কাছে এটা এখন পরিষ্কার হয়েছে যে ব্যবসায় নয়, আহমদ মুসাই ওদের আকষণের কেন্দ্র বিন্দু। আহমদ মুসার কাছে চিঠি দেয়ার ব্যাপারটা তারা যেভাবে উপস্থাপন করেছে, সেটা সেটা খুবই স্থুল। এমন স্থুল কান্ড কান্ড

অনেক সময় বুদ্ধিমানরাও ঘটায়, যখন তারা সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে মরিয়া হয়ে উঠে। ইয়েকিনির মনে হলো, এখানেও ব্যাপার তেমনই ঘটেছে।

আয়ান ফ্লেমিংদের সাথে ফটো ও নিউজ কেনার ব্যাপারে আলোচনা সেরে ইয়েকিনি রাস্তায় নামল।

রাস্তার ফুটপাতে নেমে আসতেই একটা ট্যাক্সি এসে ব্রেক কষল একদম সামনে এসে। ট্যাক্সিওয়ালা মুখ বাড়িয়ে বলল, 'স্যার কোথায় যাবেন?

ইয়েকিনি গাড়ির দিকে এগুচ্ছিল। এমন সময় আহমদ মুসার একটা কথা তার মনে পড়ে গেল। কোথাও কোন মিশনে গেলে কোন গাড়ি এগিয়ে এলে বা যথাস্থানে দাঁড়িয়ে থাকলে তাতে চড়া উচিত নয়।

কথাটা মনে হওয়ার সংগে সংগে ইয়েকিনি পেছনে হটে এল।

বলল, 'স্যরি, একটু অসুবিধা আছে।'

বলে ইয়েকিনি ফুটপাথ ধরে হাঁটতে শুরু করলো। সামনে মোড়েই ট্যাক্সি ষ্ট্যান্ড আছে।

ট্যাক্সি ঠিক করে ট্যাক্সিতে উটে বসল।

চিঠিটা তখনও হাতে আছে ইয়েকিনির। দেখল খামের মুখ ভালো করে বন্ধ করা। চিঠি সম্পর্কে অসীম কৌতুহল তার মনে। কিন্তু কৌতুহল নিবৃত্তির কোন পথ নেই। চলছে ইয়েকিনির ট্যাক্সি।

হঠাৎ ইয়েকিনির মনে পড়ল আহমদ মুসার একটা উপদেশের কথা। সে উপদেশটা ছিলঃ কোন মিশন থেকে ফেরার পথে সামনের চেয়ে পেছনটাকে গুরুত্ব দেবে বেশী। এক চোখ সামনে থাকলে, আরেক চোখ পেছনে রাখতে হবে।

কথাটা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে ইয়েকিনি পেছন ফিরে তাকাল।

সময় তখন বেলা তিনটা। তার উপর এলাকাটা নন-কমার্শিয়াল এলাকা। সে জন্যে রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া খুবই কম।

ইয়েকিনি পেছনে তাকিয়ে দেখতে পেল দুইটি প্রাইভেট কার তার গাড়ির পেছনে আসছে। সামনের প্রাইভেট কারটা তীব্র বেগে ছুটে আসছে। পেছনেরটা বেশ একটু পেছনে।

দেখতে দেখতে ছুটে আসা প্রাইভেট কারটা ইয়েকিনির গাড়ি অতিক্রম করে চলে গেল।

ক'মিনিট পরে পেছনে তাকিয়ে ইয়েকিনি দেখল মিনি ট্যাক্সি দু'টো আর দেখা যাচ্ছে না। পেছনে পড়ে গেলে বা কোন গলিতে ঢুকে গেছে। পেছনের দ্বিতীয় প্রাইভেট কারটা এখনও সেই সমান দুরত্বে। যেন ইয়েকিনির গাড়ি যে স্পীডে চলছে, ঠিক সেই স্পীডেই চলছে গাড়িটা। বিস্মিতই হলো ইয়েকিনি।

কিন্তু সোজা হয়ে বসেই আহমদ মুসার একটি কথা মনে হওয়ায় চমকে উঠল ইয়েকিনি। আহমদ মুসা বলেছিলেন, অপরিচিত ও সংযোগহীন দুইটি গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণহীন কোন রাস্তায় বেশীক্ষণ এক গতিতে চলতে পারে না। যদি চলে তার মধ্যে তাহলে একটা উদ্দেশ্য থাকবে নিশ্চয়ই।

কথাটা মনে হতেই সতর্ক হলো ইয়েকিনি। মুখ ফিরিয়ে পেছনের লাল গাড়িটার দিকে তাকিয়ে ভাবল, কোন উদ্দেশ্য আছে নাকি তাহলে গাড়িটার!

করণীয় ভাবতে গিয়ে আহমদ মুসার আরেকটা কথা মনে পড়ে গেল ইয়েকিনির। আহমদ মুসা এক উপদেশে বলেছিল, পেছনে কাউকে সন্দেহ করলে সরাসরি আর না চলে কোন আড়ালের আশ্রয় নিয়ে তাকে বোকা বানাতে হবে।

ইয়েকিনি ভাবল, কোথায় কিসের আড়াল নেয়া যায়?

খুশী হয়ে উঠল তার মন। সামনে অল্প দূরেই একটা নতুন তিনতলা মার্কেট। খুব জমজমাট এখণ। তিন পাশ দিয়েই তার রাস্তা। ওখানে নেমে পেছনের গাড়িটাকে বোকা বানিয়ে সে কেটে পড়তে পারে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে। মার্কেটের প্রায় কাছাকাছি এসে গেছে গাড়ি। মার্কেটে গাড়ি দাঁড় করাতে বলল ইয়েকিনি। মার্কেটের কার পার্কে গাড়ি দাঁড়াতেই ভাড়া চুকিয়ে দ্রুত মার্কেটে ঢুকে গেল ইয়েকিনি। মার্কেটে ঢোকার মুখে ইয়েকিনি পেছনৈ মুখ ঘুরিয়ে দেখল পেছনের সেই গাড়িটা মার্কেটের চত্বরের দিকে আসছে।

মার্কেটে ঢোকার পর প্রথমেই প্রশস্ত একটা করিডোর। তার দুই প্রান্ত দিয়ে দুটো সিঁড়ি দু'তলা, তিন তলায় উঠে গেছে। ইয়েকিনি ভেতরে ঢুকেই বাম দিকের সিঁড়ি বেয়ে দু'তলায় উঠে গেল দ্রুত। ঠিক উপরে না উঠে সিঁড়ির

মাঝামাঝি ল্যান্ডিং-এ গিয়ে সিড়ির কাঁচের জানালা দিয়ে সে তাকাল নিচের চত্বরে। দেখল, সেই লাল গাড়িটা মার্কেটের কারপার্কে এসে দাঁড়াল। গাড়ি

থেকে দ্রুত বেরিয়ে এল একজন লোক। লোকটাকে চিনতে পারলো ইয়েকিনি। আয়ান ফ্লেমিং-এর অফিসে দেখা সেই কৃষ্ণাংগ। লোকটি গাড়ি থেকে নেমেই ছুটল মার্কেটের দিকে।

ইয়েকিনি সিঁড়ির ল্যান্ডিং থেকে দু'তলার দিকে কয়েক ধাপ উঠে রেলিং এর আড়াল নিয়ে চোখ রাখল করিডোরের দিকে।

দেখল ইয়েকিনি, কৃষ্ণাংগ লোকটি মার্কেটের ভেতরে ঢুকে মুহূর্তের জন্য দাঁড়াল। এদিক-ওদিক দৃষ্টি বুলাল দ্রুত। সিঁড়ির দিকেও। তারপরেই সে দ্রুত সামনে এগুলো এবং এক তলার দোকানগুলোর পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলল।

ইয়েকিনি সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছ। সে বুঝল, কৃষ্ণাংগ লোকটি মার্কেটের ওপাশের রাস্তা লক্ষে এগুচ্ছে।

কৃষ্ণাংগ ঐ লোকটিকে আর যখন দেখা গেল না, তখন ইয়েকিনি সিঁড়ি থেকে নেমে দ্রুত করিডোর পেরিয়ে মার্কেট থেকে বেরিয়ে এল।

রাস্তায় নামতেই একটা ট্যাক্সিও পেয়ে গেল। চলন্ত একটা ট্যাক্সিকে ডেকে তাতে উঠে বসল।

ছুটে চলল ট্যাক্সি।

রোমাঞ্চ লাগল ইয়েকিনির। জীবনের প্রথম একক এক মিশনে সে জয়ী হয়েছে, বোকা বানাতে পেরেছে সে শত্রুকে।

ওরা কি সত্যিই শত্রু? ওরা কেন তার পিছু নিয়েছিল? ইয়েকিনির ঠিকানা জানাই কি ছিল ওদের টার্গেট? কেন? হঠাৎ আহমদ মুসাকে দেয়া তাদের চিঠির কথা মনে পড়ল। চিঠিতে কি আছে? কেন ওরা চিঠি দিয়েছে আহমদ মুসাকে?

এইভাবে একের পর এক প্রশ্ন তার মনে উদয় হতে লাগল। কিন্তু কোন প্রশ্নেরই সে জবাব খুঁজে পেল না।

ঘড়ি দেখল ইয়েকিনি।

বিকেল সাড়ে তিনটা।

বেশ দেরী করে ফেলেছে -ভাবল ইয়েকিনি। আজ রাশিদী ইয়েসুগোর বাড়িতে এক মহা অনুষ্ঠান। আহমদ মুসার বিয়ে। আজ চারদিন বিয়ের অনুষ্ঠান চলছে।

প্রথমদিন বিয়ে হয়েছে রাশিদী ইয়েসুগো ও ভিনিসা রোসেলিনের। তারপরের দিন এলিসা গ্রেস ও ওমর বায়ার বিয়ে। তৃতীয় দিন তার অর্থাৎ মুহাম্মদ ইয়েকিনি এবং লায়লা ইয়েসুগোর বিয়ে হয়েছে। চতুর্থ দিনে বিয়ে হয়েছে ফাতেমা মুনেকা এবং হাসান একাকুর।

এ বিয়েগুলোর মধ্যে রোসেলিনের বিয়ে হয়েছে চীফ জাস্টিসের বাসায়। অবশিষ্ট তিনটি বিয়ে হয়েছে রাশিদী ইয়েসুগোর বাড়িতে।

ভিন্ন ভিন্ন দিনে আহমদ মুসার পরিকল্পনা অনুসারে। তার কথা সবার বিয়ে এক সাথে হলে আনন্দ করার, কাজ করার লোক কোথায় পাওয়া যাবে?

পরিকল্পনা অনুসারে সর্বশেষ বিয়ে আহমদ মুসার। আজ সেই বিয়ে।

মনটা উসখুস করে উঠল মুহাম্মাদ ইয়েকিনির। মবাই আনন্দ করছে, আর সে কিনা বেরিয়েছে মিশনে। আহমদ মুসা চায়নি এদিন তাকে মিশনে পাঠাতে। কিন্তু উপায় ছিল না। সাক্ষাৎ করার এই একটি দিনই ওরা দিয়েছিল।

সুতরাং বাধ্য হয়েই আহমদ মুসা তাকে এ মিশনে পাঠায়।

গেটের ভেতরে গাড়ি না নিয়ে গেটের সামনে রাস্তাতেই নেমে পড়ল ইয়েকিনি।

গাড়ি থেকে বাড়ির দিকে তাকাতেই হঠাত্ ছাদের দিকে গেল তার দৃষ্টি। দেখল, ছাদের একদম এক প্রান্তে লায়লা ইয়েসুগো দাঁড়িয়ে। মু্হাম্মাদ ইয়েকিনিকে দেখেই সে হাত নাড়ল।

ইয়েকিনি বুঝল, লায়লা ইয়েসুগোরাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিল। তার পথ চেয়ে কি? তৃপ্তির এক অপূর্ব শিহরণ খেলে গেল ইয়েকিনির বুকে, সারাদেহে। তার মনে হলেঅ, প্রিয়তমা নারীর এমন অপেক্ষমান চোখের চেয়ে সুন্দর, মধুর বুঝি আর কিছু নেই।

হঠাৎ মনে জাগল, তাদের প্রিয় নেতা আহমদ মুসা সহস্র মিশনে গেছেন, যাচ্ছেন। বাড়িতে কি অমন অপক্ষমান কোন ব্যাকুল চোখ তার পথ চেয়ে থাকে? তার তো বাড়িই নেই! বাড়িতে চোখ থাকবে কি করে!

'এবার সে ব্যবস্থা ইনশাআল্লাহ হচ্ছে'-সানন্দে ভাবল ইয়েকিনি।

লায়লঅ ইয়ে সুগোর উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে গেট দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল ইয়েকিনি।

সুন্দর করে সাজানো হল ঘরে এসে হাজির হলো ইয়েকিনি।

বিশাল হল ঘরটির মাঝ বরাবর টাঙানো ভারি পর্দার পার্টিশন।

পার্টিশনের একপাশে মেয়েরা, অন্যপাশে ছেলেরা।

সবাই উপস্থিত। জমজমাট বিয়ের আসর।

হলের চারদিকে সাজানো সোফায় বসেছে সকলে। মাঝখানের বড় একটি সোফায় বসেছে আহমদ মুসা। তার এক পাশে রাশিদী ইয়েসুগো।

আহমদ মুসার সামনের সোফায় রোসেলিনের আব্বা চীফ জাস্টিস ওসাম বাইক এবং ডোনার আব্বা মিশেল প্লাতিনি।

ইয়েকিনি যখন হল ঘরে প্রবেশ করে, তখন কথা বলছিল মিশেল প্লাতিনি, 'না আমি খুব খুশী। আমারর ইচ্ছা ছিল আমাদের পূর্ব পুরুষের প্রাসাদে বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারীর বিয়ে হবে। কিন্তু সেখানে বিয়ে হলে যে খুশী আমার লাগত, তার চেয়ে অনেক বেশী খুশী লাগছে আমার এখানে।..'

ইয়েকিনি প্রবেশ করলে কথা বন্ধ করেছিল মিশেল প্লাতিনি।

ইয়েকিনি এগিয়ে এলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'এস ইয়েকিনি। বুঝাই যাচ্ছে তোমার মিশন সফল হয়েছে, কিন্তু সেই সাথে তোমার চোখে উদ্বেগ কেন?'

হলে উপস্থিত সকলের দৃষ্টি তখন ইয়েকিনির দিকে। পর্দার ওপাশে হলের ঐ অংশে মেয়েদের গুঞ্জন-কথাবার্তাও থেমে গেছে। তাদেরও মনোযোগ এদিকে।

ইয়েকিনি সবাইকে সালাম জানিয়ে আহমদ মুসার পাশে বসল। তারপর চাপদিকে আবার নজর বুলিয়ে দেখল বাইরের কেউ নেই। বলল, 'সফল হয়েছে

এই অর্থে য আমি তাদের দেখা পেয়েছি, কথা বলেছি। কিন্তু রহস্যের জট খোলেনি, বরং আরও জটিল হয়েছে।'

'জটিল হয়েছে? খুলে বল।' বলর আহমদ মুসা।

'ওরা আমাকে বিদায় দেবার পর গোপনে আমাকে ফলো করেছিল। সম্ভবত আমার ঠিকানা জানার জন্যে।' বলল ইয়েকিনি।

'তারপর?'

'আপনার উদেশ অনুযায়ী একটা মার্কেটে ঢুকে পড়ে ওদের বোকা বাবনিয়ে চলে এসেছি।'

'যাক, ওরা যে পরিচয় দিয়েছে, ওটা যে আসল পরিচয় নয় বুঝা গেল। বল, তারপর?'

'ওরা আপনাকে একটা চিঠি দিয়েছে।'

'আমাকে চিঠি দিয়েছে? ওরা?'

'হ্যাঁ।'

'আমার কথা তুমি ওদের বলেছ?'

'প্রশ্নই উঠে না। কথায় কথায় ওরাই আমাকে বলল, আমরা ছবি বিক্রি করি, আবার কিনিও। বিশেষ করে আহমদ মুসার মত ব্যাক্তিদের। উনি এসছিলেন ক্যামেরুনে। কোন ছবি দিতে পারেন তার?'

'তারপর?' আহমদ মুসার চোখে চাঞ্চল্য।

ইয়েকিনি একে একে চিঠির প্রসংগ তারা কিভাবে তুলল, কিভাবে চিঠি দিল ইত্যাদি খুলে বলল।

আহমদ মুসা গম্ভীর হয়ে উঠেছিল। বলল, 'সম্ভবত আমি যা ভেবেছি, রহস্যটা তার চেয়েও গভীর।'

বলে আহমদ মুসা চিচঠি চাইল। ইয়েকিনি চিঠি দিল আহমদমুসাকে। ইভেলাপটি হাতে নিয়ে আহমদ মুসা উল্টে-পাল্টে দেখল। গম্ভীর হয়ে উঠল তার মুখ। বলল, 'এটা ব্ল্যাক ক্রস-এর চিঠি।'

'না খুলেই কি করে বুঝলেন?' বলল ইয়েকিনি।

‘দেখ ইনভেলাপে নিউজ ব্যাংক-এর মনোগ্রামে কালো একটা সৈনিক মূর্তি রয়েছে। কালো এই সৈনিক মূর্তি এখন ব্ল্যাক ক্রস-এরও প্রতীক।’ বলে আহমদ মুসা ইনভেলাপ ছিড়ে চিঠিটি বের করল।

ভাঁজ খুলে চিঠিটি মেলে ধরল আহমদ মুসা তার চোখের সামনে।

চিঠি পড়তে শুরু করল আহমদ মুসা। পড়তে পড়তে তার চোখ-মুখের উদ্বেগজনক পরিবর্তন ঘটল। বিষাদের একটা কালো ছায়া তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

চিঠি পড়া শেষ হলো আহমদ মুসার। চিঠি সমেত তার দু’টি হাত ঢলে পড়ল তার কোলের উপর। আহমদ মুসার চোখে শূণ্য দৃষ্টি।

‘চিঠিতে কি আছে আহমদ মুসা?’ উদ্বিগ্ন কন্ঠে জিজ্ঞেস করল ডোনার আব্বা মিশেল প্লাতিনি।

আহমদ মুসা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে চিঠিটি তুলে দিল মিশেল প্লাতিনির হাতে।

মিশেল প্লাতিনি চিঠিটি তুলে ধরল তার চোখের সামনে। চীফ জাস্টিস ওসাম বাইকও ঝুঁকে পড়ল চিঠির দিকে। মিশেল প্লাতিনি তার হাতের চিঠি একটু এগিয়ে নিল চীফ জাস্টিসের দিকে। দু’জনেই পড়তে শুরু করল।

ঘরে তখন পিন-পতন নীরবতা। ঘরের মাঝখানের পর্দার ফাঁক দিয়ে ডোনা, লায়লা ও রোসেলিনের চোখ এদিকে নিবদ্ধ।

সকলের পচন্ড উদ্বেগ এবং কৌতুহলের মধ্যে যে চিঠি ওরা পড়তে লাগল তা এই:

"মি: আহমদ মুসা, আপনার বিজয়ের উতসব-আনন্দ নিশ্চয় শেষ হয়নি। এই আনন্দ-উতসবে আমাদের ছোট্ট একটা বজ্রাঘাত।

বারবারেতি’র ইসলামী সম্মেলন কেন্দ্র আমরা ধ্বংস করেছি। ধ্বংস করেছি একটা আড়াল সৃষ্টির জন্যে। আমরা কিডন্যাপ করেছি শেখ আবদুল্লাহ আলী আল রাশিদ মাদানী, কামাল ইনুনু, শেখ সাইয়েদ আলী কুতুব, তারেক আল মাহদী সুদানীসহ ১২ জন নেতাকে। কিন্তু দুনিয়ার চোখে তারা সবাই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে ঐ বিস্ফোরণের আগুনে। দুনিয়ার কেউ প্রমাণ করতে পারবে না যে

তারা কিডন্যাপ হয়েছে। আপনি জানার পরেও তা কোনভাবেই প্রমাণ করতে পারবেন না।

আপনাদের অগম্য একটি স্থানে তাদের বন্দী করে রাখা হয়েছে। দু:খের বিষয় তাদের ভালো অবস্থায় রাখতে পারিনি। তাদের জীবন দ্রুত ক্ষয়ে যাচ্ছে।

বিস্ফোরণের পনের দিন পর তাদের কেউই বাচবে না।

তাদের মুক্তির একমাত্র উপায় যথাসময়ে আপনার আত্মসমর্পণ। সংঘ নদীর ভবনের বিপরীত দিকে উইন্দ টাওয়ারের পাশের একটি গাছে একটা সাদা পতাকা টাঙানো থাকবে। পতাকাটি নামিয়ে নিয়ে সেটা হাতে নিয়ে অপেক্ষা করতে হবে। অপেক্ষার এক ঘন্টার মধ্যে সেখানে একটা গাড়ি গিয়ে হাজির হবে। গাড়ির ড্রাইভিং উইন্ডো থেকে অনুরূপ একটা সাদা পতাকা দেখানো হবে এবং সেই সাথে গাড়ির দরজা খুলে যাবে। ঐ গাড়িতে উঠে বসতে হবে।

পিয়ের পল হত্যার প্রতিশোধ নেয়া সবে শুরু। আপনি আত্মসমর্পণ না করলেও উল্লিখিত সময়ের মাথায় বন্দীরা নিহত হবে। আত্মসমর্পণ না করলেও আপনি বাঁচবেন না আমাদের হাত থেকে। আপনার রক্তই আমাদের প্রতিশোধ তৃষ্ণা মেটাতে পারে। আপনার আত্মসমর্পণ বন্দীদের বাঁচাতে পারে মাত্র।”

চিঠি পড়া শেষ করে ডোনার আব্বা মিশেল প্লাতিনি এবং চীফ জাস্টিস ওসাম বাইক ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। চোখে তাদের বোবা দৃষ্টি। সে দৃষ্টি উদ্বেগ-আতংকে বিহ্বল।

ডোনার আব্বার হাতে ছিল চিঠি। তার শিথিল হাত থেকে চিঠি পড়ে গেল।

পর্দার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে গেল ডোনা। তার পরণে বিয়ের পোশাক। অপরূপ সাদা গাউনে তার দেহ আবৃত। তার চেয়েও অপরূপ একটা ওড়না মাথা থেকে মুখটা প্রায় ঢেকে ফেলেছে।

সে দ্রুত প্রবেশ করে তার আব্বার হাত থেকে পড়ে যাওয়া চিঠিটা ছোঁ মেরে নিয়ে ভেতরে চলে গেল।

কি আছে চিঠিতে ভাইয়া? উদ্বিগ্ন কন্ঠে বলল রাশিদী ইয়েসুগো।

ঘরে উপস্থিত সবার চোখেও এই একই প্রশ্ন।

আহমদ মুসা সোজা হয়ে বসল। বলল, প্রিয় ভাইয়েরে, চিঠিটা লিখেছে ব্ল্যাক ক্রস। ওরা জানিয়েছে, বারবারেতির ইসলামী সম্মেলন কেন্দ্র অরাই ধ্বংস করেছে এবং কিডন্যাপ করেছে ডজন খানেক মুসলিম নেতাকে।'

আহমদ মুসা একটু থামতেই রাশিদী ইয়েসুগো বলে উঠল, 'বিস্ফোরণে তাহলে ওরা মারা যায়নি? কিডন্যাপ করা হয়েছে ওঁদের?'

'ওঁদের পণবন্দী করা হয়েছে বলতে পার। আহমদ মুসা ওদের হাতে সারেন্ডার করলে ওদের মুক্তি দেবে বলে ওরা বলেছে।'

মুখ চুপসে গেল রাশিদী ইয়েসুগোর। বলল ভাঙা গলায়, 'আর কি লিখেছে?'

'বিস্ফোরণ থেকে পনের দিনের মাথায় বন্দীরা সবাই নিহত হবে। সংঘ ও কংগ নদীর সংগম স্থল বোমাসায় গিয়ে আমাকে আত্মসমর্পণ করতে হবে।'

'না করলে কি হবে?'

'বন্দীরা ছাড়া পাবে না।'

'কোন সময় সীমা?'

'১৫ দিনের মাথায় সবাই নিহত হবে। অতএব পনের দিনই সময় সীমা।'

রাশিদী ইয়েসুগো কোন কথা বলল না।

সবাই নীরব।

ডোনার আব্বা মিশেল প্লাতিনি এবং চীফ জাস্টিস অসাম বাইক দুজনেরই যেন বাকরোধ হয়ে গেছে। তাদের চোখ-মুখ থেকে উদ্বেগ যেন ঠিকরে পড়ছে।

এ সময় পর্দার বাইরে বেরিয়ে এল লায়লা ইয়েসুগো। আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, 'চিঠির লেখা হারিয়ে গেছে।' লায়লার কন্ঠে উদ্বেগ।

আহমদ মুসার মধ্যে কোন বিস্ময় বা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো না। বরং দেখা গেল তার মুখে একটা হাসির রেখা। বলল, 'ওরা কথা রাখল, কোন প্রমাণ তারা রাখল না। বিশেষ ভ্যানিশিং কেমিকেল দিয়ে চিঠিটা লেখা ছিল। লায়লার কাছ থেকে চিঠির কাগজটা নিয়ে এল রাশিদী ইয়েসুগো।'

রাশিদী ইয়েসুগো চিঠি নিয়ে এলে সবাই দেখল।

'আহমদ মুসা চীফ জাস্টিস্কে লক্ষ্য করে বলল, 'জনাব আমরা ক'জন ভেতরে একটু বসতে চাই।'

বলে আহমদ মুসা রাশিদী ইয়েসুগোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি বসার একটু ব্যবস্থা কর। ওঁরা দু'জন এবং তোমরা দু'জন।'

ভেতরের ফ্যামিলি ড্রইং রুমে গিয়ে বসল ওঁরা পাচজন।

আহমদ মুসার সামনের দু'টি সোফায় বসেছে ডোনার আব্বা এবং রোসেলিনের আব্বা। আর বাঁ পাশের দু'টির সোফায় মুহাম্মাদ ইয়েকিনি এবং রাশিদি ইয়েসুগো।

বসার পর কথা শুরু করল আহমদ মুসা। ডোনার আব্বা ও রোসেলিনের আব্বাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'আপনারা চিঠি পড়েছেন, পরিস্থিতি বুঝতে পারছেন। আপনাদের পরামর্শ পেলে বাধিত হবো।'

'কি করা উচিত বুঝতে পারছি না। আত্মসমর্পণ তো সব নয়।' বলল ডোনার আব্বা মিশেল প্লাতিনি।

'আমিও এটাই ভাবছি।' বলল রোসেলিনের আব্বা চীফ জাস্টিস ওসাম বাইক।

আবার নীরবতা।

নীরবতা ভেঙে ধীরে ধীরে বলল আহমদ মুসা, 'বিস্ফোরণের পর দশ দিন পার হয়ে গেছে। আর মাত্র ৫ দিন বাকী। বাকী এই সময়ের মধ্যে বন্দী মুসলিম নেতৃবৃন্দকে উদ্ধার করতে হবে। উদ্ধার করতে না পারলে তাদের কেউ বাঁচবেন না।'

'উদ্ধার কিভাবে হবে? দুনিয়ার কেউ তো জানে না তাদের অবস্থার কথা।' বলল ওসাম বাইক।

'বিশ্ব মুসলিম কংগ্রেসসহ মুসলিম দেশসমুহ এবং দুনিয়াবাসীকে এই ব্যাপারটা জানিয়ে দেয়া যায়। তাহলে তাদের একটা সম্মিলিত ব্যবস্থা হতে পারে।' বলল রাশিদী ইয়েসুগো।

‘তাতে লাভ হবে না। বিষয়টা নিয়ে হৈ চৈ হলে কিংবা ঘটা করে তাদের উদ্ধারের সম্মিলিত কোন ব্যবস্থা হলে বন্দীদের তারা সময়ের আগেই হত্যা করবে। তাছাড়া ঐ ধরনের উদ্যোগে উদ্ধারের জন্যে যে সময় প্রয়োজন, সে সময় এখন হাতে নেই।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ব্ল্যাক ক্রস-এর উপর আন্তর্জাতিক কোন চাপ প্রয়োগ করা যায় না, যা তাদেরকে আন্তর্জাতিক মুসলিম নেতাদের হত্যা করা থেকে বিরত রাখতে পারে?’ বলল মুহাম্মাদ ইয়েকিনি।

‘ব্ল্যাক ক্রস-এর উপর এ ধরনের কোন চাপ দেয়া যাবে না। কারণ, তারা কিডন্যাপ করেছে এবং মুসলিম নেতৃবৃন্দ বেঁচে আছেন, এর কোন প্রমাণ নেই।’ বলল আহমদ মুসা।

আবার নীরবতা। কারো মুখে কোন কথা নেই।

পাশের ঘরেই রয়েছে ডোনা, লায়লা ইয়েসুগো, রোসেলিন, ফাতেমা মুনেকা এবং এলিসা গ্রেস। তাদের সমস্ত মনোযোগ এ ঘরের আলোচনার দিকে। তাদের সকলের চেহারাই আষাঢ়ের মেঘের মত ভেজা।

চিন্তাক্লিষ্ট আনত দৃষ্টি আহমদ মুসা মুখ তুলল। বলল, ‘ওঁদের উদ্ধারের দায়িত্ব এখন আমাদের। আমাকে যেতে হবে।’

‘আত্মসমর্পণের জন্যে?’ ডোনার আব্বার কন্ঠ।

‘আমি এখন বলতে পারছি না। তবে কোন উপায় না থাকলে আত্মসমর্পণ করতে হবে।’ স্থির, শান্ত কন্ঠে বলল আহমদ মুসা।

আবার নীরবতা। কথা বলার শক্তি যেন কারো নেই।

অনেকক্ষণ পর চীফ জাস্টিস ওসাম বাইক বলল, ‘বাবা, তোমার কথার উপর আমাদের কোন কথা চলতে পারে না। তুমি কবে যাবে মনে করছ?’

‘চাচা জান, দিন মাত্র পাঁচটা আছে। যে কাজ করতে হবে সে তুলনায় এ সময়টা কিছুই নয়। আমি আজ এখনি যাত্রা করতে চাই।’ বলল আহমদ মুসা।

আবার নীরবতা।

আহমদ মুসা ছাড়া উপস্থিত অন্য সকলের চোখ-মুখের সকল আলো যেন আক সংগে দপ করে নিভে গেল। অন্ধকার নামল মুখে-চোখে সকলের। পাশের ঘরে ডোনা লায়লাদেরও একই অবস্থা

নীরবতা ভাঙল চীফ জাস্টিস ওসাম বাইক। বলল, 'তাহলে বিয়েটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে হয়।'

আহমদ মুসা মুখ নিচু হলো। বলল, 'চাচা জান আমি এ নিয়ে ডোনার সাথে কথা বলতে চাই। সে আমার সাথে একমত হলে বিয়েটা স্থগিত রাখতে আমি অনুরোধ করব।'

আবার নীরবতা।

ডোনার আব্বা ও চীফ জাস্টিসের চোখ-মুখ বেদনা ক্লিষ্ট। রাশিদী ইয়েসুগো এবং মুহামাদ ইয়েকিনির কেঁদে ফেলা শুধু বাকী। ওদিকে লায়লা, রোসেলিন, ফাতেমা মুনেকা ও এলিসা গ্রেস অসহনীয় এক বেদনার বানে বিদ্ধ হয়ে নিজেদের অজান্তেই চোখ তুলেছে ডোনার দিকে।

ডোনার মাথা উঁচু। ভাবলেশহীন মুখ। চোখে একটা শূন্য দৃষ্টি। যেন কোথায় কোন চিন্তার সাগরে নিজেকে সে হারিয়ে ফেলেছে।

আবারও নীরবতা ভাঙল চীফ জাস্টিস ওসাম বাইক। বলল, 'ঠিক আছে কথা বলবে।'

বলে সে তাকাল রশিদী ইয়েসুগোর দিকে।

'ঠিক আছে ব্যবস্থা কড়ছি।' বলে একটু থেমেই সে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার সাথে আমরা কারা যাচ্ছি আহমদ মুসা ভাই?'

আহমদ মুসা একটু হাসল। বলল, 'তোমাদের কোন সুযোগ দিতে পারছি না। আমার সাথে যাবে ব্ল্যাক বুল এবং যদি রাজী হয় তাহলে অগাস্টিন ওকোচা'।

'কিন্তু ওরা দু'জনই তো 'কোক-ওকুয়া'র লোক, ওরা সহজেই ওদের চোখে ধরা পড়ে যাবে'। বলল রাশিদী।

'এ চিন্তা তোমার মনে উদয় হওয়ার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ। কিন্তু ওদের নেব আমি ছদ্মবেশে, অন্য মানুষ বানিয়ে'।

'আমরা পারি না কেন যেতে?' মুখ ভার করে বলল রাশিদী ইয়েসুগো।

আহমদ মুসা ডোনার আব্বা ও রোসেলিনের আব্বার দিকে এক পলক তাকিয়ে রাশিদীকে বলল, ‘পরে বলব তোমাদের কারণটা। যাও তুমি লায়লাকে বলে ডোনাকে ডেকে দাও’। আহমদ মুসার ঠোঁটে হাসি।

রাশিদী ইয়েসুগো মুখ ভার করেই উঠে দাঁড়াল।

# ৪

ইয়েউন্ডি থেকে ইয়াউন্ডি-বাতুয়া-বাতুরি হাইওয়ে ধরে পূর্ব দিকে ছুটে চলছিল আহমদ মুসার গাড়ি।

গাড়ির ড্রাইভিং সিটে আহমদ মুসা। পরনে তার পর্যটকের পোশাক। মাথায় স্পোর্টস হ্যাট, কপালের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত নামানো।

পেছনের সিটে ব্ল্যাক বুল। অগাস্টিন ওকোচাকে সাথে নেয়ার কথা ছিল, কিন্তু সিদ্ধান্তটা শেষ পর্যন্ত বাতিল করেছে আহমদ মুসা। ওকোচা কিন্তু জেদ ধরেছিল। তার পিতাও বলেছিল, আফ্রিকার বোমাসা অঞ্চলের জন্যে ওকোচা উপকারী হতে পারে। ওকোচার মা এবং স্ত্রী দু'জনেই সায় দিয়েছে তার কথায়। কিন্তু আহমদ মুসা মিষ্টি হেসে বলেছে, ওকে সাথে নিয়ে যতখানি উপকৃত হবো, তার চেয়ে বেশী উপকৃত হবো যদি সে তার এই নতুন নীড়কে আরও সুন্দর করে তোলে।

ব্ল্যাক বুলের পরনে গাইডের পোশাক। তার হ্যাটের শীর্ষে এবং ইউনিফর্মের বুকে গাইডের মনোগ্রাম জ্বল জ্বল করছে। তার মুখ ভরা ফ্রেন্স কাট দাড়ী। ব্ল্যাক বুলকে চেনার কোন উপায় নেই। দাড়ী-গোঁফ, হ্যাট এবং পশ্চিমী ধাচের গাইডের পোশাক পরে সে সম্পূর্ণ নতুন মানুষ হয়ে গেছে।

ব্ল্যাক বুলের সিটের পেছনে তার প্রিয় কুকুর দু'টো। শান্ত বালকের মত পাশাপাশি তারা বসে আছে সামনে তাকিয়ে।

ব্ল্যাক বুলের অনুরোধেই আহমদ মুসা কুকুর দু'টিকে সাথে নিয়েছে। ব্ল্যাক বুল বলেছে, দু'টি কুকুর দু'জন মানুষের চেয়ে উপকারী হবে শুধু নয়, মানুষ পারে না এমন কিছু কাজ কুকুর দু'টি পারবে।

গাড়ি ছুটে চলেছে আহমদ মুসার।

সামনে যে শহরটি তার নাম এ্যাবং এমব্যাংগ। তীরের মত সোজা রাস্তা। আহমদ মুসার হাত দু'টি স্টেয়ারিং-এ স্থির হয়ে আছে। ঝড়ের গতিতে ছুটে চলেছে গাড়ি।

আহমদ মুসার চোখ দু'টি স্থির নিবন্ধ সামনে। হঠাৎ অলস মনের এক কোণে ডোনার অশ্রু সজল মুখটি ভেসে উঠল তার।

মনটা খারাপ হয়ে গেল আহমদ মুসার। আহমদ মুসা কি অবিচার করল ডোনার উপর। বিয়ের আসন থেকে তাকে সরে দাঁড়াতে হয়েছে।

কিন্তু আহমদ মুসার কোন দোষ নেই। সে তো ডোনার উপরই সব ছেড়ে দিয়েছিল। বলেছিল আহমদ মুসা, 'সব শুনেছ, এখন কি করা যায় বল'। বেদনার একটা হাসি ফুটে উঠেছিল ডোনার ঠোঁটে। বলেছিল, 'আমাকে বুঝি খুব দুর্বল মনে কর?'

'না, তা কেন?'

'তাহলে আমার সাথে আলোচনাকে সিদ্ধান্তের শর্ত বানিয়েছ কেন?'

'তোমার অধিকার আমি অস্বীকার করতে পারি?'

'এই সময়ে আমার অধিকার নিয়ে ভাবছ?'

'এই সময়েই বেশী ভাবা দরকার'।

'কোন সময়ের কথা বলছ?' ডোনার ঠোঁটে ফুটে উঠেছিল লজ্জাজড়িত হাসি।

'আমি বলব না'।

ডোনা মুখ নিচু করেছিল। লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল তার মুখ।

মুহূর্ত কয়েক মুখ না তুলে বলেছিল, 'বল কি বলবে?'

'তুমিই তো বলবে'।

'আমি জানি তুমি সবদিক না ভেবে সিদ্ধান্ত নাও না। সুতরাং আমার আলাদা কোন বক্তব্য নেই'।

'কথাটা তুমি খুব সহজে বলে ফেললে। আমার কিন্তু খুব খারাপ লাগছে'।

'আমার জন্যে, তাই না?'

‘সত্যটা আমি ভুলব কি করে যে, তুমি রাজকুমারী মারিয়া জোসেফাইন লুই এক শান্তির ও নিরুপদ্রব জীবন থেকে ছিটকে পড়েছ আগুনের মধ্যে!’ আহমদ মুসার কন্ঠ ভারি শোনাচ্ছিল।

ডোনা চকিতে আহমদ মুসার মুখের দিকে চোখ তুলে চেয়েছিল। তারপর চোখ নামিয়ে নিয়েছিল। ধীরে ধীরে তার দু’চোখ থেকে গড়িয়ে পড়েছিল দু’ফোটা অশ্রু। বলেছিল, ‘ডোনাকে না বুঝে এভাবেই বুঝি তুমি কষ্ট পাও! তোমাকে কেমন করে বুঝাব যে, তথাকথিত রাজকুমারীর মরুময় জীবন আজ কূল উপচানো সুখ আর প্রশান্তির বাগান। তুমি যাকে আগুন বলছ, তার মত দুনিয়া জোড়া আগুনও এ প্রশান্তির স্পর্শে নিভে যায়’।

‘ধন্যবাদ ডোনা। আমার সৌভাগ্যের জন্যে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি’।

‘কোন সৌভাগ্য?’

‘এমন তোমাকে পাওয়ার সৌভাগ্য’।

ডোনা কথা বলেনি। একরাশ লজ্জা এসে তার মুখ রাঙা করে দিয়েছিল। তার বেদনাক্লিষ্ট শুল্ক ঠোঁট ভরে উঠেছিল উজ্জ্বল এক টুকরো হাসিতে। বলেছিল একটু সময় নিয়ে, ‘তোমার সৌভাগ্যের চেয়ে আমার সৌভাগ্য অনেক বড়’।

বলে একটু দম নিয়েই আবার শুরু করল, ‘একটা কথা বলব, সাহস পাচ্ছি না’।

‘কি কথা?’

‘মেইলিগুলি আপা মানে আমিনা আপা এমনি এক অভিযানে তার ‘মা-চু’কে তোমার সাথে দিয়েছিলেন। আমার তো কেউ নেই। আমি তোমার সাথী হতে পারি না?’ কান্নায় বুজে এসেছিল ডোনার কন্ঠ।

‘ডোনা, তুমি বুঝি আমিনার কথা ভুলতে পার না?’ শান্ত, ভারি কন্ঠ ছিল আহমদ মুসার।

‘আমার তো বড় আপা। আপা কি ডোনার মত? তুমি কি তাকে ভুলতে পার?’

‘ডোনা, তুমি তাকে ভালোবেসে তার গোটা আসনটাই তুমি দখল করে নিয়েছ’।

‘না, ঠিক নয়। আমি তার পাশে একটু স্থান ভিক্ষা পেয়েছি মাত্র’। ডোনার চোখে ছিল অশ্রু, ঠোঁটে হাসি।

‘ডোনা, তুমি অনেক বড়। আবার বলছি আমি ভাগ্যবান’।

ডোনা চোখ মুছে বলেছিল, ‘থাক ওসব কথা। আমার কথার জবাব তুমি দাওনি’।

আহমদ মুসা গম্ভীর হয়ে উঠেছিল। বলেছিল, ‘আমার সাথে দেবার তোমার ‘কেউ’ নেই তা ঠিক নয়’।

‘কে আছে?’ চোখ ছানাবড়া করে বলল ডোনা।

‘কেন আল্লাহ। আল্লাহ কি যথেষ্ট নয়?’

শোনার সঙ্গে সঙ্গে ডোনা ‘আল হামদুলিল্লাহ’ বলে দু’হাতে মুখ ঢেকেছিল আনন্দের উচ্ছ্বাসটা ঢেকে ফেলার জন্যে। তারপর মুখের উপর থেকে হাত সরিয়ে উজ্জ্বল চোখ দু’টি আহমদ মুসার দিকে তুলে ধরে বলেছিল, ‘ধন্যবাদ আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যে। আমার তরফ থেকে আল্লাহ তোমার নেগাহবান’।

‘আলহামদুলিল্লাহ। দোয়া করো’।

বলে আহমদ মুসা একটু থেমেছিল। বলেছিল তারপর, ‘তাহলে আসি। ওঁরা অপেক্ষা করছে’।

‘এসো’। বলেছিল ডোনা ম্লান হেসে।

কিন্তু বিদায়ের সময় কেঁদেছিল ডোনা। চোখের অশ্রু আড়াল করার চেষ্টা করেও সে পারেনি।

ডোনার সেই অশ্রু সিক্ত মুখটাই এখন ভেসে উঠছে আহমদ মুসার মানস-চোখে।

আহমদ মুসার চোখের কোণটাও সিক্ত হয়ে উঠেছিল। আহমদ মুসা স্টেয়ারিং থেকে বাম হাতটা সরিয়ে সিটের উপর থেকে রুমালটা তুলে নিয়ে চোখ ভালো করে মুছে নিল।

গাড়ি ছুটে চলছে তীরের বেগে।

'আবদুল্লাহ (ব্ল্যাক বুল) তোমার বাড়ি বারবারেতি থেকে কতদুর?' পেছনে ব্ল্যাক বুলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'যা দেখেছি ম্যাপে, বাস্তব কিছু জ্ঞান নেই। হবে হয়তো একশ' দেড়শ' কিলোমিটার'।

'আমরা তো বোমাসায় যাব ঐ দিক দিয়েই'।

'খুব মজার হবে। আমার আবাল্য একটা সাধ এতে পূরণ হবে'।

'কিন্তু এলাকার মাটি, গাছ ইত্যাদি ছাড়া আর কি দেখতে পাবে?'

'তবু গ্রামটাকে চোখ ভরে দেখব।'

'আল্লাহ তোমার আশা পূরণ করুক।'

'আমরা যখন বোমাসাতেই যাচ্ছি, তখন বাববারেতি না গিয়ে আমরা সামনে কাদেলি হয়ে স্টিম বোটে সংঘ নদী দিয়ে বোমাসা যেতে পারতাম।'

'তা পারতাম, কিন্তু ঘটনার কেন্দ্র বাবরারেতি অবশ্যয় যাওয়া প্রয়োজন। পণবন্দীদের ওরা কোথায় রাখতে পারে তা জানার সব রকম চেষ্টা আমাদের করা উচিত।'

'কোথায় রাখতে পারে?'

'বলা মুস্কিল। কিন্তু আমি ভাবছি আমার আত্নসমর্পণের স্থান ওরা বোমাসায় নির্ধারণ করল কেন?'

'দুর্গম বলেই হয়তো। সভ্যতার আলো তেকে অনেক দূরে ঐ এলাকা। রেল, বাস ইত্যাদি ঐ এলাকার মানুষ চোখেই দেখেনি এখনও।'

'কিন্তু একা একজন মানুষকে ধরার জন্যে তাকে দুর্গম এলাকায় নিয়ে যাবার প্রয়োজন কি?'

'আমি জানি না জনাব। ব্যারটা অস্বাভাবিক বটে।'

'অস্বাভাবিক যখন, তখন এর তাতপর্য নিয়ে বাবা উচিত।

কথা শেষ করেই ডানে তাকাল আহমদ মুসা। সামনেই ডানে বাতেরী শহর।

শহরের একেবারে উত্তর পাশ ঘেঁষে হাইওয়েটি। আর সীমান্তের কাছাকাছি ক্যামেরুনের শেষ শহর বারতুয়া অতিক্রম করেছে হাইওয়েটি শহরের দক্ষিণ পাশ ঘেঁষে।

আহমদ মুসার গাড়ি বারতুয়া পার হওয়ার পর দু'কিলোমিটারের মাথায় একটা বিপত্তিতে পড়ল।

আহমদ মুসার গাড়ির সামনে প্রাইভেট পরবহান কোম্পানীর একটা ট্যাক্সি চলছিল। হঠাত ট্যাক্সিটি তার পথ চেড়ে বেঁকে গিয়ে আহমদ মুসার গাড়ির সামনে এসে পড়ল।

ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটে গেল যে আহমদ মুসা তার গাড়ি পুরো নিয়ন্ত্রণে আনার সুযোগ পেল না। আহমদ মুসার গাড়ির মাথা সোজা গিয়ে আঘাত করল বেঁকে আসা ট্যাক্সির সামনের দরজায় কৌণিকভাবে।

ট্যাক্সিটি কিছুটা ছিটকে পড়ে থেমে গেল। আহমদ মুসার গাড়িও থেমে গিয়েছিল। আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে ছুটল ট্যাক্সিটির দিকে।

ট্যাক্সির সামনের দরজার দুমড়ে গিয়ে কিচুটা ভেতরের দিকে বসে গিয়েছিল।

ট্যাক্সিটিতে ছিল একজন আরোহী এবং একজন ড্রাইভার।

আরোহী মাঝ বয়সী একজন কৃষ্ণাঙ্গ। ড্রাইভারও তাই। আরোহীর মাথার এক পাশের অল্প্ একটু জায়গা থেঁতলে গেছে। আর ড্রাইভারের কপাল অনেকখানি কেটে গেছে বিয়ারিং হুইলে ধাক্কা খেয়ে।

দু'জনেই গাড়ি থকে বের করল আহমদ মুসা।

আরোহীটির মাথার থেঁতলানো জায়গা এবং ড্রাইভারের কাটা কাপাল দিয়ে রক্ত ঝরছিল। ব্ল্যাক বুল ফাস্ট এইড বক্স সহই গাড়ি থেকে নেমেছিল।

আহমদ মুসা তাকে ধন্যবাদ দিয়ে ওদের আহত স্থান ব্যান্ডেজ করে দিল। ফাস্ট এইডের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে নিতে আহমদ মুসা বলল, 'শেষ মুহূর্তে আমি আমার গাড়িটি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারিনি, আমি দু:খিত।'

'কি বলেন আপনি। আপনাকেই আমাদের হাজার বার ধন্যবাদ দেয়া উচিত। আপনি গাড়ি যতটুকু সামলিয়ে ছিলেন, ততটুকু না সামলালে গাড়ি চিড়া

চেপ্টা হয়ে যেত। আপনি আমাদের বাঁচিয়েছেন।' বলল ড্রাইভার লোকটি বিনয়ের সাথে।

'ঠিক বলেছ ড্রাইভার। কিন্তু এমন হলো কেন? গাড়িতে কি তোমার ত্রুটি আছে?' বলল আরোহীটি।

'না কোন ত্রুটি নেই। হঠাত ব্রেকফেল এমন কোন দিনই হয়নি।'

'আপনারা কোথায় যাচ্ছিলেন?' বলল আহমদ মুসা।

আরোহীটিকে ইংগিত করে ড্রাইভার বলল, 'উনি যাবেন বারবারেতি। আমি সীমান্ত পর্যন্ত ওকেঁ পৌছে দিচ্ছিলাম।'

বারবারেতির নাম মুনে চমকে উঠল আহমদমুসা। অজান্তেই তার দৃষ্টি আরোহীটির উপর গিয়ে পড়ল। মনটা আহমদ মুসার খুশীই হলো্ অন্তত বারবারেতির অবস্থা কিছুটা জানা যেতে পারে তার কাছ থেকে। বলর, আহমদমুসা,' আপনাদের তো ভীষণ অসুবিধা হলো।'

'আমার কিছু ক্ষতি হলো্ কিন্তু অসুবিধা হলো আমার আরোহীর। আমি কোনভাবে ফিরতে চাই্ উনি সীমান্তে পৌছবেন কি করে। এ সময় ভাড়া গাড়িও মিলবে না্ আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?'

'আমরা বারবারেতি যাচ্ছি। উনি ইচ্ছা করলে আমাদের সাথে যেতে পারেন।' আহমদ মুসা বলল।

'আপনি এ সাহায্য করবেন! কি যে উপকার হবে আমার্ ঈশ্বর আপনাকে কৃপা করুক।' বলল আরোহী লোকটি আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে।

'ধন্যবাদ।' বলল আহমদ মুসা্ ট্যাক্সির ড্রাইভার উঠে গিয়ে গাড়ির ইঞ্জিন পরীক্ষা করে এসে বলল, 'সব ঠিক আছে। এখন অনুমতি দিলে আমি যেতে পারি।'

'ট্যাক্সিটা কার?' আহমদ মুসা বলল।

'প্রাইভেট কোম্পানীর।'

'আপনার শেয়ার আছে তাতে?'

'নেই।'

গাড়ি মেরামতের ব্যয় কে বহন করবে?'

‘অর্ধেক বহন করতে হবে আমাকে।’

‘কষ্ঠ হবে না আপনার?’

‘এ প্রশ্ন করছেন কেন?’

‘আমার গাড়ির ধাক্কায় আপনার গাড়ির ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতি মেরামতে আমি অংশ নিতে চাই’

বলে আহমদ মুসা পকেট তেকে এক হাজার ফ্রাংকের পাঁচটি নোট বের করে ড্রাইভারের দিকে তুলে ধরল।

ড্রাইভার টাকা নিতে দ্বিধা করে বলল, ‘আপনি বিদেশী পর্যটক, আমাদের মেহমান। এ টাকা নেয়া অন্যায় হবে।’

আহমদ মুসা টাকাটাতার পকেটে গুজেঁ দিয়ে বলল, ‘গাড়ি অন্যের না হলে এ টাকা আপনাকে দিতাম না’

কথা না বলে কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে থাকল ড্রাইভার যখন মাথা তুলল তার চোখ দু’টি ছল ছল করছে। বলল, ‘ আমার মা জটিল অসুখে ভুগছেন। তার চিকিতসার জন্যে কিছু টাকা জমিয়েছি। সেই টাকা দিয়ে গাড়ি ঠিক করব ভেবেছিলাম। আপনার টাকা মা’র চিকিতসা সম্ভব করে তুলবে। প্রভু স্রষ্টা আপনার মঙ্গল করুন।’

‘ধন্যবাদ। আল্লাহ আপনার মাকে সুস্থ করে তুলুক।’ বলে আহমদ মুসা নিজের গাড়ির দিকে এগুলো সেই আরোহী লোকটাকে তার সাথে আসতে বেল।

আহমদ মুসা আরোহীটিকে তার পাশের সিটে বসাল।

‘বারবারেতি বাড়ি বললেন? নাম কি আপনার?’বলল আহমদ মুসা।

‘নাম ডেনিয়েল। বারবারেতি থাকি।’ একটু সময় নিয়ে উত্তর দিল।

আহমদ মুসা চকিতে তার মুখের দিকে একবার তাকাল।

আহমদ মুসা আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস না করার আগেই সে প্রশ্ন করল, ‘ আপনি তো পর্যটক। বারবারেতি কি আপনার কাছে আকর্ষনীয়?’

পর্যটক হলে প্রশ্নটার উত্তর কিছু না ভেবেই দিতে পারত আহমদ মুসা। কিন্তু আহমদ মুসা তা নয়। সুতরাং মুহূর্ত কয়েক ভেবে নিয়ে সে বলল, ‘নতুন দেশ

নতুন স্থান দেখার মধ্যেই আমার আগ্রহ। আফ্রিকার প্রকৃতিই আমাকে আকর্ষণ করে বেশী।'

'আফ্রিকার সত্যিকার প্রকৃতি দেখতে হলে যেতে হবে বোমাসা এবং আরও দক্ষিণে।'

'আমি সব চিনি না। প্রথম সফর তো!'

'বারবারেতি খারাপ নয়। তবে আধুনিক হয়ে উঠছে তো। বাইরের পর্যটকদের কাছে আকর্ষণ হারচ্ছে। তার উপর ..'

কথা শেষ না করেই থেমে গেল ডেনিয়েল নামের লোকটি।

'তার উপর কি?' একটু মুখ ঘুরিয়ে তার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'এই সেদিন বারবারেতিতে সাংঘাতিক দুর্ঘটনা ঘটে গেল তো। বাইরের অনেকেই সেখানে আসতে দ্বিধা করছে।'

আহমদ মুসা মনোযোগী হলো ডেনিয়েলের প্রতি। কিন্তু তার দিকে না তাকিয়ে নিরাসক্তভাবে জিজ্ঞেস করল, 'দ্বিধা করছেন কেন? কোন ভয় আচে? দুর্ঘটনা সম্পর্কে আমি তেমন কিছুই জানিনা।'

'উল্লেখযোগ্য কিছু বিদেশীসহ অনেক লোক মারা গেছে দুর্ঘটনায়। বাইরের চাপ আছে। তদন্ত চলছে। একটা আতংক আর কি।'

'তদন্ত চলছে। আবার বাইরের চাপ আছে। তাহলে তো বড় ঘটনা্ আসল ব্যাপার কি বলুন তো?'

'আমরা সকলে একে একটা বড় দুর্ঘটনা বলেই জানি। অবশ্য কেউ কেউ বলে ওটা একটা লাগানো আগুন। আবার অনেকে মনে করেন, সম্মেলনের উদ্যোক্তারা কোন কারণে কিচু বিস্ফোরক হয়তো ভেতরে রেখেছিলেন। তা থেকেই আত্নঘাতি ঘটনা ঘটেছে।'

'সম্মেলন স্থানে আগুন লাগাতে যাবে, এমন কোন শত্রু কি সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের ছিল?'

‘নিশ্চিত করে কিছুই বলা যায় না। তবে মধ্য আফ্রিকার সম্ভাবনাময় এই অঞ্চলে মুসলমানদের নতুন শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা অনেকেই ভালো চোখে নাও দেখতে পারে।’

‘অনেকে বলতে কাদের বুঝাচ্ছেন? সাধারণ জনগণ?

কাউকেই নির্দিষ্ট আমি করিনি। আমার ধারণা বলেছি মাত্র।

আহমদ মুসার মনে হলো ডেনিয়েল লোকটা জানে অনেক কিছু। কথার ধরনে তাকে খুব চালাক বলে মনে হলো আহমদ মুসার। কে লোকটি? লোকটির চেহারায় ভদ্রতার কাটিং আছে। তার আড়ালে একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, কর্কশ একটা রূপ তার আছে। আর তার ভাষায় আঞ্চলিক টান নেই। অর্থাৎ বাঁটু ভাষা বললেও বাঁটু সে নয়।

মধ্যে আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রের কোন এলাকায় আপনার বাড়ি? জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা

আমার বাড়ি তানজানিয়ায়। তবে এখানে বহুদিন থেকেই। আবার এসেছি।

কেন জানি হটাত আহমদ মুসার মনে পডল যে বারবারেতির বিস্ফোরণ সম্পর্কিত ব্ল্যাক ক্রসের বিজ্ঞপ্তিটির একটা ঠিকানা স্মরণ করতে পারলো না।

সীমান্তের চেক পোষ্ট এসে গেছে। গাড়ি থামাতে হলো আহমদ মুসাকে। খুশী হলো আহামদ মুসা সীমান্তের চেক পোষ্টে তেমন কোন ঝক্কি ঝামেলা নেই, শুধু পাসপোর্ট দেখে তাকে একটা ভিসায় সিল দিয়েই খালাস। তাও আবার গাড়ি থেকে নামতে হয় না। গাড়িতে এসে পুলিশ পাসপোর্ট চেক করে।

সীমান্ত অতিক্রমের পর আবার আগিয়ে চলল গাড়ি সোজা পূর্ব দিকে বারবারেতি লক্ক্যে।

সীমান্ত থেকে ২৫ কিলো মিটার দূরে বারবারেতি পথে আরেকটি ছোত্র শহর। নাম গাম্বুলা।

আহমদ মুসার গাড়ি। গাম্বুলা শহর অতিক্রম করছিল। শহরের ধক্ষিন পাশ ঘেসে রাস্তি, আর রাস্তার দক্ষিণ পাশ দিয়ে একটা ছোট নদী। শহর অতিক্রম করার আগেই ছোট নদীটি বাক নিয়ে দক্ষিণ দিকে চলে গেছে। তার সাতে

বারবারেতির হাইওয়ে থেকে একটা সডক বের হয়ে ছোট নদীটির তীর বরাবর দক্ষিণে চলে গেছে।

বেলা তখন আডাইটার মত।

ছোট শহর তার উপর অফিস ও স্কুল – কলেজ ছুটির পরবর্তী ভাটির সময়। রাস্তা ঘাটে লোকজন। গাডি ঘোডা খুবই কম।

রাস্তাটিও তীরের মত সোজা

দু হাত স্তেয়ারিং এ রেখে দু টি চোখ সামনে ছুডে দিয়ে বলা যায় সিটে গা এলিয়ে দিয়েছিল একটা জীপ গাডি।

সামনেই চলছিল একটা জীপ গাডি।

সামনেই নদীটি দক্ষিণ দিকে বাক নিয়েছে এবং হাইওয়ে থেকে সেই সডকটিও বেরিয়ে গেছে দক্ষিণের দিকে।

জিপটির পেছনের দক্ষিন দিকের রেড লাইট জ্বলে উঠল। সিগনাল দিতে শুরু করল। জিপটা দক্ষিনের সডকে নেমে যাবে জিপটি টার্ন নিতে গিয়ে কয়েকবার হর্ন দিল।

হর্ন শুনে চমকে উঠল আহমদ মুসা।

জিপটি ব্ল্যাক ক্রস এর কোডে হর্ন দিচ্ছে কেন? জিপটি তাহলে কি ব্ল্যাক ক্রস এর।

দ্রত চিন্তা করছিল আহমদ মুসা।

ব্ল্যাক ক্রসকে এত কাছে পেয়ে তেদের তো সে ছেডে দিতে পারে না, দক্ষিণ দিকেই। ব্ল্যাক ক্রসের গাডি কোথায় যাচ্ছে? বোমাসা এখান থেকে দক্ষিণ দিকেই, ব্ল্যাক ক্রস এর গাডি আনুসরন করে সে ওদের কোন ঘাটি বা ঠিকানা অথবা ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে মুসলিম পনবন্দিদেরও খোজ সে পেয়ে যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল আহমদ মুসা।

ড্যানিয়েলকে উদ্ধেশ্য করে বলল মিঃ ডেনিয়েল এখানে থেকে বারবারেতি যাবার ট্রান্সপোর্ট পাওয়ায় কোন আসুবিধা আছে?

না এ কথা কেন বলছেন?

আমরা এখানে থেকে একটু বাম দিকে যেতে চাই, আপনার আসুবিধা হয় কিনা তাই বললাম।

আমার কোন আসুবিধা হবে না। কিন্তু আপনারা কি বারবারেতি যাচ্ছেন না?

আপাতত নয়।

আহমদ মুসা লক্ষ্য করলে দেখতে পেত। ডেনিয়েল নামক লোকটির চোখে মুখে মুহূর্তের জন্যে বিস্ময় ফুটে উঠছে, তারপরেই সেখানে বিস্ময়ের বদলে অর্থপূর্ণ এক আনুসন্ধান ভাব ফুটে উঠল। যেন এই প্রথম বারের মত সে গভীর দৃষ্টতে পর্যবেক্ষণ করছে আহমদ মুসাকে। ধীরে ধীরে সে বলল এখানেই তো আপনাদের বামে ঘুরতে হবে, মোডটার উপর আমাকে নামিয়ে দিন।

আমরা দুঃখিত মিঃ ডেনিয়াল। বলল আহমদ মুসা।

না ধন্যবাদ। পর্যটকদের প্রোগ্রাম ঠিক থাকে না আমি জানি মিঃ ডেনিয়ালের কথাগুলো যত সরল তার মুখের হাসি ততটা সরল নয়।

মোডে নেমে গেল মি;ডেনিয়াল।

আহমদ মুসার গাডি ছুটল নদীর তীর বরাবর দক্ষিণ গামী সডক ধরে ব্ল্যাক ক্রস এর জীপটির পিছু পিছু।

গাডি থেকে নেমেই ডেনিয়াল চারদিকে চাইল ট্যাক্সির সন্ধানে।

ডেনিয়ালের মাথায় চিন্তাটা তখন গুছিয়ে আসেছে। ব্ল্যাক ক্রস এর গাডির হর্ন সেও শুনেছে। সে নিশ্চিত এই হর্ন শুনেই পর্যটক তার গন্তব্য পাল্টেছে এবং ব্ল্যাক ক্রস এর জীপটাকে সে আনুসরন করছে।

কিন্তু কেন? কে এই পর্যটক? কেন ব্ল্যাক ক্রস এর গাডি সে আনুসরন করল। ব্ল্যাক ক্রস এর কোড সে জানল কি করে?

ছোট শহর গাডি পাওয়া মুস্কিল।

একটু ভাবল ডেনিয়েল। তারপর সে অয়্যারলেস ট্রান্সমিটার বের করল পকেট থেকে। ছোট সিগারেট লাইটারের মত।

ডেনিয়েল জানে না ব্ল্যাক ক্রস এর জিপে কে যাচ্ছে। তার কাছে অয়্যারলেস আছে কিনা। তবু ডেনিয়েল ব্ল্যাক ক্রস এর মাস্টের চ্যানেলে মেসেজ

থ্রো করল। বলল ছোট কাদেলীয় সডকে ব্ল্যাক ক্রস এর জীপটিকে একজন পর্যটক আনুসরন করছে।

ব্ল্যাক ক্রস এর অয়্যারলেস নেটওয়ার্কের মাস্টার চ্যানেল একটা গোপন ও জরুরী লাইন। চ্যানেলে ব্ল্যাক ক্রস এর সব পয়েন্টে মেসেজ পৌছানো যায়।

মেসেজ পাঠানোর পর মুহূর্তেই জবাব পেয়ে গেল ডেনিয়েল অয়্যারলেসে ভেসে আশা কণ্ঠ বলল ধন্যবাদ মেসেজের জন্য আমি নজর রাখছি। কিন্তু পর্যটকের মতলব কি?

আমি জানি না তবে লোকটা খুব সহজ হবে না। আপনার সাথে কে আছে?

স্ত্রী এবং ছেলে। আমি যাচ্ছি সলো। চিন্তা করো না লডাই করার মত অস্ত্র আমার আছে। গাডি খুজছি আসছি আমি।

কথা শেষ করতেই গাডি পেয়ে গেল ডানিয়েল। গাডি তার ছুটল আহমদ মুসার গাডির পিছু পিছু।

সাম্নের গাডি একই গতিতে চলছে কোথাও দাডায়নি, গতি কমবেশিও হয়নি।

আহমদ মুসা ভাবল ব্ল্যাক ক্রস এর গাডিটি পেছনে সম্ভবত চোখ রাখেনি। কেউ আনুসরন করছে সন্দেহ নিরসনের জন্যে কিছু পরিক্ষা নীরিক্ষার চেষ্টা করে। কিন্তু সামনের গাডিটি তেমন কিছুই করেনি।

আহমদ মুসা খুশী হলো। ওকে সন্দেহ মুক্ত রাখলে ওদের ঠিকানায় পৌছা সহজ হবে।

আহমদ মুসা সামনে মানচিত্রের দিকে চেয়ে দেখল ছোট কাদেলী নদী সংঘ নদীর কাছাকাছি গিয়ে বড কাদেলী নদীতে মিশেছে। তারপর পডেছে গিয়ে সংঘ নদীতে, ঠিক সেই ভাবে রাস্তাটিও গিয়ে পডেছে সংঘ নদীর তীর বরাবর প্রলম্বিত সডক।

সংঘ নদীতে বরাবর দক্ষিনে আগিয়ে সডকটি শেষ হয়েছে ছোট গ্রাম বন্দর সলোতে।

তোমার দাদার গ্রামের নাম জান কি? ব্ল্যাক বুলকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা

সলো। বলল ব্ল্যাক বুল।

আমরা তো ধীরে ধীরে সলো এর দিকেই যাচ্ছি দেখছি।

তাই মনে হচ্ছে।

কি জানি বারবারেতি যাওয়া বোধ হয় হলো না।

সলো র দিকে যাচ্ছি বলে আমি কিন্তু খুব খুশী

সেই সলো কি আছে।

সেই মাটি আছে। সেই সংঘ আছে অনেক পুরানো গাছও আছে হয়তো সেদিনের সাক্ষী আছে।

তা আছে।

আহমদ মুসা আর কোন কথা না বলে সামনের দিকটা একবার দেখে নিয়ে ড্যাস বোর্ডের উপর রাখা মানচিত্রের দিকে আবার মনোযোগ দিল।

শুরুর দিকে রাস্তা তীরের মত সোজা ছিল। কিন্তু তার পরেই নদীর সমান্তরালে আকা বাকা হয়ে আগিয়ে গেছে রাস্তাটি। দু ধারেই ঘন বন কাছেই নদী কিন্তু দেখা যায় না।

খুবই ভালো লাগছে নিঝুম পরিবেসে বন ছায়া ঘেরা পথে ড্রাইভ করতে। আহমদ মুসা ভাবল যতই দক্ষিণে আগুনো যাবে বন জংগলের নিবিডতা ততই বাডবে, আফ্রিকার বিখ্যাত রেইন ফরেস্ট এলাকার চিহ এখনই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, কঙ্গো নদী ও তার অসংখ্য শাখা ও উপনদী স্নাত কঙ্গোর মধ্যে দক্ষিণ অঞ্চলটি পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্ভেদ্য বনাঞ্চল, বোমাসা থেকে এই এলাকার শুরু।

ড্রাইভ করতে ভাল লাগলেও মুস্কিল হয়েছে সামনের গাড়িটাকে চোখে রাখার ব্যাপারটা। আঁকা বাঁকা এবং জংগলের দেয়ালে ঘেরা রাস্তায় অধিকাংশ সময়ই গাড়িটা চোখের আড়ালে থাকছে, যদিও দূরত্ব এখন দু'শ গজের বেশী নেই।

এ ধরনের রাস্তায় শত্রুর অনুসরণ আহমদ মুসার একদম নতুন অভিজ্ঞতা। সামনে-পেছনে দু'দিকটাই তার কাছে এখন অরক্ষিত মনে হচ্ছে। গাড়ির রিয়ারভিউ এখন আর কাজ দিচ্ছে না, সামনেও বনের দেয়ালে চোখ ধাক্কা খাচ্ছে। আহমদ মুসার মনে হচ্ছে, পরিস্থিতির উপর তার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, এক অমোঘ ব্যবস্থা যেন তাকে এগিয়ে নিচ্ছে, সে চলছে ঠিক অন্ধের মতই।

অন্ধত্ব ঘুচে গেল, যখন আহমদ মুসা তার নাকের ডগার উপর দেখল, কাদেলী সড়কটি সামনেই বারবারেতি-সলো সড়কের সাথে গিয়ে মিশেছে এবং মোড়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে দু'টি জীপ এবং তাতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চারজন লোক। তাদের হাতে রিভলবার।

বিস্ময় কাটিয়ে উঠবার আগেই পেছনে শব্দ শুনে মুখ ফিরাল। দেখল, একটি গাড়ি পেছন থেকে প্রায় পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

বিস্মিত হলো আহমদ মুসা, গাড়িটার ড্রাইভিং সিটে ডেনিয়েল। তার হাতেও রিভলবার।

সবই বুঝল আহমদ মুসা। সে ফাঁদে পড়ে গেছে। কিন্তু কি করে? বুঝা যাচ্ছে, ডেনিয়েল ব্ল্যাক ক্রসের লোক। এবং এরা সবাই তাই। কিন্তু আহমদ মুসাকে চিনেছে কি ওরা? ডেনিয়েলের সাথে কথা বলে তো তা মনে হয়নি!

আহমদ মুসা কিছু চিন্তা করার আগেই ডেনিয়েল রিভলবার বাগিয়ে জীপ থেকে নেমে এল।

আহমদ মুসার কাছে এসে রিভলবার বাগিয়ে বলল, 'মিঃ পর্যটক চলুন, ওরা আপনাকে স্বাগত জানাবার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

আহমদ মুসা গাড়ি থেকে নামল।

ব্লাক বুলও নামতে যাচ্ছিল। ডেনিয়েল ধমক দিয়ে বলল, 'চুপচাপ বসে থাক গাইডের বাচ্চা। আসলটাকে দেখি, তারপর দরকার হলে...

বলে রিভলবার নাচিয়ে আবার বলল, 'চলুন পর্যটক সাহেব।'

আহমদ মুসা হাঁটতে শুরু করল। তার দু'টি হাত জ্যাকেটের দুই পকেটে।

রিভলবার বাগিয়ে পেছনে পেছনে হাঁটছিল ডেনিয়েল।

দু'টি গাড়ি দাঁড়িয়েছিল সড়কের ওপ্রান্ত অর্থাৎ পুব প্রান্তে ঘেঁসে। গাড়িতে ঠেস দেয়ে ওরা চারজন দাঁড়িয়েছিল নির্বিকভাবে।

ওদের চার গজের মধ্যে গিয়ে আহমদ মুসা দাঁড়িয়ে পড়ল।

চারজনের একজন বলল, 'মিঃ ডেনিয়েল এঁর পকেটগুলো দেখুন।'

ডেনিয়েল পেছন থেকেই ডান হাতে রিভলবার ধরে রেখে বাম হাত দিয়ে জ্যাকেট এবং প্যান্টের পকেট সার্চ করল। জ্যাকেটের পকেটে একটা রিভলবার পেল মাত্র।

গাড়িতে ঠেস দেয়া যে লোকটি পকেট সার্চের নির্দেশ দিয়েছিল, সেই আবার বলে উঠল, 'কে তুমি? আমাদের পিছু নিয়েছিলে কেন?'

'আমি ব্ল্যাক-ক্রস-এর সন্ধান করছি।'

'ব্ল্যাক-ক্রস-এর কোড তুমি জান কি কওে?'

'ব্ল্যাক-ক্রস আমার পুরনো বন্ধু।' আহমদ মুসার ঠেটে ফুটে উঠল এক টুকরো হাসি।

'পাঁচটা রিভলবারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাসছ, জোক করছ? কে তুমি?'

'ব্ল্যাক-ক্রস-এর পুরানো বন্ধু।'

কথা বলছিল যে লোকটি সে আহমদ মুসার দিকে রিভলবার তাক করে বলল, 'তোমার সাথে রসিকতা করার জন্যে আমরা এখানে বসে নেই। কে তুমি, কেন আমাদের পিছু নিয়েছিলে?'

'একজন এশিয়ান আমি। ফ্রান্স থেকে আমি এসেছি। দেখতেই পাচ্ছেন আমি পর্যটক।'

পর্যটক হিসেবে তুমি আমাদের অনুসরণ করনি। কে তুমি? কেন তুমি ব্ল্যাক ক্রস-এর সন্ধান করছ?

'পিয়েরে পল আমার পুরানো বন্ধু কিনা।'

ওরা চারজন একে অপরের দিকে তাকাল। তাদের চোখ নাচল। সম্ভবত ক্রোধ এবং বিস্ময়ে। বিস্ময়ের কারণ তাদের মুঠোয় আসা অপরিচিত একজন লোকের ঔদ্ধত্য। আর ক্রোধের কারণ নিহত পিয়েরে পলকে লোকটি বিদ্রুপ করছে।

কথা বলছিল যে লোকটি, সে তার সাথের রিভলবারধারী একজনকে লক্ষ করে বলল, ‘মুখটা ওর ভেঙে দাও। বুঝিয়ে দাও আমরা রসালাপ করতে আসিনি।’

হুকুম পেয়ে লোকটা ছুটে গেল আহমদ মুসার দিকে। রিভলবারের বাঁট দিয়ে আহমদ মুসার মুখে, ঘাড়ে, মাথায় আঘাত করল।

আহমদ মুসার কপাল ও মুখের কয়েক জায়গা ফেটে সেখান থেকে রক্ত গড়াতে লাগল।

আহমদ মুসা দাঁড়িয়েছিল পাথরের মত। ভাবলেশহীন তার মুখ। কিন্তু সে এই ধরনের আক্রমন আশা করেনি। আহমদ মুসা তার কথার দ্বারা ব্ল্যাক ক্রসের লোকদের রাগিয়ে দিতে চেয়েছিল। রাগলেই মানুষ ভুল করে।

‘এতক্ষণ তোমার মাথার খুলি উড়ে যেত, কিন্তু তা আমরা কারনি। তোমাকে জানতে হবে আমাদের। আমরা এক এশিয়ানকে খুঁজছি।’ রক্তাক্ত আহমদ মুসার দিকে চেয়ে ক্রুর হেসে বলল সেই লোকটি।

সে থামতেই যে লোকটি আহমদ মুসাকে আঘাত করেছিল, সে চিৎকার করে বলল, ‘বল এবার, তুমি কে? দেরী করলে এখন প্রথম তোমার নাক ভাঙব, তারপর হাত-পা ভাঙা শুরু করব।’

‘কষ্ট করে বলার দরকার নেই। ইতিমধ্যেই প্রমাণ করেছ এসব তোমরা পার।’

‘আবার বিদ্রুপ।’ বলে আহমদ মুসার সামনে দাঁড়ানো রিভলবারধারী লোকটা আবার তার রিভলবারের বাঁট তুলল আহমদ মুসার নাক লক্ষ্যে।

আহমদ মুসা এবার এ্যাকশনে যাবার সিদ্ধান্ত নিল। সে তার মাথাটা বিদ্যুৎ গতিতে সরিয়ে নিয়ে ডান হাত দিয়ে রিভলবার কেড়ে নিয়ে লোকটার সামনে ঝুঁকে আসা তলপেট লক্ষে প্রচন্ড একটা কিক চালাল। এবং তার সাথে সাথে চোখের পলকে হাতের রিভলবারটা পেছনের দিকে ঘুরিয়ে গুলী করল পেছনে দাঁড়ানো ডেনিয়েলকে লক্ষ্য করে।

ঘটনার আকস্মিকতা হকটকিয়ে দিয়েছিল ডেনিয়েলকে। সি কিছু সিদ্ধান্ত নেবার আগেই গুলী খেয়ে পড়ে গেল রাস্তার উপর।

গুলী করেই আহমদ মুসা তার রিভলবার সামনে ঘুরিয়ে নিল।

সামনের লাথি খাওয়া লোকটি তখন টলতে সটলতে পড়ে যাচ্ছিল।

আহমদ মুসা তার মাথার উপর দিয়ে দুইটি গুলী ছুড়ল পর পর। গুলী করেই নিজের দেহটা ছুড়ে দিল রাস্তার উপর। দ্বিতীয় গাড়ির কাছে দাঁড়ানো তৃতীয় লোকটি রিভলবার তুলেছিল গুলী করার জন্যে।

তলপেটে আহমদ মুসার লাথি খাওয়া লোকটা পড়ে যাবার মুখেও উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিল।

তৃতীয় লোকটির গুলী এসে তার মাথায় বিদ্ধ করল পেছন দিক থেকে।

আহমদ মুসা মাটিতে পড়েই তার রিভলবার তৃতীয় লোকটিকে তাক করেছিল। কিন্তু তার গুলী গিয়ে বিদ্ধ করল তৃতীয় লোকটির রিভলবার ধরা হাতে। রিভলবার পড়ে গিয়েছিল তার হাত থেকে।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

তৃতীয় লোকটি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল হাত থেকে পড়ে যাওয়া রিভলবারটি তুলে নেয়ার জন্যে। কিন্তু সে রিভলবার তুলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবার আগেই আহমদ মুসার রিভলবার তার লক্ষ্যে উঠে গিয়েছিল। আহমদ মুসার তর্জনি রিভলবারের ট্রিগারে চেপে বসছিল।

ঠিক এ সময় গাড়ির আড়াল থেকে একটি শিশু ছুটে তৃতীয় লোকটির সামনে এসে তাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে কান্না জড়িত কন্ঠে চিৎকার করে উঠল, ‘আমার আব্বুকে মের না।’

আরেকটা মহিলাও গাড়ির ওপাশে দাঁড়িয়েছিল। তার চোখে-মুখে মৃত্যুর আতংক।

শিশুটির বয়স পাঁচ ছয় বছর হবে।

শিশুটির আকুল আর্তি এবং ব্যাকুল চোখের দিকে তাকিয়ে আহমদ মসার হৃদয় কেঁপে উঠেছিল এক বেদনায়। তার তর্জনি সরে এসেছিল ট্রিগার থেকে। নেমে যাচ্ছিল রিভলবার সমেত তার হাত।

শিশুর আড়ালে দাঁড়ানো তৃতীয় লোকটি রিভলবার হতে ততক্ষণে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই সে গুলী করল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে।

ত্বরিৎ এক পাশে সরে মাথা ও বুক বাঁচাতে পালেও হাত বাঁচাতে পাড়ল না। গুলী এসে আহমদ মুসার একটা আঙুলসহ হাতের রিভলবারে বিদ্ধ হলো। হাত থেকে পড়ে গেল রিভলবার। আহমদ মুসা তার রিভলবার তুলে নিতে যাচ্ছিল।

শিশুর আড়ালে দাঁড়ানো সেই তৃতীয় লোকটি চিৎকার করে উঠল, 'রিভলবার তুলে নিতে চেষ্টা করলে মাথা গুড়ো হয়ে যাবে।'

এ সময় পাশ এবং পেছন দিক থেকে গুলী বর্ষণ ও গাড়ির শব্দ শুনতে পেল আহমদ মুসা। তাকিয়ে দেখতে পেল, বারবারেতি সড়ক দিয়ে এবং কাদেলা নদীর পথে দুইটি গাড়ি ছুটে আসছে গুলী করতে করতে। আহমদ মুসা দেখল, স্ট্রেনগানের গুলীতে তার জীপের উপরের কভার ঝাঁঝরা হয়ে গেল। কেঁপে উঠল আহমদ মুসা। ব্ল্যাক বুল কি বাঁচতে পেরেছে?

পেছন থেকে চোখ ফেরাবার আগেই আহমদ মুসা তার মাথায় শক্ত কিছুর স্পর্শ অনুভব করল। বুঝল, সেই তুতীয় লোকটির রিভলবার।

অন্যদিকে নতুন আসা দুটি গাড়ি থেকে আরও চারজন নেমে তাদের স্টেনগান ও রিভলবার বাগিয়ে তাকে এসে ঘিরে ফেলল।

নতুন আসা চারজনের একজন আহমদ মুসার মাথায় রিভলবার তাককারী সেই তৃতীয় লোকটিকে লক্ষ্য করে বলল, স্যার এ সব কি দেখছি?

এঁর পরিচয় এখনও পাইনি। তবে ভয়ানক কেউ হবে। মাত্র ৫ সেকেন্ডে আমাদের চারজন লোককে খুন করেছে। বেঁধে ফেল একে। এঁর ব্যাপারে খোঁজ খবর নিয়ে তারপর সিদ্ধান্ত। বলল, আহমদ মুসার মাথায় রিভলবার ঠেকিয়ে দাঁড়ানো তৃতীয় লোকটি।

সেই তৃতীয় লোকটি শুরু থেকে আহমদ মুসার সাথে কথা বলছিল। সেই নির্দেশ করছিল তার সাথীদের এবং সেই আগন্তুকদের নির্দেশ দিল তাকে বাঁধার জন্য আহমদ মুসা বুঝল এদের মধ্যে এরই পদ মর্যাদা সবার উপরে। নিশ্চয় নেতা গোছের কেউ হবে। শিশুটির পিতা সে। নিশ্চয় মেয়েটি তার স্ত্রী হবে। আহমদ মুসা এদের গাড়িকে অনুসরন করে এসেছে।

আহমদ মুসাকে ওরা বেঁধে ফেলল।

বাঁধা হয়ে গেল নেতা লোকটি বলল, ‘বন্দীসহ আমার গাড়ির পেছনে উঠ একজন। আর তিনজন তিনটা গাড়ী নিয়ে এস।

সন্ধ্যা তখন প্রায় আসন্ন।

জীপের পেছনে জীপের মেঝেতে বন্দী আহমদ মুসাকে ফেলে রাখা হলো। স্টেনগান হাতে একজন পেছনের সিটে বসে আহমদ মুসার উপর চোখ রাখল।

জীপটির ড্রাভিংসিটে বসল নেতা গোছের সেই লোকটি। তার পাশের সিটে বসল সেই মহিলা এবং শিশুটি।

মহিলার বয়স ত্রিশের কম হবে। শিশু এবং মহিলা দু’জনেরই মুখ গম্ভীর। সিটে বসেই মহিলাটি একবার পেছনে আহমদ মুসার দিকে তাকাল।

গাড়ী স্টার্ট নিচ্ছিল।

আহমদ মুসা মাথাটা একটু তুলে বলল, তোমরা আমার লোককে কি করলে?

জাহান্নামে গেছে। এখন তোমার কথা ভাব। বলল, ড্রাইভিং সিট থেকে নেতা গোছের লোকটি।

‘বন্দীর নিজের কথা ভাববার কি আছে। আমার কথা ভাববে এবার তোমরা। বলল আহমদ মুসা।

‘তুমি মানুষটা কি বুঝলাম না। তোমার চোখ-মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তুমি শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছ। তোমার ভয় করছে না?

‘ভয় করলে কি হবে? তোমরা আমাকে ছেড়ে দেবে?

তা কখনও কেউ পারে?

তাহলে ভয় করে লাভ?

‘আচ্ছা মানুষ তো তুমি! লাভের জন্যে কেউ কি ভয় করে? ভয় আসে অপ্রতিরোধ্যভাবে, ভেতর থেকে এবং তা আসে ক্ষতির ভয়ে, জীবনের ভয়ে।

যাদের ক্ষতির ভয় নেই কিংবা জীবনেরও ভয় নেই, তাদের ভয় আসবে কোথা থেকে?

তুমি জীবনের ভয় কর না?

করি না। কারণ মৃত্যু ঠিক সময়ের আগেও আসবে না, পরেও আসবে না।

বাঃ দারুণ দার্শনিক কথা বলেছ। কিন্তু লাভ নেই। মৃত্যু তোমার আসছে। আমাদের চারজনকে তুমি খুন করেছ।

'চারজন নয়, তিনজন।

'চতুর্থজনও তোমার কারণেই মরেছে।

সুন্দর যুক্তি। কিন্তু একজনকে মেরে কি চারজনের শোধ উঠবে?

তুমি মানুষ না পাথর? রক্তাক্ত অবস্থায়ও তোমার মুখে বিদ্রুপ আসে? কে তুমি?

যার জীবন নেই বেশীক্ষণ, তার পরিচয়ের কি দরকার?

বাজে বকো না, পরিচয় তোমার আমরা বের করবই।

তা অবশ্যই বের করবে।

'তোমার কপাল সত্যিই মন্দ। তুমি আমাদের মনে হয় ঠিক চেন না। তাই বিদ্রুপ রসিকতা তোমার মুখ থেকে যাচ্ছে না। খুব শীঘ্রই এর ফল তুমি দেখবে।

বলে সে নড়ে চড়ে বসে সামনের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করলো।

মৃত্যুর দৃশ্য সামনের আসার পর আর কিছু দেখবার বাকি থাকে কি?

মহিলাটি দু'পক্ষের এ বাক-বিনিময় শুনছিল। অবশেষে আহমদ মুসাকে বলল উদ্দেশ্য করে বলল, দেখুন অনেক সময় কথা বলার চেয়ে না বলাই ভাল।

আহমদ মুসা তাৎক্ষণাৎ কোন জবাব দিল না।

মনে মনে বলল জানি ম্যাডাম। কিন্তু এ সময়টা সে সময় নয়। এ সময় আপনাদের বেশী বেশী জানার এবং পরিমাপ করার। এবং আমি তা কিছুটা পেরেছিও। তোমরা আমাকে চিননি, না চেনা পর্যন্ত তোমরা কিছু করতেও পারবে না। তোমরা ব্ল্যাক ক্রসের উর্ধতন কেউ নও। কোন স্বাধীন সিদ্ধান্ত তোমাদের হাতে নেই। তোমাদের তুচ্ছ করে মানসিকভাবে তোমাদের দূর্বল করার মধ্যে আমার লাভ।

একটু সময় নিয়ে আহমদ মুসা বলল, স্বাধীনতা খুব মূল্যবান। কথা বলার স্বাধীনতাটুকু এখনও বাকি আছে। তাই তার একটু বেশীই ব্যবহার করছি।

মহিলাটির মুখে একটা বিস্ময়ের ছায়া নামল।

ড্রাইভিং সিটে বসা নেতা গোছের সেই লোকটি মুখ ঘুরিয়ে আহমদ মুসাকে উদ্দেশ্য করে বলল, তোমার বকবকি বন্ধ কর, না হলে মুখের মানচিত্র কিন্তু আরও বেশী পাল্টে যাবে।

আহমদ মুসা হাসল, কোন কথা বলল না।

আহমদ মুসাকে নিয়ে গাড়িটাই আগে চলছিল। তার পেছনে আরও তিনটি গাড়ি।

চলছে গাড়িগুলো সলো'র পথ ধরে।

ব্ল্যাক বুল এবং তার দু'টি কুকুর ঠিক সময়ে গাড়ির মেঝেতে শুয়ে পড়ায় বেচে গেছে। কিন্তু গাড়ি বাঁচেনি। রিজার্ভ টায়ারসহ পেছনের দু'টি টায়ার একদম ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

দুই কুকুর টম ও টমিকে দুই বগলে নিয়ে ব্ল্যাক বুল গাড়ি থেকে নামল। সাথে নিল আহমদ মুসার ব্যাগ এবং তার নিজের ব্যাগ।

আহমদ মুসাকে বহনকারী গাড়ির বহরের শব্দ মিলিয়ে যাবার পর গাড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে এল।

বেরিয়ে এসে অসহায় দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাল ব্ল্যাক বুল। জংগলের সমুদ্রে নিজেকে এক ভাসমান মানুষ মনে হলো ব্ল্যাক বুলের। সড়ক আছে বটে কিন্তু কোন যানবাহনের দেখা নেই।

সড়কে দাঁড়িয়ে ব্ল্যাক বুল সূর্যের দিক বিচার করে বুঝল, আহমদ মুসাকে নিয়ে গাড়িগুলো সলো'র দিকে গেছে। সলো তার পিতৃ পুরুষের গ্রাম, এখন নাকি ছোট-খাট একটা নদী বন্দর।

ব্ল্যাক বুল কিছুক্ষণ এদিক সেদিক করে নিরুপায়ভাবে দু'টি কুকুরের চেন ধরে সলো'র পথ ধরে হাঁটতে শুরু করল।

সড়কটি সংঘ নদীর পূর্ব তীর বরাবর দক্ষিণে এগিয়ে গেছে।

সড়কের দুই ধারেই ঘন বন। সড়ক থেকে সংঘ নদী খুবই কাছে।কিন্তু মাঝখানে বন এতই ঘন যে মনেই হয় না আশেপাশে কোথাও নদী আছে।

সন্ধ্যা আসছে নেমে। রাতের কথা ভাবতেই গাকাঁটা দিয়ে উঠল ব্ল্যাক বুলের। এই এলাকায় সে কোন দিন আসে নি, কিন্তু জানে সে এলাকার খবর। মধ্য আফ্রিকা প্রজানন্ত্রের এই দক্ষিণাঞ্চল থেকেই কঙ্গো অববাহিকা ও গ্যাবনের দূর্ভেদ্যতম বনাঞ্চলের শুরু। এই জংগলে গরিলা, সিংহ, বাঘ সব ধরনেরই হিংস্র জানোয়ার আছে। তার উপর আছে বান্টুদের শত্রু কোকুইদের ছড়ানো আতংক। ওরা অঞ্চল বিশেষে গাছের ডালে ডালে ঘুরে বেড়ায়। বান্টুদের কাউকে একাকি পেলে ফাঁদে ফেলে ধরে নিয়ে যায় তাদের দেবতার কাছে। তার পর বলি দেয়।

অন্ধকার নেমে এল চারদিকে।

যতক্ষণ দিন ছিল ততক্ষণ সাহস কিছু ছিল। রাত নামার সাথে সাথে সে সাহসটুকুও অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

ব্ল্যাক বুল শক্ত হাতে ধরল টম ও টমির চেন এবং আরেক হাতে বাগিয়ে ধরল রিভলবার। টম ও টমিকে এখন তার মনে হচ্ছে সবচেয়ে বড় বন্ধু এবং সবচেয়ে বড় বিপদেরও কারণ। কুকুরের গন্ধ শোঁকার শক্তি তার জন্যে এখন এ্যাসেট। হিংস্র বন্য জন্তু কিংবা শত্রু মানুষ ইত্যাদি যাই হোক বেশ দূরে থাকতেই বাতাসে গন্ধ নিয়ে তাকে সাবধান করতে পারবে। কিন্তু সমস্যা হলো, কুকুরের লোভনীয় গন্ধ আবার হিংস্র পশুদের আমন্ত্রন জানাতে পারে।

পশু ও মানুষের নজর এড়াবার জন্যে ব্ল্যাক বুল সড়কের ধার দিয়ে, বনের পাশ ঘেঁষে এগিয়ে চলছিল।

ব্ল্যাক বুল যেমন চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি মেলে পথ চলছিল, তেমনি সব সময় কুকুর দু'টির প্রতিক্রিয়ার দিকেও চোখ রাখছিল।

হঠাৎ এক সময় ব্ল্যাক বুলের হাতের চেনে টান পড়ল। ফিরে তাকিয়ে দেখল কুকুর দু'টি বসে গেছে।

ব্ল্যাক বুল চেন ধরে ওদের টানল, কিন্তু এক ইঞ্চিও নড়ল না।

ব্ল্যাক বুল হাতের চেনে ঢিল দিল। সংগে সংগেই কুকুর দু'টি পেছনে চলার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল।

শিক্ষিত কুকুর দু'টির ইংগিত বুঝল ব্ল্যাক বুল। নিশ্চয় সামনে বাঘ, সিংহ, গেরিলা ধরনের হিংস্র কোন জন্তু আছে।

কি করবে এখন ব্ল্যাক বুল? চিন্তারও সময় নেই। ইতিমধ্যেই তাদের দেখতে না পেয়ে থাক তবেই রক্ষা। গন্ধ নিশ্চয় পেয়েছে, যেমন কুকুর পেয়েছে।

ব্ল্যাক বুল ডানে জঙ্গলের দিকে তাকাল।দেখল,কাছেই বিশাল কান্ড বিশিষ্ট বড় একটি গাছ।ব্ল্যাক বুলের গাছে উঠার অভ্যাস আছে।কিন্তু এই গাছে উঠা তার পক্ষে অসম্ভব।হতাশ হয়ে আশেপাশে তাকাল।আনন্দের সাথে দেখল,বড় গাছটি থেকে কয়েক গজ দূরে আরেকটি স্বল্প বেড়ের তরুণ গাছ।তীরের মত বড় গাছটির ডালপালা ভেদ করে উপরে উঠে গেছে।এ গাছটি দিয়ে বড় গাছের ডালে উঠা যায়।

ব্ল্যাক বুল সময় নষ্ট করল না।কুকুর দু'টিকে টেনে নিয়ে ছুটল সে গাছের দিকে।সমস্যায় পড়ল কুকুর দু'টিকে নিয়ে।ও দু'টিকে কাঁধে নিয়ে গাছ বেয়ে উঠা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি এল।আহমদ মুসার ব্যাগে সে সিল্কের কর্ড দেখেছে।ওটাই যথেষ্ট হবে।

ব্ল্যাক বুল তাড়াতাড়ি কর্ড বের করে তার দুই প্রান্ত দুই কুকুরের চেনের সাথে শক্ত করে বেঁধে কর্ডের মাঝ বরাবর জায়গাটা নিজের বেল্টের সাথে গিট দিয়ে নিল।তারপর কুকুর দু'টি কে শান্তভাবে থাকতে বলে গাছে উঠতে শুরু করল।বিশ ফুটের মত উঠেছে এই সময় বোমা ফাটার মত ভীষণ শব্দে চারদিকটা কেঁপে উঠল।প্রবলভাবে চমকে উঠে হাত-পা ফসকে পড়ে যাচ্ছিল ব্ল্যাক বুল।শেষ মুহূর্তে প্রাণপণে হাত-পা দিয়ে গাছ আঁকড়ে ধরে রক্ষা পেল সে।

নিজেকে সামলে নিয়েই ব্ল্যাক বুল নিচের দিকে তাকাল।তার ভুল হয়নি বুঝতে যে ওটা বোমা ফাটার শব্দ নয়।সিংহের গর্জন ওটা।সিংহটা নিশ্চয় তাকে অথবা কুকুর দু'টিকে দেখতে পেয়েছে।দেখতে পেয়েই সে গর্জন করে উঠেছে শিকারকে ভীত করে তোলার জন্যে।লাফ দিয়ে শিকার ধরার দূরত্বে সিংহটি এসে গেছে।

তাড়াতাড়ি ব্ল্যাক বুল উপরে তাকাল।দেখল, মাত্র ফুট তিনেক উপরে বড় গাছটার একটা মোটা ডাল ব্ল্যাক বুলের গাছটার গা ঘেঁষে এগিয়ে গেছে।ব্ল্যাক বুল

দ্রুত উঠতে লাগল।কুকুর দু'টি কে তুলে নিতে হলে তার বসার মত একটা আশ্রয় দরকার।

কিন্তু গাছের মোটা ডাল হাতে পাওয়ার আগেই সেই গর্জন আবার শুনতে পেল ব্ল্যাক বুল।সেই সাথে হাতের কর্ডে টান পড়ল।চমকে উঠে থেমে গেল ব্ল্যাক বুল।সিংহটা কি তার কুকুরের প্রতি চড়াও হয়েছে, না কুকুর দুটি পালাবার চেষ্টা করছে?

ব্ল্যাক বুল দুই পা এবং বাম হাতে গাছকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে ডান হাত দিয়ে কর্ড ধরে কুকুর দু'টিকে টেনে তোলার চেষ্টা শুরু করল।

এক হাতে টেনে তোলা অসম্ভব।বাম হাতের সাহায্য নিল।কিন্তু বাম হাতের পক্ষে শরীরের ভার নিয়ে গাছ আঁকড়ে থাকা এবং দুইটি বাঘা কুকুরের ভার ধরে রাখা অত্যন্ত কঠিন।কিন্তু কঠিন তা অনুভব করার সময় ও নেই।পাগলের মত টেনে তুলতে লাগল কুকুর দুটিকে।কুকুর দু'টি যে ভীষণ ভারী আজই তা প্রথম মনে হলো ব্ল্যাক বুলের।মনে হচ্ছে সে ভার তাকে টেনে নামিয়ে নিয়ে যাবে গাছের তলায়।

কিছুদূর উঠেছে কুকুর দুটি,এমন সময় প্রাণ কাঁপানো এক হুংকার এবং সেই সাথে গাছের গোড়ায় ভারী কিছু পড়ার শব্দ হলো।

নিজের অজান্তেই কখন যেন কাঁপতে শুরু করেছে ব্ল্যাক বুল।কুকুরকে উপরে তোলা বন্দ হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে ফিরে পেল ব্ল্যাক বুল।

শুধু বাম হাতে পারছে না।দাঁত দিয়ে ব্ল্যাক বুল কামড়ে ধরল সিল্কের কর্ড।তারপর ডান হাত নিচে নামিয়ে কুকুর দু'টি কে আরও এক ফুট উপরে নিয়ে এল।খুশী হলো সে সিংহ কুকুরের কোন অংশের নাগাল পেলে সিংহের কাছ থেকে কুকুর দু'টিকে ছাড়িয়ে নেয়া তার পক্ষে সম্ভব হতো না।সে কুকুরকে যথেষ্ট উপরে তুলতে পেরেছে,যেখানে লাফ দিয়ে নাগাল পাওয়া সিংহের পক্ষে সম্ভব নয়।

কুকুরকে যখন ব্ল্যাক বুল এইভাবে তুলছে,গাছের গোড়ায় তখন লংকা কান্ড। নিচের কিছুই দেখা যাচ্ছে না।কিন্তু বুঝা যাচ্ছে প্রায় হাতের মুঠো থেকে

শিকার হাত ছাড়া হওয়ায় পশুরাজ ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে।মাটি কাঁপছে তার গর্জনে।কাঁপছে যেন গাছটিও।

কুকুর দু'টিকে সিংহের আওতার বাইরে আনতে পারায় ব্ল্যাক বুল খুশী।কিন্তু এই খুশী ধরে রাখা তার জন্যে সংকটজনক হয়ে দাঁড়াল।ঝুলন্ত কুকুর দু'টিকে যেখানে ধরে রাখাই কঠিন,সেখানে এই ভার নিয়ে উপরে উঠবে কেমন করে!আবার এইভাবে থাকাও সম্ভব নয়।

আবার উপরের দিকে চাইল ব্ল্যাক বুল।মাত্র ফুট খানেক উপরে ডালটা।কিন্তু ওখানে পৌঁছাবে কি করে!কুকুর দু'টিকে ধরে রাখতে গিয়ে তার ডান হাত বন্ধ।শুধু বাম হাত দিয়ে এত ভার টেনে গাছ বেয়ে ওঠা সম্ভব নয়।যে কোনভাবেই ডান হাতকে কার্যকরী করতে হবে।

ব্ল্যাক বুল ভাবল,ডান হাতের কর্ডটিকে যদি কোন ক্রমে কাঁধে এনে পেচানো যেত,তাহলে ডান হাতকে মুক্ত করা সম্ভব হতো।কিন্তু ওকাজটা প্রায় অসম্ভব।

হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে ব্ল্যাক বুলের মাথায় একটা চিন্তার উদয় হলো।কর্ড বাহুতে পেচিয়ে কুকুর দু'টির ভার কাঁধের কাছাকাছি আনতে পারে।

চিন্তার সংগে সংগেই সে কর্ড প্রথমে হাতে,তারপর বাহুতে পেঁচানো শুরু করে দিল।হ্যাঁ পেচানো যাচ্ছে শুধু নয়,কর্ডটা হাতে থাকতে শযে ভারটা কষ্টকর মনে হচ্ছিল কর্ড বাহুতে আসার পর তা অনেকটা সহনীয় হয়ে গেল।কিন্তু কর্ডকে কনুই পার করে আনা খুবই কষ্টকর হয়ে গেল।আর চেষ্টা করল না ব্ল্যাক বুল।

এবার সে ইঞ্চি ইঞ্চি করে উপরে উঠা শুরু করল।

ইতিমধ্যে এক কষ্ট গিয়ে আরেক কষ্ট দেখা দিল।ভার বহনটা আগের চেয়ে অনেক স্বস্তিকর হলেও সিল্কের সরু কর্ড ভারের চাপে বাজুতে বসে যাচ্ছিল।যেন বাজুর পেশি কেটে দু'ভাগ হয়ে যাচ্ছে তার।চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা করছিল তার।তবু দাঁতে দাঁত চেপে সে গাছ বেয়ে উপরে উঠছিল।

যখন ব্ল্যাক বুল গাছটি আঁকড়ে ধরে ডালটিতে ঘোড়ার মত উঠে বসল,তখন তার মনে হলো ের চেয়ে বড় বিজয় তার জীবনে আসেনি।এর চেয়ে বড় সাহায্য আল্লাহ তাকে আর কোনদিন করেননি।

কুকুর দু'টি কে তুলে সে ডালে বসিয়ে দিল।উপরে উঠে যাওয়া গাচটির সাথে শক্ত করে বাঁধল কুকুর দু'টির চেন।

বেশ মোটা ডাল।আরামেই বসা গেল।

ঘামে সে গোসল করে ফেলেছিল,পিঠে ঝুলানো ব্যাগ দুটি নামিয়ে রাখলে আরাম পাওয়া যেত।কিন্তু ব্যাগ দু'টি কে বিচ্ছিন্ন করতে চাইল না।একটি ব্যাগ আহমদ মুসার।যা মহামুল্যবান আমানত তার কাছে।

সিংহটি তখনও নীচে ক্রোধে গোঁ গোঁ করছিল।শব্দ শুনেই বুঝা যাচ্ছিল গাছের চারদিকে চক্কর দিচ্ছে সে।

এই সময় খুব কাছে প্রায় এক সাথে দুইটি মাটি ফাটানো গর্জন শুনতে পেল ব্ল্যাক বুল।বুকটা আবার নতুন করে কেঁপে উঠল ব্ল্যাক বুলের।ভয়ে ভয়ে নীচে তাকাল সে।

নিচে এখন একটির জায়গায় সিংহ তিন্টি।আরও আসবে নাকি?

ব্ল্যাক বুলের রাতটা কেটে গেল নির্ঘুম এবং আতংকের মধ্যে দিয়ে।ফর্সা হয়ে গেলে চারটা সিংহ প্রায় এক সংগেই চলে গেল।রোষ কষায়িত চোখে ওদের ওপরে তাকানো এবং রাজ যাত্রার মত ওদের ভারিক্কি চালে চলে যাওয়া চেয়ে চেয়ে দেখল ব্ল্যাক বুল।

পুবদিকে একটু দূরে রাস্তার দিকে তাকালে বুঝা যাচ্ছে সূর্য বেশ উপরে উঠেছে।কিন্তু গাছ থেকে নামতে সাহস পেল না।কিন্তু পরক্ষণেই তার শিক্ষিত দুই কুকুরের কথা মনে পড়ল।ভাবল,ওরাই তো তার ব্যরোমিটার।ওদের আচরণ থেকেই বুঝা যাবে আশেপাশে শত্রু আছে কিনা।

'টম, টমি দেখবি সব ঠিক আছে কিনা।'বলে ব্ল্যাক বুল কুকুর দু'টিকে নামিয়ে দিল মাটিতে।ব্ল্যাক বুলের টম ও টমি মাটিতে নেমে চারদিকে গড়াগড়ি দিয়ে নিশ্চিন্তে আনন্দ প্রকাশ করল।

ব্ল্যাক বুল নিশ্চিন্তে নেমে এল মাটিতে।

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে সড়কের ধারে বসে ব্ল্যাক বুল ব্যাগ থেকে খাবার বের করে কিছু নিজে খেল, কিছু তার টম টমিকে খাওয়াল।

তারপর তৈরী হয়ে তাকাল পথের দিকে।সলো পৌছতে আরও সত্তর-আশি কিলোমিটার রাস্তা পাড়ি দিতে হবে।কিভাবে?

বারবারেতি ও সলো'-এর মধ্যে বাস সার্ভিস হয়তো আছে।কিন্তু কি করে জানবে তার সময়টা।বাসের জন্যে অনিশ্চিত বসে থেকে আরেকটি রাতের মুখোমুখি সে হতে চায় না।ব্যক্তিগত গাড়িও যাতায়াত করে ে পথে।সেটা আরও অনিশ্চিত।

নদীর কথাও ভাবল ব্ল্যাক বুল।এ অঞ্চলে নদী পথেই বেশী যাতায়াত হয়।ব্যক্তিগত নৌকা,ভাড়া নৌকা,ব্যবসায়ের নৌকা ইত্যাদি অনেক ধরণের নৌকা রয়েছে।তাছাড়া নদী পথে কাঠের ভেলার রয়েছে ব্যাপক প্রচলন।শহরের বাইরের এলাকার মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাঠের ভেলাই ব্যবহার করে থাকে।

হেঁটে অনেক পথ চলল।কত বার আকুলভাবে পেছনে তাকাল,গাড়ির কোন চিহ্ন নেই।

গাড়ির কথা এক সময় ভুলেই গিয়েছিল ব্ল্যাক বুল।হঠাৎ ইঞ্জিনের পরিচিত শব্দে পেছন ফিরে তাকাল সে।

দেখল একটা মাইক্রোবাস আসছে।কাছে এলে দেখল দু'একজন কৃষ্ণাঙ্গ আছে,আর সবাই শ্বেতাংগ।তারা সরকারের উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ হবে,নয়তো হবে পর্যটক।

আশায় বুক বেধে ব্ল্যাক বুল হাত তুলল ওদের থামাবার জন্যে।কিন্তু শ্বেতাংগ ড্রাইভার একবার চোখ তুলে তাকিয়ে বেপরোয়াভাবে চলে গেল।

যেটুকু আশার আলো জ্বলে উঠেছিল ব্ল্যাক বুলের মনে তা আবার দপ করে নিভে গেল।

আবার সেই চলা শুরু হলো তার।

আবার গাড়ির শব্দে পেছনে ফিরে তাকাল ব্ল্যাক বুল।

দেখল একটা জীপ আসছে।

কাছে এলে দেখল পুলিশের জীপ।

পুলিশে কোন ভেজালে যেতে চায় না ব্ল্যাক বুল। তাই ঠিক করল জীপটির কোন সাহায্য চাইবে না ব্ল্যাক বুল।

কিন্তু ব্ল্যাক বুলকে বিস্মিত করে দিয়ে পুলিশের জীপটি এসে ব্ল্যাক বুলের পাশে দাঁড়িয়ে গেল।

মনটা ধক করে উঠল ব্ল্যাক বুলের। ঘটনা তো পুলিশ নিশ্চয়ই টের পেয়েছে, লাশগুলো তো ওখানেই পড়ে আছে। তাকে পুলিশ সন্দেহ করছে নাকি। আচ্ছা আমি কোত্থেকে এলাম, এ অবস্থা কেন, এসব জিজ্ঞাসা করলে কি জবাব দেব?

পুলিশের গাড়ি দাঁড়াবার সাথে সাথে ব্ল্যাক বুলও দাঁড়িয়ে গেছে।

লাফ দিয়ে নামল একজন পুলিশ অফিসার। জীপে একমাত্র সেই।

অবশ্য ড্রাইভিং সিটে যে আছে সেও পুলিশের ইউনিফরম পরা। অর্থাৎ গের পুলিশ।

পুলিশ অফিসারটি কৃষাংগ। তার দৃষ্টি কুকুর দু'টির দিকে। লোভে তার চোখ দু'টি চক চক করছে। পুলিশের চোখ না চেনার কথা নয়। কুকুর দু'টির চাহনি দেখেই বুঝতে পেরেছে ও দু'টি সোনার টুকরা। দুর্লভ জাতের শিকারী কুকুর।

'কে তুই?' পুলিশ এমনভাবে কথাটি জিজ্ঞেস করল যেন ব্ল্যাক বুল কোন বড় আসামী।

'আমি.........'

ব্ল্যাক বুলকে কথা শেষ করতে না দিয়ে পুলিশ অফিসারটিই আবার বলল, 'কুকুর দু'টি কোথায় পেলি?'

'আমার। আমি ........'

ব্ল্যাক বুলকে থামিয়ে দিয়ে বলল পুলিশ অফিসারটি, 'বুঝেছি রহস্য একটা আছেই। সেটা আমরা দেখব। কুকুর দু'টি আমাকে দিয়ে দে।'

বলে পুলিশ অফিসারটি ব্ল্যাক বুলের হাত থেকে কুকুর দু'টির চেন কেড়ে নিতে গেল।

ব্ল্যাক বুল একটু পিছনে সরে গেল। বলল, 'না দেব না।'

'দিবি না?' বলে পুলিশ অফিসার বেল্টের খাপ থেকে রিভলবার বের করে ব্ল্যাক বুলের বুক বরাবর তুলে ধরল।

মুহূর্তে ঘটে গেল ঘটনা।

হঠাৎ কুকুর দু'টি, টম ও টমি, পুলিশ অফিসারটির দু'পাশ বেয়ে দু'পায়ের উপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বাঘের গর্জন করে উঠল। তাদের মুখের বিশাল হা দেখে মনে হলো এই বুঝি তারা কামড়ে ধরবে পুলিশ অফিসারটির গলা।

ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল পুলিশ অফিসারটি। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে হাতের রিভলবারটি ফেলে দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে তোদের প্রভুকে কিছু বলব না।'

ডরভলবার ফেলে দেয়ার সংগে সংগেই কুকুর দু'টি পুলিশ অফিসারটিকে ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল এবং ফেলে দেয়া রিভলবারটি মুখ দিয়ে কামড়ে ধরে টম ও টমি দু'টিই গিয়ে ব্ল্যাক বুলের কাছে বসে পড়ল।

কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল পুলিশ অফিসারটি। তারপর হেসে উঠল। বলল, 'কংগ্রাচুলেশন তোমাকে। তোমার কুকুর দু'টি খুবই ভালো।'

'আমি দু''খিত, আপনার প্রতি বেয়াদবি করেছে টম ও টমি।' বলে ব্ল্যাক বুল টমের মুখ থেকে রিভলবারটি নিয়ে কাপড়ে মুছে তা ফেরত দিল পুলিশ অফিসারকে।

'না, ওটা বেয়াদবি নয়। প্রভুর পক্ষে যা করা দরকার তাই ওরা করেছে। সত্যি আমি মুগ্ধ।'

'ধন্যবাদ। আপনি বুঝি পশুদের খুব ভালোবাসেন?'

'বুদ্ধিমান পশুদের আমার খুব ভালো লাগে। বিশেষ করে শিকারী কুকুর। ওরা মানুষের চেয়ে হাজার গুণ বেশী বিশ্বস্ত ও উপকারী।'

বলে একটু থেমে আবার জিজ্ঞাসা করল পুলিশ অফিসারটি, 'কে তুমি? কোথায় যাচ্ছ এভাবে?'

সমস্যায় পড়ল ব্ল্যাক বুল। তার মুসলিম নামটা প্রকাশ করা ঠিক হবে না। আবার ব্ল্যাক বুল নামটা কাউকে বলার মত নয়, এ ধরনের নাম কোন আফ্রিকান স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে না।

হঠাৎ ব্ল্যাক বুলের মনে পড়ল তার দাদার নাম। ‘কমন্ড কাল্লা’, তার দাদা, সংঘ নদী তীরের ‘সলো’ গ্রাম (যা আজ বন্দর) থেকে হারিয় গিয়েছিল দাস ব্যবসায়ীদের হাতে ধরা পড়ে। সেই কমন্ড কাল্লা যদি আজ ‘সলো’তে ফিরে যায় কেমন হয়?

ব্ল্যাক বুল বলল, ‘আমার নাম ‘কমন্ড কাল্লা’। যাচ্ছি ‘সলো’।

‘কি নাম ‘কমন্ড কাল্লা?’ পুলিশ অফিসারটি যেন বিস্মিত হলো নামটায়। যেন নামটা তার কাছে পরিচিত।

‘জি।’ বলল ব্ল্যাক বুল।

পুলিশ অফিসারটি তৎক্ষণাৎ কোন কথা বলল না। যেন সে একটু আনমনা হয়ে পড়েছিল।

কয়েক মুহূর্ত পরে মুখে হাসি টেনে বলল, ‘নামটা সুন্দর। আসছো তোত্থেকে এভাবে?’

‘ইয়াউন্ডি থেকে। গাড়ি অচল হয়ে পড়ায়। গাড়ি ছেড়ে দিয়ে হাঁটছি এবং গাড়ি খোঁজ করছি সলো যাবার।’

পুলিশ অফিসারটির চোখ হঠাৎ তীক্ষè হয়ে উঠল। বলল, ‘গাড়িটা কোথায় নষ্ট হয়েছে?’

‘কাদেলীর তীরে।’

‘কবে?’

‘গতকাল।’

‘কাল থেকে হাঁটছো?’

‘হ্যাঁ।’

‘রাতে কোথায় ছিলে?’

‘গাছে।’

একটু ভাবল পুলিশ অফিসারটি। তারপর বলল, আমি ‘সলো’ যাচ্ছি। আমার সাথে যেতে পার।’

‘ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ।’ ব্ল্যাক বুলের কথার মধ্যে হৃদয় নিঃসৃত কৃতজ্ঞতা ঝরে পড়ল, ‘ওয়েলকাম। উঠে পড়ো গাড়িতে।’

বলে পুলিশ অফিসারটি ড্রাইভারের পাশের সিটে গিয়ে উঠল।

পুলিশ অফিসারটি ‘সলো’র পুলিশ সুপার। সেখানকার সর্বোচ্চ পুলিশ অফিসার। নাম জাগুয়াস ম্যাকা।

ব্ল্যাক বুল জীপের পেছনের সিটে উঠে বসল তার টম ও টমিকে নিয়ে।

গাড়ি স্টার্ট নিল।

চলতে শুরু করল জীপটি।

‘তুমি সলোতে কোথায় যাবে?’

‘কোন হোটেলে উঠব।’

উত্তরে জাগুয়াস ম্যাকা কিছু বলল না। তার দৃষ্টি প্রসারিত হলো সামনে।

# ৫

'সলো' বন্দরের শ্বেতাংগ কলোনীর মধ্যখানে সুন্দর একটি দু'তলা বাড়ি।

বাড়িটা জর্জের।

আহমদ মুসাকে ব্ল্যাক ক্রসের নেতা গোছের যে লোকটি বন্দী করে এনেছিল, এ তারই বাড়ি। বাড়ি ঠিক নয়। এটা ব্ল্যাক ক্রস- এর স্থানীয় অফিস। নিচের তলায় অফিস রুম এবং ব্ল্যাক ক্রস- এর ব্যবহৃত অন্যান্য ঘর। দু'তলায় ব্ল্যাক ক্রস- এর সলো'র প্রধান জর্জ তার স্ত্রী এবং একটি মেয়ে নিয়ে থাকে।

তখন রাত আটটা।

নিচের তলায় একটা দরজা বিশিষ্ট জানালা বিহীন একটা ঘর।

এই ঘরেই আহমদ মুসা বন্দী আছে।

হাতে খাবার একটা প্যাকেট এবং পানির একটা বোতল নিয়ে জর্জ এসে দরজার সামনে দাঁড়াল।

পেছনে পায়ের শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখল স্ত্রী এলিজাবেথ এবং মেয়ে মেরী। বলল, 'তোমরা আবার কেন?'

'ক্ষতি আছে কি?' জিজ্ঞাসা করলো এলিজাবেথ জর্জকে।

'ক্ষতি নেই। কিন্তু বন্দীকে নিয়ে আমরা বিপদে আছি। বন্দী পরিচয় না দেয়া পর্যন্ত খাবার দেয়ার হুকুম নেই। চব্বিশ ঘন্টা গেল তার পরিচয় সে দেয়নি। এসেছি আবারও চেষ্টা করে দেখি। না হলে খাবার আবার ফেরত যাবে। তোমাদের এ সবে না থাকাই ভাল। বিশেষ করে মেয়েটার।'

'কিন্তু মেয়েটাকেই তো রাখা যাচ্ছে না। সে তো তোমাদের পলিটিক্স বোঝে না। বন্দীর কথা তার মুখ থেকে যাচ্ছে না।'

জর্জ কিছু বলল না। ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগুলো।

দরজার বিরাট তালা ছাড়াও দরজার মাঝামাঝি অংশে দরজার পাল্লার গায়ে একটা তালা ঝুলছে। ওটা একটা জানালা। বন্দীর সাথে কথা বলা, তাকে খাবার দেয়া ইত্যাদি করানেই এ জানালার ব্যবস্থা।

জর্জ জানালা খুলল।

ভেতরে স্টিলের একটা খাটিয়ায় শুয়ে ছিল আহমদ মুসা।

পাশেই একটা চেয়ার ছিল সেটা নিয়ে জানালার সামনে বসল জর্জ।

আহমদ মুসার মুখটা ম্লান। কিন্তু তাতে হাসি ফুটে উঠল জর্জদের দেখে।

আহমদ মুসা ভেতরে ভেতরে অধৈর্য্য হয়ে উঠেছে। ক্ষুধার জ্বালায় নয়, পাঁচ দিনের ২টা দিন অর্থহীন ভাবে চলে যেতে দেখে। আহমদ মুসা বন্দিত্বকে এক অর্থে আল্লাহর একটা দয়া হিসেবেই গ্রহন করেছিল। মুস্লিম নেতৃত্ববৃন্দ কে ব্ল্যাক ক্রস কোথায় বন্দি করে রেখেছে তার কথা উদ্ধার করা দরকার। কিন্তু এখন তা সম্ভব হয় নি।

জর্জ চেয়ারে বসে মুখ খোলার আগে আহমদ মুসা ই কথা শুরু করল। বলল, ‘ওয়েল কাম, খুব ভাল আছি।’

আচ্ছা লোক ত তুমি। চব্বিশ ঘণ্টা খেতে পাওনি। বলছ ভাল আছি। তাহলে তোমার খারাপ কোনটা? ‘বলল জর্জ।

‘না তোমারা ভাল রেখেছ আমাকে। তোমাদেরকে এমন বন্দীখানা অ ত আছে যেখানে বন্দিদেরকে নিদিদ্রশ্ত সময় হত্যা করা হয় পয়জনাস গ্যাস ব্যবহার করে।’

হাসল জর্জ। বলল।’ ও তুমি বোমাসা’র মাবোইডিং বন্দীখানার কথা বলছ? ওটা একটা বিশেষ ব্যাবস্থা।

আহমদ মুসা উত্তর শুনে কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। এত বড় সাংঘাতিক কথা জর্জ দিয়ে দিল। আজকের প্রথম তীরই অব্যর্থ। আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করল মনে মনে। বলল, ‘বিশেষ ব্যাবস্থা কেন?’

‘ওখানে আছে সব বিশ্ববিখ্যাত লোক। তাই ব্যাবস্থা ও বিশ্ববিখ্যাত। একটা এক্সপেরিমেন্ট ও ‘।

‘এক্সপেরিমেন্ট?’

'হ্যাঁ। একটা স্লো পয়জনাস গ্যাস এয়ারকন্ডিশন এর সাথে সেট করা হয়। গ্যাস মিটারে যে সময় নির্দিষ্ট করা হবে, সে অনুসারে গ্যাস এয়ারকন্ডিশন এর উইন্ড ওয়েভের সাথে ছড়িয়ে পড়ে। যিনি নির্দিষ্ট সময় ধরে ঐ গ্যাস গ্রহন করবেন, তিনি ঐ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মারা যাবেন। '

'তোমার পুলিসকে ভয় করো না।?' লোকেশনকে স্পেসিফিক করার উদ্দেশে প্রশ্ন করল আহমদ মুসা।

'হো হো করে হাসল জর্জ। বলল, 'ব্ল্যাক ক্রস কচি খোকা নাকি? একটা বাইবেল সোসাইটির আড়ালে যেভাবে যে ব্যবস্থা করা হয়েছে, তা পুলিশের বাবার ও সাধ্য নেই যে খুজে বের করে।'

কথা শেষ করেই জর্জ বলল,' ওসব যাক। এখন বল, 'তুমি কে? তুমি আমাদের কিছু জান দেখছি।'

আহমদ মুসা মনে মনে আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করল। ঠিকানা র অন্তত তিনটা ক্লু পাওয়া গেছে, জা তার কাছে চাওয়ার চেয়ে বেশি মনে হচ্ছে। ব্ল্যাক ক্রসের এ লোকটা নিশ্চিত আজ দিল খোলা মুডে আছে। আর লক্তার স্ত্রি অ মেয়ে শুরু থেকেই তার প্রতি সহানুভূতিশীল মনে হয়েছে।

'আমার পরিচয় দেবার কিছু নেই। থাকলে তোমরাই যোগাড় করবে।' হাশি মুখে বলল আহমদ মুসা।

'কিন্তু মনে রেখ, পরিচয় না দিলে তোমার খাবারও নেই।'

'তোমাকে ব্রিটিশ বলে মনে হয়। বন্দীর সাথে বুঝি এই আচরণ করতে হয়?'

'এটা ব্রিটিশ বন্দীখানা নয়। কেমন করে জানলে আমি ব্রিটিশ?'

'তোমার ফরাসি উচ্চারণ ব্রিটিশ দের মত। '

'পরিচয় দিলে ক্ষতি কি? ছাড়া যখন পাচ্ছ না, তখন পরিচয় গোপন করে লাভ কি?'

'লাভ - ক্ষতি ভাবছি না। আমি তোমাদেরকে কন সহযোগিতা করবোনা।'

‘তোমার আর ভোগান্তি আছে।’ উঠে দাঁড়াল জর্জ। তার মুখ ক্রোধে লাল হয়ে উঠেছে।

খাবারের প্যাকেট অ পানির বোতল হাতে নিতে যাচ্ছিল।

জর্জের স্ত্রি এলিজাবেথ ছো মেরে খাবার প্যাকেট অ পানির বোতলটা তুলে নিয়ে বলল, ‘তুমি যাও আ সবের ব্যাবস্থা আমি করছি।’

‘এলিজা ভুল করছ। আমি জানি তুমি কি করবে। কিন্তু শোন,এ খাদ্য আমাদের নয়, আমাদেরকেও ইনি মেহমান নন। সুতরাং নিয়মের বাইরে আমরা কিছু করতে পারি না। ‘বলে জর্জ খাবার প্যাকেট এবং পানির বোতল নেবার জন্য হাত বাড়াল এলেজাবেথ এর দিকে। এলিজাবেথ স্বামীকে তা না দিয়ে জানালা দিয়ে খাদ্য অ পানীয় ঘরের ভেতরে ছুড়ে মারল। আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, ‘এ সবের জন্য দুঃখিত, আপনি দয়া করে খেয়ে নেবেন।’

জর্জ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। তিব্র কন্থে বলল, ‘জান এলিজা, তোমার খামখেয়ালীপনার দায় আমার উপর বর্তায়।’

এলিজাবেথ উত্তর দিতে একটু সময় নিচ্ছিল।

ইতিমধ্যে আহমদ মুসা খাতিয়া থেকে উঠে খাবারের প্যাকেট অ পানির বোতল মেঝে থেকে কুঁড়িয়ে নিয়ে ছলে এল জানালায়। জর্জের দিকে খাবারের প্যাকেট অ পানির বোতল ছুড়ে ধরে বলল, ‘নিন, কিছু মনে করবেননা। মেয়েরা তো মূলত মা। তাদের মন নরম।’

বলে আহমদ মুসা স্থম্ভিত এলিজাবেথ এর দিকে চেয়ে বলল, ‘আপনাকে ধন্যবাদ বোন। কষ্ট পাবেন না। এমন না খেয়ে থাকার অভ্যাস আছে আমার। ‘

আহমদ মুসা খাটিয়ায় ফিরে এসে আবার শুয়ে পড়ল।

মুহূর্ত দেরি না করে মেয়ের হাত ধরে এলিজাবেথ সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে চলে গেল। অপমান অ যন্ত্রণায় তার মুখটা অস্বাভাবিক রুপ নিয়েছে।

জর্জ খাবারের প্যাকেট এবং পানির বোতল নিয়ে কিছুক্ষণ হতভম্বের মত দারিয়েছিল। তার মনেও যন্ত্রণা। একজন বন্দীর মানবিকতার কাছে সে হেরে গেল। কোন বন্দি এমন হয়, এই প্রথম সে তা দেখল।

আবার ভাবল, সে তো জর্জ নয়। সে তো ব্ল্যাক ক্রস এর একজন দায়িত্বশীল। মনের দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে দেবার চেষ্টা করে সেও সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল উপরে উঠার জন্য।

পরখনেই আবার ঘুরে দাঁড়াল। ভাবল, খাবার প্যাকেট এলিজাবেথ তার হাতে দেখলে কষ্টটা তার আরও বাড়বে।

ফিরে এসে জর্জ জানালার কাছে দাঁড়াল। আহমদ মুসা লক্ষ্য করে বলল, ‘খাবার নাও, এস।’

‘আপনাদের নীতির খেলাপ হবে।’

‘তা হবে। কিন্তু কত আইনই তো ভেঙে থাকি। একটা ভাল কাজে না হয় ভাঙলাম আবার।’

‘এটা আমার প্রতি করুনা, না স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য? ‘

হাসল জর্জ। বলল, ‘তুমি কে জানি না। কিন্তু আর দুশ বন্দীর মত যে নও তা পরিষ্কার। ‘

একটু থামল। আবার শুরু করল, ‘স্ত্রির প্রতি সান্ত্বনা এটা।’

‘তাহলে নিতে পারি।’

‘কেন? ‘

‘আমি চাই না আমার কারনে আপনাদের মধ্যে কোন মতান্তর ঘটুক।’

‘তুমি আমাদের চারজন লোককে খুন করেছ। কিন্তু তোমাকে দেখে তো খুনি মনে হয় না। কেন আমাদের লোককে অনুসরণ করেছিলে? ‘

‘সবই জানবে এক সময়। ধন্যবাদ।’ বলে আহমদ মুসা খাবার অ পানি নিয়ে তার খাটিয়ায় ফেরত এল।

জর্জ উঠে গেল উপরে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ড্রইং রুম।

ড্রইং রুমের সোফায় বসে আছে এলিজাবেথ। তার পাশেই মেরি। মেরীর পাশের সোফায় বসতে বসতে জর্জ বলল, ‘খুশি তো এলিজা, খাবার দিয়ে এসেছি।’

হটাত এলিজাবেথের দু চোখ থেকে দু ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। বলল, 'আমার বাড়াবাড়ি জন্য আমি দুঃখিত। লোকটি যেই হন, তিনি আমার স্বামীকে নতুন জীবন দিয়েছেন। উনি ট্রিগার টিপতে যাচ্ছিলেন, মেরী তোমার সামনে দাড়িয়ে অনুরধ করায় ট্রিগার তিনি টিপেন নি। ছোট্ট বাচ্চার কথা তিনি শুনেছেন। আমি সারা জীবন কৃতজ্ঞ থাকব তার প্রতি।

'লোকটা ভাল আব্বু। 'বলল মেরী মায়ের কোলে মুখ গুজে।

'আমার খুব খারাপ লাগছে, তিনি রিভল্বার নামালেন, আর তুমি তাকে গুলি করলে। সরে না দাঁড়ালে তার বুকে গুলি লাগত। জীবন রক্ষার বিনিময়ে তিনি জীবন দিতে বসেছিলেন।'

'তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু আমি দায়িত্ত পালন করেছি মাত্র। ও সুযোগ পেত, তাহলে পেছন থেকে আমাদের যে চারজন আসছিল, তারা বিপদে পড়তো। সে যেমন শার্প শুটার তাতে সে আমাদের গাড়ির কভার নিতে পারলে সবাইকে শেষ করতে পারত।'

'তোমার দিক থেকে তুমি ঠিকই আছ। কিন্তু তার ত্যাগ অ মানবিকতার কোন মূল্য তোমরা দাওনি।'

'সে যেটা করেছে মহানুভবতা। কিন্তু তার মূল্য দেয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। জীবন - মৃত্যু র খেলায় ে সুযোগ নেই এলিজাবেথ।

'তোমারা তাকে ছেড়ে দিতে পার।'

'না পারি না। সে আমাদের লোকদের হত্যা করেছে। আমাদের গাড়িকে অনুসরণ করেছে। সে আমাদের চেনে, অথচ তার কোন পরিচয় আমরা এখনও পাইনি। '

'উনি নিজে বাঁচতে গিয়েই খুন করেছেন, তার আগে তোমরা তাকে মেরে রক্তাক্ত করেছ।'

জর্জ কোন জবাব দিল না। এলিজাবেথ ই আবার কথা বলল, 'তাকে দেখে তোমার কি খুনি মনে হয়?'

'এলিজা আমি তুমি কি মনে করি তা কিছু আসে যায় না। বাস্তবে যা ঘটেছে, সেটাই এখন বড় কথা। '

‘তোমার তাকে কি করবে? ‘

‘সেটা পরিচয় উদ্ধার এর পরে ঠিক হবে। ‘

‘পরিচয় তো সে বলবে না।’

‘আমরা তার ফটো বারবারিতে পাঠিয়েছি। সেখান থেকে সে ফটো আজ সকালে গেছে নাইরোবিতে। সে বড় কেউ হলে তার পরিচয় শিগ্রই জানা যাবে।’

‘যাই বল, লোকটা বড় কেউ বলে। বড় কেউ না হলে ওমন বড় মন কার হয় না। আর  শিশুরা শত্রু মিত্রু খুব তাড়াতাড়ি চিনতে পারে। আমাদের মেরী বিশ্বাসই করে না যে লোকটা চোর-ডাকাত কিংবা খুনি।’

‘তুমি ঠিকই বলেছ। আমার দেয়া খাবার সে নিত না। কিন্তু যখন বললাম খাবারটা দিচ্ছি আমার স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে তখন সে খাবার নিয়েছে। খুনি-দস্যুদের আচরণ এমন হয় না।’

‘তাহলে কে সে?’

‘সেটাই তো প্রশ্ন। একদিকে যেমন প্রশংসনীয় মানবিকতা দেখছ, অন্যদিকে তেমনি সে অত্যন্ত দক্ষ যোদ্ধা। তুমি যা বলেছ, সে যদি রিভলবার না নামাত, তার পরিকল্পনা মত চলত, তাহলে শেষের চারজনসহ কেউ আমরা বাঁচতাম না।’

‘ঠিক বলেছ। জীবন-মৃত্যুর যুদ্ধে জীবন না নিলে জীবন দিতে হয়। একটা শিশুর অনুরোধে সে জীবন না নিয়ে সে জীবন দেয়ারই বন্দোবস্ত করেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে তার মানবিক মনটাই বড়।’

এলিজাবেথ কথা শেষ করতেই টেলিফোন বেজে উঠল।

জর্জ গিয়ে টেলিফোন ধরল।

টেলিফোনে কথা শুনছিল জর্জ। শুনতে শুনতে তার মুখভাব পাল্টে গেল। চোখে-মুখে ফুটে উঠল বিস্ময় ও উত্তেজনা।

এলিজাবেথও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল। নিশ্চয় সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে।

জর্জ টেলিফোন ছেড়ে দিতেই এলিজাবেথ উদ্বিগ্ন কন্ঠে বলল, ‘কিছু ঘটেছে, কোন দুঃসংবাদ?’

জর্জ সোফায় বসতে বসতে বলল, 'বড় সুসংবাদ, তোমার জন্যে অবশ্য দুঃসংবাদ হতে পারে। লোকটির পরিচয় জানা গেছে।'

'জানা গেছে? কে তিনি?'

'আমরা যাকে হন্যে হয়ে খুঁজছি এ সেই আহমদ মুসা।'

'আহমদ মুসা?' জগতের সব বিস্ময় যেন এসে চোখে-মুখা নামল এলিজাবেথের।

'হ্যাঁ। যাকে হাতে পাওয়ার জন্যে আমরা কত কি না করেছি, সেই কিনা এসে আমাদের বন্দীখানায় বসে আছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।'

এলিজাবেথ কোন কথা বলল না।

জর্জই কথা বলল। মুখ ভরা হাসি নিয়ে বলল, 'জান, নতুন বস সাইরাস শিরাক আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছে। নিশ্চয় আমাদের প্রমোশন হবে। অবশ্যই ইউরোপের বড় শহরে আমি পোস্টিং পাব।'

এলিজাবেথ নির্বাক বসে। জর্জের কথা তার কানে যাচ্ছে, কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়া নেই।

জর্জই আবার মুখ খুলল। বলল, 'নাইরোবি থেকে একটা বিশেষ টিম বারবারেতি এসেছে। ওরা রওনা দিয়েছে সলোর উদ্দেশ্যে। রাতেই ওরা আহমদ মুসাকে নিয়ে যাবে।'

চমকে জেগে ওঠার মত নড়ে উঠল এলিজাবেথ। বলল, 'কোথায় নিয়ে যাবে?'

'প্রথমে বারবারেতি, তারপর নাইরোবি। সেখান থেকে ইউরোপে। জান আহমদ মুসা জগতের সবচেয়ে মূল্যবান বন্দী।'

'জানি। তোমার খুব খুশী লাগছে, তাই না?' নির্বিকার কন্ঠে বলল এলিজাবেথ।

'খুশী হবো না মানে? আহমদ মুসার মত ভয়ংকর এবং বিশ্ববিখ্যাত লোক আমার হাতে ধরা পড়েছে। এ তো ঐতিহাসিক ভাগ্য।'

'তার প্রাণদন্ড হলে বুঝি তুমি আরও খুশী হবে?'

‘সেটা বড়দের ব্যাপার। তবে সে আমাদের নেতাসহ অসংখ্য লোককে খুন করেছে।’

‘সেটা আমি জানি। কিন্তু সে তোমাকে নতুন জীবন দিয়েছে।’

‘তুমি কি বলতে চাচ্ছ?’

‘তার জন্যে কি আমাদের কিছুই করণীয় নেই?’

‘কি আছে?’

‘আমার কি মনে হচ্ছে জান, তোমার হাত থেকে চাবিটা নিয়ে বন্দীখানার তালা খুলে ওঁকে বলি, আপনি চলে যান। আমার স্বামীকে বাঁচিয়েছিলেন। আমি আপনাকে বাঁচালাম।’

‘পাগল হয়েছ। তাহলে তোমার স্বামীই শুধু মরবে না। তুমি মরবে এবং আমাদের সন্তানও মরবে।’

এলিজাবেথ কেঁপে উঠল। তার মুখ হয়ে গেল ফ্যাকাশে।

সে দু’হাতে মাথা চেপে ধরে মাথাটা এলিয়ে দিল সোফায়।

রাত তখন ১২টা।

বারবারেতি থেকে ব্ল্যাক ক্রসের সে দলটা এল।

জর্জ ও তার স্ত্রী এলিজাবেথ জেগেই ছিল।

গেট খুলে দিল জর্জ।

এক তলা থেকে দু’তলায় উঠার সিঁড়ির মাঝখানের ল্যান্ডিং-এ দাঁড়িয়ে এলিজাবেথ।

বারবারেতি থেকে আসা ৫ সদস্যের ক্ষুদ্র দলটির নেতৃত্ব করছিল হ্যারি, ব্ল্যাক ক্রসের একজন অপারেশন কমান্ডার সে।

হ্যারি ঘরে ঢুকেই বলল, ‘বন্দী কোথায় নিয়ে চল জর্জ।’

‘না আগে উপরে চলুন। একটু কিছু মুখে দেবেন, তারপর এদিকে আসবেন।’

‘না না জর্জ, খাওয়া-দাওয়া সেরেছি। কোন সময় নষ্ট না করে আহমদ মুসাকে নাইরোবি পৌঁছাতে হবে। সুতরাং চল।’

বন্দীখানার দরজায় দাঁড়িয়ে হ্যারি বলল, 'আহমদ মুসাকে বেঁধে রাখা হয়েছে?'

'না।' বলল জর্জ।

'তাহলে তোমরা স্টেনগান বাগিয়ে দাঁড়াও।' সাথে আসা চারজনের দিকে চেয়ে বলল হ্যারি। এবং নিজেও সে তার রিভলবার হাতে তুলে নিল।

জর্জ খুলল দরজা।

ঘরে ঢোকার আগে হ্যারি চিৎকার করে বলল, 'আহমদ মুসা হাত তুলে দাঁড়াও। কোন প্রকার চালাকির চেষ্টা করলে তুমি ঝাঁঝরা হয়ে যাবে।'

'দেখুন, মিথ্যা ভয় দেখাবেন না। আমার দেহকে ঝাঁঝরা করার শক্তি আপনার নেই। আপনি শুধু পারেন আমাকে নাইরোবি পৌঁছাতে।' শান্ত কন্ঠে বলল আহমদ মুসা।

'হাত তোল।' আবার চিৎকার করে বলল হ্যারি।

'ওরা সার্চ করেছেন, আমার হাতে কোন অস্ত্র নেই। তবু যখন তোমাদের ভয়, তখন হাত তুললাম।' বলে আহমদ মুসা দু'হাত উপরে তুলল।

হ্যারি সবাইকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। চারজন স্টেনগান বাগিয়ে। আর রিভলবার বাগিয়ে হ্যারি আগে আগে চলছিল।

এলিজাবেথ সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়েছিল। ওখান থেকে বন্দীখানার ভেতরের সবকিছুই দেখা যায়।

এলিজাবেথের মনে দুঃখ, কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ লোকটার জন্যে সে কিছুই করতে পারলো না। এই দৃশ্যগুলো দেখতে গিয়ে তার মনের কষ্টটা বাড়ছিল। কিন্তু বিশ্ববিখ্যাত লোকটির সাথে ঘটনাগুলো না দেখে সে থাকতে পারছিল না।

হ্যারি ও জর্জ মাঝখানে। তাদের দু'পাশে দু'জন করে স্টেনগানধারী।

তারা আহমদ মুসার চারগজের মধ্যে পৌঁছলে আহমদ মুসা বলল, 'আপনারা দাঁড়ান।'

আকস্মিক এই নির্দেশে সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল।

তার কথার রেশ মিলিয়ে না যেতেই আহমদ মুসা আবার বলল, হ্যারিকে লক্ষ্য করে, 'আপনার বেল্টের সাথে হাতকড়া ঝুলছে ওটা আমার হাতে পরাতে আসছেন আমি জানি। কিন্তু তার আগে আমার কয়েকটা কথা আছে।'

'কি কথা?'

'আমাদের নেতৃবৃন্দকে বন্দী করে রেখেছেন, তাদের কি হবে? আমি বন্দী হলে তারা ছাড়া পাবে কিনা?'

'তোমার চিন্তা তুমি কর। ওদের কথা ভাবছ কেন?' বলল হ্যারি।

'তোমাদের শর্ত ছিল আমি আত্মসমর্পণ করলে তাদের তোমরা ছেড়ে দেবে।'

'সে শর্তটা ছিল তোমাকে হাতে পাবার একটা কৌশল। তোমাকে হাতে পাওয়ার পর সে শর্তের কোন ভ্যালিডিটি এখন নেই।'

'অর্থাৎ আমাকে পেলেও তাদের তোমরা ছাড়বে না?'

'দেখ এসব কথার আমি কোন জবাব দেব না। শুনে রাখ, ব্ল্যাক ক্রস-এর হাতে বন্দী হবার পর কেউ আর বেঁচে থাকে না। আমরা চাই না আমাদের কথা বলার জন্যে কোন বন্দীখানার বাইরে...'

তার কথা শেষ হতে পারলো না। আহমদ মুসার উপরে উঠানো দুই হাত হঠাৎ বিদ্যুৎ গতিতে নিচের দিকে ছুটে গেল। তার দেহটা প্রবল এক পাক খেল। পা দু'টি উপরে উঠে হাতুরির মত আঘাত করল হ্যারি এবং জর্জ দু'জনকে। তারপর পা দু'টি ভূমি স্পর্শ করার সংগে সংগেই স্প্রিং-এর মত তার দেহ সোজা হয়ে দাঁড়াল।

সে উঠে দাঁড়িয়েছিল ডানপাশের দ্বিতীয় স্টেনগানধারীর প্রায় গা ঘেঁষে। স্টেনগানধারীর বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি। আহমদ মুসা তার হাত থেকে স্টেনগান কেড়ে নিয়ে ট্রিগার চেপে তা ঘুরিয়ে আনল বামপাশের দুই স্টেনগানধারী থেকে তার ডান পাশের জন পর্যন্ত।

স্টেনগানধারী চারজনের চারটা লাশ পড়ে গেল বন্দীখানার মেঝেতে।

আহমদ মুসার পায়ের হাতুড়ির মত কিক খেয়ে হ্যারি এবং জর্জ দু'জনেই ছিটকে পড়ে গিয়েছিল মেঝের উপর।

আহমদ মুসা স্টেনগানের গুলী থামিয়ে দেখল, হ্যারি ও জর্জ দু'জনেই উঠে দাঁড়াচ্ছে।

আহমদ মুসা দেখেছিল হ্যারির হাত থেকে ছিটকে পড়া রিভলবারটা আহমদ মুসার পায়ের কাছে পড়ে আছে।

আহমদ মুসা স্টেনগান বাম হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি ডান হাতে রিভলবারটা তুলে নিল।

তুলে নিয়ে মাথা খাড়া করেই দেখল, হ্যারির হাত বোমা সহ তার পকেট থেকে বেরিয়ে আসছে।

আহমদ মুসা সময় নষ্ট করল না। রিভলবারের ট্রিগার টিপল।

গুলী গিয়ে বিদ্ধ করল হ্যারির কব্জীকে। আহত হাতটি বাম হাতে চেপে ধরে বসে পড়ল সে।

জর্জও পকেটে হাত দিয়েছিল।

'দেখুন জর্জ, পকেট থেকে হাত বের করবেন না। একটা নিষ্পাপ শিশুর আবেদন একবার আপনাকে বাঁচিয়েছে। এবার বাঁচবেন না।'

আহমদ মুসা একটু অমনোযোগী হয়ে পড়েছিল হ্যারির দিকে থেকে। সেই সুযোগে হ্যারির বাম হাত ডান হাত থেকে গড়িয়ে পড়া বোমাটি তুলে নিয়েছিল।

আহমদ মুসা শেষ মুহুর্তে তা দেখে ফেলেছে। তার রিভলবার দ্বিতীয় বার গর্জন করে উঠল। এবার বাম হাতের কব্জীতে নয়, বাম বাহুর সন্ধীতে গুলী গিয়ে আঘাত করল।

ছিটকে কাত হয়ে পড়ে গেল হ্যারির দেহ।

এই সময় এলিজাবেথ এবং তার মেয়ে চিৎকার করে ঘরে প্রবেশ করল।

সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়েছিল এলিজাবেথ। গোলা-গুলীর শব্দে তার মেয়ে মেরিও এসে দাঁড়িয়েছিল। এলিজাবেথের পাশে। তারা দু'জনেই কাঁপছিল। যখন আহমদ মুসার কন্ঠ চিৎকার করে উঠল জর্জের উদ্দেশ্যে এবং পরক্ষণেই গুলীর শব্দ হলো, এলিজাবেথ বুঝল তার স্বামীই এবার টার্গেট হয়েছে। সেই কারণেই কাঁদতে কাঁদতে এসে ঘরে ঢুকেছিল।

আহমদ মুসা এলিজাবেথকে লক্ষ্য করে বলল, 'আপনারা বেরিয়ে যান। এসব রক্ত ও হিংস্রতা থেকে শিশুদের দূরে রাখবেন।'

তারপর আহমদ মুসা জর্জকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'ঘরের চাবিটা আমাকে দিন। আমি তালা লাগিয়ে যাচ্ছি। আমি চলে যাবার পর বের হবেন।'

চাবিটা আহমদ মুসাকে দেবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না জর্জের দিক থেকে।

'আমি দু'বার আদেশ করে না মিঃ জর্জ।'

জর্জও তা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছে।

সে পকেট থেকে চাবিটা বের ফেলে দিতে যাচ্ছিল। আহমদ মুসা বলল, 'না না আমার হাতে দিবেন।'

হাতে চাবিটা নিয়ে আহমদ মুসা রিভলবার বাগিয়ে পিছু হটে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তালা লাগিয়ে দিল ঘরে।

এলিজাবেথ ও মেরী সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়েছিল। কাঁপছিল তারা।

আহমদ মুসা ছোট্ট মেরীর দিকে চেয়ে বলল, 'ভয় নেই মা। মা ছেলেকে ভয় করে না।' বলে আহমদ মুসা এলিজাবেথের দিকে চেয়ে বলল, 'আমি এই চাবিটা আপনাদের গেটের বাইরে ফেলে রেখে যাব। একটু খুঁজে নিয়ে দরজা খুলে দেবেন আমি চলে যাবার পাঁচ মিনিট পর। আমি চাই না তারা আমার পিছু নিক।'

আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়িয়ে যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে থমকে দাঁড়াল। এলিজাবেথের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'খেতে দেবার জন্যে ধন্যবাদ। সে খাওয়া আমাকে অনেক সাহায্য করেছে। চলতে পারছি আমি ভালোভাবে।'

কথা শেষ করে মুখ ঘুরিয়ে আবার চলতে শুরু করল আহমদ মুসা।

এলিজাবেথের গলায় এসে অনেক কথা ভীড় জমিয়েছিল। আপনি বাচ্চাদের এত ভালবাসেন কেন? আপনার বাচ্চা আছে কিনা? এমন শিশুতোষ মন নিয়ে আপনি এতবড় বিপ্লবী কি করে হলেন? কিন্তু কিছু বলতে পারলো না। কোন কথাই তার গলা থেকে বের হলো না। খেতে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ দিল। কিন্তু তার স্বামীর জীবন সে যে ফিরিয়ে দিয়েছে, এজন্যে ধন্যবাদটুকুও সে দিতে

পারলো না। শুধু বোবার মত চেয়ে থাকল সে আহমদ মুসার চলে যাওয়া পথের দিকে।

আহমদ মুসা বেরিয়ে যাবার কয়েক মুহুর্ত পর মেরী বলল, 'আম্মা আমি তো ওঁকে ভয় করিনি। মৃত্যু দেখে, রক্ত দেখে আমার ভয় লেগেছে।'

এলিজাবেথ কোন কথা না বলে ঘড়ির দিকে তাকাল। দেখল পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে। বলল মেরীকে, 'চল চাবি নিয়ে আসি।'

বলে মেরীর হাত ধরে বাইরে বেরুবার জন্যে সামনে পা বাড়াল।

'উঠি আব্বা।' বলল পুলিশ অফিসার ম্যাকা।

'উঠবি? তাড়া কেন?' বলল ওকোটা উচি, পুলিশ অফিসার জাগুয়াস ম্যাকার আব্বা। বয়স তার ১২০ বছরের মত।

'একজন মেহমান এসেছেন, তাকে হোটেলে রাখতে যেতে হবে।'

'কৈ কেউ বলেনি তো! কে মেহমান?'

জাগুয়াস ম্যাকা সব ঘটনা তার আব্বাকে জানিয়ে বলল, ' ঐ কমন্ড কাল্লা নামটার জন্যেই বোধ হয় তাকে আপন মনে হচ্ছে।'

'খেয়েছে মেহমান?'

'হ্যাঁ আব্বা, খাবার দিয়ে এসেছি। পাওলা নোয়ানি ওদিকে দেখছে। আমি আপনার সাথে কথা বলতে এসেছি।'

'ওঁর কেউ আছে সলো'তে?'

'না নেই।'

'তাকে 'মেহমান' বলছিস, আবার 'আপন মনে হচ্ছে' বলছিস, তারপর তাকে হোটেলে রাখতে যাচ্ছিস কেন?'

'মেহমানের সাথে দু'টি কুকুর আছে। ওরকম শিকারী কুকুর আমি কোনদিন দেখিনি। তার সম্পর্কে মনে হয় আরও কিছু জানার আছে। তাই হুট করে বাড়িতে এনে রাখা ঠিক মনে করছি না আব্বা।'

‘চাকুরি করছিস তো পুলিশের, সবকিছুতেই তোর এখন সন্দেহ ঢুকেছে। তবু তুই যা বলেছিস যুক্তিসংগত।’

‘তাহলে আসি আব্বা।’

‘আচ্ছা আয়।’

ম্যাকা পা বাড়াল বাইরে গেস্ট রুমে আসার জন্যে।

ওদিকে গেস্ট রুমের টেবিলে ব্ল্যাক বুলের খাবার রেখে ম্যাকা ব্ল্যাক বুলকে বলেছিল, ‘তুমি খাও। আমি আব্বার সাথে কথা বলে আসি। পাওলাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। কিছু দরকার হলে তাকে বলো।’

ম্যাকা চলে গেলে ব্ল্যাক বুল ঢুকেছিল টয়লেটে। মুখ হাত ধুয়ে ব্ল্যাক বুল ফ্রেস হয়ে গেস্ট রুমে ফিরে আসছিল।

দরজায় প্রচন্ড ধাক্কা খেল ব্ল্যাক বুল কারো সাথে। গেস্ট রুমের ভেতর থেকে কেউ যেন ছুটে বের হয়ে আসছিল। দরজায় পর্দা থাকায় কেউ কাউকে দেখতে পায়নি।

ধাক্কা খেয়ে ওপাশ থেকে কেউ সশব্দে পড়ে গিয়েছিল।

ব্ল্যাক বুল তাড়াতাড়ি ভেতর ঢুকে দেখেছিল একটি মেয়ে মাটিতে পড়ে আছে। বয়স তার একুশ-বাইশ হবে। স্বাস্থ্যবান, নাদুস-নুদুস চেহারা। আফ্রিকান সিংহীর মত দেখতে।

ব্ল্যাক বুল দ্রুত গিয়ে মেয়েটিকে টেনে তুলেছিল। বলেছিল, ‘স্যরি, আমার আরও সাবধানে আসা উচিত ছিল। লাগেনি তো কোথাও?’

মেয়েটি ব্ল্যাক বুলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। একবার তাকিয়েই চোখ বন্ধ করেছিল। বলেছিল, ‘লাগার কথা নয়। কিন্তু দেহের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না তো। বোধ হয় মাথার পেছনটায় একটু বেশী লেগেছে।’

‘দেখি।’ বলে ব্ল্যাক বুল মেয়েটির পেছনে গেল।

দেখল, মাথার পেছনে কিছু পরিমাণ জায়গা থেঁতলে গেছে। সামান্য রক্তও বেরিয়েছে।

ব্ল্যাক বুল তাকে টেনে চেয়ারে বসাল। বলল, ‘কিছুটা জায়গা থেঁতলে গেছে, রক্তও বেরুচ্ছে। আমার কাছে ভালো ওষুধ আছে লাগিয়ে দিচ্ছি।’

বলে ব্যাগ থেকে এ্যান্টিবায়োটিক স্পঞ্জ বের করে আঘাতের জায়গাটা পরিষ্কার করল। তারপর সেখানে তুলা দিয়ে এ্যান্টিবায়োটিক ক্রিম লাগিয়ে দিল। বলল, 'দেখবে বেদনাই হবে না।'

মেয়েটি এ্যান্টিবায়োটিক স্পঞ্জ ও লোশন হাতে নিয়ে নেড়ে-চেড়ে বলল, 'এমন ওষুধ আমাদের দেশে পাওয়া যায় না, কোথায় পেলেন?' বলে মেয়েটি তাকাল ব্ল্যাক বুলের দিকে। তার চোখে মুগ্ধ দৃষ্টি।

ব্ল্যাক বুল বাল্যকাল ডিঙাবার পর এই প্রথম একটি মেয়েকে বাধ্য হয়ে স্পর্শ করেছে এবং সান্নিধ্যে এসেছে। মেয়েটির এই মুগ্ধ দৃষ্টি তার কাছে নতুন।

ব্ল্যাক বুলের চোখ সে দৃষ্টির সামনে কেমন যেন বিব্রত হয়ে পড়েছিল। চোখ নামিয়ে নিয়েছিল সে। বলেছিল, 'এগুলো ফ্রান্সের তৈরী।'

মেয়েটি চেয়ার থেকে উঠতে উঠতে বলেছিল, 'আপনি বুঝি আমাদের মেহমান, ভাইয়ার সাথে এসেছেন?'

'হ্যাঁ ওঁর সাথে এসেছি, উনি আমার বিরাট উপকার করেছেন। তোমার নাম কি পাওলা?'

'কি করে জানলেন আমার নাম?'

'তোমার ভাইয়ার কাছ থেকে। তিনি খাবার দিয়ে বলে গেলেন, পাওলা আসছে, কিছু দরকার হলে তার কাছে চাইবে।'

'হ্যাঁ। ঘরে কাউকে না দেখে আপনাকে খুঁজতেই তো যাচ্ছিলাম। এই সময় এই এ্যাকসিডেন্ট হওয়ায় নতুন ওষুধ দেখা হলো।' বলে হেসে উঠেছিল পাওলা।

পাওলা খুব স্মার্ট ও খোলামেলা। বোধ হয় এটা আফ্রিকান কালো মেয়েদের সারল্যেরই একটা চিহ্ন।

পাওলা একটু থেমেই আবার বলেছিল, 'নিন খেতে বসুন।'

বলে সে টেবিলে খাবার সাজাতে লেগে গিয়েছিল।

'হাতটা একটু পরিষ্কার করে আসি।' বলে ব্ল্যাক বুল বাইরে গেল।

খাচ্ছিল ব্ল্যাক বুল।

পাওলা সামনে দাঁড়িয়েছিল। মাঝে-মধ্যে এটা-ওটা তুলে দিচ্ছিল।

একটি মেয়ের এক জোড়া চোখের সামনে তার পরিবেশনা এইভাবে খাওয়া ব্ল্যাক বুলের জীবনে এই প্রথম। জীবনে এই প্রথম তার মনে হচ্ছিল সে যেন বিশিষ্ট কেউ, যাকে একটি সম্মানী মেয়ে দাঁড়িয়ে থেকে যত্নের সাথে খাওয়াচ্ছে।

চোখ তুলে মেয়েটির দিকে তাকাতে লজ্জা বোধ হচ্ছিল ব্ল্যাক বুলের। এই লজ্জার অনুভূতিও তার কাছে নতুন।

হঠাৎ পাওলা বলে উঠেছিল, 'বাপরে! একটা ধাক্কায় আমি কুপোকাত। আমি দৌড়াচ্ছিলাম। ধাক্কায় আপনারই পড়ার কথা ছিল। কিন্তু ছিটকে পড়লাম আমি। আপনি সিংহের সাথে লড়তে পারবেন।'

ব্ল্যাক বুল হেসেছিল।

'হাসছেন যে!' বলেছিল পাওলা।

'গত রাতে আমি আমার দু'টি কুকুর নিয়ে সিংহের তাড়া খেয়ে গাছে উঠে বসেছিলাম।'

খিল খিল করে হেসে উঠেছিল পাওলা। বলেছিল, 'তারপর?'

'তারপর আর কি। দিন হলে সিংহ চলে গেলে গাছ থেকে নেমে সলো'র পথ ধরলাম। তোমার ভাইকে না পেলে আরও একরাত গাছে কাটাতে হতো।'

'কুকুর দু'টো আপনার সাথে কেন? আপনি কি কাজে কোথায় এসেছেন?'

'সে অনেক কথা। পরে বলব।'

'পরে কখন? আপনি তো চলে যাবেন।'

পাওলার চলে যাবেন শব্দটা ব্ল্যাক বুলের হৃদয়ের কোথায় যেন একটা সুঁচ ফুটিয়ে দিল। চলে যাওয়ার কথা যেন মন পছন্দ করছিল না।

'ও, তাই তো!' তবু কষ্ট করেই বলেছিল ব্ল্যাক বুল।

'এখন কোথায় যাবেন?'

'কোন একটা হোটেলে।'

'ও তাহলে তো সলো'তেই থাকছেন। আমাকে জানাবেন হোটেলের ঠিকানা?'

‘তোমার টেলিফোন নম্বারটা দিও।’

‘নম্বার লাগবে না। টেলিফোন তুলে বলবেন পুলিশ সুপারের বাসা। আর কিছু বলতে হবে না। আচ্ছা, আপনার কে আছেন?’

‘আমার?’ বলে ব্ল্যাক বুল কিছুক্ষণ চুপ করে থেকেছিল। তারপর বলেছিল, ‘দুভার্গ্য, আমার কেউ নেই।’

‘কেউ নেই!’ বলে বিস্ময় দৃষ্টি নিয়ে পাওলা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, এই সময় ঘরে প্রবেশ করল পাওলার ভাই জাগুয়াস ম্যাকা।

‘এই তো তোমার খাওয়া হয়ে গেছে। একটু কি রেস্ট নেবে?" ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল ম্যাকা।

‘না দরকার নেই।’

‘কুকুরকে খেতে দিয়েছিস?’ পাওলার দিকে চেয়ে প্রশ্নটা করেই আবার বলে উঠল, ‘পরিচয় হয়েছে এর সাথে? এ আমার ছোট বোন পাওলা নোয়ানি। কলেজ পাশ করেছে। পুলিশ ট্রেনিংও শেষ করেছে।’

‘হয়েছে। আমি ওকে দেখেই বুঝতে পেরেছি ও পাওলা।’

‘কুকুরকে আগেই খেতে দিয়েছি।’ বলল পাওলা।

‘ধন্যবাদ পাওলা।’ বলে ম্যাকা ব্ল্যাক বুলকে বলল, ‘তুমি তৈরী হয়ে নাও। আমি হ্যাটটা নিয়ে আসি।’

পাওলা থালা-বাসন গুছিয়ে কাজের মেয়ে ডেকে তার হাতে পাঠিয়ে তার পেছনে যেতে যেতে দরজায় গিয়ে ফিরে দাঁড়াল। বলল, ‘এখান থেকে যাওয়ার পর আমাকে কি জানাতে চেয়েছিলেন বলুন তো?’

‘কি?’

‘এই ভুলে গেছেন। হোটলের নাম।’

‘স্যরি, এটার কথা বলেছ। না আমি ভুলিনি।

হোটেলে উঠেছে ব্ল্যাক বুল।

হোটেলে উঠার পর একটু রেস্ট নিয়ে ব্ল্যাক বুল তার কুকুর দু’টি নিয়ে বেড়িয়ে পড়ল ‘সলো’কে দেখার জন্য।

দুইটি লক্ষ্য। এক, তার পিতৃপুরুষের সেই সলো গ্রামকে পায়ে হেঁটে দেখা। দুই, কুকুর দু'টিকে সুযোগ দেয়া তাদের ঘ্রান শক্তির মাধ্যমে আহমদ মুসাকে তারা খুঁজে বের করতে পারে কিনা। আহমদ মুসাকে এই সলোতই আনা হয়েছে সে নিশ্চিত।

প্রায় চার ঘন্টা পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াল ব্ল্যাক বুল। কিন্তু তার মনে হলো চার ঘন্টায় শহরের একটা অংশ মাত্র সে দেখতে পারল। তার ধারণার চেয়ে বন্দর-শহরটি অনেক বড়।

ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল ব্ল্যাক বুল। শেষে যেখানে সে পৌঁছল সেটা সংঘ নদী তীরের টুরিস্ট অবজারভেটরী। এটা একটা উঁচু টাওয়ার। এর মাথায় চড়ে পর্যটকরা আফিকার বনজ রূপ উপভোগ করে।

ক্লান্ত হলেও ব্ল্যাক বুলের লোভ হল তার মাতৃভূমিকাকে আরও ভালভাবে দেখা।

কুকুর দু'টি নিয়েই উপরে উঠল ব্ল্যাক বুল।

খুশী হলো উপরে উঠে।

ছোট বেলা থেকেই বনজংগল দেখছে ব্ল্যাক বুল। কিন্তু টাওয়ারে উঠে বনের যে রূপ দেখল, তা ছিল তার কাছে আকর্ষণীয়। জংগলের অন্ধকার যাকে বলে, সেই অন্ধকার দেখল ব্ল্যাক বুল দক্ষিণে তাকিয়ে। গোটা দক্ষিণ দিগন্ত ঘন অন্ধকারে ঢাকা। সে অন্ধকাররে দিকে তাকালে আনন্দ নয়, বুকটা কেঁপে উঠে ভয়ে। খুব কাছেই সংঘ নদীর পানি। কালোর প্রতিবিম্ব তার পানিকে কালি বানিয়ে দিয়েছে।

টাওয়ারে ছোট একটা রেস্টুরেন্ট আছে। আছে একটা টেলিফোন বুথ।

পাওলার কাছে টেলিফোন করার কথা মনে পড়ল ব্ল্যাক বুলের। হোটেলের নাম জানিয়ে তাকে টেলিফোন করবে এ ওয়াদা সে দিয়ে এসেছে।

টেলিফোন করল ব্ল্যাক বুল।

ওপার থেকে জবাব এল, 'হ্যালো, আমি পাওলা।'

'চিনতে পেরেছ?' বলল ব্ল্যাক বুল।

হাসল পাওলা। বলল 'চিনতে না পারলে নাম জিজ্ঞেস করলাম না কেন?'

‘ধন্যবাদ।’

‘না, ধন্যবাদ আমারই দেবার কথা।’

‘কেন?’

‘এই টেলিফোন করার জন্য, মনে থাকার জন্য। কেমন লাগছে হোটেল?’

‘বোঝার সময়ই পাইনি। হোটেলে ব্যাগেজ রেখেই বেরিয়ে এসেছি। পায়ে হেঁটে শহর দেখার জন্য।’

‘শহর কোথায়, বলুন বন-জংগল দেখার জন্য। তা পায়ে হেঁটে কেন?’

‘সলো’র মাটির স্পর্শ আমার কাছে সোনার চেয়ে মুল্যবান মনে হচ্ছে। ভালো লাগছে এর বন-জংগলের দিকে চেয়ে থাকতে।’

‘সলো’র সাথে এই প্রেমে পড়ার কারণ?’

‘বলবো একদিন।’

‘এ নিয়ে দু’বার বললেন ‘একদিন’ বলবেন। সে দিনটি কবে আসবে?’

‘আমি জানি না।’

‘দেখুন, আমি পুলিশের ট্রেনিং নিয়েছি। আমি কিছু বুঝতে পারি। আমার মনে হচ্ছে, বড় একটি মিশন নিয়ে আপনি সলো এসেছেন। বলবেন না আমাকে?’

‘শুনে কি করবেন?’

‘আর কিছু না হোক, আপনার চিন্তার অংশীদার হতে পারি।’

‘শুনতে নতুন লাগছে। ধন্যবাদ।’

‘নতুন লাগছে কেন?’

‘এমন অংশীদার কখনও আমার হয়নি।’

‘এখন বলতে আপত্তি আছে?’

‘বলব দেখা হলে।’

‘কখন হোটেলে ফিরবেন?’

‘জানি না। এখন রাখি। টাওয়ারের ব্যস্ত পাবলিক বুথ তো।’

‘দুঃখিত, ঠিক আছে। আমরাও এখনি একটু বেরুব। বাই।’

‘বাই।’

ব্ল্যাক বুল টাওয়ার থেকে সামান্য উত্তরে নদীর ধারে ওয়াশিংটন মনুমেন্টের মত একটা মিনার দেখতে পেল।

টাওয়ার থেকে নেমে ব্ল্যাক বুল মনুমেন্টের দিকে চলল।

মনুমেন্ট এলাকাটি খুবই সুন্দর। মনুমেন্ট এলাকার তিনদিক ঘিরে সবুজ গাছের সুশৃঙ্খল বেষ্টনি। বেষ্টনি নদীর পানি পর্যন্ত নেমে গেছে।

সবুজ বেষ্টনির মাঝখানে দাঁড়িয়ে মনুমেন্টটি।

মনুমেন্ট শীর্ষে উতকীর্ণ শিরোনামটি অনেক দূর থেকে পড়া যায়। লেখা আছে "স্মরণ স্তম্ভটি দেশ মাতৃকার হারানো সন্তানদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত।"

'হারানো সন্তান' বলতে কি বুঝানো হয়েছে ব্ল্যাক বুল বুঝতে পারলো না। দেশের উতসর্গীত জীবন জানা অজানা সৈনিক অথবা নাগরিকদের স্মরণ স্তম্ভ সে দেখেছে। কিন্তু 'হারানো' বলতে কাদের বুঝানো হয়েছে?

ভেতরে প্রবেশ করল ব্ল্যাক বুল।

ভেতরে লোকজন তেমন নেই। যারা আছে, তারা অধিকাংশই শিশু ও কিশোর। তারা মনুমেন্টের চারদিকের বিস্তৃত লনে ছুটে বেড়াচ্ছে, খেলাধুলা করছে।

ব্ল্যাক বুল গিয়ে দাঁড়াল মনুমেন্টের সামনে। কংক্রিটের তৈরী স্মরণ স্তম্ভে বসানো শ্বেত পাথরে খোদিত নামের সারি দেখতে পেল ব্ল্যাক বুল।

দেখল সে, মনুমেন্টের এ দিকটা মনুমেন্টের সম্মুখ দিক নয়। সংঘ নদীর পাশটা এর সম্মুখ দিক।

ব্ল্যাক বুল ঘুরে মনুমেন্টের সম্মুখ দিকে দাঁড়াল।

দেখল, সামনের প্রশস্ত শ্বেত পাথরে লেখা অনেক কথা। তারপর নামের শুরু।

ব্ল্যাক বুল পড়ার জন্য আরও সামনে এগিয়ে গেল।

দেখল, লেখার উপর একটি শিরোনাম। শিরোনামটি হলোঃ 'স্বজন হারানোর বিয়োগান্ত সেই ঘটনা।'

শিরোনামের পরেই সেই ঘটনার বিবরণ।

পড়তে লাগল ব্ল্যাক বুলঃ

‘তখন দাস ব্যবসায়ের অন্ধকার যুগ। সেই অন্ধকার যুগের এক ভোর বেলা। সমৃদ্ধ গ্রাম সলো’র মানুষ গভীর ঘুমে অচেতন। শত বন্দুকের গুলীর শব্দে তাদের ঘুম ভাঙল। শুরু হলো দাস ব্যবসায়ীদের লেলিয়ে দেওয়া সৈন্যের বন্দুক, কামানের বিরুদ্ধে তীর-ধনুকের অসম লড়াই। গ্রামবাসীদের তীর-বর্শার সঞ্চয় শীঘ্রই শেষ হয়ে গেল। যুদ্ধ শেষ হলো গ্রামের দুইশ’ জনের নিহত এবং প্রায় তিনশ’ জনের বন্দী হওয়ার মধ্যে দিয়ে। বন্দী তিনশ’ জনের মধ্য থেকে যুবক, যুবতী বাছাই করে দেড়শ’ জনকে তিনটি বড় বোটে করে ওরা ধরে নিয়ে যায়। সলোর জীবনে এটাই ছিল সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্যের দিন। যারা নিহত হলো, তারা হলো শেষ। তাদের লাশ ছিল দুঃখের মধ্যেও একটা সান্ত্বনা। কিন্তু দাস ব্যবসায়ীরা যাদের ধরে নিয়ে গেল, তারা বেঁচে থেকেও মৃত্যু যন্ত্রণায় নিমজ্জিত হলো এবং আত্মীয়-স্বজনদের বুকে রেখে গেল সারা জীবনের জন্য যন্ত্রণার জ্বলন্ত অঙ্গার। সেই যন্ত্রণার ইতি হয়নি এখনও। সেই যন্ত্রণারই এক প্রতিবিম্ব এই কালো মিনার। যন্ত্রণার এই কালো মিনারে উতকীর্ণ করে রাখা হলো আমাদের সেই হারানো সন্তানদের নামগুলো। পাঠক, এখানে এক মুহুর্ত হলেও দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করুন আমাদের হারানো মানিকদের জন্য- ঈশ্বর যেন তাদের আত্মার শান্তি দান করেন।’

পড়তে পড়তে ঝর ফর করে অশ্রু নেমে এল ব্ল্যাক বুলের দু’চোখ দিয়ে। অবিরতভাবে তা গড়িয়ে চলল গন্ড বেয়ে।

ঝাপসা চোখেই আকুলভাবে পড়তে লাগল নামগুলো। প্রথম নামই পড়ল, ‘কমন্ড কাল্লা’ তার দাদার নাম।

নামটা পড়ার সাথে সাথেই কান্নার এক প্রবল উচ্ছাস এসে গ্রাস করল ব্ল্যাক বুলকে।

কয়েক মুহুর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে চোখ মুছল ব্ল্যাক বুল। মুখ এগিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে চুমু খেল ‘কমন্ড কাল্লা’ নামের উপর।

চুমু দিতে গিয়ে আবার অপ্রতিরোধ্য কান্নায় ভেঙে পড়র ব্ল্যাক বুল।

একটি হাতের সযত্ন স্পর্শ অনুভব করল ব্ল্যাক বুল তার কাঁধে। চমকে উঠে ফিরে তাকাল। তার কাঁধে হাত রেখে দাড়িয়ে আছে জাগুয়াস ম্যাকা, তার পাশে পাওলা। দু'জনের চোখে-মুখে রাজ্যের বিস্ময়!

ব্ল্যাক বুল কুকুরের চেন হাত থেকে ছেড়ে দিয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করে দু'হাতে দু'টি চোখ মুছে নিয়ে বলল, 'আপনারা? এখন? এখানে?' ব্ল্যাক বুলের চোখে বিস্ময়।

বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি ম্যাকা ও পাওলার চোখ থেকে।

'প্রতি বছর এই দিন আমাদের পরিবারের সকলেই একবার এইখানে আসি' বলল ম্যাকা।

'এই দিন কেন?'

'এই দিন এই স্থান থেকে অন্যান্য অনেকের সাথে তুমি যে নামটায় চুমু দিলে সেই আমাদের কমন্ড কাল্লা চিরতরে হারিয়ে গেছে। প্রতিবছর এদিন এসে আমরা তার প্রার্থণা করি, আর তার উদ্দেশ্যে নদীতে ফুল ভাসিয়ে দেই।'

ব্ল্যাক বুলের চোখে তখন বিস্ময় ঠিকরে পড়ছে। বলল, 'কমন্ড কাল্লার উদ্দেশ্যে কেন? কমন্ড কাল্লা আপনাদের কে?'

'কিন্তু তার আগে তুমিবল, তুমি এমন আকুল হয়ে কাঁদছ কেন? কমন্ড কাল্লার নামে চুমু দিলে কেন?

ব্ল্যাক বুলের চোখে আবার অশ্রু নামল। সে মুখ নিচু করল। অল্পক্ষণ পরে মুখ তুলল। অশ্রু ধোয়া তার মুখ। আবেগে কাঁপছে তার দুটো ঠোঁট। বলল সে, 'কমন্ড কাল্লা আমার দাদু।' এক প্রবল উচ্ছাসে ভেঙে পড়ল তার কন্ঠ।

ব্ল্যাক বুলের মুখ থেকে বেরুনো শব্দগুলো যেন এক বজ্রপাত। বিস্ময়ের প্রচন্ড আঘাতে ম্যাকা ও পাওলা কাঠের মত শক্ত হয়ে গিয়েছিল, নিজেদের যেন হারিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু তারপরেই কাঠের বুকে নামল যেন অশ্রুর ঝরণা। বাঁধ ভাঙা এক উচ্ছাসে ভেঙে পড়া ম্যাকা পাগলের মত জড়িয়ে ধরল ব্ল্যাক বুলকে। তার চোখ থেকে নামল অশ্রুর বন্যা।

বিস্ময়ে কাঠ হয়ে যাওয়া পাওলার দু'চোখ থেকে নামছিল অশ্রুর অবিরল ধারা।

কিছুক্ষণ পর ম্যাকা নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে বলল, ব্ল্যাক বুলকে উদ্দ্যশ্য করে, 'তোমার দাদু কমন্ড কাল্লাহ এবং আমাদের দাদী দুই আপন ভাইবোন। সেই দুর্ভাগ্যের দিন তোমার দাদুর হারিয়ে যাওয়া এবং তার বাপ-মা নিহত হওয়ার পর পরিবারের একমাত্র জীবিত মানুষ ছিলেন আমাদের দাদী।

অশ্রু রুদ্ধ কন্ঠে 'ভাই' বলে ব্ল্যাক বুল আবার জড়িয়ে ধরল ম্যাকাকে। ম্যাকাও 'আমার ভাই' বলে জড়িয়ে ধরল ব্ল্যাক বুলকে।

এক সময় ব্ল্যাক বুল ম্যাকাকে ছেড়ে দিয়ে তাকাল পাওলার দিকে। ব্ল্যাক বুল পাওলার দিকে তাকানোর সাথে সাথে পাওলার দু'গন্ডে শুকিয়ে যাওয়া অশ্রুর ধারা আবার সজীব হয়ে উঠল হঠাৎ চোখ ফেটে নেমে আসা নতুন অশ্রুতে। কালো পাওলার কালো গ্রানাইটের মত মসৃন ঠোঁট দু'টি কেঁপে উঠল প্রচন্ড এক আবেগে।

'পাওলা!' আবেগ রুদ্ধ কন্ঠে ডাকল ব্ল্যাক বুল।

সে ডাক বোধ হয় ধ্বসিয়ে দিল পাওলার বিবেচনার বাঁধকে। তার আবেগের নদীতে যেন জেগে উঠল প্রচন্ড বন্যা। যেন তারই প্রচন্ড ধাক্কায় পাওলা গিয়ে আছড়ে পড়ল ব্ল্যাক বুলের বুকে।

আবেগাপ্লুত ব্ল্যাক বুল এই অপরিচিত আকস্মিকতায় প্রথমটায় বিমুঢ় হয়ে পড়ল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে আলতোভাবে পাওলার পিঠে হাত বুলাল।

তারপর পাওলাকে ধরে নিয়ে ম্যাকা'র সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'ভাইয়া, পাওলা এখনও ছোটই আছে। কিন্তু খুব ভালো মেয়ে পাওলা।'

ম্যাকার চোখে তখনও অশ্রু। কিন্তু তার ঠোঁটে ফুটে উঠল একটা সস্নেহ হাসি। বলল, আমাদের জন্যে নতুন সুখবর যে, পাওলাকে তুমি ভাল বলেছ। ওর অত্যাচারে সবাই অতিষ্ঠ। তাই তো ওকে পুলিশে চাকুরী দিচ্ছি।'

'ভাইয়া......।' চোখ মুছে পাওলা বলতে শুরু করল।

ম্যাকা তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'আমি তোকে কিছু বলিনি। কমন্ড কাল্লা তোকে ভাল বলল তাই তোকে কিছু তথ্য দিতে যাচ্ছিলাম। যাক এসব, সবাই

এখন চল যাই বাসায়। আব্বাকে এ সুখবর তাড়াতাড়ি দিতে না পারলে বুক ফেটে যাবে আমার।'

'ভাইয়া, আমার নাম 'কমন্ড কাল্লা' নয়। এখানে এসে এই নাম আমার এ জন্যেই বলেছি যাতে এই নামের সূত্র ধরেও যদি আমার দাদু বংশের কাউকে খুঁজে পাই।' রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলল ব্ল্যাক বুল।

'তোমার উদ্দেশ্য স্বার্থক হয়েছে। তোমার কমন্ড কাল্লা নামই তোমার প্রতি আমাকে আকৃষ্ট করে। যার ফলে আগ্রহ করে তোমাকে গাড়িতে নেই, বাড়িতে নিয়ে আসি।'

একটু থেমেই ম্যাকা আবার বলল, 'তাহলে তোমার নাম কি?'

নাম আমার একাধিক হয়েছে। ছোট বেলা জর্জ জায়েদী, তারপর ব্ল্যাক বুল এবং অবশেষে 'আবদুল্লাহ্ জায়দ রাশিদী।'

'এতো মুসলিম নাম।' বিস্মিত কন্ঠে বলল ম্যাকা।

'হ্যাঁ, মুসলিম নাম।'

'তার মানে? তুমি মুসলিম? তোমার এত নাম পরিবর্তনের কারণ?

'আমার দীর্ঘ দুঃখের ইতিহাসের সাথে এর কারণ যুক্ত আছে।' গভীর বেদনার্ত কন্ঠে বলল ব্ল্যাক বুল।

ম্যাকা ও পাওলা দু'জনের মুখও গম্ভীর হয়ে উঠল। ম্যাকা ব্ল্যাক বুলের কাঁধে হাত রেখে বলল, 'চল ভাই বাসায় ফিরি, তোমাদের ইতিহাস শোনার আগে আর কিছুই ভাল লাগবে না।'

'চলুন।' বলে ব্ল্যাক বুল কুকুরের চেন তুলে নিতে যাচ্ছিল।

তার আগেই চেন দু'টি তুলে নিল পাওলা। বলল, 'কুকুর দু'টি এখন আমার।'

বলে পাওলা কুকুর দু'টির পিঠ ও মাথা নেড়ে আদর করল। কুকুর দু'টিও লেজ নেড়ে গা ঘেঁষে দাঁড়াল পাওলার। যেন নতুন প্রভূকে তারা স্বাগত জানাচ্ছে।

এত তাড়াতাড়ি আমার টম, টমি'কে তুমি দখল করে ফেললে? এ দু'টির প্রতি কিন্তু ভাইয়ারও একটা দাবী ছিল।' হেসে বলল ব্ল্যাক বুল।

ম্যাকা হাসল। বলল, 'পাওলা'র পক্ষে আমি আমার দাবী পরিত্যাগ করলাম।'

কথা শেষ করেই 'এস, আর দেরী নয়' বলে ম্যাকা হাঁটতে শুরু করল।

গেটের বাইরে এসে সবাই ম্যাকার জীপে উঠল। সামনে ড্রাইভিং সিটে বসল ম্যাকা। আর পেছনের সিটে ব্ল্যাক বুল এবং পাওলা।

গাড়ি চলতে শুরু করল ম্যাকাদের বাড়ির উদ্দেশ্যে।

ব্ল্যাক বুল বলছিল কাহিনী। তার দাদু কমন্ড কাল্লার কাহিনী।

জাগুয়াস ম্যাকা, তার আব্বা, পাওলা এবং ম্যকার স্ত্রী, ফুফু সবাই পিনপতন নীরবতার মধ্যে শুনছিল। ব্ল্যাক বুলের মুখে কমন্ড কাল্লার কাহিনী।

বৃদ্ধের পাশে বসেছিল ব্ল্যাক বুল। আর তাদের সামনে অর্ধচন্দ্রাকারে বাড়ির সবাই।

রাজ্যত্যাগী রাজা যায়দ রাশিদীর সাথে কমন্ড কাল্লার ইয়াউন্ডি পৌঁছা পর্যন্ত কাহিনী বলে থামল ব্ল্যাক বুল।

সকলেরই চোখে অশ্রু।

'তারপর?' বৃদ্ধ বলল।

ব্ল্যাক বুল পরবর্তী কাহিনী শুরু করল। কি করে সুলতান যায়দ রাশিদীর একমাত্র পুত্র মারা গেল, কেন যায়দ রাশিদী হজ্জ্ব যাত্রা বন্ধ করে ইয়াউন্ডিতে ছেলের কবরের পাশে স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত নিলেন, মহৎ হৃদয় যায়দ রাশিদী কমন্ড কাল্লাকে স্বাধীনভাবে যেখানে ইচ্ছা চলে যেতে অনুমতি দিলেও তিনি থেকে গেলে কি করে যায়দ রাশিদী তাকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করে একমাত্র কন্যার সাথে বিয়ে দিলেন।

একটু থামল ব্ল্যাক বুল। আবার শুরু করল, 'এইভাবে কমন্ড কাল্লা একজন শাহজাদী এবং বিপুল বিত্ত-বৈভবের মালিক হলেন। কিন্তু সুখ সইল না তার কপালে। খৃষ্টান মিশনারীরা হত্যা করল সুলতান যায়দ রাশিদী এবং তার

স্ত্রীকে। সকল সম্পত্তি আত্মসাতের জন্য সম্পত্তি একমাত্র উত্তরাধিকারী কমন্ড কাল্লার স্ত্রীকেও বন্দী করল এবং কমন্ড কাল্লাকে তাদের একজন নিকৃষ্ট কর্মচারী হতে বাধ্য করল। তার কোন স্বাধীনতা ছিল না, বাইরে বেরুবার কোন সুযোগ ছিল না। শুরু হয়েছিল তার এক ধরনের দাস জীবন। এ দুর্বিসহ জীবন ছিল আমার আব্বার এবং আমিও তা ভোগ করে এসেছি।'

'তোমার সে কাজটা কি ছিল?' জিজ্ঞেস করল ম্যাকা।

'সে এক ঘৃনিত কাজ। ঘাতকের দায়িত্ব পালন। তারা যাদের বন্দী করে আনত, তাদের শিরচ্ছেদ করা চিল আমার কাজ।'

একটু থামল ব্ল্যাক বুল। তারপর বলল, 'আমার হতাশ ও অন্ধকারময় জীবন এভাবেই হয়ত কেটে যেত, কিন্তু জীবন চিত্র আমার পাল্টে গেল হঠাৎ। একজন মহান মানুষ এবং মহাবিপ্লবীকে ওরা বন্দী করে আনল। তার কাছ থেকেই আমি প্রথম জানলাম আমি মানুষ, মানুষ হিসেবে শির উঁচু কারে আবার মানুষের মধ্যে দাঁড়াতে পারি। তিনি ওদের পরাভূত ও ধ্বংস করে নিজে মুক্ত হলেন এবং করে অন্ধকার জিন্দানখানা থেকে আমাকেও মুক্ত করে আনলেন। এবং প্রতিষ্ঠা করলেন যায়দী রাজবংশের এক উত্তরসুরী হিসেবে, যায়দ রাশিদীর বাড়ি ও প্রচুর সম্পদও আমার হাতে তুলে দিলেন। আমি নতুনভাবে আমার পিতৃধর্ম ইসলামে ফিরে এলাম। আমার নতুন নাম হলো আবদুল্লাহ যায়দ রাশিদী। আমার পিতা যেহেতু প্রকাশ্যে ইসলাম ধর্ম পালন করতে পারতেন না, আমার মুসলিম নামও রাখা সম্ভব ছিল না। তাই তিনি আমার নাম রেখেছিলেন জর্জ রাশিদী। নামের অর্ধেক খৃস্টান, অর্ধেক মুসলমান। আর ঘাতক হিসেবে ওরা আমার নাম রেখেছিল ব্ল্যাক বুল।' থামল ব্ল্যাক বুল।

'তারপর? এখানে এলে কেমন করে? আমাদের কথা মনে পড়ল কি করে?' বলল ম্যাকা।

সংগে সংগে উত্তর দিল না ব্ল্যাক বুল।

পাশের বালিশটায় একটু হেলান দিয়ে বসল। বলল, 'সে অনেক কথা। আমি আসিনি। আমাকে অন্য একজন সাথে করে নিয়ে এসেছেন ভিন্ন এক মিশনে। ভাগ্যই আমাকে এখানে এইভাবে নিয়ে এসেছে।'

‘কার সাথে? কি মিশন?’ বলল পাওলা।

‘বিরাট একটি মিশন। মিশনটা আমার নয়। আমি একজন সহযোগী মাত্র। বলা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছি না।’

‘মিশন যার, যার সাথে তুমি এসেছ সে কোথায়?’ বলল ম্যাকা।

ব্ল্যাক বুলের মুখ ম্লান হয়ে উঠল। বেদনা ভারাক্রান্ত মুখ নিচু করল সে।

ব্ল্যাক বুলের বেদনাক্লিষ্ট মুখের দিকে চেয়ে সকলে বেদনা অনুভব করল।

কেউ কথা বলল না।

ব্ল্যাক বুলই কথা শুরু করল আবার। বলল, ‘উনি আহত অবস্থায় বন্দী হয়েছেন।’ ব্ল্যাক বুলের কথা ভারী, অশ্রু ভেজা।

অস্বস্তি এবং বেদনার ছায়া নামল গোটা ঘরে।

নীরবতা ভেঙ্গে মুখ খুলল ম্যাকা। বলল, ‘তার জন্যে এমন ভালবাসা, কে সে?’

‘এ সেই লোক যে আমাকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে এসেছে, যে আমাকে নতুন জীবন দিয়েছে, যাকে আমি আমার জীবনের চেয়ে বেশী ভালোবাসি।’

‘কোথায় সে আহত এবং বন্দী হলো?’

‘সংঘ হাইওয়ের যেখানে কাদেলী রোড এসে মিশেছে সেখানে।’

সোজা হয়ে বসল ম্যাকা। তার চোখ-মুখ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। বলল, ‘আমি বারবারেতি থেকে আসার পথে ওখানে চারটি লাশ দেখেছি। আর হাইওয়ের পাশে কাদেলী রোডের মুখে গুলীতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া একটা জীপ দেখেছি। এই ঘটনার কথা তুমি বলছ?’

‘গুলীতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া জীপটি করেই আমরা এসেছিলাম। আর ঐ চারজন নিহত হয়েছে আমার সাথীর হাতে।’

‘তোমার সাথীর হাতে? তাহলে তোমার সাথী বন্দী হলো কিভাবে?’

‘ওদের ওঁত পেতে থাকা চারটি গাড়ি আকস্মিকভাবে আমাদের ঘেরাও করে ফেলে এবং হঠাত করেই বন্দুকের মুখে আমার সাথীকে ধরে নিয়ে যায় হাইওয়ের উপর। ওরা বন্দুকের বাঁট দিয়ে আমার সাথীকে মারধোর করে ওঁকে

রক্তাক্ত করে ফেলে। কিন্তু অসম্ভব রকমের সামান্য সুযোগের সদ্ব্যবহার করে আমার সাথী ওদের চারজনকে হত্যা করে। পঞ্চম জনকেও যখন গুলী করতে যাবে, এ সময় একটি পাঁচ ছয় বছরের শিশু হঠাত সামনে এসে তার পিতাকে হত্যা না করার আবেদন জানায়। আমার সাথী রিভলবার নামিয়ে নেয়। এই সুযোগে পঞ্চম ব্যক্তি তাকে লক্ষ্য করে গুলী করে। সে নিজেকে বাঁচাতে পারলেও হাত আহত হয় এবং তার হাত থেকে রিভলবার ছিটকে পড়ে যায়। ঠিক এই সময় আরও দু'টি গাড়িতে আরও চারজন সেখানে হাজির হয়। বন্দী হয়ে যায় আমার সাথী।'

'তুমি বাঁচলে কেমন করে?'

'আমি কৃষ্ণাঙ্গ, আমাকে ওরা গাইড মনে করেছে। তাই গুরুত্ব দেয়নি। অবশ্য শেষে ব্রাশ ফায়ার করেছিল আমার গাড়ি লক্ষ্যে। মেঝেতে শুয়ে থাকায় বেঁচে গেছি।'

'ওরা কি সবাই শ্বেতাংগ ছিল?'

'ওরা শ্বেতাংগ ছিল। আমার সাথী এশিয়ান।'

'এশিয়ান? বল তো ঐ শ্বেতাংগরা কারা?'

ব্ল্যাক বুল একটু দ্বিধা করল। তারপর বলল, 'ওরা ব্ল্যাক ক্রস-এর লোক।'

'ব্ল্যাক ক্রস?' ম্যাকা'র কন্ঠ প্রায় চিৎকার করে উঠল।

'তুমি চেন ওদের?' বলল বৃদ্ধ, ম্যাকার আব্বা।

সংগে সংগে উত্তর দিল না ম্যাকা। সে অনেকটা বিস্ময়-বিমুঢ় হয়ে পড়েছিল। একটু সময় নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ চিনি আব্বা। সমগ্র পৃথিবী বিস্তৃত অত্যন্ত শক্তিশালী এবং দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসবাদী সংগঠন।'

থামল ম্যাকা। একটু পর বলল, 'আমাদের উপর সরকারী নির্দেশ আছে পারতপক্ষে ওদের কাজে যেন আমরা নাক না গলাই। ওদের এড়িয়ে চলতে বলা হয় আমাদেরকে।'

কথা শেষ করে ব্ল্যাক বুলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওদের সাথে তোমার সাথীর ঝগড়া কিসের? তোমার সাথীর মিশনের লক্ষ্য কি ওরা?'

'হ্যাঁ।'

বলে একটু থামল ব্ল্যাক বুল। চিন্তা করল। তারপর বলল, 'ঝগড়ার কাহিনীটা বিরাট।' এরপর একে একে ব্ল্যাক বুল ক্যামেরুনে কি করে ব্ল্যাক ক্রস সমূলে উৎপাটিত হলো এবং ব্ল্যাক ক্রসের সর্বোচ্চ নেতা নিহত হলো কার হাতে, কি করে ওরা বারবারেতি'র ইসলামী কনফারেন্স স্থানে বিস্ফোরন ঘটিয়ে আন্তর্জাতিক মুসলিম নেতাদের পনবন্দী করল তার বিস্তারিত বিবরন দিয়ে বলল, 'ব্ল্যাক ক্রস শর্ত দিয়েছে আমার সাথী আত্মসমর্পন করলে তবেই তারা ছেড়ে দেবে মুসলিম নেতাদের। আমার সাথী তাদের মুক্ত করার লক্ষ্য নিয়েই আসছিলেন মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রে।'

ওদিকে বিস্ময়ে থ' হয়ে গেছে ম্যাকা। তার চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠেছে বিস্ময়ে। ব্ল্যাক বুল থামলে সে প্রায় চিৎকার করে উঠল, 'কি বলছ তুমি! ওখান থেকে কেউ বাঁচেনি। মুসলিম নেতৃবৃন্দরা সবাই অস্বাভাবিক রকম শক্তিশালী বিস্ফোরনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছেন। আমরা এটা জানি, গোটা দুনিয়া এটা জানে। ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) একটি বিশেষজ্ঞ দলও ঘটনাস্থল পরীক্ষা করে গেছে। তারাও আমাদের সাথে একমত। তুমি নতুন কথা বলছ।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন। ব্ল্যাক ক্রস এ রকম বিশ্বাসই জন্মিয়েছে। কিন্তু আসল ঘটনা হলো মুসলিম নেতৃবৃন্দকে কিডন্যাপ করার পর তারা বিস্ফোরন ঘটিয়েছে।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ, কোন সন্দেহ নেই।'

'কি করে তোমরা জানলে?'

'ওরা চিঠি পাঠিয়েছে। তাতে তারা ঐ শর্ত উল্লেখ করেছে।'

'তোমার সাথীকে হাতে পাওয়ার জন্যে তাদের এটা একটা ফাঁদও তো হতে পারে।'

'শুধু চিঠি নয়, আরও প্রমান পাওয়া গেছে।'

ব্ল্যাক বুল থামলেও ম্যাকা কোন কথা বলল না। ভাবছিল সে। বেশ কিছুক্ষন পর বলল, 'হতেও পারে। ব্যাপারটা আমাদের পুলিশের জন্যে হবে বিব্রতকর।'

বলে একটু থামল। বলল তারপর, 'কিন্তু তোমার এই সাংঘাতিক সাথীটা কে, যে একা লড়তে এসেছে, ব্ল্যাক ক্রসের সাথে এবং তাদের বিরুদ্ধে লড়ে জয়ী হয়েছে ক্যামেরুনে?'

'শুধু ক্যামেরুন নয়। ফ্রান্সেও লড়েছে এবং জয়ী হয়েছে।'

'এটাও যে অবিশ্বাস্য কথা বলছ। এমন ব্যক্তিত্ব কে আছে?'

'আছে।'

'কিন্তু কে সে?'

একটু দ্বিধা করল ব্ল্যাক বুল। তারপর বলল, 'বলব, কিন্তু একটা শর্ত।' একটু থামল। তারপর বলল, 'আপনি পুলিশের লোক। আমার অনুরোধ তাঁর নাম বা পরিচয়টা পুলিশ বা সরকারের জানা ঠিক হবে না।'

ভ্রু কুঞ্চিত করল ম্যাকা।

একটু সময় নিয়ে বলল, 'তোমার শর্ত মানব যদি তিনি মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রের লোক না হন এবং এখানকার কোন নাগরিক বা দেশের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন অপরাধ যদি তিনি করে না থাকেন।'

'আপনার শর্ত মানলাম।'

বলে একটা ঢোক গিলল ব্ল্যাক বুল। তারপর বলল, 'তিনি আহমদ মুসা।'

ব্ল্যাক বুল নাম উচ্চারণের সাথে সাথে শক খাওয়ার মত এক ত্বড়িত তরঙ্গ খেলে গেল ম্যাকা'র গোটা দেহে। তার মুখ-চোখে ফুটে উঠল প্রশ্নমাখা এক বিস্ময়। তার চোখ দুটি স্থির হয়ে কিছুক্ষন চেয়ে থাকল ব্ল্যাক বুলের দিকে। তারপর বলল, 'কোন আহমেদ মুসা? বিশ্ব ব্যাপী পএ পত্রিকায় যাকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, সে কি?'

'হ্যাঁ, সে'

'অর্থ্যাৎ বলছ বিশ্ব বিশ্রুত আহমেদ মুসা তোমার সাথী এবং এখন তিনি মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রে?'

'তাকে বন্দী করে 'সলো'র দিকেই আনা হয়েছে'

'সলোর দিকে? কেন? তাকে তো বারবারেতোএ মত বড় শহরের দিকে নিয়ে যাবার কথা।

‘কারণ বোধ হয় এই যে, মুসলিম নেতৃবৃন্দকে সলো থেকে বোমাসার মধ্য কোথাও বন্দী করে রাখা হয়েছে?’

ম্যাকা কোন কথা বলল না। বুঝা গেল সে ভাবছে। কিছুক্ষন পর বলল, ‘আমরা মনে হয় এখন উঠতে পারি। আবদুল্লাহ যায়দ ক্লান্ত। ওর বিশ্রাম প্রয়োজন।’

বলে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়তে পাওলার দিকে চেয়ে বলল, ‘মেহমানখানা একটু বাইরের দিকে। ওখানে যায়দকে রাখা ঠিক হবে না ওকে তুমি তোমার ঘরে নিয়ে যাও। আর তুমি যাও আম্মার ঘরে।’

হাঁটার জন্য পা বাড়াতে বাড়াতে বলল ব্ল্যাক বুলকে লক্ষ্য করে তুমি রেষ্ট নাও। আমি আসছি। কথা আছে।’

পাওলা ব্ল্যাক বুলকে নিজের ঘরে পৌছে দিয়ে বলল, ‘পছন্দ হবে তো ঘরটা?’

‘তোমার দুঃখ হচ্ছে না?’

‘দুঃখ হবে কেন?’

‘তোমার ঘর দখল করলাম’ দখল করবই বা না কেন? তুমি আমার কুকুর দখল করেছ, আমি তোমার ঘর দখল করলাম।’

পাওলা মুখ টিপে হাসল। বলল, আপনি আমার ঘর দখল করেছেন, না আমার ঘরে এনে আপনাকে দখল করলাম?’

‘কুকুর দখল যত সহজ, মানুষ দখল কি তত সহজ?’

‘মনে হয় মানুষ দখল বেশি সহজ। তবে সমস্যা হল দখলে যাবার পরেও মানুষ তা স্বীকার নাও করতে পারে, যা কুকুর পশু হলেও করে না।’

‘তার মানে দখল হওয়ার পরেও আমি স্বীকার করছি না!’

‘মানুষের মনের খবর আমি জানব কি করে? যাই আমি’।

দরজার দিকে হাঁটতে শুরু করল পাওলা। দরজা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, ‘মনের ‘সময়-কালটা’ কিভাবে চলে বলুন তো?’

ব্ল্যাক বুল প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারল না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল পাওলার দিকে।

পাওলা একটু হাসল। বলল, ‘পারলেন না। পারলেন না বলেই তো মানুষ দখল কঠিন বলেছেন। জানেন, মন কখনো এক পলকে হাজার দিলের পথ চলে, আবার কখনো হাজর দিনেও এক পলকের পথ চলতে পারে না। কুকুরের কিন্তু এ শক্তি নেই।’

বলে পাওলা দরজা পার হয়ে ছুটে পালাল।

হাসি ফুটে উঠল ব্ল্যাক বুলের ঠোঁটে।

হৃদয় জুড়ে তার স্নিগ্ধ প্রশান্তি। মনে হলো, এমন গল্প যদি সে পাওলার সাথে অনন্তকাল ধরেও করে, তবুও তার মনে ক্লান্তি আসবে না। সত্যি পাওলার মধ্য সে যেন হারিয়ে যাচ্ছে।

তার মনে হল এই হারিয়ে যাওয়ার যে সুখ, তার তুলনা দুনিয়াতে নেই।

ব্ল্যাক বুলের মন আগের চেয়ে অনেক সজীব, অনেক জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু দেহ জুড়ে ক্লান্তি।

‘ধীরে ধীরে ব্ল্যাক বুল পাওলার স্পর্শ জড়িত শূন্য বিছানার দিকে এগুলো।

পরদিন সকাল বেলা।

সকাল ৭টায় পাওলা হন্তদন্ত হয়ে ব্ল্যাক বুলের ঘরে প্রবেশ করল। বলল, ‘ভাইয়া টেলিফোন করেছে। আপনাকে, যেতে হবে।’

‘কোথায়?’

শ্বেতাংগ কলোনীর একটা বাড়ীতে বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া চারজন লোকের লাশ পাওয়া গেছে। দু’টি কুকুর নিয়ে আপনাকে এক্ষুণি যেতে হবে ওখানে।’

‘আমাকে?’ ‘কেন’

‘আমি জানিনা’

‘কুকুর দিয়ে আসামী ধরার ব্যবস্থা? কিন্তু আমি তো চিনি না?’

‘গাড়ি রেড়ি। আমি আপনাকে নিয়ে যাবো।’

‘ঠিক আছে চলো’

ওরা গিয়ে জীপে উঠল

ড্রাইভিং সিটে বসল পাওলা। পাশের সিটেই ব্ল্যাক বুল।

‘কিন্তু আমার মনে হয় কুকুরকে দিয়ে অপরাধী ধরার জন্য ডাকেননি। ঐ চারজনের মধ্যে আহমেদ মুসা নেই তো।’ ব্ল্যাক বুলের শুকনো কন্ঠ, চোখে মুখে প্রচন্ত উদ্বেগের চিহ্ন।

‘এসব চিন্তা বাদ দিন। আপনার কাছ থেকে এবং ভাইয়ার কাছ থেকে আহমেদ মুসার যে কাহিনী শুনেছি, তাতে তিনি অখ্যাত সলো শহরে মার খেয়ে মরবেন না তা নিশ্চিত করে বলতে পারি।’

‘তুমি ঠিকই বলেছ পাওলা। আহমেদ মুসা, যে ‘আহমেদ মুসা’ তা উদ্বেগের তোড়ে ভুলেই গিয়েছিলাম।’

‘ভাইয়ার সাথে গত বিকেলে অত কি কথা বললেন?’

‘আমি কই বললাম। তিনি বললেন আমি শুনলাম’

‘বিষয়?’

‘ভাইয়া ব্ল্যাক ক্রস সম্পর্কে কিছু খোঁজ খবর নিয়েছিলেন, তাই আমাকে বলছিলেন।’

‘কিছু পেয়েছেন নাকি ভাইয়া?’

‘না পাননি তবে খোঁজ খবর নিয়ে জেনেছেন বিস্ফোরনের একদিন পর ব্ল্যাক ক্রস-এর একটি বড় দল সংঘ নদী পথে সলো অতিক্রম করে দক্ষিণে চলে গেছে। যতটা তিনি খোঁজ নিয়েছেন তার গোয়েন্দা সূত্রে তাতে ব্ল্যাক ক্রস-এর ঐ দলটি মধ্য আফ্রিকার সীমান্ত অতিক্রম করে বোমাসার দিকে চলে গেছে।’

‘ব্ল্যাক ক্রসের ঐ দলেই কি পণবন্দী মুসলিম নেতৃবৃন্দরা ছিলেন?’

‘ভাইয়া তাই মনে করেন, কারণ বিস্ফোরনের ঘটনার পর ব্ল্যাক ক্রসের কেউ বারবারোতি থেকে অন্য দিকে যায়নি।’

‘তাহলে পরিষ্কার’

‘ঠিক তাই’

‘আছা এখন দুঃচিন্তা থেকে মুক্ত হোন’।

‘হলাম’।

‘এখন ‘তোমার’ মানে আপনার পরিকল্পনা কি?’

ব্ল্যাক বুল পাওলার দিকে চেয়ে হাসল। বলল, 'তুমি থেকে আবার আপনিতে যাচ্ছ কেন?' আপন করে আবার পর করতে চাচ্ছ বুঝি?'

'যায়দ' ভয় করে। তোমাকে কাছে টানতে গেলে তুমি যদি দূরে ঠেলে দাও।' সামনে চোখ নিবদ্ধ রেখে আবেগরুদ্ধ কন্ঠে কথাগুলো বলল পাওলা।

'যার জীবনটাই মরুভুমিতে কাটছে, সে বুঝি মরুদ্যানকে দূরে ঠেলতে পারে? পাওলা বলল, 'আলহামদুলিল্লাহ'। মুখে তার ফুটে উঠল একটু দুষ্টুমির হাসি।

'এটা শিখলে কোথায়?'

'প্রত্যেকবার খাওয়ার পর তোমাকে বলতে শুনেছি। নামযে তোমাকে বলতে শুনেছি। ভাইয়া এবং দাদুর সাথে কথা বলার সময় খুশি হলেই তোমাকে এটা বলতে শুনেছি।'

'আমি মুসলমান, আমার ধর্ম তোমার ভাল লাগবে?'

'দেখ আমাদের স্থানীয় যে ধর্ম। তা আসলে ধর্ম নয়। বাইরের ধর্মের মধ্য খৃষ্ট ধর্মের চেয়ে ইসলাম ধর্মকেই আমরা ভাল মনে করি।

এখন তো আরো ভাল লাগবে তোমার ধর্ম এবং আমাদের দাদুর ধর্ম বলে'।

'শুধু কি 'ভালো' বলা পর্যন্ত শেষ?'

'এই তো 'আলহামদুলিল্লাহ' পড়লাম, শিখিয়ে দিলে তোমার নামাযও আমি পড়ব। মুসলমানতো হয়েই গেলাম।'

হাসল ব্ল্যাক বুল। বলল, 'এগুলো তো ধর্মের বাহ্যিক অনুষ্ঠান, বিশ্বাসের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ। কিন্তু বিশ্বাসটাই গোড়ার কথা।'

'বিশ্বাস কি?'

'স্রষ্টা এবং তাঁর আদেশ সম্পর্কে তোমার সিদ্ধান্তর নাম।'

'বুঝতে পারছিনা। উদাহরণ দিয়ে বলত'।

'যেমন- আমদের ধর্ম বলে, এই পৃথিবী ও আকাশসহ গোটা বিশ্ব চরাচরের একজন স্রষ্টা আছেন। সমস্ত সৃষ্টি তাঁর দেয়া নির্দিষ্ট বিধানের আধীনে চলে। মানুষের দেহ ব্যবস্থাপনাও তাঁর দেয়া নিয়মে চলে। শুধুমাত্র মানষের ইচ্ছা

শক্তিকেই আল্লাহ স্বাধীন রেখেছেন। মানুষ ইচ্ছা করলে ভাল কাজও করতে পারে, খারাপ কাজও করতে পারে। স্রষ্টা মানুষকে কাজের স্বাধীনতা এই জন্যেই দিয়েছেন যে, তিনি পরীক্ষা করতে চান কে ভাল পথে চলে, আর কে খারাপ পথে চলে। মৃত্যুর পর পৃথিবীর সব মানুষ, পৃথিবীতে সে কি কাজ করেছে তার জবাবদিহীর জন্য আল্লাহর কাছে হাজির হবে। যারা ভাল কাজ করবে বা সত্য পথে দুনিয়ায় চলছে তাদের দেয়া হবে অনন্ত শান্তি'।

ব্ল্যাক বুল একটু থামল। সে থামতেই পাওলা চট করে বলে উঠল 'কোনটা ভাল কাজ বা কোনটা ভাল পথ, যে পথে চললে পুরষ্কার পাওয়া যাবে এবং যে পথে চললে মিলবে শাস্তি- এসব মানুষ বুঝবে কি করে? না বুঝলে কিভাবে মানুষ শাস্তি এড়াবার চেষ্টা করবে?'

'তার ব্যবস্থা না করে স্রষ্টা শাস্তির ব্যবস্থা করেননি। প্রথম মানুষকে আল্লাহ যখন দুনিয়াতে পাঠান, তখনই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন পৃথিবীতে তিনি মানুষের জন্যে সত্য পথ প্রদর্শক পাঠাবেন। তাঁরা তাদের কাছে আল্লাহর কাছ থেকে আসা ভালো কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ মানুষকে জানাবেন, বুঝাবেন এবং নিজেরা তা পালন করে দেখাবেন। মানুষের জন্যে আল্লাহর শেষ বার্তাবাহক এসেছেন ৫৭০ খৃষ্টাব্দে এবং তিনিই ইসলামের নবী। আমরা তাঁর মাধ্যমে আসা আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলি'।

'এই আদেশ, নিষেধ এবং বিশ্বাসগুলো কি? তোমার উপরোক্ত কথাগুলো মেনে নেয়া কি বিশ্বাস?'

'হ্যাঁ তাই। তবে মূল বিশ্বাসটাকে এইভাবে বলা যায়ঃ স্রষ্টা এক। তিনি সবকিছুর মালিক ও নিয়ন্ত্রক এবং বিধানদাতা। ৫৭০ খৃষ্টাব্দে তাঁর পাঠানো মোহাম্মাদ মোস্তফা (স.) তাঁর শেষ বার্তাবাহক। এবং যেসব আদেশ নিষেধ তিনি স্রষ্টার কাছ থেকে এনেছেন, যা আল কোরআন নামক গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে, তা মানুষকে মেনে চলতে হবে'।

'খুব সুন্দর ব্যবস্থা। আদেশ নিষেধের কিছু উদাহরণ দাও তো'।

'সব মানুষ এক আদমের সন্তান। সাদা-কালো কোন ভেদাভেদ করা যাবে না। শাসক-শাসিত, ধনী-গরীব সবাই আল্লাহর কাছে সমান। সকলের প্রতি

সুবিচার করতে হবে। সকল অন্যায়-জুলুম নিষিদ্ধ। প্রতিটি মানুষের আহার, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি মৌলিক প্রয়োজনসমূহ পূরণ করতে হবে ইত্যাদি জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে আদেশ-নিষেধ রয়েছে। আর এ কাজগুলো করার জন্যে যে চরিত্র দরকার তা গঠন করার জন্যে রয়েছে আনুষ্ঠানিক ইবাদাতের'।

'তাহলে দেখছি, গোটা জীবনকেই নিয়ন্ত্রণ করবে ধর্ম'।

'হ্যাঁ তাই'।

'মজার তো! আচ্ছা, আমি মুসলমান হয়ে গেলাম বললেই মুসলমান হয়ে যাব?'

'না। বিশ্বাসের একটা ঘোষণা দিতে হয় এবং কতকগুলো মূল কাজ করতে হয়'।

'কেমন ঘোষণা?'

'ঘোষণা করতে হয়ঃ 'আল্লাহ এক, মুহাম্মাদ (স.) তাঁর প্রেরিত রসুল'। এরপর নামায পড়তে, যাকাত দিতে, রোজা রাখতে এবং হজ্জ করতে রাজী হয়ে যেতে হয়'।

'নামায বুঝেছি। অন্যগুলো কি?'

ইতিমধ্যে গাড়ি এসে পড়েছে শ্বেতাংগ কলোনির সেই বাড়িটির গেটে।

গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল।

'আচ্ছা উত্তর পরে দেব'। বলে ব্ল্যাক বুল গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। পাওলাও নামল গাড়ি থেকে। সেই সাথে নামাল কুকুর দু'টিকে।

গেট খুলে তারা ভেতরে প্রবেশ করল।

কুকুর দু'টি টেনে নিয়ে পাওলা আগে এবং ব্ল্যাক বুল পেছনে চলল।

ওরা গাড়ি বারান্দায় পৌঁছতেই ভেতর থেকে বেরিয়ে এল জাগুয়াস ম্যাকা। ভেতরে দেখা গেল আরও কয়েকজন পুলিশ।

'যায়দ তোমাকে কষ্ট দিয়েছি। কারণ, আমার মনে হচ্ছে তোমার সেই সংঘ হাইওয়ের চারজনের হত্যার সাথে এ হত্যার কিছুটা মিল দেখতে পাচ্ছি। ওখানে চারজন শ্বেতাংগ, এখানেও চারজন শ্বেতাংগ। ওরাও ছিল ব্ল্যাক ক্রসের, এরাও ব্ল্যাক ক্রসের'। বলল ম্যাকা।

‘ব্ল্যাক ক্রসের?’

‘হ্যাঁ’।

একটু থেমে ম্যাকা বলল, ‘তোমাকে কুকুর আনতে বলেছি। কারণ ওরা আহমদ মুসার গন্ধের সাথে পরিচিত’।

‘তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন, আহমদ মুসা এখানে ছিল কিনা বা আছে কিনা?’ ব্ল্যাক বুলের কণ্ঠে উত্তেজনা।

‘ঠিক তাই’।

‘চলুন দেখি’।

সবাই ভেতরে প্রবেশ করল।

চারটি লাশ যেখানে পড়ে আছে, সেখানে প্রবেশ করল সবাই।

পাওলা দু’টি কুকুরের চেন হাতে ধরেছিল। ঘরে প্রবেশ করার সাথে সাথে কুকুর দু’টি ছুটল ঘরের একদম বিপরীত প্রান্তে রাখা খাঁটিয়ার দিকে। পাওলার হাত থেকে চেন খুলে গেল।

কুকুর দু’টি খাটিয়ার কাছে ছুটে গিয়ে লাফ দিয়ে খাটিয়ার উপর উঠল। মাথা নিচু করে বিছানা শুকতে লাগল। তার সাথে তারা লেজ নাড়াচ্ছিল এবং তাদের মুখ থেকে এক প্রকার নরম শব্দ বেরুচ্ছিল।

ম্যাকা, ব্ল্যাক বুল এবং পাওলা তিনজনের চোখেই বিস্ময়। ওরাও দ্রুত গিয়ে খাটিয়ার পাশে দাঁড়াল।

ব্ল্যাক বুল খাটিয়ার পাশে দাঁড়াবার পর কুকুর দু’টি ব্ল্যাক বুলের দিকে তাকিয়ে তাদের লেজ নাড়া এবং মুখের শব্দ বাড়িয়ে দিল।

ব্ল্যাক বুলের চোখে-মুখে তখন বিমুঢ় ভাব।

‘কুকুরের এই আচরণের কি অর্থ করা যায়?’ বলল ম্যাকা।

‘কোন সন্দেহ নেই, এখানেই এই খাটেই আহমদ মুসা শুয়ে ছিল’। কুকুর দু’টি একটুও ভুল করেনি’। ব্ল্যাক বুলের শুকনো ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে অশ্রু ভেজা ভারী কণ্ঠ বেরিয়ে এল।

ঘরের চারদিকে আর একবার চেয়ে ম্যাকা বলল, 'নিশ্চয় কোন বন্দী এখানে ছিল। তিনি যদি আহমদ মুসা হন, তাহলে বলতে হবে তিনি এ চারজনকে হত্যা করে বন্দীখানা থেকে চলে গেছেন'।

'চলে যেতে পেরেছেন?' ব্ল্যাক বুলের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'আমি গোটা বাড়ি সার্চ করেছি। সব দেখে মনে হয়েছে একটি পরিবার উপর তলায় বাস করতো। তাড়াহুড়া করে তারা চলে গেছে। হতে পারে হত্যাকান্ডের পর এবং আহমদ মুসা চলে যাবার পর তারা বাড়ি ছেড়েছে। আবার এও হতে পারে, আহমদ মুসা পালাতে পারেনি, তাকে নিয়েই গৃহবাসীরা অন্যত্র সরে পড়েছে'।

ম্যাকা'র শেষ কথাটা শুনে ব্ল্যাক বুলের মুখটা চুপসে গেল।

ম্যাকা আবার বলল, 'তবে তিনি চলে যেতে পেরেছেন, এটাই স্বাভাবিক। শুধু ঘরের ভেতর চারজন নিহত হওয়ায় প্রমাণ হয়, বাইরে কোন সংঘর্ষ হয়নি। লাশের অবস্থান, রক্তের চিহ্ন থেকে বুঝা যায়, আহমদ মুসার বৈরী পক্ষের ৫জন লোক ঘরে প্রবেশ করেছিল। তার মধ্যে ৪জন নিহত এবং অন্যজন আহত হয়'।

'আহত হয়েছে এবং সে ব্ল্যাক ক্রসের লোক এটা কেমন করে বুঝলেন?'

ঘরের উত্তর-পূর্ব কোণে জমাট বেধে থাকা রক্তের দিকে ইংগিত করে বলল এ রক্ত নিহত চারজনের কারো নয় এবং আহমদ মুসারও নয়। আহমদ মুসার গুলীতে নিহত লাশের যে পজিশন তাতে আহমদ মুসা কোণায় গিয়ে আহত হবার কোন যুক্তি নেই। সবচেয়ে বড় কথা হলো, ঐ রক্ত আহমদ মুসার হলে কুকুরগুলো প্রথমে ওখানেই ছুটে যেত'।

'ঠিক বলেছেন ভাইয়া। আমার আর কোন সন্দেহ নেই। আহমদ মুসা ভাই এখান থেকে নিশ্চয় বেরিয়ে গেছেন। গেট দিয়ে ঢোকার সময় থেকেই আমার টম ও টমির চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং মাটির ঘ্রাণ নেয়া শুরু করে'।

'তোমার কথাই ঠিক হোক। চল আমরা যাই পুলিশ এদিকের ব্যবস্থা করবে'।

বেরিয়ে এল তারা তিনজন।

বাড়িতে এসে গাড়ি থেকে নেমেই ম্যাকা বলল, ‘এস তোমরা, আগে জরুরী কয়েকটা কথা বলে নেই’।

তারা গিয়ে বসল ড্রইং রুমে।

‘তারা বলেছিল, আহমদ মুসাকে সারেন্ডার করতে যেতে হবে কোথায়?’ ম্যাকাই প্রথমে কথা শুরু করল।

‘বোমাসা এয়ারপোর্টের কাছাকাছি কোন জায়গা’। বলল ব্ল্যাক বুল।

‘তাহলে মুক্ত হয়ে আহমদ মুসা বোমাসা যেতে পারে বলে মনে কর?’

‘পণবন্দী মুসলিম নেতৃবৃন্দের উদ্ধার আহমদ মুসার টার্গেট’।

‘যেহেতু আহমদ মুসাকে আত্মসমর্পণ করতে বলেছে বোমাসায়, তাহলে ওদের পণবন্দী করে রেখেছে বোমাসা অথবা বোমাসারই আশেপাশে কোথাও। এই ধারণায় আহমদ মুসার বোমাসা যাওয়াটাই সবচেয়ে যুক্তিসংগত’।

‘আমারও তাই মনে হয়’।

ম্যাকার কপাল কুঞ্চিত। সে ভাবছিল। ব্ল্যাক বুল থামলেও তৎক্ষণাৎ সে কথা বললো না। একটু পর বলল, ‘কি জানি বলেছিলে ওদের দেয়া সময়ের আর পাঁচদিন বাকী?’

‘পাঁচ দিনের মধ্যে দু’দিন চলে গেছে। আর মাত্র তিনদিন বাকী’।

‘তাহলে তো অবিলম্বে বোমাসা যাত্রা করতে হয়। কিন্তু আমি তো কাল সকালের আগে যেতে পারবো না। অফিসে জরুরী কাজ’।

‘কাল গেলে বাকী থাকবে আর দু’দিন। খুব অল্প সময় হবে না?’

‘তা হবে। অসুবিধা হবে না। বোমাসার পুলিশ প্রধান উপাংগো আমার বন্ধু। সে আমার ক্ল্যাস মেট। এক সাথেই ফ্রান্সে আমরা পুলিশ ট্রেনিং-এ ছিলাম’।

‘খুব ভালো হবে যদি আমরা ওখানকার পুলিশের সাহায্য পাই।

‘হ্যাঁ পাব, ইতিমধ্যে বোমাসা পুলিশ কাজ শুরু করে দিয়েছে। আমরা গেলে তা আরও ভালো হবে।

‘তাহলে আমরা কাল সকালে যাচ্ছি?’

‘অবশ্যই। দেখি পারলে তার আগেও’।

ব্ল্যাক বুল হঠাৎ উঠে গিয়ে ম্যাকার পায়ের কাছে বসল। তার দু'হাঁটুতে হাত রেখে বলল, 'ভাইয়া দেখবেন অদ্ভুত এক যাদুকরি মানুষ তিনি। দেখা পেলে আপনি তাকে ভালো না বেসে পারবেন না। অত বড় ত্যাগী মানুষ দুনিয়াতে নেই। জানেন!'' বলে থামল ব্ল্যাক বুল।

'কি? বল'। বলল ম্যাকা।

'ফ্রান্সের রাজকুমারীর সাথে ওঁর বিয়ে। বিয়ের পোশাক পরে দু'জনেই বিয়ের আসরে বসেছেন। এই সময় তিনি মুসলিম নেতৃবৃন্দের পণবন্দী হওয়ার খবর পেলেন এবং জানলেন তাদের শর্তের কথা যে, আহমদ মুসা আত্মসমর্পণ করলে তবেই তাদের মুক্তি। তিনি বিয়ের আসর থেকে উঠে দাঁড়ালেন এবং রাকজুমারীকেও বুঝালেন, এই অবস্থায় তিনি বিয়ে করতে পারেন না। এবং তিনি আমাকে নিয়ে চলে এলেন। তার কাছে নিজের কাজের চেয়ে, আল্লাহর বান্দা মানুষের উপকারের চেয়ে বড় কিছু নেই'।

'যায়দ তার সম্পর্কে বেশী কিছু জানি না। কিন্তু যতটুকু জানি তাতে বুঝি, তিনি আমাদের মত কোন মানুষ নন'। বলল ম্যাকা।

'ভাইয়া আমার পুলিশ ট্রেনিং আছে। আমিও তো যাচ্ছি বোমাসা'। আবদারের সুরে বলল পাওলা।

'তা আমি জানি না। দেখ, যায়দ যদি অনুমতি দেয়'। বলে দ্রুত উঠে গেল ম্যাকা। তার ঠোঁটে হাসি।

লজ্জায় মুখ নিচু করেছে পাওলা। তার ভাইয়া বেরিয়ে গেল ড্রইং রুম থেকে।

ব্ল্যাক বুলের চোখে-মুখেও লজ্জার ছায়া নেমে ছিল। কিন্তু পরক্ষণেই তার ঠোঁটে ফুটে উঠল হাসি। বলল, 'পাওলা দেখলে তো ভাইয়া কত ভাল। এখন আমার অনুমতি চাও'।

পাওলার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল। লজ্জার সাথে মিশে তা তাকে করে তুলল অপরূপ।

সে উঠে দাঁড়িয়ে ব্ল্যাক বুলের পিঠে একটা কিল বসিয়ে ছুটে পালাতে পালাতে বলল, 'এই যে অনুমতি নিলাম'।

ব্ল্যাক বুল মুগ্ধ দৃষ্টিতে পলায়ন রতা পাওলার দিকে চেয়ে রইল।

পাওলা চলে গেছে, কিন্তু ব্ল্যাক বুল সেদিক থেকে তার চোখ ফেরাতে পারেনি।

হঠাৎ আনমনা হয়ে পড়েছে ব্ল্যাক বুল। তার চোখে ভেসে উঠেছে অতীতের এক দৃশ্য। অতীতের হতভাগ্য কশাই ব্ল্যাক বুল এবং আজকের এস সৌভাগ্যবান যায়দের মধ্যে কত পার্থক্য।

আল্লাহর প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতায় দু'চোখের কোণায় অশ্রু নামল ব্ল্যাক বুলের।

# ৬

সংঘ নদীর দক্ষীণ তীরে বোমাসা শহর। কংগোর সর্ব উত্তরের একটি শহর বোমাসা।

নদীর তীরে অবস্থিত কয়েকটা বড় টিলাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বোমাসা শহরটি। টিলার পরেই দক্ষিণে বিরাট বনজ একটা সমভূমি। এ এলাকায় বাদাম চাষ শুরু হয়েছে ঔপনিবেশিক আমলের শুরুতেই।

শহরের বড় টিলাগুলোর সব ক'টিই শ্বেতাংগদের দখলে। টিলাগুলোর সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে বিশাল একটা শ্বেতাংগ কলোনী।

এ কলোনীর মধ্যে 'মাবোইডিং' এলাকা শ্বেতাংগ বসতির প্রাণকেন্দ্র। মাবোইডিং টিলাটি একেবারে নদীর ধারে, বলা যায় তীর ঘেঁষে।

মাবোইডিং টিলার একেবারে মাথায় উঁচু প্রাচীর ঘেরা বিশাল এলাকা নিয়ে বাইবেল সোসাইটি কমপ্লেক্স। কমপ্লেক্সের চারটি ভাগ। একভাগে গীর্জা, দ্বিতীয় ভাগে স্কুল ও হাসপাতাল। তৃতীয় ভাগে আবাসিক এলাকা। আর চতুর্থ ভাগটি গোডাউন। গীর্জা ও গোডাউন এলাকা পাশাপাশি নদীর ধারে।

গোডাউন এলাকার পশ্চিম প্রান্তে প্রায় নদীর তীর ঘেঁষে বড় একটি কক্ষ।

অফিস কক্ষ।

বিরাট একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল।

টেবিল ঘিরে কয়েকটি দামী কুশন চেয়ার। তার একটিতে বসে লালমুখো একজন ফরাসী। টেলিফোনে কথা বলছিল।

হঠাৎ তার মুখে হতাশার একটা কালো ছায়া নেমে এল। বলল, 'পালিয়েছে স্যার?'

ওপারের কথা শুনল। তারপর বলল, 'স্যাড স্যার। আমার মনে হয় ওরা যথেষ্ট সতর্ক ছিল না। যার ফলে ৪জনকে খুন ও একজনকে আহত করে ও পালাতে পেরেছে'।

ওপারের কথা শুনল এবং আবার বলল, ‘পালিয়ে যাবে কোথায় স্যার। ওকে বোমাসায় আসতেই হবে যদি সে মুসলিম নেতৃবৃন্দকে রক্ষা করতে চায়। তাকে আত্মসমর্পণ করতেই হবে’।

ওপারের কথা শুনে বলল আবার, ‘এদিকে সব ঠিকঠাক স্যার। আমাদের লোকরা সার্বক্ষণিক পাহারায় রয়েছে। এয়ারপোর্ট এলাকায় পৌঁছার সংগে সংগে তাকে বন্দী করা হবে। একটা হেলিকপ্টার আমরা ঠিক করে রেখেছি। বন্দী হওয়ার সংগে সংগে তাকে ‘বারগুই’ পাঠিয়ে দেবো। সেখান থেকে নাইরোবি। তারপর ফ্রান্স’।

আবার ওপারের কথা শুনল লালমুখো ফরাসী। উত্তরে বলল, ‘না স্যার, নিশ্চিন্ত থাকুন। বারোজন শীর্ষ নেতা মারা যাবে তার জন্যে, এটা কিছুতেই সে মেনে নেবে না। আসবেই সে বোমাসা। আত্মসমর্পণ তাকে করতে হবে’।

পরে ওপারের কথা শুনে আমতা আমতা করে বলল, ‘তা ঠিক স্যার, আত্মসমর্পণই যদি করবে, তাহলে পালালো কেন? আহমদ মুসাকে বুঝা খুব মুশকিল স্যার। তবু স্যার আমরা শেষ দিন পর্যন্ত বোমাসায় তার অপেক্ষা করব’।

ওপারের কথা একটু শুনল। তারপর বলল, ‘ঠিক আছে স্যার, শেষ দিন পর্যন্ত দেখার পর বোমাসার পাঠ চুকিয়ে আমরা চলে আসব। আমাদের মনে আছে স্যার, পনের দিন না পুরলে ডোজ পুরণ হবে না এবং তা কাজও করবে না। একটা কথা স্যার কেউ কেউ বলছেন, আহমদ মুসা যদি ধরা না দেয় তাহলে পণবন্দীদের ধরে রাখলে সুবিধা হবে আহমদ মুসাকে ফাঁদে ফেলার’।

পরে ওপারের কথা শোনার পর বলল, ‘বুঝেছি স্যার। অবশ্যই পাতার মত ফাঁদ আমাদের আরও আছে’।

লালমুখো লোকটি টেলিফোন রাখতেই ঘরে প্রবেশ করল আরও তিনজন শ্বেতাংগ।

চেয়ারে বসতে বসতে লালমুখো লোকটি বলল, ‘নতুন বস সাইরাস শিরাক টেলিফোন করেছিলেন। খুব খারাপ খবর’।

‘আহমদ মুসা পালিয়েছে’।

‘কি বলছেন মিঃ ফ্রাসোয়া? নাইরোবি থেকে লোক এল তাকে নিয়ে যাবার জন্যে। তবু পালাতে পারল? তিনজনের একজন বলল।

‘বড় বড় রাঘব বোয়ালদেরই যেখানে সে কাত করে, সেখানে চুনোপুঁটিদের ব্যর্থতা কি বড় কথা?’

‘ভাগ্য মন্দ আমাদের। মনে করছিলাম, আহমদ মুসাকে গত-রাতে নাইরোবি নিয়ে চলে গেছে। আজ আমরা হুকুম পাব এখানকার আসর গুটিয়ে চলে যাবার। তা হলো না’। তিনজনের আরেকজন বলল।

‘আহমদ মুসাকে নাইরোবি নিয়ে গেলেও পনের দিন পূর্ণ হবার আগে আমরা যেতে পারতাম না। প্রকৃতপক্ষে আত্মসমর্পণের সাথে এদের বন্দীত্বের কোন সম্পর্ক নেই। আহমদ মুসা আমাদের হাতে এলেও তারা পনের দিনের মাথায় নিহত হবে। সে ধরা না পড়লেও হবে। আহমদ মুসাকে দেয়া শর্তটা ভূয়া। আহমদ মুসা যাতে আত্মসমর্পণ করে সেজন্যেই ঐ শর্তটা তাকে দেয়া’।

তাই যদি হয় তাহলে ঐ বারজন লোককে কেন খাওয়াচ্ছি, পাহারা দিচ্ছি আর অপেক্ষা করছি পনের দিন পূর্ণ হবার জন্যে। বারটা বুলেট অথবা একটা ষ্টেনগান ব্যবহার করলে ওরা শেষ হয়ে যায়’। বলল ওদের তিনজনের একজন।

‘তা হয়। কিন্তু পয়জনটার পরীক্ষা তাতে হয় না’।

‘আসলেই কি পয়জনটার পরীক্ষামূলক ব্যবহার হচ্ছে এঁদের উপর?’

‘হ্যাঁ মানুষের উপর প্রথম পরীক্ষা। আমাদের নেতা হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে এদের হত্যা করা হবে। অতএব পরীক্ষাটা এদের উপরই চালানোর ব্যবস্থা হয়েছে। এতে শত্রুও আমাদের মরবে এবং ওষুধেরও পরীক্ষা হয়ে যাবে- এক ঢিলে দুই পাখি।

‘বুঝেছি’।

‘ধন্যবাদ। এখন তোমাদের কি খবর বল’।

‘মিঃ ফ্রাসোয়া, গত এগার দিনে ওরা মানে বন্দীরা যতখানি দুর্বল হওয়ার কথা ছিল, ততখানি দুর্বল হয়নি। বরং খুবই সজীব দেখাচ্ছে ওদের’। বলল নবাগত তিনজনের একজন।

‘জিমি ব্যস্ত হচ্ছ কেন? ডোজ পনের দিনের। ডোজ পূর্ণ না হলে কি আর তা কাজ করবে?

‘কি জানি এক্সপেরিমেন্ট কাজ দিচ্ছে কিনা বুঝতে পারছি না’।

‘চিন্তা করো না, না যদি কাজ করে, তাহলে ১২টা বুলেট খরচ করতে হবে’।

বলে উঠে দাঁড়াল ফ্রাসোয়া ডেসফার। বলল, ‘চল ওদের সাথে একটু কথা বলে আসি’।

ফ্রাসোয়ার সাথে অন্য তিনজনও উঠে দাঁড়িয়েছে। কক্ষের দরজার দিকে হাঁটতে লাগল ওরা চারজন। গোডাউন এলাকার অন্য একটি কক্ষ। বাইবেল সোসাইটি কমপ্লেক্সের গোডাউন এলাকায় আসলেই কোন গোডাউন নেই।

গোডাউন এলাকা চারদিক উঁচু দেয়াল ঘেরা। ভেতরে বিল্ডিং আকৃতিতে গোডাউন, কিন্তু ভেতরের দৃশ্য গোডাউনের মত নয়। বেশ কিছু ঘর ষ্টোর রুম ও গুদাম হিসেবে ব্যবহার হলেও অন্যঘরগুলো যথেষ্ট ভেন্টিলেশন যুক্ত আধুনিক।

এই শ্রেণীরই একটা বড় ঘরে বারজন বসে আছেন। বেশ বড় ঘরটি। বারটি খাটিয়া পাতার পরেও ঘরের মাঝখানে প্রচুর জায়গা। আসলে এটা একটা হল ঘর। যাকে বেড় রুমে রুপান্তরিত করা হয়েছে। ঘরের দক্ষিণ দিকে দু’টো দরজা। সেদিকে কোন জানালা নেই। কিন্তু তিন দিকে বড় বড় তিনটি জানালা। জানালাগুলো কাঁচের বলে মনে হয়। কিন্তু তা নয়। জানালাগুলো স্বচ্ছ, শক্ত সিনথেটিকের। জানালাগুলো বন্ধ করে দিয়ে ঘরে এয়ারকন্ডিশন বসানো হয়। দেখলেই বুঝা যায়, এয়ারকন্ডিশন আগে ছিল না। সম্প্রতি লাগানো হয়েছে।

ঘরের মাঝখানের মেঝেতে গোল হয়ে বসেছিলেন বিশ্ব মুসলিম কংগ্রেসের প্রধান শেখ আব্দুল্লাহ আলী আল মাদানী, বিশ্বমুসলিম যুব সম্মেলনের প্রেসিডেন্ট কামাল ইনুনু, আল আজহারের গ্রান্ড শেখ সাইয়েদ আলী কুতুব, ‘ডার্ক আফ্রিকা ব্রাইট হার্ট’ সংস্থার সভাপতি তারেক আল-মাহদী প্রমুখ ১২ জন মুসলিম বিশ্বনেতা।

কথা বলছিলেন আল আজহারের গ্রান্ড শেখ বৃদ্ধ সাইয়েদ আলী কুতুব। বলছিলেন, ‘কামাল ইনুনু আপনি কেন হঠাৎ করে ঘরের জানালা খুলে রেখে

আমাদের গরম এবং মশা, মাছি ও পোকা-মাকড়ের অসহনীয় উপদ্রুপের শিকারে পরিণত করছেণ বুঝতে পারছি না।'

কামাল ইনুনু একজন ডাক্তার। ডাক্তারী পেশায় না থাকলেও তিনি মেডিকেল সাইন্স পরিত্যাগ করেননি। পৃথিবীর বিখ্যাত বিখ্যাত মেডিকেল জার্নালে প্রায় তার প্রবন্ধ ওঠে। তিনি বললেন, 'আমি দুঃখিত শেখ। আমি একটা আতংকের বশবর্তী হয়ে এটা করছি।'

'কিন্তু আবার জানালা হঠাৎ করে বন্ধ করে দেন কেন?' বলল শেখ আব্দুল্লাহ আলী।

'ওটা করি জানালা খোলা রাখার ব্যাপার ওদের চোখ থেকে গোপন রাখার জন্যে। ওরা আসার সংকেত পেলে ওটা করি।'

'কিন্তু কারণ কি?' বলল আলী কুতুব।

সংগে সংগে জবাব দিল না কামাল ইনুনু। ভাবছিল। বেশ সময় নিয়ে বলল, 'বলেছি, এটা করছি একটা আশংকা থেকে এবং চেয়েছিলাম এই আশংকার ব্যাপারটা আপনার কাছ থেকে গোপন রাখতে।'

একটু থামল কামাল ইনুনু। শুরু করল আবার, 'বন্দীখানার এ ঘরে আসার আগে আমরা যখন একটা ঘরে অপেক্ষা করছিলাম, তখন পাশের ঘরে ওদের একটা কথা আমার কানে গিয়েছিল। একজন বলছিল, 'পনের দিনের ঝামেলা, কারণ ওদের উপর পনের দিনের একটা গ্যাস এক্সপেরিমেন্ট হবে।'

'পরক্ষণেরই চলে আসাতে আর কিছু শোনা সম্ভব হয়নি। তখন কথাটাকে আমি গুরুত্ব দেইনি। কিন্তু যখন আমাদের জানানো হলো, বন্দীখানায় থাকার মেয়াদ আমাদের পনের দিন, তখন সেই শোনা কথাটা আমার হঠাৎ করেই যেন মনে পড়ে গেল।

কিন্তু তখনও এ কথার তাৎপর্যটা আমি বুঝতে পারিনি। আর একদিন ওদের আরেকটি কথায় এর অর্থটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। আপনাদের মনে আছে, কথায় কথায় একদিন মি: ফ্রাসোয়া বলেছিলেন, আপনাদের জন্যে আমরা বুলেট খরচ করব না। ধীরে-সুস্থে শান্তির সাথে আপনারা মৃত্যুর কোলে ঘুমিয়ে পড়বেন। আপনারা সম্মানী লোক, অসম্মানের মৃত্যু আপনাদের সাজে

না।’ এই তিনটি বিষয়কে এক সাথে দাঁড় করিয়ে আমি যে উপসংহার টানলাম তা হলো, পনের দিন মেয়াদের একটা গ্যাস ব্যবহার করে ওরা আমাদের হত্যা করবে।’

‘গ্যাস ব্যবহার করে? পনের দিনের মেয়াদে? তাহলে তো আর তিনদিন বাকী।’ বলল তারেক আল-মাহদী।

একমাত্র কামাল ইনুনু ছাড়া সকলের চোখে-মুখে বিস্ময়। কারও মুখে কোন কথা নেই।

কামাল ইনুনু আবার শুরু করল, ‘আমার পরবর্তী চিন্তা হলো, ওরা গ্যাস প্রয়োগ করছে কিভাবে, কোন মাধ্যমে। আর একদিন ওদের কথায় জানলাম, আমরা খুব ভাগ্যবান, কারণ আমাদের এয়ারকন্ডিশন দেওয়া হয়েছে।’ দেখলাম এয়ারকন্ডিশন সদ্য লাগানো। আমার মন বলল, এয়ারকন্ডিশনের কোল্ড উইন্ড ওয়েভের সাথে গ্যাসের শ্লো পয়জন স্প্রে করা হচ্ছে। আর একটা জিনিস আমার এ বিশ্বাসকে দৃঢ় করল, সেটা হলো এয়ারকন্ডিশন বন্ধ করার কোন ব্যবস্থা আমাদের হাতে রাখা হয়নি। এয়ারকন্ডিশন বারো ডিগ্রিতে রাখা হয়েছে এবং এটা ফিক্সড।

‘এয়ারকন্ডিশন বন্ধ করার ব্যবস্থা আমাদের হাতে না থাকায় আপনার বিশ্বাস দৃঢ় হলো কি করে?’

‘আমরা এয়ারকন্ডিশন বন্ধ করতে পারলে কোল্ড ওয়েব বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে ওদের পয়জন স্প্রেও বন্ধ হয়ে যেত।’

‘ঠিক।’ প্রায় সমস্বরে বলে উঠল উপস্থিত সকলে। সকলের চোখ-মুখে উদ্বেগ।

তারেক আল মাহদী বলল, ‘জানালা খোলার ব্যাপারটা এবার বলুন।’ শুকনো কণ্ঠ তার।

‘জানালা খোলা রেখে এয়ারকন্ডিশনের কোল্ড ওয়েভ বের করে দেবার চেষ্টা করেছি। যাতে করে তার সাথে পয়জন গ্যাসও বের হয়ে যায়।’

‘তাতে আমাদের কতখানি উপকার হবে?’ বলল আবার তারেক আল মাহদী।

‘এর ফলে তাদের নির্দিষ্ট পনের দিনের গ্যাস প্রয়োগে আমাদের মৃত্যু হবে না।’

‘আল-হামদুলিল্লাহ।’ সকলের সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হলো।

‘আল্লাহ তোমাকে এই বুদ্ধি ও সচেতনতা দিয়েছেন, এ জন্যে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন।’ বলল আল আজহারের গ্রান্ড শেখ।

‘পনের দিনে যদি আমাদের মৃত্যু না ঘটে, তাহলে তো ওরা ভিন্ন ব্যবস্থা নেবে।’ বলল শেখ আব্দুল্লাহ আলী।

‘যে বুলেট ওরা খরচ করতে চেয়েছিল না, সেটাই তাহলে তারা খরচ করবে।’ বলল কামাল ইনুনু।

‘আল্লাহ সবচেয়ে বড় পরিকল্পনাকারী। ওদের পনের দিনের পরিকল্পনা ব্যর্থ হলে দ্বিতীয়টাও ব্যর্থ হতে পারে।’ বলল বৃদ্ধ গ্রান্ড মুফতি।

‘কিন্তু কিভাবে? প্রথম বারের নিমিত্ত হলেন কামাল ইনুনু, এবার আল্লাহ কাকে মনোনীত করবেন!’ তারেক আল মাহদী।

‘আমাদের যে ওরা কিডন্যাপ করেছে, গোটা দুনিয়া থেকে তা ওরা গোপন রেখেছে। দুনিয়ার সবাই জানে আমরা মরে গিয়েছি। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় আহমদ মুসাকে তাদের জানাতে হয়েছে। যার জানা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিল।’ বলল শেখ আব্দুল্লাহ আলী।

‘আহমদ মুসাকে ওরা জানিয়েছে ওদের পরিকল্পনা অনুসারেই। ক্যামেরুনে ব্ল্যাক ক্রস, কোক ও ওকুয়ার যে পরাজয় এবং মুসলমানদের যে বিজয় তারই একটা প্রতিশোধ হিসেবে ওরা আমাদের হত্যা করতে চায়। কিন্তু বিস্ফোরণের মাধ্যমে হত্যা না করে কিডন্যাপ করেছে আহমদ মুসাকে ফাঁদে ফেলার জন্যে, এ উদ্দেশ্য ওদের পরিষ্কার হয়েছে। এখন আহমদ মুসাকেও বন্দী করতে পেরেছে। এই ফাঁদে ফেলে। এখন আমাদের সাথে আহমদ মুসাকে হত্যা করতে পারলেই ওদের মিশন পূর্ণ হবে।’ বলল বার জনের অন্য একজন ইস্ট আফ্রিকা ইসলামিক সার্কেল প্রেসিডেন্ট আলী ইব্রাহিম।

'আপনি ঠিক বলেছেন। কিন্তু এটা ওদের পরিকল্পনা। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ওদের হাতেই শুধু নেই, তা প্রমাণ হয়েছে। আহমদ মুসা ওদের হাতে পড়ায় যেমন ওদের পরিকল্পনা সফল হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তেমনি ব্যর্থ হবারও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বন্দী আহমদ মুসা মুক্ত আহমদ মুসার মতই অপ্রতিরোধ্য তা বার বার প্রমাণ হয়েছে।' বলল কামাল ইনুনু।

বিশ্ব মুসলিম কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট শেখ আব্দুল্লাহ আলী বলল, 'আল্লাহ আহমদ মুসাকে দীর্ঘজীবী করুন। তাকে নিরাপদ রাখুন। সে নীরবে জাতিকে শুধু দিয়েই যাচ্ছে, নেয়নি কিছুই। পদ, পদবী, পাওয়ার কিছুই তার নেই। মদীনার গভর্নর মসজিদে নব্বীর পাশে তাকে একটা বাড়ি দিয়েছেন। দুনিয়াতে এটাই তার একমাত্র ঠিকানা। কিন্তু সে বাড়িতে, সে ঠিকানায় এখনও সে পা রাখেনি।' বলতে বলতে শেখের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল আবেগে।

'সত্যি আল্লাহর জন্যে যিনি কাজ করেন, এটাই তো তার চরিত্র। তিনি যা যা চান আল্লাহর কাছে, আর কারও কাছে নয়।' বলল মিসরের গ্রান্ড শেখ।

তার কথা শেষ হতেই দরজায় নক হলো।

কামাল ইনুনু তাড়াতাড়ি জানালা তিনটির দিকে তাকাল। দেখল বন্ধ আছে। কিছুক্ষণ আগে ওরা তিনজন এসেছিল। সে সময় জানাল বন্ধ করে দেয়া হয়। বন্ধই আছে।

তারিক আল মাহদী গিয়ে দরজা খুলে দিল। প্রায় অর্ধ ডজন স্টেনগানধারী প্রহরী পরিবেস্টিত হয়ে ঘরে প্রবেশ করল ফ্রাসোয়া এবং তার তিন সাথী। 'হুজুররা স্বীকার করবেন খুব ভাল আছেন আপনারা। খুব সজীব আর সুস্থ দেখাচ্ছে আপনাদের।' বলল ফ্রাসোয়া বাঁকা হেসে।

'মি: ফ্রাসোয়া সুস্থ ও সজীবতার সিংহ ভাগ নির্ভর করে মনের উপর। তোমাদের কালো থাবা আমাদের মন পর্যন্ত পৌঁছে না। তোমাদের বুলেট বুক বিদীর্ণ করা পর্যন্ত আমরা হাসতে পারি। সুতরাং সুস্থতা, সজীবতা দেখবেই।' বলল কামাল ইনুনু।

‘বলেছি তো হুজুরারা, তোমাদের জন্যে আমরা আমাদের বুলেট খরচ করব না। আর এ ধরনের হত্যা অনেকটা স্থুল বা মধ্যযুগীয় হয়ে গেছে। প্রয়োজন এখন নীরব ও শান্তি পূর্ণ ব্যবস্থা আমরা তার চেষ্টা করছি।’

একটু থেমেই সে শুরু করল আবার, ‘আমরা জানি তোমরা সাহস একটু বেশীই দেখাও। এর জবাব দিতেও আমরা জানি। তোমাদের আহমদ মুসা আবার পালিয়েছে। কিন্তু পালিয়ে যাবে কোথায়? ধরা তাকে পড়তেই হবে। এবার ধরা পড়লে বাছাধনকে দেখাব আমরা। শুধু জীবনটাই রাখব, আর কিছু নয়।

আহমদ মুসার পালানোর সংবাদ শোনার সংগে সংগে আনন্দের ঢেউ খেলে গেল, চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওদের বারজনের।

ব্যাপারটা লক্ষ্য করে ফ্রাসোয়া বরল, ‘আনন্দ করে নাই। আর সময় পাবে না। আহমদ মুসাকে বোমাসা আসতেই হবে। আমাদের ফাঁদে পা তাকে দিতেই হবে। ‘

‘আহমদ মুসাকে এতটা নিচে নামিয়ে চিন্তা করতে আপনারা এখনও পারেন?’ বলল তারিক আল মাহদী।

‘এর জবাব তোমরা পাবে। ও, না, এর জবাব পাবার জন্যে তোমরা জীবিত থাকতে নাও পার। শেষ মুহূর্তে পঞ্চদশ দিবসে সে যদি আত্মসমর্পন করে তাহলে তোমাদের আর সে নাও পেতে পারে।

‘তোমরা যেভাবে কথা বলছ, তাতে মনে হচ্ছে তোমাদের ইচ্ছাতেই সবকিছু চলছে। তা কিন্তু চলছে না, চলবে না।’ বলল গ্রান্ড শেখ।

‘মৃত্যুকে স্বচক্ষে দেখার পরই তা স্বীকার করবে এবং সেটা আসছে।’ বলে মিঃ ফ্রাসোয়া বলল, ‘চল।’

ফ্রাসোয়া ফিরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল। তার সাথে সবাই।

ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যাবার পর দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

সেদিকে তাকিযে কামাল ইনুন বলল, ‘যাই হোক ওরা একটা ভাল খবর দিয়ে গেল যে, আহমদ মুসা ওদের হাত থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে।’

‘আল্লাহ্‌ আহমদ মুসাকে সাহায্য করুন।’ দু’হাত উপরে তুলে বলল গ্রান্ড শেখ।

সবাই বলে উঠল, ‘আমীন।’

‘সত্যিই আহমদ মুসা আল্লাহর অফুরান সাহায্য পুষ্ট। তাকে বন্দী করে একদিনও এরা রাখতে পারল না। আর আমরা বারদিন ধরে বন্দী আছি। বেরোবার চেষ্টা দূরে থাক, চিন্তাও করিনি।’

নিশ্চয় আহমদ মুসা বোমাসা আসছে। তবে ওদের কথা অনুযায়ী আত্মসমর্পণের জন্যে নয়। আমাদের উদ্ধারের জন্যই সে আসছে।’ বলল শেখ আব্দুল্লাহ আলী।

‘সমস্যা একটাই তার জন্যে। এই ঠিকানা খুজে বের করা। মনে আছে না যে ওরা বলেছিল এই বন্দীখানা খুজে বের করার সাধ্য কারো নেই।’

‘আরও একটা সমস্যা, আহমদ মুসা তো একা। তার একার পক্ষে এই দুর্ভেদ্য শত্রুপুরীতে হানা দেয়া মানবিক সাধ্যের মধ্যে আসে না।’ বলল আলী ইব্রাহিম।

‘মানবিক সাধ্যের বাইরে যখণ যায় কোনকিছু, তখনই আল্লাহর সাহায্য আসে। এ সাহায্য আহমদ মুসাকে আল্লাহ সব সময় করেন।’ বলল শেখ আব্দুল্লাহ্ আলী।

‘তাই হোক। আমিন।’ বলে উঠল সবাই।

কামাল ইনুন উঠে দাঁড়িয়ে জানালা খুলে দেবার জন্যে জানলার দিকে এগুলো।

ক্যামেরুন, মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র ও কঙ্গো- তিন সীমান্তের গ্রন্থীতে দাঁড়ানো কঙ্গোর বোমাসা শহর। মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্তের সংঘ নদী যেখানে গিয়ে কঙ্গোতে প্রবেশ করেছে, ক্যামেরুন সীমান্তও সেখানে এসে মিসেছে। তারপর সংঘ নদী কঙ্গো ও ক্যামেরুনের সীমান্ত রেখা হিসেবে সামনে এগিয়ে গেছে ‘ওসো’ শহর পর্যন্ত।

সংঘ নদী সীমারেখা হলেও নদীটি পুরো কঙ্গোর ভাগে পড়েছে।

সংঘ নদীর পুরো নিয়ন্ত্রণ কঙ্গোর হাতে।

দেশগুলোর পাসপোর্ট ব্যবস্থা পুরোপুরি আছে, কিন্তু বর্ডার ক্রসের সময় ইনফরমেশন রেজিস্ট্রার করা ছাড়া পৃথক কোন ভিসা নেই। কিন্তু ইনফরমেশন এড়িয়ে যাওয়া এবং রাতে চলাচলের প্রতি খুব কড়া দৃষ্টি রাখা হয়।

বর্ডার থেকে বোমাসা শহরের দূরত্ব মাত্র কয়েকশ' গজ। সংঘ নদীটা সোজা প্রস্থে নয়, একটু কোণাকুণি পার হলেই বোমাসা শহরের পূর্ব প্রান্ত পাওয়া যায়।

সেদিন রাত ৯টা।

সংঘ নদীর দক্ষিণ তীরে বোমাসা শহরের পূর্ব প্রান্তে অনেকগুলো টিলা নিয়ে গড়ে উঠা একটা সুন্দর বসতি।

সংঘ নদীর পানি থেকে উঠে গেছে একটা টিলা। টিলা শীর্ষের দক্ষিণ অর্ধাংশ জুড়ে সুন্দর একটা বাড়ি। টিলার উত্তর অর্ধাংশ ঘাসের কার্পেটে মোড়া সুন্দর একটি সবুজ লন। লনের উত্তর প্রান্তে নদীর ঠিক উপরে ওরা চারজন বসে আছে।

তাদের সামনে রূপালী নদী।

পূর্ণিমার রাত।

বনজ পরিবেশে পূর্ণিমার চাঁদের আলো যেন রজত স্রোতের মত ঢেলে পড়ছে চারদিক।

আফ্রিকার এই অঞ্চলে বিদ্যুত বড়ো দামী। বিদ্যুতের সীমিত ব্যবহার সে জন্যে।

ওদের সামনে বিরাট এক বাস্কেট মিষ্টি আলু ভর্তি। সেখান থেকে মিষ্টি আলু ছোট ছোট ঝুড়িতে তুলে প্যাক করছে।

এ প্যাকগুলো পাঠানো হবে নৌকা পথে ব্রাজাভিল এবং উপকুলের বিভিন্ন শহরে।

চাঁদের আলো এখানে এতই স্বচ্ছ যে, কোনই অসুবিধা হচ্ছে না তাদের কাজের। এমন কি খুঁতওয়ালা আলুগুলো তারা সহজেই বেছে বাদ দিতে পারছে।

সংঘ নদীর পানিতে পূর্ণিমার জোৎস্না অপরূপ দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে। ওপারে উপকূল রেখা বরাবর ছোট ছোট গাছগুলোকে আলাদা আলাদা ভাবে দেখা যাচ্ছে।

ওদের চারজনের দু'জন মাঝ বয়সী নারী ও পুরুষ। অন্য দু'জনের একজন আঠার উনিশ বছরের তরুণী, অন্য জন নয়-দশ বছরের বালক।

তরুণীটি নদীর দিকে চেয়ে বলল, 'আম্মা চাঁদের জোৎস্না আজ বেশী উজ্জ্বল বলে মনে হচ্ছে।'

'হবে। গত দু'দিন বৃষ্টি গেছে। আজ আকাশে একটুও মেঘ নেই।' বলল মাঝ বয়সী মহিলাটি।

'লঞ্চ না হোক অন্ততঃ মটর বোর্ট থাকলে কি মজাই না হতো নদীতে বেড়াতে।' তরুণীটি বলল।

'লেখা পড়া শেষ কর। ডাক্তার হয়ে গেলে নিজেই মটর বোট কিনতে পারবে।' বলল তার মা।

তরুণীটি ব্রাজিভিল মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছে।

'মেয়েটা বলছে এখনকার কথা, তুমি বলছ দশ বছর পরের কথা।' বলল মাঝ বয়সী লোকটি, তরুণীটির আব্বা।

'দাও না তাহলে কিনে।' বলল মহিলাটি।

'আজ পারবো না কাল হয়তো পারবো। ইচ্ছা তো করতে পারি।' বলল তরুণীর আব্বা।

তরুণীটি তাকিয়ে ছিল নদীর দিকে।

সে দেখতে পেল সীমান্তের দিক থেকে একটা নৌকা এগিয়ে আসছে। চাঁদের আলোয় দেখা যাচ্ছে নৌকায় একজন মাত্র আরোহী।

নৌকা মাঝ নদী বরাবর চলে এসেছে। বুঝা যাচ্ছে এ পারে ভিড়বে।

হঠাৎ সীমান্তের দিক থেকে পুলিশের সাইরেন বেজে উঠল। কঙ্গো পুলিশের সাইরেন।

তরুণীটি আগে থেকেই তাকিয়ে ছিল ওদিকে। সাইরেনের শব্দে সাবাই তাকাল। এ সাইরেনের সাথে তারা পরিচিত। নিয়ম না মেনে সীমান্ত কেউ ক্রস করলে পুলিশ এ সাইরেন বাজায় এবং আইন ভঙ্গকারীকে ধরার চেষ্টা করে।

সাইরেন বাজার পর পরই সংঘ নদীর সীমান্ত ফাঁড়ির দিক থেকে একটা বোটকে মাঝ নদী পর্যন্ত আসা নৌকার দিকে ছুটে আসতে দেখা গেল।

'এই রে, এই নৌকাওয়ালা বুঝি কোন আকাম করে বসেছে। নিশ্চয় সীমান্ত ফাঁড়ি এড়িয়ে এসেছে।' বলল মাঝ বয়সী লোকটা।

'নিশ্চয় কোন চোরাচালানী।' বলল মহিলাটি।

'তা মনে হচ্ছে না আম্মা। চোরাচালানী এমন করে পুলিশ ফাঁড়ির নাকের ডগার উপর দিয়ে সোজাসুজি এভাবে আসে না। পুলিশের চোখ ফাঁকি দেবার জন্যে অবশ্যই কোন বিলকপ পথ ধরতো।' বলল তরুণীটি।

'ঠিক বলেছ চোরাচালানী বা ক্রিমিনালরা পুলিশ ফাঁড়ির সামনে দিয়ে মাঝ নদী হয়ে আসে না।' বলল তরুণীর আব্বা।

এই সময় লাউড স্পীকারে একটি কণ্ঠ ধ্বনিত হলোঃ 'সীমান্ত ফাঁড়িকে না জানিয়ে তুমি কঙ্গো প্রবেশ করেছ। আত্মসমর্পণ কর না হলে গুলি করব।'

ওরা সবাই বুঝল লাউড স্পীকারের শব্দ ভেসে আসছে পুলিশের বোট থেকে।

কিন্তু ওরা বিস্মিত হয়ে দেখল, মাঝ নদী পর্যন্ত এগিয়ে আসা নৌকা থামার কোন লক্ষণ দেখাল না। যেভাবে দ্রুত তা আসার চেষ্টা করছিল, সেভাবেই তা এগিয়ে আসছে।'

শংকিত হয়ে উঠলো ওরা। কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, বুঝল তারা।

তাদের চমকে দিয়ে একটা রাইফেল গর্জন করে উঠ।

সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে আসা নৌকার আরোহী ঝুপ করে পড়ে গেল পানিতে।

''লোকটি কি গুলি খেয়ে পড়ে গেল?' অনেকটা স্বাগত কণ্ঠে বলল মাঝ বয়সী লোকটি।

কেউ উত্তর দিল না তার প্রশ্নের। তাদের চারজনের আটটি চোখ জোৎস্না প্লাবিত নদীর পানির উপর নিবদ্ধ।

পল পল করে সময় বয়ে যাচ্ছে। ৮টি অপলক চোখ যেন ক্লান্ত হয়ে উঠল। বলল আবার মাঝ বয়সী লোকটিই, ‘সত্যিই লোকটি তাহলে গুলি খেয়েছে, তাই ডুবে গেছে।’

আগের মতই কেউ কোন কথা বলল না। এক প্রকার ভয়, বেদনা তাদের মনকে আচ্ছন্ন করেছে।

একদম সীমান্ত লাগা তাদের বাড়ি হলেও এমন চোখের সামনে এই ধরনের ঘটনা এর আগে কখনও ঘটেনি।

পুলিশের বোট অল্প কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে ফিরে গেল তাদের ফাঁড়িতে। তাদের অব্যর্থ গুলি খেয়ে নদীতে ডুবে গেছে লোকটা, সম্ভবত এই বিজয় গৌরবে আর অনুসন্ধানের প্রয়োজন বোধ করল না তারা।

ওরা চারজন তখনও নদীর দিকে তাকিয়। পুলিশ বোটের জ্বলজ্বলে লাইটটা তখনও দেখা যাচ্ছে।

এই সময় ওদের টিলার গোড়ার কাছাকাছি নদীতে ভেসে উঠল একটা মাথা।

প্রথমে ওদের মধ্যে থেকে বালকটিরই চোখে পড়ল ব্যাপারটা। সে উত্তেজিত ফিস ফিস কণ্ঠে বলল, ‘এই দেখ, এখানে কি?’

সংগে সংগে অন্য তিনজনেরও চোখ সেদিকে আকৃষ্ট হলো।

তারা দেখল, একজন লোক অত্যন্ত সন্তর্পনে সাঁতরে উঠে আসছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে টিলার গোড়ায় তাদের ঘাটে উঠে এল।

এক ধরনের ভয় ও বিস্ময়ে ওরা চারজন প্রায় নির্বাক হয়ে গেছে।

নীরবতা ভেংগে তরুণীটি ফিস ফিস করে বলল, ‘এই কি নৌকার আরোহী?’

‘এ কি সম্ভব? এতটা ডুবে আসতে পারে কেউ? বলল তরুণীটির আব্বা।

‘কিন্তু এ লোক তো অন্য কোন দিক থেকে আসা স্বাভাবিক নয়। ঘাটে উঠেই দেখ শুয়ে পড়েছে। কোন পরিকল্পনা নিয়ে আশে-পাশের কেউ এলে নিশ্চয় এভাবে সময় নষ্ট করতো না, আর এ সময়টাও বেছে নিত না।’ বলল, মাঝ বয়সী মহীলাটি।

'তুমি ঠিকই বলেছ। লোকটি নৌকার আরোহীই হবে।'

তরুণীটি কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু বন্ধ হয়ে গেল তার কথা। মুখে তার প্রবল উত্তেজনা ফুটে উঠেছে। বলল, 'ঐ যে।' ঘাটের দিকে আংগুলি সংকেত করল তরুণীটি।

সবাই দেখল, লোকটি টিলা বেয়ে উঠে আসছে।

তরুণীটির আব্বা মাঝ বয়সী লোকটি উঠে দাঁড়াল।

উঠে আসা লোকটিকে একটু দেখে নিয়ে বলল, 'লোকটি আফ্রিকান নয়, ইউরোপিয়ান নয়। কোন অস্ত্র নেই লোকটির হাতে।

তরুণীর আব্বা একটু এগিয়ে চত্তরের প্রান্ত ঘেঁষে দাঁড়াল। আর মহিলাটি, তরুণীর মা, জ্বেলে দিলো চত্তরের বিদ্যুৎ বাতিটি।

সবাই এসে দাঁড়াল চত্তরের প্রান্ত ঘেঁষে।

'লোকটির যদি কোন বদ মতলব থাকে?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল মহিলাটি।

তরুণীর আব্বা পকেট থেকে রিভলবার বের করে হাতে নিয়ে বলল, 'ও শত্রুটা করলে আমরাও শত্রুতা করব। তবে দেখে তেমন মনে হচ্ছে না। লোকটি এশিয়ান। হয়তোবা বিপদে পড়া কোন লোকও হতে পারে।'

চত্তরে দাঁড়ানো লোকদেরও দেখতে পেয়েছে এগিয়ে আসা লোকটি।

দেখতে পেয়েই লোকটি ডান হাত একবার উপরে তুলেছে।

'ভয় নাই, লোকটি মৈত্রীর সিগন্যাল দিয়েছে।' বলল তরুণীটির আব্বা।

টিলার ঢাল বেয়ে উঠে আসা লোকটি আরও এগিয়ে এসেছে। চত্তরের আলো এবার তার উপর গিয়ে পড়েছে।

ভিজে চুপসে গেছে যুকবটি। গায়ের জ্যাকেট ও ট্রাউজার দিয়ে তখনও অল্প অল্প পানি ঝরছে। মাথার চুলটাও তার মোছা হয়নি। মোছার মত কিছু নেই।

বলা যায় একেবারেই নব্য যুবক। আশ্চর্য্য হলো তরুণীটির আব্বা। যুবকটির চেহারার দিকে তাকিয়েই এ কথাটা তার মনে হলো, কোন ক্রিমিন্যালের চেহারা এটা নয়। একজন ভদ্র যুবক বলতে যা বুঝায় যুবকটি তা-ই।

আগন্তুক যুবকটি চার গজের মধ্যে আসতেই তরুণীটির আব্বা ভদ্রলোক বলল, 'দাঁড়াও। আগে তোমার পরিচয়।' বলল বান্টু ভাষায়।

‘আমি সলো থেকে বোমাসা এসেছি একটা প্রয়োজনে, পথে এই বিপদ ঘটেছে।’

পুলিশ তোমাকে কেন তাড়া করেছে?’

‘আমি জানি না।’

‘পুলিশের নির্দেশ তুমি মানলে না কেন?

‘অন্য সময় হলে মানতাম। কিন্তু আমার হাতের কাজটা এত জরুরী যে, দু’চার দিন পুলিশ হাজতে থাকার মত সময় আমার নেই।’

‘সীমান্ত ফাঁড়িতে তোমার নাম লিখিয়েছ?’

‘না।’ এই ধরনের আইন আগে আমি জানি না। আমি বিদেশী লোকতো! জানলে অবশ্যই আমি আইন মানতাম।

যুকবটির কথা শুনে তরুণীর আব্বা-আম্মা সহ ওদের সকলেরই কেন জানি মনে হলো, যুবকটি মিথ্যা কথা বলছে না।

‘এখন তুমি কোথায় যাবে?

‘কোন হোটেল পেলে আপাতত উঠব। আশে পাশে কোন হোটেলের কথা আপনি বলতে পারেন?’

‘সে ধরনের হোটেল এখান থেকে তিন মাইল পশ্চিমে হবে।’

‘কোন পথে যেতে হবে, দয়া করে একটু দেখিয়ে দেবেন কি?’

এতক্ষণে ওদের সকলের মত থেকে সংশয় মেঘ কেটে গেল বুঝল, যুবকটি যেমন সুন্দর, সুগঠিত, তেমনি মনের দিক দিয়ে খুব ভদ্র। যুবকটির প্রতি একটু করুণাই হলো।

‘এইভাবে তুমি হোটেলে যাবে? তোমাকে নির্গাত সন্দেহ করবে। আর জান সবগুলো হোটেলের উপরই পুলিশ চোখ রাখে।’

‘কি করবো উপায় তো নেই।’

তরুণীর আব্বা বালকের দিকে চেয়ে বলল, ‘ইউহোসবি তুমি ভেতর থেকে একটা তোয়ালে ও এক প্রস্থ কাপড় নিয়ে এস। গোসলখানাটা একে দেখিয়ে দাও।’

কথা শেষ করেই যুবকটির দিকে চেয়ে বলল, ‘আমি ম্যাকাকো।’

মহিলাকে দেখিয়ে বলল, ‘ও আমার মানে ‘ও’ হলো মিসেস ম্যাকাকো।’

আর তরুণী ও বালকটির দিকে ইংগিত করে বলল, ‘ওরা আমার ছেলেমেয়ে মাসাবো এবং ইউহোসবি।’

একটু থেমে বলল, ‘তোমার নাম কি তোমার দেশ?’

‘আমি জন্ম গ্রহণ করেছি চীনের সিংকিয়াং প্রদেশে।’ তারপর বাস করছি. . . . . . .।’

কথা শেষ করতে না দিয়ে ম্যাকাকো বলল, ‘তুমি আবার কম্যুনিষ্ট-টম্যুনিষ্ট নাকি?’

না, আমি কম্যুনিষ্ট নই। কেন কম্যুনিষ্ট ভয় করেন?’

‘না করে উপায় আছে। ওরাই শান্তির কাফেলাতে অশান্তির আগুণ জ্বালে। চীন-রাশিয়া আমেরিকার রাজনীতি তারা আমাদের গরীব দেশে এনে আমাদের শান্তি কেড়ে নিয়েছিল।’

একটু থামলো। একটু ঢোক গিলে বলল, তুমি ইউহোসবির সাথে যাও। কাপড় ছেড়ে নাও।’

গোছল ও কাপড় ছাড়ার পর আগুন্তুক যুবককে বাইরে মেহমান খানায় থাকার ব্যবস্থা করে দেয়া হল।

ম্যাকাকো তাকে খাওয়া-দাওয়ার পর বলেছে, ‘আজ বিশ্রাম নাও সকালে চলে যাবে।’

শোবার আয়োজন করছিল ম্যাকাকো। গ্লাস ভর্তি পানি টেবিলে রাখতে রাখতে মিসেস ম্যাকাকো বলল, ‘লক্ষ্য করেছ ছেলেটি ভীষণ লাজুক। খেয়াল করেছি, আমি ওর সামনে গেলে মুখ তুলে কখনও চায় না, এমনকি মাসাবা কাছে গেলেও নয়।’

‘ঠিকই বলেছ। আমার মনে হয়েছে, যুবকটি বর্তমান সময়ের নয়। এমন মার্জিত, সপ্রতিভ ও লাজুক ছেলে এখন হয়না। সত্যি ছেলেটাকে বিপদে সাহায্য করতে পেরে আমার খুব ভাল লাগছে।’ একটু থেমে আবার মিঃ ম্যাকাকো বলল, ‘ভাল লাগার সাথে সাথে একটি কথা আমার কাছে বড় হয়ে উঠছে। তা হলো, দু’তিন দিনও দেরী করা যাবে না, এমন কি কাজ আছে এখানে একজন যুবকের।’

‘তবে ছেলেটা যে অসীম সাহসী, অসম্ভব রকমের সামর্থ রাখে, তা তার পুলিশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলে আসা এবং এতদূর জায়গা ডুব দিয়ে পাড়ি দেয়া থাকে বোঝা গেছে।’ বলল মিসেস ম্যাকামো।

ঘরে দৌড়ে প্রবেশ করল মাসাবো এবং ইউহোসবি। হাঁপাতে হাঁপাতে মাসাবা বলল, ‘দারুন খবর।’

‘কি খবর’ মাসাবার আব্বা-আম্মা দু’জনেই বলে উঠল।

‘আমরা মেহমানের ঘরের পাশ দিয়ে আসছিলাম. . . .. . .. . .।’ থামলো মাসাবা।

‘আসছিলে, তারপর বল।’ বলল মাসাবার আম্মা উদগ্রীবভাব।

‘দেখলাম, আমাদের মেহমান. . .. . . . . . .’আবার থামলো মাসাবা।

মাসাবার আব্বা-আম্মা দু’জনেরই উৎকন্ঠায়, চোখ বড় বড় হয়েছে। কোন দুর্ঘটনা ঘটল নাকি; তাদের মনে আশংকা। বলল, ‘বল, কি হয়েছে বল।’

‘নামাজ পড়ছেন আমাদের মেহমান।’ বলল মাসাবা।

‘নামাজ পড়ছে? ঠিক দেখেছ?’ বলল মাসাবার আব্বা।

‘এখনও পড়ছে, দেখবে চল।’ বলল মাসাবা।

‘ঠিক আছে, চল দেখি।’ বলে উঠে দাঁড়াল মিঃ ম্যাকাকো এবং তার সাথে মিসেস ম্যাকাকোও।

চারজনই গিয়ে দাঁড়াল মেহমান খানার জানালায়।

ঠিক। নামাজে দাঁড়িয়ে আগন্তুক যুবকটি। চারজন দাঁড়িয়ে দেখল। তারপর একটু সরে এল। মিঃ ম্যাকাকো ও মিসেস ম্যাককোর চোখে বিস্ময়। বলল মিসেস ম্যাকাকো, ‘তাই তো বলি ছেলেটা এত ভাল কেন! মুসলমান না হলে এমন ছেলে হয়!’

‘আমি ভাবছি অন্যকথা।’ বলে উঠল মিঃ ম্যাকাকো, ‘একজন মুসলিম যুবক এইভাবে বুমাসা এল। বুমাসায় সাংঘাতিক জরুরী কাজ তার। মেলাতে পারছি না। এস তার সাথে কথা বলি।’

বলে মিঃ ম্যাকাকো জানালায় এসে দেখল নামাজ হয়ে গেছে। দরজায় গিয়ে নক করল সে।

যুবকটি হাসি মুখে স্বাগত জানাল। বলল, ‘আসুন আপনারা।’

‘বিরক্ত করলাম তোমাকে দু’টি কারণে। প্রথম হলো আমাদের খুশীর কথা তোমাকে জানানো। দুই, আমরা যে একটা হিসাব মেলাতে পারছিনা তা তোমাকে বলা।’

ঘরে দু’টিই মাত্র চেয়ার। যুবক চেয়ার দু’টি মিঃ ম্যাকাকো ও মিসেস ম্যাকাকোর দিকে এগিয়ে দিয়ে তরুণীটিকে বলল, তুমি বেডের পাশটায় বসতে পারো বোন।’

আর বালকটিকে সে নিজের কাছে টেনে নিল।

‘বোন’ সম্বোধন শুনে তরুণী মাসাবা যুবকটির দিকে একবার চোখ তুলে চেয়ে ‘ধন্যবাদ’ বলে বসে পড়ল।

কথা শুরু করল মিঃ ম্যাকাকো বলল, ‘দেখ তোমার বিশ্রামে বিঘ্ন ঘটালাম কিছু মনে করো না। ভোর পর্যন্ত আমাদের খুশী ও কৌতুহল চেপে রাখা সম্ভব ছিল না।’ বলে একটু থামলো ম্যাকাকো।

‘না, আমার কোন কষ্ট হয়নি। বিশ্রামের সময় আমার এখন নয়। আমি বরং আপনাদের সাথে এই কথা বলার সুযোগ পেয়ে খুশী হয়েছি।’ বলল যুবকটি।

মিঃ ম্যাকাকো আবার শুরু করল, ‘কেন খুশী হয়েছ?’

‘আপনার সাহয্যের প্রয়োজন হবে আমার।’

‘কি সাহায্য?’

‘বলব, আপনার কথা আগে বলুন।’

‘আমাদের আনন্দের বিষয়টা হলো, জানলাম তুমি মুসলমান।’

ম্যাকাকোর মুখে আকস্মিকভাবে নিজের পরিচয় শুনে যুবকটি গম্ভীর হয়ে উঠল। বুঝতে পারলো না তার পরিচয় জানলো কি করে!

‘কি ভাবে জানলেন?’ মুখে হাসি টেনে বলল যুবকটি।

‘মাসাবা ও ইউহোসবি তোমাকে নামাজ পড়তে দেখেছে।’

‘নামাজ ওরা চিনল কি করে?’

হো হো করে হেসে উঠল ম্যাকাকো। বলল, ‘আমরা নিয়মিত নামাজ পড়ি না, নানা অসুবিধা আছে। ঈদে-চাঁদে তো পড়ি। জুমা পড়ি। সুতরাং নামাজ না চেনার কথা নয়।’

‘আপনারা মুসলমান?’

‘মুসলমান মানে খাটি মুসলমান।’ বলে একটু থামল ম্যাকাকো। তারপর বলল, ‘আমার নাম বেলাল ম্যাকাকো। তোমার পাশে আমার ছেলের নাম রাশিদ ইউহোসবি। আর আমার এ মেয়ের নাম ফাতেমা মাসেবা।’

যুবকটির চোখ-মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আনন্দের প্রবল উচ্ছ্বাস যেন তাকে কিছুক্ষণ কথা বলতে দিল না।

এক সময় দু’হাত উপরে তুলে বলল, ‘হে আল্লাহ তুমি সবচেয়ে বড় সাহায্যদাতা। যখন একটি মুসলিম পরিবারের সাক্ষাত আমার সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, তখন তার সাক্ষাত পেলাম।’

বলে যুবকটি বালক ইউহোসবি’র কপালে একটা চুমু খেয়ে ম্যাকাকোকে উদ্দেশ্য করে বলল, ‘আপনার আনন্দের চেয়ে আমার আনন্দ অনেক বেশী।’

‘আমাদেরটা পরিমাপ না করে তুমি বলতে পার না। এখন বল, ‘তুমি কে? এমন কি জরুরী প্রয়োজনে তুমি বুমাসা এসেছ যার জন্য দু’একদিনের অপেক্ষাও তোমার পক্ষে অসম্ভব?’

যুবকটি তাৎক্ষণাত কোন উত্তর দিল না।

একটু ভাবল। তারপর বলল, ‘বলতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তার আগে আমার একটা কৌতুহল নিবৃত্ত করলে খুবই খুশী হবো।’

‘কি সেটা?’ বলল ম্যাকাকো।

‘আপনাদের কথা। আফ্রিকার এত গভীরে দূর্গম কঙ্গোর এই কালো বুকে আপনার এই মুসলিম পরিবার কোথেকে এল?’

‘ও এই কথা। বোমাসায় আমার একটি পরিবার নয়, পাঁচশ’ মুসলিম পরিবার আছে এখানে। মোট মুসলিম জনসংখ্যা তিন হাজারের মত। একমাত্র রাজধানী ব্রাজাভিল ছাড়া কঙ্গো শহরে এত মুসলমান এক সাথে বাস করে না।’

‘অবিশ্বাস্য ব্যাপার।’ এই কথা বলার সময় যুবকটির কন্ঠে বিস্ময় থাকলেও, তার চেহারায় কোন বিস্ময় নেই। বরং তার ঠোটে খুব সুক্ষ একটা হাসির রেখা ফুটে উঠেছিল। সে যেন সব জানে। বাজিয়ে নিচ্ছে মাত্র যে, কতটুকু বিশ্বাস করা যায়, কতটুকু যায় না।

‘সকল আধুনিক যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন গভীর অরণ্যের অন্ধকারে নিমজ্জিত কঙ্গোর এই একটি শহরে এত মুসলমানের অস্তিত্ব অবিশ্বাস্য বৈকি। এই শহরে খৃস্টানদের সংখ্যা মুসলমাদের অর্ধেক। অথচ গত দু’শ বছর ধরে খৃস্টানরাই এ অঞ্চলে আধিপত্য করছে।’ বলল ম্যাকাকো।

‘কারণ কি বলুন তো!’ যুবকটি বলল।

‘বোমাসায় এই মুসলিম বসতি স্থাপনের কৃতিত্ব মাত্র একজনের। তিনি হলেন উত্তর ক্যামেরুনের রাজ্যত্যাগী রাজা সুলতান যায়দ রাশিদী। তিনি সিংহাসন ত্যাগ করে এসে এখানে ২০ বছর অজ্ঞাতবাস করেছিলেন। তিনি এখানকার ছিলেন এক মুকুটহীন রাজা। তাঁর চরিত্র মাধুর্য এখানকার কালো মানুষগুলোর মধ্যে ইসলামের আলো প্রজ্জ্বলিত করে। পরবর্তিকালের বহিরাগতদের বাদ দিলে বোমাসার মূল বাসিন্দাদের অধিকাংশই মুসলমান।’

‘আল্লাহ তাকে পুরস্কৃত করুন।’

‘সুলতান যায়দ রাশিদী কোথায় গেলেন তারপর?’ যুবকটির মুখে এখনও সেই হাসি। সব জান্তার হাসি।

‘আমরা ঠিক জানি না। কেউ বলে তিনি হজ্জে গিয়ে আর ফেরেন নি। কারও মত আবার, তিনি ক্যামেরুনেই ফিরে গেছেন।’

যুবকটি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, ‘মাফ করবেন আমাকে। এ বিষয়ে আমি অনেক কিছুই জানি। তারপরও আপনার কাছ থেকে জানতে চেয়েছি আপনার পরিচয় ঠিক কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্যে।’

ম্যাকাকো, মিসেস ম্যাকাকো, মাসাবা, ইউহোসবি সকলের মুখেই বিষ্ময় ফুঠে উঠল। কথা বলল ম্যাকাকো, ‘জান তুমি তাঁর শেষ খবরটা কি?’

যুবকটি সংক্ষেপে যায়দ রাশিদীর কাহিনী বলল। কি করে তিনি ইয়াউন্ডি গেলেন, কিভাবে তিনি সেখানে নিবাস গাড়লেন, কিভাবে তার দুঃখজনক মৃত্যু হলো ইত্যাদি।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনলো কথাগুলো ম্যাকাকো এবং তাদের পরিবার। কাহিনী শুনতে গিয়ে কখনও তাদের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, কখনও চোখ তাদের অশ্রু সিক্ত হয়েছে।

যুবকটি থামলেই ম্যাকাকো বলল, 'জান বোমাসার মানুষ তাকে কত ভালবাসে! তার গড়া বিশাল মসজিদের পাশেই ছিল তার বাড়ি। সেই বাড়ি এখন বোমাসাবাসীদের তীর্থক্ষেত্র। তার ব্যাবহার্য সকল জিনিস সেখানে যাদুঘরের মত করে সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। মানুষ সেগুলো মহা পবিত্র জ্ঞান করে। ইসলামে অনুমতি থাকলে তার মূর্তিও গড়া হতো। অমুসলিমরাও মুসলমানদের মত তাঁকে ভালোবাসে। তিনি যে তারিখে মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, সেই তারিখে প্রতিবছর তিনি জনসাধারণকে খাওয়াতেন এবং স্রষ্টা ও মানুষের সম্পর্ক, জীবন কিভাবে শান্তিপূর্ণ ও সুন্দর করা যায় ইত্যাদি বিষয়ের উপর অভিভাবক সুলভ বক্তৃতা করতেন। এর মধ্য দিয়ে বোমাসার বাইরেও তার প্রভাব সৃস্টি হয় এবং সে সব স্থানেও মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

'যায়দ রাশিদীর চালু করা সেই সম্মেলনের আয়োজন এখনও নিশ্চয় আপনারা করেন?'

'না এখন হয় না, তার মতো লোক তো নেই, কে সেখানে কথা বলবে?'

'কেন আলেম, ইমাম আপনাদের নেই?' একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল ম্যাকাকো। বলল, 'কোন আলেম লোক আমাদের নেই। কোন ভাল ইমামও নেই। অনেক লেখালেখির পর রাববারেতির চেষ্টায় বিশ্ব মুসলিম কংগ্রেস আমাদের জন্যে একজন মুবাল্লেখ দিয়েছিল ইমাম ও শিক্ষকের দায়িত্ব পালনের জন্যে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের সেই ভাই মিমি মাছির কামড়ে মারা যান, তারপর কেউ আর আসেনি। ইসলামের সাধারণ শিক্ষার সুযোগ থেকেও আমরা বঞ্চিত। আমিই যেখানে জানি না, সেখানে আমার ছেলে সন্তানদের কোরআন শিক্ষা, ইসলাম

শিক্ষা দেব কি করে? আমি জানি, যে নামাজ আমরা পড়ি, তাকেও নামাজ বলে না।'

'সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক।'

'না, আমাদের চেয়েও দুর্ভাগা মুসলমান কঙ্গো অববাহিকায় আছে। আমরা যতটুকু জানি তারা ততটুকুও জানে না। যুবকটি কোন কথা বলল না ম্যাকাকো থামলেও। কিছু বলার জন্যে ম্যাকাকোই মুখ খুলছিল। এ সময় কলিংবেল বেজে উঠল। কথা বলা হলনা ম্যাকাকো'র। সে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল স্ত্রীর দিকে।

'ওটা গেটের কলিংবেল। এতরাতে কে এল?' বলল মিসেস ম্যাকাকো। তার চোখে-মুখে বিরক্তি নয়, কিছুটা ভয়ের চিহ্ন।

মিঃ ম্যাকাকো উঠে দাড়ালো। বলল, তোমরা বস আমি দেখি।' বলে মিঃ ম্যাকাকো পা বাড়াল যাবার জন্যে।

ত্বরিৎ উঠে দাঁড়ালো মিসেস ম্যাকাকো, স্বামীর সামনে দাঁড়িয়ে তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'না, তুমি যাবেনা। আমি দেখছি।' বলে মিসেস ম্যাকাকো বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। তার পেছনে ছুটে গেল বালক ইউহোসবি।

একটি কলংবেল শুনে ম্যাকাকো পরিবারের আকস্মিক অস্বস্তি ভাব, ম্যাকাকোকে বাধা দিয়ে তার স্ত্রীর দরজা খুলতে যাওয়া-এই দুইটি বিষয় বিস্মিত করল মেহমান যুবকটিকে। সে বলল, 'কি ব্যাপার জনাব, কলিংবেল শুনে মিসেস ম্যাকাকো'র মুখে ভয়ের চিহ্ন দেখলাম, আবার উনি আপনাকে যাতে দিলেন না।'

ম্যাকাকো গম্ভীর। বলল, 'গত ১০ দিনে তিনটি মারাত্মক ঘঠনা ঘঠেছে। বোমাসা মুসলিম ট্রাষ্টের মোতাওয়াল্লী, বোমাসা ইসলামিক সার্কেল-এর সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক নিখোঁজ হয়েছেন। এই তিনটি ক্ষেত্রেই গভীর রাতে কলিং বেলের শব্দে দরজা খোলার পর উধাও.................

কথা শেষ করতে পারলনা ম্যাকাকো। তার কথা থেমে গেল একটা উচ্চ কন্ঠের হুংকারে। কন্ঠটি হুংকার করে বলল, 'বেরিয়ে এস ম্যাকাকো। কাপুরুষ বটে! স্ত্রীকে পাঠিয়েছ দরজা খুলতে।' মুহূর্তে ম্যাকাকোর চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তাকাল সে যুবকটির দিকে।

গর্জে উঠল সেই কন্ঠ আবার, ‘এক সেকেন্ডও যদি দেরী কর তোমার স্ত্রী ও ছেলেকে হত্যা করব তুমি বাঁচবে না।’

কথা শোনার সংগে সংগে ম্যাকাকো পাগলের মত ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তরুণী মাসাবা কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়েছে মেঝেতে।

মেহমান যুবকটি দ্রুত বিছানা থেকে নামল। সান্ত্বনার ভংগিতে তরুণীর মাথায় হাত রেখে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। দেখল, মিঃ ম্যাকাকো চত্তরের মাঝে পাথরের প্রাণহীন মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। কিছু দূরে দাড়িয়ে আছে মুখোশ পরা চারজন। ওদের একজনের রিভালবারের নল ম্যাকাকোর বুক লক্ষ্যে স্থির হয়ে আছে। ম্যাকাকোর স্ত্রী এবং ছেলেটি চত্তরে বসে পড়ে কাঁপছে। কান্নাও তাঁরা ভূলে গেছে, যেন বোবা হয়ে গেছে তাঁরা। রিভালবারধারী তার সাথীদের বলল, ‘যাও ম্যাকাকোকে তুলে নাও।’

দু’জন এগিয়ে এল ম্যাকাকোর দিকে। তারা এসে এক ধাক্কায় ম্যাকাকোকে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর একজন তার দু’পা এবং অন্যজন দু’হাত ধরে তাকে শূন্যে তুলে এগুতে লাগল।

মেহমান যুবকটি দাঁড়িয়ে দেখছিল। তার একটি হাত পকেটে।

এতক্ষণে সে বলল, ‘দাড়াও।’ একটা কঠিন নির্দেশের সুর তার কন্ঠ।

কিন্তূ দু’জন দাঁড়ালো না।

উত্তরে রিভলবার ধারী বলল, ‘কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করো না, লাশ হয়ে যাবে।’

মেহমান যুবকের কন্ঠে আবার নির্দেশের সুর ধ্বনিত হলো, ‘মিঃ ম্যাকাকোকে ছেড়ে দাও।’

কিন্তূ ওরা দু’জন দাড়ালো না। বরং রিভলবার ধারী তার রিভলবারের নল লক্ষ্য করেছিল মেহমান যুবকটিকে।

মুহূর্তে ঘটে গেল ঘটনাটা।

মুখোশ ধারীর রিভলবার মেহমান যুবক পর্যন্ত উঠে আসার আগেই মেহমান যুবকের হাত বিদ্যুত বেগে বেরিয়ে এল পকেট থেকে এবং বুলেট উদ্‌গীরণ করল।

একদম বুকে গুলী খেয়ে পড়ে গেল মুখোশধারী।

তার পাশে দাঁড়ানো মুখোশধারীও তার পকেটে হাত দিয়েছিল।

মেহমান যুবকের দ্বিতীয় গুলীটা বিদ্ধ করল দ্বিতীয় মুখোশধারীকে। সে গুলি খেল মাথায়।

এদিকে যে দু'জন নাগর দোলা করে নিয়ে যাচ্ছিল ম্যাকাকোকে তাঁরা তাকে ছেড়ে দিয়ে ঝাপিয়ে পড়ল মেহমান যুবকটির উপর।

দ্বিতীয় গুলী করার পর যুবকটি রিভলবার ঘুরিয়ে নিয়েছিল ঝাঁপিয়ে পড়া দু'জনের দিকে।

একটা গুলী করারই সময় হলো। এই তৃতীয় গুলিটা তৃতীয় মুখোশধারীর বুকটা এফোড় ওফোড় করে দিল। ততক্ষণ চতুর্থ মুখোশধারী এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে মেহমান যুবকটির উপর। হাত থেকে তার রিভলবারটি ছিটকে পড়ে গেল।

মেহমান যুবকটি মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। তার উপর এসে পড়েছিল মুখোশধারী। পড়েই মুখোশঢারী একটি ঘুষি চালিয়েছিল যুবকটির মুখে। ঠোট ফেটে গিয়েছিল যুবকটির।

ব্যাথার প্রবল ঝাকুনি কিছুটা ভোতা করে দিয়েছিল যুবকটিকে।

যখন সচেতন হলো বুঝল মুখোশধারীর দুইটি হাত সাঁড়াশির মত বসে যাচ্ছে তার গলায়।

যখন যুবকটি মাটিতে আছড়ে পড়ে তখনই তার অভ্যাস আনুসারে পা বুকের সাথে গুটিয়ে নিয়েছিল। গুটানো পাকে সে এবার কাজে লাগালো। হাটু এবং পা দিয়ে উপরে চেপে বসা মুখোশধারীর দেহটাকে প্রবল ধাক্কায় উপর দিকে ছুঁড়ে দিল।

মুখোশধারী উল্টে যুবকটির মাথার পেছনে এসে পড়ল। তার হাত শিথিল হয়ে পড়েছিল। যুবকটির গলা থেকে।

সংগে সংগে যুবকটি পাশ থেকে রিভলবারটি কুড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। উঠেই দেখতে পেল মুখোশধারী শোয়া অবস্থাতেই পকেট থেকে রিভলবার বের করছে। কিন্তূ সময় পেল না রিভলবার লক্ষ্যে উঠে আসার। মেহমান যুবকটির চতুর্থ গুলিটি তার হাত আহত করে বিদ্ধ করল তার বুক।

মেহমান যুবক রিভলবার পকেটে রেখে ওদের চারজনের মুখোশ খুলে ফেলল। চারজনই শেতাংগ।

ততক্ষণে মিঃ ম্যাকাকো, মিসেস ম্যাকাকো এবং ইউহোসবি উঠে দাঁড়িয়েছে। তরুণীটিও বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে। ভয়ে তারা সবাই কাঠ হয়ে গেছে। কথা বলার শক্তি যেন তারা হারিয়ে ফেলেছে। তারা একবার তাকাচ্ছে চারটি লাশের দিকে, আবার তাকাচ্ছে মেহমান যুবকটির দিকে। যুবকটিকে তারা যেন নতুন করে দেখছে।

মেহমান যুবকটি মিঃ ম্যাকাকোর দিকে চেয়ে বলল, 'আপনি কি এদের চিনতে পারছেন?'

কোন কথা বলল না মিঃ ম্যাকাকো। ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল মেহমান যুবকটিকে। শিশুর মত কেঁদে উঠল চিৎকার করে। বলল, 'তুমি ফেরেশতা। আমাকে বাঁচাবার জন্যে আল্লাহ্ তোমাকে পাঠিয়েছেন।' তার পরিবারের অন্যান্যরাও এসে তার চারদিকে দাঁড়াল তাদের চোখে-মুখে আতংক। কাঁদতেও বোধ হয় তারা পারছে না।

যুবকটি মিঃ ম্যাকাকোকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'আপনি কি এদের চেনেন?'

চোখ মুছে ম্যাকাকো বলল, 'না এদের কাউকে চিনি না।'

যুবকটি বলল, 'দেখি ওদের পকেটে কোন কাগজপত্র পাওয়া যায় কিনা, যাতে তাদের পরিচয় মেলে।' বলে সে ওদের চারজনকেই সার্চ করল।

কাগজের মধ্যে একজনের পকেটে পেল একটি মুখ ছেড়া ইনভেলাপ এবং তার ভেতরে একটা চিঠি। চিঠির উপর একবার নজর বুলিয়েই রেখে দিল পকেটে।

মিঃ ম্যাকাকোর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'এই লাশ গুলির কি ব্যাবস্থা করা যায়?'

'আমি বুঝতে পারছি না, তুমি বল কি করব।' কেঁদে উঠে বলল ম্যাকাকো।

যুবকটি একটু চিন্তা করল। বলল 'দুইটা পথ আছে। সব ঘঠনা পুলিশকে বলে লাশগুলো পুলিশের হাওলায় দিয়ে দেয়া। দ্বিতীয়, লাশগুলি গুম করে ফেলা। এদু'টির কোনটি আপনার জন্য ভাল?'

'পুলিশকে জানানো যায়। কিন্তূ পুলিশকে জানালে শুত্রুপক্ষ জেনে ফেলবে। তাতে ভবিষ্যতে বিপদ বাড়তে পারে। তার চেয়ে লাশ সরিয়ে ফেলাই নিরাপদ।' বলল ম্যাকাকো।

মানুষ তো গুলির শব্দ পেয়েছে। এটা কোন অসুবিধা করবে না?'

'গুলির ঘটনা বোমাসায় কোন বড় ঘটনা নয়। হাত সই করা, এমন কি বিনা কারণেও গোলাগুলির ঘটনা এখানে ঘটে। আর আমার বাড়ি সীমান্তের লাগোয়া এবং নদীর উপরে হওয়ায় মানুষ গুলি কয়টিকে পুলিশের বলেও ভাবতে পারে।'

'এখানে আগ্নেয়াস্ত্রের জন্যে কোন লাইসেন্স নেই। এখানে এখনও জংগলের আইনই চালু আছে। শক্তি যার বেশী, আইন এখানে তার পক্ষে।'

লাশ গুলো নদিতে ফেলে দেয়া হলো। মেহমান যুবক এবং ম্যাকাকো যখন লাশগুলোর ব্যাবস্থা করছিল, তখন মিসেস ম্যাকাকো এবং অন্যরা বাড়ির রক্তাক্ত চত্তরটা ধুয়ে মুছে-সাফ করে ফেলেছে।

বালতি দিয়ে চত্তরে পানি ঢালতে ঢালতে বালকটি বলেছিল, আম্মা আমাদের মেহমান সত্যিই ফেরেস্তা নাকি! চোখের পলকে চারজনকে সে শেষ করে ফেলল।'

'সত্যিই ফেরেস্তা বাবা, কোন মানুষের পক্ষে এটা সম্ভব নয়।' বলেছিল মিসেস ম্যাকাকো।

'দেখ মা, মেহমানের কাছে হঠাৎ করে রিভলবার এলো কোত্থেকে। আর দেখেছ উনি কেমন সব জান্তা। আমাদের দরবেশ রাজার সব কথা তিনি কেমন

গড় গড় করে বলে গেলেন। সত্যি তিনি অলৌকিক কেউ।' তরুণী মাসাবা বলেছিল।

ঘটনার মধ্যে অলৌকিকত্বের সন্ধান আরও কতক্ষণ চলত কে জানে। কিন্তু ম্যাকাকো এবং যুবকটি এসে পড়ায় তাদের গল্প বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

সবকাজ শেষ করে গোসল শেষে ওরা সবাই যখন এসে ভেতরের ড্রইং রুমে বসল, তখন রাত ৩টা।

গরম চায়ে প্রথম চুমুক দিয়ে ম্যাকাকো মেহমান যুবকটিকে লক্ষ্য করে বলল, 'আপনি আমাদের কাছে ফেরেশতা। কিন্তু ফেরেশতার ছায়া থাকে না শুনেছি, আপনার ছায়া দেখলাম। দয়া করে কি বলবেন আপনি কে?'

যুবকটি হাসল। বলল, 'সেটা বলছি, কিন্তু তার আগে বলুন ঘটনাটা কি?' ওরা আপনাদের তিনজনকে কেন গুম করেছে? কেন ওরা আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছিল?'

মি: ম্যাকাকো একটু ভাবল, তারপর বলল, 'ওদের চিনি না। কারা ওরা তাও জানি না। অন্যদের মত পুলিশেরও বক্তব্য হলো সংঘবদ্ধ সুপরিকল্পিতভাবে এটা ওরা করছে। মুসলিম সংগঠনের নেতৃ পর্যায়ের ঐ সব লোক উধাও হওয়া থেকে তারা বলছে, ব্যাপারটা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকও হতে পারে।'

'রাজনীতি কি ধরনের?' বলল যুবকটি।

'এই সংগঠনের উর্ধ্বতন দায়িত্বশীলরা এভাবে উধাও হওয়াতে মনে করা হচ্ছে হত্যাকান্ডটা রাজনীতির কারণে হয়েছে। আমাকে ধরতে এসেছিল, কারণ আমি বোমাসা ইসলামিক সার্কেলের সিনিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট।'

'বোমাসায় এ রাজনীতি কে করতে পারে?'

'আমি বুঝতে পারছি না।'

'এ ধরনের উধাও হওয়ার ঘটনা আর কখনও ঘটেছে?'

'না ঘটেনি। গত ১২ দিনের মধ্যে এই তিনটি ঘটনা ঘটেছে।'

যুবকটি পকেট থেকে একজন মুখোশধারীর কাছ থেকে পাওয়া ইনভেলাপটির ঠিকানার দিকে নজর বুলিয়ে আবার পকেটে রেখে দিল। বলল, 'বোমাসার লিভিংস্টোন রোডটি কোথায়?'

‘মাবোইডিং-এ।’

‘মাবোইডিং নাম শুনে চমকে উঠল যুবকটি। বলল, ‘মাবোইডিং- এখানে কি কোন বাইবেল সোসাইটি আছে?’

‘হ্যাঁ, সেটা তো ঐ লিভিংস্টোন রোডেই।

‘কত নম্বার বলতে পারেন?’

‘হ্যাঁ ওদের কাগজপত্র প্রায় আমরা পাই। বাইবেল সোসাইটির নাম্বার ৬৩, লিভিংস্টোন রোড।’

আবার চমকে উঠল যুবকটি। মুখোশধারীর ইনভেলাপেও এই ঠিকানা লেখা। যুবকটি হঠাৎ কোন চিন্তায় ডুবে গেল।

যুবকটির চমকে উঠা এবং হঠাৎ করে চিন্তান্বিত হয়ে পড়া ম্যাকাকোর নজর এড়ালো না। ম্যাকাকোর মনে হলো যুবকটি ঐ ঠিকানার সাথে পরিচিত এবং সে অনেক কিছুই জানে। এই সংগে তার মনে পড়লো দু’একদিনের মধ্যে সমাপ্য জরুরী কাজে তিনি এসেছেন। অন্যদিকে মাত্র কয়েক সেকেন্ডে শেষ করেছেন চারজন সাংঘাতিক সন্ত্রাসীকে। সব মিলিয়ে যুবকটি অসাধারণ কেউ। এমন অসাধারণ মুসলিম যুবক কে হতে পারে।

ম্যাকাকোর সবিনয় কণ্ঠ আবার ধ্বনিত হলো, ‘দয়া করে কি জানাবেন কে আপনি? কৌতুহল আর ধরে রাখতে পারছি না।’

‘যুবকটি একটু হাসল। বলল, ‘চিনবেন না। জেনে রাখুন, আমি আপনাদের একজন সেবক।’

‘না চিনলেও বুঝব। বলুন, ‘কোথায় বাড়ি, কি করেন, কি নাম?’

আবার হাসল যুবকটি। বলল, ‘সব দেশই আমার দেশ। আমার বিশেষ কোন দেশ নেই, বাড়িও নেই। উল্লেখ করার মত কিছুই করি না।’

‘এমন পরিচয় যার তিনি অসাধারণ। আমাদের কৌতুহল আরও বাড়ল জনাব।’ বলল, মাসাবা।

যুবকটি হাসল বলল, ‘নামটাই শুনতে চাওতো! আহমদ মুসার নাম শুনেছ?’

ফাতেমা মাসাবা আহমদ মুসার নাম শুনেই সোজা হয়ে বসল, তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল তার দৃষ্টি। বলল, 'কোন আহমদ মুসা? পত্র-পত্রিকায় যাকে নিয়ে আলোচনা হয়?'

'হ্যাঁ।'

'পত্র-পত্রিকা যারা পড়েন, তারা কেন তাঁকে চেনে। কিন্তু এ প্রশ্ন কেন? আপনি কি............।'

কথা শেষ করতে পারল না ফাতেমা মাসাবা বিস্ময়ে হা হয়ে গেছে তার মুখ। রুদ্ধ হয়ে গেছে তার কণ্ঠ।

মি: ম্যাকাকো ও মিসেস ম্যাকাকোর কৌতুহল দৃষ্টি যুবকের উপর নিবদ্ধ।

আহমদ মুসার মুখে হাসি। বলল, 'আমি নিজেকে আহমদ মুসা বললে বিশ্বাস করবে বোন?'

মুহূর্তে ফাতেমা মাসাবার চেহারা পাল্টে গেল। বিস্ময়ের প্রবল আঘাত যেন তার চোখে মুখে আছড়ে পড়ছে। চোখ দু'টি তার যেন ঠিকরে বেরিয়ে পড়বে।

মি: ম্যাকাকো ও মিসেস ম্যাকাকো অকল্পনীয় দৃশ্য দেখার বিস্ময়ে অভিভূত। তারা মাসাবার মত অত পত্রপত্রিকা পড়েনি, কিন্তু আহমদ মুসাকে তারা মুসলমানদের কিংবদন্তীর নায়ক হিসেবে জানে।

ফাতেমা মাসাবা নিজেকে সম্বরণ করে মুখ নিচু করে বিনয়ের সাথে জবাব দিল, আপনার যে পরিচয় ইতিমধ্যেই আমরা পেয়েছি, তাতে আপনার নাম আহমদ মুসা হলেই শুধু আপনার পরিচয় যথার্থ হয়।'

মি: ম্যাকাকো এবং মিসেস ম্যাকাকো সোফা থেকে নেমে মেঝের উপর বসল এবং আহমদ মুসার দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, 'আমাদের সালাম ও শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন।'

ফাতেমা মাসাবা ও বালক ইউহোসবিও তাদের আব্বা-আম্মার দেখাদেখি মেঝেতে নেমে বসে আহমদ মুসার দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে সালাম করল। তাদের আচরণ দেখে মনে হলো, তারা যেন কোন দেবতাকে ভক্তি নিবেদন করছে।

বিস্মিত আহমদ মুসা বলল, 'মি: ম্যাকাকো আপনারা একি করছেন? মুসলমানরা তো এভাবে কাউকে সম্মান দেখায় না, আল্লাহ ছাড়া কারো সামনে মাথা নোয়ায় না। আপনারা উঠে বসুন।'

ম্যাকাকো হাতজোড় করে বলল, 'মহাত্মন, আমাদের মাফ করবেন। সম্মানিত শ্রদ্ধাভাজনদের পাশে বসা বেয়াদবী। তাদের পায়ের আশ্রয় আমাদের মত গুণাগারদের মুক্তির উপায়।'

'আপনারা না উঠলে আমি মেঝেতে নেমে বসব।' বলল আহমদ মুসা।

ম্যাকাকো এবং অন্যরা শশব্যস্তে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আমরা মাফ চাচ্ছি। বেয়াদবী করতে আমাদের বলবেন না।'

কিছুতেই তারা আহমদ মুসার পাশে সোফায় বসল না। চাদর বিছিয়ে মেঝেয় বসল তারা। বলল ম্যাকাকো, 'একটা কৌতুহল আমাদের পূরণ হয়েছে। এবার আমরা আপনার মিশন এবং এখানকার যা কিছু জানেন সে সব শোনার জন্যে উদগ্রীব জনাব।'

'বারবারেতির ইসলামী সম্মেলন কেন্দ্রে বিস্ফোরণ ঘটার কথা আপনারা জানেন?' বলল আহমদ মুসা।

'জি জানি। বিস্ফোরণে মুসলিম বিশ্বের কয়েক জন নেতা নিহত হয়েছেন।' ম্যাকাকো বলল।

'না নিহত হননি। আপনারা 'ব্ল্যাক ক্রস' কে চেনেন?'

ম্যাকাকো জবাব দিল না। জবাব এল মাসাবার কাছ থেকে। বলল, 'আমি শুনেছি ওটা খৃষ্টানদের গোপন সন্ত্রাসবাদী সংগঠন। অত্যন্ত শক্তিশালী এবং হিংস্র।'

'ব্ল্যাক ক্রস বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বারবারেতি ইসলামী সম্মেলন কেন্দ্র ধ্বংস এবং কিডন্যাপ করেছে মুসলিম নেতৃবৃন্দকে।'

'কিডন্যাপ করেছে? তারা বেঁচে আছেন? বিস্ময় বিস্ফোরিত চোখে বলল ম্যাকাকো। মাসাবার চোখেও বিস্ফোরিত দৃস্টি।

'ওদের কিডন্যাপ করে এই বোমাসায় পণবন্দী করে রেখেছে।

‘এই বোমাসায়? আমাদের বোমাসায়?’ শুকনো কণ্ঠে বলল ম্যাকাকো। ভয় ও বিস্ময় তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

‘ব্ল্যাক ক্রস শর্ত দিয়েছে আমি যদি আগামী কালের মধ্যে ওদের হাতে আত্মসমর্পণ করি, তাহলে মুসলিম নেতৃবৃন্দকে ওরা ছেড়ে দেবে। আমি তাদের শর্ত পূরণের জন্যে এখানে এসেছি।’ থামল আহমদ মুসা।

ম্যাকাকো এবং অন্যরা নির্বাক। তাদের অপলক দৃষ্টি আহমদ মুসার উপর নিবদ্ধ।

আহমদ মুসাই কথা বলল আবার, ‘মজার ব্যাপার হলো আপনাদের তিনজনকে যারা উধাও করেছে, আপনাকে যারা কিডন্যাপ করতে এসেছিল তাদের এবং মুসলিম নেতৃবৃন্দকে যেখানে পণবন্দী করে রেখেছে, সেটা একই ঠিকানা।’

‘একই ঠিকানা? বুঝলেন কি করে?’

‘একজন মুখোশধারীর পকেট থেকে যে মুখছেঁড়া ইনভেলাপ পেয়েছি, তাতে বাইবেল সোসাইটির ঠিকানা লেখা আছে। ঐ ঠিকানাতেই বন্দী করে রাখা হয়েছে মুসলিম নেতৃবৃন্দকে।’

‘বাইবেল সোসাইটিতে ওদের বন্দী করে রাখা হয়েছে?’ চোখ কপালে তুলে বলল ম্যাকাকো।

একটু থেমে। একটা ঢোক গিলে বলল, ‘আমাদের তিনজনও সেখানে বন্দী আছে? আমাকে তাহলে ব্ল্যাক ক্রসরা কিডন্যাপ করতে এসেছিল?’

‘আমি যতদূর অনুমান করছি, ওদের সেখানে বন্দী করে রাখা হয়নি, হত্যা করা হয়েছে। আপনাকেও হত্যার উদ্দেশ্যেই কিডন্যাপ করতে এসেছিল।’

এ কাজ ব্ল্যাক ক্রস করেনি। আমার ধারণা, ব্ল্যাক ক্রসের কাজে উৎসাহিত হয়ে এখানকার স্থানীয় খৃষ্টানরাই এখানকার মুসলিম শক্তিকে নেতৃত্ব শূন্য করে মুসলিম সমাজকে ধ্বংস অথবা হাতের মুঠোয় আনার জন্যেই এখানকার শীর্ষ মুসলিম নেতৃবৃন্দকে হত্যার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।’

আহমদ মুসা থামলেও ম্যাকাকো কথা বলতে পারলো না। তাদের চোখে ভয়, বিস্ময় ও আতংকের জীবন্ত ছবি।

কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে ম্যাকাকো বলল, ‘বাইবেল সোসাইটি কখনো আমাদের ভালো চোখে দেখেনি। তবে প্রকাশ্য কোন বিরোধ তাদের সাথে আমাদের ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি আমাদের মসজিদের পাশের দুইটি বড়ু টিলা তারা কেনার প্রস্তাব দেয়। টিলা দু’টি মসজিদের। আমরা বিক্রি করতে পারি না। তাছাড়া আমরা জানি ওখানে তারা কমুনিটি হল তৈরী করতে চায়, যা হবে তাদের নাচ গানের কেন্দ্র। আমরা টিলা দুইটি ছাড়তে রাজী হইনি। তারা মনে মনে খুব ক্ষুব্ধ হয়েছে। তারা গোপনে গোপনে প্রচার করছে, অতীত সরকারের দুর্বলতার সুযোগে আমরা অনেক জমি অন্যায়ভাবে দখল করেছি। হতে পারে তারা গোপন কোন ষড়যন্ত্র করছে। আপনি ঠিক বলেছেন, ব্ল্যাক ক্রস হয়তো তাদের সাহস দিয়েছে। আমার মনে হয় সামনে আমাদের দুর্দিন আসছে। আশ-পাশের সব অঞ্চলেই বহু কিছু ঘটেছে। কিন্তু জংগলে লুকানো এই শহরে এতদিন আমরা ভালোই ছিলাম।’ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস সমেত কথা শেষ করল ম্যাকাকো।

একটু থেমেই ম্যাকাকো তার বিষন্ন দৃষ্টিটা আহমদ মুসার দিকে তুলে বলল, ‘সত্যি বলেছেন, আপনি আত্মসমর্পণ করতে এসেছেন?’

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘তারা আমার আত্মসমর্পণ চায়, আমি চাই তাদের পরাজয়, আমি চাই তাদের পরাজয় এবং পণবন্দীদের মুক্তি। দেখা যাক, কার চাওয়া পূর্ণ হয়।’

হাসল আহমদ মুসা।

ওরাও কোন কথা বলল না।

আহমদ মুসাই আবার বলল, ‘এখন রাত ৪টা, আমি অল্পক্ষণ রেস্ট নেব। তারপর নামাজ পড়ে আমি সাড়ে ৫টার মধ্যে চলে যাব। আপনাদের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ নাও হতে পারে। অতএব আমি এখনই বিদায় নিয়ে রাখতে চাই।’

‘কোথায় যাবেন?’ বিস্মিত কন্ঠে বলল ম্যাকাকো।

‘লিভিংস্টোন রোডে বাইবেল সোসাইটির দিকে।’

‘উদ্ধার অভিযানে?’

‘অভিযান কি বয়ে আনবে আমি জানি না। তবে আমার নিয়ত তো বলছি- আমি চাই ওদের পরাজয় এবং পণবন্দীদের মুক্তি।’

‘কিন্তু আপনি একা যাবেন কেন?’ লড়াই করার মতো সক্ষম যুবক আমাদের আছে কমপক্ষে পাঁচশত। দরকার হলে তারা সবাই যাবে আপনার সাথে।’

‘না মিঃ ম্যাকাকো। এভাবে গেলে যুদ্ধ হবে, কিন্তু পণবন্দীদের বাঁচানো যাবে না। তাছাড়া আমি চাই না, এখানকার জনপদ স্থায়ী এক আঞ্চলিক সংঘাতে জড়িয়ে পড়ুক। আমি মনে করি, আপনার চাওয়া ঠিক নয়।’

‘আপনার কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু এ প্রয়োজনের চেয়ে বড়?’

‘যুক্তিটা একটা প্রয়োজনকে বিবেচনা করেই। যাক, বিষয়টা নিয়ে হৈ চৈ করা যাবে না। অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ মানুষের জীবনের প্রশ্ন এর সাথে জড়িত। আপনি একটা সাহায্য করতে পারেন?’

‘কী সেটা?’

‘বাইবেল সোসাইটির অবস্থান? কত বড়? কতগুলো ঘর? মাটির তলে ঘর আছে কিনা? ঢোকার ও বের হওয়ার কতগুলো পথ? সোসাইটিতে কত লোক থাকে? ইত্যাদি বিষয়ে যদি কিছু জানতে পারতাম।’

‘কিছু সাহায্য করতে পারব। আমাদের নতুন মসজিদ বিল্ডিং যে ইঞ্জিনিয়ার করেছেন, সে ইঞ্জিনিয়ারই করেছিলেন সোসাইটি কমপ্লেক্স। তিনি সোসাইটির ডিজাইন আমাদের দেখিয়েছিলেন। মাটির তলায় কোন ঘর সোসাইটির নেই।’

তারপর ম্যাকাকো সোসাইটি কমপ্লেক্সের গোটা বিবরণ দিয়ে বলল, ‘সোসাইটিতে বিশ পঁচিশ জন লোক সবসময় থাকে। আবাসিক অংশের হিসাব ধরলে সংখ্যা পঞ্চাশটিতে দাঁড়াবে।’

‘ধন্যবাদ আপনার এই সাহায্য আমাকে বিরাট উপকার করবে।’

বলে আহমদ মুসা উঠার অনুমতি চাইল।

সবাই উঠে দাঁড়াল।

উঠে দাঁড়িয়ে ম্যাকাকো বলল, 'আমি প্রস্তুত থাকবো। আমি আপনাকে লিভিংস্টোন রোডে পৌছে দেব। এটুকুর অনুমতি নিশ্চয়ই পাব।'

আহমদ মুসা হেসে বলল, 'ঠিক আছে।'

বলে আহমদ মুসা সালাম দিয়ে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াল।

সকাল ৮টা তখন।

বেলাল ম্যাকাকো আহমদ মুসাকে লিভিংস্টোন রোডে পৌছে দিয়ে বাসায় ফিরে ড্রয়িং রুমে সোফায় গা এলিয়ে দিল।

চা নিয়ে ড্রয়িং রুমে প্রবেশ করল মিসেস ম্যাকাকো। তার পিছনে ফাতেমা মাসাবা এবং রাশিদ ইউহোসবি।

ম্যাকাকোর চা ঢালতে ঢালতে মিসেস ম্যাকাকো বলল, 'শত্রু পুরীতে ওঁকে একা একা রেখে এলে, কেমন লাগছে বলতো?'

'সবই তো শুনেছ, ওঁর কথার উপর কি আমরা কথা বলতে পারি।'

'সামনের ঘটনাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এস, আমরা তাঁর জন্য দোয়া করি। উনি অনেক ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন, আজও যেন এক ইতিহাস সৃষ্টি করেন তিনি। ব্ল্যাক ক্রস-এর ঘাঁটি মানে হাজারো সাপের আস্তানা। আল্লাহ তাঁকে জয়ী করুন।' বলল ফাতেমা মাসাবা। কলিংবেল বেজে উঠল।

'মাসাবা, দেখতো মা কে এল।' বলল ম্যাকাকো।

মাসাবা উঠে গেল কয়েক মহুর্ত পর দৌড়ে ফিরে এল। ফিস ফিস করে বলল, 'আব্বা পুলিশ সুপার উপাংগো এসেছেন।'

'পুলিশ সুপার উপাংগো? কেন?' ভয়ের সুর ম্যাকাকোর কন্ঠে। হঠাৎ করেই তার মুখ শুকিয়ে গেল। রাতের কথা মনে পড়ল। পুলিশ কি সব জানতে পেরেছে? পুলিশকে জানিয়েছে কি কেউ? পুলিশ কি গ্রেফতার করতে এসেছে তাকে?'

অন্যান্যদের কেও ওই একই ভয় পীড়িত করছে? কিন্তু বসে থাকা যায় না, ভাবল ম্যাকাকো। উঠে দাঁড়িয়ে এগুলো বাইরের ঘরের দিকে। মনে মনে সাহস করল, পুলিশ উপাংগো তার অনেক দিনের পরিচিত, দেখা যাক কি হয়।

দুরু দুরু বুকে যথাসম্ভব স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে দরজা খুলল ম্যাকাকো।

'আসসালামুআলাইকুম, মিঃ ম্যাকাকো।' দরজা খুলতেই সহাস্যে বলে উঠল উপাংগো।

উপাংগো নিজের গোত্র ধর্ম অনুসরণ করে। কিন্তু কার্যত তার কোন ধর্মই নেই। যে ধর্মের লোকের সাথে তার দেখা হয়, সেই ধর্মের কালচার সে অনুসরণ করে। তার বক্তব্য হল, এতে নাকি সবারই আপন হওয়া যায়।

উত্তরে সালাম জানিয়ে ম্যাকাকো বলল, 'কি খবর উপাংগো?'

ম্যাকাকো দেখল উপাংগোর সাথে আরও দু'জন লোক। ঐ দু'জনও কৃষ্ণাঙ্গ।

'এসেছি, তোমার কিছু সাহায্য প্রয়োজন।'

ম্যাকাকোর বুক থেকে একটা ভারী পাথর নেমে গেল। নিশ্চিত হলো উপাংগো তাকে গ্রেফতার করতে আসেনি।

হাসিমুখে বলল ম্যাকাকো, 'তোমার সাথী দুজনকেই তো চিনলাম না।'

'পরিচয় দেব। আগে বসতে তো দাও।'

'দুঃখিত। এস ভেতরে।'

সবাইকে নিয়ে ম্যাকাকো ড্রয়িং রুমে এসে বসল।

'ম্যাকাকো, খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে এসেছি। যার সাথে তোমার স্বার্থও জড়িত রয়েছে। কিন্তু সে কথার দিকে যাওয়ার আগে এদের পরিচয় করিয়ে দেই।'

বলে উপাংগো তার পাশে বসা লোকটার দিকে ইংগিত করে বলল, ইনি সলো'র পুলিশ সুপার জাগুয়াস ম্যাকা। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমরা একই সাথে ট্রেনিং নিয়েছি ফ্রান্সে।'

তারপর দ্বিতীয় লোকটির দিকে ইংগিত করে বলল, 'উনি আবদুল্লাহ যায়দ রাশিদী। উনি এসেছেন ক্যামেরুন থেকে।'

বলেই একটু থেমে আবার বলল, তাঁর আরেকটা পরিচয় আছে। তিনি আমাদের হুজুর সুলতান যায়দ রাশিদীর নাতি।

‘আমাদের হুজুর সুলতানের নাতি?বলে ম্যাকাকো ছুটে গিয়ে আবদুল্লাহ যায়েদ রাশদীর পায়ের কাছে উপুড় হয়ে চুমু খেল ব্ল্যাক বুল ওরফে যায়দ রাশদীর পায়ে।

দ্রুত ঘটে গেল ঘটনা।

সংকুচিত হয়ে দাঁড়াল ব্ল্যাক বুল। বলল, ‘একি করছেন আপনি। আমি আপনার অনেক ছোট। আমাকে অপরাধী করবেন না।’

‘কি বলেন হুজুর! আপনি আমাদের সুলতানজাদা। আমাদের হুজুর।’

‘আপনি আমাদের দোয়া করুন।’ বলল ম্যাকাকো।

‘ঠিক আছে, তুমি বস ম্যাকাকো। আমার জরুরী কথাটা সেরে নেই।’

ম্যাকাকো উঠে দাঁড়াল। একটা চেয়ার নিয়ে এসে সোফার পিছনে বসল।’পিছনে বসলেন কেন?’ বলল জাগুয়াস ম্যাকা।

‘থাক ম্যাকা ও হুজুরজাদার সাথে সোফায় বসবে না।’ বলল উপাংগো।

বলে একটু থামল উপাংগো।একটু ভাবল। তারপর বলল, ‘ম্যাকাকো, আমাদের হুজুরজাদা আব্দুল্লাহ জায়দ রাশিদী একজন সম্মানিত সাথীসহ মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রে আসছিলেন। কিন্তু পথে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন তার সাথী। তিনি এসেছেন বোমাসায়। তিনি এখানে এলে মুসলিম সংগঠনের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। তাই.................’

এ সময় ড্রইং রুমের দরজা ঠেলে প্রবেশকরল ব্ল্যাক বুলের কুকুর দু’টি। ছুটে এল সোফার দিকে।

‘ভুল হয়েছে গাড়ির দরজা আলগা রেখে আসায় সুযোগ পেয়ে ছুটে এসেছে। ‘বলল কথা থামিয়ে উপাংগো।

ব্ল্যাক বুল কুকুর দু’টিকে কাছে ডাকল।

কিন্তু সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপই করল না। অস্থিরভাবে কুকুর দু’টি সোফায় বিশেষ স্থান শুঁকতে লাগল। তারপর মাটি শুকতে শুকতে কুকুর দু’টি বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল।

‘দেখছি।’ বলে উঠে গেল ম্যাককো। কয়েক মুহূর্ত পরে ফিরে এসে বলল, ‘আমাদের মেহমান খানায় প্রবেশ করেছে।’

জাগুয়াস ম্যাকা তাকাল উপাংগোর দিকে। উপাংগো হাসল এবং ম্যাকাকোর দিকে চেয়ে বলল, 'আমাদের হুজুরজাদার সাথীর সন্ধান আমরা পেয়ে গেছি ম্যাকাকো।'

'তোমার ঘরে।' বলল উপাংগো।

'বুঝতে পারলাম না।' চোখ কপালে তুলে বলল ম্যাককো।

উপাংগোর মুখে নেমে এল গাম্ভীর্য। বলল, 'তোমার এখানে কেউ একজন ছিলেন বা আছেন তিনিই আমাদের হুজুর জাদার সাথী। তাকে খুঁজতেই আমরা এসেছি।'

ম্যাকাকোও গম্ভীর হয়ে উঠেছে। বলল, 'তার নাম কি বলত।'

'আহমদ মুসা।'

জাগুয়াস ম্যাকা এবং ব্ল্যাক বুল উদ্বেগ আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে ম্যাকাকোর দিকে। তাদের আকাঙ্খা ম্যাকাকো বলুক যে আহমদ মুসা এসেছেন। তাদের তখন আশঙ্কা কুকুর ভুলও তো করতে পারে।

অন্যদিকে ম্যাকাকো ভাবছে, উপাংগো পুলিশ হলেও হুজুরজাদাকে সাথে নিয়ে এসেছে সুতরাং সে আহমদ মুসার পক্ষের শক্তিই হবে। ম্যাকাকোর মনে একটা আনন্দ ঝিলিক দিয়ে উঠল আহমদ মুসার কঠিন কাজে উপাংগো সহযোগিতা করতে পারে। ম্যাকাকোর মনে হলো, আল্লাহই এ সময়ে ওদেরকে নিয়ে এসেছেন। এখন তাকে সাহায্যের জরুরী সময়।

ম্যাকাকো উপাংগোর সাথে হ্যান্ডশেক করে বলল, তুমি ঠিক বলেছ। আহমদ মুসা এখানে এসেছিলেন। কিন্তু চলে গেছেন উনি।'

`কোথায় গেছেন?'

'পণবন্দী উদ্ধারের অভিযানে।'

ব্ল্যাক বুল, জাগুয়াস ম্যাকার চোখ উত্তেজনায় বড় বড় হয়ে উঠেছে।

বলল ব্ল্যাক বুল, 'চলে গেছেন?।'

'চলে গেছেন।'

'ঠিকানা জানেন?' বলল উপাংগো।

'জানি।' বলে ঠিকানাটা বলল ম্যাকাকো।

‘ক’টায় গেছেন?’ বলল উপাংগো।

‘সাড়ে পাঁচটায়। আমি গিয়ে লিভিংষ্টোন রোডে ওঁকে পৌছে দিয়ে এসেছি। ঐ রোডে আমরা পৌছেছিলাম সাড়ে ছয়টায়।’ উঠে দাঁড়াল উপাংগো। বলল জাগুয়াস ম্যাকাকে লক্ষ্য করে, ‘চল, পুলিশ ফোর্স নিয়ে ওখানে এখনি যেতে হবে।’

‘নিতে পারবে তুমি তোমার পুলিশ ফোর্স?’ বলল ম্যাকা।

‘পারব না কেন? খবর পেয়েছি কিছু লোককে বেআইনি আটক রাখা হয়েছে। তাদেরকে উদ্ধার করতে গিয়ে উদ্ধার করলাম বিস্ফোরনে মৃত বলে ঘোষিত মুসলিম বিশ্বের কয়েকজন শীর্ষ নেতৃত্বকে।

আপনারা ফিরে পেলেন আপনাদের নেতাদের, আমি আমি বিশ্ববিখ্যাত হয়ে যাব রাতারাতি। চল, আর দেরী নয়।’ সবাই উঠে দাঁড়াল।

উঠে দাঁড়াল বেলাল ম্যাকাকোও। বলল, এই ঐতিহাসিক অভিযানে আমি তোমাদের সাথী হতে পারি?’

‘পার। কিন্তু তোমার জন্যে দেরী করতে পারব না, সিংহের গুহায় গিয়ে আহমদ মুসার কি অবস্থা হয়েছে কে জানে! সবাই যদি শেষ হয়ে যায়, কাকে আর তাহলে আমরা উদ্ধার করব?’

বলে উপাংগো হাঁটা শুরু করল। ব্ল্যাক বুল এবং জাগুয়াস ম্যাকা তার পিছু পিছু চলল।

একটু পরে বেলাল ম্যাকাকো ছুটে এসে তাদের সাথী হলো।

ওয়ারলেসে উপাংগো তার সহকারীকে নির্দেশ দিল কয়েক প্লাটুন পুলিশ নিয়ে বাইবেল সোসাইটির সামনে আসতে। তারপর ষ্টার্ট দিলো গাড়িতে।

গাড়ি ছুটে চলল ব্ল্যাক ক্রস- এর মাবোইডিং বন্দীখানার দিকে।

সাইমুম সিরিজের পরবর্তী বই

# অদৃশ্য আতংক

## কৃতজ্ঞতায়ঃ

1. Mohammed Sohrab Uddin
2. Kayser Ahmad Totonji
3. Sagir Hussain Khan
4. Masud Khan
5. M-g Mustafa
6. Jamirul Haqe
7. Elias Hossain
8. Tamanna Chowdhury
9. Ahsan Bandarban
10. Shakir Ahmed Junnun
11. Shariful Seeman
12. A.S.M Masudul Alam
13. Bondi Beduyin
14. Syed Murtuza Baker
15. Md. Jafar Ikbal Jewel
16. Nazrul Islam
17. Esha Siddique
18. Arif Rahman
19. Ashrafuj Jaman
20. Sharmeen Sayema
21. Monirul Islam Moni
22. Sohel Sharif
23. Gazi Salahuddin Mamun
24. Hafizul Islam
25. Mohammad Ahsanul Haque Arif
26. Mohammed Ayub
27. Shaikh Noor-E-Alam

## সাইমুম-২২

# অদৃশ্য আতংক

আবুল আসাদ

# ১

তেষট্টি লিভিংস্টোন রোড।

আহমদ মুসা বাইবেল সোসাইটির সামনে দাঁড়িয়ে সামনের অংশটার উপর নজর বুলাল।

গেট পার হলেই প্রশস্ত একটা কম্পাউন্ড। তারপরে কম্পাউন্ডের উত্তর প্রান্ত বরাবর দীর্ঘ বারান্দা। চার ধাপের সিঁড়ি ভেঙে বারান্দায় উঠতে হয়। লম্বা বারান্দার মাঝখানে একটা বড় দরজা। বড় দরজার দু'পাশে বারান্দায় আরও কয়েকটা দরজা আছে। বিল্ডিং-এর মাথায় একটা সাইনবোর্ড। লেখা আছে, বাইবেল সোসাইটি স্কুল।

বাইবেল সোসাইটি স্কুলের পুব পাশে একটা গীর্জা। গীর্জা এবং স্কুল একই বাউন্ডারী প্রাচীরের ভেতরে। আহমদ মুসা বেলাল ম্যাকাকোর কাছ থেকে বাইবেল সোসাইটির যে বিবরণ পেয়েছে, তাতে এখানে বাইবেল স্কুল ও গীর্জা ছাড়াও একটা আবাসিক এলাকা ও গোডাউন এলাকা রয়েছে। সব নিয়েই বাইবেল সোসাইটি কমপ্লেক্স।

আহমদ মুসা বাইবেল সোসাইটির সামনে দিয়ে লিভিংস্টোন রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে ভাবল, গোডাউন ও আবাসিক এলাকা তাহলে গীর্জা ও স্কুলের পেছনে হবে।

আহমদ মুসা দেখেছে, স্কুল ও গীর্জার মাঝে উভয়কে বিভক্তকারী একটা প্রাচীর আছে।

সকালের আমেজ কেটে যাচ্ছে। রাস্তায় লোক চলাচল দু'একজন করে শুরু হয়েছে। কিন্তু গেটের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়েও বাইবেল সোসাইটির ভেতরে কাউকে আনাগোনা করতে দেখা পেল না আহমদ মুসা। হয় সকলে ঘুমচ্ছে অথবা স্কুল ও গীর্জার কাজ শুরু হয়নি বলে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। আহমদ মুসা মনে করল, ভেতরে ঢুকার এটাই সময়।

কিন্তু পরক্ষণেই ভাবল, স্কুল ও গীর্জার অফিস খুললে ভেতর ও বাইরের লোকের আনাগোনা বাড়বে, সেই সুযোগে প্রবেশ করাটা সবচেয়ে সুবিধাজনক। সে আরও ভাবল, ভেতরে ঢোকার আগে চারদিকটা একবার ভাল করে দেখা দরকার। এতে ভেতরে ঢুকে জরুরী মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নেয়া তাঁর পক্ষে অনেক সহজ হবে।

ঠিক করল আহমদ মুসা, স্কুল ও গীর্জা খুলুক, ততক্ষণে সে বাইবেল সোসাইটি কমপ্লেক্সের চারদিকটা ঘুরে আসবে।

সোসাইটি কমপ্লেক্সের পুব দিক দিয়ে গীর্জার পাশ বরাবর বেশ ফাঁকা। তারপরে সীমানা প্রাচীর। প্রাচীরের পাশ দিয়ে পায়ে চলার মত রাস্তা।

আহমদ মুসা এগুলো সেই রাস্তা ধরে। পায়ে চলা রাস্তাটা উত্তর দিকে নদীর ধার পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে।

আহমদ মুসা নদীর ধারে বাইবেল সোসাইটির সীমানা প্রাচীরের পূর্ব-উত্তর কোণ ঘেঁষে দাঁড়াল।

সেখান থেকে নদীর ধারটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে নদীতে।

আহমদ মুসা বাইবেল সোসাইটির দিকে নজর ফেরাল। দেখল, হাত কয়েক দূরে উত্তর দিকের সীমানা প্রাচীরের গায়ে একটা বড় গেট। গেট থেকে একটা পাকা ঘাট নেমে গেছে নদীতে। গেটটা বন্ধ।

আহমদ মুসা বুঝল, নদী পথে এদের যোগাযোগ এ ঘাট পথেই। মুসলিম নেতৃবৃন্দকে কিডন্যাপ করে সম্ভবত এ ঘাট পথেই বাইবেল সোসাইটিতে ঢুকিয়েছে।

উত্তর সীমানার পশ্চিমে বেশ কিছুদূর এগিয়ে নদীর দিকে বেড়ে আসা বিল্ডিং এর মূল দেয়ালের সাথে মিশে গেছে। অর্থাৎ বিল্ডিং-এর পশ্চিম অংশের উত্তর প্রান্তটা, বলা যায়, পানির উপর দাঁড়িয়ে আছে।

আহমদ মুসা স্মরণ করল, বিল্ডিং-এর এই অংশটা বেলাল ম্যাকাকোর বিবরণ অনুসারে গোডাউন হিসেবে ব্যবহার হয়।

আহমদ মুসা ভাবল, পণবন্দি মুসলিম নেতৃবৃন্দকে নিশ্চয় গীর্জা ও স্কুল অংশে রাখা হয় নি। কারন ১২ জনের একটা বিরাট দলকে গীর্জা ও স্কুলের মত জনসমাবেশের স্থানে রাখা সম্ভব নয়। তাহলে নিশ্চয় রাখা হয়েছে আবাসিক অথবা গোডাউন এলাকায়। এ দু'য়ের মধ্যে কোথায় তাদের রাখা হতে পারে? মুসলিম বিশ্বের শীর্ষ ও সম্মানিত নেতাদের আরামদায়ক আবাসিক এলাকায় রাখাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যাদের জীবনের সীমা পনের দিনে সীমিত করা হয়েছে, তাদের সুখ-সুবিধার কথা নিশ্চয় ওদের বিবেচনার কথা নয়।

কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারল না আহমদ মুসা।

ভেতরে ঢুকেই সন্ধান করতে হবে, ভাবল আহমদ মুসা। তবে দিনের বেলা এই সন্ধান করা খুবই বিপজ্জনক। কিন্তু সামনে একটা রাত মাত্র তার হাতে আছে। তারপরেই ১৫তম দিন। কে জানে পনের তারিখের সূর্যোদয়কেই যদি ওরা বন্দীদের শেষ সময় ধরে থাকে। সুতরাং শেষ রাতের ঝুঁকি সে নিতে পারে না। তাই সকালেই সে ছুটে এসেছে।

কিন্তু দিনের এই ঝুঁকিপূর্ণ মিশন তার কেমন হবে? বন্দী নেতৃবৃন্দকে খুঁজে পাবার আগে সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেলে ওদের কাছে ঠিক সময়ে পৌঁছা এবং যথাসময়ে উদ্ধার করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। অতীতে কখনই সময় তার কাছে এত মুল্যবান মনে হয় নি। শত্রুর এমন 'ডেডলাইন'- এর মোকাবিলাও তাকে করতে হয়নি কখনও।

আহমদ মুসার দু'চোখ নিবদ্ধ ছিল বাইবেল সোসাইটির উত্তর প্রান্ত বরাবর নদী তীরের উপর। সংঘ নদীর স্বচ্ছ পানি ঢেউয়ে সোয়ার হয়ে এসে আছড়ে পড়ছে পাথর বাধানো তীরে। সেই ঢেউয়ে নাচছিল মাঝারি সাইজের একটা মটর বোট। মটর বোটটি আহমদ মুসার আগেই নজরে পড়েছে। কিন্তু হঠাৎ করেই এবার মটর বোটটির অবস্থান আহমদ মুসার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বোটটি ঘাট থেকে অতদূরে কেন?

ঘাট থেকে পশ্চিমমুখী প্রাচীরটা যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে, সেখান থেকে আট দশ ফিট পশ্চিমে তীর থেকে বেশ একটু দূরে বোটটি পানিতে ভাসছে।

আহমদ মুসা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করল, বোট থেকে একটা শিকল পানিতে নেমে গেছে। বোট নড়ার কারনে যখন শিকলে টান পড়ছে, দেখা যাচ্ছে পানির সমান্তরালে শিকলটি তীরের পাথরের মধ্যে ঢুকে গেছে। ওখানে তীরের পাথরের ফরমেশনটা অপেক্ষাকৃত খাড়া।

ভ্রু কুচকাল আহমদ মুসা। বোট ওখানে কেন? ঐভাবে কেন?

বেলাল ম্যাকাকোর বিবরণ অনুসারে বাইবেল সোসাইটি কমপ্লেক্সের ঐ অঞ্চলটা গোডাউন এলাকা। ওখানে কোন ঘাট নেই, কিন্তু বোট তাহলে কেন? এ ঘাট থেকে বোটটাকে কি ওখানে সরিয়ে রাখা হয়েছে? কিন্তু কেন? কি করে? পানিতে না নেমে বোটের কাছে পৌঁছা সম্ভব নয়। সুতরাং ঘাটের বোট ওখানে রাখা স্বাভাবিক নয়।

আহমদ মুসাকে সবচেয়ে বিস্মিত করল পানির সমান্তরালে বা পানির দু'এক ইঞ্চি নিচ দিয়ে বোটের শিকল তীরের পাথরের মধ্যে ঢুকে যাওয়ার ব্যাপারটা।

পাশেই একটা শব্দ হলো। শব্দটা এসেছে সেই দরজার দিক থেকে। দরজায় কেউ এলো নাকি?

আহমদ মুসা দ্রুত করে প্রাচীরের আড়ালে দাঁড়াল। উঁকি দিয়ে দেখল, দরজা খুলে গেছে। পায়ের শব্দ পেল আহমদ মুসা। মাথাটা প্রাচীরের আড়ালে নিয়ে পকেটে হাত দিয়ে রিভলবার স্পর্শ করল আহমদ মুসা।

দরজা দিয়ে দু'জন মহিলা পরপর বেরিয়ে এসে দরজার বাইরের ল্যান্ডিং-এ দাঁড়াল।

দু'জনেরই পরনে ট্রাক স্যুট।

স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে, ওরা ব্যায়াম করে বেরিয়ে এসেছে।

ল্যান্ডিং-এ বসল ওরা।

ট্রাক স্যুটের চেন ওরা খুলে ফেলল।

ওরা হাওয়া খেতে চায়।

দু'জনেরই বয়স তিরিশের কাছাকাছি হবে।

হাত-পা ছড়িয়ে বসে ওদের একজন বলল, 'জেনি, যে দু'টো বোট ব্রাভাজিল গেছে, কবে ফিরবে?'

'জানিনা, মনে হয় দু'একদিনের মধ্যেই।' বলল জেনি নামের মেয়েটা।

'এ সময় ঐ বোটটা ঘাটে এনে রাখা যায় না? এমন সময় কাজে না লাগলে কখন আর কাজে আসবে?'

'রেন, তুমি দেখি কিছুই জাননা। ঐ বোটটা ওখানকার জন্যই।'

'কেন?'

'ইমারজেন্সী প্যাসেজের জন্যে রাখা হয়েছে।'

চমকে উঠল আহমদ মুসা। ইমারজেন্সী প্যাসেজ! এর অর্থ কি?

জরুরী মুহূর্তের বাহন হিসেবে বোটটাকে রিজার্ভ রাখা হয়েছে?না ইমারজেন্সী প্যাসেজেই বোটটাকে বেঁধে রাখা হয়েছে? ওখানে কি ইমারজেন্সী প্যাসেজ আছে?

ইত্যাদি প্রশ্ন এসে আহমদ মুসার মনে ভীড় জমাল। সে বুঝতে চেষ্টা করল। শেষের দু'টি প্রশ্নকেই সে ইতিবাচক মনে করল। অর্থাৎ মনে হলো, বোটটা যেখানে নোঙর করা, সেখানেই কোথাও গোপন প্যাসেজ রয়েছে।

খুশীই হল আহমদ মুসা। বোটের ওখানে গিয়ে যদি গোপন প্যাসেজটা বের করা যায়, তাহলে তার অভিযান অনেক নিরাপদ হতে পারে।

'কে তুমি, এখানে কি করছ?'- পেছন থেকে আসা আকস্মিক এই শব্দে আহমদ মুসা লাফ দিয়ে উঠে ঘুরে দাঁড়াল। দেখল, মারমুখো এক শ্বেতাঙ্গ।

মারমুখো হবারই কথা। আহমদ মুসা যেভাবে গুটি গুটি মেরে প্রাচীরের আড়ালে বসে ছিল তাতে তাকে চোর-বাটপার কিংবা তার চেয়ে বড় কিছু ভাবা খুবই স্বাভাবিক।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াতেই লোকটার বাম হাত তড়াক করে এসে আহমদ মুসার জ্যাকেটের কলার চেপে ধরল। আর ডান হাতের এক প্রচণ্ড ঘুষি ছুটে এল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা ডান হাত দিয়ে তার ঘুষিটা ঠেকিয়ে বাম হাত দিয়ে লোকটির বাম বাহুর সন্ধিতে আঘাত করল।

লোকটির বাঁ হাত খসে গেল আহমদ মুসার কলার থেকে।

আহমদ মুসার এই আকস্মিক প্রতিরোধ সে আশা করেনি। মুহূর্তের জন্যে সে থমকে গিয়েছিল। তার চোখে ফুটে উঠেছিল বিস্ময়।

তার এই নিষ্ক্রিয় অবস্থার সুযোগ গ্রহন করল আহমদ মুসা। ডান হাতের কারাত চালাল সে লোকটির বাঁ কানের ঠিক নিচটায়।

টলতে লাগল লোকটির দেহ। কয়েক মুহূর্ত। পড়ে গেল লোকটি গোড়া কাটা গাছের মত।

আহমদ মুসা বাইবেল সোসাইটির সামনে ফিরে যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে তাকাল সামনের রাস্তার দিকে।

তাকিয়েই চোখ দু'টি চঞ্চল হয়ে উঠল আহমদ মুসার। দেখল, দু'জন লোক মার মুখো হয়ে ছুটে আসছে। ওদের হাতে রিভলবার।

আহমদ মুসা চকিতে পেছনে নদীর দিকে একবার তাকাল। দেখল, যে মেয়ে দু'টিকে সে দরজার ল্যান্ডিং-এ বসে গল্প করতে দেখেছিল, ওরা নদীতে গোসল করতে নেমেছে।

আহমদ মুসার মাথায় একটা নতুন চিন্তা ঝিলিক দিয়ে উঠল। সংগে সংগে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল সে।

লাফ দিয়ে আহমদ মুসা প্রাচীরের কোলে নদীর তীরে গিয়ে পড়ল। তারপর উত্তরের প্রাচীরের পাশ দিয়ে দৌড়ে দরজার ল্যান্ডিং-এ গিয়ে উঠল।

ল্যান্ডিং-এ মেয়ে দু'টির খুলে রেখে যাওয়া কাপড়।

নদীতে সাঁতাররত মেয়ে দু'টি দেখতে পেয়েছে আহমদ মুসাকে।

'কে, কে তুমি, কি চাও' বলে চিৎকার করে উঠল তারা।

সেদিকে খেয়াল করার সময় নেই আহমদ মুসার।

আহমদ মুসা দ্রুত দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

কয়েক মুহূর্ত পরে রিভলবারধারী দু'জন ছুটে এসে প্রাচীরের সেই কোনায় নদী তীরে দাঁড়াল। তাকাল নদীর দিকে। তাদের ধারণা তাড়া খেয়ে তাদের শিকার নিশ্চয় নদীতে ঝাপিয়ে পড়ে পালাবার চেষ্টা করছে।

নদীর দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল মেয়ে দু'টিকে।

মেয়ে দু'টির উপর চোখ পড়তেই সম্ভ্রম ফুটে উঠল লোক দু'টির চোখে-মুখে।

মেয়ে দু'টির একজন মোবাসা বাইবেল সোসাইটি কমপ্লেক্সের প্রধান পরিচালকের স্ত্রী, অন্যজন গীর্জার অধ্যক্ষের স্ত্রী।

লোক দু'টির একজন দ্রুত সম্ভ্রমের সাথে জিজ্ঞেস করল, 'শয়তানটা এখানে ঘাপটি মেরে আপনাদের উপর চোখ রাখছিল। পালাবার জন্যে নদীতে লাফ দিয়েছে নিশ্চয়! কোন দিকে গেছে?'

মেয়ে দু'টির চোখ তখনও ছানাবড়া। তীরের দিকে অনেকখানি উঠে এসেছে তারা। ওদের একজন বলল, 'না নদীতে লাফ দেয়নি! ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।'

লোক দু'টি এক সংগে দরজার দিকে তাকাল। দেখল, দরজা বন্ধ। তাদের চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল। তাদের একজন স্বগত কণ্ঠে বলল, 'বিপদ দেখে লোকটির নিশ্চয় মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তা না হলে নিজের পায়ে হেঁটে এসে কেউ খাঁচায় ঢোকে!'

বলে দু'জনেই দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিল, দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দেয়া।

হাসল আগের সেই কথা বলা লোকটি। বলল, 'ফাঁদে ফেলে যেমন ইঁদুর ধরে, সেভাবেই লোকটিকে ধরা হবে।'

বলে একটু থেমেই তার সাথীকে বলল, 'তুমি এ দরজা পাহারা দাও যাতে পালাতে না পারে দরজা খুলে। আমি গিয়ে সামনে দিয়ে ঢুকছি।'

যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়িয়ে তীরে উঠে আসা সেই মেয়ে দু'টিকে বলল, 'দুঃখিত ম্যাডাম, ব্যাটা ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। একটু কষ্ট করে সামনে দিয়ে ঢুকতে হবে। ব্যাটা নিশ্চয় কোন ছিঁচকে চোর বা মাথা খারাপ কেউ। এখনি ধরা পড়বে।'

বলে লোকটি রিভলবার পকেটে রেখে হাঁটা শুরু করল বাইবেল সোসাইটি কমপ্লেক্সের সামনে যাবার জন্যে।

ওদিকে আহমদ মুসা দরজা বন্ধ করেই পেছনে ঘুরে দাঁড়াল। দেখল সে একটি কংক্রিটের রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তাটি অল্প এগিয়ে একটা বাংলোতে উঠেছে। বাংলোটির পাশ দিয়ে রাস্তাটির আরও দুটি শাখা, একটি দক্ষিণে, অন্যটি উত্তরে চলে গেছে। রাস্তা থেকে আরেকটি শাখা তার ঠিক সামনে দিয়েই তার ডান পাশে পশ্চিম দিকে চলে গেছে। রাস্তার মাঝের স্থানগুলোতে মাঝে মাঝে ফুলের গাছ।

আহমদ মুসা সামনের বাংলোর দিকে যাবার জন্যর পা বাড়িয়েছিল। হঠাৎ দেখতে পেল সাম্নের বাংলোটির দরজা দিয়ে একজন লোক বেরিয়ে আসছে। আহমদ মুসা ভাবল, সে ডানের রাস্তা দিয়ে পশ্চিম দিকে সরে পড়বে। কিন্তু পা বাড়াতে গিয়ে দেখল, লোকটি আহমদ মুসাকে দেখতে পেয়েছে। এই অবস্থায় সরে পড়তে চেষ্টা করে কোন লাভ নেই।

সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল।

'আমি আপনার সাহায্য পেতে পারি, মশায়।' লোকটির দিকে চেয়ে একটু উচ্চ স্বরে বলল আহমদ মুসা।

লোকটির পরনে হাফপ্যান্ট এবং গায়ে গেঞ্জি।

আহমদ মুসাকে দেখে লোকটির মধ্যে কোন ভাবান্তর সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু আহমদ মুসা যখন সাহায্য চাইল, বিস্ময় ফুটে উঠল লোকটির চোখে-মুখে।

বিস্মিত লোকটি এগিয়ে এল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'আপনার কি সমস্যা? নতুন কি আপনি এখানে?'

লোকটি নিশ্চয় আহমদ মুসাকে তাদের কোন মেহমান মনে করেছে।

'আমি বন্দীদের এ্যাটেনডেন্ট, সকালে বাইরে বেরিয়ে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি।' এ সস্তা মিথ্যে কথাটা লোকটাকে বিশ্বাস করানো যাবে না সন্দেহ নিয়েই কথাটা বলল আহমদ মুসা। কারন মুসলিম বন্দীরা কোথায় আছে তা জানাই তার এখন প্রধান কাজ।

আহমদ মুসার কথা শুনে কপালটা কুঞ্চিত হলো লোকটির। বিস্ময়টা তার আরও যেন গাঢ় হলো। বলল, 'বন্দীরা তো গোডাউন সেকশনে, আপনি এতদুর এলেন কেন?'

আহমদ মুসা কে উত্তর দিতে হল না। পেছনের দরজায় ধাক্কা পড়তে লাগল। একজন চিৎকার করল, 'কে কথা বলছেন, দরজা খুলুন।'

'ও তো টুর্গোর গলা। ওপারে কেন?' দরজার দিকে তাকিয়ে কথাগুলো উচ্চারন করে লোকটি আহমদ মুসা কে বলল, 'মাফ করুন। আমি দরজাটা খুলে দিয়ে আসি।'

বলে সে দরজার দিকে পা বাড়াল।

আহমদ মুসা জানে। লোকটি দরজা খুলে দেয়া মানে আহমদ মুসার সংকট বাড়া।

সুতরাং তাকে দরজা খুলতে দেয়া যায় না।

লোকটি যখন আহমদ মুসাকে অতিক্রম করে যাচ্ছিল, তখন আহমদ মুসা ডান হাতের একটা কারাত চালাল লোকটির মাথা ও ঘাড়ের মধ্যবর্তী নরম জায়গাটায়।

লোকটি মুখ দিয়ে শব্দও করতে পারল না। একটা পাক খেয়ে সংজ্ঞা হারিয়ে রাস্তায় পড়ে গেল।

আহমদ মুসা দ্রুত তাকে টেনে একটা ফুলের গাছের আড়ালে রাখল।

তারপর আহমদ মুসা ডান পাশের যে রাস্তাটা প্রাচীরের সমান্তরালে পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেছে, সে রাস্তা দিয়ে শান্তভাবে দ্রুত অগ্রসর হলো।

আহমদ মুসা জানে গোডাউন সেকশন বাইবেল সোসাইটি কমপ্লেক্সের উত্তর-পশ্চিম অংশে। সুতরাং নদীর সমান্তরালে পশ্চিম দিকে এগুলেই ওই

সেকশনে পৌঁছাতে পারে। আহমদ মুসা নিজেকে এখন অনেকখানি হালকা অনুভব করছে। সে নিশ্চিত মুসলিম নেতৃবৃন্দকে গোডাউন সেকশনেই বন্দী করে রাখা হয়েছে।

একটু সামনেই বামপাশে একটা বাংলো পেল। লনে দুটি বালক একটা বল নিয়ে খেলার মহড়া দিচ্ছে।

লনের পাশ দিয়েই রাস্তা।

আহমদ মুসার দিকে চোখ পড়তেই ওরা খেলা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ওদের বিস্ময় দৃষ্টি আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা বুঝল, সে যে নতুন আগন্তুক এ কথা বালকরাও বুঝতে পেরেছে। এ আবাসিক এলাকায় নিশ্চয় এমন কোন আগন্তুক আসে না।

আরেকটু সামনে এগিয়ে আহমদ মুসা দেখল, দুই জোড়া পুরুষ মহিলা টেনিস খেলছে। ওদের পোশাক দেখলেই বোঝা যায় সকালের ব্যায়াম করছে ওরা।

আহমদ মুসা দ্রুত হাঁটছিল।

টেনিস কোর্টের সীমানায় গিয়ে থমকে দাঁড়াল।

তার সামনেই এ পাশের দু'জনের একজন, পুরুষ লোকটি, সার্ভ করতে যাচ্ছিল। তার বাম হাতে বল এবং ডান হাতে উদ্যত র‍্যাকেট।

'মাফ করবেন, আমি এখানে নতুন। ওদিকটায় যাব। কোন পথে যেতে হবে?

লোকটির সার্ভ করা আর হল না। তার বল ও ব্যাকেট ধরা হাত দু'টি নিচু হয়ে ঝুলে পড়ল। তার চোখে একটু অবাক হওয়ার ভাব। বলল, 'কে তুমি, কি কাজ ওদিকে?'

'মুসলিম বন্দীরা আছে। ওখানে যাব।'

'কি কাজ তোমার ওখানে? কে তুমি?'

লোকটির পার্টনার মহিলাটি এসে লোকটির পাশে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে কোর্টের ওপাশ থেকে র‍্যাকেট নাচাতে নাচাতে বিরক্তির সাথে মহিলা একজন বলে উঠল, 'সময় নেই, কি করছ তোমরা?'

ঠিক এই সময়েই পুব ও দক্ষিণ দিক থেকে চার পাঁচজন লোক 'চোর' 'চোর' বলতে বলতে ছুটে এল।

ঘিরে ফেলল ওরা আহমদ মুসাকে।

একজনের হাতে পিস্তল।

পিস্তলধারীকেই সে বাইরে দেখেছিল তার দিকে ছুটে আসতে।

'বাছাধন, আমাদের একজন লোককে কুপোকাত করে ভেবেছিলে পার পেয়ে যাবে। তুমি কেমন অন্ধ চোর হে যে বাঘের খাঁচায় ঢুকেছ?' বলে রিভলবারধারী লোকটি তার রিভলবারের নল দিয়ে খোঁচা দিল আহমদ মুসার মাথায়।

'চোর মানে? লোকটি চোর নাকি?' টেনিস খেলোয়াড় যার সাথে আহমদ মুসা কথা বলছিল, তার চোখে বিস্ময়।

'চোর তো চোর। সাংঘাতিক লোক। ওপারে আমাদের একজন লোককে মেরে অচেতন করে ফেলেছে।' বলেই রিভলবারধারী তার রিভলবারের বাঁট তুলল আহমদ মুসার মাথা লক্ষ্যে। ছুটে আসছিল তার ডান হাতে ধরা রিভলবারের বাঁটটি।

আহমদ মুসা শেষ মুহূর্তে মাথাটা একদিকে সরিয়ে বাঁ হাত দিয়ে তার ছুটে আসা হাতটা ঠেকিয়ে ডান হাত দিয়ে তার হাত থেকে রিভলবার কেড়ে নিয়ে লোকটির বুকে রিভলবারের নল চেপে চাপা কণ্ঠে কঠোর নির্দেশ দিল, 'তোমার সাথীরা যে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে হাত তুলে বসে পড়তে...'

আহমদ মুসার কথা শেষ হবার আগেই তার ডান পাশে দাঁড়ানো লোকটির টেনিস র‍্যাকেট এসে আঘাত করল আহমদ মুসার ডান হাতে।

আহমদ মুসার হাত থেকে রিভলবার পড়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গেই সামনে দাঁড়ানো লোকটি, যার বুকে পিস্তল ধরেছিল আহমদ মুসা, জাপটে ধরার জন্যে ঝাপিয়ে পড়ল আহমদ মুসার উপর।

আহমদ মুসা বুঝল বেকায়দায় সে পড়ে গেছে। এদের ঘেরাও থেকে মুক্ত হওয়াই এখন প্রথম কাজ।

সামনের লোকটি ঝাপিয়ে পড়ার সাথে সাথেই আহমদ মুসা বসে পড়েছিল। ঝাপিয়ে পড়া লোকটি ভারসম্য হারিয়ে আহমদ মুসার পেছনে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

বেষ্টনীর সামনেটা ফাঁকা হয়ে গেল।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়ে এক লাফে বেরিয়ে এল বেষ্টনী থেকে।

পকেট থেকে বের করে নিয়েছে রিভলবার।

কিন্তু সে সিদ্ধান্তই নিয়েছে, এই মুহূর্তে সে রিভলবার ব্যবহার করবে না। যুদ্ধের আগে যুদ্ধ করে তার আসল লক্ষ্য সে পণ্ড করতে চায় না। যতটা সম্ভব গোপনে প্রথমে তার বন্দীদের কাছে পৌঁছা দরকার।

আহমদ মুসার হাতে রিভলবার দেখে ওরা থমকে দাঁড়িয়েছিল। হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাওয়া লোকটি পাশ থেকে রিভলবার কুড়িয়ে নিয়েই উঠে দাঁড়িয়েছিল।

'কোথায় তোমরা মাইকেল?' -এই শব্দটি এ সময় দক্ষিন থেকে ভেসে এল।

ওদিকে এক পলক চেয়েই আহমদ মুসা বাম হাত তার পকেটে ঢুকিয়ে টেবিল টেনিস বলের মত গোলাকৃতি একটা বস্তু বের করল। ভাবল, আর সময় নেয়া যাবেনা, এদের খোঁজে আরও লোক এসে পড়তে পারে।

গোল বস্তুটি একটা ক্লোরোফরম বল। দ্রুত প্রসারমান এর অদৃশ্য ধোয়া মানুষের নাকে প্রবেশ মাত্র সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

আহমদ মুসা বাম হাতেই বলটা ছুড়ে মারল। পড়ল গিয়ে ওদের মাঝখানে।

ছোট্ট একটা শব্দ হল। তারপর কয়েক মুহূর্ত। লোকগুলো প্রায় একসাথে গোড়া কাটা গাছের মত লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

আহমদ মুসা পা বাড়াতে যাবে, এমন সময় দক্ষিনের রাস্তা দিয়ে ছুটে আসা একজন লোক আহমদ মুসার মুখোমুখি হয়ে গেল।

আহমদ মুসা বুঝল, এইমাত্র এই লোকটিই কোন এক 'মাইকেলের' নাম ধরে ডেকেছিল। যারা জ্ঞান হারিয়েছে তাদেরই একজন হয়তো সে হবে।

লোকটি আহমদ মুসার মুখোমুখি হয়ে প্রথমে বিস্মিত হয়ে পড়েছিল। পরে সামনেই তাদের লোকগুলোকে মাটির উপর নেতিয়ে পড়ে থাকতে দেখে আতংক ফুটে উঠল তার চোখে।

আহমদ মুসার ডান হাতে রিভলবার ছিলই।

আহমদ মুসা লোকটির দিকে রিভলবার তুলে ধরে বলল, ‘রিভলবারের কি কাজ তুমি জান। মরতে না চাইলে বল, ওধারে গোডাউনের অংশে পৌঁছার কাছাকাছি পথ কোনটা?’

লোকটার চেহারা ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। টার ঠোঁট কাঁপল, কিন্তু কোন কথা বেরুল না। যেন বাক রোধ হয়ে গেছে তার।

আহমদ মুসা তার রিভলবার তার মাথা বরাবর তুলে ধরল। তার তর্জনী ট্রিগারে চেপে বসতে লাগল।

লোকটি সবই দেখতে পাচ্ছিল।

তার চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠল। মৃত্যুভয় ফুটে উঠল তার চোখে। বলল কাঁপা গলায়, ‘কাছে কোথাও গেট নেই। একটাই গেট, মেইন গেট।’

‘এস, চল। প্রাচীরের দিকে চল।’ বলল কঠোর কণ্ঠে আহমদ মুসা।

লোকটি আগে আগে চলল। রিভলবার সমেত হাতটা পকেটে রেখেছে আহমদ মুসা।

প্রাচীরের গোড়ায় গিয়ে দাঁড়াল লোকটা।

আহমদ মুসা গিয়ে দাঁড়াল তার পেছনে।

এই এলাকায় প্রচুর গাছ-গাছড়া। বড় গাছও আছে।

খুশী হল আহমদ মুসা। শত্রুর নজরে পড়া থেকে কিছুটা বাঁচা যাবে।

আহমদ মুসা পকেট থেকে রিভলবার সমেত হাতটা বের করল। রিভলবারের নল লোকটির পাঁজরে ঠেকিয়ে বলল, ‘এক প্রশ্ন আমি দু’বার করব না। বল ওপারে গোডাউন এলাকার কোথায় মুসলিম বন্দীদের আটক করে রাখা হয়েছে?’

আহমদ মুসা কথা শেষ করতেই পেছন থেকে ছোট্ট একটা শব্দ শুনতে পেল। যেন কোন কিছুতে জড়িয়ে একটা লতা কিংবা কোন কচি গাছ ছিঁড়ে গেল।

বিদ্যুৎ বেগে পেছন দিকে তাকিয়েই আহমদ মুসা দেহটাকে ছুড়ে দিয়েছিল মাটির দিকে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গুলীর শব্দ। আহমদ মুসার সামনে যে লোকটি দাঁড়িয়েছিল তার মাথায় গিয়ে বিদ্ধ হল একটা বুলেট।

আহমদ মুসা মুখ ঘুরিয়ে দেখতে পেয়েছিল, মাত্র সাত-আট গজ দূরে একজন শ্বেতাঙ্গ দাঁড়িয়ে। তার হাতের রিভলবার উঠে এসেছে তাকে লক্ষ্য করে। আর মুহূর্ত বিলম্ব হলে ঐ বুলেট গুড়ো করত আহমদ মুসার মাথাকেই।

রিভলবারধারী লোকটি তার গুলীতে তাদের নিজের লোক গুলী বিদ্ধ হয়ে ঢলে পড়তে দেখে কিছুটা বিমুঢ় হয়ে পড়েছিল।

এরই সুযোগ গ্রহন করেছিল আহমদ মুসা।

মাটিতে পড়ে গুলী করেছিল সে।

গুলীটি কপাল গুড়ো করে দিল রিভলবারধারীর।

ছিটকে পড়ে গেল লোকটির দেহ মাটিতে।

আহমদ মুসা গুলী করেই উঠে দাঁড়াল। ভাবল, পরপর দু'টি গুলীর শব্দ হয়েছে। নিশ্চয় সবার কানে পৌঁছে গেছে। এখনই সবাই ছুটে আসবে এদিকে। তাদের আসার আগেই ওপারে তাকে পৌছতে হবে।

তাকাল আহমদ মুসা প্রাচীরের দিকে।

প্রাচীরটা বেশ উঁচু, আট ফুটের মত হবে। এ প্রাচীর ডিঙানো তার জন্যে কঠিন নয়। কিন্তু সমস্যা হল ওপারে প্রাচীর ঘেঁষে উঁচু দেয়াল উথেছে, দু'তলা বিল্ডিং এর দেয়াল।

হতাশ হল আহমদ মুসা। দক্ষিন দিকটা বিপদজনক। ওদিকে এগুলে সহজেই লোকদের নজরে পড়ে যাবে।

তাকাল আহমদ মুসা উত্তর দিকে। দেখল, উঁচু বিল্ডিংটা প্রাচীর শেষ হবার ছয় সাত ফিট দক্ষিন থেকে পশ্চিম দিকে বেঁকে গেছে।

পেছন দিক থেকে পায়ের শব্দ ও মানুষের কণ্ঠ আহমদ মুসার কানে এল। পেছনে তাকিয়ে দেখল, কয়েকজন ছুটে আসছে এদিকে।

আর চিন্তা করার কোন অবকাশ নেই।

আহমদ মুসা উত্তর দিকে ছুটছিল।

তার লক্ষ্য প্রাচীরের ফাঁকা জায়গাটুকু, যেখানে প্রাচীর ঘেঁষে ওপারে কোন দেয়াল নেই। ওখান দিয়ে ওপারে লাফিয়ে পড়া যাবে।

আহমদ মুসা ছুটা অবস্থাতেই দাত দিয়ে রিভলবার কামড়ে ধরে প্রাচীর বেয়ে প্রাচীরের মাথায় উঠে বসল। পেছনে তাকাল। দেখল, চার পাঁচজন এদিকে ধেয়ে আসছে।

আহমদ মুসা সামনে তাকাল। দেখল, নদীর তীর ঘেঁষে উত্তর প্রান্ত বরাবর প্রাচীর। আর তার সমান্তরালে একটু দক্ষিন পশ্চিম দিকে চলে যাওয়া বিল্ডিং-এর দেয়াল। এ দু'য়ের মাঝখানে দীর্ঘ একটা চত্বর সবুজ ঘাসে ঢাকা। চত্বরটা তেমন কোন কাজে ব্যাবহার হয় বলে মনে হল না। খুশী হল আহমদ মুসা।প্রথমেই কোন বাধা আসার সম্ভাবনা এখানে কম থাকবে।

আহমদ মুসা প্রাচীরের উপর থেকে লাফিয়ে পড়ল নিচের চত্বরে। পরেই দাঁত থেকে রিভলবার হাতে তুলে নিয়ে চারদিকে তাকাল। না কোথাও কাউকে দেখা যাচ্ছে না। তার বাম পাশে বিল্ডিং-এর দেয়ালে কোন জানালা দরজা নেই। তবে একটু পশ্চিমে কয়েকটা জানালা দেখা যাচ্ছে।

পেছনে প্রাচীরের ওপাশে ওরা এসে গেছে। চোর চোর বলে চিৎকার করছে ওরা তারস্বরে।

আহমদ মুসা মনে মনে হাসল। তাকে যতক্ষণ ওরা চোর ভাবে ততক্ষণ তার সুবিধা।

ঘাসে ঢাকা মাটির উপর দিয়ে আহমদ মুসা সামনে এগুলো।

হঠাৎ পেছনের চিৎকারটা খুব কাছে মনে হল আহমদ মুসার।

মাথ ঘুরিয়ে দেখল, দু'জন প্রাচীরের মাথায় উঠে এসেছে।

আহমদ মুসা মুহূর্ত দেরি করল না। রিভলবার তুলে পরপর দু'বার গুলী করল। গুলীবিদ্ধ দু'জন লোক গড়িয়ে পড়ে গেল প্রাচীরের ওপারে।

আমদ মুসা মনে কিছুটা স্বস্তি পেল। ভাবল, এই মুহূর্তে অন্তত প্রাচীর ডিঙাতে কেউ চেষ্টা করবে না। সুতরাং নিরাপদ সে অনেকটা।

কিন্তু মুখ ঘুরিয়ে সামনে তাকাতেই তার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। দেখল, সামনে যেখানে সে জানালা দেখেছিল, সেখানে এখন একটা দরজা। দরজায় দাঁড়িয়ে দীর্ঘদেহী একজন শ্বেতাঙ্গ। তার হাতে রিভলবার। আহমদ মুসার দিকে তাক করা।

আহমদ মুসার সাথে চোখাচোখি হতেই সে বলল, 'তুমি তো বড় সেয়ানা চোর হে। কিন্তু চুরি করার আর জায়গা পেলে না। রিভলবার এদিকে ফেলে দাও।'

আহমদ মুসার ডান হাতে ছিল রিভলবার।

রিভলবার ধরা তার ঝুলন্ত ডান হাতটা নড়ে উঠল। উঠতে লাগল একটু উপরের দিকে। মনে হল যেন নির্দেশ পালনের জন্যে সে রিভলবার সামনের দিকে ছুড়ে ফেলছে।

কিন্তু তার রিভলবার ধরা ডান হাতটা চোখের পলকে দরজায় দাঁড়ানো লোকটির সমান্তরালে উঠে এল এবং সঙ্গে সঙ্গেই গুলী বেরিয়ে এল একটি।

দরজায় দাঁড়ানো রিভলবারধারী লোকটি কতকটা রিলাক্সড মুডে ছিল। ভাবখানা একজন চোরের সাথে আর কি লড়াই হবে। তার চোখের সামনে যখন ঘটনাটা ঘটে গেল, তখনও যেন সে কিছু বুঝে উঠতে পারেনি। বুকে গুলী খেয়ে লোকটির দেহটা বার কয়েক এদিক-ওদিক দোল খেয়ে পড়ে গেল দরজার সামনে।

আহমদ মুসা চারদিকে তাকিয়ে জায়গাটার লোকেশনটা একবার বুঝে নিয়ে ছুটল দরজার দিকে।

লাশ ডিঙিয়ে দরজায় প্রবেশ করে আহমদ মুসা দরজা বন্ধ করে দিল।

আহমদ মুসা যেখানে প্রবেশ করল তা ঘর নয় একটা করিডোর।

আহমদ মুসা দেখল, অল্প একটু দুরেই পশ্চিম দিকে যাওয়া করিডোর থেকে আরেকটা শাখা দক্ষিণে বেরিয়ে গেছে।

আহমদ মুসা সেদিকে এগুলো। সবে এক ধাপ এগিয়েছে সে।

দক্ষিণ দিক থেক আসা করিডোর থেকে দু'জন স্টেনগানধারী এসে প্রবেশ করল এ করিডোরে। তাদের স্টেনগান উদ্যত।

আহমদ মুসা একদম মুখোমুখি হয়ে গেল তাদের। তাদের বাগিয়ে ধরা স্টেনগান স্থির হয়ে হয়েছে আহমদ মুসার বুক লক্ষ্যে।

আহমদ মুসার রিভলবার তার ডান হাতে ঝুলছিল।

'রিভলবার ফেলে দাও।' চিৎকার করে বলল তাদের একজন।

ওরা দু'জন পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল।

ওদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়েছিল আহমদ মুসা। হাত থেকে ছেড়ে দিল সে রিভলবার। পড়ে গেল তার পায়ের কাছেই।

রিভলবার পড়ে যেতেই ওদের একজন ছুটে এল। রিভলবার হাতে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছিল।

লোকটি আহমদ মুসা এবং একটু দূরে দাঁড়ানো দ্বিতীয় স্টেনগানধারীর মধ্যে একটা দেয়াল সৃষ্টি করেছিল।

আহমদ মুসা সুযোগ গ্রহণ করলো।

আহমদ মুসার ডান হাত বিদ্যুৎ গতিতে লোকটির গলা পেঁচিয়ে তাকে চেপে ধরেই বাম হাত দিয়ে তার কাছ থেকে রিভলবার কেড়ে নিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই গুলী করল দূরে দাঁড়ানো স্টেনগানধারীকে লক্ষ্য করে।

লোকটি মুহূর্তের জন্যে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। সম্বিৎ ফিরে পাওয়ার আগেই গুলী খেয়ে আছড়ে পড়ল।

আহমদ মুসার বাহুর সাড়াশির বাঁধনে আটকে পড়া লোকটি অসহায় ভাবে হাত-পা ছুড়ছিল।

আহমদ মুসা এবার রিভলবারের নলটা তার মাথায় চেপে ধরে বলল, 'মুসলিম বন্দীদের কোথায় রেখেছ বল? তিন গুনার মধ্যে না বললে মাথা গুড়ো করে দেব।'

লোকটি মুহূর্ত দেরী করল না। সামনে করিডোরের দক্ষিন পাশের ঘরের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'ঐ ঘরে রয়েছে।'

'কোন দিকে দরজা?'

'ঘরের দক্ষিন দেয়ালে' বলল লোকটি।

'চল কোন দিকে?' বলে ঐভাবে তাকে ধরে রেখেই চলতে শুরু করল।

দরজায় দাঁড়িয়ে দুজন প্রহরী। তারা আহমদ মুসাদের দেখেই তাঁদের স্টেনগান বাগিয়ে ধরল।

হেসে উঠল আহমদ মুসা। বলল, ‘ওদের দরজা খুলে দিতে বল।’

‘ওরা আমার নির্দেশের অধীন নয়। আমার নির্দেশ ওরা মানবে না।’ বলল লোকটি।

ক্রোধের চিহ্ন ফুটে উঠল আহমদ মুসার চোখে-মুখে। এসব কথা শুনে সময় নষ্ট করার সময় তার নেই।

আহমদ মুসা গার্ড দু’জনকে লক্ষ্য করে বলল, ‘দরজা খুলে দাও।’

গার্ড দু’জন যেমন দাঁড়িয়েছিল, তেমনি দাঁড়িয়ে থাকল। কোন ভাবান্তর দেখা গেল না তাদের চোখে-মুখে।

আহমদ মুসার রিভলবার তাদের লক্ষ্যে স্থির হলো। পরপর দুটি গুলী উদগীরন করল। গার্ড দু’জন দরজার উপরই ঢলে পড়ল মৃত্যুর কোলে।

আহমদ মুসা লোকটিকে ঐভাবে ধরে রেখেই দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। যাবার পথে পড়ে থাকা স্টেনগান দু’টি তুলে নিয়ে কাঁধে ঝুলিয়ে রাখল।

লোকটিকে একটা ধাক্কা দিয়ে সামনে ঠেলে দিয়ে বলল, ‘খুলে দাও দরজা।’

লোকটি আর অন্যথা করল না। খুলে দিল দরজা।

দরজা খুলে গেল।

ঘরের মাঝখানে ওরা বারোজন দাঁড়িয়েছিল। দরজার দিকে মুখ। তাদের চোখে-মুখে উদ্বেগ।

আহমদ মুসা এগিয়ে গেল দরজার কাছে।

ওদের লক্ষ্য করে সালাম দিল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা কে সামনে দেখে অপার বিস্ময়ের একটা স্রোত খেলে গিয়েছিল তাদের মুখের উপর দিয়ে। পরমুহূর্তেই সেখানে নেমে এল আনন্দের প্রস্রবণ। আহমদ মুসার সালাম নিতে তারা ভুলে গেল। চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল তুরস্কের কামাল ইনুনু।

আহমদ মুসা ঠোঁটে আঙ্গুল চেপে কথা বলতে নিষেধ করে বলল, ‘আপনারা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসুন।’

বেরিয়ে এল ওরা ঘর থেকে দ্রুত।

আহমদ মুসা আবার ওদের সালাম দিয়ে বলল, ‘আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি যে, আপনারা সুস্থ আছেন। এখনই আমাদের বেরুবার পথ করতে হবে। ওরা এখনি এসে পড়বে।’

বলে আহমদ মুসা সেই লোকটির মাথায় রিভলবারের নল চেপে ধরে বলল, ‘বেরুবার গোপন পথ কোনদিকে বল?’

‘গোপন পথ?’ অজ্ঞতার ভান করল লোকটি।

‘আর এক মুহূর্ত দেরী করলে মাথা গুড়ো করে দেব তোমার।’ বলল আহমদ মুসা চাপা কঠোর কণ্ঠে।

পশ্চিম দিকের একটা করিডোর দেখিয়ে বলল, ‘ওদিকে।’

আহমদ মুসা লোকটিকে ধাক্কিয়ে নিয়ে সেদিকে চলল। ওরা ১২জন তাদের পেছনে পেছনে চলল।

একটা চতুষ্কোণ ফাঁকা জায়গা তারা পার হচ্ছিল, এসময় বিপরীত দিক থেকে অনেকগুলো দ্রুত পদশব্দ এবং অনেকের উত্তেজিত কণ্ঠ ভেসে এল।

করিডোরের মুখ ঘেঁষেই একটা দরজা।

আহমদ মুসা লোকটিকে ঠেলে দ্রুত দরজার কাছে পৌঁছল। দরজার নব ঘুরাতেই দরজা খুলে গেল।

আহমদ মুসা পেছনে মুখ ঘুরিয়ে দ্রুত বলল, ‘আপনারা দ্রুত ভেতরে ঢুকে পড়ুন।’

সঙ্গে সঙ্গেই ওরা ১২জন ভেতরে ঢুকে গেল। আহমদ মুসা সেই আটকে রাখা লোককে ঠেলে নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

ঘরে ঢুকেই আহমদ মুসা দরজার ছিটকিনি লাগিয়ে দিল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অনেকগুলো লোক এসে প্রবেশ করল আহমদ মুসাদের পেরিয়ে আসা ফাঁকা জায়গাটায়। তাদের উত্তেজিত কথাবার্তা ও চিৎকার শোনা গেল। সম্ভবত বন্দীদের পালানোর ব্যাপারটা তারা টের পেয়েছে।

তাদের চিৎকারের মধ্যে একটু দূর থেকে একটা উচ্চ কণ্ঠ সব কণ্ঠকে ছাপিয়ে উঠল। সে বলছে, 'পুলিশ, পুলিশ অনেক পুলিশ। বাড়ির তিন দিক তারা ঘিরে ফেলেছে।'

অনেক কণ্ঠের চিৎকার ও চেঁচামেচি এক মুহূর্তেই থেমে গেল।

'কি চায় পুলিশ, কি বলছে তারা?' একটা ভারী কণ্ঠ ধ্বনিত হলো।

'তারা ভেতরে প্রবেশ করতে চায়।' বলল সম্ভবত খবর নিয়ে আসা লোকটি।

'ঠিক আছে, তোমরা কয়েকজন চারদিকটা দেখ বন্দীরা কোথায়, অন্যরা আমার সাথে এসো। দেখি পুলিশ এখানে নাক গলাতে এল কেন?' বলল সেই ভরাট গলার লোকটা।

আহমদ মুসাসহ ঘরের সবাই এইসব কথা-বার্তা শুনছিল।

আহমদ মুসা মুখ ঘুরিয়ে ভেতরের দিকে মনোযোগ দিতেই ওয়ার্ল্ড এ্যাসেম্বলী অব মুসলিম ইয়ুথের নেতা কামাল ইনুনু বলল, 'ওদের কেউ নিশ্চয় এদিকে খুজতে আসবে।'

বলেই একটু থেমে সে ঘরের এক পাশের মেঝেতে নিচে নেমে যাওয়া সিঁড়ির দিকে অঙ্গুলি সংকেত করে বলল, 'আমার মনে পড়ছে এই সিঁড়ি দিয়েই আমরা উঠেছিলাম।'

'কেন আপনারা কি আগে ভু-গর্ভের কোন কক্ষে বন্দী ছিলেন?' বলল আহমদ মুসা।

'না, এ পথেই আমরা বন্দীখানায় উঠেছিলাম। নদী থেকে এক সুড়ঙ্গ পথে আমাদের আণ্ডারগ্রাউন্ড কক্ষে আনা হয়েছিল।'

আহমদ মুসার মনে পড়ে গেল নদীর কুল ঘেঁষে দাঁড়ানো মোটর বোটের কথা। তার চোখে ভেসে উঠল মোটর বোটের নোঙরের রশি ঠিক পানির সমান্তরালে উপকূলের কংক্রিটের ভেতরে ঢুকে যাবার দৃশ্য।

আনন্দে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আহমদ মুসার। সুড়ঙ্গ পথের মুখে নিশ্চয় মোটর বোটটি দাঁড়িয়ে আছে।

আহমদ মুসা কামাল ইনুনুকে কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল এ সময় দরজায় ধাক্কা পড়তে লাগল।

আহমদ মুসা দরজার দিকে একবার তাকিয়ে কামাল ইনুনুকে লক্ষ্য করে বলল, 'আপনি এঁদের নিয়ে দ্রুত নিচে নেমে যান। নিচের ফ্লোরে নেমে উত্তর দিকে এগিয়ে যাবেন। ফ্লোর লেভেলেই নদীতে বেরুবার দরজাটা পেয়ে যাবেন। আমার যতদুর মনে হয় উত্তর দেওয়ালের কোথাও সুইচ পেয়ে যাবেন। ঠিক সুইচটা চাপলেই দেয়াল সরে যাবে। সামনেই দেখবেন একটা মোটর বোট দাঁড়িয়ে। আমার যতদুর মনে হয় লাল সুইচ কিংবা নৌকা বা মাস্তুলের ছবি ওয়ালা কোন সুইচ থাকলে সেটাই টিপবেন। খোদা হাফেয।'

কামাল ইনুনু সিঁড়ির দিকে পা বাড়ানোর জন্যে নড়ে উঠলেও বিশ্ব মুসলিম কংগ্রেসের প্রধান শেখ মাদানী নড়ল না। বলল, 'মনে হচ্ছে তুমি যাচ্ছ না। তুমিও চল।'

আহমদ মুসা তার দিকে চোখ তুলে দ্রুত বলল, 'আমি নিশ্চয়ই আসব। কিন্তু এদের আটকাতে হবে এখানে।'

'কেন দরজা শক্তভাবে বন্ধ আছে, ভাঙার আগেই আমরা চলে যেতে পারব।'

'জনাব ওদের দরজা ভাঙতে দেরী হলে কিংবা দরজা ভাঙতে না পারলে ওরা নদীর দিকে ছুটে যাবে। সেখানে আমাদের আটকাতে চেষ্টা করবে। সুতরাং দরজা খুলেই ওদের এখানে ব্যস্ত রাখতে হবে। ইতিমধ্যে আপনাদের নিরাপদ দুরত্বে সরে পড়তে হবে।' বলল দ্রুত কণ্ঠে আহমদ মুসা।

'বুঝেছি বাবা তোমার কথা। তুমি একা এদের সাথে লড়াই করবে, আর আমরা পালাব?' বলল ভারী কণ্ঠে শেখ মাদানী।

আহমদ মুসা হাত জোড় করে বলল, 'আমাকে নিয়ে চিন্তা করবেন না। লড়াই থেকে একা একা সরে পড়া কঠিন নয়, কিন্তু সবাইকে নিয়ে সরে যাওয়া কঠিন। আপনারা দয়া করে যান।'

শেখ মাদানী আর পাল্টা কথা আর বলল না। 'আল্লাহ হাফেজ' বলে পা বাড়াল সিঁড়ির দিকে। সেই সাথে তার সাথী এগারোজন সকলেই।

দরজায় ধাক্কা বাড়ছিল।

আহমদ মুসা রিভলবার পকেটে রাখল। কাঁধ থেকে হাতে তুলে নিল স্টেনগান। ধরে রাখা সেই লোকটিকে বলল, 'দরজা খুলে দাও আর বল, 'এদিকে কেউ আসেনি। তাড়া খেয়ে তুমিই দরজা বন্ধ করেছিলে।'

বলে আহমদ মুসা দরজার বিপরীত দিকে সিঁড়ির পাশে দেয়াল বরাবর রাখা একটা ভাঙা টেবিলের আড়ালে গিয়ে বসল।

লোকটি টেবিলের নিচ দিয়ে হা করে থাকা স্টেনগানের কালো ব্যারেলের দিকে একবার তাকিয়ে দরজা খুলে দিল।

দরজা খোলার সাথে সাথে দরজা ঠেলে চার পাঁচজন ঘরে প্রবেশ করল উদ্যত স্টেনগান হাতে।

দরজা খুলে দেয়া সেই লোকটি দ্রুত তাদের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল এবং দরজার বিপরীত দিকে সিঁড়ির মুখের পাশে রাখা টেবিলের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'প্রথমে ওকে দেখ, তারপর...।'

তার কথা শেষ হতে পারল না।

আহমদ মুসার স্টেনগান থেকে এক ঝাক গুলী এসে ওদের সবাইকে ঘিরে ধরল। পর মুহূর্তেই ৬টি মানুষ লাশ হয়ে পড়ে গেল মেঝেতে।

আহমদ মুসা নড়ল না টেবিলের আড়াল থেকে। তার স্টেনগানের কাল নল হা করে তাকিয়ে থাকল দরজার দিকে শিকারের অপেক্ষায়।

এদিকে স্টেনগানের গুলীর শব্দ শুনেই সম্ভবত বিভিন্ন দিক থেকে আরও তিনজন এগিয়ে এল।

তারা দরজার সামনে এসে তিনজনেই তাদের স্টেনগান থেকে গুলী ছুঁড়ল। তাদের গুলী দরজা দিয়ে ঢুকে সিঁড়ির মাথার উপর দিয়ে দেয়ালকে গিয়ে বিদ্ধ করল। আহমদ মুসাকে আড়াল করা টেবিলটা দরজার বিপরীত দেকে হলেও একটা কৌণিক ব্যবধানে তার অবস্থান ছিল। সুতরাং বৃষ্টির মত আসা গুলীর হাত থেকে বেঁচে গেল সে।

গুলী বর্ষনের কোন পাল্টা উত্তর না পেয়ে ওরা গুলী বন্ধ করে স্টেনগান বাগিয়ে পা পা করে দরজার কাছাকাছি হলো।

আহমদ মুসার স্টেনগানের নল ওদিকেই তাকিয়ে ছিল। গুলী বর্ষণ করল এক পশলা।

দরজার সামনে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সেই এগিয়ে আসা তিনটি মানুষ।

আহমদ মুসা উঠল না তার জায়গা থেকে। স্টেনগানটা সেইভাবেই দরজার দিকে তাক করে রাখল। মুসলিম নেতৃবৃন্দ এখান থেকে বেরিয়ে বোটে না ওঠা পর্যন্ত ওদের মনোযোগ ভেতর দিকেই আটকে রাখতে হবে। ওদের বুঝাতে হবে ভেতরেই সংঘাত হচ্ছে, বন্দীরা ভেতরেই আছে।

আরও কিছু সময় গেল। কেউ আসছে না। আহমদ মুসা উঠে দাঁড়ালো।

বাইরে একটু দূর থেকে ভেসে আসা কথা শুনতে পেল আহমদ মুসা।

দরজা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল, এদিকে আসছে পুলিশ এবং সেই সাথে কিছু লোক।

আহমদ মুসা দ্রুত দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সিঁড়ির দিকে ছুটল।

আণ্ডারগ্রাউন্ড ফ্লোরে নেমে ছুটল উত্তর দিকে। উত্তরে দেয়ালে সে দরজা খোলাই দেখতে পেল।

আহমদ মুসা দরজায় এসে স্তম্ভিত হয়ে দেখল, মোটর বোটে মুসলিম নেতৃবৃন্দ সবাই উঠেছে, কিন্তু বোটটি ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

আহমদ মুসা কে দেখেই 'ডার্ক আফ্রিকা ব্রাইট হার্টের' প্রধান তারিক আল-মাহদী বলল, 'লোহার বিশেষ চেন দিয়ে বোট আটকানো সম্ভবত ভেতর থেকে। কোন ক্রমেই খোলা যায়নি।'

আহমদ মুসা ঘুরে সুইচ বোর্ডের কাছে গেল। নজর বুলাল প্যানেলের সুইচগুলোর উপর। আহমদ মুসা নিশ্চিত, চেন খুলে দেবার জন্যে এখানেই একটা সুইচ আছে।

সাদা সুইচের উপর সাদা চেন আঁকা একটা সুইচ পেয়ে এগিয়ে গেল আহমদ মুসা। অফ করে দিল সুইচটা। সামনের দেয়ালের কোথাও থেকে ক্লিক করে একটা শব্দ উঠল।

'খুলে গেছে চেন' বুঝল আহমদ মুসা।

ছুটে ফিরে গেল দরজায় আহমদ মুসা। বলল, অনুচ্চ স্বরে, 'চেন খুলে গেছে স্টার্ট দিন বোটে।'

ঠিক এই সময়েই পেছনে পায়ের শব্দ শুনতে পেল আহমদ মুসা।

স্টেনগান বাগিয়ে চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল আহমদ মুসা। ট্রিগার টানতে যাচ্ছিল সে স্টেনগানের। কিন্তু দেখতে পেল পুলিশকে আর দেখতে পেল পুলিশের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে ব্ল্যাক বুল এবং মিঃ ম্যাকাকো।

বিস্মিত হল আহমদ মুসা। তার স্টেনগানের ব্যারেল নিচে নেমে গেল।

মোটর বোট স্টার্ট নেয়ার শব্দ পেল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা মুখ ফিরিয়ে চিৎকার করে বলল, 'স্টার্ট বন্ধ করে দিন।'

ব্ল্যাক বুল ও মিঃ ম্যাকাকো এগিয়ে এল। তার পেছনে পুলিশ অফিসাররা।

ব্ল্যাক বুল এসে আনন্দের অতিশয্যে জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে।

মিঃ ম্যাকাকোও বিস্ময় ও আনন্দের সাথে আহমদ মুসাকে মোবারকবাদ জানিয়ে বলল, 'একক' একজন যে এমন একটা যুদ্ধে জিততে পারে, সেই অবিশ্বাস্য এক যুদ্ধক্ষেত্র আজ দেখলাম।'

মিঃ ম্যাকাকো নামতেই ব্ল্যাক বুল একজন পুলিশ অফিসারের দিকে অংগুলি সংকেত করে বলল, 'ইনি 'সলো' বন্দরের পুলিশ প্রধান, আমার ভাই। আরেকজনকে দেখিয়ে বলল, ইনি মিঃ উপাংগো। বোমাসার পুলিশ প্রধান, আমার ভাইয়ের বন্ধু।'

পুলিশ অফিসার দু'জন আহমদ মুসার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'আমাদের জীবন ধন্য হলো, আমাদের চোখ সার্থক হলো আপনাকে দেখে।'

আহমদ মুসাও হাত বাড়িয়ে দিল তাদের দিকে।

মুসলিম নেতৃবৃন্দ নেমে এল বোট থেকে।

ব্ল্যাক ক্রস-এর প্যারিস হেড কোয়ার্টার।

বিশাল টেবিল সামনে নিয়ে রিভলবিং চেয়ারে দুলছিল ব্ল্যাক ক্রস-এর নতুন প্রধান সাইরাস শিরাক। চোখে তার শুন্য দৃষ্টি। যেন এই জগতে সে নাই। মাথার চুল উস্কো-খুস্কো। চোখ লাল।

তখন রাত ৮টা। সেই বিকেল ১টা থেকে এই চেয়ারেই বসে আছে সাইরাস শিরাক। মদ গিলছে পেগের পর পেগ।

ফ্রী ওয়ার্ল্ড টেলিভিশনের বিকেল ১টার নিউজ বুলেটিন সাইরাস শিরাকের মাথায় ভয়ানক বোমাটির বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। FWTV বলেছে, "মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রের বারবারেতির ভয়ানক অগ্নিকান্ডে নিহত বলে কথিত ১২জন মুসলিম বিশ্বনেতাকে ইউরোপ ভিত্তিক সন্ত্রাসী সংগঠন ব্ল্যাক ক্রস কিডন্যাপ করে কঙ্গোর বোমাসা সীমান্ত শহরের বাইবেল সোসাইটিতে বন্দী করে রেখেছিল। 'সলো'-এর পুলিশ প্রধান মিঃ জাগুয়াস ম্যাকা একটি গোপন সুত্রের খবরের ভিত্তিতে বোমাসার পুলিশ প্রধান মিঃ উপাংগোর সাহায্যে বন্দী মুসলিম নেতৃবৃন্দকে আজ সকালে মুক্ত করেন। প্রকাশ, ১২জন মুসলিম বিশ্ব নেতাকে কিডন্যাপ করার ঘটনা আড়াল করার জন্যেই ব্ল্যাক ক্রস বারবারেতির ইসলামী সম্মেলনে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কয়েক কুড়ি মানুষের হত্যাযজ্ঞের সৃষ্টি করে। মুসলিম বিশ্ব নেতাদের কেন কিডন্যাপ করা হয়েছিল, পুলিশ এ সম্পর্কে এখনও কিছু জানতে পারেনি।"

নিউজ শেষে FWTV ঘোষণা দেয়, 'সচিত্র ও বিস্তারিত নিউজের জন্যে FWTV সকলকে বিকেল ৩টার বুলেটিনে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।'

FWTV-এর নিউজ ব্ল্যাক ক্রস প্রধান সাইরাস শিরাকের বুকে শেলবিদ্ধ করে। বাকরুদ্ধ হয়ে যায় তার। মুসলিম বন্দীদের উদ্ধার কিভাবে সম্ভব? গোটা দুনিয়া যাদের মৃত জানে, তাদের খুঁজতে গেল কেন দু'জন পেটি পুলিশ অফিসার? আর খুজে পেলইবা কি করে?

কোন প্রশ্নেরই উত্তর সাইরাস শিরাকের কাছে ছিল না।

সবচেয়ে দুর্বহ মনে হচ্ছে তার কাছে ব্ল্যাক ক্রস-এর বদনাম। ব্ল্যাক ক্রস আজ গোটা দুনিয়ায় সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে বিবেচিত হবে।

চেয়ার থেকে উঠতে পারল না সাইরাস শিরাক। বেলা তিনটার FWTV-এর নিউজ বুলেটিন তাকে দেখতে হবে। সচিত্র বিবরণে কি তারা দেখায়, টা দেখার পরে অনেক কিছু তার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

কিছুতেই বুঝতে পারছে না সাইরাস শিরাক বোমাসা, সলো অথবা বারবারেতি থেকে কেউ কিছু জানাচ্ছে না কেন? তাহলে কি বোমাসা থেকে খবর দেবার মত কেউ বেঁচে নেই? শিউরে উঠল সাইরাস শিরাক। ক্যামেরুনে যা ঘটেছে তারই কি পুনরাবৃত্তি ঘটল বোমাসায়? সলো বন্দরে এশিয়ানকে আটক করা হয়েছিল, সে কে ছিল? সে ঘটনার পর যে অবস্থায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং যেভাবে সে পালিয়েছে, তা প্রমান করে সে অসাধারন কেউ। কে সে? আহমদ মুসা?

ঐভাবে চেয়ারে বসেই মিঃ সাইরাস শিরাক FWTV-এর ৩টার নিউজ বুলেটিন দেখে। বোমাসার বাইবেল সোসাইটির ভেতর-বাহির সবটাই দেখানো হয়। প্রায় ১৫-১৬টি লাশ তাঁর চোখে পড়ে। সবগুলোই ব্ল্যাক ক্রস-এর লোকদের। শত্রুপক্ষের একটা লাশও তার চোখে পড়ে না। ছবিতে ১২জন বিশ্ব নেতাকে দেখানো হয়। গর্বিত দু'জন পুলিশ অফিসারকেও দেখা যায় তাদের সাথে। তাদের সাক্ষাৎকারও প্রচার হয়। তারা বলে বড় বড় সুবিধা ও স্বার্থ আদায়ের গোপন দরকষাকষির অস্ত্র হিসেবে তাদের কিডন্যাপ করা হয়েছিল। তবে তারা তাদের গোপন দাবী আদায় করত, কিন্তু বন্দীদের তারা ছেড়ে দিত না। তাদের স্লো পয়জনিং করা হচ্ছিল।'

FWTV তাদের খবরে প্রাথমিক রক্ত পরীক্ষার বরাত দিয়ে বলে, মুসলিম বিশ্ব নেতাদের স্লো পয়জন করা পয়জনটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের। মনে হচ্ছে প্রথম বারের মত কোন মানুষের উপর এটা টেস্ট করা হয়েছে।

রাগে-দুঃখে মাথার চুল ছেঁড়ে সাইরাস শিরাক।

চেয়ার থেকে আর উঠতে পারেনি সে। স্রোতের মত টেলিফোন এসেছে। তাকেও টেলিফোন করতে হয়েছে অনেক।

ছয়টার মধ্যেই পৃথিবীর সকল রেডিও-টিভি নেটওয়ার্ক বোমাসার মুসলিম বন্দী উদ্ধারের ঘটনাকে তাদের প্রথম ও প্রধান ঘটনা হিসেবে প্রচার করে। FWTV-এর প্রচারিত ফটোগ্রাফ ব্যাবহার করে তারা।

মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সাইরাস শিরাকের সামনে পুরো পৃথিবীর মানচিত্রটা যেন পাল্টে গেল। তার সামনের উজ্জ্বল দিগন্তটা কালো হয়ে গেল। তার মনে হচ্ছে, ব্ল্যাক ক্রস-এর চেয়ে ব্যর্থ সংগঠন দুনিয়াতে আর নেই। কিন্তু কার জন্যে?

সন্ধ্যা ৭টায় বৈঠক বসল ব্ল্যাক ক্রস নির্বাহী কমিটির।

জলন্ত অঙ্গারের মত সবার মুখমণ্ডল।

কিন্তু কারো মুখে কথা নেই।

কথা বলল সাইরাস শিরাকই প্রথমে।

বলল, 'সবার চোখে আমি আগুন দেখছি। কিন্তু আগুনে পোড়াবে কাকে?'

কেউ উত্তর দিল না। সবারই চোখে যেন একই জিজ্ঞাসা।

সাইরাস শিরাকই কথা বলল, 'আহমদ মুসা সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করেছে, অপূরণীয় ক্ষতি করেছে আমাদের। কিন্তু শেষ এই ঘটনায় তাকে আমরা দেখছি না।'

'আমরা কি করব, আমাদের বোমাসার এত বড় বিপর্যয়ের জন্যে কাকে আমরা দায়ী করব?' বলল একজন।

'সেটা পরে খোঁজ নেয়া যাবে। সকলের আগে এখন আমাদের এক বড় শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। যে শত্রুকে সরাতে না পারলে পদে পদে আমাদের হোঁচট খেতে হবে।'

'কে এই শত্রু?' একসাথে বলে উঠল কয়েকজন।

'সময়ে জানতে পারবেন। তবে সে শত্রু কোন মানুষ নয়।'

'মানুষ নয়?'

'মানুষের চেয়েও পাওয়ারফুল। সেনসিটিভ।'

'কে সে? কি তার নাম?'

‘বললাম তো সময়ে জানা যাবে।’ বলে একটু থেমে আবার বলল সাইরাস শিরাক, ‘অপারেশন চীফ মিঃ রেনেন, আপনার নতুন অস্ত্র প্রস্তুত তো? নতুন করে পরীক্ষা করেছেন আবার?’

‘প্রস্তুত। পরেও পরীক্ষা করেছি। সফল।’

‘ধন্যবাদ। সকলকে ধন্যবাদ’ বলে সাইরাস শিরাক চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল।

# ২

আহমদ মুসা ক্যামেরুনে রাশেদী ইয়েসুগোর সাথে কথা বলছিল টেলিফোনে।

বলছিল, 'ঘটনার পর ক'দিন চলে গেল আসিনি কেন বলছ? সময় থাকলেও সুযোগ পাইনি। বোমাসাতেই কেটেছে দু'দিন। ব্ল্যাক বুল তো সেখানে শুধু পীরজাদা নয়, রীতিমত পীর বনে গেছে। তার পায়ের ধুলোও যেন অসীম মুল্য তাদের কাছে। বুঝতেই পারছ কি রকম দাওয়াত খেতে হয়েছে। তাছাড়া আমরা ওখানে কিছু কাজও করেছি। বাংগুই থেকে ওদের জন্যে একজন ইমাম আনিয়েছি। একটা আরবী স্কুল চালু করেছি। একটা মিশনারী ইউনিট গঠন করেছি। সমাজ সেবার কাজ আবার চালু করা হয়েছে। বলতে পার দুই মাসের কাজ করেছি দুই দিনে।'

'কিন্তু তারপর আরও ৫দিন গেছে' আহমদ মুসার কথার মাঝখানে ওপার থেকে বলে উঠল, রাশিদী ইয়েসুগো।

'পাঁচদিনের কথা বলছ? সলোতে এসে পাঁচটা দিন কিভাবে গেল বুঝতেই পারিনি। মনে হচ্ছে একদিনও যায়নি।'

'কি ব্যাপার! কি ঘটেছে সেখানে?' আবার আহমদ মুসাকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল ওপার থেকে রাশিদী ইয়েসুগো।

'বলছি শোন। মহা ঘটনা ঘটে গেছে। ব্ল্যাক বুলের বিয়ে হয়েছে। বিয়ের কাজে ও আনন্দে কোন দিক দিয়ে যে এ পাঁচটা দিন গেছে টের পাইনি!'

'বিয়ে? কার সাথে? এভাবে হটাৎ?' ওপার থেকে বলল রাশিদী ইয়েসুগো।

'মেয়েটি ব্ল্যাক বুলের বংশের একজন এবং নিকট আত্মীয়। ওরা মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল। সুতরাং দেরী হয়নি।'

‘ওঁকে আমাদের মোবারকবাদ দেবেন। ও বউ নেয়েই আসছে তো?’ বলল রাশিদী ইয়েসুগো টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে।

‘ও আপাতত যাচ্ছে না। আমি মনে করি সলো ও বোমাসায় তাকে দিয়ে ইসলামের অনেক খেদমত হবে। স্থানীয় লোকদের মধ্যে সে খুবই জনপ্রিয় হবে।’

আহমদ মুসা মুহূর্তকাল থেমেই আবার বলতে শুরু করল, ‘রোসেলিনের ওখান থেকে ডোনা-রোসেলিন কাল সকালে যখন ফিরছেন, তখন সুবিধা হলে সকালে টেলিফোনের চেষ্টা করব। তুমি আমার আহত হওয়ার কথা রোসেলিনকে বলো না। সে কথা রাখতে পারবে না, ডোনাকে বলে দেবে।’

‘ঠিক আছে বলব না। কিন্তু আপনি ভাল তো? কিছু লুকচ্ছেন না তো?’

‘তুমি তা মনে করো?’

‘না মনে করিনা।’ বাক্যটা শেষ করে একটা ঢোক গিলে সঙ্গে সঙ্গেই বলল, ‘আহমদ মুসা ভাই আপনি তাড়াতাড়ি আসুন। আপনাদের শুভ কাজটা সম্পন্নের পর আপনাদের নিয়ে আমরা ‘লেক চাঁদ’ এলাকায় বেড়াতে যাব। বহুদিন যাই না। কেমন সুন্দর এলাকা দেখবেন।’

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘বেড়াবার ওরকম একটা সুযোগ পেলে খুশীই হবো। তবে এই মুহূর্তে এর চেয়ে জরুরী কাজ একটা আছে।’

‘কি কাজ সেটা?’

‘বোমাসায় শুনলাম, ‘গ্যাবন এর পোর্ট জোন্টল-এ তিনশ মুসলমানের বাস। গ্রামাঞ্চল থেকে উচ্ছেদ হয়ে ওরা শহরে এসে একত্রিত হয়েছিল শহরতলীর একটা মসজিদ কে কেন্দ্র করে। সপ্তাহখানেক আগে কারা রাতের বেলা মসজিদ ভেঙে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে গেছে। বাধা দিতে গিয়ে ৪জন মুসলিম যুবক মারা গেছে। মনে করা হচ্ছে অবশিষ্ট মুসলমানকে পোর্ট জোন্টল থেকেও বহিষ্কার করা হবে। ক্যামেরুনে এসে আমি ওখানে যেতে চাই। মনে হয় ‘লেক চাঁদ’ সরকারের গ্যাবন-এর সমুদ্র তীরের পোর্ট জোন্টল সফর খারাপ হবে না।’

‘তা হবে। খেলায় আনন্দ আছে। কিন্তু অনেকে কাজে আনন্দ পায় বেশী।’

‘আচ্ছা তুমিই বল, খেলার আনন্দের চেয়ে মানুষের অশ্রু মোছানোর মধ্যে আনন্দ বেশী কিনা!’

‘এ সত্যটা কারও মতামতের অপেক্ষা করে না আহমদ মুসা ভাই।’ কথা শেষ করেই রাশিদী আবার বলে উঠল, ‘মুসলিম নেতৃবৃন্দ যাচ্ছেন কবে?’

‘রেডিও-টিভি’র খবরে তো শুনেছই, বারবারেতিতে গতকাল ইসলামী সম্মেলন হয়ে গেছে। আজ ওঁরা যাবেন।’

‘আপনি সম্মেলনে ছিলেন না?’

‘ছিলাম ব্যাক-বেঞ্চার হিসেবে, প্রৌঢ় একজন মৌলভীর পোশাকে।

‘ছদ্মবেশ কেন?’

‘পাগল হয়েছ, দুনিয়ার সব সাংবাদিক এবং গোয়েন্দারা এসে জমা হয়েছিল বারবারেতিতে। কি দরকার তাদের সামনে পরিচয়টা প্রকাশ করার!’

‘নতুন করে এ ধরনের সম্মেলনের সংবাদে আমার কিন্তু খুব ভয় হয়েছিল।’

‘ভয় হবারই কথা। একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবেই সম্মেলন করা হয়েছে। এখানে ইসলামী সম্মেলন করার চেষ্টা দু’বার ব্যর্থ হয়েছে। একবার দু’শ বছর আগে, আর এবার একবার ক’দিন আগে। সুতরাং সম্মেলনে করে অতীতের ব্যর্থতার রেকর্ড ভাঙার প্রয়োজন ছিল। এ জন্যে আমার পরামর্শ ছিল মুসলিম নেতৃবৃন্দ সম্মেলন করেই মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র ত্যাগ করবেন। আলহামদুলিল্লাহ সম্মেলন সফলভাবেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমার খুবই আনন্দ লাগছে, আফ্রিকার এই অঞ্চলে ইসলামের প্রথম নিজাম বরদার আহমদ বিন আব্দুর রহমানের দু’শ বছর আগের স্বপ্ন সফল হল। সম্মেলনটির মাধ্যমে তাঁর ভূলুণ্ঠিত পতাকা আবার উত্তোলিত হল।

‘আলহামদুলিল্লাহ’ টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে বলল রাশিদী ইয়েসুগো।

‘তুমি শুনে খুশী হবে। সলোর পুলিশ প্রধান জাগুয়াস ম্যাকা ও তার পরিবার এবং বোমাসার পুলিশ প্রধান উপাংগো ইসলাম গ্রহণ করার পর গত ৫দিনে প্রায় তিন’শ পরিবার ইসলাম গ্রহণ করেছে এই দুই শহরে।’

‘আলহামদুলিল্লাহ।’

রাশিদী ইয়েসুগোর কণ্ঠ থামতেই আহমদ মুসা বলল, ‘এখন রাখি। সবাইকে সালাম দিও।’ বলে সালাম জানিয়ে আহমদ মুসা টেলিফোন রেখে দিল।

টেলিফোনের রিসিভারটা ক্র্যাডলে রেখে সোফায় একটু গা এলিয়ে বসতেই আবার টেলিফোন বেজে উঠল।

টেলিফোনের রিসিভার আবার তুলে নিল আহমদ মুসা।

ওপারের কণ্ঠ শুনতে পেয়েই আহমদ মুসা সোজা হয়ে বসল। তার চোখে-মুখে ফুটে উঠল সম্ভ্রমের চিহ্ন।

ওপার থেকে কথা বলছে বিশ্ব মুসলিম কংগ্রেসের প্রধান শেখ আব্দুল্লাহ আলী আল মাদানী।

‘জনাব আপনি কষ্ট করে টেলিফোন করেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে আমিই টেলিফোন করতাম।’

‘কেন পুত্রই শুধু এগুবে, পিতার এগুতে নেই বুঝি?’

কথাটা শেষ করেই শেখ আল মাদানী বলে উঠল, ‘তুমি তো জান, আজ আমরা চলে যাচ্ছি। তোমার কাছে বিদায় নেবার জন্যে টেলিফোন করেছি।’

‘আমি দুঃখিত যে, উপস্থিত থেকে আমি আপনাদের বিদায় জানাতে পারলাম না। এ বেয়াদবির জন্যে ক্ষমা চাইছি জনাব।’ বলল আহমদ মুসা।

‘তুমি আমাদের লজ্জা দিও না বাছা। তুমি আহত। তোমার বিশ্রাম দরকার। ঐ অবস্থায় বারবারেতি এসেছিলে-এটাই ঠিক হয়নি।’

মুহূর্তের জন্য থামল শেখ আল মাদনী। একটা ঢোক গিলল। তারপর আবার শুরু করল, ‘তোমার প্রতি আমার একটা অনুরোধ আছে।’

তার প্রথম বাক্যটা শেষ হতে না হতেই আহমদ মুসা তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠল, ‘অনুরোধ নয়, আদেশ করুন। আমি আপনাদের মত গুরুজনদের কাছ থেকে আদেশ চাই।’

‘ঠিক আছে আদেশই ধরে নাও। আমি যা বলতে চাচ্ছি তা হলো, তুমি নিজের দিকে খেয়াল রাখবে। বিশেষ করে নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকবে। তোমার জীবনের চেয়ে বেশী মুল্যের কেউ আর আজকের মুসলিম

দুনিয়ায় নেই। আমাদের মত অকর্মণ্য, বাক্যবাগিশদের জন্যে তোমার জীবনের ঝুঁকি নেয়া উচিত নয়। সেদিন বোমাসার বাইবেল সোসাইটির যুদ্ধকালে তুমি আমাদের নিরাপদ করার জন্যে সবাইকে পাঠিয়ে দিয়ে প্রবল শক্রর মোকাবিলার জন্যে একাই দাঁড়িয়েছিলে। কথাটা স্মরন হলে আমার এখনও বুক কেঁপে ওঠে। নিছক পদবী সর্বস্ব কয়েকজনকে বাঁচাবার জন্যে তুমি নিজেকে এভাবে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পার না।’

‘আপনি নিজের উপর জুলুম করছেন জনাব। আজ ইসলামের যে রেনেসাঁ, তার ভিত্তি ও স্ট্রাকচার আপনারাই গড়েছেন।’

‘ভিত্তি ও স্ট্রাকচার গুরুত্বপূর্ণ বাছা, এতে জীবনের সক্রিয়তা না থাকলে এবং গতিমান না হলে একে মৃত লাশ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। তুমি দুর্গত মুসলিম সমাজকে জীবনের গতি দিয়েছ এবং শুধু বাচার নয় সংগ্রামের সাহসে সজ্জিত করেছ।’

‘লজ্জা দেবেন না জনাব। মানুষ কিছু করেনা, চেষ্টা করতে পারে মাত্র। আমি সামান্য একটা উপলক্ষ, সব কিছু আল্লাহর ইচ্ছাতেই হচ্ছে।’ কথাঢ় মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে উঠল আহমদ মুসা।

‘ঠিকই বলেছ। কিন্তু এই উপলক্ষ হওয়াই এখন বড় কাজ। সেই কাজ তুমি করছ। যা আমরা পারছি না। আমরা ১২জন বন্দী ছিলাম। নিজেদের মুক্ত করার কোন উদ্যোগ নেইনি। কোন ঝুঁকি নেয়ার চিন্তাও করিনি। আর আহত হয়েও এবং বন্দী হবার পরেও নিজেকে মুক্ত করে ছুটে এসেছ তুমি আমাদের মুক্ত করার জন্য। শক্রপুরীতে ঢুকেছ একা, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। সুতরাং তুমি উপলক্ষ বটে, কিন্তু আল্লাহ এ ধরনের উপলক্ষই চান।’

‘ধন্যবাদ জনাব। দোয়া করুন। এই দায়িত্ব পালন যেন আরও আন্তরিকতার সাথে করতে পারি।’

‘ফি আমানিল্লাহ। আর একটা কথা বলি?’

‘বলুন জনাব।’

‘মদিনার গভর্নর মসজিদে নববীর পাশে এবং মক্কার গভর্নর ক্বাবার পাশে তোমাকে বাড়ি উপহার দিয়েছেন। তুমি উপহার দু’টো নিজে গিয়ে এখনও গ্রহণ করনি।’

‘ব্যস্ততার কারনে পারিনি জনাব। তবে আমি জানিয়েছি, হজ্জ ও ওমরার জন্যে আসা অতিথিদের যারা চান আমার বাড়ি দু’টো ব্যবহার করলে আমি বাধিত হবো। ঐ ওছিলায় কিছু নেকীও আল্লাহ দিতে পারেন।’

‘তোমার উপযুক্ত প্রস্তাব তুমি দিয়েছ। আমি ফিরে গিয়ে খোঁজ নেব কি হচ্ছে।’

একটু থামল শেখ আব্দুল্লাহ মাদানী। পর মুহূর্তেই আবার শুরু করল, ‘আরও একটা কথা বলব?’

‘অবশ্যই জনাব।’

‘তোমার ব্ল্যাক বুলের কাছ থেকে মারিয়া জোসেফাইন সম্পর্কে শুনেছি। আমি তোমার পিতার মত। আমরা আশা করতে পারি, বৌমাকে মদিনা অথবা মক্কার বাড়িতে রেখে তোমার একটা স্থায়ী ঠিকানা গড়ে তুলবে!’

আহমদ মুসা সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলল না। একটু সময় নিয়ে ধীরে ধীরে বলল, ‘পবিত্র ক্বাবা ও মসজিদে নববীর সান্নিধ্যে বাস করার চেয়ে লোভনীয় আর কিছু নেই আমার কাছে। কিন্তু সব সাহাবীর কি এ সুযোগ হয়েছে? যারা চায়, তাদের সবার কি এ সুযোগ হয় জনাব?’

‘তোমার কথা ঠিক। কিন্তু আল্লাহ তোমাকে বিশেষ সুযোগ দিয়েছেন।’

‘আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর ইচ্ছা তাঁর বান্দাহ-এর জন্যে শিরোধার্য।’

‘আলহামদুলিল্লাহ। আবার বলি, তোমার নিজের দিকে খেয়াল রেখ।’

বলে সালাম দিয়ে টেলিফোন ছেড়ে দিল শেখ আল মাদানী।

আহমদ মুসাও রাখল টেলিফোনের রিসিভার।

বিশ্ব মুসলিম কংগ্রেসের প্রধান শেখ মাদানীর কথাটা তখনও কানে বাজছিল আহমদ মুসার। মমতা ভরা পিতৃসুলভ উপদেশ গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল তাঁর হৃদয়কে। এমন পিতৃসুলভ কণ্ঠ বহুদিন, বহুবছর সে শোনেনি। তাঁর চোখে পানি এসে গিয়েছিল।

পায়ের শব্দ কানে এল আহমদ মুসার। দরজার বাইরে থেকে।

আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি চোখ মুছে ঘুরে বসল। দেখল, দরজা দিয়ে প্রবেশ করছে জাগুয়াস ম্যাকা। তার হাতে অনেকগুলো খবরের কাগজ।

জাগুয়াস ম্যাকা এসে হাতের খবরের কাগজগুলো টিপয়ের উপর রেখে আহমদ মুসার পাশে সোফায় বসতে বসতে বলল, 'নাইরোবি' থেকে এ কাগজগুলো একজন নিয়ে এসেছে। গত সাত দিনের কাগজ আছে। আপনার জন্যে নিয়ে এলাম। ইউরোপের কাগজ নিশ্চয়ই অনেকদিন দেখেননি।'

ধন্যবাদ। ইয়াউন্ডিতে কিছু কাগজ নিয়মিত পাওয়া যেত।'

একটু থামল আহমদ মুসা। সঙ্গে সঙ্গেই আবার শুরু করল, 'কংগ্রাচুলেশন। টেলিভিশনে আপনার প্রমোশন এবং পুরষ্কারের খবর শুনলাম।'

জাগুয়াস ম্যাকা হাসল। বলল, 'কেউ মরে বিল সেচে, কেউ খায় কই।' আমার খুবই লজ্জা হচ্ছে এই প্রমোশন ও পুরস্কারের কথা শুনে।'

'কেন?'

'ঐ তো বললাম।'কাজ করলেন আপনি, আর ফল পাচ্ছি আমি।'

'কেন, কাজ তো করেছেন আপনি।'

'কি করেছি তা আপনি জানেন। উপস্থিত হওয়া কাজ হলে কিছু কাজ করেছি।'

একটু থামল জাগুয়াস ম্যাকা। থেমেই আবার শুরু করল, 'আমি বুঝতে পারছিনা, আপনি একেবারে পর্দার আড়ালে চলে গেলেন, আপনার বিষয়টা কাউকে জানতে দিলেন না কেন?'

'সবই তো শুনেছেন। প্রকাশ হলে শত্রুর আরেক দফা রোশের মধ্যে পড়া ছাড়া কি লাভ হতো!'

'সাংবাদিকদের না জানান, কিন্তু আমার পুলিশ কে জানালে তো ক্ষতি ছিল না।'

'আপনি কি নিশ্চিত, আপনাদের পুলিশের কারও সম্পর্ক ব্ল্যাক ক্রস-এর সাথে নেই?'

জাগুয়াস ম্যাকা গম্ভীর হল। বলল, 'না এটা বলতে পারবো না।'

বলেই হাসল জাগুয়াস ম্যাকা। বলল, 'আপনার যুক্তি ঠিক। কিন্তু আমার খুব কষ্ট লাগছে, আপনার এত বড় একটা কৃতিত্বের কথা বিশ্ববাসী জানতে পারল না।'

'কষ্ট লাগবে না আপনার যদি আপনি ভাবেন, কৃতিত্ব প্রকাশ না করার মধ্যেই আমার লাভ শতগুন বেশী।'

'শতগুন লাভটা কি?'

'দেখুন, মুসলমানরা এ ধরনের কাজই করেন আল্লাহর জন্যে, মানে আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব মনে করে।' এজন্যে আল্লাহর কাছ থেকে রয়েছে অঢেল পুরষ্কার। দুনিয়ার মানুষের কাছে নাম ও কৃতিত্ব পাওয়ার জন্যে এ ধরনের কাজ করলে আল্লাহর কাছ থেকে এ পুরষ্কার পাওয়া যায় না।

'কিন্তু মানুষের কাছে নাম ও কৃতিত্ব চাওয়ার মধ্যে ক্ষতিকর কি আছে, যার জন্যে আল্লাহ পুরষ্কার দেয়া বন্ধ করবেন?'

আহমদ মুসার মুখমণ্ডল গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, 'মানুষ কেন নাম চায়? কেন তার কৃতিত্বের কথা প্রচার করতে চায়? চায় কারন, সে তার ভাল কাজের বিনিময় চায়। মানুষ তার কৃতিত্বের একটা বিনিময় দিক সে চায়। এই প্রবনতা তার কাজকে স্বার্থদুষ্ট করে তোলে। আর এই স্বার্থদুষ্টতা ধীরে ধীরে তাকে শোষক ও স্বেচ্ছাচারী করে তুলতে পারে। অন্যদিকে কাজটা যদি আল্লাহর দেয়া মানবিক দায়িত্বের অংশ হিসেবে হয়, যাকে বলা হয় ফি সাবিলিল্লাহ, তাহলে তার মধ্যে স্বার্থের কোন চাহিদা থাকে না। এ ধরনের লোক দ্বারা মানবতা শুধু উপকৃতই হয়, ক্ষতিগ্রস্থ হয় না।'

'বুঝলাম। কিন্তু আমার ভুয়া 'কৃতিত্ব' নিয়ে যে দেশ জুড়ে হৈচৈ হচ্ছে তার কি করব।'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, কৃতিত্ব যখন ভুয়া বলছ, তখন এ কৃতিত্বের দ্বারা মানবতার কোন ক্ষতি হবেনা।'

'কৃতিত্ব ভুয়া হলেও, এ কৃতিত্বের যে পুরষ্কার আমার হাতে তুলে দিচ্ছে তা তো ভুয়া নয়। আমার প্রমোশন হচ্ছে, এটা বাস্তব ঘটনা।'

‘ক্ষতি নেই তাতে। প্রমোশন আসল বিষয় নয়, আসল বিষয় হলো যিনি প্রমোশন পাচ্ছেন তিনি। তিনি যদি অহংকারী ও ক্ষমতালিপ্সু না হয়ে ওঠেন এবং মনে করেন যে, প্রমোশন আল্লাহর করুনা হিসেবে তার হাতে এসেছে, তাহলে এর দ্বারা মানবতার উপকার হবে, কোন ক্ষতি নয়।’

‘ধন্যবাদ’ বলে জাগুয়াস ম্যাকা উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘আমি পোশাক ছেড়ে আসছি।’

জাগুয়াস ম্যাকা চলে গেল বাড়ির ভেতর।

আহমদ মুসা কাগজগুলো টেনে নিয়ে সোফায় হেলান দিয়ে বসল।

চা নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল ৭ বছরের নাওমি, জাগুয়াস ম্যাকার মেয়ে।

চা-এর ট্রলি নিয়ে আহমদ মুসার সামনে পৌঁছতেই আহমদ মুসা বলে উঠল, নাওমি, কাজের ছেলেটা কোথায়? তোমার তো একাজ না?

‘আম্মা বলেন, ‘মেহমানদের মেহমানদারী নিজেরা করতে হয়। আপনার মেহমানদারী তো করতেই হবে।’

‘কেন করতে হবে?’

‘আপনি সাংঘাতিক লোক।’

‘সাংঘাতিক লোক? মানে খারাপ লোক আমি? হেসে উঠল আহমদ মুসা।

‘না, ভাল সাংঘাতিক আপনি। আপনি একাই দেড়কুড়ি শত্রুকে মেরেছেন, আম্মা বলেছেন।’

‘মানুষ মারা কি ভাল?’

‘মানুষ নয়তো, শত্রু, আম্মা বলেছেন।’

‘শত্রু কি মানুষ নয়?’

নাওমি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না। উত্তর খুজছে সে। একটু পর আমতা আমতা করে বলল, ‘শত্রু কি তাহলে ভাল?’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘তোমার আম্মা ঠিকই বলেছেন। শত্রু ভাল নয়, খারাপ। কিন্তু তারা মানুষ।’

‘তাহলে মানুষ শত্রু কেন, খারাপ কেন?’

‘মানুষের মধ্যে ভাল মানুষ, খারাপ মানুষ দুই-ই আছে’

‘খারাপ কেন?’

‘মানুষ যারা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলে না, তারা খারাপ হয়ে যায়।’

‘আব্বা-আম্মার কথা না মানলে?’

‘সেটাও খারাপ কাজ। খারাপ কাজ করলে মানুষ খারাপ হয়।’

নাওমি একটুক্ষণ চুপ করে থাকল, তারপর বলল, ‘আপনি আমাদের বাড়িতে থাকবেন না কেন?’

‘কে বলল থাকব না?’

‘আম্মা বলেছেন’

‘কি বলেছেন?’

‘আপনি এক যায়গায় থাকেন না। ঘুরে বেড়ান।’

একটু থেমে একটা ঢোক গিলেই নাওমি আবার শুরু করল ‘আপনার বাড়ি নেই, আম্মা নেই?’

আকস্মিক এই প্রশ্নে আহমদ মুসা কি উত্তর দেবে ভাবছিল। এই সময় ভেতর থেকে নাওমির মা নাওমিকে ডাকল। ডাক শুনেই নাওমি দৌড় দিল ভেতরে।

আহমদ মুসা স্বস্তি বোধ করল। নাওমির শেষ প্রশ্নটা আহমদ মুসার মর্মে গিয়ে আঘাত করেছিল। হঠাৎ করেই তার মায়ের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। তার সাথে মনে পড়ে গিয়েছিল সিংকিয়াং-এর ছোট পার্বত্য গ্রামের ছোট একটা গৃহাঙ্গনের কথা।

নাওমি গেলেও স্মৃতির সেই গৃহাঙ্গন থেকে ফিরে আসতে পারল না আহমদ মুসার মন। কি অসীম সুখের বন্যা ছিল সেই গৃহাঙ্গনে। মায়ের কোল নিয়ে চলত দু’ভায়ের কাড়াকাড়ি। দুই কোলে দু’জনকে তুলে নিত মা। মায়ের কোলের সে উষ্ণতা হৃদয়ে যেন জীবন্ত হয়ে উঠল তার।

আহমদ মুসার চোখ দু’টি ভিজে উঠল।

ঠিক মাথার উপরেই দেয়াল ঘড়িতে সময় জ্ঞাপন ঘণ্টা বেজে উঠল।

আহমদ মুসা ফিরে এল অতীত থেকে। নড়ে-চড়ে বসল। চোখ দুটি মুছে সামনের টেবিল থেকে সংবাদপত্রগুলো টেনে নিল।

সংবাদপত্রগুলোর দিকে তাকিয়ে খুশী হল আহমদ মুসা। ফ্রান্সের বিখ্যাত দৈনিক লা মণ্ডে এবং সুইজারল্যান্ডের 'দার ব্লিক'- এর গত কয়েকদিনের কয়েকটি সংখ্যা।

তারিখ অনুসারে কাগজগুলোকে সিরিয়াল করে নিয়ে সুইস পত্রিকা 'দার ব্লিক' তুলে নিল হাতে।

'দার ব্লিক' তার কাছে নতুন পত্রিকা। অনেক নাম শুনেছে। কিন্তু পড়েনি কখনও আহমদ মুসা।

'দার ব্লিক'টাই আহমদ মুসা তুলে নিল হাতে।

প্রথমে আহমদ মুসা পৃষ্ঠাগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে দেখল কোন পাতাকে কোন বিষয় দিয়ে সাজানো হয়েছে। তারপর আকর্ষণীয় কিছু নিউজ পড়তে লাগল। প্রথম পাতায় সিংগল কলামের একটা নিউজ আহমদ মুসার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। শিরোনাম 'মিষ্ট্রিয়াস ডেথ' রহস্যজনক মৃত্যু। পড়ল নিউজটি আহমদ মুসা। উত্তর জেনেভায় একটি ফ্ল্যাটে একজন যুবককে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। নাম হাবিব ডুনান্ট। উত্তর জেনেভার একটি সুসজ্জিত ফ্যামেলি ফ্ল্যাটে তার রহস্যজনক মৃত্যু ঘটে। প্রচণ্ড ধরনের প্রাণীজ বিষের প্রভাবে তাঁর মৃত্যু ঘটে। বিষের প্রকৃতি ও প্রকার নিয়ে পরীক্ষা হচ্ছে।

এর একদিন পরের আরেকটি 'দার ব্লিক' পড়তে গিয়ে সিংগল কলামে প্রকাশিত আরেকটি নিউজ পড়ল আহমদ মুসা। অনুরুপ রহস্যজনক মৃত্যুর খবর। এ মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে দক্ষিণ জেনেভার একটি ফ্ল্যাটে। মৃত্যু ঘটেছে মধ্য বয়সী একজন মানুষের। এ মৃত্যুর কারণও আগের বিষ। লোকটির নাম ইউসেফ উইলিয়াম। ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় প্রমানিত হয়েছে বিষটি 'সিসি ফ্লাই-এর বিষের অনুরুপ। তবে সিসি মাছির বিষ এত দ্রুত ও প্রান সংহারী হয় না। বিষয়টি বিশেষজ্ঞ মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।

দু'দিন পরের আরেকটি 'দার ব্লিক'এর পাতায় চোখ বুলাতে গিয়ে চমকে উঠল আহমদ মুসা। সিসি মাছির বিষক্রিয়ায় আরেকটি মৃত্যুর খবর একেবারে 'শীর্ষ

নিউজ’ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। একই ধরনের খবর। ঐ একই ধরনের বিষক্রিয়ায় যুবকের মৃত্যু। মধ্য জেনেভায় ‘রণ’ নদীর তীর এলাকায় একটি ফ্ল্যাটে তার মৃতদেহ পাওয়া গেছে। নাম আসফ আফেন্দী। ওয়ার্ল্ড নিউজ এজেন্সীর (WNA) কেন্দ্রীয় ডেস্কের চীফ নিউজ কো-অর্ডিনেটরদের একজন সে।

ল্যাবরেটরি পরীক্ষার বরাত দিয়ে নিউজে বলা হয়েছে, পর পর তিনটি মৃত্যুর ঘটনাই বিশেষ ধরনের সিসি মাছির কামড়ে ঘটেছে। এ এক নতুন ধরনের সিসি মাছি। কামড়ের পরপরই মানুষ ঘুমে ঢলে পড়ে এবং সে ঘুম আর ভাঙে না। মধ্য আফ্রিকার জলজ অঞ্চলে যে কয় ধরনের সিসি মাছি পাওয়া গেছে, তা থেকে এ মাছির বিষ আলাদা। কিন্তু প্রশ্ন হল আফ্রিকার বাইরে এ মাছি আসতে পারে কি করে?

ল্যাবরেটরি পরীক্ষার এই তথ্য প্রকাশ হওয়ার পর গোটা জেনেভা শহরে আতংক ছড়িয়ে পরছে। অশরীরী ভয়ের একটা কালো ছায়া আচ্ছন্ন করেছে গোটা শহরকে। একটা অদৃশ্য আতংক এসে গ্রাস করেছে গোটা শহরবাসীকে।

খবরটি পড়ে আহমদ মুসাও বিস্মিত হল। সিসি মাছির প্রকৃতি যা, যে আবহাওয়ায় সে বাঁচে, সেদিক থেকে সিসি মাছি সুইজারল্যান্ডে যেতেই পারেনা। তাছাড়া যে সব প্রজাতির সিসি মাছি আবিষ্কৃত হয়েছে, তার বাইরে ঐ সিসি মাছি এল কোত্থেকে?

মনটা আহমদ মুসার আরও খারাপ হয়ে গেল ওয়ার্ল্ড নিউজ এজেন্সীর একজন শীর্ষস্থানীয় সাংবাদিকের মৃত্যুর খবর শুনে। ওয়ার্ল্ড নিউজ এজেন্সীর একজন শীর্ষস্থানীয় সাংবাদিকের মুল্য অনেক। তাদের একজন কে হারালে সে স্থান পূরণ হওয়া সহজ নয়। আরও একটা দিক আহমদ মুসাকে দারুন ভাবে পীড়া দিল। সেটা হল, সিসি মাছির বিষে মৃত্যুবরণকারী তিনজনই মুসলমান। এটা কেন, কিভাবে সম্ভব হলো?

প্রবল অস্বস্তি জেগে উঠল আহমদ মুসার মনে। তার মনে হতে লাগল, জেনেভা নগরীর তিন এলাকার তিনটি মৃত্যুর সাথে কোথায় যেন একটা যোগ আছে।

অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠল আহমদ মুসা।

নড়ে-চড়ে বসল আহমদ মুসা।

একটু ভাবল, তারপর হাত বাড়াল টেলিফোনের দিকে।

ডায়াল করল ওয়ার্ল্ড নিউজ এজেন্সী (WNA)-এর জেনেভাস্থ হেড অফিসের বিশেষ একটি নম্বরে। নম্বরটি WNA-এর চেয়ারম্যান মিঃ গটেফ-এর।

ও প্রান্ত থেকে মিঃ গটেফ-এর কণ্ঠ ভেসে এল, গুড মর্নিং, আমি গটেফ।

আহমদ মুসা সালাম দিয়ে নিজের পরিচয় দেয়ার পর বলল, 'কেমন আছেন আপনারা?'

'ভাল নেই। মনে মনে আপনার কথাই ভাবছিলাম।'

'কেন? কি হয়েছে?'

'কিছু শোনেননি আপনি?'

'আজ এই মাত্র 'দার ব্লিক' পড়ে জানতে পারলাম বিশেষ ধরনের সিসি মাছির বিষক্রিয়ায় WNA-এর সিনিয়র সাংবাদিকের মৃত্যুর খবর'

'সাংবাদিককোথায় একজন তিনজন'

'তিনজন? অন্য যে দু'জন মারা গেছে তারাও WNA-এর সাংবাদিক?'

'জি না। প্রথম দুজন ফ্রী ওয়ার্ল্ড টিভি (FWTV)-এর শীর্ষ সাংবাদিক।'

চমকে উঠল আহমদ মুসা। তার হৃদয় যেন প্রচণ্ড এক মোচড় দিয়ে উঠল।

তৎক্ষণাৎ কোন কথা বলতে পারলো না আহমদ মুসা।

কয়েক মুহূর্ত পর নিজেকে সামলে নিয়ে আহমদ মুসা বলল, 'এমন ঘটনা কিভাবে ঘটল?''

'পুলিশ কিছু বুঝতে পারছে না। মৃতদের শরীরে প্রচণ্ড শক্তির স্লিপিং পয়জন পাওয়া গেছে। এ স্লিপিং পয়জনের সাথে সিসি মাছির স্লিপিং পয়জনের মিল আছে। কিন্তু কোন ধরনের সিসি মাছির বিষই এমন প্রচণ্ড নয় যে, শরীরে প্রবেশের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ঘুমকে মৃত্যুতে রূপান্তরিত করবে।'

'তাহলে কি ভাবছে পুলিশ?''

'তারা ভাবছে, বিশেষ সিসি মাছি বা কোন নতুন ধরনের বিষাক্ত পোকার কামড়ে তাদের মৃত্যু হয়েছে।'

'এটা কি নিশ্চিত?''

‘মৃতদের দেহ পরীক্ষায় তাদের দেহ মাছি বা পোকার কামড়ের চিহ্ন পাওয়া গেছে। পরীক্ষায় আরও প্রমানিত হয়েছে, কামড়গুলো জীবন্ত কোন মাছি বা পোকার। সুতরাং বিষয়টা নিশ্চিতই।’

‘কিন্তু বিশেষ ঐ সিসি মাছি বা নতুন ধরনের পকা এল কখেকে?’

‘এর জবাব বিশেষজ্ঞরা দিতে পারছেন না। মারাত্মক আতংক ছড়িয়ে পড়েছে জেনেভায়। অনেকেই জেনেভা থেকে পালাচ্ছেন।’

‘কিন্তু মৃত তিনজনই সাংবাদিক কেন, দু’টি বিশেষ সংস্থার কেন এবং তিনজনই মুসলিম কেন?’

‘হতে পারে এটা ঘটনার আশ্চর্যজনক এক সাযুজ্যতা’

‘হতে পারে। তাহলে কি মৃত্যুগুলোকে পুলিশ অস্বাভাবিক মাছি বা পোকার দ্বারা সংঘটিত ও স্বাভাবিক বলেই ধরে নিচ্ছে?’

‘স্যরি, একটু ধরুন জনাব। ইন্টারকম কথা বলছে শুনে নেই।’ ওপার থেকে বলল গটেফ।

ইন্টারকমের কথা টেলিফোনের মাধ্যমে আহমদ মুসা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল।

শুনতে শুনতে উদ্বেগের ছায়া নামল আহমদ মুসার চোখে-মুখে।

ইন্টারকমে WNA-এর ম্যানেজিং এডিটর চেয়ারম্যানকে জানাচ্ছিল, এইমাত্র টেলিফোনে জানালেন (FWTV)-এর নির্বাহী পরিচালক আলাদিন উইলিয়াম মারা গেছে। পুলিশের প্রাথমিক বক্তব্যে বলা হয়েছে, রহস্যজনক ঐ মাছি বা পোকার ভয়ংকর স্লীপিং বিষেই তার মৃত্যু হয়েছে......।’

আরও অনেক কথাই ইন্টারকম থেকে টেলিফোনে ভেসে এসেছিল আহমদ মুসার কানেও প্রবেশ করছিল। কিন্তু আহমদ মুসা অন্য ভাবনায় তখন ডুবে গিয়েছিল।

প্রথমে প্রচণ্ড আঘাতে মুষড়ে পড়েছিল তার হৃদয়টা। আলাদিন উইলিয়াম কে সে জানে। যারা FWTV-কে গড়ে তুলেছে এবং জনপ্রিয় টিভি নেটওয়ার্ক হিসেবে বর্তমান পর্যায়ে একে নিয়ে এসেছে, আলাদিন উইলিয়াম তাদের একজন।

প্রাথমিক আঘাতটা সামলে নেবার পর আহমদ মুসার মনে যে কথাটা বড় হয়ে উঠল তা হলো, অর্থ কি এসব ঘটনার? এই চতুর্থ ঘটনাকেও কি 'কো-ইন্সিডেন্স' বলতে হবে?

আহমদ মুসার চিন্তা বাধাগ্রস্থ হল মিঃ গটেফ এর কণ্ঠে। বলছিল মিঃ গটেফ, 'স্যরি জনাব আপনাকে কষ্ট দিয়েছি। ইন্টারকমের সব কথা আপনি শুনেছেন নিশ্চয়। বুক আমার কাঁপছে খবর শুনে। আমার ভয় হচ্ছে, সাংঘাতিক ঐ সিসি মাছি বা পোকা আমাদের অফিস দু'টির আশে-পাশে কোথাও কনভাবে বাসা বেধেছে কিনা।'

'বিষয়টা খতিয়ে দেখেননি?'

'দেখেছি, আমাদের দু'টি অফিসের প্রতিটি ইঞ্চি জায়গা এবং আশে-পাশের স্থান আমরা পরীক্ষা করেছি, সন্দেহজনক কিছুই মেলেনি।'

'তাহলে আবার সন্দেহ করছেন কেন?'

'কারন রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে আমাদের দু'অফিস থেকেই এবং অফিস দুটি পাশাপাশি।'

'এই বিষয়টা নিয়ে পুলিশ ভাবছে না?'

'অফিসে কেউ মারা যায়নি। যে চারজন মারা গেল তারা শহরের চার এলাকার। পুলিশ এক'বা দুই অফিসের হওয়ার বিষয়টাকে বিস্ময়কর কো-ইন্সিডেন্স মনে করছে। আমরাও তাই মনে করছি।'

আহমদ মুসা মুহূর্তকাল ভাবল। তারপর বলল, 'জনাব আমি জেনেভা আসছি। আমার পরিচয় হবে আমি আপনার WNA-এর একজন সাংবাদিক। আপনাদের দেয়া ইন্টারন্যাশনাল এ্যাক্রেডিটেশন কার্ড ব্যাবহার করব। আপনি দয়া করে আপনাদের নাইরোবি ব্যুরোকে বলে দিন তারা যেন কোন এয়ার লাইন্সকে বলে ইউরোপগামী কোন টিকিটের ব্যাবস্থা করে দেয়। আজকের হলে ভাল হয়, না হলে কাল সকালের জন্যে অবশ্যই।'

'আলহামদুলিল্লাহ। আমার বুক ভরে গেল এ খবরে। এ বিপদে আশেপাশে আপনি থাকলে সাহস পাব। কিন্তু মানুষ যখন জেনেভা ছাড়ছে, তখন আপনার আসা কি ঠিক হবে?'

'এসব আলোচনার সময় এখন নেই মিঃ গটেফ। আপনি এখনি যোগাযোগ করুন নাইরোবির সাথে।'

'এত তাড়াতাড়ি ভিসার ব্যাবস্থা আপনি করতে পারবেন?'

'আল্লাহর শুকরিয়া। আমি ফ্রান্সে থাকতে সুইজারল্যান্ডে যাব বলে ভিসা নিয়েছিলাম। মাল্টিপুল ভিসা। এখনও ভ্যালিড আছে।

'ঠিক আছে। আমি এখনি নাইরোবি টে বলে দিচ্ছি।'

'শুকরিয়া' বলে সালাম দিয়ে টেলিফোন ছেড়ে দিল আহমদ মুসা।

রাত দশটায় বারবারেতি বিমান বন্দরে প্যান আফ্রিকান ইয়ার লাইন্স-এর এক্তি বিমানে উঠে বসল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা জেনেভায় কথা বলার দুঘণ্টা পরেই নাইরোবি থেকে টেলিফোন পেয়েছিল। নাইরোবি থেকে বলেছিল, রাত দশটায় প্যান আফ্রিকান এয়ার লাইন্স আহমদ মুসাকে নাইরোবি নিয়ে আসবে।

খার্তুমে আধ ঘণ্টার বিরতির পর এই বিমানই তাদের নিয়ে যাবে জেনেভায়।

বিমানের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

এখনি বিমান ছাড়বে মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রের মাটি। হঠাৎ মনটা খারাপ হয়ে উঠল আহমদ মুসার ব্ল্যাক বুলদের জন্যে।

আহমদ মুসা জানালা দিয়ে তাকাল গ্যাংওয়ের দিকে। দেখল ব্ল্যাক বুল এবং জাগুয়াস ম্যাকা এখনও দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি। ব্ল্যাক বুলের কান্না থেমেছে কি?

আহমদ মুসার চলে আসার আকস্মিক খবরে শিশুর মত কেঁদেছে ব্ল্যাক বুল। বলেছে, 'আমি মানুষ ছিলাম না, আমাকে মানুষ বানিয়েছেন এবং সুন্দর জীবনে ফিরিয়ে এনেছেন আপনি। আল্লাহর ইচ্ছায় এটা হয়েছে, কিন্তু কাজ আপনি

করেছেন। আপনি চলে যাবেন, আপনাকে আর দেখব না, এটা ভাবতে পারছি না।’

জাগুয়াস ম্যাকাও কেঁদেছে।

আহমদ মুসাও কম ব্যাথা পায়নি।

গভীর অরন্য বেষ্টিত আফ্রিকার এ দুর্গম বুকের সরল সহজ মানুষগুলোর প্রতি কি এক অপরিচিত মায়া সৃষ্টি হয়েছিল আহমদ মুসার। কিন্তু তাদের না ছেড়ে উপায় কি। দায়িত্বের ডাক সে অস্বীকার করবে কেমন করে!

নড়ে উঠল বিমান। চলতে শুরু করল।

চোখের আড়াল হয়ে গেল জাগুয়াস ম্যাকা এবং ব্ল্যাক বুলের দাঁড়িয়ে থাকার দৃশ্য।

আকাশে উড়ল বিমানটি।

ছুটে চলল গন্তব্যের লক্ষ্যে।

সিট বেল্ট খুলে আহমদ মুসা শরীরটা এলিয়ে দিল সিটের উপর।

সবে চোখ ধরে এসেছিল আহমদ মুসার। পাশ থেকে ‘জোসেফাইন’ ডাক শুনে চোখ খুলে পাশে ফিরে তাকাল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার পাশেই একজন শ্বেতাঙ্গ বালিকা বসে। তার পাশে একজন মধ্যবয়সী মহিলা। আহমদ মুসা বালিকাকে ঐ ডাকে সাড়া দিতে দেখে বুঝল, বালিকাটির নাম জোসেফাইন।

আহমদ মুসা মুখ ঘুরিয়ে নিল।

মনে পড়ে গেল মারিয়া জোসেফাইন (ডোনা জোসেফাইন) এর কথা।

সঙ্গে সঙ্গেই আহমদ মুসার হৃদয়ে বেদনার এক উষ্ণ স্রোত বয়ে গেল।

সুইজারল্যান্ডে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর আহমদ মুসা টেলিফোন করেছিল ইয়াউন্ডিতে রাশিদী ইয়েসুগোর বাড়িতে। ডোনাই টেলিফোন ধরেছিল। প্রথমে দ্বিধায় পড়েছিল আহমদ মুসা। খারাপ লাগছিল তার সুইজারল্যান্ডে যাওয়ার কথা ডোনাকে বলতে। বিয়ের আসন থেকে সে উঠে এসেছিল। ক্যামেরুনে ডোনাদের কাছে আবার ফিরে যাবে, এটাই কথা ছিল। সবাই আশা করেছিল তাদের বিয়েটা ওখানেই হবে। টা তো হচ্ছে না। উপরন্তু কারও সাথে

দেখা না করে, ডোনাদের ওখানে ফেলে রেখেই তাকে চলে যেতে হচ্ছে সুইজারল্যান্ডে। একথা ডোনাকে বলতে কষ্ট হচ্ছে তার।

তবু কঠোর কথাটা আহমদ মুসা বলেছিল ডোনাকে।

আনন্দে নেচে ওঠা এক বালিকার মত টেলিফোন ধরেছিল ডোনা।

কিন্তু আহমদ মুসার কথা শোনার পর সে নীরব হয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে কথা বলতে পারেনি।

কিছু পরে শুকনো কণ্ঠে ডোনা বলেছিল, 'তোমার কণ্ঠ শুনে মন হচ্ছে তুমি যেন অপরাধ করেছ।'

'অপরাধ হয়ত করিনি, কিন্তু সব কিছু লন্ড-ভণ্ড করে দিলাম এটা তো ঠিক।' বলেছিল আহমদ মুসা।

শুকনো কণ্ঠে একটা শুকনো হাসি ফুটে উঠেছিল ডোনার। বলেছিল, 'সাজানো ছক মত তোমার জীবন কখনও কি চলেছে?'

'তার জন্যে দুঃখ নেই। কিন্তু তোমার জীবনকেও লন্ড-ভণ্ড করে দিলাম।'

'এজন্যে দুঃখ হচ্ছে বুঝি?'

'সেটা কি অস্বাভাবিক?'

'তাহলে তুমি নিজের জন্যে যা পছন্দ কর, আমার জন্যে তা পছন্দ করনা?'

'সবার আমি ভাল চাই, সবার মুখে চাই আমি হাসি দেখতে। এই আকাঙ্ক্ষা তোমার ক্ষেত্রে কি আরও বেশী হওয়া উচিত নয়?'

হেসে ফেলেছিল ডোনা। বলেছিল, 'তুমি কথারও রাজা। পারবোনা তোমার সাথে। এখন বল, 'আমার প্রতি তোমার নির্দেশ কি?'

আহমদ মুসা তৎক্ষণাৎ কোন উত্তর দিতে পারেনি। হৃদয়ে একটা খোঁচা লেগেছিল তার। ডোনা তার আব্বাকে নিয়ে আহমদ মুসার জন্যেই ছুটে এসেছিল ফ্রান্স থেকে সুদূর ক্যামেরুনে। কি নির্দেশ এখন দেবে তাকে? বলবে যে, যেমন একা এসেছিলে, তেমনিভাবে ফিরে যাও!

ভারি মনে আহমদ মুসা বলেছিল, 'তোমার প্রতি আস্থা আমার দুর্বল নয়, কোন নির্দেশ আমার নেই।'

‘জানি তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ।’

একটু থামল ডোনা। থেমেই আবার শুরু করল, ‘আমি কিন্তু সুইজারল্যান্ডে আসব।’

‘না ডোনা, ঐ আতঙ্কের মধ্যে তুমি এসো না।’ নরম কণ্ঠে বলেছিল আহমদ মুসা।

‘বেশ ভাল কথা। তুমি আতঙ্কের সমুদ্রে ঝাঁপ দেবে, আর আমি নিজেকে রক্ষার জন্যে দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব। তা আমি পারবো না।’

‘ঠিক আছে। একটা কথা দাও, আমার টেলিফোন পাওয়ার আগে যাবে না।’

‘তোমার শর্তের পেছনে যুক্তি কি আছে?’’

‘একটাই যুক্তি, আমার টেলিফোন না পেলে আমার ঠিকানা পাবে কি করে?’

হেসেছিল ডোনা। বলল, ‘ধন্যবাদ, ভালো যুক্তি দিয়েছ। তবে এটাই একমাত্র এবং আসল যুক্তি নয়। যাক। আমি তোমার টেলিফোনের অপেক্ষা করব। তবে সেটা আমাদের প্যারিস পৌছার পর তিন দিন মাত্র।’

হেসেছিল আহমদ মুসা। বলেছিল, ‘আমার ঠিকানা না জানলে আমাকে খুঁজে পাবে কি করে?’

‘ক্যামেরুনে তোমাকে খুঁজে পাইনি? জেনেভায় তো বিষয়টা আমার জন্যে খুবই সহজ হবে।’

‘কেমন করে?’

‘জেনেভায় FWTV অথবা WNA-এর অফিসে গেলেই তোমার সাথে যোগাযোগ হয়ে যাবে।’

হেসেছিল আহমদ মুসা। বলেছিল, ‘ধন্যবাদ ডোনা। তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করছি।’

কথা শেষ করে আহমদ মুসা একটু থেমেই আবার বলেছিল, ‘বিদায় দাও ডোনা, এখনি আমাকে ছুটতে হবে। সবাইকে আমার সালাম দিও। আর মাফ করতে বলো।’

‘বিদায়’ কথাটা ফিরিয়ে নাও। বল, ‘আসি।’

‘ফিরিয়ে নিলাম ‘আসি’, ঠিক আছে?’

সত্যি আজ খুব কষ্ট লাগছে। প্রত্যাশা বোধহয় খুব বেশী করেছিলাম। ভারী হয়ে ওঠা গলা কেঁপে উঠেছিল ডোনার।

‘আমি দুঃখিত ডোনা।’

‘আমাকে তুমি মাফ করো। একটা বড় কাজে যাবার সময় তোমাকে কষ্ট দিলাম।’ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেছিল ডোনা।

তারপর সালাম দিয়ে টেলিফোন রেখে দিয়েছিল।

টেলিফোন রেখে আহমদ মুসা কিছুক্ষন ঠায় বসেছিল। বুঝতে পারছিল আহমদ মুসা, ডোনা এখন নিশ্চয় কাঁদছে।

প্লেনের সিটে হেলান দিয়ে বসা আহমদ মুসার চোখের সামনে অশ্রু সজল ডোনার সেই মুখটাই ভেসে উঠছিল।

আনমনা হয়ে পড়ল আহমদ মুসা।

এয়ার হোস্টেজ-এর ‘এক্সকিউজ মি’ শব্দে সম্বিত ফিরে পেয়ে তাকাল আহমদ মুসা। দেখল, নাস্তা এসেছে।

প্লেনের একটা পাশের তিন সিটের শুরুতেই আহমদ মুসার সিট। তারপর বালিকাটির। বালিকার পর শেষ প্রান্তের সিটটা তার মায়ের।

বালিকাটি তার নাস্তার বাক্স খুলতে গিয়ে বাক্সটি ফেলে দিল নিচে। আহমদ মুসার ট্রের পাশ দিয়েই পড়ে গেল।

আহমদ মুসা ঝুকে পড়ে টিফিন বাক্সটি তুলে বালিকাটির ট্রের উপর রেখে বলল, ‘আমি সাহায্য করতে পারি?’

বালিকাটি মুখ তুলে তাকাল। কিন্তু কিছু বলল না।

আহমদ মুসা তার টিফিন বাক্সটি খুলে সুন্দর করে সাজিয়ে দিল।

‘ধন্যবাদ’ বলল মহিলাটি।

‘ধন্যবাদ’ বলল জার্মান ভাষায় বালিকাটি।

‘ওয়েলকাম গুড গার্ল। তোমার বাড়ি নিশ্চয় জার্মানিতে নয়’

‘ঠিক। আমরা সুইজারল্যান্ডের।’ বলল, বালিকাটি।

‘আমি মিসেস জিনা ডোনাল্ট। সাহায্যের জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি নিশ্চয় জার্মান ভাষা ভালো জানেন?’

‘নামমাত্র জানি। তবে শুনেছি অনেক। তাই পার্থক্যটা ধরতে পারি।’

‘ধন্যবাদ।’ বলে আহমদ মুসা সোজা হয়ে বসতেই একটা কর্কশ শব্দে চমকে উঠে সামনে তাকাল। দেখল, ককপিটের সামনে টয়লেট ও সার্ভিস কেবিনের মাঝখানে করিডোরের মুখে রিভলবার হাতে একজন দাঁড়িয়ে। বলছে লোকটি চিৎকার করে। ‘ককপিট আমরা দখল করে নিয়েছি। প্লেন এখন আমাদের নির্দেশে চলছে। সন্দেহজনক কেউ কিছু করলে তখনই তাকে হত্যা করা হবে এবং বিমান উড়িয়ে দেয়া হবে।’

তার কথাগুলো বাজলো যেন মৃত্যু ঘণ্টার মত। আতঙ্কের এক প্রবল ঢেউ খেলে গেল বিমানের কেবিনে। মুহূর্তে মানুষের চেহারা পাল্টে গেল। মৃত্যুর আতঙ্ক তাদের চোখ-মুখ থেকে ঠিকরে পড়ছে।

প্রাথমিক আতঙ্কের পর সব বোধগম্য হলে কান্না শুরু করে দিল কেউ কেউ।

আহমদ মুসা পাথরের মত বসে। তার স্থির দৃষ্টি রিভলবারধারী লোকটির প্রতি নিবদ্ধ। লোকটি শ্বেতাঙ্গ।

পাশের বালিকা জোসেফাইন কেঁদে উঠেছিল। আহমদ মুসা সেদিকে তাকাল। তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, ‘কেদনা।’ ভয় নেই। কাঁদলে, ভয় করলে ওরা আরও সাহস পায়।’

বালিকাটির মা’র চেহারা রক্তশুন্য। পাথর হয়ে গেছে ভয়ে। মেয়েকে কিছু বলার শক্তিও যেন তার নেই।

আহমদ মুসা আবার দৃষ্টি ফেরাল রিভলবারধারী লোকটির দিকে।

লোকটির হাতে শুধু একটি রিভলবার। অন্য হাতটি খালি। আর লোকটির দেহের গঠন, চোখ-মুখের চেহারা এবং দাড়ানোর ভংগি দেখে তাকে কোন প্রফেশনাল মনে হল না।

হাইজ্যাকাররা কয়জন? আপাতত দু’জন মনে হচ্ছে। একজন সে আরেকজন ককপিটে। দেখতে হবে আরও লোক আছে কিনা ওদের।

কেন ওরা বিমান হাইজ্যাক করল? কি দাবী ওদের?

আহমদ মুসা দেখল, রিভলবারধারী লোকটি, পিছু হটে ককপিটের দিকে চলে গেল।

অল্প পরেই ফিরে এল। কিন্তু সেই লোকটি নয়। আরেকজন। তার হাতেও রিভলবার।

আহমদ মুসা বুঝল, এই লোকটিই এতক্ষন ককপিটে পাইলটদের পাহারা দিয়েছে। দ্বিতীয় লোকটি গিয়ে এই দায়িত্ব নেয়ার পর সে বেরিয়ে এসেছে।

আহমদ মুসার কোন সন্দেহ রইল না, হাইজ্যাকাররা মাত্র দু'জন।

প্লেনের মাইক্রোফোন কথা বলে উঠল এ সময়। ককপিটে চলে যাওয়া দ্বিতীয় লোকটির গলা। বলল, 'ভদ্র মহিলা ও ভদ্র মহোদয়গন, প্লেন এবং প্লেনের সকল যাত্রী আমাদের পণবন্দী। প্লেন দক্ষিণ সুদানের জুবা বিমান বন্দরে ল্যান্ড করবে। দক্ষিন সুদান থেকে খার্তুম সরকারের সৈন্য প্রত্যাহার বা প্রত্যাহারের আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার না হওয়া পর্যন্ত বিমান ও বিমানের যাত্রী আমাদের পনবন্দী থাকবে। আমরা ৪৮ ঘণ্টা সময় দিয়েছি। এর মধ্যে আমাদের দাবী না মানলে যাত্রী সমেত প্লেন ধ্বংস করা হবে। সুদান পিপলস লিবারেশন আর্মি (SPLA) চাচ্ছে, তাদের ন্যায্য দাবী মেনে নিলে যাত্রীদের জীবন বাঁচানো হবে।' কথা থেমে গেল।

আহমদ মুসার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল ব্যাপারটা।

মুসলিম রাষ্ট্র সুদানের খৃষ্টান বিদ্রোহী গ্রুপের গেরিলা অংশ SPLA এই বিমান টি হাইজ্যাক করেছে। তারা চাচ্ছে সমগ্র দক্ষিন সুদান থেকে সুদান সরকারের অর্থাৎ মুসলিম সৈন্য প্রত্যাহার করা হোক। যাতে তারা দক্ষিন সুদানকে বিচ্ছিন্ন করে পৃথক খৃষ্টান রাষ্ট্রের পত্তন করতে পারে।

সুদানের বিদ্রোহী খৃষ্টান গ্রুপের এই ভুমিকা একেবারেই অন্যায়। সুদানে মুসলিমদের সংখ্যা শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশী। অবশিষ্ট মানুষের শতকরা ৫ ভাগ খৃষ্টান। এরাই চেষ্টা করছে দেশের দক্ষিণাংশ কে বিচ্ছিন্ন করতে। এক্ষেত্রে SPLA-এর ভুমিকাই মুখ্য।

সেই ভুমিকারই অংশ হিসেবে তারা আজ এক জঘন্য পথে পা বাড়িয়েছে। পনবন্দী করেছে প্রায় দু’শ নারী-পুরুষ ও শিশুকে। তাদের অসম্ভব দাবী নিশ্চয় পূরণ হবার নয়। সুতরাং এই দু’শ মানুষের জীবন বিপন্নই বলা যায়।

আহমদ মুসা আবার চোখ বুলাল পাশের বালিকার দিকে, চোখ পড়ল তার মায়ের দিকেও। তাদের চোখে-মুখে মৃত্যুর পাণ্ডুরতা।

সকলের একই অবস্থা।

আহমদ মুসা সিটে হেলান দিয়ে চোখ বুজল। করণীয় কি? অনেক রকম চিন্তা ভিড় জমাল তার মনে।

মাইক্রোফোনের মাধ্যমে ভেসে আসা কোথায় ছেদ নামল আহমদ মুসার চিন্তায়।

কণ্ঠ থেকে বুঝল, আগের লোকটিই কথা বলছে। সে বলছিল, একজন ভদ্র মহোদয় কিংবা ভদ্র মহিলাকে ককপিটে আসার জন্যে আহ্বান করছি। তাকে গ্রাউন্ড কন্ট্রোলের সাথে যাত্রীদের পক্ষ থেকে আমরা যা বলব সেইভাবে কথা বলতে হবে। কথা শেষ করার পরেই চলে আসুন।‘’

মাইক্রোফোনের কণ্ঠ থেমে গেল।

চারদিকে পিনপতন নীরবতা।

সবাই একে অপরের দিকে তাকাচ্ছে। কারও উঠার লক্ষন নেই।

চারদিকে একবার তাকিয়ে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। মনে মনে আল্লহর শুকরিয়া আদায় করল আহমদ মুসা। হাইজ্যাকারদের নিকটবর্তী হবার একটা সুযোগ আল্লাহ্ করে দিলেন।

উঠে দাঁড়িয়ে ককপিটের দিকে হাঁটতে শুরু করল আহমদ মুসা।

ককপিটের সামনে টয়লেট ও সার্ভিস কেবিনের মাঝের করিডোরের মুখে যে রিভলবারধারী দাঁড়িয়েছিল, সে আহমদ মুসাকে তার দিকে ডাকল।

যাত্রীদের সবার উদ্বেগ দৃষ্টি আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা গিয়ে তার সামনে দাঁড়াল।

‘দু হাত উপরে তুলুন।’ কর্কশ কণ্ঠে লোকটি বলল।

আহমদ মুসা কনুই ভেঙে দু'হাত উপরে তুলল। তাতে কনুই পর্যন্ত দু'বাহু কাঁধের সমান্তরালে থাকল।

লোকটি ডান হাতে রিভলবার ধরে অন্য হাত দিয়ে আহমদ মুসাকে সার্চ করতে লাগল। সম্ভবত সে নিশ্চিত হতে চায় আহমদ মুসার কাছে কোন অস্ত্র নেই।

সুযোগের অপেক্ষায় ছিল আহমদ মুসা।

সার্চ করার জন্যে লোকটি যখন তার মাথাটা কিছুটা নিচের দিকে বাঁকিয়েছিল, তখনি আহমদ মুসার বাম হাত লোকটির রিভলবার ধরা হাতটি বাম পাশে ঠেলে দিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই ডান হাতটির প্রচণ্ড কারাত দিয়ে আঘাত করল লোকটির কানের নিচের নরম যায়গাটায়।

হাত থেকে রিভলবার পড়ে গেল লোকটির। তারপর দু'একবার টলে উঠে সংগা হারিয়ে পড়ে গেল প্লেনের মেঝেয়।

আহমদ মুসা দ্রুত রিভলবারটি হাতে তুলে নিয়ে মুহূর্তের জন্যে যাত্রীদের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে তর্জনী ঠোঁটে ঠেকিয়ে ইংগিতে সবাইকে নীরব থাকতে বলে রিভলবারটা পকেটে ফেলে স্বাভাবিক গতিতে এগুল ককপিটের দিকে।

যাত্রীদের তখন শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা। আহমদ মুসা পাশের সিটের জোসেফাইনের মা মহিলাটি ভয়ে দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকেছে। এয়ার হোস্টেস ও সার্ভিস ম্যানরা যে যেখানে দাঁড়িয়েছিল, বসে পড়েছে প্লেনের মেঝেতে।

আহমদ মুসা ককপিটের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল।

পাইলটের মাথায় রিভলবারের নল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি মাথা ঘুরিয়ে পেছনে তাকাল। বলল, 'আসুন, অয়্যারল্যাসে কথা বলুন। একটিই কথা বলবেন, জুবা বিমানবন্দরে নামতে না দিলে ওরা বিমান ধ্বংস করে দেবে। সুতরাং দু'শ মানুষের স্বার্থে বিমানকে জুবা বিমানবন্দরে নামতে দেয়ার অনুরোধ করছি।'

বলে সে নড়ে উঠল আহমদ মুসাকে এগুবার জায়গা করে দেবার জন্য। তার রিভলবার ধরা হাতটা সরে গিয়েছিল পাইলটের মাথা থেকে।

আহমদ মুসা এ সুযোগ হাতছারা করল না। ডান হাত দিয়ে লোকটির রিভলবার ধরা ডান হাতে আঘাত করল এবং সেই সাথে সাথেই বাম হাতে বাম

পকেট থেকে রিভলবার বের করে একেবারে লোকটির মাথায় ঠেকিয়ে গুলী করল।

চোখের পলকে ঘটে গেল ঘটনা।

যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানেই লাশ হয়ে পড়ে গেল হাইজ্যাকারের দেহ।

ঘটনার আকস্মিকতায় পাইলট দু'জন বিমূঢ় হয় পড়েছিল। সম্বিত ফিরে পেয়ে তারা চিৎকার করে ধন্যবাদ জানাল আহমদ মুসাকে।

এ সময় এয়ার হোস্টেস এবং ক্রুরাও এসে দাঁড়িয়েছিল। তারাও আনন্দে চিৎকার করে উঠল।

কয়েকজন ছুটে গেল যাত্রীদের কাছে। চিৎকার করে তারা ঘোষণা করল, 'যাত্রী যুবকটি হাইজ্যাকারকে হত্যা করে বিমানকে মুক্ত করেছে, মুক্ত করেছে।'

সকল যাত্রীও আনন্দে চিৎকার করে উঠল। সমবেত কণ্ঠে ইশ্বরকে ধন্যবাদ দিল।

আহমদ মুসা বেরিয়ে এল ককপিট থেকে। তাকে ঘিরে ছিল এয়ার হোস্টেস ও ক্রুরা।

এ সময় কেবিন মাইক্রোফোনে ধ্বনিত হল ক্যাপ্টেনের কণ্ঠ। বলল, 'ভদ্র মহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ ইশ্বরকে ধন্যবাদ একজন যুবকের অসীম সাহসিকতায় বিমান মুক্ত হয়েছে। যুবকটি একজন হাইজ্যাকারকে পরাভুত এবং অন্যজনকে হত্যা করে বিমান ও যাত্রীদেরকে মুক্ত করেছেন। তাকে অশেষ ধন্যবাদ। এখন বিমান তার রুটে ফিরে এসেছে এবং গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সকলের যাত্রা শুভ হোক।'

যাত্রীরা সবাই উঠে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে নানাভাবে আহমদ মুসাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে।

খুবই বিব্রত বোধ করল আহমদ মুসা। তার সিটের সামনে এসে দু'হাত তুলে সবার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে বলল, 'ভদ্র মহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ, অনুগ্রহ করে আমাকে লজ্জা দেবেন না। আমি বড় কিংবা অস্বাভাবিক কিছু করিনি। আপনারাও এগিয়ে গেলে এটাই করতেন। সকলকে ধন্যবাদ।'

সিটে বসে পড়ল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা বসতেই বালিকাটি বলল, ‘ধন্যবাদ আপনাকে। আপনার খুব সাহস। দু’জন হাইজ্যাকার মেরেছেন।’

‘মানুষ মারা কি ভাল?’

ওরা তো ভাল মানুষ নয়।’

‘ওরা মানুষ ঠিকই, তবে ওদের কাজ ভাল নয়।’

বালিকাটি তৎক্ষণাৎ কিছু বলল না। বোধ হয় কথা খুঁজছিল।

এই ফাঁকে বালিকাটির মা বলে উঠল, ‘মাফ করবেন, আপনাকে কংগ্রাচুলেশন।’ বলে একটু থেমে আবার সে বলল, ‘কাজ খারাপ হলে মানুষও খারাপ হয় নাকি?’

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘ঠিক। তবে পাপ এবং পাপী এক জিনিস নয়।’

‘কারণ।’

‘কারণ পাপ সব সময়েই খারাপ। কিন্তু পাপী সব সময় খারাপ থাকে না, সে ভালও হয়ে যেতে পারে।’

মহিলা কথা বলল না উত্তরে। তার চোখে-মুখে বিস্ময়। একটু সময় নিয়ে বলল, ‘আপনি মি...।’

‘আব্দুল্লাহ।’

‘মিঃ আব্দুল্লাহ, আপনি কি পেশায় শিক্ষক?’

‘পাসপোর্টে পরিষ্কার উল্লেখ আছে, আমি সাংবাদিক। শিক্ষক হওয়ার কথা বলছেন কেন?’

‘আপনি যে তত্ত্বকথা বলেছেন, তা একজন শিক্ষকের মুখেই মানায়।’

একটু থেমেই মহিলাটি আবার শুরু করল, সে যাক। আপনাকে আবারো ধন্যবাদ। আপনি যা করেছেন, কোন প্রশংসা দিয়েই তার ঋণ শোধ হবে না। আমার বিশ্বাস এয়ার লাইন্স কর্তৃপক্ষ আপনার অমুল্য কাজের বিষয়টা বিবেচনা করবে।

কথা আর সামনে এগুলো না।

ট্রে ঠেলে নাস্তা নিয়ে এসে দাঁড়াল এয়ার হোস্টেসরা।

আহমদ মুসা নড়ে-চড়ে বসল।

‘স্যার লাইন্স যাত্রীদের বিশেষ শুভেচ্ছা ড্রিঙ্ক সরবরাহ করছে’

‘ধন্যবাদ আমি ড্রিঙ্ক করিনা।’

‘আপনি মদ খান না, কিন্তু অন্য কোন ধরনের সফট ড্রিঙ্কস কিংবা কোন ধরনের জুস আপনি পছন্দ করবেন?’ একজন এয়ার হোস্টেস মাথা নুইয়ে অত্যন্ত সম্মানের সাথে জিজ্ঞেশ করল।

আহমদ মুসা একটু হাসল। সময়ের পরিবর্তনে সে এখন স্যার হয়ে গেছে। বলল, ‘ধন্যবাদ। নাস্তার সাথে ঠাণ্ডা পানি আর কিছু নয়।’

নাস্তা পরিবেশিত হলো।

আহমদ মুসা বিস্মিত হলো, মহিলাটি মদ নিল না। সে এবং বালিকা দু’জনেই কোক খেল।

‘মাফ করবেন ম্যাডাম, আমি অসুবিধা করলাম কি?’ সপ্রভিত কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা মহিলাটিকে।

‘না না। আমি বরং আনন্দিত যে, একজন ভাল মানুষকে সম্মান দেখাতে মদ না খাওয়ার এই ঘটনা আমার চির দিন মনে থাকবে।’

আহমদ মুসা এ প্রসংগ এড়িয়ে বলল, ‘ম্যাডাম, একটা প্রশ্ন আমি জিজ্ঞেস করতে পারি?’

‘অবশ্যই।’

‘আপনার কোথায় দু’একটা রুশ শব্দ আসছে কেন?’

‘ও’ বলে মহিলাটি হাসল। বলল, আমার স্বামী একজন কূটনীতিক। দীর্ঘদিন তিনি মস্কোতে সুইজারল্যান্ডের কুটনীতিক ছিলেন। আমরা তার সাথে ছিলাম। রুশ ভাষায় অনুপ্রবেশ তারই ফল বলতে পারেন।’

কথা শেষ করেই মহিলাটি আবার বলল, ‘আপনি রুশ ভাষাও জানেন দেখছি।’

‘কিছু জানি।’

নাস্তার পর এল বিশ্রাম পর্ব।

আলো নিভে গেল।

আবছা অন্ধকারে ঢেকে গেল কেবিন।

আহমদ মুসা পাশের বালিকা জোসেফাইনকে ‘গুড নাইট গুড গার্ল’ বলে সিটে গা এলিয়ে দিল।

চোখ দুটি তার ধীরে ধীরে বুজে এল।

# ৩

আহমদ মুসার সামনে বড় একটি টেবিল। টেবিলের তিন দিক ঘিরে আরও চারজন।

জেনেভায় ওয়ার্ল্ড নিউজ এজেন্সী (WNA)-এর অফিস।

আহমদ মুসা এসে জেনেভার একটি ট্যুরিস্ট বাংলোতে উঠেছে।

WNA এবং FWTV-এর সবাই তাকে তাদের গেস্ট হাউজে ওঠার জন্যে অনুরোধ করেছিল। কিন্তু আহমদ মুসা এ দু'টি সংস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা ঠিক মনে করেছিল। সম্পূর্ণ তৃতীয় অবস্থানে থেকে সে ঘটনার উপর দৃষ্টি রাখতে চায়।

আহমদ মুসার সামনে বসেছিল WNA এবং FWTV-এর চেয়ারম্যান এবং সংস্থা দু'টির চীফ এডিটর।

খুব অভিনিবেশ সহকারে আহমদ মুসা কাগজগুলোর উপর নজর বুলাচ্ছিল।

কাগজগুলি দু'টি সংস্থার রহস্যজনক মৃত্যুর পোষ্টমর্টেম রিপোর্ট ল্যাবরেটরি পরীক্ষার রিপোর্ট এবং পুলিশ রিপোর্ট।

পোষ্টমর্টেম রিপোর্টে মৃত্যুর কারণ হিসেবে বেদনাহীন ও যন্ত্রনাহীন এ ধরনের বিষের প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছে। বলেছে, ঐ বিষ দেহে প্রবেশের তিন ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু ঘটেছে। মৃত দেহের ব্যাপক পরীক্ষা করে যেখান থেকে বিষ গোটা দেহে ছড়িয়ে পড়েছে, সেই উৎসে গিয়ে ম্যাক্রো-মাইক্রোস্কপিক পরীক্ষায় অত্যন্ত সুক্ষ আঘাত পাওয়া গেছে, যা সুক্ষ ও জীবন্ত কিছুর আঘাতে সৃষ্টি।

আর ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় বিষয়টিকে বিশেষ ধরনের সিসি মাছির বিষ বলে চিহ্নিত হয়েছে। ল্যাবরেটরি রিপোর্টেও বিষের প্রকৃতি কে বেদনাহীন, যন্ত্রনাহীন বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বিষের এই প্রকৃতির কথা পড়তে গিয়ে হঠাৎ আহমদ মুসার মনে একটা চিন্তা ঝিলিক দিয়ে উঠল। পৃথিবীর বিষাক্ততম প্রানী 'বক্স জেলিফিশ'-এর বিষও বেদনাহীন, যন্ত্রনাহীন! এ বিষের কোন কারসাজী কি আছে এই মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনাবলীর মধ্যে। কিন্তু পরক্ষনেই চিন্তা জাগল আহমদ মুসার মনে, ল্যাবরেটরি তো বিষকে সিসি মাছির বলে চিহ্নিত করেছে। তাছাড়া বক্স জেলিফিশের বিষে তো মাত্র কয়েক মিনিট আক্রান্তেই মৃত্যু হয়। চিন্তার কোন খেই মিলল না আহমদ মুসার কাছে।

আহমদ মুসা কাগজগুলো থেকে চোখ উঠিয়ে চেয়ারে হেলান দিল। চোখ দু'টি বুজে এল তার। যেন গভীর চিন্তায় ডুবে গেল আহমদ মুসা।

-কি ভাবছেন, মিঃ আহমদ মুসা? বলল, FWTVএর চেয়ারম্যান বি, জারমিস(বাকের জারমিস)।

-ভাবছি কিন্তু কোন কিনারা পাচ্ছিনা। বলল, আহমদ মুসা।

-কাগজপত্র দেখে কি বুঝলেন? বলল, WNAএর চেয়ারম্যান জি, গটেফ (জামাল গটেফ)।

-কাগজ পত্র থেকে দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার অজানা এক ধরনের সিসি মাছির কামড় থেকে উদ্ভুত বিষে তাদের মৃত্যু হয়েছে!

-সবারই তাই বিশ্বাস। বলল, মিঃ জারমিস।

-আপনারা কি মনে করছেন?

-পুলিশ এবং বিজ্ঞানীদের এই ব্যাখ্যা মেনে না নেবার পেছনে কোন যুক্তি আমরা পাচ্ছিনা। বলল, মিঃ জারমিস।

'কিন্তু মাছি শুধু WNA এবং FWTV এই দুই প্রতিষ্ঠানে আক্রমন চালাচ্ছে কেন?' বলল, আহমদ মুসা।

-এটাই আমাদের কাছে রহস্য। এই রহস্যের কোন সমাধান আমরা পাচ্ছি না। বলল, মিঃ গটেফ।

-পুলিশের বক্তব্য কি এ ব্যাপারে? বলল, আহমদ মুসা।

-পুলিশ একে 'কো-ইন্সিডেন্স' বলছে এবং সন্দেহ করছে যে এই দুই প্রতিষ্ঠানের কোথাও সিসি মাছি এসে বাসা বেঁধেছে। তারা বলছে, যেহেতু ছুটিতে

থাকা কারও মৃত্যু এ পর্যন্ত ঘটেনি এবং যারা মরেছে, তারা সবাই অফিস থেকে যাবার নির্দিষ্ট সময় পরে, সুতরাং অফিসেই তারা সিসি মাছির কামড় খেয়েছে। বলল, মিঃ জারমিস।

-তার মানে সন্দেহ করছে আপনাদের উপর?

'কতকটা তাই।' বলল, মিঃ গটেফ।

আহমদ মুসা তৎক্ষণাৎ কিছু বলল না। চোখ বুজে আবার চেয়ারে গা এলিয়ে দিল।

টেবিল ঘিরে অন্যান্য সকলে। সকলের মাথা নিচু। ভাবছে সবাই।

অল্পক্ষণ প আহমদ মুসা সোজা হয়ে বসল। বলল, 'আমার কাছে মৃত্যুগুলোর চাইতে সবগুলো ঘটনা এই দুই প্রতিষ্ঠানে ঘটার ব্যাপারটাই বেশী বিস্ময়কর। এই রহস্যের সমাধান হলে মৃত্যু রহস্যেরও সমাধান হয়ে যাবে।'

-তার মানে মৃত্যুগুলো এই দুই প্রতিষ্ঠানে ঘটার মধ্যেই বড় রহস্য লুকিয়ে আছে বলে আপনি মনে করছেন? বলল, মিঃ গটেফ।

-হ্যাঁ তাই। আমি একে কো-ইন্সিডেন্স বলে মনে করিনা।

-তার মানে একে পরিকল্পিত বলে মনে করেন? বলল, মিঃ গটেফ।

-তাই মনে করি।

-তার মানে কেউ উদ্দেশ্যমুলক ঘটনাগুলো ঘটাচ্ছে? বলল, মিঃ গটেফ।

মিঃ গটেফ, মিঃ জারমিস এবং wna-এর চীফ এডিটর হাসান আলবার্তো- সকলেরই মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তাদের চোখে-মুখে ফুটে উঠল আতংক।

-কিন্তু মৃত্যুগুলোর কারণ যদি বিষাক্ত সিসি মাছির কামড় হয়, তাহলে এটা পরিকল্পিত হওয়া কিভাবে সম্ভব? শুকনো কণ্ঠে বলল, হাসান আলবার্তো।

-এ রহস্যের সমাধান আমার কাছে নেই, তবে আমার মন এ ব্যাপারে দ্বিধাহীন যে, ঘটনাগুলো পরিকল্পিত। আহমদ মুসা বলল।

মিঃ জামাল গটেফের সেলুলার টেলিফোন সংকেত দিয়ে উঠল।

টেলিফোন ধরল মিঃ গটেফ।

ওপারের কিছু কথা শুনেই ‘কি বলছ তুমি’ বলে প্রায় চিৎকার করে উঠল মিঃ জারমিস। তার চোখ-মুখ মৃতের মত পান্ডুর হয়ে উঠল মুহূর্তে।

সবশুনে টেলিফোন ক্লোজ করে গুটিয়ে রেখে দু’হাতে মাথা চেপে ধরে বলল, ‘আমাদের এ্যাসোসিয়েট এডিটর ওমর ফার্ডিনেন্ড মেয়ার একই ভাবে মারা গেছে।’ বলে কান্নায় ভেঙে পড়ল মিঃ গটেফ।

যেন বজ্রপাত হল টেবিলটার উপর। পাথরের মত স্থির দৃষ্টি শুন্যে নিবদ্ধ।

কথা বলল আহমদ মুসা, ‘কোথায় তার মৃত্যু হয়েছে?’

-তার বাড়িতে। বলল, মিঃ গটেফ।

-ক’টায়?

-রাত ১১ টায়। সন্ধ্যে ৭ টায় অফিস থেকে ফেরে।

একটু থেমেই মিঃ গটেফ বলল, ‘শুনলাম সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় WNA কয়েকদিন বন্ধ রাখার অনুরোধ করেছে।’

ভ্রু কুঞ্চিত হল আহমদ মুসার। বলল, ‘কখন তারা এ অনুরোধ করেছে?’

‘মৃত্যুর খবর তারা পাবার সঙ্গে সঙ্গেই। আমি টেলিফোন পাবার একটু আগেই একটা ফ্যাক্স মেসেজ এসেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় থেকে।’

মিঃ জারমিসের কথা শেষ হতেই মিঃ জারমিস-এর পি,এ কক্ষটির দরজায় এসে দাঁড়াল। অনুমতি চাইল কক্ষে প্রবেশের। তার হাতে এক খন্ড কাগজ।

মিঃ জারমিস তাকে ডাকল।

সে এসে কাগজখন্ডটি মিঃ জারমিসের হাতে তুলে দিল।

মিঃ জারমিস তাতে দ্রুত চোখ বুলাল। তারপর কাগজ খণ্ডটি তুলে দিল আহমদ মুসার হাতে। আহমদ মুসা দেখল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের পক্ষ থেকে চিঠিটা লিখেছেন জেনেভার পুলিশ কমিশনার। পড়ল আহমদ মুসা। যার সারাংশ হল “ঘটনাবলী থেকে দেখা যাচ্ছে সিসি মাছির আক্রমন WNA এবং FWTV এই দুই অফিসকে কেন্দ্র করেই সংঘটিত হচ্ছে। আজও আরেকটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। সুতরাং দুটি প্রতিষ্ঠানের কর্মরত লোকদের নিরাপত্তার স্বার্থে অফিস দু’টি সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা উচিত বলে মনে করছি। আশা করি আপনারাও একমত

হবেন। পুলিশ ঘটনাবলীর তদন্ত করছে। আশা করা হচ্ছে শীঘ্রই রহস্যের কিনারা করা যাবে”।

আহমদ মুসা চিঠিটি মিঃ গটেফের হাতে তুলে দিয়ে বলল, ‘দেখুন, সম্ভবত এই চিঠিটা আপনারাও পেয়েছেন।’

মিঃ গটেফ চিঠিটা পড়ল। পড়ল WNA এবং FWTVএর দুই চীফ এডিটরও।

-চিঠি দেখেছেন, এখন বলুন করণীয় কি? বলল, মিঃল গটেফ।

-আপনারা কি করতে চান?

মিঃ গটেফ মিঃ জারমিসের দিকে একবার চাইল। তারপর একটু ভাবল। বলল ধীরে ধীরে, ‘পুলিশ কমিশনার যে যুক্তি দিয়েছেন তার সাথে আমি একমত। সাময়িক বন্ধ করে দিয়ে যদি এই ধরনের মর্মান্তিক মৃত্যু এড়ানো যায়, তাহলে বন্ধ করাই প্রয়োজন।’

আহমদ মুসা তাকাল মিঃ জারমিসের দিকে।

মিঃ জারমিসও ভাবছিল। বলল, ‘আমারও মত তাই, কর্মরত লোকজনদের নিরাপত্তাকেই আমাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।’

‘সাংবাদিক কর্মচারীদের মত কি হবে?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘এ ধরনের সিদ্ধান্ত অগ্রহনযোগ্য হলেও বিশেষ অবস্থায় সাময়িক ভাবে সাংবাদিক কর্মচারীরা তা মেনে নিতে পারে। কারণ সংকটের কোন রিমোর্ট তাদের হাতে নেই।’ বলল, হাসান আলবার্তো, WNA-এর চীফ এডিটর।

আহমদ মুসার মুখে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল। কিন্তু পরক্ষনেই গম্ভীর হয়ে উঠল তার মুখ। বলল, ‘আর পুলিশের এ অনুরোধ উপেক্ষা করে যদি প্রতিষ্ঠান খোলা রাখা হয়, তাহলে সাংবাদিক কর্মচারীরা কাজ করবে কি?’

ওরা চারজনই নীরব। একটু পর মুখ খুলল FWTV-এর চীফ এডিটর কামাল কনরাও। বলল, ‘কাজ তারা অবশ্যই করবে, কিন্তু এতবড় ঝুঁকি নেয়া আমাদের ঠিক হবে না। বিশেষ করে পুলিশের অনুরোধের পর।’

আহমদ মুসা তৎক্ষণাৎ কথা বলল না। একটু পর ধীরে ধীরে বলল আহমদ মুসা, ‘আপনাদের কথায় যুক্তি আছে, কিন্তু আমি ভাবছি, প্রতিষ্ঠান দু’টো বন্ধ করে দিলে শত্রুর উদ্দেশ্য সফল হয়ে যায়, তাদের বরং সাহায্যই করা হয়।’

‘কিভাবে? শত্রু কে?’ প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল মিঃ গটেফ এবং মিঃ জারমিস।

-শত্রুর নাম পরিচয়কে এখনও আমি চিহ্নিত করতে পারিনি। তবে আমি নিশ্চিত, এ দু’টি সংবাদ মাধ্যম যাদের কায়েমী স্বার্থে আঘাত দিচ্ছে, তাদেরই কেউ এই শত্রু। তারা চাচ্ছে এ দু’টি সংবাদ মাধ্যম বন্ধ হয়ে যাক। এই হত্যাকান্ডগুলো মনে হচ্ছে সেই লক্ষ্যেই। বলল, আহমদ মুসা।

‘এই মৃত্যুগুলোকে আপনি হত্যাকাণ্ড মনে করেন? সত্যিই আপনি মনে করেন যে, আমাদের দুটি প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার জন্যে কেউ হত্যাকান্ড ঘটাচ্ছে?’ দু’টি চোখ কপালে তুলে বলল মিঃ গটেফ।

অন্য সবারই চোখে ফুটে উঠেছে নতুন আতংকের ছাপ।

‘আমি জানি, আপনারা সিসি মাছি পোষেন না। তাহলে এই দুই প্রতিষ্ঠানের লোক তথাকথিত সিসি মাছির কামড়ে মরবে কেন? আমি মনে করি সিসি মাছি এই দুটি সংবাদ মাধ্যমের শত্রু নয়। তাহলে তারা এ দু’টি প্রতিষ্ঠানের উপর চড়াও হবে কেন? সুতরাং সিসি মাছি হোক বা অন্য কিছু- এদেরকে কেউ ব্যবহার করছে এ দু’টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে।’ আহমদ মুসা বলল।

সবাই নীরব। সবার চোখে বিস্ময়।

নীরবতা ভাঙল মিঃ জারমিস। বলল, ‘আমরা এভাবে তো চিন্তা করিনি। এখন মনে হচ্ছে আপনার কথা ঠিক।’

‘আমারও এরকমই মনে হচ্ছে। তবে সে রকম কিছু যদি হয়, তাহলে হত্যাকান্ড এভাবে ঘটবে কেন?’

‘সেটা আমি জানিনা। তবে আমার মনে হয়, হত্যাকারীরা রহস্য সৃষ্টি করে আড়ালে থাকতে চায়।’ বললআহমদ মুসা।

সবাই আবার নীরব। সবাই ভাবছে।

সবার চোখে-মুখে উদ্বেগ-আতংকের ছাপ।

-আমরা এখন কি করব? পুলিশকে কি এসব কথা আমরা বলব?

'পুলিশ কি করবে? তারা রহস্য উদঘাটনের তো চেষ্টা করছেই। বাড়তি কোন সাহায্য তাদের কাছে পাওয়া যাবে বলে মনে হয়না। তারা বরং আরো বেশী করে সাময়িকভাবে প্রতিষ্ঠান দু'টি বন্ধ করার পক্ষে যুক্তি দেবে।'

'তাহলে আমাদের এখন কি করণীয়?'

'প্রতিষ্ঠান দু'টি খোলা থাকবে। যেভাবে কাজ চলছিল সেভাবে কাজ চলবে।'

'কিন্তু আবার যদি কিছু ঘটে?' বলল, মিঃ গটেফ।

-কিন্তু বন্ধ করলে আর খোলার সাহস পাওয়া যাবেনা। কারণ খোলার পর আবার হত্যাকান্ড শুরু হবে, এ ভয় সব সময় তাড়া করে ফিরবে। আর সে ভয় উপেক্ষা করে খুললেও আবার সেই হত্যাকান্ডই শুরু হতে পারে। তাছাড়া প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে রহস্যের উন্মোচন করা যাবে না, শত্রুর পরিচয় অজানাই থেকে যাবে।

'আল্লাহর হাজার শুকরিয়া। আপনার কথাগুলো দৈববাণীর মত মনে হচ্ছে। আমরা জীবন দিয়ে হলেও প্রতিষ্ঠান দু'টোখুলে রাখবো।' আবেগঘন কণ্ঠে বলল হাসান আলবার্তো।

আলবার্তো থামতেই WNA-এর চেয়ারম্যান জামাল গটেফ এবং FWTV-এর চেয়ারম্যান বাকের জারমিস এক সঙ্গে বলে উঠল, 'আলবার্তোর সাথে আমরা একমত। আমাদের জীবনের চেয়ে মুল্যবান সংবাদ সংস্থা দু'টিকে আমরা বন্ধ হতে দেবনা, শত্রুদের ষড়যন্ত্র আমরা সফল হতে দেবনা।' এতক্ষনের ভয় আতংক কেটে গিয়ে তাদের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

কিছুক্ষন নীরবতা।

গভীর ভাবনায় নিমজ্জিত আহমদ মুসা। তার মাথাটা ঈষৎ নুয়ে পড়ল।

একটু পর মাথা তুলল আহমদ মুসা। বলল, 'আপনাদের ধন্যবাদ। আমরা ঝুঁকি নিচ্ছি। কিন্তু এর বিকল্প নেই। শত্রুকে চিহ্নিত করা ছাড়া আমাদের জীবনের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এ সংবাদ সংস্থা দুটিকে বাঁচানো যাবে না। কিছু

কোরবানি দিয়ে হলেও আমাদেরকে সমাধানে পৌছতে হবে।' ধীর ও গম্ভীর কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

'কিছু মনে করবেন না, এটা শত্রুর ষড়যন্ত্র এ সম্পর্কে আপনি নিশ্চিত?' দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলল হাসান আলবার্তো।

আহমদ মুসা একটু হাসল। বলল, 'আমি বলছি আমার বিবেচনা থেকে। সত্য অন্য কিছুও হতে পারে। নিশ্চিত ব্যাপারটা আল্লাহই জানেন।' আহমদ মুসা থামল।

কিন্তু কেউ কথা বলল না।

নীরবতা ভেঙে কথা বলল মিঃ গটেফ। বলল, 'আমরা এত দিন একেবারেই অন্ধকারে ছিলাম। আপনি আমাদের আলোতে নিয়ে এসেছেন। সংকটকালে বিশ্বের বিভিন্ন এলাকার মুসলমানরা আপনার সাহায্য পেয়ে ধন্য হয়েছে। সুইজারল্যান্ডের মুসলমানরা আপনার মেহেরবানী থেকে বঞ্চিত হবেনা। নরম ও সশ্রদ্ধ কণ্ঠ মিঃ গটেফের।

'ওয়ার্ল্ড নিউজ এজেন্সী এবং ফ্রী ওয়ার্ল্ড টেলিভিশন তো তাঁরও প্রতিষ্ঠান। বলল FWTV-এর চীফ এডিটর কনরাত।

'এ প্রতিষ্ঠান দু'টি বিশ্বের সব মুসলমানের। আমি তাদেরই একজন মাত্র।' বলল আহমদ মুসা।

'আমাদের বিপদ দেখে তো সব মুসলমান ছুটে আসেনি, আপনি এসেছেন।' বলল হাসান আলবার্তো।

'সব দায়িত্ব সবার জন্য নয়।'

বলে একটু থেমেই আহমদ মুসা মিঃ গটেফের দিকে চেয়ে বলল, 'আপনার সংস্থার সিনিয়র সদস্যরা সবাই কি গাড়িতে যাতায়াত করেন?'

'জি হ্যাঁ।'

'আপনাদের কার পার্কে বাইরের কেউ কার পার্ক করে?'

'না করে না। তবে যারা আমাদের অফিসে আসেন, তারা তো অবশ্যই করবেন।'

'দেখলাম, আপনাদের অফিসে প্রবেশ রেস্ট্রিকটেড। কিন্তু বাইরের কেউ ঢুকেই না বলে মনে করেন?'

'সংবাদ সংক্রান্ত ব্যাপারে যারা আসেন, তাড়া রিসেপশনের নিউজ কাউন্টার পর্যন্ত আসতে পারেন। তার বেশী নয়। আর অর্থ বা প্রশাসনিক কোন ব্যাপারে যারা আসেন, তারাই শুধু তাদের পরিচয় নিশ্চিত করার পর প্রশাসন বিভাগে যেতে পারেন। সে যাওয়াটাও স্বাধীনভাবে নয়। সংশ্লিষ্ট অফিসার এসে তাকে নিয়ে যান এবং আবার রিসেপশনে রেখে যান। বলল, মিঃ গটেফ।

'নিউজের স্টাফদের কোন মেহমান বা পরিচিত জোন যদি আসেন?'

'সেক্ষেত্রে ব্যবস্থা হল, রিসেপশনের গেস্টরুমে তাদের বসানো হয়। সেখানেই এসে সংশ্লিষ্ট নিউজ স্টাফ তাদের সাথে কথা বলেন।'

'এডিটর, নিউজ এডিটর পর্যায়ের কারও কাছে যদি আসে?

-তাদের ক্ষেত্রেও ঐ একই ব্যাবস্থা।

-তার মানে নিউজ ও ট্রান্সমিশন ডিপার্টমেন্টে বাইরের কেউই প্রবেশ করেনা?'

'হ্যাঁ তাই।'

আহমদ মুসা কিছু বলল না।

তার শুন্য দৃষ্টি সামনের দেয়ালের দিকে নিবদ্ধ। ভাবছিল সে।

'FWTV-এর কথা জিজ্ঞেস করবেন না?' নীরবতা ভেঙে বলল, মিঃ জারমিস।

'FWTV-এর কথা পরে।' বলল আহমদ মুসা।

'কেন?'

'আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয়, তাহলে তথাকথিত সিসি মাছির আক্রমন WNA-এর উপরই আবার হবে।'

' WNA-এর উপর?' মিঃ গটেফ অনেকটা আর্তনাদ করে বলে উঠল।

সকলের মুখেই এবার আতংক ছড়িয়ে পড়েছে। একটা নীরবতা নেমে এল।

'আপনার অনুমানের কারণ?' নীরবতা ভেঙে বলল, মিঃ জারমিস।

‘তথাকথিত সিসি মাছিকে খুব হিসেবি মনে হচ্ছে। সংখ্যা সমতা রক্ষার জন্যে এবার আক্রমন WNA-এর উপর হবার কথা।’

আহমদ মুসার এই কথা আবার যেন একটা ভয় ছড়িয়ে দিল।

আহমদ মুসা থামলে আবার একটা নীরবতা নেমে এল।

একটু পর হাসান আলবার্তো বলল, ‘বাইরে লোক অফিসে আসা-যাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করলেন, বাড়িতেও এটা হতে পারে। সেটা তো জিজ্ঞেস করলেন না।’

‘সেটা তো বাড়িতেই জিজ্ঞেস করতে হবে। সেটা করব।’

‘কিন্তু অবিলম্বে অফিসের মতই সবার বাড়িতে বাইরে লোকের আগমন নিষিদ্ধ করা যায়না?’ বলল কামাল কনরাড ।

‘হ্যাঁ তা করা যেতে পারে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ঘটনা তো জীবন্ত সিসি মাছি অথবা এ জাতীয় পতঙ্গ নিয়ে। আপনি বাইরের লোকের প্রতি মনোযোগ দিচ্ছেন। আপনি কি এই দুইকে এক করে দেখছেন?’ বলল মিঃ হাসান আলবার্তো।

আহমদ মুসা একটু হাসল। বলল, ‘আমি নির্দিষ্ট করে কিছুই ভাবছি না। কিছু সম্ভাবনা সামনে রেখেছি। এভাবেই সামনে এগুচ্ছি।’

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা বলল, ‘আপনাদের আর কোন কথা না থাকলে এখন আমরা উঠতে পারি।’

‘ধন্যবাদ মিঃ আহমদ মুসা।’ বলে উঠে দাঁড়াল মিঃ জারমিস।

সবাই উঠে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা দাঁড়িয়েই হঠাৎ মিঃ গটেফের দিকে চেয়ে বলল, ‘আমার একটা অনুরোধ।

‘বলুন।’ বলল মিঃ গটেফ।

‘চীফ এডিটরসহ সব সিনিয়র নিউজ স্টাফ আজ অফিসে থাকলে ভাল হয়। শুধু আজকের রাতটাই। ইতিমধ্যে আরও কিছু ভাববার সুযোগ পাব।’

মিঃ গটেফ একটু ভেবে নিয়ে বলল, ‘ঠিক আছে। আপনি যেভাবে বলবেন, সেটাই হবে। আল্লাহ আপনাকে দিয়ে আমাদেরকে সাহায্য করুন।

আপনি কাজ শুরু করেছেন দেখে আমার খুব আনন্দ লাগছে, নিজেকে হালকা মনে হচ্ছে।' মিঃ গটেফের শেষের কথা আবেগে ভারি হয়ে উঠল।

আহমদ মুসা সন্ধ্যা থেকে WNA-এর কার পার্কে রাখা সিনিয়র সাংবাদিকদের গাড়ির উপর চোখ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

গভীর পর্যালোচনার পর এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে সে।

যাদের মৃত্যু ঘটেছে, তাদের বাড়িতে গিয়ে স্থান-কাল বিবেচনা করে সে দেখেছে, অফিস থেকে যাওয়ার পর সবাই পরিবারের মধ্যে থেকেছে এবং ঘুমিয়েছেও স্ত্রীর সাথে। তাই সিসি মাছি কিংবা অন্য কোন পোকা পতঙ্গ যাই হোক শুধু WNA এবং FWTV-এর সাংবাদিকদেরই কামড়াবে, একটি ক্ষেত্রেও বাড়ির অন্য কাউকে নয়, এটাই স্বাভাবিক নয় মোটেই। তাছাড়া ল্যাবরেটরির বিশ্লেষণে সিসির কামড় এবং তাদের মৃত্যুর যে ব্যবধান পাওয়া গেছে, তার সাথে তাদের অফিস থেকে বাড়িতে ফেরা ও তাদের মৃত্যুর সময়ের ব্যবধান মিলে না। সুতরাং তারা বাড়িতে তথাকথিত সিসি মাছি বা পোকার দ্বারা দংশিত হয়নি। আবার তাদের অফিসের যে পরিবেশ এবং নিহত হওয়ার দিনগুলোতে অফিসে নিহতের সময় চুলচেরা হিসেব নিয়ে সে দেখেছে, তারা বাইরের কারো সাথে দেখা করেনি, তাতে সে নিশ্চিত হয়েছে সিসি মাছি তাদের অফিস সময়ে দংশন করেনি। তথাকথিত মাছির দংশন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়ের ব্যাবধানও এ কথাই প্রমাণ করে। এ হিসেব থেকে আহমদ মুসা নিশ্চিত হয়েছে, সিসি মাছি বা কোন বিষাক্ত পোকার দংশনই যদি তাদের মৃত্যুর কারণ হয়, তাহলে তা ঘটেছে তাদের অফিস থেকে বের হওয়া থেকে শুরু করে বাড়ি পৌছা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে। যারা নিহত হয়েছে তারা প্রত্যেকেই এ সময়টা গাড়িতে কাটিয়েছে। অতএব দংশন বা কামড় যাই ঘটুক তা ঘটেছে গাড়িতে।

এই উপসংহারে পৌছার পর আহমদ মুসার কাছে প্রশ্ন দেখা দিল, সিসি মাছি হোক, বিষাক্ত পোকা-পতঙ্গ হোক কিংবা বিষাক্ত কোন অজ্ঞাতনামা অস্ত্র

হোক তা গাড়িতে প্রবেশ করল কখন। জেনেভার এই শীতে তারা নিশ্চয় গাড়ির জানালা খোলা রেখে গাড়ি চালায় নি। সুতরাং গাড়িতে কিছু প্রবেশের প্রশ্নই ওঠেনা।

এই অবস্থায় আহমদ মুসার কাছে সম্ভাব্য যে সময়টুকু অবশিষ্ট থাকে, তা হল অফিস থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠার সময়টুকু। আহমদ মুসা সিদ্ধান্তে পৌঁছল, হয় এই সময়ে কিছু ঘটেছে অথবা গাড়ি পার্ক করে রাখা অবস্থায় কিছু ঘটেছে। আহমদ মুসা ভাবল, পার্ক করা অবস্থায় গাড়িতে যদি কিছু ঘটে থাকে তাহলে তা সন্ধ্যা উত্তর অপেক্ষাকৃত নির্জন পরিবেশেই ঘটা স্বাভাবিক।

এসব বিবেচনা থেকেই আহমদ মুসা রহস্য উদঘাটনের একটা পথ হিসেবে WNA-এর কার পার্কসহ অফিসের মূল প্রবেশের পথের উপর নজর রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

পরপর চারদিন সে সন্ধ্যা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত দীর্ঘ সময় কারপার্কের প্রবেশ পথের বাম পাশে দাড় করিয়ে রাখা একটা অচল মাইক্রো বাসের সিটে সবার অলক্ষ্যে বসে কাটিয়েছে। এখান থেকে গোটা কারপার্ক এবং মূল প্রবেশপথ দেখা যায় পরিষ্কার ভাবে।

আহমদ মুসা হতাশ হয়নি। কিন্তু মিঃ গটেফরা দুর্বল হয়ে পড়েছে। বলেছে, 'আপনার এত কষ্ট! আমরা ঠিক পথে এগুচ্ছি তো?'

আহমদ মুসা হেসে বলেছে, 'আল্লাহই শুধু এটা জানেন। তবে আল্লাহ যে বিচার বুদ্ধি দিয়েছেন, তাতে সামনে এগুবার আর দ্বিতীয় পথ আমার সামনে আপাতত নেই। সিদ্ধান্ত নিতে আমি কোন ভুল করেছি, এটাও এখনও প্রমাণ হয়নি।'

আহমদ মুসার উপর পর্বত প্রমাণ আস্থা, তবু মিঃ গটেফের বুকের দুরু দুরু ভাব যায়নি। পথ যদি ঠিক চিহ্নিত না হয়ে থাকে, তাহলে যে কোন সময় আরেকটা সর্বনাশ ঘটে যেতে পারে। পরক্ষনেই বুকে বল পেয়েছে এই ভেবে যে, আহমদ মুসা নিশ্চিত না হয়ে সামনে এগোন না।

সেদিন রাত ১১টা।

আহমদ মুসা একইভাবে বসেছিল মাইক্রোবাসের সিটটায়।

তার দৃষ্টি কারপার্কের বিশেষ গাড়িগুলোর দিকে। মাঝে মাঝে তার দৃষ্টি ঘুরে গিয়ে নিবদ্ধ হচ্ছে অফিসের মূল প্রবেশ পথটার উপর।

আহমদ মুসার শুন্য দৃষ্টি হঠাৎ তীকষ্ম হয়ে উঠল কারপার্কে প্রবেশকারী একজনের পদক্ষেপে অপরাধমূলক সতর্কতা।

মানুষের চোখের যেমন ভাষা আছে, তেমনি পায়ের চলায়ও একটা ভাষা আছে। চলার সময় সে ভাষার প্রকাশ ঘটে। আহমদ মুসা লোকটির চলায় অপরাধীর ভাষা দেখতে পেল।

গেট বক্সটির পাশ দিয়ে লোকটি প্রবেশ করেছে।

কার পার্কের একটা গেট বক্স আছে। একজন গেট ম্যান থাকে এখানে সার্বক্ষণিক।

প্রবেশকারী লোকটির চলায় অপরাধের ভাষা দেখে আহমদ মুসার চোখ দুটি সতর্ক হয়ে উঠল। নড়ে চড়ে বসল সে।

লোকটির যখন মুখ দেখতে পেল আহমদ মুসা, তখন মুহূর্তেই তার সব আনন্দ এক সঙ্গে উবে গেল। লোকটি কার পার্কের গেটম্যান।

কিন্তু গেটম্যানের চলায় অপরাধীর ছাপ কেন? নিরাশার মধ্যেও আশা জাগতে চাইল আহমদ মুসার মনে।

গেটম্যান গাড়ির দিকে এগুচ্ছে।

কেউ রং পার্কিং করেছে কিন? না অবাঞ্ছিত কোন পার্কিং হয়েছে?

আহমদ মুসার কৌতূহলী চোখ তাকে অনুসরণ করলো।

গেটম্যান গিয়ে দাঁড়াল একটা গাড়ির সামনে দরজার পাশে।

আহমদ মুসা দেখল গাড়িটা WNA-এর ব্যুরোসমুহের নির্বাহী সম্পাদক(ব্যুরো এডিটর) মিসেস ফাতেমা হিরেনের গাড়ি।

গড়িটার পাশে দাঁড়িয়েই গেটম্যান তার হাত বাড়িয়ে দিল গাড়ির ‘লক’-এর দিকে।

আহমদ মুসা ভাবল, গেটম্যান তাহলে কি গাড়ি অন্য জায়গায় সরিয়ে নেবে!

গেটম্যান গড়িটার দরজা ঈষৎ ফাঁক করেই তার কোটের পকেট থেকে ছোট নলের মত একটা কিছু বের করল এবং নলটি গাড়ির ভেতরে ঢুকিয়ে সিরিঞ্জের মত তার গোড়ায় একটা চাপ দিয়েই নলটি বের করে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর দ্রুত চাবি ঘুরিয়ে দরজা লক করে ফিরে দাঁড়িয়ে গেটের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

আহমদ মুসার চিন্তা যত দ্রুত চলল, তার চেয়েও দ্রুত কাজগুলো শেষ হয়ে গেল।

গেটম্যান গাড়ির দরজা খুলল কেন? আবার বন্ধই বা করল কেন? নলটি কি? কি করল তা দিয়ে? আর তার ফিরে আসার মধ্যেও সেই গভীর অপরাধী পদক্ষেপ কেন?

প্রশ্নগুলোর সমাধান পাবার আগেই গেটম্যান গেটবক্সের কাছাকাছি পৌঁছে গেল।

গেটম্যানকে কিছু জিজ্ঞেস করবে কি?

আহমদ মুসা দ্রুত গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। এগুলো গেটম্যানের পেছনে।

আহমদ মুসা যখন গেট বরাবর পৌঁছল, তখন গেটম্যান রাস্তায়।

রাস্তায় গেটের একপাশে একটা প্রাইভেট কার দাঁড়িয়েছিল। গেটম্যান সেদিকেই এগুচ্ছে।

হঠাৎ আহমদ মুসার গোটা চেতনা যেন ঝড়ের বেগে জেগে উঠল। গেটম্যান কারও পক্ষে কিছু করলো না তো! ঐ গাড়ির কাছ থেকে বেরিয়ে সোজা ঐ গাড়ির কাছে যাচ্ছে কেন?

আহমদ মুসার দিকে পেছন ফিরে একবার দেখে গেটম্যান দ্রুত এগুলো গাড়ির দিকে। গাড়ির খোলা জানালা দিয়ে একজনকে দেখা যাচ্ছে। সেও তাকিয়ে আছে আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসাও তার হাঁটা দ্রুত করল। এ সময় আহমদ মুসার সামনেই পুলিশের একটি গাড়ি এসে দাঁড়াল। দু'জন পুলিশ অফিসার নামছে গাড়ি থেকে।

আহমদ মুসা দেখল, গেটম্যান সেই নলটা তুলে দিল গাড়ির খোলা জানালার সেই লোকটির হাতে।

লোকটি বাম হাতে নলটি নিল। পরক্ষনেই তার ডান হাত জানালায় উঠে এল।

চমকে উঠল আহমদ মুসা, তার হাতে রিভলবার।

পরক্ষনেই গুলীর শব্দ। পর পর দু'টি।

রাস্তার উপর আছড়ে পড়ল গেটম্যানের লাশ।

আহমদ মুসা ছুটল, তার পেছনে পেছনে দু'জন পুলিশ অফিসারও ছুটল সেদিকে।

গুলীর শব্দের পরই গাড়িটা ছুটতে শুরু করেছে।

আহমদ মুসারা যখন গেটম্যানের কাছে পৌঁছল, গাড়ি তখন হাওয়া হয়ে গেছে।

মাথায় গুলী লেগেছে গেটম্যানের। সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু ঘটেছে তার।

লাশ পুলিশের হাওয়ালা করে দিয়ে, অন্যান্য ফর্মালিটিজ চুকিয়ে আহমদ মুসা মিঃ গটেফকে নিয়ে অফিসে ফিরে এল।

পুলিশ কেসটি রেকর্ড করেছে বাদানুবাদ জনিত অন দি স্পট হত্যাকান্ড বলে।

হত্যার কোন মটিভ আছে কিনা পুলিশ জিজ্ঞেস করেছিল। আহমদ মুসার পরামর্শ অনুসারে মিঃ গটেফ বলেছিল আমরা কিছু জানিনা।

পুলিশ অফিসার বলেছিল, 'ব্যক্তিগত কোন শত্রুতার ফল হতে পারে।'

একটু থেমেই পুলিশ আবার বলেছিল, 'আপনাদের প্রতিষ্ঠানে যে সব অঘটন ঘটে চলেছে, তাতে পুলিশ কমিশনারের অনুরোধ অফিস কয়েকদিন বন্ধ রাখলে ভাল করতেন।'

আহমদ মুসা অফিসে ঢুকেই বলল মিঃ গটেফকে, 'আমি যা বলেছিলাম- মিসেস ফাতেমা হিরনের গাড়ি না খোলা, তার গাড়িতে কেউ হাত না দেয়া এবং তাকে অন্য গাড়িতে বাড়ি পৌঁছে দেয়া- তা নিশ্চিত করা হয়েছে?'

'হয়েছে। কিন্তু জনাব আহমদ মুসা আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা।'

'আসুন বলছি।' বলে তাদেরকে নিয়ে মিঃ গটেফের অফিস কক্ষে প্রবেশ করল।

মি; গটেফের সাথে তার টেবিল ঘিরে বসল চীফ এডিটর মিঃ কামাল কনরাড, মিসেস ফাতেমা হিরন এবং আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা ছাড়া সকলেরই মুখ শুকনো। চোখে-মুখে আতংক।

বসেই মিঃ গটেফ বলল, 'সাংবাদিক কর্মচারীদেরমধ্যে নতুন করে আবার ভীতি ছড়িয়ে পড়েছে। মিসেস ফাতেমা হিরনের গাড়ি ও তার ব্যাপারটা ভীতিকে আবার আতংকে পরিনত করেছে। কি ঘটনা বলুন জনাব।'

'সবাইকে ধৈর্য ধরতে হবে, 'সাহসী হতে হবে জনাব। গেটম্যানের মৃত্যু আমাকে আনন্দিত করেছে। মনে হচ্ছে, বোধ হয় আমি রহস্যের একটা দরজায় পৌছতে পেরেছি।'

সকলের বিস্ময় দৃষ্টি এক সঙ্গে আহমদ মুসার উপর নিবদ্ধ হল। তাদের চোখে-মুখে একরাশ প্রশ্ন ঠিকরে পড়ছে। কিন্তু কারও মুখ থেকে কোন কথা বেরুল না।

আহমদ মুসাই কথা বলল, 'চূড়ান্ত কথা আমি বলছি না, তবে যেটুকু প্রমাণ পেয়েছি তাতে গেটম্যান অন্যের পক্ষে কাজ করছিল। যাদের পক্ষে করছিল, তারাই তাকে হত্যা করেছে।'

'কেন?' কণ্ঠে উদ্বেগ মিঃ গটেফের।

'যখন তারা বুঝল গেটম্যান আমার কাছে ধরা পড়ে গেছে, সেই মুহূর্তেই তার মুখ বন্ধ করার জন্য তাকে হত্যা করা হয়েছে।'

'সে ধরা পড়েছিল আপনার কাছে?' বলল মিঃ গটেফ।

'আমি তাকে সন্দেহ করেছিলাম।'

'শত্রুর পক্ষে কি কাজ করছিল সে?' গটেফ বলল।

'ব্যাপারটা আমার কাছে এখনও স্পষ্ট নয়। কালকে মিসেস ফাতেমা হিরনের গাড়ি খোলার পর হয়ত কিছু বলা যেতে পারে।'

'গাড়ির সাথে তার সম্পর্ক?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল ফাতেমা হিরন।

'বলছি। গেটম্যান মিসেস হিরনের গাড়িতে কিছু ঢুকিয়েছে একটা ছোট পাইপ দিয়ে এবং সেই পাইপটা সে ফেরত দিয়েছে যে তাকে হত্যা করেছে। পাইপটা ফেরত দেয়ার পরই সে গুলী খেয়েছে। গেটম্যানের পিছু নিয়েছিলাম আমি, সেটা গেটম্যান এবং হত্যাকারী দু'জনেই দেখে ফেলে।

সবার চোখে-মুখে নতুন আতংক। ফাতেমা হিরনের মুখ মৃত্যুর মত ফ্যাকাশে।

'কি ঢুকিয়েছে সে গাড়িতে। চাবি পেল কোথায়?' শুকনো কণ্ঠে বলে ফাতেমা হিরন হাত ব্যাগ থেকে গাড়ির চাবি বের করল।

'নিশ্চয় সে ধরনের চাবি সে জোগাড় করে বা তাকে জোগাড় করে দেয়া হয়। গাড়িতে কি ঢুকিয়েছে আমি জানিনা, তবে আমার মনে হয়েছে মৃত্যুর যে ঘটনাগুলো ঘটেছে, তার সাথে এর সম্পর্ক আছে।'

'আল্লাহ' বলে দু'হাতে মুখ ঢেকে আর্তনাদ করে উঠল মিসেস হিরন।

'বুঝেছি মিঃ আহমদ মুসা, সব বুঝেছি।' ভাঙ্গা গলায় বলল মিঃ গটেফ।

একটু থেমে আবার বলে উঠল মিঃ গটেফ, 'মিসেস ফাতেমা হিরনের গাড়ি পাহারা দেবার ব্যবস্থা করি। অন্য গাড়িতে মিসেস হিরণকে বাড়ি পাঠিয়ে দেই।'

'তাই করুন।'

'আমার ভয় করছে বাড়িতে যেতে।' কান্না জড়িত কণ্ঠে বলল মিসে হিরন।

'আমাকে বিশ্বাস করুন বোন। সামান্য আশঙ্কা থাকলেও আমি আপনাকে বাড়িতে যেতে বলতাম না।

মিঃ গটেফ উঠে দাঁড়াল। সবাই উঠল সেই সাথে।

উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে আহমদ মুসা বলল, 'মিঃ গটেফ আপনি টেলিফোনে FWTV-কে বলে দিন তাদের কার পার্কিং-এর গেটম্যান কে যেন আপাতত ছুটি দেয়া হয় এই মুহূর্ত থেকে।

'জি আচ্ছা' বলে অফিসের দরজার দিকে হাঁটতে শুরু করল মিঃ গটেফ।

WNA-এর চীফ এডিটর কামাল কনরাড বলল, ‘শুধু কারপার্কের গেটম্যানরাই কি সন্দেহের মধ্যে পড়ে? আরও চিন্তা কি আমাদের করতে হবে?’

‘আপাতত নয়।’

সবাই দরজার দিকে হাঁটতে শুরু করল।

পরদিন সকালে মিসেস ফাতেমা হিরনের গাড়ি খুব সাবধানতার সাথে খোলা হয়েছিল।

প্রথমে বাইরে থেকে গাড়ি ভালভাবে পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু গাড়ির ভেতরে ফেলা হয়েছে, এমন বাড়তি কিছুই গাড়ির ভেতরে দেখা যায়নি। মিসেস ফাতেমা হিরনও সব দিক থেকে খুঁটে খুঁটে দেখেন কিন্তু কিছু মেলেনি।

কিন্তু আহমদ মুসা তা মেনে নিতে পারেনি। সে নিজ চোখে দেখেছে টিউব থেকে ভেতরে কিছু ফেলা হয়েছে এবং সে টিউবটা গেটম্যান তার হত্যাকারীকে ফেরত দিয়েছে। আহমদ মুসা ভাবে, টিউব কি কোন গ্যাস স্প্রে করে? গ্যাস তো চোখে দেখা যাবে না।

গাড়ির ভেতরের বাতাস পরীক্ষা করলে তা হয়ত জানা যাবে। কিন্তু তার আগে গাড়ির ভেতরটার মাইক্রোসকপিক পরীক্ষা হওয়া দরকার।

মাইক্রো টেলিলেন্স দিয়ে গাড়ির ভেতরটা পরীক্ষা করা হয়েছিল। এ লেন্সের মাধ্যমে দশ ফুট দূরের পিঁপড়াও তার সাইজের দশগুন বড় দেখা যায়।

গোটা গাড়ি সার্চের পর গাড়ির ড্যাস বোর্ডের একেবারে শেষ প্রান্তে যেখানে ড্যাস বোর্ড ও উইন্ড শিল্ড একসাথে মিশেছে সেখানে একটা বেশ বড় মাছি পাওয়া গেল।

পরীক্ষা করছিল আহমদ মুসা নিজে। চমকে উঠেছিল সে মাছি দেখে। বহুচেনা সিসি মাছি চিনতে তার কষ্ট হলনা।

গোটা দেহ আহমদ মুসার রোমাঞ্চ দিয়ে উঠছিল।

টেলি মাইক্রোসকোপটা আহমদ মুসা মিঃ গটেফের হাতে তুলে দিয়েছিল। বলেছিল, 'দেখুন ওখানে।'

চোখ বুলিয়েই সে বলেছিল, 'কি ওটা? একটা মাছির মত।'

'ওটাই সিসি মাছি।' বলেছিল আহমদ মুসা।

শব্দটা মিঃ গটেফের কানে পৌছার সাথে সাথেই তার গোটা দেহ আতংকের প্রচন্ডতায় অবশ হয়ে গিয়েছিল।

হাত থেকে তার টেলি মাইক্রোসকোপ পড়ে গিয়েছিল।

সামনেই দাঁড়িয়েছিল চীফ এডিটর কামাল কনরাড এবং ব্যুরো এডিটর মিসে ফাতেমা হিরেন।

তারা কয়েক ধাপ এগিয়ে এসে বলেছিল, 'কি হয়েছে জনাব?' বলে তারা তাকিয়েছিল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসার ঠোঁটে ছোট এক টুকরো হাসি। বলেছিল, 'কিছু হয়নি, উনি ভেতরে একটা সিসি মাছি দেখতে পেয়েছেন।'

'সিসি মাছি? গাড়ির ভেতরে? দুই জন প্রায় এক সঙ্গেই বলে উঠেছিল, কিন্তু মিসেস ফাতেমা হিরনের কণ্ঠে আর্তনাদ, আর কামাল কনরাডের কণ্ঠ কাঠ শুকনো।'

মিসেস ফাতেমা হিরনের চোখে ফুটে উঠেছিল মৃত্যুর আতংক। বলেছিল, 'কাল যদি গাড়িতে উঠতাম, তাহলে...' কান্নার তোড়ে কথা শেষ করতে পারেনি।

অস্থিরতার জন্যে তার মুখের নেকাব খুলে গিয়েছিল। নেকাব ঠিক করে ফাতেমা হিরন আহমদ মুসার মুখোমুখি দাঁড়ায়। কান্নারুদ্ধ কণ্ঠে বলে, 'আপনি আমাকে বাচিয়েছেন আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবি করুন।'

আহমদ মুসা মৃত সিসি মাছি গাড়ি থেকে বের করে। নিজেদের বিস্বস্ত একটা  ল্যাবরেটরীতে মাছিটার পরীক্ষা করা হয়।

পরীক্ষা থেকে চাঞ্চল্যকর তথ্য পেল আহমদ মুসা।

বিশ্লেষণে মৃত সিসি মাছির মধ্যে দু'ধরনের বিষ পাওয়া গেছে। এক ধরনের বিষ মাছির ভেতরে যা সিসি মাছির নিজস্ব। আরেক ধরনের বিষ পাওয়া গেছে মাছির 'হুল'- এ। সিসি মাছির 'হুল' কে বিশেষ নিয়মে এক বিশেষ ধরনের

বিষে সিক্ত করা হয়েছে। মাছির কামড়ে এই বিষটি মানুষের দেহে প্রবেশ করলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তার মৃত্যু ঘটে। অন্যদিকে মাছিও বিষটির প্রভাবে ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই মরে যায়। সেদিন রাত পৌনে ১২ টার দিকে মাছির হুল কে বিশেষ ধরনের ঐ বিষে সিক্ত করা হয়। এরপর খুনে রক্তপায়ী মাছিটি কোন মানুষ পেলে দংশন করত। মানুষটি মারা যেত, সেও মারা যেত।

বিশেষ বিষটির নাম পরিচয় ল্যাবরেটরি থেকে পাওয়া যায়নি। আহমদ মুসাই তাদের বলে যে, এই বিষে প্রকৃতির বিষের সাথে নতুন আবিষ্কৃত বিশেষ এক শ্রেনীর বক্স জেলিফিসের মিল আছে।

ল্যাবরেটরি পরিক্ষায় পরে প্রমানিত হয় আহমদ মুসার অনুমান ঠিক।

ল্যাবরেটরি রিপোর্ট, অন্যান্য তথ্য এবং বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্যে বৈঠক বসল WNA-এর মিটিং রুমে।

মিঃ বাকের জারমিস, মিঃ জামাল গটেফ, মিঃ কামাল কনরাড, মিঃ হাসান আলবার্তো, জেনেভা মুসলিম কম্যুনিটির প্রধান আব্দুল মজিদ ম্যাক্স-ফ্রিস এবং আহমদ মুসা- এই ৬জন একটা বড় টেবিল ঘিরে বসেছে।

গোটা পরিস্থিতি ব্রিফ করল WNA-এর চেয়ারম্যান মিঃ গটেফ। শেষে বলল, 'গোটা বিষয়টা ড্রিল করেছেন আমাদের মহান ভাই আহমদ মুসা। আরও কিছু জানার থাকলে তিনি বলবেন।'

'সব বিষয় কি পুলিশকে জানানো হয়েছে?' প্রথমেই কথা বললেন মিঃ ম্যাক্স ফ্রিস।

'না জানানো হয়নি। আমার মনে হয় বিষয়টা জনাব আহমদ মুসা বুঝিয়ে বললে ভাল হয়। অনেকের মনে এ প্রশ্নটা আছে।' বলল মিঃ গটেফ।

আহমদ মুসা বলল, ' আমাদের শত্রু আসলে কে আমি জানিনা। তবে তারা নিঃসন্দেহে শক্তিমান ও প্রভাবশালী হবে। তারা দু'টি মুসলিম সংবাদ মাধ্যমকে ধ্বংস করতে চাচ্ছে। এরা 'ব্ল্যাক ক্রস' এর মত কোন দল যদি হয়, তাহলে তাদের সাথে পুলিশের একটা অংশের সম্পর্ক থাকতে পারে। সুতরাং সব বিষয় যদি আমরা পুলিশকে জানাই, তাহলে শত্রুদের সবকিছু জেনে ফেলার সম্ভাবনা আছে। সে ক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়া আমাদের কঠিন হবে।

আমরা তাদের কিছুই জানিনা। গোপনে অগ্রসর না হলে বর্তমান অবস্থায় তাদের নাগাল পাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।'

'জনাব আহমদ মুসার বলার পর আমাদের আর কিছু বলার থাকেনা। কিন্তু আমি জানতে চাচ্ছি, পুলিশকে একদমকিছু না জানানো কি ঠিক হবে। অন্তত সিসি মাছি পাওয়ার ব্যাপারটা।' বলল আবার ম্যাক্স ফ্রিস।

'এটাই তো আসল কথা। এ বিষয়টা যদি পুলিশকে জানানো হয়, কালকেই এ নিয়ে হৈ চৈ পড়ে যাবে। শক্র তার কৌশল পরিবর্তন করবে। আমরা তাদের মুখোমুখি হবার একটা যোগসুত্র হারিয়ে ফেলব।' বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা থামল। সবাই নীরব।

বেশ কিছুক্ষন পর মিঃ জারমিস বলল, 'আহমদ মুসার সাথে আমি একমত।'

অন্য সবাই মাথা নেড়ে মিঃ জারমিসের কথায় সায় দিল। ম্যাক্স ফ্রিসও।

'আমি বলেছি আমার যুক্তি হিসেবে। সবাইকে এর সাথে একমত হতে হবে তা ঠিক নয়। আমি কিছুটা এগিয়েছি, কিন্তু সামনে কোন পথে চলব আমার জানা নেই। আমি সফল হব এর কোন নিশ্চয়তা নেই। পুলিশের সাহায্য উপকারীও হতে পারে।' বলল আহমদ মুসা।

মিঃ ম্যাক্স ফ্রিস চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছিল। সোজা হয়ে বসল। বলল, 'আমিও বলেছি আমার একটা যুক্তি হিসেবে। আমার আস্থা পুলিশের উপর নেই। তারা তো কেসটা নিয়ে ড্রিল করছে আপনি এখানে আসারও অনেক আগে থেকে। তারা এক পাও এগুতে পারেনি। আপনি শক্রকে ধরতে পারেননি এখনও কিন্তু মাত্র কদিনে রহস্য উদঘাটন করেছেন। আল্লাহই আপনাকে এখানে এনেছেন। আপনাকেই দায়িত্ব নিতে হবে।'

ম্যাক্স ফ্রিস থামতেই সবাই এক বাক্যে বলে উঠল, 'আর কোন কথা নয়। আমরা ম্যাক্স ফ্রিসের কথার সাথে একমত।'

কিছুক্ষন সবাই নীরব।

নীরবতা ভেঙে হাসান আলবার্তো বলল, 'শক্র কারা আপনি কি অনুমান করছেন?'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘অনুমান দিয়ে কি লাভ হবে?’

‘অনুমানের পেছনেও যুক্তি থাকে।’ বলল হাসান আলবার্তো।

‘অনুমানটা জানতে পারলে আমরাও স্বান্তনা পেতাম।’ বলল মিঃ জারমিস।

‘উদ্বেগও বাড়তে পারে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘তাহলে বোঝা যাচ্ছে, নিশ্চয়ই আপনি কিছু আঁচ করেছেন। বলুন সেটা কি?’ বলল কামাল কনরাড।

‘আমি সন্দেহ করছি ব্ল্যাক-ক্রস কে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ব্ল্যাক-ক্রস কে?’ একসঙ্গে কয়েকজন বলে উঠল।

তাদের চোখে-মুখে স্পষ্ট ভয়ের চিহ্ন।

‘হ্যাঁ ব্ল্যাক-ক্রস কে। সন্দেহ আমার দুটি কারনে। এক, সম্প্রতি WNA এবং FWTV ক্যামেরুনে ব্ল্যাক ক্রসের ষড়যন্ত্র বানচাল করতে সাহায্য করেছে। এই সেদিন বোমাসার ঘটনার যে কভারেজ WNA এবং FWTV দিয়েছে, তাতে গোটা দুনিয়ার ব্ল্যাক ক্রস-এর মুখে কালমা লেপন হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ হল, মধ্য আফ্রিকার সিসি মাছির ব্যবহার। ব্ল্যাক ক্রসের বড় বড় অনেক নেতা সাম্প্রতিককালে মধ্য আফ্রিকা গিয়েছেন। তাদের মাথায় সিসি মাছির ব্যবহারের চিন্তা আসা স্বাভাবিক।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আপনার অনুমান সত্য হলে এ শত্রু তো সাংঘাতিক।’ বলল হাসান আলবার্তো।

‘সাংঘাতিক তো বটেই। পুলিশ কে বোকা বানিয়ে কি কৌশলে দেখুন ওরা মানুষ হত্যা করে চলেছে।’

‘শত্রু যদি ব্ল্যাক ক্রসই হয়, তাহলে তো পুলিশের মধ্যে ওদের সাথী সমর্থক থাকতে পারে, প্রভাব তো আছেই। নিশ্চয় এ জন্যেই আপনি পুলিশকে এড়িয়ে চলতে চাচ্ছেন। বলল ম্যাক্স ফ্রিস।

‘ঠিক বলেছেন।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার সম্পর্কে যত শুনেছি, যত ভেবেছি, তার চেয়েও আপনি অনেক বড়। এতদিন ভাবতাম, অস্ত্র চালনায় আপনার জুড়ি নেই।

কিন্তু এখন দেখছি, বুদ্ধি চালনায় পুলিশ গোয়েন্দা আপনার কাছে কিছু নয়।' বলল ম্যাক্স ফ্রিস।

কথাগুলোর দিকে কান না দিয়ে আহমদ মুসা মিঃ গটেফের দিকে চেয়ে বলল, 'আমার জরুরী কিছু কাজ আছে, উঠতে পারি কিনা।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়। আপনার কোন সময় নষ্ট করা আমাদের উচিত নয়।' বলে গটেফ ম্যাক্স ফ্রিসের দিকে চেয়ে উঠে দাঁড়াল।

# ৪

জেনেভার মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া রণ নদীর দক্ষিন তীরের কিছুটা দূরে বিশাল দশ তলা ভবনের আট তলার একটা অফিস ফ্ল্যাট।

জেনেভায় ব্ল্যাক-ক্রস এর লিয়াজো অফিস।

ব্ল্যাক ক্রস এর প্রধান সাইরাস শিরাক এইমাত্র এসে পৌঁছেছেন এখানে। অফিসে উৎসবের আমেজ।

ব্ল্যাক ক্রসের জেনেভা অফিস তার লক্ষ্য অর্জনে দারুন সাফল্য অর্জন করেছে। ইতিমধ্যেই WNA এবং FWTV সংবাদ সংস্থা দু'টির ৬জন গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিক মরেছে। মিশন চলছে একদম নিরাপদেই। সাফল্যের আনন্দ ভোগ করার জন্য স্বয়ং সাইরাস শিরাক আজ জেনেভা এসেছেন।

তার আগমন উপলক্ষে সেই কাক ডাকা ভোরেই সবাই গিয়ে বসেছে মিটিং রুমে।

প্রথমেই কথা বলল সাইরাস শিরাক, 'এ পর্যন্ত সাফল্যের জন্য আপনাদের ধন্যবাদ। এখনকার পরিবেশ কেমন?'

সাইরাস শিরাকের সামনে টেবিল ঘিরে বসে বিশেষ অপারেশন চীফ মিঃ রেনেন, জেনেভা হেড কোয়ার্টারের প্রধান মিঃ পল এবং লিয়াজো অফিস চীফ মিঃ ফি।

কথা বলল পল। জানাল, পরিবেশ ভাল। বিশেষ সিসি মাছির কামড়েই ওদের মৃত্যু ঘটেছে বলে ওরা মনে করছে। পুলিস ল্যাবরেটরি এবং বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরি এক্সপার্ট আমাদের কথা অনুসারে কাজ করছে। পুলিশ প্রধান একটু বাঁকা লোক, কিন্তু তাকে কিছু জানতেই দেয়া হয়নি। তার ডেপুটি আমাদের খুব সাহায্য করেছে।'

'ওদের উপর প্রতিক্রিয়া কি?' বলল সাইরাস শিরাক।

‘সংবাদ সংস্থা দু’টি লোকদের উপর? ওরা তো পুলিশকে পাগল করে তুলেছে। চরম আতংকে ভুগছে সবাই।’

‘কিন্তু আমরা তো শুধু লোক হত্যা নয়, আমরা দেখতে চাই, সংবাদ সংস্থা দু’টি কত দ্রুত বন্ধ হচ্ছে। বলল সাইরাস শিরাক।

‘ওদের আতংক চরমে পৌঁছেছে। গত রাতেও আমরা একটা শিকার করেছি। আমার মনে হয়, আর দু’একটা ঘটনার পর সাংবাদিক কর্মচারীরাই পালিয়ে যাবে। তাছাড়া পুলিশ থেকেও তাদের চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সংস্থা দু’টিতেই কিছু ঘটেছে, না হলে এমন মৃত্যুর ঘটনা শুধু এ দু’টি সংস্থাতেই ঘটছে কেন? ভেতরের কোন শত্রুতা এর পেছনে কাজ করতে পারে। পুলিশকে এ ক্ষেত্রে প্রভাবিত করার চেষ্টা আমরা করেছি সাংবাদিকদের মাধ্যমে। অবস্থার কারনে প্রতিষ্ঠান দু’টি সাময়িক ভাবে বন্ধ করার পরামর্শ তাদের কানে তোলা হয়েছে।’ বলল মিঃ পল।

‘ভাল খবর, বলে সাইরাস শিরাক রেনেন-এর দিকে চেয়ে বলল, ‘ধন্যবাদ, তোমার অস্ত্র ভাল কাজ করছে। এ অস্ত্র আমি মনে করি বিরাট মার্কেট পাবে রেনেন। তোমার অস্ত্রগুলো নতুন পরিবেশে কেমন আছে?’

‘না পরিবেশ তাদের জন্যে একেবারে নতুন নয়। হ্রদের লাগোয়া কাঁচের ছাদ দেয়া ঘরে কাদার মেঝেতে একটা বনজ স্যাঁৎ স্যাঁতে পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। ৩৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপের জলীয় বাষ্পের মধ্যে অস্ত্রগুলো ভালই আছে।’ বলল রেনেন।

‘আমার আশঙ্কা ছিল সিসি’র হুলে জেলিফিস পয়জন নিষিক্ত করার কাজ তোমার ল্যাবরেটরি কেমন পারবে।’ বলল সাইরাস শিরাক।

‘কোন অসুবিধা হয়নি। সিসিকে বিশেষ প্রেসার টিউবে তুলে প্রেসার দিয়ে টিউবের বিশেষ একটি সংকীর্ণ স্থানে এনে ফেলা হয়। তারপর টিউবের ফুটো দিয়ে মডারেট করা জেলিফিশ পয়জন ইঞ্জেক্ট করা হয়। একেবারে মোক্ষম। ফল দিচ্ছে হান্ড্রেড পারসেন্ট। কোন অন্যথা হয়নি। কিন্তু...’

থেমে গেল রেনেন।

কপাল কুঞ্চিত হল সাইরাস শিরাকের। বলল ‘কিন্তু কি? থামলে কেন? বল?’

‘আজ একটা অঘটন ঘটে গেছে। আমাদের এজেন্ট যে WNA-তে আমাদের ফাঁদ পাতার কাজ করছিল, সে ধরা পড়ে গেছে।...

সাইরাস শিরাক রেনেন কে থামিয়ে দিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, ‘ধরা পরে গেছে, ওদের কাস্টডিতে?’

‘না স্যার। সম্ভবত ওদের একজন তাকে সন্দেহ করেছিল।’

‘তারপর?’

‘ওকে হত্যা করে এসেছি।’

‘সাবাস। কিন্তু কাজের কি হয়েছে?’

‘ফাঁদ পেতে আসার পথে সে সন্দেহের শিকার হয়। আমি দুরবীন দিয়ে দেখেছি সে ফাঁদ ঠিক মতই পাতে।’

‘রেজাল্ট জানা গেছে?’

‘এইত এখনই খবর হবে। জানা যাবে।’

টেলিভিশনে খবর হল।

সাইরাস শিরাকসহ সবাই শেষ পর্যন্ত খবরটা শুনল। কিন্তু সিসি মাছির নতুন ভিক্টিমের কথা বলা হলনা।

মুখ মলিন হয়ে গেল রেনেনের।

গম্ভীর হল সাইরাস শিরাকের মুখমন্ডল।

‘টার্গেটের বাসায় টেলিফোন করে দেখ মিঃ পল।’

পল টেলিফোন করল মিসেস ফাতেমা হিরেনের বাসায়। বাসা থেকে জানা গেল তিনি বাসায় ফেরেনি।

‘বাসায় না ফেরার কারণ এই হতে পারে যে, গতকাল খুনের ফলে অফিসে ব্যস্ততার কারনে বাসায় আসতে না পেরে অফিসে বা কোন বান্ধবীর বাসায় ছিল।’ বলল রেনেন।

‘না, তোমাদের পাতা ফাঁদ ধরা পরার কারনেই গাড়িতে বাসায় ফেরেনি?’ বলল সাইরাস শিরাক।

‘সে রকম কিছু ঘটলে অন্য গাড়িতে বাসায় ফিরতে পারত। আমার মনে হয় গাড়িতে ফাঁদ পাতার ব্যাপারটা কেউ দেখেনি, দেখলেও বুঝার কথা নয়। খুব বেশি হলে চুরির চেষ্টা করার জন্যে তাকে সন্দেহ করতে পারে।’ বলল রেনেন।

‘শত্রুকে সব সময় ছোট ভাবা ঠিক নয়।’ বলল সাইরাস শিরাক।

‘এখনি খবরের কাগজ এসে পড়বে। যদি সে রকম কিছু ঘটে থাকে, তাহলে সেটা কাগজের প্রধান শিরোনাম হবে। আমি নিশ্চিত আমাদের ফাঁদ ধরা পড়েনি। পড়লে আমাদের পুলিশ বন্ধুরা অনেক আগেই আমাদের জানাত।’ রেনেন বলল।

বলতে বলতেই কাগজ এসে গেল।

প্রধান দৈনিকটি হাতে তুলে পাগলের মত চোখ বুলাল রেনেন।

WNA-এর গেটম্যান খুনের ঘটনা ঘটনা সত্যিই প্রধান শিরোনাম পেয়েছে। গোগ্রাসে নিউজটা গিলল রেনেন।

পড়া শেষে চিৎকার করে উঠল, ‘থ্যাঙ্ক গড মিঃ সাইরাস। ওরা কিছুই জানতে পারেনি। পুলিশ বলেছে লেন-দেনে কোন গণ্ডগোল বা ব্যাক্তিগত কোন শত্রুতার শিকার হয়ে গেটম্যান খুন হয়েছে। প্রাথমিক অনুসন্ধানে পুলিশ নিশ্চিত হয়েছে, রহস্যজনক মৃত্যুগুলোর সাথে এ খুনের কোন সম্পর্ক নেই। পুলিশ আরও বলেছে, খুন হওয়ার আগে গেটম্যান কে অস্থিরভাবে এ গাড়ি সে গাড়ির কাছে ঘুরাফিরা করতে দেখা গেছে। মনে করা হচ্ছে, সে কোন গাড়ি চোর গ্যাং-এর সাথেও জড়িত থাকতে পারে। পরিশেষে খবরে লেখা হয়েছে, পুলিশ খুনিকে পাকড়াও করার জন্যে গেটম্যানের ইতিবৃত্ত নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করেছে।’

‘পুলিশ ইতিবৃত্ত খুঁজতে গিয়ে যদি কিছু পেয়ে যায়?’ বলল পল।

‘তুমি এই ভয় করছ পল! নিউজে এসব লেখে, এর বাস্তব কোন মুল্য নেই। আর খুজলেও কিছু পাবেনা। একমাত্র তার হাতে টাকা দেয়া এবং সিসি মাছির টিউব পৌঁছানো ছাড়া তার সাথে আমাদের কোন চিহ্ন নেই। আমরা টিউব গুলো সবই ফেরত নিয়ে এসেছি। আর টাকাতে তো কারও নাম লেখা থাকেনা। সুতরাং তারা যতই সার্চ করুক, আমাদের কোন চিহ্ন কোথাও খুজে পাবেনা।’

‘ধন্যবাদ রেনেন। এখন বল কি চিন্তা করছ তুমি। দুঃখ যে, আমি এসে প্রথমে ব্যর্থতাই দেখলাম।’

‘দুঃখিত মিঃ সাইরাস। তবে আমাদের ফাঁদে শিকার পড়েনি, এটুকুই আমাদের ব্যর্থতা। কিন্তু আমাদের যে বড় লাভ হয়েছে সেটা হল, তাদের সন্দেহটা আমাদের কাছে ধরা পড়েছে এবং আমাদের কথা প্রকাশ হওয়ার পথ আমরা যথাসময়ে বন্ধ করতে পেরেছি।’

‘ধন্যবাদ রেনেন, এটা অবশ্যই বড় লাভ। এখন বল এগুবে কিভাবে?’

-আমাদের এজেন্ট গেটম্যান না থাকায় সেখানকার কার পার্কে ফাঁদ পাততে অসুবিধা হবে। তবে নিশ্চিত থাকুন, আগামী দু’একদিনের মধ্যে আমরা আমাদের হাত থেকে ফসকে যাওয়া শিকারকে ফাঁদে ফেলব। যেখানে সুযোগ পাবো সেখানেই।’

‘তবে একটু পিছিয়ে পড়লাম আমরা।’ বলল সাইরাস শিরাক।

একটু থেমেই আবার সাইরাস শিরাক বলল, ‘আমাদের লক্ষ্য সংবাদ সংস্থা দু’টি বন্ধ করা। শুন্য পদগুলোতে লোক নিয়ে তারা যদি কাজ করেই যায়, সেটা হবে সাংঘাতিক ব্যর্থতা, এটা আমরা হতে দিতে পারিনা। একথা তোমার মনে আছে তো?

‘মনে আছে। শুন্য জায়গায় লোক নিলে সেই-ই হবে প্রথম টার্গেট। আমরা কোন ভাবেই লোক আসতে দেব না।’

একটু থামল রেনেন। তারপর আবার শুরু করল, ‘আগেই বলা হয়েছে, সংবাদ সংস্থা দু’টি বন্ধের পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে পুলিশ ও সাংবাদিকদের মধ্যে বেশ কাজ হয়েছে। এটাও ফল দেবে বলে আমি মনে করি।’

‘তাই হোক রেনেন। বলে সাইরাস শিরাক উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘চল উঠা যাক। ক্ষুধা লেগেছে।’

সবাই উঠে দাঁড়াল।

মিসেস ফাতেমা হিরেনের গাড়ি অনুসরণ করে আহমদ মুসার গাড়ি এসে প্রবেশ করল জেনেভাস্থ জাতিসংঘের ইউরোপীয় সদর দপ্তরের কার পার্কে।

সেদিন গেটম্যান নিহত হওয়া এবং ফাতেমা হিরেন বেচে যাওয়ার পর আহমদ মুসা ব্ল্যাক ক্রস সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছে, এরপর ফাতেমা হিরেনই হবে তাদের পরবর্তী টার্গেট। কোন টার্গেট ব্যার্থ হলে ব্ল্যাক ক্রস সে টার্গেটকেই আবার তাদের প্রথম টার্গেট বানায়।

আহমদ মুসা অনেক চিন্তা করেছে, মিসেস ফাতেমা হিরেনের উপর ব্ল্যাক-ক্রস এর আক্রমণ কিভাবে কোন দিক থেকে আসতে পারে। সে নিশ্চিতই মনে করেছে, সিসি মাছির অস্ত্রই ব্ল্যাক ক্রস ব্যবহারের চেষ্টা করবে। ব্ল্যাক ক্রস সুইস পুলিশ, সরকার এবং বিশ্ববাসীকে অন্ধকারে রেখে অব্যাহত ভাবে রহস্যজনক মৃত্যুর একটা আতংক সৃষ্টি করে সংবাদ সংস্থা দু'টিকে বন্ধ করতে চায়। সুতরাং পরিস্কার খুনোখুনির দিকে না গিয়ে রহস্যময় মৃত্যু ঘটানোর পথই তারা অনুসরণ করবে। সুতরাং অস্ত্র হবে সিসি মাছি এবং সিসি মাছির মৃত্যুফাঁদ পাতার জন্য গাড়ির ছোট্ট পরিবেশের চেয়ে উৎকৃষ্টতর ও নিশ্চিত কোন বিকল্প নেই।

ব্ল্যাক ক্রসকে ফাতেমা হিরেনের গাড়িতে এই মৃত্যু ফাঁদ পাতার সুযোগ করে দিতে হবে এবং এই সুযোগ দেয়ার মাধ্যমে তাদের পাকড়াও করতে হবে এবং ওদের ঘাঁটিতে যেতে হবে।

আহমদ মুসা এসব কথার প্রয়োজনীয় অংশ WNA-এর চেয়ারম্যান মিঃ গটেফকে জানালেও মিসেস ফাতেমা হিরেনকে কিছুই জানতে দেয়নি। ফাতেমা হিরেন ঘটনার পর আর সেই গাড়িতে চড়তেই রাজী হয়নি। বলেছিল, সবার সাথে সাধারন বাসে সে যাতায়াত করবে। কিন্তু এটা করলে আহমদ মুসার গোটা পরিকল্পনাই ব্যর্থ হয়ে যায়। তাই শুধু এটুকু সে তাকে বলেছিল স্বান্তনার জন্যে যে, মিসেস ফাতেমা হিরেন এমন আচরন করা কি ঠিক যাতে শত্রুরা সন্দেহ করতে পারে যে আমরা তাদের ষড়যন্ত্র ধরে ফেলেছি কিংবা আমরা তাদের সন্দেহ করছি? তার সকল কিছু স্বাভাবিক নিয়মে চালু থাকা দরকার। তার বাড়ির বাইরে সকল অবস্থায় আহমদ মুসা তার অনুসরণ করবে।

ফাতেমা হিরেন রাজ্যের ভয় মাথায় নিয়ে রাজী হয়েছে। বলেছে, দুনিয়ার অন্য কেউ বললে আমি রাজী হতাম না। কিন্তু ভয় হয়, আহমদ মুসার পরামর্শ না শুনলে গুনাহ্ হবে।

গাড়ি পার্ক করে ফাতেমা হিরেন সদর দপ্তরের ভেতরে চলে গেল।

জাতিসংঘের ইউরোপীয় সদর দপ্তরে বিশাল একটি লাইব্রেরী রয়েছে এবং রয়েছে সমৃদ্ধ ডাটা ব্যাংক। ফাতেমা হিরেন তার প্রতি সাপ্তাহিক ছুটির দিনের সন্ধ্যা এখানে এসে কাটায়।

আহমদ মুসা ফাতেমা হিরেনের গাড়ির দুই লাইন পেছনে তার গাড়ি পার্ক করে অর্ধশোয়া অবস্থায় থেকে ফাতেমা হিরেনের গাড়ির উপর চোখ রাখল।

তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে। সাড়ে ৫টা পার হয়ে গেছে, বিদ্যুতের আলোতে চারদিকে রাতের আমেজ।

একজন বলিষ্ঠ গড়ন লোক সদর দফতরের দিক থেকে এসে কার পার্কে ঢুকল। অত্যন্ত স্বাভাবিক পদক্ষেপে এসে সে ফাতেমা হিরেনের গাড়ির কাছে দাঁড়াল। যেন তার গাড়িতে সে উঠতে এসেছে, এমনি একটা স্বাভাবিক ভাব তার মধ্যে।

ভ্রু কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে আহমদ মুসার। সে নড়েচড়ে উঠে গাড়ির দরজার হাতলে হাত রাখল।

লোকটি পকেট থেকে চাবি বের করল। খুলে ফেলল সামনের দরজা। পকেট থেকে বের করল সিরিঞ্জ।

আহমদ মুসা এক ঝটকায় দরজা খুলে ছুটল ফাতেমা হিরেনের গাড়ির দিকে।

পেছনে পায়ের শব্দ শুনে লোকটি ফিরে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তার আগেই আহমদ মুসা জাপটে ধরল তাকে।

কিন্তু জাপটে ধরার সঙ্গে সঙ্গেই আহমদ মুসা লোকটির কনুই-এর প্রচণ্ড একটা গুতা খেল পাঁজরে।

আহমদ মুসার হাত শিথিল হয়ে গিয়েছিল। এক ঝটকায় বেরিয়ে গেল লোকটি আহমদ মুসার হাত থেকে।

প্রচণ্ড আঘাতের ধকলটা সামলে নিতে আহমদ মুসার দেরি হয়েছিল। পাঁজরে প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে টলে উঠেছিল তার দেহটা। গাড়িতে ঠেস দিয়ে সে ঠিক হয়ে দাঁড়িয়েই দেখল লোকটি ছুটে গিয়ে একটি গাড়িতে উঠেছে।

আহমদ মুসা ছুটল তার গাড়ির দিকে।

আহমদ মুসা লোকটির প্রায় পিছু পিছুই কার পার্ক থেকে বেরিয়ে এল।

লোকটির গাড়ির পেছনে ছুটে চলল আহমদ মুসার গাড়ি।

আহমদ মুসার গাড়িকে লোকটি শুরুতেই দেখে ফেলেছে।

এ রাস্তা সে রাস্তা ঘুরে লোকটির গাড়ি লেক জেনেভা হাইওয়েতে গিয়ে উঠল।

লেক জেনেভা হাইওয়ে পশ্চিম সুইজারল্যান্ডের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং গোটা সুইজারল্যান্ডের অন্যতম দীর্ঘ সড়ক। প্রথমে সড়কটি লেক জেনেভার তীর বরাবর উত্তরে ৩০ মাইল এগিয়ে গেছে লেক জেনেভার সুন্দর নগরী মরজেস পর্যন্ত। তারপর লেক জেনেভা পূর্বদিকে টার্ন নিয়েছে। লেক জেনেভা হাইওয়েও পূর্বদিকে টার্ন নিয়ে লেকের তীর ঘেঁষে বিখ্যাত নগরী লুজেন, তারপর মন্ট্রেস্কু হয়ে লেক জেনেভার পূর্ব প্রান্ত ঘুরে সড়কটি পশ্চিমমুখী হয়েছে। তারপর লেক জেনেভায় পড়া আলপস-এর দৃষ্টি মনোহর রণ নদীর তীর ধরে এগিয়ে গেছে সুন্দর এবং দুর্গম আলপস পর্বতমালার দিকে।

বিশাল প্রশস্থ হাইওয়ে।

লোকটির নতুন গাড়িটি হাওয়ার বেগে ছুটছিল সামনে। সব সময় চলছিল রাস্তার মিডল লাইন ধরে। আহমদ মুসা বুঝল, লোকটি হয় অনির্দিষ্টভাবে চলছে, নয়ত দূরবর্তী কোন লক্ষ্যে যাচ্ছে।

আহমদ মুসা চাইছিল গাড়িটাকে ওভারটেক করে তাকে থামতে বাধ্য করতে। কিন্তু ছোট ও পুরনো গাড়িতে সে স্পীড ছিল না।

সুতরাং গাড়িটিকে অনুসরণ করে চলারই সিদ্ধান্ত নিতে হল আহমদ মুসাকে। নিশ্চয় তাকে থামতে হবে। ফুয়েল তার শেষ হবেই। আহমদ মুসা তার গাড়ির ফুয়েল মিটারের দিকে নজর বুলিয়ে দেখল, ফুয়েল ট্যাংক ভর্তি। মনে মনে

ধন্যবাদ দিল মিঃ গটেফকে। তবে গাড়িটা এ ধরনের ধরনের কাজের উপযোগী হয়নি।

রাত নেমে এসেছে। সুইজারল্যান্ডের একটি সুন্দর অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে সে। দিন হলে দেখা যেত ডানে দিগন্ত প্রসারিত লেক জেনেভা এবং বামে সুন্দর সবুজ পাহাড়ের সারি এবং তার নিচে উঁচু-নিচু সবুজ উপত্যকা।

প্রাণপণ ছুটে চলছিল দুটি গাড়িই।

আধঘণ্টা পার হয়েছে।

আহমদ মুসার অনুমান গাড়ি এখন তাদের জেনেভা লেক তীরের মরজেস নগরীর আশেপাশে হবে।

আহমদ মুসা হঠাৎ করেই লক্ষ্য করল, সামনের গাড়িটার স্পীড কমে গেছে। গাড়ির পেছনের লাল বাতি দ্রুত আহমদ মুসার নিকটবর্তী হচ্ছে।

তেল কি ফুরিয়ে গেল গাড়িটার। হতে পারে। পালাবে নাতো।

গাড়ির স্পীড আরেকটু বাড়াল আহমদ মুসা।

যখন গাড়িটার কাছে পৌঁছল আহমদ মুসার গাড়ি, তখন সে গাড়িটা দাড়িয়ে গেছে। গাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে নাকি।

গাড়ি থেকে নেমেই আহমদ মুসা সেই গাড়িটার চারদিকে নজর বুলিয়ে লোকটিকে দেখতে পেল না। ভাবল, গাড়ির ভেতরটা এক নজর দেখে সে চারদিক ভাল করে চোখ বুলাবে। এত তাড়াতাড়ি তার পালানো স্বাভাবিক নয়।

আহমদ মুসা দ্রুত গিয়ে জানালা দিয়ে গাড়ির ভেতরে নজর রাখল। দেখল, স্টিয়ারিং-এ দু'হাত রেখে নির্বিকার বসে আছে লোকটি।

চমকে উঠল আহমদ মুসা। তাহলে কি ট্র্যাপে পড়েছে সে! ফাঁদ পেতে সে নিশ্চিন্তে বসে আছে?

গোটা দেহ আহমদ মুসার সতর্কতার এক তড়িত প্রবাহে সতর্ক হয়ে উঠল। ঘুরে দাঁড়াল সে।

ঘুরে দারিয়ে যা দেখল তাতে আর কিছুই করার ছিল না তার। দু'হাত দিয়ে মাথা ঢেকে বসে পড়ল।

প্রায় একসাথেই কয়েকটা হকিস্টিক ও লোহার রড এসে তার উপর পড়ল। মনে হল হাত দু'টো ছাতু হয়ে গেল, তার সাথে তার মাথাও। তার চারদিকটা অন্ধকার হয়ে এল। সেই অন্ধকারে মনে হল, দু'টো তীব্র আলো তার দিকে ছুটে আসছে। তার আরও মনে হল তাকে ধাক্কা দিয়ে পাশের গাড়িটা চলে গেল। মাথায় রডের বাড়িও আর পড়ছে না। তারপর সব শব্দ, সব দৃশ্য-সব কিছুই কোথায় যেন হারিয়ে গেল তার সামনে থেকে।

ওয়ার্ল্ড নিউজ এজেন্সির (WNA) মিটিং রুম।

বিরাট গোল টেবিলের চারদিক ঘিরে বসেছে WNA এবং FWTV-এর চেয়ারম্যান, দুই সংস্থার দুইজন প্রধান প্রশাসক, সংবাদ দুটির চীফ এডিটরদ্বয় এবং মিসেস ফাতেমা হিরেন।

সকলেরই মুখ ছাইয়ের মত সাদা। আতংকে সবাই যেন মুহ্যমান।

শুরু করল WNA-এর চেয়ারম্যান জামাল গটেফ। বলল, 'খবরটা আপনারা সবাই শুনেছেন। বিস্তারিত আপনাদের শোনা উচিত। মিসেস ফাতেমা হিরেনকে আমি ডেকেছি। তাকে আমি অনুরোধ করছি ঘটনা বলার জন্যে।'

মিসেস ফাতেমা হিরেন নড়ে-চড়ে বসল। তারপর শুরু করল। তার কণ্ঠ শুকনো এবং ভারী। বলল, 'আমি আমার গাড়ি পার্ক করে জাতিসংঘের ইউরোপীয় সদর দপ্তরে প্রবেশের সময় কার পার্কের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, জনাব আহমদ মুসা আমার গাড়ির দুই 'রো' পেছনে তার গাড়ি পার্ক করছেন। দু'ঘণ্টা পর আমি ফিরে এসে দেখলাম আমার গাড়ি খোলা, এমনকি দরজাটা পর্যন্ত বন্ধ করা নয়। আমি আতংকিত হয়ে তাকালাম জনাব আহমদ মুসার গাড়ির দিকে। দেখলাম তার গাড়ি নেই। আমি ছুটে গেলাম সেখানে। দেখলাম তার হাতের রুমালটি মাটিতে পড়ে আছে। আমি জাতিসংঘ অফিসের গেটে এসে আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করলাম। তারপর ফিরে এসেছি। ভয়ে আমি আমার গাড়ির কাছে আর যাইনি।'

থামল ফাতেমা হিরেন।

ফাতেমা হিরেন থামতেই মিঃ গটেফ বলল, ‘আমরা পরদিন গিয়ে গাড়িটি নিয়ে এসেছি। কিন্তু আজ এই সকাল দশটা পর্যন্ত আহমদ মুসার কোন খোঁজ নেই।’

‘তিনি টেলিফোনও করেন নি? উদ্বেগের ব্যাপার!’ বলল FWTV-এর চেয়ারম্যান বাকের জারমিস।

‘তার মত বিবেচক লোকের জন্য এটা অসম্ভব।’ বলল WNA-এর চীফ এডিটর হাসান আলবার্তো।

‘তাহলে? বলল কামাল কনরাড, FWTV-এর চীফ এডিটর।

‘তিনি কি শত্রুর কবলে পরেছেন বলে আমরা মনে করব? বলল WNA-এর প্রধান প্রশাসক।

তার কথা শেষ হল। কিন্তু কেউ কথা বলল না। কান্নার চেয়েও করুন সকলের মুখের অবস্থা। কিছুক্ষণ নীরবতা।

নীরবতা ভাঙল বাকের জারমিস। বলল, ‘বুঝতে পারছিনা আমরা কি করব? আমাদের জন্যে কি করব বা তার জন্যে কি করতে পারি?’

জবাব কারও কাছেই ছিল না। নীরব সবাই।

মিঃ গটেফ-এর পি,এ প্রবেশ করল ঘরে। গটেফকে বলল, ‘স্যার ফ্রান্স থেকে একজন মহিলা এসেছেন। আপনার সাথে দেখা করতে চান।’

‘ফ্রান্স থেকে? কি চায়?’

‘দেখা করতে চায়।’

‘কোন ব্যাপারে জিজ্ঞেস করনি?’

‘আমাকে বলবে না।’

মিঃ গটেফ মনে মনে ভয় পেল। ব্ল্যাক ক্রস-এর হেডকোয়ার্টার তো ফ্রান্সে। কোন ফ্যাসাদ আবার এল। আহমদ মুসার অনুপুস্থিতিতে কেউ কোন ফাঁদ পাততে এল না তো?

এসব চিন্তা করে গটেফ WNA-এর প্রধান প্রশাসকের দিকে চেয়ে বলল, ‘আমি পারছিনা। তুমি শুনে এস চার্লস।’

‘ইয়েস স্যার।’ বলে চার্লস চলে গেল।

ফিরে এল মিনিট তিনেক পর।

'চলে গেলেন মহিলা?'

'না, জনাব।'

'তাহলে?' মুখ কাল করে বলল মিঃ গটেফ।

'সে আপনার সাথে কথা বলতে চায়।'

'বলনি যে, আমি মিটিং-এ আছি।এখন দেখা করা সম্ভব নয়।'

'বলেছি। বললেন, তাঁকে এখানে আসার অনুমতি দিতে।'

'তুমি কি বলেছ?'

'কোন মেহমানের ভেতরে আসার অনুমতি নেই। তিনি বলেছেন, জানি আপনাদের খারাপ দিন চলছে। আপনাদের কোন মহিলা আমাকে সার্চ করতে পারেন।'

'তাঁর পরিচয় কি?'

'তিনি নিজেকে মুসলিম বলে পরিচয় দিয়েছেন।'

'প্রয়োজনীয় সার্চ করে আমি তাঁকে ভেতরে আনতে পারি।' বলল মিসেস ফাতেমা হিরেন।

'কিন্তু একটা জিনিস ভাববার আছে। মহিলা এসেছেন ফ্রান্স থেকে। আর ব্ল্যাক ক্রস-এর হেড কোয়ার্টারও ফ্রান্সে।'

'তা ঠিক। কিন্তু ফ্রান্সেই তো আহমদ মুসা ব্ল্যাক ক্রস-এর বিরুদ্ধে অনেকের সাহায্য পেয়েছিলেন।' বলল হাসান আলবার্তো।

'মহিলা মুসলিম বলে তো পরিচয় দিলেন। পোশাক কেমন ওঁর?' বলল মিঃ গটেফ।

'ভাল মুসলিমের মত পোশাক।' বলল চার্লস।

'মহিলা তো, আমার মনে হয় এখানে ডাকা যায়। নিশ্চয় জরুরী কোন ব্যাপার আছে ওঁর।' বলল জারমিস।

'ঠিক আছে। মিস ফাতেমা হিরেন যান। তাঁকে দেখে-শুনে নিয়ে আসুন।' বলল মিঃ গটেফ।

ফাতেমা হিরেন উঠল। মিনিট পাঁচেক পরে মিসেস ফাতেমা হিরেন মহিলাটিকে সাথে নিয়ে মিটিং রুমে ফেরত এল।

মহিলা আসলে একজন তরুণী।

বসল টেবিলে ফাতেমা হিরেনের পাশেই।

মিঃ গটেফ তাকে স্বাগত জানিয়ে নিজের ও অন্যদের পরিচয় দিয়ে বলল, 'আমরা একটা জরুরী মিটিং-এ আছি। বলুন, আমরা আপনার কি সাহায্য করতে পারি?'

তরুণীটি ঘরে ঢুকেই আগে সালাম দিয়েছিল। মিঃ গটেফ থামলে সে বলল, 'আপনারা একটা বিপজ্জনক সময় অতিক্রম করছেন। আমাকে কথা বলার সুযোগ দিয়েছেন এ জন্য আপনাদের ধন্যবাদ।'

একটু থামল তরুণীটি। তারপর বলল, ' আহমদ মুসা এখানে এসেছেন। আমি তাঁর খোঁজ নিতে এসেছি। তিনি কোথায় আছেন, কেমন আছেন জানালে বাধিত হবো।'

তরুণীটির কথার উত্তর কেউ দিল না। সবাই নীরব। তাদের চোখে-মুখে বিস্ময় ও সন্দেহ দুইই। এ ফরাসী তরুণী আহমদ মুসার কথা জিজ্ঞেস করছে কেন? আহমদ মুসার নিখোঁজ হওয়ার সাথে ওঁর আসার কি কোন সম্পর্ক আছে? আহমদ মুসাকে সরাবার পর কোন ফাঁদ পাততে এসেছে কি এই তরুণী?

নীরবতা ভেঙ্গে প্রথম কথা বলল গটেফ। বলল, ' আপনার পরিচয় কি? তাঁর কথা আমাদের জিজ্ঞেস করছেন কেন? তিনি এখানে এসেছেন একথা আপনি বলছেন কি করে?'

'আমি মারিয়া জোসেফাইন লুই। ডোনা জোসেফাইন বলেও আমাকে ডাকা হয়। আহমদ ফ্রান্সে থাকার সময় তাঁর সাথে আমার পরিচয়। আমি ঐ সময় ইসলাম গ্রহণ করি। আমি ক্যামেরুনেও ছিলাম। আমি ক্যামেরুন থেকে চলে এসেছি ফ্রান্সে, আর তিনি মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র থেকে এসেছেন সুইজারল্যান্ড। আমি জেনেভায় আসব উনি জানেন।' বলল ডোনা নামের তরুণীটি।

ডোনা আজই তার আব্বার সাথে প্যারিস থেকে জেনেভা এসে পৌঁছেছে। উঠেছে একটা অভিজাত টুরিস্ট কটেজে। তার আব্বার বিশ্রাম নিচ্ছেন, সেই

সুযোগে ডোনা এসেছে WNA অফিসে আহমদ মুসার খোঁজ নেয়ার জন্য। সে জানত আতংকজনক ঘটনাগুলোর পর WNA এবং FWTV এর অফিসে খুব সতর্কতা থাকবে। কিন্তু সতর্কতাটা এই পরিমাণে থাকবে তা সে ধারণা করেনি।

আবার নীরবতা।

তরুণীটির কথা বিশ্বাস করবে, না অবিশ্বাস করবে, এই দ্বিধাদ্বন্দ্ব সবার মধ্যে।

এবার নীরবতা ভাঙল মিসেস ফাতেমা হিরেন। বলল, ' মাফ করবেন। আমি জানতে চাচ্ছি তাঁর সাথে আপনার সম্পর্ক কি? আপনি ক্যামেরুন গিয়েছিলেন কেন?'

'আমি জেনেভায় যেভাবে এসেছি, সেভাবেই ক্যামেরুনে গিয়েছিলাম। সম্পর্ক সম্পর্কে আমি কি বলব?' বলে তরুণীটি একটু থামল। তারপর বলল, 'আমি তাকে চিনি, তিনি আমাকে চেনেন, আপাতত এটুকু জানা কি যথেষ্ট হয় না?'

'মাফ করবেন। আমরা যদি 'আপনাকে কোন সাহায্য করতে পারব না' বলে দুঃখ প্রকাশ করি।' বলল হাসান আলবার্তো।

'আমি কিছুই মনে করব না। একজন অপরিচিতকে এই কথা বলাই আপনাদের জন্য স্বাভাবিক। তবে আমার একটা অনুরোধ, আমি একটা টেলিফোন নাম্বার রেখে যাচ্ছি। তিনি ভাল থাকলে আমাকে কিছু জানাবার দরকার নেই, কোন অসুবিধায় যদি তিনি পড়েন, তাহলে এই টেলিফোনে আমাকে জানাবেন।'

বলে একটা টেলিফোন নাম্বার লিখে ফাতেমা হিরেনকে দিয়ে ডোনা উঠে দাঁড়াল।

মিঃ গটেফ এবং অন্যান্যরা একে অন্যের মুখ চাওয়া –চাওয়ি করল।

এতক্ষণে মিঃ গটেফের মুখের উপর আসন গেড়ে বসা সন্দেহের ছায়া কিছু ম্লান হলো। ভাবল, তরুণীটি আহমদ মুসার অবশ্যই কোন শুভাকাঙ্ক্ষী। এই চিন্তার সাথে সাথেই সে শশব্যাস্তে বলল, ' আপনি আহমদ মুসার শুভাকাঙ্ক্ষী হলে আপনাকে একটা খবর না দেয়া অন্যায় হবে।'

'কি খবর?' ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল ডোনা।

‘আমরা দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে আহমদ মুসা গতকাল থেকে নিখোঁজ।’ বলল মিঃ গটেফ।

‘নিখোঁজ? গতকাল থেকে?’ বলে চেয়ার আবার বসে পড়ল ডোনা। হঠাৎ তার দেহ যেন গভীর এক অবসন্নতায় ছেয়ে গেল।

অনেকক্ষণ কথা বলতে পারল না ডোনা।

পরে ডোনা শুনল সব কথা মিসেস ফাতেমা হিরেনের কাছ থেকে। সব শুনে ডোনা বলল, ‘ আমার বিশ্বাস তিনি শত্রুর হাতে বন্দী হয়েছেন। শত্রুরা এসেছিল মিসেস ফাতেমা হিরেনের গাড়িতে ফাঁদ পাততে। আহমদ মুসার চোখে তারা ধরা পড়ে যায়। তারা তাড়াহুড়ো করা পালায়। আহমদ মুসাও তাড়াহুড়ো করে তাদের অনুসরণ করে এবং সম্ভবত তা করতে গিয়ে আহমদ মুসা তাদের হাতে বন্দী হয়ে যায়।’ শুকনো ও ভারি কণ্ঠস্বর ডোনার।

‘আপনি কেন এতটা নিশ্চিত যে, আহমদ মুসা শত্রুর হাতে ধরা পড়েছেন?’ বলল মিঃ গটেফ।

‘আহমদ মুসা মুক্ত থাকলে হয় চলে আসতেন, না আসতে পারলে টেলিফোন করতেন।’ বলল ডোনা।

‘টেলিফোন নাও তো পেতে পারেন সেখানে?’

‘এই যুক্তি সত্য হলে সেটা খুশির কথাই হবে। তবে খারাপটাই চিন্তা করা ভাল।’ বলল ডোনা।

‘ঠিক, খারাপটা চিন্তা করেই আমাদের কিছু করা দরকার।’ বলল মিঃ জারমিস।

‘আমার মনে হয় ব্যাপারটা পুলিশকে জানানো দরকার।’ বলল গটেফ।

‘কি জানাবেন পুলিশকে?’ বলল ডোনা।

‘আহমদ মুসাকে কিডন্যাপ-এর কথা। অন্তত এটুকু।’ বলল গটেফ।

‘না, এটা পুলিশ কে জানানো যাবেনা। এমনকি আহমদ মুসা সুইজারল্যান্ডে এ বিষয়টাও পুলিশ জানতে পারলে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হবে।’

‘কি সমস্যা সৃষ্টি হবে?’ বলল মিসেস ফাতেমা হিরেন।

‘তখন একই সাথে ব্ল্যাক ক্রস এবং পুলিশের সাথে লড়তে হবে।’ বলল ডোনা।

‘কেন?’ বলল ফাতেমা হিরেন।

‘আহমদ মুসার দাম কোটি কোটি ডলার। পুলিশ গোপনে তাকে তার শক্রুর হাতে তুলে দিয়ে এ অর্থ উপার্জনের চিন্তা করতে পারে। তাছাড়া পুলিশের মাঝে বিভিন্ন এজেন্সির আজ্ঞাবহ লোকও আছে। তারাও জেনে ফেলবে।’

সবাই স্তম্ভিত হয়ে ডোনার কথা শুনছিল। তারা যেন ডোনার মধ্যে আহমদ মুসারই কণ্ঠ শুনছিল। তারা লজ্জা অনুভব করল। মনে মনে বলল, তরুণী হলেও বুদ্ধিতে পরিপক্ক। আর আহমদ মুসার সাথে পরিচিত হবার এবং তাকে খোঁজ করবার মত যোগ্যতার অধিকারী সে নিঃসন্দেহে।

‘ম্যাডাম, আপনার পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমরা কি করব, কি করণীয় বুঝতে পারছি না। যে কাজ পুলিশের সে কাজ আমরা কিভাবে করব?’ বলল মিঃ গটেফ।

ডোনা তৎক্ষণাৎ কোন উত্তর দিল না। মুখ নিচু করে চিন্তা করল কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে বলল, ‘ কারা এটা করেছে জানলেও তাদের কোন স্থান-ঠিকানা আমাদের জানা নেই। এই অবস্থায় আল্লাহর উপর ভরসা করে অপেক্ষা করা ছাড়া কোন পথ নেই।’

‘কারা এটা করেছে জানেন?’ বলল ফাতেমা হিরেন।

‘অবশ্যই জানি। ব্ল্যাক ক্রস করেছে।’

‘ব্ল্যাক ক্রস-কে আপনি জানেন?’ বলল আবার ফাতেমা হিরেন।

‘জানি।’

‘তাহলে যেটুকু পরিচয় আপনি দিয়েছেন, সেটুকু আপনার সব পরিচয় নয় বলে আমার মনে হয়।’ বলল হাসান আলবার্তো।

‘সেটা বড় কথা নয়। কিছু বাকী থাকলে ওঁর কাছেও শুনতে পারবেন। আমি এখন উঠতে চাই।’ বলল ডোনা।

ডোনা ওদের সামনে স্বাভাবিক থাকলেও ভেতরটা তার কাঁপছে। সে জানে, ব্ল্যাক ক্রস আহমদ মুসার বিরুদ্ধে ক্ষ্যাপা কুকুরের মত হয়ে রয়েছে। আহমদ মুসা তাদের হাতে পড়ার ব্যাপারটা চিন্তাও করা যায় না।

'ঠিক আছে। একটা কথা ম্যাডাম। আপনি অনেক কিছু জানেন বলেই বলছি। আমরা আহমদ মুসার ব্যাপারটা পুলিশকে জানালাম না। কিন্তু আমরা সিসি মাছির ব্যাপারটা পুলিশকে জানাব কিনা? আহমদ মুসা থাকতে আমরা জানাইনি, তিনি নিষেধ করেছিলেন এবং আমরাও তার সাথে একমত ছিলাম। কিন্তু এখন তিনি নেই, আমাদের নিরাপত্তার জন্যে পুলিশকে সব জানানো দরকার কিনা?

'আমি বলেছি, আল্লাহর উপর ভরসা করে ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করা দরকার। সবচেয়ে খারাপ অবস্থার জন্যে প্রস্তুত থাকা উচিত, কিন্তু হতাশ হওয়া ঠিক হবে না। আমাদের মনে রাখতে হবে, তিনি আহমদ মুসা। এ ধরণের ঘটনা তার জীবনে অসংখ্যবার ঘটেছে। যে পরিস্থিতির উত্তরণ আমাদের কাছে অসম্ভব, সেটা তাঁর কাছে খুবই সহজ।' বলল ডোনা।

কথাগুলো বলতে পেরে খুশী হলো ডোনা। কথাগুলো তার নিজেকেই সান্ত্বনা দিল বেশী। মন অনেক সাহস পেল তার।

সকলের মুগ্ধ দৃষ্টি ডোনার দিকে।

কথা বলতে যেন ভুলে গিয়েছিল তারা।

নীরবতা ভাঙল মিঃ গটেফ। বলল, 'ধন্যবাদ আপনাকে। এই কথাগুলো বলার জন্যেই আল্লাহ আপনাকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। আমরা কৃতজ্ঞ। আমরা কি টেলিফোনে আপনার সাথে যোগাযোগ করতে পারি? আমি নিশ্চিত, আপনার পরামর্শের আমাদের দরকার হবে।'

'মোস্ট ওয়েলকাম। আমি খুশী হবো। আমিও যোগাযোগ করব।' বলে সালাম দিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েও আবার ঘুরে দাঁড়াল ডোনা। বলল, 'আপনারা জেনেভার হাসপাতাল-ক্লিনিকগুলোতে খোঁজ নিতে পারেন। আমিও নেব। আমার মনে হয় তিনটি অবস্থা হতে পারে। এক, তিনি শত্রুর হাতে পড়েছেন, দুই, তিনি আহত হয়ে কোন হাসপাতাল বা ক্লিনিকে থাকতে পারেন এবং তিন,

তিনি জেনেভার বাইরে চলে গেছেন শত্রুকে অনুসরণ করে। দ্বিতীয় অবস্থা আমাদের আয়ত্বে এখন, এই চেষ্টা আমরা করতে পারি।' থামল ডোনা।

'আল্লাহ আমাদের মঙ্গল করুন। আপনি ঠিকই বলেছেন। আমরা অনুসন্ধান এখনি শুরু করছি।'

ডোনা ঘুরে দাঁড়িয়ে চলা শুরু করল।

এগিয়ে দেয়ার জন্যে মিসেস ফাতেমা হিরেনও উঠে দাঁড়াল।

ঘর থেকে বেরিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করল দু'জন।

'আপনার সাথে পরিচিত হয়ে খুশী হলাম।' বলল ডোনা।

'আর আপনার সাথে পরিচিত হতে পেরে আমার গর্ব হচ্ছে। অল্প কয়েক মিনিট আপনার কথা শুনলাম। কিন্তু মনে হচ্ছে কতদিনের পরিচয়। আমার সবচেয়ে অবাক লাগছে, আহমদ মুসা যেমন স্বতন্ত্র, তেমনি মনে হচ্ছে আপনাকেও। একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি? আপনি আহমদ মুসার আত্মীয় নন, আপনি ফরাসী হওয়াই তার প্রমাণ। তাহলে আহমদ মুসার সাথে সম্পর্ক কি?'

'মিসেস ফাতেমা হিরেন আপনি সাংবাদিক। বলুন কারা আত্মীয় হতে পারে? কোন ইউরোপীয় কি কোন এশিয়ানের আত্মীয় হতে পারে না?' হৃদয়ের এবং আত্মার একান্ত যে সেই তো আত্মীয়।' ঠোঁটে হাসি টেনে বলল ডোনা।

'অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনাকে ম্যাডাম। আমি এটাই জানতে চাচ্ছিলাম।'

'মোস্ট ওয়েলকাম।' বলল ডোনা। তারা রিসেপশনের দরজায় এসে গেছে।

ডোনা হাত বাড়াল বিদায়ী হ্যান্ডশেকের জন্যে।

ফাতেমা হিরেন ডোনার হাত চেপে ধরে বলল, 'আমার খুব সাহস লাগছে। আসল লোক এসেছেন, তার সাথে তার রাইট হ্যান্ডও।'

'কাকে রাইটহ্যান্ড বলছেন? আমাকে?'

'অবশ্যই।'

'না, আমি ওঁর কোন হ্যান্ডই নই। আমি অনাহুত এখানে এসেছি।'

'কেন, আপনি এই কাজে ওঁকে সহযোগিতা করেন না?'

‘উনি পছন্দ করেন না।’

‘কেন?’

‘এই রণাঙ্গন মেয়েদের জন্যে নয় বলে।’

‘কেন, মেয়েরা কি সমাজ জীবনের অংশ নয়? এ রণাঙ্গন মেয়েদের জন্যও হবে না কেন? আপনি তার সাথে একমত?’

হাসল ডোনা। বলল, ‘ঠিক নীতি হিসেবে তিনি একথা বলেননি। তবে নিজের ক্ষেত্রে এটা তিনি অপছন্দ করেন।’

‘অর্থাৎ তিনি চান না আপনি এ সবের সাথে জড়িত হন।’

‘আমাকে নির্দিষ্ট করছেন কেন? অন্য কেউও হতে পারেন।’ সলজ্জ হেসে বলল ডোনা।

‘তাঁর আরও ‘অন্য কেউ’ আছে নাকি?’ মুখ টিপে হেসে বলল ফাতেমা হিরেন।

‘আমি তা বলিনি। আমি না হয়ে অন্য কেউও হতে পারেন।’

‘ধন্যবাদ। ঐ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার মত বলুন। আপনার মতের মূল্য অনেক।’

‘লজ্জা দেবেন না। আমি খুবই সামান্য কেউ। মূল্য রয়েছে আপনাদের মতের। আপনারা দেশের জন্যে জাতির জন্যে ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন।’

‘একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিলাম। আপনার নামের শেষে ‘লুই’ কেন? আমি যতদূর জানি ‘লুই’ রাজপরিবার ছাড়া এ শব্দ কেউ তাদের নামে ব্যবহার করে না।’

ডোনা মুহূর্তকাল চুপ করে থাকার পর গম্ভীর কণ্ঠে বলল, ‘অতীতের কংকাল সে পরিবারেরই একজন আমি।’

ফাতেমা হিরেন চমকিত হয়ে পূর্ণ চোখে তাকাল ডোনার দিকে।

মুহূর্ত কয় পরে মুখে ফুটে উঠল স্বচ্ছ হাসি। তারপর অভিনয়ের ভংগিতে ডোনাকে ‘বাউ’ করে বলল, ‘সম্মানিতা রাজকুমারী, এতক্ষণে আশ্বস্ত হলাম।’

চোখে-মুখে বিস্ময় টেনে ডোনা বলল, ‘কি আশ্বস্ত হলেন?’

‘আমাদের বিশ্ববিখ্যাত মহামান্য ব্যক্তিকে আল্লাহ যোগ্য সাথী মিলিয়ে দিয়েছেন।’

ডোনা গম্ভীর হলো। তার মুখ-চোখ ভারী হয়ে উঠল। বলল, ‘আপা এভাবে বলবেন না। এ রাজপরিবার ঘৃণ্য ও জননিন্দিত চরিত্রের মানুষকেও জন্ম দিয়েছে। পরীক্ষা আমাকে কোথায় নিক্ষেপ করবে আমি জানি না আপা। আমার জন্যে দোয়া করবেন।’

ফাতেমা হিরেনও গম্ভীর হলো। বলল, ‘আপনার এই উপলব্ধিই আপনার পবিত্র মন ও অপরিমিত যোগ্যতার প্রমাণ।’

থামল ফাতেমা হিরেন। থেমেই আবার শুরু করল, ‘কথাটা কিন্তু হারিয়ে যাচ্ছে। আপনার মতটা বলেননি।’

‘কোন বিষয়ে?’

‘ঐ যে রণাঙ্গনে নারীর অংশ গ্রহণের ব্যাপারটা।’

‘ও আচ্ছা।’ বলে ডোনা একটু চিন্তা করল। তারপর বলল, ‘আমার ব্যক্তিগত মত কি বলব! আমি একজন মেয়ে হিসেবে এ অধিকার চাই। কিন্তু আমাকে যদি বিচারকের আসনে বসিয়ে এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়, তাহলে আমি বলব এই অধিকার এইভাবে মেয়েদের পাওয়া উচিত নয়।’

‘কেন? কেন?’

‘নারী হিসেবে এমন কিছু দুর্বলতা ও অসুবিধা মেয়েদের রয়েছে এবং শত্রুর হাতে পড়লে এমন কিছু অবাঞ্ছিত ফল তার উপর চেপে বসতে পারে, যা তার এবং তার বৃহত্তর পারিবারিক জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে। এই অসুবিধা পুরুষের নেই।’

ফাতেমা হিরেন সংগে সংগে জবাব দিল না। তার বিস্ময় দৃষ্টি ডোনার উপর নিবদ্ধ।

কয়েক মুহূর্ত পর সে বলল, ‘ধন্যবাদ আপনাকে ম্যাডাম। বিষয়টাকে এভাবে আমি কোনদিন চিন্তা করিনি। আপনার এ রায়ের সাথে আমি একমত। এদিক দিয়ে পুরুষ ও নারীর অবাধ মেলামেশার যৌথ কর্মক্ষেত্রও অবাঞ্ছিত।’

‘আপনাদের মিটিং চলছে। আপনার অনেক সময় নিলাম। আমি এখন আসি।’ আবার হ্যান্ডশেকের জন্যে হাত বাড়িয়ে বলল ডোনা।

ফাতেমা হিরেন হ্যান্ডশেক করে বলল, ‘একদিন বাসায় দাওয়াত করার কি সাহস করতে পারি?’

‘দাওয়াত কেন? নেম কার্ড তো নিয়েছি। একদিন বাসায় গিয়ে হাজির হবো দেখবেন।’

‘মোস্ট ওয়েলকাম।’

ডোনা সালাম দিয়ে বাইরে বেরুবার জন্যে পা বাড়াল।

# ৫

জেনেভা লেকের পশ্চিম তীরে সুন্দর শহর মোরজে। পটে আঁকা ছবির মত সুন্দর শহরটি।

শহরটির পশ্চিমে মাউন্ট টেন্ডর। পর্বতটির সবুজ উপত্যকায় জেনেভা লেকের আদিগন্ত স্ফটিক জলরাশিকে সামনে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মোরজে।

মাউন্ট টেন্ডর থেকে তাকালে মনে হয় সবুজ এক বাগান ভাসছে লেক জেনেভার স্বচ্ছ বুকে।

আবার লেক জেনেভার দিগন্ত থেকে শহরটিকে মনে হয় যেন সুন্দর একটা সবুজ তিলক ঘুমিয়ে আছে মাউন্ট টেন্ডর-এর কোলে।

শহরটির উত্তর-পূর্ব প্রান্তে লেকের ধার ঘেঁষে সুন্দর একটি বাড়ি।

বাড়িটি তৈরী হয়েছে লেকের বুক চিরে গড়ে ওঠা একটা মিনি উপদ্বীপের উত্তরে।

বাড়ির তিন দিকেই হ্রদের স্ফটিক পানির নিরন্তর নৃত্য। তীর বরাবর দীর্ঘ ও প্রশস্ত বাগানের একটা সবুজ মেলা। তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে শ্বেত সুন্দর বাড়িটি। মনে হয় যেন একটা রাজহংস সবুজ মালা পড়ে হ্রদের পানিতে ভাসছে।

বাড়িটি সুইজারল্যান্ডের সাবেক কুটনীতিত মিঃ কেলভিনের। এখন তার বয়স সত্তর। দশ বছর আগে রিটায়ার করার পর তিনি এখানেই বসবাস করছেন।

বাড়িটার দু'তলার ড্রইংরুম।

গল্প হচ্ছিল তিনজনের মধ্যে। একজন মহিলা, জিনা ডোনান্ট। তিনি একজন কূটনীতিকের স্ত্রী এবং মিঃ কেলভিনের একমাত্র সন্তান। সয়স পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি।

আরেকজন বালিকা, জিনা জোসেফাইন। জিনা ডোনান্টের একমাত্র মেয়ে।

আর তৃতীয়জন তাতিয়ানা। রাশিয়ান মেয়ে। পিটার দি গ্রেট পরিবারের সন্তান সে। মিঃ কেলভিন দীর্ঘদিন মস্কো ছিলেন কুটনীতিক হিসেবে। তার মেয়ে জিনা ডোনান্টের স্বামীও তরুন কুটনীতিক তখন সেখানে। সেই সময় পিটার পরিবারের সাথে কেলভিন পরিবারের গভীর হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। তাতিয়ানা সুইজারল্যান্ডে বেড়াতে এসে উঠেছে কেলভিনদের বাড়িতে। কেলভিন পরিবার আগেই তাকে জানিয়েছিল, সে যতদিন সুইজারল্যান্ড থাকবে ততদিন সে তাদের মেহমান হবে।

কথা বলছিল জিনা ডোনান্ট, 'সত্যিই সিসি মাছির ব্যাপারটা দারুন আতংকের সৃষ্টি করেছে। ৬টি মর্মান্তিক মৃত্যুর রহস্য ভেদ এখনও হয়নি। এই জন্যেই তোমাকে এ সময় আসতে না করেছিলাম।'

'আপনারা বাস করতে পারছেন, আর আমি ক'দিন থাকতে পারবো না কেন?' বলল তাতিয়ানা।

'আমরা বাড়িতে আছি। যাই ঘটুক, আমরা বাড়ি ছাড়তে পারি না, দেশ ছাড়তে পারি না।' বলল ডোনান্ট।

আমার যুক্তিটা এ রকমই। মৃত্যু ভয় এড়িয়ে চলতে চাইলে গাড়ি-প্লেন কিছুতেই চড়া যাবে না। অপরাধী সন্ত্রাসীদের ভয়ে ঘরের বাইরে বেরুনোও তাহলে বন্ধ করতে হবে।'

'ঠিকই বলেছ। তবে আমরা এই বয়সে যে ঝুঁকি নিতে পারি, তোমাদের তা নেয়া ঠিক নয়। 'প্রকৃত' জীবনটাই তোমার সামনে পড়ে আছে।' বলে হাসল জিনা ডোনান্ট।

গম্ভীর হয়ে উঠল তাতিয়ানার মুখ। বলল, 'প্রকৃত জীবন কখন আসবে তার কি নির্দিষ্ট সময় আছে?'

'অবশ্যই আছে। তুমিও সেটা দেখবে। সে সময় তোমার আসছে।' ঠোঁটে হাসি টেনে বলল জিনা ডোনান্ট।

একটা ম্লান হাসি তাতিয়ানার ঠোঁটে ফুটে উঠেই আবার মিলিয়ে গেল। ও হাসিটা কান্নার চেয়েও বেদনার। বলল, 'মনে হচ্ছে আপনি একেবারে নিশ্চিত দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু সবার জীবনেই কি সে সময় আসে?'

'তা আসে না। অনেকে তো সে সময় পর্যন্ত বাঁচেও না। কিন্তু তুমি এভাবে হতাশার সুরে কথা বলছ কেন?' বলল জিনা ডোনান্ট।

তাতিয়ানা একটু হাসল। বলল, 'এইতো আপনি বললেন সবার জীবনে আসে না। তাহলে বিষয়টা সবার জন্যে নিশ্চিত নয়। যা নিশ্চিত নয়, তার মধ্যেই তো একটা হতাশার ভাব থাকে।

জিনা ডোনান্ট তাতিয়ানার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে হেসে উঠে বলল, 'তুমি ছোট বেলা থেকেই কথার রাজা, তুমি ঠকবে কেন কথায়! তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'করুন।'

'আমি সে সময় দেখেছি, কিছুটা একাকিত্বকে তুমি যেন ভালবাসো। তোমার কোন বয় ফ্রেন্ড সে সময় আমি দেখিনি। নিশ্চয় তুমি এ অসামাজিকতা এখন ছেড়েছ?'

'কোন বয় আমার ফ্রেন্ড হতে চাইলেই না এই অসামাজিকতা আমি ছাড়তে পারি।' হেসে বলল তাতিয়ানা।

'বাজে কথা বলছ তুমি।'

গম্ভীর হলো তাতিয়ানা। বলল, 'বাজে কথা বলছি না আপা।' তাতিয়ানার কন্ঠস্বর ভারি।

তাতিয়ানার গম্ভীর মুখ আর ভারি কন্ঠ নজর এড়াল না জিনা ডোনান্টের। বিস্মিত হলো সে। অবাক হয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল তাতিয়ানার দিকে। তার মনে হলো তাতিয়ানার গম্ভীর মুখের আড়ালে অনেক অশ্রু লুকিয়ে আছে। তাহলে কোন দুঃখ আছে নাকি তাতিয়ানার জীবনে? জিনা ডোনান্ট উঠে গিয়ে তাতিয়ানার পাশে বসল। বলল, 'তাতিয়ানা আমার মনে হচ্ছে তুমি কিছু লুকাচ্ছ। কিছু ঘটেনি তো?'

তাতিয়ানা হাসতে চেষ্টা করে বলল, 'ভাববেন না আপা। খারাপ ঘটনার দু'টো পক্ষ থাকে। কিন্তু আমার কোন অন্য পক্ষ নেই।'

জিনা ডোনান্ট তাতিয়ানার মুখ টেনে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, 'তোমার এসব দার্শনিক কথার মানে কি?'

জিনা ডোনান্ট যখন কথা বলছিল, সে সময়েই টেলিফোন এল।

জিনা ডোনান্টের মেয়ে জিনা জোসেফাইন টেলিফোন ধরেছিল।

জিনা ডোনান্ট থামতেই তার মেয়ে জিনা জোসেফাইন তাকে বলল, 'আম্মা, নানার টেলিফোন ক্লিনিক থেকে।'

জিনা ডোনান্ট গিয়ে টেলিফোন ধরল।

জিনা ডোনান্ট টেলিফোন ধরে ফিরে এসে বসতেই তাতিয়ানা বলল উদ্বিগ্ন কন্ঠে, 'আংকল ক্লিনিকে কেন? কি হয়েছে সেখানে?'

'একজন আহত লোককে আব্বা তার ক্লিনিকে নিয়ে গেছেন।'

'এ্যাকসিডেন্ট?'

'না। আব্বা ফেরার সময় শহরের বাইরে হাইওয়েতে লোকটিকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পেয়েছে। কে বা কারা তাকে নির্দয়ভাবে মেরেছে।'

'আংকল কি বললেন?'

'বললেন, লোকটির জ্ঞান ফিরলেই আব্বা বাসায় ফিরবেন।'

'আংকল কিন্তু আরও বেশী সংবেদনশীল হয়েছেন।'

'ঠিক বলেছ। তার উপর লোকটি আবার বিদেশী তো।'

'কোন ট্যুরিস্ট?'

'বোধ হয় না। আব্বা বললেন, ট্যুরিস্টদের যেমন অবস্থায় পাওয়া যায়, সে তেমন নয়। তার সাথে কিছুই নেই। তার পাশে একটা মানিব্যাগ পাওয়া গেছে, তাতে অল্প কিছু সুইস মুদ্রা ছাড়া উল্লেখযোগ্য কিছুই পাওয়া যায়নি।'

কথা শেষ করেই জিনা ডোনান্ট উঠে দাঁড়ালো। বলল, 'তোমরা এস। আমি দেখি টেবিলে খাবার দিতে বলি। আব্বাও এখনি এসে পড়বেন।'

জিনা ডোনান্ট চলে গেল।

পরদিন সকাল।

জিনা জোসেফাইন তার পড়ার ঘরে বসে পড়ছে।

তাতিয়ানা আয়াকে নিয়ে বেবিয়েছে লেকের ধারে ঘুরতে।

ড্রইং রুমে বসে গল্প করছে জিনা ডোনান্ট এবং তার আব্বা মিঃ কেলভিন।

কথা হচ্ছিল আগের রাতের ঘটনাটা নিয়েই।

'ঘটনাটা কোন ছিনতাই, না কোন ব্যক্তিগত শত্রুতার ব্যাপার?' বলল জিনা ডোনাল্ট।

'কোন একটা তো নিশ্চয় হবে। তবে চেহারায় ছেলেটাকে আমার ভাল মনে হয়েছে। আমি বিস্মিত হয়েছি, জ্ঞান ফেরার পর ওর মধ্যে সামান্য চাঞ্চল্যও আমি দেখিনি। আমি, নার্স এবং ডাক্তার তখন তার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। সে চোখ খুলে শান্ত চোখে আমাদের দিকে চাইল। যেন বাড়িতে সে ঘুম থেকে উঠল। তার মুখ থেকে প্রথম যে শব্দ বেরুল, সেটা ছিল আমাদের প্রতি তার 'ধন্যবাদ।' তারপর ডাক্তার যখন আমার পরিচয় দিয়ে বলল, আমি তাকে ক্লিনিকে নিয়ে গেছি, আমাকে লক্ষ্য করে বলল, 'আমি কৃতজ্ঞ এক্সিলেন্সি।' কোন দাঙ্গাবাজ বা সাধারণ চরিত্রের লোকের এমন নিশ্চিন্ত, শান্ত ও ভদ্র আচরণ হতে পারে না।'

টেলিফোন বেজে উঠল।

টেলিফোন ধরল মি কেলভিণ উঠে গিয়ে।

ক্লিনিক থেকে টেলিফোন।

কথা সেরে ফিরে আসতে আসতে বলল, 'ক্লিনিকে যেত হয়।'

'কেন লোকটির খারাপ কিছু হয়েছে?' বলল জিনা ডোনাল্ট।

'না খারাপ কিছু নয়। আহত ছেলেটা চলে যেতে চায়। অথচ বলেছে এ সময় তার সামান্য হাটাও নিরাপদ নয়।'

'আপনি কি করতে চাচ্ছেন আব্বা?'

'ক্লিনিকে যাওয়া উচিত ভাবছি। তুমিও যেতে পার আমার সাথে।'

'ঠিক আছে আব্বা,চল ঘুরে আসি'

হাসপাতালে পৌঁছে তারা সোজা কেবিনে চলে গেল।

কেবিনে প্রবেশ করল মিঃ কেলভিন প্রথমে। তার পেছনে পেছনে জিনা ডোনাল্ট।

আহত লোকটির উপর চোখ পড়তেই জিনা ডোনাল্ট ভূত দেখার মত চমকে উঠল।

আহত লোকটি আহমদ মুসা। যাকে মিসেস জিনা ডোনান্ট আব্দুল্লাহ বলে জানে। মিঃ কেলভিন সেদিন আহমদ মুসাকে সংগাহীন অবস্থায় হাইওয়ে থেকে তুলে ক্লিনিকে ভর্তি করেছিল।

পায়ের শব্দে চোখ খুলেছিল আহমদ মুসা।

তারও চোখ পড়েছিল জিনা ডোনান্টের উপর।

'আপনি?' বিস্ময়ের এক বিস্ফোরণ ঘটেছিল জিনা ডোনান্টের কন্ঠে।

জিনা ডোনান্টের কথায় বিস্মিত হয়ে মিঃ কেলভিন তাকাল একবার জিনা ডোনান্টের দিকে, আর একবার আহমদ মুসার দিকে।

তারপ্র বলল, 'জিনা মা, তুমি একে চেন?'

'জি আব্বা,প্লেন হাইজ্যাক চেষ্টার কাহিনী তুমি পড়েছ, আমিও তোমাকে বলেছি। ইনিই হাইজ্যাকারদের একজনকে হত্যা, আরেকজনকে কাবু করে প্লেন রক্ষা করেছিলেন।'

'হ্যা। এ সেই ইয়ংম্যান?'

বলে মিঃ কেলভিন আহমদ মুসার দিকে এগিয়ে তার ডান হাত তুলে নিয়ে চেপে ধরে বলল,' ব্রাভো, ইয়ংম্যান। কংগ্রাচুলেশন। আমার মেয়ে জিনার কাছে, আমার নাতনী জোসেফাইনের কাছে তোমার কথা, সেদিনের বিস্তারিত ঘটনা শুনেছি।তোমাকে ধন্যবাদ।'

জিনা ডোনান্টও এগিয়ে এল। বলল,' কিন্তু সেদিন বিমানবন্দরে নেমে আপনি কোথায় হাওয়া হয়ে গিয়েছিলেন। জানেন, ইয়ারলাইন্স কতৃপক্ষ এবং আন্তর্জতিক বিমান পরিবহন সমিতি আপনাকে অনেক খুঁজেছে। আপনার জন্য একটা বড় পুরষ্কার বরাদ্দ করেছে। আপনি নিয়েছেন সে পুরষ্কার ?

আহমদ মুসা ম্লান হাসল। বলল,' না, পুরষ্কার আমি নেইনি।'

'পত্রিকায় পড়েননি?'

'পড়েছি।'

'তাহলে?'

'সেদিনই পুরষ্কার আমি পেয়ে গেছি। মানুষের আশীর্বাদই আমার পুরষ্কার'

‘তা বটে। কিন্তু তুমি এক বিস্ময়কর ছেলে তো। আজকের জমানায় এমন করে কেউ ভাবে?’

বলে এক্ টু থেমেই মিঃ কেলভিন আবার বলল,’ থাক, এসব কথা পরে হবে। এখন বল, তুমি ক্লিনিক ছাড়তে চাচ্ছ কেন?উঠে দাঁড়াবার মত সামর্থ তোমার হয়নি।ডাক্তার বলেছে।‘

‘একটু কষ্ট হবে। কিন্তু আমার যাওয়া প্রয়োজন।জরুরী কাজ আছে।’

‘কষ্ট হবে মানে? দারুন ক্ষতি হতে পারে। যতই জরুরী কাজ থাক, তার চেয়ে জীবন বড়। এখানে তোমার কে আছে?’

‘ক’জন বন্ধু আছে জেনেভায়।‘

‘তাদের ওখানে উঠেছ?’

‘না, এক ট্যুরিষ্ট কটেজে উঠেছি।‘

‘সেখানে কেউ আছে?’

‘না, সেখানে আমি একাই থাকি।’

‘তাহলে আর চিন্তা কি।এমন তো নয় যে বাড়িতে কোন সমস্যা আছে। সুস্হ হও তারপর যাবে।’

‘আব্বা,তুমি ডাক্তারকে বলে রিলিজ নাও।একে বাসায় নিয়ে যাব। বাসায় ভাল থাকবে। প্রতিদিন ডাক্তার যাবে দেখে আসবে।দরকার হলে নার্স আমরা ডেকে নেব।’

মিঃ কেলভিন উজ্জল চোখে তাকাল মেয়ের দিকে।বলল, ‘ধন্যবাদ মা। একথাটা আমার মনে আসেনি। সেটাই ভাল হবে।আমি ডাক্তারকে বলছি।’

বলে যেতে উদ্যত হলো মিঃ কেলভিন।

‘আমার একটু কথা আছে জনাব।’ হাত তুলে মিঃ কেলভিনকে বাধা দিয়ে বলল আহমদ মুসা।

‘বল।’ বলে দাঁড়াল মিঃ কেলভিন।

‘আমি ক্লিনিকেই থাকতে চাই।’

‘কেন? আমাদের ঝামেলায় ফেলতে চাও না এ জন্যে?’

‘একথা সত্য নয়। আমার অবস্থায় আপনিও কি একথা বলতেন না?’

‘শুনেছি তোমার কথা।’ হেসে কথাটুকু বলে মিঃ কেলভিন তাকাল জিনা ডোনাল্টের দিকে। বলল, ‘মা জিনা তুমি গিয়ে গাড়ির পেছনের সিটটা ঠিক করে নাও। আমি ডাক্তারকে বলে সব ঠিক করছি।’

সংগে সংগেই জিনা ডোনান্ট বেরিয়ে গেল। মিঃ কেলভিনও।

বেলা দশটা।

তাতিয়ানা বাইরে থেকে ফিরে দু’তলায় উঠার জন্যে সিঁড়িতে পা রেখেছিল।

জিনা জোসেফাইন দৌড়ে এসে তাতিয়ানার একটা হাত চেপে ধরে বলল,’ কি মজা আন্টি সেই লোক এসেছে।’

‘কোন লোক?’ জোসেফাইনের পিঠে একটা চাট্রি মেরে চোখ উলটে বলল তাতিয়ানা।

‘কেন গল্প করেছিলাম না, প্লেনে একজন লোক হাইজ্যাকারদের মেরে শেষ করে প্লেনটাকে তাদের হাত থেকে উদ্ধার করেছিল। সেই লোক।’

‘সেই লোক? তাকে কোথায় পাওয়া গেল?’

‘সেই-ই ত আহত লোক, নানু যাকে কাল ক্লিনিকে ভর্তি করেছিল।’

‘তাকে বাসায় আনা হয়েছে?’

‘হ্যাঁ। আম্মা, নানু কিছুক্ষন আগে তাকে নিয়ে এসেছেন’

‘কেন?’

‘খুব ভাল লোক তিনি’

কথা বলতে বলতে তাতিয়ানা এবং জোসেফাইন দু’তলায় ড্রইংরুমে এসে প্রবেশ করল।

ড্রইংরুমে বসেছিল জিনা ডোনান্ট, জোসেফাইনের মা। সে জোসেফাইনের শেষ কথাটা শুনতে পেয়েছিল। বলল,’কার কথা বলছ জোসেফাইন?’

‘আংকলের কথা বলছি আম্মা। খুব ভাল না?’

‘অবশ্যই ভাল মা। ভাল না হলে পরের জন্য কেউ জীবনের ঝুকি নিতে যায়?’

‘কিন্তু আন্টি, সে লোকটির এ দশা হলো কেন?’ বলল তাতিয়ানা।

‘সেই আলোচনাই এতক্ষণ করে এলাম। বেশি কথা বলে না তো, মেপে মেপে কথা বলে। এতটুকু বলল, যারা তাকে হত্যা করতে চেয়েছিল, তারা তার ব্যক্তিগত শত্রু নয়। একজন ক্রিমিনালকে সে তাড়া করতে গিয়ে এই ঘটনা ঘটেছে।’

‘লোকটির নাম কি?’

‘আব্দুল্লাহ’

‘আব্দুল্লাহ?মানে মুসলমান?’

‘হ্যাঁ’

‘আংকল বলছিলেন বিদেশী। কোন দেশী?’

‘এশিয়ান। চেহারায় মনে হয় তুর্কি’

‘শুনলাম উনি চলে যেতে চান, বাসায় আনলেন যে!’

‘সেদিন প্লেনে সে জোসেফাইনের পাশে বসেছিল। আমি জোসেফাইনের অন্যপাশে ছিলাম।সিটে বসার পর থেকেই তার সুন্দর আর সপ্রতিভ ব্যবহার আমার ভাল লেগেছিল। জোসেফাইনের সাথে কথা বলা দেখে মনে হয়েছে সে যেন আমাদের একান্ত কেউ। তার পর দেখলাম তার ভদ্র ও স্মতার মধ্যে সিংহের শক্তি ও সাহস ও আছে।অদ্ভূত কৌশলে একাই সে হাইজ্যাকারদের কবল থেকে প্লেনের কয়েক’শ মানুষকে রক্ষা করে। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, জেনেভা এয়ারপোর্টে নেমে অলক্ষ্যে সে সরে যায়। প্রশংসা ও পুরষ্কার কিছুই সে নেয়নি।এমন একজন লোক দারুন বিপদে পড়েছে। তাকে কি ক্লিনিকে ফেলে রাখা যায়? ডাক্তার ও নার্স প্রতিদিন একবার করে আসবে।’

‘কোথায় রেখেছেন?’

‘দু’তলায় উঠা-নামা করতে কষ্ট হবে চিন্তা করে একতলায় মেহমান খানায় রেখেছি’ ।

‘ঠিকই হয়েছে। লনে হাঁটতে পারবে।’ কিন্তু তাতিয়ানা মনে মনে বলল,’ খুব ভাল হয়েছে ওকে দু’তলায় না তুলে। একজন অপরিচিতের এইভাবে এখানে থাকার কথায় তাতিয়ানা অস্বস্তি বোধ করছিল।’

‘তুমি যাবে তাকে দেখতে?’

‘না। পরে।’ মুখে একথা বললেও মনে মনে সে বলল,’ সে কেন দেখতে যাবে তাকে?’

‘ও, ভুলে গেছি। তুমি দেখতে যাবে কেন? তুমি ত এমনিতেই অসামাজিক। তাঁর মধ্যে এখনতো আবার ছেলেদের সঙ্গকে আগুনের মত ভয় করে। আচ্ছা বলি, এভাবেই তোমার দিন চলবে?’

‘কেন ভালইতো চলছে আন্টি।’

‘ভালই চলছে? তাহলে অমন বাউন্ডেলে হয়েছো কেন? এদেশ থেকে সে দেশে শুধুই ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন? বলেছিলাম, তোমাকে সুইজারল্যান্ড থেকে যেতে দিবনা।’

‘এমন শাসনের কণ্ঠ ভালই লাগছে আন্টি।’ বলতে বলতে তাতিয়ানার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। সেখানে পাতলা বেদনার একটা আস্তরন।

কথা শেষ করেই তাতিয়ানা ছুট দিল তাঁর ঘরের দিকে।

সেদিনই বিকেল।

জিনা ডোনান্ট সেদিনের আনা বাজার ফ্রিজের শেল্পে সাজিয়ে রাখছিল। পাশেই দাঁড়ানো তাতিয়ানাকে বলল, ‘যাও তো এক গ্লাস গরম পানি মেহমানের টেবিলে রেখে চায়ের ট্রলিটা নিয়ে এস। না আপত্তি আছে যেতে?’

‘না আপা যাচ্ছি।’ বলে তাতিয়ানা এক গ্লাস গরম পানি একটা পিরিচের উপর রেখে আরেকটা পিরিচে ঢেকে দু’হাত দিয়ে ধরে নিয়ে চলল অসুস্থ আবদুল্লাহ নামের আহমদ মুসার ঘরের দিকে।

ঘরের দরজা খোলা ছিল।

দরজায় টাঙানো হয়েছিল পর্দা।

পর্দার ফাঁক গলিয়ে ঘরে প্রবেশ করল তাতিয়ানা।

দরজা সোজাই ভেতরে ঘরের ওপ্রান্তে পাতা ছিল আহমদ মুসার খাট। মাথা ছিল দরজার বিপরীত দিকে। চিৎ হয়ে শুয়েছিল সে। চোখ দু’টি বোজা।

ভেতরে ঢুকতেই তাতিয়ানার চোখ গিয়ে পড়ল আহমদ মুসার মুখের উপর।

চোখ পড়তেই প্রচণ্ডভাবে চমকে উঠল তাতিয়ানা।

পরক্ষনেই দেহ-মন অবশকারী এক প্রবাহ খেলে গেল তাঁর গোটা শরীরে।

তাঁর হাত থেকে গ্লাস পড়ে গেল। দু’টি পিরিচ গ্লাস ভেঙ্গে খান খান হয়ে বিরাট শব্দ করল।

শব্দে আহমদ মুসা চোখ খুলেছিল। দেখতে পেল তাতিয়ানাকে। বিস্ময়ের ধাক্কা তাঁর চিন্তাকেও মুহূর্তের জন্য আচ্ছন্ন করে ফেলল।

ওদিকে শব্দ শুনেই রান্না ঘর থেকে ছুটে এলো জিনা ডোনান্ট। এসে দেখল টলে পড়ে যাচ্ছে তাতিয়ানা। মেহমান এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তাতিয়ানার দিকে। তাঁর চখে-মুখে বিস্ময়।

জিনা ডোনান্ট তাতিয়ানাকে ধরে ফেলল। ধীরে ধীরে তাকে নিয়ে বসাল সে।

তাতিয়ানা সংজ্ঞা হারিয়েছে।

আহমদ মুসা উঠতে যাচ্ছিল।

‘মিঃ আবদুল্লাহ আপনি উঠবেন না। পাশের ঘরে নিয়ে যাচ্ছি একে আমি।’

জিনা ডোনান্ট তাতিয়ানাকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল পাশের ঘরে এবং তাঁর সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টায় লেগে গেল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই স্ট্রেচার নিয়ে এলো দু’জন আয়া।

ততক্ষনে চোখ মেলেছিল তাতিয়ানা।

‘তোমরা একে এর ঘরে শুইয়ে দাও আমি আসছি।’

তাতিয়ানাকে নিয়ে উপরে উঠার সিঁড়ির দিকে চলল দু’জন আয়া।

তাতিয়ানা একবার চোখ মেলেই চোখ বুজেছে।

জিনা ডোনান্ট আহমদ মুসার ঘরে প্রবেশ করল। গ্লাস ও পিরিচের ভাঙ্গা টুকরোগুলো কুড়িয়ে আবর্জনার বাক্সে ফেলে ফিরে এল আহমদ মুসার কাছে। বলল, ‘আপনি তাতিয়ানাকে চিনেন?’

‘অবশ্যই চিনি। তাতিয়ানা এখানে কেন?’

‘আপনার প্রশ্নের জবাব দেব। কিন্তু আমার উত্তর পাওয়া শেষ হয়নি। কিভাবে তাকে চিনেন?’

‘তাতিয়ানা তাঁর আব্বার সাথে ছিল মধ্য এশিয়ায়।’ বলে আহমদ মুসা সংক্ষেপে তাতিয়ানার কিছু ভুমিকার কথা জানিয়ে বলল, ‘তাতিয়ানাকে চিনব না মানে, সে অবিস্মরণীয়। কিন্তু সে কি অসুস্থ?’

জিনা ডোনান্ট কিছুটা আনমনা হয়ে পড়েছিল আহমদ মুসার কাছে তাতিয়ানার কাহিনি শুনে। আহমদ মুসার প্রশ্নের উত্তরে বলল, ‘সে রকম কিছু নয়। তবু আমি দেখি। ওঁর জ্ঞান ফিরেছে।’

বলে জিনা ডোনান্ট তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল আহমদ মুসার ঘর থেকে।

তাতিয়ানা শুয়েছিল চোখ বুজে।

জিনা ডোনান্ট ধীরে ধীরে তাঁর পাশে এসে বসে তাঁর কপালে হাত রাখল।

ম্লান হাসি ফুটে উঠল তাতিয়ানার ঠোঁটে। তাতিয়ানা তার একটা হাত তুলে তাঁর কপালে রাখা জিনা ডোনান্টের হাতের উপর রেখে বলল, ‘এখন নিশ্চয়ই তুমি প্রশ্ন করবে, ‘ওঁর দরজায় গিয়ে হঠাৎ কি হল আমার? হঠাৎ মাথা ঘুরে গেল কেন?’

‘না তাতিয়ানা, এ প্রশ্ন আমি করব না। আমার বিশ্বাস ভালো কিংবা মন্দ প্রচণ্ড এক মানসিক উত্তেজনায় তুমি সংজ্ঞা হারিয়েছ। এ মানসিক উত্তেজনা কেন?’

‘হঠাৎ মাথা ঘুরে গিয়েছিল?’

‘ঘটনার আগ পর্যন্ত তোমার অবস্থার খবর জানি, মাথা ঘুরাবার মত কোন রোগই তোমার নেই। চেনা লোক দেখেই কি?’

তাতিয়ানা চোখ খুলল। হেসে বলল, ‘আপনি ওঁর সাথে কথা বলেছেন দেখছি।’

‘বলেছি। জেনেছি, তোমরা একে অপরকে চেন। এক সাথে তোমরা কিছু কাজও করেছ।’

‘আর কি বললেন উনি?’

‘বলেছেন, তাতিয়ানাকে শুধু চিনি তাই নয়, তাতিয়ানা অবিস্মরণীয়।’

'অবিস্মরণীয় অর্থ কি আপা?'

'যার কোন বিস্মরন নেই।'

'আর স্মরন অর্থ কি?'

'মনে রাখা। এসব অর্থ দিয়ে তোমার কি হবে?'

'মনে রাখা বা ভুলে যাওয়ার ক্ষেত্রটা কি বলত?'

'যে দুরে থাকে তাকে মানুষ স্মরন রাখে বা ভুলে যায়।'

ম্লান হাসি ফুটে উঠল তাতিয়ানার ঠোঁটে। মনে মনে সে বলল, তাতিয়ানা তাঁর কাছের নয়, মাত্র মনে রাখার মত দুরের কেউ। বুকের গভীরে অসহ্য এক যন্ত্রণা জেগে উঠল তাতিয়ানার।

কোন কথা বলল না তাতিয়ানা।

তাতিয়ানার ম্লান হাসি এবং তাঁর মুখে যন্ত্রণার সুক্ষ প্রকাশ দৃষ্টি এড়াল না জিনা ডোনান্টের।

তাতিয়ানার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে জিনা ডোনান্ট বলল, 'একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব?'

'অবশ্যই। শান্ত কণ্ঠে বলল তাতিয়ানা।

'বহুদিন পর পরিচিত কাউকে দেখলে আনন্দিত হবার কথা। কিন্তু তুমি সংজ্ঞা হারিয়েছ এবং দেখতে পারছি তুমি মুষড়ে পড়েছ। কেন?'

তাতিয়ানা হাসল।

উঠে বসল। জড়িয়ে ধরল জিনা ডোনান্টকে। বলল, 'এসব কিছুনা আপা। অনেকদিন পর ওকে দেখে হঠাৎ যেন কি হয়ে গিয়েছিল।'

'ও এমন কে যে, 'পিটার দি গ্রেট'দের কন্যা এতটা অভিভুত হয়ে পড়েছিল'!

তাতিয়ানা তাঁর ডান হাতের তর্জনীটা জিনা ডোনান্টের ঠোঁটে চেপে ধরে বলল, 'ও কথা বলনা আপা, ও কত বড় তা কল্পনারও বাইরে।'

'উনি অসাধারণ সাহসী, কুশলী এবং অত্যন্ত সু-আচরনের সুন্দর মানুষ। কিন্তু তুমি কি বলছ?'

তাতিয়ানা তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, ‘এ প্রসঙ্গ থাক আপা। চল উঠি।’

‘তাতিয়ানা তুমি আমাকে কি মনে করেছ? আমি কি শিশু, আমাকে যা তা দিয়ে বুঝ দিবে? আমাকে বলতে না চাইলে বলো না। আমি শুনার উপযুক্ত না হলে শুনব না। আমাকে বোকা সাজাবার প্রয়োজন নেই।’ বলে জিনা ডোনান্ট অভিমানে মুখ ভার করে চলে যাবার জন্যে উঠে দাড়াতে চাইল।

তাতিয়ানা তাকে জড়িয়ে ধরল। বলল, ‘আপা তোমাকে না বলার কিছু আছে? কিন্তু...?

‘কিন্তু কি?’

‘ব্যাপারটা খুব সাংঘাতিক ধরনের। বলা ঠিক হবে কিনা ভাবছি।’

‘কেন বলা ঠিক হবে না?’

‘ওঁর নিরাপত্তার প্রশ্ন আছে।’

‘ওঁর নিরাপত্তার প্রশ্ন? কে সে?’ চোখ কপালে তুলে প্রশ্ন করল জিনা ডোনান্ট।

‘বলছি। কিন্তু একটা অনুরোধ আপা।’

‘কি?’

‘ওঁর পরিচয় এমনকি আংকেলকেও বলবেনা।’

বিস্ময় দৃষ্টি নিয়ে জিনা ডোনান্ট তাকাল তাতিয়ানার দিকে। বলল, ‘তুমি এমন অনুরোধ করছ কেন? আমি আর আব্বা কি ভিন্ন? তুমি আব্বাকে চেননা?’

‘আমি জানি। তবু অনুরোধ, ওঁর আপত্তি না থাকলে পরে বলবে আপা।’

‘ঠিক আছে তাতিয়ানা তাই হবে।’

তাতিয়ানা আহমদ মুসার পরিচয় দল জিনা ডোনান্টকে।

নাম শুনেই জিনা ডোনান্টের মুখ ‘হা’ হয়ে গেল। জিনা ডোনান্ট কূটনীতিকের কন্যা এবং কূটনীতিকের স্ত্রী। খুব ভালো করেই সে জানে আহমদ মুসাকে।

তাতিয়ানা আহমদ মুসার পরিচয় দিয়ে কথা শেষ করলেও অনেকক্ষণ কথা বলতে পারল না জিনা ডোনান্ট।

‘তাতিয়ানা, আমার স্বপ্ন মনে হচ্ছে। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না যে, আহমদ মুসা আমাদের বাড়িতে, আমাদের মেহমান?’

একটু থামল জিনা ডোনান্ট। তারপর আবার শুরু করল, ‘তাঁর নিরাপত্তার কথা তুমি ঠিকই বলেছ। নিশ্চয়ই কোন বড় ঘটনা ঘটেছে সুইজারল্যান্ডে। আহমদ মুসা ছোট-খাটো ঘটনায় কোথাও যান না। তাঁর আহত হবার ঘটনা নিশ্চয় কোন বড় ঘটনার অংশ।’

‘ঠিকই বলেছ আপা। আমিও তাই মনে করি।’

‘তুমি কি মনে কর এখানে সে নিরাপদ। ক্লিনিক থেকে তাঁর শত্রুরা এ ঠিকানা জেনে নিতে পারে।’

‘নিরাপদ না হলে উনি আসতেন না, ক্লিনিকে থাকতেন। সবদিক না ভেবে কোন সিদ্ধান্ত তিনি নেন না। তবু তুনি ক্লিনিকে সাবধান করে দাও, তোমাদের ঠিকানা তাঁরা কাউকে যেন না দেয়।’

‘ঠিক আছে। কিন্তু তিনি নিচের তলায় থাকবেন, এটা খারাপ লাগছে। যাই হোক তিনি সন্মানের পাত্র।’

‘কিন্তু আংকেল কি বলবেন?’

‘আব্বারই প্রস্তাব ছিল তাকে দু’তলায় রাখা। আমি জোর দেয়ায় একতলায় রাখা হয়েছে। এখন দেখা-শুনার অসুবিধা হচ্ছে বলে ওকে দু’তলায় নেয়া যায়।’

‘হ্যাঁ এটা হতে পারে আপা।’

সেদিনই রাত দশটা।

গ্লাসে দুধ ঢালতে ঢালতে জিনা ডোনান্ট পাশে দাঁড়ানো তাতিয়ানাকে বলল, ‘দুধ কি আহমদ মুসাকে আমাকেই দিয়ে আসতে হবে, না তুমি যাবে?’

‘না। আমি যাব।’ তাতিয়ানার ঠোঁটে সলজ্জ এক টুকরো হাসি।

‘আবার ফেলে দিবে নাতো?’

হাসল। কথা বলল না তাতিয়ানা।

জিনা ডোনাল্ট তাতিয়ানার দিকে মুহূর্তকাল তাকিয়ে থেকে বলল, ‘তোমাকে আমি বুঝতে পারছি না। তোমাকে এমন সংকুচিত, এমন ভেঙ্গে পড়া তো কোন সময় দেখিনি।’

হাসিতে উচ্ছসিত হওয়ার চেষ্টা করে বলল, ‘দাও দুধ।’

বলে দুধের গ্লাস নিয়ে তাতিয়ানা চলল আহমদ মুসার কক্ষের দিকে।

আহমদ মুসাকে বিকেলেই দু’তলায় আনা হয়েছে।

দু’তলার দক্ষিন-পুব দিকের একটা সুন্দর রুম তাকে দেয়া হয়েছে। জানালার ভারি পর্দাটা সরালে শুয়ে থেকেই লেকের আদিগন্ত বুকে চোখ বুলানো যায়।

জ্যোৎস্না প্লাবিত হ্রদের বুকের উপর চোখ মেলে শুয়ে ছিল আহমদ মুসা।

দুধের গ্লাস নিয়ে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল তাতিয়ানা।

চেষ্টা করেও তাঁর বুকের তোলপাড়টা বাঁধা দিয়ে রাখতে পারল না তাতিয়ানা। আহমদ মুসার কাছে এলেই এমন হচ্ছে। তাঁর অবস্থা ডোনাল্ট আপারও নজর এড়ায়নি। অথচ সে চেষ্টা করছে তাঁর মনটাকে শত শক্তি দিয়ে বেধে রাখতে। তাতিয়ানা জানে, আহমদ মুসা পর্বতের মত এক অনড় পাথর। তাঁর বুকের উপর দিয়ে অশ্রুর প্রস্রবন গড়াতে পারে। কিন্তু তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করা যাবে না।

আহমদ মুসা তাঁর বিছানায় শুয়ে তাকিয়েছিল লেকের শান্ত রুপালী বুকের দিকে।

তাতিয়ানা দুধের গ্লাস নিয়ে আহমদ মুসার বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

ভাবল একবার, ‘দুধ টেবিলে রেখে দেবে কিনা। কিন্তু আবার ভাবল, নিজের দুর্বলতা ঢাকতে সে এই অসৌজন্য দেখাতে পারেনা।

‘দুধ এনেছি।’ অনেক প্রস্তুতি নিয়ে বলল তাতিয়ানা।

একটু এগিয়ে এসে তাতিয়ানার হাত থেকে দুধের গ্লাসটা নিতে নিতে ওঁর দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, ‘থ্যাংকস তাতিয়ানা।’

বলে আহমদ মুসা গ্লাস টেবিলে রাখতে যাচ্ছিল।

তাতিয়ানা বাঁধা দিয়ে বলল, ‘না টেবিলে রাখা নয়। ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। এখনি খেয়ে নিন।’

‘ঠিক আছে। খেতে যখন হবে, খেয়ে নেয়াই ভালো।’

আহমদ মুসা দুধ খেয়ে গ্লাস টেবিলে রাখতে যাচ্ছিল।

তাতিয়ানা গ্লাস নিয়ে নিল আহমদ মুসার হাত থেকে। বলল, ‘ঠিক এগারোটায় ঔষধ খাবার সময় আসব।’ বলে চলে যাবার জন্যে ঘুরে দাড়াতে গেল তাতিয়ানা।

‘যেওনা তাতিয়ানা। গ্লাস টেবিলে রেখে চেয়ারটায় একটু বস।’

থমকে গিয়ে তাতিয়ানা বলল, ‘আচ্ছা।’

গ্লাস টেবিলে রেখে চেয়ার টেনে না বসে আহমদ মুসার বিছানার এক প্রান্তে জরো-সরো হয়ে মুখ নিচু করে বসল।

‘কেমন আছো তাতিয়ানা? তুমি কি অসুস্থ?’ বলল আহমদ মুসা।

চকিতে একবার আহমদ মুসার দিকে চেয়ে বলল, ‘কেন একথা বলছেন?’

‘তখন হঠাৎ তুমি সংজ্ঞা হারালে। তাছাড়া তোমার কেমন যেন মনমরা ভাব দেখছি। তুমি তো এমন নও।’

হৃদয়ের সেই যন্ত্রণা অনুভব করল তাতিয়ানা। একটা করুন হাসি ফুটে উঠতে চাইল ঠোঁটে। একটা কথা ভেতর থেকে বুক ফুড়ে বের হতে চাইল, ‘মন তো অনেক আগে মারা গেছে। সেই সেন্ট্রাল এশিয়া থেকে বিদায় নেয়ার সময়। ভেতরটাকে কঠোর শাসন করে বলল, ‘আমি দুঃখিত। আপনাকে কোনদিন দেখব ভাবিনি, তাই হঠাৎ কি যেন হয়ে গিয়েছিল। আমাকে মাফ করবেন। আপনি এখন আমার সামনে, তবুও আমার যেন স্বপ্নই মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে অনেক ঘুমের মত ঘুম ভাঙলেই যেন দেখব সব মিথ্যা।’ কাঁপল যেন তাতিয়ানার কণ্ঠ।

একটু থামল। দম নিল একটা। তারপর বলল, ‘আপনি কেমন ছিলেন? এখানে কি ঘটেছে, আপনার এমন হল কেন?’

‘বলব। কিন্তু তাঁর আগে বল, ‘তুমি কোথায় কি করছ?’

ম্লান হাসল তাতিয়ানা। বলল, 'আমার একাউন্টে আব্বার কিছু টাকা আছে। আব্বার একাউন্টের টাকাও আমি নমিনি হিসাবে পেয়েছি। তাই নিয়ে শুধু ঘুরছি।'

বেদনার একটা খোঁচা লাগল আহমদ মুসার মনে। আহমদ মুসার জন্যেই সে তাঁর আব্বাকে হারিয়েছে, বলতে গেলে স্বজন স্বদেশকে যে পরিত্যাগ করেছে। সর্বহারা হৃদয়কে নিয়ে তাঁর ঘোরা ছাড়া আর উপায় কি!

কোন কথা যোগাল না আহমদ মুসার মুখে। তাতিয়ানার শূন্য দৃষ্টি কি চায়, কিসের সন্ধান করছে আহমদ মুসা জানে। এখানেই নিজেকে অসহায় বোধ করে আহমদ মুসা।

তাতিয়ানাই কথা বলল আবার। বলল, 'এবার আপনার কথা বলুন। আপনি কেমন ছিলেন?'

'এই সময়ে আমি ফ্রান্স, ক্যামেরুন, মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র কঙ্গো ঘুরেছি। মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র থেকে এসেছি এখানে।'

'সব জায়গায় বোধ হয় একই কাজ করেছেন'?

'কি কাজ?'

'লড়াই।'

'আমার পেশাই তো ওটা।'

'হলো না। পেশা নয় মিশন।'

'পেশা নয় বলছ কেন?' হেসে বলল আহমদ মুসা।

'পেশার সাথে বিনিময়ের সম্পর্ক আছে, মিশন মানুষের স্বার্থে নিবেদিত। আপনি যা করছেন, তা কোন কিছুর বিনিময়ে নয়।'

'ঠিক হলোনা। আমিও বিনিময়ে কাজ করছি।'

'কেমন?'

'আমি 'ফি সাবিলিল্লাহ' মানে আল্লাহ্‌র জন্যে কাজ করছি। কিন্তু এর বিনিময় আছে। আল্লাহ্‌ বিনিময়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।'

'যেমন?'

'বেহেশত লাভ।'

‘ও এই বিনিময়ের কথা বলছেন’ হাঁসতে লাগল তাতিয়ানা।

‘একে কেমন মনে করছ তুমি?’

‘এটা বিনিময় হলো? বিনিময় তো হাতে হাতে পেতে হয়। ওটা তো পরকালের কথা।’

‘পরকালের পাওয়াই তো সবচেয়ে বড় পাওয়া। সে পাওয়াটা অক্ষয়। ঐ পাওয়ার প্রতিই আমার লোভ। সুতরাং বলতে পার, বিনিময় ছাড়া আমি কাজ করছি না।’

‘যাক এই প্রসংগ। সুইজারল্যান্ডে আপনার কথা বলুন।’

‘মাফ করবেন। আমি কি ভেতরে আসতে পারি?’ তাতিয়ানার কথা শেষ হবার সাথে সাথেই দরজার পর্দা একটু ফাঁক করে বলল জিনা ডোনান্ট।

‘অবশ্যই, আসুন।’

ঘরে ঢুকল জিনা ডোনান্ট। বলল, দুঃখিত।‘মঁথে’ থেকে তাতিয়ানার টেলিফোন। কথা বলবেন নাতাশা।’

নাতাশা একজন সুইস কূটনীতিকের রাশিয়ান স্ত্রী। সে কূটনীতিকও দীর্ঘদিন ছিলেন মস্কোতে। বিয়েও করেন রাশিয়ায়। নাতাশার পরিবারও পূর্ব থেকেই তাতিয়ানার পরিবারের ঘনিষ্ঠ ছিল। বিয়েও হয় তাঁদের মধ্যতায়।

নাতাশার কথা শুনেই তাতিয়ানা উঠে দাঁড়াল। বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, ‘অনুমতি দিন।’

‘অবশ্যই।’

তাতিয়ানা চলতে শুরু করে বলল, ‘প্রশ্ন কিন্তু সবই থাকল।’

তাতিয়ানা বেরিয়ে গেলে জিনা ডোনান্ট এগিয়ে এসে টেবিল থেকে দুধের গ্লাস নিয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আপনার বেশিক্ষন বসে না থাকা ভাল।’

‘ধন্যবাদ।’ বলে আহমদ মুসা শুয়ে পড়ল।

জিনা ডোনান্ট চারদিক চেয়ে বলল, সব ঠিক আছে। রাত এগারোটায় ওষুধ খেতে হবে।’

বলে জিনা ডোনান্ট চলে যাবার জন্য পা বাড়াল।

'ম্যাডাম, আমার একটা অনুরোধ, ডাক্তারকে বলে কাল যাতে যেতে পারি, সে ব্যবস্থা দয়া করে করুন।'

জিনা ডোনাল্ট হাসল। বলল, 'জানি আপনার কাজ আপনার জীবনের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু জীবন না থাকলে কাজ থাকে না।'

আহমদ মুসা একটু বিস্মিত হলেন জিনা ডোনাল্টের কথার ধরনে। বলল, 'আর কিছু জেনেছেন?'

'প্লেনেই আমি বুজেছিলাম। আপনি সাধারন কেউ নন। পরে প্রশংসা ও পুরস্কার এড়িয়ে যখন আপনি গায়েব হলেন, তখন আবারও মনে হয়ে ছিল আপনি অসাধারণ একজন। কিন্তু আপনি অসাধারনের মধ্যেও যে অনন্য একজন, তা তাতিয়ানার কাছে শোনার পড়েই বুঝলাম। আপনাকে খোশ আমদেদ। আমাদের এই ছোট্ট বাড়িটাকে 'ঐতিহাসিক' করার সুযোগ দেয়ার জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ।'

'আহমদ মুসার এ ফেভার পাবার কারন? তাতিয়ানার সৌজন্যে?'

'আহমদ মুসা ফেভার পাবে না কেন?'

'সে মুলত মুসলিম জাতির জন্যে কাজ করছে।'

'মজলুমের পরিচয় মজলুম। যে কোন জাতিই মজলুম হয়ে দাড়াতে পারে, যেমন এখন মুসলমানরা। জাতির নাম তাঁদের যাই হোক তাঁরা মজলুম। এই মজলুমের পক্ষে দাঁড়ানোর অর্থ মানবতার পক্ষে দাঁড়ানো।'

আহমদ মুসা ধীরে ধীরে উঠে বসল। বলল, 'আপনাকে ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। পক্ষপাতহীন ও মানবতার পক্ষে এমন রায় পশ্চিমে আমি খুব কম শুনেছি।'

'ওয়েলকাম। আমার একটা জিজ্ঞাসা আছে।'

'বলুন।'

'আজ নয়। অনেক রাত হয়েছে। আপনি শুয়ে পড়ুন।'

বলে জিনা ডোনাল্ট 'আসি' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

দুই দিন পর।

আহমদ মুসা বসেছিল তাঁর বিছানায়।

তাতিয়ানা বসে ছিল বিছানার এক প্রান্তে। তাঁর চোখ-মুখ ভারি।

জিনা ডোনাল্ট ঘরে প্রবেশ করল। বলল, ‘গাড়ি রেডি। কিন্তু আবার বলছি, কমপক্ষে আরও দু’টো দিন আপনার রেস্ট নেয়া প্রয়োজন।’

‘আপনাদের আমি সব বলেছি। যে কোন সময় ‘জীবন-হানি’ ঘটতে পারে ওয়ার্ল্ড নিউজ এজেন্সী অথবা ফ্রি ওয়ার্ল্ড টিভি’র কথা ভাবুন।’

‘দেখুন আপনারা যে বিষয়টাকে গোপন রাখছেন তা ঠিক হচ্ছে না। জাতি-বিদ্বেষ বশত দুটি সংবাদ মাধ্যমকে ধ্বংস করার করার যে প্রচেষ্টা চলছে তা বিশ্ববাসীর জানার অধিকার আছে।’

‘সেটা অবশ্যই জানবে। তবে এখন বললে সেটা প্রমান করা যাবেনা। ওদের হাতে-নাতে ধরিয়ে দিতে হবে। আগে প্রচার করলে সেটা পারা যাবে না।’

‘মানছি যুক্তি। এমন অসম লড়াই কি চলে? সেদিন কি হতো যদি একটা গাড়ি ঐ সময়ে না আসতো।’

‘আল্লাহ-এই ভাবেই অসহায়কে সাহায্য করেন।’

‘দুঃখিত। ভুলেই গিয়েছিলাম আপনি আহমদ মুসা। অসাধারণ বিবেচনায় আপনি পথ চলেন।’

‘দুঃখিত। এটা আমার অহংকার নয়। এটা আমার সাধারন বিবেচনা।’

‘ধন্যবাদ।’ হেসে বলল জিনা ডোনাল্ট।

একটু থেমেই আবার বলল, আপনি তাহলে আসুন। আমি ওদিকটা দেখছি।’

বলে জিনা ডোনাল্ট বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়ালো।

তাতিয়ানাও উঠে দাঁড়ালো। টেবিল থেকে ওষুধের প্যাকেট এবং ব্যবস্থাপত্র নিয়ে আহমদ মুসার ব্যাগে ভরে দিয়ে বলল, ‘ব্যবস্থাপত্র দেখে ওষুধ খাবেন। ওষুধের কোর্স শেষ হলে কোন ক্লিনিকে আবার যেতে হবে আপনাকে।’

‘ধন্যবাদ।’

‘ওষুধের কথা, ব্যবস্থাপত্রের কথা, ডাক্তারের কাছে যাবার কথা মনে থাকবে কিনা?’

‘কোনটারই গ্যারান্টি নেই।’

‘তাহলে আমি জেনেভায় যাব।’

‘জেনেভায় যাবে? ওষুধ আমার ব্যবস্থাপত্রের তদারকি করার জন্যে?’

‘ভয় নেই। আমি ওখানে আংকেলের বাসায় থাকব। আপনার সমস্যা সৃষ্টি করবো না।’

‘ধন্যবাদ তাতিয়ানা। তুমি চিন্তা করো না। যেভাবেই হোক আমার নিজের প্রতি প্রয়োজনীয় নজর আমি রাখি।’

‘সুতরাং কেউ যেন নাক গলাতে না যায় এই তো? এটা এক ধরনের স্বেচ্ছা নির্বাসন। এটা চলতে পারে না।’ গলা কাপছিল তাতিয়ানার।

আহমদ মুসা মুহূর্তের জন্য চোখ বুজল। তাতিয়ানার মনের অবস্থা তাঁর কাছে পরিস্কার। কিন্তু কি বলবে সে তাকে। অতীতের মতই সে বিষয়টাকে এড়িয়ে যেতে চায়। বলল, ‘ভেবনা তাতিয়ানা, সেখানে আমি নির্বাসনে নেই। সেখানে অনেক বন্ধু-বান্ধব আছে আমাকে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্যে।’

‘খুশি হলাম। তবে আপনিও জানেন, বন্ধু-বান্ধবরা ওষুধ খাইয়ে দেবার জন্যে দায়িত্বশীল নয়।’ ভাঙ্গা কণ্ঠস্বর তাতিয়ানার।

আহমদ মুসা কোন উত্তর দিল না।

ম্লান হেসে টেবিলে রাখা তাঁর ব্যাগের দিকে হাত বাড়াল।

তাতিয়ানা তাড়াতাড়ি ব্যাগটা তুলে নিয়ে বলল, ‘গাড়ি পর্যন্ত যদি ব্যাগটা বহন করে নিয়ে যাই, তাহলে এটা বড় রকমের কোন নাক গলানো হবেনা নিশ্চয়?’

বলে তাতিয়ানা ব্যাগ নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বলল, ‘চলুন।’

গাড়ি বারান্দায় গিয়ে পৌঁছল আহমদ মুসা এবং তাতিয়ানা।

গাড়ির কাছে দাঁড়িয়েছিল জিনা ডোনান্ট।

একটু দুরে খেলা করছিল জিনা জোসেফাইন।

আহমদ মুসাকে গাড়ির কাছে দেখে ছুটে এল। আহমদ মুসাকে জড়িয়ে ধরে বলল, ‘আংকল আবার কবে আসবেন?’

‘আচ্ছা মা-মনি ভবিষ্যৎ কেউ বলতে পারে?’ তাঁর মাথায় আদরের হাত বুলিয়ে বলল আহমদ মুসা।

‘না, আপনি আসবেন কিনা বলুন। আপনার সেই গল্প বলা শেষ হয়নি।’

‘ঠিক আছে। গল্প তো অসমাপ্ত থাকতে পারেনা। আসতেই হবে তাহলে।’

‘আমি কিন্তু রোজ টেলিফোন করব।’

‘টেলিফোন নাম্বার কোথায় পাবে?’

‘কেন, আন্টির কাছে দেখেছি।’

‘বেশ করো। তবে আমাকে না পেলে গাল দিওনা যেন।’

‘কেন থাকবেন না ঐ টেলিফোনে?’

‘আমার তো নানা কাজ নানা জায়গায় থাকি।’

‘তাহলে ‘সানডে’ তে করব।’

‘আচ্ছা করো।’

তাতিয়ানা আহমদ মুসার ব্যাগ গাড়িতে তুলে দিয়ে গাড়ির দরজা মেলে ধরে বলল, ‘আসুন।’

আহমদ মুসা জিনা জোসেফাইনের কপালে একটা চুমু খেয়ে জিনা ডোনান্টের দিকে চেয়ে বলল, ‘তাহলে আসি। আপনাদের আতিথ্য ও আন্তরিকতার কথা কোন দিনই ভুলতে পারব না।’

‘ধন্যবাদ। আমরা কতটুকু কি করেছি জানি না। কিন্তু আমরা ধন্য বোধ করেছি আপনাকে আমাদের মাঝে পেয়ে। আব্বা টেলিফোন করেছিলেন। তিনি ফিরতে না পেরে দুঃখ করেছেন। তিনি জেনেভায় আপনার সাথে কথা বলবেন।’

‘আমি খুব খুশি হবো। তাকে আমার শ্রদ্ধা দেবেন।’

বলে আহমদ মুসা গুডবাই জানিয়ে গাড়ির দরজার দিকে এগুলো।

তাতিয়ানা দু’হাত দিয়ে দরজা খুলে ধরে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল। আহমদ মুসা জানে মুখ তোলার শক্তি তাঁর নেই। ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল আহমদ মুসার। তাতিয়ানাকে সে কি বলবে? আহমদ মুসা তাকে এড়িয়ে চলছে, কোন প্রশ্রয় দিচ্ছে না, বিষয়টা তাতিয়ানাকে বেশী আহত করছে। ডোনার কথা তাকে বলা দরকার। কিন্তু বলতে চেয়েও বলতে পারেনি। কিন্তু বলতে চেয়েও বলতে পারেনি। পিতৃ-মাতৃহীনা, আত্মীয়-স্বজন থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন- বলা যায়

সর্বহারা এই মেয়েটিকে এত বড় আঘাত সে কেমন করে দেবে! তাই ইচ্ছে করেও আহমদ মুসা মুখ খুলতে পারেনি।

নতমুখী তাতিয়ানাকে বলার মত কোন কথা আহমদ মুসার মুখেও যোগাল না।

শুধু 'ধন্যবাদ তাতিয়ানা' বলে আহমদ মুসা গাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল।

তাতিয়ানা গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিয়ে জানালায় মুখ এনে বলল, 'আসসালামু আলাইকুম।'

বলে একটা ঢোক গিলেই আবার বলল, 'মনে রাখবেন আপনি সুস্থ হননি। কাজ শুরুর আগে আপনার দু'তিন দিন বিশ্রাম প্রয়োজন।' কন্ঠস্বর গম্ভীর তাতিয়ানার।

'ধন্যবাদ তাতিয়ানা।' বলল আহমদ মুসাও গম্ভীর কন্ঠে।

তাতিয়ানা সরে দাঁড়াল জানাল থেকে।

স্টার্ট নিল আহমদ মুসার গাড়ি। চলতে শুরু করল।

গাড়ির দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকল তাতিয়ানা।

তারপর সে জিনা জোসেফাইনের হাত ধরে ধীরে ধীরে উঠে গেল দু'তলায়।

সিঁড়ির মাথায় গিয়ে জিনা জোসেফাইন বাগানের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখ আন্টি, সেই হলুদ পাখিটা আবার এসেছে। আমি যাই।' বলে জিনা জোসেফাইন সিঁড়ি দিয়ে আবার ছুটে নিচে নেমে গেল বাগানের দিকে।

তাতিয়ানা অন্য সময় হলে জোসেফাইনের সাথেই ছুটতো বাগানের দিকে। কিন্তু এখন জোসেফাইনের কথা তার কানে গিয়েও যেন গেল না।

তাতিয়ানা তার ঘরে গিয়ে তার বিছানায় এলিয়ে পড়ল। বালিশ মুখ গুঁজল সে। তার মনে হলো, অকুল সমূদ্রে বহু কষ্টে খুঁজে পাওয়া অবলম্বনকে কে যেন নিষ্ঠুর ভাবে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। হৃদয়ের সমস্ত চাওয়া দিয়ে যাকে সে জড়িয়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছিল, সে নির্দয়ভাবে দূরে সরে গেল।

কান্নার প্রবল এক সাইক্লোন এসে দুমড়ে-মুচড়ে দিল তার বুক। সে সাইক্লোনে উদ্দীপ্ত সাগরের স্রোত এসে আছড়ে পড়ল তার দু'চোখে।

কাঁদছিল তাতিয়ানা।

কান্নার ধাক্কায় ফুলে ফুলে উঠছিল তার দেহ।

জিনা ডোনান্ট ঘরে ঢুকে এ দৃশ্য দেখে বিস্মিত হলো। ক'দিন ধরে যে সন্দেহ সে করছিল, তা সত্য তাহলে! কিন্তু এই ধরনের কান্না কেন? সামান্য বিচ্ছেদে তাতিয়ানার মত মেয়ের জন্যে এ ধরনের কান্না স্বাভাবিক নয়।

জিনা ডোনান্ট ধীরে ধীরে এসে তাতিয়ানার মাথায় হাত রাখল।

তাতিয়ানা মাথা তুলল। জিনা ডোনান্টকে দেখে তাড়াতাড়ি চোখ মুছে কান্না রোধের চেষ্টা করল।

কিন্তু পারল না।

দু'হাতে মুখ ঢেকে আবার কান্নায় ভেঙে পড়ল সে।

জিনা ডোনান্ট তাতিয়ানাকে বুকে টেনে নিল। বলল, 'যা সন্দেহ করেছিলাম, দেখছি তাই সত্য হলো। কিন্তু কাঁদছ কেন? জেনেভা তো আধ ঘন্টার ড্রাইভও নয়। ইচ্ছা করলেই তো গিয়ে দেখে আসতে পারবে!'

কোন উত্তর দিল না তাতিয়ানা।

জিনা ডোনান্টের কথায় কান্না তার আরও বাড়ল।

জিনা ডোনান্ট বুঝতে পারলো না কি বলে তাকে সান্তনা দেবে। শুধু স্নেহের হাত বুলাতে লাগল তার মাথায়।

তাতিয়ানা ধীরে ধীরে শান্ত হলো। রুমাল দিয়ে চোখ – মুখ মুছে বলল, 'স্যরি আপা। তোমাকেও কষ্ট দিলাম।'

'ওসব সৌজন্য রাখ। তোমাদের কি ঘটেছে বলত? তুমি ইচ্ছা করলে জেনেভায় যেতে পারতে।'

তাতিয়ানা কোন কথা বলল না। শুধু তার চোখ দু'টি থেকে আবার দু'টি অশ্রুর ধারা নেমে এল।

জিনা ডোনান্ট তার চোখ মুছে দিয়ে বলল, 'ব্যাপার কি বলত? কিছু ঘটেছে?'

'কিছুই ঘটেনি।' বলল তাতিয়ানা চোখ না তুলেই।

'তাহলে এই কান্না কেন?'

‘এটা আমার একটা অন্যায় আপা।’

‘ভ্রু কুঞ্চিত হলো জিনা ডোনান্টের। ক্ষোভ ফুঠে উঠল চোখে-মুখে। ক্ষুব্ধ কন্ঠে ডাকল, ‘তাতিয়ানা!’

‘জ্বি আপা।’

‘তুমি আমাকে বোকা ঠাওরাতে চাচ্ছ?’

‘স্যরি। না আপা।’

‘তাহলে বল কি ঘটনা?’

‘সত্যিই আপা কোন ঘটনা ঘটেনি।’

‘কিছু বলেছেন তিনি?’

‘কাউকে কাঁদাবার মত তিনি কি কিছু বলতে পারেন?’

‘ঠিক আছে। কিন্তু কিছু ঘটেনি, কিছু উনি বলেনি, তাহলে কি ঘটেছে তোমার?’

তাতিয়ানা কোন উত্তর দিল না। মাথা নিচু করে চুপ করে থাকল।

‘বল, তাতিয়ানা।’

‘কি বলব আপা। আমারই দোষ। আমি সোনা হরিণ ধরতে চাচ্ছি।’

ভ্রু কুঞ্চিত হলো আবার, জিনা ডোনান্টের। হঠাৎ তার চোখে ভেসে উঠল তাতিয়ানার ভবঘুরে জীবনের দৃশ্য। মনে পড়ল জীবন সম্পর্কে তাতিয়ানার হতাশার কথা।

সংগে সংগে চোখে-মুখে উদ্বেগ ফুটে উঠল জিনা ডোনান্টের। বলল, ‘তার মানে উনি তোমাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন?’

তাতিয়ানা একটু সময় নিল জবাব দিতে। ধীরে ধীরে বলল, ‘প্রত্যাখ্যান করলে অন্তত বুঝতাম উনি আমাকে বুঝেছেন।’ ভাঙা গলা তাতিয়ানার।

‘তোমাকে উনি বোঝেননি। মানে উনি কি জানেন না তুমি তাঁকে ভালবাস?’

‘তাও তামি জানি না।’

‘বল কি? তার তরফ থেকে কিছুই জানতে পারনি?’

'না আপা। বরফের মত ঠান্ডা উনি। ওর হৃদয় যেন পাথর। কোন আকাঙ্খা, কোন আকুতিই যেন সেখানে কোন স্পন্দন তোলে না।'

তৎক্ষণাৎ কোন উত্তর দিল না জিনা ডোনান্ট।

উদ্বেগ ও বেদনার একটা ছায়া নেমেছে তার চোখে-মুখে।

সে নীরবে বুকে জড়িয়ে ধরল তাতিয়ানাকে। বলল, 'তুই দেখছি সর্বনাশ করে বসে আছিস। এমন একা একা কান্না তোর কে দেখবে! কেন তাঁকে বলিসনি পরিষ্কার করে সব কথা?'

'ও যদি প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে কষ্ট পায় সেই ভয়ে।'

'উল্টোটাও তো হতে পারে! ও অনেক বড়। সম্পূর্ণ ভিন্ন নৈতিকতার মানুষ। তুই ভূল করেছিস তাকে বুঝতে।'

'আমি জানি না, জানি না।' বলে দু'হাতে মুখ ঢেকে কান্নায় আবার ভেঙে পড়ল তাতিয়ানা।

জিনা ডোনান্ট তার একটা হাত তাতিয়ানার মাথায় বুলিয়ে তাতিয়ানার মুখের কাছে মুখ এনে বলল, 'আমি কি ওঁকে বলব?'

তাতিয়ানা সংগে সংগেই মাথা নেড়ে জানাল, 'না।'

'তাহলে তুমি জেনেভায় ওর কাছে যাও।'

তাতিয়ানা আবার ঐ ভাবেই মাথা নেড়ে বলল, 'না! ও এক সাংঘাতিক কাজে এখন মনোযোগ দিয়েছেন। এখন নয়।'

'তাহলে তুমি এর মধ্যে গিয়ে 'মঁথে' নাতাশার ওখান থেকে ঘুরে এস। আলপস-এর বরফের রাজ্যে গেলে ভিন্ন এক স্বাদ পাবে।'

ঘরে ঢুকল এ সময় জিনা জোসেফাইন।

তাতিয়ানা তাড়াতাড়ি চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল।

জিনা ডোনান্টাও।

# ৬

‘প্রথম ব্যর্থতার একটা যুক্তি আছে। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যর্থতার কি যুক্তি আপনাদের কাছে আছে?’ তীব্র কন্ঠে বলল ব্ল্যাক ক্রস প্রধান সাইরাস শিরাক।

জেনেভায় ব্ল্যাক ক্রসের অফিস। সাইরাস শিরাকের সামনে বড় টেবিলটা ঘিরে বসেছিল জেনেভা ব্ল্যাক ক্রস-এর চার শীর্ষ ব্যক্তি।

তাদের মুখ নিচু। কোন জবাব দিল না তারা।

আবার মুখ খুলল সাইরাস শিরাকই। বলল, ‘দ্বিতীয় ব্যর্থতার ঘটনায় দেখা যাচ্ছে, ঘটনাচক্রে আমাদের সে মিশন ব্যর্থ হয়নি। প্রমাণ হচ্ছে, সুপরিকল্পিতভাবে ফাঁদ পাতা হয়েছিল আমাদের ধরার জন্যে। ভাগ্যক্রমে পালাতে পেরেছিলে। কেন তোমাদের এই ব্যর্থতা?’

‘আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না। তারা যদি আমাদের সন্দেহ করতো, তাহলে অবশ্যই পুলিশের সাহায্য নিত কিন্তু পুলিশ কিছুই জানে না।’ বলল মিঃ পল।

‘কিন্তু তারা সন্দেহ করেছে এটা তো সত্য?’

‘সত্য বলেই তো বিস্ময়। এ সাহস তারা পেল কোথায়? তারা নিজেরা আমাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হবে, এটা কল্পনাও করা যায় না।’

‘কিন্তু তা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। WNA এবং FWTV-এর সাংবাদিক-কর্মচারীদের অফিস ও বাসার খবর জান?’

‘জানি, সেখানে সর্বাত্মক সতর্কতা।’

‘জানি, তারা নিজস্ব গাড়িতে চড়া কমিয়ে দিয়েছে। যারা চড়ে; তাদের গাড়ি সার্বক্ষণিক পাহারায় থাকে?’

‘জানি।’

‘এর অর্থ কি?’

‘তাদের কাছে আমাদের সিসি মাছির ব্যাপারটা ধরা পড়ে গেছে।’

‘তাহলে তারা পুলিশকে জানাচ্ছে না কেন, খবর নিয়েছ?’

‘এটাই এখন বড় রহস্য।’

‘প্রথম ব্যর্থতার ঘটনায় রেনেন তুমি যাকে দেখেছিলে, দ্বিতীয় ব্যর্থতার ঘটনায় যার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলে, তারা এক লোক কিনা?’

‘পোশাক ভিন্ন ছিল, কিন্তু তাদের এক লোক বলেই মনে হয়েছে।’

‘আমার বিশ্বাস, এই-ই আসল লোক। এ ঘটনার মোড় পাল্টে দিয়েছে। তোমরা অপদার্থ তাকে বাগে পেয়েও শেষ করতে পারনি।’

‘একজন এশিয়ান কি এতবড় কেউ হতে পারে?’

‘সে কি এশিয়ান?’

‘হ্যাঁ এশিয়ান।’

ভ্রু কুঞ্চিত হলো সাইরাস শিরাকের। বলল, ‘এশিয়ানদের ছোট ভাবছ কেন? আহমদ মুসা তো এশিয়ান।’

‘সে কি আহমদ মুসা?’ কন্ঠে বিস্ময় ঝরে পড়ল মিঃ পলের।

‘নিশ্চিত করে বলা যাবে না। তবে কাজ দেখলে তার কথাই মনে হয়। আবার সুইজারল্যান্ড এমন কিছু আন্তর্জাতিক ঘটনা ঘটার কথা প্রচারিত হয়নি, যে কারণে তার মত লোক এখানে আসতে পারে।’

বলে একটু থেমেই আবার সে বলল, ‘সেদিন লোকটিকে তোমাদের জীবন্ত ছেড়ে দেয়া ঠিক হয়নি। আর লোকটি ক্লিনিক থেকে কোথায় গেল খুঁজে বের করতে পারলে না?’

‘ওদের রেকর্ডে কিছুই নেই। নিজের ইচ্ছাতেই রিলিজ নিয়েছে। একজন মহিলা ও একজন পূরুষের সাথে একটি প্রাইভেট গাড়িতে করে চলে গেছে।‘জেনেভা’ না ‘মরজে’তে গেছে কেউ বলতে পারছে না।’

চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজেছিল সাইরাস শিরাক। মিঃ পল থামলে সে সোজা হয়ে বসে বলল, ‘যাই হোক, আমাদের পরিকল্পনা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে। যেভাবে আমরা এগুচ্ছিলাম, সেভাবে আর এগুনো যাবে না। এখন বল কোন পথে এগুবে। আমি চাই, সংবাদ সংস্থা দু’টি বন্ধ হোক।’

'আমরা চাচ্ছিলাম, সিসি মাছি রহস্যকে আড়ালে রাখতে এবং তার সাথে আমাদের ষড়যন্ত্রটাকেও আড়াল করতে। যে কোন ভাবেই হোক সিসি মাছি রহস্যটা ধরা পড়ে গেছে এবং এটা ষড়যন্ত্রেও ফল তাও ধরা পড়ে গেছে। কিন্তু এ ষড়যন্ত্রের পেছনে কারা আছে এটা অবশ্যই ধরা পড়েনি।' বলল রেনেন।

'কেমন করে বলছ ধরা পড়েনি। আমাদের ঘাঁটি কিংবা আমরা আক্রমণের শিকার হইনি বলে?' বলল সাইরাস শিরাক।

'হ্যাঁ তাই।'

'তোমার অনুমানের পেছনে আর কি যুক্তি আছে?' সাইরাস শিরাক বলল।

'তারা আমাদেরকে অথবা আমাদের অবস্থান চিহ্নিত করতে পারলে অবশ্যই তারা পুলিশের আশ্রয় নিত। তারা এখন যেটা করছে সেটা আত্মরক্ষার কাজ। তারা বাঁচতে চাইলে তাদের আক্রমণাত্মক হতে হবে এবং তা হতে হবে পুলিশের মাধ্যমে।'

'তারা তোমাদের ধরার জন্যে তাড়া করেছে দীর্ঘ ৪০ মাইল পথ, এটা কি আক্রমণাত্মক কাজ নয়?' সাইরাস শিরাক বলল।

'সব জেনে-শুনে যে আক্রমণ সেটা বড় ধরনের কোন আক্রমণ নয়। ঘটনা চক্রে এ সুযোগ তারা পেয়েছে।'

'তোমরা কি খোঁজ নিয়েছ, এই ঘটনার পর তারা পুলিশকে বলেছে কিনা?' প্রশ্ন করল সাইরাস শিরাক।

'আজই পুলিশের সাথে কথা বলেছি। তারা বলেছে, এই কেসের ব্যাপারে কোন অগ্রগতি নেই। WNA এবং FWTV কর্তৃপক্ষ সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ আনতে পারেনি, পুলিশের পক্ষেও কিছু বের করা সম্ভব হয়নি।' বলল মিঃ পল, জেনেভা ব্ল্যাক ক্রস প্রধান।

কোন কথা বলল না সাইরাস শিরাক। চোখ বন্ধ করে চেয়ারে হেলান দিল সে আবার। একটু পরে চোখ খুলে বলল, 'এখন বল তাহলে এগুবে কিভাবে?' সাইরাস শিরাকের দৃষ্টি রেনেনের দিকে।

রেনেন সিসি মাছি অপারেশন প্রজেক্টের প্রধান।

রেনেন বলল, ‘সিসি মাছির ব্যাপারটা পুলিশের কাছে ধরা পড়েনি। এটা আমাদের জন্যে এখনও একটা বড় ইতিবাচক দিক। এখনও এই অস্ত্র পূর্ণ কার্যকরী আছে। এই অস্ত্রের এবার গণ ব্যবহার করব।’

‘কিভাবে?’

‘সংবাদ সংস্থা দু’টির বিল্ডিং- এর নক্সা জোগাড় করেছি। সংস্থা দু’টির মিটিং এ্যারেঞ্জমেন্ট ও টাইম- সিডিউল জোগাড় করেছি। সংস্থা দু’টিতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় স্টাফ মিটিং হয় একটি হল রুমে। সেখানে শীর্ষ থেকে সিনিয়র সবাই হাজির থাকে। সেখানে আমরা সিসি মাছি ছেড়ে দিতে পারি।’

‘কিন্তু কিভাবে?’

‘দু’টি মিটিং রুমই অফিস দু’টির পেছন সাইডে। একটার পেছন দিকের পরবর্তী বিল্ডিং একটা ৫ তলা কারপার্কিং। অন্যটার ব্যাকওয়ার্ড সাইডে আছে একটা গোডাউন। সুতরাং আমরা নির্বিবাদে স্যানিটারী সার্ভিসম্যানদের ইউনিফর্ম পরে মিটিং রুমের জানালায় ড্রিলিং করে পাইপের মাধ্যমে কয়েক ডজন ক্ষুধার্ত সিসি মাছি মিটিং রুমে ছেড়ে দিতে পারি।’ বলল রেনেন।

‘তোমার বুদ্ধি মন্দ নয়, তবে এত ঝামেলা করার চেয়ে আমরা মিটিং রুমটাই তো উড়িয়ে দিতে পারি।’ সাইরাস শিরাক বলল।

‘ওতে ঘটনার স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়ে যাবে। প্রমাণ হবে সংস্থা দু’টি শত্রুর ষড়যন্ত্রের শিকার। এর রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া হবে গোটা দুনিয়া ব্যাপী।’

‘তোমার সিসি মাছিও তো ধরা পড়ে যাবে। প্রমাণ হবে ওটাও ষড়যন্ত্র।’

‘এটা প্রমাণ করা কঠিন হবে। ড্রিলিং করা ফুটো বুঝিয়ে দেয়া হবে সংগে সংগেই। আর সেই সময় বিদ্যুত যাবে কয়েক মিনিটের জন্যে। সে ব্যবস্থাও করা হয়েছে। সেই অন্ধকারে মানুষ কিছুই দেখবে না, কিন্তু মানুষের রক্তের গন্ধে পাগল সিসি মাছিগুলো ঠিক গিয়ে বসে যাবে লোকদের ঘাড়ে অথবা কানের পাশটায়। ঘাড় ও কানের পাশটা তাদের একটু চুলকাবে। ব্যস। আমাদের কাজ শেষ। চুলকানোর পর থাবা মেরে বা চুলকিয়ে সিসি মাছি নিজের অজান্তেই তারা মেরে ফেলবে। পরক্ষণেই আসবে আবার আলো। কারণ সার্কিট ব্রেকারের ক্রটিটা ততক্ষণে ঠিক হয়ে যাবে। আলো আসার পর দু’একটা মাছি থাকলেও তা তাদের

দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম থাকবে। কারণ সিসি মাছি টিউবে নিষিক্ত হবার পর তার হিংস্রতা বেড়ে যাবে, কিন্তু উড়ার শক্তি ও আগ্রহ তার কমে যাবে।'

'তার মানে আগের মৃত্যুগুলোর মতই এই গণ মৃত্যু রহস্যের আড়ালে ঢাকা থাকবে।' সাইরাস শিরাক বলল।

'আমি তাই মনে করি। গণমৃত্যু ওদের হলেও মৃত্যু তাদের এক জায়গায় হবে না। সময় ও অবস্থান হিসেবে কারও মৃত্যু হবে অফিসে, কারও বা বাড়িতে, আবার কারও হবে রাস্তায়। কিন্তু সকল মৃত্যুর উৎস যে মিটিং রুম তা কারও চিন্তাতেই আসবে না। অতএব সেখানে কোন অনুসন্ধানও হবে না।'

'ব্রাভো, ব্রাভো। ধন্যবাদ মিঃ রেনেন। চমৎকার তোমার পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা কার্যকরী হলে সংবাদ মাধ্যম দু'টি সেদিনই বন্ধ হয়ে যাবে।' আনন্দে টেবিলে মুষ্টাঘাত করে উচ্চস্বরে বলল সাইরাস শিরাক।

'শুধু বন্ধ হয়ে যাওয়া নয়, সংস্থা দু'টির মালিক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলাও দায়ের হতে পারে ক্ষতিপূরণ দাবী করে অথবা এসব ঘটনার জন্যে তাদের অভিযুক্ত করে।'

'কিন্তু রহস্যের কথা তারা যদি বলে দেয়?' বলল সাইরাস শিরাক।

'বললেও তা প্রমাণ করা কঠিন হবে। তাছাড়া কেন তারা বিষয়টা পুলিকে আগে জানায়নি, কেন তারা গোপন করেছে এজন্যে অভিযুক্ত হবে। এবং তাদের বিরুদ্ধেই এখন এ অভিযোগ উঠতে পারে যে, ষড়যন্ত্রটি তারাই করেছে বিশেষ উদ্দেশ্যে।' বলল রেনেন।

'ঠিক বলেছ রেনেন। তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করছি। তোমাকে ধন্যবাদ।'

থেমে একটা দম নিল সাইরাস শিরাক। তারপর বলল, 'তোমার পরিকল্পনা দ্রুত কার্যকরী করার ব্যবস্থা করা দরকার। কঁতদূর এগিয়েছ।'

'খোঁজ-খবর নেয়া প্রায় সম্পূর্ণ। আমার সিসি বাহিনীও রেডি। এখন একটা দিন-ক্ষণ ঠিক করে এগুলেই হয়ে যায়।' বলল রেনেন।

'তোমার সিসি বাহিনীর সংখ্যা কত এখন?' বলল সাইরাস শিরাক।

‘ছিল তিন ডজন। কিন্তু হ্রদের ঘাঁটিতে যে পরিবেশ ওদের রাখা হয়েছে তাতে ওদের বংশ বৃদ্ধিও ঘটেছে। তিন ডজন এখন মনে হয় ৬ ডজনেরও বেশী দাঁড়িয়েছে।’

‘ধন্যবাদ। বিরাট বাহিনী। দেখো, এই বাহিনী আমাদের ভাগ্য খুলে দেবে।’

‘ইশ্বর তাই যেন করেন মিঃ সাইরাস।’ বলল মিঃ পল।

টেলিফোন বেজে উঠল।

রেনেন উঠল টেলিফোন ধরার জন্যে।

সাইরাস শিরাকও উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘আমি ওদিকে আছি।’

বলে সে দরজার দিকে পা বাড়াল।

‘আমাদের অবস্থার কথা বলছেন? আপনাকে হারিয়ে আমরা আতংকে উদ্বেগে দিশাহারা। পুলিশে খবর দেব না কি করব কিছুই বুঝতে পারছিলাম না আমরা। ভাবছিলাম, সিসি মাছির সব ব্যাপার পুলিশকে বলে পুলিশের আশ্রয় নেই।...’

বলছিল WNA-এর চেয়ারম্যান জামাল গটেফ। তার কথার মাঝখানেই আহমদ মুসা বলে উঠল, ‘সর্বনাশ ...’

আহমদ মুসার কথার মাঝখানেই জামাল গটেফ আবার বলে উঠল, ‘সর্বনাশ হতে যাচ্ছিল, কিন্তু হয়নি। এক তরুণী রক্ষা করেছেন।’

‘এক তরুণী রক্ষা করেছেন?’

‘হ্যাঁ, এক বিস্ময়কর তরুনী উদয় হয়েছিল।’

‘বিস্ময়কর তরুণী? কিভাবে সে রক্ষা করল?’

‘তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন, পুলিশে খবর দেয়া যাবে না, জনাব আহমদ মুসা পুলিশের কাছে যা প্রকাশ করতে বলেননি, তা প্রকাশ করা যাবে না। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে, পারলে নিজেরা কিছু করতে হবে।’

এবার আহমদ মুসার কাছে অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেল তরুণীটি কে হতে পারে। বলল সে, 'নিশ্চয় তরুণীটি ডোনা জোসেফাইন।'

'জি হ্যাঁ। মারিয়া জোসেফাইন। ডোনা জোসেফাইনও তার নাম।' বলল গটেফ।

বলে একটু থেমেই আবার গটেফ শুরু করল, 'মেয়েটি ভীষণ বুদ্ধিমতী ও সাহসী। সেদিনের পর প্রতিদিন সে যোগাযোগ করছে। হঠাৎ তাঁর আগমন না ঘটলে উদ্বেগ-আতংকে আমাদের অবস্থা যে কি হতো বলতে পারি না।'

'কিন্তু একজন অপরিচিত মেয়েকে কিভাবে আপনারা বিশ্বাস করে সব কথা বললেন?'

'কোথায় অপরিচিত, সে তো আপনাকে চেনে?'

'কিন্তু সেটা তো আপনারা জানেন না। কোন শত্রু তো এভাবে মিথ্যা কথা বলতে পারতো।'

কিছুটা গম্ভীর জামাল গটেফ। বলল, 'তা পারতো। কিন্তু তিনি যেভাবে বলেছেন, সেভাবে পারতো না। শুধু তো আমি না। সেদিন মিটিং-এ সবাই হাজির ছিলেন। তার কথা সবাই এক বাক্যে বিশ্বাস করেছিলেন।

হাসল আহমদ মুসা। ঠিকই বলেছেন, 'সত্যের আলাদা একটা শক্তি আছে। মেয়েটি কোথায়?'

'ফাতেমা হিরেন বলতে পারবে। ওঁর সাথেই যোগাযোগ। কিন্তু বলুন তো? বিস্ময়কর মেয়েটি আসলে কে?'

'ফ্রান্সের 'লুই' রাসপরিবারের বোধহয় একমাত্র রাজকন্যা।'

জামাল গটেফ কিছুক্ষণ 'হা' করে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'তাই বলুন। একজন অপরিচিত মেয়ে অপরিচিত পরিবেশে এসে যে 'কমান্ড' করল তা রাজকীয়ই বটে। কিন্তু ফরাসী রাজকুমারী এখানে কেন? তার ইসলাম গ্রহনের ব্যাপারটাই বা কি?'

'যে কেউ তো ইসলাম গ্রহন করতে পারে।'

'কিন্তু এখানে আসা তার মত রাজকুমারীর?'

'কিন্তু সে তো এখন রাজকুমারী নয়।'

‘তবু তার আসাটা?’

আহমদ মুসা একটু হাসল। বলল, ‘সব প্রশ্নের উত্তরই একসাথে পাওয়া যায় না। সময় অনেক প্রশ্নের উত্তর আপনাতেই পরিষ্কার করে দেয়। আবার অনেক প্রশ্ন এমন আছে, সরাসরি যার জবাব খুবই বিব্রতকর হতে পারে।’

জামাল গটেফ হাসল। বলল, ‘আমার শেষ প্রশ্নটি কি তেমন ধরনের?’

‘কতকটা তাই।’ আহমদ মুসার ঠোঁটে লজ্জা মিশ্রিত হাসি।

‘মাফ করবেন। আমার প্রশ্ন জেরার মত হয়েছে। যা অসুন্দর অবশ্যই। কিন্তু মন মানছিল না। আলমাহদুলিল্লাহ, আমি জবাব পেয়ে গেছি। মুবারক হোক আপনাদের পবিত্র সম্পর্ক। আমাদের গর্ব আহমদ মুসা যোগ্য সাথী খুঁজে পেয়েছেন।’

গম্ভীর হয়ে উঠেছে আহমদ মুসার মুখমন্ডল। বলল, ‘মিসেস ফাতেমা হিরেন কি অফিসে আছেন?’

‘আছেন। কথা বলবেন?’

‘হ্যাঁ। যদি ডাকেন।’

‘কোন মহিলা সাংবাদিক কর্মচারীকে সম্মিলিত কোন মিটিং ছাড়া কোন কক্ষে ডেকে কথা বলা হয় না। ইন্টারকমে কথা বলা হয়। অথবা কাঁচঘেরা সাক্ষাতকার কক্ষে গিয়ে কথা বলা যায়।’

‘ধন্যবাদ। এটাই ইসলামী নিয়ম। তাহলে ইন্টারকমে ওঁর সাথে লাইন করে দিন।’

ইন্টারকমে ফাতেমা হিরেনের সাথে সংযোগ হওয়ার পর আহমদ মুসা ডোনা কোথায় জানতে চাইল।

ফাতেমা হিরেন বলল, ‘আজ সকালে ওরা ‘ম্যাটার হর্ণ’- এ গেছেন।’

‘ম্যাটার হর্ণ’ বলা যায় সুইজারল্যান্ডের শ্রেষ্ঠ পর্যটন কেন্দ্র। সেখানে কেউ ‘স্নো-স্কি’ করতে যায়, কেউ দেখতে যায়। সবচেয়ে বড় কথা ওখানে দাঁড়িয়ে আল্পস পর্বতমালার অপরূপ দৃশ্য দেখা যায়।

‘ওরা মানে আর কে আছে?’

‘মারিয়া জোসেফাইন আপা এবং তাঁর আব্বা।’

‘ওরা কোথায় উঠেছেন?’

‘উঠেছেন একটা ট্যুরিষ্ট কটেজে। তবে মাঝে মাঝে আত্মীয়ের বাড়িতেও থাকবে। টেলিফোন নম্বার দেব দু’জায়গার?’

আহমদ মুসা টেলিফোন নম্বারগুলো লিখে নিয়ে বলল, ‘আপনি ওর সাথে কবে কথা বলেছেন?’

‘প্রতিদিন কয়েকবার করে কথা হয়। আজ ওরা যাবার আগে মিস মারিয়া আমার সাথে কথা বলেছেন।’

একটু থেমেই ফাতেমা হিরেন আবার বলল, ‘জানেন আরও কি বলেছেন?’

‘কি বলেছেন?’

‘বলেছেন, আপনি শত্রুর হাতে ধরা পড়েননি।’

‘তাই বলেছেন? কি করে জানলেন?’

‘আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। বলেছেন, আপনি শত্রুর হাতে ধরা পড়লে আমাদের দু’টো প্রতিষ্ঠানে আরও আক্রমণ হতো, থেমে যেতো না। আক্রমণ থেমে যাবার অর্থই হলো শত্রু পর পর দু’বার ব্যর্থ হবার পর পুরনো কৌশল নিয়ে সামনে এগুতে দ্বিধা করছে। আহমদ মুসা তাদের হাতে থাকলে বা আহমদ মুসাকে তাদের পথ থেকে সরাতে পারলে তারা এই দ্বিধা করতো না।’

‘ওর অনুমান ঠিক।’

‘ঠিক না হয়ে পারে। কে উনি দেখতে হবে তো!’

‘আপনি দেখছি তার অনেক কিছু জানেন?’

‘আমাদের ‘ভাবী’র অনেক কিছু জানব সেটাই তো স্বাভাবিক।’

‘দোয়া করুন আমাদের জন্যে।’ গম্ভীর কন্ঠে আহমদ মুসা বলল।

‘আমরা ভাগ্যবান এবং আনন্দিত যে, দু’জনকে এক সাথে দেখার সৌভাগ্য হলো।’

‘ধন্যবাদ। ওরা কবে ফিরবেন বলেছেন?’

‘বলেননি।’

আহমদ মুসা সালাম দিয়ে টেলিফোন রেখে দিয়ে জামাল গটেফকে লক্ষ্য করে বলল, ‘এখন উঠি।’

‘অবশ্যই উঠবেন। কিন্তু আমাদেরকে কিছু আশার কথা শোনান। আমরা সবাই আতংকে প্রতি মুহূর্তে ভাবছি, কোন দুঃসংবাদ কোত্থেকে আসে।’

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘ডোনা জোসেফাইন মিসেস ফাতেমা হিরেনকে যে কথা বলেছেন, সেটা আপনাকে শোনাই। তিনি বলেছেন, ‘দু’টি সংস্থার উপর শত্রুর আক্রমন বন্ধ থাকাই প্রমাণ করে আহমদ মুসা শত্রুর হাতে পড়েননি। দু’বার ব্যর্থতার পর শত্রু এখন দ্বিধ্যগ্রস্ত। কোন পথে তারা এগুবে চিন্তা করছে।’

উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠল জামাল গটেফ। বলল, ‘ঠিক। কিন্তু এভাবে আমরা চিন্তা করতে পারিনি। ঠিক তাদের আক্রমণ এ কারণেই বন্ধ আছে। সত্যি মিস মারিয়া জোসেফাইনের বিচার-বুদ্ধি বিস্ময়কর।’

‘আমি এখন উঠি জনাব। পরে দেখা হবে।’ বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

জামাল গটেফও উঠে দাঁড়াল। বলল,‘এখন তাহলে আমাদের করনীয়?’

‘চিন্তা করছি। মোরজে’র রাস্তায় সেই ঘটনার সময় ওদের একজনের একটা মানি ব্যাগ পড়ে গিয়েছিল। সেটা আমি পরে পেয়েছি। তাতে এক চিরকুটে একটা টেলিফোন নম্বার আছে। এই ক্লু ধরে একটু এগুবার চেষ্টা করে দেখি।’

বলে আহমদ মুসা সালাম দিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল।

জামাল গটেফ সালাম নিয়ে বলল,‘আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।’

আহমদ মুসা কটেজে ফিরে টেলিফোন নম্বারটা নিয়ে অনেক ভাবল। টেলিফোন করে যাচাই করার চিন্তা সে বাদ দিয়ে দিল। টেলিফোন নম্বারটা যদি সত্যিই ব্ল্যাক ক্রস-এর কারো হয়, তাহলে তার টেলিফোন তাদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করতে পারে। কোন প্রকার সন্দেহের সুযোগ আহমদ মুসা তাদের দিতে চায় না।

টেলিফোন গাইড থেকে টেলিফোন নম্বারটির ঠিকানা নিয়ে সে দেখল, উত্তর জেনেভায় অবস্থিত লেক আইল্যান্ডের ৯৯নং বাড়ির টেলিফোন নম্বার এটি। নাম অনুসারে বাড়িটা একটা কমার্শিয়াল টিভি স্টুডিও।

হতাশ হলো আহমদ মুসা। অমন একটা কমার্শিয়াল স্টুডিও ব্ল্যাক ক্রস-এর ঘাঁটি নয় নিশ্চয়। আক্রমণকারীদের কেউ হয়তো অভিনয়ের সাথে জড়িত ছিল। তারই মানিব্যাগে ছিল নম্বারটা। যাচাই না করে শুধু অনুমানকে সত্য বলে ধরে নেওয়াও আহমদ মুসা ঠিক মনে করলো না।

পরদিন রাত ৯টা।

আহমদ মুসা লেক আইল্যান্ডে যাবার জন্যে তৈরী হয়েছে।

বেরুবার আগে সে টেলিফোন করল ফাতেমা হিরেনকে। জানতে চাইল ডোনা জোসেফাইনের কোন খবর আছে কিনা।

ফাতেমা হিরেন বলল, 'না এ দু'দিন কোন টেলিফোন আসেনি।'

'মি. জামাল গটেফকে টেলিফোন করে পেলাম না। তার জন্যে একটা মেসেজ কি আমি আপনাকে দিতে পারি?'

'অবশ্যই। আপনার কোন কাজে আসতে পারা আমার জন্যে সৌভাগ্যের।'

'আমি একটা ঠিকানায় যাচ্ছি, মিঃ জামাল সেটা জানতে চেয়েছিলেন। আপনি দয়া করে লিখে নিন।'

বলে আহমদ মুসা লেক আইল্যান্ডের সেই বাড়িটার নম্বার এবং টেলিফোন নম্বার তাকে দিয়ে দিল।

টেলিফোন শেষ করে আহমদ মুসা বেরিয়ে এল রাস্তায়।

একটা ট্যাক্সি ডেকে তাতে উঠে বসল।

ড্রাইভারকে লেক আইল্যান্ডে যেতে বলে সিটে গা এলিয়ে দিল সে।

বেশ অনেকটাই পথ।

দক্ষিণ জেনেভা থেকে যেতে হবে উত্তর জেনেভায়। লেক আইল্যান্ড উত্তর জেনেভারও উত্তর প্রান্তে। লেক জেনেভারই একটা উপদ্বীপ এটা।

রাতের অপেক্ষাকৃত ফাঁকা রাস্তা।

বিশ মিনিটেই আহমদ মুসা পৌঁছে গেল লেক আইল্যান্ডের কেন্দ্র বিন্দুতে।

'কোথায় যাবেন স্যার?' ফরাসী ভাষায় ড্রাইভার বলল।

'লেকভিউ স্টুডিও তুমি চেন?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'কত নম্বার স্যার?'

আহমদ মুসা নম্বার বললে সে বলল, 'লোকেশানটা চিনেছি।' বলে সে গাড়ি স্টার্ট দিল।

ড্রইভার ঠিক তার গাড়িটা নিয়ে দাঁড় করাল ৯৯নং লেক আইল্যান্ড বাড়িটার সামনে।

একদম পানির কিনারায় বাড়িটা। যেন পানি থেকেই উঠে এসেছে।

ড্রইভার গাড়ি দাঁড় করিয়েই বলল, 'স্যার স্টুডিও তো চালু নেই।'

'চালু নেই? কিন্তু সাইনবোর্ড তো দেখছি।' বলল আহমদ মুসা।

'সাইনবোর্ড আছে, কিন্তু স্যার দরজায় 'খোলা' কিংবা 'বন্ধ' নির্দেশক কোন সাইনবোর্ড নেই।'

'এ ধরনের সাইন বোর্ড কি অপরিহার্য?'

'কমার্শিয়াল প্রতিষ্ঠানের জন্যে এটা অপরিহার্যই।'

'ঠিক আছে নেমে দেখি।'

বলে আহমদ মুসা গাড়ি থেকে নামল এবং ড্রইভারকে ভাড়া চুকিয়ে দিল।

নামল, কিন্তু মনটা খারাপ হয়ে গেল আহমদ মুসার। স্টুডিও যদি সত্যিই বন্ধ থাকে, তাহলে তাকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হবে। আর সেই সাথে যে লিংকটার উপর নির্ভর করছিল ক'দিন ধরে, তা ছিন্ন হয়ে যাবে। আবার তাকে হাতড়ে ফিরতে হবে ক'দিন কে জানে!

কিন্তু আবার ভাবল, স্টুডিও বন্ধ হয়ে যাওয়ার অর্থ এখানে কোন লোক না থাকা নয়। তার প্রয়োজন তো স্টুডিও- এর সাথে নয়, এখানে মানুষ থাকলেই তার চলে।

'ধীরে ধীরে বাড়িটার দিকে এগুলো আহমদ মুসা।

তিন তলা বাড়ি।

লেকের তীরে লম্বালম্বি বিল্ডিংটি। বাড়ির মাঝ বরাবর উপরে উঠার সিঁড়ি।

সিঁড়ির মুখে গেট চাইনিজ স্টাইলে তৈরি।

সাইন বোর্ডে নিওন সাইনের আলো ছাড়া বাড়িটার কোথাও এক বিন্দু আলো নেই। সবগুলো জানালা বন্ধ। সবগুলোই লোহার গরাদ এঁটে দেয়া। এমনটা ক্বচিত দেখা যায়। বাড়িতে কেউ না থাকলেই সাধারণত বাড়ি এমনভাবে সীল করা হয়।

আবার সেই সন্দেহটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল আহমদ মুসার মনে, তাহলে বাড়িতে কি কেউ নেই?

আহমদ মুসা গিয়ে দাঁড়াল গেটের সামনে।

দেখল তার দরজা কাঠের হলেও মজবুদ। ইন্টারলক সিস্টেম, তাই বলা মুষ্কিল দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ, না বাইরে থেকে।

আহমদ মুসা ধীরে ধীরে দরজার নব ঘুরাল। দরজা বন্ধ।

আহমদ মুসা পকেট থেকে বের করল 'মাস্টার কী।'

খুলে গেল তালা।

এক ঝটকায় খুলে ফেলল দারজা। বিদ্যুত বেগে একবার চোখ বুলিয়ে নিল সামনে।

কেউ কোথাও নেই।

সামনে ছোটা চার কোণা একটা করিডোর। করিডোরের সামনের প্রান্ত থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে উপরে। সিঁড়ির আলোই ম্লান আলোকে আলোকিত করেছে সামনের করিডোরটিকে। করিডোরের আলো নিভানো।

করিডোরের ডান ও বাম দেয়ালে দু'টি দরজা বন্ধ। এ দু'টি দরজা দিয়ে নিচের তলার দু'পাশের ঘরগুলোতে প্রবেশ করা যায়।

সিঁড়িতে লাইট জ্বলা দেখে আহমদ মুসার মনে আশার সঞ্চার হলো যে, ভেতরে মানুষ আছে।

সিঁড়ির দিকে চাইল আহমদ মুসা। ভাবল উপরে উঠার কথা। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হলো, অনুসন্ধানের কাজটা নিচ থেকেই হওয়া দরকার।

মানুষ থাকলে কোথায় আছে, কতজন আছে, কিছুই তার জানা নেই। সবকিছু দেখে নিশ্চিত হয়েই তার সামনে এগুনো উচিত।

ডানদিকের অংশে প্রথমে প্রবেশের সিদ্ধান্ত নিল আহমদ মুসা।

দরজার নব ঘুরাল।

দরজা প্রধান গেটের মতই বন্ধ। আগের মতই অতি সহজে মাস্টার কী দিয়ে খোলা গেল।

আহমদ মুসা ভাবল খুবই সিম্পল একটা বাড়ি বলে মনে হচ্ছে এটাকে। ব্ল্যাক ক্রসরা তো এত সিম্পল বাড়িতে থাকে না। ডিজিটাল লকের- ব্যবহার সুইজারল্যান্ডে ব্যাপক। তাহলে বাড়িটা কি বন্ধ হয়ে যাওয়া একটা স্টুডিও মাত্র।

ডান অংশের প্রায় সবগুলো ঘরই একে একে দেখা হয়ে গেল। দেখে বিস্মিত হলো, সবগুলো ঘরই সাইন্ড প্রুফ।

হতাশ মনেই ফিরছিল আহমদ মুসা। দৃষ্টি আকৃষ্ট হবার মত কোন ঘরেই কিছু দেখলো না সে।

নিচের তলার লেকের দিক দিয়ে ফিরছিল সে। লম্বা করিডোর। করিডোরের ডান অর্থাৎ লেক প্রান্ত বরাবর দেয়াল। আর বাম পাশে ছোট-বড় বেশ কয়েকটি কক্ষ। সবগুলো রুমই স্যুটিং লোকেশন আকারে সাজানো। আহমদ মুসা ভাবল, নিশ্চয় বিল্ডিংটি স্টুডিও হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। না হলে স্টুডিওগুলো এভাবে থাকতো না।

কাউকে বা সন্দেহজনক কিছু না পেয়ে সন্দেহ জাগছিল আহমদ মুসার মনে গোটা বিল্ডিং কি এভাবেই পরিত্যক্ত?

হঠাৎ আহমদ মুসার চোখে একটা অসংগতি ধরা পড়ল। সে দেখল, ডান পাশের করিডোর বরাবর যে দেয়াল, তার রং একেবারেই নতুন এবং দেয়ালের গায়ে নির্দিষ্ট দূরত্বের ব্যবধানে সমান্তরাল যে লম্বা কাটা তাকেও মনে হচ্ছে খুব নতুন। কিন্তু বাম পাশের ঘরগুলোর যে দেয়াল তার রং বেশ পুরানো।

আহমদ মুসা বুঝল ডান পাশের দেয়াল নতুন অথবা নতুন রং করা।

কিন্তু বিল্ডিং-এর ডিজাইন দেখে দেয়ালটিকে নতুন বলে তার মনে হলো না। তাহলে পুরানো দেয়ালে নতুন রং করা হয়েছে। কিন্তু ঘর বাদ দিয়ে শুধু দেয়ালে রং কেন?

আরও একটা অসংগতি ধরা পড়ল আহমদ মুসার চোখে। একটা পেইন্টিং টাঙানো আছে ডান পাশের দেয়ালে। প্রথমত, এমন অফসাইড দেয়ালে পেইন্টিং থাকার কথা নয়। দ্বিতীয়ত, পেইন্টিংটা দেয়ালের অসংগতত জায়গায় টাঙানো। রীতি অনুসারে পেইন্টিংটা টাঙানোর কথা দেয়ালের মাঝবরাবর, কিন্তু টাঙানো হয়েছে এক পাশে।

এমন অসংগতি স্বাভাবিক নয় আহমদ মুসা ভাবল। তাহলে এই অস্বাভাবিকতা কেন?

আগমদ মুসা গিয়ে পেইন্টিংটির সামনে দাঁড়াল। আলপস-এর খুবই পরিচিত একটা ল্যান্ডস্কেপ। বলা যায় পর্যটন বিভাগের বিজ্ঞাপনী চিত্রের মত। দেয়ালে রং করে এমন একটা চিত্র এখানে টাঙানোর কোন যৌক্তিকতাই আহমদ মুসা খুঁজে পেল না।

আহমদ মুসা পেইন্টিংটি নামিয়ে নিল হাতে।

পেইন্টিং সরিয়ে নেবার সংগে সংগে আহমদ মুসার দৃষ্টি উন্মুক্ত জায়গার দু'টি বোতামের উপর নিবদ্ধ হলো। একটি লাল ও একটি সাদা।

হঠাৎ আহমদ মুসার চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। লুকানো এ দু'টি বোতাম কোন নতুন পথের সংকেত কি?

বোতাম দু'টির সাধারণল অর্থ খুবই পরিষ্কার। সাদা বোতাম পজিটিভ, আর লাল বোতাম নেগেটিভ। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই পজিটিভ ও নেগেটিভের পেছনে কোন রহস্য রয়েছে!

আহমদ মুসা ভাবল কোন প্রশ্ন পেছনে রেখে সামনে এগুনো ঠিক নয়।

আহমদ মুসা চাপ দিয়ে দেখল রিভলবার পকেটে ঠিকই আছে।

আহমদ মুসা বিসমিল্লাহ বলে সাদা বোতামে চাপ দিল।

সংগে সংগেই তার একবারে সামনেই দেয়াল সরে গিয়ে একটা দরজা বেরিয়ে পড়ল। সেই সাথে এক ঝলক ভ্যাপসা গরম বাতাস এসে লাগল তা গায়ে। বিস্মিত হয়ে তাকাল সে সামনে।

কড়া আলোয় ঝালসানো আয়তকার একটা চত্বর। উঁচু দেয়াল ও নিচ্ছিদ্র ছাদের নিচে একটা কাঁচের ঘর। গোটা চত্বর কর্দমাক্ত। স্যাঁৎস্যাঁতে পরিবেশ।

আহমদ মুসা দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল।

আহমদ মুসা যতটুকু অনুমান করল তাতে বিল্ডিংটির পেছনে লেকের পানিতে মাটি ফেলে ভরাট করে কিছুটা জায়গা বাড়িয়ে নেয়া হয়েছে। আহমদ মুসা খেয়াল করল বাড়িটার দিকে আসার সময় বাড়ির পেছনে রেলিং ঘেরা বাড়তি একটা অংশ দেখেছে। সম্ভবত বসে বসে লেকের সৌন্দর্য উপভোগের জন্যে ওটা বাগান জাতীয় কিছু হবে। তারই একটা অংশে এই ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু ঘরটা এমন নিচ্ছিদ্র, গরম ও স্যাঁৎস্যাঁতে কেন? কাঁচের ঘরটাই বা ঘরের ভেতরে কেন?

আহমদ মুসা ধীরে ধীরে এগুলো কাঁচের ঘরটার দিকে। কাঁচের ভেতরে ঘরের অবস্থার দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হলো আহমদ মুসা। ঘরের ভেতরে এক শ্রেণীর লতাগুল্ম এবং সেই কর্দমাক্ত স্যাঁৎস্যাঁতে পরিবেশ। একটু ভালো করে চাইতে গিয়ে চোখ দু'টি আহমদ মুসার ছানাবড়া হয়ে গেল। দেখল বহু মাছি উড়ে বেড়াচ্ছে ভেতরে। দেখেই সে চিনতে পারল সিসি মাছি এগুলো।

শিউরে উঠল আহমদ মুসা, তাহলে সে ভয়ংকর মাছির গোডাউনে এসে হাজির! ...

ভাবনায় ছেদ নামল আহমদ মুসার। পেছনে পায়ের শব্দ শুনতে পেল। তড়াক করে ঘুরে দাঁড়াল। কিন্তু দেখল একটা রিভলবারের নল তার কপাল বরাবর। তার দু'পাশে আরও দু'টি স্টনগান তার দিকে হা করে আছে।

'কে তুমি? এ পর্যন্ত পৌঁছার কোন লোক এদেশে আছে বলে তো জানি না?' বলল রিভলবারধারী।

আহমদ মুসা কোন উত্তর দিল না।

রিভলবারধারীই আবার বলল, ‘তুমিই সেই এশিয়ান। আমাদের নিরুপদ্রুব অগ্রযাত্রায় তুমি বিপর্যয় সৃষ্টি করেছ। কে তুমি?’

প্রশ্ন করেই আবার সে বলল, ‘এখান পর্যন্ত পৌঁছিলে কারও বাঁচার কথা নয়। কিন্তু তোমাকে এত সহজে হত্যা করা ঠিক হবে না। বস আসুক। তোমার গোড়ায় যাওয়া দরকার।’

কথা শেষ করেই একজন স্টেনগানধারীকে লক্ষ্য করে বলল, ‘একে বেঁধে ফেল।’

আহমদ মুসা কোন বাধা দিল না। দেয়ার পরিবেশও ছিল না। শুধু বলল, ‘তোমাদের বস কে?’

‘কে তা টের পাবে। বলল সেই রিভলবারধারী।

‘সাইরাস শিরাক কি?’

‘সাইরাস শিরাককে তুমি জান?’ বিস্ময় রিভলবারধারীর কন্ঠে।

আহমদ মুসা নিশ্চিত হলো, এরা ব্ল্যাক ক্রস নিঃসন্দেহে।

‘আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে তোমার প্রশ্নের উত্তর আশা করতে পার না।’ বলল আহমদ মুসা।

‘সবই বুঝা যাবে সব আসলে। নিয়ে চল একে।’

আহমদ মুসার দুই হাত পিছমোড়া করে বেঁধে তাকে নিয়ে চলল।

# ৭

বরফ ঢাকা আপার আল্পস-এর আবহাওয়া অনেকটাই অনিশ্চিত। ম্যাটার হর্ণ-এর 'স্কি-রিপোর্ট' থেকে তাতিয়ানা যখন বেরিয়েছিল, তখন আবহাওয়াটা পরিস্কারই ছিল।

সে ফিরছিল মঁথে শহরের নাতাশার ওখান থেকে।

মাঝ পথেই সে মুখোমুখি হলো তূষার বৃষ্টি এবং প্রবল বাতাসের।

রণ নদী থেকে কয়েক মাইল পুবে 'মার্টিনি' শহর পেরিয়ে কয়েক মাইল সামনে গিয়ে তাতিয়ানা বরফবৃষ্টির মধ্যে একটা গাড়িকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। গাড়িটার পেছনে সে দেখল রেড এলার্ট লাইট জ্বলছে।

গাড়িটা ডোনার। সেও ফিরছিল 'ম্যাটার হর্ণ' থেকে জেনেভায়। এখানে এসে হঠাৎ তার গাড়ি বিকল হয়ে গেছে। গাড়ির এয়ারকন্ডিশন কাজ করছে না। অভাবিত এক বিপদে আটকা পড়েছে ডোনা এবং তার আব্বা। তাদের করবার কিছুই নেই। রেড এলার্ট বাতি জ্বালিয়ে তারা অপেক্ষা করছে সাহায্যের। টেলিফোনে সাহায্যের আবেদন করেছে নিকটবর্তী পুলিশ স্টেশনে।

তাতিয়ানার গাড়ি গিয়ে দাঁড়াল ডোনার গাড়ির পাশে।

ডোনা ও তার আব্বা বেরিয়ে এল গাড়ি থেকে। তাতিয়ানা কোন কথা বলার আগেই ডোনার আব্বা বলল, 'আমি মিশেল প্লাতিনি ডিবেরী লুই। একজন ফরাসী সাবেক কুটনীতিক। এ আমার মেয়ে মারিয়া জোসেফাইন লুই। আমরা গাড়ি বিকল হওয়ায় এখানে আটকা পড়ে গেছি।'

তাতিয়ানা ডোনার আব্বার মুখের দিকে মুহূর্ত কয়েক স্থির দৃস্টিতে চেয়ে ঈষৎ মাথা নুইয়ে বাউ করে বলল, 'আপনার নাম আমার মনে পড়ছে। আমি তখন অনেক ছোট। আপনাকে দেখেছিও মনে হয় মস্কোতে দু'একটা অনুষ্ঠানে।'

'তোমার পরিচয় কি মা? মস্কোয় তোমার বাড়ি কিংবা ...'

'বলব সব। আমার গাড়িতে চলুন। পুলিশ আপনার গাড়ি পৌঁছে দেবে।'

'পুলিশকে খবর দিয়েছি।'

'ঠিক আছে। ওদের এখন বলে দেব, ওরা গাড়ি 'মঁথে' পৌঁছে দেবে। ওখানেই আমরা উঠছি।'

সবাই এসে তাতিয়ানার গাড়িতে উঠল।

ড্রাইভ করছিল তাতিয়ানা। তার পাশের সিটে বসল ডোনা। আর ডোনার আব্বা বসল পেছনের সিটে।

তাতিয়ানা গাড়ি স্টার্ট দিতে দিতে বলল, 'আপনাদের কথা, আপনাদের পরিবারের কথা তখন আব্বা-আম্মার কাছে শুনেছি। ইশ্বরকে ধন্যবাদ, অনেকদিন পর আপনাদের সাক্ষাত লাভের সৌভাগ্য হলো।'

'তোমার পরিচয় দিলেনা মা?' পেছনের সিট থেকে বলল ডোনার আব্বা।

'আমি দুর্ভাগা পিটার পরিবারের সন্তান। জার আলেকজান্ডার প্রথম এর পৌত্র পিটার চতুর্থ-এর পৌত্রের মেয়ে আমি।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে। তোমার আব্বার নাম আলেকজান্ডার পিটার। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অনেকবার দেখা সাক্ষাত হয়েছে। তোমাকে দেখেছি। তুমি মারিয়া অর্থাৎ ডোনাকেও নিশ্চয় দেখে থাকবে।'

তাতিয়ানা ডোনার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'মনে পড়ে আপনার কিছু?'

ডোনাও হেসে বলল,'দু'চার বার কথা-বার্তাহীন কিছুক্ষণের দেখার কথা মনে রাখা সম্ভব নয়।'

'ঠিকই বলেছেন। আমি কিছু স্মরণ করতে পারছি না।'

'তবু দেখা হয়েছে এটা কিন্তু কম কথা নয়।'

'অবশ্যই। মনে না থাকা অতীতটাই এখন আমাদের বন্ধুত্বের দৃঢ় বুনিয়াদ হতে পারে।'

'নিশ্চয়।'

'তোমার নাম কি মা? পেছন থেকে তাতিয়ানাকে লক্ষ্য করে বলল ডোনার আব্বা।

'আমি তাতিয়ানা।'

‘ওয়েলকাম, পিটার দি গ্রেটের কন্যাকে।’

‘নামটাই এখন আছে, বাকি সবটুকুই দুর্ভাগ্য।’

‘ঐ দুর্ভাগ্য আমাদের ‘লুই’ পরিবারেও।’

‘কিন্তু লুই পরিবার ফ্রান্সে যে মর্যাদার আসনে রয়েছে, তা আমাদের নেই।’

‘ভেব না মা, তোমাদেরও সে দিন আসছে।’

বলে একটু থেমেই সে আবার বলল, ‘জান যে আলেকজান্ডার, প্রথম-এর প্রত্যক্ষ বংশধর তুমি, তিনি রুশদের কাছে কত বড়?’

‘জানি আংকেল। কিন্তু সেটা যে আপনাদের বিরুদ্ধে যায়?’ হাসতে হাসতে বলল তাতিয়ানা।

ডোনার আব্বা কথা বলতে যাচ্ছিল। বলতে গেলে তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে ডোনা বলল, ‘ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন রুশ সম্যাট আলেকজান্ডার প্রথম-এর কাছে পরাজিত হয়েছিলেন, এটা আমাদের জন্যে দুঃখের। কিন্তু আলেকজান্ডার (প্রথম) রুশ জাতিকে যে রক্ষা করেছিলেন এ জন্যে শ্রদ্ধার পাত্র তিনি আমাদের।

‘ধন্যবাদ আপনাদের।’

‘ওয়েলকাম। আমার খুব আনন্দ লাগছে যে পিটার দি গ্রেটের একজন কন্যার এইভাবে দেখা পেলাম।’

‘আমার কথাই কিন্তু আপনি বলেছেন। আমার অনেক শোনা লুই পরিবারের আপনাদের দেখা হওয়াতে আমার সৌভাগ্য বলে মনে করছি।’

বাইরে তুষার বৃষ্টি বেড়ে গেছে। সেই সাথে বাতাসের বেগটাও বেড়েছে। এই আবহাওয়ায় তুষার ঢাকা পিচ্ছিল পথে গাড়ি চালানো খুবই ঝুঁকি পূর্ণ।

ডোনা কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল। কিন্তু ডোনার আব্বা তাকে বাধা দিয়ে বলল,‘কথা বলার চেয়ে সমানের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখাই বোধহয় আমাদের ভাল।’

‘ধন্যবাদ আংকেল। আমরা অনেকটা এসেছি। সামনেই রণ নদী। নদী-তীর বরাবর রাস্তাটা আরও একটু ভাল হবে।’

‘ধন্যবাদ তোমাকে তাতিয়ানা। তুমি ভাল ড্রইভ কর।’

‘ধন্যবাদ আংকেল।’

চলতে লাগল গাড়ি।

চারদিকের তুষার শুভ্র মৌন পরিবেশের মধ্যে দিয়ে চলছে গাড়ি।

অবিরল ধারায় আকাশ থেকে নামা তুষার কণা সাদা আলোর তীর বৃষ্টির মত বিদ্ধ করছে পৃথিবীর নীরব বুককে।

নীরবতার বুক চিরে দুর্বিনীতের মত এগিয়ে চলছে গাড়িটি।

একদিন পর।

রণ নদীর তীরে ‘মঁথে’ শহর।

নাতাশার বাড়ি।

নাতাশার তিন তলা সুন্দর বাড়িটা নদীর তীরেই।

দু’দিনের দারুণ খারাপ আবহাওয়ার পর এক খন্ড রোদে চারদিক ঝলমল করে উঠেছে।

ডোনা তার বেড রুমের ব্যালকোনিতে বসে নিজেকে মেলে দিয়েছে দুর্লভ রোদে।

ভেতরে বেড এবং টেবিল ড্রেসিং করছিল তাতিয়ানা।

তিন তলার দু’টি পাশাপাশি কক্ষে থাকে ডোনা ও তাতিয়ানা।

নিজের ঘর ড্রেসিং করার পর ডোনার ঘর ড্রেসিং করছে তাতিয়ানা চুপি চুপি।

ঘর বাড়ি ঠিক রাখার এ কাজগুলো নিজেদেরই করতে হয়। কিন্তু ডোনাকে কোন কাজেই হাত দিতে দেয় না তাতিয়ানা। তাই সে ডোনার ঘরটা ড্রেসিং করে নিচ্ছে চুপি চুপি ডোনাকে ব্যালকোনিতে পাঠিয়ে।

‘কোথায় তুমি তাতিয়ানা এস।’ ব্যালকোনি থেকে ডাকল ডোনা।

‘এই আসছি ডোনা।’ বলে জোরে হাত চালাল তাতিয়ানা।

ডোনার টেবিল ঠিক করার সময় তাড়াহুড়ো করে ডোনার হাতব্যাগ সরাতে গিয়ে খোলা হাত ব্যাগ থেকে ডোনার ছোট্ট নোটবুকটা ছিটকে পড়ে গেল মেঝেতে। নোট বুক থেকে একটা ফটো বেরিয়ে পড়ল।

মেঝে থেকে নোটবুক ও ফটো তুলতে গিয়ে ফটোর উপর নজর পড়তেই ভূত দেখার মত চমকে উঠল তাতিয়ানা। এ যে আহমদ মুসার ছবি! ডোনার হাত ব্যাগে কোত্থেকে এল!

ফটো হাতে তুলে নিয়ে কিছুক্ষণ পাথরের মত স্থির হয়ে বসে থাকল তাতিয়ানা।

তার মনে নানা' প্রশ্নের ভীড়।

আহমদ মুসার ফটো এইভাবে কার কাছে থাকতে পারে? থাকতে পারে পুলিশের কাছে, গোয়েন্দা পুলিশের কাছে। অথবা থাকতে পারে আহমদ মুসার কোন আত্মীয়ের কাছে। কিংবা থাকতে পারে আহমদ মুসার প্রেমিকার কাছে।

ডোনা কে? সেকি গোয়েন্দা পুলিশ? আহমদ মুসার আত্মীয় কি সে?

আত্মীয় অবশ্যই নয়। ফ্রান্সের 'লুই' পরিবার ও এশিয়ান মুসলিম আহমদ মুসার মধ্যে কোন রক্তের সম্পর্ক থাকতে পারে না।

তাহলে ডোনা হয় গোয়েন্দা পুলিশ, নয়তো আহমদ মুসার প্রেমিকা। 'আহমদ মুসার প্রেমিকা' কথাটা ভাবতেই তাতিয়ানার ঠোঁটে বেদনার একখন্ড হাসি ফুটে উঠল। মনে মনে বলল, 'আহমদ মুসার পাথর হৃদয় কাউকে ভালবাসতে পারে না।'

তাহলে কি ধরে নিতে হবে ডোনা ফরাসী গোয়েন্দা পুলিশ? তাই হবে যদি আহমদ মুসার সাথে তার হৃদয়ের সম্পর্ক না থাকে। কিন্তু ডোনাকে গোয়েন্দা পুলিশ ভাবতে কষ্ট লাগল তাতিয়ানার মনে। মাত্র একদিনেই ডোনা তাতিয়ানার হৃদয় জয় করে নিয়েছে।

'তাতিয়ানা আসছ না যে?' আবার ডোনা ডাকল ব্যালকোনি থেকে।

তাতিয়ানা তাড়াতাড়ি ফটো, নোটবুক হাত ব্যাগে ঢুকিয়ে টেবিলে রাখতে রাখতে বলল, 'এই আসছি।'

বলে তাতিয়ানা মুখে হাসি ফুটিয়ে স্বাভাবিক হয়ে ছুটল ডোনার কাছে। সেই সাথে ভাবল ডোনাকে জানতে হবে।

গিয়ে সে ডোনার গলা জড়িয়ে ধরে তার পাশে বসে বলল, 'মনে হচ্ছে তর সইছে না। প্রেমে পড়লে এমন হয়।'

'তাহলে প্রেমে পড়ার অভিজ্ঞতা তোমার আছে? তাই কি?' বলল ডোনা।

তাতিয়ানা ভাবল, নিজে ধরা না দিলে ডোনাকে ধরা যাবে না। বলল, 'আছে, কিন্তু খুব খারাপ অভিজ্ঞতা।'

'মানে?'

'প্রেমে পড়েছি কিন্তু প্রেম পাইনি। সুতরাং অভিজ্ঞতা খুব তিক্ত।'

ডোনা তাতিয়ানাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'মিথ্যা বলছ। তোমার মত লাখে একজন নেই। তুমি প্রেম পাবে না ঠিক নয়।'

তাতিয়ানা ডোনার মুখ টেনে নিজের চোখের সামনে এনে হেসে বলল, 'তোমার মত কোটিতে একজন মিলে না এমন প্রতিদ্বন্দ্বী যদি থাকে? তাছাড়া কারও হৃদয় যদি পাথরের হয়, তাহলে সেখানে ফুল ফুটবে কি করে?'

কথা শেষ করেই তাতিয়ানা বলল,'নিশ্চয় আমার মত তিক্ত অভিজ্ঞতা তোমার নেই?'

ডোনা জবাব দিল না সংগে সংগে। তার ঠোঁটে মিষ্টি হাসি।

তাতিয়ানা সেদিকে চেয়ে বলল, 'বুঝেছি। তোমার মিষ্টি হাসি জবাব দিয়েছে। এখন বল কোন সে সৌভাগ্যবান?'

ডোনা গম্ভীর কন্ঠে বলল, 'বলতে পার আমি সুখী, কিন্তু সেই সাথে অসুখীও।'

'সুখটা আবার অসুখ হলো কি করে?'

'সুখের আকাশ যদি বিপদের পর বিপদের কালবৈশাখীতে ভরা থাকে, তাহলে সুখ আর থাকে কোথায়?'

'বুঝলাম না, তোমাদের এমন বিপদের কথা তো শুনিনি?'

'তাঁর জীবনও তো আমার জীবন!'

'বুঝেছি। সেই 'তিনি'টা কে?'

প্রশ্নটা করতে গিয়ে বুকটা কেঁপে উঠল তাতিয়ানার। যে বিপজ্জনক জীবনের কথা ডোনা বলছে, সে জীবনটা আহমদ মুসার নয়তো? ভাবতেই বুকটা তার যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যেতে চাইল। তার মন বলল, উত্তরটা না শোনাই ভাল।

তাতিয়ানার প্রশ্নের জবাব ডোনা তৎক্ষণাৎ দেয়নি।

তাতিয়ানার দুর্বল মন জবাবের জন্যে ডোনাকে আর চাপ দিল না। উঠে দাঁড়াল তাতিয়ানা। বলল, 'চল, অ্যান্টি, আংকেলরা ব্রেকফাষ্ট টেবিলে এসে গেছেন।'

ব্রেক ফাষ্ট সেরে রোদ আরেকটু তেতে উঠল ডোনা ও তাতিয়ানা নিচে নেমে এল রণ নদীর তীরে বেড়াবার জন্যে।

পাশাপাশি দু'জন হাঁটছিল।

প্রশ্নটার উত্তর ডোনা দেয়নি। কিন্তু তারপর থেকে তাতিয়ানার মন ভাল নেই। একটা অস্বস্তিকর যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়েছে যেন তার রক্তের প্রতিটি কণিকায়। জবাব তাকে পেতেই হবে।

মনটাকে শক্ত করে নিল তাতিয়ানা। তারপর ডোনাকে কাছে টেনে তার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমার জবাব কিন্তু দাওনি।'

'কি বলব বল।' সলজ্জ হেসে বলল ডোনা।

'তিনি ফরাসী নিশ্চয়? দুরু দুরু বুকে প্রশ্ন করল তাতিয়ানা।

'না তিনি ফরাসী নন।'

জবাব শুনে বুক ছ্যাঁৎ করে উঠল তাতিয়ানার। কিন্তু সামলে নিল নিজেকে। প্রশ্ন করল, 'বিদেশী? কোন দেশী?'

'ও এশিয়ান। কিন্তু ওর নির্দিষ্ট কোন দেশ নেই।'

বুকে একটা হাতুড়ির ঘা লাগল তাতিয়ানার। মিলে যাচ্ছে। আহমদ মুসার সথে মিলে যাচ্ছে তাঁর বর্ণনা। তাহলে আহমদ মুসাই কি সে? কিন্তু কোন নির্দিষ্ট দেশ না থাকা আরও শত শত লোক আছে।

কোন প্রশ্ন করতে পারলো না তাতিয়ানা।

ডোনাও কথা বলল না।

হাঁটছিল দু'জন পাশাপাশি।

অনেক্ষণ পর কম্পিত বুকে শেষ প্রশ্নটা করল, ‘কে এই অদ্ভুত মানুষ?’

‘নামটা নিষিদ্ধ। কিন্তু তোমাকে বলা যায়। তিনি ‘আহমদ মুসা।’

তীব্র শক ওয়েভের মত একটা আঘাত সামলাতে গিয়ে তাতিয়ানা তার চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল।

নদী তীরের অসমান রাস্তায় বরফ মোড়া একটা পাথরের সাথে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল তাতিয়ানা।

ডোনা তাড়াতাড়ি তাকে তুলে বলল, ‘তুমি ঠিক আছে? কোথাও লাগেনি তো তোমার?’

‘ব্যস্ত হয়ো না ডোনা। কোথাও লাগেনি আমার। খেয়াল করিনি পাথরটাকে। হোঁচট খেয়েছি।’

ডোনা তাকে বুকে জড়িয়ে বলল, ‘তোমাকে কেমন বিমর্ষ লাগছে। তোমার শরীর খারাপ হয়নি তো?’

‘না ডোনা ভাল আছি। একটু মাথা ধরা তেমন কিছু নয়।’

‘তাহলে চল ঠান্ডায় ঘুরে কাজ নেই। বাসায় ফিরে যাই।’

‘তাই চল।’

বাসায় ফিরে এল ওরা।

তাতিয়ানা নিজেকে এতক্ষণ সামলে রাখতে পেরেছিল।

বাসায় ফিরে ডোনা বলল তাতিয়ানাকে, ‘তুমি একটু রেষ্ট নাও। মাথার ব্যথা না কমলে বিকেলে ডাক্তারকে কনসাল্ট করা যাবে।’

ডোনা নিজের ঘরে চলে গেল।

তাতিয়ানা নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

এতক্ষণ মনের সকল শক্তি দিয়ে নিজেকে ধরে রেখেছিল। আর পারল না। মেঝের উপরই সে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

অতীতে আরও অনেক কেঁদেছে তাতিয়ানা। সে কান্না ছিল না পাওয়ার। কিন্তু আজকের কান্না সব হারানোর।

কাঁদতে কাঁদতে অবসন্ন তাতিয়ানা ঘুমিয়ে পড়েছিল মেঝেতেই।

তাতিয়ানা ডোনা ও তার আব্বাকে নিয়ে সেদিনই বিকেলে ফিরে এসেছিল জেনেভায়।

সেদিন দুপুরে ডোনা ফাতেমা হিরেনের সাথে টেলিফোনে কথা বলে জানতে পেরেছিল, আহমদ মুসা ফিরে আসার পর গত রাতে শত্রুর ঘাঁটিতে গিয়ে আর ফিরে আসেনি।

কথাটা শুনে মুষড়ে পড়েছিল ডোনা। আর আপাত শান্ত তাতিয়ানার হৃদয়ে উঠেছিল উদ্বেগ-উৎকন্ঠার ঝড়।

তাতিয়ানা সিদ্ধান্ত নিয়েছে ডোনাকে ঘুণাক্ষরেও কিছু জানতে না দেয়ার। ডোনার কাছ থেকে আরও কিছু সে শুনেছে। বুঝেছে, দীর্ঘদিন ধরে অসংখ্য ঘটনার মধ্যে দিয়ে আহমদ মুসার সাথে তার গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ওদের মাঝখানে তার দাঁড়ানো ঠিক নয়। এসব কথা ভাবতে গিয়ে হৃদয় যেন রক্তক্ষরণ হয়েছে তাতিয়ানার।

আহমদ মুসার খবর পাওয়ার পর তাতিয়ানা আর দেরী করতে চায়নি। বিকেলেই চলে এসেছে ওদের নিয়ে।

জেনেভা পৌঁছেই ডোনা তাতিয়ানাকে নিয়ে চলে গেল ওয়ার্ল্ড নিউজ (WNA) এজেন্সীর অফিসে।

ফাতেমা হিরেনকে অফিসেই পেল ডোনা।

'ওয়েলকাম মিস মারিয়া লুই। আমরা আপনার অপেক্ষা করছি।' বলল ফাতেমা হিরেন।

'আর কোন খবর আছে?' বলেই ডোনা তাতিয়ানাকে দেখিয়ে বলল, 'মিস তাতিয়ানা পিটার। আমার বোন, বন্ধু সব।'

'খুশী হলাম। কেমন আছেন?' বলল ফাতেমা হিরেন।

'আমিও খুশী হলাম। ভাল আছি।' বলল তাতিয়ানা।

'ধন্যবাদ।' বলে ফাতেমা হিরেন ডোনার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওঁর খোঁজ নেবার জন্যে সাহায্য চাওয়া হয়েছিল। তিনজন এসেছেন।'

‘কাদের কাছে সাহায্য চাওয়া হয়েছিল?’

‘সাইমুমের কাছে।’

‘আচ্ছা কোত্থেকে ওরা এসেছেন?’

‘ফ্রান্স থেকে।’

‘ওরা কি বলেছেন?’

‘যে ঠিকানা আমাদের কাছে আছে, সে ঠিকানায় ওরা খোঁজ-খবর নিচ্ছেন। আজ রাতেই ওরা ঐ ঠিকানায় ঢুকবেন, যদি আপনারা ভিন্নমত না করেন।’

‘ওরা বলেছেন এটা?’

‘না এ মত মিঃ গটেফ এবং মিঃ জারমিসের। পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার আগে তারা আপনার মত নিতে বলেছেন।’

‘ধন্যবাদ। পরিকল্পনা ঠিকই আছে। সাইমুমের লোকদের পরামর্শ দেবার মত আমার কিছু নেই। তবে ঠিকানার লোকেশান এবং ওরা রাতে ঠিক কয়টায় ওখানে পৌঁছবেন, তা আমরা জানতে চাই।’

‘ঠিক আছে মিঃ গটেফকে বলে আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি।’ বলল ফাতেমা হিরেন।

‘ধন্যবাদ। আমরা বাসায় যাচ্ছি। তথ্য দু’টো যত তাড়াতাড়ি জানতে পারি ততই আমাদের সুবিধা।’

‘আরেকটা কথা। মিঃ গটেফ বলেছেন, ওঁরা তিনজন অভিযানে গেলে বাড়ির বাইরে বাড়িটার উপর চোখ রাখার জন্যে মিঃ গটেফ ও মিঃ জারমিস কিছু লোক রাখার ব্যবস্থা করেছেন।

‘তা রাখতে পারেন। তবে ব্যাপারটা সাইমুমের লোকদের জানাতে হবে। আর ওঁদের আরও জানাবেন, আশে-পাশে আমাদের মত কেউ থাকতে পারে।’

বলে ডোনা উঠে দাঁড়াল।

ফাতেমা হিরেনও উঠে দাঁড়াল। গাড়ি পর্যন্ত এসে বিদায় জানাল। গাড়ি চলতে শুরু কররে তাতিয়ানা বলল, ‘তোমার সিদ্ধান্তকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি ডোনা।’

‘কোন সিদ্ধান্ত?’

‘শত্রুর ঠিকানায় আমাদের যাবার সিদ্ধান্ত।’

‘তুমিও আমার সাথে যাবে তাতিয়ানা?’

তাতিয়ানার বুকের বেদনাটা চিন চিন করে উঠল। আহমদ মুসা বিপদে, একথা জেনেও সে চুপ করে বসে থাকবে! একটা বেদনার হাসি ফুটে উঠল তাতিয়ানা ঠোঁটে। বলল, ‘তুমি যাবে, আর আমি ঘরে বসে থাকব- একথা ভাবতে পার তুমি?’ মুখ না তুলেই কথা বলল তাতিয়ানা।

‘না পারি না তাতিয়ানা। মাত্র দু’দিনে আমরা যে শত বছরের মত একাত্ম হয়ে গেছি। তোমাকে ঘরে রেখে আমি যেতে পারতাম না। মনে হতো অর্ধেক শক্তি যেন আমি রেখে গেলাম। তুমি না যেতে চাইলেও তোমাকে টেনে নিয়ে যেতাম।’

ডোনা আনন্দে ডান হাত স্টেয়ারিং- এ রেখে বাম হাত বাড়িয়ে দিল তাতিয়ানার দিকে।

তাতিয়ানা ডান হাত দিয়ে চেপে ধরল ডোনার হাত।

‘আমরা সুখে-দুঃখে এক সাথে।’ তাতিয়ানার হাত শক্ত করে চেপে ধরে বলল ডোনা।

‘না সুখে নয়, সকল দুঃখে আমরা এক সাথে।’

‘সুখে নয় কেন?’

‘সুখটা রিজার্ভ থাক। দুঃখটাই ভাগ করে নেই।’

‘সুখ নিয়ে তুমি স্বার্থপর হতে চাচ্ছ কেন তাতিয়ানা?’

‘কিছু সুখ আছে যেখানে স্বার্থপর হতে হয়। ওর ভাগ দেয়া যায় না ডোনা।’ তাতিয়ানার ঠোঁটে হাসি, কিন্তু তার চোখে অশ্রু টল টল করে উঠল।

ড্রাইভিং সিটে বসা ডোনার চোখ সামনের দিকে নিবদ্ধ থাকায় এই অশ্রু সে দেখতে পেল না।

‘তাতিয়ানা তুমি শত বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলছ। জীবন সম্পর্কে এই অভিজ্ঞতা তুমি পেলে কোথায়?’

হাসল তাতিয়ানা। বেদনার হাসি। বলল, ‘অনেক সময় এক মুহূর্তও একশ’ বছরের অভিজ্ঞতা এনে দেয়।

‘ঠিক বলেছ তাতিয়ানা।’

‘গাড়ি এসে দাঁড়াল ডোনার বাসার গাড়ির বারান্দায়। তাতিয়ানারাও এখানে থাকছে, যদিও সে এসে উঠেছে মিঃ কেলভিনের জেনেভার বাসায়। তার লাগেজ সবই রয়েছে সেখানে। শুধু সে থাকছে ডোনার সাথে।

রাত ১১টা বাজার ১৫ মিনিট আগেই ডোনা ও তাতিয়ানা ৯৯ নং লেক আইল্যান্ড বাড়িটার পাশে গিয়ে পৌঁছল। ‘সন্ধ্যার আগে এসে ডোনারা বাড়িটার চারদিক দেখে গেছে।

ডোনা তার গাড়ি দাঁড় করাল ৯৯ ও ৯৮ নং বাড়ির মাঝখানের প্যাসেজটায়। সেখান থেকে ৯৯ নং বাড়িটার তিনদিকে নজর রাখা যায়।

সাইমমের ওরা তিনজন, যারা আসবে এই বাড়িতে আহমদ মুসার সন্ধান নিতে আসার কথা রাত ১১টায়। ডোনারা ১৫ মিনিট আগে এসেছে। ওরা তিনজন কখন আসছে, কখন কোনদিক দিয়ে প্রবেশ করছে, ভেতরে কি ঘটে তার প্রতি দৃষ্টি রাখতে চায় তারা।

ডোনা বুঝতে পারল না সাইমুমের ওরা রাত ১১টা বেছে নিল কেন, রাত ১২টার পরে নির্জন পরিবেশে কেন নয়? আবার ভাবল, জনাকীর্ণ পরিবেশে ঝুকিপূর্ণ অভিযানের বিশেষ সুবিধাও আছে। হয়তো শত্রুর অসতর্ক অবস্থার এই সুযোগ তারা নিতে চায়।

ঠিক কাঁটায় কাঁটায় রাত ১১টায় সাইমুমের ওরা তিনজন এল।

বাড়ি থেকে একটু সামনে ফুটপাতের কার পার্কিং এ গাড়ি দাঁড় করাল ওরা।

ডোনার চোখে ‘নাইট বাইনোকুলার’ এবং কানে ডিস্ট্যান্ট হেয়ারিং মাইক্রো এ্যান্টেনা রয়েছে। এই বাইনোকুলার দিয়ে সিকি মাইল দূর পর্যন্ত রাতেও দেখা যায়। হেয়ারিং মাইক্রো এ্যান্টেনা দিয়ে দু’শ গজ দূরের ফিসফিসানি কথা পর্যন্ত শোনা যায়।

ডোনা শুনতে পেল গাড়ির ভেতরে ওদের তিনজনের শলাপরামর্শ।

ওদের একজন গাড়িতে অপেক্ষা করবে। আধ ঘন্টার মধ্যে না ফিরলে সেও বাড়িতে প্রবেশ করবে অন্য পথে।

দু'জন ওরা নেমে এল গাড়ি থেকে।

ওরা বাড়ির সামনে এসে সোজা প্রধান গেটে গিয়ে দাঁড়াল একেবারে স্বাভাবিক মানুষের মত। যেন এ বাড়িটা তাদেরই। তারপর পকেট থেকে চাবি বের করে দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করল।

ডোনা বুঝল, দরজার তালা খোলার জন্যে ওরা মাষ্টার কি ব্যবহার করছে। এটা খুবই সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু ডোনা চমৎকৃত হলো শত্রু ঘাঁটিতে প্রবেশের সময় ওদের স্বাভাবিকতা, নির্ভিকতা ও ঠান্ডা মাথার কাজ দেখে।

ডোনা তাতিয়ানার কানে কানে ফিস ফিস করে বলল, 'আহমদ মুসার সাইমুম সত্যিই অনন্য।'

'সত্যিই চমৎকৃত হওয়ার মত ঘটনা। বলর তাতিয়ানা।

ওরা ভেতরে চলে গেল তারপর সব নীরব।

'৯৯নং এই বিল্ডিংটি সম্পূর্ণ সাউন্ড প্রুফ। মনে হয় স্টুডিও হিসাবেই একে সাউন্ড প্রুফ করা হয়েছিল।' বলল ডোনা।

আধ ঘন্টা পার হয়ে গেল। কেউ ফিরল না।

ডোনা দেখল, গাড়ি থেকে তৃতীয় ব্যক্তি বের হয়ে এল। সে বাড়ির সামনের দিকটা এড়িয়ে ডোনাদের গাড়ি বাড়িটার যে পাশে ছিল সেই পাশে এসে বিল্ডিং- এর নিচে দাঁড়াল।

ডোনা বুঝতে পারল, সাইমুমের এ লোকটি বাড়ির এ পাশ দিয়ে সম্ভবত জানালার গরাদ খুলে বা কেটে ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করবে।

ডোনা তাতিয়ানাকে ইশারা করে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল।

সন্তুপর্ণে সাইমুমের তৃতীয় লোকটির পেছনে গিয়ে দাঁড়াল।

শেষ মুহূর্তে পায়ের শব্দ পেয়েছিল লোকটি। বোঁ করে ঘুরে সে বিভলবার তুলতে যাচ্ছিল।

'রিভলবারের দরকার নেই। আমরা আহমদ মুসার শুভাকাঙ্খী। জানার কথা আপনাদের।' বলল ডোনা।

লোকটির রিভলবার নেমে গেল। বলল, 'জি ম্যাডাম, আমরা জানি। বলুন, কি আদেশ। নির্ধারিত সময় পার হয়ে গেছে। ওরা তো ফিরল না।'

‘আপনার ভেতরে প্রবেশের প্রয়োজন নেই। আপনি নিচে পাহারায় থাকুন। বাড়ি থেকে যাতে কেউ বেরুতেও না পারে, ঢুকতেও না পারে। আপনার টেলিফোন আছে?’

‘আছে।’

‘এখন থেকে ঠিক একঘন্টা পরেও আমরা না ফিরলে পুলিশে টেলিফোন করবেন। বলবেন, এই বাড়িতে কিছু লোককে কিডন্যাপ করে রাখা হয়েছে।’

‘জি, আচ্ছা। কিন্তু আপনারা কি ভেতরে প্রবেশ করবেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘কিন্তু এটা কি ঠিক হবে? ভেতরে সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে।’

‘আমরাও তাই মনে করি। সব বিবেচনা করেই আমরা এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

বলে একটু থেমেই আবার বলল, ‘আপনি আপনার দায়িত্ব বুঝতে পেরেছেন তো?’

‘জ্বি।’

‘ঠিক আছে। আপনি আপনার গাড়িতে বসে অপেক্ষা করুন।’

লোকটি সালাম দিয়ে যেভাবে ঘুরা পথে এখানে এসেছিল, সেভাবেই সে তার গাড়ির দিকে চলে গেল।

‘তাতিয়ানা আমরা বাড়ির পেছনের দিক দিয়ে ঢুকব।’ বলল ডোনা।

‘তোমার সিদ্ধান্ত ঠিক আছে।’

বলে তাতিয়ানা একটু থামল। তার ভেতরটা উদ্বেগ-উৎকন্ঠায় কাঁপছে এই ভাবনায় যে, ভেতরে ভয়ানক কিছু ঘটছে। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলল, ‘ভেতর সম্পর্কে তুমি কি ভাবছ ডোনা?’

‘ও ভাবনাটা মন থেকে আমি দূরে রাখতে চাচ্ছি। তা না হলে এগুতে পারব না, দুর্বল হয়ে পড়ব। এস কিছু না ভেবেই আমরা প্রবেশ করি। তোমার ভয় করছে কি?’

‘কিসের ভয়? কি আছে জীবনে? জীবনের কোন মায়া আমার নেই।’

ডোনার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে তাতিয়ানার মুখোমুখি হয়ে তার ঠোঁটে নিজের তর্জনি চাপা দিয়ে বলল, ‘এমন কথা বলো না তাতিয়ানা। জীবনকে ভালবাসা আল্লাহকে ভালবাসার অংশ।’

‘কিন্তু জীবন কোরবানী না দিলে তো কোন বড় কাজ হয় না। ইসলামও তো এই কুরবানী চেয়েছে।’

‘কিন্তু সেটা জীবনকে ভালবেসে আল্লাহর পথে সর্বাত্মক কাজ করার একটা অংশ। লক্ষ্য এখানে কাজ করা। কাজ করতে গিয়ে জীবন দেয়ারও প্রয়োজন হতে পারে।’

‘ধন্যবাদ ডোনা। বুঝেছি ব্যাপারটা। আসলে আমি ভয় পাচ্ছি না সেই কথাই বলতে চাচ্ছিলাম।’

‘ধন্যবাদ।’

‘বলে ডোনা বিল্ডিং-এর ছায়ার ঘন অন্ধকারের মাঝ দিয়ে বাড়ির পেছন দিকে চলল।

বাড়ির দেয়াল ঘেঁষে লেকের পানির কিনার পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়ালো ডোনা। বাড়ির দেয়াল পানির ভেতর আরও কিছুটা এগিয়ে গেছে, তারপর পাওয়া যাবে বাড়ির পেছনের বাগান ঘেরা রেলিং।

ডোনা ও তাতিয়ানা দু’জনেই পরেছে ট্রাক-স্যুট। তার উপর পরেছে গলা থেকে পা পর্যন্ত নামানো গাউন। গাউনের উপর দিয়ে কোমরে বেল্ট আটকানো। মাথায় কালো রুমাল। তার উপর ফেল্ট হ্যাট।

গাউন দু’হাতে উঁচু করে ধরে পানিতে নামল ডোনা। তার পেছনে তাতিয়ানা। দু’জনেরই রাবারের মোজা পরা। হাঁটুর উপর পর্যন্ত উঠানো।

হাঁটু পানি পর্যন্ত নেমেই দেখল তারা রেলিং এর প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

উপরে রেলিং এর দিকে একবার তাকিয়ে ডোনা বেল্টে ঝুলানো পকেট থেকে সিল্কের কর্ড বের করে রেলিং লক্ষ্যে ছুড়ল। দু’বারের চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর তৃতীয় চেষ্টায় কর্ডের হুক রেলিং- এর সাথে আটকে গেল।

সিল্কের কর্ড বেয়ে প্রথমে উঠল ডোনা। তারপর তাতিয়ানা।

বাগানে দাঁড়িয়ে বাড়ির দিকে নজর বুলিয়ে দেখল, বাগানের গোটা উত্তর পাশ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা। বাগানের পশ্চিম অংশে মনে হলো গোডাউন জাতীয় কিছু।

বাড়ির এপাশে একটি সিঁড়ি দেখে খুশী হলো ডোনা। বলল, 'তাতিয়ানা এই সিঁড়িটা আমাদের জন্যে আল্লাহর রহমত।'

'তা বটে। কিন্তু কোন তলায় প্রথম ঢুকবে বলে মনে করছ?'

চিন্তার রেখা ফুটে উঠল ডোনার চোখে মুখে। বলল, 'গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছ। ভাবতে হবে এ নিয়ে।'

তারা সিঁড়ির দিকে এগুবে, এমন সময় একটা শব্দ শুনে চাইল সামনের দিকে। দেখল, সিঁড়ি যেখানে শেষ হয়েছে তার সামনেই দেয়ালের গায়ে একটা দরজা নড়ে উঠছে।

ডোনা তাতিয়ানাকে নিয়ে বসে পড়ল।

ফুলের গাছার ফাঁক দিয়ে তারা দেখল ইস্পাতের দরজা খুলে একজন লোক বেরিয়ে এল। তার হাতে বৈদ্যুতিক লন্ঠন। সেই আলোতে দেখা গেল, বিদ্যুতের কিছু তার এবং একটা বাল্ব তার হাতে।

লোকটি হাতের বিদ্যুতের তারের প্রান্তটা নিয়ে সিঁড়ির সাথে বাঁধল এবং তাতে বাল্ব জ্বালাতেই আলো জ্বলে উঠল।

ডোনা বুঝল, বাগানের দিক থেকে তারা মনে হয় কিছু সন্দেহ করছে। তাই এদিকে আলো জ্বেলে রাখল।

লোকটা ফিরে যাচ্ছিল দরজার দিকে।

ডোনা সংগে সংগে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। ছোট একটা পাথরের টুকরো ছুড়ে মারল লোকটিকে লক্ষ্য করে।

লোকটি শক খাওয়া মানুষের মত চমকে উটে ফিরে দাঁড়াল। তার হাতে উদ্যত হয়ে উঠেছে রিভলবার।

ডোনা তার সাইলেন্সার লাগানো রিভলবার থেকে প্রথম গুলীটা ছুড়ল লোকটিকে লক্ষ করে।

লোকটি বুকে গুলী খেয়ে নিঃশব্দে ঢলে পড়ল মাটির উপর।

ডোনা ও তাতিয়ানা দেরী না করে হামাগুড়ী দিয়ে দরজার দিকে চলল।

দু'জন ভেতরে ঢুকল। দরজা বন্ধ করে দিল ডোনা।

'তুমি ঠিকই বলেছিলে ডোনা, পুরো বাড়িটাই সাউন্ড প্রুফ।' ভেতরে ঢুকে চারদিকে তাকিয়ে বলল তাতিয়ানা।

ডোনা ডিস্ট্যান্ট হেয়ারিং কানে লাগাল।

কানে লাগিয়েই বলল, 'তাতিয়ানা গুণ গুণ করতে করতে কেউ এদিকেই মনে হয় আসছে।

ডোনা ও তাতিয়ানা সিঁড়ির নিচে রাখা একটা বাক্সের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই একজন স্টেনগানধারী পাশের করিডোর দিয়ে এল। তার লক্ষ্য দরজা। কিন্তু দরজার দিকে তাকিয়ে দরজা বন্ধ দেখেই সে চিৎকার করে ডেকে উঠল, 'হেভেন তুমি কোথায়? তোমার ডাক পড়েছে উপরে।'

বলে সে চারপাশে নজর করছিল। বাদদিকে তাকাতে গিয়েই সে দেখতে পেল উদ্যত রিভলবার হাতে দাঁড়ানো ডোনা ও তাতিয়ানাকে।

সেদিকে সে তার স্টেনগান ঘুরাতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই ডোনার একটা গুলী গিয়ে বিদ্ধ করল স্টেনগান ধরা লোকটির ডান হাতকে। স্টেনগান পড়ে গেল তার হাত থেকে।

ডোনা দু'পা এগিয়ে বলল, 'দ্বিতীয় গুলী এবার বক্ষদেশ বিদ্ধ করবে। বল, 'বন্দীদের তোমরা কোথায় রেখেছ?'

লোকটি মুখ খুলল না।

ক্ষেপন করার মত সময় নেই ডোনাদের হাতে। ডোনার দ্বিতীয় গুলী গিয়ে বিদ্ধ করল লোকটির বক্ষদেশকে। ইতিমধ্যে তাতিয়ানা কুড়িয়ে নিয়েছিল লোকটির স্টেনগান।

'তাতিয়ানা, আমার মনে হয় কর্তা ব্যক্তিরা উপরে আছেন। বন্দীও থাকতে পারে উপরে। চল আমরা যতদূর সম্ভব ওদের সংগঠিত হবার সুযোগ না দিয়ে এগুব।'

সিঁড়ি দিয়ে ডোনা ও তাতিয়ানা উঠতে লাগল পাশাপাশি।

ওরা দু'তলায় দেখল, দু'টো করিডোর দু'তলার দু'দিকে চলে গেছে। আর সিঁড়ি উঠে গেছে তিন তলায়।

ডোন উৎকর্ণ হয়ে উঠেছিল। বলল, 'তাতিয়ানা সাবধান, অনেকগুলো পায়ের শব্দ পাচ্ছি। পশ্চিম দিক থেকে যেন কারা আসছে।'

বলে ডোনা পুব দিকের করিডোরের দিকে চলে গেল। আর তাতিয়ানা এক দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে দু'তলার হাফ ল্যাডিং-এ গিয়ে দাঁড়াল।

মাত্র বিশ সেকেন্ড। পশ্চিম পাশের করিডোর দিয়ে ৪জন লোক বেরিয়ে নিচে নামার জন্যে সিঁড়ি মুখে চলে এল। তাদের সকলের হাতেই স্টেনগান।

তাতিয়ানা প্রস্তুত ছিল।

ওরা চারজনও শেষ মুহূর্তে দেখতে পেল তাতিয়ানাকে। কিন্তু কিছু করার তারা সুযোগ পেল না। তার আগেই তাতিয়ানার গুলী বৃষ্টি ওদের ঘিরে ধরল।

সিঁড়ি মুখেই ওরা চারজন হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

সংগেই সংগেই বেরিয়ে এসেছিল ডোনা। তুলে নিয়েছিল স্টেনগান। তাতিয়ানার দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল।

এই সময় পূর্ব দিকের করিডোরের দিক থেকে একটি কন্ঠ চিৎকার করে উঠল, 'স্টেনগান ফেলে দিয়ে হাত তুলে দাঁড়াও।'

ডোনাকে লক্ষ্য করে নির্দেশটা দেয়া হয়েছিল।

ডোনা করিডোরের দিকে ফিরে তাকিয়েই ফেলে দিল স্টেনগান। তাতিয়ানা ইতিমধ্যে ছুটে এসেছে দু'তলার সিঁড়ির মাথায়। দাঁড়াল সে দেয়ালের প্রান্ত ঘেঁষে স্টেনগান বাগিয়ে।

ডোনা স্টেনগান ফেলে দেয়ার সাথে সাথে করিডোরের দিক থেকে তিনজন ছুটে এসেছিল। তারা তাতিয়ানার স্টেনগানের সহজ শিকারে পরিণত হলো। আগের চারজনের সাথেই ওদের তিনজনের লাশ পড়ে গেল সিঁড়ির মাথায়।

তিন তলার করিডোর থেকে পায়ের শব্দ ভেসে আসছিল। উপর থেকে ছুটে আসা পায়ের শব্দ আগেই টের পেয়েছিল ডোনা তার ডিস্ট্যান্ট হেয়ারিং

এ্যান্টিনায়। স্টেনগান তুলে নিয়ে সিঁড়ির রেলিং- এর কভার নিয়ে সাপের মত উঠে গিয়ে হাফ ল্যান্ডিং মুখে ওঁৎ পেতে বসেছিল ডোনা।

দু'জন তিনতলার পুব দিকের করিডোর দিয়ে ছুটে এসে সিঁড়ি দিয়ে নামতে যাচ্ছিল।

ডোনার প্রস্তুত স্টেনগান অগ্নিবৃষ্টি করল তাদের প্রতি।

দু'জনেরই দেহ ঝাঁঝরা হয়ে গেল। ঝরে পড়ল তাদের দেহ সিঁড়ির মাথায়।

ডোনা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তাতিয়ানা এস।'

বলে ডোনা ছুটে উপরে তিন তলায় উঠে গেল। তিন তলার ল্যাডিং-এর সীমানায় দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে স্টেনগান বাগিয়ে দু'পাশের করিডোরের দিকে নজর রাখল সে।

তাতিয়ানা উঠে এলে দু'জন দুই করিডোরের দিকে নজর রাখল।

ডোনা উৎকর্ণ হয়ে দেখল, না কোন দিক দিয়েই কোন শব্দ আসছে না।

পল পল করে দু'মিনিট চলে গেল। না কোন দিক থেকেই কোন শব্দ আসছে না।

'তাতিয়ানা, তুমি দুই করিডোরের দিকে নজর রাখ। আমি পশ্চিম অংশটা দেখে আসি।'

বলে ডোনা পশ্চিম দিকের করিডোর দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

ফিরে এল পাঁচ মিনিট পর। বলল, 'একেবারে শূন্য। কেউ নেই।'

'নিচে তো অবশ্যই কেউ নেই। উপরেও কি কেউ নেই?'

'থাকলে সাত-আট মিনিট কেউ বসে থাকতো না। বিশেষ করে তারা যখন জানে না এদিকে কি ঘটেছে।'

এরপর দু'জনের একজন সামনে অন্যজন পেছন দিকে নজর রেখে পুব দিকের অংশে প্রবেশ করল।

বিড়ালের মত সন্তর্পণে কিছুটা চলার পর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ডোনা উৎকর্ণ হয়ে শুনতে চেষ্টা করল কোন শব্দ কোথা থেকে আসে কিনা।

এক জায়গায় দাঁড়াবার পর হঠাৎ ডোনার এ্যান্টেনায় ভেসে এল ক্লিক করে উঠা মোটা ধাতব একটা শব্দ। ডোনা নিশ্চিত হলো, এটা দরজা খোলা বা বন্ধ হবার শব্দ। শব্দের ডাইরেকশন বুঝতে চেষ্টা করে দেখল, যে করিডোরে তারা দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে পুবদিকে খুব কাছে থেকেই এ শব্দটা এসেছে।

এগুলো দু'জন করিডোর ধরে পুব দিকে।

একটু এগিয়েই পেল উত্তর দক্ষিণ একটা করিডোর।

ডোনা ও তাতিয়ানা করিডোরের দুই দেয়াল ঘেঁষে দু'জন খুব সন্তর্পণে মুখ বাড়াল করিডোরে।

করিডোর শূন্য। তবে খুব সামনেই করিডোরের ওপাশের দেয়ালে একটা দরজা।

ডোনা ভাবল, এই দরজা দিয়েই কেউ বেরিয়েছে বা ঢুকেছে তিরিশ-চল্লিশ সেকেন্ড আগে।

দরজার নব ঘুরিয়ে দেখল দরজা খোলা।

স্টেনগান বাগিয়ে ডোনা এক ঝটকায় খুলে ফেলল দরজা। প্রবেশ করল ডোনা।

কিন্তু তাতিয়ানা তৎক্ষণাৎ প্রবেশ করল না। দরজায় দাঁড়িয়ে চোখ রাখল বাইরের দিকে।

ভেতরে ঢুকেই ডোনা দেখতে পেল, ঘরের উত্তর পাশে একটা চেয়ারে আহমদ মুসা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। আরও দু'জন হাত-পা বাঁধা মেঝেতে পড়ে আছে। দুজনেই আহত।

ছুটে যাচ্ছিল ডোনা আহমদ মুসার দিকে। সে খেয়াল করেনি আহমদ মুসার পেছনেই আরেকজন দাঁড়িয়ে আছে। তারও হাতে স্টেনগান। তার হাত উঠে গেল দেয়ালের সুইচে। চিৎকার করে বলল, 'হাত থেকে স্টেনগান ফেলে দিয়ে হাত তুলে দাঁড়াও। এক মুহূর্ত দেরী হলে আমি বিদ্যুতের ৪৫০ ভোল্টের সুইচ টিপে দেব। গোটা চেয়ার বিদ্যুতায়িত হয়ে অঙ্গারে পরিণত হবে আহমদ মুসা।'

সঙ্গে সঙ্গে পাথরের মত দাঁড়িয়ে গেল ডোনা। ফেলে দিল হাত থেকে স্টেনগান। হাত তুলে দাঁড়াল সে।

চমকে উঠেছিল তাতিয়ানা।

আশ্বস্ত হলো ডোনার স্টেনগান ফেলার শব্দ শুনে। একটু সময় পাওয়া গেল।

তাতিয়ানা তার রিভলবার বাগিয়ে দরজার চৌকাঠ ঘেঁষে কোন রকমে ডান চোখটা ভেতরে নিয়ে আহমদ মুসার পিছনে দাঁড়ানো লোকটাকে এক ঝলক দেখে নিয়ে বিসমিল্লাহ বলে গুলী করল তার মাথা লক্ষ্যে।

গুলী লোকটার কপাল ভেদ করে বেরিয়ে গেল।

ছিটকে তার দেহটা দেয়ালের সাথে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল।

ছুটল ডোনা আহমদ মুসার বাঁধন খুলে দেয়ার জন্যে।

তাতিয়ানাও ঘরে প্রবেশ করে ছুটল সেদিকে বাঁধন খুলতে ডোনাকে সাহায্য করার জন্য।

বাঁধন খুলতে খুলতে হঠাৎ ডোনা চিৎকার করে উঠল, 'তাতিয়ানা কেউ আসছে।'

ডোনা আহমদ মুসার সামনে হাতের বাঁধন খুলছিল। আর তাতিয়ানা পাশে দেহের বাঁধন কেটে দিচ্ছিল।

ডোনার চিৎকারের সংগে সংগে তাতিয়ানা ঘুরে দাঁড়াল।

ডোনাও ঘুরে দাঁড়িয়েছিল।

তাতিয়ানা ও ডোনা দু'জনেই দেখল, ঘরের মেঝে ভেদ করে একজন লোক আবির্ভূত হয়েছে ঘরের দক্ষিণ প্রান্তে। তার হাতের রিভলবার উঠে এসেছে আহমদ মুসার লক্ষ্যে।

লোকটির তর্জনি নড়ে উঠছ। তর্জনি চেপে বসেছে রিভলবারের ট্রিগারে।

বিমূঢ় তাতিয়ানা চিৎকার করে আছড়ে পড়ল গিয়ে ডোনার দেহের উপর। ঢেকে দিল ডোনার দেহকে নিজের দেহ দিয়ে। আর সেই সাথেই রিভলবার গর্জন করে উঠল লোকটির। তাতিয়ানার বুকের পাশ ভেদ করে গেল গুলীটি।

ডোনা ততক্ষনে তার কোমরের বেল্টে ঝুলানো পকেট থেকে রিভলবার তুলে নিয়েছিল।

সে বামহাতে তাতিয়ানাকে জড়িয়ে রেখে ডান হাত তুলে গুলী করল লোকটিকে। লোকটি এগিয়ে আসছিল সম্ভবত, আহমদ মুসাকে সঠিকভাবে টার্গেট করার জন্যে। দু'পা এগুতে পারল না। ডোনার গুলী তার কপাল গুড়িয়ে দিল।

ডোনা তাড়াতাড়ি তাতিয়ানাকে অতি সন্তর্পণে মেঝের উপর নামিয়ে রেখে আহমদ মুসার অবশিষ্ট বাঁধন কেটে দিয়েই তাতিয়ানার দেহ কোলে তুলে নিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল।

আহমদ মুসা মুক্ত হয়েই প্রথমে সাইমুমের দু'জনের বাঁধন কেটে দিল।

সাইমুমের দু'জন যোদ্ধা উঠেই দু'টো স্টেনগান হাতে তুলে নিল।

আহমদ মুসা তাতিয়ানার পাশে বসে তার একটি হাত হাতে নিয়ে বলল, এ তোমার কি হলো তাতিয়ানা। তুমি কিভাবে এখানে এলে, এর সাথে জড়িয়ে পড়লে!'

'আমার আল্লাহ আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন। তাঁর কাছে সর্বান্তকরণে এমন কিছুই তো চেয়েছিলাম।' ধীর কন্ঠে বলল তাতিয়ানা।

'ডোনা তাতিয়ানাকে তুলে নাও। হাসপাতালে নিতে হবে।' বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

তাতিয়ানা ম্লান হাসল। বলল, 'তুমি ব্যস্ত হয়ো না। হাসপাতালে যাবার সময় আমার নেই।'

ডোনা কেঁদে উঠে জড়িয়ে ধরল তাতিয়ানাকে, 'না মরতে পার না, মরতে দেব না তোমাকে। এ তুমি কি করলে। কেন তুমি তোমার জীবন দিয়ে আমাকে বাঁচাতে গেলে?'

তাতিয়ানা ডোনার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, ' না ডোনা, এক পাথর হৃদয়ে ফুল ফুটাতে পেরেছ তুমি, এক মহা বিপ্লবীর পাথর হৃদয় গলাতে পেরেছ তুমি, তুমি তার প্রিয়তমা। তোমার জীবন অসীম মূল্যবান, তোমাকে বাঁচতে হবে ওঁর জন্যেই।'

'থাম, এসব কি বলছ তুমি।' বলে তাতিয়ানার মাথা টেনে নিল বুকের আরও কাছে।

মুখ নিচু করে পাথরের মত বসেছিল আহমদ মুসা তাতিয়ানার পাশেই।

বহু কষ্টে তাতিয়ানা মুখ ঘুরিয়ে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। অস্ফুট স্বরে বলল, 'তাতিয়ানার দিকে একটু তাকাবে না?'

আহমদ মুসা তাকাল তাতিয়ানার দিকে। এই প্রথম তাতিয়ানার চোখে চোখ রাখল আহমদ মুসা।

হাঁপাচ্ছিল তাতিয়ানা। আহমদ মুসার চোখে চোখ রেখে ক্ষীণ কন্ঠে বলল, 'একদিন তোমাকে বলেছিলাম, বিপ্লবীর মন থাকতে নেই। বলেছিলাম, বিপ্লবীরা রক্ত স্রোতের দেয়াল পেরিয়ে হৃদয়ের সবুজ উপত্যকা দেখতে পায় না। ... আমার কথা ঠিক ছিল না। ... আমি স্বীকার করছি, তুমি বিপ্লবী, কিন্তু তোমার একটি নরম মন আছে, সবুজ একটি হৃদয় আছে। তো...মাকে অভি...নন্দ...ন।'

বহু কষ্টে কথা শেষ করল তাতিয়ানা। চোখ দু'টি তার বুজে গেল।

আহমদ মুসার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছে। ঠোঁট দু'টি তার পাথরের মত স্থির। অশ্রু যে কথা বলল, ঠোঁট তা বলতে পারল না।

ধীরে ধীরে তাতিয়ানা চোখ খুলল। ডোনার দিকে চেয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, 'ডোনা, আরও কাছে এস, তোমাকে একটা চুমু খাব।'

ডোনা পাগলের মত চুমু খেল তাতিয়ানার কপাল, চোখ, গাল, ঠোঁট সবর্ত্র। কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'তুমি আমাকে এসব কথা বলনি কেন? কেন বলনি তুমি ওকে চিনতে, ভালোবাসতে! আমি ওঁকে ছাড়তে পারব না তাই বুঝি!'

এক টুকরো ম্লান হাসি ফুটে উঠল তাতিয়ানার ঠোঁটে। তার ক্ষীণ কন্ঠে ধ্বনিত হলো, 'ডোনা বোন, সারাজীবন ধরে জীবনটা ভোগ করলেও আজকের মৃত্যুর মত এত সুখ আমি পেতাম না। কেঁদনা বোন, আমি মরে গেলেও তোমার মধ্যে আমি বেঁচে থাকব। আমরা দু'জন না একাত্মা! তাহলে তোমার চোখ আমার চোখ, তোমার ঠোঁট আমার ঠোঁট, তোমার কথা আমার কথা হবে না কেন?'

তাতিয়ানার শেষ কথাগুলো ক্ষীণতর হতে হতে নীরবতায় মিলিয়ে গেল।

পরক্ষণেই কষ্ট করে চোখ আবার খুলল তাতিয়ানা। তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'তোমাকে একটা ভার দিতে পারি?'

‘বল।’ শুকনো কন্ঠ আহমদ মুসার। এই একটা শব্দ উচ্চারণ করতে গিয়েও তার ঠোঁট কাঁপল।

শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল তাতিয়ানার। হাঁপাচ্ছিল সে। দু’হাতে পাঁজরটা চেপে ধরে অস্ফুট কন্ঠে বলতে শুরু করল আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে, ‘আমার ব্রীফকেসে একটা ডায়েরী আছে। লক করা। এই ডায়েরী এবং আমার হাতের এই আংটি তোমাকে পৌঁছে দিতে হবে আমার ফুফু প্রিন্সেস ক্যাথরিন (তৃতীয়) কে। আমার পর পিটার পরিবারের একমাত্র উত্তরাধিকারী সে। উনি থাকেন প্যারিসের সোন নদীর দক্ষিণ তীরে লুই এর প্যালেস এলাকার ঐ বাড়িতে।’ বলে তাতিয়ানা ডোনার দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ কন্ঠে বলল, ‘আমার আঙুল থেকে আংটি খুলে ওকে দাও।’

তাতিয়ানার ডান হাতের অনামিকা থেকে আংটি খুলতে খুলতে ডোনা বলল, ‘আমাদেরও বাড়ি ঐ এলাকায়। আমি এক ক্যাথরিনকে চিনি।’

তাতিয়ানার কানে কথাগুলো পৌঁছল কিনা বুঝা গেল না। সে বলেই চলল, ‘পিটার দি গ্রেট থেকে শুরু করে ক্যাথরিন (প্রথম), এলিজাবেথ, পিটার (তৃতীয়), ক্যাথারিন (দ্বিতীয়), পল (প্রথম), আলেকজান্ডার (প্রথম), নিকোলাস (প্রথম), আলেকজান্ডার (দ্বিতীয়), নিকোলাস (দ্বিতীয়)- অর্থাৎ সব রুশ সম্রাট এই আংটি সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে পরেছেন।’

তাতিয়ানার শেষ কথাগুলো ভেংগে পড়ল গভীর ক্লান্তিতে। চোখ বুজে গেল তাতিয়ানার। দেহের স্পন্দন তার শেষ হয়ে যাচ্ছে।

কিছু বলার জন্যে ঠোঁট নাড়ছিল তাতিয়ানা।

চোখ তার ঈষৎ ফাঁক হযে গেল।

চোখ দু’টো আহমদ মুসার দিকে টেনে নিয়ে বলল, ‘আমার কবর দেয়ার সুযোগ হলে মুসলিম মতে আমার দাফন করো। তুমি মরজেস থেকে চলে আসার পর আমি জেনে...ভায় এ ...সে ইস...লাম গ্রহ..ণ করে..ছি।’

তাতিয়ানার কথা থেমে যাবার সাথে সাথে তার দেহটাও নিশ্চল হয়ে পড়ল।

‘তাতিয়ানা, বোন আমার।’ বলে তাতিয়ানাকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ল ডোনা।

ডোনার গাড়ির ড্রইভিং সিটে বসল আহমদ মুসা। আর ডোনা তাতিয়ানার মরদেহ কোলে করে গাড়ির পেছনের সিটে বসল। বসতে গিয়ে ফুপিয়ে কেঁদে উঠল ডোনা। এই গাড়ি করে দু’জন এসেছিলাম এবং পরিকল্পনা করেছিলাম। আর এখন ...

কান্নায় রুদ্ধ হয়ে গিয়েছল ডোনার কন্ঠ।

আহমদ মুসা পিছন ফিরে চাইল, কিন্তু কোন কথা বলল না।

সাইমুমের দু’জন গিয়ে উঠেছিল সাইমুমের গাড়িতে।

উপর থেকে নামার আগেই আহমদ মুসা টেলিফোন করেছিল পুলিশকে যে, লেক আইল্যান্ড-এর ৯৯ নং বাড়িতে বড় ঘটনা ঘটেছে। আপনারা আসুন। একইভাবে WNA, FWTV, রায়টার, এএফপি, এপি- সবাইকে টেলিফোন করে খবর দিয়েছে।

রাত থেকেই রেডিও এবং টিভি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে WNA ও FWTV সংবাদ সংস্থা দু’টির চাঞ্চল্যকর হত্যা রহস্য গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ল। বলা হলো, ব্ল্যাক ক্রস সংবাদ সংস্থা দু’টিকে বন্ধ করার, ধ্বংস করে দেয়ার ষড়যন্ত্র এঁটেছিল। লেক আইল্যান্ডে তাদের নিজস্ব ঘাঁটিতে ব্ল্যাক ক্রসের প্রধান সাইরাস শিরাকসহ তাদের ১৩ জন লোককে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেছে। এবং পাওয়া গেছে সিসি মাছির প্রজনন ও পালন ক্ষেত্র। পুলিশের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, সম্ভবত ব্ল্যাক ক্রসএর প্রতিদ্বন্দ্বী কোন গ্রুপ অথবা গোপন সৌখিন কোন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তাদের হত্যা করে তাদের ষড়যন্ত্র ধরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছে।

সুইজারল্যান্ডের সবগুলো দৈনিক ব্যানার হেডে খবরটি ছেপেছে। তারা সুইচ পুলিশের ব্যর্থতার তীব্র নিন্দা করেছে এবং দু’টি সংবাদ সংস্থার বিরুদ্ধে

পরিচালিত ষড়যন্ত্রে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সর্বাধিক প্রচাতি 'দার ব্লিক' পূর্বাপর ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে অবশেষে লিখেছে, ''এই ঘটনা শুধু দু'টি সংবাদ সংস্থার নিরাপত্তাহীনতা নয়, গোটা সংবাদপত্র জগতের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তাকে হুমকির সম্মুখিন করে তুলেছে। ব্ল্যাক ক্রস-এর গোটা কার্যক্রমের উপর ইন্টারপোলের মাধ্যমে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। তারা ইতিপূর্বে অনেক কুকীর্তি করেছে, মানবতার বিরুদ্ধে জঘন্য অপরাধ করেছে। মনে করা হচ্ছে, পুলিশের এবং প্রশাসনের একটি মহলের সাথে যোগ সাজশের মাধ্যমে বর্ণবাদী এই সংগঠনটি সর্বত্র যথেচ্ছাচার চালিয়ে যেতে পারছে। সুইচ পুলিশের কারা এর সাথে জড়িত রয়েছে, তারও অবশ্যই তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।'

সব শেষে 'দার ব্লিক' লিখেছে, WNA এবং FWTV সংস্থা দু'টিসহ নিহতদের পরিবারের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ হওয়া প্রয়োজন।'

WNA-এর চেয়ারম্যান মিঃ গটেফ এবং FWTV -এর চেয়ারম্যান মিঃ জারমিস জেনেভা বিমান বন্দরে আহমদ মুসার সাথে বিদায়ী হ্যান্ডশেক করতে গিয়ে বলল, 'যে অবিস্মরনীয় কাজ আপনি করলেন, তার কৃতিত্ব দেবার জন্যে দুনিয়ার মানুষ লোক খুঁজে পাচ্ছে না। আহমদ মুসা আপনার কি ইচ্ছা করে না এই কৃতিত্বের মালিক হতে?'

আহমদ মুসা হেসে বলল, 'আমার কোন কিছুই আমার নয়? সব কিছু যিনি দিয়েছেন, কৃতিত্ব তো তারই হবার কথা। সব কিছু যিনি দিয়েছেন তাঁর জন্যেই আমি কাজ করছি।'

'একেই বলে বোধ হয় ফি সাবিলিল্লাহর কাজ?' বলল মিঃ গটেফ।

মিঃ গটেফের কথা শেষ হতেই মিঃ জারমিস বলল, 'প্রশংসা নয়, আমাদের কৃতজ্ঞতা আপনি নিন। এ দু'টি সংবাদ সংস্থা ধ্বংস হলে মুসলমানদের শুধু যে তাৎক্ষণিক অপূরণীয় এক ক্ষতি হতো তা নয়, এ ধরনের আর কোন সংবাদ

সংস্থা গড়ে উঠতো না, গড়ে উঠতে তারা দিত না। এক অন্ধকারে ডুবে যেত মুসলিম উম্মাহ।'

'সে মুসলিম উম্মারই তো আমি একজন গর্বিত সদস্য। সুতরাং একজন উপকৃতকে আবার কৃতজ্ঞতা কেন?'

বলে আহমদ মুসা আবার সালাম দিয়ে পা বাড়াল বিমানের দিকে।

বিমানে ডোনা এবং তার আব্বা আগেই উঠে গেছে। আহমদ মুসা বিমানে উঠে ডোনার আব্বার পাশে বসল। ডোনার আব্বার ওপাশে বসেছে ডোনা।

আহমদ মুসা বসতেই ডোনা বলল, 'মদীনা শরীফ থেকে কি খবর পেলেন?'

'তাতিয়ানার লাশ সকাল ১১টায় পৌঁছেছে মদীনা শরীফের বিমান বন্দরে। সেখান থেকেই দাফন গাহে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আবার জানাযা হয়েছে সেখানে। দাফন হয়ে গেছে।' বলল আহমদ মুসা।

সেদিন ঘটনার পর রাতেই আহমদ মুসা জুরিখস্থ সৌদি দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করে তাতিয়ানার লাশ মদীনায় দাফন করার অনুমতি চায়। সৌদি দূতাবাস রাতেই রিয়াদে সরকারের কাছে মেসেজ পাঠায়। সংগে সংগেই সরকার অনুমতি দিয়ে টেলিফোন করে। সকালেই সৌদি দূতাবাসের তত্ত্বাবধানে তাতিয়ানার লাশ দাফনের জন্যে মদীনা শরীফ পাঠানো হয়।

আমিনার (মেইলিগুলি) কবরের পাশেই তার কবর দেয়ার ব্যবস্থা করেছে আহমদ মুসা।

'আলহামদুল্লিাহ।' স্বগত উচ্চারণ করল ডোনা।

'প্যারিসে টেলিফোন করে ক্যাথারিন-এর কোন খোঁজ পেয়েছিলে?' ডোনাকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করল আহমদ মুসা।

সংগে সংগে ডোনা কোন উত্তর দিল না। একটু সময় নিয়ে ধীর কন্ঠে বলল, 'মাফ করবেন' ভেবেছিলাম বিমানে আপনাকে খবরটা দেব না। ওখানকার খবর মনে হচ্ছে ভাল নয়। আমি যে ক্যাথারিনকে চিনি, তিনি দু'দিন আগে অর্থাৎ এখানে তাতিয়ানার মৃত্যুর দিন প্যারিস থেকে নিখোঁজ হয়েছেন।'

'নিখোঁজ হয়েছেন? না কিডন্যাপ হয়েছেন?'

‘দু’য়ের মধ্যে পার্থক্য কি?’

‘খোঁজ না পাওয়ার অর্থ কিডন্যাপ হওয়া নয়। কাউকে না বলে হঠাৎ কোথায়ও চলে গেলে, মারাত্মক আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেও মানুষ নিখোঁজ নয়।’

‘বুঝেছি। ধন্যবাদ। তাঁকে কিডন্যাপ করা হয়েছে বলেই মনে হয়। তিনি যথারীতি রাতে শয়ন করেন, কিন্তু সকাল বেলা তাকে বেডে পাওয়া যায়নি। তার জানালার গরাদ খোলা ছিল।’

‘তুমি যে ক্যাথারিনকে চিন সে কি রুশ।’

‘হ্যাঁ রুশ।’

‘তাহলে তোমার সন্দেহ কেন যে এ ক্যাথারিন সে ক্যাথারিন নাও হতে পারে?’

‘তাতিয়ানা ক্যাথারিন তৃতীয় -এর কথা বলেছে। আমার ক্যাথারিন তৃতীয় কিনা জানি না। আর রুশদের মধ্যে ক্যাথারিন নাম প্রচুর।’

‘ক্যাথারিনের সাথে কিভাবে তোমার পরিচয়?’

‘আমরা একই স্কুলে পড়েছি।’

‘সে যে পিটার পরিবারের কিংবা রাশিয়ার রাজপরিবারের কেউ, এমন কোন কিছু জানতে পারনি?’

‘না। তার বাসায় কোন সময় যাইনি। দেখিনি বাসা কোন সময়। কেউ তার বাসায় গেছে বলেও শুনিনি। আব্বা হয়তো কিছু বলতে পারেন, পিটার পরিবারের কেউ আমাদের ওখানে থাকে কিনা।’

‘স্যরি। আমিও জানি না। রুশ বিপ্লবের পর সেখানকার রাজপরিবারের যারা পালিয়ে এসেছে, তারা সবাই আত্মগোপন করে থাকছে। এমনকি তারা আগে ছেলে মেয়েদের স্কুলে পর্যন্ত পাঠাতো না সোভিয়েত গোয়েন্দাদের চোখে পড়ার ভয়ে। সুতরাং বাড়ির পাশে থাকলেও তাদের আসল পরিচয় জানা কঠিন।’

‘ঠিক বলেছেন। এটাই স্বাভাবিক ছিল।’

বলে একটু থেমেই আহমদ মুসা আবার বলল, ‘মাফ করো ডোনা আরেকটা প্রশ্ন। তোমার ক্যাথারিন কি ধরনের জামা-কাপড় পরতো?’

‘সবার থেকে আলাদা। লম্বা হাতাওয়ালা এবং পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত নামানো জামা বা স্কার্ট পরতো সে।’

‘আমার অনুমান মিথ্যা না হলে এই ক্যাথারিন সেই ক্যাথারিনই হবেন।’

‘তাহলে তো দুঃসংবাদ। আমরা যার জন্যে ছুটে যাচ্ছি, তিনি তো নেই।’

‘কে জানে, হয়তো আমরা আর এক রহস্যের মুখোমুখি। তাতিয়ানা চলে গেছে, কিন্তু তার ডায়েরী এবং তার আংটি, জার সম্যাটদের সৌভাগ্য অঙ্গুরী, আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে কে জানে?’

চমকে উঠল ডোনা। তার চোখে নামল উদ্বেগের একটা ছায়া। বুকও যেন কাঁপল তার। কথা বলল না সে।

আহমদ মুসাও কোন কথা বলল না।

অথৈ শূন্যে সাঁতার কেটে ছুটে যাচ্ছে বিমান প্যারিসের উদ্দেশ্যে।

আহমদ মুসা তার ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিল বিমানের সিটে।

সাইমুম সিরিজের পরবর্তী বই

# রাজ চক্র

**কৃতজ্ঞতায়ঃ**

1. Hm Zunaid
2. Tamanna Chowdhury
3. Ahsan Bandarban
4. Shakir Ahmed Junnun
5. Selina Akhter
6. Md Amdadul Haque Swapan
7. Monirul Islam Moni
8. Md Amdadul Haque Swapan

সাইমুম-২৩

# রাজচক্র

আবুল আসাদ

# ১

বন্ধ গেটটির সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে হর্ণ দিল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার গায়ে ফরাসি মেট্রো পলিটান পুলিশ ইন্সপেক্টরের পোশাক।

গেটম্যান বন্ধ গেটের ওপাশে দাঁড়িয়ে আহমদ মুসার গাড়ির দিকে তাকাল।

আহমদ মুসা গাড়ি থেকে মুখ বের করে বলল, 'দরজা খুলে দাও। ম্যাডামের সাথে কথা বলতে হবে।'

গেটম্যান পা ঠুকে আহমদ মুসাকে একটা স্যালুট দিয়ে বলল, 'ইয়েস স্যার।'

গেট খুলে গেল। ভেতরে প্রবেশ করল আহমদ মুসার গাড়ি। বেশ বড় বাড়ি। চারদিকে প্রাচীর ঘেরা। উঁচু প্রাচীর।

শিন নদীর রয়্যাল ব্রীজ থেকে যে প্যালেস দক্ষিণ দিকে উঠে গেছে, তার দক্ষিণ প্রান্তের দিকে এ বাড়িটি। লুইদের প্রাসাদ অর্থাৎ ডোনাদের বাড়ি এ প্যালেস রোডের মুখে অর্থাৎ নদীর তীরেই।

বাড়িতে থাকত ক্যাথারিন, তার মা এবং ক্যাথারিনের নানা। ক্যাথারিন কিডন্যাপ হওয়ার পর তার মা এবং নানা রয়েছে বাড়িতে।

আহমদ মুসা প্যারিসে আসার পর ক্যাথারিনের বিষয় জানার জন্যে ক্যাথারিনের মা'র সাথে চেষ্টা করেও দেখা করতে পারেনি। প্রতিবার চেষ্টায় একই জবাব পেয়েছে, কারও সাথে উনি কথা বলবেন না। কারও কিছু জানার বা বলার থাকলে তিনি পুলিশের সাথে যোগাযোগ করুন।

কিন্তু ক্যাথারিনের মা'র সাথে দেখা আহমদ মুসাকে করতেই হবে। অবশেষে আজ পুলিশ বেশে আহমদ মুসা প্রবেশ করল ক্যাথারিনের বাড়িতে।

গাড়ি বারান্দায় গাড়ি থামতেই একজন বেয়ারা ছুটে এসে গাড়ির দরজা খুলে ধরল।

আহমদ মুসা নামল গাড়ি থেকে।

'আসুন, মহামান্য ডমেস অপেক্ষা করছেন ড্রইংরুমে।' বলল বেয়ারা, সামনে চলার পথের দিকে ইংগিত করে।

বেয়ারা পুলিশ রূপী আহমদ মুসাকে পৌঁছে দিল ড্রইংরুমে।

ড্রইংরুমে প্রবেশ করে আহমদ মুসা দেখল ষাট-পঁয়ষট্টি বছরের একজন বৃদ্ধা সোফায় বসে আছে। রাজকীয় চেহারা। বসে আছেনও রাজকীয় কায়দায়।

এ বৃদ্ধাই তাতিয়ানার দাদী এবং ক্যাথারিনের মা। নাম গ্রান্ড ডমেস লিওনিদা জিভনা।

আহমদ মুসা প্রবেশ করতেই ক্যাথারিনের মা বলল, 'ওয়েলকাম, ইন্সপেক্টর।'

তারপর সোফার দিকে ইংগিত করে বলল, 'বসুন।'

আহমদ মুসা বসল।

আহমদ মুসা বসতেই ক্যাথারিনের মা লিওনিদা বলে উঠল, 'মিঃ ইন্সপেক্টর, বলুন আমি কি সাহায্য করতে পারি। কালকেও তো আবার জানিয়েছি, যা বলেছি তার বাইরে কোন তথ্য আমাদের কাছে নেই।'

‘ইয়োর হাইনেস, আপনি কি আমাকে মাফ করবেন যদি আমি বলি আমি পুলিশের বেশ ধরে এসেছি, কিন্তু আমি পুলিশ নই।’ বলল আহমদ মুসা খুব নরম কন্ঠে।

কথাটা শুনেই বিস্ময়ের একটা ছায়া খেলে গেল ক্যাথারিনের মা লিওনিদার মুখের উপর দিয়ে। তার চোখ দু’টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। বলল, ‘তাহলে আপনি কে? ক্যাথারিনকে কিডন্যাপকারীদের কেউ?’

‘আমি পুলিশেরও কেউ নই, কিডন্যাপকারীদেরও কেউ নই। আমি ক্যাথারিনের শুভাকাঙ্খী। আমি চাই সত্বর তিনি উদ্ধার পান।’

‘ক্যাথারিনের বন্ধু তুমি? কিন্ত ক্যাথারিনের বন্ধু ছিল বলে তো জানি না।’

‘আমি ক্যাথারিনের বন্ধু নই। তাঁর সাথে কোনদিন দেখাও হয়নি। আমি তাঁর একজন শুভাকাঙ্খী।’

‘কারণ?’ ক্যাথারিনের মা লিওনিদার চোখে তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসা।

আহমদ মুসা দ্বিধায় পড়ে গেল। সে তাতিয়ানার সাথে সম্পর্কের কথা এখন বলতে চায় না।

আহমদ মুসা তৎক্ষণাৎ কোন জবাব দিতে পারল না।

‘উদ্দেশ্যই সবচেয়ে বড় জিনিস। তুমি যখন উদ্দেশ্যটাই বলতে পারলে না, তখন তোমার বিশ্বাসযোগ্যতা আর থাকল কোথায়?’

‘আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে সব সত্য সব সময় প্রমাণ করা যায় না। সব কথা সব সময় বলাও যায় না।’

‘তা যায় না, কিন্ত কেন তুমি আমাদের সাহায্য করতে চাও, এটুকু তো তোমার বলা উচিত।’

আহমদ মুসা গম্ভীর হলো। বলল, ‘অবশ্যই বলা উচিত। কিন্ত বলতে পারছি না। অবিশ্বাস করে যতটুকু বলা যায় ততটুকু কি আমাকে বলতে পারেন না?’

ক্যাথারিনের মা লিওনিদা হাসল। বলল, ‘বলতাম। তোমাকে অবিশ্বাস করলে বলতাম। কিন্তু তুমি সত্য লুকাওনি। তোমাকে খুবই ভালো ছেলে মনে হচ্ছে। তাছাড়া তুমি এশিয়ান, তোমার এতটা পর্যন্ত পৌঁছা প্রমাণ করছে আর দশ

জনের মত সাধারণও তুমি নও। যেহেতু আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, তাই আমি চাই, তুমিও আমাকে বিশ্বাস করো।'

আহমদ মুসা ভাবছিল। জবাব তৎক্ষণাৎ দিতে পারল না। ক্যাথারিনের মা'র আন্তরিকতাপূর্ণ কথাগুলো তার হৃদয় স্পর্শ করেছে। কিন্তু সব কথা খুলে বলতে সে ভরসা পাচ্ছে না। বিশেষ করে তাতিয়ানার মৃত্যুর খবর, আংটি ও ডায়েরীর কথা।

উত্তর দিতে আহমদ মুসার দেরী হলো।

কথা বলল আবার ক্যাথারিনের মা'ই। বলল, 'ঠিক আছে। বলো, কি জানতে তুমি।' অসন্তুষ্টির ছাপ তার চোখে-মুখে।

আহমদ মুসা উঠে গিয়ে লিওনিদার পায়ের কাছে কার্পেটের উপর বসল। বলল, 'আপনি আমার মায়ের মত। আপনি অসন্তুষ্ট হলে আমি কষ্ট পাব। সবই আপনি জানতে পারবেন, কিন্তু আজ নয়।'

লিওনিদা হাসল। বলল, 'পাগল ছেলে। যাও উঠে বস। তোমার মুখ দেখে যা বুঝেছি, ঠিক তেমন তুমি। বলত কি বিষয় তুমি জানতে চাও?'

'ক্যাথারিনের কিডন্যাপ হওয়ার পূর্বাপর অবস্থা ও কারণ সম্পর্কে কিছু তথ্য।'

'এসব তথ্য নিয়ে কি করতে চাও তুমি?'

'আমি তাঁকে উদ্ধার করার চেষ্টা করব।'

লিওনিদা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'মনে হয় বাজে কথা তোমার মুখে মানায় না। তুমি কি বুঝে কথা বলছ বাছা? আমরা এক কঠিন সংকটে পড়েছি। কিন্তু তাই বলে এই নিয়ে কোন প্রকার বিদ্রুপ আমরা পছন্দ করবো না।'

আহমদ মুসার ঠোঁটে সূক্ষ্ম একটা হাসি ফুটে উঠল।

তৎক্ষণাৎ জবাব দিল না। একটু সময় নিয়ে ধীরে ধীরে বলল, 'ইয়োর হাইনেস, আমি সামান্য মানুষ। শক্তি সেই রকম ক্ষুদ্র। কিন্তু তাই বলে কাউকে এমন ছোট করে দেখা কি ঠিক?'

হাসল লিওনিদা। সোজা হয়ে বসল। বলল, ‘বাহ তুমি বেশ কথা জান। আমি তোমাকে ছোট করে দেখিনি। তবে তোমার কথাটা অসম্ভব, কিছু মনে হওয়ায় ওভাবে তার প্রকাশ করেছি। যাক, তোমার দৃঢ়তাকে মোবারকবাদ দিচ্ছি বাছা। বল, তুমি কি জানতে চাও।’

‘প্রিন্সেস ক্যাথারিন কিডন্যাপ কেন কার দ্বারা হলো, এ ব্যাপারে আপনার চিন্তা আমাকে বলুন।’

লিওনিদার চোখে সামান্য বিস্ময়ের একটা রেখা ফুটে উঠল। বলল, ‘আমি কি জানি, তা জিজ্ঞাসা না করে আমার চিন্তা জানতে চাচ্ছ কেন?’

‘মানুষ অনেক কিছু না জানতে পারে, কিন্তু অনেক কিছু সে চিন্তা করতে পারে। আর চিন্তার মধ্যে জানা বিষয়ও থাকে, চিন্তাও থাকে।’

‘ব্রাভো, ব্রাভো! তুমি আমাকে অবাক করেছ বৎস। পুলিশ কিন্তু সব সময় জানতে চেয়েছে আমি কি জানি।’

বলে একটু থামল লিওনিদা। তারপর ধীরে ধীরে শুরু করল, ‘পুলিশকে আমি কিছুই বলিনি। কারণ কারা কেন কিডন্যাপ করল কিছুই জানি না। তবে তুমি চিন্তার কথা বলছ। চিন্তা আমার তো কিছু হয়ই।’

আবার থামল।

সোফায় গা এলিয়ে দিল। বলতে লাগল, ‘যখন বুঝলাম, ক্যাথারিন কিডন্যাপ হয়েছে, সংগে সংগে আমার মনে হলো, ‘বহু বছর পর রাশিয়ার রাজ পরিবারের সৌভাগ্য সূর্যের উদয় কি তাদের ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াল? এটাই ছিল আমার প্রথম চিন্তা।’

থামল ডমেস লিওনিদা।

‘সৌভাগ্য সূর্যের উদয়টা কি?’

‘বলছি।’

বলে একটু দম নিল তারপর আবার বলতে শুরু করল, ‘সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়া এবং কম্যুনিজমের পতনের পর রুশ দূতাবাসের কাছে আমাদের পরিচয় আর গোপন রাখিনি। ক’মাস আগে নতুন রুশ সরকারের একজন মন্ত্রী বেসরকারী সফরে ফ্রান্সে এসে আমাদের সাথে দেখা করলেন। তিনি

জানালেন, সরকার চিন্তা করছেন রাজ পরিবারের সব সদস্যকে রাশিয়ায় ফিরিয়ে নেবেন যথাযথ মর্যাদার সাথে। সরকার ক্রাউন প্রিন্সেস তাতিয়ানাসহ রাজ পরিবারের সকল সদস্যের মতামত জানতে চান। এর কিছু দিন পর রুশ প্রেসিডেন্টের বিশেষ দূত এসে গোপনে আমার সাথে দেখা করলেন এবং বললেন, সরকার সংবিধান সংশোধন করে গণতন্ত্রের সাথে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ব্যবস্থা চালু করতে চাচ্ছেন। প্রেসিডেন্টের বদলে থাকবেন রাজা বা রাণী। আর প্রধানমন্ত্রী হবেন রাষ্ট্রের নির্বাহী প্রধান। সিংহাসনের প্রথম উত্তরাধিকারী তাতিয়ানা এবং দ্বিতীয় উত্তরাধিকারী হবেন তৃতীয় ক্যাথারিন। এ ব্যাপারে রুশ সরকার রাজপরিবারের সম্মতি ও সহযোগিতা প্রার্থনা করেছেন।

দ্বিতীয় এই ঘটনার ঠিক দু'মাসের মাথায় ক্যাথারিন কিডন্যাপ হলো এবং পনের দিন হলো তাতিয়ানারও কোন খোঁজ জানি না। ক্যাথারিন ঠিকানাহীন ভবঘুরে হয়ে পড়লেও সাত দিনে সে একবার আমাদের খোঁজ নেবেই। আমি তার জন্যেও উদ্বিগ্ন।' থামল লিওনিদা।

'এ ব্যাপারে আর কিছু আপনার চিন্তায় আছে?'

'রুশ প্রেসিডেন্টের বিশেষ দূত দু'টো জিনিস সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল। সেটা হলো, রুশ সম্রাটদের উত্তরাধিকার বিষয়ক মূল্যবান দু'টি ডকুমেন্ট। আমি বলেছিলাম, রাজ পরিবারের নিয়ম অনুসারে প্রথম উত্তরাধিকারী তাতিয়ানার এ বিষয়টা জানার কথা। অতৎপর এ ব্যাপারে তারা আর কিছু বলেনি।'

'সে দ'টি ডকুমেন্ট কি?'

'তারা বলেনি। আমিও জানি না।'

'এখন কিডন্যাপকারীদের সম্পর্কে আপনার চিন্তা বলুন।'

'এ ব্যাপারটায় আমি একদম অন্ধকারে।'

'আপনার মনে কোন কথাই কি জাগে না?'

'কোন চিন্তাই আমার মনে স্থায়ী হয়নি। কখনও ভেবেছি, ক্যাথারিনের প্রতি আসক্ত কেউ এটা করেছে। কিন্তু নিজেকে এটা বিশ্বাস করাতে পারিনি। মনে হয়েছে, কোন কারণে ক্যাথারিনের প্রতি প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে কেউ এটা করতে

পারে। কিন্তু চারদিকের সমাজ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন ক্যাথারিনের কোন শত্রু আছে বলে মনে করি না।’

‘রুশ সরকার কি কিছু করতে পারে?’

‘এমন চিন্তাও মাথায় এসেছে। কিন্তু তা টেকেনি। রুশ সরকারের যে পরিকল্পনা তার সাথে এই চিন্তা মেলে না। তাছাড়া ক্যাথারিন কিডন্যাপ হওয়ার পর তাদের প্রতিক্রিয়া এবং উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দেখেও আমার তা মনে হয়নি।’ থামল লিওনিদা।

আহমদ মুসা ভাবছিল। তৎক্ষণাৎ কোন কথা বলল না সে। একটু পর বলল, ‘যে দু’টি গোপন ডকুমেন্টের তারা খোঁজ করছে, সেটি আপনি জানেন না। কিন্তু আপনাদের রাজ পরিবারের এ রকম কোন ডকুমেন্টের কথা কি আপনি জানেন?’

‘না জানি না। রাজ পরিবারের কিছু গোপন জিনিস আছে, যা শুধু জানেন রাজা বা সম্রাট। তাঁর অবর্তমানে জানেন যুবরাজ বা যুবরাজ্ঞী। আরেকটা ব্যাপার, যারা ক্যাথারিনকে কিডন্যাপ করেছে, তারা সারা বাড়ি কি যেন খুঁজেছে। কোন ড্রয়ার কোন বাক্স তারা আস্ত রাখেনি। অবস্থা দেখে মনে হয়েছে, তারা পাগলের মত মহামূল্যবান কিছু খুঁজেছে।’

‘স্বর্ণালংকার?’

‘না সে সব তারা নেয়নি।’

‘এ সবের চেয়ে মূল্যবান কি থাকতে পারে?’

‘জানি না।’

‘সেই দু’টি ডকুমেন্ট কি?’

‘জানি না।’

‘ধন্যবাদ। যে ঘর থেকে ক্যাথারিন কিডন্যাপ হয়েছে এবং যে পথ দিয়ে কিডন্যাপকারীরা এসেছে গেছে সেটা কি আমি দেখতে পারি?’

‘অবশ্যই বাছা।’ বলে পাশের টিপয়ে রাখা কম্পিউটার প্যানেলের একটা সুইচে চাপ দিল।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে একজন রুশ বালক এসে হাজির হলো।

‘আলেক্সি, মেহমানকে ক্যাথারিন-এর ঘর এবং কিডন্যাপারদের আসা-যাওয়ার পথটা দেখিয়ে দাও।’

বালকটি মাথা নুইয়ে বাউ করে বলল, ‘তথাস্তু।’

আহমদ মুসা বালকটির সাথে হাঁটতে শুরু করলে লিওনিদা বলল, ‘তোমার নাম বলনি বাছা। আর তুমি কি করছ তা কি জানার আমার সুযোগ হবে?’

‘গেট যদি বাঁধা হয়ে না দাঁড়ায়, তাহলে অবশ্যই সে সুযোগ আপনার হবে।’

পাশের টিপয়ে রাখা একটা সোনালী কেস থেকে একটা ক্ষুদ্রাকার সোনালী কার্ড বের করে আহমদ মুসার দিকে তুলে ধরে বলল, ‘এটা প্রাইভেট নাম্বার। যখন আসতে চাও তার আগে এই নাম্বারে একটা রিং করো। ঈশ্বর আমাদের সহায় হোন।’

‘এই ‘আমাদের’ মধ্যে কি আমি আছি?’

‘অবশ্যই বাছা। তুমি খুব ভাল ছেলে। খুব সহজেই তুমি মা’দের হৃদয় জয় করতে পার।’ বলে সোফায় গা এলিয়ে চোখ বুজল লিওনিদা।

আহমদ মুসা আলেক্সির পিছ পিছ চলল ক্যাথারিনের শোবার ঘরের দিকে।

সবকিছু দেখার পর বালকটি প্রধান গেট পর্যন্ত এসে আহমদ মুসাকে বিদায় দিয়ে গেল।

আহমদ মুসার গাড়ি বেরিয়ে এল ক্যাথারিনের বাড়ি থেকে।

কিছু দূর চলার পর রিয়ারভিউ-এর পর্যবেক্ষণ থেকে তার মনে হলো, কেউ তাকে অনুসরণ করছে।

আহমদ মুসা গাড়ির গতি দ্রুত করল।

সে পুলিশের পোশাক পরে কারও সাথে লড়াই-এ অবতীর্ণ হতে চায় না। ক্যাথারিনের বাড়ির গেট থেকে যে বা যারা তাকে অনুসরণ করছে, তারা গোয়েন্দা বিভাগের লোক হতে পারে। তার পুলিশ হওয়া সম্পর্কে তাদের মনে সন্দেহ জাগতে পারে। কারণ তার গায়ে পুলিশের পোশাক থাকলেও গাড়িটা পুলিশ বিভাগের নয়।

আহমদ মুসা গাড়ির জানালায় শেড দেয়া কাঁচ তুলে পুলিশের পোশাকটা খুলে ফেলল গাড়ি চালাতে চালাতেই। পরল সৌখিন পর্যটকের পোশাক।

শিন এলাকার পুলিশ অফিসের দিকে চলল আহমদ মুসার গাড়ি।

আহমদ মুসা ভাবল, অনুসরণকারী যদি গোয়েন্দা বিভাগের লোক হয়, তাহলে সেও পুলিশ অফিসে ঢুকবে। আর যদি অন্য কেউ হয়, তাহলে ঢুকবে না। আহমদ মুসা যে নিশ্চিতই পুলিশের লোক, এটা নিঃসন্দেহ হয়ে ফিরে যাবে।

আহমদ মুসা দ্রুত পুলিশ অফিসের প্রবেশ গেট দিয়ে ঢুকে অপর প্রান্তের বাইরে বের হওয়ার গেট দিয়ে বেরিয়ে এল।

সে লক্ষ্য করল অনুসরণকারী গাড়িকে আর দেখল না।

আহমদ মুসা নিশ্চিত হলো অনুসরণকারী তাহলে ক্যাথারিনকে কিডন্যাপকারীদের কেউ ছিল এবং ওরা তদন্তকারী পুলিশের গতিবিধির উপর চোখ রাখছে।

ওরা কারা হতে পারে? রুশ সরকার হতে পারে? কিংবা রুশ সরকারের কোন পক্ষ? রুশ রাষ্ট্রদূতের সাথে কথা বললে কিছু বুঝা যেত? কিন্তু এ আলোচনা তার সাথে করা যাবে কোন উপলক্ষে?

সামনেই ডিপ্লোম্যাটিক জোন।

ডিপ্লোম্যাটিক জোনের দিকে চলতে শুরু করল আহমদ মুসার গাড়ি।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল বিকেল ৫টা বাজে।

আহমদ মুসা ভাবল, রাষ্ট্রদূত এ সময় নিশ্চয় তাঁর বাসায় আছেন।

আহমদ মুসা ডিপ্লোম্যাটিক গাইডটি বের করে দেখে নিল ডিপ্লোম্যাটিক জোনের রেসিডেন্সিয়াল এলাকায় রুশ রাষ্ট্রদূতের বাড়ির লোকেশানটা।

রাষ্ট্রদূতের বাড়ির দিকে চলতে চলতে আহমদ মুসা পরিকল্পনা করে নিল কি বলবে সেখানে? ভালই হয়েছে ডমেস লিওনিদার সাগে আগে কথা বলে। এখন ক্যাথারিনের বন্ধু বলে পরিচয় দেয়ার আর কোন সমস্যা নেই।

রাষ্ট্রদূতের গেটে গিয়ে দাঁড়াতেই গেট বক্স থেকে একজন পুলিশ বেরিয়ে এল। স্যালুট দিয়ে বলল, 'স্যার, আদেশ করুন।'

‘আপনি রাষ্ট্রদূতকে বলুন, একটা জরুরী প্রয়োজনে আমি তাঁর সাথে দেখা করব।’

‘আপনার নাম পরিচয় বলন।’

‘তেমন নাম পরিচয় আমার নেই, যা উনি চিনবেন। আমি গিয়েই ওকে পরিচয় দেব।’

পুলিশ তার গার্ড বক্সের কাছে ফিরে গিয়ে কিছু বলল ভেতরের লোককে।

অল্পক্ষণ পরে ফিরে এসে বলল, ‘নাম, পরিচয় এবং প্রয়োজন বলন। না হলে দেখা হবে না।’

আহমদ মুসা গাড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সোজা হয়ে দাঁড়াল। বলল, ‘ওঁকে বলুন, আমার জরুরী প্রয়োজন। অনুমতি না দিলেও আমি প্রবেশ করব। আমাকে গুলি করবেন কিনা তার অনুমতি নিন।’

পুলিশ চোখ ছানাবড়া করে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। তারপর ফিরে গেল আবার।

এবার দু’জন পুলিশ বেরিয়ে এল গেট বক্স থেকে। একজন গেটে দাঁড়াল, অন্যজন এল আহমদ মুসার কাছে। বলল, ‘অনুমতি মিলেছে। আসুন, নিক আপনাকে নিয়ে যাবে।’

আহমদ মুসা এগিয়ে গেল গেটের দিকে।

গেটে পৌঁছতেই গেট বক্স থেকে বেরিয়ে এল লম্বা-চওড়া ষ্টিলবডির একজন রুশ। কিছু না বলেই সে হাঁটতে শুরু করল।

আহমদ মুসা বুঝল এই লোকই নিক।

তার পিছু পিছু হাঁটতে শুরু করল আহমদ মুসা।

বাড়িতে ঢুকে এ করিডোর সে করিডোর ঘুরে একটা বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়াল নিক।

নক করতে হলো না দরজায়।

একটা কণ্ঠ ধ্বনিত হলো ঠিক মাথার উপরেই, ‘ভেতরে এস।’

আহমদ মুসা বুঝল, বাড়ির সবখানেই টিভি ক্যামেরার চোখ পাতা আছে। কথাটা হলো ভেতর থেকে মাইক্রোফোনে।

ভেতরে প্রবেশ করল আহমদ মুসা এবং নিক।

রাষ্ট্রদূত বসেছিল সোফায়। উঠে দাঁড়াল। গম্ভীর মুখে একবার আহমদ মুসার দিকে চেয়ে বলল, 'নিক তুমি যাও। ধন্যবাদ।'

তারপর আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বস ইয়ংম্যান। ছেলের বয়সের বলে 'তুমি' বললাম কিছু মনে করনি তো?'

রাষ্ট্রদূত চল্লিশোর্ধ। উন্নত কপাল ও পরিচ্ছন্ন চেহারার মানুষ।

'ধন্যবাদ। 'তুমি' সম্বোধন আমাকে আনন্দিত করেছে।' বলে আহমদ মুসা রাষ্ট্রদূতের বিপরীত দিকের একটা সোফায় বসল।

তোমার কথা আমাকে চমৎকৃত করেছে। এভাবে কথা খুব কম লোকই বলতে পারে।'

বলে একটু নড়ে-চড়ে বসে রাষ্ট্রদূত বলল, 'কি নাম তোমার? পরিচয় কি? ফ্রান্সে একজন এশিয়ানের কি জরুরী কাজ থাকতে পারে আমার সাথে?'

'আমি ক্যাথারিনের বন্ধু। আমি তার খোঁজ চাই।'

রাষ্ট্রদূতের চোখে-মুখে নেমে এল বিস্ময়। তার চোখ দু'টি আঠার মত লেগে থাকল আহমদ মুসার মুখে স্থিরভাবে। এক সময় ধীর কন্ঠে বলে উঠল, 'তুমি বন্ধু না শত্রু প্রমাণ কি?'

'প্রমাণ ক্যাথারিন করবে। তার মা ডমেস লিওনিদাও বলতে পারেন।'

'প্রিন্সেস ক্যাথারিনের খোঁজ আমার কাছে চাচ্ছ, তাহলে প্রিন্সেস কোথায় আছে বলে মনে কর?'

'কোথায় আছে জানি না। তবে তিনি রুশ রাজ পরিবারের মেয়ে। রুশ সরকারের স্বার্থ তার সাথে সংশ্লিষ্ট আছে। সুতরাং হয় সে রুশ সরকারের হাতে, নয়তো রুশ সরকার জেনেছেন বা জানার চেষ্টা করছেন তিনি কোথায়?'

'ম্যাডাম লিওনিদা কি বলেন?'

'এক্সিলেন্সী, তার বক্তব্য আমি বলতে পারি না।'

'ক্যাথারিনের খোঁজ তোমার কেন চাই? তার আর কোন বন্ধু বা আত্মীয় তো আমার কাছে এভাবে আসেনি?'

'সবাই সব জিনিসকে একইভাবে নেয় না, দেখে না।'

'তোমার দেখার কারণ কি? কি সে কারণ যার জন্যে তুমি জোর করে আমার বাড়িতে ঢুকতে চাও আমার সাথে দেখা করার জন্যে?'

'আমি তার পরিবারকে সাহায্য করতে চাই।'

'আর কিছু?'

'আর কিছু' বলতে যদি বিশেষ সম্পর্ক বুঝতে চান তাহলে বলছি, সে ধরণের কোন সম্পর্ক নেই।'

'আমি যদি বলি ক্যাথারিনকে তোমার মত করেই আমরা খুঁজছি, তুমি বিশ্বাস করবে?'

'বিশ্বাস করব। কারণ আমার কাছে মিথ্যা বলার আপনার প্রয়োজন নেই।'

রাষ্ট্রদূত হাসল। বলল, 'ধন্যবাদ। তুমি সাহসী এবং বুদ্ধিমান দুই-ই।'

বলে একটু থেমেই আবার সে বলল, 'আমার উত্তর শুনলে। এখন তুমি কি করবে?'

'আমার আরও প্রশ্ন আছে।'

'কি?'

'তাকে কে বা কারা কিডন্যাপ করতে পারে?'

রাষ্ট্রদূত তৎক্ষণাৎ জবাব দিল না।

একটু সময় নিয়ে বলল, 'বিষয়টাকে আমরা সুনির্দিষ্ট করিনি। তবে আমার মনে হয়, কিডন্যাপের ব্যাপারটা অপরাধ না হয়ে রাজনৈতিক হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।'

'তার মানে, রাজ পরিবারকে রাশিয়ায় ফিরিয়ে নেয়া হোক, নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি সেখানে চালু হোক এটা চায় না কোন পক্ষ?'

'তুমি এসব জান?'

'এটুকুই জানি। আমার প্রশ্নের জবাব কি দয়া করে দেবেন?'

'ঐ ধরনের কোন পক্ষকে আমি জানি না।'

'তাহলে ব্যাপারটাকে রাজনৈতিক বলছেন কোন কারণে?'

‘ঘটনার পেছনে ক্রিমিনাল কোন কারণ খুঁজে পাই না, রাজনৈতিক কারণ তবু কিছু থাকতে পারে।’

‘কেন রাজ পরিবারের সাথে কোন অর্থ যোগ থাকতে পারে না?’

‘তেমন কিছু নেই। জারদের কিছু গোল্ড ছিল পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি সরকারের কাছে। রাজ পরিবার এতদিন এর উপরই চলেছে। সে সঞ্চয় নিঃশেষ বলে আমরা জেনেছি।’

‘আপনারা কি করছেন তাকে উদ্ধারের জন্যে?’

‘আমরা চেষ্টা করছি, ফরাসি পুলিশ চেষ্টা করছে।

একটু থামল রাষ্ট্রদূত। তারপর বলল, ‘আমাদের সরকার খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। ক্রাউন প্রিন্সেস ক্যাথারিন অপহৃত হয়েছে। আজই সরকারের যে মেসেজ পেলাম, তাতে বলা হয়েছে, রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে সরকারের গোটা পরিকল্পনাই শুধু বানচাল হওয়া নয়, অপূরণীয় ক্ষতি হবে যদি এ দু’জনকে পাওয়া না যায়। সুতরাং যে কোন মূল্যে তাদের উদ্ধারের চেষ্টা করতে হবে।’

থামল রাষ্ট্রদূত মিখাইল পাভেল। কিছু ভাবল। তারপর বলল, ‘এসব কথা তোমাকে বলছি। কারণ তোমার সাহস আমাকে চমৎকৃত করেছে। তুমি আমাদের সাহায্য করতে পার।’

আহমদ মুসা সেদিকে কান না দিয়ে বলল, ‘সরকারের পরিকল্পনা বানচালের কথা বুঝলাম, কিন্ত অপূরণীয় ক্ষতিটা কি?’

‘আমিও জানি না ইয়ংম্যান।’

‘সেটা কি কোন মূল্যবান ডকুমেন্ট?’

রাষ্ট্রদূত পাভেলের চোখ বিস্ময়ে নেচে উঠল। বলল, ‘ডকুমেন্টের কথাও তুমি জান? ম্যাডাম বলেছেন?’

‘শুধু ‘ডকুমেন্ট’ শব্দ টুকুই জানি। আর কিছু না।’

রাষ্ট্রদূত সোফায় গা এলিয়ে চোখ বুজে ছিল। ঐ অবস্থাতেই বলল, ‘অপূরণীয় ক্ষতির কারণ সে মূল্যবান ডকুমেন্ট হতে পারে, আমি জানি না।’

‘ধন্যবাদ, তাহলে উঠি।’ আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল।

রাষ্ট্রদূত পাভেল সোজা হয়ে বসল। বলল, ‘আমার প্রস্তাবের জবাব দিলে না?’

‘প্রস্তাবের তো প্রয়োজন নেই। বন্ধু ক্যাথারিনের সন্ধানে আজ যেমন এখানে ছুটে এসেছি। তেমনি আরও ছুটব।’

‘ধন্যবাদ। যতটুকু পারি আমার সাহায্য পাবে।’

বলে একটা প্রাইভেট নেম কার্ড আহমদ মুসসার দিকে এগিয়ে ধরে বলল, ‘এতে আমার বিশেষ টেলিফোন নাম্বার আছে। তুমি যে কোন সময় টেলিফোন করতে পার।’

আহমদ মুসা এগিয়ে গিয়ে কার্ড নিয়ে হ্যান্ডশেক করে চলে আসার জন্য পা বাড়াল।

‘একটু দাঁড়াও। বাইরে দেখছি আমার স্ত্রী ও মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের সাথে তোমার পরিচয় করিয়ে দেই।’ দরজার উপরে দেয়ালের একটা স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলল রাষ্ট্রদূত পাভেল।

কথা শেষ করেই সে বলল হাতের মিনি সাইজের কম্প্যুটারের দিকে তাকিয়ে, ‘এস তোমরা এলিয়েদা।’

ঘরে ঢুকল একজন মধ্য বয়সী মহিলা এবং একজন তরুণী।

তারা ঘরে ঢুকে আহমদ মুসার উপর নজর পড়তেই তরুণীটি উচ্ছ্বসিত কন্ঠে আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলে উঠল,‘আপনি? এখানে?’

‘তাই তো, কেমন আছেন আপনি?’ বলল মধ্য বয়সী মহিলাও আহমদ মুসার দিকে সহাস্যে তাকিয়ে।

আহমদ মুসার চোখে-মুখেও বিস্ময় ওদের দেখে।

‘কি ব্যাপার, একে তোমরা চেন?’ স্ত্রী ও মেয়ের দিকে তাকিয়ে রাষ্ট্রদূত পাভেল বলল।

তরণীটি রাষ্ট্রদূতের মেয়ে। নাম ওলগা। আর মধ্য বয়সী মহিলা স্ত্রী। নাম এলিয়েদা।

‘আব্বা, ইনিই তো সেদিন আমাদের বাঁচিয়ে ছিলেন।’ বলল ওলগা।

‘মানে সেদিন উইক এন্ড থেকে ফেরার পথের ঘটনায়?’

‘হ্যাঁ।’ বলল রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী এলিয়েদা।

‘ও! ব্রাভো!’ বলে রাষ্ট্রদূত কয়েক পা এগিয়ে এসে আহমদ মুসার পিঠ চাপড়ে বলল, ‘ইয়ংম্যান, আমরা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। তুমি আমাদের পরিবারকে একটা বিপযর্য় থেকে বাঁচিয়েছ, অপূরণীয় উপকার করেছো আমাদের।’

আহমদ মুসা বিব্রত বোধ করল। বলল,‘ধন্যবাদ। কিন্তু সেটা ছিল খুবই সাধারণ ঘটনা। যে কেউ ওখানে থাকলে, আমি যা করেছি সে তাই করত।’

‘কিন্তু আমাদের নিরাপত্তা প্রহরীরা তা পারেনি।’ বলল রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী এলিয়েদা।

‘বোধহয় পারেনি তা নয়। ঘটনার আকস্মিকতায় ওরা বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল।’ বলল আহমদ মুসা।

‘যাই হোক ইয়ংম্যান, এখন তোমার যাওয়া হচ্ছে না। বসতেই হবে। রুশরা খুব অকৃতজ্ঞ, এ কথা কেউ বলে না। মিষ্টি মুখ না করে তুমি যেতে পার না।’ রাষ্ট্রদূত পাভেল বলল।

‘ঠিক। তোমার নাম যেন কি?’

‘আব্দুল্লাহ।’

‘মুসলিম আপনি?’ ওলগার চোখে বিস্ময়।

‘আমার বিস্ময় আরও বাড়ল যুবক। একজন মুসলিম যুবক অথোর্ডক্স খৃস্টান ক্যাথারিনের বন্ধু হতে পারে কি করে?’

‘আপনি প্রিন্সেস ক্যাথারিনের বন্ধু?’ চোখে আরও বিস্ময় নিয়ে জিজ্ঞেস করল ওলগা।

‘থাক এ বিতর্ক চল ভেতরে।’ আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল এলিয়েদা।

আহমদ মুসা হাত জোড় করে বলল, ‘মাফ করুন। আজ নয়। আরেকদিন আসব।’

বলেই আহমদ মুসা সবাইকে গুডবাই জানিয়ে বাইরে বেরুবার জন্যে পা বাড়াল।

‘তোমার সম্পর্কে আমার অনুমান মিথ্যা না হলে বলব তুমি সময় নষ্ট করার মত ছেলে নও। ঠিক আছে। এসো তুমি। আমরা তোমার আবার আসার অপেক্ষা করব।’

বলে রাষ্ট্রদূত পাভেল এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে ধরে আহমদ মুসাকে বিদায় জানাল এবং দরজার ওদিকে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপত্তা প্রহরীটিকে আহমদ মুসাকে গেট পর্ন্ত পৌঁছে দিতে বলল।

আহমদ মুসাকে বিদায় দিয়ে ফিরে আসতেই এলিয়েদা বলল,‘সত্যিই ছেলেটা প্রিন্সেস ক্যাথারিনের বন্ধু?’

‘ও বলেছে। আমিও অবিশ্বাস করিনি।’

‘মনে হয় অবিশ্বাস করার মত মানুষ উনি নন।’ বলল ওলগা।

‘আমারও তাই মনে হয়।’ বলল রাষ্ট্রদূত পাভেল।

‘আমি প্রশ্নটা অবিশ্বাস থেকে করিনি, বিস্ময় থেকে বলেছি।’ বলল এলিয়েদা।

‘ঠিকই বলেছ আম্মা। আমারও মনে বিস্ময়। আমরা রাজ পরিবারকে অতি মানুষ হিসাবে দেখি। মানুষ হিসেবে দেখলে বোধ হয় এ বিস্ময় আমাদের হতো না।’ বলল ওলগা।

‘ধন্যবাদ ওলগা। কিন্তু রাজ পরিবার রাজ পরিবারই। স্বাতন্ত্র না থাকলে রাজ পরিবার হতো না।’ বলল এলিয়েদা।

‘ধন্যবাদ আম্মা। এই স্বাতন্ত্রটাও বোধহয় আমরা আমাদের বিশ্বাস থেকে সৃষ্টি করেছি।’ ওলগা বলল।

‘তুমি বলতে চাচ্ছ, বিশেষ কোন মান ও যোগ্যতা ওদের নেই? তাহলে সিংহাসনে ওদের আমরা ফিরিয়ে আনছি কেন?’ বলল এলিয়েদা।

‘ওঁদের বিশেষ মান ও যোগ্যতা নেই বলছি না। ওঁদের রয়েছে ঐতিহ্য ও অভিজ্ঞতার সম্ভার। কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি, আমাদের আস্থা ও ভালোবাসা এবং তাঁদের হাতে পাওয়া শক্তি ও সুযোগই তাদের রাজা বানায়।’

‘ব্রাভো ব্রাভো! আমাদের মা ওলগা চমৎকার বলেছে।’

হাঁটতে শুরু করে রাষ্ট্রদূত পাভেল বলল, ‘এস। মা ও মেয়ে দু’জনেই জিতেছ।’

আহমদ মুসা রাষ্ট্রদূত পাভেলের বাড়ি থেকে বেরিয়ে অকূল সমুদ্রে পড়ল। সে আশা করেছিল, একটা আশার আলো সে দেখতে পাবে। কিন্তু কিছুই হলো না। বুঝলো, সেদিন ক্যাথারিনের বাড়ি থেকে বেরুবার পর তাকে অনুসরণ করেছিল রুশ সরকারের কেউ নয়, অন্য কোন শক্তি এবং তারাই সম্ভবত কিডন্যাপ করেছে ক্যাথারিনকে।

তবে রুশ রাষ্ট্রদূত পাভেলের কাছে আসা অর্থহীন হয়নি। বুঝা গেল, তারাও ক্যাথারিনকে খুঁজছে। তাদের সহযোগিতা পাওয়া যাবে।

কিন্তু এখন এগুবে কোন পথে?

ক্যাথারিনের বাড়ির উপর ওরা চোখ রাখছে? তাহলে ওর বাড়িতে গেলে ওদের দেখা পাওয়ার একটা পথ হতে পারে।

পরদিন আহমদ মুসা ক্যাথারিনের বাড়িতে গেল। চলে এল। কিন্তু কেউ তাকে অনুসরণ করল না। গাড়ির রিয়ারভিউতে বার বার চোখ ফেলল। কিন্তু তার গাড়ির প্রায় গা ঘেঁষে আসা বেঢপ আকৃতির একটা হোম সাপ্লাই-এর গাড়ি ছাড়া কোন গাড়িকেই আহমদ মুসা তার পেছনে স্থির হতে দেখলো না। হতাশ হলো আহমদ মুসা।

হতাশ মনেই গাড়ি চালিয়ে আহমদ মুসা এসে প্রবেশ করল শিন নদী তীরের একটা ট্যুরিস্ট স্পটে।

ট্যুরিস্ট স্পট শূন্য। সকাল দশটার মত ব্যস্ত ওয়ারকিং আওয়ারে ট্যুরিস্ট স্পটে কোন লোক থাকার কথা নয়।

আহমদ মুসা একদম নদীর কিনারে একটা বেঞ্চিতে বসে গা এলিয়ে দিল।

চোখ বুজে গিয়েছিল তার।

চারদিকের অন্ধকারে পথ খুঁজছিল আহমদ মুসা।

কেউ তার গা ঘেঁষে বসার স্পর্শে চমকে উঠে চোখ খুলল।

দেখল, তার গা ঘেঁষে বসেছে একজন মুখোশধারী লোক।

আহমদ মুসা একটু সরে বসল। তার মনে প্রশ্ন, কৌতুককারী কেউ, কিংবা মানসিক অসুস্থ কেউ, না অদৃশ্য কোন... চিন্তা আহমদ মুসার শেষ হলো না। মুখোশধারী লোকটি পকেটে রাখা তার ডান হাতটি বের করল। হাতে রুমাল।

মুখোশধারী লোকটি পকেট থেকে হাত বের করেই বিদ্যুত গতিতে রুমালটি চেপে ধরল আহমদ মুসার নাকে।

কিন্তু রুমালটি নাক স্পর্শ করার সংগে সংগেই উঠে দাঁড়িয়েছিল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার বুঝতে বাকি ছিল না রুমালটি ক্লোরোফরম ভিজানো এবং মুখোশধারীর মতলব কি?

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়েই তার বাম হাতের কারাত চালাল লোকটির ডান কানের উপরের প্রান্ত ঘেষে।

মুখোশধারী উঠে দাঁড়াতে গিয়েও টলে পড়ে গেল বেঞ্চিতে।

আহমদ মুসা পেছনে পায়ের শব্দ পেল।

তড়াক করে পেছনে ফিরল। দেখল, দু'জন লোক তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। তাদেরও মুখে মুখোশ।

লোক দু'টি তার উপর এসে পড়েছে। সরে দাঁড়াবারও সময় নেই।

আহমদ মুসা শরীরটা বেঁকিয়ে উবু হয়ে বসে পড়ল গাছ থেকে ফল পড়ার মত দ্রুত।

ওরা দু'জন আহমদ মুসার উপর দিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

ওরা দু'জনও উঠে দাঁড়াচ্ছিল।

ওদের একজন দাঁড়ানো অবস্থাতেই ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ছিল আহমদ মুসার উপর।

আহমদ মুসা তাকে দু'হাত দিয়ে ঠেকাবার চেষ্টা করে বা পায়ের একটা কিক চালালো লোকটির তলপেটে।

লোকটি তলপেট চেপে ধরে বসে পড়ল।

দ্বিতীয় লোকটি ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। সে বসে পড়া লোকটির উপর দিয়ে একটা অশ্রাব্য গালি উচ্চারণ করতে করতে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল আহমদ মুসার উপর।

আহমদ মুসা বাম পাশে একটু সরে তার ডান বাহুটা লৌহ দন্ডের মত চালাল ছুটে আসা লোকটির গলা লক্ষ্যে।

প্রচন্ড ঘা খেয়ে লোকটির চলন্ত দেহ চরকির মত ঘুরে গেল এবং চিৎ হয়ে পড়ে গেল বসে পড়া লোকটির উপর।

'কে তোমরা' বলে আবার আহমদ মুসা এগুচ্ছিল ওদের দিকে। এ সময় পেছনে কিছুর শব্দ পেয়ে পেছনে তাকাল। দেখল, একটা জাল নেমে আসছে তার উপর। একজন মুখোশধারী দাঁড়িয়ে আছে ক' গজ পেছনে।

আহমদ মুসা বুঝল সে জালের ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছে। মাত্র কয়েক মুহূর্ত। নাইলনের বিশেষ জালে সে জড়িয়ে পড়ল।

একটু দূরে দাঁড়ানো লোকটিই ফাঁদ ছুড়েছিল। ফাঁদের নিয়ন্ত্রণী রশিটি ছিল তার হাতে।

ফাঁদে জড়িয়ে পড়ার সাথে সাথেই পড়ে গেল আহমদ মুসা।

ফাঁদের নিয়ন্ত্রণী রশি টেনে গুটিয়ে নিতে শুরু করেছে লোকটি।

আহমদ মুসা বন্দী হয়ে গেল। পশুরাজ সিংহ জালে আটকা পড়ে যেভাবে অসহায় হয়ে যায় সেভাবেই।

ফাঁদ গুটিয়ে নেবার পর ফাঁদের জালে আহমদ মুসার দেহ গুটি-শুটি খেয়ে গোলাকার হয়ে গেল।

মার খেয়ে ভূলুন্ঠিত তিনজন তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। ওরা গরজাতে গরজাতে এগিয়ে এল আহমদ মুসার দিকে। একজন জালে জড়ানো আহমদ মুসার পাজরে লাথি মেরে বলল, 'শালা গলাটা ভেংগেই দিয়েছে।'

অন্য দু'জনও আহমদ মুসার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল।

ফাঁদের রশি হাতে দাঁড়ানো লোকটি হাত তুলে ওদের নিষেধ করে বলল, 'বীরত্ব আর দেখাতে হবে না। একটি থাপ্পড়ে সব কুপোকাত। নাম ডুবালে তোমরা।'

‘বস, আমাদের দোষ নেই। ব্যাটার হাত বোধহয় লোহার তৈরি। বিশ্বাস না হলে পরখ করে দেখতে পার।’ বলল তিনজনের একজন।

‘পরখ করে দেখার সময় হবে।’ বলে একজন ইংগিত করে বলল,‘তাড়াতাড়ি একে নিয়ে গাড়িতে তোল, কেউ এসে পড়বে।’

একজন এসে জালে জড়ানো আহমদ মুসাকে কাঁধে তুলে নিল। হাঁটতে শুরু করে সে বলল, ‘সত্যি উস্তাদ এর শরীরে লোহা আছে। না হলে এমন হালকা-পাতলা এশিয়ান এত ভারি হবে কেন?’

‘কথা বল না, দৌঁড়াও।’ বলল বস গোছের সেই লোকটি।

গাড়িটা দাঁড়ানো ছিল ট্যুরিস্ট স্পটটার অনেকখানি ভেতরে। খোলাই ছিল গাড়ির দরজা।

খোলা দরজা পথে লোকটি আহমদ মুসার দেহটা ছুঁড়ে মারল গাড়ির স্টিলের মেঝের উপর।

আহমদ মুসা দম বন্ধ করেছিল।

তার ভাগ্য ভাল পাঁজর গিয়ে পড়েছিল ফ্লোরে। মাথা টোকা খেলে ফেটে যেত নির্ঘাত। পাঁজরটার আঘাতও কম হলো না। তার মনে হলো, পাজরের তিনটি হাড় যেন তার ভেঙে গেল।

কিন্তু আঘাতের মধ্যেও গাড়ি দেখে তার মনে সৃষ্টি হওয়া বিস্ময় দূর করতে পারলো না। তার গাড়ির পিছে পিছে আসা হোম সাপ্লাই-এর গাড়িই শেষ পর্যন্ত শত্রু হলো। গাড়িটা গোটা পথ তার পিছে পিছে এলেও গাড়ির প্রতি তার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ জাগেনি।

মনে মনে আহমদ মুসা তাদের ছদ্মবেশের প্রশংসা করল। সে বুঝল, তারা পরিকল্পিতভাবেই তাকে অনুসরণ করেছে। নিশ্চয় তারা চোখ রেখেছিল ক্যাথারিনের বাড়ির উপর। নিশ্চয় এরা ক্যাথারিনকে কিডন্যাপকারীরাই হবে।

খুশী হলো আহমদ মুসা। কিডন্যাপকারীদের মুখোমুখি হবার তার সুযোগ হলো।

কিন্তু এরা কারা? ভাষা প্রমাণ করছে ওরা রুশ। ওরা রাশিয়ার কোন পক্ষ? কোন ক্রিমিনাল গ্রুপ? না রুশ সরকারেরই গোপন কোন পক্ষ?

ওদের একজন উঠে এল গাড়িতে, আহমদ মুসার কাছে। একটা রুমাল চেপে ধরল আহমদদ মুসার নাকে। ক্লোরোফরম ভেজানো রুমাল।

অন্য সময় হলে আহমদ মুসা দম বন্ধ করে প্রতিরোধের চেষ্টা করত। কিন্তু এখন আহমদ  মুসা সে রকম কিছু করল না। আহমদ মুসা যেতে চায় ওদের ঘাটিতে।

আহমদ মুসা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল।

সংজ্ঞা ফিরে পেলে আহমদ মুসা দেখল সে একটা ঘরের মেঝেয় কার্পেটের উপর পড়ে আছে। তার হাত পা বাঁধা। হাত দু'টি এমন ভাবে পিছ মোড়া করে বাঁধা যে, কষ্ট হচ্ছে। সম্ভবত এই কষ্টের কারণেই তাড়াতাড়ি সে সংজ্ঞা ফিরে পেয়েছে।

কষ্ট হলেও আহমদ মুসা অন্ধকার মেঝেয় গড়াগড়ি দিয়ে শরীরটাকে একটু চাঙ্গা করে নিল। কিন্তু শরীরকে চাঙ্গা করতে গিয়ে প্রচন্ড ক্ষুধা অনুভূত হলো তার।

সময় এখন কত? ঘড়িটা তারা খুলে  নেয়নি। হাতে আছে। কিন্তু পিছ মোড়া করে বাঁধা থাকায় ঘড়িটা দেখে সময় জানার তার কোন সুযোগ নেই।

এখন রাত হবে নিশ্চয়। দিন হলে ঘরে অন্ধকার এত গাঢ় হতো না। অথবা হতে পারে ঘরটি আন্ডার গ্রাউন্ড।

ক্ষুধার চিন্তা মাথা থেকে উবে গিয়ে এবার মাথায় এসে চাপল আরেক চিন্তা। কেন ওরা ধরে আনল তাকে। পথের বাঁধা দূর করতে চাইলে তারা তো খুন করতে পারতো।  ধরে আনল কেন? দু'টো কারণ  হতে পারে। এক, আমি কে তা তাদের জানা প্রয়োজন, যাতে তারা তাদের আরো বাঁধাকে চিহ্নিত করতে পারে। দ্বিতীয়ত, তারা  হয়তো অন্য কিছু জানতে চায়। ক্যাথারিনের বাড়িতে পাহারা বসানোর ব্যাপারটা শুধু তাদের শত্রু পক্ষের উপর চোখ রাখার জন্যে হয়তো নয়। তারা হয়তো আরও কিছু খোঁজ করছে।

শব্দ হলো দরজা খোলার। খুলে গেল দরজা। সলিড ইস্পাতের তৈরি দরজা।

দরজা খোলার সংগে সংগে ঘরের আলোও জ্বলে উঠল।

দেয়ালের অনেক উঁচুতে ভেন্টিলেটর ছাড়া কোন জানালা নেই। ঘরটি দেয়াল জুড়ে শুধু তাক আর তাক।

আহমদ মুসা দেখেই বুঝল ঘরটি একটা আন্ডারগ্রাউন্ড স্টোর।

দু'জন লোক ঘরে ঢুকল। তাদের মুখ আগের লোকদের মতই মুখোশে ঢাকা।

'তুমি তো বেশ শেয়ানা হে। সময়ের আগেই সংজ্ঞা ফিরে পেয়েছ।' বলল দু'জনের মধ্যে নেতা গোছের লোকটি।

আহমদ মুসা কোন কথা বলল না।

সেই নেতা গোছের লোকটাই আবার বলল, 'কে তুমি? একবার প্রিন্সেস ক্যাথারিনের বাড়ি, আরেকবার রুশ রাষ্ট্রদূতের বাড়ি ঘুর ঘুর করছ। পুলিশের লোক তুমি?'

'তোমরা সে খোঁজ না নিয়েই আমাকে ধরে এনেছ?'

'প্রশ্ন আমি করেছি। জানা আমাদের প্রয়োজন।' বলল সেই নেতা গোছের লোকটি।

'জানা আমারও প্রয়োজন।'

'কি জানতে চাও?'

'তোমরা কে? কেন আমাকে ধরে এনেছ?'

'এ জেনে তোমার কাজ কি?'

'আমার প্রশ্নের জবাব না দিলে তোমাদের কোন প্রশ্নের জবাব আমি দেব না। আমার কাছে জানাই তোমাদের গরজ বেশি নিশ্চয়?'

'দেখ আমরা তোমার উপর নির্ভরশীল নই, তুমি আমাদের উপর নির্ভরশীল। কথা কিভাবে বের করতে হয় আমরা জানি।'

বলেই সে পাশের লোকটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'টমকে যন্ত্রসহ ডাক।'

লোকটি বেরিয়ে গেল।

মিনিট খানেক পরেই ভীমাকৃতি এক লোককে নিয়ে সে ফিরে এল। ভীমাকৃতি লোকটির হাতে চামড়ার একটা চাবুক।

নেতা গোছের লোকটি টমকে লক্ষ্য করে বলল, 'টম তোমার ম্যাজিক দেখাও তো। কথা বলাবার জন্যে তোমার কয় ঘা প্রয়োজন হবে মনে করো?'

'কয়টি আর স্যার। আট-দশটা ঘা'র পর তো সংজ্ঞাই থাকবে না।'

'বেশ শুরু কর।'

চাবুকধারী লোকটির ভয়াল চাবুকটি বিদ্যুত বেগে উপরে উঠল।

এ সময় দু'জন লোক ঘরে প্রবেশ করল। তাদের সামনের জন টমকে লক্ষ্য করে বলল, 'দাঁড়াও।'

তাদের দু'জনের ঘরে প্রবেশের সংগে সংগে নেতা গোছের লোকটিসহ তিনজনেই জড়-সড় হয়ে গেল। একটু সরে দাঁড়াল।

চাবুকধারীকে থামতে বলে কক্ষে প্রবেশকারী সামনের লোকটির দিকে চেয়ে বলল, 'কি ব্যাপার টমের অস্ত্র প্রয়োগ করছ কেন?'

নেতা গোছের লোকটি বলল, 'স্যার লোকটি বড় সেয়ানা, পরিচয় সম্পর্কে কোন কথা আদায় করা যাচ্ছে না। উল্টো আমাদেরই জিজ্ঞাসাবাদ করছে। বলছে, আমাদের পরিচয় না পেলে কোন কথাই সে বলবে না।'

'ও তাই? আমি দেখছি।'

বলে সে সাথের লোকটির দিকে চেয়ে বলল, 'তুমি যাও ওলোর্ভ। আমি আসছি।'

'ঠিক আছে মায়োভস্কি।' বলে তার সাথের লোকটি চলে গেল।

মায়োভস্কি আহমদ মুসার দিকে এগিয়ে গেল। তার মুখে কোন মুখোশ নেই, সাথে আসা লোকটিরও ছিল না। তাদের দু'জনেরই নিরেট রুশ চেহারা।

আহমদ মুসার কাছাকাছি গিয়ে ঘরের একপাশে দাঁড়ানো সেই নেতা গোছের লোকটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'এর বাঁধন খুলে দাও প্লেখভ।'

আহমদ মুসার বাঁধন খুলে দিল প্লেখভ নামের লোকটি।

'আমাদের পরিচয় আপনার কেন প্রয়োজন?' বলল মায়োভস্কি।

'কাকে সহযোগিতা করব জানা প্রয়োজন নয় কি?'

মায়োভস্কি হাসল। বলল, 'আমরা আপনার সহযোগিতা চাই না। আমরা আপনাকে জানতে চাই।'

'সেটাও একটা সহযোগিতা। এ সহযোগিতা আমি নাও করতে পারি।'

'যদি আমরা আদায় করি?'

'সব সময় সব কিছু আদায় করা যায় না।'

'এসব কথা থাক। আমাদের পরিচয় প্রকাশে কোন আপত্তি নেই। তবে আমরা ভয় করি রাশিয়ার কেজিবি'কে। আমরা একটা মহৎ কাজ করছি। আমরা রুশ রাজ পরিবারের শুভাকাঙ্খী। রুশ সরকার নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার নামে প্রিন্সেস তাতিয়ানা ও প্রিন্সেস ক্যাথারিনকে হাত করে ফায়দা লুটতে চায়। আমরা রাজ পরিবারের অপমান হতে দেব না।'

'তাহলে আমাকে গ্রেফতার করেছেন কেন?'

'আমরা নিঃসন্দেহ যেন, আপনি রুশ সরকারের গুপ্তচর। তাদের পক্ষ থেকে আপনি রাজ পরিবারের তথ্য সংগ্রহ করছেন।'

আহমদ মুসা বুঝল, ওরা রুশ দূতাবাসের সাথে তার যোগাযোগের খবর জানে। তবু বলল, 'আপনাদের একথা সত্য নয়, প্রিন্সে ক্যাথারিন আমার বন্ধু। সে কারণেই তাদের সহযোগিতার জন্যে তাদের বাড়িতে গেছি।'

মায়োভস্কি হাসল। বলল, 'বটে! সেটা দেখা যাবে। কিন্তু তাতেও আপনি রুশ সরকারের গুপ্তচর নন তা প্রমাণ হয় না। থাক এ প্রসংগ। এখন বলুন, প্রিন্সেস তাতিয়ানা কোথায়?'

মনে মনে চমকে উঠল আহমদ মুসা। এরা কি সব জানে? কিন্তু প্রকাশ্যে বলল, 'এ প্রশ্ন আমাকে কেন?'

'কারণ আপনি রাজ পরিবারের অনেক কিছুই জানেন। আর প্রিন্সেস ক্যাথারিনের অন্তর্ধান হবার পর আপনার উদয় ঘটেছে। নিশ্চয় প্রিন্সেস তাতিয়ানাকে খোঁজার প্রয়োজন নেই, তাই প্রিন্সেস ক্যাথারিনের খোঁজে আপনার আবির্ভাব।'

'আপনার ধারণার গোটা ভিত্তিটাই ভুল।'

আহমদ মুসা থামলেও সংগে সংগে উত্তর দিল না মায়োভস্কি। স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে থেকে ধীর কণ্ঠে বলল, 'দেখুন, যেকোন মূল্যে তথ্যটা আমাদের চাই। রুশ সরকার আপনাকে বাঁচাতে পারবে না। প্রিন্সেস ক্যাথারিনের সাথে দেখা করার সুযোগ আমরা দিচ্ছি। তার সাথে কথা বলুন। তিনি যদি আপনার বন্ধু হন, তাহলে তাঁর স্বার্থে তথ্যটি আমাদেরকে দিতে হবে আপনার।'

মুখে কৃত্রিম বিস্ময় এনে আহমদ মুসা বলল, 'প্রিন্সেস ক্যাথারিনকে আপনারা কিডন্যাপ করেছেন?'

'কিডন্যাপ নয়, রুশ সরকারের এক চক্রের হাত থেকে আমরা তাঁকে সরিয়ে এনেছি। তাঁর নিরাপত্তার জন্যেই নিরাপদ স্থানে তাঁকে রাখা হয়েছে। আপনিও গিয়ে দেখবেন, তাঁকে প্রিন্সেস-এর মর্যাদায় রাখা হয়েছে।'

আহমদ মুসা মনে মনে খুশী হলো হাতে আকাশের চাঁদ পাওয়ার মতই। কিন্তু ভাবল, এত সহজে তাকে তারা প্রিন্সেস ক্যাথারিনের কাছে নিয়ে যাচ্ছে কেন? তাতিয়ানার সন্ধান লাভকে এত গুরুত্ব দিচ্ছে কেন? তাতিয়ানা কোথায়, এ তথ্য প্রিন্সেস ক্যাথারিনই তো তাদের দিতে পারে। ক্যাথারিন নিশ্চয় তাদের সহযোগিতা করেনি। অর্থাৎ এদের পরিচয় সম্পর্কে এরা যা বলেছে সবটাই মিথ্যা।

'আসুন, প্রিন্সেসের সাথে কথা বলবেন।' বলে মায়োভস্কি নামক লোকটি হাঁটতে শুরু করল দরজার দিকে।

আহমদ মুসাও তার পিছু পিছু হাঁটতে শুরু করল। তার পিছু নিল সেই নেতা গোছের লোকসহ আরও একজন। তাদের হাতে পিস্তল। ট্রিগারে আঙুল।

একটা আশংকা আহমদ মুসার মনে জাগল, প্রিন্সেস ক্যাথারিন যদি বলে ফেলে আমি তার বন্ধু নই, সে আমাকে চেনে না!

একটা ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল মায়োভস্কি নামের লোকটি। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল দু'জন প্রহরী। তাদের হাতে স্টেনগান। মায়োভস্কিকে দেখেই তারা দরজার সামনে থেকে সরে দাঁড়াল।

মায়োভস্কি দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে নক করল দরজায়।

মুহূর্ত কয়েকের মধ্যেই দরজার লুকিং হোল থেকে ধাতব শাটার সরে যাবার নরম একটা শব্দ হলো। তারপরই খুলে গেল দরজা।

মায়োভস্কি দরজায় দাঁড়িয়ে প্রিন্সেসকে একটা বাউ করে ঘরের ভেতর প্রবেশ করল। আহমদ মুসাও।

প্রহরী কয়েকজন দাঁড়াল দরজায়।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে মায়োভস্কি বলল, 'ইয়োর হাইনেস, এই যুবককে নিশ্চয় চিনেন।'

আহমদ মুসা হাঁটছিল মায়োভস্কির পেছনে পেছনে।

মায়োভস্কি কথাটা উচ্চারণ করার সাথে সাথে বিরক্তি ও অনাগ্রহের চোখে প্রিন্সেস ক্যাথারিন আহমদ মুসার চোখে চোখ রাখল।

বিপদ বুঝল আহমদ মুসা।

দ্রুত আহমদ মুসা তার ডান হাতের তর্জনি ঠোঁটে ঠেকিয়ে প্রিন্সেসকে সাবধান করতে চাইল।

কিন্তু আহমদ মুসা বুঝতে পারল না প্রিন্সেস এই ইংগিত কতটা গ্রহণ করবেন।

তবে আহমদ মুসা ক্যাথারিনের মুখের দিকে একবার তাকিয়েই বুঝল প্রিন্সেস ক্যাথারিন তাতিয়ানার মতই শার্প। তার সারা মুখমন্ডলে তাতিয়ানার মতই রাজকীয় ব্যক্তিত্ব। অবশ্য তার চোখে নেই তাতিয়ানার চোখের সেই সাগরের গভীরতা এবং নেই তার মুখে তাতিয়ানার মুখের সেই ফুলের নরম লাবণ্য। প্রিন্সেস ক্যাথারিনের মুখে শাসকের ছবি, কিন্তু তাতিয়ানার মুখে ছিল শাসকের ছবির সাথে শিল্পীর মমতা।

আহমদ মুসার ইংগিত থেকে ক্যাথারিন যা-ই বুঝুক, তার চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল এবং তার মুখমন্ডলে সচেতন হয়ে ওঠার আলেখ্য নেমে এসেছিল।

কোন কথা না বলে চোখ ঘুরিয়ে ক্যাথারিন তাকিয়েছিল মায়োভস্কির দিকে।

‘আপনি নিখোঁজ হবার পর আপনার এই বন্ধু প্যারিসে এসেছে এবং আপনার খোঁজে নেমে পড়েছে। আমাদের বিশ্বাস, প্রিন্সেস তাতিয়ানার খবর সে জানে। কিন্তু আমাদের বলেনি। বার বার আমরা বলছি, আমরা রাজ পরিবারের শুভাকাঙ্খী। আমরা সরকারের চক্রান্ত থেকে দুই রাজকুমারী এবং রাজ পরিবারের সবকিছুকে রক্ষা করতে চাই। আমাদের অনুরোধ, আপিন তাঁকে বুঝান। আমরা পরে আসব।’

বলে মায়োভস্কি কোন জবাবের অপেক্ষা না করে দীর্ঘ একটা বাউ করে দরজার দিকে ঘুরে চলতে শুরু করল।

প্রিন্সেস ক্যাথারিন গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর ফিরে এল তার সিংহাসন সদৃশ চেয়ারে। সামনের একটা কুশন চেয়ারে বসতে বলল আহমদ মুসাকে।

প্রিন্সেস ক্যাথারিন গভীরভাবে নিরীক্ষা করছিল আহমদ মুসাকে। বলল, আপনি মিথ্যা পরিচয় কেন দিয়েছেন? কেনই বা এভাবে এদের হাতে পড়লেন? কে আপনি?’

‘মাননীয় প্রিন্সেস, এতটুকু বলাই কি যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার এক শুভাকাঙ্খী? বিশ্বাস করতে পারেন তা?’ বলল আহমদ মুসা।

‘ওদের আপনাকে ধরে আনা এটা প্রমাণ করেছে।’ নিরেট কণ্ঠে জবাব দিল প্রিন্সেস ক্যাথারিন।

একটু থেমেই ক্যাথারিন আবার বলল, ‘আমার সব প্রশ্নের জবাব আমি পাইনি।’

‘মিথ্যা পরিচয় না দিলে আপনার সাথে হয়তো দেখা করতে পারতাম না।’

‘কেন আমার সাথে দেখা করতে চান? আমার শুভাকাঙ্খী হওয়ার কারণ কি?’

‘আপনার সাথে দেখা করা আমার দায়িত্ব ছিল। কিন্তু জানলাম, আপনি নিখোঁজ হয়েছেন। তারপর আপনাকে মুক্ত করা আমার দায়িত্ব হয়ে দাঁড়াল।’

ম্লান হাসল প্রিন্সেস ক্যাথারিন। পরক্ষণেই তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। মুহূর্তের জন্যে কুঞ্চিত হয়ে উঠল তার কপাল। বলল, 'দায়িত্ব? কে এই দায়িত্ব দিয়েছে? রুশ সরকার?'

'না রুশ সরকার নয়। তাতিয়ানা।'

'তাতিয়ানা?' বিস্ময়ে ফেটে পড়ল যেন ক্যাথারিনের কণ্ঠ।

সে স্তম্ভিতভাবে অপলক চোখে চেয়ে থাকল আহমদ মুসার দিকে কিছুক্ষণ। বলল অনেকক্ষণ পর, 'তাঁর কোন চিঠি আছে?'

'নেই।'

এবার উদ্বেগ নেমে এল প্রিন্সেস ক্যাথারিনের চোখে-মুখে। ধীর-শুষ্ক কণ্ঠে সে বলল, 'তাহলে কি তাতিয়ানা নেই?' শেষ শব্দটা ক্যাথারিনের রুদ্ধ কণ্ঠ থেকে খুব কষ্টে বেরুল।

'আপনি এ কথা বলছেন কেন?' বিস্মিত কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

প্রিন্সেস ক্যাথারিন বলল, 'সে টেলিফোনে কিছু বলবে না, চিঠি দেবে না, অথচ একজন অপরিচিত লোককে দায়িত্ব দেবে আমার সাথে দেখা করার জন্যে এটা অসম্ভব।'

একটু থেমে একটা ঢোক গিলে ভাঙা গলায় বলল, 'বলুন আপনি কি ঘটেছে?'

আহমদ মুসা নরম কণ্ঠে ধীর স্বরে বলল, 'আপনার অনুমান ঠিক। তাতিয়ানা নেই।'

'কেন কেমন করে কি ঘটেছে তার?' বলে কান্নায় ভেঙে পড়ল ক্যাথারিন।

আহমদ মুসা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। ভাবল একটু কাঁদা উচিত প্রিন্সেস ক্যাথারিনের।

শান্ত হলো ক্যাথারিন। নিজেকে সামলে নিয়েছে। রুমাল দিয়ে চোখ মুছে বলল, বলুন কি ঘটেছিল? আমি এই সেদিন তার সাথে কথা বলেছি। কোন দিনই তার কোন বড় অসুখ-বিসুখ ছিল না।'

'আপনি মুক্ত হবার আগে আমি আর কিছুই বলবো না। বলা উচিত হবে না।'

‘কিন্তু তাহলে আমি আপনাকে বিশ্বাস করব কেমন করে? আমাকে অবশ্যই জানতে হবে তাতিয়ানা আপনাকে কি দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছে।’

‘এখন আমাকে অবিশ্বাস করলেও এ ভুল আপনার ভেঙে যাবে। আমি মনে করি, বন্দী অবস্থায় আপনি যত বেশি জানবেন, ততই আপনার কষ্ট বাড়বে।’

‘কিন্তু আপনি না বললেও আমি জানি। দু’টি বিশেষ জিনিস বহনের দায়িত্ব তাতিয়ানা আপনাকে দিতে পারেন।’

‘বলেছি, কোন কিছুই আমি বলব না।’

রাজ পরিবারের দায়িত্ব মনে হচ্ছে যেন আপনারই বেশি!’ প্রিন্সেস ক্যাথারিনের কণ্ঠে কিছুটা উষ্মা ঝরে পড়ল।

‘মাফ করবেন প্রিন্সেস। রাজ পরিবারের দায়িত্ব আমার নয়, কিন্তু তাতিয়ানার দেয়া দায়িত্ব আমাকে পালন করতে হবে।’

‘কিন্তু এদেরকে তো বলবেন। এর বিকল্প মৃত্যুকে অবশ্যই আপনি চাইবেন না।’

আহমদ মুসা হাসল। কিছু বলতে যাচ্ছিল। এই সময় দরজায় নক হলো।

থেমে গেল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসাই গিয়ে এবার দরজা খুলে দিল।

আগের মত মায়োভস্কি এসে বাউ করে প্রবেশ করল এবং আগের মত চারজন প্রহরী দরজায় দাঁড়াল।

‘ইয়োর হাইনেস, সব কথা হয়েছে নিশ্চয়। আশা করি, তাতিয়ানার খবর ইনি আমাদের জানাতে আপত্তি করবেন না।’ প্রিন্সেস ক্যাথারিনকে লক্ষ্য করে বলল মায়োভস্কি।

বলে কোন উত্তরের অপেক্ষা না করে আহমদ মুসার দিকে চেয়ে বলল, ‘চল।’

চলতে শুরু করে মায়োভস্কি পেছনে ফিরে প্রিন্সেস ক্যাথারিনকে বলল, ‘ধন্যবাদ আপনাকে। আপনার শেষ কথাটা আমি শুনেছি। মুখ না খুললে মৃত্যুই বিকল্প। আর সে মৃত্যু আপনার সামনেই এর হবে।’

বলে মায়োভস্কি বাউ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করল। চারজন প্রহরী নিয়ে চলল আহমদ মুসাকে।

# ২

আহমদ মুসার গায়ে কোট নেই। শার্ট রক্তাক্ত। আহমদ মুসা পড়ে আছে মেঝেতে। পাশে দাঁড়িয়ে আছে টম চামড়ার চাবুক হাতে।

মায়োভস্কি ঘরে প্রবেশ করল।

'স্যার এ ব্যাটা মানুষ নয়। হাতিকে এভাবে পেটালে হাতিও কথা বলতো। কিন্তু এঁকে কথা বলানো যায়নি।' বলল টম নামের ভীমাকৃতি সেই লোকটি।

'প্লেখভ কোথায়?'

'এইমাত্র গেলেন। পাশের রুমে রেস্ট নিচ্ছেন।'

মায়োভস্কি চেয়ার টেনে আহমদ মুসার পাশে বসল। পড়ে থাকা আহমদ মুসার দিকে মাথাটা ঝুকিয়ে বলল, 'প্লেখভ ও টমের হাতে তোমাকে ছেড়ে দিতে চাইনি। কিন্তু তুমি আমার সব কথা, সব অনুরোধ ব্যর্থ করে দিয়েছ। তাতিয়ানা সম্পর্কে কোন তথ্যই দাওনি।'

আহমদ মুসা ধীরে ধীরে উঠে বসল। কোন কথা বলল না।

'শোন, কথা না বলে তুমি বাঁচবে না, তাতিয়ানাকে বাঁচাতে পারবে না, ক্যাথারিনকেও নয়।'

হাসি ফুটে উঠল আহমদ মুসার ঠোঁটে। বলল, 'আপনারা নাকি রাজ পরিবারের শুভাকাঙ্খী, ক্যাথারিন ও তাতিয়ানার শুভাকাঙ্খী?'

সংগে সংগে উত্তর দিল না মায়োভস্কি। কিছু সময় নিয়ে বলল, 'তুমি তো মরতে যাচ্ছ। মরার আগে তাহলে শোন। রাজ পরিবার আবার সিংহাসন ফিরে পাক, এ ব্যাপারে আমাদের কোন আগ্রহ নেই। বরং সরকার সিংহাসন ফিরিয়ে দেয়ার নামে তাতিয়ানা ও ক্যাথারিনকে হাত করে রাজ পরিবারের গুপ্তধন ভান্ডার হাত করতে চায়। আমরা তা হতে দেব না। আমরা হাত করতে চাই বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম সে গুপ্তধন ভান্ডার।'

‘রাজ পরিবারের গুপ্তধন হাত করার জন্যে এত কিছুর প্রয়োজন কি। নিশ্চয় প্রিন্সেস ক্যাথারিন ও তাতিয়ানা সাথে নিয়ে বসে নেই সেই ধন ভান্ডার?’

‘তাতিয়ানাকে আমাদের প্রয়োজন। কারণ তার হাতেই রয়েছে রয়্যাল আংটি এবং তারই কাছে রাজকীয় ডাইরীও আছে। ও দু’টি আমাদের প্রয়োজন।’

চমকে উঠল আহমদ মুসা আংটি এবং ডায়েরীর কথা শুনে। একটু সময় নিয়ে বলল, ‘ও দু’টি দিয়ে কি কাজ?’

হাসল মায়োভস্কি। বলল, ‘আংটির মধ্যে রয়েছে গুপ্তধনের নক্সা এবং ডায়েরীতে পাওয়া যাবে রাজ পরিবারের কে কোথায় রয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ।’

‘আপনারা রাজ পরিবারের লোকদের চান, না ঐ দু’টি জিনিস চান, আমি বুঝতে পারছি না।’

আবার হাসল মায়োভস্কি। বলল, ‘আমরা জিনিস দু’টিও চাই, লোকদেরও চাই। আমরা গুপ্তধন দখল করব, কিন্তু ওদের বাঁচিয়ে রাখলে সব কিছু প্রকাশ হয়ে পড়বে। সুতরাং যখন গুপ্তধন দখল করব, তখন ওরা কেউ দুনিয়াতে থাকবে না।’

বলেই মায়োভস্কি উঠে দাঁড়াল এবং বলল, ‘এখনও সময় আছে, আমাদের সহযোগিতা কর। তাহলে তোমার শুধু জীবনই বাঁচবে না, লাভবানও হবে।’

‘আমি চাইলেই বাঁচতে পারি না, আপনি চাইলেই আমাকে মারতে পারেন না।’

‘টম একে নিয়ে চল।’ বলে দরজার দিকে হাঁটতে শুরু করল মায়োভস্কি।

টম টেনে দাঁড় করাল আহমদ মুসাকে। ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলল তাকে।

দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল চার স্টেনগানধারী। তারাও পেছনে পেছনে চলল।

একটা প্রশস্ত করিডোরে ওরা আহমদ মুসাকে নিয়ে এল।

করিডোরটা একটা মিটিং প্লেসের মত। আহমদ মুসা চারদিকে চেয়ে দেখল। বিভিন্ন দিক থেকে কয়েকটি করিডোর এসে মিশেছে প্রশস্ত এ চত্বরে।

উপরের ছাদটি তিন তলার মত উঁচুতে। উপরে দু'টি ফ্লোরেরই ব্যালকনি প্রশস্ত করিডোরটির চারদিকে ঘুরানো।

করিডোরে প্রবেশ করতেই আহমদ মুসা দেখতে পেয়েছে প্রিন্সেস ক্যাথারিনকে। দোতলার ব্যালকনিতে এনে বসানো হয়েছে তাঁকে।

আহমদ মুসার রক্তাক্ত জামা-কাপড়ের দিকে চেয়ে চমকে উঠেছিল প্রিন্সেস ক্যাথারিন। ধীরে ধীরে তার মুখটি উদ্বেগ ও বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল।

মায়োভস্কি আহমদ মুসাকে ব্যালকনির সামনে নিয়ে দাঁড় করাল। প্রিন্সেসকে লক্ষ্য করে কিছু বলতে যাচ্ছিল মায়োভস্কি।

হঠাৎ তার হাতের টেলিফোন বিপ বিপ সংকেত দিয়ে উঠল।

'মাফ করবেন ইয়োর হাইনেস। টেলিফোনে কথাটা বলে নেই।'

একটু আড়ালে চলে গেল মায়োভস্কি টেলিফোনে কথা বলার জন্যে। মিনিট খানেক পরে ফিরে এল।

'প্লেখভ, শফরোভিচকে ডাক। জরুরী কল এসেছে। আমাকে এখুনি যেতে হবে।'

প্লেখভ দ্রুত চলে গেল।

মায়োভস্কি প্রিন্সেসের দিকে চেয়ে বলল, 'ইয়োর হাইনেস, আপনার বন্ধু যুবকটি একেবারেই নির্বোধ বেয়াড়া। আমাদের সহযোগিতাই সে করেনি। মৃত্যুর জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। আপনার সামনে এবার তার মৃত্যুদন্ড কার্যকরী করার নাটকই অনুষ্ঠিত হবে।'

একটু থামল মায়োভস্কি। একটা ঢোক গিলে আবার শুরু করল, 'একটা শেষ সুযোগ।' আপনাকে দিচ্ছি ইয়োর হাইনেস। আপনি তাকে বলে দেখতে পারেন, প্রিন্সেস তাতিয়ানা এবং তার সেই দু'টি জিনিস কোথায় আছে সে বলুক।'

মায়োভস্কি কথা শেষ করতেই প্লেখভ শফরোভিচকে নিয়ে হাজির হলো।

'মিঃ শফরোভিচ, আমাকে তাড়াতাড়ি যেতে হচ্ছে। টেলিফোন এসেছে। আপনি এদিকটা দেখুন। সবই আপনি জানেন। হার হাইনেস প্রিন্সেসকে অনুরোধ

করেছি শেষ চেষ্টা করার জন্যে। ব্যর্থ হলে যেভাবে কথা আছে, সেভাবে হত্যা করবেন। যাতে সে দৃষ্টান্ত অন্যদের মুখ খুলতে সাহায্য করে।'

বলে মায়োভস্কি প্রিন্সেস ক্যাথারিনকে একটা ছোট্ট বাউ করে বেরিয়ে গেল করিডোর থেকে।

শফরোভিচ প্রিন্সেসকে ছোট্ট একটা বাউ করে বলল,'ইয়োর হাইনেস আপনি কি বলবেন, না আমরা কাজ শুরু করে দেব।'

'প্রিন্সেসের কিছু বলার নেই। তিনি নিজেই তোমাদের বন্দী। বন্দী আরেক বন্দীকে কোন নির্দেশ দিতে পারেন না, অনুরোধও নয়। এখন তিনি যা বলবেন সেটা তাঁর কথা নয়, তোমাদের কথা।'

প্রিন্সেস ক্যাথারিনের ভ্রু কুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার কথা শুনে। অপার বিস্ময় ফুটে উঠল তার চোখে-মুখে। সে ভাবতেই পারছে না, রাজ পরিববারের সাথে সম্পর্কহীন একজন নিপীড়িত রক্তাক্ত যুবক মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে রাজ পরিবারের স্বার্থে এইভাবে কথা বলতে পারে কেমন করে! কে এই যুবক! একজন এশিয়ানের মধ্যে এই তেজ!

কোন কথা বলতে পারল না প্রিন্সেস। কি বলবে সে! যুবক যা বলেছে, সেটাই তো সত্য।

শফরোভিচ ক্রুদ্ধ চোখে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। তারপর টম এর দিকে তাকিয়ে বলল,'তোমার আয়োজন প্রস্তুত?'

'হ্যাঁ।' বলে টম কয়েক পা এগিয়ে এসে করিডোরের ঠিক মাঝখানে মানুষ পরিমাণ উঁচু কোন কিছুর উপর ছড়িয়ে রাখা কালো পর্দা তুলে ফেলল।

দেখা গেল বিরাট একটা বোর্ড। তাতে মানুষ পরিমাণ ক্রুশ আঁকা।

হেঁসে উঠল শফরোভিচ। বলল,'ইয়োর হাইনেস, এই ক্রুশে চড়ানো হবে আপনার এই দুর্বিনীত বন্ধুকে। তারপর যিশু খৃস্টের মত করেই পেরেক দিয়ে তার দেহকে গেঁথে দেয়া হবে বোর্ডের সাথে। তারপর কুকুর লেলিয়ে দেয়া হবে। কুকুরটি সাত ফিট উপর পর্যন্ত লাফিয়ে উঠে শিকারের গোশত ছিঁড়ে আনতে পারে।'

মুহূর্তে প্রিন্সেস ক্যাথারিনের চেহারা পাংশু পান্ডুর হয়ে গেল। মুখে যেন তার এক ফোঁটাও রক্ত নেই।

‘মৃত্যুকে এখন দেখতে পাচ্ছ শয়তান?’ আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল শফরোভিচ।

‘না আমি দেখতে পাচ্ছি না। তুমি নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছ?’ বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার কথা শেষ হতে না হতেই শফরোভিচের একটা প্রচন্ড ঘুষি গিয়ে পড়ল আহমদ মুসার মুখে। মুখ সরিয়ে নেবারও সময় পেল না সে।

ঠোঁট ফেটে দর দর করে রক্ত নেমে এল।

ঘুষি দিয়েই শফরোভিচ বলল,‘তোমরা এ শয়তানকে নিয়ে যাও ক্রুশে। মৃত্যুকে দেখতে পাচ্ছে না, দেখতে দাও মৃত্যুকে।’

আচানক ঘুষি খেয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল আহমদ মুসা।

দু’জন স্টেনগানধারী এগিয়ে গিয়ে দু’জন দু’দিক থেকে এক হাতে স্টেনগান ধরে, অন্য হাতে আহমদ মুসাকে তুলে দাঁড় করিয়ে ক্রুশ বোর্ডের দিকে নিয়ে চলল।

অন্য দুই স্টেনগানধারী এবং প্লেখভ, টম এবং শফরোভিচ সবাই ক্রুশ বোর্ডের সামনে একটু দূরে দাঁড়িয়ে। তাদের চোখে-মুখে উৎসবের আমেজ।

প্রিন্সেস ক্যাথারিনের চোখ দু’টি ছানাবড়া হয়ে গেছে। উদ্বেগ-আতংকে তার ঠোঁট দু’টি কাঁপতে শুরু করেছে। এর মধ্যেও তার মনে অপার বিস্ময়, যার পরিণতির কথা ভেবে সে  উদ্বেগ-আতংকে মরে যাচ্ছে, তার মুখে-চোখে কিন্তু ভয়ের লেশ মাত্র নেই। কে এই অদ্ভুত যুবক!

দু’জন স্টেনগানধারী আহমদ মুসার দেহকে ক্রুশ বোর্ডের সাথে শেঁটে দেবার জন্যে তার সামনে দাঁড়িয়ে স্টেনগান দুই হাঁটুর মাঝখানে চেপে রেখে ক্রুশ বোর্ডের লকে আহমদ মুসার হাত-পাকে আটকাতে যাচ্ছিল।

ক্রুশ বোর্ডে ঠেশ দেয়ার সময় আহমদ মুসার দেহ হঠাৎ স্প্রিং-এর মত ছিটকে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তার সামনে দাঁড়ানো তার উপর ঝুঁকে পড়া দু’জন

ছিটকে পড়ে গেল। তারা পড়ে যাবার আগেই তাদের একজনের স্টেনগান তুলে নিয়ে আহমদ মুসা ট্রিগার চেপে অর্ধচন্দ্রাকারে ঘুরিয়ে নিল সামনে।

সামনে দাঁড়ানো ওরা চারজন চোখের পলকে লাশ পড়ে গেল।

আহমদ মুসার সামনে পড়ে যাওয়া দু'জন উঠে ছুটে পালাচ্ছিল। ওরাও স্টেনগানের খোরাকে পরিণত হলো।

আহমদ মুসা তাকাল প্রিন্সেসের দিকে। দেখল সে উঠে দাঁড়িয়েছে চেয়ার থেকে। তার চোখে-মুখে উদ্বেগ, বিস্ময়, উত্তেজনা ঠিকরে পড়ছে।

আহমদ মুসা চারদিক তাকিয়ে দোতলায় উঠটার কোন পথ দেখতে পেল না।

আহমদ মুসাকে এ করিডোরে আনা হয়েছিল ভূগর্ভস্থ কোন কক্ষ থেকে। আগের দিন প্রিন্সেস ক্যাথারিনের কক্ষে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় অনেক ঘর, দরজা ও করিডোর ঘুরিয়ে।

আবার আহমদ মুসা তাকাল প্রিন্সেস ক্যাথারিনের দিকে।

তাকিয়েই আহমদদ মুসা নিজের দেহটাকে এক পাশে মেঝের উপর ছুড়ে দিল। আর সংগে সংগেই একটা গুলী ক্রুশ বোর্ডকে এসে বিদ্ধ করল। আহমদ মুসা সরে না দাঁড়ালে গুলীটা তার মাথা গুড়ো করে দিত।

আহমদ মুসা মাটিতে পড়েই শরীরটাকে গড়িয়ে ক্রুশ বোর্ডের আড়ালে নিয়ে গেল।

ওদিক থেকে আরও কয়েকটি গুলী বর্ষণ হলো। সবগুলো এসে আঘাত করলো ক্রুশ বোর্ডকে।

আহমদ মুসা প্রিন্সেস ক্যাথারিনের দিকে দ্বিতীয়বার তাকিয়েই দেখতে পেয়েছিল, একজন লোক রিভলবার বাগিয়ে ঘরের ভেতর থেকে ব্যালকনিতে প্রিন্সেস ক্যাথারিনের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

আহমদ মুসা ক্রুশ বোর্ডের পাশ দিয়ে উঁকি দিল ব্যালকোনির দিকে। দেখল, রিভলবারধারী লোকটি প্রিন্সেস ক্যাথারিনকে সামনে রেখে আহমদ মুসার খোঁজ করছে।

আহমদ মুসা মুখ বের করতেই লোকটি রিভলবার ঘুরিয়ে গুলী করল।

আহমদ মুসা মাথা সরিয়ে নিয়েছিল। গুলীটা ক্রুশ বোর্ডের পাশ ঘেঁষে চলে গেল। অব্যর্থ নিশানা।

ব্যালকোনি থেকে লোকটি কর্কশ কন্ঠে বলে উঠল, ‘বেরিয়ে এস আড়াল থেকে অস্ত্র ফেলে দিয়ে। না হলে গুলী করব প্রিন্সেসকে। বেরিয়ে এসে ৫ গোনার মধ্যে।’

‘প্রিন্সেসকে গুলী করার ক্ষমতা তোমার নেই।’

এ সময় পেছনে কোথাও অনেকগুলো পায়ের শব্দ হলো।

আহমদ মুসা দ্রুত ক্রুশ বোর্ডটি ঠেলে প্রিন্সেস ক্যাথারিন এবং রিভলবারধারী লোকটি পশ্চিমের যে ব্যালকোনিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার নিচে চলে গেল এবং বোর্ডের আড়ালে ওঁত পেতে বসল।

সেখান থেকে পূর্ব দিকের করিডোর আহমদ মুসা দেখতে পাচ্ছে। পশ্চিম দিকের করিডোরটি একদম তার বাম হাতের পাশেই। দক্ষিণ দিকের করিডোরটিও তার চোখের সামনে। উত্তর পাশে কোন করিডোর নেই।

পুব দিকের করিডোর দিয়ে যারা ছুটে আসছিল তারা প্রায় করিডোরের মুখে এসে পড়েছিল। ব্যালকোনি থেকে সেই লোকটি চিৎকার করে উঠল, ‘সাবধান এদিকে বোর্ডের আড়ালে লুকিয়ে আছে শত্রু।’

ওদিকে পায়ের শব্দ থেমে গেল। তার বদলে ছুটে এল গুলী বৃষ্টি।

অধিকাংশ গুলী এসে বিদ্ধ করল ক্রুশ বোর্ড।

ক্রুশ বোর্ডটি আসলে কোন বড় গেটের দরজা। দেড় ইঞ্চি পুরু কাঠের পাল্লার এক পাশে ইস্পাতের প্লেট বসানো।

অব্যাহত গুলী বৃষ্টির মুখে আহমদ মুসা করিডোরটির দিকে স্টেনগান তাক করতে পারছিল না। এ সময় পশ্চিমদিকের করিডোরেও ছুটে আসা পায়ের শব্দ শুনতে পেল আহমদ মুসা। প্রমাদ গুণল আহমদ মুসা।

পশ্চিম করিডোর দিয়ে যারা আসছে তাদের গুলীর মুখে পড়ে যাবে সে। ওদেরকেও টার্গেট করা যাবে না এখান থেকে। ওদের ঠেকাতে গেলে পুব দিক থেকে ওরা এগিয়ে আসবে, আবার পুব দিকে নজর দিলে পশ্চিম দিকের ওরা তাকে টার্গেট করার সুযোগ পেয়ে যাবে। সবচেয়ে বড় কথা ক্রুশ বোর্ডের আড়াল

থেকে বের হবার তার কোন সুযোগ নেই। এই অবস্থায় দক্ষিণ দিকের করিডোর দিয়ে যদি কেউ প্রবেশ করে, তাহলে সে সরাসরি তাদের গুলীর মুখে পড়ে যাবে।

আহমদ মুসা দ্রুত চারদিকে তাকাল। পেছনেই দেয়ালে একটা দরজা। কিন্তু বন্ধ। মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল আহমদ মুসা।

ক্রুশ বোর্ডের কভার নিয়ে আহমদ মুসা দ্রুত দক্ষিণ দিকের করিডোরের দিকে ছুটল।

পেছনে গুলী ছুটে এল পুব দিক থেকে। তারপর পশ্চিম দিক থেকেও।

বোর্ডে আঘাত করা ছাড়াও আহমদদ মুসার দু'পাশ দিয়ে ব্রষ্টির মত গুলী বেরিয়ে যাচ্ছিল।

আহমদ মুসা বুঝল ওরা গুলী করতে করতে ছুটে আসছে।

আহমদ মমুসা করিডোরে প্রবেশ করে ছুটল করিডোর দিয়ে। অল্প যাওয়ার পরই সে দেখল, করিডোরের দু'পাশ থেকে দু'টি সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে। আর সিঁড়ি দু'টির পাশ দিয়ে করিডোরটি দু'ভাগ হয়ে একটা পশ্চিমে, অন্যটা পুবদিকে চলে গেছে।

আহমদ মুসা কোন দিকেই এগুলো না।

পশ্চিমমুখী করিডোরের মুখে স্টেনগান বাগিয়ে দেয়ালের আড়ালে শুয়ে পড়ল। শত্রুকে বিভ্রান্তিতে ফেলে মোকাবিলা করার একে একটা উপযুক্ত জায়গা বলে আহমদ মুসা মনে করল।

আহমদ মুসা বুঝল ওরা করিডোরে প্রবেশ করেছে। ওরা গুলী বৃষ্টি থামায়নি। আহমদ মুসা ক্রুশ বোর্ডটি সিঁড়ি বরাবর ফেলে রেখে দেয়ালের আড়ালে পজিশন নিয়েছিল। উদ্দেশ্য ওদের ধারণা দেয়া যে আহমদ মুসা উপরের দিকে পালিয়েছে। এইভাবে ওদের সেখানে থামতে বাধ্য করা। স্বাভাবিকভাবেই তখন তাদের সামনের দিকে গুলী বর্ষণ বন্ধ হয়ে যাবে।

ওদের প্রতিটি পদক্ষেপের প্রতি উৎকর্ণ আহমদ মুসা স্টেনগানের ট্রিগারে হাত রেখে অপেক্ষা করছে।

আহমদ মুসার পরিকল্পনা সফল হলো। সত্যিই ওরা সিঁড়ি বরাবর এসে মুহূর্তের জন্যে থেমে গেল। বিভিন্ন দিকে যাবার জন্যে ভাগ হবার সময় তাদের গুলী বর্ষণও মুহূর্তের জন্যে থেমে গিয়েছিল।

এমন একটা মুহূর্তেরই অপেক্ষা করছিল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা দেয়ালের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ট্রিগারে হাত রেখে। তারপর ট্রিগার চেপে স্টেনগান ঘুরিয়ে নিল অর্ধচন্দ্রাকারে।

ওরা ছুটে এসেছিল পাঁচজন। পাঁচজনই লাশ হয়ে পড়ে গেল।

আহমদ মুসা পা পা করে চত্বরের প্রান্তে ফিরে এল আবার। দেখল, প্রিন্সেস ক্যাথারিন আগের মতই চেয়ারে বসে আছে। একা।

বিস্মিত হলো আহমদ মুসা। প্রিন্সেস একা কেন? দু'পা এগুলো সে ক্যাথারিনের দিকে।

ঠিক এ সময়েই প্রিন্সেস ক্যাথারিন তার তর্জনী তুলে ধরল। তার চোখে-মুখে উদ্বেগ।

আহমদ মুসা ভূত দেখার মতই চমকে উঠে মেঝের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শরীরটাকে গুটিয়ে নিয়ে বলের মত দ্রুত গড়িয়ে চলল পুবের করিডোরের দিকে।

আহমদ মুসা মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার সংগে সংগেই তার মাথার উপর দিয়ে একটা রিভলবারের গুলী চলে গেল।

এরপর আরও গুলী তাকে ফলো করল। কিন্তু আহমদ মুসা তীব্র গতির বলের মত গড়িয়ে পুবে করিডোরে ঢুকে গেল।

করিডোর লক্ষ্যে তখনও গুলী আসছিল।

আহমদ মুসা করিডোর থেকে একটা স্টেনগান কুড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

পশ্চিমের করিডোর থেকে গুলীর আওয়াজ শুনল আহমদ মুসা। সেই সাথে শুনল বেশ কিছু পায়ের শব্দ। এ করিডোর লক্ষ্যেই গুলী আসছে।

আহমদ মুসা প্রিন্সেস ক্যাথারিনের কাছে পৌঁছা এবং তাকে উদ্ধারের চিন্তা বাদ দিল।

সে ছুটল বেরুবার জন্যে করিডোর ধরে পুব দিকে।

সামনে গিয়েই উত্তর-দক্ষিণ একটা করিডোর পেয়ে গেল আহমদ মুসা। দেখল, করিডোরটি দিয়ে দক্ষিণ দিক থেকে ছুটে আসছে একজন।

একেবারে তার মুখোমুখি হয়ে পড়েছিল আহমদ মুসা। তার তর্জনি ট্রিগারে প্রস্তুত ছিল। তর্জনি ট্রিগারে চেপে ধরতেই এক ঝাক গুলী গিয়ে ঘিরে ধরল লোকটিকে।

লোকটির দেহ দক্ষিণ দিকে ছিটকে পড়ে গেল।

আহমদ মুসা অনুভব করল, এ করিডোরে অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা বাতাস। দক্ষিন দিক থেকে আসছে। বুঝল আহমদ মুসা, গেটটা দক্ষিণ দিকে এবং কাছেই হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

আহমদ মুসা লাফ দিয়ে লাশটি ডিঙিয়ে ছুটল দক্ষিণ দিকে।

কিছুদূর এগিয়েই একটা কক্ষের বড় দরজায় গিয়ে শেস হলো করিডোরটি।

দরজাটি খোলা।

পেছনে করিডোরের ওপ্রান্ত থেকে স্টেনগানের ব্রাশ ফায়ারের শব্দ সে শুনতে পেল।

আহমদ মুসা দ্রুত ঘরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিল।

দেখল, সোজা সামনেই ঘরের বিপরীত দিকে আরেকটা বড় দরজা। দরজার উপরের দিকটা জানালা। খোলা। দরজা বন্ধ।

দরজা খুলে আহমদ মুসা দেখল, সামনে একটা ছোট চত্বর। তারপরেই বাইরে বেরুবার গেট।

আহমদ মুসা স্টেনগানটি ঘরে ফেলে দিয়ে হাতের গ্লাভসটি খুলে পকেটে ফেলে বেরিয়ে এল গেট দিয়ে। তারপর ছুটল পাবলিক কল অফিসের সন্ধানে।

বাড়িটার পাশেই মোড়ের উপর পেয়েগেল একটা পাবলিক টেলিফোন বুথ।

টেলিফোন করল রুশ রাষ্ট্রদূত মিখাইল পাভেলের কাছে। পেয়ে গেল তাকে। বলল, 'জোয়ান অব আর্ক অ্যাভেনিউ-এর ৭১ নম্বর বাড়িতে এই মুহূর্ত

পর্যন্ত প্রিন্সেস ক্যাথারিন বন্দী আছেন। অবিলম্বে বাড়িটি সার্চ করতে পারলে প্রিন্সেস ক্যাথারিনকে উদ্ধার করা যেতে পারে।'

'তুমি কোথায়?'

'বাড়িটার পাশ থেকে টেলিফোন করছি। আমাকে আটকে রেখেছিল সেখানে। আমি বেরুতে পেরেছি।'

'প্রিন্সেস ঠিক আছেন?'

'ভাল আছেন।'

'ওকে পুলিশকে জানিয়ে আমি এখুনি আসছি।'

আহমদ মুসা টেলিফোন রেখে প্রিন্সেস ক্যাথারিনকে বন্দী করে রাখা সেই বাড়িটার সামনে এসে একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

ওদিকে যারা আহমদ মুসাকে তাড়া করে এসেছিল গেট পর্যন্ত, তারা ফিরে গেল প্রিন্সেস ক্যাথারিন যেখানে বসেছিল সেই ব্যালকোনির সামনে। তাদের মধ্যে একজন ব্যালকোনিতে রিভলবার হাতে প্রিন্সেস ক্যাথারিনের পাশে দাঁড়ানো লোকটির দিকে চেয়ে বলল, 'মিঃ উস্তিনভ, শয়তানটা পালিয়েছে।'

'খবরটা বলতে লজ্জা করছে না? তোমরা কয়েক ডজন মানুষ তাকে আটকাতে পারলে না, মারতেও পারলে না।' বলল উস্তিনভ।

কোন কথা বলতে পারলো না নিচে দাঁড়ানো লোকটা। নিরুত্তর লোকটি মাথা নত করল।

'কতজন মারা গেছে আমাদের?'

'এগার জন স্যার।'

'যাও এখন আন্ডার গ্রাউন্ড প্যাসেজে জমায়েত হও।'

বলে প্রিন্সেস ক্যাথারিনের দিকে চেয়ে একটা ছোট্ট বাউ করে বলল, 'চলুন মহামান্য প্রিন্সেস। লোকটি বড় এক ক্রিমিনাল। নিশ্চয় কোন বড় গ্যাং-এর সদস্য। আপনাকে পণবন্দী করে টাকা আদায় ওদের লক্ষ্য। আমরা চেষ্টা করেছিলাম, প্রিন্সেস তাতিয়ানা ওদের কবলে পড়েছে কি না তা জানতে।'

প্রিন্সেস ক্যাথারিন উঠে দাঁড়াল। মনে মনে হাসল তার কাহিনী সাজানোর বহর দেখে। বলল মনে মনে, যারা টাকার লোভে কিছু করে, তারা টাকার চেয়ে

জীবনকে বড় করে দেখে। সুতরাং তারা এক পাশে টাকা, অন্যপাশে জীবন থাকলে জীবনকেই বেছে নেয়। কিন্তু লোকটি তো তা নেয়নি। জীবন দিতে সে রাজী হয়েছিল, তবু কোন কথাই সে প্রকাশ করতে রাজী হয়নি। তার রক্তাক্ত দেহটা প্রমাণ করেছে কি অকথ্য নির্যাতন সে সহ্য করেছে। টাকার জন্যে কেউ এত কষ্ট সহ্য করে না, বরং টাকার বিনিময়ে সে নির্যাতন থেকে বাঁচতে চায়, কথাও প্রকাশ করে দেয় বাঁচার জন্যে।'

প্রিন্সেস হাঁটতে হাঁটতে আরও ভাবল, লোকটির সাথে তার আরও ভাল ব্যবহার করা উচিত ছিল। বলা উচিত ছিল তার জানা অনেক কথা। নিশ্চয় লোকটি তাকে সাহায্য করতেই এসেছিল। এদেরও সন্দেহ এবং লোকটির কথায় পরিষ্কার হয়ে গেছে, তাতিয়ানা সম্পর্কে সব তথ্য সে জানে।

খুবই আপসোস হলো প্রিন্সেস ক্যাথারিনের লোকটিকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে না পারার জন্যে।

কিন্তু আবার ভাবল, তার দোষ কি! একজন এশিয়ান রুশ প্রিন্সেসদের সাহায্য করতে আসবে, একথা তো স্বাভাবিক নয়।

আসলে কে লোকটি! যেই হোক সে অসাধারণ। এমন লোকের মুখোমুখি সে জীবনে হয়নি। শুধু এগারজন লোককে মেরে পালাতে পেরেছে বলে নয়, একজন রুশ প্রিন্সেসের সাথে তার কথা বলার সময় ঋজুতা তার মধ্যে দেখা গেছে। সেটাও ক্যাথারিনের কাছে নতুন।

আনমনা হয়ে ক্যাথারিনের চলা ধীর হয়ে পড়েছিল।

'মহামান্য প্রিন্সেস একটু দ্রুত চলতে হবে, আমাদের তাড়া আছে।'

বলল উস্তিনভ।

'আপনারা বলছেন, আপনারা আমাদের সাহায্য করার জন্যেই সবকিছু করছেন। কিন্তু আমরা তো এই খুনোখুনি চাইনি। চাই না।'

উস্তিনভের কঠিন ঠোঁটে একটা ক্রুর হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'প্রয়োজনেই এসব হচ্ছে। আমরা তো শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারি না, আপনাকে তাদের হাতে তো তুলে দিতে পারি না।'

‘কিন্তু লোকটিকে তো আপনারাই ধরে এনেছিলেন, সে তো চড়াও হতে আসেনি!’

‘ম্যাডাম প্রিন্সেস, মাফ করবেন। আপনার এসব প্রশ্নের জবাব দেয়ার দায়িত্ব আমার নয়।’

বলে দ্রুত চলার জন্যে প্রিন্সেস ক্যাথারিনকে আবার তাড়া দিল উস্তিনভ।

রুশ রাষ্ট্রদূত পাভেলের ফ্যামিলি ড্রইং রুমে আহমদ মুসা দুই হাত ছড়িয়ে সোফায় গা এলিয়ে বসে। জীবন্ত একটা হতাশা খচ খচ করছে তার অন্তরে।

প্রায় মুঠোর মধ্যে পেয়েও প্রিন্সেস ক্যাথারিনকে সে উদ্ধার করতে পারলো না। তাঁকে রেখেই তাকে পালিয়ে আসতে হলো।

আহমদ মুসা টেলিফোন করার ৫ মিনিটের মধ্যেই একটা অগ্রবর্তী পুলিশ দল সেখানে পৌঁছেছিল। তারা ঘিরে ফেলেছিল বাড়িটিকে। সাত মিনিটের মধ্যে রাষ্ট্রদূত পাভেল সেখানে পৌঁছে। আরও পুলিশও পৌঁছেছিল।

কিন্তু বাড়িতে কিছুই পাওয়া যায়নি। পাওয়া গিয়েছিল শুধু এগারটি লাশ।

প্রিন্সেস ক্যাথারিন যে ঘরে ছিল, সে ঘরেও আহমদ মুসা তাদের নিয়ে গিয়েছিল। সে ঘরে তার ব্যবহার্য জিনিসপত্র ও কাপড়াদি পাওয়া গেছে। সে সবে তাঁর ফিংগারপ্রিন্টও পাওয়া গেছে।

আহমদ মুসারা পৌঁছার আগেই ওরা পালিয়েছে প্রিন্সেসকে নিয়ে। পালাবার পথও খুঁজে পাওয়া গেছে। বাড়ির আন্ডার গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে একটা টানেল বাইরে বেরিয়ে গেছে। সে পথেই তারা পালিয়েছে।

আহমদ মুসার সামনে অন্ধকার। কোন পথে এগুবে তার কোন ইংগিত তার কাছে নেই। এমনকি প্রিন্সেসকে কিডন্যাপকারী ঐ লোকদের দলের বা গ্রুপের নাম-পরিচয় পর্যন্ত জানা হয়নি।

আহমদ মুসার চেয়েও হতাশ বেশী রুশ রাষ্ট্রদূত পাভেল। খবরটি মস্কোকে জানাবার পর সে ভয়ানক বকুনি খেয়েছে সেখান থেকে। পাভেলই ডেকে

এনেছে আহমদ মুসাকে সামনে এগুবার  কোন পথ বের করা যায় কিনা তা আলোচনার জন্যে।

পাভেলও হাত কপালে রেখে গা এলিয়ে দিয়েছিল সোফায়।

একসময় সে সোজা হয়ে বসে বলল, 'তোমাকে মোবারকবাদ ইয়ংম্যান, তুমি প্রিন্সেসের কাছে পৌঁছতে পেরেছিলে এবং তাকে উদ্ধারের চেষ্টাও করেছ। এখন কি করা যায়, ঐ ধরনের সুযোগ আবার কি করে সৃষ্টি করা যায়?'

আহমদ মুসাও সোজা হয়ে বসল। বলল, 'ওঁকে যারা কিডন্যাপ করেছে তারা রাশিয়ান। আপনাদের গোয়েন্দা বিভাগ তাঁকে খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে আমার মনে হয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।'

'হ্যাঁ তার পারে। কিন্তু এখনও কিছুই পারেনি।'

'ফ্রান্সে বিশেষ করে প্যারিসে রুশ কম্যুনিটির খোঁজ খবর তো আপনারা অবশ্যই রাখেন?' বলল আহমদ মুসা।

'কম্যুনিস্ট সরকারের আমলে এটা রুশ দূতাবাসের একটা প্রধান দায়িত্ব ছিল। কিন্তু এখন ঐভাবে খোঁজ-খবর রাখা হয় না।'

একটু থামল। থেমেই আবার শুরু করল রাষ্ট্রদূত পাভেল, 'তবে একটা যোগাযোগের ব্যবস্থা সবার সাথেই আছে। তারাও দূতাবাসে আসে। আমরাও তাদের আমন্ত্রণে তাদের আয়োজন-অনুষ্ঠানে গিয়ে থাকি।'

'এসব আয়োজন ও আয়োজকদের ফটো এ্যালবাম আপনারা সংরক্ষণ করেন না?'

'হ্যাঁ, কিছু কিছু আমরা করি। দেখতে চাও এ্যালবাম?'

'দেখালে বাধিত হবো।'

'অল রাইট' বলে রাষ্ট্রদূত পাভেল টেলিফোন তুলে নিল হাতে। ডায়াল করল। বলল, 'ওলগা মা, আমার কম্প্যুটারে দেখ প্যারিসের রুশ কম্যুনিটির একটা ফাইল আছে। ফাইলের একটা প্রিন্ট নিয়ে এস তো মা।'

'এত বড় ফাইলের কেন দরকার পড়ল? তোমার সাথে ওখানে কে আব্বা?' ওপার থেকে বলল তার মেয়ে ওলগা।

'কেন তোমাদের সেই সেভিয়ার, এশিয়ান ইয়ংম্যান।'

‘ও, নাইস, আসছি আব্বা।’

ক’মিনিটের মধ্যেই ওলগা এসে প্রবেশ করল ড্রইং রুমে।

প্রবেশ করেই আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, ‘মিঃ আব্দুল্লাহ, আপনাকে অভিনন্দন। আমাদের গোয়েন্দা বিভাগ ও ফরাসি পুলিশ যা করতে পারেনি, আপনি তাই পেরেছেন। প্রিন্সেস উদ্ধার হয়নি বটে, কিন্তু জানা গেল তিনি কি অবস্থায় আছেন।’

‘ওয়েলকাম মিস ওলগা। উদ্ধার আসল কাজ, সেটাই তো হয়নি।’ বলল আহমদ মুসা।

‘তাঁর কাছে পৌঁছতে পারা, তার অবস্থার কথা জানা, এটাও ছোট খবর নয়।’

মুহূর্তের জন্যে থামল ওলগা। আবার শুরু করল। ‘আপনার শরীর এখন কেমন? মুখের আহত জায়গা সম্পূর্ণ সারেনি দেখছি।’

‘কিছু অসুবিধা আছে। কিন্তু আমি সুস্থ।’

‘মা, ফাইলটা দাও’ আহমদ মুসার দিকে ইংগিত করে বলল রাষ্ট্রদূত।

আহমদ মুসা ফাইলটি ওলগার হাত থেকে নিল। ফাইলে মনোযোগ দিল আহমদ মুসা।

‘আসছি আব্বা, আসছি মিঃ আব্দুল্লাহ’ বলে ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেল ওলগা।

ফাইলে অনেক ফটো। কোনটি গ্রুপ, কোনটি সিংগেল। ফটোর ক্যাপশনে প্রত্যেকের পরিচয় লেখা আছে।

আহমদ মুসা শুধু ফটোগুলোর  উপর চোখ বুলিয়ে চলল। দরকার হলে ক্যাপশন দেখে নেয়া যাবে।

দু’টো ফাইল। প্রথমটিতে প্যারিসের রুশ কম্যুনিটির লোকদের নানা অনুষ্ঠান আয়োজনের ছবি। আর দ্বিতীয় ফাইলে রয়েছে দূতাবাস কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ছবি ও তাদের পরিচয়।

প্রথম ফাইলে সন্দেহ করারর মত কাউকেই পেল না। হাতে তুলে নিল দ্বিতীয় ফাইল-দূতাবাস কমকর্তা সচিত্র ডসিয়ার।

‘ও ফাইলে কিছু পেলে না, না? তাহলে ক্রিমিনালরা আরও অপরিচিত কেউ।’

আহমদ মুসা দূতাবাস কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ফটো ডসিয়ারটা বন্ধ করে টিপয়ের
উপর রাখতে যাচ্ছিল। রাষ্ট্রদূত পাভেল বলল, ‘ডসিয়ারটা দেখ। আমাদের সবাইকে তো চেননা। চেনা থাকলে উপকার হতে পারে তোমার আমাদের সকলেরই।’

আহমদ মুসা আবার হাতে তুলে নিল ফটো ডসিয়ারটা।

রাষ্ট্রদূত পাভেল একটা খবরের কাগজের পাতায় মনোযোগ দিয়েছিল। আর আহমদ মুসা একের পর এক পাতা উল্টিয়ে দেখে যাচ্ছিল ডসিয়ারটা।

হঠাৎ একটা ফটোর উপর চোখ পড়তেই ভূত দেখার মত চমকে উঠল আহমদ মুসা। আবার চট করে তাকাল রাষ্ট্রদূত পাভেলের দিকে। দেখল, তার চোখ দু'টি কাগজে নিবদ্ধ।

আহমদ মুসা ছবিটির পাশের পরিচিতি পড়ল। পড়ে আরেক দফা চমকে উঠল সে। মায়োভস্কি ফ্রান্সের রুশ দূতাবাসের কেজিবি প্রধান?

ছবিটি মায়োভস্কির। প্রিন্সেস ক্যাথারিনকে যারা বন্দী করে রেখেছে, মায়োভস্কি তাদেরই একজন। আহমদ মুসাকে ক্যাথারিনের বন্দীখানায় ইন্টারোগেট করেছে, নির্যাতন করেছে এই মায়োভস্কিই।

গোটা দেহে একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল আহমদ মুসার। গোটা দূতাবাস কি প্রিন্সেস ক্যাথারিনের কিডন্যাপের সাথে জড়িত? রাষ্ট্রদূত পাভেল কি তার সাথে অভিনয় করছেন? খেলছেন কি তিনি আহমদ মুসার সাথে? এই খেলা, এই অভিনয়ের উদ্দেশ্য কি? এই আশংকার পাশেই আবার ভাবল সে, সরকারের মধ্যেও সরকার থাকে। হতে পারে, মায়োভস্কি এবং তার সাথীরা দূতাবাসের অবস্থান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারায় কাজ করে যাচ্ছে।

কিন্তু কোনটা সত্যি তা এই মুহূর্তে বলা কঠিন। কূটনীতিকদেরকে নিখুঁত অভিনয়ও জানতে হয়। সুতরাং হঠাৎ করে তাদের স্বরূপ সন্ধান মুশকিল।

‘কি ভাবছ তুমি? মনে হচ্ছে তুমি বিমূঢ় হয়ে পড়েছ।’ বলল রাষ্ট্রদূত পাভেল।

আহমদ মুসা হাসার চেষ্টা করল। বলল, ‘ঠিকই বলেছেন। চারদিকে অন্ধকার দেখছি। বুঝতে পারছি না কোন পথে এগুব।’

‘আমারও তো একই অবস্থা। কিন্তু এ নিয়ে তো ভেংগে পড়ার দরকার নেই।’

‘আপনাদের এখানকার গোয়েন্দা দফতরে কি এ এলাকার ক্রিমিনালদের কোন তালিকা আছে?’

‘আছে। কিন্তু তা দিয়ে কি হবে? কাউকে সন্দেহ করলে না তার সন্ধান করবে ছবিতে। প্রিন্সেস ক্যাথারিনের কিডন্যাপকারী যাদের তুমি দেখেছ, তাদের সন্ধান করতে চাচ্ছ?’

আহমদ মুসা মুহূর্ত ভাবল। তারপর বলল, ‘ওরা আপনার এ্যালবামে থাকবে না।’

ভ্রু-কুঞ্চিত করল রাষ্ট্রদূত পাভেল। প্রশ্ন করল, ‘তার অর্থ?’

‘‘অর্থ হলো, আপনি দেখেছেন কিডন্যাপকারীদের সবগুলো লাশ রুশ। এর অর্থ প্রিন্সেস ক্যাথারিনকে কিডন্যাপ করার সাথে রুশদের কোন গ্রুপ জড়িত। তাদের ফটো নিশ্চয় আপনার এ্যালবামে থাকবে না। নিশ্চয় আপনারা রীতি হিসাবে ফরাসি ও প্রতিপক্ষ ও অপরাধীদের উপরই শুধু চোখ রাখেন।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ঠিক বলেছ। কিন্তু প্রিন্সেস ক্যাথারিনের কিডন্যাপের সাথে শুধু রুশরা জড়িত থাকলে ফরাসি ক্রিমিনালদের ছবি দেখতে চাচ্ছ কেন?’

‘ক্রিমিনালরা অনেক সময় সাহায্যও করে।’

ক্রিমিনালদের ফটো ফাইল দেখল আহমদ মুসা। আসলে ফটো দেখা নয়, ক্রিমিনাল এরিয়ার লোকেশান সম্পর্কে একটা আইডিয়া নেয়াই তার উদ্দেশ্য। আহমদ মুসার বিশ্বাস, প্রিন্সেস ক্যাথারিনকে যদি প্যারিসে রাখা হয়ে থাকে, তাহলে অপরাধ জগতের কোন বলয়ের প্রশ্রয়েই তাকে রাখা হবে।

ক্যাথারিনের কাছে পৌঁছার বিশ্বস্ততম সূত্র তার কাছে এখন মায়োভস্কি। আহমদ মুসা যেখানে পৌঁছবে সেই সম্পর্কে আগাম একটা ধারণা পেতে চায়।

মায়োভস্কির কথা মনে হতেই আহমদ মুসার মনে আরেকটা প্রশ্নের সৃষ্টি হলো। প্রিন্সেস ক্যাথারিনের কিডন্যাপের সাথে মায়োভস্কির জড়িত থাকার ব্যাপার যদি রাষ্ট্রদূত পাভেল জানতেন কিংবা তিনি নিজেও জড়িত থাকেন ঘটনার সাথে, তাহলে এমন অভিনয় কি সম্ভব? আহমদ মুসার অন্তর্ভেদী চোখেও মিঃ পাভেলের কোন অস্বাভাবিকতা তার চোখ-মুখ থেকে ধরা পড়ছে না।

পুনরায় আগের চিন্তাই আহমদ মুসার মনে আবার ফিরে এল, কূটনীতিকরা চলচ্চিত্রের অভিনেতাদের চেয়েও সিরিয়াসস অভিনেতা হয়ে থাকে। আহমদ মুসাকেও অভিনয় করতে হবে। রাষ্ট্রদূত পাভেলের বাসায় না এলে তো মায়োভস্কির পরিচয় ও ঠিকানা জানা যেত না। মায়োভস্কি আহমদ মুসার কাছে এখন সবচেয়ে মূল্যবান ব্যক্তি।

আহমদ মুসার মন চঞ্চল হয়ে উঠল। মায়োভস্কির বাসা কোথায়? ওর উপর চোখ রাখলেই নিশ্চিত ক্যাথারিনের কাছে পৌঁছা যাবে।

'অনুমতি দিন, আমি উঠতে চাই।' একটু সময় নিয়ে আহমদ মুসাই আবার বলল।

'তাহলে কি ঠিক হলো? কি ভাবছ তুমি এখন?' বলল রাষ্ট্রদূত পাভেল।

'চিন্তা করছি। আপনার গোয়েন্দা বিভাগ আজকের ঘটনার সূত্র ধরে কি করছে সেটাও দেখুন।' উঠতে উঠতে বলল আহমদ মুসা। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাষ্ট্রদূত পাভেলের চোখের উপর নিবদ্ধ। প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে চায় আহমদ মুসা।

'মায়োভস্কিদের সাথে কথা বলেছি। তারা চেষ্টা করছে, কিন্তু আমি আশাবাদী নই।'

'কিন্তু আমার মতে আশাবাদী বেশী হবার কথা। রুশ ক্রিমিনালদের সম্পর্কে সবকিছুই কেজিবি'র জানার কথা।'

'রুশরা জড়িত থাকার ব্যাপারটা এই প্রথম জানা গেল। এখন এ বিষয়টাকে তারা সিরিয়াসলি দেখবে। তবু আমি খুব আশাবাদী নই।'

‘কারণ?’

একটা ঢোক গিলল রাষ্ট্রদূত পাভেল। বলল, ‘তুমি যে কেজিবি’কে চেন, সে কেজিবি এখন নেই। এখন আমরা অফেনসিভ নই, ডিফেনসিভ। কোন মিশন না থাকলে এমন ডিফেনসিভ হয়ে পড়তে হয়।’

‘ঠিকই বলেছেন।’ বলে আহমদ মুসা হ্যান্ডশেকের জন্যে হাত বাড়াল পাভেলের দিকে।

আহমদ মুসা রাষ্ট্রদূত পাভেলের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে ভাবল, পাভেলের শেষ কথাটা একটা সত্যের প্রকাশ, না ক্ষোভের বিস্ফোরণ! ক্ষোভের বিস্ফোরণ হলে সে এবং মায়োভস্কি এক পক্ষের লোক হতে পারে।

রাষ্ট্রদূত পাভেলের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে আহমদ মুসা খুবই একাকিত্ব বোধ করছিল। সে নিশ্চিত হয়েছিল, রাষ্ট্রদূত পাভেলের কোন কথার উপর বিশ্বাস করা তার ঠিক হবে না। মায়োভস্কি এবং পাভেল যে আলাদা তা প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বাস করা যাবে না।

মায়েভস্কির উপর চোখ রাখছিল আহমদ মুসা।

সেদিন মেঘ না চাইতেই পানি।

রুশ দূতাবাসের বিপরীত দিকের কার পার্কে তার গাড়িতে বসে আহমদ মুসা দেখল, মায়োভস্কি এবং তার সাথে একজন লোক গাড়িতে উঠছে। দ্বিতীয় লোকটিকে আহমদ মুসা প্রিন্সেস ক্যাথারিনের সেই বন্দী খানায় দেখেছিল মায়োভস্কির সাথে প্রথম সাক্ষাতের সময়। খুশী হলো আহমদ মুসা, তারা দু’জন এক সাথে গাড়িতে উঠার অর্থ তারা কোন মিশনে যাচ্ছে।

প্রথমে গাড়িতে উঠল দ্বিতীয় লোকটি। তারপর মায়োভস্কি হাত ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে গাড়ির ড্রাইভিং সিটে উটে বসল।

ছুটে চলল ওদের গাড়ি।

আহমদ মুসার গাড়ি ফলো করল তাদের।

শুরুতেই মায়োভস্কিদের গাড়ি লাফিয়ে উঠে তীব্র গতিতে চলতে শুরু করেছে। মায়োভস্কির হাত ঘড়ি দেখা এবং শুরু থেকেই তাদের গাড়ির এমন গতি থেকে আহমদ মুসা বুঝল, সুনির্দিষ্ট সময়ের কোন সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রামে ওরা যাচ্ছে। দেরী হওয়ায় সময় কভার করতে চাচ্ছে জোরে গাড়ি চালিয়ে। একান্ত গরজে না পড়লে প্যারিসের রাস্তায় এভাবে কেউ গাড়ি চালায় না।

একই গতিতে চলছিল আহমদ মুসা ওদের পেছনে নিরাপদ একটা ব্যবধান রেখে।

সময়টা বিকেল। শহরের উপকণ্ঠে চলে এসেছে তাদের গাড়ি।

মায়োভস্কির গাড়ির গতি আরও বেড়েছে। ঝড়ের গতিতে এগিয়ে চলছে তার গাড়ি।

হঠাৎ মায়োভস্কির গাড়ি ওভারটেক করার জন্যে ভিন্ন লেনে টার্ন নিতে গিয়ে সামনের একটি পিকআপের সাথে একসিডেন্ট করে বসল।

মায়োভস্কির গাড়ি পিকআপটিকে পেছন থেকে ঠুকে দিয়ে সামনে বেরিয়ে গিয়েছিল। পিকআপটি ছিটকে গিয়ে কাত হয়ে পড়েছিল।

মায়োভস্কির গাড়ি চলে গিয়েছিল।

আহমদ মুসা স্পটটিকে ওভারটেক করতে গিয়ে দেখল, একটি বালক গাড়ি থেকে ছিটকে মুখ থুবড়ে পড়েছে মাটির উপর। রক্তে লাল হয়ে উঠেছে মাটি।

আহমদ মুসা ভুলে গেল মায়োভস্কিকে অনুসরণ করার কথা।

আহমদ মুসা তার গাড়ি রাস্তার এক পাশে দাঁড় করিয়ে ছুটল বালকটির দিকে। বালকটিকে কোলে তুলে নিয়ে তার গাড়ির দিকে আসার জন্যে পা বাড়িয়ে তাকাল পিকআপটির দিকে। দেখল, একটি মেয়ে গাড়ি থেকে বেরিয়ে টলতে টলতে এগিয়ে আসছে। সেও আহত।

আহমদ মুসা তার দিকে এগিয়ে বলল, 'আসুন আমার গাড়িতে।'

বালকটিকে গাড়ির সিটে শুইয়ে দিল আহমদ মুসা। মেয়েটি উঠে বসল তার পাশে।

মেয়েটির বয়স চব্বিশ-পঁচিশ বছর। তীক্ষ্ণ চোখ। স্লীম শরীর, স্পোর্টসম্যান ফিগার। লাবণ্য ভরা মিষ্টি চেহারা।

আহমদ মুসা গাড়ি স্টার্ট দেবার আগে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার পরিচিত কোন ক্লিনিক...।'

'আমাদের বাড়ির দিকে সোজা সামনে চলুন।'

আহমদ মুসার গাড়ি তীর বেগে এগিয়ে চলল সামনে। মায়োভস্কির গাড়িও এ পথেই গেছে।

আমরা কি কোন ক্লিনিকে যাচ্ছি?' ঘাড়টা ঈষৎ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'আমাদের ফ্যামেলি ক্লিনিকে সব ব্যবস্থা আছে। পিটার দেখা যাচ্ছে জ্ঞান হারায়নি।'

'ছেলেটার নাম পিটার?'

'হ্যাঁ, পিটার পাওয়েল। আর আমি জাহরা ইভানোভা।'

'ওয়েলকাম। দু'টোই সুন্দর নাম।'

গাড়ির চলার বেগটা আরও বাড়িয়ে দিতে দিতে বলল আহমদ মুসা।

প্যারিস উপকণ্ঠে একটা সবুজ গ্রাম। একটা সবুজ টিলার উপর দূর্গ সদৃশ বাড়ি।

বাড়িটা থেকে একটা সিঁড়ি ধাপে ধাপে নেমে এসেছে উপত্যকায়। আর একটা গাড়ির রাস্তা টিলার গা বেয়ে এঁকেবেঁকে উঠে গেছে বাড়িটার বিশাল গেটে।

গেটের সামনে লম্বা আকৃতির একটা বাগান। তার একদিকের রাস্তা দিয়ে গাড়ি প্রবেশ করে, অপরদিকেরটা দিয়ে গাড়ি বেরিয়ে যায়।

বাড়িটার কেন্দ্রবিন্দু বরাবর ভুগর্ভস্থ একটা বিশাল কক্ষ। কক্ষের মধ্যখানে একটা টেবিলের তিন দিকে বসে গ্রেগরিংকো, উস্তিনভ এবং মায়োভস্কি। গ্রেগরিংকো রাশিয়ার 'গ্রেট বিয়ার'-এর হোম এ্যাফেয়ার্সের প্রধান। উস্তিনভ 'গ্রেট বিয়ার'-এর 'অপারেশন রাজচক্র'কে নেতৃত্ব দিচ্ছে। আর মায়োভস্কি প্যারিসস্থ

রুশ দূতাবাসের কেজিবি প্রধান এবং অপারেশন রাজচক্র-এর ইউরোপীয় ইউনিটের প্রধান।

‘এশিয়ান লোকটি কে? এমন অবিশ্বাস্য ঘটনা সে ঘটাল, বিশ্বাস করতে বল?’ কথা বলছিল গ্রেগরিংকো। তার চেহারায় প্রবল বিরক্তির ছাপ।

‘অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে আমার কাছেও। জরুরী কল পেয়ে আমাকে যখন চলে আসতে হয়, তখন তাকে ক্রুশ বোর্ডে সেট করা শুধু বাকি ছিল। চারটি স্টেনগান ও একটা রিভলবারেরর বেষ্টনির মধ্যে ছিল সে। এই অবস্থায় এত কিছু ঘটা কিভাবে সম্ভব আমি বুঝতে পারছি না।’ বলল মায়োভস্কি শুকনো কণ্ঠে।

‘যে বিবরণ শুনলাম, তাতে তোমার পাঁচজন কি করবে। মুক্ত অবস্থায় শতজনের কাছেও সে ভয়ংকর। কে এই লোক।’ বলল গ্রেগরিংকো।

‘জানা যায়নি। তবে কেউ তাকে নিয়োগ করেছে।’ বলল উস্তিনভ।

‘কেন, কি উদ্দেশ্যে? ক্যাথারিনকে উদ্ধার করার জন্যে?’ বলল গ্রেগরিংকো।

‘এ বিষয়টা তো পরিষ্কার হয়ে গেছে। মুক্ত হবার পর সে পুলিশ নিয়ে সেখানে হাজির হয়েছিল। রুশ রাষ্ট্রদূতও সেখানে গিয়েছিল।’

‘তাহলে আমাদের রুশ সরকার কি তাকে নিয়োগ করেছে বলে আমরা ধরে নেব?’

‘ঘটনাচক্র তাই বলে। কিন্তু ব্যাপারটা সত্য নয়। রুশ সরকারের সংশ্লিষ্টতা থাকলে অবশ্যই আমি জানতাম। তাছাড়া এই কাজে একজন এশিয়ানকে নিয়োগ করার মত অসহায় অবস্থায় রুশ সরকার নিশ্চয় পৌঁছেনি।’ বলল মায়োভস্কি।

‘তোমার কথায় যুক্তি আছে মায়োভস্কি, কিন্তু তাহলে তার পরিচয় কি, এল কোত্থেকে?’ প্রশ্ন তুলল গ্রেগরিংকো।

সেটাই প্রশ্ন। প্যারিসে হঠাৎ করেই উদয় হয়েছে তার। মনে হয় তার উদয়ের সাথে তাতিয়ানার কোন সম্পর্ক আছে।’ বললো উস্তিনভ।

‘তাহলে তো ব্যাপারটা আরও সাংঘাতিক। আমরা তো তাতিয়ানার সাথে যুদ্ধে নামিনি, তাহলে তার লোকের সাথে আমাদের যুদ্ধ কেন? আমরা ক্যাথারিনের মত তাতিয়ানাকেও হাতে পেতে চাই।’ বলল গ্রেগরিংকো।

‘তার সাথে তাতিয়ানার সংশ্লিষ্টতার বিষয় স্পষ্ট নয়।’ বলল মায়োভস্কি।

‘সে কেন প্রিন্সেস ক্যাথারিনকে উদ্ধার করতে চায়, কেন তার পক্ষে সে কাজ করছে, এ বিষয়টা পরিষ্কার হলেই ও ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যাবে।’ বলল উস্তিনভ।

গ্রেগরিংকো নড়ে-চড়ে বসে কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল এ সময় সামনের দেয়ালে সেট করা কম্পিউটারে রেড সিগন্যাল জ্বলে উঠল, সেই সাথে বিপ বিপ শব্দ।

ওরা তিনজনই মুখ তুলে সে দিকে দৃষ্টি ফেরাল। তিনজনই ওরা এ্যাটেনশন হয়ে বসল। ওদের চোখে-মুখে প্রবল ভয় ও ভক্তির ছাপ।

ওদের সামনে দেয়ালে টিভি স্ক্রিন। ওদের তিন জোড়া চোখ সে স্ক্রিনের উপর নিবদ্ধ।

টিভি স্ক্রিনে ধীরে ধীরে মুখোশ ঢাকা একটা মুখ ভেসে উঠল।

ওরা তিনজনই মাথা নুইয়ে তাকে বাউ করল। মুখে উচ্চারণ করল ‘মহামান্য আইভান দি টেরিবল, আমরা আপনার খেদমতে।’

গ্রেট বিয়ারের বর্তমান নেতা ‘আইভান দি টেরিবল’ নাম গ্রহণ করেছে। রুশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় পিটার দি গ্রেটের পর সবচেয়ে ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করেন আইভান দি টেরিবল। অতি নিষ্ঠুর এই শাসকের সময়েই সাইবেরিয়া এবং ভলগা নদী পর্যন্ত ভূখন্ড রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়। রুশ রাজধানী হিসেবে মস্কোর পত্তন তিনিই করেন।

আইভান দি টেরিবলের অনুসরণে গ্রেট বিয়ার রুশদের জন্যে উৎকট ধরনের পুঁজিবাদী ডিক্টেটরশীপ কায়েম করতে চায়। রুশ সরকার নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের অধীনে রাশিয়ায় যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে তারও বিরোধী এরা।

মুখোশধারীর মুখ নড়ে উঠল। তার কণ্ঠে ধ্বনিত হলো,'রাশিয়ার প্রিয় সন্তানগণ, রাশিয়ার বার জন মহান সন্তান নিহত হওয়ার ঘটনায় আমি যারপরনাই দুঃখিত ও বিস্মিত। বিস্ময় এজন্যে যে তোমাদেরকে কারো হাতে পরাজয় বরণের জন্যে পাঠানো হয়নি। বিস্ময় আরও এজন্যে যে, হত্যাকারীকে এখনও তোমরা ধরতে পারনি, সে এখনও জীবিত। তোমাদের এই ব্যর্থতার কারণে আমাদের গোপন পরিকল্পনা বাইরে প্রকাশ হওয়ার আশংকা সৃষ্টি হয়েছে, এটা ক্ষমার যোগ্য নয়।' থামল মুখোশধারী।

এদের তিনজনেরই মুখ তখন ভয়ে ফ্যাকাশে। আবার কণ্ঠ ধ্বনিত হলো মুখোশধারীর। বলল, 'আমি তোমাদের আরও কিছু সময় দিচ্ছি। মনে রেখ তার এক মুহূর্ত জীবিত থাকার অধিকার নেই। সে জীবিত থাকলে তোমরা বেঁচে থাকার অধিকার হারাবে। সব ঘটনার পর্যালোচনায় বুঝতে পারছি, প্রিন্সেস ক্যাথারিন তাতিয়ানার খবর জানে না এবং আংটি ও ডায়েরীর খবরও তার জানা নেই। তাতিয়ানাকে হাতে পাওয়াই আমাদের এখন প্রধান কাজ। তাতিয়ানাকে খুঁজতে হবে তোমাদেরকেই। ইন্টারনেট-এর সাহায্য নিয়ে তোমরা গত ছয় মাসের ইউরোপীয় সব বিমান বন্দরের যাত্রী তালিকা নাও। বের কর সর্বশেষ তাতিয়ানা কোথায় ল্যান্ড করেছে। লোকেশন চিহ্নিত করার পর সেখানে জালের ছাঁকুনি দাও। পেতেই হবে তাতিয়ানাকে। প্রথমে গুপ্তধন উদ্ধার তারপর ওদের দেখে নেব। দীর্ঘজীবী হোক রাশিয়া এবং রাশিয়ার সন্তানরা।' থামমল মুখোশধারী। তার ছবিও সরে গেল স্ক্রীন থেকে।

ওরা তিনজন তখনও পাথরের মূর্তির মত বসে আছে।

নীরবতা ভাঙলো গ্রেগরিংকো। বলল, 'উস্তিনভ তুমি তোমার সর্বশক্তি নিয়ে তাতিয়ানার খোঁজে লেগে যাও। ইউরোপের ছয় মাসের যাত্রী চার্ট যোগাড় করো আজ, কাল দু'দিনের মধ্যেই। আর মায়োভস্কি, তোমার দায়িত্ব হলো এশিয়ান যুবককে জন্মের মত শিক্ষা দেওয়া। তাকে হত্যা কর যেখানে পাও।'

মায়োভস্কি কিছু বলার জন্য মুখ খুলেছিল, কিন্তু তার আগেই কথা বলে উঠল ইন্টারকম। বলল, 'মহামান্য গ্রেগরিংকো, জাহরা ইভানোভা এবং পিটার

পাওয়েল এ্যাকসিডেন্ট করেছে। পিটার সাংঘাতিক আহত, ইভাও ছোট-খাট আঘাত পেয়েছে।'

জাহরা ইভানোভা এবং পিটার পাওয়েল  বাড়িটার মালিক নিকিতা স্ট্যালিনের দুই সন্তান। নিকিতা ফ্রান্সে আশ্রয় গ্রহণকারী একজন ধনাঢ্য রুশ। সোভিয়েত ইউনিয়নের একজন ভিন্নমতালম্বী বিদ্রোহী হিসেবে সে ফ্রান্সে আশ্রয় পায়। কিন্তু কার্যত সে ছিল কেজিবি'র হার্ডকোর লবীর একজন প্রতিভাবান এজেন্ট। সে এখন ফ্রান্সে গ্রেট বিয়ারের প্রধান অবলম্বন। কোটিপতি নিকিতা এখন গ্রেট বিয়ারের গড ফাদারের ভূমিকা পালন করছে। তার মেয়ে জাহরা ইভানোভাও গ্রেট বিয়ারের একজন কর্মী।

'ও গড! মিঃ নিকিতাকে জানান হয়েছে?'

'তিনি এখন লন্ডনে। জানানো হচ্ছে।'

'ডাঃ জ্যাকভ আছেন?'

'তাকে টেলিফোন করা হয়েছে, আসছেন তিনি।'

'অল রাইট, আমরা আসব।'

টেলিফোন রেখে গ্রেগরিংকো বলল, 'ইভানোভা ও পিটার এ্যাকসিডেন্ট করেছে, চল দেখি।'

বলে গ্রেগরিংকো উঠে দাঁড়াল।

তার সাথে অপর দু'জনও।

বাড়ির কাছাকাছি হয়েই ইভানোভা গাড়িরর ইমার্জেন্সী সাইরেনের সুইচ অন করে দিয়েছিল।

গাড়ি নিয়ে আহমদ মুসা ক্লিনিকের বারান্দায় দাঁড়াল।

গ্রামীণ পরিবেশে টিলার উপরে নির্মিত বাড়িটি মুগ্ধ করল আহমদ মুসাকে।

বাড়ির ক্লিনিক অংশটি বাড়ির এক প্রান্তে। বাড়ির সম্মুখস্থ মূল চত্বর অতিক্রম করেই ওখানে যেতে হয়।

গাড়ি দাঁড়াবার সাথে সাথেই অপেক্ষমান দু'জন এ্যাটেনড্যান্ট ছুটে এলে।

ইভানোভা হেঁটেই ক্লিনিকে প্রবেশ করল। পিটার পাওয়েলকে নেয়া হলো স্ট্রেচারে।

কিন্তু সার্বক্ষনিক ডাক্তার তখন ক্লিনিকে হাজির নেই। জরুরী কল পেয়ে কোথাও গেছেন। বিকল্প এখনও এসে পৌঁছেনি।

অপেক্ষা করার সময় ছিল না।

আহমদ মুসাই পিটার পাওয়েল এবং ইভানোভার প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করল। রক্ত পড়া বন্ধ হলো পাওয়েলের। দু'টি দাঁত ভাঙা ও চোখের নিচটায় বড় একটা ক্ষতের সৃষ্টি হওয়া ছাড়া বড় কোন ক্ষতি তার হয়নি। ইভানোভার কপালের একপাশ থেতলে ও কেটে গেছে। আরও কয়েক জায়গায় ছোট খাট আঘাত পেয়েছে ইভানোভা।

ব্যান্ডেজ নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ইভানোভা বলল, 'আপনি কি ডাক্তার?'

'না।'

'ও তাহলে কোথাও কাজ করেছেন বুঝি?'

'না তাও নয়।'

বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠল ইভানোভার চোখে মুখে। ভাবল, ফার্স্ট এইড-এর কাজ অনেকেই জানে, কিন্তু এমন নিখুঁত হাতের কাজ প্রোফেশনাল ছাড়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

কিছু বলতে যাচ্ছিল ইভানোভা। একজন এ্যাটেনডেন্ট ছুটে এসে বলল, 'মিঃ গ্রেগরিংকো আসছেন।'

তার কথা শেষ না হতেই দরজা ঠেলে প্রবেশ করল উল্লেখিত গ্রেগরিংকোরা।

আহমদ মুসা, ইভানোভা ও সাথের অন্যান্যরা তখন ইমার্জেন্সী হল রুমে।

আহমদ মুসা গ্রেগরিংকোদের দিকে তাকিয়েই ভূত দেখার মত চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়িয়ে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে সকলের পেছনে এসে মুহূর্ত কয়েক দাঁড়াল। তারপর হাঁটা দিল বিপরীত দিকের দরজার দিকে।

গ্রেগরিংকা, উস্তিনভ ও মায়োভস্কি এক সংগে প্রবেশ করেছে হল ঘরে।

ইভানোভা তাদের স্বাগত জানিয়ে ঘটনার বিবরণ দিল। তারপর আহমদ মুসাকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্যে পেছন দিকে চাইল। পেছনে তাকে দেখতে না পেয়ে বিস্মিত হলো ইভানোভা। ইভানোভা মনে করেছিল, অপরিচিত বলেই বোধহয় সামনে থেকে সরে দাঁড়াচ্ছে। এখন পেছনে আহমদ মুসাকে না দেখে বলা যায় চমকেই উঠল ইভানোভা। গ্রেট বিয়ারের কর্মী হিসেবে এর মধ্যে প্রবল একটা অস্বাভাবিকতা আঁচ করল। কিন্তু ব্যাপারটা গ্রেগরিংকোদের কাছে প্রকাশ করতে চাইল না।

তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বলল,'সম্ভবত উনি টয়লেটে গেছেন পরিষ্কার হবার জন্যে। অনেক পরিশ্রম হয়েছে ওর। চলুন পাওয়েলকে দেখবেন।'

বলে গ্রেগরিংকোদের নিয়ে ইভানোভা পাওয়েলের কক্ষের দিকে হাঁটা শুরু করল।

'ভদ্রলোকের নাম কি? কোথায় থাকেন?' বলল উস্তিনভ।

ইভানোভা ঘুরে দাঁড়িয়ে সলজ্জ হেসে বলল,'স্যরি, তাড়াহুড়োর মধ্যে কোনটাই জানার সুযোগ হয়নি।'

এই সময় ডাক্তারও এসে পৌঁছল।

ডাক্তারসহ সবাই পিটার পাওয়েলের কক্ষে প্রবেশ করল।

পিটার পাওয়েলকে দেখে ওরা চলে গেল। গাড়িতে ওদের বিদায় দিয়ে ইভানোভা ফিরে এল পাওয়েলের কক্ষে। দেখল, পাওয়েলকে নিয়ে ডাক্তার এবং নার্সরা অপারেশন থিয়েটারে প্রবেশ করেছে।

ইভানোভা আবার চারদিকে চাইল। আশেপাশে খোঁজ করল। কিন্তু আহমদ মুসাকে কোথাও পেল না।

ইভানোভার মনে প্রশ্নের অন্ত নেই। লোকটিকে যতটুকু সে বুঝেছে, তাতে এরকম কান্ড ঘটাবার লোক সে নয়। অত্যন্ত সপ্রতিভ, সতেচন, বুদ্ধিমান, স্পষ্ট, ঋজু ও সংবেদনশীল প্রকৃতির লোক সে। কিন্তু ওভাবে সে সরে পড়ল কেন? এখন ইভানোভার স্পষ্ট মনে হচ্ছে, গ্রেগরিংকোদের দেখার পরেই সে পেছনে সরে যায়। তাহলে কি সে গ্রেগরিংকোদের চেনা? কিন্তু চেনা হলেই সরবে কেন! চমকে উঠল ইভানোভা। তাহলে কি লোকটির পরিচয় এমন যে গ্রেগরিংকোদের সামনে পড়লে তার অসুবিধা হতো! কি সেই অসুবিধা যে তাকে অসৌজন্যমূলকভাবে পালাতে হলো? বড় ধরনের কোন ব্যাপার না হলে এমনটা ঘটতে পারে না।

এসব চিন্তা ভয়ানক উৎসুক করে তুলল ইভানোভাকে আহমদ মুসার ব্যাপারে।

ইভানোভা ছুটল আহমদ মুসার গাড়ি যেখানে পার্ক করা ছিল সেখানে। না, গাড়ি ঠিকই আছে। তাহলে নিশ্চয় সে চলে যায়নি। কিন্তু কোথায় সে?

ইভানোভা ছুটল গেটে। জিজ্ঞেস করল গেটম্যানকে চেহারা ও পোশাক আশাকের বিবরণ দিয়ে।

গেটম্যান তার কম্প্যুটারে গেটের টিভি ক্যামেরার কয়েক ঘন্টার ছবি সামনে নিয়ে এসে দেখাল। না, লোকটি গেট দিয়ে বের হয়নি, স্বগত উচ্চারণ করল ইভানোভা।

গেট ছাড়া অন্যদিক দিয়ে বের হওয়া কঠিন। বাড়ির চারদিকের প্রাচীর বরাবর টিভি ক্যামেরার পাহারা রয়েছে। রয়েছে ঝটিকা পাহারাদারদের ক্যাম্প। যারা সন্দেহজনক কাউকে দেখলে পর মুহূর্তেই তাকে পাকড়াও করবে।

সুতরাং লোকটি ভেতরেই আছে, এই সিদ্ধান্তে স্থির হলো ইভানোভা।

ইভানোভা দ্রুত ফিরে এল। গিয়ে প্রবেশ করল পিতার কনট্রোল রুমে।

বিশাল বাড়িটার ঠিক মাঝ বরাবর স্বতন্ত্র একটা ব্লক নিয়ে তাদের বাড়ি। বাড়ির অবশিষ্ট অংশ গ্রেট বিয়ারের গোপন ঘাটি হিসেবে ব্যবহার হয়। তবে ইভানোভাদের ব্লকের সাথে গোটা বাড়ির সংযোগ রয়েছে গোপন সুড়ঙ্গ পথের মাধ্যমে। আবার গোটা বাড়ির উপর নজর রাখার জন্যে টিভি ক্যামেরার একটা স্বতন্ত্র নেটওয়ার্ক-এর নিয়ন্ত্রণ হয় ইভানোভার আব্বার কনট্রোল রুম থেকে। ঘাটি

এলাকার জন্যে ঘাটির একটা নিজস্ব নেটওয়ার্ক আছে যা গ্রেট বিয়ার নিয়ন্ত্রণ করে তাদের ঘাটির নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে।

ইভানোভা টিভি প্যানেলের সামনে বসে কনট্রোল সুইচ এক এক করে টিপে চলল। একটি সুইচ টেপার সাথে সাথেই একটি কক্ষ বা করিডোরের চিত্র ভেসে উঠেছে।

এক সময় একটা সুইচ টিপতেই একটা ঘরের বন্ধ দরজায় আহমদ মুসাকে দাঁড়ানো দেখলো ইভানোভা।

চমকে উঠে ইভানোভা ঝুকে পড়ল টিভির উপর। সে দেখল, ল্যাসার বিম দিয়ে দরজার লক গলিয়ে আহমদ মুসা ঘরে প্রবেশ করল। ঘরের চারদিকটা দ্রুত দেখল সে। তারপর সে ঘর থেকে বেরিয়ে একইভাবে পাশের ঘরে প্রবেশ করল। ঐভাবেই সারা ঘরে সে নজর বুলিয়ে চলল।

শিউরে উঠল ইভানোভা। ভাবল সে, লোকটা নিশ্চয় শত্রু পক্ষের সাংঘাতিক কেউ হবে। কিছু খুঁজছে সে? কি খুঁজছে? তাঁর টার্গেট কি গ্রেট বিয়ারের এ ঘাটির কনট্রোল রুম?

ইভানোভার গোটা শরীর শক্ত হয়ে উঠল উৎকণ্ঠায়। সে টিভি স্ক্রিনে চোখ রেখে টেলিফোন তুলে নিল হাতে। পেল ডিউটি অফিসারকে। বলল,'মিঃ গ্রেগরিংকোকে এখনি জানান, আপনাদের ঘাটিতে সন্দেহজনক কেউ ঢুকেছে।'

কথা বলা অবস্থায়ও ইভানোভা সুইচ টিপে আহমদ মুসাকে অনুসরণ করছিল।

টেলিফোন করার পর ইভানোভার মনে কোথাও যেন একটা খোঁচা লাগল। যেই হোক লোকটা তার উপকার করেছে। ইভানোভা ও পিটার তার কাছে অনেক ঋণী। তাছাড়া অপরাধ প্রবণ মানুষকে সে চেনে। লোকটিকে দেখে চোখ, মুখ, কথা, আচরণ, হাসি-কোনদিক দিয়েই অপরাধী বলে মনে হয়নি।

মনটা অস্বস্তিতে ভরে গেল ইভানোভার। গ্রেগরিংকোদের হাতে পড়লে লোকটা নির্ঘাত মারা পড়বে।

কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হলো, এমন শত্রুপুরিতে যে একা ঢুকতে পারে, অত্যাধুনিক লেসার বীম যার অস্ত্র সে সাধারণ শত্রু নয়। এমন শত্রুর শাস্তি হতেই হবে।

টিভি স্ক্রীনে ইভানোভার চোখ ফলো করছিল আহমদ মুসাকে। হঠাৎ এক সময় দেখল, আহমদ মুসা একটা কক্ষ সার্চ শেষে দরজা বন্ধ করে প্রার্থনায় দাঁড়িয়ে গেল দক্ষিণ-পূর্বমুখী হয়ে।

ইভানোভা দেখেই বুঝতে পারল, ওটা মুসলমানদের নামায।

আহমদ মুসার এই মুসলিম পরিচয় পাওয়ার সাথে সাথেই ইভানোভার মনে হঠাৎ করেই একটা বিস্ময়-বিমূঢ়তা নেমে এল। লোকটি তাহলে মুসলমান।

এই পরিচয় পাওয়ার সংগে সংগে ইভানোভার হৃদয়ের একটা বন্ধ দুয়ার যেন খুলে গেল। স্মৃতির দিগন্তে কিছু স্মৃতি ভীড় করে উঠল।

কিছুটা আনমনা হয়ে পড়েছিল ইভানোভা।

পরক্ষণেই সতর্ক হয়ে উঠল। কিন্তু দেখল, সে ঘরটিতে আহমদ মুসা নেই।

পরে পেয়ে গেল তাকে করিডোরে।

আহমদ মুসা একের পর এক ঘর সার্চ করে চলল, আর ইভানোভার চোখ তাকে অনুসরণ করল। ইভানোভা উদ্বেগের সাথে সাথে লক্ষ্য করলো, আহমদ মুসা ঘাটির কেন্দ্রীয়  কনট্রোল রুমের কাছে এসে পড়েছে। সে কি এই কনট্রোল রুমেরই খোঁজ করছে? কে এই লোকটি? বিপজ্জনক লোক তো?

ইভানোভার মোবাইল টেলিফোন বেজে উঠল।

ইভানোভা তুলে নিল টেলিফোন।

গ্রেগরিংকোর টেলিফোন। বলল, ‘ধন্যবাদ মা, আমরা এসেছি। লোকটাকে আমরা লোকেট করেছি। সে আমাদের কনট্রোল রুমে ঢোকার চেষ্টা করছে। সব দিক থেকে আমরা ভেতরে প্রবেশ করছি।’

একটু থেমে গ্রেগরিংকো আবার শুরু করল,‘তুমি খবর দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ। তুমি কেমন করে বুঝতে পেরেছিলে যে, কেউ প্রবেশ করেছে?’

'আমাদের যে লোকটি পৌঁছে দিয়েছিল, তাকে যখন কোথাও খুঁজে পেলাম না, যখন দেখলাম তার গাড়িও আছে এবং গেটে জানলাম যে, সে গেট দিয়ে বেরিয়ে যায়নি, তখন হঠাৎ করেই আমার মনে হলো, সে আমাদের ঘাটিতে প্রবেশ করতে পারে।'

ইভানোভা ইচ্ছা করেই সত্য গোপন করল। সত্য গোপনের আরেকটা কারণ, ঘাটি পর্যবেক্ষণ করার আলাদা টিভি ক্যামেরার নেটওয়ার্ক যে তার আব্বার আছে এটা গোপন বিষয়।

'তোমাকে আবার ধন্যবাদ। তোমার অনুমান সত্য প্রমাণিত হয়েছে। লোকটা বিপজ্জনক।' বলল গ্রেগরিংকো ইভানোভা থামার সাথে সাথেই।

'চেনেন তাকে?'

'আমি চিনি না, কিন্তু উস্তিনভ ও মায়োভস্কি ওকে দেখেছে। এই লোকটিই সেদিন আমাদের ডজন খানেক লোক হত্যা করে আমাদের প্যারিসের ঘাটি থেকে পালায়।'

শুনে বিস্ময়-বিস্ফারিত হয়ে উঠল ইভানোভার চোখ।

কিছু বলতে যাচ্ছিল ইভানোভা। কিন্তু ওপার থেকে গ্রেগরিংকো বলে উঠল,'এখন রাখি মা। ওরা এগুচ্ছে, আমিও উঠি।'

টেলিফোন রেখে দিয়ে ইভানোভা টিভি স্ক্রীনের উপর ঝুঁকে পড়ে খুঁটে খুঁটে দেখল আহমদ মুসাকে। না, নিষ্পাপ একটি মুখ। চোখে-মুখে একটা উৎকণ্ঠা। কিন্তু সে উৎকণ্ঠায় কোন অপরাধের ছবি নেই। তার উৎকণ্ঠা বলছে, কোন হারানো জিনিস যেন সে খুঁজে পাচ্ছে না।

অন্য একটা টিভি স্ক্রীনের নব ঘুরিয়ে ইভানোভা দেখল, গ্রেগরিংকোর দল চারদিক থেকে ছুটে আসছে আহমদ মুসার দিকে।

হঠাৎ একটা উদ্বেগে ছেয়ে গেল ইভানোভার মন। প্রায় দেড় ডজন স্টেনগান ঘিরে ফেলেছে লোকটিকে। লোকটিকে হয় মরতে হবে, নয়তো আত্মসমর্পণ করতে হবে। কিন্তু তার সম্পর্কে যেটুকু জানল তাতে মনে হয়, সে আত্মসমর্পণ করার বদলে শেষ পর্যন্ত লড়াই করবে। কারণ সে জানে, গ্রেট

বিয়ারের ডজনখানেক লোক হত্যার শাস্তি তার কি হতে পারে। সুতরাং আত্মসমর্পণের তার প্রশ্নই ওঠে না।

তাহলে সে মরবে?

কথাটা মনে হতেই হৃদয়ের কোথায় যেন যন্ত্রণা অনুভব করল। লোকটি তার এবং পিটারের উপকার বলেছে বলে নয়, কোন মুসলমানকে দেখলে এক ধরনের আবেগ অনুভব করে সে। এই আবেগ থেকেই এই যন্ত্রণা। মুসলিম লোকটি এমন বেঘোরে প্রাণ হারাবে তা তার হৃদয় মেনে নিতে পারছে না। অন্যদিকে আহমদ মুসাকে ক্রিমিনাল বলেও মনে করতে পারছে না।

প্রবল দ্বিধার মধ্যে পড়েছিল ইভানোভা।

এর মধ্যেই সে দেখল, গ্রেগরিংকোরা ঘিরে ফেলেছে আহমদ মুসাকে। গ্রেগরিংকোর হাতে হ্যান্ড মাইক। সে মাইক মুখের সামনে তুলে ধরল। ইভানোভা বুঝল, কিছু বলছে সে আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে।

সংগে সংগেই সে দেখল, ভূ-গভর্স্থ কনট্রোল রুমে নামার সিঁড়ি মুখের দরজায় দাঁড়ানো আহমদ মুসা সোল্ডার গোলস্টার থেকে ভয়ানক এম-১০ মেশিন রিভলবার হাতে তুলে নিয়েছে। তার মনে হলো, মুহূর্তে আহমদ মুসার দেহ যেন ইস্পাতের মত শক্ত হয়ে গেল। যুদ্ধের জন্যে সে প্রস্তুত।

এ যুদ্ধের ফল কি হবে তা বুঝতে বাকি রইল না ইভানোভার। তার মনে তখন ঝড় বইছে।

এক সময় তার দেহটাও শক্ত হয়ে উঠল একটা সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ায়। সে সিদ্ধান্ত নিল, আহমদ মুসার পরিচয় না জেনে সে তাকে মরতে দিবে না।

সিদ্ধান্ত নেবার পর ইভানোভা দ্রুত ভূ-গভর্স্থ সিঁড়ি মুখের দরজায় আহমদ মুসার লোকেশন আবার দেখে নিয়ে ছুটল পাশের দেয়ালে।

দেয়ালের একটা স্থানে চাপ দিতেই দেয়াল রংয়ের একটা ইস্পাতের প্লেট সরে গেল। বেরিয়ে পড়ল একটা সুইচ বোর্ড। বোর্ডে পাশাপাশি দু'টি সুইচ।

দু'টি সুইচের একটি ঘাটির বিদ্যুত ট্রান্সমিটার, আরেকটা জেনারেটরের সাথে যুক্ত। সুইচ দু'টি ডেটনেটরের কাজ করে। অন করলেই জেনারেটর ও

ট্রান্সমিটারের বিশেস টিউবে রক্ষিত বিস্ফোরককে বিস্ফোরণ ঘটায়। তার ফলে অন্ধকারে ঢেকে যাবে ঘাটি।

ইভানোভা সুইচ দু'টি অন করে দিয়ে ছুটল টর্চ হাতে ভূ-গর্ভস্থ টানেলে নামার গোপন সিঁড়ি মুখের দিকে। ভূ-গর্ভস্থ এই টানেলটি গিয়ে উঠেছে ঘাটির কনট্রোল রুমে।

ট্যানেল দিয়ে দ্রুত এগিয়ে ইভানোভা গিয়ে উঠল সেই কনট্রোল কক্ষে। এই কনট্রোল রুম থেকেই কিছুক্ষণ আগে গ্রেগরিংকো, উস্তিনভ এবং মায়োভস্কিদের কথা বলতে দেখা গেছে।

ইভানোভার এক হাতে টর্চ, অন্য হাতে রিভলবার।

কনট্রোল রুমে ঢুকে প্রথমেই ইভানোভা ডেটোনেটিং সুইচ দু'টি অন করে দিল গ্লাভস পরা হাত দিয়ে, যাতে বুঝা না যায় এই সুইচ অন করেই ট্রান্সফর্মার ও জেনারেটরে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল।

তারপর ইভানোভা এগুলো বাইরে বেরুবার সিঁড়ি মুখের দরজার দিকে। এই দরজার ওপারেই আহমদ মুসা দাঁড়িয়ে। দরজাটি বাইরে থেকে বন্ধ। কিন্তু ভেতরের নব ঘুরালেই দরজা খুলে যাবে।

নব ঘুরাতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল ইভানোভা। টর্চ জ্বালিয়ে দরজা খোলা যাবে না। টর্চের আলো দরজায় দাঁড়ানো আহমদ মুসা এবং গ্রেগরিংকোদের লোক দু'পক্ষেরই টার্গেট হতে পারে। দ্বিতীয়ত, ভাবল, আহমদ মুসার নাম সে জানে না, কিভাবে ডাকবে? নিজের পরিচয় দিয়ে ডাকাও সে নিরাপদ মনে করলো না, গ্রেগরিংকোর লোকেরা কত কাছে এসেছে কে জানে। তৃতীয়ত, আহমদ মুসা দরজার সামনেই আছে কিনা। এই তৃতীয় বিষয়ে ইভানোভা নিশ্চিত যে, আহমদ মুসা দরজা ছেড়ে যায়ন্ িকারণ সে বাবছে আলো নিভিয়ে দেয়া শত্রু পক্ষের কাজ। নিশ্চয় অন্ধকারের মধ্যে তাকে ঘেরাও করে এগিয়ে এসে বন্দী করাই শত্রু পক্ষের লক্ষ্য। আর জায়গাটা আহমদ মুসার জন্যে অপরিচিত। তাই সে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে শত্রুর অপেক্ষা করাকেই যুক্তিযুক্ত মনে করবে।

শত্রুর জন্যে অপেক্ষমান আহমদ মুসার এম-১০ এর টার্গেট ইভানোভাকে না হতে হয়, এ ভয় ইভানোভা করল।

কিন্তু নষ্ট করার মত সময় হাতে নেই ইভানোভার। গ্রেগরিংকোর লোকেরা নিশ্চয় এগিয়ে আসছে। তারা বিকল্প আলোরও ব্যবস্থা করতে পারে। তার আগেই আহমদ মুসাকে সরিয়ে নিতে হবে।

ইভানোভা ঠিক করল, নব ঘুরিয়ে দরজা একটু ফাঁক করেই সে ফিস ফিস কণ্ঠে নিজের নাম জানিয়ে বলবে সে সাহায্য করতে এসেছে।

এর পরেও দ্বিধা থাকল ইভানোভার মনে। কাকে সাহায্য করতে এসেছে না বললে সে কি বিশ্বাস করবে!

কিন্তু বিকল্প নেই।

ইভানোভা খুব সন্তর্পণে নব ঘুরাল। মৃদু ধাতব এক শব্দ তুলে দরজা আনলক হয়ে গেল। দরজাও নড়ে উঠেছিল সেই সাথে।

ইভানোভা ধীরে ধীরে দরজা টানতে যাচ্ছিল। এই সময় দরজার আকস্মিক তীব্র ধাক্কায় ইভানোভা ছিটকে পড়ে গেল এবং সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল সিঁড়ির গোড়ায় কনট্রোল রুমের মেঝেতে।

পড়ে গিয়েও ইভানোভা তার হাতের টর্চ ছাড়েনি। পড়ে গিয়ে মাথার এক পাশের খানিকটা জায়গা থেতলে গেছে। কপালের কাটাটায় আবার আঘাত লেগেছে।

কিন্তু আঘাতের কথা ভুলে গেল ইভানোভা। ব্রাশ ফায়ার ছুটে আসার আগে তাকে কিছু করতে হবে। মাথায় বুদ্ধি এসে গেল।

ইভানোভা তাড়াতাড়ি টর্চ জ্বেলে নিজের মুখে ধরল। উদ্দেশ্য, আহমদ মুসাকে তার পরিচয় দেয়া এবং এ ধারণা দেয়া যে, সে শত্রু নয়।

না, ব্রাশ ফায়ার এলো না। তার বদলে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ এবং একটি ফিসফিসে কণ্ঠ কানে এল, 'জাহরা ইভানোভা আপনি?'

জাহরা ইভানোভা উঠে বসল এবং বলল, 'সিঁড়ি মুখের দরজা বন্ধ করে দিয়ে আসুন নিঃশব্দে।'

আহদ মুসা একবার পিছন দিকে তাকিয়ে দ্রুত উপরে উঠে সিঁড়ি মুখের দরজা বন্ধ করে দিয়ে নিচে নেমে এল।

ইভানোভা উঠে দাঁড়িয়েছিল।

আহমদ মুসা এসে তার সামনে দাঁড়াতেই টর্চের আলো আহমদ মুসার মুখে একবার ফেলে আহমদ মুসার একটা হাত ধরে চলতে শুরু করে বলল,'আমার সাথে আসুন।'

'কিন্তু জাহরা ইভানোভা, আপনি এখানে কিভাবে? কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'সব দেখবেন। এখন আসুন। ওরা আলোর বিকল্প ব্যবস্থা করতে পারে এবং ওরা এই ঘরে নিশ্চয় আসবে।'

বলে টর্চ জ্বেলে কক্ষের ফাঁক হয়ে থাকা দেয়ালের সুড়ঙ্গ পথের দিকে ছুটল ইভানোভা। আহমদ মুসাও।

দেয়াল পেরিয়ে ওপারে পৌঁছে ইভানোভা পেছন ফিরে টর্চ জ্বেলে সুড়ঙ্গের ছাদের বিশেষ একটা স্থানে চাপ দিল। সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালের সুড়ঙ্গ পথ বন্ধ হয়ে গেল।

এ সুড়ঙ্গ পথ শুধু এপার থেকেই খোলা যায়।

এবার ইভানোভা স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে শুরু করল।

আহমদ মুসা চলল তার পেছনে পেছনে।

সুড়ঙ্গ পথ শেস করে ইভানোভা প্রবেশ করল তার পিতার কনট্রোল কক্ষে।

আহমদ মুসাও।

ইভানোভা ফিরে দাঁড়িয়েছিল সুইচ টিপে সুড়ঙ্গ পথের মুখ বন্ধ করার জন্যে।

আলো প্লাবিত কক্ষে ইভানোভার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল আহমদ মুসা। দেখল, ইভানোভার কপাল ও মুখ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। আগের কেটে যাওয়া জায়গা থেকে আবার রক্ত ঝরছে। দেখল, মাথার বাম পাশের এক জায়গাও থেতলে গেছে। রক্তে চুল ভিজে উঠেছে। বলল আহমদ মুসা,'ইস আপনি মারাত্মকভাবে আহত, কিছু বলেননি তো? আর কোথাও লেগেছে?'

দেয়ালের একটা কক্ষের সুইচ অফ করে দিচ্ছিল ইভানোভা।

সুইচ অফ করার সঙ্গে সঙ্গে ফাঁক হয়ে থাকা দেয়ালটা বুজে গেল। বন্ধ হয়ে গেল সুড়ঙ্গের মুখ।

ইভানোভা ঘুরে দাঁড়িয়ে হেসে বলল,'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আপনার ব্রাশ ফায়ার থেকে বেঁচে গেছি।'

একটা বেদনার ছায়া নামল আহমদ মুসার মুখে। বলল,'ঠিকই বলেছেন, সে সময় টর্চের আলোতে যদি আপনার মুখ না দেখতে পেতাম, তাহলে ব্রাশ ফায়ার হতো। ট্রিগার চাপতে যাচ্ছিলাম।'

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা ব্যস্ত হয়ে উঠে বলল,'চলুন ক্লিনিকে, আগের চেয়ে এ আঘাত আপনার অনেক মারাত্মক।'

ইভানোভা ঠোঁটে আঙুল ছেকিয়ে বলল, 'ক্লিনিকের নাম বলবেন না। ওখানে গেরে ধরা পড়ে যাবো। আপনি তো ওদিকে যেতেই পারবেন না।'

'তাহলে...।' আহমদ মুসার কণ্ঠে উদ্বেগ।

'আমাদের ফাস্ট এইড বক্সে যা আছে তাতেই চলবে।' বলে ইভানোভা ফাস্ট এইড বক্স বের করে এনে বলল, 'নার্সকে ডাকব?'

'যে কারনে আপনি ক্লিনিকে যাচ্ছেন না, সে কারণে কি এ ক্ষেত্রেও নেই। আর মনে হয়, ড্রেসিং আমি খারাপ করি না।'

'ধন্যবাদ। আহত স্থান দু'টো শুধু আপনি ড্রেসিং করুন। বাকি কাজ আমি করব।'

বলে ইজি চেয়ারে বসল ইভানোভা।

আহমদ মুসা ড্রেসিং শেষ করে হাত-মুখ ধুয়ে ফিরে এসে দেখল ইভানোভা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তুলা ভিজিয়ে মুখ-গলা পরিষ্কার করছে।

আহমদ মুসা দাঁড়িয়ে ছিল।

ইভানোভা কাজ শেষ করে আহমদ মুসার মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো। গম্ভরি কণ্ঠে বলল,'আপনি কে?'

আহমদ মুসাও গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল,'তার আগে বলুন গ্রেট বিয়ারের সাথে আপনার সম্পর্ক কি?'

ম্লান হাসল ইভানোভা। বলল,'আমি গ্রেট বিয়ারের একজন কর্মী।'

ভ্রু-কুঞ্চিত করলো আহমদ মুসা। একটু সময় নিয়ে বলল,'আমাকে বাঁচিয়ে ঋণ শোধ করলেন বুঝি। কিন্তু আমি তো আপনাকে বাঁচাইনি, বাড়ি পৌঁছে দেয়ার সামান্য কাজ করেছি মাত্র।'

'আমি আপনার কাছে ঋণী বলে কি আপনি মনে করেন?'

'পেছন থেকে গুলী করার বদলে মুক্তির দ্বার কেন উন্মুক্ত করে দিলেন, এ থেকেই কথাটা এসে যায়।'

'আপনার প্রশ্নের উত্তর পরে দেব, আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।'

'আমি প্রিন্সেস তাতিয়ানার বন্ধু। আমি এসেছি প্রিন্সেস ক্যাথারিনকে উদ্ধার করতে।'

অপার বিস্ময় নিযে আহমদ মুসার দিকে চেয়ে রইল ইভানোভা কিছুক্ষণ। তারপর বলল,'আপনি কে?'

সংগে সংগেই আহমদ মুসা উত্তর দিল না। দ্বিধার মধ্যে পড়ল।

'অসুবিধা থাকলে দরকার নেই। আমি প্রশ্নটা প্রত্যাহার করছি।' ম্লান হেসে বলল ইভানোভা।

হাসল আহমদ মুসা। বলল,'অবিশ্বাসের অসুবিধা না থাকলে আর কোন ভয় থাকে না।'

বলে একটু থামল আহমদ মুসা। গম্ভীর হয়ে উঠল তার মুখমন্ডল। বলল,'আমার নাম আহমদ মুসা।'

আহমদ মুসা নাম শোনার সাথে সাথে শক খাওয়ার মত চমকে উঠেছিল ইভানোভা। কিন্তু সামলে নিয়েছিল নিজেকে পরক্ষণেই। তার চোখ দু'টি কিন্তু আঠার মত আটকে আছে আহমদ মুসার মুখে।

ইভানোভার ঠোঁটে একটা শক্ত হাসি ফুটে ইঠল। বলল,'তাহলে আমি কম্যুনিস্ট আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থা ওয়ার্ল্ড রেড ফোর্সেস (WRF) এবং মধ্য এশিয়ার গ্রেট বিয়ার-এর ধ্বংসকারী এবং WRF নেতা জেনারেল বোরিস এবং গ্রেট বিয়ার নেতা ও তাতিয়ানার আব্বা............. হত্যাকারীর সামনে দাঁড়িয়ে আছি?'

‘আমার দুর্ভাগ্য যে, এই অপ্রীতিকর কাজগুলো আমাকে করতে হয়েছে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আমার এখন কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না যে, তাতিয়ানা আপনার বন্ধু এবং ক্যাথারিনকে মুক্ত করতে চান।’

‘আপনাকে বিশ্বাস করবার জন্যে এখন যা বলতে হয়, তা বলার সময় আমার নেই। সুতরাং বিশ্বাস করতে আমি আপনাকে বলব না।’

‘সময় নেই মানে আপনি কি চলে যেতে চান? আপনার পরিচয় পাওয়ার পর আমি আপনাকে ছেড়ে দিতে পারি?’ বলর ইভানোভা মুখ গম্ভীর করে।

‘আহমদ মুসাকে আপনি আটকাতে পারবেন না, এটা আপনিও জানেন।’

‘আমার বিস্ময় এখনও যায়নি। আমার ধারণা ছিল আহমদ মুসা হবে ছয় সাড়ে ছয় ফুট লম্বা আর হবে তার হারকিউলিসের মত শরীর। আপনার মত ভদ্র সন্তান বলে তাকে আমি ভাবিনি।’

‘আমাকে আহমদ মুসা না ভাবলেই তো আমার মুক্তি ত্বরান্বিত হতে পারে।’

‘অবশ্যই না। বিশ্বাস না হলেও সন্দেহ করে ধরে রাখা যায়।’

কথা শেষ করে দুই পকেট থেকে দু’টি মিনি রিভলবার বের করে সোফার উপর রাখতে রাখতে বলল,‘দেখুন এ দু’টি রিভলবারের একটির ক্লোরোফরম স্মোক স্প্রে করে সেকেন্ডের মধ্যে আপনাকে ঘুমিয়ে দিতে পারি। তারপর গিয়ে পড়বেন গ্রেট বিয়ারের হাতে।’

‘না, তা পারবেন না। ক্লোরোফরম স্মোক স্প্রে করার পর সংজ্ঞা হারিয়ে ঢলে পড়ব ঠিকই, কিন্তু আপনাকে বিমূঢ় করে দিয়ে পরক্ষণেই আমি উঠে দাঁড়াব এবং আমি পালিয়েও যাব।’

‘কিভাবে এটা সম্ভব হবে?’ বলল ইভানোভা।

‘ক্লোরোফরম বোমার কার্যকারিতা দুই মিনিট। এই দুই মিনিট আমি সংজ্ঞাহীনের ভান করে দম বন্ধ করে পড়ে থাকব। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে আপনার অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে আপনাকে রিভলবারের টার্গেটে রেখে নিরাপদে সরে যাব।’

ইভানোভা মুগ্ধ চোখে কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই ইভানোভার মোবাইল টেলিফোন বেজে উঠল।

টেলিফোন তুলে নিল ইভানোভা। কথা বলল। বলতে গিয়ে তার চোখে-মুখে ম্লান ছায়া নেমে এল।

টেলিফোন রেখে দিয়ে সে সোফায় হেলান দিয়ে বসল। বলল,'গ্রেগরিংকোর টেলিফোন। বলছে, 'শত্রুকে ঘাটির কোথাও পাওয়া যায়নি। দুর্বোধ্য কারণে একই সাথে বিদ্যুত ট্রান্সমিটার ও জেনারেটর নষ্ট হওয়ায় অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে সে পালিয়েছে। তবে আমাদের বাড়ির বাইরে যেতে পারেনি। মনে হয় কোন দিক দিয়ে সে আপনাদের বাড়িতে গিয়ে লুকাতে পারে। আমরা খোঁজ করে দেখতে চাই।'

ইভানোভা কথা শেষ করতেই আবার তার টেলিফোন বেজে উঠল।

টেলিফোনে কথা বলতে বলতে চঞ্চল হয়ে উঠল ইভানোভা।

টেলিফোন রেখে দিয়েই সে বলল,'আব্বা এসেছেন। শিঘ্রী উঠুন, পালাতে হবে আপনাকে।'

বলে ইভানোভা উঠে দাঁড়ালো। বলল,'বাইরে আব্বা গ্রেগরিংকোদের সাথে কথা বলছেন। এখনি ওরা এসে পড়বেন।'

কথা বলতে বলতেই দ্রুত হাঁটা শুরু করেছে ইভানোভা।

কনট্রোল রুমের দরজার পাশে গিয়ে সুইচ বোর্ডের উপরের দেয়ালের এক জায়গায় বাম হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে চাপ দিল।

সংগে সংগে পাশের দেয়াল সরে গেল এবং বেরিয়ে পড়ল নিচে নামার সিঁড়ি।

আহমদ মুসাকে দ্রুত আসার ইশারা করে সিঁড়ি দিয়ে প্রায় দৌড়েই নামতে শুরু করল ইভানোভা।

আহমদ মুসা বুঝল, ইভানোভা সত্যিই উদ্বেগ বোধ করছে। আহমদ মুসাকে সরিয়ে দিতে পারলে সে বেঁচে যায়।

আহমদ মুসা ছুটে চলল ইভানোভার পেছনে।

আন্ডার গ্রাউন্ড ফ্লোর পেরিয়ে ইভানোভা প্রবেশ করল একটা সুড়ঙ্গে।

‘এই সুড়ঙ্গ নিয়ে যাবে টিলার একদম গোড়ায় ডাম্প হাউজের সাথে যুক্ত একটা ছোট কক্ষে। ঘরটির বন্দ দরজা নব ঘুরালেই খুলে যাবে। ঐ পর্যন্ত পাহারা নেই। সুতরাং.....।’

কথা শেষ করার প্রয়োজন বোধ করল না ইভানোভা। দ্রুত হাঁটছিল সে।

এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল ইভানোভা।

পেছনে একবার তাকিয়ে বলল,‘এসে গেছি। সামনের স্টিলের দরজাটা পেরুলেই ডাম্প হাউজের সেই ঘর।’

বলে ইভানোভা স্টিরের দরজার গায়ে মিশে থাকা ক্ষুদ্র একটা বোতামে চাপ দিতেই দরজাটা খুলে গেল।

ইভানোভা দরজার এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে বলল,‘যান। আই উইশ ইউ গুড লাক।’

আহমদ মুসা একটু নড়ে-চড়ে দাঁড়াল। মুখ একবার নিচু করল। দ্বিধা করল। তারপর বলল,‘শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?’

‘অবশ্যই, বলুন।’

‘প্রিন্সেস ক্যাথারিনকে গ্রেট বিয়ার কোথায় রেখেছে?’

হাসল ইভানোভা। পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে উঠল সে। বলল,‘ওটুকু পারবো না। বিশ্বাসঘাতকতার ওটুকু বাকি থাক।’ ইভানোভার কণ্ঠে বেদনার সুর।

আহমদ মুসার মুখেও লজ্জার একটা ছায়া নামল। বলল, ‘স্যরি। আমার অনুরোধ প্রত্যাহার করলাম।’

একটু থেমে আবার বলল,‘কিন্তু বিশ্বাসঘাতক তো আপনি হয়েই গেছেন।’

‘ওটুকুর জন্যে আমার কাছে জবাব আছে। যার ফলে নিজের কাছে অন্তত অপরাধী নই।’ ম্লান হাসি ফুটে উঠেছিল ইভানোভার ঠোঁটে।

‘প্রশ্নটা শুরুতেই আমি করেছিলাম। জবাব দেননি। জানতে পারি কি, পিতা ও দলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে একজন শত্রুকে বাঁচাবার কারণটা কি?’

হাসল ইভানোভা। বলল,‘বলার এখন সময় নেই। সময় কখনও এলে জানবেন।’

বলেই ইভানোভা ফেরার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল। বলল,‘আব্বা এসে পড়বে, আমি যাই।’

ইভানোভার আব্বা নিকিতা স্ট্যালিনের খাস ড্রইং রুমেই কথা হচ্ছিল দারুণভাবে উত্তেজিত চিন্তিত গ্রেগরিংকো, উস্তিনভ, মায়োভস্কির মধ্যে। তাদের বৈঠকে নিকিতা স্ট্যালিনও হাজির ছিলেন।

কথা বলছিল গ্রেগরিংকো, ‘একজন মাত্র লোক, তাও এশিয়ান, আমাদের সব কাজ ওলট-পালট করে দিল।’

‘যে কোন মূল্যে তাকে ধরতে হবে, নয়তো শেষ করে দিতে হবে।’ বলল উস্তিনভ।

‘কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, সে পালাল কিভাবে?’ বলল নিকিতা স্ট্যালিন।

‘আমার মনে হয়, সে সব রকম প্রস্তুতি নিয়েই ঘাটিতে প্রবেশ করেছিল। ট্রান্সফরমার ও জেনারেটরে বিস্ফোরণ তারই প্রমাণ। তার কাছে অবশ্যই ইনফ্রারেড গগলস ছিল। যার দ্বারা সে আমাদের বোকা বানিয়ে আমাদের সকলের পাশ দিয়েই চলে গেছে। পাহারাদারদের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে।’

‘এ রকম একটা কিছুই ঘটেছে। কিন্তু আমরা এখন কি করব। এ খবর পৌঁছার পর মহামান্য আইভানের যে কি মূর্তি হবে, কলিগরা নিশ্চয় তা অনুভব করেছেন।’

আইভানের নাম উচ্চারিত হবার সাথে সাথে সকলের চোখে-মুখে ভয় ও চিন্তার চিহ্ন ফুটে উঠল।

কারো মুখে কোন কথা নেই। নীরব সবাই।

এই মুহূর্তে এ বাড়ি এবং ঘাটি পরিত্যাগ করতে হবে, এ অনুমতিও তোমাদেরকে আইভানের কাছ থেকে নিতে হবে।

‘জি, ঠিকই বলেছেন।’ বলল গ্রেগরিংকো।

আর এক দফা সকলের মুখ মলিন হয়ে গেল। পর পর এই বিপর্যয়কে কোন যুক্তি দিয়েই যৌক্তিক প্রতিপন্ন করা যাবে না। এই একই চিন্তা সবার মনকে পীড়া দিচ্ছে।

‘আমাদের এত বড় সর্বনাশ যে করল তার কি হবে? তাকে কোথায় আমরা পাব? তাকে ধ্বংস করতে পারলে আমাদের সব ক্ষতি পূরণ হয়ে যাবে।’ বলল মায়োভস্কি চোখ লাল করে।

‘এ দায়িত্ব মায়োভস্কি তোমার। আমরা প্রিন্সেস তাতিয়ানার বিষয়টা দেখছি।’

মায়োভস্কি সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। বলল,‘সমস্যা হলো প্রিন্সেস ক্যাথারিনের বাড়ি ছাড়া তাকে লোকেট করার আর কোন জায়গার কথা আমাদের জানা নেই।’

‘লোকটির গাড়ি থেকে কোন ক্লু পাওয়া যায়নি?’ বলল নিকিতা স্ট্যালিন।

‘গাড়ির নাম্বার এবং কাগজপত্র সবই ভূয়া।’ বলল মায়োভস্কি।

কারো মুখে কোন কথা নেই। নীরবতা।

নিকিতা স্ট্যালিন উঠে দাঁড়াল। বলল,‘গুড নাইট।’

# ৩

তাড়াহুড়ো করে বেরুচ্ছিল আহমদ মুসা। দরজাতেই মুখোমুখি হলো ডোনার সাথে।

ডোনা থাকে তার পিতার সাথে তাদের রয়্যাল প্যালেসে। আহমদ মুসাকেও সেখানে থাকার অনুরোধ করেছিল ডোনার আব্বা মিঃ প্লাতিনি। কিন্তু আহমদ মুসা রাজী হয়নি। যুক্তি দিয়ে বলেছিল, আহমদ মুসাকে খুবই ব্যস্ত থাকতে হবে। তাই স্বাধীনভাবে থাকার একটা জায়গা তার দরকার। তাছাড়া সবচেয়ে গুরুত্ব যে বিষয়চির উপর দিয়েছিল, তাহলো, এবার তাকে কি ধরনের শত্রুর মুখোমুখি হতে হবে তা বলা যাচ্ছে না। ডোনাদের  বাড়িটা তাদের নজরে আনা ঠিক হবে না। এই শেষ যুক্তিটায় ডোনার আব্বা রাজী হয়ে যায় আহমদ মুসার সাথে। তবে আহমদ মুসার থাকার ব্যবস্থা ডোনার আব্বাই করে দেয় তাদের সদ্য কেনা একটা বাংলোতে।

সালাম বিনিময়ের পর আহমদ মুসা ডোনাকে রক্ষ্য করে বলল,‘কি ব্যাপার ডোনা, অকস্মাত?’ আহমদ মুসার কণ্ঠে বিস্ময়।

‘বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যাবার পথে উঠলাম। কেন আসতে নেই?’ বলল ডোনা।

ডোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের তার শেষ পরীক্ষা দেবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। সামনেই তার পরীক্ষা।

‘তুমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে টেলিফোন করেছিলে। কিন্তু বলনি তো তুমি আসবে।’

‘তখন ভাবিনি, কিন্তু আসার পথে হঠাৎ মনে হলো কি করছ একটু শুনে যাই। সেই সাথে একটা সারপ্রাইজ দেয়াও হলো।’

‘কিন্তু দেখা নাও পেতে পারতে। দু’এক মিনিট পরে এলে আর দেখা পেতে না।’

'যাক, সব সময়ই ভাগ্য আমার পক্ষে থাকে। এখন বল, তাড়াহুড়ো করে কোথায় বেরুচ্ছ?'

'রুশ দূতাবাসে।'

গম্ভীর হলো ডোনা। বলল,'আমি উদ্বিগ্ন। কে শত্রু কে মিত্র আমি বুঝতে পারছি না। তুমি তো চূড়ান্ত কথা বলে দিয়েছ এসব নিয়ে আমি যেন চিন্তা না করি। নাক না গলাই।কিন্তু তা কি পারা যায়? বল, ঘটনা কোন দিকে গড়াচ্ছে? কি তোমার প্ল্যান? না হলে কিন্তু তোমার পিছু নেব আমি।'

'দোহাই আল্লাহর। তুমি তা পার। তোমার সব রকম দুঃসাহস আছে। তুমি কিন্তু তা করো না। সেদিন তো সব বলেছি। নতুন তেমন কিছু বলার নেই। আজ সকালে প্যারিস উপকণ্ঠের সেই রহস্যপূর্ণ বাড়িতে গিয়েছিলাম। কিন্তু বাড়িটা খালি। সাইনবোর্ড টাঙানো 'বাড়িটি সংস্কারের জন্যে নির্দিষ্ট।' হতাশ হয়ে ফিরে এসেছি।

'কি আশা নিয়ে গিয়েছিলে সে বাড়িটিতে?'

'জাহরা ইভানোভার কাছ থেকে প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষ কিছু সাহায্য পাওয়া যেতো। তাছাড়া ঐ বাড়ির লোকদের উপর নজর রেখে ওদের নতুন কোন ঘাটির নাগাল পাওয়া যেতো।'

'জাহরার পিতার নাম কি বলেছিলে?'

'নিকিতা স্ট্যালিন।'

'রুশ দূতাবাসে কি জন্যে যাচ্ছ?'

'যাবার কোন জায়গা নেই বলে। তাছাড়া তিনি টেলিফোন করেছিলেন দেখা করার জন্যে।'

'ঠিক আছে। ফিরে এসে আমাকে টেলিফোন করো। তোমার দেরি করে ফেললাম, আসি।'

সালাম দিয়ে ডোনা বিদায় নিল।

আহমদ মুসা গাড়ি স্টার্ট দিল রুশ দূতাবাসের উদ্দেশ্যে।

আহমদ মুসা রুশ রাষ্ট্রদূত পাভেলের ঘরে ঢুকতেই রাষ্ট্রদূত উঠে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানিয়ে বলল,'এস এস, তোমার অপেক্ষা করছি।'

আহমদ মুসা হাসল। বলল,‘বলুন।’

‘বলব কি, আমি বড় বিপদে। প্রচন্ড চাপ আমাদের সরকারের তরফ থেকে। ক্যাথারিনকে উদ্ধার করা যায়নি, অন্যদিকে তাতিয়ানাও নিখোঁজ। অথচ আমাদের জাতীয় দিবস ঘনিয়ে আসছে। ঐ দিনই শাসনতন্ত্র সংশোধনের মাধ্যমে রাশিয়ার নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ব্যবস্থা প্রবর্তন করার সবকিছু ঠিক-ঠাক হয়ে গেছে।’ বলল রাষ্ট্রদূত পাভেল।

‘একটা কথা বলুন তো, রাশিয়ার ভীষণ অর্থনৈতিক দুর্দিন চলছে, এর মধ্যে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে একটা বড় খরচ মাথায় তুলে নিচ্ছে কেন?’

বসল পাভেল। বলল,‘রাজ পরিবারের কাছে যে অর্থ রয়েছে তা দিয়ে রাশিয়া এক যুগ চলতে পারে।’

‘কি বলছেন আপনি, ওরা তো যাযাবর। রাশিয়ায় ওদের কোন নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই। বিদেশেও তারা অধিকাংশ ভাড়া বাড়িতে থাকে।’ কৃত্রিম বিস্ময় নিয়ে বলল আহমদ মুসা।

‘তুমি কিছু জাননা দেখছি। বলশেভিক কম্যুনিস্টরা নিকোলাশ (দ্বিতীয়) এবং তার স্ত্রী পুত্র কন্যাদের হত্যা করেছিল বটে, কিন্তু তাদের ধনভান্ডারের এককণাও তারা পায়নি। সবই জমা রয়ে গেছে রাজ পরিবারের গুপ্ত ধনভান্ডারে।’

‘সেটা কোথায়?’

‘রাশিয়ায়।’

‘তাহলে সেটা তো আপনাদের দখলে।’

‘না। ধন ভান্ডার রাশিয়ায় বটে, কিন্তু কেউ তার সন্ধান জানে না। পৌনে একশ বছর কম্যুনিস্ট সরকার চেষ্টা করেও সে ধন ভান্ডারের সন্ধান পায়নি। আজকের রাশিয়ার জাতীয়তাবাদী সরকারও খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছে। আগের রাজধানী পিটার্সবার্গে (পরে নাম হয়েছে স্ট্যালিনগ্রাদ) অথবা তার আশেপাশে কোথাও লুকানো আছে সেই শত শত বছরের সঞ্চিত বিস্ময়কর ধন ভান্ডার।’

‘সেই ধনের লোভেই কি নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ব্যবস্থার প্রবর্তন?’

আবারও হাসল পাভেল। বলল, 'রাশিয়া তার এই দুর্দিনে সেই ধন পেলে বেঁচে যায়, কিন্তু ধনের জন্যে রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা নয়। রাশিয়ার রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্যেই একটা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ব্যবস্থার প্রয়োজন।'

'রাশিয়ার এই প্রয়োজন যতখানি, ততখানি কিন্তু চেষ্টা হচ্ছে না প্রিন্সেস ক্যাথারিনের উদ্ধারের জন্যে।'

'না, তুমি ঠিক বলনি। আমাদের চেষ্টা ছাড়াও আমরা ফরাশি পুলিশ ও ইন্টারপোলের সাহায্য চেয়েছি। তবে একথা ঠিক যে, কোন কাজেই কোন ফল দেয়নি।'

'নিকিতা স্ট্যালিন নামে কাউকে চেনেন?'

রাষ্ট্রদূত একটু চিন্তা করে বলল, 'ঐ নামে উল্লেখযোগ্য কেউ রুশ কমিউনিটিতে নেই।'

'কিন্তু লোকটা বিখ্যাত ধনাঢ্য ব্যক্তি। বহুদিন প্যারিসে বাস করছেন।'

'নামটি হয় নকল, নয়তো কোন নকল নামে সে পরিচিত।'

'জাহরা ইভানোভা নামে তার একটা তরুণী মেয়ে আছে।'

রাষ্ট্রদূত পাভেলের কপাল কুঁচকালো। চিন্তা করে বলল,'তারও এই নাম নকল হতে পারে, অথবা নকল নামে সে সমাজে পরিচিত।'

আহমদ মুসা কখনও এদিকটা চিন্তা করেনি। সে মিঃ পাভেলের কথার যৌক্তিকতা স্বীকার করল। তবে আহমদ মুসার মনে হলো, সে আসল নামই শুনেছে। তাদের ভিন্ন অফিসিয়াল নাম থাকতে পারে। যে নামে তারা বাইরেও পরিচিত।

রাষ্ট্রদূত পাভেলের ইন্টারকম কথা বলে উঠলঃ স্যার,'ভ্লাদিমির মায়োভস্কি এসেছেন।'

'হ্যাঁ, পাঠিয়ে দাও।' বলল রাষ্ট্রদূত পাভেল।

আহমদ মুসা 'মায়োভস্কি' নাম শুনে চমকে উঠল। কিন্তু তার সাথে ভ্লাদিমির যুক্ত থাকায় মনটা আবার ঠিক হয়ে গেল।

দরজায় দু'বার সক হলো।

'এসো।' বলল রাষ্ট্রদূত পাভেল।

দরজা ঠেলে প্রবেশ করল ভ্লাদিমির মায়োভস্কি।

তার দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠল আহমদ মুসা। গোটা শরীরে একটা উষ্ণ স্রোত বয়ে গেল তার।

মায়োভস্কির চোখেও মুহূর্তের জন্যে আঠার মত লেগে গিয়েছিল আহমদ মুসার মুখের উপর। সেই সাথে তার চোখ দু'টি জ্বলে উঠেছিল। কিন্তু সংগে সংগেই সে সামলে নিল নিজেকে।

রাষ্ট্রদূত পাভেল মায়োভস্কিকে এসো বলেই মনোযোগ দিয়েছিল দিনের কর্মসূচীর দিকে।

চোখ সেখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে একবার মায়োভস্কির দিকে চেয়ে আহমদ মুসার দিকে মুখ ঘুরিয়ে মায়োভস্কিকে দেখিয়ে বলল,'ইনি ভ্লাদিমির মায়োভস্কি। এখানে সিকিউরিটি চীফের দায়িত্ব পালন করছেন।' তারপর মায়োভস্কিকে বলল আহমদ মুসার দিকে ইংগিত করে,'ইনি মিঃ আবদুল্লাহ। খুব সাহসী ও পরোপকারী ছেলে। প্রিন্সেস ক্যাথারিনের পরিবারের বন্ধু। ক্যাথারিনকে উদ্ধারের ব্যাপারে তার সাহায্য আমরা পেতে পারি।'

আহমদ মুসা ও মায়োভস্কি কারো ঠোঁটেই তখন শুভেচ্ছার হাসি ফুটে ওঠেনি। তবু তারা একে অপরকে হাত তুলে স্বাগত জানাল।

রাষ্ট্রদূত পাভেল মায়োভস্কিকে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সেই সময় তার লাল টেলিফোনটি বেজে ওঠায় বলা হলো না। টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিল রাষ্ট্রদূত পাভেল। টেলিফোনে কিছু একটা শুনেই সে বলে উঠল, 'না লাইন দেবার দরকার নেই। হোল্ড করো। আমিই আসছি ওয়্যারলেসে।'

টেলিফোন রেখে দ্রুত মায়োভস্কির দিকে চেয়ে বলল,'তোমাকে খোঁজ করছিলাম একটা কথা বলার জন্যে। ওলগা, তার মা ও অন্যান্যরা গেছে সাঁজেলিঁজে'র সান্ধ্য মেলায়। ওলগা আবার অন্য প্রোগ্রামে যাবে। সুতরাং একা পড়বে ওরা। দিন কাল ভাল নয়। তোমার লোকদের ওদিকে খেয়াল করতে বলো।'

কথা শেষ করেই উঠে দাঁড়াল রাষ্ট্রদূত পাভেল এবং আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, 'আমি একটা জরুরী কাজে যাচ্ছি। তোমার নাস্তা খেয়ে তারপর যাবে। আর তোমার সাথে কথা শেষ হলো না। তোমাকে আবার ডাকব।'

রাষ্ট্রদূত কথা শেষ করতেই মায়োভস্কি বলে উঠল, 'আমি আসি স্যার?'

'এসো।' বলল রাষ্ট্রদূত।

বেরিয়ে গেল মায়োভস্কি।

রাষ্ট্রদূত পাভেলও এগুচ্ছিল দরজার দিকে।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমিও আর বসছি না জনাব।'

'না। নাস্তা না খেয়ে গেলে মনে করব অসৌজন্যমূলকভাবে আমি চলে গেলাম বলে তুমি অসৌজন্য প্রদর্শন করলে।' বলল মুখ ঘুরিয়ে রাষ্ট্রদূত পাভেল।

'ঠিক আছে।' বলে বসল আহমদ মুসা।

ভালই হলো। আহমদ মুসা নিরিবিলি চিন্তা করার একটু সময়ও চায়।

তার মাথায় তখন চিন্তার ঝড়।

মায়োভস্কি এখানকার কেজিবি (রুশ গোয়েন্দা সংস্থা) প্রধান এবং সেই প্রিন্সেস ক্যাথারিনকে কিডন্যাপকারীদের একজন। রাষ্ট্রদূত কি তাদের এ ষড়যন্ত্র থেকে বিচ্ছিন্ন! বিচ্ছিন্ন তার প্রমাণ কি? মায়োভস্কির সাথে জড়িত নেই তাও যেমন প্রমাণ করা মুস্কিল, তেমনি জড়িত আছে, সেটাও প্রমাণিত নয়। তবে একটা বিষয়, ভাবল আহমদ মুসা, রাষ্ট্রদূত মায়োভস্কিকে আহমদ মুসার সামনে ডাকা কিছুটা প্রমাণ করে রাষ্ট্রদূত ষড়যন্ত্রের সাথে নেই। ডাকলেও আহমদ মুসাকে মুক্ত অবস্থায় বাইরে আসার সুযোগ দিত না।

দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যেই আহমদ মুসা নাস্তা সেরে বাইরে বেরিয়ে এল।

গাড়ির দিকে এগুতেই হঠাৎ একটা শঙ্কা ঝড়ের বেগে এসে প্রবেশ করল আহমদ মুসার মনে। তার মনে হলো, মায়োভস্কি আহমদ মুসাকে এখান থেকে মুক্ত মানুষ হয়ে যেতে দেবে তা স্বাভাবিক নয়। আহমদ মুসাকে যেতে দেয়ার অর্থ তাদের নাম-ঠিকানা ফরাসি পুলিশ ও রুশ সরকারের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়া। তাছাড়া তাদের দু'টি বড় বিপর্যয়ের প্রতিশোধের প্রশ্ন তো আছেই।

আহমদ মুসা গাড়ির দিকে এগুতে এগুতেই চারদিকে একবার তাকাল। না, সন্দেহজনক কিছু দেখতে পেল না।

আহমদ মুসা গাড়ির কাছে গিয়ে গাড়ির চারদিক ঘুরে ভেতরটা ভালো করে দেখে নিয়ে গাড়ির ভেতরে প্রবেশ করল। প্রথমেই বিস্ফোরক ডিটেকটরের সুইচ অন করে দেখে নিল গাড়িতে কোন বিস্ফোরক পাতা নেই।

গাড়ি স্টার্ট দিল আহমদ মুসা। চলতে শুরু করল গাড়ি।

আহমদ মুসার মন থেকে খুঁত খুঁতে ভাবটা গেল না। তার মনে হচ্ছে, শত্রুর চোখের অস্বস্তিকর ছায়ায় যেন সে দাঁড়িয়ে।

রিয়ারভিউতে চোখ রেখেছিল আহমদ মুসা, কিন্তু অনেক গাড়ির ভীড়ে বুঝা যাচ্ছিল না কিছুই।

রুশ দূতাবাস থেকে দুই কিলোমিটার দূরে বিরাট একটা মোড়। বিভিন্ন দিক থেকে আসা ছয়টি রাস্তার মোহনা এটা।

মোড়ের মুখে এসে গাড়িগুলো বিভিন্ন দিকে যাবার জন্য নির্দিষ্ট লেন দিয়ে এগিয়ে বিভিন্ন ফ্লাই ওভারে ও গ্রাউন্ড ওয়েতে বিভক্ত হয়ে যায়।

ঠিক এই জায়গায় এসে আহমদ মুসা গাড়ির গতি কিঞ্চিত স্লো করে লেন চেঞ্জ করছিল।

হঠাৎ গাড়ির পাঁজরে প্রচন্ড এক আঘাত। সেই আঘাতের সাথে দেহটাও যেন তার চ্যাপ্টা হয়ে গেল, মনে হলো আহমদ মুসার। ছুটে আসা ভাঙা কাঁচের টুকরায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল তার মুখ।

এই আঘাত সামলে উঠার আগেই গাড়ির বাম পাঁজরে আরও একটা ধাক্কা এসে পড়ল। চ্যাপ্টা হয়ে গেল গাড়ি।

প্রায় সাথে সাথেই সামনের উইন্ডস্ক্রীন ভেঙে একজন লোক ঝাঁপিয়ে পড়ল ভেতরে। প্রায় সংজ্ঞাহারা আহমদ মুসাকে টেনে বের করে নিয়ে গেল লোকটি।

এ সব কিছুই ঘটল ওলগার চোখের সামনে।

আহমদ মুসার গাড়িকে আর একটি গাড়ি যখন প্রথম আঘাত করল, তখন ওলগার গাড়ি এর সমান্তরালে বিপরীত প্রান্তের লেনে এসে দাঁড়িয়েছিল। তার

অনিচ্ছাতেই যেন তার গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছিল। দ্বিতীয় গাড়িটি যখন আঘাত করল আক্রান্ত গাড়িটাকে, তখন ওলগার হঠাৎ করে মনে হলো ব্যাপারটা দুর্ঘটনা নয়। গাড়ির আরোহীর হত্যা করাই কি আক্রমণকারীদের টার্গেট? হঠাৎ মায়োভস্কিকে ছুটে এসে উইন্ড শিল্ড ভেঙে ভেতরের লোকটিকে বের করতে দেখে খুশী হলো ওলগা। ভাবল, যাক আক্রান্তের পর উদ্ধার হওয়ার একটা পথ হলো।

মায়োভস্কি যখন আহমদ মুসাকে বের করে নিয়ে আসছিল, তখন মুখটা তার দেখতে পেল ওলগা। চমকে উঠল সে। এ যে মিঃ আবদুল্লাহ! তাকে কে মেরে ফেলতে চেষ্টা করেছিল?

মায়োভস্কি আহমদ মুসাকে নিয়ে দ্রুত তার গাড়িতে তুলল এবং সংগে সংগেই গাড়ি স্টার্ট দিল।

ওলগা ভাবল মিঃ আবদুল্লাহকে মায়োভস্কি নিশ্চয় হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে। ওলগাও সিদ্ধান্ত নিল হাসপাতালে যাবার। আবদুল্লাহ একদিন তার নিজের জীবন বিপন্ন করে বাঁচিয়েছিল তাকে এবং তার মাকে। তার দুর্দিনে তার পাশে দাঁড়াতে পারলে ভালই হবে।

ওলগা তার গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে চলল মায়োভস্কির গাড়ির পেছনে। মায়োভস্কির গাড়ি অসাধারণ লাল রংয়ের। তাই অনেক পেছনে পড়েও তার পিছু নেয়া কঠিন হলো না ওলগার।

অনেক ক্লিনিক, হাসপাতাল পেরুল, কিন্তু থামার নাম নেই মায়োভস্কির গাড়ির। তাহলে আব্দুল্লাহকে কি কোন নির্দিষ্ট হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে? হতে পারে।

প্রায় ২০ মিনিট চলার পর মায়োভস্কির গাড়ি একটা সংকীর্ণ গলিতে ঢুকে একটা বাড়ির সামনে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়েই হর্ণ দিল মায়োভস্কি। সংগে সংগেই বাড়ির সামনের গেটটি উপরে উঠে গিয়ে গাড়ি ঢুকতে পারে এই পরিমাণ উপরে উঠে স্থির হলো।

মায়োভস্কির গাড়ি দৌড় দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

ভেতরটা এক ঝলক দেখতে পেল ওলগা। বিস্মিত হলো ওলগা, ভেতরে যে কয়জন লোক তার নজরে পড়ল সবার হাতে স্টেনগান।

আরও একটা জিনিস ওলগার নজর এড়ালো না। সেটা হলো, মায়োভস্কির গাড়ি রুশ দূতাবাসের কূটনীতিকের গাড়ি নয়।

অনেক প্রশ্ন এসে ভীড় জমাল ওলগার মনে। কারা আবদুল্লাহকে হত্যার চেষ্টা করল, হঠাৎ মায়োভস্কি কোত্থেকে এল, উইন্ডশিল্ড ভেঙে তাড়াহুড়ো করে উদ্ধারের জন্যে এগুলো কেন, হাসপাতালে না নিয়ে তাকে অস্ত্রধারীদের আড্ডায় আনল কেন, কেন মায়োভস্কি কূটনীতিকের গাড়ি ব্যবহার করেনি। কোন প্রশ্নেরই সদুত্তর খুঁজে পেল না ওলগা।

বাড়িটার পাশেই কয়েকটা গাড়ির আড়ালে গাড়ি পার্ক করে ওলগা নজর রাখছিল বাড়িটার গেটের উপর।

মিনিট দশেক পরেই মায়োভস্কির গাড়ি বেরিয়ে এল। গাড়ির পিছে পিছে পকেটে হাত ঢুকানো দু'জন লোকও বেরিয়ে এসেছে। লোক দু'টি রুশ।

গেট পেরুবার পর গাড়ি রোডের উপর নেবার আগে গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে লোক দু'টিকে লক্ষ্য করে বলল,'দেখো, সাবধান থেকো। দু'বার কিন্তু জাল কেটে পালিয়েছিল।'

বলেই তীর গতিতে গাড়ি ছাড়ল।

একটু সময় নিয়ে ওলগাও তার গাড়ি ছেড়ে দিল।

মায়োভস্কির শেষ কথাটা কানে আসার সাথে সাথে মুখ ম্লান হয়ে গেল ওলগার। শেষ ঐ কথাটা শোনার পর ওলগার বিন্দু মাত্র সন্দেহ রইল না যে, আবদুল্লাহ লোকটি বন্দী মায়োভস্কিদের হাতে। তাহলে নিশ্চয় মায়োভস্কিরাই সেই এ্যাকসিডেন্টটা ঘটিয়েছিল।

কিন্তু কেন? এই প্রশ্নটি ক্ষতবিক্ষত করল ওলগাকে। আবদুল্লাহর মত বিদেশী লোকের সাথে মায়োভস্কির কি শত্রুতা থাকতে পারে? মায়োভস্কির কথায় মনে হয় আরও দু'বার তারা আবদুল্লাহকে ধরেছিল।

বাড়িতে পৌঁছেও ওলগা আহমদ মুসার চিন্তাটা তার মাথা থেকে দূর করতে পারলো না।

একবার তার মনে হলো, ব্যাপারটা তার আব্বাকে (রাষ্ট্রদূত পাভেল) জানানো উচিত। কিন্তু তার মনে শংকা দেখা দিল, যদি ব্যাপারটার সাথে তার

আব্বা অর্থাৎ দূতাবাস জড়িত না থাকে, আর যদি মায়োভস্কির কাজটা বেআইনি হয়, মায়োভস্কির ক্ষতি হবে। এই ক্ষতি ওলগা সহ্য করতে পারবে না।

ওলগা ও মায়োভস্কি পরস্পরকে ভালবাসে।

এই চিন্তা থেকেই ওলগা ব্যাপারটা তার আব্বাকে জানানো ঠিক মনে করল না। অথচ সে জানে, মায়োভস্কির এই কাজের সাথে যদি তার আব্বা অর্থাৎ দূতাবাস যদি জড়িত না থাকে, তাহলে আবদুল্লাহকে বাঁচানোর এটাই সবচেয়ে সহজ পথ।

পরিশেষে সিদ্ধান্ত নিল, ওলগা নিজে গিয়ে মায়োভস্কিকে অনুরোধ করবে আবদুল্লাহকে ছেড়ে দেবার জন্যে। যদি দেখা যায় দূতাবাস এই ঘটনার সাথে জড়িত এবং তার আব্বার অনুমতি ছাড়া মায়োভস্কি তাকে ছাড়তে পারছে না, তাহলে সে তার আব্বাকে অনুরোধ করবে।

সন্ধ্যা ৭ টায় টেলিফোনে কথা বলার পর ওলগা গিয়ে হাজির হলো মায়োভস্কির বাড়িতে।

ওলগা প্রবেশ করতেই মায়োভস্কি উঠে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানিয়ে বলল, 'ওলগা কিছু হয়নি তো?' মায়োভস্কির চোখে-মুখে বিস্ময়।

'কেন বলছ একথা?' বলল ওলগা।'তোমাকে টেলিফোন করে আনরা যায় না, সেখানে তুমি টেলিফোন করে আসবে, সেটা কল্পনাও করতে পারছি না।'

'এটা কি অবাক হওয়ার মত কাজ?'

'তোমার ক্ষেত্রে অবশ্যই। অন্যদের চেয়ে তোমার নৈতিকতাটা ভিন্ন।'

'একে খারাপ মনে কর?'

'আমার জন্যে আনন্দের, কিন্তু কষ্টকর।'

ওলগা মায়োভস্কির পাশে বসতে বসতে বলল,'একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি।'

'অনুরোধ নয়, আদেশ কর।'

গম্ভীর হলো ওলগা। একটু দ্বিধা করল। তারপর বলল,'আজকে একটা ঘটনা ঘটেছে না?'

'কি ঘটনা?'

'তোমরা একজন আহত লোককে নিয়ে গেছ না?'

চমকে উঠল মায়োভস্কি।

স্থির দৃষ্টিতে তাকাল ওলগার দিকে। বলল, 'তুমি কি করে জান?'

'কেন আমি দেখেছি। আমি সাঁজেলিঁজে থেকে ফিরছিলাম। আমার গাড়ি তখন ওখানে এসে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছিল।'

'কি দেখেছ তুমি?'

'তোমরা আহত মিঃ আবদুল্লাহকে তুলে নিয়ে গেলে?' থামল ওলগা।

'আর কি দেখেছ?'

'তোমরা তাকে হাসপাতালে না নিয়ে একটা বাড়িতে তুলেছ।'

মায়োভস্কির চোখে-মুখে দেখা দিল উদ্বেগ-আতংকের ছাপ। বলল, 'তুমি সেখানে গিয়েছিলে কেন?'

'মনে করলাম মিঃ আবদুল্লাহকে তোমরা হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছ, তাই তাকে দেখতে গিয়েছিলাম।'

মায়োভস্কি মুখ নিচু করেছে। তার চোখ-মুখ শক্ত হয়ে উঠেছে। সেখানে ভয় ও উদ্বেগের ছাপ। কিছুক্ষণ সে নির্বাক থাকল। তারপর বলল,'তুমি কি বলতে এসেছ?'

'আমার মনে হচ্ছে, মিঃ আবদুল্লাহকে তোমরা আটক করেছ কোন কারণে। তাকে ছেড়ে দেবার জন্যে অনুরোধ করতে এসেছি। সে একদিন আমাদের জীবন বাঁচিয়েছিল।'

'আব্বাকে কিছু বলিনি। ভাবলাম, তোমাকে বললে যদি কাজ হয়, আব্বাকে আর বলবো না।'

মায়োভস্বির মুখ থেকে উদ্বেগের ভাবটা একটু দূর হলো। বলল,'ঠিক করেছ। ভিষয়টা ভিন্ন ধরনের একটা ব্যাপার। তোমার আব্বার জানা উচিত নয়।'

'ঠিক আছে, বলব না। কিন্তু বল, আমার অনুরোধ রাখবে?'

মায়োভস্কি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল,'তুমি কি মনে কর নিরপরাধ কোন লোককে আমরা আটকাতে পারি?'

'না পার না।'

‘জান, লোকটি যে অপরাধ করেছে তাতে তাকে এক মুহূর্ত বাঁচিয়ে রাখা যায় না।’

‘কি অপরাধ করেছে সে?’

‘সব কিছু তোমার জানা ঠিক নয়। তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না?’ মায়োভস্কি ওলগাকে কোলে টেনে নিয়ে বলল।

ওলগা এক হাতে মায়োভস্কির গলা পেঁচিয়ে ধরে বলল,‘তোমাকে বিশ্বাস না করলে দুনিয়ায় আর কাকে বিশ্বাস করব বল?’

‘তাহলে শোন, লোকটি ভয়ংকর। বাইরে ভাল মানুষী চেহারা দেখে তার কিছুই বুঝবে না। দেশ ও জাতির স্বার্থে অনেক কিছুই সবার অলক্ষ্যে করতে হয়। এ বিষয়টাও সেই রকম। বুঝেছ তুমি?’

মায়োভস্কির কোল থেকে মাথা তুলতে তুলতে ওলগা বলল,‘বুছেছি। কিন্তু.........।’

‘কোন কিন্তু নয়, সে তোমাদের জীবন বাঁচিয়েছিল, সেটা তার একটা রাজনীতি ছিল।’

‘হতে পারে, কিন্তু...........।’

‘আর কোন কিন্তু নয়।’ বলে মায়োভস্কি তাকে নিবিড়ভাবে কাছে টেনে নিল।

শুয়ে ঘুম আসছিল না মায়োভস্কির। এপাশ ওপাশ করছিল অবিরাম।

একটা প্রচন্ড অপরাধ বোধ তাকে ক্ষত-বিক্ষত করছিল। সে ভাবছিল, ওলগার প্রতি তার ভালোবাসা গ্রেট বিয়ারের সুনির্দিষ্ট বিধান ভংগ করতে তাকে বাধ্য করেছে। গ্রেট বিয়ারের নির্দেশ হলো, গ্রেট বিয়ারের সদস্য নয় এমন কেউ গ্রেট বিয়ারের কোন লোক বা গ্রেট বিয়ারের কোন ঘাটি দেখে ফেললে তাকে অবশ্যই বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। ওলগা মায়োভস্কিকে গ্রেট বিয়ারের লোক হিসেবে চিনতে পারা শুধু নয়, গ্রেট বিয়ারের একটা গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন এবং একটি

গুরুত্বপূর্ণ ঘাটি দেখে ফেলেছে। এরপরও মায়োভস্তি তাকে জীবন্ত ছেড়ে দিয়েছে। এত বড় ঘটনা আইভান দি টেরিবলের অবশ্যই অজানা থাকবে না। নিশ্চয় তার এই বাড়ি আইভানের নজরের বাইরে নয়। তার এবং ওলগার কথোপকথন কে জানে এতক্ষণ তার কাছে পৌঁছে গেছে কিনা। কেঁপে উঠল মায়োভস্কি। শয্যা তার কাছে কাঁটা বলে মনে হতে লাগলো।

তাড়াতাড়ি উঠে বসল মায়োভস্কি।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। গ্রেট বিয়ারের দাবীর কাছে তার ভালোবাসার কোন মূল্য নেই। উপায় নেই তার, কোরবানী দিতে হবে তার ভালোবাসাকে।

দ্রুত উঠে গিয়ে টিপয় থেকে মোবাইল টেলিফোন তুলে নিল। ডায়াল করে বলল,'পেট্রভ তুমি তৈরি হয়ে এখনি এসো।'

টেলিফোন রেখে দিয়ে অস্থিরভাবে পায়চারী করতে লাগল মায়োভস্কি।

মিনিট দশেকের মধ্যে ডার্ক ছাই রংয়ের পোশাকে ঢাকা দীর্ঘদেহী একজন প্রবেশ করল মায়োভস্কির কক্ষে।

মায়োভস্কি ধপ করে সোফায় বসে পড়ল। তারপর একটা কাগজ লোকটির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল,'পেট্রভ বুঝতে পারো কিনা দেখ।'

পেট্রভ নামক লোকটি কাগজটির উপর চোখ বুলিয়ে বলল,'রাষ্ট্রদূত পাভেলের বাসার ভেতরের স্কেচ। আমাকে ঢুকতে হবে মিস ওলগার কক্ষে। হাতে নিডল গান। তার মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার পর আমাকে তার কক্ষ ছাড়তে হবে।'

মায়োভস্কির মুখের চেহারা পাথরের মত। গম্ভীর কণ্ঠে সে বলল,'ধন্যবাদ পেট্রভ। পেট্রভ মনে রেখ তোমাকে সফল হতে হবে।'

'বুঝেছি।'

মায়োভস্কি সোফায় হেলান দিয়ে চোখ বুজে বলল,'যাও, তোমার ফেরা পর্যন্ত আমি এখানে বসে অপেক্ষা করবো।'

পেট্রভ বেরুবার জন্যে ঘুরে দাঁড়িয়েও থমকে দাঁড়াল,'স্যার, তাকে যদি কক্ষে না পাওয়া যায়?'

'তোমার উপর দায়িত্ব তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়া, যেখানে পাবে সেখানে।' কঠোর কণ্ঠে বলল কথাগুলো মায়োভস্কি। কিন্তু বড্ড শুষ্ক শুনাল তার কণ্ঠ।

পেট্রভ বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ওদিকে ওলগারও ঘুম আসছিল না। তার ভেতরে অসহ্য এক টানাপোড়েন। মায়োভস্কিকে সে ভালোবাসে। তার কথা সে বিশ্বাস করেছে। যতক্ষণ তার কাছে ওলগা ছিল, ভালই ছিল। কিন্তু যতই সময় যাচ্ছে, ভেতরের এক টানাপোড়েন তাকে পীড়িত করছে। আহমদ মুসার যে ভয়ংকর রূপ মায়োভস্কি ওলগার কাছে তুলে ধরেছে, সেটা মেনে নিতে তার কষ্ট হচ্ছে। ক্রিমিনালরা যতই তার অপরাধকে ভদ্র পোশাক আর ভদ্র কথার আড়ালে চাপা দিক, তার চোখ ও চেহারার আয়নায় তার যে আসল রূপ প্রকাশ পায় তা সে ঢাকতে পারে না কিছুতেই। আহমদ মুসার কোন কিছুই প্রমাণ করে না যে সে ক্রিমিনাল। আরও একটা কথাকে সে কিছুতেই মিলাতে পারছিল না। আহদ মুসা যদি রাশিয়ার শত্রু কিংবা রাশিয়ার বিবেচনায় কোন ক্রিমিনালই হবে, তাহলে রাষ্ট্রদূতের কাছ থেকে সে বিষয়টা গোপন রাখা হবে কেন? তাঁরই প্রথম জানার কথা। এ গোপনীয়তার অর্থ, কাজটা এমন যা রাষ্ট্রদূতের জানা ঠিক নয়, তিনি এটা পছন্দ করবেন না। এর অর্থ কাজটা বৈধ নয়।

এসব চিন্তার দ্বিমুখী টানাপোড়েনে অস্থির হয়ে উঠেছিল ওলগা। ঘুম ধরছিল না তার চোখে।

ঘর অন্ধকার।

দেয়াল বরাবর পর্দা টানা থাকায় এবং জানালায় গরাদ লাগানো থাকায় যেটুকু আলো আসতে পারতো তাও আসছে না।

হঠাৎ ধাতব ঘর্ষণের একটা অস্পষ্ট টানা শব্দ তার কানে এল। উৎকর্ণ হলো ওলগা উৎসের দিকে।

আবার শব্দ হলো তেমনি অস্পষ্ট। ওলগার বুঝতে বাকি রইল না যে, কেউ জানালার গরাদ এবং কাঁচের জানালা তুলল।

মুহূর্তেই উদ্বেগ ও আতংকের একটা ঢেউ খেলে গেল তার গোটা শরীরে।

পরক্ষণেই সতর্কতায় শক্ত হয়ে উঠল তার দেহ। বালিশের তলা থেকে রিভলবার এবং ক্ষুদ্র একটা টর্চ বের করে নিল। তার ডান হাতের রিভলবার স্থির তুলে ধরল শব্দের উৎস লক্ষ্যে। বাম হাতে তার টর্চ।

শব্দের উৎসের দিকে স্থির নিবদ্ধ তার দু'চোখ দেখল, অন্ধকার নড়ে উঠল এবং এক খন্ড সাদা আলো ফুটে উঠল অন্ধকারের বুকে।

ওলগা বুঝল, গরাদ ও কাঁচের জানালা খুলে কেউ প্রবেশ করছে তার ঘরে।

পর্দা আরও ফাঁক হলো। সেখানে আবির্ভূত হলো এক কালো ছায়ামূর্তি। ওলগা রিভলবারের ট্রিগারে তর্জনি রেখে টর্চের সুইচ অন করল ছায়ামূর্তিকে লক্ষ্য করে।

ঘটনার আকস্মিকতায়ও বিমূঢ় হলো না ছায়ামূর্তি।

টর্চের আলো জ্বলে উঠার সংগে সংগে ছায়ামূর্তি ডান হাত তুলে ধরেছিল। হাতে তার নিডল গান।

নিডল গান থেকে আলপিনের অগ্রভাগের মত এক ঝাঁক গুলী বের হয়। গুলী গুলোর অগ্রভাগ ভয়ংকর বিষাক্ত। বিষাক্ত নিডল কারও চামড়া ভেদ করে রক্ত স্পর্শ করার সাথে সাথে তার মৃত্যু ঘটে। আর এ নিডলগুলো এত শক্তি ও গতি সম্পন্ন যে, একমাত্র লোহার বর্ম ছাড়া সব রকম পোশাকই ভেদ করতে পারে।

ছায়ামূর্তি নিডল গান সমেত তার হাত তুলে স্থির হবার আগেই ওলগার রিভলবার গুলী বর্ষণ করল।

গুলীটি ছায়ামূর্তির বক্ষ ভেদ করল।

ছায়ামূর্তিটি বার কয়েক চক্কর খেয়ে আছড়ে পড়ল মেঝের উপর।

ওলগা টর্চ নিভাল, কিন্তু রিভলবার নামাল না। ছায়ামূর্তির সাথে আরও কেউ থাকতে পারে।

ওলগার রিভলবারের গুলী বর্ষিত হবার পর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে রাষ্ট্রদূত পাভেল সহ বাড়ির সবাই ছুটে এল ওলগার ঘরে।

রাষ্ট্রদূত পাভেলই ঘরে আলো জ্বালল। দেখল রিভলবার হাতে ওলগাকে এবং রক্তাক্ত লাশটাকে।

রাষ্ট্রদূত ওলগার তাছে ঘটনা শোনার পর পুলিশে টেলিফোন করে ছায়ামূর্তিটির লাশের দিকে এগুতে এগুতে বলল,‘কে এই লোক?’

মূর্তিটি ভালো করে দেখে বলল,‘লোকটি রুশ কিন্তু অপরিচিত।’

তারপর লোকটির হাতে ধরে রাখা নিডল গান ভালো করে নিরীক্ষণ করে চমকে উঠল রাষ্ট্রদূত। নিডল গানটি যে শুধু রাশিয়াতেই তৈরি তা নয়, নিডল গানে রুশ গোয়েন্দা সংস্থা কেজিবি’র নতুন সংকেত চিহ্ন উৎকীর্ণ রয়েছে যা অন্যকেউ না বুঝলেও তিনি দেখেই বুঝলেন।

কেজিবির নিডল গান লোকটির হাতে দেখে তার চোখ-মুখ উদ্বেগে ছেয়ে গেল।

সে তাড়াতাড়ি হাতে গ্লাভস পড়ে লোকটির পকেট সার্চ করল। লোকটির বুক পকেটে প্রথমেই পেয়ে গেল একটি ছোট কাগজ। কাগজটি তার বাড়ির ইন্টরন্যাল ডায়াগ্রাম। যাতে দেখানো হয়েছে ওলগার ঘরে আসার পথ। ডায়াগ্রামের সাথে হাতের লেখার প্রতি নজর পড়তেই ভূত দেখার মত আঁৎকে উঠল রাষ্ট্রদূত পাভেল। হস্তাক্ষর দেখার সাথে সাথেই চিনতে পারলো ওটা মায়োভস্কির হাতের লেখা। তাহলে তো মায়োভস্কিই লোক পাঠিয়েছে ওলগাকে খুন করার জন্যে! কিন্তু কেন? ওলগা ও মায়োভস্কির ঘনিষ্টতা আছে বলেই তো তারা জানে। এর মধ্যে তাহলে এমন কিছু কি ঘটেছে যার জন্যে ওলগাকে তার খুন করার প্রয়োজন পড়েছে? বিষয়টা অস্বাভাবিক মনে হলো তার কাছে। আরও বড় কিছু কি আছে এর পেছনে?

ওলগা তার আব্বার ভাবান্তর দেখে বলল, ‘ও কাগজে কি কিছু পাওয়া গেছে আব্বা?’

রাষ্ট্রদূত পাভেল ওলগার দিকে কয়েক পা এগিয়ে এসে বলল,‘মায়োভস্কির সাথে তোমার বড় ধরনের কোন গন্ডগোল হয়েছে?’

ওলগা বিস্ময়ে চোখ দু’টো কপালে তুলে বলল,‘এ সময়ে এ প্রশ্ন কেন আব্বা?’

রাষ্ট্রদূত পাভেল তার স্ত্রী ছাড়া অন্য সবাইকে বাইরে যেতে ইংগিত করল এবং বলল ওলগাকে,'মায়োভস্কি তোমাকে খুন করার জন্যে এই লোককে পাঠিয়েছিল।'

শুনে ওলগার চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হলো। কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলো না ওলগা।

'কিছু ঘটেছে তোমার সাথে তার?' বলল ওলগার আব্বাই।

'আমার সাথে কিছু ঘটেনি। তবে....।'

বলে একটু থামল ওলগা। তারপর বলল,'মায়োভস্কি ও তার লোকরা মিঃ আবদুল্লাহকে আহত করে কিডন্যাপ করেছে। আমি তাকে অনুরোধ করতে গিয়েছিলাম তাকে ছেড়ে দেবার জন্যে।'

'কেন আবদুল্লাহকে গ্রেপ্তার করেছে? কেমন করে তুমি জানতে পারলে? কেন আমাকে জানাওনি?' এইভাবে এক সাথে অনেকগুলো প্রশ্ন করল রাষ্ট্রদূত পাভেল।

ওলগা সব কথা, সব বিবরণ তার আব্বাকে খুলে বলল।

ওলগার কথা শেষ হতেই রাষ্ট্রদূত উঠে দাঁড়াল। দ্রুত গিয়ে টেলিফোন তুলে নিল। নিরাপত্তা বিভাগকে নির্দেশ দিল, এখনি মায়োভস্কিকে আটক করতে এবং বলল,'পুলিশের সাথে কথা বলে আমি আসছি।'

কিন্তু মায়োভস্কির বাড়ি শূন্য। তাকে পাওয়া গেল না।

তারপর লাষ্ট্রদূত পাভেল পুলিশকে বলে ছুটল আহমদ মুসাকে উদ্ধারের জন্যে। সেখানেও মায়োভস্কিকে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রদূত পাভেল তখনও বুঝেনি, মায়োভস্কির এই ভীমরতির কারণ কি!

ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘর।

আহমদ মুসা সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে চোখ মেলল। কিছুই দেখতে পেল না। তার কি ঘটেছে মনে করার চেষ্টা করল।

তার গাড়ির এ্যাকসিডেন্টে সে আহত হয়েছিল। কিন্তু সে জ্ঞান হারায়নি। তারপর মায়োভস্কি তাকে টেনে বের করল। গাড়িতে তুলল। তারপর ক্লোরোফরম ভেজা একটা রুমাল তার নাকে চেপে ধরল। কিছু মনে নেই এরপর।

বুঝা যাচ্ছে, এ্যাকসিডেন্টটা ছিল গ্রেট বিয়ারের পরিকল্পিত। মায়োভস্কি রাষ্ট্রদূতের কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসার পর যে সময়টুকু পেয়েছিল তা সে এই পরিকল্পনায় ব্যয় করেছে। একটা কিছু সে করবে, রাষ্ট্রদূতের কক্ষ থেকে বেরুবার পর আহমদ মুসারও মনে হয়েছিল। কিন্তু কি করবে সেটা ভাবতে পারেনি।

তাহলে সে এখন গ্রেট বিয়ারের হাতে।

ধীরে ধীরে উঠে বসল সে। সর্বাঙ্গে ব্যথা।

এর মধ্যেও এই ভেবে খুশী হলো যে, তার হাত পা বাঁধা নেই। সম্ভবত তারা সংজ্ঞাহীন লোককে বাঁধার প্রয়োজন অনুভব করেনি।

চারদিকে হাত বুলিয়ে মেঝের কার্পেট ছাড়া আর কিছুই পেল না আহমদ মুসা।

এ সময় পায়ের শব্দ শুনতে পেল সে।

কয়েকজনের পায়ের সেই শব্দ থেমে গেল হঠাৎ।

ওরা দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে কি? দরজা খুলবে ওরা?

এই জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার মনে উদয় হওয়ার সংগে সংগেই যেভাবে সে মেঝের উপর কার্পেটে পড়েছিল সেইভাবে আবার শুয়ে পড়ল সংজ্ঞাহীনের মত।

খুলে গেল ঘরের দরজা। জ্বলে উঠল ঘরের আলো।

ঘরে প্রবেশ করল স্বয়ং গ্রেগরিংকো, উস্তিনভ এবং আরও দু'জন।

তাদের ঘরে ঢোকার পর পরই একটা ছোট ভ্যানে করে প্রিন্সেস ক্যাথারিনকে সেখানে আনা হলো।

প্রিন্সেস ঘরে ঢুকেই দেখতে পেল সংজ্ঞাহীনভাবে পড়ে থাকা রক্তাক্ত আহমদ মুসাকে। আঁৎকে উঠল সে আহমদ মুসার এই অবস্থা দেখে। একটা প্রবল যন্ত্রণা অনুভব করল সে তার হৃদয়ে। বলল সে গ্রেগরিংকোর দিকে তাকিয়ে, 'মিঃ

গ্রেগরিংকো, এই লোকটি তো রাজ পরিবারের কেউ নয়, রাজ পরিবারের সাথে সম্পর্কিতও নয়। তাহলে কেন বার বার এইভাবে একে নির্যাতন করছেন?'

'সম্মানিতা প্রিন্সেস, এ রাজ পরিবারের কেউ না হয়েও সে আমাদের পেছনে লেগেছে। সে এ পর্যন্ত আমাদের যে ক্ষতি করেছে, আমাদের সাম্প্রতিক ইতিহাসে তার কোন নজীর নেই। এর জন্যে আমাদের দু'টি মূল্যবান ঘাটি ছাড়তে হয়েছে, কয়েক ডজন লোককে হারাতে হয়েছে। একে শতবার হত্যা করলেও আমাদের প্রতিহিংসা মিটবে না। কিন্তু আমরা তাকে হত্যা করিনি। আমরা শুধু তার কাছে জানতে চাই, কেন সে আমাদের পিছু লেগেছে। তাতিয়ানা সম্পর্কে সে কি জানে?'

বলে একটু থেমেই সে উস্তিনভকে লক্ষ্য করে বলল, 'এর তো জ্ঞান এখনও ফেরেনি। তাহলে একটু পরেই আমাদের কাজ শুরু করতে হবে, কেমন?'

'ঠিক বলেছেন।' বলল উস্তিনভ।

গ্রেগরিংকো ভ্যানের ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে বলল,'সম্মানিতা প্রিন্সেসকে তাঁর ফ্লাটে নিয়ে যাও।'

সবাই কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল।

কক্ষ থেকে বেরুতে বেরুতে গ্রেগরিংকো উস্তিনভকে বলল, 'একটু পর তোমরা এসে একে বেঁধে ছোট ভ্যানে করে নিয়ে যাবে। আমিও যাব প্রিন্সেসের ওখানে। শেষ নাটক ওখানেই হবে।'

কক্ষের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আবার সেই ঘুটঘুটে অন্ধকার।

আহমদ মুসা আবার ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। মুখ মাথা ব্যথায় টন টন করছে। শরীরের হাড়গোড়ও যেন গুড়ো হয়ে গেছে।

উঠে বসতেই মাথাটা ঘুরে গেল। মাটিতে দু'হাতের হেলান দিয়ে শরীরটাকে স্থির রাখল সে। এ সময় তাকে দুর্বল হলে চলবে না। প্রবল মানসিক শক্তি দিয়ে দেহের সব শক্তিকে একত্রিত করতে চাইল সে।

ধীরে ধীরে সে উঠে দাঁড়াল। অন্ধকার ঘরে পায়চারী করল। আহত শরীরকে চাঙ্গা করতে চেষ্টা করল। ব্যথা জ্বর জ্বর শরীরের বিভিন্ন অংশের

স্টিফনেস দূর করতে গিয়ে নতুন ব্যথায় তার মুখ ফুঁড়ে আর্তনাদ বেরিয়ে এল, নিজের মুখ নিজেই চেপে ধরল সে।

দরজার দিকে পা করে যেভাবে চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল, সেভাবেই আবার শুয়ে পড়েছে।

শুয়ে শুয়ে আহমদ মুসা অপেক্ষা করছে আবার সেই পরিচিত পদশব্দের।

অবশেষে সে পদশব্দ শোনা গেল দরজার বাইরে।

দরজা খুলে গেল।

উস্তিনভ, চারজন স্টেনগানধারী এবং একটি ছোট ভ্যান নিয়ে একজন ড্রাইভার-এই ছয়জন প্রবেশ করল ঘরে।

আহমদ মুসাকে একইভাবে সংজ্ঞাহীনের মত পড়ে থাকতে দেখে উস্তিনভ স্টেনগানধারী একজনকে বলল,'দেখ তো নাড়া দিয়ে, সংজ্ঞাহীন না সে ঘুমুচ্ছে।'

স্টেনগানধারী একজন এগিয়ে বাম হাতে স্টেনগান নিয়ে ডান হাতে আহমদ মুসাকে পরীক্ষা করার জন্যে ঝুকে পড়ল। তার স্টেনগান ধরা বাম হাত খানাও আহমদ মুসার বুকের প্রায় কাছাকাছি।

আহমদ মুসা এমন একটা সময়েরই অপেক্ষা করছিল।

মাটিতে নেতিয়ে পড়ে থাকা আহমদ মুসার দু'টি হাত চোখের পলকে উঠে এল। ছিনিয়ে নিল ঝুকে পড়া লোকটির বাম হাত থেকে স্টেনগান এবং শুয়ে থেকেই গুলী বৃষ্টি করল ওদের লক্ষ্য করে।

উস্তিনভরা বোঝার আগেই সব শেষ। ছয়টি রক্তাক্ত লাশ পড়ল কার্পেটের উপর।

আহমদ মুসা আরেকটি স্টেনগান কুড়িয়ে কাঁধে ফেলে হাতের স্টেনগান বাগিয়ে ধরে ছুটল দরজা পেরিয়ে করিডোর ধরে।

করিডোরের একটা বাঁক ঘুরতেই আহমদ মুসা মুখোমুখি হয়ে গেল মায়োভস্কির। মায়োভস্কির সাথে আরও চারজন। ওদের হাতে স্টেনগান, মায়োভস্কির হাতে রিভলবার।

আহমদ মুসা মুহূর্ত মাত্রও নষ্ট করেনি। মায়োভস্কিদের উপর চোখ পড়ার সাথে সাথেই আহমদ মুসার স্টেনগান গর্জে উঠল। এক ঝাঁক গুলী গিয়ে ঘিরে ধরল ওদেরকে। হুমড়ি খেয়ে পড়ল পাঁচটি লাশ করিডোরের উপর। আহমদ মুসা লাফ দিয়ে লাশগুলো ডিঙিয়ে ছুটল সামনে।

করিডোর দিয়ে ছুটতে গিয়ে উপরের তলায় উঠার সিঁড়ি পেয়ে গেল।

প্রশস্ত সিঁড়ি।

আহমদ মুসা নিঃসন্দেহ যে, প্রিন্সেস ক্যাথারিনকে উপরের কোন তলায় কোথাও রাখা হয়েছে।

আহমদ মুসা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে শুরু করল। শরীর টেনে নিয়ে উঠতে কষ্ট হচ্ছিল।

কয়েক ধাপ উঠতেই উপরের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেল।

সেদিকে চাইতেই দেখল আহমদ মুসা, তিনজন দ্রুত নামছে সিঁড়ি দিয়ে। ওদের সাথে চোখাচোখি হয়ে গেল।

আহমদ মুসার স্টেনগান তখন ডান হাতে ঝুলানো। তোলার সময় নেই।

আহমদ মুসা লাফিয়ে পড়ল নিচে করিডোরে। প্রচন্ড ব্যথা পেল। শরীরের হাড়-গোড় যেন ভেংগে গেল তার। কিন্তু সেদিকে মনোযোগ দেয়ার সময় নেই। করিডোরে লাফিয়ে পড়ে শোয়া অবস্থাতেই গুলী বৃষ্টি করল উপরের সিঁড়ি লক্ষ্যে। ওদিক থেকেও গুলি বৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু ওরা আর নামেনি, সিঁড়ির যেখানে ছিল, সেখান থেকেই গুলী বৃষ্টি করছে। সিঁড়ির বাঁক কোন পক্ষের গুলীকেই লক্ষ্যে পৌঁছতে দিচ্ছে না।

গুলী বৃষ্টি অব্যাহত রেখেই আহমদ মুসা গড়িয়ে সরে এল দেয়ালের আড়ালে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ছুটল সামনের দিকে।

অল্প এগুতেই একটা বড় দরজা পেয়ে গেল। আর করিডোরটি বাঁক নিয়ে ডান ও বাম দু'দিকে চলে গেছে।

আহমদ মুসা খোলা দরজা পথে ঘরের বিপরীত দিকের দরজা দিয়ে লনে একটা গাড়ি দাঁড়ানো দেখতে পেল। বুঝল এটাই বাইরে বেরুবার পথ।

দরজা পথে ছুটল আহমদ মুসা গাড়ির দিকে। পেছনে ব্রাশ ফায়ারের শব্দ ছুটে আসছে। কয়েকটি গুলী এসে পেছনে ফেলে আসা দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করেছে।

আহমদ মুসা লনে একটি স্টেনগান ফেলে দিয়ে অন্যটি হাতে নিয়ে গাড়ির ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল। গাড়ির চাবি গাড়ির কি হোলে ঝুলছিল।

আহমদ মুসার গাড়ি যখন রাস্তায় নেমে ছুটতে শুরু করেছে, তখন আহমদ মুসাকে ধাওয়া করে আসা স্টেনগানধারীরা লনে এসে দাঁড়িয়েছে।

ছুটছে আহমদ মুসার গাড়ি। কোথায় ছুটছে, তার কোন চিন্তা আহমদ মুসার মাথায় নেই।

মাথাটা তার ঝিম ঝিম করছে। স্টেয়ারিং হুইলে রাখা তার হাত দু'টি শিথিল হয়ে আসছে। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে তার। দেহের সব শক্তি একত্রিত করে হাত দু'টি সবল এবং চোখ দু'টি তার খোলা রাখতে চেষ্টা করছে।

আহমদ মুসার ভাগ্য ভালো যে, তখন রাতের শেষ প্রহর। রাস্তায় গাড়ি তেমন নেই বললেই চলে। তাই নিরাপদে চলতে পারলো অনেক দূর। ছোট ছোট ট্রাফিক বিধি লংঘন হলেও বড় কিছু ঘটলো না।

আহমদ মুসার গাড়ি তখন চলে এসেছে শিন নদীর তীর অঞ্চলে।

হাত দু'টি আর স্টেয়ারিং হুইলে থাকছে না আহমদ মুসার। চোখের সামনে তার সবকিছু ঘুরছে। আহমদ মুসা বুঝল, আর পারবে না সে এগুতে। দেহের সব শক্তি তার নিঃশেষ। শেষ মুহূর্তে আহমদ মুসা তার পা চেপে গাড়ি দাঁড় করাতে চেষ্টা করলো। পারলো না। গাড়িটা একটা গাছের সাথে ধাক্কা খেল এবং আপনাতেই দাঁড়িয়ে পড়লো।

আহমদ মুসার দেহটা গড়িয়ে পড়ল সিটের উপর।

টেলিফোন পাশে রেখে দু'হাতে মুখ ঢাকলো ডোনা।

উস্কো-খুস্কো তার চেহারা। রাতে ভালো ঘুম হয়নি তার। রাতে বার বার টেলিফোন করে জানতে চেষ্টা করেছে আহমদ মুসা ফিরেছে কিনা। তারপর সকাল থেকে প্রতি ঘন্টায় টেলিফোন করেছে। না, আহমদ মুসা ফেরেনি। এখন বেলা দশটা।

পাশের সোফায় বসে ডোনার আব্বা মিঃ প্লাতিনি খবরের কাগজ পড়ছিল।

মেয়ের দিকে তাকিয়ে কাগজ পাশে রেখে বলল, 'কোন খবর মা?'

হাত দু'টি মুখ থেকে সরিয়ে শুকনো কণ্ঠে বলল,'না আব্বা ফেরেনি। কোনও খবরও নেই।'

মিঃ প্লাতিনি রাতে মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়েছে বার বার এই বলে যে, নিশ্চয় কোন কাজে জড়িয়ে পড়েছে। দেরী হচ্ছে। এসে পড়বে। আহমদ মুসার জীবনে এমন ঘটনা অহরহই ঘটে। কিন্তু সকাল থেকে এ সান্ত্বনার বাণী প্লাতিনির মুখেও আর আসছে না। উদ্বেগ তাকেও আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

একটু সময় নিয়ে সে ধীরে ধীরে বলল,'প্যারিসের বাইরে কোথাও তো যেতে পারে সে।'

'কোন প্রকার প্রোগ্রাম-পরিকল্পনা ছাড়াই তিনি রুশ দূতাবাসে গিয়েছেন।'

'সেখানে গিয়েও তো কোন প্রোগ্রাম হতে পারে?'

'তাহলে দূতাবাসে টেলিফোন করব?'

'করতে পার। কিন্তু পরিচয় না দিলে তো কোন ইনফরমেশন সেখান থেকে পাবে না।'

'পরিচয় দেব।'

'সেটা আহমদ মুসা পছন্দ করবে কিনা।'

'আব্বা, তার অনুপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব আমাদের। আমি আমার নাম বলব, বন্ধু পরিচয় দেব। ঠিকানা বলার প্রয়োজন হবে বলে মনে করি না।'

'ঠিক আছে, টেলিফোন করতে পার।'

ডোনা টেলিফোন করল দূতাবাসে। পেল রাষ্ট্রদূতকে। ডোনা নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, 'আমি ডোনা জোসেফাইন। মিঃ আবদুল্লাহ আমার বন্ধু।'

'মিঃ আবদুল্লাহর বন্ধু?'

একটু থামল রাষ্ট্রদূতের কণ্ঠ। কয়েক মুহূর্ত সময় য়ে সে বলল, মিঃ আবদুল্লাহ কোথায় সেটাই বুঝি জানতে চান?'

'না। সেটা আপনি নাও জানতে পারেন। আমি শুধু জানতে চাই আপনার ওখানে যাবার পর মিঃ আবদুল্লাহর কি ঘটেছে। তিনি এ পর্যন্ত বাসায় ফেরেননি।'

'ধন্যবাদ মিস ডোনা জোসেফাইন। আপনি বুদ্ধিমতী, মিঃ আবদুল্লাহর উপযুক্ত বন্ধু। কিন্তু আপনাকে আমি কোন সুখবর দিতে পারবো না।'

বলে থামল রাষ্ট্রদূত পাভেল।

এদিকে ডোনার বুকটা থর থর করে কেঁপে উঠল। দ্রুত বলল, 'বলুন কি খবর?' গলা কেঁপে উঠেছিল ডোনার।

'আমি দুঃখিত মিস। আমরা চেষ্টা করেও কোন সাহায্য তাঁকে করতে পারিনি।'

অস্থির হয়ে উঠেছে ডোনা। উত্তেজনায় উদ্বেগে কাঁপছে তার শরীর। বলল, 'বলুন আপনি দয়া করে।'

রাষ্ট্রদূত পাভেল বিকেলে আহমদ মুসার রাষ্ট্রদূতের বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর পরিকল্পিত মোটর দুর্ঘটনা থেকে শুরু করে তার বন্দী হওয়া, বন্দী খানায় রাষ্ট্রদূতদের অভিযানের বিবরণ দিয়ে বলল, 'যদিও মিঃ আবদুল্লাহকে আমরা পাইনি, তবু আমার কথা হলো সেখানে আমরা ১১টা লাশ পেয়েছি, সবই শত্রুদের। এর অর্থ আহমদ মুসার হাতেই তারা নিহত হয়েছে।'

'তাহলে কি আবারও বন্দী হয়েছেন।' ভাঙা গলায় বলল ডোনা।

'বলা মুস্কিল, তবে আমার মনে হয় মিঃ আবদুল্লাহ বন্দী হলে শত্রুরা ঘাটি খালি করে পালাতো না।'

'দয়া করে বলবেন কি, আপনারা কটায় গিয়ে শত্রুদের ঐ ঘাটি খালি দেখেন?'

'তখন রাত সাড়ে ৪টা হবে।'

সময়টা শুনে হতাশা বাড়ল ডোনার। যেটুকু আশার আলো মনে জ্বলে উঠেছিল তাও নিভে যেতে চাইল। কথা বলতে পারল না ডোনা।

ওপার থেকে রাষ্ট্রদূতই বলল, 'কোন খারাপ কিছু চিন্তা করো না মা। ঈশ্বর তার সহায়। সে খুব ভাল ছেলে।'

'থ্যাংকস। ঠিক আছে। গুড ডে জনাব।'

বলে ডোনা টেলিফোন রেখে দিয়ে তার আব্বার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আব্বা ওঁর গাড়ি এ্যাকসিডেন্টে ফেলে ওকে আহত অবস্থায় কিডন্যাপ করা হয়েছে। যেখানে বন্দী করে রাখা হয়েছিল, সেখানে পুলিশ নিয়ে অভিযান চালিয়ে তাকে পাওয়া যায়নি। পাওয়া গেছে শত্রুদের ১১টি লাশ।' কান্না জড়িত গলায় বলল ডোনা।

বলে ডোনা তার হাতের রুমালে মুখ ঢাকল।

ডোনার আব্বা এগিয়ে এসে মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'আল্লাহর উপর ভরসা কর মা। আমার মনে হয় সে সরে পড়তে পেরেছে।'

'কিন্তু এতটা সময় তাহলে উনি কোথায়? এই পরিস্থিতিতে তিনি অবশ্যই টেলিফোনে তাঁর খবর জানাতেন।'

'সেটাও নির্ভর করে সুযোগের উপর।'

ডোনা চোখ মুছে বলল, 'এখন কি করণীয় আব্বা?'

'এস আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করে অপেক্ষা করি।'

বলে একটু থেমেই আবার বলল, 'রুশ রাষ্ট্রদূতের সাথে কথা বলে তোমার কি মনে হলো?'

'আমার মনে হয়েছে তিনি সত্য কথাই বলেছেন।'

ডোনার আব্বা কোন কথা বলল না।

ডোনাও নয়।

একটু পরে নীরবতা ভেঙে ডোনার আব্বা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'সাইমুমের টেলিফোন নাম্বারটা দাও, ওদের সাথে যোগাযোগ করে দেখি।'

হঠাৎ কিছু পাওয়ার আনন্দে ডোনার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'ওদের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম আব্বা। যাই নিয়ে আসি ওদের নাম্বার।'

বলে ডোনা ছুটল উপরে ইঠার সিঁড়ির উদ্দেশ্যে।

ডোনার আব্বা সোফায় হেলান দিয়ে খবরের কাগজটা আবার তুলে নিল হাতে।

সকাল ৮টা। শিন নদীর তীর এলাকা তখনও গভীর কুয়াশায় ঢাকা।

ফাতমা ও তার আব্বা আবু আমের আবদুল্লাহ মোটর কারে যাচ্ছিলেন নদীর তীর বরাবর রাস্তা ধরে।

নদী তীরের এই জায়গাটা খুবই মনোরম। রাস্তা থেকে নদীর পানি পর্যন্ত নেমে গেছে পরিকল্পিত সাজানো গাছের সারি। গাছের ফাঁকে ফাঁকে বসার জায়গা। প্যারিসে এটা পিকনিকের একটা পপুলার স্পট।

ড্রাইভ করছিল ফাতমা।

তার চোখে পড়ল একটা গাড়ি গাছের গোড়ার সাথে আটকে আছে।

ফাতমা প্রথমে মনে করেছিল, কোন গাড়ি পার্ক করা আছে। কিন্তু পরে দেখল, গাড়িটা গাছের সাথে এ্যাকসিডেন্ট করেছে। গাড়ির সামনের কিছুটা অংশ দুমড়ে গেছে।

'আব্বা, মনে হয় একটা গাড়ি এ্যাকসিডেন্ট করেছে। আটকে আছে একটা গাছের গোড়ায়।' বলল ফাতমা।

ফাতমার আব্বা কিছু বলার আগেই ফাতমা গাড়ি দাঁড় করিয়ে ফেলেছে।

'ঠিক আছে। চল দেখি। পুলিশ নিশ্চয় জানতে পারেনি।' বলল ফাতমার আব্বা আবু আমের আবদুল্লাহ।

দু'জনেই নামল গাড়ি থেকে।

ফাতমাই আগে আগে চলল।

ড্রাইভিং সাইডের জানালা দিয়েই ভেতরে তাকাল ফাতমা। কিছু বুঝতে পারলো না। কুয়াশা সিক্ত জানালার কাঁচ দিয়ে সিটের উপর একজন লোক পড়ে থাকার আবছা দৃশ্য দেখতে পেল সে।

দরজা নিশ্চয় ভেতর থেকে লক করা। তবু ফাতমা দরজা টানল। সংগে সংগে খুলে গেল দরজা। দরজা পথে মুখ বাড়িয়ে দেখল, রক্তাক্ত একজন সিটের উপর পড়ে আছে।

'আব্বা, মারাত্মক আহত একজন সিটের উপর পড়ে আছে।' বলল ফাতমা।

'বেঁচে আছে তো?'

সিটে পড়ে থাকা লোকটির মাথা ছিল ভেতরের দিকে। একটা হাত ঝুলে ছিল সিটের নিচে।

ফাতমা হাত তুলে নিয়ে পরীক্ষা করল। বলল,'আব্বা, লোকটি বেঁচে আছে। লোকটি এশিয়ান আব্বা।'

'এশিয়ান? আহা! চল দেখি বের করে আনি।'

দু'জনে ধরাধরি ধরে বের করে আনল গাড়ি থেকে লোকটিকে।

বের করে শুইয়ে দিয়ে মুখের দিকে তাকিয়েই চিৎকার করে উঠল ফাতমা,'আব্বা, আহমদ মুসা।'

'তাইতো মা, আহমদ মুসাই তো।' আর্তনাদ করে উঠল আবু আমেরের কণ্ঠও।

'আব্বা, সময় নষ্ট করা যাবে না, কোথায় নেব এঁকে?'

'চল কাছেই একটা ভাল ক্লিনিক আছে।'

'না, আব্বা, এঁকে অপরিচিত কোন ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া যাবে না।'

'ঠিক বলেছ, আমাদের ক্রিসেন্ট ক্লিনিকেই চল নিয়ে যাই।'

আহমদ মুসাকে আবার তারা নিজেদের গাড়িতে তুলল।

ফাতমা বলল,'আব্বা লক্ষ্য করেছেন, এঁর চোখ, মুখ, মাথার আঘাত কোনটাই তাজা নয়। সব রক্তই শুকনো।'

'হ্যাঁ তাই তো দেখছি। এর অর্থ কি? গাড়ি এ্যাকসিডেন্টে সে আহত হয়নি?'

ফাতমা ড্রাইভিং সিটে উঠে বসতে বসতে বলল,'আমার মনে হয় উনি আহত হয়েছেন অন্য কোন ঘটনায় এবং তা নিশ্চয় আট দশ ঘন্টা আগে। গাড়িতে তাঁর পাশে স্টেনগান পড়েছিল। আমার বিশ্বাস কোন সংঘর্ষের পর আহত অবস্থায় সরে আসার পথে তিনি এ্যাকসিডেন্ট করেছেন।'

গাড়ি তখন ঝড়ের গতিতে চলতে শুরু করেছে।

সকালের রাস্তা প্রায় গাড়ি শূন্য বলা যায়। ২০ মিনিটের মধ্যেই গাড়ি প্যারিস ক্রিসেন্ট ক্লিনিকে এসে পৌঁছল।

জরুরী অবস্থা ঘোষিত হলো প্যারিস ক্রিসেন্ট ক্লিনিকে। মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যেই সিনিয়র-জুনিয়র সব ডাক্তার এসে হাজির হলো।

প্রাথমিক পরীক্ষা করে ক্লিনিকের প্রধান সার্জন ডাঃ ওমর ফ্লেমিং অপেক্ষমান উদ্বিগ্ন সকলকে জানাল, 'ভয়ের বোধহয় কিছু নেই। বাইরে বড় ধরনের কোন আঘাত নেই। দীর্ঘক্ষণ ধরে প্রচুর রক্ত ক্ষরণের ফলেই ইনি সংজ্ঞা হারিয়েছেন। তবে আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার পরেই বলা যাবে প্রকৃত অবস্থা কি।'

'সে সব পরীক্ষায় কতক্ষণ লাগবে?' বলল আবু আমের আবদুল্লাহ।

'রক্ত লাগবে। সেলাই দিতে হবে। জ্ঞান ফিরিয়ে আনাই এখন প্রধান কাজ।'

সংগে সংগে চারদিক থেকে শতজন বলে উঠল,'রক্তের গ্রুপ বলুন, যত রক্ত লাগে দেব।'

'ধন্যবাদ। আমিও আপনাদের সাথে আছি।'

বলে ডাঃ ফ্লেমিং ইমারজেন্সী অপারেশন হলের ভেতরে ঢুকে গেল।

ঘন্টা দু'য়েক পরে ডাঃ যুবায়ের, ফাতমার ভাই বের হয়ে ডাঃ ফ্লেমিং-এর পক্ষ থেকে উদ্বিগ্ন ও অপেক্ষমানদের উদ্দেশ্য করে বলল,'আমাদের মহান ভাই আহমদ মুসাকে ইনটেনসিভ কেয়ারে নেয়া হয়েছে। কোন মেজর অপারেশনের দরকার হয়নি। তবে জ্ঞান এখনও ফেরেনি।'

‘তাঁর আঘাতের ব্যাপারে আপনারা কি ধারণা করেছেন ভাইয়া।’ বলল ফাতমা।

‘তাঁর মাথা ও মুখের আঘাতের মধ্যে কিছু কিছু ভাঙা কাঁচ পাওয়া গেছে। তাঁর মাথা ও পাঁজরে প্রবল চাপ জনিত আঘাত। আমরা মনে করছি, ষোল সতের ঘন্টা আগে আরও একটা কার এক্সিডেন্টে সে মারাত্মকভাবে আহত হয়। দ্বিতীয় এক্সিডেন্টে তাঁর নতুন কোন ক্ষতি হয়নি।’

‘তাহলে জ্ঞান হারালেন কি করে?’

‘এটা তাঁর দ্বিতীয় বার সংজ্ঞা হারানো।’

‘কেমন করে জানলেন?’

‘প্রথম এক্সিডেন্টের পর সংজ্ঞা না হারালে অন্তত মুখে রক্তের দাগ এভাবে থাকতো না। আঘাত কিংবা যে কোন কারণেই হোক রক্তের দাগ শুকানোর পর সে সংজ্ঞা ফিরে পায়।’

কথা শেষ করেই ডাঃ যুবায়ের ফাতমাকে কাছে ডাকল। কানে কানে বলল, ‘প্রিন্সেস মারিয়া জোসেফাইনকে ব্যাপারটা তো এখন জানানো হয়নি!’

‘ঠিক বলেছ ভাইয়া, কথাটা আমার মনেই আসেনি। এখনই জানাচ্ছি।’

বলেই ফাতমা ছুটল টেলিফোনের দিকে। কিন্তু ওপার থেকে টেলিফোন উঠাল না। বার বার নো রিপ্লাই হলো।

‘ওটা তোমার কোন বাড়ির নাম্বার? ওঁদের কয়েকটা বাড়ি আছে।’ বলল ডাঃ যুবায়ের।

‘আমি তা জানি না ভাইয়া। এ নাম্বারে কয়েকবার তার সাথে কথা বলেছি।’

‘ঠিক আছে। আল্লাহ ভরসা।’

বলে ডাঃ যুবায়ের ভেতরে চলে গেল।

বেলা তখন ১২টা।

আহমদ মুসার সংজ্ঞা ফিরেছে বেলা দশটার পর পরই।

আহমদ মুসাকে এনে রাখা হয়েছে তার জন্যে বিশেষভাবে সাজানো ক্লিনিকের বিশেষ একটি কক্ষে। কারও দ্বারা কখনও ব্যবহৃত হয়নি এমন বিছানা-

পত্র, আসবাবপত্র তার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঘরটির আশেপাশের ঘরে ডাঃ ফ্লেমিং ডাঃ যুবায়েরসহ ডজন খানেক ডাক্তার ও নিরাপত্তা কর্মীর থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তখন আহমদ মুসার কাছে বসে আবু আমের আব্দুল্লাহ, ডাঃ ফ্লেমিং, ডাঃ যুবায়ের, প্যারিসের মুসলিম কমুনিটির অন্যতম নেতা ও প্যারিসস্থ সাইমুম ইউনিটের উপদেষ্টা আবু বকর শিরাক এবং আরও কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। পর্দার আড়ালে রয়েছে ফাতমা সহ প্যারিসের মহিলা নেত্রীরা।

ঘটনা ঘটার পর উদ্বিগ্ন সকলে চেপে ধরেছিল আহমদ মুসাকে।

যতটা বলা যায়, ততটা বলে থামল আহমদ মুসা।

কারো মুখে কোন কথা নেই। পিনপতন নীরবতা।

‘আমার একটা প্রবল কৌতুহল জনাব, আমরা এখানকার মুসলিম কমুনিটি ঘটনাক্রমে আপনাকে এখানে পেয়েছি। কিন্তু আপনার মিশনে এসে আপনি বাস করছেন অন্য কোথাও। আপনি যার মেহমান, সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিটিকে আমার খুব জানতে ইচ্ছা করছে।’ বলল ‘ইয়ুথ সোসাইটি অব ইউরোপিয়ান রেনেসাঁ’- এর নতুন সেক্রেটারি জেনারেল হুয়ারী হাবিব বেনগাজি।

ডাঃ যুবায়ের কিছু বলতে যাচ্ছিল। আহমদ মুসা তাকে থামিয়ে হেসে বলল, ‘তাঁদের একজন এখানে আসবেন। না শুনে চোখেই দেখবেন।’

‘আলহামদুলিল্লাহ, শত্রুরা তোমাকে জীবন্ত ধরতে চেয়েছিল। কিন্তু তা তারা পারেনি। এটা আল্লাহর একটা সাহায্য।’ বলল আবু আমের আবদুল্লাহ, ডাঃ যুবায়েরের আব্বা।

‘সংজ্ঞাহীন অবস্থায় আপনি যে শত্রুর হাতে পড়েননি, এটাও আল্লাহর বড় একটা সাহায্য।’ বলল ডাঃ ফ্লেমিং।

‘অবশ্যই।’ বলল আহমদ মুসা।

এইভাবে প্রশ্নোত্তরর চলার এক পর্যায়ে হুয়ারী হাবিব বলে উঠল, ‘মাফ করবেন সকলে, একটু উঠতে হচ্ছে। এখনি ফিরে আসব’

‘আসুন।’ বলল আহমদ মুসা।

হুয়ারী হাবিব বের হয়ে গেল।

প্রায় সংগে সংগেই আহমদ মুসা ডাঃ যুবায়েরকে কাছে ডেকে কানে কানে বলল, ‘তুমি তোমার লোককে হুয়ারী হাবিবকে ফলো করতে বল। কোথায় কি করে কি বলে তার রিপোর্ট চাই।’

ডাঃ যুবায়েরের মুখে প্রবল বিস্ময়ের প্রকাশ ঘটল। কিন্তু কিছু বলল না।

সে উঠে দাঁড়াল এবং দ্রুত বের হয়ে গেল।

মিনিট পনের পরে ফিরে এসে আহমদ মুসার কানে কানে বলল, ‘হুয়ারী ঔষধ কিনতে গিয়েছিল। ফিরে আসে এখন টয়লেটে ঢুকেছে।’

আহমদ মুসার ভ্রু মুহূর্তের কুঞ্চিত হয়ে আবার মিলিইয়ে গেল। বলল, ‘যে লোককে পাঠিয়েছিলে তাকে ডাকো।’

লোকটি এসে আহমদ মুসার শয্যার কাছে হাঁটু গেড়ে বসল।

আহমদ মুসা ফিসফিসে কণ্ঠে বলল, ‘উনি সোজা দোকানে গিয়ে ঔষধ কিনে আনেন?’

‘না, উনি ঔষধ বের করতে বলে ভেতরে গিয়েছিলেন।’

‘কেন?’

‘টেলিফোন করার জন্যে।’

‘আপনি দেখেছেন টেলিফোন করতে?’

‘না দেখিনি। উনি দোকানীকে বলেছিলেন যে তিনি একটা টেলিফোন করবেন।’

‘ঠিক আছে। যান আপনি।’

লোকটি চলে গেলে আহমদ মুসা ডাঃ যুবায়েরকে ডেকে বলল, ‘একটা গাড়ির ব্যবস্থা কর। আমি এখনি যাব।’

ডাঃ যুবায়েরের মুখ কালো হয়ে গেল উদ্বেগ ও বিষণ্নতায়। কিন্তু আহমদ মুসার মুখের দিকে চেয়ে কোন প্রশ্ন করার সাহস পেল না।

আহমদ মুসা যুবায়েরকে কথা বলা শেষ করেই উপস্থিত সকলের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি দুঃখিত, জরুরী প্রয়োজনে আমাকে এখনই চলে যেতে হবে। আপনারা আমার জন্য দোয়া করুন। আপনাদের ভালবাসার জন্যে ধন্যবাদ।’

সকলেই এক বাক্যে বলল, ‘এই শরীর নিয়ে! না এটা হতে পারে না।’

ডাঃ ফ্লেমিং বলল, 'আমি ডাক্তার, ডাক্তার হিসেবে এমন রুগী আমি ছাড়তে পারি না।'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'জনাব আপনি ঠিক বলেছেন। আমি ডাক্তার হলে এ কথাই বলতাম। কিন্তু এখনকার কাজ বিশ্রামের চেয়ে বড়।'

বলে আহমদ মুসা ধীরে ধীরে উথে বসল।

ডাঃ যুবায়ের বাইরে চলে গিয়েছিল। ফিরে এসে বলল, 'গাড়ি রেডি।'

লিফটে ফাতমা বলল, 'জনাব, ডোনা আপা আসার জন্যে তৈরি হচ্ছেন। দু'এক মিনিটের মধ্যেই যাত্রা করবেন।'

'তুমি তাকে আসতে নিষেধ করে দাও।'

'কোথায় যাচ্ছেন আপনি? তার ওখানে?'

'না। কোথায় যাচ্ছি, সেটা আপাতত থাক।'

'বাবা, আমাদের কোন অপরাধ হয়েছে? এভাবে আকস্মিক চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন?' বলল বৃদ্ধ আমের আবদুল্লাহ।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনারা সব বুঝতে পারবেন। পরে আমি সব বলব এখন নয়।'

লিফট থেকে বের হয়ে আহমদ মুসা এগুলো গাড়ির দিকে। সাথে আবু আমের আবদুল্লাহ, ডাঃ ফ্লেমিং, ডাঃ যুবায়ের, হুয়ারী হাবিবসহ সকলেই।

সবাই তখনও প্রতিবাদ করছে আহমদ মুসার সিধান্তের। বিশেষ করে হুয়ারী হাবিব ব্যস্ত হয়ে উঠেছে আহমদ মুসাকে বাধা দেয়ার জন্যে।

আহমদ মুসা গাড়ির কাছাকাছি হলে ডাঃ যুবায়ের চাবি হাতে গাড়ির সামনে দাঁড়ানো একটি যুবককে দেখিয়ে বলল, 'এ আমার ড্রাইভার, ড্রাইভ করবে।'

'প্রয়োজন নেই। আমি ড্রাইভ করতে পারব।'

'কেন? ... অসম্ভব!' বলল ডাঃ যুবায়ের।

'ঠিক বলেছে যুবায়ের, বাবা।' বলল আমের আবদুল্লাহ।

'আমার উপর আপনাদের কোন আস্থা নেই?'

ডাঃ যুবায়ের এগিয়ে এসে আহমদ মুসার হাত চেপে ধরে আবেগ রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, ‘আস্থা-অনাস্থার প্রশ্ন এখানে নয়। আমরা বলছিলাম, এইভাবে এই অবস্থায় নিরুদ্ধেশ যাওয়াটা আমরা সহ্য করতে পারছি না।’

‘ধন্যবাদ তমাদের ভালবাসার জন্যে। সকলকে ধন্যবাদ, আসসালামু আলাইকুম।’

গাড়ির ড্রাইভিং সিটে উথে বসল আহমদ মুসা।

বসাটা একটু জোরে হয়েছিল। মাথা ও গোটা শরীর চিন চিন করে উঠল।

মাথাটা সিটে আস্তে করে ন্যস্ত করে গাড়িতে স্টার্ট দিল আহমদ মুসা।

গাড়ি বারান্দা থেকে রাস্তায় নেমে এল আহমদ মুসার গাড়ি।

রাস্তায় নেমেই তিব্র গতিতে চলতে শুরু করল গাড়ি।

যতক্ষন গাড়ি দেখা গেল, তারা সবাই দাঁড়িয়ে থাকল। গাড়ি দৃষ্টির আড়ালে চলে যাবার পর সকলে ঘুরে দাঁড়াল।

আকস্মিক যা ঘটে গেল সবাই বিক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করছিল। কেউ চলে যাবার, কেউ ক্লিনিকের ভেতরে যাবার উদ্যোগ নিয়েছে, এই সময় ঝড়ের গতিতে পর পর তিনটি মাইক্রোবাস এসে দাঁড়াল ক্লিনিকের গাড়ি বারান্দায়।

গাড়ি থেকে প্রায় দু’ডজন মানুষ নামল। তাঁদের কারও হাতে রিভলবার, কারও হাতে স্টেনগান।

তারা নেমেই কয়েকজন ক্লিনিকের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। কয়েকজন গাড়ি বারান্দায় স্টেনগান বাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। অবশিষ্টরা ক্লিনিকে ঢোকার জন্যে ক্লিনিকের বারান্দায় উঠল।

যে লোক সবাইকে নির্দেশ দিচ্ছিল, ডাঃ ফ্লেমিং তার মুখোমুখি হয়ে বলল, ‘আমি ডাঃ ফ্লেমিং। ক্লিনিকের ডক্টর ইনচার্জ। আপনারা এসব কি করছেন, বুঝতে পারছি না।’

লোকটি ক্রুর হেসে বলল, ‘আপনাকেই তো বেশি দরকার। ভালই হলো।’

একটু থামল লোকটি। তারপর চোখে আগুন বর্ষণ করে বলল, ‘চলুন, আহমদ মুসা কোথায় আমাদের দেখিয়ে দিন।’

প্রথমটায় তার কথায় বিস্মিত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল ডাঃ ফ্লেমিং। তা মুহূর্তের জন্যে। মুহূর্তেই তার কাছে সব পরিস্কার হয়ে গেল। পরিস্কার হয়ে গেল কেন আহমদ মুসা এইভাবে চলে গেল। হৃদয়টা তার দারুণভাবে কেঁপে উঠল। যদি সে থাকতো, তাহলে কি হতো! তার মন ভরে গেল শ্রদ্ধায় আহমদ মুসার প্রতি।

'আহমদ মুসা? যে আহত লোকটি আজ সকালে ভর্তি হয়েছিল, সেই এশিয়ান লোক?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। কোথায় সে, চলুন।'

'কিন্তু সে তো এই ক'মিনিট হলো চলে গেছে?'

'চলে গেছে? মিথ্যা কথা।'

'মিথ্যা নয়, দেখুন এখানে অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞাসা করুন'

'না বিশ্বাস করি না। চলুন সার্চ করব।'

'ঠিক আছে, চলুন।'

ডাঃ ফ্লেমিংকে নিয়ে একদল অস্ত্রধারী ঢুকে গেল ক্লিনিকের ভেতরে।

গাড়ি বারান্দায় লনের উপর তখনও স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে আবু আমের আবদুল্লাহ, ডাঃ যুবায়ের ও ফাতমা।

'আল্লাহ আহমদ মুসাকে রক্ষা করেছেন। কিন্তু অবাক হচ্ছি, বুঝল কি করে সে যে এমন কিছু ঘটতে যাচ্ছে?' ফিসফিসে কণ্ঠে বলল আবু আমের আবদুল্লাহ।

'ভাইয়া নিশ্চয় কিছু জানেন?' বলল ফাতমা।

কথা তাঁদের শেষ হলো না চিৎকার করতে করতে সদলবলে নেমে এল অস্ত্রধারীরা।

ডাক্তার ও অন্যান্য যারা ছিল সবাইকে ডেকে বলল, 'ডাক্তার ফ্লেমিং কথা গোপন করছে। মুমূর্ষু প্রায় একজন লোক একা গাড়ি ড্রাইভ করে চলে যেতে পারে? আমরা এটা বিশ্বাস করি না।'

বৃদ্ধ আবু আমের বক্তা লোকটির দিকে এগিয়ে গেল। বলল, 'ডাঃ ফ্লেমিং ঠিকই বলেছেন। আমিই সকালে লোকটিকে সংজ্ঞাহীন মুমূর্ষু দেখে আমার

গাড়িতে এখানে নিয়ে এসেছিলাম। আবার আমার চোখের সামনেই সে নিজে ড্রাইভ করে চলে গেল। আমার কাছেও এটা মিরাকল, কিন্তু ঘটেছে এটা।'

একটু থেমে দূরে দাঁড়ানো একজনকে কাছে ডেকে তাকে দেখিয়ে বলল, 'এই হল গাড়ির ড্রাইভার। ড্রাইভারকে সে নেয়নি।'

'গাড়িটার নাম্বার কত?' চিৎকার করে উঠল অস্ত্রধারী লোকটি।

ড্রাইভার লোকটি গাড়িটার নাম্বার তাকে জানাল।

সংগে সংগেই অস্ত্রধারী লোকটি পাশের একজনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'গোটা প্যারিসে আমাদের সবাইকে নাম্বারটি জানিয়ে দাও। পুলিশকেও জানিয়ে তাঁদের সাহায্য চাও। যাবে কোথায় সে?'

অস্ত্রধারীরা চলে গেল।

ক্রিসেন্ট ক্লিনিকের সামনে লনে তখনও কয়েকজন দাঁড়িয়ে। আহমদ মুসাকে কেন্দ্র করে যারা এসেছিল, তারাও প্রায় সকলেই চলে গেছে। হুয়ারী হাবিবও।

লনে দাঁড়ানো সবার মুখে তখনও একটা দুঃস্বপ্নের ছাপ। সবাই মৌন।

মৌনতা ভেংগে কথা বলল প্রথমে আবু আমের। বলল সে, 'চল উপরে একটু বসি।' কথায় তার ক্লান্তির ছাপ।

সবাই উপরে উথে এল। বসল গিয়ে ডাঃ ফ্লেমিং-এর কক্ষে।

'এরা কারা এসেছিল বুঝলে কিছু ডাক্তার?' বসেই মুখ খুলল প্রথমে আবু আমের। বললেন ডাক্তার ফ্লেমিংকে লক্ষ্য করে।

'বুঝতে পারিনি। তবে আহমদ মুসার কাছে যাদের কথা শুনলাম, সেই গ্রেট বিয়ারের ভাড়া করা লোক হতে পারে এরা।' বলল ডাঃ ফ্লেমিং।

'কিন্তু এরা তো রুশ নয়, ফরাসি।' বলল ডাঃ যুবায়ের।

'গ্রেট বিয়ারের ভাড়া করা লোকও তো হতে পারে।' বলল ফাতেমা।

'তা হতে পারে এবং আমার মনে হয় এটাই ঘটনা।' বলল ডাঃ যুবায়ের।

'কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, এত তাড়াতাড়ি জানল কি করে এবং এদের জেনে ফেলার ব্যাপারটা আহমদ মুসা জানল কি করে। এখন তো আমাদের কাছে পরিস্কার কেন তিনি তাড়াহুড়া করা চলে গেলেন।' বলল ডাঃ ফ্লেমিং।

‘আল্লাহর হাজার শোকর যে তিনি চলে গেছেন। তিনি আমাদের অনুরোধ শুনলে যে কি হতো!’ বলল আবু আমের আবদুল্লাহ।

‘কিন্তু এমন কিছু ঘটবে তিনি তা আমাদের জানালেন না কেন?’ বলল ডাঃ ফ্লেমিং।

কথা শেষ করেই আবার সে শুরু করল, ‘ডাঃ যুবায়ের তুমি কিছু জান মনে হয়। তোমাকে কিছু তো বলেছেন তিনি।’

‘আমাকে এই বিষয়টা কিছুই জানাননি।’ বলে থামল ডাঃ যুবায়ের। তারপর চারদিক চেয়ে উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করে এসে বলল, ‘তিনি আমাকে বলেছিলেন হুয়ারী হাবিবকে ফলো করার জন্যে লোক পাঠাতে। উনি কোথায় কি করেন তা দেখার জন্যে। তিনি যখন জানতে পারলেন যে, হুয়ারী ঔষধ কিনতে গিয়ে টেলিফোন করেছেন। তখনই তিনি চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে আমার মনে হচ্ছে।’

‘তার মানে আমাদের হুয়ারী হাবিব টেলিফোনে আহমদ মুসার খবর শক্রকে জানিয়েছেন!’ আর্তকণ্ঠে বলল ডাঃ ফ্লেমিং।

‘ঘটনা তো এটাই দাঁড়াচ্ছে।’ বলল আবু আমের আবদুল্লাহ।

‘কিন্তু বুঝতে পারছি না, হুয়ারী হাবিব সাহেবকে সন্দেহ করার হেতু কি?’ বলল ফাতমা।

‘শুনেছি, কোন অস্বাভাবিক জিনিসই আহমদ মুসার নজর এড়ায় না। নিশ্চয় আহমদ মুসা ভাই হুয়ারী হাবিবের কথা ও আচরনে অস্বাভাবিক কিছু টের পেয়েছিলেন।’

‘আল্লাহর হাজার শোকর যে, তিনি আহমদ মুসাকে এই দৃষ্টি দিয়েছেন। আমরা তো কিছুই বুঝিনি।’ বলল আবু আমের।

‘আর একটি ব্যাপার। আহমদ মুসা ড্রাইভার সাথে নিল না কেন?’ বলল ডাক্তার ফ্লেমিং।

‘আমাদের কাছেও এটা বিস্ময়ের!’ বলল উপস্থিত সবাই।

একটুক্ষণ নীরব সবাই।

নীরবতা ভাঙল ডাঃ ফ্লেমিং। বলল, ‘হুয়ারী হাবিব সম্পর্কে আমরা কি ভাববো?’

‘বিশ্বাসঘাতক ছাড়া আর কি!’ বলল ফাতমা।

ডাঃ ফ্লেমিং-এর টেলিফোন বিপ বিপ শব্দ করে উঠল।

ডাঃ ফ্লেমিং টেলিফোন ধরেই ডাঃ যুবায়েরের হাতে তুলে দিল। বলল, ‘তোমার টেলিফোন।’

টেলিফোন ধরেই বলল, ‘জি, আমি ডাঃ যুবায়ের। ঠিক আছে দিন তাকে।’

ওপারের কথা শুনেই আনন্দে চোখ-মুখ নেচে উঠল ডাঃ যুবায়েরের। স্পিকারে হাত চাপা দিয়ে সকলের দিকে চেয়ে বলল, ‘আহমদ মুসা ভাই।’

সবার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল নড়ে-চড়ে বসল সবাই।

ডাঃ যুবায়ের কথা বলল আহমদ মুসার সাথে। অস্ত্রধারীদের আসার কথা, হুয়ারী হাবিব ও ড্রাইভারের কথা – সবই বলল সে।

টেলিফোনে কথা শেষ করে টেলিফোন রাখতেই সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠে ‘কেমন আছেন উনি, কি বললেন তিনি’, ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন করে বসল।

ডাঃ যুবায়ের বলল, ‘উনি ভাল আছেন। গাড়ি আজ বেলা তিনটায় শিন নদীর ১১ নাম্বার ব্রীজের দক্ষিণ প্রান্তে থাকবে, তবে তা পুলিশের হাতে পড়াই ভাল......।’

যুবায়েরকে বাধা দিয়ে তার আব্বা আবু আমের বলল, ‘থাক তোমার গাড়ির কথা, হুয়ারী হাবিবের কথা কি বলল, সেটা বল।’

‘বলছি। হুয়ারী হাবিবের চেহারা, তার কথা ও আচরণ দেখে আহমদ মুসার সন্দেহ হয়। তাকে ফলো করে সন্দেহটা প্রমাণিত হয়। আহমদ মুসার মতে যে কোন কারনেই হোক হুয়ারী হাবিব ফরাসি পুলিশের পুতুল হিসেবে কাজ করছে। তিনিই পুলিশকে খবর দেন, পুলিশের একটা মহল জানায় তা গ্রেট বিয়ারকে। তবে আহমদ মুসা বলেছেন, এ বিষয়টা নিয়ে ফ্রান্সের মুসলিম কমুনিটিতে আলোচনা না হওয়া উচিত। কমুনিটির ঐক্য কোন ভাবেই নষ্ট হতে

দেয়া যাবে না। নীরবে চেষ্টা করতে হবে তাকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্যে।’

একটু থেমে ডাঃ যুবায়ের আবার শুরু করল, ‘ড্রাইভারকে তিনি নেননি, কারণ ড্রাইভার তাতে বিপদে পড়ত। তাকে আহমদ মুসার ঠিকানা পুলিশ অথবা গ্রেট বিয়ারকে জানাতে বাধ্য হতে হতো। সকলকে তিনি সালাম জানিয়েছেন।’

ডাঃ যুবায়ের থামল।

‘আল্লাহ তাকে আরও দীর্ঘজীবী করুন। প্যারিসের মুসলিম কম্যুনিটির ভবিষ্যৎ ভেবে যে পরামর্শ দিয়েছেন, সেটাই ঠিক। বিশ্বাসঘাতক আমার মনে হয় শুধু হুয়ারী হাবিবি নন। আরও যারা আছেন, তাদের নীরবে চিহ্নিত করতে হবে। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি, আহমদ মুসা আমাদের দৃষ্টি খুলে দিয়েছেন। আমরা সাবধান হতে পারব।’

বলে আবু আমের আবদুল্লাহ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, ‘আমরা চলি। ডাঃ ফ্লেমিং তোমাদের সময় আর নষ্ট করব না।’

ফাতমাও উঠে দাঁড়াল।

সালাম দিয়ে তারা পা বাড়াল দরজার দিকে।

# ৪

সুস্থ হয়ে উঠেছে আহমদ মুসা।

শরীরের উপর দিয়ে তার এবার বড় একটা ধকল গেছে। অনেক পরীক্ষা-নীরিক্ষা অনেক ঔষধ-পাতি খেতে হয়েছে তাকে। 'সাইমুম' – এর লোকেরা সেবা-শুশ্রূষা করেছে, বাড়ির চাকর-বাকর তো আছেই। ডোনাকে ইচ্ছা করেই আহমদ মুসা দূরে রাখতে চেষ্টা করেছে। একদিকে তার ইউনিভার্সিটির ফাইনাল পরীক্ষা, অন্যদিকে নিরুপায় অবস্থায় পর্দার সীমা লঙ্ঘিত হলেও এই স্বাভাবিক অবস্থায় আহমদ মুসা এই সীমা রক্ষা করতে চেয়েছে। ডোনাও সেটা মেনে নিয়েছে।

অসুখ অবস্থায় শুয়ে শুয়ে আহমদ মুসা যে পীড়া খুব বেশি অনুভব করেছে, সেটা হলো, প্রিন্সেস ক্যাথারিনকে অনুসন্ধানের কোন ক্লুই এখন তার কাছে নেই।

সুস্থ হবার পর এ বিষয়টা তাকে আরও বেশি পীড়া দিয়েছে।

রুশ দুতাবাস ছিল গ্রেট বিয়ারের সাথে লিংকের একটা উৎস। কিন্তু মায়োভস্কির মৃত্যুর পর এ লিংক কি এখন আছে? এখনও কি ওরা রুশ দূতাবাসের উপর চোখ রাখে?

এই বিষয়টি পরখ করা এবং রুশ রাষ্ট্রদূতের সাথে কথা বলার জন্যে আহমদ মুসা গিয়েছিল রুশ রাষ্ট্রদূতের বাসায়।

তার এই উদ্যোগকে সফল বলেই আহমদ মুসা মনে করছে।

রুশ রাষ্ট্রদূতের সাথে কথা বলার পর আহমদ মুসার সফল আলাপ হয়েছিল ওলগার সাথেও।

মায়োভস্কির সাথে ঐ ঘটনার পর ওলগা খুবই মুষড়ে পড়েছে। অনেকটা নীরব হয়ে গেছে সে।

তবু আহমদ মুসার আসার কথা শুনে সে এসেছিল তার সাথে দেখা করতে।

আহমদ মুসা শুরুতেই শুভেচ্ছা জানিয়ে তাকে বলেছিল, আপনার সাহায্যের জন্যে আমি কৃতজ্ঞ থাকব। সব আমি শুনেছি। সেই সাথে আপনার বিপর্যয়ের জন্যে আমি দুঃখিত।

ম্লান হেসেছিল ওলগা। মুখ নিচু করেছিল। বলেছিল, 'ধন্যবাদ। কতটুকু আর সহযোগিতা করতে পেরেছি। আমাদের সাহায্য পৌঁছার আগেই নিজেকে আপনি মুক্ত করতে পেরেছিলেন। কনগ্রাচুলেশন আপনাকে।'

'বাঁচার চেষ্টা সকলেই করে। থাক এসব কথা। মায়োভস্কি সম্পর্কে আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারি আমি?' খুব নরম কণ্ঠে বলেছিল আহমদ মুসা।

চকিতে একবার মুখ তুলেছিল ওলগা আহমদ মুসার দিকে। আবারও ম্লান হেসেছিল। বলেছিল, 'অবশ্যই।'

'তাঁর সম্পর্কে আপনি কতটুকু জানেন?'

'তাকে আমি ভালবাসতাম। তাঁর পারিবারিক ও পেশাগত সব খবরই আমি জানি। তবে গ্রেট বিয়ারের সাথে তার সম্পর্কের ব্যাপারটা সেদিন রাতেই জানলাম।'

'তিনি কূটনৈতিক দায়িত্বের বাইরে যাতায়াত করতেন, এমন কোন জায়গার সন্ধান কি আপনি জানেন?'

'প্রতিদিন দেখা আমাদের খুবই কম হতো। সেই জন্যে এ ধরনের অভ্যাস সম্পর্কে বলা কঠিন। তবে একটা জায়গার কথা মনে পড়ছে। সাঁজেলিজে'র অভিজাত 'পার্ল রেস্টুরেন্টে' তিনি এক সময় নিয়মিত যেতেন। কিন্তু গত এক বছর ধরে ওমুখো আর হন না। আমি অনেক বলেও তাকে নিয়ে যেতে পারিনি।'

'ওখানে কি তিনি বিশেষ কারো সাথে মিশতেন?'

'হ্যাঁ, রেস্টুরেন্টের রেসিডেন্ট পরিচালক মিস লিন্ডা মাঝে মধ্যেই তার টেবিলে এসে বসতেন। মায়োভস্কিও তাঁর কক্ষে যেতেন।'

'আর কারো সাথে?'

'এমন কাউকে আমি জানি না।'

‘ধন্যবাদ। মিস লিন্ডাকে আপনার কেমন মনে হয়েছে।’

‘ক্রিমিনাল মনে হয়েছে। মায়োভস্কির সাথে তার মেশা পছন্দ করতাম না, যদিও রেস্টুরেন্টটা আমার খুব পছন্দের ছিল।’

‘পার্ল রেস্টুরেন্টে তার না যাওয়াটা আপনার কাছে কেমন মনে হয়েছে?’

‘আমাকে অবাক করত। পার্ল রেস্টুরেন্টের কথা বললেই তিনি বিমর্ষ হতেন।’

‘আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি চলি।’

‘ওয়েলকাম।’

ওলগার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠেছিল আহমদ মুসা। খুশি হয়েছিল আহমদ মুসা ওলগার কাছ থেকে পাওয়া তথ্যে। পার্ল রেস্টুরেন্টের সাথে মায়োভস্কির সম্পর্কের মধ্যে একটা রহস্যের গন্ধ রয়েছে।

গাড়ি চলতে শুরু করেছিল। খুবই রিল্যাক্স মুডে গাড়ি চালাচ্ছিল সে। সর্বান্তকরণে সে প্রার্থনা করেছে, গ্রেট বিয়ারের লোকেরা তার পিছু নিক। তাহলে তাদের সন্ধান পাওয়ার একটা পথ হবে।

তার গাড়ি মাইল দুই যাবার পর গাড়ির রিয়ারভিউ লাইটে একটা গাড়িকে বেশ কিছুক্ষন ধরে আহমদ মুসার পিছু আসতে দেখে। তাকে ফলো করছে কি?

মনে মনে খুশি হয়েছিল আহমদ মুসা। তাকে গ্রেট বিয়ারের লোকেরা অনুসরণ করুক এটাই সে চাচ্ছিল।

এরপর রাস্তার প্রতিটি মোড়ে সে অপেক্ষা করেছিল তিন বা চারদিক থেকে আগের মতই গ্রেট বিয়ারের গাড়ি তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়বে। আহমদ মুসা এই আঘাত থেকে আত্মরক্ষা করবে। পারলে তাদের অনুসরণ করবে অথবে সংজ্ঞা হারাবার ভান করে তাদের বন্দী হিসাবে তাদের আড্ডায় ঢুকবে।

কিন্তু না, কোন মোড়েই তার গাড়ি আক্রান্ত হলো না। পেছনের গাড়ি তাকে একইভাবে অনুসরণ করেছিল। বাড়ির এলাকায় পৌঁছে গিয়েছিল আহমদ মুসা। বাড়ি আর বেশি দূরে নয়।

হঠাৎ আহমদ মুসার মনে হয়েছিল গ্রেট বিয়ার তার ঠিকানা উদ্ধার করতে চাচ্ছে।

এই চিন্তা মাথায় আসার সংগে সংগেই আহমদ মুসা তার প্ল্যান পালটে ফেলেছিল। সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সামনের মোড়ে গিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে অনুসরণ করবে পেছনের গাড়িটাকে। শত্রু ধরতে পারলে ভাল, অনুসরণ করে শত্রুর ঘাটির সন্ধান পেলে আরও ভাল।

মোড়ে পৌঁছে আহমদ মুসা গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে অনুসরণকারী গাড়িটির পিছু নিয়েছিল।

আহমদ মুসার আশংকা হয়েছিল, সে গাড়িটিও ঘুরে আহমদ মুসার পিছু নেয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু তা হলো না। গাড়িটি স্বাভাবিক গতিতেই সামনে চলতে লাগল।

খুশিই হয়েছিল আহমদ মুসা শত্রুর গাড়িটিকে অনুসরণ করার সুযোগ পেয়ে।

কিন্তু অল্প কিছুদুর যেতেই ঘটনাটি ঘটেছিল।

একটা গাড়ি পাশাপাশি আসতে দেখে আহমদ মুসা সেদিকে অভ্যাস বসেই তাকিয়েছিল। তাকিয়েই দেখতে পেয়েছিল একটা রিভলবার উঠে আসছে। রিভলবারের নল জানালার দিকে।

সংগে সংগেই আহমদ মুসা মাথে নুইয়ে স্টেয়ারিং হুইলের উপর ঝুঁকে পড়েছিল।

আর তার সাথে সাথেই একটা গুলি জানালার কাঁচ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে বিপরীত দিকের জানালা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। আহমদ মুসা মাথা না নোয়ালে গুলির আঘাতে তার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত।

আহমদ মুসার গাড়ির গতি বেঁকে গিয়েছিল। ধাক্কা দিতে যাচ্ছিল পাশের লেনের গাড়িকে। মাথা নিচু রেখেই আহমদ মুসা সামলে নিয়েছিল গাড়িকে।

আহমদ মুসা একটু মাথা তুলে দেখছিল, গুলি বর্ষণকারী গাড়িটি বেশ একটু সামনে এগিয়ে গেছে।

আহমদ মুসা নিজের গাড়িটিকে সামনের ঐ গাড়ির লেনে নিয়ে তার পিছু নেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিয়েছিল আহমদ মুসা।

পরক্ষণেই একটি বুলেট এসে বিদ্ধ হয়েছিল আহমদ মুসার গাড়ির সামনের চাকায়।

হুমড়ি খেয়ে পড়ে গাড়িটা উলতে গেল।

গাড়ির ভীড় জমে গিয়েছিল। পুলিশ এসেছিল।

পুলিশই উল্টে যাওয়া গাড়ি থেকে বের করেছিল আহমদ মুসাকে।

কে একজন আহমদ মুসার গাড়িতে গুলি বর্ষণকারী গাড়ির নাম্বার পুলিশকে জানাল। পুলিশ নাম্বারটি টুকে নিতে নিতে বলেছিল, 'ক্রিমিনালদের নাম্বার সব সময় ভুয়াই হয়ে থাকে।'

পুলিশ জিজ্ঞেস করেছিল আহমদ মুসাকে সে প্রতিপক্ষ সম্পর্কে কিছু জানে কিনা। 'না' জবাব দিয়েছিল আহমদ মুসা।

ভ্রুর উপরে কপালের একটা জায়গা কেটে যাওয়া ছাড়া আর কোন ক্ষতি হয়নি আহমদ মুসার।

পুলিশই একটা ট্যাক্সি ডেকে আহমদ মুসাকে তুলে দিয়েছিল। বলেছিল, 'মনে হয় ওদের মতলব হত্যা করা অথবা কিডন্যাপ করা দু'টোই ছিল। কিন্তু গাড়ির ভীড় এবং পুলিশ দেখে কিছুতা এগুনর পর আবার পিছিয়ে গেছে।'

অন্যদিকে গ্রেট বিয়ারকে খুঁজে পাবার আরেকটি উদ্যোগ আহমদ মুসার ব্যর্থ হয়েছিল।

রাত ১১টায় বাসায় ফিরেছিল আহমদ মুসা। গেটে ঢুকতেই ছুটে এল দারোয়ান তার কাছে। ভীত কণ্ঠে বলল, 'স্যার পুলিশ এসেছিল, বাড়ি সার্চ করেছে।'

'পুলিশ এসেছিল? বাড়ি সার্চ করেছে?'

'জি হ্যাঁ।' বলল দারোয়ান।

আহমদ মুসা ছুটে গিয়েছিল বাড়ির ভেতরে।

দেখে, বাড়ির সুটকেস, আলমারি, ড্রয়ার প্রভৃতি কোন জিনিসই আস্ত নেই। মনে হয় আতিপাতি করে তারা কি যেন খুঁজেছে।

স্তম্ভিত হয়ে আহমদ মুসা সোফায় বসে পড়েছিল। পুলিশ তার বাসায় এভাবে আসবে! আসতে পারে, কিন্তু এভাবে কি খুঁজছে তারা! আহমদ মুসার পরিচয়মূলক কোন কাগজ? হতেও পারে।

দারোয়ান, এটেনডেন্টদের জিজ্ঞাসাবাদ করে কোন হদিস পাওয়া যায়নি।

পুলিশের বুকের নেমপ্লেটে তাদের নাম দেখা তো দূরের কথা, পুলিশদের মুখও তারা দেখতে পায়নি। ফেল্ট হ্যাটে মুখ নাকি ঢাকা ছিল।

রাতে ভাল ঘুম হয়নি আহমদ মুসার। পুলিশ কি তাহলে তার পরিচয় জেনে ফেলেছে?

সকালে উঠেই ভীষণ একটা দুঃসংবাদ পেল আহমদ মুসা।

টেলিফোন ডোনার। কান্নায় ভেঙ্গে পড়া তার কণ্ঠ।

বলল, সর্বনাশ হয়ে গেছে। আব্বাকে কারা কিডন্যাপ করেছে।

'কিডন্যাপ করেছে?' প্রায় চিৎকার করে উঠল আহমদ মুসা।

'আমাকেও কিডন্যাপ করতে ওরা এসেছিল। কিন্তু আমার গুলিতে ওরা চারজন মারা গেছে।'

'চারজন মারা গেছে। ওদের লাশ?'

'এই মাত্র পুলিশ নিয়ে গেল।'

'পুলিশ কখন এসেছিল?'

'ঘটনার পরপরই, টেলিফোন পেয়ে। খোদ পুলিশ কমিশনার এসেছিলেন।'

'যারা মরেছে, তাদের চেহারা?'

'তারা চারজনই রুশ।'

'রুশ?' আহমদ মুসার কণ্ঠে সীমাহীন বিস্ময়।

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা ডোনার বাসার দিকে ছুটল।

বাসাই গিয়ে আহমদ মুসা দেখল সেই একই দৃশ্য। ঘরের সব কিছু লন্ড-ভন্ড। পাগল হয়ে কি যেন খুঁজছে তারা।

কি খুঁজছে তারা? কে কিডন্যাপ করতে চেয়েছিল ডোনাকে? কেন কিডন্যাপ করেছে তার বৃদ্ধ আব্বাকে?

সোফায় বসে দু'হাতে মাথা চেপে ধরে এসব কথাই ভাবছিল আহমদ মুসা।

সামনের সোফায় বসে রুমাল দিয়ে ঘন ঘন চোখ মুছছিল ডোনা।

মোবাইল টেলিফোনটি বেজে উঠল আহমদ মুসার।

টেলিফোন ধরল।

জেনেভা থেকে মিঃ গটেফের টেলিফোন।

'আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন মিঃ গটেফ, আপনারা?' কথা শুরু করল আহমদ মুসা।

'সবাই আমরা ভাল। গুরুত্বপূর্ণ খবর আছে। গতকাল থেকে আপনাকে ধরার চেষ্টা করছি। পাইনি।'

'কি খবর বলুন। দ্রুত জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।'

'সম্ভবত ৭ দিন আগে কয়েকটি কাগজে একটি বিজ্ঞাপন দেখলাম। বিজ্ঞাপনটি প্রচার করেছেন প্রিন্সেস তাতিয়ানার পরিবারের পক্ষ থেকে প্রিন্সেস ক্যাথারিন। বিজ্ঞাপনে তাতিয়ানাকে জরুরী প্রয়োজনে অবিলম্বে একটি পোস্ট বক্স নাম্বারে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। গতকাল বিকেলে আমি ভয়াবহ খবর পেলাম। প্রিন্সেস ক্যাথারিনের ঐ পক্ষ ব্লাক ক্রস ও জেনেভা পুলিশের সাথে যোগাযোগ করে প্রিন্সেস তাতিয়ানা নিহত হয়ার সময়ের গোটা ভিডিও টেপ হস্তগত করেছে। ব্লাক ক্রস – এর ষড়যন্ত্র ও অপরাধ আড়াল করাক জন্যে তারা এই খবর সংবাদপত্রে যেতে দেয়নি।'

খবরটা চমকে দিল আহমদ মুসাকে। একটি ঢোক গিলে সে বলল, 'আপনাদের কোন সমস্যা হয়নি তো? কোন বিপদ হয়নি তো আপনাদের?'

'ও ভিডিওতে আমাদের পাবে না। আমরা ভাবছি আপনার কথা। ভিডিও তো সব প্রকাশ করে দিল।'

আহমদ মুসা মিঃ গটেফের সাথে কথা শেষ করে টেলিফোনটা সোফায় ছুড়ে দিয়ে সোফায় হেলান দিয়ে বলল, ‘রহস্যের জট খুলেছে ডোনা জোসেফাইন।’

চোখ মুছে সোফায় সোজা হয়ে বসে ডোনা বলল, ‘কোন রহস্য?’

‘আমার বাসায় ও তোমাদের বাসায় গত রাতে এসেছিল গ্রেট বিয়ারের লোকেরা। হতে পারে তাদের সহযোগী রূপে এসেছিল ব্লাক ক্রসেরও কেউ।’

‘তারা কেন আসবে আমাদের বাড়িতে?’

‘তাতিয়ানার আংটি এবং তার ডায়েরীর সন্ধানে।’

‘কেন ভাববে তারা যে ওগুলো এখানে পাওয়া যাবে?’

‘যে ঘরে আমি বন্দী ছিলাম, যে ঘরে তাতিয়ানা নিহত হয়, সে ঘরের সবকিছু ভিডিও হয়েছে ব্লাক ক্রসের গোপন ক্যামেরায় এবং সেটা পুলিশের হাতে পড়ে। পুলিশের কাছ থেকেই উদ্ধার করেছে গ্রেট বিয়ার। সে ভিডিওতে তুমি আছ এবং সব কথাই আছে।’

‘ও আল্লাহ! তাহলে আংটি ও ডায়েরী না পেয়ে আব্বাকে পণবন্দী হিসেবে নিয়ে গেছে এবং আমাকেও কিডন্যাপ করতে চেয়েছিল?’ কান্না জড়িত কণ্ঠে বলল ডোনা।

‘হ্যাঁ, তাই। তারা প্রথমেই খুঁজেছে আমার বাড়ি। না পেয়ে হানা দিয়েছে তোমাদের বাড়িতে। ঠিকই বলেছ, পণবন্দী করেছে ও দু’টি জিনিস উদ্ধারের জন্যে।’

বলে একটু থেমে আহমদ মুসা বলল, ‘ওরা অনেক লোক এসেছিল এক সাথেই সব ঘরে প্রবেশ করেছিল ওরা। আল্লাহর হাজার শোকর যে তুমি আত্মরক্ষা করতে পেরেছ।’

‘আলহামদুলিল্লাহ। পেরেছি নয়, আল্লাহ পারিয়েছেন। ঘুম ধরছিল না। জানালা দিয়ে কাউকে প্রবেশ করতে দেখে বালিশের তলা থেকে রিভলবার হাতে তুলে নেই। বাঁচার জন্যেই গুলী চালিয়েছিলাম। আব্বা এ সুযোগ পাননি। রাতে বরাবরই তার ভাল ঘুম হয়।’

বলে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ডোনা।

‘ডোনা এখন তোমাকে সাধারণ ডোনা জোসেফাইন থেকে অসাধারণ মারিয়া জোসেফাইন হতে হবে। এখন শোক নয় শক্তি দরকার। শত্রুর কবল থেকে তোমার আব্বাকে উদ্ধার করতে হবে।’

একটু থামল আহমদ মুসা। সোজা হয়ে বসল সোফায়। বলল, ‘ভয় নেই। ওঁর কোন ক্ষতি ওরা করবে না। ওদের টার্গেট এখন আমি। জানে ওরা, আমার কাছে সেই ডায়েরী এবং আংটি আছে। আমাকে হাতে পাওয়ার জন্যে তোমার আব্বাকে পণবন্দী হিসেবে ব্যবহার করবে। আমি আজই ওদের কাছে গিয়ে হাজির হলে কালই তাঁকে ছেড়ে দেবে আমার ধারণা।’

ডোনা তার অশ্রু সিক্ত ও বেদনা ভরা মুখ তুলে তাকাল আহমদ মুসার দিকে।

সোফা থেকে উঠে ডোনা ধীরে ধীরে এসে বসল নিচে আহমদ মুসার পায়ের কাছে। তার একটি কম্পিত হাত আহমদ মুসার একটি পা স্পর্শ করল। বলল, ‘কিন্তু তা তুমি পার না। ডোনা বা তোমার ভাষায় মারিয়া জোসেফাইনের আব্বাকে বাঁচানো তোমার মিশন নয়। এমনকি প্রিন্সেস ক্যাথারিনের কাছে ডাইরী ও আংটি পৌঁছানোর যে কথা তুমি তাতিয়ানাকে দিয়েছ সেটাও একটা প্রতিশ্রুতি, তোমার মিশন নয়। এ সবের জন্যে জীবন বিপন্নকারী কোন ঝুঁকি নিতে আমি তোমাকে দেব না। একটা ওয়াদা পালন করতে এসে কয়েক বার তুমি মৃত্যুর মুখে গিয়ে পড়েছ, একে আমি সংগত বলে মেনে নিতে পারছি না।’

আহমদ মুসা আলতো করে ডোনার মাথায় সান্ত্বনার হাত রেখে আস্তে করে পা টেনে নিল। বলল গম্ভীর কণ্ঠে, ‘মুসলমানরা যখন আল্লাহর ওয়াস্তে ভাল কাজের প্রতিজ্ঞা ও মন্দ কাজের প্রতিরোধের পক্ষে কাজ করে, তখন সেটাও ইসলামের মিশনের মধ্যে পড়ে। তাতিয়ানাকে যখন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তখন সেটা ছিল নিছক একটা প্রতিশ্রুতি পালনের ব্যাপার। কিন্তু এখন সেটা দাঁড়িয়েছে ভয়াবহ এক জালেম গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মজলুমকে সাহায্য করার ব্যাপার। মিঃ প্লাতিনি, তোমার আব্বা, প্রিন্সেস ক্যাথারিনের মতই জালেমদের হাতে বন্দী। অতএব তুমি বলতে পার না আমি আমার মিশনের বাইরে গেছি।’

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা বলল, ‘প্যারিসে তোমার থাকার এমন জায়গা কি আছে যার সন্ধান বাইরের কেউ জানবে না?’

‘আমাদের সব বাড়ি, সব ফ্ল্যাট এবং সব আত্মীয়ের বাড়ির খবর জানা। একথা বলছ কেন?’

‘গ্রেট বিয়ার হন্যে হয়ে উঠেছে। তাদের সাথে ব্লাক ক্রস যোগ দিয়েছে। সুতরাং সাবধান হওয়ার প্রয়োজন আছে। আমি মনে করি তোমাকে এখান থেকে সরতে হবে। যেতে পার কোথায়?’

‘ক’দিন পর আমার পরীক্ষা। কোথাও সরা আমার ঠিক হবে না।’

‘কিন্তু তোমার জন্যে দ্বিতীয় আক্রমন হতেও পারে।’

‘তুমি কি সরছ?’

‘না। আমি চাই ওরা আসুক। যে কোন ভাবে ওদের সাক্ষাত আমার দরকার।’

‘তাহলে তুমি এখানে চলে এস। তুমি এলে ওদের টার্গেট চেঞ্জ হয়ে যাবে।’

আহমদ মুসা কোন জবাব দিল না।

ডোনাও সংগে সংগে কথা বলল না। একটু সময় নিয়ে ডোনাই আবার মুখ খুলল। ধীরে ধীরে বলল, ‘আমি জানি আমাদের এটুকু মেলামেশাও সীমালজ্ঘন ইসলামের দৃষ্টিতে। কিন্তু বল, আব্বা নেই, আমার আশ্রয় এখন কোথায়? অন্য কোথাও যেতে বলছ? সেখানে তো পর্দা লজ্ঘন আরও বেশি হবে।’

থামল ডোনা।

আহমদ মুসার পায়ের কাছ থেকে উঠল ডোনা। আহমদ মুসার কাছ থেকে একটু দূরে সোফায় বসল। ধীরে ধীরে আবার শুরু করল, ‘আমার খালাম্মা এসেছেন। আমি তিনতলায় ওঁর কাছে থাকব। তুমি দু’তলায় এসে উঠতে পার না? মনে কর, তিন তলা একটা বাড়ি, দু’তলা ভিন্ন একটা বাড়ি।’

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘শুধু দূরে থাকাই যেমন পর্দা নয়, তেমনি শুধু কাছে থাকাও পর্দাহীনতা নয়।’

‘আমি সে কথাই বলছি। আমি যদি পর্দা সমেত মাঠ-ঘাট বিশ্ববিদ্যালয় সব জায়গাতেই যেতে পারি, তাহলে তোমার কাছেও আসতে পারি।’

‘তোমার এখানে পুলিশ গিজগিজ করছে। পুলিশও তো গোপনে গোপনে আমাকে খুঁজছে, তুমি তা জান?’

‘কেউ জানবে না তুমি এসেছ। বাড়ির আন্ডার গ্রাউন্ড প্যাসেজ দিয়ে তুমি যাতায়াত করবে। প্যাসেজটি গিয়ে উঠেছে পাশেই আমাদের বাগান বাড়ির বাংলোতে। ওখানে পুলিশ পাহারা নেই। ওখান দিয়ে যাতায়াত করলে বাড়ির দারোয়ানও জানবে না, পুলিশতো দূরে থাক।’

‘ধন্যবাদ। এখন উঠি?’

‘কিছু যে বললে না?’

‘বলার কি আছে, আমি তো এসেই গেছি।’

ম্লান মুখে ঠোঁটে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল ডোনার।

ডোনা উঠল। বলল, ‘চল নাস্তা দিয়েছে টেবিলে খাবে।’

নাস্তা খেতে বসে আহমদ মুসা বলল, ‘তোমার নাস্তা কই?’

‘এটা তো দু’তলা আমার নাস্তা তিনতলায়।’

‘ব্যবস্থা তাহলে আগেই করে রেখেছ?’

‘কারণ গরজটা আমার বেশি।’

আহমদ মুসা চামচটা হাতে তুলে নিয়েছিল। প্লেটে তা রেখে সোজা হয়ে বসে বলল, ‘না ডোনা তুমি ঠিক বলনি। গরজ আমারই বেশি হওয়া উচিত। তোমাদের পারিবারিক অশান্তি বিপর্যয় আমার জন্যেই।’ গম্ভীর কণ্ঠস্বর আহমদ মুসার।

ডোনা ধীরে ধীরে এসে আহমদ মুসার চেয়ারের পেছনে দাঁড়াল। দু’হাত দিয়ে চেয়ারের পেছনটা জরিয়ে ধরে আহমদ মুসার মাথার উপর ঝুঁকে পড়ে বলল, ‘না তোমার জন্যে নয় এ আমার সৌভাগ্যের মুল্য। আমি আরও যে কোন মুল্য দিতে রাজি আছি।’

কান্নায় রুদ্ধ হয়ে এল ডোনার কণ্ঠ। দু’ফোটা অশ্রু নেমে এল তার গন্ড বেয়ে।

আহমদ মুসা চামচ হাতে তুলে নিয়ে বলল, ‘তোমার এ ত্যাগ আমার সৌভাগ্যের ফল।’

ডোনা তার মাথাটা চেয়ার ধরে রাখা নিজের বাহুর উপর রেখে অস্থির কণ্ঠে বলল, ‘নানা এই ত্যাগের কথা বলো না। মেইলিগুলি (আমিনা) আপার চেয়ে বড় ত্যাগ তোমার জন্যে আর কেউ করতে পারে না।’

‘ধন্যবাদ ডোনা, বড়কে বড় বলাও বড় হওয়ার লক্ষণ।’

ডোনা সোজা হয়ে দাঁড়াল। চোখ মুছল। বলল, ‘বড়কে বড় বললেই বড় হওয়া অত সহজ নয়। ধন্যবাদ। তুমি নাস্তা খেয়ে নাও আমি আসছি।’

বলে ডোনা তিনতলা সিঁড়ির দিকে হাঁটতে লাগল।

প্রচুর ঘুমাল আহমদ মুসা। এটেনডেন্ট ডেকে না দিলে মাগরিবের নামাজ কাজা হয়ে যেত।

আহমদ মুসা নামাজ পড়ে চা খেয়ে ঘড়ির দিকে চাইছিল আর অস্থিরভাবে পায়চারী করছিল। মাঝে মাঝে তিনতলার সিঁড়ির দিকে চাইছিল।

ডোনা নামল তিনতলার সিঁড়ি দিয়ে। গায়ে সোনালী গাউন পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত নামানো। মাথায় সাদা রুমাল জড়ানো। মুখে কোন প্রসাধনী নেই।

তাকে দেখে মনে হচ্ছে ঝড়ে বিধ্বস্ত, কিন্তু বৃষ্টি স্নাত একটি স্নিগ্ধ ফুল।

আহমদ মুসার কাছাকাছি এসে বলল, ‘তোমার ঘুমটা আজ একটু অস্বাভাবিক হয়েছে। এটেনডেন্টকে না পাঠালে তোমার নামায কাজা হতো।’

‘অনেক ঘুমাবো নিয়ত করেই শুয়েছিলাম। কিন্তু প্রয়োজনের বেশি হয়ে গেছে।’

‘অসময়ে এই ঘুম কেন? মনে হচ্ছে তুমি কোথায় বেরুবে?’ ডোনার কণ্ঠে উদ্বেগ।

‘ঠিকই বলেছ। তোমাকে আজ রাত খুব সাবধানে থাকতে হবে। আমি কখন ফিরব বলতে পারি না।’

‘কোথাও যাচ্ছ তুমি?’

‘হ্যাঁ, বেরুব।’

‘কোথায়?’

‘ওলগাকে তুমি জান। রুশ রাষ্ট্রদূতের মেয়ে। ও আমাকে একজন রহস্যময়ী নারীর ঠিকানা দিয়েছে। তার কাছ থেকে কোন তথ্য পাওয়া যেতে পারে।’

‘কে সেই রহস্যময়ী নারী?’

‘মিস লিন্ডা, সাঁজেলিজের পার্ল রেস্টুরেন্টের আবাসিক পরিচালিকা।’

‘পার্ল রেস্টুরেন্ট? ওটা তো এক শ্রেণীর টাকাওয়ালা ও ক্রিমিনালদের আড্ডা। ওলগার কি করে পরিচয় হলো তার সাথে?’

আহমদ মুসা ডোনাকে কাহিনীটি জানিয়ে বলল, ‘আমার ধারণা মিথ্যা না হলে মায়োভস্কির বিশ্বাসঘাতক সাজার পেছনে মিস লিন্ডা কিংবা তার পরিচিত কারো ভুমিকা রয়েছে।’

ডোনা কিছু ভাবছিল। তৎক্ষণাৎ কোন কথা বলল না।

একটু চিন্তা করে ধীরে ধীরে বলল, ‘ওটা খুব শক্ত জায়গা, শক্ত জায়গার মেয়েটা আরও শক্ত হবে। তোমার ওখানে একা যাওয়া ঠিক হবে না।’

‘কিন্তু যে কোন প্রকারে হোক গ্রেট বিয়ারের কাছে পৌছাতে হবে। মিঃ প্লাতিনিকে আজ কিডন্যাপ করেছে তো, কোন পাকাপোক্ত ব্যবস্থায় আজ তারা নিতে পারেনি বলেই আমার বিশ্বাস। এটাই উপযুক্ত সুযোগ।’

‘কিন্তু একা নয়...।’

আহমদ মুসা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, ‘সাইমুমের লোকেরা আমাকে সাহায্য করছে। গত কয়েক ঘণ্টা তারা কাজ করে মিস লিন্ডা সম্পর্কে মুল্যবান কিছু তথ্য আমাকে জানিয়েছে। তারা আমার অভিযানের আশে-পাশে থাকবে। ভয় করো না তুমি।’ বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

‘শুধুই মিস লিন্ডার ওখানে, না আরো কোথাও?’

‘সেটা নির্ভর করছে মিস লিন্ডার কাছ থেকে আমি কি পাচ্ছি।’

বলে আহমদ মুসা সামনের দিকে পা বাড়াল।

ডোনার মুখ ভারী হয়ে উঠেছে। একটা অসহায় ভাব ফুটে উঠেছে তার চোখে-মুখে। সে কম্পিত কণ্ঠে বলল, ‘ফি আমানিল্লাহ।’

প্যারিসের শিন নদীর উত্তর তীরে নদীর ধার ঘেঁষে বিশাল বাগান ঘেরা বাড়ি।

বারিটা চার তলা। চারতলার একটা কক্ষ।

কক্ষে একটা বড় টেবিলে একটা রিভলবিং চেয়ারে বসে গ্রেগরিংকো।

তার সামনে বসে ম্যালেনকভ।

উস্তিনভ ও মায়োভস্কির নিহত হওয়ার পর তাদের জায়গায় এসেছে ম্যালেনকভ। এই মাত্র এসে পৌঁছল সে প্যারিসে। আসার পর এই প্রথম সাক্ষাত গ্রেগরিংকোর সাথে।

কথা হচ্ছিল দু'জনের মধ্যে।

টেবিলে প্রচণ্ড মুষ্ঠাঘাত করে গ্রেগরিংকো বলল, 'কি আর বলব। সব অপদার্থের দল। পাঠিয়েছিলাম ওদের আহমদ মুসার বাসা থেকে ডায়েরী ও আংটি সমেত আহমদ মুসাকে আটক করতে। ডায়েরী ও আংটি না পেলে আহমদ মুসাকে ধরে নিয়ে আসবে যে কোন মূল্যে। কথা ছিল, আহমদ মুসার বাসায় তাকে এবং ডায়েরী ও আংটি না পেলে প্রিন্স স্যার প্লাতিনির বাসাও সার্চ করা হবে এবং সেই সময় আহমদ মুসার বাসায় একদল তার জন্যে ওঁৎ পেতে থাকবে। প্রিন্সেস মারিয়া কিংবা তার আব্বা প্রিন্স প্লাতিনিকে ধরে আনার কথা মোটেও ছিল না।'

'শুনলাম প্রিন্সেস মারিয়ার হাতে চারজন নিহত হওয়ার প্রতিশোধ বশেই হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে মিঃ প্লাতিনিকে কিডন্যাপ করেছে।' বলল ম্যালেনকভ।

'তা করেছে। কিন্তু ফলাফলটা দেখ। ফরাসি পুলিশ গ্রেট বিয়ারের শত্রু ছিল না। বরং ব্লাক ক্রস আমাদের সহায়তা করায় পুলিশও আমাদের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ব্লাক ক্রস এবং পুলিশ দুই-ই এখন ক্ষেপে গেছে মিঃ প্লাতিনিকে কিডন্যাপ করায়।'

'কিন্তু ব্লাক ক্রস তো আহমদ মুসার ঘোরতর শত্রু।' ম্যালেনকভ বলল।

‘তা শত্রু ঠিকই আছে। কিন্তু এখানে জাতীয়তাবাদী চিন্তা মূখ্য হয়ে উঠেছে। হাজার হোক তাদের রাজ পরিবার, তাদের প্রিন্স। তাদের গায়ে আমরা হাত দেব কেন? আহমদ মুসাকে ধরে মেরে টুকরো টুকরো করলে তারা খুশি হবে। তারা মনে করে, আহমদ মুসা তাদের প্রিন্সেসকে হিপনোটাইজ করেছে। এ থেকে প্রিন্সেসকে তারা মুক্ত করতে চায়।’

‘এখন কি করা যাবে? তাকে ছেড়ে দেয়া হবে?’

‘ছেড়ে দিতে হবেই। তবে মহামান্য আইভান দি টেরিবল জানালেন, যখন কিডন্যাপ করাই হয়েছে তখন তার কাছ থেকে কিছু আদায় করার আগে নয়। অন্তত আহমদ মুসাকে হাতে পেতে তার সাহায্য পাওয়া যায় কিনা দেখতে হবে।’

‘চেষ্টা কি কিছু হয়েছে?’

‘সকাল থেকেই চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু কোন ফল হয়নি। প্রিন্সেস তাতিয়ানার দেয়া ডায়েরী ও আংটি সম্পর্কে তিনি পরিস্কার বলেছেন, ও দু’টি জিনিস প্রিন্সেস তাতিয়ানা দিয়েছে প্রিন্সেস ক্যাথারিনকে দেবার জন্যে। প্রিন্সেস ক্যাথারিনকে না পাওয়ায় নিশ্চয় জিনিস দু’টি আহমদ মুসার কাছে রয়েছে। সামান্য দু’টি জিনিস নিয়ে আমি কখনই কিছু ভাবিনি, জিজ্ঞেসও করিনি। এরপর ওঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসার কি থাকে?’

‘আর আহমদ মুসা সম্পর্কে মিঃ প্লাতিনি মিঃ বলেছেন?’

‘বলেছেন, তার সাথে তাঁদের দৈবক্রমে পরিচয়। আহমদ মুসা তাঁদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ড।’

‘তার সাথে তাঁর মেয়ের সম্পর্কের কথা তোলেননি?’

‘বলেছি। তিনি বলেছেন, ব্যাপারটা আমার মেয়ের ব্যক্তিগত। আমার মেয়ে সাবালিকা। অসংগত না হলে তার অধিকারে আমরা হস্তক্ষেপ করি না।’

‘তারপর?’ বলল ম্যালেনকভ।

‘আমি তাকে বলেছিলাম, আহমদ মুসা আমাদের শত্রু। তাকে কিভাবে আমরা হাতে পেতে পারি, আমাদের সাহায্য করুন। তিনি বলেন, আপনাদের কেন শত্রু তা আপনারাই জানেন, আমাদের শত্রু তিনি নন।’ আমি বলি, ‘সে আমাদের

দু'জন নেতাসহ প্রায় অর্ধ শতাধিক লোক হত্যা করেছে। সুতরাং এই ক্রিমিনালকে আমাদের হাতে তুলে দেয়া আপনার দায়িত্ব।' তিনি বললেন, 'আহমদ মুসা পুতুল নয় যে আপনাদের হাতে আমি তাকে তুলে দিতে পারি। দ্বিতীয়ত, সে ক্রিমিনাল কিনা সে রায় দেবার দায়িত্ব আপনাদেরও নয়, আমারও নয়। হত্যা মাত্রই ক্রাইম নয়।'

'এই তার পরিস্কার কথা।'

'তার কাছ থেকে নিছক জিজ্ঞাসাবাদ দ্বারা কিছুই পাওয়া যাবে না আমি নিশ্চিত।'

'কথা আদায়ের অন্য পন্থা সম্পর্কে কিছু চিন্তা করেছেন?'

'তাতেও ফল হবে কিনা আমি নিশ্চিত নই। তার বয়সে তার মত লোক ভাঙ্গে কিন্তু মচকে না। তার উপর সাধারণ তিনি নন, বুবুঁ রাজ বংশের তিনি রাজপুত্র। মাঝখানে তাঁর গায়ে হাত দেয়ার কথা প্রকাশ হলে বা তাঁর কিছু হলে গ্রেট বিয়ার বিপদে পড়বে। গ্রেট বিয়ারের মিশনের জন্যে তা শুভ হবে না।'

'তাহলে উপায়?'

'উপায় হলো, যে কোনভাবে, যে কোন মুল্যে আহমদ মুসাকে আমাদের হাতের মুঠোয় আনতে হবে। তাকে হাতে পেলে ডায়েরী ও আংটিও হাতে পাওয়া যাবে।'

'তাকে কয়েকবার হাতে মুঠোয় পেয়েও তো রাখা যায়নি।'

'যাই হোক, সে আমাদের সম্মিলিত শক্তির চেয়ে বড় নয়।'

'সেটাই ভরসা। আচ্ছা তাকে কি আড়াল থেকে কেউ সাহায্য করছে? আমাদের রুশ সরকার কিংবা অন্য কেউ?'

'মনে হয় না। আমাদের রুশ সরকার মানে আমাদের এখানকার রুশ দূতাবাস তাকে সাহায্য করা দূরে থাক তারাই ওঁর সাহায্য চাচ্ছে।'

'আহমদ মুসা কোথায় থাকছে?'

'আমরা খবর পেয়েছি, গত রাতে আমাদের গরধভরা প্রিন্স প্লাতিনির বাড়িতে অপারেশন করেছে, তখন আহমদ মুসা তার বাড়িতে দিব্যি ঘুমাচ্ছিল।

আহমদ মুসার বাড়ি থেকে আমাদের লোকেরা চলে এসেছে রাত এগারটার দিকে। তারা চলে আসার পর পরই আহমদ মুসা বাসায় ফেরে।'

'আজ কি আমরা তার বাড়িতে যাচ্ছি?'

'সকাল থেকে লোক বসিয়েছি, কিন্তু আহমদ মুসা সকালে সেই যে বেরিয়েছে, তারপর আর ফেরেনি।'

'প্রিন্সেস মারিয়া জোসেফাইন মানে প্রিন্স প্লাতিনির বাড়িতে তো তার যাওয়ার কথা।'

'গিয়েছিল সকালে। দু'ঘণ্টা পর বেরিয়ে গেছে। সেখানেও আর ফেরেনি।'

'চালাকের শ্রেষ্ঠ সে। আমি ভাবছি, আমাদের অতি গুরুত্বপূর্ণ এই মিশনে, সে প্রতিদ্বন্দ্বি হয়ে আসা আমাদের জন্যে দুর্ভাগ্য।'

'তুমি হতাশার কথা বলছ ম্যালেনকভ'।

'আমি হতাশার কথা বলছি, কিন্তু আমি হতাশ নই। আমি জীবন দিয়ে হলেও তাকে পথ থেকে সরানর চেষ্টা করবো।'

'তোমাকে আমি জানি।' বলে গ্রেগরিংকো ইন্টারকমে পি, এ, কে ডাকল। পরে ম্যালেনকভকে লক্ষ্য করে বলল, একটু বস। পি, এ, কে একটা ব্রিফ দেই।

'ঠিক আছে।' বলে ম্যালেনকভ চেয়ার ছেড়ে উঠে সোফায় গিয়ে বসল। হাতে তুলে নিল সেদিনের কাগজ।

বিখ্যাত সাঁজেলিজের পার্ল রেস্টুরেন্ট।

পার্কিং-এ গাড়ি পার্ক করে আহমদ মুসা রেস্টুরেন্টের সুদৃশ্য গেট দিয়ে গট গট করে ভেতরে ঢুকে গেল।

আহমদ মুসার নির্দেশে সাইমুমের লোকেরা পার্ল রেস্টুরেন্ট এবং মিস লিন্ডার বাড়ির অভ্যন্তরীণ ডিজাইন সংগ্রহ করেছিল। এবং আজ রাতে মিস

লিন্ডার প্রোগ্রাম কি তা জোগাড় করেছিল। প্রোগ্রাম অনুসারে এই সময়টা লিন্ডার প্রাইভেট টাইম। সারাদিন প্যারিসের বাইরে কাটাবার পর সে রাত ৮টা পর্যন্ত বিশ্রাম নেবে। আহমদ মুসা এই সময়টাই বেছে নিয়েছে তার সাথে সাক্ষাতের।

রেস্টুরেন্ট বিল্ডিং-এর ৫তলা অর্থাৎ শীর্ষ তলায় মিস লিন্ডার ফ্ল্যাট। ফ্ল্যাটটির একটি নিজস্ব লিফট আছে। আবার রেস্টুরেন্টের লিফট দিয়েও সেখানে যাওয়া যায়। ফ্ল্যাটটির নিজস্ব লিফটটির ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত। ও লিফটটা মিস লিন্ডা এবং তাঁর ব্যক্তিগত লোক ও মেহমানরাই ব্যবহার করে থাকে।

আহমদ মুসা রেস্টুরেন্টের লিফট দিয়ে উঠে প্রবেশ করল মিস লিন্ডার ফ্ল্যাটে।

ফ্ল্যাটের দরজার সাথেই একটা কক্ষ। কক্ষটির দরজা খোলা। ভেতরে একজন তাগড়া যুবক বসে।

আহমদ মুসা দরজার কাছাকাছি হতেই লোকটি ছুটে বেরিয়ে এল।

আহমদ মুসা বুঝল, লোকটি এটেনডেন্ট অথবা নিরাপত্তা প্রহরী হতে পারে।

লোকটির মুখে প্রবল বিরক্তির ছাপ। আহমদ মুসার মুখোমুখি হয়ে বলল, 'এখানে কেন? কে, কি চান আপনি?'

'আমি লিন্ডার কাছে এসেছি। জরুরী প্রয়োজন।'

'রাত ৮টার পর অফিসে আসুন। এ সময় কোন এপয়েন্টমেন্ট তার নেই। উনি রেস্টে আছেন।'

'ঠিক আছে উনি বললে চলে যাব। আপনি শুধু তাকে বলুন একজন বিদেশী জরুরী প্রয়োজনে আপনার সাথে দেখা করতে চান।'

লোকটি এবার পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে আহমদ মুসার দিকে তাকাল। একটু চিন্তা করল। তারপর বলল, 'আপনি একটু দাঁড়ান। আমি ম্যাডামের সাথে কথা বলি।'

সে এগুলো তার কক্ষের দিকে।

পেছনে পেছনে এগুলো আহমদ মুসাও।

সে ঘরের ভেতরে ঢুকতেই আহমদ মুসা তাকে পেছন থেকে জাপটে ধরে তার নাকে ক্লোরোফরম ভেজা রুমাল চেপে ধরল।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই লোকটি সংজ্ঞা হারাল। আহমদ মুসা তাকে ঘরের ভেতরে ঠেলে দিয়ে প্রবেশ করল ঘরে। তার টেবিলের ড্রয়ার খুলল। পেয়ে গেল চাবি।

আহমদ মুসা আনন্দের সাথেই ফ্ল্যাটের দরজায় চাবি লাগাল। খুলে গেল তালা।

ধীরে ধীরে দরজা ফাঁক করল আহমদ মুসা। কিন্তু হঠাৎ দরজাটি তার হাত থেকে ছুটে গেল এবং সম্পূর্ণ খুলে গেল দরজা।

ঘটনাটি এতই আকস্মিক ছিল যে সতর্ক আহমদ মুসাও মুহূর্তের জন্যে বিমুঢ় হয়ে পড়েছিল। যখন তার চোখ সামনে স্থির হল, দেখল, একটি মহিলার হাতে রিভলবার স্থির নিবদ্ধ তার দিকে। আহমদ মুসার রিভলবার তখন ঝুলছে তার ডান হাতে।

হো হো করে হেসে উঠল রিভলবার হাতে মেয়েটি। বলল, 'আমার গেটম্যানকে ক্লোরোফরমে সংজ্ঞাহীন করে আমার সাথে কেমনতরো দেখা করতে চাও তুমি? তুমি নিজেকে খুব চালাক ভেবেছিলে। কিন্তু তোমার মত চালাকদের নাকে দড়ি দেবার জন্যে আমার টিভি ক্যামেরার চোখ আছে সর্বত্র।'

কথা শেষ করেই আবার মিস লিন্ডা বলে উঠল, 'তোমরা বেঁধে ফেল একে। ঠান্ডা ঘরে নিয়ে যাও। ঠান্ডা করে দেখ কি কথা বের হয়। তারপর বুঝে শুনে সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে।'

মিস লিন্ডার কথা শেষ না হতেই আহমদ মুসা তার দু'পাশে তাকাল। দেখল, দু'পাশে দু'জন যুবক দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দেহের গড়ন ও মাসলের কারুকাজ দেখলে মনে হয়, কুস্তি ও মারামারি করাই এদের কাজ। চেহারায় পেশাদার ক্রিমিনালের ছাপ। আহমদ মুসা বুঝতে পারলো না, এরা ভেতরেই ছিল, না আহমদ মুসাকে ঠান্ডা করার জন্যে এদের ডেকে আনা হয়েছে। হতে পারে মিস লিন্ডার নিজস্ব লিফট-পথের এরা  নিরাপত্তা রক্ষী। কোন সংকেত দিয়ে এদের ডেকে আনা হয়েছে।

মিস লিন্ডার কথা শেষ হওয়ার পর ডানদিকের লোকটি আহমদ মুসার পেছনে এসে দাঁড়াল। তার হাতের ডান্ডা মেঝের উপর সশব্দে ফেলে দিয়ে আহমদ মুসার দুই হাত টেনে নিল পিছমরা করে বাঁধার জন্যে।

আহমদ মুসার দৃষ্টি ছিল মিস লিন্ডার রিভলবারের দিকে। দেখল, মিস লিন্ডার তর্জনি রিভলবারের ট্রিগার থেকে সরে গেল এবং তা বুড়ো আঙুলের অগ্রভাগ নিয়ে খেলা করতে লাগল।

আহমদ মুসা সুযোগ নষ্ট করলো না।

তার পা দু'টি ঈষৎ উপরে উঠে মাটির সমান্তরালে বিদ্যুতবেগে ছুটল মিস লিন্ডার পা লক্ষে।

আহমদ মুসার হাত দু'টি তখন পেছনের লোকটির হাতে ধরা। সেও প্রস্তুত ছিল না এমন ঘটনার জন্যে। আহমদ মুসার দেহের প্রবল গতির হ্যাঁচকা টানে সে সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

ওদিকে আহমদ মুসার পা দু'টি তীব্র গতিতে গিয়ে আঘাত করল মিস লিন্ডার হাঁটু ও পায়ের মধ্যবর্তি স্থানে।

আকস্মিক এ আঘাতে মিস লিন্ডাও সামনের দিকে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। পড়ে গেল ঠিক আহমদ মুসার উপরেই।

আহমদ মুসা পড়ে গিয়েই পাশে পড়ে থাকা মিস লিন্ডার রিভলবার তুলেই ডান্ডা হাতে তেড়ে আসা বাম দিকে দাঁড়ানো লোকটিকে গুলী করল। তারপর মিস লিন্ডার মাথায় রিভলবারের নল চেপে ধরে তাকে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসাকে বাঁধতে আসা লোকটি। সে একবার মাথায় গুলী বিদ্ধ তার মৃত সহযোগির এবং একবার মিস লিন্ডার মাথায় তাক করা রিভলবারের দিকে তাকিয়ে একদম চুপসে গেল।

আহমদ মুসা পকেট থেকে ক্লোরোফরম ভেজা রুমাল বের করে লোকটির দিকে ছুড়ে দিয়ে বলল, 'যদি বাঁচতে চাও, তাহলে রুমালটি নাকে চেপে জোরে নিশ্বাস নাও।'

লোকটি একবার তাকাল মিস লিন্ডার দিকে। একবার তাকাল রুমালটার দিকে। রুমাল তুলে নিতে ইতস্তত করতে লাগল সে।

আহমদ মুসা কঠোর কণ্ঠে বলল, 'দেখ আমি দু'বার কাউকে নির্দেশ দেই না। মানুষ হত্যার কাজও খুব অমানবিক। কিন্তু তুমি যদি মুহূর্তকাল নির্দেশ পালন করতে দেরি কর তাহলে তোমার মাথা উড়ে যাবে।'

লোকটি পুতুলের মত নিচু হয়ে ক্লোরোফরম ভেজা রুমাল তুলে নিল, চোখ বন্ধ করে নাকে চেপে ধরে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিল। মুহূর্ত কয়েকের মধ্যেই তার দেহ আছড়ে পড়ল মেঝের উপর। নিঃসাড় হয়ে পরল তার দেহ।

আহমদ মুসা মিস লিন্ডার মাথায় রিভলবারের নলের একটা খোঁচা দিয়ে বলল, 'মিস লিন্ডা যান বাইরের দরজাটা লক করে আসুন।'

মিস লিন্ডা আহমদ মুসার দিকে একবার তাকিয়েই সুবোধ বালিকার মত গিয়ে দরজা লক করে এল।

আহমদ মুসা মিস লিন্ডাকে নিয়ে মিস লিন্ডার ড্রইং রুমে এল। মিস লিন্ডাকে একটা সোফায় বসতে বলে তার সামনের সোফার বসল আহমদ মুসা।

মিস লিন্ডার চোখে-মুখে ভয়ের ছাপ। জড়ো-সরো হয়ে সে সোফায় বসল।

তার সম্পর্কে আহমদ মুসার ধারণা হলো, 'মিস লিন্ডা বড় ধরনের কোন ক্রিমিনাল নয়। সে অপরাধ বা অপরাধীদের একটা মাধ্যম হতে পারে।'

আহমদ মুসা তাঁর হাতের রিভলবারটা পাশের সোফায় রেখে বলল, 'দেখুন মিস লিন্ডা, আপনার সাথে আমার কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই। এ পর্যন্ত যা ঘটেছে তার জন্যে আমি দুঃখিত। গেটম্যানকে যদি আমি ক্লোরোফরম না করতাম, তাহলে আমি ভেতরে ঢুকার সুযোগ পেতাম না, সে ভেতরে ঢুকতে দিত না। আর আপনার এ লোকটি যে খুন হলো, সেটা অবস্থার কারনে। নিজেকে রক্ষার জন্যে এর প্রয়োজন হয়েছে'।

একটু থামল আহমদ মুসা। দেখল, মিস লিন্ডার চেহারা অনেকটা সহজ হয়ে উঠেছে। তাঁর ভয়ের ভাবটা কমে গেছে।

আবার শুরু করল আহমদ মুসা, 'আমার জন্যে খুবই জরুরী, এমন একটা বিষয় আপনার কাছ থেকে জানতে এসেছি মিস লিন্ডা'।

'কে আপনি?' শুকনো কণ্ঠে বলল মিস লিন্ডা।

'আমার নিজস্ব এমন কোন পরিচয় নেই। রুশ রাষ্ট্রদূতের মেয়ে ওলগা আমার বন্ধু। আমি মায়োভস্কি সম্পর্কে কিছু জানতে চাই'।

মিস লিন্ডা নড়ে-চড়ে বসল। মনে হলো তাঁর চোখ-মুখ আর একটু স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। বলল, 'মায়োভস্কি সম্পর্কে আমি কি বলব, আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন কেন?'

'দেখুন মিস লিন্ডা, মিথ্যা কথা বলবেন না। আমার সময় খুব কম। এক কথা আমি দুই বার বলতে পারবো না। মনে রাখবেন'।

'মায়োভস্কি আমাদের রেস্টুরেন্টের খদ্দের ছিলেন। প্রায়ই আসতেন, কিন্তু গত এক বছর ধরে আসেননি'।

'ধন্যবাদ মিস লিন্ডা। আমার জানার বিষয় এটুকুই যে, যিনি নিয়মিত এ রেস্টুরেন্টে আসতেন, তিনি আসা হঠাৎ করে বাদ দিলেন কেন?'

কথা বলল না মিস লিন্ডা।

চোখের নিমিষে আহমদ মুসা পাশ থেকে রিভলবার তুলে নিয়ে গুলী করল। গুলীটা মিস লিন্ডার বাম কানের ঝুলন্ত রিংটা ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেল।

মিস লিন্ডা বাম হাত দিয়ে তাঁর কান চেপে ধরল। কানে গুলী লাগেনি, কিন্তু বিচ্ছিন্ন রিং-এর আঘাতে তাঁর কানের লতি কেটে গেছে। মুখ খুলল সে। বলল, 'আমি রেস্টুরেন্ট চালাই। অনেকের সাথে পরিচয় হয়, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় অনেকের কথা শুনতে হয়'। বলে থামল মিস লিন্ডা।

'বলুন'। তাড়া দিল আহমদ মুসা।

'একজন রাশিয়ান আমাকে বেকায়দায় ফেলে বাধ্য করেছিল এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে যাতে মায়োভস্কিকে একজন আমেরিকান মেয়ের বেড়ে তোলা যায়। কেজিবি'র বিশেষ ক্ল্যাসিফাইড চিহ্ন যুক্ত একটা ফাইল দিয়েছিল আমাকে। ফাইলটি ওদের বেড়ে মেয়েটির পাশে থাকবে। সেই অবস্থায় গোপনে ফটো নিতে হবে। আমি সে ফটো নিয়েছিলাম এবং সেই রাশিয়ানকে দিয়েছিলাম। এই ফটো সে কি করেছিল জানি না, তবে এর পর থেকে মায়োভস্কি আর এ রেস্টুরেন্টে আসেনি। এক উইক এন্ডে তাঁর সাথে দেখা হয়েছিল এক অবকাশ কেন্দ্রে। সে বলেছিল, 'ঐ ঘটনার পর আমি আপনাকে খুন করতাম। কিন্তু চিন্তা

করে দেখেছিলাম, ঐ ঘটনা আমাকে একটা নতুন জীবন দিয়েছে, যা আজ রাশিয়ার জন্যে খুবই প্রয়োজন। সুতরাং আপনি বেঁচে গেছেন। কিন্তু আপনাকে ঘৃণা করি আমি!' বলে সে সরে গিয়েছিল আমার কাছ থেকে'।

'ফটো দিয়ে কি করেছে? ব্ল্যাকমেইল করেছে মায়োভস্কিকে?'

একটুক্ষণ চুপ থেকে আহমদ মুসার দিকে একবার তাকিয়ে বলল, 'বিশ্বাস করুন এই বিষয়টা আমি জানি না'। তাঁর চোখে অসহায়ত্ব ফুটে উঠল।

'আপনি জানেন সে রাশিয়ান কে ছিল?'

'সেটা আমি পড়ে জেনেছি যে, তিনি গ্রেট বিয়ার-এর একজন নেতা'।

'তাঁর সাথে কোথায় আপনার দেখা হতো?'

'এই রেস্টুরেন্টেই'।

'আপনি বেকায়দায় পড়েছিলেন এই রেস্টুরেন্টে নিশ্চয় নয়?'

মুখ নিচু করল। বলল 'ঠিক'।

'আপনাকে বোধহয় ছবিতে কেজিবি'র এজেন্ট প্রমান করেছিল?'

মুখ তুলে তাকাল মিস লিন্ডা আহমদ মুসার দিকে। বিস্ময় তাঁর চোখে। বলল, 'আপনি জানলেন কি করে?'

'অনুমান'।

'কিন্তু সব অনুমান কিভাবে সত্য হয়?'

'হতেও পারে। আমার আরেকটা প্রশ্ন, সেই জায়গাটা কোথায়?'

'একটা বিরাট বাড়ি। তাঁর বাসভবন মনে করে গিয়েছিলাম। কিন্তু কোন 'ফ্যামিলি হোম' বলে মনে হয়নি'।

'কোথায় সে বাড়ি?'

'দ্যগল এ্যাভেনিউ এর ৪ নং স্ট্রিটের ঊনপঞ্চাশ নম্বর বাড়ি'।

'ধন্যবাদ আপনাকে। আর একটা কথা আমি আপনাকে বলব'।

'কি সেটা?'

'আমার সাথে আপনাকে ঐ ঊনপঞ্চাশ নম্বর বাড়ি পর্যন্ত যেতে হবে'।

'কেন, আমি ঠিক বলেছি কিনা তা দেখতে চান?'

'না। আমি ঊনপঞ্চাশ নম্বরে পৌছার আগেই আপনি যাতে তাঁদের খবরটা না দিতে পারেন'।

একটু চুপ করে থাকল মিস লিন্ডা। তারপর বলল, ঠিক আছে'।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়ালো পাশ থেকে রিভলবারটা তুলে নিয়ে।

মিস লিন্ডা উঠতে উঠতে বলল, 'একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'করুন'।

'মায়োভস্কির ঐ কারনেই কি গ্রেট বিয়ারের সাথে আপনার শত্রুতা?'

'না'।

বাইরে বেরুবার দরজার দিকে এগুচ্ছিল মিস লিন্ডা।

আহমদ মুসা তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'আপনার পার্সোনাল লিফটের দিকে চলুন'।

মিস লিন্ডা বিস্মিত চোখ তুলে আহমদ মুসার তাকিয়ে হাটার গতি পরিবর্তন করল। বলল, 'ওদিক দিয়ে বেশি সুবিধা তো!'

'না মিস লিন্ডা। এদিক দিয়েই বেশি সুবিধা। লিফটের মুখেই আপনার গাড়ি দাড়িয়ে আছে'।

আবার তাকাল লিন্ডা আহমদ মুসার দিকে বিস্মিত করে।

'বিস্ময়ের কিছু নেই মিস লিন্ডা আমি সব খবর নিয়েই এসেছি। শুধু জানা ছিল না ভেতরের দুই প্রহরী এবং টিভি ক্যামেরার নেটওয়ার্কের বিষয়টা?'

মিস লিন্ডা আগে আগে চলল। আহমদ মুসা পেছনে।

লিফট থেকে বেরুবার আগে আহমদ মুসা মিস লিন্ডাকে বলল, 'আশা করি কোন চালাকি করবেন না মিস লিন্ডা। আপনি যা যা করতে পারেন তা আমি ভেবেই রেখেছি। সুতরাং কোন ফল হবে না, রক্তপাত ছাড়া'।

একটু থামল। আবার বলল, 'আপনি ড্রাইভ করবেন, আর কোন দিক দিয়ে যেতে হবে তা বলে দিব আমি'।

লিফটের মুখেই গাড়ি দাঁড়িয়েছিল।

লিন্ডা গিয়ে ড্রাইভিং সিটে বসল। আহমদ মুসা বসল পেছনের সিটে ঠিক লিন্ডার পেছনে।

রাস্তায় নেমে এল লিন্ডার গাড়ি।

‘আমার দেখা কোন মানুষের সাথেই আপনার মিল নেই। আপনি কে বলুন তো?’

সামনে থেকে প্রশ্ন ভেসে এল লিন্ডার।

‘সৃষ্টিগতভাবেই একজনের সাথে আরেকজনের মিল নেই’। বলল আহমদ মুসা।

‘আমি আচরনের মিলের কথা বলছি। সব ক্রিমিনালকেই আমি এক জাতের দেখেছি। আপনি ভিন্ন দেখছি’।

‘কেমন?’

‘দেখুন বয়স হবার পর পুরুষের সান্নিধ্যে এসেছি নানাভাবে, নানা প্রয়োজনে তাঁদের প্রত্যেকের চোখে প্রকাশ্য অথবা প্রচ্ছন্ন লোভের আগুন দেখেছি শত্রু মিত্র নির্বিশেষে। সে লোভের আগুনে পুড়তে হয়েছে বার বার। আজই প্রথম দু’টি পুরুষ চোখ দেখলাম যেখানে লোভ নেই, আছে পবিত্রতা। তাই বলছিলাম কে আপনি?’

‘স্রষ্টার আদেশ-নিদেশকে মেনে চলে এমন একজন মানুষ মাত্র’।

দ্যগল অ্যাভেনিয় এর ৪ নং স্ট্রিটের ঊনপঞ্চাশ নম্বর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো  গাড়ি।

আহমদ মুসা গাড়ি থেকে নামল। গাড়ি থেকে নামল লিন্ডাও।

‘না মিস লিন্ডা আপনাকে গাড়ি থেকে নামতে হবে না। আপনি ফিরে যেতে পারেন। আপনাকে ধন্যবাদ’।

‘ধন্যবাদ’ বলে গাড়ির ড্রাইভিং আসনে ফিরে এল লিন্ডা। তাঁর মুখ ফুটে বেরিয়ে এল, ‘এত আত্নবিশ্বাস লোকটির?’

সে আরও ভাবল, আসলে লোকটি কে? গ্রেট বিয়ারের লোক নয়তো, গ্রেট বিয়ারের কোন গ্রুপের! কিন্তু সে তো রুশ নয়, গ্রেট বিয়ারের হবে কেন? তাহলে কে সে? এঁকে পথ দেখিয়ে নতুন বিপদে জড়িয়ে পড়ল না তো লিন্ডা?

লিন্ডা তাড়াতাড়ি গাড়ির টেলিফোন বের করে রিং করল গ্রেগরিংকোকে। বলল, 'সব কথা পড়ে বলব, এখন জরুরী খবর একজন এশিয়ান আপনার গেটে। ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করছে'।

'ধন্যবাদ লিন্ডা' বলে ওপার থেকে টেলিফোনের লাইন কেটে দেয়া হলো।

গ্রেট বিয়ারকে খবরটা দিতে পেরে লিন্ডার মন অনেক পাতলা হলো। কিন্তু চলে যাবার জন্যে গাড়ি ঘুরিয়েও চলে যেতে পারল না সে। মনটা তাঁর খচখচ করতে লাগল। লোকটা শত্রু বটে, লোকটা তাঁর একজন লোককে হত্যা করেছে বটে, কিন্তু এমন সুশীল শত্রু এবং এমন নিরাপদ মানুষ সে দেখেনি। শেষটা না দেখে তাঁর যেতে ইচ্ছা করছে না।

মিস লিন্ডা গাড়ি পার্ক করে ধীরে ধীরে বাড়িটার দিকে এগুলো।

ওদিকে আহমদ মুসা তখন বাড়িটিতে প্রবেশের প্রধান দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাড়িটাতে প্রবেশের এই দরজাই সহজ পথ। দুর্গের স্টাইলে তৈরি বাড়িটা। চারদিক ঘিরে চার তলা স্ট্রাকচার। জানালা ভেঙ্গে চার তলার ছাদে উঠে বাড়িটাতে প্রবেশের একটা ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু আহমদ মুসা বাড়িতে প্রবেশের জন্যে সম্মুখ দরজার স্বাভাবিক পথেই প্রথমে চেষ্টা করার স্বিদ্ধান্ত নিল।

আহমদ মুসা দরজার সামনে দাড়িয়েই দেখতে পেল ডিজিটাল লক দরজায়। লেসার  বীম দিয়ে লক গলিয়ে প্রবেশ করতে হবে এখন তাকে। কিন্তু তাঁর আগে অনেকটা অভ্যাস বশেই দরজার নব ঘুরানোর চেষ্টা করল আহমদ মুসা।

ঘুরে গেল নব। একটা ছোট্ট 'খট' শব্দ করে খুলে গেল দরজা।

তাঁর সংগে সংগেই ছ্যাঁত  করে উঠল আহমদ মুসার বুক।

দরজা খোলা কেন? লিন্ডার ফ্ল্যাটে ফাঁদে পড়ার কথা তাঁর মনে পড়ল।

আকস্মিক সতর্কতায় গোটা দেহ শক্ত হয়ে উঠল আহমদ মুসার। তাঁর বাম হাত দরজার নব যতটা ঘুরিয়েছিল, সেভাবেই ধরে রাখল।

ডান হাতে আহমদ মুসা সাইলেন্সার লাগানো এম-১০ মেশিন রিভলবার দরজার দিকে তাক করল।

তাঁর মনে জিজ্ঞাসা জাগল, তাঁর আসার সুযোগটা গ্রেট বিয়ারের কোনভাবে জানার সুযোগ আছে কি? লিন্ডাকে সাথে নিয়ে এসেছে এ কারনেই যাতে এই খবর পাচারের সুযোগ সে না পায়। লিন্ডাকে গাড়িতে রেখে আসা বোধহয় ঠিক হয়নি। সে তো গাড়ি থেকে কোন সংকেত পাঠাতে পারে। গাড়িতে নিশ্চয় টেলিফোন আছে। এ বিষয়টা তাঁর নজর এড়িয়ে গেছে, ভাবল সে।

আহমদ মুসা এসব চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলল। পেছনের ভাবনাটা তাঁর কোন উপকারে আসবে না। পিছানোর সুযোগ তাঁর নেই, সামনেই এগুতে হবে তাকে।

দরজা খোলা রেখে ভেতরে কি ফাঁদ পাততে পারে তারা? তাকে ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়ে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলতে পারে। অথবা ভেতরে ঢোকার পর তারা তাকে ফাঁদে আটকাতে পারে। অথবা হতে পারে ঘরের চারদিকে তারা ওঁৎ পেতে আছে। ভেতরে ঢুকার সাথে সাথেই চারদিক থেকে গুলীর ঝাক এসে তাকে ঘিরে ধরবে।

আহমদ মুসা তাঁর চিন্তার উপসংহার এইভাবে করল, আহমদ মুসাকে সারপ্রাইজ দেবার জন্যে ওঁরা বসে আছে, উল্টো ওদের সারপ্রাইজ দিতে পারলে সহজ বিজয় লাভ করা যাবে।

আহমদ মুসা বাম হাত দিয়ে দরজার পাল্লা তীব্র বেগে ঠেলে দিল ভেতরে। সেই সাথে ট্রিগারে তর্জনী রেখে এম-১০ মেশিন রিভলবার ঘরের চারদিক একবার ঘুরিয়ে নিয়ে এল। না ঘরে কেউ নেই।

কিন্তু এই না থাকাটাই বেশি বিপজ্জনক মনে হলো আহমদ মুসার কাছে।

আহমদ মুসা দেখল, ঘরটি বিরাট, হলঘর জাতীয়। আয়তকার দু'পাশেও দু'টি দরজার এবং বাইরের দরজা বরাবর সামনে আর একটি দরজা।

দু'পাশের দু'টি দরজা বন্ধ,কিন্তু সামনেই যে দরজাটা দেখা যাচ্ছে, তা খোলা।

মুহূর্ত কয়েক অপেক্ষা করল আহমদ মুসা দরজায় দাড়িয়ে। না, কোন সাড়া শব্দ এল না কোথা থেকেই।

আহমদ মুসা তার রিভলবার বাগিয়ে চারদিকে দৃষ্টি রেখে চলল ঐ খোলা দরজার দিকে। বুঝল, গেটের দরজার তালা খুলে রাখা যে পরিকল্পনার ফল, সেই পরিকল্পনা অনুসারেই সামনের দরজা খুলে রাখা হয়েছে। ফাঁদ থাকলে সেটা সামনে।

ঘরের মাঝ বরাবর যাওয়ার পড়ে হঠাৎ আহমদ মুসার মন যেন বলে উঠল, চারদিক থেকে তাঁর দিকে গুলী ছুটে আসছে।

নিজের অজান্তেই আহমদ মুসা নিজেকে ছুড়ে দিল মেঝের উপর। আর সেই সাথেই তিনটি রিভলবারের গর্জন এক সাথে। সেই সাথে তিনটি আর্ত চিৎকারের শব্দ আহমদ মুসার কানে গেল।

গুলী এসেছিল তিন দিক থেকে-সামনে এবং দু'পাশ থেকে।

আহমদ মুসার চোখ প্রথমেই ছুটে গিয়েছিল সামনের দিকে। দেখল, খোলা দরজার ওপারে করিডোরের মুখে রিভলবার হাতে গ্রেগরিংকো। একটি গুলী তাঁর রিভলবার থেকেই এসেছে। কিন্তু তাঁর বিমূঢ় দৃষ্টি আহমদ মুসাকে পেরিয়ে আরও সামনে।

আহমদ মুসা সময় নষ্ট করল না।

আহমদ মুসা শুয়ে পড়লেও তাঁর রিভলবার ধরা ডান হাত সামনের দিকে প্রসারিত ছিল এবং তর্জনী ঠিকই স্পর্শ করেছিল এম-১০ মেশিন রিভলবারের ট্রিগার।

রিভলবারের নল সামান্য উচু করে ট্রিগারে চাপ দিল আহমদ মুসা। কয়েকটি গুলীর একটি বহর বেরিয়ে গেল মেশিন রিভলবার থেকে।

গ্রেগরিংকো তাঁর বিমূঢ় ভাব কাটিয়ে দ্বিতীয় গুলীর জন্যে ট্রিগার টিপতে যাচ্ছিল। তাঁর আগেই ছুটে আসা গুলীতে ঝাঁঝরা হয়ে গেল তাঁর দেহ।

আহমদ মুসা এক লাফে উঠে গিয়ে সামনের খোলা দরজার পাশে দেয়ালের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর গ্রেগরিংকোর করিডোর দিয়ে আর কেউ আসছে কিনা দেখে নিয়ে পেছনের ঘটনা দেখার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালো।

গেটের দরজার উপর চোখ পড়তেই চমকে উঠল আহমদ মুসা। দেখল দরজার উপর গুলিবিদ্ধ মিস লিন্ডার দেহ। কাতরাচ্ছে সে।

দুই পাশেও তাকাল। দেখল, পাশের দু'টি দরজাও ফাঁক হয়ে গেছে। দুই দরজার সেই দুই ফাকে পড়ে আছে বুকে গুলী বিদ্ধ দুটি দেহ।

অজ্ঞাতেই শিউরে উঠল আহমদ মুসা। তিনটি গুলী সামনে এবং দু'পাশ থেকে তাকে বিদ্ধ করার কথা ছিল। সে শুয়ে পড়ায় দু'পাশ থেকে দু'জন এঁকে অপরের গুলীতে প্রান দিয়েছে। সামনে থেকে গ্রেগরিংকোর গুলীতে প্রান দিয়েছে আহমদ মুসার ঠিক পেছনে দরজায় এসে দাঁড়ানো মিস লিন্ডা।

আহমদ মুসা গ্রেগরিংকোর করিডোরের দিকে আর একবার তাকিয়ে ছুটে গেল মিস লিন্ডার কাছে। তারও একটা পাজর ধসে গেছে গুলীতে।

'একি করেছেন মিস লিন্ডা, আপনাকে না চলে যেতে বলে এলাম'। বলে আহমদ মুসা তাকে পাঁজাকোলা করে তুলতে গেল।

মিস লিন্ডা মাথা নেড়ে নিষেধ করে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, 'বাঁচাবার চেষ্টা করে লাভ হবে না। আমার সময় বেশি নেই। জীবনে অনেক পাপ করেছি। সর্ব শেষ পাপ হল, আপনি এ বাড়িতে ঢুকেছেন সেটা গাড়ি থেকে টেলিফোন করে বলে দিয়েছিলাম গ্রেগরিংকোকে। আমার বিবেক বলছে আপনি একজন ভালো লোক। ইশ্বর আমাকে আমার পাপের শাস্তি দি......য়ে......ছে....ন'।

লিন্ডার কথা অস্পষ্ট হয়ে একদম মিলিয়ে গেল।

আহমদ মুসার হাতের উপরই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল লিন্ডা। আহমদ মুসার আর কিছু জিজ্ঞাসারও অবকাশ হলো না।

আহমদ মুসা তাঁর এম-১০ নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। চারটি লাশের দিকে তাঁর দৃষ্টি আর একবার ঘুরে এল। আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতায় হৃদয় নুয়ে পড়ল আহমদ মুসার। যারা সুযোগ পেয়ে ফাঁদ পেতেছিল আহমদ মুসাকে হত্যার, তারা সবাই নিহত, কিন্তু সে বেঁচে আছে।

আহমদ মুসা বাইরের গেটটা বন্ধ করে দিয়ে গ্রেগরিংকো পড়ে আছে যে করিডোরে, সে করিডোর দিয়ে এগুলো বাড়ির ভেতরে। বাড়িটা একেবারে নিরব-নিস্তব্ধ। আর কেউ নেই বাড়িতে? মন দমে গেল আহমদ মুসার। তাঁর তো লক্ষ্য,

ডোনার আব্বা মিঃ প্লাতিনি এবং প্রিন্সেস ক্যাথারিনকে উদ্ধার করা। তাঁর ধারনা, গ্রেগরিংকো যে ঘাটিতে থাকবে, সেই ঘাটিতেই তো মুল্যবান বন্দীদের থাকার কথা।

সমগ্র বাড়ি খুঁজে দেখার সিদ্ধান্ত নিল আহমদ মুসা। কারো সাড়া-শব্দ না পাওয়ার অর্থ বন্দীরা নেই তা নয়। হয়তো এই মুহূর্তে ঘাটিতে শত্রুপক্ষের এই তিনজনই ছিল। জনশক্তি কম থাকতে কারনেই সম্ভবত গ্রেগরিংকো আহমদ মুসাকে বন্দী নয়, হত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আহমদ মুসাকে বন্দী করার চেয়ে হত্যা করা সহজ ও অনেক কম ঝুঁকিপূর্ণ।

আহমদ মুসা ঘাটির চারটি তলার সবগুলো কক্ষ একে একে দেখল। সে নিশ্চিত হয়ে গেল, কিছুক্ষন আগে পর্যন্ত মিঃ প্লাতিনি এবং প্রিন্সেস ক্যাথারিন এই ঘাটিতেই বন্দী ছিল।

বাড়ির তিন তলায় বিশেষভাবে সুরক্ষিত দু'টি সুসজ্জিত কক্ষ পেল আহমদ মুসা। একটি কক্ষের ক্যাবিনে হ্যাংগারে এক সার্ট পেল আহমদ মুসা। সার্টটা যে প্লাতিনির দেখেই চিনতে পারল সে। অন্য কক্ষে বালিশের তলায় একটি ঘড়ি পেল আহমদ মুসা। ঘড়িটি লেডিজ। প্রিন্সেস ক্যাথরিনের বলে নিশ্চিত হলো আহমদ মুসা। আরও একটা বড় প্রমান ঐ ঘরের বিছানায় যে সেন্টের গন্ধ সে পেল সেই গন্ধ প্রিন্সেস ক্যাথারিনের সাথে দেখা হওয়ার সময় সে পেয়েছিল। আর একটা বিষয়, দুই শোবার বিছানার তাপ পরীক্ষা করে সে বুঝল কিছুক্ষন আগেও কোন মানুষ এখানে শুয়ে ছিল।

এর অর্থ কি দাড়ায়? আহমদ মুসা অনেক ভাবল। সে অবশেষে নিশ্চিত হলো, তাঁর এ ঘাটিতে প্রবেশের চেষ্টার খবর লিন্ডা গ্রেগরিংকো জানাবার পর গ্রেগরিংকো বুঝে নিয়েছিল, তাঁদের এ ঘাটি ধরা পড়ে গেছে। সংঘর্ষে আসার আগেই তড়িঘড়ি করে সে দুই বন্দীকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে দু'জনকে নিয়ে এ ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করছিল আহমদ মুসাকে হত্যার জন্যে।

আহমদ মুসা গোটা ঘাটি তন্ন তন্ন করে খুঁজে কোন কাগজ,কোন প্রাইভেট টেলিফোন গাইড, যা দিয়ে গ্রেট বিয়ারের অন্য ঘাটির সন্ধান পাওয়া যায়, পেল না।

শ্লথ পায়ে হতাশ মনে গ্রেট বিয়ারের ঘাটি থেকে বেরিয়ে এল আহমদ মুসা। রাস্তায় নেমে কিছু হেঁটে একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে বসল সে।

# ৫

পিতার সার্ট হাতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল ডোনা। আহমদ মুসা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল সব খারাপের মধ্যে ভালো খবর এই যে, তারা প্রিন্সেস ক্যাথারিনের মতই মিঃ প্লাতিনিকে সসন্মানে রেখেছে। বিছানাপত্র, পরিবেশ, ইত্যাদি সব মিলে মিঃ প্লাতিনিকে বড় ধরনের কোন অসুবিধায় রাখেনি।

'কিন্তু আজ ভালো ব্যবহার দেখেছ, কাল যদি খারাপ আচরন করে!' বলেছিল ডোনা।

'দেখ, হাজার হোক মিঃ প্লাতিনি রাজপুত্র এবং ফরাসি সরকার বিষয়টাকে খুবই গুরুত্বের সাথে নিয়েছে। ফরাসি সরকারকে অসন্তুষ্ট করার মত কাজ গ্রেট বিয়ার করবে না। আর তোমার আব্বা তো তাঁদের শত্রু নন। তাঁকে বলা যায় পন বন্দী করে রেখেছে আমাকে হাতে পাওয়ার জন্যে। সুতরাং তিনি গ্রেট বিয়ারের টার্গেট নন, টার্গেট আমি। আজ আমি ধরা দিলে কাল উনি মুক্তি পাবেন।

আহমদ মুসার শেষ কথাটা শুনে চমকে উঠেছিল ডোনা। মুখ পাংশু হয়ে উঠেছিল তাঁর। বলেছিল, দেখ, এমন কথা কোন সময় বলনা। তুমি ও তোমার মিশন আমি, আমার পিতা, আমাদের পরিবারের যোগফলের চেয়েও অনেক অনেক বেশি মুল্যবান। তোমার জন্যে কোন কোরবানিই আমার কাছে বড় নয়। তুমি যদি এমনভাবে ভবিষ্যতে কথা বল, আমার পিতার নাম আমি আর মুখে আনব না'। বলে দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল ডোনা।

আহমদ মুসা সান্ত্বনা দেয়ার সুরে নরম কণ্ঠে বলেছিল, 'আমি দুঃখিত ডোনা। বলব না ঐ ধরনের কথা আর। আর শোন, নিজে আত্নসমর্পণ করে কাউকে মুক্ত করতে হবে, এমন চিন্তা কোন সময়ই আমি করি না, এমন কোন দুর্বলতাও আমার মধ্যে নেই। ইনশাআল্লাহ্ শয়তানদের হাত থেকে তাঁকে মুক্ত করবোই।

আল্লাহ্র উপর ভরসা করে এই কথা বলেছে আহমদ মুসা, কিন্তু ডোনার আব্বা এবং প্রিন্সেস ক্যাথারিনকে উদ্ধারের কোন পথই দেখতে পাচ্ছে না সে।

ইতিমধ্যে বার কয়েক সে রুশ রাষ্ট্রপ্রধানের ওখানে গেছে। উদ্দেশ্য গ্রেট বিয়ারের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ করা। হঠাৎ করে ওঁরা যেন উধাও হয়ে গেছে। আহমদ মুসার মনে হয়েছে ওঁরা কোন নতুন ষড়যন্ত্র আঁটছে, কোন নতুন পথে ওঁরা অগ্রসর হতে যাচ্ছে। সেটা কি? ওঁরা কি কারও মাধ্যমে কিছু করার চেষ্টা করছে? মাঝে মাঝেই আহমদ মুসার আশংকা হয়, ফরাসি পুলিশের সাথে ব্ল্যাক ক্রস বা কারও মাধ্যমে একটা এমন চুক্তি হতে পারে যে, পুলিশ আহমদ মুসাকে তুলে দিবে ওদের হাতে, আর ওঁরা মুক্তি দিবে মিঃ প্লাতিনিকে। এই আশংকা সামনে রেখেই আহমদ মুসা পুলিশের দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়ালে রাখার চেষ্টা করছে।

মোবাইল টেলিফোনের বিপ বিপ শব্দে আহমদ মুসার ভাবনায় ছেদ ঘটালো। টেলিফোন তুলে নিল আহমদ মুসা।

রুশ রাষ্ট্রদূত মিঃ পাভেলের টেলিফোন। বলল সে ওপার থেকে, 'মিঃ আবদুল্লাহ গুরুতর খবর আছে, তাতিয়ানা নিহত হয়েছেন জেনেভায়। তাতিয়ানার কাছে রক্ষিত অতি মুল্যবান রাজকীয় ডকুমেন্ট একজন এশিয়ান এবং দু'জন ফরাসি পুরুষ ও মহিলা প্যারিসে নিয়ে এসেছে প্রিন্সেস ক্যাথারিনের কাছে হস্তান্তরের জন্যে। একটি ভিডিওতে সবকিছু রেকর্ডেড ছিল। তাঁর সবগুলো কপি গ্রেট বিয়ার জেনেভা পুলিশকে বিভ্রান্ত করে নিয়ে এসেছে। সুতরাং যারা ডকুমেন্টগুলো প্যারিসে নিয়ে এসেছে, তাঁদের ফটো পাওয়া যায়নি। আমাদের সরকারের তথ্য মোতাবেক প্রিন্সেস তাতিয়ানা এবং সেই রাজকীয় ডকুমেন্টগুলো এখন প্যারিসেই রয়েছে। আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রী সত্বরই প্যারিসে আসছেন। ফরাসি সরকার ও পুলিশ তৎপর হয়ে উঠেছে। রাশিয়ায় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্মৃতিবাহী মাস মার্চে রাশিয়ায় নিয়মতান্ত্রিক রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সুতরাং দু'মাসের মধ্যেই সব কাজ সম্পন্ন করতে হবে। আমাদের সরকার এখন এই বিষয়টাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন'। থামল মিঃ পাভেল।

'ধন্যবাদ এ সুখবরের জন্যে। আপনারা সফল হোন'। বলল আহমদ মুসা।

'সাফল্যের জন্যে তোমারও সাহায্য চাই আমরা। আমাদের মিনিস্টার এলে তোমাকে ডাকব আমরা। নতুন তথ্যের ভিত্তিতে চিন্তা করার জন্যে তোমাকে অনুরোধ করছি'।

একটু থামল রাষ্ট্রদূত পাভেল। থেমেই আবার শুরু করল, 'সত্যি তুমি বিস্মিত করেছ আমাকে, আমাদের সরকারকেও। তুমি প্রিন্সেস কে এখনও উদ্ধার করতে পারনি, কিন্তু প্রতিটি পদক্ষেপ তোমার সফল। গ্রেট বিয়ারের চারটির মত ঘাটির এ পর্যন্ত পতন ঘটেছে তোমার কারনে। তোমার সাহায্য আমরা চাই'।

'আমাকে কি বলার প্রয়োজন আছে। আমিতো নিজের ইচ্ছাতেই কাজ করছি'।

'এটাও আমার জন্যে একটা বিস্ময়ের। আমাদের প্রিন্সেসের জন্যে তুমি জীবন বিপন্ন করছ কেন? সত্যি বলতো, তোমার সাথে কোন হৃদয়ের সম্পর্ক নেই তো!'

'একেবারেই নেই'।

'তোমার এসব উত্তর ঔৎসুক্য আরও বাড়িয়ে তুলছে। তুমি কে, এই জিজ্ঞাসার চেয়ে বড় কিছু এখন আমার কাছে নেই। তুমি সাধারন কেউ নও আমি বুঝি। কে তুমি আসলে?'

'সবচেয়ে বড় পরিচয় আমি মানুষ'।

'দেখ, তোমাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করে ভুল করেছি বলে এখন মনে হচ্ছে। বয়সে যত ছোটই হও তুমি অনেক বড় তা প্রমান করেছ। এখন থেকে আমি 'আপনি' বলে সম্বোধন করব'।

'দুরে ঠেলে দিবেন আমাকে?'

'না, মাথায় রাখতে চাই'।

কথা শেষ করেই রাষ্ট্রদূত বলল, 'এখন এ পর্যন্তই। প্রয়োজন হলেই কিন্তু টেলিফোন করব আপনাকে'।

'অবশ্যই। ধন্যবাদ'। বলল আহমদ মুসা।

টেলিফোন রেখে দিয়ে সোফায় গা এলিয়ে দিল আহমদ মুসা। মনে মনে বলল, রুশ দুতাবাসের সাথে সম্পর্ক সম্ভবত খুব শীঘ্রই তাঁর শেষ হয়ে যাচ্ছে।

রুশ সরকার সবই জেনে ফেলেছে। শুধু নাম আর ফটো পায়নি। পেলেই আহমদ মুসা, ডোনা আর তাঁর আব্বা টার্গেট হয়ে পড়বে রুশ সরকারেরও। রুশ সরকার চেষ্টা করবে আহমদ মুসার কাছ থেকেই রাজকীয় ডাইরি ও আংটি হাত করতে। কিন্তু আহমদ মুসা ক্যাথারিন ছাড়া কারও হাতে এই আমানত তুলে দিতে পারে না।

কিন্তু এগুবে সে কোন পথে?

যে সুত্র যখন খুঁজে পেয়েছে, সেটাই ছিঁড়ে গেছে। এমন বিদঘুটে অবস্থায় সে কোন সময়ই পড়েনি। সত্যিই চারদিকে শুধু অন্ধকার দেখছে সে।

প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিবেট সিরিজের একটা সেশন।

সন্ত্রাস ও মানবাধিকারের উপর বিতর্ক চলছে।

ডোনা জোসেফাইন বিতর্কে তাঁর বক্তব্য শেষ করে বক্তার প্যানেলে এসে বসল।

পাশের বিরোধী বক্তা ইভানোভা উঠে দাড়িয়ে ডোনার সাথে হ্যান্ডশেক করে বলল, ‘ভালো বলেছেন। কিন্তু আপনার বিরোধিতা করব’।

‘ওয়েলকাম। আমি বেশি কিছু বলিনি। মানবাধিকার একটি স্বাভাবিক চাহিদা যার উপর মানব সমাজের সামাজিক শৃঙ্খলা ও বিকাশ নির্ভর করে। আর সন্ত্রাস তাঁর নামেই অস্বাভাবিক একটা কর্মকাণ্ড যা বৈধ নয়। উদ্দেশ্য মহৎ হলেও একে অর্জন করা অসৎ মাধ্যমকে যৌক্তিক বলা যাবে না’। বলল ডোনা জোসেফাইন।

‘ধন্যবাদ, বলে ডোনার পিঠ চাপড়ে ডায়াসের দিকে চলল ইভানোভা। ডোনা জোসেফাইনের পরবর্তী স্পীকার হিসাবে ডাক পড়েছে তাঁর।

ইভানোভা একজন রুশ কিন্তু এখন ফরাসি নাগরিক। ডোনা জোসেফাইনের মতই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নামকরা ছাত্রী সে।

ইভানোভা তাঁর তুখোড় বক্তৃতার এক অংশে বলল, 'মারিয়া জোসেফাইন যে যুক্তি দিয়েছেন মানবাধিকারের পক্ষে এবং সন্ত্রাসের সেটা আইনের শাসনের কথা, শান্তির সময়ের কথা। কিন্তু আইন যেখানে বেআইন, শান্তি যেখানে অশান্তি, দুর্নীতিই যেখানে নীতি, সত্য, ন্যায় ও সুবিচার যেখানে দুর্বলের নিস্ফল কান্না, সেখানে সন্ত্রাস মানবাধিকারের বিশ্বস্ত হাতিয়ার। ফিলিস্থানে হামাসের যে সন্ত্রাস, সেটা তাঁদের অধিকার অর্জনের জন্যই অপরিহার্য অস্ত্র। কাশ্মীরে মুসলিম গেরিলাদের যে সন্ত্রাস তা নিরুপায় মজলুমদের অধিকার অর্জনের শেষ অবলম্বন। অনুরূপভাবে পৃথিবীতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অব্যাহত জুলুম ও অধিকার পদদলিত করার বিচারহীন অবস্থা থেকে সন্ত্রাসের উদ্ভব ঘটেছে। এখানে মানবাধিকার ও সন্ত্রাস পরস্পর বৈরী নয়, সহযোগী। আমরা পশ্চিমারা মুসলিম বিপ্লবী নেতা আহমদ মুসার সমালোচনায় মুখর, কিন্তু শত শত বছর ধরে জুলুম শোষণ ও অবিচারের শিকার বিধ্বস্ত এক জাতির মধ্য থেকে ইতিহাসের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবেই তাঁর উদ্ভব ঘটেছে। ইতিহাসের এক চাবুক, মানবাধিকারের এক রক্ষাকবচ তাঁকে বলতে হবে। তাঁর বিরুধ্যে আমাদের সংবাদ মাধ্যমগুলোর অভিযোগ, তিনি ফ্রান্স, স্পেন, ককেশাস, মধ্য এশিয়া, কঙ্গো-ক্যামেরুন জুড়ে শত শত লোক হত্যা করেছেন। কিন্তু এই নিহতরা কারা? মজলুমের বিপন্ন জীবন বাঁচাতে গিয়ে জালেমের জীবন বিপন্ন হলে, সেটা অবশ্যই দূষণীয় নয়, আইনের চোখে তা অপরাধও নয়'।

বক্তৃতা শেষ করে ইভানোভা তাঁর আসনে ফিরে এলে ডোনা জড়িয়ে ধরল ইভানোভাকে। অভিনন্দন আপনাকে। আমি বলেছিলাম নীতির কথা, আর আপনি দেখিয়েছেন নীতির ব্যাতিক্রমগুলোকে। আপনাকে অভিনন্দন'।

ইভানোভাকে অভিনন্দন জানিয়েই ছেড়ে দেয়নি ডোনা। তাঁকে ধরে নিয়ে এসেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিনে। বসেছিল দু'জন ক্যান্টিনের নির্জন কোনায়।

বসেই ইভানোভা বলল, 'কি ব্যাপার মারিয়া জোসেফাইন, আপনার ক্ষেত্রে এই ঘটনাটা নতুন'।

'আজ আপনাকে পেট পুরে খাওয়াব'।

'কেন?'

'আপনার সুন্দর বক্তৃতার জন্যে'।

'ধন্যবাদ। কিন্তু বক্তৃতা এতটা তো সুন্দর হয় নি'।

'এটা বলবে শ্রোতা'।

বলে একটু থামল ডোনা। পর মুহূর্তেই আবার শুরু করল, 'কিন্তু একটা বিষয়। লেলিন, মাওসেতুং, হো-চি মিন, ক্যাস্ট্রো, প্রমুখ বিশ্ব বিপ্লবী থাকতে আপনি আহমদ মুসার দৃষ্টান্ত আনলেন কেন?'

ইভানোভা কথা বলার জন্যে মুখ খুলেছিল। ডোনা বলল, 'একটু থামুন, আমি গিয়ে খাবারটা নিয়ে আসি। আপনি বসুন। দু'জনেরটাই আমি নিয়ে আসছি'।

ইভানোভা উঠে দাড়িয়ে হেসে বলল, বরং আপনি বসুন আমিই দু'জনেরটা নিয়ে আসছি'।

শেষে দু'জনেই গেল খাবার আনতে। খাবার নিয়ে দু'জনেই বসল টেবিলে। দু'জনেই খেতে শুরু করল।

'এবার প্লিজ বলুন'। ইভানোভাকে লক্ষ্য করে বলল ডোনা।

'আপনি একটা সিরিয়াস প্রশ্ন করেছেন। এর উত্তর প্রকাশ্যে দেয়া কঠিন, কিন্তু আপনাকে বলতে পারি'।

বলে একটু থামল ইভানোভা। এক টুকরো গোশত মুখে পুরে জুসের গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে বলল, 'আপনি যে বিপ্লবীদের নাম করলেন, তারা মহা বিপ্লবী সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁদের কেউই সত্য, ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্যে লড়াই করেন নি। ঠিক হোক বে ঠিক হোক তাঁদের অনুসৃত মতাদর্শ এবং তাঁদের ব্যক্তিপ্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে তারা কাজ করেছেন। তাই তারা শ্রমিক-কৃষকের ভ্রাতা সেজে লাখো-কোটি শ্রমিক-কৃষককে হত্যা করেছে। সত্য ও সুন্দর তাঁর আদর্শিক শক্তির জোরেই মানুষের হৃদয় জয় করে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তাঁকে অস্ত্র ও খুন খারাবির আশ্রয় নিতে হয় না। নিজ জনগনের উপরই তারা অস্ত্র প্রয়োগ করেছে। কারন সত্য সুন্দরের বিপ্লবী তারা ছিল না। অন্যদিকে আহমদ মুসা তাঁর

মজলুম জাতির পক্ষে জালেমের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন সুতরাং দৃষ্টান্ত হবার মত বিপ্লবী আজকের দুনিয়ায় একমাত্র তিনিই'।

ডোনার মনে বিস্ময় ও আনন্দের ঢেউ। কিন্তু সেটা চেপে রেখে বলল, 'নিকট থেকে না দেখে একজন আন্ডার গ্রাউন্ড লিডার সম্পর্কে শুধু শোনা কথার উপর এতবড় সার্টিফিকেট দেয়া কি ঠিক?'

হাসল ইভানোভা। বলল, 'এ ধরনের মন্তব্য আমরা সব সময় শোনা ও পড়ার উপর ভিত্তি করেই বলে থাকি। তাঁর উপর বাড়তি একটা দুর্লভ সুযোগও আমি পেয়েছি'।

'বাড়তি সুযোগ, কি সেটা?' প্রবল একটা আগ্রহ ঝরে পড়ল ডোনার কথায় এবং চোখে-মুখে।

ইভানোভা গভীর দৃষ্টিতে তাকাল ডোনার দিকে। বলল, 'বলছি, কিন্তু আগে বলুন। আপনার মধ্যে আহমদ মুসা সম্পর্কে একটা প্রবল আগ্রহ দেখছি। সেটা কেন?'

সলজ্জ একটা হাসিতে ভরে গেল ডোনার মুখ। বলল, 'কারন একটা অবশ্যই আছে। বলব। তার আগে আমার প্রশ্নের জবাব দিন'।

'বলছি। কিন্তু এইটুকু প্রশ্নের জবাব দিন। সাইকোলজি আমার সবচেয়ে ফেভারিট সাবজেক্ট। আমার মনে হচ্ছে আপনার চোখ, মুখ ও আগ্রহ দেখে এবং কথা শুনে যে, আহমদ মুসা আপনার বা আপনাদের খুব কাছের কেউ হবে। আমার এ অনুমান ঠিক কিনা?'

ডোনা চোখ তুলে গভীর দৃষ্টিতে তাকাল ইভানোভার দিকে।

ইভানোভাও তাকিয়েছিল। চার চোখের মিলন হলো।

আবার সলজ্জ হাসি ফুটে উঠল ডোনার চোখে-মুখে। সেই সাথে কিছুটা বিব্রত ভাব। বলল, 'খুব পয়েন্টেড প্রশ্ন করেছেন। উত্তর দিচ্ছি আমি। তাঁর আগে আমার প্রশ্নটার জবাব দিন। তবে এটুকু বলছি, তাঁর সম্পর্কে যে কোন কথা বলার ক্ষেত্রে আমার উপর আস্থা রাখতে পারেন'।

ইভানোভার দৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণ হলো। বলল, 'সেটা আমি আগেই বুঝেছি। তাই আমি আরো জানতে চাচ্ছিলাম'।

একটু থামল ইভানোভা। তারপর আবার শুরু করল, ‘সে দুর্লভ সুযোগটা ছিল আমার এক অকল্পনীয় সৌভাগ্য। একটা এ্যাকসিডেন্ট আমার সে সৌভাগ্য সৃষ্টি করেছিল। আমি তাঁর দেখা পেয়েছিলাম। কয়েক ঘণ্টার জন্যে তাঁকে কাছে পেয়েছিলাম। আমি তাঁর হাতের শুশ্রূষা পেয়েছিলাম। তাঁকে সামান্য সাহায্য করার গৌরবপূর্ণ সুযোগ আমার হয়েছিল’।

থামল ইভানোভা। তাঁর কণ্ঠ ধীরে ধীরে গম্ভীর ও ভারী হয়ে উঠেছিল। সে যখন কথা শেষ করল তখন এক অবরুদ্ধ আবেগে তাঁর কণ্ঠ কাঁপছিল।

ডোনার চোখও যেমন তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল,তেমনি চোখে-মুখে ফুটে উঠেছিল কিছু একটা খুঁজে পাবার আনন্দ। দ্রুত বলল ডোনা, ‘আপনি কি জাহরা ইভানোভা, পিটার পাওয়েল যার ভাই এবং নিকিতা স্ট্যালিন যার আব্বা?’

বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে জাহরা ইভানোভা বলল, ‘এসব জানলেন কি করে?’

‘আপনাদের আহত অবস্থায় বাসায় নিয়ে গিয়েছিল আহমদ মুসা। গ্রেট বিয়ারের লোকদের দেখে আহমদ মুসা সরে পড়েছিলেন। গ্রেট বিয়ারের ঘাটিতে আহমদ মুসা ঘেরাও হয়ে বিপন্ন হয়ে পড়লে আপনি তাঁকে উদ্ধার করেন নিজের জীবন বিপন্ন করেও এবং তাঁকে নিরাপদে সরে আসারও ব্যবস্থা করে দেন আপনি’।

এসব কথা আহমদ মুসা ছাড়া আর কেউ জানে না। এর অর্থ তাঁর কাছ থেকেই আপনি এ কথাগুলো শুনেছেন। কোথায় তাঁর দেখা পেলেন? কি ঘটনা বলুন তো’।

‘বলেছি তো সব বলব। কিন্তু তাঁর আগে আমার একটা বিস্ময় দূর করা দরকার। তাহলে সব কথা আপনাকে বলতে পারব’।

‘সেটা কি?’

‘আপনার আব্বা গ্রেট বিয়ারের আন্দোলনের একজন পরিচলনাকারী। আপনিও গ্রেট বিয়ারের একজন সক্রিয় কর্মী। আহমদ মুসাকে এই সাহায্য আপনি করলেন কেন? তিনি আহত অবস্থায় আপনাদের সাহায্য করেছিলেন বলে কি?’

‘না’।

'তাহলে?'

একটা বেদনার হাসি ফুটে উঠল জাহরা ইভানোভার মুখে। হঠাৎ আনমনা হয়ে উঠল সে। বলল, 'এ প্রশ্ন তিনিও জিজ্ঞাসা করেছিলেন। উত্তর দেইনি। কোনদিন সুযোগ পেলে বলব ভেবেছিলাম'। থামল জাহরা ইভানোভা।

আবার শুরু করল। বলল, 'তিনি গ্রেট বিয়ারের ঘাটিতে যখন প্রিন্সেস ক্যাথারিনকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন এঘর থেকে সে ঘরে, টিভি স্ক্রিনের সামনে বসে আমি তাঁকে ফলো করছিলাম। হঠাৎ এক সময় আমি তাঁকে নামাযে দাঁড়াতে দেখলাম। এই প্রথম জানলাম তিনি মুসলমান। এই জানাটাই আমার সব উলট পালট করে দিল'।

'কেমন?'

'আমি ভুলে গেলাম যে আমি একজন রুশ। মনে থাকল না যে আমি গ্রেট বিয়ারের একজন কর্মী। জীবনের পাতাগুলো এক এক করে উল্টে গেল। সুদূর এক অতীত জীবন্ত হয়ে আমার সামনে হাজির হলো। আমার সমগ্র সত্তা জুড়ে একটা কথাই বড় হয়ে উঠল আমি জাহরা ইভানোভা ফাতিমা জোহরার উত্তর-সন্তান। আমার রক্ত ফাতিমা জোহরার রক্ত। সেই ফাতিমা জোহরার একান্ত আপনজন সেই আহমদ মুসা। আজ আমার যায়গায় ফাতিমা জোহরা হলে জীবন দিয়ে সাহায্য করতেন আহমদ মুসাকে। এই চিন্তা থেকেই আমি জাহরা ইভানোভা হিসাবে নয় ফাতিমা জোহরা হিসাবে তাঁকে সাহায্য করেছি'।

ভারি হয়ে উঠেছিল জাহরা ইভানোভার গলা। শেষটায় আবেগে রুদ্ধ হয়ে গেল তাঁর কণ্ঠ।

ডোনার চোখ-মুখ সত্তা জুড়ে উন্মুখ এক বিস্ময়। মন্ত্রমুগ্ধ সে। জাহরা ইভানোভা থামতেই তাঁর মুখ থেকে ছুটে বেরিয়ে এল জিজ্ঞাসা, 'ফাতিমা জোহরা কে?'

'এক হতভাগিনী নারী। কয়েক জেনারেশন আগের আমার পূর্ব পুরুষ'।

'তারপর?'

'ফাতিমা জোহরা তুর্কি অধীন ক্রিমিয়ার ইতিহাস নন্দিত সুলতান করিম গিরাই এর কন্যা। রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী জারিনা দ্বিতীয় ক্যাথারিন রাশিয়ার সিংহাসনে

আরোহণ করার পর তুর্কি সম্রাজ্যের উত্তর-পূর্বাংশে হত্যা, লুণ্ঠন ও ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেন। যার ফলে তুর্কি সম্রাজ্যের ক্রিমিয়া, মলদোভিয়া, জর্জিয়া আর্মেনিয়া এবং ককেশাস অঞ্চল অশান্ত অস্থিতিশীল হয়ে উঠে। বাধ্য হয়ে তুরস্কের সুলতান তৃতীয় মোস্তফা ১৭৬৮ সালে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই যুদ্ধ ঘোষণার পর ক্রিমিয়ার 'মহান খাঁ' করিম গিরাই-ই সর্ব প্রথম রাশিয়ার উপর সিংহ বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তাঁর ঘোড়সওয়ার বাহিনী সব বাধা অতিক্রম করে রাশিয়ার ভেতরে ১৪ দিনের পথ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। তাঁর বাহিনী পোল্যান্ডের প্রান্ত সীমা পর্যন্ত স্পর্শ করেছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে করিম গিরাই কখনও হারেন নি, হারেন তিনি ষড়যন্ত্রের কাছে। অপ্রতিরোধ্য করিম গিরাই কে থামিয়ে দেয়ার পথ হিসাবে দ্বিতীয় ক্যাথারিনের সরকার তাঁর গ্রিক চিকিৎসকের মাধ্যমে বিষ প্রয়োগে তাঁকে হত্যা করেন'।

থামল জাহরা ইভানোভা। আবেগে তাঁর চোখ-মুখ ভারী হয়ে উঠেছে।

'তারপর?'

'করিম গিরাই ছিলেন সোনার টুকরো এক শাসক। ন্যায় বিচারের এক চির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি। একবার তাঁর কয়েকজন সৈনিক একটি গীর্জার 'ক্রুশ' এর অবমাননা করেছিল। করিম গিরাই সেই সৈন্যদের  গীর্জার সামনে দাড় করিয়ে প্রত্যেককে ১০০ টি বেত্রাঘাত করেছিলেন। আরেকবার তাঁর বিজয়ী বাহিনীর একদল সৈনিক পোল্যান্ডের এক গ্রাম লুণ্ঠন করেছিল। করিম গিরাই সেই সৈনিকদের প্রত্যেককে ঘোড়ার  লেজে বেঁধে হত্যার নির্দেশ দেন। এই মহান করিম গিরাই এর কন্যা ছিলেন ফাতিমা জোহরা-আমার পূর্ব পুরুষ। আমি গর্বিত যে, করিম গিরাই এর রক্ত আমার দেহে আছে। এই রক্তের দাবীই সেদিন আমাকে বাধ্য করেছিল আহমদ মুসাকে সাহায্য করতে'।

থামল জাহরা ইভানোভা। তাঁর  দু-চোখের কোনায় দু'ফোটা জমাট অশ্রু। আর মুখে আনন্দের জ্যোতি।

'কিন্তু এই ফাতিমা জোহরা কি করে আপনার পূর্ব পুরুষ হলো?'

'করিম গিরাই নিহত হন ১৭৬৮ সালে, তখন ফাতেমা জোহরার বয়স আট বছর।  দৌলত গিরাই নতুন সুলতান হন ক্রিমিয়ার। তুর্কি সম্রাজ্য ও রাশিয়ার

মধ্যে যুদ্ধ বিরতি হয় ১৭৭৪ সালে। চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে আবার রুশ সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিনের বাহিনী তুর্কি সম্রাজ্য আক্রমন করে ১৭৮৩ সালে। ফাতেমা জোহরা তখন কৈশোর যৌবনে পা দিয়েছে। তখন সদ্য বিবাহিতা। তাঁর বিয়ে হয়েছিল দৌলত গিরাই-এর পুত্র যুবরাজ ওমর গিরাই-এর সাথে। ক্রিমিয়া সীমান্তে দৌলত গিরাই বাধা দিয়েছিল ক্যাথারিনের বাহিনিকে। পর পর কয়েকটি যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে দৌলত গিরাই –এর। যুদ্ধক্ষেত্রে যুবরাজ ওমর গিরাই নিহত হন। রাজধানী লুণ্ঠিত হয়। বন্দী ও ক্ষমতাচ্যুত হন দৌলত গিরাই। আহত অবস্থায় বন্দিনী হন ফাতিমা জোহরাও। দুর্ধর্ষ রুশ জেনারেল পটেমকিন অতুলনীয় সুন্দরী ফাতিমা জোহরাকে দেখে মুগ্ধ হন। অসংখ্য পুরুষ,নারী, শিশু নিহত হলেও তিনি বেঁচে যান। ফাতিমা জোহরা সুস্থ হয়ে উঠলে জেনারেল পটেমকিন তাঁর বড় ছেলে রুশ নৌবাহিনীর তরুন অফিসার ক্যাপ্টেন কমান্ডার সিপিলভের সাথে তাঁর বিয়ে দেন। ফাতিমা জোহরা ও সিপিলভেরই বংশধর আমি। আমি তাঁদের সপ্তম জেনারেশন'।

'আপনারা একজন হতভাগ্য নারীকে এতদিন মনে রেখেছেন?'

'মনে রাখার কারন ফাতিমা জোহরা নিজেই। তিনি তাঁকে কোনদিনই ভুলেন নি। তিনি ধর্ম ত্যাগ করেন নি। মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত মুসলিম ধর্মের বিধি-বিধান মেনে চলেছেন। তাঁর ইচ্ছা মোতাবেক তাঁর কবরও হয়েছে মুসলিম নিয়মে। তিনি পরিবারের কাউকে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করার জন্যে বলেন নি। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব চরিত্র গোটা পরিবারকে মুসলিম পরিবারে পরিণত করেছিল। রুশ এডমিরাল সিপিলভ তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীর প্রভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু প্রকাশ করতে পারেন নি। যাবার মত সেন্ট পিটার্স বার্গে কোন মসজিদ ছিল না। কিন্তু গির্জাতেও তখন সিপিলভ পরিবারের কেউ যেত না। পরে এই অবস্থা আর থাকে নি। তবে ফাতিমা জোহরা অবস্মরনিয় হয়ে আছেন। সেন্ট পিটার্স বার্গের (এখন লেলিনগ্রাদ) পারিবারিক গোরস্থানে তাঁর বিশেষ কবরটি এখনও স্বযত্নে রক্ষিত। তাঁর নিজের লিখে যাওয়া আরবি অক্ষরে তাঁর নাম ফলক তাঁর পিতা করিম গিরাই-এর নাম সহ এখনও অক্ষত আছে। প্রতি চন্দ্র মাস রমজানের ২৭ তারিখের রাতে তাঁর কবরে বাতি দেয়া হয়, ফুল দেয়া হয়। আর তাঁর নামের

একটা অংশ আমাদের পরিবারের অধিকাংশ মেয়ের সাথে যুক্ত হয়ে আছে। তাঁর 'জোহ্রা' নাম থেকেই আমার নামের প্রথম অংশ 'জাহ্রা' হয়েছে। আমরা গর্ব করি আমরা জেনারেল পটেমকিন এবং এডমিরাল সিপিলভের বংশ, কিন্তু আমরা তাঁর চেয়েও শত গুন বেশি গর্ব করি যে, আমাদের দেহে চির স্বাধীনচেতা মুসলিম তাতারদের অসম সাহসী, অবিশ্বাস্য ন্যায় পরায়ণ সুলতান করিম-গিরাই এর রক্ত রয়েছে। এ রক্ত আমাদের মর্যদার প্রতীক। করিম গিরাই-এর সেদিনের সালতানাত আজকের চেচনিয়া আমাদের পরিবারের কাছে তীর্থস্থানের মত। সুযোগ পেলেই আমাদের পরিবারের সদস্যরা অন্তত একবার গিয়ে করিম গিরাই-এর অস্তিত্বহীন প্রাসাদ এবং ফাতিমা জোহরার পদধূলি মাখা পাহাড়-উপত্যকার উপর চোখ বুলিয়ে আসি'।

আবেগে রুদ্ধ হয়ে থেমে গেল জাহ্রা ইভানোভার কণ্ঠ।

ডোনা জোসেফাইনেরও মন ভিজে উঠেছিল।

জাহ্রা ইভানোভা থামলেও কথা বলতে পারলনা ডোনা।

একটু পর ধীরে ধীরে বলল, 'জানতে ইচ্ছে করে আপনার ধর্ম বিশ্বাস কি?'

'আমি গির্জায় যাই না। আমার আব্বাকেও যেতে দেখিনি। অনেকে মনে করেন ধর্ম বিশ্বাস বিরোধী কম্যুনিস্ট আমরা। আমরা কম্যুনিস্টও নই। হঠাৎ কখনও কোথাও মসজিদের আযান কানে গেলে মনটা যেমন আনচান করে উঠে, গির্জার ঘণ্টা ধ্বনি কিন্তু মনকে ঐভাবে নাড়া দেয় না'।

'ক্রিমিয়ার সে 'খাঁ' দের স্মৃতি বিজড়িত আজকের চেচনিয়া অঞ্চলে আপনি গেছেন?'

'যাওয়ার ইচ্ছা আমার পুরন হয়নি এখনও'।

থামল একটু জাহ্রা ইভানোভা। কফির কাপটা টেনে নিয়ে চুমুক দিতে দিতে বলল, 'চেচনিয়ায় আমাদের পারিবারিক সফরটা একটা বিশেষ নিয়মে হয়ে থাকে। চেচনিয়ায় একটা হেরিটেজ ফাউন্ডেশন আছে। সেই ফাউন্ডেশনে চেচনিয়ায় ইসলামের ইতিহাস ও ইসলামী ব্যক্তিত্ব, তাঁদের কাজ ও তাঁদের পারিবারিক ইতিহাস সংগ্রহীত আছে। সেখানে করিম গিরাই-এর কন্যা ফাতিমা

জোহরার কাহিনীও লিপিবদ্ধ আছে। ফাতিমা জোহরার সিপিলভ পরিবার যে এখনও ফাতিমাকে স্মরন করে, এ জন্যে চেচনিয়া হেরিটেজ ফাউন্ডেশন আমাদের পরিবারকে সম্মান করে। আমরা তাঁদের মাধমেই চেচনিয়া সফর করে থাকি'।

'ধন্যবাদ ইভানোভা। আরেকটা জিজ্ঞাসা, রাশিয়ায় রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হচ্ছে। এ নিয়ে রাজ পরিবারকে ঘিরে সংঘাত বেধেছে। এই বিষয়ে আপনার কি চিন্তা?'

'আমি একজন রুশ। রাশিয়ায় গনতন্ত্র চাই, কিন্তু গনতন্ত্রের পরিবেশ সেখানে গড়ে উঠছে না। প্রমানিত হয়েছে, সেখানে কেন্দ্রীয় একটা অভিভাবকত্ব দরকার। সেটা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র হতে পারে। আরো একটা কারণে রাজ পরিবার ক্ষমতায় ফিরে আসুক আমি চাই'।

'সেটা কি?'

'রাজ পরিবারকে তাঁদের কিছু পাপের প্রায়শ্চিত করার সুযোগ দেয়া দরকার'।

'তাঁদের অনেক পাপ। কোন পাপের প্রায়শ্চিত আপনি চাচ্ছেন?'

'তাঁদের সব পাপের প্রায়শ্চিত হওয়া উচিত। কিন্তু আমার আগ্রহ একটি ব্যাপারে বেশি'।

'সেটা কি?'

রুশ সম্রাজ্ঞী জারিনা দ্বিতীয় ক্যাথারিন এবং জার প্রথম আলেকজান্ডারের আমলে তুর্কি সম্রাজ্যের ক্রিমিয়াসহ বিশাল অঞ্চলের যে সম্পদ লুণ্ঠন করা হয়েছে, তা ফেরত দেয়া দরকার'।

'আমি জানি না, এটা কি খুব বড় বিষয়?'

'অবশ্যই বড় বিষয়'।

বলে একটু থেমে আবার জাহরা ইভানোভা শুরু করল, 'শুধু বড় নয়, অতি বড় বিষয় মারিয়া জোসেফাইন। রুশ সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথারিনের রুশ বাহিনী তুর্কি সম্রাজ্যের ক্রিমিয়া থেকে বোসনিয়ার পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের ৫৪ টি নগরী ধ্বংস ও লুণ্ঠন করে, যার অধিকাংশই ছিল বিশ্বাসঘাতকতামুলক এবং

সন্ধি শর্তের পরিপন্থী। এর মধ্যে ৭টি নগরীর কাউকে বাঁচিয়ে রাখা হয়নি। আমার গ্র্যান্ড গ্র্যান্ড গ্র্যান্ড মাদার ফাতিমা জোহরার মাতৃভূমি ক্রিমিয়া বার বার লুণ্ঠন ও গনহত্যার শিকার হয়েছে। ১৭৮৩ সালে আমার পূর্ব পুরুষ রুশ জেনারেল পটেমকিন শুধু ক্রিমিয়া (চেচনিয়ার রাজধানী) শহরেই তিরিশ হাজার লোক হত্যা করে। পালিয়ে যাওয়া ছাড়া কেউ সেখানে বাঁচেনি। তুর্কি সম্রাজ্যের দুঃসময়ের সুযোগ নিয়ে রুশ সম্রাট জার প্রথম আলেকজান্ডারের রুশ বাহিনিও তুর্কি সম্রাজ্যের বিশাল অঞ্চল সহ ১৪ টি মুসলিম নগরী ধ্বংস ও লুণ্ঠন করে। পরে যে সন্ধি চাপিয়ে দেয়া হয় তুর্কি সম্রাজ্যের উপর, তাতে অপরাধী বানানো হয় রুগ্নসিংহ তুর্কি সম্রাজ্যকে। যে রুশ সম্রাট অন্যায়ভাবে তুর্কি সম্রাজ্যের একটা অংশ বিধ্বস্ত করল, লুণ্ঠন করল, সে রুশ সম্রাটই সানস্টেফানোর (১৭৯২) সন্ধিতে তুর্কি সুলতানের কাছ থেকে ১ কোটি ২০ লক্ষ্য পাউন্ড ক্ষতিপূরণ আদায় করল। সব মিলিয়ে রুশ সম্রাটদ্বয় দ্বিতীয় ক্যাথারিন ও প্রথম আলেকজান্ডার দুই হাজার কোটি স্বর্ণ মুদ্রা তুর্কি সম্রাজ্য থেকে লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়। এই লুণ্ঠন ছোট কোন ঘটনা নয়'। থামল জাহরা ইভানোভা।

বিস্ময় ও বেদনায় আচ্ছন্ন ডোনার সমগ্র মুখমণ্ডল। বলল সে ধীর কণ্ঠে, ধন্যবাদ জাহরা ইভানোভা। বেদনাদায়ক এই ইতিহাস এইভাবে এতটা জানতাম না। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না এর প্রায়শ্চিত্য হবে কিভাবে? জাররা না হয় ক্ষমতায় এল, কিন্তু তুর্কি সম্রাজ্য তো নেই'। জাহরা ইভানোভা গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'প্রায়শ্চিত্য আছে। জাররা ক্ষমতায় এলে এ দাবী উঠা উচিত, তারা লুণ্ঠিত দুই হাজার কোটি স্বর্ণ মুসলমানদের ফেরত দিক। তুর্কি সম্রাজ্য নেই, কিন্তু এই টাকা গ্রহনের বৈধ কর্তৃপক্ষ রয়েছে'।

'কোনটি সেটা?'

'এখন বলব না, সময়ই বলে দিবে'।

'কিন্তু টাকা কোথায়? রাশিয়ার কোষাগার তো এখন শূন্য'।

হাসল জাহরা ইভানোভা। বলল, 'নিশ্চিত থাকুন, জারদের শত শত বছরের সঞ্চিত ধনভাণ্ডার এখনও অক্ষত আছে। এত বড় ধনভাণ্ডার পৃথিবীতে আর নেই'।

‘কোথায় সে ধনভাণ্ডার?’

‘কেউ জানে না। মাত্র জানতো প্রিন্সেস তাতিয়ানা। এখন এর চাবিকাঠি, সর্বশেষ খবর অনুসারে আহমদ মুসার হাতে। তাই উনি এখন গ্রেট বিয়ার ও রুশ সরকারের সবচেয়ে মূল্যবান টার্গেট। এই টার্গেটকে ধরার জন্যে গ্রেট বিয়ার জাল পেতেছে’।

উদ্বেগ নেমে এল ডোনা জোসেফাইনের চোখে। বলল, কি সে জাল?’

নড়ে-চড়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল জাহরা ইভানোভা। বলল মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য টেনে, ‘আর কোন প্রশ্নের জবাব দেব না আমি। আমার প্রশ্নের জবাব দেন নি। বলেননি, আহমদ মুসার সাথে আপনার সম্পর্ক বা যোগাযোগের কথা’।

ডোনা হাসল। বলল, ‘সে অনেক কথা’।

ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে জাহরা ইভানোভা বলল, ‘সব কথাই আমি শুনব। সময়ের কোন প্রশ্ন নেই’।

সলজ্জ হাসি ফুটে উঠল ডোনা জোসেফাইনের মুখে। বলল, ‘একটা এক্সিডেন্টের মধ্য দিয়ে তাঁর সাথে আপনার যেমন সাক্ষাত, এমনিভাবেই তাঁর সাথে আমার সাক্ষাত হয়’।

বলে একটু থামল ডোনা জোসেফাইন। তারপর শুরু করল কাহিনী।

এক ঘণ্টা ব্যাপী দীর্ঘ কাহিনী শেষ করে ডোনা জোসেফাইন আবেগ রুদ্ধ কণ্ঠে কথা শেষ করল এই ভাবে, ‘আহমদ মুসা দেশহীন ঠিকানাহীন আল্লাহ্‌র এক সৈনিক। তাঁর এই সময়ের সমস্ত মনোযোগ ঐ একদিকে ধাবিত’।

বিস্ময়-বিমুগ্ধ জাহরা ইভানোভার মুখে ফুটে উঠল মিষ্টি এক হাসি। চেয়ার থেকে উঠে দাড়িয়ে ডোনাকে একটা বাউ করে বলল, ‘আমি ফরাসি প্রিন্সেসের কাছ থেকে এক মহান বিপ্লবীর অন্তরঙ্গ অপরুপ এক কাহিনী শুনলাম। আমি সৌভাগ্যবান। ধন্যবাদ আপনাকে’।

বলে জাহরা ইভানোভা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো। গিয়ে ডোনার পিছনে দাড়িয়ে দুই হাত দিয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, ‘ঠিক বলত? মনোযোগ তাঁর আর কোনদিকে নেই?’

‘সমগ্র মনোযোগ বলতে আমি বুঝিয়েছি, উনি যে কাজে যখন হাত দেন, তখন সে ব্যাপারে তিনি একনিষ্ঠ হন’। ঠোঁটে হাসি টেনে বলল ডোনা।

‘আর আমি বুঝিয়েছি, মিশনের কাজ ছাড়া তাঁর মনোযোগ আর কোন দিকে আছে কিনা?’

‘এ প্রশ্নের কোন অর্থ নেই, মানুষের মনোযোগ একই সাথে কত দিকেই তো থাকতে পারে’। হাঁসতে হাঁসতে বলল ডোনা।

জাহরা ইভানোভা হেসে বলল, ‘তা থাকতে পারে। আমি কিন্তু সব মনোযোগের কথা বলনি। বিশেষ মনোযোগের কথা বলেছি’।

‘সেটা তো উনিই বলতে পারেন’।

‘ঠিক আছে। আপনার বিশেষ মনোযোগের কথাই তাহলে জিজ্ঞেস করব’।

বলে একটু থেমে আবার শুরু করল, ‘দেশহীন ঠিকানাহীন আল্লাহ্‌র সৈনিককে অবশেষে দেশ ও ঠিকানা তো আপনি দিয়েছেন। এখন তাঁকে দেশহীন ঠিকানাহীন বলতে পারেন না’।

লজ্জায় লাল হয়ে উঠল ডোনা জোসেফাইনের মুখ। ধীরে ধীরে গম্ভীর হয়ে উঠল তার মুখ। জাহরা ইভানোভার একটি হাত গলা থেকে টেনে হাতে তুলে নিয়ে বলল, ‘ঘটির কি সাধ্য যে সাগরকে ঠিকানা দেয় ইভানোভা!’

‘এক ক্ষুদ্র হৃদয় কিন্তু শত সাগরের চেয়েও বড় প্রিন্সেস মারিয়া’।

‘আপনি ওকে জানেন না ইভানোভা’।

‘তিনি মানুষের চেয়ে বেশি কিছু নন। আর বিপ্লবীদের মন হৃদয়ের একটা টুকরো সবুজ আশ্রয়ের ভিখারী হয়ে থাকে। আপনার কাহিনী এ কথাও প্রমাণ করেছে’।

‘হয়তো হবে। বুঝিনা আমি’।

‘যে জয় করে তাঁর বুঝার প্রয়োজন নেই। আপনাকে কনগ্রাচুলেট করছি প্রিন্সেস’।

বলে জাহরা ইভানোভা ডোনার চুলে মুখ গুঁজে বলল, ‘আপনি কিন্তু পর্বত প্রমান একটা ভার মাথায় তুলে নিয়েছেন। লুই প্রিন্সেসের জন্যে সত্যিই এটা মানিয়েছে’।

ডোনা নিজের দু’হাত উপরের দিকে তুলে জাহরা ইভানোভার গলা জড়িয়ে ধরল। ভারি এবং ভেজা কণ্ঠে বলল, ‘আমি ঐ ভার বহনের বোধ হয় উপযুক্ত নই ইভানোভা। আমি ওকে শুধু বাধাই দেই, একে এগিয়ে দিতে পারিনা’।

‘যাকে আপনি বাধা বলছেন, ওটা বাধা নয়। ওঁর জীবনের ভারসাম্য বিধানের জন্যে এটা খুবই জরুরী’।

‘কিন্তু আমার বাধা কোন কাজ করে না। বরং তাঁর মিশন থেকে সব সময় আমাকে দুরে রাখতে তিনি চেষ্টা করেন’।

‘এটাই স্বাভাবিক। একজন বিপ্লবী তাঁর পথ তিনি নিজেই নির্দিষ্ট করেন। তবু যে বাধা বা পরামর্শ আপনি দেন, তার প্রয়োজন আছে। কোন সৎ পরামর্শই বৃথা যায় না। তাঁর অশরীরী প্রভাব অবিরাম কাজ করে চলে। বুঝতেই পারবেন না কিভাবে আপনি ওঁর কাজ নিয়ন্ত্রন করছেন’।

‘ধন্যবাদ। আপনার কথা সত্য হোক’। বলে ইভানোভাকে টেনে নিয়ে পাশের চেয়ারে বসাল। বলল, ‘আপনি ওকে অমুল্য সাহায্য করেছেন। আরও সাহায্য আপনি ওকে করতে পারেন’।

‘অবশ্য পারি। সেদিন উনি আমাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলেন। জানতে চেয়েছিলেন ক্যাথারিনকে কোথায় বন্দী করে রাখা হয়েছে। বিশ্বাসঘাতকতার পরিধি আর বাড়াবো না এই যুক্তিতে সেদিন তাঁকে প্রশ্নটির উত্তর দেইনি। আজ সে প্রশ্নের উত্তর দেব। কারন প্রিন্সেস ক্যাথারিন এখন একা বন্দী নন, তাঁর সাথে এখন বুঝলাম আপনার আব্বা প্রিন্স প্লাতিনিও বন্দী রয়েছেন’।

উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ভরা মুখে একরাশ প্রশ্ন নিয়ে ডোনা তাকাল জাহরা ইভানোভার দিকে।

গম্ভীর হয়ে উঠেছে জাহরা ইভানোভার মুখ। বলল, ‘প্রিন্সেস ক্যাথারিন এবং আপনার আব্বা প্রিন্স প্লাতিনিকে মস্কো নিয়ে যাওয়া হয়েছে’।

চমকে উঠল ডোনা। আর্তকণ্ঠে বলল, ‘মস্কো নিয়ে যাওয়া হয়েছে?’

‘হ্যাঁ। আমি ব্যাপারটা সংগে সংগেই জানতে পারি, কিন্তু আহমদ মুসাকে জানাবার কোন উপায় ছিলনা আমার। সেদিন তাঁর কোন ঠিকানা নেয়া বা টেলিফোন নাম্বার রাখার সুযোগ হয়নি’।

‘প্রিন্সেস ক্যাথারিনকে মস্কো নিয়ে যাওয়ার যুক্তি আছে। কিন্তু আব্বাকে নিয়ে গেল কেন?’

‘গ্রেট বিয়ার তাঁর যুদ্ধক্ষেত্র ফ্রান্স থেকে রাশিয়ায় শিফট করার জন্যেই এটা করেছে। আহমদ মুসাই এখন তাঁদের একমাত্র টার্গেট। এই টার্গেটকে তারা রাশিয়ায় নিয়ে যেতে চায়। নিজের দেশে যুদ্ধ করা গ্রেট বিয়ারের পক্ষে সহজ হবে, আহমদ মুসার জন্যে হবে অপেক্ষাকৃত কঠিন’।

একটু থামল জাহরা ইভানোভা। ধীরে ধীরে শুরু করল আবার, ‘প্রিন্সেস ক্যাথারিনকে রাশিয়ায় নিয়ে গিয়েই আহমদ মুসাকে তারা রাশিয়ায় নিয়ে যেতে বাধ্য করতে পারতো। কিন্তু তারা বাড়তি ব্যবস্থা হিসাবে মিঃ প্লাতিনিকেও রাশিয়ায় নিয়ে গেছে। যাতে আহমদ মুসার রাশিয়া গমন একেবারে নিঃসন্দেহ হয়’।

ডোনার মুখ একেবারে চুপসে গিয়েছিল। প্রায় ভেঙ্গে পড়ার অবস্থা হয়েছিল তাঁর। একদিকে তাঁর পিতাকে রাশিয়ায় নিয়ে যাবার খবর, অন্যদিকে আহমদ মুসা রাশিয়ায় যেতে বাধ্য হবে, এই দুই খবর তাঁকে ভীত-শংকিত করে তুলেছে।

জাহরা ইভানোভা ডোনার কাধে হাত রেখে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, ‘আপনার আব্বাকে তারা মর্যাদা অনুসারেই রেখেছে। ভালো আছেন তিনি। তাঁর সাথে গ্রেট বিয়ারের শত্রুতা নেই। সুতরাং ওদিক থেকে খুব চিন্তার কিছু নেই’।

‘ধন্যবাদ ইভানোভা আপনাকে। আহমদ মুসা খুব খুশি হবে। চলুন না আমার সাথে’।

হাসল জাহরা ইভানোভা। বলল, 'সমগ্র মন থেকে এমন একটা আমন্ত্রনের অপেক্ষায় ছিলাম। তবে আজ নয়। আমাকে ঠিকানা দিন। দু'একদিনের মধ্যেই যাব'।

'আপনার ঠিকানাটা দিন। আহমদ মুসা নিশ্চয় চাইবে'। বলে ডোনা নিজের নেম কার্ড তুলে দিল ইভানোভার হাতে।

'ধন্যবাদ'। বলে জাহরা ইভানোভাও নিজের নেম কার্ড ডোনাকে দিল।

'ধন্যবাদ'। বলে ডোনা উঠে দাঁড়ালো।

জাহরা ইভানোভাও।

দোতলায় আহমদ মুসার ড্রয়িং রুমে প্রবেশ করে আহমদ মুসার সোফায় ধপ করে বসে পড়ল ডোনা জোসেফাইন।

আহমদ মুসা ডোনার দিকে তাকিয়ে কিছুটা উদ্বেগ নিয়ে বলল, 'তোমাকে খুব ক্লান্ত, বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে আর মনে হচ্ছে তুমি কিছু বলবে?'

'বলব, বলছি। আব্বা ও প্রিন্সেসে ক্যাথারিনাকে মস্কো নিয়ে যাওয়া হয়েছে'।

বিস্ময়-উৎকণ্ঠা নেমে এল আহমদ মুসার চোখে। সোজা হয়ে বসল। বলল, 'মস্কো নিয়ে গেছে! কেন? কি কারনে?'

'গ্রেট বিয়ার যুদ্ধক্ষেত্র রাশিয়ায় নিয়ে যেতে চায়। তোমাকে সেখানে যেতে বাধ্য করবে তারা'।

তৎক্ষণাৎ কোন কথা বলল না আহমদ মুসা। ভাবছিল সে। বলল এক সময়, 'ঠিকই বলেছ। যুদ্ধক্ষেত্রটা ওদের জন্যে রাশিয়ায় শিফট করাই এখন স্বাভাবিক। কিন্তু তুমি এসব জানলে কি করে?'

'জাহরা ইভানোভা আমাকে বলেছে'।

'জাহরা ইভানোভা? কোথায় পেলে তাঁকে, কেমন করে পরিচয় হলো? সে বলল তোমাকে এসব কথা?'

ডোনা সব ঘটনা আহমদ মুসাকে বলল।

ডোনার বলা শেষ হলেও আহমদ মুসা কোন কথা বলল না। যেন মন্ত্রমুগ্ধ সে। অনেকক্ষণ পর ধীরে ধীরে সে বলল, 'ডোনা তুমি জাহরা ইভানোভার যে কাহিনী শুনালে, তা উপন্যাস নয়, কিন্তু উপন্যাসের চেয়ে অপরুপ। অপরুপ কাহিনীর অপরুপ নায়িকা জাহরা ইভানোভা। বুক বিদীর্ণ হবার মত এত কথা তাঁর মধ্যে ছিল, তাঁর এততুকুও প্রকাশ ঘটায়নি সে সেদিন। সত্যি ডোনা জাহরা ইভানোভা ভুলে যাওয়া এক ইতিহাস আমাদের সামনে এনেছেন। রাশিয়ায় যাওয়ার মধ্যে এক বাড়তি আগ্রহ আমি আমার মধ্যে দেখতে পারছি। রাশিয়ার রাজচক্রে জড়িয়ে পড়ার মধ্যে নতুন সার্থকতা খুঁজে পাচ্ছি আমি'।

'রাশিয়ার জার সম্রাটদের ধনভাণ্ডারে মুসলিম অধিকারের কথা বলছ?'

'অধিকার' এর কথা বলছি না। জারদের ধনভাণ্ডারে মুসলিম সম্পদ থাকার কথা বলছি'।

'অধিকার নয় কেন?'

'তুর্কি সুলতানরা কিংবা তুর্কি সম্রাজ্যের কেউ এ অধিকারের কথা কখনও তুলেননি'।

'না তুললেই কি অধিকার অধিকার থাকেনা?'

'আইনগত দাবী থেকেই অধিকার সৃষ্টি হয়। রুশ ধনভাণ্ডারের এই অধিকার মুসলমানদের নেই'।

'কিন্তু জাহরা ইভানোভা দাবীর কথাই তুলেছে'।

'সে রুশ। সে দাবী তুলতে পারেনা। খুব বেশি হলে সে পারে মুসলিম সম্পদ ফিরিয়ে দিতে'।

'বুঝেছি। তাহলে রাশিয়ার রাজচক্রে জড়িয়ে পড়ার মধ্যে নতুন সার্থকতা পেলে কোথায়?'

'রাশিয়ায় যে রাজচক্রের সৃষ্টি হয়েছে, তাঁর কেন্দ্র বিন্দু হল জার সম্রাটদের ধনভাণ্ডার। এ ধনভাণ্ডারে মুসলিম অর্থও রয়েছে। সুতরাং এ ধনভাণ্ডার অবৈধ লুণ্ঠন থেকে রক্ষার মধ্যে বাড়তি একটা আকর্ষণ অবশ্যই আছে'।

'যাক এ প্রসঙ্গ। নতুন সংকট সম্পর্কে বল'।

‘বলার তো কিছু নেই। কাজ করার প্রশ্ন। গ্রেট বিয়ার যে পরিকল্পনা করেছে, তা ব্যর্থ হবার নয়। আমি যাব রাশিয়ায়’।

মুহূর্তে বদলে গেল ডোনার মুখ। উদ্বেগ বেদনার ছায়া নামল সারা মুখমণ্ডল জুড়ে।

কথা বলতে পারল না ডোনা।

আহমদ মুসাই বলল, ‘বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসেছ। ক্লান্ত তুমি। এখনও খাওয়া হয়নি। যাও উপরে। পরে কথা হবে’।

ডোনা মাথা নিচু করে উঠল। হাঁটতে শুরু করল তিনতলার সিঁড়ির দিকে।

আহমদ মুসার ঠোঁটে ফুটে উঠল এক টুকরো মিষ্টি হাসি। মনে মনে বলল, নারী সব সময় নারীই।

# ৬

দরজায় নক করার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল আহমদ মুসার।

বিছানায় যেমন শুয়েছিল, তেমনি শুয়ে থেকেই উৎকর্ণ হলো আহমদ মুসা।

নক হলো আবার।

এবার ভালো করে শুনেই বুঝতে পারল ডোনা নক করছে দরজায়। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, রাত সাড়ে তিনটা।

এত রাতে ডোনা? নিশ্চয় অঘটন কিছু ঘটেছে। দ্রুত উঠল আহমদ মুসা।

দরজা খুলল। দ্রুত বলল, 'কিছু ঘটেছে, তুমি ভালো আছো?'

'না ঘটেনি। কিন্তু মনে হয় ঘটতে যাচ্ছে। খবর আছে'।

বলে ডোনা ঘরে প্রবেশ করার জন্যে পা বাড়াল।

আহমদ মুসা হাত দিয়ে বাধা দিল ডোনা কে। বলল, 'চল করিডোরের চেয়ারে গিয়ে দু'জন বসি'।

'ডোনা বাধা পেয়ে বিব্রত কণ্ঠে বলল, 'কেন?'

'কিছু মনে করোনা। রাত সাড়ে তিনটায় এসে তুমি আমার ঘরে প্রবেশ করবে এটা ঠিক নয়'।

এক রাশ লজ্জা এসে আচ্ছন্ন করল ডোনার মুখমণ্ডল। মুখ নিচু করল। বলল 'ধন্যবাদ'।

বলে ডোনা পিছন ফিরে বেরিয়ে এল করিডোরে।

দু'জনে গিয়ে চেয়ারে বসল।

'তোমাকে আবারও ধন্যবাদ। তোমাকে আল্লাহ্ এত সতর্ক করেছেন, এ জন্যে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করছি'। বলল ডোনা।

'এসব থাক। তুমি বল কি ঘটেছে'।

'জাহরা ইভানোভা এই মাত্র টেলিফোন করেছিল। গুরুতর সংবাদ'।

‘কি?’

‘আমার এই বাড়ির কে একজন মহিলার সাথে একজন পুলিশ অফিসারের যোগাযোগ হয়েছে। সেই পুলিশ অফিসার কাজ করছে গ্রেট বিয়ারের পক্ষে। তাঁদের পরিকল্পনা হয়েছে, আজ রাত সাড়ে চারটায় তোমাকে কিডন্যাপ করা হবে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্যে সেই পুলিশ অফিসার আজ আমাদের বাড়ির পাহারার তদারকিতে থাকবে। রাত সাড়ে চারটায় গ্রেট বিয়ারের লোকরা পুলিশের ছদ্মবেশে সেই পুলিশ অফিসারের সহায়তায় গেট দিয়ে আমাদের বাড়িতে প্রবেশ করবে। আর এদিকে সেই মহিলা তাঁর আগেই তাঁকে সরবরাহ করা ক্লোরোফরম পয়জন তোমার ঘরে স্প্রে করে তোমাকে সংজ্ঞাহীন করে রাখবে। তোমার ঘরের ডুপ্লিকেট চাবিও গ্রেট বিয়ারকে সরবরাহ করা হবে। কিডন্যাপ করে তোমাকে ওঁরা নিয়ে যাবে গোপন সুড়ঙ্গ পথে। এ সুড়ঙ্গ পথের খবরও গ্রেট বিয়ারকে দেয়া হয়েছে’।

‘আমি এখানে আছি সেই খবরও তাহলে সেই মহিলাই ওদেরকে দিয়েছে’।

‘সেটাই স্বাভাবিক মনে করছি’।

আহমদ মুসা কোন কথা বলল না। চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করেছিল। ভাবছিল।

কয়েক মুহূর্ত পড়েই সোজা হয়ে বসল। বলল, ‘ডোনা তুমি তোমার রুমে ফিরে যাও। কোন চিন্তা না করে ঘুমিয়ে পড়। আমি এ দিকের ব্যাপারটা দেখছি’।

‘কি করতে চাও তুমি? পুলিশ বেশের গ্রেট বিয়ারের লোকদের আটকাবে?’

‘না, আমি কিছু করব না। ওঁরা এসে আমার ঘর বন্ধ দেখতে পাবে। কোন সংকেত থেকে তারা বুঝবে ক্লোরোফরম পয়জন স্প্রে হয়ে গেছে। তারা আনন্দের সাথে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে ঘর খুলবে। দেখবে যে আমি নেই। তারা ছুটে যাবে তোমার কক্ষে। সম্ভবত তোমার লকেরও ডুপ্লিকেট চাবি তাঁদের কাছে। ঘর খুলে দেখবে, তুমি ঘুমিয়ে আছো, আর কেউ নেই ঘরে। তারপর বিভিন্ন ঘর তালাশ

করবে, সুড়ঙ্গ পথ দেখবে। তারা ধরে নিবে কোনভাবে বিষয়টা জানতে পেরে আমি পালিয়ে গেছি'।

'পালানোর ধারনা তারা করবে কেন? তুমি আজ বাড়িতে নেই এ ধারনাও তো তারা করতে পারে'।

'না আমি রাতে শোবার পর গ্রেট বিয়ারকে খবর দেয়া হয়েছে এবং তাঁর ভিত্তিতেই তারা পরিকল্পনা ফাইনাল করেছে, এটাই যুক্তির দাবী'।

'না আমি শোব না, আমি দেখতে চাই মহিলাটিকে যে ক্লোরোফরম পয়জন স্প্রে করতে আসবে এই কক্ষে'।

'দেখার প্রয়োজন নেই ডোনা। আমি বোধহয় বলতে পারি কে সে'।

'কে সে?' উদগ্রীব ভাবে প্রশ্ন করল ডোনা।

'তিনি তোমার খালাম্মা'।

'খালাম্মা?' আর্তকণ্ঠে বলে উঠল ডোনা।

'গোটা বাড়ির মধ্যে আমার দৃষ্টিটা ওঁর উপর গিয়েছে'।

কিছুক্ষন কথা বলতে পারল না ডোনা। তাঁকে বিস্ময়-বিমূঢ় দেখাচ্ছে।

একটু সময় নিয়ে বলল, 'তোমার সন্দেহের কারন'।

'কারন কিছুই ঘটেনি। কিন্তু তোমার কাছ থেকে খবরটা শোনার পর আমার মনে হয়েছে এ ধরনের ঘটনা একমাত্র তিনিই ঘটাতে পারেন'।

'এই মনে হওয়ার একটা কারন তো নিশ্চয় রয়েছে'।

'তোমার সাথে আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কের ব্যাপারটাকে তিনি নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। যেহেতু এমন চিন্তা তাঁর মাথায় আছে, সেজন্যে নীরবে আমাকে সরিয়ে দেবার কোন পথ পেলে তিনি তা গ্রহণ করতে পারেন'।

ডোনা একবার মুখ তুলে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে মুখ নিচু করল। সংগে সংগে কোন কথা সে বলল না।

কিছুক্ষন পর মুখ তুলল ডোনা। তাঁর মুখ ম্লান। বেদনায় পাণ্ডুর।

বলল, 'তুমি যদি এটা উপলব্ধি করে থাক, তাহলে সেটা ঠিকই হবে। এর পিছনে ওঁর একটা স্বার্থ আছে।

'কি স্বার্থ?'

‘ওঁর একটা ছেলে আছে। তাঁর একটা ধারনা ছিল, লুই পরিবার থেকে তাঁর জন্যে একটা মেয়ে তিনি নেবেন’।

‘সে মেয়েটি তুমি?’

‘হ্যাঁ’।

‘আমিই তাহলে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছি?’

‘না। তুমি আমার জীবনে না এলেও তাঁর স্বপ্ন সফল হতো না। আমার তরফ থেকে কিংবা আব্বার তরফ থেকে কোন সময়ই তিনি পাত্তা পান নি’।

মুহূর্তের জন্যে থামল ডোনা। সোজা হয়ে বসে বলল, ‘তুমি আমাকে গিয়ে ঘুমাতে বলছ। আমি যাচ্ছি না। আমি তাঁকে হাতে-নাতে ধরব। তারপর কালকে আমি.....’। উত্তেজিত কণ্ঠ ডোনার।

আহমদ মুসা ডোনা কে থামিয়ে দিয়ে বলল, ‘ধৈর্য ধর ডোনা। তিনি যেটা করেছেন, সেটা অনেকটাই স্বাভাবিক। এ জন্যে তাঁকে কিছু বলার, এমনকি তুমি বিষয়টা জান তাও তাঁকে জানতে দেয়ার প্রয়োজন নেই। তুমি গিয়ে ঘুমিয়ে পড়। খুব বেশি হলে তোমার ঘরের আশে পাশে দাড়িয়ে তাঁর অভিযানটা তুমি দেখতে পার’।

‘তারপর?’

‘তারপর গ্রেট বিয়ারের লোকরা এসে ঘুরে যাবে। সকাল থেকে আমাকেও এ বাড়িতে দেখা যাবে না’।

চমকে উঠল ডোনা। বলল, ‘তুমি কোথায় যাবে, কোথায় থাকবে?’

প্যারিসে আমাদের সাইমুমের একটা মেস আছে, আমি সেখানে চলে যাচ্ছি। সেখান থেকে টেলিফোনে তোমার সাথে প্রয়োজনীয় কথা হবে’।

কথা বলল না ডোনা। তাঁর মুখ নিচু।

অল্পক্ষণ পরে মুখ তুলল। তাঁর চোখের কোনায় অশ্রু। বলল, ‘আমার অ্যান্টির ষড়যন্ত্রের কাছে তোমাকে পরাজিত হতে দিতে পারি না’।

‘পরাজয়ের প্রশ্ন নয়, এটা একটা কৌশল। আমি চাচ্ছিনা তোমাদের বাড়িতে আর কোন রক্তারক্তি হোক। আমি এখানে থাকলে আগামীকাল রাতেও ওঁরা আসবে, পরেরদিন রাতেও আসবে। এমনকি দিনের বেলাতেও আসতে

পারে। দ্বিতীয়ত আমি চাচ্ছিনা তোমার অ্যান্টি তোমারও শত্রু হয়ে দাঁড়াক। তোমার আব্বা না ফেরা পর্যন্ত এমনটাই থাকুক'।

'তুমি এ বাড়িতে কেন থাকছ, তা কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ'।

'না ভুলিনি। আমার এবং সাইমুমের জনা চারেক কর্মীর চোখ ২৪ ঘণ্টা এ বাড়ির উপর থাকবে'।

একটু থেমেই আহমদ মুসা আবার বলল, 'তাহলে এখন ঘুমাতে যাও। সময় কিন্তু খুব বেশি নেই'।

'তুমি আমাকে কাছ থেকে তাড়াতে পারলেই বাঁচ'। বলে ডোনা গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়ালো।

এমন সময় কিছু একটা শব্দ শুনে আহমদ মুসা উৎকর্ণ হয়ে উঠল। ভালো করে শুনে বলল, 'ডোনা তোমার তিনতলার সিঁড়ি দিয়ে কেউ নামছে'।

ডোনাও উৎকর্ণ হয়ে উঠল। বলল, 'ঠিক তাই'।

ডোনার চোখে-মুখে চাঞ্চল্য দেখা দিল। কিছু বলতে যাচ্ছিল ডোনা। আহমদ মুসা বাধা দিয়ে বলল, 'ডোনা চল তাড়াতাড়ি সিঁড়ির পাশের ঐ করিডোরে যাই। সেখান থেকে সবকিছু দেখা যাবে'।

বলে আহমদ মুসা চলতে শুরু করল।

ডোনা চলল তাঁর পিছনে।

ওঁরা ওদিক গিয়ে একটা দেয়ালের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো।

সিঁড়ি দিয়ে নামছে এক মহিলা। পাশটা দেখা যাচ্ছে। মুখ ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে না।

'অ্যান্টি নামছে'। ফিস ফিস করে নামল ডোনা।

তাঁর হাতে কাগজের একটা ছোট্ট প্যাকেট।

আহমদ মুসা বলল, 'ঐ প্যাকেটে আছে একটা স্প্রে পাম্প এবং কিছু ফাপা তাঁর। আর গুটানো কয়েকটা স্টিক। স্টিকটি খুলে ফেললে একটি দীর্ঘ স্টিকে পরিনত হয়। ঐ স্টিকের মাথায় ফাপা তাঁর বেঁধে ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়া হয়। তারের এ দিকের প্রান্ত যুক্ত থাকে স্প্রে টিউবের সাথে। পাম্প সুইচ অন করার সাথে সাথে ফাপা তাঁর দিয়ে ক্লোরোফরম পয়জন ঘরের ভেতরে ঢুকে যায়।

এই ক্লোরোফরম পয়জন সাধারন ক্লোরোফরম থেকে আলাদা। এ ক্লোরোফরম পয়জন কারো উপর প্রয়োগ করলে সে আপনা আপনি সংজ্ঞা ফিরে পায় না। ইনজেকশন দিয়ে তাঁর সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনতে হয়। বারো ঘণ্টার মধ্যে সংজ্ঞা ফিরিয়ে না আনলে সংশ্লিষ্ট লোক মারা যেতে পারে। তবে উন্মুক্ত অবস্থায় এ পয়জন গ্যাস দশ মিনিটের মধ্যে কার্যকারিতা হারায়'।

চমকে উঠল ডোনা। মায়ের মত যাকে শ্রদ্ধা করে সেই খালাম্মা এত নিষ্ঠুর!

ডোনার খালাম্মা গিয়ে দাঁড়িয়েছে আহমদ মুসার বন্ধ দরজার সামনে।

'ডোনা এবার যাও তোমার ঘরে। উনি কিংবা যারা আসছে তারা যদি আমার ঘর খুলে বসেন, তাহলে ওঁরা সকলেই ছুটবেন তোমার কক্ষের দিকে'।

'ঠিক আছে যাচ্ছি। তুমি কতক্ষন থাকছ?'

'ওঁরা সকলে চলে না যাওয়া পর্যন্ত'।

'গুড নাইট। আসসালামু আলাইকুম'।

বলে ডোনা বিড়ালের মত নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল তিন তলায়।

আহমদ মুসা ডোনার খালাম্মার দিকে নজর রেখেছিল। না সে পেছনে ফিরে তাকায় নি।

ডোনা চলে যাবার পর আহমদ মুসা গড়িয়ে গড়িয়ে গিয়ে আশ্রয় নিল সামনের ড্রয়িং স্পেসে এদিকের সোফা সেটের আড়ালে। ড্রয়িং কক্ষের একটি কোনাকে কভার করে রাখা সোফাটির পেছনে বেশ অনেক জায়গা। সেই স্পেসে গাছওয়ালা একটা টব থাকায় সুন্দর আড়ালেরও সৃষ্টি হয়েছে। ওখান থেকে উকি দিয়ে তিন তলায় উঠার সিঁড়ি দেখা যায়, আবার দোতলায় উঠার সিঁড়িও নজরে পরে।

আহমদ মুসা পকেট থেকে এম-১০ মেশিন রিভলবার বের করে দেখে নিল ঠিক আছে কিনা।

অবশ্য মনে মনে ভাবল, রিভলবারের আজ দরকার হবে না। সে আজ পুরোপুরিই  দর্শক সাজবে। তখন দশ মিনিট পার হয়ে গেছে। আহমদ মুসা দেখল, ডোনার খালাম্মা তিনতলার সিঁড়ির দিকে এগুচ্ছে। ঠিক সেই সময় আহমদ

মুসা দোতলায় উঠার সিঁড়িতে অনেকগুলো পায়ের শব্দ পেল। ওদের পায়ের শব্দ ডোনার খালাম্মাও শুনতে পেয়েছে।

সে মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়াল। তাকাল দোতালার সিঁড়ির দিকে। তারপর দ্রুত উপরে উঠে গেল।

আহমদ মুসাও দোতালার সিঁড়ির দিকে তাকাল। দেখতে পেল একজন পুলিশ উঠে আসছে। হাসি ফুটে উঠল আহমদ মুসার ঠোঁটে। গ্রেট বিয়ারের লোকদের ফরাসী পুলিশের পোশাকে বেশ মানিয়েছে।

ওঁরা দ্রুত উঠে এল।

কয়েকজন দাঁড়ালো দোতলা ও তিনতলার সিঁড়ির মুখে। অবশিষ্টরা পুলিশ সুপারের পোশাকপরা একজনের নেতৃত্বে এসে দাঁড়ালো আহমদ মুসার ঘরের দরজায়।

পুলিশ সুপারের পোশাকধারী লোকটি দরজার গোঁড়ায় বসে পরে চৌকাঠের গোঁড়ায় কি যেন পরীক্ষা করল। তারপর উঠে দাড়িয়ে ছোট করে বলল, ‘ঠিক আছে। কাজ হয়েছে’।

বলেই সে পকেট থেকে একটা চাবি বের করে দরজার তালা খুলে ফেলল।

প্রথমেই ঘরে প্রবেশ করল রিভালবার বাগিয়ে পুলিশ অফিসারের বেশধারী লোকটি।

কয়েক মুহূর্ত পর দরজায় অপেক্ষমান সবাই ছুটে ভেতরে ঢুকে গেল। ঘরের ভেতর ছুটাছুটি ও উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেল আহমদ মুসা। বুঝল সে, বিছানায় তাঁকে না পেয়ে হন্যে হয়ে ঘরের সর্বত্র খুজছে।

অল্পক্ষণ পরেই ছুটে বেরিয়ে এল সেই পুলিশ সুপারবেশী লোকটি। চাপা উত্তেজিত স্বরে বলল, ‘শয়তানটা ঘরে নেই। শূন্য ঘরে ক্লোরোফরম স্প্রে করা হয়েছে’।

বলে একটু থেমেই সে নির্দেশ দিল, ‘বাড়ির সবগুলো ঘর সার্চ করো তোমরা’।

‘স্যার, শয়তানটা প্রিন্সেস ডোনা জোসেফাইনের ঘরে মউজ করছে না তো’। একজন বলে উঠল।

‘ঠিক বলেছ তুমি। তোমরা কয়জন এসো আমার সাথে’।

বলে পুলিশ সুপারবেশী লোকটি দ্রুত তিন তলার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। তাঁর পেছনে পেছনে কয়েকজন।

তিনতলার মাথায় এ সময় এসে দাঁড়ালো ডোনার খালাম্মা। বলল সে পুলিশ সুপারবেশী লোকটিকে লক্ষ্য করে, ‘এত লোক দরকার নেই। আপনি আরেকজন লোক নিয়ে আসুন। প্রিন্সেস ডোনার ঘরের ডুপ্লিকেট চাবি আমার কাছে আছে’।

বলে ডোনার ঘরের দিকে হাঁটতে শুরু করল ডোনার খালাম্মা।

পেছনে পেছনে চলল পুলিশ সুপারবেশী লোকটি এবং আর একজন। পুলিশ সুপারবেশীর হাতে উদ্ধত রিভলবার এবং তাঁর সাথীর হাতের স্টেনগানও উদ্ধত।

ডোনার ঘরের তালা খুলল ডোনার খালাম্মা। দরজা খুলে ধরল সে-ই।

খোলা দরজা দিয়ে ওঁরা দু’জন প্রবেশ করল।

ডোনাকে ঘুমন্ত দেখা গেল তাঁর বেডে। ডোনার খালাম্মাসহ পুলিশবেশী গ্রেট বিয়ারের দু’জনের মুখ হতাশায় ছেয়ে গেল।

নিশ্চিত হবার জন্যে ওঁরা টয়লেট অংশসহ লুকানো যায় এমন সব জায়গায় আতিপাতি করে খুঁজল আহমদ মুসাকে।

হতাশভাবে ওরা তিন তলার অন্যান্য ঘর সার্চ করে দুতলায় সেই আগের জায়গায় নেমে এল। ডোনার খালাম্ম দোতালায় নামল না, দাঁড়িয়ে থাকল তিনতলার সিঁড়ির মাথায়।

বাড়ির চাকর-বাকর ও এ্যাটেনডেন্টদের এক জায়গায় জড়ো করে রেখে উপর-নিচ সবগুলো ঘর সার্চ করে সবাই ফিরে এল দোতলার সেই স্থানে।

‘শোবার পরে শয়তানটা আবার উঠে কোথাও চলে গেছে। শয়তানের বাপ শয়তান সে। বাতাস থেকে সে বিপদের গন্ধ আঁচ করতে পারে’।

‘স্যার এখন কি করণীয়?’

প্রিন্সেস ডোনা জোসেফাইনকে আমরা নিয়ে যাব। তারপর কান টানলে মাথা আসার মত শয়তানটা গিয়ে হাজির হবে তাহলে। চল তোমরা তিনতলায়।

‘না একাজ তোমরা করো না। অবশ্যই সব কথা প্রকাশ হয়ে পড়বে। তোমাদের সাথে ফরাসি সরকারের সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং আমারও ক্ষতি হবে’।

‘কোন ক্ষতির ভয় আমরা করিনা ম্যাডাম। আহমদ মুসাকে আমরা চাই যে কোন মুল্যে। আর প্রিন্সেসকে আমরা যে কিডন্যাপ করেছি, একথা আপনি থানায় না জানালেই হলো। আহমদ মুসাকে পেলেই ওকে আমরা ফেরত দিয়ে যাব। প্রিন্সেসের কোন ক্ষতি হবে না। তিনি আমাদের শত্রু নন’।

‘না। পারিবারিক ভাবে এ ভয়ানক ঘটনার জন্যে দায়ী হবো আমি। সব কথা প্রকাশ হবেই। আমি এর সাথে একমত হতে পারিনা’।

পুলিশ সুপারবেশী লোকটি তিনতলার সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়ানো দু’জনের প্রতি ইংগিত করে বলল, ‘তোমরা ম্যাডামকে নিয়ে এসে শয়তানটার ঘরে ঢুকাও। আর ক্লোরোফরম করো। শান্তিতে ঘুমিয়ে থাকবে’।

তাঁর নির্দেশের সংগে সংগেই দু’জন গিয়ে ডোনার খালাম্মাকে ধরে নিয়ে এল এবং আহমদ মুসার ঘরে ঢুকিয়ে ক্লোরোফরম করে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল।

পুলিশ সুপারবেশী লোকটি সবাইকে ডেকে নিয়ে সোফায় এসে বসল। তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল সবাই। আহমদ মুসা যে সোফার আড়ালে লুকিয়েছিল, সে সোফায় ঠেস দিয়েও একজন দাঁড়াল।

‘শোন তোমরা, প্রিন্সেস ডোনা জোসেফাইন কি রকম বিপজ্জনক তোমাদের মনে আছে। গত বারের ঘটনায় সে আমাদের চারজনকে হত্যা করেছিল। তাঁকে কিডন্যাপ করা যায়নি। এবার সাবধান হতে হবে। একই সাথে তাঁকে আক্রমন করতে হবে। তবে গুলী করবে না কেউ। অন্য যে কোন ধরনের আঘাত তাঁকে করা যায়’।

বলে উঠে দাঁড়াল সুপার ছদ্মবেশী লোকটা। বলল, ‘এসো’।

সে আগে আগে চলল। তাঁর পেছনে একে একে চলল অন্যান্যরা।

আহমদ মুসার সোফায় ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো লোকটি ছিল সর্বশেষ ব্যাক্তি।

তাঁর হাতে ঝুলছিল স্টেনগান।

সে পা বাড়িয়েছিল চলা শুরু করার জন্যে।

আহমদ মুসা নিঃশব্দে উঠে দাড়িয়ে ডান হাতের একটা তীব্র কারাত চালাল তাঁর ঠিক কানের নিচটায়।

তাঁর দেহটা একবার দুলে উঠে নীরবে পরে যাচ্ছিল।

আহমদ মুসা তাঁকে তাঁর স্টেনগান সমেত শুন্যে তুলে ধরে সোফার আড়ালে নিয়ে গেল। তাঁর স্টেনগানটা তুলে নিয়ে নিজের এম-১০ পকেটে রেখে দিল।

ওঁরা সবাই তখন তিনতলার সিঁড়িতে উঠেছে।

আহমদ মুসা গড়িয়ে গড়িয়ে সোফা ও দেয়ালের আড়ালকে আশ্রয় করে চলল সিঁড়ির দিকে।

আহমদ মুসা নিশ্চিত যে, ডোনা ঘুমায়নি এবং গোটা ব্যাপারতাই সে অবলোকন করছে। অবশ্যই সে এদের প্রতিরোধ করবে। কিন্তু এক রিভলবার দিয়ে এতগুলো স্টেনগানধারীর পরিকল্পিত আক্রমন মোকাবেলা করা তাঁর পক্ষে কঠিন।

ওরা সিঁড়ি পেরিয়ে তিনতলার ড্রয়িং রুম-এ উঠে ডোনার ঘরের দিকে চলল।

তিনতলার ড্রয়িং রুম থেকে এক প্রশস্ত করিডোর ধরে এগুতে হয় ডোনার বেড রুমের দিকে।

ওরা সেই করিডোর ধরে এগুচ্ছিল।

আহমদ মুসা গড়িয়ে গড়িয়েই উঠে এসেছে তিনতলার ড্রয়িং-এ। সোফার আড়াল নিয়ে সেই করিডোরের দিকে এগুচ্ছে আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা তখন প্রশস্ত সেই করিডোরটির মুখে।

একটা রিভলবারের গুলীর শব্দ হলো। করিডোরের যে দিকে ডোনার ঘর তাঁর বিপরীত দিকের দেয়াল বরাবর সামনেই যে লোকটি হাঁটছিল, সে গুলী খেয়ে পরে গেল।

আহমদ মুসা বুঝল, দরজা খুলেই গুলী করেছে ডোনা।

একজন গুলী খাবার পর সবাই ওরা চলে এল ডোনার ঘর যেদিকে সেইদিকের সমান্তরালে।

আহমদ মুসা দেখল সঠিক কৌশল নিয়েছে এরা। দেয়ালের এই সমান্তরালে গুলী করতে হলে ডোনাকে অবশ্যই হাত ও মুখটা একটু বের করতে হবে, যা ডোনার পক্ষে সম্ভব হবে না। এই সুযোগ নিয়ে এরা দেয়াল ঘেঁষে এগিয়ে পৌঁছে যাবে ডোনার দরজার প্রান্তে। তখন দরজার কন্ট্রোল এদের হাতে এসে যাবে।

আহমদ মুসা দেখল, এদের একদম সামনের পুলিশ সুপারের পোশাকধারী লোকটি ডোনার দরজার প্রান্তে পৌঁছে গেছে।

আহমদ মুসা আর অপেক্ষা সমীচীন মনে করল না। স্টেনগানের ট্রিগারে তর্জনী স্পর্শ করে উঠে দাঁড়াল। স্টেনগান ওদের দিকে তাক করে বলল, 'আর নয় বীর পুরুষরা, খেলা শেষ'।

চমকে উঠে সবাই একসাথে পেছনে তাকাল। তাকিয়েই রিভলবার ঘুরিয়ে নিয়েছিল পুলিশ সুপারের বেশধারী লোকটি।

তাকে সুযোগ দিল না আহমদ মুসা। তাঁর তর্জনী চেপে বসল স্টেনগানের ট্রিগারে। গুলীর এক অব্যাহত বৃষ্টি ঘিরে ধরল ওদের সবাইকে।

ওঁরা যে যেখানে ছিল, সেখানেই লাশ হয়ে পরে থাকল।

আহমদ মুসা ছুটে গেল ডোনার দরজায়। দেখল, দুই হাতে দুই রিভলবার নিয়ে দরজায় ঠেস দিয়ে দাড়িয়ে আছে সে।

'আমি জানতাম প্রথম গুলীর পর তুমি সাড়া দেবে। রিভলবার দু'টি গাউনের দু'পকেটে রাখতে রাখতে বলল ডোনা।

'কেন তোমার এই ধারনা হয়েছিল?'

'তুমি নিশ্চয় দেখতে চাইবে, আমি পরিস্থিতি মোকাবেলায় কতটা প্রস্তুত'।

'তুমি ঠিকই বলেছ। তবে ওদেরকে এ পর্যন্ত আসতে দেয়া, আমার এম-১০ ব্যবহার না করে স্টেনগান ব্যবহার করার ভিন্ন কারন রয়েছে'।

‘কি সেটা?’

কোন উত্তর না দিয়ে আহমদ মুসা স্টেনগান তুলে দিল ডোনার হাতে। বলল, ‘তুমি পুলিশকে বলবে, তোমার খালাম্মাকে ক্লোরোফরম করে দোতলার এক কক্ষে আটক করার পর ওরা তোমাকে কিডন্যাপ করার জন্যে আসে। তাদের একজনকে রিভলবারের গুলীতে হত্যা করে তাঁর স্টেনগান ছিনিয়ে নিয়ে তারপর ওদের সবাইকে তুমিই হত্যা করেছ। তোমার খালাম্মার সাথে ওদের কথা শুনে তোমার বিশ্বাস হয়েছে পুলিশের ছদ্মবেশে ওরা ক্রিমিনাল, যারা তোমার পিতাকে কিডন্যাপ করেছে’।

বলে একটু থেমেই আহমদ মুসা আবার বলল, ‘তুমি এখনি টেলিফোন কর পুলিশ চীফকে যে, পুলিশের ছদ্মবেশে কিডন্যাপকারীরা ঢুকেছিল বাড়িতে এবং তারা নিহত হয়েছে’।

‘তার মানে তুমি কোন ভুমিকায় থাকছ না?’

‘না। পুলিশ আসার আগেই আমি চলে যাব। পুলিশই তোমার খালাম্মাকে উদ্ধার করবে ঐ ঘর থেকে’।

‘তারপর?’

‘আগে যা বলেছি সে ব্যবস্থাই চলবে। আমি গিয়ে সাইমুমের মেসে উঠছি’।

‘খালাম্মা কি বক্তব্য দেবেন পুলিশকে?’

‘সেটা তিনিই ঠিক করবেন। তুমি বলবে, হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গার পর বাইরে অপরিচিত কণ্ঠস্বরে তুমি বেরিয়ে এসে দেখ, তোমার খালাম্মাকে ঐ ঘরে আটকাচ্ছে এবং কিছু লোক ছুটে আসছে তোমার ঘরের দিকে’।

‘বুঝেছি’।

‘বাড়ির চাকর-বাকরদেরও ওরা আটকে রেখেছে নিচের একটা কক্ষে। তারা তাদের বিবরন দিলে বিষয়টা আরও পরিস্কার হয়ে যাবে। ঠিক আছে?’

‘ধন্যবাদ। ঠিক আছে’।

বলে ডোনা তাঁর মোবাইলটা তুলে নিল পুলিশ চীফকে টেলিফোন করার জন্যে।

‘আসি’।

‘না। পুলিশ গেটে আসা পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা কর’।

‘ঠিক আছে’। বলে বলে আহমদ মুসা বসল সোফায়।

ডোনাও বসল পাশের আরেক সোফায়।

‘যে লোককে তুমি কারাত মেরে ঘুম পাড়িয়েছ, তাঁর কি হবে?’

‘সে এতক্ষনে সংজ্ঞা ফিরে পেয়েছে এবং পালিয়েছে। খবর পৌঁছাবার জন্যে একজন লোক পালাক’।

‘কেন তাঁকে পাকড়াও করলে কিছু খবর পেতে না?’

‘সে আর কি খবর দিবে? এখন তো যুদ্ধক্ষেত্র রাশিয়ায়’।

‘রাশিয়া’ শব্দ শুনেই ম্লান হয়ে গেল ডোনার মুখ। আহমদ মুসা আবার রাশিয়ায় যাবে, এ কথা মনে হতেই হৃদয়ে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করে সে।

ডোনার মুখ নিচু।

আহমদ মুসা তখন ভাবছে এরপর কি ঘটেছে সে বিষয়ে।

টেলিফোন ধরে ডোনা বলল, স্বয়ং পুলিশ চীফ এসেছেন গেটে। আসতে বললাম’।

‘তাহলে আমার ছুটি। আসসালামু আলাইকুম’।

বলে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

ডোনা সাথে সাথে উঠল নিচে নামার জন্যে।

# ৭

রুশ রাষ্ট্রদুতের অফিস কক্ষে বসেছিল আহমদ মুসা।

তাঁর পাশের সোফায় বসেছিল রুশ রাষ্ট্রদূতের মেয়ে ওলগা।

রুশ রাষ্ট্রদূত পাভেল পাশের রুম থেকে এসে আহমদ মুসার সামনে দাঁড়াল। তাঁর হাতে একটি পাসপোর্ট। বলল, 'মিঃ আবদুল্লাহ আপনার ভাবী স্ত্রী প্রিন্সেস মারিয়া জোসেফাইন ওরফে ডোনা জোসেফাইন দু'দিন আগে রাশিয়ার ভিসা নিয়েছে দেখলাম'।

ভীষণ বিস্মিত হল আহমদ মুসা। স্বয়ং রাষ্ট্রদূত না বললে এ কথাকে সে ইয়ার্কি বলে মনে করতো। কিন্তু মুখে কিছু বলল না আহমদ মুসা।

রাষ্ট্রদূত পাভেলের মুখে মজা দেখার মত হাসি। তাঁর হাতের পাসপোর্টটি আহমদ মুসার দিকে তুলে ধরে বলল। মিঃ আহমদ মুসাও ওরফে মিঃ আবদুল্লাহ আপনার ভিসা দিলাম। কিন্তু আপনার রাশিয়ায় তো যাওয়া হবে না, যদি আপনি আমাদের শর্তে না আসেন'।

আহমদ মুসা বিস্মিত হলো না। তাঁর পরিচয়, ডোনার পরিচয় রুশ রাষ্ট্রদূত যে জেনে ফেলবেন খুব শীঘ্রই, এটা সে আগেই মনে করেছিল।

আহমদ মুসা ভাবলেশহীন মুখে উঠে দাঁড়িয়ে পাসপোর্টটা রাষ্ট্রদূতের হাত থেকে নিল। কিন্তু কোন কথা বলল না।

রাষ্ট্রদূতই আবার কথা বলল, 'ভাবছ কেমন করে তোমার পরিচয় জেনে ফেললাম? জেনেভাস্থ আমাদের দুতাবাস অবশেষে প্রিন্সেস তাতিয়ানার মৃত্যুর সময়কার ভিডিও-র একটা কপি বহু অর্থের বিনিময়ে কালোবাজারিদের মাধ্যমে জেনেভা পুলিশের কাছ থেকে কিনে ফেলেছে। এই মাত্র তাঁর একটা প্রিন্ট আমি পেলাম। দেখলাম'। থামল রাষ্ট্রদূত পাভেল।

আহমদ মুসার নতুন পরিচয় পেয়ে এবং তাঁর আব্বার পরবর্তী কথাগুলো শুনে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে ওলগার মুখ। সেও সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে।

‘কথা বলছেন না যে?’ বলল রাষ্ট্রদূত পাভেল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে।

‘কি বলব?’

‘ঐ যে শর্তের কথা বললাম’।

‘শর্ত কি কেন আমি বুঝিনি?’

রাজকীয় ডাইরি ও রাজকীয় আংটি আপনি আমাদের দিয়ে দিবেন এবং আমরা আপনাকে রাশিয়া নিয়ে যাব রাজকীয় মেহমান হিসাবে। আপনি আমাদের সাহায্য করবেন ক্যাথারিনকে উদ্ধারের ব্যাপারে’।

‘শর্ত যদি আমি না মানি?’

‘তাহলে রাশিয়া যাওয়া তো দুরে থাক আপনি এ দুতাবাস থেকেই যেতে পারবেন না’।

‘তার মানে আপনারা বাধা দিবেন। তাহলে আমি কি বন্দী?’

আহমদ মুসা পেছনে তাকাল। দেখল তার পেছনেই সোফার ফুট খানেক দুরে দু’জন স্টেনগান উদ্যত করে দাঁড়িয়ে আছে।

এ ব্যাপার দেখে ওলগার চোখে-মুখে প্রবল বিস্ময় ও উত্তেজনা। সে তার আব্বাকে লক্ষ্য করে বলল, ‘আব্বা এসব আপনি কি বলছেন? সব অতীতকেই কি আপনি ভুলে গেলেন?’

‘মা, আমি রাষ্ট্রদূত। রাষ্ট্রের পক্ষে কাজ করা আমার দায়িত্ব। প্রিন্সেস তাতিয়ানা ভালবাসতেন মিঃ আবদুল্লাহ ওরফে আহমদ মুসাকে। মৃত্যুর সময় প্রিন্সেস সেই রাজকীয় ডাইরি ও রাজকীয় আংটি দিয়ে গেছেন আহমদ মুসাকে প্রিন্সেস ক্যাথারিনের হাতে পৌঁছবার  জন্যে। আমাদের রাষ্ট্র ঐ দু’টো জিনিস খুঁজছে। জিনিস দু’টি আহমদ মুসা আমাদের দিয়ে দিলেই সব চুকে যায়’।

‘কিন্তু মিঃ রাষ্ট্রদূত আপনাদের সেই আশা পুরন হবে না। ক্যাথারিন ছাড়া ঐ জিনিস আর কেউ পাবে না’।

‘কিন্তু আমাদের পেতেই হবে, আপনাকে আমরা ছাড়ব না’।

‘পারলে তো অবশ্যই ছাড়বেন না’।

'পারা সম্পর্কে আপনার সন্দেহ আছে?' যতই বড় আপনি হন, রাষ্ট্রের চেয়ে বড় আপনি.....'।

রাষ্ট্রদূত পাভেলের কথা শেষ হলো না।

হঠাৎ আহমদ মুসার মাথা পেছনে সোফার সিটের দিকে ছুটে গেল। আর পা দু'টি উঠল আকাশের দিকে। তারপর অর্ধ চন্দ্রাকারে বেঁকে পেছনে দাঁড়ানো দুই স্টেনগানধারীর মাথায় তীব্রভাবে আঘাত করল।

সেই প্রচণ্ড লাথিতে স্টেনগানধারী দু'জন চিৎ হয়ে পরে গেল মাটিতে। তাঁদের স্টেনগান হাত থেকে খসে পরে গেল তাদের পাশেই।

আর আহমদ মুসার দেহ অর্ধ চন্দ্রাকারে ঘুরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল দু'জনের মাঝখানে।

আহমদ মুসা তাদের দু'জনের স্টেনগান তুলে নিল হাতে।

মুহূর্তের মধ্যেই ঘটে গেল দৃশ্যপট পরিবর্তনের এই ঘটনা।

রাষ্ট্রদূত পাভেল ও ওলগা দু'জনের চোখই ছানাবড়া।

ধীরে ধীরে চোখের ছানাবড়া ভাব কেটে গিয়ে ওলগার ঠোঁটে আনন্দের হাসি ফুটে উঠল।

কিন্তু রাষ্ট্রদূত পাভেলের বিস্ময় বিমুঢ় ভাব কাটেনি। সে যেন বাকরুদ্ধ।

আহমদ মুসা দু'টি স্টেনগান হাতে নিয়ে ফিরে এল তার সোফায়। বলল, 'স্টেনগান দু'টো আপাতত আমার কাছে থাকবে। বেরুবার সময় প্রয়োজন হতে পারে'।

বলে একটু থেমেই আবার শুরু করল, 'বসুন মিঃ এ্যামবেসেডর'।

বসল রাষ্ট্রদূত পাভেল আহমদ মুসার সামনের সোফায়।

'মিঃ রাষ্ট্রদূত, দয়া করে আপনার প্রহরী বেচারাদের যেতে বলুন'।

রাষ্ট্রদূত চোখ তুলে ওদের ইশারা করল। ওরা কক্ষ থেকে বের হয়ে চলে গেল।

ওরা বেরিয়ে যেতেই রাষ্ট্রদূত পাভেল বলে উঠল, 'আপনার শক্তি ও কৌশলের প্রশংসা করছি আহমদ মুসা। কিন্তু রুশ সরকারকে এই চ্যালেঞ্জ দেয়া

কি আপনার ঠিক হলো? দুজনকে আপনি কুপোকাত করেছেন, কিন্তু সত্যই আপনি দুতাবাস থেকে বেরিয়ে যেতে পারবেন না'।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'মিঃ রাষ্ট্রদূত আমাকে হত্যা করতে পারেন, কিন্তু আমাকে আটকাতে পারবেন না। আর মেরেও ফেলতে পারবেন না আমাকে, কারন তাতে রাজকীয় ডাইরি ও রাজকীয় আংটি চিরদিনের মত হারিয়ে যাবে'।

শেষ কথাটায় চমকে উঠল রাষ্ট্রদূত পাভেল। বলল, 'আমরা রক্তারক্তিতে যেতে চাইনি। আমরা আপনাকে একটা শান্তিপূর্ণ সমাধানের প্রস্তাব দিয়েছি'।

'কিন্তু আমার জন্যে ওটা সম্পূর্ণ অশান্তির'।

'শান্তির সমাধান আপনার কাছে কি আছে?'

'এতদিন যেভাবে কাজ চলছিল, সেভাবেই চলতে হবে। রুশ সরকার যেভাবে কাজ করছিল সেভাবেই তারা কাজ করবেন। আর আমার কাজ আমি করব। প্রয়োজনে দু'পক্ষের সহযোগিতা হতে পারে। ক্যাথারিন উদ্ধার হলে তাঁর হাতে ঐ ডকুমেন্ট দু'টো তুলে দিলেই আমার কাজ শেষ। আপনাদের প্রিন্সেস আপনাদের ডকুমেন্ট নিলে আপনারা কি করবেন  আপনারাই সেটা দেখবেন'।

'জনাব আহমদ মুসা যুক্তিসংগত কথা বলেছেন। তাঁর প্রস্তাব মেনে নেয়ার মধ্যে উভয় পক্ষেরই কল্যান রয়েছে আব্বা'। বলল ওলগা।

'জিনিস দু'টি রুশ সরকারকে দেবেন না কেন? প্রকৃতপক্ষে রুশ সরকারই ও দু'টোর মালিক'।

'সে বিচারের দায়িত্ব আমার নয়। যার হাতে জিনিষ দু'টো পৌঁছে দেয়া আমার দায়িত্ব, আমাকে শুধু সে টুকুই করতে হবে'।

'আমার সরকারের সাথে এ বিষয় নিয়ে আলোচনার আগে আমি কিছুই বলতে পারছি না। কিন্তু আজ ছাড়লে আপনাকে যদি আর না পাই?'

আহমদ মুসা ভ্রু কুঞ্চিত করলো। বলল, 'ছাড়লে' কথাটা বলছেন কেন? আমার এখান থেকে যাওয়া না যাওয়াটা আপনার ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয় মিঃ এ্যামবেসেডর'।

'আমি ঠিক ও কথা বলি নি।আপনি চলে যাওয়ার পর আপনার দেখা কি করে পাবো সে কথাই বলতে চেয়েছি'।

'দেখুন রুশ রাষ্ট্রদূতের সাথে আমার বিরোধ ঘটেছে নীতির প্রশ্নে। বিরোধ না থাকলেই সব ঠিক হয়ে যাবে'।

'বিরোধ মেটার জন্যে সময় তো দরকার'।

'বিরোধ মেটার খবর দিলে আমি খুশি হবো মিঃ এ্যামবেসেডর'।

বলে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা। দু'টি স্টেনগানও সে হাতে তুলে নিয়েছে।

ওলগা ও উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসার সাথে সাথে।

'গুড ডে' বলে আহমদ মুসা বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

পাথরের মত বসে ছিল রাষ্ট্রদূত। কোন কথাই সে বলল না।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ওলগা বলল, 'আজ আমার এক সৌভাগ্যের দিন'।

'কেন?' বলল আহমদ মুসা।

'কিংবদন্তী আহমদ মুসার সাথে শুধু দেখা নয়, কথা বলারও সৌভাগ্য হলো'।

'কেন পরিচয় ও কথা তো আগেই হয়েছে'।

'তখন মিঃ আবদুল্লাহ ছিলেন, আহমদ মুসা নয়'।

'কিন্তু আপনি যাকে সৌভাগ্য বলছেন তা আমার জন্যে দুর্ভাগ্য ডেকে এনেছে। আপনার আব্বাসহ রুশ সরকারের বন্ধুত্ব হারালাম'।

'রুশ সরকার কি করবে আমি জানি না, কিন্তু আপনার সহযোগিতার প্রস্তাবে রুশ সরকারের নিজেকে ধন্য মনে করা উচিত। জানেন? আমার আজই কেবল মনে হচ্ছে, ক্যাথারিন উদ্ধার হবে, নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাও সম্ভব হবে'।

গেট পর্যন্ত পৌঁছে আহমদ মুসা দু'টি স্টেনগান ওলগার হাতে তুলে দিল।

স্টেনগান হাতে নিয়ে ওলগা বলল, 'রাশিয়ায় যাবার আগে কি আবার দেখা হবে?'

'আপনি যদি চান এবং আসার যদি পরিবেশ থাকে'।

‘প্রিন্সেস ক্যাথারিনের উদ্ধারের ব্যাপারে আপনার সহযোগিতা লাগলে আমি বাধিত হবো। আর আমি আমার কিছু বন্ধু-বান্ধবের ঠিকানা দিতে চাই যারা আপনাকে সহযোগিতা করতে পারে’।

‘ধন্যবাদ। আমি এগুলো সংগ্রহের চেষ্টা করব’।

বলে আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল।

আহমদ মুসা ও ডোনা জোসেফাইন বসেছিল মুখোমুখি দু’টি সোফায়।

ডোনার মুখ নিচু। কথা বলছিল সে, ‘আমি মনে করি রাশিয়ায় আমার যেতে হবে, এই ধারনাতেই আমি ভিসা করেছি। অপরাধ হলে মাফ করে দাও’।

‘ভিসা করা অন্যায় নয়। এতে কোন অপরাধও হয়নি। বলছি তোমার রাশিয়া যাওয়া ঠিক কিনা’।

‘কেন ঠিক নয়?’

‘ওটা একটা যুদ্ধক্ষেত্র, ক্যাথারিনের উদ্ধারের উদ্যেশ্য ছাড়া অন্য কোন কাজ সেখানে নেই। তোমার ওখানে যেয়ে কোন কাজ নেই’।

ডোনার গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর হয়ে উঠেছে। মুখ তাঁর নিচু। বলল, ‘যেয়ে কোন কাজ নেই বটে, গেলে কোন অকাজ হবে?’

‘কাজ ও অকাজের কোন প্রশ্ন না থাকলে তুমি যেতে চাইছ কেন?’

ডোনা তৎক্ষণাৎ কোন উত্তর দিল না।

একটু পর ধীরে ধীরে বলল, ‘তুমি সব জেনেছ। আব্বা নেই। তুমি কার কাছে রেখে যাবে আমাকে? খালাম্মার কাছে?’ ভারি কণ্ঠ ডোনার।

ডোনার কথাটা হৃদয় স্পর্শ করল আহমদ মুসার। সত্যি তো, তাঁর খালাম্মা তাঁর নিরাপদ আশ্রয় নয়। কিন্তু তাঁকে রাশিয়া নিয়ে যাবে সে কেমন করে?

বলল আহমদ মুসা, ‘তুমি ঠিকই বলেছ ডোনা, কিন্তু তোমাকে রাশিয়ায় নেব কেমন করে? আগে তুমি তোমার আব্বার সাথে সফর করেছ, এখন?’

‘কেন তোমার সাথে?’

‘আমি ও তুমি একা এক সাথে সফর করতে পারি না। ইসলাম এ অনুমতি দেয় না’।

‘অনুমতির শর্ত?’

আহমদ মুসা মুখ নিচু করল। নীরব রইল কোন উত্তর দিল না। ড্রয়িং রুমে প্রবেশ করল এ সময় জাহরা ইভানোভা। প্রবেশ করতে করতে বলল, ‘অনুমতির শর্ত আমি বলছি। তার আগে আমি মাফ চাইছি আড়ালে দাঁড়িয়ে আপনাদের কথা শোনার জন্যে’।

আহমদ মুসা ও ডোনা দু’জনেই মুখ তুলল। উঠে দাঁড়াল দু’জনেই।

স্বাগত জানালো জাহরা ইভানোভা কে। ডোনা বলল, ‘মাফ করব, কিন্তু তাঁর আগে দু’ঘণ্টা দেরিতে আসার কৈফিয়ত দাও’।

‘কৈফিয়ত কিসের? কাল গেছি দু’ঘণ্টা দেরিতে, আজ এলাম দু’ঘণ্টা দেরিতে। সমান সমান’।

বলে জাহরা ইভানোভা বসল ডোনার পাশে ডোনাকে জড়িয়ে ধরে।

তারপর চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে জাহরা ইভানোভা সোজা হয়ে বসল। বলল গম্ভীর কণ্ঠে, ‘এবার আসল কোথায় আসি’।

বলে একটু থামল। ধীরে ধীরে আবার শুরু করল, ‘আমি মনে করি রাশিয়ার সফরটা খুব কঠিন হবে। জনাব আহমদ মুসার ছবি গ্রেট বিয়ারের সবার কাছে সর্বত্র চলে গেছে। গ্রেট বিয়ারের প্রতি সহানুভূতিশীল রুশ পুলিশের কাছেও এ ছবি থাকবে। তাঁর উপর সরকারেরও টার্গেট হতে পারেন তিনি। যদি তা হন, তাহলে সব পুলিশের কাছে তাঁর ছবি চলে যাবে। এই অবস্থায় যে গোপনীয়তার সাথে সফর করতে হবে, তাতে আপনারা সফর শুরু করার আগে আইন ও সামাজিক বিধানমতে আপনাদের দু’জনের একাত্ম হতে হবে। এটাই অনুমতির শর্ত’।

ডোনা ও আহমদ মুসা দু’জনেই মুখ নিচু করল। ডোনার মুখ লাল হয়ে উঠেছে লজ্জায়। দু’জনেই নীরব।

‘কি ব্যাপার, বলুন আপনারা?’ জাহরা ইভানোভার চোখ দু’টি উজ্জ্বল। ঠোঁটে মধুর এক টুকরো হাসি।

ডোনা তাঁর লাজ রাঙা মুখ জাহরা ইভানোভার কাধে গুজে বলল, 'এটাই যদি অনুমতির শর্ত হয়, এ শর্তে আমি রাজি'।

জাহরা ইভানোভা জড়িয়ে ধরল ডোনাকে। তারপর আহমদ মুসার দিকে চোখ তুলে বলল, 'এবার বলুন জনাব আহমদ মুসা'।

'ও কিন্তু শর্তের জালে পরে 'হ্যাঁ' বলেছে'। আহমদ মুসার ঠোঁটে হাসির রেখা।

জাহরা ইভানোভার ঠোঁটে দুষ্ট এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল। বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, 'শর্তের মধ্যে না পড়লে বিয়েতে উনি না বলতেন বুঝি?'

আহমদ মুসার চোখে-মুখেও লজ্জার ছায়া নেমেছে। বলল, 'ওর আব্বার অনুপস্থিতিতে ব্যাপারটা কেমন হবে?'

জাহরা ইভানোভা মুখ ঘুরিয়ে ডোনার কানের কাছে নিয়ে বলল, 'এবার বল প্রিন্সেস'।

ডোনা তাঁর মুখটা জাহরা ইভানোভার কাঁধে আরও গুজে দিয়ে বলল, 'আব্বার মত আছে। আমার পরিবারেরও সকলে বিষয়টা জানেন'।

জাহরা ইভানোভার মুখে আবার সেই দুষ্টুমির হাসি। বলল আহমদ মুসাকে, 'আর পালাবার কি পথ আছে জনাব'।

আহমদ মুসা তখন গম্ভীর হয়ে উঠেছে। বলল, 'পালাতে চাইনি কখনও। সহস্র দিন সহস্র রাত ধরে তো আমি এ দিনেরই অপেক্ষায় আছি'।

'আলহামদুলিল্লাহ্'। শব্দটি মুখ ফুঁড়ে বেরিয়ে এল জাহরা ইভানোভার।

কথা বলেই জাহরা ইভানোভা হঠাৎ আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ল। সে ডোনাকে জড়িয়ে ধরল বুকে। তার চোখ জানালা দিয়ে ছুটে গেল বাইরে। সে চোখে শুন্য দৃষ্টি। ভারি কাঁপা কণ্ঠে স্বগোতোক্তির মত সে বলল, 'বহু বছর আগে মুসলিম প্রিন্সেস ফাতিমা জোহরাকে একজন রুশ জেনারেল বিয়ে করেছিল জোর করে, তার বহু বছর পরে ফাতিমা জোহরার এক উত্তর-সন্তান জাহরা ইভানোভা ইউরোপের শ্রেষ্ঠ প্রিন্সেসকে তাঁর পূর্ণ সম্মতিতে তুলে দিতে পারছে এক মুসলিম জেনারেলের হাতে। কত যে খুশি হতেন ফাতিমা জোহরা, যদি তিনি জানতেন!'

চোখের দু'কোনায় দু'ফোটা অশ্রু এসে জমেছিল জাহরা ইভানোভার।

ডোনা নিজের মাথার ওড়না দিয়ে মুছে দিল সে অশ্রু খুব মমতার সাথে। বলল, 'এটাই প্রমাণ করে জাহরা ইভানোভা যে, পরাজয়ের কালো রজনী শেষে মুসলমানদের বিজয়ের যাত্রা শুরু হয়েছে'।

ডোনার কণ্ঠও রুদ্ধ এক আবেগের বিস্ফোরণে ভেঙে পড়ল।

ধীরে ধীরে আহমদ মুসার কণ্ঠেও উচ্চারিত হলো, 'আমি আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করছি, ক্রিমিয়ার অপরাজেয় এবং ন্যায়পরায়ন সুলতান করিম গিরাই-এর উত্তর-সন্তান এক রুশ কন্যা জাহরা ইভানোভা আমাদের বিয়ের মধ্যস্থতা করল'। আহমদ মুসার কণ্ঠও ভারি, তাঁর মুখ নিচু। আহমদ মুসা থামল।

সবাই নীরব।

তিন হৃদয়ের মাঝখানে স্বর্গীয় এক নীরব পরিবেশ।

নিরবতা ভাঙল জাহরা ইভানোভার মোবাইল টেলিফোনের বিপ বিপ শব্দ।

টেলিফোন কানে ধরেই জাহরা ইভানোভা সহাস্যে বলল, 'আসসালামু আলাইকুম, ফাতমা।.....সব রেডি?....ধন্যবাদ। কয়টা?...নাইস। ডাঃ জুবায়েরকে আমার ধন্যবাদ দিয়ো। ..আমি না। আমার পক্ষ থেকে তুমিই তাঁকে ধন্যবাদ দাও।....ঠিক আছে। ওকে। আসসালামু আলাইকুম'।

আনন্দে জাহরা ইভানোভার মুখ নাচছে। বলল, 'আপনাদের কাছে মাফ চাই। একটা অনধিকার চর্চা করে ফেলেছি। সকালেই ফাতমাকে টেলিফোন করে বলেছিলাম, 'সময় কম। আজকেই বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। সে যেন সবাইকে বলে এর ব্যবস্থা করে। ফাতমা এখন জানাল, মুসলিম কম্যুনিটি হলে আজ বাদ মাগরিব বিয়ে হবে। সবাই আয়োজনে লেগে গেছে। প্যারিস কেন্দ্রীয় মসজিদের ইমাম বিয়ে পড়াবেন'। থামল ইভানোভা।

'আমাদের বিয়ে? আজ? বাদ মাগরিব?' এক সাথেই আহমদ মুসা ও ডোনার বিস্ময় বিজড়িত কণ্ঠ ধ্বনিত হলো।

'তোমাদের নয়তো কার বিয়ের জন্যে এত পাগল হবে জাহরা ইভানোভা?'

আহমদ মুসা ও ডোনা কোন কোন উত্তর দিল না। দু'জন দু'জনের দিকে একবার চেয়ে মুখ নিচু করল।

'ভয় নেই তোমাদের। কেনা-কাটার কাজটা সেরে ফেলেছি। বিয়ের কেনা-কাটা করতে গিয়েই তো দু'ঘণ্টা দেরি করেছি'।

বলে ইভানোভা ডোনার মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'ধন্যবাদ দেবে না?'

ডোনার চোখ-মুখ লজ্জায় আনন্দে ভারি হয়ে উঠেছিল। সে জাহরা ইভানোভাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল। বলল, 'তুমি এত ভালো কেন?'

জাহরা ইভানোভা ডোনার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, 'শেরেক' করো না, 'শেরেক' করো না। এ কথাটা জনাব আহমদ মুসার জন্যে রিজার্ভ করে রাখো'।

ডোনা জোহরা ইভানোভার পিঠে একটা কিল দিয়ে সরে বসে বলল, 'দেখবে আমিও সুযোগ পাবো। ডাঃ জুবায়েরকে ফাতমার মাধ্যমে ধন্যবাদ দিলে কেন? নিজে দিতে পারলে না কেন?'

জাহরা ইভানোভার চোখে-মুখে এক ঝলক লজ্জা নেমে এল। একটু সলাজ হেসে বলল, 'ওর সাথে তো এই সেদিন আমার পরিচয়'।

'কবে পরিচয় এই প্রশ্ন তো আমি জিজ্ঞেস করিনি। এক দৃষ্টিতেই শত বছরের প্রেম হয়ে যায়। তুমি....।

ডোনাকে বাধা দিয়ে উঠে দাঁড়াল জাহরা ইভানোভা। বলল, 'দেখ এসব আলোচনায় নষ্ট করার মত সময় আমার নেই। তুমি তোমার পরিবারকে জানাও বিষয়টা। আমি এখনি আসছি বাইরে থেকে'।

বলে আহমদ মুসাকে সালাম দিয়ে চলে গেল জাহরা ইভানোভা।

বসেছিল আহমদ মুসা ও ডোনা। দু'জনেরই মুখ নিচু। দু'জনের মধ্যে অস্বস্তিকর এক নিরবতা। মুখ তুলল ডোনা। তাকাল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসাও তাকিয়েছে।

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল ডোনা। কিন্তু পারলো না। রাজ্যের লজ্জা এসে ঘিরে ধরল তাঁকে। লজ্জায় আড়ষ্ট ঠোঁটে কথা ফুটে উঠা একটু হাসি নিয়ে মুখ নিচু করল আবার ডোনা।

পরদিন ভোর চারটা।

আহমদ মুসা হাতঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে উঠে বসল। বেড সুইচটি অন করল।

পাশে ডোনা অঘোরে ঘুমাচ্ছে। অবিন্যস্ত চুলের কয়েকটি গোছা মুখের উপর এসে পড়েছে।

আহমদ মুসা চুলগুলো মুখ থেকে সরিয়ে আস্তে আস্তে কয়েকটা টোকা দিল গালে।

নড়ে উঠে ধীরে ধীরে চোখ খুলল ডোনা। আহমদ মুসার দিকে তার চোখ পড়তেই লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল তার মুখ। দু'হাতে মুখ ঢাকল সে।

আহমদ মুসা ডোনার হাত দুটি মুখ থেকে সরিয়ে মুখের দিকে উকি দিয়ে বলল, 'এসো নামাজের জন্যে তৈরী হই'।

বলে আহমদ মুসা উঠল বিছানা থেকে।

আহমদ মুসা টয়লেটের দিকে চলে গেলে গা থেকে কম্বল নামিয়ে কাপড় ঠিক-ঠাক করে ডোনা ও উঠে দাঁড়াল।

সাইমুম সিরিজের পরবর্তী বই

# জারের গুপ্তধন

**কৃতজ্ঞতায়ঃ**

1. Abu Taher
2. Sharwat Kabir Safin
3. Md Amdadul Haque Swapan

## সাইমুম-২৪

# জারের গুপ্তধন

## আবুল আসাদ

# ১

মস্কোর দক্ষিণ অংশে মস্কোভা নদী লেনিন হিলস-এর পাদদেশে এসে 'ইউ' টার্ন নিয়েছে। এই 'ইউ' টার্নের যেখানে কমসোমলস্কায়া হাইওয়ে দক্ষিণ থেকে এসে মস্কোভা নদী অতিক্রম করে এগিয়ে গেছে সেদোভায়া রিং-এর দিকে, সেখানে মস্কোভা নদীর তীরে একটি দুর্গ সদৃশ বাড়ি।

বাড়িটার বিশাল গেটে একটা সুদৃশ্য সাইনবোর্ড। লেখা, 'হেরিটেজ ফাউন্ডেশন'। সাইনবোর্ডে 'হেরিটেজ ফাউন্ডেশন'-এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'সোশ্যাল রিসার্চ ফর ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন'।

সরকারী কাগজে কলমে সংস্থাটি একটি জাতীয় এনজিও। এই এনজিও সাইনবোর্ডের আড়ালে এটাই গ্রেট বিয়ারের হেডকোয়ার্টার।

বাড়িটা এক সময় সোভিয়েত রাজবন্দীদের বধ্যভূমি বলে কথিত কেজিবি'র জেলখানা 'লুবিয়াংকা'র অংশ ছিল। কমিউনিজমের পতনের পর বাড়িটা পরিত্যক্ত হয়। এই পরিত্যক্ত বাড়িটাই 'হেরিটেজ ফাউন্ডেশন'-এর নামে গ্রেট বিয়ার কিনে নিয়েছে। গ্রেট বিয়ার লুবিয়াংকার 'হেরিটেজ' ঠিকই রক্ষা করছে একে আর একটা বধ্যভূমিতে পরিণত করে। লুবিয়াংকা ছিল কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার বধ্যভূমি, গ্রেট বিয়ারের হাতে এসে এটা এখন হয়েছে রুশীয়করণের

বধ্যভূমি। হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের ভূগর্ভস্থ দু'টি তলা গ্রেট বিয়ারের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বধ্যভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বাড়িটা দুর্গ সদৃশ, কারণ পাঁচতলা উঁচু বিরাট এলাকা নিয়ে তৈরি বিরাট বাড়িটার উত্তর দিকের প্রধান গেটটি ছাড়া আর কোন দরজা, জানালা, কার্নিশ, ব্যালকনি ইত্যাদি কিছুই নেই। বাড়ির বহির্দেয়ালের নিচ থেকে শীর্ষ পর্যন্ত প্রতি পনের ফুট দূরত্বে বিল্ডিং-এর চারদিক ঘুরে একসারি করে ঘুলঘুলি। ঘুলঘুলির আয়তন এক বর্গফুটের বেশি হবে না।

দুর্গ সদৃশ বাড়ির দক্ষিণ অংশে পাঁচ তলায় বিরাট একটি হলঘর।

ঘরে ডজন দুই বড় সাইজের কুশন চেয়ার। চেয়ারগুলোর সামনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। ফাঁকা জায়গাটার পরে প্রায় পাঁচ ফুট উঁচু একটা মঞ্চ।

মঞ্চের ঠিক মাঝখানে সাত ফুট উঁচু আরও একটা মঞ্চ। মঞ্চটির আয়তন পাঁচ বর্গফুটের মত হবে।

হলরুমের মেঝে থেকে এই মঞ্চটিকে সলিড মেঝে বিশিষ্ট বলে মনে হয়। আসলে মঞ্চটি দশ ফুট কংক্রিটের দেয়াল বিশিষ্ট একটা ফাঁকা চোঙা।

হলঘরের পঁচিশটি চেয়ারে পঁচিশজন লোক বসে। ওদের দিকে তাকালে ওদের পোশাক, স্বাস্থ্য, চেহারা, গাম্ভীর্য ইত্যাদি বলে দেয়, ওরা সবাই রাশিয়ার এক একজন দিকপাল।

ওদের স্থির এবং সম্ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টি মঞ্চের উপরে মঞ্চের শীর্ষদেশটার উপর নিবদ্ধ।

তাদের চোখের সামনে বরাবরের মতই একটা সোনালী সিংহাসন উঠে এল মঞ্চের শীর্ষে। সোনালী সিংহাসনে সোনালী বর্মে ঢাকা একজন মানুষ। মুখেও সোনালী মুখোশ।

সোনালী সিংহাসনটি মঞ্চ শীর্ষে উঠে আসার সাথে সাথে হলের চেয়ারে বসা সকলে উঠে ডান হাত সামনে বাড়িয়ে মাথা নিচু করল।

মঞ্চ শীর্ষ থেকে গমগমে দু'টি শব্দ বেরিয়ে এল, 'বস তোমরা।'

মাথা নিচু করে বসল সবাই।

সেই কণ্ঠ আবার ধ্বনিত হলো। মঞ্চ শীর্ষ থেকে ভেসে এল কথা, 'রাশিয়ার গর্বিত সন্তানগণ, আপনাদের মাধ্যমে সকলের প্রতি আমার শুভেচ্ছা।'

বলে একটু থামল। মুহূর্তকাল পরে গম গম করে উঠল সেই কণ্ঠ আবার। বলল, 'গোয়েন্দা প্রধান মাজুরভ, আমাদের 'অপারেশন প্যারিস প্রজেক্ট' সম্পর্কে বলার জন্যে তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি।'

'মহামান্য আইভান দীর্ঘজীবী হোন।'

বলে সামনের সারি থেকে উঠে দাঁড়ানো মাজুরভ একটা ঢোক গিলে আবার শুরু করল, 'প্রিন্সেস ক্যাথারিন ও ফরাসী রাজপরিবারের সদস্য প্রিন্স প্লাতিনিকে মস্কো নিয়ে আসতে পারার সাফল্য বাদে আমাদের প্যারিস অপারেশন ব্যর্থ হয়েছে। রাজকীয় ডায়েরী ও রাজকীয় রিং-এর সন্ধান পেয়েও এবং কার কাছে আছে জেনেও তা উদ্ধার করতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। সেই লোককে তিন বার ধরেও আমরা আটকাতে পারিনি। সেখানে পাঠানো প্রায় পুরো জনশক্তি আমাদের ধ্বংস হয়ে গেছে মাত্র একজন লোককে মোকাবিলা করতে গিয়ে। আমরা সেখানে আক্রমণের পর্যায় থেকে আত্মরক্ষার অবস্থানে নেমে এসেছি। আহমদ মুসা প্রিন্সেস ক্যাথারিন ও মিঃ প্লাতিনিকে উদ্ধার করার জন্যে ইতোমধ্যেই রাশিয়া যাত্রা করেছে বলে আমরা জানতে পেরেছি।' থামল মাজুরভ।

মঞ্চ থেকে সেই কণ্ঠ বেজে উঠল আবার। বলল, 'আরও সফলতা আছে। গ্রেগরিংকো, উস্তিনভ, ম্যালেনকভ, মায়োভস্কির মত অপদার্থদের দেশে ফিরে আসতে হয়নি। ওদের জন্যে আমাদের কোন বুলেট খরচ করতে হয়নি।' থামল কণ্ঠটি।

হলে চেয়ারে বসা সকলের মুখ ম্লান হয়ে গেল। গ্রেট বিয়ারের আইনে ব্যর্থতার কোন জায়গা নেই। মৃত্যুই এর একমাত্র মূল্য। চেয়ারে উপবিষ্ট সকলের ম্লান মুখে এই ছবিই ভেসে উঠেছিল।

মঞ্চ থেকে ভেসে আসা কণ্ঠ থামতেই মাজুরভ সামনের দিকে মাথা নুইয়ে বলে উঠল, 'মহামান্য আইভান দীর্ঘজীবী হোন'।

সেই কণ্ঠ আবার। বলল, 'ভ্লাদিমির খিরভ, তোমার পরিকল্পনা জানাও।'

সামনের সারির মাজুরভের পাশ থেকে উঠে দাঁড়াল একজন। মাথা নুইয়ে সামনের দিকে দেহটা একবার ঝুঁকিয়ে বলল, 'মহামান্য আইভান, আমাদের এ প্রজেক্টের নাম 'অপারেশন ফরচুন প্রজেক্ট'। সংক্ষেপে ওএফপি (OFP)। এর লক্ষ্য, প্রিন্সেস ক্যাথারিনকে সিংহাসনে বসিয়ে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সরকারী প্রয়াস বানচাল করা এবং নতুন আইভানের নেতৃত্বে রাশিয়ায় সেই আইভানের গৌরব-যুগ আবার ফিরিয়ে আনা। এজন্যে এ প্রজেক্টের মূল কাজ হলো, প্রিন্সেস ক্যাথারিনকে হাতের মুঠোর মধ্যে রাখা এবং আহমদ মুসাকে হাতের মুঠোয় এনে রাজকীয় ডায়েরী ও রাজকীয় আংটি উদ্ধার করা।' থামল ভ্লাদিমির খিরভ।

কথা শেষ করেও দাঁড়িয়ে থাকল। মঞ্চের সেই কণ্ঠ থেকে বসার নির্দেশ এলে তবেই সে বসল।

'মাজুরভ, এবার তুমি বল।' ধ্বনিত হল মঞ্চ থেকে সেই কণ্ঠ।

মাজুরভ উঠে দাঁড়িয়ে তার নিচু মাথা সামনের দিকে একটু ঝুঁকিয়ে বলল, 'আমরা মনে করছি, আহমদ মুসা রাশিয়া যাত্রা করেছে। তবে আমরা জানতে পারিনি সে কোন পথে রাশিয়া আসছে। আমাদের অনুমান, সে আকাশপথ নয়, স্থলপথকেই নিরাপদ মনে করবে। যতদূর জানা গেছে, লুই প্রিন্সেস মারিয়া জোসেফাইন তার সাথে রয়েছেন। আহমদ মুসা ও মারিয়া জোসেফাইন রুশ অ্যাম্বেসি থেকে ভিসা নিয়েছে, কিন্তু কি নামে নিয়েছে, কি বেশে নিয়েছে তা আমরা জানতে পারিনি। তাদের ভিসার কোন দরখাস্ত দূতাবাসের ভিসা সেকশনে নেই। স্বয়ং রাষ্ট্রদূত তাদের ভিসা ইস্যু করেছেন এবং সমস্ত রেকর্ড তার কাছেই রয়েছে। আমাদের সূত্র মনে করেন যে, এমনও হতে পারে যে, তাদের কোন রেকর্ডই অ্যাম্বেসিতে রাখা হয়নি।'

'তারপর?' মাজুরভ থামার সাথে সাথেই মঞ্চ থেকে কণ্ঠটি ধ্বনিত হলো।

'পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাংগেরী, রুমানিয়া সীমান্তের যে কোন পয়েন্ট দিয়ে তারা রাশিয়া প্রবেশ করতে পারে। সীমান্তেই যাতে তাদের ফাঁদে ফেলা যায়, এ জন্যে আমাদের লোকদের এবং মিত্র রুশ পুলিশ ও বন্ধু দেশের পুলিশদের আমরা সতর্ক করে দিয়েছি।'

'বলে যাও।' মাজুরভ থামতেই মঞ্চের সেই কণ্ঠ ধ্বনিত হল অনেকটা বজ্রপাতের মতো।

মাজুরভ আবার শুরু করল, 'সরকারের তৎপরতার দিকে আমরা নজর রাখছি। তারা এখন নিশ্চিত, প্রিন্সেস ক্যাথারিন রাশিয়ায়। তারা তাদের গোয়েন্দা ও পুলিশ বাহিনীকে সর্বাত্মক অনুসন্ধানের নির্দেশ দিয়েছে। তাদের ধারণা, প্রিন্সেস ক্যাথারিনকে মস্কো অথবা লেনিনগ্রাডেই রাখা হয়েছে। তারা আরও নিশ্চিত হবার পর কম্বিং অপারেশনেও যেতে পারে।'

একটু থেমে একটা ঢোক গিলে আবার শুরু করল মাজুরভ। বলল, 'মিঃ প্লাতিনিকে রাশিয়ায় নিয়ে আসায় তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে ফ্রান্সের সরকারী মহলে। ব্যাপারটা প্রকাশিত হলে জনগণের চাপে সরকার খারাপ অবস্থায় পড়বে। সুতরাং ফরাসী সরকার হুমকি দিচ্ছে, সত্বর তাকে মুক্তি না দিলে তারা রুশ সরকারকে জানানো ছাড়াও ইন্টারপোল ও জাতিসংঘের সাহায্য নেবে। আমরা তাদের বোঝাবার চেষ্টা করেছি যে, ফরাসী প্রিন্সকে খুবই সম্মানের সাথে রেখেছি। আহমদ মুসাকে আমাদের মুঠোয় আনার জন্যে আর কোন উপায় ছিল না বলেই সাময়িকভাবে তাকে আমাদের পণবন্দী করতে হয়েছে। কিন্তু তারা এসব কিছুই শুনতে রাজি নয়। তারা আমাদের পনের দিন সময় দিয়েছে। এর মধ্যে তাকে রিলিজ করতে হবে। আর ইতোমধ্যে মিঃ প্লাতিনিকে ফরাসী প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলতে দিতে হবে।' থামল মাজুরভ।

'এসবই তোমাদের ব্যর্থতার মাশুল। তোমরা এক ছোকরা আহমদ মুসাকে হাতের মুঠোয় আনতে ব্যর্থ হয়ে ধরে এনেছ এক ফরাসী বুড়ো ভদ্রলোককে।'

একটু থামল মঞ্চ থেকে ছুটে আসা কণ্ঠটি। পরক্ষণেই আবার গর্জন করে উঠল, 'তোমরা বুড়োকে ঠাণ্ডা কর। পারলে তাকে রাজি করিয়ে তার পরিবারের জন্যে তার কাছ থেকে মেসেজ নাও যে, তিনি ভাল আছেন। সত্বরই দেশে ফিরবেন। দেখ, লক্ষ্যে পৌঁছার আগে এসব নিয়ে আমরা কোন ঝামেলায় পড়তে চাই না।'

মঞ্চের সিংহাসনটি নড়ে উঠল। সেই সাথে জ্বলে উঠল মঞ্চে একটা নীল বাতি।

মুহূর্তেই হলে চেয়ারে বসা সকলে যন্ত্রের মত উঠে দাঁড়াল। সকলে সমস্বরে বলে উঠল, 'দীর্ঘজীবী হোন, মহামান্য আইভান।'

মঞ্চ থেকে সেই কণ্ঠ গম গম করে বেজে উঠল, ' দীর্ঘজীবী হোক রাশিয়া। দীর্ঘজীবী হোন রাশিয়ার মহান সন্তানরা। শুনে রাখ সবাই, ব্যর্থতা ও ব্যর্থ দু'টিই রাশিয়া ও রাশিয়ার মহান জনগণের শত্রু।'

তার কণ্ঠ থামার সাথে সাথেই সেই স্বর্ণ সিংহাসন হারিয়ে গেল মঞ্চের বুকে।

সবাই সার বেঁধে একে একে বেরিয়ে গেল হল থেকে।

হল থেকে বেরিয়েই গ্রেট বিয়ারের গোয়েন্দা প্রধান মাজুরভ অপারেশন ফরচুন প্রজেক্ট (OFP)-এর প্রধান ভ্লাদিমির খিরভকে কানে কানে বলল, 'চলুন, মিঃ প্লাতিনির কাছে এখনি যেতে হবে।'

মিঃ খিরভ মাথা নেড়ে সায় দিল।

মাজুরভের পাশেই হাঁটছিল আরেকজন। সে মাজুরভকে লক্ষ্য করে বলল, 'মিঃ মাজুরভ, আহমদ মুসাকে কি আমরা বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি না?'

প্রশ্ন করল নিকোলাস বুখারিন। রুশ সেনাবাহিনীর সদ্য বরখাস্তকৃত প্রতিভাবান এক যুবক জেনারেল। চরমপন্থী আচরণের জন্যে তাকে সেনাবাহিনী থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। সেনাবাহিনীতে থাকাকালীন সময়েই সে গ্রেট বিয়ারের সক্রিয় কর্মী ছিল। এখন সে গ্রেট বিয়ারের শীর্ষ অপারেশন কমান্ডার।

প্রশ্ন শুনে হাসল মাজুরভ। বলল, 'আমরা তাকে গুরুত্ব দিচ্ছি না। এই গুরুত্ব সে আদায় করে নিয়েছে।'

'আমিও কিছু জানি তাকে। এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ তাকে মনে করাই তার মোকাবিলায় আমরা দুর্বল হয়ে পড়ার কারণ।'

'আপনার এই মনোভাবকে আমি অভিনন্দিত করছি, কিন্তু সেই সাথে সাবধানও করছি। কাউকে ওভারএস্টিমেট করার মধ্যে ক্ষতি আছে, কিন্তু কাউকে আন্ডারএস্টিমেট করার ক্ষতি অনেক বেশি।' বলল মাজুরভ।

‘এই নীতিকথা অবশ্যই স্মরণযোগ্য, কিন্তু একজন এশিয়ানকে আমরা খুব বেশি উপরে তুলেছি। ওখান থেকে তাকে নামাতে হবে।’

‘ধন্যবাদ নিকোলাস। একজন অপারেশন কমান্ডারের কাছ থেকে আমরা এটাই চাই। কিন্তু আবার বলি, আহমদ মুসার ব্যাপারে সাবধান।’ মাজুরভ বলল।

নিকোলাস বুখারিন তার দুই তর্জনী দুই কানে ঢুকিয়ে বলল, ‘দুর্বলতার সূচক এই কথাগুলো আমি শুনতে চাই না, মিঃ মাজুরভ।’

মাজুরভ হাসল। বলল, ‘দুর্বলতার কথা শুনে হজম করাই কিন্তু সবলতার লক্ষণ জেনারেল।’

‘একটা যুদ্ধের জন্যে যা সত্য, তা একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে সত্য করার প্রয়োজন নেই মিঃ মাজুরভ।’

‘ব্রাভো মিঃ নিকোলাস বুখারিন। এই ধরনের ডেসপারেট যোদ্ধাই আমাদের প্রয়োজন।’ বলল ভ্লাদিমির খিরভ।

কয়েক মুহূর্ত তিনজনই চুপচাপ।

নীরবতা ভাঙল নিকোলাস বুখারিন। বলল মাজুরভকে লক্ষ্য করে, ‘একটা অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারি?’

‘এখন আপনার জন্যে সব প্রশ্নই সংগত ধরে রাখুন।’ মাজুরভ বলল।

‘আমরা এখন কোন লক্ষ্যে কাজ করছি, দেশপ্রেমহীন বিদেশের ক্রীড়নক সরকারের পতন ঘটানো, না জারের গুপ্তধন দখল?’ প্রশ্ন করল নিকোলাস বুখারিন।

‘এখন প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য জারের গুপ্তধন দখল। এই দখলের মাধ্যমে আমরা রাশিয়ায় নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র চালু করে সরকারের শেষ রক্ষার প্রয়াসকে নস্যাৎ করতে চাই। এই গুপ্তধনের অর্থশক্তিই আমাদেরকে সাহায্য করবে রাশিয়ার জন্যে রাশিয়ার সরকার কায়েম করতে এবং গুপ্তধনের নকশার জন্যে চাই রাজকীয় আংটি এবং রাজকীয় আংটির জন্যে আহমদ মুসাকে।’

‘কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, আহমদ মুসাকে হাতে পেলেই কি রাজকীয় আংটি এবং ডায়েরী আমরা পেয়ে যাব? ওগুলো কি তিনি আমাদের দেবার জন্যে পকেটে করে নিয়ে আসছেন?’

‘তা হয়তো নিয়ে আসছেন না। কিন্তু কান টানলে মাথা আসার মত, আহমদ মুসা হাতে এলে জিনিসও হাতে এসে যাবে।’ বলল মাজুরভই।

‘তা আসতে পারে। কিন্তু সেটা হতে পারে প্যারিস থেকে নিয়ে আসার ব্যাপার। আমরা কেন আহমদ মুসাকে রাশিয়ায় টেনে নিয়ে আসছি। প্যারিসে তাকে এবং জিনিসগুলোকে একসাথে পাওয়া সহজ ছিল।’

‘সে চেষ্টা তো হয়েছে জেনারেল।’

‘কোন চেষ্টাকেই শেষ চেষ্টা বলা ঠিক নয়।’

‘তা ঠিক। কিন্তু ঘটনার সাথে লুই রাজপরিবার জড়িয়ে পড়ার পর ফ্রান্স আমাদের জন্যে নিরাপদ ছিল না। এ দিকটা আপনি নিশ্চয় স্বীকার করবেন।’

জেনারেল নিকোলাস বুখারিন কোন উত্তর দিল না। ভাবছিল সে। তার মুখ আগের চেয়ে এখন প্রসন্ন।

‘প্রশ্ন শেষ তো মিঃ নিকোলাস?’

বলল ভ্লাদিমির খিরভ হাসিমুখে নিকোলাসের দিকে তাকিয়ে।

‘জ্বি, আপাতত। এখন আসতে পারি স্যার?’ মাজুরভ ও খিরভের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল নিকোলাস।

‘গুড নাইট জেনারেল নিকোলাস।’ প্রায় একসাথেই বলে উঠল মাজুরভ এবং খিরভ।

মাজুরভ ও খিরভ গিয়ে একটা লিফটে প্রবেশ করল।

লিফট গিয়ে গ্রাউন্ড ফ্লোরে থামল।

লিফট থেকে বেরিয়ে মাজুরভ ও খিরভ বিশাল এক চত্বরে এসে দাঁড়াল। বিশালতার জন্যে চত্বর বলে মনে হয়, কিন্তু আসলেই এটা একটা হলরুম। দেখতে ডিম্বাকৃতি। হলের চারদিক ঘুরে ঘরের সারি। ডিম্বাকৃতি এই হলরুমের মাঝখানে লিফট কক্ষ। কক্ষটির চারদিকে চারটা লিফট। চারটা লিফটের তিনটির দরজা

থেকে বেরুলেই লাল কার্পেটে গিয়ে পা পড়ে। লাল কার্পেটের তিনটি রাস্তা সোজা এগিয়ে সারিবদ্ধ ঘরের তিনটি করিডোরে গিয়ে প্রবেশ করেছে।

কিন্তু মাজুরভ ও খিরভ যে লিফট থেকে বাইরে বেরুল, সেখানে লাল কার্পেট নেই এবং সেই দরজা থেকে সোজা এগোলে ঘরগুলোর সারিতে কোন করিডোরও পাওয়া যায় না। কিন্তু পাওয়া যায় একটা বন্ধ দরজা।

মাজুরভ ও খিরভ লিফট থেকে বেরিয়ে চত্বরে মুহূর্তকালের জন্যে দাঁড়াল। চারদিকে একবার তাকাল। তারপর লিফটের দরজা থেকে নাক বরাবর সোজা এগোলো। দাঁড়াল গিয়ে বন্ধ দরজার সামনে।

সংগে সংগেই দরজা খুলে গেল।

দরজার পরেই ছোট্ট একটা কক্ষ। কক্ষের মাঝখানে একটা টেবিল। টেবিলের তিন দিকে ছয়টা চেয়ার।

ঘরে ঢুকে মাজুরভ ও খিরভ টেবিলের দু'পাশের দু'টি চেয়ারে গিয়ে বসল।

বসার সাথে সাথেই কক্ষের দরজা বন্ধ হয়ে গেল এবং গোটা কক্ষটি দ্রুত নিচে নামতে শুরু করল।

কক্ষটি এক জায়গায় গিয়ে স্থির হলো। সাথে সাথেই মাজুরভ ও খিরভ চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। সংগে সংগে খুলে গেল কক্ষের দরজা।

মাজুরভ ও খিরভ কক্ষ থেকে বেরিয়ে যেখানে পা রাখল, সেটা একটা প্রশস্ত করিডোর। সাদা কার্পেটে মোড়া।

করিডোর ধরে হাঁটছিল মাজুরভ ও খিরভ।

করিডোরটির একদম শেষ প্রান্তে আরেকটা প্রশস্ত করিডোর। উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত। এ করিডোরটির পূর্ব ধার ঘেঁষে পাঁচটি স্বতন্ত্র কক্ষ। কক্ষ না বলে এগুলোকে ভিআইপি স্যুট বলাই ভাল। বিশাল কক্ষের প্রত্যেকটিতে শয়নকক্ষ, ড্রইং ও ডাইনিং কক্ষ রয়েছে। রয়েছে প্রশস্ত বাথ।

পাঁচটি কক্ষের দক্ষিণ দিক থেকে দ্বিতীয় কক্ষের দরজার সামনে গিয়ে দু'জন দাঁড়াল।

দরজায় একদম মুখ বরাবর উঁচুতে একটা ডিজিটাল কী-বোর্ড।

মাজুরভ তর্জনী দিয়ে কী-বোর্ডের কয়েকটা পয়েন্টে নক করল।

খুলে গেল দরজা।

সুসজ্জিত কক্ষের একটা সুদৃশ্য চেয়ারে বসে প্লাতিনি। তার সামনে টেবিল। টেবিলে বেশ কিছু বই। একটা বই খোলা ছিল প্লাতিনির সামনে।

'ভেতরে আসতে পারি প্রিন্স প্লাতিনি?' বলল মাজুরভ।

দু'জনের পায়ের শব্দে ওদের দিকে ফিরে তাকিয়েছিল প্লাতিনি।

ওদের দেখেই মুখটা অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছিল প্লাতিনির। কিন্তু মুখে হাসি টেনেই বলল, 'আসুন।'

প্লাতিনিকে ধন্যবাদ দিয়ে টেবিলের সামনে দেয়াল বরাবর রাখা সোফায় বসে পড়ল মাজুরভ ও খিরভ।

বসেই মাজুরভ বলল, 'সম্মানিত প্রিন্স, আমরা দুঃখিত, অন্যের পাপের খেসারত আপনাকে দিতে হচ্ছে।'

'কার পাপের কথা বলছেন?'

'কেন, আহমদ মুসার পাপেই তো আপনি বন্দী?' মাজুরভই বলল।

'আপনাদের প্রিন্সেসের দেয়া দায়িত্ব সে পালন করতে চাচ্ছে শত বিপদ মাথায় নিয়ে। দায়িত্ব পালন, সততা, ওয়াদা রক্ষা ইত্যাদি কি পাপ?'

'সে অনাহুত বিদেশী। আমাদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ তার অন্যায়।'

'সে অনাহুত নয়। আপনাদের ক্রাউন প্রিন্সেসের দ্বারা সে দায়িত্বপ্রাপ্ত।'

'মান্যবর, খৃস্টান তথা পশ্চিমের শত্রু একজন ব্লাডি এশিয়ানের পক্ষে আপনার এই পক্ষপাতিত্ব লজ্জাকর। আমাদের সাহায্য করা আপনার কর্তব্য।'

'মজলুমের পক্ষ নেয়া লজ্জার নয়। গৌরবের। সম্পদ আত্মসাতে সাহায্য করা কি বৈধ?'

'আমরা দুঃখিত, আপনার অসুবিধা আপনি বাড়াচ্ছেন মিঃ প্লাতিনি। সাহায্য যদি না করেন, আপনার কন্যাও তাহলে আমাদের পণবন্দী হয়ে এখানে আসবে। সুন্দরী ফরাসী প্রিন্সেস রুশদের হাতে পড়া কি তার সম্মানের জন্যে মানানসই হবে?'

চমকে উঠে মিঃ প্লাতিনি তাকাল মাজুরভের দিকে। মিঃ প্লাতিনির শান্ত মুখে এবার কিছু উদ্বেগের চিহ্ন ফুটে উঠেছে।

হাসল মাজুরভ। বলল, 'মিঃ প্লাতিনি, আপনি যতটা সম্মানের, আহমদ মুসার বাগদত্তা আপনার কন্যা আমাদের কাছে ততটা সম্মানের নয়।'

প্লাতিনি নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছে। বলল, 'এই ভয় দেখিয়ে আমার কাছে আপনারা কি চাচ্ছেন?'

'আমরা যেভাবে বলব সেভাবে একটা চিঠি আপনি লিখবেন আপনার মেয়েকে উদ্দেশ্য করে। এই বিল্ডিং-এর একজন সুইপার আপনার টাকার লোভে চিঠিটি অতি গোপনে নিয়ে পৌঁছাবে ফরাসী দূতাবাসে।'

'তারপর?'

'তারপর আপনার জানার আর কিছু নেই।'

'তারপরের কথা আমি বলছি। আমার চিঠি পেয়ে আমার দেয়া ঠিকানায় ছুটে আসবে আমার মেয়ে এবং আপনারা তাকে পণবন্দী করবেন।'

'বলেছি তো, এই সহযোগিতা করলে আপনার মেয়ের গায়ে আমরা হাত দেব না। আপনার মেয়ে আমাদের শত্রু নয়, শত্রু আমাদের আহমদ মুসা।'

প্লাতিনি চিন্তা করল। ভাবল, আহমদ মুসার জন্যে এ ধরনের চিঠিতে কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি আছে কিনা? এ চিঠির মন্দ দিক তো পরিষ্কার, কিন্তু কোন ভাল দিকও আছে কিনা। অনেক ভাবনার পর সে বলল, 'চিঠি কাল নিয়ে আসবেন, লিখে দেব।'

'ধন্যবাদ প্রিন্স।' বলে মাজুরভ ও খিরভ উঠে দাঁড়াল।

বেরিয়ে এল তারা ঘর থেকে।

লিফট দিয়ে উঠতে উঠতে খিরভ বলল, 'তার মেয়েকে পণবন্দী করার ভয় দেখানোতে কাজ হয়েছে। এখন শিকার ফাঁদে পড়লেই হয়।'

'ফাঁদে পড়তেই হবে। ফরাসী দূতাবাসে চিঠিটা পৌঁছার সাথে সাথে ফ্যাক্সে তা চলে যাবে প্যারিসে ডোনা জোসেফাইনের কাছে। আর ডোনা জোসেফাইন পেলে সংগে সংগেই তা সে জানাবে আহমদ মুসাকে।'

হাসল খিরভ। হাসল মাজুরভও।

ক্রেমলিনে প্রধানমন্ত্রীর কক্ষ।

প্রধানমন্ত্রী কেরনস্কী জুনিয়র এবং কেজিবি প্রধান মার্শাল জুকভ এক টেবিলে মুখোমুখি বসে।

কথা বলছিল মার্শাল জুকভ।

'না, আমি মনে করি, প্রিন্সেস ক্যাথারিনের উদ্ধার এবং রাশিয়ায় নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ঘোষণার কাজ আমরা শিডিউল অনুসারে মার্চেই করতে পারবো।'

'কিন্তু 'মনে করি' বলছেন, নিশ্চিত নয় কেন? এখানেই আমার উদ্বেগ।' বলল প্রধানমন্ত্রী কেরনস্কী জুনিয়র।

মার্শাল জুকভ হাসল। বলল, 'ঈশ্বরের জন্যে কিছু রেখেছি। বিষয়টা সম্ভবের মধ্যে না থাকলে 'মনে করি' বলতাম না। কোন সন্দেহ নেই, প্রিন্সেস ক্যাথারিনকে এখন হয় মস্কোতে, না হয় সেইন্ট পিটার্সবার্গে রাখা হয়েছে। আর আহমদ মুসার কাছে রাজকীয় রিং ও ডায়েরী রয়েছে, সেটাও জানা গেছে। এবং আহমদ মুসা ক্যাথারিনের সন্ধানে রাশিয়া এসেছে, সেটা আমাদের প্যারিস দূতাবাস জানিয়ে দিয়েছে।'

'আহমদ মুসা আমাদের জন্যে সমস্যা নয়। ক্যাথারিনকে আমরা হাতে পেলে, ঐ জিনিসগুলো ক্যাথারিনের হাতে আসবে এবং তার মাধ্যমে আসবে আমাদের হাতে। সুতরাং ক্যাথারিনকে উদ্ধার করাটাই আসল বিষয়। সে ব্যাপারে বল।'

'এজন্যে আমরা দেশব্যাপী জাল পেতেছি। কিন্তু সত্য বলতে কি, গ্রেট বিয়ার একটা অতি দক্ষ, কুশলী এবং হিংস্র সংগঠন। আমাদের প্রশাসন, পুলিশ, এমনকি সেনাবাহিনীতেও ওদের লোক আছে। বেশ কিছুকে চিহ্নিতও আমরা করেছি। তাদের অনেককে ডাবল এজেন্ট হিসেবে ব্যবহার করছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সকলেরই অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে। আমরা মনে করছি, গ্রেট বিয়ারের

কাছে তারা ধরা পড়ে যায় এবং সে কারণেই তারা নিহত হয়। আমরা আমাদের লোকদের আরও সাবধান করেছি। কিন্তু ভীষণ সাবধান ওরা। বার বার ওদের কাছাকাছি হয়েও আমরা ওদের গায়ে হাত দিতে পারছি না।'

'নিশ্চয় আপনাদের পরিকল্পনা পাচার হয় কোন রকমে। প্যারিসে মায়োভস্কি আমাদের এক ইঞ্চি এগোতে দেয়নি। এমন মায়োভস্কি নিশ্চয় আরও আছে।'

'আমি আপনার সাথে একমত স্যার। আমরা তাদেরও সন্ধান করছি। কিন্তু সমস্যা হলো, গ্রেট বিয়ারের চরম জাতীয়তার শ্লোগান বিশেষ করে তরুণদের খুবই আকৃষ্ট করছে।'

'জানি আমি। বিকৃতি কোন সময়ই সুস্থতাকে অতিক্রম করে না। স্বীকার করতে হবে, অযোগ্যতাই আমাদের বড় বাঁধা। পাভেলের রিপোর্টে দেখলাম, একা এক মানুষ আহমদ মুসা তিনবার ওদের ঘাঁটিতে প্রবেশ করেছে এবং গুঁড়িয়ে দিয়েছে গ্রেট বিয়ারের সেখানকার শক্তিকে। চিন্তা করতে বিস্ময় লাগে, গ্রেট বিয়ারের প্যারিস অপারেশনে যাওয়া কোন নেতাই বাঁচেনি।'

'আপনার সাথে আমি একমত স্যার। আহমদ মুসার তুলনা শুধু আহমদ মুসাই। কিছু দিন আগে সেন্ট্রাল এশিয়াতেও গ্রেট বিয়ারের সাথে আহমদ মুসার লড়াই হয়েছে। সে লড়াইতেও আহমদ মুসা মধ্য এশিয়ার গ্রেট বিয়ারকে ধ্বংস করেছিল। সবচেয়ে ভাল হতো যদি তাকে আমরা ব্যবহার করতে পারতাম।'

'আমাদের রাষ্ট্রদূত পাভেল তো সে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সে আমাদের কথায় আসেনি।'

'এরপরও রাশিয়ায় এসে সে যা করবে তা আমাদের সাহায্যেই আসবে। তাকে অনুসরণ করলেও আমাদের কাজ অনেক সহজ হয়ে যেতে পারে। এক ঢিলে দুই পাখি মারার সুযোগ হতে পারে। গ্রেট বিয়ার ও আহমদ মুসা দু'পক্ষেরই একসাথে সর্বনাশ আমাদের জন্যে লাভজনক।'

'ঠিকই বলেছেন। প্রিন্সেস ক্যাথারিনের সাথে আহমদ মুসার সাক্ষাৎ ভিন্ন কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে।'

‘প্রিন্সেস তাতিয়ানার সাথে আহমদ মুসার প্রেম আপনার যুক্তিকে সমর্থন করছে স্যার।’

‘পাভেলের রিপোর্ট অনুসারে বন্দী অবস্থায় প্রিন্সেস ক্যাথারিনের সাথে আহমদ মুসার এ পর্যন্ত দু’বার সাক্ষাৎ হয়েছে। প্রিন্সেস ক্যাথারিনের এ বিশ্বাস হওয়া স্বাভাবিক, আহমদ মুসাই একমাত্র তাকে উদ্ধারের জন্যে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছে।’

‘ঠিক স্যার।’

‘সুতরাং আপনি ঠিকই বলেছেন, গ্রেট বিয়ার ও আহমদ মুসাকে একসাথে আমাদের সামনে থেকে সরিয়ে দেয়ার মধ্যেই আমাদের লাভ।’

‘কাজটা সহজ হবে না।’

‘তা তো বটেই। তবে সুবিধা হলো, আহমদ মুসা এখানে কোন গ্রাউন্ড সাপোর্ট পাবে না। মধ্য এশিয়ার তুর্কি কমিউনিটির লোক ছাড়া তাকে সাহায্য করার কেউ নেই। এদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। চোখ রাখতে হবে এদের উপর। আহমদ মুসার লোকেশন ডিটেক্ট করার জন্যেও এটা প্রয়োজন।’

‘আপনার পরামর্শ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এদিকে লক্ষ্য রাখব।’

‘তবে মার্শাল জুকভ, প্রিন্সেস ক্যাথারিনকে উদ্ধারের মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদেরকে খুব সন্তর্পণে এগোতে হবে।’

‘আমরা এ ব্যাপারে সতর্ক স্যার।’

জেনারেল জুকভের কথা শেষ হতেই ইন্টারকমে প্রধানমন্ত্রীর পিএস-এর গলা শোনা গেল। বলল, ‘স্যার, জরুরী একটা ফাইল এসেছে।’

‘পাঠাও।’ নির্দেশ দিল প্রধানমন্ত্রী কেরনস্কী জুনিয়র।

বলে কেরনস্কী জুনিয়র তার বাম পাশের কম্পিউটার স্ক্রীনের দিকে তাকাল। তারপর প্রিন্টারের একটা বোতামে নক করল।

সংগে সংগেই বেরিয়ে এল কাগজের একটা লম্বা শীট।

শীটটির উপর একবার নজর বুলিয়ে তা এগিয়ে দিল মার্শাল জুকভের দিকে।

মার্শাল জুকভও কাগজটির উপর নজর বোলাতে লাগল।

‘গ্রেট বিয়ার পাগল হয়ে উঠেছে আহমদ মুসাকে ধরার জন্যে।’ বলল প্রধানমন্ত্রী কেরনস্কী জুনিয়র।

কাগজ থেকে মুখ তুলে মার্শাল জুকভ বলল, ‘তাই তো দেখছি। আহমদ মুসার মত দেখতে বলেই নিশ্চিত না হয়ে একটি দম্পতিকে হত্যা করে ফেলল?’

‘হত্যা করার লক্ষ্য অবশ্যই ছিল না। কিন্তু স্বীকারোক্তি করাতে গিয়ে ব্যর্থ হওয়ার রাগে প্রথমে হত্যা করে স্ত্রীকে। তাতেও স্বীকারোক্তি না করায় লোকটির উপর যে নির্যাতন চলে তাতেই সে মারা যায়।’

‘বোঝা যাচ্ছে, পথেই আহমদ মুসাকে পাকড়াও করার জন্যে গ্রেট বিয়ার সর্বাত্মক জাল ফেলেছে। আহমদ মুসা ওদের হাতে গেলে যথাসময়ে লক্ষ্যে পৌঁছা আমাদের জন্যে যেমন কঠিন হবে, তেমনি জারের ধনভাণ্ডার উদ্ধারের চাবিকাঠি গ্রেট বিয়ারের হাতে চলে যাবে। যার ফলে জগতের শ্রেষ্ঠ ধনভাণ্ডার চিরতরে আমাদের হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে।’

‘ফ্রান্স থেকে রাশিয়ামুখী সকল পথের উপর আমাদের প্রহরা গ্রেট বিয়ারের চেয়ে অনেক বেশি নিশ্ছিদ্র করে তুলতে হবে। আহমদ মুসাকে ওদের হাতে পড়তে দেয়া যাবে না। ওকে বন্দী করে রয়্যাল রিং এবং রয়্যাল ডায়েরী রক্ষা করতে হবে গ্রেট বিয়ারের হাত থেকে।’

প্রধানমন্ত্রী কেরনস্কী জুনিয়রের কথা শেষ হতেই তার ইন্টারকম আবার কথা বলে উঠল। কথা বলছে তার পিএস, ‘স্যার, আরেকটা ফাইল এসেছে। পাঠিয়েছেন প্যারিস থেকে রাষ্ট্রদূত পাভেল।’

‘হ্যাঁ। ওর কাছ থেকে একটা জরুরী মেসেজ আসার কথা। ও, কে।’

বলে প্রধানমন্ত্রী কেরনস্কী জুনিয়র কম্পিউটারের দিকে ঘুরল। কম্পিউটারে ফাইল কন্ডিশন দেখে নিয়ে ফাইলের একটা প্রিন্ট বের করে নিল।

দ্রুত চোখ বোলাল কাগজের শীটটার উপর। বলল মার্শাল জুকভকে লক্ষ্য করে, ‘আহমদ মুসার যে ছবি আমাদের কাছে আছে এবং ভিডিও-তে দেখা গেছে, সেই ছবিতেই সে ভিসা নিয়েছে।’

‘সাংঘাতিক দুঃসাহসী লোক সে। তার অজানা নয় যে, তার এই ছবি গ্রেট বিয়ার এবং আমাদের কাছে রয়েছে। নামও কি ঠিক রেখেছে ভিসায়?’ বলল জুকভ।

‘না। ‘আবদুল্লাহ’ নামে নিয়েছে।’

‘প্রবেশ পথ সম্পর্কে কি বলেছে?’

‘স্থল ও বিমান দুই-ই রেখেছে।’

‘তার উচ্চতা?’

‘পাঁচ ফিট আট ইঞ্চি।’

‘ওজন?’

‘একশ পঁচিশ পাউন্ড।’

‘এসব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দূতাবাস থেকে প্রকাশ হয়ে পড়বে, সেটা তো অবশ্যই সে জানত।’

‘অবশ্যই জানার কথা।’

‘আহমদ মুসার মত লোক কি এত বড় দুর্বলতা নিয়ে রাশিয়া প্রবেশ করতে আসছে?’

‘ভিসা যখন নিয়েছে, তখন তো এর বিকল্প নেই।’

‘হতে পারে ভিসা নেয়াটা তার লোক দেখানো।’

‘অর্থাৎ সে ভিসা ব্যবহার করবে না মনে করছেন?’

‘আমার তা-ই মনে হয়। তার ছবি আমাদের ও গ্রেট বিয়ারের হাতে আছে জানার পর সে পাসপোর্ট ব্যবহার করবে বলে মনে হয় না।’

‘যদি তাই হয়, যদি সে ছদ্মবেশ নিয়ে সীমান্ত ক্রস করে, তাহলে তার সম্পর্কে পাওয়া তথ্যগুলো আমাদের উপকারে আসবে।’

বলে প্রধানমন্ত্রী কেরনস্কী জুনিয়র কাগজের শীটটি মার্শাল জুকভের হাতে তুলে দিয়ে বলল, ‘দেখুন, এতে আরও কিছু তথ্য আছে। এগুলো সর্বত্র আমাদের লোকদের জানিয়ে দিন।’

‘অবশ্যই স্যার।’ বলে কাগজের শীটটি হাতে নিয়ে বলল, ‘এখন উঠতে পারি স্যার?’

‘এস।’

উঠে দাঁড়িয়ে হ্যান্ডশেইক করে বিদায় জানাল মার্শাল জুকভকে প্রধানমন্ত্রী কেরনস্কী জুনিয়র।

# ২

তাল্লিন বিমানবন্দর। তাল্লিন এস্টোনিয়ার রাজধানী।

ফিন উপসাগরের তীরে দাঁড়ানো তাল্লিন একগুচ্ছ সাদা গোলাপের মত সুন্দর ও স্নিগ্ধ শহর।

লাউঞ্জের জানালা দিয়ে ফিন উপসাগরের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা পেত্রভ বলল, 'এই তাল্লিন আবার রাশিয়ার হবে শেখভ। রাশিয়ার কু-সন্তানরা এদের স্বাধীনতা দেয়ার নামে রাশিয়ার অঙ্গচ্ছেদ করেছে।'

'যদি আমাদের আইভান দি টেরিবল ক্ষমতায় আসে তাহলেই।' বলল শেখভ।

'তাতো বটেই। কেরনস্কীর উত্তরসূরী কেরনস্কী জুনিয়রদের গণতন্ত্র শুধু রাশিয়াকে ধ্বংস করার জন্যেই। রুশ সাম্রাজ্য থেকে পনেরটি অংশ আগেই বিচ্ছিন্ন হয়েছে। চেচনিয়াও গেল। তারপর আরও যাবে। সুতরাং...।'

কথা শেষ না করেই থেমে গেল পেত্রভ। হেলসিংকি থেকে আসা একটা বিমান ল্যান্ড করছিল তাল্লিন বিমানবন্দরে। সে দিকেই চোখ গিয়েছিল তার।

পেত্রভ এবং শেখভ দু'জনেই গ্রেট বিয়ারের গোয়েন্দা অফিসার। ওরা মোতায়েন ছিল তাল্লিনে। মস্কোর গ্রেট বিয়ার হেডকোয়ার্টারের নির্দেশে ওরা দু'জনেই যাচ্ছে মিনস্কে। মিনস্ক থেকে পেত্রভ যাবে ব্রাডনো এবং শেখভ যাবে বিরেস্টে। দু'টিই পোল্যান্ড বর্ডারে রাশিয়ার সীমান্ত শহর। যতগুলো রেল ও সড়ক পথে আহমদ মুসা রাশিয়া প্রবেশের চিন্তা করতে পারে, তার মধ্যে এ দু'টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মধ্য ইউরোপীয় অঞ্চল থেকে মস্কো পৌঁছবার এ দু'টিই সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পথ। গ্রেট বিয়ার কর্তৃপক্ষ এ দু'টি প্রবেশ পথে তাদের শক্তি বৃদ্ধির জন্যেই তাদেরকে সেখানে পাঠাচ্ছে।

সময়ের ঘণ্টা দুয়েক আগে তারা বিমানবন্দরে এসেছে তাদের সামরিক বসকে অভ্যর্থনা জানাতে। গ্রেট বিয়ারের শীর্ষ অপারেশন চীফ নিকোলাস

বুখারিন আসছে হেলসিংকি থেকে তাল্লিনে এস্টোনিয়ার গোয়েন্দা চীফের সাথে কথা বলার জন্যে। গ্রেট বিয়ার এস্টোনিয়ার গোয়েন্দা বিভাগের সহযোগিতা চায় আহমদ মুসার উপর চোখ রাখার জন্যে। পেত্রভ ও শেখভ বুখারিনকে স্বাগত জানাবার পর তারা মিনস্ক যাত্রা করবে।

যাত্রীরা ইমিগ্রেশন এরিয়া থেকে ডিপারচার লাউঞ্জে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে।

বেরিয়ে এল নিকোলাস বুখারিন।

পেত্রভ ও শেখভ এগিয়ে গিয়ে স্যালুট দিল বুখারিনকে। বলল, 'ওয়েলকাম জেনারেল।'

'আপনাদের প্লেনের কত দেরি?' জিজ্ঞেস করল বুখারিন।

'অনেক সময় আছে। এখনও দেড় ঘণ্টার মত বাকি।' বলল পেত্রভ।

'চল, আমরা একটু বসি। কথা আছে।' বলে বুখারিন লাউঞ্জের একটা সোফার দিকে এগোলো।

বুখারিন ও শেখভ আগেই গিয়ে বসেছিল সোফায়। পেত্রভও বসল বুখারিনের পাশে। বসে সামনের দিকে চাইতেই একজন যাত্রীকে দেখে তার উপর তার চোখটা আঠার মত আটকে গেল। মুহূর্ত কয়েক চেয়েই ভূত দেখার মত আঁৎকে উঠল পেত্রভ। সে দেখল, ছোট্ট একটি ব্রিফকেস হাতে আহমদ মুসা তাদের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে ডিপারচার ডোরের দিকে।

বিস্ময়ে হা হয়ে যাওয়া মুখ নিয়ে কখন যেন উঠে দাঁড়িয়েছিল পেত্রভ।

বুখারিন ও শেখভ অবাক হয়ে পেত্রভের দিকে তাকাল। বলল, 'কি ব্যাপার, পেত্রভ?'

ধপ করে বসে পড়ল পেত্রভ সোফায়। ওদের দু'জনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে বলল, 'ঐ যে আহমদ মুসা যায়।'

বলে অঙ্গুলি নির্দেশ করল একজন যাত্রীর প্রতি।

শেখভ ও বুখারিন দু'জনই শক খাওয়া মানুষের মত চমকে উঠে তাকাল লোকটির দিকে। তার উপর নজর পড়তেই তারা দু'জন বিস্ময়ে 'থ' হয়ে গেল।

যাকে ধরার জন্যে রাশিয়ার গোটা সীমান্ত অঞ্চল তারা চষে বেড়াচ্ছে, সেই আহমদ মুসা এত কাছে!

'ঠিক বলেছ পেত্রভ। ছবির সাথে ঠিক মিলে যাচ্ছে। সন্দেহ নেই, এ আহমদ মুসাই।' চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে বলল নিকোলাস বুখারিন।

'ঠিক। চলুন ওকে পাকড়াও করি।' দ্রুত কণ্ঠে বলল শেখভ।

'না, এখানে নয়। চল ওকে ফলো করি। লাউঞ্জ থেকে বেরোনোর পর ওকে পাকড়াও করতে হবে। গাড়ি রেডি তো?'

'রেডি।'

তিনজনেই উঠল। যাত্রীদের সাথে মিশে আহমদ মুসার তিন দিক ঘিরে ওরা চলতে লাগল।

লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে আহমদ মুসা সবে তার হাতের ব্রিফকেসটা মাটিতে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরতে গেছে, অমনি পেত্রভ ও শেখভ দু'পাশ থেকে দু'জন তার পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রিভলভারের নল পাঁজরে চেপে ধরল। পেত্রভ দ্রুত কণ্ঠে বলল, 'সামনে এগোও আহমদ মুসা, কোন চালাকির চেষ্টা করো না।'

আহমদ মুসা তাদের দিকে তাকালোও না। বললো, 'নিজেদের আস্থা এত দুর্বল কেন? দুই পাঁজরে দুই রিভলভারের পাহারা নিয়ে কোন চালাকি করা যায় না।' আহমদ মুসার কণ্ঠ একদম স্বাভাবিক এবং ঠোঁটে হাসি।

নিকোলাস বুখারিন পাশেই দাঁড়িয়েছিল। সে বিস্মিত হয়ে তাকাল আহমদ মুসার মুখের দিকে। ভাবল সে, পাগল নাকি লোকটা! তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, বিপদটা যেন তার নয়, আমাদের।

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা ব্রিফকেসটা তুলে নিয়ে হাঁটতে শুরু করেছে।

গাড়িতে উঠল ওরা।

আগে থেকেই ড্রাইভিং সিটে বসা ছিল একজন। নিকোলাস বুখারিন উঠে বসল সামনের সিটে, ড্রাইভিং সিটের পাশে। আর পেছনের সিটে আহমদ মুসাকে

মধ্যে বসিয়ে দু'পাশে বসল পেত্রভ ও শেখভ। তাদের দু'টি রিভলভার আহমদ মুসার দিকে তাক করা।

গাড়িতে বসেই ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে নির্দেশ দিল নিকোলাস বুখারিন, 'সোজা সেইন্ট পিটার্সবার্গ (লেনিনগ্রাড) হয়ে মস্কো।'

গাড়ি স্টার্ট নিল।

'কেমন লাগছে আহমদ মুসা? তুমি যে ছদ্মবেশ নাওনি, এজন্যে ধন্যবাদ।' পেছন দিকে মুখ ফিরিয়ে আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল নিকোলাস বুখারিন।

'ছদ্মবেশ নিলে আপনাদের হাতে বন্দী হওয়ার সুযোগ কি করে পেতাম?' খুব সহজ কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

ভ্রু কুঞ্চিত হলো নিকোলাস বুখারিনের। মুখ ফিরিয়ে সে আহমদ মুসার দিকে একবার চাইল। তারপর বলল, 'তার মানে ইচ্ছা করেই আমাদের হাতে ধরা দিয়েছ?'

'অর্থ তা-ই দাঁড়ায়।' বলল আহমদ মুসা।

'কিন্তু কেন?'

'আপনাদের কোথায় খুঁজতাম, কি করে খুঁজে পেতাম?'

'ঠিক বলনি। তোমার নার্ভ খুব শক্ত। কথা সাজাচ্ছ তুমি।'

'যদি তা-ই হয়, ছদ্মবেশ না নেয়ার কি কারণ থাকতে পারে বলুন?'

'কিন্তু আমাদের সাক্ষাৎ পেয়ে ধরা তো পড়লে। জান তো গ্রেট বিয়ার শত্রুদের কি করে, বিশেষ করে তোমার মত শত্রুদের?'

'প্রতিদ্বন্দ্বী দুই শত্রুর দু'জনই জেতে না। জেতে যে কোন একজন। এবার তোমরা জিতেছ।'

'তারপর?'

'সেটা ভবিষ্যতই বলবে।'

'না, আমরা বলব।'

বলে নিকোলাস বুখারিন তার রিভলভারটা আহমদ মুসার দিকে তাক করে বলল, 'এখনই এ রিভলভার কথা বলতে পারে এবং তোমার জীবন এখানেই সাঙ্গ হয়ে যেতে পারে।'

'না, তোমার রিভলভার কথা বলতে পারে না। আমাকে হত্যা করার ক্ষমতা তোমার নেই, তোমাদের কারও নেই এই মুহূর্তে। আমাকে হত্যা করার চেয়ে রাজকীয় আংটি ও রাজকীয় ডায়েরী তোমাদের বেশি প্রয়োজনীয়।'

নিকোলাস বুখারিনের মুখটা মুহূর্তেই ম্লান হয়ে গেল। একটা জ্বলন্ত সত্য তার সামনে এসে দাঁড়াল। রাজকীয় আংটি এবং রাজকীয় ডায়েরী তাদের কাছে যতটা মূল্যবান, ততটা মূল্যবান এখন আহমদ মুসার জীবন তাদের কাছে। ও দু'টি জিনিস পাওয়ার আগে আহমদ মুসাকে তারা মরতে দিতে পারে না। বলল নিকোলাস বুখারিন, 'এটাই তাহলে এখন তোমার শক্তির উৎস?'

'হ্যাঁ, বলটা আমার কোর্টে। খেলাটা আমার এখতিয়ারে।'

'কিন্তু তুমি আমাদের বন্দী। রাজকীয় আংটি এবং রাজকীয় ডায়েরী এখন আমাদের হাতের মুঠোয়। একদিকে তোমার জীবন রক্ষা, অন্যদিকে ও দু'টো জিনিস আমাদের হাতে তুলে দেয়া- এ দু'টির মধ্যে তুমি তোমার জীবনটাকেই বেছে নেবে নিশ্চয়। সুতরাং বলটা আমাদের কোর্টেই।'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'আর আমি যদি একটা নয়, দু'টোকেই বেছে নেই?'

'তার মানে তুমি বেঁচে যাবে এবং রাজকীয় আংটি ও ডায়েরীও দেবে না?'

'হ্যাঁ, তা-ই।'

হাসল নিকোলাস বুখারিন। বলল, 'কিছু সাফল্যের ঘটনা তোমাকে অতি আশাবাদীই শুধু নয়, অহংকারীও করে তুলেছে।'

'অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই-এ বিজয়ের চিন্তা অহংকার নয়, খুবই স্বাভাবিক একটা মানবিক চিন্তা।'

'অন্যায় তুমিই করেছ। আমাদের নিজেদের ব্যাপারে তুমি নাক গলিয়েছ।'

'হাস্যকর কথা বলছ তুমি। তোমরা এবং গোটা রাশিয়া জানে, তাতিয়ানা ছিলেন ক্রাউন প্রিন্সেস। ক্রাউন প্রিন্সেস হিসেবে তিনি যে দায়িত্ব আমাকে দিয়েছেন, সেটা পালনে আমাকে বাঁধা দিয়ে তোমরা অন্যায় করছ। এবং সেটা তোমরা করেছ কোন জাতীয় বা জনগণের স্বার্থে নয়, জঘন্য ধরনের লোভের বশবর্তী হয়ে।'

গাড়িটি অনেকক্ষণ এস্টোনিয়ার রাজধানী তাল্লিন নগরী পেরিয়ে এসেছে। চলছে এখন উঁচু-নিচু টিলায় ভরা প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে। টিলাগুলোতে পরিকল্পিত ফলের বাগান এবং মাঠে সবুজ ফসল।

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই জ্বলে উঠেছিল নিকোলাস বুখারিনের চোখ। উত্তেজনায় কাঁপছিল তার ঠোঁট। আহমদ মুসার কথার তৎক্ষণাৎ সে জবাব দিল না।

গাড়ির কিছুটা পেছনে একটা হর্ন বেজে উঠল।

হর্ন শুনেই উৎকর্ণ হয়ে উঠল আহমদ মুসা। তার চোখে-মুখে আনন্দের একটা বহিঃপ্রকাশ দেখা গেল।

নিকোলাস বুখারিনের ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ধ্বনিত হলো, 'তোমার অহংকার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে আহমদ মুসা। ঠিকই বলেছ, তোমাকে হত্যা করতে পারি না, কিন্তু তোমাকে ল্যাংড়া, নুলো তো করতে পারি।'

বলে নিকোলাস তার রিভলভার ঘুরিয়ে নিচ্ছিল আহমদ মুসার দিকে।

ঠিক এ সময়েই ঘনতালে তিনটি হর্ন ভেসে এল পেছন থেকে।

সাথে সাথেই আহমদ মুসার দু'টি হাত শক্ত হয়ে উঠল।

পেছনের শেষ হর্নটির শব্দ মিলিয়ে যাবার সাথে সাথেই পেছন থেকে একটা গুলির শব্দ হলো এবং সামনের টায়ার বার্স্ট হয়ে সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ল গাড়িটি।

ট্রিগার টিপেছিল নিকোলাস বুখারিন। কিন্তু টায়ারে গুলি খেয়ে গাড়ির পেছনটা লাফিয়ে উঠলে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে তা বিদ্ধ করেছিল পেত্রভকে।

আর গাড়ি উল্টে যাওয়ার আগেই আহমদ মুসা হুমড়ি খেয়ে পড়া শেখভের হাতের রিভলভার ছিনিয়ে নিয়েছিল।

তাল্লিন বিমানবন্দরে লাউঞ্জের যাত্রী সারিতে ডোনা জোসেফাইন আহমদ মুসার পেছনে ছিল। মাঝখানে কয়েকজন যাত্রী।

এটা ছিল আহমদ মুসারই পরিকল্পনা। প্যারিস থেকে বের হবার পর আহমদ মুসা ও ডোনা পাশাপাশি চলেনি, হোটেলের এক কক্ষে থাকেনি। চলার সময় আহমদ মুসা আগে থেকেছে। ডোনা জোসেফাইন বেশ পেছনে পেছনে চলেছে। হোটেলেও পাশাপাশি কক্ষে তারা ঘুমিয়েছে। এর দ্বারা আহমদ মুসা দু'টো জিনিস চেয়েছে। এক. ডোনা জোসেফাইনকে সন্দেহের বাইরে রাখতে এবং দুই. ডোনা জোসেফাইনকে দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা লাইন হিসেবে ব্যবহার করতে।

ডোনা জোসেফাইন পেছন থেকে চোখ রেখেছিল আহমদ মুসার উপর। হঠাৎ তিনজন রুশকে আহমদ মুসার পেছনে এসে অবস্থান নিতে এবং তাদের চোখ-মুখের ভাব দেখে ডোনার মনে আশংকার সৃষ্টি হলো। তারপর যখন আহমদ মুসা ওদের দ্বারা ঘেরাও, তখন ডোনার বুঝতে বাকি রইল না যে, নিশ্চয় ঐ তিনজন রুশ গ্রেট বিয়ার কিংবা রুশ সরকারের লোক।

আহমদ মুসাকে ওরা গাড়িতে তোলার পর ডোনা ছুটোছুটি করল গাড়ির জন্যে। রেডি কোন গাড়ি হাতের কাছে পেল না। যা ছিল যাত্রীরা নিয়ে নিয়েছে। এখন হয় দু'এক মিনিট ওয়েইট করতে হয়, নয়তো পার্কিং-এ গিয়ে গাড়ি জোগাড় করতে হবে। কিন্তু সে সময় তার হাতে নেই।

এ সময় আল্লাহর রহমতের মত একটা গাড়ি এসে তার সামনেই পার্ক করল। মহিলা ড্রাইভার। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। এস্টোনীয়।

'যাবে?' জিজ্ঞেস করলো ডোনা।

'হ্যাঁ। কোথায়?'

'বলছি।' বলে ডোনা তার ব্যাগটি গাড়ির পেছনের সিটে তুলে দিয়ে সামনে উঠে বসল। বলল, 'ঐ যে সামনে ৩৮২০৯০ গাড়িটা যাচ্ছে, তাকে অনুসরণ করুন। ঐ গাড়িতে আমার স্বামী আছেন।'

ড্রাইভার মেয়েটি খুব সুন্দরী। বুদ্ধিদীপ্ত মুখ। চঞ্চল চোখ। গায়ে দামি পোশাক। সে একবার ডোনার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়েই গাড়ি স্টার্ট দিল।

কিছুদূর চলার পর মেয়েটি বলল, 'গাড়িটা বেশ জোরে চলছে। ধরব কি গাড়িটাকে?'

'না। পেছনে থাকুন এমনভাবে যাতে সন্দেহ না করে যে, আমরা পেছনে আছি।'

আবার মেয়েটি ডোনার দিকে তাকাল। বলল, 'আপনার স্বামী কি বিপদে পড়েছেন?'

'একথা বলছেন কেন? ডোনা তার বিস্মিত দৃষ্টি মেয়েটির দিকে তুলে বলল।

'ম্যাডাম, আপনার চোখে-মুখে উদ্বেগ দেখছি তাই বললাম। আবার আপনি গাড়িটাকে অনুসরণ করবেন, অথচ ধরতে চাইছেন না গাড়িটাকে। তাছাড়া গাড়িটাতে যেহেতু আপনার স্বামী রয়েছেন, তাই গাড়িটা স্বাভাবিক ভাবেই আপনার জন্যে অপেক্ষা করবে, কিন্তু তা করছে না।'

ম্লান হাসল ডোনা। বলল, 'ধন্যবাদ আপনাকে। অনেক চিন্তা করেছেন আপনি।'

বলে একটু থামল। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন আপনি। আমার স্বামী বিপদগ্রস্থ। তিনি কিডন্যাপড হয়েছেন।'

'আপনার স্বামী কি রাশিয়ান?'

'না।'

'ওকে রাশিয়ানরা কিডন্যাপ করল কেন?'

'কেমন করে বুঝলেন, রাশিয়ানরা কিডন্যাপ করেছে?'

'রাশিয়ান ছাড়া ঐ ধরনের রাফ ড্রাইভিং কোন এস্টোনিয়ান করে না।'

'সব রাশিয়ান কি এক রকম?'

'তা জানি না। কিন্তু যে রাশিয়ানদের আমরা পঞ্চাশ বছর ধরে চিনেছি, তারা সব শয়তানের বাচ্চা।'

একটু থামল মেয়েটি। পরক্ষণেই বলল, 'কেন ওরা আপনার স্বামীকে কিডন্যাপ করেছে? পুলিশে জানিয়েছেন আপনি?'

'না, পুলিশকে জানাইনি।'

'পুলিশে এখনি বলতে পারি টেলিফোনে। বলব?'

'না, এখন দরকার নেই।'

মেয়েটি আবার মুখ ঘুরিয়ে ডোনার দিকে তাকাল। তার চোখে-মুখে বিস্ময়! বলল, 'তাহলে আপনার পরিকল্পনা কি? শুধু কি অনুসরণ?'

গাড়ি তাল্লিন নগরীর বাইরে বেরিয়ে এসেছে। বাগান শোভিত টিলা এবং ফসলের প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে গাড়ি।

'আপাতত অনুসরণ।' বলে একটু থামল ডোনা। বলল, 'আমাকে ড্রাইভিং-এ বসার অনুমিত দেবেন?'

মেয়েটি বিস্মিত হয়ে তাকাল ডোনার দিকে। বলল, 'অবশ্যই, যদি আপনার কোন উপকার হয়।'

গাড়ি থামিয়ে মেয়েটি বলল, 'আসুন।'

মেয়েটি এসে ডোনার সিটে বসল। আর ডোনা গিয়ে বসল ড্রাইভিং সিটে।

গাড়ি স্টার্ট দিতে দিতে ডোনা বলল, 'আমি ডোনা জোসেফাইন। আপনাকে কি বলব?'

'ড্রাইভার বলাই কি যথেষ্ট নয়?'

'ড্রাইভার হলে ড্রাইভারের এ সিট আমাকে দিতেন না।'

'তাহলে আমি কি?'

'তা আমি জানি না। কিন্তু নিছক ভাড়ায় খাটা ট্যাক্সি চালক আপনি নন।'

হাসল মেয়েটি। বলল, 'আমি 'কেলা এলভা'।'

গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে দিল ডোনা। অকারণেই হর্ন দিল।

ব্যাপারটার দিকে মনোযোগ দিয়ে কেলা এলভা বলল, 'আপনার হর্নের ধরনটা কিন্তু খুবই সুন্দর।'

ডোনা ঠোঁটে হাসি টেনে কেলা এলভার দিকে তাকাল। বলল, 'আমি সামনের গাড়িটাকে থামিয়ে দিতে চাই।'

'কিন্তু কিভাবে?'

ডোনা তার কোটের পকেট থেকে রিভলভার বের করল।

চোখে-মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল কেলা এলভার। একটু সময় নিয়ে বলল, 'টায়ারে গুলি করবেন?'

'তাছাড়া উপায় কি?'

'কিন্তু তারপর?'

'বলা মুশকিল। আশা করি, আমরাই জিতব। আপনার কোন ভয় নেই। ওরা অ্যাকশানে আসার আগে দরকার হলে গাড়ি নিয়ে সরে পড়ার অনেক সময় থাকবে।'

'আমি ভয়ের কথা বলিনি। জানতে চাচ্ছি আপনার পরিকল্পনা।'

'ধন্যবাদ।'

বলে ডোনা বাঁ হাত স্টিয়ারিং হুইলে রেখে ডান হাতে রিভলভার তাক করল গাড়ির দিকে।

খুব সামনেই রাস্তাটা 'L' টাইপ একটা শার্প বাঁক নিয়েছে।

এমন একটা বাঁকই সর্বান্তকরণে চাচ্ছিল ডোনা। যাতে সামনের গাড়িটার সামনের টায়ার তাক করা এবং সহজে গুলিও করা যায়।

গুলি করল ডোনা।

সশব্দে টায়ার বার্স্ট করল দ্রুতগামী গাড়িটার। আর পরক্ষণেই গাড়ির পেছনটা শূন্যে উঠল এবং উল্টে গেল গাড়িটা। গড়াগড়ি খেল কয়েকটা।

ইতোমধ্যে ডোনার গাড়ি গাড়িটার কাছাকাছি এসে পড়েছিল।

গাড়ি থামাল ডোনা। পকেট থেকে পঞ্চাশ ডলার বের করে কেলা এলভার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ধন্যবাদ কো-অপারেশনের জন্যে। এই টাকাটা রাখুন। আপনি এখন গাড়ি নিয়ে যেতে পারেন।'

বলে ডোনা রিভলভার হাতে নিয়েই দ্রুত গাড়ি থেকে নামল।

কেলা এলভা টাকা হাতে নেয়নি। টাকা সিটের উপরে পড়েছিল ডোনার হাত থেকে।

দ্রুত কেলা এলভাও গাড়ি থেকে নামল। তার হাতেও রিভলভার।

গাড়ি থেকে বেরিয়েই রিভলভার তাক করল ডোনার দিকে। বলল, 'যে গাড়ির টায়ার ফুটো করে থামিয়ে দিয়েছেন, সেটা আমাদের গোয়েন্দা বিভাগের গাড়ি। নিশ্চয় আপনার স্বামী আমাদের গোয়েন্দা বিভাগের হাতে। কেন আমি আপনাকে আমাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করব?'

'এস্টোনিয়ার গোয়েন্দা বিভাগে কি রুশরা চাকুরী করে?'

'অবশ্যই না।'

'ঐ গাড়িটা তিনজন রুশ নিয়ে যাচ্ছে।'

'আমি বিশ্বাস করি না। গাড়িটা আমাদের।'

'যদি গাড়িতে তিনজন রুশ থাকে?'

'যদি থাকে এবং তারা আমাদের পক্ষের না হয়, তাহলে আমার কোন বৈরিতা থাকবে না আপনার প্রতি।'

এই সময় উল্টে যাওয়া গাড়ি থেকে গুলির শব্দ ভেসে এল।

ডোনা দ্রুত বলল, 'আসুন দেখবেন।' বলে ডোনা দ্রুত গাড়ির দিকে ছুটল।

ডোনার দিকে রিভলভার বাগিয়ে ছুটল কেলা এলভাও।

ডোনা গাড়ির কাছে ছুটে গিয়ে উবু হয়ে থাকা গাড়ির উঁচু হয়ে উঠা জানালা দিয়ে ভেতরে তাকাল।

গাড়ি উল্টে এক পাক খেয়ে কাত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এক দিকের জানালা মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।

ডোনা দেখল, আহমদ মুসা একজন রুশের কাছ থেকে রিভলভার কেড়ে নিল। লোকটিও আহত। তাদের পাশেই দু'জন রুশের রক্তাক্ত দেহ পড়ে আছে।

কেলা এলভাও এসে দাঁড়িয়েছে ডোনার পাশে।

গাড়ির ইঞ্জিন দিয়ে ধোঁয়া উঠছে।

রিভলভার কেড়ে নিয়েই আহমদ মুসা সেই রিভলভার দিয়ে গুলি করে গাড়ির উইন্ডশীল্ড ভেঙে দিল।

গাড়ির ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল ডোনা।

ইঞ্জিন গাড়ির পেছনে। পেছনে থাকায় গাড়ির সামনেটা যতখানি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, পেছনে তা হয়নি। কিন্তু পুরানো গাড়ি হওয়ায় প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে পেছনের কভার টপটি যেমন উঠে গেছে, তেমনি ক্ষতিগ্রস্থ কয়েলে আগুন ধরে গেছে। ফুয়েল ট্যাংকার থেকে তেল গড়িয়ে এসেছে। বাড়ছে ধোঁয়া। আগুন ফুয়েল ট্যাংকারে গেলে গোটা গাড়িই বিস্ফোরণে উড়ে যাবে।

ডোনা চিৎকার করে আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, 'বেরিয়ে এস তাড়াতাড়ি। সময় নেই।'

কিন্তু আহত নিকোলাস বুখারিন এবং আহত এস্টোনীয় ড্রাইভার আটকা পড়েছিল। আহমদ মুসা গুলি করে উইন্ডস্ক্রীন ভেঙে ফেলার পর আটকে পড়া ড্রাইভারকে বের করার চেষ্টায় তৎপর হয়ে উঠেছিল।

ডোনার পেছনে দাঁড়িয়ে কেলা এলভাও দেখছিল ব্যাপারটা।

ডোনা ছুটে এসেছিল আহমদ মুসাকে সাহায্য করার জন্যে।

আহমদ মুসা ড্রাইভারকে ভাঙা উইন্ডস্ক্রীনের পথে ডোনার হাতে ঠেলে দিয়ে এগোলো নিকোলাস বুখারিনের দিকে।

ডোনা ড্রাইভারকে বের করছে দেখে আহমদ মুসা চিৎকার করে বলল, 'তাড়াতাড়ি করো, গাড়িতে আগুন ধরে যাচ্ছে।'

কেলা এলভা পেছন থেকে এসে ডোনার সাথে লেগে গেল ড্রাইভারকে টেনে বের করার কাজে। সেও চিৎকার করে বলল, 'সময় বেশি নেই, তাড়াতাড়ি করুন।'

গাড়ির সিট ও গাড়ির চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়া বডির মাঝখানে আটকা পড়েছিল নিকোলাস বুখারিনের একটা পা।

আহমদ মুসা উবু হয়ে থাকা জানালা গুলি করে ভেঙে ফেলল।

ভাগ্য ভাল জানালার লক ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি। আহমদ মুসা জানালা আনলক করে দু'পায়ে লাথি চালালো দরজায়।

দরজা আধা পরিমাণ খুলে গেল। ছাড়া পেয়ে গেল বুখারিনের পা।

মাথা ফেটে গিয়েছিল এবং বাম হাতটা ভেঙে গিয়েছিল বুখারিনের। তার ডান হাতে রিভলভার ধরা ছিল। সেটা দিয়েই দ্বিতীয় গুলি করতে যাচ্ছিল আহমদ মুসাকে। কিন্তু তার আগেই রিভলভার কেড়ে নিয়েছিল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা যখন তাকে টেনে বের করছিল, তখন নিকোলাস বুখারিন চিৎকার করে বলছিল, 'আমি তোমার অনুগ্রহ চাইনি। বেঁচে থাকলে তোমাকে আমি ছাড়বো না।'

আহমদ মুসা নিকোলাস বুখারিনকে বাইরে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'আমি কোন মানুষের করুণার মুখাপেক্ষী নই।'

আহমদ মুসা বাইরে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণে সমগ্র গাড়িটি একটা অগ্নিপিণ্ডের রূপ নিল।

অল্প দূরে দাঁড়িয়ে আহমদ মুসা সেই কুণ্ডলী পাকানো আগুনের দিকেই তাকিয়েছিল।

ডোনা এবং কেলা এলভা এসে আহমদ মুসার পাশে দাঁড়ালো।

'দু'জন মানুষের জীবন রক্ষার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু যে দু'জন মানুষ আগুনে ছাই হয়ে গেল, তাদের হত্যা আপনিই করেছেন।' আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে কেলা এলভা বলল।

আহমদ মুসা কেলা এলভার দিকে তাকাল। হাসল। বলল, 'ওয়েলকাম। দু'জনের একজনের হত্যা সেমসাইডের ব্যাপার। দ্বিতীয়জনের গুলি থেকে বাঁচার জন্যেই তাকে আমি গুলি করেছি।'

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা আবার কেলা এলভাকে লক্ষ্য করে বলল, 'আহত দু'জনের ব্যবস্থা করতে হয়। আপনি নিশ্চয় সাহায্য করবেন।'

'ওরা আপনাকে কিডন্যাপ করেছিল। আপনার তাড়া কিসের? না কিডন্যাপের কাহিনীটা সাজানো?' বলল কেলা এলভা।

'আপনি কি কোন গোয়েন্দা কর্মী?'

'আপনিও কোন গোয়েন্দার কেউ?'

'কেন?'

'না হলে এটা ধরলেন কি করে?'

'না, গোয়েন্দা নই। নিজ স্বার্থে কারও পক্ষে আমি কাজ করছি না।'

'তাহলে এসব গণ্ডগোলে কেন? না নিজেই কোন পক্ষ?'

'না। মানুষ হিসেবে মানুষের জন্যে কাজ করছি।'

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা বলল, 'আহত দু'জনের কথা আমি বলেছিলাম।'

'কিন্তু শত্রুর অবস্থা নিয়ে আপনি মাথা ঘামাচ্ছেন কেন?'

'যুদ্ধ শেষে আহত সৈন্যরা আর শত্রু থাকে না, তারা মানুষ হয়ে যায়।'

তৃতীয়বার অবাক হলো কেলা এলভা। প্রথম অবাক হয়েছিল ডোনার কিছু কথায়। গাড়িতে আটকা পড়া শত্রুকে উদ্ধারের আকুলতা দেখে সে দ্বিতীয়বার অবাক হয়েছিল।

'লড়াই তো শেষ হয়নি। দেখুন ওর চোখে আগুন জ্বলছে। রিভলভার কাছে থাকলে এখুনি গুলি করতো। কিংবা কাছে পেলে আপনাকে চিবিয়ে খাবে।' নিকোলাস বুখারিনের দিকে ইংগিত করে বলল কেলা এলভা।

'তবু তো শত্রু নিরস্ত্র, অসহায়।'

'এমন মানবতাবাদী কেউ খুনোখুনির মত ঘটনায় যেতে পারে কি করে?'

'মানবতাকে রক্ষার জন্যেই মানুষ নামের অমানুষদের অনেক সময় সরিয়ে দেয়ার প্রয়োজন।'

'আপনি আদর্শবাদীদের মত কথা বলছেন। যাক, ঐ দেখুন, পুলিশ ও অ্যাম্বুলেন্স আসছে।'

'আপনি জানিয়েছিলেন বুঝি?'

'ঠিক ধরেছেন। তবে পুলিশ আপনাদের গ্রেফতার করবে না।'

'কেন করবে না?'

'আমি একটা অ্যাকসিডেন্টের কথা জানিয়েছি।'

অ্যাম্বুলেন্স এল। তার সাথে পুলিশের একটা গাড়ি। ড্রাইভারসহ অ্যাম্বুলেন্স কর্মী তিনজন এবং পুলিশ তিনজন।

পুলিশ তিনজন নেমে স্যালুট করল কেলা এলভাকে।

আহমদ মুসা বুঝল, মেয়েটি নিশ্চয় পুলিশ বা গোয়েন্দা অফিসার।

অ্যাম্বুলেন্স কর্মীরা প্রথমে ড্রাইভারকে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে নিকোলাস বুখারিনের দিকে এগোলো।

আহমদ মুসা, কেলা এলভা এবং ডোনা কাছেই পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল।

অ্যাম্বুলেন্স কর্মীরা বুখারিনকে অ্যাম্বুলেন্সে নেবার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ইতোমধ্যে পুলিশ অফিসার বুখারিনের মচকে যাওয়া পা দেখে তারপর মাথার আঘাত পরীক্ষা করার জন্যে তার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল।

হঠাৎ বুখারিন পুলিশ অফিসারের কোমরে ঝুলন্ত খাপ থেকে রিভলভার তুলে নিয়েই গুলি করল আহমদ মুসাকে।

সৌভাগ্যই বলতে হবে আহমদ মুসার। সে বুখারিনের দিকে তাকিয়ে পুলিশ অফিসারের কাজ দেখছিল। বুখারিনকে রিভলভার কেড়ে নিতে দেখেই নিজেকে মাটির উপর ছুঁড়ে দিয়েছিল আহমদ মুসা এবং মাটিতে পড়েই গুলি করেছিল বুখারিনের হাতে।

আহমদ মুসা নিজেকে সরাতে না পারলে বুখারিনের গুলি তার উরুদেশ বিদ্ধ করতো। যথাসময়ে সরে পড়ায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো বুখারিনের গুলি। উল্টো বুখারিনের রিভলভার ধরা ডান হাত আহমদ মুসার গুলিতে বিধ্বস্ত হলো।

বিধ্বস্ত হাতের দিকে কিন্তু কোন খেয়াল নেই বুখারিনের। সে সমানে চিৎকার করতে শুরু করেছে, 'তোমরা সবাই এ ক্রিমিন্যালকে পাকড়াও করো। এ হলো সেই কুখ্যাত আহমদ মুসা। এই মাত্র আমার দু'জন সাথীকে সে হত্যা করেছে। এর পর্বতপ্রমাণ অপরাধের সাথে সাথে সে আমাদের যুবরাণী রাজকুমারী তাতিয়ানার হত্যাকারীও। একে ধরে দিলে আমরা গ্রেট বিয়ারের পক্ষ থেকে লক্ষ ডলার পুরস্কার দেব', ইত্যাদি।

তার কথা শুনে পুলিশ অফিসার, তিনজন পুলিশ, দু'জন অ্যাম্বুলেন্স কর্মী এবং কেলা এলভা সকলেই চমকে উঠেছিল। মুহূর্তের জন্যে তাদের মধ্যে একটা বিমূঢ় ভাবও সৃষ্টি হয়েছিল।

তাদের বিমূঢ় ভাব কেটে যেতেই দ্রুত পুলিশ অফিসারটি তার রিভলভারটি কুড়িয়ে নিল। তা দেখে অন্য দু'জন পুলিশও তাদের রিভলভারের দিকে হাত বাড়াল।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়েছে রিভলভার হাতে।

চট করে সে দু'ধাপ সরে কেলা এলভার পেছনে এসে তার মাথা বরাবর রিভলভার তাক করলো। পুলিশ অফিসারকে লক্ষ্য করে বলল, 'রিভলভার ফেলে দিন এবং অন্য দু'জন পুলিশকেও ফেলে দিতে বলুন।'

তিনজন পুলিশ তাদের হাত থেকে রিভলভার ফেলে দিল।

ডোনা এগিয়ে গিয়ে রিভলভারগুলো তুলে নিল। ফিরে আসছিল ডোনা।

আহমদ মুসা বলল, 'পুলিশ অফিসারটির কাছে ওয়্যারলেস সেট আছে ডোনা।'

বলেই পুলিশ অফিসারটিকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'ফেলে দিন ওয়্যারলেস সেটটি।'

পুলিশ অফিসারটি একবার কেলা এলভার দিকে তাকাল। তারপর পকেট থেকে বের করে ছুঁড়ে দিল ওয়্যারলেস সেটটি।

ডোনা ওয়্যারলেস সেটটি কুড়িয়ে ফিরে এল আহমদ মুসার কাছে।

'ধন্যবাদ।' ডোনাকে লক্ষ্য করে বলল আহমদ মুসা। তারপর বলল কেলা এলভাকে, 'চলুন ম্যাডাম আপনার গাড়িতে।'

কেলা এলভা একবার মুখ ঘুরিয়ে আহমদ মুসার দিকে তাকাল। এবং হাঁটতে শুরু করল গাড়ির দিকে।

কেলা এলভা এবং ডোনাকে পেছনের সিটে বসাল। আহমদ মুসা ড্রাইভিং সিটে উঠে বসার আগে গুলি করে অ্যাম্বুলেন্স ও পুলিশের গাড়ির একটি করে টায়ার নষ্ট করে দিল।

কেলা এলভা সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'আহতদের হাসপাতালে নেবার পথ বন্ধ করে দিলেন?'

'না, দেরি করালাম মাত্র। বাড়তি টায়ার লাগিয়ে অল্পক্ষণ পরেই যাত্রা করতে পারবে।'

‘কেন দেরি করালেন?’

‘আমি চাই না তারা পিছু নিক।’

‘বুঝেছি।’ কেলা এলভার চোখে সপ্রশংস দৃষ্টি।

আহমদ মুসা গাড়ি স্টার্ট দেবার আগে পকেট থেকে একটা রিভলভার বের করে পেছন দিকে তাকিয়ে ছুঁড়ে দিল কেলা এলভার কোলে। বলল, ‘আপনার রিভলভার।’

রিভলভারের দিকে একবার তাকিয়ে কেলা এলভা নিজের পকেটে হাত দিল। রিভলভার পেল না। বিস্ময় ফুটে উঠল তার চোখে-মুখে। বলল, ‘আমার পকেট থেকে রিভলভার কিভাবে আপনার কাছে গেল?’

‘যখন আমি আপনার পেছন থেকে রিভলভার তাক করি আপনার মাথায়, তখনই আপনার পকেট থেকে রিভলভার তুলে নেই। আপনি খেয়াল করেননি, মনোযোগ অন্যদিকে থাকার কারণে।’

‘নেয়ার পর রিভলভার আবার ফেরত দিচ্ছেন কেন?’

‘অন্যদের নেয়া হয়েছে, তাই আপনারও নেয়া হয়েছিল। অন্যরা এখানে নেই, তাই আপনারটা ফেরত দেয়া হলো।’

‘তার মানে আমাকে আপনাদের কোন ভয় নেই! কেন?’

‘ভয় নেই তা নয়, তবে বিদেশে যখন এসেছি, তখন কোথাও না কোথাও একটা আস্থার স্থান আমরা অবশ্যই খুঁজে পেতে চাইব।’

‘রিভলভার উঁচিয়ে কি এ আস্থা কেউ অর্জন করতে পারে?’

‘সে জন্যেই তো আপনার রিভলভার ফেরত দিলাম।’ ঈষৎ হেসে বলল আহমদ মুসা।

‘আমার ধারণার চেয়েও আপনি বুদ্ধিমান। কিন্তু আমার লোকদের হেনস্থা করে, আমাকে রিভলভারের মুখে ধরে এনে আপনি কোন সাহায্যের আশা করতে পারেন না। নিকোলাস বুখারিন বললেই কি আমরা আপনাকে গ্রেফতার করতাম মনে করেন?’

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘আপনারা আমার কোন ক্ষতি করবেন বলে আমি রিভলভার, ওয়্যারলেস সেট কেড়ে নিয়ে ও গাড়ির টায়ার নষ্ট করে এবং

আপনাকে ধরে এনে আপনাদের কষ্ট দিতে চাইনি। আসলে আপনাদেরকে একটা বিপদ থেকে আমি বাঁচিয়েছি।'

'কেমন?' কেলা এলভার চোখে-মুখে বিস্ময়।

'আমি যদি কিছু না করতাম, তাহলে আমাদেরকে গ্রেফতার করতে হতো আপনাদের।'

'কেন?'

'গ্রেফতার না করলে আমাদের ছেড়ে দেয়ার দায়ে আপনারা অভিযুক্ত হতেন। গ্রেট বিয়ার, এমনকি রুশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রবল চাপ আসতো আপনাদের উপর। সুতরাং, আমি যা করেছি, তাতে আপনারাও বেঁচেছেন, আমরাও বেঁচেছি।'

'বুঝতে পারছি মিঃ আহমদ মুসা, কেন আপনি অজেয়। কিন্তু আপনারা বেঁচে গেছেন মনে করবেন না। আপনি পুলিশ অফিসারের ওয়াকিটকি নিয়ে এসেছেন। কিন্তু আসল ওয়্যারলেস তার পকেটেই রয়ে গেছে।'

'ধন্যবাদ এই মূল্যবান ইনফরমেশনের জন্যে। আপনি আমাদের পাশে থাকা পর্যন্ত আমাদের কোন চিন্তা নেই।' বলল আহমদ মুসা গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিতে দিতে।

'আমি কি আপনাদেরকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি?' বলল কেলা এলভা অনেকটা শক্ত কণ্ঠে।

'প্রতিশ্রুতি দেননি। কিন্তু আমরা আপনার সাহায্য পাব।'

আহমদ মুসা তার গাড়ির স্পীড বাড়ানোর সাথে সাথে গাড়িটি একেবারে অ্যাবাউট টার্ন করে পুব দিকে যাওয়া শুরু করল।

'কি ব্যাপার, কোথায় যাচ্ছেন?'

'পূর্ব দিকে।'

'সেতো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু কোথায় যাচ্ছেন?'

'আপাতত তারতু, তারপর কালান্তি।'

'তারপর লেকের পথে রাশিয়ায় প্রবেশ?' বলল কেলা এলভা।

'ঠিক বলেছেন।'

চোখে-মুখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে কেলা এলভার। আহমদ মুসার ক্ষমতা সম্পর্কে সে অবহিত। কিন্তু একটি ভিনদেশের মানচিত্র সম্পর্কে তার এত স্বচ্ছ ধারণা এবং এমন দ্রুত এমন একটি রুটের সিদ্ধান্ত সে নিতে পারে! অনেক এস্টোনীয় নাগরিকই জানে না যে, রাশিয়ায় অবৈধ প্রবেশের এটাই সবচেয়ে নিরাপদ পথ। লেক 'পাইপাস' অনেকটাই নির্জন। পশ্চিম তীরের উত্তরাংশের একটা অংশ ছাড়া লেক পাইপাসের গোটা তীরই সাধারণ ব্যবহারের অযোগ্য। রুশ পূর্ব তীরে কোন নগর-নগরী তো দূরে থাক, রাস্তাঘাটও গড়ে উঠতে পারেনি।

'সত্যিই আমি চমৎকৃত। রাশিয়ায় অবৈধ প্রবেশের সবচেয়ে উত্তম পথ বেছে নিয়েছেন। লেক 'পাইপাসে' জেলেদের নৌকা ভাড়া করে আপনি একদম নির্বিবাদে রাশিয়ার লেক পুশকভে প্রবেশ করতে পারেন। তারপর লেক পুশকভের তীরে উঠে বা পুশকভ নগরী হয়ে রাশিয়ার যেথা ইচ্ছা যেতে পারেন।'

একটু থামল কেলা এলভা। তারপর বলল, 'আমার প্রশ্ন দু'টি, এক, এই গোপন পথের কথা আপনি জানলেন কি করে? দুই, আপনার মত আদর্শবাদী লোক অবৈধ প্রবেশের মত দুর্বল ভিত্তি নিয়ে রাশিয়ায় যাচ্ছেন কেন?'

আহমদ মুসা হাসল। স্টিয়ারিং-এ দু'টি হাত এবং চোখ সামনে প্রসারিত রেখেই ধীরে ধীরে বলল, 'সাইবেরিয়ার রুশ বন্দী শিবির থেকে পলাতক এস্টোনীয় লেখক এমাস্তে এলভার লেখা 'দি লং নাইট'-এর ইংরেজি অনুবাদ পড়েছি। তাতে এই পথের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। এই পথেই এমাস্তে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে পালিয়েছিলেন।'

কেলা এলভার চোখে আনন্দের স্ফূরণ। বলল, 'আপনি এমাস্তে এলভার বই পড়েছেন! ভালো লেগেছে আপনার?'

'সব মানুষেরই ভালো লাগার কথা। চিরন্তন এক কাহিনী।'

'বইটির কোন দিক আপনার ভালো লেগেছে?'

'এস্টোনীয় জনসংখ্যার এক-দশমাংশ মানুষ সাইবেরিয়ার সোভিয়েত বন্দী শিবিরে কিভাবে হারিয়ে গেল, তার এক মর্মন্তুদ চিত্র গ্রন্থটি। সবচেয়ে ভালো লেগেছে একজন পরাধীন দেশপ্রেমিকের অন্তর্জ্বালার দিকটি।'

‘ধন্যবাদ আপনাকে। ক্ষুদ্র এক জাতির সাহিত্য আপনি এইভাবে পড়েছেন?’

‘সংখ্যার কারণে কোন জাতি ক্ষুদ্র হয় না। হৃদয়ের কারণে ক্ষুদ্র জনসংখ্যার জাতিও বিশ্বে বড় আসন পেতে পারে।’

‘সব জাতির ক্ষেত্রেই কি আপনার এই কথা প্রযোজ্য?’

‘হৃদয়বৃত্তি একটা মানবিক ধর্ম, যদি তা প্রবৃত্তির অমানবিক কোন চাহিদা দ্বারা কলুষিত না হয়। এই মানবধর্ম স্রষ্টার দেয়া একটা নিয়ামাত। এর কোন দেশ-কাল-পাত্র নেই।’

‘আপনি দেখছি পরম মানবতাবাদী, উদার। কিন্তু শুনেছি যে, চরম সাম্প্রদায়িক আপনি?’

‘তারা ঠিকই বলেছে, স্রষ্টা যতটুকু সাম্প্রদায়িক, আমি ততটা সাম্প্রদায়িক অবশ্যই।’

হাসল কেলা এলভা। বলল, ‘কথাটা মজার, কিন্তু বুঝলাম না।’

‘স্রষ্টা তার প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে একটা সুনির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে রেখেছেন। কারও পক্ষে এই নিয়মের অন্যথা করার সুযোগ নেই। কোন উপায় নেই অসাম্প্রদায়িক বা ‘আনলফুল’ হবার। সুতরাং স্রষ্টা অসাম্প্রদায়িক নন, আমিও নই।’

‘কিন্তু মিঃ আহমদ মুসা, স্রষ্টার সেই আইন বা প্রকৃতিগত দেহতাত্ত্বিক ও বস্তুগত চরিত্র নিয়ে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ কোথাও নেই। অভিযোগ এসেছে মানুষের স্বাধীন জীবন পরিচালনার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ নিয়ে।’

‘আচ্ছা বলুন তো, নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন হয় কোথায়?’

‘যেখানে আইন ভংগের সম্ভাবনা থাকে, ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, কোন ধরনের সংকটের সম্ভাবনা থাকে, ইত্যাদি।’

‘তাহলে মানুষের জীবন পরিচালনায় এসব কিছুই আছে কিনা?’

‘আছে, অবশ্যই। এ জন্যেই তো রাষ্ট্র, আইন, সংবিধান- এসব কিছু।’

‘রাষ্ট্র, আইন ও সংবিধানের নিয়ন্ত্রণ স্থান, কাল ও পাত্রের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল। এ নিয়ন্ত্রণ সংকীর্ণ গণ্ডীর ও সীমাবদ্ধ বুদ্ধির বলেই এই

পরিবর্তন ঘটে। অথচ মানুষের জীবন একটা অব্যাহত বিষয়। এর জন্যে একটা কালোত্তীর্ণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে কিনা?’

‘সত্যিই কি প্রয়োজন আছে?’

‘জীবের বিশেষ করে মানুষেরও বস্তুগত দিক নিয়মের অধীন বলে, তার জীবন পরিচালনা একটা স্থায়ী নিয়মের অধীন হবে না কেন?’

‘মানুষের দেহগত দিকের মত তার জীবন পরিচালনাকে তাহলে একটা অলংঘনীয় বা স্থায়ী নিয়মের অধীন করে দেয়া হয়নি কেন?’

‘মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি দেয়া হয়েছে বলেই এবং তাকে ভালো-মন্দ পার্থক্য করার বিচারবুদ্ধি দেয়া হয়েছে বলেই।’

‘যদি তা-ই হয়, তাহলে মানুষের জীবন পরিচালনার নিয়ন্ত্রণ তার বিবেক ও বিচারবুদ্ধির উপর ছেড়ে দেয়াই তো উচিত। খোদায়ী নিয়ন্ত্রণের আবার ব্যবস্থা কেন?’

‘মানুষ অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে খুব অল্পই জানে এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে কিছুই জানে না। মানুষের এই সীমিত জ্ঞান নির্ভর বিচারবুদ্ধির পক্ষে নিজেদের জীবনকে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিকভাবে কল্যাণ ও মুক্তির পথে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। সমুদের দিক নির্ণয়ের জন্যে যেমন আকাশের তারা, কম্পাস ও বাতিঘরের প্রয়োজন, স্থলপথে যেমন ম্যাপ ও রোড সাইনের প্রয়োজন হয়, তেমনি মানুষের আদর্শ, সৃষ্টি ও লক্ষ্যগত জীবন পরিচালনার জন্যে দিক-নির্দেশিকার প্রয়োজন আছে, যার অভাবে মানুষ লক্ষ্যচ্যুত হয়ে অশান্তি-অবিচার, জুলুম-অত্যাচারের ধ্বংসকরী পাঁকে নিমজ্জিত হয়ে যেতে পারে। এই দিক-নির্দেশিকারই নাম খোদায়ী জীবন বিধান।’

‘মিঃ আহমদ মুসা, জানতাম আপনি বিপ্লবী, কিন্তু এখন দেখছি আপনি দার্শনিক বা মিশনারীও।’

একথা বলে একটা দম নিয়েই বলল কেলা এলভা, ‘খোদায়ী জীবন বিধান যাকে বলছেন, তাদের মধ্যেই কি ঝগড়া কম! এর কি করবেন?’

‘মানুষের বিচারবুদ্ধি যদি স্বাধীনভাবে কাজ করে, তাহলে এ ঝগড়া বাঁধতে পারে না।’

‘কেমন করে?’

‘খোদায়ী জীবন-পদ্ধতি হওয়ার দাবিদার ধর্মগুলোর মধ্যে বিচারবুদ্ধির রায় অনুসারে একমাত্র ইসলাম ছাড়া অন্য কোনটাই আজকের মানুষের জীবন পদ্ধতি হওয়ার উপযুক্ত নয়।’

‘এটা তো আপনার কথা।’

‘আমার নয়, বিচারবুদ্ধির রায়ের কথা। কি বল মারিয়া জোসেফাইন?’ সমর্থনের জন্যে আহমদ মুসা চাইল ডোনার দিকে।

‘স্ত্রী তো স্বামীকে সমর্থন করবেই।’ হেসে বলল কেলা এলভা।

‘ও শুধু স্ত্রী নয়। ও একজন সচেতন ইউরোপীয়।’ বলল আহমদ মুসা।

মুখ খুলল ডোনা। বলল, ‘আমার নিজের কথা বলব না, আজকের পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীরা ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের নিরাপত্তা ও বিজয় সর্ম্পকে বলতে গিয়ে উল্লেখ করছেন, আধুনিক যুগ-জিজ্ঞাসার জবাব দেয়া ও আধুনিক মানুষের প্রয়োজন পূরণ করার ক্ষমতা ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের নেই।’

‘যেহেতু এ বিষয়ের উপর আমার পড়াশোনা নেই, তাই আমি কিছু বলব না। তবে আমি একটা বিষয়ে খুশি, আহমদ মুসা লেনিন, মাও সেতুং, হো চি মিন, চে গুয়েভারা, ক্যাস্ট্রো প্রমুখ বিপ্লবীর চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ। যিনি ভয়ের বদলে আশার উদ্রেক করেন, যিনি রহস্যময় পূজ্য ব্যক্তিত্ব হবার বদলে বন্ধু হতে পারেন।’

কথা শেষ করেই কেলা এলভা সামনে একটা গাড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, ‘মিঃ আহমদ মুসা, মনে হয় সামনে বিপদ আছে।’

‘কেন একথা বলছেন?’

‘সামনে যে গাড়িটা আসছে, ওটা এস্টোনীয় গোয়েন্দা পুলিশের বিশেষ পেট্রোল কার। বিশেষ মিশন ছাড়া এ গাড়িগুলোকে রাস্তায় ছাড়া হয় না।’

‘তাহলে?’

কেলা এলভা উঠে দাঁড়িয়ে স্টিয়ারিং হুইলের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, ‘আপনি পাশের সিটে, তারপর পেছনে চলে আসুন। আমি ড্রাইভিং-এ বসছি।’

কেলা এলভা ড্রাইভিং সিটে বসে হাসতে হাসতে বলল, ‘এভাবে ড্রাইভিং সিট ছেড়ে দেয়া কি ঠিক হলো মিঃ আহমদ মুসা?’

‘ড্রাইভিং সিট ছেড়ে দিয়েছি, কিন্তু আপনার নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেইনি।’ বলল আহমদ মুসাও হাসতে হাসতে।

সামনের গাড়িটি এসে পড়েছে। হর্ন বেজে উঠল সামনের গাড়ি থেকে।

সংগে সংগে কেলা এলভাও হর্ন বাজাল একই নিয়মে, ঠিক আগের হর্নের আক্ষরিক অনুসরণ।

হর্ন বাজিয়েই থামিয়ে দিয়েছিল গাড়ি কেলা এলভা।

সামনের গাড়িটারও ড্রাইভিং উইনডো কেলা এলভার পাশাপাশি এসে দাঁড়াল।

সামনে থেকে গাড়ির ড্রাইভার হাত তুলে এস্টোনীয় ভাষায় বলল, ‘আমি সার্কেল ইন্সপেক্টর কেভিন।’

‘আমি সেন্ট্রাল ইন্সপেক্টর কেলা এলভা।’

চমকে উঠল ইন্সপেক্টর কেভিন। বলল, ‘এই যে খবর এল, আহমদ মুসা আপনাকে পণবন্দী করে পালিয়েছে? নির্দেশ এসেছে সবগুলো রাস্তা ক্লোজ করার।’

‘পালিয়েছে আহমদ মুসা। খুঁজছি আমিও তাকে।’

‘তাহলে জানিয়ে দিন এ খবরটা।’

‘আমার তো ওয়্যারলেস নেই।’

‘বুঝেছি। আমি জানিয়ে দিচ্ছি। ওরা কারা পেছনে?’

‘ফরাসী দম্পতি। আমার বন্ধু।’

বলে কেলা এলভা গাড়িতে স্টার্ট দিল।

স্যালুট দিল হাত তুলে ইন্সপেক্টর কেভিন।

ছুটে চলল কেলা এলভার গাড়ি।

‘ধন্যবাদ আপনাকে।’ পেছন থেকে কেলা এলভাকে লক্ষ্য করে বলল আহমদ মুসা।

‘ধন্যবাদ দরকার নেই। এবার কি করব বলুন।’ বলল কেলা এলভা।

'কিন্তু তার আগে বলুন, অবস্থা কি দাঁড়াল। আমরা আপনাকে ফেলে পালিয়েছি এবং আপনি একটি ফরাসী দম্পতিকে পথ থেকে কুড়িয়ে আমাদের অনুসরণ করছেন, এই তো?'

'জ্বি, হ্যাঁ।'

'কিন্তু আপনাকে ফেলে আপনার গাড়ি নিয়ে আমার পালানোর কথা। আপনি গাড়ি পেলেন কি করে?'

'এটা একটা প্রশ্ন বটে।' একটু চিন্তা করল কেলা এলভা। তারপর বলল, 'আমার গাড়ি লক করে চাবি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এই ফরাসী দম্পতির অধিকতর দ্রুতগামী নতুন গাড়ি নিয়ে আপনি পালিয়েছেন। চাবি খুঁজে পেতে বিলম্ব হয়। তারপর আপনাকে আমরা অনুসরণ করছি।'

'ধন্যবাদ। আপনার কাহিনী সুন্দর। আর একটা কথা, ফরাসী দম্পতির গাড়ির কি পার্টিকুলারস পুলিশকে দেবেন?'

'অযথা এই প্রশ্ন তুলছেন। পুলিশের কাছে জওয়াবদিহির পর্যায়ে অবশ্যই আমি নিজেকে নিয়ে যাবো না।'

কথা শেষ করেই কেলা এলভা আবার সেই পুরানো প্রশ্ন করল। বলল, 'বলুন এখন কি করণীয়। সামনে শহরের প্রবেশমুখে পুলিশ সদলবলে আছে নিশ্চয়।'

'আপনার কাহিনী দ্বিতীয় জায়গায় বলা আর ঠিক মনে করছি না। আপনার গাড়ির নেমপ্লেট উল্টে দিলে কেমন হয়?'

কেলা এলভা হাসল। বলল, 'উল্টো দিকে একটা ভুয়া নাম্বার আছে।'

'আল্লাহকে ধন্যবাদ। গাড়ি তাহলে থামান মিস...।'

বলতে গিয়ে থেমে গেল আহমদ মুসা। বলল পরক্ষণেই, 'মাফ করবেন, আপনি মিস না মিসেস?'

কেলা এলভার হাস্যোজ্জ্বল মুখ হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল।

গাড়ি থামাল সে। বলল, 'ও প্রশ্ন থাক। গাড়ির নেমপ্লেট পাল্টে দেব?' কেলা এলভার কণ্ঠস্বর হঠাৎ যেন ভিজে গেছে।

আহমদ মুসা এবং ডোনা কারোরই ব্যাপারটা দৃষ্টি এড়াল না।

কেলা এলভা গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে।

আহমদ মুসাও নামল। বলল, ‘নেমপ্লেট আমিই পাল্টে দিচ্ছি, আপনি বসুন।’

ভারি হয়ে ওঠা মুখে হাসি টানার চেষ্টা করে বলল কেলা এলভা, ‘আমার গাড়ি, কাজটা আমিই দ্রুত পারব।’ বলে কাজে লেগে গেল কেলা এলভা।

আহমদ মুসাও গাড়ির পেছনের নেমপ্লেট উল্টে দেয়ার কাজে লেগে গেল।

কাজ শেষে কেলা এলভা আহমদ মুসার সামনে এসে বলল, ‘এবার?’ কেলা এলভার মুখে হাসি। অনেকখানি সহজ হয়ে উঠেছে সে।

‘আপনি পেছনে ডোনার পাশে বসুন। আমি ড্রাইভিং-এ বসব।’

‘কিন্তু...।’

তাকে বাঁধা দিয়ে আহমদ মুসা বলল, ‘এখনি সব বুঝবেন। আপনি বসুন।’

বলে আহমদ মুসা ড্রাইভিং সিটে গিয়ে বসল।

কেলা এলভাও পেছনের সিটে গিয়ে বসল।

‘ডোনা, ব্যাগ থেকে পাগড়ি ও শিখের দাড়িটা দাও।’

ডোনা ব্যাগ থেকে শিখের পাগড়ী ও দাড়ি বের করে আহমদ মুসার দিকে এগিয়ে দিল।

আহমদ মুসা এগুলো নিয়ে পরতে পরতে বলল, ‘ডোনা, ওকে তোমার পাগড়ী ও দাড়িটা বের করে পরিয়ে দাও।’

পাগড়ী ও দাড়ি পরতে গিয়ে কেলা এলভা হাসতে হাসতে বলল, ‘বুঝেছি এবার। আমি ও মিসেস ডোনা হলাম শিখ দম্পতি। আর আহমদ মুসা সাহেব হলেন শিখ ড্রাইভার। কিন্তু আমাদের দেশে শিখ ড্রাইভার তো নেই বললেই চলে।’

‘তা ঠিক। তবে জন দশেক তো আছে।’

চোখ কপালে তুলে কেলা এলভা বলল, ‘জানেন আপনি এ তথ্যও?’

‘এটা কি খুব বড় তথ্য? হেলসিংকিতেই এটা আমি পেয়েছি।’

‘ঠিক তাই। আপনি যে আহমদ মুসা, একথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।’

কেলা এলভার কথা এড়িয়ে আহমদ মুসা বলল, ‘এই ছদ্মবেশ কোন কাজ দেবে বলে মনে করেন?’

‘না দেবার কারণ দেখি না। তবে পুলিশকে প্রকৃতপক্ষে কি নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমি জানি না।’

গাড়ি আহমদ মুসার ছুটে চলল।

খুব সামনেই ‘পেদে’ নামের একটা বড় শহর।

# ৩

রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে একজন পুলিশ অফিসার লাল পতাকা নাড়ছে।

আহমদ মুসা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল সামনের পরিস্থিতিটা।

বড় একটি পুলিশ ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার পাশে। তার সমান্তরালে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে আছে একটা পুলিশ জীপ। একজন উচ্চপদস্থ অফিসার বসে আছে জীপে। পুলিশ ভ্যান, জীপ ও রাস্তায় দাঁড়ানো মোট পুলিশ দশ-বারো জন।

আহমদ মুসা গাড়ি নিয়ে দাঁড় করাল জীপটির সামনে রাস্তার ঠিক মাঝ বরাবর। জীপ এবং পুলিশ ভ্যান দুটোই তার ডান পাশে থাকল।

আহমদ মুসার গাড়ি থামতেই ছুটে এল জীপে বসা পুলিশ অফিসারটি। ড্রাইভিং উইনডো'তে এসে পুলিশ অফিসারটি বলল, 'সিংজী, আপনি কোত্থেকে আসছেন?'

'তাল্লিন।'

'সাথে ওরা কে?'

'একটা শিখ দম্পতি।'

'কোথায় যাবেন?'

'তারতু।'

'একটু থানা হয়ে যেতে হবে সিংজী।'

'কেন?'

'নির্দেশ হয়েছে, সব বিদেশীকেই থানার সাথে কথা বলে যেতে হবে। সার্চ করা ও কথা বলার পর চলে যাবেন।'

'কিন্তু আমি তো এক মিনিট সময়ও দিতে পারবো না।'

'পারতে হবে সিংজী, এটা নির্দেশ।'

'এটা অন্যায়।'

‘দুঃখিত সিংজী।’ বলে পুলিশ অফিসারটি পাশে দাঁড়ানো পুলিশের দিকে চেয়ে বলল, ‘তুমি সিংজীকে নামিয়ে গাড়ি নিয়ে থানায় চল। আমি সিংজীকে নিয়ে আসছি।’

আহমদ মুসা বলল, ‘ঠিক আছে অফিসার, যাচ্ছি থানায়। চলুন।’ বলে গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিল।

‘ধন্যবাদ।’ বলে পুলিশ অফিসারটি পাশের পুলিশকে ইংগিতে আহমদ মুসার পাশের সিটে উঠতে নির্দেশ দিয়ে নিজের গাড়ির দিকে এগোলো। আর পুলিশটি গাড়ির পেছন ঘুরে আহমদ মুসার পাশে উঠার জন্যে এগোলো।

আহমদ মুসা গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বাম হাতে শক্ত করে স্টিয়ারিং ধরে ডান হাত দিয়ে পকেট থেকে রিভলভার বের করে বিদ্যুৎ বেগে তা উপরে তুলে পর পর দু’টি গুলি ছুঁড়ল। একটি গুলি জীপের সামনের চাকা, অন্যটি পুলিশ ভ্যানের সামনের চাকা গুঁড়িয়ে দিল।

আর গুলির সাথে সাথেই আহমদ মুসার গাড়ি বিদ্যুৎ বেগে ছুটে চলল সামনের দিকে।

কি ঘটে গেল বুঝে উঠতে উঠতে আহমদ মুসার গাড়ি লক্ষ্যে বন্দুক তোলার আগেই গাড়ি তাদের নাগালের বাইরে চলে এল।

শহরে প্রবেশ করল আহমদ মুসার গাড়ি।

আহমদ মুসা পেছন দিকে তাকিয়ে কেলা এলভাকে লক্ষ্য করে বলল, ‘কোন আড়াল পাওয়া যাবে গাড়ির নেমপ্লেট পাল্টাবার?’

‘একটু সামনে বাঁ দিকে যাবার একটা রাস্তা পাওয়া যাবে, সেটা একটা পার্কের পাশ দিয়ে গেছে।’

‘ধন্যবাদ।’

পার্ক পাওয়া গেল। পার্কে গাড়ি একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড় করিয়েই আহমদ মুসা লাফ দিয়ে নেমে সামনের নেমপ্লেটটা উল্টে দেবার কাজে লেগে গেল। আর কেলা এলভা পেছনের নেমপ্লেটটা উল্টিয়ে লাগিয়ে দিল।

আহমদ মুসা শিখের দাড়ি ও পাগড়ী খুলে ছুঁড়ে দিল ডোনার কাছে এবং কেলা এলভাকে লক্ষ্য করে বলল, ‘আপনি এবার দাড়ি-পাগড়ী খুলে কেলা এলভা সেজে ড্রাইভিং সিটে গিয়ে বসুন।’

‘ধন্যবাদ। আমি আর পারছি না দাড়ি আর পাগড়ী পরে থাকতে। চুলকাতে শুরু করেছে।’

বলে কেলা এলভা ওগুলো খুলে ডোনাকে দিয়ে ড্রাইভিং সিটে গিয়ে বসল। বলল, ‘খুবই মজার হবে। এখন ‘পেদে’ এবং সামনের রাস্তার পুলিশরা শিখ ড্রাইভারের শিখ দম্পতির গাড়ি খুঁজে মরবে। আমরা আরাম করে এগিয়ে যাব।’

কেলা এলভার গাড়ি অন্য আরেকটা পথ দিয়ে প্রধান সড়কে উঠে ছুটে চলল পুব দিকে।

রাস্তায় পুলিশের গাড়ির ছুটোছুটি। কয়েক জায়গায় কেলা এলভার গাড়ি থামাল। কিন্তু থামিয়েই তারা বলে উঠল, ‘না, এ গাড়ি নয়। শিখ ড্রাইভারের সে গাড়িতে আছে একজন শিখ পুরুষ এবং একজন মহিলা।’

গাড়ি বেরিয়ে এল ‘পেদে’ শহর থেকে।

আহমদ মুসা বলল, ‘সামনেই তো পোলি শহর। পোলি থেকে ‘ভিলিজান’ ঘুরে কি আমরা ‘তারতু’তে ঢুকব?’

‘দরকার নেই। তারতু আমার নিজের শহর। এবার আমার উপর সবকিছু ছেড়ে দিন। পুলিশ এখন বিভ্রান্ত। আর ভয় নেই।’

‘নিজের শহর মানে? তারতু আপনার জন্মস্থান?’ বলল ডোনা।

‘হ্যাঁ, আমার জন্মস্থান।’

‘কিন্তু আপনি থাকেন তো তাল্লিনে।’

‘তাল্লিন আমার চাকরী কেন্দ্র। কিন্তু বাড়ি আমার তারতু’তে।’

‘আপনার মিস্টার কোথায় থাকেন?’

মুহূর্তে মুখটা ম্লান হয়ে গেল কেলা এলভার। বেদনার একটা উচ্ছ্বাস উপচে উঠল সে মুখে।

সঙ্গে সঙ্গে কোন উত্তর দিল না কেলা এলভা। গাড়ি নিয়ে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল।

একটু পর কেলা এলভা মুখে হাসি টেনে বলল, 'মিঃ আহমদ মুসা, অদ্বিতীয় আপনার পরিস্থিতি পর্যালোচনার ক্ষমতা। গাড়ির নাম্বার আর বেশ না পাল্টালে হয়তো বিপদে পড়তে হতো। কিন্তু এ চিন্তাটা আপনার মাথায় এল কি করে? আমি সহকর্মী গোয়েন্দা ইন্সপেক্টরকে যে কাহিনী বলেছি, সে কাহিনী বলেই সামনে এগোবার চেষ্টা করতাম।'

'চিন্তাটা খুবই সাধারণ। আপনার বলা কাহিনীতে যথেষ্ট ফাঁক ছিল। ছাড়া পাওয়ার পর আপনার প্রথম দায়িত্ব ছিল হেডকোয়ার্টারে খবর দেয়া বা সেখানে হাজির হওয়া, কাউকে লিফট দেয়া নয়। সুতরাং আপনার পরিচয় নিয়ে আপনি 'পেদে' ঢুকলে আপনাকে অবশ্যই সেখানকার পুলিশ হেডকোয়ার্টারে তাল্লিনের সাথে কথা বলতে হতো। সেখানকার পুলিশরাও আপনার কাছে এটাই চাইতো।' বলল আহমদ মুসা।

'ওয়ান্ডারফুল! আপনার প্রত্যেকটা কথা সত্য। কিন্তু এমন চিন্তা আমার মাথায় আসেনি। সামনের শহর পোলি'তে এ বিপদ নেই?'

'নেই। এখন শিখ ড্রাইভার ও শিখ দম্পতির বিষয়টা সামনে এসেছে। আপনাকে দেখলে সবাই এখন বুঝবে, আপনি বাড়িতে যাচ্ছেন।'

'ঠিক বলেছেন।'

কথা শেষ করেই কেলা এলভা কিছু একটা বলার জন্যে মুখ খুলেছিল। তার আগেই ডোনা কেলা এলভাকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, 'মাফ করবেন, একটা জিজ্ঞাসা আমি ধরে রাখতে পারছি না।'

'আমাকে?'

'হ্যাঁ।'

মুখটা পেছনে ডোনার দিকে একটু ঘুরিয়ে হেসে বলল, 'বলুন গ্রেট লেডি।'

'গ্রেট লেডি! আমাকে বলছেন?'

'আর কাকে বলব। আপনার মত মহা সৌভাগ্যবতী আর দ্বিতীয় নেই।'

‘আমি বিদ্রূপ বলে ধরে নেব।’

‘বিদ্রূপ বলে ধরে নেবেন? মিঃ আহমদ মুসাকে আপনি বিপ্লবের বিশ্বনায়ক মানেন না?’

‘তাতে কি?’

‘আহমদ মুসা বিশ্বনায়ক হলে বিশ্বনায়িকার মুকুট আপনার মাথায় ওঠে না?’

‘ও এই কথা!’ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল ডোনার মুখ।

‘আপনাকে আপনি বুঝবেন না ম্যাডাম। বুঝবে আমার মত লাখো মেয়েরা।’ মুখে হাসি টেনেই বলল কেলা এলভা।

কথা শেষ করেই কেলা এলভা বলল, ‘দুঃখিত অন্য প্রসঙ্গে যাওয়ার জন্যে। আপনার জিজ্ঞাসা বলুন।’

গম্ভীর হলো ডোনা। বলল কেলা এলভাকে লক্ষ্য করে, ‘কিছু মনে করবেন না তো? ব্যাক্তিগত প্রশ্ন।’

মুখে সপ্রতিভ একটা হাসি টেনে কেলা এলভা বলল, ‘কি ব্যক্তিগত প্রশ্ন! বলুন?’

‘আমার মনে হয়েছে, আপনি মিস না মিসেস, আপনার মিস্টার কোথায়- এই দুই প্রশ্নের জবাব আপনি এড়িয়ে গেছেন। শুধু তা-ই নয়, প্রশ্ন দু’টিতে আপনি কষ্ট পেয়েছেন।’

আবার ম্লান হয়ে গেল কেলা এলভার মুখ। ধীরে ধীরে তার ঠোঁটে কান্নার মত করুণ একটা হাসি ফুটে উঠল।

অনেকক্ষণ পর বলল, ‘দুঃখিত মিসেস মারিয়া।’

বলেই একটু থামল। তারপর শুরু করল, ‘প্রত্যেকেরই জীবনে একটা ব্যক্তিগত অংশ থাকে যা তার একান্ত নিজস্ব। সেখানকার হাসি-কান্না হৃদয়ের কথার মতই সংগোপন। তবু বলছি আমি।’ থামল কেলা এলভা।

একটু পরে আবার মুখ খুলল।

সূক্ষ্ম কম্পন দেখা দিল তার ঠোঁটে। ঠোঁটের কম্পন তার বেড়ে গেল। ঠোঁট ফেঁড়ে তার কথা বেরিয়ে এল, 'আমার স্বামী নেই- একথা বলতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, আবার আছে তাও বলতে পারছি না।'

কেলা এলভার শেষের কথাগুলো ভেঙে পড়ল কান্নার চাপা উদ্দামে।

দু'চোখ থেকে তার নেমে এল দু'টি অশ্রুর ধারা।

ডোনা এবং আহমদ মুসা দু'জনেই স্তম্ভিত, বিব্রত।

পেছন থেকে ডোনা ধীরে ধীরে কেলা এলভার কাঁধে হাত রাখল। বলল, 'আমি দুঃখিত কেলা এলভা। আমি বুঝতে পারিনি।'

কেলা এলভা ডান হাত স্টিয়ারিং-এ রেখে বাম হাত দিয়ে কাঁধে রাখা ডোনার হাত চেপে ধরল। বলল, 'না মিসেস ডোনা। আপনি আমার উপকার করেছেন। আমার কাঁদা দরকার। না কাঁদলে আমি বাঁচব না, বুক ফেটে যাবে আমার।'

বলে কেলা এলভা কান্নায় লুটিয়ে পড়ল স্টিয়ারিং-এর উপর।

গাড়ির ব্রেক কষেছে সে। দাঁড়িয়ে পড়েছে গাড়ি।

ডোনা সিট থেকে উঠে কেলা এলভার মাথায় হাত রাখল। সান্ত্বনা দিল।

আহমদ মুসা বিমূঢ়। কর্তব্যপরায়ণ আনন্দ-উচ্ছল মেয়েটার বুকে দুঃখের এতবড় সমুদ্র লুকিয়ে আছে! দুঃখটা তার আসলে কি? স্বামী তার নেই বলেই মনে হয়। পশ্চিমী সমাজে স্বামীর সাথে বিচ্ছেদ হওয়াকে খুব বড় ঘটনা বলে দেখা হয় না। কেলা এলভার স্বামী না থাকার মধ্যে এতবড় দুঃখটা কিসের! ভেবে কোনই কূল পেল না আহমদ মুসা।

অল্প পরেই স্টিয়ারিং থেকে মাথা তুলে রুমাল বের করে চোখ মুছে পেছনে তাকিয়ে বলল, 'ধন্যবাদ মিসেস আহমদ মুসা। আমি দুঃখিত।'

বলে সোজা হয়ে বসে গাড়ি স্টার্ট দিল। ছুটে চলল আবার গাড়ি।

কেলা এলভাই কথা শুরু করল। বলল, 'স্যরি, খুবই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম।' থামল কেলা এলভা।

শুরু করল আবার, 'জানতে চেয়েছেন আমি মিস না মিসেস, আমার স্বামী কোথায়! তিনি এস্টোনিয়া কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর অপারেশন চীফ। অত্যন্ত

প্রতিভাবান হিসেবে তরুণ বয়সেই তিনি এ দায়িত্ব পেয়ে যান। আজ ছ'মাস আমরা বিয়ে করেছি।' থামল কেলা এলভা।

'তারপর?' বলল ডোনা।

'বিয়ের পর দিনই তাকে একটা অপারেশনে বের হতে হয়। সে আর ফিরে আসেনি।' শেষের কথাগুলো কান্নায় জড়িয়ে গেল কেলা এলভার।

থামল কেলা এলভা।

ডোনারাও তৎক্ষণাৎ কিছু বলল না। কিছুক্ষণ নীরবতা।

নীরবতা ভাঙল আহমদ মুসা। বলল, 'সত্যিই এ এক মর্মান্তিক ঘটনা ম্যাডাম। আমার একটা প্রশ্ন, এই নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারে এস্টোনীয় গোয়েন্দা বিভাগ কি তথ্য জোগাড় করেছে?'

'তাদের রিপোর্টে সুনির্দিষ্ট কোন তথ্যই নেই যা নিয়ে সামনে এগোনো যায়।'

'তার ঐ অপারেশনটা কোন পক্ষ বা কোন দেশের বিরুদ্ধে ছিল?'

'এ ব্যাপারে কোনই তথ্য নেই ঐ রিপোর্টে।'

'রিপোর্টের সুপারিশেও কিছু নেই?'

'কোন দেশকেই অভিযুক্ত করা হয়নি।'

'দুঃখিত মিসেস এলভা, ঐ রিপোর্টটা ভুয়া।'

চট করে মুখ ঘুরিয়ে কেলা এলভা আহমদ মুসার দিকে একবার তাকাল। তার চোখে-মুখে বিস্ময়। বলল, 'অল্প জেনেই একদম প্রান্তিক মন্তব্য করে ফেলেছেন। অন্য কেউ এ কথা বললে আমি হাসতাম। কিন্তু আপনার কথা আমাকে হাসার বদলে আতংকিত করেছে। কিন্তু প্রশ্ন, কেন আপনি এই রিপোর্টকে ভুয়া বলছেন?'

'একটা দেশের কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট যখন তার সাধারণ শত্রুও চিহ্নিত না করতে পারে, তখন বুঝতে হবে তার মধ্যে গণ্ডগোল আছে।'

'সাধারণ শত্রু চিহ্নিত করা এবং একটি মারাত্মক অভ্যন্তরীণ ঘটনার জন্যে কোন দেশকে দায়ী করা কি এক জিনিস?'

'এক জিনিস নয়। কিন্তু একটা দেশের কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চীফ যখন কোন গুরুতর অপারেশনে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায়, তখন অবশ্যই বিশেষ শত্রু দেশটির উপর গিয়ে নজর পড়তে হবে। রিপোর্টে এই ব্যাপারে কোন নির্দেশনা দিতে ব্যর্থ হওয়াই রিপোর্টটি ভুয়া হওয়ার প্রমাণ।'

কেলা এলভার মুখটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আহমদ মুসা থামতেই সে বলে উঠল, 'প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়াই দায়ী করা যায়, এমন শত্রু দেশ কি এস্টোনিয়ার আছে?'

'এ প্রশ্ন তো আমিই আপনাকে করব।'

'মাফ করবেন, আমি মিলিয়ে নিতে চাচ্ছি।'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'সুইডেন, ডেনমার্ক, পোল্যান্ড, জার্মানী, রাশিয়া- সবাই এস্টোনিয়ার শত্রুর তালিকায় পড়ে। কিন্তু আজ এস্টোনিয়ার অস্তিত্বের শত্রু একটাই। সে হলো রাশিয়া।'

'কেন?'

'একমাত্র রাশিয়া ছাড়া ঐ দেশগুলোর কারোরই এই মুহূর্তে ভূখণ্ডগত সম্প্রসারণের কোন লক্ষ্য নেই। রাশিয়া বিশেষ করে রাশিয়ার একটি বিশেষ ক্ষমতাধর মহল সোভিয়েত ইউনিয়নের আকার ফিরে পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছে।'

'ধন্যবাদ।' বলল কেলা এলভা।

কথা শেষ করেই বলে উঠল, 'রাশিয়ার সেই ক্ষমতাধর মহলটি কে? সরকার? না বাইরের কেউ?'

'আপাতত সরকার নয়।'

'তাহলে?'

'কারণ, সেখানে সরকারের মধ্যে সরকার আছে, সরকারের বাইরেও ছায়া সরকার আছে। কারা করেছে ব্যাপারটা বলা মুশকিল।'

'ছায়া সরকার বলতে কি আপনি 'গ্রেট বিয়ারকে' ইংগিত করছেন?'

'হ্যাঁ, তারা লেনিনীয় পন্থায় ক্ষমতা দখল করতে চাচ্ছে। ঠিক লেনিন ১৯১৭ সালে যেভাবে মেনশেভিখদের কাছ থেকে ক্ষমতা হাইজ্যাক করেছিল, ঠিক সেভাবেই।'

‘বুঝেছি। তাহলে কি আপনি নিশ্চিত, রাশিয়ারই কারও হাতে পড়েছিল আমার স্বামী?’

‘আপনার স্বামীর অপারেশন অভিযানের পথ সম্পর্কে কিছু জানতে পেরেছিলেন?’

‘তার গাড়িটি শেষবারের মত লোকেট করা হয় সামনের ‘তারতু’ থেকে উত্তরে।’

‘আমি নিশ্চিত ম্যাডাম। আপনার স্বামী রুশদের হাতেই পড়েছিল।’

উত্তরে কেলা এলভা কোন কথা বলল না। স্টিয়ারিং-এ রাখা তার ডান হাতটি শুধু মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উঠল। তার অচঞ্চল দৃষ্টি প্রসারিত সামনের রাস্তার উপর। অনেকক্ষণ পর বলল, ‘আপনারও তো লড়াই রুশদের বিরুদ্ধে?’

‘রুশদের বিরুদ্ধে নয়, সেখানকার এক রুশ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে।’

‘একই কথা। গ্রেট বিয়ার এখন লেনিনের প্রতিভূ, আইভান দি টেরিবলের মত জারদেরও প্রতিভূ। এক কথায়, সমগ্র রুশ মানসের প্রতিভূ।’

‘ঠিক। তবু তারা রাশিয়ার একটা গ্রুপ মাত্র।’

‘আপনার সাথে তর্কে যাবো না। রাশিয়ার সেই ষড়যন্ত্রকারী পক্ষ, আমি দেখছি, আমাদের কমন এনিমি। আপনি আমাকে সাহায্য করবেন, না আমি আপনাকে সাহায্য করব?’

‘দু’টোই প্রয়োজন।’

বলেই আহমদ মুসা কেলা এলভাকে লক্ষ্য করে বলল, ‘আপনার ‘পোলে’ শহর এসে গেল।’

‘কোন চিন্তা নেই। আমার উপর সবকিছু ছেড়ে দিন।’

কথা শেষ করেই নড়ে-চড়ে বসল কেলা এলভা। তার গাড়ির স্পীড বেড়ে গেল।

মস্কোভা নদী তীরের গ্রেট বিয়ারের সেই হেডকোয়ার্টার। পঁচিশ চেয়ারের সেই হলরুম। পঁচিশটি চেয়ারে পঁচিশ জন মানুষ। তাদের সামনে সাত ফুট উঁচু পাঁচ বর্গফুটের সেই মঞ্চ।

মঞ্চ ফুঁড়ে উঠে এল সেই সোনালী সিংহাসন। সোনালী সিংহাসনে বসা সোনালী বর্মে আপাদমস্তক ঢাকা সেই সোনালী মূর্তির মুখ থেকে নিঃসৃত হলো গমগমে এক আওয়াজ, 'মহান রাশিয়ার সন্তানগণ, মাথা তোল।'

সামনের মঞ্চে সোনালী সিংহাসন উদয় হবার সংগে সংগে হলের পঁচিশজন মানুষ সবাই 'মহামান্য আইভান' বলে মাথা নিচু করেছিল।

তারা মাথা তুলল সবাই।

ধ্বনিত হলো সোনালী ছায়ামূর্তির কণ্ঠ। বলল, 'নিকোলাস বুখারিন, প্রথমবার এবং শেষবারের মত তোমার ব্যর্থতাকে মাফ করে দেয়া হয়েছে এই বিবেচনায় যে, আহমদ মুসার কাছে তোমার পরাজয়ের কারণ আহমদ মুসার চেয়ে পেছনের গাড়িটার কৃতিত্বই বেশি, যার উপর তোমার কোন হাত ছিল না।'

নিকোলাস বুখারিনের মুখ ছিল ফাঁসির আসামীর মত। সোনালী ছায়ামূর্তি 'আইভান দি টেরিবল'-এর ঘোষণা ধ্বনিত হবার সাথে সাথে তার উদ্দেশ্যে আভূমি নত হয়ে গেল নিকোলাস বুখারিনের মাথা।

আবার ধ্বনিত হলো ছায়ামূর্তির কণ্ঠ, 'নিকোলাস বুখারিন, পরের বক্তব্য তুমি সবার অবগতির জন্যে বল।'

'মহামান্য আইভান, পরের বক্তব্যও ব্যর্থতার এক করুণ কাহিনী', কান্নার মত করুণ কণ্ঠে বলতে শুরু করল নিকোলাস বুখারিন, 'গোটা এস্টোনিয়ায় তার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়নি। আমার আবেদনের পর এস্টোনিয়া সরকার ত্বরিৎ যে পদক্ষেপ নিয়েছে, তা যথোপযুক্তই ছিল। আহমদ মুসার হাত থেকে কেলা এলভাকে উদ্ধার করার মধ্যে তাদেরও স্বার্থ ছিল। কিন্তু সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে দিয়েও আহমদ মুসার দেখা পাওয়া যায়নি। কেলা এলভাকে রাস্তায় ছেড়ে সে কোথাও সটকে পড়েছে। সন্দেহ করা হচ্ছে, যে শিখ ড্রাইভার ও শিখ দম্পতির সাথে পুলিশের সংঘাত হয়েছে, তাদের একজন আহমদ মুসা হতে পারেন। এই ঘটনার পর শিখ ড্রাইভার ও শিখ দম্পতিও হাওয়া হয়ে যায়। এই ঘটনার পর

এস্টোনীয় পুলিশ কোন রাস্তাতেই সন্দেহজনক আর কিছু পায়নি। তবে একটা জিনিস পরিষ্কার, আহমদ মুসা লেক 'পাইপাস'-এর দিকে এসেছে।'

'মাজুরভ, তোমার গোয়েন্দা রিপোর্ট কি বলে?'

মাজুরভ উঠে দাঁড়িয়ে আভূমি একটা বাউ করে বলল, 'মহামান্য আইভান, আমরা মনে করছি, কেলা এলভার গাড়িতে যে দম্পতি ছিল, সেটা আহমদ মুসা দম্পতি। কেলা এলভা বুলেটের মুখে মিথ্যা কথা বলেছে। আবার কেলা এলভা এবং আহমদ মুসা দম্পতিই শিখ ড্রাইভার ও শিখ দম্পতি সেজেছিল। পোলে ও তারতু শহরে প্রবেশের সময় কেলা এলভা এবং আহমদ মুসাদের কোন ছদ্মবেশ ছিল না। কিন্তু এস্টোনীয় পুলিশ তাদের কোন সন্দেহ করেনি। আহমদ মুসা কেলা এলভাকে পুতুলের মত ব্যবহার করেছে। কিন্তু তারতু প্রবেশের পর তারা নিখোঁজ হয়ে গেছে। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, কেলা এলভা তার বাড়িতে যায়নি। সন্দেহ করা হচ্ছে, আহমদ মুসা লেক পাইপাসের পথে রাশিয়া প্রবেশ করেছে। পুশকভ শহর থেকে উত্তরে লেক পুশকভের পূর্ব তীরের অল্প পানিতে দু'টি গামবুট এবং একটি ডুবে যাওয়া নৌকা পাওয়া গেছে। মনে করা হচ্ছে, আহমদ মুসা দম্পতি এগুলো ব্যবহার করেছে। আহমদ মুসা পুশকভ থেকে মস্কো কিংবা সেইন্ট পিটার্সবার্গের দিকে যেতে পারে। আমরা এ দু'শহরগামী সব পথের উপর চোখ রেখেছি।' থামল মাজুরভ।

সে থামতেই সোনালী ছায়ামূর্তির কণ্ঠে ধ্বনিত হলো, 'মাজুরভ, তুমি যে মহাকাব্য পাঠ করলে, তার মহানায়ক দেখা যাচ্ছে আহমদ মুসা। যে রাশিয়ার বীর সন্তান জেনারেল বোরিস ও যুবরাজ পিটারসহ অসংখ্য রুশ-সন্তানের হত্যাকারী রাশিয়ার নাম্বার ওয়ান শত্রু। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, তোমার বর্ণনায় সে অপ্রতিরোধ্য। লজ্জা করল না তোমার এসব কথা বলতে?' থামল ছায়ামূর্তি আইভান দি টেরিবল।

মাজুরভ কোন কথা বলল না। অসহায়ের মত বাউ করল সোনালী মূর্তি আইভানকে।

মাজুরভ গ্রেট বিয়ারের গোয়েন্দা প্রধান।

এবার সোনালী মূর্তি আইভানের কণ্ঠ ধ্বনিত হলো ভ্লাদিমির খিরভকে লক্ষ্য করে। খিরভ গ্রেট বিয়ারের অপারেশন ফরচুন প্রজেক্ট-এর প্রধান। অপারেশন ফরচুন প্রজেক্ট-এর লক্ষ্য, আহমদ মুসাকে হাতের মুঠোয় এনে রাজকীয় আংটি ও রাজকীয় ডায়েরী হাত করা এবং একই সাথে জারদের ধনভাণ্ডার কুক্ষিগত করা ও জারদের যুবরাজ্ঞী ক্যাথারিনকে হত্যা করে রুশ সরকারের নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে উত্তরণের উদ্যোগ বানচাল করে দেয়া।

আইভানের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো, 'এবার খিরভ, তুমি ব্যর্থতার কোন মহাকাব্য শোনাবে?'

খিরভ উঠে দাঁড়িয়ে ডান হাত বুকে রেখে বাউ করে বলল, 'মহামান্য আইভান, আমরা নিশ্চিত, আহমদ মুসাকে আমাদের হাতের মুঠোয় আসতে হবে। তার মিশন হলো, ক্যাথারিনকে উদ্ধার করে রাজকীয় আংটি ও ডায়েরী তার হাতে বুঝে দেয়া। তার এ মিশনের দাবিই হলো, তাকে আক্রমণাত্মক হতে হবে এবং ক্যাথারিনকে উদ্ধারের জন্যে আমাদের খাঁচায় তাকে ঢুকতে হবে।'

একটু থামল খিরভ। তারপর আবার শুরু করল, 'মহামান্য আইভান, ক্যাথারিনকে আমরা যেখানে রেখেছি, সেখানে শত্রু শুধু ঢুকতেই পারে, বেরুতে পারে না। সুতরাং অধৈর্য্য না হয়ে আমাদের অপেক্ষা করা দরকার, আহমদ মুসা আমাদের বড়শী কখন গিলছে। তারপরেই আমরা ডাঙায় টেনে তুলব।'

'খিরভ, তুমি একজন জেনারেলের মত অংক কষলে, যা যুদ্ধক্ষেত্রের জেনারেলদের জন্যে প্রযোজ্য। কিন্তু আহমদ মুসা বন্দুক নির্ভর কোন জেনারেল নয়। সে একজন মাথাওয়ালা অতিসতর্ক বিপ্লবী । সে যদি জেনেই ফেলে ক্যাথারিন কোথায় আছে, তাহলে সেতো সরকারী সাহায্য নিয়েও অগ্রসর হতে পারে। তোমার জিন্দানখানা রাষ্ট্রশক্তি মোকাবিলা করার মত অবশ্যই নয়। এ সম্ভাবনার বিরুদ্ধে কি পদক্ষেপ তুমি নেবে?' ধ্বনিত হলো সোনালী মূর্তি আইভানের কণ্ঠে।

'মহামান্য আইভান, আহমদ মুসার সাথে রুশ সরকারের যোগাযোগ হওয়া এবং সমন্বিত একটা অভিযানের ব্যবস্থা হওয়া খুব বড় ঘটনা। আমরা তা অবশ্যই জানতে পারব এবং ক্যাথারিনকে উদ্ধারের প্রয়াস তাদের বানচাল হয়ে

যাবে। সেই সাথে প্রমাণ হবে, একটা লোকহিতকর জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে সন্দেহ করে তারা অন্যায় করেছে।'

'তোমার আত্মরক্ষামূলক মনোভাব সম্পর্কে তুমি সতর্ক হও খিরভ। আমরা চাই না আমাদের শত্রু কিংবা সরকার আমাদের কোন আঙিনায় পা রাখার সুযোগ পাক।' গর্জে উঠল আইভানের কণ্ঠ। গম গম করে বেজে উঠল সমগ্র হলঘর।

ভয় ছড়িয়ে পড়ল সবার চোখে-মুখে। চুপসে গেল ভ্লাদিমির খিরভের মুখ।

আইভানের গলাই আবার ঝনঝন করে উঠল। বলল, 'বুঝেছ আমার নির্দেশ?'

'বুঝেছি মহামান্য আইভান। শত্রু আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠার আগেই তাকে কাবু করতে হবে।' বলল খিরভ।

'আর এর অর্থ কি?' ধ্বনিত হলো আইভানের কণ্ঠ।

'আমাদের এখন প্রতি মুহূর্তের চেষ্টা হবে আহমদ মুসাকে আমাদের হাতের মুঠোয় আনা।'

'শোন, আহমদ মুসার চেয়ে তার নববধূ কম মূল্যবান নয়। আহমদ মুসাকে কথা বলানো কঠিন। কিন্তু তার সুন্দরী নববধূকে যদি হাতে পাও, তাহলে আহমদ মুসা পাকা ফলের মত এসে হাতে পড়বে এবং পুতুলের মতই নাচানো যাবে আহমদ মুসাকে।' বলল আইভান।

'ধন্যবাদ, মহামান্য আইভান, আপনার এ নির্দেশ আমরা বাস্তবায়ন করব।' বলল খিরভ মাথা নত করে।

'সরকার কি করছে মাজুরভ?' আইভানের লক্ষ্য এবার মাজুরভের দিকে।

মাজুরভ বলল, 'মহামান্য আইভান, সরকার তার গোয়েন্দাদের ছড়িয়ে দিয়েছে এবং সকল চেকপোস্টকে সতর্ক করেছে। তাদের লক্ষ্য, আহমদ মুসাকে খুঁজে পাওয়া এবং তাকে সব সময় চোখে চোখে রাখা। তার যোগাযোগ ও অবস্থানের প্রতিটি স্থানকে চিহ্নিত করা। ক্যাথারিন উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত তারা

আহমদ মুসাকে গ্রেফতার করবে না। তারা মনে করে, ক্যাথারিন উদ্ধারে আহমদ মুসা সরকারের সবচেয়ে উপকারী অস্ত্র।' থামল মাজুরভ।

'আহমদ মুসাকে খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে সরকারী এ উদ্যোগ থেকেও তোমরা সাহায্য পেতে পার।' বলল আইভান।

'অবশ্যই, মহামান্য আইভান।' বলল খিরভ।

খিরভের কথা শেষ হতেই ঝন ঝন করে বেজে উঠল গোটা হলঘর। শোনা গেল, আইভানের ভারি ও উচ্চকণ্ঠ, 'রাশিয়ার ঈশ্বর রাশিয়ার সহায় হোন। শোন রুশ সন্তানরা, কোন ব্যর্থতা আর বরদাশত করা হবে না।'

কথার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় সাত ফুট উঁচু বেদি থেকে সোনালী মূর্তি আইভানের অন্তর্ধান ঘটল।

জ্বলে উঠল হলঘরে আলো। এতক্ষণে সবার মুখে ফুটে উঠল স্বাচ্ছন্দ্য এবং কারও কারও মুখে হাসি।

সবাই হলঘর থেকে বাইরে বেরুবার জন্যে পা বাড়াল।

হলঘর থেকে বেরুবার পর ফিস-ফাস কথা শুরু হয়ে গেল তাদের মধ্যে।

পাশাপাশি হাঁটছিল মাজুরভ, খিরভ ও নিকোলাস বুখারিন।

নিকোলাসের দু'হাতে ব্যান্ডেজ। একটি পা আহত। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিল সে।

মাজুরভ নিকোলাস বুখারিনের দিকে চেয়ে ঠোঁটে হাসি টেনে বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না বুখারিন, আহমদ মুসা বাঁচালো কেন তোমাকে নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে?'

বুখারিনের মুখে ফুটে উঠল একরাশ ঘৃণা। বলল, 'আমি কিন্তু সংগে সংগেই বলে দিয়েছি, তার কোন অনুগ্রহ আমি চাইনি। সুযোগ পেলেই তাকে আমি হত্যা করব।'

'এটা তো তোমার কথা বুখারিন। আমি জিজ্ঞেস করছি, সে তোমাকে বাঁচাতে এগিয়ে এল কেন নিজের জীবন বিপন্ন করে?'

'শত্রুকে হাত করার একটা কৌশল বা তার এটা একটা ফ্যাশন।'

'যে শত্রু মরে যাচ্ছে তাকে হাত করার প্রয়োজন কি?'

‘যা-ই বলুন, ব্যাটা ধড়িবাজ। এসব করেই নাম কিনেছে। তার কিন্তু এবার রক্ষা নেই।’

‘বুখারিন, আবেগ দিয়ে আহমদ মুসার মত শত্রুর মোকাবিলা করতে পারবে না। তাকে কাবু করতে হলে তাকে জানতে হবে। বিপদগ্রস্থ শত্রুর উপর আহমদ মুসা কখনও হাত তোলেনি, বরং তাকে সাহায্য করেছে। এটা আহমদ মুসার চরিত্রের একটা দিক। এটা জানা থাকলে এর সুযোগ তুমি নিতে পার।’ বলল ভ্লাদিমির খিরভ।

‘এটা তার বড়ত্ব জাহিরের একটা অহমিকা।’ বলল বুখারিন।

‘কিন্তু এ ধরনের বড়ত্ব জাহিরের জন্যে বড় মন ও বড় সাহস দরকার।’ বলল খিরভ।

‘এর দ্বারা আপনি কি বলতে চাচ্ছেন?’ বলল আবার বুখারিন।

‘বলতে চাচ্ছি, আহমদ মুসা অনেক বড় শত্রু। এ পর্যন্ত সে লক্ষ্য অর্জনে কোথাও ব্যর্থ হয়নি। সুতরাং তাকে ছোট করে নয়, বড় করে দেখেই তার বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে হবে। আমাদের এ বারের ব্যর্থতা শুধু আমাদের নয়, রাশিয়ার ভবিষ্যতকেই ধ্বংস করবে।’

সবার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। তাদের সামনে ভেসে উঠেছিল আইভানের আজকের শেষ কথা, ‘কোন ব্যর্থতাই আর বরদাশত করা হবে না।’

কিছুক্ষণ নীরবতা তাদের মধ্যে।

নীরবতা ভাঙল খিরভ। বলল, ‘আহমদ মুসার লক্ষ্য কি সেইন্ট পিটার্সবার্গ না মস্কো?’

‘আহমদ মুসা সময় নষ্ট করার পাত্র নয়। ক্যাথারিন যেখানে বন্দী আছে মনে করবে সেখানেই সে যাবে।’ বলল মাজুরভ।

‘আহমদ মুসা কি ভাবছে, সেটাই প্রশ্ন। গ্রেট বিয়ারের পুরানো হেডকোয়ার্টার সেইন্ট পিটার্সবার্গে। তাছাড়া সেখানে গ্রেট বিয়ারের তৎপরতাও বেশি। সুতরাং আহমদ মুসা সেইন্ট পিটার্সবার্গকে ক্যাথারিনকে লুকিয়ে রাখার স্থান হিসেবে চিহ্নিত করতে পারে। মস্কোতে গ্রেট বিয়ারের নতুন হেডকোয়ার্টারের

সন্ধান তার জানার কথা নয়। এরপরও রাজধানী মস্কোতেও সে আসতে পারে।' বলল খিরভ।

'এস্টোনিয়া দিয়ে তার প্রবেশ থেকে মনে হয়, সেইন্ট পিটার্সবার্গ হয়ে সে মস্কো আসবে।' বলল মাজুরভ।

কিন্তু কথা শেষ করেই মাজুরভ আবার বলল, 'পুশকভ দিয়ে সে রাশিয়ায় প্রবেশ করায় সেইন্ট পিটার্সবার্গে তার প্রথম যাওয়ার ব্যাপারটা অন্তত অর্ধেক পরিমাণে কমে গেছে।'

'যা-ই হোক, সবদিকেই আমাদের সমান নজর দিতে হবে। একটা খুশির কথা এই, আহমদ মুসাকে চিহ্নিত করা এবার অনেক সহজ হবে। তার সাথে রয়েছে তার ফরাসী স্ত্রী।' বলল খিরভ।

'ঠিক বলেছেন। এটা বড় একটা প্লাস পয়েন্ট আমাদের জন্যে।' বলল মাজুরভ।

'স্ত্রী সাথে নিয়ে আহমদ মুসার অভিযান এই প্রথম। এটা তার হবে বড় একটা দুর্বল দিক।' খিরভ বলল।

'মহামান্য আইভান যা বলেছেন, আহমদ মুসার স্ত্রীকে হাতের মুঠোয় পেলে সত্যি আহমদ মুসাকে পুতুলের মত নাচানো যাবে। নববধূর স্বার্থ সে সব স্বার্থের চেয়ে বড় করে দেখবে।' বলল বুখারিন।

'দেখ বুখারিন, তোমার চোখে কিন্তু লোভের চিহ্ন দেখছি।' বলল খিরভ।

'তার ফরাসী স্ত্রী দেখলে আপনারও লোভ হবে।' বুখারিন বলল।

'সাবধান বুখারিন। নিজের জীবনের কথা প্রথম ভেবো।'

লিফটের মুখে এসে পড়েছে ওরা তিনজন। দাঁড়ালো ওরা।

উঠে আসছে লিফট।

দক্ষিণ পুশকভের আবাসিক এলাকার ছোট বিলাসবহুল একটি বাংলো। বাংলোটির দু'তলার দক্ষিণ প্রান্তের একটি কক্ষে আহমদ মুসা ও ডোনা পাশাপাশি একটা সোফায় বসে।

বাড়িটা কেলা এলভার খালুর।

কেলা এলভার খালু বরিসভ একজন রুশ কাস্টমস অফিসার। পুশকভে সে দীর্ঘদিন ধরে রয়েছে। কেলা এলভার খালার সাথে তার বিয়ে হয় প্রেম করে তাল্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়। বরিসভ আসলে হাফ রাশিয়ান। তার মা ছিলেন এস্টোনীয়।

তারতু থেকে আসার সময় কেলা এলভা আহমদ মুসা ও ডোনাকে বার বার বলে দিয়েছিল, তারা পুশকভ কিংবা রাশিয়ার কোথাও যেন কোন হোটেল বা রেস্টহাউসে না ওঠে। উঠলেই তারা ধরা পড়ে যাবে। কারণ, গ্রেট বিয়ার এবং রুশ সরকার অবশ্যই তাদের প্রত্যেকটি হোটেল ও রেস্টহাউসে পাহারা বসিয়েছে।

কেলা এলভার অনুরোধেই আহমদ মুসা ও ডোনা কেলা এলভার চিঠি নিয়ে তার খালুর এ বাড়িতে এসে উঠেছে।

আহমদ মুসাদের সামনে বিছানো ছিল পশ্চিম রাশিয়ার একটা মানচিত্র।

আহমদ মুসা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে মানচিত্রটি। কিন্তু ডোনার মনোযোগ সেদিকে নেই। ডোনা তার ডান হাত দিয়ে আহমদ মুসার গলা পেঁচিয়ে ধরে মাথাটা তার কাঁধে ঠেস দিয়ে বলল, 'দেখ, কেলা এলভা আমাদের উপকার করেছে, তার স্বামীর সন্ধান কিন্তু করতেই হবে।'

আহমদ মুসা মানচিত্র থেকে মুখ তুলল। বলল, 'ঠিক বলেছ। তার সাথে দেখা হওয়ায় অন্যদিক দিয়েও উপকৃত হয়েছি। সে যে বিশ্ববিখ্যাত এস্টোনীয় লেখক এমাস্তে এলভার নাতনি, এটা আমার জন্যে একটা বড় আবিষ্কার।'

'দেখ মেয়েটা কত ভাল। একটুও আত্মপ্রচার নেই। তার বাড়িতে গিয়ে এমাস্তে এলভার পারিবারিক ছবি না দেখলে জানাই যেত না তার পরিচয়।'

'সত্যিই ডোনা, ওর ঋণ শোধ হবার নয়। 'পোলে' ও 'তারতু'তে তার বুদ্ধিমত্তার কারণেই আমরা ধরা পড়া থেকে বেঁচে গেছি। এমনকি তার বাড়িতেও

আমরা ধরা পড়ে যেতাম। গ্রেট বিয়ার আগেই সেখানে পাহারা বসিয়েছিল। সে যদি গোপন পথে তার বাড়িতে নেয়ার ব্যবস্থা না করতো, যদি তাদের অবস্থানকে সবদিক থেকে গোপন না রাখতো এবং গোপনে যদি বের করে না আনতো তার বাড়ি এবং তারতু থেকে, তাহলে বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে পড়তে হতো আমাদের।'

'একটা জিনিস আমি বুঝতে পারছি না। তার বাড়িতে আমরা তিনদিন ছিলাম। তার সাথে সকল আলোচনায় আমার মনে হয়েছিল, স্বামীর সন্ধান করার জন্যে রাশিয়ায় সেও আমাদের সঙ্গী হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে এ বিষয়ে কিছুই বলল না, কিছুই করল না।'

'ধন্যবাদ ডোনা। আমিও এ রকমই ভেবেছি।'

একটু থামল আহমদ মুসা। তারপরেই আবার বলল, 'সে তো সরকারী চাকুরে। চাইলেই যা ইচ্ছা তা করতে পারে না।'

'তা-ই হবে।' বলল ডোনাও।

আহমদ মুসা ডান হাত দিয়ে ডোনার মুখ একটু উঁচু করে তুলে ধরল। ঘনিষ্ঠভাবে চোখ রাখল ডোনার মুখে।

ডোনার মুখ রাঙা হয়ে উঠল লজ্জায়। বলল, 'এভাবে দেখছ কেন?'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'এই যে বাড়ি, এমন একটা শান্তির নীড়ে তোমাকে মানায় বেশি।'

'এমন কথা বলছ কেন?'

'সুন্দর এই বাংলোতে তিনদিন আমাদের ভালোভাবে কাটল, তাই।'

'ও, অভিযানের কথা ভাবছ। এই নরম শরীর নিয়ে আমি তোমার অভিযানে শরীক হতে পারবো না ভয় করছ?'

'ভয় করছি না। সব ব্যাপারে আল্লাহর উপর ভরসা করি। তবু ভাবনা তো হয়ই। যাকে নিয়ে যত আশা, যত স্বপ্ন, তাকে নিয়ে তত উদ্বেগ তো হবেই।'

ডোনা তার মুখ আহমদ মুসার কাঁধে জোরে চেপে বলল, 'আল্লাহই আমাকে এ পথে এনেছেন। তিনিই ভরসা।' ভারি হয়ে উঠেছে ডোনার কণ্ঠ।

আহমদ মুসা ডোনার পিঠে সান্ত্বনার হাত বুলিয়ে বলল, 'তুমি প্রস্তুত তো?'

'হ্যাঁ।'

'দু'টো গাড়ি ডাকতে বলেছি। ইনশাআল্লাহ, ক'মিনিটের মধ্যেই আমরা বেরুব।'

'দু'টো গাড়ি কেন?'

'তোমার জন্যে একটা, আমার জন্যে একটা।'

'আমরা ভিন্ন দুই পথে যাব?' ম্লান হয়ে উঠেছে ডোনার মুখ, তার কণ্ঠ শুষ্ক।

'না, পথ আমাদের একটাই। যা তোমাকে বলেছি, পুশকভ থেকে বেরিয়ে দক্ষিণমুখী রোড ধরে 'ওরসা'। 'ওরসা' থেকে পূর্বমুখী রোড ধরে সোজা মস্কো।'

'সেটা জানি, কিন্তু তাহলে দুই গাড়ি কেন?'

'অনেক কারণে। এক, আহমদ মুসাকে চিহ্নিত করার জন্যে শত্রুর কাছে আজ এক সহজ অস্ত্র হলো, আহমদ মুসা তার ফরাসী স্ত্রী নিয়ে পথ চলছে। আলাদা চলে শত্রুপক্ষকে বিভ্রান্ত করা। দুই, আমার বিপদ হলেও তোমার বিপদ যেন না আসে। অথবা দু'জন যেন একসাথে বিপদে না পড়ি। তিন, বিপদে যাতে একে অপরকে সাহায্য করার সুযোগ হয়।'

'অবশ্যই, এদিকগুলোর প্রত্যেকটিই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ভিন্ন চলতে গিয়ে আমরা যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই?'

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল। এই সময় দরজায় নক হলো।

পর মুহূর্তেই ঘরে প্রবেশ করল কেলা এলভার খালু মিঃ বরিসভ।

মিঃ বরিসভ পাশের সোফায় বসতে বসতে বলল, 'দু'টো গাড়ি ঠিক হয়েছে, এসে গেছে। একটার পুরুষ, অন্যটার মেয়ে ড্রাইভার।'

আহমদ মুসার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'ধন্যবাদ। মহিলা আরোহীর জন্যে মহিলা ড্রাইভার ভালই হবে। মস্কো পর্যন্ত চুক্তি তো?'

'একজন দক্ষ লোককেই পাঠিয়েছিলাম। যে দু'টো গাড়ি এনেছে, তার ড্রাইভার আমার পরিচিত ও বিশ্বস্ত।'

'ধন্যবাদ জনাব।'

মিঃ বরিসভের ঠোঁটে অল্প এক টুকরো হাসি। চোখে-মুখে কি একটা দ্বিধা ভাব। দ্বিধা ঠেলে বলল অবশেষে, 'আপনারা আমার স্নেহ প্রতিম কেলা এলভার বন্ধু। কিছু না মনে করলে একটা কথা বলি।'

আহমদ মুসা মিঃ বরিসভের দিকে একবার চোখ তুলে চেয়ে বলল, 'অবশ্যই। বলুন।'

'কেলা এলভা গোপন করলেও প্রথম দিনেই আমি আপনাকে চিনতে পেরেছি। আপনি আহমদ মুসা। কারণ, আপনি আসার একদিন আগেই আমাদের অফিসে আপনার ছবি পৌঁছে যায়।'

আহমদ মুসা সামান্যও চমকাল না। বিস্মিতও হলো না। বলল, 'ছবি কার তরফ থেকে পৌঁছে?'

'গ্রেট বিয়ার এবং সরকার-উভয়ের তরফ থেকেই।'

'ছবির সাথে কি নির্দেশ ছিল?'

'সরকারী নির্দেশ, আহমদ মুসাকে দেখা পেলেই সে বিষয়টা সংগে সংগেই থানায় জানানো। আর গ্রেট বিয়ারের নির্দেশ, আহমদ মুসা চিহ্নিত হবার সাথে সাথে একটা টেলিফোন নাম্বারে তা জানিয়ে দিতে হবে।'

কথা শেষ করে একটা ঢোক গিলে আবার বলতে শুরু করল, 'আপনার সামনে এগোনো অত্যন্ত কঠিন হবে। মস্কো ও সেইন্ট পিটার্সবার্গগামী যত পথ আছে, তাতে নিশ্ছিদ্র পাহারা বসানো হয়েছে। প্রত্যেক রেল স্টেশনে প্রত্যেকটা বগি সার্চ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে আপনি যে রুট বেছে নিয়েছেন, তা কিছুটা নিরাপদ হবে। কিন্তু প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে আপনি জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়তে পারেন।'

ডোনার মুখ মলিন হয়ে গেছে।

আহমদ মুসা নির্বিকার। বলল, 'ধন্যবাদ জনাব, এই ইনফরমেশনের জন্যে।'

আহমদ মুসা থামতেই মিঃ বরিসভ বলল, 'আপনাদের দু'জনের আলাদা যাওয়ার সিদ্ধান্ত খুবই চমৎকার হয়েছে। হতে পারে, এই একটা কারণে আপনি নিরাপদে মস্কো পৌঁছে যাবেন।'

‘এতটা নিশ্চিতভাবে বলছেন কিভাবে?’

‘আহমদ মুসা তার ফরাসী স্ত্রীসহ সফর করছে, এই খবর সব জায়গায় এসেছে। সব পাহারাদারদের চিন্তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই বিষয়টির দিকেই ঘুরপাক খাবে।’

‘আপনার চিন্তা সত্য হোক।’ সহাস্যে বলল আহমদ মুসা।

‘তবে আপনাদের কিছু ছদ্মবেশ নেয়া প্রয়োজন।’

‘কি ধরনের?’

‘আপনি ফরাসী ট্যুরিস্ট অ্যাক্রোবেটদের ছদ্মবেশ নিতে পারেন। মস্কোয় কয়েকটা থিয়েটারে এখন যাত্রা চলছে। মনে হবে, আপনি সেখানে যাচ্ছেন। আপনার স্লিম শরীরে অ্যাক্রোবেট ছদ্মবেশ মানাবে ভালো।’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘ধন্যবাদ। কিন্তু পাবো কোথায় ঐ পোশাক?’

হাসল বরিসভও। বলল, ‘আমি জোগাড় করে রেখেছি।’

‘আমি কৃতজ্ঞ। এতটা স্নেহের চোখে দেখছেন আপনি আমাদের।’ ভারি কণ্ঠ আহমদ মুসার।

‘আমারও স্বার্থ আছে বৎস।’

‘কি সেটা?’

‘কেলা এলভা লিখেছে, সে যদি আপনার সাহায্য পায়, সে নিশ্চিত, তার স্বামীর সন্ধান সে করতে পারবে। আমিও এটা মনে করি।’

আহমদ মুসা একটু ভাবল। বলল, ‘বলুন তো, কেলা এলভার স্বামীকে রুশরা কেন আটক করে রাখবে?’

‘আমি ঠিক জানি না। তবে আমার অনুমান হয়, কেলা এলভার স্বামী অত্যন্ত প্রতিভাবান গোয়েন্দা অফিসার লেনার্ট লার এস্টোনিয়ার আত্মরক্ষার সাথে জড়িত রাজনৈতিক ও সামরিক বহু কিছুই জানেন। তাছাড়া পশ্চিমী গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের অনেক কিছুই সে জানত, যার সাথে রাশিয়ার স্বার্থও জড়িত থাকতে পারে।’

‘বুঝেছি।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ধন্যবাদ!’ বলে বরিসভ পোশাক আনার জন্যে বেরিয়ে গেল।

নিখুঁত একজন অ্যাক্রোবেটের পোশাকে আহমদ মুসা তার গাড়ির দিকে এগোলো।

ডোনা তার পাশাপাশি চলতে চলতে বলল, 'শেষ নির্দেশ কি আমার জন্যে?'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'একাই তোমাকে মস্কো পৌঁছতে হবে, এভাবে মন তৈরি করে রাখ। আমার কথা ভেব না। তেমন কিছু যদি ঘটেই যায়, আমি তোমাকে খুঁজে নেব। ফি আমানিল্লাহ।'

বলে আহমদ মুসা তার গাড়িতে উঠে বসল।

ডোনার গাড়ি আরেকটু সামনে।

'ফি আমানিল্লাহ' বলে ডোনাও কয়েক পা হেঁটে গিয়ে তার গাড়িতে উঠল। ডোনার গাড়ি আগে। আহমদ মুসার গাড়ি পেছনে। দুই গাড়ি একই সাথে স্টার্ট নিয়ে যাত্রা শুরু করল।

গাড়িতে উঠেই আহমদ মুসা গাড়ির মস্কো পর্যন্ত ভাড়া বাবদ পাঁচ হাজার রুবল বুঝিয়ে দিল ড্রাইভারকে।

ড্রাইভার ভাড়ার চেয়ে আড়াই হাজার রুবল বেশি পেয়ে একটা লম্বা স্যালুট করল আহমদ মুসাকে।

'রাস্তায় কখন কি ঘটে বলা যায় না তো, তাই ভাড়াটা আগেই দিয়ে দিলাম।' ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বলল আহমদ মুসা।

'আপনার অনুগ্রহ স্যার।' আবার স্যালুট করে বলল ড্রাইভার।

ছুটে চলছে দু'টি গাড়ি ওরসার উদ্দেশ্যে। ডোনার গাড়ি ও আহমদ মুসার গাড়ির মধ্যে দূরত্ব সিকি মাইলের মত।

আহমদ মুসা সিটে হেলান দিয়ে ভাবছিল তার মিশনের কথা। কোথায় রেখেছে ওরা ক্যাথারিনকে? কোথায় রেখেছে ডোনার আব্বা মিঃ প্লাতিনিকে! নিশ্চয় সে জায়গা এতটাই নিরাপদ, যেখানে সরকারেরও চোখ পড়বে না বা সরকার তা খুঁজে পাবে না। আহমদ মুসা কিভাবে তার সন্ধান করবে। সবচেয়ে সহজ পথ ওদের হাতে পড়া, তাহলেই জানা যাবে ক্যাথারিন কোথায়। কিন্তু সে

মস্কো পৌঁছে সবটা বুঝে নেয়ার আগে এত তাড়াতাড়ি ওদের হাতে পড়তে চায় না।

নড়েচড়ে বসল আহমদ মুসা।

মনে পড়ল ডোনার কথা। ঠোঁটে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল আহমদ মুসার। বেচারী খুব মনমরা হয়ে পড়েছে। এটাই প্রথম তার বড় ধরনের একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়া। ডোনার বিদায়কালীন শুকনো ঠোঁট এবং নরম হয়ে ওঠা দৃষ্টির কথা মনে পড়তেই আহমদ মুসার মনও খারাপ হয়ে গেল। সংগে সংগেই তার মন থেকে প্রার্থনার বাণী উচ্চারিত হলো, আল্লাহ তার সহায় হোন। তার সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহ রক্ষা করুন।

আহমদ মুসা হাতঘড়ির দিকে চেয়ে ড্রাইভারকে উদ্দেশ্য করে বলল, ''ওরসা' খুব সামনেই না?'

'জ্বি, হ্যাঁ। আর দু'মাইল।'

'দেখো, আগের মতই কোন চেকপোস্ট থাকলে আমার স্ত্রীর গাড়ি তা ক্রস না করা পর্যন্ত তুমি চেকপোস্টের মুখোমুখি হবে না।'

'মনে আছে স্যার।'

আহমদ মুসা আবার গা এলিয়ে দিল গাড়ির সিটে।

ওরসার উপকণ্ঠ।

রাস্তার একটা তেমাথা।

পুশকভ থেকে যে রাস্তাটা এসেছে তা সোজা দক্ষিণে এগিয়ে শহরে ঢুকে গেছে। আর এখান থেকেই আরেকটা রাস্তা বেরিয়ে এগিয়ে গেছে পশ্চিমে।

তেমাথার উত্তর পাশে পুশকভ রোডের পশ্চিম পাশ ঘেঁষে একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। স্টোরের সামনে প্রায় রাস্তার উপর একটা জীপ এবং একটা ছোট মাইক্রো দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার দু'পাশে দু'জন স্টেনগানধারী। জীপের

উপর হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন। একজনের হাতে লম্বা অ্যান্টেনার ওয়্যারলেস।

পুশকভ হাইওয়ে দিয়ে ওরসা অভিমুখে একটা ট্যাক্সি আসতে দেখে দু'জন স্টেনগানধারী স্টেনগান তুলে সতর্ক হয়ে দাঁড়াল। ওয়্যারলেসধারীসহ যে দু'জন জীপে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, তারা সোজা হয়ে উঠল।

'দেখ জুকভ, গাড়িটার রেজিস্ট্রেশন একেবারে পুশকভের। থামাও গাড়ি। শিকার মিলতে পারে।'

'ইয়েস বস।' বলে জুকভ নামের লোকটি হাত তুলে ঠিক জীপের পাশেই ট্যাক্সিটি দাঁড় করাল।

ওয়্যারলেসধারী গাড়ির ভেতরে উঁকি দিয়ে মুখ তেতো করে বিড় বিড় করে বলল, 'দুর্ভাগ্য, একজন মাত্র ভদ্রমহিলা। আমরা তো খুঁজছি একটা সুন্দর জোড়াকে।' তারপর ওয়্যারলেস মুখের কাছে এনে কণ্ঠ উঁচু করে বলল, 'মস্কো জিবি এইচ কিউ স্যার?'

ওপার থেকে যান্ত্রিক কণ্ঠে জবাব এল, 'হ্যাঁ।'

'আমি ওরসা থেকে বলছি স্যার।'

'কি খবর?'

'একটা ট্যাক্সি। একজন ফরাসী ট্যুরিস্ট মহিলা। রুশ মহিলা ড্রাইভার।'

'দেবার আর খবর পেলে না। এক ফরাসী মহিলা দিয়ে কি করব? আমরা চাই জোড়া। ছেড়ে দাও।'

'জ্বি, স্যার।'

বলে ওয়্যারলেস অফ করে দিয়ে জুকভকে ট্যাক্সির সামনে থেকে সরে যাবার ইংগিত করে বলল, 'ক্লিয়ার।'

'ক্লিয়ার' বলার সাথে সাথে ট্যাক্সিতে বসা ফরাসী ট্যুরিস্ট মহিলাবেশী ডোনা জোসেফাইন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। সেই সাথে আবার বুঝল, পৃথকভাবে চলার আহমদ মুসার সিদ্ধান্ত কত সঠিক হয়েছে।

চেকপোস্ট পেরিয়ে গাড়ি ফুলস্পীডে উঠার পর ডোনা ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বলল, 'মিস রোসা, তোমার রিয়ারভিউতে পেছনের গাড়ি দেখা যায়?'

'জ্বি, না।' বলল ড্রাইভার।

'তাহলে নিশ্চয় গাড়ির গতি স্লো করেছে। তা না হলে যতক্ষণ আমাদের সময় গেছে, এখানে তাতে গাড়ি দেখা যাবার কথা।'

'তা-ই হবে।'

ডোনার গাড়ি তখন ওরসা শহরের বুক চিরে তীব্র বেগে এগোচ্ছে মস্কো হাইওয়েতে ওঠার জন্যে।

এদিকে পেছনের চেকপোস্টে তখন ভিন্ন এক দৃশ্য।

ফরাসী অ্যাক্রোবেটের ছদ্মবেশধারী আহমদ মুসার ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে চেকপোস্টে জীপের পাশে রাস্তার উপর। ট্যাক্সির দু'পাশে দুই স্টেনগানধারী। সামনে সেই জুকভ হাত তুলে দাঁড়িয়ে ট্যাক্সিটিকে থামিয়ে রেখেছে। আর ওয়্যারলেসধারী ম্যালেনকভ কথা বলছে ওয়্যারলেসে।

'ইয়েস স্যার। একজন আরোহী। ফরাসী অ্যাক্রোবেটের পোশাকে। তবে তাকে ফরাসী মনে হয় না।'

'কি মনে হয়?'

'এশিয়ান ধরনের।'

'কি বললে? এশিয়ান?'

'হ্যাঁ।'

'এই যে একটা মেয়েকে ছেড়ে দিলে সে ফরাসী ছিল না?'

'হ্যাঁ, ফরাসী।'

'হ্যাঁ, মিলে যাচ্ছে। পর পর, আগে এবং পিছে। শোনো।' উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ওয়্যারলেসের ওপার থেকে।

সোজা হয়ে দাঁড়ালো ওয়্যারলেসধারী ম্যালেনকভ। বলল, 'ইয়েস স্যার।'

'অ্যাক্রোবেটকে পাকড়াও করো। আর দেখ, গোঁফটা নকল কিনা। মিলাও আহমদ মুসার ছবির সাথে।'

শোনার সাথে সাথে হুংকার দিয়ে উঠল ম্যালেনকভ। চিৎকার করে উঠল, 'বেরিয়ে এসো অ্যাক্রোবেট।'

বলে নিজেই গাড়ির দরজা খুলে হাত ধরে টেনে নামাল আহমদ মুসাকে। লাল ধরনের লম্বা গোঁফে মারল এক টান। খসে গেল নকল গোঁফ। চিৎকার করে উঠল আবার ম্যালেনকভ, 'এই তো আহমদ মুসা। মিলে যাচ্ছে ছবির সাথে।'

দু'জন স্টেনগানধারী ছুটে এসে আহমদ মুসার দু'পাশে দাঁড়াল। আহমদ মুসার দুই পাঁজরে স্টেনগানের দুই নল। আরও দু'জন স্টেনগানধারী নেমে এসেছে মাইক্রো থেকে।

ওয়্যারলেসে মুখ লাগিয়ে ম্যালেনকভ তখন চিৎকার করছে, 'হ্যাঁ স্যার, জ্বি স্যার, আহমদ মুসাই। একেবারে ছবির সাথে মিলে গেছে।'

'শোন, চিৎকার করো না। মাথা ঠাণ্ডা কর। তোমার জীপটা এখনি পাঠিয়ে দাও সেই ফরাসী মহিলার সন্ধানে। ঐ মহিলাই আহমদ মুসার স্ত্রী। তাকে যে কোন মূল্যে পাকড়াও করতেই হবে। জীপের ড্রাইভারের সাথে যাবে জুকভ এবং দুই স্টেনগানধারী। আর তুমি আহমদ মুসাকে মাইক্রোবাসে তোল। তার দু'পাশে দু'জন স্টেনগানধারীকে বসাও। তুমি আহমদ মুসার পেছনে বসো তোমার রিভলভার তার মাথায় ঠেকিয়ে। দেখ, অন্যথা না হয়। যত দ্রুত সম্ভব চলে এস মস্কোতে। তোমাদের এগিয়ে নেবার জন্যে আমরাও এগোচ্ছি। পথেই দেখা হয়ে যাবে। খুব সাবধান।' বলল মস্কো থেকে।

'জ্বি স্যার। অবশ্যই স্যার।' বলে ম্যালেনকভ ওয়্যারলেস অফ করে দিয়ে চিৎকার করে উঠল জুকভের দিকে চেয়ে, 'তুমি, মেদভ ও শেখভ জীপ নিয়ে এখনি ছোটো যে ফরাসী মহিলা গেল তাকে ধরার জন্যে। যেখানে পাও, যেভাবেই পার, তাকে ধরতেই হবে।'

বলেই জীপের ড্রাইভারের দিকে চেয়ে খেঁকিয়ে উঠল, 'হা করে কি দেখছ। এখনও জীপে স্টার্ট দাওনি কেন?'

ড্রাইভার চমকে উঠে জীপে স্টার্ট দিল। জুকভ লাফ দিয়ে ড্রাইভারের পাশের সিটে উঠল। আর দু'জন স্টেনগানধারী মেদভ ও শেখভ জীপের পেছনে উঠে বসল।

জীপ লাফ দিয়ে স্টার্ট নিয়ে ছুটে চলল তীর বেগে ডোনা জোসেফাইনের ট্যাক্সির উদ্দেশ্যে।

জীপ চলে যেতেই ম্যালেনকভ চিৎকার করে বলল, ‘জোসেফ, নিকো, তোমরা মেহমানের পকেট সার্চ করো। তারপর নিয়ে তোল মাইক্রোতে।’

দুই স্টেনগানধারীর নাম জোসেফ ও নিকো। তাদের একজন পকেট সার্চ করল আহমদ মুসার। পেল একটা রিভলভার।

ম্যালেনকভ জোসেফের কাছ থেকে রিভলভারটি নিতে নিতে আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে সোৎসাহে বলল, ‘তুমি আহমদ মুসা নও, কোন যুক্তি প্রমাণ আছে তোমার কাছে?’

‘আমার কিছুই বলার নেই।’ বলল আহমদ মুসা নির্বিকার কণ্ঠে।

‘জান তো, তোমাকে যেতে হচ্ছে মস্কোতে আমাদের সাথে?’

‘জানি।’

‘কি ব্যাপার, মনে হচ্ছে তোমার কিছুই হয়নি, তুমি বুঝতে পারছ তো সব কিছু?’

‘হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। তোমার আনন্দে আমার খুব আনন্দ লাগছে।’

‘কেন?’

‘আহমদ মুসাকে ধরার জন্যে বড় রকম পুরষ্কার পাবে তুমি।’

‘পুরষ্কারের কথা জানি না। দেশের জন্যে কাজ করছি। আমাদের রাজত্ব এলে বড় দায়িত্ব অবশ্যই পাব।’

‘তোমাদের রাজত্ব কত দূরে?’

‘তোমাকে হাতে পাওয়া মানেই তো রাজত্ব পাওয়া।’

‘এই জন্যেই এত আনন্দ?’

‘অবশ্যই।’ বলে ম্যালেনকভ স্টেনগানধারী দু’জনকে নির্দেশ দিল আহমদ মুসাকে মাইক্রোতে তুলতে।

জোসেফ ও নিকো দু’জনে স্টেনগানের ব্যারেল দিয়ে ঠেলে আহমদ মুসাকে মাইক্রোতে তুলল। আহমদ মুসাকে মধ্যের সিটে বসিয়ে দু’পাশের সিটে দু’জন বসল আহমদ মুসার দিকে স্টেনগান তাক করে। আহমদ মুসার ঠিক পেছনের সিটে এসে বসল ম্যালেনকভ। তার হাতে রিভলভার। তাক করা আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা মনে মনে প্রশংসাই করল ওদের, সতর্কতার মধ্যে ওদের কোন ক্রটি নেই।

ড্রাইভার বসেই ছিল তার সিটে। ম্যালেনকভ এসে বসার সাথে সাথে গাড়ি স্টার্ট দিল ড্রাইভার।

'মস্কোতে আমাকে কোথায় নেবে তোমরা, জেলখানায়?' আহমদ মুসা মাথা ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল ম্যালেনকভকে।

'জেলখানায় কেন? আমরা কি সরকারের চাকর নাকি? বললাম না, আমাদের রাজত্বের জন্যে আমরা কাজ করছি।'

'সেটা আবার কোন রাজত্ব?'

'চল, সবই জানতে পারবে।'

'কোথায় যেতে হবে, তোমাদের হেডকোয়ার্টারে?'

'তাইতো যাবে।'

আহমদ মুসা খুশি হলো। তার টার্গেট, গ্রেট বিয়ারের মূল হেডকোয়ার্টার মস্কোতে না সেইন্ট পিটার্সবার্গে তা জানা। সম্ভবত মূল হেডকোয়ার্টারেই গ্রেট বিয়ার তাদের সবচেয়ে মূল্যবান বন্দী প্রিন্সেস ক্যাথারিন ও মিঃ প্লাতিনিকে আটক করে রেখেছে।

আহমদ মুসা একটু চিন্তা করে সরাসরি জিজ্ঞেস করল, 'তুমি প্রিন্সেস ক্যাথারিনকে চেন?'

'চিনব না কেন?' বলল ম্যালেনকভ।

'তাকে নাকি তোমাদের সরকার ক্ষমতায় বসাচ্ছে?'

'ছো...।' বলে হো হো করে হেসে উঠল ম্যালেনকভ। বলল, 'বামন হয়ে চাঁদে হাত। প্রিন্সেস ক্যাথারিনকে পাবে কোথায়?'

'প্রিন্সেস ক্যাথারিন কোথায়?'

'তুমি তো সাংঘাতিক লোক দেখি। কোর্টের মত জেরা শুরু করেছ। আর কোন কথা নয়। চল, সবই জানতে পারবে।'

বলে চুপ করল ম্যালেনকভ। আহমদ মুসা বুঝল, আর কোন কথাই ওর কাছ থেকে বের করা যাবে না। তবে আহমদ মুসা নিশ্চিত হলো, গেলে সে 'সবই

জানতে পারবে' অর্থ ক্যাথারিনের বিষয়ও জানতে পারবে। তার মানে, প্রিন্সেস ক্যাথারিনের বিষয় সেখানে আলোচনা হবে, অথবা প্রিন্সেস ক্যাথারিনকে সে দেখতে পাবে।

বন্দী হওয়ায় যেটুকু উদ্বিগ্ন হয়েছিল আহমদ মুসা, এসব চিন্তা তাকে তার মিশনের ব্যাপারে আশান্বিত করলো। কিন্তু পরক্ষণেই মনটা উদ্বেগে ভরে গেল ডোনা জোসেফাইনের চিন্তায়। শয়তানদের হাতে ও ধরা পড়ে যাবে না তো!

ওরসা শহরের মধ্যে দিয়ে তখন ম্যালেনকভের গাড়ি তীব্র বেগে এগিয়ে চলেছে মস্কোর উদ্দেশ্যে।

ওদিকে আহমদ মুসাকে নিয়ে ম্যালেনকভের গাড়ি ছেড়ে দিতেই সক্রিয় হয়ে উঠল আহমদ মুসার ট্যাক্সির ড্রাইভার।

আহমদ মুসার সিটে আহমদ মুসার ব্যাগ পড়েছিল। ব্যাগটির দিকে চেয়ে ড্রাইভার ভাবল, মস্কো পর্যন্ত ভাড়া সে তো পেয়েই গেছে। সে মস্কো পর্যন্ত বন্দী আহমদ মুসার গাড়ি অনুসরণ করতে পারে। ব্যাগটি যদি ফিরিয়ে দেয়ার সুযোগ হয়, ফিরিয়ে দেবে। না হলে ব্যাগটি ফিরে এসে পৌঁছে দেবে বরিসভকে। কোথায় ওরা আহমদ মুসাকে নিয়ে যাচ্ছে, সেটাও তার জানা হয়ে যাবে। কোন সাহায্য বরিসভ তাকে করতেও পারে।

এই চিন্তার পর আহমদ মুসার ট্যাক্সি ড্রাইভার তার গাড়ি নিয়ে ছুটে চলল ম্যালেনকভের গাড়ি অনুসরণ করে।

দেখা গেল, ট্যাক্সি ড্রাইভারের গাড়ি চলা শুরু করার পর কিছু দূরে রাস্তার পাশে দাঁড়ানো একটা নতুন জীপও ছুটতে শুরু করল। জীপের ড্রাইভিং সিটে একজন তরুণী।

# ৪

সূর্য ডুবে গেছে। সন্ধ্যার অন্ধকার তখনও নামেনি।

অল্প আগে ম্যালেনকভের গাড়ি বিখ্যাত স্মলেনস্ক শহর অতিক্রম করে এসেছে।

গাড়ি প্রবেশ করছে 'দনপর' নদীর ব্রীজে। এখানে সড়ক ও রেলপথ পাশাপাশি। দু'টো ব্রীজও প্রায় গায়ে গায়ে লাগানো। রেলওয়ে ব্রীজে তখন একটি রেলগাড়ি। প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছে।

ম্যালেনকভের গাড়ির মধ্যে থেকেও আহমদ মুসা রেলের শব্দের মধ্যে যেন ডুবে গিয়েছিল।

হঠাৎ গাড়ির নিচে থেকেই আরেকটা প্রচণ্ড শব্দ উঠল। সেই সাথে হঠাৎ দেবে গেল গাড়ির পেছনটা প্রচণ্ড ঝাঁকি দিয়ে।

ঠিক পর মুহূর্তেই গুলির শব্দ। ঝন ঝন করে ভেঙে পড়ল গাড়ির কাঁচের জানালা। আর্তচিৎকার করে উঠল পেছন থেকে ম্যালেনকভের কণ্ঠ।

প্রথম গুলির পরপরই গর্জে উঠেছিল আরেকটা গুলির শব্দ। সেই সাথেই শোনা গেল ড্রাইভারের কণ্ঠে মরণপণ চিৎকার।

ততক্ষণে গাড়ি গিয়ে ব্রীজের প্রবেশ মুখে ব্রীজের রেলিং-এ গিয়ে ধাক্কা খেয়েছে।

আহমদ মুসা প্রথমটায় কিছু বিমূঢ় হয়ে পড়লেও পরক্ষণেই তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, ম্যালেনকভদের গাড়ি আক্রান্ত হয়েছে।

প্রথম গুলির পরেই আহমদ মুসা গাড়ির প্রবল ঝাঁকুনিতে প্রথমে পেছনে, তারপর সামনে ঝুঁকে পড়া বিমূঢ় জোসেফ ও নিকোর মধ্যে নিকোর হাত থেকে নিজের হাতে স্টেনগান তুলে নিয়ে তার পাঁজরে গুঁতো চালিয়ে দু'হাতে স্টেনগানের দু'প্রান্ত ধরে তীব্রভাবে আঘাত করল জোসেফের ঘাড়ে।

দু'জনেই কুঁকড়ে পড়ে গেল সিটের উপর।

আহমদ মুসা স্টেনগান নিয়েই গাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে এল।

আহমদ মুসা দেখেছিল, ম্যালেনকভের গাড়িতে গুলি বর্ষণকারী গাড়িটি একটা জীপ এবং দ্রুত সামনে চলে গিয়েছিল।

আহমদ মুসা গাড়ি থেকে বেরিয়েই সামনে তাকাল। জীপের কোন চিহ্নই দেখল না। তাকাল পেছনে। দেখল, একটি ট্যাক্সি এসে ব্রীজের মুখে দাঁড়াল। দূরত্ব কয়েক গজ মাত্র। তখনও সন্ধ্যার অন্ধকার নামেনি। আহমদ মুসা ট্যাক্সির দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হলো, ওটা তারই ট্যাক্সি, পুশকভ থেকে নিয়ে এসেছিল।

পরক্ষণেই আহমদ মুসা দেখল, ট্যাক্সি থেকে মুখ বাড়িয়ে ট্যাক্সি ড্রাইভার তাকে ডাকছে।

হঠাৎ সন্দেহের এক প্রবল ধাক্কা লাগল আহমদ মুসার মনে। তার ট্যাক্সিটি ম্যালেনকভের গাড়ির পেছনে কেন? ট্যাক্সি ড্রাইভার গ্রেট বিয়ারের লোক নয়তো?

আহমদ মুসা স্টেনগানের ট্রিগারে তর্জনী চেপে দ্রুত এগোলো ট্যাক্সির কাছে। বলল ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে, ‘তুমি এখানে কেন?’

‘স্যার, গাড়িতে উঠুন। সব বলছি। এখান থেকে আগে আমরা পালাই। পুলিশ কিংবা কোন বিপদ এসে পড়তে পারে।’ বলল ড্রাইভার দ্রুত কণ্ঠে।

আহমদ মুসা চকিতে গাড়ির ভেতরটায় চোখ বোলাল, না, গাড়ির সিটে বা ফ্লোরে কেউ লুকিয়ে নেই। আহমদ মুসার ব্যাগটি পড়ে আছে পেছনের সিটে।

আহমদ মুসা স্টেনগান নিয়েই গাড়ির পেছনের সিটে উঠে বসল।

সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ি স্টার্ট দিল ড্রাইভার।

ম্যালেনকভের গাড়িকে পাশ কাটিয়ে দ্রুত সামনে এগোলো ট্যাক্সি।

ব্রীজ পেরিয়ে বেশ কিছুদূর এসে গাড়ির গতি কিছুটা স্লো করে প্রথমেই মুখ খুলল ট্যাক্সি ড্রাইভার। বলল, ‘স্যার, আমাকে ভাড়া দিয়েছেন মস্কো পর্যন্ত। আপনাকে ওরা ধরে নিয়ে গেলে আপনার ব্যাগ রয়ে গেল আমার গাড়িতে। আমি মনে করলাম, মস্কো পর্যন্ত যাওয়া উচিত আপনাকে অনুসরণ করে। আপনাকে না পেলে আপনাকে কোথায় নিয়ে যায় দেখে অন্তত তা আমি রিপোর্ট করতে পারবো মিঃ বরিসভকে। ব্যাগও তাকে দিতে পারবো।’

'ধন্যবাদ ড্রাইভার। তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করছি। অথচ হঠাৎ এখানে দেখে আমি তোমাকে ওদের লোক বলে সন্দেহ করেছিলাম।'

'ওরা কারা স্যার?'

'গ্রেট বিয়ারকে চেন?'

'চিনি স্যার। ওরা রাশিয়ায় ডিক্টেটরশীপ কায়েম করতে চায়।'

'ঠিক বলেছ তুমি। এরা সেই দল।'

ড্রাইভার আর কোন কথা বলল না। কিছুক্ষণ নীরবতা।

আহমদ মুসাই আবার বলল, 'জিজ্ঞেস করলে না আমি কে?'

'স্যার, এত কথা কি ড্রাইভারের জন্যে মানায়?'

'নিছক ড্রাইভার হলে মানায়।'

চকিতে মুখ ঘুরিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল ড্রাইভার। তার আগেই আহমদ মুসা জিজ্ঞেস করল, 'এসব কথা থাক। আসল কথা বল ড্রাইভার। গাড়িতে গুলি করল কে? তুমি কিছু জান?'

'না স্যার। আমি তিনটা গুলির শব্দ শুনেছি। আমি যখন ব্রীজের মুখে এসে দাঁড়ালাম, তখন তো শুধু আপনাকেই দেখলাম। আমার প্রথমে মনে হয়েছিল, বোধ হয় আপনিই ভেতর থেকে গুলি করে বেরিয়ে এসেছেন। কিন্তু চাকায় গুলি দেখে তা আবার মনে হয়নি।'

'একটা গাড়ি থেকে গুলি হয়েছে। গাড়িটা দ্রুত সামনে চলে গেছে।'

'স্যার, গাড়িটা কি জীপ?'

'হ্যাঁ, জীপ।'

'স্যার, গুলির দু'মিনিট আগে একটা নতুন জীপ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে আমাকে ওভারটেক করেছে। হতে পারে ঐ জীপ। কিন্তু জীপটিতে কোন আরোহী ছিল না। মনে হলো, একজন তরুণী জীপটিকে ড্রাইভ করছিল।'

'তরুণী?'

'হ্যাঁ, আমার তা-ই মনে হয়েছে।'

ড্রাইভারের শেষ কথাটায় চিন্তার অথৈ পানিতে পড়ে গেল আহমদ মুসা। এ ধরনের উদ্ধার অভিযান তার স্ত্রী তরুণী ডোনা জোসেফাইনের জন্যে মানায়।

কিন্তু সে নয়। তার ট্যাক্সি অনেক সামনে চলে গেছে। তাছাড়া তাকে ধরার জন্যে তাকে ফলো করছে গ্রেট বিয়ারের জীপ এবং জীপটি নতুন নয়। সুতরাং কোনভাবে ডোনা জীপটি ছিনিয়ে এ অভিযান করেছে, এটাও নয়। ম্যালেনকভের গাড়ির উপর হামলা চালায় তাহলে কে? গ্রেট বিয়ারের তৃতীয় কোন শত্রু? কিংবা রুশ সরকারের কেউ? সন্দেহ নেই, গ্রেট বিয়ারের সাথে লড়াই-এ আহমদ মুসাকে জেতানোর মধ্যে সরকারের লাভ আছে। কারণ, তাতে প্রিন্সেস ক্যাথারিন উদ্ধার হয়ে যায় এবং তার মাধ্যমে সরকার জারের ধনভাণ্ডারও পেয়ে যায়। তাহলে এটা সরকারেরই কাজ। অর্থাৎ সরকারী লোক কি তাহলে তাকে অনুসরণ করছে? মনে মনে খুশি হলো আহমদ মুসা। সরকারী লোক অনুসরণ করলে ডোনা জোসেফাইনের নিরাপত্তাও হয়ে যায়। আহমদ মুসার মন উদ্বিগ্ন গ্রেট বিয়ারের জীপ ডোনার ট্যাক্সিকে অনুসরণ করার পর থেকেই।

আহমদ মুসা বলল, ‘গ্রেট বিয়ারের একটা জীপ আমার স্ত্রীর ট্যাক্সি অনুসরণ করেছে, তা দেখেছ তো?’

‘দেখেছি স্যার, ট্যাক্সির ড্রাইভার রোসা খুব চালাক এবং এক্সপার্ট স্যার। সে নিশ্চয় ব্যাপারটা বুঝবে এবং গ্রেট বিয়ারের জীপকে ঘোল খাইয়ে ছাড়বে স্যার।’

‘তুমি এতটা আশাবাদী কেমন করে?’

‘মিঃ বরিসভ সেভাবেই সিলেক্ট করেছেন স্যার। রোসাকে আমি ভালো করে জানি।’

‘তোমার কথা সত্য হোক ড্রাইভার। আমি এখন আমার স্ত্রীর সন্ধান করতে চাই। তুমি আমাকে কিভাবে সাহায্য করবে? সামনে আর কোন অসুবিধা আছে বলে মনে কর?’

‘মস্কো পর্যন্ত সামনে আর দু’টো বড় শহর আছে। ভাজমা এবং গ্যাগরিন।’

‘আমার তো মনে হয়, গ্রেট বিয়ার তার শিকার পেয়ে গেছে, এ ঘোষণা তাদের সব ক্ষেত্রে পৌঁছে গেছে এবং এ দু’টি শহরে মোতায়েন গ্রেট বিয়ারের

লোকেরা ম্যালেনকভের গাড়ির অপেক্ষা করছে। অন্য কোন দিকে তাদের নজর যাবার কথা নয়।'

'ঠিক বলেছেন স্যার। সামনে কোন অসুবিধা আর হবে না।'

'আল্লাহ তা-ই করুন, তা-ই হোক ড্রাইভার। এস ড্রাইভার, এখন আমরা ভাবি, আমার স্ত্রীর গাড়ি আর সেই জীপটির কথা।'

'মস্কো পৌঁছে রোসার সন্ধান আমি পাব স্যার। উভয়ে মস্কো পৌঁছার পর একটা জায়গায় আমাদের সাক্ষাৎ হবে, এই কথাই আমাদের আছে। অতএব, খবর আমরা পাচ্ছিই।'

'ড্রাইভার, সত্যিই তোমাদের বুদ্ধিতে আমি চমৎকৃত হচ্ছি।'

'ধন্যবাদ স্যার।'

তখন তীব্র বেগে এগিয়ে চলছে আহমদ মুসার গাড়ি। ভাজমা শহর অতিক্রমের সময় গাড়ির গতি স্লো হলো। কিন্তু কেউ গাড়ি আটকাতে এলো না, জিজ্ঞাসাবাদ করল না।

খুশি হলো আহমদ মুসা। তার অনুমান ঠিক।

ভাজমা শহর পার হবার পর আবার আহমদ মুসার গাড়ি তীব্র গতিতে ছুটল মস্কোর উদ্দেশ্যে।

আহমদ মুসা তার সিটে গা এলিয়ে দিয়েছে। তার শূন্য দৃষ্টি বাইরে সন্ধ্যার আলো-আঁধারীর বুকে নিবদ্ধ।

তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে ডোনা জোসেফাইনের অতুলনীয় সুন্দর নিষ্পাপ মুখটি। এ মুখটি ঘিরেই আহমদ মুসার আজ নতুন স্বপ্ন, নতুন জীবন। জীবনে অনেক স্বপ্নই আহমদ মুসার ভেঙে গেছে। তাই যেন উদ্বেগের অপ্রতিরোধ্য এক যন্ত্রণা তার হৃদয়কে আজ দুমড়ে-মুচড়ে দিতে চাচ্ছে।

সিটে হেলান দেয়া আহমদ মুসার চোখ দু'টি আস্তে আস্তে বুজে গেল। তার মুখ থেকে সাহসের এক প্রার্থনা বেরিয়ে এল, 'হাসবুনাল্লাহ, ওয়া নেয়মাল ওয়াকিল, নেয়মাল মাওলা ওয়া নেয়মান নাসির।'

ড্রাইভার রোসা উদ্বিগ্ন চোখে বার বার রিয়ারভিউ-এর দিকে তাকাচ্ছে।

হঠাৎ সে গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল। স্পীডোমিটারের কাঁটা সত্তর কিলোমিটার থেকে লাফিয়ে উঠল একশ' দশে।

'কি ব্যাপার মিস রোসা, হঠাৎ গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিলেন যে!'

'ওরসায় যে জীপটা আমাদের গতিরোধ করেছিল, সেই জীপটা আমাদের দিকে ছুটে আসছে।'

'সেই জীপটা? চিনতে পেরেছেন?'

'আমার সন্দেহ নেই, সেই জীপটাই।'

'আমাদের লক্ষ্যে ছুটে আসছে কি করে বোঝা গেল?' ডোনা জোসেফাইনের কণ্ঠে কিছুটা উদ্বেগ।

'এই যে আমি গাড়ির গতি বাড়ালাম, সঙ্গে সঙ্গে জীপটির গতিও বেড়ে গেছে।'

'এর অর্থ কি মিস রোসা?'

'আপনি কি মনে করছেন ম্যাডাম?'

'আমাদের দিকে ছুটে আসার অর্থ আমাকে সন্দেহ করেছে বা আমার পরিচয় জেনেছে। আর এর অর্থ, আমার স্বামীর পরিচয় ওদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়েছে এবং সম্ভবত উনি ওদের হাতে পড়েছেন।' বলতে গিয়ে গলা কাঁপল ডোনা জোসেফাইনের।

'আমারও তাই মনে হচ্ছে ম্যাডাম।'

বলে একটু থেমেই রোসা আবার বলল, 'বলুন, এখন কি করণীয়?'

আহমদ মুসার চিন্তায় ডোনা জোসেফাইনের হৃদয় কেঁপে উঠেছিল। আহমদ মুসা ওদের হাতে পড়ার কথা ভাবতেই শ্বাসরুদ্ধ একটা যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়েছিল তার গোটা হৃদয়জুড়ে।

কিন্তু ঠোঁট কামড়ে নিজেকে সম্বরণ করল ডোনা জোসেফাইন। একটু সময় নিয়ে নিজেকে স্বাভাবিক করে তুলে রোসার প্রশ্নের জবাবে ডোনা জোসেফাইন বলল, 'আমার স্বামী ওদের হাতে পড়ার পর এই খবর নিশ্চয় তারা

সব জায়গায় দিয়েছে। সুতরাং পাহারা তুলে নেয়াই স্বাভাবিক। আর যদি আমার কথা ওদের জানিয়ে থাকে, তাহলে পাহারা থাকবে।'

বলে একটু থামল। তারপর আবার শুরু করল, 'দ্বিতীয়টি যদি সত্য হয়, তাহলে সমস্যা দেখা দেবে। এক্ষেত্রে আমার পরামর্শ হলো, কোন অবস্থাতেই আমরা গাড়ি দাঁড় করাবো না। গাড়ি দাঁড়ানোর ভান করে, সঙ্গে সঙ্গেই আবার লাফ দিয়ে পালাতে হবে। যাতে তারা আমাদের গাড়িতে গুলি করার মত সময় হাতে না পায়। পারবেন না মিস রোসা? ভয় করলে অনুরোধ করব ড্রাইভিংটা আমাকে দিতে।'

রোসার মুখে হাসি ফুটে উঠলো। বলল, 'পালানোর ট্রেনিং ড্রাইভারদের একটা বেসিক ট্রেনিং। দেখুন আমি কতটা পারি।'

'ধন্যবাদ। আমি আপনাকে আরেকটু সাহায্য করব। আমি এস্টোনীয় যুবকের পোশাক নিচ্ছি। দেখা যাবে, আমাদের কেউ সন্দেহ করছে না।'

'সুন্দর আইডিয়া।' বলল হেসে রোসা।

ডোনা এস্টোনীয় যুবকের পোশাক পরল। মাথায় চুল ও মুখে স্কিন প্লাস্টিকের মুখোশ লাগানোর পর স্বয়ং রোসা চিৎকার করে উঠল, 'মনে হয় ম্যাডাম, আপনার স্বামী দেখলেও এস্টোনীয় যুবক ভেবে আপনার সাথে হ্যান্ডশেক করবে।'

'ধন্যবাদ মিস রোসা।'

রোসার কথাই ঠিক। ভাজমা শহরের প্রবেশমুখে গ্রেট বিয়ারের পাহারা ছিল। কিন্তু গাড়ির ভেতরে একবার তাকিয়েই গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। গাড়ি তারপর তীর বেগে ছুটেছে আবার। পেছনের জীপটা প্রায় কোয়ার্টার মাইলের মত পিছিয়ে পড়েছিল। পুরানো জীপ নতুন ট্যাক্সির সাথে পারছিল না। কিন্তু ডোনা জোসেফাইনের গাড়ি ভাজমা থামায় জীপটা প্রায় দেড়শ' গজের মধ্যে এসে পড়েছিল। সেখান থেকে অবশ্য চিৎকার করে কিছু বলে বাঁধা দেয়ার পর্যায়ে জীপটি ছিল না

ভাজমা পার হয়ে এসে কিছু রিল্যাক্সড হয়ে রোসা বলল, 'সামনে গ্যাগরিন, একটা শহর, তারপরেই মস্কো।

‘বোঝা গেল, গ্যাগরিনেও পাহারা থাকবে।’ বলল ডোনা জোসেফাইন।

‘গ্যাগরিনকে পাশ কাটাবার মত ডান বাম দু’দিকেই বাইপাস সড়ক আছে। যদি বলেন আমরা বাইপাস রুট নিতে পারি।’

‘পেছনে শত্রুর তাড়া রেখে সাইডে অপ্রশস্ত রোডে ঢোকা ঠিক হবে না।’

‘ঠিক বলেছেন।’

বলে রোসা পেছনে তাকিয়ে গাড়ির স্পীড আবার বাড়িয়ে দিল।

পেছনের জীপ আপ্রাণ চেষ্টা করছে ডোনা জোসেফাইনের জীপ ধরার জন্যে। কিন্তু গতির শক্তিতে কুলিয়ে উঠতে পারছে না।

সামনের স্কাই লাইনে গ্যাগরিন শহরের আলোকমালা সজ্জিত দৃশ্য খুব সামনে এসে গেছে।

হঠাৎ আঁৎকে উঠল রোসা, ‘দেখুন, আসার রাস্তা বাদ দিয়ে তাদের যাওয়ার রাস্তা ধরে চারটি হেডলাইট ছুটে আসছে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে।’

কথাটা রোসা ডোনা জোসেফাইনকে বলতেই ডোনা চিৎকার করে উঠল, ‘নিশ্চয় ওগুলো শত্রুর গাড়ি। সামনে থেকে আমাদের ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছে।’

‘তাহলে বলুন ম্যাডাম, সামনেই ফ্লাইওভার আছে ডাইনের বাইপাসে যাবার।’ চিৎকার করে বলল রোসা।

‘তা-ই কর রোসা।’ দ্রুত বলল ডোনা জোসেফাইন।

ফ্লাইওভারটি তখন বলা যায় নাকের উপর। এক্সপার্ট ড্রাইভার রোসা বোঁ করে ঘুরিয়ে গাড়িকে তুলে আনল ফ্লাইওভারে।

ফ্লাইওভার থেকে ডোনার গাড়ি গিয়ে পড়ল ডাইনের বাইপাস সড়কে।

সড়কটি গ্যাগরিন শহর পাশে রেখে কয়েকটি লোকালয় স্পর্শ করে এগিয়ে গেছে মস্কোর দিকে।

বাইপাস সড়ক ধরে তীব্র বেগে ছুটে চলল ডোনা জোসেফাইনের গাড়ি।

‘মিস রোসা, পেছনে ছয়টি হেডলাইট মানে তিনটি গাড়ি আমাদের পিছু নিয়েছে।’

‘পেছনেরটি জীপ। সামনের দু’টিই মাইক্রো। সুতরাং স্পীডের দিক দিয়ে আমরা এখনও সুবিধাজনক অবস্থায় আছি।’ রোসা বলল।

‘আলহামদুলিল্লাহ।’ বলল ডোনা জোসেফাইন।

‘কি বললেন ওটা ম্যাডাম?’

‘ওটা একটা প্রার্থনা।’

‘আপনারা খুব ঈশ্বর মানেন, তাই না?’

‘সৃষ্টি করেছেন, তাই স্রষ্টাকে তো মানতেই হবে।’

‘না মানলে?’

‘না মানলে স্রষ্টার কোন ক্ষতি নেই, ক্ষতি নিজের।’

‘কেমন?’

‘কি কি করলে মানুষ, সমাজ, রাষ্ট্র সুস্থ থাকবে, সুশৃঙ্খল থাকবে, শান্তিতে থাকবে, সেগুলোই স্রষ্টা মানুষকে করতে বলেছেন। এগুলো করলে মানুষ এবং তার পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রেরই লাভ। না করলে ক্ষতি আকারে আসবে অসুস্থতা, বিশৃঙ্খলা এবং অশান্তি।’

‘অবাক কথা শোনালেন আপনি। ঈশ্বরের দেয়া কাজগুলোর কথা বললেন, সেগুলো তো রাষ্ট্রের সংবিধান এবং আইনের কাজ। কোন ধর্ম এসব বলে নাকি!’

‘বিশ্বে মানুষের জীবন ও চাহিদা সব সময় এক রকম ছিল না, তাই খোদায়ী ধর্মের ব্যবহারিক বিধান সব সময় এক রকম হয়নি। মানুষের জন্যে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত যে ধর্ম আল্লাহ দিয়েছেন, তাতে মানুষের জীবন পরিচালনার পূর্ণ দিকনির্দেশনা রয়েছে।’

‘সে ধর্ম কোনটি?’

‘ইসলাম।’

‘ও, মুসলমানদের ধর্ম।’

‘না, ইসলাম মুসলমানদের ধর্ম নয়। ইসলাম মানুষের ধর্ম। যখন মানুষ ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে গ্রহণ করে, তখন তাকে বলা হয় মুসলমান। ‘মুসলমান’ অর্থ শান্তির পথ গ্রহণকারী, আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণকারী ইত্যাদি।’

‘মানুষের জীবন পরিচালনার পূর্ণ দিকনির্দেশনা অন্য কোন ধর্মে নেই? যেমন, আমাদের খৃস্টান ধর্ম।’

‘নেই।’

‘কারণ কি? কারণ কি এটাই যে, যা আপনি বললেন, মানুষের জীবন ও চাহিদার সে রকম দাবি ছিল না?’

‘হ্যাঁ, তা-ই।’

‘বিষয়টা আরও পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন।’

‘যেমন, বৈঠায় যখন প্রয়োজন পূরণ হয়েছে, তখন পাল আসেনি। যখন পালে প্রয়োজন চলেছে, তখন ইঞ্জিন আসেনি। যখন ইঞ্জিনের নৌকা বা ইঞ্জিনের গাড়িতে প্রয়োজন শেষ হয়েছে, তখন উড়োজাহাজ হয়নি, ইত্যাদি। আরেকটা উদাহরণ দেয়া যায়। রাষ্ট্রের সংবিধান ও আইন প্রয়োজনের তাগিদেই ক্রমপরিবর্তনের মাধ্যমে পূর্ণতার দিকে চলে। খোদায়ী ধর্মের ব্যবহারিক বিধানের ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছে।’

‘ধন্যবাদ। বুঝলাম আমি। এর দ্বারা কিন্তু আরেকটা জিনিস প্রমাণ হয়ে যায়, আগের খোদায়ী ধর্মগুলো বাতিল, সর্বশেষ খোদায়ী ধর্মটাই শুধু অনুসরণযোগ্য। সত্যিই কি তাই?’

‘ধন্যবাদ। ঠিক বুঝেছেন আপনি।’

‘এটা কিন্তু খুব বড় কথা। আগের ধর্মগুলো এটা মানবে না।’

‘মানছে না বলেই তো সমস্যা। তা না হলে গোটা পৃথিবীতে আজ শান্তির রাজত্ব কায়েম হয়ে যেত।’

‘আমি ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝেছি। আমি মনে করি, এই স্বাভাবিক, সংগত ও যৌক্তিক বিষয়টি সকলেরই মানা উচিত।’

বলে একটু থেমে একটা ঢোক গিলেই আবার বলল, ‘ম্যাডাম, আপনি ফরাসী। শুধু তা-ই নয়, আরও যেটুকু শুনেছি, আপনি ফ্রান্সের মহামান্যা রাজকুমারী এবং অবশ্যই খৃস্টান ছিলেন। আপনি ইসলামের বিষয় এত গভীরভাবে জানলেন কি করে এবং বুঝতে পারলেন কি করে?’

রোসার মুখে নিজের পরিচয় শুনে চমকে উঠল ডোনা জোসেফাইন। মিঃ বরিসভ দায়িত্বের কারণে জেনেছেন। কিন্তু ট্যাক্সি ড্রাইভার রোসার তো জানার

কথা নয়। জানলো কি করে? মিঃ বরিসভ তো এসব কথা ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বলে দেবার কথা নয়।

ডোনা জোসেফাইন উত্তর দিতে একটু সময় নিল। কিন্তু তার মনের কৌতুহলটা চেপে গিয়ে রোসার প্রশ্নের উত্তরে বলল, 'আমি ইসলাম শিখেছি আমার স্বামীকে দেখে, তার কাছে শুনে এবং পড়াশোনা করে।'

'ম্যাডাম, আপনি কিন্তু সুন্দর বলতে পারেন। আমি ইসলাম সম্পর্কে পড়িওনি, তেমন কিছু শুনিওনি। কিন্তু আপনার কাছ থেকে এতটুকু শুনে আমার মনে হচ্ছে, আমার সব শোনা শেষ। আমি ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছি। ইসলাম গ্রহণ করতে হলে কি করতে হয়?'

'আলহামদুলিল্লাহ!' বলে ডোনা জোসেফাইন বিষয়টা রোসাকে বুঝিয়ে দিল।

'বাহ, চমৎকার। খুব সোজা। একটা ঘোষণা মাত্র।'

তাদের এই আলোচনা আরও চলল।

রোসা আলোচনায় শরীক থাকলেও তার চোখ সামনের রাস্তা ও রিয়ারভিউ থেকে মুহূর্তের জন্যেও বিচ্ছিন্ন হয়নি।

মস্কো আর বেশি দূরে নয়।

মস্কোর উজ্জ্বল স্কাইলাইন চোখে লাগছে।

বাইপাস সড়কটি এখন আর বাইপাস সড়ক নেই, প্রসারতার দিক দিয়ে হাইওয়ের রূপ নিয়েছে। যাওয়ার সড়কটিতে চারটি লেন। মাঝখানে প্রশস্ত ডিভাইডার। ওপারে আসার সড়কেও চারটি লেইন।

পেছন থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে ডোনা জোসেফাইন রোসাকে লক্ষ্য করে বলল, 'একটা ব্যাপার মিস রোসা, পেছনের পিছু নেয়া তিনটি গাড়ি ইতোপূর্বে সচেষ্ট ছিল আমাদের ধরার জন্যে। কিন্তু এখন সে চেষ্টা তাদের দেখছি না। ওরা একই গতিতে আমাদের পেছনে ছুটে আসছে।'

'ইয়েস ম্যাডাম, আমিও এটা লক্ষ্য করেছি। বুঝতে পারছি না, এদের এই মত পরিবর্তন কেন?'

সঙ্গে সঙ্গে কথা বলল না ডোনা জোসেফাইন। চিন্তা করছিল সে। এক পর্যায়ে ডোনা জোসেফাইনের চোখে-মুখে চাঞ্চল্য দেখা দিল। সে দ্রুত কণ্ঠে বলল, 'রোসা, তাহলে কি ওরা নিশ্চিত হয়েছে যে, আমাদের ধরার জন্যে ওদের ওমন প্রাণপণ ছোটার প্রয়োজন নেই, সামনে থেকে ওদের সাহায্য আসছে? অথবা আমাদের এভাবে তাড়িয়ে নিয়ে কি সামনে কোন ফাঁদে আটকাবার পরিকল্পনা করেছে?'

'আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ম্যাডাম। আপনি ঠিক চিন্তা করেছেন। এ না হলে ওদের মনোভাব পরিবর্তনের আর কোন যুক্তি নেই।'

'তাহলে রোসা? এভাবে চলে ওদের ফাঁদে তো পড়া যাবে না।'

'ম্যাডাম, আমরা যে সড়ক দিয়ে চলছি, সামনে তা বেঁকে গিয়ে উঠেছে লেনিন হাইওয়েতে। ঐ হাইওয়েটি মস্কোভা নদীর পূর্ব পাশ দিয়ে গিয়ে পড়েছে মস্কোর সাদোভায়া রিং রোডে। হতে পারে ঐ হাইওয়ে দিয়েই ওদের কোন সাহায্য আসছে। আমরা বাঁ পাশের কোন এক্সিট রোড (ভিন্ন দিকে বেরুবার পথ) ধরে কমসোমল হাইওয়েতে গিয়ে উঠতে পারি। ঐ হাইওয়েটিও মস্কো স্টেট ইউনিভার্সিটি ও লেনিন হিলস-এর পাশ দিয়ে মস্কোভা নদী অতিক্রম করে গিয়ে পড়েছে সাদোভায়া রিংরোডে।

'মিস রোসা, আপনি ঠিক চিন্তা করেছেন। সবচেয়ে কাছের এক্সিট রোড দিয়ে চলুন আমরা এ রোড থেকে সরে পড়ি।'

'ইয়েস ম্যাডাম।' বলে মাথা নাড়ল রোসা।

একটু সামনে এগিয়েই রোসা যে এক্সিট রোড দিয়ে বামে এগোলো, সেটা অপেক্ষাকৃত একটু উঁচু অধিত্যকার মত এলাকায় উঠে গেছে।

অধিত্যকা ধরে তীব্র বেগে ডোনা জোসেফাইনের গাড়ি এগোচ্ছিল।

উদ্বিগ্ন ডোনা তাকিয়ে ছিল পেছনে। পেছনের শত্রু গাড়িগুলোর দিকে। তাকিয়ে থেকেই চিৎকার করে উঠল ডোনা জোসেফাইন, 'রোসা, আমরা যে সড়কটি ছেড়ে এলাম, সেই সড়ক ধরে উত্তর দিক থেকে ছুটে এল একটা গাড়ি। সেই গাড়ি এবং পেছনের তিনটি গাড়ি এখন ছুটে আসছে এই এক্সিট রোড ধরে।'

‘ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, অল্পের জন্যে আমরা বেঁচে গেছি। দুই দিকের চাপে এতক্ষণ আমাদের চিড়ে-চ্যাপ্টা হতে হতো। সামনের ঐ গাড়িটারই তারা অপেক্ষা করছিল।’

‘এখন তো চারটা গাড়ি ছুটে আসছে পেছন থেকে। আমরা এভাবে কতক্ষণ আত্মরক্ষা করতে পারবো?’

‘সামনে থেকে আসা নতুন গাড়িটা কি গাড়ি মনে হচ্ছে?’

‘সামনের হেড লাইটের অবস্থান এবং পেছনের লাইটের সাথে দূরত্ব দেখে মনে হয়েছে গাড়িটা মাইক্রো।’

‘তবু রক্ষা, রাশিয়ান এ মাইক্রোগুলো তাদের স্পীড দিয়ে অন্তত আমার ট্যাক্সিকে ধরতে পারবে না। আর এই অধিত্যকায় তাদের আরও অসুবিধা হবে।’

কিছু বলল না ডোনা জোসেফাইন। তার দৃষ্টি তখনও পেছনের দিকে নিবদ্ধ।

ডোনা জোসেফাইনের গাড়ি উঠে এল কমসোমল হাইওয়েতে। ছুটে চলল তারপর তীর বেগে।

হাইওয়ের সে জংশনটি চোখের আড়াল হওয়ার আগেই ডোনা জোসেফাইন দেখল, পিছু নেয়া শত্রুর চারটি গাড়িই উঠে এসেছে হাইওয়েতে।

শত্রুর সে গাড়িগুলো বেশ পেছনে থাকলেও দুর্ভাবনা এসে ঘিরে ধরেছে ডোনা জোসেফাইনকে। সে শত্রুর কৌশল বুঝে ফেলেছে। ওয়্যারলেসে যোগাযোগের মাধ্যমে তাদেরকে সামনে ও পেছন থেকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে। হতে পারে দু’পাশ থেকে শত্রু আসতে পারে। ডোনা জোসেফাইন নিশ্চিত, কমসোমল হাইওয়েতে তারা উঠেছে, এটা শত্রুমহলে জানাজানি হয়ে গেছে। নিশ্চয় শত্রু পেছন থেকে যেমন, তেমনি সামনে থেকেও এখন ছুটে আসছে। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল ডোনা জোসেফাইন। সে তো আহমদ মুসা নয়, কিভাবে শত্রুর চতুর্মুখী এ হামলার মোকাবিলা করবে?

গাড়ি তখন ‘লেনিন হিলস’ এলাকায় পৌঁছে গেছে।

ডোনা জোসেফাইন মনস্থির করে রোসার দিকে চেয়ে বলল, ‘রোসা, আর সামনে এগোনো যাবে না। ডানে কিংবা বামে কোনদিকে গাড়ি সরিয়ে নাও।’

‘আর এগোনোই যাবে না ম্যাডাম। চেয়ে দেখুন।’ দ্রুত কণ্ঠে বলল রোসা।

ডোনা জোসেফাইন চমকে উঠে সামনে তাকিয়ে দেখল, সামনেই একটা রোড জংশন, যেখানে ফ্লাইওভারের মুখে হাইওয়ের একাংশ জুড়ে একটা কার এবং একটা জীপ দাঁড়িয়ে আছে আলো নিভিয়ে এদিকে মুখ করে।

কিছু বলতে যাচ্ছিল ডোনা জোসেফাইন। কিন্তু গাড়ির আকস্মিক ঝাঁকুনিতে মুখ থেকে কথা বেরুল না, কাত হয়ে পড়ে গেল সে সিটের উপর।

‘সংকীর্ণ হলেও একটা এক্সিট পেয়ে গেছি। মনে হচ্ছে, সরে পড়ার এটাই শেষ সুযোগ। গাড়ি ঘুরিয়ে নিলাম।’ বলল রোসা।

ডোনা জোসেফাইন উঠে বসে বলল, ‘ঠিক করেছ রোসা। আমিও এটাই বলেছিলাম।’

বলেই দ্রুত পেছনে সেই রোড জংশনের দিকে তাকাল ডোনা জোসেফাইন। দেখল, চারটা হেডলাইট এ এক্সিট রোডের দিকে ছুটে আসছে। এভাবে উল্টো দিকে আসতে দেখে ডোনা নিশ্চিত হলো, হেড লাইট নিভিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ি দু’টি তাহলে শত্রুরই ছিল এবং তারা এখন ছুটে আসছে ডোনাদের গাড়ির লক্ষ্যে। ডোনা জোসেফাইন আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল। অল্পখানেকের মধ্যে তৃতীয় সম্মুখ বিপদ থেকে বাঁচার আল্লাহ সুযোগ দিলেন।

ডোনা বলল আবার রোসাকে, ‘দাঁড়ানো গাড়ি দু’টি শত্রুরই। ওরা এখন ছুটে আসছে এদিকে।’

‘ম্যাডাম, এ রাস্তা দিয়ে বোধ হয় বেশি এগোনো যাবে না। মনে হচ্ছে, এটা একটা প্রাইভেট রোড। কোন অফিস বা কোন বাড়িতে গিয়ে এটা শেষ হয়েছে।’

একটা পাহাড়ের গা বেয়ে রাস্তাটা একেঁ বেঁকে উপরে উঠে গেছে। যেখানে পাহাড়ের গা’টা সমতল, সেখানে রাস্তায় কোন সাইড রেলিং নেই। আবার যেখানেই পাহাড়টা খাড়া হয়ে নিচে গেছে, সেখানেই সাইড রেলিং বা পিলার দিয়ে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

রোসাই আবার কথা বলল, 'ম্যাডাম, উপায় নেই, গাড়ি আমাদের ত্যাগ করতে হবে। উপরে বাসা বা অফিস যা-ই থাক, সেখানে আমরা নিরাপদ হবো না। সেখানে ওদের ছ'টি বহর গিয়ে হানা দেবে।'

'আমি তোমার সাথে একমত রোসা।' স্থির কণ্ঠে বলল ডোনা জোসেফাইন।

রাস্তা দু'পাশ জুড়েই ঘন ঝোপ-ঝাড়।

পাহাড়ের অনেক উপরে উঠে এসেছে তখন গাড়ি।

পাহাড়ের একটা বাঁক ঘুরে রোসা বলল, 'ম্যাডাম, সামনে যেখানেই সমতল পাব, সেখানেই গাড়ি স্লো করবো। আপনাকে সেখানে নেমে যেতে হবে। তৈরি থাকুন।'

'তারপর?'

'তারপর আমি পরবর্তী খাড়া এলাকায় পৌঁছে রেলিং-এর একাংশ ভেঙে গাড়ি নিচে ফেলে দেব। আমি সরে পড়ব। আর গাড়ি নিচে পড়ে আগুনে পুড়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। শত্রুরা ভাববে, আমরা অ্যাক্সিডেন্ট করে গাড়িসমেত ধ্বংস হয়ে গেছি। পরে আমরা দু'জন দু'জনকে খুঁজে নেব।'

'ধন্যবাদ রোসা।'

'ওয়েলকাম ম্যাডাম।'

ডোনা জোসেফাইন হাতের ব্যাগটাকে পিঠে ঝুলিয়ে নিল। আগে থেকেই পুরুষের পোশাক পরা ছিল, খুশি হলো, এতে সুবিধাই হবে।

উপত্যকার মত একটু সমতল জায়গায় এসে রোসা গাড়ি স্লো করল এবং সুইচ টিপে খুলে দিল দরজা।

ডোনা খোলা দরজা দিয়ে নিচে লাফিয়ে পড়ল।

গাড়িটা প্রায় ডেড স্লো হয়ে পড়েছিল, তবু একটা পা অসমান জায়গায় পড়ায় ঘুরে পড়ে গেল ডোনা পাশের ঝোপের উপর।

আসলে ঝোপটা ছিল রাস্তার সাইড রেলিংকে কেন্দ্র করে গজিয়ে উঠা নতুন লতা-পাতার ঘন আবরণ।

এই লতা-পাতার আবরণের কারণে রোসা রেলিং দেখতে পায়নি। অন্যদিকে উপত্যকার মত বলে একে সমতল ভূমি বলেই মনে করেছিল রোসা। আসলে সমতল নয়। পাহাড়ের সাংঘাতিক এক ঢালু এলাকা এটা।

ডোনা জোসেফাইনের দেহ নতুন গজানো হালকা লতা-পাতার উপর পড়ে রেলিং-এর ফাঁক গলিয়ে আছড়ে পড়ল পাহাড়ের ঢালে। ঢালের উপর পড়েই ডোনা জোসেফাইনের দেহ ওলট-পালট খেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল নিচে।

পাহাড়ের এ ঢালটায় ছিল গা ভর্তি ঘাস এবং ছোট ছোট লতাগুল্ম। দেহটা আটকে যাবার মত কিংবা ধরে পতন রোধ করার মত গাছ-গাছড়া বা কোন অবলম্বন ছিল না। তার উপর মাঝে মাঝে ছিল পাথরের মত শক্ত মাটির ঢেলা এবং গাছের পুরানো মুথা। এ সবের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হতে লাগলো ডোনা জোসেফাইনের দেহ।

কি ঘটতে যাচ্ছে ডোনা জোসেফাইন বুঝতে পেরেছিল। সে চেষ্টা করছিল কোন অবলম্বন ধরে নিজের পতন রোধ করতে। কিন্তু পারছিল না।

শেষ পর্যন্ত ডোনা জোসেফাইন চেষ্টা করেছিল নিজের সংজ্ঞা ধরে রাখতে, যাতে কোন প্রতিকূল অবস্থায় আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু তাও পারল না ডোনা। সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল ডোনা জোসেফাইন।

আহমদ মুসার গাড়ি কুটুজোভস্কি হাইওয়ে দিয়ে মস্কো শহরে প্রবেশ করল। এই হাইওয়ে দিয়ে মিনিট কুড়ি এগোবার পর গাড়ি ডান দিকে টার্ন নিল।

আহমদ মুসা ড্রাইভারের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'পাভলভ, কোথায় যাচ্ছ?'

'স্যার, ফরেন মিনিস্ট্রি রোডে ঢুকলাম। এখান হয়ে সাদোভায়া রিং রোডে পড়ব। তারপর পূর্বদিকে এগিয়ে টলস্টয় পার্কে প্রবেশ করব। সেখানে টলস্টয়ের বাড়ির সামনে দর্শনার্থী গ্যালারিতে রোসার সাথে আমার সাক্ষাৎ হবার কথা।'

‘ঠিক আছে। কিন্তু পাভলভ, আমি জানতাম, টলস্টয়ের বাড়িটা গোটা দক্ষিণ মস্কোর গোয়েন্দা হেডকোয়ার্টার।’

‘চিন্তার কিছু নেই স্যার। সে সোভিয়েত ইউনিয়ন নেই, সে কেজিবিও নেই।’

আধা ঘণ্টার মধ্যে আহমদ মুসার গাড়ি প্রবেশ করল টলস্টয় পার্কে।

টলস্টয় পার্ক মস্কোর সবচেয়ে বড় পার্ক। যেমন বড়, তেমনি মনোরম এ পার্ক। ইংরেজী বর্ণ ‘ইউ’-এর আকারে মস্কোভা নদী তিন দিক দিয়ে ঘিরে আছে পার্ককে। পার্কের দক্ষিণ পাশে লেনিন হিলস্‌। কমসোমল হাইওয়েটি লেনিন হিলস ও টলস্টয় পার্কের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে পড়েছে গিয়ে সাদোভায়া রিং রোডে।

টলস্টয়ের বাড়িতে দর্শক গ্যালারিতে আহমদ মুসা এবং পাভলভ অপেক্ষা করল রাত এগারটা পর্যন্ত। কিন্তু রোসার সাক্ষাৎ মিলল না।

কপাল কুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার। ডোনা জোসেফাইন মস্কো পৌঁছার পর ট্যাক্সি আটকে রাখার কথা নয়।

পাভলভও ভাবনায় পড়ল। বলল, ‘যার বাড়িতে ম্যাডাম উঠবেন, সে বাড়ি খোঁজার জন্যে কি খুব বেশি দেরি হওয়ার কথা?’

‘অবশ্যই না। যার বাড়িতে উঠার কথা, তার সাথে কথা বলা হয়েছে পুশকভ থেকে। পরিষ্কার লোকেশন পাওয়া গেছে। চিনতে সামান্য অসুবিধা হওয়ারও কথা নয়।’

দু’জনের কেউই আর কথা বলল না।

আহমদ মুসা টেলিফোন করল সেই বাড়িতে পাবলিক বুথ থেকে। না, সেখানে ডোনা জোসেফাইন পৌঁছেনি। তাহলে কি রাস্তাতেই কোন কারণে তাদের দেরি হচ্ছে? না কোন বিপদে পড়েছে তারা?

এবার শংকা এসে ঘিরে ধরল আহমদ মুসাকে।

রাত এগারটার পর আহমদ মুসা ও পাভলভ ফিরে এল টলস্টয় পার্ক থেকে।

আবার পরদিন সেই অপেক্ষার পালা। অনিশ্চিত অপেক্ষা খুবই কষ্টকর। আহমদ মুসা ও পাভলভ দু’জনই উদ্বিগ্ন।

তখন বেলা দশটা।

অস্থিরভাবে ঘুরছিল পাভলভ পার্কিং এরিয়ায়। কাছেই আহমদ মুসা একটা রেলিং-এ হেলান দিয়ে তাকিয়েছিল টলস্টয় হাউজ সংলগ্ন সুন্দর বাগানটার দিকে।

একটা ট্যাক্সি এসে থামল। পাভলভ ও আহমদ মুসা দু'জনেই শব্দ শুনে আগ্রহের সাথে তাকাল সেদিকে।

কিন্তু গাড়ির নাম্বারের দিকে তাকিয়ে দু'জনেই হতাশ হলো। না, ওটা রোসার গাড়ি নয়।

চোখ সরিয়ে নিতে যাচ্ছিল আহমদ মুসা। কিন্তু দেখল, ট্যাক্সি থেকে লাফ দিয়ে নামল রোসা।

রোসার দৃষ্টি পাভলভের দিকে। পাভলভও তাকে দেখতে পেয়েছে। ছুটে গেল পাভলভ রোসার দিকে।

কিন্তু রোসা খুব ঠাণ্ডা। সে পাভলভের একটা হাত ধরল মাত্র। কিন্তু উচ্ছ্বাস নেই। মুখ মলিন।

অজানা এক আশংকায় কেঁপে উঠল আহমদ মুসার মন।

পাভলভের চোখে-মুখে উদ্বেগজড়িত বিস্ময়।

আহমদ মুসা এগোলো রোসার দিকে।

আহমদ মুসার পরনে শিখ ট্যুরিস্টের পোশাক। রোসা চিনতে পারেনি আহমদ মুসাকে। একজন শিখ ট্যুরিস্টকে তার দিকে আসতে দেখে রোসা প্রশ্নবোধক দৃষ্টি তুলেছিল আহমদ মুসার দিকে।

হাসল পাভলভ। বলল, 'রোসা, স্যারকে চিনতে পারনি? তাহলে সার্থক স্যারের ছদ্মবেশ।'

এতক্ষণে বুঝল রোসা। হাসল সেও। বলল, 'সত্যি নিখুঁত ছদ্মবেশ।'

পরক্ষণেই হাসি মিলিয়ে গেল রোসার মুখ থেকে। ভারি ও মলিন হয়ে উঠল তার মুখ। বলল, 'স্যার, ম্যাডামকে আমি পৌঁছাতে পারিনি। হারিয়ে ফেলেছি তাকে।' অবরুদ্ধ এক আবেগের উচ্ছ্বাসে শেষের কথাগুলো তার ভেঙে পড়ল।

আহমদ মুসার বুকটা ধড়াস করে উঠল উদ্বেগের ধাক্কায়।

নিজেকে সামলে নিল আহমদ মুসা। কি কথা বলবে সে! হৃদয় কাঁপল তার কথা বলতে। রোসার কাছ থেকে পরবর্তী কি কথা সে শুনবে এই ভয়ে।

একটু সময় নিয়েই আহমদ মুসা শান্ত কণ্ঠে বলল, 'বলুন, কি ঘটেছে?'

রোসা আহমদ মুসার আরও কাছে সরে এল। তারপর ধীরে ধীরে বলল সব ঘটনা। সামনে ও পেছন থেকে অব্যাহত তাড়া খেয়ে কিভাবে অবশেষে লেনিন হিলস-এর সংকীর্ণ রাস্তায় এসে পড়ল তারা, সে বিবরণ রোসা দিল। পরিশেষে বলল, 'পেছন থেকে ছ'টা গাড়ি ছুটে আসছিল। এক সেকেন্ড নষ্ট করার সময় ছিল না। আমি উপত্যকা ধরনের সমতল জায়গা দেখে গাড়ি স্লো করেছিলাম। ম্যাডামও তৈরি ছিলেন। উনি লাফ দিয়ে নেমে পড়েছিলেন গাড়ি থেকে। পাহাড়ের আরও শীর্ষে উঠে গাড়ি পাহাড়ের নিচে ফেলে দিয়ে আমি লুকিয়ে পড়েছিলাম। ওদের ছ'টি গাড়ি এসেছিল, ওরা দেখেছিল নিচে পড়ে গিয়ে বিধ্বস্ত হওয়া প্রজ্জ্বলিত আমাদের গাড়ির দিকে। ওদের কথায় বুঝেছিলাম, ওরা বিশ্বাস করেছে অ্যাকসিডেন্টের শিকার হয়ে গাড়ির সাথে আমরাও পড়ে গেছি। এরপর ওরা সকলেই ছুটে গিয়েছিল পাহাড়ের নিচে বিষয়টা পরখ করে নিশ্চিত হবার জন্যে। ওরা চলে গেলে আমি ছুটে গিয়েছিলাম ম্যাডামকে যেখানে নামিয়ে দিয়েছিলাম সেখানে। কথা ছিল, আমরা দু'জন দু'জনকে খুঁজে নেব। কিন্তু আমি তাকে সেখানে পেলাম না। সেখানে রাস্তার আশ-পাশ পরখ করে আমি আঁৎকে উঠলাম। যাকে সমতল মনে করেছিলাম, সেটা সমতল নয়। সংকীর্ণ রাস্তার দু'পাশে লতা-পাতার আড়ালে লুকানো রেলিং ছিল এবং তার নিচেই অত্যন্ত ঢালু পাহাড়ের গা। সেদিন রাতে এবং আজ সকালে আমি জায়গাটা পরীক্ষা করে বুঝলাম, কোনও ভাবে তিনি লুকানো রেলিং-এর ফাঁক গলিয়ে পড়ে গেছেন। কিন্তু আজ সকালে পাহাড়ের সে ঢাল এবং নিচটা খোঁজাখুঁজি করে তাকে আমি পাইনি। যে জায়গায় তার গড়িয়ে পড়ার কথা, তার পাশ দিয়েই সড়ক। সড়কটি মস্কোভা নদীর একটা নৌ-বন্দর থেকে বেরিয়ে লেনিন হিলস-এর পাদদেশ দিয়ে চলে গেছে দক্ষিণ দিকে।

থামল রোসা।

‘ঐ সড়ক দিয়ে কি যেখানে আপনার গাড়ি ভেঙে পড়েছে, সেখানেও যাওয়া যায়?’ বলল আহমদ মুসা।

‘হ্যাঁ, ওটাই একমাত্র পথ। তবে গাড়ি যেখানে পড়েছে, সে জায়গাটা একটা গভীর খাদ। সড়ক থেকে বিশ-পঁচিশ গজ দূরে।’ রোসা বলল।

ম্লান হয়ে উঠেছে আহমদ মুসার মুখ। একটু ভাবল আহমদ মুসা। তারপর বলল, ‘আমরা কি ঐ এলাকায় যেতে পারি?’

‘অবশ্যই। এখনি যেতে পারি।’

‘ধন্যবাদ।’

বলেই আহমদ মুসা তাকাল পাভলভের দিকে। বলল, ‘তুমি কি বল?’

‘স্যার, এখনি যেতে পারি।’

কথা শেষ করেই পাভলভ হাঁটা দিল তার ট্যাক্সির লক্ষ্যে।

ড্রাইভিং সিটে বসল পাভলভ। তার পাশে রোসা। পেছনের সিটে আহমদ মুসা।

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ডোনা জোসেফাইনের যেখানে গড়িয়ে পড়ার কথা সেখানে পৌঁছল আহমদ মুসারা।

গাড়ি সড়কের পাশে পার্ক করে জায়গাটার দিকে এগোলো তারা।

পাহাড়ের ঢাল বরাবর সড়কের পাশ দিয়ে এক ফুট, দেড় ফুট উঁচু রক্ষা প্রাচীর। এরপর ঢালু হয়ে উপরে উঠে গেছে পাহাড়ের গা।

রোসা একটু সামনে এগিয়ে একটা এলাকা চিহ্নিত করে বলল, ‘আমি উপর থেকে কয়েকটা ভারি পাথর ফেলে দেখেছি, কোনটাই এই এলাকার বাইরে যায়নি। সুতরাং ম্যাডামের দেহ এর বাইরে যেতে পারে না।’

আহমদ মুসা কিছুটা ঝুঁকে পড়ে গভীরভাবে চোখ বোলাতে লাগল জায়গাটার উপর। আহমদ মুসা ভাবছে, এত উঁচু থেকে গড়িয়ে পড়ার পরে আহত হবার কথা। ঘাসে রক্তের দাগ থাকতে পারে। কিন্তু আহমদ মুসা তেমন কিছুই পেল না।

এলাকার এক জায়গায় অনেকখানি জায়গা জুড়ে ঘাস একইভাবে নিচের দিকে হেলে পড়া। অনেকগুলো ঘাসের ডগা ছেঁড়া আছে, দু'একটা ঘাস উপড়ে যাওয়াও রয়েছে।

আহমদ মুসা কি যেন ভাবল, তারপর নাক ঘাসের কাছাকাছি নিয়ে ঘ্রাণ নিল।

চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আহমদ মুসার। ডোনার ব্যবহৃত বিশেষ সেন্ট-এর গন্ধ পেল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা মাথা তুলে বলল, 'সন্দেহ নেই রোসা, ডোনা জোসেফাইনের দেহ সর্বশেষ এখানে এসেই স্থির হয়েছিল।'

'কি করে বোঝা গেল?'

'দেখুন এই জায়গাটার ঘাসের অবস্থা। আর এখানে আলাদা একটা গন্ধ আছে।'

রোসা ও পাভলভ দু'জনেই এগিয়ে এসে পরখ করে বলল, 'ঠিক বলেছেন।'

আহমদ মুসা রাস্তায় নেমে এল। ওরা দু'জনও।

আহমদ মুসা আবার চারদিকে নজর বোলাল। বলল, 'আমার বিশ্বাস, আহত বা সংজ্ঞাহীন ডোনা জোসেফাইনকে কেউ তুলে নিয়ে গেছে।'

রোসা ও পাভলভ দু'জনেই শুকনো মুখে আহমদ মুসার দিকে তাকাল। কথা বলল না।

আহমদ মুসাই আবার বলল রোসাকে লক্ষ্য করে, 'আপনি এখানে কখন এসেছিলেন?'

'প্রায় দেড় ঘণ্টা পর।'

'তার আগে তো এখান দিয়েই ঐ ছয়টি গাড়ি আপনাদের গাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখতে গিয়েছিল?'

'এদিক দিয়েই তো যাওয়ার পথ। কিন্তু তারা গিয়েছিল কিনা জানি না। আমি এসে কাউকে দেখতে পাইনি।'

'ওরা গাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখতে আসবে বলেই তো নেমে এসেছিল।'

‘হ্যাঁ।’

‘তাহলে ধরে নিতে হচ্ছে, আপনার আসার আগেই ওরা এদিক দিয়ে গেছে।’

‘সম্ভবত এটাই ঘটেছে।’ বলে একটা ঢোক গিলেই রোসা আবার বলল, ‘তাহলে কি ম্যাডাম ওদের হাতেই পড়েছে আপনি মনে করেন?’ কাঁপা কণ্ঠ রোসার।

আহমদ মুসার বুকটাও কেঁপে উঠল তার কথা শুনে। গোটা দেহটাই যেন তার যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল। তার সমগ্র সত্তা যেন বলে উঠল, ডোনা জোসেফাইনের মত নিষ্পাপ একটি ফুল ওদের হাতে পড়তে পারে না, পড়া উচিত নয়।

কিন্তু ঘটনা ঘটে থাকলে, সেই ঘটনা অস্বীকার করবে কে?

‘কি ঘটতে পারে আমি সেটাই বলছি রোসা। ঘটেছে তা আমি বলতে পারি না।’ আহমদ মুসা থামল।

ওরাও নীরব।

অল্পক্ষণ পরে নীরবতা ভেঙে আহমদ মুসা বলল, ‘গাড়ি যেখানে পড়েছিল, সেটা আর কতদূর?’

‘বেশি দূর নয়।’ বলল রোসা।

‘চলুন, যাওয়া যাক।’

সবাই গাড়িতে উঠে সামনে এগোলো।

পাহাড়ের দ্বিতীয় বাঁকটি পার হবার সময় রোসা বলল, ‘এই বাঁকের পরেই জায়গাটা।’

বাঁকটি পার হয়েই আহমদ মুসার গাড়ি আরেকটি গাড়ির প্রায় মুখোমুখি গিয়ে পড়ল। অল্পের জন্যে অ্যাক্সিডেন্ট থেকে বেঁচে গেল। দু’গাড়ির কোনটিই হর্ন ব্যবহার করেনি।

রাস্তায় ডিভাইডার দিয়ে আসা-যাওয়ার লেন আলাদা করা না থাকলেও লাল রেখা দিয়ে দু’টি লেন আলাদা করা রয়েছে। সামনের গাড়িটা রং লাইন দিয়ে আসছিল।

সামনের সেই গাড়িটিতে ড্রাইভারসহ চারজন আরোহী। দু'জন সামনে, পেছনে দু'জন।

গাড়িটার ড্রাইভার তার অন্যায় কাজের জন্য সামান্য 'স্যরি' শব্দটি পর্যন্ত উচ্চারণ করল না। গাড়িটিকে পাশ কাটিয়ে নিয়ে চলে গেল।

আহমদ মুসার মনটা তেতো হয়ে গেল তাদের আচরণে। দুর্বিনীত লোকদের ভালো করে দেখার জন্যে আহমদ মুসা গাড়িটার দিকে ভালো করে তাকাল।

ডোনাদের গাড়ি যে গভীর খাদে ভেঙে পড়েছে, সেই বরাবর এসে আহমদ মুসার গাড়ি থামল।

গাড়ি থেকে নেমে সামনে তাকাতেই আহমদ মুসার দৃষ্টি একটা বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট হলো।

আহমদ মুসার গাড়ি যেখানে দাঁড়িয়েছে তার সামনেই গাড়ির চারটি চাকার আঁকা-বাঁকা চিহ্ন। দাগগুলো তাজা। মনে হয়, একটি গাড়ি এখানে দাঁড়িয়েছিল। তারপর গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে আবার পেছন দিকে চলে গেছে। সামনের দিকে রাস্তায় গাড়ির চাকার কোন চিহ্ন নেই। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, রাতের পর সকালে এ পথে আর কোন গাড়ি চলেনি।

হঠাৎ আহমদ মুসার মনে ঝড়ের মত চিন্তাটা এল, তাহলে তো এই মাত্র চলে যাওয়া গাড়িই সেই গাড়ি, যে গাড়ি এখানে দাঁড়িয়েছিল। আর এখানে দাঁড়ানোর অর্থ, তারা ডোনা জোসেফাইনের ধ্বংসপ্রাপ্ত গাড়িটিই দেখতে এসেছিল। গাড়িটির আরোহীরা কেউ তো পুলিশ নয়। তাহলে ওরা কারা? নিশ্চয় গত রাতে ওরাই ডোনা জোসেফাইনের গাড়ি অনুসরণ করেছিল এবং ওরাই সম্ভবত ডোনা জোসেফাইনকে তুলে নিয়ে গেছে সংজ্ঞাহীন অবস্থায়। গত রাতে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত গাড়িটা পরীক্ষা করতে পারেনি। আজ সকালে এসেছিল সেই কাজে।

আহমদ মুসা আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মতই খুশি হয়ে উঠল। শয়তানদের ফলো করতে হবে। ওরাই এখন ডোনা জোসেফাইনকে উদ্ধার, প্রিন্সেস ক্যাথারিনকে উদ্ধার ও মিঃ প্লাতিনিকে উদ্ধারের সংযোগ সূত্র।

আহমদ মুসা গাড়ির দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্রুত কণ্ঠে বলল, 'পাভলভ গাড়িতে উঠো, মিস রোসা গাড়িতে উঠুন।'

বলে আহমদ মুসা দ্রুত গাড়িতে উঠে বসল। ওরা দু'জনও দ্রুত ফিরে এল গাড়িতে। বলল পাভলভ, 'কি হলো স্যার?'

'পাভলভ, যে গাড়িটা এখনি চলে গেল, যেভাবেই হোক তাকে ধরতে হবে।' মনের উত্তেজনা আহমদ মুসার কণ্ঠে ধরা পড়ল।

পাভলভ ও রোসা দু'জনেই পেছন ফিরে আহমদ মুসার দিকে তাকাল। তাদের চোখে বিস্ময়। তাদের ভাবনা, ছোট-খাট কোন ব্যাপারে আহমদ মুসার মত ব্যক্তিত্ব এমন উত্তেজিত হয়ে পড়ার কথা নয়। বলল রোসা বিনীতভাবে, 'জানতে পারি কি আমরা, কি ঘটেছে?'

রোসার প্রশ্নের ধরনে আহমদ মুসা হেসে উঠল। বলল, 'অবশ্যই।'

বলে একটু থেমে আবার বলতে শুরু করল আহমদ মুসা. 'আমি মনে করছি, ঐ গাড়ি বা ঐ গাড়ির আরোহীরাই গত রাতে আপনাদের গাড়ি অনুসরণ করেছিল এবং পরে এরাই সম্ভবত ডোনা জোসেফাইনকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তুলে নিয়ে গেছে।'

অপার বিস্ময় ফুটে উঠল রোসা ও পাভলভের চোখে। বলল পাভলভ, 'কিন্তু বোঝা গেল কিভাবে?'

আহমদ মুসা তাদেরকে সড়কে গাড়ির দাগের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল।

রোসা ও পাভলভের চোখে নতুন বিস্ময়। রোসা বলল, 'ঠিক ধরেছেন। কিন্তু এত ছোট বিষয় এভাবে আপনার নজরে পড়ে?'

'এসব বিষয় ছোট কোথায়? চোখে পড়ার মত যথেষ্ট বড়।'

'কিন্তু আমাদের চোখে পড়েনি।' বলল পাভলভ।

'এসব কথা থাক পাভলভ। স্পীড আরও বাড়াতে পারো না?'

'পাহাড়ী রাস্তা তো। চেষ্টা করছি স্যার।' স্পীড বাড়িয়ে দিতে দিতে বলল পাভলভ।

কিন্তু এতসব চেষ্টার পরেও কমসোমল হাইওয়েতে উঠার আগে সামনের গাড়িটিকে নজরেই আনতে পারলো না। পাহাড়ের শেষ বাঁকটা ঘুরে আহমদ মুসার

গাড়ি যখন কমসোমল রোডের মুখোমুখি হলো, তখন তারা দেখল, সামনের গাড়িটি কমসোমল হাইওয়েতে গিয়ে উঠল।

আহমদ মুসার গাড়ি যখন কমসোমল হাইওয়েতে উঠল, সামনের গাড়িটি তখন প্রায় দেড়শ' গজ সামনে।

হাইওয়েতে তখন প্রচণ্ড ভিড়। খুব চেষ্টা করেও আহমদ মুসার গাড়ি সামনের সেই গাড়িটার খুব বেশি নিকটবর্তী হতে পারল না।

'ঠিক আছে পাভলভ। এখন অনুসরণ করা ছাড়া আর করার কিছু নেই।'

কমসোমল হাইওয়ে লেনিন হিলস এর উত্তর প্রান্তে এসে মস্কোভা নদীর ব্রীজে প্রবেশ করেছে। সামনের গাড়িটা ব্রীজের কাছাকাছি গিয়ে বাম দিকের একটা এক্সিট রোড ধরে মস্কোভা নদীর তীর বরাবর পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলল।

এ রাস্তায় ভিড় অপেক্ষাকৃত কম।

পাভলভ তার গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিল। খান তিনেক গাড়ি ওভারটেক করে আহমদ মুসার গাড়ি যখন ঐ গাড়িটার কাছে পৌঁছল, ঠিক তখনই গাড়িটা বাম দিকে টার্ন নিয়ে একটা প্রাইভেট রোডে প্রবেশ করল। আহমদ মুসার গাড়ি একটু সামনে এগিয়ে একটা গাছের নিচে পার্ক করল।

আহমদ মুসা পেছন ফিরে গাড়ির দিকে চোখ রেখেছিল। দেখল, যে প্রাইভেট রোডে গাড়িটি প্রবেশ করেছিল, তা দক্ষিণ দিকে কয়েক গজ এগিয়ে একটা বিশাল বাড়ির বিরাট গেটে গিয়ে শেষ হয়েছে। গাড়িটি সেই গেট দিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল।

বাড়িটার গেট বন্ধ ছিল। গাড়িটা বন্ধ গেটের সামনে দাঁড়াতেই গেট খুলে গিয়েছিল।

দুর্গ সদৃশ বাড়ির বিশাল গেটের বিরাট সাইনবোর্ডের সব লেখাই পরিষ্কার পড়তে পারছে আহমদ মুসা। সাইনবোর্ড অনুসারে বাড়িটি হলো 'হেরিটেজ ফাউন্ডেশন'। হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের পরিচয়ে বলা হয়েছে, 'সোশ্যাল রিসার্চ সেন্টার ফর ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন' (জাতীয় সংহতির সামাজিক গবেষণা কেন্দ্র)।

‘হেরিটেজ ফাউন্ডেশন’ সংস্থাটি সরকারী না বেসরকারী বুঝতে পারল না আহমদ মুসা। আর ওরাই বা এ বাড়িতে ঢুকল কেন, এ বিষয়টাও বিস্ময় জাগাল আহমদ মুসার মনে।

অবশ্য হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের পরিচয় থেকে আহমদ মুসার মনে হলো, এর সাথে রাজনীতির যোগ আছে। আর এমন ফাউন্ডেশনের সাথে দুর্গ সদৃশ এই বাড়িকেও বেমানান লাগলো আহমদ মুসার কাছে।

পল পল করে পঁচিশ মিনিট পার হয়ে গেল।

এ ধরনের অপেক্ষা খুবই কষ্টকর।

আহমদ মুসা বাড়িটার গেটের দিকে চোখ রেখেই পাভলভকে লক্ষ্য করে বলল, ‘পাভলভ, তোমাদের সাথে আমার একটা আলাপ হওয়া প্রয়োজন।’

‘বলুন স্যার।’ বলল পাভলভ।

‘তোমাদের সাথে চুক্তি ছিল আমাদেরকে মস্কো পৌঁছে দেয়া। পৌঁছে দিয়েছ। তারপরও আজ এই সময় পর্যন্ত তোমার গাড়ি ব্যবহার করেছি। তোমাকে আর কষ্ট দেয়া ঠিক হবে না। বাকি ভাড়াটা নিয়ে তুমি চলে যাও। আর মিস রোসা সম্ভবত চুক্তি অনুসারে মস্কো পৌঁছার টাকা পাননি। তার উপর তার গাড়ি নষ্ট হয়েছে আমাদের কারণেই। আমি ঐ ভাড়া ও গাড়ির দাম দিয়ে দিচ্ছি।’

পাভলভ ও মিস রোসা পরস্পরের দিকে চাইল। তাদের মুখ গম্ভীর।

একটু পর পাভলভ বলল, ‘ঠিক বলেছেন স্যার। আমরা ড্রাইভার। ভাড়ায় গাড়ি খাটাই। যে চুক্তিতে এসেছিলাম, সে চুক্তি শেষ। আমাদের চলে যাওয়াই উচিত। কিন্তু স্যার, মস্কোতে আপনার গাড়ি লাগবে। ভাড়াতেই গাড়ি নেবেন। তাহলে আমাদের নেবেন না কেন? আপনিই বলুন, অন্য ড্রাইভারের চেয়ে আমাদের কাছে ভালো সার্ভিস পাবেন কিনা?’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘যুক্তিতে আমাকে বেঁধে ফেলেছ পাভলভ। কিন্তু একটা বড় ফাঁক রয়ে গেছে।’

‘স্যার সেটা কি?’

'সব সময় আমি গাড়ি ব্যবহার করবো না। এমনও হতে পারে, দু'তিন দিন গাড়ি ব্যবহারের সুযোগ পাব না। এই অবস্থায় আমার পেছনে গাড়ি খাটানো তোমার জন্য লাভজনক হবে না।'

'সে চিন্তা আমার স্যার। অন্য জায়গায় গাড়ি খাটাতে আপনার নিশ্চয় কোন নিষেধ থাকবে না।'

হাসল আহমদ মুসা। কিছু বলতে যাচ্ছিল। এমন সময় দেখল, সেই গেট দিয়ে আগের সেই গাড়িটিই বেরিয়ে এল। কিন্তু এবার গাড়িতে চারজন নয়। দু'জন। একজন ড্রাইভার এবং একজন আরোহী। আহমদ মুসার চিনতে অসুবিধা হলো না, এরা সেই চারজনেরই দু'জন।

আহমদ মুসা মুখ ঘুরিয়ে পাভলভকে বলল, 'গাড়ি ঘুরিয়ে পিছু নাও গাড়িটার।'

সামনের গাড়িটা কমসোমল রোডে উঠে মস্কোভা নদীর ব্রীজ পার হয়ে এগিয়ে চলল। কিন্তু টলস্টয় পার্কের প্রান্তে এসে কমসোমল রোড ছেড়ে দিয়ে গাড়িটা বাঁ দিকে টার্ন নিয়ে পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলল। মস্কোর বিখ্যাত ন্যাশনাল স্টেডিয়াম (সাবেক লেনিন স্টেডিয়াম) ও লুরানিকি স্পোর্টস কমপ্লেক্স বাঁয়ে রেখে স্পোর্টস রোড ধরে গাড়িটি সামনে এগোলো। কিন্তু শীঘ্রই আবার ডান দিকে টার্ন নিয়ে নেভিডিভিচ কনভেন্টের পুব পাশ দিয়ে টলস্টয় এভেনিউ ধরে উত্তরে এগিয়ে চলল। এই এভেনিউটি টলস্টয় পার্কের ভেতর দিয়ে টলস্টয়ের বাড়ির পাশ ঘেঁষে গিয়ে সাদোভায়া রিং রোডে উঠেছে।

টলস্টয় এভেনিউ মস্কোর সবচেয়ে নির্জন রাস্তা। আজ সোমবার প্রথম কার্যদিবস বলে মনে হচ্ছে আরও নির্জন।

এই নির্জন রোডে সামনের গাড়িটা হঠাৎ হার্ড ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল।

আহমদ মুসা কি করবে চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেবার আগেই তাদের গাড়ি সামনের গাড়ির কাছাকাছি এসে গেল।

সামনের গাড়িটি দাঁড়িয়েই আড়াআড়ি হয়ে গিয়েছিল।

আহমদ মুসাদের গাড়িকে দাঁড়াতেই হলো এই অবস্থায়।

আহমদ মুসাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সামনের গাড়ির দু'পাশ থেকে দু'জন স্টেনগান নিয়ে বেরিয়ে এল। একজন চিৎকার করে বলল আহমদ মুসাদের গাড়িকে লক্ষ্য করে, 'তোমরা বেরিয়ে এসো গাড়ি থেকে।'

রোসা ও পাভলভ দু'পাশ দিয়ে দু'জন গাড়ি থেকে বেরুল।

আহমদ মুসা রিভলভার ধরা ডান হাতটা পেছনে নিয়ে গাড়ি থেকে বেরিয়ে উঠে দাঁড়াল।

আগের সেই লোকটিই চিৎকার করে বলে উঠল, 'শিখ বেটা, তুই কেন গিয়েছিলি মস্কো হিলস ('লেনিন হিলস' নাম পরিবর্তন করে 'মস্কো হিলস' করা হয়েছে)-এর ঐ এলাকায়? আবার ফলোও করছিলি আমাদের। তোর জান নেয়ার আগে তোর পরিচয় নেয়া দরকার। তুই আয় আমাদের গাড়িতে।'

একটু থেমেই রোসাকে লক্ষ্য করে আবার বলল, 'ছুঁড়ি, তুইও আয়, মউজ করার মত সুন্দরী তুই।'

বলেই লোকটি স্টেনগান তুলল পাভলভকে লক্ষ্য করে।

পাভলভকে লক্ষ্য করে স্টেনগান উঁচাতে দেখেই আহমদ মুসা বুঝে নিয়েছিল কি ঘটতে যাচ্ছে। আহমদ মুসা তাকে স্টেনগানের ট্রিগার চাপার সুযোগ দিল না। আহমদ মুসা বিদ্যুৎ বেগে তার ডান হাতটি সামনে নিয়ে এসেই পর পর দু'টি গুলি করল।

গাড়ির দু'পাশের দুই স্টেনগানধারী মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে ছিটকে পড়ল মাটিতে।

ঠিক এই সময়েই পেছনে অট্টহাসি শুনল।

চমকে ঘুরে দাঁড়াল আহমদ মুসা। দেখল, তাদের গাড়ির কয়েক গজ পেছনে আরেকটা কার এসে দাঁড়িয়েছে। আহমদ মুসা ভাবল, সামনের পরিস্থিতির দিকে মনোযোগ থাকার কারণে পেছনের এই গাড়ির আগমন তারা টের পায়নি।

সামনের গাড়ির মতই পেছনের গাড়ির দু'পাশে দু'জন দাঁড়িয়ে। তাদের দু'জনের হাতে দু'টি মেশিন রিভলভার। তাদের দু'জনেরই রিভলভারের নল স্থির নিবদ্ধ আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়ালে অট্টহাসি হাসা লোকটি এবার শান্ত কণ্ঠে বলল, ‘দারুণ হাত দেখিয়েছ তুমি। তুমি শুধু শিখ ড্রাইভার নও।’

বলে চোখের দৃষ্টি আহমদ মুসার উপর স্থির রেখেই তার সাথীকে নির্দেশ দিল, ‘গিয়ে ওর রিভলভার নিয়ে নাও। আর ওকে বেঁধে নিয়ে এস।’

আহমদ মুসার রিভলভার ধরা হাতটি তখন নিচু। উপরে তোলার সময় হয়নি।

নির্দেশ পেয়ে দ্বিতীয় লোকটি এগিয়ে আসতে শুরু করেছিল আহমদ মুসার দিকে।

পিনপতন নীরবতা তখন।

এই সময় সেই নীরবতা ভেঙে পড়ল গুলির শব্দে। পর পর দু’টি গুলি।

গুলির উৎস লক্ষ্যে আহমদ মুসার চোখ দ্রুত ছুটে গিয়েছিল দক্ষিণে।

একজন কাউকে গাছের আড়াল দিয়ে রাস্তার দিকে ছুটে যেতে দেখল। তারপরেই একটা ইঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার শব্দ।

অদৃশ্য থেকে আসা গুলির দু’জনেই শিকার হলো। যে লোকটি আহমদ মুসার দিকে আসছিল, তার দেহটি পড়ে গেল আহমদ মুসার থেকে কয়েক ফুট দূরে। আর যে লোকটি মেশিন রিভলভার বাগিয়ে দাঁড়িয়েছিল, তার দেহটি প্রথমে আছড়ে পড়ল গাড়ির উপর। তারপর গাড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ল নিচে।

আহমদ মুসার কাছে আসল পাভলভ। তার পেছনে পেছনে রোসাও।

‘স্যার, আমি দেখতে পেয়েছি, ওটা সেই জীপ।’

‘আমারও তা-ই মনে হচ্ছে।’

আহমদ মুসার চোখে-মুখে গভীর চিন্তার রেখা। এটা সেই জীপ হলে, নিশ্চয় এ দুটো গুলি সেই মেয়েটির রিভলভার থেকেই এসেছে। কে এই মহিলা? আহমদ মুসাকে বাঁচাচ্ছে কেন? বিপদের চরম মুহূর্তে কোত্থেকে, কিভাবে সে আবির্ভূত হচ্ছে!

ভাবনায় ডুবে গিয়েছিল আহমদ মুসা।

‘স্যার, আমাদের সরে পড়া দরকার। পুলিশ এলে আমরা ঝামেলায় পড়ব।’ বলল পাভলভ।

'হ্যাঁ, চল।' বলে আহমদ মুসা গাড়িতে উঠার আগে গাড়ির কাগজপত্র নিয়ে নিল।

রোসা ও পাভলভও উঠল। বলল পাভলভ গাড়ি স্টার্ট দিতে দিতে, 'কোথায় যাব স্যার?'

'সামনে এগিয়ে সাদোভায়া রিং রোডে ওঠো।'

চলতে শুরু করল গাড়ি।

'স্যার, আপনি আমাকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছেন।' বলল পাভলভ বিনীত কণ্ঠে।

পাভলভ থামতেই রোসা বলল, 'আমরা চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব স্যার।'

আহমদ মুসার মুখে হাসি ফুটে উঠল। রোসাকে বলল, 'জীবন পাভলভের, আপনি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন কেন?'

রোসার মুখ লাল হয়ে উঠল লজ্জায়। সে প্রশ্নটা পাশ কাটিয়ে বলল, 'আমাকে 'আপনি' না বলে 'তুমি' বলার জন্যে অনুরোধ করছি স্যার। পাভলভকে 'তুমি' বলেন। আমার খুব ভালো লাগে।'

'ঠিক আছে। আমার প্রশ্নের উত্তরটা দাও।'

মুখ নিচু করল রোসা। মুখে সলাজ হাসি।

'ও অনুগ্রহ করে বিয়ের কনসেন্ট দিয়েছে স্যার।' পাভলভের ঠোঁটে হাসি।

কৃত্রিম রাগ ফুটে উঠল রোসার রাঙা মুখে। পাভলভের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার ওটা ভাষা হলো!'

পাভলভ হাসল। বলল, 'ঠিক আছে, 'অনুগ্রহ' শব্দ কেটে দিলাম।'

রোসা হাসল।

'তোমাদের আগাম শুভেচ্ছা। আর শোন, তোমরা এ খুনোখুনির মধ্যে থেকো না, পুশকভে ফিরে যাও।' বলল আহমদ মুসা।

'না স্যার। এবারই প্রথম একটা সাহসের কাজ নিয়েছি বলে মনে করে রোসা। এ সুযোগ থেকে আমাকে ছাঁটাই করবেন না।'

সাদোভায়া রিং রোডে উঠে পড়েছে গাড়ি।

‘এবার কোন দিকে স্যার?’ বলল পাভলভ।

‘বিল্ডিং আরকাইভস-এ চল।’

‘বিল্ডিং আরকাইভস-এ কেন স্যার?’

‘‘হেরিটেজ ফাউন্ডেশন’-এর ইতিবৃত্ত আমি জানতে চাই।’

‘আপনি কিছু সন্দেহ করেন?’ বলল রোসা।

‘সন্দেহ করার সংগত কারণ আছে। যে চারজনকে লেনিন হিলস থেকে ফলো করেছিলাম, ওরা হেরিটেজ ফাউন্ডেশনে প্রবেশ করে। তাদের দু’জন বেরিয়ে আসে প্রথম গাড়িতে করে। পেছনের গাড়িতে আসা যে দু’জন মারা পড়ল, তারা ঐ চারজনের অবশিষ্ট দু’জন নয়। তার মানে, ঐ চারজনের দু’জন সেখানে রয়ে গেছে, তার বদলে সেখান থেকে এসেছে অন্য দু’জন। এর অর্থ, ‘হেরিটেজ ফাউন্ডেশন’ এই ব্যাপারের সাথে জড়িত।’

‘পেছনের গাড়িটিও হেরিটেজ ফাউন্ডেশন থেকে এসেছে মনে করেন?’ রোসা বলল।

‘অবশ্যই। হেরিটেজ ফাউন্ডেশনে বসেই পরিকল্পনা করা হয়েছে আমাদেরকে ফাঁদে ফেলে ধরার।’

‘হেরিটেজ ফাউন্ডেশনও কি এর সাথে জড়িত তাহলে?’

‘এটা বলা মুশকিল। কেউ হেরিটেজ ফাউন্ডেশনকে ব্যবহার করতে পারে। এ জন্যেই কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছার আগে হেরিটেজ ফাউন্ডেশন এবং ঐ বিল্ডিং সম্পর্কে জানতে চাই।’

‘বুঝেছি স্যার।’ বলল পাভলভ।

গাড়ি ছুটে চলল আরকাইভস-এর উদ্দেশ্যে।

মস্কোর ইনার রিং-এর ভেতরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংরক্ষিত এলাকার ভেতরে বিল্ডিং আরকাইভস।

সংরক্ষিত এলাকার প্রবেশপথেই আটকে গেল আহমদ মুসার গাড়ি। প্রহরী বলল, ‘বিশেষ বিভাগের অনুমতি লাগবে।’

পাভলভ গাড়ি ফিরিয়ে আনল পার্কিং-এ।

‘বিশেষ বিভাগ বলতে কি বুঝিয়েছে পাভলভ?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘গোয়েন্দা বিভাগের সিকিউরিটি শাখা স্যার।’

গাড়ি পার্ক করে পাভলভ গাড়ি থেকে নেমে বলল, ‘স্যার, একটু বসুন। আমি অনুমতির ব্যাপারটা একটু দেখে আসি স্যার।’

আহমদ মুসা গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, ‘তুমি কি বলবে তাদের?’

পাভলভ একটু ভাবল। হাসল। তারপর বলল, ‘আপনার বেশ এবার নিখাদ ইহুদির মত। আমি বলব, একজন ইহুদি নগর পরিকল্পনা গবেষক আরকাইভস পরিদর্শন করতে চান।’

‘এতটুকুতে হবে?’

‘দেখি স্যার।’

বলে চলে গেল পাভলভ।

ফিরে এল পনের মিনিট পর হাসিমুখে।

সেদিকে তাকিয়ে রোসা বলে উঠল, ‘বলেছি না স্যার, নিশ্চয় অনুমতি হবে। অনুমতি না হলে ওর মুখে হাসি থাকতো না।’

পাভলভ এসে গাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে বলল, ‘অনুমতি দিয়েছে স্যার।’

আপনাতেই ভ্রু দু’টি কোঁচকাল আহমদ মুসার। একজন ড্রাইভার পাভলভ কি করে এত তাড়াতাড়ি বিশেষ বিভাগ থেকে বিশেষ অনুমতি বের করে আনল! রোসা আগাম নিশ্চিত করে তা বললই বা কি করে? আহমদ মুসা কিছু বলার আগেই গাড়ি স্টার্ট দিতে দিতে পাভলভ বলল, ‘নগদ নারায়ণের সবাই বশ স্যার। বিশেষ করে আমাদের রাশিয়ায়।’

‘কিন্তু নগদ খরচ করার অনুমতি আমার কাছ থেকে নাওনি।’ বলল আহমদ মুসা।

‘মাফ চাই স্যার। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করেছি। অনুমতির সময় হয়নি।’ বলল পাভলভ বিনীত কণ্ঠে।

আহমদ মুসার মনের খুঁতখুঁতি গেল না। কিন্তু কিছু বলল না আর।

আরকাইভস-এ প্রবেশ করল আহমদ মুসা এবং ওরা দু'জন। আরকাইভস-এ প্রবেশের জন্যে বড় ধরনের প্রবেশ ফি দিতে হলো।

আরকাইভস-এর করিডোর দিয়ে চলতে চলতে আহমদ মুসা বলল পাভলভকে, 'কোন বিল্ডিং-এর কম্পিউটার ডিস্কের যদি একটা প্রিন্ট নিতে চাই?'

'আইনত পারা যাবে না। কিন্তু পয়সা দিলে সব হয় স্যার।'

'এত কথা তুমি জান কি করে?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না পাভলভ। এরপর হেসে বলল, 'আমি কি রাশিয়ার ছেলে নই স্যার? আর ড্রাইভাররা তো অনেক কিছুই দেখে, জানে।'

আরকাইভস-এর ডিজাইন ডিস্ক কাউন্টারে গেল প্রথমে আহমদ মুসারা।

কাউন্টারের ভদ্রলোকটি ঋজু শরীরের গম্ভীর এক বৃদ্ধ।

আহমদ মুসা নিজের নতুন পরিচয়টা দিয়ে প্রয়োজনের কথা বলল।

ভদ্রলোক কোন কথা না বলে পাশের কম্পিউটারটির নব টিপে ডিজাইন ডিস্কের ক্যাটালগ পর্দায় নিয়ে এল। একের পর এক পর্দায় এল ডিস্কের ক্যাটালগ।

এক সময় পর্দায় স্থির হলো বৃদ্ধের চোখ। স্থির হবার পরক্ষণেই তার চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠল। অস্বস্তিতে ভরে গেল তার মুখ। সে আহমদ মুসার দিকে চেয়ে বলল, 'দুঃখিত, ডিস্কটা আমরা দেখাতে অপারগ।'

'কিন্তু আমি তো উপযুক্ত ফি দেব।'

বৃদ্ধটি একটু দ্বিধা করল। তারপর বলল, 'কিছু দিন আগে ডিস্কটি চুরি গেছে। আমরা নতুন ডিস্ক করতে পারিনি।'

চুরির সংবাদে আহমদ মুসা বিস্মিত এবং কিছুটা হতাশ হলো। বলল, 'আমি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারি?'

'অবশ্যই।' বৃদ্ধ বলল।

'এ ধরনের চুরি কি অতীতে আর কখনও হয়েছে?'

'জানি না। তবে আমার পঁচিশ বছরের আরকাইভস জীবনে এই প্রথম।'

'আরেকটা কথা। আমার প্রয়োজন পূরণের বিকল্প কোন পথ আছে?'

‘আপনি ইতিহাস সেকশনে যান। সেখানে ইতিহাস সম্বলিত ডিস্ক আছে। তাতে ইতিহাসও পাবেন, ডিজাইনও পাবেন।’

‘ধন্যবাদ।’ বলে আহমদ মুসারা বেরিয়ে এল।

ইতিহাস সেকশনের লোকটি প্রাণবন্ত একজন যুবক।

আহমদ মুসা তাকে প্রয়োজনের কথা জানালে যুবকটি ভ্রু কুঞ্চিত করল।

চোখ নিচু করে মুহূর্ত সে ভাবল। তারপর বলল, ‘দুর্ভাগ্য স্যার, বিল্ডিংটি নতুনভাবে লীজে বরাদ্দ হবার পর বিল্ডিংটির উপর তৈরি সবগুলো ডিস্ক চুরি গেছে।’

চুরি যাওয়ার এই দ্বিতীয় সংবাদে আহমদ মুসা আর বিস্মিত হলো না। বরং খুশিই হলো সে। তার সন্দেহ ঠিক প্রমাণ হচ্ছে। বলল, ‘একটা সাহায্য করতে পারেন? কারা লিজ নিয়েছে বিল্ডিংটা?’

‘স্মৃতিশক্তি অত তীক্ষ্ণ, অত শক্তিশালী হলে কি এই আরকাইভস কাউন্টারে বসতাম?’

‘আর কোন সাহায্য করতে পারেন?’

যুবকটি একটু চিন্তা করে বলল, ‘অনুরূপ ডিস্ক গোয়েন্দা বিভাগের ‘হোম জিওগ্রাফি’ সেকশনে পাবেন।’

যুবকটিকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এল আহমদ মুসারা।

আরকাইভস থেকে বেরিয়ে এসে পাভলভ তার ড্রাইভিং সিটে বসতে বসতে বলল, ‘স্যার, আপনি যদি বলেন, তাহলে গোয়েন্দা বিভাগের ‘হোম জিওগ্রাফি’ বিভাগ থেকে ডিস্কের একটা কপি আনার চেষ্টা করতে পারি।’

‘ওয়েলকাম পাভলভ। ডিস্কটা খুবই জরুরী দরকার আমার। কিন্তু পারবে তুমি?’

‘আমার পরিচিত লোক আছে স্যার। চেষ্টা করে দেখতে পারি।’

‘ঠিক আছে।’

‘ডিস্কটা এত জরুরী কেন স্যার?’ জিজ্ঞেস করল রোসা।

‘এখনও পর্যন্ত নিশ্চিত যে, তোমার ম্যাডাম (ডোনা জোসেফাইন) ওদের হাতেই পড়েছে। সুতরাং তাকে উদ্ধারের প্রস্তুতিতে এক মুহূর্তও দেরি করা যায়

না। প্রতি সেকেন্ড আমার কাছে মনে হচ্ছে একটা যুগের মতন।’ আহমদ মুসার ম্লান কণ্ঠস্বর।

রোসা ও পাভলভ দু’জনেরই মুখ ম্লান হয়ে গেল। একটু পর পাভলভ ধীরে ধীরে বলল, ‘স্যার, হেরিটেজ ফাউন্ডেশনকে সত্যিই সন্দেহ হলে, সেখানে তো এখনই অনুসন্ধান চালানো যায়।’

‘আমি সফল হতে চাই পাভলভ। তাই আরেকটু জেনে অগ্রসর হতে চাই।’

‘ঠিক বলেছেন স্যার। হঠকারী কোন পদক্ষেপে ম্যাডামের উদ্ধার না হয়ে তার আরও ক্ষতি হতে পারে।’ বলল রোসা।

রোসার কথা একটা যন্ত্রণা ছড়িয়ে দিল আহমদ মুসার গোটা দেহে। তার ডোনা জোসেফাইনের কোন ক্ষতি হতে পারে, এমন আশংকার কথা সে ভুলে থাকতে চায়।

‘স্যার, আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গোয়েন্দা দফতরে যাচ্ছি। আপনারা গাড়িতে থাকবেন। আমি ভেতরে গিয়ে চেষ্টা করে দেখি।’ বলল পাভলভ।

‘ঠিক আছে।’ বলল আহমদ মুসা।

আনমনা হয়ে পড়েছিল আহমদ মুসা। পাভলভের কথায় সম্বিত ফিরে এল তার। কিন্তু আবারও নানা চিন্তা এসে ঘিরে ধরল তাকে।

রোসা ঠিকই বলেছে। তাকে খুব সাবধানে এগোতে হবে। শুধু তো এখন প্রিন্স ক্যাথারিন, মিঃ প্লাতিনি উদ্ধার নয়, তার ‘রানী’কেও উদ্ধারের প্রশ্ন এবার।

এভাবে চিন্তা করতে গিয়েও আহমদ মুসার মন এক সময় প্রবলভাবে মাথা নাড়ল। তার ডোনা জোসেফাইন ঐ জঘন্য শত্রুর হাতে পড়বে কেন, কোন পাপে!

আহত মনের এই অসহায় জিজ্ঞাসার কোন জবাব দিতে পারল না আহমদ মুসা। তার মুখ থেকে পরম নির্ভরতার এক দোয়া বেরিয়ে এল, ‘হাসবুনাল্লাহ...।’

হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের সেই হলরুম। হলের পঁচিশটি আসনে পঁচিশজন বসে। প্রথম সারির প্রথম চেয়ারে গ্রেট বিয়ারের গোয়েন্দা প্রধান মাজুরভ। দ্বিতীয় সিটে অপারেশন ফরচুন প্রজেক্ট-এর প্রধান ভ্লাদিমির খিরভ। এবং তৃতীয় চেয়ারে অপারেশন ফরচুন প্রজেক্ট-এর কমান্ডার জেনারেল নিকোলাস বুখারিন।

হলের সামনে পাঁচ ফুট উঁচু সেই রহস্যময় মঞ্চের বুক ফুঁড়ে উঠে এল সেই সোনালী সিংহাসনে আসীন সেই সোনালী মূর্তি।

চেয়ারে আসীন সকলের মাথা নিচু। যেন কোন নির্দেশের অপেক্ষায়।

অখণ্ড নীরবতার মধ্যে বজ্রপাতের মত কণ্ঠ ধ্বনিত হলো সোনালী চেয়ার থেকে। বলা হলো, 'জেনারেল নিকোলাস বুখারিন, তোমার কিছু বক্তব্য আছে?'

মাথা নিচু করে উঠে দাঁড়াল বুখারিন। বলল, 'মহামান্য আইভান, আহমদ মুসাকে আমরা গ্রেফতার করতে সমর্থ হয়েছি, কিন্তু ধরে রাখতে পারিনি। এ ব্যর্থতা স্বীকার করে নিচ্ছি। কিন্তু আমাদের এই ব্যর্থতা তৃতীয় পক্ষের কারণে। তৃতীয় কেউ তাকে পালাতে সাহায্য করেছে, অনুসন্ধানে এটা প্রমাণিত হয়েছে। মহামান্য আইভান, আমরা সব রকম চেষ্টা করে এবং ছ'টি গাড়ির বহর দিয়ে তাড়া করেও মিসেস আহমদ মুসাকে ধরতে পারিনি। আমরা মনে করেছিলাম, গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে ড্রাইভার ও মিসেস আহমদ মুসার মৃত্যু ঘটেছে। পরবর্তী পরীক্ষায় এটা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। এ ব্যর্থতা স্বীকার করছি যে, মহিলাকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও তাকে আমরা হারিয়েছি। কেবলমাত্র পাহাড়ের একটা ঢালে লেডিস সাইজ একটা হ্যাট এবং এক জোড়া লেডিস জুতা পেয়েছি। জুতাটি একটা ফরাসী কোম্পানীর। আমরা মনে করছি, হ্যাট ও জুতা মিসেস আহমদ মুসার হতে পারে। যদি তা-ই হয়, তাহলে মিসেস আহমদ মুসা পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে আহত হয়েছেন। যতদূর সম্ভব আশেপাশের সব ক্লিনিক ও হাসপাতালে আমরা খোঁজ নিয়েছি কোন ফরাসী মহিলা চিকিৎসা নিতে গেছে কিনা। কিন্তু সন্ধান পাওয়া যায়নি। সবশেষে আমাদের পিছু নেয়া এবং আমাদের হেডকোয়ার্টারের পাশ পর্যন্ত জনৈক শিখকে, যাকে এখন আহমদ মুসা বলে সন্দেহ করা হচ্ছে, ফাঁদে ফেলেও আমরা তাকে আটকাতে পারিনি। উপরন্তু আমাদের চারজন লোক প্রাণ

দিয়েছে। আমাদের একজনের মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতে প্রমাণিত হয়েছে যে, এখানেও একটি তৃতীয় পক্ষ রক্ষা করেছে আহমদ মুসাকে। তবু এটা আমাদের ব্যর্থতা। যতটা সতর্ক ও যতটা প্রস্তুত আমাদের হওয়া উচিত ছিল, তা আমরা হতে পারিনি। আমরা ব্যর্থ হয়েছি। তবে মহামান্য আইভান, এ ব্যর্থতার জন্যে আমার কোন গ্লানি নেই। যোগ্য ফাইট দেয়ার পর আমরা ব্যর্থ হয়েছি।'

থামল নিকোলাস বুখারিন।

সেই বজ্রকণ্ঠ আবার ধ্বনিত হলো, 'ভ্লাদিমির খিরভ, এবার তুমি বল।'

মাথা নিচু করে উঠে দাঁড়াল খিরভ। বলল, 'মিঃ বুখারিন শেষ দু'টি বাক্যে ঠিক বলেননি। আহমদ মুসা অজেয় নয়। আমরাই তাকে জয় করার যোগ্যতা দেখাতে পারিনি।' থামল ভ্লাদিমির খিরভ।

'তারপর।' গর্জন করে উঠল সোনালী চেয়ারের কণ্ঠ।

'মহামান্য আইভান, আপনার নির্দেশ।' মাথা নুইয়ে বাউ করে বলল খিরভ।

খিরভ থামার সাথে সাথে দেখা গেল, চেয়ারের হাতলে রাখা নিকোলাস বুখারিনের দু'টি হাত হাতল থেকে উঠে আসা দু'টি হ্যান্ডকাফে আটকা পড়ে গেল এবং চেয়ারের দু'পাশে বেরিয়ে আসা দু'টি লোহার বাহুতে চেয়ারের সাথে বাঁধা পড়ে গেল নিকোলাস বুখারিনের দেহ। সেই সাথে দেখা গেল, চেয়ারের পায়া মেঝের ইস্পাতের বাঁধন থেকে আপনিই খুলে গেছে এবং চার পায়ার চার চাকাই সচল হয়ে উঠেছে।

চেয়ার গড়িয়ে হল থেকে বেরুবার ওয়াকিং করিডোরে গিয়ে থেমে গেল।

সোনালী চেয়ার থেকে ধ্বনিত হলো সেই বজ্রকণ্ঠ। বলল, 'মিস ক্যাথারিনরা তিনজন যেখানে বন্দী আছে, সেখানে আরও দু'টি কক্ষ আছে। একটি আহমদ মুসার জন্যে, অন্যটিতে নিয়ে রাখ বুখারিনকে। তার বিচার আহমদ মুসার সাথে একবারেই করব। আহমদ মুসা যে অজেয় নয়, তা দেখেই তার মৃত্যুবরণ করা উচিত। নিকোলাস বুখারিনের মত একজন রুশ সন্তানকে ভুল ধারণা নিয়ে মরতে দিতে পারি না।'

একটু থামল বজ্রকণ্ঠ। তারপর আবার শুরু করল, 'আহমদ মুসাকে আমাদের হাতের মুঠোয় আনার জন্যে আমরা আহমদ মুসার দোরগোড়ায় পৌঁছব, এটাই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আহমদ মুসাই তার লক্ষ্য অর্জনের জন্যে সাফল্যজনকভাবে আমাদের দোরগোড়ায় পৌঁছেছে। সে প্রমাণ করেছে, সে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত, অনেক বেশি আক্রমণাত্মক। এ কারণেই তার কাছে আমাদের এক ধরনের পরাজয় ইতোমধ্যেই ঘটেছে। এরপরও অবিশ্বাস্য দ্রুত সে সামনে এগোচ্ছে। মাজুরভ, তোমার কাছে খবর আছে নিশ্চয়।'

মাজুরভ উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে বলল, 'হ্যাঁ, মহামান্য আইভান। আমরা যে সব খবর সংগ্রহ করেছি, তাতে প্রতীয়মান হচ্ছে, আহমদ মুসা বিল্ডিং আরকাইভস-এ গিয়েছিল আমাদের এই হেরিটেজ ফাউন্ডেশন-এর ইতিহাস ও ডিজাইন সংগ্রহের জন্যে। আমাদের ভাগ্য ভালো, ইতিহাস ও ডিজাইনের গোটা কম্পিউটার ফাইল চুরি যাওয়ায় এগুলো তার হাতে পড়েনি। আহমদ মুসা এই বিল্ডিং-এর ইতিহাস ও ডিজাইন অনুসন্ধান করতে যাওয়ায় এটা প্রমাণ হয়েছে, হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের আসল পরিচয় সে পায়নি। চেষ্টা করছে পাওয়ার।' থামল মাজুরভ।

'তোমার কথায় সান্ত্বনা আছে মাজুরভ। সান্ত্বনা দিয়ে পরাজয়ের বেদনা মোছা যায়, কিন্তু বিজয়ের অগ্নি স্ফুলিঙ্গ জ্বালানো যায় না।'

মুহূর্তের জন্যে থামল বজ্রকণ্ঠ। মুহূর্ত পরেই আবার শুরু করল, 'আহমদ মুসার হেরিটেজ ফাউন্ডেশন-এর ইতিহাস ও ডিজাইন সন্ধান ছিল একটা বাড়তি ব্যবস্থা। হেরিটেজ ফাউন্ডেশনকে যদি সন্দেহ করেই থাকে, তাহলে এখানে প্রবেশের জন্যে কোন ইতিহাস বা ডিজাইনের দরকার তার হবে না। বুঝতে পেরেছ মাজুরভ?'

'বুঝতে পেরেছি মহামান্য আইভান।'

'কি বুঝেছ?'

'আহমদ মুসা হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের ইতিহাস ও ডিজাইন পায়নি বলে আমাদের আনন্দিত হবার কিছু নেই।'

সোনালী চেয়ারের সেই বজ্রকণ্ঠ আবার বলল, 'আমার অনুমান ভুল না হলে তোমরা তার কাছে পৌঁছার আগে সেই-ই তোমাদের কাছে আসছে এই হেরিটেজ ফাউন্ডেশনেই।'

'মহামান্য আইভান, এর মধ্যে একটা আমাদের ব্যর্থতা আছে, কিন্তু আহমদ মুসার জন্যে আছে চরম দুর্ভাগ্য।'

'হ্যাঁ, রাশিয়ার প্রিয় সন্তানরা, চরম দুর্ভাগ্যই যেন তার হয়।'

কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই সোনালী চেয়ারটি চোখের পলকে মঞ্চের ভেতরে ঢুকে গেল।

আইভান চলে গেলেও হলের চেয়ারে বসা অবস্থা থেকে কেউ উঠল না।

শুধু উঠল ভ্লাদিমির খিরভ। তারপর নিকোলাস বুখারিনকে নিয়ে দাঁড়ানো চেয়ার ঠেলে হলের দরজার দিকে এগিয়ে চলল সে।

হল থেকে বেরুবার পর চেয়ারসহ নিকোলাস বুখারিনকে নিয়ে লিফটে উঠল খিরভ। লিফট থেকে নেমে চলল নিচে।

লিফট উঠা-নামার লাইট ইনডিকেটরটি একদম বটম বোতামে পৌঁছতেই লিফট স্থির হয়ে দাঁড়াল।

লিফটের দরজা খুলে গেল।

লিফটের বাইরে বেশ প্রশস্ত চারকোণা একটা চত্বর। চত্বরটি প্রলম্বিত করিডোরের একটি গ্রন্থি। চত্বর এবং করিডোর সবই সাদা পুরু কার্পেটে মোড়া। দেয়াল ও ছাদও তাই।

লিফট-এর বিপরীত দিকে চত্বরের ওপাশে গার্ডরুম। লিফট এসে পৌঁছার সাথে সাথে লিফট-এর দরজা খোলার আগেই গার্ডরুম থেকে চার স্টেনগানধারী বেরিয়ে এসে তাক করেছে লিফট রুমকে।

লিফট রুমের দরজা খুলে যেতেই ভ্লাদিমির খিরভ মুখোমুখি হলো তাদের।

খিরভ দুই হাত তুলে বিভিন্ন ভঙ্গিতে দু'হাতের কয়েকটি আঙুল নাড়ল কয়েকবার।

এটা আঙুলের ভাষায় কথা বলা। যাতে বলা হলো, 'আইভান দি টেরিবল জিন্দাবাদ'। যে বা যারাই এ লিফট দিয়ে নামুক, তাকে আঙুল দিয়ে এ কথা বলতে হয়। ব্যর্থ হলে স্টেনগানের ব্রাশফায়ার তার জন্যে নির্দিষ্ট।

খিরভের আঙুল স্থির হতেই চারজনের স্টেনগানের ব্যারেল নিচে নেমে গেল। চার পাথরের মূর্তি পিছু হটে ঢুকে গেল গার্ডরুমে। বন্ধ হয়ে গেল গার্ডরুমের দরজা।

খিরভ নিকোলাস বুখারিনের চেয়ার ঠেলে সেই চারকোণা চত্বরে প্রবেশ করল।

চত্বর থেকে পুবদিকের করিডোর ধরে এগোলো সামনে।

চত্বর থেকে করিডোরটি পশ্চিম দিকে বেশি দূর এগোয়নি। মাত্র কয়েক গজ। যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে, সেখানে দেয়াল জোড়া একটা পেইন্টিং। পেইন্টিংটি ইতিহাসের 'আইভান দি টেরিবল'-এর একটা আবক্ষ চিত্র।

বুখারিনের চেয়ার ঠেলে নিয়ে চলছিল খিরভ। করিডোরের দু'পাশে সারিবদ্ধ ঘর।

এক স্থানে এসে করিডোরটি উত্তর-দক্ষিণে প্রশস্ত একটি করিডোরে এসে পড়ল। প্রশস্ত সে করিডোরের পুব পাশ দিয়ে বড় ধরনের পৃথক পৃথক পাঁচটি ঘর।

খিরভ প্রশস্ত করিডোরটিতে নেমে বুখারিনের চেয়ার ঠেলে সোজা পুব পাশের রুমটির দরজার সামনে গিয়ে থামল।

ঘরটির দক্ষিণ পাশে পর পর তিনটি কক্ষ। আর উত্তর পাশে একটি।

ঘরে ডিজিটাল লক।

কয়েকটা অংকে টোকা দিতেই দরজা খুলে গেল।

চেয়ার ঠেলে বুখারিনকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল ভ্লাদিমির খিরভ।

এতক্ষণ খিরভ ও বুখারিন পরস্পর একটি কথাও বলেনি।

চেয়ারসমেত বুখারিনকে ঘরে ঢুকিয়ে খিরভ প্রথমবারের মত বুখারিনের চোখে চোখ রাখল। বলল, 'বুখারিন, আমরা সবাই রাশিয়ার সন্তান, রাশিয়ার সেবক। রাশিয়ার স্বার্থে আমাদের সবকিছুই মেনে নেয়া উচিত।'

নিকোলাস বুখারিনের মুখ পাথরের মত অচঞ্চল। তাতে ভয়ের লেশমাত্র নেই। খিরভের কথা শুনে তার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল। বিদ্রূপ মিশ্রিত হাসি। বলল, 'মিঃ ভ্লাদিমির খিরভ, আমি সৈনিক। মৃত্যুকে আমি ভয় পাই না। দেশের জন্যে জীবন দিতে আমি সদা প্রস্তুত। কিন্তু তোমাদের 'মহামান্য আইভান' আর আমার দেশ রাশিয়া এক নয়।'

'তুমি মিথ্যা বলছ। এটা নিছক একটা প্রতিক্রিয়া ছাড়া কিছুই নয়।' প্রতিবাদ করল খিরভ।

'আপনি আমাকে মিথ্যা বলুন আপত্তি নেই। কিন্তু শুনে রাখুন, দেশের শ্লোগান দিয়ে কোন ব্যক্তি বা কোন গ্রুপের ভাগ্য গড়া দেশপ্রেম নয়। দেশপ্রেম ও জাতিপ্রেমের সাথে গণতন্ত্র নিষ্ঠার কোন পার্থক্য নেই। স্বেচ্ছাচারী হয়ে দেশপ্রেমিক হওয়া যায় না। এটা আমি বুঝেছি, আপনারাও বুঝবেন।'

একটা প্রবল ভয় নেমে এল খিরভের চোখে-মুখে। দ্রুত বলল, 'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। মহামান্য আইভান সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।'

'আপনাকে এই অফিসিয়াল কথাগুলো অবশ্যই বলতে হবে মিঃ খিরভ। কিন্তু আপনি জানেন, এই হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের বিল্ডিং লাখো মানুষের বধ্যভূমি লুবিয়াংকার অংশ ছিল। গণতান্ত্রিক রাশিয়া একে উদ্ধার করে মানুষের হাতে তুলে দিয়েছে। কিন্তু আপনার মহামান্য আইভান একে আবার লুবিয়াংকায় পরিণত করেছে। লেনিন-স্টালিনের স্বেচ্ছাচারিতা সোভিয়েত ইউনিয়নে টিকেনি, আইভানের স্বেচ্ছাচারিতাও রাশিয়ায় টিকবে না।' দৃঢ় কণ্ঠে বলল বুখারিন।

'আপনার এই পদস্খলনের জন্যে দুঃখ হয় মিঃ বুখারিন।'

বলে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে এল খিরভ।

তার চোখে-মুখে বুখারিনের উপর কোন ক্রোধ নয়, ভয়ের কালো ছায়ায় আচ্ছন্ন।

সে দ্রুত পা বাড়াল লিফটের দিকে।

# ৫

লেনিন হিলস-এর পশ্চিমে মস্কোর বিখ্যাত মুভি স্টুডিও'র একটা অনুষ্ঠানে শরীক হয়ে বাড়িতে ফিরছে ডঃ নাতালোভা।

ডঃ নাতালোভা মস্কো স্টেট ইউনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলর।

ডঃ নাতালোভা বসা ড্রাইভিং সিটের পাশের সিটে। ড্রাইভ করছে তারই মেয়ে ওলগা। ওলগা মস্কো স্টেট ইউনিভার্সিটির সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত একজন তরুণী অধ্যাপিকা।

তারা ফিরছে লেনিন হিলস-উপত্যকার সড়ক পথে। তখন রাত বেশ হয়েছে। তারা তখন পাহাড়ের একটা ঢালের প্রান্ত দিয়ে চলছে। হঠাৎ উপর থেকে ভারি কিছু গড়িয়ে পড়ার শব্দ পেল।

সেদিকে তাকিয়ে ডঃ নাতালোভা ও ওলগা দু'জনেই দেখল, রাস্তার একেবারে পাশেই একটা কিছু গড়িয়ে পড়ে স্থির হলো।

কোন পাথর নয় তারা নিশ্চিত।

ওলগা গাড়ি থামিয়ে ফেলেছে।

ডঃ নাতালোভা টর্চের আলো ফেলল গড়িয়ে পড়া বস্তুটির উপর। বলল, 'ওলগা, এতো মানুষ!'

ডঃ নাতালোভা ও ওলগা দু'জনেই দ্রুত গাড়ি থেকে নামল। দ্রুত তারা পৌঁছল গড়িয়ে পড়া দেহটির পাশে।

টর্চের আলোতে দেখল আহত, রক্তাক্ত একটি যুবক। ডঃ নাতালোভা পরীক্ষা করে বলল, 'যুবকটি বেঁচে আছে, সংজ্ঞা হারিয়েছে মাত্র।'

'তাহলে আম্মা?' বলল ওলগা।

'চলো গাড়িতে তুলে নেই, কোন ক্লিনিকে নিতে হবে।' ডঃ নাতালোভা বলল।

'অবশ্যই। নাও এস।'

বলে ওলগা সংজ্ঞাহীন যুবকটির মাথার দিকে গিয়ে তুলে নেবার উদ্যোগ নিল। ওলগার মা ডঃ নাতালোভা পেছন দিকটা ধরল। গাড়িতে তুলে নিল তারা যুবকটিকে।

'আম্মা, তুমি দেখ ওর সংজ্ঞা ফেরাতে পার নাকি। তাড়াতাড়ি তাকে ক্লিনিকে নিতে হবে।'

ওলগা তার ড্রাইভিং সিটে ফিরে গিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিল। ছুটে চলল গাড়ি উপত্যকার পথ ধরে।

জ্ঞান ফেরাবার জন্যে যুবকটির দেহ নাড়া-চাড়া করতে গিয়ে চমকে উঠল ডঃ নাতালোভা, এতো ছেলে নয়। তার মাথার চুলও উঠে এসেছে হাতের সাথে এবং বেরিয়ে পড়েছে কালো চুলের বদলে মেয়েলি কাটের সুন্দর স্বর্ণাভ চুল।

চিৎকার করে উঠল ডঃ নাতালোভা, 'ওলগা, পুরুষের ছদ্মবেশে এতো মেয়ে!'

'আম্মা তা-ই?' বিস্ময় ওলগার চোখে-মুখেও।

ডঃ নাতালোভা চেষ্টা করল। কিন্তু জ্ঞান ফেরার কোন লক্ষণ নেই।

ডঃ নাতালোভা সংজ্ঞাহীন মেয়েটির পিঠ থেকে ব্যাগটি সরিয়ে নিয়েছিল। ব্যাগ খুলে চেক করল ডঃ নাতালোভা। ব্যাগে ছোট-খাট কিছু প্যাকেট আছে। পোশাক আছে। মেয়েদের পোশাক।

পকেট সার্চ করতে গিয়ে আবার তার চমকে উঠার পালা। পকেটে পেল লোডেড একটি রিভলভার। কোমরের বেল্টের সাথে আটকানো থলিতে পেল পাসপোর্ট, মানিব্যাগ ইত্যাদি।

এ সময় ওলগা বলল, 'আম্মা, ওর পুরুষ বেশ, গড়িয়ে পড়ে আহত হওয়া এই সব খুব স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। আমার অনুমান ভুল না হলে, আমাদের এ রাস্তার উপরে পাহাড়ের গা বেয়ে যে রাস্তা সিকিউরিটি ব্যারাকের দিকে গেছে, সেই রাস্তায় কিছু একটা ঘটেছে। এর এভাবে গড়িয়ে পড়া তার রেজাল্ট হতে পারে।'

ডঃ নাতালোভা দ্রুত কণ্ঠে বলল, 'আরও আছে ওলগা, ব্যাগে রিভলভার পাওয়া গেছে। পাসপোর্টের নামটা ফরাসী বলে মনে হচ্ছে।'

'রিভলবার? কি নাম?'

'মারিয়া জোসেফাইন লুই।'

'ঠিক, ফরাসী নাম আম্মা। রিভলভারের ব্যাখ্যা কি করা যায় আম্মা?'

'এটা বড় কথা নয়। আত্মরক্ষার মত প্রয়োজনেও মানুষের রিভলভার থাকতে পারে।'

মাইলকয়েক দক্ষিণে লেনিন হিলস-এর দক্ষিণ প্রান্তে মস্কো স্টেট ইউনিভার্সিটি। ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসেই ভিসি'র বাংলো। এখানেই ডঃ নাতালোভা এবং ওলগা থাকেন।

গাড়ি প্রবেশ করল ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে।

'জ্ঞান তো এখনও ফিরল না। কোথায় নেবে ওলগা একে?'

'আমাদের ক্যাম্পাস ক্লিনিক যথেষ্ট হবে আম্মা। মাথায় কিংবা দেহে বড় কোন আঘাত নেই। কিন্তু উঁচু থেকে গড়িয়ে পড়তে গিয়ে অব্যাহত আঘাতে ওর সংজ্ঞা লুপ্ত হয়েছে।'

তখন বেশ রাত। আলো-আধাঁরী ঘেরা ক্লিনিক যেন ঘুমিয়ে পড়েছে।

গাড়ির ইমারজেন্সী লাইট জ্বালিয়ে এগিয়ে আসছিল ওলগার গাড়ি।

ক্লিনিকের গাড়ি বারান্দায় গাড়ি এসে দাঁড়াতেই ছুটে এল তিনজন একটা ট্রলি নিয়ে।

গাড়িতে ভাইস-চ্যান্সেলর ডঃ নাতালোভাকে দেখে চমকে উঠে লম্বা স্যালুট দিল তারা।

দ্রুত তারা মারিয়া জোসেফাইনকে ট্রলিতে শুইয়ে ছুটল ইমারজেন্সীর দিকে।

ওলগা মারিয়ার ব্যাগটা হাতে নিয়ে ডঃ নাতালোভার সাথে এগোলো সিঁড়ির দিকে।

রিসেপশনের সামনে দিয়ে একটু সামনে এগোলে ইমারজেন্সীতে ঢোকার বিশেষ গেট।

রিসেপশনের সামনে দিয়ে সেদিকেই এগোচ্ছিল ওলগারা।

রিসেপশনিস্ট মেয়েটি টেলিফোনে কথা বলছিল। সে দাঁড়িয়ে পড়েছিল ডঃ নাতালোভাকে দেখে।

হঠাৎ রিসেপশনিস্ট মেয়েটি ওলগার দিকে হাত তুলে বলল, 'মাফ করবেন ম্যাডাম, রোগীটি কে?'

একটু ভেবে ওলগা উত্তর দিল, 'আমার খালাতো বোন।'

'ঈশ্বর তাকে সাহায্য করুন।' বলে বসে পড়ল রিসেপশনিষ্ট মেয়েটি।

মারিয়া জোসেফাইনের জ্ঞান ফিরলে ডঃ নাতালোভা বাসায় ফেরে রাত এগারটার দিকে। ওলগা বাসায় ফেরেনি।

মারিয়া জোসেফাইনকে ভাইস-চ্যান্সেলরের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হিসেবে ভিআইপি বেড দেয়া হয়েছিল। ওলগা মারিয়া জোসেফাইনের পাশের বেডে শুয়েছিল।

দু'চারটা কথা বলেই ওলগা ঘনিষ্ঠ হয়ে গেছে মারিয়া জোসেফাইনের। অসুস্থ মারিয়া জোসেফাইনকে একা ফেলে সে বাসায় ফিরতে রাজি হয়নি।

ওলগাদের বাড়ি থেকেই ওলগা ও মারিয়া জোসেফাইনের জন্যে ব্রেকফাস্ট এসেছিল সকালে।

সকাল নয়টার দিকে ওলগাদের ভিআইপি রুমের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল সেই রিসেপশনিস্ট।

দরজা খোলা ছিল।

রিসেপশনিস্ট দাঁড়াল। ওলগাকে লক্ষ্য করে বলল, 'ম্যাডাম, সিকিউরিটির একজন কিছুক্ষণ আগে টেলিফোন করেছিল। জিজ্ঞেস করেছিল, রোগীর নাম কি, কেমন দেখতে, ইত্যাদি।'

মারিয়া জোসেফাইনও তার বেডে শুয়ে রিসেপশনিস্ট-এর কথা শুনছিল। তার কথা কানে যেতেই বুকটা কেঁপে উঠল মারিয়া জোসেফাইনের। ওরা ক্লিনিকে হামলা করবে নাকি?

ওলগা বলল, 'কেন জানতে চেয়েছে? আপনি কি বললেন?'

'ওরা দু'বার টেলিফোন করেছিল। প্রথমবার জিজ্ঞেস করল, 'গত রাত বা আজ সকালে কোন অসুস্থ বা আহত মহিলা ক্লিনিকে এসেছে কিনা। আমি 'এসেছে' বলার সঙ্গে সঙ্গে ওপার থেকে 'ধন্যবাদ' বলে টেলিফোন রেখে দিল। এক মিনিট পরেই আবার টেলিফোন এল। জিজ্ঞেস করল, 'মহিলাটি পরিচিত

কিনা? নাম কি? বিদেশী কিনা? দেখতে কেমন? ইত্যাদি।' আমি তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'শুনুন, মহিলাটি আমাদের ভাইস-চ্যান্সেলর ডঃ নাতালোভার বোনের মেয়ে।' আমার একথা শোনার পর লোকটি বিরক্ত করার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করে বলল, 'এক ভয়ংকর মহিলাকে আমরা খুঁজছি। দেশের স্বার্থে তাকে আমাদের পাওয়া প্রয়োজন।'

'ধন্যবাদ।' ওলগা রিসেপশনিস্টকে লক্ষ্য করে বলল।

রিসেপশনিস্ট চলে গেল।

ওলগা হাসিমুখে তাকাল মারিয়া জোসেফাইনের দিকে। বলল, 'সিকিউরিটির লোকরা আপনাকেই খুঁজছে।'

'ওরা সিকিউরিটির লোক নয়।'

'নয়? কারা ওরা?'

'রাশিয়ার একটি গোপন সংগঠন।'

'কোন সংগঠন জানতে পারি?'

মারিয়া জোসেফাইন ওলগার দিকে একবার তাকাল। তারপর বলল, 'অবশ্যই। 'গ্রেট বিয়ার'।'

'গ্রেট বিয়ার?'

'নিশ্চয় চেনেন সংগঠনটিকে?'

ওলগার চোখে-মুখে চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছিল। বলল, 'অবশ্যই চিনি।'

একটু থেমেই ওলগা আবার বলল, 'তাদের সাথে আপনার ঝগড়া কেন?'

'আমার কোন ঝগড়া নেই, আমাকে হাতে পাওয়ার মধ্যে তাদের কোন স্বার্থ আছে।'

ওলগা আবার মুখ খুলতে গিয়েও চুপ করল। ভাবল, এসব প্রশ্ন জেরার মত হয়ে যাবে।

একটু পর মারিয়া জোসেফাইনই বলল, 'মিস ওলগা, আমার হাঁটার মত শক্তি হয়েছে। আমি চলে যেতে চাই। আমি সত্যিই বিপদে আছি। আমার স্বামী ওদের হাতে বন্দী।'

ওলগা তাকাল মারিয়া জোসেফাইনের দিকে। বলল ধীরে ধীরে, 'বুঝতে পারছি। কিন্তু আম্মা এ অবস্থায় কিছুতেই আপনাকে যেতে দিতে রাজি হবেন না। চলুন, আপনাকে আমরা বাসায় নিয়ে যাব। ওখানে কোন বিপদের ভয় নেই। সুস্থ হবার পর চলে যাবেন।'

বলে ওলগা হাতের মোবাইল টেলিফোনে ডায়াল করা শুরু করল।

মারিয়া জোসেফাইন তাকে বাঁধা দিয়ে বলল, 'আমাকে আপনারা চেনেন না। সব জেনে এইভাবে আপনারা আমাকে আশ্রয় দেবেন কেন? তার উপর শুনলেন, আমি এক ভয়ংকর মহিলা।'

'এসব কথা আমার আম্মাকে বলবেন। তবে আমি এটুকু বলতে পারি, গ্রেট বিয়ারের কথাকে আমরা সার্টিফিকেট বলে মনে করি না।'

বলে ওলগা তার মা'কে টেলিফোন করে বলল, 'আম্মা, সব কথা এসে বলব। আমি মিসেস মারিয়া জোসেফাইনকে বাসায় নিয়ে আসছি।'

ওপার থেকে ওর মায়ের কথা শুনে হাসিতে ভরে গেল মুখ, 'ধন্যবাদ আম্মা, আমরা আসছি।'

কথা শেষ করেই বাইরে গিয়ে অ্যাটেনডেন্টকে সবকিছু গোছাতে বলে চলে গেল ক্লিনিকের অফিসে।

মিনিট পাঁচেক পরে ফিরে এসে বলল, 'চলুন, সব কমপ্লিট।'

মারিয়া জোসেফাইন ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করল।

দু'জন এসে উঠল গাড়িতে। ওলগা গাড়ি ড্রাইভ করল।

গাড়িতে উঠে বসে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল মারিয়া জোসেফাইন। যখন সে চরম অসহায়, তখন আল্লাহ তাকে আশ্রয় দিলেন মস্কো স্টেট ইউনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলরের বাড়িতে।

ওলগার পাশের কক্ষেই মারিয়া জোসেফাইনের থাকার ব্যবস্থা হলো।

বাসায় আসার পর পরই মারিয়া জোসেফাইনের জ্বর আসে। সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তার আনা হয়। ডাক্তার মারিয়া জোসেফাইনকে কমপ্লিট বেডরেস্টের জন্যে বলে। হাঁটা, চলা-ফেরা একদম নিষিদ্ধ করা হয়।

দু'দিন থেকে জ্বর আসেনি। শরীরের ভেতরের ব্যথা-বেদনাও কমে গেছে।

ডাক্তার আনা পাভলোভা শরীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ওলগাকে বলল, 'হ্যাঁ ওলগা, এখন তোমার বোন কিছু হাঁটতে পারে। এঘর-সেঘর যেতে পারে।

এ সময় ডঃ নাতালোভা প্রবেশ করল ঘরে। বলল, 'ডাঃ আনা, কেমন আছে আমার মেয়েটি?'

ডাঃ উঠে দাঁড়াল। ডঃ নাতালোভা সোফায় বসল।

ডাক্তার তার চেয়ারে বসতে বসতে বলল, 'বিস্ময়কর উন্নতি হয়েছে ম্যাডাম। মাথায় এবং শরীরে যে ধরনের আঘাত, তাতে মাসখানেকের আগে উঠে দাঁড়াবার কথা নয়। মাথায় তো অপারেশনের দরকার ছিল। কিন্তু বিস্ময়করভাবে মস্তিষ্কের ব্লাড সার্কুলেশন স্বাভাবিক হয়ে গেছে। দেহের এই ধরনের বৈশিষ্ট্য বিরল। ওর রক্তও অসাধারণ গ্রুপের। আর দু'চার দিনের মধ্যে উনি ঘোড়ায় চড়ার মত অবস্থা ফিরে পাবেন।'

ডাক্তার তার যন্ত্রপাতি গুটিয়ে ব্যাগ নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

ওলগা ডাক্তার আনা পাভলোভাকে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এল।

ডঃ নাতালোভা কথা বলছিল। বলছিল, 'ডাঃ আনা ঠিকই বলেছে, তোমার মুখের দিকে চাইলে সত্যিই চোখ ফেরানো যায় না। কি এক অসাধারণ আভিজাত্য ছড়িয়ে রয়েছে তোমার মুখে। আসলে তুমি কে মা?'

মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে মারিয়া জোসেফাইন বলল, 'আমার নাম তো জানেন খালাম্মা। আমি ফ্রান্সের 'লুই' বংশের মেয়ে।'

''লুই' মানে 'বুরবন' রাজবংশের মেয়ে?' ডঃ নাতালোভার কণ্ঠে বিস্ময়ের ছাপ।

'জ্বি।' বলল মারিয়া জোসেফাইন।

'তার মানে তুমি ফ্রান্সের রাজকন্যা?' বিস্ময়-বিমুগ্ধ কণ্ঠে বলল ওলগা।

'ফ্রান্সে কোন রাজবংশ নেই এখন। লুই'রা এখন আর রাজপরিবার নয়।' ম্লান হেসে মারিয়া জোসেফাইন বলল।

‘রাজত্ব গেলেও রাজবংশ থাকে। আমাদের জারদের রাজত্ব নেই, কিন্তু জাররা আছেন এবং নামমাত্র হলেও তাদের আবার সিংহাসন ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে।’

‘সত্যি সিংহাসন তারা পাচ্ছে?’

‘অবশ্যই। আর মাত্র কয়েকদিন। তার পরেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র চালু হচ্ছে।’

‘কে বসছেন সিংহাসনে?’

‘প্রিন্সেস তাতিয়ানার বসার কথা। কিন্তু গুজব শোনা যাচ্ছে, উনি নিহত হয়েছেন সুইজারল্যান্ডে। এখন শোনা যাচ্ছে, প্রিন্সেস ক্যাথারিন সিংহাসনে বসতে যাচ্ছেন।’

‘কিন্তু প্রিন্সেস ক্যাথারিন কি সিংহাসনে বসতে পারবেন?’

‘কেন পারবেন না? তুমি কিছু জান?’ বলল ডঃ নাতালোভা।

‘কিছু জানি। প্রিন্সেস ক্যাথারিন এখন গ্রেট বিয়ারের হাতে বন্দী।’

‘কেন গ্রেট বিয়ার তাকে বন্দী করেছে?’ বলল ডঃ নাতালোভা বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে।

‘গ্রেট বিয়ার নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র চালুর প্রচেষ্টা বানচাল করতে চায়। দ্বিতীয়ত, জারের গোপন ধনভাণ্ডার কুক্ষিগত করতে চায়। দুই কাজের জন্যেই প্রিন্সেস ক্যাথারিনকে তারা হাতের মুঠোয় রাখতে চায়।’

ডঃ নাতালোভা এবং ওলগা দু’জনের মুখই ম্লান হয়ে গেছে। তাদের চোখে-মুখে উদ্বেগের চিহ্ন।

‘তুমি এসব জানলে কেমন করে?’ বলল ডঃ নাতালোভা।

‘আমার স্বামী প্রিন্সেস ক্যাথারিনকে উদ্ধারের চেষ্টা করছেন এবং সে জন্যেই তিনি রাশিয়ায় এসেছেন। এই তার অপরাধ। আমার স্বামী যেমন ওদের হাতে বন্দী, তেমনি আমার পিতাও। আমাকেও ওরা আটক করতে চায়।’

‘তোমার পিতা কেন বন্দী? তোমাকে কেন ওরা ধরতে এমন মরিয়া? আসল লোক তো ওদের হাতে রয়েছেই।’

‘আমার স্বামীর কাছ থেকে দু’টো জিনিস উদ্ধার করতে চায়, যা না পেলে জারের ধনভাণ্ডার কোনদিনই উদ্ধার করা যাবে না। আমার স্বামীর উপর চাপ সৃষ্টির জন্যেই আমাকে ওরা বন্দী করতে চায়।’

‘বুঝলাম। কিন্তু বুঝতে পারছি না, তোমার স্বামী প্রিন্সেস ক্যাথারিনকে উদ্ধার করতে আসবেন কেন? জারের গোপন ধনভাণ্ডারের সাথে তিনি জড়িয়ে পড়বেন কেন?’

ডঃ নাতালোভার কথা শেষ হতেই একটা প্যাকেট নিয়ে পরিচারিকা ঘরে প্রবেশ করল। সে ডঃ নাতালোভার হাতে প্যাকেটটি তুলে দিয়ে বলল, ‘লাইব্রেরী থেকে দিয়ে গেল।’

বড় এনভেলাপে একটা মোটা বই।

ডঃ নাতালোভা সেদিকে একবার তাকিয়ে এনভেলাপে একটা চুমু খেয়ে বইটি বের করল।

বইটি কোরআন শরীফ।

কোরআন শরীফ বের করে হাতে নিয়ে আবার চুমু খেল ডঃ নাতালোভা।

সেদিকে তাকিয়ে আছে মারিয়া জোসেফাইন। তার দু’চোখ প্রায় ছানাবড়া হয়ে যাবার জোগাড়।

ডঃ নাতালোভা মারিয়া জোসেফাইনের দিকে চাইল। তার অবস্থা দেখে বলল, ‘কি দেখছ, এটা কোন আজব জিনিস নয়, একটি ধর্মগ্রন্থ, কোরআন শরীফ।’

‘কোরআন শরীফে আপনি চুমু খেলেন, আপনি কি মুসলিম?’ বলল মারিয়া জোসেফাইন চোখে-মুখে বিস্ময় নিয়ে।

‘এবং আপনি?’ ওলগার দিকে চেয়ে দ্রুত কণ্ঠে বলল মারিয়া জোসেফাইন।

‘আমি আম্মার চেয়ে সিনিয়র মুসলমান।’ বলল ওলগা হাসিমুখে।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে মারিয়া জোসেফাইন ‘আল্লাহু আকবর’ বলে দু’হাতে মুখ ঢাকল।

ওলগা লাফ দিয়ে মারিয়া জোসেফাইনের কাছে উঠে এল। মারিয়া জোসেফাইনের মুখ থেকে তার দুই হাত সরিয়ে নিল।

দেখা গেল, মারিয়া জোসেফাইনের ঠোঁটে আনন্দের হাসি। চোখ দিয়ে অশ্রু গড়াচ্ছে। আনন্দের অশ্রুতে ভেসে গেছে তার দুই গণ্ড।

'আপনি মুসলমান?' বলল ওলগা মারিয়া জোসেফাইনকে।

'আলহামদুলিল্লাহ'। বলল মারিয়া জোসেফাইন।

শুনে পাগলের মত জড়িয়ে ধরল ওলগা মারিয়া জোসেফাইনকে। মারিয়া জোসেফাইনও জড়িয়ে ধরল ওলগাকে।

জড়িয়ে রেখেই ওলগা বলল, 'ফরাসী রাজকুমারী মুসলমান হয়েছে, ইউরোপের জন্যে এটা একটা বড় খবর।'

মারিয়া জোসেফাইন ওলগার হাতের বাঁধন মুক্ত হয়ে বলল, 'মস্কো স্টেট ইউনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলর এবং তার অধ্যাপিকা কন্যা মুসলমান, এটা তার চেয়ে অনেক বড় খবর।'

বলে খাট থেকে নামল মারিয়া জোসেফাইন। নেমে এগোলো ডঃ নাতালোভার দিকে।

ডঃ নাতালোভাও উঠে দাঁড়িয়ে এগোলো মারিয়া জোসেফাইনের দিকে এবং তাকে জড়িয়ে ধরে তার কপালে বার বার চুমু খেল। বলল, 'এ কারণেই প্রথম যখন দেখলাম, তখন থেকেই মনে হচ্ছিল একান্ত আপন কেউ।' বলে পাশের সোফায় বসাল মারিয়া জোসেফাইনকে।

ওলগা গিয়ে মারিয়া জোসেফাইনের সোফায় বসল ঠাসাঠাসি করে এবং গলা জড়িয়ে ধরল মারিয়া জোসেফাইনের।

'ওলগা, মুসলমান হিসেবে খালাম্মার চেয়ে সিনিয়র হলে কেমন করে বুঝতে পারলাম না।' বলল মারিয়া জোসেফাইন।

'আম্মার আগে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আম্মা আমার কাছে ইসলাম গ্রহণ করেছে।'

'আর তুমি কার কাছে ইসলাম গ্রহণ করেছ?'

প্রশ্ন শুনেই মুখটা মলিন হয়ে গেল ওলগার। মারিয়া জোসেফাইনের গলা থেকে তার হাতটা খসে পড়ল।

'কি হলো তোমার ওলগা?' বলল মারিয়া জোসেফাইন।

'মারিয়া, তুমি ওলগাকে এমন একজনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছ যার কথা স্মরণ হলে সে ভেঙে পড়ে।'

'কে সে?'

'মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়েরই একটি মেয়ে। ওলগার সাথে পড়তো। তার কাছেই ওলগা ইসলাম শেখে।' বলল ডঃ নাতালোভা।

'শুধু ইসলাম শেখা নয়। আম্মা যখন সোভিয়েত কারাগারে, আমার সামনে যখন সমগ্র জগৎ অন্ধকার, যখন জীবন আমার কাছে থাকা না থাকা সমান, সেদিন মাত্র তার কাছে আমি বেঁচে থাকার প্রেরণা পাই, সামনের জমাট অন্ধকারে আশার আলো জ্বলে উঠে, জীবনের নতুন অর্থ খুঁজে পাই আমি।'[১]

'তিনি কোথায়? তার কথা স্মরণ হলে ভেঙে পড়ার কারণ?'

'সে একজন উজবেক মেয়ে। মধ্য এশিয়া স্বাধীন হলে সে দেশে ফিরে যায়। বাড়িতে থাকাকালেই সে রাশিয়ার এক কু-সন্তান জেনারেল বরিসের দলের হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়।'

জেনারেল বরিসের নাম শুনে মারিয়া জোসেফাইন চমকে উঠল। এই লোকটা তো ছিল আহমদ মুসার কট্টর দুশমনদের একজন এবং তার হাতেই নিহত হয়েছে মেইলিগুলি, আহমদ মুসার প্রথম প্রিয়তমা স্ত্রী।

'জেনারেল বরিসের কথা আমি শুনেছি। কিন্তু এই জেনারেল বরিস একজন উজবেক মেয়েকে মারতে যাবে কেন?'

---

১। ফাতিমা ফারহানা ও ওলগার এই কাহিনীর জন্যে 'রক্তাক্ত পামির' (সাইমুম-৫) গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

'তার অপরাধ ছিল, তিনি ছিলেন বহু বিপ্লবের নায়ক আহমদ মুসার বাগদত্তা। তাকে হত্যা করে আহমদ মুসার উপর একটা প্রতিশোধ নেয় জেনারেল বরিস।' বলল ডঃ নাতালোভা।

চমকে উঠল মারিয়া জোসেফাইন। বলল দ্রুত কণ্ঠে, 'আপনি ফাতিমা ফারহানার কথা বলছেন? আপনারা আহমদ মুসাকে চেনেন?'

'আমরা আহমদ মুসাকে চিনব না! মধ্য এশিয়ায় তার বিপ্লব রুশ জনগণের স্বাধীনতাকেও ত্বরান্বিত করেছে। তুমি ফাতিমা ফারহানার নাম জান কি করে? তুমিও কি আহমদ মুসাকে চেন?' বলল ওলগা।

মারিয়া জোসেফাইন তৎক্ষণাৎ জবাব দিল না। তারপর মাথা নিচু করে ধীর কণ্ঠে বলল, 'তিনি আমার স্বামী। তার কাছেই আমি ফাতিমা ফারহানার কথা শুনেছি।'

'আম্মা' বলে চিৎকার করে দাঁড়িয়ে পড়ল ওলগা। তার বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টি মারিয়া জোসেফাইনের মুখের উপর নিবদ্ধ। ডঃ নাতালোভারও বিমুগ্ধ দৃষ্টি মারিয়া জোসেফাইনের উপর।

মারিয়া জোসেফাইন বিমূঢ়ভাবে দাঁড়ানো ওলগাকে হাত ধরে টেনে পাশে বসালো। ওলগা পাগলের মত আবার জড়িয়ে ধরল মারিয়া জোসেফাইনকে। বলল, 'আমাদের কি সৌভাগ্য, আল্লাহর কি দয়া যে, আহমদ মুসার স্ত্রীকে আমরা এত কাছে পেয়েছি। নিশ্চয় আহমদ মুসাকে দেখার সৌভাগ্যও আল্লাহ দেবেন।'

ডঃ নাতালোভা পাশের সোফাতে বসেছিল। সে মারিয়া জোসেফাইনের একটা হাত টেনে নিয়ে চুমু খেয়ে বলল, 'এতক্ষণ তুমি 'মা' ছিলে, এখন তুমি আমাদের মাথার মণি হয়ে দাঁড়ালে। আহমদ মুসা আমাদের পরম শ্রদ্ধার, পরম সম্মানের, পরম আদরের।'

মারিয়া জোসেফাইন সোফা থেকে হঠাৎ ডঃ নাতালোভার পায়ের কাছে বসে পড়ল। দু'হাতে ডঃ নাতালোভার দু'হাঁটু পর্যন্ত জড়িয়ে ধরে তার উরুতে মুখ গুঁজে বলল, 'না, আমি আপনার মেয়ে থাকতে চাই। আহমদ মুসা অনেক অনেক বড়, কিন্তু আমি খুব সামান্য।'

ডঃ নাতালোভা মারিয়া জোসেফাইনকে বুকে টেনে নিল। বলল, 'না, তুমি সামান্য নও। সামান্য কেউ আহমদ মুসার সঙ্গী হতে পারে না। তিনি মুকুটহীন রাজা। রাজকন্যাই তার প্রাপ্য। আলহামদুলিল্লাহ, একজন নিখাদ রাজকন্যাই তিনি পেয়েছেন।'

লজ্জায় লাল হয়ে ওঠা মারিয়া জোসেফাইনকে ওলগা মায়ের কোল থেকে তুলে খাটে নিয়ে বসল। বলল, 'আর বোন নয়, ভাবী। বোন তবু আমার আছে, ভাবী নেই। ভাবী পেলাম এবার।'

সলাজ হেসে বলল, 'আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আমার যত ননদ হবে, তাদের সামাল দেব কি করে!'

ওলগা কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার মা ডঃ নাতালোভা তাকে বাঁধা দিয়ে বলল, 'ওলগা, ভাবী তোমার থাকছে, পরে বলো।' বলে ডঃ নাতালোভা মারিয়া জোসেফাইনের দিকে তাকাল এবং উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, 'তুমি যা বলেছ তাতে আহমদ মুসা এখন গ্রেট বিয়ারের হাতে বন্দী।'

'আমি তা-ই মনে করছি।'

'মনে করা কেন, নিশ্চিত জান না?'

'নিশ্চিত জানি না, কার্যকারণ থেকে মনে করছি।'

'ঘটনাটা খুলে বলবে মা? তোমার ঐ দশা কেন হয়েছিল, তাও কিন্তু আমরা জিজ্ঞেস করিনি।'

'ঐ ঘটনা বললে তাতেই সব এসে যাবে খালাম্মা।' বলে মারিয়া জোসেফাইন পুশকভ থেকে আহমদ মুসা ও মারিয়া জোসেফাইনের যাত্রা থেকে শুরু করে তার লেনিন হিলস-এ পৌঁছা পর্যন্ত সব কাহিনী খুলে বলল।

ডঃ নাতালোভা ও ওলগা বিস্ময় ও উদ্বেগ ভরা চোখে মারিয়া জোসেফাইনের কথা শুনল। তার কথা শেষ হলেও ডঃ নাতালোভা ও ওলগা কয়েক মুহূর্ত যেন কথা বলতে পারল না।

নীরবতা ভাঙল ডঃ নাতালোভা। বলল, 'আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তার খাস রহমত দিয়ে তোমাকে রক্ষা করেছেন। আর তুমি ঠিকই বলেছ, কার্যকারণ থেকে আহমদ মুসা ওদের হাতে পড়াই বোঝায়।'

বলে একটু থামল। তারপর বলল, ‘আল্লাহ তাকে সাহায্য করুন। তাদের হাতে পড়া শেষ কথা নয়। আহমদ মুসার জন্যে এটা নতুন ঘটনাও নয়। এখন বল, আহমদ মুসা ক্যাথারিনের ঘটনার সাথে জড়িয়ে পড়লেন কেন? তার কাছে কি এমন জিনিস আছে যা পাবার জন্যে গ্রেট বিয়ার মরিয়া হয়ে উঠেছে?’

‘সে অনেক কথা খালাম্মা।’ বলে মারিয়া জোসেফাইন প্রিন্সেস তাতিয়ানার সাথে আহমদ মুসার পরিচয়ের কথা, সুইজারল্যান্ডের ঘটনা, সেখানে প্রিন্সেস তাতিয়ানার মর্মান্তিক মৃত্যু, তাতিয়ানা কর্তৃক রাজকীয় আংটি ও ডায়েরী প্রিন্সেস ক্যাথারিনের হাতে পৌঁছানোর দায়িত্ব আহমদ মুসাকে দেয়া, তার ফ্রান্সে আগমন ও গ্রেট বিয়ারের সাথে সংঘাত শুরু হওয়া, প্রভৃতি সব কথা ডঃ নাতালোভাকে খুলে বলল।

মারিয়া জোসেফাইন কাহিনী বলা শেষ করলেও ডঃ নাতালোভা ও ওলগা অনেকক্ষণ কথা বলল না। বিস্ময়-বিমুগ্ধ তাদের দৃষ্টি। ধীরে ধীরে তাদের বিস্ময়-বিমুগ্ধ চোখে দুশ্চিন্তার ছায়া নেমে এল। বলল ওলগা, ‘ভাবী, আমি একজন দেশপ্রেমিক রাশিয়ান। কিন্তু তবু আমি বলব, একটা দায়িত্ব পালনের জন্যে পর্বতপ্রমাণ ঝুঁকি নেয়া তার ঠিক হয়নি। উনি কোন ‘লা-ওয়ারিশ’ মাল নন যে, ইচ্ছেমত যে সে তাকে ব্যবহার করবে।’

ওলগা কথা শেষ করার আগেই মারিয়া জোসেফাইন তার তর্জনী ওলগার ঠোঁটে চাপা দিয়ে বলল, ‘প্রিন্সেস তাতিয়ানাকে ‘যে’ ‘সে’র দলে ফেল না ওলগা। তাতিয়ানা মধ্য এশিয়ার মুসলমানদের বিপদে নিজের পিতাকে পর্যন্ত কুরবানী দিয়ে যে সাহায্য করেছে, কোন কিছু দিয়েই তার মূল্য আদায় হবে না।[১] সে আহমদ মুসাকে নিজেকে নিঃশেষ করে ভালোবেসেছে, কিন্তু কোন দাবি নিয়ে সে আহমদ মুসার কাছে দাঁড়ায়নি। সবশেষে যে গুলিটা আমার বুক বিদ্ধ করতো, সে গুলিটা প্রিন্সেস তাতিয়ানা নিজের বুকে নিয়ে তার ভাষায় ‘আহমদ মুসার

---

[১] এই কাহিনীর জন্যে সাইমুম সিরিজের ‘মধ্য এশিয়ায় কাল মেঘ’ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

প্রিয়তমা’কে রক্ষা করে তার ভালোবাসা কত বড় তার প্রমাণ দিয়েছে। সেই প্রিন্সেস তাতিয়ানার দেয়া দায়িত্ব পালন করতে কোন ত্যাগকেই আমাদের বড় করে দেখা উচিত নয়।’

‘বুঝলাম ভাবী। এ কাহিনী তোমার কাছে আরও শুনতে চাই।’

‘আমাদের প্রিন্সেস তাতিয়ানার জন্যে আমার গর্ব হচ্ছে। আহমদ মুসা তাতিয়ানাকে কি এই দৃষ্টিতে দেখে!’

‘অবশ্যই খালাম্মা। তাতিয়ানার মৃত্যুর পর নীরব অশ্রুতে তাকে ভাসতে দেখেছি। বলেছেন, ‘তাতিয়ানা শুধু দিয়েই গেল, নিল না কিছু।’’ বলল মারিয়া জোসেফাইন।

‘এখন আমাদের কি করণীয় আছে ভাবী? আহমদ মুসা ভাই শত্রুর হাতে পড়েছেন, এটা ধরে নিয়েই আমাদের কিছু করা দরকার কিনা?’ বলল ওলগা।

‘আমরা যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি, তাহলে কি করব, এ ব্যাপারে আমার প্রতি তার নির্দেশ ছিল, আমি যেন নির্দিষ্ট ঠিকানায় থাকি। তিনিই আমাকে খুঁজে নেবেন।’ বলল মারিয়া জোসেফাইন।

‘নির্দিষ্ট ঠিকানাটা কি?’ বলল ওলগা।

‘আমাদের এক শুভাকাঙ্ক্ষীর কাছ থেকে মস্কোর একটা ঠিকানা আমরা নিয়ে এসেছি। সে ঠিকানাতেই আমার ওঠার কথা।’

‘টেলিফোন নাম্বার আছে?’

‘আছে।’

‘টেলিফোন করে আপনার মস্কো উপস্থিতির কথা তাদের বলে রাখা যায়।’

‘দু’দিন আগে এ উদ্দেশ্যে আমি সেখানে টেলিফোন করেছিলাম। পাইনি। রেকর্ডেড রিপ্লাই থেকে জানলাম, কি এক কাজে হঠাৎ মস্কোর বাইরে যেতে হয়েছে ওদের।’

‘তাহলে?’

‘দু’একদিনের মধ্যে মস্কোর ফরাসী দূতাবাসে গিয়ে খোঁজ নেব। আহমদ মুসা ওখানেও কোন মেসেজ রাখতে পারে।’

ওলগা ও ডঃ নাতালোভা দু'জনেই মাথা নাড়ল। ডঃ নাতালোভা বলল, 'ঠিক মা, এটাই এখন প্রথম করণীয়।'

বলে একটু থেমে আবার শুরু করল, 'কিন্তু মা, তোমার চলাফেরা নিরাপদ নয়। গ্রেট বিয়ারের লোকরা পাগলা কুকুরের মত হয়ে আছে।'

'ঠিক বলেছেন খালাম্মা।'

'আমিও সাথে যাব মা। একটু ছদ্মবেশ নিতে হবে ভাবীকে। অসুবিধা হবে না, সুপার প্লাস্টিকের স্কিন মাস্ক ভাবীর রয়েছে।' বলল ওলগা।

'ঠিক বলেছে ওলগা। কোন অসুবিধা হবে না।' বলল মারিয়া জোসেফাইন।

ডঃ নাতালোভা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'যাই, স্টাডি রুমে একটু কাজ আছে।'

একটু থেমে ওলগাকে লক্ষ্য করে বলল, 'তুমি মারিয়াকে নিয়ে বাগানের দিক থেকে একটু বেড়িয়ে এস।'

'তার আগে আম্মা আমি আয়েশা আলিয়েভা আপাকে টেলিফোন করতে চাই।'

'বেশ।' বলে ডঃ নাতালোভা ঘরের দরজার দিকে পা বাড়াল।

'আয়েশা আলিয়েভা কে ওলগা?'

'হাসান তারিকের স্ত্রী। হাসান তারিককে চেন?'

'নাম শুনেছি। ফিলিস্তিন বিপ্লবে আহমদ মুসার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন।'

একটু থেমেই আবার বলল, 'নাম শুনে মনে হচ্ছে, আয়েশা আলিয়েভা সোভিয়েত মেয়ে। কি করে বিয়ে হলো?'

'আয়েশা আলিয়েভা উজবেক মেয়ে এবং অত্যন্ত প্রতিভাবান গোয়েন্দা অফিসার ছিলেন। হাসান তারিক সোভিয়েতদের হাতে বন্দী হয়ে আসেন ফিলিস্তিন থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে। আয়েশা আলিয়েভার উপর ভার পড়ে হাসান তারিককে সংশোধন অথবা জয় করে নেবার। কিন্তু আয়েশা তার প্রেমে পড়ে যান এবং ব্যর্থ হন। ব্যর্থতার দায়ে বন্দীশিবিরে পাঠানো হয় আয়েশা আলিয়েভাকে।' থামল ওলগা।

‘তোমার সাথে পরিচয় কিভাবে?’

‘আমার আম্মা যে বন্দীশিবিরের যে সেকশনে ছিলেন, সেখানেই নিয়ে যাওয়া হয় আয়েশা আলিয়েভা ও রোকাইয়েভা নামে আরেক মেয়েকে। তারপর অনেক কথা। আরেক দিন বলব। সংক্ষেপে ঘটনা হলো, আয়েশা আলিয়েভা ও রোকাইয়েভা আম্মার পরামর্শে সেখান থেকে পালান এবং আমাদের কাছে ছিলেন ফাতিমা ফারহানা আপা তাদের সরিয়ে না নেয়া পর্যন্ত।’[১]

‘সে সময় আহমদ মুসার সাথে সাক্ষাৎ হয়নি?’ বলল মারিয়া জোসেফাইন।

‘আহমদ মুসার মূল কেন্দ্র তখন মধ্য এশিয়া। রাশিয়াতেও এসেছেন। কিন্তু তার সাথে দেখা হওয়ার মত ততটা বড় কিংবা সৌভাগ্যবান আমরা ছিলাম না।’

‘তোমার এ কথাগুলো আহমদ মুসাকে আমি বলব। এখন চল, আয়েশা আলিয়েভাকে টেলিফোন করবে। এ দিকের খবরটা হাসান তারিকের জানা দরকার। মধ্য এশিয়ায় সাইমুম সহযোগিতায় আসতে পারে।’

ওলগা তার মায়ের রেখে যাওয়া মোবাইল টেলিফোন হাতে তুলে নিল।

মস্কোর ফরাসী দূতাবাসে মারিয়া জোসেফাইন তার আইডেন্টিটি কার্ড দেখাতেই তথ্য অফিসারটি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বাউ করল তাকে এবং তৎক্ষণাৎ সে ইন্টারকমে কথা বলল রাষ্ট্রদূতের সাথে।

কথা শেষ করেই বলল, ‘চলুন সম্মানিতা রাজকুমারী। রাষ্ট্রদূত আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।’

তথ্য অফিসারটি মারিয়া জোসেফাইন ও ওলগাকে সাথে নিয়ে এগিয়ে চলল।

---

[১] আয়েশা আলিয়েভা ও হাসান তারিকের কাহিনীর জন্যে সাইমুম সিরিজ-৫ ‘রক্তাক্ত পামির’ দ্রষ্টব্য।

রাষ্ট্রদূতের অফিসে পৌঁছার পর দেখা গেল, রাষ্ট্রদূতের পিএস দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে তাদের জন্যে।

রাষ্ট্রদূতের পিএস মারিয়া জোসেফাইনদের স্বাগত জানিয়ে রাষ্ট্রদূতের কক্ষের দরজা খুলে দিল।

মারিয়া জোসেফাইন এবং ওলগা প্রবেশ করল ঘরে।

রাষ্ট্রদূত উঠে দাঁড়িয়ে তাদের স্বাগত জানাল।

বসার পর কুশল জিজ্ঞাসা হলো রাষ্ট্রদূত ও মারিয়া জোসেফাইনের মধ্যে।

তারপর মারিয়া জোসেফাইন সরাসরি প্রশ্ন করল রাষ্ট্রদূতকে, 'সম্মানিত রাষ্ট্রদূত, আমার জন্যে কোন মেসেজ আছে কিনা?'

রাষ্ট্রদূত উত্তর দেবার আগে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে একবার ওলগা আরেকবার মারিয়া জোসেফাইনের দিকে তাকাল।

বুঝতে পেরে মারিয়া জোসেফাইন বলল, 'সম্মানিত রাষ্ট্রদূত, এ ওলগা নাতালোভা। ও আমার বোন, বন্ধুর মত। আমাদের কোন কিছু গোপন নেই ওর কাছে। আপনি সব কথাই বলতে পারেন।'

'ধন্যবাদ, সম্মানিতা প্রিন্সেস ডোনা জোসেফাইন। আপনার আব্বার কাছ থেকে একটা মেসেজ পেয়েছি আমরা।'

বলে একটা চিরকুট মারিয়া জোসেফাইনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'আপনি পড়ুন সম্মানিতা প্রিন্সেস। তারপর কথা আছে, বলব।'

মারিয়া জোসেফাইনের চোখে-মুখে উদ্বেগ।

দ্রুত সে চিরকুটটির উপর চোখ বোলাল। তাতে লেখা, 'মা ডোনা, বাবা আহমদ মুসা, খুব খারাপ অবস্থায় এরা রাখেনি। তবু এ জীবন অসহনীয়। একটা করে মুহূর্ত একটা যুগের মত। কবে এর ইতি হবে, কিংবা হবে না, কিছুই জানি না। সোভিয়েতরা সবচেয়ে বেশি অর্থের কাঙাল। এরই সুযোগ নিয়ে আমার বন্দীখানায় একজন উঁচু পর্যায়ের কর্মচারীকে, যে বাইরে যাতায়াত করে, আমার হীরের আংটি দিয়ে বশ করেছি। তার মাধ্যমেই চিঠিটি পাঠালাম। এখন থেকে প্রতি সোমবার বেলা এগারটায় টলস্টয় পার্কের টলস্টয় এভেনিউ-এর মাঝামাঝি

২১নং কালভার্টটির রেলিং-এ লাল জ্যাকেট ও নীল ফুলপ্যান্ট পরা একজন লোককে বসে থাকতে দেখবে। আর কালভার্টের দক্ষিণ গোড়ায় দক্ষিণমুখী হয়ে একটা ছোট নীল মাইক্রোকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবে। ঐ মাইক্রোতে উঠে বসলে লাল জ্যাকেটওয়ালা লোকটিও মাইক্রোতে উঠে বসবে। তার কাছেই প্রয়োজনীয় সব কথা শুনবে। পরে সে তোমাকে বা তোমাদের নেভিডিভিচ কনভেন্টের সামনে নামিয়ে দিয়ে চলে আসবে।'

চিরকুটের লেখা শেষে দস্তখত। দস্তখতটি ভালো করে পরীক্ষা করে দেখেও কোন ত্রুটি পেল না মারিয়া জোসেফাইন। এটা আব্বারই দস্তখত।

চিরকুটটি পড়ার পর তা ওলগার হাতে তুলে দিয়ে তাকাল রাষ্ট্রদূতের দিকে। বলল, 'চিঠি পড়লাম, বলুন এখন সম্মানিত রাষ্ট্রদূত।'

'দস্তখত সম্পর্কে বলুন সম্মানিত প্রিন্সেস।'

'দস্তখত আমার আব্বার।'

'আমরা এ মেসেজ পাবার পর ফ্যাক্সে তা আপনার প্যারিসের বাড়িতে পাঠিয়েছি। এ ছাড়া আমরা এ মেসেজ পাবার পর দু'টি সোমবার পেয়েছি। একটি মেসেজ পাওয়ার পরদিন, আরেকটা ছিল গতকাল। দু'দিনই আমরা আমাদের গোয়েন্দা এজেন্টদের পাঠিয়েছি রাস্তার দু'দিক থেকে ঠিক এগারটায় ঐ ২১নং কালভার্ট অতিক্রম করার জন্যে। যাতে তারা লাল জ্যাকেটওয়ালা লোকটি এবং তার গাড়িকে দেখতে পায়। তাদের উপর নির্দেশ ছিল, যদি তারা দেখতে পায়, তাহলে অনেক দূর থেকে তাকে অনুসরণ করে ওদের ঘাঁটিকে চিহ্নিত করবে। কিন্তু দু'দিনের একদিনও পাওয়া যায়নি সেই লোক এবং সেই গাড়ি। আমরা মনে করছি, আহমদ মুসা এবং আপনি গেলেই শুধু ঐ তাকে এবং সেই গাড়িকে ঐ অবস্থায় পাওয়া যাবে।'

মারিয়া জোসেফাইন তৎক্ষণাৎ কোন কথা বলল না। ভাবল অনেকক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'আহমদ মুসা নেই এ সময়। আমিই শুধু আছি। বলুন কি করণীয়।'

'আমাদের লক্ষ্য সম্মানিত প্রিন্স প্লাতিনিকে উদ্ধার। এই উদ্ধারের জন্যে প্রয়োজন ওদের ঘাঁটি চিহ্নিত হওয়া। গোয়েন্দা লাগিয়ে আমরা সেটাই

চেয়েছিলাম। হয়নি। এখন আমরা মনে করছি, সম্মানিতা প্রিন্সেস যদি যান, তাহলে ওরা থাকে কি না দেখা যেত। ওদের দেখা পেলেই তাদের অনুসরণ করার একটা সুযোগ হতো।'

'আপনার কথা বুঝেছি। চিঠিরও দাবি এটাই। কিন্তু আমি যাব কিনা সিদ্ধান্ত নেবার আগে একটা বিষয় জানা দরকার। সেটা হলো, আপনাদের গোয়েন্দা দল চিঠির বক্তব্য অনুসারে লাল জ্যাকেটওয়ালা এবং তার গাড়ির দেখা পেল না কেন?'

'সেটাই তো আমরা বুঝতে পারছি না। অবশেষে আমরা মনে করছি, সম্মানিত প্রিন্সেস গেলে চিঠির বক্তব্য সত্য হতে পারে।'

'কিন্তু গোয়েন্দা দল গেলে তা সত্য হলো না কেন? এ প্রশ্নের সমাধান না করে ওদিকে পা বাড়ানো আমি মনে করি বিপজ্জনক হবে।'

'কেন?'

'আপনার গোয়েন্দারা লাল জ্যাকেটওয়ালা ও তার গাড়িকে না পাবার তিনটি কারণ হতে পারে। এক, লাল জ্যাকেটওয়ালা ঐ দু'দিন কোন কারণে আসেনি। দুই, আপনার গোয়েন্দা দল ঠিক রিপোর্ট দেয়নি। এবং তিন, লাল জ্যাকেটওয়ালা এসেছিল, কিন্তু আপনার গোয়েন্দা দলের উপস্থিতি টের পেয়ে সরে পড়েছে। এখন দেখা দরকার, এ তিনটি কারণের কোনটি সত্যের সবচেয়ে কাছাকাছি হতে পারে।'

'ধন্যবাদ সম্মানিতা প্রিন্সেস। আমি আপনার সাথে একমত। কিন্তু এ তিনটি কারণের কোনটি সত্যের কাছাকাছি হতে পারে? প্রথমটি সত্য হওয়া স্বাভাবিক নয়। দ্বিতীয়টির সাথে সত্যের কোন দূরবর্তী সম্পর্কও নেই। এ দিক থেকে তৃতীয় কারণটি অপেক্ষাকৃত সত্যের কাছাকাছি হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, গোয়েন্দা দলের উপস্থিতি লাল জ্যাকেটওয়ালা টের পাবে কি করে?'

'টলস্টয় এভেনিউ-এর দুই প্রবেশ (অন্তত পার্কে) পথে পাহারা বসানো থাকলে টের পাওয়া কঠিন নয়।'

'এটা যদি সত্য হয়, তাহলে বলা যায় চিঠির মাধ্যমে ফাঁদ পাতা হয়েছে।'

'তা জানি না। কিন্তু এ রকম ধারণা করা অসংগত নয়।'

‘ধন্যবাদ সম্মানিতা প্রিন্সেস। আপনি ঠিক বলেছেন।’

বলে মুহূর্তকাল থামল রাষ্ট্রদূত। তারপর বলল, ‘তাহলে এখন কি করণীয় আমাদের?’

একটু ভাবল মারিয়া জোসেফাইন। বলল, ‘আগামী সোমবার সকাল আটটা-ন’টার দিকে টলস্টয় এভেনিউ-এর দু’প্রান্তে পাহারা বসাতে পারেন। যাদের দায়িত্ব হবে লাল জ্যাকেটওয়ালা লোক যখনই তার ছোট মাইক্রো নিয়ে টলস্টয় এভেনিউ-এর সেই কালভার্ট-এর দিকে যাবে, তখন দু’প্রান্ত থেকে তাকে ক্লোজ করে ধরে ফেলা অথবা তাকে অনুসরণ করা।’

মারিয়া জোসেফাইন থামতেই আনন্দে রাষ্ট্রদূত উঠে দাঁড়াল এবং হাসিমুখে মারিয়া জোসেফাইনকে বাউ করে বলল, ‘আমি আপনাকে অভিনন্দিত করছি সম্মানিতা প্রিন্সেস। আমাদের বুরবন রাজকুমারীর জন্যে আমি গৌরববোধ করছি। এই বুদ্ধিটা আমার এবং আমাদের গোয়েন্দাদের মাথায় আসেনি।’

‘ধন্যবাদ সম্মানিত রাষ্ট্রদূত।’

বলে একটু থামল। শুরু করল আবার, ‘আমাদের ধরে নিতে হবে, লাল জ্যাকেটওয়ালা যখন তার মাইক্রো নিয়ে টলস্টয় এভেনিউতে প্রবেশ করবে, তখন তাদের তরফ থেকেও এভেনিউ-এর দুই প্রান্তে পাহারা বসানো হবে। তাদের মোকাবিলায়ও প্রস্তুতি আমাদের থাকতে হবে। তবে আমার মতে, লাল জ্যাকেটওয়ালা টলস্টয় এভেনিউতে প্রবেশের সাথে সাথেই যদি তাকে দুই প্রান্ত থেকে ক্লোজ করা হয়, তাহলে ওদের পাহারায় মোতায়েন লোকরা সাহায্যে আসার সুযোগ পাবে না।’

‘সম্মানিতা প্রিন্সেস, আপনার পরামর্শ আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। আপনি সবদিক চিন্তা করেছেন। আমার মন বলছে, আমরা সফল হবো। ঈশ্বর সাহায্য করুন।’

‘আমিন। আমরা এবার উঠতে পারি?’ বলল মারিয়া জোসেফাইন।

‘সম্মানিতা প্রিন্সেসের ঠিকানাটা...।’ কথা সমাপ্ত না করেই থেমে গেল রাষ্ট্রদূত।

মারিয়া জোসেফাইন উঠে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে বলল, ‘আপনার গোয়েন্দারা তো অনুসরণ করবেই।’

রাষ্ট্রদূতও উঠে দাঁড়িয়েছে। অপ্রতিভ কণ্ঠে সে বলল, ‘মাফ করবেন সম্মানিতা রাজকুমারী। আমরা ঠিক মনে না করলেও দায়িত্ব হিসেবে অনেক কাজ করতে হয়।’

‘ধন্যবাদ। গোয়েন্দা পাঠানোর দরকার নেই।’

বলে একটা চিরকুট রাষ্ট্রদূতের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, ‘এই মোবাইল নাম্বারে খোঁজ করলে আমাকে পাবেন। শুধু আপনার ব্যবহারের জন্যে এটা।’

চিরকুটটি হাতে নিয়ে রাষ্ট্রদূত বলল, ‘অনেক ধন্যবাদ সম্মানিতা প্রিন্সেস।’

তারপর ওলগার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘অনেক ধন্যবাদ এই ভিজিটের জন্যে। আশা করি আসবেন আবার।’

‘ওয়েলকাম সম্মানিত রাষ্ট্রদূত। অনেক কিছু শিখেছি আপনাদের আলোচনায়।’

মারিয়া জোসেফাইন ও ওলগা দু’জনেই রাষ্ট্রদূতের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। রাষ্ট্রদূত দূতাবাসের ভেতরের গাড়ি বারান্দা পর্যন্ত এসে তাদেরকে বিদায় জানালো।

গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসল ওলগা। পাশের সিটে মারিয়া জোসেফাইন। গাড়িতে উঠেই মারিয়া জোসেফাইন সুপার প্লাস্টিকের স্কিন মুখোশটি পরে নিয়েছে।

গাড়ি বেরিয়ে এল দূতাবাসের গেট দিয়ে।

চলতে শুরু করল ওলগার গাড়ি।

‘ভাবী, আহমদ মুসা ভাইয়ের পছন্দকে আমি মোবারকবাদ জানাচ্ছি। তোমার কথা শুনে মনে হলো, তুমি আর এক আহমদ মুসা।’

‘তুমি সূর্যের সাথে মাটির প্রদীপের তুলনা করছ ওলগা।’

‘মাটির প্রদীপের সাথে সূর্যের কখনও মিলন হয় না ভাবী। আল্লাহ তা করেন না।’

‘থাক এসব কথা, এস সমস্যা নিয়ে ভাবি।’

‘তোমার ঠিকানা তুমি দূতাবাসে রাখলে না কেন? যে মোবাইলের নাম্বার তুমি দিলে, তা একটি সাংকেতিক নামে নেয়া এবং এর কোন গ্রাউন্ড অ্যাড্রেস নেই।’

‘শোন, দূতাবাসগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটা করে চিড়িয়াখানা। সবাই এখানে আমার বন্ধু নাও হতে পারে। এখানে রুশ সরকারের লোক যেমন থাকতে পারে, তেমনি থাকতে পারে গ্রেট বিয়ারের লোকও। তাদের হাতে আমার ঠিকানা যাওয়া কি ঠিক?’

‘ধন্যবাদ ভাবী। আমি এ দিকটা ভাবতেই পারিনি।’

বলে একটু থেমেই আবার শুরু করল, ‘আচ্ছা ভাবী, রাষ্ট্রদূত তোমাকে ‘ডোনা জোসেফাইন’ বলল কেন?’

হাসল মারিয়া জোসেফাইন। বলল, ‘আমার প্রকৃত নাম ‘মারিয়া জোসেফাইন লুই’ বটে, কিন্তু আমার ডাক নাম ‘ডোনা’। তাই সবাই আমাকে ‘ডোনা জোসেফাইন’ হিসেবেই জানে। আর রাজকীয় নাম ‘মারিয়া জোসেফাইন লুই’-এর চাইতে সাধারণ নাম ‘ডোনা জোসেফাইন’ আমার ভালো লাগে।’

‘কিন্তু ‘মারিয়া জোসেফাইন’ নাম হাজার গুণ বেশি ভালো লাগছে আমার কাছে।’

‘আহমদ মুসাও তা-ই বলেন।’

‘তুমি এখন কি বল?’

‘আমারও ভালো লাগতে শুরু করেছে।’ হেসে বলল ডোনা।

‘তোমার ডাক নামও ‘মারিয়া’ অথবা ‘জোসেফাইন’ হওয়া উচিত।’

‘কারণ?’

‘ডোনা নামটা হালকা, স্কুল ছাত্রীর জন্যে মানায়।’

‘ঠিক আছে, কোন নামেই আমার আপত্তি নেই।’

বলে একটু থেমেই আবার বলল, ‘এবার এস, সমস্যা নিয়ে আলোচনা করি।’

‘সোমবারে তো গোয়েন্দাদের রাষ্ট্রদূত সাহেব পাঠাচ্ছেন। আমাদের কি কিছু করণীয় আছে?’

‘চল আমরা টলস্টয় এভেনিউ দিয়ে ফিরি। দেখে যাই জায়গাটা। কিছু করার আছে কিনা বোঝা যাবে।’

‘ঠিক আছে।’

ছুটে চলল ওলগার গাড়ি।

পরবর্তী সোমবার।

সকাল দশটা।

সাদোভায়া রিং রোড-এর একটি মোটরসাইকেল ভাড়ার শপ থেকে একটা মোটরসাইকেল টলস্টয় পার্কে প্রবেশ করল। ছুটে চলল পার্কের অভ্যন্তরে।

কমিউনিস্ট আমলে পার্কে মোটরসাইকেল ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল। এখন সে আইন অনেকখানি শিথিল করা হয়েছে। এখন মহিলাদের জন্যে কিংবা মহিলা বা শিশু সাথে পুরুষদের জন্যে পার্কে মোটরসাইকেল ব্যবহার বৈধ করা হয়েছে।

মোটরসাইকেলটি পার্কের মাঝামাঝি জায়গায় টলস্টয় এভেনিউ থেকে একশ’ গজ পরিমাণ পশ্চিমে বৃত্তাকার ফুলগাছ থেকে সৃষ্ট ঝোপের পাশে এসে থামল।

মোটরসাইকেল থেকে প্রথমে নামল ডোনা। সে পেছনের সিটে ছিল। তারপর নামল ওলগা। সেই চালাচ্ছিল মোটরসাইকেল।

নামার পর ওলগা মোটরসাইকেল ঠেলে নিয়ে ফুলগাছের বৃত্তের মধ্যে রাখল। লক করল গাড়ি।

দু’জনের মাথায় মোটরসাইকেলের হেলমেট। হেলমেট খুলে ওরা মোটরসাইকেলে রেখে দিল।

ডোনা কিংবা ওলগা কাউকেই চেনার কোন উপায় নেই। দু'জনের মুখেই স্কিন মুখোশ। দু'জনেই খেলোয়াড়ী চেহারার আধা সুন্দরী চৌকস মহিলাতে পরিণত হয়েছে।

যে ঝোপে তারা মোটরসাইকেল রাখল, সেখান থেকে আরও কিছু পুবে আরেকটি ঝোপ দেখা যাচ্ছে। ঠিক ওটা ঝোপ নয়। বৃত্তাকার ঝাউগাছের সারি।

ডোনা ও ওলগা গুটি মেরে দ্রুত ঝাউগাছের সেই ঝোপের দিকে চলল।

উঁচু বৃক্ষের মোটা মোটা কাণ্ডের আড়াল নিয়ে নিয়ে তারা চলল।

ঝাউ গাছের আড়ালে পৌঁছে তারা দেখল, টলস্টয় এভেনিউ-এর ২১ নম্বর কালভার্ট ত্রিশ গজের মত দূরে। মাঝখানে কয়েকটা উঁচু বৃক্ষ। গাছের শাখা-প্রশাখা অনেক উপরে। তাই কয়েকটা মোটা কাণ্ড ছাড়া দৃষ্টিপথকে বাঁধা দেবার আর কিছু নেই।

ডোনা ও ওলগা কালভার্টের উপর চোখ রেখে ঝোপের আড়ালে অবস্থান নিল।

একুশ নম্বর কালভার্টটির মত আরও চল্লিশটি কালভার্ট আছে পার্কের মধ্য দিয়ে প্রলম্বিত টলস্টয় এভেনিউতে। কোনটারই প্রস্থ পঁচিশ-তিরিশ ফুটের বেশি নয়। কালভার্টগুলো আসলে ফ্লাইওভারের মত। পার্কে বেড়ানো মানুষদের রাস্তা ক্রস করতে না হয়, সে জন্যই এগুলি তৈরি হয়েছে। কালভার্টের নিচ দিয়ে পার্কের পায়ে চলা পথ, পাথর বিছানো।

ডোনা ও ওলগা যখন সেই ঝোপে ওঁৎ পেতে বসল, তখন বেলা সাড়ে দশটা।

ঠিক যখন বেলা ১০টা ৪০ মিনিট, তখন বিস্ময়ের সাথে ডোনা ও ওলগা লক্ষ্য করলো, টলস্টয় এভেনিউ দিয়ে চলমান একটা জীপ থেকে দু'জন লোক গড়িয়ে পড়ল রাস্তায়। তারপর রাস্তা থেকে নেমে এল পার্কে।

কালভার্ট থেকে সাত-আট গজ দূরের পাশাপাশি প্রায় দু'টি গাছের মোটা কাণ্ডের আড়ালে এসে তারা ঘাপটি মেরে বসল।

'ওরা কি গ্রেট বিয়ারের পক্ষ, না আমাদের পক্ষ?' বলল ওলগা ডোনার কানে কানে।

‘নিশ্চিত, ওরা আমাদের পক্ষ নয়।’

‘তাহলে তো দেখা যাচ্ছে, শত্রুপক্ষ রাস্তার দু’প্রান্তে পাহারা বসানো ছাড়াও বাড়তি লোক আজ নিয়োগ করেছে।’

‘বোঝা মুশকিল, গত দু’দিনও হয়তো ওরা ছিল এই ভাবে গাছের আড়ালে।’

‘হতেও পারে।’

আর কোন কথা না বলে হাতের ব্যাগ থেকে বন্দুকের কিছু পার্টস বের করল এবং সংযোজন করতে লেগে গেল।

সংযোজন শেষ হলে দেখা গেল, খাট ব্যারেলের একটি স্বয়ংক্রিয় রাইফেল।

রাইফেলটি তাক করলো ডোনা ২১নং ব্রীজের দিকে।

ঠিক সকাল সাড়ে দশটায় একটা নীল মাইক্রোকে দক্ষিণ দিক থেকে একুশ নাম্বার কালভার্টের দিকে আসতে দেখা গেল। তার পঞ্চাশ গজ পেছনেই আর একটা জীপ।

মাইক্রো একুশ নাম্বার কালভার্টের গোড়ায় পৌঁছল, তখন উত্তর দিক থেকে আরেকটা জীপ তার প্রায় পঞ্চাশ গজ সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

ডোনা ফিস ফিস করে ওলগাকে বলল, ‘আমাদের গোয়েন্দাদের টাইমিং চমৎকার। ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় মাইক্রোকে ঘিরে ফেলেছে।

‘ঐ দু’দিন ঐ নীল মাইক্রো এল না, আজ আসার ব্যাখ্যা কি?’ বলল ওলগা।

‘মাইক্রোটিকে যদি এইভাবে সংগে সংগে ফলো না করে সেই এগারটার নির্ধারিত সময়ে দু’দিক থেকে দুটো গাড়ি একুশ নাম্বার কালভার্টের দিকে আসত, তাহলে মাইক্রোটিকে এইভাবে পেত না।’

‘কোথায় যেত?’

‘এই প্রশ্নের জবাব আমার কাছে এখনও স্পষ্ট নয় ওলগা।’

ডোনা ও ওলগা কথা বলছিল কিন্তু তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল মাইক্রোটির দিকে।

মাইক্রোটি দাঁড়িয়ে পড়েছে একুশ নাম্বার কালভার্টের দক্ষিণ গোড়ায়।

দু'দিক থেকে দু'টি জীপ এভেনিউ-এর একই লেন ধরে মাইক্রোর দিকে আসছিল।

এতক্ষণে মাইক্রো তার বিপদ টের পেয়ে গেছে।

মাইক্রোটির মাথা বোঁ করে পশ্চিম দিকে ঘুরে গেল এবং দ্রুত এভেনিউ থেকে কালভার্টের গোড়া ঘেঁষে পশ্চিমপাশে পার্কে নেমে এল।

পার্কের পৃষ্ঠদেশ থেকে এভেনিউ উঁচু প্রায় পাঁচ ফুট, তবে কালভার্টের জায়গায় উচ্চতা প্রায় সাত ফুটের মত।

পার্কের মাটিতে নেমেই মাইক্রোটি আবার পুব দিকে ঘুরে কালভার্টের নিচে প্রবেশ করতে যাচ্ছিল।

ডোনা দ্রুত বলল, 'ওলগা, তোমার প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেছে। আগের দুই সোমবার মাইক্রোটি শত্রুর গতিবিধির খবর পেয়ে এইভাবে কালভার্টের তলায় লুকিয়ে ছিল।'

'ঠিক বলেছেন ভাবী।'

মাইক্রোটি পুব দিকে টার্ন নিতেই দক্ষিণ দিক থেকে আসা জীপ থেকে একটা গুলি মাইক্রোর সামনের চাকা গুঁড়িয়ে দিল।'

মাইক্রোটি আর এক ইঞ্চিও সামনে না এগিয়ে বসে পড়ল।

দু'দিক থেকে দুই জীপই তখন কালভার্টটির দু'পাশের গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে।

টায়ার ফুটো হওয়া মাইক্রোবাসটি বসে পড়তেই মাইক্রোর ড্রাইভিং সিটের দরজা খুলে গেল। লাল জ্যাকেটওয়ালা একজন লোক ড্রাইভিং সিট থেকে লাফিয়ে পড়েই উবু হয়ে দৌঁড় দিল এবং এসে আশ্রয় নিল সেই দু'টি গাছের আড়ালে।

রিভলভার হাতে নেমে পড়েছিল দুই জীপ থেকে চারজন।

তারা গাড়ি থেকে নামার সাথে সাথে গাছের আড়ালে পুব থেকে লুকানো লোক দু'টি ব্রাশফায়ার করল সেদিক লক্ষ্য করে।

জীপ থেকে নামা লোক চারজন সংগে সংগে জীপে উঠে গেল।

ঠিক এই সময়ই টলস্টয় এভেনিউ-এর দু'দিক থেকে দু'টি মাইক্রো ছুটে এল।

জীপ দু'টির কাছাকাছি এসে ওরা ব্রাশফায়ার করল জীপ দু'টিকে লক্ষ্য করে।

জীপ দু'টি থেকে কোন পাল্টা গুলি হলো না।

ডোনা বলল, 'গোয়েন্দা চারজন আত্মরক্ষার কৌশল নিয়েছে। মনে হয় তাদের কাছে রিভলভার ছাড়া কোন অস্ত্র নেই।'

মাইক্রো দু'টি থেকে দু'জন দু'জন করে চারজন লোক নেমে এল। ওদের হাতে স্টেনগান।

নেমেই স্টেনগানধারী চারজনের দু'জন পকেটে হাত দিয়ে বের করল ক্রিকেট বলের মত গোলাকৃতি একটা কাল বস্তু।

আঁৎকে উঠল ডোনা। বলল, 'সর্বনাশ, ওরা গ্রেনেড চার্জ করতে যাচ্ছে জীপে। জীপসমেত চারজন গোয়েন্দাই ধ্বংস হয়ে যাবে।'

সময় নষ্ট করেনি ডোনা। কথা বলতে বলতেই রাইফেল তাক করল প্রথমে দক্ষিণের জনকে। 'বিসমিল্লাহ' বলে প্রথম গুলি ছুঁড়েই দ্রুত ব্যারেল উত্তরের লোকটির দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে আরেকটা গুলি ছুঁড়ল।

গ্রেনেডধারী দু'জনের হাত গ্রেনেডসহ মাথা পর্যন্ত উঠেছিল জীপ দু'টি লক্ষ্যে। সে পর্যন্তই। হাত দু'টি আর এগোতে পারল না। দু'জনের মাথাই গুঁড়ো হয়ে গেল দু'টি গুলিতে।

তাদের সাথী দু'জন স্টেনগানধারী পশ্চিম দিকে একবার তাকিয়েই দ্রুত উঠে গেল গাড়িতে এবং গাড়ির কভার নিয়ে স্টেনগান তুলল। ফায়ার করল লক্ষ্যহীনভাবে।

এদিকে পেছন থেকে গুলির শব্দ শুনেই গাছের আড়ালে দাঁড়ানো তিনজন ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। তাদের মধ্যে ছিল আতংকিত ও বিমূঢ় ভাব। তারা যেন গুলির ঠিক লোকেশনটা চিহ্নিত করতে পারছিল না। তাদের সামনেও অনেকগুলো গাছ এবং তারপর ঝাউ-এর ঝোপ।

দ্বিতীয় গুলিটি করেই ডোনা রাইফেলের ব্যারেল ঘুরিয়ে নিয়েছিল এই তিনজন লোকের দিকে। তিনজনের মুহূর্তকালের সিদ্ধান্তহীনতার সুযোগ গ্রহণ করলো ডোনা। পর পর গুলি করল দু'টি দুই স্টেনগানধারীর লক্ষ্যে। বসা অবস্থাতেই দু'জন বুকে গুলিবিদ্ধ হয়ে ছিটকে পড়ল গাছের পাশে।

লাল জ্যাকেটধারী উঠে দৌঁড় দিয়ে পালাচ্ছিল। ডোনা তার পায়ে গুলি করল তাকে জীবন্ত ধরতে হবে এই লক্ষ্যে।

গুলি খেয়ে লোকটি পা চেপে ধরে গড়াগড়ি দিতে লাগল।

এ সময় রিভলভারের দু'টি গুলির শব্দ শুনল মাইক্রো দু'টির দিক থেকে।

ওদিকে তাকাল ডোনা ও ওলগা। দেখল, মাইক্রোর খোলা দরজা দিয়ে লাফিয়ে পড়ছে অবশিষ্ট স্টেনগানধারী দু'জন। তাদের হাতে স্টেনগান নেই।

উত্তরের জন লাফিয়ে পড়ার সাথে সাথেই হ্যান্ড গ্রেনেডের বিস্ফোরণ হলো। উড়ে গেল তার দেহ।

আর দক্ষিণের জন নিচে লাফিয়ে পড়ে বাম হাত দিয়ে ডান হাত চেপে ধরে দৌঁড় দিচ্ছিল পালাবার জন্যে। মাইক্রোর আড়াল থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসা দু'জন গোয়েন্দা তাকে ধরে ফেলল এবং টেনে তাকে জীপে তুলল।

তিনজন গোয়েন্দা ছুটে এল আহত হয়ে পড়ে থাকা লাল জ্যাকেটওয়ালার কাছে।

ডোনা এবং ওলগাও বেরিয়ে এসেছিল ঝোপের আড়াল থেকে। কয়েক ধাপ সামনে এগিয়ে গোয়েন্দাদের লক্ষ্য করে ফরাসী ভাষায় বলল, 'ধরা পড়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে ও নিশ্চয় পটাসিয়াম সায়ানাইড জাতীয় কিছু খেয়েছে। আপনারা তাড়াতাড়ি যান। দেখুন ঐ বন্দীর যাতে এই একই পরিণতি না হয়।'

কথা শুনেই দু'জন ছুটল গাড়ির দিকে। একজন দাঁড়িয়ে থাকল। তার মাথা নিচু। ডোনার দিকে একটা বাউ করে বিনীত কণ্ঠে বলল, 'মহামান্যা প্রিন্সেস, আমরা কৃতজ্ঞ। আমাদের চারজনের জীবন আপনি রক্ষা করেছেন।'

'আপনি এ কথা চিনে বলছেন, না না-চিনে বলছেন?'

'আমাদের বুরবন প্রিন্সেস পাঁচ ফিট সাত ইঞ্চি লম্বা এবং তার ফরাসী উচ্চারণ সম্রাজ্ঞী জোসেফাইনের মত।'

‘ধন্যবাদ।’ বলে ডোনা ওলগার দিকে চেয়ে বলল, ‘চল, আমরা ফিরি মোটরসাইকেলের স্থানে।’

ডোনা হাঁটতে শুরু করেছে। ওলগাও।

হাঁটতে হাঁটতে বলল, ‘বুঝলাম না, গোয়েন্দা অফিসার ‘বুরবন প্রিন্সেস’ বলল কেন?’

‘আমাদের রাজবংশকে ‘হাউজ বুরবন’ বলা হয়।’

‘আর সম্রাজ্ঞী জোসেফাইন নেপোলিয়নের স্ত্রী, তাই না?’

‘হ্যাঁ।’

টলস্টয় পার্ক পার হয়ে ওলগা মোটরসাইকেল ছেড়ে যখন সাদোভায়া রিং রোডে পার্ক করা নিজেদের গাড়িতে উঠল, তখন ওলগা বুক ভরে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, ‘এতক্ষণে স্বস্তি বোধ করছি। মনে হচ্ছে, মায়ের মুখ তাহলে দেখতে পাব।’

‘কেন, আর কারও মুখ দেখতে ইচ্ছে হয় না?’

‘ওটা বিজ্ঞাপন দিয়ে বলার মত নয় ভাবী।’

‘তাহলে আছে নাকি?’

‘বলব না। তোমাকে আমার সাথে থাকতে হবে এবং তা আবিষ্কার করতে হবে।’

‘চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম।’

‘ঠিক আছে।’ ওলগার মুখে দুষ্টু হাসি।

# ৬

হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের ভূ-গর্ভস্থ গ্রাউন্ড ফ্লোরে ভিআইপি লিফট থেকে নামল এক মুখোশধারী। তার পেছনে সামরিক পোশাক পরা দু'জন প্রহরী। তাদের হাতে লেটেস্ট মডেলের ক্ষুদ্রাকৃতি মেশিনগান। এ বহুমুখী মেশিনগান এক মিনিটে পাঁচশ গুলি বর্ষণ করতে পারে।

মুখোশধারীর পরনে রাজকীয় পোশাক। জাররা যে পোশাক পরতো সেই পোশাক। পায়েও সেই রাজকীয় জুতা।

লিফট থেকে নেমে পেছনে না তাকিয়েই মাথা সোজা রেখে নির্দেশ দিল, 'লিফট লক করা হয়েছে?'

কথা হুংকারের মত শোনাল।

পেছনের প্রহরীদের একজন বাউ করে বলল, 'মহামান্য প্রভু আইভান, আমি নিজ হাতে লক করেছি।'

'এটাও লক করে দাও।'

বলে সামনে পা বাড়াল মুখোশধারী। তার হাঁটার স্টাইলও রাজকীয়।

তার পেছনে পেছনে দু'জন নিরাপত্তা গার্ড। হ্যান্ড মেশিনগানের ট্রিগারে তাদের হাত। একজন হাঁটছে সামনে তাকিয়ে আর একজন পেছন ফিরে।

মুখোশধারী যাচ্ছে প্রিন্সেস ক্যাথারিনরা যেদিকে আছে, সেদিকে। সে গিয়ে প্রবেশ করল ক্যাথারিনদের করিডোরে। দাঁড়াল গিয়ে প্রিন্সেস ক্যাথারিনের দরজায়।

দরজার ডিজিটাল লকের নির্দিষ্ট বোতামে নক করল মুখোশধারী। খুলে গেল দরজা।

ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে বই পড়ছিল প্রিন্সেস ক্যাথারিন। দরজা খুলে যাওয়া দেখে সোজা হয়ে বসেছে সে।

প্রথমেই তার চোখ গিয়ে পড়ল মুখোশধারীর উপর। মুখের সোনালী মুখোশ ছাড়া সবটা পোশাকই 'আইভান দি টেরিবল' মানে জার চতুর্থ আইভানের মত।

চমকে উঠল প্রিন্সেস ক্যাথারিন। এই কি তাহলে গ্রেট বিয়ারের প্রধান! যে 'আইভান দি টেরিবল' সেজে বসেছে!

মুখোশধারীর কণ্ঠে ধ্বনিত হলো, 'ক্যাথারিন, বেরিয়ে এস।'

বিস্মিত হলো ক্যাথারিন, কথা বলার স্টাইল জারদের মত। যেন কোন যাত্রা গানে কেউ জারের অভিনয় করছে।

ধীরে ধীরে বিস্ময়ের স্থান ক্রোধ এসে দখল করল। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে প্রিন্সেস ক্যাথারিন বলল, 'শিষ্টতা বজায় রেখে কথা বললে খুশি হবো।'

মুখোশধারীর কণ্ঠে আগের মতই ধ্বনিত হলো, 'ক্যাথারিন, বেরিয়ে এস।'

'ভালো ভাবে কথা বলুন। আমি জনৈক ক্যাথারিন নই, ক্রাউন প্রিন্সেস ক্যাথারিন।'

'আমি আইভান, আমি নিজে ডাকছি, এটাই যথেষ্ট।'

'শৃগাল সিংহের মুখোশ পরলেই সিংহ হয় না। সে শৃগালই থাকে।'

হুংকার দিয়ে উঠল মুখোশধারী আইভান। যেন পাওয়ারফুল লাউডস্পীকারে কেউ চিৎকার করে উঠল। বলল, 'আমার সাথের এরা তোমার গায়ে হাত দিতে পারলে খুশি হবে। সেটাই করবো, তুমি বেরিয়ে না আসলে।'

'কোথায় বেরুবো?'

'তোমার গুরুজন প্লাতিনির ঘরে। কিছু কথা বলব তোমাদের দু'জনকে।'

প্রিন্সেস ক্যাথারিন রাজকীয় পদক্ষেপে বেরিয়ে এল।

ইতোমধ্যে আইভান মিঃ প্লাতিনির ঘর আনলক করেছিল।

মিঃ প্লাতিনি সোফায় বসেছিল। চমকে উঠল মুখোশধারী রাজবেশের আইভানকে দেখে।

প্রিন্সেস ক্যাথারিন গিয়ে বসল মিঃ প্লাতিনির পাশে।

আইভান ঘরে প্রবেশ করে প্লাতিনির পড়ার টেবিলের উপর বসল চেয়ারের উপর পা রেখে। যেন ওটাই তার সিংহাসন। সে কথা বলল আবার সেই লাউডস্পীকার মার্কা যান্ত্রিক সুরে।

বলল, 'প্লাতিনি, তোমার সাথে আইভানের মহান রাশিয়ার কোন বিরোধ নেই। লড়াই আমাদের আহমদ মুসার সাথে। তোমার মেয়ে তাকে বিয়ে করে সেও উচ্ছন্নে গেছে। আহমদ মুসা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করেছে। প্যারিসে সে আমাদের কয়েক ডজন লোককে হত্যা করেছে। রাশিয়াতেও এ ক'দিনে আমাদের প্রায় ডজনখানেক লোক তার হাতে প্রাণ দিয়েছে। আমরা আর এক মুহূর্তও ক্ষেপণ করতে চাই না।'

বলে আইভান একটা কাগজ এগিয়ে দিল প্লাতিনির দিকে।

কাগজটি হাত পেতে নিয়ে তাতে নজর বোলাতে লাগল প্লাতিনি, পড়ল সেঃ

"বাবা আহমদ মুসা। আমি মৃত্যুর মুখোমুখি। আজ সন্ধ্যার মধ্যে যদি তুমি মস্কোর বেসরকারী রেডিওতে তোমার আত্মসমর্পণের ঘোষণা না দাও এবং রাতের মধ্যে যদি আত্মসমর্পণ না কর, তাহলে ওরা আমাকে হত্যা করবে। অনেক চেষ্টা করেছ, আমাকে মুক্ত করতে পারনি। শত ডজন হত্যা করেও আমাকে মুক্ত করতে পারবে না। সুতরাং সন্ধ্যার মধ্যেই সিদ্ধান্ত নাও, তুমি কি করবে।"

পড়া শেষ করে মুখ তুলল প্লাতিনি।

আইভানের কণ্ঠ যান্ত্রিক স্বরে বলল, 'আমার বন্দীখানার সব ঘরেই ভিডিও রেকর্ডের ব্যবস্থা চালু আছে। তুমি কাগজের লেখাগুলো পড়ে যাও প্লাতিনি। তোমার কথা রেকর্ড হয়ে যাবে এবং আধা ঘণ্টা পরে মস্কোর বেসরকারী টিভি চ্যানেলে তা প্রচারিত হবে বার বার।'

'আমি এটা পড়ব না।'

'আমি দ্বিতীয় বার আদেশ করব না।'

বলে গ্লাভস ঢাকা হাত দিয়ে পকেট থেকে বের করল অস্বাভাবিক আকৃতির একটা রিভলভার। বলল, 'এটা থেকে গুলি বের হয় না প্লাতিনি। বের হয় ভয়ানক শক্তিশালী বৈদ্যুতিক ক্যাপসুল। এ ক্যাপসুল লোহার বর্মও ভেদ

করে, কিন্তু শরীরের চামড়া ভেদ করে না, বরং তাকে কামড়ে ধরে থাকে। যতক্ষণ কামড়ে ধরে থাকবে, শরীরে বিদ্যুৎ প্রবাহ বইবে। মৃত্যু যন্ত্রণা বোধ হবে, কিন্তু মৃত্যু হবে না।'

বলে আইভান রিভলভার তুলল প্লাতিনিকে লক্ষ্য করে।

প্রিন্সেস ক্যাথারিন আইভানকে বাঁধা দিয়ে বলল, 'নামাও রিভলভারের নল।'

তারপর প্লাতিনির দিকে ফিরে তার হাত দু'টি চেপে ধরে বলল, 'চাচাজান, আপনি বিবৃতিটি পড়ে ফেলুন।'

'না মা, আহমদ মুসাকে এদের হাতে তুলে দেব না। আমার বেঁচে থাকার কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু মজলুম মানুষের স্বার্থে তাকে বাঁচতে হবে।'

'চাচাজান, আপনি একটা বিবৃতি পড়ছেন, আহমদ মুসাকে এদের হাতে তুলে দিচ্ছেন না। আমি আহমদ মুসাকে যতটুকু দেখেছি, তাতে জানি, আপনার এ বিবৃতি তার অ্যাকশনকে জোরদার করবে, তাকে তার পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না।'

প্লাতিনি তাকাল প্রিন্সেস ক্যাথারিনের দিকে। প্লাতিনির মুখ তখন সহজ হয়ে উঠেছে।

তারপর সে চোখ ফেরাল আইভানের দিকে। বলল, 'আচ্ছা, পড়ছি তোমার বিবৃতি।'

বলে প্লাতিনি খুব স্বাভাবিক কণ্ঠে বিবৃতিটি পাঠ করল।

'ধন্যবাদ প্লাতিনি।' পাঠ শেষ হলে প্লাতিনিকে লক্ষ্য করে বলল আইভান।

কথা শেষ করেই আইভান, আর একটি কাগজ তুলে ধরল প্রিন্সেস ক্যাথারিনের সামনে।

কাগজটি হাতে নিল ক্যাথারিন।

কাগজে লেখা আছে পড়ল প্রিন্সেস ক্যাথারিনঃ

"আমি ক্রাউন প্রিন্সেস ক্যাথারিন রুশ জাতির নতুন ত্রাতা আইভানের কাছে স্বেচ্ছায় আশ্রয় নিয়েছি। কেরনস্কী জুনিয়রের সরকার শাসনতান্ত্রিক

রাজতন্ত্রের নামে রাজপরিবারকেও বিদেশী শক্তির লেজুড় করার যে উদ্যোগ নিয়েছে, তার সাথে আমি নেই। কেরনস্কী সরকার বিদেশী এজেন্ট ও ক্রাউন প্রিন্সেস তাতিয়ানাকে হত্যাকারী এবং অতি মূল্যবান রাজ-সম্পদ দখলকারী আহমদ মুসাকে লেলিয়ে দিয়েছে আমার পেছনেও। আমাকে সিংহাসনে বসানোর অজুহাতে জারদের শত শত বছরের ধনভাণ্ডার আত্মসাৎ করতে চায় সরকারের গুটিকতক লোক। এই ষড়যন্ত্র বানচাল করার জন্যে আমি রুশ জনগণের প্রতি উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।"

পড়া শেষ হলে মুখ তুলল প্রিন্সেস ক্যাথারিন। তার মুখমণ্ডল শক্ত এবং চোখে আগুন। বলল, 'ভণ্ড আইভান, মনে করেছ জনগণের উদ্দেশ্যে আমি এটা পড়ব, তাই না?'

'অবশ্যই তুমি এটা পড়বে এবং এখনি।'

'তুমি ভণ্ড আইভান সেজেছ, অভিনয় করছ জারদের। কিন্তু তুমি রাজপরিবারকে আসলেই চেন না।'

'চিনি কিনা দেখাচ্ছি।' বলে আইভান তার রিভলভারের নল স্থির করল প্রিন্সেস ক্যাথারিন লক্ষ্যে।

প্লাতিনি চোখের পলকে উঠে প্রিন্সেস ক্যাথারিনকে আড়াল করে বলল, 'আমি বেঁচে থাকতে প্রিন্সেস ক্যাথারিনের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।'

হো হো করে হেসে উঠল আইভান। বলল, 'আরো ভালো হলো। ক্যাথারিনের চেয়ে তোমার গায়ে বিদ্যুৎ চালালেই ক্যাথারিনকে দ্রুত রাজি করানো যাবে।'

বলে আইভান আবার তার রিভলভারের নল তুলল প্লাতিনিকে লক্ষ্য করে। আইভানের তর্জনী যাচ্ছিল রিভলভারের ট্রিগার স্পর্শ করতে।

চিৎকার করে উঠল প্রিন্সেস ক্যাথারিন। কিছু বলতে যাচ্ছিল ক্যাথারিন চিৎকার করে। ঠিক এই সময়েই মেশিনগান গর্জন করে উঠল বাইরে। আকস্মিক সেই শব্দে চমকে উঠল ঘরের সবাই। আইভানও।

সে লাফ দিয়ে মেঝেতে নামল। বিড়ালের মত এগোতে লাগল দরজার দিকে।

নিকোলাস বুখারিন তার বন্দী কক্ষে প্রথম কয়েক দিন ঘুমিয়েই কাটিয়েছে। আইভানের হুমকি বা ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তাই করেনি। বরং আহমদ মুসাকে বন্দী করার পর দু'জনকে একসাথে শাস্তি দেবে, এই ঘোষণায় খুশি হয়েছে নিকোলাস বুখারিন। এখন আর আহমদ মুসাকে তার শত্রু মনে হয় না। মনে হয়, আহমদ মুসাই ন্যায়ের পক্ষে রয়েছে। আহমদ মুসা যদি রাজকীয় আংটি এবং রাজকীয় ডায়েরী প্রিন্সেস ক্যাথারিনের কাছে পৌঁছাতে পারে এবং ক্যাথারিনের মাধ্যমে যদি রাশিয়ায় শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্র কায়েম হয়, তাহলে তাতেই রাশিয়ার কল্যাণ হবে।

এই মানবিক পরিবর্তনের পর নিকোলাস বুখারিন নতুন করে ভাবতে শুরু করল, তাকে বাঁচতে হবে এবং তাকে এখান থেকে বেরুতে হবে। কিন্তু কিভাবে? এই পথ সন্ধানই তার এখন সর্বক্ষণের চিন্তা হয়ে দাঁড়াল।

সেই যে দরজা বন্ধ হয়েছে আর খোলা হয়নি। খাবার আসে দরজার স্লাইডিং উইন্ডো দিয়ে।

বুখারিন জানে, এই কক্ষের সব কথা, সব দৃশ্য টিভি ক্যামেরার মাধ্যমে রেকর্ড হচ্ছে।

নিকোলাস বুখারিন টিভি ক্যামেরার চোখ খুঁজে পেয়েছে। ইচ্ছে করলে সে ক্যামেরার চোখে এখন কাগজ লাগিয়ে টিভি ক্যামেরার ছবি ও সাউন্ডের রিলে বন্ধ করে দিতে পারে। কিন্তু নিকোলাস বুখারিন চিন্তা করেছে, শত্রুপক্ষকে হঠাৎ হুঁশিয়ার করায় লাভ নেই। প্রয়োজনে এই কৌশল কাজে লাগানো যাবে।

নিকোলাস বুখারিন জানে, বন্দীখানার কথা রেকর্ড হয়ে যেমন বাইরে যায়, তেমনি বাইরের বিভিন্ন রুমের কথা বন্দীখানায় আসতে পারে। মাত্র একটা সুইচ অন করতে হয় এবং সে সুইচটি কক্ষের কোন না কোন জায়গায় রয়েছে।

নিকোলাস সে সুইচ অনেক খুঁজেছে, কিন্তু পায়নি।

আজ নাস্তার পর নতুন এক দফা খুঁজতে শুরু করল সে।

খুঁজতে খুঁজতে দরজার ডিজিটাল কী-বোর্ডের পাশে কালো চৌকাঠে একটা কালো বোতামের সন্ধান পেল। এর অবস্থান দেখে মনে হচ্ছে, দরজার ডিজিটাল কী-বোর্ডের সাথে চৌকাঠের এই কালো বোতামটির সম্পর্ক নেই।

তাহলে এ বোতামটি কি?

বোতামে চাপ দিল নিকোলাস বুখারিন।

চাপ দেয়ার সংগে সংগেই ছাদের দিক থেকে কথা ভেসে আসতে শুরু করল।

নিকোলাস বুখারিন চমকে ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকাল ছাদের দিকে। আশ্বস্ত হলো, টেলিভিশন ক্যামেরার সাথে রাখা নীরব স্পীকার এখন সরব হয়ে উঠেছে।

আর নিকোলাস বুখারিনের চমকে উঠার কারণ, যে কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে সে কণ্ঠটি আইভান দি টেরিবলের।

আইভানের প্রথম যে কথা নিকোলাস বুখারিন শুনতে পেল তাতে আইভান প্রিন্সেস ক্যাথারিনকে তার কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসতে বলছে।

মুখোশধারী সোনালী মোড়কের কাল শয়তান আইভান কি এখানে এসেছে? প্রিন্সেসকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

নিকোলাস বুখারিন উৎকর্ণ হলো স্পীকারের দিকে।

শুনতে লাগল আইভান ও ক্যাথারিনের মধ্যেকার উত্তপ্ত কথোপকথন।

ক্যাথারিন ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হওয়া, ক্যাথারিনকে প্লাতিনির ঘরে নিয়ে যাওয়া, প্লাতিনিকে অনিচ্ছাকৃত বিবৃতি দিতে বাধ্য করা- এ পর্যন্ত শুনতেই নিকোলাস বুখারিনের সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল ক্রোধে। এই আইভানকে আর এক ইঞ্চিও এগোতে দেয়া যায় না। কিন্তু ঘর থেকে বেরুবে কেমন করে?

হঠাৎ নিকোলাস বুখারিনের মনে পড়ল, সেদিন বন্দীখানায় নিয়ে আসার আগে সার্চ করা হয়নি তাকে। কোন আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে সেই হলে প্রবেশ বৈধ নয়। এ কারণেই তাকে সার্চ করার প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু সেদিন তার পকেটে সদ্য সংগ্রহ করা কলমাকৃতির সুপার ম্যাগনেটিক টর্চ ছিল। এই টর্চ অন করলে অর্থাৎ সুইচ টিপে কলমের মাথা থেকে প্লাস্টিক কভার সরিয়ে নিলে যে ম্যাগনেটিক রেডিয়েশন হয়, তা একটি নির্দিষ্ট আওতার মধ্যে যে কোন ইলেকট্রনিক ব্যবস্থাকে

নিষ্ক্রিয় করে দেয়। নিকোলাস বুখারিন ভাবল, সুপার ম্যাগনেটিক টর্চ ডিজিটাল লকের ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা নিষ্ক্রিয় করে দেয়ার অর্থ লকিং সিস্টেম স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাওয়া অর্থাৎ আনলক হয়ে যাওয়া।

আনন্দে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল নিকোলাস বুখারিনের।

ঠিক এ সময় আইভান প্রিন্সেস ক্যাথারিনকে হুমকি দিয়ে বলছিল, 'অবশ্যই তুমি এটা পড়বে এবং এখনি।'

নিকোলাস দ্রুত গিয়ে পকেট থেকে সুপার ম্যাগনেটিক টর্চ বের করে আনল এবং টর্চটি অন করে এগোলো দরজার ডিজিটাল লকের দিকে।

সুপার ম্যাগনেটিক টর্চ ডিজিটাল লকের উপর সেট করার পর মাত্র কয়েক সেকেন্ড। দরজা কিঞ্চিত কেঁপে উঠে ঢিলা হয়ে গেল।

অতি সন্তর্পণে দরজা খুলল নিকোলাস বুখারিন। কিন্তু এরপরও শব্দ হয়েছিল বোধ হয়।

নিকোলাস বুখারিন সামনে চোখ পড়তেই দেখল, পশ্চিম দিক থেকে যে করিডোরটি তাদের সামনের উত্তর-দক্ষিণ করিডোরে এসে পড়েছে, তার মুখে পশ্চিমমুখী হয়ে ওঁৎ পেতে থাকা হ্যান্ডমেশিনগানধারী একজন বোঁ করে ঘুরে দাঁড়াল এবং তার মেশিনগানটি বিদ্যুৎ বেগে উঠে এল বুখারিনের লক্ষ্যে।

নিকোলাস বুখারিন জানে, কোমরে ব্ল্যাক বেল্ট এবং মাথায় কাল হেলমেট পরা সামরিক পোশাকের এ লোকেরা আইভানের পার্সোনাল স্কোয়াডের লোক। মারা এবং মরা ছাড়া আর কোন শিক্ষা এদের নেই।

নিকোলাস বুখারিন তার সামনে সাক্ষাৎ মৃত্যুকে দেখতে পেল। সৈনিক সে, মৃত্যুকে ভয় করে না। কিন্তু আফসোস, ভণ্ড আইভানকে শাস্তি দেয়া হলো না।

হ্যান্ড মেশিনে শব্দ হলো সামনে থেকে।

নিজেকে মৃত্যুর হাতে সঁপে দিয়ে চোখ বন্ধ করলো নিকোলাস বুখারিন।

মস্কোর ভোর রাত। লেনিন হিলস-এর পাদদেশ।

এখানে এসে মস্কোভা নদী 'ইউ' টার্ন নিয়েছে।

'ইউ'-এর দুই বাহুর ঠিক মধ্যতলায় হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের ঠিক নাম বরাবর সামনে মস্কোভা নদীর কূল ঘেঁষে একটা ওয়াটার প্ল্যান্ট।

এই ওয়াটার প্ল্যান্টটি এক সময় তৈরি হয়েছিল হেরিটেজ ফাউন্ডেশন অর্থাৎ সাবেক লুবিয়াংকা কারাগারের এই অংশটিতে পানি সরবরাহের জন্যে। মস্কোতে পানি সরবরাহের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা হওয়ার পর এই প্ল্যান্ট বন্ধ রাখা হয়েছে।

জাগরণ ক্লান্ত নগরী যেন এ সময় একেবারেই অচেতন। মস্কোভা নদীর দক্ষিণ বরাবর রাস্তাটিতে একটি গাড়িও চোখে পড়ছে না।

মস্কোভা নদীর বুকেও কোন কম্পন নেই। বরফে সাদা হয়ে আছে মস্কোভার বুক।

মস্কোভা নদীর কমসোমল ব্রীজের গোড়ায় আহমদ মুসা গাড়ি থেকে নামল।

পাভলভের সাথে হ্যান্ডশেক করে পাভলভ ও রোসা দু'জনকেই লক্ষ্য করে বলল, 'তোমাদের আপাতত কোন কাজ নেই।'

'মাফ করবেন স্যার, আপনার প্রোগ্রাম কি?' বলল পাভলভ।

'গ্রেট বিয়ারের ঘাঁটিতে প্রবেশ ছাড়া আর কিছু আমার মাথায় নেই। সেখানে প্রিন্সেস ক্যাথারিন আছে, মিঃ প্লাতিনি আছে, এটা আমি জানি না। আমার এই প্রবেশ বলতে পার অনুসন্ধানমূলক।'

'আমাদের প্রতি কোন নির্দেশ স্যার?'

'তোমরা ব্রীজের উত্তর গোড়ায় অপেক্ষা করতে পার।'

বলে আহমদ মুসা পাভলভের সাথে আবার হ্যান্ডশেক করে পা বাড়াল হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের রাস্তার দিকে।

পাভলভ ও রোসা দু'জনেই আহমদ মুসার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। আহমদ মুসা দৃষ্টির আড়াল হতেই রোসা বলল, 'সত্যি পাভলভ, একে যতই দেখছি, অতীতের ধারণা পাল্টে যাচ্ছে। একজন বিপ্লবী এত মানবিক, এত হৃদয়বান হতে পারেন!'

‘পারেন রোসা, যদি তিনি স্রষ্টার হয়ে কাজ করেন। স্রষ্টা সকলের বলে তিনিও সকলের হয়ে যান।’

‘আমাদের সৌভাগ্য পাভলভ।’

‘অবশ্যই।’

‘এ ধরনের লোকের জন্যে এবং তার নির্দেশে হাসিমুখে জীবন দেয়া যায়।’

‘এ কারণেই তো আহমদ মুসার বাহিনী অজেয়।’

‘এখানে যে উনি একা?’

‘একা কোথায়? গোটা মধ্য এশিয়া ওর। রাশিয়াতেই যত মুসলমান আছে, সব তার কর্মী। প্রয়োজন এখনও হয়নি বলে কারও সাহায্য উনি নেননি।’

‘এখন বল আমরা কি করব? সরকারী দায়িত্ব অবশ্যই আমাদের পালন করতে হবে।’

‘অবশ্যই।’

বলে পাভলভ পকেট থেকে সিগারেট লাইটারের মত ক্ষুদ্র ওয়্যারলেস সেট বের করল। সেটটি অন করে মুখের কাছে নিয়ে বলল, ‘আমি পাভলভ। বরিসভ ইউনিট।’

একটু থামল। ওপারের কথা শুনল। তারপর বলল, ‘খবর আছে স্যার। আহমদ মুসা গ্রেট বিয়ারের হেডকোয়ার্টার হেরিটেজ ফাউন্ডেশনে প্রবেশ করেছে।’

একটু থেমে ওপারের কথা শুনে বলল, ‘ঠিক আছে।’

পাভলভ ওয়্যারলেস অফ করে দিয়ে বলল, ‘কি করণীয়, পরে জানাচ্ছে। বস বললেন, এটা দারুণ খবর। এ খবর যাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে, সেখান থেকে প্রেসিডেন্ট কেরনস্কী জুনিয়রের কাছে, তারপর সিদ্ধান্ত আসবে।’

চারদিক ফর্সা হয়ে গেছে। পুব দিগন্ত লাল হয়ে উঠেছে।

পাভলভ গাড়ি ড্রাইভ করে কমসোমল ব্রীজটির উত্তর গোড়ায় গিয়ে পার্ক করলো।

রোসা সিটে গা এলিয়ে বলল, ‘খুব খারাপ লাগছে পাভলভ, আমরা যে সরকারী গোয়েন্দা- এটা আহমদ মুসাকে না জানিয়ে আমরা তার সাথে প্রতারণা করছি।’

‘আমরা প্রতারণা করছি না, সরকার করছে। আমরা হুকুমের চাকর।’

‘আহমদ মুসা কি কিছুই বুঝতে পারেনি?’

‘তিনি বুঝতে পারেননি, একথা বলা মুশকিল। কিন্তু বুঝেছেন, এমন কিছু প্রমাণ তিনি দেননি।’

পাভলভের ওয়্যারলেস হাত ঘড়ির সময় জ্ঞাপনের মত দু’বার শব্দ করে উঠল।

আহমদ মুসার অ্যাসাইনমেন্টে আসার পর পাভলভ ও রোসা এই প্রথম সরকারী কল পেল। বরিসভ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, পাভলভ ও রোসাই শুধু কল করবে, কোন কল তাদের কাছে আসবে না।

পাভলভ ওয়্যারলেস তুলে নিল কানের কাছে। শুনল ওপারের নির্দেশ এক মিনিট ধরে। তারপর ‘গুডবাই, স্যার’ বলে ওয়্যারলেস অফ করে দিল।

রোসা উন্মুখ হয়ে উঠেছিল ওপারের নির্দেশ শোনার জন্যে।

পাভলভ ওয়্যারলেস পকেটে রেখে বলল, ‘প্রেসিডেন্ট নির্দেশ দিয়েছেন, হেরিটেজ ফাউন্ডেশন পুলিশকে ঘেরাও করে হেরিটেজ ফাউন্ডেশনে প্রবেশের জন্যে।’

রোসার মুখ ম্লান হয়ে গেল। বলল, ‘আহমদ মুসার ক্ষতি হবে না এতে?’

পাভলভের মুখও ম্লান হয়ে গেল। বলল, ‘আমি জানি না সরকারী এই অভিযানের টার্গেট কি কি!’

‘আমার খুব খারাপ লাগছে পাভলভ। সরকার আহমদ মুসাকে কি দৃষ্টিতে দেখে, বল তো?’

‘সরকার প্রিন্সেস ক্যাথারিনকে উদ্ধারে আহমদ মুসার সহযোগিতা চায়। উদ্ধারের পর তার প্রতি সরকারের মনোভাব কি দাঁড়াবে, তা বলা মুশকিল।’ পাভলভ থামল।

রোসা কোন কথা বলল না।

পাভলভ রোসার ভারি মুখের দিকে চেয়ে তার একটা হাত হাতে নিয়ে বলল, ‘রোসা, আহমদ মুসাকে ছোট করে দেখো না। উনি গ্রেট বিয়ারকেও চেনেন, সরকারকেও চেনেন।’

রোসা মুখে ম্লান হাসি টেনে বলল, ‘তা-ই যেন হয় পাভলভ। প্রিন্সেস ক্যাথারিনকে উদ্ধার করতে এসে তিনি যেন বিপদে না পড়েন।’

ওদিকে আহমদ মুসা পাভলভ ও রোসার কাছে বিদায় নিয়ে মস্কোভা নদী তীরের রাস্তা ধরে এগোলো হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের দিকে।

কিছুটা এগোবার পর আহমদ মুসা রাস্তা ছেড়ে দিয়ে নেমে গেল নদীর কিনারে।

হাতের প্যাকেট থেকে গামবুট বের করে তাতে দু’পা ঢুকিয়ে নিয়ে নদী-কিনারের বরফের উপর দিয়ে হেঁটে চলল আহমদ মুসা।

হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের সামনের ওয়াটার প্ল্যান্টের বরাবর এসে সে এক মুহূর্ত দাঁড়াল, তারপর নদীর কিনার ধরে আরও পশ্চিমে এগিয়ে গেল।

অল্প কিছু যাওয়ার পর নদীর কিনার থেকে ক্রলিং করে তীরে উঠল। তীরে রাস্তার উত্তর পাশ ঘেঁষে একটা ছোট মাইক্রো দাঁড়িয়েছিল। মাইক্রোটির জানালায় হালকা শেডের কাঁচ।

আহমদ মুসা গাড়ি আনলক করে ড্রাইভিং সিটে উঠে সব ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করে আবার গাড়ি লক করে নেমে গেল নদীর কিনারে। ফিরে চলল আবার ওয়াটার প্ল্যান্টের দিকে।

দাঁড়াল কিছুক্ষণ ওয়াটার প্ল্যান্টের পাইপ ঘেঁষে।

ওয়াটার প্ল্যান্টের মোটা স্টীলের পাইপ এখনও আগের মতই ওয়াটার প্ল্যান্ট থেকে বেরিয়ে নদীতে ডুবে আছে।

ওয়াটার প্ল্যান্টের পাথরের তৈরি ঘরটি বেশ বড়। তবে এ ঘরে যন্ত্রপাতি কিছুই নেই। ঘরটি ব্যবহৃত হতো ওয়ার্কিং অফিস হিসেবে। যন্ত্রপাতির মূল এস্টাবলিশমেন্ট রয়েছে ভূগর্ভে।

কিন্তু বিল্ডিং-এর ইতিহাস ও ডিজাইন পরীক্ষা করে আহমদ মুসা জেনেছে, ওয়াটার প্ল্যান্টের কভারে এটা হলো গোপন প্যাসেজ যা দিয়ে হেরিটেজ

ফাউন্ডেশনের ভূগর্ভস্থ অংশ দিয়ে ঐখানে যাতায়াত করা যায়। হেরিটেজ ফাউন্ডেশন যখন লুবিয়াংকার অংশ ছিল, এ গোপন প্যাসেজ দিয়ে মারাত্মক সব রাজবন্দীদের কারাগারে নেয়া হতো, আবার বের করা হতো।

কমিউনিস্ট সরকারের পতনের পর এবং সোভিয়েত সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ার পর লুবিয়াংকা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং লুবিয়াংকার এ অংশ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে লীজ দেয়া হয়। সে সময় ভূগর্ভস্থ এই প্যাসেজ সীল করে দেয়া হয়।

আহমদ মুসা এই পথেই হেরিটেজ ফাউন্ডেশনে প্রবেশের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ পথে গিয়ে প্রথমেই পাওয়া যাবে হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের বন্দীখানা যেখানে প্রিন্সেস ক্যাথারিন এবং মিঃ প্লাতিনি বন্দী থাকার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।

ওয়াটার প্ল্যান্টের অফিস কক্ষের এক পাশ দিয়ে ভূগর্ভস্থ যন্ত্রপাতির কক্ষে নামার সিঁড়ি আছে। কিন্তু এ কক্ষের সাথে হেরিটেজ ফাউন্ডেশনে ঢোকার আন্ডারগ্রাউন্ড প্যাসেজের কোন সম্পর্ক নেই।

ওয়াটার প্ল্যান্টের যে মোটা পাইপটা নদীতে নেমে গেছে, তার নিচ দিয়ে তিন ফুট প্রশস্ত পাথর বিছানো একটা প্লেট ওয়াটার প্ল্যান্টের পাইপের গোড়া থেকে পানি পর্যন্ত ধাপে ধাপে নেমে গেছে।

পাইপের গোড়ায় যেখান থেকে পাথর বিছানো প্লেট বের হয়েছে, সেখানে বিল্ডিং –এর ডিজাইনে আহমদ মুসা দেখেছে দুই বর্গফুটের একটা উইন্ডো। এটাই হেরিটেজ ফাউন্ডেশনে প্রবেশের সুড়ঙ্গে ঢোকার পথ।

আহমদ মুসা পাইপের নিচ দিয়ে একটু উবু হয়ে পাথর বাঁধানো ধাপ বেয়ে পাইপের গোড়ায় গিয়ে বসল। দেখল, প্যাসেজের সেই মুখ, দুই বর্গফুটের উইন্ডোটি, কনক্রিট ওয়াল দিয়ে বন্ধ করা।

আহমদ মুসা পরীক্ষা করল এই ওয়াল অরিজিন্যাল কিনা। কিংবা পরবর্তীকালে এই দেয়াল তুলে প্যাসেজ বন্ধ করা হয়েছে কিনা। এবং এই প্যাসেজ বা সুড়ঙ্গ পথটি যখন চালু ছিল, তখন এটা কি দিয়ে বা কিভাবে বন্ধ রাখা হতো, এ বিষয়টাও আহমদ মুসা বুঝতে চেষ্টা করল।

টর্চের আলো ফেলে গভীরভাবে পরীক্ষা করে আহমদ মুসা বুঝল, এই দেয়াল পরবর্তীকালে তৈরি করা নয়। যখন প্যাসেজ ও আশপাশের দেয়াল তৈরি হয়েছে, তখনই তৈরি এই দেয়াল।

আর দেয়ালটির চারপাশ পরীক্ষা করে দেখল, দেয়ালটির দুই পাশ ও উপরের প্রান্তের সাথে তার পাশের দেয়ালের স্পষ্ট বিচ্ছেদ রেখা রয়েছে। কিন্তু তলার প্রান্তে সেই বিচ্ছেদ রেখা নেই। মনে হয় যেন দেয়ালটি মেঝের অভ্যন্তর থেকে উঠে এসেছে।

আহমদ মুসার মুখে হাসি ফুটে উঠল। সে নিশ্চিত হলো, এমন একটি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা আছে, যে ব্যবস্থায় প্রয়োজনে দেয়ালটি মেঝের ভেতরে ঢুকে যায়, আবার বন্ধও করা যায়। এবং এই ব্যবস্থা দেয়ালের এপারে-ওপারে দু'দিকেই থাকা স্বাভাবিক।

আহমদ মুসা শেডের আড়াল দেয়া এলাকায় টর্চের আলো ফেলে তিল তিল করে খুঁজল আশপাশ, উপর-নিচে গোটা দেয়াল। কিন্তু সন্দেহ করার মত কোথাও কিছু পেল না।

হতাশ হলো আহমদ মুসা।

দেয়ালের উপরের অংশে চোখ বোলাতে গিয়ে পাইপের গোড়ায় চোখ গেল আহমদ মুসার।

স্টীল পাইপের গোড়ার এক ফুট পরিমাণ অংশ কালো রং করা। পানি পর্যন্ত অবশিষ্ট অংশের রং সাদা।

পাইপের এই ব্যতিক্রমটা প্রথম আহমদ মুসার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

এই কালো অংশে চোখ বোলাতে গিয়ে আহমদ মুসা দেখল, পাইপ যেখান থেকে বেরিয়ে এসেছে সেই দেয়াল থেকে এক ফুট পর্যন্ত পাইপের নিচের অংশ স্ফীত হয়ে উঠেছে। দেখলে মনে হয়, তৈরির সময় বাড়তি লোহার একটা স্তূপ সেখানে জমে গেছে। অথবা কোন কারণে পুরু করে সিমেন্ট লাগিয়ে দেয়া হয়েছে পাইপে।

পাইপের স্ফীত অংশ বেশ এবড়ো-থেবড়ো। এর উপর আহমদ মুসা অনেকটা অলসভাবেই চোখ বোলাচ্ছিল।

আহমদ মুসার চোখে পড়ল একটা বড় ধরনের স্ক্রু। তারও রং কালো। আহমদ মুসার মনে হলো, স্ক্রুটা পাইপের স্ফীত অংশকে পাইপের সাথে আটকে রাখার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। স্ক্রুর মাথা একটু বেরিয়ে আছে। যেন সবটা ভেতরে বসানো হয়নি। স্ক্রুটা লুজ হয়ে আছে কিনা তা দেখার জন্যেই আহমদ মুসা স্ক্রুর মাথায় তর্জনী দিয়ে চাপ দিল।

চাপ দেয়ার সংগে সংগেই স্ক্রুটি স্প্রিং এর মত নিচে বসে গেল। আর সেই সাথেই আহমদ মুসা বিস্ময় ও আনন্দের সাথে দেখল, প্যাসেজের বন্ধ দরজাটা খুলে গেছে।

আহমদ মুসা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল এবং গ্যাস মাস্ক পরে ঢুকে গেল প্যাসেজটিতে।

প্যাসেজের মুখ ছোট হলেও ভেতরটা বেশ প্রশস্ত। দাঁড়ানো যায়।

প্যাসেজের মেঝে এবং দেয়াল, ছাদ সবই পাথরের। ভেতরটা অন্ধকার।

আহমদ মুসা টর্চ জ্বেলে প্যাসেজের মুখ বন্ধ করার সুইচ খুঁজল। এটা পেতে বিলম্ব হলো না।

মুখের পাশেই প্যাসেজের দেয়ালে পাথর রং-এর ছোট চারকোণা একটা জায়গা। দেয়ালের লেভেল থেকে অপেক্ষাকৃত নিচু।

আহমদ মুসা আঙুল দিয়ে তার উপর চাপ দিতেই পাথর রং-এর প্লাস্টিক প্লেটটি দেয়ালের ভেতর সরে গেল। বেরিয়ে পড়ল একটা সুইচ। সুইচটা অফ করতেই প্যাসেজের মুখ বন্ধ হয়ে গেল।

আহমদ মুসা পকেট থেকে হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের ডিজাইন বের করে আর একবার দেখল। প্যাসেজটা একেবারে সোজা এগিয়ে হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের ভূগর্ভস্থ বটম ফ্লোরের উত্তর দেয়ালের পশ্চিম প্রান্তে গিয়ে ঠেকেছে।

আহমদ মুসা সেই প্রান্তে গিয়ে পৌঁছল।

প্যাসেজের মুখে আগের মতই একটি দেয়াল।

দেয়ালটি অরিজিন্যাল, না পরে তৈরি, রং দেখে তা ঠিক করতে পারলো না আহমদ মুসা। তবে বুঝল, পরে তৈরি হলে এমন মসৃণ হতো না। অবশেষে

আরেকটা জিনিস চোখে পড়ায় আহমদ মুসা নিশ্চিত হলো, দেয়ালটি অরিজিন্যাল এবং আগের দরজার মতই নিয়ন্ত্রণযোগ্য।

দেয়ালের শীর্ষ অংশে দেয়ালের লেভেল থেকে অল্প নিচু চারকোণা দেয়াল রংয়ের একটা প্লাস্টিক বোর্ড। আগেরটার মতই বোর্ডের নিচে সুইচ আছে, আহমদ মুসা মনে করল।

দু'আঙুল দিয়ে চাপ দিয়ে বোর্ড সরিয়ে ফেলল আহমদ মুসা। কিন্তু ভেতরটা দেখে হতাশ হলো সে। সুইচের বদলে সেখানে কম্বিনেশন লক। তিন সারিতে তিনটি করে নয় পর্যন্ত নাম্বার চিহ্নিত নব রয়েছে। প্রত্যেকটির পাশে একটি করে ঘর খালি। অর্থাৎ বোর্ডে মোট আঠারোটি ঘর রয়েছে। এই আঠারোটি ঘরেই নাম্বার চিহ্নিত নবকে ঘোরানো যায়।

সাংঘাতিক জটিল এই কম্বিনেশন লক। একটি সারিতে তিনটি নাম্বার মিললেও দরজা খুলতে পারে। আবার দু'লাইন বা তিন লাইন মেলানোরও প্রয়োজন হতে পারে। তাছাড়া কম্বিনেশন হরাইজেন্টাল অথবা ভার্টিক্যালও হতে পারে।

গোলকধাঁধাঁয় পড়ে গেল আহমদ মুসা। ঘড়িতে দেখল, সকাল সাতটা।

আহমদ মুসার ইচ্ছা, ভোরের দিকে বন্দীখানায় সে প্রবেশ করবে। এ সময় অপেক্ষাকৃত নিরাপদ হতে পারে।

আহমদ মুসা বসে পড়ল প্যাসেজের মেঝেতে। চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ ভাবল। কিন্তু কোন কূলকিনারা পেল না।

বসে থেকেই আহমদ মুসা টর্চ জ্বালিয়ে এলোপাথাড়ি আলো ফেলছিল প্যাসেজে এবং প্যাসেজের মুখের দেয়ালে।

হঠাৎ আহমদ মুসার চোখে পড়ল, প্যাসেজ-মুখের দেয়ালে পাশাপাশি তিনটি তারকা। দেয়াল রং-এর কারণে দেয়ালের সাথে প্রায় মিশে আছে।

তিনটি তারকার একটি মজার ব্যাপার আহমদ মুসার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তিন তারকার প্রথমটির মাথা চারটি, দ্বিতীয়টির পাঁচটি এবং তৃতীয়টির ছয়টি।

এখানে এমনভাবে তিনটি তারা কেন? না হয় থাকল। কিন্তু তিন তারকা তিন রকম কেন? হেরিটেজ ফাউন্ডেশনে প্রবেশের মুখে দাঁড়ানো এই দেয়ালের এই তিন তারা কি পরিকল্পিত? কোন কিছুর ইংগিত দিচ্ছে কি এই তারা?

লাফ দিয়ে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়ালো। তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

আহমদ মুসা দাঁড়ালো গিয়ে কম্বিনেশন লকের সামনে। পাশাপাশি তিনটি অংকের প্রথমে নিয়ে এল চার, দ্বিতীয় অংকে নিয়ে এল পাঁচ এবং তৃতীয় অংকের স্থানে নিয়ে এল ছয়।

তিনটি অংক পাশাপাশি সম্পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে সুড়ঙ্গ মুখের দেয়াল সরে গেল।

আহমদ মুসা মনে করছিল, কনক্রিটের প্রলেপ দেয়া দু'ইঞ্চি স্টীলের এই দেয়াল সরে যাবার পর কনক্রিটের আরেকটা স্তুপ থাকবে। কিন্তু আহমদ মুসা বিস্মিত হলো, স্টীলের দেয়াল সরে যাবার পর সাদা কার্পেট মোড়া করিডোর পাওয়া গেল। তার অর্থ সুড়ঙ্গ পথ শেষ। সে এখন প্রবেশ করতে যাচ্ছে হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের বন্দীখানায়।

আহমদ মুসা নিজেকেই প্রশ্ন করল, হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের ইতিহাসে আছে, লুবিয়াংকা বন্ধ করে দিয়ে যখন একে বেসরকারী হাতে লীজ দেয়া হয়, তখন সুড়ঙ্গ পথ সীল করে দেয়া হয়, এর অর্থ তাহলে কি? ভাবল আহমদ মুসা আবার, তাহলে কি গোপন প্যাসেজ বা সুড়ঙ্গ পথে প্রবেশ ও বের হওয়ার নির্দেশিকা নষ্ট করে দেয়া হয়েছে এবং একেই কি সীল করে দেয়া বোঝানো হয়েছে! হতে পারে।

আহমদ মুসা সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে পা রাখল আলোকোজ্জ্বল করিডোরে।

আহমদ মুসা এই বন্দীখানার ডিজাইন এতবার দেখেছে যে, সবটা তার চোখের সামনে ভাসছে। বন্দীখানার ভিআইপি অংশ একেবারে পুবে।

সেদিকেই আহমদ মুসা এগোলো।

কোথাও কোন প্রহরী দেখলো না।

আহমদ মুসা ভাবল, অতি আত্মবিশ্বাসী গ্রেট বিয়ার সুরক্ষিত বন্দীখানায় তাহলে প্রহরী রাখার প্রয়োজন বোধ করেনি।

আহমদ মুসা এগোবার সময় দু'পাশে বন্ধ কক্ষ দেখল। বাম পাশে লিফট রুমও দেখল। তার বিপরীত বন্ধ ঘরটিও দেখল।

আরও পুবে এগোলো আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা লিফট রুমের চত্বরটি পার হয়ে সামনে এগোবার সঙ্গে সঙ্গে লিফট রুমের বিপরীত দিকের কক্ষটির দরজা নিঃশব্দে খুলে গেল। বিড়ালের মত বেরিয়ে এল একসাথে চারজন প্রহরী। তাদের প্রত্যেকের হাত স্টেনগানের ট্রিগারে।

চারজনের চোখ-মুখ থেকে বিস্ময়-বিমূঢ় ভাব কাটেনি। সম্ভবত তারা বিস্মিত হয়েছিল লিফট দিয়ে না এসে অকল্পনীয় এক দিক থেকে আহমদ মুসাকে আবির্ভূত হতে দেখে।

সতর্ক আহমদ মুসা অবশেষে পেছনের পদশব্দ টের পেল। ঘুরে দাঁড়িয়েই দেখল, চারটি স্টেনগানের মুখে দাঁড়িয়ে সে।

চার স্টেনগানধারীর দূরত্ব আহমদ মুসা থেকে চার গজের মত।

আহমদ মুসা মুহূর্তের জন্যে বিমূঢ় হয়ে পড়ল। বন্দীখানায় প্রহরী থাকতে পারে, এটা সত্যিই সে মনে আনেনি।

চার স্টেনগানধারী পাথরের মত।

আহমদ মুসা বুঝল, নির্দেশ পালন ছাড়া অন্য কোন বিবেচনা ওদের কাছে নেই।

ওদের চারজনের তর্জনী স্টেনগানের ট্রিগারে। ওদের মুখভাবের দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। দৃঢ় হচ্ছে তাদের মুখের মাংসপেশী এবং কঠোর হয়ে উঠছে তাদের চোখ।

আহমদ মুসার কাছে পরিষ্কার, এটা গুলি করার পূর্ব মুহূর্ত।

এ সময় আহমদ মুসা করিডোরের পশ্চিম প্রান্তে কালো কাপড়ে আবৃত এক ছায়ামূর্তিকে এগিয়ে আসতে দেখল। তার হাতে হ্যান্ড মেশিনগান।

আহমদ মুসা বুঝতে পারল না, কালো মূর্তিটি শত্রু না মিত্র!

আহমদ মুসার ভাবনা শেষ হবার আগেই কালো কাপড়ের ছায়ামূর্তি তার ডান হাত তুলে ইশারায় আহমদ মুসাকে শুয়ে পড়তে বলল।

আহমদ মুসা পেছন দিকে এই ইশারার প্রতি তার দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিল।

চার স্টেনগানধারী সম্ভবত এ বিষয়টি টের পেয়ে পেছনে কেউ এসেছে এই চিন্তায় তাদের চকিত দৃষ্টি পেছন দিকে ফিরে গিয়েছিল।

আহমদ মুসা সুযোগ নষ্ট করেনি।

নিজের দেহটাকে এই সুযোগে ছুঁড়ে দিয়েছিল মাটিতে।

ওদিকে ছায়ামূর্তি এরই অপেক্ষা করছিল। তার হ্যান্ড মেশিনগান সঙ্গে সঙ্গেই অগ্নি বৃষ্টি করল।

চার স্টেনগানধারী মুহূর্তের মধ্যে ঝাঁঝরা শরীর নিয়ে আছড়ে পড়ল মাটিতে।

রুশ সরকারের পুলিশ বাহিনীর সর্বোচ্চ প্রধানের নেতৃত্বে প্রায় শ'খানেক পুলিশ এসে হেরিটেজ ফাউন্ডেশন ঘেরাও করে ফেলল।

হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের গেট বন্ধ।

পুলিশপ্রধান নির্দেশ দিল কামান দেগে গেট ভেংগে ফেলতে। তা-ই করা হলো।

ধ্বসে পড়া গেট দিয়ে পুলিশের একটা দল ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিল।

কিন্তু মেশিনগানের গুলি বৃষ্টি তাদের সামনে দেয়াল হয়ে দাঁড়াল।

গুলি করতে করতে পুলিশের দলটি পিছু হটে এল।

এই সময় হেরিটেজ ফাউন্ডেশনকে ঘিরে দাঁড়ানো পুলিশের উপর গুলি বর্ষণ শুরু হলো বিল্ডিং-এর এক তলা, দু'তলা ও তিন তলার ঘুলঘুলি ধরনের জানালা দিয়ে।

আকস্মিক এ আক্রমণে ক্ষতি হলো পুলিশের। উন্মুক্ত ময়দানে দাঁড়ানো পুলিশরা শেল্টার নেবার কোন জায়গা পেল না। বাধ্য হয়ে হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের চারধারে দাঁড়ানো পুলিশকে নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে হলো।

অভিজ্ঞ পুলিশপ্রধান পুলিশের আর্টিলারী ইউনিটকে নির্দেশ দিল, বিল্ডিং-এর চারদিকের দেয়ালে চারটা সুড়ঙ্গ সৃষ্টি করতে।

নির্দেশ অনুসারে কামান দেগে বিল্ডিং-এর চার পাশের চার দেয়ালে চারটি সুড়ঙ্গ সৃষ্টি করা হলো। তারপর কামানের অগ্নিবৃষ্টির আড়ালে পুলিশরা সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে প্রবেশ করল বিল্ডিং-এ।

এরপর মূল গেটে গ্রেট বিয়ারের প্রতিরোধ অনেকটা কমে এল।

গুলিবৃষ্টির আড়াল নিয়ে মূল গেট দিয়েও পুলিশ প্রবেশ করল হেরিটেজ ফাউন্ডেশনে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই গোটা বিল্ডিং-এ ছড়িয়ে পড়ল সংঘর্ষ।

ঘণ্টা দুই পর গোলাগুলির শব্দ বন্ধ হয়ে গেল।

পুলিশ গোটা বিল্ডিং-এর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছে।

পুলিশপ্রধান আলেকজান্ডার ভেরনভ একের পর এক কক্ষ দেখছেন। তৈরি হচ্ছে আহত-নিহতের তালিকা।

গোটা বিল্ডিং পরিদর্শনের পর হতাশ হলো পুলিশপ্রধান আলেকজান্ডার। প্রিন্সেস ক্যাথারিনকে তো নয়, তার কোন আলামতও কোথাও পাওয়া গেল না। আহমদ মুসারও চিহ্ন কোথাও নেই।

আহত অবস্থায় অনেকেই ধরা পড়েছে। তার মধ্যে রয়েছে গ্রেট বিয়ারের গোয়েন্দা প্রধান মাজুরভ এবং অপারেশন ফরচুন প্রজেক্ট-এর প্রধান ভ্লাদিমির খিরভ।

এ দু'জনকে পুলিশপ্রধান আলেকজান্ডারের কাছে আনা হলো।

আলেকজান্ডার তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে যাবেন, এমন সময় একজন গোয়েন্দা অফিসার এসে পুলিশপ্রধানের কানে কানে বলল, 'ভূগর্ভে আরও দু'টি ফ্লোর আছে। সেখানেই প্রিন্সেস ক্যাথারিন এবং ফ্রান্স থেকে ধরে আনা মিঃ প্লাতিনিকে পাওয়া যাবে। জানা গেল, গ্রেট বিয়ারের প্রধান আইভানও সেখানে প্রবেশ করেছেন।'

শুনেই পুলিশপ্রধান আলেকজান্ডার প্রবল উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল। মাজুরভ ও খিরভের মুখোমুখি হয়ে পুলিশপ্রধান মাজুরভকে ধীর, কিন্তু অত্যন্ত কঠোর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'ভূগর্ভে নামার পথ কোথায় মাজুরভ?'

প্রশ্ন শুনে একটু চুপ থাকল মাজুরভ।

তারপর পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল পুলিশপ্রধানের দিকে। তারপর আরও একটু ভাবল এবং বলল, 'ভূগর্ভে যাওয়ার দু'টি লিফটই নিচে নিয়ে লক করেছেন আমাদের নেতা মহামান্য আইভান।'

'কখন গেছেন তিনি?'

'আমরা জানতে পারিনি। পরে জেনেছি তিনি নিচে নেমেছেন, এইটুকু।'

'প্রিন্সেস ক্যাথারিন কোথায়?'

'ভূগর্ভস্থ বন্দীখানায়।'

মাজুরভের কথা শেষ হতেই পুলিশপ্রধান আলেকজান্ডার বলল, 'এদের নিয়ে চল, লিফট রুম আমাদের দেখিয়ে দেবেন।'

লিফট রুমের সামনে পৌঁছল তারা। লিফট রুম বন্ধ।

একজন পুলিশ নন-ফায়ার ধরনের প্রচণ্ড শক্তির গ্যাসীয় প্রেসার বম্ব চার্জ করে লিফট কক্ষের দরজা ভেঙে ফেলল।

উন্মুক্ত দরজা দিয়ে লিফট-সুড়ঙ্গে বিশ-পঁচিশ ফুট নিচে লক করে রাখা লিফট দেখা গেল।

পুলিশপ্রধানের নির্দেশে লিফটের উপর গ্যাসীয় প্রেসার বম্ব নিক্ষেপ করা হলো। লিফট মুহূর্তে টুকরো টুকরো হয়ে নিচে নামার পথ উন্মুক্ত করে দিল।

সঙ্গে সঙ্গেই গোটা পাঁচেক সিল্কের কর্ড নামিয়ে দেয়া হলো এবং দড়ি বেয়ে গেরিলা ইউনিটের পাঁচজন পুলিশ নিচে নেমে গেল।

তারা নিচে নেমে পজিশন নেয়ার পর ইংগিত করলে পুলিশপ্রধান আরও কয়েকজন অফিসারকে নিয়ে কর্ড বেয়ে নিচে নামল।

নিচে নেমে পুলিশপ্রধান আলেকজান্ডার সামনে তাকাতেই দেখতে পেল, গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া চারটি লাশ করিডোরে পড়ে আছে।

উদ্বেগে বিবর্ণ হয়ে উঠল পুলিশপ্রধানের মুখমণ্ডল। অসহনীয় এই দুশ্চিন্তা তার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলল যে, প্রিন্সেস ক্যাথারিনের কিছু হয়নি তো!

'কাউন্সিল অব মুসলিম, মস্কো' (সিএমএম)-এর গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ সভা শেষ হলো বেলা সাড়ে ন'টায়।

আহমদ মুসার বিষয় নিয়ে এই পরামর্শ সভার আয়োজন হয়েছিল ওলগার উদ্যোগে। খবর পেয়ে এ মিটিং-এ শরীক হয়েছিল মধ্য এশিয়া সরকারের নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান আহমদ মুসার একজন শীর্ষ সহকর্মী যুবায়েরভ।

আহমদ মুসার খবর পেয়ে সবকিছু ফেলে ছুটে আসে সে মস্কোতে। পরামর্শ সভায় সে জানাল, আহমদ মুসা মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সে মস্কোতে থাকবে।

পরামর্শ সভায় আহমদ মুসাকে উদ্ধারের সার্বিক কার্যক্রমের দায়িত্ব দেয়া হয় সিএমএম-এর তরুণ প্রধান এবং মস্কোর 'ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি'-এর অধ্যাপক আসিফ আজিমের উপর। আর অভিযান কার্যক্রমের দায়িত্ব নিয়েছে যুবায়েরভ নিজে।

এই পরামর্শ সভায় মেয়েরাও অংশগ্রহণ করে। মহিলা ও পুরুষের বসার স্থান আলাদা করা হয়েছিল। চোখের প্রান্ত পর্যন্ত নামিয়ে দেয়া চাদরে জড়ানো মেয়েরা পরামর্শ সভায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ডোনা জোসেফাইন ছিল এ মিটিং-এর মধ্যমণি। সে ছিল সবার কাছে আকাশের চাঁদের মত।

ডোনা জোসেফাইনের আগমন শুধু মস্কোতে নয়, সাড়া ফেলেছে গোটা মধ্য এশিয়ায়। মধ্য এশিয়া বিপ্লবের ছাত্রী-কর্মী, যেমন সুফিয়া সভেৎলানা, খোদেজায়েভা,কুলসুম ত্রিফোনভা, রইছা নভোস্কায়া, তাহেরভা তাতিয়ানা এবং মধ্য এশিয়া মুসলিম প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট কুতাইবার স্ত্রী শিরিন শবনম ও যুবায়েরভের স্ত্রী রোকাইয়েভা সকলেই দাবি তুলেছে, হয় ডোনা জোসেফাইনকে মধ্য এশিয়া যেতে হবে, নয়তো তারা সকলেই মস্কো আসবে। এরা সকলেই ছিল ফাতিমা ফারহানার সহযোদ্ধা ও বন্ধু।

ডোনা জোসেফাইনও খুশি হয়েছে এই প্রস্তাবে। বলেছে, ফাতিমা ফারহানার বন্ধু তারও বন্ধু। তাদের সাথে দেখা করতে পারলে সে খুশি হবে।

পরামর্শ সভা থেকে বেরিয়ে ওলগা ও ডোনা জোসেফাইন এগোচ্ছিল গাড়ির দিকে। ওলগা ও ডোনা জোসেফাইন পাশাপাশি।

ওলগার বাম পাশে একটু দূরে হাঁটছে আসিফ আজিম।

'যুবায়েরভ ভাই যে কথা বলেছিলেন, একটা গাড়ি তোমাদের সাথে গেলে ভাল হতো না?' ওলগাকে লক্ষ্য করে বলল আসিফ আজিম।

'আজ একটা গাড়ি সাথে দিচ্ছ, কালও কি দিতে পারবে?' বলল ওলগা।

'প্রয়োজনে তাও করতে হবে।'

'ভাল চিন্তা, তবে বাস্তব নয়।'

'প্রয়োজন অনেক সময় অবাস্তবেরও পথ ধরে।'

'আমাদের ক্ষেত্রে এমনটা না করলেও চলবে।'

'চিন্তা তোমাকে নিয়ে নয়, ভাবীকে নিয়ে।'

'আমাকে নিয়ে বুঝি কোন চিন্তা নেই?' ওলগার ঠোঁটে দুষ্টুমির হাসি।

আসিফ আজিমের চোখে-মুখে লজ্জা এবং সেই সাথে বিব্রত ভাব ফুটে উঠল। বলল, 'না, মানে আমি বলছি বর্তমান সংকটের কথা।'

ডোনা জোসেফাইনের ঠোঁটেও এক টুকরো হাসি ফুটে উঠেছে।

'ঠিক আছে। আমি বুঝেছি।' ওলগার ঠোঁটে সেই হাসি তখনও।

একটু থেমেই আবার বলল ওলগা, 'আমরা আসি। সুন্দর আয়োজনের জন্যে ধন্যবাদ।' বলে গাড়িতে উঠতে গেল ওলগা।

মিটিংটা আসিফ আজিমের বাড়িতেই অনুষ্ঠিত হয়। যুবায়েরভও তার অতিথি হয়ে আছেন।

কমিউনিস্ট আমলের শেষের দিকে স্ট্যালিন এভেনিউ-এর এ বাড়িটা ছিল মুসলিম মধ্য এশিয়ার মুক্তি আন্দোলন 'সাইমুম'-এর একটা নিরাপদ আশ্রয়।

আসিফ আজিম-এর পিতা 'ফেদর বেলিকভ' ছিলেন কমিউনিস্ট সোভিয়েত সরকারের একজন রাষ্ট্রদূত। আর আসিফ আজিম-এর মা ছিল একজন

কাজাখ মেয়ে। কাজাখ স্ত্রীর প্রভাবেই ফেদর বেলিকভ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তিনি এটা গোপন রেখে চলেন। তিনি একসময় 'সাইমুম'-এর মস্কো অঞ্চলের প্রধান উপদেষ্টায় পরিণত হন।

আসিফ আজিম পিতা-মাতার সে ঐতিহ্য শুধু বজায় রাখা নয়, এখন মস্কোর মুসলিম কাউন্সিলের প্রধানের দায়িত্ব পেয়েছে।

গাড়িতে উঠে বসেছে ডোনা জোসেফাইন এবং ওলগা।

ওলগা গাড়ি ড্রাইভ করছে এবং পাশের সিটে ডোনা জোসেফাইন।

ছুটে চলল গাড়ি।

ডোনা জোসেফাইন হাত বাড়িয়ে ওলগার পাঁজরে একটা চিমটি কাটল এবং বলল, 'তোমার 'তাকে' খুঁজে পেয়েছি ওলগা।'

'কাকে?'

'যাকে খুঁজে বের করতে আমাকে বলেছিলে?'

কথা বলল না ওলগা। তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে। একটু পর বলল, 'ভাবী, তাকে কি পাওয়া গেছে?'

'নামও কি বলব?'

'কিন্তু কি প্রমাণ তুমি পেয়েছ ভাবী?'

'প্রমাণ তুমি নিজে। বল দেখি, আসিফ আজিম তোমার কেউ না।'

কথা বলল না ওলগা।

'কেউ নয় বল।' হেসে বলল ডোনা জোসেফাইন।

ওলগার চোখ-মুখে তখন ঝরে পড়ছে অনুরাগের একটা বিচ্ছুরণ।

ওলগা ডান হাত স্টিয়ারিং-এ রেখে বাম হাত বাড়িয়ে চেপে ধরল ডোনা জোসেফাইনের হাত। বলল, 'কথা বলতে বলো না ভাবী।'

'ঠিক আছে বলব না। খালাম্মা তো নিশ্চয় জানেন?'

'আম্মার সাথেই তো ওর যোগাযোগ বেশি।'

'তোমার সাথে বুঝি নেই?'

'জান ভাবী, ও খুব আইডিয়ালিস্ট।'

'এটা কি সৌভাগ্য নয়?'

‘অবশ্যই।’

‘আমি কনগ্রাচুলেট করছি ওলগা।’

ওলগা কিছু বলতে যাচ্ছিল।

ডোনা জোসেফাইন বাঁধা দিয়ে বলল, ‘ওলগা, ওদিকে শোন, কিসের শব্দ?’

উৎকর্ণ হলো ওলগা।

ডোনা জোসেফাইনই কথা বলল, ‘কামানের শব্দ ওলগা।’

‘ঐ তো, তার সাথে মেশিনগানের শব্দও শোনা যাচ্ছে।’

ডোনা জোসেফাইন কিছুক্ষণ উৎকর্ণ থেকে বলল, ‘রীতিমত যুদ্ধ ওলগা।’

‘মনে হচ্ছে, নদীর ওপারেই রাস্তার পাশে।’

ওলগার গাড়ি চলছিল তখন কমসোমল হাইওয়ে ধরে। পার হচ্ছিল টলস্টয় পার্ক। সামনেই কমসোমল হাইওয়ের উপর মস্কোভা ব্রীজ।

গাড়ির গতি স্লো করে দিয়েছিল ওলগা।

‘ব্রীজের ওপারেই গণ্ডগোলটা ওলগা। আমার মনে হয়, ব্রীজের গোড়ায় গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে ন্যাশনাল স্টেডিয়ামের রাস্তা দিয়ে আমরা যেতে পারি।’

‘ঠিক বলেছ ভাবী।’

ওলগা ব্রীজের গোড়ায় গিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে নিল।

ওলগার গাড়ি কমসোমল হাইওয়ে পার হয়ে স্টেডিয়াম রোডে পড়তে যাচ্ছিল।

হঠাৎ ব্রীজের গোড়ায় কমসোমল হাইওয়ে এবং স্টেডিয়াম রোডের সংযোগস্থলে একটা ট্যাক্সিতে ঠেস দেয়া অবস্থায় রোসা ও পাভলভকে দেখতে পেল ডোনা জোসেফাইন।

‘গাড়ি বাম পাশে দাঁড় করাও ওলগা।’ দ্রুত কণ্ঠে বলল ডোনা জোসেফাইন। প্রবল উত্তেজনা ডোনা জোসেফাইনের চোখে-মুখে। পাভলভের কাছে আহমদ মুসার প্রকৃত খবর পাওয়া যাবে, কি হতে পারে সেই খবর, এসব চিন্তা ডোনা জোসেফাইনকে নতুনভাবে উদ্বিগ্ন করে তুলল।

ওলগা ডোনা জোসেফাইনের দিকে একবার তাকিয়ে গাড়ি রাস্তার পাশে নিতে নিতে বলল, ‘কি ব্যাপার ভাবী?’

‘যে দুই গাড়িতে আমি ও আহমদ মুসা পুশকভ থেকে এসেছিলাম, সে দুই গাড়ির ড্রাইভারকে ঐখানে দাঁড়ানো দেখছি। ড্রাইভার পাভলভের কাছে আহমদ মুসার প্রকৃত খবর পাওয়া যাবে।’

‘কিন্তু ভাবী, ওদের সাথে তোমার সাক্ষাৎ নিরাপদ হবে কিনা?’

‘না ওলগা, রোসা বিশ্বস্ত।’

‘আর ড্রাইভার পাভলভ?’

‘আমার ধারণা, দু’জন ভিন্ন নয়।’

ওলগা তার গাড়ি রোসা ও পাভলভের গাড়ির কাছাকাছি এনে দাঁড় করাল।

‘তুমি বস ওলগা, আমি কথা বলে আসি।’

‘না ভাবী, তোমার নামার দরকার নেই। তুমি ‘রোসা’ মেয়েটাকে ডাক।’

‘পাভলভকেও তো দরকার।’

‘রোসাই পাভলভকে ডাকবে।’

‘ঠিক বলেছ ওলগা, আমি সত্যিই খুব অস্থির হয়ে পড়েছি। আমাদের সতর্ক হওয়ার দরকার আছে।’

কথা শেষ করেই ডোনা জোসেফাইন গাড়ির দরজা খুলে দু’হাতে দরজা ধরে খোলা দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। তারপর নাম ধরে ডাকল ‘রোসা’কে।

রোসারা দাঁড়িয়ে ছিল মাত্র গজ পাঁচেক দূরে।

ডাক শুনে চমকে ফিরে তাকাল রোসা ডোনা জোসেফাইনের দিকে।

ডোনা জোসেফাইনকে চিনতে পারেনি রোসা।

ডোনা তার মুখের স্কিন মাস্ক খুলে ফেলল এবং ডাকল রোসাকে আবার।

এবার রোসা দ্রুত পাভলভকে কিছু বলেই ছুটে এল ডোনা জোসেফাইনের কাছে।

এসেই ডোনা জোসেফাইনের একটা হাত নিয়ে চুমু খেয়ে বলল, ‘ম্যাডাম, খবর আছে।’

রোসার কণ্ঠ দ্রুত। তার চোখে-মুখে উদ্বেগ।

এটা লক্ষ্য করে ডোনা দ্রুত বলল, 'কি খবর? তোমার কি হয়েছে?'

'স্যার গ্রেট বিয়ারের ঘাঁটিতে ঢুকেছেন।'

'কোন স্যার? আহমদ মুসা?' ডোনা জোসেফাইনের কণ্ঠেও উদ্বেগ ঝরে পড়ল।

'জ্বি ম্যাডাম।'

'গ্রেট বিয়ারের ঘাঁটি কোথায়?'

'নদীর ওপারে। গোলা-গুলির শব্দ ওখান থেকেই আসছে।'

'কামান ও মেশিনগানের শব্দ যেখান থেকে আসছে?' উদ্বেগ-আতংকে রুদ্ধপ্রায় ডোনা জোসেফাইনের গলা।

'জ্বি ম্যাডাম।'

ডোনা জোসেফাইন কথা বলতে পারলো না। কাঁপছে তার ভেতরটা। একা ঢুকেছে আহমদ মুসা! এত কামান, মেশিনগানের শব্দ কেন? কি হচ্ছে সেখানে? একেবারে ভেঙে পড়ার উপক্রম হলো ডোনার।

গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে ওলগা। সেও এসে দাঁড়িয়েছে ডোনার পাশে। সে বলল রোসাকে লক্ষ্য করে, 'আহমদ মুসা গ্রেট বিয়ারের হাতে পুশকভ থেকে আসার পথে বন্দী হননি?'

'হয়েছিলেন। কিন্তু কোন এক মহিলার সাহায্যে পথেই তিনি মুক্ত হয়ে যান।'

'কে সে মহিলা?' কম্পিত গলায় ডোনার প্রশ্ন।

'মহিলার পরিচয় পাওয়া যায়নি। স্যারও তাকে দেখেননি। টলস্টয় পার্কে গ্রেট বিয়ারের সাথে সংঘর্ষের সময় স্যারকে আরও একদিন সেই মহিলা বাঁচিয়েছেন। এদিনও আড়ালে থেকে।'

রোসা থামতেই ওলগা বলল, 'আহমদ মুসা কখন ঢুকেছেন গ্রেট বিয়ারের ঘাঁটিতে? গোলা-গুলি কখন থেকে শুরু হয়েছে?'

'আরও কিছু ঘটনা ঘটেছে ম্যাডাম। আহমদ মুসা হেরিটেজ ফাউন্ডেশন অর্থাৎ গ্রেট বিয়ারের ঘাঁটিতে ঢুকেছেন ভোর বেলা। পুলিশপ্রধানের নেতৃত্বে

পুলিশ বাহিনী এসে হেরিটেজ ফাউন্ডেশন ঘেরাও করেছে আধঘণ্টা আগে। কামান দেগেছে পুলিশ। মেশিনগানের শব্দ দুই পক্ষের।'

ডোনা জোসেফাইন ও ওলগা দু'জনের কারও মুখ থেকেই কোন কথা সরছে না। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার পাহাড় এসে তাদের ঘিরে ধরেছে। আহমদ মুসা ভোর বেলা ঢুকেছেন, এখন বেলা দশটা। কি হচ্ছে সেখানে? কি অবস্থায় আছে আহমদ মুসা? কামান-মেশিনগানের যুদ্ধে সেতো একা এক মানুষ!

নীরবতা ভাঙল ওলগা। বলল, 'আপনারা ওদিকে গেছেন?'

'না, স্যার আমাদেরকে এখানেই অপেক্ষা করতে বলেছেন।'

'তিনি বলেছেন?'

বলে ডোনা জোসেফাইন জড়িয়ে ধরল রোসাকে। কেঁদে ফেলল সে। আবার বলল, 'ওর সাথে কখন দেখা হলো, কিভাবে দেখা হলো তোমাদের?'

'আমরা একসাথেই আছি। আমরাই ভোরবেলা ওকে ব্রীজের দক্ষিণ গোড়ায় নামিয়ে দিয়েছি।'

'তোমরা? বল তো আবার, কি বলেছেন উনি?' চোখ মুছে বলল ডোনা জোসেফাইন।

'আমরা ওকে নামিয়ে দিয়ে আমাদের প্রতি তার নির্দেশ জানতে চেয়েছিলাম। তিনি আমাদেরকে ব্রীজের উত্তর গোড়ায় অপেক্ষা করতে বলেছেন।'

ডোনা জোসেফাইন ওলগার দিকে তাকাল। বলল, 'আমরা অপেক্ষা করব ওলগা।'

'অবশ্যই।' বলল ওলগা দৃঢ়কণ্ঠে।

'রোসা, তুমি গাড়ির ভেতরে এস।'

বলে গাড়ির সামনের দরজা বন্ধ করে পেছনের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ডোনা।

রোসা দ্বিধা করছিল ভেতরে ঢুকতে ও ডোনার পাশে বসতে।

ডোনা তাকে হাত ধরে টানল।

রোসা পাভলভের দিকে চেয়ে বলল, 'তুমি গাড়িতে গিয়ে বস।'

বলে ভেতরে ঢুকে সিটের পাশে গাড়ির ফ্লোরের উপর বসে পড়ল রোসা।

ডোনা বাঁধা দিলে হাত জোড় করল রোসা। বলল, ‘এভাবে বসলেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করব ম্যাডাম। আপনি বাঁধা দেবেন না।’

ওলগা গিয়ে বসল তার ড্রাইভিং সিটে।

‘তোমরা তো এ পর্যন্ত ওর সাথে ছিলে?’

‘জ্বি ম্যাডাম।’

‘বল ওর এই কয় দিনের সব কথা।’

রোসা শুরু করল। শুনছিল ডোনা জোসেফাইন ও ওলগা।

শুনছিল বটে ডোনা জোসেফাইন। কিন্তু চোখ ও মন তার পড়েছিল ব্রীজ পেরিয়ে আসা কমসোমল হাইওয়ের উপর। কখন আসবেন তিনি, তার প্রিয়তম!

একটি করে মুহূর্তকে তার কাছে মনে হচ্ছে একটা করে যুগের মত। যন্ত্রণাদায়ক এক অপেক্ষা এটা। কিন্তু মনে হচ্ছে, এই অপেক্ষায় গোটা জীবন তার শেষ হলেও ক্লান্তি আসবে না।

সাইমুম সিরিজের পরবর্তী বই

# আটলান্টিকের ওপারে

**কৃতজ্ঞতায়ঃ**

1. Kayser Ahmad Totonji
2. Sharmeen Sayema
3. Meah Imtiaz Zulkarnain

# সাইমুম-২৫

# আটলান্টিকের ওপারে

আবুল আসাদ

# ১

নিকোলাস বুখারিন বুঝল সে বেঁচে আছে। ব্রাশ ফায়ারের গুলী তার লাগেনি।

চোখ খুলল নিকোলাস বুখারিন।

চোখ খুলেই দেখল তার সামনে দাঁড়ানো আইভানের সৈনিক প্রহরীটি ব্রাশ ফায়ারের শব্দ লক্ষ্যে পেছনে তাকিয়েছে।

নিকোলাস বুখারিন একে ঈশ্বরের দেয়া সুযোগ মনে করল। ঝাঁপিয়ে পড়ল সে প্রহরীটির উপর।

কিন্তু ততক্ষণে নিকোলাস বুখারিন মিঃ প্লাতিনির কক্ষের সামনে দ্বিতীয় প্রহরীটির নজরে পড়ে গেছে।

দ্বিতীয় প্রহরীটির তার হ্যান্ড মেশিনগান তুলে গুলি করল নিকোলাস বুখারিনকে লক্ষ্য করে।

একটি গুলি গিয়ে নিকোলাস বুখারিনের পাঁজরকে বিদ্ব করল।

কিন্তু তার দেহ গিয়ে পড়ল প্রথম প্রহরীটির উপর।

গুলি বিদ্ধ হয়েও নিকোলাস বুখারিন প্রহরীটিকে জড়িয়ে ধরল।

কিন্তু তার আগেই প্রথম প্রহরীটির হ্যান্ড মেশিনগান ছিটকে পড়েছিল তার হাত থেকে।

ওদিকে আহমদ মুসা কালো কাপড়ে আবৃত আগন্তুকের ব্রাশ ফায়ার থেমে যাবার সাথে সাথেই উঠে দাঁড়িয়েছে।

পেছন ফিরে উঠে দাঁড়িয়েছিল আহমদ মুসা। কালো কাপড়াবৃত আগন্তুকের দিকে এগুতে যাবে, এমন সময় পেছন থেকে হ্যান্ড মেশিনগান গর্জে উঠার শব্দ পেল। চমকে উঠে পেছনে ফিরল সে।

দেখল, করিডোরের একেবারে পুব মাথায় মাটিতে পড়ে দুজন একে অপরকে কাবু করার চেষ্টা করছে।

একজন সৈনিকের পোশাক। আরেকজনের দিকে চাইতেই চমকে উঠল আহমদ মুসা। নিকোলাস বুখারিনের সাথে তার সৈনিকের লড়াই হচ্ছে কেন?

আহমদ মুসার নজরে পড়ল, নিকোলাস বুকারিন তার বাম হাত দিয়ে নিজের পাঁজর চাপে ধরে আছে এবং ডান হাত দিয়ে গলা চেপে ধরেছে সৈনিকটির। আর সৈনিকটিও দু'হাতে গলা চেপে ধরেছে নিকোলাস বুখারিনের।

রক্তে ভেসে যাচ্ছে নিকোলাস বুখারিনের বাম পাঁজর। আহমদ মুসা বুঝল, ব্রাশ ফায়ারটি নিকোলাসকে লক্ষ্য করেই হয়েছে।

আহমদ মুসা ছুটে গেল সেদিকে। আহমদ মুসাকে দেখতে পেয়েছে নিকোলাস বুখারিন। বলল সে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে, 'পারলাম না আমি, পাশের ঘরে ক্যাথারিন ও প্লাতিনি বন্দী। উদ্ধার কর তাদের।'

বলে নিকোলাস বুখারিন সৈনিকটির গলা ছেড়ে দিয়ে দু'হাতে নিজের পাঁজর চেপে ধরল। আহমদ মুসা সৈনিকটির হাত থেকে ছিটকে পড়া করিডোরের এদিকে চলে আসা হ্যান্ড মেশিনগান তুলে নিয়েছে।

সৈনিকটি নিকোলাস বুখারিনকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। পকেটে হাত দিয়ে সে বের করল রিভলবার।

ঠিক এই সময় মিঃ প্লাতিনির কক্ষের সামনে দাঁড়ানো সেই দ্বিতীয় সৈনিকটি ছুটে এল আহত বুখারিনের পাশে দাঁড়ানো প্রথম সৈনিকের কাছে।

আহমদ মুসা প্রথম সৈনিককে রিভলবার বের করতে দেখেই হাতের হ্যান্ড মেশিনগানের ট্রিগারে আঙুল চাপে তৈরি হয়েছিল। দ্বিতীয় সৈনিকটি ছুটে আসতে দেখেই ট্রিগারে আঙুল চাপল সে।

হ্যান্ড মেশিনগানের ব্যারেল সে ঘুরিয়ে নিল প্রথম ও দ্বিতীয় সৈনিকের উপর দিয়ে।

আহমদ মুসা তার হ্যান্ড মেশিনগান বাগিয়ে প্রবেশ করল ক্যাথারিনদের কক্ষের সামনে দিয়ে যাওয়া করিডোরে।

প্রবেশ করার সময় সে করিডোরের পুব পাশ দিয়ে দাঁড়ানো পাঁচটি কক্ষের দক্ষিণ দিক থেকে দ্বিতীয়টির দরজা বন্ধ হতে দেখল।

'আহমদ মুসা, গ্রেট বিয়ারের প্রধান শয়তান আইভান ঐখানে লুকিয়েছে। ঐখানে প্রিন্সেস ক্যাথারিন এবং মিঃ প্লাতিনি রয়েছেন। তুমি দেখ, শয়তান ওদের যেন ক্ষতি না করে।' ক্লান্ত কণ্ঠে বলল নিকোলাস বুখারিন।

আহমদ মুসা এগিয়ে গেল নিকোলাস বুখারিনের কাছে। ঝুঁকে পড়ল তার পাঁজরের আহত স্থানটা পরীক্ষার জন্যে।

নিকোলাস বুখারিন তার একটা হাত দিয়ে ঠেলে আহমদ মুসাকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করে বলল, 'সময় বেশি পাবে না। তাড়াতাড়ি ওদেরকে শয়তানের হাত থেকে উদ্ধার কর। আমাদের রাশিয়াকে তুমি সাহায্য কর।'

'কিন্তু আপনি গুরুতর আহত।'

'আমার কথা বাদ দাও। আমি একজন সৈনিক। লাখো সৈনিক আছে রাশিয়ায়। তুমি যাও।'

আহমদ মুসা এগুলো দরজার দিকে।

পেছন থেকে নিকোলাস বুখারিন বলল, 'দরজায় ডিজিটাল লক। তুমি এই ম্যাগনেটিক রেডিয়েশনটা নিয়ে যাও।'

আহমদ মুসা ফিরে এল।

নিকোলাস বুখারিন রক্তাক্ত হাতে তার কলমাকৃতির ম্যাগনেটিক রেডিয়েশন গানটা আহমদ মুসার হাতে তুলে দিতে দিতে বলল, 'অন করাই আছে, তুমি শুধু লকের উপর এটাকে সেট কর।'

আহমদ মুসা ছুটল দরজার দিকে।

দরজার ডিজিটাল কম্পুটারাইজড লকের উপর সেট করল ম্যাগনেটিক রেডিয়েশন গানটা।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড, খুলে গেল দরজার লক।

আহমুদ মুসা হ্যান্ড মেশিনগানটা কাঁধে ঝুলিয়ে রেখে রিভলবার ডান হাতে নিয়ে তর্জনিটা ট্রিগারে রেখে বাম হাতে এক ঝটকায় খুলে ফেলল দরজা।

আইভান তখন প্লাতিনি এবং প্রিন্সেস ক্যাথারিনের ওপাশে বসে অয়্যারলেস সংযোগের চেষ্টা করছিল। তার রিভলবারটা পড়েছিল তার সামনে।

দরজা খুলে যাওয়ার শব্দে আইভান চমকে উঠে অয়্যারলেস ফেলে দিয়ে প্রিন্সেস ক্যাথারিনকে সামনে ধরে উঠে দাঁড়াল।

তার রিভলবারটা তুলে নিতে সময় পায়নি আইভান।

আহমদ মুসা গুলী করল তার রিভলবারের উপর। তা ছিটকে পড়ল ঘরের শেষ প্রান্তে, খাটের পাশ দিয়ে নিচে।

'আহমদ মুসা তোমার রিভলবার ফেলে দাও। আমার হাতে কথা বলার মত সময় বেশি নেই।' একটা ভয়ংকর ধরনের চকচকে ছুরি ক্যাথারিনের গলায় চেপে ধরে কথাগুলো বলল আইভান।

আইভানের ছুরির তীক্ষ্ণ ফলা ক্যাথারিনের গলার চামড়া ঠেলে নিয়ে অনেকখানি ডিপ হয়েছে।

প্রিন্সেস ক্যাথারিনের মুখ থেকে তার অজান্তেই যেন একটা 'আহ!'শব্দ বেরিয়ে এল।

আহমদ মুসা আইভানের চোখ দেখতে না পেলেও বুঝল আইভান দি টেরিবলের ভঙ্গিতে অভিনয়ের কোন চিহ্ন নেই অতএব এর অসাধ্য কিছু নেই। মরার আগে মেরেই মরবে।

আহমদ মুসা ছুড়ে দিল তার রিভলবার বাইরে। কাঁধে ঝুলানো হ্যান্ড মেশিনগানকেও তাই করল।

আহমদ মুসা হাত তুলে বাইরে বেরিয়ে যাও। প্লাতিনি যাও।

আহমদ মুসা ও প্লাতিনি বাইরে বেরুল।

আইভানও প্রিন্সেস ক্যাথারিনকে সামনে ধরে রেখে প্রায় সাথে সাথেই বাইরে বেরুল।

আইভান আহমদ মুসা ও প্লাতিনিকে দক্ষিণ দিকে সরে যেতে বলে প্রিন্সেস ক্যাথারিনকে সামনে নিয়ে পিছু হটে পশ্চিম মুখী করিডোরে গিয়ে প্রবেশ করল।

পাঁজর চেপে ধরে মাটিতে পড়ে থাকা নিকলাস বুখারিন বলল, 'পারলে না তুমি আহমদ মুসা, আইভান শয়তানটাকে খতম করতে। তার মৃত মুখটা দেখে যাবার খুব ইচ্ছা ছিল আমার।'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'তা অবশ্যই দেখবে তুমি বুখারিন।'

আহমদ মুসার কথা শেষ হবার সাথে সাথেই ওদিক থেকে একটা রিভলবার গর্জন করে উঠল।

গুলীটা মাথা গুড়িয়ে দিয়েছে আইভানের।

গুলী করেই আড়াল থেকে বেরিয়ে এল কালো কাপড়ে আবৃত সেই ছায়ামূর্তি। মাথা থেকে কালো কাপড়টা সরিয়ে সে বাউ করল প্রিন্সেস ক্যাথারিনকে।

ঠিক এ সময়েই আহমদ মুসা এসে দাঁড়িয়েছে পশ্চিমমুখী করিডোরটির মুখে।

উন্মুক্ত মাথা সেই মূর্তির দিকে চোখ পড়তেই আহমদ মুসা অবাক বিস্ময়ে বলল, 'কেলা এলভা তুমি?'

বেদনাময় এক হাসি মাখা মুখে কেলা এলভা বলল, 'হ্যাঁ, আমি।'

মুহূর্ত কয়েক বিস্ময়ভরা চোখে কেলা এলভার দিকে তাকিয়ে আহমদ মুসা বলল, 'তুমি তোমার কথা রেখেছো মিসেস কেলা এলভা। কিন্তু আমি তোমার জন্যে কিছু করতে পারিনি।'

'সময় এখনো শেষ হয়ে যায়নি। ভাবি কোথায়? তাঁর খোঁজ পেয়েছেন?'

'না পাইনি' বলেই আহমদ মুসা প্রিন্সেস ক্যাথারিনের দিকে চেয়ে কেলা এলভার পরিচয় তাকে দিয়ে বলল, 'সম্মানিতা প্রিন্সেস একটু দাঁড়ান।'

কথা শেষ করে আহমদ মুসা ফিরল নিকোলাস বুখারিনের দিকে। দ্রুত কণ্ঠে বলল, 'মিঃ বুখারিন দ্রুত আমাদের চলে যেতে হবে। আপনাকে হাসপাতালে নেয়া দরকার। তার আগে দয়া করে বলুন, 'আপনার এ দশা কেন? আর আমার স্ত্রী ডোনা জোসেফাইনকে এরা কোথায় রেখেছে? এখানে তো নেই।'

চোখ বুজে পড়েছিল নিকোলাস বুখারিন। ধীরে ধীরে চোখ খুলল সে। বলল, 'হাসপাতালের নেবার দরকার হবে না। শয়তানটার মুখোশ খুলে আমাকে দেখাও। তাহলে আমি শান্তিতে মরতে পারব। আর আপনার স্ত্রী এদের হাতে ধরা পড়েনি।'

থামল বুখারিন। একটু দম নিল। ক্লান্তিতে ধুকছিল সে। কথা শুরু করল একটু পরেই, 'হ্যা, আর একজন বন্দী ওদিকে আছে। খাঁটি একজন দেশপ্রমিক সে। শত নির্যাতন করেও তার কাছ থেকে একটা কথাও আদায় করতে পারেনি। তাকে আপনাদের সাহায্য করা দরকার।'

কথাটা শুনেই চমকে উঠল কেলা এলভা। যে ঘরের দিকে বুখারিন ইংগিত করেছে, সেদিকে চলল কেলা এলভা।

পেছনে পেছনে গেল আহমদ মুসাও।

ম্যাগনেটিক রেডিয়েশন গান দিয়ে দরজা খুলল আহমদ মুসাই।

দরজা খুলে আহমদ মুসা দেখল তৃতীয় শ্রেণীর একটা কয়েদখানা। মাটিতে রাখা একখন্ড তক্তার উপর শুয়ে আছে একজন বন্দী।

দরজা ফাঁক করে এক পাশে সরে দাঁড়াল আহমদ মুসা। কেলা এলভা ঘরে ঢুকে বন্দীর দিকে একবার তাকিয়েই চিৎকার করে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আহমদ মুসা বেরিয়ে এল ঘর থেকে। আহমদ মুসার মুখে আনন্দের হাসি।

ডোনা জোসেফাইন তাহলে বন্দী হয়নি। তার বুক থেকে একটা পর্বতের ভার যেন নেমে গেল। অন্যদিকে কেলা এলভার স্বামী' লেনার্ট লা'রকেও পাওয়া গেছে। সবচেয়ে বড় কথা, গ্রেট বিয়ার প্রধান আইভান নিহত হয়েছে এবং প্রিন্সেস

ক্যাথারিন ও মিঃ প্লাতিনিকে পাওয়া গেছে। তাদেরকে এখন নিরাপদে বের করে নিয়ে যেতে পারলেই হলো।

আহমদ মুসার মনে পড়ল নিকোলাস বুখারিনের কথা। আহমদ মুসা দ্রুত গিয়ে আইভানের মুখোশ টান দিয়ে খুলে ফেলল।

নিকোলাস বুখারিন কষ্ট করে তাকিয়েছিল এদিকেই। আইভানের মুখের উপর চোখ পড়তেই চিৎকার করে বলে উঠল, 'লেনিনের নাতি শয়তান বুলগানিন তুমি আইভান!' সব শক্তি একত্রিত করেই যেন চিৎকার করে উঠেছিল নিকোলাস বুখারিন।

লেনিনের নাতি বুলগানিন মানে রুশ পার্লামেন্টের বিরোধী দলীয় নেতা? কথাটা জিজ্ঞেস করার জন্যে আহমদ মুসা ছুটে গেল নিকোলাসের কাছে। কিন্তু গিয়ে দেখল নিকোলাস বুখারিন আর নেই। চিৎকারটাই তার জীবনের শেষ প্রকাশ ছিল।

স্বামীকে হাত ধরে বের করে নিয়ে এল কেলা এলভা। তার চোখে অশ্রু।

আহমদ মুসা, প্রিন্সেস ক্যাথারিন এবং মিঃ প্লাতিনির পরিচয় স্বামীকে দিয়ে কেলা এলভা বললেন, 'মিঃ আহমদ মুসার জন্যেই আজ তুমি, প্রিন্সেস ক্যাথারিন ও মিঃ প্লাতিনি মুক্ত হতে যাচ্ছ।

আহমদ মুসা কেলা এলভার স্বামী লেনার্ট লার'-এর সাথে হ্যান্ডশেক করে বলল, 'আর কেলা এলভার সাহায্য না পেলে আপনাদের মুক্ত করার সুযোগই পেতাম না।'

লেনার্ট লার কিছু বলতে যাচ্ছিল।

আহমদ মুসা তাকে বাধা দিয়ে বলল। 'আপনাদের কাছ থেকে অনেক কথা শুনতে হবে। চলুন, আমরা বের হই। আপনারা খেয়াল করেছেন কিনা জানিনা, বিল্ডিংটা কয়েকবার কেঁপেছে। কিছু একটা ঘটছে বা ঘটতে যাচ্ছে।

সকলের মুখে একটা ভয়ের চিহ্ন দেখা দিল। কেউ কিছু বলল না।

আহমদ মুসা কেলা এলভাকে বলল, 'তুমি সামনে এগোও। আমি পেছনে চলছি।'

'কিন্তু গত কয়েকদিনে আমি পেছনে পেছনে চলতে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছি।' কেলা এলভা বলল।

'সেটা আমার অজান্তে এবং সে অবস্থা এখন নেই।' সেই সুড়ঙ্গ পথে চলতে শুরু করল কেলা এলভা। চলতে শুরু করল সবাই। সকলের পেছনে আহমদ মুসা।

হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের সামনের ওয়াটার প্ল্যান্ট-এর একটু পশ্চিমে মাইক্রো'তে চড়ে আহমদ মুসারা যখন হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের সামনে দিয়ে চলছিল, তখনও হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের ভেতরে গোলা-গুলী চলছিল। পুলিশ চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে বিল্ডিংটাকে।

আহমদ মুসা তাকাল কেলা এলভার দিকে। বলল, 'পুলিশ এখানে কেন এল, কি করে এল জান তুমি কিছু?'

'না আমি জানি না। আমি পুলিশকে কিছু জানাইনি।'

মনে পড়ল আহমদ মুসার পাভলভ ও রোসার কথা। তারা কি পুলিশকে খবর দিয়েছে? আহমদ মুসার কোন সন্দেহ নেই যে, তারা মিঃ বরিসভের নিজস্ব লোক। মিঃ বরিসভ অবশ্যই সরকারী লোক।

আহমদ মুসা কমসোমল রোডের ব্রীজটি পার হয়ে বামে মোড় নিয়ে গাড়ি পাভলভের গাড়ির পাশে দাঁড় করাল। পাভলভ আহমদ মুসাকে দেখতে পেয়ে গাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে এল। প্রবল উৎসাহে কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই আহমদ মুসা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'পুলিশকে তুমি কিভাবে খবর দিয়েছিলে পাভলভ?'

পাভলভ অবাক বিস্ময়ে আহমদ মুসার দিকে একবার চাইল। বুঝল, আহমদ মুসার কাছে কিছুই গোপন নেই। তারা যেমন আহমদ মুসাকে জানে। তেমনি আহমদ মুসাও পাভলভদের জেনেই সাথে করে রেখেছে। তারপর আহমদ মুসার প্রশ্ন সম্পর্কে ভাবল এবং একটু দ্বিধা করে বলল, 'অয়্যারলেসের মাধ্যমে।'

'অয়্যারলেস তোমার কাছে আছে?'

'আছে।'

'আমাকে দিতে পার?'

'আপনি চাইলে অবশ্যই দেব।'

'দাও।'

পাভলভ সঙ্গে সঙ্গে জামার ভেতর হাত দিয়ে ভেতরের একটা পকেট থেকে ক্ষুদ্র অয়্যারলেসটি বের করে আহমদ মুসার হাতে তুলে দিল। আহমদ মুসা তা হাতে নিতে নিতে বলল, 'তোমার চাকুরীর ভয় করো না।'

একটু থেমেই আবার বলল, 'প্রেসিডেন্টের অয়্যারলেস কোড তোমার কাছে আছে?'

'আছে স্যার।'

'দাও।'

আহমদ মুসা লিখে নিচ্ছিল কোড নাম্বারটি। এমন সময় রোসা ছুটে এসে বলল, 'স্যার ম্যাডাম অপেক্ষা করছেন।'

'কোন ম্যাডাম?' চমকে উঠে বলল আহমদ মুসা।

'পাভলভ কিছু বলেনি?'

'না।'

পাভলভ কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই রোসা বলল, 'ডোনা জোসেফাইন ম্যাডাম ঐ গাড়িতে।'

নামটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে আহমদ মুসার গোটা স্নায়ু তন্ত্রীতে শিহরণের একটা উচ্ছাস খেলে গেল।

'তোমরা দাঁড়াও রোসা। 'বলে আহমদ মুসা গাড়ি নিয়ে দাঁড় করাল ডোনাদের গাড়ির পাশে।

ডোনা বেরিয়ে আসছিল।

আহমদ মুসা নিষেধ করল ইশারায়।

নামল আহমদ মুসা মাইক্রো থেকে।

ডোনা নামতে গিয়ে দরজা খুলে ছিল, সে দরজা খোলাই ছিল।

আহমদ মুসা ভেতরে উঁকি দিতেই এক সাথে সালাম দিল ডোনা এবং ওলগা। আহমদ মুসা তাকাল ওলগার দিকে।

ডোনা বলল, 'ও ওলগা।'

'কোন ওলগা? ডঃ নাতালোভার মেয়ে?'

'হ্যা।'

'তুমি কেমন আছো? তোমার মা কেমন আছেন। 'ওলগাকে লক্ষ্য করে বলল আহমদ মুসা

'আলহামদুলিল্লাহ। ভাল।'

'পরে কথা হবে।' বলে আহমদ মুসা ডোনা জোসেফাইনের দিকে চেয়ে বলল, 'আল্লার অশেষ শুকরিয়া, তুমি ওদের ওখানে আছ।'

তারপর বলল, 'আমার মাইক্রোতে প্রিন্সেস ক্যাথারিন ও তোমার আব্বা ছাড়াও কেলা এলভা ও তার স্বামী লেনার্ট লার রয়েছে। ওলগার আপত্তি না থাকলে ক্যাথারিন ছাড়া অন্যদের এ গাড়িতে দিতে চাই। আমি ক্যাথারিনকে নিয়ে প্রেসিডেন্ট হাউজে যাব।'

'কেলা এলভার স্বামীকে পাওয়া গেছে? আলহামদুলিল্লাহ। অবশ্যই ওঁরা আসবেন।'

বলে একটু থেমে বলল ডোনা জোসেফাইন, ' তোমার প্রেসিডেন্ট হাউজে যাওয়া কি নিরাপদ হবে?'

'জানিনা। তবু যেতে হবে।'

'আমরা?'

'তোমাদের বাসায় ফেরা উচিৎ।'

'ওলগা ওদের নিয়ে যাবে, আমি মাইক্রোতে উঠব। 'বলল দৃঢ় কণ্ঠে ডোনা জোসেফাইন। বলল আহমদ মুসা।

ঠিক আছে ওলগার গাড়ি প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ চত্বরের বাইরে দাঁড়াতে পারে।'

মিঃ প্লাতিনি, কেলা এলভা, তার স্বামী লেনার্ট লার এসে ওলগার গাড়িতে উঠল।

পিতাকে স্বাগত জানানো ও কুশল বিনিময়ের পর ডোনা কেলা এলভাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আহমদ মুসাকে বার বার যে বাঁচিয়েছেন, সেই আড়ালের তরুণী তাহলে তুমি?'

আহমদ মুসা অপেক্ষমান পাভলভ ও রোসাকে তাদের অনুসরণ করতে বলে মাইক্রোতে উঠে স্টার্ট দিল গাড়ি।

গাড়ি চলতে শুরু করলে আহমদ মুসা ক্যাথারিনকে লক্ষ্য করে বলল, 'সম্মানিতা প্রিন্সেস, কয়েকটা কথা বলতে চাই।'

'অবশ্যই।'

'প্রেসিডেন্টের কাছে আপনাকে পৌছে দিতে চাই। আপনার কোন কথা আছে?'

'যে পরিস্থিতি তাতে এ প্রোগ্রাম ঠিক আছে।'

'আপনার দু'টি আমানত আমার কাছে আছে, তা কখন আপনি নিতে চান?'

'প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলার পর।'

'ব্যাপারটা দেরী হয়ে যাবে। পরে জিনিস দু'টি নেয়া আপনার জন্যে জটিল হয়ে দাঁড়াতে পারে।'

'যদি এমন পরিস্থিতি হয়, তাহলে জিনিস দু'টি আপনার কাছে থাকাই নিরাপদ বেশি।'

'সম্মানিতা প্রিন্সেস, জিনিস দু'টি আপনার কাছে পৌছানো আমার দায়িত্ব, এ সবের নিরাপত্তা বিধান নয়।'

'আপনি জিনিস দু'টির বাহক মাত্র নন। প্রিন্সেস তাতিয়ানার মৃত্যুকালীন ভিডিও ফিল্ম আমি দেখেছি। তাতিয়ানার প্রতি যদি আপনার দায়িত্ব থাকে, তাহলে তার আমানাতের প্রতিও আপনার দায়িত্ব থাকবে।

তাতিয়ানা নেই বটে, কিন্তু তার প্রিয়তম ব্যক্তি আমাদের পর নন।'

'গ্রেট বিয়ারের সাথে একবার ঝগড়া হলো, রুশ সরকারের সাথে আবার ঝগড়ায় নামতে হয় তাহলে।'

'ঐ রকম ঝগড়ায় নামতে আমি দেব না।'

'আপনাকে তারা জানাবে না। রাশিয়ায় প্রবেশের শুরু থেকেই রুশ গোয়েন্দারা আমার প্রতি পদক্ষেপ অনুসরণ করছে, আজ থেকে তা আরও বাড়বে এবং জিনিস দু'টি তারা যে কোন উপায়ে হাত করতে চেষ্টা করবে।'

'সে সুযোগ সম্ভবত রুশ সরকার পাবে না। আমি তাদের সাথে ঝগড়া করতে চাই না। রাজতন্ত্র সম্পর্কে তাদের পরিকল্পনার সাথে আমি একমত শুধু আমার কিছু শর্ত আছে, সে শর্ত তাদের মেনে নিতে হবে।'

'সে শর্ত যদি মেনে নেবার মত না হয়?'

'না মানলে নতুন সরকার ব্যাবস্থা সংক্রান্ত তাদের রাজনৈতিক পরিকল্পনা ব্যর্থ হবে। এই ঝুঁকি তারা নিশ্চয় নেবে না। যদি নেয় তাহলে আমাকে তারা তাদের সাথে পাবে না এবং রাজকীয় রিং ও ডায়েরী তাদের পাবার প্রশ্নই উঠে না।'

'আপনার এ ভুমিকা আমি সমর্থন করছি। কিন্তু আপনার সাথে আমি একটা পক্ষ হয়ে পড়া ঠিক হবে না। এতে আপনার অবস্থানও দুর্বল হতে পারে।'

থামল আহমদ মুসা। থেমেই আবার শুরু করল, 'সম্মানিতা প্রিন্সেস, আমি আমার দায়িত্ব শেষ করে রোখসত পেতে চাই।'

'মিঃ আহমদ মুসা রাশিয়ার সিংহাসনের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র লোভ নেই। যদি সিংহাসনে আমাকে দেশের স্বার্থে বসতেই হয়, তাহলে আমার শর্তের সাথে তাদেরকে অবশ্যই একমত হতে হবে। আর এ শর্ত পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে মস্কো থাকতে হবে। আপনি এবং আপনার স্ত্রী মারিয়া জোসেফাইন হবেন আমার ব্যক্তিগত মেহমান।'

ক্যাথারিন একটু থামল এবং পরক্ষণেই আবার শুরু করল, 'রাজকীয় ডায়েরীটা সাময়িকভাবে আমাকে দেবেন। আমার শর্তের ব্যাপারে ডায়েরী আমাকে সাহায্য করতে পারে। আমি কাজ শেষ করেই আপনাকে ডায়েরী ফেরত দেব।'

'ঠিক আছে প্রিন্সেস, গাড়ি থেকে নামার আগেই আপনি ডায়েরী পেয়ে যাবেন।'

গাড়ি তখন চলে এসেছে 'পুশকিন মিউজিয়াম অব ফাইন আর্টস'-এর পাশের রাস্তায়। সামনেই 'কিরনস্কি স্টেট লাইব্রেরী' (সাবেক লেনিন স্টেট লাইব্রেরী)।

'কিরনস্কি স্টেট লাইব্রেরী' থেকে একটা রাস্তা সোজা পুব দিকে এগিয়ে ক্রেমলিনের আউটার রিং রোডে গিয়ে পড়েছে।

আহমদ মুসা এই রিং রোড ধরে এগিয়ে ক্রেমলিনের গেটে গিয়ে পৌছল।

গাড়ি দাঁড় করাল আহমদ মুসা।

তার পেছনের গাড়িটা ছিল ডোনা জোসেফাইনের এবং শেষের গাড়িটা পাভলভের।

এ গাড়ি দুটোও দাঁড়াল।

আহমদ মুসা পকেট থেকে পাভলভের অয়্যারলেস বের করল। সংযোগ করল প্রেসিডেন্টের সাথে।

'কোথায় অয়্যারলেস করছেন? 'বলল প্রিন্সেস ক্যাথারিন।

'প্রেসিডেন্টের কাছে।'

'ঠিক আছে।'

আহমদ মুসা অয়্যারলেস তুলে নিল মুখের কাছে।

প্রেসিডেন্ট কিরনস্কী জুনিয়ার তার ক্রেমলিন অফিসে বিশাল টেবিলের সামনে বসে। উদ্বিগ্ন সে।

হেরিটেজ ফাউন্ডেশনে পুলিশ অপারেশনের প্রতি মুহুর্তের খবর তাকে অবহিত করা হচ্ছে।

এই অপারেশনের রেজাল্ট কি হবে?

প্রিন্সেস ক্যাথারিন সেখানে বন্দী আছে, এটা নিশ্চিত না হয়ে নিশ্চয় আহমদ মুসা সেখানে প্রবেশ করেনি। তাদের পুলিশের সর্বাত্মক বেষ্টনি এবং আক্রমণ থেকে আহমদ মুসা ও গ্রেট বিয়ার কেউ-ই রেহাই পাবে না। এক ঢিলে দুই পাখি তারা মারতে পারবে।

প্রেসিডেন্ট মনে মনে ধন্যবাদ দিল তাদের ব্রিলিয়ান্ট গোয়েন্দা অফিসার বরিসভকে। তার নিয়োজিত দু'জন গোয়েন্দা এজেন্ট পাভলভ ও রোসা

ড্রাইভারের ছদ্মবেশে সর্বক্ষণ সাথে থেকেছে আহমদ মুসার। তারাই জানিয়েছে হেরিটেজ ফাউন্ডেশনে আহমদ মুসার প্রবেশের কথা।

প্রেসিডেন্ট কিরনস্কী জুনিয়রের মনে পড়ল বরিসভের অনুরোধের কথা। আহমদ মুসার কোন ক্ষতি না হয়, এটা নিশ্চিত করতে আবেদন করেছে বরিসভ। অনেকে চাইলেও প্রেসিডেন্ট কিরনস্কী চান না আহমদ মুসার কোন প্রকার ক্ষতি হোক। তিনি শুধু চান প্রিন্সেস ক্যাথারিনের উপর আহমদ মুসার কোন প্রভাব পড়ুক।

এই মাত্র আসা একটা খবর প্রেসিডেন্ট কিরনস্কীর টেনশন বাড়িয়ে দিয়েছে। তার পুলিশ বাহিনী গোটা হেরিটেজ সার্চ করার পরও আহমদ মুসা, প্রিন্সেস ক্যাথারিন, ফরাসী প্রিন্স প্লাতিনি কারোরই কোন সন্ধান পায়নি। পুলিশ প্রধান আলেকজান্ডার খুব হতাশ কণ্ঠে এ খবর জানিয়েছে প্রেসিডেন্টকে। তবে একটা ভাল খবর দিয়েছে, গ্রেট বিয়ারের প্রধান আইভান ধরা না পড়লেও তার প্রধান দুই সহযোগী, মাজুরভ ও ভাদিমির খিরভ ধরা পড়েছে।

প্রেসিডেন্ট কিরনস্কী কিছুতেই উত্তর খুঁজে পাচ্ছে না আহমদ মুসা ও ক্যাথারিনরা কোথায় হাওয়া হলো? সকাল থেকে একটা প্রাণীও তো বের হয়নি হেরিটেজ ফাউন্ডেশন থেকে।

অয়্যারলেসে আবার মেসেজ এল। এ্যাম্পলিফায়ার সেট করা অয়্যারলেস প্রেসিডেন্টের সামনে রাখা। অয়্যারলেস কথা বলে উঠল।

পুলিশ প্রধান আলেকজান্ডার জানাচ্ছেন, মাজুরভের কাছ থেকে জানা গেল

প্রিন্সেস ক্যাথারিনদেরকে হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের ভূগর্ভস্থ বন্দীখানায় রাখা হয়েছে। গ্রেট বিয়ারের প্রধানকেও ওখানে পাওয়া যাবে। কিন্তু নিচে নামার পথ বন্ধ। লিফট ভূগর্ভে নিয়ে লক করে রাখা হয়েছে। এখন লিফট ধ্বংস করে রাস্তা পরিস্কার করার পর সেখানে নামার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

এই মেসেজ পেয়ে প্রেসিডেন্ট কিরনস্কীর মুখে হাসি ফুটে উঠল। নিশ্চয় আহমদ মুসাও আইভানের হাতে ধরা পড়ার পর সেই ভূগর্ভেই রয়েছে।

মাত্র পাঁচ মিনিট। এরপর যে দু'টি খবর এল তা ভয়াবহ। ভুগর্ভস্থ বন্দীখানায় পুলিশ প্রধান আলেকজান্ডার সহ পুলিশরা প্রবেশ করেছে।

গ্রেট বিয়ারের প্রধান আইভানকে তার ছয়জন প্রহরীর সাথে মৃত অবস্থায় সেখানে পাওয়া গেছে। প্রিন্সেস ক্যাথারিনের বন্দী কক্ষে তার কাপড় চোপড় পাওয়া গেছে, কিন্তু তাকে পাওয়া যায়নি। ফরাসী প্রিন্স প্লাতিনের বন্দী কক্ষেও এই একই বিষয় দেখা গেছে।

দ্বিতীয় ভয়াবহ খবর হলো, বন্দীখানায় মৃত অবস্থায় আইভান হিসেবে যাকে পাওয়া গেছে, তিনি পার্লামেন্টের বিরোধী দলের নেতা লেনিনের নাতি বুলগানিন।

এই দুই খবরে উদ্বেগ-উত্তেজনায় প্রেসিডেন্ট কিরনস্কী জুনিয়রের মধ্যে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার সৃষ্টি হলো।

আর দু'দিন বাদে ৫ই মার্চ জার সম্রাটের পদত্যাগ দিবসে (১৯১৭) ক্রাউন প্রিন্সেস ক্যাথারিনকে রাশিয়ার নিয়মতান্ত্রিক সম্রাট ঘোষণা করা হবে। তাকে না পেলে এর কি উপায় হবে। জনগণকে তারা কি বলবে। অবশ্য কানাঘুষার মাধ্যমে দেশের সব লোকই আজ জানে, ক্রাউন প্রিন্সেস ক্যাথারিনকে গ্রেট বিয়ার কিডন্যাপ করেছে রুশ পার্লামেন্টের নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র চালুর উদ্যোগ বানচাল করে দেবার জন্যে। তবে যেহেতু সরকার কিছু বলেনি, তাই জনগণ ধরে নিয়েছে ৫ই মার্চ তাদের

আকাঙ্খিত নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র চালু হতে যাচ্ছে রাশিয়ায়। এই অবস্থায় মানুষকে আশাহত করলে এমনকি তার সরকারের পতনও ঘটতে পারে।

এরপর রুশ পার্লামেন্টের বিরোধী দলীয় নেতা বুলগানিন আইভান হওয়া এবং হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের ভূগর্ভস্থ কক্ষে তার নিহত হওয়ার ঘটনা। জনগণ কি এটা বিশ্বাস করবে? একে যদি মানুষ তার সরকারের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বলে তাহলে তার সরকারের দশা কি হবে!

একমাত্র উপায় ছিল ক্রাউন প্রিন্সেস ক্যাথারিন উদ্ধার হওয়া। সে যদি জনগণকে সব ঘটনা জানাত, তাহলে মানুষ সেটা বিশ্বাস করতো এবং সরকার ভয়াবহ বিপর্যয় থেকে বেঁচে যেত।

বিমূঢ় প্রেসিডেন্ট কিরনস্কী ইন্টারকমে পি.এসকে নির্দেশ দিল প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে তাড়াতাড়ি আসার জন্যে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা এসে আসন নিল প্রেসিডেন্টের সামনের চেয়ারে। তাদেরও মুখ ম্লান ও চিন্তাক্লিষ্ট।

'সব খবর আপনারা শুনেছেন। বলুন আপনারা কি ভাবছেন?'

'স্যার, আমরা পরিস্থিতিকে বিপদজনক মনে করছি। গ্রেট বিয়ারের কারাগারে বন্দী এবং প্রত্যক্ষদর্শী প্রিন্সেস ক্যাথারিনের সাক্ষ্যই শুধু পারে সরকারকে রক্ষা করতে।' বলল তারা।

'আপনাদের সাথে আমি একমত। কিন্তু প্রিন্সেস ক্যাথারিনকে পাওয়া যাবে কোথায়?'

'আমাদের মনে হচ্ছে, আহমদ মুসাই তাকে বন্দীখানা থেকে উদ্ধার করেছে।' বলল প্রধানমন্ত্রী।

'তোমার পুলিশ তা পারল না কেন?' তীব্র ক্ষোভের সাথে বলল প্রেসিডেন্ট কিরনস্কী।

'স্যার, আমাদের পুলিশ ভূগর্ভস্থ সুরঙ্গের কথা চিন্তাই করেনি।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলল।

'বিদেশী আহমদ মুসা তা চিন্তা করল কি করে? খুঁজে পেল কি করে?' তীব্র কণ্ঠে বলল প্রেসিডেন্ট।

কথা বলল না প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

প্রেসিডেন্ট কিছু বলতে যাচ্ছিল।

কিন্তু তার আগেই প্রেসিডেন্টের অয়্যারলেস কথা বলে উঠল। তাতে অপরিচিত এক কন্ঠ শোনা গেল, 'মহামান্য প্রেসিডেন্ট, আমি আহমদ মুসা। গাড়ি নিয়ে ক্রেমলিনের গেটে। আমার সাথে রয়েছেন ক্রাউন প্রিন্সেস ক্যাথারিন। আমি প্রেসিডেন্টের সাক্ষাত প্রার্থী।'

প্রেসিডেন্ট তার কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। সত্যিই আহমদ মুসা ক্রাউন প্রিন্সেস ক্যাথারিনকে নিয়ে ক্রেমলিনের গেটে এসেছে। সে কথাগুলো স্বপ্ন শুনছে না তো?

আনমনা হয়ে পড়েছিল প্রেসিডেন্ট।

'স্যার, জবাব দেয়ার প্রয়োজন।' বলল প্রধানমন্ত্রী।

সম্বিত ফিরে পেল প্রেসিডেন্ট। না সে স্বপ্ন দেখছে না। বলল, 'আপনার সাথে আর কে আছে আহমদ মুসা?'

'প্রথম গাড়ি ড্রাইভ করছি আমি। এ গাড়িতে আছেন ক্রাউন প্রিন্সেস। দুই নম্বর গাড়িতে রয়েছেন আমার স্ত্রী, স্ত্রীর দু'জন বান্ধবী এবং গ্রেট বিয়ারের বন্দীখানা থেকে উদ্ধার পাওয়া প্রিন্স প্লাতিনি এবং লেনার্ট লার। আর শেষ গাড়িতে রয়েছেন আপনাদের দু'জন গোয়েন্দা এবং আমার সাথী পাভলভ ও রোসা।'

'হুকুম দিচ্ছি তিন গাড়িই ভেতরে ঢুকবে। কিন্তু আমার কাছে আসবেন আপনি এবং ক্রাউন প্রিন্সেস।'

'ধন্যবাদ।' ওপার থেকে বলল আহমদ মুসা।

তিন গাড়িই ভেতরে ঢুকল।

প্রেসিডেন্টের গাড়ি বারান্দায় স্বয়ং প্রেসিডেন্ট নেমে এসেছেন ক্রাউন প্রিন্সেস ক্যাথারিনকে স্বাগত জানানোর জন্যে।

প্রেসিডেন্ট কিরনস্কীর অফিসের আলোচনা কক্ষ।

টেবিলের এক পাশে বসেছে প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অন্যপাশে ক্রাউন প্রিন্সেস ক্যাথারিন ও আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা বসতে চায়নি প্রিন্সেসের পাশে। প্রেসিডেন্টও আহমদ মুসাকে সমর্থন করেছে।

কিন্তু ক্রাউন প্রিন্সেস যুক্তি দেখিয়েছে, বর্তমান সংকটকালে আহমদ মুসা স্বাভাবিকভাবে তার পক্ষে শামিল হয়ে গেছে।

কথা শুরু হলো।

প্রেসিডেন্ট দুঃখ প্রকাশ করলেন। ক্রাউন প্রিন্সেসের দীর্ঘ বন্দী জীবনের জন্যে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট মোবারকবাদ জানালেন আহমদ মুসাকে প্রিন্সেসকে উদ্ধারে তার অবিস্মরণীয় অবদানের জন্যে।

'ধন্যবাদ মিঃ প্রেসিডেন্ট। আমার এখানে আসার উদ্দেশ্য সম্মানিতা প্রিন্সেসকে আপনার কাছে পৌছে দেয়া। আমার সে দায়িত্ব পালন শেষ।' বলল আহমদ মুসা।

'ধন্যবাদ। কিন্তু.......মানে আমি বলতে চাচ্ছি, রাজকীয় রিং এবং...।'

আহমদ মুসা প্রেসিডেন্টকে বাধা দিয়ে বলল, 'ও দু'টি জিনিসের মালিকানা ক্রাউন প্রিন্সেসের। এ ব্যাপারে উনিই বলতে পারেন।'

'না, মানে এসব কথা আমি প্রিন্সেসকে জিজ্ঞেস করছি না। থাক এসব এখন। বর্তমান সংকটের কথায় আসি। সম্মানিতা ক্রাউন প্রিন্সেসের আমরা সহযোগিতা চাই।'

'কি সহযোগিতা?' বলল ক্যাথারিন।

'আমার সরকার ভীষণ সংকটে পড়েছে। বিরোধী দলীয় নেতা বুলগানিন হেরিটেজ ফাউন্ডেশনে নিহত হয়েছে, একথা এখনি ঘোষণা করা দরকার। কিন্তু আইভান নামের আড়ালে সেই যে গ্রেট বিয়ারের প্রধান ছিল, একথা মানুষকে বিশ্বাস করানো যাবে না। একমাত্র ক্রাউন প্রিন্সেস ক্যাথারিনের সাক্ষ্যই পারে রুশ জনগণকে এ কথা বিশ্বাস করাতে। সুতরাং ক্রাউন প্রিন্সেসকে অবিলম্বে রেডিও টেলিভিশনে কথা বলতে হবে।'

'ব্যাপারটা আমি বুঝেছি। কিন্তু রেডিও টিভিতে শুধু আমিই কথা বললে চলবে না। ফ্রান্সের বুরবন প্রিন্স প্লাতিনি লুই গ্রেট বিয়ারের বন্দীখানায় বন্দী ছিলেন, এস্টোনিয়ার কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স প্রধান লেমার্ট লারও গ্রেট বিয়ারের বন্দীখানায় বন্দী ছিলেন। এদের সবাইকেই রেডিও টিভিতে কথা বলতে দিতে হবে।'

থামল ক্যাথারিন। প্রেসিডেন্ট কিরনস্কী জুনিয়র একবার প্রধানমন্ত্রীর দিকে চাইল এবং তারপর বলল, 'যদিও এর খুব বেশি প্রয়োজন ছিল না, তবু ক্রাউন প্রিন্সেসের এ প্রস্তাবকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি।'

'দ্বিতীয়ত, আমার কথা মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করাতে হলে আমার বন্দী জীবন, আমার উদ্ধারের সব সত্য কথাই আমাকে বলতে হবে। তাতে আহমদ মুসার কথাও বার বার আসবে।'

প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সকলের মুখ ম্লান দেখা গেল।

একটু সময় নিয়ে প্রেসিডেন্ট অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলল, 'আমাদের যাতে উপকার হবে, তাতে আমাদের আপত্তি নেই। আপনি যা ভাল মনে করবেন, সবই বলতে পারবেন।'

'তৃতীয়ত, রাশিয়ায় নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত আপনাদের রাজনৈতিক প্রোগ্রামের সাথে আমি একমত। তবে জার পরিবারের সদস্য হিসেবে জার সম্রাটদের অতীত অনেক ভুলের আমি প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই, এ ব্যাপারে আমার পূর্ণ স্বাধীনতা আপনাদের স্বীকার করতে হবে।'

'প্রায়শ্চিত্তগুলো কি?' বলল প্রেসিডেন্ট কিরনস্কী জুনিয়র।

'সেগুলো আমি পরে বলব। তবে সে সবের সবটাই রাশিয়ার জাতীয় রাজনীতির ভবিষ্যত স্বার্থকে সামনে রেখেই করব।'

'সম্মানিতা ক্রাউন প্রিন্সেসের তৃতীয় শর্তকেও আমরা মেনে নিচ্ছি।' বলল প্রেসিডেন্ট।

'চতুর্থত, আহমদ মুসা এবং তার সাথের লোকজন আমার ব্যক্তিগত অতিথি হিসেবে থাকবেন যে কয়দিন ওরা রাশিয়ায় আছেন। তবে ওরা কোথায় থাকবেন, সেটা শুধু ওরাই জানবেন। তবে ক্রেমলিনে এবং আমার বাসস্থান পর্যন্ত পৌছার তাদের অবাধ অধিকার থাকবে। ক্রেমলিনে তাদের কারও কোন ক্ষতি হলে রাষ্ট্র দায়ী থাকবে।'

'রাশিয়ানরা অবশ্যই অতিথি পরায়ণ। আপনার প্রস্তাব আমরা সানন্দে গ্রহণ করছি।' বলল প্রেসিডেন্ট কিরনস্কী জুনিয়র।

কথা শেষ করেই প্রেসিডেন্ট একটু থামল। পরক্ষণেই আবার বলল, 'সম্মানিতা ক্রাউন প্রিন্সেস, ক্রেমলিনে জার সম্রাটদের খাস মহল নতুন করে সাজানো হয়েছে। সেখানেই আপনি থাকবেন।'

বলে প্রধানমন্ত্রীর দিকে চেয়ে প্রেসিডেন্ট বলল, 'আপনি একটু ওদিকে দেখবেন, কোন অসুবিধা না হয়। উনি একটু রেষ্ট নেবার পর রেডিও টিভি'তে আসবেন। আর ক্রাউন প্রিন্সেসের মেহমানরা এখনকার মত ক্রেমলিনের মেহমান খানায় থাকবেন।'

'ধন্যবাদ প্রেসিডেন্ট।' বলে উঠে দাঁড়াল প্রিন্সেস ক্যাথারিন।

প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও উঠে দাঁড়িয়েছে। আহমদ মুসাও।

# ২

সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন সিংহাসনে বসে।

মার্চের পাঁচ তারিখেই তার অভিষেক হয়েছে। অর্থ্যাৎ এদিন ক্যাথারিন জারের সিংহাসনে বসার মধ্যে দিয়ে রাশিয়ায় নিয়মতান্ত্রিক রাজতান্ত্রিক ব্যাবস্থা চালু হয়েছে। এর আগের দিন পার্লামেন্টে সর্ব সম্মতিক্রমে এই লক্ষ্যে সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে। বিরোধীদলের সদস্যরাও সংশোধনীর পক্ষে ভোট দিয়েছে। বিরোধীদলীয় নেতা বুলগানিনের 'আইভান দি টেরিবল' হওয়ার তথ্য ফাঁস হবার পর

বিরোধীদলীয় সকল সদস্য বুলগানিনের নিন্দা করেছে।

মার্চের পাঁচ তারিখে ক্যাথারিনের সিংহাসনে আরোহনকে রুশ জনগণ স্বাগত জানিয়েছে। ১৯১৭ সালের এই তারিখেই জার সম্রাট সিংহাসন পরিত্যাগ করে পার্লামেন্টের হাতে সব ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছিলেন। রুশ জনগণ মনে করছে, জারতন্ত্রও নয়, আবার কম্যুনিস্ট স্বৈরতন্ত্রও নয় এবং কান্ডারীহীন গনতন্ত্রও নয়, নতুন নিয়ম তান্ত্রিক রাজতন্ত্রের অধীন গনতন্ত্রে অবশ্যই রাশিয়ায় শান্তি সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা নিয়ে আসবে।

সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন তার অভিষেক অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে জনগণের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, 'জারদের অনেক পাপের তিনি প্রায়শ্চিত্ত করবেন এবং বিশ্ব সভায় রাশিয়ার শক্তি, সুনাম ও মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন। স্বদেশ ও বিদেশ থেকে লুন্ঠনের মাধ্যমে জাররা শত শত বছর ধরে যে ধনাগার গড়ে তুলেছিলেন তা উন্মুক্ত করে তিনি পাওনাদারদের মধ্যে বিলিয়ে দেবেন।

সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিনের এই ভাষণকে রুশ জনগণ অভিনন্দিত করেছে। পত্র-পত্রিকা সম্রাজ্ঞীর ন্যায়পরায়নতা ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভংগির প্রশংসা করেছে। বলেছে, সম্রাজ্ঞীর অতীতের ভুল ও অবিচারের প্রতিকারের প্রতিশ্রুতি নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করবে এবং এর প্রতি মানুষের আস্থা বাড়াবে।

রুশ প্রধানমন্ত্রী, ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী সম্রাজ্ঞীর অফিসে প্রবেশ করার পর একটা লম্বা বাউ করে সিংহাসনের প্ল্যাটফরমের নিচে দু'পাশে রাখা সারিবদ্ধ চেয়ারের ডানদিকের প্রথমটিতে প্রধানমন্ত্রী কিরনস্কী জুনিয়র দ্বিতীয়টিতে ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী এবং বামদিকর প্রথমটিতে অর্থমন্ত্রী এবং দ্বিতীয়টিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বসলেন।

সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে প্রেসিডেন্টের পদ বিলোপ করার পর প্রেসিডেন্ট কিরনস্কী জুনিয়র প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী।

ওরা আসন গ্রহন করতেই সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন তার সামনের ফাইলের দিকে একবার চোখ বুলাল। তারপর সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানাবার জন্যে আমি আপনাদের ডেকেছি।'

ক্যাথারিন থামতেই প্রধানমন্ত্রী বিনয়ের সাথে বলল, 'আমরা কৃতজ্ঞ সম্রাজ্ঞী।'

ক্যাথারিন বলা শুরু করল, 'আমার অভিষেক অনুষ্ঠানের বক্তৃতায় আমি জনগণের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, সেটাই এখন আমি কার্যকরী করতে চাই। এ সম্পর্কিত আমার রাজকীয় ফরমান তৈরী সমাপ্ত হয়েছে। আজ ফরমান জারীর আগে আপনাদেরকে আমি বিষয়টি জানাতে চাই।'

'মহামান্য সম্রাজ্ঞী, মাফ করবেন আমাকে। ফরমান জারীর আগে তো তা মন্ত্রী সভায় অনুমোদিত হতে হবে। 'বিনয়ের সাথে বলল প্রধানমন্ত্রী।

হাসল ক্যাথারিন। বলল, 'ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী, আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আমি রাষ্ট্রের সমসাময়িক কোন বিষয়ের উপর ফরমান জারী করতে যাচ্ছি না যে, এটা করতে মন্ত্রীসভার অনুমোদন লাগবে। কিন্তু সম্রাজ্ঞীর পারিবারিক বিষয়, রাজতন্ত্রের অতীত কোন বিষয়-সম্পত্তি যা রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় কোষাগারের আইনানুগ কোন বিষয় নয়, ইত্যাদি ব্যাপারে সংবিধান সম্রাজ্ঞীকে ফরমান জারী বা সিদ্ধান্ত গ্রহণেরবাধা-বন্ধনহীন এখতিয়ার দিয়েছে।'

'সম্রাজ্ঞী ঠিকই বলেছেন।' বলল প্রধানমন্ত্রী।

ক্যাথারিন আবার শুরু করল, 'আমার মা'র নেতৃত্বে সরকারের একজন ও রাজ পরিবারের একজন প্রতিনিধি সম্বলিত তিন সদস্যের কমিশন জার সম্রাটদের গোপন ধন-ভান্ডারের যে বিবরণ তৈরি করেছে তাতে আমার কাজ অনেকখানি সহজ হয়ে গেছে।'

একটু থামল ক্যাথারিন। থেমেই আবার শুরু করল, 'কমিশনের রিপোর্ট জারের ধন-ভান্ডারের তিনটি বিভাগ দেখানো হয়েছে। যেমন, বৈদেশিক, দেশীয় ও পারিবারিক। বিদেশ থেকে আহরিত সোনা, স্বর্ণালংকার এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা বৈদেশিক বিভাগে এবং দেশ থেকে আদায়কৃত অর্থ রাখা হয়েছে দেশীয় বিভাগে এবং পারিবারিক অলংকারাদি ও অর্থ-সম্পদ সঞ্চিত করা হয়েছে পারিবারিক বিভাগে। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, বিদেশের লুণ্ঠিত সম্পদ সংশ্লিষ্ট দেশের জনগণের হাতে ফেরত দেব। দেশীয় বিভাগের অর্থ-সম্পদ পাবে রুশ জনগণ। এই টাকা তাদের চিকিৎসা, শিক্ষা ও বার্ধক্য ভাতা খাতে খরচ হবে। আর পারিবারিক সম্পদ যাবে জার পরিবারের কাছে।'

ফাইলের দিকে নজর দেবার জন্যে ক্যাথারিন একটু থামতেই প্রধানমন্ত্রী কিরনস্কী বলে উঠল, 'মহামান্য সম্রাজ্ঞী, বিদেশ থেকে আহরিত টাকা কিভাবে সংশ্লিষ্ট দেশের জনগণকে ফেরত দেবেন। দেশ ও টাকার পরিমাণ চিহ্নিত হবে কিভাবে?'

ফাইল থেকে মুখ তুলে হাসল ক্যাথারিন। বলল, 'আমার পূর্ব পুরুষরা নামের জন্যে যা করে গেছেন তা এখন আমার কাজে লাগছে। তারা তাদের ধন-ভান্ডারের বিদেশ বিভাগকে বিভিন্ন উপ-বিভাগে ভাগ করেছেন। একটি করে উপবিভাগকে একটি বিজয়ের স্মারক হিসেবে দেখানো হয়েছে। যেমন- এস্টোনিয়া, লিথুনিয়া ও ল্যাটভিয়া বিজয়ের স্মারক, পোলান্ড বিজয়ের স্মারক, রোমানিয়া বিজয়ের স্মারক, তুর্কি বিজয়ের স্মারক ইত্যাদি। সুতরাং প্রদর্শনীর জন্যে বিজয় থেকে লুন্ঠিত সম্পদকে আলাদা আলাদা করেই রাখা হয়েছে। তাই লুন্ঠিত সম্পদ ফিরিয়ে দেয়া খুবই সহজ হয়ে গেছে।'

থামল ক্যাথারিন।

উপস্থিত চারজনের কেউই কথা বলল না।

মুখ চোখ দেখে সবাইকে বিব্রত মনে হলো।

অবশেষে মুখ খুলল প্রধানমন্ত্রীই। বলল, 'মাফ করবেন সম্রাজ্ঞী, এভাবে কি কেউ সম্পদ ফেরত দেয়?'

'আমার জানা মতে দেয়নি কেউ। সবার পক্ষ থেকে সংশোধনের এই কাজ আমি শুরু করতে চাই।'

'মহামান্য সম্রাজ্ঞী, এই কাজটি জার সম্রাটদের আবহমান ঐতিহ্যের বিপরীত হবে।'

'আমাদের নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রও তো জার সম্রাটদের 'আবহমান' ঐতিহ্যের বিপরীত। কিন্তু তবু তো করছি আমরা তা।'

'মহামান্য সম্রাজ্ঞী, কোন দেশই তো এভাবে অর্থ ফেরত দেয়নি, দেয় না।' বলল প্রধানমন্ত্রী।

'সম্ভবত সে সব দেশে আপনাদের এই ক্যাথারিনের মত কেউ সিংহাসনে বসেননি।'

'মাফ করবেন সম্রাজ্ঞী, এটা করে আমরা কি অর্জন করতে চাচ্ছি?'

'এর মাধ্যমে আমি রাজপরিবারের পাপ স্খালন করতে চাচ্ছি। আর এই পাপ স্খালনের মাধ্যমে আমি মনে করি নতুন রাশিয়ার উত্থান ঘটবে এবং নতুন শক্তি ও সমৃদ্ধিতে হবে বলিয়ান। যা আমি অস্ত্রের জোরে নয়, রাশিয়ার হৃদয় দিয়ে অর্জন করতে চাই। 'বলতে বলতে ক্যাথারিনের কণ্ঠ আবেগে ভারি হয়ে উঠল।'

প্রধানমন্ত্রী কিরনস্কী জুনিয়র তার আসন থেকে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'ধন্যবাদ মহামান্যা সম্রাজ্ঞী। আমার আর কোন জিজ্ঞাসা নেই। আমি আপনার সাথে একমত।'

'ধন্যবাদ প্রধনামন্ত্রী। ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে।'

সবাই উঠে দাঁড়িয়ে বাউ করল ক্যাথারিনকে।

তারপর অনুমতি নিয়ে ঘর থেকে দরজার দিকে এগুলো।

বাইরে বেরিয়ে চারজনই পাশাপাশি চলছিল।

কিছু বলার জন্যে উশখুশ করছিল ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী। বলল সে অবশেষে, 'সম্রাজ্ঞীকে তার সিদ্ধান্ত থেকে ফিরাবার কি কোন উপায় নেই?'

'আমিও তাই ভাবছি। 'বলল অর্থমন্ত্রী।

'কিন্তু আমি মনে করছি, সম্রাজ্ঞীর সাহসী সিদ্ধান্ত রাশিয়াকে নতুন যুগে প্রবেশ করাবে এবং অতীতের অনেক ক্লেদ-কালিমা থেকে রাশিয়াকে মুক্ত করবে। এদিক দিয়ে রাশিয়ায় নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র চালুর সিদ্ধান্ত ঐতিহাসিক এবং সার্থক প্রমাণিত হবে।' বলল প্রধানমন্ত্রী।

'কিন্তু রাশিয়ার তো ক্ষতি হচ্ছে। 'বলল ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী।

'বড় বড় সুবিধা ও স্বার্থ আদায় করার জন্যে অনেক সময় নগদ ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। এটা সেই রকম ব্যাপার।' বলল প্রধানমন্ত্রী।

'মানুষ কি এটা মেনে নেবে?' বলল আবার ডেপুটি প্রধানমন্ত্রীই।

প্রধানমন্ত্রী হাসল। বলল, 'আগেও সম্রাজ্ঞী পপুলার ছিলেন। কিন্তু তার দু'টি বক্তব্য রেডিও টিভিতে আসার পর বলা যায় তিনি একশ'ভাগ রাশিয়ানদের হৃদয় জয় করেছেন। আজ তাঁর এ ফরমান প্রকাশিত হবার পর আমি মনে করি স্বদেশের মত বিদেশেও তিনি মানুষের হৃদয় জয় করবেন।'

'আপনার এসব কথা আমি মেনে নিচ্ছি। কিন্তু আহমদ মুসার মত একজন বিদেশী আমাদের সম্রাজ্ঞীর উপর প্রভাব খাটাবেন, তা আমি মেনে নিতে পারছি না।' বলল ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী।

'দেখ, আহমদ মুসা আমাদের সম্রাজ্ঞীর জন্যে যা করেছেন, কোন রাশিয়ান কিন্তু তা করেননি। আর আহমদ মুসার ব্যাক্তিত্বকে ছোট করে দেখছ কেন? এই আহমদ মুসা ফরাসী রাজকুমারীকে বিয়ে করেছেন আর আমাদের ক্রাউন প্রিন্সেস তাতিয়ানারও তিনি ছিলেন প্রিয়তম ব্যাক্তি।'

'তারা একজন মুসলিম আহমদ মুসার প্রতি কেন এমন করে ঝুঁকলেন। সেটাই আমার খারাপ লাগছে।'

প্রধানমন্ত্রী কিরনস্কী জুনিয়র একটু চিন্তা তারপর বলল, 'তুমি ইতিহাসের ছাত্র। তোমার তো জানার কথা, রাশিয়ার রাজ পরিবারের সূচনাতেই তাদের রক্তের সাথে 'মোঙ্গল' রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছিল এবং সেই সময় মোঙ্গল রক্তের সাথে সংমিশ্রণ ঘটেছিল মুসলিম রক্তের। এই মুসলিম রক্তের প্রভাব ক্রাউন

প্রিন্সেস তাতিয়ানার উপর পড়েছিল এবং হয়তো আমাদের সম্রাজ্ঞীর উপরও পড়তে পারে।'

'এটা কি খারাপ খবর নয়?' ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী বলল।

'কেন তোমার বোন দেশের শীর্ষ বুদ্ধিজীবী ডঃ নাতালোভা ও তোমার ভাগ্নী ওলগা কি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হননি? আমাদের সম্রাজ্ঞী তার উপকারীর ধর্মকে যদি ভাল চোখে দেখেন ক্ষতি কি?'

ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী ইউরি অরলভের দু'চোখে মুহূর্তের জন্যে আনন্দের একটা বিদ্যুত চমক খেলে গেল। কিন্তু মুখের গাম্ভীর্য সে নষ্ট হতে দিল না।

প্রধানমন্ত্রীর কথার পর কোন কথা ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী আর বলল না।

কথা বলল আবার প্রধানমন্ত্রীই। বলল, 'সম্রাজ্ঞীর ভুমিকায় আমি আনন্দিত। তিনি একাই শুধু জনপ্রিয় হবেন না, তাঁর সাথে সাথে জনপ্রিয় হবে আমাদের সরকারও। তার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তকে যদি আমরা পুঁজি হিসাবে কাজে লাগাতে পারি, তাহলে আমাদের সরকারের সুনাম বিদেশেও বৃদ্ধি পাবে। দীর্ঘস্থায়ী হবে আমাদের সরকার।'

সকলেই ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল প্রধানমন্ত্রীর কথায়।

লিফটের সামনে তারা পৌঁছে গেছে।

লিফটের দরজা খুলে গেলে প্রবেশ করল তারা লিফটে।

সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিনের অন্দর মহলের প্রাইভেট ড্রইংরুম।

একটি সোফায় সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন বসে। সামনে আরেকটি সোফায় আহমদ মুসা ও ডোনা জোসেফাইন পাশাপাশি।

সম্রাজ্ঞী জারের ধন-ভান্ডার সংক্রান্ত তার ফরমান ঘোষণার ক'দিন পর ক্যাথারিন ও আহমদ মুসার এই সাক্ষাৎ।

সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিনের জারের ধন-ভান্ডার সম্পর্কিত ফরমান বিস্মিত করেছিল আহমদ মুসাকে। আহমদ মুসার জিজ্ঞাসার জবাবে ক্যাথারিন ব্যাখ্যা করছিল তার পরিকল্পনা।

ব্যাখ্যার এক পর্যায়ে সে বলল, 'জারের ধন-ভান্ডারের বণ্টন সংক্রান্ত আরেকটা বিস্তারিত ফরমান আমার তৈরি হয়ে গেছে। এই ফরমান প্রকাশিত হলে দেখা যাবে, মুসলমানদের তুর্কি খিলাফতের ব্যাপক অঞ্চল লুণ্ঠন করে জাররা যে অর্থ তার ধন-ভান্ডারে সঞ্চয় করেছিল, তার পরিমাণ বর্তমান হিসেবে দুই হাজার কোটি ডলার। এই অর্থ আমি তিন ভাগ করে দুই ভাগ দান করতে চাই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বর্তমান সরকারের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে। বাকী এক ভাগ যাবে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন তহবিলে।' থামল ক্যাথারিন।

'দ্বিতীয় ভাগের কাজ সহজ, কিন্তু প্রথম দুই ভাগের অর্থ বন্টনের কাজ কিভাবে নির্ধারণ করবেন?' বলল আহমদ মুসা।

সেটা আমি করে ফেলেছি। বোসনিয়া হার্জেগোভিনার পশ্চিম সীমান্ত থেকে কাস্পিয়ান সাগরের উত্তর সীমান্ত পর্যন্ত ৬৮ টি মুসলিম নগরী অগ্নিদগ্ধ করাসহ এই অঞ্চলে জাররা ব্যাপক লুণ্ঠন চালায়। মায়না, আকডিয়া, বাজারজিক, গ্রেভনা ইত্যাদির মত নগরীতে কেউ বেঁচে ছিল না। এই অঞ্চলগুলোও পড়েছে এখন কাজাখস্তান, চেচনিয়া, তাতারস্তান, আজারবাইজান, ইউক্রেন, রোমানিয়া, বুলগেরিয়া, সার্বিয়া ও বোসনিয়ার মধ্যে। তবে বৃহত্তর অংশে পড়েছে চেচনিয়া, তাতারস্তান, ইউক্রেন ও ককেশীয় অঞ্চলে। এদের মধ্যে আবার সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চল হলো চেচনিয়া ও তাতার অঞ্চল। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, প্রথম ভাগের দুই তৃতীয়াংশ অর্থ্যাৎ ৮শ কোটি ডলার যাবে এই দুই রাষ্ট্রে।'

'ধন্যবাদ সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন।' বলে হাসল আহমদ মুসা। তারপর বলল, 'মানুষ তো বলতে পারে, মুসলমানদের আপনি বেশি ফেভার করেছেন। এটা কি প্রতিদানের মত কোন অনুগ্রহ?

'কিসের প্রতিদান?'

'একজন মুসলমানের কাছে আপনি কিছু সাহায্য পেয়েছিলেন, তার প্রতিদান।'

'সেই মুসলমান কি কোন প্রতিদান চান?'

'চাইবে কেমন করে? সে তো সীমহীন দানের কিঞ্চিত প্রতিদান হিসেবে এটা করেছে।'

উত্তরে বলল সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন, 'স্থান ও পাত্রের অনেক পার্থক্যের বিচারে প্রতিদান অবশ্যই চাইতে পারেন। কিন্তু প্রতিদান হিসাবে আমি এটা করছি না। বলতে পারেন এটা রক্তের একটা টান।' বলে হাসল ক্যাথারিন। বলল আবার, 'রাজকীয় পারিবারিক ইতিহাসেও বলে, আমাদের রাজপরিবার ও রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল মোঙ্গলদের দ্বারা। মস্কো অঞ্চলের অনেক প্রিন্সের মধ্যে একজন প্রিন্স ইউরি বিয়ে করেছিলেন মোঙ্গল খানের এক বোনকে ১২ শ' খৃস্টাব্দের শুরুর দিকে। তারপর মোঙ্গল সৈন্যের সাহায্য নিয়েই প্রিন্স ইউরি প্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর রাজত্ব। সেই থেকে অর্থ্যাৎ ১২৩৭ খৃস্টাব্দ থেকে ১৪৮০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ২৪৩ বছর রাশিয়ার রাজপরিবার ও রাজত্বের উপর মোঙ্গলদের নিয়ন্ত্রন ছিল। ১২২৭ সালে চেঙ্গিসখানের মৃত্যুর পর তাঁর পরিবার ও রাজত্ব চার ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই চার ধারার সবকটির উপর ইসলাম প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং মস্কোর উপর ২৪৩ বছরের মোঙ্গল প্রভাবের সময় রাশিয়ার রাজপরিবারের সাথে ইসলাম ধর্মের অনুসারী মোঙ্গলদের ব্যাপক বৈবাহিক সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। এইভাবে মুসলিম রক্ত প্রবেশ করেছে রাশিয়ার রাজপরিবারে। প্রথম দিকে রাজপরিবারের অনেক রাজকুমার, রাজকুমারী ও সদস্য প্রকাশ্যে ইসলামের অনুসরণ করতো। কিন্তু আইভান দি টেরিবলের সময় পরিস্থিতি পাল্টে যায়। মোঙ্গলদের সাথে বৈরিতা বাড়ার সাথে সাথে মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু রক্তের টান তো একটা আছেই।

দীর্ঘ এক বক্তব্য দেয়ার পর থামল সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন।

'ধন্যবাদ সম্রাজ্ঞী, অনেক নতুন তথ্য দিয়েছেন আপনি আপনার রয়্যাল ডায়েরী থেকে। আমরা খুশি হয়েছি, রয়্যাল ডায়েরী সম্ভবত কোন সত্যই গোপন করেনি। মহামান্যা সম্রাজ্ঞীর শাসন যদি রয়্যাল ডায়েরীর মত স্বচ্ছ হয় এবং হবে বলেই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, তাহলে রাশিয়া ও মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কের এক নতুন যুগে প্রবেশ করবে। তবে একটা প্রশ্ন সম্রাজ্ঞী। আপনি যে রক্তের টানের কথা

বললেন, তা আইভান দি টেরিবল-এর ১৫৪৭ সালে ক্ষমতায় আসার পর কোন সময়েই দেখা যায়নি কেন?' বলল আহমদ মুসা।

হাসল ক্যাথারিন। বলল, 'বংশ তত্ব সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তত্ব হলো, বংশীয় 'জীন'-এর প্রভাব কখন বা কত জেনারেশন পরে কার মধ্যে হঠাৎ করে প্রকাশ পাবে, তা বলতে বিজ্ঞানও অপারগ। তাছাড়া অতীতে আহমদ মুসার মত একজনের সাথে হয়তো এই বংশের কারো সাক্ষাত ঘটেনি। আহমদ মুসার সাথে আমারও সাক্ষাত না হলে রক্তের টান উপলদ্ধি করার সুযোগ আমার হতো কিনা বলা মুস্কিল।

'আপনার এই রক্তের টান কি মুসলমানদের অর্থ মুসলমানদের ফিরিয়ে দেয়া পর্যন্তই?'

'এ প্রশ্নের জবাব আমি দেব না।'

'কিন্তু জবাবটার প্রতি আমার আগ্রহ বেশি।'

'তাহলে অপেক্ষা করতে হবে আমি বেসরকারী লাইফে ফেরত না যাওয়া পর্যন্ত।'

'আলহামদুলিল্লাহ। আমি জবাব পেয়ে গেছি।'

'যদি পেয়ে থাকেন, তাহলে তা শুধু আপনি এবং প্রিন্সেস মারিয়া জোসেফাইনের জন্যেই।' গম্ভীর কণ্ঠে বলল ক্যাথারিন।

'বুঝেছি। কিন্তু সম্রাজ্ঞীর তো কোন রিটায়ারমেন্ট নেই।

একজন সম্রাজ্ঞীর বেসরকারী লাইফ কোনদিনও আসে না।'

'এসব বিষয়ে আমি এখন চিন্তা করছি না। সাম্রাজ্যটা আগে ঠিক করতে দিন। তারপর এসব নিয়ে চিন্তা করা যাবে। সিংহাসন আমার কাছে কোনদিনই বড় ছিল না, কোনদিনই বড় হবে না।'

'কিন্তু সম্রাজ্ঞী, আমাদের কাছে এ সিংহাসনের মূল্য অনেক।'

'আমিও সেটা জানি। আমার কোন সিদ্ধান্তই কাউকে হতাশ করার মত হবে না।'

'আলহামদুলিল্লাহ। আজ মনে পড়ছে তাতিয়ানাকে। তার দেয়া দায়িত্ব দেখছি আমাদের জন্যে পরম সৌভাগ্যের প্রমাণিত হলো।'

'কিন্তু আমার জন্যে তার চেয়েও পরম সৌভাগ্যের প্রমাণিত হয়েছে। আমি পেয়েছি নতুন জীবন।'

'তবে দুর্ভাগ্য হয়েছে তাতিয়ানার।'

'না। অমন সৌভাগ্যের মৃত্যু যদি আমার ভাগ্যে জুটতো! মদীনায় কবর হয়েছে তার!' ক্যাথারিনের কণ্ঠ ভারি হয়ে উঠেছিল।

একটু থামল। নিজেকে স্বাভাবিক করে তোলার চেষ্টা করল।

তারপর সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন বলল, 'ক'দিন খুব খারাপ লেগেছিল আপনি খাঁচা ভাঙা পাখির মত পালিয়ে যাবেন, তারপর রাশিয়ার সাথে আপনার সব সম্পর্কের ইতি ঘটবে, এই ভাবে।'

'মনে হচ্ছে, এখন খারাপ লাগছে না?'

সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন হাসল। বলল, 'খারাপ না লাগার কারণ ঘটেছে। মনে হচ্ছে, রাশিয়া আপনার সাথে একটা সম্পর্কের বাঁধন তৈরি করতে যাচ্ছে।'

'সেটা কি? আহমদ মুসার চোখে কৌতূহল।

আবার হাসল ক্যাথারিন। বলল, 'বলছি। আপনাকে কষ্ট দিয়েছি একথা বলার জন্যেও।'

কথা শেষ করে গম্ভীর হল ক্যাথারিন। বলল ডোনাকে লক্ষ্য করে, 'প্রিন্সেস মারিয়া জোসেফাইন, আপনি ওলগার ওখানে ক'সপ্তাহ আছেন, কেমন মনে হয় তার মাকে?'

হঠাৎ এমন প্রশ্নে বিস্মিত হলো ডোনা। একটু সময় নিয়ে জবাব দিল, 'ঠিক মাকে যেমন মনে হয়।'

'ধন্যবাদ প্রিন্সেস। এ প্রশ্নটা আমি ওলগাকেও করেছিলাম দু'সপ্তাহের সাহচর্যে প্রিন্স প্লাতিনি লুইকে তার কেমন মনে হয়। সেও ঠিক এমন জবাবই দিয়েছিল।' থামল সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন।

'কথাটা বুঝলাম না সম্রাজ্ঞী।' বলল আহমদ মুসা।

'অর্থ পরিস্কার। আমরা মারিয়া জোসেফাইনকে একজন মা দিতে চাই এবং ওলগাকে দিতে চাই একজন পিতা।'

ডোনা সোফা থেকে লাফ দিয়ে উঠল। আনন্দে তার চোখ-মুখ নাচছে। স্থান-কাল-পাত্র ভুলে সে চিৎকার করে উঠল, 'চমৎকার, চমৎকার, মহামান্যা সম্রাজ্ঞী আপনাকে মোবারকবাদ।'

কিন্তু আহমদ মুসার চোখে-মুখে আনন্দের চেয়ে বিস্ময়ের ঘোর বেশি। বলল সে, 'ডোনার আনন্দের সাথে আমি শেয়ার করছি। কিন্তু সম্রাজ্ঞী, 'এই পর্বত প্রমাণ ভারি কথাটা বলবে কে, তুলবে কে? রাজী করাবে কে?'

সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন ঠোঁটে এক টুকরো হাসি টেনে বলল, 'সব কিছু অবহিত হবার পর আপনার কাছে আজ এ কথাটা তুলেছি ফাইনাল সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে।'

'কিন্তু আমি যতদুর জানি ওলগার মা ও ডোনার আব্বার সাথে আপনার এ পর্যন্ত দেখা হয়নি। আপনি কোথা থেকে কি অবহিত হয়েছেন?' বলল আহমদ মুসা।

'আমাদের ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী ইউরি অরলভ ওলগার আপন মামা।

তার তরফ থেকে কথাটা আমার কাছে এসেছে। তিনি জানিয়েছেন, 'এ

ধরনের একটা উদ্যোগ যদি নেয়া হয় তালে দু'জনের কাছ থেকেই সম্মতি পাওয়া যাবে।' বলল ক্যাথারিন।

'আমিও মনে করি সম্মতি পাওয়া যাবে। যদি বিষয়টা কেউ না তুলতো, তাহলে আমি এবং ওলগাই কথাটা তুলতাম।' বলল ডোনা।

'তুমি এতটাই নিশ্চিত ডোনা? মনে রেখ, দু'জনই অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি। ওঁদের সামান্য বিব্রত করাও আমাদের ঠিক হবে না।' বলল আহমদ মুসা গম্ভীর কণ্ঠে।

হাসল ডোনা। বলল, 'ওরা অসম্মত হবেন না একথা আমি নিশ্চিত ভাবেই বলতে পারি।'

সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন বলল, 'ধন্যবাদ প্রিন্সেস মারিয়া জোসেফাইন। কথাটা শুনার পর আমিই সবচেয়ে খুশী হয়েছি। সত্তরই ওলগার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। তারপর ওলগার মা ডঃ নাতালোভা একেবারেই একা হয়ে যাবেন। আর প্রিন্সেস মারিয়া জোসেফাইন আহমদ মুসার সাথে চলে যাবার পর প্রিন্স প্লাতিনি লুইও ঐ

ভাবে একা হয়ে যাবেন। এই বিয়ে দু'জনকেই এক অস্বাভাবিক অবস্থা থেকে বাঁচাবে।'

'মহামান্যা সম্রাজ্ঞী, আল্লাহ যদি আমাদের এই ইচ্ছা পূর্ণ করেন, তাহলে আমার মাথা থেকে পর্বত প্রমাণ এক সমস্যা নেমে যাবে।' বলল ডোনা।

'যে সমস্যার আমি সমাধান পাচ্ছিলাম না, তার সমাধান পেয়ে যাব।' আহমদ মুসা বলল।

'তাহলে আহমদ মুসা ও মারিয়া জোসেফাইন আমরা এগুতে পারি?' সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন বলল।

'অবশ্যই। 'দু'জনেই বলে উঠল।

সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন হেসে বলল, 'আমারও একটা সমস্যার সমাধান হলো। রাশিয়া একটা সম্পর্কের বাধনে আহমদ মুসাকে বাধতে পারল।'

'রাশিয়ার মেয়ে তাতিয়ানা রাশিয়াকে এবং রাশিয়ার রাজপরিবারকে অনেক আগেই আমার কাছে অবিস্মরণীয় করেছে।' বলল আহমদ মুসা।

'অবিস্মরণীয় হওয়া এবং আত্মীয়তা করা এক জিনিস নয় জনাব আহমদ মুসা। অবিস্মরণীয়কে স্মরণ করলেই চলে, কিন্তু মাঝে মাঝে বেড়াতে না এলে আত্মীয়তার প্রতি অবিচার হয়।' বলল ক্যাথারিন।

'বুঝলাম।' আহমদ মুসা বলল।

'তাহলে আমি বলে দিচ্ছি প্রধানমন্ত্রীকে অগ্রসর হবার জন্যে। অবশ্য প্রথমে কথাটা আমিই পাড়ব। বলব আমিই ডেকেছি ওঁদের এবং আমরা ঠিক করেছি ডঃ নাতালোভা ও প্রিন্স প্লাতিনি লুই-এর বিয়ে আগে হবে, এর এক সপ্তাহ পর ওলগার বিয়ে হবে।' বলল ক্যাথারিন।

'ঠিক আছে। এটাই স্বাভাবিক হবে।' বলল আহমদ মুসা।

'আমার খুব আনন্দ লাগছে। মনে হচ্ছে রাশিয়ায় অনেক দিন থাকব।' বলল ডোনা।

'ওয়েলকাম। আমাদের বাধন কার্যকরী হওয়ার প্রথম প্রমাণ এটা।' হেসে বলল সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন।

'আমার কথা তো বললাম। ওঁকে বলুন উনি থাকবেন কিনা।' ডোনা বলল।

'জিজ্ঞেস করার কোন দরকার নেই। কান টানলে যেমন মাথা আসে, তেমনি মারিয়া জোসেফাইন যেখানে, সেখানে আহমদ মুসাকেও পাওয়া যাবে।' ক্যাথারিন বলল।

কথা শেষ করেই পাশে পড়ে থাকা তার হ্যান্ড ব্যাগ থেকে ক্যাথারিন তিনটা ইনভেলপ বের করল। তার মধ্যে একটা হাতে রেখে অন্য দু'টি আহমদ মুসা ও ডোনার হাতে তুলে দিল।

আহমদ মুসা ও ডোনা দু'জনেই ইনভলপ খুলল। তাতে পেল, রুশ নাগরিকত্বের একটি সনদপত্র এবং একটি রাশিয়ান ভিআইপি পাসপোর্ট।

আহমদ মুসা ও মারিয়া জোসেফাইন দু'জনের মুখই আনন্দে উজ্বল হয়ে উঠল।

পাসপোর্ট থেকে মুখ তুলে ক্যাথারিনের দিকে তাকিয়ে বলল আহমদ মুসা, 'আমরা কৃতজ্ঞ সম্রাজ্ঞী।'

সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিনের চোখ-মুখ আবেগে লাল হয়ে উঠছে। বলল, 'কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মত ব্যাপার এটা নয়। আপনারা এটা গ্রহন করলে আমরা সম্মানিত বোধ করব।'

থেমেই সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন তার হাতের তৃতীয় ইনভেলপটি তুলে দিল আহমদ মুসার হাতে।

আহমদ মুসা খুলল ইনভেলপ। বের হল, 'গ্লোবাল ব্যাংক অব ব্যাংকস'(GBB)-এর ওপেন ইন্টারন্যাশনাল একাউন্টের একটা 'কোড কার্ড'।

বিশ্বের সবচেয়ে দামী বস্তু হলো এই 'কোড'। এই কোড নম্বার বিশ্বের যে কোন ব্যাংকের 'অটো উইথড্রয়াল' স্লিপে লিখে তাতে টাকার যে অংক লেখা হবে, ব্যাংক তা দিয়ে দিবে। বিশ্বের প্রত্যেক ব্যাংকের প্রত্যেক শাখার কম্পিউটার তার ইন্টার ন্যাশনাল ফাইলে এই কোড নম্বার সংরক্ষণ করে।

'কোড কার্ডটা হাতে নিয়ে আহমদ মুসা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকল। তারপর মাথা তুলে সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিনের দিকে চেয়ে বলল, 'একজন ব্যাক্তির জন্যে এই পুরস্কার বেশি হয়ে গেছে সম্রাজ্ঞী।'

'না হয়নি। আমার জায়গায় তাতিয়ানা হলে আরও কি করতো আমি বুঝতে পারছি না।' অপ্রতিরুদ্ধ এক আবেগে রুদ্ধ হয়ে গেল ক্যাথারিনের গলা। তার দু'চোখে থেকে নেমে এল দু'ফোটাআ অশ্রু।

আহমদ মুসা ও ডোনা জোসেফাইন এই অবস্থায় বিব্রত হয়ে পড়ল।

বলল আহমদ মুসা ধীরে ধীরে, 'করার মত কিছুই আপনি বাকী রাখেননি সম্রাজ্ঞী। আমাদের সবচেয়ে বড় পাওয়া হলো, আপনি অপ্রকাশিত ঘোষণায় যা আমাদের জানিয়েছেন। তাতিয়ানার বিদেহী আত্মা সবচেয়ে খুশি হবে একথা জেনেই।

সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন রুমাল দিয়ে চোখ মুছে বলল, 'আমি ও তাতিয়ানা যদিও ছিলাম এক মনের, এক চিন্তার। কিন্তু তার স্থান আমাকে দিয়ে পূরণ হবার নয়। একই সাথে তার মন ছিল কুসুমের মত কোমল, পাহাড়ের মত অনড় এবং আকাশের মত উদার। সেই তাতিয়ানা নেই, কিন্তু তার প্রিয়তম ব্যাক্তি আছেন। তাঁর জন্যে যা কিছু করি, তাকে আমার যথেষ্ট মনে হয় না।'

আহমদ মুসা লজ্জা-সংকোচে লাল হয়ে উঠেছে। বলল একটু সময় নিয়ে, 'লজ্জা দেবেন না সম্রাজ্ঞী। আপনি যা করেছেন। অন্য কোন রুশ সম্রাজ্ঞীর কাছে তার একাংশও প্রাপ্য ছিল না। আপনি একান্ত আপনজন বলেই আমরা এবং আমাদের জাতি এসব পেয়েছে। আর আপনজন সব সময় পোশাকি প্রশংসার উর্ধ্বে।'

'ধন্যবাদ। সিংহাসনের চেয়েও এটাআমার কাছে বড় পাওয়া।'

বলেই উঠে দাঁড়াল সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন। বলল, 'চলুন আমরা নাস্তা করব।'

আহমদ মুসা ও ডোনা জোসেফাইন উঠে দাঁড়াল।

মস্কো ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। সৌদি জাম্বুজেট টারমাকে দাঁড়িয়ে।

আহমদ মুসার গাড়ি রয়্যাল ওয়েটিং হাউজের গেটে গিয়ে দাঁড়াল।

প্রায় সংগে সংগে আরেকটা গাড়ি এসে আহমদ মুসার গাড়ির পেছনে দাঁড়াল।

দুই গাড়ি থেকে প্রায় এক সাথেই নেমে এল চারজন আরোহী।

প্রথম গাড়ি থেকে নামল আহমদ মুসা ও ডোনা জোসেফাইন এবং দ্বিতীয় গাড়ি থেকে নামল ডোনার আব্বা প্লাতিনি লুই এবং ডোনার নতুন মা ডঃ নাতালোভা।

রয়্যাল ওয়েটিং হাউসের গেটে সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিনের ব্যাক্তিগত প্রতিনিধি হিসেবে দাঁড়িয়েছিল স্বয়ং সম্রাজ্ঞীর মা গ্রান্ড ডমেস লিওনিদা জিভনা।

রয়্যাল ওয়েটিং হাউজের দিকে প্রথমে এগুলো আহমদ মুসা। তার পেছনে ডোনা এবং তারপর ডোনার আব্বা-আম্মা।

গেটে আহমদ মুসা পৌছতেই লিওনিদা জিভনা সম্রাজ্ঞীর পক্ষে স্বাগত জানাল আহমদ মুসাকে।

'সম্রাজ্ঞীর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু একটা সামান্য ফরমালিটির জন্যে মহামান্যা গ্রান্ড ডমেসকে কষ্ট দেয়ায় আমি দুঃখিত।' বলল আহমদ মুসা বিনয়ের সাথে।

লিওনিদা জিভনা আহমদ মুসার পিঠ চাপড়ে সামনে এগিয়ে নিয়ে বলল, 'ছোট ফরমালিটি কোথায় দেখলে বৎস। একদিকে তোমার হৃদয়, অন্যদিকে রুশ সাম্রাজ্যকে রাখলে তোমার হৃদয়ের ওজনই বেশি হবে।'

'এটা একান্তই আপনার স্নেহের কথা।'

'এত বড় স্নেহটা তোমাকে আদায় করতে হয়েছে এবং তা তোমার ঐ হৃদয় দিয়েই।'

'মাতৃস্নেহের কাছে সন্তানের হৃদয়টা এমনই হয়। কিন্তু আমার যা কিছু ভালো তা ইসলামের শিক্ষারই ফল।'

'শুধু সম্রাজ্ঞী নয়, আমাকেও তা তুমি উপলব্ধি করিয়ে ছেড়েছ বৎস।'

কথা শেষ করে ডোনা জোসেফাইনের দিকে তাকিয়ে তার পিঠ চাপড়ে বলল, 'ওয়েলকাম গ্রেট লেডি। তোমার সৌভাগ্যের চেয়ে তোমার দায়িত্ব কিন্তু অনেক বড়।'

'আশীর্বাদ করুন।'

'আশীর্বাদ করা ছেড়ে দিয়েছি, এবার দোয়া করব।'

'আলহামদুলিল্লাহ।' বলল ডোনা জোসেফাইন।

যাত্রীরা প্রায় বিমানে উঠে গেছে।

সৌদি বিমানের স্বয়ং ক্যাপ্টেন অল্প দূরে আহমদ মুসাকে স্বাগত জানিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে অপেক্ষা করছে।

ডোনার সাথে তার আব্বার বিদায়ের দৃশ্যটা খুব করুণ হলো। বাপ-মেয়ে দু'জনেই অঝোরে কাঁদল।

ডোনা তার নতুন মা ডঃ নাতালোভাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে বলল, 'আজই প্রথম আব্বাকে ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি। কষ্টের মধ্যেও আমার আনন্দ এই যে, আমি আমার মা'র কাছে আব্বাকে রেখে যাচ্ছি। বোন ওলগা তো থাকলই।'

ডঃ নাতালোভা ডোনা জোসেফাইনকে অজস্র চুমু খেয়ে বলল, 'মা হবার মত সুযোগ তো দিলে না তুমি।'

'প্রথম দেখাতেই মা করে নিয়েছি আপনাকে।'

প্লাতিনি লুই জড়িয়ে ধরেছিল আহমদ মুসাকে। বলেছিল, 'এ কান্না আমার আনন্দের। তোমার হাতে আমার হৃদয়ের টুকরোকে তুলে দিতে পারলাম কত পূণ্যের ফলে তা আল্লাহই জানেন।'

আহমদ মুসা ডঃ নাতালোভার কাছে বিদায় নিয়ে বলল, 'শেষ পর্যন্ত ওলগা ও আসিফ আজিম-এর সাথে সাক্ষাৎ হলো না। নিশ্চয় জরুরী কিছুতে আটকা পড়েছে ওরা।'

বলে আহমদ মুসা ডোনা জোসেফাইনকে নিয়ে গ্যাংওয়ের দিকে এগুলো।

গ্যাংওয়ের মুখে দাঁড়িয়ে ছিল সম্রাজ্ঞীর প্রতিনিধি হিসেবে সম্রাজ্ঞীর মাতা লিওনিদা জিভনা।

লিওনিদা জিভনা আহমদ মুসার হাতে একটা রাজকীয় সিলমোহর যুক্ত ইনভলপ তুলে দিয়ে বলল, 'আহমদ মুসার জন্যে সম্রাজ্ঞীর একটি চিঠি।' তারপর আহমদ মুসাকে সম্রাজ্ঞীর পক্ষ থেকে রাশিয়া সফরের জন্যে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং পুনরায় সত্তর রাশিয়া সফরে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে হেসে বলল, 'নতুন মা পেয়ে পুরনো এক মাকে যেন ভুলে যেওনা বাছা।'

'মা যত পুরানো হন, ততই তার মূল্য বাড়ে।' বলে হাসতে হাসতে গ্যাংওয়েতে প্রবেশ করল আহমদ মুসা। তার সাথে সাথে ডোনা জোসেফাইন।

সৌদিয়ার ক্যাপ্টেন স্বাগত জানিয়ে সাথে নিয়ে গিয়ে বিমানের দুটি বিশেষ নির্ধারিত আহনে তাদের বসিয়ে বলল, 'এ বিমান আপনার। আপনার কোন সেবায় লাগতে পারলে আমরা ধন্য হবো।

বলে আহমদ মুসার হাতে এক টুকরো কাজ তুলে দিয়ে বলল, 'খাদেমুল হারমাইন শরীফাইনের মহামান্য বাদশার মেসেজ।'

সৌদি বাদশার ইন্টারনেট মেসেজ পড়ল আহমদ মুসা, 'আমাদের মহান ভাই আহমদ মুসা এবং তার স্ত্রী সম্মানিতা বোন মারিয়া জোসেফাইনকে সৌদি আরবে খোশ আমদেদ জানাচ্ছি।'

পড়ে ইন্টারনেট মেসেজটি আহমদ মুসা ডোনার হাতে তুলে দিয়ে ক্যাপ্টেনকে ধন্যবাদ জানাল।

সিটে বসে সব ঠিকঠাক করে নেবার পর ডোনা জোসেফাইন আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, 'সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিনের ইনভেলপটি বোধহয় এবার খোলা যায়।'

'ধন্যবাদ মনে করিয়ে দেবার জন্যে।' বলে আহমদ মুসা ইনভেলপটি খুলে ফেলল।

ভেতর থেকে বেরুল একটি চিঠি। রাজকীয় প্যাডে লেখা সম্রাজ্ঞীর একটা চিঠি। চিঠিতে সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন লিখেছেন:

"মহান ভাই আহমদ মুসাকে রুশ সম্রাজ্ঞী তৃতীয় ক্যাথারিনের পক্ষ হতে, আমি যে কালেমায়ে তাইয়েবার সাক্ষ্য পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করেছি, তার সাক্ষ্য আল্লাহ ছাড়া দুনিয়াতে আর কেউ নেই। কিন্তু অন্তত একজন সাক্ষীর হাতে এমন

একটা দলিল থাকা দরকার মনে করছি যাতে তিনি দুনিয়াবাসীর কাছে সাক্ষ্য দিতে পারেন, রুশ সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন মুসলিম ছিল, কাফের ছিল না। এই লক্ষ্যে আমি রুশ সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন আমাদের মহান ভাই আহমদ মুসাকে জানাচ্ছি যে, আল্লাহকে একমাত্র 'ইলাহ' এবং মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সঃ) কে শেষ রাসূল ঘোষণা করে পূর্ণভাবে আমি ইসলামে দাখিল হয়েছি।

আমার প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয়ার অপরাগতাকে আল্লাহ সম্রাট নাজ্জাশির ক্ষেত্রে যেভাবে মাফ করেছিলেন, সেভাবে মাফ করুন। আমীন!"

চিঠি শেষ সম্রাজ্ঞী ক্যাথারীনের দস্তখত এবং রাজকিয় সীল।

চিঠি পড়তে গিয়ে চোখ দিয়ে অশ্রু গড়ল আহমদ মুসার।

ডোনা জোসেফাইনও চিঠিটি পড়ল। বলল, 'সেদিন পরোক্ষভাবে যে কথা তিনি বলেছিলেন, আজ কাগজে-কলমে তা জগতবাসীকে জানানোর ব্যাবস্থা রাখলেন তিনি। খোশ আমদেদ আমাদের মহান বোনকে।' ডোনা জোসেফাইনের কণ্ঠও ভারী হয়ে উঠেছে আবেগে।

'আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ এই ভাবেই তাঁর সত্য দ্বীনকে দুনিয়ায় এগিয়ে নেবেন। তুমি নিশ্চয় জানতে পেরেছ ডোনা, ওলগার মামা ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী ইউরি অরলভও গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছেন আগেই।'

'হ্যাঁ, ওলগা আমাকে বলেছে।'

আহমদ মুসা এরপর কথা বলল না। একটু ভাবল। তারপর বলল, 'রাশিয়ার রাজনৈতিক নেতৃত্ব পেছন দিকে ফিরে তাকিয়ে জাতির স্বার্থে জাতির ঐক্য ও অভিভাবকত্বের একটা কেন্দ্র খুঁজে নিয়েছে। আমাদের মুসলিম রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও ষড়যন্ত্রমূলকভাবে বিলুপ্ত, গণতান্ত্রিক খিলাফত ব্যবস্থাকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। ইসলামী বিশ্বের ঐক্য ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্যে এর আর কোন বিকল্প নেই।'

তখন বিমানের দরজা বন্ধ গিয়েছিল। সিট বেল্ট বাঁধারও ঘোষণা দেয়া হয়ে গেছে।

আহমদ মুসা তার কথা শেষ করেই সিট বেল্ট বাঁধতে যাচ্ছিল।

হঠাৎ বিমানের দরজা আবার খুলে গেল।

খোলা দরজা দিয়ে দ্রুত প্রবেশ করল ওলগা এবং তার স্বামী আসিফ আজিম।

ওলগার গায়ের গাউন পা পর্যন্ত নামানো। তার মাথায় ওড়না কপাল ঢেকে চোখের প্রান্ত পর্যন্ত নেমে এসেছে।

ওলগা ও আসিফ দু'জনেই এসে সালাম জানাল আহমদ মুসা ও ডোনা জোসেফাইনকে।

ডোনা জোসেফাইন উঠে জড়িয়ে ধরেছে ওলগাকে। তারপর বলল, 'কষ্ট হচ্ছিল এই ভেবে যে, 'আমার নতুন বোনটার সাথে শেষ দেখা বোধহয় হলো....'

ওলগা ডোনা জোসেফাইনের ঠোঁটের উপর আঙুল চাপা দিয়ে বলল, 'শেষ দেখা' শব্দ বলতে পারবেনা, আরও অজস্রবার দেখা হবে।'

ডোনা জোসেফাইন হেসে বলল, 'অবশ্যই।'

ওদিকে আহমদ মুসা আসিফ আজিমকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'মহামান্য ভাই, না আসার চেয়ে এই দেরীতে আসাটা অবশ্যই শ্রেয়তর।'

লজ্জিত মুখে আসিফ আজিম আহমদ মুসার হাতে বড় একটি ফ্যাক্স মেসেজ গুঁজে দিয়ে বলল, 'আপনার এই জরুরী ফ্যাক্সটি এসেছিল ওলগাদের বাসার ফ্যাক্সে। খবর পেয়ে ওটা আনতে গিয়েই দেরী হয়েছে ভাইয়া।'

আহমদ মুসা তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, তোমরা ঠিক করেছ।'

বলে আহমদ মুসা ফ্যাক্স-মেসেজের দিকে মনোযোগ দিল। পড়লো: "আল্লাহর সৈনিক মুহতারাম আহমদ মুসা",

"আমি টার্কস দ্বীপপুঞ্জের অতি সামান্য একজন বালিকা। গ্রান্ড টার্কস দ্বীপে চার্লস বিশ্ব বিদ্যালয়ের এডভান্সড স্কুল অবইকনমিককস-এর একজন ছাত্রী আমি। নাম লায়লা জেনিফার। একটি সমীক্ষা ও কিছু ঘটনা আমাদের ক'জনকে ভয়ানক উদ্বিগ্ন করেছে। এই উদ্বেগ থেকেই এই চিঠি লেখা। আমরা ক'জন ছাত্র জনসংখ্যার একটা ডেমোগ্রাফিক সমীক্ষা করতে গিয়ে একটা চাঞ্চল্যকর তথ্য পেয়ে যাই। গত ৬ বছরে জনসংখ্যার বিশেষ শ্রেণী মুসলমানদের পুরুষ জনসংখ্যা গড়ে ১৪ শতাংশ হারে হ্রাস পেয়েছে। পুরুষ জনসংখ্যা হ্রাসের ক্রমবর্ধমান চিত্র

খুবই উদ্বেগজনক। ৬ বছরের প্রথম বছর শতকরা ৫, দ্বিতীয় বছর শতকরা ৮, তৃতীয় বছর ১১, চতুর্থ বছর ১৫, পঞ্চম বছর ২০ এবং ষষ্ঠ বছর ২৫ শতাংশ হারে পুরুষ জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। এই চাঞ্চল্যকর তথ্য আমরা আমাদের গবেষণা সংস্থার তরফ থেকে খবরের কাগজে দিয়েছিলাম। খবরটি ছাপা হয়নি। যে সাংবাদিক খবরটি আমাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিল, সে সেই রাতেই নিহত হয়। পরবর্তীতে গবেষণাটির ফিল্ড ওয়ার্কের সাথে জড়িত ৪জন ছাত্রই নিহত হয়েছে। সকল কাগজ-পত্রসহ আমাদের গবেষণা সংস্থাটির অফিস এক রাতে প্রচন্ড বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়ে গেছে।গবেষণার সাথে জড়িত পঞ্চম ব্যক্তি আমি এখনও বেঁচে আছি সম্ভবত এই কারণে যে আমি ফিল্ড ওয়ার্কে ছিলাম না, আমার দায়িত্ব ছিল ডাটা এ্যানালিসিস। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই না। গ্রান্ড টার্কস দ্বীপ থেকেও আমি সরে এসেছি। লুকিয়ে বাস করছি অন্য একটি দ্বীপে। জানিনা ক'দিন বেঁচে থাকব। পরিস্থিতির আরও একটা উদ্বেগজনক দিক হলো, টার্কস দ্বীপপুঞ্জের পর আমরা পাশ্ববর্তী ককজ দ্বীপপুঞ্জ ও বাহামা দ্বীপপুঞ্জে সমীক্ষা শুরু করেছিলাম। শেষ করতে পারিনি। যতুটুকু করা গেছে তাতে সেখানেও কম বেশি একই চিত্র দেখা গেছে। হত্যাকান্ডের পর পুলিশের কাছে কেস দেয়া হয়েছিল। কিন্তু দুর্বোধ্য কারণে তদন্তেই যায়নি। বিশ্বের বড় বড় ঘটনার ভীড়ে এই ছোট ঘটনা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণের মত নয়। তবু আপনাকে জানালাম। দুনিয়ার কাকে জানাতে পারি, চিন্তা করতে গিয়ে আপনার কথাই প্রথম মনে পড়ল। আপনার ঠিকানা জানিনা। রাবেতায়ে আলম আল ইসলামীর কাছে পাঠালাম। জানিনা আপনার কাছে পৌছবে কিনা। আমাদের টার্কস দ্বীপপুঞ্জের অস্তিত্ব বিশ্বের মানচিত্র খুঁজলে পাওয়া যায় না। আমেরিকার মানচিত্রও নয়। মধ্য আমেরিকার মানচিত্র একে দেখা যায় বাহামার পূর্ব-দক্ষিণে, ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র ও হাইতির উত্তর-পশ্চিমে এবং কিউবার উত্তর-পূর্ব আটলান্টিকের অথৈ পানিতে বিন্দুর চেয়েও ক্ষুদ্রাকার। ক্ষুদ্র দেশের আমরা কিছু মুসলিম এতই নগণ্য যে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারও দৃষ্টি আমাদের দিকে পড়ে না।"

পড়া শেষে ফ্যাক্স মেসেজটি আহমদ মুসা তুলে দিল ডোনা জোসেফাইনের হাতে।

পড়তে গিয়ে উদ্বেগে ভরে গিয়েছিল আহমদ মুসার মন। চিঠির শেষ কয়টি লাইন পড়ে আহমদ মুসার দু'চোখ ভিজে উঠেছিল অশ্রুতে। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের বহিরংগে আটলান্টিকের বুকে ভাসমান টার্কস দ্বীপপুঞ্জের দৃশ্য। আটলান্টিকের পানির উপর দাঁড়ানো মৌরতানিয়ার 'নওয়াবিধু' থেকে যদি আটলান্টিকের উপর দিয়ে সোজা একটা সরল রেখা টানা যায়, তাহলে সেই সরল রেখা টার্কস দ্বীপপুঞ্জের উপর দিয়ে অগ্রসর হয়ে কিউবার 'কানাগুয়ে' শহর ছেদ করবে। আহমদ মুসা আমেরিকা বিশেষ করে ল্যাটিন আমেরিকার মুসলমানদের নিয়ে ভেবেছে, কিন্তু টার্কস দ্বীপের মুসলমানদের কথা কোনদিন তার চিন্তাতেও আসেনি। সুতরাং লায়লা জেনিফারের অভিমান অসংগত নয়।

আহমদ মুসা তাকাল আসিফ আজিমভের দিকে। বলল, 'লায়লা জেনিফারের ফ্যাক্সটা তার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাক্স থেকে এসেছে। লায়লা জেনিফারের নামে এ্যাটেনশন লিখে একটা ফ্যাক্স করে দাও। লিখবে, প্রাপক তার ফ্যাক্স পেয়েছেন। তিনি প্রথম সুযোগেই টার্কস দ্বীপপুঞ্জ সফরে আসবেন।'

ডোনারও মেসেজটি পড়া শেষ হয়েছিল। সেও মুখ তুলেছে। শুনল আহমদ মুসার কথা।

আহমদ মুসার নির্দেশ পাবার পর আসিফ আজিম এবং ওলগা আহমদ মুসা ও ডোনা জোসেফাইনের কাছে বিদায় নিয়ে বের হয়ে গেল বিমান থেকে।

যাবার সময় ওলগার দু'চোখে অশ্রু টল টল করছিল।

ওরা চলে গেলে একটু পর ডোনা জোসেফাইন বলল, 'পড়েই আমার লোভ লেগেছে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের ঐ অঞ্চলে যাবার। আমার মনে হচ্ছে, আকাশের অনন্ত নীলের নিচে অথৈ নীল পানিতে ভাসমান অসম্ভব এক সপ্নের দেশ ওটা।

'আমিই বেশি খুশী হতাম তোমাকে নিতে পারলে। কিন্তু...।'

'কিন্তু কি? মুখ ম্লান করে বলল ডোনা জোসেফাইন।

'মদীনায় তোমাকে বিশ্রামে থাকতে হবে।'

'কেন?'

'এ সময় মেয়েদের ঝুঁকিপূর্ণ বেড়ানো চলে না। দু'মাস হয়ে গেছে। আর মাত্র আট মাস।'

লজ্জায় লাল হয়ে উঠল ডোনা জোসেফাইনের মুখ। সিটের হাতলে রাখা আহমদ মুসার হাতে ছোট একটা কিল দিয়ে মুখ নিচু করল সে।

'তোমার আব্বা মিঃ প্লাতিনি, আম্মা ডঃ নাতালোভা এবং ওলগা তিনজনই আসছেন মদীনায় দীর্ঘ ছুটিতে। আনন্দেই তোমার সময় কাটবে। কেমন রাজী তো?'

'কেন আসবেন ওরা? আমি তো জানি না।'

'তোমার পরিচর্যার বুঝি দরকার নেই?'

'বলেছ বুঝি সব তুমি ওঁদের? লজ্জায় মুখ লাল করে বলল ডোনা জোসেফাইন।

'এ খবর বুঝি কেউ লুকায়?'

'ও আল্লাহ, ছেলেদের একটুও লজ্জা নেই।'

বলে দু'হাতে মুখ ঢাকল ডোনা।

আহমদ মুসার মাথায় তখন অন্য চিন্তা। সে ভেবেছিল, ক'মাস সে মদীনায় কাটাবে। এ সময় ডোনার কাছে থাকাও দরকার। কিন্তু তা হলো না একদিনও সে আর শুয়ে বসে কাটাতে পারে না। সময় নষ্ট করতে পারে না সে কিছুতেই।

সে ঠিক করল, মদীনা শরীফ গিয়েই সে বুকিং দেবে ওয়াশিংটনের। সেখানে গিয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে রুট ঠিক করে সে যাবে টার্কস দ্বীপপুঞ্জে। হাতের উপর ডোনার হাতের স্পর্শে সম্বিত ফিরে পেল আহমদ মুসা। তাকাল। দেখল, ডোনা নিস্পলক তাকিয়ে আছে তার দিকে। ডোনার চোখে এবার লজ্জা নেই। আছে স্ত্রীর নিঃসীম মমতা মাখানো স্নিগ্ধ দৃষ্টি। তাতে আছে দুর্ভাবনার একটা কালো ছায়া। আহমদ মুসাও তার দিক থেকে চোখ ফিরাতে পারলো না। 'তুমি কি মন খারাপ করছ?' ধীরে ধীরে বলল আহমদ মুসা ডোনা জোসেফাইনের হাত মুটোর মধ্যে নিয়ে। ডোনা মুখে কিছু বলল না। 'না' সূচক মাথা নাড়ল। শুকনো ঠোঁটে

এক টুকরো হাসি টানার চেষ্টা করলো। কিন্তু তার সে হাসির সাথেই তার চোখ থেকে নেমে এল দু'ফোটা অশ্রু।

# ৩

গ্রান্ড টার্কস দ্বীপ থেকে সোজা দক্ষিণে একটা দ্বীপ। নাম'ভিজকায়া মামুন্ড'।

‘ভিজকায়া'দ্বীপের ‘কেজান’ গ্রাম। গ্রামের কম্যুনিটি হল।

কম্যুনিটি হলের মাঝখানে বৃত্তাকার চত্বরে তখন নাচ চলছে।

প্রতি সাপ্তাহিক ছুটির দিনে কম্যুনিটি হলে এই ধরনের সামাজিক সমাবেশ হয়। এতে খাওয়া-দাওয়া হয়, নাচ-গান চলে, খেলা-ধুলাও হয়ে থাকে।

কম্যুনিটি হলের এক প্রান্তে একটা টেবিলে জেনিফার, তার মামী এবং মামাতো বোন সারা উইলিয়াম।

লায়লা জেনিফার সপ্তাহখানেক হলো মামা বাড়ি এসেছে আত্মগোপনের তাকিদে।

লায়লা ইতিমধ্যেই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। গায়ের রং তার সোনালী, স্বর্ণাভ চুল, নীল চোখ এবং আফ্রিকান মেয়েদের মত বলিষ্ট শরীর।

নীচু স্বরে কথা বলছিল তারা।

লায়লা জেনিফারের মামী কথা বলছিল সামাজিক পরিবেশের দ্রুত পরিবর্তনশীলতা নিয়ে। বলছিল সে, 'যারা একদিন তাদের দিকে মুখ তুলে

কথা বলতে সাহস করত না, তারা এখন মাথায় চড়ে বসতে চাচ্ছে।'

'আমাদের নতুন জেনারেশন বেপরোয়া ধরনের। কারণ হয়তো এটাই মামী।' বলল জেনিফার।

'তুমি সাধারণ প্রবণতার কথা বলছ, মা। যদি এটা সাধারণ প্রবণতাই হতো, তাহলে সবার মধ্যেই এটা দেখা যেত। কিন্তু তাতো নয়। দেখা যাচ্ছে, কারো কারো কাছে হঠাৎ যেন আমরা অবাঞ্চিত হয়ে পড়েছি’।

‘সম্পর্কের অবনতি থেকে এমনটা হওয়া স্বাভাবিক।'

‘একদমই চিনি না, বা কোন সম্পর্ক কোনদিন ছিল না, এমন ক্ষেত্রেও তো এটা ঘটছে। সেদিন অটো হুইলারে করে বন্দরে যাচ্ছিলাম। তৃষ্ণা পাওয়ায় নামলাম 'ভিজকায়া মামুন্ড' রেস্টুরেন্টে। এই পুরনো রেস্টুরেন্টে ছোটবেলা থেকে হাজারো বার গিয়েছি। কিন্তু সেদিন যা দেখলাম, কোনদিন সেখানে তা ঘটেনি। পুরনো ওয়েটারের কাছে পানি চাইলে সে কাগজের গ্লাসে পানি দিল। বললাম, ‘কাগজের গ্লাস কেন?'

'হুকুম।'সে বলল।

আমি বললাম, ‘সবাইকে কাগজের গ্লাস দেয়া হচ্ছে?'

সে বলল, ‘সবাইকে নয় এক শ্রেণীর মানুষকে দেয়া হচ্ছে।'

'সেই এক শ্রেণীর সাথে কি আমাদের উইলিয়াম পরিবার আছে?' বললাম আমি।

উত্তরে ওয়েটার ফিস ফিস করে বলল, 'আছে।'

একশ'বছর আগে আমাদের উইলিয়াম পরিবার এই দ্বীপে আসে, তখন এই দ্বীপে কিছুই ছিল না। এই রেস্টুরেন্টেরও প্রতিষ্টা আমাদের টাকায় হয়।

রেস্টুরেন্টে উপস্থিত খদ্দরদের অধিকাংশই তখন ছিল আফ্রিকান-ক্যারিব ইন্ডিয়ান কম্যুনিটির।

ক্রীতদাস হিসেবে আফ্রিকান নিগ্রোদের সাথে'ক্যারিব গোত্রীয় ইন্ডিয়ানদের বিয়ের ফলে এই কম্যুনিটির উদ্ভব ঘটেছে। এদের মধ্যে স্পেনীয় মুর ও তুর্কি মুসলিমদের রক্তও রয়েছে। এ কম্যুনিটির বিপুল সংখ্যক মানুষ বিশ্বাসের দিক দিয়ে মুসলিম। এদেরকেও কাগজের গ্লাস দেয়া হয়েছে।

এই কম্যুনিটির লোকেরা আমাকে সমর্থন করল। এই সময় রেস্টুরেন্টের পরিচালক মিঃ জন কাউন্টার থেকে উঠে এসে আমার টেবিলে বসল। নীচু স্বরে বলল, 'এসব নিয়ে কথা না বলাই ভাল ম্যাডাম। সময় পাল্টেছে।'

আমি ক্ষুদ্ধ কণ্ঠে বললাম, 'কিন্তু উইলিয়াম পরিবারের সাথে এই অবিচার কেন?'

মিঃ জন বলল, ‘এখন বলা হচ্ছে ম্যাডাম, আপনার উইলিয়াম পরিবার সান সালভাডোর থেকে পালিয়ে এসেছিল এবং বাঁচার জন্যেই আশ্রয় নিয়েছিল এই বিজন দ্বীপে।'

আমি বললাম, ‘পালাবে কেন সানসালভাডোর থেকে?'

সে বলল, আমি শুনলাম বলা হচ্ছে, আপনাদের উইলিয়াম পরিবার 'হিদেন' মানে ধর্মদ্রোহী।

আমি প্রতিবাদ করে বললাম, ‘মিথ্যে কথা।'

সে বলল, “কিন্তু বলা হচ্ছে, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের সানসালভাডোরে কলম্বাসের চীফ নেভিগেটর হিসেবে আগত আবু আলী আন্দালুশি খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে আবু আলী উইলিয়াম হয়ে যান এবং খৃষ্টান হিসেবেই সানসালভাডোরে বসতি স্থাপন করেন। অন্যান্য অনেক চালাক মুসলমানদের মত বিয়ে করে স্থানীয় আরাক রেডইন্ডিয়ানদের এক সর্দার কন্যাকে এবং নিজেকে শক্তিশালী করার পর আবু আলী স্বধর্ম অর্থ্যাৎ ইসলাম ধর্মে ফেরত যান। এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্যেই উইলিয়াম পরিবার ধর্মদ্রোহী।'

আমি তার কথার প্রতিবাদ করে বললাম, “আমার পূর্ব পুরুষ আবু আলী আন্দালুশি খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেননি। ওটা ছিল কলম্বাসের প্রচার। তিনিই আবু আলীর নামের শেষাংশ ‘আন্দালুশী' পাল্টে উইলিয়াম করেন। প্রতিকূল অবস্থার কারণে আবু আলী কলম্বাসের এই অন্যায়ের প্রতিবাদ না

করে চুপ থাকেন। এই চুপ থাকার অর্থ তার খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করা নয়।'

মিঃ জন প্রতিবাদ করে বলল, ‘কলম্বাসের মত মহান একজনের উপর কি এমন অন্যায় চাপাতে পারেন?'

আমি বললাম, ‘কলম্বাস মুসলিম বিদ্বেষী 'মহান' ছিলেন। তার অলিখিত একটা নীতি ছিল মুসলিম হিসেবে কোন লোককে তিনি জাহাজে নেবেন না। কিন্তু যাদেরকে নিতে তিনি বাধ্য হয়েছেন, তাদেরকে খৃষ্টান বলে পরিচয় দিয়েছেন। আবু আলী আন্দালুশির ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।'

মিঃ জন অবশেষে বলল, 'আমি যা বললাম তা আমার শোনা কথা। কিন্তু আপনাদের কাগজের গ্লাস ও কাগজের প্লেট দেবার আদেশ আমি লংঘন করতে পারবো না।'

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'এ আদেশ কার, সরকারের অবশ্যই হতে পারে না।'

সে বলল, 'আমি ওদের চিনি না, কিন্তু ভয় করি। ব্যবসায় করতে হলে ওদের কথা আমার মানতে হবে।'

থামল জেনিফার মামী আয়েশা উইলিয়াম।

লায়লা জেনিফার ও সারা উইলিয়াম উদ্বেগের সাথে শুনছিল আয়েশা উইলিয়ামের কথা।

মামী থামলে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে লায়লা জেনিফার বলল, 'কিন্তু মামী এসব হচ্ছে কি, কোথেকে হচ্ছে?'

'জানি না বাছা। তবে আমি দেখছি, এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ইদানিং পরিবর্তন এসেছে। সমাজ সম্পর্ক তারা বদলে দিতে চাচ্ছে।'

'কোন শ্রেণীর কথা বলছেন?'জেনিফারই বলল।

'মুখ্যত শ্বেতাংগের মধ্যেই এটা বেশি দেখা যাচ্ছে...'

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু জেমস ক্লাইভকে দেখে থেমে গেল জেনিফারের মামী।

জেমস ক্লাইভ বৃটিশ বংশোদ্ভুত একজন পিওর শ্বেতাংগ যুবক। সে পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়েছিল জেনিফারদের টেবিলের দিকে এগিয়ে এল।

দাঁড়াল এসে লায়লা জেনিফারের পাশে। লায়লা জেনিফারের মামাত

বোন সারা উইলিয়ামের দিকে তাকিয়ে জেনিফারকে দেখিয়ে বলল, 'এ কে সারা?'

'আমার ফুফাতো বোন জেনিফার।'

'বা নামও সুন্দর।'বলে জেমস ক্লাইভ জেনিফারের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

এটা নাচের আমন্ত্রণ।

জেনিফার হাত না বাড়িয়ে বলল, ‘দুঃখিত’।

জেনিফারের কথার সাথে সাথেই সারা উইলিয়াম বলে উঠল ‘মুসলমানদের অনেকেই এভাবে নাচে না জেমস।'

জেনিফার'দুঃখিত'বলার সংগে সংগেই সংকুচিত হয়ে পড়েছিল জেমস ক্লাইভ। কিছুটা আহতও হয়েছিল সে। সারা উইলিয়ামের কথা শুনে হাসতে চেষ্টা করে বলল, ‘এখনও এ মাটির সংস্কৃতি গ্রহণ করো সারা, না হলে এ মাটিতে বাস করতে পারবে না।'

মুখটা ম্লান হলো সারা উইলিয়ামের। কিন্তু বলল তবু, ‘এ মাটির সংস্কৃতি এটা নয়, এ এসেছে ইউরোপ থেকে।'

‘ইউরোপ এ মাটি জয় করেছে, অতএব এটাও ইউরোপ এবং ইউরোপের সাংস্কৃতিই এর সংস্কৃতি।'

‘কিন্তু জেমস, এ দ্বীপপুঞ্জসহ ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের দুই তৃতীয়াংশ মানুষ আফ্রিকা থেকে আসা। তাদের অর্ধেকেরও বেশি মুসলমান। তারা এ দেশ আবাদ করেছে, বসবাসযোগ্য করেছে। সুতরাং তাদের সংস্কৃতি এ মাটির সংস্কৃতি হবে না কেন?'

‘এসব কুটযুক্তি দিয়ে শেষ রক্ষা হবে না সারা।'

বলে সে ঘুরে দাঁড়িয়ে অন্য একটি টেবিলের অন্য একটি মেয়ের হাত ধরে গিয়ে শামিল হল নাচের সারিতে।

জেনিফারদের তিনজনের মুখই ম্লান। সারা উইলিয়ামের চোখে-মুখে ভয়েরও চিহ্ন। তিনজনই নীরব।

নীরবতা ভাঙল জেনিফারের মামী আয়েশা উইলিয়াম। বলল, ‘ক'বছর আগেও উইলিয়াম পরিবারকে হুমকি দূরে থাক, এমনভাবে মাথা উঁচু করে কথা বলার সাধ্য কারো ছিল না।'

‘আম্মা সবাই জানে জেমস যেদিকে হাত বাড়ায় খালি হাত তার ফিরে আসে না। আমার ভয় করছে লায়লার জন্যে। ও এমনিতেই বিপদে আছে।'

সারার আম্মা কিছু বলতে যাচ্ছিল। এমন সময় টেবিলের সামনে এসে দাড়াল গ্রামের বার্নস পরিবারের কালমা বার্নস। তার মুখ মলিন।

আয়েশা উইলিয়াম তাকে বসতে বলল, 'কি হয়েছে মিঃ বার্নস? কিছু ঘটেছে?'

'শিশু সনদে আমার ছেলেটি মারা গেছে। নিয়ে আসা হয়েছে। জানাযার জন্যে দাওয়াত দিতে এসেছি।'

'ভুমিষ্ট হবার পর সম্পূর্ণ সুস্থ শুনেছিলাম। হঠাৎ কি হয়েছিল?'

'হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। ডাক্তাররা সব চেষ্টা করেও রোগ ধরতে পারেনি। কোন একটা নতুন ভাইরাস এসেছে বলে ডাক্তাররা মনে করছে। আমি তো গত ৭ দিন শিশু সনদে যাতায়াত করছি। এর মধ্যেই ৪ টি শিশু মারা গেছে।'

কালমা বার্নস থামতেই লায়লা জেনিফার দ্রুত বলে উঠল, 'ঐ চারটি শিশু ছেলে না মেয়ে?'

বার্নস একটু চিন্তা করল। তারপর বলল, 'চারটি শিশুই ছেলে।'

'মাফ করবেন, কোন মেয়ে শিশু কি ঐ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে?'বলল জেনিফার।

বার্নস হঠাৎ যেন জেগে উঠল। বলল, 'একটা মজার প্রশ্ন করেছেন তো? ঠিকই কোন মেয়ে শিশু ঐ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়নি। আমার জানা মতে গোটা ছয়েক মেয়ে শিশু এখন শিশু সনদে রয়েছে। অথচ ছেলে শিশু এখন শিশু সনদে একটিও নেই। ৪টি ছিল, ৪টিই মরে গেছে।'

মনে মনে শিউরে উঠল লায়লা জেনিফার। শিশু সনদে ছেলে শিশু যেমন এখন একটিও নেই, তেমনি গোটা দেশ থেকে, গোটা ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ থেকে মুসলিম পুরুষ উজাড় করবে। হঠাৎ তার মনে প্রশ্ন জাগল, শিশু সনদে ঐ চারটি ছেলে শিশু মুসলিম ছিল কিনা।

সংগে সংগেই লায়লা জেনিফার প্রশ্ন করল, 'ঐ চারটি পুরুষ শিশু মুসলিম পরিবারের ছিল কিনা?'

'জি হ্যাঁ।'বার্নস জবাবে বলল।

কথা শেষ করেই বার্নসই আবার প্রশ্ন করল, 'এ প্রশ্নের হেতু কি?

মুসলিম অমুসলিম পার্থক্য আসছে কেন?'

'না এমনি কৌতুহল।'ম্লান হেসে বলল লায়লা জেনিফার।

'আপনার কৌতুহল ঠিক আছে। আমি ম্যাটারনিটিতে বলাবলি করতে শুনেছি যে, আজকাল মুসলিম ছেলে সন্তান বাঁচছে না।'

'কারণ সম্পর্কে ওরা কি বলে?'বলল জেনিফার।

'ঐ সম্পর্কে কিছু শুনিনি। হায়াত মৃত্যুর উপর কারও হাত নেই।'

'ঠিক।'বলল আয়েশা উইলিয়াম।

পাশেই এক টেবিল ওপারে একটা মেয়ে মাথা নিচু করে চা খাচ্ছিল।

মেয়েটিকে দেখতে পেয়েছে সারা উইলিয়াম। তার আম্মার কথা শেষ হতেই সে মেয়েটিকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, 'কি সুসান মনে হচ্ছে তোমার মাথায় এক পাহাড় চেপে বসেছে?'

মেয়েটির নাম সুমা সুসান। লোকাল কাউন্সিলের একজন কর্মচারী। সে চোখ তুলে তাকিয়ে সারা ও তার মাকে দেখেই উঠে দাঁড়াল টেবিল থেকে। এসে সারাদের টেবিলে বসতে বসতে বলল, 'আমি এদিকে খেয়াল করিনি। খালাম্মা আপনি কেমন আছেন?'সুমা সুসানের লক্ষ্য সারার মা।

'তোমার কথা বল আগে। তোমাকে এত বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন?'

গম্ভীর হলো সুমা সুসান। একটুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, 'এমন নগ্ন অবিচার কি সহ্য করা যায়?'

'কোন অবিচারের কথা বলছ?'প্রশ্ন করল সারা।

'মামুন শেরম্যান-এর নাগরিকত্ব হয়নি, অথচ মুলিভান স্মিথ যেন-তেন দরখাস্ত করেই নাগরিকত্ব পেয়ে গেছে।'বলল সুসান।

শেরম্যান জার্মান বংশোদ্ভুত একজন কানাডীয় মুসলিম ছাত্র। সুসানের সাথে তার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। আর মুলিভান স্মিথ একজন ডেনিশ যুবক।

'হলো না কেন? আমি তো জানি সব ঠিক-ঠাক হয়ে গিয়েছিল।'বলল সারা।

'শুনলাম একটা মহল থেকে চাপ দেয়া হয়েছে তাকে নাগরিকত্ব না দেয়ার জন্যে।'সুসান বলল।

‘কোন মহল?'জিজ্ঞেস করল জেনিফার।

‘সেটা বলতে তার ভয় করছে।'

‘মুলিভানের ক্ষেত্রে এ চাপ আসেনি?'আবার জিজ্ঞেস করল জেনিফার।

‘না।'সুসান জানাল।

‘মামুন শেরম্যান মুসলমান এবং মুলিভান স্মিথ খৃষ্টান, এই পার্থক্য ছাড়া উভয়ের মধ্যে আর কোন পার্থক্য আছে কি?'জেনিফারের প্রশ্ন।

‘আমি দেখিনা। বরং নাগরিকত্ব পাওয়ার পক্ষে মামুনেরই প্লাস পয়েন্ট বেশি।'

'তাহলে?'

একটু ভেবে সুসান বলল, ‘দরখাস্ত করার সময় ওর পরিচিত একজন ওকে তার'ধর্ম ইসলাম'একথা না লেখার জন্যে পরামর্শ দিয়েছিল। কিন্তু বিশ্বাস গোপন করতে সে রাজী হয়নি।'

‘এর অর্থ মুসলমানদের প্রতি বৈষম্য করা হচ্ছে।'বলল সারা উইলিয়াম।

কিছু বলতে যাচ্ছিল জেনিফার।

কিন্তু তার আগেই তার মামী বলল, ‘এখানে আর নয়। চল তোমরা বাসায়। সব কথা সব জায়গায় বলা ঠিক নয়।'

বলে উঠে দাঁড়াল আয়েশা উইলিয়াম। সারা সুসানকেও টেনে নিয়ে আসল বাসায়। তারা বসল সারাদের বৈঠকখানায়।'

সারাদের ‘উইলিয়াম'পরিবারটি এই ভিজকায়া মামুন্ড দ্বীপের সবচেয়ে পুরনো ও অভিজাত পরিবার। বিরাট বাড়ি।

বসেই জেনিফারের মামী আয়েশা উইলিয়াম বলল, 'সামাজিক ও

রাজনৈতিক সামগ্রিক অবস্থার সাথে জেনিফারের বিপদের কথা মেলানোর পর আমার ভাল ঠেকছে না। কথাবার্তায় আমাদের সাবধান হওয়া দরকার। জেমস-এর হুমকিটা কোন বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়।'

'ঠিক বলেছেন মামী। চারদিকটা যেন আমাদের ক্লোজ হয়ে আসছে। কিন্তু কি হচ্ছে, আমরা কি করব কিছুই বুঝা যাচ্ছে না।'বলল জেনিফার ম্লান কণ্ঠে।

‘এসব বুঝবে কে? দেখবে কে?'বলল সুসান।

আয়েশা উইলিয়াম দ্বীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'এটাই এখনকার সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। আমাদের সংখ্যা আছে, শক্তি নেই। আমাদের বিত্ত যতটুকু আছে, বুদ্ধি ততটুকু নেই।'

'দিন দিন অবস্থা এমন খারাপ হয়ে যাচ্ছে কেন?'বলল সারা উইলিয়াম।

সারা উইলিয়ামের মা সোফায় হেলান দিল। তার মুখে কান্নার মত করুণ হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'এই ক্যারিবিয়ান দ্বীপাঞ্চলেরও তো আদি বাসিন্দা ছিল আরাক ও ক্যারিব রেডইন্ডিয়ানরা। লাখ লাখ সংখ্যায় তারা ছিল কিন্তু তারা এখন নেই। আমাদের রক্তে তারা বেঁচে আছে মাত্র। আফ্রিকা ও এশিয়া থেকে আমাদের পূর্ব পুরুষরা দাস, শ্রমিক, চাকুরে ও অভিযাত্রী হিসেবে এই অঞ্চলে এসেছিল। তারাই আবাদ করেছে এই ভূখন্ডগুলো। কে জানে রেডইন্ডিয়ানদের মত তাদেরও দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে কিনা।'থামল আয়েশা উইলিয়াম।

সবাই নীরব। সকলের মুখেই ভয় ও হতাশার চিহ্ন।

আয়েশা উইলিয়ামই আবার মুখ খুলল। বলল, 'লায়লা জেনিফারের মাথায় যে বিপদ এসে চেপেছে, তার কারণ কি? লায়লার কি অপরাধ? তার সাথীদের কি অপরাধ ছিল? তাদের পরিসংখ্যানে জনসংখ্যাগত একটা সমস্যা প্রকাশ পেয়েছিল। এর বেশি তো কিছু নয়? কেন তার সাথীরা খুন হলো? কেন খুনের ছোরা লায়লার মাথার উপর উদ্যত? কে করবে এই সমস্যার সমাধান?'থামল আয়েশা উইলিয়াম।

এবারও সবাই নীরব। সবারই মুখে আয়েশা উইলিয়ামের মতই একই অব্যক্ত প্রশ্ন।

একটা অটো হুইলার টেম্পো জাতীয় উন্নতমানের গাড়ি সশব্দে এসে সারাদের গেটে থামল।

জেনিফাররা সবাই তাকাল সেদিকে।

গাড়ি থেকে নেমে একটি মেয়ে দ্রুত এগুলো সারাদের বৈঠকখানার দিকে।

মেয়েটি কৃষ্ণাংগ। কিন্তু চেহারা নিগ্রোদের মত নয়। চেহারায় এশিয়া ও ইউরোপের মিশ্রণ আছে।

তাকে দেখেই আনন্দে চিৎকার করে উঠল লায়লা জেনিফার, ‘হ্যাল্লো মাকোনি।'বলে জেনিফার ছুঠল তার দিকে।

হাত ধরে টেনে নিয়ে এসে পরিচয় করিয়ে দিল সবার সাথে, ‘এ হলো আমার বন্ধু শুভাকাঙ্খী সুরাইয়া মাকোনি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক রিলেশন্স অফিসার। আরেকটা পরিচয় হলো, আমাদের দূর্ভাগ্যজনক সেই সমীক্ষায় ইনি পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন।'

সবার সাথে হ্যান্ডসেক ও কুশল বিনিময় করে সুরাইয়া মাকোনি বসল। বসেই লায়লা জেনিফারের দিকে সহাস্যে তাকিয়ে বলল, ‘গুডলাক জেনিফার।'

লায়লা জেনিফার চমকে উঠল। বলল, ‘বিপদের সময় একথা কেন মাকোনি?'

সুরাইয়া কোন কথা না বলে একখণ্ড কাগজ তুলে দিল জেনিফারের হাতে।

আয়েশা উইলিয়াম, সারাহ উইলিয়াম এবং সুমা সুসান এক রাশ কৌতূহল নিয়ে দেখছিল ব্যাপারটা।

লায়লা জেনিফারও কৌতুহল নিয়ে হাতে নিল কাগজ খন্ড। কাগজটি একটি ফ্যাক্স শিট। একটা ফ্যাক্স মেসেজ ওটা। ইংরেজীতে লেখা ফ্যাক্স মেসেজটি পড়ল লায়লা জেনিফার।

পড়েই'ও গড'বলে চিৎকার করে উঠে দাঁড়াল জেনিফার। তারপর দু'হাতে মুখ ডেকে বসে পড়ল।

বিস্মিত উদ্বিগ্ন আয়েশা উইলিয়াম প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল সুরাইয়া মাকোনির দিকে।

‘ওটা অকল্পনীয় এক আনন্দের প্রকাশ খালাম্মা। চিন্তা করবেন না।'

বলল মাকোনি আয়েশা উইলিয়ামকে লক্ষ্য করে। মুখ থেকে দু'হাত সরিয়ে মুখ তুলল লায়লা জেনিফার। তার গোটা মুখ অশ্রুতে ধোয়া। ঠোঁটে আনন্দের হাসি। বলল, ‘সত্যি মামী, এ এক অকল্পনীয় আনন্দ, অভাবিত এক সুসংবাদ।'

বলতে ইয়ে আবার কেঁদে ফেলল জেনিফার। বলল কাঁদতে কাঁদতেই, ‘আমাদের মত এত ক্ষুদ্র মানুষদের আল্লাহ্ এত দয়া করবেন!'

‘কিছুই বুঝতে পারছি না।'বলে সারা উইলিয়াম জেনিফারের হাত থেকে কাগজ খন্ডটি টান দিয়ে কেড়ে নিল। পড়ল সে। পড়ে সেও চিৎকার করে উঠল, ‘অসম্ভব, অবিশ্বাস্য ব্যাপার। সত্যি কি এ ফ্যাক্স তার?'সারা উইলিয়াম দৃষ্টি মাকোনির দিকে।

মাকোনি মুখ খোলার আগেই 'কি ব্যাপার, দেখি ওতে কি আছে'বলে আয়েশা উইলিয়াম কাগজ খন্ডটি কেড়ে নিল সারা-এর কাছ থেকে।

দ্রুত নজর বুলাল সে ফ্যাক্স মেসেজটির উপর। পড়লঃ

"প্রিয় বোন লায়লা,

আসসালামু আলাইকুম,

যার নামে আপনার ফ্যাক্স মেসেজ ছিল, তার নির্দেশে আপনাকে জানাচ্ছি, তিনি আপনার ফ্যাক্স-মেসেজ পড়েছেন। এই মুহূর্তে তিনি বিমানে, মদীনার পথে। মদীনা পৌছার পর তিনি প্রথম সুযোগেই টার্কস দ্বীপপুঞ্জ সফর করবেন।

ওয়াচ্ছালাম।

আপনার এক ভাই

আসিফ আজিম

মস্কো"

ফ্যাক্স মেসেজ থেকে মুখ তুলে আয়েশা উইলিয়াম বলল, 'কিছুই তো বুঝলাম না। কার ফ্যাক্স মেসেজ? কে টার্কস দ্বীপপুঞ্জে আসছেন?'

‘ও আম্মা, তুমি আগের ঘটনা জান না ও মেসেজটি মহামান্য ভাই আহমদ মুসার।'বলল সারা উইলিয়াম।

‘কোন আহমদ মুসা? যার নাম পত্র-পত্রিকায় পড়েছি?'

‘জ্বি আম্মা।'

‘বল কি? তিনি লায়লা জেনিফারের কাছে ফ্যাক্স করতে যাবেন কেন? তোমরা মস্করা করছ আমার সাথে। বল তো, ‘প্রকৃত ঘটনা কি?'

সারা উইলিয়ামের মুখে হাসি। বলল, 'সে জন্যেই তো আম্মা আমি ব্যাপারটাকে অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য বলেছিলাম। ঘটনা ঠিক আম্মা। লায়লা সত্যি ফ্যাক্স পাঠিয়েছিলেন তাঁর কাছে।'

রাজ্যের বিস্ময় এসে ভীড় করল আয়েশা উইলিয়ামের চোখে-মুখে। কিছুক্ষণ সে কথা বলতে পারল না। হাঁ করে তাকিয়ে থাকল সারা উইলিয়ামের দিকে। এক সময় ধীরে ধীরে বলল, 'ফ্যাক্স সত্য হলে তিনি তো আসছেন। এত বড় দয়া আল্লাহ এই দ্বীপবাসীকে করবেন।'

'মামী, আমারও এই কথা। একটি অতি নগন্য বালিকার ফ্যাক্সকে

আহমদ মুসা এইভাবে অনার করবেন। আল্লাহ এতবড় দয়া করবেন এই দ্বীপবাসীকে। আমি ফ্যাক্স করেছিলাম একটা আবেগবশত। তাঁর আসার জন্যে নয়।'

'তুমি তাঁর ঠিকানা পেলে কোথায়?'বলল জেনিফারের মামী।

'ঠিকানা তো জানি না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে বিশ্বের ইসলামী সংগঠনগুলোর একটা ইনডেক্স পেয়েছিলাম। তাতে মক্কার রাবেতায়ে আলমে আল-ইসলামীর ফ্যাক্স নম্বার ও ঠিকানা ছিল। আমি ঐ ফ্যাক্সে আহমদ মুসাকে চিঠিটা পাঠিয়েছিলাম।'

'তুমি ফ্যাক্স পাঠিয়েছিলে মক্কায়, কিন্তু উত্তর তো এল মস্কো থেকে।'বলল তার মামী।

লায়লা মুখ খোলার আগেই কথা বলে উঠল সুরাইয়া মাকোনি।

বলল, 'তখন আহমদ মুসা যেহেতু মস্কো ছিলেন, তাই রাবেতা মনে হয় ফ্যাক্সটা মস্কোয় তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল।'

'থ্যাংকস গড। ভাগ্য জেনিফারের।'বলল জেনিফারের মামী আয়েশা উইলিয়াম।

'ভাগ্য জেনিফারের নয় মামী, ভাগ্য দ্বীপবাসীর। আল্লাহর বিশেষ

দয়াতেই এটা হয়েছে। না হলে নগন্য এক বালিকার মক্কায় পাঠানো ফ্যাক্স মস্কোতে যায়!'বলল জেনিফার।

‘আমারও তাই মনে হচ্ছে, আল্লাহ আমাদের প্রতি মুখ তুলে চেয়েছেন। বিশ্বাস করবেন না খালাম্মা , ফ্যাক্সটা পাওয়ার পর আমার অবস্থা কি হয়েছিল। জেনিফার তো আনন্দে কেঁদেছে। আর আমি কাঁপতে শুরু করেছিলাম। একটা অদৃশ্য শক্তি যেন আমাকে এখানে ঠেলে এনেছে। আমার মনে হচ্ছে, দুঃখের দিন আমাদের শেষ হচ্ছে।'বলল সুরাইয়া মাকোনি।

‘তাই যেন হয়।'বলে আয়েশা উইলিয়াম একটু থামল। তারপর বলল, ‘ফ্যাক্সে আহমদ মুসার নাম নেই। বুঝলাম না এটা কেন?'

‘এটা খুবই সোজা ব্যাপার মামী। মেসেজ উনি পাঠিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাক্সে। এটা যে কারও হাতে পড়তে পারতো এবং প্রকাশ হয়ে পড়তো আহমদ মুসা এখানে আসছে। আর তখনই ওটা আগুনের মত ছড়িয়ে পড়তো সবখানে। আর তাতে ওঁর চেয়ে বিপদে পড়তাম আমরাই বেশি।'জেনিফার বলল।

‘বুঝেছি আমি। থ্যাংকস গড, যে ও রকম কিছু হয়নি।'বলল তার মামী।

কথা শেষ করেই সে জেনিফার ও সারার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘মেহমানকে ভেতরে নিয়ে যাও। খাবার এবং রেষ্টের ব্যবস্থা কর।'

‘যাচ্ছি মামী।'বলে হেসে উঠে দাঁড়াল জেনিফার।

জেনিফার, সারা এবং মাকোনি তিনজনেই ভেতরে চলে গেল।

সুসানও চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াচ্ছিল। এ সময় আরেকটি অটো হুইলার এসে দাঁড়াল গেটে। গাড়ি থেকে নামল অপরিচিত এক ভদ্রলোক। বয়স চল্লিশের মত হবে। দেহের শক্তিশালী গড়ন। চোখ-মুখের চেহারা খুব তীক্ষ্ণ। শরীরের রং কালো, কিন্তু দৈহিক গড়নে বৃটিশ। সুসান আবার বসে পড়েছিল তার সোফায়। দু'জনেই তাকিয়েছিল ভদ্রলোকের দিকে।

ভদ্রলোক আসছিল বৈঠকখানার দিকে।

সুসান ও আয়েশা উইলিয়াম দু'জনেই উঠে দাঁড়িয়েছিল।

আয়েশা উইলিয়াম ভদ্রলোককে স্বাগত জানিয়ে বসতে অনুরোধ করল। তার চোখে প্রশ্নবোধক দৃষ্টি।

ভদ্রলোকের ঠোঁটে ঈষৎ হাসি। বসতে বসতে সে বলল, 'আপনি নিশ্চয় আয়েশা উইলিয়াম?'

নিজের পরিচয় দেয়ার সৌজন্যটুকু প্রদর্শন না করে বরং তাকে প্রশ্ন করল এতে দারুণ বিরক্ত হলো আয়েশা উইলিয়াম।এ ধরনের আচরণ থানার পুলিশ এবং কোর্টের উকিলরা করে থাকে। হঠাৎ তার মনে হলো, সৌজন্য বোধহীন লোকটি ঐ ধরনের কেউ নয় তো? কোন মতলব নিয়ে আসেনি তো? সাবধান হলো সে।

লোকটির প্রশ্নের উত্তরে আয়েশা উইলিয়াম ছোট্র উত্তর দিল, 'হ্যা।'

'আপনার ননদ কন্যা লায়লা জেনিফার কতদিন এখানে এসেছেন?'

মনে মনে আঁৎকে উঠল আয়েশা উইলিয়াম। তার মনে হলো, লোকটি তাহলে জেনিফারের খোঁজেই এসেছে।

নিজেকে সামলে নিয়ে আয়েশা উইলিয়াম স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, 'এসেছেন'নয় এসেছিলেন'বলুন।

'তার মানে তিনি চলে গেছেন?'লোকটির কণ্ঠে কিছুটা হতাশা এবং ব্যস্ততা।

'এই তো আপনি আসার পনের বিশ মিনিট আগে।'

কথা শেষ করেই আয়েশা উইলিয়াম প্রশ্ন করল, 'দুঃখিত আপনাকে চিনতে পারলাম না। আমার নাম জানলেন কি করে? আমার ননদ কন্যাকে আপনার কি প্রয়োজন?'

'বলছি, লায়লা জেনিফার কোথায় গেল বলতে পারেন?'বলল লোকটি।

গ্রান্ড টার্কস-এ গেছে, নিশ্চয় বিশ্ববিদ্যালয়েই গেল। জানতে পারি কি, কি ধরনের প্রয়োজন জেনিফারের সাথে?'

লোকটি একটু চিন্তা করল, তারপর বলল, 'আমি বেসরকারী গোয়েন্দা সংস্থার একজন সদস্য। আমরা দায়িত্ব পেয়েছি জেনিফারকে খুঁজে বের করার।'

'কেন জেনিফার কি ফেরারী আসামী যে, তাকে এভাবে খুঁজে বের
করার জন্যে লোক নিয়োগ করতে হবে?"

‘আমি কিছু জানিনা ম্যাডাম। তাকে খুঁজে বের করাই শুধু আমাদের দায়িত্ব।'

‘এই দায়িত্ব কে দিয়েছে? পুলিশ?'

‘আমি তাও জানি না। জানতে পারে আমাদের সংস্থা। তবে পুলিশ নয় এটুকু জানি।'

‘কারণ, উদ্দেশ্য, ইত্যাদি না জেনে এ ধরনের দায়িত্ব গ্রহণ কি নৈতিক?'

‘এর উত্তরের দায়িত্ব আমার সংস্থার উপর বর্তায়, আমার উপর নয়।'

আমার ভাগ্নি যদি এখানে থাকতো, তাহলে কি করতেন? ধরে নিয়ে যেতেন? এটা কি সম্ভব ছিল?'

‘স্যরি ম্যাডাম, ধরা আমার দায়িত্ব নয়। সন্ধান পেলে আমি ওদের জানিয়ে দিতাম এবং জেনিফার কোথাও গেলে আমি ওকে ফলো করতাম। যাতে তিনি আমার চোখের বাইরে না যেতে পারেন। ধরা, না ধরা, এসব দায়িত্ব ওদের।'

‘কিভাবে আপনি জানাতেন?'

লোকটি পকেট থেকে একটা মোবাইল টেলিফোন বের করল।

বলল, ‘এই টেলিফোন ব্যবহার করতাম।'

কথা শেষ করে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'চলি ম্যাডাম। দুর্ভাগ্য আমার। আসার পথে মিনিট বিশেক আগে একটা অটো হুইলার বন্দরের দিকে যেতে দেখেছি। হতে পারে ওটাতেই তিনি গেছেন।'

বলে গেটের দিকে পা বাড়াল লোকটি।

লোকটির অটো হুইলার স্টার্ট নিয়ে চলে গেল।

ঠিক সে সময়েই পরিচিত একটা ছেলে হাতে একটা ইনভলপ নিয়ে প্রবেশ করল গেট দিয়ে।

ছেলেটি জেমস ক্লাইভ-এর ছোট ভাই। তাকে দেখে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করল আয়েশা উইলিয়াম। তখনই কম্যুনিটি সেন্টারের কথা তার মনে পড়ে গেল।

ছেলেটি এসে তার হাতের ইনভেলপটি তুলে দিল আয়েশা উইলিয়ামের হাতে। ইনভেলপের উপর লেখা লায়লা জেনিফারের নাম।

ইনভেলপ দিয়েই চলে গেছে ছেলেটি।

ইনভেলপ খুলল আয়েশা উইলিয়াম।

মাত্র কয়েক লাইন লেখা। পড়ল।

"প্রিয় লায়লা জেনিফার, আজ রাতে ৮টায় আমাদের খামার বাড়িতে আপনাকে ডিনারের আমন্ত্রণ। ডিনারে যোগ দিয়ে আমাকে ধন্য করবেন।

জেমস ক্লাইভ"

বৈঠকখানায় প্রবেশ করল সারা এবং জেনিফার, সারা বাইরের দরজা-জানালা বন্ধ করে দিল। তারপর তার মায়ের কাছে ফিরে এসে বলল, ‘প্রাইভেট গোয়েন্দার সব কথা আমরা শুনেছি।

ও চিঠিতে কি আছে আম্মা।

চিঠিটা পড়ছিল জেনিফার।

কম্পিত হাতে জেনিফার চিঠিটা তুলে দিল সারা-এর হাতে।

সারা চিঠিটা পড়ে বলল, 'সর্বনাশ আম্মা, এর অর্থ ভয়ংকর। ওদের লাম্পট্যের আড্ডা ওদের খামার বাড়ি।'

সারার মা আয়েশা উইলিয়াম-এর চোখে-মুখে তখন অপমান ও

উদ্বেগের কালো ছাপ।

'ঐ লম্পটের ক্ষমতার উৎস কি, সারা?'বলল লায়লা জেনিফার।

'কাকুজ ও টার্কস দ্বীপপুঞ্জের বৃটিশ গভর্নরের সিকুরিটি বাহিনীতে আছে ওর ভাই। এটা এবং শ্বেতকায় হওয়া এ দু'টোই তার ক্ষমতার উৎস। ওরা আমাদের টার্কস দ্বীপপুঞ্জের বাসিন্দা নয়। বাড়ি কাকুজ দ্বীপপুঞ্জের গ্রান্ড কাকুজে। আর গ্রান্ড কাকুজ বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়ে বলে কথা আছে। কিন্তু তাকে কোনদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে দেখা যায়নি। আজ এক বছর হলো ওদের পরিবারের একটা অংশ এ দ্বীপে এসেছে। বৃটিশ গভর্নর নাকি তাদেরকে জমির পত্তনি দিয়েছে। ওদের জমির পরিধি ক্রমেই বাড়ছে। পরিস্কার মনে হচ্ছে ওরা বাস করতে নয় দ্বীপ দখল করতে এসেছে। এ পর্যন্ত ওরা প্রায় ৫০টি টার্কো পরিবারকে বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ করেছে, যাদের সকলেই মুসলমান।'

'এ অবিচারের কোন প্রতিকার হয়নি?'

'বিচার চাওয়াই হয়নি। এই যে ডিনারের দাওয়াত দিয়েছে। না গেলে ধরে নিয়ে যাবে। ফেরত দিয়ে যাবে সকালে। কোথায় বিচার পাওয়া যাবে এর। বিচার চাওয়ার চেষ্টা করলে প্রণেই মেরে ফেলবে।'

'একক নয়, সম্মিলিত উদ্যোগ তো নেয়া হয়নি।' বলল জেনিফার।

'বড় চাচা কেন নিহত হয়েছেন, তাঁর বড় ছেলে আলী ভাইয়া কোন ভয়ে আমাদের দ্বীপাঞ্চলের বাইরে গ্রেট ইন্ডিয়াতে আশ্রয় নিয়েছে তা তুমি ভুলে গেছ। একটা সমিতি গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিল, এটাই ছিল তাদের অপরাধ।'

লায়লা জেনিফারের মুখ মলিন হয়ে উঠল।

তার মামী আয়েশা উইলিয়াম ধপ করে বসে পড়ল সোফায়। বলল, 'সারা, জেনিফার তোমরা তোমাদের কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নাও। এক্ষুণি বেরুতে হবে, এ বাড়ি ছাড়তে হবে তোমাদের।'

'কোথায় যাব?'বলল সারা।

'মেয়েদের যাওয়ার জায়গা সীমাবদ্ধ। আপাতত তোমরা যাও জেনিফারদের বাড়িতে। ওখানে অন্তত জেমস-এর মত শয়তান নেই। আর যারা জেনিফারকে খুঁজছে, তারা তো জেনে গেল জেনিফার গ্রান্ড টার্কস-এর দিকে গেছে। সুতরাং তার বাড়িতে তারা খোঁজ এই মুহূর্তে করবে না। দু'একদিন সেখানে থাক, তারপর দূরে কোথাও যাবার বন্দোবস্ত করা যাবে।'

সুসান চলে গিয়েছিল, সুরাইয়া মাকোনি মুখ মলিন করে বসেছিল

জেনিফারের পাশে। সে বলল, 'জেনিফার তার বাড়িতে নিরাপদ নয়। বাড়ির উপর ওদের চোখ রাখার কথা। তবে লুকয়ে গিয়ে দু'একদিন সেখানে লুকিয়ে থাকতে পারবে।'

'এটাই হবে। তবে জেনিফারকে তো আর এ বাড়িতে রাখাই যাবেনা।'বলে আয়েশা উইলিয়াম সারা-এর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমরা সোজা বেরিয়ে পুবদিকে বন্দরের দিকে যেতে পারবে না। বাড়ির পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে উপত্যকা দিয়ে পশ্চিম উপকূলে গিয়ে নৌকা নিতে হবে তোমাদের।'

সারা ও জেনিফার তৈরি হবার লক্ষ্যে বাড়ির ভেতরে যাবার জন্যে

পা বাড়াল।

'আমিও এক সংগে বেরুতে চাই খালাম্মা। আমি যদি পুবদিকে যাই, তাহলে শত্রুদের কিছুটা বিভ্রান্ত করা যাবে।'বলল সুরাইয়া মাকোনি।

'ঠিক বলেছ মা।'

সবাই বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

লায়লা জেনিফার কাপড় গুছিয়ে ব্যাগে নিচ্ছিল। পাশে দাঁড়িয়েছিল মাকোনি।

এক সময় জেনিফার বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না এই চতুর্মূখি

সংকটে আহমদ মুসা একা এসে কি করবেন। কেমন করেই বা তার দেখা পাবো।'

'তুমি নিশ্চন্ত থাক জেনিফার, আহমদ মুসা আল্লাহ ছাড়া আর কারও উপর নির্ভর করে এখানে আসছেন না। আর সন্দেহ নেই, যাকে খুঁজে নেবার তিনিই খুঁজে নেবেন। কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা।'

'কি?'

'তাঁর ফ্যাক্স পড়ে তোমার যা দশা হয়েছিল ওঁকে কাছে পেলে তোমার কি দশা হয়, সেটাই আমার চিন্তার বিষয়।'মুখ টিপে হেসে বলল মাকোনি।

'কি আর হবে। সমুদ্রের কাছে বৃষ্টি বিন্দু কোন মূল্য রাখে?'বলল জেনিফার।

'রাখে না। কিন্তু সমুদ্রের বুকে বৃষ্টি বিন্দু বিলীন হয়ে যেতে তো বাধা নেই।'

'মাকোনি তুমি ভিন্ন দিকে যাচ্ছ।'কৃত্রিম চোখ রাঙিয়ে বলল জেনিফার।

এ সময় সারা সেখানে এল। বলল, 'আমি রেডি।'

ব্যাগের চেন টানতে টানতে জেনিফার বলল, 'আমিও রেডি।'

'রেডি আমিও। তবে পথ ভিন্ন।'বলল মাকোনি।

তিনজনেই একসাথে হেসে উঠল।

কিন্তু আয়েশা উইলিয়ামের চোখ তখন অশ্রুতে ভারি। মনে মনে তার আকুল প্রার্থনা, আল্লাহ তার মেয়েদের মান-সম্মান রক্ষা করুন, তাদের নিরাপত্তা দান করুন।

গ্রান্ডস টার্কস দ্বীপের প্রধান বন্দরটির দৃশ্য নয় বরং বন্দরটির নাম;জোয়ান ডি সুসুলামা'আহমদ মুসার দৃষ্টি আকর্ষণ করল বেশি। ভাষা সম্পর্কে আহমদ মুসার যতটুকু জ্ঞান আছে, তাতে তার মনে হচ্ছে আরবী শব্দাংশের উপর এখানে স্পেনীয় রং ছড়ানো হয়েছে। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ বিশেষ করে টার্কস দ্বীপপুঞ্জের মানচিত্রের উপর নজর বুলাতে গিয়ে এমন শংকর দৃশ্য সে অনেক দেখেছে। যেমন'ভিজকায়া মামুন্ড'দ্বীপ। এর'ভিজকায়া'শব্দ স্পেনীয়, কিন্তু 'মামুন্দ'শব্দ আফ্রিকান। যেমন ভিজাকয়া মামুন্ড'দ্বীপের'কেজান'গ্রাম।' কেজান'নামটি তুর্কি। 'কেজান'নামটি যেমন তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহরের মাইল চল্লিশ পশ্চিমের একটি ছোট্ট শহরের নামের সাথে মেলে, তেমনি এই দ্বীপের 'মামুন্ড'নামাংশটি আফ্রিকার মুসলিম রাষ্ট্র গিনি'র বেফিং নদী তীরের ছোট্র বন্দরের নামের সাথে মিলে যায়। এর অর্থ আমেরিকার কোলে দাঁড়ানো এই দ্বীপাঞ্চলে আফ্রিকা ও এশিয় মুসলিম দেশ থেকে মুসলিম ও সেই সাথে মুসলিম ঐতিহ্যের ব্যাপক আগমন ঘটেছে।

আহমদ মুসা একটা মোটর বোট থেকে টার্কস দ্বীপপুঞ্জের গ্রান্ড টার্কস দ্বীপের 'জোয়ান ডি সুসুলামা'বন্দরের জেটিতে বিসমিল্লাহ বলে পা রাখল।

আহমদ মুসা পোর্টরিকোর সামজুয়ান বন্দর থেকে এসেছে এই টার্কস দ্বীপপুঞ্জে। এর আগে ওয়াশিংটন থেকে এসেছিল ফ্লোরিডার মিয়ামিতে এবং মিয়ামি থেকে পোর্টরিকোর সামজুয়ান-এ।

বন্দরে নেমে তিন দিকের সাগরের দিকে তাকিয়ে আহমদ মুসার মনে হলো সে যেন এক ভেলায় দাঁড়িয়ে আছে।

বন্দরের পাশেই বাতিঘরের টাওয়াঁর।

টাওয়ারটি পর্যটকদের জন্যে একটি আকর্ষণীয় স্থান। টাওয়ারে দাঁড়িয়ে গোটা টার্কস দ্বীপপুঞ্জ এবং আটলান্টিকের অপরূপ দৃশ্য উপভোগ করা যায়।

আহমদ মুসা জেটি থেকে উপরে উঠতেই একটি তরুণ ছুটে এল।

বলল, ‘স্যার টাওয়ার দর্শন মাত্র দুই পাউন্ড কমিশনসহ। যাবেন।'

তরুণটির পরণে প্যান্ট এবং গায়ে সার্ট। খুব সাধারণ। স্বাস্থ্য ভাল, কিন্তু চোখে-মুখে ক্লান্তির চিহ্ন। গায়ের রং হালকা কালো।

'তোমার নাম কি?'আহমদ মুসা জিজ্ঞেস করল তরুণটিকে।

'কুমামি।'বলল তরুণটি।

আহমদ মুসা কখনও ইংরেজী, কখনও স্পেনিশ ভাষায় কথা বলছিল। বলল, 'আচ্ছা কুমামি, আমি দুই পাউন্ড দিলে তোমার কমিশন কত থাকবে?'

'পঁচাত্তর পেনি।'

'সারাদিনে কত আয় হয় তোমার?'

'পর্যটক না এলে কিছু হয় না। মুট বয়ে হয়তো তখন সারাদিনে চার পাঁচ পাউন্ড হয়।'

'কিন্তু পর্যটক যখন মোটামুটি মেলে?'

'তখন বিশ পঁচিশ পাউন্ড পর্যন্ত হয় স্যার।'

'এ আয় তো মন্দ নয়।'

'স্যার এর মধ্যে খরচ আছে।'

'কি খরচ?'

'পুলিশ ও বন্দর সুপারভাইজারকে দিতে হয়। এসব খরচসহ খাওয়া-দাওয়া বাদ দিলে আট দশ পাউন্ট টেকে স্যার।'

'বাড়িতে তোমার কে আছে?'

'আব্বা, আম্মা, দুই বোন। একটি ভাই হয়েছিল। গতকাল মারা গেছে সাত দিন বয়সে।'

'কি হয়েছিল?'জেনিফার চিঠির কথা মনে পড়ায় কতকটা আঁৎকে উঠেই প্রশ্ন করল আহমদ মুসা।

'মাতৃসনদে ছিল। কি রোগ হয়েছিল ডাক্তাররাও বলতে পারেনি।'

'শিশু মৃত্যুর পরিমাণ কি বেড়েছে ইদানিং?'

'তাই তো মনে হয়। গত মাসে মাতৃসনদে ৪টি শিশু মারা গেছে।

তবে শ্বেতাংগদের শিশু মরছে না, মরছে আমাদের।'

'মেয়ে শিশু না ছেলে শিশু বেশি মারা যায়?'

'তা বলতে পারবো না। তবে গত মাসে আমাদের মাতৃসনদে মৃত ৪টি শিশুর সবাই ছেলে।'

উত্তরে আহমদ মুসা আর কোন কথা বলল না।

হাঁটতে হাঁটতে কুমামি'র হাতে দুটি পাউন্ড তুলে দিয়ে বলল, 'যাও টাওয়ারের টিকিট করে আন।'

বন্দরের যাত্রী লাউঞ্জের যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আহমদ মুসা কথা বলছিল, সে জায়গাটা বেশ নিরিবিলি। আহমদ মুসা নামাযের জায়গা খুঁজছিল। জায়গাটা পছন্দ হলো।

কুমামি চলে গেলে আহমদ মুসা ওজু করে এসে ধীরে সুস্থে যোহরের নামায পড়ল।

নামায শেষ করে পেছন ফিরে দেখল, কুমামি দাঁড়িয়ে আছে।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'টিকিট করেছ কুমামি?'

'জি স্যার।'বলে টিকিট আহমদ মুসার হাতে দিল।

টিকিট দেওয়ার সময় কুমামি কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে গেল।

তার চোখ-মুখ দেখে মনে হয় কিছু বলবে সে।

কিছু তুমি বলবে কুমামি?'জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'স্যার, আপনি মুসলমান?'প্রশ্ন করার সময় তার চোখে-মুখে আনন্দের প্রকাশ ঘটল।

'তোমাকে খুব খুশি মনে হচ্ছে, কেন?'জিজ্ঞেস করল আহমদ
মুসা।

'স্যার, আমার জীবনে এই প্রথম একজন মুসলমান বিদেশী পেলাম।'

'মুসলিম পর্যটক পেলে খুশি লাগে কেন?'

'স্যার, আমরাও মুসলমান।'

'তোমরা মানে তোমাদের পরিবার মুসলমান?'

'জি স্যার। আমার নাম আলী কুমামি।'

'কিন্তু নাম জিজ্ঞেস করলে তো শুধু'কুমামি'বলেছ।'

'অপরিচিত কারো কাছে'আলী'নাম বলি না।'

'কেন?'

'তাতে অসুবিধা হয় স্যার।'

'মুসলিম পরিচয় দিলে কি ধরনের অসুবিধা হয়?'

'সেটা পরিস্কার বলা মুস্কিল। আমাদের আলাদা ধরনের মানুষ মনে করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে অবিশ্বাস করা হয়। শাসক ও শ্বেতাংগরা অনেক ক্ষেত্রে আমাদের মানুষ মনে করে না। ছোট-খাট দোষ হলেও আমাদের মাফ করা হয় না।'

'তুমি থাক কোথায়?'

'বন্দর ও রাজধানীর মাঝামাঝি জায়গার একটা গ্রামে।'

'গ্রামে কতজন মুসলমান?'

'তিন ভাগের দুই ভাগই মুসলমান।'

'বাকি এক ভাগ?'

'কিছু খৃষ্টান আছে, কিছু অন্য ধর্ম।'

'শ্বেতাংগের সংখ্যা কত?'

'আমাদের গ্রামে শ্বেতাংগ ছিল না। বছর খানেক আগে সরকার কয়েক ঘর শ্বেতাংগ বসিয়েছে। তারপর থেকে দু'একটি করে শ্বেতাংগ-ঘর বাড়ছে।'

আহমদ মুসা ব্যাগ হাতে তুলে নিয়ে বলল, 'চল টাওয়ারে যাই। আমাকে আবার গ্রান্ড টার্কস মানে রাজধানীতে যেতে হবে।'বলে টাওয়ারের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

টাওয়ারের একদম শীর্ষে বাতিঘর। টাওয়ারে প্রবেশের দরজার ডান পাশের দেয়ালে ফাউন্ডেশন স্টোন। স্প্যানিশ ভাষায় কয়েক লাইন লেখা।

দাঁড়াল আহমদ মুসা ফাউন্ডেশন স্টোনের সামনে। বাতিঘরের ইতিহাস সম্পর্কে কয়েক লাইন লেখা হয়েছে ফাউন্ডেশন স্টোনে।

পড়ল আহমদ মুসা।

"টার্কস দ্বীপপুঞ্জ প্রথম দেখতে পান অভিযাত্রী'জুয়ানা পন্স ডি লিওন'১৫১২ সালে। দ্বীপে প্রথম অবতরণ করেন'ও, এ্যাফেনডিও'।

এ্যাফেনডিও ১৫১২ সালেই এই বাতিঘরের প্রতিষ্ঠা করেন। পরে দ্বীপের বৃটিশ গভর্নর আলডেবার্গ বাতিঘরের বর্তমান রূপ দেন।"

'ও, এ্যাফেনডিও'নাম পড়তে গিয়ে হোচট খেল আহমদ মুসা। স্প্যানিশ শব্দ মালায় এ ধরনের শব্দ নেই। তুর্কি'এ্যাফেন্দী'শব্দের এটা স্পেনিওকরণ কি?'ও'-এর পূর্ণরূপ কি হতে পারে?'

মনে প্রশ্ন নিয়েই আহমদ মুসা প্রবেশ করল টাওয়ারে।

টাওয়ারের শীর্ষে বাতিঘর। তার নিচেই অবজারভেটরী হল। অবজারভেটরী হলের চারদিকে ফাইবার কাচের উইনডো এবং চারদিকে চারটি দূরবীন। চারদিকে তাকিয়ে চমৎকৃত হলো আহমদ মুসা। উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণে আটলান্টিকের অথৈ নীল পানি। পশ্চিম দিকে তাকিয়ে বামপাশে টার্কস দ্বীপপুঞ্জের অর্ধ ডজনের মত এবং ডানে তাকিয়ে কাকুজ দ্বীপপুঞ্জের দ্বীপগুলোকে আদিগন্ত নীল পানিতে ভেলার মত ভাসতে দেখল আহমদ মুসা। মহাসাগরের বিশালত্বের মাঝে বড়ই অসহায় মনে হলো দ্বীপগুলোকে। টার্কস দ্বীপপুঞ্জের সবচেয়ে কাছের দ্বীপপুঞ্জ বাহামা। কিন্তু তারও প্রধান দ্বীপ সত্তর আশি মাইল পশ্চিম-উত্তরে। টার্কস দ্বীপপুঞ্জ থেকে ডোমিনিকান রিপাবলিকের অবস্থান প্রায় একশ'মাইল দক্ষিণে, আর কিউবা প্রায় দু'শ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। এমন অবস্থানের ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জের মানুষগুলো অসহায় হবে সেটাই স্বাভাবিক।

অবজারভেটরীর নিচেই রেষ্টুরেন্ট। রেস্টুরেন্টে নাস্তা করে আহমদ মুসা নিচে নেমে এল। বলল সে আলী কুমামিকে, 'তুমি গ্রান্ড টার্কস-এর চার্লস বিশ্ববিদ্যালয় চেন?'

'না স্যার, গ্রান্ড টার্কস-এ দু'একবার গেছি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইনি।'

আহমদ মুসা পঞ্চাশ পাউন্ড-এর মত হবে কয়েকটা নোট আলী

কুমামির হাতে গুজে দিয়ে বলল, 'তোমার আব্বা-আম্মার জন্যে মিষ্টি নিয়ে যাবে। তোমার ঠিকানা নিয়েছি। সুযোগ পেলে দেখা করব।'

বলে আহমদ মুসা একটা গাড়ি ডেকে উঠে বসল।

চলল গাড়ি রাজধানী শহর গ্রান্ড টার্কস-এর পথে।

গ্রান্ড টার্কস শহরের ঠিক মাঝখানে চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়টি ছোট, কিন্তু ছবির মত সুন্দর। ইংল্যান্ডের যুবরাজ চার্লস-এর ব্যাক্তিগত অনুদানে এই বিশ্ববিদ্যায়টি গড়ে ওঠে।

প্রধান গেট দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করল আহমদ মুসা।

প্রশাসনিক অফিস থেকে অর্থনীতি বিভাগের লোকেশন জেনে নিয়ে আহমদ মুসা গিয়ে হাজির হলো অর্থনীতি বিভাগের অফিসে।

লায়লা জেনিফার অর্থনীতি বিভাগের ছাত্রী। আহমদ মুসা অর্থনীতি বিভাগ থেকে লায়লা জেনিফারের খোঁজ নিতে চায়। সে জানে জেনিফার বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই, কোথাও আত্মগোপন করে আছে। অফিসে তার বাড়ির ঠিকানা আছে। এই ঠিকানা পেলে লায়লা জেনিফারকে সন্ধান করার একটা পথ সে পাবে।

আহমদ মুসা অর্থনীতি বিভাগের পাবলিক রিলেশন্স অফিসের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো।

দরজায় পর্দা।

আহমদ মুসা পর্দার এ পারে দাঁড়িয়ে বলল, 'ভেতরে আসতে পারি।'

সংগে সংগে জবাব এল না। একটু পর একটা কণ্ঠ বলল, 'ভেতরে আসুন।'

আহমদ মুসা ঘরে প্রবেশ করল।

দেখল, দরজার ঠিক বিপরীত প্রান্তে সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপারে একটা রিভলবিং চেয়ারে বসে একজন কৃষ্ণাংগ মেয়ে।

আহমদ মুসাকে স্বাগত জানাবার জন্যেই সম্ভবত সৌজন্যের খাতিরে সে উঠে দাঁড়িয়েছে। একজন বিদেশীকে দেখায় তার চোখে-মুখে একটা কোতূহল।

মেয়েটির টেবিলের সামনে দু'টি চেয়ার। তার একটিতে আগে থেকেই একজন শ্বেতাংগ লোক বসে। গায়ে ডোরাকাটা টি সার্ট, পরণে জিনসের প্যান্ট।

আহমদ মুসা টেবিলের সামনে পৌঁছলে মেয়েটি হাত বাড়াল হ্যান্ডশেকের জন্যে এবং বলল, 'আমি মাকোনি। তথ্য অফিসার।'

আহমদ মুসা হ্যান্ড শেকের জন্যে হাত না বাড়িয়ে বলল, 'স্যরি ম্যাডাম। মেয়েদের সাথে হ্যান্ডশেক করা আমার সংস্কৃতি অনুমোদন করে না।'

মেয়েটির চোখে-মুখে বিব্রতভাব ফুটে উঠল। কিছুটা অপমানের চিহ্নও।

পর মুহূর্তেই মেয়েটি নিজেকে সামলে নিয়ে মুখে হাসি টানার চেষ্টা করে বলল, ‘বসুন।'বলে নিজেও বসে পড়ল।

আহমদ মুসা বসতে বসতে বলল, 'ধন্যবাদ। আমি আহমদ আবদুল্লাহ। এসেছি ওয়াশিংটন থেকে। আমি আপনার কিছু সহযোগিতা চাই।'

পাশের লোকটি বিস্ময় ও বিরক্তি নিয়ে তাকিয়েছিল আহমদ মুসার দিকে। আহমদ আবদুল্লাহ নাম শুনে তার চোখে বিতৃষ্ণা ও তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটে উঠল।

'আহমদ আবদুল্লাহ'নাম শুনে মাকোনি চমকে উঠেছিল। লোকটি তাহলে মুসলমান। আহমদ মুসার নাম সে শুনেছে।'আহমদ আবদুল্লাহ'আবার কে? শেষে তার মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল।

'বলুন, কি সহযোগিতা করতে পারি?'বলল মাকোনি।

‘অর্থনীতি বিভাগের একজন ছাত্রী লায়লা জেনিফারের দেখা কিভাবে পেতে পারি?'

চমকে ওঠে মাকোনি মনে মনে। চকিতে একবার তাকাল পূর্ব পাশে বসা লোকটির দিকে। মাকোনির চোখে-মুখে ভয়ের চিহ্ন। জিজ্ঞাসা জেগে উঠল তার মনে, কে এই লোক?'আহমদ আবদুল্লাহ'নামের লোকটি কি আহমদ মুসা হতে পারে? জিজ্ঞাসারও কোন উপায় নেই লোকটির সামনে। জেনিফারের কোন তথ্য দেয়াও সম্ভব নয়। লোকটি সামান্য সন্দেহ করলেও কারও রক্ষা নেই।

‘লায়লা জেনিফার আমাদের ছাত্রী। সে এখন কোথায় আছে আমরা জানি না। বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছে না বেশ কিছুদিন।'

‘তার স্থায়ী একটা ঠিকানা বা পোস্টাল ঠিকানা নিশ্চয় আপনাদের কাছে আছে। সে ঠিকানা পেলেও আমার চলবে।'

বিপদে পড়ে গেল মাকোনি। এই ঠিকানা সে দিতে পারে। কিন্তু ভয় করলো মাকোনি। লোকটির সামনে এই ঠিকানাটুকুও দেয়া যায় না।

মাকোনি পরিস্কার লক্ষ্য করেছে, আহমদ আবদুল্লাহ নামক লোকটির মুখে'লায়লা জেনিফারের নাম শুনেই এ লোকটির চোখ দু'টি সাংঘাতিক সতর্ক ও শক্ত হয়ে উঠেছে। এসব ভেবে মাকোনি বলল, ‘মাফ করবেন, অভিভাবক বা নিকট আত্মীয় নন এমন কাউকে আমরা আমাদের ছাত্রীর ঠিকানা দেই না।'

'অল রাইট, তাঁর কোন বন্ধু বান্ধবের ঠিকানা দয়া করে দিতে পারেন, যারা চাইলে আমাকে সাহায্য করতে পারেন।'

'স্যরি, এ সাহায্যও তার ক্লাসমেটদের কেউ করতে পারেন। আমি পারছি না। আজ একাডেমিক একটা ছুটির দিন। আপনি কাল এলে তার ক্লাসমেটদের পাবেন।'

‘ধন্যবাদ। আপনাকে কষ্ট দিতে হলো বলে দুঃখিত।'

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

আহমদ মুসার পাশের লোকটিও উঠে দাঁড়াল।

মাকোনিকে লক্ষ্য করে বলল, 'তাহলে ম্যাডাম আমিও উঠি। পরে আসব।'

আহমদ মুসার পেছনে পেছনে লোকটিও বেরিয়ে গেল মাকোনির অফিস থেকে।

মাকোনি উঠে দাঁড়িয়েছিল ওদের বিদায় দেবার জন্যে।

ওরা বেরিয়ে যেতেই মাকোনি ধপ করে তার চেয়ারে বসে পড়ল। মাকোনির খুব খারাপ লাগছে'আহমদ আবদুল্লাহ'নামের লোকটিকে কোন সাহায্য করতে না পারার জন্যে। ঐ লোকটিও তো আহমদ মুসা হতে পারে!লোকটির দৃষ্টি ও চেহারায় অপরূপ পবিত্রতা। আর ব্যক্তিত্বে রয়েছে প্রচন্ড এক সম্মোহনী। যতক্ষণ সে বসেছিল তার মনে হয়েছিল আলোর এক অদৃশ্য ছায়া যেন তার চারদিকে।

যে লোকটি সামনে বসে থাকার কারণে মাকোনি'আহমদ আবদুল্লাহ'নামের লোককে কোন সহযোগিতা করতে পারল না, মাকোনি নিশ্চিত সে লোকটি, হন্তা গ্রুপের একজন। জেনিফারকে পেলেও তারা তাকে খুন করবে।

মনের অস্থিরতার জন্যে মাকোনি সিটে বসে থাকতে পারলো না।

সে উঠে দাঁড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে করিডোরে কাউকে দেখতে পেল না মাকোনি।

‘আহমদ আবদুল্লাহ'নামের লোকটি কোনদিকে যেতে পারে? রেজিস্টার অফিসের দিকে যেতে পারে কি? বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরুবার রাস্তা এবং রেজিস্টারের অফিস একই দিকে। সেদিকেই ছুটল।

করিডোরে ধরে কিছু দূর ছুটে যাবার পর যে দৃশ্যটা দেখল, তাতে

তার বুক কেঁপে উঠল।

'আহমদ আবদুল্লাহ'নামের লোকটা সামনে। তার পেছনে হন্তা গ্রুপের সেই লোক। হাতে রিভলবার। রিভলবারের নল দিয়ে আহমদ আবদুল্লাহ নামের লোকটির পিঠের মাঝে গুঁতো দিয়ে তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পেছনের গেটের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

মাকোনিও সম্মোহিতের মত তাদের পেছনে পেছনে চলল নিজেকে তাদের চোখ থেকে আড়াল করে।

করিডোরের পথে দু'চারজন এ দৃশ্যটা দেখল। তারা রিভলবারধারী শ্বতাংগকে সম্ভবত গোয়েন্দা পুলিশ মনে করে বেশি কৌতূহল না দেখিয়ে কেটে পড়ল।

মাকোনি চিন্তা করল'আহমদ আবদুল্লাহ'নামের লোকটি যদি আহমদ মুসা হতো, তাহলে তো সুবোধ বালকের মত শ্বেতাংগ লোকটির রিভলবারের খোঁচা খেয়ে সামনে এগুতো না! তাহলে লোকটি আহমদ মুসা নয়। মনটা খারাপ হয়ে গেল মাকোনির। আবার ভাবল, আহমদ মুসা না হোক, বেচারা মুসলমান তো!

করিডোরটি যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে, সেটা একটি বিশাল গেট।

এটাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পেছনের দিকের দরজা।

এ দরজার পর কিছু ফাঁকা জায়গা। তারপরেই শুরু হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আবাসিক এলাকা।

দরজাটি থেকে আরও দুটি করিডোর ডান ও বাম দিকে চলে গেছে।

গেটে পৌছেই শ্বেতাংগ লোকটি চিৎকার করে বলল, 'দাঁড়াও।'

এ কথা বলেই সে দু'পাশের করিডোরের দিকে দ্রুত তাকাল।

রিভলবারসহ তার হাতটা তখন নিচে নেমে গিয়েছিল।

আর আহমদ মুসাকে থামতে বলার সংগে সংগেই সে চোখের পলকে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল।

ঘুরে দাঁড়িয়েই আহমদ মুসা তার বাম হাত দিয়ে শ্বেতাংগটির রিভলবার ধরা ডানহাতের কবজিতে একটা প্রচন্ড মোচড় দিয়ে ডান হাত দিয়ে একটা কারাত চালাল তার কানের নিচে ঘাড়ের নরম জায়গাটায়।

লোকটির দেহ টলে উঠল এবং আছড়ে পড়ে গেল।

আহমদ মুসা লোকটির রিভলবার তুলে নিতে যাচ্ছিল। নিচু হয়েছিল সে। ডানদিক থেকে আসা পায়ের শব্দ শুনে মুখ তুলল সেদিকে। দেখল আর এক শ্বেতাংগ ছুটে এসে ঝাঁফিয়ে পড়েছে তার উপর।

তখন কিছু করার ছিল না। আহমদ মুসা উবু হয়ে বসে পড়ল।

ঝাঁফিয়ে পড়া লোকটির পেট এসে আঘাত করল আহমদ মুসার পিঠে। লোকটির মাথা ও হাত গেল আহমদ মুসাকে অতিক্রম করে।

আহমদ মুসার দেহটি কাত হয়ে গিয়েছিল। পড়ে থেকেই শ্বেতাংগ

লোকটি আহমদ মুসার গলা জাপটে ধরার চেষ্টা করছিল।

আহমদ মুসা লোকটির দু'হাত ধরে পাক খেয়ে নিজের শরীরটাকে উল্টে দিল।

লোকটির দু'হাত মুচড়ে যাওয়ায় লোকটি কাবু হয়ে পড়ল।

আহমদ মুসা লোকটির বাঁম হাত ছেড়ে দিয়ে তার ডান হাত আগের মতই ধরে রেখে নিজের দেহকে আর এক পাক ঘুরিয়ে নিল।

লোকটির ডান হাত আরও মুচড়ে যাওয়ায় লোকটি ব্যথায় চিৎকার করে উঠল এবং তার দেহটি উল্টে ছিটকে পড়ল মাটিতে।

আহমদ মুসা লোকটির ডান হাত মোচড় দিয়ে ধরে রেখে একটা পা দিয়ে তার দেহকে চেপে রেখে বলল, ‘তোমরা কে? আমার সাথে তোমাদের শত্রুতা..'

আহমদ মুসা কথা শেষ করতে পারল না। একটা ভারি কিছুর আঘাত এসে পড়ল তার মাথায়। সংগে সংগে সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে গেল সে মাটিতে।

গোটা ব্যাপারটা মাকোনি রুদ্ধশ্বাসে দেখছিল। খুশী হয়েছিল সে যখন'আহমদ আবদুল্লাহ'নামের লোকটি দ্বিতীয় লোকটিকেও কাবু করে ফেলেছিল।

কিন্তু হঠাৎ তার চোখে পড়ল বাম দিকের করিডোর দিয়ে বিড়ালের মত নিঃশব্দে একজন শ্বেতাংগ এগিয়ে আসছে। তার হাতে ভারি একটা কাঠের টুকরো। সে যখন আহমদ মুসার পেছনে গিয়ে আহমদ মুসার মাথার উপর কাঠের টুকরোটি তুলল, তখন চিৎকার করে উঠতে চেয়েছিল মাকোনি। কিন্তু তার গলা থেকে কোন স্বর বের হয় নি। ভয়ে রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল তার কণ্ঠ।

আহমদ মুসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলে মাকোনি ছুটে পালাল সেখান থেকে। তার সমগ্র মন জুড়ে একটাই আতংক তখন, খুনিরা তাহলে'আহমদ আবদুল্লাহ'নামের লোকটিকেও খুন করল। সে যদি আহমদ মুসা হয়? আহা! সে তো সহজেই দু'জনকে কুপোকাত করেছিল। লোকটি যদি পেছন থেকে এসে চোরের মত আঘাত না করতো।

আহমদ মুসার কারাতে যে জ্ঞান হারিয়েছিল, তার সাথী দু'জন তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনল।

সে সংজ্ঞা ফিরে পেয়েই উঠে দাঁড়িয়ে প্রচন্ড এক লাথী চালাল সংজ্ঞাহীন আহমদ মুসার পাঁজরে। তারপর বলল, ‘এখন মনে হচ্ছে এ শয়তানকে জেনিফাররা হায়ার করে এনেছে।'

‘তাহলে একে নিয়ে যাচাই করতে হয়।'বলল দ্বিতীয় জন।

‘জঞ্জাল বহন করে লাভ নেই। বেঁচে গেলে আপনাতেই বাপ বাপ বলে দ্বীপ ছেড়ে পালাবে।'বলল দ্বিতীয় জন।

‘কিন্তু লোকটাকে খুব শেয়ানা মনে হচ্ছে।'বলল তৃতীয়জন।

‘শিক্ষাও হয়েছে। না হলে, এরপর জানটাও যাবে।'বলল প্রথম জন।

বলে সে আহমদ মুসার সংজ্ঞাহীন দেহে আরেকটা লাঠি চালিয়ে সাথীদের বলল, ‘চল যাই।'

ওরা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ওরা বেরুবার আগেই একজন ছাত্র এসে দাঁড়িয়েছিল দরজায়।

ওদের শেষ জনের কথা এবং লাথি দেয়ার দৃশ্যটা সে দেখতে পেয়েছিল।

ওদের বেরিয়ে যেতে দেখে ছাত্রটি বলল, 'কি হয়েছে? কি ঘটনা?'

'বিদেশী ঐ কুত্তাকে জিজ্ঞেস কর।'বলল ওদের একজন।

বলে সবাই চলে গেল।

ভেতরে দুকল ছাত্রটি। ছাত্রটির বয়স একুশ বাইশ বছর হবে। দেহের বলিষ্ট গড়ন। মাথার চুল কালো। চোখ নীল। শ্বেতাংগ।

বসে পড়ল ছাত্রটি আহমদ মুসার পাশে। হাতের বই মাটিতে রেখে দ্রুত নাড়ি পরীক্ষা করল সে আহমদ মুসার। স্বগত উচ্চারণ করল, 'থ্যাংকস গড, লোকটি বেঁচে আছে।'

ছাত্রটি দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে ছুটল বাইরে। বাইরে কোন গাড়ি পেল না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্যারের গাড়ি যাচ্ছিল, অনুরোধ করে দাঁড় করাল সে গাড়ি।

'কি ব্যাপার, জর্জ?'বলল ড্রাইভিং সিটে বসা অধ্যাপকটি বিস্মিত কণ্ঠে।

ছাত্রটির নাম জর্জ জেফারসন। এই চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন তুখোড় ছাত্র সে। ইতিহাসের ছাত্র জর্জ অনার্স পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিভাগের মধ্যে সর্বোচ্চ নাম্বার পাওয়ায়'চার্লস গোল্ড মেডেল'পেয়েছে এবং স্কলারশীপ পেয়েছে অক্সফোর্ডে উচ্চ শিক্ষার।

'স্যার একজন মুমূর্ষ লোককে হাসপাতালে নিতে হবে।'

'কোথায়?'

'স্যার এই গেটের ভেতরে।'

'স্যার আমি গাড়ি ড্রাইভ করতে পারবো, গাড়িটা আমাকে দিতে পারেন, যদি অবিশ্বাস না করেন।'

অধ্যাপকটি গাড়ি থেকে নামল। বলল, 'তোমাকে অবিশ্বাস করলে

বিশ্বাসের আর কোন জায়গা থাকে না জর্জ।'বলে গাড়ির চাবী জর্জের হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'চল দেখি, কে লোকটি, কি ব্যাপার?'

'স্যার লোকটি একজন বিদেশী। তিনজন লোক তার মাথায় আঘাত করে পালিয়ে গেল।'

চলল দু'জন গেটের ভেতরে।

অধ্যাপকটি সংজ্ঞাহীন আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'লোকটি এশিয়ান হে। লোকটাকে তো গুন্ডা বদমাশ বলে মনে হয় না।'বলল জন ফিলিপ।

অধ্যাপক জন ফিলিপ চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের একজন সিনিয়র প্রফেসর।

'আমারও তাই ধারণা স্যার। যারা মেরে পালাল ওদের বর্ণবাদী ধরণের বলে আমার মনে হলো। ওরা হুমকী দিয়ে গেছে, শিক্ষা না হলে এরপর লোকটির জান যাবে।'

'চল তোমাকে আমি সাহায্য করি লোকটাকে গাড়িতে তুলতে।'

বলে অধ্যাপকটি আহমদ মুসার পায়ের দিকটা ধরল।

'ধন্যবাদ স্যার'বলে জর্জ আহমদ মুসার মাথার দিকটা হাতে তুলে নিল।

'ধন্যবাদ দিচ্ছ কেন? মনে হচ্ছে তোমার কাজটা যেন আমি করে

দিচ্ছি। দেখ, তুমি সমাজ সেবা করে বেড়াও একথা ঠিক, কিন্তু সুযোগ পেলে আমি করি না। একথা ঠিক নয়।'

'ধন্যবাদ স্যার। আপনারাই তো আমাদের মডেল।'

'দেখ জর্জ, নীতিহীন বিনয় ভালো নয়। সবাইকে মডেল বানিও না, বিপদে পড়বে।'

'ধন্যবাদ স্যার।'ঠোঁটে হাসি টেনে বলল জর্জ।

গাড়ির কাছে তারা এসে গেছে।

দু'জন ধরাধরি করে আহমদ মুসাকে গাড়িতে তুলল।

ড্রাইভিং সিটে বসল জর্জ।

গাড়ি ছুটে চলল রানী এলিজাবেথ হাসপাতালের দিকে।

রানী এলিজাবেথ হাসপাতালটি নতুন। কিন্তু মধ্য ক্যারিবিয়ানের সবচেয়ে আধুনিক ও সুসজ্জিত হাসপাতাল। বাহামা, ডোমিনিকান রিপাবলিক, এমনকি কিউবা থেকেও কখনও কখনও রুগী এখানে আসে।

হাসপাতালের ঈমারজেন্সিতে নেয়ার সাথে সাথেই আহমদ মুসাকে নিয়ে একদল ডাক্তার ছুটল ইনটেনসিভ কেয়র ইউনিটে। এদের মধ্যে জর্জের বড় বোন ডাঃ মার্গারেটও রয়েছে।

মারিয়া মার্গারেট হাসপাতালের একজন সার্জন।

দু'ঘন্টা পর মার্গারেট বেরিয়ে এসে অপেক্ষমান জর্জকে বলল, 'লোকটি কে জর্জ?'

'আমি চিনি না। তিনজন লোক মেরে একে বিশ্ববিদ্যালয়ের পেছনের গেটে ফেলে রেখে গিয়েছিল। আমি তুলে এনেছি।'

'অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে লোকটি। ব্রেণের কোন ক্ষতি হয়নি। তবে জ্ঞান ফিরতে কয়েক ঘন্টা সময় লাগতে পারে। ছোট একটা অপারেশনের দরকার হবে।'

বলে একটু থেমেই আবার বলল, 'তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাও। আমি ওঁর দিকে খেয়াল রাখব। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফেরার পথে এস।'

'লোকটি বিদেশী। কিন্তু তাঁর ব্যাগ খুঁজে ওঁর কিছু কাপড় চোপড়, টুকিটাকি ধরনের কয়েকটা অদ্ভুত জিনিস পেয়েছি। নাম-ঠিকানা জানা যায়, এমন কিছুই পাইনি।'বলল জর্জ।

'ওঁর পকেটে একটা মানিব্যাগ এবং একটা পাসপোর্ট পাওয়া গেছে। পাসপোর্টে ওর নাম আহমদ আবদুল্লাহ। তুর্কি পাসপোর্ট। সৌদি আরব, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হয়ে এখানে এসেছেন।'

বলে মার্গারেট মানিব্যাগ ও পাসপোর্ট জর্জের দিকে তুলে ধরল এবং বলল'এগুলো ওঁর কাছে থাকলে হারাতে পারে।'

'এগুলো তোমার কাছেই থাক না আপা।'

'আমি ডাক্তার। রোগীর পকেটের জিনিস আমার কাছে থাকতে পারে না।'

'অবশ্যই থাকতে পারে তোমার কাছে অভিভাবক হিসেবে, আর না হয় হাসপাতালের অফিসে রেখে দাও।'

'অফিসে রাখতে চাই না, মানিব্যাগে অনেক পাউন্ড আছে।'

জর্জ আর কথা না বাড়িয়ে জিনিস দু'টি হাতে নিল। তারপর বড় বোন মার্গারেটের কাছে বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠে বসল বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেরার জন্যে।

মাকোনি উদ্বেগ-অস্বস্তির তাড়ায় বেশিক্ষণ তার অফিসের সিটে বসে থাকতে পারলো না।'আহমদ আবদুল্লাহ'নামের লোকটিকে কি ওরা মেরে ফেলল? না ধরে নিয়ে গেল? অথবা আহত করে ফেলে রেখে গেল কিনা?

মাকোনি যেন অনেকটা সম্মোহিতের মতই ফিরে এল সেই গেটে। কিন্তু আহত আহমদ মুসা যেখানে পড়েছিল, সেখানে রক্তের দাগ ছাড়া আর কিছুই দেখল না।

বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল মাকোনির। নিশ্চয় সেই খুনিরা ধরে নিয়ে

গেছে আহত'আহমদ আবদুল্লাহ'নামের লোকটিকে। খুনিরা অবশ্যই তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে নিয়ে গেছে। কথা বের করার পর নিশ্চয় ওরা তাকে মেরে ফেলবে।

ফিরে এল মাকোনি তার অফিসে আবার। ধপ করে বসে পড়ল তার সেই চেয়ারে।

‘এখন কি করা যায়?'এই এক প্রশ্ন বার বার ঘুরে এসে তাকে পীড়া দিতে লাগল।

ভাবল সে, বিষয়টা জেনিফারকে জানানো দরকার। সে হয়তো ভেঙে পড়বে, তবু তাকে জানানো দরকার। কিন্তু জানাবে কেমন করে? জেনিফারদের একটা গোপন মোবাইল টেলিফোন আছে। ওর আব্বা পোর্টরিকো কেন্দ্রীক একটা আমেরিকান কোম্পানীর কাছ থেকে নিয়ে এসেছে। গোটা মধ্য ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ওর আওতায় আসে। সে গোপন নম্বার তার কাছে আছে। কিন্তু জেনিফারকে তো বাড়িতে পাওয়া যাবে না। মামীর বাড়ি থেকে পালিয়ে এক দু'দিনের বেশি তার বাড়িতে থাকার কথা নয়।

তবু মাকোনি টেলিফোন করল লায়লা জেনিফারকে। পেল তাকে বাড়িতে। বলল, ‘জেনি'আহমদ আবদুল্লাহ'নামের একজন লোক আমার অফিসে এসে তোর খোঁজ করছিল?'

‘কোথাকার লোক?'উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল জেনিফার।

‘এশিয়ান লোক।'

‘এশিয়ান লোক? নিশ্চয় সে তাহলে আহমদ মুসা।'আবেগ-রুদ্ধ কণ্ঠ জেনিফারের।

‘এত নিশ্চিত হচ্ছিস কেমন করে?'

'তোর অফিসের ফ্যাক্সেই তাঁকে মেসেজ পাঠানো হয়েছিল।

তাতে তোর অফিসের ফ্যাক্স নাম্বার ছিল। সুতরাং আহমদ মুসাতো তোর অফিসেই প্রথম আসবে।'

'ঠিক বলেছিস। আমি এদিকটা তো চিন্তা করিনি। কিন্তু সর্বনাশ হয়ে গেছে।'কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলল মাকোনি।

‘কি সর্বনাশ হয়ে গেছে?'ওপার থেকে উদ্বেগাকুল জিজ্ঞাসা জেনিফারের।

‘হ্যাঁ সর্বনাশ য়ে গেছে।'বলে কেঁদেই ফেলল মাকোনি।

‘কাঁদবি না। তাড়াতাড়ি বল কি হয়েছে। আমি কিন্তু সহ্য করতে পারছি না।'

মাকোনি চোখ মুছে গোটা কাহিনী লায়লাকে শোনাল।

শেষ কথা শোনার সাথে সাথেই ‘সত্যি সর্বনাশ হয়ে গেছে মাকোনি' বলে কান্নায় ভেঙে পড়ল লায়লা জেনিফার।

তার হাত থেকে টেলিফোন পড়ে গেল।

মাকোনি চেষ্টা করেও আর কথা বলতে পারলো না।

গভীর হতাশায় চেয়ারে গা এলিয়ে দিল মাকোনি। একটা কথা বার বার তার বুকে কাঁটার মত বিঁধতে লাগল, ‘এতবড় একজন বিপ্লবী এখানে এসে এভাবে প্রাণ হারাবে?'আবার মনকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল এই ভেবে, ‘খুনিরা ওকে ধরে নিয়ে গেছে, কিন্তু মেরে ফেলবেই এমন তো নাও হতে পারে।'

# ৪

চোখ খুলল আহমদ মুসা। চোখ খোলার পর তার চোখ ঘরের তিন দিকে ঘুরে এল। হাসপাতালের সুসজ্জিত একটা কক্ষ।

দরজার পর্দায় সুন্দর করে লেখা, ‘কুইন এলিজাবেথ হাসপাতাল।'

মাথায় হাত না দিয়েই বুঝল, গোটা মাথায় তার ব্যান্ডেজ। মাথা ভারি এবং বেদনা।

মাথা বাঁদিকে একটু ঘুরাতেই আহমদ মুসা ডাঃ মারিয়া মার্গারেটকে দেখতে পেল।

ডাঃ মার্গারেট এল আহমদ মুসার সামনে।

‘গুড ইভনিং ডাক্তার।'

‘ওয়েলকাম আহমদ আবদুল্লাহ।'বলে একটু ভাবল ডাঃ মার্গারেট। তারপর বলল, 'গুড ইভনিং বললবেন কেন, কি করে বুঝলেন যে এখন বিকেল?'

'টেবিলের ফুলদানিতে তাজা ফুল দেখে। সাধারণত হাসপাতালের কক্ষগুলোতে বিকেলে ফুল সরবরাহ করা হয়।'

'স্থান বিশেষে নিয়ম তো আলাদাও হতে পারে।'

‘হাসপাতালের সকালটা খুব ব্যস্ত সময়। এ সময় হাসপাতালে ফুল সরবরাহের পরিবেশ থাকে না। তবে আরও কিছু কারণ আছে।'

ডাঃ মার্গারেট কিছুটা অবাক হলো। বলতে গেলে বেশির ভাগ সময় হাসপাতালে কাটে, কিন্তু সেতো এ বিষয়টা এতদিন লক্ষ্য করেনি! বলল, 'সে কারণগুলো কি?'

আহমদ মুসার ঠোঁটে ঈষৎ হাসি। বলল, ‘প্রথমত, আমার ক্ষুধা। মনে হচ্ছে, খাওয়ার পর অন্তত পাঁচ ছয় ঘন্টা পার হয়েছে। দ্বিতীয়ত, আপনার ক্লান্তি। দীর্ঘ সময় আপনি ডিউটিতে আছেন। কিন্তু আপনার চোখে-মুখে রাত জাগার চাপ নেই।'

ডাঃ মার্গারেটের চোখে-মুখে ফুটে উঠল বিস্ময়। বলল, ‘সামান্য কয়েক মুহূর্তে আপনি এত জিনিস খেয়াল করেছেন! এত সুক্ষ্ণ বিষয় আপনার চোখে পড়ে! আপনার পরিচয় কি? পেশা কি?'

‘আমার পাসপোর্টে কিছু তো পেয়েছেন?'

‘আপনার পাসপোর্ট আমি দেখেছি কি করে বুঝলেন?'ডাঃ মার্গারেটের কণ্ঠে আবারও বিস্ময়।

‘পাসপোর্টে লেখা আমার পূর্ণ নাম আপনার মুখে শুনেছি।'

ডাঃ মার্গারেট টেবিলের পাশের চেয়ারটিতে ধপ করে বসে পড়ল।

তার চোখে মুখে প্রবল উৎসুক্য। বলল, 'বলুন তো আপনার পকেট থেকে কিছু খোয়া গেছে কিনা?'

‘না খোয়া যায়নি।'

‘কি করে নিশ্চিত হলেন আপনি এতটা?'

‘আপনার প্রশ্ন থেকে?'

‘আমার প্রশ্ন থেকে?'বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে বলল ডাঃ মার্গারেট।

‘হ্যাঁ।আপনার প্রশ্ন থেকে বুঝা যাচ্ছে, খোয়া যাওয়ার মত কিছু আমার পকেটে ছিল যা আপনি দেখেছেন। যখন দেখেছেন, তখন তা খোয়া যাওয়ার কথা নয়।'

এবার ডাঃ মার্গারেটের চোখে বিস্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টি। বলল, ‘আপনি শার্লক হোমস-এর মত কোন গোয়েন্দা নাকি? এমন সুক্ষ্ণ বিশ্লেষণ সাধারণ মাথার কাজ নয়।'

আহমদ মুসার জন্যে খাবার এল। সবজির স্যুপ। এক গ্লাস দুধ। ‘সবজির স্যুপে প্রাণীজ কোন চর্বি নেই তো?'এ্যাটেনডেন্টের দিকে চেয়ে বলল আহমদ মুসা।

এ্যাটেনডেন্ট কিছু বলার আগেই ডাঃ মার্গারেট বলল, 'ভেজিটেবল ওয়েল আছে, প্রাণীজ চর্বি কোন ভেজিটেবল স্যুপে দেয়া হয় না।'

‘শুকরসহ কিছু প্রাণী আছে, সেগুলো ছাড়া সব কিছুই খাই।

আমাদের ধর্মে এগুলো খাওয়া নিষিদ্ধ।'বলল আহমদ মুসা।

‘বুঝেছি। আচ্ছা বলুন তো, এই নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটা কি ধর্ম প্রবর্তকদের লোকাল কালচার থেকে এসেছে?'

'দু'একটা এমন ঘটা বিচিত্র নয়, তবে ইসলামে নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটা সেই প্রাণীর ধরণ ও গুণাগুণের সাথে সংশ্লিষ্ট। হিংস্র ও জঘন্য চরিত্রের প্রাণীকে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার ইসলামে নিষিদ্ধ হয়েছে।'

‘শুকর নিষিদ্ধ হওয়ার পেছনেও কি একই কারণ?'

‘আমার মনে হয় তাই।'

‘প্রাণীর গোশতের গুনাগুণ একটা যুক্তিসংগত বিবেচ্য বিষয়। কিন্তু প্রাণীর হিংস্রতা ও চরিত্র কি করে নিষিদ্ধের কারণ হতে পারে?'

‘যা খাওয়া হয়, তার বস্তুগত দিকের মত তার জেনেটিক প্রভাবও পড়ে কিনা তা আপনারা ডাক্তাররাই ভাল বলতে পারেন।'

ডাঃ মার্গারেট হাসল। বলল, ‘খাদ্যের উদ্দ্যেশ্যই তো খাদ্য থেকে তার গুণাগুণ আহরণ করা।'

বলে একটু থেমেই আবার বলল, ‘জেনেটিক লাইনও দেখেছি আপনার নজরের বাইরে নয়। আসলে আপনি কে বলুন তো?'

আহমদ মুসা কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল। এ সময় কক্ষে প্রবেশ করল জর্জ জেফারসন।

ডাঃ মার্গারেট জর্জের দিকে তাকিয়ে'এস জর্জ'বলে আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, 'এ আমার ছোট ভাই জর্জ জেফারসন। চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এই আপনাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে এসেছে। জর্জই এখন আপনার'লোকাল গার্ডিয়ান'। তার কাছেই আপনার পাসপোর্ট, মানিব্যাগ ও ব্যাগেজ রয়েছে।' হাসি মুখে কথা শেষ করল ডাঃ মার্গারেট।

শুয়ে থেকেই আহমদ মুসা হাত বাড়িয়ে দিল হ্যান্ডশেক-এর জন্যে।

জর্জ এগিয়ে এসে হ্যান্ডশেক করল। বলল, ‘কেমন বোধ করছেন এখন?'

‘ডাক্তার কাছে না থাকলে উঠে বসেই হ্যান্ডশেক করতাম। মাথা কিছুটা ভারি এবং কিছু বেদনা ছাড়া আর কোন অসুবিধা নেই।'

বলে একটু থামল। তারপর জর্জকে লক্ষ্য করে বলল, ‘আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। একটা বিষয় জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি।'

‘ওয়েলকাম। বলুন।'

‘যারা আমাকে আহত করল, তারা আমার সংজ্ঞাহীন দেহ নিয়ে যাবার চেষ্টা করেনি?'

‘না। তবে যাওয়ার সময় তারা বলেছে যে, এতে শিক্ষা না হলে পরে প্রাণটাও যাবে।'

আঁতকে উঠল ডাঃ মার্গারেট। বলল, ‘মিঃ আহমদ আবদুল্লাহ, ওদের আপনি কি করছেন? ওরা আপনার শত্রু কেন?'

‘আমি জানি না। ওদের সাথে আমার কোন ঘটনা ঘটেনি। কখনও কোন কথাও হয়নি ওদের সাথে আমার।'

‘হঠাৎ ওরা আপনাকে আক্রমণ করল কেন? ওরা যদি ছিনতাইকারী হতো, তাহলে ওরা আপনার মানিব্যাগ, হ্যান্ডব্যাগ রেখে যেত না।' বলল জর্জ।

‘ঠিক বলেছ। ওঁদের শেষ যে কথা তুমি শুনেছ, তাতে প্রমাণ হয়, ওরা কোন বিশেষ কারণে আমার শত্রু এবং তারা চায় আমি তাদের পথ থেকে সরে দাঁড়াই।'

মুহূর্তের জন্যে থামল আহমদ মুসা। তারপর আবার শুরু করল, 'ওদের একজনকে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের পাবলিক রিলেশন্স অফিসার সুরাইয়া মাকোনির অফিসে বসে থাকতে দেখেছি, যখন আমি সেখানে গিয়েছিলাম। আমি যখন মিস মাকোনির সাথে কথা বলে বেরিয়ে আসি, তখন সে আমার পিছু পিছু আসে। আমি তাকে কোনই সন্দেহ করিনি। কিন্তু হঠাৎ সে পেছন থেকে এসে আমার পিঠে পিস্তল ঠেকিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ গেটের দিকে নিয়ে আসে।' থামল আহমদ মুসা।

‘কিছু বলেনি সে আপনাকে এ সময়?'বলল জর্জ।

‘কিছুই বলেনি।'

‘তারপর বলুন।'

আহমদ মুসা তার সংজ্ঞাহীন হওয়া পর্যন্ত সব ঘটনা বর্ণনা করল।

গোগ্রাসে খাওয়ার মত কথাগুলো গিলল দু'জনে।

আহমদ মুসা থামতেই ডাঃ মার্গারেট বলল, 'পেছন থেকে চুপি চুপি এসে ঐ লোকটি মাথায় আঘাত না করলে তো আপনি দু'জনকেই কুপোকাত করে জিতেই গিয়েছিলেন।'

'আপনার কি ধারণা, আপনাকে ওরা পিস্তল বাগিয়ে গেট পর্যন্ত নিয়ে এল, কিন্তু আপনি সংজ্ঞাহীন হবার পর আপনাকে নিয়ে গেল না কেন?'

ডাঃ , মার্গারেট থামতেই কথা বলে উঠল জর্জ।

'আমার ধারণা, ওরা আনাকে ভয় দেখানোর জন্যে নির্যাতন করতে চেয়েছিল, ধরে নিয়ে যেতে চায়নি।'বলল আহমদ মুসা।'

'আপনি মাকোনির কাছে কেন গিয়েছিলেন, কি আলাপ করেছিলেন মাকোনির সাথে?'

আহমদ মুসা সংগে সংগে উত্তর দিল না। ভাবল সে, জেনিফারের

নাম এখানে বলবে কিনা। আহমদ মুসা নিশ্চিত, জেনিফারের খোঁজ করার সাথে সাথে তার উপর ঐ আক্রমণের যোগ আছে। নিশ্চয় ঐ লোকেরা সেই খুনি গ্রুপ হবে, যারা জেনিফারের সাথীদের খুন করেছে এবং জেনিফারকেও খুঁজে বেড়াচ্ছে। নিশ্চয় ওরা আহমদ মুসাকে জেনিফারের কোন বিদেশী সাহায্যকারী মনে করেছিল, অথবা ভয় করেছিল যে, আহমদ মুসার মত বিদেশীর মাধ্যমে তাদের সব কথা জেনিফার বিদেশে পাচার করতে চাচ্ছে। এটা যাতে না হয় এজন্যে তারা ভয় দেখিয়ে তাদের পথ থেকে আহমদ মুসাকে সরিয়ে দিতে চায়।

একটু দেরী হয়েছিল আহমদ মুসার উত্তর দিতে। তখন জর্জ বলল, অল রাইট, কোন কনফিডেনশিয়াল কথা হলে আমরা শুনতে চাইব না।'

আহমদ মুসা জর্জের দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল, 'কনফিডেনশিয়াল নয়, নিতান্তই পার্সোনাল। বলতে কোনই আপত্তি নেই।'

বলে একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর বলল, 'অর্থনীতি বিভাগের ছাত্রী লায়লা জেনিফারকে কোথায় পাব এটাই খোঁজ করেছিলাম মাকোনির কাছে।'

আহমদ মুসা জেনিফারের নাম বলার সাথে সাথে জর্জের চেহারায়

একটা পরিবর্তন এল। হঠাৎ করেই তার চেহারায় একটা আরক্ত ভাব এল। তার চোখে কিছুটা সলাজ সংকোচের চিহ্ন। পর মুহূর্তেই সেখানে এল বেদনার সুক্ষ্ম একটা কালো ছায়া। সে দু'চোখ দিয়ে যেন আহমদ মুসাকে গোগ্রাসে গিলছে। সে দৃষ্টিতে আহমদ মুসাকে পরখ করা, পরীক্ষা করার ভাব।

জর্জের এই পরিবর্তনে আহমদ মুসা বিস্মিত হলো। তার মনে হলো জর্জ জেনিফারকে চেনে। শুধু চেনা নয়, সম্ভবত জেনিফারকে সে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখে। আহমদ মুসার সাথে জেনিফারের সম্পর্কটা কি, এই

ব্যাপারটা নিয়ে জর্জ অস্থির হয়ে পড়েছে। সে আহমদ মুসাকে প্রতিদ্বন্ধী ভাবতে শুরু করেছে। মনে মনে হাসল আহমদ মুসা। দেশ-কাল-পাত্র যাই হোক এই ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী কাউকে সহ্য করা যায় না। খুশী হলো আহমদ মুসা, তার অনুমানটা সত্য হলে তার সামনে এগুবার একটা পথ হবে।

'নিশ্চয় জেনিফার আপনার বন্ধু। কিন্তু মাকোনির কাছে গিয়ে তাকে খোঁজ করছিলেন কেন?'বলল জর্জ। তাঁর কণ্ঠ শুকনো।

আহমদ মুসা হাসলো। বলল, 'হ্যা, বোন বন্ধুও হতে পারে?'

জর্জের চোখে লজ্জা-সংকোচ জড়ানো এক বিব্রত ভাব। বলল, 'বুঝলাম না। জেনিফারের তো কোন ভাই নেই।'

'জেনিফারের অদেখা, অচেনা এক ভাই আমি।'

'জেনিফারকে আপনি দেখেননি, চেনেন না?'

'না।'

জর্জের চোখ-মুখ একটু সহজ হলো। বলল সে, 'কিন্তু তাহলে সে

আপনার বোন বা বন্ধু কেমন করে?'

'মুসলিম নারী-পুরুষ সকলেই দেশ-কাল-পাত্র ছাড়িয়ে ভাই-বোন-এর সম্পর্কে আবদ্ধ।'

জর্জ ভাবছিল। একটু দেরী করল কথা বলতে। বলল, 'আমি এখন বুঝতে পারছি, জেনিফারের খোঁজ করাই আপনার বিপদ ডেকে এনেছে।'

'কেমন করে?'না বোঝার ভান করে বলল আহমদ মুসা। সে ভাবল, এরা সমস্যার কতটা জানে, তা জানা দরকার।

‘জেনিফার ও তার সাথীদের একটা সামাজিক গবেষণা একটি মহলকে সাংঘাতিক ক্ষেপিয়ে তুলেছে। জেনিফারকে তারা খুঁজছে। পালিয়ে বেড়াচ্ছে জেনিফার। এই অবস্থায় তার খোঁজ করার অর্থ আপনি তার সহযোগী কেউ হবেন। তার উপর আপনি বিদেশী। সুতরাং আপনাকে জেনিফার থেকে দূরে রাখার জন্যে যা ইচ্ছে তারা করতে পারে।'জর্জ বলল।

‘মহলটির পরিচয় কি?'

‘আমি জানি না। তবে অনুমান করি।'

‘কি সেটা?'

‘তারা সাংঘাতিক বর্ণবাদী একটা গ্রুপ। সারা ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ জুড়ে তাদের নেটওয়ার্ক। এমন কি এর বাইরেও থাকতে পারে।'

বলে একটা ঢোক গিলল জর্জ। তারপর আবার বলল, ‘আমি জেনিফারকে বলেছিলাম গবেষণার সব কাগজপত্র, দলিল দস্তাবেজ ওদের হাতে তুলে দাও এবং নিজেকে এসব থেকে বিচ্ছিন্ন করে নাও। কিন্তু আমার কোন কথাকেই সে পাত্তা দেয় না, এ ক্ষেত্রেও দেয়নি। ভীষণ জেদী সে।'আবেগে গলাটা ভারি হয়ে উঠেছিল জর্জের।

জেনিফারের প্রতি জর্জের ক্ষোভ ও অভিমানের প্রকাশ এটা।

মনে মনে হাসল আহমদ মুসা। জর্জের কথায় বঞ্চিতের বেদনা আছে। এটা কি জেনিফারের তরফ থেকে সাড়া না পাবার বেদনা? বলল আহমদ মুসা, ‘গবেষণার দলিল-দস্তাবেজ ওদের হাতে তুলে দিলেই কি জেনিফার রক্ষা পেত?'

‘পঞ্চম খুনের পর ওরা মাকোনির মাধ্যমে জেনিফারের কাছে এই প্রস্তাব পৌছয়েছে। জেনিফার ব্রিলিয়ান্ট ছাত্রী বিবেচনায় তারা বলেছে, সে যদি ঐ সাম্প্রদায়িক পথ থেকে ফিরে আসে এবং ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার সাথে একাত্মা হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে তাদের আর কোন অভিযোগ থাকবে না।'থামল জর্জ।

‘তারপর?'বলল আহমদ মুসা।

‘জেনিফারকে অনেক বুঝিয়েছি, স্যারদেরকে দিয়েও বুঝিয়েছি, জেনিফার আমার কোন কথা শুনবে না তবুও। আমার শুভেচ্ছাকে সে ভুল বুঝেছে।

বলেছে, 'আমি নাকি আমার জাতির পক্ষ নিয়েছি।'আবারও কণ্ঠ ভারী হয়ে এল জর্জের।

ডাঃ মার্গারেট এতক্ষণ নীরবে কথা শুনছিল। এবার কথা বলল সে, 'জর্জ তুমি ভুল করেছ। জেনিফারের প্রতি তোমার প্রেম তোমাকে অন্ধ করেছে। তুমি একটা অন্যায়কে সমর্থন করেছ। জেনিফার তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতেই পারে।'

'আমি যা করেছি জেনিফারের স্বার্থেই করেছি।'

'জেনিফার তা মনে করে না। কারণ জেনিফার নিজের স্বার্থের চেয়ে একটা জনগোষ্ঠীর সামষ্টিক স্বার্থকে অবশ্যই বড় করে দেখতে পারে।'

'আমিও বড় করে দেখি আপা।'

'সবক্ষেত্রেই দেখ। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা তুমি প্রমাণ করতে পারনি ব্যক্তি জেনিফারের কথা ভাবতে গিয়ে।'

'কিন্তু বিকল্প যেটা করতে পারতাম, সেটা কি ভাল? দেখ জেনিফারের কি অবস্থা হয়েছে। একজন নিরপরাধ বিদেশী শুধু তাকে খোঁজ করার অপরাধে কি অবস্থায় পড়েছে। শুধু টার্কস দ্বীপপুঞ্জ কেন, ক্যারিবিয়ানের এক ইঞ্চি মাটি এমন নেই যেখানে জেনিফার নিরাপদ।'আবেগে রুদ্ধ হয়ে এল জর্জের কণ্ঠ।

ডাঃ মার্গারেটের মুখে চিন্তার ছাপ। বলল. 'জর্জ তুমি জেনিফারের ব্যাপারে খুব ইমোশনাল হয়ে পড়েছ। বাস্তবতা তোমাকে দেখতে হবে। জেনিফারও কিন্তু দুর্বোধ্য। আমরা চাই না তুমি অহেতুক কষ্ট পাও।'

'সব জানি আপা। তবু বলছি, আমার ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দিন।'

আহমদ মুসার দুঃখ হলো জর্জ ছেলেটার জন্যে। বুঝা যাচ্ছে, সাড়া পায়নি জেনিফারের। খৃষ্টান জর্জ আর মুসলিম জেনিফারের বিষয়টা বিব্রত করল আহমদ মুসাকে। আবার খুশী হলো, জেনিফারের খোঁজ করার একটা পথ বের হলো বলে।

জর্জের কথার পর ডাঃ মার্গারেট আর কিছু বলেনি। একটা অস্বস্তিকর অবস্থা তাদের দু'ভাইবোনের মধ্যেই।

আহমদ মুসা নীরবতা ভাঙল। বলল, 'স্যরি জর্জ, একটা অন্য প্রসংগ। জেনিফারের সন্ধান আমি কিভাবে পেতে পারি?'

জর্জ আহমদ মুসার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। বলল, 'জেনিফার

এখন পলাতক অবস্থায়। তার সাথে আপনার দেখা করার বা দেখা করার চেষ্টায় তারও বিপদ হতে পার, আপনারও হতে পারে। শত্রুরা আপনাকেও চিনে ফেলেছে এবং শাসিয়েও গেছে।'

'এ সব কিছু জেনেই আমি বলছি জর্জ।'

'আপনি বলেছেন, আপনি তাকে চেনেন না, দেখেননি। তাহলে এই অবস্থার মধ্যে তার সাথে দেখা করার হেতু কি?'

সংগে সংগে জবাব দিল না আহমদ মুসা। একটু ভাবল। তারপর বলল, 'সব কথা, এখন বলব না, শুধু এটুকু বলছি, 'যে সমস্যায় জেনিফার জড়িয়ে পড়েছে, সে সমস্যা দেখার জন্যেই আমি এসেছি। জেনিফারের সাক্ষাত আমার এ জন্যে প্রয়োজন যে, বিতর্কিত গবেষণাটা আমি দেখতে চাই, তার কাছে শুনতেও চাই।'

ডাঃ মার্গারেট ও জর্জ দু'জনের চোখে-মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল।

বলল, 'দেখতে চান মানে, আপনি প্রতিকারে নামতে চান?'

'সে লক্ষ্যেই এসেছি।'

'আর কেউ এসেছে?'

'না।'

'আপনি একা নামবেন? জানেন এরা কত বড় শক্তি, কত বড় এদের নেটওয়ার্ক?'

'একা কোথায়? সাথে আমার আল্লাহ আছেন। আর দেশের সব ভাল মানুষ তো আমার সাথে থাকবে।'

'যা বললেন, এটা তো সান্ত্বনার কথা।'বলল ডাঃ মার্গারেট।

মার্গারেট থামতেই জর্জ বলে উঠল, 'আমি বুঝতে পারছি না। আপনি একা মানুষ, খালি হাত। আপনি কিভাবে এমন একটা লড়াইয়ে নামতে পারেন? এই তো প্রথম দর্শনেই ওরা আপনাকে মেরে ফেলতে যাচ্ছিল।'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'আমি যদি জানতাম, ওরা সেই খুনি গ্রুপের, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় ওদের সাথে লড়াইয়ে নামতাম না।'

‘কি করতেন?'

‘ওদের হাতে ধরা দিতাম এবং এমন সব কথা বলতাম যাতে আমাকে ওরা ওদের ঘাটিতে ধরে নিয়ে যায়।'

‘ধরা দিতেন? কেন? কেন?'দু’জনে প্রায় এক সাথেই বলে উঠল।

দু’টি লাভের জন্যে। এক, তাদের ঘাটি চানা হতো। দুই, ওদেরও চেনার সুযোগ হতো।'

কিন্তু ওরা যদি আপনাকে মেরে ফেলতো?'

‘জীবন-মৃত্যু আল্লাহর হাতে, কোন মানুষের হাতে নেই। সুতরাং এ নিয়ে চিন্তার কিছু নেই।'

ডাঃ মার্গারেট এবং জর্জ কিছু বলল না। তাদের অবাক দৃষ্টি আহমদ মুসার উপর নিবদ্ধ।

একটু পর ডাঃ মার্গারেট বলল, ‘আমার অনুমান তাহলে কি ঠিক, আপনি কোন গোয়েন্দা?'

‘আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'না।'

'কেউ আপনাকে ডেকেছে? কিংবা কেউ পাঠিয়েছে আপনাকে?'বলল মার্গারেট।

‘লায়লা জেনিফার ডেকেছে।'

‘জেনিফার ডেকেছে?'দু’জনেই বলে উঠল এক সাথে।

‘হ্যাঁ।'

‘সে আপনাকে চেনে?'বলল জর্জ।

‘না।'

‘আপনাকে দেখেছে?'

‘না।'

‘আপনার সাথে কথা বলেছে?'

‘না।'

‘তাহলে কিভাবে ডাকল?'

‘সে হয়তো কোথাও আমার নাম শুনেছিল। সেই নামে আন্তর্জাতিক একটি মুসলিম সংস্থার ঠিকানায় আমাকে চিঠি লিখেছিল। সেই সংস্থা আমার কাছে চিঠি পৌছায়। সেই চিঠি পেয়ে আমি এসেছি।'

‘এ তো রূপ কথার গল্প।'বিস্মিত কণ্ঠে বলল মার্গারেট।

‘কিন্তু সত্য।'বলল আহমদ মুসা।

জর্জ কিছু বলতে যাচ্ছিল। আহমদ মুসা হাত জোড় করে বলল, 'আর কোন কথা নয়। সব কথাই, একদিন জানবে। এখন আমাকে সাহায্য কর।'

‘আমি জেনিফারের বাড়ির ঠিকানা দিতে পারি। কিন্তু সে তো বাড়িতে নেই।'

‘ওর যে কোন একটা ঠিকানা পেলেই হলো। সেই ঠিকানা থেকে আরও ঠিকানা বেরিয়ে আসবে।'

‘ঠিকানা দিতে পারি একটা শর্তে।'

‘কি সেটা?'

‘জেনিফারের সাথে দেখা হওয়ার পর যখন আপনি কাজ শুরু করবেন, তখন আমার কথা মনে রাখবেন। কিছু না পারি আপনার ফায়ফরমাস মাটিতে পারব অবশ্যই।'

‘কিন্তু জর্জ, তুমি জেনিফারকে গবেষণার দলিল-দস্তাবেজ ওদের হাতে তুলে দিয়ে আপোস করতে বলেছিলে।'

‘বলেছিলাম। সেটা জেনিফারকে বাঁচানোর জন্যে। কিন্তু অন্যায়কে

‘ন্যা’ বলিনি।

‘কিন্তু ‘অন্যায়’কে অন্যায় বলা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এক জিনিস নয়।'

‘সেটা আমি জানি।'

‘ধন্যবাদ জর্জ। তোমার সাহায্যকে স্বাগত জানাই। কিন্তু কখন তোমাকে কি করতে হবে, তোমাকে স্বাধীনভাবেই সে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'

‘আপনি কোথায় কি করছেন তা জানতে হবে তো?’

'না জানলে সাহায্য করবে কি করে? যখন জানতে পারবে, তখনই সাহায্যের সময়।'

'বুঝলাম।'বলল জর্জ।

ডাঃ মার্গারেটের বিস্ময় দৃষ্টি আহমদ মুসার উপর। জর্জ থামার সংগে সংগে সে বলল, 'মিঃ আহমদ আবদুল্লাহ আসলে আপনি কে? আপনার মত বিদেশী একজনকে স্থানীয় কেউ সহযোগিতার অফার করলে, সেই সহযোগিতা গ্রহণ করার জন্য যেভাবে কথা বলে, আপনি তা বলেননি। যে কথা আপনি বলেছেন তা সেই বলতে পারে, যে সাংঘাতিক আত্মবিশ্বাসী এবং যে সাহায্য আপনি চেয়েছেন তা জর্জের জন্যে যতটুকু স্বাভাবিক ততটুকুই। এই গোটা দৃষ্টিভঙ্গীটাই অসাধারণ।'

'ম্যাডাম, আমাকে যা দেখছেন আমি তাই। এতটুকুই কি যথেষ্ট নয়?'

ডাঃ মার্গারেট কিছু বলতে যাচ্ছিল, এ সময় নার্স দ্রুত ঘরে ঢুকে ডাঃ মার্গারেটকে বলল, 'ম্যাডাম, প্রফেসর স্যার আসছেন।'

ডাঃ মার্গারেট চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল।

কক্ষে প্রবেশ করল ইমারজেন্সী এবং ইনটেনিসিভ কেয়ার ইউনিটের প্রধান ডাক্তার।

কক্ষে প্রবেশ করে সকলের সাথে সম্ভাষণ বিনিময়ের পর আহমদ মুসার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, 'ইয়ংম্যান খুব ভালো আছ তাই না?'

'জি ডক্টর।'বলল আহমদ মুসা।

ডাক্তার আহমদ মুসার ফাইল হাতে নিয়ে মাথার আঘাতের সর্বশেষ পরীক্ষার রিপোর্টসহ বর্তমান অবস্থার রিপোর্ট পরীক্ষা করল। তারপর আহমদ মুসার ডান হাত তুলে নিয়ে নাড়ী পরীক্ষা করল। তারপর আহমদ মুসার পিঠ চাপড়ে বলল, 'উইল পাওয়ার নিয়ে তোমার কোন চর্চা আছে নাকি হে। অদ্ভুত শক্ত তোমার নার্ভ। অপারেশনের ৪ ঘন্টা পর তোমার যে উন্নতি হয়েছে ৪ দিনেও তা হবার কথা নয়। তোমাকে অভিনন্দন ইয়াংম্যান।'

'ওয়েলকাম, ডক্টর।'আহমদ মুসা বলল।

‘আরেকটা বিষয়ে তুমি লাকি ইয়াংম্যান। তোমার মাথায় বিভিন্ন সময়ে পাওয়া অনেকগুলো বড় বড় আঘাতের চিহ্ন। কিন্তু সবগুলো আঘাতই বিস্ময়করভাবে তোমার ব্রেণকে এড়িয়ে গেছে।'

‘আল্লাহর বিশেষ দয়া, ডক্টর।'

‘কিন্তু ইয়াংম্যান এতটুকু বয়সে তোমার এত শত্রু এল কোত্থেকে? সাবধান হবে।'

‘ধন্যবাদ ডক্টর।'

প্রধান ডক্টর বেরিয়ে গেল।

তার সাথে সাথে মার্গারেট ও জর্জও বেরিয়ে গেল প্রধান ডাক্তারের সাথে কথা বলতে বলতে।

প্রধান ডাক্তারকে কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে ডাঃ মার্গারেট ও জর্জ ফিরল কক্ষে ফেরার জন্যে।

দরজায় প্রবেশের আগে ডাঃ মার্গারেট জর্জকে টেনে ধরল এবং সরিয়ে আনল একটু দূরে। বলল’ ‘আহমদ আবদুল্লাহকে কেমন বুঝছ তুমি?'

‘তুমিই তো ভাল বুঝার কথা আপা।'

ডাঃ মার্গারেট একটু চিন্তা করল। বলল, 'আমার মনে হচ্ছে তার

বড় কোন পরিচয় আছে।'

বলে একটু থামল। তারপর আবার শুরু করল, 'ওঁর দৃষ্টি অসাধারণ তীক্ষ্ণ। বুদ্ধি ও বিশ্লেষণী শক্তি অসাধারণ ধারালো। প্রফেসর স্যার এখনি বললেন, ওঁর নার্ভ অসাধারণ এবং তাঁর কাছ থেকে শুনে যা বুঝা গেছে মারামারিতেও তিনি অসাধারণ। তাহলে উনি সাধারণ হন কেমন করে?'

‘আরেকটা বিষয় খেয়াল করেছ আপা, প্রফেসর বললেন, 'মিঃ আহমদ আবদুল্লাহর মাথায় বিভিন্ন সময়ে পাওয়া অনেক আঘাত আছে। এ থেকে বুঝা যায়, হয় তিনি ক্রিমিনাল, না হয় তিনি কোন গোয়েন্দা। ক্রিমিনাল নন আমার বিশ্বাস, তাহলে তিনি গোয়েন্দা ধরনের কেউ হবেন।'

‘লায়লা জেনিফার তার নাম জেনেছে এবং সাহায্যের জন্যে ডেকেছে, এটাও বড় ব্যাপার। শুধু অসাধারণ নয়, খুবই অসাধারণ না হলে তাকে সাহায্যের জন্যে চিন্তা করতো না জেনিফার।'

‘আমারও তাই মত আপা। তাকে কি আবার জিজ্ঞেস করব তার পরিচয়?'

‘না। যখন তিনি বলেননি, তখন না বলার পেছনে নিশ্চয় কারণ আছে, অথবা তিনি আস্থা রাখতে পারছেন না আমাদের উপর।'

‘এ জন্যেই কি আমি সাহায্য করতে চাইলে তিনি ঠান্ডা মনোভাব পোষণ করেছেন?'

‘তা নাও হতে পারে। কিন্তু তুমি তো ওঁকে সাহায্য করতে যাচ্ছ না, সাহায্য করতে চাচ্ছ জেনিফারকে।'

‘জেনিফার আমার সাহায্য চায় না। তার সাহায্যের জন্যে লোক তো এসেছেই। কিন্তু ঐ খুনিরা ধরা পড়ুক, তাদের শাস্তি হোক এবং জেনিফার মুক্ত হোক, এটা আমার একান্ত কামনা বলেই আমি সাহায্য করতে চাই।'

হাসল ডাঃ মার্গারেট। বলল, ‘জেনিফারকে তুমি বুঝতে পারনি কিংবা জেনিফার তোমাকে বুঝতে পারেনি, এটা তোমারও ব্যর্থতা। এর দায় বেচারা আহমদ আবদুল্লাহর ঘাড়ে চাপিও না।'

হাসল জর্জ। বলল, ‘আহমদ আবদুল্লাহ জেনিফারের চেয়ে অনেক উঁচুতে বটে, কিন্তু জেনিফার আমাকে তার চেয়ে অনেক নিচু মনে করে।'

হাসল ডাঃ মার্গারেট। বলল, 'তা আমি জানি না। তবে প্রত্যেকেরই অধিকার আছে, সে যা ঠিক মনে করে সে মত পোষণ করার।'

জর্জ কিছু বলতে যাচ্ছিল। বাধা দিয়ে মার্গারেট বলল, ‘চল যাই, প্রফেসর স্যার আহমদ আবদুল্লাহর জন্য কি লিখে গেলেন, তার ফলোআপ করতে হবে।'

দু'জন কক্ষের দিকে পা বাড়াল।

একটা ছোট মটর বোট এগিয়ে চলছে সাউথ টার্কো দ্বীপের দিকে। টার্কস দ্বীপপুঞ্জের সবচেয়ে বড় দ্বীপ, গ্রান্ড টার্কস। এর পূর্ব-দক্ষিণে পর পর আরও দু'টো দ্বীপ। সাউথ টার্কো দ্বীপ গ্রান্ড টার্কস থেকে সোজা দক্ষিণে। টার্কস দ্বীপপুঞ্জের এটা দ্বিতীয় বৃহত্তম দ্বীপ।

মটর বোটে তিনজন আরোহী।

দু'জন কৃষ্ণাংগ। তাদের একজন ড্রাইভিং সিটে। সে যুবক বয়সের।

অন্যজন সাদা-কালো চুলের প্রৌঢ়।

বোটের ডেকে রাখা একমাত্র চেয়ারে আহমদ মুসা বসে।

এক সময় আহমদ মুসার পায়ের কাছে পাটাতনের উপর এসে বসল সাদা-কালো চুলের সেই প্রৌঢ়।

আহমদ মুসাও চেয়ার থেকে নেমে পাটাতনের উপর বসল।

প্রৌঢ়টি ইংরেজী স্প্যেনিশ মিশিয়ে বলল, 'আপনি স্যার, আপনি অতিথি, আপনি সম্মানিত, আপনি এভাবে আমার পাসে বসবেন কেন?'বলে একটু সরে উঠে দাঁড়াচ্ছিল প্রৌঢ়টি।

আহমদ মুসা তাকে আবার টেনে বসিয়ে দিল। বলল, 'দেখ আমি

মুসলমান। আমাদের ধর্মে সব মানুষ সমান। সাদা-কালো, ধনী-গরীব কিংবা শ্রমিক-মালিক-এর পার্থক্যের কারণে মানুষ ছোট-বড় হয় না। আমাদের ধর্মে মানুষ সম্মানিত-অসম্মানিত হয় ভালো কিংবা মন্দ কাজ করার ভিত্তিতে।'

'আমাদের দ্বীপে অনেক মুসলমান আছে স্যার। আপনি ঠিকই বলেছেন, তাদের মধ্যে সাদা-কালোর ভেদ নেই। তারা এঁক সাথে বসে খায়। এক সাথে উপাসনা করে। কিন্তু স্যার, আমরা দেখছি, টাকা-পয়সা দিয়েই বড়-ছোটর বাছ-বিচার হচ্ছে।'

'এর কারণ ইসলামের এই শিক্ষা আমরা হয় ভুলে গেছি, না হয় মানি না।'

'জর্জ স্যাররা খুব ভাল স্যার। ওরা সাদা-কালো দেখে না। ওর বড় বোন ডাক্তার। সাদা-কালো দুই রুগী এলে কালোটাই সে প্রথম দেখে।'

'ঠিক বলেছ, আমিও ওঁর রোগী ছিলাম।'

সাদা-কালো চুলের প্রৌঢ় কয়েক মুহূর্তের জন্যে নীরব থাকল।

তারপর বলল, 'জর্জ সাহেব বলেছেন, আপনি যেখানে নামতে চান সেখানেই নামিয়ে দিতে হবে। কোথায় নামা আপনার পছন্দ হবে স্যার?

'উপকূলের যে কোন জায়গায় নামা যায়?'

'দু'চারটা জায়গা ছাড়া সব স্থানেই নামা যায়। তবে ঘাট বা বন্দরের জেটি ছাড়া নামলে কিছুটা পানিতে নামতে হয়।'

আহমদ মুসা মানচিত্র থেকে জেনেছে, সামনেই দ্বীপের উত্তর পাশে দ্বীপটির প্রধান বন্দর। এ বন্দর থেকে রাস্তা ছড়িয়ে পড়েছে গোটা দ্বীপে।

আহমদ মুসা এ পাশের এ বন্দরে না নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জেনিফারের সাথে দেখা হওয়ার আগে কোন সংঘর্ষে সে লিপ্ত হতে চায় না।

আহমদ মুসা জর্জের হাতে লেখা জেনিফারের ঠিকানা বের করল পকেট থেকে। সে জর্জের কাছে শুনেছে, জেনিফারের বাড়ি দ্বীপটার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে। এলাকাটা নাকি পাহাড় ও উর্বর উপত্যকায় ভরা।

ঠিকানা লেখা কাগজ চোখের সামনে মেলে ধরল আহমদ মুসা।

গ্রামের নাম 'সিডি কাকেম'।

নাম পড়ে চমকে উঠল আহমদ মুসা যেমন চমকে উঠেছিল গ্রান্ড টার্কস দ্বীপের প্রধান বন্দর'জোয়ান ডি সুসুলামা'নাম পড়ে। বরং তার চেয়েও এই নামে আরবীয় উপস্থিতিটা আরও স্পষ্ট। জর্জ ইংরেজীতে গ্রামটির নাম লিখেছে 'Sidi Kacem'। আহমদ মুসা ভাবল, গ্রামটির এই নামকে'সিদি কাছেম'ও পড়া যায়।

'সিদি কাছেম' নাম উচ্চারণের সাথে সাথে আহমদ মুসার মন চলে গেল মুসলিম উত্তর আফ্রিকার দিকে। সেখানে মুসলমানদের মধ্যে এই ধরনের বহু নাম প্রচলিত।

আহমদ মুসা বলল, 'আমি সিডি কাকেম গ্রামে যাব। বন্দরে না নেমে আর কোথাও নামতে পারি?'

'বন্দরে নামার দরকার নেই স্যার। সিডি কাকেম'সবু'উপত্যকার মুখে 'সেবু' নদীর তীরে একটা বিখ্যাত গ্রাম। সেবু নদীর মোহনায় মৎস শিকারীদের একটা জেটি আছে। সেখান থেকে গ্রামটা সবচেয়ে কাছে। সেখানে নেমে হেঁটেও

যাওয়া যায়, অটো হুইলারেও যেতে পারেন। ছোট নৌকা পেলে নৌকাতেও যেতে পারেন গ্রামটিতে।'

তার কথা শুনছিল আহমদ মুসা। কিন্তু'সেবু'নদীর নাম শোনার সাথে সাথে আহমদ মুসার মন ছুটে গিয়েছিল মরক্কোর আটলান্টিক উপকূল এলাকায়। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল মরক্কোর রাজধানী ‘রাবাত’ থেকে একশ'সোয়াশ'মাইল পুবে সাগরের দিকে বয়ে যাওয়া ‘সেবু’ নদী এবং তার তীরের ‘সিদি কাছেম’ নামক শহরের দৃশ্য। পশ্চিম আটলান্টিকের ক্যারিবিয়ান সাগরে হারিয়ে থাকা একটা দ্বীপের একটা অখ্যাত গ্রামের নাম এই'সিদি কাছেম'এবং নদীর নাম 'সেবু'হলো কি করে?

এ বিস্ময়টা চেপে রেখে আহমদ মুসা বলল, 'আমাকে ঐ মৎস ঘাটেই নামিয়ে দিবেন।

বলে একটু থামল। তারপর আবার বলল, 'আপনার পূর্ব পুরুষরা কোত্থেকে এসেছিল বলতে পারেন?'

সংগে সংগে উত্তর দিল না প্রৌঢ়টি।

একটু চিন্তা করল। বলল, 'আমার মা অতীতের কথা আমাদের বেশি বলতেন। তাঁর কাছে শুনেছি, আমার পূর্ব পুরুষকে পশ্চিম আফ্রিকার গাম্বিয়া থেকে ধরে আনা হয়েছে। আমাদের সে পূর্ব পুরুষ গাম্বিয়ার একজন যোদ্ধা ছিলেন। তার'বাজুবন্ধ'টি আমরা বংশ পরম্পরায় সংরক্ষণ করে চলেছি। তাঁকে ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে ধরে আনা হয় এবং দাস হিসাবে নয় যোদ্ধা হিসাবে তাঁকে ব্যবহার করা হয়। তখন সমগ্র ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে চলছিল স্বর্ণ খনি আবিস্কার ও খননের ধুম। এই খনন কাজে দাস হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছিল এখানকার আদিবাসী রেডইন্ডিয়ানদের। আর তাদের কাবু রাখা ও পরিচালনার জন্যে ব্যবহার করা হতো আফ্রিকান নিগ্রোদের। যোদ্ধা হওয়ায় আমার পূর্ব পুরুষ এই কাজে গুরুত্বপূর্ণ পদ লাভ করেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি রেডইন্ডিয়ানদের উপর মালিকদের অমানুষিক নির্যাতনের প্রতিবাদ করেন। ফলে তার উপর নির্যাতন নেমে আসে এবং তিনি জেলে নিক্ষিপ্ত হন। তিনি জেল থেকে পালিয়ে কিউবা অঞ্চল থেকে বাহামা আঞ্চলে চলে আসেন। রেডইন্ডিয়ানদের কাছে তিনি

হিরোতে পরিণত হন। বাহামা অঞ্চলে এসে বিয়ে করেন এক রেডইন্ডিয়ান মেয়েকে। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে শ্বেতাংগদের ব্যবহারে ক্ষুদ্ধ হয়ে আমাদের পূর্ব পুরুষ চলে আসেন টার্কস দ্বীপপুঞ্জে।'থামল প্রৌঢ়টি।

বোটের চালক যুবকটির দিকে ইংগিত করে আহমদ মুসা বলল, 'যুবকটি তোমার কে?'

'আমার ছেলে।'গর্বের সাথে উচ্চারণ করল প্রৌঢ়টি।

'তাই তো তোমার কাহিনী শুনে তার চোখ-মুখ উজ্বল হয়ে উঠেছিল।'

মুহূর্তের জন্যে একটু থেমে আহমদ মুসা যুবকটির দিকে তাকিয়ে

হেসে বলল, 'আমিও খুশী হয়েছি তোমার পূর্ব পুরুষের পরিচয়ে।'

তারপর প্রৌঢ়ের দিকে চেয়ে আহমদ মুসা বলল, 'তোমার সেই পুর্ব পুরুষের নাম কি?'

'আরাবাকা।'বলল প্রৌঢ়।

"বাজুবন্ধ";-এর কথা বললে। ওটা কার কাছে?

'আমার কাছে। এই তো।'বলে প্রৌঢ়টি জামার হাতা উপরে তুলে বাজুবন্ধটি দেখাল।

খোদাই কাজ করা চাঁদির বাজুবন্ধ।

'বাজুবন্ধ-এর উপর চোখ পড়তেই চমকে উঠল আহমদ মুসা।

বাজুবন্ধের উপর চোখ পড়তেই চমকে উঠল আহমদ মুসা। বাজুবন্ধের উপর খোদিত আরবী বর্ণমালা ক্যালিওগ্রাফী স্টাইলে লেখা।

'হাতে নিয়ে দেখতে পারি বাজুবন্ধটি?'দ্রুত কণ্ঠে বলল আহমদ

মুসা।

প্রৌঢ়টি খুশী হয়ে বাজুবন্ধটি খুলে আহমদ মুসার হাতে দিল।

আহমদ মুসা নজর বুলাল বাজুবন্ধটির উপর।

পুরাতন ক্যালিওগ্রাফী স্টাইলে আরবী লেখা।

পড়ল আহমদ মুসা শ্বাসরুদ্ধ বিস্ময়ের সাথে। বাজুবন্ধটির ডিম্বাকৃতি উপরের অংশে চারদিকে ঘিরে আল্লাহু আকবর শব্দমালার একটি

ডিম্বাকার বৃত্ত। তার মাঝে লেখা'সোংগাই সুলতান আসকিয়া মুহাম্মাদের তরফ থেকে তরুণ সেনাধ্যক্ষ আবু বকর মুহাম্মদকে বীরত্বের প্রতীক হিসেবে।'লেখার নিচেই সুলতানী সিলমোহর।

পড়ে আনন্দ বিস্ময়ের শ্বাসরুদ্ধকর চাপে আহমদ মুসা কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলো না। আবেগে উচ্ছ্বাসে ভারি হয়ে উঠেছিল তার চোখ-মুখ। বাজুবন্ধ থেকে মুখ তুলে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল প্রৌঢ়টির দিকে।

'কি দেখলেন? এভাবে তাকিয়ে আছেন কেন?'বলল প্রৌঢ়টি অবাক হয়ে।

তবু আহমদ মুসা কিছু বলল না।

আরও একটু পরে ধীরে ধীরে বলল, 'জনাব বাজুবন্ধে কি লেখা আছে জানেন?'

'কিছু লেখা আছে জানি আমরা। কিন্তু কি লেখা আছে জানিনা।

আম্মার কাছে শুনেছি, আমার দাদা একবার হ্যাভানায়'আফ্রিকান ক্যারিবিয়ানদের'এক সম্মেলনে গিয়েছিলেন। একজন পন্ডিত লোক বাজুবন্ধটি পড়েছিলেন। ওখানে অনেক কিছু নাকি লেখা আছে। তার সাথে একজন বাদশাহর নাম ও আমার সেই পূর্ব পুরুষের নাম লেখা আছে। পন্ডিত ব্যক্তি দাদাকে বলেছিলেন, বাজুবন্ধটি কোন যাদুঘরে দিলে আমরা অনেক টাকা পাব। আপনি পড়তে পারেন ওখানে কি লেখা আছে?'

'হ্যাঁ আমি পড়তে পারি, পড়েছি।'

'প্রৌঢ়টি আনন্দে চিৎকার করে উঠল, 'বাকা বোট বন্ধ করে এখানে এস। এ সুযোগ আর পাওয়া যাবে না।'ড্রাইভিং সিটে বসা ছেলেকে লক্ষ্য করে বলল প্রৌঢ়টি কথাগুলো।

'বাকা'অর্থ্যাৎ প্রৌঢ়ের যুবক ছেলেটি এসে বসল প্রৌঢ় লোকটির পাশে প্রচুর সংকোচ নিয়ে।

'স্যার দয়া করে পড়ুন কি লেখা আছে। কি সৌভাগ্য আমাদের।'

আল্লাহু আকবার'শব্দ আপনারা শনেছেন?'বলল আহমদ মুসা প্রৌঢ়কে লক্ষ্য করে।

'শনেছি। মুসলমানদের মসজিদ থেকে এ শব্দ আমরা অনেক

শুনেছি।'বলল প্রৌঢ়টি।

আহমদ মুসা বাজুবন্ধের ডিম্বাকৃতি বৃত্ত ওদের সামনে তুলে ধরে বলল, এ বৃত্তের চারদিকে ঘিরে এগারবার'আল্লাহু আকবার'শব্দ লেখা আছে।

তারা বাপ-বেটা বিস্মিত কণ্ঠে প্রায় এক সাথেই বলে উঠল, 'মুসলমানদের শব্দ এখানে কেন? কি অর্থ এর?'

'কেন পরে বলছি। শব্দটির অর্থ'আল্লাহ' অর্থাৎ 'ঈশ্বর সর্ব শক্তিমান।'

একটু থেমে প্রৌঢ়ের দিকে চেয়ে আহমদ মুসা বলল, 'বাজুবন্ধে একজন বাদশাহর নাম লেখা আছে বললেন, জানেন তার নাম?'

'আমাদের কারোরই মনে নেই।'বলল প্রৌঢ়টি।

'বাদশাহর নাম'আসকিয়া মোহাম্মদ।'

'এ তো মুসলমানদের নাম। বাদশাহ কি মুসলমান?'

'হ্যাঁ মুসলমান। সোংগাই সাম্রাজ্যের তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন। পশ্চিম আফ্রিকার সর্ব বৃহৎ সাম্রাজ্য ছিল এটা। এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় ১৪৬৪ সালে। আরেকটা মুসলিম সাম্রাজ্য 'মালি'র রাজধানীও এদের অধিকারে আসে। আসকিয়া মুহাম্মদ ১৪৯৩ থেকে ১৫২৮ সালপর্যন্ত দীর্ঘ ৩৫ বছর ক্ষমতায় ছিলেন। এই সুলতানেরই একজন সেনধ্যক্ষ ছিলেন আপনার পুর্ব পুরুষ, যিনি এই বাজুবন্ধের মালিক।

এই বাজুবন্ধে লেখা আছে সাহস ও বীরত্বের জন্যে বাদশাহ আসকিয়া মুহাম্মদ তাকে এই বাজুবন্ধ উপহার দেন।'থামল আহমদ মুসা।

প্রৌঢ় এবং তার ছেলে দু'জনের চোখেই আনন্দ, বিস্ময় এবং অনেক প্রশ্ন।আহমদ মুসা থামতেই প্রৌঢ় বলল, 'তাহলে আমাদের পুর্ব পুরুষ একটি বিশাল সাম্রাজ্যের একজন সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। কত বড় ছিল সেই সাম্রাজ্য? আমাদের গাম্বিয়া কি অন্তর্ভুক্ত ছিল?'

'বললাম তো সোংগাই সালতানাত পশ্চিম আফ্রিকার সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্য ছিল। মনসুর মুসা (১৩১২-১৩২৭) প্রতিষ্ঠিত মালি সাম্রাজ্যের পতনের পর সোংগাই সালতানাতের প্রতিষ্ঠা হয়। সোংগাইরা আগে অমুসলিম ছিল, মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে তারা মুসলমান হয়ে যায়। আজকের

মৌরতানিয়ার কিছু অংশ, গাম্বিয়া, সেনেগাল, গিনি বিসাউ, গিনি, সিয়েরা লিওন, আইভরি কোস্ট, মালি বুকিনা ফাসো ইত্যাদি অঞ্চল নিয়ে সোংগাই সালতানাতের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।'থামল আহমদ মুসা।

প্রৌঢ় ও তার ছেলের চোখে-মুখে রাজ্যের বিস্ময়।

আহমদ মুসা থামলে যুবক বাকা বলল, ‘আপনি এত জানেন কি করে? আমাদের'গাম্বিয়া'আপনি দেখেছেন?'

‘দেখেছি। আটলান্টিকের কূল, ঘেঁষে দাঁড়ানো সুন্দর একটা ছোট্ট দেশ এখন ওটা।'

‘দেখছেন?' বলল আবার যুবক বাকা।

‘প্রৌঢ় এবং তার ছেলে বাকা দু'জনের চোখেই এক সীমাহীন আনন্দ ঝড়ে পড়েছিল।

আহমদ মুসা প্রৌঢ়ের দিকে চেয়ে বলল, ‘আপনার পূর্ব পুরুষের না, যেন কি বলেছিলেন?'

'আবাবাকা।' বলল প্রৌঢ় গর্বের সুরে।

‘এটা আপনার পূর্ব পুরুষের পুরো নাম নয়, এবং সঠিক উচ্চারণও এটা নয়।'

‘কি নাম। কি নাম লেখা আছে বাজুবন্ধে?'বাপ-বেটা দু'জনেই এক সাথে বলে উঠল। তাদের চোখে প্রবল বিস্ময় ও উৎসুক্য।

‘বলছি। কিন্তু তার আগে বলুন, আপনারা খৃষ্টান কবে থেকে?'

‘প্রৌঢ় ও তার ছেলে বাকা দু'জনেই নীরব।

একটু পরে প্রৌঢ় বলল, ‘আমরা জানি না।'

বৃদ্ধ থামল। একটা ঢোক গিলল। পরক্ষণেই বলে উঠল দ্রুত, ‘এ প্রশ্ন করছেন কেন?'

‘এ প্রশ্ন করছি কেন আপনার পুর্ব পুরুষের নামই তার জবাব দেবে।'

আহমদ মুসা থামল।

তাদের বাপ-বেটার চোখে কিছুটা বিমুঢ় দৃষ্টি।

আহমদ মুসা বাজুবন্ধ-এর লেখার উপর তর্জনি স্পর্শ করে বলল, ‘শুনুন এখানে লেখা আছে ‘সোংগাই সুলতান আসকিয়া মুহাম্মদ-এর তরফ থেকে তরুণ সেনাধ্যক্ষ আবু বকর মোহাম্মদকে বীরত্বের প্রতীক হিসেবে।'

শোনার সাথে সাথে যুবক বাকা চিৎকার করে উঠল, ‘আমাদের পূর্ব পুরুষের নাম ‘আবু বকর মোহাম্মদ?’ কণ্ঠে তার প্রবল উচ্ছ্বাস।

‘তার মানে আমাদের পুর্ব পুরুষ মুসলমান ছিলেন?’ প্রৌঢ়ের কণ্ঠে শ্বাসরুদ্ধকর বিস্ময়।

‘নাম তো তাই প্রমাণ করে’। বলল আহমদ মুসা।

প্রৌঢ় ও যুবক বাকা স্থির, স্তম্ভিত দৃষ্টি আহমদ মুসার উপর নিবদ্ধ।

তারা যেন বাকহারা হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ তারা কিছুই বলতে পারলো না। ধীরে ধীরে তাদের চোখের স্তম্ভিত দৃষ্টি কমে এল। কি এক আবেগে নরম হয়ে উঠল তাদের চোখ-মুখ।

ধীর কণ্ঠে প্রৌঢ়টি এক সময় বলল, ‘এ জন্যেই আপনি প্রশ্ন করেছেন আমরা খৃষ্টান কবে থেকে হলাম। আমারও মনে এখন এই প্রশ্ন জাগছে, কখন কেমন করে অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন হলাম।

বৃদ্ধের চোখে আবেগময় এক শূন্য দৃষ্টি। একটা তন্ময়তা তাতে। আহমদ মুসা কথা বলে তার সে তন্ময়তা ভাঙতে চাইল না।

আনেকক্ষণ পর প্রোঢ়টি স্বপ্নভংগের মত হঠাৎ কথা বলে উঠল ধীরে শান্ত কণ্ঠে, ‘আমার প্রশ্নের উত্তর আমিও বোধহয় জানি।'বলে আবার থামল বৃদ্ধ।

শুরু করল একটু পরে, ‘আফ্রিকার কালো মানুষ যাদের ধরে আনা হয়েছিল, তাদের তো মানুষই মনে করা হতো না। তারা তাদের আত্মপরিচয়, সংস্কৃতি, শিক্ষা, ধর্ম রক্ষা করবে কি করে? খৃষ্টান নাম নিতে যেখানে তাদের বাধ্য করা হয়েছে, সেখানে তারা মুসলিম আচার-আচরণ ও পরিচয় রক্ষা করবে কিভাবে? শুনে যতটা মনে হয়েছে, আফ্রিকা থেকে ধরে আনা আমাদের পূর্ব পুরুষ নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন, যার জন্যে সইতে হয়েছিল তাকে কারা যন্ত্রনাসহ অনেক দুঃখ-কষ্ট, পালিয়ে বেড়াতে হয়েছিল স্থান থেকে স্থানান্তরে। তারপর অন্যান্য অনেকের ক্ষেত্রে যা হয়েছে, আমাদের পরিবারেও তাই ঘটে।

আমরা লীন হয়ে গেছি শাসক সম্প্রদায়ের সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মের মধ্যে।'থামল প্রৌঢ়।

প্রৌঢ় থামতেই যুবক বাকা বলে উঠল, ‘আমি বুঝতে পারছি না, একটি সাম্রাজ্যের সেনাধ্যক্ষের মত একজনকে কিভাবে ইউরোপীয়রা ধরে আনল?

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘দিন কারও সমান যায় না। আসকিয়া মুহাম্মদ ১৫৮২ সালে মৃত্যু বরণ করলে সোংগাই সালতানাত দুর্বল হয়ে পড়ে। এরপর মরক্কো এ সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণ চালায় এবং কিছু অংশ দখল করে নেয়। এরপর সোংগাই সালতানাতটি ছোট ছোট রাজ্যে ভাগ হয়ে যায়। তাদের পারস্পরিক লড়াই তাদের আরও দুর্বল করে দেয়। এরই সুযোগ নেয় ইউরোপীয়রা। সমগ্র পশ্চিম উপকূল জুড়ে তাদের দস্যুতা মানুষের জন্যে একটা ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। অনেক সময়ই বণিকের নির্দোষ ছদ্মবেশ পরে তারা আসত। সুযোগ পেলেই তারা চড়াও হতো স্থানীয় মানুষের উপর। যাকে যেখানে পেত ধরে নিয়ে যেত। এমনি ধরনের কোন এক ঘটনায় তোমার পূর্ব পুরুষ আবু বকর মোহাম্মদ তাদের ফাঁদে পড়ে যায়।'

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল প্রৌঢ়টি।

একটু চুপ থেকে প্রৌঢ়টি বলল, 'আমার পূর্ব পুরুষের নাম অনুসারে আমার এই ছেলের নাম রেখেছিলাম আবাবাকা। এই নাম শুধরে দিলে এখন তো এর নাম হয়'আবু বকর মোহাম্মদ'। তাই না?'

'হ্যাঁ।'বলল আহমদ মুসা।

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা তাকাল যুবক বাকার দিকে। বলল, ‘তুমি মুসলিম নাম'আবু বকর মোহাম্মদ'গ্রহণ করতে রাজী হবে?'

যুবক বাকা মাথাটা সামনের দিকে ঝুকিয়ে আভূমি বাও করে বলল, ‘আমার পূর্ব পুরুষ যা আমিও তাই।'

বাকার চোখে মুখে গর্ব ও আনন্দের স্ফুরণ।

‘মোবারকবাদ আবু বকর মোহাম্মদ, এবার তুমি ড্রাইভিং-এ যাও।'

হাসি মুখে বাকা ওরফে আবুবকর উঠে দাঁড়িয়ে আহমদ মুসা ও পিতাকে মাথা ঝুঁকিয়ে একটা বড় বাও করে বোটের ড্রাইভিং সিটে গিয়ে বসল।'

ছুটে চলতে শুরু করল বোট।

প্রৌঢ় মশগুল হলো আহমদ মুসার সাথে নানা কথায়।

বোট এসে নোঙর করল সাউথ টার্কো দ্বীপের দক্ষিণ পাশের সেই মৎস ঘাটের জেটিতে।

জেটির এক পাশে তখন একটা মাঝারি আকারের স্টিম বোট নোঙর করা ছিল। বোটটির দিকে তাকিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে ফিসফিস করে প্রৌঢ় বলল, 'এটা একটা প্রাইভেট বোট। এ ধরণের বোট তো এখানে আসার কথা নয়।'

'এসেছে যখন দরকারেই এসেছে।'বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা বোটের ভাড়া আগেই চুকিয়ে দিয়েছে। ভাড়া ঠিক নয়। যা ভাড়া তার কয়েক গুণের মত বেশি পয়সা গুঁজে দিয়েছে প্রৌঢ়ের হাতে। পয়সা সে নিতে চায়নি। বারবার বলেছে, 'আপনার দেখা হওয়া আমাদের জীবনের এক শ্রেষ্ঠ ঘটনা। আপনার কাছ থেকে আমরা ভাড়া নিতে পারবো না।'

আহমদ মুসা বলেছে, 'আমি ভাড়া দেইনি। হিসেব না করেই অল্প কিছু পয়সা দিয়েছি আপনাদের পরিবারকে আমার উপহার হিসেবে।'

অনেক সংকোচ করে সে অবশেষে টাকা নিয়েছে এবং বলেছে, 'আবার কোথায় দেখা পাবে আপনার?'

'আমি আপনাদের ঠিকানা নিয়েছি। আমিই খোঁজ করব আপনাদের।'বলেছে আহমদ মুসা।

'জর্জ স্যারদের ওখানে খোঁজ করলে আপনাকে পাবো না? বলেছে বৃদ্ধ।

'নিশ্চয় খোঁজ পাবেন।'আহমদ মুসা বলেছে।

আহমদ মুসা বোট থেকে নামার জন্যে উঠে দাঁড়ানোর পর নিচু হচ্ছিল ব্যাগটা হাতে নেবার জন্যে।

আবু বকর ছুটে এল এবং ডেক থেকে ব্যাগ নিয়ে আহমদ মুসার হাতে তুলে দিল।

আহমদ মুসা আবু বকরের পিঠ চাপড়ে বলল, 'তোমার পূর্বপুরুষ সোংগাই সেনাধ্যক্ষ আবু বকর মোহাম্মদের মত তোমাকে হতে হবে।

পারবে না?'

হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করে যুবকটি বলল, ‘পারবো স্যার।'

‘স্যার নয়, ভাই বলবে। ঠিক আছে?'

যুবকটি মাথা নেড়ে বলল, ‘ঠিক আছে।'

আহমদ মুসা বিদায় নেবার জন্যে প্রৌঢ়ের দিকে ফিরল।

প্রৌঢ়ের মুখ গম্ভীর।

আহমদ মুসা কিছু বলার আগে সে বলল, ‘আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি।'

‘কি সিদ্ধান্ত?'বিস্মিত কণ্ঠ আহমদ মুসার।

‘পূর্ব পুরুষের ধর্মে আমি ফিরে যাব।'

বলেই ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার কি মত?'

‘আমি তো আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি।'

আহমদ মুসা 'আল্লাহু আকবার'বলে প্রৌঢ়কে, তারপর যুবক আবু বকরকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

আহমদ মুসা যখন বোট থেকে নেমে বিদায় নিল, তখন প্রৌঢ় ও তার ছেলে দু'জনেরই চোখে অশ্রু চিকচিক করছিল।

প্রৌঢ়ের কাছে সিদি কাছেম-এ যাওয়ার যে দিক নির্দেশিকা পেয়েছিল তা অনুসরণ করেই আহমদ মুসা তখনও চলছিল।

গ্রামের মেঠোপথ। ঘাসে মোড়া।

এর উপর দিয়ে 'অটো হুইলার'এর মত গাড়িও চলে।

রাস্তার দু'ধারের মাঠে কোথাও লেবুর ক্ষেত, কোথাও শশার ক্ষেত। উঁচু টিলার মত জায়গাগুলোতে প্রচুর আনারসের ক্ষেতও দেখা গেল। কিন্তু প্রচুর জায়গা খালি পড়ে আছে।

রাস্তার দু'ধারে মাঝে মাঝে গ্রামও দেখা যাচ্ছে। গ্রামগুলো জনবহুল নয়।

গ্রামের নারী-পুরুষের পরণে প্যান্ট-সার্ট, প্যান্ট গেঞ্জী, আবার অনেকের পরণে স্থানীয় পোশাক। কিছু কিছু মেয়ের পরণে স্কার্ট, সার্ট, ফ্রক, গাউনও রয়েছে।

গ্রামের মানুষ অধিকাংশই কালো। কিছু রয়েছে মিশ্র, যাদের অনেকে বাদামী ও সোনালী রংয়ের। শ্বেতাংগও দু'চার জন দেখা গেছে।

তাদের অধিকাংশের ভাষা ইংরেজী-স্প্যানিশ মেশানো। কেউ পরিস্কার ইংরেজীতেও কথা বলে।

আহমদ মুসা দুই ভাষাই জানে বিধায় তার কোন অসুবিধা নেই।

একটা বড় গ্রামের মধ্যে দিয়ে চলছিল আহমদ মুসা।

দু'ধারে গ্রাম বিস্তৃত, মাঝখান দিয়ে সড়ক।

সে সড়ক দিয়ে চলার সময় রাস্তার ডান পাশে একটা ঘরের উপর

নজর পড়তেই চমকে উঠল আহমদ মুসা।

ঘরটিতে কাঠের বেড়া, টিনের ছাদ। ঘরটির একটি দরজা। দরজা বরাবর উপরে ছাদে একটা কাঠের গম্ভুজ।

সড়কটি উত্তর-পশ্চিম কোণাকুণি হলেও সড়কের পাশের ঘরটি ঠিক পূর্বমুখী।

‘ঘরটি কি মসজিদ?'দেখার সংগে সংগে এই প্রশ্নটা আহমদ মুসার মনে জাগল।

ঘরটি যে মসজিদ টুপি মাথায় একজনকে ভেতর থেকে বের হয়ে আসতে দেখে একেবারে নিশ্চিত হলো আহমদ মুসা।

টুপি মাথায় দেয়া লোকটি বেরিয়ে বারবার রাস্তার দিকে তাকাল। তাকানোর মধ্যে কারও জন্যে প্রতিক্ষার ভাব। হঠাৎ আহমদ মুসার মনে পড়ল আজ শুক্রবার। সংগে সংগে তার কাছে পরিস্কার হয়ে গেল নামাযের জন্যে মসজিদে সমবেত হয়েছে মুসল্লিরা।

ঘড়ি দেখল আহমদ মুসা। বেলা ১টা বাজে।

আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি উঠে গেল মসজিদে।

নলকূপ থেকে পানি নিয়ে অজু করল। টুপি ওয়ালা যে লোকটি বাইরে বেরিয়ে এসেছিল কৌতূহল নিয়ে তাকিয়েছিল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা অজু শেষ করে উঠে দাঁড়ালে সে কিছু বলতে যাচ্ছিল। আহমদ মুসা তাকে সালাম দিল।

সে 'অ'লাকুম ছালাম'বলে সালাম নিয়ে বলল স্প্যানিশ মেশানো ইংরেজী ভাষায়, 'নিশ্চয় আপনি বিদেশী? কোথায় বাড়ি?'

‘এশিয়ায়।'

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা আবার বলে উঠল, 'চলুন, নামায পড়ি। পরে কথা বলব।'

বলে আহমদ মুসা মসজিদে প্রবেশ করল।

মসজিদে প্রবেশ করার সময় আহমদ মুসার সালামের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। সকলেই একবার তাকাল আহমদ মুসার দিকে। সম্ভবত এভাবে সালাম কেউ দেয় না। যেহেতু কেউ নামায অবস্থায় নেই, বসে আছে, সে জন্যেই সালাম দিয়েছে আহমদ মুসা।

মসজিদে বিশ পঁচিশজনের মত মুসল্লি।

সুন্নত নামায শেষ করে সবার উপর একবার চোখ বুলাতে গিয়ে আহমদ মুসা দেখল, সবার মুখে একটা অস্বস্তির ভাব। যে লোকটিকে আহমদ মুসা বাইরে যেতে দেখেছিল এবং কথা বলেছিল, তাকে বারবারই বাইরে যেতে দেখল। একটা অস্থির ভাব তার মধ্যে।

আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকাল। বেলা তখন সোয়া একটা।

পাশের মুসল্লিটি একজন যুবক।

আহমদ মুসা তাকে অনুচ্চ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, ‘ইমাম ক'টায় খুতবা দেন?'

প্রথমে যুবকটি বুঝল না। সম্ভবত খুতবা অথবা ইমাম-এর উচ্চারণ তার কাছে কোনদিক দিয়ে নতুন মনে হয়েছে।

আহমদ মুসা তাকে বুঝিয়ে বলার পর সে বুঝল এবং বলল, 'সোয়া একটায় হয়, কিন্তু ইমাম সাহেব আসেননি। বন্দরে গেছেন। নামাযের আগেই তার ফেরার কথা ছিল।'

আরও কিছুটা সময় চলে গেল।

প্রথম সারি থেকে একজন বয়স্ক লোক উঠে দাঁড়াল। তার মুখ ভরা দাড়ি। একমাত্র তার মাথায় পাগড়ী আকারে কাপড় বাঁধা। বলল ইংরেজী ও স্প্যানিশ মেশানো ভাষায়, 'ভাইগণ, ইমাম সাহেব এখনও ফিরলেন না। আর দেরিও করা যায় না। খুতবা হচ্ছে না। এখন আমরা যোহরের নামায পড়ব।'

'খুতবা পড়ার মত আর কেউ নেই?'বলে উঠল আহমদ মুসা সেই বৃদ্ধকে লক্ষ্য করে।

'না নেই। গ্রামের যাকে আমরা ইমামের দায়িত্ব দিয়েছি, শুধু তিনিই পোর্টরিকোতে ৬ মাস থেকে কিছু শিখে এসেছেন'। বলল সেই প্রবীণ ব্যক্তি।

'আপনাদের আপত্তি না থাকলে আমি খুতবা দিতে পারি।'বলল আহমদ মুসা।

বিস্ময় ও কৌতূহল মিশ্রিত চোখে তাকাল প্রবীণ ব্যক্তিটি আহমদ মুসার দিকে।

তারপর তিনি তাকালেন অন্যদের দিকে।

সবার দৃষ্টি আহমদ মুসার দিকে।

এই সময় আহমদ মুসার সাথে বাইরে কথা বলা লোকটি বলে উঠল, 'উনি বিদেশী। এশিয়ায় দেশ। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, মসজিদ দেখে নামায পড়ার জন্যে উঠে এসেছেন।'

প্রবীণ ব্যক্তিটি জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসাকে, 'আপনার নাম কি?'

'আহমদ আবদুল্লাহ।'

'আপনাকে পেয়ে আমরা আনন্দিত। আসুন খোতবা দিন, আমাদের নামায পরিচালনা করুন।'বলল প্রবীণ লোকটি হাসিতে গোটা মুখ তার ভরিয়ে তুলে।

বাইরে বেরুনো ও আহমদ মুসার সাথে কথা বলা লোকটিই মোয়াজ্জিন।

সে আযান দিল।

আযানের উচ্চারণে বড় কোন ভুল নেই।

খোতবার একটা বইছিল।

বইটা হাতেই রাখল আহমদ মুসা। কিন্তু খুতবা দিল আরবীতে মুখস্থ। ইচ্ছাকরেই খুতবার মধ্যে অন্য ভাষায় কিছু বলল না। এদের অনুসৃত রীতি না জেনে খুতবার মধ্যে অন্য ভাষা নিয়ে আসা ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করতে পারে। গোটা খুতবাকালে সকলের বিস্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টি আহমদ মুসার উপর নিবদ্ধ ছিল। নামাযও পড়াল আহমদ মুসাই।

নামায শেষে সবাই এসে ঘিরে ধরল আহমদ মুসাকে।

প্রথমেই মাথায় পাগড়ী বাঁধা প্রবীণ ব্যাক্তিটি অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে হ্যান্ডশেক করল আহমদ মুসার সাথে। বলল, 'আলহামদুলিল্লাহ। এমন আরবী পড়া, এমন সুন্দর কোরআন তেলাওয়াত কোনদিন আমরা শুনিনি। ধন্য হয়েছি আমরা।'

এরপর আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে কোথায় দেশ, কি নাম, কোথায় যাবে ইত্যাদি প্রশ্নের ঢল নামল চারদিক থেকে। যতটুকু জবাব দেয়া যায়, ততটুকু করে জবাব দিল।

যখন তারা শুনল আহমদ মুসা মক্কা, মদীনা হয়ে এখানে এসেছে, তখন তাদের আবেগ আরও উথলে উঠল। মনে হলো যেন আহমদ মুসাই মক্কা-মদীনা। আহমদ মুসার সাথে কথা বললে, একটু ছুঁলেও যেন মক্কা-মদীনায় স্পর্শ তারা পাবে।

ইসলাম ও ইসলামের নবী এবং ইসলামের পবিত্র স্থানের প্রতি তাদের এই আবেগ অভিভূত হলো আহমদ মুসা।

আহমদ মুসাও তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শুনল।

গ্রামের নাম ওকারী।

সবাই কৃষ্ণাংগ আফ্রিকান। প্রথমে তাদের পূর্ব পুরুষরা ডোমিনিকান অঞ্চলে ছিল। সেখান থেকে তারা এসেছে এই অঞ্চলে।

এই গ্রামসহ আশে-পাশের গ্রামে মুসলমানরাই সংখ্যা গরিষ্ঠ। দক্ষিণ টার্কো দ্বীপের এক তৃতীয়াংশ মুসলমান। বাকিরা খৃষ্টান। কিন্তু অন্যান্যরা আফ্রিকার আঞ্চলিক ধর্মে বিশ্বাসী।

এই অঞ্চলে এই একটি মসজিদ। সমগ্র দক্ষিণ টার্কো দ্বীপে মসজিদের সংখ্যা মাত্র দু'টি। অন্য মসজিদটি সিডি কাকেম গ্রামে। দ্বীপের উত্তারঞ্চলে শিক্ষা ও ব্যবসায় বাণিজ্যে উন্নত খৃষ্টানদের প্রাধান্য বেশি। ঐ অঞ্চলে আফ্রিকার আঞ্চলিক ধর্মে বিশ্বাসী লোকদের সংখ্যাও বেশি।

ধর্ম শিক্ষক ও ইমামের খুব অভাব। দুই মসজিদে দু'জন ইমাম

আছেন, যারা পোর্টরিকোর এক মসজিদ থেকে ৬ মাস ট্রেনিং নিয়ে এসেছেন। নামায পড়ানো, ধর্ম শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে তারাই সব এ অঞ্চলের।

তাদের পূর্ব পুরুষরা আফ্রিকার কোন অঞ্চল থেকে এখানে এসেছে তা বলতে পারলো না। তবে আহমদ মুসা গ্রামের আফ্রিকান নাম দেখে অনুমান করল তাদের পূর্ব পুরুষদের দক্ষিণ নাইজেরিয়া অঞ্চল থেকে ধরে আনা হতে পারে। দক্ষিণ নাইজেরিয়ার'বেনু'নদীর তীরে'ওকারী'নামে একটা ছোট্র শহর আছে।

আহমদ মুসা কথায় কথায় তাদের অসুখ-বিসুখ ও চিকিৎসা সুযোগের কথা তুলে শিশুদের চিকিৎসা ও পরিচর্যা সম্পর্কে জানতে চাইল। তার লক্ষ্য, ছেলে শিশু মৃত্যুর ব্যাপারে কোন তথ্য পাওয়া যায় কিনা।

আহমদ মুসা জানতে পারল, দ্বীপে একমাত্র ডাক্তারখানাটি বন্দরে। গ্রামাঞ্চলে কিছু গ্রাম্য ডাক্তার আছে। হাসপাতাল আছে গ্রান্ড টার্কস শহরে। ইদানিং শিশু চিকিৎসায় সংকট দেখা দিয়েছে। জন্মগ্রহণের পর বেশীর ভাগ শিশু বাঁচছে না।

‘কোন শ্রেণীর শিশু বেশি মারা যাচ্ছে? ছেলে না মেয়ে?'জিজ্ঞেস করে আহমদ মুসা।

প্রবীণ ব্যক্তিটি সংগে সংগে উত্তর দিল না। চিন্তা করল, তারপর এর ওর দিকে তাকাল, নিচু স্বরে কয়েকটা কথা বলল। সবশেষে একটু দূরে বসা একটি তরুণের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘কলিন কামেল আমরা তো দেখছি গত ক'বছরে যত শিশু মারা গেছে তার ৯০ ভাগই ছেলে শিশু।

তুমি ডাক্তরি কলেজে পড়, হাসপাতালে যাও। তুমি কিছু বলতে পার কিনা?'

ছেলেটি বিনীতভাবে উঠে দাঁড়াল, ‘বিষয়টার প্রতি আমি লক্ষ্য রাখিনি। তবে গত কয়েকদিন আগে কলেজে শিশু মৃত্যুর হার নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। সেখানে এ বছরের একটা পরিসংখ্যানে মৃত শিশুদের তালিকা দেয়া ছিল। আমি সেটা পড়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল ছেলে শিশু মৃত্যুর হার ৬০ ভাগের কিছু বেশি হতে পারে।'

‘ধন্যবাদ কামাল, ঐ তালিকায় তো সব ধর্মের শিশুরাই ছিল।'বলল আহমদ মুসা ছেলেটিকে লক্ষ্য করে।

‘জ্বি হ্যাঁ।'ছেলেটি বিনীতভাবে বলল।

আহমদ মুসা প্রবীণ ব্যাক্তিটির দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আপনার অঞ্চলে গত ক'বছরে ছেলে শিশু মৃত্যুর হার নব্বই ভাগ বললেন, অন্য ধর্মের লোকদের মধ্যে এই মৃত্যুর হার কেমন?'

প্রবীণ লোকটি চিন্তা করে বলল, 'আমি যে হিসেবটা দিয়েছি আমাদের অর্থ্যাৎ মুসলমানদের মধ্যকার। যতটুকু খেয়াল করেছি, শিশু মৃত্যুর হার ইদানিং আমাদের চেয়ে ওদের অনেক কম।

আলোচনার এক পর্যায়ে আহমদ মুসা বলল, 'আমি এখন উঠব। কিছু জরুরী কাজে আমি এখানে এসেছি।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

প্রবীণ ব্যাক্তিটি প্রবল বাধা দিয়ে বলে উঠল, ‘না, খেয়ে যেতে হবে। এভাবে যেতে পারেন না।'

আহমদ মুসা বিনীত কণ্ঠে বলল, 'আজ পরিচয় হলো, সুযোগ হলে নিশ্চয় আর একদিন আসব। আজকের মত মাফ করুন।'

‘কোথায় যাবেন আপনি?'বলল প্রবীণ সেই লোকটিই।

‘সিডি কাকেম গ্রামে।'

‘এফেন্দী পরিবারের ওখানে?'

‘জ্বি হ্যাঁ।'

‘শুনেছি, ওদের কি একটা বিপদ হয়েছে।'

‘জানেন, বিপদটা কি?'

‘না। বলল প্রবীণ লোকটি।

‘জানি আমি।'বলল কলিন কামাল ছেলেটি।

‘কি জান?'বলল আহমদ মুসা।

‘পাশা পরিবারের জেনিফার আপা টার্কস দ্বীপপুঞ্জের বাসিন্দাদের

উপর পরিচালিত কি এক সমীক্ষায় সহায়তা করায় বিপদে পড়েছেন। গোপন একটি সংগঠন তাদের পেছনে লেগেছে। কয়েকজনকে তারা হত্যা করেছে। জেনিফার আপার জীবন বিপন্ন। উনি পালিয়ে আছেন।'বলল কলিন কামাল।

'এসব কথা তো পত্রিকায় বের হয়নি। কোথায় শুনেছ?'

'আমি এখনো শুনেছি চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র একজন মুসলিম বন্ধুর কাছ থেকে।'

'তোমরা জেনিফারদের কোন সাহায্য করছ না?'

'সবাই ঐ গোপন দলকে ভয় করে।'

'ঐ দলটি কারা?'

'আমি জানি না। তবে শুনেছি, সমগ্র ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, এমনকি এর বাইরেও তারা শক্তিশালী।'

আহমদ মুসা মসজিদের বাইরে এল। সবাই এল তার সাথে সাথে।

ঠিক এই সময়ে অটো হুইলারের শব্দ এবং নারী কণ্ঠের চিৎকার

তার কানে এল।

মুখ ফিরিয়ে দেখল, দ্বীপের অভ্যন্তর থেকে ঘাট মুখী একটা অটো

হুইলার দ্রুত এগিয়ে আসছে। ঐ গাড়ি থেকেই আসছে নারী কণ্ঠের চিৎকার।

রাস্তার পাশে মসজিদের স্থানটা বেশ উঁচু। এখানে সড়ক অপেক্ষাকৃত নিচু।

গাড়ি একটু দূরে থাকতেই আহমদ মুসার চোখে পড়ল, এক শ্বেতাংগ গাড়ি ড্রাইভ করছে, আরেকজন শ্বেতাংগ তার পাশে বসে। পেছনের ভ্যান বক্সে আরও দু'জন শ্বেতাংগ বসে। তাদের পায়ের কাছে গাড়ির মেঝেতে পড়ে আছে একটি মেয়ে। সম্ভবত তার হাত-পা বাঁধা।

গাড়ি আরও কাছে এল।

আহমদ মুসা দেখল, ভ্যান বক্সের একজন শ্বেতাংগ গাড়ির মেঝেতে পড়ে থাকা মেয়েটির বুকে এক পা রেখেছে, আরেক পা মেয়েটির মুখে।

মেয়েটি অবিরাম মুখ এদিক ওদিক করে চিৎকার করছে ‘বাঁচাও’ 'বাঁচাও'বলে।

আহমদ মুসার গোটা শরীরে প্রবল এক উষ্ণ স্রোত বয়ে গেল। শক্ত হয়ে উঠল তার হাত, পা, গোটা শরীর। তার মনে হলো, ঐ মেয়েটির 'বাঁচাও''বাঁচাও' আর্ত চিৎকারের মধ্যে গোটা মানবতার আর্ত ক্রন্দন যেন সে শুনতে পাচ্ছে।

সিদ্ধান্ত নিতে মুহূর্তও বিলম্ব হলো না আহমদ মুসার। বিলম্ব হলো না তা কার্যকরী করতে।

আহমদ মুসা লাফিয়ে পড়ল নিচে। গাড়ির সামনে।

দু'হাত উঁচু করে বলল, 'দাঁড়াও।'

ড্রাইভার শ্বেতাংগের মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে উঠল।

সে গাড়ি দাঁড় করাল।

লাফ দিয়ে নামল ড্রাইভিং সিট থেকে। তার সাথে সাথেই নামল তার পাশের জনও।

ড্রাইভিং সিটের লোকটি গটগট করে এসে আহমদ মুসার সামনে দাঁড়াল। বলল, ‘দাঁড়িয়েছি। বল, কি জন্যে দাঁড়াতে বললি?'

'যে মেয়েটি বাঁচার জন্যে চিৎকার করছে তাকে ছেড়ে দাও।'শান্ত কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

ড্রাইভিং সিট থেকে নামা লোকটি হাসল। পেছনে তাকিয়ে ভ্যান বক্সের শ্বেতাংগ দু'জনের দিকে চেয়ে বলল, ‘তোরা নেমে আয়। মেয়েটিকে ছেড়ে দিতে বলছে। ছেড়ে দিবি কিনা দেখ।'

ওরা নেমে এল সংগে সংগেই।

ওরা এসে দাঁড়াল আগে থেকে দাঁড়ানো দু'জনের পাশেই।

ড্রাইভিং সিটের সেই লোকটিই আবার মুখ খুলল। কৌতুকের সুরে বলল, ‘বল আবার। কি যেন বলছিলি?'

'আবার বলছি শুনুন, ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে মেয়েটিকে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন, তাকে ছেড়ে দি...।'

আহমদ মুসা কথা শেষ হবার আগেই ভ্যান বক্স থেকে নেমে আসা দু'জনের একজন ঝাঁপিয়ে পড়ল আহমদ মুসার উপর।

আহমদ মুসার চোখ-কান খাড়া ছিল আগে থেকেই। ত্বড়িৎ আহমদ মুসা তার দেহ কাত করে একদিকে সরিয়ে নিল। লোকটি সশব্দে পড়ে গেল মাটির উপর।

মাটিতে পড়ে গিয়েই আঘাত পাওয়া মাথা ও বুক নাড়তে নাড়তে উঠে দাঁড়াল গোঁ গোঁ করতে করতে।

উঠেই মরণপণ এক ঘুষি চালালো আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে।

আহমদ মুসা ঘুষিটা বাম হাতে ঠেকিয়ে ডান হাতের দু'টি ঘুষি পর পর চালাল লোকটির তলপেটে।

লোকটি পেট চেপে ধরে বাঁকা হয়ে বসে পড়ল।

ড্রাইভিং সিটের লোকটিই বোধহয় হবে তাদের দলনেতা।

সে এবার দু'হাত মুষ্টিবদ্ধ করে ঝড়ের মত এগিয়ে এল।

আহমদ মুসা দু'ধাপ পিছিয়ে দু'পায়ের ফ্লাইং কিক চালাল ঝড়ের মত এগিয়ে আসা লোকটির বুকে।

উল্টে চিৎ হয়ে পড়ে গেল সে মাটিতে।

ফ্লাইং কিক ছুড়ে দেয়ার পর আহমদ মুসাও পড়ে গিয়েছিল মাটিতে।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াবার আগেই দেখল, অবশিষ্ট দু'জন ঝাঁপিয়ে পড়ছে তার উপর।

আহমদ মুসা ছিটকে সরে গিয়ে আত্মরক্ষা করল।

মসজিদের সামনে দাঁড়ানো লোকের ভয় ও উদ্বেগ নিয়ে তাকিয়ে আছে ঘটনার দিকে।

গাড়ির মেঝেতে পড়ে থাকা হাত-পা বাঁধা মেয়েটি উঠে বসে তাকিয়ে আছে। আতংক ও মত্যু ভয় তার চোখে-মুখে।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াবার আগেই দেখল ড্রাইভিং সিটের লোকটিসহ সবাই রিভলবার বের করেছে।

আহমদ মুসার উপর ঝাঁপিয়ে পড়া শেষ দু'জনের একজন আহমদ মুসার পাশেই পড়েছিল।

সেও পকেট থেকে রিভলবার বের করতে করতে উঠে দাঁড়াচ্ছে।

সময় ছিল না আহমদ মুসার হাতে। তিনটি রিভলবারের নল তাক করেছে।

আহমদ মুসা শোয়া অবস্থাতেই পাশের প্রায় দাঁড়িয়ে পড়া লোকটার পা ল্যাং মেরে উল্টো দিকে ঠেলে দিল।

লোকটির দেহ বোঁটা থেকে খসে পড়া ফলের মত এসে পড়ল আহমদ মুসার গায়ের উপর। তার হাতের রিভলবারটা তার হাত থেকে খসে একেবারে গিয়ে পড়েছিল আহমদ মুসার মুখে।

আহমদ মুসা লোকটিকে ল্যাং মারার সাথে সাথেই হয়েছিল গুলীর শব্দ।

লোকটি আহমদ মুসার উপর এসে না পড়লে গুলীটি আহমদ মুসার বুক বিদ্ধ করতো। মুহূর্তে দৃশ্যপটের পরিবর্তনে গুলীটি আহমদ মুসার বদলে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল আহমদ মুসার বুকের উপর আছড়ে পড়া লোকটির বুক।

আহমদ মুসা বাম হাত দিয়ে লোকটিকে নিজের বুকে চেপে ধরে

রেখেই তার মুখের উপর ছিটকে পড়া রিভলবারটি তুলে নিয়ে শুয়ে থেকেই রিভলবারের ট্রিগার একের পর এক চেপে রিভলবারের সামনে দিয়ে অর্ধচন্দ্রকারে ঘুরিয়ে নিয়ে এল।

চোখের পলকে তিনজন বুকে গুলী বিদ্ধ হয়ে ঢলে পড়ল মৃত্যুর কোলে।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

চারদিকে তাকাল আহমদ মুসা।

ভ্যান বক্সে বসে থাকা হাত-পা বাঁধা মেয়েটি কাঁপছে। তার মুখ মরার মত পাংশু। অনেকটা ভূত দেখার মতই সে তাকিয়ে আছে আহমদ মুসার দিকে।

মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মাথায় পাগড়ী পরা সেই প্রবীণ

লোকটি। তার পেছনে আর দু'জন যুবক। নিশ্চয় প্রবীণ লোকটিরই ছেলে বা আত্মীয় হবে যারা তাদের বাপ বা আত্মীয়কে ফেলে পালায়নি।

আহমদ মুসা কয়েক ধাপ এগিয়ে প্রবীণ সেই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলল, ‘জনাব কিছু বলবেন আপনি?'

সে দাঁড়িয়ে ছিল পাথরের মত। তার চোখে-মুখে আতঙ্ক এবং বিস্ময়।

আহমদ মুসার প্রশ্নের উত্তরে একটু সময় নিয়ে সে বলল, 'আপনাকে ধন্যবাদ, আপনি একটি মেয়ের জীবন ও ইজ্জত রক্ষা করেছেন। কিন্তু এই দ্বীপাঞ্চলে শ্বেতাংগ হত্যা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার। একজন শ্বেতাংগ হত্যার বিনিময়ে ডজন ডজন কৃষ্ণাংগকে নিহত হতে হয়। সেই কৃষ্ণাংগরা যদি মুসলমান হয়, তাহলে তো আর কোন কথায় নেই।

দেখুন, সবাই আতংকে পালিয়েছে।'

‘বলুন, আপনার কি পরামর্শ?'বলল আহমদ মুসা।

‘আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে এর পরিণতি যাই হোক আমাদের মেনে নিতে হবে। করার কিছুই নেই।'বলল প্রবীণ লোকটি।

‘আমার দুটি পরামর্শ আছে জনাব।'

'কি?'

‘প্রথম পরামর্শ, এই চারটি লাশ দূরে কোথাও সরিয়ে ফেলতে হবে। এখানকার সব রক্তের দাগ মুছে ফেলতে হবে। তারপর আপনারা কোন কিছু জানেন না, এই ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। দ্বিতীয় পরামর্শ, 'আপনাদের মৎস ঘাটে এদের মোটর বোট নোঙর করা আছে। ওখানে একজন লোক ওদের আছে। আপনারা গিয়ে তাকে খবর দিন, তাদের চারজন লোক একজন বিদেশীর হাতে এখানে খুন হয়েছে। বিদেশী লোকটি তাদের খুন করে তাদের ধরে আনা একটি মেয়েকে মুক্ত করে লাশসহ অটো হুইলার নিয়ে দ্বীপের ভেতরে পালিয়ে গেছে। বিদেশীর হাতে বন্দুক ছিল বলে আপনারা কিছু করতে পারেননি।'

প্রবীণ লোকটি পরামর্শ দু'টি শুনে সংগে সংগেই কিছু বলল না। চিন্তা করল। একটু পর বলল, 'আপনার দ্বিতীয় পরামর্শ গ্রহণ করার অর্থ অন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করা এবং উপকারী ভাইয়ের বিরুদ্ধে লড়াই-এ অবতীর্ণ হওয়া। আমরা এটা পারবো না। সুতরাং আপনার প্রথম পরামর্শ আমরা গ্রহণ করছি। তবে এ

বিষয়টা গোপন থাকবে না, তারা জানতে পারবেই। জানতে পারার পর অবস্থা খুবই ভয়াবহ হবে।'

'তাহলে দ্বিতীয় পরামর্শ আপনারা গ্রহণ করছেন না কেন?'

'আমাদের অনেকেই হয়তো এটা গ্রহণ করতে রাজী হবে। কিন্তু শত্রুদেরকে গিয়ে বলে দিলেই কি আমরা বেঁচে যাব? তারা কিছুতেই আমাদের সন্দেহের বাইরে রাখবে না। তার ফলে এ ক্ষেত্রেও পরিণতি খুব ভাল হবে না। সুতরাং প্রথম পরামর্শই আমাদের জন্যেই শ্রেয়তর।'

বলে একটু থামল প্রবীণ লোকটি। একটা ঢোক গিলেই আবার বলে উঠল, 'আপনি তাড়াতাড়ি চলে যান। মেয়েটিকেও আপনি পৌঁছে দেবেন।'

'না, এখান থেকে লাশ সরানো এবং সব ঠিক ঠাক করার পর আমি যাব।'আহমদ মুসা বলল।

প্রবীণ লোকটি হাত জোড় করে বলল, 'না, না, আপনি যান;মেয়েটি এবং আপনি আবারও বিপদে পড়তে পারেন।'

'কিন্তু আপনারা তো বিপদে পড়ে গেছেন।'

হাসল প্রবীণ লোকটি। বলল, 'আমরা বংশ পরম্পরায় এই বিপদের সাথেই তো লড়াই করছি। আফ্রিকার মাতৃভূমি থেকে আমাদের পূর্ব পুরুষরা ছিটকে পড়ার পর কোন মাটিতেই আমরা দাঁড়াতে পারছি না। অনেক দেশ, দ্বীপ পাল্টে এখানে এসেছি আমরা। এ মাটি আমাদের মাতৃভূমি হবে তা বলব কি করে?'

কথা শেষ করেই প্রবীণ লোকটি পাশের দুই যুবককে বলল কয়েকজন লোককে ডাকতে এবং কোদাল নিয়ে আসতে।

আহমদ মুসা একটু চিন্তা করে প্রবীণ লোকটিকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'জনাব এ লাশ চারটির দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। আমি গাড়ি করে নিয়ে নিরাপদ কোথাও লুকিয়ে ফেলব। আপনারা এ জায়গাটা পরিস্কার করুন।'

বলেই আহমদ মুসা অটো হুইলারের ভ্যান বক্সে মেয়েটির কাছে উঠে এল।

মেয়েটি একুশ বাইশ বছরের তরুণী। গায়ের রং সোনালী। চোখ

নীল।

তার চেহারায় সেমেটিক, রেডইন্ডিয়ান ও আফ্রিকি বৈশিষ্টের সমন্বয়। এই বৈশিষ্ট মেয়েটিকে এক অপরূপ সুষমা দান করেছে।

মেয়েটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে আহমদ মুসাকে। তার চোখে ভয় এবং আশার আকুতি।

আহমদ মুসা মেয়েটির মুখোমুখি হয়ে বলল, 'দেখি বোন বাঁধন খুলে দেই।'

আহমদ মুসা চাকু দিয়ে বাঁধন কেটে ফেলল। তারপর বলল, 'বোন আপনি সামনে ড্রাইভিং সিটের পাশের সিটে গিয়ে বসুন। এখানে লাশগুলো উঠবে।'

বলে আহমদ মুসা ভ্যান বক্স থেকে নেমে এল।

মেয়েটিও নেমে এল পেছনে পেছনে যন্ত্রের মতো। নির্দেশ মত গিয়ে সিটে বসল।

প্রবীণ লোকটির ডেকে পাঠানো লোকেরা আসার আগেই আহমদ মুসা চারটি লাশ তুলে ফেলল ভ্যান বক্সে।

তার আগে আহমদ মুসা চার জনের চারটি রিভলবার কুড়িয়ে নিয়ে নিজের ব্যাগে ঢুকিয়ে ব্যাগটি গাড়ির ড্রাইভিং সিটের পাশে রাখল।

লাশ চারটির পকেটে কাগজপত্র কিছু পেল না, মাত্র চারটি মানিব্যাগ। প্রত্যেকটি মানিব্যাগেই বেশ কিছু করে পাউন্ড আছে।

প্রবীণ লোকটি নেমে এসেছে তখন রাস্তায়। ততক্ষণে আরও কয়েকজন এসেছে।

আহমদ মুসা চারটি মানিব্যাগ প্রবীণ লোকটির হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'মানিব্যাগের টাকাগুলো যদি নিহত লোকদের পরিবারের হাতে পৌছানো যেত তাহলে সবচেয়ে ভাল হতো। তা সম্ভব নয় যখন, তখন এ টাকাগুলো আপনি ইয়াতিম দরিদ্রদের দান করে দিতে পারেন।'

'কেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কুড়িয়ে পাওয়া মাল কি যোদ্ধারা নিতে পারে না?'বলল প্রবীণ লোকটি।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘এটা তো কোন ঘোষিত যুদ্ধ ছিল না। আমরা একে অপরকে চিনি না। সুতরাং যুদ্ধলব্ধ মাল এটা নয়। এ টাকাগুলো নীতিগত ভাবে নিহতদের পরিবারের প্রাপ্য।'

প্রবীণ লোকটি এবং তার সাথীরা বিস্ময়-বিমুগ্ধ চোখে তাকিয়ে ছিল আহমদ মুসার দিকে। বলল প্রবীণ লোকটি অবাক কণ্ঠে, 'আপনার মত এমন কথা কখনও শুনিনি। এমন মনুষ থাকতে পারে বলেও জানতাম না। যতই সময় যাচ্ছে, আপনাকে দেখে আমরা অভিভূত হচ্ছি।'

তার কথার দিকে কান না দিয়ে আহমদ মুসা বলল, 'জনাব আমি এখন যাচ্ছি। কিন্তু মনে রাখবেন, আমি আপনাদের পাশে আছি।'

বলে সবাইকে সালাম দিয়ে আহমদ মুসা অটো হুইলারের ড্রাইভিং সিটে এসে বসল।

গাড়ি ছুটে চলল উত্তরে দ্বীপের অভ্যন্তরে।

মেয়েটি গাড়ির জানালার প্রান্ত বাম হাতে আঁকড়ে ধরে মাথা নিচু করে বসেছিল।

তার গায়ে ম্যাক্সির মত একটি জামা। পরণে শর্ট ধরণের কিছু থাকতে পারে। খুবই ইনফরমাল পোশাক। সম্ভবত মেয়েটিকে ওরা যে অবস্থায় পেয়েছে, সেই অবস্থায় ধরে নিয়ে এসেছে। ওরা কারা ছিল? মেয়েটিই বা কে? তবে মেয়েটা যে শিক্ষিত, বুদ্ধি দীপ্ত ও অভিজাত তা তার চেহারা দেখেই বুঝা যায়।

পরক্ষণেই আহমদ মুসার মনে এ চিন্তার চেয়ে চারটি লাশের চিন্তাই বড় হয়ে উঠল।

মিনিট পনের ড্রাইভ করার পর আহমদ মুসা মেয়েটির দিকে চেয়ে বলল, 'এ এলাকাতেই আপনার বাড়ি?'

মেয়েটি মুখ না তুলেই জবাব দিল, 'জি।'

'আপনি কি বলতে পারেন, এ লাশগুলো কোথায় লুকিয়ে ফেলা যায়, এমন জায়গা এদিকে কোথাও আছে?'

মেয়েটি মুহূর্তের জন্যে আহমদ মুসার দিকে একবার তাকাল। তার দৃষ্টিতে ভয়ের চিহ্ন নেই, তার দৃষ্টিতে এখন বিস্ময়, শ্রদ্ধা ও মুগ্ধতা।

চোখ নামিয়ে মেয়েটি বলল, 'আর দশ মিনিট ড্রাইভ করার পর 'সেবু'নদীর ব্রীজ পাওয়া যাবে। নদীতে বেশ স্রোত আছে। ওখানে লাশগুলো ফেলে দেয়া যায়।'

'ধন্যবাদ আপনাকে। এটাই করব।'

মেয়েটি আর কিছু বলল না। আহমদ মুসাও নীরব।

অল্পক্ষণ পর আহমদ মুসা বলল, 'আপনাকে প্রশ্ন করতে পারি?'

চোখ দু'টি সামনে রাস্তার উপর প্রসারিত রেখে জিজ্ঞেস করলল আহমদ মুসা।

মেয়েটি মুহূর্তের জন্যে আহমদ মুসার দিকে চোখ তুলে আবার নামিয়ে নিল। বলল, 'অবশ্যই।'

'নিহত এই চারজন কে?'

'আমি জানি না।'

'এদের চেনেন না?'

'জি না। কাউকেই চিনি না।'

'আপনাকে এরা নিয়ে যাচ্ছিল কেন?'

'আমাকে হত্যা করাই এদের উদ্দেশ্য।'

কিন্তু হত্যা করার জন্য নিয়ে যেতে হবে কেন। হত্যা করে রেখে যেতে পারতো। নিয়ে যাচ্ছিল কেন?'

'আমি জানি না।'

আহমদ মুসা একটু ভাবল;তারপর বলল, 'আপনাকে ওরা হত্যা করবে কেন?'

মেয়েটি একটু সময় নিয়ে জবাব দিল।বলল, 'ঐ শ্বেতাংগ গ্রুপ আমাদের অস্তিত্বেরও বিরোধী।'

আহমদ মুসা বুঝল মেয়েটি জবাব এড়িয়ে যাচ্ছে। হতে পারে শ্বেতাংগরা অশ্বেতাংগদের চরম বিরোধী। কিন্তু তারা কারো কারো অস্তিত্বের বিরোধী হয়ে উঠবে কেন? আহমদ মুসা আর কোন প্রশ্ন করল না।

'সেবু'নদীর ব্রীজটি এসে গেল।

আহমদ মুসা গাড়ি দাঁড় করাল। নামল গাড়ি থেকে।

এলাকাটা এবড়ো-থেবড়ো একটা উপত্যকা। মাঝে মাঝে লেবু জাতীয় ফলের গাছ।

ব্রীজ থেকে একটু দূরে নদী তীরের সমতল ভূমিতে গমের গাছের মত সবুজ ক্ষেত দেখতে পেল। জনমানবের চিহ্ন কোথাও নেই।

আহমদ মুসা এক এক করে চারটি লাশই ব্রীজ থেকে নদীতে ফেলে দিল।

আহমদ মুসা গাড়িতে ফিরে এল। তার জামা কাপড়, শরীর রক্তে ভেজা।

আহমদ মুসা ড্রাইভিং সিটে বসে বলল, 'গাড়ি নিচে নদীর কিনারে নিয়ে যেতে চাই। গা'টা পরিস্কার করতে হবে। গাড়িটাও ধুয়ে ফেলা দরকার। আপনি কি উপরে অপেক্ষা করবেন?'

মেয়েটি অল্প একটু চুপ করে থেকে বলল, 'রাস্তায় দাঁড়াতে ভয় করছে। নেমে যাই, নিচে কোথাও দাঁড়িয়ে থাকব.'বলে নামতে যাচ্ছিল মেয়েটি।

'ঠিক আছে। বসে থাকুন।'

বলে আহমদ মুসা গাড়ি ড্রাইভ করে ব্রীজের ওপারে নিয়ে রাস্তার ঢাল বেয়ে নদীর তীরে নেমে একটা ঝোপের আড়ালে একদম নদীর কিনারে গাড়ি দাঁড় করাল।

আহমদ মুসা ব্যাগটা নিয়ে গাড়ি থেকে নামার উদ্যোগ নিল।

'আমিও নামছি। ঝোপের ওপাশেই আমি আছি।'বলল মেয়েটি।

'আপনি বসতে পারেন গাড়িতে।'

'আপনি পোশাক পাল্টে পরিস্কার হয়ে নিন। আমি ওদিকে আছি।'

মেয়েটি ঝোপের আড়ালে গিয়ে ঘাসের উপর বসল।

মৃত্যুর প্রান্তে দাঁড়ানো ভয়াবহ ঘোরটি মেয়েটির এখনো কাটেনি। তবে মৃত্যুর মুখ থেকে যে তাকে ফিরিয়ে আনল আরও চারটি মৃত্যু ঘটিয়ে, সেই লোকটি তার কাছে এখন সবচেয়ে বড় গবেষণার বস্তু।'

ওকারী গ্রামের প্রবীণ চাচার কথা তার মনে পড়ল তিনি ঠিকই বলেছেন, এই লোকটির মত একজন লোকের দেখা মিলবে, সেও কোনদিন ভাবেনি। মৃত

শত্রুর মানিব্যাগ তার পরিবারকে ফেরত দিতে হবে, এমন অদ্ভুত কথা কে বলতে পারে! চারজন শত্রু এবং চারটি রিভলবারের বিরুদ্ধে খালি হাতে বিজয়ী হওয়ার মত ঘটনা কে ঘটাতে পারে! ওকারী গ্রামের মানুষের গায়ে যাতে সন্দেহের আঁচড়ও না লাগে সে জন্যে সব দোষ নিজের ঘাড়ে তুলে নেয়ার কাজ একজন বিদেশী কিভাবে করতে পারে! মেয়েটির কাছে সবচেয়ে বড় মনে হলো, একজন যুবকের চোখ তার দিকে আটকে যাবার মত অবশ্যই সুন্দরী সে। কিন্তু এই যুবকের চোখ তার দিকে একবারও আটকায়নি। মনে হয়েছে, তার মত একজন সুন্দরী মেয়ে তার পাশে আছে, কাছে রয়েছে, এটা যেন সে দেখতেই পাচ্ছে না। কে এই লোক? প্রথমে ওর সাথে আসতে ভয় করেছিল। কিন্তু এখন আর ভয় করছে না। লোকটি মুসলমান সালাম দেয়া থেকেই বুঝা গেছে। কোন দেশের লোক সে? এশীয়ান তো অবশ্যই। কি করে লোকটি? ট্যুরিস্টদের মতই ব্যাগটা।

হঠাৎ মনে পড়লো মাকোনির কথা। মাকোনি তার অফিসে যাওয়া এক এশীয়ানের কথা বলেছিল। কিন্তু সেই এশীয়ানতো হয় মারা গেছে, নয়তো শয়তানদের হাতে পড়েছে। এ তাহলে কে?

আহমদ মুসার কথা মনে পড়ল মেয়েটির। মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠল

তার। একি আহমদ মুসা হতে পারে? তার কল্পনার, তার স্বপ্নের আহমদ মুসার সাথে মিলাল সে এই লোকটিকে। তার সমগ্র অন্তর বলে উঠল এই লোকটি একমাত্র আহমদ মুসা হলেই সব দিক থেকে মানায়। লোকটি সাধারণ হয়েও একেবারে অসাধারণ। কথা ও কাজে শুধু নয়, পবিত্র এক অপূর্ব সম্মোহন আছে তার চোখে-মুখে। যা মানুষকে শুধু কাছেই টানে। ক'মিনিটই বা হলো তাকে দেখার। তার মনে হচ্ছে, ওঁর কাছে নিজের সবকিছু তুলে দেওয়া যায়।

ছোট্র শব্দে গাড়ির হর্ণ বেজে উঠল।

মেয়েটি ভাবল, ‘ও তাহলে গাড়িতে ফিরেছে। তাকে ডাকছে।

উঠে দাঁড়াল মেয়েটি। পা বাড়াল সে গাড়ির দিকে।

কিন্তু পা বাড়াতে গিয়ে একরাশ সংকোচ ও লজ্জা এসে তাকে ঘিরে ধরল। হঠাৎ করেই লজ্জা করছে তার ঐ লোকটির মুখোমুখি হতে।

এক পা দু'পা করে মেয়েটি গাড়ির কাছে গেল।

গাড়িটি ফেরার জন্যে ঘুরিয়ে নিয়েছে আহমদ মুসা। গাড়ির এদিকের দরজা খোলা।

মেয়েটি দেখল, লোকটি ড্রাইভিং সিটে বসে আছে। নতুন পোশাক তার গায়ে। দু'হাত স্টিয়ারিং-এ রেখে সামনের দিকে তাকিয়ে বসে আছে সে।

মেয়েটি গাড়ির দরজার কাছে আসতেই আহমদ মুসা মেয়েটির দিকে এক পলকের জন্যে তাকিয়ে বলল, 'আসুন।'

মেয়েটি উঠে বসল।

সড়কে উঠে এল গাড়ি।

সড়কে উঠে গাড়ি দাঁড় করাল আহমদ মুসা। 'আপনাকে পৌঁছে দিতে চাই। বলুন, কোথায় পৌঁছাতে হবে। আপনার বাড়ি কোথায়?'দৃষ্টি সামনে প্রসারিত রেখে কথাগুলো বলল আহমদ মুসা।

মেয়েটি তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'আমার বাড়ি সিডি কাকেম গ্রামে।'

‘সিডি কাকেম গ্রামে!'বিস্মিত কণ্ঠে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার কথায় মেয়েটি চমকে উঠল। তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘চেনেন আপনি'সিডি কাকেম'গ্রাম?

‘চিনি না। কিন্তু আমি সেখানেই যাচ্ছি।'

চমকে উঠল মেয়েটি। তার মনের আকাশ থেকে একখন্ড মেঘ যেন সরে গেল। সব কিছু তার কাছে মুহূর্তে পরিস্কার হয়ে গেল।

বলে উঠল সে বিস্ময় বিজড়িত দ্রুত কণ্ঠে, 'আপনি কি আহমদ মুসা?'

চমকে উঠল আহমদ মুসাও। একটি অপরিচিতা মেয়ের মুখে তার নাম শুনে। এক মুহূর্ত ভাবল আহমদ মুসা। তার কাছেও বিষয়টা যেন পরিস্কার হয়ে গেল। বলল মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আহমদ মুসা, 'আপনি নিশ্চয় লায়লা জেনিফার?'

আহমদ মুসার মুখে নিজের নাম শোনার সাথে সাথেই মেয়েটি দু'হাতে মুখ ঢেকে উপুড় হয়ে দু'হাটুতে মুখ গুজল।

বাঁধ ভাঙা বিস্ময়, আবেগ ও আনন্দে সংজ্ঞাহীনের মত নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলল মেয়েটি। ঝর ঝর করে তার চোখ থেকে নেমে এল আনন্দের অশ্রু। আনন্দের অশ্রু কোত্থেকে যেন বাধ ভাঙা কান্না ডেকে নিয়ে এল।

ফুপিয়ে কাঁদল মেয়েটি ঐভাবে মুখ গুঁজে থেকে।

বুঝল আহমদ মুসা মেয়েটি লায়লা জেনিফার। কিন্তু স্তম্ভিত হলো মেয়েটি এইভাবে ভেঙে পড়ায়। হতে পারে, ভাবল আহমদ মুসা, কিছুক্ষণ আগের তার বিপদের কথা, হঠাৎ আহমদ মুসার দেখা পাওয়া ইত্যাদি বিষয় তাকে হয়তো আবেগ-প্রবণ করে তুলেছে।

আহমদ মুসা লায়লা জেনিফারকে লক্ষ্য করে বলল, 'লায়লা জেনিফার খুব খুশী হয়েছি তোমার সাথে এভাবে দেখা হওয়ায়।

আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা উচিত তিনি আমাদের সাহায্য করেছেন?'

জেনিফার ধীরে ধীরে মুখ তুলল। দু'হাত দিয়ে অশ্রু মুছে ফেলল। মুখ নিচু করেই বলল, 'আমি দুঃখিত। আমার সৌভাগ্য আমি সহ্য করতে পারিনি। ছোট বুকে এত বড় সৌভাগ্য ধারণ করতে পারিনি আমি। আপনার সাথে এইভাবে দেখা হবে, জীবনের এক চরম সন্ধিক্ষণে আমার জন্যে আল্লাহ আপনাকে এভাবে পাঠাবেন, এমন আশা সব কল্পনার উর্ধ্বে ছিল।'

'আল্লাহরই সমস্ত প্রশংসা।'

বলে আহমদ মুসা একটু থামল। বলল আবার, 'তোমার বাড়ির খবর ভালো? ওরা কারও ক্ষতি করেনি তো?'

'জি না। আমাকেই শুধু ওরা ধরে এনেছে। বাড়িতে আম্মা, দাদী ও চাকর-বাকর ছাড়া কেউ নেই এখন। বাড়ির কিংবা গ্রামের কেউ ওদের বাধা দিতে সাহস করেনি। তাই সেখানে কোন ঘটনা ঘটেনি।'নিচের দিকে চোখ রেখেই বলল লায়লা জেনিফার।

'সিডি কাকেম কোন দিকে? যেমন চলছিল, সেই উত্তর দিকেই গাড়ি চলবে?'

'জি। এ সড়ক আমাদের গ্রামের মধ্যে দিয়ে গেছে।'

শোনার সংগে সংগেই আহমদ মুসা গাড়ি স্টার্ট দিল।

চলতে শুরু করল গাড়ি।

‘লায়লা জেনিফার, ওরা কারা তোমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল?'আবার জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘ওরা সেই গোপন সংগঠনের লোক, যাদের কথা আমি আপনাকে লিখেছিলাম’।

‘আর কোন খুন হয়নি তো?'

‘আমার জানা মতে হয়নি।'

একটু থামল জেনিফার। সংগে সংগেই আবার শুরু করল, ‘মাকোনির অফিস থেকে ওরা একজন এশিয়ানকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। সে এশিয়ান যদি আপনি না হন, তাহলে সে তাদের হাতে মারাও যেতে পারে।'

‘সে এশীয়ানকে ওরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল কেন?'

‘তিনি মাকোনিকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেসকরেছিলেন। এতেই তারা ধরে নিয়েছিল সেই বিদেশী নিশ্চয় আমাদের তৎপরতার সাথে জড়িত আছেন।'

‘কিন্তু সেই বিদেশীর কথা তুমি জানলে কেমন করে?'আহমদ মুসা বলল কিছুটা বিস্ময় নিয়ে।

‘মাকোনি আমাকে জানিয়েছে। মাকোনি মুসলিম এবং আমাদের

সাথে আছে।'

‘বুঝেছি, শত্রু পক্ষ সামনে হাজির ছিল বলেই সেদিন আমাকে সহযোগিতা করতে পারেনি।'

‘কিন্তু আপনাকে বলার জন্যে সে আপনার পিছু নিয়েছিল। তার ফলেই আপনার পরিণতিটা সে জানতে পারে এবং আমাকে জানায়।'

‘বুঝা যাচ্ছে, ঐ শত্রু পক্ষ মাকোনির কাছে আসে। মাকোনি তাদের পরিচয় জানতে পারেনি?'

‘আমি কোথায় আছি এটা খোঁজ নেয়া ছাড়া তারা আর কোন কথায় বলে না। ওদের ফলো করতেও মাকোনি সাহস করেনি।'

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই লায়লা জেনিফার বলে উঠল, ‘আপনি ওদের আক্রমণে আহত সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিলেন। ওরা কি আপনাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল? আপনি ছাড়া পেলেন কিভাবে?'

‘কি করে কি হয়েছিল আমি কিছুই জানি না। আমার যখন সংজ্ঞা ফিরল, তখন দেখলাম আমি হাসপাতালে একটি ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের অত্যন্ত নরম বিছানায় শুয়ে আছি। পাশে বসে আছেন এক মহিলা ডাক্তার। পরে জানলাম তাঁর নাম ডাঃ মার্গারেট। তিনিই জানালেন, তাঁর ভাই জর্জ আমাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসে।'

‘আল্লাহর শোকর আপনি ভাল হাতে পড়েছিলেন। ডাঃ মার্গারেটের কোন তুলনা হয় না। আর জর্জের'সমাজ সেবা'তার সবচেয়ে প্রিয় হবি।'

‘হ্যাঁ ওরা খুব ভাল। ওদের বাসায় কয়েকদিন ছিলাম। জর্জই তোমার ঠিকানা দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছে।'

একটুক্ষণ চুপ করে থাকল লায়লা জেনিফার। বলল পরে, ‘কিন্তু আপনি বন্দরে না গিয়ে উল্টো পথ দিয়ে এলেন কেন?'

‘যতটা কম লোকের নজরে পড়ি, সেটা আমি চাই। বন্দরে নেমে একজন বিদেশী সিডি কাকেম গ্রামে যাচ্ছে, এটা আমি কাউকে জানাতে চাইনি।'

‘আপনি এসব চেয়েছেন। আর আল্লাহ চেয়েছেন আপনাকে দিয়ে আমাকে বাঁচাতে।'

‘ঠিক বলেছ।'

আবার নীরব হলো লায়লা জেনিফার।

অনেকক্ষণ পর বলল, ‘আপনি আমার পাশে বসে আছেন, আপনি গাড়ি ড্রাইভ করছেন, সবই স্বপ্ন মনে হচ্ছে আমার কাছে। অত্যন্ত নগণ্য এক বালিকার একটা ছোট্ট চিঠিকে আপনি এতটা গুরুত্ব দিয়েছেন?'

‘সেটা একটা ছোট্ট চিঠি ছিল, কিন্তু আমার কাছে তা ছিল হিমালয়ের মত ভারি। আর এমন চিঠি যিনি লিখতে পারেন, তিনি নগণ্য নন।'

আবার নীরব হলো লায়লা জেনিফার।

একটু পর বলল, ‘ছোটকে এমন বড় করে দেখতে পারেন বলেই

আল্লাহ আপনাকে এত বড় করেছেন।'ভারি কণ্ঠ লায়লা জেনিফারের।

আহমদ মুসা আলোচনা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, 'ওদের সম্পর্কে কিছু জানার আগেই ওদের সাথে লড়াই শুরু হয়ে গেল। মূল বিষয়টা আমার জানা দরকার। সে জন্যেই তোমার সাহায্য নিতে ছুটে এসেছি।'

হাসল লায়লা জেনিফার। বলল, 'জনাব মনে হচ্ছে কাজটা আপনার, গরজও আপনার, আমি বা আমরা সাহায্যকারী মাত্র।'

'জাতির কাজ সকলের কাজ। কিন্তু যেহেতু আমি এ কাজ নিয়েই এখানে এসেছি, তাই এটাই আমার একমাত্র কাজ, কিন্তু তোমাদের একমাত্র কাজ নয়।'

'কিন্তু কাজটা তো আমাদের?'

'না, এটা জাতির কাজ।'

লায়লা জেনিফার গম্ভীর হলো। বলল, 'এই জাতীয়তাবোধ কি কোথাও আছে? যদি থাকে, তাহলে ক্যারিবিয়ান মুসলমানদের এ দুর্দশা কেন?'

'জেনিফার, ক্যারিবিয়ান মুসলমানদের খবরই শুধু তুমি জান বলে এ কথা বলছ। কিন্ত গোটা বিশ্ব জুড়েই মুসলমানরা কমবেশি দুর্দশা ভোগ করে চলেছে।'

'আমাদের মত কি? ওকারী গ্রামে কিছুক্ষণ আগে যা ঘটল, ওটা যদি কোন ক্রমে প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাহলে ও গ্রামের উপর কিয়ামত নেমে আসবে। পুলিশ, আইন, আদালত কিছুই তাদের পাশে দাঁড়াবে না। মুসলিম দেশে বা মুসলিম জনবহুল দেশে মুসলমানরা ভালই আছে।'

'জেনিফার, তাদের বিপদটা তোমাদের থেকে ভিন্ন। একটু খোঁজ

নিলে জানতে পারবে, অধিকাংশ মুসলিম দেশেই ইসলামের আকিদা, বিশ্বাস নির্যাতনের শিকার। ইসলামের একনিষ্ঠ অনুসারী মুসলমানরা হত্যা, গুম, বন্দীদশা এবং সহায়-সম্পত্তির অপরিসীম ক্ষতির শিকার হচ্ছে। সেখানেও পুলিশ, আইন, আদালত তাদের কোন কাজে লাগে না।'

জেনিফারের মুখ বিস্ময়ে হা হয়ে গেল। বলল, 'একি বলছেন আপনি? এমন কেন হবে? কারা এসব করবে? সবাই তো মুসলমান।'

‘তোমাদের যারা জুলুম অত্যাচার করছে, তারা শ্বেতাংগ এবং খৃষ্টান। আর ঐসব মুসলিম দেশে যারা এসব করছে, তারা শ্বেতাংগ, খৃষ্টান বা পশ্চিমীদের তৈরী করা লোক, যারা নামে মুসলমান, কিন্তু কাজে শ্বেতাংগ খৃষ্টানদের চেয়ে বিপদজনক।'

কথা বলল না জেনিফার।

আহমদ মুসার কথা সে বুঝার চেষ্টা করছে। বলল সে অল্পক্ষণ পর, ‘আমাদের সমস্যার সমাধানের জন্যে আপনাদের ডাকি। কিন্তু ওদের এই বিরাট সমস্যার সমাধান কে করবে?'জেনিফারের কণ্ঠে হতাশার সুর।

‘তাদের এ সমস্যার সমাধান অন্য কেউ করতে পারবে না। সেখানে অবস্থা হল, দেশ জনগণের এবং জনগণ মুসলিম। তাদের দ্বারা বা তাদের সমর্থন ও সাহায্যেই সেখানে সরকার গঠিত হয় এবং টিকে থাকে। সুতরাং জনগণ অর্থ্যাৎ মুসলিম জনগণ যদি তাদের সমস্যা উপলব্ধি করে সচেতনভাবে ভোট দেয় এবং উপযুক্ত সরকার গঠন করে, তাহলে তাদের সমস্যার সামাধান হবে।'

‘ঐ উপলব্ধি করানোটা তো গুরুত্বপূর্ণ। ঐ কাজটা কে করবে?'

‘প্রত্যেক মুসলিম দেশেই ইসলামী আন্দোলন মানুষের চিন্তার পরিশুদ্ধি এবং তাদের সংগঠিত করার কাজ করছে। এখন তারা যত তাড়াতাড়ি জনগণের কাছে পৌছতে পারবে এবং জনগণ যত তাড়াতাড়ি তাদের গ্রহণ করতে রাজী হবে, তত দ্রুত হবে তাদের সমস্যার সমাধান।'

আহমদ মুসা থামল। থেমেই আবার শুরু করল, ‘জেনিফার তুমি

ওকারী গ্রামের বিপদের কথা বললে। সত্যই কি ঘটনাটা শত্রুর কান পর্যন্ত পৌঁছার সম্ভাবনা আছে?'

‘কোন সম্ভাবনা আমি দেখছি না। আমি'যদি'দিয়ে কথা বলেছি। যদি ফাঁস হয় তাহলে ওদের মারাত্মক বিপদ ঘটবে। অবশ্য সে বিপদটা একই সাথে বা তার আগে আমাদের উপরও আসবে।'

‘বুঝেছি, ওকারী গ্রামের খোঁজ-খবর রাখতে হবে জেনিফার।'

জেনিফার মাথা নেড়ে সায় দিল। বলল তারপর আনন্দের সাথে, 'আমরা এখন আমাদের গ্রামে প্রবেশ করেছি। দেখুন গ্রামের লোকজন বেরিয়ে এসেছে। এ গাড়িটা আমাদের। ওরা সবাই এ গাড়ি চেনে।'

আহমদ মুসা মনযোগ দিল সামনে।

গ্রামের প্রবেশ মুখে লোকজনদের ভীড়ে আহমদ মুসাকে তার গাড়ির গতি স্লো করতে হলো।

# ৫

জেনিফারদের বৈঠকখানা।

জেনিফারের দাদী, মা, জেনিফার এবং আহমদ মুসা বৈঠকখানায় বসে। বৈঠকখানার দেয়ালে বিরাট এক জাহাজের স্কেচ পাল তোলা জাহাজ। দেখেই আহমদ মুসা বুঝল জাহাজের স্কেচটা কোন পাকা হাতের

নয়। কোন অশিল্পীর আঁকা একটা শিল্প।

আহমদ মুসা উঠে গিয়ে জাহাজের স্কেচটা আরও ঘনিষ্ঠভাবে দেখল।

কিন্তু দেখতে গিয়ে আহমদ মুসা বিস্মিত হলো। স্কেচের নিচে পরিস্কার ভাষায় লেখা, 'ক্যাপ্টেন জোয়ান ডি লিওন-এর জাহাজ, যাতে আমি ওসমান এফেন্দী চীফ নেভীগেটর হিসাবে সফর করেছি।'অর্থ্যাৎ এ স্কেচটা শুধুই স্কেচ মাত্র নয়, এটা একটা ইতিহাস। যে ইতিহাস বিশ্বের নামকরা মিউজিয়ামে থাকার কথা।

বিস্মিত আহমদ মুসা আরও একটি কারণে। জোয়ান ডি লিওনের

বিখ্যাত জাহাজের চীফ নেভীগেটর ওসমান এফেন্দী ছিল একজন মুসলমান।

আহমদ মুসা স্কেচের সামনে দাঁড়িয়েই মাথা ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল সবাইকে লক্ষ্য করে, 'এই স্কেচ এখানে কেন? আপনারা কোথায় পেলেন?'

'কেন জিজ্ঞেস করছ ভাই?'বলল জেনিফারের দাদী।

'এই স্কেচটা তো এক অমূল্য ইতিহাস। এটা বিশ্বের কোন বিখ্যাত মিউজিয়ামে থাকা দরকার। আমার মনে হয়, তুরস্কের ইতিহাস যাদুঘর এটা পেলে লক্ষ লক্ষ ডলার দিয়ে কিনে নেবে।'

'কিন্তু ভাই, এটা মুল স্কেচ নয়। মুল স্কেচটা ছিল কাঠের। সেখান থেকে আমাদের কোন এক পূর্বপুরুষ কাউকে দিয়ে হুবহু নকল করিয়ে নিয়েছেন। আমরা বংশ পরম্পরায় এটা সংরক্ষণ করে দুধের সাধ ঘোলে মিটাচ্ছি।'

আহমদ মুসা তার সোফায় ফিরে এল। বলল, ‘দাদিজান, আপনার কথা বুঝলাম না।'

‘ঐ কাঠের উপরে আঁকা স্কেচটার উত্তরাধিকারী আমরা। আমাদের কাছে ওটা থাকা উচিত ছিল। কিন্তু আমরা নকল নিয়েই তুষ্ট আছি।'

‘কিন্তু ওসমান এফেন্দীর ঐ স্কেচের উত্তরাধিকার সকল মুসলমান। বিশেষভাবে আপনারা দাবী করছেন কেন?'

হাসল জেনিফাররা সবাই। বলল জেনিফারের দাদী, 'কারণ আমরা, মানে আমাদের পরিবার, ওসমান এফেন্দীর উত্তর-পুরুষ।'

একটা বিস্ময় আছড়ে পড়ল আহমদ মুসার চোখে-মুখে। বলল সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে, 'সত্যি? সত্যিই কি আমি ষোড়শ শতকের সমুদ্র বিহারী ওসমান এফেন্দীর বংশধরদের আমার সামনে দেখছি। তিনি গ্রান্ড টার্কস বসতি গড়েছিলেন?'

'না, তিনি গ্রান্ড টার্কস-এ বসতি গড়েননি কিংবা বাস করেননি। তিনি বসতি স্থাপন করেছিলেন বাহামার সানসালভাডোরে। বিয়েও করেছিলেন এক রেড ইন্ডিয়ান কন্যাকে। কিন্তু সানসালভাডোরে বাস করতে পারেননি তাঁর বংশধররা। বৃটিশরা যখন বসতি স্থাপন করতে এল সানসালভাডোরে, তখন তাঁরা বিতাড়িত হলেন। শুনেছি, সেখান থেকে উচ্ছেদ হয়ে তারা বসতি স্থাপন করেছিলেন বাহামারই ক্রুকড দ্বীপে। পরবর্তীকালে সেখান থেকেও উচ্ছেদ হতে হয় তাদের। অবশেষে তারা আসেন তাদের পূর্ব পুরুষের প্রথম পদচিহ্ন ধন্য এই টার্কস দ্বীপপুঞ্জের এই সাউথ টার্কো দ্বীপে।'বলল জেনিফারের দাদী।

‘ওসামন এফেন্দী কি প্রথম নেমেছিলেন এই দ্বীপে?'বলল আহমদ মুসা।

‘হ্যাঁ, ভাই। বলতে পার এটা ছিল মহান অভিযাত্রী ক্যাপ্টেন জোয়ান পঞ্চ ডে লিওন-এর উদারতা। তিনি কলম্বাসের মত মুসলিম বিদ্বেষী ছিলেন না। কলম্বাস তার সমুদ্র যাত্রায় মুসলিম কুশলীদের সাহায্য নিয়েছিলেন বাধ্য হয়ে। কিন্তু তিনি তাদের নাম পাল্টে অমুসলমান বা ধর্মান্তরিত হিসাবে দেখিয়েছিলেন। কিন্তু জোয়ান ডি লিওন এই নীচতা দেখাননি।'

বলে একটা লম্বা দম নিল জেনিফারের দাদী। তারপর আবার শুরু করল, ‘১৫১২ সালের এক শুভ্র প্রত্যুষে জোয়ান ডি লিওনের জাহাজের চোখে এই দ্বীপপুঞ্জের অস্তিত্ব ধরা পড়েছিল। এই দ্বীপপুঞ্জে প্রথম ল্যান্ড করার সম্মান জোয়ান ডি লিওন তাঁর চীফ নেভিগেটর তুর্কি ওসমান এফেন্দীকে দিতে চেয়েছিলেন। একটা বোটে করে ওসমান এফেন্দীকে পাঠিয়েছিলেন দ্বীপে ল্যান্ড করার জন্যে। ওসমান এফেন্দী প্রথম দ্বীপে ল্যান্ড করেন। তিনি যেখানে ল্যান্ড করেন, সেটাই এখন এই দ্বীপপুঞ্জের প্রধান বন্দর। এই জায়গাটারও নামকরণ তিনিই করেন। নামটা এখন বিকৃত করে ফেলা হয়েছে...'

জেনিফারের দাদীর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে আহমদ মুসা বলল, ‘আমারও তাই মনে হয়েছে।'সুসুলামা'কোন স্প্যানিশ শব্দ নয় বলে আমি মনে করি।'

'বলছি, শোন। আমি আমার শ্বশুরের কাছে শুনেছি, সেই সময় ওসমান এফেন্দীর দেশ তুরস্কে'সুলতান সুলায়মান'নামে মহামতি এক বাদশাহ ছিলেন। ওসমান এফেন্দী তাঁর নামে বন্দরের জায়গার নাম রাখেন ‘সুলতান সুলায়মান’, যা বিকৃত হয়ে এখন হয়েছে ‘সুসুলামা’। এর সাথে পরবর্তীকালে যোগ হয়েছে ‘জোয়ান ডি’।

‘আল্লাহু আকবর। দাদিজান ‘সুলতান সুলায়মান'-এর নাম এতদূর পর্যন্ত এসেছে। তিনি ইতিহাসে একজন শ্রেষ্ঠ মুসলিম সুলতান ছিলেন। ভূমধ্য সাগরে তাঁর নৌবহর ছিল অপ্রতিদ্বন্দী।এই কারণে তাকে সাগর-অধিপতিও বলা হতো। তুরস্কের এই সুলতান বলা যায় সমগ্র মধ্য ইউরোপ পদানত করেন। ১৫২৯ সালে তিনি হ্যাংগেরী পেরিয়ে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনার দরজা পর্যন্ত পৌছান। এই দুর সূদুরের একটি বন্দরের সাথে তার নাম জড়িয়ে আছে।'আহমদ মুসা বলল।

‘জোয়ান ডি লিওনের এটা মহানুভবতা এবং ওসমান এফেন্দীর এটা স্বজাতি প্রীতি। শুধু তাই নয়, ওসমান এফেন্দী তুর্কি ছিলেন বলে এই দ্বীপপুঞ্জের নামকরণ করা হয় টার্কস বা টার্কো দ্বীপপুঞ্জ।'বলল জেনিফারের দাদী।

‘আমি বন্দরে বাতিঘরের ‘স্মারক প্লেটে’ বাতিঘরের মূল প্রতিষ্টাতা ‘ও, এফেনডিও-এর নাম দেখলাম। ও, এফেনডিও অর্থ্যাৎ ওসমান এফেন্দীই তাহলে ছিলেন বাতিঘরের প্রথম প্রতিষ্টাতা।'

‘হ্যাঁ ভাই। শুনেছি, উনি দ্বীপে নেমে তাবু গেড়ে ৭ দিন দ্বীপে অবস্থান করেন। যেখানে তিনি ছিলেন, সেটাই এখন রাজধানী গ্রান্ড টার্কস।'থামল জেনিফারের দাদী।

আহমদ মুসাও এ সময় কোন কথা বলল না। ভাবছিল সে। এক সময় ধীরে ধীরে আহমদ মুসা বলল, 'আপনারা বাহামার সানসালভাডোর থেকে ক্রুকড দ্বীপে, সেখান থেকে এলেন টার্কস দ্বীপপুঞ্জে। এখানেও মনে হচ্ছে এক নতুন বিপদ ঘনিয়ে আসছে।'

‘কি সেটা তুমি কি বুঝতে পারছ বাছা?'বলল জেনিফারের মা।

‘জেনিফারের কাছে যা শুনেছি এবং আমিও এ দ্বীপপুঞ্জে এসে যতটা শুনলাম তাতে আমি বুঝতে পারছি, পুরুষ শিশু হত্যার মাধ্যমে মুসলমানদের সংখ্যা কমানোই শুধু নয়, মুসলিম জাতি সত্তাকে বিকৃত ও পরিবর্তিত করারও প্রয়াস এটা। মুসলিম পুরুষের যদি অভাব ঘটে, মুসলিম মেয়েরা অন্য জাতির পুরুষকে যদি বিয়ে করতে বাধ্য হয়, তাহলে ধীরে ধীরে মুসলিম জাতির অস্তিত্ব এ দ্বীপপুঞ্জ থেকে আপনা থেকেই মুছে যাবে।'

‘এ তো পয়জনিং-এর মত ভয়াবহ ষড়যন্ত্র।'জেনিফারের মা-ই

বলল।

‘ঠিক বলেছেন খালাম্মা। তবে আমার মনে হচ্ছে, ষড়যন্ত্রটার গভীরতা আমরা আঁচ করতে পারছি না। এ ষড়যন্ত্রের গোড়া টার্কস দ্বীপপুঞ্জে প্রোথিত আছে, তা মনে হয় না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল জেনিফারের দাদী। বলল, 'শান্তি আমাদের জীবনে আর এল না।'

‘পৃথিবীতে ভালো-মন্দের লড়াই যতদিন থাকবে, মানুষের জীবনে ততদিন শান্তির পাশে অশান্তিও থাকবে।'বলল আহমদ মুসা।

জেনিফারের আম্মা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'তোমরা বস। ওদিকে একটু কাজ আছে, রাত অনেক হয়ে গেল।'

কথা শেষ করে সে হাঁটতে শুরু করল।

জেনিফারের দাদিও উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আর পারছি না বসতে। যাই, না শুয়ে আর হচ্ছে না।'জেনিফারের দাদীও চলে গেল জেনিফারের মায়ের পিছু পিছু।

ওরা উঠে গেলে জেনিফার এসে সোফায় আহমদ মুসার পাশে বসতে বসতে বলল, 'এ ষড়যন্ত্রের গোড়া কোথায় থাকতে পারে বলে আপনি মনে করেন?'

আহমদ মুসা প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে জেনিফারের পাশ থেকে উঠে পাশের সিংগল সোফাটায় গিয়ে বসল।

হঠাৎ লায়লা জেনিফারের চোখ দু'টি চঞ্চল হয়ে উঠল। মুখে প্রথমে বিস্ময়, তারপর তাতে অপমানের চিহ্ন ফুটে উঠল। অপমান অতঃপর তার চোখ ছল ছল অশ্রতে রূপ নিল। লায়লা জেনিফার কিছুক্ষণ পাথরের মত স্থির থেকে দু'হাতে মুখ ঢাকল।

আহমদ মুসা অপ্রস্তুত হয়ে গেল জেনিফারের এই পরিবর্তনে। আহমদ মুসা জেনিফারকে কয়েকবার ডাকল। জিজ্ঞেস করল তাকে, কি হয়েছে তার।

জেনিফার কোন উত্তর দিল না।

অবশেষে আহমদ মুসা একটু শক্ত কণ্ঠে বলল, 'জেনিফার এসব কি হচ্ছে? এ কান্নার অর্থ কি?'

জেনিফার এবার মুখ তুলল। অশ্রু ধোয়া তার মুখ। বলল, 'আমরা ক্ষুদ্র, সামান্য কিন্তু এই সত্য কথাটা কি এভাবে না বললেই নয়?'

'কি বলছ তুমি জেনিফার? আমি কিছুই বুঝলাম না।'ভ্রু-কুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার।

'আমরা অপমানিত হবার মত অবশ্যই। কিন্তু অপমান করার মত আপনি নন। আপনি অনেক...অনেক বড়।'অশ্রু বিজড়িত কণ্ঠে বলল জেনিফার।

বিব্রত বোধ করল আহমদ মুসা। বলল, 'অপমানিত হওয়া বা করার কথা আসছে কি করে! আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'সকালে কম্যুনিটি সেন্টারে যাবার সময় আমি আপনার পাশে বসলে আপনি উঠে গিয়ে অন্য জায়গায় বসেছিলেন। আবার এখন আপনার পাশে বসলাম, আপনি সংগে সংগে উঠে গিয়ে ওখানে বসলেন। কেন আমি এতটাই কি...।'

কথাটা শেষ করতে পারলো না জেনিফার। কান্নায় আটকে গেল

তার কথা।

আহমদ মুসা সশব্দে হেসে উঠল।

হাসির শব্দে জেনিফার মুখ তুলে তাকাল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসার হাসির শব্দ মিলিয়ে গেল। ধীরে ধীরে গম্ভীর হয়ে এল আহমদ মুসার মুখ। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'তুমি বিষয়টাকে এভাবে নিয়েছ, এ জন্যে আমি দুঃখিত। আসলে কিছু বিষয় তোমাকে শেখাবার জন্যেই আমি ওরকম করেছি।'

'শেখাবার জন্যে? কি শেখাবার জন্যে?'বলল বিস্মিত কণ্ঠে জেনিফার।

'শেখার সুযোগ নেই বলে ইসলামের অনেক কিছুই তুমি এবং তোমরা জান না। ইসলামী সমাজে যাদের সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ শুধুমাত্র তাদের সাথে ছাড়া অন্যদের সাথে মুসলিম মেয়েরা যথেচ্ছা মিশতে পারে না, একান্তে সাক্ষাত করতে পারে না, স্বাভাবিক চলাফেরা কালেও ঘনিষ্ঠ হতে পারে না। এই বিধান চাচাতো, ফুফাতো, মামাতো ভাই থেকে শুরু করে প্রতিবেশী ও অপরিচিত সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।'বলল আহমদ মুসা।

'তার মানে আমি আপনার পাশে ঐভাবে বসতে পারি না, এই তো?

ধন্যবাদ।'গম্ভীর কণ্ঠে বলল জেনিফার।

কিন্তু তোমার মনের মেঘ কাটেনি জেনিফার?'

'ইসলামের বিধান আমাদের অবশ্যই মানতে হবে। কিন্তু বাস্তবে কি এটা মানা হয়?'বলল জেনিফার আত্মপক্ষ সমর্থনের সুরে।

‘বাস্তব অবস্থা হলো, বেশির ভাগ লোক এটা মানেন না, মানেন কম লোক। কিন্তু এটা সুস্থতা নয়, মুসলমানদের আধঃপতনের একটা দৃষ্টান্ত এটা।'

‘আমি দুঃখিত আমার ব্যবহারের জন্যে।'

বলে একটু দম নিল জেনিফার। বলল আবার, ‘অনেক সময় আমি মনে রাখতে পারি না যে, আমার চাওয়া যতবড়, আমি তত বড় নই।'

আহমদ মুসার ঠোঁটে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটে উঠল। বলল, 'আজ বিকেলে আমি আমার স্ত্রীর সাথে টেলিফোনে আলাপ করেছি। তাকে বলেছি, জেনিফারকে যতটা ভেবেছিলাম তার চেয়েও ভাল এবং বুদ্ধিমতি সে।'

আহমদ মুসার এ কথার সাথে সাথে জেনিফারের চোখে-মুখে একটা চমকে উঠা ভাব ও বিব্রতকর অবস্থার একটা চিহ্ন ফুটে উঠল।

কথা বলতে একট দেরী করল জেনিফার।সম্ভবত নিজেকে সামলে নিল সে। বলল একটু পর, ‘আপনার স্ত্রী আছে? কোথায় তিনি?'

‘হ্যাঁ জেনিফার। মদীনা শরীফে তাকে রেখে এসেছি।'

আবারও নীরবতা জেনিফারের। তার মুখ নিচু।

তার মুখের বিব্রত ভাব কেটে গেছে। কিন্তু সেখানে যেন স্থান করে নিয়েছে কিছুটা হতাশার বেদনা।

বলল এক সময় গম্ভীর কণ্ঠে, ‘আপনি ভাল এবং সবাইকে ভাল দেখেন। তাই তার কাছে আমাকে অমন ভাল বলতে পেরেছেন।'

আহমদ মুসার ঠোঁটে আবার এক টুকরো হাসির রেখা ফুটে উঠল।

বলল, ‘জর্জ কিন্তু তোমাকে আরও ভাল বলে, আরও ভাল জানে জেনিফার।'

চমকে উঠল জেনিফার। তাকাল আহমদ মুসার দিকে গভীর ভাবে।

বলল, 'জর্জ কিছু বলেছে বুঝি? জর্জের এটা বাড়াবাড়ি।'ক্ষোভ ফুটে উঠল তার স্বরে।

‘জর্জ আমাকে কিছু বলেনি। কিন্তু তাদের দুই ভাই-বোনের আলোচনায় বুঝেছি, জর্জ তোমাকে অনেক বড় ও শ্রদ্ধার চোখে দেখে। তার বোনের আস্থা

তোমার প্রতি অগাধ। ক'দিন ওদের সাথে ছিলাম। দেখেছি, জর্জ খুবই ভাল ছেলে।'

'ভালো ছেলে, কিন্তু ভিন্ন বিশ্বাসের, ভিন্ন জাতের।'

'বিশ্বাস অপরিবর্তনীয় নয় জেনিফার। আমার বুঝা যদি বেঠিক না হয়, তাহলে বলবো ওরা দু'ভাই-বোনই ইসলামের প্রতি অনুরক্ত। আর জাতের ব্যাপারটা কিছুই নয়। লক্ষ লক্ষ শ্বেতাংগ মুসলমান চিন্তা, চরিত্র ও যোগ্যতায় মুসলিম সমাজের নেতার আসনে উন্নীত হয়েছেন।'

'কিন্তু জর্জের ঐ সব কথা বলে বেড়ানোর অভ্যাস আছে।'

জেনিফারের কণ্ঠ এবার অনেকটা দুর্বল।

'জর্জকে দেখে কিন্তু আমার এমনটা মনে হয়নি। সে খুব রিজার্ভ ছেলে।'

'জর্জ আপনাকে যাদু করেছে।'

'কেন যাদু করবে? আমার বোনকে যাতে রাজী করাই, এ জন্যে?'

'ভাইয়া, তাহলে আমি উঠলাম।'

বলে উঠে দাঁড়াচ্ছিল জেনিফার। তার কণ্ঠে কৃত্রিম রাগ। মুখ তার লজ্জায় আরক্ত।

ঠিক এই সময় বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হলো।

জেনিফার চলতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল।

তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বাইরের দরজার দিকে এগুলো খোলার জন্যে।

আহমদ মুসা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। বলল, 'দাঁড়াও জেনিফার, আমি দেখছি।'

আহমদ মুসা গিয়ে দরজা খুলল।

দরজা খুলেই চমকে উঠল আহমদ মুসা দরজায় দাঁড়ানো আবাবাকা অর্থ্যাৎ আবু বকর ও তার আব্বা সেই প্রৌঢ় ব্যক্তিকে দেখে।

আবু বকরই দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল। তার পেছনে তার পিতা।

'কি ব্যাপার আবু বকর, তোমরা?'

'স্যার খুব জরুরী খবর আছে। সেটা জানাতে এসেছি।'

আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়িয়ে জেনিফারকে বলল, ‘তুমি একটু ভেতরে যাও। এঁরা বৈঠকখানায় বসবেন।'

জেনিফার বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে ভেতরের দরজার আড়ালে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা আবু বকর ও তার আব্বাকে ভেতরে নিয়ে এল।

তাদেরকে বসার জন্যে সোফা দেখিয়ে দিয়ে নিজে সোফায় বসল।

আবু বকর ও তার আব্বা সোফায় না বসে মেঝেয় ম্যাটের উপর বসে পড়ল।

আহমদ মুসা তাদের দিকে চেয়ে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, ‘আবু বকর তোমরা দেখছি আগের মতই আচরণ করছ। তোমরা না ইসলামে ফিরে এসেছ! ইসলামে কি সবাই ভাই ভাই নয়? দেখ তোমরা সোফায় উঠে না বসলে আমিও তোমাদের সাথে মেঝেতে বসব।'

সংগে সংগেই তারা দু'জন উঠে সোফায় বসল। তারপর আবু বকর বলল, 'মাফ করুন অভ্যাস বদলাতে সময় লাগবে।'

‘এবার বল, জরুরী খবরটা কি?'

আবু বকর নড়ে-চড়ে বসল। তার মুখ গম্ভীর হলো। সেই গম্ভীর মুখে দেখা দিল প্রবল ভয়ের চিহ্ন। সে বলতে শুরু করল, 'আমরা আপনাকে নামিয়ে দেবার পর স্থানীয় কয়েকজন জেলের সাথে চুক্তিতে এসেছিলাম। দু'দিন মাছ ধরার কাজ শেষে আজ সন্ধ্যায় ঘাটে ফিরে আসি। আমরা ঘাটে ফেরার পর দেখলাম, আগে থেকে দাঁড়ানো সেই স্টিম বোটটির পাশে আরেকটা মাঝারি আকারের বোট এসে দাঁড়াল। ওদের মধ্যে যে কথা শুনলাম তা ভয়াবহ।' একটু থামল আবু বকর।

আবু বকর থামতেই আহমদ মুসা বলল, 'কি সেটা?'

শুরু করল আবার আবু বকর, 'শুনলাম, দু'দিন আগে একজন পথিক দ্বীপের ভেতরে যাওয়ার সময় সে দূর থেকে দেখেছে, ওকারী গ্রামের মসজিদের কাছে চারজন শ্বেতাংগকে হত্যা করেছে একজন এশীয়ান। মসজিদের সামনে গ্রামের লোকজন দাঁড়িয়েছিল। এশীয়ান লোকটি নাকি চারজনকে হত্যা করে একজন মেয়েকে উদ্ধার করে অটো হুইলারে চড়ে দ্বীপের ভেতরে চলে যায়।

পথিক লোকটি ভয়ে ঘাটে ফিরে আসে। তার কাছ থেকে স্টিম বোটের লোকটি জানতে পারে ঘটনাটি। ঐ চারজন শ্বেতাংগ বোটের লোকটিরই সাথী ছিল। সে খবর জানার পর তার লোকদের দ্রুত এ দ্বীপে আসার খবর দিয়ে খবর সংগ্রহের জন্যে সে বের হয়। তারা জানতে পেরেছে, এশীয়ান লোকটি যে মেয়েটিকে উদ্ধার করেছে সে সিডি কাকেম গ্রামের এফেনডিও পরিবারের মেয়ে এবং এশীয়ানটি ঐখানেই আছে। এই আলোচনা শুনেই বুঝেছি আমরা ঐ এশীয়ান আপনিই হবেন।' আবার একটু থামল আবু বকর মোহাম্মদ।

'এটাই সেই ভয়াবহ সংবাদ?' বলল আহমদ মুসা।

'না স্যার, বলছি।'

বলে আবার শুরু করল, 'আমরা ওদের যে ষড়যন্ত্র শুনে এলাম তা হলো, 'আজ রাত ১২টার দিকে ওরা এই বাড়িটার উপর হামলা চালাবে। ধরে নিয়ে যাবে আপনাকে এবং জেনিফার নামে একটি মেয়েকে। ফেরার পথে ওরা ওকারী গ্রামের উপর আক্রমণ করবে রাত ৩টার দিকে। ঐ সময় ওদের আরেকটি গ্রুপ ঘাটের দিক থেকে এসে ওদের সাথে মিলিত হবে। ঐ গ্রুপটি আজ রাতে বাইরে কোথাও থেকে ঘাটে এসে পৌছবে।'

আবু বকর থামলে আহমদ মুসা শান্ত কণ্ঠে বলল, 'তোমরা যে মোটর বোটকে ঘাটে আসতে দেখেছ তাতে ক'জন লোক আছে তোমাদের অনুমান?'

'শুনেছি ওরা দশজন।' বলল আবু বকর।

'আগের বোটে ছিল একজন। তাহলে এগার জন।'

বলে আহমদ মুসা একটু থেমে বলল, 'তোমরা তো খাওয়া-দাওয়া করনি। তোমরা হাত-মুখ ধুয়ে নাও।' বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

'খাওয়ার কথা চিন্তা করছেন কেন? আর তো এক ঘন্টা সময় আছে। এখন কি হবে বলুন।' উদ্বেগাকুল কণ্ঠে বলল আবু বকর।

'এক ঘন্টা অনেক সময়। তোমরা আগে খেয়ে নাও।'

বলে আহমদ মুসা ভেতরের দরজার দিকে লক্ষ্য করে বলল, 'জেনিফার দু'জন মেহমানের খাওয়ার ব্যবস্থা কর।'

দরজার আড়ালে জেনিফারের পাশে তার মা'ও এসে দাঁড়িয়েছিল।

জেনিফারের সাথে সাথে তার মাও শুনেছিল সব কথা।

ভয়ানক খবরটায় কাঁপছিল জেনিফার।

তার মায়ের মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল।

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই আবু বকর এবং তার পিতা এক সাথেই বলে উঠল, 'এ সময় আমাদের পেটে কিছু ঢুকবে না, আমরা খেতে পারব না। আপনি খাওয়ার চিন্তা বাদ দিয়ে এখন কি করণীয় বলুন। বাড়ি থেকে সরতে হলে, তার ব্যবস্থা তো এখনই করতে হবে।'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'এত ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই। আগে নিশ্চিন্তে বসে তোমরা খেয়ে নাও।'

আবু বকর এবং তার আব্বা বিস্ময়ে বিস্ফোরিত চোখে তাকাল আহমদ মুসার দিকে।

ওদিকে জেনিফার এবং ওর আম্মারও বিস্ময়ে কাঠ হয়ে যাবার অবস্থা। এই ভয়ানক খবর শুনে এবং এক ঘন্টা পর ভয়াবহ এক দূর্যোগ আসছে জেনেও আহমদ মুসা হাসছে।

আহমদ মুসা দু'জন আগন্তুককে খাওয়াবেই, এই কথা বুঝে জেনিফার তার মাকে কম্পিত কণ্ঠে বলল, 'আম্মা খাবার টেবিলে দু'জনের খাবার যে দিতে হয়।'

'দেব, দিচ্ছি। কিন্তু আহমদ মুসা কিছু ভাবছেন না কেন?'

'হয়তো ভাবছেন।'

'হবে হয়তো। আহমদ মুসা আগুনের উপর দাঁড়িয়ে হাসতে পারেন। আমরা তা পারব কি করে?'

আহমদ মুসা একটা কাসি দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল।

কাসির শব্দ পেয়েই জেনিফার এবং তার মা তাড়াতাড়ি মাথার উপর চাদর টেনে দিল।

আহমদ মুসা ভেতরে প্রবেশ করতেই জেনিফারের মা প্রায় কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলল, 'সব শুনেছি বাছা। এখন কি হবে?'

'খালাম্মা আল্লাহর উপর ভরসা করুন, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'দু'দিন আগেই তো একটা ঘটনা ঘটল। খুব ভয় করছে বাছা।'

'ভয় করলে তো আমরা দুর্বল হয়ে পড়ব খালাম্মা। কোন ভয় নেই। আল্লাহর শক্তি সব শক্তির চেয়ে বড়।'

'তুমি কি ভাবছ? আমরা সবাই বাড়িতে থাকব কিনা? কিংবা কি করতে হবে আমাদের?

'কিছুই করতে হবে না খালাম্মা। আপনারা সবাই বাড়িতে থাকবেন। অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে যারা আসবে, তাদের ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দিন।'

'গতবার এসেছিল চারজন, এবার নাকি অনেক আসছে।'

'অনেকই আর কি। তবে দশজনের বেশি নয়।'

'ওদের হাতে তো বড় বড় অস্ত্রও থাকবে।'

' সেটা ভাল। ও অস্ত্রগুলো পরে আমাদের কাজে লাগবে।'

জেনিফার এবং তার মা বিস্মিত দৃষ্টিতে আহমদ মুসার দিকে তাকাল। এত বড় বিপদ সামনে রেখে এত নিশ্চিন্ত, এমন নিশ্চিত কণ্ঠে কথা বলা কিভাবে সম্ভব? কি কি ঘটতে যাচ্ছে, কি হবে, এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকলেই শুধু একজন নিশ্চিন্ত থাকতে পারে। তারা আহমদ মুসাকে আর কি বলবে খুঁজে পেল না।'

অবশেষে জেনিফারের মা বলল, 'ওদের খাবার দিচ্ছি। ওরা কারা বাছা? খুব উপকার করল আমাদের।'

'ওদের বোটে করে আমি এই দ্বীপে এসেছিলাম। সেই সূত্রে পরিচয়। ওরা খৃষ্টান ছিল, কিন্তু ওদের পূর্ব পুরুষ ছিল আফ্রিকার 'গাম্বিয়া' দেশের একটি বিখ্যাত মুসলিম পরিবার। ওদের কাছে পাওয়া একটা দলিল থেকে জেনে একথা ওদের বলি। শুনেই ওরা ইসলামে পুনরায় ফিরে এসেছে।'

'আলহামদুলিল্লাহ।' এক সাথেই বলে উঠল জেনিফার এবং তার মা।

জেনিফার আনন্দ-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল, 'ভাইয়া আপনার আগমনে টার্কস দ্বীপপুঞ্জে নতুন বাতাস বইতে শুরু করেছে। এই ঘটনা তার একটা প্রমাণ।'

'আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর জেনিফার।'

'আলহামদুলিল্লাহ।' বলল জেনিফার।

জেনিফারের মা খাবারের ব্যবস্থা করতে চলে গেল।

আহমদ মুসা প্রবেশ করল পাশেই তার ঘরে।

জেনিফারও নিঃশব্দে আহমদ মুসার পিছে পিছে তার ঘরে প্রবেশ করল।

কিন্তু প্রবেশ করেই জেনিফার জিব কেটে তেমনি নিঃশব্দে দ্রুত বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তার মনে পড়েছে, এভাবে একাকী অন্য লোকের সাথে কোন ঘরে প্রবেশ করা ইসলামে নিষিদ্ধ। আহমদ মুসা এটা দেখতে পেলে ভীষণ রাগ করবেন।

বাইরে এসে দরজায় দাঁড়াল জেনিফার।

আহমদ মুসা ঘরে প্রবেশ করেই সাইড টেবিল থেকে ব্যাগটা নিয়ে মেঝেয় রাখল। ব্যাগ খুলে বের করল ওকারী গ্রামের সংঘর্ষ থেকে কুড়িয়ে পাওয়া চারটি রিভলবার।

চারটি রিভলবারই চেক করল আহমদ মুসা।

একটি রিভলবারেই ছয়টি গুলী ভর্তি করে রাখা আছে। অন্য তিনটি খালি।

আহমদ মুসা ব্যাগ থেকে গুলী বের করে মেঝেয় রুমালের উপর রাখল।

দরজায় শব্দ পেয়ে আহমদ মুসা মুখ তুলে তাকাল দরজার দিকে।

দেখল, জেনিফার দরজায় ঠেস দিয়ে বিস্ফোরিত চোখে তাকিয়ে আছে রিভলবারগুলোর দিকে।

আহমদ মুসা তার দিকে তাকাতেই জেনিফার মাথার ওড়নাটা কপালের উপর টেনি দিয়ে বলল, 'ভাইয়া আমি একটু বাইরে দাঁড়িয়ে দেখছি।

আহমদ মুসা ঐ প্রশ্নের কোন উত্তর নাদিয়ে বলল, 'ভাল, দেখ। রিভলবারের ব্যবহার তোমাদেরও শিখতে হবে।'

বলে আহমদ মুসা মনযোগ দিল তার কাজের দিকে। রুমালের উপর থেকে গুলী তুলে এক এক করে রিভলবারে ভরতে শুরু করল।

আহমদ মুসা কথা শেষ হতেই জেনিফার বলে উঠেছিল, 'নেভিগেটর ওসমান এফেন্দীর বংশধররা কি যুদ্ধ করতে পারে?'

আহমদ মুসা কাজ অব্যাহত রেখে না তাকিয়েই বলল, 'নেভিগেটর তুর্কি ওসমান এফেন্দী কার বংশধর জান?'

'জি না।' বলল জেনিফার।

'তুর্কি সাম্রাজ্যের ওসমানিয়া খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা ওসমান (প্রথম)-এর বংশধর। এই তুর্কি সাম্রাজ্য সম্পর্কে জান?'

'জানি না।'

'এই তুর্কি সাম্রাজ্য ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার বিশাল এলাকা নিয়ে গঠিত ছিল। সাত'শ বছর তারা রাজত্ব করে। এই সাম্রাজ্যের তুর্কি সেনাবাহিনী সম্পর্কে কিছু জান?'

'দুঃখিত, জানি না।'

‘সেই তুর্কি সাম্রাজ্য এখন আর নেই। কিন্তু তুর্কি সৈন্যবাহিনীর নাম শুনলে এখনও ইউরোপীয়রা চোখে বিভীষিকা দেখে। এই সাম্রাজ্য শাসনকারী রাষ্ট্রনায়কও এই তুর্কি সেনাবাহিনীরই উত্তরসুরী। এখন বল যুদ্ধ তোমার সাজবে কিনা?

হাসল জেনিফার। বলল, 'ভাইয়া মনে হয় আপনি মরা মানুষের মনেও আসার আগুন জ্বালাতে পারবেন।'

‘জেনিফার আশার প্রজ্জ্বলন এখন খুব বেশি প্রয়োজন। পশ্চিমী ঔপনিবেসিক শাসন এবং পশ্চিমের প্রযুক্তি, বিশ্বাস, অর্থ ও সামরিক শক্তি মুসলমানদেরকে তাদের নিজেদের ভবিষ্যত বিষয়ে হতাশার সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছে। আজ তারা ইতিহাস জানলে তাদের আত্মপরিচয় তাদের কাছে পরিস্কার হবে। আত্ম-পরিচয় তাদের মনে আশার সৃষ্টি করবে। আশা নিয়ে আসবে আত্মবিশ্বাস এবং আত্মবিশ্বাসই করতে পারে তাদেরকে বিজয়ের পথে পরিচালিত।'

জেনিফার মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল আহমদ মুসার দিকে।

জেনিফারের মনে হলো, আহমদ মুসার কথাগুলো যদি কোন এক বিশ্ব মাইক যোগে বিশ্বের সব মুসলমানের কানে পৌছে দেয়া যেত! প্রশ্ন জেগে উঠল জেনিফারের মনে, আহমদ মুসার যোদ্ধা রূপ বড়, না তার এই মিশনারী রূপ বড়।

আহমদ মুসার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল।

জেনিফারকে নীরব দেখে বলল, 'নীরব কেন জেনিফার?'

বলে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা রিভলবার চারটি কোট ও প্যান্টের চার পকেটে রেখে।

'ভাবছিলাম আপনি যোদ্ধা না হয়ে মিশনারী হলে দুনিয়ার মানুষ বোধহয় বেশি উপকৃত হতো।' বলল জেনিফার।

আহমদ মুসা সেদিকে কান না দিয়ে বলল, 'চার রিভলবারে গুলী থাকল ২০ টা। আর ওরা মানুষ দশজন।'

'আপনি কি এখন বেরুচ্ছেন?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জেনিফার বলল।

'না, ওদের সাথে একটু কথা বলব।'

বলে আহমদ মুসা বৈঠকখানার ভেতরে ঢুকে গেল।

দেখল ওরা দুই বাপ-বেটা খেয়ে এসে বসেছে। আহমদ মুসাকে দেখে ওরা উঠে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বলল, 'আবু বকর গেটের বাইরে রাস্তার পাশে দু'টি গাছ রয়েছে, তার আড়ালে বসে তোমরা অপেক্ষা করবে। ইনশাআল্লাহ রাত দু'টোর দিকে আমরা ওকারী গ্রামে যাত্রা করব।

'স্যার আপনি কোথায় থাকবেন। সময় খুব বেশি নেই। ওদের ব্যাপারে কি করণীয় হবে?' বলল আবু বকর।

'আমি সামনে এগুচ্ছি। ওদিকটা আমি দেখব।'

আবু বকর এবং তার পিতা বিস্ময় ভরা চোখে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। কিছু বলার চেষ্টা করল। কিন্তু তার আগেই আহমদ মুসা ভেতরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াল।

ভেতরে ঢুকে আহমদ মুসা দেখল জেনিফার এবং তার আম্মা দাঁড়িয়ে আছে। তাদের চোখ-মুখ উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় আচ্ছন্ন।

আহমদ মুসা ভেতরে ঢুকতেই জেনিফারের মা বলে উঠল, 'গ্রামবাসীকে জানানো দরকার নয়? তাদের সাহায্য পাওয়া যেত।'

'গ্রামবাসীদের সব কথা জানিয়ে তাদের সংগঠিত করার সময় আমাদের নেই। অসংগঠিত ভীড়, আতংক আমাদের বেশি ক্ষতি করতে পারে। তার উপর রাত। তাছাড়া কি ধরণের অস্ত্র, কি প্রস্তুতি নিয়ে তারা আসছে আমরা জানি না। এই অবস্থায় অপ্রস্তুত মানুষদের তাদের সামনে ঠেলে দিলে প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি হতে পারে।'

'তাহলে একা তুমি তাদের সামনে যাচ্ছ কি করে? বলল জেনিফারের মা।

'একা যাওয়ায় সুবিধা আছে। ওরা আমাকে সন্দেহ নাও করতে পারে। সেই সুযোগ তাদের ফাঁদে ফেলার একটা সুযোগ পেয়ে যেতে পারি।'

'আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আমার ভয় করছে। আমরা কি করব?'

আহমদ মুসা তাকাল জেনিফারের মা'র দিকে। তারপর ধীরে কণ্ঠে বলল, 'খালাম্মা, কি ঘটবে আল্লাই জানেন। তাঁর উপর আমাদের ভরসা করা দরকার। তিনিই আমাদের সাহায্য করবেন।'

বলে আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়াল বাইরে বেরুবার জন্যে।

জেনিফার কয়েক পা এগিয়ে আহমদ মুসার সামনে দাঁড়াল। বলল, 'আমরা কিছুই কি জানতে পারবো না, কিছুই করতে পারবো না?' উদ্বেগ-উত্তেজনায় বিপর্যস্ত জেনিফারের ভারি কণ্ঠস্বর।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘কি জানাব বল। সামনে কি আছে, কি করব আমিই তো জানি না। আমি চাচ্ছি ওরা বাড়ি পর্যন্ত না আসুক। সবচেয়ে ভাল গ্রামে ঢোকার মুখেই যদি ওদের আটকানো যায়।'

'আপনি একা কি করে আটকাবেন? তার চেয়ে কি এটাই ভাল নয়, আমরা বাড়ি খালি করে চলে যাই। আমাদের পাবে না ওরা এসে।'

'তারপর কি করবে? বাড়িতে ফিরবে?'

কথা বলল না জেনিফার।

আহমদ মুসাই বলল, 'একবার পালালে পালিয়েই থাকতে হবে। কোথায় এত পালাবার জায়গা আছে? তাছাড়া আমরা এখন বাড়ি খালি করে চলে গেলে ওরা গোটা গ্রাম সার্চ করবে, মানুষের উপর জুলুম নির্যাতন করবে, এমনকি গ্রামবাসী যদি আমাদের হদিশ না দেয়, তাহলে ঘর-বাড়ি জ্বালিয়েও দিতে পারে।

তার উপর ওকারী গ্রামের উপরও আজ রাতে তারা গণহত্যা চালাতে পারে। আমরা যদি এখানে ওদের বাধা দিতে পারি, তাহলে ওকারী গ্রামেও ওদের বাধা দেবার পথ হবে।' থামল আহমদ মুসা।

জেনিফার ছল ছল চোখে বোকার মত দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখে আর কোন কথা নেই। কথা খুঁজে পাচ্ছে না সে।

আহমদ মুসাই বলল কথা, 'সুতরাং ওদের বাধা দেয়া এবং ওদের পরিকল্পনা ভন্ডুল করে দেয়াই এখন একমাত্র পথ।'

'কিন্তু আপনি একা...।'

কথা শেষ করতে পারলো না জেনিফার। বাক রুদ্ধ হয়ে গেল তার।

'একা কোথায়? আল্লাহ আমার সাথে আছেন। তাছাড়া চিন্তার কিছু নেই জেনিফার। একজন মুসলমান সাধারণ ভাবেই দশজন কাফের প্রতিপক্ষের সমান। ওরা সম্ভবত দশজনের বেশি আসতে পারছে না।'

বলে হাসল আহমদ মুসা। নিশ্চিন্ত মনের সুন্দর একটা হাসি সেটা।

বিস্ময় জেনিফার এবং তার আম্মার চোখেমুখে-। পরিস্থিতির ভয়াবহতা কোনই কি প্রভাব ফেলেনি আহমদ মুসার মনে, ভাবল তারা।

'আসি। আসসালামু আলাইকুম।'

বলে আহমদ মুসা জেনিফারের পাশ কাটিয়ে বাইরে বেরুবার জন্যে হাঁটা শুরু করল।

পাথরের মত হয়ে যাওয়া জেনিফার সালাম নিতেও ভুলে গেল। সে ছুটে গিয়ে তার মাকে জড়িয়ে ধরল। বলল সে, 'আম্মা বিরাট লোক সে, খুবই মুল্যবান তার জীবন। আমিই তাকে ডেকে এনেছি এখানে। তখন আমি বুঝিনি, তাঁকে এমন ভয়াবহ এক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হবে। এখন কি হবে আম্মা?'

জেনিফারের মা জেনিফারকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'ওর ভাগ্যের

সাথে আমাদের ভাগ্য জড়িয়ে গেছে। ওঁর জয় হবে আমাদের বিজয়, আর ওঁর পরাজয় ডেকে আনতে পারে আমাদের ধ্বংস। এস আমরা বিলাপ না করে তার জন্যে প্রার্থনা করি।'

'চলুন আম্মা।'

'চল।'

উভয়ে হাঁটা দিল ছাদে উঠার কাঠের সিঁড়ির দিকে।

গ্রামে প্রবেশের মুখে প্রথম বাড়িটাই জেনিফারদের। একটা ছোট্ট টিলার মত উঁচু জায়গার উপর তাদের বাড়ি। বাড়ির একপাশ দিয়ে সড়ক চলে গেছে উত্তর দিকে বন্দর লক্ষে। সড়কের দু'ধারেই গ্রামের বাড়িঘর-। জেনিফারদের বাড়ির উত্তর পাশ থেকেই অন্যদের বাড়িঘর শুরু হয়েছে-। জেনিফারদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে টিলার গোড়া থেকে কয়েক পা দক্ষিণে এগুলেই একটা ছোট্র ব্রীজ। কাঠের তৈরী। ব্রীজটি 'সেবু' নদী থেকে বেরিয়ে আসা একটি খালের উপর। বছরের প্রায় সব সময়ই এতে পানি থাকে। 'সেবু' নদীটি গ্রামের পাশ ঘেঁষে দক্ষিণ দিকে বয়ে গেছে।

জেনিফারদের বাড়ি খাল ও 'সেবু'নদীর ত্রিমোহনায়। আহমদ মুসা ব্রীজে পা দিতেই খুব কাছে মোটর ইঞ্জিনের শব্দ পেল। সংগে সংগেই আহমদ মুসা বুঝল অটো হুইলারের মত কিছু এগিয়ে আসছে।

হাতঘড়ির দিকে তাকাল আহমদ মুসা। রাত পৌনে ১২টা বাজে।

কারা আসছে? ওরাই কি?

আহমদ মুসা ব্রীজ পার হলো।

ব্রীজের মাথায় পৌছে দেখল, একটা হেড লাইট এগিয়ে আসছে।

আহমদ মুসা হাঁটা থামাল না।

আরও নিকটবর্তী হলো হেড লাইট।

আহমদ মুসার মাথায় হ্যাট, দুই হাত পকেটে।

সামনে রাস্তায় এক জায়গায় বাঁকা। বাঁকের উপর গাড়িটা উঠলে হেড লাইট অন্যদিকে সরে গেলে গাড়ির অবয়বটা পরিস্কার হয়ে উঠল। গাড়িটা একটা ডাবল অটো হুইলার। দশ বার জন লোক খুব সহজেই ওতে ধরবে।

ওরাই কি আসছে এ গাড়িতে?

আহমদ মুসা হাঁটছে।

গাড়ির হেড লাইট আহমদ মুসার গায়ে এসে পড়েছে।

আহমদ মুসা নিশ্চয় ওদের চোখে পড়েছে।

আহমদ মুসা পথচারী হিসাবে তাদের নিকটবর্তী হতে চায়। ওদের পরিচয় পাওয়া এবং ওদের মধ্যে পৌঁছা তার লক্ষ্য।

আহমদ মুসা রাস্তার এক পাশ দিয়ে চলছিল।

গাড়িটা আহমদ মুসার পাশে এসে ঘ্যাচ করে একটা কড়া ব্রেক কষল।

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে শ্বেতাংগ ড্রাইভার বলল, 'এই কোত্থেকে এলি, কোথায় যাবি?'

আহমদ মুসা হাত দিয়ে ইংগিত করে বলল, 'ব্রীজের ওপারে ঐ যে বাড়ি ওখান থেকে এলাম।...'

আহমদ মুসা কথা শেষ করতে না দিয়ে বলল, 'ওটাই জেনিফারদের বাড়ি না?'

আকাশে জ্যোৎস্না থাকায় ঐখান থেকে পরিস্কার দেখা যাচ্ছে জেনিফারদের বাড়িটা।

লোকটির প্রশ্নের উত্তরে আহমদ মুসা বলল, 'হ্যাঁ।'

'ওদের সাথে তোমার কিসের সম্পর্ক?' বলল ড্রাইভার লোকটি।

'আত্মীয়।' বলল আহমদ মুসা।

শুনেই ড্রাইভার লোকটি লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নামল এবং গাড়ির পেছনে যারা বসে আছে তাদের লক্ষ্য করে বলল, 'তোমরা নেমে এস।'

ড্রাইভার লোকটির হাতে একটা স্টেনগান।

অন্যরা যারা গাড়ি থেকে হুড়হুড় করে নেমে এল, তাদের হাতেও স্টেনগান।

'কে তুমি? দেশ কোথায়? তোমাকে দেখে তো এদেশী মনে হচ্ছে না?' দ্রুত কণ্ঠে বলল ড্রাইভার লোকটি।

বলেই লোকটি চোখের পলকে আহমদ মুসার মাথার হ্যাট খুলে নিল।

আহমদ মুসাকে দেখেই লোকটি বলে উঠল, 'আরে !এতো এশীয়ান ! সেই এশীয়ান?'

বলেই লোকটি তার বাম হাত থেকে হ্যাটটি ফেলে দিয়ে দু'হাতে স্টেনগান তুলল আহমদ মুসার মাথায় আঘাত করার জন্যে।

এ রকমটাই ঘটবে আহমদ মুসা তা আগেই ধরে নিয়েছিল।

আহমদ মুসা তার ডান পা দিয়ে প্রচন্ড এক লাথি মারল তার হাঁটুতে, অন্যদিকে দু'হাত দিয়ে টলে উঠা লোকটির উত্তোলিত স্টেনগান কেড়ে নিল।

হাঁটুতে লাথি খাবার পর লোকটি পড়ে গেল। এই সুযোগে আহমদ মুসা হাতে পাওয়া স্টেনগানের নল ঘুরিয়ে নিল গাড়ি থেকে নেমে আসা লোকগুলোর দিকে।

তারা ঘটনার আকস্মিকতায় কেউ বিমুঢ় হয়ে পড়েছিল, কেউ কেউ স্টেনগানের নল উপরে তুলছিল।

আহমদ মুসা তাদেরকে প্রস্তুত হবার সুযোগ দিল না। ট্রিগার চেপে স্টেনগান ঘুরিয়ে নিয়ে এল লোকগুলোর উপর দিয়ে।

লোকগুলো গুলির ঝাঁকের মধ্যে পড়ে ঝাঁঝড়া দেহ নিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

আহমদ মুসা চোখ এদিক ফিরাতেই চমকে উঠল। দেখল, পড়ে যাওয়া লোকটি রিভলবার তাক করছে তার দিকে।

এদিকে চোখ পড়ার সংগে সংগেই আহমদ মুসা ঝাপিয়ে পড়ল মাটির উপর।

কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। বাম বাহুর সন্ধিস্থলের নিচে কিছুটা জায়গা ছিঁড়ে নিয়ে বেড়িয়ে গেল গুলী।

আহমদ মুসা মাটিতে পড়েই স্টেনগানের নল ঘুড়িয়ে নিয়ে গুলী করল।

লোকটি উঠে বসেছিল। দ্বিতীয় গুলী করার আগেই আহমদ মুসার স্টেনগানের গুলী তাকে ঘিরে ধরল।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল। দেখল, গাড়ির ওপার থেকে একটি মুখ উঁকি দিয়ে আবার ত্বড়িৎ সরে গেল। তার স্টেনগানের নলও দেখা গেল। নলটি আহমদ মুসার দিকে তাক করার সুযোগ পায়নি।

গাড়ির ওপারেও তাহলে লোক আছে? কয়জন আছে? আহমদ মুসা গুণে দেখল এদিকে লাশ পড়েছে নয়টি। তাহলে ওপারে এক বা দুইজনের বেশি লোক নেই।

আহমদ মুসা গাড়ির এদিকটা ঘুরে গাড়ির ওপাশে লোকটির কাছাকাছি হবার চেষ্টা করল।

আহমদ মুসা গাড়ির এ প্রান্ত ঘুরে ওপাশের দিকে মুখ ঘুরাতেই দেখল, ওপাশের স্টেনগানধারী বাগিয়ে ধরা স্টেনগান নিয়ে একেবারে তার মুখের উপর।

এই অবস্থায় দু'জন দু'জনকে দেখে হকচকিয়ে গেল। দু'জনের হাতেই উদ্যত স্টেনগান। দু'জনের চোখ দু'জনের উপর নিবদ্ধ।

আহমদ মুসার প্রতিপক্ষের মধ্যে বিমূঢ় ভাব ছাড়াও ভীত হয়ে পড়ার চিহ্ন স্পষ্ট।

এটাই আহমদ মুসাকে সাহায্য করল।

হকচকিয়ে উঠার ধাক্কা কাটিয়ে আহমদ মুসা যখন তার স্টেনগানের ট্রিগার চেপে ধরল, তখনও তার প্রতিপক্ষ তার স্টেনগানের দিকে মনযোগই দেয়নি।

ফলে মাত্র দু'গজ দূরে থেকে ছুটে আসা গুলীর ঝাঁকে ঝাঁজরা হয়ে গেল তার দেহ।

আহমদ মুসা গাড়ির ভেতরে একবার নজর ফেলল, না কেউ আর নেই।

এতক্ষণে আহমদ মুসা গুলীতে আহত তার বাম বাহুর যন্ত্রণা অনুভব করল। তাকিয়ে দেখল, সেখান থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

আহমদ মুসা হাত থেকে স্টেনগান ফেলে দিয়ে ডান হাত দিয়ে আহত স্থানটা চেপে ধরল।

তারপর কয়েক ধাপ এগিয়ে গাড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতেই আহমদ মুসা দেখল, একটু দূরে আবু বকর দাঁড়িয়ে আছে।

আহমদ মুসাকে দেখেই সে আনন্দে চিৎকার করে ছুটল ব্রীজের উপর দিয়ে জেনিফারদের বাড়ির দিকে। সেই সাথে তার উচ্চ কণ্ঠ শোনা গেল। সে চিৎকার করে বলছে, 'সকলে শুনুন সুখবর, স্যার বেঁচে আছেন। আপনারা আসুন।'

অল্পক্ষণের মধ্যেই এক ঝাঁক লোক ব্রীজের উপর দিয়ে আলো হাতে ছুটে এল। তাদের সাথে ছুটে এল জেনিফারও।

লোকগুলো জেনিফারদের গ্রামের। গুলীর শব্দ শুনে সবাই এসে জমা হয়েছিল জেনিফারদের বাড়ির সামনে। সব কিছু তারা শুনেছে জেনিফার এবং আবু বকরের কাছে।

রক্তে ভাসমান দশজন শ্বেতাংগের লাশ দেখে এক ঝাঁক মানুষ গোটাটাই থমকে দাঁড়াল। এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য তাদের সামনেপ্রথমেই এক রাশ আতংক ! ও ভয় তাদের ঘিরে ধরেছিল। আহমদ মুসা তার ডান হাত দিয়ে বাম বাহু চেপে ধরে দাঁড়িয়েছিল।

তার হাতও রক্তাক্ত হয়ে উঠেছিল।

জেনিফার ছুটে গেল তার কাছে। আর্তকণ্ঠে বলল, আপনি ভাল আছেন, আরও কোথাও গুলী লাগেনি তো?'

আহমদ মুসা হেসে বলল, 'না লাগেনি।আমি ভাল আছি।'

বলে আবু বকরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্টেনগানগুলো গাড়িতে তোল। ওদের পকেট সার্চ করে রিভলবারগুলো বের করে গাড়িতে রেখে দাও।'

সব মানুষ এসে ঘিরে দাঁড়াল আহমদ মুসাকে। সবার চোখে বিস্ময়-বিস্ফোরিত দৃষ্টি। যেন আহমদ মুসা গ্রহান্তর থেকে আসা কোন অতিমানব। তাদের বুঝেই আসছে না, এক নিরস্ত্রপ্রায় লোক দশজন অস্ত্রসজ্জিত শ্বেতাংগকে হত্যা করে এভাবে বিজয়ী হলো!

আহমদ মুসা আবু বকরকে নির্দেশ দেয়া শেষ করতেই জেনিফার বলল, 'ভাইয়া, আপনার আহত জায়গাটা বাঁধতে হবে, না হয় তাড়াতাড়ি আপনি বাসায় চলুন।'

বলে জেনিফার এগিয়ে এল আহত জায়গাটা পরীক্ষার জন্যে।

সংগে সংগেই আহমদ মুসা বলল, চল বাসায় চল জেনিফার।
ব্যাগে আমার ফাস্ট এইড আছে।'
জেনিফারকে কথাগুলো বলেই আহমদ মুসা গ্রামের জনগণের দিকে
চেয়ে বলল, ভাইসব, আপনাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন, যারা আজ রাতে আমার সাতে ওকারী গ্রামে যেতে পারেন?'

সবাই নীরব।

অবশেষে সেই নীরবতা ভেঙে এগিয়ে এল কয়েকজন যুবক। বলল, 'আমরা রাজী, কখন যেতে হবে?'

'এখন থেকে এক ঘন্টার মধ্যে।'

'আমরা রাজী স্যার। কিন্তু...।'

'কিন্তু কি?'

'আমরা তো এসব বন্দুক চালাতে জানি না।'

ক্ষতি নেই তাতে।'

বলে আহমদ মুসা ডান হাত দিয়ে বাম বাহুটা ধরে হাঁটতে শুরু করল।

জেনিফারও হাঁটতে শুরু করেছে, তার ঠোঁটে এক টুকরো ম্লান হাসি।

সে চেয়েছিল আহমদ মুসার আহত জায়গায় তার ওড়নাটা দিয়ে বাঁধতে, অব্যাহত রক্ত ক্ষরণ রোধ করার জন্যে। কিন্ত সে বুঝেছে, আহমদ মুসা এটা চায় না। জেনিফার তার গা স্পর্শ করুক, শুশ্রুষা করুক তা সে চাচ্ছে না।

বাড়ির গেটেই দাঁড়িয়েছিল জেনিফারের মা এবং দাদী।

দূরে থাকতেই জেনিফার চিৎকার করে উঠল, 'দাদী, আম্মা, আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর। ওরা দশজন এসেছিল, দশজনই নিহত হয়েছে।

আলহামদুলিল্লাহ পড়েই জেনিফারের মা আর্তকণ্ঠে বলে উঠল, 'একি ! আমাদের বাছার কি !কি সর্বনাশহলো? কোথায় লেগেছে?'

বলে কয়েক ধাপ এগিয়ে এল জেনিফারের মা এবং দাদী।

আহমদ মুসা কাছাকাছি এসে বলল, 'তেমন কিছু নয় খালাম্মা।
একটা গুলী বাহুর একটা ছোট অংশ তুলে নিয়ে গেছে।'

জেনিফারের মা কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলল, 'কি বলছ বাবা তেমন কিছুই হয়নি। গুলী লেগেছে, কি আবার হবার বাকি আছে।'

বলে জেনিফারের মা ছুটে এসে আহমদ মুসাকে ধরে ভেতরে নিয়ে এল।

আহমদ মুসার ব্যাগ ছাড়াও জেনিফারদের ঘরেও ব্যান্ডেজ সরঞ্জাম ছিল।

জেনিফারদের ব্যান্ডেজ সরঞ্জাম এবং আহমদ মুসার ব্যাগ থেকে ঔষধ নিয়ে আহমদ মুসার ব্যান্ডেজ বেঁদে দিল জেনিফারের দাদী, তার মা সাহায্য করল। ফায়ফরমাস খাটল জেনিফার।

ব্যান্ডেজ বাঁধা দেখছিল আর ভাবছিল জেনিফার, তার স্বপ্নের মানুষ আহমদ মুসা তার কল্পনার চাইতেও বড়। যুদ্ধের মাঠে যেমন, ঘরেও তেমনি সে। যুদ্ধের মাঠে যেমন শত্রুর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক বিজয়ী, ঘরেও তেমনি নীতির প্রশ্নে আপোষহীন। জেনিফার তো নয়ই, জেনিফারের মা'র হাতেও তিনি ব্যান্ডেজ নেয়া পছন্দ করলেন না। কৌশলে তার মাকে অন্য কাজে ব্যস্ত করে তার দাদীকে কাজে লাগালেন। ইসলামের বিধানের উপর থাকার কি আপ্রাণ প্রয়াস এমন এক অসহায় মুহূর্তেও।

শ্রদ্ধায় ভক্তিতে মাথাটা নুয়ে এল জেনিফারের আহমদ মুসার প্রতি। মনে মনে সে বলল, ইসলামের নিয়ম-নীতি মানার ক্ষেত্রে নিশ্চয় সে তার স্বপ্নের মানুষের মতই হবার চেষ্টা করবে।

ব্যান্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে জেনিফারের দাদী বলল, 'শুনলাম, ওদের দশজনের কাছেই স্টেনগান ছিল। তুমি তো গেলে খালি হাতে। ওদের দেখে ভয় করেনি? ওদের মারলে?'

'খালি হাতে যাইনি দাদী। আমার পকেটেও রিভলবার ছিল। কিন্তু ব্যবহার করতে হয়নি। ওদের অস্ত্র দিয়েই ওদের সাথে লড়াই করেছি।'

'কিন্তু কি করে সম্ভব হলো, বুঝতে পারছি না।' বলল জেনিফারের মা।

'আমি তো আমার শক্তি বলে ওদের সাথে লড়তে যাইনি, গেছি আল্লাহর ওপর ভরসা করে। আর আল্লাহ তো সর্বশক্তিমান।'

'বাছা, এই বিশ্বাসের শক্তি যদি সবার থাকতো!' বলল জেনিফারের মা।

'শুনেছি, কয়দিন আগে মাথায় সাংঘাতিক আঘাত পেয়ে হাসপাতালে ছিলে। আজ আবার এভাবে গুলী বিদ্ধ হলে। খারাপ লাগছে না?' বলল জেনিফারের দাদী।

'না খুব ভাল লাগছে দাদী। ঐ বার ঐভাবে আঘাত না পেলে জর্জকে বন্ধু হিসাবে পেতাম না। আর আজ গুলিবিদ্ধ না হলে আপনার এ আদর ভরা শুশ্রুষা পাওয়ার সুযোগ হতো না।' হাসতে হাসতে বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই জেনিফারের দাদী দ্রুত বলল, 'দাদু ভাই, ওভাবে বলে না। বিপদে খুশী হওয়ার কথা বলা ঠিক নয়।'

আহমদ মুসা গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'ঠিক বলেছেন দাদী। আসলে আমি খুশী হইনি। দাদীর সাথে একটু মজা করছিলাম। এমন দাদী তো কখনও পাইনি।'

জেনিফারের দাদী ব্যান্ডেজ বাঁধা বন্ধ করে আহমদ মুসার চোখে চোখ রেখে বলল, 'ওমন করে মায়া ধরিও না ভাই। শেষে কাঁদতে হবে। তোমার মত বনের পাখিকে পোষ মানাবার মত কেউ নেই।'

ভেজা কণ্ঠে বলল জেনিফারের দাদী।

'আছে দাদী।' বলল জেনিফার।

'কে?' জেনিফারের দিকে মুখ ঘুরিয়ে প্রশ্ন করল তার দাদী।

'তিনি 'মারিয়া জোসেফাইন' আমাদের ভাবী। বলল জেনিফার।

'আচ্ছা। নাম শুনলাম। আমার হতভাগী বোনকেও তাহলে তুমি কষ্ট দিচ্ছ। সেও দেখি তোমাকে পোষ মানাতে পারেনি।' বলল জেনিফারের দাদী।

'আপনার বোন আমাকে পোষ মানাবে কি! সেও তো আসতে চেয়েছিল এখানে। বহু কষ্টে রেখে এসেছি।' বলল আহমদ মুসা।

'যাক ভাই, পোষ মানাবার দরকার নেই তোমাকে। পোষ মানালে আমাদের মত যারা তারা তোমাকে তাহলে পাবে কি করে! তুমি একটা ভাল সংবাদ দিয়েছ। আমার ভাই যেমন, আমার বোনকে অবশ্যই তেমন তো হতে হবে।'

বলতে বলতে ব্যান্ডেজের শেষ মাথাটা পেষ্ট করে জেনিফারের দাদী উঠে দাঁড়াল।

'ধন্যবাদ দাদী।' বলল জেনিফারের দাদীকে লক্ষ্য করে আহমদ মুসা।

'ধন্যবাদের দরকার নেই ভাই। এই অবস্থায় ওকারী গ্রামে তোমার না গেলেই কি নয়?'

'তাহলে কে যাবে দাদী?'

'শুনলাম গ্রামের সাত আটজন যুবক রাজী হয়েছে। তার উপর তোমার আবু বকররা আছে।'

'এরা কেউ বন্দুকটুকুও চালাতে জানে না দাদী। অথচ ওকারী গ্রামে আজ যে হামলা হবে, সেটা বড় ধরনের। সংখ্যায় তারা কম আসবে না, ভারী অস্ত্র নিয়েও আসতে পারে।'

'কিছুটা তো দুর্বল ওরা হবে, এই দশজন তো ওদের সাথে শামিল হতে পারলো না।' বলল জেনিফারের মা।

'তা হবে বটে, কিন্তু এখানকার পরিস্থিতি আঁচ করার সাথে সাথে তারা ভয়ংকর হয়ে উঠবে। গ্রামের প্রতিটি লোক হত্যা ও প্রতিটি বাড়ি ধ্বংস করে তারা প্রতিশোধ নিতে চাইবে।' বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার কথা শুনে জেনিফার, জেনিফারের মা, তার দাদী সকলেই শিউরে উঠল ভয়ে। তারা যেন লাশে ভরা জ্বলন্ত ওকারী গ্রাম দেখতে পাচ্ছে। কিছুক্ষণ তাদের মুখে কোন কথা এল না।

নীরবতা ভেঙে কথা বলল দাদীই প্রথম। বলল, 'এদের বিরুদ্ধে একা তুমি কি করবে?'

'কি করতে পারবো আমি জানি না দাদী। কিন্তু আমাকে গ্রামবাসীর পক্ষে দাঁড়াতে হবে, এটা আমার দায়িত্ব। এরপর যা করার সে দায়িত্ব আল্লাহর।' বলতে বলতে আবেগে কণ্ঠ ভারী হয়ে এল আহমদ মুসার।

আহমদ মুসার এ আবেগ সবাইকে স্পর্শ করেছে। সকলের মুখ গম্ভীর।

এবার দাদীই কথা বলল, 'আমরা তো ভাই, তেমন কিছুই জানি না। কিন্তু এটুকু বলতে পারি, আল্লাহর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা নিয়ে চোখ বন্ধ করে এমনভাবে যে দায়িত্ব পালনে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, তাকে সাহায্য না করে আল্লাহরও উপায় নেই।'

'আল্লাহ দাতা ও দয়াময়। আমাকে দোয়া করুন দাদী।'

এ সময় বাইরে গাড়ির শব্দ হলো।

একটি গাড়ি এসে বাইরে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

বাইরের দরজায় নক হলো।

আহমদ মুসা এগিয়ে গিয়ে দেখল, আবু বকর দাঁড়িয়ে।

আহমদ মুসাকে দেখেই বলল, 'গাড়ি নিয়ে এসেছি। গাড়িতে দশটি স্টেনগান ও দশটি রিভলবার রয়েছে। গ্রামের যুবকরা যারা যাবে, এক্ষুণি এসে পড়বে।'

আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল রাত পৌনে ১টা। সে বলল, 'আমরা একটায় ওকারী গ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করব।'

আর কোন নির্দেশ, স্যার? বলল আবু বকর।

'ঠিক আছে, যাও।'

আবু বকর ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে যাচ্ছিল।

আহমদ মুসা তাকে ডাকল।

ঘুরে দাঁড়িয়ে কয়েক ধাপ এগিয়ে এল।

'গাড়ি কিভাবে নিয়ে এলে?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

লাজুক হাসি হাসল আবু বকর। বলল, 'স্যার আমি অটো হুইলার ড্রাইভ করতে পারি। কিছুদিন আগে পর্যন্ত অটো হুইলার চালাতাম।'

'সাবাস, আবু বকর। খুব কাজের ছেলে তুমি। আচ্ছা যাও।'

'আপনার দোয়া চাই স্যার।' বলে আবু বকর চলা শুরু করল।

আহমদ মুসা ফিরে এল বাড়ির ভেতরে।

যাচ্ছিল তার কক্ষের দিকে।

জেনিফার এল তার কাছে। বলল, 'একটা বিষয় বুঝতে পারছি না, জিজ্ঞেস করতে পারি ভাইয়া?'

'অবশ্যই।'

'যারা বন্দুক চালাতেও জানে না, তাদের আপনি ওকারীতে গুলী বৃষ্টির মধ্যে নিয়ে যাচ্ছেন কেন?'

'ওদের নিয়ে যাচ্ছি যুদ্ধ করার জন্যে নয়, একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছি।'

'কি সেটা?'

'আগে শোনার চেয়ে পরে শুনলে ভালো লাগবে।'

'ঠিক আছে।'

'ধন্যবাদ জেনিফার।'

বলে আহমদ মুসা তার কক্ষের দিকে চলে গেল। পোশাক পাল্টে ওকারী গ্রামে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলো সে।

আহমদ মুসার অটো হুইলার তখনও ওকারী গ্রামের মাইল দুই উত্তরে।

একটা বাঁক ঘুরতেই হঠাৎ একটা হেড লাইট চোখে পড়ল তার।

মনের কোণায় চিন্তা জাগল আহমদ মুসার, এত রাতে কারা আসতে পারে? ঐ শ্বেতাংগ গোষ্ঠীর কোন পশ্চাৎ বাহিনী নয়তো? হতেও পারে, আবার নাও পারে।

তবে সাবধান হওয়া উচিত, ভাবল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা ড্রাইভ করছিল। তার পাশের সিটে বসেছিল আবু বকর।

আহমদ মুসা আবু বকরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সামনের গাড়িটাকে জিজ্ঞাসাবাদ না করে যেতে দেয়া যাবে না।'

সামনের গাড়ির হেড লাইট অনেক কাছে চলে এসেছে। রীতিমত চোখে লাগছে।

আহমদ মুসা স্টেনগানটা ডান পাশে ডান হাতের কাছে রাখল।

সামনের গাড়িটা একদম কাছে চলে এসেছে।

আহমদ মুসা ইচ্ছা করেই রাস্তার ঠিক মাঝখান দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে। উদ্দেশ্য হলো, সামনের গাড়ির প্রতিক্রিয়া জানা। যদি ওটা ঐ শয়তানদের কারও গাড়ি হয়, তাহলে গাড়িটা নিশ্চয় ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করবে। ক্রুদ্ধ হর্ণ বাজাবে। পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা না করে রাস্তার মাঝ দিয়ে এসে মুখোমুখি গাড়ি দাঁড় করিয়ে বাহাদুরি দেখাবার চেষ্টা করবে। আর যদি গাড়িটা সাধারণ কারও হয়, তাহলে এই রাতে ঝামেলা এড়িয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করবে।

আহমদ মুসার দ্বিতীয় অনুমানটাই ঠিক হলো। গাড়িটা রাস্তার প্রান্ত দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করল।

আহমদ মুসা বুঝল গাড়িটা সাধারণ বা ভালো লোকেরই হবে।

আহমদ মুসার কৌতুহল হলো, গাড়িটা এত রাতে কোথায় যাবে তা জানার জন্যে। তাছাড়া গাড়িটা নিশ্চয় সেই মৎস বন্দর থেকে আসছে।

ওদিকের অবস্থা কিছু হয়তো বলতেও পারবে সে।

আহমদ মুসা তার গাড়ি ক্লোজ করে ঐ গাড়িটার চলার পথ অনেকটা রুদ্ধ করে দিয়ে বলল, 'গাড়ি কোথায় যাবে?'

গাড়ি থেকে উত্তরে আসতে দেরী হলো। একটু দেরী করে বলল, 'এই সামনের গ্রামে।'

'কোন গ্রামে?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

এবারও উত্তর এল না তাড়াতাড়ি।

ভ্রু কুচকালো আহমদ মুসা। নিশ্চয় সন্দেহজনক কিছু আছে এ গাড়িতে। জেনিফারদের বাড়িতেই যাচ্ছে না তো?

কথাটা ভাবার সাথে সাথেই আহমদ মুসার হাতের টর্চ জ্বলে উঠল।

টর্চের আলো ভ্যান বক্সে বসা একজন মাত্র লোকের উপর গিয়ে পড়তেই আহমদ মুসা চমকে উঠল, 'একি! এ যে জর্জ!'

'একি, তুমি কোত্থেকে জর্জ এই রাতে?'

আহমদ মুসার প্রথম প্রশ্ন শুনেই জর্জ একে আহমদ আবদুল্লাহর কণ্ঠ বলে সন্দেহ করেছিল। দ্বিতীয় প্রশ্ন শুনে তার সন্দেহ আরও বেড়ে গেল।

এবার চিনতে পেরে আনন্দে চিৎকার করে উঠল জর্জ, 'আবদুল্লাহ ভাই আমি আপনার কাছেই যাচ্ছি।'

বলতে বলতে জর্জ গাড়ি থেকে নেমে এল।

আহমদ মুসাও গাড়ি থেকে নামল।

দু'জন মুখোমুখি হলো। চাঁদের জ্যোৎস্নায় দু'জন দু'জনকে খুব ভালো দেখতে পাচ্ছে।

আহমদ মুসার বিস্ময় তখনও কাটেনি। বলল, 'তোমরা সবাই ভালো আছ তো? তুমি এভাবে এ সময় এদিকে আসবে, তা ভাবতেই পারছি না আমি।'

'আমরা ভাল আছি। আপনাদের কোন খারাপ খবর নেই তো?'

'খারাপ ভাল মিলিয়ে খবর আছে। কিন্তু তার আগে বলল, 'তোমার এই নৈশ অভিযান কেন?'

জর্জ একটু ভাবল। বোধ হয় কথা গুছিয়ে নিল। তারপর বলল, 'আজ সন্ধ্যায় আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপাশে যে রেস্টুরেন্ট সেই রেস্টুরেন্টে বসে খাচ্ছিলাম। আমার টেবিলেই আমার মত আরেকজন শ্বেতাংগ বসেছিল। তার হাতে মোবাইল টেলিফোন। আমি তখনও খাচ্ছিলাম। তার মোবাইলে টেলিফোন এল। টেলিফোনে কথা বলল সে। তার কথাগুলো এমনিতেই আমার কানে এসে ঢুকছিল। আমার তেমন মনযোগ ছিল না। কিন্তু এক পর্যায়ে আমার কান উৎকর্ণ হয়ে উঠল। তখন সে বলছিল, সিডি কাকেম গ্রামে আরও একটি দল যাবে আজ রাতে, সে দল ওকারী গ্রামে ফিরে আসলে তবেই ওকারী গ্রামে অপারেশন শুরু হবে। এই কথা শোনার সাথে সাথে আমার কাছে পরিস্কার হয়ে গেল যে, জেনিফারদের বাড়িতেই আক্রমণ হবে যেখানে আপনিও আছেন। আমার মনে হলো, 'নিশ্চয় আপনারা খবরটা জানেন না। সংগে সংগেই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম সিডি কাকেম গ্রামে আসব। কিন্তু রাস্তায় বোটের ইঞ্জিন গন্ডগোল করায় প্রায় ঘন্টা দুই সময় আমার নষ্ট হয়েছে। এ দিকের কি খবর ভাইয়া?'

'না, তার আগে বল, টেলিফোনে আর কি শুনেছিলে?'

'হ্যাঁ। উপরে যে কথার উদ্ধৃতি দিলাম, তারপর আরেকটি এই ধরণের বাক্য বলেছিল, ওকারী গ্রামের দক্ষিণে ঝোপ আচ্ছাদিত যে টিলা, ওখানে ওরা

আগে থেকেই অপেক্ষা করবে। সিডি কাকেম থেকে তারা ওখানেই ওদের সাথে মিলিত হবে।'

'ধন্যবাদ। বন্দরে তুমি কিছু দেখেছ?'

'বন্দরে তিনটি বোট দেখেছি। যে বোটের পাশে আমার বোটটি নোঙর করেছিল, সে বোটটি বেশ বড়। তাঁতে আমার মনে হয় পনের বিশজন লোক ছিল। আমাদের বোটটি নোঙর করতেই বোটের কেবিন থেকে কে একজন বলে উঠেছিল, কোন চিড়িয়ারে ওখানে? বোটের ডেক থেকে একজন উত্তরে বলেছিল, না কিছু না, একজাত।'

''ধন্যবাদ জর্জ, খুবই মূল্যবান তথ্য তুমি নিয়ে এসেছ।'

আহমদ মুসা একটু থেমে স্বরটা নিচু করে বলল, 'জর্জ আমাকে বাঁচানো গরজ, না জেনিফারকে?'

জর্জের মুখ লাল হয়ে উঠল লজ্জায়। বলল, 'ওঁর কথা বলবেন না ভাইয়া, অত উঁচুতে আমার তাকানো ঠিক নয়।'

'এখন তুমি নতুন জেনিফারকে দেখবে জর্জ।'

হাসল জর্জ। বলল, 'ভাইয়ার যাদু স্পর্শে তা হতে পারে।'

বলে একটু থেমে আবার শুরু করল, 'আপনার জন্যে একটা সুসংবাদ আছে ভাইয়া।'

'কি সেটা?'

'আমি এবং আপা গতকাল গ্রান্ড টার্কস মসজিদে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছি।'

'কি বলছ তুমি? মজা করছ আমার সাথে' বলল আহমদ মুসা।

'মজা করার মত বিষয় এটা ভাইয়া?'

'কিন্তু এত বড় ঘটনা, আমি জানলাম না।'

'আমি আপাকে বলেছিলাম আপনি ফিরলে এই অনুষ্ঠান করতে।

কিন্তু আপা বললেন, আপনাকে সারপ্রাইজ দেবেন।'

'সারপ্রাইজ সত্যি দিয়েছ। এবার এস।'

বলে আহমদ মুসা বুকে জড়িয়ে ধরল জর্জকে। বলল, 'স্বাগত তোমাকে আলোর পথে, মুক্তির পথে।'

'আলহামদুলিল্লাহ, দোয়া করুন ভাইয়া।'

আহমদ মুসা জর্জকে আলিঙ্গন থেকে ছেড়ে দিয়ে বলল, 'হঠাৎ তোমাদের এই সিদ্ধান্ত কিভাবে হলো?'

'হঠাৎ নয় ভাইয়া, দু'বছর আগে আমি ও আপা এক ছুটিতে স্পেন সফরে গিয়েছিলাম। আমরা দু'জনেই ইতিহাস ভক্ত। গিয়েছিলাম কর্ডোভা, গ্রানাডা, মালাগা'র ঐতিহাসিক নিদর্শন এবং প্রাচীন মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দেখতে, যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে ইউরোপীয় ছাত্ররা শিক্ষা লাভ করে এসে অন্ধকার ইউরোপকে আলোকিত করেছিল। আমরা অভিভূত হই মুসলিম সভ্যতার নিদর্শন দেখে। আমরা ব্যথিত হয়েছিলাম একটি সভ্যতার হিংসার আগুনে বিধ্বস্ত হওয়া দেখে। সেখান থেকেই ঐ সভ্যতা সম্পর্কে জানার একটি তীব্র আগ্রহ সৃষ্টি হয় আমাদের মধ্যে। আমরা ফেরার পথে বেশ কিছু বই কিনে আনি লন্ডন থেকে। এই বইগুলো পড়তে গিয়েই ইসলামের প্রতি আমরা আকৃষ্ট হই। আমাদের মনে হয় মানুষের ধর্ম প্রকৃতপক্ষেই শুধু ইসলামই। এই সময়ই আপনার সাথে আমাদের দেখা হয়।যে ইসলামকে বই পড়ে আমরা জেনেছিলাম, সে ইসলামকে আমরা স্বচক্ষে দেখলাম আপনার মধ্যে। আপনি সিডি কাকেমে চলে আসার দিনই আমরা দু'ভাই-বোন সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম ইসলাম গ্রহণের। পরদিনই আমরা গেলাম গ্রান্ড টার্কস মসজিদে। 'থামল জর্জ।

আহমদ মুসা আবার জড়িয়ে ধরল জর্জকে। বলল, 'আমি খুশি হয়েছি জর্জ। খুশি লাগছে এ জন্যে যে, 'টার্কস দ্বীপপুঞ্জ শুধু নয় গোটা ক্যারিবিয়ানে নতুন সুর্যোদয় আসন্ন।'

'আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া।'

একটু থেমেই জর্জ আবার বলল, 'এদিকের খবর কি ভাইয়া?'

আহমদ মুসা কিছুক্ষণ আগে সিডি কাকেমে যা ঘটেছে তা জানাল এবং বলল, 'রাত ৩টার দিকে ওরা ওকারী গ্রামে হামলা চালাবে। আমরা ওখানেই যাচ্ছি। দেখি কি করা যায়। তুমি সিডি কাকেমে গিয়ে বিশ্রাম নিতে পার।'

'কেন ভাইয়া, আমার কোন যোগ্যতা নেই তাই? আমি অন্তত আপনার গাড়ি ড্রাইভ করতে পারব। রিভলবার, স্টেনগানগুলো যদি থাকে, রিলোড করতে পারবো।'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'ঠিক আছে, তোমার গাড়ি ঘুরিয়ে নাও।'

ওকারী গ্রামের কাছাকাছি পৌছে আহমদ মুসার নির্দেশে দুই গাড়িরই হেডলাইট নিভিয়ে দেয়া হলো।

সুন্দর জ্যোৎস্না থাকলেও রাস্তার দু'পাশে মাঝে মাঝে গাছ থাকায় অন্ধকার ঠেলেই দু'টি গাড়িকে সামনে চলতে হচ্ছে।

ওকারী গ্রামের উত্তর পাশের মাঠটা ফাঁকা। চড়াই-উৎড়াই ভরা। মাঝে মাঝে লেবুর ক্ষেত।

এই মাঠের মধ্য দিয়েই গাড়ি চলছে আহমদ মুসাদের।

হঠাৎ আহমদ মুসার চোখ সামনের রাস্তার ডান পাশে গাছ তলার একটি চলন্ত জমাট অন্ধকাররের উপর আটকে গেল। চলন্ত জমাট অন্ধকারটি এসে রাস্তার উপর একটা গাছের আড়ালে গুটি-সুটি মেরে বসল।

দ্রুত ভাবছিল আহমদ মুসা। শত্রু পক্ষ? শত্রু পক্ষ এমন জায়গায় গাড়ি লক্ষ্যে ওঁৎ পাতার প্রয়োজন কি? আর লুকিয়ে দেখার মত আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে তাদের যাবার দরকার কি? তাহলে?

সেই ছায়ামূর্তিটির বরাবর গাড়ি এসে গেছে। গাড়ি আস্তে আস্তেই চলছিল।

আহমদ মুসা ডান হাতে টর্চ নিল এবং একই সাথে গাড়ির ব্রেক কষল, অন্যদিকে টর্চের ফোকাস ফেলল কালো ছায়ামূর্তির উপর। সাথে সাথে নামল আহমদ মুসা লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে।

টর্চের আলোতে যে ধরা পড়েছে সে একজন কৃষ্ণাংগ।

টর্চের আলো তার মুখে পড়ার সংগে সংগে সে ভয়ে কুকড়ে গেছে।

পালাবার চেষ্টাও সে করতে পারেনি।

আহমদ মুসা তার দিকে ভালো করে তাকাতেই চমকে উঠল। একে তো শুক্রবারে ওকারী গ্রামের মসজিদে সেই প্রবীণ ব্যক্তিটির সাথে দেখেছি। ভালো করে আবার পরখ করল আহমদ মুসা। ঠিক, এ সেই যুবকই।

যুবকটি প্রাথমিক বিমূঢ় ভাব কাটিয়ে উঠেছে। তার হাতের ছোরাকে সে শক্ত হাতে উদ্যত করে তুলে ধরল।

আহমদ মুসা বলল, 'ছোড়ার প্রয়োজন নেই। তুমি আমার শত্রু নও।'

বলে আহমদ মুসা টর্চের আলো নিজের মুখের দিকে ঘুরিয়ে নিল।

ছেলেটি চিনতে পারল আহমদ মুসাকে। সে ছুটে এল আহমদ মুসার কাছে। সালাম দিয়ে বলল, 'স্যার আপনার ওদিকের খোঁজ নেবার জন্যেই এখানে বসেছিলাম।'

'কি খোঁজ?'

'ওদের একটা দল সিডি কাকেমে আপনাদের ধরার জন্যে গেছে।

আমরা উদ্বিগ্ন কি হয় সে খবর জানার জন্যে।'

ওদের সম্পর্কে আর কি জান?'

'আমরা খবর পেয়েছি, আজ রাতে ওরা আমাদের গ্রামে আক্রমণ করবে।'

'জান? কি করে?'

একজন জেলে আমাদেরকে এ খবর দিয়েছে। সে শুনেছে একজন কৃষ্ণাঙ্গ বোটম্যানের কাছ থেকে।'

'খবর শোনার পর কি করেছ তোমরা?'

'কি করার আছে! আমরা গ্রাম খালি করে চলে এসেছি।'

'গ্রাম খালি করে? কোথায় এসেছ?'

মাঠের একটা স্থানের দিকে আঙুল দিয়ে ইংগিত করে বলল, 'সবাই ওখানে আত্মগোপন করে আছে।'

'কিন্তু গ্রাম এতে রক্ষা পাবে?'

'পাবে না, কিন্তু জীবন বাঁচবে।'

'মোকাবিলা করলে জীবন ও সম্পদ দুই-ই বাঁচতে পারতো।'

'মোকাবিলা করতে পারলে তা হতো। কিন্তু মোকাবিলার শক্তি আমাদের নেই। লাঠি, ছুরি, তরবারি, তীরের বাইরে আমাদের কিছু নেই। এসব নিয়ে যুদ্ধ করে মরা যায়, জেতা যায় না।'

'সিডি কাকেমের খবর জানার জন্য কেন তোমরা উদ্বিগ্ন?'

'আমরা সবাই ভাবছি সেখানে যদি আপনারা জেতেন, তাহলে আপনার সাহায্যের একটা সম্ভাবনা আমাদের থাকে।'

'আলহামদুলিল্লাহ, তোমরা ঠিকই ভেবেছ। আমরা ওখানে জিতেছি। ওরা দশজনই মারা গেছে। আমরা তোমাদের সাহায্য করতেই এখানে এসেছি।' থামল আহমদ মুসা।

থেমেই আবার বলল, 'তুমি গিয়ে সবাই কে নিয়ে এস, আমরা সবাই গ্রামে ফিরব।'

যুবকটি সংগে সংগেই ছুটল। পনের মিনিট পর ফিরে এল সবাই কে

নিয়ে। ছোট বড় মিলে প্রায় ৫০০ মানুষের বিরাট দল। সবাই চলল গ্রাম অভিমুখে।

আহমদ মুসা তার পাশের সিটে তুলে নিয়েছে ওকারী গ্রামের সেই প্রবীণ ব্যক্তিকে। জেনেছে তার নাম আব্দুর রহমান ওকারী। তার ছেলের নাম ইসহাক আব্দুল্লাহ।

হেড লাইট নিভানো গাড়ি ধীরে ধীরে চলছিল।

আহমদ মুসার গাড়ি আগে। জর্জের গাড়ি তার পিছনে।

চলতে চলতে কথা হচ্ছিল আব্দুর রহমান ওকারীর সাথে।

আব্দুর রহমান ওকারী বলছিল, 'এখন রাত আড়াইটা। নিশ্চয় ওরা এতক্ষণে পজিশন নিয়েছে। ওরা যদি কাকেমের কথা কোনভাবে জানতে পারে; তাহলে ওরা ধ্বংসের দৈত্যে পরিণত হবে। আমরা গ্রামে যাচ্ছি, কিন্তু আমাদের কি করণীয়?'

'আমি আপনাদের গ্রামে পৌঁছে দিয়ে ওদের সাথে সাক্ষাত করতে যাব।'

'সাক্ষাত করতে?'

‘জ্বি হ্যাঁ। সাক্ষাত না করলে সংঘর্ষ হবে কি করে?’

‘বুঝেছি। সিডি কাকেম গ্রামে যেভাবে বেরিয়েছিলেন?’

গ্রামের সেই মসজিদের পাশে পৌঁছার পর গাড়ি থামাল আহমদ মুসা। ধীরে ধীরে রাস্তা ও মসজিদের চত্বরে সব লোক জমা হয়ে গেল।

আহমদ মুসা আব্দুর রহমান ওকারীকে বলল, ‘জনাব লোকেরা আপাতত এখানেই বিশ্রাম নিক। এদিকটা ফায়সালা হবার পর সবাই বাড়ি ফিরে যাবে। মেয়েরা এই সময়টা মসজিদে বিশ্রাম নিতে পারে।’

আব্দুর রহমান ওকারী আহমদ মুসার এ প্রস্তাব মেনে নিল এবং গাড়ি

উপর দাঁড়িয়ে এ বিষয়টি ঘোষণা করে দিল।

এ সিদ্ধান্তে সবাই খুশী হল। অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে আতংক নিয়ে কারও বাড়ি ফিরতে মন সায় দিচ্ছিল না।

আবদুর রহমান ওকারী গাড়ির উপর থেকে নিচে নামতেই একজন লোক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল তার কাছে।

লোকটিকে দেখে আব্দুর রহমান ওকারী মনে উদ্বেগ, উৎসাহ দুইয়েরই প্রকাশ ঘটল।

আগন্তুককে দেখিয়ে সে আহমদ মুসাকে বলল, ‘এ ছেলে আমাদের অনুসন্ধান বিভাগের কর্মী। তাকে নিয়োগ করা হয়েছিল যারা ঘাট থেকে গ্রাম আক্রমণে আসবে তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে।’

কথা শেষ করেই সে আগন্তুক লোকটিকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'কি খবর নিয়ে এসেছ? খুব উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে তোমাকে।'

‘ওরা দুই ভাগে ভাগ হয়েছে। দশজন যাচ্ছে গ্রামের পূব পাশে। আর

দশজন আসবে দক্ষিণ দিক থেকে। আর সিডি কাকেম থেকে যারা আসবে তারা ঘিরবে গ্রামের উত্তর দিক।'

আহমদ মুসা ঘড়ি দেখলে। রাত পৌঁনে তিনটা।

আহমদ মুসা বুঝল, ওরা আশা করছে রাত তিনটার মধ্যেই সিডি কাকেমে যাওয়া তাদের বাহিনী ফিরে আসবে এবং তখন তাদের অপারেশন শুরু করবে।

'দক্ষিণ থেকে যারা আসবে তারা এখন কোথায়? খবর নিয়ে আসা লোকটিকে জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘ওরা কিছুদূর দক্ষিণে রাস্তার পাশে একটা ঝোপওয়ালা টিলার আড়ালে ওঁৎ পেতে বসে আছে।’

আহমদ মুসা আবদুর রহমান ওকারীর দিকে চেয়ে বলল, ‘জনাব আমি এই দশজনের কাছে যাচ্ছি।

বলে জর্জের দিকে তাকিয়ে আহমদ মুসা বলল, ‘জর্জ তুমি আমার গাড়ি ড্রাইভ করবে। চল।’

‘আমি বুঝতে পারছি না। গাড়ি নিয়ে কি করে যাবেন? ওরা তো টের পেয়ে যাবে।’ বলল আবদুর রহমান ওকারী।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘এই গাড়িটা ওদের। দেখুন সামনে নম্বার প্লেটে হোয়াইট ঈগল আকাঁ একটা কাগজ সেঁটে দেয়া। নিশ্চয় এটা ওদের মনোগ্রাম হবে। সুতরাং গাড়িকে ওরা সন্দেহ করবে না।

এটাই হবে আমাদের বড় অস্ত্র।

‘আহমদ মুসার কথা শুনে আবদুর রহমান ওকারী, জর্জ আবুবকর সহ সবাই গাড়ির নম্বার প্লেটের দিকে তাকাল, দেখল, একটা সাদা বর্ণের 'T' অক্ষরের উপর হোয়াইট ঈগলটি শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার পোজ নিয়ে বসে আছে।

সকলের সাথে আহমদ মুসাও সেদিকে তাকাল। বলল, 'T' অক্ষরকে ক্রসও ধরা যায় যদি মনে করা হয় ঈগলের আড়ালে ক্রসের উপরের দন্ডটি লুকিয়ে আছে অথবা যদি মনে করা হয় ঈগল নিজেই 'ক্রস' এর সেই দন্ড।'

জর্জ উচ্ছ্বসিত কন্ঠে বলল, ‘ঠিক বলেছেন, ভাইয়া। হোয়াইট ঈগল ক্রসকে ভিত্তি করছে এবং তার ভিত্তিকে ক্যামোফ্লেজ করেছে।’

'ধন্যবাদ জর্জ। তোমার ব্যাখ্যা সুন্দর হয়েছে শুধু তাই নয়, ভাবনার নতুন দিগন্তও উন্মচন করেছে। গ্রুপটির পরিচয় উদ্ধারে এটা আমাদের সাহায্য করবে।’

বলে আহমদ মুসা গাড়ির দিকে এগুলো।

জর্জও গিয়ে ড্রাইভিং সিটে বসল।

সবাইকে সালাম দিয়ে যাত্রা শুরু করল আহমদ মুসা।

হেড লাইট জ্বালিয়ে বেপরোয়া গতিতে এগিয়ে চলল গাড়ি।

মিনিট পাঁচেক ড্রাইভ করার পর রাস্তার ডান পাশের একটা ঝোপ আচ্ছাদিত টিলা অতিক্রম করতেই গাড়ির সামনে এক শেতাংগকে দেখতে পাওয়া গেল। সে দু'হাত উঁচিয়ে গাড়ি থামাতে ইশারা করে চিৎকার দিয়ে বলল, 'আমরা সবাই এখানে'।

আহমদ মুসা জর্জকে লোকটির বাম পাশ ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করাতে বলল।

যখন গাড়ি দাঁড়াল, লোকটি তখন আহমদ মুসার হাতের নাগালের মধ্যে।

গাড়ি স্থির হবার সংগে সংগেই আহমদ মুসা ঝাঁপিয়ে পরে লোকটির গলা বাম হাতে পেচিয়ে ধরে লোকটিকে বুকের সাথে সেটে ধরে জর্জকে লক্ষ্য করে বলল, 'তুমি পূবপাশে গাড়ির আড়ালে চলে এস।'

এই ফাঁকে লোকটি প্রাণপ্রণে চিৎকার করে উঠেছিল। উদ্দেশ্য ঘটনাটা সাথীদের জানিয়ে দেয়া।

তার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়নি। তাদের কানে চিৎকার পৌছেছিল। তারা ছুটে আসছিল গাড়ির লক্ষ্যে।

আহমদ মুসা লোকটিকে বুকে সেটে রেখেই দ্রুত গাড়ির আড়ালে থেকে একটু দক্ষিণে এগিয়ে গেল।

একবার চিৎকার করার পরই লোকটির কন্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেছে ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে পড়েছে তার দেহ। লোকটিকে ঠেলে দক্ষিণে দিকে নিয়ে যাবার সময় আহমদ মুসা বুঝল, লোকটি প্রাণহীন হয়ে পড়েছে।

আহমদ মুসার ডান হাতে স্টেনগান।

আহমদ মুসার লোকটির কভার নিয়ে গাড়ির আড়ালে বেরিয়ে এসে দেখল সবাই ছুটে আসছে গাড়ির দিকে। তাদের দৃষ্টিও গাড়ির উপর নিবদ্ধ।

এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করল আহমদ মুসা।

লোকটিকে ফেলে আহমদ মুসা দু'হাতে স্টেনগান তাক করলো ওদের দিকে।

ততক্ষণে আহমদ মুসা ওদের দৃষ্টিতে পড়ে গেছে। কেউ থমকে দাঁড়িয়েছে, কেউ আবার স্টেনগান ঘুরিয়ে নিচ্ছে।

কিন্তু আহমদ মুসার স্টেনগান তার আগেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

ট্রিগারও চেপেছে আহমদ মুসা।

স্টেনগানের নল চোখের পলকে ঘুরে এল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা লোকগুলোর উপর।

তারপর আহমদ মুসা এগিয়ে গেল তারা যেখানে লুকিয়েছিল সেখানে। আর কোন লোক নেই। গুণে দেখল দশটি লাশ পড়ে আছে মাটিতে। গুলীর কয়েকটা বাক্স পড়ে আছে তাদের লুকিয়ে থাকা জায়গায়।

জর্জ তখন গাড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে।

আহমদ মুসা তাকে বলল, 'জর্জ দশটি স্টেনগান ও গুলির বাক্সগুলো গাড়িতে তোল। আর দেখ, ওদের পকেটে রিভলবার থাকলে সেগুলোও নিয়ে নাও।'

এগুলো গাড়িতে তোলা হয়ে গেলে আহমদ মুসা হাতের স্টেনগান ছাড়াও আর একটি স্টেনগান তার কাধে ঝুলাল। তারপর জর্জকে বলল, 'গাড়ি নিয়ে তুমি মসজিদে ফিরে যাও।' ওখানে গিয়ে জনাব আব্দুর রহমান ওকারীকে বলে ইসহাক আবদুল্লাহসহ দশ বারজন লোককে এখানে পাঠাও লাশগুলোকে লুকিয়ে ফেলার জন্য।

আর এই গাড়িতে ১৮টি স্টেনগান ও ১২টি রিভালবার রয়েছে, এগুলোর উপর তুমি চোখ রাখবে।'

আহমদ মুসার কথা শেষ করল। কিন্তু জর্জ কিছু বলল না। আহমদ মুসা দেখল অপার বিস্ময় নিয়ে জর্জ তার দিকে তাকিয়ে আছে। বোবা হয়ে গেছে যেন সে।

'কি ব্যাপার, এতগুলো লাশ দেখে তোমার খারাপ লাগছে?' বলল আহমদ মুসা।

'না ভাইয়া। আমি দেখছি আপনাকে। আমার বিস্ময় আপনি। আজ রাতের সিডি কাকেম গ্রামের ঘটনা আমি শুনলাম। এখন আবার দেখলাম। যা গল্পের বইয়ে পড়েছি, তা নিজের চোখে দেখলাম। আপনার সর্ম্পকে আমার

কৌতুহল ধরে রাখতে পারছি না। আমি যেটুকু জানি, সেটুকুই আপনার পরিচয় হতে পারে না।' থামল জর্জ।

'সব জানবে, এখন যাও।' বলল হাসি মুখে আহমদ মুসা।

'আমি যাচ্ছি কিন্তু আপনি?'

'আমি এখানেই অপেক্ষা করছি। ওরা এলে ওদের কাজ বুঝিয়ে দিয়ে ইসহাক আব্দুল্লাহকে নিয়ে গ্রামের পূবদিকে যারা গেছে তাদের সন্ধানে বের হবো।'

জর্জ গাড়িতে উঠে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে চলে গেল। দশ বার মিনিট লাগলো লোকদের আসতে।

লাশগুলো মাটির তলায় লুকিয়ে ফেলার এবং রক্তগুলো মাটি চাপা দেবার নির্দেশ দিয়ে আহমদ মুসা ইসাক আবদুল্লাহকে নিয়ে মাঠের মধ্যে দিয়ে গ্রামের পূব প্রান্তের দিকে যাত্রা করল।

আহমদ মুসা ও ইসহাক যতটা সম্ভব ঝোপ-ঝাড় ও উঁচু জায়গায় কভার নিয়ে গ্রামের পূব প্রান্তের দিকে এগিয়ে চলল। ইসাক আবদুল্লাহ সব কিছু চেনে বলে অসুবিধা হলো না।

'ইসহাক আবদুল্লাহ সামনের দিকে ভালো করে খেয়াল রেখো। এদিকে গুলীর শব্দ শুনে ওরা কিংবা ওদের কেউ খোঁজ নিতে এদিকে আসতে পারে'। বলল আহমদ মুসা।

সামনের দিকে চোখ রেখে ওকারী গ্রাম, গ্রামের মানুষের জীবন ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতে করতে চলছে দু'জন। কথায় কথায় কখন যেন আনমনা হয়ে পড়েছিল তারা।

হঠাৎ উদ্যত স্টেনগানধারী একজনকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আহমদ মুসা ও ইসাক আবদুল্লাহ ভূত দেখার মতই চমকে উঠল।

আহমদ মুসার একটি স্টেনগান কাঁধে ঝুলানো, আরেকটি হাতে ঝুলছে। আর ইসাক আবদুল্লাহর হাতে রয়েছে একটি বর্শা এবং কোমরে ঝুলানো একটি ছোরা।

উদ্যত স্টেনগান হাতে দাঁড়ানো লোকটির চোখে-মুখেও বিস্ময়।

লোকটি চিৎকার করে বলল, 'কে তোরা? ওদিকে গোলা-গুলীর শব্দ হলো কোথায়?'

ইসাক আবদুল্লাহ ভীত হয়ে পড়েছে। ফ্যাকাশে হয়ে গেছে তার মুখ ভয়ে। আর আহমদ মুসার চোখে-মুখে একটা নির্দোষ ও ভাবলেশহীন ভাব। যেন উদ্যত স্টেনগান হাতে কোন লোককে সে সামনে দেখছেই না। লোকটির প্রশ্নের জবাবে আহমদ মুসা বলল, আমরা পাশের গ্রামের লোক। আমাদের ছুটে যাওয়া কিছু পশুকে খুঁজতে বেরিয়েছি আমরা। গুলীর শব্দ কোথায়? গোলা-গুলী তো হয়নি। আমি আমার এই স্টেনগান দিয়ে ফায়ার শিখছিলাম। শেই শব্দই আপনি শুনেছেন'।

বলে আহমদ মুসা তার হাতের স্টেনগান সামনের লোকটিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এই দেখেন এর অর্ধেক ম্যাগাজিন খালি।'

লোকটি স্টেনগানটিকে লুফে নিল এবং বলল, 'তোমার কাঁধের স্টেনগানও আমাকে দাও।'

সুবোধ বালকের মত আহমদ মুসা কাধেঁর স্টেনগানটিও তার হাতে তুলে দিল।

দ্বিতীয় এই স্টেনগানটি হাতে পাওয়ার পর লোকটির উদ্ধত করে রাখা স্টেনগানের ব্যারেল অনেকখানি নিচে নেমে গেল এবং আহমদ মুসার কাছ থেকে পাওয়া স্টেনগাটি সে সময় কাঁধে ঝুলছিল।

এই সুযোগ নষ্ট হতে দিল না আহমদ মুসা।

চোখের পলকে তার ডান হাতে পকেটে ঢুকে গেল এবং বের করে আনল একটি রিভলবার। সংগে সংগেই গুলী বর্ষিত হলো রিভলবার থেকে। চোখের পলকেই ঘটে গেল ঘটনা।

লোকটির চোখে দৃশ্যটা ধরা পড়েছিল শেষ মুহূর্তে। কিন্তু স্টেনগান তোলার আর সুযোগ পেল না সে। মাথা তার গুড়ো হয়ে গেল আহমদ মুসার গুলীতে।

লোকটির পকেট সার্চ করে কোন কাগজপত্র পেলো না। পেল একটি রিভালবার ও একটি মানিব্যাগ।

আহমদ মুসা রিভলবারটি পকেটে পুরে ম্যানিব্যাগটা রেখে দিল আবার লোকটির পকেটেই।

‘ম্যানিব্যাগ মৃত মানুষের পকেটে রাখলে কোন লাভ হবে কি মৃত মানুষের?’ বলল ইসহাক।

‘লাভ তার হবে না, লাভ হবে আমাদের।’

‘কি লাভ জনাব?’

‘যে ঘটনা ঘটল তার সাথে অর্থলোভের কোনো সর্ম্পক ছিল না। তার টাকা পয়সা হাতে পেয়েও নেইনি, এর মাধ্যমে সেটা প্রমাণ হবে। এই অর্থ প্রত্যাখান করার ফলে আমাদের মধ্যে নিস্বাঃর্থ কাজের স্পৃহা বাড়বে।’

‘ওয়ারিশহীন এটা নিলে কি সে স্পৃহা কমতে পারে?’

‘কমতে পারে।’

‘কিভাবে?’

‘আজ যদি তার এই টাকাগুলো নেই, সে টাকায় আমার তোমার নিশ্চয় উপকার হবে। কালকে আরও কয়েকজন নিহতের টাকা আমাদের পকেটে আসবে। তাতে আমরা আরও উপকৃত হব। এইভাবে ধীরে ধীরে আমাদের মনে এই ধারণা জন্মাবে যে, শত্রুর বিরুদ্ধে এই অপারেশন, হত্যা ইত্যাদি নীতি ও আদর্শিক দিক থেকে প্রয়োজনীয়ই শুধু নয়, লাভজনক। ধীরে ধীরে এই লাভটাই এক সময় মুখ্য হয়ে ওঠবে। তখন আমার এই কাজগুলো আর নিঃস্বার্থ বা 'ফি সাবিলিল্লাহ' হবে না। এর চেয়ে বড় ক্ষতি আমার এবং তোমার আর কিছু হতে পারে না।’

ইসাক আবদুল্লাহর মুগ্ধ দৃষ্টি আঠার মত লেগে ছিল আহমদ মুসার মুখে। আহমদ মুসার কথা শেষ হলে বলল সে, ‘এই ধরণের কথা কোনদিন শুনিনি। এগুলো তো নতুন মানুষের কথা, নতুন মানসিকতার কথা, নতুন সভ্যতার কথা। এটাও কি ইসলামেরই শিক্ষা?’

‘অবশ্যই ইসহাক।’

বলে একটি স্টেনগান ইসাক আবদুল্লাহর কাঁধে তুলে দিয়ে আর দু'টি আগের মত করেই নিজে নিয়ে নিল।

আবার চলতে শুরু করছে ওরা। গ্রামের পুব প্রান্তে প্রায় এসে গেছে।

এখন দাড়িঁয়ে নয়, হামাগুড়ি দিয়ে পথ চলতে শুরু করেছে তারা। তাদের সন্ধানি দৃষ্টি এবার চারদিকে। একবার অমনোযোগিতার অপরাধ আল্লাহ মাফ করেছেন, তার পুনরাবৃত্তি আর তারা চায় না।

এক জায়গায় একটি ঝোপের আড়ালে বসে তারা বিশ্রাম নিচ্ছিল। পুব দিক থেকে আসা বাতাসে সিগারেটের গন্ধ তাদের নাকে ঢুকল। চমকে উঠল আহমদ মুসা। নিশ্চয় শত্রু আশেপাশে কোথাও আছে।

ভাবনা শেষ হতে পারেনি আহমদ মুসার।

মানুষের কথা শুনতে পেল একদম ঝোপের ওপাশেই। কথা বলতে বলতে কারা যেন এগিয়ে আসছে। কথাগুলো স্পষ্টভাবে আহমদ মুসার কানে এল, 'কিছু একটা ঘটছে। এই মাত্র যে রিভালবারের গুলীর শব্দ এল তা খুব দূর থেকে নয়।'

কথাগুলো থেকে আহমদ মুসার মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হবার আগেই ঝোপ পেরিয়ে তারা একদম সামনে এসে গেছে।

আহমদ মুসা স্টেনগান বাগিয়ে ধরে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

স্টেনগান ওদের দিকে তাক করে চিৎকার করে বলল, 'হাতের স্টেনগান ফেলে দাও তোমরা।'

এগিয়ে আসা লোকগুলোর কাছে এই চিৎকার বোমা পড়ার মতই বোধ হয় মনে হলো।

সামনের দু'জনের হাত থেকে স্টেনগান আপনাতেই যেন খসে পড়ল। অন্যেরা স্টেনগান ফেলেনি। কেউ কেউ ঘটনার আকস্মিকতার ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেনি। পেছন থেকে কয়েকজন দু'পাশে পালাচ্ছিল। আহমদ মুসা তাদের এ সুযোগ দিল না। গর্জে উঠল তার হাতের স্টেনগান। মুহুর্তেই নয়জন লাশ হয়ে ঢলে পড়ল মটিতে।

আহমদ মুসা লাশ গুণে দেখে বলল, 'ইসহাক আবদুল্লাহ আমাদের পুর্বমুখী অভিযান শেষ।'

একটু থেমেই আবার বলল, 'ওদের সকলের পকেট সার্চ কর। রিভালবার ও যেকোন ধরণের কাগজপত্র থাকলে নিয়ে নাও।'

এদের কাছেও কোন কাগজপত্র পাওয়া গেল না। রিভলবার পাওয়া গেল সকলের কাছেই। নয়টা স্টেনগানও নিয়ে নেয়া হলো। রিভালবারগুলো পকেটে এবং স্টেনগানগুলো দু'জন কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে গ্রামের দিকে যাত্রা শুরু করল।

মসজিদ, মসজিদ চত্তর ও রাস্তায় জমায়েত গ্রামবাসীরা দারুন উদ্বিগ্ন। গুলির সবগুলো শব্দই তারা শুনেছে। এই গুলি কারা করল এবং কারা এর শিকার হল, সেটাই তাদের উদ্বেগ।

জর্জ ও আবু বকরের কাছে বসে ছিল আবদুর রহমান ওকারি।

তার মনে দুশ্চিন্তা ও গর্ব দুই-ই।দুশ্চিন্তা এই কারণে এই গোলা-গুলীর মধ্যে তার ছেলে কখনও যায়নি। আজ কি হয় কে জানে! আর গর্ব এই জন্যে যে, 'আহমদ আবদুল্লাহর মত এত বড় বিদেশী লোক তার ছেলেকে পছন্দ করেছে তার সাথী হিসাবে।'

আবদুর রহমান ওকারী বার বার জিজ্ঞেস করেছে জর্জ এবং আবু

বকরকে, গ্রামের পূর্ব পাশ ঘুরে আসতে এত দেরী কেন, আল্লাহ আমাদের বিজয়ী করবে তো ইত্যাদি। তারপর জিজ্ঞাসা করেছে, সত্যিই আহমদ আবদুল্লাহ কে? এ রকম লোক তো দেখিনি, শুনিনি এমন লোকের কথা। কোথেকে আল্লাহ তাকে আনলেন? ইত্যাদি।

জর্জ বলেছে, আমরাও কিছু জানি না। তার সম্পর্কে শুধু এইটুকু বলতে পারি, তিনি কোন সাধারণ লোক নন। হয় কোন ফেরেস্তা মানুষ রূপ ধরে এসেছেন, অথবা কোন অসাধারণ কেউ হবেন যে পরিচয় আমরা এখনও জানি না।

এই সময় আহমদ মুসা ও ইসাক আবদুল্লাহ মসজিদ চত্তরে প্রবেশ করল স্টেনগানের বোঝা নিয়ে।

সবাই আনন্দ ধ্বনি করে উঠল। কেউ কেউ আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিল।

জর্জ, আবু বকর এবং আবদুর রহমান ওকারী তখনও বসে অস্ত্র রাখা অটো হুইলারে।

আহমদ মুসাকে দেখেই আবু বকর গাড়ি থেকে বেরিয়ে ছুটে গেল আহমদ মুসার কাছে। তার কাছের স্টেনগানগুলো নিয়ে আহমদ মুসার সাথে সাথে চলল জর্জের গাড়ির দিকে।

জর্জ গাড়ি থেকে বের হয়নি আহমদ মুসার নির্দেশ অনুসারে পাহারা থাকার জন্যে।

সব অস্ত্র রাখা হল গাড়িতে।

আহমদ মুসা গাড়িতে বসতেই আবদুর রহমান ওকারী বলল, ‘ওদিকের কি সংবাদ বলুন জনাব, আমাদের তর সইছে না।’

‘ওরা দশজনই মারা গেছে। বাকি কথা ইসহাক আব্দুল্লাহর কাছে শুনবেন।'

বলে একটু থেমেই আবার বলল, ‘আমার কিছু জরুরি কথা আছে।’

‘শুনব তার আগে বলুন, আমার ছেলের নামের প্রথম অংশ ‘ইসাক’ না ‘ইসহাক’। আপনি 'ইসহাক' বলছেন। বলল আবদুর রহমান

ওকারী।

‘শুদ্ধ উচ্চারণ ‘ইসহাক’। বলে থামল।

আবার শুরু করল আহমদ মুসা। বলল, 'এখানে যারা হাজির আছে, তার মধ্যে জনাব আবদুর রহমান ওকারী ও ইসহাক আবদুল্লাহ এই

দু’জন ওকারী গ্রামের, জর্জ গ্রান্ড টার্কস দ্বীপের, আবু বকর ভিজকায়া মামুন্ড দ্বীপের। আর হাজির আছেন সিডি কাকেম গ্রামের কয়েকজন যুবক। ওরা পাশের গাড়িতে আছে। ডাকলেই আসবে। আর কাউকে ডাকার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন জনাব।’ শেষ বাক্যটা আবদুর রহমান ওকারীকে লক্ষ্য করে বলল আহমদ মুসা।’

‘কি কাজের জন্যে মানে এখন আলোচনার বিষয় হবে কি?’

‘এই দ্বীপ এবং দ্বীপপুঞ্জের ভবিষ্যত সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলতে চাই।’

‘তাহলে আমাদের গ্রামের ‘রক্ষা সমিতি’র সেক্রেটারী ফরিদ নোয়ানকোকে ডাকতে হয়। আমাদের ইসহাক আবদুল্লাহ গ্রামের ‘রক্ষা সমিতির’র সভাপতি।’

‘বেশ তাকে ডাকুন আর ও গাড়ি থেকে সিডি কাকেম গ্রামের ওদেরকেও ডাকতে হবে।'

সবাইকে ডাকা হলো।

অটো হুইলারের ভ্যান বক্সের সিটে গোল হয়ে সবাই বসল।

কথা শুরু করল আহমদ মুসা। বলল, ‘আজ যে ঘটনা ঘটল, তাতে শত্রুদের একটা বড় আক্রমণ রোধ করা গেছে। তাদের তিরিশজন মারা গেছে আজ। এর প্রতিশোধ তারা নিতে চাইবে এ দ্বীপে, কিংবা অন্য দ্বীপে। ঠিক কিনা?’

‘ঠিক।’ বলল জর্জ এবং আবদুর রহমান ওকারী প্রায় এক সাথেই।

‘যদি ঠিক হয়, তাহলে তিনটি বিকল্প ব্যবস্থা আমাদের সামনে। এক, পালানো, দুই, নীরবে মার খেয়ে নিঃশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া এবং তিন, আজকের মত প্রতিরোধ করা। এ তিনের মধ্যে পালানো আসলে কোন বিকল্প নয়। পালিয়ে বাঁচা যায় না। অবশিষ্ট থাকে দু’ই বিকল্প। এর মধ্যে আমাদের কোনটি গ্রহণ করা উচিত?’ বলল আহমদ মুসা।

কিছুক্ষণ নীরবতা। সবাই একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

কিছুক্ষণ পর সবার পক্ষ থেকে প্রশ্নের উত্তরে বলল ইসহাক আবদুল্লাহ, শেষ বিকল্প ব্যবস্থাটাই আমাদের গ্রহণীয়। কিন্তু আজকের মত আপনাদের আমাদের সাথে থাকতে হবে।

‘আমি বিদেশি। আমি কতক্ষন থাকব। আপনাদের নিজের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদেরই নিতে হবে।’ বলল আহমদ মুসা।

সে শক্তি এবং সাহস আমাদের অবশিষ্ট নেই ভাইয়া।’ বলল জর্জ।

‘তোমরা যদি ঐক্যবদ্ধ হও। একে অপরের পাশে দাঁড়াও এবং ওরা যা নিয়ে আসবে, সে প্রস্তুতি তোমাদেরও থাকে, তাহলে কি তোমরা ওদেও ভয় করবে?’

‘আমাদের ঐক্যও নেই, আমাদের অস্ত্রও নেই, আমাদের সাহসও

নেই। এসব যদি থাকে, ভয় অবশ্যই থাকার কথা নয়’ ।বলল আবু বকর।

'এই ঐক্য এবং প্রতিরোধের শক্তি কী আপনাতেই আসবে না কেউ বা কিছু লোককে এর উদ্যোগ নিয়ে অর্জন করতে হবে? বলল আহমদ মুসা।

‘কিছু লোককে এর উদ্যোগ অবশ্যই নিতে হবে।’ জর্জ বলল।

এই উদ্যোগ নিতে তোমরা রাজী আছ?' আহমদ মুসা বলল।

‘রাজী, কিন্তু...।’ কথা শেষ না করেই থেমে গেল ইসহাক আবদুল্লাহ।

‘কিন্তু কি।’

‘আবার সেই কথা, আপনাকে আমাদের সাথে থাকতে হবে, নেতৃত্ব দিতে হবে।’ বলল জর্জ।

‘আমিও আবার বলছি, তোমাদের মধ্যে শক্তি, সাহস, যোগ্যতা, সবই আছে। শুধু প্রয়োজন সে সবকে উজ্জীবিত করা।’

‘এই উজ্জীবিত করার দায়িত্বই আপনাকে নিতে হবে। গত কয়েক দিনে আমরা যেভাবে নিজেদের চিনতে শুরূ করেছি, তা আমাদের কাছে অজানা ছিল। এখনও বহু কিছুই আমাদের অজানা। এই জানাবার দায়িত্ব আপনি ছাড়া আর কে নেবে?’ বলল আবদুর রহমান ওকারী।

‘আমি আমার দায়িত্ব পালন করব। আমি জানতে চাই, তোমরা তোমাদের দায়িত্ব পালন করতে রাজী আছ কিনা।’

‘আমরা রাজী।’ সমস্বরে সবাই বলল।

‘পরিণতির কথা কি তোমাদের সামনে আছে? বলল আহমদ মুসা গম্ভীর কন্ঠে।’

‘আছে।’

‘শান্তির বদলে এই অশান্তির পথে গ্রহণে পক্ষে তোমাদের যুক্তি কি?’

‘আমরা শান্তিতে ছিলাম না। তিল তিল করে আমরা মরছিলাম। শান্তির জন্যে, স্বাধীনভাবে বাঁচার জন্যেই আমরা এই সংগ্রামের পথ গ্রহণ করতে চাই।’ বলল জর্জ।

জর্জ থামতেই বলে উঠল আবু বকর, ‘বর্তমান অবস্থার যে পরিনতি, আর প্রতিরোধ করার যে পরিনতি-এ দু'য়ের মধ্যে ক্ষতির দিক দিয়ে খুব পার্থক্য নেই।

কিন্তু একটা বড় পার্থক্য রয়েছে। প্রথমটা অপমানকর মৃত্যু, আর দিতীয়টি বীরের মৃত্যু।' আরেকটা পার্থক্য আছে। সেটা হলো, প্রথমটিতে আছে শুধুই ধ্বংস, কিন্তু দ্বিতীয়টির একটি বিকল্প হলো স্বাধীনতা ও সম্মানের জীবন।

জর্জ ও আবু বকরের কথা শুনে আহমদ মুসার মুখ আনন্দ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল সকলকে লক্ষ্য করে, 'তোমাদের কথা বল।'

সকলে একবাক্যে বলে উঠল, 'জর্জ ও আবু বকর যা বলছে, ওঠাই আমাদের সকলের কথা।'

'যদি তাই হয়, তাহলে তোমাদের সংঘবদ্ধ কাজ দরকার এবং এজন্যে তোমাদের একটা সংগঠন দরকার। তোমরা একমত এ ব্যাপারে?' বলল আহমদ মুসা।

আমরা একমত, আমরা রাজী।' সকলে আনন্দে চিৎকার করে উঠল।

'ধন্যবাদ। প্রথমে সংগঠনের একটা নামকরণ প্রয়োজন। তারপর প্রয়োজন প্রাথমিক একটা সেন্ট্রাল কমিটি গঠন। এরপর হতে হবে সংগঠনের লক্ষ্য নির্ধারণ। গঠনতন্ত্র, ইত্যাদির প্রণয়ন হবে পরবর্তী কাজ।' একটু থামল আহমদ মুসা।

একটু ভাবল। তারপর বলল, 'তোমাদের কারও কোন প্রস্তাব আছে এ সংগঠনের নাম কি হতে পারে, সে ব্যাপারে?'

সংগে সংগে কেউ কোন উত্তর দিল না। সবাই ভাবল।

প্রথম কথা বলল প্রবীন আবদুর রহমান ওকারী। বলল, 'এই শুভ ও বড় কাজটা আপনিই করুন। এটা যেমন ঐতিহাসিক হবে, বরকতও এতে আসবে।'

সবাই সমস্বরে তাকে সমর্থন করে বলে উঠল, 'আমরাও সকলে এটাই চাচ্ছি।'

আহমদ মুসা একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'এই মুহূর্তে আমার মাথায় দু'টি নামের চিন্তা এসেছে। এক, ক্যারিবিয়ান ক্রিসেন্ট, দুই, আটলান্টিক ক্রিসেন্ট। তৃতীয় আরেকটা নামও হতে পারে 'আমেরিকান ক্রিসেন্ট'। দেখ, তোমাদের কোন নাম পছন্দ হয়।'

‘ইসলাম’, ‘মুসলিম’ ধরনের জাতীয় পরিচয় জ্ঞাপক কোন শব্দ যে এখানে থাকলো না?’ প্রশ্ন করল আবদুর রহমান ওকারী।

‘ক্রিসেন্ট’ শব্দ দ্বারা এই প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায়। গোটা দুনিয়ায় এখন এই ‘ক্রিসেন্ট’ শব্দ ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করছে।’

‘ঠিক বলেছেন স্যার। খৃষ্টানদের যেমন ‘ক্রস’ মুসলমানদের তেমনি ‘ক্রিসেন্ট’।

বলল কলিন কামাল। চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল ছাত্র। সে সবশেষে এসে যোগ দিয়েছে মিটিং-এ।

এরপর সবাই নীরব। নীরবতা ভাঙল জর্জ। বলল, ‘তিনটি নামই ভাল। তবে আমার মতে গভীরতার দিক দিয়ে ‘আটলান্টিক ক্রিসেন্ট’ বেশি উপযুক্ত।’

‘জর্জ, তোমার চিন্তা আরেকটু বুঝিয়ে বল সবাইকে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ক্যারিবিয়ান ক্রিসেন্ট’ ও ‘আমেরিকান ক্রিসেন্ট’ এই দুই নামের মধ্যে স্থানিক একটা সীমাবদ্ধতা আছে। সেদিকে থেকে একে আমার কাছে স্থুল মনে হয়েছে। অন্যদিকে ‘আটলান্টিক ক্রিসেন্ট’ নামের মধ্যে অগ্রসরমান মিশনারী স্পিরিটের একটা ভাব আছে। আজকের আমেরিকার ধর্ম, সভ্যতা যা কিছু আছে সব আটলান্টিকের পথেই এসেছে।’ থামল জর্জ।

জর্জ থামতেই আবু বকর মোহাম্মদ বলে উঠল, ‘আমি জর্জের সাথে একমত। কিন্তু তাঁর ব্যাখ্যা শুনেই আমার মনে হচ্ছে, নাম ‘আটলান্টিক ক্রিসেন্ট’ না হওয়াই ভাল। তাঁর ব্যাখ্যা অনুসারে ‘আটলান্টিক ক্রিসেন্ট’- এর মধ্যে এই ভাব আছে যে, ক্রিসেন্ট বা ইসলামের মিশন অভিযান করে আমেরিকার দিকে আসছে, যেমন এসেছে অন্য ধর্ম, অন্য সভ্যতাও। এতে মনে হতে পারে ইসলামকে এখানে আমদনী করা হচ্ছে। এ ধরণের মনে হওয়া খুব ভালো নয়। বরং আমরা যদি বলি, আমরা মুসলিম আমেরিকানরা আমেরিকান মুসলমানদের বাচাঁতে চেষ্টা করছি, ইসলামের উজ্জীবন ঘটাতে চাচ্ছি এখানে আমেরিকার স্বার্থে, আমেরিকান মানুষের স্বার্থে, তাহলে এটাই বেশি যুক্তিযুক্ত হয়।

এদিক থেকে ‘আমেরিকান ক্রিসেন্ট’ হওয়ায়ই ভাল আমার মতে।

আবু বকর কথা শেষ করতেই জর্জ উঠে গিয়ে আবু বকর কে জড়িয়ে ধরল। বলল, 'ধন্যবাদ আবু বকর। তোমাকে সেই আবাবাকা মনে হচ্ছে না। এমন গভীর চিন্তা তোমার মাথায় এল কি করে? সমস্যার মৌলিক দিক এমনভাবে ভাবতে পারলে কি করে! তোমাকে আবার ও ধন্যবাদ আবু বকর।'

জর্জ ছেড়ে দিল আবু বকরকে।

'স্যার, আমার সম্পর্কে উনি একটু বেশি বলেছেন।' বলল আবু বকর আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে।

'স্যার' নয় ভাই বলবে।' আবু বকরের কথা শেষ হবার সংগে সংগেই বলল জর্জ।

এর পর জর্জ আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি আবু বকরের যুক্তিকেই সঠিক মনে করছি। আমার মত প্রত্যাহার করছি ভাইয়া।'

'ধন্যবাদ জর্জ।' বলে আহমদ মুসা সবার দিকে চেয়ে বলল, এবার তোমাদের মত বল।

সবাই এক যোগে বলল, আমাদেরও মত 'আমেরিকান ক্রিসেন্ট' এর পক্ষে।

'ধন্যবাদ তোমাদের।' বলে একটু থামল আহমদ মুসা।

একটু ভাবল। শুরু করল আবার, আলহামদুলিল্লাহ। নাম ঠিক হয়ে গেল 'আমেরিকান ক্রিসেন্ট টার্কস দ্বীপপুঞ্জ'। আমেরিকান ক্রিসেন্ট টার্কস দ্বীপপুঞ্জ।এর একটা প্রাথমিক সেন্ট্রাল কমিটি এখনই গঠিত হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।'

সকলে বলে উঠল, 'আমরাও চাই।'

'আমি মনে করি এই সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির একজন প্রেসিডেন্ট, একজন সেক্রেটারী জেনারেল, চারজন সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল এবং আটজন সদস্য থাকা উচিত। তোমরা কি মনে কর?

সকলে বলল, 'আমরা একমত'।

‘আমি মনে করি আজ এখন তোমরা প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী জেনারেল, দু’জন সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল ও চারজন সদস্য ঠিক কর। অবশিষ্ট সাতজন পরে ঠিক হবে। তোমরা একমত?’ বলল আহমদ মুসা।

‘জি, একমত।’ সবাই বলল।

‘ধ্যনবাদ। বল তোমরা কিভাবে ঠিক করবে।’

‘আপনি ঠিক করে দিন।’

‘না, তা হয় না। তোমাদের নেতা তোমাদের ঠিক করতে হবে।’

বলে আহমদ মুসা ব্যাগ থেকে কতগুলো কাগজের শ্লিপ বের করল। প্রত্যেকের হাতে একটি করে শ্লিপ দিয়ে নিজের সিটে ফিরে এস বলল, ‘দেখ কাগজের শ্লিপে সভাপতি, সেক্রেটারী জেনারেল, দুই সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল এবং চারজন সদস্যের পদের নাম আছে। এ পদগুলোর মধ্যে যে পদের জন্যে যাকে পছন্দ কর তার নাম লিখে দাও।’

দুই তিন মিনিটের মধ্যে সব কাগজ আহমদ মুসার হাতে এসে গেল।

আহমদ মুসা ভোট গণনা করল।

তারপর সকলের দিকে চেয়ে বলল আলহামদুলিল্লাহ। তোমরা আমাকে অবাক করেছ। তোমরা যে পদে যে ভোট পেয়েছ, সকলের কাছ থেকে পেয়েছ। অর্থাৎ ভোট ভাগ হয়নি। তোমাদের চিন্তার এই ঐক্য আমার কাছে আল্লাহর রহমতের বিশেষ ফল বলে মনে হচ্ছে।

আমার মনে হচ্ছে, ‘আমেরিকান ক্রিসেন্ট’ নামে যে সংগঠন তোমরা গড়ে তুললে আল্লাহ তাকে কবুল করেছেন।’...'

আহমদ মুসা বাক্যটি শেষ করার সাথে সাথে সকলে আনন্দে ‘আল্লাহ আকবর’ ধ্বনি দিয়ে উঠল।

আহমদ মুসা থেমে গিয়েছিল। আবার শুরু করল, ‘তোমরা এখানে আটজন যুবক হাজির আছ এবং দু’জন মুরব্বী হাজির আছেন। এই

দশজনের ভোটে নির্বাচিত আট সদস্যের কমিটি এখন আমি ঘোষণা করছি। সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছে গ্রান্ড টার্কস এর মুহাম্মদ জর্জ জেফারসন।’

নাম ঘোষণার সাথে সাথে একমাত্র জর্জ ছাড়া উপস্থিত নয়জন ‘আল্লাহ আকবর’ ধ্বনি দিয়ে হাততালি দিয়ে উঠল।

আহমদ মুসা থেমে গিয়েছিল। আবার শুরূ করল, 'সেক্রেটারী জেনারেল হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন ওকারী গ্রামের ইসহাক আব্দুল্লাহ।’

সংগে সংগেই আবার সেই আল্লাহ আকবর ধ্বনিত ও হাততালিতে আহমদ মুসাকে থেমে যেতে হলো।

আহমদ মুসা বলল, ‘তোমারা আমাকে ঘোষণা শেষ করতে দাও। তারপর ধ্বনি দিও, হাততালি দিও সবকিছু করো।’

বলে আহমদ মুসা আবার শুরু করল, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল নির্বাচিত হয়েছে ‘ভিজকায়া মামুন্ড’ দ্বীপের আবু বকর মুহাম্মদ। আরেকজন সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল নির্বচিত হয়েছে সিডি কাকেম গ্রামের আলী রুফাই। আর চারজন সদস্য নির্বাচিত হয়েছে, ওকারী গ্রামের ফরিদ নোয়ারাকো ও কলিন কামাল এবং সিডি কাকেম গ্রামের ওমর লাওয়াল ও রমজান ইরোহা।’

আহমদ মুসা ঘোষণা শেষ করল।

কিন্তু ঘোষণা শেষ হলেও আল্লাহু আকবর ধ্বনি ও হাততালি দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করা হল না। সকলের মুখ গম্ভীর মাথা নিচু।

আর জর্জ, ইসহাক আবদুল্লাহ ও আবু বকরের চোখ দিয়ে অশ্রু গড়াচ্ছিল। আহমদ মুসা ঘোষনা শেষ করে উঠে গিয়ে এক এক করে সকলকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

কেঁদে ফেলল সকলেই।

আহমদ মুসা ফিরে এল তার আসনে। বলল, ‘তোমরা কাঁদছ দেখে আমার আনন্দ লাগছে। আজ কত বড় দায়িত্ব তোমরা কাঁধে তুলে নিলে তোমরা তা বুঝতে পেরেছ। এই মুহূর্তটা বিগলিত মন আর অশ্রু ভরা চোখ নিয়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার সময়। এস আমরা মুনাজাত করি।’

বলে আহমদ মুসা হাত তুলল মুনাজাতের জন্যে। তার সাথে সবাই হাত তুলল।

দোয়া শেষ আহমদ মুসা বলল, ‘তোমাদের যে সংগঠন গঠিত হলো, তার একটা উপদেষ্টা কাউন্সিল থাক প্রয়োজন। একটা তথ্য ও গবেষণা শাখা থাকতে হবে। এবং প্রতরিক্ষার জন্য গড়ে তুলতে হবে একটা ‘হোমগার্ড বাহিনী’। থামল আহমদ মুসা।

‘আমরা একমত।’ সবাই একযোগে বলল।

আবার শুরু করল আহমদ মুসা, ‘নয় সদস্যের একটা উপদেষ্টা কাউন্সিল হবে। জনসাব আবদুর রহমান ওকারী ও আবু বকরের আব্বা।

মোহাম্মদ আলী পাওয়েল এই দু'জনকে নিয়ে উপদেষ্টা কমিটি কাজ শুরু করবে। পরে সাতজন নেয়া হবে এবং তখন যথারীতি কমিটি গঠনহবে। আর তথ্য ও গবেষণা সেল গঠিত হবে মহিলাদের সাতজন সদস্য নিয়ে। আপাতত ডাঃ মার্গারেট ও লায়লা জেনিফার চেয়ারপারসন ও সেক্রেটারী হিসেবে কমিটির কাজ শুরু করবেন। অন্যদিকে হোমগার্ড বাহিনী গঠিত হবে এই দ্বীপপুঞ্জের আগ্রহী সকল যুবককে নিয়ে। আজ শত্রদের কাছ থেকে কুড়িয়ে পাওয়া ত্রিশটি স্টেনগান ও ত্রিশটি রিভলবার হবে এই বাহিনীর প্রথম অস্ত্র ভান্ডার। এই বাহিনীর ট্রেনিং-এর দায়িত্ব আমার। আজ সকাল থেকে এই ট্রেনিং শুরু হবে। তার আগে এখনই বাইরে উপস্থিত যুবকদের মধ্যে থেকে যারা আগ্রহী তাদের এই বাহিনীতে শামিল করার ব্যাবস্থা করুন। সিডি কাকেম গ্রাম থেকে রিক্রুটের দায়িত্ব নেবে আলী রুফাই, ওমর লাওয়াল এবং রমজান ইরোহা।' থামল আহমদ মুসা।

থামার সংগে সংগে ভ্যান বক্সে উপস্থিত নয়টি কণ্ঠ উচ্চকণ্ঠে 'আল্লাহু আকবে' ধ্বনি দিয়ে উঠল।এই তকবির ধ্বনি রাতের নীরবতা চৌচির করে বাইরে অপেক্ষমান অর্ধ সহস্র নারী পুরুষের কানসহ বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল।

টার্কস দ্বীপপুঞ্জের এটাই প্রথম সম্মিলিত তকবির ধ্বনি।

তকবির ধ্বনি মিলিয়ে যেতেই আবদুর রহমান ওকারী উঠে দাঁড়াল।

বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, 'আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায়

করছি। আজ আমাদের নতুন জন্ম হলো এবং তা হলো ফেরেশতা তুল্য আপনার হাতে। কিছুক্ষণ পূর্ব পর্যন্ত আমার মনে প্রবল আকুলি বিকুলি ছিল আপনার সত্যিকার পরিচয় কি তা জানার জন্যে। কিন্তু এখন আর তা নেই। এখন

আমার কাছে আপনার একটিই পরিচয়, আল্লা আপনাকে আমাদের জন্যে পাঠিয়েছেন। মনে আমার এখন একটাই উদ্বেগ, কখন আবার আল্লাহ আপনাকে সরিয়ে নিয়ে যান।' থামল আবদুর রহমান ওকারী।

আহমদ মুসা হাত ঘড়ির দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'চলুন জনাব। তোমরা সকলে চল। সকলের কাছে 'আমেরিকান ক্রিসেন্ট টার্কস দ্বীপপুঞ্জ' (ACT) গঠিত হয়েছে তার ঘোষণা দিয়ে এর বাহিনীতে যোগ দেয়ার জন্যে যুবকদের আহব্বান করতে হবে।'

আহমদ মুসা উঠল। সবাই উঠে দাঁড়াল।

আগে চলল আহমদ মুসা। তার সাথে সাথে বলল আবদুর রহমান ওকারী।

গাড়ি থেকে নামতে নামতে আবদুর রহমান ওকারী আহমদ মুসাকে বলল, 'জনাব আপনি প্রথমে কিছু বলুন। মানুষ উন্মুখ হয়ে আছে আপনার কথা শোনার জন্যে। খুব খুশি হবে তারা।'

'অবশ্যই বলব জনাব। শুধু টার্কস দ্বীপপুঞ্জ কিংবা শুধু ক্যারিবিয়ানের জন্যে নয়, গোটা আমেরিকারে জন্যে এটা এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত।'

নামল সবাই গাড়ি থেকে। চলল মসজিদের উঁচু চত্তরে উঠার জন্যে।

ওখান থেকে কথা বললে সবাই ভালো করে শুনতে পাবে। দেখতে পাবে।

# ৬

একজন মধ্যবয়সী শ্বেতাংগ। বসে আছে রিভলবিং চেয়ারে একটা বড় সুদৃশ্য টেবিল সমনে রেখে।

তার বাম পাশের সাইড ডেস্কে টেলিফোন, ইন্টারকম ও ফ্যাক্স। আর ডান পাশে ইন্টারনেট এবং বড় একটি কম্পিউটার। তার পেছনের দেয়ালে তার মাথা বরাবর উঁচুতে একটা লাল পাথরে একটা সাদা বৃত্তের মধ্যে একটা সাদা 'T'-এর উপর উধ্যত ভঙ্গির একটা সাদা ঈগল নিয়ে সুন্দর একটা মনোগ্রাম খোদাই করে তৈরি।

একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে লোকটির সার্টসহ ঘরের টেবিল, টেলিফোন, কম্পিউটার ইত্যাদি সব কিছুতেই এই সাদা মনোগ্রাম আঁকা।

দীর্ঘকায় লোকটির দেহের গড়ন অত্যন্ত বলিষ্ট।

চোখের দৃষ্টি সাপের মত ঠান্ডা এবং অন্তর্ভেদী।

এই অন্তর্ভেদী দৃষ্টি তার স্থির নিবদ্ধ ছিল সামনে বসা একজন যুবকের প্রতি, যার সাথে সে কথা বলছিল।

যুবকটির গায়ে আর্মি কাট-এর সাদা সার্ট। তারও সার্টের কলারে ঐ হোয়াইট ঈগল-এর মনোগ্রাম আঁকা।

বলছিল রিভলভি চেয়ারে বসা সেই দীর্ঘকায় লোকটি, 'রাখ তোমার ক্ষয়-ক্ষতির হিসেব। আমি জানি সাউথ টার্কো দ্বীপের তিনটি ঘটনায় 'হোয়াইট ঈগল'-এর ৩৪ জন মূল্যবান সন্তান হারিয়ে গেছে। আমি জানতে চাই, লাশগুলো পাওয়া গেছে কিনা? হাওয়া হয়ে যাওয়া তিনটি মোটর বোটের সন্ধান পেয়েছ কিনা?'

দীর্ঘকায় বলিষ্ট দেহের সাপ চক্ষুর এই লোকটিই জিজে ফার্ডিনান্ড

(জর্জ জেমস ফার্ডিনান্ড)। দুধষ্য 'হোয়াইট ঈগল' দলের ক্যারিবিয়ান এলাকার প্রধান।

'হোয়াইট ঈগল' দলটি 'অল আমেরিকান এ্যাসোসিয়েশন অব হোয়াইট ক্রস সার্ভিস' সংক্ষেপে' হোয়াইট ক্রস সার্ভিস' - HCS এর সামরিক সংগটন। 'হোয়াইট ক্রস সার্ভিস' আমেরিকা জোড়া একটা এনজিও। প্রচার করা হয় এনজিওটি শান্তির স্বার্থে নিবেদিত। হোয়াইট ক্রস-এর প্রকাশ্য ব্যাখ্যা হলো 'শান্তির ক্রস'। কিন্তু অফিসিয়াল বা গোপন ব্যাখ্যা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এই অফিসিয়াল ব্যাখ্যায় বলা হয়, 'ক্রস' এগিয়ে চলার একটা বাহন, বিজয়ের একটা অস্ত্র এবং এই বাহন ও এই অস্ত্র কাজ করবে শুধু শ্বেতাংগদের জন্যেই। 'ঈগল শ্বেতাংগ স্বার্থের প্রতীক এবং ক্রস তার বাহন। একে মনোগ্রাম হিসেবে গ্রহণ করে হোয়াইট ইগল তার উদ্দেশ্যের কথা পরিস্কার বলে দিয়েছে। এই হোয়াইট ঈগলকেই অর্থ, বুদ্ধি ও জনশক্তি দিয়ে চালায়' হোয়াইট ক্রস সার্ভিস। 'তাদের প্রথম টার্গেট তাদের আদর্শের শত্রুকে নির্মূল করা, তারপর বর্ণ শত্রুর গায়ে হাত দেয়া।

হোয়াইট ঈগল নেতা জিজে ফার্ডিনান্ডের প্রশ্নের জবাবে যুবল পল বিনীত কণ্ঠে বলল, 'স্যার, একটিও লাশ পাওয়া যায়নি। মোটর বোট তিনটিরও সন্ধান লাভ সম্ভব হয়নি।'

'কে কিভাবে সন্ধান করেছে?'

'সাউথ টার্কো দ্বীপের বারজন অশ্বেতাংগ খৃষ্টানকে আমরা কাজে লাগিয়েছিলাম। গত কয়েকদিন ধরে পৃথকভাবে সাউথ টার্কো দ্বীপের গোটা দক্ষিণাংশ তারা ঘুরে বেড়িয়েছে। সন্দেহ ভাজন এলাকা তারা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে, নানাভাবে মানুষকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। কিন্তু সন্দেহজনক কিছু পায়নি। খাড়ি ও নদীগুলো খুঁজে দেখা হয়েছে। বোট কোথাও দেখা যায়নি।'

'সব অপদার্থ। ৩০ জন মানুষ হাওয়া হয়ে গেল? গোলা-গুলীর শব্দ কেউ শুনবে না, কেউ কিছু দেখবে না। জানবে না, এটা কি করে সম্ভব?'

'সম্ভব নয় স্যার। কিন্তু কোন মানুষের কাছ থেকে এমন কোন কথা বের করা যায়নি, যা দিয়ে সামনে এগুনো যেতে পারে।'

'এমন তো কোন সময়ই হয়নি।মানুষ সব নতুন হয়ে গেল নাকি?'

'অনেকটা তাই স্যার। হঠাৎ করে ঐ অঞ্চলের মানুষগুলো যেন নীরব হয়ে গেছে। অপরিচিত এবং বাইরের কাউকে তারা সহজ চোখে দেখছে না। অনেকে বলছেন, ব্যাপারটা পুলিশকে জানানো দরকার।'

'পুলিশকে কি বলবে?'

'ত্রিশজন লোক ওকারী ও সিডি কাকেম এলাকায় গিয়ে হারিয়ে গেছে।'

'পুলিশের কথা বাদ দাও, কেউ যদি তোমাকে বলে এ কথা তুমি বিশ্বাস করবে?'

যুবক পল হোয়াইট ঈগল-এর তথ্য চীফ। জিজে ফার্ডিনান্ডের প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না সে।

হো হো করে হেসে উঠল ফার্ডিনান্ড। বলল তীব্র কণ্ঠে, পল কাপুরুষ তোমরা। পুলিশের আশ্রয় নেয় দুর্বলরা। তোমরা কি হোয়াইট ঈগলকে আক্ষম, দুর্বল ভেবেছ? ধিক তোমাদের! তোমাদের ব্যর্থতা, দুর্বলতার ভার এবার তুলে দিতে চাচ্ছ পুলিশের কাঁধে। যাও, তথ্য চীফের চেয়ারে আর বসবে না। আজ মাফ করলাম। আর কোনদিন এ ধরনের বেয়াদবী করলে রিভলবারের ছয়টি গুলীই তোমার মাথায় ভরব।'

ফার্ডিনান্ড কথা শেষ করতেই ইন্টারকম বেজে উঠল।

পল উঠে দাঁড়িয়ে একটা স্যালুট করে মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল।

কথা বলার মত অবস্থা তার ছিল না। টেলিকমে ফার্ডিনান্ডের পার্সোনাল সেক্রেটারীর কণ্ঠ বেজে উঠল। বলল, 'স্যার মিটিং রুমে সবাই এসেছেন।'

'আসছি।' বলে ফার্ডিনান্ড উঠে দাঁড়াল।

ফার্ডিনান্ডের এই অফিসেরই চার তলায় মিটিং রুম। এটাই বিল্ডিং-এর সর্ব্বোচ্চ তলা।

অফিস রুমেরই নিজস্ব সিড়ি দিয়ে ফার্ডিনান্ড উঠে গেল মিটিং রুমে। মিটিং রুম একটা বিরাট হলঘর।

হলঘরে প্রায় একশ'র মত ছোট সাইজের রিভলবিং চেয়ার।

এই বিরাট হলরুমকে মুভেবল পার্টিশন টেনে ছোট চারটি মিটিং রুমেও বিভক্ত করা যায়।

মিটিং হলের সামনের প্রান্তে বেশ প্রশস্ত একটি মঞ্চ।মঞ্চেও অনেকগুলো চেয়ার।

মঞ্চের পেছনে দেয়ালে ক্রিস্টোফার কলম্বাসের একটা বিশাল ছবি টাঙানো। কলম্বাসের ঠিক মাথার উপর সেই লাল পাথরে খোদিত 'হোয়াইট ঈগল'-এর মনোগ্রাম।

মঞ্চের উত্তর পাশের দেয়ালে যে জানালা সেটায় গিয়ে দাঁড়ালে দু'তিন শ' গজ উত্তরে সাগরের কূলে দাঁড়ানো আকাশ ছোয়া 'কলম্বাস মনুমেন্ট' দেখা যায়।

এই সানসালভাডোর দ্বীপে মনুমেন্টে দাঁড়িয়ে থাকা ঐ স্থানটিতেই ১৪৯২ সালের ১২ই অক্টোবর দুপুর ১২টার সময় কলম্বাসে জাহাজ এসে ভিড়েছিল।

আমেরিকান মহাদেশে ইউরোপীয়দের এটাই ছিল প্রথম আগমন।

এই আগমন স্মরণীয় করে রাখার জন্যেই বাহামা দ্বীপপুঞ্জের সানসালভাডোর দ্বীপে কলম্বাসে জাহাজ ভেড়ানোর ঐ স্থানটিতে তৈরী হয়েছে কলম্বাস মনুমেন্ট।

ফার্ডিনান্ডের হোয়াইট ঈগলের অফিসটি কলম্বাস মনুমেন্ট কমপ্লেক্সেরই একটা অংশ।

মিটিং হলের মঞ্চে ডেস্ক আকারের লম্বা টেবিল। টেবিলের পেছনে

এক সারি চেয়ার।

মিটিং হলের সবগুলো চেয়ার পূর্ণ। কোন সিট খালি নেই।

জিজে ফার্ডিনান্ড মিটিং হলে প্রবেশ করে মঞ্চের পাশে থমকে দাঁড়িয়ে সবার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করে মঞ্চে উঠল।

চেয়ারের সারিতে মাঝখানে রাখা প্রেসিডেন্টের আসনে গিয়ে বসল ফার্ডিনান্ড।

তার বসার সাথে সাথেই পাশের কক্ষে অপেক্ষমান হোয়াইট ঈগল-এর অন্যান্য নির্বাহী কর্মকর্তারা বেরিয়ে এসে ফার্ডিনান্ডের দু'পাশের আসনগুলোতে বসল।

ফার্ডিনান্ডের বামপাশে বসা বুদ্ধিদীপ্ত কঠিন অবয়বের এক যুবক ফার্ডিনান্ডের কানে কানে বলল, 'স্যার মিটিং-এর কাজ এখন শুরু করতে পারি?'

যুবকটি 'হোয়াইট ঈগল'-এর সেক্রেটারী জেনারেল। নাম 'হের বোরম্যান'। জার্মান বংশোদ্ভুত শ্বেতাংগ।

প্রেসিডেন্টের অনুমতি পাওয়ার পর যুবক বোরম্যান তার সামনের

মাইকটা অন করে বলল, 'খৃষ্টীয় হোয়াইট নেশন লং লীভ'। বন্ধুগণ, আজ এক অতি গুরুত্বপূর্ণ সভায় আমরা মিলিত হয়েছি। 'হোয়াইট ঈগল'-এর সম্মানিত প্রেসিডেন্টের উদ্বোধনী বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে আমাদের সভার কাজ শুরু হবে। এখন আপনাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করছেন 'খৃষ্টীয় হোয়াইট নেশন'-এর দিগ্বীজয়ী বন্ধু 'হোয়াইট ঈগল'-এর প্রধান জিজে ফার্ডিনান্ড।'

কথা শেষ করে হের বোরম্যান তার মাইকের সুইচ অফ করে দিল।

প্রায় সংগে সংগেই ফার্ডিনান্ডের তর্জনি তার সামনের মাইকের সুইচ অন করল।

কথা শুরু করল ফার্ডিনান্ড, "মহান খৃষ্ট এবং মা মেরী দীর্ঘজীবী হোন।' দীর্ঘজীবী হোক খৃষ্টীয় হোয়াইট নেশন।'

খৃষ্টীয় ভ্রাতৃবর্গ, একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার জন্যে আমরা এই মিটিং-এ মিলিত হয়েছি।

হোয়াইট ঈগলকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে এমন কেউ দুনিয়াতে আছে বলে আমার জানা ছিল না। বিশেষ করে আমেরিকা উপমহাদেশে আমাদের কোন লোকের গায়ে কেউ হাত তুলতে পারে, এটা অকল্পনীয় ছিল। কিন্তু সে অকল্পনীয় ঘটনাই আজ বাস্তবে পরিণত হয়েছে। সপ্তাহ দু'য়েক আগে সাউথ টার্কো দ্বীপের ওকারী গ্রামে একজন আগন্তুক এশীয়ানের হাতে আমাদের চারজন লোক খুন হয়। এ খবর পাওয়ার পর আমাদের গ্রান্ড টার্কস অফিস দু'টি মোটর বোটে প্রথমে দশজন, পরে আরও বিশজন সশস্ত্র লোক পাঠায় সেই এশীয়ান ও একটি মেয়েকে ধরে আনা ও ওকারী গ্রামকে উচিত শাস্তি দেবার জন্যে। কিন্তু অস্ত্রপাতি সহ এই ত্রিশজন লোকই হারিয়ে গেছে।'

ফার্ডিনান্ডের সামনে মিটিং হলের চেয়ারে যারা বসে আছে সকলেই ক্যারিবিয়ান হোয়াইট ঈগলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য।

তাদেরই একজন ফার্ডিনান্ডের কথার মাঝখানে বলে উঠল, 'এশীয়ান ও মেয়েটি কে? ওরা এখন কোথায়?'

'এশীয়ান একজন ট্যুরিস্ট মুসলমান হতে পারে। আর মেয়েটিকে আপনারা সবাই জানেন লায়লা জেনিফার। ষড়যন্ত্রমূলক ডেমোগ্রাফিক সমীক্ষা যারা করেছিল, তাদের মধ্যে একমাত্র সেই এখনও জীবিত আছে। এশীয়ান লোকটা এখন ছিল জেনিফারের বাড়িতে। এখন সেখানে কিংবা কোথায় আছে আমরা জানি না।' বলল ফার্ডিনান্ড।

'সেখানে থাকা না থাকার ব্যাপারে আমরা অনিশ্চিত কেন?' বলল সদস্যদের একজন।

'কারণ যাদেরকে খোঁজ নিতে পাঠানো হয়েছে, তারা বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছা নিরাপদ মনে করেনি। সকল অপরিচিত লোককে সেখানে সন্দেহের চোখে দেখা হচ্ছে। আর কাউকে জিজ্ঞাসা করে সেখানে কিছু জানার পরিবেশ এখন নেই। তবে অনুমান করা হচ্ছে, তারা সেখানেই আছে।'

'এমন বিস্ময়কর পরিবর্তন সেখানে কিভাবে এল?'

'আমরা বুঝতে পারছি না।'

'আমাদের ৩০ জন মানুষ হারিয়ে যাওয়া যেমন বিস্ময়কর ঘটনা, তেমনি বিস্ময়কর ঘটনা এই পরিবর্তন।' বলল আরেকজন সদস্য।

'ঘটনাটা এত বড় বলেই তো আজকের এই সভা আহবান।' বলল সেক্রেটারী জেনারেল।

'কিন্তু কিছু করতে হলে তো কি করবো সেটা জানতে হবে। সেখানকার রহস্যের রূপ কি তা না জানলে আমরা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কি করতে পারি?' বলল সামনের একজন প্রবীণ সদস্য।

'এই পরামর্শের জন্যে আমরা বসেছি। আপনারা বলুন, আমরা কি করতে পারি?'

একজন তরুণ সদস্য পেছন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না হোয়াইট ঈগল কি দুর্বল হয়ে পড়ল যে, একটা গ্রামের একটা ছোট্ট ঘটনা নিয়ে আমরা এমন দিশেহারা হয়ে পড়েছি?'

'চৌত্রিশ জন সশস্ত্র লোক হারিয়ে যাওয়া ছোট ঘটনা নয়।' বলে

উঠল আরেকজন সদস্য।

'চৌত্রিশ জন মানুষ হারিয়ে যাওয়া ছোট ঘটনা নয়, কিন্তু ওকারী ও সিডি কাকেম গ্রাম হোয়াইট ঈগলের কাছে বড় কিছু নয়।'

'সম্মানিত তরুণ সদস্য ঠিক বলেছেন। তাকে ধন্যবাদ। হোয়াইট

ঈগল-এর কাছে ওকারী ও সিডি কাকেম কিংবা সেই এশীয়ান বড় কিছু নয়। কিন্তু আমাদের ৩৪জন সদস্য হারিয়ে যাওয়া হোয়াইট ঈগল-এর জন্যে প্রথম বড় ঘটনা। তাই আমরা পরামর্শ করে অগ্রসর হতে চেয়েছি।' বলল ফার্ডিনান্ড।

আরেকজন তরুণ সদস্য বলল, 'যুদ্ধক্ষেত্রে এ ধরণের পরামর্শ করে কাজ হয় না। যখনই আমাদের লোক হারিয়ে যাওয়ার খবর পাওয়া

গেল, সে মুহূর্তেই আমাদের আঘাত হানা উচিত ছিল ওকারী ও সিডি কাকেম গ্রামে। আজ পরামর্শ করে আমরা যখন অগ্রসর হবো, তখন শত্রু নিশ্চয় আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী হবে।'

'আমাদের তরুণ সদস্যকে ধন্যবাদ। তাঁর অভিমতের সাথে আমি

একমত। কিন্তু একটা বিষয় আমি বিবেচনা করতে অনুরোধ করি। ওকারী গ্রামে চারজন লোক খুন হবার পর তড়িৎ ব্যবস্থা হিসেবে এ ধরণের কোন পরামর্শ ছাড়াই শক্তিশালী অভিযান পাঠিয়েছিলাম ওকারী ও সিডি কাকেম গ্রামে। ত্রিশটি স্টেনগান, ত্রিশটি রিভলবার এবং দশ বাক্স বাড়তি গুলীসহ ত্রিশজন জানবাজ সদস্যের এই দল ছোট ছিল না। কিন্তু সে অভিযান আমাদের ব্যর্থ হয়েছে, কিভাবে ব্যর্থ হয়েছে আমরা জানি না। ব্যর্থতার একটা চিত্র আমাদের সামনে থাকলে আমরা চোখ বন্ধ করে সেদিকে পা বাড়াতে পারতাম। কিন্তু তা আমরা পারিনি। আমরা মনে করছি, সকলের জন্যেই এটা বিবেচনার বিষয়। এই জন্যেই এই বৈঠক।' বলল ফার্ডিনান্ড।

অন্য একজন তরুণ সদস্য বলল, 'সম্মানিত চীফ-এর কথা আমি বুঝতে পেরেছি। তার যুক্তির সাথে আমি একমত। তবে আমি মনে করি একটা সুস্পষ্ট বিষয় নিয়ে বিরাট আলোচনা করে বিপুল সময় খরচকরার কোন প্রয়োজন নেই। অবিলম্বে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হোক।'

'ধন্যবাদ। আপনার মতটা বলুন।' বলল ফার্ডিনান্ড।

তরুণ সদস্যটি সংগে সংগে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'সিদ্ধান্তের ব্যাপারটা সুস্পষ্ট, যে লক্ষ্য অর্জনে আমাদের আগের অভিযান ব্যর্থ হয়েছে, সে লক্ষ্য অর্জনের জন্যে এখনই অভিযান পাঠানো হোক। এতে লক্ষ্য অর্জনও হবে, আগের অভিযান সম্পর্কিত আমাদের সব প্রশ্নের জবাবও মিলবে।'

তরুণ সদস্যটি থামতেই লের প্রায় সব সদস্যই একযোগে উঠে দাঁড়িয়ে সমস্বরে বলল, 'আমরাও এর সাথে একমত।'

'ধন্যবাদ। সে অভিযানটা কেমন হওয়া উচিত বলে আপনারা মনে করেন?'

আবার একজন তরুণ সদস্য উঠে দাঁড়াল। বলল, 'অভিযানটা কেমন হবে আপনারা ঠিক করবেন। আমরা যেটা চাই, খৃষ্টীয় হোয়াইট নেশন যা চায়, তাহলো, 'নষ্টের মূল ঐ জেনিফারকে জীবন্ত ধরে আনতে হবে। আর ঐ এশীয়ানকেও কোন সহজ মৃত্যু দেয়া যাবে না। তাকেও জীবন্ত আমরা চাই। আর ওরা যেমন আমাদের ৩৪জন লোককে গায়েব করেছে, তেমন আমরা চাই ওকারী ও সিডি কাকেম গ্রামের কোন অস্তিত্ব থাকবে না সাউথ টার্কো দ্বীপের মানচিত্রে। এরপরের পদক্ষেপ হবে, যে সব গ্রাম বা যারা তাদের সাহায্য করেছে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে, তাদের উচ্ছেদ করতে হবে এ দ্বীপপুঞ্জ থেকে। আমাদের কোন অখৃষ্টান অশ্বেতাংগ, বিশেষ করে মুসলমানরা থাকতেই পারবে না।' আবেগ ভরা কণ্ঠ থামল তরুণ সদস্যটির।

সদস্যটি থামতেই এবারও সব সদস্য হাত উঁচু করে একবাক্যে বলল, 'আমরা একমত। এই কাজে কোন প্রকার দুর্বলতা না দেখানো হোক, আমরা চাই।'

সবাই থামল। নীরবতা কয়েক মুহূর্ত।

সেই নীরবতা ভেঙে ভারি কণ্ঠ শ্রুত হলো ফার্ডিনান্ডের। তার আসনে নড়ে-চড়ে বসে কথা শুরু করেছে ফার্ডিনান্ড, 'সকলকে ধন্যবাদ। সকলে যা বলেছেন এবং যে আবেগের প্রকাশ ঘটিয়েছেন তার সাথে আমরা একমত। আমি আপনাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছি, হোয়াইট ঈগল কোন কাজে কখনও দুর্বলতা দেখায়নি, ভবিষ্যতেও দেখাবে না। 'হোয়াইট ঈগল' কলম্বাসের সংগঠন এবং আমরা কলম্বাসের সন্তান। আমরা সকলেই জানি, ১৪৯২ সালে কলম্বাস তাঁর যে অভিযাত্রায় আমাদের এই আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন, তাতে তার বড় একটা উদ্দেশ্য ছিল এ থেকে যে ধন-সম্পদ অর্জিত হবে, তা স্পেনে মুসলমানদের চূড়ান্ত পরাজয় ও স্পেন থেকে মুসলমানদের বিতাড়নের কাজে লাগবে। স্পেন থেকে মুসলমানদের চুড়ান্ত উচ্ছেদকারী রাজা ফার্ডিনান্ড ও রাণী ইসাবেলাকে কলম্বাস এই প্রতিশ্রুতি দিয়েই তাদের কাছ থেকে অভিযাত্রার জন্যে অভূতপূর্ব সাহায্য আদায় করেছিলেন। সুতরাং কলম্বাসের সে অভিযাত্রা ছিল এক অর্থে মুসলিম উচ্ছেদের লক্ষ্যাভিসারী। এ লক্ষ্য না থাকলে স্পেন থেকে মুসলিম বিতাড়নের যুদ্ধে ব্যাপৃত রাজা ফার্ডিনান্ড ও রাণী ইসাবেলা অমনভাবে হাত উজাড় করে কলম্বাসকে সাহায্য করতেন না। পৃথিবীর বড় বড় সমীক্ষকরা বলেছেন, অভিযাত্রী কলম্বাস হঠাৎ করে রাজা ফার্ডিনান্ড ও রাণী ইসাবেলার কাছ থেকে যে অস্বাভাবিক সাহায্য পেয়েছিলেন, তা পৃথিবীর আর কোন অভিযাত্রীরই ভাগ্যে জোটেনি। বন্ধুগণ, রাজা ফার্ডিনান্ড ও রাণী ইসাবেলা কলম্বাসের অভিযাত্রাকে যে দৃষ্টিতে দেখেছিলেন, আমরা আমেরিকার খৃষ্টীয় হোয়াইট নেশন কলম্বাসের অভিযাত্রাকে সে দৃষ্টিতেই দেখছি। এই কারণেই বন্ধুগণ, আমেরিকার প্রকৃত আবিষ্কর্তা আমেরিগো ভেসপুসি হলেও আমরা স্মরণ করি কলম্বাসকে। আমরা কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পাঁচশ বছর পূর্তি উৎসব পালন করেছি, কিন্তু প্রকৃতই যারা আমেরিকার মুল ভুখন্ডে পা দিয়েছিলেন, আমেরিকার আবিষ্কার করেছিলেন, তাদের কথা আমরা স্মরণ করিনি। আমরা হোয়াইট ঈগল আমেরিকার এ মানসিকতারই উত্তর সূরী। আমরা কলম্বাসের সন্তান। কলম্বাস এই ভূখন্ডে স্পেন থেকে মুসলিম নির্মূলকারী রাজা ফার্ডিনান্ড ও রাণী ইসাবেলার পতাকা উড্ডীন করেছিলেন। সেই পতাকাই আমরা বহন করছি। এই পতাকার

ছায়ায় গোটা আমেরিকা। এই পতাকার ছায়ায় আর যাই হোক মুসলমানদের কোন স্থান নেই।' থামল ফার্ডিনান্ড। একটু পানি খেল গ্লাস থেকে।

তারপর আবার শুরু করল, 'খৃষ্টীয় হোয়াইট নেশন-এর গর্বিত সন্তান বৃন্দ, শক্তিশালী অভিযান প্রেরণের ব্যাপারে আমরা সকলেই একমত। এই অভিযান কার কার নেতৃত্বে কতজন কিভাবে কখন প্রেরিত হবে, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত আমরা নিচ্ছি। এইটুকু আমি আপনাদের জানিয়ে রাখছি, জেনিফার ও ঐ এশীয়ানটা দ্বীপের যেখানেই থাক আমরা তাদের ধরবই। আর ওকারী ও সিডি কাকেম গ্রামের মানুষ পরশু দিনের সূর্যোদয় দেখবে না, এ ব্যাপারে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন।' থামল ফার্ডিনান্ড।

সে থামতেই গোটা হলে একটা হর্ষধ্বনি উঠল। শ্লোগান উঠল, 'খৃষ্টীয় হোয়াইট নেশন জিন্দাবাদ। জিন্দাবাদ হোয়াইট ঈগল। জিন্দাবাদ ফার্ডিনান্ড।'

সেদিনই দুপুর ১২টা।

সানসালভাডোরের কলম্বাস বন্দর থেকে পাঁচটি বড় মোটর বোট সাউথ টার্কো দ্বীপের দিকে রওনা হলো।

পাঁচটি বোটে শতাধিক মানুষ। প্রত্যেক বোটের পাটাতনের নিচে অস্ত্র ও গোলা-গুলীর বাক্স।

বোটগুলো চলছে বিমানের সম্মিলিত মহড়ার মত সুন্দর সার বেঁধে।

সারিবদ্ধ বোট বহরকে নেতৃত্ব দিচ্ছে যে বোটটি, সবার আগের সেই বোটের মাথায় পাশাপাশি দু'টি ডেক চেয়ার পাতা।

ডান পাশের আসনটিতে বসেছে বোট বহরের কমান্ডার জন ব্ল্যাংক এবং তার বামপাশে সহকারী কমান্ডার জিম টেইলর।

জন ব্ল্যাংক মধ্য বয়সী এবং টেইলর তারুণ্যদীপ্ত যুবক।

'পুলিশের ভূমিকা সম্পর্কে তো আমাদের কিছু বলা হয়নি স্যার?'

বলল টেইলর তার বস ব্ল্যাংককে লক্ষ্য করে।

'টার্কস দ্বীপপুঞ্জের বৃটিশ পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ে আমাদের প্রচুর সমর্থক আছে। তাদের সহযোগিতা আমরা পাই। কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রকাশ্যে আইনের অধীন তাদের থাকতেই হবে। এ জন্যে আমরা কাজ করব তাদেরও চোখের আড়ালে। এ কারণেই রাতকেই বেছে নেয়া হয়েছে। ভোর হবার আগেই আমাদের সব কাজ শেষ হয়ে যাবে।'

'আমরা কি সাউথ টার্কো দ্বীপে সরাসরি যাচ্ছি?'

'না না, আমরা যাচ্ছি এখন গ্রান্ড টার্কস-এ। আমরা মেডিকেল ইউনিট নিয়ে আসিনি। ওখানকার হোয়াইট ঈগল অফিস থেকে একটা শক্তিশালী মেডিকেল ইউনিট নিতে হবে।'

'আমরা কি ওদের জানিয়েছি?'

'না জানানো হয়নি। তবে অসুবিধা হবে না। আমরা ওখানে পৌঁছাব রাত আটটার দিকে। রাত ১১টার দিকে আমরা সাউথ টার্কো দ্বীপে রওয়ানা হবো। সুতরাং সময়ের অসুবিধা নেই।'

'ঠিক আছে। আমি ভাবছিলাম, ওখানকার মেডিকেল ইউনিট যথেষ্ট শক্তিশালী নাও থাকতে পারে।'

'তা ঠিক। যা সময় আমরা হাতে পাচ্ছি, তাতে প্রয়োজন হলে আমরা ঔষধপত্র সংগ্রহ করতে পারবো। কাছেই কুইন এলিজাবেথ হাসপাতাল। ওখানকার সেন্ট্রাল মেডিকেল স্টোরটি সার্বক্ষণিক খোলা থাকে।'

'আমরা রাত ১২টার দিকে 'সাউথ টার্কো'র পোর্ট টার্কো'তে নামছি। সেখান থেকে ওকারী ও সিডি কাকেম গ্রাম খুব কাছে নয়।আমরা যাবার জন্যে অতগুলো অটো হুইলার কি তখন পাব সেখানে?'

'আমরা সেখানে নামছি না টেইলর। অতএব চিন্তার কিছু নেই। আমাদের আগের অভিযান যেখানে নেমেছিল, দক্ষিণের সেই মৎস ঘাটে আমরাও নামব।'

'ঘাটের অবস্থার খবর না নিয়েই সেখানে ল্যান্ড করা কি আমাদের ঠিক হবে?'

'তুমি ঠিক চিন্তা করেছ। এ চিন্তা আমরা করিনি বলে মনে করো না। আমাদের এজেন্টরা সেখানে আজ বিকেল থেকে সার্বক্ষণিক পাহারায় থাকবে।

আমাদের বোটের হেডলাইট থেকে সংকেত পাওয়ার পর ওরা সবুজ সংকেত দেবে। যদি সে সবুজ সংকেত পাওয়া যায়, তাহলেই আমরা ল্যান্ড করব।'

'আর একটা কথা স্যার, আগের অভিযানে ওরা শক্তি দু'ভাগ করেছিল, ওটা ঠিক হয়নি।'

'কিন্তু টেইলর এবারও তাই করতে হবে। ঘাটে নামার পর অর্ধেক বাহিনী নিয়ে তুমি যাবে সিডি কাকেম গ্রামে। অবশিষ্ট অর্ধেক নিয়ে আমি যাব ওকারী গ্রামে। তুমি সিডি কাকেম গ্রাম নিশ্ছিদ্রভাবে ঘিরে ফেলার পর মোবাইলে আমাকে জানাবে। তারপর আমি ওকারী গ্রামে হামলা চালাব। ওকারী গ্রামের অপারেশন শেষে আমরা সিডি কাকেমে পৌছলে, তবেই সেখানে অপারেশন শুরু হবে।' তার আগে তোমার দায়িত্ব হবে গ্রাম থেকে একটা প্রাণীকেও বের হতে না দেয়া।'

'কিন্তু অনেক সময় নষ্ট করতে হবে দাঁড়িয়ে থেকে।'

'সময় নষ্ট হবে না টেইলর। গ্রাম ঘেরাও করার পর বেশ কাজ আছে। গ্রাম ঘেরাও হবার পর আমাদের বিস্ফোরণ ইউনিট গ্রামে ঢুকে ঘর-বাড়ির প্রতিটি গুচ্ছে বোমা পেতে আসবে। সিডি কাকেম গ্রামে শুধু বোমা পাতা হবে না জেনিফারের বাড়িতে। বোমা পাতার পর ওরা ফিরে এলে ডেনোনেটরের একটা সুইচ টিপলেই গোটা গ্রাম দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। তখন শুধু আমাদের কাজ হবে বেঁচে যাওয়া লোকগুলোকে হত্যা করা। ৫০ জন লোকের এতে বেশি সময় লাগবে না।' থামল জন ব্ল্যাংক।

একটা সিগারেট ধরাল সে। তারপর বলল, 'তোমার সিডি কাকেম গ্রামের অপারেশনও আগেই শুরু করা যায়। কিন্তু দেরী করা এই জন্যে যে, ওখানে জেনিফার ও সেই এশীয়ান রয়েছে মনে করা হচ্ছে। তাদেরকে জীবন্ত ধরতে হবে। অতএব সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন হতে পারে। তবে বোমা পাতার কাজ তোমার সম্পূর্ণ করে রাখতে হবে। যাতে আমরা পৌছার সাথে সাথে অপারেশন শুরু হয়ে যায়।'

আনন্দে মাথা নাড়ল টেইলর। বলল, 'কিন্তু আমি ভাবছি ৩০ জন সশস্ত্র লোক গায়েব হবার রহস্য কি করে জানা যাবে?'

'ভেবনা টেইলর। এ জন্যেই ঐ এশীয়ান ও জেনিফারকে আমরা জীবন্ত ধরতে যাচ্ছি।'

জন ব্ল্যাংক কথা শেষ করলেও টেইলর কথা বলল না।

অল্পক্ষণ চুপ থাকার পর সে বলল, 'মুসলিম ও অশ্বেতাংগ পুরুষ

শিশু কমিয়ে ফেলার মাধ্যমে আমরা জনসংখ্যার যে শ্বেতাংগকরণ করার পরিকল্পনা নিয়েছি, এটা খুব ধীর। কতদিনে এ পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হবে কে জানে। তার চেয়ে আজকের মত ডাইরেকট এ্যাকশনে আমাদের এগুনো উচিত বলে আমি মনে করি।'

'দেখ তুমি শিশুর মত কথা বলছ। আবেগ নিয়ে এসব কথা বলা যায়, কিন্তু এসব কাজ করা যায় না। দেখ, দু'চারটা গ্রাম জ্বালানো যায়, লোকদেরও হত্যা করা যায় এবং একে দুর্ঘটনা ও পারস্পরিক দাঙ্গার ফল বলে চালিয়েও দেয়া যায় কিন্তু সব গ্রামে তা করা যাবে না। তাহলে গোটা দুনিয়ায় হৈচৈ শুরু হয়ে যাবে। চাপে পড়ে জাতিসংঘ ও শত শত মানবাধিকার ফোরাম ছুটে আসবে এখানে। তাতে সব জারিজুরি আমাদের ধরা পড়ে যাবে। আমরা ব্যর্থ হবো। অন্যদিকে জনসংখ্যা পরিবর্তনের যে পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি, তা কারও চোখে পড়বে না। সময় বেশি লাগলেও অত্যন্ত নিরাপদে জনসংখ্যার শ্বেতাংগকরণ ও খৃষ্টীয়করণ হয়ে যাবে।'

'বুঝলাম। কিন্ত জনসংখ্যা পরিবর্তনের এ ষড়যন্ত্র তো জেনিফাররা

ধরে ফেলেছে।'

'ষড়যন্ত্র ধরে ফেলেনি এবং তা পারাও সম্ভব নয়। ওরা যেটা ধরেছে সেটা হলো, 'মুসলিম পুরুষ সংখ্যার হার কমছে। কিন্তু এটা কোন ষড়যন্ত্রের ফল তা তারা জানতে পারেনি। জানতেও কোনদিন পারবে না।'

'কিন্তু এই পরিবর্তন কেন, এ নিয়ে অনুসন্ধান হবে তো?'

পৃথিবী জানতে পারলে তো হবে! যাতে জানতে না পারে, তারই তো ব্যবস্থা আমরা করেছি। ওদের রেকর্ডপত্র আমরা ধ্বংস করেছি।

সমীক্ষার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িতদের আমরা হত্যা করেছি। জেনিফার শেষ হলে পরোক্ষ সাক্ষীও শেষ হয়ে যাবে।'

'আমি ভাবছি স্যার, জেনিফার খুবই ক্ষুদ্র, খুবই দুর্বল, কিন্তু সাউথ টার্কো দ্বীপের ওকারী ও সিডি কাকেম অঞ্চলে যা ঘটল তা খুবই বড়।এর কোন ব্যাখ্যা আমি খুঁজে পাচ্ছি না।' থামল টেইলর।

জন ব্ল্যাংকও কিছু বলল না।তারও চোখে মনে হয় ঐ একই প্রশ্ন।

# ৭

সন্ধ্যা নেমে এসেছে সাউথ টার্কো দ্বীপে।

বিশাল সাগরের বুকে একখন্ড কালো বড় তিলক চিহ্নের মত মনে হচ্ছে দ্বীপটাকে। দ্বীপটা ঢাকা পড়েছে অন্ধকার আর নীরবতার এক অখন্ড চাদরে।

সেই অন্ধকারের বুক চিরে হঠাৎ কোন সময় চোখে এসে পড়ে কোন প্রদীপ থেকে বিচ্ছুরিত আলোক শিখা।

এমনি একটা প্রদীপ জ্বলছে ওকারী গ্রামের মসজিদে।

মাগরিবের নামায শেষ হয়েছে। নামায শেষে প্রথমে আহমদ মুসা এসে বসল সেই প্রদীপের পাশে।

'আমেরিকান ক্রিসেন্ট' নির্বাহী কমিটির এটা একটা জরুরী বৈঠক।

তারা যখন এই বৈঠকে বসেছে, তখন তাদের দৃষ্টি সীমার অনেক দূরে, তাদের গোচরের সম্পূর্ণ বাইরে ব্ল্যাংকের নেতৃত্বে 'হোয়াইট ঈগল' বাহিনীর ৫টি বড় বোট এসে নোঙর করল গ্রান্ড টার্কস দ্বীপে।

তখন রাত ৯টা।

লায়লা জেনিফারদের বাড়ি। লায়লা জেনিফারের ড্রইং রুমে সোফায় গা এলিয়ে বসে আছে ডাঃ মার্গারেট।

মাত্র আধা ঘন্টা আগে এসেছে সে গ্রান্ড টার্কস থেকে।

খাওয়া সেরে সবে এসে বসেছে ড্রইং রুমে।

ড্রইং রুমে চা নিয়ে প্রবেশ করল লায়লা জেনিফার। তার সাথে সাথে ড্রইং রুমে এসে ঢুকল জেনিফারের মামাতো বোন সারা উইলিয়াম এবং সুরাইয়া মাকোনি।

চায়ের আসর বসে গেল ড্রইং রুমে। তারপর গল্প। হাসি।

ঠিক এই সময় গ্রান্ড টার্কস-এ 'হোয়াইট ঈগল' প্রস্তুত হচ্ছে সাউথ টার্কো দ্বীপে অভিযানের।

সাইমুম সিরিজের পরবর্তী বই

## ক্যারিবিয়ানের দ্বীপদেশে


**কৃতজ্ঞতায়ঃ**

1. **Emrul Hasan**
2. **Rabiul Islam**

সাইমুম-২৬

# ক্যারিবিয়ানের দ্বীপদেশে

আবুল আসাদ

# ১

আহমদ মুসা ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি সাগরে যাবার সময় ঘাটে যাদের দেখেছিলে, ফিরে এসেও আবার তাদেরই দেখলে?’

‘জ্বি হ্যাঁ।’ বলল আলী ওরমা।

আলী ওরমা ওকারী গ্রামের জেলে।

আহমদ মুসা তাকে নিয়োগ করেছিল দক্ষিণের মৎস্য ঘাটের উপর নজর রাখার জন্যে।

‘তুমি কটায় নৌকা নিয়ে সাগরে নেমেছিলে?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘তিনটায়।’

‘তখন ঐ দু’জনকে কি অবস্থায় দেখেছিলে?’

‘ওরা জেটিতে একটা নৌকায় বসে শশা চিবুচ্ছিল।’

‘নৌকাটা কার?’

‘আমার।’

‘তোমার নৌকায় ওরা বসেছিল?’

‘জ্বি হ্যাঁ।’

‘তারপর?’

‘আমি যখন নৌকার কাছে গেলাম। ওরা যখন বুঝল নৌকা আমার, তখন ওরা নেমে এল। বলল, সাগরে নামবেন বুঝি? ঠিক আছে। আমরা এখানে বসে একটা বোটের অপেক্ষা করছিলাম। আপনাদের বাড়ি কোথায়? আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। কেন, নরফোকে। বলে ওদের একজন।’

নরফোক টার্কো দ্বীপের মধ্যাঞ্চলের একটি গ্রাম। উত্তর প্রান্তের টার্কো বন্দর থেকে যে সড়কটি দক্ষিণে চলে এসেছে, গ্রামটি তার পাশেই।

গ্রামটি চেনে আলী ওরমা। গ্রামের সবাই কৃষ্ণাংগ। গ্রামের অধিকাংশ লোক আফ্রিকী ধরনের স্থানীয় ধর্মের অনুসারী। অবশিষ্টদের কিছু খৃষ্টান, কিছু মুসলমান। গ্রামে শ্বেতাংগ খৃষ্টান মিশনারীরা একটি গীর্জা ও একটি ক্লিনিক তৈরি করছে।

‘ঘাটে আসা লোক দু’টি কৃষ্ণাংগ। কার বোট? কে আসবে? আমি ওদের জিজ্ঞেস করি। মাছ আসবে। আমাদের একটা আয়োজন আছে। জবাব দেয় ওদের একজন।’

‘তারপর?’ জিজ্ঞেস করল আলী ওরমাকে আহমদ মুসা।

‘আমি নৌকা নিয়ে চলে যাই সাগরে। একটু আড়ালে গিয়ে আমি নজর রাখি কোন নৌকা বা বোট ঘাটের দিকে যায় কিনা। কিন্তু সন্ধ্যার আগে আমি ফেরা পর্যন্ত কোন বোট ঘাটের দিকে আসেনি।’ থামল আলী।

‘বলে যাও।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আমি ঘাটে ফিরে দেখলাম লোক দু’টি নেই। ভাবলাম অপেক্ষা করে চলে গেছে। ঘাটের আশপাশ ভালো করে দেখে নিয়ে চিন্তা করলাম নিকটের কোন গ্রামে মাগরিবের নামায আদায় করে আবার চলে আসব। এই উদ্দেশ্যে ঘাট থেকে উঠে অল্প কিছু দূর আসতেই দেখলাম, নরফোক গ্রামের ঐ দু’জন ঘাটের দিকে আসছে। অবাক হলাম তারা আমাকে দেখে যেন চমকে উঠল। কিছুটা বিব্রত কণ্ঠে কৈফিয়তের সুরে বলল, এদিকটা একটু ঘুরে এলাম। দেখি বোটটা এসেছে কিনা। আমি কিছু বললাম না। ওরা চলে গেল। তবে আমি একটা গাছের আড়ালে এসে একটু দাঁড়ালাম। দেখলাম, আড়াল হবার পর ওরা আর এগুলো না। রাস্তার

পাশেই একটু উঁচু টিলা ছিল। তারা ওখানে উঠে ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হলো। আমি আর অপেক্ষা না করে চলে এসেছি।'

আলী থামলেও আহমদ মুসা কোন কথা বলল না।

ভাবছিল আহমদ মুসা।

বলল একটু পর, 'এ ধরনের ঘটনা আর তো ঘটেনি?'

'জ্বি তাই।' বলল আলী।

'মাছের নৌকার জন্যে এত দূর আসবে, এইভাবে অপেক্ষা করবে এটাও বাস্তব নয়।'

'জ্বি।'

'ওদের আচরণ ও কথার মধ্যে সঙ্গতি নেই।' আহমদ মুসা বলল।

'আমারও তাই মনে হয়েছে স্যার।'

আবার ভাবনায় ডুবে গেল আহমদ মুসা।

অল্প পরে মুখ তুলে জর্জের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চল, আমরা ক'জন সেখানে যাই। লোক দু'জন যদি এখনও থাকে, তাহলে ওদের ধরলেই সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

মিটিং মুলতুবি করে উঠল সবাই।

জর্জ, ইসহাক আব্দুল্লাহ ও আবু বকরকে নিয়ে আহমদ মুসা এগুলো ঘাটের দিকে। পায়ে হেঁটে। সাথে থাকল আলী।

কিন্তু সেই উঁচু টিলায়, যেখানে আলী নরফোকের দু'জন লোককে দেখে গিয়েছিল, কাউকে পাওয়া গেল না।

অন্ধকারে চুপি চুপি তারা ঘাট পর্যন্ত গেল, এদিক ওদিক খুঁজল। কিন্তু কাউকে পেল না। ফিরল তারা।

সেই টিলা পার হয়ে কিছুটা পথ এসে আহমদ মুসা থমকে দাঁড়াল। সবাউ দাঁড়াল আহমদ মুসাকে ঘিরে।

আহমদ মুসা কাছে টেনে নিল আলীকে। ফিসফিস করে তাকে বলল, 'তোমাকে এখানে থেকে যেতে হবে। তুমি এখানে যে কোন স্থানে আত্মগোপন করে থেকে চারদিকে নজর রাখবে। সেই দু'জন কিংবা অন্য কাউকে পাও কিনা,

সেটা খোঁজ করতে হবে। রাস্তা নয়, রাস্তার বাইরে দুর থেকে সব দিকে নজর রাখবে।'

বলে পকেট থেকে একটা গগলস বের করে আলীর হাতে দিল। বলল, 'এটা বিশেষ ধরনের গগলস। এ দিয়ে অন্ধকারেও বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। সত্যিই তুমি যদি কাউকে দেখতে পাও, তাহলে তার পিছে পিছে থাকবে, চোখের বাইরে যেতে দেবে না। রাত দশটা পর্যন্ত তুমি যদি মসজিদে না ফের, তাহলে বুঝা যাবে তুমি কারো সন্ধান পেয়েছ। রাত সাড়ে দশটার দিকে আবু বকর সবাইকে খবর দিয়ে তোমার সন্ধানে আসবে। প্রশ্ন হলো তোমাকে তারা পাবে কি করে?

আহমদ মুসা একটু থেমে বলল, 'রাত সাড়ে দশটায় আবু বকর এই গাছ তলায় গাছের আড়ালে বসবে, তোমাকেও গোপনে এখানে আসতে হবে।'

কথা শেষ করে আহমদ মুসারা চলে না যাওয়া পর্যন্ত আলীকে গাছ তলার অন্ধকারে অপেক্ষা করতে বলে সবাই হাঁটা শুরু করল।

আহমদমুসাকে বাম, ডান ও পেছন থেকে বেষ্টন করে অগ্রসল হচ্ছিল অন্যরা।

পাশে হাঁটতে হাঁটতে জর্জ বলল, 'আলীকে রেখে যাওয়ার কি দরকার ছিল?'

'হ্যাঁ জর্জ, একবার সন্দেহের সৃষ্টি হলে তার শেষ পর্যন্ত দেখা উচিত।' বলল আহমদ মুসা।

'কাউকেই তো পাওয়া গেল না।'

'হতে পারে ঘটনা কিছুই না। সত্যিই হয়তো মাছের নৌকার জন্যে অপেক্ষা করে তারা চলে গেছে। কিন্তু এমনও হতে পারে, তারা যায়নি। আমরা তাদের দেখতে পাইনি।'

'কি হতে পারে ব্যাপারটা তাহলে?' বলল জর্জ।

'বলা মুস্কিল। তবে এই ছোট্ট ঘাটটা এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শুনছো তো, অপরিচিত লোকজন গত সপ্তাহ দেড়-দুই ধরে সাউথ টার্কো দ্বীপে, বিশেষ করে এই অঞ্চলে বেশ দেখা গেছে। হতে পারে শত্রুর কেউ ওরা। উদ্দেশ্য পরিষ্কার, ঐ ৩০ জন মানুষের কিভাবে কি হলো এবং কারা ঘটাল এই ঘটনা ইত্যাদি জানতে

চায় তারা। এই মাছের ঘাটকে শত্রুরা আগেও ব্যবহার করেছে, আবারও করতে পারে।’

বলে আহমদ মুসা ইসহাক আব্দুল্লাহর দিকে তাকাল। বলল, আমি ও জর্জ এখন সিডি কাকেম যাচ্ছি। আবু বকর এখানে থাকল। তোমরা সাবধান থাকবে। রাত দশটার দিকে তোমরা একত্রিত হবে মসজিদ চত্বরে। তারপর আবু বকর এগুবে আলীর খোঁজে। তোমরা পেছনে থাকবে গোপনে।’

‘আমরা কতজন একত্র হবো?’ বলল ইসহাক আব্দুল্লাহ।

‘রাত দশটার মধ্যে যদি আলীর খবর না পাও, তাহলে সব শক্তি একত্র করবে। আমাকেও জানাবে টেলিফোনে।’

মসজিদ চত্বরে তখন পৌছে গেছে তারা। ওখানে একটা অটো হুইলার অপেক্ষা করছিল। সেই অটো হুইলারে উঠল আহমদ মুসা ও জর্জ। অটো হুইলার চলতে শুরু করল সিডি কাকেম গ্রামের উদ্দেশ্যে।

গাড়ি চলতে শুরু করলে আহমদ মুসার হঠাৎ যেন মনে হতে লাগল, কি কাজ যেন অসম্পূর্ণ থাকল। তার মনে হলো, আলীর সাথে দেখা হবার পর আবু বকর ও ইসহাক আব্দুল্লাহরা কি করবে সে বিষয়ে তো কিছু বলা হয়নি।

পরক্ষণেই আবার তার মনে হলো, কিছু বলারও তো ছিল না। তারপর আহমদ মুসা মনের এলোমেলো চিন্তা বিদায় করে সামনের আলো অন্ধকারে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

চলছে অটো হুইলার।

লায়লা জেনিফার সবার হাতে চায়ের পেয়ালা তুলে দিয়ে নিজের পেয়ালা নিয়ে সোফায় তার আসনে এসে বসেছিল।

গল্প চলছিল।

সুরাইয়া মাকোনি এবং সারা উইলিয়ামও আজই এসেছে জেনিফারদের বাড়িতে। মার্গারেট এসে পৌছেছে রাত আটটার দিকে। সারা উইলিয়াম ও

সুরাইয়া মাকোনি এসেছে তার এক ঘণ্টা আগে। সুরাইয়া মাকোনী চায়ের পিয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে বলল, ‘আমি ভাবতে পারছি না জেনিফার, সেই এশিয়ানটা পরিস্থিতি এমন ওলাট-পালট করে দিল কি করে? আমি তো ভেবেছিলাম, সে ওদের হাতে মারা পড়েছে।’

‘না, মাকোনি। মারা যাওয়ার কথা অমন করে মুখে এনো না।’ বলল জেনিফার ত্বড়িৎ গতিতে।

বলে একটা দম নিয়ে জেনিফার বলল, ‘আল্লাহ ওঁকে বাঁচিয়েছেন। আর বাঁচাবার জন্যে কাজ করেছেন জর্জ এবং মার্গারেট আপা। জর্জ তাঁকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়েছিল।’

লায়লা জেনিফারের কথা শেষ হতেই সারা উইলিয়াম বলল, ‘কিরে জেনিফার। এশীয় সম্পর্কে ‘মরার’ কথা শুনে অমন আঁৎকে উঠলি কেন? হৃদয় ঘটিত কোন ঘটনা সংঘটিত হয়েছে নাকি?’

এ কথার পর সারা উইলিয়াম ও সুরাইয়া মাকোনি দু’জনেই হেসে উঠল। ডাঃ মার্গারেটের মুখ একটু ম্লান হলো। আর গম্ভীর হয়ে উঠল লায়লা জেনিফারের মুখ।

কথা বলে উঠল লায়লা জেনিফার। বলল, ‘সারা তুমি ওঁকে দেখনি, ওঁকে জাননা, তাই এ কথা বলতে পারলে।’ গম্ভীর কণ্ঠ জেনিফারের।

ডাঃ মার্গারেট তাকাল জেনিফারের দিকে। তার চোখে একটা সন্ধানী দৃষ্টি। পরে ধীরে ধীরে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, ‘আমি জেনিফারের সাথে একমত। তিনি ভিন্ন এক মানুষ। যতই তাঁকে দেখা যায় আনন্দ ও বিস্ময় শুধু বাড়েই।’

‘ঠিক বলেছেন ডাঃ মার্গারেট আপা। তিনি মাত্র অল্পক্ষণ আমার সামনে কথা বলেছেন। আমার মনে হয়েছিল, আমি নতুন এক পরিবেশে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির মানুষের সাথে কথা বলছি। আমি যেন সাম্মোহিত হয়ে পড়েছিলাম। উনি উঠে গেলে আমি যেন বাধ্য হয়েছিলাম ওঁর সন্ধানে উঠে যেতে।’

বাইরের দরজায় নক হলো এ সময়।

‘উনি এসেছেন।’ বলে উৎকর্ণ হলো জেনিফার।

সংগে সংগে সবাই সচকিত হয়ে উঠল।

বলল সারাহ উইলিয়াম, ‘তুমি বুঝলে কি করে, জেনিফার? ওঁর গন্ধও চিনে ফেলেছ নাকি?’ হাসল সারা উইলিয়াম।

‘বলেছি, এভাবে কথা বলো না সারা। ওঁকে তুমি জান না। জান না তুমি, ওঁর সব কাজে শৃঙ্খলা আছে। দরজায় উনি নকও করেন একই নিয়মে।

বলে জেনিফার উঠে দাঁড়াল।

সবাই উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল। জেনিফার বলল, ‘না উনি বৈঠকখানায় আসবেন না। সোজা উনি ওঁনার ঘরেই যাবেন।’

জেনিফার পা বাড়াল ড্রইং রুমের ভেতরের দরজার দিকে।

দরজার কাছে যেতেই দরজায় এসে দাঁড়াল পরিচারিকা। বলল, ‘স্যার তাঁর রুমে গেছেন। আরেকজন এসেছেন। ড্রইং রুমে আসতে চাচ্ছেন।’

জেনিফার ‘কে’ বলে মুখ বাড়াল দরজায়। দেখল, জর্জ দাঁড়িয়ে।

একটা রক্তিম আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল জেনিফারের মুখ। বলল, ‘এসো।’

সালাম দিয়ে ড্রইং রুমে প্রবেশ করল জর্জ। তার পেছনে পেছনে লায়লা জেনিফার।

সারা ও মাকোনি উঠে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানাল জর্জকে।

ডাঃ মার্গারেট উঠেনি।

‘কেমন আছ আপা?’ ডাঃ মার্গারেটকে লক্ষ্য করে বলল জর্জ।

‘ভাল। তুমি কেমন আছ?’

‘আলহামদুলিল্লাহ!’ বলল জর্জ।

‘তোমার চিঠি পেেয়ে সব জেনে আমি থাকতে পারলাম না। চলে এলাম। অসুবিধা হলো না তো জর্জ? উনি কিছু মনে করবেন না তো?’ ডাঃ মার্গারেট বলল।

‘না আপা। তোমরা সবাই এসেছ জেনে খুশীই হবেন।’ জর্জ বলল।

‘কোথায় উঠব? জেনিফারদের এখানেই উঠলাম। জেনিফার নিশ্চয় বেজার হয়নি।’ বলল ডাঃ মার্গারেট ঠোঁটে হাসি টেনে।

সলাজ হাসি ফুটে উঠেছিল জেনিফারের মুখে।

সেদিকে তাকিয়ে জর্জ হেসে বলল, ‘আপা তুমি জেনিফারকে নতুন মানুষ দেখবে।’

কৃত্রিম ক্ষোভে ফুসে উঠল লায়লা জেনিফার। বলল, ‘দেখ জর্জ, এতে তোমার কোন কৃতিত্ব নেই। তোমার ভাগ্য, আহমদ মুসার মত ব্যক্তি তোমার উকিল হয়েছেন।’

আহমদ মুসার নাম উচ্চারণ করে কথা শেষ করার পরেই জিহ্বায় কামড় দিল জেনিফার। সংগে সংগে ভয় ও অপরাধের চিহ্ ফুটে উঠল তার মুখে। সংকুচিত হয়ে পড়ল সে।

আহমদ মুসা নাম শুনে সবাই চমকে উঠেছিল। জর্জ তার চোখ দু’টি বিস্ফোরিত করে বলল, ‘আহমদ মুসা? কে আহমদ মুসা?’

বিমূঢ় লায়লা জেনিফার কিছুক্ষণের জন্যে পাথরের মত শক্ত হয়ে গিয়েছিল।

জর্জের সরব প্রশ্ন উত্থিত হবার পর লায়লা জেনিফার যন্ত্রচালিতের মত ড্রইং রুমের ভেতরের দরজার দিকে এগিয়ে দরজা লক করে ফিরে এল তার সোফায়।

চারদিক থেকে সবাই ছেঁকে ধরল লায়লা জেনিফারকে। বিব্রত জেনিফার।

‘জেনিফার, আহমদ আব্দুল্লাহই কি আহমদ মুসা?’ গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ডাঃ মার্গারেট।

কথা বলল না। হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল জেনিফার।

ডাঃ মার্গারেট, জর্জ, মাকোনী, সারা উইলিয়াম সকলের মধ্যেই একটা স্তব্ধতা নেমে এল।

বিস্ময়, আনন্দ ও অভাবিত পাওয়ার এক প্রবল বন্যায় সকলের মধ্যেই আত্মহারা ভাব।

নীরবতা ভাঙল ডাঃ মার্গারেট। বলল, ‘তিনি আহমদ মুসা হলেই শুধু তিনি যা তার সাথে মানায়।’

‘এখন মনে হচ্ছে, তিনি আহমদ মুসা না হওয়াই অবিশ্বাস্য। কিন্তু বিশ্বাস হতে চাইছে না তিনি আমাদের মাঝে।’ বলল সারা উইলিয়াম।

‘তাঁকে প্রথম দেখেই মনে করেছিলাম তাঁর আহমদ মুসা হওয়া উচিত।’ মাকোনী বলল।

‘জেনিফার পরিচয়টা না দিলেই ভাল ছিল। এখন ভয় ও সংকোচে মনটা যে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। আর লজ্জা রাখব কোথায়, তার সাথে কত কি বেয়াদবি এ কয়দিনে হয়ে গেছে!’ বলল জর্জ।

জেনিফার উঠে দাঁড়ালো। কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলল, ‘সত্যি আমার একটা অপরাধ হয়ে গেছে। ওঁর পরিচয় কাউকে যখন উনি বলেননি, এমনকি আম্মা ও দাদিকেও নয়, তখন আমার এভাবে বলে ফেলাটা অন্যায় হয়েছে। আমার ভয় হচ্ছে, উনি একে কি চোখে দেখবেন।’ থামল একটু।

তারপর সবার দিকে চেয়ে ফিসফিস করে আবার বলল, ‘সবাইকে অনুরোধ সকলে দয়া করে বিষয়টা গোপন রাখবেন। পরিচয় দিতে চাইলে উনিই দেবেন। আমাদের কাছ থেকে তাঁর পরিচয় আর কেউ না জানুক।’

‘ঠিক বলেছ জেনিফার। কিন্তু বল, তোমার সাথে পরিচয় হলো কি করে? উনি কি তোমাকে বলেছেন তার পরিচয়?’ বলল ডাঃ মার্গারেট।

‘না বলেননি। উনি ওকারী গ্রামে আমাকে উদ্ধার করা থেকে শুরু করে তার কাজ, কথাবার্তা, সিডি কাকেমে আসার পথে চারটি লাশ গোপন করাসহ ঘটনাবলী দেখে আমিই তাঁকে গাড়িতে বলেছিলাম তিনি আহমদ মুসা। তিনি স্বীকার করেছিলেন মাত্র।’ লায়লা জেনিফার বলল।

জেনিফার থামলে আবার নেমে এল নীরবতা।

কিছুক্ষণ পর নীরবতা ভাঙল ডাঃ মার্গারেট। অনেকটা স্বগত কণ্ঠের মত বলল, ‘এখন পরিবেশ, পরিস্থিতি সবকিছুই নতুন মনে হচ্ছে। মুহূর্তেই যেন পাল্টে গেল সব। মনে হচ্ছে, আমাদের এই ক্ষুদ্র দেশটা হঠাৎ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।’

‘এই পরিবর্তন কেন? ব্যক্তি আহমদ মুসা তো আজকের আগেও আমাদের মাঝে ছিলেন।’ বলল সারা উইলিয়াম।

'এটা বোধ হয় তাঁর নামের সাথে আল্লাহর দেয়া একটা শক্তি।' বলল ডাঃ মার্গারেট।

'কিন্তু ব্যক্তির প্রভাব ও নামের শক্তি কি আলাদা হতে পারে?'

'পারে না। নাম যে গুণগুলো বহন করে, ব্যক্তি সে কাজগুলোই করবে। কিন্তু নামের যে প্রভাব ব্যক্তি তা হঠাৎ করে সৃষ্টি করতে পারে না।' বলল ডাঃ মার্গারেট।

থামল একটু ডাঃ মার্গারেট। পরক্ষণেই আবার শুরু করল, 'এই কারণেই আহমদ মুসার নাম আমাদের সামনে একটা নতুন অবস্থার সৃষ্টি করেছে।'

'ধন্যবাদ ডাঃ মার্গারেট, আমি অন্য একটা কথা বলতে চাচ্ছি। জেনিফারের কথা। জনাব আহমদ মুসা জর্জের উকিল হলো কি করে?' বলল মাকোনী।

জেনিফারের মুখ লাল হয়ে উঠল।

ডাঃ মার্গারেট মুখ টিপে হাসল। কিছু বলতে যাচ্ছিল সে। এই সময় পাশে রাখা তার মোবাইল টেলিফোন বেজে উঠল। ডাঃ মার্গারেট টেলিফোন তুলে নিল। কথা বলল।

গ্র্যান্ড টার্কস থেকে তার বান্ধবীর টেলিফোন। কথা বলতে বলতে মুখ ম্লান হয়ে গেল মার্গারেটের। মুখে ফুটে উঠল ভয়ের চিহ্ন।

টেলিফোন রেখেই সে শুকনো কণ্ঠে বলল, 'খুব খারাপ খবর মনে হয়। হোয়াইট ঈগলের বিরাট বাহিনী নাকি এই সাউথ টার্কো দ্বীপে আসছে।'

জর্জ চমকে উঠল ডাঃ মার্গারেটের কথা শুনে। জিজ্ঞেস করল, 'কে দিল এই খবর?'

'মেরী।'

'তাহলে বিষয়টা তো এখনই জনাব আহমদ মুসাকে জানাতে হয়।'

বলেই জর্জ ছুটল ড্রইং রুম থেকে বেরিয়ে আহমদ মুসার রুমের দিকে।

মিনিট খানেকের মধ্যে জর্জ ফিরে এল আহমদ মুসাকে নিয়ে।

আহমদ মুসা ড্রইং রুমে ঢুকতে গিয়ে দরজায় থমকে দাঁড়াল। বলল, 'স্যরি, আপনারা অনেকে দেখছি এখানে আছেন। আমি বরং....।

ডাঃ মার্গারেটসহ সবাই উঠে দাঁড়িয়েছিল। মুহূর্তে সবার মাথায় উঠে গেছে ওড়না। পোশাকের আবরণের ভেতর সবাই সবাইকে যেন সংকুচিত করে নিয়েছে। দ্রুত ড্রইং রুমের একদিকে তারা সরে এসেছে দু'টি সিংগল সোফা খালি করে।

আহমদ মুসাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে লায়লা জেনিফার বলল, 'না ভাইয়া আপনি বসুন। অপরিচিত দু'জন অন্য কেউ নয়। মাকোনীকে তো আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখেছেন। আর এ আমার মামাতো বোন সারা উইলিয়াম।' মাকোনী ও সারা উইলিয়ামকে দেখিয়ে বলল জেনিফার।

আহমদ মুসা সকলকে সালাম দিয়ে মাকোনীর দিকে চেয়ে হেসে বলল, 'আপনি কেন সেদিন আমাকে সহযোগিতা করতে পারেননি, সেটা আমি হাসপাতালে জ্ঞান ফেরার পরেই বুঝেছিলাম। আরও বুঝেছিলাম, ঐভাবে খোলামেলা জিজ্ঞেস করা আমার ঠিক হয়নি।'

সংকুচিত, লজ্জিত মাকোনী বলল, 'আমি সেদিনের ঘটনার জন্যে দুঃখিত।'

'না বোন মাকোনী, দুঃখিত আমার হওয়া উচিত।' বলল আহমদ মুসা।

'কেন?' বলল মাকোনি মুখ নিচু রেখেই।

'সেদিন বিবেচনায় আমার বিরাট ভুল হয়েছিল। আমি এখানকার শত্রুর শক্তিকে ছোট করে দেখেছিলাম। তাই একবারও ভাবিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের উপর শত্রুরা চোখ রাখতে পারে। অন্য কারো সামনে জেনিফারের কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করা ছিল একটা ভুল সিদ্ধান্ত। এ ভুল সিদ্ধান্তের শাস্তি আমি পেয়েছি।'

'ধন্যবাদ জনাব। এভাবে আপনি নিজেকে ছোট করতে পারে বলেই হয়তো আপনি এত বড়।' বলল মাকোনি আবেগ জড়িত কণ্ঠে।

'বোন মাকোনি। কখনও প্রশংসা করলে শুধু আল্লাহরই করবেন।' গম্ভীর কণ্ঠ আহমদ মুসার।

আহমদ মুসার এ কণ্ঠে সবাই তার দিকে চোখ তুলে তাকাল। একটা বিব্রত ভাব সকলের চোখে।

'স্যরি।' বলল মাকোনি।

'ধন্যবাদ।' আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসা গিয়ে সোফায় বসল।

বসল সবাই।

আহমদ মুসা বসেই বলল, 'ডাঃ মার্গারেট আপনাকে যে খবর দিয়েছে সে কে?' আহমদ মুসার চোখ নিচু। মুখে ভাবনার চিহ্ন।

ডাঃ মার্গারেট পাশের সোফায় বসে ছিল। সে মুহূর্তের জন্যে চোখ তুলে একবার আহমদ মুসার দিকে তাকাল। বলল, 'জানিয়েছে আমার এক বান্ধবী।'

'কি করে জানতে পারল সে?'

'বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের বিপরীত দিকে রাস্তার ওপাশে স্বাস্থ্য দফতর পরিচালিত সেন্ট্রাল মেডিকেল ষ্টোর। সে ষ্টোরেরই সেলস ম্যানেজার আমার সেই বান্ধবী। কিছুক্ষণ আগে দু'জন লোক, যার একজন সানসালভাদরের, ঐ দোকানে ঔষধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম কিনতে গিয়েছিল। তাদের তাড়াহুড়া দেখে আমার বান্ধবী কারণ জিজ্ঞেস করেছিল। উত্তরে তারা জানায়, আমাদের খুব তাড়াতাড়ি সাউথ টার্কো দ্বীপে পৌছতে হবে। কেন সেখানে কোন দূর্ঘটনা.......? জিজ্ঞেস করেছিল আমার বান্ধবী। আমার বান্ধবীকে কথা শেষ করতে না দিয়েই তারা বলে, না দুর্ঘটনা ঘটেনি। তবে সুর্ঘটনা ঘটবে সেখানে। তাহলে ঔষধ ও চিকিৎসা সরঞ্জামের প্রয়োজন কেন? বলেছিল আমার বান্ধবী। সুলক্ষ্যের জন্যে যুদ্ধ কি সুঘটনার মধ্যে পড়ে না? বলেছিল তাদের একজন। তা পড়ে। কিন্তু তার জন্যে এত তাড়াহুড়া কেন? জিজ্ঞেস করে আমার বান্ধবী। আমরা অনেক লোক যাচ্ছি তো। প্রস্তুত হয়ে বের হতেও তো সময় লাগবে। তারা বলেছিল।

এসব কথা থেকেই আমার বান্ধবীর মনে হয়েছে সাউথ টার্কো দ্বীপে বড় কিছু ঘটতে যাচ্ছে। সাউথ টার্কো দ্বীপে আমি এসেছি এবং সাউথ টার্কোতে এ পর্যন্ত কি ঘটেছে সে জানে। সুতরাং তার মনে সন্দেহ উদয় হবার সাথে সাথে সে টেলিফোন করেছে আমার কাছে।' বলল মার্গারেট।

আহমদ মুসা গভীরভাবে ভাবছিল। ডাঃ মার্গারেট কথা শেষ করলেও আহমদ মুসা তৎক্ষণাৎ কিছু বলল না।

একটু পরেই চকিতে একবার মুখ তুলে ডাঃ মার্গারেটের দিকে চেয়ে বলল, ‘তাদের তাড়াহুড়া কেন ছিল বলুন তো?’

‘অনেক কিছু অনুমান করা যায়, কিন্তু ঠিক করে বলা মুষ্কিল।’ বলল ডাঃ মার্গারেট।

‘অনুমান একটা এই হতে পারে যে, সাউথ টার্কো দ্বীপে তাদের মূল লোকেরা এসেছে সানসালভাদর থেকে। তারা চিকিৎসা সরঞ্জাম সম্ভবত সাথে আনতে পারেনি ভুলের কারণে। তাই তাড়াহুড়া করে সংগ্রহ।’

ডাঃ মার্গারেট হাসল। বলল, ‘আমার মনে হয় এই অনুমানটা সত্যের সবচেয়ে কাছাকাছি।’

আবার ভাবনায় ডুব দিয়েছে আহমদ মুসা।

এবার মুখ তুলে তাকাল জর্জের দিকে। বলল, ‘জর্জ, আমরা ওকারী গ্রামে মৎস বন্দরের দু’জন সন্দেহজনক লোক সম্পর্কে যা শুনে এলাম, তার সাথে ডাঃ মার্গারেটের দেয়া তথ্য মেলালে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, সাউথ টার্কো দ্বীপে একটা বড় ধরনের অভিযান আসছে এবং তা আসছে ঐ মৎস বন্দরের পথেই।’

‘বড় ধরনের অভিযান?’ শুকনো কণ্ঠে বলল জর্জ।

শুধু জর্জ নয় আহমদ মুসার শেষ কথাটা মুহূর্তেই সকলের চেহারা পাল্টে দিয়েছে। উদ্বেগ ফুটে উঠেছে সবার চোখে-মুখে।

জর্জের সভয় প্রশ্নের জবাবে আহমদ মুসা বলল, ‘হ্যাঁ অভিযানটা বড় ধরনেরই হবে। সুদূর সানসালভাদর থেকে ছোট-খাট অভিযানের জন্যে তারা আসছে না নিশ্চয়। ঔষধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম সংগ্রহ থেকে বুঝা যায়, বেপরোয়া ধরনের কোন অভিযান নিয়ে তারা আসছে।’

‘সুদূর সানসালভাদর থেকে কেন কাছে কোথাও থেকে কেন নয়? বলল জর্জ।

‘এর উত্তর জানি না। পরে খোঁজ নেয়া যাবে। আমার মনে হয় তাদের একটা বড় কেন্দ্র হতে পারে সানসালভাদর। স্থানীয় উদ্যোগ বড় ধরনের মার খাওয়ার পর ওরা আসছে যুদ্ধে জেতার জন্যে।’

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকাল। তারপর সবার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'আমি এখন উঠব। এখনি যেতে হবে ওকারী গ্রামে।'

জর্জসহ মেয়েদের সকলের মুখ ভয় ও উদ্বেগে আচ্ছন্ন। কিন্তু আহমদ মুসার ঠোঁটের স্বাভাবিক হাসিটি তখনও মিলায়নি।

আহমদ মুসা থামতেই লায়লা জেনিফার বলল, 'তাহলে সাউথ টার্কো দ্বীপের উপর ভয়ানক বিপদ ঘনিয়ে আসছে?'

'ভয়ানক কিনা জানিনা, তবে একটা বিপদ তো আসছেই।'

'আপনি ওকারী গ্রামে চলে গেলে আমাদের এখানে কি করণীয় হবে?' লায়লা জেনিফার বলল উদ্বিগ্ন কণ্ঠে।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'আমি জর্জকে রেখে যাচ্ছি। সে এখানকার আলী রুফাই, ওমর লাওয়াল ও রমযান ইরোহাকে নিয়ে প্রতিরক্ষার একটা ব্যবস্থা গড়ে তুলবে।'

বলে তাকাল আহমদ মুসা জর্জের দিকে। তারপর বলল, 'ঠিক আছে জর্জ?'

'ঠিক আছে ভাইয়া। আপনার আদেশ সর্বশক্তি দিয়ে পালন করব।' শুকনো, উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল জর্জ।

আহমদ মুসা হেসে উঠল।

'হাসছেন যে ভাইয়া?' ম্লান কণ্ঠে বলল জর্জ।

'হাসছি তোমার ভীত, উদ্বিগ্ন কণ্ঠ শুনে।'

'কিন্তু ভাইয়া, আপনার হাসি দেখে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা কিছুই নয়। অথচ সাংঘাতিক কিছু ঘটতে যাচ্ছে।' বলল জেনিফার।

'জর্জের পক্ষ নেবার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ জেনিফার। তুমি ঠিকই বলেছ, হয়তো সাংঘাতিক কিছু ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু একে ভয় পাবার কিছু নেই।'

'সাংঘাতিক কিছু তো অবশ্যই ভয় পাবার মত।'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'ভয় পেলে সাংঘাতিক বহুগুণ সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়ায়। যার ফলে যুদ্ধের আগেই পরাজয় নির্ধারিত হয়ে যায়।'

‘আপনার একটুও ভয় করছে না?’ লায়লা জেনিফার বলল।

একটা গাম্ভীর্যের ছায়া নেমে এল আহমদ মুসার মুখে। তাকাল জেনিফারের দিকে। বলল, ‘ভয় কাকে করব বলত? আমি যে আল্লাহকে ভয় করি, যে আল্লাহকে আমি আমার অভিভাবক, রক্ষাকর্তা বলে মনে করি, সেই আল্লাহ তো অন্য কাউকে ভয় করতে নিষেধ করেছেন। আর ভয় আমি কেন করব বলত? সর্ব শক্তিমান আল্লাহ আমার সাথে আছেন, আমি আমাকে শত্রুর চেয়ে দুর্বল ভেবে ভীত হবো কেন?’

আহমদ মুসা কথা শেষ করলেও কেউ কোন কথা বলল না। সবার চোখে একটা বিস্ময় ও আনন্দের ঔজ্জ্বল্য।

নীরবতা ভাঙল ডাঃ মার্গারেট। বলল, ‘আমি অহেতুক ভয় করার কথা বলছি না। কিন্তু শত্রুর চেয়ে আসলেই দুর্বল হলে সে বাস্তবতা চাপা দেয়া কি ঠিক?’

‘দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিত থাকা এবং ভয় করা, দু’টি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিত থাকলে তবেই তো মোকাবিলার উপযুক্ত ষ্ট্রাটেজি গ্রহণ করা যাবে। কিন্তু ভয় করলে মোকাবিলার আগেই অর্ধেক পরাজয় হয়ে যায়।’

‘বুঝতে পেরেছি। ধন্যবাদ।’ বলল ডাঃ মার্গারেট মুগ্ধ চোখে।

মার্গারেটের কথা শেষ হতেই সারা উইলিয়াম বলল, ‘আপনি বহুবার বন্দী হয়েছেন, বহুবার মৃত্যুর মুখে পড়েছেন, সে সময়গুলোতে আপনার কেমন মনে হতো, কি ভাবতেন আপনি?’

‘সারা?’ তীব্র কণ্ঠে বলল লায়লা জেনিফার।

সারা উইলিয়াম জিহ্বায় কামড় দিয়ে বলল, ‘স্যরি।’

সারা উইলিয়াম ও লায়লা জেনিফার দু’জনের দিকেই তাকাল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসাকে তাকাতে দেখে লায়লা জেনিফার লজ্জা পেল সারাকে ঐভাবে ধমকে উঠার জন্যে। বলল সেও, ‘স্যরি।’ বিব্রত চেহারা লায়লা জেনিফারের।

বুঝল আহমদ মুসা। হাসল সে। বলল, 'বিব্রত হওয়ার কি আছে জেনিফার। যা গোপন নেই, আমার কাছে গোপন করার প্রয়োজন কি?'

'ভাইয়া.........।' জেনিফার কথা বলতে পারলো না। কেঁদে ফেলল জেনিফার ক্ষোভে, লজ্জায়।

আহমদ মুসা গম্ভীর হলো। বলল, 'তোমাদের কাছে আমার পরিচয় গোপন রাখার প্রয়োজন নেই। এখানকার শত্রু বা প্রতিপক্ষের কাছে আমার পরিচয় গোপন রাখা প্রয়োজন এ জন্যে যে, আমার পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়লে প্রতিপক্ষরা একদিকে সাবধান হবে, অন্যদিকে ওদেরকে সাহায্য করার জন্যে আমার পুরনো শত্রুদের অনেকেই ছুটে আসবে।'

লায়লা জেনিফার চোখ মুছে বলল, 'তাহলে আমি অন্যায় করিনি ভাইয়া?'

'অবশ্যই না।' বলে আহমদ মুসা আবার ঘড়ির দিকে তাকাল।

'আমরা সৌভাগ্যবান, আপনাকে আমার অভিনন্দন।' বলল ডাঃ মার্গারেট আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে।

'ডাঃ মার্গারেট, অভিনন্দনটা আগামী হয়ে গেল। দোয়া করুন।'

বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল জর্জকে, 'চল, দেখ গাড়িতে তেল আছে কিনা। এখনি যেতে হবে।'

জর্জ উঠে দাঁড়াল।

'একটা কথা বলতে পারি?' বলল ডাঃ মার্গারেট আহমদ মুসাকে।

'আহমদ মুসা চলতে শুরু করেছিল। থমকে দাঁড়াল। বলল, 'বলুন।'

'ওরা তো অনেক ঔষধ, অনেক চিকিৎসা সরঞ্জাম নিয়ে আসছে। আমি একজন ডাক্তার। আমি কি আপনাদের সাথী হতে পারি?'

আহমদ মুসার চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'ধন্যবাদ ডাঃ মার্গারেট। অবশ্যই সাথী হতে পারেন, এক সময় সাথী হতে হবে। কিন্তু আজ আপনি গেলে, জর্জকেও যেতে হবে। কিন্তু আমি চাই, জর্জ এখানে থাকুক। সুতরাং আপনিও এখানেই থাকুন।'

'আরেকটা কথা।' বলল ডাঃ মার্গারেট।

‘বলুন।’ আহমদ মুসা বলল।

‘সারা উইলিয়াম একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিল, তার জবাব দেননি।’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘এ প্রশ্নের কি জবাব দেব? এই যে আজ বেরুচ্ছি, জীবন এবং মৃত্যু দুই-ই আমার সাথে। আমি এ নিয়ে কিছুই ভাবছি না। জীবন মৃত্যুর মালিক যিনি, ভাবনা তাঁর, সিদ্ধান্তও তাঁরই।’

বলে আহমদ মুসা সালাম দিয়ে পা বাড়াল বাইরে বেরুবার জন্যে।

বেরিয়ে গেল ড্রইংরুমের থেকে। তার পিছে পিছে জর্জও।

আহমদ মুসার যাত্রাপথের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে ছিল ওরা চারজন।

আহমদ মুসা বেরিয়ে গেছে, কিন্তু ওদের চোখের পলক পড়েনি, দৃষ্টি তাদের ফিরে আসেনি।

এক সময় ঠোঁট ফুঁড়েই যেন কথা বেরুল ডাঃ মার্গারেটের। বলল, ‘জেনিফার, মৃত্যুঞ্জয়ী মানুষের কথা শুনেছিলাম। আজ দেখলাম এক অপরূপ মৃত্যুঞ্জয়ীকে।’ ধীর এবং ভারী কণ্ঠ ডাঃ মার্গারেটের।

মার্গারেটের কণ্ঠস্বরে ওরা তিনজন ফিরে তাকাল মার্গারেটের দিকে।

ধপ করে বসে পড়ল মার্গারেট সোফায়। বসল ওরা তিনজনও।

কথা বলল মার্গারেটই আবার। বলল, ‘কিছুক্ষণ আগ পর্যন্ত যে ভয় আমাকে পেয়ে বসেছিল, সে ভয় এখন আর নেই আমার।’

‘সত্য বলেছেন আপা। মনের অজানা একটা দুয়ার যেন খুলে গেছে। নিজেকে অনেক সাহসী ও শক্তিশালী মনে হচ্ছে।’ বলল লায়লা জেনিফার।

‘এ জন্যেই আহমদ মুসা অমন জগৎজয়ী আহমদ মুসা হতে পেরেছে। সে ব্যক্তি মাত্র নয়, সে যেন সাধনার সেই পরশমণি। লোহাও ওঁর সান্নিধ্যে সোনা হয়ে যায়।’

কিছু বলতে যাচ্ছিল মাকোনি। কিন্তু মুখ হা করেই থেমে গেল।

ড্রইং রুমে প্রবেশ করল জেনিফারের মা ও দাদী। বলল জেনিফারের মা, ‘কি ব্যাপার? কি ঘটেছে ওকারী গ্রামে? কয়েক টুকরো রুটি মুখে দিয়েই আমাদের আহমদ আব্দুল্লাহ (আহমদ মুসা) আবার ছুটে গেল ওকারী গ্রামে?’

‘আম্মা, আজ রাতেই শত্রুদের একটা বড় অভিযান আসছে আমাদের সাউথ টার্কো দ্বীপে।’ বলল লায়লা জেনিফার।

শুনে জেনিফারের মা ও দাদী দু’জনেই হতাশ ভাবে বসে পড়ল সোফায়। বলল জেনিফারের দাদী, ‘তাহলে কি টার্কো দ্বীপপুঞ্জ থেকেও আমাদের ভাত উঠল? এরপর কোথায় যাব আমরা? কে আমাদের জায়গা দেবে?’

উদ্বেগ, আতংকে ছেয়ে গেছে জেনিফারের মা ও দাদীর মুখ।

‘দোয়া করুন দাদী। বড় বিপদ ঠিকই। কিন্তু দাদী, বহু শতাব্দীর অব্যাহত পরাজয়ের পর আমরা প্রথমবার জিততে শুরু করেছি। এবার আমাদের বিজয়ের পালা।’ বলল জেনিফার আবেগ রুদ্ধ কণ্ঠে।

‘আল্লাহ আমাদের আহমদ আব্দুল্লাহকে সাহায্য করুন। তার হাতেই তো আমাদের বিজয় আসতে শুরু করেছে।’ বলল জেনিফারের মা।

‘আমিন।’ সকলে একযোগে বলে উঠল।

আহমদ মুসা ওকারী গ্রামের মসজিদে এসেই শুনল, আলী ওরমা রাত দশটার মধ্যে ফেরেনি। তার পরেই আবু বকর ক’জনকে নিয়ে ওদিকে চলে গেছে।

আহমদ মুসার মন চঞ্চল হয়ে উঠল। বুঝল, আলী নিশ্চয় সন্দেহজনক কারও দেখা পেয়েছে। তাহলে হোয়াইট ঈগল এই পথেই দ্বীপের মুসলিম অবস্থানের উপর আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওদের পথকে এত তাড়াতাড়ি চিি‎হ্নত করতে পারায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসাকে রাস্তায় কথা বলতে দেখে মসজিদ থেকে দ্রুত বেরিয়ে এল ইসহাক আব্দুল্লাহ, কলিন  কামাল এবং ফরিদ নোয়ানকো।

আহমদ মুসার সামনে আসতে আসতে ইসহাক আব্দুল্লাহ বলল, ‘আবু বকর দশ মিনিট আগে তিনজনকে সাথে নিয়ে আলীর সাথে দেখা করতে গেছে।’

আহমদ মুসা তার কথার দিকে কান না দিয়ে বলল, ‘তোমার আব্বা কোথায়?’

ইসহাক আব্দুল্লাহ মুখ খুলতে যাচ্ছিল। সেই সময় তার আব্বা আব্দুর রহমান ওকারীকে আহমদ মুসার দিকে আসতে দেখা গেল।

সে আসতেই আহমদ মুসা তাকে সালাম দিয়ে বলল, ‘জনাব হোয়াইট ঈগল বড় ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে এ দ্বীপে আসছে। আজ রাতেই কোন এক সময় আক্রমণ হবে এবং মনে হচ্ছে এ ঘাটেই তারা ল্যা- করবে।’

আব্দুর রহমান ওকারীর চোখে-মুখে উদ্বেগ ফুটে উঠল। বলল, ‘আলী কিংবা আবু বকর কেউতো ফেরেনি। এটা জানা গেল কিভাবে?’

‘আজ সন্ধ্যায় জর্জের বোন এসেছে ‘গ্রান্ড টার্কস’ থেকে। তাকেই একজন টেলিফোন করে জানিয়েছে। তার উপর আলী দশটার মধ্যে না ফেরায় প্রমাণিত হচ্ছে সেও সন্দেহজনক কিছু দেখেছে।’ বলল আহমদ মুসা।

সকলের চোখে-মুখে চিন্তা ও উদ্বেগের ছায়া।

আহমদ মুসা সকলের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে বলল, ‘কি ব্যাপার, তোমরা কি ভয় করছ?’

ম্লান হাসল ইসহাক আব্দুল্লাহ। তাড়াতাড়ি বলল, ‘না ভাইয়া, আমরা ভাবছি, আপনি পাশে থাকলে, যে কোন কিছুর মোকাবিলায় আমরা দাঁড়াতে পারি।’

‘অবশ্যই।’ বলে উঠল কলিন কামাল ও নোয়ানকো একযোগে।

‘আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের এখন দু’টি কাজ। এক, গ্রামের ট্রেনিং প্রাপ্ত সকলকে এই মসজিদ চত্বরে এনে জমা করা। দুই, কয়েকজনকে এখনি আবু বকরের সাথে যোগ দিতে হবে। ওদিকের সব অবস্থা জেনে এখানে এসে আমাদের কৌশল ঠিক করতে হবে। আমি, কলিন ও নোয়ানকো আবু বকরের ওদিকে যাই। ইসহাক আবদুল্লাহ এদিকটা দেখ।’

‘আমিও যাব।’ ইসহাক আবদুল্লাহ বলল।

‘অসুবিধা নেই। আমি অন্যদের নিয়ে এ দিকটা ম্যানেজ করবো। আমি গ্রামের দিকে বেরুচ্ছি।’ বলল ইসহাক আবদুল্লাহর আব্বা আবদুর রহমান ওকারী।

‘জর্জকে দায়িত্ব দিয়ে এসেছি সিডি কাকেম এলাকার।’

বলে একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর আবার শুরু করল, ‘আমি যতদূর জানতে পেরেছি, ওরা বড় ধরনের দল নিয়ে আসছে। এ বিষয়টা কারও কাছে লুকানো ঠিক হবে না। তবে কেউ যদি ওদের মোকাবিলার প্রশ্নে দ্বিধাগ্রস্ততা অনুভব করে, তাহলে তাকে আমাদের সাথে শামিল হতে বাধ্য করা ঠিক হবে না। নিজেদের বিশ্বাস, নিজেদের সমাজ স্বজাতি, নিজেদের মাটি রক্ষার জন্যে যারা জীবন দিতে প্রস্তুত, তাদের সংখ্যা কম হলে ক্ষতি নেই। এঁরা আল্লাহর সাহায্য পাবেন।’

আবদুর রহমান ওকারী আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে ছিল। তাঁর চোখে ধীরে ধীরে ফুটে উঠল অবাক বিস্ময়।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, ‘এমন করে কেউ কোনদিন আমাদের বলেনি। এমন বিশ্বাসের কথা, এমন আবেগের কথা আমাদের জানাই ছিল না। আল্লাহর সাহায্য এভাবে পাওয়া যায়, ভাবনায়ও আসেনি কোনদিন আমাদের। এতকিছু তুমি জান, এমনভাবে তুমি বলতে পার, কে তুমি বাবা?’

আহমদ মুসা বলল, ‘আমি আপনাদের ভিনদেশী এক ভাই। আর কিছুর কি দরকার আছে?’

বলে আহমদ মুসা ইসহাক আবদুল্লাহর দিকে চেয়ে বলল, ‘তোমরা কি প্রস্তুত? আমরা এখনি যাত্রা করব।’

‘আমরা প্রস্তুত।’ বলল ইসহাক আবদুল্লাহ।

‘তোমাদের তিনজনের পকেটেই কি রিভলবার আছে? আহমদ মুসা বলল।

ইসহাক আবদুল্লাহ উত্তর দিল না। তারা তিনজন পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। একটু পর ইসহাক আবদুল্লাহ বলল, ‘না ভাইয়া, আমাদের কারো পকেটেই রিভলবার নেই।’

‘চাকু বা ছোরা আছে?’

ইসহাক আবদুল্লাহ আবার অন্য দু’জনের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করে বলল, ‘না নেই।’

‘তাহলে প্রস্তুত কেমন করে তোমরা?’

‘আমরা মনে করছি, কি অবস্থা তার খোঁজ নিতে যাচ্ছি, লড়াইয়ে তো যাচ্ছি না। তাই....।’

কথা শেষ না করেই থেমে গেল ইসহাক আবদুল্লাহ।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘দেখ বর্তমান অবস্থায় একজন মুসলিমকে সব সময় পুলিশ ও সৈনিকের ভূমিকায় থাকতে হবে। আমরা যুদ্ধাবস্থায় আছি। রিভলবার ও চাকুর মত অস্ত্র সব সময় সাথে থাকতে হবে। যাও তৈরি হয়ে এসো।’

ওরা তিনজনই ছুটে চলে গেল।

আবদুর রহমান ওকারীও আহমদ মুসাকে সালাম দিয়ে ‘যাই ওদিকের ব্যবস্থা করি’ বলে হাঁটাতে শুরু করল।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ওরা তিনজনই ফিরে এল।

আহমদ মুসা হাঁটতে শুরু করল। তার পেছনে পেছনে ওরা তিনজন।

হাঁটতে হাঁটতে ইসহাক আবদুল্লাহ, ‘আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?’

‘সেটাই ভাবছি।’ বলল আহমদ মুসা।

‘কেন সেই গাছতলায়, যেখানে আলীর সাথে আবু বকরদের দেখা করার কথা, সেখানেই কি প্রথমে যাব না?’ বলল ইসহাক আবদুল্লাহ।

‘সেখানেই তো যাওয়ার কথা। ভাবছি, আলী আর আবু বকরের দেখা হলো কিনা? দেখা হলে তারা সেখানে এখনও আছে কিনা। যা পরিস্থিতি, তাতে আমার মনে হচ্ছে আলীর দেখা পাওয়ার পর আবু বকর প্রস্তুতির জন্যে বা খবর দেয়ার জন্যে এতক্ষণ ফেরার কথা। কিন্তু ফিরল না কেন?’

‘তাহলে?’ বলল ইসহাক আবদুল্লাহ।

‘তবু ওখানেই প্রথম যেতে হবে আমাদের।’ আহমদ মুসা বলল।

সেই গাছতলা ঘাটের খুব কাছাকাছি। এখান থেকে গন্তব্যস্থল এখনও বেশ দূরে। আহমদ মুসা আগে চলছিল। পেছনে ওরা তিনজন। আহমদ মুসা চারদিকে সাবধানী দৃষ্টি রেখে সামনে এগিয়ে চলছিল।

আহমদ মুসার দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ ছিল সামনে বেশ দূরে। ক্ষুদ্র একটি আলোক শিখাকে সে জ্বলে উঠেই আবার নিভে যেতে দেখেছে। সেটা দিয়াশলাই-এর কাঠি বা সিগারেট লাইটারের আলো, না দৃষ্টি বিভ্রম! এ নিয়ে আহমদ মুসা মুহূর্তের জন্যে আনমনা হয়ে পড়েছিল।

কোন কিছুর সাথে হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে গেল আহমদ মুসা।

নিচের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল আহমদ মুসা। মানুষের দেহ। ঘুমন্ত না মৃত।

পেন্সিল টর্চ জ্বেলে পরীক্ষা করতেই আরেক দফা চমকে উঠল আহমদ মুসা। এতো ওকারী গ্রামের! একি আবু বকরের সাথী ছিল?

কথাটা মনে আসতেই উদ্বেগের একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল আহমদ মুসার গোটা দেহে।

সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আহমদ মুসা চাপা কণ্ঠে বলল, ‘ইসহাক তাড়াতাড়ি এদিকে এস। সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে।’

বলে আহমদ মুসা সামনে ও আশেপাশে চোখ বুলাল। রাস্তার উপর পড়ে থাকা আরও তিনটি দেহ দেখতে পেল সে।

এই সময় একটা কণ্ঠ ভেসে এল সামনে মাটিতে পড়ে থাকা দেহ তিনটির দিক থেকে, ‘আহমদ আবদুল্লাহ ভাই, আমি পারিনি। সব শেষ হয়ে গেছে।’

আবু বকরের গলা! সে জীবিত কথাটা ভাবতেই আহমদ মুসা ছুটল দেহটির দিকে। ততক্ষণে আবু বকর তার ডান হাতটা বাম হাত দিয়ে চেপে ধরে উঠে বসেছে।

আহমদ মুসা ছুটে গিয়ে বসল তার পাশে।

বসেই বলল, ‘তুমি কেমন আছ, আর কোথাও গুলী লেগেছে?’

একে একে সবাই এসে ঘিরে দাঁড়াল আবু বকরকে।

‘ভাইয়া, আবু বকরের সাথের ওরা তিনজনই মারা গেছে।’ আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল ইসহাক আবদুল্লাহ।

কেঁদে উঠল আবু বকর। বলল, ‘পারিনি ওদের সাথে। ওরা ছিল তিনজন। প্রথম গুলীতে ওদের একজনকে মেরেছিলাম। দ্বিতীয় গুলী ছুড়বার আগেই গুলী খেলাম আমি। রিভলবার হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল। তারপরেই এল ওদের ব্রাশ ফায়ার। আমি মাটিতে পড়েছিলাম। ওরা মনে করেছিল গুলীতে আমিও ঝাঁঝরা হয়ে গেছি। চলে যায় ওরা।’

‘ওদের মৃত লোকটিকে তো দেখছি না। কোথায় সে?’ বলল আহমদ মুসা।

রাস্তার পাশে একটা জায়গার দিকে অংগুলি সংকেত করে বলল, ‘ঐখানে পড়েছিল। ওরা যাবার সময় লাশ নিয়ে গেছে।’

আহমদ মুসা উঠে গিয়ে জায়গাটা পরীক্ষা করল। অনেক জায়গা জুড়ে জমাট রক্ত।

আহমদ মুসা আঙুলের ডগা দিয়ে কিঞ্চিত রক্ত তুলে নিয়ে পরখ করে দেখল, কমপক্ষে ১৫ মিনিট আগে এ লোকটি নিহত হয়েছে। তার মানে ওরা তের চৌদ্দ মিনিট আগে এখান থেকে চলে গেছে।

আহমদ মুসা ফিরে এল আবু বকরের কাছে। বলল, ‘সংক্ষেপে বল কি ঘটেছিল?’

‘আকাশ থেকে বাজ পড়ার মত ওরা উদ্যত রিভলবার ও ষ্টেনগান হাতে আমাদের সামনে আবির্ভূত হয়। শুধু একটা গুলী করারই সুযোগ পেয়েছিলাম। তারপরেই সবশেষ। ’ বলল কান্না ভরা কণ্ঠে আবু বকর।

ভাবছিল আহমদ মুসা। বলল, ‘আমার মনে হচ্ছে তোমাদের অপেক্ষায় ওরা ওঁৎপেতে বসেছিল।’

‘কিন্তু জানল কি করে?’ বলল ইসহাক আবদুল্লাহ।

‘আমি নিশ্চিত আমাদের আলী হয় ওদের হাতে নিহত, নয়তো বন্দী।’

সকলেই চমকে উঠল আহমদ মুসার কথায়। আবু বকর বলল, 'তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন, বন্দী বা নিহত আলীর কাছ থেকে খবর পেয়ে বা সন্দেহ করেই তারা এখানে এসে ওঁৎপেতে বসেছিল?'

'আমি তাই মনে করি।' আহমদ মুসা বলল।

বলেই আহমদ মুসা কলিন কামালের দিকে চেয়ে বলে উঠল, 'তুমি তো বলা যায় ডাক্তার। তুমি আবু বকরকে নিয়ে যাও। আমি এদিকে দেখছি।'

'তিনটি লাশের আমরা কি করব?' বলল কলিন কামাল।

'ওগুলেঅ এখানেই থাকবে। গাড়ি এনে ওদের নিয়ে যেতে গেলে আমরা শত্রুর নজরে পড়ে যাব।'

বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। হাঁটতে শুরু করল আহমদ মুসা সড়ক ধরে ঘাট লক্ষ্যে। তার পেছনে ইসহাক ও নোয়ানকে।

ভাবছিল আহমদ মুসা, শত্রু দু'জন এখন কোথায় থাকতে পারে, কি করছে এখন তারা। এভাবে বিকেল থেকে ঘাটে থাকার তাদের উদ্দেশ্য কি? হঠাৎ আহমদ মুসার মনে হলো, তারা কি হোয়াইট ঈগলের আজকের অভিযানের অগ্রবাহিনী? হতে পারে। তারা এ এলাকায় খোঁজ-খবর রাখছে যা হোয়াইট ঈগলের অভিযানের সাহায্যে আসবে।

সুতরাং তারা শত্রুর গুপ্তচর। তাদের হত্যা করলে ওদের অভিযান অনেক মূল্যবান তথ্য থেকে বঞ্চিত হবে। আর যদি ওদের ধরতে পারা যায়, তাহলে অনেক মূল্যবান তথ্য আমরা পাব, ভাবল আহমদ মুসা।

ওরা এই মুহূর্তে কোথায় কি কাজ করতে পারে? আলী এবং এদেরকে হত্যা করার পর নিশ্চয় এদের খোঁজে আরও কেউ আসবে, এ নিশ্চিত আশংকা তারা করবে। সুতরাং তারা সড়কের উপর অবশ্যই চোখ রাখবে।

এ বিষয়টা চিন্তা করার সাথে সাথেই আহমদ মুসা থমকে দাঁড়াল। তার সাথে সাথে ইসহাকরাও।

'কিছু ঘটেছে?' ফিস ফিস করে বলল ইসহাক আবদুল্লাহ।

'ঘটেনি। ঘটতে পারে, সে বিষয়েই চিন্তা করছি।'

চলা শেষ করেই আহমদ মুসা আবার বলল, ‘সড়ক দিয়ে এভাবে যাওয়া আর নয়। ইসহাক তুমি আর নোয়ানকো রাস্তার পশ্চিম পাশে নেমে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে থাকো। আমি পুব পাশে নামছি।

যে গাছ তলায় আলী ও আবু বকরদের দেখা করার কথা, সে গাছ তলা আহমদ মুসারা পার হয়ে এসেছে। সে গাছ তলায় গিয়ে আহমদ মুসা চকিতে চোখ বুলিয়েও এসেছে। না সেখানে কিছু নেই। সেখানে আসার আগেই আলীর কিছু হয়েছে নিশ্চয়।

ঘাট খুব বেশি দূরে নয়।

একটা টিলার গোড়া দিয়ে যাচ্ছিল আহমদ মুসা। টিলার একাংশ কেটে রাস্তাটা তৈরি হয়েছে।

টিলা এবং রাস্তার মাঝখান দিয়ে নালা। সম্ভবত বৃষ্টির পানি সরানোর জন্যেই এ নালার সৃষ্টি।

এই নালা ধরেই দক্ষিণে ঘাটের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল আহমদ মুসা।

টিলাটির গোড়ায় পৌছতেই হঠাৎ আক্রান্ত হলো আহমদ মুসা। তার মনে হলো গোটা টিলাটাই যেন তার মাথায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

হাত থেকে ষ্টেনগানটা ছিটকে পড়ল আহমদ মুসার। সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল নালায়।

পড়ে যাবার পরক্ষণেই আহমদ মুসা বুঝতে পারল টিলা ভেঙে তার মাথায় পড়েনি। দু’জন লোক তার উপর লাফিয়ে পড়েছে টিলার উপর থেকে। নিশ্চয় এরা সেই দু’জন। এরা ওঁৎপেতে ছিল টিলার উপর। ভাবল আহমদ মুসা।

এরা দু’জন আহমদ মুসার উপর লাফিয়ে পড়েই জাঁপটে ধরেছিল আহমদ মুসাকে।

একজন টিপে ধরেছিল আহমদ মুসার গলা। অন্যজন মুখ, নাক চেপে ধরে তার শ্বাস বন্ধ করার চেষ্টা করছিল।

নালাটা খুব প্রশস্ত ছিল না।

আহমদ মুসার হাত দু’টি পড়ে গিয়েছিল তার দেহের নিচে। উপর থেকে দু’জন চেপে ধরে থাকায় হাত দু’টি বের করার উপায় ছিল না।

গলা, মুখ ও নাকে ওদের হাতের চাপ বাড়ছে। মুখ এদিক ওদিক সরিয়ে মুখ ও নাক বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল আহমদ মুসা। কিন্তু কতক্ষণ?

শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে আহমদ মুসার।

প্রদীপও নেভার আগে জ্বলে। অনেকটা যেন সে ধরনেরই ঘটনা ঘটল।

আহমদ মুসা দু'পা জোড়া করে যতটা পারা যায় ওপরে তুলে দ্রুত নিচে নামিয়ে দেহে একটা ঢেউ এর সৃষ্টি করে কটিদেশটা প্রবল বেগে উপরে তুলল। তার ফলে দেহের মধ্য অঞ্চলে একটা প্রবল ঝাঁকুনির সৃষ্টি হলো। মাথা আকস্মিক সক্রিয় হয়ে মাটির সাথে সেঁটে গেল এবং পিঠ ও কটিদেশটা বেশ তীব্র গতিতে অনেকখানি উপরে উঠল।

আকস্মিক এই প্রবল ঝাঁকুনিতে ওদের দু'জনের হাতই আহমদ মুসার গলা, মুখ ও নাক থেকে কিছুটা শিথিল হয়ে পড়ল এবং আহমদ মুসার উপর চেপে বসা তাদের দেহ পাশে সরে গেল।

মুক্ত বাতাসে বুক ভরে গেল আহমদ মুসার এবং সংগে সংগেই হাত দু'টি সক্রিয় হলো তার।

আহমদ মুসা দুই হাতে ভর দিয়ে দেহের সামনের অংশকে উপর দিকে ছুঁড়ে দিল।

আগের ঝাঁকুনিতেই ওদের হাত কিছুটা ঢিলা হয়ে পড়েছিল। আহমদ মুসার পিঠ থেকে এবার দু'জন দু'পাশে ঝুলে পড়ল। তারা আহমদ মুসার গলা ও মাথা তাদের হাতের মুঠোয় রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করছিল।

আহমদ মুসা তার দুই কনুই চালাল ওদের দু'জনের পাঁজরে। গুলী খাওয়ার মতই ওরা কেঁপে উঠল। টলে উঠল তাদের দেহ। আহমদ মুসাকে ছেড়ে দিয়ে ওরা নিজেদের সামলে নেবার চেষ্টা করল। কিন্তু তারা সময় নষ্ট করল না। এক হাত দিয়ে তারা পাঁজরটা চেপে ধরে অন্য হাত দিয়ে দ্রুত রিভলবার বের করল।

ওদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে আহমদ মুসাও রিভলবার বের করেছে। কিন্তু আঘাত সামলে ওরা এতটা ক্ষিপ্রতা দেখাবে, তা সে ভাবেনি। আহমদ মুসা

যখন ওদের দিকে চাইল, দেখল ওদের রিভলবারের দু'টি নলই তাকে লক্ষ্য করে উঠে এসেছে। তখন আহমদ মুসা তার রিভলবার সবে হাতে নিয়েছে মাত্র।

দ্বিতীয়বার বেকায়দায় পড়ল আহমদ মুসা। ওরা দু'জনেই দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। তবে বেশ দূরত্ব ওদের মধ্যে। একজন দক্ষিণ-পূর্ব কোণে, অন্যজন দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। দু'জনকে গুলী করতে হলে রিভলবার বেশ ঘুরিয়ে নিতে হবে। এই অবস্থায় একজনকে গুলী করার পর আরেকজনকে গুলী করার সুযোগ সে কি পাবে?

বিকল্প হিসেবে তার পুরনো কৌশলের কথা চিন্তা করল। আহমদ মুসা তার চোখ ওদের দিক থেকে সরিয়ে আরও পেছনে তাকিয়ে দ্রুত মাথা নাড়ল যেন ওদের পেছনে দাঁড়ানো কাউকে কিছু বলছে সে। কাজ হলো।

ওরা দু'জনেই চমকে উঠে চকিতের জন্যে পেছন দিকে তাকাল।

সংগে সংগেই আহমদ মুসার রিভলবার বিদ্যুত বেগে উঠে এল এবং পর পর দু'বার গর্জন করে উঠল।

ওদের দু'জনেরই মাথায় গুলী লাগল। ওদিকে ফিরে তাকানো অবস্থাতেই মাটির উপর ছিটকে পড়ল ওদের দেহ।

আহমদ মুসা ধীরে ধীরে গিয়ে ওদের পকেট সার্চ করল। পেয়ে গেল একজনের পকেটে বাঞ্চিত বস্তু, ইনফ্রারেড গগলস। এই গগলসটি আহমদ মুসা দিয়েছিল আলীকে। কিন্তু অন্ধকারে দেখার এই গগলস দিয়ে আলী শত্রুদের খুঁজে পায়নি, বরং শত্রুরাই সম্ভবত তাকে প্রথম চিহ্নিত করে। নিশ্চয় এই গগলস দিয়েই এরা আহমদ মুসাকে দূরে থাকতেই চিহ্নিত করেছিল এবং ওঁৎপেতে ছিল। তবু ভাল, ওরা প্রথমেই গুলী করেনি।

গুলীর শব্দ পেয়ে ইসহাক আবদুল্লাহ এবং নোয়ানকো রাস্তার উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে দ্রুত চলে এসেছে রাস্তার এ প্রান্তে। উদ্বেগ, আতংক ফেটে পড়ছে তাদের চোখ-মুখ থেকে।

রাস্তার প্রান্ত দিয়ে ছোট ছোট গাছ-গাছড়া। ইসহাক আবদুল্লাহ ও নোয়ানকো গাছ-গাছড়ার পাশ দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখতে পেল আহমদ মুসাকে।

উঠে দাঁড়িয়ে তারা ছুটে এল আহমদ মুসার কাছে। বলল ইসহাক আবদুল্লাহ আনন্দের সাথে, আলহামদুলিল্লাহ, অবশিষ্ট দু'একজনকে আপনি শেষ করেছেন। এখন নিশ্চয় আমাদের লুকিয়ে এগুতে হবে না?'

আহমদ মুসা ওদিকে কান দিয়ে বলল, 'ইসহাক, আমাদের আরেক ভাই আলী নিহত হয়েছে।' গম্ভীর কণ্ঠ আহমদ মুসার।

'পাওয়া গেছে তার লাশ? কোথায়?' বলল ইসহাক আবদুল্লাহ।

'লাশ দেখিনি। তবে সে নিহতই হয়েছে।'

বলে আহমদ মুসা হাতের গগলসটা তাদের দেখিয়ে বলল, 'এটা আলীর কাছে ছিল। হত্যার পর নিশ্চয় আলীর কাছ থেকে এটা ওরা পেয়েছে।'

'তাই হবে ভাইয়া।' বলল ইসহাক আবদুল্লাহ।

আহমদ মুসার মুখমন্ডল আরও গম্ভীর হয়ে উঠেছে। বলল, 'আজ যাত্রার শুরুতেই চারজন শহীদের রক্তে স্নাত হলো আমাদের ভুখন্ড।'

'কিন্তু ওদের মারা গেছে তো আমাদের সংখ্যার চেয়ে এগার গুণ বেশী।' বলল ইসহাক আবদুল্লাহ সান্ত্বনার সুরে।

'হ্যাঁ। শত্রুর তুলনায় অংকটা আনন্দিত হবার মত। কিন্তু এই চারজন তাদের পরিবারেই শুধু নয় আমাদের এখানকার এই ছোট্ট সমাজেও ছিল অমূল্য।'

'আল্লাহর ইচ্ছা ভাইয়া। আপনার পরিকল্পনায় কোন ত্রুটি ছিল না।' বলল ইসহাক আবদুল্লাহ।

আহমদ মুসা কোন উত্তর দিল না। সে তাকাল পাশের টিলার মাথার দিকে। বলল, 'চল টিলার উপরটা দেখি। ওখানেই ওরা দু'জন ওঁৎপেতে ছিল।'

বলেই আহমদ মুসা টিলায় উঠতে শুরু করল। ওরাও দু'জন আহমদ মুসার পেছনে পেছনে চলল।

টিলার উপরে জায়গাটা খুব প্রশস্ত নয়। ৪ বর্গগজের বেশি হবে না। শীর্ষটাও ছোট ছোট গাছ-গাছড়ায় ঢাকা।

টিলার মাথার মাঝামাঝি জায়গাটার গাছ-গাছড়াগুলো ছেটে ফেলা। সেখানে একটা তোয়ালে বিছানো।

আহমদ মুসা সেদিকে এগিয়ে গেল। দেখল, তোয়ালের ওপর একটা হ্যাট, একটা টর্চ। তার পাশে একটা সাইড ব্যাগ।

ব্যাগ হাতে তুলে নিল আহমদ মুসা।

ব্যাগ খালি, মাত্র দু'ই শিট পাতলা কাগজ পেল। একটা শীট নীল, অন্যটি লাল।

আহমদ মুসা বুঝতে পারল ষ্টেনগান বহনের জন্যেই ওরা এই ব্যাগ ব্যবহার করেছিল।

কাগজের একটা শিট হাতে তুলে নিল আহমদ মুসা।

শিটটি হাতে তুলে নিতেই কাগজের ভাঁজ থেকে একটা ছোট্ট ইনভেলপ বেরিয়ে পড়ল।

ইনভেলপটি কুড়িয়ে নিল আহমদ মুসা। ইনভেলপটি খুলে ভাঁজ করা ছোট একটা শিট কাগজ পেল। আহমদ মুসা ভাঁজ খুলে চোখের সামনে মেলে ধরল কাগজটি।

পর পর চারটি লাইনের মাত্র ছয়টি শব্দ।

প্রথম লাইনে 'পর্যবেক্ষণ ও খবর সংগ্রহ', দ্বিতীয় লাইনে 'সংকেত', তৃতীয় লাইনে 'ব্রিফিং' এবং চতুর্থ লাইনে 'শুরু' লিখা।

আহমদ মুসার বুঝতে বাকি রইল না যে, যারা এদের নিয়োগ করেছে, তাদের তরফ থেকেই এই চিরকুট। অর্থাৎ যারা অভিযানে আসছে তাদেরই এ ব্রিফিং। কিন্তু ব্রিফিং সবটা খুব স্পষ্ট নয়।

ভাবল আহমদ মুসা এ বিষয়ে।

প্রথম লাইনের বক্তব্য পরিষ্কার। টর্চ ও লাল নীল কাগজ দেখে দ্বিতীয় লাইনের 'সংকেত'-এর অর্থও মাথায় এল। বুঝতে পারল, যারা আসছে তাদেরকে সবুজ বা লাল সংকেত দিতে হবে। কখন, কোন অবস্থায় তা অবশ্য বলা হয়নি। চতুর্থ লাইনের 'শুরু'-এর অর্থ অপারেশন শুরু ধরা যায়, তৃতীয় লাইনের 'ব্রিফিং' দুর্বোধ্য। 'ব্রিফিং' কি অপারেশন শুরুর আগে আলোচনা? আহমদ মুসা এ বিষয়ে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌছতে পারল না।

আহমদ মুসা টর্চ হাতে নিয়ে ইসহাক আবদুল্লাহদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'যা বুঝলাম এই টর্চ দিয়ে সংকেত দিতে হবে যারা আসছে তাদেরকে। টর্চের মাথায় লাল কাগজ জড়িয়ে লাল সংকেত দেয়ার অর্থ হবে এদিকে বিপদ আছে। আসাটা বিপজ্জনক। আর নীল কাগজ জড়িয়ে নীল সংকেত দেয়ার অর্থ হবে সব ঠিক আছে, আসুন।'

কথাটা শেষ করেই আহমদ মুসা বলল, 'আমার মনে হচ্ছে, এই টিলার আশে-পাশেই কোথাও আলীর লাশ পাওয়া যাবে। ওরা তিনজন এখানেই বসেছিল। এখানে বসেই রাস্তার দিকে নজর রেখেছিল এবং এখান থেকেই তারা সংকেত দিত। উভয় উদ্দেশ্যেই ওরা এই টিলা বেছে নিয়েছিল। আলী এই টিলার আশে-পাশে আসার পর আমার মতই ওদের দ্বারা আক্রান্ত হয়।'

'তাহলে খুঁজে দেখতে হয়।' বলল ইসহাক আবদুল্লাহ।

'চল দেখি।'

আহমদ মুসারা তিনজনই নেমে এল টিলা থেকে।

নিচে নেমে আহমদ মুসা ইসহাক আবদুল্লাহ ও নোয়ানকোকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'ইসহাক রাত ১২টা বাজতে যাচ্ছে। এক মূহূর্ত আর নষ্ট করা যাবে না। আমি আলীকে খুঁজছি। তুমি আর নোয়ানকো গ্রামে ফিরে যাও। সব অস্ত্র, সব গোলা-গুলী ও সব মানুষকে নিয়ে এস। তোমার আব্বা আসবেন না। তিনি গ্রামের নারী, শিশু ও অবশিষ্ট লোকদের নিয়ে সজাগ থাকবেন।'

'আমি একা যাই। নোয়ানকো আপনার সাথে থাকুক।' বলল ইসহাক আবদুল্লাহ।

'তোমার একা যাওয়া ঠিক মনে করছি না। আগাম সাবধানতা ভাল।' বলল আহমদ মুসা।

'কিন্তু আপনি তো একা থাকবেন।' ইসহাক আবদুল্লাহ বলল।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'জীবনের অধিকাংশ সময় একাই আমাকে পথ চলতে হয়েছে।'

বলে আহমদ মুসা ইসহাক আবদুল্লাহদের সালাম দিয়ে টিলার পেছন দিক লক্ষ্যে হাঁটা শুরু করল।

ইসহাক আবদুল্লাহ ও নোয়ানকো আহমদ মুসার যাত্রা পথের দিকে মুহূর্ত কয়েক চেয়ে থেকে হাঁটতে শুরু করল গ্রাম লক্ষ্যে।

হাঁটতে হাঁটতে নোয়ানকো বলল, 'আহম আবদুল্লাহ ভাইকে যতই দেখছি, বিস্ময় আর প্রশ্ন বাড়ছে।'

'আমারও।' বলল ইসহাক আবদুল্লাহ।

'আহমদ আবদুল্লাহ নামের একজন মানুষ মাত্র তিনি নন। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় কি জান, কোন ফেরেশতাকে হয়তো আল্লাহ মানুষের রূপ দিয়ে পাঠিয়েছেন আমাদের প্রত্যক্ষ সাহায্যের জন্যে। তা না হলে এত সাহস, বহুমুখী এমন দক্ষতা এবং পরার্থে উৎসর্গীত এমন জীবন হঠাৎ একজন মানুষের মধ্যে কোত্থেকে এল। এমন লোক থাকলে তার নাম অবশ্যই শোনা যেত।' বলল নোয়ানকো।

'নোয়ানকো তুমি সত্যই বলেছ। এই মাত্র যা ঘটল তার কথাই ধরনা! উনি তাঁর নিরাপত্তার কথা ভাবলেন না, ভাবলেন আমাদের নিরাপত্তার কথা।' বলল ইসহাক।

'আর ফেরেশতাই বা তাঁকে বলা যাবে কেমন করে। জর্জের কাছে শুনেছি, মদীনায় তিনি স্ত্রী রেখে এসেছেন। তাই প্রশ্নটা তীব্রতর হচ্ছে, তিনি আসলে কে?' বলল নোয়ানকো।

'আমরা এর কিনারা করতে পারব না। থাক আলোচনা। চল দ্রুত হাঁটি। লোকজনকে নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।

দু'জনেই দ্রুত পা চালাল গ্রামের উদ্দেশ্যে।

# ২

ঘাটের তিনদিক ঘিরে লোকজনদের বসিয়ে দিয়ে আহমদ মুসা ইসহাক আবদুল্লাহ, নোয়ানকো ও কলিন কামালকে সাথে নিয়ে উঠে এল সেই টিলায়।

আহমদ মুসার ব্যবস্থা অনুসারে ঘাটের পূর্ব দিকে থাকবে নোয়ানকো, মধ্য অঞ্চলে থাকবে কলিন কামাল এবং পশ্চিম ঘাট থেকে আসা যাওয়ার পথ অঞ্চলে থাকবে ইসহাক আবদুল্লাহ।

সম্ভাব্য ঘটনাবলী তাদের সামনে তুলে ধরে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছে সবাইকে আহমদ মুসা।

ইসহাক আবদুল্লাহ, নোয়ানকো ও কামাল প্রত্যেকের সাথে থাকবে ১০জন লোক। সকলেই তারা ষ্টেনগান সজ্জিত।

টিলার মাথায় সবে বসেছে আহমদ মুসা এবং ওরা দু'জন। এ সময় ঘাট থেকে কিছু দূরে অন্ধকার সাগর বক্ষে হঠাৎ জ্বলে উঠল সার্চ লাইটের আলো।

আহমদ মুসাদের তিনজনের চোখই আঠার মত লেগে গেল দৃশ্যটির প্রতি।

সার্চ লাইটের আলো উত্তরমুখী অর্থাৎ ঘাটের দিকে নয়।

আহমদ মুসা বুঝল এটা ক্যামোফ্লেজ। তারা বুঝতে দিতে চায়না যে আলোটা ঘাটে আসছে।

আলোটা তিনবার নিভল, তিনবার জ্বলল। আহমদ মুসার বুঝতে বাকি রইল না যে ওরা সিগন্যাল দিচ্ছে, এবার ওরা সিগন্যাল আশা করছে।

আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি নীল কাগজ নিয়ে টর্চের মাথা মুড়ে নিল।

ইসহাক আবদুল্লাহ বলে উঠল, 'ভাইয়া, লাল সংকেত দিয়ে ওদের বিদায় দেয়া যায় না?'

আহমদ মুসা ইসহাক আবদুল্লাহর দিকে তাকাল। হাসল। বলল, 'তোমার কি ভয় করছে?'

‘ভয় নয়। ওদের বোকা বানিয়ে বিদায় করা।’ বলল ইসহাক আবদুল্লাহ।

‘বোকা বানিয়ে বিদায় করলে চালাক হয়ে আবার ফিরে আসবে। সেই ফিরে আসাটা আমাদের জন্যে আরও মারাত্মক হতে পারে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ঠিক কথা।’ বলল ইসহাক আবদুল্লাহ।

আহমদ মুসা টর্চ জ্বালিয়ে তিনবার নীল আলোর সংকেত দিল।

আহমদ মুসা নীল সংকেত দেয়ার পর মুহূর্তেই একটা হেড লাইট জ্বলে উঠল। হেড লাইট এগিয়ে আসতে লাগল ঘাটের দিকে।

দশ মিনিটের মধ্যেই হেড লাইটটি ঘাটে এসে পৌছল। তার পাশে জ্বলে উঠল আরও চারটি হেড লাইট।

আহমদ মুসা বুঝল, পাঁচটি বোট এসে নোঙর করেছে ঘাটে।

পাঁচটি হেড লাইটের আলোতে গোটা ঘাট আলোকিত হয়ে উঠেছে। পরে এক সাথেই পাঁচটি হেড লাইট নিভে গেল।

প্রথমে ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঢেকে গেল ঘাট। পরে অন্ধকার ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে গেল। চাঁদ না থাকলেও কুয়াশা ও মেঘহীন আকাশের তারার আলো গাছ-গাছড়ার ছায়াহীন ঘাটকে বেশ স্বচ্ছ করে তুলেছে। বোটে মানুষের চলাফেরা বেশ দেখা যাচ্ছে।

আহমদ মুসার চোখে ইনফ্রারেড গগলস। বেশ ক’মিনিট গেল। কোন বোট থেকেই কাউকে নামতে দেখলো না আহমদ মুসা।

হঠাৎ আহমদ মুসার মনে হলো সংকেতের পর আছে ব্রিফিং। এর অর্থ কি তাহলে এই যে, ওরা ঘাটে আসার পর এদিকের অবস্থা সম্পর্কে ব্রিফিং নেবার পর তারা অভিযান শুরু করবে! তাহলে তাকে তো ঘাটে যেতে হবে।

ঠিক এই সময়েই ঘাট থেকে হ্যান্ড মাইকের অনুচ্চ শব্দ ভেসে এল। বলা হলো, ‘মিঃ ওবোটে মাইকেল, আপনি তাড়াতাড়ি আসুন। আমরা দেরী করতে চাই না।’

আহ্বান শোনার সাথে সাথে আহমদ মুসা বলল, ‘বুঝা গেছে, অভিযান শুরুর আগে ওরা ব্রিফিং এর অপেক্ষায় আছে। সুতরাং আমাকে ওখানে যেতে হবে।’

‘আপনি তো ওবোটে মাইকেল নন, আপনি যাবেন কি করে? বলল কলিন কামাল।

‘আমি তো ওবোটে মাইকেল এর জায়গায় অভিনয় করছি।’

‘সেটা তো অভিনয়। আপনি গেলেই ধরা পড়ে যাবেন।’ বলল নোয়ানকো।

‘কিন্তু সম্ভবত ওরা ওবোটে মাইকেলের ব্রিফিং না পেলে অভিযানেই নামবে না।’

‘তাতে আমাদের তো ক্ষতি নেই।’ বলল ইসহাক আবদুল্লাহ।

‘অভিযানে নামবে না অর্থ অভিযান করবে না, সেটা নয়। তারা আরও কোন একটা বিপজ্জনক পথ বেছে নিয়ে এগুতে পারে। সুযোগ তাদের না দিয়ে আমরা চাই আমাদের পরিকল্পনার আওতার মধ্যে এনে শত্রুদের বিনাশ করতে। ওদের চলে যাবার সুযোগ দিতে চাই না।’

‘সেটা অন্যভাবে হয় না? আমরা এখন ওদের আক্রমণ করতে পারি না?’ বলল ইসহাক আবদুল্লাহ।

‘আক্রমণের আগে ওদের সবাইকে পাঁচটি বোট থেকে মাটিতে নামাতে হবে। বোটে থাকলে বেশির ভাগ পালিয়ে যাবার সুযোগ পাবে। এ সুযোগ আমরা কাউকেই দিতে চাই না।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আপনি গেলেই কি ওরা নামবে? আপনাকে চিনে ফেললে তো উল্টো ঘটবে।’

‘তা ঘটতে পারে। ঝুঁকি না নিয়ে উপায় নেই। আমার ধারণা, আমাকে যেতে দেখলেই ওরা ওদের বাহিনীকে ঘাটে নামাবে এবং অভিযানের প্রস্তুতি নেবে। ব্রিফিং পাওয়ার পর কিভাবে কোনদিকে যাত্রা শুরু করবে তা ঠিক করবে।’

‘বুঝলাম, কিন্তু আপনি ওখানে গেলেই তো ধরা পড়বেন।’ বলল নোয়ানকো উদ্বিগ্ন কণ্ঠে।

‘ধরা পড়ার ঝুঁকি অবশ্যই আছে। কিন্তু এমনও হতে পারে, আমি ব্রিফিং-এর জন্যে ওদের বোটে উঠার পর শত্রুদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলার সুযোগ আমাদের হবে।’

‘কিভাবে?’ বলল ইসহাক আবদুল্লাহ।

নোয়ানকো থাকছে পূর্ব দিকে। কলিন কামাল থাকছে মধ্য অঞ্চলে অর্থাৎ উত্তরে, ইসহাক আবদুল্লাহ থাকছে পশ্চিমে এবং দক্ষিণে।’

আহমদ মুসা থামতেই নোয়ানকো কিছু বলতে যাচ্ছিল। আহমদ মুসা তাকে বাধা দিয়ে বলল, ‘আর কোন কথা নয়। দেরী হয়ে যাচ্ছে। আমি উঠলাম।’

বলে আহমদ মুসা মাটিতে তোয়ালের উপর পড়ে থাকা হ্যাটটা তুলে মাথায় নিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, তোমরা যে যার জায়গায় চলে যাও। ঘাট থেকে যখন গুলী বর্ষণের শব্দ পাবে, তখন পরিকল্পনা অনুসারে তোমরা আক্রমণ শুরু করবে। আর আমি ঘাটে পৌছার পাঁচ থেকে দশ মিনিটের মধ্যে যদি ওদিক থেকে গুলীর শব্দ না পাও, তাহলে তোমরাই পরিকল্পনা অনুসারে আক্রমণ শুরু করবে এবং নিজেদের বুদ্ধিবিবেক অনুসারে কাজ করবে।’

‘ওদিক থেকে গুলীর শব্দ না পাবার অর্থ?’ শুকনো কণ্ঠে প্রশ্ন করল ইসহাক আবদুল্লাহ।

‘আমি যদি বন্দী হয়ে যাই বিনা যুদ্ধে তাহলে গুলীর শব্দ পাবে কি করে/’

বলেই আহমদ মুসা ওদের আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সকলকে সালাম জানিয়ে টিলা থেকে ঘাটের উদ্দেশ্যে নামতে শুরু করল।

আর ইসহাক আবদুল্লাহ, কলিন কামাল ও নোয়ানকো হতবুদ্ধি হবার মত নির্বাক হয়ে আহমদ মুসার গমন পথের দিকে চেয়ে রইল।

এক সময় ঠোঁট ফেড়ে কথা বেরুল ইসহাক আবদুল্লাহ। বলল, ‘একজন মানুষ কত বড় হলে এভাবে পরার্থে নিজেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারে।’ আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল ইসহাক আবদুল্লাহর।

‘না উনি মানুষ নন ইসহাক ভাই, আল্লাহ নিশ্চয় আমাদের সাহায্যের জন্যে ফেরেশতা পাঠিয়েছেন।’ কথা বলতে বলতে চোখ মুছল নোয়ানকো।

কলিন কামাল কিছু বলতে যাচ্ছিল। ইসহাক আবদুল্লাহ বাধা দিয়ে বলল, ভাইয়েরা, আর কোন কথা নয়। চলুন আমরা তাঁর আদেশ পালন করি। যে যার নির্দিষ্ট জায়গায় চলে যাই। আর যাবার আগে এসো আমাদের তিনজনের ৬ হাত একত্র করে আল্লাহর নামে শপথ করি, আমাদের ভাই আহমদ আবদুল্লাহ যেমন

মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়ে পেছনে ফিরে তাকাননি, তেমনি আমরা আমাদের একজন বেঁচে থাকা পর্যন্ত লড়াই করে যাব, পরাজয় নিয়ে কেউ ঘরে ফিরবো না।

তারা ছয় হাত একত্র করে শপথ গ্রহণ করল।

তাদের তিনজনের চোখ থেকেই অশ্রু গড়াচ্ছিল। তাদের চোখে মুখে অপার্থিক এক আলো। নতুন মানুষ যেন তারা।

'ঐ যে ওবোটে মাইকেল আসছে।' উচ্ছসিত কণ্ঠে বলল জন ব্ল্যাংক।

জন ব্ল্যাংক তার কমান্ড বোটের ডেক কেবিনে বসে উন্মুক্ত দরজা দিয়ে তাকিয়েছিল ঘাট থেকে যে পথটা চলে গেছে দ্বীপের অভ্যন্তরে সে পথের দিকে।

পাঁচ বোটের শতাধিকে লোক নিয়ে যে অপারেশন টিম সাউথ টার্কো দ্বীপে অভিযানে এসেছে জন ব্ল্যাংক তার অধিনায়ক।

জন ব্ল্যাংকের পাশেই আরেকটা চেয়ারে বসেছিল জিম টেইলর।

জন ব্ল্যাংকের কথা শেষ হতেই জিম টেইলর বলল, 'কি দেখে বুঝলেন ওবোটে মাইকেল আসছে, ঐ নীল টর্চের আলো?'

'হ্যাঁ তাই। ঐ নীল টর্চই আমাদের কূলে আসার সবুজ সংকেত দিয়েছে।'

'পাশের বোট থেকে রবার্ট ফুটকে ডাকলে ভালো হয় না। ওবোটে মাইকেলদেরকে তো তার মাধ্যমেই এই এ্যাসাইনমেন্ট দেয়া হয়েছিল।' বলল জিম টেইলর।

'হ্যাঁ তাকে ডাক। সেও তো এই টার্কস দ্বীপপুঞ্জের লোক। ব্রিফিং-এর সাথে সাথে আলোচনাও সেরে নেয়া যাবে।'

জিম টেইলর চেয়ার থেকে উঠে ডেক কেবিন থেকে ডেকে বেরিয়ে গেল।

কমান্ড বোটের গায়ের সাথে গা লাগিয়ে দু'পাশে দু'টি করে চারটি বোট নোঙর করা।

পাশের প্রথম বোটেই ছিল রবার্ট ফুট।

দু'মিনিটের মধ্যেই জিম টেইলর রবার্ট ফুটকে ডেকে নিয়ে কেবিনে প্রবেশ করল।

তারা কেবিনে ঢুকতেই জন ব্ল্যাংক জিমকে লক্ষ্য করে বলল, 'জিম তুমি আমাদের সকল বোটের সবাইকে নির্দেশ দাও আর্মস-এ্যমুনিশন নিয়ে এখনি ঘাটে নামতে। ওবোটে মাইকেলের সাথে কথা বলার পর আমরা আর এক মিনিটও অপেক্ষা করবো না। যাও, কুইক।'

জিম ডেকে বেরিয়ে দেখল, ওবোটে মাইকেল তখনও ঘাট থেকে বেশ খানিকটা দূরে।

সে বোটগুলোর ক্যাপ্টেনদের ডেকে নির্দেশ জারি করল, 'এখনি তোমরা তোমাদের লোক ও সকল আর্মস-এ্যামুনিশনসহ ঘাটে নেমে যাও এবং ফরমেশন নিয়ে দাঁড়াও।'

হুকুম জারির দু'মিনিটের মধ্যে পাঁচটি বোটের শতাধিক লোক অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ঘাটে নেমে ফরমেশন নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

জেটির পরেই ইট-পাথর বিছানো একটা ছোট্ট চত্বর। জেলেরা বোট থেকে মাছ ও মালপত্র নামিয়ে প্রথমে এখানেই জমা করে, অনেক সময় ভাগ-বাটোয়ারা করে। গাড়িও এসে এখানেই দাঁড়ায়। এই চত্বর থেকেই একটা রাস্ত বেরিয়ে গেছে দ্বীপের অভ্যন্তরে।

এই চত্বরের উপরে ঘাসে ঢাকা অনেকখানি ফাঁকা জায়গা। বোট থেকে নেমে সবাই সেই ফাঁকা জায়গাতেই শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছে।

এই ফাঁকা জায়গার পর আগাছা ও ছোট ছোট গাছ-গাছালীতে পূর্ণ এবড়ো-থেবড়ো এলাকা শুরু হয়েছে।

নির্দেশ দিয়ে এসে জিম টেইলর জন ব্ল্যাংকের পাশে এসে বসল। জন ব্ল্যাংকের অন্যপাশে বসেছে রবার্ট ফুট।

'ওবোটে মাইকেল এসেছে।' বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল জন ব্ল্যাংক।

কথা শেষ করেই আবার বলল, 'জিম যাও তাকে এই কেবিনে নিয়ে এস।'

জিম কেবিন থেকে বেরিয়ে কেবিনের দরজায় একপাশে দাঁড়িয়ে জন ব্ল্যাংকের পারসোনাল গার্ড জনকে ঘাটের দিকে এগিয়ে ওবোটে মাইকেলকে দেখিয়ে বলল, 'ওঁকে এই বোটে নিয়ে এস।'

গার্ড বোট থেকে নেমে কিছুটা এগিয়ে ওবোটে মাইকেলের মুখোমুখি হয়ে বলল, 'মিঃ ওবোটে আসুন। মিঃ জন ব্ল্যাংক ঐ বোটে আছেন।'

মিঃ ওবোটের মাথার হ্যাটটা তার কপাল পর্যন্ত নেমে এসেছে। ফলে মুখের অবয়বটা স্পষ্ট নয়।

'সিওর।' মাত্র এই শব্দটা উচ্চারণ করে ওবোটে বোটের দিকে যাত্রা শুরু করল। পেছনে গার্ড।

বোটের ডেকে দাঁড়িয়ে ছিল জিম টেইলর।

ওবোটে বোটে উঠল। গার্ড বোটের নিচে জেটিতেই দাঁড়িয়ে থাকল। ডেক থেকে ওবোটেকে ভেতরে নিয়ে যাবার দায়িত্ব জিম টেইলরের।

জিম টেইলর ওবোটের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'ওয়েলকাম মিঃ ওবোটে। চলুন, মিঃ ব্ল্যাংক আপনার অপেক্ষা করছেন।

'ধন্যবাদ।' বলে ওবোটে কেবিনের দিকে পা বাড়াবার আগে পেছন ফিরে চারদিকটা একবার দেখল। দেখল সে বোটের গলুই-এর কাছে জেটিতে দাঁড়ানো গার্ডকেও।

ওবোটে কেবিনে প্রবেশ করল।

জিম টেইলর আগেই প্রবেশ করেছিল। সে গিয়ে বসেছিল তার চেয়ারে।

ওবোটে বেশধারী আহমদ মুসা কেবিনে প্রবেশ করে কপাল পর্যন্ত নেমে যাওয়া হ্যাট কপালের উপরে তুলে দিল।

জন ব্ল্যাংক, জিম টেইলর এবং রবার্ট ফুট আহমদ মুসার মুখের দিকে তাকিয়ে ভুত দেখার মত চমকে উঠেছিল। একজন কৃষ্ণাংগ টার্কসবাসীর বদলে দেখছে একজন কালার্ড এশিয়ানকে!

তারা তাদের বিমূঢ় ভাব কাটিয়ে উঠার আগেই আহমদ মুসা কাঁধের ষ্টেনগান হাতে নিয়ে তাদের দিকে তাক করে বলল, 'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন আমি আপনাদের ওবোটে নই।'

বলেই ষ্টেনগানের ট্রিগারে হাত চেপে ওদের দিকে চেয়ে কঠোর কণ্ঠে বলল, ‘তোমাদের আজকের খেলাটা শেষ। বেঘোরে জীবন দিতে না চাইলে তোমরা অস্ত্র ফেলে দাও, তোমাদের লোকদের অস্ত্র ফেলে দিতে বল এবং আত্মসমর্পণ.......।’

আহমদ মুসার কথা শেষ হতে পারল না। একটা আঘাত এসে পড়ল মাথায়।

আহমদ মুসা টের পায়নি যে, গার্ড জনকে সে বোটের নিচে গলূই-এর কাছে দেখে এসেছিল, আহমদ মুসা ও জিম টেইলর কেবিনে ঢোকার পর সে বোটে উঠে এসে কেবিনের দরজার পাশেই দাঁড়িয়েছিল। কেবিনের দরজা বন্ধ না থাকায় আহমদ মুসার সব কথাই সে শুনতে পেয়েছিল। সে বিপদটা আঁচ করতে পেরে বিড়ালের মত নিঃশব্দে আহমদ মুসার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল এবং ষ্টেনগানের বাঁট দিয়ে আঘাত করেছিল আহমদ মুসার মাথায়।

ষ্টেনগানের বাঁটের বাড়িটা আহমদ মুসার ঠিকই লাগল। তবে কেবিনের ছাদটা নিচু হওয়ায় ষ্টেনগানের বাঁট ছাদে একটা বাড়ি খেয়ে তারপর আহমদ মুসার মাথায় গিয়ে আঘাত করে।

সুতরাং আঘাতটা যতটা ভয়াবহ হবার কথা তা হলো না। কিন্তু দেখা গেল আহমদ মুসা মাথায় আঘাত খাওয়ার সংগে সংগেই টলে উঠে একটা পাক খেয়ে কাত হয়ে পড়ে গেল কেবিনের মেঝেয়। ডান হাত থেকে তার ষ্টেনগান খসে পড়েছিল।

ওরা তিনজনই চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল।

‘ধন্যবাদ জন, তুমি ঠিক সময়ে এসে পড়েছিলে।’ বলল জন ব্ল্যাংক।

একটু থেকে ক্রুদ্ধ চোখে আহমদ মুসার দিকে চেয়ে সে বলল, ‘এই তাহলে সেই শয়তান এশিয়ান যার কথা তোমরা এত বলেছ। তাই না রবার্ট ফুট।’

রবার্ট ফুট কথা বলতে যাচ্ছিল। সে কথা বলার আগেই জন ব্ল্যাংক আবার বলল, ‘জন তাড়াতাড়ি ওকে সার্চ কর। জ্ঞান ফেরার আগেই ওকে বেঁধে ফেল। ওর জ্ঞান ফেরা পর্যন্ত অভিযান শুরু করা যাচ্ছে না। তার কাছ থেকে কথা বের করতে হবে তারা কি জেনেছে, কতটা জেনেছে।’

আহমদ মুসার দেহটা পড়েছিল বোটের আড়াআড়ি এবং জনের বিপরীত দিকে অর্থাৎ জন ব্ল্যাংকের দিকে কাত হয়ে।

নির্দেশ পেয়ে জন ব্ল্যাংক আহমদ মুসার পেছন দিকটা ঘুরে আহমদ মুসার সামনের দিকে এগিয়ে সবে কোমর বরাবর পৌছেছে।

চোখের পলকে এই সময় আহমদ মুসার দু'টি পা বিদ্যুত বেগে উঠে এসে জনের গলা সাঁড়াশির মত চেপে ধরে তাকে আছড়ে ফেলল কেবিনের মেঝেতে। সেই সাথে কোটের পকেটের উপর পড়ে থাকা আহমদ মুসার বাম হাত পকেট থেকে রিভলবার বের করে তিনজনকে লক্ষ্য করে তিনটি গুলী ছুঁড়ল পর পর।

ওরা তিনজন কিছু বুঝে উঠার আগেই গুলী খেয়ে ঢলে পড়ে গেল মেঝের উপর।

ওদিকে জন আহমদ মুসার দু'পায়ের সাঁড়াশিতে বন্দী হয়ে মেঝেতে আছড়ে পড়েও তার ডান হাত দিয়ে যখন সঁড়াশির চাপ ঢিলা করার চেষ্টা করছে, বাম হাত দিয়ে তখন সে বেল্টে গুজে রাখা রিভলবার বের করে আহমদ মুসার বুক অথবা মাথা তাক করার চেষ্টা করছে।

তিনজনকে গুলী করেই আহমদ মুসা মনোযোগ দিয়েছিল জনের দিকে। সে দেখতে পেল জনের কসরত। আহমদ মুসা সময় নষ্ট করল না। চতুর্থ গুলী করল জনকে লক্ষ্য করে।

জন একেবারে বুকে গুলী বিদ্ধ হলো।

আহমদ মুসা উঠে বসল। ভাবছিল সে, নিশ্চয় ওদের লোকেরা বোটের কেবিনে গুলীর শব্দ শুনে এদিকে ছুটে আসছে।

আহমদ মুসা উঠে বসেই ছিটকে পড়া ষ্টেনগানটা টেনে নিল কাছে।

উঠে দাঁড়াচ্ছে আহমদ মুসা। এ সময়ই ঘাটের তিন দিক থেকে প্রায় এক সাথেই অনেকগুলো ষ্টেনগান গর্জে উঠল।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়েছে। তার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল। এদিকে গুলীর শব্দ শুনে এরা এদিকে আসার আগেই গুলীর শব্দ পাওয়ার সাথে সাথে আহমদ মুসার লোকেরা আক্রমণ শুরু করেছে।

এদিক থেকেও গুলী বর্ষণ শুরু হয়েছে। তখন গুলী বৃষ্টির পালা চলছিল।

আহমদ মুসা কেবির দরজায় উঁকি দিল। দেখল, ডজনখানেক লোক ছুটে আসছে কেবিনের দিকে। তাদের হাতে উদ্যত ষ্টেনগান। তারা মুখ দিয়ে চিৎকার করছে, 'স্যার, এখানে কি ঘটেছে? আপনারা আসুন। হুকুম দিন, তিনদিক থেকেই শত্রু আক্রমণ করেছে।'

আহমদ মুসা কেবিনের দরজায় এসে চিৎকার করে বলল, 'হুকুম দেবার মত তোমাদের নেতারা কেউ বেঁচে নেই। তোমরা অস্ত্র ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ কর।'

আহমদ মুসার কণ্ঠস্বর শোনার সাথে সাথে ওদের ডজনখানেক ষ্টেনগান নড়ে উঠল। আহমদ মুসা এর জন্যে তৈরিই ছিল। নিজের শেষ কণ্ঠস্বর বাতাসে মেলাবার আগেই তার ষ্টেনগান অগ্নি বৃষ্টি করল। এক ঝাঁক গুলী গিয়ে ওদের জড়িয়ে ধরল।

এদের পরিণতি দেখে বোটের দিকে আসার চেষ্টা আর কেউ করল না। তবু আহমদ মুসা তার গুলী অব্যাহত রাখল যাতে ওরা এদিকে আক্রমণে আসার বা পিছু হটে পালাবার কোন সুযোগ না পায়।

প্রায় পনের মিনিট গুলী চলার পর গুলী থেমে গেল। বোটের সামনে ঘাটের উপরে উন্মুক্ত জায়গা টুকুতে তখন লাশ আর লাশ। কেউ বাঁচেনি। চারদিক থেকে আক্রান্ত হওয়ায় কেউ পালাতেও পারেনি।

ইসহাক আবদুল্লাহর দল, কলিন কামালের দল এবং নোয়ানকোর দল প্রায় এক সাথেই ছুটে এল বোটের দিকে আহমদ মুসার কাছে।

ইসহাক, কলিন কামাল ও নোয়ানকো এসে আহমদ মুসাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল। বলল, 'আল্লাহ আমাদের বিজয় দিয়েছেন। আপনি ভাল আছেন তো?'

আহমদ মুসা বলল, 'আমি ভাল আছি। তোমরা সবাই ভাল তো? আমাদের লোকদের কি অবস্থা?'

'মাত্র তিনজন আহত। তাছাড়া সবাই ভাল।' বলল ইসহাক আবদুল্লাহ।

'আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করেছেন।' আহমদ মুসা বলল।

‘প্রথমে এদিক থেকে চারটা গুলীর শব্দ পাওয়া গেছে। কি ঘটেছিল?’ বলল নোয়ানকো।

‘দেখবে ভেতরে এস।’

বলে আহমদ মুসা বোটের কেবিনের দিকে চলতে শুরু করল।

আহমদ মুসার সাথে ইসহাক আবদুল্লাহ, কলিন কামাল ও নোয়ানকো প্রবেশ করল কেবিনে।

কেবিনে পড়ে থাকা চারটি লাশের দিকে চোখ পড়তেই ইসহাক আবদুল্লাহ বলে উঠল, ‘তাহলে এই চারজনকে গুলী করার শব্দ আমরা পেয়েছিলাম?’

ইসহাক টর্চ জ্বেলে লাশগুলো দেখছিল।

‘হ্যাঁ। এই চারজনের ঐ তিনজন হলো নেতা। আর এ ছিল শীর্ষ নেতার ব্যক্তিগত গার্ড।’ লাশগুলোর দিকে ইংগিত করে বলল আহমদ মুসা।

‘তাহলে নেতা নেতাদের মেরেছেন কর্মীরা কর্মীদের মেরেছে।’ বলল নোয়ানকো।

‘না নোয়ানকো, তুমি খেয়াল করনি, কর্মীদের যারাই যখন বোটের দিকে আসার চেষ্টা করেছে, তারা মারা পড়েছে আহমদ আবদুল্লাহ ভাইয়ের হাতে। তিনি পেছন দিক থেকে এভাবে পাহারা না দিলে হয়তো শত্রুদের বেশির ভাগই পালিয়ে যেত। এখন সংবাদ পৌছাবার মত একজনও পালাতে পারেনি।’

‘আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি যে, আহমদ আবদুল্লাহ ভাই বোটে নেতাদের কাছে আসার দুঃসাহসী সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিলেন।’ বলল কলিন কামাল।

ইসহাক আবদুল্লাহ টর্চের আলো ঘুরাতে গিয়ে হঠাৎ চোখ পড়ল আহমদ মুসার মুখে। আহমদ মুসার মাথা ও মুখের ডান পাশ রক্তাক্ত দেখে আঁৎকে উঠল ইসহাক আবদুল্লাহ। বলল, ‘একি, আহমদ আবদুল্লাহ ভাই আপনি তো আহত!’

ইসহাক আবদুল্লাহর কথার সাথে সাথেই অন্য দু’জনও ঝুকে পড়ল আহমদ মুসার দিকে।

‘আপনার কি গুলী লেগেছে আহমদ আবদুল্লাহ ভাই?’

‘তোমরা ব্যস্ত হয়ো না। গুলী লাগেনি। পেছন থেকে ঐ গার্ড চুপি চুপি এসে ষ্টেনগানের বাঁট দিয়ে মাথায় আঘাত করেছিল। মাথার ডান পাশের কিছুটা থেঁথলে গেছে।’

বলে ঘুরে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, ‘চল বাইরে, অনেক কাজ আছে।’

আহমদ মুসা বেরিয়ে এল। তার সাথে ওরা তিনজনও।

‘অন্তত ফাষ্ট এইড আপনার এখনি নেয়া দরকার।’ বলল কলিন কামাল।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘ঠিক আছে ডাঃ কলিন কামাল, প্রথম কাজটা সেরে নেই। তারপর তোমার ডাক্তারী বিদ্যা প্রদর্শনের সুযোগ দেব।’

বলে একটু থেমেই আহমদ মুসা ইসহাক আবদুল্লাহর দিকে চেয়ে বলল, ‘কয়েকটা জরুরী কাজ করতে হবে। এক. ওদের সমস্ত লাশ বোটে তুলে গভীর সাগরে ফেলে দিয়ে আসতে হবে। দুই. ঘাটের সব রক্ত ধুয়ে-মুছে সাফ করে ফেলতে হবে রাতের মধ্যেই। তিন. আগের তিনটি বোটের মত এ পাঁচটি বোটকেও আমাদের সেবু নদীতে ডুবিয়ে রাখতে হবে। চার. ভোর রাতেই থানায় গিয়ে ডায়েরী করতে হবে, কয়েকটি বোটে করে ডাকাত এসেছিল। আমাদের চারজন লোককে খুন ও তিনজনকে আহত করেছে। তারপর গ্রামবাসী জেগে উঠে একযোগে ধাওয়া করলে ওরা পালিয়ে গেছে। ইদানিং এই ধরনের ডাকাতের আনাগোন বেড়ে গেছে। ওকারী গ্রাম বা ওকারী ঘাট এলাকায় পুলিশ ফাঁড়ি বা রাত্রিকালীন পাহারা চাই। পাঁচ. কিছু পয়সা খরচ করে হলেও খবরের কাগজে ডাকাতের হানা, চারজন নিহত ও তিনজন আহত হওয়ার খবর ভালো করে প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে এবং এই নিউজে এই এলাকার জন্যে স্বতন্ত্র পুলিশ ফাঁড়ি ও সার্বক্ষণিক পুলিশ পাহারা দাবী করতে হবে। ছয়. এদের কাছ থেকে পাওয়অ শতখানেক ষ্টেনগান, শতখানেক রিভলবার, বিপুল গোলাবারুদ এই রাতেই লুকিয়ে ফেলতে হবে এবং ঔষধগুলো আমারে ষ্টোরে জমা করতে হবে। সাত. আজকের এই খবর সিডি কাকেম গ্রামে এখনি পৌছতে হবে এবং জর্জকে আসতে বলতে হবে সকালের মধ্যেই। আট. অবিলম্বে আরও দু’শ যুবককে যুদ্ধ ট্রেনিং দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এ জন্য বিভিন্ন দ্বীপ থেকে আস্থাভাজন দু’শ যুবক সংগ্রহ করতে হবে। নয়. আরও কয়েকটি দ্বীপে অন্তত ভিজকায়া মামুন্ড

এবং গ্রান্ড টার্কস দ্বীপে আমাদের নতুন ঘাঁটি গড়ে তুলতে হবে। প্রধান ঘাঁটি এখানেই থাকবে। দশ. এ পর্যন্ত প্রাপ্ত ৮টি মোটর বোট সমন্বয়ে একটা নৌবহর আমাদের থাকবে। এগুলোর জন্যে তেল ও প্রয়োজনীয় সবকিছু প্রস্তুত রাখতে হবে। যে কোন জরুরী মুহূর্তে যাতে এগুলো কাজে লাগানো যায়। এগার. আমাদের এ দ্বীপের খৃষ্টান ও অন্যধর্মী অধ্যুসিত উত্তরাংশের উপর নজর রাখা এবং অন্যান্য দ্বীপ থেকে নিয়মিত তথ্য সংগ্রহের জন্য একটা গোয়েন্দা ইউনিট গঠন করতে হবে।' দীর্ঘ বক্তব্যের পর থামল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা থামতেই আনন্দে চিৎকার করে উঠল ইসহাক আবদুল্লাহ ও কলিন কামাল। তারা বলল, 'আজকের এই ঘটনার পর মহাকিছু ঘটাতে পারে শত্রুরা, এ নিয়ে আমরা আনন্দের মধ্যেও উদ্বিগ্ন ছিলাম। আপনার এই পরিকল্পনা তার জবাব দিয়েছে, যা আমরা আশা করছিলাম, তার চেয়েও অনেক বেশি। জিন্দাবাদ, আহমদ আবদুল্লাহ ভাই জিন্দাবাদ। সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আপনাকে এই জ্ঞান দিয়েছেন এবং আমাদের মধ্যে দয়া করে পাঠিয়েছেন।'

শেষের কথাগুলো তাদের আবেগে ভারি হয়ে উঠল।

আহমদ মুসা এসব কথার দিকে কান না দিয়ে বলল, 'নোয়ানকো তুমি একজন কাউকে সাথে নিয়ে গ্রামে যাও। লোকদেরকে এখানে পাঠিয়ে তুমি যাবে সিডি কাকেম গ্রামে। আর ইসহাক আবদুল্লাহ তুমি থানার জন্যে এফ আই আর লিখতে বস। আর ডাঃ কলিন তুমি দেখ আহতরা কি অবস্থায় আছে।'

কথা শেষ করে আহমদ মুসা বোটের সামনে চত্বরে দন্ডায়মান সাথীদের দিকে মুখ করে দাঁড়াল। বলল, 'বিজয়ী সাথী ভাইরা, তোমাদের মোবারকবা। আল্লাহ তোমাদের একটা বড় বিজয় দিয়েছেন। বিজয়ের কৃতিত্ব তোমাদের। তোমাদের যা আছে তাই নিয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে দাঁড়িয়েছ এবং যা সাধ্য তোমাদের, তা করেছ। এ জন্যেই আল্লাহ তোমাদের বিজয় দিয়েছেন। আমরা আনন্দিত হবো, কিন্তু গর্বিত হবো না, অলস হবো না। শত্রুদের পরাজয় শুরু হয়েছে বটে, কিন্তু অনেক দীর্ঘ পথ আমাদের পাড়ি দিতে হবে। তোমাদেরকে আরও সতর্ক, আরও দক্ষ, আরও কুশলী হতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে আরও বড় বিজয় দেবেন।' থামল আহমদ মুসা।

সামনের ওরা সমস্বরে ধ্বনি দিল, ‘আল্লাহু আকবর।’

ওদের একজন দাঁড়িয়ে থাকা সারি থেকে দু’ধাপ এগিয়ে এল। বলল, ‘নিপীড়ন, পরাজয়, আত্মসমর্পণ এবং নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াকে যখন আমরা আমাদের ভাগ্য লেখা হিসেবে ধরে নিয়েছিলাম, তখন আপনার আগমন আমাদের নতুন জীবন দিয়েছে। আপনার উসিলায় আমরা পরাজয়ের জায়গায় বিজয় পেতে শুরু করেছি। আল্লাহর অসীম দয়া হিসেবে আপনাকে আমরা পেয়েছি। আপনি যে নির্দেশ আমাদের দেবেন, সে নির্দেশ আমরা পালন করব, জীবনের বিনিময়ে হলেও।’

‘আলহামদুলিল্লাহ। ধন্যবাদ ভাইয়েরা। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন।’

বলে আহমদ মুসা তাকাল ইসহাক আবদুল্লাহর দিকে। দেখল, নোয়ানকো গ্রামে যাবার জন্যে তৈরি হয়েছে। নেমে গেছে বোট থেকে।

‘খসড়ার জন্যে কাগজ তো দরকার। আমার কাছে কাগজ তো নেই।’ আহমদ মুসা তাদের দিকে মনোযোগ দিতেই বলে উঠল ইসহাক আবদুল্লাহ।

আহমদ মুসা তার পিঠে ঝুলানো ব্যাগের দিকে ইংগিত করে বলল, ব্যাগের পকেটে দেখ তোমার প্রয়োজন মত কাগজ পাবে।’

কাগজ নিয়ে নিল ইসহাক আবদুল্লাহ।

এবার এগিয়ে এল কলিন কামাল আহমদ মুসার দিকে।

‘ডাঃ কলিন তুমি আগে অন্য আহতদের প্রয়োজনটা সেরে এসো।’

‘ওদের ব্যবস্থা আগেই করেছি। ওদের আঘাতগুলেঅ অপারেশনের মত গুরুতর নয়।’ বলল কলিন কামাল।

‘ধন্যবাদ।’ বলে আহমদ মুসা বসল ফাষ্ট এইড নেবার জন্যে।

বাহামার সানসালভাদর।

কলম্বাস বন্দরে হোয়াইট ঈগলের সেই অফিস সংলগ্ন একটা সুন্দর বাড়ি। বাড়ির ড্রইং রুম।

সোফায় বসে আছে মাঝ বয়সের রাশভারি একজন আমেরিকান।

চেহারায় কাঠিন্য। চোখ ঠান্ডা। বিরাট শরীর।

এই ব্যক্তিটিই আমেরিকান কন্টিনেন্ট হোয়াইট ঈগল-এর চীফ। নাম ডেভিড গোল্ড ওয়াটার।

তার চোখে-মুখে কিছুটা অস্থিরতা। কারও যেন অপেক্ষা করছে সে।

এই সময় অনেকটা ঝড়ের বেগেই প্রবেশ করল ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের হোয়াইট ঈগল-এর প্রধান জি,জে, ফার্ডিন্যান্ড।

ঢুকে সম্ভাষণ বিনিময়ের পর সোফায় বসতে বসতে দ্রুত কণ্ঠে বলল, 'আপনি এসেছেন শুনে প্রথমে আমার বিশ্বাস হয়নি। এভাবে তো আপনি আসেন না। কোত্থেকে, কিভাবে বলুন, কেমন আছেন আপনি?' এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে চুপ করল ফার্ডিন্যান্ড।

'সত্যিই আমিও ভাবিনি আসব। আমার ফ্লাইট সিডিউল ছিল সোজা প্রিটোরিয়া (দক্ষিণ আফ্রিকা) থেকে ওয়াশিংটন। বিমান বন্দরে এসে শুনলাম সানসালভাদরের নতুন আন্তর্জাতিক বিমান বন্দ 'কলম্বাস'-এ বিমানটি সৌজন্য অবতরণ করবে। সুযোগ পেয়ে আমি টিকিট চেঞ্জ করলাম। ঠিক করলাম কয়েক ঘণ্টা সানসালভাদরে কাটিয়ে পরে মিয়ামী হয়ে ওয়াশিংটন যাব।' একটু থামল।

একটা হ্যাভানা চুরুট ধরিয়ে মুখে পুরে বলল, 'তোমার সাথে বেশ অনেক দিন দেখা নেই। ভাবলাম তোমাদের কিছু খবর নিয়ে যাই। নতুন ডেমোগ্রাফিক রিষ্ট্রাকচার প্রোগ্রামে মুসলিম জনসংখ্যা বিলোপ কর্মসূচী এখানে কতদূর এগুলো সরেজমিন জানতে পারলে ভালই লাগবে।' থামল ডেভিড গোল্ড ওয়াটার।

'ধন্যবাদ। অগ্রগতি উৎসাহব্যঞ্জক। বলা যায় আশার চেয়ে বেশি। চলতি বছর মুসলিম পুরুষ শিশুর মৃত্যুর হার ২৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এই অগ্রগতি রাখতে পারলে, আগামী দশ বছরের মধ্যে ১৫ বছর পর্যন্ত মুসলিম বালকের সংখ্যা প্রায় শূন্যের কোঠায় চলে যাবে। পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের মুসলিম মেয়েরা বিয়ের জন্যে মুসলিম যুবক খুঁজে পাবে না। পরবর্তী

পাঁচ বছরের মধ্যে শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ মুসলিম মেয়ের বিয়ে হবে খৃষ্টান অথবা অন্য কোন ধর্মের ছেলের সাথে। এর বছর দুয়েকের মধ্যে কোন মুসলিম শিশু খুঁজে পাওয়া যাবে না ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে। তারপর দুই তিন দশকের মধ্যে এই দ্বীপপুঞ্জে মুসলিম জনসংখ্যা শূন্যের কোঠায় নেমে যাবে।'

'ব্রাভো! ব্রাভো! ফার্ডিন্যান্ড। যদি তা হয় তাহলে বলে দিচ্ছি, নোবল পিস প্রাইজ তুমি পেয়ে যাবে।' বলল গোল্ড ওয়াটার।

'নোবেল পিস প্রাইজ? কেমন করে?' বলল ফার্ডিন্যান্ড।

'ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জকে ধর্ম ও জাতিগত সংঘাত থেকে মুক্ত করে শান্তি স্থাপনের জন্যে।' বলল গোল্ড ওয়াটার।

'অশান্তির মাধ্যমে শান্তি!' বলে হো হো করে হেসে উঠল ফার্ডিন্যান্ড।

'কথাটা মনে হয় তুমি নতুন শুনলে! আমাদের পশ্চিমীদের রাজনীতি তো এটাই। এ রাজনীতির বিভিন্ন নাম আছে। কিন্তু লক্ষ্য একটাই পশ্চিমী আদর্শ নিয়ন্ত্রিত এক মতের, এক পথের, এক বিশ্ব।'

'নোবেল পুরষ্কার কথা পরে। একটা সংকটের কথা বলা হয়নি আপনাকে।'

'সংকট? কি সেটা?'

'বলেছিলাম আপনাকে যে, গ্রান্ড টার্কস-এর চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কয়েকজন ছাত্রের সমীক্ষায় মুসলিম পুরুষ শিশুদের সংখ্যা হ্রাস ধরা পড়েছিল, তাদেরসহ একজন সাংবাদিককে আমরা হত্যা করেছি। কিন্তু সমীক্ষার সাথে জড়িত এক মুসলিম ছাত্রী পলাতক ছিল। তাকে ধরতে গিয়ে আমাদের চারজন লোক রহস্যজনকভাবে খুন হয়। সেই............'

ফার্ডিন্যান্ডকে বাধা দিয়ে গোল্ড ওয়াটার বলল, 'রহস্যজনক বলছেন কেন?'

'রহস্যজনক এই কারণে যে, হত্যাকান্ডটি এলাকার গ্রামবাসীদের দ্বারা হয়নি। হয়েছে একজন এশিয়ানের হাতে।'

'এশিয়ান? কে সে?'

‘কে জানি না, কিন্তু লোকটি গ্রান্ড টার্কস দ্বীপে এসে প্রথমেই সেই মুসলিম মেয়েটির খোঁজ করে। আমাদের লোকেরা তাকে সন্দেহ করে তাকে মারপিট করে।’

‘তারপর?’

‘তার খোঁজ আমরা রাখিনি। খুব সাধারণ কেউ তাকে আমরা মনে করেছিলাম।’

‘আচ্ছা বল, কি বলছিলে।’

‘আমাদের চারজন লোক হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্যে আমরা তিরিশজন লোকের একটা শক্তিশালী দল পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তারা হারিয়ে গেছে। তাদের জীবিত অথবা মৃত কোন চিহ্ন আমরা খুঁজে পাইনি।’

‘কি বলছ তুমি, এটা কি সত্য?’

‘সত্য। আমরা লোক পাঠিয়ে গোটা দ্বীপ তন্ন তন্ন করে দেখেছি। কোথাও সন্দেহ করার মত কিছু পাইনি।’

‘অসম্ভব ব্যাপার। দ্বীপের কেউ কিছু বলতে পারেনি?’

‘না, পারেনি।’

‘বোটগুলো?’

‘বোটগুলোও পাওয়া যায়নি!’

কিছু বলতে যাচ্ছিল গোল্ড ওয়াটার। এ সময় ঘরে প্রবেশ করল শিলা সুসান। ফার্ডিন্যান্ডের একমাত্র মেয়ে।

ঢুকেই বলল, ‘স্যরি ড্যাডি। তোমরা গল্প করছ তাই কেউ আসতে সাহস করছে না। গ্রান্ড টার্কস থেকে দু’জন লোক এসে আপনার অপেক্ষা করছে।’

শিলা সুসান-এর হাতে রঙের তুলি। পাশেই আর্ট রুমে বসে সে আর্ট করছিল। সেখান থেকে রিসেপশন রুমের কথাবার্তা শোনা যায়। শুনেই ওদের সাহায্য করতে এসেছে।

কথা শেষ করেই শিলা সুসান গোল্ড ওয়াটারকে উদ্দেশ্য করে বলল, ‘গুড মর্নিং স্যার।’

শিলা সুসানের কথা শেষ হতেই ফার্ডিন্যান্ড সুসানের দিকে ইংগিত করে বলল, 'এ আমার মেয়ে শিলা সুসান, ওয়াশিংটনের জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। আর্ট ওর বিশেষ সখ।'

'ওয়েলকাম বেটি। বস।' বলল গোল্ড ওয়াটার।

'ধন্যবাদ।' বলে বসল সুসান।

ইন্টারকমে রিসেপশনে খবর পাঠিয়েছিল ফার্ডিন্যান্ড।

দু'জন লোক প্রবেশ করল ড্রইং রুমে।

তারা সম্ভাষণ বিনিময়ের পর বলল ফার্ডিন্যান্ডকে, 'আমরা গ্রান্ড টার্কস থেকে এসেছি জরুরী খবর নিয়ে।'

ফার্ডিন্যান্ডের ভ্রু কুঞ্চিত হয়ে উঠল। বলল, 'জন ব্ল্যাংকরা কোথায়?'

ফার্ডিন্যান্ডের কথা শেষ হতেই শিলা সুসান বলে উঠল, 'ড্যাডি আমি যাই। যেসব মারামারির কথা চলছিল, সে রকম মারামারির কথাই আবার শুরু হবে। আমি এসব শুনতে পারব না। বলে উঠে দাঁড়াল শিলা সুসান।

শিলা সুসানের কথা শুনে হেসে উঠেছিল গোল্ড ওয়াটার। বলল, 'যে মারামারি জীবনের জন্যে, সে মারামারিতে বিতৃষ্ণা থাকলে চলবে কেন বেটি?'

'মারামারিটা জীবনের জন্যে অর্থাৎ আত্মরক্ষার জন্যে হচ্ছে কি?' বলল শিলা সুসান।

'অবশ্যই বেটি।' গোল্ড ওয়াটার।

সুসান কিছু বলতে যাচ্ছিল তার আগেই ফার্ডিন্যান্ড বলল সুসানকে, 'তোমাকে আইন না পড়িয়ে ভুল করেছি মা। ভাল আইনজীবি হতে।' হাসতে হাসতে কথা বলছিল ফার্ডিন্যান্ড।

সুসান উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'ড্যাডি আজ নয়, আরেকদিন ঝগড়া করব। চলি।'

বলে সুসান ড্রইং রুম থেকে বেরিয়ে তার আর্ট রুম ঢুকল।

সুসান বেরিয়ে যেতেই প্রশ্নবোধক দৃষ্টি তুলে ধরল ফার্ডিন্যান্ড গ্রান্ড টার্কস থেকে আসা লোক দু'টির দিকে।

লোক দু'টির মুখ শুকনো এবং চোখে উদ্বেগ। চারদিকের কোন কথার দিকেই তাদের মনোযোগ নেই।

ফার্ডিন্যান্ড তাদের দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টি তুলে ধরতেই তাদের একজন বলল, 'সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে আমাদের ওখানে।'

'ভনিতা নয়, ঘটনা বল।' কিছুটা শক্ত কণ্ঠে বলল ফার্ডিন্যান্ড।

'সাউথ টার্কো দ্বীপে যারা অভিযানে গিয়েছিল, তাদের কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।' বলল তাদের একজন কম্পিত কণ্ঠে।

'কি?' চিৎকার করে উঠল ফার্ডিন্যান্ডের কণ্ঠ। যেন বাজ পড়ল ঘরে।

চমকে উঠেছে ওরা দু'জনও। ভ্রু কুঁচকে উঠেছে গোল্ড ওয়াটারেরও।

অবিশ্বাস্য বিস্ময়ে আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে ফার্ডিন্যান্ডের মুখ।

চিৎকারের শব্দ মিলিয়ে যাবার আগেই ফার্ডিন্যান্ড বলল, 'ওরা ফিরে আসেনি?'

'আসেনি।'

'কোন খবর দেয়নি?'

'না।'

'তারপর?'

'দুপুর পর্যন্ত আমরা মনে করেছি, অপারেশনের পর তারা পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে। কিন্তু দুপুরেই টেলিফোন পেলাম সাউথ টার্কো দ্বীপের আমাদের অফিস থেকে। জানাল, অভিযানের আগে যে তিনজনকে পরিস্থিতি সম্পর্কে খবর সংগ্রহের জন্যে পাঠানো হয়েছিল, কেউ ফিরেনি, অভিযানে যাদের আসার কথা তাদেরও কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি।'

'অভিযানে আসার কথা' বলেছে কেন, অভিযানে ওরা যায়নি?'

'সে কথা তারা জানে না।'

'চিহ্ন খুঁজে পেল না কেন? ওরা কি ওখানে গিয়েছিল?

'সাউথ টার্কো পুলিশ ষ্টেশন থেকে বিষয়টা তারা জানতে পারে।'

'পুলিশ ষ্টেশন থেকে?'

‘হ্যাঁ। গ্রামবাসীদের তরফ থেকে খুব সকালে থানায় কেস হয় যে, ডাকাতরা তাদের গ্রাম আক্রমণ করতে এসেছিল। পথে তিনজনকে পেয়ে ডাকাতরা তাদের হত্যা করে। পরে গ্রামবাসীরা জেগে উঠলে ওরা পালিয়ে যায় তাদের বোটে চড়ে।’

লোকটি থামলেও ফার্ডিন্যান্ড কথা বলতে পারলো না। সে স্তম্ভিত চোখে তাকিয়ে আছে লোকটির দিকে। এ ধরনের অবিশ্বাস্য ঘটনা ঐ দ্বীপে এর আগেও একবার ঘটেছে। সে ঘটনায় হাওয়া হয়ে গিয়েছিল ৩০ জন লোক। কিন্তু আজকের ঘটনায় কথা বলার শক্তি যেন সে হারিয়ে ফেলেছে। একশ’ জনেরও বেশি সশস্ত্র লোক সেখানে নেই, ফিরেও আসেনি, তাদের নিহত হবার ঘটনাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তাহলে ওরা গেল কোথায়! এবারের ঘটনায় একটাই শুধু নতুন বিষয়, ওদের পক্ষের তিনজন লোক নিহত হয়েছে এ পক্ষের লোকদের হাতে।

‘ওদের পক্ষের যে তিনজন লোক নিহত হয়েছে, তারা কিভাবে নিহত হয়েছে?’ অনেকক্ষণ পর বলল ফার্ডিন্যান্ড।

‘ষ্টেনগানের ব্রাশ ফায়ারে নিহত হয়েছে।’

‘থানা তদন্তে গিয়েছিল?’

‘হ্যাঁ। আমাদেরও লোক গিয়েছিল পুলিশের সাথে। তারা গ্রাম, ঘাট এলাকা, ঘাট পর্যন্ত রাস্তা, আশপাশ এলাকা সবই তারা পুলিশের সাথে ঘুরে ঘুরে দেখেছে, কিন্তু সন্দেহজনক কোথাও কিছু দেখতে পায়নি।’

‘কি চিহ্ন তারা খুঁজেছে?’

‘কোন বড় সংঘাত-সংঘর্ষ ও রক্তারক্তি হলে তার একটা চিহ্ন থাকবেই। সে রকম কিছু তারা পায়নি।’

লোকটি কথা শেষ করলেও ফার্ডিন্যান্ড কথা বলল না। ভাবছিল সে। বলল এক সময়, ‘থানা কি বলেছে?’

‘পুলিশরা তিনটা খুনকেই বড় করে দেখছে। তারা মনে করছে, রাতে কোন জলদস্যু গ্রামগুলোর উপর চড়াও হতে এসেছিল। গ্রামবাসীদের আবেদনে দ্বীপের দক্ষিণাঞ্চলে দু’টি পুলিশ বক্স বসেছে এবং রাতে পুলিশ এলাকায় টহল দিচ্ছে।’

‘গ্রান্ড টার্কস-এর পুলিশকে কিংবা পুলিশে আমাদের যারা আছে তাদের কিছু বলা হয়নি?’

‘না বলা হয়নি। বললে তো সব কথাই বলতে হবে। এ সিদ্ধান্ত আমরা নিতে পারিনি।’

‘ঠিক করেছ। ওখানকার বৃটিশ পুলিশের মধ্যে বেয়াড়া পুলিশ অফিসার অনেক আছে যাদের কাছে ঘটনার প্রকাশ ঘটলে আমাদের ক্ষতি হবে।’ বলল গোল্ড ওয়াটার।

বলে গোল্ড ওয়াটার তাকাল ফার্ডিন্যান্ডের দিকে এবং বলল, ‘ওর কাছ থেকে আর কিছু জানার আছে?’

‘সামান্য দু’একটা কথা।’ বলে ফার্ডিন্যান্ড লোকটিকে আবার জিজ্ঞেস করল, ‘ওদের কাছে অনেকগুলো মোবাইল টেলিফোন ছিল। ওদের কোন টেলিফোন পাওয়া যায়নি?’

‘না স্যার।’

‘তোমরা কি সাগরে সন্ধান করেছ?’

‘জ্বি। আমাদের কয়েকটা বোট দ্বীপটির চারদিকের গোটা সমুদ্র এলাকা তন্ন তন্ন করে দেখেছে। সেখানেও কিছু পাওয়া যায়নি।

লোকটি কথা শেষ করতেই ফার্ডিন্যান্ড তাকে বলল, ‘তোমরা গিয়ে রেষ্ট নাও। দরকার হলেই ডাকব তোমাদের।’

লোক দু’জন বেরিয়ে গেলে ফার্ডিন্যান্ড বিমূঢ় দৃষ্টি তুলে তাকাল গোল্ড ওয়াটারের দিকে। বলল, ‘আপনি কিছু বুঝলেন?’

‘আমি মনে করি সেখানে অলৌকিক কিছু ঘটেনি। আমাদের লোকেরা হয় বন্দী হয়েছে, নয়তো সবাই নিহত হয়েছে।’ বলল গোল্ড ওয়াটার।

‘এটা কি সম্ভব? সর্বোধুনিক অস্ত্রসজ্জিত আমাদের ১০০ জন লোককে ওখানকার গ্রামবাসীরা হত্যা বা বন্দী করবে কেমন করে?’

‘তা আমি জানি না। কিন্তু বন্দী বা হত্যা ছাড়া অন্য কোন ব্যাখ্যা বাস্তব নয়।’

‘বন্দী বা নিহত হওয়ার ঘটনাই বা বাস্তব হয় কি করে?’

‘আমারও এটা প্রশ্ন। কিন্তু হত্যা বা বন্দী হওয়া ছাড়া অন্য কিছুর কথা আমি চিন্তাও করতে পারছি না।’

‘পাঁচটা বোট গেল কোথায়?’

‘ওরা ওগুলো সাগরে ডুবিয়ে দিতে পারে।’

‘কেন? এ ধরনের বোট তো তাদের জন্যে খুব লোভনীয়।’

‘শত্রুকে তুমি গেঁয়ো বললেও আমার মনে হচ্ছে ওরা খুব বুদ্ধিমান। আমাদের লোকদের ওরা হত্যা বা বন্দী করেছে এটা তারা কোনভাবেই প্রমাণ হতে দিতে চায় না। থানায় তারা ডাকাত পড়ার ইজাহার দিয়ে দারুণ বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। নিজেদের মজলুম প্রমাণ করে পুলিশকেও তারা তাদের পক্ষে নিতে চায়।’

‘কিন্তু হঠাত এ বুদ্ধি তাদের মাথায় এলো কি করে? এ গ্রামবাসীদের জানি আমরা। এরা প্রতিবাদ করা তো দূরে থাক প্রতিবাদের ভাষাও জানতো না। এদের এমন সাহস, শক্তি ও বুদ্ধি আসবে কোত্থেকে?’

‘এই উত্তর আমার কাছেও নেই।’

গোল্ড ওয়াটার থামলেও ফার্ডিন্যান্ড কিছুক্ষণ কথা বলল না।

বেশ কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর ফার্ডিন্যান্ড বলল, ‘আমাদের জিজ্ঞাসার জবাব পাওয়ার জন্যে এবং শত্রুকে আর বাড়িতে না দেবার জন্যে এখনই সর্বাত্মক অভিযান পরিচালনা করতে হবে বলে আমি মনে করছি।’

‘না ফার্ডিন্যান্ড এ ধরনের অভিযান করে আমরা যে সংকটে পড়েছি তাকে আরও বৃদ্ধি করবে। এ পর্যন্ত দুই ঘটনায় আমাদের লোকবলের ক্ষতি হয়েছে, আর্থিক ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু ইমেজের ক্ষতি হয়নি। আমাদের এই আক্রমণের ঘটনা প্রকাশিত হবার সাথে সাথে আমরা সন্ত্রাসী বলে চিহ্নিত হবো বিশ্বের সকলের কাছে।’ বলল গোল্ড ওয়াটার।

‘আমরা পুলিশের সহযোগিতা পাব। সুতরাং খুব অসুবিধা কি হবে?’

‘কিছু পুলিশের বা বেশিরভাগ পুলিশের পাবে, সব পুলিশের পাবে না। সুতরাং বিষয়টা প্রকাশ পাবে। এ নিয়ে হৈ চৈ হবে। হৈ চৈ করবে বৃটেনবাসীরাও। সুতরাং বৃটিশ পুলিশকে প্রকাশ্যে আমরা পক্ষে পাব না।’

‘ঠিক বলেছেন। প্রকাশ্য অভিযান ক্ষতিকর হবে। আগের মতই গোপনে পুনরায় একটা চেষ্টা করতে আমরা পারি।’

‘পারি। কিন্তু আগের চেয়ে তা কঠিন হবে। আগে পুলিশ পাহারা ছিল না, এখন পুলিশ আছে। তাছাড়া কিছু না জেনে অন্ধকারে ঝাঁপ দেয়াকে যুক্তিসঙ্গত মনে করি না।’

‘তাহলে?’

‘আমার মতে ব্যাপক হত্যাকান্ড চালিয়ে কোন জনগোষ্ঠীকে দমন করা এখন বিপজ্জনক। এ বিষয়টা খুব তাড়াতাড়ি জানাজানি হয়ে যায় এবং চারদিক থেকে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ওঠে, এমনকি বিভিন্ন মানবাধিকার গ্রুপ ও জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন থেকে এর তদন্তও হয়। সুতরাং সামরিক অভিযানের পথে অগ্রসর হওয়া যাবে না। আমি মনে করি, আমরা যে পথে অর্থাৎ মুসলিম জনসংখ্যা হ্রাস করার যে পথে অগ্রসর হচ্ছি, সেটা দীর্ঘ মেয়াদী হলেও এটাই নিরাপদ। এ কার্যক্রমটাই আমাদের আরও জোরদার করা দরকার।’ বলল গোল্ড ওয়াটার।

‘তাহলে সাউথ টার্কো দ্বীপে আমরা এখন কিছুই করব না? এত বড় পরাজয় মেনে নেয়া খুবই কষ্টকর হবে।’ বলল ফার্ডিন্যান্ড।

‘কিছুই করব না, এ কথা ঠিক নয়। আমাদের গোয়েন্দা ইউনিটের লোকদের সেখানে ছড়িয়ে দাও। জানতে চেষ্টা কর, সেখানে কি ঘটেছে, কারা দায়ী। যারা দায়ী, তাদের এক এক করে কিডন্যাপ কর এবং শেষ করে দাও। আমাদের লোকেরা এক সাথে হারিয়ে গেছে, আর ওরা এক এক করে হারিয়ে যাবে।’

ফার্ডিন্যান্ডের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, ‘যিশুকে ধন্যবাদ, আমাদের লোকেরা খুশী হবে এ কর্মসূচী পেলে। আর মুসলিম পুরুষ শিশু জন্মের পরেই শেষ করে দেয়ার ব্যাপারটা আমরা জোরদার করব।‘

‘কিন্তু সাবধান, খুব গোপনে বুদ্ধিমত্তার সাথে এ কর্মসূচী এগিয়ে নিতে হবে। এটাও খুব বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে, যদি জানাজানি হয়ে যায়।’

‘আমরা খুব সাবধান এ ব্যাপারে। আমাদের বিশ্বস্ত লোকদের দিয়ে আমরা এ কাজ করাচ্ছি। চিন্তার কোন কারণ নেই।’

‘খুশী হলাম।’

‘কিন্তু মারাত্মক কিছু দু:সংবাদও শুনলেন’

‘এ রকম কিছু দু:সংবাদের জন্যে তৈরি থাকতে হয়, এক তরফা একটা কাজ হয়ে চলবে, এটা স্বাভাবিক নয় ফার্ডিন্যান্ড।’ চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিতে দিতে বলল গোল্ড ওয়াটার। থামল একটু।

তারপর চায়ের কাপটা পিরিচে রাখতে রাখতে বলল, ‘এখন উঠি ফার্ডিন্যান্ড। কলম্বাস গীর্জার ফাদারের সাথে একটু কাজ আছে। সেটা সেরে রেষ্ট হাউজে ফিরব।’

বলে উঠে দাঁড়াল গোল্ড ওয়াটার।

ফার্ডিন্যান্ড তার সাথে হ্যান্ডশেক করতে করতে বলল, ‘ঈশ্বরই আজ আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছিল। আপনার মূল্যবান পরামর্শ গোটা পরিস্থিতি পাল্টে দিয়েছে। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।’

গোল্ড ওয়াটার বলল, ‘কাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছ, এটা তোমার কাজ, আমার কাজ শুধু নয়, সকলের কাজ।’

ফার্ডিন্যান্ড গাড়ি বারান্দায় গোল্ড ওয়াটারকে গাড়িতে তুলে দিয়ে ফিরে এল। নিজের ষ্টাডি রুমে যাবার পথে ফার্ডিন্যান্ড তার মেয়ে শিলা সুসানের আর্ট রুমে উঁকি দিল। বলল, ‘স্কেচটা শেষ করতে পেরেছ সুসান?’

শিলা সুসান একটা স্কেচের দিকে তাকিয়ে গালে হাত দিয়ে বসেছিল। তার আব্বার কথা কানে যেতেই ফিরে তাকাল তার আব্বার দিকে। হাসল। বলল, ‘আর্টের একটা রঙ লাল বটে, ড্যাডি, কিন্তু মানুষের লাল রক্তের সাথে এর আকাশ-পাতাল পার্থক্য।’

‘তাতো বটেই। কিন্তু তারপর কি?’ বলল সুসানের আব্বা ঠোঁটে হাসি টেনে।

‘ওপাশে তোমাদের রক্তারক্তির গল্পে আমার রঙের কাজ আমি করতে পারিনি। আমার আর্ট রুম অনেকটা ড্রইং-এর অংশ। আমার এ রুম পাল্টে দাও।’

শিলা সুসানের আব্বা ফার্ডিন্যান্ড সুসানের শেষের কথাগুলো যেন শুনতেই পায়নি। বলল, ‘পাগল মেয়ে, রক্তারক্তির গল্প কোথায় শুনলে। খবর

এসেছে আমাদের একশ' লোককে ওরা সম্ভবত হত্যা করেছে। এ বিষয় নিয়েই আমরা আলোচনা করছিলাম।'

'একশ' লোক হত্যা হওয়া মানে রীতিমত একটা যুদ্ধ। এটা কি রক্তারক্তি নয়? 'ওরা' কারা ড্যাডি?'

'সাউথ টার্কো দ্বীপের মুসলমানরা।'

'কিন্তু ওদের সাথে তোমাদের বিরোধ কেন? কেন একশ' লোকের বাহিনী পাঠিয়েছিল ওদের বিরুদ্ধে?'

'এটা অস্তিত্বের রাজনীতি। তুমি এখন ছোট, পড়াশুনা করছ। আরও বড় হও বুঝবে মা। ধন্যবাদ।'

বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে তার ষ্ট্যাডি রুমের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

তার আব্বা চলে গেলেও শিলা সুসান দরজার দিকেই তাকিয়ে রইল। তার চোখের শূন্য দৃষ্টি বাইরে প্রসারিত। তার আব্বার শেষ কথাই তার মনে ঘুরপাক খাচ্ছে। তার আব্বার শেষ কথা থেকে সুসান এটুকু বুঝেছে, বিষয়টা বড় রাজনীতির ব্যাপার। কিন্তু রাজনীতির সাথে এই হত্যাকান্ড কেন? বিভেদের এই হানাহানি ভাল লাগে না তার। তার বিশ্ববিদ্যালয়ে নিগ্রো ছাত্রদের ক্যান্টিন ও ক্লাসে বসার জায়গা আগে আলাদা ছিল। এখন এক হয়েছে। কিন্তু মন, সম্পর্ক ও সামাজিকতা তো হয়নি। সেই বিভেদের দেয়াল এখনও খাড়াই আছে। এ থেকে হানাহানি ও রক্তারক্তির ঘটনাও ঘটেছে। এই ক'দিন আগে একজন কৃষ্ণাংগ ছাত্রের সাথে শ্বেতাংগ ছাত্রীর প্রেম নিয়ে যে গন্ডগোল ও হানাহানি হয়েছে তা দেখে মনে হয়েছে কৃষ্ণাংগ ছাত্রটি যেন মানুষ নয়, পশু। শেষে তাকে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়তে হয়েছে। এটাকেও নিশ্চয় বলা হবে অস্তিত্বের রাজনীতি। তাহলে দেখা যাচ্ছে, স্বতন্ত্র অস্তিত্বই আসল সমস্যা। কিন্তু স্বতন্ত্র তো একটা বাস্তবতা। এই বাস্তবতা সমস্যা হয়ে দাঁড়ালে তো বিপদ! এর সমাধান কোথায়? সকল ধর্ম, জাতীয়তা, স্বত্তা-স্বাতন্ত্রের উর্ধে ওঠা? মাথা ব্যথা বলে কি মাথা কেটে ফেলতে হবে?

মাথা ঘুরে গেল শিলা সুসানের। আর চিন্তা করতে পারল না।

হাতের স্কেচ এবং তুলিটা টেবিলে ছুঁড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে।

# ৩

ডা: মার্গারেটের চোখের সামনেই শিশুটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

দ্রুত ঘুমিয়ে পড়ার মতই মৃত্যুটিকে মনে হলো ডা: মার্গারেটের কাছে।

রাজধানী গ্রান্ড টার্কস-এর একজন মুসলিম ব্যবসায়ীর ছেলে এই শিশুটি।

ডা: মার্গারেট পলকহীন চোখে তাকিয়ে আছে শিশুটির দিকে। মৃত্যুটি তার কাছে অবিশ্বাস্য। সকালে ডিউটিতে এসেই সে পরীক্ষা করেছে শিশুটিকে। সব ঠিক আছে। তার শারীরিক অন্যান্য পরীক্ষার রিপোর্টও ভাল। কিন্তু কয়েক ঘণ্টায় কি ঘটে গেল। মরেই গেল শিশুটি।

চিন্তার মধ্যে ডুবে গিয়েছিল ডা: মার্গারেট।

ওয়ার্ডের ষ্টুয়ার্ড মেয়েটির কথায় সম্বিত ফিরে পেল ডা: মার্গারেট। সে বলছিল, 'ম্যাডাম, ছেলেটিকে সরিয়ে ফেলতে হয়।'

ডা: মার্গারেট তাকাল ষ্টুয়ার্ডের দিকে। ভাবল অল্পক্ষণ। তারপর বলল, 'ষ্টুয়ার্ড, আমি ছেলেটিকে মর্গে পরীক্ষা করাতে চাই।'

'কেন?' অস্বাভাবিক কিছু সন্দেহ করেন?'

'ঠিক তা নয়, কিন্তু সকালে পরীক্ষার সময় একে যেমন পেয়েছি, তাতে এভাবে মরার কথা নয়। তাই কারণ জানতে চাই।'

'ম্যাডাম, তাহলে আপনি নোট দিন। ওয়ার্ডের হেড স্যার এবং হাসপাতালের ডিজি নোট অনুমোদন করলে তবেই মর্গে এই পরীক্ষা সম্ভব।'

ডা: মার্গারেট ভাবল কিছুক্ষণ। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল আহমদ মুসার মনোহর অবয়বটি। আহমদ মুসার নির্দেশেই সে হাসপাতালের ইমারজেন্সী ওয়ার্ড থেকে অনেক তদবির করে বদলী নিয়ে প্রসূতি ও শিশু ওয়ার্ডে এসেছে। তাকে অনুরোধ করা হয়েছে, ওয়ার্ডের মুসলিম পুরুষ শিশুর উপর নজর রাখতে, তাদের কারো মৃত্যু হলে তার কারণ সন্ধান করতে। আহমদ মুসার এই

অনুরোধ তার কাছে এক অলঙ্ঘনীয় নির্দেশ। সে এই নির্দেশ পালন থেকে পিছাতে পারে না।

ডা: মার্গারেট মুখ তুলল ষ্টুয়ার্ডের দিকে। বলল, ‘আসুন আমি নোট দিচ্ছি।’

ডা: মার্গারেট ওয়ার্ডে তার অফিসে এসে তার প্যাডে অফিসিয়াল একটা নোট লিখে ষ্টুয়ার্ডের হাতে তুলে দিল।

নোট নিয়ে ষ্টুয়ার্ড চলে গেলে চেয়ারে গা এলিয়ে দিল ডা: মার্গারেট। তার এই পদক্ষেপ সাধারণ দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক। অস্বাভাবিক মৃত্যুর পক্ষে সুস্পষ্ট কারণ ঘটলেই শুধু এই ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়। একমাত্র প্রমাণহীন সন্দেহ ছাড়া তার দাবীর পক্ষে আর কিছু যুক্তি নেই। তাঁর উর্ধ্বতনরা তার সুপারিশকে কি দৃষ্টিতে দেখবেন?

ডা: মার্গারেট যখন এসব ভাবনায় ডুবে আছে, তখন হন্ত-দন্ত হয়ে তার ঘরে প্রবেশ করল ডা: ওয়াভেল। প্রবেশ করেই বলল, ‘ডা: মার্গারেট আপনি কি নোট দিয়েছেন? এর কি প্রয়োজন?’

ডা: মার্গারেট উঠে দাঁড়াল চেয়ার থেকে। বলল, ‘আমি যা মনে করেছি, সেটাই আমি নোটে লিখেছি স্যার।’

‘ঠিক আছে। কিন্তু আপনার যুক্তি কি?’

‘স্যার রোগীর রোগের ধরন, তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট কোন কিছুই শিশুটির মৃত্যু সমর্থন করে না। এটাই অস্বাভাবিকতা। এই অস্বাভাবিকতা কেন ডাক্তার হিসেবে আমাদের জানা কর্তব্য। এই কর্তব্যবোধ থেকেই আমি এই নোট দিয়েছি।’ বলল ডা: মার্গারেট।

‘হতে পারে রোগ নতুন কোন দিকে টার্ন নেয়ায় তার মৃত্যু ঘটেছে। যাই হোক রোগেই তার মৃত্যু ঘটেছে। এটা অস্বাভাবিক নয়। সুতরাং পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন নেই। নোট ফেরত নিন ডা: মার্গারেট।’

‘ফেরত নেবার প্রয়োজন নেই স্যার। আপনি এবং ডিজি যে সিদ্ধান্ত নেবেন সেটাই তো হবে।’

‘ডা: মার্গারেট, আমরা ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে বাড়াবাড়ি করছি বলে মনে হয়।’

‘দু:খিত স্যার, নোট আমার হাত থেকে চলে গেছে, এটা এখন আপনাদের এক্তিয়ারে। যা ভাল মনে করছেন, তাই করুন।’

‘একটা নোট আমার কাছে পৌছার পর তা আমি ডিজিকে না দিয়ে পারি না। তাই বলছিলাম আপনি নোটটা প্রত্যাহার করলে ঝামেলা চুকে যায়।’ নরম সুরে বলল ডা: ওয়াভেল।

‘আপনি নোটে প্রয়োজন নেই লিখে দিন, তাহলেই তো হল।’

‘আমি আপনার সাথে ঝগড়ায় নামতে চাচ্ছিলাম না ডা: মার্গারেট।’

‘ঝগড়ার তো কিছু নেই। এটা মত পার্থক্যের ব্যাপার এবং এ মত পার্থক্য খুবই স্বাভাবিক।’

‘এই মত পার্থক্যের প্রয়োজন কি? আমি এটা চাই না। আবার অনুরোধ করছি, নোটটা আপনি প্রত্যাহার করুন।’

স্তম্ভিত হলো ডা: মার্গারেট ডা: ওয়াভেলের এই অনুরোধে। তার চেয়ে বেশি আশ্চর্য হলো, ডা: ওয়াভেলের মধ্যে কাকুতি মিনতির ভাব দেখে। একটা সামান্য বিষয় নিয়ে ডা: ওয়াভেলের মত একজন অত্যন্ত সিনিয়র ডাক্তার তার মত নবীন ডাক্তারের কাছে কাকুতি মিনতির পর্যায়ে নামবে কেন? এ বিষয়টাও ডা: মার্গারেটের কাছে শিশুটির মৃত্যুর মতই অস্বাভাবিক মনে হলো। এই চিন্তার সাথেই তার মনে হলো অস্বাভাবিকতার গ্রন্থি মোচন অবশ্যই হওয়া প্রয়োজন।

অবশেষে বলল, ‘স্যার নোটের কথাই আবার বলছি, ডাক্তার হিসেবে আমাদের সকলেরই জানা দরকার কি কারণে বা কি রোগে তার মৃত্যু হলো। এতে আমরা জানতে পারবো আমাদের করণীয় কি।’

‘এটাই তাহলে আপনার শেষ কথা?’

‘আমি দু:খিত স্যার।’

‘আপনি ভাল করলেন না ডা: মার্গারেট। আমি যা বলেছি, সব আপনার ভালোর জন্যেই বলেছি।’

‘দু:খিত স্যার।’

'দু:খিত আমি আপনার জন্যে।' বলে উঠে দাঁড়াল ডা: ওয়াভেল।

ডা: ওয়াভেল চলে যাবার পর এলেমেলো চিন্তার মধ্যে আবার ডুবে গেল ডা: মার্গারেট। মন তার খারাপ হয়ে গেল একজন সিনিয়র ডাক্তারের অনুরোধ এভাবে প্রত্যাখ্যান করায়। ডা: ওয়াভেল এই ওয়ার্ডে আছেন ৫ বছরেরও বেশী কাল ধরে। পুরনো লোক উনি। কিন্তু ডা: মার্গারেট বুঝতে পারছে না, এমন পুরনো ও অভিজ্ঞ ডাক্তার অমন অযৌক্তিক অনুরোধ করতে পারলেন কেমন করে! তার চেয়ে বড় কথা হলো, তার অনুরোধের ধরন দেখে মনে হয়েছে আমি তার বিরুদ্ধে ক্ষতিকর যেন কিছু করেছি, যা থেকে আমিই তাকে উদ্ধার করতে পারি। আবার শেষের দিকে 'আমি দু:খিত আপনার জন্যে' বলে যে শক্ত কথা বললেন, সেটাও তাঁর ব্যক্তিগত অসন্তুষ্টি থেকে এসেছে। বিষয়টাকে এভাবে তিনি ব্যক্তিগত নিলেন কেন?

মাথার চিন্তাটাকে হাল্কা করার জন্যে ওয়ার্ডে বের হলো ডা: মার্গারেট। রোগীদের খোঁজ খবর নিতে শুরু করল।

এক সময় একজন এ্যাটেনডেন্ট ছুটে এল ডা: মার্গারেটের কাছে। বলল, 'শীঘ্রী চলুন, ডি জি স্যারের টেলিফোন।'

নিজের অফিসে ফিরে এসে টেলিফোন ধরল ডা: মার্গারেট।

ওপার থেকে ডিজি বলল, 'তুমি যে নোট দিয়েছ, তা ডা: ওয়াভেল সমর্থন করেননি। শিশুটির মৃত্যুর অস্বাভাবিকতা সম্পর্কে তুমি কতটা নিশ্চিত?'

'আমার দাবীর ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। শুরু থেকেই আমি শিশুটির রোগের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করছি। এবং আজ সকালেও যা দেখেছি, তাতে ঐ রোগে মৃত্যুটা একেবারেই অস্বাভাবিক।'

'তাহলে আমি সার্বিক পরীক্ষার অর্ডার দেব?'

'স্যার যদি আমার উপর আস্থা রাখতে পারেন।'

'তোমার রেকর্ড আমি জানি। সে জন্যেই টেলিফোন করলাম তোমাকে। আমি ওয়ার্ড-এর ইনচার্জের মতকেই তো ও,কে করতে পারতাম।'

'ধন্যবাদ স্যার।'

'ও.কে মাই ডটার। তোমার সাফল্য কামনা করি। ধন্যবাদ।'

টেলিফোন রেখে চেয়ারে গা এলিয়ে দিল ডা: মার্গারেট।

পরদিন বিকেল।

ওয়ার্ডে ঘুরতে গিয়ে দুটি শিশুর অবস্থার আকস্মিক পরিবর্তন দেখে চমকে উঠল ডা: মার্গারেট।

এ দু'টি শিশুর উপরও ডা: মার্গারেট ঘনিষ্ঠ দৃষ্টি রেখে আসছিল, শিশু দু'টি ভূমিষ্ঠ হয়ে বেড়ে আসার পর থেকে। শিশু দু'টি মুসলিম পুরুষ শিশু।

গতকাল রাতে ডিউটি থেকে যাবার সময় ডা: মার্গারেট শিশু দু'টিকে দেখে গেছে। সবদিক দিয়েই ভাল ছিল। কিন্তু আজ এসে দেখছে, শিশু দু'টির প্রাণশক্তি যেন দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। বাইরে রোগের তেমন কোন লক্ষণ নেই, ভেতরে থাকলেও তা বলার শক্তি শিশুর নেই। অবসাদগ্রস্থতা একমাত্র লক্ষণ। ধীরে ধীরে বাড়ছে শিশু দু'টির অবসাদগ্রস্থতা। আগের শিশুটির সাথে এর দু'টি শিশুর যেটুকু পার্থক্য তা হলো, ঐ শিশুটি নীরব ঘুমের মধ্যে দিয়ে শেষ হয়ে গেছে, আর এ দু'টি শিশু ঘুম নয়, এমনিতেই নিশ্চল হয়ে পড়ছে, যেন ধীরে ধীরে মৃত্যু এসে গ্রাস করছে শিশু দু'টিকে।

ডা: মার্গারেট দ্রুত শিশু দু'টির ফাইলে তাদের প্যাথোলজিক্যাল টেষ্ট সুপারিশ করল এবং লাল কালিতে টপ প্রায়োরিটি লিখল।

ফাইলটি আয়ার হাতে তুলে দিয়ে ডা: মার্গারেট সহকারী ডাক্তারকে ওয়ার্ডের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে বলল, 'আমি একটু হাসপাতাল লাইব্রেরীতে যাচ্ছি। কেউ খোঁজ করলে বলো।'

আধ ঘণ্টা পর ওয়ার্ডে ফিরে এল ডা: মার্গারেট। ওয়ার্ডে ঢুকতেই তার সহকারী ডাক্তার মুখ শুকনো করে বলল, 'ডা: ওয়াভেল স্যার আপনার নোট গ্রহণ না করে নিউরো টেষ্ট রিকোসেন্ড করে শিশু দু'টিকে নিউরো বিভাগে স্থানান্তরিত করেছে।'

চমকে উঠল ডা: মার্গারেট। বলল, 'নিউরো প্রোব্লেম এখানে মূল ইস্যু নয়। নিউরো টেষ্ট দিয়ে কি হবে?'

বলে হতাশভাবে চেয়ারে বসে পড়ল ধপ করে।

আর কোন কথা না বলে ডা: মার্গারেট চেয়ারে গা এলিয়ে চোখ বুজল। চোখ বুজতেই শিশু দু'টির ছবি তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। শিশু দু'টির যা অবস্থা তাদের প্যাথোলজিক্যাল টেষ্ট দরকার। তাতে শিশু দু'টিকে বাঁচানো যেত কিনা বলা মুস্কিল, কিন্তু রোগটা জানা যাবে, রোগের কারণ জানা যাবে, জানা যাবে কেন কেমন করে দু'টি শিশু একই সময়ে একই রোগে আক্রান্ত হলো। কিন্তু কি করবে সে! এই ছোট ব্যাপার নিয়ে সে ওয়ার্ড প্রধানকে ডিঙিয়ে ডিজি'র কাছে যেতে পারে না।

ওয়ার্ডে সেদিনের শেষ রাউন্ডটা শেষ করে ডা: মার্গারেট অফিস কক্ষে ফিরে হাত ব্যাগ নিয়ে বেরুচ্ছিল এমন সময় তার টেবিলের টেলিফোন বেজে উঠল।

টেলিফোন ধরল ডা: মার্গারেট।

'আমি ডা: কনরাড। আমি ডা: ওয়াভেলকে না পেয়ে তোমার কাছে টেলিফোন করলাম।' ওপার থেকে কণ্ঠ ভেসে এল।

নাম শুনেই শশব্যস্ত হয়ে উঠল ডা: মার্গারেট। বলল, 'স্যার আমি ডা: মার্গারেট।'

ডা: কনরাড নিউরোলজীর প্রফেসর। নিউরো ওয়ার্ডের প্রধান তিনি।

'তোমাকেই চাচ্ছি আমি। যে শিশু দু'টিকে ডা: ওয়াভেল এ ওয়ার্ডে রেফার করেছিলেন, আমি ওদের দেখেছি। আমি ওদের ফেরত পাঠালাম। তোমার নোটই ঠিক। প্রোব্লেমটা আমার ধারণায় প্যাথোলজিক্যাল। তোমরা তাড়াতাড়ি দেখ ওদিকটা। খুবই সংকটাপন্ন ওদের অবস্থা।' বলল ডা: কনরাড।

ডা: মার্গারেট খুশী হলো, উদ্বিগ্নও হলো সেই সাথে শিশু দু'টির ভবিষ্যত নিয়ে।

টেলিফোন রেখে দ্রুত ওয়ার্ডে ফিরে এল ডা: মার্গারেট। ইতিমধ্যে শিশু দু'টিকে পৌছানো হয়েছে ওয়ার্ডে।

ডা: মার্গারেট তাড়াতাড়ি ডা: কনরাড-এর রেফারেন্স দিয়ে আরেকটা নোট লিখল শিশু দু'টির ফাইলে।

নোট লেখা শেষ করেই ডা: মার্গারেট সহকারী ডাক্তারকে বলল, 'নোট অনুসারে এদের টেষ্টের ব্যবস্থা কর। পরবর্তী ডাক্তার ডিউটিতে না আসা পর্যন্ত আমি আছি।'

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে বাড়ি আসার জন্যে যখন গাড়িতে উঠল ডা: মার্গারেট, তখন মনটা তার অনেক হালকা মনে হলো। শিশু দু'টির উপযুক্ত টেষ্টের ব্যবস্থা হয়েছে। মনে মনে ধন্যবাদ দিল ডা: কনরাডকে।

পরদিন হাসপাতালে যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়েছে ডা: মার্গারেট।

হাসপাতালে ডিউটিতে যাচ্ছে বটে, কিন্তু তার মন খারাপ। ডা: মার্গারেট শিশু বিশেষজ্ঞ না হওয়ার অভিযোগ তুলে তাকে প্রসূতি ওয়ার্ড থেকে বদলীর জন্যে ডা: ওয়াভেল গতকালই এক সুপারিশ পাঠিয়েছে ডিজি ডাক্তার ক্লার্কের কাছে।

ডা: মার্গারেট শিশু বিশেষজ্ঞ নয়, এ কথা ঠিক। কিন্তু সে মেডিসিনের ডাক্তার। হাসপাতালের অর্গানোগ্রাম অনুসারে প্রত্যেক ওয়ার্ডেই অন্তত একজন করে মেডিসিনের ডাক্তার থাকবে। তাছাড়া প্রসূতি ও শিশু রোগের উপর ডাক্তার মার্গারেটের একটা বিশেষ ট্রেনিং আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জর্জ ওয়াশিংটন মেডিকেল ইনষ্টিটিউট থেকে।

ডা: মার্গারেট কিছুতেই বুঝতে পারছে না ডা: ওয়াভেল কেন তার প্রতি বিরূপ। দু'তিন দিন আগে তিনটি শিশু নিয়ে যা ঘটেছে, তা প্রতিটি ওয়ার্ডে প্রতিদিনের সাধারণ দৃশ্য। একে তার অন্যভাবে নেবার কারণ নেই। তাহলে? এই তাহলের কোন উত্তর মার্গারেটের কাছে নেই।

প্রস্তুত হয়ে হাসপাতালে যাবার জন্যে হাতব্যাগটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল ডা: মার্গারেট।

টেলিফোন বেজে উঠল। যাবার জন্যে পা তুলেও আবার ফিরে দাঁড়াল ডা: মার্গারেট। টেলিফোন ধরল। টেলিফোন ধরেই সচকিত হলো ডা: মার্গারেট। ডিজি ডা: ক্লার্কের টেলিফোন।

'স্যার আপনি। কিছু ঘটেনি তো?' ডা: ক্লার্কের কণ্ঠ শুনেই শশব্যস্তে জিজ্ঞেস করল ডা: মার্গারেট।

'কিছু তো ঘটেছেই। তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি মার্গারেট। এখনই ল্যাবরেটরি থেকে ডা: বিশপ জানালেন, তিনটি শিশুর রক্তেই অস্বাভাবিক ও ভয়ংকর ধরনের উপাদান পাওয়া গেছে। তিনটি শিশুর কেউ বাঁচেনি বটে, কিন্তু তারা ভয়ংকর কোন রোগের বিষয়ে আমাদের চোখ খুলে দিয়ে গেল। তোমার সচেতনতার ফলেই তাড়াতাড়ি বিষয়টা জানা সম্ভব হয়েছে।' বলল ডা: ক্লার্ক।

'ধন্যবাদ স্যার। একজন ডাক্তারের যা করণীয় তার বেশি কিছু করিনি স্যার।'

'ধন্যবাদ, মার্গারেট। রাখি, বাই।'

'বাই, স্যার।'

টেলিফোন রাখল মার্গারেট।

চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মার্গারেটের। গত দু'তিন দিনের উদ্বেগ ও বিষণœতা, ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে গেল মন থেকে। তার একটা ভয় ছিল, প্যাথেলজিক্যাল টেস্টে যদি কিছু না পাওয়া যায়, তাহলে তার বিরুদ্ধে ডা: ওয়াভেলের অভিযোগ আরও মজবুত হবে এবং প্রসূতি ওয়ার্ড তাকে অবশ্যই ছাড়তে হবে। তা যদি হয়, তাহলে আহমদ সুসার কাছে তার মুখ দেখাবার মত থাকবে না। আহমদ মুসা হয়তো ভাববে, আমার নির্বুদ্ধিতার কারণেই আহমদ মুসার একটা পরিকল্পনা মাঠে মারা গেল।

এই দু:সহ অবস্থায় তাকে যে পড়তে হলো না এ জন্যে সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল। শিশু তিনটির প্যাথোলজিক্যাল টেস্টের এই রেজাল্ট পেলে আহমদ মুসা দারুণ খুশি হবে। কিভাবে মুসলিম পুরুষ শিশুগুলো মরছে

তার কারণ সে চিহ্নিত করতে চায়। কারণ চিহ্নিত হলে কারণের উতস  সে খুঁজে বের করতে চেষ্টা করবে।

এটা ভাবেত গিয়ে আহমদ মুসার হাস্যোজ্জ্বল মুখ ডা:মার্গারেটের চোখে ভেসে উঠল। তার সাথে সাথে তার হৃদয় এল প্রশান্তির একটা পরশ। তার মনে হলো,হৃদয়ের ফ্রেমে এ মুখটা এভাবেই সব সময় বাঁধা থাকতো! এটা ভাবতে গিয়ে চমকে উঠল ডা:মার্গারেট। একটা অনধিকার চর্চার ভয় ও লজ্জা এসে তাকে ঘিরে ধরল।

মন থেকে এসব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে হাসপাতালে যাবার জন্যে পা বাড়াল সে।

কিন্তু সংগে সংগেই পা আবার থেমে গেল। ভাবল, আহমদ মুসাকে বিষয়টা সে তো টেলিফেনে জানাতে পারে। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবল হাসপাতারৈ গিয়ে রিপোর্ট দেখে বিস্তারিত জানানোই ঠিক হবে।

পা বাড়াল আবার সে হাসপাতালে যাবার জন্যে। নিজস্ব গাড়িতে করে যাচ্ছে সে হাসপাতালে।

ডা:মার্গারেটের আব্বা ছিল একজন বৃটিশ সেনা অফিসার। সুতরাং নিজেদের গাড়ি, বাড়ি নিয়ে তারা গ্রান্ড টার্কস দ্বীপের সচ্ছল পরিবারের একটি।

তাদের বাড়িকে সবাই কর্নেলের বাড়ি বলে জানে। তার আব্বা কর্নেল র‍্যাংক থেকে রিটায়ার করে। ডাক্তার মার্গারেট ও জর্জ দু'টি সন্তানই মাত্র তার।

চলছে মার্গারেটের গাড়ি। গাড়িটা সুন্দর নতুন একটা কার। রাস্তায় তেমন ভীড় নেই।

ডা:মার্গারেট তার গাড়ির রিয়ারভিউতে দেখল, পিছন থেকে একটা ট্রাক আসছে নির্ধারিত গতির চেয়ে অনেক বেশি তীব্র বেগে।

ডা: মার্গারেট সাবধানতা হিসাবে তার গাড়িটাকে রাস্তার পাশ বরাবর চাপিয়ে নিয়ে ট্রাককে বেশি জায়গা দিয়ে দিল।

পরবর্তী কয়েক সেকেন্ড কি ঘটল ডা:মার্গারেট কিছুই বুঝল না। শুধু তার মনে হলো, ট্রাকটি এসে তার গাড়ির উপর পড়েছে। তারপর কিছুই মনে নেই তার। রাস্তার পাশ বরাবর ছিল রেলিং-এর পর খাল।

খালটি প্রাকৃতিক নয়, তৈরি করা। রাজধানী শহরের মধ্য দিয়ে খালটি দ্বীপের বুক চিরে সাগরে গিয়ে পড়েছে।

ট্রাকের প্রচন্ড ধাক্কায় ডা: মার্গারেটের গাড়িটা রেলিং ভেঙে ছিটকে গড়িয়ে পড়ল খালে।

হাসপাতাল বেডে জ্ঞান ফিরে পেয়ে ডা: মার্গারেট দেখতে পেল জর্জকে।

জর্জের চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং ঠোঁটে ফুটে উঠল হাসি। মুখে ফুটে উঠল স্বস্তির চিহ্ন।

ডা: মার্গারেটের ঠোঁটেও ফুটে উঠল ম্লান হাসি। ধীর কণ্ঠে বলল, 'এখন সময় কতরে জর্জ?'

'বিকেল পাঁচটা।'

উত্তরটা দিয়েই জর্জ আবার শুরু করল, 'মাথার আঘাতটাই বড়, কিন্তু তাতে বড় ধরনের ক্ষতি হয়নি। খুব অল্পের জন্যে খুব বড় ক্ষতি থেকে আল্লাহ তোমাকে বাঁচিয়েছেন। সবাই খুশী হয়েছে। ডা: ক্লার্ক, ডা: কনরাড দু'জনেই অপারেশনের সময় হাজির ছিলেন।'

'ডা: ওয়াভেল ছিলেন না?'

'উনি এসেছিলেন, কিন্তু বেশিক্ষণ থাকেননি। কি কাজ থাকায় চলে যান।'

'আর কেউ আসেনি?'

'কেন, হাসপাতালের সব ডাক্তারই এসেছিল।'

'আর কেউ?' মার্গারেটের ঠোঁটে ম্লান হাসি।

জর্জ ডা: মার্গারেটের মুখের দিকে চাইল, তারপর চিন্তা করল।

পরক্ষণেই হেসে উঠল। বলল, 'হ্যাঁ ভাইয়া এসেছিলেন। দু'জন এক সাথে এসেছিলাম। তোমাকে দেখে তো উনিই প্রথম বলেন, 'আল্লাহ মার্গারেটেকে বাঁচিয়েছেন।'

ম্লান হাসল মার্গারেট। বলল, 'উনি আছেন?'

‘না আপা। উনি তোমাকে দেখেই দুর্ঘটনার স্পটে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে আবার হাসপাতালে এসেছিলেন। এসে আমার সাথে কিছু কথা বলেই আবার চলে গেছেন।’

বলে জর্জ তার গলার স্বরটা আর একটু নামাল এবং ডা: মার্গারেটের দিকে আর একটু ঝুকে পড়ে বলল, ‘শুরু থেকেই পুলিশ বলছে তোমার ওটা এ্যাকসিডেন্ট, সবাই বিশ্বাসও করেছে। কিন্তু আহমদ মুসা ভাই এ্যাকসিডেন্টের স্পট দেখে এসে আমাকে বলে গেলেন, ‘ট্রাকটি রাস্তার যেখানে এসে মার্গারেটের গাড়ির যে জায়গায় আঘাত করেছে, তাতে এই আঘাত নি:সন্দেহে পরিকল্পিত। সুতরাং এ্যাকসিডেন্ট নয়।’

ডা: মার্গারেটের মুখের আলোটা হঠাৎ দপ করে নিভে গেল। তার ভ্রু কুঞ্চিত হলো। বলল উদ্বিগ্ন কণ্ঠে, ‘ঠিক, আমারও এখন তাই মনে হচ্ছে। ট্রাকটার তীব্র গতি দেখে আমি আমার গাড়ি রাস্তার কিনার বরাবর সরিয়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে এসেই ট্রাকটি আঘাত করে আমার গাড়িকে। ট্রাকটি কি এ্যাকসিডেন্টে পড়েছে?’

‘না পালিয়েছে।’

‘একমাত্র ব্রেক ফেল হলেই ট্রাকটা ঐভাবে আমাকে পাগলের মত আঘাত করতে পারতো। সে ক্ষেত্রে ট্রাকটিও এ্যাকসিডেন্টে পড়ত। তা যখন হয়নি, তখন ঠিকই ওটা এ্যাকসিডেন্ট নয়।’

‘কিন্তু আপা ওটা যদি এ্যাকসিডেন্ট না হয়, তাহলে প্রশ্ন জাগে কে তোমাকে ওভাবে হত্যা করতে চেয়েছিল?’

‘জানি না জর্জ। আমার কোন শত্রু আছে বলে হয় না।’

বলে একটু থেমেই ডা: মার্গারেট আবার বলল, ‘উনি কোথায় গেলেন?’

‘ভাইয়া?’

‘হ্যাঁ।’

‘যে ট্রাকটা এ্যাকসিডেন্ট ঘটিয়েছে, তার খোঁজ পাওয়া যায় কিনা উনি বলেছিলেন। কিন্তু কোথায় কি কাজে গেছেন আমি জানি না।’

ডা: মার্গারেট কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু বলা হলো না। ঘরে প্রবেশ করলেন ডা: ক্লার্ক। তার সাথে ছিল ওয়ার্ডের ডাক্তার।

'এই তো সেরে গেছ মার্গারেট। তুমি খুব লাকি। মাত্র দেড়-দু'ইঞ্চির জন্যে ভয়ানক পরিণতি থেকে বেঁচে গেছ।'

বলতে বলতে ডা: ক্লার্ক ডা: মার্গারেটের সামনে এসে দাঁড়াল।

জর্জ উঠে আগেই পাশে সরে গেছে।

ডা: ক্লার্ক মার্গারেটের একটা হাত তুলে নিয়ে নাড়ী দেখে বলল, 'বাঃ সবকিছুই নরমাল।'

'ধন্যবাদ স্যার।' বলল মার্গারেট।

'শুনলাম, এ্যাকসিডেন্ট খুব মারাত্মক ছিল। অবশ্য তোমার কোন দোষ ছিল না। ট্রাকটাই হঠাৎ নাকি নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিল।' ডা: ক্লার্ক থামল।

ডা: মার্গারেট একটু দ্বিধা করল। তারপর বলল, 'স্যার মাফ করবেন, ঐ রিপোর্টগুলো আপনি পেয়েছেন?'

মার্গারেটের প্রশ্নের সাথে সাথেই ডা: ক্লার্কের মুখ মলিন হয়ে গেল। মুহূর্ত কয়েক বাকহীন হয়ে থাকার পর ডা: ক্লার্ক বলল, 'ও তুমি ঘটনাটা এখনও জানতে পারনি। রিপোর্টগুলো এবং রিপোর্টের সাথে সংশ্লিষ্ট সবকিছু চুরি গেছে।'

'চুরি গেছে?'

'হ্যাঁ। ডা: বিশপ রাতে ডিউটি থেকে যাবার সময় রিপোর্ট তার ফাইলে রেখে গিয়েছিল এবং পরীক্ষিত ব্লাড, ইউরিন ইত্যাদি রীতি অনুসারে ল্যাবেই রাখা ছিল। তোমাকে টেলিফোন করার ক'মিনিট আগে ডা: বিশপ-এর টেলিফোন পাই। টেলিফোন করেই অফিসে যান। অফিসে গিয়ে রিপোর্ট এবং ওগুলোর কিছুই পাননি।'

বিষয়টা ডা: মার্গারেটের জন্যে শ্বাসরুদ্ধকর বিস্ময়ের। কিছুক্ষণ সে কথা বলতে পারল না। ডা: ক্লার্কই আবার কথা বলল বলল, 'আরও কিছু ঘটনা ঘটেছে। তুমি আমার ছাত্রী এবং মেয়ের মত। বলতে বাধা নেই। বিষয়টা খুব জটিল মনে হচ্ছে। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

একটু থামল ডা: ক্লার্ক। দু'পাশে তাকাল। দেখল সাথের ডাক্তার ও নার্স ওদিকের টেবিলের দিকে গিয়ে ডা: মার্গারেটের ফাইল নিয়ে আলোচনা করছে।

ডাক্তার ক্লার্ক বলল, 'চুরির খবর জানার সাথে সাথে আমি বিষয়টাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখি এবং থানায় কেস করার সিদ্ধান্ত নেই এবং পুনরায় লাশ তিনটিকে টেষ্টের চিন্তা করি। সংগে সংগেই বিষয়টা আমি ডা: ওয়াভেল ও ডা: বিশপকে জানিয়ে দেই। মাত্র আধ ঘণ্টা পরে আমি টেলিফোন পাই। একটা ভারি কণ্ঠ যান্ত্রিক স্বরে বলে, 'ডাক্তার সাহেব, তিনটি শিশুর প্যাথোলজিক্যাল টেষ্টের রিপোর্ট এবং আনুসঙ্গিক জিনিসগুলো হারানোর ব্যাপারে থানায় নাকি মামলা করছেন এবং লাশগুলোকে আবার নাকি পরীক্ষা করাবেন শুনলাম। শুনুন ডাক্তার, বিশেষ প্রয়োজনে ওগুলো আমরা নিয়েছি। আমরা চাই, নতুন টেষ্ট এবং থানায় মামলা করার ব্যাপারে এক ইঞ্চি এগুবেন না। এগুলে রিপোর্টগুলো যেভাবে গায়েব হয়েছে, সেভাবে আপনিও গায়েব হয়ে যাবেন।'

শুকনো কণ্ঠে কথাগুলো বলল ডা: ক্লার্ক। তার চোখে-মুখে ভয়ের চিহ্ন।

'তারপর স্যার?' ভয় মেশানো উদগ্রীব কণ্ঠে বলল ডা: মার্গারেট।

'ডা: ওয়াভেলের সাথে আলাপ করলাম। ডা: বিশপ-এর সাথেও। ডা: ওয়াভল এই ছোট্ট বিষয় নিয়ে কোন ঝুঁকি নেয়ার বিরোধীতা করলেন। অন্যদিকে ডা: বিশপ ভীত হয়ে পড়েন। তবে মামলা ও টেষ্টের পক্ষে তিনি। কিন্তু আবার মামলার জড়িত হয়ে বিপদ ডেকে আনতে চান না। এই অবস্থায় মামলা করা ও নতুন পরীক্ষায় সাহস পাচ্ছি না।' বলল ডা: ক্লার্ক।

হতাশা নেমে এল ডা: মার্গারেটের চোখে মুখে। বলল, 'তাহলে শিশু তিনটির মৃত্যুর কারণ জানার আর উপায় রইল না স্যার। তার ফলে এভাবে হয়তো শিশু মৃত্যু ঘটেই চলবে।'

'স্যরি, মাই ডটার।'

বলে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ডা: ক্লার্ক বলল, 'তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠো। ঈশ্বর আছেন মার্গারেট।'

ডা: ক্লার্ক চলে যাবার অনেক সময় পর। ডা: মার্গারেট তার বেডে শুয়ে। আহমদ মুসা তার পাশে চেয়ারে বসে। জর্জ দাড়িয়েছিল আহমদ মুসার পেছনে। ডাক্তার, নার্স, কেউ তখন ঘরে নেই।

ডাক্তার মার্গারেট গত তিনদিনের কাহিনী বলছিল আহমদ মুসাকে। বলছিল কিভাবে সেদিন প্রথম মুসলিম শিশুটির মৃত্যু হওয়ায় সন্দেহ জাগে, কিভাবে মৃত শিশুর পোষ্টমর্টেম মার্গারেট দাবী করলে ডাক্তার ওয়াভেল তার বিরোধীতা করেন, কিভাবে ডাক্তার ক্লার্কের সমর্থনে শিশুটির লাশ পোষ্টমর্টেমে যায়, কিভাবে ১দিন পরে দু'টি মুসলিম শিশু দুর্বোধ্য রোগে সংকটজনক অবস্থায় পড়ে। ডা: মার্গারেট তার প্যাথোলজিক্যাল টেষ্টের সুপারিশ করেন এবং ডাক্তার ওয়াভেলের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন, কিভাবে তাদের টেষ্ট অবশেষে হয়, কিভাবে তিনটি টেষ্টের রিপোর্ট ও পরীক্ষিত আইটেম মিসিং হয়েছে, কিভাবে তার এ্যাকসিডেন্ট হয় এবং কিছুক্ষণ আগে ডা: ক্লার্ক তার উপর হুমকি আসার বিষয়ে কি বলে গেলেন।

গভীর মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনছিল আহমদ মুসা।

কাহিনী শেষ করে ডা: মার্গারেট থামলেও আহমদ মুসা কথা বলল না।

ভাবছিল সে। তার চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

বলল সে ডাক্তার মার্গারেটকে লক্ষ্য করে, 'তুমি দু'দিনে বহুদূর এগিয়েছ। শিশু তিনটির মৃত্যুর কারণ জানা গেল না, কিন্তু কারণের উৎস চিহ্নিত হয়ে গেছে। তোমাকে ধন্যবাদ মার্গারেট।'

ডা: মার্গারেটের চোখ-মুখ আনন্দের বন্যায় ভেসে গেল। আহমদ মুসা তার কাজের স্বীকৃতি দিয়েছে, প্রশংসা করেছে, এটুকু পাওয়ায় তার সব ব্যথা-বেদনা ভুলিয়ে দিল। দুর্বোধ্য একটা আনন্দের সুখ-শিহরণ খেলে গেল তার দেহ, মনে এবং প্রতিটি রক্ত কণিকায়।

একটু সময় নিয়ে ডাক্তার মার্গারেট বলল, 'উৎস চিহ্নিত হয়েছে? আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'এটুকু জেনে রাখ আইসবার্গের অনেক মাথার একটা মাথা ডা: ওয়াভেল হতে পারেন।'

বিস্মিত ডা: মার্গারেট কিছু বলতে যাচ্ছিল। আহমদ মুসা তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'ডা: ওয়াভেলের বাসা কোথায়?'

'হাসপাতালের পাশেই ডাক্তারদের রেসিডেন্সিয়াল ব্লকে। নম্বার এফ-১৩।'

'ওর কোন ক্লিনিক আছে?'

'নিজস্ব ক্লিনিক নেই, কিন্তু একটা ক্লিনিকে তিনি বসেন। বাসায় আমার টেলিফোন ইনডেক্সে ঠিকানা আছে।'

'মার্গারেট তিনটি শিশুর নাম আমার দরকার। রিপোর্টে তাদের নাম যেভাবে আছে।'

মার্গারেট তাকাল জর্জের দিকে। কাগজ কলম নিতে বলল জর্জকে। মার্গারেট নাম তিনটি বলল লিখে নিল জর্জ। নাম লেখা স্লিপটা হাতে নিয়ে ভাঁজ করে পকেটে রাখতে রাখতে বলল, 'ধন্যবাদ মার্গারেট।'

'এসব নিলেন, কিছু করতে চাচ্ছেন?' বলল মার্গারেট উদ্বিগ্ন কণ্ঠে।

'কতটুকু কি করতে পারব জানি না। কিছু করতে তো হবেই এবং সেটা কাল সকালের আগেই।'

'কি সেটা?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠ মার্গারেটের।

'সবই জানবে, তবে এখন নয়, এখানে নয়।'

বলে উঠে দাঁড়াচ্ছিল আহমদ মুসা।

রুমে প্রবেশ করল লায়লা জেনিফার এবং সারা উইলিয়াম। কথা না বললে ওদের চিনতেই পারতো না আহমদ মুসা। দু'জনের পরণে ছেলের পোশাক। মাথায় হ্যাটও ছেলেদের। বলা যায় নিখুঁত ছদ্মবেশ।

বাইরে বেরুলে লায়লা জেনিফারকে ছদ্মবেশ নিতে বলা হয়েছে। এটা আহমদ মুসারই নির্দেশ।

বা! তোমরা সুন্দর ছদ্মবেশ নিয়েছ।' বলল জেনিফারদের আহমদ মুসা।

'না ভাইয়া, এ আমি পারব না। কি লজ্জা, তার চেয়ে ভাল আমি বাইরেই বেরুব না।' মুখ লাল করে বলল জেনিফার।

‘বেশিদিন এ কষ্ট করতে হবে না জেনিফার। দেখ তোমার তালিকায় এবার মার্গারেটও পড়েছে। আজ আল্লাহ তাকে বাঁচিয়েছেন। মার্গারেটকেও সাবধান থাকতে হবে।’

বলে আহমদ মুসা মার্গারেটের দিকে তাকিয়ে বলল, ’যে কয়দিন তুমি হাসপাতালে আছ, তেমন কোন ভয় নেই। কিন্তু তারপর আমার মনে হয় একটা বিপজ্জনক সময় তোমাকে পাড়ি দিতে হবে।’

‘কেমন?’ বলল মার্গারেট।

‘সামনে তুমি শত্রুর আরও বড় টার্গেট হয়ে দাঁড়াতে পার।’

‘জানি, আপনি বেশি বেশি ভয় দেখাচ্ছেন, যাতে আমি সাবধান হই।’

‘না মার্গারেট, সাউথ টার্কো দ্বীপের এক পর্যায়ের লড়াই সমাপ্ত হলো। আরেক লড়াই শুরু হয়ে গেছে।’ বলল গম্ভীর কণ্ঠে আহমদ মুসা।

থামল আহমদ মুসা। একটু থেমেই আবার শুরু করল, ‘সত্যি আমি একটু স্লো হয়ে গিয়েছিলাম, বুঝতে পারিনি, আঘাতটা দ্রুত আসবে। সবই আল্লাহর ইচ্ছা, কিন্তু আমার অসাবধানতার জন্যে মার্গারেটের জীবন বিপন্ন হয়েছিল।’

বিষন্ন হয়ে উঠল মার্গারেটের মুখ। বলল, ‘না পরিস্থিতিটা আপনাকে জানাইনি, এটা আমারই দোষ।’

‘না মার্গারেট, আমার এখন মনে হচ্ছে, খুব একটা চিন্তা না করেই তোমাকে কঠিন এক বিপদে ঠেলে দিয়েছি। হয়তো এই কাজটা অন্যভাবে করতে পারতাম।’

ডা: মার্গারেটের মুখে ক্ষোভের চিহ্ন ফুটে উঠল। চোখের দৃষ্টি আবেগে ভারি হয়ে উঠেছে তার। বলল, ‘সব বিপদ আপনি আপনার জন্যে বরাদ্দ করে নেবেন। কেন বিপদ মোকাবিলার মন, শক্তি কিছুই বুঝি আমাদের নেই। আদেশ দিয়ে দেখুন না, আগুনেও ঝাপ দিতে পারি কিনা।’ কণ্ঠ ভারি মার্গারেটের। কথা শেষ করেই ওপাশে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে মার্গারেট।

আহমদ মুসা হাসল। উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘ধন্যবাদ মার্গারেট তোমাদের। আমি নিশ্চিত, লড়াইয়ে আমরা জিতব। ক্যারিবিয়ান দ্বীপাঞ্চল তোমাদের যে পেয়েছে, এ জন্যে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি।’

কথা শেষ করে আহমদ মুসা ফিরল জেনিফারের দিকে। আহমদ মুসা কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল। কিন্তু আহমদ মুসার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জেনিফার বলল, 'ভাইয়া মার্গারেট আপা'র মত সাহসীদের লক্ষ্য করে 'তোমাদের' শব্দ বললেন, তার মধ্যে আমি আছি কিনা?'

'কেমন করে থাকবে? একটা ছদ্মবেশ পরার ভয়ে বাইরে বেরুতে চাচ্ছ না। তাহলে কি পারবে তুমি বল?' হেসে বলল আহমদ মুসা।

'ঠিক আছে পারব না। একদিন একটা গাড়ি এ্যাকসিডেন্ট করে দেখাব।'

'এ্যাকসিডেন্ট করো, কিন্তু আহত, নিহত না হও সেটা দেখো।'

'তাতে কার কি ক্ষতি?'

'এ প্রশ্নের জবাব জর্জ দিতে পারবে। তবে আমার একটা ক্ষতি আছে, ঝগড়া করা ও ঝামেলা পাকাবার লোক থাকবে না।'

'আমি ঝামেলা পাকাই?'

'তুমি ঝামেলা পাকিয়েই তো আমাকে নিয়ে এসেছ।'

বলেই আহমদ মুসা 'চলি' বলে হাঁটা শুরু করল কক্ষ থেকে বেরুবার জন্যে।

জেনিফার ছুটে গিয়ে আহমদ মুসার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমার তো আরও কথা আছে। যেতে দেব না।'

আহমদ মুসা তাকে পাশ কাটিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'সাউথ টার্কো দ্বীপে পুলিশ প্রহরা ভালো চলছে। শত্রুদের চররা কিছুদিন সাউথ টার্কো দ্বীপে সক্রিয় ছিল, কিন্তু কোন খবর সংগ্রহ করতে না পেরে, তারা হাল ছেড়ে দিয়েছে, ইত্যাদি কথা বলবে তো আমি জানি।'

আহমদ মুসা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ডা: মার্গারেট আবার এ পাশ ফিরেছে। জেনিফারকে লক্ষ্য করে বলল, 'তোমাকে উনি এত ¯েœহ করেন তাতো জানতাম না।'

'আর আপনাকে যে উনি আকাশে তুললেন সেটা কি?'

'আকাশে তোলা আর কাছে টানা এক জিনিস নয়।'

কথাটা বলেই মার্গারেট বুঝতে পারল মুখ ফসকে যা বলার নয় তাই বেরিয়ে গেছে। কথাটা সংশোধন করার জন্যে মার্গারেট সংগে সংগেই আবার বলল, 'তোমার মত অমন কাছে হতে পারা সবার জন্যেই সৌভাগ্যের।'

জেনিফার জর্জের দিকে চেয়ে একটা দুষ্টুমি হেসে ডাঃ মার্গারেটকে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ডাক্তার ও নার্স ঘরে এসে প্রবেশ করায় মুখ তেতো করে নীরব হয়ে যেতে হলো জেনিফারকে।

ডাঃ মার্গারেটের কক্ষ থেকে বের হয়ে আহমদ মুসা প্রথম কাজ ঠিক করল, ডাঃ ওয়াভেল কোথায় তা জানা।

আহমদ মুসা নিঃসন্দেহ যে, হয় ডাঃ ওয়াভেল নিজে রিপোর্টগুলো চুরি করেছে, না হয় সে চুরি করতে সাহায্য করেছে। সুতরাং তাকে পাওয়া দরকার।

আহমদ মুসা ছুটল ডিউটি রুমের দিকে।

ওয়ার্ডগুলোর প্রবেশ মুখে সিঁড়ি ও লিফট রুমের পাশেই ডিউটি রুম।

ওয়ার্ডে প্রবেশের আগে ডাক্তার ও ষ্টাফরা তাদের ডিউটি কার্ড রেজিষ্টার মেশিনে ঢুকিয়ে ডেট ও টাইম এন্ট্রি করিয়ে নেয়। ডিউটি থেকে ফেরার সময়ও তাই করে।

ডিউটি রুমে ডিউটি অফিসারের চেয়ারে একটি মেয়ে। কক্ষে সেই একমাত্র লোক।

আহমদ মুসা ঘরে ঢুকে গুড ইভনিং জানিয়ে ডিউটি অফিসার মেয়েটিকে বলল, 'একটা ব্যাপারে আপনার সাহায্য পেতে পারি?'

'অবশ্যই। কি করতে পারি বলুন?' গোঁফওয়ালা আনকমন একজন যুবকের দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে চেয়ে বলল মেয়েটি।

'আমি ডাঃ ওয়াভেল সম্পর্কে জানতে চাই। তিনি ডিউটিতে আছেন কিনা।'

মেয়েটি বলল, 'প্লিজ বসুন, এখনি জানাচ্ছি।'

বলে মেয়েটি তার সামনের কম্পুটারের দিকে মনোযোগ দিল। তার হাতের দুটো আঙুল কয়েকটি কম্পুটার নব-এর উপর ঘুরে এল।

কম্পুটার স্ক্রিনে ভেসে উঠল কয়েকটি শব্দ, কয়েকটি অংক। সেদিকে একবার চোখ বুলিয়েই মেয়েটি বলল, 'ডাঃ ওয়াভেল আধ ঘণ্টা আগে রাত ৭টায় চলে গেছেন। শরীর খারাপ বলে আজ একটু আগেই চলে গেছেন।'

শরীর খারাপ হওয়ার কথা শুনে হঠাৎ আহমদ মুসার মনে প্রশ্ন জাগল, এর মধ্যে কোন তাৎপর্য নেই তো!

আহমদ মুসা চট করে প্রশ্ন করল, 'অসুস্থ ছিলেন! কিন্তু আমাকে তো আসতে বলেছিলেন!'

'অসুস্থ ছিলেন না। হঠাৎ করেই খারাপ ফিল করে চলে গেছেন।' বলল মেয়েটি।

'এ রকম প্রায়ই তাঁর হয় বুঝি?' বলল আহমদ মুসা।

'না, এভাবে তার চলে যাবার দৃষ্টান্ত নেই।'

'তাহলে তাঁকে বাড়িতে পাওয়া যেতে পারে।'

'সম্ভবত।'

'অনেক ধন্যবাদ।' বলে আহমদ মুসা ডিউটি রুম থেকে বেরিয়ে এল।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে ভাবল আহমদ মুসা, 'ডাঃ ওয়াভেল নিশ্চয় অসুস্থ নন। কিন্তু অসুস্থতার কথা বলে আগেই চলে গেছেন কেন, যা তিনি কখনই করেননি। কোন জরুরী কাজে কি গেছেন? সে কাজটা কি?

আহমদ মুসা এই মুহূর্তেই ডাঃ ওয়াভেলের বাসায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

হাসপাতালের উত্তর পাশে ডাক্তারদের জন্যে নির্দিষ্ট রেসিডেন্সিয়াল ব্লকে ডাঃ ওয়াভেলের বাড়ি।

রেসিডেন্সিয়াল ব্লকের উত্তর প্রান্তের শেষ বাড়িটা ডাঃ ওয়াভেলের। এর পরেই শুরু হয়েছে আরেকটা রেসিডেন্সিয়াল ব্লক।

বাড়িটা খুবই নিরিবিলি।

আহমদ মুসা বাড়ির চারদিক দেখল। ব্লকের সব বাড়িই এক রকম। বাড়িতে ঢোকার প্রধান প্যাসেজ একটা। বাড়ির অন্য পাশে চাকর-বাকরদের জন্যে আরও একটা ছোট প্যাসেজ রয়েছে।

ডাক্তারের দর্শনার্থী একজন রোগীর মত স্বাভাবিক হেঁটে আহমদ মুসা বাড়িটার দরজায় গিয়ে দাঁড়াল।

রাত তখন ৮টা।

আহমদ মুসা তেমন একটা ছদ্মবেশ নেয়নি। মুখে একটা গোঁফ লাগিয়েছে মাত্র। মাথার হ্যাটটা কপালের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত নামানো।

দরজায় নক করল আহমদ মুসা।

আধা মিনিটের মধ্যেই দরজা খুলে গেল।

বার-তের বছরের একটা ছেলে দরজায় দাঁড়ানো।

দরজা খুলে যাওয়ার সাথে সাথে আহমদ মুসার দৃষ্টি ছুটে গেল ভেতরে।

দরজার পরেই একটা করিডোর। করিডোরটি প্রশস্ত।

করিডোরের দক্ষিণ দেয়ালে একটা দরজা। উত্তর দেয়ালেও আরেকটা। উত্তর দরজার উপরে শিরোনাম 'টয়লেট'। অল্প পশ্চিমে এগিয়ে করিডোরটি বড়, ফাঁকা একটা স্পেসে গিয়ে শেষ হয়েছে।

'কে আপনি? কাকে চাই?' ছেলেটি প্রশ্ন করল।

'আমি ডাঃ ওয়াভেলের সাথে সাক্ষাত করতে চাই। আছেন তিনি?'

'আছেন। কি বলব তাকে?'

'হাসপাতালে গিয়ে ওকে পাইনি, তাই এখানে এসেছি। খুব জরুরী দরকার।'

ছেলেটি করিডোরের দক্ষিণ পাশের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

এক মিনিটের মধ্যে ফিরে এসে বলল, 'উনি এখন ব্যস্ত। আধঘণ্টা পরে আসুন, নয়তো কাল হাসপাতালে দেখা করতে বলেছেন।'

'ঠিক আছে তুমি গিয়ে বল, আমি আধঘণ্টা দাঁড়াচ্ছি।'

ছেলেটি আবার গেল সেই কক্ষে। আহমদ মুসার মনে হলো, কক্ষটি বাইরের ড্রইং রুম, নয়তো ডাঃ ওয়াভেলের পার্সোনাল কোন ঘর। করিডোরের সামনে যে সুদৃশ্য কার্পেট মোড়া স্পেস দেখা যাচ্ছে, ওটাই মূল ড্রইং রুম।

ছেলেটি ফিরে এসে বারান্দায় চেয়ার দেখিয়ে বলল, 'এখানে তাহলে বসুন।'

বলেই ছেলেটি করিডোর দিয়ে বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

ছেলেটি চলে যেতেই আহমদ মুসা ভেতরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিল। তারপর পকেটে হাত দিয়ে রিভলবার স্পর্শ করে দক্ষিণ দিকের দরজা দিয়ে ঘরটিতে প্রবেশ করল।

ঘরে তিনজন লোক। একদিকের সোফায় দু'জন, অন্যদিকে একজন।

একজন মধ্য বয়সী। অন্য দু'জন যুবক। আহমদ মুসা বুঝতে পারলো মধ্য বয়সী জনই ডাঃ ওয়াভেল। তারা মুখো-মুখি বসে। তাদের মাঝখানে টেবিলের উপর একটা ছোট ফাইল। আহমদ মুসা ঢুকেই দরজা লাগিয়ে দিল।

আহমদ মুসাকে ঢুকতে দেখেই ডাঃ ওয়াভেল ফাইলটি টেবিল থেকে সোফায় সরিয়ে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়িয়েছে। তার চোখে তীব্র দৃষ্টি। বলল, 'কে আপনি?'

আহমদ মুসার দু'হাতই পকেটে।

ধীরে ধীরে এগুলো ওয়াভেলের দিকে।

ডাক্তার ওয়াভেলের সামনে বসা দু'জন লোক তখনও বসে। তাদের চোখ-মুখ দেখলে মনে হয় তারা ব্যাপারটা বুঝার চেষ্টা করছে।

আহমদ মুসা ডাঃ ওয়াভেলের কাছাকছি পৌছে ডাঃ ওয়াভেলকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'কি চাই বলছি ডাঃ ওয়াভেল, তার আগে ঐ ফাইলটা একটু দেখে নেই।'

আহমদ মুসার কথার সাথে সাথেই ডাঃ ওয়াভেলের মুখ মরার মত পাংশু হয়ে উঠল।

সোফায় বসা যুবক দু'জনও সংগে সংগে উঠে দাঁড়িয়েছে।

'ফাইলটি দিন ডাঃ ওয়াভেল। দু'বার বললাম। আমি এক আদেশ কিন্তু দু'বার দেই না।' চাপা কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা কথাগুলো।

ডাক্তার ওয়াভেলকে কথা বলার সময় আহমদ মুসা খেয়াল করেনি যে, যুবক দু'জন সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তাদের দু'জনেরই দুই পা তীব্র গতিতে এগুলো ভারি টিপয় লক্ষ্যে।

মুহূর্তেই টিপয় টেবিলটি উপরে উঠে তীব্র বেগে এল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা যখন টের পেল, তখন সময় ছিল না।

আহমদ মুসা টিপয়টির আঘাত খেয়ে পাশের সোফার উপর ছিটকে পড়ে গেল।

টিপয় ছুঁড়ে দেয়ার পর ওরাও ঝাঁপিয়ে পড়ল আহমদ মুসার ওপর। কিন্তু আহমদ মুসা টিপয়ের আড়ালে থাকায় তাকে বাগে আনা ওদের পক্ষে অসুবিধা হচ্ছিল।

ওদিকে আহমদ মুসা টিপয়ের ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলেও দু'হাত দিয়ে টিপয়টি সে অবশেষে ধরতে পেরেছিল। সুতরাং তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়া দু'জনকে টিপয় দিয়ে ধাক্কা মেরে তার উপর থেকে সরিয়ে দিয়ে সংগে সংগে উঠে দাঁড়াল এবং পকেট থেকে রিভলবার হাতে তুলে নিল।

যুবক দু'জনও নিজেদের সামলে নেবার পর পকেট থেকে রিভলবার বের করেছিল এবং রিভলবার তুলছিল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে।

কিন্তু আহমদ মুসার রিভলবার আগেই উঠেছিল।

আহমদ মুসার সাইলেন্সার লাগানো রিভলবার পর পর দু'বার অগ্নি বৃষ্টি করল।

গুলী দু'টি যুবক দু'জনের রিভলবার ধরা হাত গুড়ো করে দিল।

ওদেরহাত থেকে রিভলবার ছিটকে পড়ল।

দু'জনেই আহত হাত চেপে ধরে বসে পড়ল।

আহমদ মুসা ওদের দু'টি রিভলবার কুড়িয়ে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ডাঃ ওয়াভেলের দিকে।

ডাঃ ওয়াভেল তখন দাঁড়িয়ে কাঁপছিল।

আহমদ মুসা তাঁর দিকে রিভলবার তাক করে বাম হাত বাড়াল ফাইল নেবার জন্যে।

ডাঃ ওয়াভেল আহত যুবক দু'জনের দিকে একবার তাকিয়ে কম্পিত হাতে ফাইলটি সোফার উপর থেকে নিয়ে আহমদ মুসার হাতে তুলে দিল।

আহমদ মুসা তার দিকে রিভলবার তাক করে থেকেই ফাইলের উপর নজর বুলাল। দেখল, কম্পুটারে টাইপ করা চার-পাঁচ শিট কাগজ হোয়াইট ঈগল নামক সংস্থার প্যাডে। শিরোনাম দেখে চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আহমদ মুসার। শিরোনামে বড় বড় অক্ষরে লিখা, 'এ রিভিউ অব মুসলিম পপুলেশন কনট্রোল প্রজেক্ট অব ক্যারিবিয়ান রিজিওন।'

কিন্তু আহমদ মুসা ফাইলে শিশু তিনটির প্যাথোলজিক্যাল রিপোর্ট পেল না।

ফাইল বন্ধ করে আহমদ মুসা তীব্র চোখে তাকাল ডাঃ ওয়াভেলে দিকে। বলল, 'চুরি করে আনা তিনটি প্যাথোলজিক্যাল রিপোর্ট কোথায়?'

কাঁপতে কাঁপতে মরার মত মুখ করে ডাঃ ওয়াভেল বলল, 'আমি আনিনি, আমি জানিনা।'

আহমদ মুসার তর্জনি চাপ দিল রিভলবারের ট্রিগারে। বেরিয়ে গেল একটা গুলী নিঃশব্দে। গুলীটা ডাঃ ওয়াভেলের কানের উপর দিয়ে মাথার এক টুকরো চামড়া তুলে নিয়ে চলে গেল।

শক খাওয়া মানুষের মত কেঁপে উঠল ডাঃ ওয়াভেল।

আর এক মুহূর্ত দেরী করলে গুলী এবার মাথা গুড়ো করে দেবে।' স্থির, কঠোর কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

সংগে সংগেই ডাঃ ওয়াভেল কম্পিত হাতে পকেট থেকে কাগজের কয়েকটা শিট বের করে টিপয়ের উপর রাখল।

আহমদ মুসা কাগজের শিটগুলো তুলে নিয়ে দেখল, তিনটি শিশুরই পরীক্ষাগুলোর উপাত্ত এবং ডাক্তারের ডায়াগনসিস রয়েছে।

'ধন্যবাদ ডাঃ ওয়াভেল।'

বলে আহমদ মুসা পিছু হটে বেরুবার দরজার দিকে আসতে শুরু করল। আহত যুবকদের একজন জিজ্ঞেস করল, 'কে আপনি?'

'মানুষ এবং চোর আর অত্যাচারীদের যম।'

আহমদ মুসা ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে করিডোরে পথে বাড়ির ভেতর দিকে তাকাল। দেখল, করিডোরের মাথায় ফাঁকা স্পেসটাতে

একজন বয়স্ক মহিলা সহ কয়েকজন ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের চোখে-মুখে ভয়ার্ত দৃষ্টি। আহমদ মুসা বুঝল, ভেতরের কথা তারা কিছু জানতে পেরেছে।

পরক্ষণেই আহমদ মুসা ভাবল, ওরা কি পুলিশে খবর দিয়েছে?

এই কথা ভাবার সাথে সাথেই আহমদ মুসা তাকাল বাইরের দরজার দিকে। দেখল, দরজা ভেতর থেকে লক করা। অথচ আহমদ মুসা দরজা তখন লক করে যায়নি।

আহমদ মুসার কাছে বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে গেল। এই সময় আহমদ মুসা বাইরে বাড়ির সামনে গাড়ির শব্দ পেল।

আহমদ মুসা দ্রুত এগুলো মহিলাদের দিকে। তাদের সামনে দাঁড়িয়ে দ্রুত বলল, 'মিসেস ওয়াভেল এই ফাইল আপনার স্বামী হাসপাতাল থেকে চুরি করে শত্রুদের দিতে যাচ্ছিল। আমি এটা উদ্ধার করে নিয়ে গেলাম। দেখুন আমার দু'হাতে গ্লাভস। এ ফাইলে এবং ভেতরের কাগজ-পত্রে আপনার স্বামীর ফিংগার প্রিন্ট আছে। পুলিশের হাতে আমি এখন ফাইলটি দিলে আপনার স্বামী দেশদ্রোহীতার অভিযোগে জেলে যাবে। বাইরে পুলিশ এসেছে, আপনি তাদের কি বলবেন ভেবে দেখুন।'

মিসেস ওয়াভেলের ভয়-কাতর মুখে উদ্বেগের ছায়া ফুটে উঠল। তার সামনে দাঁড়ানো শত্রু যুবকটির ঋজু কথাকে তার মন সত্য বলে মেনে নিতে বাধ্য হলো। তাছাড়া তার স্বামীর কিছু অস্বাভাবিক আচরণ এবং আজ দেখা একটা ফাইলের কথা তার মনে পড়ে গেল।

বাইরে থেকে নক হতে শুরু করেছে।

আহমদ মুসার দিকে একবার তাকাল মিসেস ওয়াভেল। আহমদ মুসার হাতের রিভলবারও দেখল সে। তারপর এগুলো বাইরের দরজার দিকে।

দরজা খুলল মিসেস ওয়াভেল।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একজন পুলিশ অফিসার। বারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে আরও দু'জন। আরেকজন পুলিশ গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসে তখনও।

'গুড ইভনিং। আপনারা?' পুলিশদের দিকে তাকিয়ে পুলিশ অফিসারকে লক্ষ্য করে বিস্মিত কণ্ঠে বলল মিসেস ওয়াভেল।

‘কেন, আপনারা পুলিশকে টেলিফোন করেননি? আপনার বাসার নম্বার ১৫-এর এ নয়?’

‘হ্যাঁ। কিন্তু আমরা তো এ ধরনের টেলিফোন করিনি?’

‘এটা কি ডাঃ ওয়াভেলের বাড়ি নয়?’

‘হ্যাঁ।’

‘আমাদের তো বলা হয়েছে ডাঃ ওয়াভেল সন্ত্রাসীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে।’

হেসে উঠল মিসেস ওয়াভেল। বলল, ‘কেউ নিশ্চয় আপনাদের মিস গাইড করেছে। দুঃখিত।’

‘স্যরি, আপনাদের বিরক্ত করার জন্যে।’ বিষণœ কণ্ঠে বলল পুলিশ অফিসারটি।

পুলিশের গাড়ি চলে গেল।

পুলিশ চলে গেলে মিসেস ওয়াভেল ফিরে এল।

‘ধন্যবাদ মিসেস ওয়াভেল। পুলিশ চলে যাওয়ায় আমি বাড়তি ঝামেলা থেকে বাঁচলাম। আপনার স্বামীও বাঁচল। ঐ ঘরে আপনার স্বামীর সাথে দু’জন ক্রিমিনাল রয়েছে। ওদের স্বার্থেই আপনার স্বামী হাসপাতাল থেকে এই ফাইল চুরি করেছিল।’ বলে আহমদ মুসা যাবার জন্যে পা বাড়াল।

‘থামুন।’ পেছন থেকে বলল মিসেস ওয়াভেল।

ফিরে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

‘আপনি কে? আপনি হাসপাতালের লোক?’

‘আমি মিথ্যা বলব না। তাই আপনার এ প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না। এটুকু জেনে রাখুন, আমি আপনাদের শত্রু নই। আপনারাও আমার শত্রু নন। এক ক্ষতিকর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গিয়েই আমাকে এখানে এভাবে আসতে হয়েছে।’

‘কি ষড়যন্ত্র?’

‘আমি এখন বলতে পারবো না।’

‘আমি বলি?’

চমকে উঠে আহমদ মুসা মিসেস ওয়াভেলের মুখের দিকে তাকাল। বলল, ‘আপনি জানেন?’

‘জানি। ক্যারিবিয়ান এলাকা থেকে মুসলিম জনসংখ্যা বিনাশের ষড়যন্ত্র। একটা গোপন ফাইল হঠাৎ আমার হাতে আসায় আমি জেনেছি।’

‘ষড়যন্ত্র আপনি সমর্থন করেন?’

‘না। আমার স্বামীও করেন না। কিন্তু বাঁচতে হলে ষড়যন্ত্রে সহযোগিতা না করে তাঁর উপায় নেই।’

একটু থামল মিসেস ওয়াভেল। একটা ঢোক গিলেই আবার শুরু করল, ‘কিন্তু আপনি এমন একটা দু’টো ফাইল উদ্ধার করে, দু’চারজনকে মেরে বা হত্যা করে এ ষড়যন্ত্রের সামান্য গতিরোধও করতে পারবেন না। এ পন্ডশ্রম হবে মাত্র।’

কৌতুহলী চোখে আহমদ মুসা মিসেস ওয়াভেলে দিকে তাকাল। বলল, ‘তাহলে এ ষড়যন্ত্র অপ্রতিরুদ্ধ আপনি মনে করেন?’

‘তা মনে করি না। কিন্তু যে আন্তর্জাতিক প্রচার-প্রতিক্রিয়া এর গতিরোধ করতে পারে, তা এখানে কারো হাতে নেই।’

বিস্মিত হলো আহমদ মুসা মিসেস ওয়াভেলের কথা শুনে। বলল, ‘আপনি শুধু মিসেস ওয়াভেল নন, কে আপনি?’

‘আমি মিসেস ওয়াভেল, সেই সাথে চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ের অধ্যাপিকা।’ গম্ভীর কণ্ঠে বলল মিসেস ওয়াভেল।

‘আপনি কেন আমাকে সহযোগিতা করলেন? ঐ ষড়যন্ত্র পছন্দ করেন না বলেই কি?’

‘সেটা তো বটেই। আরও কারণ আছে?’

‘কি সেটা?’

‘আমি টার্কস দ্বীপপুঞ্জের সকল মানুষের ঐক্য ও মিলনে বিশ্বাসী।’

‘কেন?’

‘আপনি কে না জানলে এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।’

আহমদ মুসা গভীরভাবে দেখছিল মিসেস ওয়াভেলকে। যেন তার দৃষ্টি প্রবেশ করেছে মিসেস ওয়াভেলের অন্তরেও। বলল আহমদ মুসা, 'আপনার উত্তরটা আমিই দেই?'

কিছুটা বিস্ময় মিসেস ওয়াভেলের চোখে। বলল, 'বলুন।'

'আপনি এই দ্বীপপুঞ্জের স্বাধীনতা চান।'

চমকে উঠল মিসেস ওয়াভেল। তার চোখে এবার রাজ্যের বিস্ময়। বিস্ময়ের ধাক্কায় কিছুক্ষণ সে কথা বলতে পারল না। একটু পর বলল, 'কে আপনি?' অনেক প্রশ্ন ও কৌতুহলের ভীড় তার চোখে এবং কিছুটা ভয়ও।

'ভয় নেই। আমি সরকারী গোয়েন্দা নই।'

'কিন্তু কে আপনি?'

'দুঃখিত, আপনার এ প্রশ্নটার উত্তর এখন দিতে পারছি না। তবে পরিচয়টা আপনাকে দেয়া যাবে।'

'আরেকটা প্রশ্ন, আপনি অনুমানটা কিসের ভিত্তিতে করলেন?'

'অনুমানটা সত্যি কিনা?'

'দয়া করে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।'

'খুব সহজ উত্তর। আপনি 'হোয়াইট ন্যাশনালিজম ষড়যন্ত্রের বিরোধী, অন্যদিকে টার্কস দ্বীপপুঞ্জের সব মানুষের ঐক্য চান। কেন চান? কোন স্বার্থে চান? কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য চান? এসব প্রশ্নের উত্তর একটাই, আপনি ঐ দ্বীপপুঞ্জের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। দ্বীপপুঞ্জের সব মানুষের ঐক্যের মাধ্যমেই এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব।'

বিস্ময়ে ছানাবড়া হয়ে উঠল মিসেস ওয়াভেলের চোখ। বলল, 'সত্যি কে আপনি? না বললে আমি উদ্বেগে থাকবো।'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'উদ্বেগের কারণ নেই। আমি বৃটিশ সরকারের লোক নই। আমি মিথ্যা কথা বলি না।'

বলে আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়িয়ে বেরুবার জন্যে দরজার দিকে হাঁটা শুরু করল।

আহমদ মুসার চলার পথের দিকে তাকিয়ে ছিল মিসেস ওয়াভেল।

‘অদ্ভুত লোক তো আম্মা?’

‘অদ্ভুত শুধু নয়, অকল্পনীয় এক চরিত্র।’

বলেই মিসেস ওয়াভেল ছুটল বন্ধ ড্রইং রুমের দিকে যেখানে তার স্বামী বন্ধ আছে।

ফার্ডিন্যান্ড মাথা নিচু করে তিনটি মুসলিম পুরুষ শিশুর মৃত্যু নিয়ে ডাঃ মার্গারেট ও ডাঃ ওয়াভেলের কাহিনী, ডাঃ ওয়াভেল কর্তৃক প্যাথোলজিক্যাল রিপোর্ট চুরির কথা এবং সর্বশেষ ডাক্তার ওয়াভেলের বাড়িতে একজন মাত্র যুবক এসে কিভাবে তিনজনকে আহত করে মুসলিম পপুলেশন কনট্রোল রিভিউ রিপোর্ট ও প্যাথোলজিক্যাল রিপোর্টগুলো নিয়ে গেল তার কাহিনী শুনছিল।

তার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল ডাঃ ওয়াভেলের ড্রইং রুম থেকে ফিরে আসা সেই দুই যুবক এবং পাশের একটি সোফায় বসেছিল অপারেশন চীফ হিসেবে নতুন দায়িত্ব প্রাপ্ত হের বোরম্যান।

যুবক দু’জনের কথা শেষ হলে মাথা তুলল ফার্ডিন্যান্ড। তার দুই চোখ রক্তের মত লাল। তীব্র কণ্ঠে বলল, ‘একজন লোক এসে তোমাদের জীবনের চেয়ে মূল্যবান রিপোর্ট নিয়ে তোমাদের ঘরে বন্ধ করে বেরিয়ে গেল। আর তোমরা এটা জানাতে এসেছ?’

বলে ফার্ডিন্যান্ড পকেট থেকে রিভলবার বের করে যুবক দু’জনকে লক্ষ্য করে দু’টি গুলী করল। দু’জনেই বুকে গুলী খেয়ে ছিটকে পড়ল মেঝেয়।

উঠে দাঁড়াল ফার্ডিন্যান্ড। বলল বোরম্যানকে লক্ষ্য করে, ‘জায়গাটা পরিষ্কার করতে বলে তুমি এস আমার অফিসে।’

অফিসে এসে নিজের চেয়ারে বসল ফার্ডিন্যান্ড। ভীষণ অস্থির সে। একের পর এক বিপর্যয়, সর্বশেষে অত্যন্ত গোপনীয় রিভিউ রিপোর্টসহ গুরুত্বপূর্ণ প্যাথোলজিক্যাল রিপোর্ট হাত ছাড়া হয়ে যাওয়াকে সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না।

চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজল সে। না, তাতে করে অস্থিরতা আরও কিলবিলিয়ে উঠছে।

উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে লাগল ফার্ডিন্যান্ড। ঘরে ঢুকল হের বোরম্যান। ফার্ডিন্যান্ড তার চেয়ারে ফিরে এল। বসল বোরম্যানও।

'কি বুঝছ বোরম্যান?' গম্ভীর কণ্ঠে বলল ফার্ডিন্যান্ড।

'আমার মনে হয় সেই এশীয় যুবকই সব অনর্থের মূল। চেহারার যে বিবরণ ওদের দু'জনের কাছে পাওয়া গেছে তাতে সেই এশীয়ই সেদিন রিপোর্টগুলো ছিনিয়ে নেবার মত অঘটন ঘটিয়েছে।'

'কিন্তু এই এশীয় কে? তাকে কোথায় পাওয়া যাবে? সে কেন আমাদের পেছনে লেগেছে? ওখানকার পুলিশ কি বলে?'

'পুলিশের কাছে কোন এশীয় সম্পর্কে কোন রিপোর্ট নেই, তথ্যও নেই।'

'সে থাকছে কোথায় কিংবা কাদের সাথে যোগাযোগ রাখছে তা না জানলে তো আমরা এগুতেই পারছি না।'

'ডাঃ মার্গারেট আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হবার পর তার কক্ষে একজন এশীয়কে ঢুকতে দেখা গেছে।'

চেয়ারে সোজা হয়ে বসল ফার্ডিন্যান্ড। তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বলল, 'এ খবর তো আমাকে দাওনি?'

'ওদের দু'জনের কাছ থেকে আজই তো শুনলাম।'

'ডাঃ মার্গারেটের কক্ষে এশীয়টির যাওয়ার খবরকে তুমি কিভাবে দেখছ?'

'পেশেন্ট হিসেবে পরিচয়ের কারণে ডাক্তারের এ্যাকসিডেন্টের খবরে তার কাছে যেতে পারে। আবার কোন সম্পর্কের সূত্র ধরেও যেতে পারে।'

'আমি জিজ্ঞেস করছি, তুমি কি ভাবছ?'

'আমার মনে হয়, সম্পর্কের সূত্র ধরেই গেছে।'

'তোমার এই মনে হওয়ার কারণ?'

'তিনটি মুসলিম পুরুষ শিশুর প্যাথোলজিক্যাল টেষ্ট করাবার যে জেদ ডাঃ মার্গারেটের এবং এ নিয়ে ডাঃ ওয়াভেলের সাথে তার যে আচরণ তা থেকে

মনে হয় নিছক ডাক্তার হিসেবে নয় কোন উদ্দেশ্য নিয়েই এটা তিনি করেছেন। এই সন্দেহ হওয়ার কারণেই ডাঃ ওয়াভেলের পরামর্শে টার্কস দ্বীপপুঞ্জের হোয়াইট ঈগল শাখা তাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল।'

'তোমাকে ধন্যবাদ বোরম্যান। তুমি অবশেষে ঠিক ভেবেছ। আসলে আমরা ভুল করছি, ডাঃ মার্গারেটকে টার্কস দ্বীপপুঞ্জের হোয়াইট ঈগল সন্দেহ করার সংগে সংগে আমাদের সক্রিয় হওয়া দরকার ছিল।'

'কিন্তু টার্কস দ্বীপপুঞ্জের হোয়াইট ঈগল তো যথাসময়ে সক্রিয় হয়েছে এবং দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে ডাঃ মার্গারেটকে।' বলল বোরম্যান।

'এখানেই তাদের ভুল হয়েছে এবং এ ভুল আমরা শুধরে দেইনি।'

'ভুলটা কি?'

'ডাঃ মার্গারেটকে হত্যা করে কি হবে? ডাঃ মার্গারেট গেলে আরেক ডাক্তার মার্গারেট তৈরি হবে। আসল হলো, ডাঃ মার্গারেটকে দিয়ে এসব যে করাচ্ছে তাকে চিহ্নিত করা এবং তাকে হত্যা করা। তাহলেই ডাঃ মার্গারেট আর তৈরি হবে না।'

'ঠিক বলেছেন।'

'ঠিক বললাম, কিন্তু সেটা ক্ষতি হবার পর।'

'এশীয়টা ঐ রিপোর্টগুলো নিয়ে কি করতে পারবে! মিডিয়া তো আমাদের দখলে। সরকারকে এসব জানিয়েও কোন লাভ হবে না।'

'কি করবে, সেটা আমার কাছেও স্পষ্ট নয়। অপেক্ষা করতে হবে এ জন্যে। কিন্তু একটা ক্ষতি হয়েছে, আমাদের পরিকল্পনা আমাদের হাতের বাইরে চলে গেছে।'

ফার্ডিন্যান্ড থামলেও বোরম্যান কিছু বলল না। ভাবছিল সে।

কিছুক্ষণ পর ফার্ডিন্যান্ডই মুখ খুলল। বলল, 'কি ভাবছ বোরম্যান?'

'ভাবছি এখন কি করণীয়।'

'এটা নিয়ে এত চিন্তা করতে হয়? কি করতে হবে তা কি পরিষ্কার নয়?'

'কি সেটা স্যার?'

'আগের ভুলের সংশোধন।'

'কিভাবে?'

'ডাঃ মার্গারেটকে হত্যা নয়, তাকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসতে হবে। বের করতে হবে ঐ এশীয়টির পরিচয় তার কাছ থেকে।'

মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল বোরম্যানের। বলল, 'ধন্যবাদ স্যার। এটাই এখন একমাত্র পথ।'

ফার্ডিন্যান্ড কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে গেল। তাকাল ইন্টারকমের দিকে। সেখানে একটা সবুজ সংকেত।

ইন্টারকমের একটা বোতামে চাপ দিল ফার্ডিন্যান্ড। ওপার থেকে তথ্য চীফ মার্ক পল-এর গলা শুনা গেল। বলল, 'কেন্দ্র থেকে একটা ডকুমেন্ট এসেছে স্যার।'

'নিয়ে এস।' বলল ফার্ডিন্যান্ড।

তথ্য চীফ মার্ক পল কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ঘরে প্রবেশ করে একটা ইনভেলাপ তুলে দিল ফার্ডিন্যান্ডের হাতে।

হাতে নিয়েই খুলল ইনভেলাপ ফার্ডিন্যান্ড। ভেতরের কাগজের উপর চোখ পড়তেই বুঝল, হোয়াইট ঈগল-এর হেড কোয়ার্টার থেকে আসা মাসিক সিচুয়েশন রিপোর্ট। সমকালিন পরিস্থিতির উপর এই রিপোর্টে থাকে আমেরিকান মহাদেশের উপর বিগত মাসের পর্যবেক্ষণ।

ফার্ডিন্যান্ড হের বোরম্যান-এর দিকে তাকিয়ে বলল, 'বস, রিপোর্টে কি আছে দেখা যাক।'

বলে রিপোর্টটা পড়তে লাগল ফার্ডিন্যান্ড,

"গত মাসে গোটা আমেরিকা বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকা থেকে আমাদের প্রতিনিধিরা হেড কোয়ার্টারকে যা জানিয়েছে, তা উদ্বেগজনক কিছু পুরাতন প্রবণতা নতুন করে তীব্র হওয়া এবং আমাদের পরিকল্পনা বাচনাল করার লক্ষ্যে পরিচালিত কিছু মারাত্মক ঘটানা ঘটেছে। গত মাসের পরিস্থিতির প্রধান দিকগুলো হলো: এক. রেড ইন্ডিয়ানদের সাথে মুসলিম সখ্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত মাসে ১০ জন রেড ইন্ডিয়ান তরুণীর সাথে মুসলিম

তরুণের এবং ৮ জন মুসলিম তরুণীর সাথে রেড ইন্ডিয়ান তরুনের বিয়ে হয়েছে। সব ক্ষেত্রেই রেড ইন্ডিয়ান পরিবার ইসলাম গ্রহণ করেছে স্বতস্ফুর্তভাবে। উদ্বেগজনক হলো, আগে মুসলিম তরুণীরা রেডইন্ডিয়ানদের ঘরে যায়নি, কিন্তু এখন যাওয়া শুরু করেছে। অন্যদিকে গত এক বছরে মাত্র তিনজন রেড ইন্ডিয়ান তরুণী আমেরিকান শ্বেতাংগ তরুণের সাথে বিয়ে হয়েছে, কিন্তু একজন রেডইন্ডিয়ান তরুণও শ্বেতাংগ তরুণীকে বিয়ে করেনি। আর উল্লেখিত তিনটি বিয়ের কোন রেড ইন্ডিয়ান তরুণীই খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেনি। দুই. মুসলিম রেড ইন্ডিয়ান বিয়ের ৫০ ভাগ হয়েছে আমেরিকায় জন্মগ্রহণকারী এশীয় ও আফ্রো-আমেরিকান ব্ল্যাক মুসলমানের সাথে। আর ৫০ ভাগ চীন, কোরিয়া, জাপান, ফিলিপাইন ও তুর্কিস্থান এলাকা থেকে সদ্য আসা আমেরিকান নাগরিকত্ব পাওয়া মুসলমানদের সাথে হয়েছে। তিন. আমেরিকানস ইন্ডিয়ানস মুভমেন্ট (AIM) নতুন করে জোরদার হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। গত মাসের ২৫ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিয়ন ষ্টেটের প্রাচীন রেডইন্ডিয়ান নগরী 'কাহোকিয়া'তে 'এইম' (AIM) এর বিরাট সম্মেলন হয়েছে। সে সম্মেলনে প্রধান যে দাবী তারা তুলেছে তা হলো, মিসিসিপি ও সংলগ্ন অন্যান্য নদীর তীর বরাবর সতের শ' রেড ইন্ডিয়ান নগরী ছিল যা ইউরোপিয়ানরা ধ্বংস করেছে, সে সব রেড ইন্ডিয়ান নগরীর পুনস্থাপন করতে হবে এবং রেড ইন্ডিয়ানদেরকে তা ফেরত দিতে হবে। দ্বিতীয় যে দাবী তারা করেছে তা হলো, ইউরোপিয়ানরা আমেরিকায় আগমনের সময় অর্থাৎ ১৪৯২ সালের দিকে আমেরিকায় রেড ইন্ডিয়ানদের সংখ্যা ছিল দুই কোটি যার মধ্যে ৫০ লাখ ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই রেড ইন্ডিয়ান জনসংখ্যা গত ৫শ' বছরে সাড়ে সাত কোটিতে উন্নীত হবার কথা ছিল। কিন্তু ইউরোপীয় গণহত্যার শিকার হয়ে তাদের সংখ্যা বাড়ার বদলে তা ৫০ লাখ থেকে আজ ১৪ লাখে নেমে এসেছে। এই গণহত্যার বিচার তারা চাচ্ছে না, কিন্তু রেড ইন্ডিয়ানদের ন্যায্য ভূখন্ডগত অধিকার রক্ষার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাংশে মিসিসিপি নদীর পশ্চিম ও পূর্ব এলাকায় তাদের রিজার্ভ এলাকার সংখ্যা ২৮৫ থেকে ১০০০-এ উন্নীত করতে হবে। চার. বিশেষ উদ্বেগজনক ঘটনা ঘটেছে ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের টার্কস দ্বীপপুঞ্জে। গত মাসে এই দ্বীপাঞ্চল হোয়াইট

ঈগলের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে আমাদের দেড়শ' লোক হারিয়ে গেছে অর্থাৎ প্রাণ হারিয়েছে। কিন্তু যাদের দ্বারা এতবড় ঘটনা ঘটল তাদের চিহ্নিত করা যায়নি। উপরন্তু ঐ অঞ্চলে এখন বৃটিশ পুলিশ এমন তৎপরতা শুরু করেছে যার ফলে আমাদের প্রতিশোধমূলক সশস্ত্র পদক্ষেপের কর্মসূচী বাদ দিতে হয়েছে। পাঁচ. গত মাসে আমেরিকায় অশ্বেতাংগ জনসংখ্যা বেড়েছে শূন্য দশমিক দুই পাঁচ (০.২৫) ভাগ, আর শ্বেতাংগ জনসংখ্যা বেড়েছে শূন্য দশমিক শূন্য পাঁচ (০.০৫) ভাগ। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গত মাসে অশ্বেতাংগ বৃদ্ধি পেয়েছে শূন্য দশমিক এক পাঁচ (০.১৫) ভাগ এবং শ্বেতাংগ জনসংখ্যা কমেছে শূন্য দশমিক শূন্য পাঁচ (০.০৫) ভাগ।

উল্লেখিত এসব তথ্য প্রমাণ করছে শত শত বছরের চেষ্টায় শ্বেতাংগরা যে অধিকার অর্জন করেছে, তাতে ভাগ বসাতে আসছে অশ্বেতাংগরা। আর এ পরিস্থিতি 'হোয়াইট ঈগল'-এর প্রয়োজনকে সর্বোচ্চে তুলে ধরেছে।'

রিপোর্ট পড়া শেষ করল ফার্ডিন্যান্ড। পড়তে পড়তেই তার মুখটা শক্ত হয়ে উঠেছিল।

পড়া শেষ করেই ফার্ডিন্যান্ড টেবিলে একটা প্রচন্ড মুষ্টাঘাত করে বলল, 'কয়েক ঘন্ডা রেড ইন্ডিয়ানকে বাঁচিয়ে রাখার কি দরকার ছিল? দাস প্রথা উচ্ছেদের আগে বা পরে কেন আমরা ব্ল্যাকদেরকে আফ্রিকায় ঠেলে দেইনি? এরাই তো অশ্বেতাংগ জনসংখ্যা বাড়াচ্ছে আমেরিকায়। আর এরাই তো আবার ইসলাম গ্রহণ করে আমেরিকায় মুসলমানদের সংখ্যা বাড়াচ্ছে। এদের কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমানরা দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় জাতি গোষ্ঠীতে পরিণত হতে যাচ্ছে।'

'স্যার, রেডইন্ডিয়ানদের বাঁচিয়ে রাখা এবং ব্ল্যাকদের শুধু দেশে রাখা নয়, তাদেরকে আমরা আমেরিকায় বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন অধিকার দিয়ে মাথায় তুলেছি। আজ রেড ইন্ডিয়ানরা এত বড় দাবী তুলতে পারছে কারণ অতীতে মার্কিন সরকার রেড ইন্ডিয়ানদের এ ধরনেরই দাবী নানাভাবে মেনে নিয়েছে। সত্তর দশকের শুরুর দিকে হঠাৎ করে রেড ইন্ডিয়ানরা শত শত বছর আগে শ্বেতাংগদের হাতে তাদের যে জমি চলে গেছে তা উদ্ধারের জন্যে মামলা করতে শুরু করে। পাসামোকাই ও পেনরস্কট নামে দু'টি রেড ইন্ডিয়ান গোত্র

মামলা করে 'মেইন' ষ্টেট-এর ১২ মিলিয়ন একর অর্থাৎ রাজ্যটির দুই তৃতীয়াংশের দখল দাবী করে বসে। মার্কিন সরকার অনেক অনুরোধ করে ৮২ মিলিয়ন ডলার দিয়ে রেড ইন্ডিয়ানদেরকে মামলা প্রত্যাহারে রাজী করে। আবার ১৯৮৭ সালের দিকে ম্যাসাচুসেটস ষ্টেটে ওয়ামপানগ রেড ইন্ডিয়ান গোত্রের অনুরূপ দাবী প্রায় ৫ মিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে রফা করে। এর আগের আরেকটা বড় ঘটনা ঘটে। ১৯৮০ সালে মার্কিন সুপ্রীমকোর্ট ১৯৮৭ সালে সাউথ ডাকোটার রেড ইন্ডিয়ানদের যে জমি শ্বেতাংগরা জোর করে কুক্ষিগত করে তার জন্যে রেড ইন্ডিয়ানদেরকে প্রায় ১২৩ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে মার্কিন সরকারকে বাধ্য করে। এইভাবে রেড ইন্ডিয়ানদের দাবীর যৌক্তিকতা সরকার এবং কোর্ট স্বীকার করে নিয়েছে। সন্দেহ নেই, এর উপর ভিত্তি করেই তাদের জন্যে বরাদ্দ রিজার্ভ এলাকার পরিমাণ ২৮৫ থেকে ১০০০-এ উন্নিত করার দাবী করেছে।' বলল বোরম্যান।

'ধন্যবাদ বোরম্যান। ঠিকই বলেছ তুমি। সরকারের আইন ও মানবতাবাদী এই সর্বনাশা চেহারা শ্বেতাংগ জনগণের কাছে উন্মুক্ত করে দিতে হবে। কিন্তু রেড ইন্ডিয়ানদের ও মুসলমানদের সাথে এই দহরম-মহরমের কি করা যাবে?' বলল ফার্ডিন্যান্ড।

'স্যার, এটা ঐতিহাসিক সম্পর্কের একটা ফল। মূলের দিকে ফিরে যাওয়া মানুষের একটা স্বভাব বা প্রবণতা। রেড ইন্ডিয়ানরা তাই করছে। রেড ইন্ডিয়ানদের পূর্ব পুরুষ এশিয়া থেকে আমেরিকায় আসে। বিশেষ করে পূর্ব এশিয়ার চীন, জাপান, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, তুর্কিস্থান এলাকার মঙ্গোলীয় ও মিশ্র মঙ্গোলীয় জাতি-গোষ্ঠী বরফ ঢাকা বেরিং প্রণালী পথে আমেরিকায় আসে। এরাই আমেরিকার প্রথম মানুষ। রেড ইন্ডিয়ানরা এদেরই বংশধর। সুতরাং এশিয়ানদের প্রতি, এশিয়ান কালচারের প্রতি তাদের দূর্বলতা রয়েছে।'

'কিন্তু প্রশ্নটা এশিয়ানদের নিয়ে নয়, মুসলমানদের নিয়ে।'

'একই কথা স্যার। এশিয়ানরাই তাদের কাছে ইসলাম নিয়ে আসে। ৮ম থেকে দ্বাদশ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে মুসলিম নাবিকরা, তাদের সাথে মুসলিম পর্যটক, ব্যবসায়ী ও মিশনারীরা পৃথিবীর গোটা সমুদ্র এলাকা চষে ফিরেছে।

তাদেরই অনেকে আফ্রিকা থেকে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে এবং বেরিং প্রণালী হয়ে বা ফিলিপাইন থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে আমেরিকায় আসে। এরা ছিল এশিয়ান এবং প্রশান্ত মহাসাগর পথে যারা আসে তাদের অধিকাংশই মঙ্গোলীয় জাতি গোষ্ঠীর মুসলমান, যাদের সাথে রেড ইন্ডিয়ানদের মিল রয়েছে। রেডইন্ডিয়ানরা অনেক ক্ষেত্রে তাদের এশিয়ান ভাইদের বুকে জড়াবার সাথে সাথে ইসলামকেও বুকে জড়িয়ে নেয়। মুসলামানদের প্রতি রেডইন্ডিয়ানদের বিশেষ দুর্বলতার কারণ এটাই।'

'জানি বোরম্যান। কিন্তু এটা যে সর্বনাশা প্রবণতা। রেডইন্ডিয়ানদের ঘরে শ্বেতাংগ মেয়ে যাওয়া বন্ধ হয়েছে, এটা একটা ভালো প্রবণতা। কিন্তু রেড ইন্ডিয়ান ও মুসলমানদের মিলন বন্ধ করা যাবে কি করে?'

'পথ একটাই রেড ইন্ডিয়ান ও মুসলমানদের ঘরে কোন মেয়ে দেযা যাবে না এবং তাদের মেয়ে আনাও যাবে না। উভয় ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বংশ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। মুসলমান ও রেড ইন্ডিয়ানদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি শূন্যে নামিয়ে আনতে হবে অবিলম্বে। তাহলে অশ্বেতাংগ জনসংখ্যা বৃদ্ধি শূন্য দশমিক পাঁচের দিকে নেমে আসবে। অন্যদিকে শ্বেতাংগ জনসংখ্যা প্রতি মাসে অনুরূপ পরিমাণ বাড়াতে হবে।'

'কিভাবে? সন্তান নেয়ার প্রতি শ্বেতাংগ মেয়েদের যে অনিহা তার মোকাবিলা তো বন্দুক দিয়ে করা যাবে না।'

'বন্দুক দিয়ে পারা যাবে না, কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে যাবে।'

'সে বুদ্ধিটা কি?'

'খুব সহজ। মার্কিন মেয়েরা যে ব্রান্ডের জন্মনিয়ন্ত্রণ পিল ব্যবহার করছে, সে সব ব্রান্ডের কোম্পানীগুলোতে ঢুকতে হবে এবং শতকরা ২৫ ভাগ পিলে ভেজাল ঢুকাতে হবে। অন্য দিকে যে সব ক্লিনিক সৌখিন এ্যাবরশন করায়, তাদের ঘাড় মটকাতে হবে।'

'ঠিক বলেছ বোরম্যান। এই কাজ এখনি আমরা শুরু করতে পারি। গোল্ড ওয়াটারকে জানাতে হবে ব্যাপারটা। এ কর্মসূচী কেন্দ্রীয়ভাবে গ্রহণ করা উচিত।'

কথা শেষ করে একটু সোজা হয়ে বসে বলল, 'এস আমাদের কথায় ফিরি। রিপোর্টে বলেছে, টার্কস দ্বীপপুঞ্জে আমাদের দেড়শ' লোক হত্যার জন্যে যারা দায়ী, তাদের চিহ্নিত করা যায়নি। কিন্তু চিহ্নিত আমরা করেছি। আমরা নিশ্চিত এশিয়ানটাই সব কিছুর মূলে রয়েছে। এই মূলকে ধরার জন্যে ডাঃ মার্গারেটকে আমরা হাতে নিয়ে আসছি। এ কথাটা গোল্ড ওয়াটারকে জানাতে হবে।'

'জ্বি, আজকেই টেলিফোনে কথা বলা যায়।'

'এখন ডাঃ মার্গারেটকে নিয়ে আসার ব্যাপারে কি চিন্তা করছ?'

'স্যার, একটু ভেবে দেখি। আর গ্রান্ড টার্কস থেকে আরও কিছু জানারও প্রয়োজন আছে। তারপরে সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে।'

'কিন্তু দেরী করা যাবে না। পরশু দিনের মধ্যে তাকে এখানে চাই।'

'তাই হবে স্যার।'

ফার্ডিন্যান্ড উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়াল হের বোরম্যানও।

টেবিলে নাস্তা সাজিয়ে রেখে সোফায় এসে বসতে বসতে ডাঃ মার্গারেট জর্জকে বলল, 'আমার অবাক লাগছে, হঠাৎ করে উনি বিশেষ এ সময়ে টিভি প্রোগ্রাম দেখতে আসতে চাইলেন কেন!'

'আমারও অবাক লেগেছে আপা। উনি তো অনর্থক কোন কাজ করেন না।'

'কিন্তু বল তো উনি আমাদের বাড়িতে থাকছেন না গ্রান্ড টার্কসে এসেও, এর পেছনে কি অর্থ আছে?' বলল মার্গারেট।

'অর্থ আছে। আমি তার সিদ্ধান্তে আপত্তি করেছিলাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'তোমাদের পরিবারকে সন্দেহের উর্ধে রাখার মধ্যেই আমাদের লাভ। হাসপাতালের ঘটনায় ডাঃ মার্গারেট ওদের সন্দেহের তালিকায় পড়তে

পারে বলে আমি আশংকা করছি। আমি বিদেশী, তোমাদের ওখানে থাকলে সন্দেহ আরও গভীরতর হবে।’ বলল জর্জ।

‘আমিও এটাই বুঝেছি। অদ্ভুত এক মানুষ। সব মাথা খালি করে সব বোঝা তিনি নিজের মাথায় নেন। কিন্তু এত করেও তিনি আমাকে সন্দেহমুক্ত রাখতে পারেননি।’

‘কি ব্যাপার?’ জর্জ বিস্ময়ের সাথে বলল।

‘গতকাল ডাঃ ওয়াভেল আমাকে বলেছেন সাবধানে থাকতে। আমি তাঁকে কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ‘যারা প্যাথোলজিক্যাল রিপোর্ট চুরি করতে বাধ্য করেছিল, তারা তোমাকেও সন্দেহ করছে। ওরা সাংঘাতিক। ওরা না পারে এমন কিছু নেই।’

‘উনি কি তোমাকে ভয় দেখালেন, না আন্তরিকভাবে তোমাকে সাবধান হওয়ার জন্যে বললেন?’

‘না জর্জ, সেদিনের ঘটনার পর উনি বদলে গেছেন। এমনকি ওঁর (আহমদ মুসার) প্রতি কোন ক্ষোভ তাঁর নেই। বরং বলেন, সেদিনের ঘটনা তাঁর জন্যে ভালই হয়েছে। এই ঘটনার অজুহাতে ওদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার সুযোগ হয়েছে।’

‘আমি যতটা শুনেছি, ওঁর স্ত্রীর কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে। ঘটনার পর একদিন আহমদ মুসা ভাইয়ের সাথে মিসেস ওয়াভেলের কথা হয়েছে। মিসেস ওয়াভেল তাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন এবং দেখা করার জন্যে অনুরোধ করেছেন। আহমদ মুসা ভাইয়ের মতে মিসেস ওয়াভেলের রাজনৈতিক চিন্তা আমাদের সাহায্য করতে পারে।’

‘সত্যি ওঁর উপর আল্লাহর বিশেষ রহমত আছে। যে পরিবারটা তার সাংঘাতিক শত্রু হওয়ার কথা, সে পরিবার তার বন্ধু হয়ে গেল।’

‘আপা আমার বিস্ময়টা এখনও কাটেনি। সেদিন তিনি হাসপাতালের রুম থেকে স্বাভাবিকভাবে বের হয়েছিলেন। এত বড় একটা অভিযানে উনি বেরুচ্ছেন তার বিন্দু মাত্র আঁচ করা যায়নি। কি করে উনি বুঝলেন ডাঃ ওয়াভেলের বাসায় অভিযান করলে চুরি যাওয়া ডকুমেন্টগুলো পাওয়া যাবে! সামান্য ভয়ও তাঁর মনে

জাগেনি। কি আশ্চর্য, তিনি শুধু ডকুমেন্টগুলো উদ্ধারই করলেন না, কঠিন এক সময়ে গোটা পরিস্থিতিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনলেন, যার ফলে মিসেস ওয়াভেল পুলিশ ডেকেও মিথ্যা কথা বলে পুলিশকে ফেরত দেন।'

'বোধ হয় এটাই ওঁর মৌলিকত্ব যে, তিনি যুদ্ধের ময়দানে অস্ত্রের শক্তির চেয়ে বুদ্ধির শক্তির উপর বেশি নির্ভর করেন।'

আটটা বাজার শব্দ হলো ঘড়িতে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে জর্জ বলল, 'আহম মুসা ভাই এতক্ষণ এলেন না।'

জর্জের কথা শেষ না হতেই দরজায় নক হলো। ছুটে গেল জর্জ দরজায়। খুলে দিল দরজা। দরজায় আহমদ মুসা।

তারা সালাম বিনিময়ের পর আগে আহমদ মুসা ও পেছন পেছন জর্জ প্রবেশ করল ঘরে।

ঘরে প্রবেশ করে সালাম দিল আহমদ মুসা মার্গারেটকে।

দরজা খোলার সংগে সংগেই ডাঃ মার্গারেট উঠে দাঁড়িয়েছিল। গায়ের কাপড় ঠিক-ঠাক করে মাথার ওড়নাটা টেনে দিয়েছিল কপালের উপর।

'ওয়া আলাইকুম।' বলে সালাম গ্রহণ করল ডাঃ মার্গারেট। মার্গারেটের চোখে-মুখে আনন্দ। তার সাথে সেখানে লজ্জার একটা পীড়ন। দুইয়ে মিলে অপরূপ লাবন্যের সৃষ্টি হয়েছে মার্গারেটের চেহারায়।

আহমদ মুসা সালাম দেয়ার সময় ডাঃ মার্গারেটের মুখের উপর একবার চোখ পড়েছিল মাত্র। চোখ নিচু করে নিয়েছিল সংগে সংগেই।

আহমদ মুসা সোফায় এসে বসল। তার পাশে এসে বসল জর্জ। আর মার্গারেট জর্জের ওপাশে আরেকটা সোফায়। টেলিভিশনটা তাদের সামনে।

আহমদ মুসা সেদিকে তাকিয়ে বলল, জর্জ, 'ফ্রি ওয়ার্ল্ড টিভি' (FWTV) তে দাও।'

'আচ্ছা, ওদের তো এখন 'ওয়ার্ল্ড ইন এক্সক্লুসিভ' প্রোগ্রাম রয়েছে। ঐ প্রোগ্রামের কথা আপনি বলেছেন?'

'হ্যাঁ' বলল আহমদ মুসা।

জর্জ উঠতে উঠতে বলল, ‘ওদের এই প্রোগ্রামটা খুব নাম করেছে ভাইয়া। দেশ-কাল-পাত্র নির্বিশেষে সকল জালেম ও মজলুমের কথা কোন অতিরঞ্জন ছাড়াই এরা নিরপেক্ষভাবে তুলে ধরে। এ কারণেই এটা এখন দুনিয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রোগ্রাম। ‘ওয়ার্ল্ড ওয়াচ’-এর সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুসারে বিশ্বের টিভি দর্শকদের শতকরা ৭০ ভাগ নিয়মিত এই প্রোগ্রাম দেখে থাকে, যা একটি প্রোগ্রামের সর্বোচ্চ রেকর্ড।’

রিমোর্ট কনট্রোলটা এনে চ্যানেল চেঞ্জ করে FWTV তে নিয়ে এল জর্জ।

ঠিক আটটা পাঁচ মিনিটে প্রোগ্রাম শুরু হলো।

একজন ঘোষক বলল, আজ আমাদের দৃশ্যপট আমেরিকান কন্টিনেন্ট, বিশেষভাবে ক্যারিবিয়ান দ্বীপাঞ্চল। তারপর সে বলল, ‘রীতি অনুসারে প্রথমে রিপোর্ট সারাংশ। তারপর ‘সরেজমিন’, যাতে থাকবে সাক্ষাতকার ও প্রমাণপঞ্জী। সবশেষে থাকবে ‘মন্তব্য’।

ঘোষণা শুনেই জর্জ বলল, ‘লায়লা জেনিফার ও অন্যান্যদের খবরটা জানানো দরকার। নিশ্চয় বিষয়টা খুব ইন্টারেষ্টিং হবে।’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘ওরা সবাই জানে।’

‘জানে?’ জর্জের মুখে বিস্ময়। বলল, ‘তাহলে এ প্রোগ্রামটা নিশ্চয় খুব গুরুত্বপূর্ণ।’

‘দেখে মন্তব্য করলে ভালো হবে।’ ঈষৎ হেসে বলল আহমদ মুসা।

রিপোর্ট সারাংশ তখন শুরু হয়ে গেছে।

সবারই সব মনোযোগ আছড়ে পড়ল টিভি’র উপর।

রিপোর্টে তখন বলা হচ্ছে,

‘আজ একুশ শতকে মানুষের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার যখন সবচেয়ে বড় শ্লোগান হতে যাচ্ছে, তখন ক্যারিবিয়ান সাগরের দ্বীপাঞ্চলে চরম মানবাধিকার লংঘনের খবর পাওয়া গেছে। জানা গেছে, সেখানকার অশ্বেতাংগ বিশেষ করে মুসলিম কম্যুনিটির সদ্যজাত পুরুষ সন্তানদের অব্যাহত হত্যা এবং মুসলিশ পুরুষদের হত্যা, গুম, ইত্যাদি কর্মসূচীর মাধ্যমে সেখান থেকে মুসলিম জনসংখ্যা নির্মূলের কাজ উদ্বেগজনক গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। গ্রান্ড টার্কস

বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ষ্টুডেন্ট গ্রুপের বিশেষ সমীক্ষা এবং এই মানবাধিকার লংঘনের ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত 'হোয়াইট ঈগল' নামক গোপন সংগঠনের নিজস্ব দলীল থেকে এই মানবাধিকার লংঘন-ষড়যন্ত্রের নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে।

চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ের ষ্টুডেন্ট গ্রুপের সমীক্ষা অনুসারে গত ৬ বছরে জনসংখ্যার বিশেষ শ্রেণী মুসলমানদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে গড়ে ১৪ শতাংশ হারে। মুসলিম জনসংখ্যার মধ্যে মুসলিম পুরুষ শিশুর মৃত্যুর হার উদ্বেগজনক। গত ছয় বছরের প্রথম বছর মুসলিম শিশুর মৃত্যু হার শতকরা ৬ ছিল, কিন্তু ষষ্ঠ বছর অর্থাৎ গত বছর এই হার ছিল শতকরা ২৫, তার আগের বছর ছিল শতকরা ২০ এবং তার আগের বছর শতকরা ১৫ ছিল। হোয়াইট ঈগলের নিজস্ব দলিলে গত তিন বছরের একটা মুল্যায়ন পাওয়া গেছে। চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ের ষ্টুডেন্টদের সমীক্ষা ছিল টার্কস দ্বীপপুঞ্জের উপর, কিন্তু হোয়াইট ঈগল-এর মূল্যায়ন গোটা ক্যারিবিয়ান দ্বীপাঞ্চল নিয়ে। এই মূল্যায়নে ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের প্রতিটি দ্বীপ-রাষ্ট্রের চিত্র পৃথক পৃথক ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। মূল্যায়ন অনুসারে গত তিন বছরে গোটা ক্যারিবিয়ান দ্বীপাঞ্চলে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাসের গড় হার ১৫ শতাংশ। এর মধ্যে কিউবাতে সবচেয়ে কম, তিন বছরে গড়ে হ্রাস ১০ শতাংশ এবং সবচেয়ে বেশি টার্কস দ্বীপপুঞ্জে, তিন বছরে গড় হ্রাস ২১ শতাংশ।

'হোয়াইট ঈগল' পরিচালিত মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাসের পদ্ধতিটি চরম অমানবিক এবং হৃদয়বিদারক। হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ম্যাটারনিটিতে সদ্য ভূমিষ্ঠ হওয়া মুসলিম শিশু সন্তানদের নানা মেডিকেল পদ্ধতিতে কৌশলে হত্যা করা হচ্ছে। সম্প্রতি গ্রান্ড টার্কস-এর কুইন এলিজাবেথ হাসপাতালে সদ্য মৃত তিনটি মুসলিম শিশুর লাশ পরীক্ষা করে দেখা গেছে, একজনকে 'স্লিপ পয়জনিং' এবং অন্য দু'জনকে ভয়ংকর 'ডেথ ভাইরাস' দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। 'হোয়াইট ঈগল' নামের গোপন সংগঠন পরীক্ষার এই রিপোর্টগুলো এবং পরীক্ষার উপকরণসমূহ চুরি করে বিষয়টি ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করে। হাসপাতালের শিশু ও প্রসূতি বিভাগের প্রধান ডাঃ ক্লার্ক চুরি ঘটনার কথা স্বীকার করেছেন। মনে করা হচ্ছে, কমপক্ষে গত ৬ বছর ধরে লাখ লাখ মুসলিম পুরুষ শিশুকে এই ধরনের

নানা পন্থায় হত্যা করা হয়েছে। এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে প্রবল ডেমোগ্রাফিক ভারসাম্যহীনতার। স্যাম্পলিং সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে, ক্যারিবিয়ান দ্বীপাঞ্চলে মুসলিম মেয়ে শিশু ও পুরুষ শিশুর গড় অনুপাত দাঁড়িয়েছে ২০:১ এবং সবচেয়ে উপদ্রুত টার্কস দ্বীপপুঞ্জে এই অনুপাত ৩০:১-এ পৌঁছেছে। মনে করা হচ্ছে, এই প্রজন্ম তাদের বয়স কালে মুসলিম তরুণীরা বিয়ের জন্যে মুসলিম তরুণ পাবে না। ফলে মুসলিম মেয়েরা স্বাভাবিক পারিবারিক জীবন লাভে ব্যর্থ হবে অথবা শতকরা নব্বই ভাগ ক্ষেত্রে তাদেরকে অমুসলিমদের ঘরে প্রবেশ করতে বাধ্য হতে হবে।

প্রাপ্ত তথ্যাবলীর ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে মনে করা হচ্ছে, মানবতা বিরোধী এই জঘন্য অপরাধের সাথে 'হোয়াইট ঈগল' নামের গোপন সংগঠন জড়িত। এক শ্রেণীর শ্বেতাংগ পুলিশ, আমলা, ডাক্তার অথবা হাসপাতাল কর্মীরা কোথাও স্বতস্ফূর্তভাবে, কোথাও ভয়ে-প্রলোভনের কারণে বাধ্য হয়ে 'হোয়াইট ঈগল'কে সহযোগিতা দিচ্ছে। মনে করা হচ্ছে, জাতীয় সরকারগুলো ব্যাপক অনুসন্ধান চালালে 'হোয়াইট ঈগল'এর এজেন্ট পুলিশ, আমলা ও অন্যান্যদের চিহ্নিত করা কঠিন হবে না। তবে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা, 'হোয়াইট ঈগল'-এর মত আন্তআমেরিকান সংগঠনের হুমকি ও চাপ মোকাবিলার সাধ্য ছোট ছোট জাতীয় সরকারগুলোর নেই। এ জন্যেই তারা অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট এজেন্সিগুলোকে তাদের তৃতীয় বিশ্বের বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে গঠিত টিমের মাধ্যমে তদন্ত ও উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণে এগিয়ে আসতে হবে। অবিলম্বে এদের কালো হাত ভেঙে দিতে না পারলে গোটা আমেরিকার অবস্থাকে তারা ঐ একই পর্যায়ে নিয়ে যাবে বলে আশংকা করা হচ্ছে।'

'রিপোর্ট সার-সংক্ষেপ' উপস্থাপনার পর 'সরেজমিন' প্রতিবেদন শুরু হলো।

ডা: মার্গারেট ও জর্জের চোখ টিভি'র দৃশ্যে যেন আটকে গেছে আঠার মত। গোগ্রাসে যেন তারা গিলছে সব কথা। দেখছে সবকিছু সম্মোহিত হওয়ার মত।

প্রোগ্রামটি ছিল বিশ মিনিটের।

প্রোগ্রাম শেষ হয়ে গেলেও সম্মোহন যেন তাদের কাটল না। তাদের মুখে কোন কথা নেই। নড়াচড়া করতেও তারা যেন ভুলে গেছে।

টেলিফোন বেজে উঠল। জর্জ তার মোবাইলটা তুলে নিল পাশ থেকে।

টেলিফোন ধরেই তা আহমদ মুসার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'ভাইয়া জেনিফারের টেলিফোন।'

আহমদ মুসা টেলিফোন ধরতেই সালাম দিয়ে জেনিফার বলল, 'অভিনন্দন ভাইয়া। যে ঘটনা ওরা টার্কস দ্বীপপুঞ্জে আমাদের প্রচার করতে দেয়নি, তা আপনি বিশ্বময় ছড়িয়ে দিলেন। ভাইয়া, কি বলে কি দিয়ে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাব ভাইয়া।' আবেগে রুদ্ধ হয়ে গেল জেনিফারের কণ্ঠ।

'পাগল বোন, ভাইকে বুঝি এভাবে কৃতজ্ঞতা জানাতে হয়?'

'আমার নয় ভাইয়া, এটা জাতির কৃতজ্ঞতা।'

'জাতি কি আমার নয়?'

'তবু ভাইয়া, আমি জাতির মধ্যকার একজন।'

'আচ্ছা থাক এসব। শোন, একে শুধু আনন্দের নয়, আশংকার দৃষ্টিতেও দেখতে হবে। তোমাকে এবং মার্গারেটকে খুব সাবধানে থাকতে হবে। ওরা এটা শোনার পর এতক্ষণে ক্ষ্যাপা কুকুরের মত হয়ে গেছে। ষ্টুডেন্ট গ্রুপের সমীক্ষার তথ্য পাচার করার জন্যে তোমাকে এবং হাসপাতালের তিনটি শিশুর পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করার জন্যে মার্গারেটকেই ওরা সন্দেহ করবে। সুতরাং তোমাদেরকে খুবই সাবধান থাকতে হবে। রাস্তায় বেরুনো তোমার একেবারেই বন্ধ করে দিতে হবে।'

'আমি তো লুকিয়েই আছি। ওখানে আপনাদের সাথে এক সাথে টিভি দেখার ইচ্ছা আমার ছিল। কিন্তু রাস্তায় বেরুতে হবে, এ কারণেই তো যেতে পারলাম না। জর্জকে টেলিফোন দিন। আমি ওর সাথে ঝগড়া করবো। আমার সৌভাগ্য সে কেড়ে নিচ্ছে।'

'জেনিফার, তোমার আর জর্জের সৌভাগ্য আলাদা হয়ে গেল কখন? দিচ্ছি ওকে টেলিফোন, ঝগড়া কর।'

বলে আহমদ মুসা জর্জকে টেলিফোন দিল। দিতে দিতেই শুনল জেনিফার চিৎকার করছে, 'থাক ওর সাথে আর কথা বলব না।'

জর্জ টেলিফোন ধরে বলল, 'বেশ জেনিফার, আমি তো কথা বলতে চাইনি।'

ওপারের কথা শুনে জর্জ আবার বলল, 'তুমি আসতে পারনি, এটা কি আমার দোষ?'

ওপারের কথার পর জর্জ পুনরায় বলল, 'বা! বা! বা!, আমি গিয়ে তোমাকে নিয়ে এলাম না কেন, তুমি বলনি কেন? আমি তো তোমাকে চালাই না, তুমিই আমাকে চালাও। তাই........।'

জর্জের কথা শেষ হতে পারল না। ওপার থেকে টেলিফোন রেখে দিয়েছে জেনিফার।

জর্জ টেলিফোন রাখতে রাখতে বলল, 'রেগে গেছে জেনিফার'

'তুমি যাতা বলে ওকে রাগাও জর্জ, এটা ভাল নয়।' বলল ডা: মার্গারেট।

'আপা, তুমি তো কোন সময়ই জেনিফারের ত্রুটি দেখ না। ওই প্রথম আজ অযৌক্তিক কথা বলেছে।'

আহমদ মুসার ঠোঁটে হাসি। বলল, 'ঠিক আছে জর্জ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আজ জেনিফারই ঝগড়াটা প্রথম শুরু করেছে।'

আহমদ মুসা থামতেই ডা: মার্গারেট চকিতে আহমদ মুসার দিকে একবার চোখ তুলল। তারপর কম্পিত চোখটা নামিয়ে গভীর কণ্ঠে বলল, 'FWTV'-তে এই অসম্ভব ঘটনা কিভাবে ঘটতে পারলো?'

'এটা তো অসম্ভব ঘটনা নয়!'

'আমাদের কাছে অসম্ভব। লোকাল খবরের কাগজে যে নিউজ ছাপা যায় না, সে নিউজ বিশ্ব টিভি'তে বিশ্বময় প্রচার হবে এটা অসম্ভব ঘটনা নয়?'

'তা ঠিক। কিন্তু FWTV –এর মত বিশ্বমানের টিভিগুলো এ ধরনের বিষয় পেলে লুফে নেয়।'

'কিন্তু পেল কি করে?'

'আমি ওদের কাছে পাঠিয়েছি।'

‘সেটা আমরা বুঝেছি।’ হেসে বলল ডা: মার্গারেট।

থেমেই ডা: মার্গারেট আবার শুরু করল, ‘কিন্তু পেয়েই ওরা প্রচার করল? BBC কিংবা VOA কে দিলে তারা কি প্রচার করত?’

‘না করত না।’

বলে একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর সোফায় হেলান দিয়ে বসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আসল কথা ডা: মার্গারেট, FWTV এবং WNA-এই দু’টি সংবাদ মাধ্যম মুসলমানদের তৈরি। বিশ্বমানের সংবাদ মাধ্যম হিসাবে যে দায়িত্ব, সেটা তারা পালন করার সাথে নিজস্ব দায়িত্বও এভাবে তারা পালন করছে।’

‘আলহামদুলিল্লাহ।’ ডা: মার্গারেট ও জর্জ এক সাথেই বলে উঠল।

একটু থেমেই জর্জ আবার বলল, ‘এ সংবাদ মাধ্যম দু’টির এই গোপন পরিচয় কি অন্যেরা জানে?’

‘কেউ কেউ এটা সন্দেহ করে। কিন্তু সবাই এটা জানে, এ সংবাদ মাধ্যম দু’টিতে মুসলিম কিছু পুঁজিপতির পুঁজি আছে। কিন্তু তারা মনে করে অন্যগুলোর মতই এটা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। বিশেষ করে এ সংস্থা দু’টোর সংবাদ প্রচারে নিরপেক্ষতা এদের সম্পর্কে নেতিবাচক চিন্তার সুযোগ কাউকে দিচ্ছে না। মুসলিম কোন গ্রুপ বা শাসকের দ্বারা কোন অন্যায় হলে তা এ সংবাদ মাধ্যম দু’টো সোচ্চার কণ্ঠেই প্রচার করে থাকে।’

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা ডা: মার্গারেটকে বলল, ‘তুমি কি কিছুদিনের জন্যে ছুটি নিতে পার?’

‘কেন?’

‘হাসপাতালে যাতায়াত তোমার নিরাপদ নয়। তাছাড়া আমি মনে করি কিছুদিন তোমার একটু সরে থাকা দরকার।’

‘আপনি যা আদেশ করবেন তাই হবে।’

‘এটা আমার আদেশ নয়, পরামর্শ।’

মুখ নিচু রেখেই থামল ডা: মার্গারেট। বলল, ‘নেতা যেটা দেন তা পরামর্শ নয়, নির্দেশ।’

‘আদেশ না হয়ে পরামর্শই হওয়া ভাল নয় কি? আদেশ হলে তা তো অপরিহার্য হয়ে যায়।’

‘আদেশ না মানতে পারি, এ ভয় তাহলে আপনার আছে?’

‘মার্গারেট, আমার কথা বিশেষ কারো জন্যে নয়, সাধারণ নীতি হিসাবে বলেছি।’

‘ধন্যবাদ।’ বলে ডা: মার্গারেট উঠে দাঁড়াল এবং বলল, ‘আমি উঠছি। আজ কিন্তু আপনি খেয়ে যাবেন। সব রেডি।’

কথা শেষ করেই আহমদ মুসাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে মার্গারেট দ্রুত ড্রইং রুম ত্যাগ করল।

মার্গারেট চলে গেলে জর্জ টিভি বন্ধ করে দিল। মুখোমুখি হলো আহমদ মুসার। বলল, ‘এরপর কি ভাইয়া? হোয়াইট ঈগল তো ক্ষ্যাপা কুকুরের মত হয়ে উঠবে বলছেন। কিন্তু বিশ্ব কিছু বলবে না?’

‘অবশ্যই বলবে। দেখবে আগামী কালের সংবাদপত্র এই নিউজ কমবেশী কভার করবে গোটা দুনিয়ায়। প্রতিক্রিয়াও কালকে থেকেই প্রকাশ হওয়া শুরু করবে। এবং এটা অবশ্যই একটা ইস্যুতে পরিণত হবে।’

‘এর ফল কি হবে?’

‘কি ফল হবে আমি জানি না। তবে এটুকু বলতে পারি বৃটিশ সরকার, টার্কস দ্বীপপুঞ্জের এ ঘটনার জন্যে ঘরে বাইরে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়বে। সুতরাং বাধ্য হয়েই তাকে টার্কস দ্বীপপুঞ্জে ‘হোয়াইট ঈগল’-এর মূলোচ্ছেদ করতে এগিয়ে আসতে হবে।’

‘আলহামদুলিল্লাহ। এটা হবে আমাদের জন্যে একটা বড় লাভ। শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল আমাদের জন্যে।’

আহমদ মুসা কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল। কিন্তু তার আগেই ভেতর থেকে জর্জের ডাক পড়ল, ‘ওঁকে নিয়ে এস জর্জ।’

সংগে সংগেই জর্জ উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘চলুন ভাইয়া। বাড়িতে আর কেউ নেই, কাজের দু’জন মেয়ে ছাড়া।’

আহমদ মুসাও উঠল। খাবার টেবিলে বসল জর্জ এবং আহমদ মুসা।

খাবারগুলো ঠিক-ঠাক এগিয়ে দিয়ে ডা: মার্গারেট বলল, 'শুরু করুন সেলফ সার্ভিস।'

'এটাই নিয়ম, ধন্যবাদ।' বলল আহমদ মুসা।

'আপা, তুমি বস। দাঁড়িয়ে রইলে যে!' বলল জর্জ।

'হোষ্ট হিসাবে তুমি তো খাচ্ছই। মেহমানের অস্বস্তির কোন কারণ নেই।' ঠোঁটে হাসি টেনে বলল মার্গারেট।

জর্জ একটু ভাবল। তারপর আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভাইয়া, এভাবে একত্রে খাওয়ার ব্যাপারে ইসলামের কোন নিষেধাজ্ঞা আছে?'

'নিরাপদ পরিবেশে পর্দাসহ বিয়ে নিষিদ্ধ নয় এমন লোককে খাবার পরিবেশন করা, তার সাথে দেখা করা, কথা বলা যায়, কিন্তু একান্ত বাধ্য না হলে এক সাথে খাওয়া যায় কিনা আমার জানা নেই।'

'নিরাপদ পরিবেশ কি?' জর্জ বলল।

'যাদের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ নয় এমন দু'জন ছেলে মেয়ে কোন নিভৃত স্থানে বা কোন নির্জন কক্ষে দেখা করতে বা কথা বলতে পারে না। তবে নিরাপদ হলে পারে। অর্থাৎ সাথে যদি স্বামী ও ভাই-এর মত কেউ থাকে তাহলে পারে। সাথে স্বামী ও ভাই-এর মত অতি আপন কেউ থাকাই নিরাপদ পরিবেশ।'

'এক সাথে খাওয়ার ক্ষেতেও এই একই বিধান হতে পারে না কেন?'

'আমি মনে করি একান্ত বাধ্য হলে পারে। কিন্তু সাধারণভাবে এটা আমার মনে হয় মুসলিম সংস্কৃতি বিরোধী।'

'কারণ?' প্রশ্ন করল জর্জ।

'জনাব, কারণ বলবেন না। এসব ব্যাপারে কত বই আছে, কোরআনের তফসির এবং হাদীস তো আছেই। লেখাপড়া করবে না, শুধু প্রশ্ন। এত কথা বললে খাওয়া হবে না। খেতে দাও।' কৃত্রিম শাসনের সুরে বলল ডাঃ মার্গারেট।

জর্জ আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্যরি, ভাইয়া। আপা ঠিকই বলেছেন।'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'ঠিক আছে তোমার প্রশ্নটার জবাব আরেকদিন দেব।'

‘জর্জ কিন্তু লেখাপড়া করে না। ওর আবেগ যতটা বেশি, লেখাপড়া ততটাই কম।’ ঠোঁটে হাসি টেনে বলল মার্গারেট।

‘তাই নাকি জর্জ?’

‘ভাইয়া আপা ইসলামের পন্ডিত হচ্ছেন, আমাকে পন্ডিত হতে বলেন।’ বলল জর্জ।

‘পন্ডিত না হও, প্রয়োজনীয় সবকিছু তোমাকে জানতে হবে।’

‘সে চেষ্টা করছি ভাইয়া। কোরআন শরীফ আমি অর্থসহ দু’বার পড়া সম্পন্ন করেছি। মিশকাত শরীফের অর্ধেক পর্যন্ত পড়েছি। তাছাড়া মাসলা-মাসায়েলের বই নিয়মিতই দেখি।’

‘ধন্যবাদ জর্জ। আর তোমার আপা?’

‘সে হিসেব আমি দিতে পারবো না। ওঁর টেবিল ভর্তি বইয়ে। ডাক্তারি বিদ্যা সে ভুলতে বসার পথে।’

আহমদ মুসা তাকাল ডাঃ মার্গারেটের দিকে। বলল, ‘জর্জের অভিযোগ সত্য নয় আশা করি। তোমাকে শ্রেষ্ঠ ডাক্তার হতে হবে, সেই সাথে হতে হবে একজন শ্রেষ্ঠ মুসলমান।’

আহমদ মুসার দিকে মুহূর্তের জন্যে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল ডাঃ মার্গারেট। তার মুখ রক্তিম হয়ে উঠেছে লজ্জা এবং অপরিচিত এক আবেগে। বলল, ‘দোয়া করুন।’

বলে ডাঃ মার্গারেট কি মনে হওয়ায় দ্রুত রিফ্রেজারেটরের দিকে এগুলো।

আহমদ মুসা মনোযোগ দিল খাওয়ার দিকে।

টেলিফোনের শব্দে আহমদ মুসার ঘুম ভাঙল। রাত তখন ৩টা। ধরল টেলিফোন। লায়লা জেনিফারের কণ্ঠ। কান্নায় কথা বলতে পারছে না জেনিফার।

‘সময় নষ্ট করো না জেনিফার। কি ঘটেছে বল?’ একটু শক্ত কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

‘মার্গারেট আপাকে কেউ ধরে নিয়ে গেছে। জর্জ আহত হয়ে বাইরে পড়ে আছে।’ কান্না জড়িত কণ্ঠে বলল জেনিফার।

‘কি বলছ তুমি জেনিফার? তুমি বাসা থেকে?’

‘আমি বাসায়। জর্জের বাসায় আর কেউ নেই। কাজের মেয়েটা আমার টেলিফোন নম্বার জানত, এইমাত্র আমাকে জানাল।’

‘তুমি টেলিফোন রেখে দাও। আমি এখনি বেরুচ্ছি।’

‘ভাইয়া, আমি যাব।’

‘বেশ প্রস্তুত থাক। আসছি আমি।’

রাত সাড়ে তিনটার মধ্যেই আহমদ মুসা জেনিফারকে নিয়ে জর্জদের বাড়ি পৌছল।

জর্জকে তখন প্রতিবেশীরা কয়েকজন এসে ধরাধরি করে ড্রইং রুমে এনে তুলেছে।

জর্জ আহমদ মুসাকে দেখে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

আহমদ মুসা কোন কথা না বলে জর্জের মাথায় হাত বুলিয়ে জর্জের আঘাত পরীক্ষা করল। দেখল, জর্জের দু’হাত ক্ষত-বিক্ষত। বাধা দেবার জন্যে দুহাতে ছোরা ধরে ফেলারই ফল এটা। তাছাড়া তার ডান বাহুতে এবং কাঁধে মারাত্মক আঘাত।

কাজের মেয়েরাও প্রতিবেশীরা ক্ষতগুলো কাপড় দিয়ে বেঁধে রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে চেষ্টা করছে।

আহমদ মুসা কান্নারত বিমূঢ় জেনিফারের দিকে চেয়ে বলল, ‘জেনিফার তুমি থানায় এবং হাসপাতালে টেলিফোন কর।’

বলে আহমদ মুসা কান্নারত জর্জের দিকে চেয়ে বলল, ‘জর্জ এখন কান্নার সময় নয়। তুমি আমাকে সাহায্য কর।’ আদেশের সুরে কথাগুলো বলল আহমদ মুসা।

জর্জ চোখ মুছল। শান্ত হবার চেষ্টা করল।

'বল, যারা মার্গারেটকে ধরে নিয়ে গেছে, তাদের সম্পর্কে তুমি কি বুঝেছ?'

'ওরা দশ বারোজন এসেছিল। সবারই মুখ মুখোশে ঢাকা ছিল। আমার সাথে ধস্তাধস্তির সময় ওদের একজনের মুখোশ খুলে যায়, জামার কয়েকটা অংশ ছিড়ে পড়ে যায়। আমার মনে হয় ওরা সবাই শ্বেতাংগ। যারা কথা বলেছে, সবাই ইংরেজি ভাষায়। ইংরেজির উচ্চারণ উত্তর বাহামা অঞ্চলের মত।'

'জামার অংশগুলো ছিড়ে খসে পড়েছে তা কোথায়?'

'আমি আপার চিৎকার শুনে ঘুমে থেকে জেগে ছুটে আসি আপার ঘরের দিকে। ওদের সাথে ঘরের দরজায় আমার ধস্তাধস্তি হয়। সম্ভবত জামার ছিড়ে পড়ে যাওয়া অংশ ও মুখোশ ওখানেই পড়ে আছে।'

শুনেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'জর্জ ওটা আমাকে দেখতে হবে। আমি দেখছি।'

বলে ছুটল আহমদ মুসা মার্গারেটের ঘরের দিকে।

মার্গারেটের ঘরের সামনেই প্রশস্ত করিডোরে কালো সার্টের কয়েকটা টুকরো পড়ে থাকতে দেখল।

আহমদ মুসা দ্রুত সেদিকে এগুলো এবং তাড়াতাড়ি জামার টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিল।

আহমদ মুসা দেখল, টুকরোগুলো মিলালে গোটা জামাই হয়ে যায়। জামা ছিঁড়ে যাওয়া লোকটি নিশ্চয় গোটা জামা খুলে ফেলে দেয়। সাফারী ধরনের সার্টের উপরে ও নিচের চারটি পকেটই অক্ষত আছে।

আহমদ মুসা পরীক্ষা করল পকেটগুলো। একটা পকেটে টাকার কয়েকটা নোট পেল। টাকাগুলো বাহামার ডলার। তাহলে লোকরো ছিল বাহামার? অন্য একটা পকেটে আহমদ মুসা ভাঁজ করা নীল রঙের পাতলা কাগজ পেল।

ভাঁজ খুলল কাগজটির। একটা রশিদ ধরনের কাগজ। ভালো করে দেখল আহমদ মুসা। একটা এয়ার প্যাসেস সার্টিফিকেট। সানসালভাদরের কলম্বাস এয়ারপোর্ট ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে 'দি ব্লু বার্ড'কে।

তাড়াতাড়ি তারিখের দিকে নজর বুলাল আহমদ মুসা। তারিখ আজকের। টেক অফের সময়ও লেখা আছে রাত দশটা। চমকে উঠল আহমদ মুসা। ওরা কি সানসালভাদর থেকে বিমান নিয়ে এসেছিল! ডাঃ মার্গারেটকে ওরা বিমানেই নিয়ে যাবে। চঞ্চল হয়ে উঠল আহমদ মুসা। ওদের বিমান নিশ্চয় ল্যান্ড করেছে গ্রান্ড টার্কস বিমান বন্দরে। ডাঃ মার্গারেটকে নিয়ে তাহলে ওরা এয়ারপোর্টেই গেছে।

বিষয়টা চিন্তা করেই আহমদ মুসা ছুটল জর্জের কাছে। আহমদ মুসা যেতেই জেনিফার বলল, 'ভাইয়া, পুলিশ আসছে। হাসপাতাল থেকেও এই শিফটের এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসার একজন ডাক্তার নিয়ে আসছেন।'

'আলহামদুলিল্লাহ। পুলিশ এলে জর্জ তুমি একটা মামলা দায়ের কর।'

তারপর জেনিফারের দিকে তাকিয়ে আহমদ মুসা বলল, 'ডাক্তার জর্জকে যদি হাসপাতালে নিয়ে যেতে চায়, তুমিও যেও তার সাথে হাসপাতালে। বাড়িতে একা তুমি থাকবে না।'

'আপনি থাকছেন না?' বলল জর্জ।

'আমি এখনি গ্রান্ড টার্কস এয়ারপোর্টে যাচ্ছি।'

'কেন?' বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বলল জেনিফার।

'সম্ভবত বিমানে করে মার্গারেটকে টার্কস দ্বীপপুঞ্জের বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দেখি ওদের নাগাল পাই কিনা?'

বেদনায় অন্ধকার হয়ে উঠেছে জর্জের মুখ। বলল, 'ওরা কারা ভাইয়া? হোয়াইট ঈগল?'

'নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। তবে সন্দেহ ওদেরকেই।' কথা শেষ করেই আহমদ মুসা বলল, 'আসি।' বলে দ্রুত পা চালাল আহমদ মুসা বাইরে বেরুবার জন্যে।

এক ঘণ্টা পরে ফিরে এল আহমদ মুসা। এসে জর্জ এবং জেনিফারকে পেল না। শুনল, এ্যাম্বুলেন্সেই ওরা হাসপাতালে চলে গেছে। হাতের ঘড়ির দিকে তাকাল আহমদ মুসা। রাত সাড়ে ৪টা।

সময় হাতে বেশি নেই। ছুটল সে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে।

ব্যান্ডেজ ইত্যাদি শেষ করে এইমাত্র জর্জকে বেড়ে আনা হয়েছে।

আহমদ মুসা যখন কক্ষে ঢুকছিল, তখন বেরিয়ে যাচ্ছিল ডাক্তার ও নার্সরা।

কক্ষে প্রবেশ করল আহমদ মুসা।

জর্জ চোখ বন্ধ করে শুয়েছিল। আর জেনিফার বসেছিল জর্জের মাথার পাশে এক চেয়ারে।

আহমদ মুসা প্রবেশ করতেই আকুল, উৎসুক্য চোখে জেনিফার চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল।

পায়ের শব্দ পেয়ে জর্জও চোখ খুলেছে। আহমদ মুসাকে দেখেই তার চোখ দু'টি চঞ্চল হয়ে উঠল। শত প্রশ্ন ঝরে পড়ল তার চোখ থেকে।

আহমদ মুসা জর্জের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। একটি হাত জর্জের বুকে আস্তে করে রেখে জর্জের শত প্রশ্ন ভরা চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'না জর্জ, তোমাকে মুখে হাসি ফুটানোর মত কোন খবর নিয়ে আসতে পারিনি। যেটা এনেছি সেটা দুঃসংবাদই।'

জর্জ চোখ বুজল।

'কি খবর ভাইয়া?' কম্পিত গলায় প্রশ্ন করল জেনিফার।

'আমার সন্দেহ যদি সত্য হয়, আমি এয়ারপোর্টে পৌছার আধঘণ্টা আগে মার্গারেটকে বহনকারী প্রাইভেট বিমানটি বিমান বন্দর ত্যাগ করেছে।'

'কোথায় নিয়ে গেছে ভাইয়া?' জেনিফারই বলল।

'আমার সন্দেহ সত্য হলে বিমানটি সানসালভাদরে গেছে।'

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা আবার বলল, 'জেনিফার পুলিশ এসে কি করল?'

'পুলিশ কেস নিয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও পুলিশকে টেলিফোন করেছে। পুলিশ জানতে চাচ্ছে কাউকে আমাদের সন্দেহ হয় কিনা। জর্জ শুধু এটুকু বলেছিল, যারা সম্প্রতি প্যাথোলজিক্যাল রিপোর্ট চুরি করেছিল তারা জড়িত থাকতে পারে। কারা চুরি করিয়েছিল আমরা জানি না।'

'ঠিক আছে এটুকু। ধন্যবাদ তোমাদের।'

জর্জ চোখ খুলল। বলল, 'কিন্তু ভাইয়া, পুলিশ কেস নেয়া পর্যন্তই। কিছুই হবে না।' জর্জের কণ্ঠে হতাশা।

জর্জের গায়ে সান্ত¦নার হাত বুলিয়ে আহমদ মুসা বলল, 'পুলিশ কিছু করবে এজন্যে পুলিশকে বলা হয়নি। বলা হয়েছে এজন্যে যে পুলিশের কাছে ঘটনাটা রেকর্ডেড হওয়া দরকার।'

বলে একটু থামল আহমদ মুসা। পরক্ষণেই আবার শুরু করল, 'আমার হাতে সময় বেশি নেই জর্জ। একটা বোট ঠিক করে এসেছি। ঠিক সাড়ে ছয়টায় আমি যাত্রা করব। ফজরের নামাযও আমি সেরে নিয়েছি।'

'কোথায় ভাইয়া?' দুজনেই চমকে উঠে এক সাথে প্রশ্ন করল।

'সানসালভাদর।'

'আপনি কি নিশ্চিত ভাইয়া, আপাকে ওরা সানসালভাদর নিয়ে গেছে?'

'নিশ্চিত নই। তবে যেটুকু প্রমাণ পেয়েছি, তাতে ওরা সানসালভাদর থেকে এসেছিল, ওখানেই ফিরে গেছে। মার্গারেটকে তাদের সাথে নেবারই কথা।'

'মাফ করবেন, কি প্রমাণ ভাইয়া?'

'তুমি যে ছেঁড়া জামার কথা বলেছিলে, সে জামার পকেটে একটা এয়ার প্যাসেজ সার্টিফিকেট পাওয়া গেছে। সার্টিফিকেট অনুসারে 'দি ব্লু বার্ড' নামক একটা প্রাইভেট এয়ারলাইন্সের একটা বিমান গত রাত দশটায় সানসালভাদর বিমান বন্দর থেকে 'টেক অফ' করেছিল। আমার ধারণা এই বিশেষ বিমানেই ওরা এসেছিল এবং ফিরে গেছে। এবং আমার আরো ধারণা, শুধু ডাঃ মার্গারেটকে কিডন্যাপ করার জন্যেই ছিল তাদের এ আয়োজন।'

আহমদ মুসার এই বর্ণনা যেন ভীত করল জর্জকে। তার মুখ কুঁকড়ে গেছে উদ্বেগ ও বেদনায়। কম্পিত গলায় বলল সে, 'মনে হচ্ছে ওরা বিরাট শক্তিশালী বিশাল দল। আপনি একা। কিভাবে......।'

কথা শেষ করতে পারল না জর্জ। রুদ্ধ হয়ে গেল তার কণ্ঠ।

আহমদ মুসা হো হো করে হেসে উঠল। বলল, 'জর্জ আমি একা নই। আমার সাথে আল্লাহ আছেন। আর আল্লাহর শক্তির কাছে ঐসব শক্তি কিছুই নয়।'

'নিশ্চয় আল্লাহ সকলের চেয়ে, সবকিছুর চেয়ে বড়। কিন্তু সবক্ষেত্রেই সাফল্য কি তিনি দেন? আমি যে ভাবনা মন থেকে দূর করতে পারছি না।' বলে ফুপিয়ে কেঁদে উঠল জর্জ।

আহমদ মুসা হেসে উঠল। সোজা হয়ে দাঁড়াল। বলল, 'জর্জ, তুমি শুধু ডাঃ মার্গারেটের ভাই এ হিসাবে ভাবলে চলবে না, তুমি আজ 'আমেরিকান ক্রিসেন্ট' এর সভাপতি।'

ঠোঁটে হাসি কিন্তু শক্ত কণ্ঠে কথাগুলো বলল আহমদ মুসা।

জর্জ ধীরে ধীরে আহত হাত তুলে গায়ের চাদর দিয়ে চোখের পানি মুছে ফেলল। বলল, 'দুঃখিত আমি ভাইয়া। আপাকে না নিয়ে আমাকে ওরা ধরে নিয়ে গেলে ভেঙে পড়াতো দূরে থাক কোন ভয়ই করতাম না।'

'জানি জর্জ। তোমাকে এখন শক্ত হতে হবে। আমি চলে যাচ্ছি। তোমাকে এদিকটা দেখতে হবে।'

থামল আহমদ মুসা। তারপর তাকাল লায়লা জেনিফারের দিকে। সে বিমূঢ় এক পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে। এরপর তাকাল জর্জের দিকে। ধীরে ধীরে বলল আহমদ মুসা, 'আমি তোমাদের দু'জনকে একটা কথা বলতে চাই।'

'আদেশ করুন ভাইয়া।' দুজনেই বলল।

'FWTV -তে ঐ খবরটি প্রচারিত হবার পর ওরা নিশ্চয় পাগল হয়ে গেছে। তারই একটা প্রমাণ, বিশেষ বিমান নিয়ে এসে তারা ডাঃ মার্গারেটকে ধরে নিয়ে গেছে। আমার বিশ্বাস, লায়লা জেনিফারের উপর তারা আরও বেশি ক্ষেপে আছে। সুতরাং লায়লা জেনিফারের একটা শক্ত আশ্রয় ও সার্বক্ষণিক সাথী দরকার। গ্রামের বাড়ি তার জন্যে নিরাপদ নয়। তার মামার বাড়িও নয়। মেয়ে হওয়ার কারণেই অন্য কোন আশ্রয়ও তার জন্যে নিরাপদ নয়। অপর দিকে জর্জও একা হয়ে পড়েছে। আমি চাই, এই মুহূর্তে না হলেও আজই তোমরা বিয়ে কর। তোমাদের মত বল।'

লজ্জায় লাল হয়ে উঠল জেনিফারের মুখ। মুখ নিচু করেছে সে।

আকস্মিক এই প্রস্তাবে জর্জও লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে অনেকটা।

‘বলেছি, হাতে আমার সময় নেই। তোমরা কথা বল। আমি মনে করছি, জর্জ অসুস্থ হওয়ায় জেনিফারের সঙ্গ তার জন্যে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। বিয়ে এই সমস্যারও সমাধান করে দেবে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ভাইয়া আপনার সিদ্ধান্তই আমার সিদ্ধান্ত। আপনি ওকে জিজ্ঞেস করুন। ওকে তার মতের বাইরে একবিন্দুও নড়ানো যায় না।’ বলল জর্জ।

‘ভাইয়া, ও বলতে চাচ্ছে আপনার আদেশ সেই শুধু চোখ বন্ধ করে মানে, আমি মানি না। নিজের মত বলা কি অপরাধ? ওকে জিজ্ঞেস করুন ভাইয়া, কবে কোন আদেশ আপনার আমি মানিনি!’ জেনিফারের রাঙা মুখে ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটেছে।

দুঃখের মধ্যেও আহমদ মুসার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল দু’জনের মধুর ঝগড়া দেখে। বলল, ‘ঠিক আছে তোমাদের দু’জনের মত আমি পেয়ে গেছি। আলহামদুলিল্লাহ।’

মুহূর্তের জন্যে থামল আহমদ মুসা। থেমেই আবার বলল, ‘আমি গাড়িতে করে মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন ও আর একজনকে নিয়ে এসেছি। ওদের বলে দেই, আজ দিনের কোন এক সময় তারা বিয়ে পড়াবার ব্যবস্থা করবে। তোমরাও বন্ধু-বান্ধবদের ডাকতে পার।’

আহমদ মুসা থামার সাথে সাথেই জেনিফার প্রতিবাদ করে উঠল, ‘না ভাইয়া, সবার অনুপস্থিতিতে বিয়ে হতে পারে, আপনার অনুপস্থিতিতে নয়।’

‘তাহলে?’ আমাকে তো অল্পক্ষণের মধ্যেই যেতে হবে।’

‘এই অল্পক্ষণে বিয়ে হতে পারে না? এবং এই কক্ষেই?’ বলল জেনিফার।

‘পারে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘এতেই আমি আনন্দিত হবো ভাইয়া। এখন ওকে জিজ্ঞেস করুন।’ বলল জেনিফার।

আহমদ মুসা তাকাল জর্জের দিকে।

‘ভাইয়া, আমার কোন পৃথক সিদ্ধান্ত নেই। আপনি যা বলবেন, সেটাই আমি করব। কিন্তু দেখলেন তো ভাইয়া, ও নিজের মতের ব্যাপারে কতটা সিরিয়াস। কিভাবে তার মত সে চাপিয়ে দিয়ে ছাড়ল।’ বলল জেনিফার।

জেনিফার তীব্র কণ্ঠে কিছু বলতে যাচ্ছিল। আহমদ মুসা তাকে হাতের ইশারায় বাধা দিয়ে বলল, ‘বোন জেনিফার তোমাকে কিছু বলতে হবে না। আমিই জর্জের কথার প্রতিবাদ করছি।’

বলে আহমদ মুসা জর্জের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘জর্জ, জেনিফারের মতামত আমার কাছে খুবই মূল্যবান। আশা করি তোমার কাছেও। মতামত দেয়ার ক্ষমতা একটা বড় গুণ। এ গুণ আমার এ বোনটির আছে। মতামতকে সম্মান করবে, রাগাবে না কখনও।’

জর্জ গম্ভীর হলো। জেনিফারের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, ‘স্যরি, রিয়েলি স্যরি জেনিফার।’

জেনিফারের মুখ লজ্জা, সংকোচে একেবারে রাঙা হয়ে গেছে। মুখ নিচু করেছে সে।

‘জর্জ, তোমার অনামিকায় হীরক বসানো যে সোনার আংটি দেখছি, সেটা তুমি জেনিফারকে পরিয়ে দাও। এটাই হবে মোট মোহরানার নগদ অংশ।’

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়িয়ে বাইরে বেরুবার জন্যে হাঁটা শুরু করে বলল, ‘তোমরা তৈরি হও, আমি গাড়ি থেকে ওদের নিয়ে আসি।’

দু’মিনিটের মধ্যেই আহমদ মুসা মসজিদ থেকে আনা ইমামসহ তিনজনকে নিয়ে হাজির হলো।

আহমদ মুসা কক্ষে ঢুকে দেখল, জর্জ বাসা থেকে সাথে করে আনা বাড়তি সার্টটা পরেছে। জেনিফার যা পরেছিল সেটাই। শুধু ডান হাতের অনামিকায় শোভা পাচ্ছে জর্জের দেয়া হীরের আংটি। পোশাকে পার্থক্য শুধু এটুকুই ঘটেছে যে, মাথায় ওড়নাটা কপালের নিচে একটু বেশি পরিমাণে নেমে এসেছে।’

ইমাম সাহেবরা এসে ভেতরে বসলেন।

আহমদ মুসা জর্জ ও জেনিফারের কাছাকাছি এসে একটু নিচু গলায় বলল, ‘বিয়ের জন্যে ইসলামী বিধান মতে অভিভাবকদের উপস্থিতি প্রয়োজন। তোমরা আমাকে অভিভাবকত্ব দিচ্ছ কিনা।’

‘ভাইয়া, আল্লাহ সবচেয়ে বড় অভিভাবক। আর দুনিয়ায় আপনার চেয়ে বড় কোন অভিভাবক আমাদের নেই।’ বলল জেনিফার।

‘আমি জেনিফারের মতকে সম্মান করি ভাইয়া।’ বলল জর্জ, তার ঠোঁটে হাসি।

‘ভাইয়া, ও কি বলল দেখুন।’

হাসল আহমদ মুসা। জর্জের মাথায় আঙুল দিয়ে একটা টোকা দিয়ে বলল, ‘যাই হোক, বিয়ের পর যেন ঝগড়া দিয়ে জীবন শুরু করো না।’

বিয়ের অনুষ্ঠান হলো খুবই সংক্ষিপ্ত।

আহমদ মুসা বর ও কনে দুই পক্ষের নিকট থেকে সম্মতি (এজেন) আদায়ের দায়িত্ব পালন করল। সাক্ষী মসজিদের মুয়াজ্জিন এবং আরও একজন। বিয়ে পড়াল ইমাম সাহেব। সবশেষে দোয়া করল আহমদ মুসা।

এই রাতে মিষ্টি পাওয়া সম্ভব নয়। আহমদ মুসা সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে সকলের হাতে একটা করে আমেরিকান ক্যান্ডি তুলে দিয়ে বলল, ‘হাসপাতালের পাশের একটা শপে এটাই পেয়েছি। আপনারা এটা গ্রহণ করে দম্পতিকে দোয়া করুন।’

‘আপনি যে মিষ্টির কথা বলছেন, সে মিষ্টির চেয়ে অনেক দামী মিষ্টি এটা।’ বলল ইমাম সাহেব।

‘ধন্যবাদ।’ বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা ইমাম সাহেবদের গাড়িতে রেখে কক্ষে ফিরে এল আবার।

এবার আহমদ মুসা কক্ষে প্রবেশের আগে দরজায় নক করল। জেনিফার এসে দরজা খুলে ধরলে তবেই আহমদ মুসা কক্ষে প্রবেশ করল।

জর্জ এবং জেনিফার দু’জনেই লজ্জায় জড়সড়। দু’জনের চোখে মুখেই নতুন এক লজ্জার আবরণ।

‘আমার যাবার সময় হয়েছে। কয়েকটা কথা বলছি মনোযোগ দিয়ে তোমরা শুন।’

বলে আহমদ মুসা একটা দম নিল। তারপর শুরু করল, ‘জেনিফার হাসপাতালের বাইরে বেরুতে পারবে না। কাউকে দিয়ে খাবার আনিয়ে খেতে হবে। এই অবস্থায় হাসপাতালে থাকা কঠিন হবে। সুতরাং আজকেই বিকেলে হাসপাতাল থেকে রিলিজ নেয়ার চেষ্টা করতে হবে। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, জর্জদের বাড়ি ওরা চিনেছে। ওখানে তোমরা দু’জন কেউ নিরাপদ নও। সুতরাং হাসপাতাল থেকে ভিন্ন কোথাও গিয়ে তোমাদের উঠতে হবে। জর্জের কোন আত্মীয়ের বাসা হলে চলবে না। আত্মীয়ের বাসার সন্ধান ওদের জন্যে সহজ হবে। এ রকম জায়গা তোমাদের খোঁজে আছে?’

‘আমার এক ফুফা চাকরী নিয়ে সপরিবারে পোর্টেরিকা চলে যাচ্ছেন আজ, সেখানেই আজ আমার উঠার কথা। আম্মাও আসবেন। আমরা সেখানে উঠতে পারি।’

‘ধন্যবাদ জেনিফার। একটা দুঃশ্চিন্তা থেকে আমাকে বাঁচালে।’

একটু থামল। শুরু করল আবার, ‘জেনিফারের বেরুনই চলবে না বাড়ির বাইরে। জর্জ বেরুলেও কিছু ছদ্মবেশ নিয়ে বেরুতে হবে।’

‘ভাইয়া, আমি তো ওদের টার্গেট নই। হলে আজই তো নিয়ে যেত।’ বলল জর্জ।

‘জর্জ তোমার টার্গেট হওয়া, না হওয়া নির্ভর করছে ডাঃ মার্গারেটকে নিয়ে কি ঘটছে তার উপর। খোদা না করুন, সে যদি সব কথা বলে দিতে বাধ্য হয়, সব কিছু স্বীকার করতে বাধ্য হয়, তাহলে তুমি ওদের একটা প্রধান টার্গেট হয়ে দাঁড়াতে পার।’

উদ্বেগ, আতংকে ছেয়ে গেল জর্জ এবং জেনিফারের মুখ। বলল আর্তকণ্ঠে জেনিফার, ‘আপার উপর কি নির্যাতন করতে পারে?’

‘জর্জ, জেনিফার তোমরা কি হবে, কি ঘটবে এসব নিয়ে ভেব না। ভবিষ্যতটা আল্লাহর উপর ছেড়ে দাও। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ হেফাজতকারী।’

বলে আহমদ মুসা টেবিলের উপর থেনে নিজের ব্যাগটা তুলে নিল।

আহমদ মুসার যাবার প্রস্তুতি দেখে জর্জ এবং জেনিফার দু'জনেরই মুখ মলিন হয়ে উঠল। বলল জেনিফার, 'শত শত্রুর মধ্যে গিয়ে আপনি কিভাবে কি করবেন! আপার মত আপনিও যদি বিপদে পড়েন, আমার ভয় করছে ভাইয়া।' ভারি কণ্ঠ জেনিফারের।

'বলেছি তো, কি হবে, কি ঘটবে এসব চিন্তাকে বড় করে দেখো না।' একটু শক্ত কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

'আপনার খবরের জন্যে প্রতি মুহূর্তে আমরা উৎকণ্ঠিত থাকব। কিভাবে আমরা জানতে পারব।' জর্জ অশ্রু ভেজা নরম কণ্ঠে বলল।

আহমদ মুসা একটু চিন্তা করল। বলল, 'এ ব্যাপারে আমি এখন কিছু বলতে পারবো না। তবে কোন খবর থাকলে সেটা মাকোনির কাছেই থাকবে।'

বলে আহমদ মুসা যাবার জন্যে পা বাড়িয়েও ঘুরে দাঁড়াল। বলল জেনিফারকে, যদি সম্ভব হয় তাহলে আজতেই তোমার ভাবীকে টেলিফোন করে বলবে, 'আমি সানসালভাদরে গেছি।'

'আপার কথা তাঁকে বলব?'

'ওঁর কাছে কোন কথা আমি লুকোই না, তা যত খারাপই হোক।'

আহমদ মুসা সালাম দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে পা বাড়াল দরজার দিকে।

জর্জ ও জেনিফারের চারটি চোখ আহমদ মুসা চলে গেলেও তার চলার পথের উপর আটকে থাকল। দু'জন যেন হারিয়ে ফেলেছে নিজেদেরকে।

এক সময় ধীরে ধীরে মুখ খুলল জেনিফার। বলল, 'দেখেছ জর্জ, ভাইয়া ভাবীর কথা মনে করেছেন, কিন্তু তাঁর চোখে মুখে কোন বেদনা, দুশ্চিন্তা নয়, বরং তাতে একটা প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তির ছাপ। অথচ তিনি ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছেন একটা জীবন-মৃত্যুর লড়াই-এ।'

'এটাই আহমদ মুসা জেনিফার। আল্লাহ ওঁকে মানুষের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর মনও ঐভাবে তৈরি।' বলল জর্জ।

'না হলো না জর্জ। উদ্দেশ্য লক্ষ্য স্থির করার এবং মন ঠিক করার দায়িত্ব মানুষের। আহমদ মুসা তা করেছেন।'

‘তুমি ঠিক বলেছ জেনিফার। এ অধিকার আল্লাহ মানুষের হাতেই দিয়েছেন।’ বলল জর্জ।

‘ধন্যবাদ। সত্য তুমি বিনা তর্কে মেনে নিয়েছ জর্জ।’ হেসে বলল জেনিফার জর্জের দিকে তাকিয়ে।

জর্জও চোখ তুলল জেনিফারের দিকে। তারও মুখে হাসি। বলল, ‘বিশ্বাস কর জেনিফার, তোমার মতকে আমি সম্মান করি।’

‘ধন্যবাদ, ভাইয়ার পরামর্শ যে তুমি মানছ!’ মুখে মিষ্টি হাসি জেনিফারের।

‘না জেনিফার, এ শ্রদ্ধা আমার তোমাকে জানার পর থেকেই।’

‘তাহলে কথায় কথায় ঝগড়া বাধাও কেন?’

‘তুমি রাগলে তোমাকে অপরূপ দেখায়।’ বলে জর্জ হাত বাড়াল জেনিফারের দিকে।

‘না মশায়, এটা হাসপাতাল। বেড রুম নয়, বাড়ি নয়।’

বলে জেনিফার দৌড় দিয়ে পালাল জর্জের কাছ থেকে। তার মুখ ভরে গেছে মিষ্টি হাসিতে। রাঙা হয়ে উঠেছে মুখ আপেলের মত।

# ৪

রাগে-ক্ষোভে মুখ লাল করে টেলিফোন রাখল ফার্ডিন্যান্ড।

তাকাল তীব্র দৃষ্টিতে সামনে বসা অপারেশন কমান্ডার হের বোরম্যান এবং তথ্য চীফ পল-এর দিকে। বলল, 'গোল্ড ওয়াটার দারুণ ক্ষেপেছে। বলছে, যাকে যেখানে সন্দেহ হয় সাফ করে দাও। তাঁর রাগ হলো, যে সব কথা হোয়াইট ঈগলের বাইরে কাক-পক্ষীও জানত না, তা টিভি নেটওয়ার্ক ও নিউজ এজেন্সী নেটওয়ার্কে গেল কি করে?'

'হোয়াইট ঈগল-এর বাইরে কাক-পক্ষীও জানে না, একথা ষোলআনা ঠিক নয় স্যার। চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছেলে তো ব্যাপারটা ধরে ফেলেছিল যাদের মধ্যে অন্তত একজন লায়লা জেনিফার এখনও জীবিত আছে। এবং গ্রান্ড টার্কস দ্বীপে আমাদের লোক গায়েব করার যে ঘটনাগুলো পর পর ঘটল তা লায়লা জেনিফারের এলাকা বা লায়লা জেনিফারকে কেন্দ্র করেই।' বলল বোরম্যান।

'কিন্তু লায়লা জেনিফাররা মাত্র জনসংখ্যাগত একটা তথ্য জানতে পেরেছিল, আমাদের পরিকল্পনার কিছুই তো জানতে পারেনি।' বলল বিরক্তির সাথে ফার্ডিন্যান্ড।

'মাফ করবেন স্যার, গ্রান্ড টার্কস-এর কুইন এলিজাবেথ হাসপাতালের তিনটি মৃত মুসলিম পুরুষ শিশুর প্যাথোলজিক্যাল রিপোর্ট আমাদের হাতে এসেও হাত ছাড়া হয়ে যাওয়া এবং সবচেয়ে বড় কথা ডাঃ ওয়াভেলের বাসায় আমাদের লোকদের হাত থেকে আমাদের প্লান বাস্তবায়নের রিভিউ রিপোর্ট শত্রুর হাতে চলে যাওয়া প্রমাণ করে শত্রুর হাতে আমাদের তথ্য চলে গেছে। সে শত্রুরাই তথ্যগুলো টিভি চ্যানেল ও নিউজ এজেন্সী চ্যানেলে দিয়েছে।' বলল হের বোরম্যান।

'কিন্তু এই শত্রু তো এমন নয় যে, ঐ সব বিশ্ব চ্যানেল নিয়ন্ত্রণ করে!' ফার্ডিন্যান্ড বলল।

‘ঐ এশিয়ানকে পাওয়ার আগে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে না স্যার।’ বলল বোরম্যান।

‘ডাঃ মার্গারেটকে দিয়েই ঐ এশিয়ানকে পেতে হবে স্যার।’ বলল তথ্য চীফ পল।

‘হ্যাঁ মার্গারেটের প্রসঙ্গটা খুব জরুরী। আমি সে প্রসংগে আসছি, তার আগে এস একটু আলোচনা করি, এখন পরিস্থিতি কি? ঐ টিভি নিউজ ও নিউজ পেপার রিপোর্টের স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া কি?’ ফার্ডিন্যান্ড বলল।

পল নড়েচড়ে বসল। বলল, ‘বাইরের এ পর্যন্ত চারটা প্রতিক্রিয়ার কথা জানা গেছে। এক. বৃটিশ সরকার তার টার্কস দ্বীপপুঞ্জের বিষয়টা তদন্তের জন্যে একটা তদন্ত কমিশন গঠন করেছে এবং তদন্ত কমিশনটি দু’একদিনের মধ্যেই টার্কস দ্বীপপুঞ্জে এসে পৌছবে। দুই. এ্যামনেষ্টি তার নির্বাহী কমিটির জরুরী মিটিং-এ বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং সাত দিনের মধ্যে গোটা বিষয়ের উপর সরেজমিন রিপোর্ট চেয়েছে। তিন. জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন ও ইউনিসেফও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং সরেজমিন রিপোর্টের জন্যে প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছে। আর ইউনিসেফ ক্যারিবিয়ানের প্রত্যেক হাসপাতাল ও ক্লিনিকে পৃথক পৃথক ফান্ড দিয়ে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছে ছয় মাসের জন্যে। তারা প্রত্যেক শিশুর কেস মনিটর করবে। চার. ওআইসি, রাবেতা আলমে আল ইসলামীসহ পৃথিবীর অসংখ্য মুসলিম সংগঠন বিষয়টির তীব্র প্রতিবাদ করেছে, জাতিসংঘের কাছে তদন্ত ও বিচার দাবী করেছে। ওআইসি সরকারগুলোর সাথে যোগাযোগ করে প্রত্যেক দেশেই পর্যবেক্ষক দল পাঠাচ্ছে। আর অভ্যন্তরীন অবস্থা হলো, সরকারগুলো চারদিকের প্রবল প্রেসারের মুখে চরম বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছে। গত ছয় সাত বছরের সকল শিশু মৃত্যুর পরিসংখ্যান ও বিবরণ সংগ্রহ করছে। সরকারগুলো তাদের সকল হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোর শিশু বিভাগে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছে। প্রতিটি অসুস্থ শিশুর প্রতি বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। অন্যদিকে ক্যারিবীয় অঞ্চলের জনগণের মধ্যে বিশেষ করে মুসলিম সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতংক দেখা দিয়েছে। অসুস্থ শিশুর চিকিৎসা গর্ভবতী

মহিলাদের প্রসবের জন্যে হাসপাতাল ও ক্লিনিকে নেয়া তারা বন্ধ করেছে। সরকার ও ইউনিসেফ উদ্যোগ নিয়েছে তাদের বুঝানোর জন্যে।'

এক নাগাড়ে কথাগুলো বলে থামলো তথ্য চীফ পল।

ফার্ডিন্যান্ডের চোখে মুখে বিরক্তি ও ক্রোধের ছাপ। বলল, 'খারাপ খবরগুলো যতটা বিস্তৃত ও মনোযোগের সাথে সংগ্রহ করেছ, তার খোঁজ সউদী আরবের ওআইসি পেলে তোমাকে পুরস্কার দেবে।'

বলে ফার্ডিন্যান্ড হের বোরম্যানের দিকে চেয়ে বলল, 'আমাদের চলমান কাজের ব্যাপারে যা বলেছিলাম, তার কি করেছ?'

'আপনার কথাই ঠিক স্যার। প্রত্যেক অঞ্চল থেকে আমাদের লোকেরা একই কথা বলেছে, যে বা যারা আমাদের পক্ষে কাজ করছে, তারা সবাই ভীত হয়ে পড়েছে। কেউ কেউ কর্মস্থল থেকে সরে পড়েছে। এই অবস্থায় তাদেরও সকলের মত, পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখা যাবে না এবং কাজ বন্ধও হয়ে গেছে।' বলল বোরম্যান।

রাগে-ক্ষোভে মুখ লাল হয়ে উঠেছে ফার্ডিন্যান্ডের। বলল, 'প্রকল্পের কাজ বন্ধ থাকবে, কিন্তু যে শয়তানরা এই বিপর্যয়ের জন্যে দায়ী, তাদের শায়েস্তা করার কাজ তীব্র করতে হবে। লায়লা জেনিফারকে যে ভাবেই হোক ধরতে হবে। ওকে জ্যান্ত কবর দিতে হবে। জর্জকেও খোঁজ কর। মনে হচ্ছে সেও একজন নাটের গুরু।'

বলে থামল। গ্লাস থেকে এক ঢোক মদ গলধঃকরণ করে বলল, 'বল এবার শয়তান ডাক্তারের কথা।'

'স্যার আমরা যে ভদ্র আচরণ করছি, তা দিয়ে তার কাছ থেকে কথা বের করা যাবে না।' বলল হের বোরম্যান।

'কি করব এটা গোল্ড ওয়াটারের অনুরোধ। ডাঃ মার্গারেটের আব্বা এবং আমাদের গোল্ড ওয়াটার পরষ্পর পরিচিত ছিলেন। মার্গারেটের আব্বা বৃটিশ নৌবাহিনীতে থাকাকালে একবার এক বিপন্ন অবস্থা থেকে গোল্ড ওয়াটারকে বাঁচিয়েছিলেন।' বলল ফার্ডিন্যান্ড।

‘কিন্তু স্যার তাকে মানসিক চাপ দিয়ে কথা আদায়ের সকল প্রচেষ্টা বলা যায় ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের গোয়েন্দা ইউনিটের সবচেয়ে দক্ষ মিঃ বেভান এবং হায়েনার মত ক্রুর ও শৃগালের মত চালাক মিস মার্টিনা তার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় একটা কথাও আদায় করতে পারেনি।’

‘পরিবেশটা কি সৃষ্টি করেছিলে?’

‘স্যার তাকে তিন দিন থেকে ঘুমুতে দেয়া হয়নি। সর্বক্ষণ চোখ ধাঁধানো আলোর মধ্যে রাখা হয়েছে। তার সাথে হৃদয় মুচড়ে দেয়ার মত অব্যাহত শব্দের নিরন্তর আক্রমণ। মানসিক প্রতিরোধ তার নষ্ট হয়ে যাবার কথা। এরপরও কিন্তু এর কাছ থেকে একটা কথাও বের হয়নি।’

‘চল আমি তার সাথে কথা বলব। তারপর সিদ্ধান্ত নেব কি করা যায়।’

বলেই ফার্ডিন্যান্ড উঠে দাঁড়াল।

উঠে দাঁড়াল হের বোরম্যান এবং পল।

ডাঃ মার্গারেটকে রাখা হয়েছে অফিস বিল্ডিং-এর নিচ তলায় একটি কক্ষে। হোয়াইট ঈগলের বন্দীখানাটা কলম্বাস দ্বীপের পাশেই ককবার্স দ্বীপে।

সানসালভাদর শহরটা কয়েকটা দ্বীপের সমষ্টি।

ডাঃ মার্গারেটকে হোয়াইট ঈগলের বন্দীখানায় নিয়ে যাওয়া হয়নি। এটাও গোল্ড ওয়াটারের পরামর্শেই। গোল্ড ওয়াটারের পরামর্শ হলো, মেয়ে মানুষ তার উপর বয়স কম। কোন কৃমিনালও নয়। সুতরাং তার কাছ থেকে কথা বের করা কোন ব্যাপার নয়। বন্দী খানায় রাখার দরকার নেই।’

অফিস বিল্ডিং এবং ফার্ডিন্যান্ডের বাড়ি পাশাপাশি গায়ে গায়ে লাগানো। কিন্তু অফিস বিল্ডিংটা কলম্বাস কমপ্লেক্সের অংশ। আর ফার্ডিন্যান্ডের বাড়ি কমপ্লেক্সের বাইরে।

ফার্ডিন্যান্ডের বাড়ি তিন তলা।

ফার্ডিন্যান্ডের বাড়ির তিন তলা ও অফিস বিল্ডিং এর তিন তলা একটা করিডোর দিয়ে সংযুক্ত। করিডোরটি ছয়ফুট দীর্ঘ একটা ফোল্ডিংব্রীজ। ফোল্ড (F) সুইচ টিপলে করিডোরটি প্রসারিত হয়ে দুই বিল্ডিং-এর মধ্যে একটা ব্রীজে

পরিণত হয়। আর আনফোল্ড (UF) সুইচ টিপলে মুহূর্তে ব্রীজটি সরে যায়। ফার্ডিন্যান্ড এই পথেই অফিসে যাতায়াত করেন।

অফিস বিল্ডিংটা দক্ষিণমুখী। আর ফার্ডিন্যান্ডের বাড়ি পূর্বমুখী।

ফার্ডিন্যান্ডের বাড়ির উত্তরের জানালায় দাঁড়ালে অফিস বিল্ডিং-এর প্রধান গেট ও তার সামনের চত্বরটি পরিষ্কার দেখা যায়।

ফার্ডিন্যান্ড এগুচ্ছিল সেই ফোল্ডিং ব্রীজটার দিকে।

আগে আগে চলছিল ফার্ডিন্যান্ড। আর পেছনে একটু দুরত্ব নিয়ে হাঁটছিল হের বোরম্যান ও পল পাশাপাশি।

'পল, যে মানসিক চাপ আমরা দিচ্ছি তাতে মার্গারেটের কিছুই হবে না।' বলল বোরম্যান অনেকটা ফিসফিসিয়ে।

'একজন সাধারণ মেয়ে মানুষ এত শক্ত?'

'সাধারণ কোথায় দেখলেন?'

'না। সাধারণ এই অর্থে যে, তিনি কোন ক্রিমিনাল নন এবং গোয়েন্দাও নন।'

'তা হয়তো নয়, কিন্তু মেয়েটির নার্ভ আমাকে চমকে দিয়েছে। বুঝতে পারছি না তার এ মানসিক শক্তির উৎস কি?'

'কিন্তু তার তথ্যে যা পাওয়া গেছে, তাতে সে একজন সাধারণ ডাক্তার মাত্র। কিন্তু একজন সাধারণ মহিলা ডাক্তার এই অসাধারণ শক্তি পেল কোত্থেকে?'

'আসলে এ ধরনের মেয়েরা যে মানসিক চাপে ভেঙে পড়ে, সে চাপ আমরা দিতে পারিনি?'

'সেটা কি?'

'এ ধরনের নীতি বাগীশ মেয়েরা খুব বেশি স্পর্শ কাতর হয় তাদের সতিত্ব নিয়ে। আমরা তার মনের এই দুর্বল জায়গায় আঘাত করতে পারিনি।'

'বসকে বলেননি?'

'বলেছি। কিন্তু তিনি গোল্ড ওয়াটারের অসন্তুষ্টির ভয় করছেন।'

‘জানলে তবে তো তিনি অসন্তুষ্ট হবেন। জানবেন কি করে? নষ্ট হওয়ার আগে মেয়েদের যতই সুচিবাই থাকুক, নষ্ট হওয়ার পর এই ধরনের মেয়েরা বিষয়টা চেপে যায়। গোল্ড ওয়াটার কিছুই জানতে পারবে না।’

‘দেখা যাক, বস আজ কি করেন?’ বলল হের বোরম্যান।

সেই সংযোগ ব্রীজ পেরিয়ে সবাই এল অফিসের নিচ তলায়। তিন তলা থেকে লিফট নয় সিঁড়ি দিয়ে নামল।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে দক্ষিণ দিকে এগুলে অফিস থেকে বের হবার প্রধান গেট। কিন্তু গেটটি এখন বন্ধ। পুরু ষ্টিল-প্লেটের দেয়াল দিয়ে স্থায়ীভাবেই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তার বদলে গেট সোজা বাইরে থেকে একটা প্রশস্ত সিঁড়ি উঠে তেতলার সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এর সাথে যুক্ত হয়েছে। এই সিঁড়ি পথেই এখন হোয়াইট ঈগলের অফিসে ঢুকতে হয়। দোতলা তিনতলা এখন অফিসের কাজে ব্যবহার করা হয়। এক তলাটি ষ্টোর ও বিভিন্ন গোপন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। দোতলা থেকে নিচ তলায় নামার সিঁড়ি মুখ তালাবন্ধ ফোল্ডিং গেট দ্বারা বন্ধ। এক তলায় নেমে উত্তর দিকে এগুলে প্রায় পনের ফিট পরেই অফিসের মাঝ বরাবর দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে একটা প্রশস্ত করিডোর। দু’পাশে বন্ধ ঘর।

করিডোর দিয়ে পশ্চিম দিকে এগুলে অল্প পরেই উত্তরে আরেকটা করিডোর। দক্ষিণ মুখী করিডোরের মুখে দু’জন প্রহরী। হাতে তাদের ষ্টেনগান। ফার্ডিন্যান্ডদের দেখেই একটা স্যালুট দিয়ে দু’পাশে সরে দাঁড়াল। ফার্ডিন্যান্ডরা এ করিডোরে পশ্চিমের একটা দরজার সামনে দাঁড়াল। দরজাটা ষ্টিলের।

দরজার মাথা বরাবর উঁচুতে একটা ‘কী বোর্ড’। আলফাবেটিক্যাল ‘কী বোর্ড’-এর অর্থ দরজাটা তালাবদ্ধ।

ফার্ডিন্যান্ড দরজার সামনে দাঁড়াতেই হের বোরম্যান এগিয়ে গেল এবং কী বোর্ডের কয়েকটা আলফাবেট ডিজিটের উপর আঙুলে টোকা দিল। জ্বলজ্বলে লাল কিছুটা নীল বিন্দুতে রুপান্তরিত হলো।

খুলে গেল দরজা।

চোখ ধাঁধানো উৎকট আলোর প্রবল ধাক্কা এসে সবার চোখকে আহত করল। সে সাথে বুকে স্পন্দন তোলা এক ঘেয়ে শব্দের গোঙানী এসে কানে ঢুকল।

ঘরটির নগ্ন মেঝে। শোবার কোন ব্যবস্থা নেই। বসার কোন চেয়ারও নেই।

মার্গারেটের পরনে একটা পাতলা নাইট গাউন। আর কিছু নেই। এভাবেই তাকে ধরে এনেছিল।

দরজা খুলে যাবার পরপরই হের বোরম্যান পকেট থেকে রিমোর্ট কনট্রোল বের করে দু'টো সুইচ অফ করল। সঙ্গে সঙ্গে চোখ ধাঁধানো আলো এবং শব্দ থেমে গেল।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল ডাঃ মার্গারেট। দরজা খোলার শব্দে সে উঠে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়েছিল। তার চোখ দু'টি রক্তের মত লাল।

আলো ও শব্দ অফ হবার সাথে সাথে ডাঃ মার্গারেট ধপ করে মাটিতে পড়ে গেল। যেন আলো ও শব্দই তাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল।

ঘরে প্রবেশ করল ফার্ডিন্যান্ড, হের বোরম্যান ও পল।

ঘরে তখন জ্বলে উঠেছে হালকা নীল রঙের এক প্রশান্ত কিন্তু রহস্যময় আলো।

প্রহরীরা ইতিমধ্যেই তিনটি চেয়ার এনেছে ঘরে। ফার্ডিন্যান্ড, বোরম্যান ও পলের জন্যে।

ডাঃ মার্গারেটের দেহটা মাটির উপর এলিয়ে পড়েছিল। ধীরে ধীরে সে উঠে বসল।

ফার্ডিন্যান্ড চেয়ারে বসতে বসতে বোরম্যানকে বলল, 'আরেকটা চেয়ার আনতে বল।'

চেয়ার আরেকটা এল।

চেয়ারটা প্রহরী রাখল মার্গারেটের কাছে।

ফার্ডিন্যান্ড মার্গারেটের দিকে চেয়ে বলল, 'বসুন, আপনি চেয়ারটায়।'

মার্গারেট চেয়ারে ভর দিয়ে দুর্বল দেহটা উপরে তুলে চেয়ারে বসল।

'স্যরি ডাঃ মার্গারেট আপনি আপনার উপর অবিচার করছেন, আমাদের কোন দোষ নেই।' বলল ফার্ডিন্যান্ড।

মার্গারেট কোন উত্তর দিল না। যেমন ছিল তেমনিভাবে মাথা নিচু করে থাকল।

‘ডাঃ মার্গারেট, আমরা এক দেশের, আমরা এক জাতির। আপনার সাথে আমাদের কোন শত্রুতা নেই। আপনি আমাদের সহযোগিতা করলে সে সহযোগিতা দেশকে এবং জাতিকেই করা হবে।’ নরম কণ্ঠে বলল ফার্ডিন্যান্ড।

‘কিন্তু যে সহযোগিতা আপনারা চান, সেটা আমার বিষয় নয়।’ দুর্বল কণ্ঠে বলল মার্গারেট।

‘ডাঃ ওয়াভেলের বাসা থেকে যে এশীয়টি প্যাথোলজিক্যাল রিপোর্টগুলো ছিনিয়ে নিয়ে গেল, তাকে আপনি চেনেন? তার পরিচয় ও ঠিকানা আমরা জানতে চাই।’

বারবার এ উত্তর আমি দিয়েছি। ঐ ঘটনার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমার পক্ষে কিছুই বলা সম্ভব নয়।’

‘প্যাথোলজিক্যাল টেষ্ট করানোর ব্যাপারে আপনার বিশেষ ভূমিকা ছিল।’ বলল ফার্ডিন্যান্ড।

‘সেটা ডাক্তার হিসেবে আমার দায়িত্ব ছিল।’

‘সেই এশিয়ানকে আপনি চেনেন। আপনি আহত অবস্থায় হাসপাতালে ছিলেন যখন, তখন সেই এশিয়ান হাসপাতালে আপনার সাথে দেখা করতে যায়।’

‘সে জর্জের বন্ধু। সে নির্দোষ।’

‘আমরা তার ঠিকানা চাই।’

‘সে এখন কোথায় আমি জানি না।’

‘দেখুন আপনি উত্তর এড়িয়ে যাচ্ছেন।’

‘আমাকে মাফ করবেন। আমার কাছে আপনারা অবাস্তব দাবী করছেন।’

‘দেখুন আপনি সহযোগিতা না করলে জর্জকেও এখানে আমরা ধরে আনব।’

ভীষণ চমকে উঠল মার্গারেট। তার ভেতরটা থর থর করে কেঁপে উঠল। জর্জকে পেলে মেরেই ফেলবে ওরা। তার উপর আমি বলেছি এশীয়টি জর্জের বন্ধু। কেন বললাম?

‘জর্জের কি দোষ?’ শুকনো ও ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

‘আপনার যে দোষ, সে দোষ তারও। এক সাথেই দু’জনকে আমরা দেখাব, দেশদ্রোহিতা জাতিদ্রোহিতার কি সাজা!’

‘আমরা দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে কিছুই করিনি। কোন অপরাধ আমাদের নেই।’

‘দুঃখিত ডাঃ মার্গারেট, আমরা ভদ্র আচরণ করেছিলাম। আপনি তার মূল্য দিচ্ছেন না। নিজের জীবন কিন্তু আপনি নিজেই বিপন্ন করছেন।’ শক্ত কণ্ঠে বলল ফার্ডিন্যান্ড।

‘বাঁচব সে আশা করছি না। অতএব জীবনের ভয় দেখিয়ে আর লাভ কি?’

‘মৃত্যুর আগেও আরও অনেক ধরনের মৃত্যু আছে ডাঃ মার্গারেট। আমাদেরকে আপনি সেদিকে যেতেই বাধ্য করছেন।’

বলে ফার্ডিন্যান্ড একটু থামল। এরপর বলল, ‘শুনুন মিস মার্গারেট, এশীয় লোকটির নাম ঠিকানা আমরা জানতে চাই। কি করে হোয়াইট ঈগলের গোপন কাজের খবর টিভি ও নিউজ এজেন্সীতে গেল তা আমরা পরিষ্কার জানতে চাই। আজকের দিনটুকুই সময়। এর মধ্যে আপনি সিদ্ধান্ত নিন। সন্ধ্যে সাতটায় আমি আসব। তখন যদি সব কথা আপনার কাছ থেকে না পাই, তাহলে আপনার এক মৃত্যু আসবে। সে মৃত্যু আপনার প্রাণের মৃত্যু নয়, এক ধরনের দৈহিক মৃত্যু। এক ক্ষুধার্ত পুরুষের হাতে আপনাকে ছেড়ে দেয়া হবে। সে পুরাতন মার্গারেটের মৃত্যু ঘটিয়ে নতুন এক ধর্ষিতা মার্গারেটের জন্ম দেবে। এই মৃত্যু আপনার প্রতিরাতেই ঘটবে, যতদিন না আপনি মুখ খোলেন।’

বলেই ফার্ডিন্যান্ড উঠে দাঁড়াল।

বেরিয়ে গেল তার ঘর থেকে।

ডাঃ মার্গারেটের হৃদয়ে ফার্ডিন্যান্ডের কথাগুলো বজ্রের আঘাতের মত তীব্র হয়ে প্রবেশ করল। অসহনীয় এক যন্ত্রণায় দেহের প্রতিটি তন্ত্রী যেন তার চিৎকার করে উঠল। কিছু বলতে চাইলে সে ফার্ডিন্যান্ডকে, কিন্তু শুকনো আড়ষ্ট জিহ্বা এক বিন্দুও নড়ল না। কাঠ হয়ে যাওয়া গলা থেকে একটু স্বরও বেরুল না।

তার বিস্ফোরিত চোখের সামনে ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। জ্বলে উঠল সেই চোখ দগ্ধকারী আলো এবং বেজে উঠল হৃদয় কাঁপানো সেই অব্যাহত শব্দ।

আছড়ে পড়ল ডাঃ মার্গারেট মেঝের উপর। তার কাছে ঐ চোখ ঝলসানো আলো এবং হৃদয় কাঁপানো শব্দ এখন কিছুই মনে হচ্ছে না। মন বলছে, এই আলো আগুন হয়ে জ্বলে উঠে তার দেহকে পুড়িয়ে ছাই করে দিক এবং শব্দ ভয়ংকর হয়ে উঠে তার কান ফাটিয়ে দিক, তবু যদি বাঁচা যায় দেহের ঐ ভয়াবহ মৃত্যু থেকে।

সন্ধ্যে তো বেশি দূরে নয়! বিদ্যুতে শক খাওয়ার মত দেহটা তার কেঁপে উঠল। তার মনে হচ্ছে, এক ক্ষুধার্ত হায়েনা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সকল সম্পদ লুটেপুটে নিচ্ছে, তার সত্তাকে ছিন্ন-ভিন্ন করছে এবং তাকে একটি জীবন্ত লাশে পরিনত করছে। সে হাজার মৃত্যুর যন্ত্রণা সহ্য করতে রাজি আছে, কিন্তু এ মৃত্যু সে সইতে পারবে না। গোটা জগতের বিনিময় দিয়ে হলেও এই মৃত্যু থেকে সে বাঁচতে চায়।

সে কি তাহলে বলে দেবে আহমদ মুসার নাম এবং তার সব তথ্য যা সে জানে?

আহমদ মুসার কথা মনে হতেই চোখ ফেটে অশ্রুর ঢল নামল মার্গারেটের। না না, সে আহমদ মুসার নাম বা তার সম্পর্কে কোন তথ্যই এদের দিতে পারবে না। যে লোক কোনও স্বার্থ ছাড়াই আত্মীয় নয়, স্বজন নয় এমন লোকদের সাহায্যের জন্যে ছুটে এসেছে, নিজের জীবন বিপন্ন করে তাদের জন্যে কাজ করছে, ইতিমধ্যেই যে আহত হয়েছে কয়েকবার এবং মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছে বারবার এবং যার আগমনের সাথে সাথে সৌভাগ্যের সূর্যোদয় ঘটেছে মজলুম ক্যারিবিয়ানদের জীবনে, সেই আহমদ মুসার কথা সে এদের বলতে পারবে না।

কিন্তু তার পরিনতি কি হবে। সে তো তার জীবনের সবকিছু হারাবে, একটা সজীব দেহের খোলস ছাড়া তো তার কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না। এই জীবন নিয়ে বাঁচবে কি করে সে! গোটা দেহ মন তার আর্তনাদ করে উঠল। গোটা পৃথিবী এবং তার মৃত্যুর বিনিময়েও সে এই পরিনতি থেকে বাঁচতে চায়। এক

আহমদ মুসা কি এই গোটা পৃথিবী এবং তার জীবনের চেয়ে বড় হয়ে গেল? আহমদ মুসা তার কে? কিন্তু এই প্রশ্ন উচ্চারণ করতে গিয়ে কেঁপে উঠল তার হৃদয়। হৃদয়ের কোন দরজা যেন খুলে গেল। ভীষণভাবে চমকে উঠল ডাঃ মার্গারেট। একি দৃশ্য সেখানে! হৃদয়ের সে গহীনে আহমদ মুসা যে তার জীবন ও তার পৃথিবীর চেয়ে বড় আসন নিয়ে বসে আছে। হৃদয়ের সবটুকু জুড়ে যে সে সমাসীন! সবটা হৃদয় উপচে একটাই সুর জেগে উঠল, আহমদ মুসার জন্যে কোন ত্যাগই তার কাছে বড় নয়, কোন পরিণতিই তাকে পিছপা করতে পারে না।

নিজেকে এইভাবে আবিষ্কার করে আঁৎকে উঠল মার্গারেট। কি অন্যায় করে সে বসে আছে! ও জানতে পারলে নিশ্চয় তাকে অন্ধ, অবিবেচক ও জঘন্য চরিত্রের বলে মনে করবে। সত্যিই সে সব জেনেও অন্ধের মত কাজ করেছে।

কিন্তু কি দোষ তার! সজ্ঞানে তো আমি এমনটা কখনো চিন্তা করিনি।

চোখ থেকে নেমে আসা অবিরল ধারার অশ্রু মুছে ফেলল মার্গারেট। হঠাৎ তার মনের ভয়গুলো যেন কোথায় হাওয়া হয়ে গেছে। তার নিজের আর কিছুই নেই, তাই কিছু হারাবার ভয়ও নেই। তার সামনে আর কোন চাওয়া নেই, তাই আর কিছু পাওয়ারও প্রশ্ন নেই। কোন অদৃশ্য লোক থেকে যেন একটা প্রশান্তির হাওয়া নেমে এল তার হৃদয় জুড়ে। আহমদ মুসার জন্যে সে সবকিছু উৎসর্গ করতে প্রস্তুত, এর চেয়ে বড় সাফল্য তার আর কি হতে পারে!

নতুন ধরনের এক কান্না নেমে এল তার দু'চোখ জুড়ে। এ যেন আপনার চেয়ে আপন যিনি, তার জন্যে সব হারানোর প্রশান্তি।

দু'হাতে চোখ চেপে উপুড় হয়ে পড়ে মেঝেতে মুখ গুজেছে মার্গারেট। যেন সে লুকাতে চায় তার একান্ত আপনার এ কান্না। কিন্তু তার এ কান্না দেখার তো কেউ নেই ঘরের চার দেয়াল ছাড়া।

বাহামার সানসালভাদর।

সানসালভাদরের কলম্বাস বিমান বন্দরে ল্যান্ড করল আহমদ মুসা। বিমানের সিঁড়ি থেমে সামনে তাকাতেই ছোট আকারের দোতলা টারমিনালের উপর দিয়ে দেখতে পেল কলম্বাস মনুমেন্ট। কলম্বাস মনুমেন্টটি কলম্বাস নৌবন্দরের প্রবেশ মুখে। মনুমেন্ট পেরিয়ে সমুদ্র যাত্রার জন্যে নৌবন্দরে প্রবেশ করতে হয়।

কলম্বাস নৌবন্দরের পাশেই গড়ে তোলা হয়েছে কলম্বাস বিমান বন্দর।

বিমান বন্দর থেকে বেরিয়ে এল আহমদ মুসা। তার মুখে ইহুদী বারবীদের মত দাঁড়ি। মাথায় বারবীদের মতই পেয়ালা মার্কা টুপি। তাকে একবার দেখেই যে কেউ বলবে ইসরাইলের একজন তরুণ বারবী এসেছে কলম্বাসের স্মৃতি বিজড়িত সানসালভাদরে বেড়াতে।

আহমদ মুসার দরকার একজন ভাল ট্যাক্সিওয়ালা। এখন তার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন 'দি ব্লু বার্ড' এয়ারলাইন্সের ঠিকানা। এয়ারপোর্টের কাউন্টারে এটা সে জিজ্ঞেস করতে পারতো। কিন্তু নিরাপদ মনে করেনি আহমদ মুসা। হোয়াইট ঈগল-এর জাল এ ছোট্ট বিমান বন্দরে কতটা বিস্তৃত এবং কে তাদের সাথে আর কে নেই তার কিছুই সে জানে না। জিজ্ঞেস করতে গিয়ে হঠাৎ সে তাদের চোখে পড়ে যেতে পারে। সে চায়না মার্গারেটের দেখা পাওয়ার আগে তাকে শত্রু শিবির চিনে ফেলুক।

আহমদ মুসা টারমিনালের বাইরে গিয়ে হাতের ব্যাগটা মাটিতে রেখে ট্যাক্সি ষ্ট্যান্ডের দিকে তাকাতেই ট্যাক্সি ষ্ট্যান্ড থেকে একজন লোক এগিয়ে এল। আহমদ মুসার সামনে এসে বলল, 'গাড়ি লাগবে স্যার?'

'হ্যাঁ। তুমি 'দি ব্লু বার্ড' এয়ার লাইন্স-এর অফিস চেন?'

'ওটা তো এয়ারলাইন্স নয় স্যার, একটা এয়ার কোম্পানী। কোন লাইনে ওরা যাতায়াত করে না, কোন যাত্রীও বহন করে না, সাধারণ কোন কার্গো ক্যারিয়ারও নয়। আমার মনে হয় রিজার্ভ ক্যারিয়ার হিসাবে কাজ করে। যে নেয় গোটা বিমান ভাড়া নেয়।'

আহমদ মুসার কাছে এ তথ্যগুলো খুবই মূল্যবান। কিন্তু এ বিষয়ে কোন কথা বলল না। জিজ্ঞেস করল 'দি ব্লু বার্ড'-এর অফিস কোথায় কতদূর?'

‘বেশি দূরে নয়, কলম্বাস কমপ্লেক্সের ওপাশে।’ বলল ট্যাক্সির লোকটি।

‘তাহলে চল।’

বলে আহমদ মুসা ব্যাগটি হাতে তুলে নিল।

‘স্যার কি বিমান ভাড়া-টাড়া নেবেন?’ বলল হাঁটতে হাঁটতে ট্যাক্সির লোকটি।

‘দেখি ওদের সাথে বনিবনা কেমন হয়।’ বলল আহমদ মুসা।

তারা গাড়িতে উঠল। গাড়ি চলতে শুরু করলে আহমদ মুসা বলল, ‘দেশে শান্তি কেমন আছে, কোন গন্ডগোল নেই তো?’

আহমদ মুসা একটু টোকা দিয়ে তার দৃষ্টি ভংগি জানতে চাইল।

‘না স্যার কোন অসুবিধা নেই। তবে অশ্বেতাংগ বিদেশীরা থাকতে চাইলেই অসুবিধা।’ বলল লোকটি। লোকটিও অশ্বেতাগং, মিশ্র শ্রেণীর।

‘কেমন অসুবিধা?’

‘তাদের থাকতে দেয়া হচ্ছে না।’

‘নাগরিকত্ব নিয়ে থাকতে চাইলেও?’

‘ক’বছর আগেও অশ্বেতাংগদের নাগরিকত্ব দেয়া হয়েছে। এখন একদম বন্ধ।’

‘কেন?’

‘জানি না। তবে শোনা যায়, অশ্বেতাংগদের সংখ্যা আর বাড়তে দেয়া হবে না। অন্যদিকে স্যার, শ্বেতাংগদের সংখ্যা বাড়াবার জন্যে ¯্রােতের মত শ্বেতাংগদের নিয়ে আসা হচ্ছে।’

‘কেন, এর প্রতিবাদ হয় না? অশ্বেতাংগরা তো এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ।’

‘স্যার এসব হচ্ছে আইন করে নয়, বেআইনি ভাবে। শ্বেতাংগদের নিয়ন্ত্রণে সরকার। আইনের লোকেরা চোখের আড়ালে বেআইনি কাজ করে যাচ্ছে, ধরবে কে?’

‘আচ্ছা এই ‘দি ব্লু বার্ড’ এয়ার লাইন্সটা কাদের?’

'আমি জানি না স্যার। তবে এদের অফিসটা কলম্বাস কমপ্লেক্সে ছিল। স্থান সংকটের কারনে নতুন জায়গায় অফিস নিয়েছে। স্যার, যারা কলম্বাস কমপ্লেক্সে জায়গা পায় তারা খাস শ্বেতাংগ।'

'ধন্যবাদ। তোমার নাম কি?'

'জন কার্লোস।'

'তুমি খৃষ্টান?'

'আমার আব্বা খৃষ্টান ছিলেন। মা খৃষ্টান ছিলেন না।'

'তুমি?'

'মন খারাপ হলে মাঝে মাঝে গীর্জায় যাই স্যার।'

মিনিট দশেকের মধ্যেই এসে পৌছল তারা 'দি ব্লু বার্ড' অফিসের সামনে।

রাস্তার উপর গাড়ি দাঁড় করাল কার্লোস।

রাস্তার পরে ছোট্ট একটা প্রাঙ্গন। প্রাঙ্গনের পরেই তিন তলা একটা বিল্ডিং।

বিল্ডিং-এ ঢোকার গেট মুখে একটা সাইনবোর্ড। তাতে লেখা, 'দি ব্লু বার্ড লিমিটেড'। তার নিচে লেখা একটা অভিজাত প্রাইভেট এয়ার কোম্পানী।'

ড্রাইভার কার্লোস ঘুরে এসে আহমদ মুসাকে নামার জন্যে গাড়ির দরজা খুলে ধরে বলল, 'স্যার আমি কি অপেক্ষা করব?'

'কিছুটা সময় দেখতে পার, দেরী হলে চলে যেয়ো।'

বলে আহমদ মুসা পঞ্চাশ বাহামা ডলারের একটা নোট তুলে দিল কার্লোসের হাতে।

কার্লোস নোটটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্যার আমার কাছে তো ভাঙতি নেই।'

'নোটটা তো তোমাকে ভাঙাবার জন্যে দেইনি কার্লোস।'

কার্লোস বিস্ময়ের সাথে বলল, 'স্যার, ভাড়া মাত্র ২০ ডলার, আপনি দিয়েছেন ৫০ ডলার।'

'যা ভাড়া হওয়া উচিত, তাই তোমাকে দিয়েছি।'

'পোর্টরিকো কিংবা ফেøোরিডার হিসাবে ধরলে ঠিক বলেছেন।' বলতে বলতে লজ্জা ও সংকোচের সাথে নোটটা কার্লোস পকেটে রাখল।

আহমদ মুসা অফিসের দিকে হাঁটা শুরু করল।

অফিসের বারান্দা বেশ উঁচু। বড় বড় তিনটি সিঁড়ি পেরিয়ে বারান্দায় উঠা যায়।

অফিস বিল্ডিংটির দু'পাশের অংশ বারান্দার সিঁড়ির সমান্তরাল। আর প্রশস্ত অর্ধ চন্দ্রকার বারান্দাটি বিল্ডিং-এর পেট থেকে অনেকখানি জায়গা নিয়ে নিয়েছে।

আহমদ মুসা বারান্দায় উঠে দেখতে পেল ভেতরে ঢোকার দরজা কাঁচের। আহমদ মুসা কাঁচের দরজা টেনে ভেতরে প্রবেশ করল। দরজার পরে একটা প্রশস্ত ঘর।

ঘরের ঠিক মাঝখানে বসে আছে টেবিল-চেয়ার নিয়ে একজন। তার টেবিলে রয়েছে একটা টেলিফোন, একটা রেজিষ্টার বুক, একটা কলমদানি এবং কিছু কাগজপত্র পেপার ওয়েট দিয়ে চাপা দেয়া।

আহমদ মুসা বুঝল লোকটি রিসেপশনিষ্ট। বয়সে যুবক।

আহমদ মুসা ঢুকতেই রিসেপশনিষ্ট যুবক বলল, 'এদিকে আসুন, কি চাই আপনার?'

আহমদ মুসা তার দিকে এগিয়ে বলল, 'স্যাররা কেউ আছেন?'

'চেয়ারম্যান, ডিরেক্টর সবাই আছেন। কাকে চান?'

'চেয়ারম্যান।'

রিসেপশনিষ্ট টেলিফোন হাতে তুলে নিতে নিতে বলল, 'কি কাজে দেখা করতে চান?'

'এয়ার লাইন্স নিয়ে।'

রিসেপশনিষ্ট কথা বলল টেলিফোনে। টেলিফোন রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'চলুন।'

কিন্তু এক ধাপ এগিয়েই ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, 'একটু দাঁড়ান বাইরের দরজাটা লক করি।'

বলে সে টেলিফোনের পাশ থেকে ছোট রিমোর্ট কনট্রোল টেনে নিয়ে একটা বোতামে চাপ দিল।

আহমদ মুসা বুঝল, দরজাটা রিমোর্ট কনট্রোলের অধীন। এদের সবকিছুই কি তাহলে এ ধরনের রিমোর্ট কনট্রোলের মত সর্বাধুনিক ব্যবস্থার অধীন?

রিসেপশনিষ্ট হাঁটতে শুরু করেছে।

আহমদ মুসা তার পেছনে পেছনে চলল।

দু'তলায় উত্তর-পূর্বের একেবারে প্রান্তের একটা দরজার সামনে দাঁড়াল রিসেশনিষ্ট।

নক করল সে দরজায়। তারপর প্রবেশ করল চেয়ারম্যানের পি,এ এর কক্ষে।

পি,এ এর কক্ষে পৌছে দিয়েই রিসেপশনিষ্ট ফিরে গেল।

পি,এ একজন শ্বেতাংগ তরুণী।

আহমদ মুসাকে বসতে বলেই সে ইন্টারকমে বলল, 'স্যার ভিজিটর এসেছেন।'

'আচ্ছা, পাঠিয়ে দাও।'

পি,এ তরুণীটি উঠে পাশের দরজাটা খুলে ধরে বলল, 'যান ভেতরে স্যার।'

আহমদ মুসা প্রবেশ করল।

দেখল, ঘরের প্রায় মাঝ বরাবর একটা সুদৃশ্য টেবিলের ওপাশে একটা রিভলভিং চেয়ারে গা এলিয়ে বসে আছে একজন মাঝ বয়সী শ্বেতাংগ। বলিষ্ঠ চোয়াল, তীক্ষè চোখ লোকটির। মুখ দেখেই বুঝা যায়, শরীরে একটুকুও মেদ নেই। খেলোয়াড় কিংবা সেনাবাহিনীর লোক হলে তাকে মানাতো ভাল।

লোকটি আহমদ মুসাকে দেখেই চেয়ারে সোজা হয়ে বসল। সামনে টেবিলের ওপাশে চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলল।

ধন্যবাদ জানিয়ে আহমদ মুসা বসল।

'বলুন, কি প্রয়োজন আপনার?' তীক্ষè দৃষ্টি লোকটির চোখে।

‘আমি ‘বাহামা এয়ার’ অফিসে গিয়েছিলাম জানার জন্যে যে ওদের ‘চাটার্ড সিষ্টেম’ আছে কিনা। তারা দুঃখ প্রকাশ করে আপনাদের কথা বলল। সে জন্যে এসেছি।’

লোকটির চোখে বিস্ময়। বলল, ‘কি চাই আপনার?’

‘এখান থেকে পোর্টেরিকা, এখান থেকে গ্রান্ড টার্কস, এইসব দূরত্বের ভাড়া কত? শুনলাম গতকাল আপনাদের একটা বিমান কারা যেন গ্রান্ড টার্কসে নিয়ে গিয়েছিল। ভাড়া কত ছিল?’

লোকটির প্রতিক্রিয়া জানা এবং তাকে স্বরূপে বের করে আনার জন্যেই আহমদ মুসা শেষ বাক্যটা বলল।

আহমদ মুসার শেষ কথা শোনার সংগে সংগেই লোকটির চোখ চঞ্চল হয়ে উঠল। বলল, ‘গ্রান্ড টার্কস-এ যাওয়ার তথ্যও কি ওরাই দিয়েছে?’

‘হ্যাঁ, আমি এয়ারপোর্ট থেকেই শুনেছি।’

‘আর কি শুনেছেন? আমরা কখন কি নিয়ে ফিরলাম তা বলেনি?’ লোকটির ঠোঁটে বাঁকা হাসি। তার চোখের দৃষ্টি শক্ত।

চমকে উঠল আহমদ মুসা। লোকটি তাকে সন্দেহ করেছে।

আহমদ মুসার চিন্তা আর সামনে এগুতে পারল না। পেছনে পায়ের শব্দ পেয়ে ফিরে তাকাল। দেখল উদ্যত রিভলবার হাতে দু’জন যুবক তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

সামনে তাকাল আহমদ মুসা। দেখল চেয়ারে বসা লোকটির হাতেও রিভলবার। তার বুক বরাবর তাক করা।

আহমদ মুসা ফিরে তার দিকে তাকাতেই হো হো করে হেসে উঠল লোকটি। শিকারকে জালে আটকানোর তৃপ্তির হাসি এটা।

বলল লোকটি, ‘দেখ তোমার সাজানো কথা খুবই কাঁচা ধরনের হয়েছে। সত্যি তুমি বিমান বন্দরে খোঁজ নিলে এই কথা বলতে পারতে না। এয়ার পোর্টের কাউন্টার ক্রু থেকে শুরু করে দায়িত্বশীল সবাই জানে ‘দি ব্লু বার্ড’ শুধু প্রাইভেট নয়, একেবারে পার্সেনাল। কখনই ভাড়া খাটে না। দ্বিতীয়ত, আমাদের বিমান যে

গ্রান্ড টার্কস-এ গেছে, তা বিমান বন্দরের একজনও জানে না। সুতরাং তুমি মিথ্যা কাহিনী সাজিয়েছ।'

বলে একটু থামল। থেমেই আবার মুখ খুলল। কঠোর কণ্ঠে বলল, 'কে তুমি?'

আহমদ মুসা একটু হাসল। বলল, 'আর এ কথা জিজ্ঞাসার কি প্রয়োজন আছে? আমি কে না জেনেই কি আপনারা রিভলবার বের করেছেন?'

লোকটি টেবিলে এক প্রচন্ড মুষ্ঠাঘাত করল। বলল, 'ঠিক বলেছ।' তারপর আহমদ মুসার পেছনে দাঁড়ানো রিভলবারধারীদের একজনকে লক্ষ্য করে বলল, 'এই একে বেঁধে ফেল।'

লোকটি রিভলবারটি পকেটে পুরে প্রথমে আহমদ মুসার দু'হাত পিছমোড়া করে বাঁধল, তারপর দু'পা। আহমদ মুসা যেভাবে চেয়ারে বসেছিল, ঐভাবেই বসে থাকল।

সামনে বসা সেই মাঝ বয়সী লোকটি তার হাতের রিভলবার টেবিলে রেখে তার মোবাইল টেলিফোনটি টেনে নিল। বলল, 'মিঃ ফার্ডিন্যান্ডকে ব্যাপারটা জানাই।'

'ফার্ডিন্যান্ড কে?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'তোমার বাপ।' মুখ বাঁকা করে বলল লোকটি।

টেলিফোন সংযোগের পর বলল লোকটি, 'স্যার আমাদের অফিসে একজন লোক ধরা পড়েছে।' তারপর গোটা বিবরণ দিয়ে বলল, 'লোকটি ইহুদী বেহারার স্যার। কোন কিছুর গোপন অনুসন্ধানে এসেছে বলে মনে হয়।'

'আপনার ওখানে পাঠাব স্যার?'

'বুঝেছি স্যার। ওখানে ঝামেলা বাড়িয়ে কাজ নেই।'

'ঠিক স্যার। এসব চুনোপুঁটির দায়িত্ব আমরা নিতে পারি।'

'নিকেশ করে ফেলব?'

'ঠিক আছে। আমরা কিছু কথা বের করার চেষ্টা করি। কিছু আদায় করে আপনাকে জানিয়ে তারপর আমরা যা করার সেটা করব স্যার।'

'ধন্যবাদ স্যার।'

টেলিফোন রেখে দিল লোকটি।

আহমদ মুসা ফার্ডিন্যান্ড নামক লোকটির টেলিফোন নাম্বারটি মনে মনে বার বার আওড়িয়ে মুখস্থ করছিল। মোবাইলে লোকটির আঙুলের মুভমেন্ট দেখেই টেলিফোন নম্বারটি ঠিক করে নিয়েছিল।

আহমদ মুসা টেলিফোনের ওপারের কথা শুনতে পায়নি বটে, কিন্তু লোকটির কথাগুলো থেকে গোটা ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছে আহমদ মুসা। তাকে চুনোপুঁটি বিবেচনা করে তাকে এখানেই শেষ করার দায়িত্ব ফার্ডিন্যান্ড এদের হাতে দিয়েছে। তার আগে এরা তার পরিচয় ও তার কাছ থেকে কথা আদায়ের চেষ্টা করবে।

খুশী হলো আহমদ মুসা।

বন্দী হওয়ার ক্ষতির মধ্যে বড় লাভ এই হবে যে, মার্গারেটকে ওরা কোথায় বন্দী করে রেখেছে তা জানার একটা পথ হবে। ফার্ডিন্যান্ড কে? তার টেলিফোন নম্বার পেয়েছে। কিন্তু মোবাইল টেলিফোন নম্বার থেকে ঠিকানা বের করা কঠিন। ফার্ডিন্যান্ড কি হোয়াইট ঈগলের কোন নেতা? নিশ্চয় কোন বড় নেতা হবে। না হলে তাকে 'নিকেশ' করার এত বড় সিদ্ধান্ত দিল কি করে সে? মার্গারেটকে হোয়াইট ঈগল কোথায় রেখেছে? এরা কি তা জানে? না এটা জানার জন্যে ফার্ডিন্যান্ড পর্যন্ত পৌছতে হবে?

আহমদ মুসা ভাবনার সূত্র ছিঁড়ে গেল লোকটির উচ্চ কণ্ঠে। বলছিল সে, 'একে নিয়ে যাও। ঠান্ডা করার কক্ষে রেখে দাও। আমি পরে আসছি।'

সঙ্গে সঙ্গেই দু'দিক থেকে দু'জন এসে ঘরে ঢুকল। আহমদ মুসাকে টেনে তুলে চ্যাং দোলা করে নিয়ে চলল। রিভলবারধারী দু'জন রিভলবার উঁচিয়ে তাদের পেছনে পেছনে চলল।

আহমদ মুসাকে তারা নিয়ে গেল গ্র্যান্ড ফ্লোরে। সেখান থেকে ভু-গর্ভস্থ ফ্লোরে।

আহমদ মুসাকে বহনকারী দু'জন ভু-গর্ভস্থ ফ্লোরের একটা কক্ষের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

রিভলবারধারীদের একজন এগিয়ে এসে আলফাবেটিক্যাল কম্পিউটার লক’-এর ‘কী বোর্ড’-এর চারটা ‘কী’তে নক করল। খুলে গেল দরজা।

যারা আহমদ মুসাকে বহন করছিল, তারা দরজায় দাঁড়িয়েই ছুড়ে দিল আহমদ মুসাকে ঘরের মধ্যে।

আহমদ মুসার দেহের মাথার অংশটা গিয়ে পড়ল লোহার খাটিয়ার উপর এবং নিচের অংশটা মেঝের উপর।

লোহার ‘এল’ টাইপ এ্যাংগল বার দিয়ে খাটিয়ার পায়াসহ চারধারের কাঠামো তৈরি। খাটিয়ার প্রান্তের এ্যাংগল বারের সাথে ধাক্কা খেয়ে আহমদ মুসার বাম পাশের কপালটা কেটে গেল। ঝর ঝর করে রক্ত নেমে এল মুখের উপর।

আহমদ মুসা মাথাটা তুলে খাটিয়ায় হেলান দিয়ে সোজা হয়ে বসল।

আহমদ মুসার রক্তাক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে তৃপ্তির হাসি হাসল দরজায় দাঁড়ানো ওরা।

বলল রিভলবারধারীদের একজন, ‘মরতে এসেছিলে না? কেবল তো কপাল থেকে রক্ত বেরুল। বস যখন আসবেন, তখন সারা গা থেকেই রক্ত ঝরবে।’

কপালে আঘাত, রক্ত ঝরা এ সবের কোন দিকেই আহমদ মুসার খেয়াল নেই। তার গোটা চিন্তা ফার্ডিন্যান্ডকে নিয়ে আবর্তিত হচ্ছে। একটা প্রশ্ন করবার সুযোগ পেয়ে গেল ওদের কথা থেকে। বলল, ‘তোমাদের বস ফার্ডিন্যান্ড আসবেন এখানে?’ ইচ্ছা করেই খোঁচা দেয়ার মত প্রশ্নটা করল আহমদ মুসা।

‘ছো। তোমার মত চুনোপুঁটির কাছে ফার্ডিন্যান্ড আসবে কেন? জান, সে আমাদের বসের বস।’

‘ও তাহলে তো রাজধানী নাসাউতে থাকেন না?’

হাসল রিভলবারধারীটি। বলল, ‘তুমি ঘোড়ার ডিম জান। এই তো কলম্বাস কমপ্লেক্সে উনার অফিস, বাড়িও তো ওখানে।’

‘রসিকতা করছেন। অত বড় লোক এত ছোট জায়গায় থাকেন, বিশ্বাস হয় না।’ বলল আহমদ মুসা।

‘তুমি গন্ডমুর্খ দেখছি। সানসালভাদর, কলম্বাস কমপ্লেক্সকে তুমি ছোট জায়গা বলছ? জান তুমি গোটা ক্যারিবিয়ানের হোয়াইট ঈগল-এর হেড কোয়ার্টার কলম্বাস কমপ্লেক্সে।’

আহমদ মুসার মন আনন্দে নেচে উঠল। তার মন বলল, কপালে সে যে আঘাত পেয়েছে তার মত শত আঘাতের চেয়েও এই তথ্য মূল্যবান। মনে মনে সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল। শেষ বিষয়টি জেনে নেয়ার চেষ্টার মতই প্রশ্ন করল আহমদ মুসা, ‘ও তোমাদের বসের বস ফার্ডিন্যানড-এর অফিস এবং হোয়াইট ঈগলের হেড কোয়ার্টার তাহলে এক জায়গায়?’

‘গর্দভ কোথাকার, এক জায়গায় হবে কেন, একই অফিস তো। ফার্ডিন্যান্ড তো হোয়াইট ঈগল-এর চীফ বস।’

বলেই সে দরজা বন্ধ করে দিতে যাচ্ছিল। আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি বলল, ‘আর একটা কথা জনাব। আপনারা কয়দিন আমাকে বন্দী করে রাখবেন? ছাড়া পাব কবে?’ খুব বিপদে পড়া প্রাণ ভয়ে ব্যাকুল মানুষের মতই বিনয়ের সাথে বলল আহমদ মুসা।

শুনে ওরা চারজনই মজা পাওয়ার মত হি হি করে হেসে উঠল। সেই রিভলবারধারীই বলল, ‘কোন চিন্তা নেই, কোন চিন্তা নেই। আমাদের মেহমান হওয়ার পর কেউ আমাদের কখনও ছেড়ে যায়নি। তুমিও যাবে না।’

বলেই দরজা বন্ধ করে দিল সে।

দরজা বন্ধ হবার পর হাসল আহমদ মুসা। বেচারায় ওরা তাকে চুনোপুঁটি মনে করে বলার কিছুই বাকি রাখেনি। শুধু একটা বিষয়ই অস্পষ্ট থাকল তার কাছে। সেটা হলো, ডাঃ মার্গারেট কোথায় বন্দী আছে। হোয়াইট ঈগলের হেড কোয়ার্টারেই কিনা?

‘তাড়াতাড়ি তাকে এখান থেকে বের হতে হবে’ ভাবল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা হাত-পা নেড়ে দেখল হাত-পায়ের বাঁধন বেশ শক্ত। হঠাৎ আহমদ মুসার মনে পড়ল এ্যাংগল বার খাটিয়ার কথা। আহমদ মুসা পেছন ফিরে এ্যাংগল বারের তৈরি খাটিয়ার পায়ার দিকে তাকাল। দেখে খুশী হলো। এ্যাংগল বারের প্রান্ত মরিচা পড়ে ধারালো হয়েছে। আহমদ মুসা পায়ার দিকে এগিয়ে

গেল। পায়ার দিকে পিঠ করে বাঁধা দুই হাত দিয়ে এ্যাংগলের প্রান্ত খুঁজে নিয়ে তাতে হাতের বাঁধন ঘষতে শুরু করল আহমদ মুসা। প্লাষ্টিক কর্ডের বাঁধন। প্রায় আধ ঘণ্টার চেষ্টায় আহমদ মুসার হাতের বাঁধন কেটে গেল। পায়ের বাঁধন খুলে ফেলল সে।

ঠিক এই সময়েই দরজার বাইরে পায়ের শব্দ পেল আহমদ মুসা। সেই সাথে কথাও শুনতে পেল। একজন বলছে, 'বস না এখানে রাতে আসার কথা?'

'ঠিক জানি না। বস বললেন, সাপ নিয়ে বেশিক্ষণ খেলতে নেই।'

আহমদ মুসা বুঝল। ওরা দরজা খুলতে এসেছে।

আহমদ মুসা উঠে এক দৌড়ে দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

এক পাল্লার দরজা। দরজার পাল্লা ভেতরের দিকে খোলে।

খোলার পর পাল্লা যে দিকে সরে যায়, সেদিকে থাকলে আড়ালে থাকা যায়। কিন্তু সমস্যা হলো, দরজা খুলে যাওয়ার সংগে সংগে তাকে দেখতে না পেলে ওরা সতর্ক হয়ে যাবে। এই অবস্থায় খালি হাতে তাদের মোকাবিলা করা কঠিন হবে।

এই সব চিন্তা করে আহমদ মুসা দরজার অন্যপাশে প্রায় চৌকাঠে গা ঘেঁষে দেয়াল সেঁটে দাঁড়াল। আহমদ মুসা বুঝল, ওরা দরজা খুলে বিশেষভাবে এদিকে একটু চোখ ফেললেই দেখতে পাবে তাকে। কিন্তু আহমদ মুসা চিন্তা করল, দরজা খোলার পর ওদের দৃষ্টি স্বাভাবিকভাবেই প্রথমে ছুটবে ঘরের মাঝখান বা খাটিয়ার দিকে। এই সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে তাদের দৃষ্টি এদিকে আসার আগেই ওদের উপর চড়াও হতে পারবে আহমদ মুসা।

গোটা দেহ মাথা দেয়ালের সাথে সেঁটে রেখে দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে চোখ রেখেছিল দরজার উপর।

রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিল আহমদ মুসা।

দরজার বাইরে তাদের বস দি ব্লু বার্ডের চেয়ারম্যানের কণ্ঠ শুনতে পেল আহমদ মুসা। সেই নির্দেশ দিল, দরজা খোলার।

দরজা খুলে গেল। ঘরের মাঝ বরাবর তাক করা একটা রিভলবার এবং রিভলবার ধরা হাত আহমদ মুসার নজরে পড়ল প্রথমে।

আহমদ মুসা বাজের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল ঐ রিভলবার লক্ষ্যে।

আহমদ মুসার ডান হাত ছোঁ মেরে রিভলবারটি চেপে ধরল। কিন্তু তার দেহটি রিভলবারধারীর হাতে সামান্য বাধা পাওয়ার পর পড়ে গেল করিডোরের উপর।

আহমদ মুসা প্রস্তুত হয়েই লাফ দিয়েছিল। তার বাম হাত ও রিভলবার কেড়ে নেয়া ডান হাত প্রথমে করিডোরে গিয়ে পড়ল। এ দু'হাতের উপর দেহের ভর নিয়ে দেহটা ছুড়ে দিল মাথার উপর দিয়ে সামনে। কারও দেহকে আঘাত করেছিল শূন্য দিয়ে সামনের দিকে ছুটে যাওয়া তার দু'টি পা।

আহমদ মুসার দেহটা চিৎ হয়ে পড়ল করিডোরের উপর।

আহমদ মুসার চোখ দু'টি প্রথমেই দেখল তার মাথার কাছে দু'জনকে। সেই দু'জন রিভলবারধারী। ওদের একজনের হাতে রিভলবার নেই, তার কাছ থেকেই রিভলবার কেড়ে নিয়েছে আহমদ মুসা। আর একজনের হাতে রিভলবার। কিন্তু বিমূঢ় লোকটির রিভলবার তখনও তাকে তাক করে সারেনি।

আহমদ মুসার প্রস্তুত এবং ক্ষিপ্র হাতের রিভলবার দু'বার অগ্নি বৃষ্টি করল।

রিভলবারের দু'টি গুলী দু'জনেরই থুথনির নিচ দিয়ে ঢুকে গেল মাথায়।

আহমদ মুসা গুলী করেই তাকাল তার পায়ের দিকে। সেখানে একজন পড়ে গিয়েছিল। নিশ্চয় লোকটি হবে এদের 'বস' অর্থাৎ ব্লু বার্ডের চেয়ারম্যান, যে আসছিল আহমদ মুসার কাছ থেকে কথা আদায় করে তারপর 'নিকেশ' করে ফেলতে।

আহমদ মুসা দেখল, হ্যাঁ, সে বস লোকটিই।

সে উঠে দাঁড়িয়েছে এবং পকেট থেকে রিভলবার বের করছে। পকেট থেকে সে রিভলবার বের করেছে মাত্র।

আহমদ মুসা তৃতীয় গুলীটি ছুঁড়ল তাকে লক্ষ্য করে।

বুকে গুলী খেলে লোকটি সেখানেই ঢলে পড়ল।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। রিভলবার বাগিয়ে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেলে একটু অপেক্ষা করল। না কেউ নেই, কোন সাড়া-শব্দ কোথাও নেই।

ছুটল এবার আহমদ মুসা উপরে ওঠার সিঁড়ির দিকে।

সিঁড়ির গোড়ায় পৌছে আহমদ মুসা দেখল, সিঁড়ির মাথায় গ্রাউন্ড ফ্লোরে উপর মুখে সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ।

আহমদ মুসা দ্রুত সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠল। আহমদ মুসা খুশী হলো। এখানে বন্দীখানার মতই কম্পিউটার লক। এ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডারে কী বোর্ড সাজানো।

আহমদ মুসা দেখেছিল বন্দীখানার লক খোলার জন্যে 'কী' বোর্ডের যে 'কী'গুলোতে লোকটি আঙুল ফেলেছিল তা যোগ করলে 'EGLE' শব্দ দাঁড়ায়। সুতরাং বন্দীখানার কম্পিউটার লক খোলার কোর্ড ওয়ার্ড ছিল 'EGLE' এখানেও কি তাই?

আহমদ মুসা দুরু দুরু বুকে বোর্ডের চারটি 'কী'তে তর্জ্জনি দিয়ে 'EGLE' শব্দ বানাল। শেষ 'ঊ' বর্ণে চাপ পড়ার সাথে সাথেই মাথার উপর পুরু লোহার পাত সরে গেল।

আহমদ মুসা একটু অপেক্ষা করল। না কেউ এল না। লাফ দিয়ে উপরে উঠল আহমদ মুসা।

কাউকে চোখে পড়ল না। বুঝল, ভূ-গর্ভের কোন শব্দ বাইরে না আসায় এরা কিছুই বুঝতে পারেনি।

আহমদ মুসা চুপি চুপি সরে পড়াই ঠিক মনে করল। এখানে গোলা-গুলী খুব সহজেই বাইরের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

আহমদ মুসা দেখেছে, সিঁড়ি মুখ থেকে পুব দিকে কিছুদূর এগুবার পর উত্তরে টার্ন নিলেই রিসেপশন কক্ষে প্রবেশ করা যায়।

আহমদ মুসা রিভলবার বাগিয়ে বিড়ালের মত নিঃশব্দে ছুটল পূবদিকের সেই করিডোর ধরে।

দক্ষিণমুখী একটা করিডোরের মুখ তখন অতিক্রম করছিল আহমদ মুসা।

একটা শব্দ পেয়ে তাকাল সেই করিডোরের দিকে। তাকিয়েই দেখতে পেল একজন লোক এবং তার উদ্যত রিভলবার তাকে তাক করা।

আহমদ মুসা তার রিভলবার ঘোরাবার সুযোগ পেল না। একটা গুলী এসে তার বুড়ো আঙুল সমেত রিভলবারে আঘাত করল।

হাত থেকে আহমদ মুসার রিভলবার খসে পড়ে গেল।

আহমদ মুসা রিভলবারের সাথে সাথেই আছড়ে পড়েছিল মেঝের উপর। যেন গুলী বিদ্ধ হয়ে সে ঢলে পড়েছে মাটিতে।

গুলী বর্ষণকারী লোকটিও মুহূর্তের জন্যে দ্বিধায় পড়েছিল এ নিয়ে। এই সুযোগেই আহমদ মুসার বাম হাত রিভলবার কুড়িয়ে গুলী করল লোকটিকে।

লোকটি এত তাড়াতাড়ি পাল্টা আক্রমণের শিকার হবে বুঝেনি। তারই খেসারত হিসাবে বুকে গুলী বিদ্ধ হয়ে ঢলে পড়ল মাটিতে।

আহমদ মুসা রিসেপশনের দরজায় এসে দেখল এদিকে গুলীর শব্দ শুনে রিসেপশনিষ্ট হাতে রিভলবার নিয়ে এদিকে এগুচ্ছে। আহমদ মুসাকে রিভলবার হাতে একেবারে মুখোমুখি দন্ডায়মান দেখে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল সে।

আহমদ মুসা তার দিকে রিভলবার তাক করে বলল, 'বাঁচতে চাইলে রিভলবারটি ফেলে দিয়ে ঐ টয়লেটে ঢোকো গিয়ে।'

রিসেপশনিষ্ট যুবকটি দৌড় দিয়ে গিয়ে টয়লেটে ঢুকল।

আহমদ মুসা রিভলবারটি কুড়িয়ে নিয়ে টয়লেটের সিটকিনি লাগিয়ে রিসেপশনিষ্টের টেবিলে ফিরে এসে রিমোর্ট কন্ট্রোলের বোতাম টিপে বাইরের দরজা খুলে ফেলল। তারপর দৌড় দিল বাইরে।

বাইরে রাস্তায় বেরিয়ে আহমদ মুসা চিন্তা করল কোন দিকে যাবে। আহমদ মুসার আশু দরকার হলো, আহত বুড়ো আঙুলটাকে একটু দেখা এবং মুখের রক্ত মুছে ফেলা। এসব নিয়ে মানুষের মধ্যে যাওয়া যাবে না।

ডান দিকে শহর, আর বাঁ দিকে অপেক্ষাকৃত জনবিরল, গাছপালাও প্রচুর। এ দিকে প্রয়োজনীয় আড়াল পাওয়া যাবে।

আহমদ মুসা বাঁ দিকে ছুটল।

কিছু এগিয়েই একটা ট্যাক্সি দেখতে পেল রাস্তার পাশে গাছের ছায়ায় দাঁড়ানো। পরক্ষণেই দেখল ট্যাক্সি ড্রাইভার বেরিয়ে এসেছে। একি? কার্লোস তো! বিস্মিত হলো আহমদ মুসা। এতক্ষণ সে আছে।

কাছাকাছি হয়েই আহমদ মুসা বলল, ‘একি তুমি এতক্ষণ এখানে?’

আহমদ মুসার কথার দিকে কর্ণপাত না করে বিস্মিত কার্লোস বলল, ‘একি আপনার অবস্থা? হাত থেকে রক্ত পড়ছে, মুখ রক্তাক্ত। আমার সন্দেহই তাহলে ঠিক।’

‘কি সন্দেহ করেছিলে তুমি?’

‘ওসব কথা থাক। গাড়িতে উঠুন। আপনার আগে অন্তত ‘ফাষ্ট এইড’ প্রয়োজন।’

আহমদ মুসা গাড়িতে উঠে বসতে বসতে বলল, ‘একি, আমার ব্যাগ আমি তোমার গাড়িতে ফেলে গিয়েছিলাম?’

‘স্যার, এই ব্যাগ নিয়েই তো বিপদে পড়েছি। এই ব্যাগও আমার অপেক্ষা করার একটা কারণ।’

‘আরেকটা কারণ কি?’

‘স্যার, পৌনে এক ঘণ্টাতেও আপনাকে বের হতে না দেখে আমি অফিসে গিয়েছিলাম ব্যাগটা আপনাকে দেয়া যায় কিনা সে জন্যে। ওদের ব্যবহার সন্দেহজনক মনে হলো আমার কাছে। আমার ট্যাক্সিতে আপনি এসেছেন এই কথা বলে আপনার খোঁজ করতেই রিসেপশনিষ্ট বলল, ‘ও ভাড়া পাবে তো? যাও, ইহ জীবনে আর তাকে পাবে না, পরকালে নিও।’ বলে আমাকে বের করে দেয় অফিস থেকে। আমি বুঝতে পারলাম, কিছু একটা ঘটেছে। এই অবস্থায় আমি যেতে পারছিলাম না। অপেক্ষা করছিলাম কোন খোঁজ পাওয়া যায় কিনা। এই মাত্র ভাবছিলাম থানায় খবরটা দিয়ে আমি চলে যাব।’

‘থানায় খবর দিলে থানা কি করত?’

‘হয়তো খোঁজ নিত। কিন্তু যেহেতু প্রতিষ্ঠানটি শ্বেতাংগদের তাই তাদের কোন দোষ হতো না, দোষ হতো আপনার।’

‘তাহলে থানায় খবর দিতে কেন?’

‘নিয়ম স্যার, এ জন্যে। আইন আছে, এ ধরনের কোন বড় সন্দেহজনক কিছু দেখলে, গাড়িতে ঘটলে সংগে সংগেই থানায় জানাতে হবে।’

বলেই কার্লোস আবার জিজ্ঞেস করল, 'কি ঘটেছিল স্যার, আমি গুলীর শব্দ শুনলাম।'

আহমদ মুসা একটু ভাবল কার্লোসকে কতটুকু বলা যায় তা নিয়ে। তারপর বলল, 'বুঝলাম না, বিমান ভাড়া চাওয়ায় ওরা আমাকে সন্দেহ করল। বন্দী করল। শুনলাম, ওরা যাদের বন্দী করে তারা আর বাঁচে না। তাই প্রাণপণ চেষ্টা করে বেরিয়ে এলাম। কথায় কথায় ওদের কোন একজনের কাছে 'হোয়াইট ঈগল'-এর নাম শুনলাম।'

'হোয়াইট ঈগল?' বিস্মিত কণ্ঠ কার্লোসের।

'তুমি চেন 'হোয়াইট ঈগল'কে?

'চিনি না। তবে দু'জন প্যাসেঞ্জারের মধ্যে আলোচনায় এই নাম শুনেছিলাম। বুঝেছিলাম, কোন ভয়ংকর দল এটা।'

'কোথায় পেয়েছিলে প্যাসেঞ্জার দু'জনকে?'

'এয়ারপোর্টে। আর নামিয়ে দিয়েছিলাম কলম্বাস কমপ্লেক্সে। পথিমধ্যে শুনেছিলাম তাদের গল্প।'

কলম্বাস কমপ্লেক্সের নাম শুনে চমকে উঠল আহমদ মুসা। ব্লু বার্ড অফিসে তাকে বন্দী করা একজন রিভলবারধারীও কলম্বাস কমপ্লেক্সে হোয়াইট ঈগল-এর চীফ বস ফার্ডিন্যান্ডের অফিসের কথা বলেছে। কিন্তু তার কথায় কলম্বাস কমপ্লেক্স-এর কোথায় হোয়াইট ঈগল-এর অফিস তা জানা যায়নি। এটা আহমদ মুসার জন্যে খুব জরুরী। আহমদ মুসা প্রশ্ন করল, 'কলম্বাস কমপ্লেক্সে ওদের অফিস নাকি?'

'তা জানি না। তবে ওদের যে উঠানে নামিয়ে দিয়েছিলাম, সেখানে সাইনবোর্ড দেখেছি 'ক্যারিবিয়ান ওয়েলফেয়ার সিন্ডিকেট'-এর।'

কথা শেষ করেই কার্লোস বলল, 'আপনাকে ছোট-খাট ডাক্তার খানায় না ক্লিনিকে নিয়ে যাব?'

'না কার্লোস। আমার ব্যাগে 'ফাষ্ট এইড' এর সবকিছুই আছে, তোমার বোতলে ভাল পানিও আছে। এখন ভাল একটা জায়গা দেখে তোমার গাড়ি দাঁড় করাও।' বলল আহদ মুসা।

আহমদ মুসার মাথায় 'ফাষ্ট এইড' এর চিন্তা নয়, মাথা জুড়ে এখন তার হোয়াইট ঈগল-এর অফিস। মনে মনে বার বার আহমদ মুসা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছে। সে এখন নিশ্চিত কলম্বাস কমপ্লেক্সেই হোয়াইট ঈগল-এর অফিস এবং 'ক্যারিবিয়ান ওয়েল ফেয়ার সিন্ডিকেট'ই তার ছদ্মবেশী নাম।

মেইন রোড থেকে বাইরে একটু দূরে নির্জন এক সংরক্ষিত বাগানে গাড়ি দাঁড় করাল কার্লোস।

কপালের এবং বুড়ো আঙুলের ক্ষত পরিষ্কার করলো কার্লোস। কপাল বেশ গভীর হয়ে কেটে গেছে, কিন্তু ক্ষতটা ততটা মারাত্মক নয়। ডান হাতের বুড়ো আঙুলও অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে। বুলেট আঙুলের হাড় স্পর্শ করেনি।

ব্যান্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে কার্লোস বলল, 'আপনার অন্তত সপ্তাহ খানেক রেষ্ট নিতে হবে।'

'না কার্লোস, যে ঔষধ লাগিয়েছি দু'তিন দিনের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'স্যার, এখন কোথায় যাবেন?'

'সে চিন্তাই করছি।'

'স্যার, আমি থাকি বীচ এলাকায়। কাছাকাছি 'ট্যুরিষ্ট কটেজ' আছে। ভাড়া একটু বেশি হলেও আরামদায়ক এবং নিরাপদ।'

'ঠিক আছে। আবহাওয়াও ওখানকার ভাল হবে।'

দু'জনেই গাড়িতে উঠল। গাড়ি চলতে শুরু করল।

# ৫

সন্ধ্যার আলো-আধারীতে আহমদ মুসা এসেছে 'ক্যারিবিয়ান ওয়েলফেয়ার সিন্ডিকেট'-এর চত্বরে।

চত্বর থেকে যে রাস্তাটি পূর্বদিকে বেরিয়ে গেছে, সে রাস্তার উপরে বিখ্যাত ম্যাকডোনাল্ডের একটা ফাষ্ট ফুডের দোকান। সেখান থেকে ক্যারিবিয়ান ওয়েলফেয়ার সিন্ডিকেট অফিসের সিঁড়িসহ আশপাশের সবকিছুই দেখা যায়।

গত তিনদিন ধরেই আহমদ মুসা বিভিন্ন ছদ্মবেশে এখানে আসছে। অনেক তথ্যই সে যোগাড় করেছে। ফার্ডিন্যানেডর বাড়ি অফিসের দক্ষিণ পাশ ঘেঁষেই। দুয়ের মাঝে ফোল্ডিং করিডোরের একটি সংযোগ আছে। তিন দিনের চেষ্টায় ওদের লোকদের সাথে কথায় কথায় এটুকু জানতে পেরেছে যে, একজন মহিলা বন্দী আছে।

ফার্ডিন্যান্ডের বাড়ি ও অফিসের মধ্যে যে সংযোগ করিডোরের কথা শুনেছিল, তা হঠাৎ করে তার চোখেও পড়ে গেল।

আহমদ মুসা ম্যাগডোনাল্ডের বাইরের কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে এক গ্লাস জুস খাচ্ছিল। তার চোখটা ফার্ডিন্যান্ডের অফিস বিল্ডিং-এর দিকে। হঠাৎ তার চোখে পড়ল তিন তলা বরাবর সেই সংযোগ করিডোর। করিডোরটা আলোকিত। আহমদ মুসা দেখল তিনজন লোক ফার্ডিন্যান্ডের বাড়ির দিক থেকে অফিস বিল্ডিং-এর দিকে যাচ্ছে। ফার্ডিন্যান্ড কি? না হলে এ করিডোর অন্যের জন্যে লাগবে মনে হয় না।

আহমদ মুসা জুস খাওয়া শেষ করে ধীরে ধীরে এগুলো ক্যারিবিয়ান ওয়েলফেয়ার সিন্ডিকেট নামধারী 'হোয়াইট ঈগল'-এর অফিসের দিকে।

আজ আহমদ মুসার গায়ে রেড ইন্ডিয়ান যুবকের ছদ্মবেশ। হাতে একটা দুর্লভ ডিজাইনের সেতার। সেতারটা আসলে একটা মিনি আকারের হ্যান্ড মেশিনগান।

হাতের সেতারটা ঝুলাতে ঝুলাতে একেবারে স্বাভাবিকভাবে হেঁটে সিঁড়িতে উঠতে যাচ্ছিল আহমদ মুসা।

সিঁড়ির পুবপাশে সিঁড়ির সাথে লাগানো একটি কক্ষ। গেটম্যানের কক্ষ ওটা। আসলে ওটা অফিসের সিক্যুরিটি রুম। সেখানে দু'চারজন লোক সব সময়ই থাকে।

ওদের একজন ছুটে এল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা বলল, 'মিঃ ফার্ডিন্যান্ডের সাথে দেখা করতে এসেছি।'

'ঠিক আছে টেলিফোন করে দেখি।'

'দেখুন, দুই দিন আগে আমি তাঁর সাথে দেখা করে গেছি। তিনি আমার গানও শুনেছিলেন।'

আহমদ মুসার একথা সত্য। আহমদ মুসা নিজে দেখেছে, দু'দিন আগে একজন রেড ইন্ডিয়ান গায়ক ফার্ডিন্যান্ডের সাথে দেখা করে গেছে। তারও হাতে এ রকম সেতার ছিল। সেটা দেখেই আহমদ মুসা এ ছদ্মবেশ নিয়েছে।

প্রহরী লোকটি টেলিফোন করার জন্যে গেট রুমের দিকে কয়েক ধাপ এগিয়েও থেমে গেল। তারও মনে পড়ল একজন রেডইন্ডিয়ান যুবক দু'দিন আগে এসেছিল।

সে ফিরে দাঁড়াল। বলল, 'ঠিক আছে যাও।'

'আবার কেউ আটকাবে নাতো?' বলল আহমদ মুসা।

'না। ঠিক আছে, একটা পাশ নাও।'

বলে প্রহরীটি পকেট থেকে একটা গেট পাশ বের করে আহমদ মুসাকে দিল।

আহমদ মুসা সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল তর তর করে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠেই সোজা সামনে রিসেপশন কক্ষ। আর বামে তিন তলায় উঠার সিঁড়ি এবং ডান পাশে এক তলায় নামার সিঁড়ির মুখ। আজ এ সিঁড়ি মুখটি সে খোলা দেখল। কিন্তু গতকাল যখন উপরে উঠেছিল নিউজ পেপার হকারের ছদ্মবেশে, তখন এ সিঁড়িমুখ লোহার ডবল ফোল্ডিং দরজা দ্বারা বন্ধ দেখেছিল।

আহমদ মুসা সোজা চলে গেল রিসেপশন রুমে। চটপটে এক শ্বেতাংগ তরুণ বসে আছে রিসেপশন টেবিলে।

'আমি মিঃ ফার্ডিন্যান্ডের সাথে দেখা করব। দু'দিন আগে এসেছিলাম।' বলল আহমদ মুসা।

'তিনি আসতে বলেছিলেন?' বলল রিসেপশনিষ্ট ছেলেটি।

'বলেছিলেন। সুযোগ মত আসার কথা ছিল।'

'তাহলে বাইরে আপনি বসুন। উনি গ্রাউন্ড ফ্লোরে গেছেন।'

'গ্রাউন্ড ফ্লোরেও আপনাদের অফিস?'

'ঠিক অফিস নয়। ষ্টোর আছে, মেহমানখানা আছে?'

ষ্টোর এলাকায় মেহমানখানা! শুনে চমকে উঠল আহমদ মুসা। এই অসংগতিটা ছোট নয়। এই মেহমানখানা কি বন্দীখানা? তাহলে ফার্ডিন্যান্ড কি বন্দীখানাতেই গেছে!

'মেহমানের সাথে সাক্ষাত করতে গেছেন? তাহলে তো দেরী হবে।' আরও কিছু জানার লক্ষ্যে প্রশ্ন করল আহমদ মুসা।

রিসেপশনিষ্ট ছেলেটির মুখে যেন একটা রহস্যময় হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'দেরী হতে পারে। ওঁর সাথে একজন 'গরিলা-মানুষ'কে যেতে দেখলাম।'

'গরিলা-মানুষ?'

'হ্যাঁ।'

'তাঁর কি কাজ?'

'একটাই তার কাজ বেয়াড়া মানুষকে সোজা করা।'

চমকে উঠল আহমদ মুসা। এ বন্দীখানায় কি মার্গারেট আছে?'

মনে মনে চমকে উঠলেও ঠোঁটে হাসি টেনে জিজ্ঞেস করল 'মেহমানখানায় বেয়াড়া কোত্থেকে পেলেন?'

'কি বলেন, কত রকমের মেহমান আছে। এবার জুটেছে একজন মহিলা মেহমান। কিন্তু পুরুষের বাপ। তাকেই ঠিক করার জন্যে গরিলা মানুষ কিনা জানি না।'

এ আলোচনায় রিসেপশনিষ্ট যেন আনন্দ পাচ্ছে। তার মুখে রসাত্মক হাসি। কিন্তু আহমদ মুসারও মন তখন উদ্বেগে চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

'তাহলে স্যার, ওদিকে বসি।' বলে আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়াল।

'কিন্তু আমাকে একদিন গান শুনাতে হবে।'

'আচ্ছা।' বলে আহমদ মুসা চলে এল রিসেপশন রুম থেকে।

আহমদ মুসার মুখ শক্ত হয়ে উঠেছে। সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, তাকে গ্রাউন্ড ফ্লোরে নামতে হবে এবং তা এখনই।

আহমদ মুসা দেখল, গ্রাউন্ড ফ্লোরে নামার সিঁড়ি মুখে একজন প্রহরী। খালি হাত। কিন্তু তার পকেটে রিভলবার আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ফোল্ডিং দরজাটা আধা পরিমাণ খোলা। খোলা অংশেরই এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে প্রহরী।

আহমদ মুসা রিসেপশন রুম থেকে বেরিয়ে দ্রুত গিয়ে দাঁড়াল প্রহরীটির কাছে। তাকে দ্রুত কণ্ঠে বলল, 'আমি ফার্ডিন্যান্ডের কাছে এসেছি। তাকে জরুরী একটা খবর পৌছাতে হবে। রিসেপশনে বলে এসেছি। আমি তার কাছে যাচ্ছি।'

বলে আহমদ মুসা দরজা পার হয়ে গেল।

প্রহরীটি দেখেছিল আহমদ মুসাকে রিসেপশন রুম থেকে বের হয়ে আসতে।

প্রহরীটি বিশ্বাস করল আহমদ মুসা রিসেপশনে বলেছে। টেলিফোনে হয়তো অনুমতিও নিয়েছে। তাছাড়া আহমদ মুসার দ্বিধাহীন কথাবার্তা ও ভেতরে প্রবেশ দেখেও মনে করল অনুমতি সে অবশ্যই পেয়েছে।

প্রহরী আহমদ মুসাকে বাধা দিল না।

আহমদ মুসা ভেতরে প্রবেশের প্রধান দু'টি বাধা বিনা বাধায় অতিক্রম করতে পারায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল। গেটেই গোলা-গুলী হলে তার কাজ কঠিন হয়ে যেত।

আহমদ মুসা দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল নিচে। কিন্তু করিডোরে নেমে বিপদে পড়ে গেল আহমদ মুসা। এখন কোন দিকে যাবে সে।

সিঁড়ি থেকে নেমে ডানদিকে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে বড় একটা ষ্টিলের দরজা। দেখেই বুঝল এটাই একদিন এ অফিস থেকে বাইরে বেরুবার প্রধান গেট ছিল। পরে গেটটি ষ্টিল চৌকাঠের সাথে ওয়েল্ডিং করে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং দোতলায় উঠার বাইরের সিঁড়িটা পরে তৈরি করা হয়েছে।

আহমদ মুসা পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিম দিকে চেয়ে দেখল তিনদিকেই তিনটা করিডোর এগিয়ে গেছে। কোনদিকে যাবে সে?

আহমদ মুসা মুহূর্তের জন্যে চোখ বন্ধ করে অফিস বিল্ডিংটার অবয়ব সামনে নিয়ে এল। দেখল সে অফিসের বৃহত্তর অংশ সিঁড়ি থেকে পশ্চিম দিকে। সিঁড়ি থেকে পূর্ব ও উত্তর দিকে বড় জোর দু'তিনটি কক্ষ পাওয়া যাবে।

সুতরাং আহমদ মুসা সিদ্ধান্ত নিল পশ্চিমের করিডোর ধরে এগুবার জন্যে।

আহমদ মুসা তার হাতের সেতার বন্দুকের মত ধরে বিড়ালের মত নিঃশব্দে, কিন্তু স্বাভাবিক হেঁটে সামনে এগুলো।

তিনটা কক্ষের দরজা পার হতেই সে দেখল সামনেই উত্তর-দক্ষিণ একটা করিডোর। আহমদ মুসা অনুমান করলো এই এলাকাটা অফিস বিল্ডিং-এর মাঝামাঝি স্থান হবে।

আর দু'পা এগুতেই আহমদ মুসা দু'জন প্রহরীর মুখোমুখি হয়ে গেল। তারা দক্ষিণ করিডোর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

দু'পক্ষই চমকে উঠল।

আহমদ মুসার ডান হাতের তর্জনি ছেতারের মাঝ বরাবরে গর্ত দিয়ে সাইলেন্সার লাগানো মিনি ষ্টেনগানের ট্রিগার স্পর্শ করেছে। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে সে সেতারের তার স্পর্শ করেছে। এখনি বাজানো সে শুরু করবে।

চমকে ওঠা অবস্থা দূর হওয়ার পর ষ্টেনগান ধারী প্রহরী দু'জনের একজন বলল, 'কি হে, এখানে তুমি কি করছ? এটা কি গানের জায়গা? এলে কি করে?'

'ফার্ডিন্যান্ড এখানে, তাই এখানেই দেখা করতে এলাম। কোথায় সে?'

ঠিক এই সময়েই নারী কণ্ঠের কাকুতি-মিনতি ও ক্ষীণ চিৎকার ভেসে আসতে লাগল।

আহমদ মুসার কথা শুনে ওরা কপাল কুঞ্চিত করেছিল। তাদের ষ্টেনগানের নল উপরে তুলেছিল আহমদ মুসার লক্ষ্যে। তাদের একজন কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল।

কিন্তু আহমদ মুসা তাদেরকে সময় দিল না।

আহমদ মুসার তর্জনি অস্থিরভাবে চেপে ধরল ট্রিগারে। নিঃশব্দে এক ঝাক গুলী বেরিয়ে গেল সেতার রূপী মিনি ষ্টেনগান থেকে।

শব্দ করারও সময় পেল না প্রহরী দু'জন। ঝাঁঝরা দেহ নিয়ে ঢলে পড়ে গেল করিডোরের উপর।

নারী কণ্ঠের চিৎকার কোন দিক থেকে আসছে তা ঠিক করার জন্যে একটু উৎকর্ণ হয়েই আহমদ মুসা ছুটল দক্ষিণ দিকে। তার আগে দু'জনের দু'টি ষ্টেনগান আহমদ মুসা কাঁধে তুলে নিয়েছে।

দক্ষিণ করিডোরের পশ্চিম পাশে প্রথম ঘরটি থেকেই আসছিল শব্দ।

আহমদ মুসা দরজায় গিয়ে দাঁড়াল।

এখানে কম্পুটারাইজড এ্যালফাবেটিক্যাল লক।

খুশী হলো আহমদ মুসা। নিশ্চয় লক খোলার কোডও ঐ একই হবে।

আহমদ মুসা ডান হাতে ষ্টেনগান বাগিয়ে বাম হাতে 'EGLE' কম্পিউট করল।

ঠিক এই সময়ই মার্গারেট চিৎকার করছিল, 'আল্লাহ আমাকে রক্ষা কর,' আল্লাহ আমাকে রক্ষা কর' বলে।

আর তার জবাবে আরেকটি লোক হো হো করে হেসে উঠল, 'তোমার আল্লাহ যেখানেই থাক, এখানে আসতে পারবে না। এখনও বল, এশীয় লোকটি কোথায়, তার কি পরিচয়, তাহলে তোমাকে ছেড়ে দিতে বলি।'

'না আমি বলব না। কিছুতেই বলব না। আমাকে মেরে ফেল।' চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বলল মার্গারেট।

'না, সুন্দরী, তোমাকে মারলে তো তুমি বেঁচে যাবে। তোমাকে বাঁচিয়ে রেখেই এভাবে তোমাকে প্রতিদিন মারতে চাই।'

কথা শেষ করেই চিৎকার করে উঠল লোকটি, ‘শয়তানি শুনবে না। তোমার কাজ শুরু কর।’

সংগে সংগেই ‘আল্লাহ তুমি কোথায়’ বলে বুক ফাটা চিৎকার করে উঠল মার্গারেট।

আহমদ মুসার ‘EGLE’ কম্পিউট শেষ হয়েছে। শেষ করেই সে রিভলবার তুলে নিয়েছে বাম হাতে। আর ডান হাতে ষ্টেনগান।

‘EGLE’ কম্পিউট শেষ হবার সাথে সাথে চোখের পলকে দরজার পাল্লা দেয়ালে ঢুকে গেল।

আহমদ মুসার চোখ ছুটে গেল ঘরের ভেতর। প্রায় নগ্ন মার্গারেট মাটিতে পড়ে আছে। দৈত্যাকার একজন লোক মার্গারেটের বুকে পা দিয়ে তাকে চেপে রেখে কাপড় খুলছে। আর পাশেই দাঁড়িয়ে আরেকজন শ্বেতাংগ আমেরিকান।

ষ্টেনগানের ট্রিগারে হাত ছিলই আহমদ মুসার। তর্জনি চাপল ট্রিগারে। দৈত্যাকার লোকটিকে ঝাঁঝরা করল এক ঝাঁক বুলেট গিয়ে।

আহমদ মুসার এইভাবে উপস্থিতি এবং দৈত্যসদৃশ তার পাহলোয়ানের উপর ব্রাশ ফায়ারে মুহূর্তের জন্যে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল ফার্ডিন্যান্ড। সম্বিত ফিরে পেয়ে যখন সে পকেট থেকে রিভলবার বের করল, তখন তা দিয়ে আর কোন কাজ হলো না। আহমদ মুসার বাম হাতের রিভলবারের একটা গুলী তার রিভলবার ধরা হাতকে চৌচির করে দিয়ে গেল। তার হাত থেকে বেশ দূরে গিয়ে ছিটকে পড়ল রিভলবার।

‘বাঁচতে চাইলে দু’হাত তুলে দেয়ালের দিক মুখ করে দাঁড়াও।’ নির্দেশ দিল ফার্ডিন্যান্ডকে আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা প্রথমে এক ঝলক মাত্র তাকিয়েছিল মার্গারেটের দিকে। তারপর তার দৃষ্টি ভিন্ন দিকে সরিয়ে রেখেছিল।

ফার্ডিন্যান্ড গিয়ে দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে আহমদ মুসা ষ্টেনগানগুলো রেখে নিজের জ্যাকেট খুলে মার্গারেটকে দিয়ে ওদিকে না তাকিয়েই তা ছুড়ে দিল মার্গারেটকে। বলল, ‘পরে নাও।’

মার্গারেটকে ধরে আনার সময় তার গায়ে ছিল নাইট গাউন। সেটাই আজ পর্যন্ত তার পরেনে ছিল। কিন্তু সেটা আজ শত ছিন্ন হয়েছে ওদের হাতে। মার্গারেট জ্যাকেট কুড়িয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি পরে নিল।

তারপর আহমদ মুসা এগুলো ফার্ডিন্যান্ডের দিকে। পায়ে একটি লাথি মেরে ফার্ডিন্যান্ডকে ফেলে দিল মাটিতে। বলল, 'প্যান্টটা খুলে দাও ফার্ডিন্যান্ড।'

বলেই মার্গারেটকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'তুমি ভিন্ন দিকে ঘুরে দাঁড়াও মার্গারেট।'

আন্ডার ওয়্যার পরা ফার্ডিন্যান্ড সংগে সংগেই প্যান্ট খুলে হুকুম তামিল করেছে।

আহমদ মুসা প্যান্টটা মার্গারেটের দিকে ছুড়ে দিয়ে বলল, 'তাড়াতাড়ি পরে নাও।'

আহমদ মুসা তার সেতার ষ্টেনগানটি কাঁধে ঝুলিয়ে দু'হাতে দুই ষ্টেনগান নিয়ে বলল, 'চল মার্গারেট।'

দরজায় এসে আহমদ মুসা ফার্ডিন্যান্ডকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'কাপুরুষ ফার্ডিন্যান্ড, এশীয়টির গায়ে হাত দিতে না পেরে একজন মহিলাকে ধরে আনার বীরত্ব দেখিয়েছিলে। তোমাকে হত্যা করলাম না। আরও প্রায়শ্চিত্য করার জন্যে বাঁচিয়ে রাখলাম।'

বলে আহমদ মুসা বাইরে থেকে দরজার ছিটকিনি এঁটে বন্ধ করে দিল। ভিন্ন কোডে কম্পুটার লক বন্ধ করা যাবে কিনা এই ভেবে সেটা ব্যবহার করল না আহমদ মুসা।

সিঁড়ির কাছাকাছি এসে আহমদ মুসা মার্গারেটকে বলল, 'অফিসের সবার জানার ও প্রস্তুত হওয়ার আগেই আমাদের বেরিয়ে যেতে হবে। গেটে মাত্র ছয় সাত জন প্রহরী আছে, অসুবিধা হবে না। তুমি আমার পেছনে থাকবে সব সময়। ভয় নেই।'

মার্গারেট কোন কথা বলল না। তার দু'চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় গড়িয়ে পড়েছে অশ্রু। কিন্তু মন তার বলল, আপনার পাশে থেকে এখন আমার মৃত্যু, আমার সবচেয়ে বড় কাম্য বস্তু।

সিঁড়ির গোড়ায় পৌছে আহমদ মুসা দেখল, সিঁড়ি মুখের দরজার বাইরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে প্রহরী, তার হাতে ষ্টেনগান ঝুলছে।

আহমদ মুসা দ্রুত উঠতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে। পায়েল শব্দে ঘুরে দাঁড়াল প্রহরী গেটম্যান। আহমদ মুসাকে ঐভাবে দেখে তার চক্ষু চড়ক গাছ। আহমদ মুসার বাম হাতের ষ্টেনগান এক পশলা গুলী ছাড়ল। গেটের উপরই ঢলে পড়ল প্রহরীর দেহ।

একজনকে মারার জন্যে এত গুলীর প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আহমদ মুসা তা ছুড়ল এই কারণে যে, ব্রাশ ফায়ারের শব্দ শুনে নিচের গেট রুম থেকে সবাই ছুটে আসবে উপরে। তাদের সবাইকে আহমদ মুসা এক সাথে পেতে চায়।

আহমদ মুসা দু'তলার সিঁড়ি মুখ পার হয়েই দেখল, রিসেপশন রুম থেকে দু'জন বেরিয়ে এসেছে।

আহমদ মুসার ডান হাতের ষ্টেনগান আবার এক ঝাঁক গুলী বৃষ্টি করল রিসেপশন রুম লক্ষ্যে।

গুলী করেই আহমদ মুসা দু'ধাপ এগিয়ে অফিস থেকে নিচে লনে নামার সিঁড়ির দিকে তাকাল। দেখল ছয় সাত জন ছুটে আসছে ষ্টেনগান বাগিয়ে উপরের দিকে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে।

আহমদ মুসা আরও দু'ধাপ এগুলো সামনে। ওরাও তখন দেখতে পেয়েছে রেডইন্ডিয়ান যুবকবেশী আহমদ মুসাকে।

ওরাও ষ্টেনগান ঘুরাচ্ছে আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে। কিন্তু ওদের লক্ষ্যে উদ্যত আহমদ মুসার দু'তর্জনি ছিল দু'ষ্টেনগানের ট্রিগারে প্রস্তুত। তার দুই হাতের দু ষ্টেনগান এক সাথে গুলী বৃষ্টি করল ওদের উপর। ওরা সাতজনই ঢলে পড়ল সিঁড়ির উপর।

গুলী বৃষ্টি করতে করতেই 'মার্গারেট এসো' বলে ছুটল আহমদ মুসা সিঁড়ি দিয়ে নিচের দিকে।

ডা: মার্গারেট নির্দেশ মত আহমদ মুসার পেছনেই দাঁড়িয়েছিল। সেও ছুটল আহমদ মুসার পেছনে পেছনে তার ছায়ার মত।

আহমদ মুসা প্রায় সিঁড়ির গোড়ায় নেমে এসেছে। এমন সময় সে দেখল সিঁড়ির গোড়ায় গড়িয়ে পড়া রক্তাক্ত একজন রিভলবার তাক করেছে আহমদ মুসার লক্ষ্যে।

আহমদ মুসা দ্রুত মাথা নিচু করে ডান পাশে সরে গেল। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। রিভলবারের নিক্ষিপ্ত গুলীটা এসে বিদ্ধ হলো আহমদ মুসার বাম কাঁধ সংলগ্ন বাহুর পেশিতে।

আহমদ মুসার বাম হাত থেকে ষ্টেনগান পড়ে গেল।

আহমদ মুসা তার ডান হাতের ষ্টেনগানটা ঘুরিয়ে লোকটির দিকে গুলী করে আবার ছুটল লন ধরে। তার পেছনে পেছনে মার্গারেট। আহমদ মুসার আহত হাত থেকে পড়ে যাওয়া ষ্টেনগানটা তুলে নিয়েছিল ডা: মার্গারেট।

আহমদ মুসার গুলী বিদ্ধ হওয়া দেখে আতংকিত হয়ে পড়েছিল মার্গারেট। কিন্তু আতংকের মধ্যেও সে আশ্বস্ত হলো এই ভেবে যে, গুলীটা বিপজ্জনক জায়গায় লাগেনি।

আহমদ মুসা লন থেকে রাস্তায় উঠে পেছনে তাকাল। দেখল, পেছন থেকে এখনও কেউ তাড়া করে আসেনি।

আহমদ মুসা রাস্তার দিকে তাকাল। দেখল, রাস্তা ফাঁকা। আতংকিত মানুষ বিভিন্ন দিকে সরে গেছে।

আবার দু'জন ছুটল রাস্তা ধরে।

এ সময় আহমদ মুসার মনে হলো কার্লোসের কথা। কার্লোস গাড়ি নিয়ে থাকলে কতই না ভালো হতো। কিন্তু কার্লোসকে গতকাল হঠাৎ করে যেতে হয়েছে প্রায় সোয়া শ' কিলোমিটার পশ্চিমে আর্থার টাউনে। গতকালই ফেরার কথা ছিল। কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়ায় আসতে পারেনি।

একটা সুদৃশ্য নতুন টয়োটা কার আসছিল সামনের দিক থেকে।

আহমদ মুসার মাথায় একটা চিন্তা এসে গেল। সংগে সংগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল সে।

রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ষ্টেনগান উচিয়ে গাড়িটা থামিয়ে দিল সে।

গাড়ি থামার সংগে সংগেই আহমদ মুসা গাড়ির ড্রাইভিং সিটের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ড্রাইভিং সিটে একজন তরুণী।

আহমদ মুসা তার দিকে ষ্টেনগান তাক করে বলল, 'দরজা খুলে দাও, না হলে ভেঙ্গে ফেলব।'

সংগে সংগে তরুণীটি গাড়ির দরজা খুলে দিল। তরুণীটির চোখে-মুখে বিস্ময় এবং ভয় দুইই।

আহমদ মুসা খোলা দরজা পথে পেছনের দরজা আনলক করে দরজাটা খুলে দিয়ে বলল, 'ডা: মার্গারেট তাড়াতাড়ি উঠে বস।'

বলার সাথে সাথেই মার্গারেট গাড়িতে উঠে বসল।

আহমদ মুসা তরুণীটির দিকে ষ্টেনগান তাক করে বলল, 'পাশের সিটে গিয়ে বসুন।'

ভয়ে পাংশু হয়ে উঠেছিল তরুণীটির মুখ। বিনাবাক্যব্যয়ে মেয়েটি ড্রাইভিং সিট ছেড়ে পাশের সিটে সরে গেল।

আহমদ মুসা ড্রাইভিং সিটে উঠে বসতে যাচ্ছে এ সময় লনের দিক থেকে গোলমাল ও ষ্টেনগানের শব্দ ভেসে এল। দু'একটা গুলী এসে আশপাশে পড়ল।

আহমদ মুসা গাড়িতে উঠে চোখের পলকে গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে ছুটল সামনের দিকে।

গাড়ির তরুণীটি শিলা সুসান। ফার্ডিন্যান্ডের মেয়ে। একজন বান্ধবীকে বিদায় দিয়ে সে এয়ারপোর্ট থেকে ফিরছিল।

প্রথমে সে আহমদ মুসাদেরকে হাইজ্যাকার, কিডন্যাপারে ভেবেছিল। কিন্তু আহমদ মুসার গুলী বিদ্ধ বাম বাহু থেকে অব্যাহত রক্তপাত এবং মার্গারেটের বিধ্বস্ত ও রক্তাক্ত অবস্থা দেখে বুঝল কোন বিপদ ও সংঘাত থেকে এরা ফিরছে। পরে যখন হোয়াইট ঈগল-এর অফিসের দিক থেকে হৈ চৈ ও ষ্টেনগানের গুলীর ঝাঁক ছুটে এল, তখন বুঝতে পারল এরা হোয়াইট ঈগল-এর অফিস থেকে মারামারি করে ফিরছে এবং তার গাড়ির সাহায্য নিয়ে এরা পালাবার চেষ্টা করছে।

এসব চিন্তা করার পর শিলা সুসানের ভয় অনেকটা কেটে গেল। তার জায়গায় তার মনে প্রশ্ন জাগল, এরা কারা? মেয়েটির পরনে অদ্ভুত পোশাক কেন? বুঝাই যাচ্ছে তার গায়ের জ্যাকেটটি তার নয়, কোন ছেলের। আর তার পরনের একদম বেঢম প্যান্টটি কোন পুরুষের। কোন মেয়ের এমন পোশাক জীবনে সে এই প্রথম দেখল।

বেশ কিছুটা পথ চলে এসেছে।

আহমদ মুসা পাশের তরুণীটির দিকে মুহূর্তের জন্যে চোখ তুলে বলল, 'আমাদের এই ব্যবহার ও আপনার অসুবিধা হওয়ার জন্যে আমি দু:খিত।'

আহমদ মুসার এ কথায় শিলা সুসান আহমদ মুসার দিকে তাকাল। আহমদ মুসার নরম ও ভদ্র সুর শুনে গম্ভীরভাবে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'আপনারা কারা?'

'হঠাৎ করে এ প্রশ্নের জবাব দেয়া মুস্কিল। এটাই এখন আমাদের বড় পরিচয় যে আমরা জুলুমের শিকার।'

'জালেম কে? মনে হচ্ছে আপনারা লড়াই করে এসেছেন।'

'জালেমদের পরিচয়ও হঠাৎ দেয়া মুস্কিল। লড়াই করতে আমরা যাইনি। ডা: মার্গারেট বন্দী ছিলেন, ওকে উদ্ধার করতে যেয়ে লড়াই হয়েছে।'

আহমদ মুসা পরিচয় না দিলেও শিলা সুসান বুঝল হোয়াইট ঈগলকেই জালেম বলা হচ্ছে। তাহলে এ মেয়েটি 'হোয়াইট ঈগল'-এর কাছে বন্দী ছিল। কেন বন্দী ছিল? বিষয়টা তার মনে কষ্ট দিলেও সে জানে 'হোয়াইট ঈগল' শ্বেতাংগ স্বার্থের একটি সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু মেয়েটি তো নিরেট শ্বেতাংগ, তাহলে এভাবে বন্দী হলো কেন? আর একজন অশ্বেতাংগ তাকে মুক্ত করে নিয়ে যাচ্ছে কেন? এসব প্রশ্ন মাথায় নিয়ে শিলা সুসান প্রশ্ন করল, 'কোথায় বাড়ি আপনাদের?'

'ডা: মার্গারেটের বাড়ি গ্র্যান্ড টার্কস-এ।'

গ্রান্ডস টার্কস-এর নাম শুনে চমকে উঠলে শিলা সুসান। তার আব্বাদের আলোচনায় সে জেনেছে হোয়াইট ঈগলের কয়েকটা অভিযান সেখানে মার খেয়েছে। হোয়াইট ঈগল-এর দেড়শ' থেকে দু'শ লোক সেখানে নিহত হয়েছে।

এসব ঘটনার কার্যকরণ থেকেই কি মেয়েটিকে বন্দী করা হয়েছিল? আর ড্রাইভ করছে এ লোকটি কে? ডা: মার্গারেটের বাড়ি বলল গ্রান্ড টার্কস-এ, কিন্তু এঁর বাড়ি কোথায় তা তো বলল না! এ তো অশ্বেতাংগ। এশিয়ান কি? এ প্রশ্ন মনে জাগতেই তার পিতাদের আলোচনা থেকে শোনা জনৈক এশিয়ানের কথা তার মনে পড়ল। তার পিতাদের সেই এশিয়ানই নাকি 'হোয়াইট ঈগল' এর সব বিপর্যয়ের হোতা। এই এশিয়ানই কি সেই এশিয়ান?

এই শেষ প্রশ্নটা মনে উদয় হতেই একটা ভয়ার্ত শিহরণ এসে তাকে ঘিরে ধরল। সে নিশ্চিত হলো, এ সেই এশিয়ানই হবে। হোয়াইট ঈগল ঘাটি থেকে একজন বন্দী উদ্ধার এইভাবে আর কে করতে পারে!

হঠাৎ আহমদ মুসা তার গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল। তরুণীটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'ম্যাডাম, ওরা পিছু নিয়েছে।'

এ খবরে শিলা সুসান আনন্দিত হবার বদলে উৎকণ্ঠিত হলো। সানসালভাদরের এ কলম্বাস দ্বীপটা খুব বড় নয়। লুকানোর জায়গা তেমন নেই। চারদিক থেকে হোয়াইট ঈগলরা আসলে এ গাড়ি পালাবার জায়গা পাবে না। তার গাড়ি ওখানকার সবাই চেনে। সুতরাং নম্বার এতক্ষণ তারা পুলিশকে বা হোয়াইট ঈগলকে দিয়ে দিয়েছে। সুতরাং যে দিক দিয়েই পালাবার চেষ্টা করা হোক, তাদের খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে না। কিন্তু সুসানের মনে এই বিষয়টাই অস্বস্তির সৃষ্টি করেছে। তার মন বলছে, এই মেয়েটির হোয়াইট ঈগল-এর বন্দীখানায় ফেরা আর ঠিক নয়।

'কয়টি গাড়ি পিছু নিয়েছে?' বলল শিলা সুসান।

'একটা গাড়ি দেখতে পাচ্ছি। মনে হয় একটাই।' আহমদ মুসা বলল।

'তাহলে আরও গাড়ি অন্য দিক দিয়ে আসছে।'

'কি করে বুঝলেন?' বিস্মিত কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা শিলা সুসানের দিকে তাকিয়ে।

'যেখান থেকে আপনারা এলেন, সেটা আমাদের বাড়ির পাশেই। ওদের জানি আমি। পিছু যখন নিতে পেরেছে, তখন একটি নয় অনেকগুলো গাড়ি পিছু নেবার কথা। তাই আমার মনে হচ্ছে, একটি যখন পেছন দিক থেকে পিছু নিয়েছে

তখন আরও গাড়ি অন্যদিক দিয়ে আসছে। কলম্বাস কমপ্লেক্স একটা গ্রন্থি। ওখান থেকে অনেক রাস্তা বিভিন্ন দিকে গেছে।'

'তাহলে এটা আপনার জন্যে খুশীর, আর আমাদের জন্যে খুব দু:খের খবর।' বলল কথাগুলো আহমদ মুসা হাসি মুখে।

তারপর আহমদ মুসা তার গাড়ির গতি স্লো করে দিল।

গাড়ি তখন সবে বন্দর শহর থেকে বেরিয়ে এসেছে। চলছিল তখন এক এবড়ো-থেবড়ো জংলা এলাকার মধ্যে দিয়ে।

বিস্মিত হলো শিলা সুসান। বলল, 'কি ব্যাপার গাড়ি থামিয়ে দিলেন যে?'

'সব গাড়ির মাঝে পড়ে লড়াই করার চেয়ে শুরুতে একটার সাথে লড়াই করে দেখি।' বলল আহমদ মুসা নির্বিকার কণ্ঠে। তার ঠোঁটে হাসি।

আরও বিস্মিত হলো শিলা সুসান আহমদ মুসার এই হাসি দেখে। এমন বিপদে পড়ে কেউ হাসতে পারে জীবনে সে এই প্রথম দেখল। পাগল হয়ে গেল নাকি লোকটা বিপদে পড়ে? দ্রুত কণ্ঠে শিলা সুসান বলল, 'দেখুন আমার খুশী-অখুশী আমার ব্যাপার। কিন্তু আমি চাই না এই মেয়েটি আবার ওদের হাতে বন্দী হোক।'

আহমদ মুসা গভীর দৃষ্টিতে তাকাল শিলা সুসানের দিকে। বলল, 'ধন্যবাদ, তাহলে কি আমি ডাঃ মার্গারেটকে আপনার হেফাজতে দিতে পারি? আপনি তাকে নিরাপদে বাড়ি পৌছানোর ব্যবস্থা করবেন।'

'হ্যাঁ পারেন।' বলল দৃঢ় কণ্ঠে শিলা সুসান।

'তাহলে এখনি আপনি মার্গারেটকে নিয়ে পাশের ঝোপে নেমে যান। একটু পর তাকে নিরাপদ কোথাও পৌছানোর ব্যবস্থা করবেন।'

'আর আপনি?'

'পেছনে মানে উত্তর দিকে চেয়ে দেখুন, একটি নয় দু'টি গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ওরা অপেক্ষা করছে সামনের গাড়ির। দেখুন দক্ষিণ দিক থেকে চারটা হেডলাইট এদিকে এগিয়ে আসছে। আর পূর্ব দিক থেকে যে হেড লাইট এগিয়ে আসতে দেখছি, ওটাও ওদেরই গাড়ি মনে করছি। সবারই লক্ষ্য এই গাড়ি। আমার মনে হচ্ছে, আপনার গাড়ির কোথাও ট্রান্সমিটার লাগানো আছে।

যে ট্রান্সমিটারের মেসেজ অনুসরণ করে ওরা নিখুঁতভাবে ঘিরে ফেলতে আসছে এ গাড়িকে। আপনারা এখানে নামুন। আমি গাড়ি নিয়ে চলে যাই। ওদের লক্ষ্য আমার দিকে চলে যাবে। পরে আপনি ওকে নিয়ে সরে পড়বেন।'

'কিন্তু আপনার কি হবে?' বলল ভারী কণ্ঠে ডাঃ মার্গারেট।

'আমি ওদের ফাঁদ থেকে বেরুতে পারলে বেঁচে যাব।'

'বেরুতে না পারলে?' বলল শিলা সুসান।

'বেরুতে না পারলে ধরা পড়ব। তাতে অন্তত একজন রক্ষা পাবে। আপনিও জানেন মার্গারেট ধরা পড়া ঠিক নয়।'

বলে আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে বেরিয়ে ওপাশে গিয়ে শিলা সুসান ও মার্গারেটের দরজা খুলে দিয়ে বলল, 'তাড়াতাড়ি নেমে পড়ুন।'

'আপনাকে এভাবে ফেলে আমি যাব না।' বলে মার্গারেট ফুফিয়ে কেঁদে উঠল।

আহমদ মুসা মার্গারেটকে লক্ষ্য করে বলল, 'মার্গারেট এটা আমার নির্দেশ। নেমে এসো।'

কাঁদতে কাঁদতে মার্গারেট নেমে এল গাড়ি থেকে।

গাড়ি থেকে নেমে এসেছে শিলা সুসানও। অনেক বিস্ময়, অনেক প্রশ্নের ভীড়ে সে নির্বাক। তার সামনের এশীয়টিকে মনে হচ্ছে বিশ্ববিখ্যাত কোন সিনেমার নায়ক। আর তার সামনে নায়ক-নায়িকার মধ্যে অকল্পনীয় এক ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে।

আহমদ মুসা গাড়ির দুই দরজা বন্ধ করে দিয়ে পকেট থেকে একটা ইনভেলাপ বের করে শিলা সুসানের হাতে তুল দিয়ে বলল, 'এতে কিছু ডলার আছে। ওঁর প্রয়োজন হতে পারে।'

একটু দম নিয়েই আহমদ মুসা বলল আবার সুসানকে, 'আপনার নাম জানতে পারি এবং ঠিকানা?'

'আমি শিলা সুসান। আমার টেলিফোন 'নব্বই হাজার নয়'।

'ধন্যবাদ' বলে আহমদ মুসা মার্গারেটের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখা হবে।'

আহমদ মুসা গাড়িতে উঠে তীব্র বেগে গাড়ি ছাড়ল সামনের দিকে।

আহমদ মুসার গাড়ি ষ্টার্ট দেবার সঙ্গে সঙ্গে পেছনের গাড়ি দু'টিও ষ্টার্ট নিল।

শিলা সুসান ডাঃ মার্গারেটকে টেনে নিয়ে একটা গাছের আড়ালে গিয়ে বসল। সামনে ঝোপ থাকায় রাস্তা থেকে তাদের দেখা যাবে না। কিন্তু তারা উত্তর-দক্ষিণে বহুদূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে।

আহমদ মুসার গাড়িকে অনুসরণ করে পেছনের গাড়িটা শিলা সুসানদের পাশ দিয়ে ছুটে গেল সামনে।

আহমদ মুসার সামনে থেকে যে গাড়ি দু'টি আসছিল, আহমদ মুসার গাড়িকে তীব্র গতিতে ছুটতে দেখে তা থেমে গেছে। তাদের চারটি হেড লাইট পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ তারা আহমদ মুসার চারদিক থেকে ঘিরে ফেলার অপেক্ষা করছে।

পূর্ব দিকে যে গাড়িটা আসছিল, সেটাও গতি পরিবর্তন করে ছুটছে আহমদ মুসার গাড়ির দিকে।

আর পেছন থেকে দু'টি গাড়ি।

আহমদ মুসার গাড়ির রিয়ার লাইট জ্বালানো নেই। মাঝে মাঝে তার গাড়ির হেড লাইটের আলো দেখা যাওয়ায় বুঝা যাচ্ছিল তার গাড়ির লোকেশান।

কিন্তু আহমদ মুসার উপর সামনের দু'টি গাড়ির হেড লাইটের আলো পড়ার পর তার গাড়ির অবয়ব পরিষ্কার হয়ে উঠল

আহমদ মুসার গাড়ি এগুচ্ছে ঐ দু'গাড়ির দিকে পাগলের মত।

প্রায় মুখোমুখি হয়ে পড়েছে আহমদ মুসার গাড়ি এবং ঐ দু'গাড়ি।

ডাঃ মার্গারেটের উদ্বেগ ও আর্তকে তখন শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা। আর শিলা সুসানের চোখে-মুখে অবাক বিস্ময়।

এ সময় ঐ গাড়িগুলোর দিক থেকে ব্রাশ ফায়ারের আওয়াজ ভেসে এল। এক সাথে দু'টি ষ্টেনগানের।

ডাঃ মার্গারেট এবং শিলা সুসানের বিস্ফোরিত চোখ সেদিকে চেয়ে আছে। দু'জনের চোখেই প্রশ্ন, গুলী কোন গাড়ি থেকে হলো। সব গাড়ীর হেড

লাইট তখন নিভানো। সব একাকার হয়ে যাওয়ায় কিছুই বুঝা যাচ্ছে না সেখানকার অবস্থা।

হঠাৎ সেখানে দু'টি বিস্ফোরণের শব্দ এবং পরক্ষণেই সেখানে দেখা গেল আগুনের কুন্ডলী।

ডাঃ মার্গারেট আর্তনাদ করে শিলা সুসানের একটা হাত চেপে ধরল। শিলা সুসানেরও দু'টি উদ্বিগ্ন চোখ সেদিকে নিবদ্ধ। বলল, 'ডাঃ মার্গারেট দেখেছেন, আগুনের আলোয় একটা গাড়িকে সচল এবং দক্ষিণ দিকে যেতে দেখা গেল।'

'কিন্তু গাড়িটি কার, কোন পক্ষের কেমন করে বলা যাবে?' ভাঙা কণ্ঠে বলল ডাঃ মার্গারেট।

'তা বলা মুষ্কিল।' বলল শিলা সুসান হতাশভাবে।

দেখা গেল উত্তর দিকে যাওয়া ও পুবদিক থেকে আসা গাড়ি তিনটিও তাদের সব লাইট নিভিয়ে দিয়েছে। লাইট নিভিয়ে তারা এগুচ্ছে। সুতরাং ওদিকের কোন কিছুই এখন আর বোঝা যাচ্ছে না।

'ডাঃ মার্গারেট চলুন, আর অপেক্ষা করা কি হবে না। অনেকখানি হাঁটতে হবে আমাদের।' বলল শিলা সুসান।

'কিন্তু ওঁর কোন খবর?' সেই ভাঙ্গা কান্না ভেজা কণ্ঠে বলল ডাঃ মার্গারেট।

'ঘটনাস্থলে যাওয়া কি সম্ভব আমাদের?' বলল শিলা সুসান।

'তা সম্ভব নয়, কিন্তু......।' কথা শেষ করতে পারলো না ডাঃ মার্গারেট। কান্নায় বুজে গেল তার কথা। একটা কথা বার বারই তার বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে, সে জীবন বিপন্ন করে আমাকে উদ্ধার করল, আমি তো ওঁর বিপদে কিছুই করতে পারছি না।

'কিন্তু কি ডাঃ মার্গারেট?'

'অতবড় একজন মানুষ কি অসহায়ভাবে শেষ হয়ে যাবে?' বলতে বলতে আবার কেঁদে ফেলল ডাঃ মার্গারেট।

শিলা সুসান ডাঃ মার্গারেটের পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, 'ওঁর বিপদ হয়েছে তা আমরা জানি না, বিপদ হয়নি তাও আমরা জানি না। তাঁর উপর বড় কিছু ঘটেছে আমরা বলতে পারছি না, ঘটেনি তাও বলতে পারছি না। সুতরাং আসুন সব ব্যাপার ঈশ্বরের উপর ছেড়ে দেই। তাঁকে যতটুকু আমি দেখেছি, তাতে তিনি পরোপকারী এবং সুবিবেচক। ঈশ্বর এমন লোকদের সাহায্য করেন।'

ডাঃ মার্গারেট চোখ মুছে বলল, 'আপনার কথা সত্য হোক।'

'আসুন, চলি।' বলে হাঁটতে শুরু করল শিলা সুসান।

ডাঃ মার্গারেটও হাঁটতে শুরু করেছে।

হাঁটতে গিয়ে পিঠে কিছু চেপে আছে মনে হলো ডাঃ মার্গারেটের। না শুধু পিঠে কেন? কাঁধ থেকে পিঠ পর্যন্ত। হাত দিয়ে দেখল আহমদ মুসার ব্যাগ।

চমকে উঠল ডাঃ মার্গারেট। কখন দিল আহমদ মুসা এ ব্যাগ তাকে! নিশ্চয় যাবার সময় কথা বলার ফাঁকে সে ব্যাগটি মার্গারেটের পিঠে ঝুলিয়ে দিয়েছে। মনের অবস্থার কারণে সে খেয়াল করেনি।

ব্যাগটা তার কাছে আসায় একটা অশুভ চিন্তায় মনটা কেঁপে উঠল মার্গারেটের। সব সময় এ ব্যাগটি আহমদ মুসার কাছে থাকে। এ ব্যাগটি মার্গারেটের কাছে রেখে যাবার অর্থ কি এটাই যে আহমদ মুসা নিজের ব্যাপারে খুবই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল! অশুভ চিন্তায় আবার কেঁপে উঠল মার্গারেটের মন।

দু'জন পাশাপাশি চলছে।

হাঁটতে হাঁটতে শিলা সুসান বলল, 'তিনি অন্যের ব্যাপারে যত সতর্ক দেখলাম, এমন লোক নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারে অবশ্যই সতর্ক হবেন। তিনি তো অবশ্যই সাধারণ কেউ নন।'

হাঁটতে শুরু করে ডাঃ মার্গারেটের মনে নতুন চিন্তার উদয় হয়েছিল, 'কোথায় যাচ্ছে সে? মেয়েটাকে কিছুই জিজ্ঞেস করা হয়নি।'

শিলা সুসানের কথা শেষ হলে ডাঃ মার্গারেট বলল, 'মিস সুসান, উনি মনে করেন ওঁর জীবনটা পরের জন্যে। তাই নিজের ব্যাপারে খুব একটা চিন্তা করেন না।' ভারী গলায় কথা শেষ করেই একটা ঢোক গিলে ডাঃ মার্গারেট আবার বলল, 'আমরা কতদূরে কোথায় যাচ্ছি মিস সুসান?'

শিলা সুসান সঙ্গে সঙ্গেই বলল, 'ঠিক বিষয়টা আপনাকে বলা হয়নি।' বলে একটু থেমে আবার সে শুরু করল। বলল, 'যেখান থেকে আপনারা গাড়িতে চড়েছেন, তার কয়েক গজ সামনেই আমার বাড়ি। আমার বাড়িতে আপনাকে নিচ্ছি না। অসুবিধার কথা আমি পরে বলব। আমরা যাচ্ছি আমার খালার বাড়িতে। খালা ও এক খালাতো বোন ছাড়া বাড়িতে এমন কেউ নেই। সেখানে আপনি ভাল থাকবেন এবং নিরাপদে থাকবেন।'

'সত্যি লজ্জা করছে এই পোশাকে।' বলল ডাঃ মার্গারেট।

'না, এই পোশাকে যাবেন কেন? সামনেই মার্কেট আছে কাপড় কিনে নেব। উনি তো টাকা দিয়েই গেছেন।'

বলে থামল। কিন্তু থেমেই আবার বলল, 'সত্যি উনি বোধ হয় সবজান্তা।' আমার পকেটের খবর পেয়েই বোধ হয় উনি তার মানিব্যাগটা দিয়ে গেছেন। সত্যি এমন কোনদিন হয়নি। বিমান বন্দরে যাবার সময় আমার পার্স নিতে আমি ভুলে গেছি। আমার কাছে এখন একটা পয়সাও নেই।'

'সব জান্তা উনি অবশ্যই নন। কিন্তু সব দিকে নজর তাঁর থাকে। বিশেষ করে অন্যের অসুবিধা দূর করার দিকে।' ভারি কণ্ঠস্বর ডাঃ মার্গারেটের।

'ডাঃ মার্গারেট, ওঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যেও অশরীরী মনে হয় কিছু আছে। ক'মিনিটের দেখা ওঁর সাথে। কিন্তু মনে হচ্ছে জানেন, উনি যেন পর কেউ নন। উনি যখন আপনাকে আমার হেফাজতে দিতে চাইলেন তখন আমার কি মনে হয়েছিল জানেন, আমার ঘনিষ্ঠ কেউ যেন আমাকে কথাটা বলছেন যা আমি অস্বীকার করতে পারি না। আমি অবাক হয়েছি দেখে, ওঁর গুলীবিদ্ধ বাহু থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। কিন্তু কোন সময়ই তাকে একবারও ওদিকে তাকাতে পর্যন্ত দেখিনি।'

'এটাই ওঁর প্রকৃত রূপ মিস সুসান। সবার প্রয়োজন শেষেই শুধু তিনি নিজের প্রয়োজন নিয়ে ভাবেন।' বলল ডাঃ মার্গারেট উদাস কণ্ঠে।

'ওঁরা দুর্লভ। কিন্তু এরা আছেন বলেই দুনিয়া আছে।' বলল প্রায় স্বগত কণ্ঠে শিলা সুসান।

কথা তাদের চলছে। হাঁটছেও তারা অবিরাম।

শিলা সুসানের খালা আম্মার বাড়িটা একটা সুন্দর বাংলো। ছবির মত। মানুষ থাকেন মাত্র দু'জন। সুসানের খালাম্মা এবং তার খালাতো বোন। তাও খুব কম সময়ই তারা এ বাড়িতে থাকেন। সুসানের খালু বাহামা সরকারের একজন কূটনৈতিক অফিসার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাহামা দূতাবাসের নিউইয়র্ক শাখায় তিনি কর্মরত। সুসানের খালা, খালাতো বোন সেখানেই অধিকাংশ সময় থাকেন।

সুসানের খালা ও খালাতো বোন মার্কেটিং-এ গেছে। ডাঃ মার্গারেট একাই বাসায়। ডাঃ মার্গারেট কোন সময়ই বাইরে বের হয় না। খালা ও খালাতো বোনকে মার্গারেটের বিপদের কথা বলে তাকে বাইরে বেরুতে দিতে নিষেধ করে গেছে শিলা সুসান। তাই তারাও কখনও তাকে বাইরে নিতে চায় না।

ডাঃ মার্গারেট ড্রইং রুমে বসে গালে হাত দিয়ে আহমদ মুসার কথাই ভাবছিল। ঘটনার পর দু'দিন পার হয়েছে, আহমদ মুসার কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। পরদিনই ঘটনাস্থলে শিলা সুসান গিয়েছিল, কিন্তু তার গাড়ির কোন ধ্বংসাবশেষ সে পায়নি। তার মানে আহমদ মুসা প্রতিপক্ষের গাড়ি দু'টি ধ্বংস করে অবশেষে সরে পড়তে পেরেছিল। বুলেটে ঝাঁঝরা হওয়া সুসানের গাড়ি পরে এক জায়গায় পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু আহমদ মুসার কোন সন্ধান নেই। তিনি ভাল আছেন? অন্য কোথাও আছেন? থাকলে যোগাযোগ করবেন না কেন? না শিলা সুসানের উপর মার্গারেটকে বাড়িতে পৌছানোর দায়িত্ব দিয়ে উনি দায়িত্ব মুক্ত হয়ে গেছেন। কিন্তু এ রকম তিনি নন। কিন্তু তাঁর এ নীরবতার ব্যাখ্যা কি?

কলিংবেলের শব্দ হলো। বাইরে কেউ কলিংবেল বাজাচ্ছে? ওরা মার্কেটিং করে ফিরে এল এত তাড়াতাড়ি? না, তাতো হয় না।

দরজার আইহোল দিয়ে বাইরে তাকিয়ে শিলা সুসানকে দেখতে পেল ডাঃ মার্গারেট।

ডাঃ মার্গারেট তাড়াতাড়ি খুলে দিল দরজা। শিলা সুসান প্রবেশ করল ভেতরে। তার মুখ ম্লান।

সদাহাস্যোজ্জ্বল সুসানকে গম্ভীর ও ম্লান মুখে দেখে উদ্বিগ্ন হলো ডাঃ মার্গারেট। বলল, 'কি ব্যাপার সুসান কিছু ঘটেছে? তোমাকে বিষণœ দেখাচ্ছে।'

শিলা সুসান ম্লান হেসে বলল, 'খালারা নেই ভালই হলো, চলুন কথা আছে।'

বসল দু'জন গিয়ে সোফায় পাশাপাশি। বসেই ডাঃ মার্গারেট বলল, 'প্রোগ্রাম ঠিক আছে? তোমার ওয়াশিংটন আর আমার গ্রান্ড টার্কস-এ যাওয়ার?'

'বিশ্ববিদ্যালয় কাল খুলছে। যেতেই হবে। তবে আপনি দু'একদিন থেকে যেতে পারেন। জর্জ আপনাকে এসে নিয়ে যাবে, সেটাই বরং ভাল।' বলল শিলা সুসান।

'তুমি চলে গেলে আমার থাকার কোন অর্থ নেই।'

'ঠিক আছে, এটা দেখা যাবে। বলে একটু থেমে শিলা সুসান বলল, 'একটা প্রশ্ন আপনি বার বার পাশ কাটিয়ে গেছেন। বলুন, ঐ এশীয় আপনার কে?'

ম্লান হলো ডাঃ মার্গারেটের মুখ। একটু চুপ করে থাকল। তারপর হেসে বলল, 'আমার কেউ নন। আবার মাঝে মাঝে মনে হয়, তিনি আমার সব। কোনটা ঠিক আমি ভেবে দেখিনি। তবে এ কথায় সন্দেহ নেই, আমি তাঁর কেউ নই।'

'তিনি কে, আপনি জানেন?'

চমকে উঠল ডাঃ মার্গারেট। উত্তর দিল না।

'বুঝেছি, তিনি কে আপনি তাহলে জানেন।'

'তুমি জান?'

'আমি জানতাম না, আব্বার কাছে শুনলাম।'

'তোমার আব্বা মানে মিঃ ফার্ডিন্যান্ড?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি নিশ্চয় আমাদের এসব কাহিনী তাঁকে বলনি। তাহলে কেন তিনি বলতে এলেন তাঁর সম্পর্কে তোমাকে?'

সংগে সংগেই উত্তর দিল না সুসান। তাঁর চোখে মুখে দ্বিধাগ্রস্থতা ও বিষণœ ভাব। একটু সময় নিয়ে ধীর কণ্ঠে বলল সুসান, 'আপা তিনি ধরা পড়েছেন।'

'ধরা পড়েছেন?'

বিদ্যুত স্পৃষ্ট হওয়ার মত কেঁপে উঠল ডাঃ মার্গারেট। তারপর হঠাৎ যেন পাথরের মত হয়ে গেল সে।

'হ্যাঁ। ধরা পড়েছেন। আবার কাঁধে গুলী বিদ্ধ হয়েছিলেন তিনি। রক্তক্ষরণে তিনি দুর্বল হয়ে নিশ্চয় পড়েছিলেন। দু'জন পথচারী হাসপাতালে নিয়ে যায়। ঐ হাসপাতালে হোয়াইট ঈগল-এর আহত কয়েকজনের চিকিৎসা হচ্ছিল। আহমদ মুসাকে দেখে তারা চিনতে পারে। খবর পেয়ে আব্বা ছুটে যান এবং তাকে আটক করে নিয়ে আসেন।'

'কোথায় আছেন তিনি?' ক্ষীণ কণ্ঠে বলল ডাঃ মার্গারেট।

'সেটা আমি অনুসন্ধান করেছি। খবরটা আব্বার কাছ থেকে জানার পরেই হোয়াইট ঈগল-এর কলম্বাস কমপ্লেক্সের বন্দীখানা এবং ককবার্ন দ্বীপের মূল বন্দীখানায় সন্ধান করি গোপনে। তাঁকে এসব বন্দী খানায় রাখা হয়নি। পরে আব্বাকে জিজ্ঞেস করেই জানতে পারি, তাঁকে আমেরিকায় হোয়াইট ঈগল-এর হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

'হোয়াইট ঈগল-এর হেডকোয়ার্টার কোথায়?'

'হয়তো ওয়াশিংটনে। আমি ঠিক জানি না। তবে জেনে নেব।'

বলে একটু থামল শিলা সুসান। তারপর শুকনো কণ্ঠে বলল, 'ভয়াবহ সব কথা শুনলাম আব্বার কাছে। তিনি জানালেন, দুনিয়ার সবচেয়ে মূল্যবান মানুষ এখন আহমদ মুসা। তাকে যদি হোয়াইট ঈগল ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান-এর হাতে তুলে দেয়, তাহলে তারা কয়েক বিলিয়ন ডলার দেয়া হবে বলে তাদের নেতা ফেজাসিস জানিয়েছেন। আবার 'ডব্লিউ আর এফ' নামের একটি বামপন্থী সন্ত্রাসবাদী সংগঠনও নাকি তাঁকে এর চেয়ে বেশি মূল্যে কিনতে চাচ্ছে।'

আনমনা হয়ে পড়েছিল ডাঃ মার্গারেট। শিলা সুসান-এর কোন কথাই ডাঃ মার্গারেটের কানে যাচ্ছিল না।

এটা লক্ষ্য করে সুসান বলল, ‘কি ভাবছেন আপা?’

‘ভাবছি, আমার দুর্ভাগ্যের কথা। আমাকে উদ্ধার করতে আসার ফলেই এতবড় সর্বনাশ ঘটে গেছে। আমার কি মূল্য? আমার মত শত শত মার্গারেট মারা গেলে দুনিয়ার কারো কোন ক্ষতি হতো না। কিন্তু তিনি না থাকলে পৃথিবীর সারা দিগন্ত জুড়ে যে অশ্রু ঝরবে, রক্ত ঝরবে!’

‘আপনি জানেন আপা, ফার্ডিন্যান্ড আমার আব্বা, কিন্তু হোয়াইট ঈগল-এর রাজনীতি আমার ভাল লাগে না। আহমদ মুসা বাহামায় থাকলে তাকে উদ্ধার করার জন্যে আমি সব কিছু করতাম। আমেরিকায় কিছু করতে পারলে করব। আহমদ মুসার মত এমন মানুষ আমি দেখিনি। জানেন আরেকটা মজার ঘটনা ঘটেছে। আমার গাড়ি উদ্ধারের পর গাড়ির ব্লু বুকের মধ্যে দু’হাজার আমেরিকান ডলার পাওয়া গেছে। টাকার সাথে একটা স্লিপে লেখা, ‘গাড়ির ক্ষতি হওয়ার জন্যে দুঃখিত। আমার কাছে যা ছিল গাড়ি রিপিয়ারের জন্যে রেখে দিলাম।’

‘টাকা পাওয়ার পর আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। আব্বাকে বলেছিলাম, এই ধরনের লোককে কষ্ট দেয়া ঈশ্বর অবশ্যই পছন্দ করবেন না।’

আব্বা বলেছিলেন, ‘সে কেমন মানুষ সেটা আমাদের দেখার বিষয় নয়, সে কি করেছে, করছে সেটাই বিবেচ্য। তাকে সহ¯্রবার হত্যা করলেও আমাদের ক্ষতিপূরণ হবে না। সেই জন্যে হত্যা নয়, তাকে আমরা বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমাদের কয়েক বছরের বাজেটের টাকা এর থেকে আমরা পেয়ে যাব।’ থামল সুসান।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডাঃ মার্গারেট। বলল, ‘সুসান, জর্জকে টেলিফোন করতে চাই।’

ডাঃ মার্গারেট আহমদ মুসার খবর জর্জকে জানালে জর্জ ও জেনিফার দু’জনেই কেঁদে ফেলে। তারা টেলিফোনে আর কথা বলতেই পারেনি।

কয়েক মিনিট পরেই টেলিফোন এল জর্জের। জর্জ এবং জেনিফার দু’জনেই জানাল, তারা আমেরিকা যেতে চায়।

টেলিফোনে কথা বলার পর ডঃ মার্গারেট শিলা সুসানের সাথে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করল। বলল, ‘আমিও ওদের সাথে আমেরিকা যেতে চাই।’

শিলা সুসান বলল, 'যাওয়ার এই সিদ্ধান্ত যুক্তিসংগত। তবে গেলেই কোন লাভ হবে তা নয়। হোয়াইট ঈগলকে আমি জানি। আপনাদেরকে ওরা পেলে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। আহমদ মুসাকে ওরা বাঁচিয়ে রেখেছে টাকার লোভে, কিন্তু আপনাদেরকে এক মুহূর্তও বাঁচতে দেবে না। সুতরাং বিচার বিবেচনা না করে আপনারা বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়লে কোন লাভ হবে না। আমাকে আপনারা বিশ্বাস করুন, জে.জি ফার্ডিন্যান্ড আমার আব্বা, কিন্তু আব্বার অন্যায়ের ভার লাঘবের জন্যেই আমি আহমদ মুসাকে সাহায্য করব। কিভাবে করব আমি জানি না। যদি জানতে পারি, আপনাদের জানাব। ততদিন আপনাদের অপেক্ষা করা উচিত।'

'তাহলে জর্জের সাথে আমি আলোচনা করি, ফিরে যাই গ্রান্ড টার্কস-এ। আমরা তোমার অপেক্ষা করব, যদি অপেক্ষা করার জন্যে বেঁচে থাকি।'

'এ কথা বলছেন কেন? কেন বেঁচে থাকবেন না?'

'আহমদ মুসা আমাদের জন্যে বাঁচার পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি এখন নেই, মাথার উপর আমাদের ঢালও নেই।' ভারী কণ্ঠ মার্গারেটের।

শিলা সুসান একটু চুপ থাকল। তারপর বলল, 'কিন্তু যতটুকু জানি, ক্যারিবিয়ান দ্বীপাঞ্চল, বিশেষ করে টার্কস দ্বীপপুঞ্জের বিপদ কেটে গেছে। জাতিসংঘ ও বিশ্বের মানবাধিকার সংস্থাগুলো অনুসন্ধান ও চাপের ফলে বৃটিশ সরকার সাংঘাতিক তৎপর হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণাংগ তথা মুসলমানদের সামান্য অভিযোগও আজ সংবাদ মাধ্যমে চলে যাচ্ছে এবং বৃটিশ সরকার এবং ক্যারিবিয়ান সরকারগুলো তার প্রতিকারে দ্রুত এগিয়ে আসছে। এই পরিস্থিতিতে হোয়াইট ঈগল ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে তার সকল কার্যক্রম স্থগিত করেছে। তারা বিব্রত হয়ে পড়েছে যে, ভিন্ন কোন কারণে ভিন্ন কারও দ্বারা একজন মুসলমান বা কৃষ্ণাংগ মারা গেলে দায়ী করা হচ্ছে হোয়াইট ঈগলকে। টার্কস দ্বীপপুঞ্জ সহ ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের পরিস্থিতি ভাল হোক এটা হোয়াইট ঈগলও চাচ্ছে। সুতরাং যে ভয় করছেন সে ভয়ের কোন কারণ নেই। আহমদ মুসা সেখানে নেই বটে কিন্তু যা তিনি করেছেন তা ফসল দিয়ে চলবে বহু বছর।'

'কিন্তু ওদের সমস্ত রাগ আজ গিয়ে পড়েছে আহমদ মুসার উপর এবং তিনি ওদের হাতে বন্দী।' কান্নায় ভারী হয়ে উঠল ডাঃ মার্গারেটের কণ্ঠ।

শিলা সুসানের মুখও মলিন হয়ে উঠেছে। তারও চোখে মুখে বেদনার চিহ্ন। ধীরে ধীরে বলল সে, 'এটা ট্রাজেডি এবং সকলের জন্যে। তিনি মুক্ত হোন চাই। কিন্তু কিভাবে আপনি জানেন না, আমিও জানি না।' ভারী কণ্ঠস্বর শিলা সুসানের।

ডাঃ মার্গারেটের দু'চোখ থেকে দু'ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল তার দুগন্ড দিয়ে।

# ৬

সকালে নাস্তার পর শিলা সুসান তার হল ফ্ল্যাটের ষ্ট্যাডি রুমের ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে আহমদ মুসার ব্যাপারটা নিয়ে আকাশ-পাতল চিন্তা করছিল। আমেরিকান হোয়াইট ঈগল-এর হেড কোয়ার্টার কোথায়? হোয়াইট ঈগল-এর প্রধঅন গোল্ড ওয়াটারের সাথে তার পরিচয় আছে। কিন্তু বিনা কারণে তার কাছে যাওয়া যেমন অসম্ভব, তেমনি তার কাছ থেকে হেড কোয়ার্টারের অবস্থান সম্পর্কে কিছু জানাও অসম্ভব। তাহলে কি করবে সে? কোন পথে এগুবে?

এ সময় কলিংবেল বেজে উঠল।

ভাবনায় ছেদ পড়ল।

উঠে দাঁড়াল সুসান। হোষ্টেস মার্কেটিং-এ গেছে। তাকেই খুলে দিতে হবে দরজা।

জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আবাসিক হল এলাকার বিশেষ হল-ফ্ল্যাট এগুলো। এ হল-ফ্ল্যাটগুলোর প্রত্যেকটিতে একটি বেড রুম, একটি ষ্ট্যাডি, একটি ড্রইং, একটি কিচেন ও টয়লেট রয়েছে। এ ফ্ল্যাটগুলো সাধারণ হল-কক্ষের তুলনায় অনেক ব্যয়বহুল। উচ্চবিত্তরা যাদের উড়াবার মত টাকা রয়েছে তাদের ছেলেমেয়েরা এসব ফ্ল্যাট নেয়।

শিলা সুসানের ফ্ল্যাটটিও এ ধরনেরই একটা ফ্ল্যাট। রান্না-বান্না ও ঘর-দোরের তত্ত্বাবধানের জন্যে একজন হোষ্টেস রয়েছে। মেয়েটিকে সানসালভাদর থেকে আনা হয়েছে।

দরজা খুলে দিতেই সহপাঠিনী জিনা ক্রিষ্টোফার ঘরে প্রবেশ করে জড়িয়ে ধরলো সুসানকে। বলল, ‘কোন খোঁজ নেই, এত বড় ছুটিটা বাড়িতে কাটিয়ে এলি?’

‘কেন, তুই কবে এসেছিস? আমি কাল এসেছি।’

‘ছুটির অর্ধেকটা থাকতেই চলে এসেছি।’

‘বিশ্ববিদ্যালয়টা আমার দেশে হলে আমিও নিশ্চয় তাই করতাম।’

‘এ কথা ঠিক। কিন্তু আবার এটাও ঠিক যে, বাইরের অনেকে ছুটিতে দেশেই যায়নি।’

‘ঠিক আছে। বল এবার এদিকের কথা। কেমন ছিলি?’

‘ভাল। বেশ আনন্দেই কেটেছে সময়। কিন্তু শেষ রক্ষা বোধ হয় হলো না।’

‘কেমন?’

‘তুমি জান, বিশ্ববিদ্যালয় দিবসে একটা নাটক অনুষ্ঠানের কথা ছিল। সে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরাই যেহেতু নাটক করবে, তাই ছাত্র-ছাত্রীদের কারও লেখা নাটক বেছে নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। বেছে নেয়া হয়েছে মাষ্টার্স শেষ বর্ষের ছাত্রী মেরী রোজ আলেকজান্ডারের নাটক ‘দি নেশন’কে। রিহার্সেলের আয়োজন সব শেষ। শেষ মুহূর্তে গন্ডগোল বাধিয়েছে মেরী রোজ।’

‘মেরী রোজ গন্ডগোল বাধিয়েছে?’

‘হ্যাঁ।’

‘কি গন্ডগোল?’

‘তার অনুমতি নেয়া হয়নি, তাই আপত্তি তুলেছে তার লেখা নাটকের অভিনয়ে।’

‘যেখানে খুশী হবার কথা সেখানে আপত্তি? কিন্তু মেরী রোজ তো এমন নয়। তার কাছ থেকে কোন অবিবেচক কথা আসতে পারে না।’

‘আসল ব্যাপার হলো, নাটকে রেডইন্ডিয়ান ছাত্রের একটা চরিত্র রয়েছে। তাকে এ্যান্টি নেশন, এ্যান্টি সিভিলাইজেশন এবং সংকীর্ণ দৃষ্টি কম্যুনাল হিসেবে দেখানো হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, মেরী রোজ এই চরিত্রকে আর এভাবে দেখতে চায় না। কিন্তু এ কথা সে সরাসরি বলছেও না।’

জিনা ক্রিষ্টোফারের এ কথা শোনার সাথে সাথে শিলা সুসানের চোখের সামনে একটা মুখ ভেসে উঠল। মুখটি রেড ইন্ডিয়ান ছাত্র ‘ঈগল সান ওয়াকার’-এর। আকস্মিকভাবেই হৃদয়ের কোথঅও যেন একটা আঘাত লাগল সুসানের। একটা ব্যথা যেন চিন চিন করে উঠল মন জুড়ে। সুসানের মত মেরী রোজও সান

ওয়াকারকে নিয়ে ভাবছে না তো? পরক্ষণেই আবার ভাবল, ঈগল সান ওয়াকার ও মেরী রোজ আলেকজান্ডার দু'জনেই অসাধারণ ছাত্র। কিন্তু শুরু থেকেই তো মেরী রোজ সান ওয়াকারকে কিছুটা বৈরী দৃষ্টিতে দেখে আসছে! এসব চিন্তাকে চাপা দিয়ে শিলা সুসান বলল, 'যে কথা মেরী রোজ নিজে বলছে না, সেটা তুই বলছিস কি করে?'

'সবাই বলছে।'

'কিন্তু কারণ কি?'

'কিছু একটা ঘটেছে। সেদিন বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে জর্জ ওয়াশিংটন দিবসের নাচ অনুষ্ঠানে সান ওয়াকারকে ঢুকতে দেয়া না হলে মেরী রোজ আলেকজান্ডার বেরিয়ে যায়।'

চমকে উঠল শিলা সুসান। তার মুখ মলিন হয়ে গেল। কিন্তু সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'এর দ্বারা কি বলতে চাচ্ছিস?'

'সবাই বলছে সান ওয়াকারের সাথে একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠার কারণেই মেরী রোজ তার নিজের লেখা নাটক সম্পর্কেও আজ ভিন্ন মত পোষণ করছে।'

সঙ্গে সঙ্গে কথা বলতে পারলো না শিলা সুসান। হৃদয়কে মুচড়ে দেয়ার মত ব্যথা অনুভব করল সে। সান ওয়াকার এবং মেরী রোজ দু'জনেই শিলা সুসানের ক্লাসমেট। মেয়ে বান্ধবীদের মধ্যে মেরী রোজ শিলা সুসানের সবেেচয় ঘনিষ্ঠ। আর ছেলেদের মধ্যে সান ওয়াকারকে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ চোখে দেখে সুসান। সান ওয়াকারকে ভাল লাগে তার। বর্ণ বৈষম্যকে কোন সময় আমল দেয় না বলেই শিলা সুসান সান ওয়াকারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছে। মনের অজান্তেই স্বপ্ন দেখেছে তাকে নিয়ে। কিন্তু সান ওয়াকার কি ভাবে, আদৌ ভাবে কিনা তা জানতে চেষ্টা করেনি সুসান কখনই। মেরী রোজ তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ হওয়ার পরেও মেরী রোজ ও সান ওয়াকারের ঘনিষ্ঠতা বিষয়ক কিছুই তো সে দেখেনি! আজ আকস্মিক এ সংবাদে শিলা সুসান সত্যিই কষ্টবোধ করছে। তবু তাদের সম্পর্কের বিষয়টা অস্বীকার করার জন্যেই বলল, 'মেরী রোজ-এর বিরুদ্ধে এই অভিযোগের মূলে ঐটুকু একটা ঘটনা ছাড়া আসলেই কোন সত্য আছে?'

‘মেরী রোজ খুব চাপা মেয়ে। তার ব্যক্তি জীবন সম্পর্কে জানা খুব মুষ্কিল। তবু দু’একটা এমন ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়েছে, তা ঐ অভিযোগ প্রমাণের জন্যে যথেষ্ট। মনে আছে তোর, গত পিকনিকে একটা নাশতার প্যাকেট কম পড়েছিল। সান ওয়াকার সবশেষে ছিল বলে সে নাশতা পায়নি। কেউ কিছু বলার আগে সান ওয়াকার হেসে বলেছিল, তার ক্ষুধা নেই, তাছাড়া এ সময় রেডইন্ডিয়ানরা নাশ্তা খায় না। পরে দেখা গেছে মেরী রোজ নাশ্তা খায়নি এই প্রতিবাদে যে, রেডইন্ডিয়ান বলে তাকে অপমান করার জন্যেই ইচ্ছা করে তার নাশতা কম ফেলানো হয়েছে।’

চমকে উঠলো শিলা সুসান। এ ঘটনা সেও জানে। কিন্তু এ ঘটনাকে তখন তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ হিসেবেই দেখেছিল। কিন্তু আজ জিনা ক্রিষ্টোফার ঘটনাটাকে ভিন্ন দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করায় একেই সত্য বলে তার মনে হচ্ছে। মন আরও দূর্বল হয়ে পড়ল শিলা সুসানের। তবু বলল, ‘কিন্তু জিনা সান ওয়াকারকে অপমান ও ছোট করার জন্যে মেরী রোজ যা করেছে, সেটা দেখছিস না?’

‘সেটা অতীতের কথা সুসান। দুই প্রতিভার মধ্যে দ্বন্দ থাকে। মনে হয় মেরী রোজ প্রথম দিকে সান ওয়াকারকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবেই ছোট করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সবাই যখন রেড ইন্ডিয়ান হওয়ার কারণে সান ওয়াকারকে নানাভাবে অপমান ও ছোট করতে লাগল, তখন থেকেই মেরী রোজ সান ওয়াকারের পক্ষ নিতে শুরু করেছে।’

জিনা ক্রিষ্টোফারের কথার জবাবে শিলা সুসান কোন যুক্তি দাঁড় করাবার আর শক্তি পেল না। কোন কিছু হারাবার মত এক ধরনের বেদনা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

জিনা ক্রিষ্টোফারই আবার বলল, ‘যাই বল সুসান, মেরী রোজ ভুল করছে। সবাই একমত, নাটক মঞ্চস্থ হবেই। মেরী রোজ জেদ করলে তার ক্ষতি হবে, বেশি ক্ষতি হবে সান ওয়াকারের। এমনিতেই সান ওয়াকারের শত্রু সৃষ্টি হয়েছে প্রচুর। রেডইন্ডিয়ানদের মধ্যে এত বড় বিজ্ঞান প্রতিভা জন্মাক অনেকেই

তা চাচ্ছে না। তার উপর যদি মেরী রোজও সান ওয়াকারের সম্পর্কের কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাহলে সান ওয়াকারের বিরুদ্ধে তাদের ক্রোধ বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।'

মনে মনে কেঁপে উঠল শিলা সুসান। জিনার কথার প্রতিটি অক্ষর যে সত্য, সুসানের চেয়ে বেশি তা আর কে জানে? বলল সে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে, 'মেরী রোজ কি সত্যিই ঐ রকম জেদ করছে?'

'করছে মানে? মেরী রোজ এমনকি একথা পর্যন্ত বলেছে, যদি নাটকের রিহার্সেল বন্ধ না হয়, যদি তার নাটক মঞ্চস্থই করতে চায়, তাহলে সে আদালতের আশ্রয় নেবে।'

'ঠিকই তো আদালতের আশ্রয় সে নিতে পারে। কি করার থাকবে তখন?'

'কিন্তু তার আগেই অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে। ছাত্ররা একা নয় সুসান, ছাত্রদের বুদ্ধি দেবার লোক জুটেছে প্রচুর।'

'কেমন?'

'আমিও সব জানি না সুসান। কিন্তু চারদিক দেখে-শুনে আন্দাজ করি, ভয়ংকর কিছু ঘটে যাবে।'

একদিকে মনটা সুসানের খারাপ হয়ে গেছে। তার উপর জিনার দেয়া এই ভয়ংকর খবরে উদ্বেগ-আতংকে মনটা পূর্ণ হয়ে উঠল। কোন উত্তর সে দিল না।

জিনাই বলল, 'সুসান, মেরী রোজ তোর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তুই একটু চেষ্টা করে দেখ তাকে বিপজ্জনক পথ থেকে ফিরাতে পারিস কিনা। এটা শুধু আমার কথা নয়, ওরা সবাই আমাকে তোর কাছে পাঠিয়েছে শেষ চেষ্টা করার জন্যে।'

'স্যাররা তো বলতে পারেন মেরী রোজকে।'

'বিজ্ঞান বিভাগের ডীন ও পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যানকে বলা হয়েছিল। তারা বলেছেন, 'ছাত্রদের ব্যাপার ছাত্রদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখ। আমাদেরকে কোন পক্ষ হতে বলো না।'

'একটু ভাবল শিলা সুসান। কি বলবে সে মেরী রোজকে? মেরী রোজ যা ভাবছে, সেটা সুসানেরও ভাবনা। তবে একটা যুক্তি আছে, বিপদ থেকে বাঁচাতে হবে মেরী রোজ ও সান ওয়াকার দু'জনকেই।

সান ওয়াকারের কথা মনে হতেই মনটা তার বেদনায় টন টন করে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাবল, সান ওয়াকারকে সে জয় করতে পারেনি। মেরী রোজ যদি তাকে জয় করে থাকে, তাহলে তাদের পথে তার দাঁড়ানো ঠিক নয়।

মুখটা গম্ভীর হয়ে উঠল সুসানের। বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

জিনা চমকে উঠল। বলল, 'তোর কি হলো সুসান?'

সুসান নিজেকে সামলে নিল।

মুখে হাসি টানার চেষ্টা করে বলল, 'ঠিক আছে, আমি তাকে বলে দেখব। কিন্তু এ বর্ণবাদ আমারও ভাল লাগে না জিনা।'

'বর্ণবাদ কোথায় পেলি? এটা সত্য ও স্বচ্ছতার ব্যাপার। কোন বিশেষ সম্পর্ক সত্য প্রকাশে বাধা দেবে, তা হওয়া ঠিক নয়।'

'সত্য বলছিস কাকে জিনা?'

'যা মেরী রোজ নিজে লিখেছে।'

'কেউ কিছু লিখলেই তা সত্য হয়ে যায় না। মেরী রোজ এখন বলতে পারে সে এক সময় যা লিখেছিল, তা সত্য নয়।'

জিনা হাসল। বলল, 'একজন রেডইন্ডিয়ানের সাথে তার অবৈধ সম্পর্ক হবার পর তার এ বক্তব্য এখন আর গ্রহণযোগ্য নয়।'

'সম্পর্কটাকে অবৈধ বলছিস কেন?'

'আমি বলছি না সবাই বলছে। অবৈধ বলা হচ্ছে কারণ রেডইন্ডিয়ানের ঘরে শ্বেতাংগ তরুণী যাবে তা আজকের সমাজ স্বীকার করবে না।'

'কেন বিয়ে, প্রেম এসব তো পার্সোন রাইট-এর ব্যাপার।'

'কোন পার্সোনাল সিদ্ধান্ত সমাজ স্বার্থের বিরুদ্ধে গেলে সে পার্সোনাল রাইট সমাজ মানতে পারে না।'

'তোর এ কথা কিন্তু মার্কিন আইনের কথা নয়।'

'আইন বড়, কিন্তু সমাজ তার চেয়ে ছোট নয়। বিশেষ করে বর্তমান পরিস্থিতিতে।'

'বর্তমান পরিস্থিতি কি?'

‘আজ পশ্চিমী স্বার্থ, শ্বেতাংগ স্বার্থ এবং দেশের স্বার্থ এক।’

‘একেই তো বর্ণবাদ বলেছিলাম জিনা।’

‘বলতে পারিস। কিন্তু আসলে এটা জাতি প্রেম।’

হাসল শিলা সুসান। বলল, ‘তুই বর্ণবাদী সংস্থা ‘হোয়াইট ঈগল’ এর মত কথা বলছিস।’

চমকে উঠল জিনা। বলল, ‘হোয়াইট ঈগল‘কে তুই জিনিস?’

শিলা সুসান বিষয়টাকে চেপে গিয়ে বলল, ‘শুনেছি কিছু কিছু। তুই জানিস নাকি?’

‘তোর ধারণা কি এদের সম্পর্কে?’

‘যতটুকু শুনেছি তাতে ভাল ধারণা হয়নি। বর্ণবাদী সংগঠন ওটা।’

‘ভাল বলার দরকার নেই। কিন্তু এভাবে খারাপ বলিস না। ঝামেলা বাড়িয়ে কি লাভ?’

‘ঝামেলা বাড়বে কেন?’

‘পড়া শুনার বাইরে তো কোন খবর রাখিস না। ভেতরে ভেতরে সমাজটা পাল্টে যাচ্ছে। হোয়াইট ঈগল আজ এক পরিবর্তনের প্রতীক। তাকে ভাল বলতে না পারিস, খারাপ বলার প্রয়োজন নেই।’

‘খারাপ হলে খারাপ বলবো না কেন?’

‘সান ওয়াকার ও মেরী রোজ যে বিপদে পড়েছে, সে ধরনের কোন বিপদ আনিস না। কথা কম বলা ভাল।’

‘ওদের বিপদের সাথে কি হোয়াইট ঈগল জড়িত আছে?’

‘আজ আর কোন কথা নয়।’ বলে জিনা ক্রিষ্টোফার উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘তুই এদিকটা একটু দেখ।’

বেরিয়ে গেল জিনা ক্রিষ্টোফার।

জিনা জবাব না দিলেও শিলা সুসান বুঝল, সান ওয়াকার ও মেরী রোজকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট পরিস্থিতির সাথে হোয়াইট ঈগল জড়িত আছে। জিনা ক্রিষ্টোফারসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ষ্টুডেন্ট বডিটা কি হোয়াইট ঈগল এর প্রভাবাধীনে চলে গেছে?

এই অবগতির বিষয়টা শিলা সুসানকে উদ্বিগ্ন করে তুলল। সেই সাথে আনন্দিত হলো এই ভেবে যে, জিনারা যদি হোয়াইট ঈগলের সাথে জড়িত থাকে, তাহলে হোয়াইট ঈগল এর হেডকোয়ার্টারের সন্ধান তার জন্যে সহজ হবে।

কলিংবেল বেজে উঠল আবার। উঠে দরজা খুলে দিল শিলা সুসান। বাজার নিয়ে প্রবেশ করল পরিচারিকা।

শিলা সুসান মেরী রোজ-এর কলিংবেল চাপ দিতে গিয়ে লক্ষ্য করল, দরজা খোলা, ঈষৎ ফাঁক হয়ে আছে।

অবাক হলো শিলা সুসান। ধীরে ধীরে দরজা খুলল সে। প্রবেশ করল যে ঘরে সেটা সুসানের ফ্ল্যাটের মতই ড্রইং রুম।

মেরী রোজ এর এ ফ্ল্যাটটি শিলা সুসানের ফ্ল্যাট যে বিল্ডিং-এ, তার পাশের বিল্ডিং-এ। সব ফ্ল্যাট একই সাইজের, একই ডিজাইনের।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ধনীর দুলালী যে কয়জন রয়েছে, মেরী রোজ রয়েছে তাদের শীর্ষে। মেরী রোজ মার্কিন ফেডারেল কোর্টের চীফ জাষ্টিস জর্জ ওয়ারেন আলেকজান্ডারের একমাত্র মেয়ে। শিলা সুসান ও সান ওয়াকারের মতই পদার্থ বিজ্ঞানের মাষ্টার্স শেষ বর্ষের ছাত্রী মেরী রোজ।

সুসান ড্রইং রুম-এর বাইরের দরজা লক করে সামনে এগুলো।

ড্রইং ও ষ্টাডি রুমের মাঝে কাঁচের স্থানান্তর যোগ্য দেয়াল। দেয়ালটি পর্দায় ঢাকা।

দেয়ালের কিছু অংশ সরানো। পর্দাও টেনে উন্মুক্ত করা।

শিলা সুসান বুঝল, কেউ একজন বাইরে থেকে মেরী রোজ এর কাছে এসেছে।

আস্তে আস্তে এগিয়ে ভেতরে উঁকি দিল সুসান। দেখে চমকে উঠল সে।

ভেতরে মুখ নিচু করে একাই বসে আছে ঈগল সান ওয়াকার।

সান ওয়াকার এখানে?

কোনদিন তো সে মেরী রোজ-এর ফ্ল্যাটে আসেনি।

কোন মেয়ের ফ্ল্যাট কেন বন্ধু-বান্ধবদের কক্ষেও সে যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস, লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরী, তার নিজের হল কক্ষ এবং রাস্তা এই হলো তার ঠিকানা।

সান ওয়াকারের মুখ শুকনো দেখল শিলা সুসান।

শিলা সুসানের চোখে সান ওয়াকার অপরূপ চেহারার একটি ছেলে। রেডইন্ডিয়ান, তুর্কি ও চীনা এই তিন অবয়বকে একত্রিত করলে সবটার ভালো নিয়ে চতুর্থ যে চেহারা দাঁড়ায় সে হলো সান ওয়াকার। কালো চুল, নীল চোখ, সোনালী রং এবং তার সাথে শিল্পীর আঁকা নিখুঁত এক মুখাবয়ব।

চেহারার মতই উজ্জ্বল শিক্ষা জীবন তার। ইউরোপীয় বিজ্ঞান পুরস্কার, আমেরিকান কন্টিনেন্টাল বিজ্ঞান পুরস্কার এবং ষ্টুডেন্ট নোবল প্রাইজ পাওয়ার পর সে পৃথিবীর শীর্ষ উদীয়মান বিজ্ঞান প্রতিভায় পরিণত হয়েছে। অবশ্য এই কৃতিত্ব তার জন্যে কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্ণবাদীদের ক্রোধ গিয়ে তার উপর আছড়ে পড়েছে। মেরী রোজ এর নাটক এবং মেরী রোজ এর সাথে তার সম্পর্ককে কেন্দ্র করে তাদের সেই ক্রোধ বিস্ফোরনোন্মুখ অবস্থা এসে পৌঁছেছে।

এই সময়ে সান ওয়াকার মেরী রোজ এর ফ্ল্যাটে!

মেরী রোজ মাথায় চিরুণি করতে করতে তার ষ্ট্যাডি রুমে এসে প্রবেশ করল।

গোসল করে এল মেরী রোজ।

একদম ফ্রেশ।

যেন একটা ফুল এই মাত্র পাপড়ীর বাধনে পেরিয়ে নিজেকে মেলে ধরল।

পরনে তার গোলাপী স্কার্টের সাথে সাদা শার্ট।

শিলা সুসান নিজে সুন্দরী, কিন্তু মেরী রোজকে কাছে পেলেই জড়িয়ে ধরে সে বলে ছেলে হলে অবশ্যই তোর প্রেমে পড়তাম। চোখ ফেরানো যায় না এমন একটি সাদা গোলাপ মেরী রোজ।

মেরী রোজ এর একাডেমিক কৃতিত্বও তার মতই অপরূপ। এ পর্যন্ত সকল পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে এসেছে। অনার্সেও সে প্রথম হয়েছে।

মেরী রোজ ষ্ট্যাডি রুমে ঢুকতে ঢুকতে বলল, ‘স্যরি সান। তোমাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি। স্যরি।’

মেরী রোজকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়েছে সান ওয়াকার।

‘ধন্যবাদ রোজ। অসময়ে বিনা নোটিশে এসে তোমাকে বিপদে ফেলেছি। স্যরি।’ বলল সান ওয়াকার।

সান ওয়াকারের পাশে বসতে বসতে মেরী রোজ বলল, ‘কোন ‘স্যরি’ নয়। তোমাকে ওয়েলকাম সান। তুমি যে আমার ফ্ল্যাটটা চিনতে পেরেছ এ জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।’

‘ঠিক, ধন্যবাদ ঈশ্বরেরই প্রাপ্য। তিনিই তোমার বাসা চেনার পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন।’

‘কি পরিস্থিতি তিনি সৃষ্টি করেছেন?’ গম্ভীর হয়ে উঠেছে মেরী রোজের মুখ।

গম্ভীর হয়ে উঠেছে সান ওয়াকারের মুখও। সঙ্গে সঙ্গে সে উত্তর দিল না মেরী রোজ এর প্রশ্নের।

একটু সময় নিয়ে বলল, ‘সেটা রোজ আমার চেয়ে তুমিই ভাল জান।’

সান ওয়াকারের মুখে নিবদ্ধ ছিল মেরী রোজ এর চোখ।

সান ওয়াকারের কথার পর মুখ নিচু করল রোজ। মুখ নিচু রেখেই সে বলল, ‘আমার নাটক ‘The Nation’-এর মঞ্চায়ন নিয়ে যা ঘটছে, তার কথাই তুমি বলছ?’

‘হ্যাঁ।’

একটু হাসল মেরী রোজ। বলল, ‘কিন্তু এ ব্যাপারটা তোমার পর্যন্ত গেল কি করে? এটা নিয়ে কি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে?’ মেরী রোজের কণ্ঠে উদ্বেগ প্রকাশ পেল। তার চোখে-মুখে চিন্তার একটা ছায়া।

সান ওয়াকার মেরী রোজ এর মুখ থেকে তার চোখ সরিয়ে নিল। সোজা হয়ে বসল। বলল, ‘ক’দিন আগে বিশ্ববিদ্যালয় ষ্টুডেন্টস ইউনিয়নের কালচারাল সেক্রেটারী উইলিয়াম আমার কক্ষে গিয়েছিল। বলেছিল, আমার কারণেই নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিকী অনুষ্ঠানের সবচেয়ে আকর্ষণীয় নাট্যানুষ্ঠানে বাধা

পড়েছে। তোমার ‘The Nation’ নাটকে রেড ইন্ডিয়ানদের ছোট করে দেখানো হয়েছে। এই কারণেই নাটকটির মঞ্চায়ন যাতে হতে না পারে সে জন্যে আমি তোমাকে প্রভাবিত করেছি। যখন আমি বলি, বিষয়টি নিয়ে কোনদিন তোমার সাথে আমার কোন আলোচনাই হয়নি, তখন সে বলে অত কিছু বুঝি না, তোমার কারণেই আমরা একটা সংকটে পড়েছি। তারপর বলে যে, আমি যেন তোমাকে বলি নাটক মঞ্চায়নে বাধা না দেয়ার জন্যে। বলে সে চলে যায়। গতকাল আমার কক্ষে গিয়ে হাজির বিশ্ববিদ্যালয় ষ্টুডেন্টস ইউনিয়নের সভাপতি ম্যাক আর্থার। গিয়ে সোজাসুজি আমাকে বলে, সান ওয়াকার তুমি এ বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দাও। তুমি ভাল ছাত্র। দুনিয়ার যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে তুমি ভর্তি হতে পারবে।’ আমি কিছু বলতে চাইলে সে বাধা দিয়ে বলে, আমি বলতে এসেছি, শুনতে আসিনি। আমরা চাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিকী অনুষ্ঠানের আগেই বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ছ।’ বলে সে চলে যায়।’ থামল সান ওয়াকার।

সান ওয়াকারের দিকে তাকিয়ে এক মনে কথাগুলো শুনছে মেরী রোজ। তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে। চোখে-মুখে ভীষণ ক্রোধ ও অপমানিত হওয়ার চিহ্ন।

সান ওয়াকার থামার সঙ্গে সঙ্গে সে বলল, ‘ষ্টুডেন্টস ইউনিয়নের এই দু’চার নেতা কি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিক? বিশ্ববিদ্যালয়কে তুমি কিছু জানাওনি?’

‘না রোজ।’

‘কেন?’

‘ঘটনা আর আমি বাড়াতে চাই না।’

‘ওদের ভয় পেয়েছ?’

‘তুমি কি তাই মনে কর?’

‘মনে করি না বলেই প্রশ্ন করছি।’

‘ভয় নয় রোজ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সবাই একদিকে দাঁড়ালেও সবার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস আমার আছে। কারণ জীবন ছাড়া আমাদের মত রেডইন্ডিয়ানদের আর কিছু হারাবার নেই। কিন্তু আমি চাই রোজ........।’

কথা শেষ করতে পারল না সান ওয়াকার। হঠাৎ যেন কথা আটকে গেল গলায়।

রোজের ভারি দৃষ্টি আছড়ে পড়ে আছে সান ওয়াকারের মুখের উপর। সান ওয়াকার থামতেই বলল, ‘বল সান।’ ঈষৎ কাঁপছিল মেরী রোজ-এর ফুলের মত দু’টি ঠোট।

সান ওয়াকারের মুখ নিচু।

তারও মুখ লাল হয়ে উঠেছে অবরুদ্ধ এক আবেগের উত্তাপে। বলল, ‘তোমার ‘The Nation’ নাটক মঞ্চায়ন করতে না দেয়ার কারণ যদি আমি হই, তাহলে বলব তুমি তোমার আপত্তি তুলে নাও রোজ। আমি চাই তুমি সকল বিতর্কের উর্ধ্বে থাক। বিশেষ করে বর্ণবাদের জঘন্য রাজনীতি থেকে।’

ঠোঁট দু’টি থর থর করে কেঁপে উঠল মেরী রোজ-এর। তার দু’চোখ ফেঁটে দু’ফোটা অশ্রু নেমে এল। দু’হাতে মুখ ঢাকল মেরী রোজ। কান্না আটকাবার চেষ্টা করতে গিয়ে কান্নায় সে ভেঙে পড়ল।

সোফায় হাতলের উপর মুখ গুজেছে মেরী রোজ।

সান ওয়াকার মেরী রোজ এর কাধে হাত রেখে বলল, ‘রোজ একটা নাটকে রেডইন্ডিয়ানদের কয়েকটা গালি বললেই তারা ছোট হয়ে যাবে না, আবার না বললে তারা বড় হয়ে উঠবে না। সুতরাং এটাকে এত বড় করে দেখো না।’

মেরী রোজ সান ওয়াকারের হাতটি টেনে নিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে তাতে মুখ গুজে বলল, ‘না সান, এটা বড় করা কিংবা ছোট করার ব্যাপার নয়। নীতির ব্যাপার এটা। যে নাটক আমি পরিত্যাগ করেছি, তা আমি অভিনীত হতে দেব না’।

‘কিন্তু রোজ তুমি যা পরিত্যাগ করেছ, অন্যেরা তা পরিত্যাগ নাও করতে পারে। একজন লেখকের লেখা প্রকাশ হবার পর তা জনগণের প্রোপার্টি হয়ে দাঁড়ায়।’

‘হ্যাঁ, অন্যেরা তা পরিত্যাগ না করতে পারে, কিন্তু আমার নাটক যখন মঞ্চস্থ হতে যাবে, তখন আমার অনুমতি নিতে হবে।’

সান ওয়াকার তার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে মেরী রোজকে সোজা করে বসিয়ে চোখ মোছার জন্যে টিস্যু তার হাতে তুলে দিয়ে বলল, ‘তোমার কথা ঠিক রোজ। কিন্তু তারা একটা আয়োজন করে ফেলেছে।’

‘এক. তারা আমার অনুমতি নেয়নি। দুই. এ আয়োজনটা তারা করেছে তোমার আমার বিরুদ্ধে নয়, একটা কম্যুনিটির বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবেই। আমি তাদের এ বদনিয়তকে স্বীকৃতি দেব না।’

একটু থামল মেরী রোজ। থেমেই আবার শুরু করল, ‘তার উপর তোমাকে যে হুমকি দিয়েছে, তারপর এটা আর মেনে নেয়া যায় না। মেনে নেয়ার অর্থ হবে সন্ত্রাসের কাছে নতী স্বীকার করা। আমি এটা পারবো না।’

‘তুমি যে নীতির কথা বলছ তা ঠিক আছে। কিন্তু তারা তা স্বীকার করছে না। তারা বলছে অন্য কথা।’

‘তারা তো বলছে যে, তোমার সাথে আমার সম্পর্কের কারণেই এই নাটক মঞ্চায়নে বাধা দিচ্ছি। তাদের এ কথাও কি ঠিক। কাউকে ভালোবাসা আমার পার্সোনাল রাইট এবং তার বিরুদ্ধে আমাকে ব্যবহার করতে না দেয়াও আমার ব্যক্তিগত অধিকার।’

‘রোজ, আমাদের সম্পর্ক কি এ ধরনের শত নাটকের শত কথার উর্ধ্বে নয়? একটা মূল্যহীন, তুচ্ছ বিষয় নিয়ে কেন তুমি বিরাট বিতর্ক ও বৈরিতার মধ্যে জড়িয়ে পড়বে?’

‘আমার বোধ হয় এটা প্রাপ্য সান। ভাল ছাত্রী হবার, অপ্রতিদ্বন্দ্বী হবার অহমিকা নিয়ে আমি তোমার উপর অনেক অবিচার করেছি, সবার সামনে বারবার তোমাকে আমি অপমান করেছি। সবার শেষে তোমাকে নিয়ে নাটকও লিখেছি। এখন আমি তোমাকে ভালবেসে যদি অপমানিত হই, লাঞ্চিত হই, এটা হবে আমার যোগ্য প্রাপ্য। আমি এটা মাথা পেতে গ্রহণ করবো।’ মেরী রোজ কান্না জড়িত ভারি কণ্ঠে কথাগুলো বলল।

কথা শেষ করে দু’চোখে রুমাল চেপে মুখ নিচু করল রোজ।

সান ওয়াকার মেরী রোজ এর দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে তার কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, ‘তুমি অযথা নিজেকে কষ্ট দিচ্ছ রোজ। তোমার কোন আঘাতই আমার কাছে আঘাত ছিল না, তোমার কোন অপমানই আমার কাছে অপমান মনে হয়নি। আমি জানতাম, মেঘের আড়ালে সূর্য আছে।’ সান ওয়াকারের ঠোঁটে হাসি।

মেরী রোজ তার কাঁধে রাখা সান ওয়াকারের হাত জড়িয়ে ধরে তাতে মুখ গুজে বলল, ‘কেন তাহলে তখন তুমি আমার ভুল ভেঙে দাওনি, কেন তুমি আমার পাগলামীকে সহ্য করে গেছ অমন করে? কেন? কেন?’

মেরী রোজ এর অশ্রুতে সান ওয়াকারের হাত ভিজে গেল।

সান ওয়াকার নিজের হাত টেনে নিয়ে মেরী রোজের চোখ মুছে দিয়ে বলল, ‘ফুলের গন্ধের জন্যে তাকে প্রস্ফুটিত হবার সুযোগ দেয়া দরকার।’

মেরী রোজ এর রাঙা হয়ে ওঠা মুখে হাসি ফুটে উঠল। সোফার হাতলে রাখা সান ওয়াকারের হাতে একটা কিল দিয়ে বলল, ‘ঠিক আছে, ফুল ফোটাবার জন্যে যেমন তোমাকে মূল্য দিতে হয়েছে, তেমনি আমাকেও প্রায়শ্চিত্য করতে দাও।’

‘তাহলে এটা তোমার শেষ কথা?’

‘অবশ্যই। আমি ঐ সন্ত্রাসীদের কোন কথাই শুনব না। দেখি কি শক্তি আছে তাদের তোমাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের করে দেবার।’

‘আমি ওদের ভয় করি না। কিন্তু আমি কোন গন্ডগোল চাই না।’

‘আমরা তো গন্ডগোল করছি না, তাদের অন্যায় ও বেআইনী দাবী গন্ডগোলের সৃষ্টি করছে।’

‘তাহলে আমি উঠি রোজ।’

‘না বস। তোমার প্রথম আগমন। মিষ্টি মুখ না করে তোমাকে ছাড়তে পারি না।’

কাঁচের দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে তাদের সব কথাই শিলা সুসান শুনল। তাদের কথা যেখানে এসে শেষ হলো, তাতে কেঁপে উঠল সুসান। তাহলে সান ওয়াকার ও মেরী রোজ সংঘাতে যাচ্ছে ষ্টুডেন্টস ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ তথা হোয়াইট ঈগল এর সাথে। তারা কি জানে হোয়াইট ঈগল কি? কি পরিণতি হতে পারে এর?

ভাবল শিলা সুসান, ওদের এই বিপজ্জনক পথ থেকে ফেরানো দরকার। এই ভাবনার পাশেই হৃদয়ের কোন অন্তরলোক থেকে অভিমান ক্ষুব্ধ একটা কণ্ঠ

ভেসে এল, বঞ্চিত ও পরাজিত হৃদয় নিয়ে কেমন করে তুমি ওদের সামনে যাবে? কেন যাবে? কে তোমার ওরা?

মনটা মুষড়ে পড়ল শিলা সুসানের। কিন্তু আবার ভাবল সে, তার এই অভিমান, তার এই ক্ষোভ কার বিরুদ্ধে? কি দোষ সান ওয়াকারের কি দোষ মেরী রোজ এর? সান ওয়াকারের কাছে সুসান কোনদিনই নিজেকে প্রকাশ করেনি। মেরী রোজ সুসানের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু, কিন্তু তার কাছেও সান ওয়াকার সম্পর্কে তার মনের কথা খুলে বলেনি সুসান। আর সবচেয়ে বড় কথা, আজ সুসান নিজ চোখে সান ও রোজ এর মধ্যকার যে গভীর প্রেম প্রত্যক্ষ করল, তা প্রশংসনীয়। সত্যিই সান ওয়াকারকে রোজ যেভাবে চেয়েছে, সুসান সেভাবে চাইতে পারেনি। সুতরাং সান ও রোজকে সে দোষী করতে পারে কেমন করে?

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল শিলা সুসান। সান ও রোজকে হোয়াইট ঈগলের সাথে সংঘাতে কিছুতেই যেতে দেয়া যাবে না। তাদেরকে ফেরাতে হবে এ পথ থেকে।

তবে আজ এই মুহূর্তে ওদের সাথে দেখা করা এবং এসব বিষয়ে কিছু বলা ঠিক হবে না। ওদের একান্ত অন্তরঙ্গ এই বৈঠকে তার অনুপ্রবেশ বেমানান। সুযোগ করে সান ও রোজকে একত্রিত করে সুসান তাদেরকে এ কথাগুলো বলবে।

সুসান মেরী রোজ এর ড্রইং রুমের দরজা আনলক করে অতিসন্তর্পনে বেরিয়ে এল বাইরে।

# ৭

সেদিন সকাল আটটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে ঢুকছিল শিলা সুসান। পেছন থেকে জিনা ক্রিষ্টোফারের ডাক শুনে ঘুরে দাঁড়াল সে।

অপেক্ষা করল জিনা ক্রিষ্টোফারের জন্যে।

জিনা ক্রিষ্টোফার কাছাকাছি হয়েই দ্রুত কণ্ঠে বলে উঠল, 'শুনেছিস?'

'কি?'

'সান ওয়াকারকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'কি বলছিস তুই? খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না?'

'হ্যাঁ, গতকাল দুপুর থেকে তার কোন সন্ধান নেই। দুপুরে খেতে সে হলে যায় নি। রাতেও হলে ফেরেনি।'

মনটা ধক করে উঠল শিলা সুসানের। হার্টবিট বেড়ে গেল তার উদ্বেগে। তবু সে বলার চেষ্টা করল, তাঁকে খুঁজে না পাওয়ার প্রশ্ন উঠছে কেন? হঠাৎ কোথাও তো সে যেতেও পারে?'

'সে রকম মনে হচ্ছে না। লাইব্রেরীতে যেখানে বসে সে গতকাল দুপুরের আগে পড়ছিল, সেখানে তার নোট ফাইল খোলা অবস্থায় পাওয়া গেছে। তার কলমও খোলা সেখানে ছিল। তার হ্যান্ড ব্যাগটাও ছিল টেবিলে। টয়লেটে কিংবা কারো সাথে কথা বলতে পাশে কোথাও গেলে যেমন থাকে, সে অবস্থায় তার সবকিছু পাওয়া গেছে। এই অবস্থায় তাকে খুঁজে না পাওয়া অস্বাভাবিক।'

উদ্বেগের ছায়া নামল এবার শিলা সুসানের চোখে-মুখে। বলল, 'মেরী রোজ কিছু জানে?'

'মেরী রোজও নাকি কিছু বলতে পারছে না। সে খুব ভেঙে পড়েছে। খুব কাঁদছে। খুব খারাপ লাগছে বলে আমি দেখা করতে যাইনি। লাইব্রেরীতে একটা কাজ সেরে আমি যাব মনে করছি।'

শিলা সুসান তৎক্ষণাৎ নিজের হাতের ফাইলটা জিনাকে দিয়ে বলল, ‘তুই এটা রাখ। আমি মেরী রোজ এর ওখান থেকে একটু ঘুরে আসি।’

বলে জিনার হাতে ফাইলটা গুজে দিয়েই ছুটল সুসান প্রায় পাগলের মত।

শিলা সুসান ফ্ল্যাটেই পেল মেরী রোজকে। সেই তাকে দরজা খুলে দিয়েছিল।

শুকনো, বিধ্বস্ত চেহারা মেরী রোজের।

ঘরে প্রবেশ করেই শিলা সুসান জড়িয়ে ধরল মেরী রোজকে। বলল, ‘এই মাত্র আমি জিনা ক্রিষ্টোফারের কাছে শুনলাম ঘটনাটা। শুনেই ছুটে এসেছি তোর কাছে।’

কেঁদে উঠল মেরী রোজ। বলল, ‘আমি আজ সকালে জানতে পেরেছি। নিশ্চয় বড় কিছু ঘটেছে সুসান। নোট, ব্যাগ, কলম ইত্যাদি ফেলে লাইব্রেরীর বাইরে কোথাও সে যেতে পারে না।’

‘আমিও তাই মনে করি।’

বলে সুসান মেরী রোজকে টেনে এনে বসাল সোফায়। বলল সুসান, ‘পুলিশকে জানানো হয়েছে?’

‘হল কর্তৃপক্ষ পুলিশকে জানিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টও টেলিফোন করেছেন পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে।

শিলা সুসান মেরী রোজ এর একটি হাত নিজের দু’হাতের মুঠোয় নিয়ে বলল, ‘তোর কথা ঠিক রোজ, একটা খুব বড় ঘটনা ঘটেছে।’

চোখ মুছে রোজ বলল, ‘কি ঘটনা সেটা তুই জানিস? ষ্টুডেন্ট ইউনিয়নের নেতারাই কি এটা ঘটিয়েছে?’

‘আমার মনে হয় তারা আছে এবং তার সাথে আরও বড় কোন চক্রান্ত রয়েছে।’

‘কে তারা? সান ওয়াকার লেখাপড়া ছাড়া সক্রিয় কোন রাজনীতিতে ছিল না।’

‘সক্রিয় রাজনীতিতে না থাকলেও রেডইন্ডিয়ানদের জাতীয় রাজনীতি থেকে সে বিচ্ছিন্ন অবশ্যই নয়। এর সাথে রয়েছে তোর সাথে সম্পর্কের ব্যাপার।

আমার মনে হয় তার সবচেয়ে বড় অপরাধ একজন রেডইন্ডিয়ান হয়েও দেশের শীর্ষ বিজ্ঞান প্রতিভা হতে যাচ্ছে।'

'ঠিক বলেছিস। সব মিলিয়েই তার উপর বিপদ এসেছে। এখন কি হবে?' বলে দুহাত দিয়ে কান্না রোধের জন্যে মুখ ঢাকল সে।

শিলা সুসান তাকে কাছে টেনে নিয়ে সান্ত¦না দিয়ে বলল, 'আমি তোর পাশে আছি রোজ। আমি কিছুই না, কিন্তু এই চক্রকে আমি চিনি। সব কথা আজ তোকে আমি বলব না। তবে এটুকু জেনে রাখ, ঈশ্বর সহায় হলে সান ওয়াকারের কিছু হবে না। কিন্তু এই ঘটনা আমেরিকায় বড় ঘটনার জন্ম দেবে।'

'ধন্যবাদ সুসান। তুই যদি চক্রটিকে চিনিস। তাহলে আমরা প্রাইভেট ডিটেকটিভ লাগিয়ে কাজ করতে পারি।'

'এদিকটাও আমি চিন্তা করছি। তবে ভাবছি, প্রাইভেট ডিটেকটিভরা ওদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস পাবে কিনা? তবে কথা দিচ্ছি কিছু করার একটা সুযোগ আছে। আমি দেখব।'

'ধন্যবাদ সুসান। তোর সাথে কথা বলে আমার শক্তি ফিরে আসছে। সানকে উদ্ধারের জন্যে যা করা দরকার তাই করব।'

থামল রোজ। থেমেই আবার বলল, 'আমেরিকায় বড় ঘটনা ঘটার কথা বললি, সেটা কি?'

'আমেরিকায় ইন্ডিয়ানদের মুভমেন্ট এখন খুবই সংহত। তার সাথে যুক্ত হয়েছে আমেরিকার মুসলিম ও ব্ল্যাকদের শক্তি। হোয়াইট ঈগল-এর বর্ণবাদী আচরণের কারণে এই শক্তি আরও সংহত ও শক্তিশালী হবে। সানকে কিডন্যাপ করার ঘটনা এই সংঘাতকে একটা সিদ্ধান্তকারী দিকে নিয়ে যেতে পারে।'

'হোয়াইট ঈগল' এর নাম শুনেছি। ওরা তো অত্যন্ত শক্তিশালী ও বিপজ্জনক সংস্থা। ওরা কি এসবের সাথে যুক্ত আছে?'

একটু ভাবল সুসান। তারপর বলল, 'দ্বিতীয় কাউকে বলবি না এই শর্তে বলছি, আমার বিশ্বাস ওরাই কিডন্যাপ করেছে সানকে।'

'কি বলছিস তুই?' আর্তনাদ করে উঠল মেরী রোজ এর কণ্ঠ। উদ্বেগ-আতংকে টকটকে লাল হয়ে উঠেছে মেরী রোজ এর চোখ-মুখ।

শিলা সুসান মেরী রোজের পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, 'ভয় করিস না রোজ। ঈশ্বর বড় এবং ঈশ্বরের সাহায্যও বড়।' বলে উঠে দাঁড়াল সুসান।

'এখনি যাবি?' বলল রোজ হতাশ কণ্ঠে।

শিলা সুসান বলল, 'আমাকে অনেক খোঁজ-খবর নিতে হবে রোজ, আমি যাই। ভাবিস না, এটাই আমার এখন প্রধান কাজ।'

বলে সুসান বেরিয়ে এল রোজ এর ঘর থেকে।

ছুটল আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর দিকে। অনেক কথা বলতে হবে তাকে জিনা ক্রিষ্টোফারের সাথে। তার মাধ্যমে পৌছতে হবে হোয়াইট ঈগল'দের কাছে, জানতে হবে হোয়াইট ঈগল এর প্রধান আস্তানার খবর।

যখন জ্ঞান ফিরল আহমদ দেখল সে নরম একটি সুন্দর বিছানায় শুয়ে।

চোখ মেলে দেখল সে তার চারদিক।

ঠিক জেলখানার সেল জাতীয় নয়, তার চেয়ে বেশ বড় ঘর। এখানে আসার আগে আরও দু'জায়গায় সে থেকেছে। সে সব থেকে এ ঘরটা বেশ আলাদা।

বাহামার এক হাসপাতালে প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় বন্দী হবার পর এ পর্যন্ত তার তিনবার সংজ্ঞা ফিরেছে। দু'বার ভিন্ন দু'টি সেলে তার সংজ্ঞা ফিরেছে। সে দু'টি সেলই এর চেয়ে অনেক ছোট। তখন হাত পা বাঁধা অবস্থায় মেঝের কার্পেটের উপর তাকে পড়ে থাকতে হয়েছে।

ঐ দু'জায়গাতেই যখনই তার সংজ্ঞা ফিরেছে, তখনি তাকে আবার ইনজেকশন দিয়ে সংজ্ঞাহীন করে ফেলা হয়েছে।

আজ নরম বিছানা এবং গায়ে কম্বল দেখে অবাক হলো আহমদ মুসা। প্রথম অনুভুতির সময়ই তার মন খুশী হয়েছিল, সেকি কোন নিরাপদ আশ্রয়ে? মুক্ত করেছে কি কেউ তাকে কোন প্রকারে?

কিন্তু চারদিকে চাওয়ার পর তার ভুল ভেঙে যায়। বিছানা সুন্দর বটে, কিন্তু ঘরটা নিরেট বন্দীখানা। একটা মাত্র দরজা। জানালা একটিও নেই। অনেক উঁচুতে ছাদ। ঘরটি এয়ারকন্ডিশনড। কিন্তু এয়ারকন্ডিশনের যন্ত্রের কোথাও দেখতে পেল না। ভাবল আহমদ মুসা, গোটা বিল্ডিংটা হয়তো সেন্ট্রালী এয়ারকন্ডিশনড।

ঘরে তার শোবার ষ্টিলের খাট ছাড়া দ্বিতীয় কোন আসবাবপত্র নেই।

ঘরের সাথে এ্যাটাচট একটা টয়লেট আছে। টয়লেটে দরজা নেই। শুয়ে থেকেই আহমদ মুসা দেখতে পাচ্ছে টয়লেটে একটা বেসিন, একটা পানির টেপ এবং প্লাষ্টিকের একটা মগ ছাড়া আর কিছু নেই।

আহমদ মুসা ভাবল, নিশ্চয় এ ঘরের সাথে অডিও ও ভিডিও সংযুক্ত আছে। তার অর্থ আহমদ মুসার প্রতিটি মুভমেন্ট এবং কথাবার্তা মনিটর করা হচ্ছে। এই যে সে সংজ্ঞা ফিরে পেয়েছে, এটাও এতক্ষণে তাদের জানা হয়ে গেছে।

আবার কি তাকে ইনজেকশন দিয়ে সংজ্ঞাহীন করে রাখা হবে? তবে যাই হোক, বর্তমান শত্রু ভদ্রবেশী ভয়ানক কেউ হবে। ভদ্র আয়োজন দেখে তা বুঝা যাচ্ছে।

আহমদ মুসা বুঝতে পারল না কোথায় সে এখন। দু'বার স্থান পরিবর্তন করে সে তৃতীয় স্থানে এসেছে। এ জায়গাটা কোথায়?

বাইরে পায়ের শব্দে তার চিন্তায় ছেদ পড়ল। পায়ের শব্দ দরজার বাইরে এসে স্থির হলো। দরজা খুলবে কি?

কারা ওরা?

আহমদ মুসা উঠে বসল।

সাইমুম সিরিজের পরবর্তী বই

# মিসিসিপির তীরে

## কৃতজ্ঞতায়ঃ Mahfuzur Rahman

## সাইমুম-২৭

# মিসিসিপির তীরে

আবুল আসাদ

# ১

‘বল তোকে ওয়াশিংটন ছাড়তে বলা হয়েছে, আমেরিকার ছাড়তে বলা হয়েছিল, ছাড়িসনি কেন?’ কথাগুলো বলতে বলতে দৈর্ঘ্য-প্রস্থে দৈত্যাকার একজন লোক ঘুষি ছুড়ে মারল সান ওয়াকারের মুখে

মেঝের উপর ছিটকে পড়ে গেল সান ওয়াকারের দেহ। ঠোঁটে ফেটে ঝর ঝর করে রক্ত বেরুল।

কপালটাও তার থেঁতলে যাওয়া। মনে হয়। ভোতা জিনিস দিয়ে তার মাথায় আঘাত করা হয়েছিল। মেঝের উপর দের ফুট লম্বা একটা ব্যাট পড়ে আছে। ওটারও আঘাত হতে পারে।

লোকটা আঘাত করে গিয়ে চেয়ারে বসল। দৈত্যাকার বপু এ লোকটার নাম গ্রিংগো। সে হোয়াইট ঈগলের ওয়াশিংটন হেড অফিসে টর্চার ইউনিটের সবচেয়ে কার্যকর হাত।

তার দু’পাশে দাঁড়িয়ে আছে খুনি আকৃতির ষন্ডা মার্কা আরো দু’জন লোক।

ঘুষি খেয়ে পড়ে যাবার পর ধীরে ধীরে উঠে বসল সান ওয়াকার। বলল, ‘কিন্তু আমি ওয়াশিংটন ছাড়ব কেন, আমিরিকা ছাড়ব কেন? আমার দোষ কি?

‘দোষ কি আবার জিজ্ঞেস কা হচ্ছে! ন্যাকা, যেন কিছুই বোঝে না’।

বলে গ্রিংগো একটু থামল। শুরু করল আবার, ‘তুই মেরী রোজকে বিপদগামী করেছিস। তোর কারণেই মেরী রোজ আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।’

‘মিথ্যে কথা। স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেবার বয়স রোজ-এর হয়েছে। এবং সে বুদ্ধি তার আছে।’ কপাল থেকে চোখের উপর দিয়ে গড়িয়ে আসা রক্ত মুছতে মুছতে সান ওয়াকার বলল।

‘এসব কেতাবী কথা রাখ। সব আমরা বুঝি। ‘বলতে বলতে উঠে দাঁড়িয়ে সান ওয়াকারের পাঁজরে একটা সজোরে লাথি কষে আবার গ্রিংগো মুখ বাকিয়ে বলল, ‘আহা! প্রেম করেছে। ব্লাডি ব্লাক হয়ে শ্বেতাংগিনী রোজ-এর দিকে হাত বাড়াবার মাজা এবার পাইয়ে দেব।’

সান ওয়াকার কিছুই বললনা। সে জানে এসব প্রলাপ, হিংসার অস্ত্র। জবাব দেবার কিছু নেই।

কিন্তু সান ওয়াকারেরর নীরবতা গ্রিংগোকে ক্ষেপিয়ে তুলল। বলল সে গর্জে ওঠে, ‘বল হারামজাদা ওয়াশিংটন এবং আমেরিকা ছাড়ছিস কিনা!’

আমি এমন কিছু করিনি যে আমাকে নিজের বিশ্ববিদ্যালয় ও নিজের দেশ ছাড়তে হবে।’ বলল সান ওয়াকার শান্ত ও দৃঢ় কণ্ঠে।

জ্বলে উঠল যেন গ্রিংগোর মুখ। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল চেয়ার থেকে। বলল চিাকার করে, 'দেশ ফলানো হচ্ছে! কোথায় তোর দেশ? আমেরিকা? এখানো তেআ পরাজিত হয়েছিস। উাখাত হয়েছিস এখান থেকে। তোদের সবাইকে পালাতে হবে যদি বাঁচতে চাস।'

‘আমেরিকা ও আমেরিকান জনগণের কথা নয়। আর পালাব কেন? সবার মত আমরাও আমেরিকান।’

‘গোল্লায় যাক তোর আমেরিকান আইন আর জনগণ। আমরা শ্বেতাংগরা নতুন আইন করেছি আমেরিকায়। তোরা এশিয়া থেকে এসেছিস, এশিয়ায় ফিরে যেতে হবে।’

‘কিন্তু আপনারা এসেছেন ইউরোপ থেকে আমাদের পরে।’

‘কিন্তু আমরা জিতেছি। আমেরিকা এখন আমাদের।’

‘আমেরিকান জনগণ এটা মানবে না।’

‘গোল্লায় যাক জনগন। তোর জনগণ মানে তো হোয়াইট, নন হোয়াইট সব। আমরা এ জনগণ তত্ত্ব মানি না। আমরা জনগণের বাপ। আমরা যা বলব তাই হবে।’

বলে একটা ঢোক গিলেই আবার বলল, ‘বল, দেশ ছাড়ছিস কিনা?’

‘না’ আমি দেশ ছাড়ছি না। তাছাড়া আমি ছাত্র, আমি লেখাপড়া করছি এখানে।’ শক্ত কণ্ঠে বলার চেষ্টা করল সান ওয়াকার।

‘কি এত বড় স্পর্ধা! শিক্ষা তাহলে তোর এখনও হয়নি।’ বলে গ্রিংগো সান ওয়াকারের কাছে ছুটে গিয়ে পাঁজরে একটা লাথি চালিয়ে পা দিয়ে মেঝেয় ঢলে পড়া সান ওয়াকারের গলা চেপে ধরে বলল, ‘তুই স্টুডেন্ট নোবেল প্রাইজ’ পেয়েছিস। তোকে আর বাড়তে দেয়া যায় না। তোকে মরতে হবে। তোকে বাইরে পাঠানোর প্রস্তাব ছিল আমাদের একটা উদারতা।’

সান ওয়াকারের শ্বাস রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হলো। তখন চিৎকার করে বলছিল গ্রিংগো, ‘বল হারামজাদা, স্বেচ্ছায় দেশ ছাড়বি কিনা?’

ঠিক এই সময় ঘরে প্রবেশ করল হোয়াইট ঈগল-এর প্রধান গোল্ড ওয়াটার-এর ডিপুটি জর্জ আব্রাহাম।

ঢুকে গ্রিংগোর দিকে তাকিয়ে বলল, ‘গ্রিংগো মেরে ফেলো না। মুল্যবান লোক ও। অনেক জানার আছে তার কাছ তেকে। ছেড়ে দাও ওকে।’

গ্রিংগো সরে দাঁড়াল।

জর্জ আব্রাহাম সান ওয়াকারের হাত ধরে টেনে তুলে বসাল। বলল, ঈগল সান ওয়াকার আমরা দুঃখিত এজন্য যে, তোমার উপর এসব অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে।’

বলে জর্জ আব্রাহাম দাঁড়িয়ে থাকা একজনকে আরেকটা চেয়ার আনতে বলল।

চেয়ার এল।

জর্জ আব্রাহাম সান ওয়াকারকে বলর, ‘চেয়ারে উঠে বস।’

সান ওয়াকার ম্লান হাসল। বলল, 'প্রশস্থ মেঝেতেই ভাল আছি স্যার। বলুন, আপনার প্রশ্নের জবাব দেব।'

'ধন্যবাদ সান ওয়াকার, জবাব পেলে খুশী হবো। তুমি ভাল ছাত্র।তোমার বিরাট ভবিষ্যত আছে। তুমি যদি আমাদের সহযোগিতা বরো, তাহলে তোমার ব্যাপারটা আমরা নতুন করে ভেবে দেখবো।' নরম কন্ঠে বলল জর্জ আব্রাহাম।

সান ওয়াকার জবাবে কিছু বলল না। শুধু তার ঠোঁটের কোণে একটা তীক্ত হাসি ক্ষনীকের জন্য ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল।

জর্জ আব্রাহামের হাতে একটা ফাইল। ফাইলের ভেতরটায় একটু চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, তোমার বিষয়ে আমরা এ ফাইলটা চুরি করেছি কিংবা বলতে পার, ম্যানেজ করে এনেছি এফবিআই-এর পলিটিক্যাল সেকশন থেকে এখানে তোমার সম্পর্কে এমন অনেক কতা আছে যা আমরা স্বপ্নেও কল্পনা করিনি। রেড ইন্ডিয়ানরা নতুন করে সংগঠিত হওয়া এবং তাদের সাথে মুসলমান ও আফ্রিকান আমেরিকান সখ্যতা, ইত্যাদি বিষয়ে তোমার গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকার কথা এখানে আছে। এসব বিষয়ে তোমার কাছে কিছু জানতে চাই।'

বলে একটু থামল জর্জ আব্রাহাম।

একটু ভাবল। যেন চিন্তাটা গুছিয়ে নিল সে। তারপর বলল, 'আমেরিকায় ইন্ডিয়ান মুভমেন্ট (AIM) কে জান?'

'অবশ্যই।'

'ধন্যবাদ। মুভমেন্টের সাথে তুমি শরিক আছ?'

'সকল ইন্ডিয়ানই আছে। আমিও আছে।'

'তোমার কি দায়িত্ব সেখানে?,

'কর্মি মাত্র।'

'গত মাসের কাহেকিয়া সম্মেলনে (AIM) এর দাবীনামা কে ড্রাফট করেছে?'

'আমি।'

'একজন কর্মি কি এই দায়িত্ব পায়?

‘হয়ত পায় না, কিন্তু আমাকে তারা এ দায়িত্ব দিয়েছিল।’

‘দাবীগুলোর মূল উদ্দেশ্য কি?’

‘রেড ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া অধিকার ফিরে পাওয়া।’

‘মিথ্যে কথা।’

‘তাহলে সত্যিটা কি?’

‘আমেরিকান নেশনকে দু’ভাগ করে সংঘাত বাধানো।’

‘এটা একেবারেই বানানো কথা।’

‘কাহোকিয়ায় রেড ইন্ডিয়ানদের ১ লাক প্রতিনিধিদের যে সম্মেলন হলো, তাতে কত খরচ হয়েছে জান?’

‘জানি না।’

‘৫ কোটি ডলার। এবং সব টাকাই দিয়েছে আন্তর্জাতিক একটি মুসলিম সংস্থা।’

চমকে উঠল সান ওয়াকার। এ ধরনের কোন তথ্য তারা জানা নেই এবং সত্যও নয়। সান ওয়াকার জানে, সম্মেলনের খরচ সংকুলান হয়েছে ডেলিগেট ফি এবং চাঁদা আদায় থেকে। সকলের জানা বিষয়টি এরাও জানে অবশ্যই। কিন্তু এক অবিশ্বাস্য অভিযোগ তুলছে কেন? সন্দেহ নেই, রেড ইন্ডিয়ানদের বদনাম ও তাদের উপর কোন পদেক্ষেপকে জাস্টিফাই করার জন্যেই এই অভিযোগ। সান ওয়াকার দৃঢ় কন্ঠে বলল, ‘আপনি শেষ যে তথ্যটি দিলেন তা সত্য নয়।এবং এটা রেড ইন্ডিয়ানদের জন্য খুবই অপমানজনক। আর কোন মুসলিম সংস্থা এমন অর্থ দেবেই না কেন?’

‘দেবে কেন? মুসলমানদের সাথে রেড ইন্ডিয়ানদের যে দহরম-মহরম তার মূল্যের ক্ষেত্রে ৫ কোটি টাকা কিছুই নয়।’

‘মুসলমানদের সাথে দহরম-মহরম? কোথায়?

‘মুসলমানদের সাথে তোমাদের বিয়ে-শাদী ও সামাজিক সম্পর্ক দারূণভাবে বেড়েছে। কাহোকিয়া সম্মেলনে ১ লাখ প্রতিনিধির মধ্যে প্রচুর মুসলিম ছিল।’

‘তারা মুসলিম হিসেবে আসেনি, এসেছিল রেড ইন্ডিয়ান হিসেবে। যেমন এসেছিল প্রচুর খৃষ্টান রেড ইন্ডিয়ান। আর বিয়ে-শাদীর ব্যাপারটা সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তিতে হয়, বিশেষ কোন ধর্ম বিচার করে হয় না।’

আমি এই সামাজিক সম্পর্কের কথাই বলছি। মুসলমানদের সাথে সামাজিক ঘনিষ্ঠতা রেড ইন্ডিয়ানদের মধ্যে সাংঘাতিক ভাবে বেড়েছে।’

‘বেড়েছে একথা ঠিক নয়। ঐতিহাসিক কারণে ইউরোপীয়রা এদেশে আসার অনেক আগে থেকে মুসলমানদের সাথে সামাজিক সম্পর্ক ছিল, সেই সম্পর্ক এখনও আছে। বিয়ে-শাদীর ব্যাপারটা আগে হয়তো প্রচার হতো না। এখন হচ্ছে।’

‘কাহোকিয়া সম্মেলনে ইসলামী ইসলামী সম্মেলন সংস্থার প্রতিনিধি এসেছিল কেন?’

‘যে নীতির ভিত্তিতে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ভ্যাটিক্যান, ইত্যাদি বিশ্ব সংগঠনের প্রতিনিধিদের ডাকা হয়েছিল, সে নীতির ভিত্তিতেই দাওয়াত দেয়া হয় ওআইসি’কে।

‘আসলে কাহোকিয়া সম্মেলন ছিল আমেরিকান নেশনকে ভাগ করার এক বিশ্বমহড়া।’

‘না এটা ঠিক নয়। মার্কিন সংবিধান তার মার্কিন নাগরিকদের যে অধিকার দিয়েছে তার এক ইঞ্চি বাইরে রেড ইন্ডিয়ানরা যায়নি।’

রাগে মুখ লাল হয়ে উঠেছে জর্জ আব্রাহামের। লাল ক্রুদ্ধ স্বরে, ‘এই রেড ইন্ডিয়ানের বাচ্চা, সব কথা সব আইন সংবিধানে লেখা থাকে না। বাস্তবতা কি? পরাজিত ও বিজয়ী কি এক আসন পাবে? একই অধিকার পাবে?’ থামল জর্জ আব্রাহাম।

কোন উত্তর দিল না সান ওয়াকার।

জর্জ আব্রাহামই আবার কথা বলল। বলল সে, ‘বুঝা গেছে আমার কথা? তোদের কাহোকিয়া সম্মেলন, দাবি-দাওয়া সবই অনধিকার চর্চা। মার্কিন সরকার সংবিধান দেখে তোদের চোখ দিয়ে। তোদের মত ওরাও শ্বেতাঙ্গ জাতির শত্রু।

তোদের ধ্বংস করার পর ওদেরকেও আমরা শেষ করব। শত্রুরা কেউ বাঁচবে না আমাদের হাত থেকে।' বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল জর্জ আব্রাহাম।

জর্জ আব্রাহাম থামলেও সান ওয়াকার চুপ করে থাকল। কি উত্তর দেবে এসব কথার? কোন যুক্তি দিয়ে হিংসার আগুন নেভানো যাবে না। জর্জ আব্রাহামের কথার মধ্য দিয়ে যে বর্ণবাদী দৈত্যের চেহারা নগ্ন হয়ে উঠল, তা দেখে সান ওয়াকার সত্যিই আrকে উঠেছে।

উত্তেজিত জর্জ আব্রাহাম চেয়ার থেকে উঠে পায়চারি করছিল। দু'টি হাত তার পেছনে মুষ্টিবদ্ধ।

এক সময় সান ওয়াকারের মুখোমুখি দাঁড়াল। বলল শক্ত কন্ঠে, 'তুমি মৃত্যু থেকে বাঁচতে পার তিনটি শর্তে। এক, কাহোকিয়া সম্মেলনে গোপন ভোটে তিনশ' সদস্যের যে 'রিজিওনাল কাউন্সিল' গঠিত হয়েছে তার তালিকা আমরা চাই। দুই, মেরী রোজ-এর সাথে কোন সম্পর্ক রাখবেনা তার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। এবং তিন, তোমাকে আমেরিকা ত্যাগ করতে হবে। এশিয়ায় যাওয়া এবং সেখানে থাকার ব্যবস্থা আমরা করে দেব। এখন তুমি বল, মৃত্যু এবং শর্তগুলোর কোনটা পছন্দনীয়।'

শর্তগুলো শুনে বিস্মিত হলো সান ওয়াকার। বিস্মিত হলো এই কারনে যে, তার মত একজন ছাত্রকে এত ভয় করে ওরা? আরও বিস্মিত হলো তাদের অসহনশীলতার ভয়াবহ রুপ দেখে। গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের শ্রেষ্ঠতম নিশান বরদার দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমাজ জীবনের অভ্যন্তরে এই ধরনের সংঘবদ্ধ দুর্বৃত্তরাও বাস করছে? জর্জ আব্রাহামের জবাবে বলল সান ওয়াকার, 'মৃত্যু জীবনে একবার আসবেই। মৃত্যু আমার কাছে ভয়ের বস্তু নয়। তবে মৃত্যুকে ভয় করলেও আপনাদের তিন শর্তে রাজী হতাম না।'

আগুন ঝরে পড়ল জর্জ আব্রাহামের চোখ থেকে। বলল, 'তোরা সব শ্বেতাংগ বিরোধী আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের এজেন্ট।' বলে সে পাশে দাঁড়ানো গুন্ডামার্কা দু'জন লোকের একজনের দিকে চেয়ে বলল, 'এর মুখটা একটু ঠিক করে দাও যাতে এই ধরনের বেয়াদবী আর না করে।'

জর্জ আব্রাহামের কথা শেষ হবার আগেই লোকটির ঘুষি গিয়ে পড়ল সান ওয়াকারের মুখে।

সান ওয়াকার ‘তেল ঢালা স্নিগ্ধ তনু তন্দ্রা রসে ভরা’ ধরনের ছেলে নয়। কিন্তু আঘাতটা এতটাই আকস্মিক হয়েছে যে, সতর্ক হবার বিন্দুমাত্র সুযোগও সে পায়নি।

লোকটির ঘুষি গিয়ে সান ওয়াকারের একেবারে মুখে আঘাত করেছিল। আহত ঠোঁট আবার ফেটে গিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল ঝরঝর করে।

পড়তে গিয়ে আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল সান ওয়াকার।

সান ওয়াকারের রক্তাক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে জর্জ আব্রাহাম ক্রুর হেসে বলল, ‘মরার আগে এ ধরনের আরও বহু ডোজ আসবে। শত্রুর আরামদায়ক মৃত্যু হোয়াইট ঈগলের অভিধানে নেই। এখন ভেবে দেখ মৃত্যু সহজ, না শর্তগুলো সহজ। মৃত্যু পর্যন্ত ভাববার সুযোগ দেয়া হলো। এরা প্রতিদিনই আসবে। প্রতিদিনই তোমার দেহের উপর কাজ চলবে মৃত্যুকে এগিয়ে আনার জন্যে।’

বলে চলে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল জর্জ আব্রাহাম।

জর্জের সাথে বেরিয়ে গেল গুন্ডা দু’জনও। কক্ষের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

সম্ভবত ভুল করে ওরা ঘর থেকে চেয়ার দু’টো বের করে নিয়ে যায়নি। সান ওয়াকার গিয়ে বসল চেয়ারে।

চেয়ারে গিয়ে বসতেই মনে পড়ল মেরী রোজ-এর কথা। তার কোন বিপদ হয়নি তো? পরক্ষণেই আবার ভাবল সে চীফ জাস্টিসের মেয়ে। তাকে অবশ্যই কেউ এমনভাবে ঘাঁটাবে না যা মার্কিন ইতিহাসের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ও প্রভাবশালী প্রধান বিচারপতিকে বিরক্ত করতে পারে। কি করছে মেরী রোজ? সে অবশ্যই জানতে পেরেছে সান ওয়াকারের ঘটনা। কিন্তু অবশ্যই জানতে পারেনি কারা তাকে কিডন্যাপ করেছে কোন কারণে। সান ওয়াকার নিশ্চিত এদের হাত থেকে তাকে উদ্ধার করার কেউ নেই। রেড ইন্ডিয়ানরা বিষয়টা জানতেই পারবে না। পুলিশ কিছু করলে? কিন্তু পুলিশের উপর তার কোন আস্থা নেই। ওদের নিষ্ক্রিয় করতে হোয়াইট ঈগলের মত সংগঠনের বেগ পেতে হবে না। চারদিকে হতাশার অন্ধকারের মধ্যেও দু’টি বিষয় আনন্দের সূর্য হয়ে তার সামনে এল। একটি মেরী

রোজ-এর প্রেম, আরেকটি রেড ইন্ডিয়ানদের জাগরণ যা খুনী বর্ণবাদীদের আতংকিত করেছে।

'রেড ইন্ডিয়ানরা আমেরিকান জাতিকে দ্বিধাবিভক্ত করছে'- জর্জ আব্রাহামের এই কথা মনে হতেই বিদ্রূপের একটা হাসি ফুটে উঠল সান ওয়াকারের মুখে। মনে মনে সে বলল রেড ইন্ডিয়ানরা তোমাদের চেয়ে বেশি আমেরিকান। ছিনিয়ে নেয়া অধিকার ফিরিয়ে চাওয়া আমেরিকানদের বিভক্ত করা নয়। বরং এই অবিচারের অবসান হলে আমেরিকানরা আরও সংহত হবে।

ঠোঁটের ব্যথায় তার চিন্তায় ছেদ পড়ল।

জামার আস্তিন দিয়ে ঠোঁট মোছার জন্যে হাতটা উপরে তুলল সান ওয়াকার।

তাকাল সে চাদর ছাড়া শুধু ফোম বিছানো খাটিয়ার দিকে। শোয়ার এটুকু আয়োজনকেই তার কাছে অমৃত মনে হচ্ছে। ক্লান্ত, বেদনা কাতর দেহ জুড়ে নেমে আসছে অবসাদ। তার কাছে এখন ঘুমের চেয়ে মূল্যবান কিছু দুনিয়াতে আছে বলে মনে হচ্ছে না। সে চেয়ার থেকে উঠে ধীরে ধীরে এগুলো খাটিয়ার দিকে।

কক্ষের দরজা খুলে যেতেই দু'জন স্টেনগানধারী দরজায় এসে দাঁড়াল।

তারপর দরজা দিয়ে প্রবেশ করল মধ্যবয়সী সুবেশধারী ভারী চেহারার একজন লোক। তার সাথে একজন যুবক। তাদের পেছনে পেছনে প্রবেশ করল আরও দু'জন স্টেনগানধারী।

আহমদ মুসা বলেই বোধহয় নিরাপত্তার এই বাড়তি ব্যবস্থা।

আহমদ মুসা উঠে বসেছিল বিছানায়।

স্টেনগানধারী দু'জন খাটের দু'পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

সুবেশধারী মাঝ বয়সী লোকটি দৃঢ় পদক্ষেপে এসে আহমদ মুসার সামনে দাঁড়াল। বলল, 'আমি ডেভিড গোল্ড ওয়াটার। আমি.....।'

ডেভিড গোল্ড ওয়াটারের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আহমদ মুসা বলল, ‘হোয়াইট ঈগলের প্রধান।’

‘আপনি জানলেন কি করে?’

‘জানতে পেরেছি সানসালভাদর দ্বীপে থাকতেই।’

‘এখন আপনি কোথায়? সানসালভাদর দ্বীপে নেই এখন?’

‘আপনাকে এবং বন্দীখানা দেখে এখন মনে হচ্ছে আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।’

‘ধন্যবাদ আহমদ মুসা। আপনাকে ধন্যবাদ। এই দ্বিতীয় ধন্যবাদটা কেন দিলাম জানেন?’

আহমদ মুসা কোন জবাব দিল না। গোল্ড ওয়াটার নিজেই কথা বলল আবার। বলল, ‘দ্বিতীয় ধন্যবাদ এই কারণে যে আপনি হোয়াইট ঈগল-এর বন্দীখানাকে ধন্য করেছেন। আজ ক্লু ক্ল্যাক্স ক্ল্যান, সিনবেথ, ব্ল্যাক ক্রস, ফ্র, ইত্যাদি বিশ্ব বিখ্যাত সংগঠনগুলো আমাদের এ বন্দীখানার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।’

‘ওদের বন্দীখানাতেও ছিলাম।’

‘ছিলেন হয়তো, কিন্তু তখন এত সাড়া পড়েনি। এখন সবাই ছুটে আসছে এ বন্দীখানার দিকে।’

‘ওরা জানল কি করে?’

‘জানিয়েছি আমি ক্লু ক্ল্যাক্স ক্ল্যানের মি: বেনজামিলকে। উনিই জানিয়েছেন সবাইকে। এতে আমার ভালই হয়েছে।’

‘কি ভাল হয়েছে?’

হাসল ডেভিড গোল্ড ওয়াটার। বলল, ‘এতে দর কষাকষির সুবিধা হয়েছে।’

‘কিসের দর কষাকষি?’

আবার একটা ক্রুর হাসি ফুটে উঠল গোল্ড ওয়াটারের ঠোঁটে। বলল, ‘আপনাকে কে কত দামে কিনতে পারে, সেইটা। ইতিমধ্যেই বেনজামিল ১ বিলিয়ন ডলার দিতে চেয়েছে। কিন্তু আমি মনে করছি, এর চেয়ে অনেক বেশী দাম

আমি পাব। দেখা যাচ্ছে সবাই দারুণ আগ্রহী। সবচেয়ে আগ্রহী দেখা যাচ্ছে ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থা সিনবেথকে। আমি তার কাছে মূল্য চেয়েছি ৩ বিলিয়ন ডলার।’

‘ব্যবসায়ের সুন্দর সুযোগ পেয়েছেন।’

‘আপনার প্রতিক্রিয়া কি?’

‘আমার কোন সমস্যা নেই। সব বন্দীখানা বন্দীখানাই। শত্রুর মধ্যে বড় ছোট আছে, কিন্তু ভাল-মন্দ নেই।’

‘না ভাল-মন্দ আছে। দেখুন, আমরা আপনাকে মারছি না কিংবা মেরেও ফেলছি না। বিক্রি করছি মাত্র। আমাদের উদ্যোগটা নির্দোষই বলা যায়।’ বলল গোল্ড ওয়াটার মুখে ক্রুর হাসি টেনে।

বলেই একটু থামল। তারপর আবার শুরু করল, ‘সে যাক, ‘কাজের কথায় আসি। কখন বিক্রি হয়ে যান, ঠিক তো নেই, আমাদের কয়েকটা কথা জানা দরকার।’ বলে একটু থামল।

আহমদ মুসা কোন জবাব দিল না।

গোল্ড ওয়াটারই আবার বলল, ‘আপনি আমাদের দু’শরও বেশী লোক হত্যা করেছেন। কিন্তু এটা আমার কাছে কোন বড় বিষয় নয়?’

‘কেন?’

‘এই কারণে যে আহমদ মুসা প্রতিপক্ষ যেখানে, সেখানে দু’শো, তিনশ, লোক গায়েব হওয়া বা নিহত হওয়া বিস্ময়ের ছিল না। আমাদের কাছে বড় বিষয় হলো, আমাদের লোকগুলোকে কি করে গায়েব করলেন?’

‘না এটা বলবো না। শত্রুকে কৌশল জানানো যাবে না।’

‘একজন বন্দীর মুখে এই কথা মানায় না। জানেন আমরা কি করতে পারি?’

‘সব জেনেই বলছি।’

‘কতটুকু জানেন আপনি? বলুন তো এই মুহূর্তে আমি কি করতে পারি?’

‘আপনার হাতে ইলেকট্রনিক্যাল যে হ্যান্ড ডাইরী দেখছি, ওটা হ্যান্ড ডাইরী নয়। অত্যন্ত পাওয়ারফুল বিদ্যুত জেনারেটর ওটা। ডাইরী ওপেনের যে

‘কী’টা সামনে দেখা যাচ্ছে ওটায় চাপ দিলেই দু’পাশ থেকে দু’টো বৈদ্যুতিক তার বেরিয়ে আসবে। ঐ তারের মাথায় মানুষের চামড়া কামড়ে ধরার মত প্লাগ আছে। প্লাগ দু’টো কারো দেহে আটকে দিয়ে সুইট টিপলেই প্রবাহমান বিদ্যুতের যন্ত্রণাদায়ক অব্যাহত চাবুকে সে বাঁদর নাচ শুরু করে দেবে।’

বিস্ময়ে মুখ হা হয়ে গেছে গোল্ড ওয়াটারের। কিছুক্ষণ সে কথা বলতেই যেন ভুলে গেল।

অনেকক্ষণ পর বিস্মিত কণ্ঠে সে বলল, ‘ইলেকট্রনিক্যাল যে ডাটা ডায়েরী আছে, তার সাথে এর সামান্য পার্থক্যও নেই। একে আপনি ডায়েরী না ভেবে অস্ত্র ভাবলেন কি করে?’

‘খুবই সোজা হিসাব। ঐ ধরনের কোন ডাটা ডায়েরী নিয়ে এই বন্দীখানায় আমার কাছে আপনার আসার কোন যৌক্তিকতা নেই। সুতরাং যেটা এনেছেন সেটা একজন বন্দীকে ভয় দেখাবার মত কোন জিনিসই হবে।’

গোল্ড ওয়াটারের চোখে-মুখে সপ্রশংস ভাব ফুটে উঠল। বলল সে পরক্ষণেই, ‘ধন্যবাদ, আরেকটা প্রশ্নের জবাব দিন। এই যন্ত্রটা মাত্র গতকাল বাজারে এসেছে এক আমেরিকান কোম্পানীর তরফ থেকে। সুতরাং এই যন্ত্রটা কোনভাবেই আপনি দেখেননি, জানেন না, কিন্তু ঐ নিখুঁত বিবরণ দিলেন কি করে?’

‘দেখিনি বটে, জানি না একথা টিক নয়। আজ থেকে ৬মাস আগে ‘ইনভেনশন’ ম্যাগাজিনের একটি সংখ্যায় এই অস্ত্রের সাইজ এবং বিবরণ পড়েছিলাম।’

হাসল গোল্ড ওয়াটার। বলল, ‘মিঃ আহমদ মুসা, সত্যি আপনি এক বিস্ময়কর শত্রু। আপনি যদি বন্ধু হতেন, তাহলে কতই না ভাল হতো!’

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘আপনি আমার শত্রু কিন্তু আমি আপনার শত্রু নই। আপনি বা আপনারা মুসলমান বা অশ্বেতাংগদের উপর বৈরিতা ছাড়ুন, আপনারাও আমাদের বন্ধু হয়ে যাবেন।’

‘বন্ধুত্বের চেয়ে এখন আমাদের কাছে কাজ বড়। কাজের কথা বলুন।’

‘বলেছি, যে তথ্য মুসলমান ও কৃষ্ণাংগদের বিরুদ্ধে যাবে, সে তথ্য আপনারা আমার কাছ থেকে পাবেন না।’

‘সে দেখা যাবে। এখন বলুন, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের ঐসব গোপন তথ্য FWTV টেলিভেশন নেটওয়ার্ক এবং WNA নিউজ এজেন্সীতে গেল কি করে?’

‘আমি পাঠিয়েছি।’

‘আপনি পাঠিয়েছেন?’ চোখ কপালে তুলে প্রশ্ন করল গোল্ড ওয়াটার।

প্রশ্ন করে মুহুর্তকাল থেমেই আবার প্রশ্ন করল, ‘আপনি পাঠালেই তা ওরা বিশ্বাস করবে কেন?’

‘অনেক সময় কে পাঠাল তা বড় বিষয় হয় না, কি পাঠানো হয়েছে তাই বড় বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। আমাকে নয় আমার পাঠানো দলিলকে তারা বিশ্বাস করেছে।’

‘আহমদ মুসা আপনি যে অপরাধ করেছেন, কয়েকবার আপনাকে হত্যা করলেও তার শাস্তি সম্পূর্ণ হবে না। কিন্তু আমাদের ভাগ্য মন্দ।’

‘কেন?’

‘উপযুক্ত মূল্যে আমরা আপনাকে বিক্রি করছি। যারা টাকা দিয়ে কিনছে, তাদের এখন হক হয়ে গেছে আপনাকে বানানো তারা যেমন চায়।’

‘তাহলে আপনাদের জন্যে দুঃখেরই।’

‘লাভের তুলনাই তা কিছুই নয়। যে কয় বিলিয়ন ডলার আমরা পাচ্ছি আপনাকে বিক্রি করে, তা আমাদের আন্দোলনের চেহারা পাল্টে দেবে। সুতরাং আপনার প্রতি আমরা খুশীই বলতে পারেন।’

‘খুশী থাকার কোন চিহ্ন দেখছি না।’

‘কেন এত সুন্দর বন্দীখানা, এত সুন্দর বিছানা। আমাদের বন্দীখানার কোন কক্ষেই এ ব্যবস্থা নেই।’

বলে গোল্ড ওয়াটার হাতের ইলেকট্রনিক ডায়েরীটা পকেটে রেখে পকেট থেকে যা বের করল তা একটা ছোট্ট ইলেকট্রনিক ক্যালকুলেটরের মত জিনিস। তাতে বড় একটা স্ক্রিন এবং ছোট্ট একটা কী-বোর্ড।

সে একটা কী-বোর্ডে চাপ দিয়ে জিনিসটা আহমদ মুসার দিকে তুলে ধরল।

জিনিসটা একটা মিনি টেলিভিশন।

আহমদ মুসা টেলিভিশনটা হাতে নিয়ে স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে দেখল, বন্দীখানার কক্ষগুলো একের পর এক পর্দায় ভেসে উঠছে।

কক্ষগুলোর সবগুলোই একটি করে সংকীর্ণ সেল। লোহার খাটিয়ায় নগ্ন ফোম বিছানো। তার এক পাশে গোটানো খসখসে কম্বল।

একটা কক্ষে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল টেলিভিশনের ফোকাস।

আহমদ মুসার দৃষ্টি আছড়ে পড়ল আহত রক্তাক্ত একজন  মানুষের উপর। শুয়ে আছে সে খাটিয়ার উপর। বন্দীটি একজন রেড ইন্ডিয়ান তরুণ।

'কে এই বন্দীটি?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'দেখেছেন তো কি অবস্থায় সে আছে, আর কি অবস্থায় আপনি আছেন?'

আহমদ মুসা তার কথার দিকে কান না দিয়ে আবার জিজ্ঞেস করল, 'কে এই বন্দি ছেলেটি?'

'সে সান ওয়াকার। তার অনেক অপরাধ।'

'চুরি, ডাকাতি, হাইজ্যাক, খুন ইত্যাদি নিশ্চয় নয়।'

'তার চেয়েও বড় অপরাধ। সে 'আমেরিকান ইন্ডিয়ানস মুভমেন্ট' (AIM) - এর একেবারে ভেতরের লোক। গত মাসে কাহোকিয়াতে ইন্ডিয়ানদের যে সম্মেলন হয়েছে, সে সম্মেলনের যে সাংঘাতিক দাবীনামা তার ড্রাফট এই ছেলেটিই করেছে। আরও অপরাধ তার আছে। রেড ইন্ডিয়ানদের একটা গোপন রিজিওনাল কাউন্সিল গঠিত হয়েছে। সদস্যদের নাম তার কাছ থেকে আমরা চেয়েছিলাম, নামগুলো সে দিলে তাকে দেশ ত্যাগের একটা সুযোগ দিতাম, ছেলেটি খুব প্রতিভাবান শুধু এই বিবেচনায়।'

'কেমন প্রতিভাবান?'

'সে স্টুডেন্ট নোবল প্রাইজ পেয়েছে বিজ্ঞানে, এ বছর।'

'এমন একটা প্রতিভাকে এভাবে বন্দী করে রেখেছেন?'

‘আমরা তো একজন বিজ্ঞানী ছাত্রকে বন্দী করে রাখিনি, আমরা বন্দী করে রেখেছি শয়তান রেড ইন্ডিয়ানদের এক শয়তান বাচ্চাকে। তাছাড়া সে বাইরে থাকলে সে একটা শ্বেতাংগ বিজ্ঞান প্রতিভাকে নষ্ট করত।’

‘কেমন?’

‘এরই ক্লাসমেট মেরী রোজ। সে স্টুডেন্ট নোবল প্রাইজ পায়নি বটে, কিন্তু উদীয়মান একটা বিজ্ঞান প্রতিভা। এ পর্যন্ত সে সকল পরীক্ষায় প্রথম হয়ে এসেছে। তার সাথে এ সম্প্রতি ফষ্টিনষ্টি শুরু করেছে।’

‘আপনারা ছেলেটিকে মেরে ফেলবেন?’

‘আমাদের শর্ত মানতে সে অস্বীকার করেছে, সুতরাং মৃত্যু তার অবধারিত।’

‘একটা বিরল বিজ্ঞান প্রতিভাকে আপনারা এভাবে ধ্বংস করবেন?’

‘ও রেড ইন্ডিয়ানদের বিজ্ঞান প্রতিভা, আমাদের নয়। তার প্রতিভা আমাদের বিরুদ্ধে যেতে শুরু করেছে, সে ভবিষ্যতে একজন প্রতিভাবান শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং শুরুতেই শেষ হলে আমাদের সবার ভাল।’

‘কিন্তু আপনাদের এই কথা তো মার্কিন সরকার ও মার্কিন জনগণের নয়।’

‘হোয়াইট ঈগলই মার্কিন সরকার এবং মার্কিন জনগণ। এর বাইরে কিছুই নেই।’

‘কিন্তু এসব কথা একদিন প্রকাশ হবেই।’

‘হোয়াইট ঈগল-এর হোয়াইট আমেরিকা কাউকেই তোয়াক্কা করে না।’

‘মার্কিন জনগণকেও তোয়াক্কা করেন না?’

‘মার্কিন জনগণ আমাদের সাথে আছে।’

‘তাহলে আপনাদের আন্দোলনে এত রাখ-ঢাক কেন? গোপন কেন?’

‘গোপন অন্য কারণে। বাইরের প্রতিক্রিয়া এড়িয়ে আমরা লক্ষ্যে পৌছুতে চাই।’

কথা শেষ করেই গোল্ড ওয়াটার বলে উঠল, ‘এত কথা দিয়ে আপনার কাজ কি?’

বলে একটু থামল। শুরু করল আবার, 'ভদ্রভাবে যে বিষয় দু'টো জানতে চাইলাম। ভেবে দেখবেন। আবার আসব। আর এদের সাথে ব্যবসাটা আমাদের না হলে আমাদের অন্যভাবেও আসতে হতে পারে।'

কথা শেষ করে আহমদ মুসার হাত থেকে পকেট টিভি ছো মেরে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা মনে মনে হাসল। মনে মনেই বলল, 'ধন্যবাদ টিভি যন্ত্রটি হাতে দেবার জন্যে।'

টিভি যন্ত্রটি ছিল বন্দীখানাসহ গোটা অফিস বিল্ডিং-এর সর্ট সার্কিট টিভির মনিটর।

টিভি মনিটরিং 'কী' প্যানেলের প্রত্যেকটি 'কী'-এর কোনটি 'প্রিজন রুমস', কোনটি 'অফিস রুমস', কোনটি 'করিডোরস', কোনটি 'এক্সিটস' বা বের হবার পথ, ইত্যাদির নির্দেশক।

আহমদ মুসা গোল্ড ওয়াটারের সাথে কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে প্যানেলের 'কী'গুলোর টিপে প্রয়োজনীয় জায়গাগুলো দেখে নিচ্ছিল। সে প্রথমেই দেখেছে করিডোর, তারপর বের হবার পথ। বের হবার পথ দেখল সে দুটি। একটা সামনের গেট। আরেকটা পথ পেছনে বন্দীখানার একটা করিডোর থেকে সুড়ঙ্গ সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেছে। কিন্তু সিঁড়ি মুখ বন্ধ। সিঁড়ি মুখের বাইরের দিকটাও দেখা গেল। সেটা এক তলার ছাদ।

সবশেষে আহমদ মুসা দেখছিল অফিস রুমগুলো। এই সময়ই টিভি মনিটরটি আহমদ মুসার হাত থেকে ছো মেরে নিয়ে নিল। গোল্ড ওয়াটার বেরিয়ে যাবার পর প্রহরীরা বেরিয়ে যেতেই দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আহমদ মুসা লক্ষ্য করল দরজা ভেতর থেকে খোলার কোন ব্যবস্থা নেই।

এই হতাশার মধ্যেও আহমদ মুসা আনন্দিত হলো হোয়াইট ঈগলের এই ঘাটি সম্পর্কে একটা ধারণা লাভ করে।

ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন এন্ড লিগ্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট ব্যুরো (CI & LAB) এর সুসজ্জিত ড্রইং রুমে বসে আছে মেরী রোজ এবং শিলা সুসান। তারা অপেক্ষা করছে তাদের ডাক পড়ার।

'CI & LAB' আমেরিকার একটা বিখ্যাত ডিটেকটিভ ফার্ম।

ওয়াশিংটনেই তাদের হেড কোয়ার্টার।

শিলা সুসান ও মেরী রোজ সান ওয়াকার নিখোঁজ হওয়ার বিষয় নিয়ে টেলিফোনে এই ফার্মের সাথে আলাপ করে। সিআই এন্ড ল্যাব তাদেরকে জানায় সমস্যাটা লিখে জানাবার জন্যে, অবশ্য সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নামধাম উল্লেখ না করে এবং বলে তারা কেসটিকে যদি গ্রহণযোগ্য মনে করে তাহলে সাক্ষাৎ আলোচনার জন্যে ডাকবে। সেই ডাক পাওয়ার পরেই শিলা সুসান ও মেরী রোজ সিআই এন্ড ল্যাব এর অফিসে এসেছে।

বেশীক্ষণ বসে থাকতে হল না মেরী রোজদের। তাদের ডাক পড়ল।

তাদের সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন রন হাওয়ার্ড। সিআই এন্ড ল্যাব এর চীফ ডিটেকটিভ।

মেরী রোজ এবং শিলা সুসান প্রবেশ করল ঘরে।

একটা মাঝারী টেবিলে বসে আছেন মাঝ বয়সী ভদ্রলোক।

স্লিম স্পোর্টিং চেহেরা।

একটা ফাইল পড়ছিল সে।

মেরী রোজরা ঘরে ঢুকতেই সে উঠে দাঁড়িয়ে হাসি মুখে স্বাগত জানাল মেরী রোজদের। মেরী রোজদের উপর নজর পড়তেই হঠাৎ তার মুখে বিস্ময়ের একটা ছায়া নেমে মুহূর্তেই মিলিয়ে গেল।

টেবিলের সামনে পাশাপাশি দুটি চেয়ারে বসল মেরী রোজ ও শিলা সুসান।

তার আগে মেরী রোজ নিজের এবং শিলা সুসান এর পরিচয় দিল।

আমরা কথা শুরু করতে পারি এখন তাহলে? বলল রন হাওয়ার্ড স্মিত হাস্যে নরম কণ্ঠে।

অবশ্যই স্যার। বলল মেরী রোজ।

যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে আপনাদের সমস্যা, সেটা অবশ্যই ইন্টারেস্টিং। এ ঘটনা আমরা সংবাদপত্রেও পড়েছি। পুলিশও কনফার্ম করেছে। আরও কিছু জানিয়েছিও আমরা। আমাদের জানার সাথে আপনাদের জানাটা মিলিয়ে নেবার জন্যেই আজ আপনাদের ডেকেছি। রন হাওয়ার্ড বলল। কেন আমাদের কেসটা গ্রহনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেননি। বলল শিলা সুসান।

ঈষৎ হাসল রন হাওয়ার্ড। বলল, 'আমাদের জানাটা মিলিয়ে নেবার পর এ সিদ্ধান্ত আমরা নিব।

বলুন কি জানতে চান? বলল, মেরী রোজ।

আপনারা সমস্যার যে বিবরণ লিখে পাঠিয়েছেন, তাতে পরিস্কার যে, অপহরণকারীদের আপনারা জানেন? তারা কারা সেটা জানতে চাই।

অপহরণকারীদের আমরা জানিনা, কিন্তু তারা যে দলের লোক সে দলকে আমরা চিনি। বলল, মেরী রোজ।

সে দল কি হোয়াইট ঈগল?

আপনি কি করে জানলেন? বিস্মিত কণ্ঠে বলল শিলা সুসান।

পুলিশ সুত্রে জেনেছি। তাহলে এটা ঠিক?

ঠিক? বলল আবার শিলা সুসান। মুখটা ম্লান হল রন হাওয়ার্ডের।

ভাবল কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলল, দুঃখিত মিস মেরী রোজ, শিলা সুসান, কেসটা গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

এবার ম্লান হলো মিস মেরী রোজ, শিলা সুসানের মুখ। তারা এ ধরনের উত্তর আসা করেনি। অপ্রস্তুত অবস্থায় তারা কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না।

কেন? প্রশ্ন করল মেরী রোজ কয়েক মুহূর্ত পর।

আমাদের এটা প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান। আমরা ব্যাক্তি ক্রাইম কিংবা গ্যাং ক্রাইম নিয়ে কাজ করি। এটা সে রকম নয়।

'কেন এটা গ্যাং ক্রাইমের মধ্যে পড়ে।'বলল শিলা সুসান।

হাসল রন হাওয়ার্ড। বলল, তারা এক অর্থে গ্যাং হতে পারে, কিন্তু ক্রিমিনাল গ্যাং নয়, পলিটিকাল গ্যাং। এ ধরনের পলিটিকাল গ্যাং আমাদের আওতার বাইরে। এদের ব্যাপারে শুধু সরকারই কিছু করতে পারে।

কিন্তু সরকার তো কিছুই করছে না। বলল, মেরী রোজ।

সরকার কিছু করছে না নয়, পুলিশ কিছু করছে না।

তাহলে উপায়? আপনারাও কিছু করবেন না। তাহলে ঐ ক্রিমিনালরা তো মাথায় উঠে বসবে। বলল মেরী রোজ।

হাসল আবার রন হাওয়ার্ড। বলল, আপনার আব্বাকে বলুন। তিনি বললে কাজ হবে।

বিস্মিত হলো মেরী রোজ এবং শিলা সুসান দু'জনেই। বলল মেরী রোজ, 'আপনি আমাকে চেনেন?

'চিনি না। আপনাকে দেখে আপনার পরিচয় আমি পেয়েছি।একটা অনুষ্ঠানে আপনার আব্বার সাথে আপনাকে দেখেছিলাম।'

'ধন্যবাদ।'

বলে একটু থেমে মেরী রোজ বলল, 'আব্বাকে বলতাম। কিন্তু জানি, বললে তিনি এসব থেকে আমাকে দূরে থাকতে বলবেন। এবং বলবেন, পুলিশকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দাও।'

'তাহলে আমাদের হতাশা নিয়ে উঠতে হবে?' বলল শিলা সুসান।

'শুধু আমরাই নই কোন প্রাইভেট ডিটেকটিভ ফার্মই এ ধরনের রাজনৈতিক কেস হাতে নেয় না।'

রাজনৈতিক ক্রাইম কি কোন ক্রাইম নয়? বলল মেরী রোজ?

'ক্রাইম অবশ্যই। কিন্তু এ ক্রাইমের মোকাবেলা শুধু সরকারই করতে পারে।'

'কিন্তু সরকার অর্থ পুলিশ এবং গোয়েন্দা সার্ভিসের লোক। তারাও রাজনৈতিক স্বীকার।' বলল শিলা সুসান।

'এই দুর্ভাগ্যের প্রতিকার নেই?' বলল মেরী রোজ।

'আছে। কিন্তু এজন্যে আব্রাহাম লিংকনের মত সাহসী কাউকে এগিয়ে আসতে হবে। দেখুন, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে হোয়াইট ঈগলের কুকীর্তি ফাঁস হয়ে যাবার পর সেখানে প্রতিকার এসেছে।

নিশ্চয় সাহসী কেউ এগিয়ে এসেছিল, যার ফলে প্রতিকারের একটা পথ হয়েছে।'

'আমার বাড়ি বাহামায়। আমি শুনেছি, একজন বিদেশী এসে এটা করেছে।'

'একজন বিদেশী করেছে?' বিস্মিত কণ্ঠে বলল রন হাওয়ার্ড।

'হ্যাঁ, একজন বিদেশী।'

'কে সে? ইংল্যান্ড বা ইউরোপের মানবাধিকার আন্দোলনের কেউ?'

একটু দ্বিধা করল। তাকাল মেরী রোজে এর দিকে। তারপর বলল সুসান, 'না ইউরোপের কেউ নয়। কে এক আহমদ মুসা নাকি এসব করেছে।'

চমকে উঠল রন হাওয়ার্ড নাম শুনার সাথে সাথে। চোখ কপালে তুলে বলল, 'আহমদ মুসা ওখানে এসেছিল?'

'আপনি চেনেন আহমদ মুসাকে?' বলল শিলা সুসান।

'দুনিয়ার খজ-খবর রাখে, অথচ তাকে জানে না এমন কেউ নেই।বিশেষত আমরা আমাদের সর্বোচ্চ মডেল হিসাবে তাঁকে শ্রদ্ধা করি।বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির পর্বতপ্রমাণ সংকটের সমাধান তিনি করে চলেছেন, তা আমাদের জন্যে শিক্ষার বিষয়।'

শিলা সুসান চিন্তা করছিল। তার কপাল কুঞ্চিত হয়ে উঠছে। সে ভাবছে, হোয়াইট ঈগলের হাতে আহমদ মুসার বন্দি হবার খবর মিঃ রন হাওয়ার্ডকে জানানো ঠিক হবে কিনা। অবশেষে সে ভাবল, আহমদ মুসাকে মুক্ত করার ব্যাপারে সে তো কিছুই করতে পারছে না। মিঃ রণকে বললে যদি কিছু সাহায্য হয়, বা পরামর্শ পাওয়া যায়।

এসব চিন্তা করে শিলা সুসান বলল, 'আরেকটা খবর আমি সানসালভাদরেই শুনে এসেছি। আহমদ মুসা নাকি বন্দি হয়েছে হোয়াইট ঈগলের হাতে।'

শিলা সুসানের কথা কানে যাওয়ার সাথে সাথে তড়িতহতের মত মিঃ রন হাওয়ার্ড এর দেহ চেয়ারের উপর সোজা হয়ে বসল। বলল, 'একি ঠিক বলছেন আপনি?'

বিশ্বাসযোগ্য খবর না হলে আপনাকে বলতাম না। বলল শিলা সুসান।

অবশ্যই' বলে হঠাr চেয়ারে গা এলিয়ে চোখ বুজল রন হাওয়ার্ড।

মুহূর্ত পরেই চোখ খুলে সোজা হয়ে চেয়ারে বসল। বলল, ‘মিস মেরী রোজ আপনার সমস্যা সমাধানের একটা পথ সম্ভবত খুলে যাচ্ছে।’

-কি সেটা? মেরী রোজ বলল।

‘আহমদ মুসা যখন হোয়াইট ঈগলের হাতে, তখন দু’টি ঘটনার একটা অবশ্যই ঘটবে। হয় তারা আহমদ মুসাকে হত্যা করবে, নয়তো আহমদ মুসা নিজেকে মুক্ত করবে। আহমদ মুসা অবশেষে হোয়াইট ঈগলের বন্দিখানায় এসে মারা পড়বে, এটা ভাবতেও কষ্ট হয়। মারা পরতেও পারে। কিন্তু সে যদি বেরুতে পারে, তাহলে সান ওয়াকার শুধু মুক্ত হওয়া নয়, আমেরিকায় কিছু বড় ঘটনা ঘটবে। আহমদ মুসা কোন দেশে পা দেয়ার অর্থই সেখানে বড় ধরনের কিছু ঘটবে।’

‘আহমদ মুসা সম্পর্কে আমি কিছু জানিনা। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে পার্থনা করছি, আপানর শেষ কথাটা সত্যি হোক।’

আমিও চাই। বলল শিলা সুসান।

চাই আমিও। রন হাওয়ার্ড বলল গম্ভীর মুখে।

তাহলে আমরা উঠি? বলল মেরী রোজ।

উঠে দাঁড়াল মেরী রোজ ও শিলা সুসান।

রন হাওয়ার্ডও উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘আমি দুঃখিত যে, আপনাদের সাহায্যে আসতে পারলাম না।

তবে একটা কথা বলতে পারি, আজকের পর থেকে হোয়াইট ঈগলের গতি-বিধির উপর চোখ রাখতে চেষ্টা করব। আহমদ মুসার সাথে আমার সাক্ষাr আমার জন্যে মহা সৌভাগ্যের হবে।

‘ধন্যবাদ। তাঁর সাথে সান ওয়াকারের নামটাও আপনি ভুলবেন না’

‘নাম মনে থাকবে। কিন্তু আমার আলগা চোখ রাখায় কারও কোনও লাভ হবে কিনা জানিনা।’

আলগা কেন বলছেন? বলল শিলা সুসান।

কারণ, হোয়াইট ঈগলের সাথে কোন ভাবেই কোন সংঘাতে আমরা যাব না। আলগা মানে দূর থেকে চোখ রাখা।

তবু তো এটা এক পা অগ্রসর হওয়া। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। বলল মেরী রোজ ও শিলা সুসান।

বেরিয়ে এল অফিস থেকে।

গাড়ি স্টার্ট দিতে দিতে পাশের সিটে মেরী রজ-এর দিকে চেয়ে সুসান বলল, এখন বুঝে দেখ, দেশের একটা সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাইভেট গোয়েন্দা ফার্ম যদি হোয়াইট ঈগল এর ব্যাপারে এতটা নিষ্ক্রিয় হয়, তাহলে কার উপর ভরসা করা যাবে।

আহমদ মুসা সম্পর্কে উনি যা বললেন, এ ব্যাপারে তোর কি মত? বলল মেরী রোজ।

'উনি সত্যি বলেছেন।'

'কিন্তু হতাশা ছাড়া আর কিছুই দেখছিনা। মেরী রোজের একথাগুলো কান্নার মত করুণ শোনাল।'

হাল ছেড়ে দেয়ার মত গাড়ির সিটে গা এলিয়ে দিয়েছে মেরী রোজ।

শিলা সুসান একটু ভাবল। তারপর বলল, 'হোয়াইট ঈগলের হেড কোয়ার্টারের ঠিকানা তো পেয়েছিল। চল না কাল ওদিকে একটু যাই।'

'কিন্তু তুই গোল্ড ওয়াটারের নজরে পড়লে তোকে সন্দেহ করতে পারে বলে ভয় করছিলি, তার কি হবে?'

'তবু ভাবছি যাওয়া দরকার ওদিকে। আমার ধারনা হেড কোয়ার্টারেই ওরা বন্দি আছে। দেখলে বুঝা যাবে, কিছু করার আছে কিনা। তাছাড়া ভাবছি, গোল্ড ওয়াটারের নজরে পড়ে হেড কোয়ার্টারে প্রবেশের কোন সুযোগ পেলে টা মন্দ হবে না।'

'ঠিক আছে কালকে তাহলে বেরুনো যাক।'

'তাহলে এটাই কথা হলো, কাল ঠিক বেলা দশটায় দু'জনে দু'জার গাড়ি নিয়ে এক সাথে বেরুবো।'

'দুই গাড়ি কেন?'

‘এসব অভিযানে দু’জন এক সাথে কোন বিপদে না পড়া উচিত। গোল্ড ওয়াটার দেখতে পেলে আমাকেই দেখুক, তোকে না। তুই তো সান ওয়াকারের সাথে সম্পর্কিত হয়ে পড়েছিস।’

মুখটা প্রসন্ন হলো মেরী রোজ-এর। বলল, বুঝেছি। তোর দেখছি বুদ্ধি আছে।

‘একে বুদ্ধি বলে নাকি! এতো সামান্য কমনসেন্স। বুদ্ধি দেখতে হলে আহমদ মুসাকে দেখতে হবে।’

‘তুই দেখছিস নাকি তাঁকে?’ কৌতূহলী কণ্ঠে বলল মেরী রোজ। ‘দেখেছি বললে অনেক প্রশ্ন করবি। তাই থাক এসব কথা এখন।’ মেরী রোজের চোখে মুখে তখন বিস্ময়। বলল, ‘কি পুরু তোর বুক। এসব কথা লুকিয়ে রেখেছিস। কোন কথা নয় সব কথা এখনই বলতে হবে।’

বলে মেরী রোজ এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরল শিলা সুসানকে।

শিলা সুসান  হাসল। বলল, ‘ছাড়, গাড়ি চালাতে দে বলছি।’

# ২

দরজার বাইরে কথা শুনতে পেল আহমদ মুসা। কথা বলছে গোল্ড ওয়াটার। বলছে, 'মিঃ আইজ্যাক শ্যারণ সেদিনের কথা ভেবে আজ আপনার কেমন লাগছে বলুন তো?'

'কি বলল। সেদিন চোখের সামনে তেলআবিবের পতন শুধু নয়, নিজেকে বাঁচাবার জন্যে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছিলাম তেলআবিব থেকে।

সে বেদনার ক্ষতটা আজ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে।'

'মিঃ আইজ্যাক শ্যারণ!' আহমদ মুসা ভাবল, এ নিশ্চয় সেই জেনারেল আইজ্যাক শ্যারণ? তেলআবিবে সাইমুমের অভ্যুত্থানকালে এ ছিল ইসরাইলী গোয়েন্দা বাহিনীর সহকারী প্রধান। অন্যান্যদের সাথে গোয়েন্দা বাহিনীর চীফও সেদিন মারা যায়। সহকারী চীফ জেনারেল শ্যারণ সেদিন পালিয়ে বাঁচে। পালিয়ে বাঁচা এই  আইজ্যাক শ্যারণই আজ আন্তর্জাতিক ইহুদী গোয়েন্দা চক্রের প্রধান। দ্রুত চিন্তা ঘুর পাক খাচ্ছে আহমদ মুসার মাথায়।

এসব ভাবতে ভাবতে আহমদ মুসার মনে প্রশ্ন জাগল,  জেনারেল আইজ্যাক শ্যারণ আজ এখানে কেন? তাহলে কি তাঁকে বিক্রির ব্যাপারটা একদম চূড়ান্ত হয়ে গেছে এবং আজ তাঁকে দেলিভারি নিতে এসেছে।

কথাটা মনে হবার সাথে সাথেই আহমদ মুসার  গোটা দেহে একটা বিদ্যুr চমক খেলে গেল।

মন বলে উঠল মানুষ কেনা-বেচার এই ব্যাবসাকে সফল হতে দেয়া যাবে না। কিন্তু কিভাবে? নিশ্চয় ওরা আট-ঘাট বেঁধেই আসছে।

এর আগে দু'বার স্থানান্তরের সময় সংজ্ঞাহীন করেছিল।

এবার তারা কি করবে?

আহমার মুসা ভাবল, তার সম্পর্কে গোল্ড ওয়াটার ও তার লোকদের মাঝে যে সুধারনা সৃষ্টি হয়েছে, সেটা তার জন্যে একটা পুঁজি।

এখানে বন্দী থাকার দিনগুলোতে আহমদ মুসা একজন অনুগত গোবেচারা বন্দীর ভূমিকা পালন করেছে। তার আচরণ দেখে গোল্ড ওয়াটার একদিন বলেছে, 'আপনার সম্পর্কে যা শুনেছি, তার কিছুই তো আপনার মধ্যে দেখছি না।'

আহমদ মুসা বলেছে, 'কি শুনেছিলেন? ভয়ানক ক্রিমিনাল চরিত্রের?'

'না। শুনেছি আপনি বাঘের মত ক্ষীপ্র, সিংহের মত সাহসি এবং শৃগালের মত ধূর্ত।'

আহমদ মুসা হেসেছে। বলেছে, 'ওদের তেজ বনে। আমার মত খাঁচায় বন্দি হবার পরও ওরা আমার মতই গো' বেচারা।'

এইভাবে আহমদ মুসা সম্পর্কে ওদের একটা ধরনা হয়েছে যে, সে ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়েছে। সম্ভবত এই কারনেই আহমদ মুসার উপর ওদের পাহারাদারী অনেক শিথিল। আহমদ মুসা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করল ওদের ঢিলেঢালা ভাব অন্যান্যা দিনের মত আজও যেন থাকে।

আহমদ মুসা শুয়েছিল। শুয়েই থাকল। দরজা খুলে গেল।

দরজা খুলে যাবার পর দরজায় এসে দাঁড়াল দু'জন প্রহরী। তাদের হাতে স্টেনগান। স্টেনগানের ব্যারেল নিম্নমুখী।

তারপর প্রথমেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করল গোল্ড ওয়াটার। তার পেছনে পেছেনে লাল তামাটে রঙের দীর্ঘকায় একজন লোক। আহমদ মুসা বুঝল এই লোকটিই গোয়েন্দা প্রধান জেনারেল আইজ্যাক শ্যারণ।

তাদের পেছনে একটা কফিন ধরাধরি করে নিয়ে এল আরও দু'জন লোক। তাদের কাঁধে স্টেনগান ঝুলানো। সে লোক দু'টি লাল তামাটে রঙের। এরা ইহুদী জেনারেলের সাথে এসেছে।

আহমদ মুসা বুঝল, আগের মতই সংজ্ঞাহীন করে এই কফিনে পুরে তাঁকে পাচার করা হবে ইহুদীদের হাতে।

ওদের ঘরে ঢুকতে দেখে উঠল আহমদ মুসা শোয়া থেকে। ঠিক দরজা মুখোমুখি হয়ে পা ঝুলিয়ে বসল খাটিয়ায়।

কফিনটি এনে রাখল ঠিক মাঝখানে। বহনকারী লোক দুজন তার পাঁশেই দাঁড়াল।

ঘরে ঢুকেই জেনারেল জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ।

জেনারেল আইজ্যাক শ্যারনের দিকে তাকিয়ে ঠোঁটে হাসি টেনে বলল, 'জেনারেল, মনে হচ্ছে তুমি শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। দরকার নেই। শিকার হাতের মুঠোয়। আর কিছুক্ষণ পর চলে যাবে তোমাদের খাঁচায়।'

'ধন্যাবাদ গোল্ড ওয়াটার, শয়তানের বাচ্চাকে অবশেষে হাতে পাওয়া গেল। মাথায় আমাদের বাড়ি দিয়েছে এই শয়তান।'

'ঠিক আছে। এর মাথায় বাড়ি দিয়ে তার শোধ তুলে নিবেন।' বলল গোল্ড ওয়াটার।

'এর এক মাথা ভেঙ্গে লাভ কি। ভাঙতে হবে ওদের গোষ্ঠী শুদ্ধ মাথা। সে সুযোগ এখন হাতের মুঠোয়।'

'কিভাবে?'

'এই শয়তানের বাচ্চাকে দেখিয়ে সব শয়তানের বাচ্চাকে খোঁয়াড়ে তুলব। তারপর শুধু ওদের মাথা নয়, ওদের দেশ ভাঙ্গারও সুযোগ আসবে।'

'এ ধরনের স্বপ্ন আপনার কতবার ভংগ হয়েছে জেনারেল?'

বলল আহমদ মুসা খুব শান্ত কণ্ঠে।

জেনারেল আইজ্যাক শ্যারণ পায়চারী করছিল আর কথা বলছিল। সে আহমদ মুসার সামনে এসে স্থির হয়ে দাঁড়াল। তার অগ্নি দৃষ্টি আহমদ মুসার উপর নিবদ্ধ। পকেট থেকে সে বের করল রিভালবার। বলল, 'শয়তানের বাচ্চা সে সব স্বপ্ন ভঙ্গের জন্যে তুই দায়ী।'

বলে সে রিভারবারের বাঁট দিয়ে আহমদ মুসার মাথায় আঘাত করতে গিয়েও থেমে গেল। তাকাল সে স্টেনগান কাঁধে ঝুলানো কফিনের কাছে দাঁড়ানো লোক দুজনের দিকে। বলল, 'আর দেরী নয়, তোমাদের কাজ শুরু কর। শয়তানের বাচ্চাকে দেখব আমাদের কব্জায় নিয়ে গিয়ে।'

জেনারেল আইজ্যাক শ্যারণ বলার সাথে সাথে দু'জনের একজন কোটের পকেট থেকে ছোট বাঁট ও লম্বা ব্যারেল ওয়ালা স্প্রে গানের মত একটা জিনিস বের করল। দেখেই আহমদ মুসা বুঝল, ওটা স্প্রে গান নয়, কারণ স্প্রে গান হলে সবাই তার কবলে পড়বে।

নিশ্চয় ওটা এ্যানেসথেসিয়া গান। যার বুলেট শুধু চামড়া ভেদ করে এবং বুলেটের এ্যানেসথেসিয়া বিষ সঙ্গে সঙ্গেই মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। একজন ইহুদী অতি সম্প্রতি এটা আবিস্কার করেছে।

লোকটি এ্যানেসথেসিয়া গান হাতে নিয়েই তাক করল আহমদ মুসাকে।

জেনারেল শ্যারণ তখনও তাকিয়ে আছে লোকটির দিকে। তার হাতে রিভারবাল। বাঁট দিয়ে আহমদ মুসাকে আঘাত করার জন্যে যেভাবে সে রিভারবাল ধরেছিল, সেভাবেই ধরে আছে। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে আহমদ মুসা। এ্যানেসথেসিয়া বুলেট তাঁকে আঘাত হানার পর তার আর কোন সুযোগ থাকবে না।

আহমদ মুসা বসা অবস্থা থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়ল জেনারেল আইজ্যাক শ্যারণ-এর উপর।

বাঁট ধরে কেড়ে নিল তার হাত থেকে রিভারবাল। সেই সাথেই তার পেছনে গিয়ে বাম হাত দিয়ে সাঁড়াশির মত পেছিয়ে ধরল তার গলা। ডান হাতের রিভারবাল চেপে ধরল তার মাথায়। এবং চাপা কণ্ঠে চিৎকার করে বলল, 'যার কাছে যে রিভারবাল আছে, দরজার দিকে ফেলে দাও। মুহূর্ত দেরী করলে গুড়ো হয়ে যাবে জেনারেল শ্যারণের মাথা।'

বলে আহমদ মুসা জেনারেল শ্যারণকে টেনে পশ্চিম দেয়ালের দিকে সরে গেল।

আহমদ মুসা নির্দেশ দেয়ার সাথে সাথে কফিনের পাঁশে দাঁড়ানো লোক দু'জন তাদের কাঁধের স্টেনগান ছুরে দিয়েছে দরজার দিকে।

গোল্ড ওয়াটারের চোখ দু'টি ছানাবড়া। হতবুদ্ধি তার চেহারা। সেও ধীরে ধীরে তার রিভারবাল ছুড়ে দিল দরজার দিকে।

দরজায় দাঁড়ানো দু'জন স্টেনগানধারী তাদের স্টেনগান তখনও ফেলেনি। কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাবে তারা দাঁড়িয়ে।

গোল্ড ওয়াটার ওদেরকে স্টেনগান ফেলে দিয়ে ভিতরে ঢুকতে বল। অনুচ্চ, কিন্তু কঠোর কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

গোল্ড ওয়াটার ওদেরকে নির্দেশ দিল।

ওরা হাতের স্টেনগান করিডোরের উপর ফেলে দিয়ে একপা দু'পা করে ঘরে প্রবেশ করল।

আহমদ মুসা জেনারেল শ্যারণকে সামনে রেখে তাঁকে টেনে নিয়ে পিছু হেঁটে দরজার বাইরে চলে এল।আসার সময় দরজার উপর ছড়িয়ে থাকা স্টেনগান ও রিভারবাল পা দিয়ে টেনে নিল দরজার বাইরে।

দরজার বাইরে এসে আহমদ মুসা বাম হাত সরিয়ে নিল জেনারেল শ্যারণের গলা থেকে। কিন্তু তার হাতের রিভারবাল জেনারেল শ্যারণের মাথা স্পর্শ করে থাকল স্থির ভাবে। বলল সে, ' তোমরা কেউ সামান্য নড়াচড়া করলে ছাতু হয়ে যাবে জেনারেল শ্যারণের মাথা।

বলে আহমদ মুসা ডোর লকের কী বোর্ডের দিকে তাকাল। দেখল অটো লক সিস্টেম। বন্ধ করার জন্যে একটা লাল বোতাম চাপতে হয় মাত্র।

আহমদ মুসা বাম হাতে লাল বোতাম চেপে ধরে ডান হাত ও হাটু দিয়ে ধাক্কা মেরে জেনারেল শ্যারণ কে ঢুকিয়ে দিল ঘরে। সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

দরজা বন্ধ হবার প্রায় সংগে সংগেই আহমদ মুসার কানে এল চারদিক থেকে এ্যালারমের শব্দ।

সচকিত হয়ে উঠল আহমদ মুসা। বুঝল, ঘরে বন্ধ গোল্ড ওয়াটার রিমোর্ট-এর মাধ্যমে এ্যালার্ম বাজিয়ে দিয়েছে। তার মানে এখন যে যেখানে আছে সেখান থেকে ছুটে আসবে। নিশ্চয় সে এই কৌশলে সবাইকে নির্দেশও দিতে পারবে কি ঘটেছে এবং কি করতে হবে।

তাহলে ওদের ঘরে বন্দী করে লাভ খুব একটা হলো না- এই কথা ভাবতে ভাবতে আহমদ  মুসা চারদিকে তাকিয়ে সর্ট সার্কিট টিভি স্ক্রীনে দেখে পিছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিল।

ছুটল সে করিডোর ধরে পশ্চিম দিকে।

একটা দরজার পাশ দিয়ে যাবার সময় আহমদ মুসা পুরুষ কণ্ঠের আর্ত চিৎকার শুনতে পেল। হঠাৎ তার মনে পড়ল  গোল্ড ওয়াটারের সর্ট সার্কিট টিভি স্ক্রীনে দেখা এবং তার কাছ থেকে শোনা সান ওয়াকারের কথা।

এ কি সান ওয়াকারের চিৎকার?

থমকে দাঁড়াল। তাকাল দরজার দিকে। এই দরজার ভেতর থেকেই আসছে চিৎকারটা।

সে ভেতরে প্রবেশ করবে কিনা, ভাবল আহমদ মুসা।

অবস্থার নাজুকতার দিক বিচার করার এবং এক মুহূর্ত নষ্ট করার অবকাশ নেই। সুতরাং কোন কিছুর দিকে না তাকিয়ে প্রথম তাকে শুক্র পুরি থেকে বের হওয়া দরকার।

কিন্তু পরক্ষণেই কোরআন শরীফের একটা আয়াতের কথা তার মনে পড়ল। যাতে মযলুম মানুষের ফরিয়াদে সাড়া দেয়াকে অপরিহার্য  করা হয়েছে।

আহমদ মুসা দাঁড়াল দরজার দিকে।

এখানেও আলফাবেটিক্যাল লক। আহমদ মুসা রিভারবাল পকেটে রেখে ডান হাতে স্টেনগান নিয়ে বাম হাত দিয়ে লক-এর কি-বোর্ডে টাইপ করল ‘হোয়াইট ঈগল’

দরজা খুলে গেল সংগে সংগে।

ভেতরে প্রবেশ করে আহমদ মুসা উদ্বেগের সাথে দেখল, সান ওয়াকার ছাদের সাথে উবু করে টাঙ্গানো। চোখ-মুখ রক্তের মত লাল। চোখ দুটি যেন তার বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে। নাক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

আহমদ মুসা সান ওয়াকারকে এক হাতে ধরে অন্য হাতে গুলি করল চামড়ার দড়িটায়।

সান ওয়াকার গড়িয়ে পড়ল আহমদ মুসার হাতে। দুর্বল কণ্ঠে বলল সান ওয়াকার, পানি, পানি চাই।

আহমদ মুসা ঘরে চারদিকে চাইল। পানি কোথাও নেই। বলল, একটু ধৈর্য ধরতে হবে সান ওয়াকার। এখানে থেকে না বেরুলে পানি পাওয়া যাবে না।

সান ওয়াকারের দাঁড়াবার শক্তি নেই আহমদ মুসা তাকে কাঁধে তুলে নিল। বাম হাতে তাকে ধরে রেখে ডান হাতে স্টেনগান বাগিয়ে কক্ষ থেকে বেরুচ্ছিল। পূর্ব দিক থেকে কতকগুলো। পায়ের শব্দ ছুটে আসার শব্দে আহমদ মুসা থমকে দাঁড়াল। উঁকি দিয়ে দেখল, স্টেনগান বাগিয়া ছুটে আসা চারজন দাঁড়াল আহমদ মুসার বন্দিখানার দরজায়, যেখানে এখন বন্দী আছে গোল্ড ওয়াটার, জেনারেল শ্যারণ এবং অন্যান্যরা।

ওরা দরজা খুলতে যাচ্ছে।

ওদের সমস্ত মনোযোগ দরজার দিকে।

আহমদ মুসা বাম পা করিডোরে নামিয়ে পূর্বমুখী হয়ে স্টেনগান পাঁজরে চেপে ডান হাতে ট্রিগার টিপল স্টেনগানের।

ওদের দু'জন শেষ মুহূর্তে দেখতে পেয়েছিল। স্টেনগান ঘুরিয়েও নিয়েছিল ওরা। কিন্তু ততক্ষণে আহমদ মুসার স্টেনগানের গুলীর ঝাঁক ওদের ঘিরে ধরেছে।

আহমদ মুসা গুলী করেই আবার ছুটল করিডোর ধরে পশ্চিম দিকে বাইরে বেরুবার পেছনের দরজা লক্ষে।

করিডোরের শেষ মাথাটা দেখা যাছে আরও কিছুটা পশ্চিমে।

দক্ষিণ দিকে চলে যাওয়া একটা শাখা। করিডোরের মুখে তখন সে।

বেশ পেছন থেকে একটা কণ্ঠ ভেসে এল 'ঐ যে যায়।

শুনেই আহমদ মুসা পশ্চিমমুখী যে ধামটা টা আর না ফেলে নিজের দেহটাকে কাত করে ছুড়ে দিল দক্ষিণের করিডোরে।

ঠিক সে সময়েই এক ঝাঁক গুলী চলে গেল করিডোর দিকে। তারা দাঁড়িয়ে থাকলে তাদের দু'জনের দেহটাই ঝাঁঝরা হয়ে যেত।

আহমদ মুসা পড়ে যাবার পর সান ওয়াকারের দেহটা ছিটকে গিয়েছিল তার উপর থেক।

আহমদ মুসার বাম কপালটা ঠুকে গিয়েছিল করিডোরের মেঝের সাথে। ছিঁড়ে গিয়েছিল কপাল। রক্ত নেমে এসেছিল কপাল থেকে।

ব্যাথা সামলাবার জন্যে আহমদ মুসা বাম হাতে কপালটা চেপে ধরে পড়ে যাবার সংগে সংগেই আবার উঠে দাঁড়াল। দ্রুত এগিয়ে দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে উঁকি দিল পূর্ব-পশ্চিম করিডোরের দিকে। দেখল ছুটে আসছে তিনজন স্টেনগান বাগিয়ে। মাঝে মাঝে গুলী করছে।

আহমদ মুসা স্টেনগান ঘুরিয়ে নিল ওদের দিকে। অপেক্ষা করল ওদের গুলীর বিরতির সময়টুকুর জন্যে।

সময়টা আসতেই আহমদ মুসা স্টেনগানের মাথা  দেয়ালের আড়ালের থেকে বের করে নিজেও কিছুটা এগিয়ে ট্রিগার টিপল স্টেনগানের।

ওদের আড়াল নেবার কোন আশ্রয় ছিল না। অসহায়ভাবে একঝাক গুলীর শিকার হল তিনজনই।

আহমদ মুসা পশ্চিমমুখী করিডোরে আর ফিরে না গিয়ে দক্ষিণের করিডরে ধরে এগুনোর সিদ্ধান্ত নিল। তার মনে পড়ল আঁকা বাঁকা করিডোরের শেষ প্রান্তে পেছনের দরজা দেখেছিল সে গোল্ড ওয়াটারের মিনি টিভি স্ক্রীনে।

উঠে দাঁড়িয়েছিল সান ওয়াকার।

আহমদ মুসা তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে গেল।

ধন্যবাদ। কষ্ট হলেও পারব হাঁটতে। বলল সান ওয়াকার।

ধন্যবাদ সান ওয়াকার। চল পেছনের দরজা আমাদের খুজে বের করতে হবে। পালানোর এটাই হবে সহজ পথ।

বলে আহমদ মুসা সান ওয়াকারের একটা হাত ধরে দ্রুত এগুলো দক্ষিণ দিকে।

সান ওয়াকার আহমদ মুসার হাতের উপর শরীরের অনেকখানি ভার ন্যাস্ত করে চলতে লাগল আহমদ মুসার সাথে।

একটু এগিয়ে করিডর পশ্চিম দিকে মোড়  নিয়েছে।

পশ্চিম দিকে চলল আহমদ মুসা। কিন্তু কয়েকগজ এগিয়ে সামনে তাকিয়ে হতাশা ও উদবগে ছেয়ে গেল তার মন। করিডোরের সামনে একটা ঘরের দরজা গিয়ে শেষ হয়েছে। সে চায় উপরে উঠার সিঁড়ি দরজা দিয়ে সে কি করবে।

থমকে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

ভাবল পেছনে ফিরে আবার পশ্চিমমুখী সেই করিডরে ফিরে যাবে নাকি!

এসময় আহমদ মুসা পিছনে ফেলে আসা করিডরে গুলীর শব্দ অনেকগুলো পায়ের শব্দ শুনতে পেল। পিছনে ফেরার কোন উপায় নাই।

সামনেই তাকে এগুতে হবে। ভাগ্যই যেন তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঠেলে নিয়ে চলছে।

দ্রুত এগিয়ে আহমদ মুসা ঘরটির দরজায় দাঁড়াল। এখানেও সেই আলফাবেটিক্যাল লক।

লকের কী-বোর্ড নক করতে করতে আহমদ মুসা ভাবল, আবার সে নিজ হাতে আরেক বন্দীখানায় প্রবেশ করছে কিনা।

কিন্তু উপায় নাই।

ঈগল-এর 'L' এ নক হবার সাথে সাথেই খুলে গেল দরজা।

সান ওয়াকারকে প্রথমে ঘরে ঢুকিয়ে নিজে ঘরে প্রবেশ করল। প্রবেশ করেই দরজা লাগিয়ে দিল।

গুলী এবং ছুটে আসা পায়ের শব্দ অনেক কাছে এসেছে।

দরজা লাগিয়েই আহমদ মুসা দরজা বন্ধ করার উপায় তালাশ করতে গিয়ে হঠাৎ আহমদ মুসার নজরে পড়ল দরজা বন্ধ করার আলীশান ব্যবস্থা।

দরজা সিটকানি ছাড়াও রয়েছে দুই চৌকাঠে আইরন বার দিয়ে দরজা বন্ধ করার গর্ত। মোটা একটা আইরন বারও ঝুলছে দরজার চৌকাঠের সাথে।

আহমদ মুসা দরজার সিটকানি বন্ধ করে আইরন বারটিও লাগিয়ে দিল।

দরজাও দেখল সে লোহার।

দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করার এ ব্যবস্থা দেখে প্রথমে বিস্মিত হয়ে ছিল আহমদ মুসা, কিন্তু পরক্ষণেই ভেবে খুশি হল যে, এই ঘর কোন বন্দীখানা নয়।

নিশ্চয় এটা আত্মরক্ষামূলক ঘর। না হলে দরজাটা লোহার এবং ভেতর থেকে ডাবল প্রটেকশনের ব্যবস্থা থাকবে কেন?

কিন্তু একটা ঘরে এই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা কেন? একটা ঘরে এভাবে আশ্রয় নিলে আত্মরক্ষা করা যায় না।

পরবর্তী আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হিসাবে এ ঘর থেকে নিরাপদ কোন পথে বাইরে যাবার উপায় অবশ্যই থাকতে হবে।

হঠাৎ আহমদ মুসা হলো পেছনের দরজায় পৌছার পথে এটা কোন ঘর নয় তো।

কিন্তু চারিদিকে চেয়ে চার দেয়ালে কোন দরজা দেখতে পেল না।

নিরেট পাথরের দেয়াল।

কিন্তু আহমদ মুসার মন বলল একটা দরজা থাকতেই  হবে কোন দেয়ালে।

আহমদ মুসা স্টেনগানের বাঁট দিয়ে দেয়ালে আঘাত করতে লাগল।

উত্তর ও পশ্চিম দেয়ালে ব্যর্থ হবার পর দক্ষিণ দেয়ালে আঘাত করতে লাগল।

দেয়ালের পাশ ঘেঁষে হাঁটছিল আর আঘাত করছিল আহমদ মুসা।

দরজার বাইরে পায়ের শব্দ, গুলিরও শব্দ। সান ওয়াকারের মুখ ভয় ও উদ্বেগে ফ্যাঁকাসে হয়ে উঠেছিল। অসহায় দৃষ্টি তার আহমদ মুসার প্রতি।

অসাধারণ ও অস্বাভাবিক মানুষটি কি শেষ রক্ষা করতে পারবে? পারবে কি তারা বাইরে বেরুতে।

আহমদ মুসা দক্ষিনের দেয়ালে স্টেনগানের বাঁট দিয়ে আঘাত করতে করতে দেয়ালের মাঝামাঝি এক জায়গায় এসে দাঁড়াতেই ভোজবাজির মত দেয়ালটা ফাক হয়ে দু'দিকে সরে গেল এবং বেরিয়ে পড়ল উপরে উঠার একটা সিঁড়ি পথ।

আহমদ মুসা 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ফেলল।

সান ওয়াকার নতুন প্রাণ পাওয়ার মত সজীব হয়ে উঠেছ। আহমদ মুসার প্রতি তার অসীম কৃতজ্ঞ দৃষ্টি।

এস সান ওয়াকার’ বলে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করল।

সান ওয়াকারের দুর্বল শরীর। খাড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠতে তার কষ্ট হচ্ছিল। দেখে আহমদ মুসা কয়েক ধাপ নেমে এসে তার হাত ধরে টেনে তুলতে লাগল। সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে দেখল অন্যন্ত পুরু ইস্পাতের প্লেট দিয়ে তৈরী ঢাকনা দিয়ে সিঁড়ির মুখ বন্ধ।

আহমদ মুসা দেখেই বুঝল, হুড়কো বা সিটকানি জাতীয় কিছু দিয়ে ঢাকনাটি বন্ধ করা নয়। তাহলে নিশ্চয় দরজা খোলার ইলেকট্রনিক কোন ব্যবস্থা আছে ভাবল আহমদ মুসা।

অন্যসব দরজায় ইলেকট্রনিক লকের সব কী-বোর্ড খুজতে লাগল আহমদ মুসা।

খুজল দরজা এবং তার চারপাশে। না কিছুই নেই। তারপর দেখল সিঁড়ির ল্যান্ডিং এবং তিন দিকের দেয়ালে। প্রথম সন্ধানে লকের কী-বোর্ড ধরণের কছুই চোখে পড়ল না।

নিচে দরজায় তখন প্রবল ধাক্কা। দরজা ভাঙার চেষ্টা করা হচ্ছে।

সান ওয়াকারের দুর্বল শরীর কাঁপছে তখন। বলল, ‘দরজা খোলার কোন উপায় পাওয়া যাচ্ছা না।

‘আল্লাহ একটা  উপায় বের করে দিবেনই’ বলে আহমদ মুসা আবার চারদিকে চোখ বুলাতে শুরু করল।

এক জায়গায় এসে তার চোখটা আটকে গেল। দেখল, দেয়ালের এক জায়গায় পেন্সিলের অস্পষ্ট আঁচড়ে মুষ্টিবদ্ধ হাত আঁকা।

হঠাৎ আহমদ মুসার মনে পড়ল গ্রীকদের ধাধার প্রাসাদের কাহিনী।

যেখানে ছবির ইংগিত অনুসরণ করে পথ সন্ধান করে ধাঁধার চক্র ভেঙ্গে ফেলা হয়।

এই চিন্তার সাথে সাথে আহমদ মুসা মুষ্টিবদ্ধ ছবির উপর একটা মুষ্ট্যাঘাত করল। সংগে সংগে তার পাশের দেয়াল ফুড়ে বেরিয়ে এল ইলেকট্রনিক লক-এর কী বোর্ড।

মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠক আহমদ মুসার। কী বোর্ডটি আগের গুলোর মতই আলফাবেটিক্যাল।

আহমদ মুসা মুহূর্ত দেরী না করে কী-বোর্ডে টাইপ করল আগের মতি।'হোয়াইট ঈগল' কিন্তু দরজা খুলল না।

বিস্ময়ে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল আহমদ মুসার। ভাবল, এখানে তাহলে ভিন্ন 'বোর্ড' ব্যবহার করা হয়েছে। কি সে বোর্ড? এতক্ষণে প্রবল একটা হতাশা এসে ঘিরে ধরল আহমদ মুসাকে।

কিন্তু তা মুহূর্তের জন্যে। পর মুহূর্তেই সান ওয়াকারের দিকে চেয়ে বলল, 'আমাদের ধর্মে আছে, আল্লাহর সাহায্যের ব্যাপারে কখনও হতাশ হতে নেই। দেখ একটা একটা পথ আল্লাহ বের করে দিবেনই।

হঠাৎ আহমদ মুসার চোখে পড়ল কী-বোর্ডের মাথার হোয়াইট ঈগলের একটা অস্পষ্ট ছবি। সাদা বোর্ডের উপর সাদা ঈগলটি পা উপরে তুলে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে।

দেখেই আহমদ মুসা বুঝল ছবিটি নিরর্থক নয়। কিন্তু ছবিটি এমন অস্বাভাবিক কেন? কোন ইংগিত দিচ্ছে কি ছবিটি?

মুহূর্ত কয়েক ভাবল আহমদ মুসা।

হঠাৎ তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দ্রুত 'কী বোর্ডের উপর আবার আঙ্গুল চালাল আহমদ মুসা। এবার টাইপ করল পরের শব্দটা আগে এনে। ঈগল হোয়াইট টাইপ করার সাথে সাথেই সিঁড়ি মুখের দরজা নিঃশব্দে সরে গেল।

স্টেনগান বাগিয়ে আহমদ মুসা আগে উঠল সিঁড়ি থেকে উপরে। গোল্ড ওয়াটারের টিভি স্ক্রীনে দেখা সেই একতলার ছাদ এটা।

ছাদের চারদিকে ভাগাড়, ময়লা আবর্জনা ভর্তি। তার চারদিক দিয়ে কাঁটাতারের বেড়া। চারদিকে আবর্জনার মধ্যে ছোট এক তলাটি পরিত্যক্ত এক আবর্জনার মতই দাঁড়িয়ে আছে।

আহমদ মুসা দেখল, ছাদ থেকে একটা সিঁড়ি ঘরের ভিতরে নেমে গেছে।

আহমদ মুসা সান ওয়াকারকে হাত ধরে টেনে উঠল। তারপর তার হাত ধরেই সিঁড়ি দিয়ে ঘরের ভেতরে নামল।

ঘরের মেঝে পাকা। ধুলোবালি ছাড়া অন্য কোন আবর্জনা নেই।

মেঝেতে নেমেই আহমদ মুসা দেখতে পেল, ঘরের পশ্চিম পাঁশের দেয়ালে একটা সুড়ঙ্গ।

আহমদ মুসা উঁকি দিয়ে দেখল, সুরঙ্গটি একটা কনক্রিটের পাইপের মধ্য দিয়ে বেয়ে গেছে। এটাই কি এখান থেকে বের হবার পথ? এইসময় ঠিক ঘরটির ছাদেই পায়ের শব্দ শুনতে পেলে আহমদ মুসা।

ওরা এসে গেছে আর এক মুহূর্ত দেরী করা যায় না।

আহমদ মুসা সান ওয়াকারকে সুড়ঙ্গ দেখিয়ে বলল, 'এর ভিতর দিয়ে যেতে পারবে তো?'

'আপনি ভাববেন না, আমি পারব।' বলল সান ওয়াকার।

সান ওয়াকারকে ঢুকে গেল আগে। আহমদ মুসা পিছনে।

আহমদ মুসা সুড়ঙ্গে ঢুকে ঘরের দিকে স্টেনগান বাগিয়ে বসল।

সান ওয়াকার কিছুটা এগিয়ে পেছনে তাকিয়ে বলল, 'আপনি আসছেন না যে?'

'ওরা এসে গেছে। আমি ওদের আটকাই। তুমি এগোও। আমি তাড়াতাড়ি চলে আসতে পারব।' আহমদ মুসা বলল।

সান ওয়াকার আবার চলতে শুরু করল।

ওরা ঝড়ের বেগে সিঁড়ি দিয়ে ঘরের মেঝেয় নামল। ছয়জন ওরা। এদিক-ওদিক তাকিয়ে ওরা এগুলো সুরঙ্গের দিকে।

ভেগেছে ওরা সুরঙ্গ দিয়ে। ব্যাটা যাদুকর নাকি! কোন বাঁধাই তাকে আটকতে পাড়ল না। বলল ওদের একজন।

কথা নয় এস তোমরা। শয়তান যাবে কোথায়? বলল ওদের সামনের নেতা গোছের লোকটি। ওরা এল সুরঙ্গের সামনে।

‘এস, শয়তান কোথাও যায়নি।’ বলে আহমদ মুসা সুরঙ্গের মুখে এসে স্টেনগানের ট্রিগারে আঙ্গুল রেখে ঘুরিয়ে নিল অর্ধচন্দ্রাকারে।

ওরা ছয়জন ভুত দেখার মত চমকে উঠল। স্টেনগান ঘুরিয়ে নিচ্ছিল ওরা।

আহমদ মুসা প্রস্তুত স্টেনগান তার আগেই অগ্নি বৃষ্টি করল।

ঝরা পাতার মত মাটিতে আছড়ে পড়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল ওদের ছয়টি দেহ।

আহমদ মুসা মুহূর্ত কয়েক অপেক্ষা করল। না কোন শব্দ আসছে না। ওদের পিছনে যারা আসছে। তারা এসে পৌঁছায়নি এখনও। ওরা আসার আগেই তাকে সুরঙ্গ পার হতে হবে। ভাবল আহমদ মুসা। তারপর ছুটল সুরঙ্গ ধরে ক্যাঙ্গারুর মত লাফিয়ে লাফিয়ে। সুরঙ্গের মুখ একটা ঝোপে এসে শেষ হয়েছে।

আহমদ মুসা সুরঙ্গ থেকে বের হয়ে দেখল, ঝোপের মধ্যে শুয়ে পড়েছে সান ওয়াকার। হাঁপাচ্ছে সে। হামাগুড়ি দিয়ে আসতে কষ্ট হয়েছে তার।

আর দেরী করা যাবে না।

আহমদ মুসা কাঁধে তুলে নিল সান ওয়াকারকে। ছুটল তারপর গাছ-গাছড়ার মধ্য দিয়ে।

সামনেই পশ্চিম দিকে গাড়ি চলাচলের শব্দ কানে আসছে।

নিশ্চয় রাস্তা খুব কাছে।

রাস্তা লক্ষ করে ছুটল আহমদ মুসা সান ওয়াকারকে কাঁধে নিয়ে।

রাস্তার পাশে পার্কিং কর্ণারে গাড়ি পার্কিং করে বসে আছে মেরী রোজ।

মেরী রোজ ও শিলা সুসান দু’জনে দুই গাড়ি নিয়ে এসেছে।

গাড়ি নিয়ে তারা দু’জন গোল্ড ওয়াটারের বাড়ির (হোয়াইট ঈগল-এর হেড কোয়ার্টার)আশে পাশে একটা চক্কর দেয়ার পর শিলা সুসান গাড়ি নিয়ে মেরী রোজকে এখানে দাঁড়াতে বলে ফিরে গেছে সে গোল্ড ওয়াটারের বাড়ির সামনে।

বার বার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে মেরী রোজ।

শিলা সুসান যাবার পর আধ ঘন্টা হয়ে গেছে। এতক্ষন সে কোন কাজে দেরী করবে, কোথায় দেরী করবে?

এদিক ওদিক পায়চারী করে আবার সে গাড়ির সিটে এসে বসল। ভাবল সে, অপেক্ষা করার মত কঠিন কাজ কিছু নেই। তবু ভালো লাগছে তার এই ভেবে যে সান ওয়াকারের জন্যেই সে এখানে এসেছে, তার জন্যে কষ্ট করা আসলেই আনন্দের।

সান ওয়াকারের কথা মনে হতেই বেদনায় জর্জরিত হয়ে গেল তার মন। মনে পড়ে গেল তার অতীতের কথা। অত্যন্ত প্রতিভাবান লাজুক এই রেড ইন্ডিয়ান তরুনকে সে কত কষ্ট দিয়েছে, নানাভাবে নাজেহাল করেছে ঘৃণাসুচক 'কালার'ড নামে ডেকে। কোনদিন কোনকিছুরই প্রতিবাদই করেনি সে। সবকিছুর জবাবে এমনভাবে হেসেছে যেন সেই বিজয়ী আর মেরী রোজ পরাজিত। সে যেন শক্ত এক পাথর। ঘৃণার যে বুলেটই মেরী রোজ ছুড়েছে, সব বুমেরাং হয়ে ফেরত এসেছে মেরী রোজের কাছেই। শেষে মেরী রোজ সত্যিই পরাজিত হয়েছে। নিজের অজান্তেই কখন যেন তার হৃদয় বাধা পড়ে গেছে সান ওয়াকারের কাছে। সমগ্র সত্ত্বা দিয়ে সে ভালোবেসে ফেলেছে সান ওয়াকারকে। যেদিন সে প্রথম এটা বুঝল, অনেক কেঁদেছে সেদিন। কেঁদেছে সে তার অমুলক বর্ণবাদী অহংকারের জন্য। সোজা গিয়ে সে নিজেকে সমর্পণ করেছে সান ওয়াকারের কাছে। সান ওয়াকার অতীতের দিকে একটুও না তাকিয়ে দু'হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করেছে মেরী রোজকে। আবেগে কেঁদে ফেলে বলেছে, 'রোজ, আমি এ দিনেরই অপেক্ষা করেছি।'

ভাবতে ভাবতে মেরী রোজ-এর চোখ দু'টি অশ্রুসজল হয়ে উঠল।

অতীতের স্মৃতির মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে মেরী রোজ।

পেছনে শব্দ ও গাড়ির ঝাঁকুনীতে সম্বিত ফিরে পেল মেরী রোজ।

চোখ তুলতেই সে দেখতে পেল স্টেনগানধারী একজন যুবককে। সেই গাড়ির পেছনে কাউকে শুইয়ে দিয়েছে। সেদিকে তাকাতেও সাহস পেলনা মেরী রোজ।

দ্রুত এগিয়ে আসছে যুবকটি তার দিকে।

যুবকটি এগিয়ে এসে স্টেনগানের ব্যারেলটি তার দিকে তুলে বলল, ‘গাড়ি আমাদের দরকার, আপনি সহোযোগিতা করুন। আপনি ঠিক সিটে বসে থাকুন। আমি ড্রাইভিং-এ বসছি।’

বলেই যুবকটি একলাফে উঠে ড্রাইভিং সিটে বসল। বসতে বসতে বলল, ‘কোনও প্রকার অসহোযোগিতা করলে কিন্তু আমি গুলি করতে বাধ্য হবো। নিশ্চিত থাকুন আপনার কোন ক্ষতি হবে না।’

গাড়ি স্ট্রার্ট দিল যুবকটি।

কিন্তু গাড়ি চলতে শুরু করার আগেই পেছনে ব্রাশফায়ারের শব্দ হলো।

যুবকটি মাথা নিচু করল এবং মেয়েটিকে সিটে শুয়ে পড়তে বলল।

লাফিয়ে উঠে চলতে শুরু করেছে গাড়ি। তীব্র গতিতে এগিয়ে চলছে গাড়ি। গুলীর শব্দ তখন অনেকটা পেছনে গেছে। কিন্তু গাড়ির গতি স্লো হয়নি।

গুলীর হাত থেকে বাঁচলেও গাড়ির গতি দেখে আতংকিত হলো মেরী রোজ। এভাবে চললে হয় এ্যাকসিডেন্ট করবে, নয়তো পুলিশের হাতে পড়তে হবে। পুলিশের হাতে পড়লে তার জন্যে ভাল। কিন্তু এ্যাকসিডেন্ট করলে জীবন বাঁচবে না।

কিন্তু বিস্মিত হলো মেরী রোজ যে, যুবকটি অবিশ্বাস্য দক্ষতার সাথে নিজে বেঁচে এবং সবাইকে বাঁচিয়ে এগিয়ে চলছে ঝড়ের গতিতে। রাস্তার বাঁক অতিক্রম কালে তার দক্ষতা দেখার মত। যেন গাড়ি তার কাছে হাতের একটা খেলনা। যখন ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা, যতটা ইচ্ছা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিচ্ছে।

মিনিট সাত আট চলার পর যুবকটি গাড়ির গতি কিছুটা স্লো করল। বলল, ‘ম্যাডাম, আপনার গাড়িতে পানি দেখেছি। পানি কি নিতে পারি? আমার অসুস্থ বন্ধুটি ভয়ানক তৃষ্ণার্ত।’

মেরী রোজ মনে মনে বলল, যুবকটি যেই হোক, ভদ্র। চেহারায় ক্রিমিনাল নয়, শরীরে ভদ্রলোকের ছাপ। কথাও পোশাকী ভদ্রগোচের নয়, কথার মধ্যে সম্মান ও আন্তরিকতার ছাপ আছে।

যুবকটির কথার উত্তর না দিয়ে মেরী রোজ তাকাল পেছনে শুইয়ে রাখা যুবকটির বন্ধুটির দিকে।

পেছনে তাকিয়ে আর্তচিৎকার করে উঠল মেরী রোজ, 'সান ওয়াকার তুমি! একি তোমার হাল!'

বলে মেরী রোজ লাফ দিয়ে সিট ডিঙ্গিয়ে পেছনে চলে গেল। ঝাঁপিয়ে পড়ল সান ওয়াকারের বুকে।

এতক্ষণ সান ওয়াকার চোখ বুঝে পড়েছিল। মেরী রোজ-এর চিৎকারে সে চোখ খুলল। জড়িয়ে ধরল বুকে ঝাঁপিড়ে পড়া মেরী রোজকে।

বিস্মিত আহমদ মুসা মহুর্তেই বুঝল, নিশ্চয় মেয়েটি সান ওয়াকারের স্ত্রী বা কোন একান্ত আপনজন। খুশি হল এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল আহমদ মুসা। এই মহুর্তে সান ওয়াকারের একটা নিরাপদ আশ্রয় প্রয়োজন।

ওদিকে মেরী রোজ-এর অনেক কথার জবাবে সান ওয়াকার বলল, 'মরেই যাচ্ছিলাম, অপরিচিত ঐ মহান যুবকটি মৃত্যুর সাথে লড়াই করে অসম্ভবকে সম্ভব করে আমাকে নতুন জীবন দিয়েছেন।'

'সান ওয়াকার ঈশ্বরকে ডাক। এখনও বিপদ কাটেনি। পেছনে মনে হচ্ছে ওদের কয়েকটা গাড়ি পাগলের মত ছুটে আসছে।'

বলেই আহমদ মুসা তার গাড়ির স্পীডও বাড়িয়ে দিল।

সান ওয়াকার ও মেরী রোজ দু'জনেই পেছনে তাকাল। দেখল ঠিকই দুরে কয়েকটা গাড়ি একই গতিতে পাগলের মত ছুটে আসছে।

দু'জনের মুখই ভয় ও উদ্বেগে পাংশু হয়ে গেল।

'সান ওয়াকার তোমার তৃষ্ণা কি এখনও আছে?' পেছনে না তাকিয়েই ঠোঁটে হাসি টেনে বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার কথায় মেরী রোজ তাকাল সান ওয়াকারের দিকে। বলল, 'স্যরি ভুলে গেছি। দিচ্ছি পানি।'

বলে মেরী রোজ ড্যাশবোর্ডে রাখা বোতল নিয়ে পানি খাওয়াবার জন্যে এগুলো সান ওয়াকারের দিকে।

পানি খেয়ে সান ওয়াকার কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'আপনি কে, জানিনা বন্ধু, কিন্তু ঈশ্বর আপনাকে তার দয়ার সবটুকু ঢেলে দিয়েছেন। সবদিকেই আপনি সমান নজর রাখতে পারেন।'

আহমদ মুসা সান ওয়াকারের কথার দিকে কোন কান না দিয়ে বলল, 'ম্যাডাম, সান ওয়াকারকে কোথায় নিতে পারি?'

বিপদে পড়ল মেরী রোজ। কোথায় নিতে বলবে সান ওয়াকারকে? বিশ্ববিদ্যালয় কি তার জন্যে নিরাপদ? না। পুলিশের আশ্রয় নেবে? তাও নিরাপদ নয়। পুলিশের আশ্রয় থেকে ওরা সান ওয়াকারকে নিয়ে যাবে। নিজের বাড়িতে নেবে সান ওয়াকারকে মেরী রোজ? সেটাও সম্ভব নয়। তার আব্বা এসব হাঙ্গামা থেকে মেরী রোজকে দুরে থাকতে বলেছেন। কোন উত্তর খুঁজে পেলনা মেরী রোজ। অসহায় দৃষ্টিতে তাকাল সে সান ওয়াকারের দিকে। অশ্রুতে ভরে উঠেছে তার চোখ। নিজের দেশ নিজের নগরীতে কোন নিরাপদ স্থান খুঁজে পেল না সান ওয়াকারের জন্যে।

সান ওয়াকারও নির্বাক।

আহমদ মুসাই কথা বলল আবার। বলল, 'আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নতুন। আমাকে শহর থেকে বেরুবার পথ বলে দিন।'

মেরী রোজ চোখ মুছে বলল, 'যে পথ দিয়ে চলছেন, সে পথ দিয়ে সোজা পশ্চিমে এগুলে পটোম্যাক নদীর ব্রীজে পৌছা যাবে। ব্রীজ পেরোলেই অরলিংটন, প্রবেশ করা যাবে ভার্জিনিয়ায়।'

'ধন্যবাদ।' বলে আহমদ মুসা রিয়ার ভিউ-এর দিকে একবার তাকিয়ে সামনের দিকে মনোযোগ দিল।

অনুসরণকারী গাড়ি বলে যাদের সন্দেহ তারা একই দুরুত্বে রয়েছে।

পটোম্যাক ব্রীজ পার হয়ে অরলিংটন সমাধি ভুমিকে বামে রেখে এক্সপ্রেসওয়ে ধরে এগিয়ে চলল আহমদ মুসার গাড়ি।

এক্সপ্রেসওয়ে ধরে ঝড়ের বেগে এগিয়ে চলল সে।

মেরী রোজ-এর গাড়িটি নতুন এবং আমেরিকান গাড়ি। স্পীড ভালো। সুতরাং পেছন থেকে এসে ওরা ধরে ফেলবে, এ সম্ভাবনা কম। আবার সামনে

থেকে এসে ঘিরে ফেলবে, নগরী থেকে বেরুবার পর এ সম্ভাবনাও কমে গেছে। কিন্তু এভাবে প্রতিযোগিতার দৌড়ে বাঁচা তো সমস্যার সমাধান নয়।এসব চিন্তা করে বলল আহমদ মুসা, 'সান ওয়াকার, ওরা আমাদের পিছু ছাড়বেনা।'

'তাই তো দেখা যাচ্ছে।' উদ্বিগ্ন কন্ঠে বলল মেরী রোজ।

'ওদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সরে পড়া ও তো সম্ভব নয়।' আহমদ মুসা বলল অনেকটা স্বগত কন্ঠে।

'তাহলে।' বলল মেরী রোজ শুকনো কন্ঠে।

'লড়াইয়ে নামা ছাড়া পথ নেই। তবে ভয় নেই, যুদ্ধ ঘোষণা আমরা করব, সেহেতু যুদ্ধের নেতৃত্ব আমাদের হাতেই থাকবে।'

'কিন্তু তিন গাড়িতে ওরা অনেক লোক হবে।' বলল মেরী রোজ ভীত কন্ঠে।

'ভয় নেই আমাদের হাতে এখন দু'টি স্টেনগান। আর সংখ্যা শক্তি আধুনিক যুদ্ধ জেতার নিয়ামক নয়।'

মেরী রোজ ও সান ওয়াকার বিস্মিত চোখে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। শুরু থেকেই মেরী রোজ দেখছে, বিপদে পড়ার কোন চাপ আহমদ মুসার মুখে নেই। বিপদটা যেন তার কাছে খেলা।এখন লড়াইয়ে নামার কথা এমনভাবে বলছে যেন যুদ্ধে কি হবে তা নিশ্চিতভা্বেই জানে। অন্যদিকে সান ওয়াকার ভাবছে, সাধারণ মাপের এই অসাধারণ যুবকটি কে? লড়াই সম্পর্কে সে যে কথা বলছে তার বিন্দু বিসর্গও অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে না। যে লড়াই করে সে হোয়াইট ঈগলের ঘাটি থেকে বেরিয়ে এসেছে, তাতে করে তার অসাধ্য কিছুই নেই।

হঠাৎ আহমদ মুসা উৎকর্ণ হয়ে উঠল।

পর মুহূর্তেই আহমদ মুসা পেছনে তাকিয়ে বলল, 'পেছন থেকে বড় একটা বিপদ আসছে সান ওয়াকার।'

মেরী রোজ ও সান ওয়াকার দু'জনেই পেছন দিকে তাকাল উদ্বিগ্ন চোখে। কিছুই না দেখে বলল সান ওয়াকার, 'কি বিপদ, কিছুই তো দেখছি না তিনটি গাড়ি ছাড়া।'

'কান পেতে শোন হেলিকপ্টার আসছে।'

সান ওয়াকার ও মেরী রোজ দু'জনেই উৎকর্ণ হয়ে পর মুহূর্তে বলল, 'হ্যাঁ দূরে হেলিকপ্টারের শব্দ শোনা যাচ্ছে। তাতে কি?'

'শুধু গাড়ি নয়, এবার হেলিকপ্টারও আমাদের পিছু নেবে। হেলিকপ্টার দিয়ে রোড ব্লক করে আমাদের ধরতে চেষ্টা করবে অবশেষে।'

মুহূর্তে মেরী রোজ ও সান ওয়াকারের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। ভয় ও উদ্বেগে পাংশু হয়ে উঠল তাদের মুখ।

হেলিকপ্টারের শব্দ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আরও কয়েক মুহূর্ত পর দূর দিগন্তে একটি ছুটে আসা হেলিকপ্টারের অবয়ব স্পষ্ট হয়ে উঠল।

ভাবছিল আহমদ মুসা। সান ওয়াকার ও মেরী রোজ উদ্বেগ-আতংক নির্বাক। তারা জানে, হেলিকপ্টারের সাথে পাল্লা দিয়ে গাড়ি পারবে না। মেরী রোজ-এর মনে পড়ল মার্কিন গোয়েন্দাদের একটা বাস্তব অপারেশনের কাহিনীর কথা। সে কাহিনীতে গোয়েন্দা হেলিকপ্টারের শক্তিশালী চুম্বক রশি নিচে পলায়নপর ক্রিমিনালদের গাড়ি আটকে ফেলেছিল শূন্যে তুলে নিয়ে। হোয়াইট ঈগলের মত সংস্থার এ ধরনের ব্যবস্থা তো থাকতেই পারে।

মেরী রোজ অসহায়ভাবে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। সান ওয়াকারও।

আহমদ মুসার দিকে গভীরভাবে ভাবতে গিয়ে হঠাৎ মেরী রোজ-এর মনে পড়ল শিলা সুসানের কাছে শোনা আহমদ মুসার কথা। চমকে উঠল মেরী রোজ, এ যুবকটিই আহমদ মুসা নয়তো? সে না হলে এ আর কে হবে? বিশেষ করে যুবকটি যখন এশিয়ান চেহারার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যখন এই প্রথম সে আর তারা আশাও করছিল আহমদ মুসাই সান ওয়াকারকে উদ্ধার করতে পারে বন্দীখানা থেকে।

আহমদ মুসাকে আহমদ মুসা বলে ভাবতে গিয়ে মেরী রোজ-এর মনে আশার সঞ্চার হলো। সে শিলা সুসানের কাছে শুনছে, আহমদ মুসা অসাধ্য সাধন করতে পারে। সে নিশ্চয় বাঁচার একটা পথ বের করবেই।

মেরী রোজের চিন্তা আর এগুতে পারল না। আহমদ মুসা একটু মুখ ঘুরিয়ে মেরী রোজ ও সান ওয়াকারকে লক্ষ্য করে বলল, 'তোমরা কিছু ভাবছ?'

'আমরা কিছুই ভাবতে পারছি না।' বলল সান ওয়াকার।

‘একটাই পথ, আমি নিরাপদ জায়গা দেখে তোমাদের নামিয়ে দেব এবং গাড়ি নিয়ে আমি সামনে এগিয়ে যাব। হেলিকপ্টার ও গাড়িগুলো আমাকে তাড়া করে চলে গেলে তোমরা পালাবার ব্যবস্থা করবে।’

মেরী রোজ ও সান ওয়াকারের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সত্যিই তারা বাঁচতে পারে। কিন্তু পরক্ষনেই নিভে গেল তাদের মুখের আলো। বলল মেরী রোজ, ‘আমাদের বাঁচার ব্যবস্থা হলো, কিন্তু আপনি তো ধরা পড়ে যাবেন।’

‘সবাই এক সাথে বাঁচার চেষ্টা করলে সবাই ধরা পড়ে যাব। ভয় নেই, তোমাদের বাঁচাটা নিশ্চিত হবার পর আমি বাঁচার চেষ্টা করব। চেষ্টা সফল না হলে হয়তো ধরা পড়ব। কিন্তু তাতেও একটা লাভ হবে, সবাই ধরা পড়লাম না।’

স্তম্ভিত হয়ে গেল মেরী রোজ ও সান ওয়াকার দু’জনেই আহমদ মুসার কথা শুনে। নিজের ধরা পড়ার কথা এমনভাবে, এমন নিরুদ্বিগ্ন মুখে বলল যেন ধরা পড়াটা কোন ব্যাপারই নয়। অথচ মেরী রোজ জানে, বিলিয়ন ডলারে বিক্রি করা হবে আহমদ মুসাকে তার চরম শত্রু ইহুদী গোয়েন্দাদের কাছে। মনে কষ্ট লাগল মেরী রোজ-এর। বলল, ‘সব বিপদ আপনার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে আমরা কেমন করে সরে পড়ব?’

আহমদ মুসা গম্ভীর কণ্ঠে বলল, ‘দেখ, আমি এখন তোমাদের অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করছি। আমার দেয়া সিদ্ধান্ত তোমাদের মানতে হবে। তাছাড়া সান ওয়াকার অসুস্থ। তার নিরাপত্তাই প্রথম বিবেচ্য। আর তার সাথে তুমি না থাকলে সে একা বিপদে পড়বে নিজেকে নিয়েই। সুতরাং তোমাদের দু’জনকেই নামতে হচ্ছে।’

বলে আহমদ মুসা একটা দম নিয়ে তাদেরকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বলল, ‘আমার মনে হচ্ছে আমরা টিলা, আঁকা-বাঁকা ও বনবাদাড় পূর্ণ রাস্তায় প্রবেশ করতে যাচ্ছি। তোমাদের একটা ভালো জায়গায় নামিয়ে দেব। হেলিকপ্টার ও শত্রু গাড়িগুলো চলে না যাওয়া পর্যন্ত তোমাদের খুব সাবধানে ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করতে হবে। ওরা চলে গেলে রাস্তার পাশে কোন ঝোপে আশ্রয় নিয়ে তোমাদেরকে গাড়ি তালাশ করতে হবে।’

গাড়ি প্রবেশ করল টিলাপূর্ণ আঁকা-বাঁকা রাস্তায়। টিলাগুলো গাছ ও ঝোপ-ঝাড়ে ঢাকা।

ফুলস্পীডে চলছিল আহমদ মুসার গাড়ি। সান ওয়াকারদের নামিয়ে দিতে যে সময় যাবে, তা এই ভাবে সঞ্চয় করতে চায় আহমদ মুসা।

আঁকা-বাঁকা রাস্তায় গাড়ির এই গতি দেখে ভয়ে শ্বাস রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল মেরী রোজ ও সান ওয়াকারের।

গাড়িটা গভীর জংগলে একটা টিলার প্রান্তে উপত্যকার মুখে হার্ড ব্রেক কষে দাঁড়াল তারা যেন প্রাণ ফিরে পেল।

গাড়ি থামতেই আহমদ মুসা দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির টিলার দিকের দরজা খুলে দিয়ে বলল, 'দ্রুত নাম।'

দ্রুত নামল তারা দু'জন।

থেমেই মেরী রোজ বলল, 'মাফ করবেন আপনি আহমদ মুসা নন কি?'

আহমদ মুসা চমকে উঠে তাকাল মেরী রোজ-এর দিকে। তারপর গাড়ির দরজা বন্ধ করে এবং সুইচ টিপে ছাদ দিয়ে গাড়ির উন্মুক্ত অংশ ঢেকে দিতে দিতে বলল, 'সত্যি বলেছেন। ফটো দেখে চেনেন, না শুনেছেন কারও কাছে?'

'শিলা সুসানের কাছে শুনেছি। সেও আজ আরেকটা গাড়িতে ওখানে আমার সাথে ছিল।' বলল মেরী রোজ।

আহমদ মুসা গাড়িতে উঠার জন্যে ড্রাইভিং দরজা খুলে ফেলেছিল। মেরী রোজ-এর কথা শুনে সংগে সংগেই ঘুরে দাঁড়াল আহমদ মুসা। বলল, 'সে ওখানে ছিল আপনার সাথে? তাহলে চিন্তা নেই, সে এদিকে আসবে। তোমরা তার অপেক্ষা কর।'

'কেমন করে এ কথা বলছেন?' মেরী রোজ বলল চোখ কপালে তুলে।

আহমদ মুসা ড্রাইভিং সিটে উঠে বসে দরজা বন্ধ করে গাড়ি স্টার্ট দিতে দিতে বলল, 'বাহামার হোয়াইট ঈগল-এর নেতা জর্জ ফার্ডিনান্ডের মেয়ে শিলা সুসানকে আমি জানি।'

গাড়ি চলতে শুরু করলে মুখ ফিরিয়ে চাপা কণ্ঠে বলল, 'আবার এতক্ষণ তোমরা দাঁড়িয়ে আছ। যাও যা বলেছি তাই করবে।'

ঝড়ের গতি নিয়ে ছুটে চলে গেল আহমদ মুসার গাড়ি।

গভীর জংগলের দিকে ছুটতে ছুটতে মেরী রোজ বলল, ‘সত্যি মনটা খারাপ হয়ে গেল। মনে হচ্ছে কোন আপনজন যেন আমাদের ছেড়ে চলে গেল।’

‘ঠিক বলেছ রোজ। এমন মানুষ আমি দেখিনি যে মাত্র এক ঘন্টায় হৃদয়ে ঢুকে জয় করে নিতে পারে। এই আহমদ মুসা কে?’

‘চল, বলব। এটুকু জেনে রাখ, শত ক্যাস্ট্রো, শত চেগুয়েভারা এবং শত হোচিমিনকে জোড় দিলেও তার মত বিপ্লবী হবে না।’

ছুটছে তখন আহমদ মুসার গাড়ি।

অরলিংটন এলাকা পার হয়ে ভার্জিনিয়ার মধ্যে দিয়ে পশ্চিমমুখী এক্সপ্রেসওয়ে ধরে এগিয়ে চলছে আহমদ মুসা।

দক্ষিণমুখী আরেকটা এক্সপ্রেসওয়ে সে পেল। কিন্তু সড়কটি উন্মুক্ত সমভুমির মধ্যে দিয়ে চলে গেছে। আহমদ মুসা ঝোপ-ঝাড় ও উঁচু-নিচু টিলার মধ্যে দিয়ে চলে যাওয়া পশ্চিমমুখী সড়ককেই পছন্দ করল।

পেছনের অনুসরণকারী গাড়ি যতখানি দূরত্বে ছিল তার বেশী এগুতে পারেনি। কিন্তু হেলিকপ্টার অনেকখানি কাছে চলে এসেছে। তবু এখনও ১৫ ডিগ্রি কৌণিক দূরত্বে রয়েছে। কিন্তু হেলিকপ্টার অন্তত ৪০ ডিগ্রি কৌণিক অবস্থানে চলে এলে তার চোখকে ফাঁকি দিয়ে সরে পড়া কঠিন হবে।

আরও কিছুটা চলার পর হেলিকপ্টার আহমদ মুসার গাড়ি থেকে ২৫ ডিগ্রি কৌণিক দূরত্বে চলে এল। হেলিকপ্টারটি দ্রুত এগিয়ে আসছে। আহমদ মুসা গাড়ির সর্বোচ্চ স্পীড ব্যবহার করেও দূরত্ব বাড়াতে পারছে না কমছেই।

আহমদ মুসা ভাবল আর কিছুক্ষণের মধ্যে যদি সে সরে পড়ার কোন ব্যবস্থা না করতে পারে তাহলে হেলিকপ্টারের নজরে সে বাঁধা পড়ে যাবে।

কিন্তু কিভাবে সে সরে পড়বে?

গাড়ি নিয়ে পালানো যাচ্ছে না।

গাড়ি থেকে নেমে পালানো কঠিন হবে।

গাড়ি তখন একটা ব্রীজের মুখে এসে পড়েছে। ব্রীজ মানে নদী। নদীর কথা মনে হতেই নতুন প্রাণ পেল আহমদ মুসা। কোন নদী এটা? ভার্জিনিয়ার

মানচিত্র যতটুকু স্মরণ আছে তাতে মনে হয় এটা পটোম্যাক নদী থেকে বেরিয়ে আসা সেনেনদোয়া বনাঞ্চলের সেনেনদোয়া নদী।

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল আহমদ মুসা।

ব্রীজের মাঝখানে পৌঁছে গাড়ির দরজা খুলে গাড়ির স্পীড অব্যাহত রেখেই গাড়ি থেকে নিজেকে ছিটকে দিল ব্রীজের উপর।

নূতন গাড়ি। তার স্টিয়ারিং হুইল আহমদ মুসাকে সহায়তা করল। গাড়িটি তীর বেগে সোজা এগিয়ে ব্রীজ পেরিয়ে রাস্তার এক পাশে গড়িয়ে পড়ে উল্টে গেল। দেখলেই মনে হবে আহমদ মুসা ব্রীজ পেরিয়ে টার্ন নিতে গিয়ে ঢালু রাস্তায় তীব্র গতির কারণে এ্যাকসিডেন্ট করেছে।

ওদিকে আহমদ মুসা ব্রীজে আছড়ে পড়ে আঘাত পেল তার আহত কপালটায় আবার।

তার দু'চোখে অন্ধকার নেমে এল। সে কি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলছে?

না তাকে এখানে এই মুহূর্তে সংজ্ঞা হারালে চলবে না। পেছনের গাড়ি অল্পক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে এ ব্রীজে এবং হেলিকপ্টারও।

আহমদ মুসা জোর করে চোখ খোলা রেখে সর্বশক্তি দিয়ে অনুভূতিকে জাগ্রত রাখার চেষ্টা করে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল ব্রীজের রেলিং ধরে। তারপর আচ্ছন্ন অনুভূতির সাহায্যে আহমদ মুসা রেলিং পেরিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীতে। কোথায় পড়ছে, তারপর কি হবে এসব দেখার-বুঝার কোন শক্তি তখন আহমদ মুসার নেই। তার আচ্ছন্ন অনুভূতিতে তখন একটা বিষয়ই ছিল তাকে নদীর পানিতে পড়তে হবে, নদীর স্রোত তাকে কোথাও সরিয়ে নিয়ে যাবে।

এ্যাকসিডেন্টে পড়া আহমদ মুসার গাড়িকে প্রথম দেখতে পেল গোল্ড ওয়াটার। সে চোখে দূরবীন লাগিয়ে বসেছিল হেলিকপ্টারে। তার পাশেই বসে ছিল ইহুদী গোয়েন্দা প্রধান জেনারেল শ্যারণ।

রাস্তার নিচে খাদে উল্টে পড়া আহমদ মুসার গাড়ির উপর চোখ পড়তেই উদ্বিগ্ন কণ্ঠে গোল্ড ওয়াটার বলল, 'সর্বনাশ জেনারেল শ্যারণ, আহমদ মুসা এ্যাকসিডেন্ট করেছে। মারা গেল নাকি?'

জেনারেল শ্যারণ তার চোখের দূরবীণ সেদিকে ঘুরিয়ে উল্টে পড়া গাড়িটা দেখে বলল, 'উদ্বিগ্ন হচ্ছেন কেন মি: গোল্ড ওয়াটার। তার এবং তার খয়েরখাঁ মুসলিম দেশগুলোর উপর যে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলাম, তা না হওয়ায় ক্ষতি আমাদের হবে। কিন্তু ব্যাটা শেষ হলে আমরা বাঁচি। এটাও কম লাভ নয়।'

'আপনার হিসাবে আপনি ঠিক আছেন জেনারেল। কিন্তু আমাদের হিসাব নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন।'

'কোন হিসাব? তিন বিলিয়ন ডলারের? হ্যাঁ ঠিক বলেছেন, সে প্রশ্নটা এখন উঠতেই পারে।'

'কিন্তু জেনারেল, প্রশ্নটা আসলেই উঠতে পারে কি? তাকে তো আপনাদের হাতে দিয়েছি আমরা। সুতরাং বিনিময় তো হয়েই গেছে।'

'তাই যদি হয়, তাহলে উদ্বিগ্ন কেন বলুন তো আপনার হিসাব নিয়ে? উদ্বেগের কারণ, আপনিও বোঝেন যে, তিন বিলিয়ন ডলারের প্রতি আপনার দাবী এখন খুবই দুর্বল।'

গোল্ড ওয়াটার কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু হেলিকপ্টার তখন এ্যাকসিডেন্টে পড়া আহমদ মুসার গাড়ির পাশেই ল্যান্ড করেছে।

গোল্ড ওয়াটার ও জেনারেল শ্যারণ দ্রুত নেমে এল হেলিকপ্টার থেকে।

হেলিকপ্টার থেকে নেমে আসা অন্যান্যরা ইতিমধ্যেই উল্টানো গাড়ি সোজা করেছে।

গাড়ির দিকে তাকিয়ে গোল্ড ওয়াটার এবং জেনারেল শ্যারণের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। গাড়িতে কেউ নেই।

কিছুক্ষণ তারা কথা বলতে পারল না।

কোথায় গেল জলজ্যান্ত তিনজন লোক? এ্যাকসিডেন্টের পর ওরা কি গাড়ি থেকে বেরিয়ে পালিয়েছে? এত অল্প সময়ে এটা কি সম্ভব? বলল গোল্ড

ওয়াটার বিস্ময়ের সাথে, ‘এ্যাকসিডেন্ট হওয়ার দু’চার মিনিটের মধ্যেই স্পটটি আমার নজরে এসেছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে এত বড় এ্যাকসিডেন্ট থেকে বেঁচে গাড়ি থেকে বেরিয়ে পালিয়ে যাওয়া বাস্তব নয়।’

‘কিন্তু মি: গোল্ড ওয়াটার, তারা যখন গাড়িতে নেই, তখন পালিয়েছে এটাই বাস্তবতা।’ বলল জেনারেল শ্যারণ।

তিনটি গাড়িও এসে পৌঁছল এ সময়। গাড়ি থেকে নামল ওরা ১৪ জন।

‘পালিয়ে ওরা বেশিদূর যেতে পারেনি অবশ্যই, কথাগুলো স্বগোতোক্তির মত সকলের দিকে তাকিয়ে বলল গোল্ড ওয়াটার, তোমরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়। নদীর তীরটাও তোমরা দেখ। তিনজন লোক পালিয়ে বেশিদূর যেতে পারবে না।’

‘মি: গোল্ড ওয়াটার, ওরা এদিকে দেখুক। চলুন আমরা হেলিকপ্টারে যাই। লো-ফ্লাই করে সার্চ করাটা বেশি ফলপ্রসূ হবে।’ বলল জেনারেল শ্যারণ।

হেলিকপ্টারের দিকে চলল গোল্ড ওয়াটার এবং জেনারেল শ্যারণ।

হঠাৎ গোল্ড ওয়াটারের বাড়ির সামনে ছুটাছুটি দেখে রাস্তার পাশে গাড়ি নিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল শিলা সুসান।

সে দেখল ভীষণ উত্তেজিত ও ব্যস্তসমস্ত ডজনেরও বেশি লোক তিন গাড়ি বোঝাই হয়ে বাড়ির পাশের রোড ধরে ছুটল পশ্চিম দিকে।

ব্যাপারটা দেখে বিস্মিত হলো শিলা সুসান। ভাবল, কিছু একটা ঘটেছে।

আরও কিছুটা সময় পার হলো। বাড়ির দিক থেকে আর কেউ বের হলো না। হৈ চৈ কিছু শোনা গেল না।

বাড়ির দিকে এগুবে। ভাবল শিলা সুসান।

ঠিক এই সময় ব্যস্ত ও উত্তেজিত গোল্ড ওয়াটার আরও কয়েকজনকে নিয়ে প্রধান গেট দিয়ে বেরিয়ে এল। বেরিয়েই ছুটল তারা বাড়ির পুব পাশের উন্মুক্ত লনে দাঁড়ানো হেলিকপ্টারের দিকে।

ওরা সবাই হেলিকপ্টারে উঠল এবং উঠার সাথে সাথেই হেলিকপ্টার উড়ল আকাশে।

শিলা সুসান এবার সত্যি সত্যি উদ্বেগ বোধ করল। কি ঘটেছে? কোথায় যাচ্ছে ওরা?

গেটে স্টেনগানধারী দারওয়ান দাঁড়িয়ে, দেখতে পাচ্ছে সে।

কৌতূহলকে দমিয়ে রাখতে পারলো না শিলা সুসান। ভাবল সে দারোয়ানকে গিয়ে জিজ্ঞেস করবে।

ভাবার সাথে সাথেই শিলা সুসান গাড়ি চালিয়ে গোল্ড ওয়াটারের গেটে গিয়ে দাঁড়াল।

গেটম্যান এগিয়ে এল শিলা সুসানের গাড়ির কাছে। তার হাতে স্টেনগান। বলল, 'বলুন, কি সাহায্য করতে পারি ম্যাডাম।'

কথা আগেই গুছিয়ে রেখেছিল শিলা সুসান। বলল, 'আমি গোল্ড ওয়াটার আংকেলের সাথে দেখা করতে এসেছি।'

'কে আপনি?'

'শিলা সুসান। উনি আমার বাবার বন্ধু।'

গার্ড একটু চিন্তা করল। বলল, 'একটা বড় ঘটনা ঘটে গেছে। খুব ব্যস্ত ওরা আজ। উনিও বেরিয়ে গেছেন।'

'কি ঘটেছে? কারও অসুখ-বিসুখ?'

'না অসুখ-বিসুখ নয়। একজন আরেকজনকে সাথে নিয়ে পালিয়ে গেছে? তাদেরকে ধরার জন্যেই বেরিয়েছেন ওরা।'

পালাবার কথায় চমকে উঠল শিলা সুসান। কারা পালাল? আহমদ মুসা কি? জিজ্ঞেস করল গোবেচারা ঢংয়ে, 'কাজের লোক পালিয়েছে কিছু চুরি করে?'

গেটম্যানের চোখে-মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠল। বলল, 'কাজের লোক হবে কেন? তারা আর কি চুরি করবে? দু'জন দুষ্ট লোককে ধরে রাখা হয়েছিল জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে। তারাই পালিয়েছে।'

শিহরিত হলো দেহটা শিলা সুসানের। তাহলে আহমদ মুসা ও সান ওয়াকার পালিয়েছে, তারা যেমনটা ভেবেছিল। মনে আনন্দের একটা ঢেউ খেলে গেল।

কিন্তু গেটম্যানের সামনে মুখটা ভার করে বলল, 'খুবই দুঃসংবাদ। আমি চলি।'

বলে শিলা সুসান গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরে এল রাস্তায়। ছুটল সে মেরী রোজ-এর কাছে তাকে সুখবরটা জানানোর জন্যে।

কিন্তু মেরী রোজ যেখানে ছিল গাড়ি পার্ক করে, সেখানে পেল না তাকে।

শুধু বিস্মিত নয়, উদ্বিগ্নও হলো শিলা সুসান। মেরী রোজ অবশ্যই অন্য কোথাও যাবার কথা নয়। কোন বিপদে পড়েনি তো সে?

হঠাৎ তার মনে হলো, আহমদ মুসা ও সান ওয়াকার পালাবার সাথে তার অন্তর্ধানের কোন যোগ নেই তো? কিংবা হোয়াইট ঈগলের লোকরা মেরী রোজকে চিনতে পেরে তাদের সাথে নিয়ে যায়নি তো?

এই শেষ কথাটা ভাবার সাথে সাথে শিলা সুসানের বুকটা কেঁপে উঠল ভয়ে এবং সিদ্ধান্ত নিল ওদের অনুসরণ অবশ্যই করতে হবে তাকে।

সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ি স্টার্ট দিল শিলা সুসান। ঝড়ের বেগে গাড়ি এগিয়ে চলল।

## ৩

সেনেনদোয়া নদী দিয়ে এগিয়ে চলছিল সুন্দর একটি মোটর বোট।

সেনেনদোয়া নদীটি উত্তর বাহী। .... পর্বতমালা থেকে বেরিয়ে গ্রেটভ্যালি হয়ে সেনেনদোয়া সংরক্ষিত বনাঞ্চলের পাশ ঘেঁষে উত্তরে এগিয়ে চলেছে পটোম্যাক নদীতে।

মাঝারী স্পীডে চললেও স্রোতের বিপরীতে চলছে বলে বেশ শব্দ করে পানি কাটছে বোটটি।

বিলাসবহুল ট্যুরিস্ট বোট।

বোটের দোতলার কেবিনে ইজি চেয়ারে বসে আছে ষাটোর্ধ বয়সের প্রফেসর আরাপাহো আরিকারা। ইলিয়া রাজ্যের মিসিসিপি তীরের প্রাচীন রেড ইন্ডিয়ান নগরী 'কাহোকিয়া'র 'রেড ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ' (RIHR)- এর চেয়ারম্যান তিনি। তিনি একজন সম্মানিত রেড ইন্ডিয়ান বুদ্ধিজীবী।

ছুটির সুযোগে তিনি বেড়াতে বেরিয়েছেন।

তার এক ছেলে ও এক মেয়ে দু'জনেই জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্টবিজ্ঞানের ছাত্র।

তার এই সফরে দুই ছেলেমেয়েও তার সাথী।

নৌ-পথে ভ্রমণের মজার প্ল্যান নিয়ে বেরিয়েছে তারা।

তারা ওয়াশিংটন নগরীর উপকণ্ঠ থেকে ট্যুরিস্ট মটর বোট নিয়ে যাত্রা করেছে। পটোম্যাক থেকে তারা পড়েছে সেনেনদোয়া নদীতে। এ নদী থেকে তারা উঠবে এক্সপ্রেস ওয়েতে। তারপর পশ্চিম ভার্জিনিয়ার চার্লসটন হয়ে তারা যাবে হান্টিংটনে। এখান থেকে ওহাইও নদী পথে তাদের নৌযাত্রা শুরু হবে আবার। ওহাইও হয়ে মিসিসিপি দিয়ে তারা পৌঁছবে কাহোকিয়া।

ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে প্রফেসর আরাপাহো আরিকারা চারদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করছে।

তার ছেলে জিভারো ডেক চেয়ারে বসে মাঝে মাঝে চারদিকে দেখছিল, আবার একটা উপন্যাসে চোখ বুলাচ্ছিল এবং মেয়ে হায়েদা ওগলালা উপরে কেবিনের ছাদে, ছাদ সমান বিশাল ফোম ম্যাটে গড়াগড়ি দিচ্ছে। জিভারো এবং ওগলালা দু'জনেরই উদ্দেশ্য শরীরে কিছুক্ষণ সূর্য্যের তাপ নেয়া।

কেবিনের ছাদে বড়ো কোন আঘাত বা ভারি কিছু পড়ার শব্দ হলো। সেই সাথে ওগলালার চিৎকার।

প্রফেসর আরাপাহো আরিকারা নদী তীরের দৃশ্যের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল। তার মনে পড়ছিল, এই উপত্যকা বনাঞ্চলে একদিন রেড ইন্ডিয়ানদের শক্তিশালী সাম্রাজ ছিল। যার কেন্দ্র ছিল মিসিসিপি কেন্দ্রিক সমভূমি অঞ্চল। এই বিশাল অঞ্চলে মোহক নেতা রেড ইন্ডিয়ান বীর হাইওয়াথার নেতৃত্বে ইরিকুইস ইন্ডিয়ানদের শক্তিশালী শাসন গড়ে উঠেছিল। এই রকম নদীগুলোর দু'তীরে এবং বনাঞ্চলে শিকার সন্ধানী রেড ইন্ডিয়ানদের ছিল গৌরবপূর্ণ বিচরণ। প্রফেসর আরাপাহো আরিকারা যেন দেখতে পাচ্ছে সেদিনের তাদেরকে।

মাথার উপরে প্রচণ্ড শব্দ এবং ওগলালার চিৎকারে তার সম্বিত ফিরে এল। সোজা হয়ে বসল সে। বলল হাঁক দিয়ে ছেলেকে লক্ষ্য করে, 'কি হয়েছে জিভারো?'

বলে নিজেই বেরিয়ে এল কেবিন থেকে ডেকে।

ততক্ষণে জিভারো সিঁড়ি দিয়ে তর তর করে উঠে গেছে কেবিনের ছাদে।

প্রফেসর আরাপাহো আরিকারাও সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত উপরে উঠল। বয়স তার ষাটোর্ধ হলেও দেখতে চল্লিশের বেশি মনে হয় না।

প্রফেসর আরাপাহো আরিকারা ছাদের উপর নজর পড়তেই দেখল, একজন যুবক পড়ে আছে ছাদের ফোম ম্যাটের উপর। তার কপালে ক্ষত। রক্ত বেরুচ্ছে সেখান থেকে।

ওগলালা জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার পাশেই।

জিভারো ঝুঁকে পড়ে যুবকটিকে পরীক্ষা করছিল।

প্রফেসর আরাপাহো ছাদে উঠতেই জিভারো বলল, ‘আব্বা, লোকটা সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছে।’

মোটর বোট তখন ব্রীজ থেকে বেশ একটু দক্ষিণে সরে এসেছে।

প্রফেসর আরাপাহো তাকাল ব্রীজের দিকে। কোন মানুষ, কোন গাড়ি কিছুই দেখতে পেল না। যুবকটি কি নিজেই নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিল? না কেউ তাকে ফেলে দিয়েছিল?

এসব চিন্তা রেখে যুবকটির দিকে তাকিয়ে প্রফেসর আরাপাহো বলল, ‘যুবকটি এশিয়ান। এবং কপালের আঘাতটি তার বোটে পড়ার ফলে নয়। একে নিচে নিয়ে চল জিভারো।’

‘ঠিক বলেছেন আব্বা। ওর পেছনটা আগে পড়েছে। এখানে কপালে সে আঘাত পায়নি।’ বলল হায়েদা ওগলালা।

বলে ওগলালা একটু থামল দম নেবার মত। তারপর বলল, ‘অল্পের জন্যে আমি বেঁচে গেছি। আমার একদম মাথার কাছেই ও এসে পড়েছে।’

বাপ, বেটা, বেটি তিনজনেই ধরাধরি করে নামাল যুবকটিকে নিচে দু’তলার ডেকে।

নিচ থেকে বোটের একজন স্টাফ এসে দাঁড়িয়েছিল। প্রফেসর আরাপাহো তাকে তাড়াতাড়ি ফাস্ট এইড বক্স আনতে বলল নিচ থেকে।

ফার্স্ট এইড বক্স আনলে প্রফেসর আরাপাহো বক্স থেকে স্পিরিটের শিশি তুলে নিয়ে বলল, ‘এর সংজ্ঞা আগে ফেরানো দরকার।’

বলে সে স্পিরিটে তুলা ভিজিয়ে যুবকটির নাকে ধরে রাখল।

যুবকটি আহমদ মুসা।

প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থাতেই সে লাফিয়ে পড়েছিল ব্রীজ থেকে। আল্লাহর করুনা সে পানিতে পড়েনি, আবার বোটের নরম ম্যাট তাকে বড় ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। কিন্তু বোটে পড়ার পর পুরোপুরি সে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে।

স্পিরিটের উদ্দীপক গন্ধে তাড়াতাড়ি সংজ্ঞা ফিরে পেল আহমদ মুসা। চোখ মেলল সে।

প্রথমেই চোখ বুজে গেল আহমদ মুসার। মনে পড়লো তার, সে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কিন্তু তার গা ভিজা নয়। তাহলে কি এই বোটের উপর পড়েছিল? এবং সে সংজ্ঞা হারিয়েছিল? কতক্ষণ সময় গেছে? হোয়াইট ঈগলের লোকেরা কোথায়? এরা কারা? চেহারায় এরা রেড ইন্ডিয়ান। কিন্তু পোশাকে ইউরোপিয়ান। তাহলে শিক্ষিত ও শহুরে রেড ইন্ডিয়ান এরা।

আবার চোখ খুলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা চোখ খুললে জিভারো আহমদ মুসার ঘাড়ের নিচে হাত দিয়ে তার মাথা উঁচু করে তুলে ধরল। আর প্রফেসর আরাপাহো এক গ্লাস ব্রান্ডি আহমদ মুসার মুখের কাছে তুলে ধরে বলল, 'খেয়ে নাও। শরীরটা সবল হবে। ভাল লাগবে তোমার।'

'গ্লাসে নিশ্চয় ব্রান্ডি অথবা বিয়ার? আমি মদ খাই না।' বলল আহমদ মুসা।

বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠল প্রফেসর আরাপাহো এবং জিভারো ও ওগলালার চোখে-মুখে।

'অল রাইট ইয়ংম্যান। এখন কেমন মনে করছ?' বলল প্রফেসর আরাপাহো।

'ভালো জনাব।' বলে উঠে বসল আহমদ মুসা।

'বসে থাকতে পারবে? না শুয়ে পড়বে? আহত স্থান থেকে এখনও রক্ত বেরুচ্ছে। তাড়াতাড়ি ড্রেসিং করে দিতে হবে।' বলল প্রফেসর আরাপাহো।

আহমদ মুসা প্রফেসর আরাপাহোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'জনাব আপনি কষ্ট করবেন? একটু পর আমিই সব কিছু ঠিক করে নিতে পারব।'

'তোমার সৌজন্য বোধের জন্যে ধন্যবাদ।' বলে প্রফেসর আরাপাহো কাজে লেগে গেল।

ড্রেসিং করতে করতে বলল, 'খারাপ হবে না আমার ড্রেসিং। ভাল ট্রেনিং আছে এ ব্যাপারে আমার।'

ড্রেসিং শেষে আহমদ মুসাকে নিয়ে এল কেবিনে।

আহমদ মুসা নিজেই হেঁটে এল এবং কেবিনের টয়লেটে গিয়ে তার মুখ পরিষ্কার করল। জিভারো এবং ওগলালা পাশে দাঁড়িয়েছিল। জিভারো সাহায্য করতে চাইলে আহমদ মুসা বলল, 'ধন্যবাদ আপনাদের, যেটুকু পারা যায় নিজে করাই ভাল।'

কেবিনের টেবিলে বসল সবাই। পরিবেশিত হলো গরম চা।

প্রফেসর আরাপাহো চায়ের কাপ তুলে নিতে নিতে বলল, 'ইয়ংম্যান, অবশ্যই চায়ে তোমার অভ্যেস আছে? নাও।'

'ধন্যবাদ জনাব।' বলে চা তুলে নিল আহমদ মুসা।

জিভারো এবং ওগলালাও চায়ে চুমুক দিল।

চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে প্রফেসর আরাপাহো বলল, 'ইয়ংম্যান, তোমার কপালের আহত স্থানে দু'বার আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। একটা কয়েক ঘণ্টা আগের, আরেকটা তাজা। সত্যি কি তাই?'

'জ্বি, ঠিক বলেছেন।'

'তোমার নাম কিন্তু এখনও আমরা জানি না। তুমি কি মুসলিম?'

'জ্বি। কি করে বুঝলেন?'

'প্রথমত, তোমার কপালে নামাযের চিহ্ন দেখেছি। দ্বিতীয়ত, তুমি মদ খাও না।'

'জনাব, নাম জিজ্ঞেস করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই আমি ঠিক নামটা বলতে পারি না।'

'বুঝেছি। দেখ, আমি কাহোকিয়ার 'রেড ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ'- এর চেয়ারম্যান। এরা আমার ছেলেমেয়ে। জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটিতে পড়ে।'

আহমদ মুসা ওদের দু'জনের দিকে তাকাল। জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম শুনে মনে পড়ল সান ওয়াকার, মেরী রোজ ও শিলা সুসানের কথা। বলল ওদের লক্ষ্য করে, 'তোমরা কি ঈগল সান ওয়াকারকে চেন?'

সান ওয়াকারের নাম শুনেই দু'জনের চোখ-মুখ যেন নতুন করে জেগে উঠল। তার সাথে কিছুটা মলিন হয়ে উঠল ওগলালার মুখ। একটা বেদনার প্রকাশ সেখানে স্পষ্ট।

ওগলালাই জিজ্ঞেস করল, 'চিনেন আপনি তাকে?' কণ্ঠ তার অনেকটা শুকনো।

'চিনতাম না। তবে একই বন্দীখানায় থাকার সময় তাকে চিনেছি।' বলল আহমদ মুসা।

'একই বন্দীখানায়? আমরা শুনেছি সে তো হোয়াইট ঈগলের হাতে বন্দী।'

'আমিও বন্দী ছিলাম হোয়াইট ঈগলের হাতে।'

প্রচণ্ড এক বিস্ময় নেমে এল ওগলালা, জিভারো এবং প্রফেসর আরাপাহোর চোখে-মুখে।

কিছুক্ষণ যেন তারা কিছুই বলতে পারল না।

'হোয়াইট ঈগল তোমাকে বন্দী করল কেন? শুধু অশ্বেতাংগ বলে নিশ্চয় নয়?' বলল প্রফেসর আরাপাহো নীরবতা ভেঙে।

'ঠিক বলেছেন জনাব। আমি ক্যারিবিয়ান দ্বীপাঞ্চলে অশ্বেতাংগ বিশেষ করে মুসলমানদের পক্ষ নিয়েছিলাম, এটাই আসল কারণ। আমার কারণে নাকি ক্যারিবিয়ান অঞ্চলকে শ্বেতাংগকরণের ওদের পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, আমাকে বিক্রি করে ওরা বিলিয়ন ডলার উপার্জন করতে চেয়েছিল।' বলল আহমদ মুসা।

জিভারো, ওগলাল এবং প্রফেসর আরাপাহোর স্থির দৃষ্টি আহমদ মুসার মুখে নিবদ্ধ। তাদের চোখে বিস্ময় ও কিছুটা সমীহের ভাব।

আহমদ মুসা থামলে সংগে সংগেই প্রফেসর আরাপাহো বলে উঠল, 'ফ্রি ওয়ার্ল্ড টিভি এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে জেনেছি ক্যারিবিয়ানে ওদের অশ্বেতাংগ বিরোধী ষড়যন্ত্রের কথা। তাহলে তুমিই এসব করিয়েছ বলছ?'

'আমি কৃতিত্ব দাবী করছি না। ওদের সাথে আমার শত্রুতার কারণ বলেছি।' আহমদ মুসা বলল।

প্রফেসর আরাপাহো হাসল। বলল, ‘তুমি খুব বুদ্ধিমান ছেলে। আমার কথার ঐ রকম অর্থ হওয়ার জন্যে আমরা দুঃখিত।’

বলে একটু থামল প্রফেসর আরাপাহো। থেমেই আবার বলল, ‘হোয়াইট ঈগল তোমাকে বিক্রি করার অর্থ বুঝলাম না।’

‘হ্যাঁ, ওরা আমাকে ইহুদী গোয়েন্দা সংস্থার কাছে কয়েক বিলিয়ন ডলারে বিক্রি করতে যাচ্ছিল।’ আহমদ মুসা বলল।

প্রফেসর আরাপাহোসহ ওদের তিনজনেরই ভ্রু কুঞ্চিত হলো টাকার অংক শুনে। বলল প্রফেসর আরাপাহো, ‘ইহুদী গোয়েন্দা সংস্থার লাভ?’

‘ওদের সাথে আমার পুরানো শত্রুতা। ইসরাইলে ওদের পতন নাকি আমার কারণে। ওরা প্রতিশোধ নিতে চায় এবং আমাকে হাতে রেখে কয়েকটি মুসলিম সরকারের সাথে দর কষাকষি করতে চায়।’

প্রফেসর আরাপাহোর বিস্ময় বিজড়িত মুখে হাসি ফুটে উঠল। বলল, ‘তুমি নিরাপত্তার কারণেই তোমার নাম বলনি। কিন্তু তুমি সাংঘাতিক একটা অস্ত্র তুলে দিলে আমাদের হাতে। ঐ লাভজনক ব্যবসায়ের উদ্যোগ হোয়াইট ঈগলের মত আমরাও নিতে পারি।’

‘আমি নিশ্চিত হবার পরই একথা বলেছি জনাব। কাহোকিয়ার রেড ইন্ডিয়ান সংস্থার কেউ এই ব্যবসা করতে যাবে না।’

‘তুমি কাহোকিয়াকে জান?’ বলল প্রফেসর আরাপাহো।

‘কিছু কিছু শুনেছি। সান ওয়াকারও কাহোকিয়া এবং আমেরিকান ইন্ডিয়ান মুভমেন্টের লোক।’

গম্ভীর হলো প্রফেসর আরাপাহোর মুখ। বলল, ‘তুমি আমেরিকান ইন্ডিয়ান মুভমেন্টের বিষয়ে জান?’

‘কিছু কিছু।’

‘ইয়ংম্যান, আমার মনে হচ্ছে তুমি যথার্থ ভাবেই নাম বলায় সতর্কতা অবলম্বন করেছ। প্রয়োজন হলে নামটা তোমার বলো। আপাতত আমি তোমাকে আহমদ মুসা বলেই ডাকব। এখন বলল, কেমন করে বন্দীখানা থেকে এই সেনেনদোয়া নদীর ব্রীজে এলে?’

প্রফেসর আরাপাহোর মুখে আহমদ মুসার নাম শুনে বিস্ময়ে ‘থ’ হয়ে গেল আহমদ মুসা। বলল, ‘আহমদ মুসাকে আপনি চেনেন?’

‘চিনি না জানি। এবং জানি শুধু নয়, আমেরিকান ইন্ডিয়ান মুভমেন্টের সকলেই জানে আহমদ মুসাকে। আহমদ মুসা তাদের জীবন্ত মডেল।’

‘ঠিক আছে ঐ নামটায় দিন। কিন্তু নামটা বাইরে দয়া করে বলবেন না। সীমাবদ্ধ রাখবেন আপনাদের তিনজনের মধ্যে।’

প্রফেসর আরাপাহো এবং ওগলালা ও জিভারো কারোরই বুঝতে বাকি রইল না যে, তাদের সামনের যুবকটিই আহমদ মুসা। তাদের তিনজনের বিস্ময় দৃষ্টি গিয়ে আছড়ে পড়ল আহমদ মুসার উপর।

নীরবতা ভাঙল প্রফেসর আরাপাহো। বলল, ‘আমি খুশী যে আমি ঠিক মানুষকে ঠিক নাম দিয়েছি। আর ঈশ্বরের প্রশংসা করছি যে, তিনি আপনাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এনেছেন এবং আপনার সাথে সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ দিয়েছেন। অধিকার বঞ্চিত রেড ইন্ডিয়ানরা খুশী হবে আপনার আগমনের এ খবরে।’

প্রফেসর আরাপাহোর মুখে এখন ‘আপনি’ সম্বোধনে বিব্রত বোধ করল আহমদ মুসা। বলল, ‘আমি আপনার ছেলের বয়সের। আমাকে ‘তুমি’ বলে সম্বোধন করলেই আমি খুশী হবো।’

‘ঠিক আছে। কিন্তু বয়সে ছেলের মত হলেও ওজন কিন্তু দাদার বয়সের। এ সম্মান তোমাকে না দিয়ে আমরা পারি না।’ বলল প্রফেসর আরাপাহো।

‘আপনার মত মুরুব্বীদের স্নেহ আমার জন্যে বড় সম্মান।’ আহমদ মুসা বলল।

‘এখন বল সেনেনদোয়া ব্রীজে তোমার আসা এবং তোমার নদীতে পড়ার কাহিনী। আর সান ওয়াকারের খবর কি?’ বলল প্রফেসর আরাপাহো।

আহমদ মুসা তার বন্দী হওয়া, বন্দী অবস্থায় গোল্ড ওয়াটারের ক্লোজ সার্কিট টিভি মনিটরে সান ওয়াকারকে দেখা ও তার পরিচয় পাওয়া, বন্দীখানা থেকে মুক্ত হওয়া এবং সান ওয়াকারকে মুক্ত করা, তাকে নিয়ে বন্দীখানা থেকে বের হওয়া, একটা গাড়ি হাইজ্যাক করে পলায়ন, মেরী রোজ-এর সাথে পরিচয় হওয়া, স্থল ও আকাশ পথে ঘেরাও হয়ে পড়ার পর মেরী রোজ ও সান ওয়াকারকে

পালাবার সুযোগ করে দেয়ার জন্যে তাদেরকে নিরাপদ স্থানে নামিয়ে দিয়ে ওদের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নেবার জন্যে গাড়ি নিয়ে অগ্রসর হওয়া এবং সবশেষে চলন্ত গাড়ি থেকে ব্রীজে লাফিয়ে পড়তে গিয়ে কপালে আবার আঘাত পাওয়া এবং বাঁচার জন্যে প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়া ইত্যাদি সব কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করল তাদের কাছে।

সম্মোহিতের মত তারা শুনল সব কথা। বিস্ময় ও প্রশংসার প্রশ্রবণ তাদের চোখে মুখে।

আহমদ মুসা থামতেই ওগলালা বলল, 'সান ওয়াকার অসুস্থ। সে পালাতে পারবে?' ওগলালার কণ্ঠে উদ্বেগ ঝরে পড়ল।

'পারবে। সাথে মেরী রোজ আছে। এবং আমার ধারণা শিলা সুসানও তাদের খোঁজে আসছে।'

'তার কি ওয়াশিংটনে ফিরে যাওয়া ঠিক হবে?' ওগলালা বলল।

'আমি মনে করি, ঠিক হবে না।'

'কিন্তু মেরী রোজরা তাকে ওয়াশিংটনেই ফিরিয়ে নিতে চেষ্টা করবে?'

আহমদ মুসা ওগলালার কথার মধ্যে সান ওয়াকারের প্রতি স্বাভাবিকের চেয়ে অনুরাগ এবং মেরী রোজ-এর প্রতি বিরাগ লক্ষ্য করল। এটা কি সান ওয়াকারের সাথে তার কোন বিশেষ সম্পর্কের ইংগিত দেয়? না এটা রেড ইন্ডিয়ান সান ওয়াকার, আর শ্বেতাংগ মেরী রোজ-এর প্রতি তার স্বাভাবিক মনোভারের প্রকাশ? কোনটা ঠিক বুঝতে পারল না আহমদ মুসা।

বলল আহমদ মুসা, 'আমার মনে হয় তারা নিরাপত্তার দিকটা ভেবেই সিদ্ধান্ত নেবে।'

'আপনি' সেনেনদোয়ার ব্রীজে গাড়ি থামিয়ে না নেমে লাফিয়ে পড়তে গেলেন কেন?' বলল জিভারো।

'ওরা আমাকে তিনটি গাড়ি ও হেলিকপ্টার নিয়ে তাড়া করছিল, বুঝতে পারছিলাম, গাড়ি চালিয়ে বা গাড়ি থেমে নেমে ছুটে পালিয়ে ওদের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে না। এই সময় পেয়ে গেলাম ব্রীজ। সিদ্ধান্ত নিলাম নদী দিয়ে পালাব। কিন্তু এই পালানো নিরাপদ করতে হলে ওদের বুঝতে দেয়া যাবে না যে

আমি নদী দিয়ে পালিয়েছি। তা করতে হলে গাড়ি ব্রীজের উপর রাখা যাবে না, গাড়ি পাঠাতে হবে ব্রীজের ওপারে। ড্রাইভার বিহীন চলন্ত গাড়ি নিশ্চয় ওপারে গিয়ে এ্যাকসিডেন্ট করবে। ওরা বুঝবে এ্যাকসিডেন্ট করেছি, তারপর পালিয়ে গেছি। সে জন্যেই গাড়ি স্পীডে রেখে গাড়ি থেকে ব্রীজে লাফিয়ে পড়েছি। এ কৌশল কাজ দিয়েছে। সম্ভবত নদীর দিকে কেউ ওরা আসেনি। ওদের হেলিকপ্টার স্থলাঞ্চল ঘুরে বেড়াচ্ছে, নদীর উপর একবারও আসেনি।'

'সাংঘাতিক উপস্থিত বুদ্ধি আপনার।' বলল জিভারো।

'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমি কোন রোমাঞ্চ কাহিনী পড়ছি। আপনি যদি আপনার কাহিনী লিখতেন দারুণ বিক্রি হতো।' ওগলালা বলল।

চা'র পর নাস্তাও খেল তারা ঐ টেবিলে বসেই।

বেশ অনেকক্ষণ থেকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেনি প্রফেসর আরাপাহো। ভাবছিল সে। একসময় বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, 'ঈগল সান ওয়াকার রেড ইন্ডয়ানদের সমকালিন শ্রেষ্ঠ প্রতিভা। আমি ভাবছি, এ প্রতিভার কি হবে? সেতো এখন কোথাও নিরাপদ নয়।'

আহমদ মুসা মুখ খোলার আগেই ওগলালা বলে উঠল, 'আব্বা তার এ বিপর্যয়ের কারণ মেরী রোজ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সবাই বলাবলি করছে, মেরী রোজ সান ওয়াকারের ঘনিষ্ঠ হওয়াকে বর্ণবাদীরা মেনে নেয়নি। মেরী রোজ থেকে সান ওয়াকারকে বিচ্ছিন্ন করে বিদেশে কোথাও পাঠিয়ে দেবার জন্যেই হোয়াইট ঈগল সান ওয়াকারকে কিডন্যাপ করেছে। বলাবলি হচ্ছে, সান ওয়াকার যদি মেরী রোজ-এর সাথে সম্পর্ক না রাখে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনও সময় আর ফিরে আসতে চেষ্টা না করে, তাহলে সান ওয়াকারকে তারা পৃথিবীর কোনও দেশে পাঠিয়ে দেবে।' ওগলালা থামল। তার কণ্ঠে ক্ষোভ ও অভিমান ঝড়ে পড়ল। সেই সাথে অব্যক্ত এক আবেগে লাল হয়ে উঠেছে তার মুখ।

'আমি সান ওয়াকারকে জানি। সে এসব শর্তের কোনটাই মানবে না। জীবনের বিনিময়েও নয়। সুতরাং তার অবস্থা বিপজ্জনক, সে কথাই আমি ভাবছি।' বলল প্রফেসর আরাপাহো।

‘বর্ণবাদীরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ শ্বেতাংগীনি মেরী রোজকে সান ওয়াকারের দিকে ঠেলে দেয়, সান ওয়াকারকে দিয়ে তাকে হিপনোটাইজ করে তারা এই সর্বনাশ........।’

কান্নায় অবরুদ্ধ উচ্ছ্বাসে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। কথা শেষ করতে পারলো না ওগলালা।

রুমালে মুখ চাপা দিয়ে উঠতে উঠতে বলল, ‘সান ওয়াকারকে সে দু’চোখে দেখতে পারতো না, কত অপমান ও লাঞ্ছনা যে সান ওয়াকারকে করেছে। তারপর হঠাৎ তার রাতারাতি পরিবর্তন হওয়া একটা ষড়যন্ত্র।’ কান্নাজড়িত কণ্ঠে কথাগুলো বলে সে ছুটে পালাল।

মুহূর্তকাল নীরবতা।

নীরবতা ভেঙে প্রফেসর আরাপাহো বলল, ‘কিছু মনে করো না আহমদ মুসা। ও খুব ইমোশনাল এবং জেদী। কিন্তু আবার ঠান্ডা হতেও দেরী হয় না।’

‘বুঝতে পেরেছি। কিন্তু একটা জিনিস আমি বলতে পারি। সান ওয়াকারকে কিডন্যাপ যে কারণেই করুক। কিন্তু এখন তার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ আমেরিকান ইন্ডিয়ান মুভমেন্টে-এর কাহোকিয়া সম্মেলনে তার ভূমিকা।’

‘সে তো ছাত্র মাত্র। কোন কর্মকর্তা সে তো নয়, মুভমেন্টের!’ বলল প্রফেসর আরাপাহো।

‘সম্মেলনের দাবী-নামা নাকি তার ড্রাফটিং।’

‘হোয়াইট ঈগল এটাও জানতে পেরেছে?’ প্রফেসর আরাপাহো বলল।

‘তারা সান ওয়াকারের কাছে জানার চেষ্টা করছিল ‘এইম’ (AIM- আমেরিকান ইন্ডিয়ান মুভমেন্ট)- এর সেন্ট্রাল কমিটির নবনির্বাচিত সদস্যদের নাম।’ বলল আহমদ মুসা।

‘সান ওয়াকারতো এসব বলে দেয়ার মত ছেলে নয়। প্রফেসর আরাপাহো বলল।

'সুতরাং সান ওয়াকারের ছাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। ইতিমধ্যেই তার উপর দৈহিক নির্যাতন চালানো হয় অনেক। সে হয়তো বাঁচতো না ওদের হাত থেকে।'

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। তোমাকেও ধন্যবাদ। সে বেঁচে গেছে।' বলল প্রফেসর আরাপাহো।

'হ্যাঁ, এ যাত্রা বেঁচে গেছে।'

'ঠিক বলেছ, তার বিপদ সামনে আরও আছে। খুবই দুঃসংবাদ এটা আমাদের জন্যে।' প্রফেসর আরাপাহো বলল।

পরদিন সকাল।

বোট এসে ভিড়েছে স্ট্যানটনের কিছু উত্তর-পূর্বে ক্ষুদ্র নদীবন্দর 'পোর্ট ভ্যালিতে।'

বন্দরটি সেনেনদোয়া নদী এবং গ্রেট ভ্যালি এক্সপ্রেসওয়ের একটা সংযোগ স্থল। পরিকল্পনা অনুসারে প্রফেসর আরাপাহোরা এখানে নামবে এবং সড়ক পথে যাবে পশ্চিম ভার্জিনিয়ার চার্লসটন হয়ে হান্টিংটনে। হান্টিংটন ওহাইও নদীর একটা নৌবন্দর। এই নদী বন্দর থেকে প্রফেসর আরাপাহোরা যাবে ওহাইও ও মিসিসিপি হয়ে কাহোকিয়া।

আহমদ মুসা শুয়ে ছিল তার বেড়ে।

প্রফেসর আরাপাহো এসে ঢুকল আহমদ মুসার কেবিনে।

প্রফেসর আরাপাহোকে দেখে আহমদ মুসা উঠে বসতে যাচ্ছিল।

প্রফেসর আরাপাহো তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'না উঠো না, তুমি অসুস্থ।'

বলে প্রফেসর আরাপাহো বসল কক্ষের একটা চেয়ারে। বলল, 'তুমি নাকি বলেছ এখানে নেমে তুমি চলে যেতে চাও?'

'জ্বি, বলেছে।'

'অসম্ভব। তোমার ভীষণ জ্বর। তোমাকে এভাবে আমরা ছাড়তে পারি না। তাছাড়া তোমাকে আমি কাহোকিয়াতে নিতে চাই।'

'আমি ক্যারিবিয়ানের খোঁজ-খবর নিতে চাই। তাছাড়া সান ওয়াকাররা কোথায়, সেটাও দেখতে চাই।'

'সব হবে। কিন্তু আগে তোমাকে সুস্থ হয়ে উঠতে হবে এবং সেই সাথে তোমাকে কাহোকিয়াতেও যেতে হবে।'

বলে আহমদ মুসাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে তাকাল পেছনে।

পিতার সাথে সাথে ওগলালাও এসে প্রবেশ করেছিল ঘরে। তাকে লক্ষ্য করে প্রফেসর আরাপাহো বলল, 'এ্যাম্বুলেন্স ওয়াগন কার' পাওয়া গেছে মা?'

'জ্বি, আব্বা। স্ট্যানটন থেকে কয়েক মিনিটের মধ্যেই এসে পৌঁছবে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা যাত্রা করতে পারব।'

'ধন্যবাদ মা, সুন্দর এ্যারেঞ্জমেন্ট করেছ। এখন তুমি আহমদ মুসার ঔষধ ও কাপড় প্যাক করে এস ওদিকে।'

বলে বেরিয়ে গেল প্রফেসর আরাপাহো।

ঔষধ প্যাক করতে করতে ওগলালা বলল, 'জনাব, আপনাদের সমাজে মেয়েরা নাকি আপাদ-মস্তক কাপড়ে প্যাক করে রাস্তায় বের হয়?'

ওগলালার কথার ঢংয়ে আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'আপাদ-মস্তক কাপড়ে প্যাক করে নয়, সৌন্দর্যের স্থানগুলো ঢেকে বের হতে হয়।'

'কেন?'

'খারাপ দৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার জন্যে।'

'এভাবে আগাম খারাপ ধারণা করে নেয়া কি ঠিক? খারাপ ঘটলে তবেই না তাকে খারাপ বলা যায়।'

'মেয়েদের সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া এবং আকৃষ্ট হবার পর খারাপ চিন্তার উদয় হওয়া মানুষের একটা সহজাত প্রবৃত্তি। সুতরাং এ ব্যাপারে আগাম চিন্তা করা যায়।'

'প্রবৃত্তিটা যদি সহজাত হয়, তাহলে তো এ থেকে আপনি, আমি, শিক্ষক, ছাত্র কেউই মুক্ত নয়। তাই কি?'

'হ্যাঁ তাই।'

'কিন্তু এটা কি বাস্তবতা?'

'শিক্ষক-ছাত্রী কিংবা শিক্ষিকা-ছাত্রের মধ্যে অঘটন বা ঘটনা কি নেই?'

ওগলালা একটু চিন্তা করে বলল, 'আছে।'

'এটা কি বাস্তবতার প্রমাণ নয়?'

'সবক্ষেত্রেই কিছু ব্যতিক্রম থাকে। ব্যতিক্রমের উপর কিন্তু কোন সাধারণ সিদ্ধান্ত হয় না।'

'এ দু'চারটা ঘটনা আসলে ঘটনার আইস বার্গ। দেখুন, সব খারাপ চিন্তা খারাপ ঘটনায় রূপ নেয় না। আবার সব খারাপ ঘটনা জনসমক্ষে প্রকাশ পায় না। সুতরাং সব মিলিয়ে ব্যতিক্রম যাকে বলছেন, তা ব্যতিক্রম নয়।'

'তার অর্থ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে প্রবৃত্তিগতভাবে খারাপ প্রবণতা আছে এবং সেই অর্থে ধরে নিতে হবে প্রত্যেক মানুষই খারাপ।'

'কথাটা এইভাবে বলা ভাল, প্রত্যেক মানুষ খারাপ, আবার প্রত্যেক মানুষই ভাল। আমাদের ধর্মগ্রন্থ আল কোরআনে স্রষ্টা বলেছেন, মানুষকে সুন্দরতর বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, আবার তাকে নিচ থেকে নীচত্বর করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব ও পশুত্ব পাশাপাশিই বাস করে।'

'মেয়েরা তাদের সৌন্দর্য ঢেকে বের হওয়াই কি ঐ পশুত্বের আক্রমণ থেকে বাঁচার উপায়?'

'কথাটা এইভাবে বলুন, মেয়েরা জনসমক্ষে তাদের সৌন্দর্য ঢেকে রাখা মানুষের পশুত্বকে উস্কে না দেবার উপায়।'

'আপনি সুন্দর করে কথা বলেন। ঠিক মনোযোগী প্রফেসরের মত। যাক, আপনাদের মেয়েদের সৌন্দর্য ঢেকে বেরুনোর যুক্তি পেলাম। এখন বলুন, আমাদের সম্পর্কে আপনি কি ভাবেন?'

'আমি বাইরের সংস্কৃতির লোক। ভাববেন তো আপনারা।'

'ঠিকই বলেছেন। তবে ভাববার এ বিষয়টা কোনদিন কেউ এমনভাবে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়নি। ধন্যবাদ আপনাকে।'

বলে একটু থেমেই আবার বলল, ‘মিঃ আহমদ মুসা, সান ওয়াকার অনেকটা আপনার মতই ভাবে। সে হিটলারের মত মেয়েদেরকে রান্নাঘরে ফিরিয়ে দেয়ার পক্ষপাতি।’

বলতে গিয়ে ওগলালার মুখ হঠাৎ মলিন হয়ে গেল।

থামল সে আবার। থেমেই আবার অনেকটা স্বগোতোক্তির মত বলল, ‘সেই ভাল, অতি সরল সান ওয়াকার কিনা শ্বেতাংগদের ফাঁদে গিয়ে পড়ল।’

বলেই তাড়াতাড়ি দু’হাতে মুখ ঢেকে ছুটে বেরিয়ে গেল ওগলালা।

আহমদ মুসা খুব বিস্মিত হলো না। আগেই সে বুঝতে পেরেছিল ওগলালা ভালোবাসে সান ওয়াকারকে। আর সে মনে করে মেরী রোজ ষড়যন্ত্রমূলকভাবে সান ওয়াকারকে ভালোবাসার ফাঁদে আটকেছে। সে জন্যে ওগলালা ভীষণ ক্রুদ্ধ মেরী রোজ-এর উপর। এ বিষয়টা আজ আরও পরিষ্কার হয়ে গেল তার কাছে এবং বুঝল যে, সান ওয়াকারের প্রতি ওগলালার ভালোবাসা সাংঘাতিকভাবে অন্ধ। এই বুঝতে পারা শংকিত করল আহমদ মুসাকে। বেচারা মেরী রোজ ওগলালার হিংসার শিকার হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অথচ আহমদ মুসা যতটুকু দেখেছে, সান ওয়াকারের প্রতি মেরী রোজ-এর ভালোবাসা নিখাদ। সান ওয়াকারের জন্যে মেরী রোজ-এর চোখে যে উদ্বেগ ও ব্যাকুলতা সে দেখেছে তাতে কোন কৃত্রিমতা নেই।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই প্রফেসর আরাপাহো যাত্রা করল এ্যাম্বুলেন্স ওয়াগনে করে পশ্চিম ভার্জিনিয়ার চার্লসন হয়ে ওহাইও নদীর বন্দর শহর হান্টিংটনের উদ্দেশ্যে।

ওয়াগনের পেছন দিকটায় আরামদায়ক শোবার ব্যবস্থা আছে। আহমদ মুসাকে সেখানে শোয়ানো হলো।

বেডের পাশেই এ্যাটেনডেন্টের সিটে বসেছে জিভারো এবং সামনে বসে প্রফেসর আরাপাহো এবং ওগলালা।

গাড়ি চলতে শুরু করলে আহমদ মুসা বলল, ‘অনুমতি দিলে আমি বসতে পারি। একটুও জ্বর নেই। আমি সুস্থ। শুয়ে থাকলে আমি চারদিকের দুর্লভ দৃশ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছি।’

‘তাই কি? জিভারো গা’টা দেখতো।’ হেসে বলল প্রফেসর আরাপাহো।

‘সত্যি আব্বা, গায়ে তাপ নেই।’ কপাল পরীক্ষা করে জিভারো বলল।

‘না আব্বা, ওকে উঠতে দিও না। জ্বর ছাড়লেই বুঝি মানুষ সুস্থ হয়ে যায়?’ বলল ওগলালা।

‘ঠিক বলেছ মা। তবে যেহেতু সে এসেছে নতুন, এই বিবেচনায় তাকে বসার সুযোগ দেয়া যায়।’

‘ধন্যবাদ স্যার, ওগলালা ভেটো দেবার আগেই আমি উঠে বসলাম।’ হেসে বলল আহমদ মুসা।

‘ভেটোকে ভয় করার কিছু নেই। ভেটোর সেই সুদিন আর নেই।’

‘সুদিন আছে। বলুন, ঠান্ডা যুদ্ধের পর ভেটো দেবার মত দেশ নেই।’

প্রফেসর আরাপাহোর মুখে মুগ্ধ হাসি। বলল, ‘বৎস আহমদ মুসা, তোমাকে যতই দেখছি আমি বিস্মিত হচ্ছি। এমন বিপ্লবীর কাঠিন্য, রাশভারি আচরণ, রুচির নিরসতা, বুলেটের মত নির্দয় গতি, প্রভৃতি কিছুই নেই তোমার মধ্যে। এমন কাগজের মত সাদা মন আর শিশুর মত সারল্য নিয়ে তুমি বিপ্লবী কেমন করে? তোমার মত সংবেদনশীল লোকের লেখক-কবির মত শিল্পী হওয়া উচিত।’

‘না আব্বা, উনি সমাজ সংস্কারক বা মিশনারী হলে মানাতো ভাল। মানুষের মন গড়ার মাধ্যমে দেশ গড়তে উনি ভাল পারতেন।’ দ্রুত কণ্ঠে বলল ওগলালা।

‘তাহলে কথাটা দাঁড়াচ্ছে, আমাদের সন্মানিত আহমদ মুসা ভাই ‘অল ইন ওয়ান’।’ বলল জিভারো।

‘জিভারোর কথায় যে মানুষের ছবি ভেসে ওঠে, তা ‘অল পারফেক্ট’ বা পূর্ণ মানুষের ছবি। এমন অল পারফেক্ট মানুষ শুধু আল্লাহর বার্তাবাহী নবি-রাসুল বা প্রফেটরাই হতে পারেন। যেমন জগতের শেষ প্রফেট মুহাম্মদ (সঃ)। তাঁরা মডেল। তাদের অনুসরণে মানুষ পারফেক্ট হবার চেষ্টা করবে। কিন্তু ঐ পর্যায়ে পৌঁছা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। সুতরাং ‘অল ইন ওয়ান’ আর কেও হতে পারেনা।’ বলল আহমদ মুসা গভীর কণ্ঠে।

'সব প্রফেটই কি সম্পূর্ণ মানুষ?' বলল প্রফেসর আরাপাহো।

'অবশ্যই।'

'কিন্তু তোমাদের প্রফেট যুদ্ধ করেছেন, রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন, যিশু তা করেননি।' প্রফেসর আরাপাহো বলল।

'যিশু পূর্ণ মানুষ তার সময়ের জন্যে। আর একটি কথা, সব প্রফেট কে সমান দায়িত্ব দিয়ে পাঠানোও হয়নি। যেমন যিশু এশেছেন বনি ইসরাইলের জন্যে, কিন্তু শেষ প্রফেট এসেছেন বিশ্বের সব মানুষের জন্যে এবং সর্বকালের জন্যে।'

'ও নাইস, নাইস! আমরা যিশুর ধর্ম গ্রহণ করিনি। ঠিক করেছি। সারা পৃথিবীর জন্যে যিনি, সর্বকালের জন্যে যিনি, তার ধর্মই মানুষের সত্যিকারের ধর্ম।' আনন্দে চিৎকার করে বলে উঠল ওগলালা।

'ঠিক বলেছ ওগলালা। তবে এটা নিয়ে এসো আরও ভাবি। আহমদ মুসার কাছে আরও জানা যাবে।'

বলে একটু থেমেই প্রফেসর আরাপাহো আবার বলল, 'ওগলালার কথাই ঠিক, তুমি প্রকৃতই মানুষ গড়া ও সমাজ গড়ার লোক। কিন্তু তোমার হাতে আবার বন্দুক কেন?'

'কারন আমার প্রফেট যুদ্ধ করেছেন, দেশ শাসন করেছেন। স্রষ্টা নির্দেশ দিয়েছেন ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধের জন্যে। আজ অন্যায়ের প্রতিরোধ কি বন্দুক ছাড়া সম্ভব?'

'বুঝেছি, তমাদের মিশন শুধু উপদেশ দেয়ার নয়, আদেশ দেয়ারও। সত্যিই এই বৈশিষ্ট্য অনন্য।

প্রফেসর আরাপাহোর কণ্ঠ থামতেই ড্রাইভারের কণ্ঠ ভেসে এল, স্যার আমরা পশ্চিম ভার্জিনিয়া স্টেটে প্রবেশ করছি।'

সবাই তাকাল সামনে।

কথায় কথায় তারা অনেকটা পথ চলে এসেছে।

'আহা, আমি অনেক দৃশ্য মিস করেছি।' বলে আহমদ মুসা দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো বাইরে।

ওহাইও নদীর জল কেটে এগিয়ে চলেছে সুন্দর বিলাসবহুল মোটর বোট টি।

প্রফেসর আরাপাহোর ভাড়া করা এ বোট টি আগেরটার চেয়ে বড় এবং সুন্দরও। এবার আরও বেশিক্ষণ বোটে থাকতে হবে। ওহাইও নদীর ৯০০ কিলোমিটার এবং মিসিসিপি'র ৪০০ কিলোমিটার পাড়ি দিতে হবে কাহোকিয়াতে পৌঁছার জন্যে।

ওহাইও, মিসিসিপি আহমদ মুসার স্বপ্নের নদীগুলোর অন্যতম।

সেই স্বপ্নের নদীর নীল জলে ভেসে ভেসে এগিয়ে চলেছে আহমদ মুসা।

ওহাইওকে সীমান্ত নদী বলা যায়। সব সময় এর গতি দুই স্টেটের সীমান্ত দিয়ে। হান্টিংটন পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে পশ্চিম ভার্জিনিয়া ও ওহাইও স্টেটের সীমান্ত দিয়ে। হান্টিংটনের পর ২০০ কিলোমিটার চলল ওহাইও এবং কেনটাকি স্টেটের সীমান্ত রেখা ধরে। এখন এগিয়ে চলছে কেনটাকি এবং ইন্ডিয়ানা স্টেটের সীমান্ত বরাবর।

আহমদ মুসা বোটের দু'তলার ডেকে ইজি চেয়ারে বসে উপভোগ করছে চারদিকের দৃশ্য। তার বামদিকে কেনটাকি স্টেট আর ডান দিকে নদীর ওপারে ইন্ডিয়ানা স্টেট।

ওগলালা এসে প্রবেশ করলো ডেকে। পাশেই এক চেয়ারে বসল। তার পোশাকে বেশ পরিবর্তন এসেছে। মিনিস্কার্ট ও টাইট প্যান্টের বদলে সে এখন পরেছে লম্বা স্কার্ট, গাউন ধরনের ঢিলা জামা হাতাওয়ালা। এখন এসেছে মাথায় রুমাল জড়িয়ে।

চেয়ারে বসে সে বলল, 'দেখুন তো আমাকে কেমন লাগছে?'

আহমদ মুসা ওগলালার দিকে চেয়ে হাসল। বলল, 'আমি বলব না,তুমিই বল তোমার কেমন মনে হচ্ছে?'

হাসল ওগলালা। বলল, ‘খুবই ফরমাল মনে হচ্ছে। এভাবে কি সর্বক্ষণ কেউ থাকতে পারে? না চলাফেরা সম্ভব এভাবে?’

‘তার মানে ভাল লাগছে না।’

‘ঠিক তা নয়। আমাকে নতুন মনে হচ্ছে। আর যেহেতু ভাল লাগাটা রিলেটিভ। এজন্যে কাউকে এটা ভালও লাগতে পারে, মন্দও লাগতে পারে।’

‘কিন্তু তোমার তো নিজস্ব ভাল লাগা মন্দ লাগা আছে।’

‘হঠাৎ নিজেকে যেন দায়িত্বশীল মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, অন্যদের সাথে ধুম-ধারাক্কা, হৈচৈ, লাফালাফি যেন আমার জন্যে নয়। হাসি পাচ্ছে এটা ভাবতে।’

এ সময় ডেকে প্রবেশ করলো জিভারো। বলল ওগলালার দিকে তাকিয়ে, ‘বাহ!তোকে তো সুন্দর মানিয়েছে।’

‘তুমি বিদ্রূপ করছ নাতো ভাইয়া?’ বলল ওগলালা।

‘না সত্যি বলছি, তোকে অনেক ‘এলিট’ মানে অনেক মর্যাদা সম্পন্ন মনে হচ্ছে।’

‘ঠিক বলেছ জিভারো, শালিন পোশাকে মেয়েদের মর্যাদা সম্পন্ন করে তোলে। মানুষ তাদেরকে খারাপ দৃষ্টিতে নয়, মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখে।’

‘কিন্তু মেয়েদেরকেই শুধু শালিন ও সংযত হতে হবে কেন ? আপনাদের ধর্মে মেয়েদের জন্যে অবাধ মেলামেশাকে আপত্তিকর বলা হয়েছে কেন ?’ বলল ওগলালা আহমদ মুসার দিকে ফিরে বসে।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘অবাধ মেলামেশা শুধু মেয়েদের জন্যে নয়, ছেলেদের জন্যেও আপত্তিকর বলা হয়েছে। তবে মেয়েদেরকে বেশী শালিন, সংযত ও চলাফেরায় সাবধান হতে বলা হয়েছে এজন্যে যে, একদিকে মেয়েরা আত্মরক্ষায় দুর্বল, আর অন্য দিকে ছেলেরা সবল ও মেয়েদের ব্যাপারে আক্রমণাত্মক। কোন অঘটন ঘটলে, তাতে ক্ষতিও হয় মেয়েদের বেশী।’

‘বুঝেছি ভাইয়া আপনি যা বলতে চাচ্ছেন। কিন্তু মেয়েদের শালিন, সংযত ও সাবধান হওয়াই কি পুরুষের এই যুলুম ও অবিচারের প্রতিকার ? কেন...।’

আহমদ মুসা ওগলালা কে বাধা দিয়ে হেসে বলল, ‘বুঝেছি তোমার কথা। এটুকুকেই প্রতিকার বলা হয়নি। যে পুরুষের দ্বারা এ ধরনের অঘটন ঘটবে, তার

বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর শাস্তির ব্যাবস্থা করা হয়েছে। ধর্ষণকারী যদি অবিবাহিত হয়, তাহলে প্রকাশ্যে ও জনসমক্ষে ৮০টি বেত্রাঘাতের শাস্তি দেয়া হয়েছে। আর যদি সে বিবাহিত হয়, তাহলে প্রকাশ্যে ও জনসমক্ষে তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যার বিধান দেয়া হয়েছে। এ ধরনের শাস্তির ব্যাবস্থা করা হলে ধর্ষণ প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে।'

'কিন্তু ভাইয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্ষণকে ধর্ষণ হিসেবে প্রমাণ কারা যায় না।' বলল জিভারো।

'এ কারনেই দাম্পত্য জীবনের বাইরে সব ধরনের অবৈধ অঘটনকে আমাদের ধর্ম ব্যাভিচার বা অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। উভয় পক্ষের সম্মতিতে হোক অসম্মতিতে হোক এই অপরাধের একই ধরনের শাস্তির বিধান করা হয়েছে।'

'সাংঘাতিক ! আমাদের সমাজে এটা অকল্পনীয়।' জিভারো বলল।

'সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা ও মেয়েদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এর প্রয়োজন আছে।' বলল আহমদ মুসা।

'আমি ভাবছি ভাইয়া। আমি সমর্থন করছি আপনাকে, আপনাদের আইনকে। ধন্যবাদ নতুন এক শিক্ষার জন্যে।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল জিভারো, কিন্তু হঠাৎ নারী ও পুরুষ কণ্ঠের সম্মিলিত চিৎকারে তার কণ্ঠ থেমে গেল। তিনজনই এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল।

কেবিন থেকে বেরিয়ে এল প্রফেসর আরাপাহো।

চার জনই গিয়ে দাঁড়াল যেদিক থেকে চিৎকার আসছে সেদিকে রেলিং-এর ধারে। দেখল তারা, একটা মোটর বোটে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে পৌঢ় নারী-পুরুষ। স্বামী-স্ত্রী হবে। বোটের একটু দূরে একটি বালক হাবুডুবু খাচ্ছে পানিতে।

নদীর এই জায়গাটা জনবিরল এবং মোহনা ধরনের। সামনেই একটা শাখা নদী বেরিয়ে গেছে ওহাইও কেনটাকির দিকে। সে কারনেই সম্ভবত নদিতে স্রোত এখানে বেশ জোরালো।

ঐ স্বামী- স্ত্রীর চিৎকারে ডুবন্ত বালকটির দিকে তাকিয়ে এসেট ওসেট দুই বোটের সবাই শোরগোল করে উঠছে।

আহমদ মুসা ডুবন্ত বালকটিকে দেখার সাথে সাথেই গা থেকে কোট ও পা থেকে জুতা খুলে ছুড়ে ফেলে রেলিং-এ উঠে দাঁড়াল।

জিভারো ও ওগলালা দু'জনেই এটা দেখে আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে চিৎকার করে উঠল, 'আপনি এভাবে নামবেন না । এখানে ওহাইও'র স্রোত খুব খারাপ, তার উপর আপনি অসুস্থ। আর এত উঁচু থেকে লাফ দিতে পারেন না।'

কিন্তু তাদের কথা আহমদ মুসা যেন শুনতেই পেল না। দু'হাত সামনে বাড়িয়ে মাথা নিচু করে লাফ দিয়েছে সে। বাজপাখির মত নেমে গেল নদীর পানি লক্ষ্যে। পানিতে পরল না, পানিতে ঢুকে গেল তীরের মত নিঃশব্দে।

দুইটি বোট থেকে দজন খানেক চোখের দৃষ্টি তার দিকে ছুটে গেল।

কিন্তু পানিতে সেই যে ঢুকে গেল, উঠল না সে। সব চোখ আশা করছে সে সাঁতরে দ্রুত এগিয়ে যাবে ছেলেটির কাছে। ছেলেটি যে ডুবে যাচ্ছে। সত্যিই ডুবে গেল। দেখা যাচ্ছে না ছেলেটিকে আর।

ডুকরে কেঁদে উঠল পৌঢ় নারী-পুরুষ। হায় হায় করে উঠল দুই বোটের মানুষ।

কোথায় আহমদ মুসা?

সেও কি ডুবে গেল নাকি! আর্তনাদ করে উঠল ওগলালা।

ঠিক এ সময়েই ছেলেটি যেখানে ডুবে গিয়েছিল, সেখান থেকে আট-দশ গজ দূরে ছেলেটিকে এক হাত উপরে তুলে ধরে ভেসে উঠল আহমদ মুসা।

দুই বোটের সবাই আনন্দে চিৎকার করে উঠল। পৌঢ় দুই নারী-পুরুষ দু'হাত উপরে তুলে ঈশ্বরকে ডাকতে লাগল।

আহমদ মুসা বালকটিকে এক হাতে ঐভাবে উঁচু করে ধরে সাঁতরে এগুলো বোটের দিকে স্রতের প্রতিকুলেই। বোটও এগুতে লাগল আহমদ মুসার দিকে।

বোট থেকে দড়ির মই নামিয়ে দেয়া হলো।

আহমদ মুসা ছেলেটিকে নিয়ে দড়ির মইয়ে দাঁড়ালে ওরা তাদের বোটে তুলে নিল।

ছেলেটির পেট পানিতে ভর্তি। কিন্তু সম্পূর্ণ সংজ্ঞা হারায়নি সে তখনও।

আহমদ মুসা ছেলেটিকে নিয়ে ডেকে এসে নামতেই প্রৌঢ়া মহিলাটি হুমড়ি খেয়ে পড়ল বালকটির উপর। প্রৌঢ় লোকটি মহিলাটিকে টেনে তুলে বলল, 'আগে ছেলেটিকে বাঁচতে দাও।'

'ধন্যবাদ।' প্রৌঢ়টির উদ্দেশ্যে কথাটি বলে আহমদ মুসা বালকটির পেট থেকে পানি বের করার প্রক্রিয়া শুরু করল।

ততক্ষণে প্রফেসস আরাপাহো তার বোট এ বোটের গায়ে ভিড়িয়ে ওগলালা ও জিভারোকে নিয়ে নেমে এসেছে এ বোটে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ছেলেটির পেটের পানি বের হয়ে গেল এবং ছেলেটি সুস্থ হয়ে উঠল।

প্রৌঢ় লোকটি ছেলেটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে তুলে দিল প্রৌঢ়া মহিলাটির কোলে। মহিলাটি তাকে বুকে জড়িয়ে আরেক দফা কেঁদে উঠল।

প্রৌঢ় লোকটি আহমদ মুসার দু'হাত জড়িয়ে বলল, 'ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ বাবা। ঈশ্বর তোমার ভাল করবেন।'

বলেই প্রৌঢ় লোকটি ছুটে গেল তার কেবিনে। মিনিট খানেক পরেই বেরিয়ে এল একটি চেক হাতে করে। চেকটি আহমদ মুসার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'একমাত্র নাতির নবজীবন লাভে আনন্দিত তার দাদুর পক্ষ থেকে এক লাখ ডলার উপহার দিলাম বাবা।'

আহমদ মুসা চেক হাতে নিল। তারপর বালকটির গালে তকা দিয়ে আদর করে প্রৌঢ়টিকে বলল, 'এ আপনার নাতি। সেই সাথে এ ঈশ্বরের সুন্দরতম সৃষ্টি মানুষের একজন এবং এই হিসেবে এ আমারও ভাই। এ ছোট ভাইয়ের জন্যে আমার এ ছোট্ট উপহার গ্রহণ করুন।'

বলে আহমদ মুসা চেকটি প্রৌঢ়ের হাতে তুলে দিল।

প্রৌঢ়টি বিস্মিত চোখে কম্পিত হাতে চেকটি গ্রহণ করলো। বলল, কে তুমি বাবা এত সুন্দর কথা বল? তুমি চার্চের ফাদার হলে আমি বিস্মিত হতাম না। কিন্তু তোমদের মত নব্য যুবকের জন্যে এটা বিস্ময়। যাই হোক, যে ভাবেই হোক তুমি আমার উপহার প্রত্যাহার করলে বাবা।'

'তাহলে কি আপনি চান পরোপকার, মানব সেবা, কারও বিপদে এগিয়ে যাওয়া ইত্যাদি লাভজনক ব্যাবসায় পরিনত হোক ?'

প্রৌঢ় কথা বলল না। স্তম্ভিত চোখ তার আহমদ মুসার উপর নিবিদ্ধ। এক সময় সে আহমদ মুসার দু'হাত চেপে ধরে বলল, 'এস বাবা, তোমার সাথে একটু কথা বলি। এক দুর্লভ যুবক তুমি।'

এগিয়ে এল ওগলালা। বলল প্রৌঢ়কে, 'মাফ করবেন আংকল, ওর কাপড় পাল্টানো দরকার। ঠাণ্ডায় ওর ক্ষতি হবে।

আহমদ মুসা প্রৌঢ়ের সাথে ওগলালা, জিভারো এবং প্রফেসর আরাপাহোর  পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'আমি ওঁদের অতিথি। আমি চলি জনাব।'

প্রৌঢ় আহমদ মুসার হাত ছেড়ে দিয়ে  ওঁদের সাথে সম্ভাষণ বিনিময় করল। তারপর আহমদ মুসার দিকে ফিরে বলল, 'ঠিক, তাড়াতাড়ি তোমার কাপড় পাল্টানো দরকার।'

বলে পকেট থেকে নিজের পরিচিতি কার্ড বের করে আহমদ মুসার দিকে তুলে ধরে বলল, 'তুমি কি আমেরিকান?'

আহমদ মুসা কার্ড হাতে নিয়ে বলল, 'না, আমি আমেরিকান নই।'

'আমার পরিচয় তোমার কাছে থাকল। সময় করে যদি দেখা করো, তাহলে আমি এবং আমার ছেলে খুব খুশী হবো। তাছাড়া তোমার কোন প্রয়োজনে যদি আমি লাগতে পাড়ি, তাহলে নিজেকে সউভাগ্যবান মনে করব।' বলল প্রৌঢ় কৃতজ্ঞতা ভরা কণ্ঠে।

প্রৌঢ় প্রফেসর আরাপাহোর দিকেও ফিরল। বলল, 'প্রফেসর নামে আপনাকে চিনি। খুশী হলাম দেখা হওয়ায়। আপনারাও আমার কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।'

আহমদ মুসা ওগলালাদের বোটে পার হয়ে প্রৌঢ়ের পরিচিতি কারদের দিকে নজর দিল। ভাল করে নজর পড়তেই চমকে উঠল। নাম জর্জ আব্রাহাম জনসন। পরিচয় ডাইরেক্টর ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই)।

আহমদ মুসারা পাশাপাশি হেঁটে কেবিনে চলে এসেছিল।

‘কার্ডে কি পড়লেন ভাইয়া ? লোকটি কে?’ জিজ্ঞেস করলো ওগলালা।

‘লোকটি এক অর্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে পাওয়ারফুল ব্যাক্তি। এফবিআই-এর ডাইরেক্টর জর্জ আব্রাহাম জনসন।’ বলে আহমদ মুসা কার্ডটি তুলে দিল ওগলালার হাতে।

নাম শুনার সাথে সাথে তারা তিনজনই দাঁড়িয়ে পড়েছে। প্রফেসর আরাপাহো ওগলালার হাত থেকে কার্ডটি নিল। কার্ডটির দিকে একবার নজর বুলিয়ে বলল, ‘ঠিকই বলেছ আহমদ মুসা তার শক্তি সম্পর্কে। আগে জানলে আরও আলাপ করা যেত।’

‘আব্বা ওঁকে আর না আটকানো উচিত। ওর কাপড় পাল্টানো দরকার।’

বলেই ওগলালা আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আপনি গরম সাওয়ার নেবেন। উপকার হবে।’

‘ধন্যবাদ ওগলালা। মেয়েদের সংসার জ্ঞান সত্যি মজ্জাগত। এই বয়সে এত বিষয় জান কি করে ? সান ওয়াকার সত্যিই বলে ‘go back to kitchen.’

‘আমি এর প্রতিবাদ করছি। আপনার ধর্ম ইসলামও এ কথা বলেনা। কিন্তু পরে কথা হবে, আপনি যান।’

আহমদ মুসা মিনিট দশেকের মধ্যেই ফিরে এল।

একটা ডেকে টেবিল ঘিরে ওরা তিনজন বসে। চায়ের সরঞ্জাম সাজিয়ে বসে ওরা।

আহমদ মুসাও বসল।

সঙ্গে সঙ্গেই ওগলালা এক কাপ গরম চা আহমদ মুসার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, ‘চা দিলাম বলে আমি ‘রান্নাঘর’-এর উপযুক্ত বলে বসবেন না যেন।’

‘কেন বলব ? তুমিই তো বলেছ আমাদের ধর্ম ইসলাম এটা সমর্থন করে না।’

‘কি বলে সেই কথাও সবাইকে বলুন।’ বলল ওগলালা

‘বলে মেয়েরা উপযুক্ত পরিবেশ তাদের মন-মানসিকতা ও সামর্থের সাথে সঙ্গতিশীল সব কাজই করতে পারবে।’

‘ধন্যবাদ। আরও ধন্যবাদ এ জন্যে যে, আপনি এক লাখ টাকার উপহার ফেরত দিয়েছেন মিঃ জর্জ আব্রাহাম জনসনকে। আমার মন আকুলি-বিকুলি করছিল আপনার পরিচয় তাকে দেবার জন্যে। তাহলে সে বুঝতো, আহমদ মুসার মানবিকতা ও মহত্ত্ব কতবড় এবং কিভাবে সে হৃদয়ের ঐশ্বর্য দিয়ে প্রাচুর্যকে পদাঘাত করতে পারে।’

ওগলালা একটু থেমেছিল।

সেই সুযোগে কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল জিভারো।

কিন্তু ওগলালা ‘আমার আসল কথাই বলা হয়নি ভাইয়া’ বলে থামিয়ে দিল জিভারো কে। তারপর আহমদ মুসার দিকে চেয়ে বলল, আপনার প্রাপ্ত ধন্যবাদ দিয়েছি। এখন প্রাপ্ত নিন্দার কথা বলি, আপনার ঐভাবে নদীতে লাফিয়ে পড়া ঠিক হয়নি। এক অঘটনের প্রতিকার করতে গিয়ে আরেক অঘটন ঘটতে পারতো।

‘কিন্তু ওগলালা কোন অঘটন ঘটেনি। অন্যদিকে একটা জীবন বেঁচেছে। এজন্যে ওঁকে ধন্যবাদ দেয়া প্রয়োজন।’ বলল জিভারো।

‘ঘটেনি কিন্তু ঘটতে পারতো। এ থেকে ভবিষ্যৎ এর জন্যে শিক্ষা নেয়া প্রয়োজন।’ বলল ওগলালা।

জিভারো কিছু বলতে যাচ্ছিল।

প্রফেসর আরাপাহো তাকে বাধা দিয়ে বলল, ‘তোমার কথাও ঠিক, ওগলালার কথাও ঠিক। কিন্তু এই দুই কথার কোনটাই আহমদ মুসার জন্যে প্রয়োজন নেই। আহমদ মুসাকে আমরা নামে চিনেছি। কার্যক্ষেত্রে একঝলক দেখার সৌভাগ্য হলো। তবে ঈশ্বর কে বলি, তাকে কার্যক্ষেত্রে এমন ভাবে দেখার যেন প্রয়োজন না হয়।’

‘ঠিকই বলেছেন আব্বা। তবে কিছু কাজ না দেখালে দুর্লভ সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হবো।’ বলল ওগলালা।

‘কিন্তু এই যে তুমি তাকে নসিহত করলে ঐভাবে ঝুঁকি না নিতে।’

ওগলালা সলাজ হাসল। বলল, ‘সব কাজ, সব ঘটনাই তো আর পর্বতপ্রমাণ উঁচু থেকে নদীর ঘূর্ণিপাকে ঝাঁপিয়ে পড়া নয়।’

হেসে উঠল প্রফেসর আরাপাহো এবং জিভারো।

হাসি দেখে ভ্রূকুটি করল ওগলালা। লজ্জা ও অপমানের চিহ্ন ফুটে উঠল তার চোখে-মুখে। হাত থেকে চায়ের কাপ টেবিলে রেখে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল ওগলালা এবং কোন কথা না বলে গট গট করে হেঁটে কেবিনের ভেতরে চলে গেল।

‘ঠিক ছোট্টটিই রয়ে গেছে একেবারে। দৈত্য-দানবের কেচ্ছা শুনবে, কিন্তু কোলের নির্ভয় আশ্রয়ে বসে।’ হাসতে হাসতে বলল প্রফেসর আরাপাহো।

কথা শেষ করেই প্রফেসর আরাপাহো নদীর ডান পাড়ে ইন্ডিয়ানা স্টেটের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘এই যে সবুজ সুন্দর রাজ্যটি দেখছ, আমেরিকার অন্যান্য স্থানের মত এখানেও রেড ইন্ডিয়ানদের রক্তের স্রোত বইয়েছে। ১৭৭৯ সালে পরাজিত ব্রিটিশ বাহিনী এই অঞ্চল মার্কিন বাহিনীর হাতে ছেরে দেয়। কিন্তু রেড ইন্ডিয়ানরা তাদের মাতৃভূমি ছেড়ে দিতে চায়নি। মার্কিন বাহিনী দু’বার পরাজিত হয় রেড ইন্ডিয়ানদের হাতে। আঠার বছরের অব্যাহত লড়াইয়ের পর মার্কিন বাহিনী এখানকার বাসিন্দা রেড ইন্ডিয়ানদের প্রতিরোধ নির্মূল করে শক্তির জোরে। আজ তুমি এই ইন্ডিয়ানা স্টেটে কোন ইন্ডিয়ান খুঁজে পাবেনা।’

প্রফেসর আরাপাহোর শেষ কথাটা আবেগে ভারি হয়ে উঠল।

আহমদ মুসা সমবেদনার সুরে নরম কণ্ঠে বলল, ‘এই রক্তলেখা কাহিনী পৃথিবীর বহুদেশে আছে। কিন্তু আপনাদের কাহিনীর চেয়ে মর্মন্তুদ আর কোনটাই নয়।’

বলে একটু থেমেই আহমদ মুসা বলল আবার, ‘আপনারা বাড়তি যে ৭১৫ টি রিজার্ভ এলাকা দাবী করেছেন, তার মধ্যে এই ইন্ডিয়ানা স্টেটের কোন এলাকা আছে?’

‘আছে। ওয়াবাল নদী উপত্যকা এবং মিশিগান হ্রদ সংলগ্ন ‘সাউথ বেন্ড’ এলাকা।’

‘কিন্তু আপনারা রিজার্ভ এলাকা দাবী করার মাধ্যমে কি নিজেদের ‘জাতি’ হওয়ার বদলে ‘উপজাতি’তে পরিণত করেছেন নাকি ?’

'তুমি ঠিক বলেছ। তার অর্থ এটাই বুঝায়। কিন্তু এটা আমাদের একটা কৌশল। আমাদের যোগ্য করে তৈরি করার কৌশল। এর পরের পদক্ষেপ হবে জাতীয় জীবনের সর্বত্র আমাদের ন্যায্য অংশ আদায় করা।'

'কিন্তু শ্বেতাঙ্গ বা ইউরোপিয়ানদের বৈরী নীতি অনুসরনে  তা করা ঠিক হবে না।'

'সেটা এখন আমাদের নীতিও নয়। ভাই হওয়ার সমানাধিকার নিয়েই আমরা আমাদের অংশ চাইব। এবং আমরা জানি মুষ্টিমেয় বর্ণবাদী ছাড়া অধিকাংশ আমেরিকান এবং মার্কিন সংবিধানের সমর্থন আমরা পাব।'

প্রফেসর আরাপাহো কথা শেষ করতেই কেবিনের দরজায় ওগলালা এসে আদালতের ঘোষকের মত হাঁক ছাড়ল, 'খাদ্য খাবার টেবিলে প্রস্তুত। সকলকে খাদ্য গ্রহনের জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।'

প্রফেসর আরাপাহো উঠল। তার সাথে আহমদ মুসা এবং জিভারো।

তখন বোট চলছে ইলিনয় স্টেট ও কেনটাকির সীমান্ত দিয়ে। ক'মিনিট আগে ওয়াবাশ নদীর সংযোগ স্থল পেরিয়ে এসেছে। এখানে ওহাইওতে মিশিগান হ্রদের পানি সমৃদ্ধ ওয়াবাশ নদীর পানি যুক্ত হওয়ায় নদীর গতি অপেক্ষাকৃত বেগবান।

এখান থেকে মিসিসিপির সংযোগ স্থল পর্যন্ত প্রায় দু'শ কিলোমিটার এলাকা ইলিনয় স্টেটের জনবিরল প্রেইরীর অংশ। দু'ধারেই বিস্তীর্ণ তৃণভূমি। নদীর দু'ধারে ঝোপঝাড়, গাছ-পালা অবশ্যই আছে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য শহর বা জনপদ এই দু'শ কিলমিতারের মধ্যে নেই, একমাত্র পাদুকান শহর ছাড়া। পাদুকান শহর ওহাইও এবং কেনটাকি নদীর সংযোগ স্থলে অবস্থিত।

কেনটাকি নদীর ২৫ কিলোমিটার আগে বার্কলে নদী।কেনটাকির মতই এ নদী ওহাইও থেকে বেরিয়ে কেনটাকির মধ্য দিয়ে দক্ষিণ দিকে টিনেমির দিকে এগিয়ে গেছে।

বোট তখন বার্কলে'র উৎসের মুখে প্রায় পৌঁছে গেছে।

বোটের দু'তলার ডেকে বসে গল্প করছে ওরা চারজন, প্রফেসর আরাপাহো, আহমদ মুসা, জিভারো এবং ওগলালা।

হঠাৎ বাম দিকের তীর থেকে একটি জোরালো ও ভারি কণ্ঠ ভেসে এল, ‘বোট ভিড়াও এদিকে।’

চমকে উঠল আহমদ মুসারা। ভয় ফুটে উঠল প্রফেসর আরাপাহোর চোখে-মুখে।

‘পুলিশ নাকি?’ বলল ওগলালা।

‘না, পুলিশ অবশ্যই নয়। নৌ-পুলিশ হলে তাদের বোট থাকতো। আমার মনে হচ্ছে, এরা অন্য কেউ। এখান থেকে মিসিসিপি পর্যন্ত এই এলাকাটা ভাল না।’ বলল প্রফেসর আরাপাহো।

আহমদ মুসা ভাবছিল। তার দৃষ্টি তীরের দিকে। তীরে ওরা দশ বারোজন লোক। সবাই বসে। যে কথা বলছে সে দাঁড়িয়ে। তার হাতে আধুনিক রাইফেল।

ওদিক থেকে আর কোন কথা এলোনা। এল বন্দুকের শব্দ। তীরের সেই লোকটির হাতের বন্দুক মোটর বোটের দিকে তাক করা।

বন্দুকের গুলী হবার মুহূর্তেই একটি গুলী এসে বিদ্ধ করল বোটের ফ্ল্যাগ স্ট্যান্ডকে।

চখের পলকে ফ্ল্যাগ স্ট্যান্ডটি কোথায় উড়ে গেল!

গুলীর প্রায় সাথে সাথে তীরের সেই কণ্ঠটি আবার ধ্বনিত হলো, ‘দু’বার আমি নির্দেশ করিনা। বোট না ভেড়ালে বোমা মেরে উড়িয়ে দেব।’

প্রায় মরার মত ফ্যাকাশে হয়ে গেছে জিভারো এবং ওগলালার মুখ। ভয় ও উদ্বেগে মুষড়ে পড়েছে প্রফেসর আরাপাহো।

আহমদ মুসা তাদের দিকে একবার তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল। ডেকের সামনের দিকটায় এগিয়ে বলল, ‘বোট  ভিড়ানো হচ্ছে।’

বলে আহমদ মুসা রেলিং পাশে নিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে ক্রুদের বলল, ‘বোট তীরে ভেড়াও।’

আহমদ মুসা ফিরে এল প্রফেসর আরাপাহোদের কাছে।

প্রফেসর আরাপাহো ভীত ও শুষ্ক কণ্ঠে বলল, ‘বোট ভেড়ানো কি ভাল হলো। শুনেছি ওরা নিষ্ঠুর ও জঘন্য প্রকৃতির লোক। এই এলাকায় আগেও নৌ-ডাকাতি ও হাইজ্যাকের ঘটনা ঘটেছে।’

‘উপায় কি। মিথ্যা হুমকি ওরা দেয়নি। সত্যিই ওরা বোট উড়িয়ে দিতে পারতো।’ একান্ত স্বাভাবিক ও উদ্বেগহীন কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

‘আমার ভয় করছে। বোট ওরা তীরে ভেড়াতে বলছে কেন? ওরা কি করতে চায় আমাদের?’ বলল ওগলালা।

‘যা ঘটার তাই ঘটবে। ভয় করে লাভ কি? ইশ্বরের উপর ভরসা কর।’ বলল আহমদ মুসা।

বোট ভিড়েছে।

তীরের লোকদের নির্দেশে সংযোগ সিঁড়িও নামিয়ে দেয়া হয়েছে তীরে।

সিঁড়ি লাগার সঙ্গে সঙ্গে ওরা সিঁড়ি বেয়ে ঝড়ের বেগে উঠে এল বোটে।

সাতজন ওরা।

সাতজনের মধ্যে সবার আগে যে বোটে উঠল তার হাতে স্টেনগান এবং কোমরে ঝুলানো রিভলবার। আর অন্যদের হাতে স্বয়ংক্রিয় রাইফেল। সবাই শ্বেতাঙ্গ।

বোটে উঠে প্রফেসর আরাপাহোদের দিকে নজর পড়তেই সবাই হৈহৈ করে উঠল, ‘ব্যাটা ইন্ডিয়ান! তোদেরই মুখ দেখতে হলো।’

আর আহমদ মুসার দিকে নজর পড়তেই স্টেনগানধারী বলে উঠল, ‘আর তুই কে হে। তকে তো এশিয়ান কালা আদমী মনে হচ্ছে।’

‘হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। আমি এশিয়ান। এখন বল, তোমরা বোট ভিড়াতে বললে কেন ?’

লোকটি হো হো করে হেসে উঠল। বলল, ‘তোদের আদর-সোহাগ করার জন্যে বোট ভেড়াতে বলেছি’। বলে আবার একবার হাসল কুৎসিত কণ্ঠে।

ওরা বোটে উঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রফেসর আরাপাহো, জিভারো ও ওগলালা উঠে দাঁড়িয়েছিল।

ওগলালা ছুটে এসে দাঁড়িয়েছিল আহমদ মুসার পেছনে। তার ভীত মুখ রক্তহীন পাণ্ডুর।

হাসি থামিয়ে স্টেনগানধারী লোকটি আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, ‘তর পেছনে ওটা কে? খাসা সুন্দরী তো! আহ! মেঘ না চাইতেই জল!’

'দেখ এঁরা সম্মানি লোক।' তারপর প্রফেসর আরাপাহোর দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'উনি একজন সম্মানিত প্রফেসর। এরা দুজন ওঁর ছেলেমেয়ে। এঁরা পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে।'

লোকটি আবার সেই হেঁড়ে স্বরে হো হো করে হেসে উঠল। বলল, গরুর রাখাল যাযাবর ব্যাটারা আবার কবে সম্মানি হল?'

কথা শেষ করেই সাথীদের দু'জনকে নিরদেশ দিল, 'তোমরা নিচে যাও। বোটের ক্রুদের ঠিক করো।' অন্যদের উদ্দেশ্যে বলল, 'এদের সার্চ করো। টাকা-পয়সা, অস্ত্রপাতি কিছু আছে কিনা দেখ। সুন্দরীকে সার্চ করার দরকার নেই, ওকে সার্চের কাজটা আমিই পড়ে করব।'

সার্চ হয়ে গেলে লোকটি প্রফেসর কে লক্ষ্য করে বলল, 'তোমরা বোট থেকে নেমে যাও'।

প্রফেসর আরাপাহো তাকাল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা বলল, 'মিঃ প্রফেসর এদের সাথে ঝগড়া করে লাভ নেই। চলুন আমরা নেমে যাই'।

প্রফেসর আরাপাহোর মুখ মলিন হয়ে উঠল।

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়িয়েছিল যাওয়ার জন্যে। বোটের সিরির দিকে পা বাড়াবার আগে আহমদ মুসা বলল, 'চল ওগলালা'।

আহমদ মুসার কথা শোনার পড় প্রফেসর আরাপাহো এবং জিভারো হাঁটা শুরু করেছে বোট থেকে নামার জন্যে।

আহমদ মুসা ওগলালাকে ডেকেছে বটে বোট থেকে নামার জন্যে, কিন্তু নিজে এক পা বাড়ায়নি চলার জন্যে।

এদিকে ওগলালা বোট থেকে নামার জন্যে চলা শুরু করার সাথে সাথে স্টেনগানধারী সরদার গোছের লোকটি বলল, 'না সুন্দরী যাবে না। সে আমাদের সাথে থাকবে। কাল সকালে সুন্দরী ও বোট দুটোই তোমরা ফেরত পাবে।'

বলেই সে এগুলো ওগলালাকে ধরার জন্যে।

চিৎকার করে ছুটে যাচ্ছিল ওগলালা তার পিতার দিকে। তার পিতা প্রফেসর আরাপাহো এবং জিভারো লোকটির কথা শোনার সাথে সাথেই থমকে দাঁড়িয়েছে।

ওগলালার পথ রোধ করে দাঁড়াল লোকটি।

ওগলালা বাধা পেয়ে ছুটে এসে আহমদ মুসার আড়ালে দাঁড়াল। তার মুখ মরার মত পাণ্ডু। কাঁপছিল সে আতঙ্কে।

আহমদ মুসা হাসি মুখে ওগলালার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভয় কি ওগলালা। ওরা তো আমাদের মত মানুষ।'

'ঠিক বলেছ কালা এশিয়ান। তোমার বুদ্ধি আছে। তবে আমরা তোমাদের মত নয়, অনেক উৎকৃষ্ট মানুষ। সুন্দরীও বুঝবে আমাদের সাথে থাকার পর।'

বলে লোকটি এক পা দু'পা করে এগুতে লাগল ওগলালার দিকে।

লোকটির অবশিষ্ট চারজন সাথী দাঁড়িয়েছিল প্রফেসর আরাপাহো আগে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে। আর প্রফেসর আরাপাহো এবং জিভারো দাঁড়িয়ে আছে বোটের আরেকটু সামনের দিকে।

লোকটি একদম কাছে এসে গেছে।

ওগলালা আহমদ মুসার গা ঘেঁষে পেছনে দাঁড়িয়েছিল।

লোকটি তার স্টেনগান ডান হাতে নিয়ে আহমদ মুসার ডান পাশ দিয়ে তার বাম হাত বাড়িয়ে এগুলো ওগলালাকে ধরার জন্যে।

লোকটির লক্ষ্য তখন তার শিকার ওগলালার দিকে।

আল্লাহর দেয়া এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করলো আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা তার ডান হাত বাড়িয়ে এক ঝটকায় স্টেনগানটা কেড়ে নিয়েই স্টেনগানের বাঁট দিয়ে আঘাত করল লোকটির ঘাড়ে। তারপর স্টেনগান সোজা করে নিয়েই একটু দূরে দাঁড়ানো চারজনকে লক্ষ্য করে স্টেনগানের ট্রিগার টিপল আহমদ মুসা।

ঘটনার আকস্মিকতায় ওরা চারজন প্রথমটায় হকচকিয়ে গিয়েছিল।

আহমদ মুসা ঐটুকু সময়েরই সুযোগ গ্রহণ করে। চারজন কিছু করার আগেই একই সাথে এক ঝাঁক গুলীর শিকার হয়ে ঝরে পড়ল মাটিতে।

এদিকে ঘাড়ে আঘাত পাওয়া লোকটি নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে মরিয়া হনে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল আহমদ মুসার উপর।

আহমদ মুসা ছিটকে পড়ে গেল ডেকের উপর।

লোকটি জাপটে ধরেছে ডেকে পড়ে যাওয়া আহমদ মুসাকে।

কিন্তু আহমদ মুসার হাত দু'টি মুক্ত থেকে গেছে। আহমদ মুসার ডান হাতে তখনও স্টেনগান। কিন্তু গুলী করার জো নেই।

আহমদ মুসা দু'হাতে স্টেনগান ধরে একটু উঁচু করে লম্বাভাবে আবার আঘাত করল লোকটির মাথায়। পর পর কয়েকবার।

আহমদ মুসাকে জাপটে ধরা লোকটির হাত কিছুতা শিথিল হয়ে গিয়েছিল।

আহমদ মুসা নিজের দেহকে প্রবলভাবে ঘুরিয়ে দেহকে গড়িয়ে নিল এবং লোকটিকে ছিটকে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

ঠিক এই সময়েই জিভারো চিৎকার করে উঠল 'পেছনে গুলী ভাইয়া'।

এ চিৎকার কানে যাবার সাথে সাথেই এক পাশে নিজের দেহকে ছিটকে দিল আহমদ মুসা। তার দেহটি মাটি স্পর্শ করার আগেই দুটি গুলী একই সাথে অতিক্রম করল তাকে। দাঁড়িয়ে থাকলে তার বুক ও মাথা ভেদ করতো গুলী দুটো।

আহমদ মুসা মাটিতে পড়েই তার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে পেছন দিকে। দেখতে পেল নিচের ডেক থেকে উঠে আসা সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আছে ওরা দু'জন তারা আবারও বন্দুক তাক করেছে আহমদ মুসাকে।

আহমদ মুসা মুখ ঘুরিয়ে নেবার সাথে সাথে দু'হাতে ধরা তার স্টেনগানকেও সোজা করে নিয়েছিল। লোক দুটি তার চোখে পড়ার সাথে সাথেই স্টেনগানের ট্রিগার টিপল আহমদ মুসা তাদের লক্ষ্য করে।

ওরাও ট্রিগার টিপতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই স্টেনগানের ছুটে যাওয়া অনেক গুলীর গ্রাসে পরিণত হলো তারা।

তাদের দেহ গড়িয়ে পড়ল সিঁড়ি দিয়ে নিচে।

গুলী করেই তাকাল আহমদ মুসা তাকে আক্রমণকারী সেই লোকটির দিকে।

দেখল লোকটি টলতে টলতে উঠে দাঁড়াচ্ছে। তার হাতে রিভলবার।

তার মাথার পেছন দিক স্টেনগানের বাঁটে ভালই আঘাত পেয়েছে। আহত জায়গা থেকে রক্ত গড়িয়ে তার পেছন পেছন ভিজে যাচ্ছে।

রিভলবার হাতে লোকটিকে যখন আহমদ মুসার চোখে পড়ল। তখন স্টেনগান ঘুরিয়ে গুলী করার সময় ছিল না। মুহূর্তও নষ্ট না করে আহমদ মুসসা স্টেনগান ছুড়ে মারল লোকটির রিভলবার ধরা হাত লক্ষ্যে।

ছিটকে পড়ল রিভলবার লোকটির হাত থেকে।

রিভলবার হাতছাড়া হলে লোকটি স্টেনগান কুড়িয়ে নেবার জন্যে ঝাপিয়ে পড়ল স্টেনগানের উপর।

স্টেনগান ছুড়ে দিয়েই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়েছিল। সে ছুটে গেল লোকটির লক্ষ্যে।

লোকটি দু'হাত দিয়ে স্টেনগান আঁকড়ে ধরেছিল।

আহমদ মুসা এক পা দিয়ে স্টেনগান চাপা দিয়ে অন্য পা দিয়ে প্রচণ্ড এক লাথি মারল লোকটির স্টেনগান ধরা হাতে।

লোকটির থেথলে যাওয়া হাত স্টেনগান ছেড়ে দিল।

আহমদ মুসা দু'হাতে লোকটিকে তুলে দাঁড় করিয়েই প্রচণ্ড এক ঘুষি মারল তার মুখের এক পাশে। সে ছিটকে গিয়ে পড়ল। একেবারে পড়ল গিয়ে রিভলবারের উপর। নতুন প্রাণ পাওয়ার মত সে তুলে নিল রিভলবার। রিভলবার ঘুরাল সে আহমদ মুসার দিকে।

কিন্তু দেখল আহমদ মুসার স্টেনগান আগেই তাকে লক্ষ্য করে হাঁ করে উঠেছে।

আহমদ মুসা লোকটিকে ঘুষি মেরেই পায়ের তলা থেকে তুলে নিয়েছিল স্টেনগান।

লোকটিকে রিভলবার কুড়িয়ে ঘুরতে দেখেই আহমদ মুসা স্টেনগানের ট্রিগার টিপল।

লোকটির ঝাঁঝরা দেহ গড়িয়ে পড়ল ডেকের উপর।

চারিদিকে একবার তাকিয়ে স্টেনগান ফেলে দিল আহমদ মুসা হাত থেকে।

জিভারো, প্রফেসর আরাপাহো এবং ওগলালা এতক্ষণ ভয় ও আতঙ্ক নিয়ে পাথরের মত নিশ্চল মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থেকে দেখছিল স্বপ্নাতীত এক দৃশ্য।

এবার জিভারো ছুটে জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে।

প্রফেসর আরাপাহোও এল। সে আহমদ মুসার মাথায় হাত দিয়ে বলল, 'ঈশ্বর তমাকে দীর্ঘজীবি করুন বৎস।'

আর ওদিকে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়ানো ওগলালার স্থির চোখ দু'টি থেকে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু, কৃতজ্ঞতার অশ্রু, অবিরামভাবে।

আহমদ মুসা সেদিকে এগুবার জন্যে পা বাড়াতে বাড়াতে বলল। 'অশ্রু কেন ওগলালা, আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর।'

ওগলালা ছুটল আহমদ মুসার দিকে। ছুটে এসে উপুড় হয়ে মাথা রাখল আহমদ মুসার পায়ে।

আহমদ মুসা তাকে টেনে তুলল ল বলল, 'বোস, মানুষ আল্লাহর সর্বোৎকৃষ্ট এবং সবচেয়ে সম্মানিত সৃষ্টি। আল্লাহ ছাড়া আর কারও কাছে তার মাথা নত হবে না, এটা আল্লাহ চান।'

'হতে পাড়ে ভাইয়া। কিন্তু মাটির মানুষও অনেক সময় ঈশ্বর হয়ে ওঠেন।' কান্নায় ভেঙে পড়ল তার কথা।

'আল্লাহ মাফ করুন। যে মানুষকে তুমি ঈশ্বর বলবে, হতে পাড়ে সে আল্লাহর মাত্র একজন অনুগত বান্দাহ।'

বলে আহমদ মুসা তাকাল জিভারোর দিকে। বলল, 'জিভারো বোটের ক্রুদের বল, লাশ গুলো নদীতে ফেলে সবগুলো জায়গা ভালও করে ধুয়ে দেবে।'

কথা শেষ করে আহমদ মুসা প্রফেসর আরাপাহোর দিকে চেয়ে বলল, 'আমার মনে হয় লাশ ও অস্ত্রগুলো পুলিশের জন্যে রেখে ঝামেলা বাড়ানো ঠিক হবে না।'

'না, তুমি ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছ। পুলিশ আশেপাশে থাকলে দেখা যেত। এখন কোথায় পুলিশ খুঁজে বেড়াব।'

জিভারো আহমদ মুসার নির্দেশ নিয়ে নিচের ডেকে চলে গেল।

আর আহমদ মুসা, প্রফেসর আরাপাহো এবং ওগলালা কেবিনের ভেতরে এসে একটা টেবিল ঘিরে বসল।

ক-মিনিট পর জিভারো এসে প্রবেশ করল। বলল, 'ওরা কাজে লেগে গেছে। নোঙর তোলা হয়েছে। এখনি বোট চলতে শুরু করবে।'

'ঠিক সিদ্ধান্ত দিয়েছ। বলতে চেয়েছিলাম এটা। ভুলে গেছি।'

চা এল।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে প্রফেসর আরাপাহো অনেকটা স্বগতোক্তির মত বলল, 'জীবন রক্ষাকারী এবং জীবন সংহারী দুই আহমদ মুসাকেই আজ দেখলাম।'

'কোন আহমদ মুসা বড় আব্বা?' বলল ওগলালা।

তার পিতা প্রফেসর আরাপাহো মুখ খলার আগেই জিভারো বলে উঠল, 'আব্বা যাকে জীবন সংহারী আহমদ মুসা বলেছেন, সেই আহমদ মুসাই বড়।'

'তোমার যুক্তি কি বলত।' বলল প্রফেসর আরাপাহো।

'খুবই সহজ। প্রথম ঘটনায় একজন বালকের জীবন রক্ষা হয়েছে। তার বেশি কিছু ঐ ঘটনায় নাই। কিন্তু শেষের এই ঘটনায় চলমান পায়ের একটা পথ রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। সাতজন লোকের প্রাণ সংহার হয়েছে, কিন্তু এর দ্বারা অনেক মানুষের জীবন রক্ষা পেয়েছে এবং অনেক পরিবার ধ্বংস থেকে রক্ষা পেয়েছে। অন্যায় জুলুম সংহারী আহমদ মুসার এই রুপই বড়।'

'ধন্যবাদ জিভারো। আমিও তাই মনে করি। ভালো কাজ ভালো, অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু অন্যায়ের প্রতিরোধ এর চেয়ে অনেক বেশি মুল্যবান। ভাল কাজের ভাল ফলের যে পরিধি, তার চেয়ে অন্যায় প্রতিরোধের যে ভাল। তার পরিধি অনেক বেশি ব্যাপক।'

প্রফেসর আরাপাহো থামতেই আহমদ মুসা বলে উঠল, 'ধন্যবাদ জনাব, আপনার কথা আমাদের ধর্মগ্রন্থ আল-কোরআনেরই প্রতিধ্বনি অনেকটা। আমাদের ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে, হত্যা, জুলুমের মত অপরাধের নির্ধারিত শাস্তি বিধানের মধ্যে মানুষের জীবন নিহিত।'

‘তার মানে শাস্তিটা মানুষের জীবনের মত মুল্যবান। শাস্তি না থাকলে মানুষের জীবন বিপন্ন হবে। তাই কি ?’

‘হ্যাঁ তাই।’

‘তাহলে অনেকে এবং অনেক দেশে মৃত্যুদণ্ড ও কঠোর শাস্তি তুলে দিচ্ছে বা তুলে দেওয়ার কথা বলছে তার কি হবে?’ বলল জিভারো।

‘এটা এক ধরনের চিন্তা বিকৃতি। এই বিকৃতদের কাছে বিচারের খড়্গ ভয়ংকর, কিন্তু অপরাধীদের খড়্গ যেন একটা স্বাভাবিক ঘটনা।’ আহমদ মুসা বলল।

‘শাস্তি কি মানুষের সুস্থ ও শান্তির জীবন নিশ্চিত করতে পারে?’ জিভারো বলল।

‘আমাদের ধর্মগ্রন্থে এই ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে দু’ধরণের কাজ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এক, ভালো কাজের নির্দেশ দিতে হবে এবং মন্দ কাজ, পাপ, অপরাধ থেকে মানুষকে বিরত রাখতে হবে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘নির্দেশ ও বিরত রাখার চেষ্টাই কি যথেষ্ট?’ জিভারো বলল।

‘আমাদের ধর্মের বিধান অনুসারে এ দু’টি বাহ্যিক পদক্ষেপের পর্যায়ভুক্ত। আত্মিক ও বিশ্বাসগত কিছু পদক্ষেপ রয়েছে। এই বাহ্যিক ও আত্মিক ব্যবস্থা একত্রে মিলিত হলে তবেই মানুষের স্বেচ্ছাচারিতা বা অপরাধ প্রবণতা নিয়ন্ত্রিত হয়।’ আহমদ মুসা বলল।

‘বিশ্বাসগত যে ব্যবস্থার কথা বললে সেটা কি?’ বলল প্রফেসর আরাপাহো।

‘ঐশীগ্রন্থ আল কোরআনের মাধ্যমে আমরা যে জীবন দর্শন পেয়েছি, সে জীবন দর্শন হলোঃ মানুষের দুনিয়ার জীবন মৃত্যু পরবর্তী চিরন্তন জীবনের প্রস্তুতি পর্ব মাত্র। দুনিয়ার জীবনে ভাল কাজ করলে পরজীবনে চিরন্তন পুরস্কার পাওয়া যাবে এবং খারাপ কাজ করলে চিরন্তন শাস্তির সম্মুখিন হবে। দুনিয়ার জীবনে মানুষ ছোট-বড় যে কাজই করুক তার ভাল অথবা খারাপ যে কোন একটি ফল রয়েছে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনে তা ভোগ করতে হবে। যে মানুষ স্রষ্টার আদেশ-নিষেধ মেনে চলবে তার দ্বারা শুধু ভাল কাজই হবে এবং মন্দ কাজ থেকে সে

বিরত থাকবে। এই বিশ্বাসগত নিয়ন্ত্রণ মানুষকে সকল পাপ ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘বিশ্বাস মানুষকে এত পরিশুদ্ধ করতে পারে?’ বলল জিভারো।

‘এটা নিছক কোন বিশ্বাস নয়। মানব জীবনের এটা অনিবার্য বাস্তবতা যা তার অস্তিত্বের মতই সত্য। এই বিশ্বাসের শক্তি জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি।’

‘আপনি ভয়ংকর কথা শুনালেন। মৃত্যু পরবর্তী জীবনের ঐ পরিণতি থেকে তো আমরা কিংবা কোন মানুষ তাহলে মুক্ত নয়?’ বলল ওগলালা চোখ কপালে তুলে। ঘটনার পর প্রথম মুখ খুলল ওগলালা। কথা বললেও তার মুখের গাম্ভীর্য ও বিষণ্নতা কাটেনি।

‘না কোন মানুষই মুক্ত নয়।’

‘কিন্তু আমরা তো এ বিশ্বাসের কথা এভাবে জানি না। তাহলে আমাদের কি হবে?’

‘যারা জানে, জানানোর দায়িত্ব তাদের। আর সত্য সন্ধানী বিবেক সত্যের সন্ধান যে কোন ভাবে পাবেই। যেমন আজ আপনারা আমার কাছ থেকে সন্ধান পেলেন।’

‘হাসল প্রফেসর আরাপাহো। বলল, ‘তুমি একজন দক্ষ এবং খাঁটি মিশনারী। এ পরিচয়ে তুমি দেখছি অনেক বড়। তুমি সবশেষে যে কথাটা বললে তার অর্থ হলো তুমি মানুষের অস্তিত্বের মত সত্য যে পথের সন্ধান দিলে তা আমাদের মেনে নেয়া।’

‘হাসল আহমদ মুসাও। বলল, ‘এটা দোষণীয় নয় নিশ্চয়। নিজের জন্যে যা ভাল মনে করা হয়, তা অপরের জন্যে ভাল মনে করাই প্রকৃত কল্যাণকামীতার লক্ষণ।’

‘ধন্যবাদ বৎস। তোমার সাথে দেখা হওয়ায় ঈশ্বরের শুকরিয়া আদায় করছি। মনে হচ্ছে, তোমার সংস্পর্শে আমরা নতুন মানুষে পরিণত হচ্ছি।’

‘তাও বটে।’ বলল প্রফেসর আরাপাহো।

‘এখন এ পর্যন্তই। চলুন ওরা কতটা কি করল দেখা যাক।’ বলল আহমদ মুসা।

‘না একটু বসুন। আমার একটা কথা। এই কিছুক্ষণ আগের কঠিন বিপদের সময় আপনার মুখ আমি সব সময় নির্ভয় ও উদ্বেগহীন দেখেছি এবং আপনার ঠোঁটে হাসিও দেখেছি। আপনি কি একটুকুও ভয় পাননি?’ বলল ওগলালা।

‘আহমদ মুসার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, ‘ভাল বা মন্দ করার একমাত্র মালিক আল্লাহ, জীবন ও মৃত্যুর ফায়সালা শুধু আল্লাহই করেন, এই বিশ্বাস থাকলে কোন মানুষকে ভয় করার কোন অবকাশ থাকে না, কোন বিপদেই তখন ভয় আসে না।’

‘কিন্তু আপনি যদি পরাজিত হতেন, ওরা ছিল সাত অস্ত্রধারী।’ বলল জিভারো।

‘ভাবতাম ওরা জয়ী হবার মত তাই আল্লাহ তাদের জয় দিয়েছেন। তবে আমিও জয়ী হবার চেষ্টা করতাম তারপর।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ওরা সাতজন মরেছে, মরেও তো যেতে পারতেন আপনি?’ জিভারোই আবার বলল।

‘হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আমার চেষ্টা জয়ের জন্যে, কিন্তু মৃত্যুর জন্যেও আমি সব সময় পস্তুত।’

প্রফেসর আরাপাহো, জিভারো এবং ওগলালা স্তম্ভিত চোখে তাকিয়ে আছে আহমদ মুসার দিকে।

‘আহমদ মুসার কথা শেষ হলেও তারা কেউ কথা বললো না, বলতে পারলো না।

কিছুক্ষণ পর ওগলালা প্রশ্ন করল, ‘আপনার দেশ কোথায়? আপনার বাড়ি কোথায়? আপনার কে আছে?’ প্রশ্নগুলোর সাথে সাথে রাজ্যের মমতা ঝরে পড়ল ওগলালার চোখে-মুখে।

আহমদ মুসা ম্লান হাসল। বলল, ‘তুমি কঠিন প্রশ্ন করেছ ওগলালা।’

বলে একটু থামল। তারপর বলল, ‘আমি জন্মগ্রহন করেছি চীনের জিনজিয়াং প্রদেশে, যাকে পূর্ব তুর্কিস্তানও বলা হয়। কিন্তু সেটা এখন আমার দেশ

নেই। আমাকে অনেক দেশ তাদের নাগরিকত্ব দিয়েছে। কোনটাকে আমার দেশ বলব? আমি এ নিয়ে কোন সময় ভাবিনি।'

আবার থামল আহমদ মুসা। হাসল আবারও। বলল, 'কে আছে' বলতে নিশ্চয় রক্তের সম্পর্কের কাউকে বুঝিয়েছ। তেমন আমার কউ নেই। আমার আব্বা, আম্মা, ছোট ভাই সবাই নিহত হয়েছে সেই জিনজিয়াং-এ। আমি বেঁচে ছিলাম উদ্বাস্তু হয়ে। রক্তের সম্পর্কের বাইরে সবচেয়ে ঘনিষ্টতম হলেন স্ত্রী। আমি ক'মাস আগে বিয়ে করেছি। তিনি আছেন।' থামল আহমদ মুসা।

সলজ্জ একটা রক্তিমাভা ফুটে উঠেছে ওগলালার মুখে। তার সাথে প্রবল উৎসুক্য। বলল, 'মাত্র ক'মাস আগে বিয়ে? তিনি কোথায়? দেশ না থাকলে তিনি কোথায় আছেন? তিনি কি আমেরিকা এসেছেন?'

'আমাদের নবীর দেশ সৌদি আরবের অন্যতম পবিত্র নগরী 'মদিনা' শরীফে তাঁকে রেখে এসেছি।' আহমদ মুসা থামল।

তৎক্ষণাৎ কেউ কথা বলল না।

সবার চোখে-মুখে একটা বিস্ময় ও বেদনার চিহ্ন।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ তিনি কিছু ঘটাননি। কিন্তু আপনার কিছু ঘটলে উনি কি জানতে পারতেন? কি হত তাঁর? কি করতেন তিনি?' নরম কম্পিত গলায় বলল ওগলালা।

আহমদ মুসার ঠোঁটে এক টুকরো স্বচ্ছ হাসি। বলল, 'আমি সানসালভাদরে হোয়াইট ঈগলের হাতে ধরা পড়ার আগের দিন তাঁর সাথে কথা বলেছি টেলিফোনে। আবার সুযোগ পেলে বলব।'

'আমার প্রশ্নের উত্তর হলো না জনাব।' ব্যথিত-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল ওগলালা।

'উত্তর আমি জানি না ওগলালা। আমার অভিভাবক যিনি, আমার স্ত্রীরও অভিভাবক যিনি সেই আল্লাহর উপর তাঁর ও আমার দু'জনেরই ভরসা।' গোটা আলোচনায় এই প্রথমবারের মত আহমদ মুসার কণ্ঠ একটু কাঁপল, একটু ভারিও শুনাল।

আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল।

বলল, 'চলুন ওদিকটা দেখা যাক।'

সবাই উঠল।

প্রফেসর আরাপাহো উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'আহমদ মুসা, তোমার শক্তি ও সাহসের উৎস কি তা আজ দেখলাম, যে লোক ঈশ্বরের উপর ভরসা করে জীবন-মৃত্যুর সব প্রশ্ন পেছনে ফেলে উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে অগ্রসর হতে পারে, তার অসাধ্য কিছুই থাকবে না, সে অজেয় হবে, এটাই স্বাভাবিক। তোমাকে অভিবাদন নয় আহমদ মুসা, তোমার বিশ্বাসকে, তোমার মহান নবীকে, যাঁর শিক্ষা তুমি অনুসরণ কর এবং তোমার আল্লাহকে, যাঁর বিধান তুমি পালন কর, আমি অভিবাদন জানাচ্ছি এবং তোমার বিশ্বাসের সাথী হবার অংগিকার করছি।'

বলে আহমদ মুসার দিকে হাত বাড়াল প্রফেসর আরাপাহো।

আহমদ মুসা আনন্দে লুফে নিল প্রফেসর আরাপাহোর হাত।

এক হাত আরেক হাতকে বাড়িয়ে ধরল নিবিড়ভাবে। যন্ত্রচালিতের মতো কোন অমোঘ আকর্ষণে ওগলালা এবং জিভারোর হাতও এসে যুক্ত হলো দু'টি হাতের সাথে।

এ যেন চার হাতের মিলন নয়, বিশ্বাসী চার হৃদয়ের এক অপরূপ মিলন।

বোট ধুয়ে-মুছে সাফ করা হয়েছে।

কিছুক্ষণ আগের রক্তাক্ত ঘটনার কোন চিহ্নই বর্তমান নেই।

জিভারো নিচের ডেকে নেমে গেছে কোন কাজে। প্রফেসর আরাপাহো তার কক্ষে বিশ্রাম নিতে গেছে।

আহমদ মুসা তার দু'হাতের কনুই বোটের রেলিং-এ রেখে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে তাকিয়ে আছে সামনে ইন্ডিয়ানার অবারিত সবুজ সৌন্দর্যের দিকে।

ওগলালা আস্তে আস্তে এসে আহমদ মুসার পাশে দাঁড়াল। দু'হাতের কনুই রেলিং-এ রেখে আহমদ মুসার মতই সামনে ঝুঁকে পড়ল এবং তাকাল আহমদ মুসার দিকে। তারপর মুখ ফিরিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার

বিশ্বাসের সাথী হবার অংগিকার করেছি। কিন্তু আপনি যে কষ্ট দিয়েছেন তা ভুলে যাইনি। আপনি নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুর!'

আহমদ মুসা কপাল কুঞ্চিত করে ওগলালা দিকে তাকিয়ে বলল, 'বুঝলাম না। নিষ্ঠুরতার কি দেখলে?'

'আপনি সবার প্রতি হয়তো সুবিচার করছেন, কিন্তু অবিচার করছেন ভাবীর প্রতি। এটা নিষ্ঠুরতা।'

'কিন্তু তোমার ভাবীর সাথে তুমি কথা বলনি। তাঁর কাছ থেকে কিছু শোননি।'

'শোনার কি প্রয়োজন আছে? আমি মেয়ে নই? কোন মেয়েই তার স্বামী কোন বিদেশ-বিভূয়ে অজানার অন্ধকারে হারিয়ে যাবে তা বরদাশত করতে পারে না।'

'তোমার কথা ঠিক। কিন্তু তোমার ভাবী শুধু তো নারী নয়, তিনি আমার বিশ্বাস ও কর্মের সাথী। আমার যে কাজ সেটা তারও কাজ এবং সে কারণেই তিনি আমাকে উৎসাহের সাথে বিদায় দিতে পারেন।'

'এটা যুক্তির কথা। এ যুক্তির বাইরে মনের একটা ভিন্ন অবস্থান আছে।'

'আছে। কিন্তু তারপরও একজন মেয়ে তার হাতের বিয়ের মেহেদী না মুছতেই স্বামীকে যুদ্ধে পাঠায় এবং স্বামীকে আর ফিরে পায় না-এ দৃষ্টান্তও আছে।'

'এবং তার শেষহীন ও সীমাহীন বুক ফাটা কান্নার দৃষ্টান্তও আছে। আমি নারী, আমি এ অসহায় নারীর কথাই বলছি।'

'ঠিক বলেছ। কিন্তু তুমি, আমি এবং তোমার ভাবী সংসারের এ বাস্তবতাকে কি অস্বীকার করতে পারব?'

'আমি জানি না। কিন্তু নারীর অশ্রুর মূল্য পুরুষরা দেয় না, এটাই ঠিক।'

বলেই ছুটে পালাল ওগলালা। তার শেষ কথাটা ছিল কান্নায় ভারি।

আহমদ মুসা ডাকল না তাকে।

ওগলালার কান্না ভরা কণ্ঠ আহমদ মুসাকে মনে করিয়ে দিল সান ওয়াকারের কথা। মনে পড়ল মেরী রোজ এর কথাও। বেদনায় ভরে গেল আহমদ

মুসার মন। ওগলালার হৃদয়ে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে সার ওয়াকারকে নিয়ে তার প্রতিকার কিসে!

# ৪

কাহোকিয়ার ফেডারেল রেস্টহাউজ।

মিঃ ডেভিড তার কক্ষের দরজা খুলে সুন্দর বেড এবং সাজানো-গোছানো ঘর দেখে খুব খুশী হলো।

হাতের ব্যাগটা সে মেঝের উপর ছুড়ে দিয়ে বিছানার উপর ঝাপিয়ে পড়ল।

মিঃ ডেভিড আসলে মিঃ ডেভিড গোল্ড ওয়াটার। হোয়াইট ঈগলের আমেরিকান প্রধান। ডেভিড ছদ্মনামে সে ফেডারেল রেস্টহাউজে উঠেছে।

ফেডারেল রেস্টহাউজ রেড ইন্ডিয়ান রিজার্ভ এলাকা কাহোকিয়ার ফেডারেল কমিশনারের অফিস কর্তৃক পরিচালিত রেস্টহাউজ। ভ্রমণ বা অন্য কোন কাজে ভিআইপি নাগরিক যারা কাহোকিয়া আসেন, তারা ইচ্ছা করলে থাকতে পারেন এখানে। কিন্তু এই মানের হোটেল থেকে চারগুণ বেশি ভাড়া ও খাবারের চার্জ দিতে হয় এখানে। তবু নিরাপত্তার দিক বিবেচনা করে উল্লেখযোগ্য সবাই এখানে উঠতে চায়। স্ট্যাটাস অনুসারে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এই রেস্ট হাউজে থাকতে দেয়া হয়। যেহেতু রেস্টহাউজটা ফেডারেল কমিশনের অফিস-এর অংশ, তাই এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা ফেডারেল কমিশনারের হাতে।

রেড ইন্ডিয়ানদের প্রত্যেক রিজার্ভ এলাকায় একটি করে ফেডারেল কমিশন আছে। ফেডারেল কমিশন রেড ইন্ডিয়ান রিজার্ভ এলাকায় কেন্দ্রীয় সরকারের স্বার্থ দেখা ছাড়াও সেখানকার প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার আপিলেই প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে।

ডেভিড গোল্ড ওয়াটার জেনারেল আইজ্যাক শ্যানরণসহ তার আরও চারজন নিরাপত্তা কর্মীকে নিয়ে সে এই রেস্টহাউজে উঠেছে। জেনারেল আইজ্যাক শ্যারণ আইজ্যাক ছদ্মনামে রেস্টহাউজে পরিচিত হয়েছেন।

তারা ওয়াশিংটনের সেক্রেটারী অব স্টেটের অফিস থেকে পরিচিতি কার্ড নিয়ে এসেছে তাই সম্মানিত মেহমান হিসেবে জায়গা পেয়েছে রেস্টহাউজে।

ডেভিড গোল্ড ওয়াটার নিজেকে বেশ ক্লান্ত মনে করছে। ওয়াশিংটন থেকে বিমানে এসেছে শিকাগো। সংগে সংগেই সেখান থেকে হেলিকপ্টারে কাহোকিয়া।

গোল্ড ওয়াটারের চোখ ধরে এসেছিল। তার দরজায় নক হলো।

চোখ খুলল সে। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

দরজায় মাঝ বয়সি এক শ্বেতাংগ দাঁড়িয়ে। নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, 'আমি এ্যালেন ট্যালন্ট। এখানকার ফেডারেল কমিশনার। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। শুনলাম, স্টেট ডিপার্টমেন্টের মেহমান এসেছেন। দেখা করতে এলাম।'

'আমি ডেভিড। আসুন।' বলে ডেভিড গোল্ড ওয়াটার ট্যালন্টকে নিয়ে এসে সোফায় বসাল।

নিজে বসতে বসতে ডেভিড বলল, 'ঠিক স্টেট ডিপার্টমেন্টের মেহমান নয়। আমার সাথে একজন সম্মানিত বিদেশীও আছেন, মিঃ আইজ্যাক। পাশের রুমেই উনি আছেন। সব মিলিয়ে স্টেট ডিপার্টমেন্ট আমাদের একটা পরিচিতি পত্র দিয়েছে।'

'ঐ একই হলো।' বলে একটু থামল ট্যালন্ট। তারপর আবার শুরু করল, 'আপনারা কতদিন থাকছেন? কি উদ্দেশ্যে এসেছেন? আমি কি করতে পারি আপনাদের জন্যে?'

'থাকার ঠিক নেই যতদিন ভাল লাগবে থাকব। উদ্দেশ্য কাহোকিয়া দেখা। রেড ইন্ডিয়ানদের এলাকা, কোন চোর-ছ্যাচ্ছর হাইজ্যাকারের ফাদে না পড়ি, এটুকু আপনি দেখবেন।'

'অবশ্যই কাহোকিয়া ভাল জায়গা। এখানকার স্থানীয়রাও ভাল। তবে খুবই স্বতন্ত্রমনা এবং মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন। আমি মনে করি কাহোকিয়া সমঝদারদের জন্যে একটা স্বর্গভূমি। কয়েক হাজার বছরের ইতিহাস এখানে চোখে দেখা যায়। মিসরের পিরামিড এলাকা পর্যটকদের স্বর্গভূমি বলা হয়, কিন্তু

কাহোকিয়া তারচেয়ে কোন অংশে কম নয়। বরং এখানকার কাহোকিয়ার মাটির পিরামিডগুলো মিসরের-গুলোরচেয়েও বড় এবং সংখ্যাতেও বেশি। সুতরাং দেখার অনেক কিছু পাবেন।'

ট্যালন্ট থামতেই আবার দরজায় নক হলো।

'আসুন।' দরজার দিকে তাকিয়ে বলল ডেভিড।

ঘরে প্রবেশ করল রেস্টহাউজ অফিসের একজন স্টাফ। হাতে তার একটা রেজিস্টার। স্টাফটি এক তরুণ রেড ইন্ডিয়ান।

'প্রাথমিক কাজটা তোমাদের এখনও সারা হয়নি? ঠিক আছে, সেরে নাও।' এ কথাগুলো ট্যালন্ট রেড ইন্ডিয়ান তরুণকে লক্ষ্য করে বলে মুখ ফিরাল ডেভিড গোল্ড ওয়াটারের দিকে। বলল, মিঃ ডেভিড, এখন আসি। পরে কথা হবে। সময় করে একবার চা খান আমার অফিসে।'

'অবশ্যই।' বলে উঠে দাঁড়িয়ে ডেভিড গোল্ড ওয়াটার হ্যান্ডসেক করল ট্যালন্টের সাথে।

ট্যালন্ট চলে গেল।

রেড ইন্ডিয়ান তরুণটি তার রেজিস্টার হাতে তখনও দাঁড়িয়েছিল।

'তোমার নাম কি? বস।'

তরুণটি বসল। বলল, 'আমি নাভাজো।'

কথা বলার মত একজন রেড ইন্ডিয়ান তরুণকে দেখে খুশিই হলো ডেভিড গোল্ড ওয়াটার। কারণ সে জানে, রেড ইন্ডিয়ান চক্রে প্রবেশ করতে হলে, ঈগল সান ওয়াকার এবং তাকে সাহায্যকারী আহমদ মুসার খোঁজ পেতে হলে রেড ইন্ডিয়ানদের সাহায্য দরকার। গোল্ড ওয়াটার এবং জেনারেল শ্যারণের দৃঢ় বিশ্বাস, সান ওয়াকার অবশ্যই ওয়াশিংটন ফেরেনি, তার নিরাপত্তার জন্যে আহমদ মুসা নিশ্চয়ই তাকে নিয়ে এসেছে কাহোকিয়াতে কিংবা অপর কোন রেড ইন্ডিয়ান রিজার্ভ এলাকায়। কাহোকিয়াকেই তারা প্রথম সন্দেহ করেছে। তাই এসেছে তারা প্রথমে কাহোকিয়াতেই।

'বল নাভোজো, তোমাকে কি সাহায্য করতে পারি।' বলল গোল্ড ওয়াটার খুবই আন্তরিক কণ্ঠে।

‘ধন্যবাদ স্যার। আমাদের রেজিস্টার পূরণের জন্যে কতকগুলো রুটিন ইনফরমেশন।’

‘বল সে সব কি?’

‘পূর্ণ নাম, ঠিকানা, বয়স, কতদিন থাকবেন, সফরের উদ্দেশ্য, খাবেন রেস্টহাউজে কিনা, বেড়াবার সময় ‘গাইড’ বা সিকুরিটি দরকার কিনা, ইত্যাদি।’

ডেভিড গোল্ড ওয়াটার ডিকটেট করল এবং নাভাজো লিখল তার রেজিস্টারে।

কতদিন থাকবে সে ব্যাপারে গোল্ড ওয়াটার বলল, ‘যতদিন ভাল লাগবে, ততদিন থাকব। যে মুহূর্তে মনে করব চলে যাব, সে মুহূর্তেই চলে যাব। রেস্টহাউজেই খাবার ব্যবস্থা থাকবে, তবে বাইরেও কখনও খেতে পারি। প্রতিদিনের পেমেন্ট প্রতিদিনই করব।’

আর সফরের উদ্দেশ্যের ব্যাপারে বলল, ‘কাহোকিয়ার কিছু লোকের সাথে পরিচয় ছিল তাদের সাথে দেখা সাক্ষাত এবং কাহোকিয়াকে দেখা ও জানা।’

গাইড ও সিকুরিটির লোক নেয়ার ব্যাপারে বলল, ‘লোক পছন্দ করে নিয়োগ দিয়ে রাখতে চাই। দরকার হলে সাথে নেব।’

‘ধন্যবাদ।’ বলে নোট শেষ করে উঠে দাঁড়াচ্ছিল নাভাজো।

‘একটু বস নাভাজো।’ বলল গোল্ড ওয়াটার।

নাভাজো বসল

‘তোমার বাড়ি কাহোকিয়াতেই না?’ জিজ্ঞেস করল গোল্ড ওয়াটার।

‘জ্বি হ্যা।’

‘ওল্ড কাহোকিয়াতে না নিউ কাহোকিয়াতে?’

‘ওল্ড অংশে।’

‘তাহলে তোমরা বোধহয় খুব পুরনো বাসিন্দা?’

‘জ্বি হ্যা।’

‘তোমার লেখাপড়া?’

‘ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয় থেকে গ্রাজুয়েশন।’

‘বাইরের মানে স্টেটের বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়ে কেউ যায় না।?’

‘অনেকেই যায়।’

‘বল, ওয়াশিংটনের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কেউ আছে?’

গোল্ড ওয়াটারের এসব প্রশ্নের টার্গেট সান ওয়াকারের প্রসঙ্গ সামনে আনা এবং তার সম্পর্কে জানা। সান ওয়াকারও নিশ্চয় ওল্ড কাহোকিয়ার বাসিন্দা হবে। শিক্ষিত নাভাজো নিশ্চয় তাকে চিনবে।

গোল্ড ওয়াটারের প্রশ্নে নাভাজো একটু ভাবল। তার মুখটাকে কিছুটা ম্লান দেখাল। বলল, ‘তিনজনের কথা আমার মনে পড়ছে। আমার মনে হয় শুধু এ তিনজনই সেখানে পড়ে।’

‘বা! তিনজন! কম নয়তো। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে জান?’

‘জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে।’

‘সবাই?’

‘হ্যা।’

‘নিশ্চয় খুব ভাল ছাত্র ওরা। স্কলারশীপে না নিজ খরচে ওরা পড়ছে?’

‘শুধু একজন ঈগল সান ওয়াকার স্কলারশীপ পেয়েছে। সে একজন ছাত্র-বিজ্ঞানী।’

গোল্ড ওয়াটারের চোখ দু’টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। যেন সে সাত রাজার ধন কুড়িয়ে পেয়েছে।

পরক্ষণেই মুখে কৃত্রিম বিস্ময় টেনে বলল, ‘ঈগল সান ওয়াকারের বাড়ি এখানে? কাহোকিয়াতে? তার কথা শুনেছি, পড়েছি কাগজে। বিজ্ঞানে কৃতিত্বের জন্যে অনেক গোল্ড মেডেল পেয়েছে।’

‘জ্বি হ্যা, ওর বাড়ি এই কাহোকিয়াতেই।’

‘ওল্ড না নিউ কাহোকিয়াতে?’

‘ওল্ড কাহোকিয়ায়।’

‘এখন তো সে বিশ্ববিদ্যালয়ে না?’

মুখ ম্লান হয়ে উঠল নাভাজোর। বলল, ‘তার এখন খুব বিপদ। তাকে অপহরণ করা হয়েছিল। ছাড়া পেয়ে সে লুকিয়ে আছে।’

‘বল কি নাভাজো? এ রকম খবর তো শুনিনি! তাকে কিডন্যাপ করার কে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে? সে কোথায়? পুলিশ নিশ্চয় কিছু করছে?’

‘সে কাহোকিয়াতেই পালিয়ে এসেছে। পুলিশ তার জন্যে কিছুই করেনি শুনেলাম।’

সাফল্যের আনন্দে চোখ দু’টি আনন্দে চিক চিক করে উঠল গোল্ড ওয়াটারের।

কিন্তু পরক্ষণেই চোখে-মুখে কৃত্রিম সমবেদনার বান ডাকিয়ে বলল, ‘আহা বেচারা, তার জন্যে তো কিছু করতে হবে। পুলিশ ও সরকারের কিছু বড় বড় লোকের সাথে আমার পরিচয় আছে। আমি অবশ্যই কিছু করতে পারবো।’

‘তাহলে সত্যিই সে উপকৃত হয়।’

‘তার সাথে দেখা করিয়ে দিতে পার? কিংবা বাড়ির ঠিকানা দিলেও চলবে।’

‘সে আসার পর আমার সাথেও দেখা হয়নি। নিজের বাড়িতে নয়, কোন এক আত্মীয়ের বাড়িতে থাকে শুনেছি। একটু খোঁজ নিয়ে আপনাকে জানাব।’

‘ধন্যবাদ নাভাজো। তার কথা শুনে সত্যিই আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। দেখ তুমি কত তাড়াতাড়ি তার সাথে দেখা করিয়ে দিতে পার।’

‘অবশ্যই আমি তাড়াতাড়ি চেষ্টা করব স্যার। সেও নিশ্চয় খুব খুশি হবে।’

কথা শেষ করেই আবার সে বলল, ‘তাহলে উঠি স্যার এখন?’

‘এস। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে।’

‘ধন্যবাদ স্যার। বাই।’ বলে উঠে দাঁড়াল এবং বেরিয়ে গেল ঘর থেকে নাভাজো।

নাভাজো বেরিয়ে যেতেই গোল্ড ওয়াটার টেলিফোন তুলে জেনারেল আইজ্যাক শ্যারণকে বলল, ‘এখনই চলে এস আমার ঘরে, মহা খবর আছে। টেলিফোনে বলা যাবে না।’

মিনিট খানেকের মধ্যেই ঘরে এসে প্রবেশ করল আইজ্যাক শ্যারণ।

সোফায় বসতে বসতে বলল, ‘কেবল সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে বিছানায় গা দিয়েছি। খুব ক্লান্তি লাগছে। বল তোমার মহাখবর।’

‘সব ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে আইজ্যাক খবরটা শোনার পর। দেখ, তুমি গোছ-গাছ করে এতটা সময় কাটিয়েছ। কিন্তু আমি এক মিনিটও নষ্ট না করে আসল আজে লেগে গেছি। ইতিমধ্যেই আমি আবিস্কার করে ফেলেছি, ঈগল সান ওয়াকার কাহোকিয়াতে আছে।’

কথাটা শুনতেই জেনারেল আইজ্যাক লাফিয়ে উঠল শোয়া থেকে এবং গোল্ড ওয়াটারের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, ‘ব্রাভো, ব্রাভো, সত্যিই তুমি কাজের লোক গোল্ড ওয়াটার। তুমি যাদু জান নাকি?’

‘যাদু নয়, বুদ্ধি বলে খবরটা বের করেছি।’ বলে গোল্ড ওয়াটার নাভাজোর সাথে তার সব কথার রিপোর্ট দিল জেনারেল আইজ্যাককে।

জেনারেল আইজ্যাক শোনার পর আনন্দের আতিশয্যে আবার হ্যান্ডশেক করল গোল্ড ওয়াটারের সাথে এবং বলল, ‘বড় শয়তানের খোঁজ পেয়েছ?’

‘আহমদ মুসার?’

‘হ্যা।’

‘জিজ্ঞেস করলে ওর মনে কোন সন্দেহ জাগতে পারে ভেবে কিছু জিজ্ঞেস করিনি। তবে কান টানলে যেমন মাথা আসে, তেমনি সান ওয়াকারের সাথে তার আসা স্বাভাবিক।’

‘তোমার কথা ঠিক হোক গোল্ড ওয়াটার। আমি আমার কথা রাখব। তার মূল্যটা আমরা বাড়িয়ে দেব।’

‘ধন্যবাদ আইজ্যাক শ্যারণ। এখন আমাদের প্রথম কাজ হলো সান ওয়াকার কোথায় থাকে তা জেনে নেয়া এবং গোপনে তার উপর চোখ রাখা।’

‘ঠিক বলেছ গোল্ড ওয়াটার, আমরা এসেছি তা ঘূর্ণাক্ষরেও যেন সান ওয়াকার টের না পায়।’

‘অবশ্যই। আমি নাভাজোকে বলেছি সান ওয়াকারের সাথে দেখা করার কথা। এটা নাভাজোকে আমার আগ্রহ ও সমবেদনা দেখাবার জন্যে। আমি কৌশলে জানব সান ওয়াকার কোথায় থাকে সে ঠিকানা। কাজ ও ব্যস্ততার কথা বলে দেখা করার বিষয়টাকে এড়িয়ে যাব।’

'কিন্তু সেও তো বলতে পারে সান ওয়াকারকে দেখা করার জন্যে।'

'তাও বলতে পারে। কিন্তু আমি মনে করি, সান ওয়াকার যেহেতু লুকিয়ে থাকছে, তাই সরকারী রেস্টহাউজে আসার মত কাজ সে করবে না। তবু আমরা বিষয়টার দিকে লক্ষ্য রাখব।'

'সান ওয়াকারকে পাহারা দিয়ে খুঁজতে হবে আহমদ মুসাকে। আহমদ মুসাকে পাওয়ার পর এক আঘাতেই ওদের দু'জনকেই জালে পুরতে হবে।'

'অবশ্যই। এখন মুখ্য কাজই হলো আহমদ মুসার সন্ধান করা।'

'আরেকটা কথা গোল্ড ওয়াটার। নাভাজো আমাদেরকে সহযোগিতা করবে, এটা ধরে নিয়েও আমি মনে করি নাভাজোর উপর গোপনে আমাদের চোখ রাখতে হবে। তার বাড়ির ঠিকানাসহ সে কোথায় যাচ্ছে, কার সাথে দেখা করছে তা আমাদের সংগ্রহ করতে হবে। এর দ্বারা সান ওয়াকার ও আহমদ মুসাকে সে বলার বা দেখার আগেই আমরা তাদের পেয়ে যেতে পারি।'

আনন্দে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল গোল্ড ওয়াটারের। বলল, 'তুমি ঠিক বুদ্ধি বের করেছ জেনারেল আইজ্যাক। তোমাকে ধন্যবাদ।'

'আরও একটা কথা গোল্ড ওয়াটার। তোমাদের সেই মেরী রোজও সান ওয়াকারের সাথে থাকতে পারে। সেটাও যেন মনে রাখে তোমাদের লোকে অনুসন্ধানের সময়।'

'ধন্যবাদ আইজ্যাক। মেরী রোজ চোখে পড়া অর্থ সান ওয়াকারকে পেয়ে যাওয়া, যদি সে সান ওয়াকারের সাথে এসে থাকে।'

জেনারেল আইজ্যাক কিছু বলতে যাচ্ছিল। দরজায় নক হলো।

জেনারেল আইজ্যাক কথা বন্ধ করে তাকাল গোল্ড ওয়াটারের দিকে।

ডেভিড গোল্ড ওয়াটার উঠে গিয়ে দরজা খুলল। দেখল, একজন পুলিশ অফিসার দাঁড়িয়ে। এইভাবে আকস্মিক পুলিশকে দেখে মনে মনে কিছুটা হকচকিয়ে গিয়েছিল গোল্ড ওয়াটার। চোখে সম্ভবত তার কিছুটা প্রকাশ ঘটেছিল।

পুলিশ অফিসারের ঠোঁটের কোণায় এক টুকরো হাসি ফুটে উঠেছিল মুহূর্তের জন্যে। বলল, 'কমিশনার সাহেব পাঠালেন আমাকে আপনার সাথে

পরিচিত হবার জন্যে এবং একথা জানাতে যে, প্রয়োজনীয় যে কোন সাহায্যের জন্যে আমরা প্রস্তুত আছি।'

'অনেক ধন্যবাদ। আসুন বসুন।' বলে গোল্ড ওয়াটার একপাশে সরে গিয়ে তাকে ভেতরে প্রবেশের জন্যে আহ্বান জানাল।

পুলিশ অফিসারকে নিয়ে গোল্ড ওয়াটার এসে বসাল সোফায়।

মনে মনে খুশীই হলো গোল্ড ওয়াটার। পুলিশ অফিসার রেড ইন্ডিয়ান হওয়ায় তার সাথে পরিচয় খুবই জরুরী মনে করল সে। কথায় কথায় সান ওয়াকারের প্রসঙ্গ তুলে তার সম্পর্কে এদের মনোভাবও জানা যাবে।

গোল্ড ওয়াটার সোফায় বসেই বলল পুলিশ অফিসারকে লক্ষ্য করে, 'খুব খুশী হয়েছি আপনি আসায়। আমরা এখানে নতুন, কিছু জানাও যাবে আপনার কাছ থেকে।'

'কিছু মাটির পিরামিড এবং কিছু ঐতিহাসিক বাড়িঘরের ধ্বংসাবশেষ ছাড়া তেমন কিছু জানা, দেখার নেই কাহোকিয়াতে।'

'কাহোকিয়ার আকর্ষণ তো এগুলোই।' বলে একটু থেমেই গোল্ড ওয়াটার আবার বলল, 'এখানকার আইন-শৃঙ্খলা কেমন?'

'বেশ ভাল। মানে খুবই ভাল বলা যায়। সাত দিনেও একটা মামলা আসে না। আমরা অলস হয়ে গেলাম স্যার।'

'খুবই সুখবর। নিশ্চিন্তে বেড়ানো যাবে। আচ্ছা একটা খবর বলুন তো, শুনলাম বিখ্যাত ছাত্র-বিজ্ঞানী ঈগল সান ওয়াকার, যে কিডন্যাপ হয়েছিল, তার বাড়ি নাকি এই কাহোকিয়াতে?' জিজ্ঞাসা করল গোল্ড ওয়াটার।

সান ওয়াকারের নাম শুনতেই মুখটা ম্লান হয়ে গেল পুলিশ অফিসারটির। বলল, 'জি, তার বাড়ি এই কাহোকিয়াতে।'

'কাহোকিয়ার জন্যে তো এটা গৌরব।' বলল গোল্ড ওয়াটার।

'গৌরব অবশ্যই। কিন্তু গৌরব সূর্য বোধহয় অস্তমিত হয়ে যাচ্ছে! সে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারছে না, পড়া শুনা নেই। পালিয়ে বেড়াচ্ছে সে এখন।'

'দুর্ভাগ্য আমাদের। সে এখন কোথায়?'

‘কাহোকিয়াতেই সম্ভবত। একদিন তার সাথে দেখা হয়েছিল। সে বাড়িতে থাকে না।’

‘কেন আপনারা তার উপর চোখ রাখেন না তার নিরাপত্তার জন্যে?’

‘সে পুলিশকে বিশ্বাস করে না। সে মনে করে তার কিডন্যাপ-কারীদের পুলিশ চেনে, কিন্তু তাকে মুক্ত করার কোনই ব্যবস্থা করেনি।’

‘আপনাকেও বিশ্বাস করে না?’

‘না। মনে করে আমি একজন আদেশ পালনকারী চাকুরে।’

‘কিন্তু আপনাদেরও একটা দায়িত্ব আছে। তার অলক্ষ্যেই তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা আপনারা করতে পারেন।’

‘সে রকম কিছু করলে তার নজরে পড়বেই এবং সে ক্ষেত্রে সন্দেহ করে সে কাহোকিয়া ছেড়েই চলে যেতে পারে।’

‘সে কি এখন কাহোকিয়াতেই? খুব ইচ্ছা আমার বেচারার সাথে দেখা করার।’

‘কয়দিনের খবর আমি জানি না।’

‘নিশ্চয় কাহোকিয়াতেই আছে।’

‘খবর জোগাড় করতে পারলে আমি জানাব আপনাকে। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।’

‘ধন্যবাদ স্যার। আমার আর কিছু করণীয় আছে?’

‘ধন্যবাদ। এখন নেই। দরকার হলে বলব।’

‘আপনার কাহোকিয়া সফর সুন্দর হোক। বাই।’ বলে বেরিয়ে গেল পুলিশ অফিসার।

পুলিশ অফিসার বেরিয়ে যেতেই জেনারেল আইজ্যাক বলল, ‘কাহোকিয়াতে আসার পর দেখছি সব কিছুই আমাদের পক্ষে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে লক্ষ্য অর্জন আমাদের হাতে মুঠোয়।’

‘যদি আহমদ মুসা কাহোকিয়াতে থাকে।’

‘তুমি কি মনে কর?’

‘আমার চেয়ে আহমদ মুসাকে তুমিই ভাল জান। সুতরাং তুমিই বলতে পার তার গতি-বিধির ধরণ সম্পর্কে।’

‘সে সব সময় নতুন। তাই তাঁর সম্পর্কে আগাম কিছু বলা মুস্কিল।’ বলল জেনারেল আইজ্যাক শ্যারণ মুখ ম্লান করে।

‘তবে আমি বলতে পারি, সান ওয়াকারকে নিরাপদে কাহোকিয়াতে পৌঁছানো এবং যেহেতু সে আমেরিকায় নতুন তাই ঐতিহাসিক কাহোকিয়া দেখার এটা তার সুযোগ, এই দুই কারণে অবশ্যই সে কাহোকিয়াতে এসেছে।

‘তোমার কথা সত্যি হোক।’ বলে তার ঘরে ফেরার জন্যে জেনারেল আইজ্যাক শ্যারণ উঠে দাঁড়াল।

গোল্ড ওয়াটারও উঠল। এগুলো বিছানার দিকে অর্ধ সমাপ্ত বিশ্রাম সমাপ্ত করার জন্যে।

ওল্ড কাহোকিয়ার একটা সাধারণ পুরাতন বাড়ি।

বাড়ির বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়ার গাড়ি।

বাড়িটা সান ওয়াকারের খালার। সান ওয়াকার কাহোকিয়াতে ফেরার পর নিজ বাড়িতে না থেকে এখানেই থাকছে।

সান ওয়াকার কিছু ব্যাগ-ব্যাগেজ এনে গাড়িতে তুলল। তারপর বাড়ির ভিতরে ফিরে গিয়ে ড্রইং রুমের সোফায় বসতে বসতে হাঁক দিল মেরী রোজ, সুসান তোমরা এস।

পরক্ষণেই মেরী রোজ এসে সান ওয়াকারের পাশে সোফায় বসল। তার মুখ ভার। বলল, ‘সান তুমি আমাকে এভাবে জোর করে পাঠিয়ে দিচ্ছ কেন?’

‘বলেছি তো, এভাবে তোমার থাকাটা তোমার আব্বা, তোমার পরিবার ভালভাবে নেবেন না।’

‘আমি তো আম্মাকে টেলিফোনে বলেছি, হঠাৎ করে একটা প্রোগ্রামে শামলি হয়ে কাহোকিয়া এসেছি।’

‘তারপরও কয়েকদিন পার হয়ে গেছে।’

‘তাতে কি?’

হাসল সান ওয়াকার। বলল, ‘তুমি ভুলে যাচ্ছে কেন তুমি দেশের প্রধান বিচারপতির কন্যা। দূরে কোথাও পিকনিকে যাবার অনুমতিও যেখানে তোমার পরিবার দেয় না, সেখানে এই আসাটাকে তাঁরা স্বাভাবিকভাবে নেবেন?’

একটু থামল সান ওয়াকার। গম্ভীর হয়ে উঠল তার মুখ। বলল, ‘তুমি কোনভাবে তোমার পরিবার বা কারও কাছে ছোট হও আমি তা চাই না। আবার সেই ছোটটা যদি আমার কারণে হও, তাহলে ভীষণ কষ্ট লাগবে আমার। নিশ্চয় আমাকে তুমি কষ্ট দিতে চাইবে না।’

মেরী রোজ কিছু বলল না। মুখ নিচু করে চুপ করে থাকল।

ড্রইং রুমে প্রবেশ করল শিলা সুসান। বলল, ‘সবাই বসে কেন? চল মেরী রোজ।’ বলে মেরী রোজ-এর দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসল শিলা সুসান। বলল, ‘এ জগতে হায় সেই বেশি চায় আছে যার ভুরি ভুরি।’

এরপর বাইরের দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বলল, ‘এস আমি গাড়িতে উঠছি।’

শিলা সুসান হাসি মুখে কবিতাংশটি শুরু করেছিল, কিন্তু শেষ করার সময় বেদনায় ভরে যায় তার মুখ। মনের কোণের গোপন একটা বেদনা যেন তার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল।

‘শুনলে সুসানের কবিতা?’ সান ওয়াকার বলল।

‘আমি ভুরি ভুরি পাইনি, ভুরি ভুরি চাই না। এক তোমাকেই চেয়েছি, পেয়েছি। তাও কেড়ে নেবার আতংক সব সময় আমাকে তাড়া করে ফিরছে। তাই তো ভয় করছে তোমাকে ছেড়ে যেতে। কান্নায় ভারি হয়ে উঠল মেরী রোজ এর কণ্ঠ।

সান ওয়াকার তার একটা হাত মেরী রোজ-এর কাঁধে রেখে সান্ত্বনার স্বরে বেলল, ‘মেঘ কেটে একদিন সুদিনের সোনালী সূর্য উঠবেই।’

শিলা সুসান গাড়িতে উঠার অল্প কিছুক্ষণ পর মেরী রোজ এবং সান ওয়াকারও গাড়িতে এসে উঠল। সান ওয়াকার গাড়ির চালককে নির্দেশ দিল বিমান বন্দরে চল।

গাড়ি চলতে শুরু করল।

'কার আছে ভুরি ভুরি সুসান?' শিলা সুসানকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করল মেরী রোজ। সে ভুলতেই পারেনি সুসানের টিপ্পনি।

'হৃদয়ের দিকে তাকিয়ে দেখ।'

'দেখলাম। কিন্তু নেই কার?'

'পেট ভরা থাকলে কারও ক্ষুধা টের পাওয়া যায় না।'

'তুই তো কোনদিন বলিসনি ক্ষুধার কথা। সত্যিই এরকম কিছু আছে নাকি?' হেসে বলল মেরী রোজ।

শিলা সুসানের মুখেও হাসি। ম্লান হাসি। মুহূর্তের মধ্যে সান ওয়াকারের দিকে তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে বলল মেরী রোজকে, 'আমি একটা নীতিকথা বলেছি।'

কথাটা শেষ করে একটু থেমেই আবার শুরু করল সে, 'যাক এসব। আজ এভাবে যাত্রা করতে গিয়ে কিন্তু আহমদ মুসার কথা খুব মনে পড়ছে। বেচারার কি হলো আমরা কোন খোঁজ নিতেও পারলাম না। অথচ আমার উপর একটা দায়িত্ব ছিল তাঁর খোঁজ করা এবং একজনকে জানানো।'

'শিলা সুসান তুমি ঠিক বলেছ। যে লোক নিজের জীবন বিপন্ন করে আমাকে বাঁচাল এবং আমাদের নিরাপদ করার জন্য বিপদের সব বোঝা নিজের ঘাড়ে নিয়ে চলে গেল তার জন্যে আমরা কিছুই করতে পারলাম না।' বলল সান ওয়াকার।

'সত্যি আমাদের নামিয়ে দিয়ে যখন উনি যান, তখন তাঁর পেছনে ধাওয়া করছিল তিনটি গাড়ি এবং একটি হেলিকপ্টার। এই অবস্থায় আমাদের বাঁচা অসম্ভব বলেই তিনি আমাদের নামিয়ে দিয়ে আমাদের নিরাপদ করে সব বিপদ নিজের দিকে টেনে নিয়েছিলেন। উনি বাঁচতে পেরেছেন কি?'

'ওভাবে বলিসনে রোজ। অমন প্রশ্ন তোলাও অলুক্ষণে। ওঁকে বাঁচতে হবে। মানুষের জন্যেই বাঁচতে হবে।' শিলা সুসান বলল।

‘ঈশ্বর তাকে সাহায্য করুন। কিন্তু আমি বলছি একটা অসম্ভব সম্ভব হয়েছি কিনা সেই কথা।’

‘আহমদ মুসাকে আমরা সম্পূর্ণ দেখিনি, তাঁর সবটা আমরা জানি না। কিন্তু গোল্ড ওয়াটারের ফাঁদ তাঁকে আটকাতে পারবে বলে মনে করি না।’ বলল শিলা সুসান।

‘আমিও তাই মনে করি। হোয়াইট ঈগলের বন্দীখানা থেকে বের হবার সময় উনি প্রতিটি দুর্লঙ্ঘ বাধা যে বুদ্ধি ও কৌশলে অতিক্রম করেন, তা না দেখলে বিশ্বাস করা সম্ভব নয়।’

‘তোমাদের কথাকে ঈশ্বর সত্য করুন।’ বলল মেরী রোজ।

সান ওয়াকার কথার মোড় ঘুরিয়ে নিল, কাহোকিয়া সম্পর্কিত আলোচনায়।

এক সময় তাদের আলোচনা গাড়ি চালকের কথায় নেমে গেল। গাড়ি চালক বলল, ‘স্যার ব্রীজের মুখ রোধ করে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।’

সবাই তাকাল সেদিকে। ঠিক, একটা জীপ গাড়ি ব্রীজের মুখে রাস্তার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। সান ওয়াকার বলল, ‘গাড়িটা খারাপ হয়ে থাকতে পারে। তুমি গিয়ে দেখ।’

ঘোড়ার গাড়িটা তখন দাঁড়িয়ে পড়েছে।

সান ওয়াকার ঐ নির্দেশ দেবার পর গাড়ির চালক নেমে পড়ল গাড়ি থেকে এবং গেল গাড়িটার কাছে।

আরেকটা গাড়ি এ সময় এসে দাঁড়াল সান ওয়াকারদের গাড়ির ঠিক পেছনে।

সান ওয়াকার মনে করল এ গাড়িটা তাদের সামনের পথ বন্ধ দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

সামনের দিকে তাকিয়ে ছিল সান ওয়াকার। সে দেখতে পেল, তাদের গাড়ির চালক জীপটির কাছে পৌঁছতেই জীপ থেকে দু’জন লোক লাফ দিয়ে নেমে আক্রমণ করল তাদের গাড়ির চালককে। হঠাৎ আক্রমণে বিমূঢ় গাড়ির চালক বাধা দেবারও কোন সুযোগ পেল না। সে কয়েকটি ঘুষি ও লাথি খেয়ে মাটিতে

পড়ে গেল। তারা গাড়ি চালকের দেহটি ব্রীজের নিচে ছুড়ে দিয়ে লাফ দিয়ে জীপে উঠল।

সান ওয়াকার গাড়ি থেকে নেমে ওদিকে যাবে কিনা চিন্তা করতেই দেখল জীপ গাড়িটা ষ্টার্ট নিয়ে তাদের দিকেই ছুটে আসছে।

কিছু বুঝে উঠার আগেই জীপটি সান ওয়াকারের গাড়ির একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল।

জীপটা থামতেই লাফ দিয়ে নামল দু'জন জীপ থেকে।

সান ওয়াকার গাড়ির দরজা খোলার শব্দে পেছনে তাকিয়ে দেখল পেছনের কার থেকেও দু'জন নেমেছে।

চারজনই এগিয়ে আসছে সান ওয়াকারের ঘোড়ার গাড়ি লক্ষ্যে।

এতক্ষণে পরিস্থিতি আঁচ করতে পারল সান ওয়াকার। তার পাশে বসে ছিল মেরী রোজ। সে সরে এল সান ওয়াকারের গা ঘেঁষে। বলল, ওদের মতলব ভাল মনে হচ্ছে না'। তার কণ্ঠে উদ্বেগ।

সামনে সান ওয়াকারদের দিকে মুখ করে বসে ছিল শিলা সুসান। তার মুখে উদ্বেগ। বলল সে ফিস ফিস করে, 'সান, মনে হচ্ছে ওরা আমাদের দিকে ফিরে আসছে'।

উদ্বেগ ফুটে উঠল সান ওয়াকারের মুখেও।

সান ওয়াকার উঠে দাঁড়াল।

ওরা চারজন তখন সান ওয়াকারের গাড়ি ঘিরে ফেলেছে। চারজনই শ্বেতাংগ। ওদের একজন সান ওয়াকারকে লক্ষ্য করে বলল, 'শুনেছি তুমি কারাত-কুংফুতে ব্ল্যাক বেল্ট পেয়েছ। কিন্তু চারটে রিভলবারের কাছে তোমার ঐ ট্রেনিং কোন কাজে আসবে না'।

সান ওয়াকার চেয়ে দেখল, ওদের চারজনের হাতেই রিভলবার।

চারদিকে তাকাল সান ওয়াকার।

এলাকাটা জনবিরল।

পুরাতন কাহোকিয়া শহরের দক্ষিণাংশ। এই ওল্ড কাহোকিয়ার একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে এয়ারপোর্ট রোডে মিসিসিপির একটা ক্যানালের উপর

এই ব্রীজ। মাত্র ১০০ গজ দূরে মিসিসিপি থেকে বেরিয়ে এসেছে ক্যানালটি। মোহনা এলাকা বলে ক্যানালটি প্রায় নদীর মতই প্রসস্ত।

ব্রীজের দু'পাশেই কয়েকটা প্রাইভেট জেটি আছে। প্রত্যেকটি জেটি বরাবর উপরে একটা অফিসও আছে। যা বৈঠকখানা, বিশ্রামাগার ও অস্থায়ী গোডাউন হিসেবেও ব্যবহার হয়।

ছয় সাতটি এ ধরনের অফিসের একটিতেও আলো নেই।

কিন্তু সেদিক থেকে চোখ ফরাবার আগেই একটিতে আলো জ্বলে উঠল। সেই সাথে খুলে গেল তার এদিকের দরজাও। সান ওয়াকার বুঝল, নিচের জেটিতে বোট বা লঞ্চ ভিড়িয়ে কে বা কারা উঠে এসেছে।

সান ওয়াকারের দৃষ্টি আবার ফিরে এল সেই চারজনের দিকে।

ওরা ঠিকই বলেছে কারাত এবং কুংফু'তে সান ওয়াকরের ট্রেনিং আছে। কিন্তু চারদিকের রিভলবারের বিরুদ্ধে তা এখন কোন কাজে লাগবে না্

সান ওয়াকারের মনে পড়ল ঈশ্বরের কথা। কিন্তু কোন ঈশ্বরকে ডাকবে? রেড ইন্ডয়ানদের ঈশ্বর নিরাকার বটে। কিন্তু তার নানা আকারে নানা ভাবে পুঁজাও হয়। তাদের কাকে সে ডাকবে। সান ওয়াকারের মনে পড়ল তার গোত্র ব্ল্যাক ফুট ইন্ডিয়ানদের এক ঈশ্বর 'আল্লাহ'র কথা। সান ওয়াকারের দাদা বলতেন, আল্লাহ সব মানুষ এবং সব সৃষ্টির স্রষ্টা এবং তিনি সর্বশক্তিমান ও সবকিছুর উপর ক্ষমতাশালী। এই বিপদকালে সান ওয়াকার সেই আল্লাহর কথা স্মরণ করল। তার উদ্বেগ তার নিজেকে নিয়ে নয়। তার উৎকণ্ঠা মেরী রোজ ও সুসানকে নিয়ে। তাদের কোন অপমান, ক্ষতি সে বরদাশত করতে পারবে না। প্রায় ভুলে যাওয়া আল্লাহকে স্মরণ করে তার সাহায্য প্রার্থনা করল সান ওয়াকার।

ওরা চারজন ধীরে ধীরে গাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে।

ওদের একজন চাপা কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, 'তোমরা তিনজন হাত উপরে তুলে দাঁড়াও। শোন, সান ওয়াকার তোমার সামান্য চালাকি ধরা পড়ার সাথে সাথে প্রথমে তোমার প্রেমিকা মেরী রোজ মরবে, তারপর তোমার বান্ধবী।'

হাত তুলল সান ওয়াকাররা তিনজনই্ তারপর ওদের লক্ষ্য করে বলল, 'তোমরা কারা? কি চাও তোমরা?'

'সব জানবে'।

চারজনের একজন এই কথা বলেই নির্দেশ দিল, 'সান ওয়াকার হাত তুলে রেখেই তুমি প্রথম নেমে এস, তারপর ওরা দু'জন'।

তার কথা শেষ হবার সাথে সাথেই চারটি গুলীর শব্দ হলো পর পর।

সান ওয়াকার দেখল ভোজবাজীর মত চারজনের হাত থেকেই রিভলবার পড়ে গেছে।

ওরা চারজন গুলী যেদিক থেকে এসেছে, সেদিকে একবার তাকিয়েই ছিটকে পড়া রিভলবার তারা তুলে নিতে গেল।

আবার সেই চারটা গুলীর শব্দ হলো।

ওরা চারজন রিভলবার না তুলে প্রত্যেকেই বাম হাত দিয়ে ডান হাত চেপে ধরে উঠে দাঁড়াল এবং দৌড়ে গাড়িতে গিয়ে উঠল।

দু'টি গাড়িই ষ্টার্ট নিয়ে ছুটে পালাল।

সান ওয়াকার, মেরী রোজ এবং শিলা সুসান তিনজনেই তাকিয়েছিল গুলীর উৎস লক্ষ্যে। দেখল, একজন লোক এগিয়ে আসছে। তার দু'হাতে দুটি রিভলবার। মাথায় হ্যাট। হ্যাটের ছায়া মুখের উপর পড়ায় মুখ দেখা যাচ্ছে না।

লোকটি আরও কাছে এগিয়ে এসেছে।

আরও তিনজন লোক এগিয়ে আসছে তার পেছন পেছন। তারাও বেরিয়েছে সেই জেটি সংলগ্ন অফিস থেকে, যেখানে সান ওয়াকার আলো জ্বলে উঠতে দেখেছে।

এগিয়ে আসা লোকটি তার হাতের রিভলবার পকেটে রেখে দিয়েছে।

আরও কিছুটা এগিয়েই লোকটি এক হাত দিয়ে মাথার হ্যাট নামিয়ে উচ্চস্বরে বলে উঠল, 'সান ওয়াকার, সুসান, মেরী রোজ তোমরা?'

বলেই সে দ্রুত পা চালালো সান ওয়াকারদের দিকে।

'এতো আহমদ মুসা, সান ওয়াকার'। কণ্ঠে একটা আনন্দের উচ্ছ্বাস ফুটে উঠল এবং লাফ দিয়ে নামল গাড়ি থেকে শিলা সুসান।

'ঠিক, আহমদ মুসাই'। বলে সান ওয়াকার নামল গাড়ি থেকে। তার সাথে মেরী রোজও।

নেমেই সান ওয়াকার গিয়ে জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে। বলল, ‘আমার দাদার আল্লাহ স্বয়ং নেমে এসেছেন আপনার রূপ ধরে’। আবেগ রুদ্ধ কণ্ঠে বলল সান ওয়াকার।

‘তোমার দাদার আল্লাহ? বুঝলাম না সান ওয়াকার’।

‘ধন্যবাদ। আপনি আমাদের বাঁচিয়েছেন’। আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল শিলা সুসান।

‘ঈশ্বর যে কিভাবে সাহায্য করেন। আজ চোখে দেখলাম’। বলল মেরী রোজ।

এর মধ্যে এসে পৌঁছে গেল প্রফেসর আরাপাহো, জিভারো এবং ওগলালা।

‘দীর্ঘজীবী হও সান ওয়াকার। কি ঘটেছে বলত? ওরা কার?’

সান ওয়াকার এগিয়ে মাথা নিচু করে অভিবাদন জানিয়ে প্রফেসর আরাপাহোর হাত চুম্বন করে বলল, ‘স্যার ওদের চিনতে পারিনি। ওরা শ্বেতাংগ। হঠাৎ আমরা দু’দিক থেকে আক্রান্ত হয়েছি’।

‘এ সময় তোমরা এদিকে কোথায় যাচ্ছ ঘোড়ার গাড়ি করে?’

‘স্যার এয়ারপোর্টে যাচ্ছিলাম। মেরী রোজ ও শিলা সুসান ওয়াশিংটনে ফিরবে’।

প্রফেসার আরাপোহা আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘তুমি তো ব্যাপারটা প্রথম দেখতে পেয়েছ। বুঝতে পেরেছ কিছু?’

‘ওদের একজনকে পেলেই তো অনেক কিছু বুঝা যেত? কিন্তু হত্যার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও চারজনের কাউকে হত্যা বা আটকাবার চেষ্টা করলে না কেন?’

‘বেড়াতে এসেছি কাহোকিয়াতে। প্রথমেই হত্যার মত কাজে জড়িয়ে পড়তে চাইনি। বিশেষ করে ওরা এদের হত্যার চেষ্টা করেনি, কিডন্যাপ করতে চেয়েছিল’।

‘কিন্তু যে কাজ তারা করতে যাচ্ছিল তা হত্যার চেয়েও ভয়ংকর হতো’। বলল প্রফেসর আরাপাহো।

‘সেটা ঠিক। তবে হত্যার মত কারণ আমি পাইনি’। আহমদ মুসা বলল।

‘ঠিক বলেছ বৎস। তোমার সিদ্ধান্তই ঠিক। সত্যি তোমার আত্মবিশ্বাস আকাশচুম্বি এবং এর চেয়ে বড় শক্তি আর কিছু নেই’। বলল প্রফেসর আরাপাহো।

একটু থামল প্রফেসর আরাপাহো।

থেমেই আবার শুরু করল, ‘কথা বলার জায়গা এটা নয়। ওদের প্লেন ক’টায় সান ওয়াকার?’

‘প্লেন আর পাওয়া যাবে না। সময়ের চেয়ে ১৫ মিনিট বেশি হয়েছে’। সান ওয়াকার বলল।

‘তাহলে আজকের মত ওদের নিয়ে ফিরে যেতে চাও?’

‘জ্বি হ্যাঁ’।

‘সান ওয়াকার, পেছনের গাড়ি নিশ্চয় তোমাকে ফলো করে এসেছে?’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমারও তাই মনে হয়। এখন আমার মনে পড়ছে ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে আসার সময় বাড়ির অল্প দূরে পেছনের এই গাড়িটাকেই মনে হয় পার্ক করা দেখেছিলাম রাস্তার পাশে’।

‘তাহলে ঐ বাড়িতে ফেরা তোমাদের জন্যে নিরাপদ নয়। ওদের শিকার হাতছাড়া হয়েছে। তার উপর আহত হয়েছে ওরা। ওরা এখন পরিণত হয়েছে ক্ষ্যাপা কুকুরে’।

‘তাহলে আমার নিজের বাড়িতে ফিরতে পারি’। সান ওয়াকার বলল।

‘কেন তোমরা কোথায় ছিলে? কোথেকে তোমরা এসেছ?’

‘মুক্ত হয়ে ফিরে আসার পর থেকে আমি আমার খালার বাড়িতে থাকছি’।

‘তোমার নিজ বাড়িতে নয় কেন?’

‘আমার সন্দেহ, আমার বাড়ির উপর ওরা চোখ রাখবে’।

‘তাহলে এখন আবার নিজের বাড়িতে ফিরতে চাচ্ছ কেন?’

উত্তর দিল না সান ওয়াকার। ভাবছিল সে।

‘পরে চিন্তা করো সান ওয়াকার, এখন চল আমাদের বাড়িতে’। বলল প্রফেসর আরাপোহা।

পিতার কথায় ওগলালার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই নামল সেখানে মলিনতার ছায়া। তবু মুখে হাসি টেনে বলল, মেরী রোজ ও শিলা সুসানের দিকে কয়েক ধাপ এগিয়ে গিয়ে, 'আব্বা ঠিকই বলেছেন। এখন তোমাদের সকলের আমাদের বাড়িতে যাওয়াই সব দিক থেকে যুক্তিসংগত।'

'ধন্যবাদ, ওগলালা'। বলল মেরী রোজ।

ওগলালা তার পিতার দিকে চেয়ে শিলা সুসানকে দেখিয়ে বলল, 'আব্বা এ শিলা সুসান। সান ওয়াকারের সাথে পড়ে। আমাদের বন্ধু'।

একটু থেমে একটা ঢোক গিলে মেরী রোজকে দেখিয়ে বলল, 'আর এ মেরী রোজ আব্বা। এও সান ওয়াকারের সাথে পড়ে এবং সান ওয়াকারের বাগদত্তা।'

শেষ কথাটা বলার সময় গলাটা কাঁপছিল ওগলালার।

বোধহয় এ ব্যাপারটা ঢাকা দেয়ার জন্যেই জোরে হেসে উঠল ওগলালা। কিন্তু সেটা হাসির শব্দ হলো, কিন্তু হাসি হলো না।

আহমদ মুসা তাকাল ওগলালার দিকে। কিছুটা বিব্রত দৃষ্টি আহমদ মুসার। ভাবল আহমদ মুসা, সরল ও বেপরোয়া ওগলালা কি ঘটিয়ে বসে আল্লাহই জানেন।

মেরী রোজ ও শিলা সুসানের চোখেও বিস্ময় দৃষ্টি ফুটে উঠেছিল মুহূর্তের জন্যে।

ওগালালা থামতেই আহমদ মুসা বলল, ওসব পাসোর্নাল ব্যাপার এখন না তোলাই ভাল। চল যাওয়া যাক।'

'গাড়ির চালককে দেখতে হয়, তার কি অবস্থা'। বলল সান ওয়াকার।

আহমদ মুসা জিভারোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি এদের নিয়ে যাও। গাড়িতে উঠ গিয়ে। আমি ও সান ওয়াকার গাড়ি চালকের দেখি। তার হাতে ঘোড়ার গাড়ির দায়িত্ব তুলে দিয়ে আমরা আসছি'।

বলে আহমদ মুসা ও সান ওয়াকার পা বাড়াল ব্রীজের দিকে।

আহমদ মুসা ও সান ওয়াকার চলে যেতেই জিভারো বলল, 'একজন ভাই ও একজন ভাবী পেয়ে গেলি'।

ওগলালা জিভারোর এই টিপ্পনির কোন জবাব না দিয়ে গম্ভির মুখে শিলা সুসান ও মেরী রোজ দু'জনের দু'হাত দু'হাতে ধরে হাঁটা শুরু করল যেখানে থেকে এসেছিল সেই অফিসের দিকে।

জিভারো বিস্ময় দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল ওগলালার দিকে। জীবনে এই প্রথমবার ওগলালা জিভারোর একটা টিপ্পনির জবাব দিল না। পিঠাপিঠি দু'ভাইবোন ওরা। দু'জনের মধ্যেকার মধুর বিরোধ মাতিয়ে রাখে বাড়িকে, গোটা পরিবারকে সব সময়।

কিন্তু ওগলালার এই আচরণে অবাক হলো জিভারো।

বিষয়টা তার পিতারও নজর এড়ায়নি। কিছু বলতে গিয়েও সে চেপে গেল। সম্বিত ফিরে পাওয়ার মত হেসে উঠে বলল, 'চল যাই।'

ওগলালাদের বাড়ির দক্ষিণের একটি ব্যালকনিতে দু'হাতের কনুইয়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল মেরী রোজ। তার মুখ ভার। চোখ দু'টি বেদনার্ত।

কিছুক্ষণ পর সান ওয়াকার এসে প্রবেশ করল ব্যালকনিতে। দু'হাতে ঠেস দিয়ে মেরী রোজ-এর মতই সে দাঁড়াল ব্যালকনির রেলিং ঘেঁষে। মেরী রোজ-এর মুখের দিকে একবার চেয়ে প্রশ্ন করল, 'এভাবে চলে এলে কেন?'

'কোন কারণে নয় এমনিই উঠে এসেছি।' সান ওয়াকারের দিকে না তাকিয়েই বলল মেরী রোজ।

'কেউ না বুঝলেও আমি বুঝেছি তুমি এভাবে চলে এলে কেন? ওগলালার কথায় তুমি মাইন্ড করেছ।'

'না। ওগলালার কথায় আমি কষ্ট পেয়েছি, কিন্তু মাইন্ড করিনি। ওতো ঠিকই বলেছে। একজন শ্বেতাংগীনি বিশেষ করে একটি শীর্ষ শ্বেতাংগ পরিবারের কন্যা ভালবাসবে একজন রেড ইন্ডিয়ানকে, এটা শ্বেতাংগরা বরদাশত করতে পারেনি বলেই তোমার জীবনে বিপর্যয় নেমেছে। এর মানে আমার প্রেম তোমার

জীবনে বিপর্যয় ঘটিয়েছে। ওগলালার এ কথা সত্য।' মেরী রোজ-এর শেষের কথাগুলো আবেগ ও কান্নায় রুদ্ধ হয়ে গেল।

'ওরা বরদাশত করতে পারবে না, এটা কি কোন নতুন সত্য? তুমি, আমি সকলেই কি এটা জানি না?'

'কিন্তু তোমার জীবনে বিপর্যয় নেমেছে এটা সবার জন্যে নতুন সত্য।'

'এ সত্যও নতুন নয়? তুমি আমি কি জানতাম না এ ধরনের অসম ভালবাসার ক্ষেত্রে আমাদের চারদিকে কি ঘটছে? জানতাম। জানার পরেই আমরা ভালবেসেছি।'

'তোমাকে এমন মূল্য দিতে হবে ভাবিনি আমি'।

'কি এমন মূল্য দিয়েছি? অনেকে তো জীবন দিয়েছে, আমি তো বেঁচে আছি।'

'ওভাবে তুমি বলো না। আমার জন্যে তোমার মত প্রতিভাকে নষ্ট হতে আমি দেব না।'

'তাহলে কি করবে? ওদের কথা মানবে? আমি দেশত্যাগ করি, আর তুমি নতুন জীবন শুরু কর, এটা তুমি চাও?'

মেরী রোজ মুখ তুলে সান ওয়াকারের দিকে চাইল। তার দু'চোখ পানিতে ভরে উঠেছে।

মেরী রোজ তার মাথা সান ওয়াকারের কাঁধে রেখে দু'হাতে সান ওয়াকারের হাত চেপে ধরল। বলল, 'আমি তা চাইতে পারি বলে তুমি মনে কর?'

'মনে করি না বলেই তো প্রশ্ন করলাম।'

'তাহলে শোন, তুমি আমার জীবন সমার্থক।'

'তাহলে কষ্টকে ভয় পাচ্ছ কেন?'

'আমার নয়, তোমার কষ্টকে ভয় পাচ্ছি।'

'তাহলে তুমি আমাকে তোমার চেয়ে দুর্বল মনে কর?'

মেরী রোজ হেসে ফেলল। বলল, 'তা বুঝি মনে করতে পারি? তবে একটা কথা মেয়েরা যতটা আঘাত হজম করতে পারে, ছেলেরা তা পারে না'।

'এটা তো দৈহিক দুর্বলতারই লক্ষণ'।

'আবার এটা কিন্তু মনের সবলতারও লক্ষণ'। হেসে বলল মেরী রোজ।

'যদিও এ ব্যাপারেও আমার কথা আছে। তবু দুর্বলতা ও সবলতার ফিফটি শেয়ার মেনে নিচ্ছি।'

একটু থেমেই সান ওয়াকার আবার বলল, 'চল যাই।'

দু'জনেই পা বাড়াল ব্যালকনি থেকে ঘরের দিকে।

সান ওয়াকার যখন কথা শেষ করল তার আগেই ওদিকে আহমদ মুসা কথা শেষ করেছে ওগলালার সাথে।

সান ওয়াকার উঠে যাবার পর পর ওগলালা উঠে গিয়েছিল ভারি মুখ নিয়ে।

আহমদ মুসা সবইল লক্ষ্য করেছে।

ওগলালার আব্বা উঠে ঘরের দিকে যেতেই আহমদ মুসা যেদিকে ওগলালা গেছে সেদিকে চলে গেল।

ওগলালা উত্তরের এক ব্যালকনিতে সামনের সবুজ বাগানের দিকে চেয়ে মুখ গোমড়া করে দাঁড়িয়েছিল।

আহমদ মুসা ব্যালকনিতে প্রবেশ করে ডাকে ওগলালাকে।

ওগলালা জবাব দেয় না, মুখও ফিরায় না। কিন্তু তার চোখ-মুখ ছলছলে হয়ে উঠেছিল।

'ওগলালা তোমাকে আমি বকুনি দিতে এসেছি, কথা বলছ না কেন?'

ওগলালা চরকির মত ঘুরে দাঁড়ায়। বলে, 'আমি জানি আপনি আমাকে বকবেন। বকুন, বকুন, বকুন!' বলে ফুফিয়ে কেঁদে উঠল ওগলালা।

আহমদ মুসা কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে যায়। ওগলালা এমন করে কেঁদে ফেলবে, আহমদ মুসা ভাবেনি। সে মনে করেছিল, ওগলালা রুখে দাঁড়িয়ে নিজেকে সমর্থন করবে। কিন্তু হয়ে যায় তার উল্টো।

আহমদ মুসা ধীর কণ্ঠে ওগলালাকে লক্ষ্য করে বলল, 'বোন, আমি তোমার মনের অবস্থা জানি। তুমি মেরী রোজকে সান ওয়াকারের বাগদত্তা বলে পরিচয় দিয়েছিলে, তখন খুশী হয়েছিলাম বাস্তবতাকে তোমার মেনে নেয়া দেখে।

কিন্তু তুমি এভাবে মেরী রোজকে আঘাত করলে কেন? অথচ তুমি জান মেরী রোজ-এর কোন দোষ নেই।'

'বুঝতে পারছি আমার ভুল হয়েছে। কিন্তু ভাইয়া মনকে আমি ধরে রাখতে পারিনি। মাঝে মাঝেই মন বলে উঠে, আজকের শ্রেষ্ঠতম রেড ইন্ডিয়ান প্রতিভা সান ওয়াকারকে ধ্বংস করার জন্যেই মেরী রোজকে দিয়ে শ্বেতাংগরা ফাঁদ পেতেছে।' বলেছিল ওগলালা কান্না ভেজা কণ্ঠে।

'কিন্তু তুমি তো জান বোন, এটা সত্য নয়।'

'জানি, কিন্তু মনকে বুঝাতে পারি না। সান ওয়াকারকে কেড়ে নিয়েছে ওরা।'

'কিন্তু এর জন্যে না সান ওয়াকার, না মেরী রোজ দায়ী। সান ওয়াকার ও মেরী রোজ তোমার ব্যাপারটার কিছু জানতো না।'

'ভাইয়া, আমি জানি দোষ আমার। সান ওয়াকার আমার আবাল্য সাথী। তাকে কিছু জানাবার আছে কোনদিনই ভাবিনি। ভাবলাম সেদিন, যেদিন সান ওয়াকার মেরী রোজ-এর হয়ে গেল এবং যেদিন আমার শূন্য বুক হাহাকার করে উঠল।' বলে দু'হাতে মুখ ঢেকে ওগলালা বসে পড়েছিল। কাঁদছিল ওগলালা। কেঁপে কেঁপে উঠছিল তার দেহ।

আহমদ মুসা কি বলবে ভেবে পায় না। কি সান্ত্বনা দেবে তাকে।

বাকহারা মানুষের মত দাঁড়িয়ে থাকে আহমদ মুসা্

কিছুক্ষণ পর উঠে দাঁড়িয়েছিল ওগলালা। কান্না থেমে গিয়েছিল তার। রুমাল দিয়ে চোখ মুছে সে বলেছিল, 'ভাইয়া, আর ভুল হবে না আমার। আর কোনদিন বকুনি দিতে হবে না আপনার বোনকে। আমি মেরী রোজ-এর কাছে মাফ চেয়ে নেব।' খুব শান্ত কণ্ঠ ওগলালার।

আহমদ মুসার চোখ দুটিও ভিজে উঠেছিল। বলেছিল আহমদ মুসা ধীর কণ্ঠে; না বোন মেরী রোজকে এখন তুমি কিছুই বলো না। তোমার মনের অবস্থা যদি সামান্যও টের পেয়ে যায় সে, তাহলে সমস্যা জটিল হয়ে যাবে। কিছু বলার দরকার হলে বোনের পক্ষ থেকে আমিই বলব তাকে।'

'ঠিক আছে ভাইয়া।'

‘ধন্যবাদ ওগলালা।’

‘এ ধন্যবাদ আপনারই প্রাপ্য।’

‘বুঝলাম না।’

‘ধৈর্য ধরা, সর্ব অবস্থায় মানুষকে সম্মান করা, নিজের অধিকারের সাথে সাথে অন্যের অধিকারকে সমান দৃষ্টিতে দেখার মত শিক্ষা এ কয়দিনে আপনার কাছ থেকে পেয়েছি।’

‘বল ইসলামের কাছ থেকে পেয়েছ।’

‘ঠিক ভাইয়া। আগে শুধু পৃথিবীর জীবন নিয়েই ভাবতাম। এখন মৃতুয পরবর্তী জীবন নিয়েও ভাবি। বোধ হয় এ কারণেই আগের সেই জেদ আমার মধ্যে আর নেই।’

‘ধন্যবাদ বোন। ওদিকে একটু দেখি। আসি?’

‘ওকে, সালাম।’ বলেছিল ওগলালা আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে।

আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়িয়েছিল চলার জন্যে। ঘুরে দাঁড়ায় আবার ওগলালার দিকে। বলে ‘ওয়া আলাইকুম সালাম।’

আহমদ মুসার ঠোঁটে হাসি। সালাম নেবার পর বলেছিল, ‘ইসলামের প্রতি তোমাদের আকর্ষণ বিস্ময়কর। আমেরিকার এই গভীর অভ্যন্তরে এমন কিছু ঘটতে পারে তা আমার অকল্পনীয় ছিল।’

‘রেড ইন্ডিয়ানদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্কের নাকি একটা ইতিহাস আছে। ভাইয়া কি সেই ইতিহাস?’

আব্বা কি সব বলেছিলেন আমার মনে নেই।

‘আচ্ছা চলি ওগলালা’ বলে আহমদ মুসা আবার পা বাড়ায় যাবার জন্যে।

আহমদ মুসা সান ওয়াকারদের খুঁজতে খুঁজতে দক্ষিণের ব্যালকনিতে ঢোকার মুখেই মুখোমুখি হলো তাদের।

আহমদ মুসা সান ওয়াকার ও মেরী রোজ এর মুখের উপর একবার চোখ বুলিয়ে বলল, ‘আমি মেরী রোজকেই খুঁজছিলাম। ভাল হলো তোমাদের দু’জনকে পেয়ে। এসো একটু বসি।’

আহমদ মুসা ঘরের সোফায় গিয়ে বসল।

ঘরটা বাড়ির অতিথিদের ব্যবহার্য ড্রইং রুম।

সান ওয়াকার এবং মেরী রোজও আহমদ মুসার সামনের সোফায় পাশাপাশি বসল।

আহমদ মুসার ঠোঁটে আপনাতেই এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল। বলল, ‘সান ওয়াকার ও মেরী রোজকে লক্ষ্য করে, তোমাদের দু’জনের মুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে তোমাদের উপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে।’

দু’জনের মুখই লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। দু’জনেই মুখ নিচু করল। কিছু বলল না।

‘এই বিষয়েই তোমাকে কয়েকটা কথা বলব মেরী রোজ’। বলল আহমদ মুসাই গম্ভীর কণ্ঠে।

‘বলুন ভাইয়া’।

‘ওগলালা ঐ কথাটা তোমাকে আহত করার জন্যে বলেছে বলে তুমি মনে করনি তো?’

‘প্রথমটায় তাই মনে করেছিলাম। পরে বুঝেছি, অবস্থার চাপ থেকেই ওগলালা ঐ কথা বলেছে এবং তা যুক্তিসংগত।’

‘ধন্যবাদ মেরী রোজ। আমি এখনি ওগলালার সাথে কথা বললাম। সে খুব অনুতপ্ত ও লজ্জিত। প্রত্যেক রেড ইন্ডিয়ানের মত সেও সান ওয়াকারের ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বিগ্ন বলেই তৎক্ষণিক আবেগ থেকে ঐভাবে কথা বলেছে’।

‘বুঝেছি ভাইয়া। আমি ওগলালার সাথে এ নিয়ে কথা বলব। আমি রেড ইন্ডিয়ান হলে আমার সেন্টিমেন্টোও তার মতই হতো।’

‘ধন্যবাদ, মেরী রোজ। তোমরা বস। আমি উঠি, কাজ আছে।’

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়েছিল চলে যাবার জন্যে।

ঘরে এসে প্রবেশ করল প্রফেসর আরাপাহো। বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, ‘সুখবর আহমদ মুসা। তোমার আর যাওয়ার ঝুঁকি নিতে হলো না। সান ওয়াকারের গোটা পরিবার এসে হাজির হয়েছে।’

একটু হাসল। তারপর বলল সান ওয়াকারকে লক্ষ্য করে, ‘আমি ওদের বসিয়েছি। যাও তোমরা ওদিকে ওগলালা গেছে।’

পরে আবার আহমদ মুসাকে বলল, ‘আজও আমার ইনষ্টিটিউটে তোমার যাওয়া হলো না। ঠিক আছে। আরেকদিন যাবে। আমি চলি। টেলিফোন পেয়েছি, একটু আগেই, আজ অফিসে যেতে হচ্ছে।’

বলে প্রফেসর আরাপাহো বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

প্রফেসর আরাপাহো বেরিয়ে যেতেই সান ওয়াকার বলল, ‘চলুন ভাইয়া, খুব খুশী হবেন তারা আপনাকে পেলে। সব কথা তারা জানেন।’

‘আমার নামও?’

‘না ভাইয়া নাম বলিনি। প্রকৃত পরিচয়ও দেয়নি’।

‘ঠিক আছে চল। কিন্তু শুধু আমাকে বলছ কেন? মেরী রোজকে না বেশি পরিচয় করিয়ে দেয়া দরকার।’

‘ওর সাথে পরিচয় হয়ে গেছে।’

‘আসল পরিচয়?’

মুখ লাল হয়ে উঠল সান ওয়াকারের। বলল, ‘আসল পরিচয় বলতে হয়নি, তাঁরা বলার আগেই বুঝেছেন’।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

সান ওয়াকার এবং মেরী রোজও।

প্রফেসর আরাপাহোর ড্রইং রুম জমজমাট।

সান ওয়াকারের আম্মা আব্বা পাশাপাশি বসেছে। তাদের পাশে বসেছে মেরী রোজ।

তাদের মুখোমুখি আরেক সোফায় বসেছে আহমদ মুসা। তার পাশে সান ওয়াকার।

অন্যদিকে পাশাপাশি সোফায় বসেছে জিভারো এবং শিলা সুসান।

ওগলালা মেহমাদারীতে ব্যস্ত।

সে স্থির হয়ে বসতে পারেনি। সে উঠে যাচ্ছে আবার এসে বসছে।

কথা বলছিল সান ওয়াকারের আব্বা শাম ওয়াকার।

হাঁটুর উপর হাঁটু তুলে কথা বলছিল তিনি। তার ডান হাতটা রাখা ছিল হাঁটুর উপর।

তার হাতের অনামিকায় পরা আংটির উপর নজর পড়তেই চমকে উঠল আহমদ মুসা। আহমদ মুসার মনে হল সোনার আংটির উপর ক্যালিওগ্রাফিক ষ্টাইলে আরবী হরফ।

কৌতুহল সৃষ্টি হলো আহমদ মুসার মনে। বলল সান ওয়াকারের আব্বা শাম ওয়াকারকে, 'জনাব আমি কি আপনার আংটি দেখতে পারি?'

'অবশই বেটা' বলে শাম ওয়াকার তার ডান হাতের অনামিকা থেকে আংটি খুলে আহমদ মুসার হাতে দিল।

আহমদ মুসা দেখল আংটিটি। ঠিক আংটির উপর ক্যালিওগ্রাফিক ষ্টাইলে আরবী বর্ণ উৎকীর্ণ। আরও বিস্মিত হলো যখন দেখল ক্যালিওগ্রাফিক হরফে আল্লাহ্ শব্দ লেখা।

আহমদ মুসা ভাবল, নিশ্চয় ষ্টাইল হিসেবে এটা আংটিতে উৎকীর্ণ করা হয়েছে। আহমদ মুসা জিজ্ঞেস করল, 'আংটি কোথেকে কিনেছেন?'

'কেনা নয়তো। তৈরি করা।' বলল সান ওয়াকারের আব্বা শাম ওয়াকার।

'আপনি তৈরি করে নিয়েছেন?'

'হ্যাঁ আমি তৈরি করে নিয়েছি। আব্বার হাতে এ ধরনের আংটি ছিল। দাদার হাতেও দেখেছি। এটা আমাদের বংশের মঙ্গল আংটি'।

'এ ডিজাইনটা কোথায় পেলেন? ডিজাইনে যে লেখা আছে তাকি আপনি ঠিক করে দিয়েছিলেন?'

'ওঠা লেখা নয়, মঙ্গল চিহ্ন। আব্বা ও দাদার আংটিতেও এটা ছিল। এ মঙ্গল চিহ্ন পরিবারের কর্তা ব্যক্তির হাতে থাকলে পরিবার অশুভ প্রভাব থেকে মুক্ত থাকে। কোন রোগ ঔষধে না সারলে এ মঙ্গল চিহ্নের আংটি ধুয়ে পানি খাওয়ালে সে ভাল হয়ে যায়'।

ভ্রুকুচকে গেল আহমদ মুসার। হঠাৎ তার মনে পড়ল ওগলালার কিছুক্ষণ আগের কথা যে, রেড ইণ্ডিয়ানদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্কের একটা ইতিহাস আছে। আরবী আল্লাহ শব্দ এরা পেল কোথায়? পুরুষানুক্রমে ‘আল্লাহ’ শব্দকে ওরা মঙ্গলের প্রতীক বলে মনে করছে কেন? এই ধরনের বিশ্বাস গড়ে ওঠে ঐতিহ্য থেকে? আল্লাহ শব্দের সাথে তাদের ঐতিহ্যিক যোগসূত্র কোথায়?

ভাবতে গিয়ে আহমদ মুসা একটু আনমনা হয়ে পড়েছিল।

প্রশ্ন করল শাম ওয়াকারই ‘কি ভাবছ? বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথা? খৃষ্টানরা এবং রেড ইণ্ডিয়ানদেরও অনেকে এটা বিশ্বাস করে না’।

‘অবিশ্বাস নয় জনাব আমি ভাবছি অন্য কথা। আপনাদের ঈশ্বরকে আপনারা কি বলেন?’ আহমদ মুসা বলল।

‘বিভিন্ন গোত্র বিভিন্ন সিম্বল ও অনুষ্ঠানকে ঈশ্বরের ক্ষমতার সাথে যুক্ত করে। আসলে আমাদের ঈশ্বর একটি অদৃশ্য শক্তি। উপবাস অবস্থায় ধ্যানকালে তাকে দেখা যায়’। বলল শাম ওয়াকার।

আহমদ মুসা আংটির ক্যালিওগ্রাফি দেখিয়ে বলল, ‘এটা কোন চিহ্ন নয়, এটা সমগ্র সৃষ্টির স্রষ্টা ‘ঈশ্বর’-এর নাম’।

আহমদ মুসা এ কথা বলার সাথে সাথে সান ওয়াকারের আব্বা শাম ওয়াকার সোজা হয়ে বসল। তার চোখে-মুখে কৌতুহল ও বিস্ময়। একটু ভেবে নেবার পর বলল, ‘কি ভাষায় লেখা? আমরা কেউ বুঝতে পারিনি’।

‘আরবী ভাষায় লেখা’।

‘ভাষার নাম শুনেছি। কোথাকার যেন ভাষা?’

‘মধ্য প্রাচ্যের আরব দেশ ও আরব জাতির ভাষা’।

‘ঈশ্বরের কি নাম লেখা আছে?’

‘আল্লাহ’।

‘আল্লাহ? আল্লাহ... আল্লাহ..... হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ওয়াশিংটনে গিয়ে মিনারওয়ালা এক বাড়ি থেকে খুব মধুর আওয়াজে উপাসনার ডাক শুনেছিলাম। সে ডাকে ‘আল্লাহ’ শব্দ ছিল। এ নাম আরবী ভাষায় লেখা কেন?’

‘আপনি ওয়াশিংটনে উপাসনার জন্যে খুব মধুর যে ডাক শুনেছিলেন, সেটা ছিল আরবী ভাষায়। গোটা দুনিয়ার মুসলমানরা তাদের উপাসনায় আরবী ভাষা ব্যবহার করে’।

‘কারণ?’

‘মধ্য প্রাচ্যের আরব দেশে ‘মুহাম্মাদ’ (স.) নামে একজন ‘প্রফেট’ জন্মগ্রহণ করেন ৫৭০ খৃষ্টাব্দে। তিনিই স্রষ্টা প্রেরিত সর্বশেষ নবী। যেহেতু তিনি আরবী ভাষী, তাই তাঁর ভাষাতেই সর্বশেষ ঐশ্বরিক গ্রন্থ হিসেবে ‘আল কোরআন’ নাজিল হয়। এই ঐশ্বরিক গ্রন্থে স্রষ্টা তার নাম ‘আল্লাহ’ বলেছেন। গোটা দুনিয়ায় ঈশ্বর বা স্রষ্টার যত নাম মানুষ ব্যবহার করে তার মধ্যে মাত্র এই নামই মৌলিক। গোটা দুনিয়ার মুসলমান স্রষ্টাকে ‘আল্লাহ’ বলে ডাকে এবং আল কোরআনের ভাষা আরবীকে উপাসনার ভাষা হিসেবে ব্যবহার করে’। আহমদ মুসা থামল।

শাম ওয়াকার কোন কথা বলল না। ভাবছিল সে। তার কপাল কুঞ্চিত।

আহমদ মুসাই কথা বলল। বলল সে, ‘আমি ভাবছি বংশ পরম্পরায় আপনাদের আংটিতে ‘আল্লাহ’ নাম এবং আরবী অক্ষর এল কি কর?’

‘শুধু আংটিতে নয় বৎস। আমাদের বাড়ির সংরক্ষিত রেকর্ডে এমন কিছু কাপড় ও কাগজপত্র ছিল যাতে কিছু দুর্বোধ্য ভাষা লিখিত ছিল দেখেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্য ‘ওন্ডেড নী ক্রিক’-এর যুদ্ধে আমরা সব হারিয়েছি। তখন আমরা বাস করতাম সাউথ ডাকোটায়। ইউরোপীয়রা তখন ঐ অঞ্চল দখলের যুদ্ধে লিপ্ত। ওদের সাথে আমাদের শেষ যুদ্ধ হয় ‘ওন্ডেড নী ক্রিক’-এ। যুদ্ধে আমাদের ব্ল্যাক ফুট ইণ্ডিয়ানসহ কয়েকটা রেড ইণ্ডিয়ান গোত্র দু’শ মানুষসহ বাড়িঘর সব হারাই। সেই সাথে হারিয়ে যায় আমাদের পারিবারিক ঐসব রেকর্ড। তবে মহামূল্যবান একটা রেকর্ড আমাদের কাছে আছে। যুদ্ধে যাবার সময় আমার পূর্ব পুরুষ ছোট বাক্সে রাখা ঐ জিনিসটি সাথে নিয়েছিলেন। আমি দাদার কাছে শুনেছি, ঐ পবিত্র বাক্সটা কাছে ছিল বলেই তার আব্বা যুদ্ধে বেঁচে যান। তার আশেপাশে সবাই নিহত হয়। সারা জীবন দাদা আপসোস করেছেন এই বলে যে, তিনি যদি পবিত্র বাক্সটা বাড়িতে রেখে আসতেন, তাহলে তিনি হয়তো মরতেন, কিন্তু রক্ষা পেত তাঁর পরিবার। কিন্তু তাঁর বৃদ্ধ আব্বা ছেলের নিরাপত্তার জন্যেই বাক্সটি আব্বার

দাদার সাথে দিয়েছিলেন। বাক্সটি আমাদের বাড়িতে এখনও আছে। এটা আমাদের পরিবারের নিরাপত্তার প্রতীক’।

‘আপনার সাউথ ডাকোটা থেকে ইলিনয়-এর কাহোকিয়াতে কবে এলেন?’

ঐ যুদ্ধের পরেই দাদা সহায়-সম্পদ বাড়িঘর পরিবার সব হারিয়ে মিসিসিপি ধরে চলে আসেন এই কাহোকিয়াতে’।

‘ঐ বাক্সে কি আছে?’

‘একটি কাল ভেলভেট কাপড়। তাতে সোনালী লেকা’।

‘কি লেখা আছে?’

‘আমি জানি না। দাদার কাছে শুনেছি, কাপড়ে ঈশ্বরের ঘরের দোয়া আছে এবং কাপড়ের কথাও ঈশ্বরের।’

‘লেকা কাউকে পড়তে দেননি?’

‘কাউকে দেখানো হয়নি।’

‘আমি দেখতে পারি?’

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না শাম ওয়াকার। একটু ভেবে বলল, ‘তোমার সম্পর্কে সান ওয়াকার, বিশেষ করে শিলা সুসানের কাছ থেকে অনেক কিছু শুনেছি, তুমি পরোপকারী ও পবিত্র মানুষ। তুমি নাকি দিনে পাঁচবার ঈশ্বরের উপসনা কর। তাছাড়া তুমি আংটির পাঠোদ্ধার করেছ। আংটিটাও ঐ বাক্সের মতই আমাদের কাছে পবিত্র। সুতরাং বাক্স আমি অবশ্যই তোমাকে দেখাতে পারি এবং তা এখনি পারি।’

‘এখনি?’ উজ্জ্বল চোখে বলল আহমদ মুসা। আহমদ মুসা ইতিমধ্যেই ভেবে নিয়েছে এই পরিবার বা এদের গোত্রের অতীতের সাথে মুসলমানদের কোন একটা সম্পর্ক রয়েছে।

‘হ্যাঁ, এখনি। আমার দাদার ঐতিহ্যের অনুসরণে আমরা যেখানেই যাই বাক্সটা সাথে রাখি। ওটাকে আমরা মনে করি আমাদের নিরাপত্তার ধর্ম।’

বলতে বলতেই শাম ওয়াকার তার জামার তলা থেকে তার বগলের নিচে ঝুলানো ছাত্রদের ইনষ্ট্রমেন্ট বক্সের মত একটা আয়তাকার বাক্স বের করে আনল। সুন্দর কাজ করা কাঠের বাক্স।

সামনের টিপয় টেবিলের উপর রুমাল বিছিয়ে তার বাক্সটি রাখল শাম ওয়াকার।

বাক্সে ডিজিটাল কম্বিনেশন লক। শাম ওয়াকার ডিজিটগুলো ঘুরিয়ে বাক্সের তালা খুলল।

ঘরের অন্য সবাই এতক্ষণ তন্ময় হয়ে শুনছিল আহমদ মুসা এবং সান ওয়াকারের আব্বার কথা।

সান ওয়াকারের আব্বা শাম ওয়াকার বাক্সের তালা খুলতে শুরু করলে সবাই এগিয়ে এসে বাক্সের চারদিক ঘিরে দাঁড়াল। উম্মুখ সবাই।

বাক্সের ডালা খুরতেই চোখে পড়ল চোখ ধাঁধানো কালো রঙের সুন্দর ভাজকরা ভেলভেট কাপড়।

সবার চোখ আছড়ে পড়েছে কাপড়টির উপর।

আহমদ মুসা দু'হাত দিয়ে ধরে ধীরে ধীরে কাপড়টি তুলল। মেলে ধরল টেবিলের উপর। ঘন কাল কাপড়ের উপর সোনালী রঙের লেখা অপরূপ লাগছে দেখতে।

আহমদ মুসার নজর কাপড় ও লেখার উপর পড়তেই বুঝতে বাঁকি রইল না, কাপড়টি কাবা শরীফের গেলাফের অংশ। কাপড়ের লেখা গেলাফে লিখিত আল কোরআনের কাবাঘর সংক্রান্ত আয়াতের অংশ। কাপড়টি যেহেতু একটা খণ্ড, তাই আয়াতের কতকগুলোর শব্দই মাত্র এখানে রয়েছে। পড়ল আহমদ মুসা লেখাগুলো আয়াতগুলোর সাথে মিলিয়ে।

দেখা ও পড়ার সাথে সাথে অপার বিস্ময় ও কৌতূহল এসে আহমদ মুসাকে ঘিরে ধরল। কাবার গেলাফের অংশ শত বছর কিংবা তারও আগের রেড ইণ্ডিয়ানদের বাক্সে আসবে কি করে?

আহমদ মুসার কপাল কুঞ্চিত হল।

তার মুখ ন্যস্ত হয়েছে তার দু'হাতে।

গালে হাত দিয়ে বসার মত গভীর চিন্তায় নিমগ্ন আহমদ মুসা।

ঘরের সবার দৃষ্টি হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল বাক্সের কাপড়ের উপর। এখন সবার দৃষ্টি গিয়ে নিবদ্ধ হয়েছে আহমদ মুসার উপর। আংটির মতই অশ্রুতপূর্ব কিছু কথা তারা আশা করে বাক্সের পবিত্র কাপড় সম্পর্কে।

'কি ভাবছ তুমি বাছা, বুঝলে কিছু?' চিন্তামগ্ন আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল শাম ওয়াকার।

'আমি ভাবছি, বিস্মিত হচ্ছি এই জিনিস আপনার এখানে আসল কি করে?'

'চিনতে পেরেছ? বুঝতে পেরেছ?' শাম ওয়াকার বলল।

'আরবের যে 'প্রফেট'-এর কথা এখনি বললাম, সেই নবী জন্মগ্রহণ করেন যে পবিত্র নগরীতে তার নাম মক্কা। এটাই প্রথিবীর প্রথম নগরী। এই নগরীতে প্রথিবীর আদি মানুষ হযরত আদম (আঃ) পৃথিবীর আদি উপাসনা গৃহ হিসাবে আল্লাহর ঘর কা'বা নির্মাণ করেন। আল্লাহর এই ঘর এখনও বর্তমান। এই ঘরেরই গেলাফের অংশ এটা'।

আহমদ মুসার এই কথা একটা তড়িৎ প্রবাহের মত কাজ করল গোটা ঘরে সকলের মধ্যে।

সবাই হঠাৎ নড়ে উঠল। সোজা হয়ে বসল। সকলের বিস্ফারিত চোখ গেলাফ খণ্ডের উপর নিবদ্ধ।

শাম ওয়াকারের চোখ-মুখ ভয়, বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় অপরূপ আকার ধারণ করেছে। হঠাৎ আভূমি নত হয়ে তার মাথা গেলাফ স্পর্শ করল।

তারপর মাথা তুলে মুখ উর্ধ্বমুখী করে বলল, 'মহান ঈশ্বর, আমাদের সৌভাগ্যের জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ'।

'জনাব একটা কথা বলি?' বলল আহমদ মুসা।

'অবশ্যই বাবা'।

'যে কাবার এই গেলাফ, সেই কাবা'র মালিক যে আল্লাহ, সিজদা শুধু তাঁরই প্রাপ্য, এই গেলাফের নয়'।

‘তোমার অত যুক্তির কথা আমি বুঝি না। ঈশ্বর মানে তোমার ‘আল্লাহ’ অদৃশ্য, তাঁর দৃশ্যমান প্রতিনিধি আমাদের কাছে এই গেলাফ’।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘বুঝিয়ে বললেই বুঝবেন, এ নিয়ে পরে কথা হবে। এখন বলুন, আদি মানুষ আদমের তৈরি আদি উপাসনাগৃহ আল্লাহর ঘর-এর এই গেলাফ আপনাদের কাছে কিভাবে এল?’

‘নিশ্চয় আল্লাহই আমাদের দান করেছেন। কিন্তু বল, চিনতে পারলে কেমন করে যে এটা আল্লাহর কা’বার গেলাফ?’

‘ঐ পবিত্র নগরীতে জন্মগ্রহণকারী সমগ্র জগতের জন্যে প্রেরিত সর্বশেষ প্রফেট মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপর যে ঐশ্বরিক গ্রন্থ আল কোরআন নাজিল হয়, সেই পবিত্র গ্রন্থের আল্লাহর বণী এই গেলাফে লেখা আছে’।

‘কেমন করে বুঝলে?’

‘এই গেলাফ খণ্ডটি কাবা ঘরের বিশাল গেলাফের একটা অংশ। গোটা গেলাফে আল্লাহর যে বাণী লিখিত আছে, তার মাত্র কয়েকটা শব্দ এই গেলাফ খণ্ডে আছে। আল্লাহর সেই গোটা বাণীই আমার মুখস্থ আছে। সুতরাং দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি’।

‘মুখস্থ আছে তোমার?’ বিষ্ফারিত চোখে জিজ্ঞেস করল শাম ওয়াকার।

‘জ্বি, মুখস্থ আছে’।

‘শুনতে পারি আমরা?’

‘অবশ্যই। তাহলে একটু বসুন। আমি আমার মুখ হাত মাথা পবিত্র করে আসি’।

বলে আহমদ মুসা তোয়ালে নিয়ে টয়লেটে ঢুকল এবং অজু করে মুখ হাত মুছতে মুছতে বেরিয়ে এল।

বসল আহমদ মুসা তার জায়গায়। বলল, ‘মানুষের জন্যে প্রেরিত আল্লাহর সর্বশেষ বাণীর গ্রন্থ আল কোরআনে মোট ৬৬৬৬ আয়াত বা পংক্তি রয়েছে। ২৩ বছর ধরে এই পংক্তিগুলো আল্লাহর তরফ থেকে শেষ নবী মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপর নাজিল হয়। কোরআন নাজিল শুরু হয় ৬১০ খৃষ্টাব্দে, শেষ হয় ৬৩৩ খৃষ্টাব্দে এবং এ বছরই প্রফেট মুহাম্মাদ (সঃ) ইন্তেকাল করেন। কোরআনের

পংক্তিগুলো নাজিল হওয়ার সংগে সংগে প্রফেটের শত শত অনুসারীরা তা মুখস্থ করে ফেলত এবং তা লিখেও রাখা হতো'।

একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর বলল, কোরআন শরীফের যে আয়াতের অংশ এই গেলাফের লেখাগুলো, আমি এখন সে আয়াত পাঠ করছি'।

বলে আহমদ মুসা আউজুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পাঠ করল এবং পড়তে লাগল।

"বল, আল্লাহ সত্য বিবৃত করেন। সত্যপন্থী ইব্রাহিমের ধর্ম অনুসরণ কর। মানুষের জন্যে যে প্রথম উপাসনা গৃহটি নির্মিত হয় তা মক্কায়। বরকতপূর্ণ এ গ্রন্থ এবং মানব জাতির জন্যে পথ প্রদর্শনের এ কেন্দ্রভুমি। এখানে রয়েছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ এবং ইব্রাহিমের উপাসনার স্থান। যে এখানে প্রবেশ করে সে লাভ করে নিরাপত্তা। মানুষের মধ্যে যারা যেখানে পৌঁছার সামর্থ রাখে, তারা যেন এ গৃহে হজ্জ সম্পন্ন করে এবং এটা তাদের উপর আল্লাহর অধিকার। কেউ এটা অস্বীকার করলে তার জেনে রাখা উচিত, আল্লাহ বিশ্ববাসীর মুখাপেক্ষী নন"।

আহমদ মুসার মধুর স্বরে কোরআন তেলাওয়াত যেন সম্মোহিত করল ঘরের সবাইকে। ভয়, ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিস্ময় সকলের চোখে।

তেলাওয়াত শেষ হলে অভিভূত কণ্ঠে শাম ওয়াকার বলল, 'আরবী ভাষা এত সুন্দর, আল্লাহর বাণী এত মধুর! এর অর্থ কি জানতে পারি?'

আহমদ মুসা অর্থ বলল।

অর্থ শুনে বিস্মিত চমৎকৃত শাম ওয়াকার বলল, 'ইব্রাহিম কি 'আব্রাহাম'?

'জ্বি, হ্যাঁ'।

'তার ধর্ম অনুসরণ করার অর্থ? প্রফেট মুহাম্মাদের ধর্ম তাহলে কি?'

'আব্রাহাম-এর ধর্মই মুহাম্মাদ (সঃ)-এর ধর্ম'।

একটু ভাবল শাম ওয়াকার্ বলল, 'মক্কার কা'বা ঘরে মানে আল্লাহর ঐ ঘরে আব্রাহামও উপাসনা করেছেন?'

'শুধু উপাসনা নয়, তিনি এবং তার ছেলে ইসমাঈল কা'বা ঘর পুননির্মান করেন'।

‘পুনর্নির্মাণ কেন?’

‘আদি মানুষ হযরত আদমের তৈরি আল্লাহর কা’বা নূহের প্লাবনের সময় নষ্ট হয়ে যায়। এই নষ্ট হয়ে যাওয়া ঘরই হযরত ইব্রাহিম পুনর্নির্মাণ করেন’।

আবার ভাবল শাম ওয়াকার কিছুক্ষণ।

ঘরের অন্য সবাই নীরব। তারা তাদের সমস্ত আগ্রহ নিয়ে শুনছে দু’জনের কথোপকথন।

কিছুক্ষণ পর মখ খুলল শাম ওয়াকার। বলল, ‘পবিত্র ঐশীগ্রন্থের ঐ আয়াতে বলা হয়েছে, সামর্থ থাকলে সবাইকে ঐ ঘরে হজ্জ করতে হবে? হজ্জ কি?

‘হজ্জ একটি ইবাদত। কাবা এবং কাবা সন্নিহিত কতিপয় স্থানে কিছু আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে এটা করতে হয়’।

‘মানুষ কি যায়?’

‘প্রফেট মুহাম্মাদ (সঃ) প্রচারিত ধর্ম যারা গ্রহণ করেছেন, তারা যান’।

‘আমরাও কি তার ধর্মের অনুসারী? না হলে কাবার গেলাফ আমাদের হাতে কেন?’

‘এটা আমারও প্রশ্ন’।

‘আমাদের পূর্ব পুরুষদের কারও সাথে নিশ্চয় ইসলামের সংযোগ এবং সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছিল’। বলল সান ওয়াকার দীর্ঘ মৌনতা ভেঙে।

‘আচ্ছা একটা প্রশ্ন, ‘শাম’ ‘ওয়াকার’ এই সব শব্দগুলো কি রেড ইণ্ডিয়ান? অর্থ কি এসব শব্দের?’

‘শব্দগুলো রেড ইণ্ডিয়ান নয়। অর্থও আমাদের জানা নেই’। বলল শাম ওয়াকার।

‘এই শব্দগুলো আরবী ভাষায় আছে’।

‘আরবী ভাষায়? বলছ কি তুমি? বলত অর্থ কি?’

‘ওয়াকার অর্থ মর্যাদা, সম্মান, সহনশীলতা, ইত্যাদি। আর ‘শাম’ শব্দ আসলে শামস। শামস অর্থ সুর্য। তাহলে শামস ওয়াকার-এর মোটামুটি অর্থ দাঁড়াল মর্যাদাবান সূর্য। আর.....’।

আহমদ মুসাকে থামিয়ে শাম ওয়াকার বলল, 'আমার নাম আরবী এবং আমাদের বাড়িতে কা'বার গেলাফ্ এর অর্থ কি?' বিস্ময় বিমূঢ় কণ্ঠ শাম ওয়াকারের।

'আপনারা ভাগ্যবান আংকেল। খুঁজতে গেলে আপনাদের শিকড় নিশ্চয় আমাদের মেহমান ভাইয়ের সাথে জুড়ে যাবে। আমাদের এই সৌভাগ্য নেই, তাই আগে-ভাগেই আমরা মেহমান ভাইয়ের ধর্ম গ্রহণ করে বসে আছি'। বলল ওগলালা।

'প্রফেসরসহ তোমরা সবাই?'

'জ্বি আংকেল'।

'তাহলে তো আমরা মুসলমান আছিই'।

'কিন্তু মেরী রোজ?' টিপ্পনি কেটে বলল ওগলালা।

'বর্ণবাদের বেড়া ডিঙানোর সাথে সাথে তাহলে আমি বলব, 'আমি ধর্মের বেড়াও ডিঙিয়েছি'।

'তবে ইসলাম ধর্মের খাতিরে নয়'। একটা খোঁচা দিল ওগলালা মেরী রোজকে।

'ঠিক ওগলালা, এক্ষেত্রে আমি তোমার অনেক পেছনে'। চট করে জবাব দিল মেরী রোজ।

ওগলালা চোখ ঘুরিয়ে কি যেন বলতে যাচ্ছিল। আহমদ মুসা তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'সত্যি কথা, মুসলমান হওয়ার জন্যে আরও অনেক কিছু তোমাদের করতে হবে। মুসলিম অর্থ আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পিত মানুষ। আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মানার মাধ্যমে যে গুণ ও চরিত্র অর্জিত হয়, তা-ই মানুষকে মুসলমান বানায়, আল্লাহর মাধ্যমেই ক্ষমতার কাছে আত্মসমর্পণ করায়'।

'সে গুণগুলো কি বৎস?' বলল শাম ওয়াকার।

'ধীরে ধীরে সবই জানতে পারবেন। বলব সব। কিন্তু এখন বলুন এই 'মিরাকল'-এর তাৎপর্য কি? এই কাবার গেলাফ এবং আপনাদের অতীতটা কি?'

শাম ওয়াকার মাথা নিচু করল। বলল, 'এই প্রশ্ন আমাকেও অস্থির করে তুলেছে বেটা।'

‘আব্বা সম্ভবত কিছু সাহায্য করতে পারবেন।’ বলল ওগলালা।

‘হ্যাঁ উনি আমেরিকা এবং রেড ইণ্ডিয়ানদের ইতিহাস নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। তিনি অনেক কিছুই জানেন।’ বলল শাম ওয়াকার।

‘আমার মনে হয় আংকেলদের অতীত আবিষ্কার হলো, তার উপর একটা সেলিব্রেশন হওয়া উচিত’। বলল জিভারো, ওগলালার ভাই।

‘আমি সমর্থন করি। তবে সেটা আবিষ্কার পুরো হবার পর। কিন্তু তার আগে তুমি এবং শিলা সুসান যে পরস্পরকে আবিষ্কার করেছ তার উপর একটা সিলেব্রেশন হতে পারে। বলল ওগলালা।

জিভারো এবং শিলা সুসান দু’জনেই যেন অজান্তেই পরস্পরের দিকে তাকাল। তারা বিব্রত ও তাদের মুখ লাল হয়ে উঠেছে লজ্জায়।

জিভারো চোখ রাঙিয়ে তাকাল ওগলালার দিকে।

‘আমি ওগলালাকে সমর্থন করছি। আমি মনে করছি এটাও একটা বড় খবর।’ মেরী রোজ বলল।

‘দেখ মেরী রোজ, তুমি কথা বলো না। তুমি একেবারে কাঁচের ঘরে। তুমি যে অনেককে হারিয়ে দিয়ে ‘গোল্ড কাপ’ জয় করেছ তার সিলেব্রেশন কবে?’

মেরী রোজ এবং সান ওয়াকার দু’জনেই চকিত দৃষ্টিতে একবার শাম ওয়াকারের দিকে তাকাল। সান ওয়াকার মুখ নিচু করেছে। আর মেরী রোজ কটমট করে তাকিয়েছে শিলা সুসান-এর দিকে।

শিলা সুসান-এর কথার পর একটা নীরবতা নেমে এল। নীরবতা ভাঙল আহমদ মুসা। বলল, ‘তোমরা লাফ দিয়ে একেবারে ইতিহাস থেকে বর্তমানে চলে এসেছ। আমিও মনে করি, বর্তমানই প্রথম বিবেচ্য। তোমাদের সিলেব্রেশনের প্রস্তাব আমি সমর্থন করছি। এখানে দুই মুরুব্বী, সান ওয়াকারের আব্বা ও আম্মা, হাজির আছেন। প্রফেসর সাহেব এলে এঁদের সবার সাথে আমি এ বিষয় নিয়ে আলাপ করবো। আমাদের ধর্ম ইসলাম দুই জীবনকে জোড়ার কাজ ঝুলিয়ে না রাখার পক্ষপাতি।’

সান ওয়াকারের আব্বা এবং আম্মা মুখ টিপে হাসছিল। বলল সান ওয়াকারের মা, 'ওগলালাকে আর বাদ রাখছ কেন বেটা। তারও জোড়া তো এখানে হাজির....।'

আহমদ মুসা সান ওয়াকারের আম্মাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বলল, 'ওগলালা আমার বোন তো! ওর ব্যাপারটা আমাকে বিশেষভাবে দেখতে হবে।'

'ও তাই? সেটা তো আরও ভাল বাছা'। বলল সান ওয়াকারের মা।

আহমদ মুসা যখন কথা বলছিল, তখনই উঠে গেছে জিভারো ও শিলা সুসান। সান ওয়াকারের মা কথা শুরু করলে উঠে যায় সান ওয়াকার ও মেরী রোজ।

সান ওয়াকারের মা থামতেই ওগলালা আহমদ মুসাকে বলল, 'আপনাকে ধন্যবাদ ভাইয়া। তবে আমার ব্যাপারটা বিশেষ ভাবে দেখার দরকার নেই। সবাইকেই মেরী রোজ আর শিলা সুসান হতে হবে তা ঠিক নয়'। আবেগ ভরা গম্ভীর কণ্ঠ ওগলালার।

বলেই ওগলালা ছুটে পালাল ঘর থেকে।

সেদিকে তাকিয়ে সান ওয়াকারের মা বলল, 'খুব ভাল মেয়ে ওগলালা। ছোট বেলা থেকে দেখছি। একেবারে কাগজের মত সাদা মন।'

'ঠিক বলেছেন খালাম্মা। তবে এর জীবনের চলার পথে বেশি বেশি আহত হয়। এরা পৃথিবীকে নিজের মত দেখে কিন্তু পৃথিবী তেমন নয়। তাই ঠকে এরা পদে পদে।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল সান ওয়াকারের আম্মা। যেমন গিয়েছিল তেমনি ছুটে এসে ড্রইং-এ ঢুকল ওগলালা। ঢুকেই ঝড়ের মত বলল, 'আসুন টেবলি চা রেডি। আমি ওদেরও ডাকছি।'

বলেই ঝড়ের মত আবার বেরিয়ে গেল।

সান ওয়াকারের মা'র মুখে স্নেহের হাসি। সে উঠল।

সান ওয়াকারের আব্বা এবং আহমদ মুসাও উঠল্

# ৫

কাহোকিয়া হলিক্রস হাসপাতালের বিলাসবহুল একটা বড় কক্ষ।

কক্ষে চারটি বেড।

চারটি বেডে চিকিৎসাধীন আছে গোল্ড ওয়াটারের সেই চারজন আহত লোক।

এদের চারজনেরই ডান হাত গুলীবিদ্ধ আহমদ মুসার রিভলবারের গুলীতে।

এই চারজন গোল্ড ওয়াটারের নির্দেশেই চোখ রাখছিল সান ওয়াকারের উপর আহমদ মুসাসহ তাকে ধরার জন্যে।

সান ওয়াকারের খোঁজ গোল্ড ওয়াটার পেয়েছিল ফেডারেল রেষ্টহাউজের কর্মচারী নাভাজোর কাছ থেকে।

ওঁৎ পেতে চোখ রাখার সময় সেদিন যখন তারা দেখেছিল সান ওয়াকার শিলা সুসান ও মেরী রোজকে নিয়ে এয়ারপোর্টে যাচ্ছে। তখন তারা ভেবেছিল সান ওয়াকার কাহোকিয়া ত্যাগ করছে এবং তাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। এখন ওঁৎপেতে থাকা দু'জন মোবাইল টেলিফোনে গোল্ড ওয়াটারকে ঘটনা জানিয়েছিল। সংগে সংগেই গোল্ড ওয়াটার আরও দু'জনকে পাঠিয়েছিল এবং নির্দেশ দিয়েছিল সান ওয়াকারসহ তিনজনকেই কিডন্যাপ করার জন্যে।

গোল্ড ওয়াটার প্রেরিত দু'জন এয়ারপোর্ট রোডের ব্রীজে গাড়ি নিয়ে সান ওয়াকারদের অপেক্ষা করছিল এবং অন্য দু'জন গাড়ি নিয়ে অনুসরণ করছিল সান ওয়াকারদের ঘোড়ার গাড়ি।

কিন্তু তাদের কিডন্যাপ পরিকল্পনা বণ্ডুল হয়ে যায় হঠাৎ আহমদ মুসা এসে উদয় হওয়ায়।

ওদের চারজনের গুলীবিদ্ধ হাত সেরে উঠেছে। আজ তাদের হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার কথা।

ওদের চারজনের সকলেই শুয়ে আছে। কেউ আধ-শোয়া অবস্থায় গল্প করছে।

বলছিল একজন, 'এ কয়দিন চিন্তা করেও আমি হিসেব মেলাতে পারছি না এমন নিশানার ঐ রকম বন্দুকবাজ হঠাৎ সেদিন কোথেকে এসে উদয় হয়েছিল'।

'যাই হোক, লোকটা অসাধারণ। সেকেণ্ডের ব্যবধানও ছিল না একটা গুলী থেকে আরেকটা গুলীর মধ্যে। তার আটটা গুলীরই অব্যর্থ নিশানা'। বলল আরেকজন।

'তোমাদের প্রশংসা বেশি হয়ে যাচ্ছে। পরিকল্পিত আক্রমণে আক্রমণকারীর একটা বাড়তি সুযোগ থাকে, সেটা সেদিন আমাদের ছিল না'। বলল তৃতীয় জন।

'আজ আমরা ছাড়া পাচ্ছি, কালকেই আবার রাস্তায় নামতে হবে। বলা যায় না তার সাথে আবার দেখা হয়েও যেতে পারে। সে পুলিশের লোক নয় তো?'

'এমন ধারণার কারণ?' প্রথমজন বলল।

'সে আমাদের কাউকেই হত্যা করার জন্যে গুলী করেনি। পুলিশরাই সাধারণত এ রকম করে'। বলল চতুর্থজন।

'পুলিশ নয় তার প্রমাণ আমরা বহাল তবিয়তে হাসপাতালে আছি। পুলিশ এমনকি কোন জিজ্ঞাসাবাদও আমাদের করেনি'। বলল তৃতীয়জন।

'পুলিশ এ বিষয়টা চেপেও যেতে পারে। কারণ আমরা গোল্ড ওয়াটারের লোক। আর গোল্ড ওয়াটার ফেডারেল সরকারের মেহমান এখানে। অন্যদিকে এখানকার পুলিশ সবাই রেড ইণ্ডিয়ান।' বলল প্রথমজন।

'হতেও পারে তোমার কথা ঠিক। যদি তোমার কথা ঠিক হয়, তাহলে একটা ভয়ের ব্যাপার হলো পুলিশ প্রত্যক্ষভাবে আমাদের কিছু না করতে পারলেও পরোক্ষভাবে আমাদের উপর নানাভাবে চড়াও হতে পারে'। বলল দ্বিতীয় জন।

দ্বিতীয়জন কথা শেষ করতেই ঘরে ঢুকল নার্স। বলল, 'স্যার এসেছেন'।

তার কথা শেষ না হতেই ঘরে ঢুকর গোল্ড ওয়াটার। ঢুকেই বলল, ‘বাছারা সব ঠিক ঠাক আছে? প্রব্লেম নেই কিছু?’

চারজনই বলল, ‘সব ঠিক আছে। কোন সমস্যা নেই’।

‘তাহলে নার্স ওদের রিলিজের সব ব্যবস্থা কর। আমি তোমাদের অফিসে বলে এসেছি। আমি এখনি এদের নিয়ে যেতে চাই’। বলল গোল্ড ওয়াটার নার্সকে।

‘ওকে স্যার। আমি দেখছি। আপনি বসুন’।

বলে নার্স দ্রুত বেরিয়ে গেল।

নার্স বেরিয়ে যাওয়ার পরক্ষণেই হাসপাতালের ডিউটি অফিসার প্রবেশ করল কাহোকিয়ার ফেডারেল কমিশনার এ্যালেন ট্যালন্টকে সাথে নিয়ে।

ঘরে ঢুকেই ট্যালন্ট হ্যান্ডশেকের জন্যে হাত বাড়িয়ে গোল্ড ওয়াটারের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলল, ‘আমি খুব দুঃখিত মিঃ গোল্ড ওয়াটার। ওয়াশিংটনে গিয়ে নানা সমস্যায় জড়িয়ে পড়ায় আপনার দুঃসময়ে আপনার পাশে থাকতে পারিনি’।

‘না না, কোন অসুবিধা হয়নি। আপনার লোকেরা যথেষ্ট করেছে আমাদের জন্যে। আমি আমি কৃতজ্ঞ’।

এ্যালেন ট্যালন্ট হ্যান্ডশেক করার জন্যে এগিয়ে গেলেন এক এক করে চারজনের কাছে। তাদের কুশল জিজ্ঞেস করলেন এবং পিঠ চাপড়ে তাদের উৎসাহিত করলেন।

তারপর গোল্ড ওয়াটারের দিকে ফিরে বললেন, ‘চলুন ওদিকে নিরিবিলি বসি। কিছু কথা বলা যাবে’।

‘চলুন’। বলল গোল্ড ওয়াটার।

এ্যালেন ট্যালন্ট গোল্ড ওয়াটারকে নিয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে হাসপাতাল অফিসের মিটিং রুমে এসে বসল।

বসেই ট্যালন্ট বলল, ‘আপনার আমাদের মেহমান, আপনাদেরকে এভাবে জঘণ্য হামলার শিকার হতে হয়েছে, এজন্যে দুঃখিত’।

‘না এতে আপনার বিচলিত হবার কিছু নেই। সন্ত্রাসীরা মেহমান, অমেহমান, স্বদেশী, বিদেশী বিচার করে সন্ত্রাস করে না’। বলল গোল্ড ওয়াটার।

‘বলেন কি, বিচলিত হবো না। কাহোকিয়াতে আমার কার্যকাল চার বছর হলো। এই চার বছরে এ ধরনের ঘটনা একটিও ঘটেনি।’

‘যা ঘটেনি, তা ঘটবে না এমন কথা বলা যায় না।’

‘তা ঠিক। কিন্তু যখন এমনটা ঘটেছে, তখন তা চিহ্নিত হবার মতই বটে। আমি দেখছি ব্যাপারটা।’

‘ধন্যবাদ।’

‘শুনলাম, আপনার থানায় কোন কিছু জানাননি।’

‘বেড়াতে এসেছি। বিষয়টা নিয়ে আমরা ঝামেলা বাড়াতে চাইনি। তবে পুলিশ ইনফরমালি আমার লোকদের বক্তব্য নিয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ করেছে।’

‘আর কোন অসুবিধা নেই তো?’

‘ধন্যবাদ। আপনার লোকেরা আমাদের কোনই অসুবিধা হতে দেয়নি।’

‘বেড়ালেন কেমন?’

‘প্রচুর বেড়িয়েছি। ‘রেড ইণ্ডিয়ান ইনিষ্টিটিউট অব হিষ্টোরিক্যাল রিসার্চ’-এ এখনো যাইনি। দু’একদিনের মধ্যে যাব। ভাল লাগলে আজও যেতে পারি। শহরের বাইরে গ্রাম এলাকায়ও যাব’।

‘খুশী হলাম’।

বলে একটু থেমেই আবার বলল, ‘আমি হাসপাতালকে বলে দিয়েছি, সম্পূর্ণ সুস্থ হবার জন্যে যতদিন প্রয়োজন ওরা হাসপাতালে থাকবে’।

গোল্ড ওয়াটার হাসল। বলল, ‘আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ আপনার শুভেচ্ছার জন্যে। ওরা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছে। আজই ওদের রিলিজ নিচ্ছি।

আরও দু’দিন আগেই ওরা রিলিজ হতে পারতো, কিন্তু আপনার লোকেরা ছাড়েনি’।

‘ঠিক আছে। কোন অসুবিধা হলেই কিন্তু জানাবেন’।

বলে একটু থামল। বলল তারপর, ‘এযাজত দিন, উঠি।’

‘ঠিক আছে। আবার দেখা হবে। আপনি কষ্ট করে আসাতে খুব খুশী হয়েছি।

এ্যালেন ট্যালন্ট উঠে দাঁড়িয়েছিল। গোল্ড ওয়াটারও উঠল।

বিদায় নিয়ে এ্যালেন ট্যালন্ট কার পার্কে দাঁড়ানো তার গাড়িতে গিয়ে উঠল।

পাশেই দাঁড়ানো ছিল পুলিশ প্রধানের গাড়ি। পুলিশ প্রধান দাঁড়িয়েছিল তার গাড়ির পাশেই।

এ্যালেন ট্যালন্ট তাকে ডাকল গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে।

পুলিশ প্রধান তার কাছে এগিয়ে গেলে ট্যালন্ট বলল, ‘তুমি আমার পাশে উঠে বস। কথা আছে’।

পুলিশ প্রধান সংগে সংগে তার ড্রাইভারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে এসে ট্যালন্টের পাশে উঠে বসল।

চলতে শুরু করল গাড়ি।

‘মিঃ চিনক, ঘটনা কি বলুন তো? চারজন লোক গুলীবিদ্ধ হলো। অথচ তার কোনই কিনারা করতে পারলাম না। লজ্জার বিষয় আমাদের জন্যে’। বলল ট্যালন্ট পুলিশ প্রধান চিনকে লক্ষ্য করে।

পুলিশ প্রধান চিনক রেড ইণ্ডিয়ান। বলল সে, ‘স্যার গোটা ব্যাপারটাই আমাদের কাছে রহস্যজনক মনে হচ্ছে। প্রথমত, তারা কোন অভিযোগ দায়ের করেনি। থানায় সাধারণ একটা ইনফরমেশন দিয়েছে মাত্র। হাসপাতালে গিয়ে আহতদের বক্তব্য নিতে হয়েছে। দ্বিতীয়ত, বক্তব্য তাদের পরিষ্কার নয়। কোথায়, কিভাবে, কি অবস্থায়, কার বা কাদের দ্বারা এই ঘটনা ঘটল, তা বিস্তারিত তারা বলেনি। যা বলেছে তা দিয়ে কিছু বুঝা যায় না। পুলিশের মনে হয়েছে, ঘটনার অধিকাংশই তারা লোকোচ্ছে। তৃতীয়ত, চারজনের আহত হওয়ার ধরনটা বিস্ময়কর। প্রত্যেকের ডান হাতের প্রায় একই জায়গায় গুলীবিদ্ধ হয়েছে। এর কোন ব্যাখ্যা তারা দিতে পারেনি। পুলিশের ধারণা এই চারজন আক্রমণাত্মক কিছু করছিল। তা থেকে তাদের বিরত রাখার জন্যেই কেউ তাদের গুলী বর্ষণ করে। মনে করা হচ্ছে, এদের হাতেও রিভলবার ছিল। যারা এই চারজনকে গুলী

করেছিল তারা এদেরকে হত্যা করতে চায়নি, শুধু কোন কাজ থেকে তাদের বিরত রাখতেই চেয়েছিল। হত্যা করতে চাইলে তারা সবার একই জায়গায় ঐভাবে গুলী করতো না। পুলিশের এই ধারণ সত্য বলে প্রতীয়মান হয় চারজনের বক্তব্যের রাখ-ঢাক দেখে।'

'কিন্তু আক্রমণাত্মক কি ঘটনায় তারা জড়িত থাকতে পারে?' প্রশ্ন ট্যালন্টের।

'সেটাই আমরা উদ্ধার করতে পারিনি স্যার। যে জায়গায় ঘটনা ঘটেছে, সেটা এয়ারপোর্ট রোডের ব্রিজের পশ্চিম পাশের রাস্তা। জায়গাটা আমরা ভালভাবে পরীক্ষা করেছি। রাস্তার চার জায়গায় আমরা রক্তের দাগ পেয়েছি। এই চারটা পয়েন্টকে যুক্ত করলে একটা আয়তক্ষেত্র দাঁড়ায়। আয়তক্ষেত্রটা রাস্তার লম্বালম্বি। লম্বার পরিমাণ ২০ ফিটের মত। অর্থাৎ বিশ ফিট দূরত্বে রাস্তার দু'পাশে দু'জন করে ওরা আহত হয়েছে। চারজন দাঁড়ানোর এই অবস্থান বিশ্লেষণ করে পুলিশ ধারণা করছে, এই চার অবস্থানের মাঝখানে রাস্তার উপর কোন গাড়ি বা মানুষ কিংবা কিছু ছিল যাকে তারা চারজনে ঘিরে ফেলেছিল। তারপর তারা গুলীবিদ্ধ হয়।'

'উল্টোভাবে তারাও তো কোন ঘেরাও-এর মধ্যে পড়তে পারে।'

'তাদের অবস্থান তা প্রমাণ করে না স্যার।'

'ধন্যবাদ চিনক। পুলিশ সঠিক পথেই এগিয়েছে। এখন কি ভাবছ তোমরা? আবার কোন কেলেংকারী না ঘটে।'

'সে ব্যাপারে আমরা সতর্ক স্যার। আমরা স্থির করেছি, এঁরা যে ক'দিন কাহোকিয়া থাকেন, আমরা চোখ রাখতে চেষ্টা করব।'

'নাইস চিনক। তোমরা ঠিক চিন্তা করেছ। ধন্যবাদ।'

'আরেকটা ব্যাপার স্যার?'

'কি?'

'ব্যাপারটা তেমন ধর্তব্য নয়, তবু বলছি স্যার।'

'কি সেটা?'

'আমাদের গোয়েন্দা বিভাগের একজন কর্মী রেষ্ট হাউজে চাকুরী নিয়ে আছে। রেষ্ট হাউজে রুটিন ইনফরমেশন হিসাবে সে তথ্যে বলেছে, মিঃ গোল্ড ওয়াটার বার বার তাকিদ দিয়ে সান ওয়াকার কোথায় থাকে তা জেনে নিয়েছে।'

'তারপর?'

'এ টুকুই স্যার।'

ট্যালন্টের ভ্রু কুচকে উঠেছিল। ভাবছিল সে। বলল, 'তুমি একে ছোট খবর বলছ কেন চিনক? সান ওয়াকার কিডন্যাপড হয়েছিল। পুলিশ তাকে উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়েছে। সে যেমনভাবে পালিয়ে এসে আত্মগোপন করে আছে। শ্বেতাংগ কেউ যখন তার অবস্থানের ব্যাপারে অতি আগ্রহ প্রকাশ করে, তখন সে ব্যাপারটাকে ছোট খবর হিসাবে দেখা যাবে না। তুমি তো জান, তাকে কিডন্যাপ করেছিল চরম বর্ণবাদী হোয়াইট ঈগল।'

'ঠিক বলেছেন স্যার। এদিকটা আমি মোটেই চিন্তা করিনি। তাহলে সান ওয়াকার প্রশ্নে গোল্ড ওয়াটারের ব্যাপারে আপনি কিছু সন্দেহ করেন?'

'অবশ্যই না। আবার আস্থাও নেই। তবে সত্য কি তা জানা প্রয়োজন?'

'বুঝতে পেরেছি স্যার।'

ফেডারেল কমিশনার ট্যালন্ট পৌঁছে গেল তার অফিসে।

গাড়ি থেকে নেমে ট্যালন্ট পুলিশ প্রধান চিনককে বলল, 'তুমি এস, আরেকটু কথা আছে'।

ট্যালন্ট ও চিনক হাঁটতে শুরু করল ট্যালন্টের অফিস কক্ষের দিকে।

ওদিকে গোল্ড ওয়াটার হাসপাতাল থেকে তার চারজনকে নিয়ে পৌঁছেছে তার কক্ষে।

পৌঁছেই ডেকে নিল সে জেনারেল শ্যারণকে।

সবাই বসলে মদ পরিবেশন করল গোল্ড ওয়াটার নিজে। বলল, 'আসুন আমরা উৎযাপন করি হাসপাতাল থেকে ওদের চারজনের মুক্তির মুহূর্তকে।'

মদে শেষ চুমুকটি দিয়ে গোল্ড ওয়াটার বলল, 'এখন তাহলে আমরা কিছু প্রয়োজনীয় কথা আলোচনা করতে পারি।'

হ্যাঁ, তবে আমার একটা কথা মিঃ গোল্ড ওয়াটার। আমি কিন্তু এখানে আর সময় দিতে পারবো না।' বলল জেনারেল শ্যারণ।

'হ্যাঁ, মিঃ জেনারেল। আমিও এই কথাই বলতে চাচ্ছি। এখানে এখন এক ঘন্টা বসে থাকা আমার কাছে এক বছরের মত মনে হচ্ছে। ওরা অসুস্থ না হলে কবে এখানকার পাঠ চুকে যেত।'

'কিন্তু মিঃ গোল্ড ওয়াটার একজন লোক যদি চারজনের চারটি রিভলবারকে চোখের পলকে অকেজো করে দিতে পারে, তাহলে পাঠ চুকে কি করে।'

'ঐ রকম কিংবদন্তীর বন্দুকবাজ মাত্র আমেরিকাতেই কিছু কিছু আছে। আর এরা চারজন ওকে আগে দেখতে পায়নি।'

কথা শেষ করে একটা দম নিয়ে গোল্ড ওয়াটার বলল 'থাক অতীতের কথা। এখনকার যা কাজ দ্রুত আমাদের শেষ করা দরকার।'

'কি শেষ করবে গোল্ড ওয়াটার। আহমদ মুসার কোন খোঁজই তো এখনও পাওয়া গেল না।'

'আমি বুঝেছি, ফাঁদ না পাতলে ওকে ধরা যাবে না।'

'ফাঁদ কোথায়?

'সান ওয়াকার ও মেরী রোজ সেই ফাঁদ'।

'কেমন?'

'এই দু'জনকেই আমরা আটক করতে চাই। তাহলেই কান টানলে মাথা আসার মত আহমদ মুসা এদের উদ্ধারের জন্যে এসে উদয় হবে।'

'না মিঃ গোল্ড ওয়াটার, শুনেছি মেরী রোজ চীফ জাস্টিসের মেয়ে। তাকে আটক করার সাথে শামিল থেকে আমি ঝামেলায় পড়তে চাই না।'

'তা ঠিক নয়। সান ওয়াকারের সাথে তাকে ওয়াশিংটনে নিয়ে ছেড়ে দেব।'

'এতে বিপদ আরও বাড়বে'।

'সেটাও ঠিক। তাহল?'

‘শুধু সান ওয়াকারকে আটক করাই যথেষ্ট। তাছাড়া শিলা সুসান না কি যেন নাম ঐ মেয়েকে আটক করার কথা বলছেন না কেন। শুনেছি সেই বেশি সক্রিয়।’

‘সমস্যা হলো, সে ক্যারিবিয়ানের হোয়াইট ঈগলের নেতা জর্জ ফার্ডিন্যান্ডের মেয়ে। আমি নই, তার পিতাকে দিয়ে তাকে শায়েস্তা করতে হবে। ইতিমধ্যেই তার পিতাকে আমি জানিয়েছি।’

‘বুঝলাম; ফাঁদ হিসাবে সান ওয়াকার কি খুব ভাল হবে। তার সাথে আহমদ মুসার কি সম্পর্ক?’

‘সম্পর্ক কিছুই নেই। আহমদ মুসা সম্পর্ক বিচার করে কাজ করে না। অসহায় কেউ ভয়ানক বিপদে পড়েছে, এ টুকুই তার জড়িত হবার জন্যে যথেষ্ট। চিন্তা করবেন না জেনারেল। আহমদ মুসার জন্যে আরও ফাঁদ পাতছি। জর্জ ফার্ডিন্যান্ডের সাথে আজ সকালেই এ নিয়ে আলাপ করেছি। টার্কস দ্বীপপুঞ্জে ডাঃ মার্গারেট ও লায়লা জেনিফার তার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ্ তাদের গায়ে হাত পড়া মানে তার গায়ে হাত পড়া’।

‘ঠিক আছে, ঈশ্বর আমাদের সফল করুন।’ বলল জেনারেল শ্যারণ।

কথা শেষ করেই গোল্ড ওয়াটার তার মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে হাসপাতাল থেকে ছাড়িয়ে আনা ঐ চারজনের দিকে। বলল, ‘নিশ্চিত জানা গেছে, সান ওয়াকার ও দুই বান্ধবী সবাই কাহোকিয়াতেই আছে। এখন খুঁজে বের করতে হবে কোথায় তারা আছে। আজ থেকেই তোমরা কাজে নেমে পড়। নাভাজোর সাহায্য পাওয়া যাবে, পুলিশও সাহায্য করবে’।

‘থাকাটা বিষ্ময়কর তো! সেদিন তো চলে যাচ্ছিল।’ বলল চারজনের একজন।

‘না সবাই যাচ্ছিল না। এয়ারপোর্ট থেকে খবর নিয়ে দেখা গেছে, সেদিন যাচ্ছিল শুধু মেরী রোজ ও শিলা সুসান’।

‘কোথায় থাকবে, কোন আত্মীয়ের বাড়িতে নিশ্চয়।’

‘বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতজনদের বাসাতেও থাকতে পারে। বাসা ভাড়া নিয়েও থাকতে পারে।’

‘তা থাকতে পারে।’

‘সুতরাং খুঁজতে হবে তোমাদের। পেতেই হবে তাকে।’

‘এবার মনে হচ্ছে কঠিনই হবে। নাভাজোর কাছ থেকে কাজের কথা বের করা খুব কঠিন।’

‘কঠিন, কিন্তু সফল আমাদের হতেই হবে। সান ওয়াকারকে আমাদের চাই।’

‘তার বান্ধবী দু’জনকে?’

‘দরকার নেই।’

‘সেই লোকটিকে, যে সেদিন আমাদের পরিকল্পনা ভণ্ডুল করে দিয়েছিল?’

‘সে লোকটিকে পেলে আমরা দলে নিতাম যে কোন মূল্যের বিনিময়ে। ও রকম বন্দুকবাজের কথা আমি শুনিনি’।

‘তার মুখ তো আমরা দেখিনি, চিনব কি করে? পাব কি করে?’

‘সান ওয়াকারকে পেলে তাকেও পাবার একটা পথ হতে পারে।’

‘ঠিক বলেছেন’।

‘তাহলে তোমরা কিভাবে সামনে ওগুবে, ভাবছ কি?’ নাভাজোর সাথে আমি কথা বলেছি, সেদিনের ঘটনার পর ওরা কোথায় থাকছে সে জানে না। সান ওয়াকারের বাবা-মা ও আত্মীয়-স্বজনের কাছে জানতে বলেছিলাম। কিন্তু তার আত্মীয় স্বজনরা এখন খুব সতর্ক। তারা মুখ খোলেনি। তবে কথাচ্ছলে এতটুকু বলেছে, সান ওয়াকারকে কাহোকিয়ার বাইরে পাঠাবার চেষ্টা করে তারা ব্যর্থ হয়েছে। সান ওয়াকারের এক কথা, মরতে হলেও নিজ জন্মভুমিতেই সে মরবে।’

‘কোন কিছুই অসম্ভব নয়। ছোট্ট কাহোকিয়া চষে ফেলা কঠিন হবে না।’

‘দরকার হলে তার বাপ-মাকে কিডন্যাপ করে তাদের মুখ খোলাতে হবে। পরাজয় মেনে এখান থেকে আমরা ফিরব না।’

‘অবশ্যই স্যার।’

‘শোন, এবার শুধু পুরোনো কাহোকিয়া নয়, নতুন কাহোকিয়ার উপরও চোখ রাখতে হবে।’

‘আমরা নতুন কাহোকিয়া থেকেই কাজ শুরু করব।’

‘ওকে। যাও, এখন তোমরা বিশ্রাম নাও।’

ওরা চারজন বেরিয়ে গেল।

‘শুধু ওদের চারজনের উপর ভরসা করলেই কি চলবে মিঃ গোল্ড ওয়াটার?’ বলল জেনারেল শ্যারণ।

‘দেখা যাক।’

‘ওকে’। বলে উঠে দাঁড়াল জেনারেল।

গোল্ড ওয়াটারও উঠল কাপড় ছাড়ার জন্যে।

প্রফেসর আরাপাহোর অফিস কক্ষ থেকে বেরিয়ে করিডোর ধরে প্রফেসর ও আহমদ মুসা হাঁটছিল ইনষ্টিটিউটের ডকুমেন্ট গ্যালারির দিকে।

রেড ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব হিষ্টোরিক্যাল রিসার্চ-এর এই সুদৃশ্য ভবনটি সুন্দর ও সুপ্রশস্ত একটা টিলার উপর অবস্থিত। ভবনের চারদিকে বিস্তৃত বাগানের সারি। মাঝে মাঝে আবার প্রাকৃতিক ঝোপ-ঝাড়। নিচ থেকে পাথর বিছানো একটা রাস্তা এঁকেবেঁকে উঠে এসেছে ইনষ্টিটিউটে।

করিডোর ধরে হাঁটতে হাঁটতে আহমদ মুসা বলল, ‘ইণ্ডিয়ান অতীত ও মুসলমানদের অতীতের মধ্যে কোন যোগসূত্র আছে কিনা, থাকলে সেটা কি? এ বিষয় জানার আমার খুব আগ্রহ। ওগলালা বলেছিল, এ বিষয়ে আপনি জানেন।’

হাসল প্রফেসর আরাপাহো। বলল, ‘আমারও আগ্রহ এ বিষয়ে। এই আগ্রহ থেকেই তোমাকে ডেকে এনেছি এই ইনষ্টিটিউটে। চল দেখবে।’

ডকুমেন্ট গ্যালারিতে প্রবেশ করল প্রফেসর আরাপাহো এবং আহমদ মুসা। প্রফেসর আরাপাহো বলল, ‘অনেক সময় লাগবে ডকুমেন্ট গ্যালারী ঘুরে দেখতে। অত সময় তুমি দেবে না। সুতরাং কয়েকটা জিনিস মাত্র তোমাকে দেখাব।’

শুরুতেই একটা মানচিত্রের সামনে দাঁড়ালো প্রফেসর আরাপাহো। বলল, 'অষ্টম শতাব্দীতে তৈরি এই মানচিত্র। পাথরের উপরে আঁকা এই মানচিত্র তৈরি হয় ইণ্ডিয়ানদের রূপ কথার উপর ভিত্তি করে। মানচিত্র বলতে যা বুঝায় এটা তা নয়। আসলে এটা পথের ম্যাপ। পথের ম্যাপ আঁকতে গিয়ে দুই মহাদেশ এবং এক সাগরের অবস্থান চিহ্নিত হয়েছে এখানে। দেখ দুই মহাদেশের ঠোঁট একদম উত্তর প্রান্তে মুখোমুখি হয়েছে। দুইয়ের মাঝখান দিয়ে যে মার্কিন সাগর ওটাই বেরিং প্রণালী। বেরিং-এর দক্ষিণে বিস্তির্ণ এলাকায় ঢেউএর সিম্বল আঁকা এটাই প্রশান্ত মহাসাগর'।

একটু থামল প্রফেসর আরাপাহো।

আহমদ মুসা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল ম্যাপটি।

প্রফেসর আরাপাহোই আবার শুরু করল। বলল, 'এই ম্যাপের সবচেয়ে বড় আকর্ষণের বিষয় হলো, আমেরিকায় আদি বসতি স্থাপনকারীদের আগমন পথ। দেখ, দু'টি জনস্রোত এশিয়া থেকে আমেরিকায় প্রবেশ করেছে। ছবি এঁকে দু'টি পথই ভিন্ন ভিন্নভাবে দেখানো হয়েছে।'

থামল প্রফেসর আরাপাহো। তাকালো আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'আমেরিকামুখী এই দুই এশীয় জনস্রোত আমাদের কি জানাচ্ছে বলতে পারো?'

'আপনিই বলুন জনাব। আমার মনে হয় জনস্রোত দু'টো অনেক কথা বলছে।'

'ঠিক বলেছ আহমদ মুসা। জনস্রোতের ছবি দু'টো অনেক কথা বলছে।'

বলে একটু থেমে একটা ঢোক গিলে আবার শুরু করল। বলল, একটা জনস্রোতের মানুষগুলো দেখ প্রায় নগ্ন। এদের হাতে পাথর এবং বর্শার মত অস্ত্র। আর এদের পথ বেরিং প্রণালী দিয়ে নয়, বেরিং প্রণালী থেকে বেশ দক্ষিনে সাগরের মধ্যে দিয়ে। অথচ নৌকার কোণ সিম্বল আঁকা নেই। অর্থাৎ এশিয়ার এই মানুষগুলো শিকারের পেছনে বা শিকার ধাওয়া করে সাগর পাড়ি দেয় মহাকালের এমন এক সময়ে যখন প্রশান্ত সাগর, বিশেষ করে উত্তর প্রশান্ত মহাসাগর বরফে ঢাকা ছিল। এই জনস্রোত আমেরিকার আদি বসতি। দ্বিতীয় জনস্রোতের ছবিতে দেখ লোকগুলো সভ্য, কাপড় পরা এবং তাদের হাতে কোন অস্ত্র নেই। আর তারা

বেরিং প্রণালী দিয়ে নৌকায় সাগর পাড়ি দিয়ে আমেরিকায় প্রবেশ করে। মজার ব্যাপার একটা দেখ, দুই জনস্রোতের উৎস মঙ্গোলিয়া। তৎসন্নিহিত চীন এবং মধ্য এশিয়া। তবে আদি সনস্রোতটর উৎস চীন, জাপান কোরিয়ার উপকুলীয় অঞ্চল। কিন্তু দ্বিতীয় জনস্রোতটির উৎস এশিয়ার আরো গভীরে, মঙ্গোলিয়া ও মধ্য এশিয়া অঞ্চল থেকে।' থামল আরাপাহো একটু।

একটু ভাবল। বলল তারপর, 'আরেকটি জিনিস দেখ, প্রশান্ত মহাসাগরে ঢেউ-এর বুকে কয়েকটা নৌকা ভাসছে। পাল তোলা, দাঁড় টানা এবং এদের গতি আমেরিকার দিকে। এটা আমেরিকামুখী তৃতীয় জনস্রোত। এই তিনটি জনস্রোতের মধ্যে প্রথমটি নিঃসন্দেহে বরফ যুগের। কিন্তু পরবর্তী দু'টি জনস্রোত অনেক অনেক পরে, এশীয় সভ্যতার যুগে। যে যুগ বলতে পার ম্যাপ নির্মাণের সময় অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত। এখন শোন, শেষের এই দুই জনস্রোতের মধ্যে মুসলমানরা শামিল ছিল। তবে গভীর প্রশান্ত সাগরের পথে নৌকা বা জাহাজবাহী যে স্রোত দেখছ, এটা ছিল এককভাবে মুসলমানদের। মুস...।'

প্রফেসর আরাপাহোকে বাধা দিয়ে আহমদ মুসা বলল, 'এককভাবে মুসলমানদের ছিল একথা বলছেন কেমন করে?'

'বলছি এ কারণে যে অষ্টম শতক থেকে চতুর্দশ শতক পর্যন্ত আটলান্টিক বল, প্রশান্ত মহাসাগর বল, সব সাগরের রাজা ছিল মুসলমানরা। এমনকি পঞ্চদশ শতকে সাগরের আধিপত্য (ভূমধ্য সাগর ছাড়া) ইউরোপীয়দের হাতে চলে গেলেও মুসলিম সমুদ্র বিশেষজ্ঞ ও মুসলমান নাবিকদের সাহায্য ছাড়া ইউরোপীয় ক্যাপ্টেনরা সমুদ্রে জাহাজ ছাড়ার কথা কল্পনাই করতো না। কলম্বাসকে আমেরিকা এবং ভাস্কোডাগামাকে ভারতে নিয়ে গিয়েছিল মুসলিম নৌ-কুশলীরাই। সব তো আমি জানি না। জানার মধ্যে থেকে একজনের কথা বলছি। তিনি মুসলিম নাবিক আবহারা। উত্তর প্রশান্ত মহাসাগর থেকে অষ্ট্রেলিয়া পর্যন্ত বিশাল সাগর তাঁর কাছে ছিল পুকুরের মত। কলম্বাসের আমেরিকা আসার সাত আট শ'বছর আগে থেকে শত-সহস্র আবহারা সাগর পাড়ি দিয়ে আমেরিকা পৌঁছেছে। আবহারা ধরনের নাম আমাদের রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে অনেক পাবে।'

থামল প্রফেসর আরাপাহো। আবার মনোযোগ দিল ম্যাপের দিকে। শুরু করল, 'বলছিলাম, এই ম্যাপ সম্পর্কে। এই ম্যাপটা তৈরি হয় রেড ইণ্ডিয়ান রূপকথার ভিত্তিতে। ইতিহাস আজ এই রূপকথাকে সত্য প্রমাণ করেছে। আমার মনে হয় আহমদ মুসা রেড ইণ্ডিয়ানদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক কি- তোমার এই প্রশ্নের জবার এই ম্যাপ থেকে কিছুটা পরিষ্কার হয়।'

'আপনি যা বললেন তা যুক্তির কথা, কিছুটা ধারণার কথাও। নিশ্চিত হবার জন্যে মানুষ কি সুস্পষ্ট প্রমাণ চাইবে না? তবে রেড ইণ্ডিয়ানরা এশীয় বংশোদ্ভুত। ম্যাপের এই কথা আজ ইতিহাসও বলছে।'

হাসল প্রফেসর আরাপাহো। বলল, 'চল আরও সামনে চল।

আহমদ মুসাকে নিয়ে সামনে এগুলো প্রফেসর আরাপাহো। বলছিল 'তুমি যে প্রমাণের কথা বলছ, সে ধরনের প্রমানের সন্ধান সবেমাত্র শুরু হয়েছে। এতদিন আমেরিকা এই ধারণায় বুদ হয়ে ছিল যে, কলম্বাসই প্রথম আমেরিকার মাটিতে পা রাখে। কিন্তু রেড ইণ্ডিয়ান ইতিহাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে যে ম্যাপ দেখলাম সে ধরনের কিছু ম্যাপ ও দলিল পাওয়ার পর ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিদরা নতুন সম্ভাবনার উপর কাজ শুরু করেছেন। সর্ব প্রথম প্রফেসর হেনর ও বামহফ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের  প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে দেয়া এক রিপোর্টে বলেন, ''বিভিন্ন অঞ্চলে আরবীয় ঐতিহ্যমণ্ডিত ইসলামের কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। তাঁরা এসব নিদর্শনের একটা তালিকাও পেশ করেন। তাঁদের অনুসন্ধানের পথ ধরে আরও অনুসন্ধান কাজ এগিয়ে চলে। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত বিভাগের অধ্যাপক মিঃ বেরীফিল এমন কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হাজির করেন যা প্রমাণ করে কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কারের সাত আটশ বছর আগে মুসলমানরা আমেরিকায় ছিলেন। অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ প্রথমে এ বক্তব্যকে আমল দেননি। অনেকে তাকে বিদ্রুপ করে লিখেছেনও। কিন্তু ১৯৭৮ সালে কেসলিটন বীর মাউন্ট কলেজে প্রত্নতত্ত্ববিদদের সমাবেশে তিনি তার উপস্থাপিত তত্ত্বের পক্ষে তথ্য প্রমাণ হাজির করলে একটা নতুন বিষ্ময় হিসেবে সবাই একে গ্রহণ করেন।'

'সে তথ্য প্রমাণগুলো কি?' আহমদ মুসা জিজ্ঞেস করল।

‘হ্যাঁ, সে তথ্য প্রমাণের দু’একটা তোমাকে দেখাব বলেই বলেছি।’

তারা মেঝেতে চারটা পিলারের উপর রাখা কাচমোড়া একটা সেলফের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আরও কয়েকটা সেলফ পর পর।

সেলফটির মধ্যে একটা বড় পাথর। তাতে খোদাই করে লেখা।

লেখাগুলো আরবী।

পড়ল আহমদ মুসা, ‘আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ’।

প্রফেসর আরাপাহো বলল, ‘এই শিলালিপি অরজিন্যাল নয়, অরজিন্যালের ডামি। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্নতত্ত্ব গ্যালারির মূল শিলালিপি থেকে এটা নকল করে আনা হয়েছে।’

‘শিলালিপির বয়স?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘ভাল করে দেখ শিলালিপিতেই লেখা আছে।’

ভাল করে দেখতে গিয়ে লিপির নিচে তারিখ লেখা দেখতে পেল। পড়ল ‘পহেলা রমজান, ছিয়ানব্বই হিজরী।’

বিস্ময় বিমুগ্ধ আহমদ মুসার চোখ যেন আঠার মত লেগে গেল শিলালিপির গায়ে। শিলালিপিটি তার চোখকে টেনে নিয়ে গেল শত শত বছর আগের দিনে। এই মাত্র প্রফেসরের কাছে শোনা মুসলিম আবহারাদের যেন চোখে দেখতে পাচ্ছে সে। দেখতে পাচ্ছে ইসলামের পতাকা হাতে তাদের আমেরিকার বনজ, পাথুরে এবং মরুময় পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতে। ইসলামের কোন সে গতি, কোন সে সয়লাব তাদের ঠেলে নিয়ে এসেছিল এতদূরে।

চোখের দু’কোণ ভিজে উঠেছিল আহমদ মুসার।

‘পড়তে পেরেছ তারিখ?’ জিজ্ঞেস করল প্রফেসর আরাপাহো।

সম্বিত ফিরে পেল আহমদ মুসা।

পকেট থেকে রুমাল নিয়ে চোখের কোণ দু’টি মুছে আহমদ মুসা বলল, ‘পড়েছি জনাব।’

একটু থামল। তারপর বলল ‘ইংরেজী সালের হিসাবে এই শিলালিপি লিখিত হয়েয়ে ৭২৯ সালে। আর হিজরী সাল হিসাবে ৯৬ সালে। কার্বন টেষ্ট কিংবা এ ধরনের বৈজ্ঞানিক টেষ্ট শিলালিপির কাল সম্পর্কে কি বলে?’

'কয়েক ধরনের পরীক্ষা হয়েছে। সব পরীক্ষাতেই প্রমাণ হয়েছে, লেখা তারিখ সত্য'।

'আলহামদুলিল্লাহ'। বলল আহমদ মুসা অমূল্য দলিলটি ভূয়া না হওয়ার আনন্দে।

'চল, সামনে আগাও।'

ঘরের কাঁচ ঢাকা সেলফের সামনে এসে হাজির হলো তারা।

এখানেও আরেক শিলালিপি। চোখ ছুটে গেল আহমদ মুসার। শিলালিপি পড়ল সে, 'লা-ইলাহা ইল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু।'

এই শিলালিপির তারিখ কিছুটা পরের, পহেলা মহররম, ১০৮ হিজরী।

আহমদ মুসা কিছু বলার আগেই প্রফেসর আরাপাহো বলল, 'এই শিলালিপিটি ওটার চেয়ে ১২ বছর পরের। এই শিলালিপিটি পাওয়া যায় ক্যালিফোর্নিয়ার সাউথটংক এলাকায় আর ওটা নেবদা এলাকায়।'

বলে চোখ ফিরিয়ে আহমদ মুসার দিকে তাকাল। বলল, 'বুঝেছ কি লেখা ওখানে?'

'বুঝেছি প্রথমটায় লেখা 'আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ'। আর দ্বিতীয়টায় লেখা, 'আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি এক ও শরীক বিহীন।' আর মজার ব্যাপার হলো, এই দুটি মিলে যা দাঁড়াল সেটা ইসলামের মূল মন্ত্র। যা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কালে প্রথমেই পড়তে হয়।'

'বাঃ ওয়াণ্ডারফুল। তাহলে ওগুলো নিশ্চয় কোন ডেকোরেশনের বিষয় ছিল না, ছিল আসলে আগত মুসলমানদের মিশনারী উপকরণ।'

'আমিও তাই মনে করছি জনাব।'

আহমদ মুসা থামলেও প্রফেসর তৎক্ষণাত কোন কথা বলল না। ভাবছিল সে। কুঞ্চিত তার ভ্রু দু'টি। জিজ্ঞেস করল একটু সময় নিয়ে, 'তাহলে বুঝা যাচ্ছে, এ ধরনের প্রচার উপকরণ ব্যাপকভাবে ছড়ানো হয়েছিল। সেজন্যেই দুই স্থানের দুই শিলালিপি মিলে এক বিষয় হওয়ার সুযোগ হয়েছে।

'তাই হবে।'

‘হবে মানে? এটাই হয়েছে। আর শোন এটা শুধু লস এঞ্জেলেস এলাকায় নয়, গোটা আমেরিকায়। মিনেসেটো, ডাকোটা, উইসকিনসিন বিশ্ববিদ্যালয়েও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে দেখিয়েছেন, কলম্বাসের অনেক, অনেক আগে মুসলমানরা আমেরিকায় আগমন করে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে কলম্বাসকে আমেরিকার আবিষ্কারক হিসাবে না দেখাবার সিদ্ধান্ত হয়েছে। বল আরও প্রমাণ তোমার চাই? বল?’

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল এমন সময় কার পার্কের দিক থেকে একাধিক নারী কণ্ঠের ‘বাঁচাও’ ‘বাঁচাও’ চিৎকার ভেসে এল।

আহমদ মুসা মুহূর্তের জন্যে উৎকর্ণ হয়ে শুনেই বলল, ‘মেরী রোজ, ওগলালাদের গলা মনে হচ্ছে। আসুন জনাব।’

বলেই আহমদ মুসা ছুটল ঘর থেকে বেরুবার জন্যে। ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটল আহমদ মুসা কার পার্কের দিকে। তার পেছনে পেছনে প্রফেসর আরাপাহো।

দূর থেকেই আহমদ মুসা দেখতে পেল, মেরী রোজ, ওগলালা, শিলা সুসান পাগলের মত চিৎকার করছে। তাদের পাশেই বিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে জিভারো।

আহমদ মুসা তাদের সামনে যেতেই ওগলালা কান্না জড়িত কণ্ঠে বলে উঠল, ‘সর্বনাশ হয়ে গেছে ভাইয়া, সান ওয়াকারকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে।’

চমকে উঠল আহমদ মুসা। বলল, ‘কারা?’

‘মনে হয় সেই চারজন। আমরা গাড়ি থেকে নেমে ঢুকতে যাচ্ছিলাম ইনষ্টিটিউটে। চারজন শ্বেতাংগ বেরিয়ে আসছিল ইনষ্টিটিউট থেকে। সান ওয়াকারকে দেখেই ওরা তার উপর ঝাপিয়ে পড়ল এবং চোখের পলকে ওরা চারজন সান ওয়াকারকে চ্যাং দোলা করে নিয়ে গাড়িতে তুলে পালিয়েছে’। ওগলালা বলল।

‘গাড়ির কি রং? নাম্বার কত?’

‘দুটোই নীল গাড়ি। গাড়ির নাম্বার খেয়াল করিনি’।

‘দুটোই গাড়ি ছিল?’ দ্রুত কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

‘হ্যাঁ’।

‘নীল রং ছাড়া গাড়ির বিশেষ কোন চিহ্ন?’

‘দুই গাড়িরই পেছনের উইন্ড স্ক্রীনে কার্ডিনাল বার্ডের ছবি আঁকা আছে’। চোখ মুছতে মুছতে বলল দ্রুত কণ্ঠে মেরী রোজ।

আহমদ মুসা চারদিকে একবার চেয়ে ছুটে গেল ওগলালাদের গাড়ির দিকে।

গাড়িতে উঠে গাড়িতে ষ্টার্ট দিতে দিতে জানালা দিয়ে প্রফেসর আরাপাহোর দিকে চেয়ে বলল, ‘আপনারা চিন্তা করবেন না জনাব। আমি দেখছি।’

আহমদ মুসার গাড়ি বেরিয়ে এল ইনষ্টিটিউট থেকে।

ইনষ্টিটিউট থেকে একটি মাত্র রাস্তা টিলার গা বেয়ে এঁকে বেঁকে নেমে গেছে নিচে।

ইনষ্টিটিউট এলাকাটা জনবিরল।

ইনষ্টিটিউটের টিলা থেকে একটা প্রশস্ত রাস্তা বেরিয়ে চলেছে কাহোকিয়ার নতুন অংশের দিকে। রাস্তাটির দু’পাশে মাঝে মাঝে দু’একটি বাড়ি ও অফিস দেখা যাচ্ছে।

আহমদ মুসা ভাবল,টিলার আঁকা-বাঁকা রাস্তা দিয়ে তারা নিশ্চয় খুব দ্রুত এগিয়ে যেতে পারেনি।টিলা থেকে নামার পরও তাদের কিছুটা পথ সরল সোজা একটা মাত্র রাস্তা ধরে এগুতে হবে।সুতরাং আহমদ মুসা নিশ্চিত যে গাড়ি দু’টির সাক্ষাত পাওয়া যাবে।

আহমদ মুসা ঝড়ের গতিতে গাড়ী চালিয়ে টিলার গোড়ায় এসে দূরে সোজা রাস্তাটি ধরে দুটি নীল গাড়িকে ছুটে যেতে দেখল।

সামনেই দুই নীল গাড়ি এবং আহমদ মুসার গাড়ি প্রানপণ ছুটে চলছে হরিণ ও নেকড়ের জীবন- মৃত্যুর লড়াইয়ের মত।

নীল গাড়ি দু’টির সাথে দুরত্ব কমে আসতেই আহমদ মুসা রিভলবার বের করল। ভাবল, ওদের গাড়ি থামাতে হলে টায়ার ফাটানো ছাড়া পথ নেই। সামনের দুই গাড়ির পেছনের গাড়িতে সান ওয়াকার না থাকলে এ গাড়ির সাথে লড়াইয়ে জড়িয়ে পরার ফাঁকে সামনের গাড়িটা পালিয়ে যাবে সান ওয়াকারকে নিয়ে।

এসব চিন্তায় আহমদ মুসা স্বীদ্ধান্ত নিয়ে সারেনি, এমন সময় সামনের দুটি গাড়ি পেছনেরটি থেকে প্রথমে দুটি, পরক্ষনেই আরও দুটি এভাবে অব্যাহত গুলী এগিয়ে আসতে লাগল।

প্রথম গুলীটি এসে আঘাত করেছিল আহমদ মুসার গাড়ির সামনের উইন্ড শিল্ডে। উইন্ড শিল্ড গুড়ো হয়ে গেল। একটা গুলী এসে আহমদ মুসার গাড়ির টায়ারে লাগল। হুমড়ি খেয়ে গাড়ি থেমে গেল আহমদ মুসার। আহমদ মুসা শংকিত হল, ওরা এই সুযোগে নিশ্চয় পালিয়ে যাবে।

আহমদ মুসা হতাশ ভাবেই তাকাল সামনের গাড়ির দিকে। কিন্তু বিস্ময়ের সাথে দেখল, সামনের দুই গাড়ির পেছনের গাড়িটা থেমে গেছে। আরও দেখল, পেছনের গাড়িকে দাড়াতে দেখে সামনের দ্বিতীয় নীল গাড়িটাও থেমে গেছে। তার মানে ওরা লড়াইয়ে নামতে চায়, ভাবল আহমদ মুসা। তারা যে সান ওয়াকারকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার স্বিদ্ধান্ত নেয়নি সেজন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল।

টায়ার ফেটে যাওয়ায় আহমদ মুসার গাড়িটা ডান দিকে একটা টার্ন নিয়ে থেমে গিয়েছিল। তার ফলে সামনের রাস্তাটা আহমদ মুসার ড্রাইভিং সীটের জানালার মুখোমুখি এসে গিয়েছিল।

আহমদ মুসা ড্রাইভিং সিটের ওপর মরার মত গা এলিয়ে বসেছিল এবং অস্পষ্ট ভাবে তাকিয়ে ছিল রাস্তার উপর। তার হাতে রিভলবার এবং হাতের তর্জনীটা ট্রিগারে।

দুই গাড়ি থেকে ওঁরা চারজনই নেমে এসেছে।

সামনের গাড়ির দু'জন ছুটে এসেছে পেছনের গাড়ির দু'জনের কাছে।

বলল তাদের একজন, কি ব্যাপার দাঁড়ালে কেন তোমরা?

'শালাকে একটু দেখতে চাই। কে আমাদের পিছু নিয়েছিল।'

'অক্কা পেয়েছে,নাকি বেঁচে আছে?'

'চলো দেখি।'

'না আমি দেরি করতে পারছিনা।স্যার অপেক্ষা করছেন।সান ওয়াকারকে আটকে রেখে তারপর ওখানে যেতে হবে। তুমি সোজা স্যারের

ওখানে চলে যেও।' নিজের গাড়ির দিকে ছুটতে ছুটতেই কথাগুলো বলছিল লোকটি।

কথাগুলো আহমদ মুসাও শুনতে পেল। শুনে উদ্বিগ্ন হলো সে। তাঁর কাছে এখন অবস্থা এই দাঁড়ালো, ওই দুজন সান ওয়াকারকে নিয়ে চলে যাবে, আর পেছনের দু'জনের সাথে তাঁকে এখন লড়তে হবে। অথচ এই অবস্থা এড়ানোর জন্যই আহমদ মুসা গুলি করে টায়ার ফাটিয়ে এ গাড়িকে থামাবার চেষ্টা করেনি। দুই গাড়িকে এক সাথে ধরতে চেয়েছে।

এই ভাবনার সাথে সাথে আহমদ মুসা স্বিদ্ধান্ত নিল সান ওয়াকারকে নিয়ে ওদের পালাতে দেয়া যাবেনা। আহমদ মুসা সোজা হয়ে বসল। রিভলবার ধরা ডান হাত নিয়ে এল জানালায়।

ওরা দুজন যখন তাঁদের গাড়ির দিকে ছুটছিল, এ দুজনও তখন আহমদ মুসার গাড়ির দিকে ছুটা আরম্ভ করে।

মাঝ পথে এসে আহমদ মুসাকে রিভলবার বাগিয়ে উঠে বসতে দেখে ভুত দেখার মত আঁতকে উঠল এবং আত্মরক্ষার জন্য দু'জন দু'দিকে ছিটকে পড়ল।

নিজেদের সামলে নিয়ে ওরা অতি দ্রুত ছিটকে পরবে আহমদ মুসা ভাবতে পারেনি। ফলে তার দুটি গুলী লক্ষ্য ভ্রষ্ট হলো।

লক্ষ্য সংশোধন করে আহমদ মুসা তৃতীয় গুলী ছুড়ল। ডান দিকে ছিটকে পরা লোকটিকে লক্ষ্য করে। এ গুলীটি একজনের মাথা গুড়িয়ে দিল। কিন্তু আহমদ মুসার চতুর্থ গুলী বাম দিকে ছিটকে পরা লোকটিকে আঘাত করার আগেই তার রিভলবার গুলী বর্ষণ করল। গুলীটি আহমদ মুসার বাম বাহুর কাঁধ সন্নিহিত অংশের কিছুটা ছিড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু এই বুলেট আহমদ মুসাকে আঘাত করার আগেই আহমদ মুসাও ট্রিগার টিপেছিল। গুলীটি আঘাত করল দ্বিতীয় লোকটির একেবারে মাথায়।

গুলী খেয়ে আহমদ মুসার কেঁপে উঠেছিল দারুণভাবে। কুঁকড়ে গিয়েছিল তার দেহটি তার অজান্তেই। কিন্তু আহমদ মুসা মাথা ঝাঁকিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো গাড়ি থেকে। তারপর ওদের রিভলবার দুটি

কুড়িয়ে পকেটে পুরে ডান হাত দিয়ে আহত বাম বাহুর সন্ধিস্থলটা চেপে ধরে ছুটল ওদের গাড়ির দিকে।

গাড়িতে উঠে গাড়ির সিটে পরে থাকা তোয়ালে বাম কাঁধের ওপর দিয়ে আহত স্থানটা জানালায় চেপে ধরে গাড়িতে স্টার্ট দিল আহমদ মুসা। সামনের গাড়িটা এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল, এইমাত্র একটা বাঁকে একটা বাড়ির আড়ালে তা ঢাকা পড়ল।

যততুকু স্পীড বাড়ানো যায়, ততটুকুও ব্যবহার করল আহমদ মুসা। বাঁক ঘুরার পর আবার সামনের গাড়িটা নজরে পড়ল আহমদ মুসার। আহমদ মুসা তার গাড়ির যতটা স্পীড বাড়িয়েছে, সামনের গাড়িটা ততটা স্পীড বাড়ায়নি।

আহমদ মুসার গাড়ি সামনের গাড়িটার নজরে পড়েছে, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তবু গাড়িটার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া নেই কেন?

পরক্ষনেই নিজের বোকামিতে নিজেই হেসে উঠল আহমদ মুসা। এ গাড়িকে ওরা সন্দেহ করবে কেন? ওরা তো জানে আমি মরে গেছি। আর এটা ওদেরই গাড়ি এবং ওদের লোকই এ গাড়িতে।

আহমদ মুসা তার গাড়ির স্পীড আর বাড়াল না। ভাবতে লাগল, এখন তার করনীয় কি? সে ওদের একজনকে বলতে শুনেছে, সান ওয়াকারকে কোথাও বন্দী করে ওরা স্যারের সাথে দেখা করতে যাবে। সে কি ওদের অনুসরন করে ওদের আস্তানায় যাবে? ওদের স্যার কে তা কি সে দেখবে? না সামনের গাড়ির অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে ওদের ওপর চড়াও হয়ে সান ওয়াকারকে মুক্ত করে আনবে? দুই ক্ষেত্রেই ঝুকি আছে।

রাস্তায় এভাবে খুনাখুনি যেমন নিরাপদ নয়,তেমনি ওদের আস্তানা কি, কেমন তার কিছুই সে জানেনা।

সামনেই আরেকটি বাঁক। বাঁক নিয়ে রাস্তাটি সেখানে একটি বাগানে প্রবেশ করেছে। বাঁক নিয়ে সামনের গাড়িটা আবার চোখের আড়ালে চলে গেল।

আহমদ মুসা আবার দ্রুত করল গাড়ির গতি। আহমদ মুসা বাঁকে পৌঁছে দেখল, একটু সামনে রাস্তার ডান পাশে একটা গাছের ছায়ায় দাড়িয়ে সামনের

সেই নীল গাড়িটা। আহমদ মুসা বুঝল,ওঁরা গাড়ি থামিয়ে ওদের সাথীদের অপেক্ষা করছে।

বাঁক থেকে প্রায় সিকি মাইল পরিমান জায়গা নিয়ে রাস্তার দু'পাশে 'হোয়াইট ওক' এর বাগান। অভ্যন্তরটা ঝোপ-ঝাড়ে একদম সড়কের প্রান্ত থেকেই।

আহমদ মুসা আকস্মিক এই নতুন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে মুহূর্তের জন্য দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু দাঁড়াবার উপায় ছিল না। দাঁড়াবার অর্থ ধরা পড়ে যাওয়া। এখন প্রস্তুত শত্রুর বিরুদ্ধে তাকে লড়তে হবে। তার চেয়ে ধোঁকায় পড়া শত্রুর অপ্রস্তুত অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাদের উপর আকস্মিকভাবে চড়াও হওয়া অনেক বেশি উত্তম।

আহমদ মুসা তার গাড়ির গতি না কমিয়ে এগিয়ে চলল সামনের গাড়িটার দিকে।

আহমদ মুসার গাড়ি সামনের দাড়িয়ে থাকা গাড়ি বরাবর রাস্তার উপর দাড়াতেই গাড়িটার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল আহমদ মুসা। গাড়িতে হাত,পা,মুখ বাঁধা অবস্থায় সান ওয়াকার বসে আছে, আর কেউ নেই। সঙ্গে সঙ্গেই আহমদ মুসা বুঝতে পারলো যে সে ওদের ফাঁদে পড়ে গেছে।

পাশ থেকে রিভলবার হাতে তুলে নিল আহমদ মুসা। দু'পাশে তাকাতে গিয়ে দেখল তার গাড়ির দু'পাশে দু'জন এসে দাঁড়িয়েছে। তাঁদের হাতের উদ্যত রিভলবার তাকে তাক করা।

তার জানালার পাশের জন হো হো করে হেসে উঠল। বলল, তুমি সত্যিই প্রথমে আমাদের বোকা বানিয়েছিলে। গাড়ি দেখে আমারা ভেবেছিলাম আমাদের সাথীরাই আসছে। কিন্তু তুমি আমাদের দুই সাথীকে হত্যা করে আমাদেরই গাড়ি নিয়ে আমাদের ধাওয়া করছ তা বুঝিনি। মোবাইলে যোগাযোগ করতে গিয়ে দেখলাম আমাদের সাথীর টেলিফোন নীরব। বুঝলাম আমাদের সাথীরা নেই। গাড়ি নিয়ে আসছে তাহলে আমাদের কোন শত্রু। সে শত্রুকে দেখার জন্যই আমরা এখানে দাঁড়িয়েছি।

বলে একটু থেমে আবার বলল, ‘তোমার রিভলবারটা আমাকে দিয়ে দাও’। ক্রুদ্ধ কণ্ঠ তার। চোখে তার খুনের নেশা চকচক করছে।

আহমদ মুসা তাকাল একবার তার দিকে। আরেকবার ডান পাশের রিভলবারধারীর দিকে। তারপর রিভলবারটা তুলে দিল নির্দেশকারীর হাতে।

‘গাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে এস। তোমার রক্তে আমাদের গাড়ি নষ্ট করতে চাই না, ইতিমধ্যে কিছুটা নষ্ট করেছ। রাস্তার চেয়ে জঙ্গলে তোমার লাশ পড়লে পশু-পাখিদের কিছুটা সুবিধে হবে’। দ্বিতীয় নির্দেশ ধ্বনিত হলো সেই প্রথম লোকটির কণ্ঠে।

আহত বাম হাত দিয়ে দরজা খুলতে গিয়ে ব্যাথায় অজান্তেই ‘আঃ’ বলে উঠল আহমদ মুসা।

‘নেমে এস আহতের ব্যাথা আর বেশিক্ষন থাকবে না’। বিদ্রুপ ঝরে পড়লো লোকটির কণ্ঠে।

আহমদ মুসা খুলে ফেলল গাড়ির দরজা। লোকটি দাঁড়িয়েছিল দরজা সোজা মাত্র দু’গজের মত দুরে। আহমদ মুসা ডান হাত দিয়ে বাম বাহুর আহত জায়গাটা চেপে ধরে বসে থেকেই দু’পা ঘুরিয়ে দরজার দিকে এল। দু’পা নামাল মাটি স্পর্শ করার ভঙ্গিতে। একবার তাকাল লোকটির দিকে।তার রিভলবার ধরা হাত কিছুটা নেমে গেছে।

আহমদ মুসা চোখ সরিয়ে নিয়েই তার দু’হাত বিদ্যুতবেগে মাটির দিকে ছুড়ে দিয়ে দেহটা উল্টিয়ে নিয়ে দু’পায়ের জোড়া লাথি চালাল সামনের লোকটির বুকে। লোকটি ছিটকে পড়ে গেল। তার হাতের রিভলবার ছিটকে পড়ে গেল হাত থেকে।

আহমদ মুসা মাটিতে পড়ে থাকা অবস্থাতেই পাশে দেখতে পেল রিভলবার। রিভলবার কুড়িয়ে নিল আহমদ মুসা।

লোকটি পড়ে গিয়েই তড়িঘড়ি করে উঠে দাঁড়াচ্ছিল।

আহমদ মুসা শুয়ে থেকেই তাকে গুলী করল।

সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াবার আগেই লোকটি গুলী খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

গাড়ির ডান পাশের রিভলবারধারী লোকটি ঘটনার আকস্মিকতা কাটিয়ে উঠার পর গাড়ির ওপাশ থেকে রিভলবার তাক করতে গিয়ে শুয়ে থাকা আহমদ মুসাকে নাগালের মধ্যে পেল না। সে ছুটল গাড়ির পাশ ঘুরে এদিকে আসার জন্য।

ওদিকে আহমদ মুসা গুলী করেই দ্রুত গতিতে গাড়ির পাশে এসে উঠে বসেছে।

সে উঠে বসেই গাড়ির খোলা দরজা পথে উইন্ডশিল্ডের কাঁচের মধ্য দিয়ে দেখতে পেল, ডান পাশের লোকটি দৌড়াচ্ছে গাড়ি ঘুরে এদিকে আসার জন্য।

আহমদ মুসা গুলী করল। কিন্তু গুলীটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। গুলীটা পেছন দিক দিয়ে চলে গেল।

গুলির শব্দে লোকটি সঙ্গে সঙ্গেই বসে পড়েছে।

লোকটির কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। আহমদ মুসা বসা অবস্থায় গুটি গুটি এগুল গাড়ির সামনের দিকে গাড়ির গা ঘেঁষে।

আহমদ মুসা যখন গাড়ির সামনের প্রান্তে পৌঁছে গেছে, তখন রাস্তার পাশে দাঁড়ানো ওদের গাড়ির স্টার্ট নেয়ার শব্দ পেল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা চমকে উঠে দাঁড়াল। পালাচ্ছে লোকটি সান ওয়াকারকে নিয়ে।

গাড়ি তখন ছুটতে শুরু করেছে, আহমদ মুসা ছুটন্ত গাড়ি লক্ষে গুলী করল পর পর দু'বার। একটি গুলী ব্যর্থ হলো। দ্বিতীয় গুলী গিয়ে আঘাত করল গাড়িটার পেছনের টায়ার।টায়ার ফাটা গাড়িটা এঁকে বেঁকে কিছুটা এগিয়ে নেমে গেল। আহমদ মুসা ছুটল গাড়ির দিকে। কিন্তু গাড়ির কাছাকাছি হয়ে দেখল লোকটি তার গাড়ির ডান পাশের দরজা দিয়ে বের হয়ে ছুটছে জঙ্গলের দিকে। আহমদ মুসা যখন গাড়ির পাশে এসে দাঁড়াল, তখন লোকটি জঙ্গলে ঢুকে গেছে।

আহমদ মুসা সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে তাকাল সান ওয়াকারের দিকে। তাড়াতাড়ি গাড়ির দরজা খুলে মুখ ও হাত-পায়ের বাধন খুলে দিল তাঁর।

সে মুক্ত হয়েই দু'হাত দিয়ে চেপে ধরল আহমদ মুসার আহত বাহু-সন্ধিস্থল। আহত জায়গা দিয়ে তখনও রক্ত বেরুচ্ছে। বলল সান ওয়াকার, 'আহমদ মুসা ভাই আপনি ভীষণ আহত।' আর্ত কণ্ঠ সান ওয়াকারের।

'সান ওয়াকার তাড়াতাড়ি চলো।'

বলে আহমদ মুসা গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো। সান ওয়াকারও।

আহমদ মুসা ও সান ওয়াকার ওদের পরিত্যক্ত নীল গাড়িতে এসে উঠল।

আহমদ মুসা ড্রাইভিং সিটের পাশের সিটে বসে বলল, 'তুমি গাড়ি চালাও সান ওয়াকার।'

সান ওয়াকার ড্রাইভিং সিটে বসে বলল, 'আপনার আহত জায়গার রক্ত বন্ধ করার জন্য প্রথমেই কিছু করা দরকার আহমদ মুসা ভাই'।

সিটের পাশ থেকে তোয়ালে তুলে নিয়ে আহত জায়গায় চেপে ধরে বলল, 'এ নিয়ে তুমি ভেবনা। তাড়াতাড়ি তুমি ইন্সটিটিউটে চলো। ওঁরা দারুন কান্নাকাটি করছে'।

সান ওয়াকার হাসল। কান্নার মত হাসি। বলল, 'আপনি ওদের কান্নার কথা ভাবছেন। নিজের কথা একটুও ভাববেন না যে, আপনি গুলিবিদ্ধ, অবিরাম রক্ত ঝরছে আহত স্থান থেকে'।

বলে সান ওয়াকার গাড়ি স্টার্ট দিল।

তিরবেগে গাড়ি ছুটে চলল ইন্সটিটেউটের উল্টো দিকে।

'কোথায় চললে সান ওয়াকার?' বলল আহমদ মুসা।

'আমাদের নিজস্ব একটা ক্লিনিকে,কাহোকিয়ার পুরানো অংশে। কাছেই'।

'তাহলে তুমি ভালো আছো এটা ওদের জানাতে পারলে ভালো হতো।'

'আমি কেমন আছি সেটা জানাবার জন্যে ব্যাস্ত হয়ে পড়লেন, আপনি কেমন আছেন তা কাউকে জানাবার বুঝি প্রয়োজন নেই?'

'তুমি ভিন্ন দিকে নিয়ে যাচ্ছ। আমি একথা বলছি কারন, 'ওঁরা ভীষণ উদ্বেগ-উৎকন্ঠার মধ্যে আছে।'

'ঠিক আছে তোমার সাথে একমত হলাম'। হেসে বলল আহমদ মুসা।

'ধন্যবাদ ভাইয়া।'

আহমদ মুসা কি যেন ভাবছিল। কোন কথা বলল না। ছুটে চলছে তখন গাড়ি।

ওগলালা কিভাবে সান ওয়াকার কিডন্যাপড হলো বিস্তারিত বিবরন দিয়ে থামল।

ওগলালার পাশে বসে ছিল তাঁর আব্বা প্রফেসর আরাপাহো এবং তাঁর অন্য পাশে বসেছিল মেরী রোজ ও শিলা সুসান। তাঁদের সামনে বসেছিল পুলিশ প্রধান চিনক এবং ফেডারেল কমিশনার মিঃ ট্যালন্ট।

আহমদ মুসা সান ওয়াকারের সন্ধানে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাবার পর পরই প্রফেসর আরাপাহো টেলিফোনে বিষয়টা পুলিশ প্রধান মিঃ চিনক ও ফেডারেল কমিশনার মিঃ ট্যালন্টকে জানান। প্রফেসর আরাপাহো একজন শীর্ষ রেড ইন্ডিয়ান তো বটেই গোটা দেশেও একজন সন্মানিত ব্যক্তি।তাঁর টেলিফোন উপর মহলে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাছাড়া সান ওয়াকার মুক্ত হবার পর আবার এভাবে কিডন্যাপড হবে, পুলিশ কোনই দায়িত্ব পালন করবে না, এটা সরকারের জন্য অস্বস্থিকর। তাই প্রফেসর আরাপাহোর টেলিফোন পাবার পর পরই ফেডারেল কমিশনার ও পুলিশ প্রধান পুলিশ বাহিনী নিয়ে ছুটে আসে প্রফেসর আরাপাহোর অফিসে।

তারা প্রথমে প্রফেসর আরাপাহোর প্রাথমিক একটা বক্তব্য নেয়ার পর ঘটনাস্থলে উপস্থিতিদের মধ্য থেকে ওগলালার জবানবন্দী গ্রহন করছিল।

ওগলালার জবানবন্দী শেষ হবার সংগে সংগেই পুলিশ প্রধান চিনক বলল, ‘গাড়ির রঙ কি ছিল?’

‘নীল’। বলল ওগলালা।

‘দুই গাড়িরই?’

‘জ্বি’।

‘মানুষ চার জনই শ্বেতাঙ্গ?’

‘আপনাদের বন্ধু যে গাড়ি নিয়ে সান ওয়াকারের সন্ধানে গিয়েছিলেন, সে গাড়ির রঙ কি ছিল?’

‘সাদা’।

‘সাদা?’

প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করেই পুলিশ প্রধান চিনক তাকাল ফেডারেল কমিশনার ট্যালন্টের দিকে।

বলল, ‘স্যার এদের আমরা স্পটে নিয়ে যেতে পারি। বিষয়টা তাহলে আমাদের কাছে আরও পরিষ্কার হবে’।

‘ঠিক বলেছ চিনক’। বলল ট্যালন্ট।

‘কোন স্পটে? কোথায়?’ বলল প্রফেসর আরাপাহো।

পুলিশ প্রধান বলল, ‘স্যার আমরা আসার সময় দুটি স্থানে টায়ার ফাটা ও উইন্ডশিল্ড ভাঙ্গা দু’টি গাড়ি রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে এসেছি। একটি গাড়ির সামনে দেখে এসেছি দুটি লাশ, আরেকটির পাশে একটি’।

পুলিশ প্রধানের কথা শোনার সাথে সাথে প্রফেসর আরাপাহোসহ ওগলালাদের সকলের মুখ উদ্বেগ-উৎকন্ঠায় ভরে গেল।

‘গাড়ি দুটির রঙ কি?’ প্রশ্ন করল মেরী রোজ।

‘একটা নীল, অন্যটা সাদা’। বলল পুলিশ প্রধান।

সাদা রঙের কথা শুনে আরও মুষড়ে পড়ল ওগলালা ও মেরী রোজ।

আহমদ মুসা যে গাড়ি নিয়ে যায় তাঁর রঙ সাদা।

‘চলুন স্পটে যাওয়া যাক, কিছুই বুঝতে পারছিনা।’ বলল প্রফেসর আরাপাহো।

‘চলুন।’ পুলিশ প্রধান উঠে দাড়াতে দাড়াতে বলল।

প্রথম স্পটে তাঁরা গেল।

টায়ার ফাটা ও উইন্ডশিল্ড ভাঙ্গা ওই সাদা গাড়িতেই সান ওয়াকারের বন্ধু কিডন্যাপকারীদের পিছু নিয়েছিল, তা নিশ্চিত করল ওঁরা সবাই এবং ওঁরা বলল, গাড়ির সামনে পড়ে থাকা লাশ কিডন্যাপকারীদের দু’জনের।

আহমদ মুসার গাড়ি এভাবে পড়ে থাকতে দেখে ভয়ানকভাবে মুষড়ে পড়লো ওগলালা ও মেরী রোজ। তাঁদের বুঝতে বাকি রইল না, ওখানে কিডন্যাপকারীদের সাথে আহমদ মুসার সংঘাত হয়েছে। দু’জন কিডন্যাপকারী

আহমদ মুসার হাতে মরেছে বটে, কিন্তু আহমদ মুসাও আক্রান্ত হয়। অবশেষে নিশ্চয়ই ওঁরা সান ওয়াকারের সাথে আহমদ মুসাকেও ধরে নিয়ে গেছে।

ওদিকে পুলিশ প্রধান এবার কিডন্যাপকারী বলে শনাক্তকৃত লাশ দুতিকে ভালো করে দেখতে গিয়ে চমকে উঠল, এরাতো মিঃ ডেভিডের সেই চার সাথীর দু'জন। চমকে উঠার পর উত্তেজিত হয়ে পড়লো চিনক। তাহলে মিঃ ডেভিডের চার সাথীই এখানে চার কিডন্যাপকারী?

পুলিশ প্রধান ফিস ফিস করে কথা বলল ট্যালন্টের কানে কানে।

ট্যালন্টও চমকে উঠল ভীষণ।

এগিয়ে এসে সেও ভালো করে দেখল দু'টি লাশকে। বলল ঠিকই বলেছ চিনক।

বলে একটু থেমেই বলল, 'তাহলে চিনক তোমার প্রশ্নের সমাধান হয়ে যাচ্ছে, আগের ঘটনাতেও এই চারজন কোন কিডন্যাপ প্রচেষ্টার সাথেই জড়িত ছিল। তুমি যে অনুমান করে ছিলে তা সত্যি'।

'ধন্যবাদ স্যার'।

বলেই কুঞ্চিত কপাল প্রফেসর আরাপাহোর দিকে চেয়ে দ্রুত কণ্ঠে বলল, 'স্যার এ কিডন্যাপকারীদের আমরা চিনতে পেরেছি। এর আগেও এরা চারজন সম্ভবত কোন কিডন্যাপের চেষ্টা করতে গিয়ে আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল'।

'কোথায় সে ঘটনা ঘটেছিল?'

'এয়ারপোর্ট রোডে ব্রীজের পাশে'। শুনে চমকে উঠল প্রফেসর আরাপাহো এবং তাঁর সাথের অন্যরাও। বলল প্রফেসর আরাপাহো, 'অবাক ব্যাপার, সেখানে তো সান ওয়াকার, এই মেরী রোজ ও শিলা সুসানরাই চারজন দুর্বৃত্তের কিডন্যাপ চেষ্টার মুখে পড়েছিল। আর সেখানেও তো এদের এই বন্ধু লোকটিই ঐ চারজনকে গুলী করে আহত করে এদের রক্ষা করেছিল। পালিয়ে গিয়েছিল কিডন্যাপকারীরা। সে ঘটনাতেও তাঁরা দুটি গাড়ি ব্যাবহার করেছিল, আজও দুটি ব্যাবহার করেছে'।

বিস্ময়ে ছানাবড়া হয়ে গেল পুলিশ প্রধান চিনক এবং ট্যালন্টের চোখ। তাঁরা কিছুক্ষন কথা বলতে পারলো না বিস্ময়ের ধাক্কায়।

একটু পর পুলিশ প্রধান বলল প্রফেসর আরাপাহোকে লক্ষ্য করে, 'স্যার আপনার কথার পর এখন আমার মনে হচ্ছে, এই দুই কিডন্যাপ প্রচেষ্টার টার্গেট সান ওয়াকার। আমি জানিনা এই কিডন্যাপ প্রচেষ্টার সাথে ওয়াশিংটনে সান ওয়াকার কিডন্যাপ হওয়ার ঘটনার কোন যোগ আছে কিনা'।

'আমি প্রার্থনা করি, তুমি যা বললে ঘটনা এমন হোক। হলে সেটা হবে বড় ঘটনা। এখন চলো দ্বিতীয় স্পটে যাওয়া যাক'। বলল ট্যালন্ট।

মেরী রোজ, ওগলালা এবং শিলা সুসান তিনজনই বসে গাড়ির কাছে। তিনজনেরই বিপর্যস্ত চেহারা। সবাই গাড়িতে উঠেছে। প্রফেসর আরাপাহো গাড়িতে উঠেছে। জিভারো গাড়ির দিকে এগুতে এগুতে সুসানকে লক্ষ্য করে বলল, 'সুসান ওদের নিয়ে এস।'

সবাই গাড়িতে উঠল।

দ্বিতীয় স্পটে গিয়ে মেরী রোজ ও ওগলালা নিহত লোকটিকে দেখে বলল, 'এ লোকটিও চার কিডন্যাপকারীদের একজন। গাড়ীকেও তাঁরা চিনতে পারল। তাঁরা বলল দুই গাড়িরই রঙ নীল ছিল এবং দুই গাড়িরই পেছনের উইন্ড স্ক্রীনে কার্ডিনাল বার্ড –এর ছবি আঁকা ছিল।'

প্রফেসর আরাপাহো বলল, 'মিঃ চিনক, কি বুঝছেন বলুন? কিডন্যাপকারী তিনজন মারা গেল কিভাবে? আমাদের গাড়ির টায়ারে গুলী, উইন্ড স্ক্রীন ভাঙল কে? ওদের এই গাড়ি নষ্ট করল কে? কিডন্যাপকারীদের একজন এখানে মারা গেল কিভাবে?

পুলিশ প্রধান চিনক ভাবছিল। বলল, 'কি ঘটেছিল বলা মুস্কিল। এটুকু বলা যায়, ঘোরতর লড়াই হয়েছে। ওঁরা আপনাদের গাড়ি প্রথমে নষ্ট করেছে। তারপর আপনাদের লোক ওদের দু'জনকে হত্যা করেছে, যারা তাঁর গাড়ির দিকে আসছিল। আপনাদের লোক অবশিষ্ট দুই কিডন্যাপকারীদের হাতে বন্দী হয়ে বা তাঁদের অনুসরন করে এখানে আসে। এখানে আসার পর আপনাদের লোকের হাতে কিডন্যাপকারীদের একটি গাড়ি নষ্ট হয় ও একজন মারা যায়। তারপর কি

ঘটেছে বলা মুস্কিল। অবশিষ্ট একজন কিডন্যাপার সান ওয়াকার সহ আপনাদের লোককে বন্দী করে নিয়ে গেছে,এটা যেমন অবিশ্বাস্য ঠেকছে। তেমনি আপনাদের লোক অবশিষ্ট কিডন্যাপারকে বন্দী বা বিতারিত করে সান ওয়াকারকে মুক্ত করেছে, এর কোন প্রমান দেখা যাচ্ছেনা'। থামল পুলিশ প্রধান।

চিনক থামতেই ফেডারেল কমিশনার ট্যালন্ট বলল, 'চলো চিনক। প্রথমে থানায় গিয়ে ত্বরিত পদক্ষেপের ব্যাবস্থা নিতে হবে। সান ওয়াকার যদি ওদের হাতে বন্দী হয়ে থাকে, তাহলে ওঁরা যাতে কাহোকিয়া এলাকার বাইরে যেতে না পারে তাঁর ব্যবস্থা এখুনি নিতে হবে। থানাকে তুমি-আমি বলেছি বটে, কি করল চল দেখি গিয়ে।'

একটু থামল। থেমেই তাকাল প্রফেসর আরাপাহোর দিকে। বলল, জ্বনাব, প্রয়োজনে আমরা আপনাদের ডাকব এবং আমরাও আসব। ঘটনার জন্য আমরা দুঃখিত। আমরা সব রকম সহায়তা দিতে চেষ্টা করব'। থামল ট্যালন্ট।

পুলিশ প্রধান চিনক বলল, স্যার, প্রথমে আমি মিঃ ডেভিডের ওখানে যেতে চাই। তাঁর একটা বক্তব্য না পেলে সবকিছু স্পষ্ট হবেনা।

'ঠিক আছে। থানা হয়ে তুমি যাবে।'

'অল রাইট স্যার।'

বলে পুলিশ প্রধান তাঁর পাশে দাঁড়ানো এক অফিসারকে নির্দেশ দিল লাশ ও গাড়িগুলোর ব্যাবস্থা করতে।

বিদায় নিয়ে ট্যালন্ট ও পুলিশ প্রধান চলে গেল তাঁদের অফিসের দিকে।

আর প্রফেসর আরাপাহো সবাইকে গাড়িতে উঠার ইঙ্গিত করে বলল, 'চল সবাই অফিসে যাই। ওখানকার ব্যাবস্থা করে বাড়ি ফিরব।

সবাই গাড়িতে উঠল। গাড়ি স্টার্ট নিল। গাড়ি চলছিল। গাড়ির শব্দ শুনে পেছনে তাকাল ওগলালা।

পেছনে তাকিয়েই চিৎকার করে উঠল ওগলালা, 'ভাইয়া, সান ওয়াকার।'

সবাই পেছনে তাকাল। জিভারো গাড়ি রাস্তার পাশে দাড় করাল।

পেছনের গাড়িটা ড্রাইভ করছিল সান ওয়াকার। পাশের সিটে বসে ছিল আহমদ মুসা। তাঁর বাম বাহুর গোঁড়ায় ব্যান্ডেজ বাঁধা, জামা-কাপড় রক্তে ভেজা।

তাঁরা ফিরছিল ক্লিনিক থেকে। জিভারো গাড়ি থামাতেই গাড়ির সবাই গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল। সান ওয়াকার গাড়ি দাড় করাতেই চারদিক থেকে তাঁরা ঘিরে দাঁড়ালো গাড়ি। আহমদ মুসার রক্তাক্ত জামা-কাপড় এবং বাহুতে ব্যান্ডেজ দেখে আঁতকে উঠল সবাই।

গাড়ি থেকে নামল সান ওয়াকার। বলল, 'আহমদ মুসা ভাই গুলিতে আহত। ভয়ের কিছু নেই। গুলীটা বাহুর গোঁড়ার মাসল-এর কিছুটা অংশ ছিড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেছে'।

বেরিয়ে এলো আহমদ মুসাও। হাসল। বলল, 'সব ঠিক আছে। ওদের চারজনের একজন পালিয়েছে। শত্রুরা ইতিমধ্যে সব খবর পেয়ে গেছে। চল তাড়াতাড়ি আমরা ফিরি। অনেক ভাববার আছে'।

'কিছু করার চিন্তা বাদ দাও। তুমি আহত। তোমার বিশ্রাম ও চিকিৎসা দরকার। পুলিশ এসেছিল। তাঁরা বড় ধরনের সন্দেহ করেছে। মনে করছে ওয়াশিংটনে যারা সান ওয়াকারকে কিডন্যাপ করেছিল, তারাই এক্ষেত্রে জড়িত থাকতে পারে। তাঁরা কাজ শুরু করে দিয়েছে।'

'আমার সন্দেহ তাই।'

'আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম গাড়ি নষ্ট অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে। কি হয়েছিল আমাদের অল্প কথায় কিছু বল।'

'ওটা সান ওয়াকারের কাছে শুনবেন। ওর হাত,পা ও মুখ বাঁধা থাকলেও চোখ খোলা ছিল। সে সবকিছু দেখেছে ওদের গাড়িতে বসে।'

'সব বলব, অনেক সময় লাগবে। এখন এটুকু জানিয়ে রাখি, তাঁর গাড়ি আক্রান্ত ও অকেজো হয়ে পরার পর ভাইয়াকে মৃত মনে করে ওদের দু'জন যখন তাকে দেখতে যায়, তখন ঐ দু'জন নিহত হয়, আর ভাইয়া আহত হন। আহত অবস্থাতেই তিনি আমি যে গাড়িতে বন্দী ছিলাম সেই গাড়িকে অনুসরন করেন। অবশেষে ওদের একজনকে হত্যা করে আমাকে মুক্ত করেন। শত্রুদের একজন পালিয়ে গেছে'।

সান ওয়াকার থামতেই আহমদ মুসা বলল প্রফেসর আরাপাহোকে লক্ষ্য করে, ‘পুলিশ ওদের পরিচয় সম্পর্কে কিছু বলেছে?’

‘পরিচয় সম্পর্কে বলেনি, তবে পুলিশ ওদের জানে। ওঁরা চারজন আহত অবস্থায় এর আগে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। সম্ভবত এদের পরিচয় ঠিকানাও পুলিশ জানে’। বলল প্রফেসর আরাপাহো।

‘পুলিশ কি ওদের ঠিকানা জানে? জেনে নেয়া যাবে তাঁদের কাছ থেকে?’

‘চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু কেন? ওদের তিনজন তো মারাই গেছে’।

‘ওঁরা চারজন সব নয়। আর আসল লোকও তাঁরা নয়। ওদের যারা চালাচ্ছে, কাজে লাগাচ্ছে তারাই আসল। এদের ঠিকানা পেলে ওঁদেরও সন্ধান করা যাবে।’

‘তুমি এসব নিয়ে এখন চিন্তা করোনা। পুলিশ এটা করছে।’

‘পুলিশ অবশ্যই করবে, কিন্তু আমাদেরও জানা প্রয়োজন।’

‘ঠিক আছে চল। খোঁজ করা যাবে।’

বলে গাড়িতে উঠল প্রফেসর আরাপাহো। সবাই গাড়িতে উঠে বসল। ছুটে চলল দুই গাড়ি।

# ৬

পুলিশ প্রধান চিনক কক্ষে প্রবেশ করলে ফেডারেল কমিশনার ট্যালন্ট ফাইল থেকে চোখ তুলে বলল, ‘চিনক বস।’

টেবিলের সামনে একটা চেয়ারে বসল পুলিশ প্রধান চিনক।

সামনের ফাইল বন্ধ করে পাশের ফাইল ক্যাবিনেটে রেখে সোজা হয়ে ট্যালন্ট বসল। বলল, ‘কিছু এগুতে পারলে?’

‘চারজন কিডন্যাপারকারীর যে একজন বেঁচে আছে তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। মিঃ ডেভিড তাঁর সম্পর্কে কোন তথ্য দিচ্ছেন না। উপরন্তু বলছেন, তাকেও হত্যা করা হয়েছে। আর সান ওয়াকার সম্পর্কে মিঃ ডেভিড একটা কথাও বলেননি। তিনি বলেছেন, সান ওয়াকারের নাম শুনেছেন, তাকে জানেন না’।

‘আমার সাথেও টেলিফোনে উনি কথা বলেছেন। তিনি তো একদম উল্টো কথা বলছেন। তাঁর চারজন লোক নাকি রেড ইন্ডিয়ান রিসার্চ সেন্টার দেখতে গিয়েছিল, একটা অজুহাত তুলে তাঁদের হত্যা করা হয়েছে।’

‘স্যার আমাদের কাছে কিডন্যাপের প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবৃতি, কিডন্যাপ হওয়া সান ওয়াকারের জবানবন্দী, উদ্ধারকারী যুবকের দেয়া বিবরন, আনুষাঙ্গিক প্রমানাদি, সবই রয়েছে।’ বলল পুলিশ প্রধান চিনক।

‘কিন্তু মিঃ ডেভিড তো আইন ও প্রমানের কথা বলছেন না। তিনি বিষয়টাকে রাজনৈতিক রুপ দিতে চাচ্ছেন। সন্দেহ নেই কিডন্যাপকারীদের পালিয়ে যাওয়া চতুর্থ ব্যাক্তিকে তিনিই লুকিয়ে ফেলেছেন’।

‘স্যার, আইন,প্রমান বাদ দিয়ে যদি রাজনীতির কথা তুলা হয়, তাহলে তো আমরা অপারগ।’

‘ঘটনা তাই দাঁড়াচ্ছে। যাকে অপহরণ করেছিল, যারা অপহরনের প্রধান সাক্ষী এবং যে উদ্ধার করেছিল, তাঁরা সবাই অশ্বেতাঙ্গ। সুতরাং বলা যাবে তাঁরা মিথ্যা কথা বলছে।’

'তাহলে এখন কি করনীয় স্যার?' বলল চিনক হতাশ কণ্ঠে।

'মিঃ ডেভিড এখানে আসছে। এ জন্যই তোমাকে ডেকেছি। দেখা যাক তাঁর সাথে আরও কথা বলে।'

'মনে হচ্ছে তিনি একই কথা বলবেন, তাহলে আমরা কি করব?

মুস্কিল। মিঃ ডেভিডরা যদি পানি ঘোলা করতে চান, তাহলে করতে পারেন। পত্র-পত্রিকায় সংবাদ রটিয়ে দিতে পারেন যে, সান ওয়াকারের নেতৃত্বে রেড ইন্ডিয়ানরা রিসার্চ সেন্টার দেখতে যাওয়া ৪জন ট্যুরিস্ট শ্বেতাঙ্গকে হত্যা করে তাঁর অপহরনের প্রতিশোধ নিয়েছে। আইন প্রমান যাই বলুক, এক মুহূর্তেই সান ওয়াকার বাদীর তালিকা থেকে আসামীর তালিকায় উঠবে। দেশ ব্যাপী শুরু হবে হৈ চৈ। জাতিগত উত্তেজনা দেখা দেবে। তখন বিচারের বদলে পরিবেশ ঠিক রাখাই মুখ্য বিষয় হয়ে যাবে এবং দেখা যাবে সংখ্যাগুরু শ্বেতাঙ্গদের স্বার্থই রক্ষিত হচ্ছে'।

উত্তরে পুলিশ প্রধান চিনক কোন কথা বলল না। তাঁর মুখ হয়ে উঠল বিষণ্ন।

চিনকের দিকে তাকিয়ে ট্যালন্ট বলল, 'মন খারাপ করো না চিনক। তোমার কাজ তুমি করে যাও। অন্যরা যদি তাঁর দায়িত্ব পালন না করে, তাতে তোমার কিছু এসে যায় না।'

দরজায় নক হোল। ট্যালন্ট উঠে দাঁড়ালো। বলল, 'চিনক বস, দেখি উনি বোধ হয় এলেন।'

ট্যালন্ট গিয়ে দরজা খুলে ধরল। দরজায় দাড়িয়ে মিঃ ডেভিড। সম্ভাষণ বিনিময় হোল।

ট্যালন্ট ডেভিডকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে নিজের চেয়ারে এসে বসল। বলল, 'ওয়েলকাম মিঃ ডেভিড। বসুন। আমরা আপনারই অপেক্ষা করছি।'

'নতুন কোন কথা নেই। আমি থানায় আইন অনুসারে জানিয়েছি আমার তিনজন লোককে হত্যা করার কথা এবং একজন মিসিং হওয়ার বিষয়। এ ব্যাপারে আপনারা কি করছেন, সেটাই জানতে চাই।'

'মিঃ ডেভিড, আইন যা বলে সেটাই হবে। থানায় আপনি একটা অভিযোগ করেছেন। তাঁর আগে থানা আরও একটা অভিযোগ রেকর্ড করেছে এবং সে অভিযোগ অনুসারে পুলিশ সরেজমিন দেখার ভিত্তিতে একটা প্রাথমিক রিপোর্টও তৈরি করেছে। এখন আরও অনুসন্ধান চলবে।'

'কিন্তু এই তদন্তের নামে যারা ক্ষতিগ্রস্থ, মজলুম, তাদেরকেই আরও হয়রানি করার আলামত আমরা দেখতে পাচ্ছি। ইতিমধ্যে কয়েকজন গোয়েন্দা অফিসার নিহত ও নিখোঁজ চারজনের জিনিসপত্র ও অতীত নিয়ে টানাটানি শুরু করেছে। যেন তারাই আসামী। এমনকি তাঁরা আমার কাহোকিয়া আসার উদ্দেশ্য নিয়েও আকারে-ইঙ্গিতে প্রশ্ন তুলছে।'

'মিঃ ডেভিড, আপনি একজন সচেতন নাগরিক। আপনি আইন জানেন। পুলিশ যা করছে তা তাঁদের রুটিন ডিউটি।'

'না মিঃ ট্যালন্ট, তাঁরা ঐ চারজনকে, তাঁর সাথে অনেকটা আমাকেও কিডন্যাপার হিসাবে ধরে নিয়েছে'।

'প্রমানের আগে এভাবে ধরে নেয়া যায় না, তবে অনুসন্ধান করতেই হয়।'

'না, এই অনুসন্ধান আমার জন্য অপমানকর। আপনারা বন্ধ করুন। না হলে আমি বলব, আমরা জাতিগত বিদ্বেষের শিকার।'

'এই ক্ষেত্রে আমাদের জন্যে আপনার পরামর্শ বলুন।' বলল চিনক।

'আপনারা আমার নিখোঁজ লোককে খুঁজে বের করুন এবং এই হত্যাকাণ্ড যে জাতিগত উত্তেজনার সৃষ্টি করছে, তা নিরসনের চেষ্টা করুন। এই ঘটনা ইতিমধ্যে চারদিক ছড়িয়ে পড়েছে। যারা এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, তাদেরকে এক সময় মারাত্মক পরিণতির সম্মুখিন হতে হবে, যদি সেন্টিমেন্ট প্রশমিত না করে আরও বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়।'

পুলিশ প্রধান চিনক তাকাল ট্যালন্টের দিকে।

বলল, 'স্যার ওঁর কথা আমরা শুনলাম। আমরা তদন্ত বন্ধ করে এই সব কাজে মনোযোগ দেব কিনা, এ জন্যে একটা নীতিগত সিদ্ধান্ত হতে হবে।'

'মিঃ চিনক, আপনি আমার কথার ভিন্নার্থ করেছেন। আমি তদন্ত বন্ধ করতে বলিনি। কিভাবে তিনজন নিহত ও একজন নিখোঁজ হলো তাঁর তদন্ত অবশ্যই প্রয়োজন। আমি চাই, আমাদের কেউ যেন বিরক্ত না করে।'

কথা শেষ করে 'চলি' বলে উঠে দাঁড়াল মিঃ ডেভিড। উঠে দাঁড়াল ট্যালন্ট ও চিনক।

তাঁরা ডেভিডকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিল। বিদায়ী হ্যান্ডশেকের সময় ট্যালন্ট ডেভিডকে বলল, 'আপনি যা বলেছেন সে বিষয়ে আমরা দেখব মিঃ ডেভিড।'

'ধন্যবাদ' বলে গাড়িতে উঠল ডেভিড।

ডেভিড চলে গেলে চিনক বলল, 'আমিও যাই স্যার।'

'যাও, কিন্তু বিষয়টা জটিল হয়ে গেল। বুঝলেতো সে পরোক্ষভাবে আমাদের হুমকি দিয়ে গেল। আমরা যদি হত্যাকারীর বিচার না করি, তাহলে বিচার মানুষই করবে।' বলল ট্যালন্ট।

'স্যার তাঁর মুল কথা হলো, তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্ত আমাদেরকে বন্ধ করতে হবে এবং এটাই প্রমান করে স্যার, তাঁরা অপরাধী।'

'এভাবে বলো না। তাদেরকে যতটা পার ডিস্টার্ব না করে তদন্ত চালিয়ে যাও। দেখা যাক, পরে আরও চিন্তা করা যাবে।'

'স্যার তাদেরকে নিয়েই তো তদন্ত।'

'ঠিক আছে, একটু ধীরে চলো। আমি ইতিমধ্যেই স্টেট সরকার ও ফেডারেল সরকারকে বিষয়টা জানিয়েছি। নিশ্চয় তারাও কিছু বলবেন। বিষয়টা নিয়ে স্টেট বা ফেডারেল তদন্তও হতে পারে।'

'কিন্তু তাহলে তো স্যার ইন্ডিয়ান রিজার্ভ এলাকার স্ট্যাটাস ক্ষুণ্ন হবে।'

'তা হবে কিছুটা। কিন্তু ডেভিডদের কাবু করতে হলে স্টেট বা ফেডারেল ব্যবস্থার হস্তক্ষেপ দরকার। ঠিক আছে, এ বিষয় নিয়ে পরে আরো আলোচনা হবে।'

'ঠিক আছে স্যার।'

'ঠিক আছে,তুমি এস।'

‘শুভদিন স্যার।’ বলে চিনক বিদায় নিয়ে কয়েক ধাপ এগিয়ে গাড়িতে চড়ল।

এদিকে ডেভিড রেস্টহাইজে তাঁর কক্ষে পৌঁছেই ডাকল জেনারেল শ্যারনকে।

জেনারেল কক্ষে প্রবেশ করতে করতে বলল, ‘কি খবর মিঃ ডেভিড? কতদুর?’

‘বসুন বলছি।’

‘খবর তেমন কিছু নেই। ভয় দেখিয়ে এসেছি। আশা করি ওঁরা এগুবেনা। ওঁরা দু’একদিন আমাদের ডিস্টার্ব না করলেই হয়’।

‘তারপর?’

টেলিফোনে কথা হয়েছে, শিকাগো থেকে সন্ধার মধ্যেই ওঁরা এসে পরবে।’

‘তাঁরা কেমন হবে? মনে রেখ আহমদ মুসাকে ধরতে যাচ্ছ।’

‘পনের জনের যে স্কোয়াড আসছে, সে স্কোয়াড দিয়ে পনের’শ রেগুলার আর্মির সাথে লড়াই করা হয়। এরা সবাই কমান্ডো। আর ভুল হবে না জেনারেল।’

‘ওকে ঠিক তুমি আহমদ মুসাই মনে করছ?’

‘আমি নিশ্চিত। উইলিয়াম (কিদন্যাপকারীদে চতুর্থ ব্যক্তি) আহমদ মুসাকে একবার দেখেছে। সুতরাং চিনতে সে অবশ্যই ভুল করেনি। তাছাড়া ঘটনা দিয়েও প্রমান হয় সে আহমদ মুসা ছাড়া আর কেউ নয়।’

‘তোমার পরিকল্পনা কি?’

‘পরিকল্পনা এটাই। যে কোন মুল্যে আহমদ মুসাকে ধরতে হবে।সান ওয়াকারকেও চাই।’

‘কিন্তু তাকে ধরার জন্যে পাওয়া যাবে তো?’

‘টাকায় সব হয়। রেস্ট হাউজের নাভাজো একজন গোয়েন্দা এজেন্ট আমি জানি। টাকা দিয়ে তাকে কিনেছি। তাকে কাজে লাগিয়েছি। সে প্রফেসর আরাপাহোর বাড়িতে আহমদ মুসাকে পেয়েছে। সে এখন তাঁর উপর চোখ রাখছে’।

‘ধন্যবাদ গোল্ড ওয়াটার’।

‘না গোল্ড ওয়াটার নয়, আমি এখন ডেভিড। গোল্ড ওয়াটার নামের সাথে হোয়াইট ঈগল জড়িয়ে আছে। আমি চাই হোয়াইট ঈগলের নাম যত কম জড়ানো যায়। এখানে যে ঘটনা ঘটবে, তা প্রতিহিংসামূলক, তিনজন শ্বেতাঙ্গকে হত্যার প্রতিশোধ সবাই এটা জানবে’।

‘পুলিশের কি ভুমিকা হবে?’

‘পুলিশ কিছু বোঝার আগেই সব শেষ হয়ে যাবে।’ বলে উঠল জেনারেল শ্যারন।

কক্ষ থেকে বের হতে হতে বলল জেনারেল শ্যারন, ‘মিঃ ডেভিড কালকেই আমি ফিরতে চাই।’

‘তাই হবে।’ বলে ডেভিড গোল্ড ওয়াটার সোফায় গা এলিয়ে দিল।

আহমদ মুসা ড্রয়িং রুমে প্রবেশ করতেই প্রফেসর আরাপাহোসহ মেরী রোজ, শিলা সুসান,ওগলালা, জিভারো সকলেই একরাশ বিস্ময় নিয়ে তাঁর দিকে তাকাল। সকলের চোখেই প্রশ্ন, অপরিচিত এ শেতাঙ্গ কোথেকে এসে প্রবেশ করল।

আহমদ মুসা তাঁর ডান হাত দিয়ে স্কিন মাস্ক খুলে ফেলল মুখ থেকে। ফিসিয়াল স্কিন মাস্ক মাথাটাও কাভার করে ছিল। মুখ থেকে স্কিন মাস্ক খোলার সাথে সাথে মাথার সোনালী চুলও সরে গেল।

সবাই একযোগে হেসে উঠল। ওগলালা বলল, ‘আপনাকে এ অবস্থায় দেখলে ভাবিও চিনতে পারতেন না ভাইয়া।’

‘ধন্যবাদ বোন’।

‘চিনতে পারবে না এটা কোন ধন্যবাদ দেয়ার বিষয় হলো?’ ওগলালা বলল।

‘আমার ছদ্মবেশকে নিখুত বলেছ, এ জন্য ধন্যবাদ।’

‘কি ব্যাপার বেটা, এখন তোমার শুয়ে থাকার কথা। কিন্তু শোয়া তো নয়, মুখোশ পরার মহড়া দিচ্ছ। ব্যাপার কি?’

আহমদ মুসা সোজা হয়ে বসল।

তাঁর মুখ গম্ভির হয়ে উঠল। বলল, ‘জ্বনাব আমি হোয়াইট ঈগলকে যতটা জানি, তাতে আমি মনে করি তাঁরা ত্বরিত কোন প্রতিশোধের উদ্যেগ নেবে। তাছাড়া পুলিশ প্রধান চিনকের সাথে আপনার সর্বশেষ কথায় দেখা যাচ্ছে তাঁরা পুলিশকেও হুমকি দিয়েছে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্ত বন্ধ করতে বলেছে। তাঁরা এখান থেকে চলে গেলে তদন্তের পরোয়া করতো না। তাহলে এরা থাকছে। যখন থাকছে তখন কিছু করার জন্যই থাকছে।’

‘পুলিশও এদের উপর চোখ রেখেছে।’

‘পুলিশের উপর আমার আস্থা আছে। কিন্তু একথা সত্য, আমাদের কাজ যেটা সেটা পুলিশ করে দিবে না।’

‘আমাদের কি কাজ এখন?’

‘শত্রু আমাদের উপর চোখ রাখছে। শত্রুর উপর আমাদেরও চোখ রাখতে হবে।’

‘শত্রুরা আমাদের উপর চোখ রাখছে নাকি?’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আমরা বাড়ি আসার সময় মোটর সাইকেল ওয়ালা একজন রেড ইন্ডিয়ান যুবককে আপনাদের বাড়ির মেইন রোডে হা করে আমাদের উপর তাকিয়ে থাকতে দেখেছিলাম। তাঁর চোখকে আমার সন্দেহ হলেও একে আমি একজনের স্বাভাবিক বিস্ময় বলে মনে করেছিলাম। কিন্তু ঘণ্টা খানেক পর আমাদের বাড়ির ছাদ থেকে এই যুবককেই মোড়ের একটা দোকানের সামনে তাঁর মোটর সাইকেলে বসে আমাদের বাড়ি মুখো হয়ে বাদাম চিবুতে দেখেছি। তারপর এই মাত্র রাস্তায় গিয়েছিলাম পায়চারি করতে এই শ্বেতাঙ্গ বেশ নিয়ে। এবার গিয়ে তাকে দেখলাম ডানদিকের রোড ক্রসিং-এ। আমাকে এ বাড়ি থেকে বেরুতে দেখেছিল। আমি রেল ক্রসিং- এ পৌছাতেই লোকটি আগ্রহ ভরে এগিয়ে এসেছিল। বলেছিল, স্যার কি প্রফেসর সাহেবদের দেখতে এসেছিলেন? ওঁরা ভালো আছে?’

আমি বলেছিলাম, ‘আমি ওঁর বাসায় এসেছি। আমি ওঁর ছাত্র। ওঁরা সবাই ভালো আছেন’।

‘আপনি ওখানে থাকছেন?’ সে প্রশ্ন করেছিল।

‘না এসে উঠেছি। থাকব ফেডারেল রেস্টহাউজে। সন্ধায় যাব।’

‘ওখানে রুম পেয়েছেন?’

‘না সোজা এখানে এসেছি। এখান থেকে সন্ধায় রেস্টহাউজে যাব।’

‘কোন অসুবিধা হবে না স্যার। আমি সব ব্যাবস্থা করে রাখব। স্যারের নাম কি?’

‘আল কোহেন।’

‘ঠিক আছে স্যার। প্রফেসর আরাপাহো আপনার স্যার, আর আমাদের পূজনীয় ব্যক্তি। সান ওয়াকার ও তাঁর বিদেশী লোকটি এখন কেমন আছে স্যার?’

‘আহত লোকটার কথা বলছ?’

‘হ্যাঁ’।

‘হ্যাঁ, ড্রয়িং রুমে বসে থাকতে দেখেছি সান ওয়াকারের সাথে। ভালই আছে ওঁরা।’

‘ধন্যবাদ স্যার’।

অতঃপর ওঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এদিক সেদিক পায়চারি করে আমি ফিরে এসেছি। এখন বলুন এই লোকটি সম্পর্কে কি ধারনা করতে পারি?’

‘ঠিকই বলেছ আহমদ মুসা, হয় সে লোকটি সরকারী লোক। না হয় মিঃ ডেভিডের গোয়েন্দা’। বলল প্রফেসর আরাপাহো।

‘সে সরকারী গোয়েন্দা নয়। হলে তাঁর আগ্রহ ভিন্ন রকম হতো।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তাঁর মানে শত্রুরা সর্বক্ষণ আমাদের চোখে চোখে রাখছে।’ বলল প্রফেসর আরাপাহো।

‘আমি কি দেখব রেড ইন্ডিয়ান যুবকটি কে? তাকে পাকড়াও করলেও অনেক কিছু জানা যাবে।’ বলল জিভারো।

আহমদ মুসা শশব্যস্ত হয়ে বলল, না, না, তাকে আমরা সন্দেহ করছি, এটুকুও প্রকাশ করা যাবেনা। আমরা শত্রু পক্ষের চোখ রাখার বিষয়টি জানতে পেরেছি, এটা শত্রুরা বুঝতে পারলে তাঁদের প্ল্যান পাল্টে ফেলবে, তাঁরা সাবধান হয়ে যাবে। তারচেয়ে শত্রুরা আসুক আমরা কিছুই জানিনা। তাঁর ফলে নিরপদ্রুপে আমরা শত্রুর উপর চোখ রাখতে পারব'।

'আপনি কি সত্যিই সন্ধ্যায় ফেডারেল রেস্টহাউজে যাচ্ছেন?' জিজ্ঞেস করল ওগলালা।

'হ্যাঁ যাচ্ছি।'

'যাচ্ছ? তোমার শরীরের এই অবস্থা নিয়ে? উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল প্রফেসর আরাপাহো।

'ওখানে একটু ব্যাথা আছে। কিন্তু শরীর ভালো আছে। অসুবিধা হবে না'।

'কিন্তু কেন তোমার ওখানে যাওয়া প্রয়োজন?'

'শত্রুকে আরও জানার জন্য। তাঁদের উপর চোখ রাখার জন্য।'

'তাহলে তোমার সাথে জিভারো যাক?'

'তা হবে না। জিভারো ধরা পরে যাবে। অন্তত রেড ইন্‌ডিয়ান যুবকটি তো জিভারোকে চিনবে।'

'তোমার পরিকল্পনা কি?'

'জ্বনাব, আমি মনে করি, শত্রুরা তৃতীয় আঘাত হানবে এবং এটা হবে ওদের চূড়ান্ত আঘাত। আমি চাইনা ওদের এই আঘাত একতরফা হোক। এ জন্য কি করনীয় তা জানার জন্যে শত্রুর পাশে যাচ্ছি।' গম্ভীর কণ্ঠ আহমদ মুসার।

'কিন্তু তুমি আহত, আমরা উদ্বেগ বোধ করছি।' প্রফেসর আরাপাহো ম্লান কণ্ঠে বলল।

'জ্বনাব যুদ্ধ ক্ষেত্রে এমন পরিস্থিতি আসে, যখন আহতদেরকেও লড়াই করতে হয়। ওহুদ যুদ্ধে আমাদের রসূলের (সঃ) বাহিনী কতিপয় লোকের একটা ভুলের কারনে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। বহু আহত-নিহতের ঘটনা ঘটে। স্বয়ং রসূল

(সঃ) আহত হন। কিন্তু শত্রুর চূড়ান্ত আঘাতকে প্রতিহত করার জন্য যখন আহত সৈন্যরাই নবউদ্যোমে উঠে দাড়ায়, তখন শত্রু বাহিনী পলায়ন করে'।

সবার প্রশংস ও মুগ্ধ দৃষ্টি আহমদ মুসার দিকে।

কারও মুখে কোন কথা নেই।

আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'মাগরিবের নামাযের সময় হয়েছে। নামাজ পরেই আমি যাবো।'

'চলো বাবা, সবাই মিলে আমরা এক সঙ্গে নামায পরি। তুমি বলেছিলে, মেয়েরাও ছেলেদের সাথে নামায পরতে পারে।'

'জ্বি, মেয়েরা পেছনে দাঁড়াবে।' সবাই উঠল।

আহমদ মুসা মেরী রোজ ও শিলা সুসানের দিকে চেয়ে বলল, 'তোমরাও যে দেখি উঠছ।'

'কেন নামায পরতে হবে না?' বলল মেরী রোজ।

'জানাওনি তো, কখন তোমরা এদিকে এলে?' তাইতো ক'দিন থেকে দেখছি পোশাকে-আশাকে বিরাট পরিবর্তন। ঘোমটা উঠেছে মাথায়'। বলল আহমদ মুসা।

বলল ওগলালা, 'ভাইয়া আপনি দেখছি, অসাধারারন চিন্তা করতে করতে সাধারন বিষয় আপনার নজরেই পড়েনা। বলুন, সান ওয়াকার মুসলিম প্রমাণিত হওয়ার পর মেরী রোজ কি আর এক মিনিট খৃষ্টান থাকতে পারে? আর জিভারো নিজে মুসলমান হওয়ার পর শিলা সুসানকে এক মুহূর্ত অমুসলিম থাকতে দিতে পারে?'

'তাঁর মানে আমি জোর করে সুসানকে মুসলমান বানিয়েছি?' প্রতিবাদ করল জিভারো। হাসছিল সুসান।

ওগলালা কিছু বলতে যাচ্ছিল। আহমদ মুসা তাকে বাঁধা দিয়ে বলল, 'তোমরা দেখি ঝগড়া বাধাবে। চল নামাযে যাই।'

সবাই এগুতে শুরু করল।

আহমদ মুসা মিঃ ডেভিডের রুমের বিপরীত দিকের রুমটাই পেয়ে গেছে। সে মনে মনে শুকরিয়া আদায় করল রেড ইন্ডিয়ান যুবক নাভাজোর।

আহমদ মুসার প্রথম কাজ হলো মিঃ ডেভিডকে চেনা এবং তাকে ফলো করা।

আহমদ মুসার কক্ষের দরজার প্রায় সোজাসুজিই মিঃ ডেভিডের দরজা।

আহমদ মুসা তাঁর কক্ষের দরজা খোলা রেখে এমন এক জায়গায় বসল, যেখান থেকে ডেভিডের ঘরে ঢোকা ও বের হওয়া দেখা যায়।

এখন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। আহমদ মুসা শুনতে পেল ডেভিডের দরজায় নক হচ্ছে। মুখ বাড়াল আহমদ মুসা।

যার উপর চোখ পড়লো তাকে দেখে প্রায় ভুত দেখার মতই চমকে উঠল আহমদ মুসা।

বিশ্ব ইহুদীবাদীদের গোয়েন্দা জেনারেল আইজ্যাক শ্যারন নক করছে ডেভিডের দরজায়।

সংগে সংগেই আহমদ মুসার মনে হলো, তাহলে ডেভিড হচ্ছে গোল্ড ওয়াটার?

বেশিক্ষন অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকতে হলো না। ডেভিডের দরজা খুলে গেল। দরজায় যে মুখ দেখা গেল তা ডেভিড গোল্ড ওয়াটারের।

ডেভিড গোল্ড ওয়াটারকে দেখে আহমদ মুসা বিস্ময়ের চেয়ে আত্নপীড়ন অনুভব করল বেশি। দুই বড় ঘটনার পরেও তাঁর কেন মনে হলনা যে, এ ধরনের ঘটনা এই সময় শুধু গোল্ড ওয়াটাররাই ঘটাতে পারে।

ডেভিড গোল্ড ওয়াটার দরজা খুলতেই জেনারেল শ্যারন বলল, 'চল সাতটা তো বেজে গেছে'।

'হ্যাঁ, লবীতে ওঁরা অপেক্ষা করছে'। বলল গোল্ড ওয়াটার।

'লবিতেই কথা বলবে?'

'চল, ওখানে বেশ নিরিবিলি জায়গা পাওয়া যাবে।

ডেভিড গোল্ড ওয়াটার বেরিয়ে এল।

ওঁরা দু'জন করিডোর ধরে এগিয়ে চলল লিফটের দিকে। ওঁরা লিফটে না উঠা পর্যন্ত আহমদ মুসা উকি দিয়ে ওদের দেখল।

আহমদ মুসা ধপ করে বসে পড়লো সোফায়। দু'হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরে দ্রুত ভাবতে লাগল। ওঁরা লবিতে গেল কারো সাথে কিছু আলোচনা করার জন্যে? সে তো আলোচনার আশেপাশে হাজির থাকতে পারে। কিন্তু পরক্ষনেই ভাবল, মিঃ ডেভিড গোল্ড ওয়াটারের ঘরে একটা রেকর্ড রাখা খুবই জরুরী। এখানকার রেড ইন্ডিয়ান পুলিশের হাতে যদি দলিল তুলে দেওয়া যায়, তাহলে গোল্ডকে হেনস্তা করার একটা পথ হবে। তাছাড়া তাঁদের পরিকল্পনাও এর দ্বারা জানার পথ হতে পারে।

আহমদ মুসা ব্যাগ থেকে একটা রেকর্ডার চীপ ও মাষ্টার কী নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। মাষ্টার কী দিয়ে দরজা খুলে ডেভিড গোল্ড ওয়াটারের ঘরে প্রবেশ করল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা ঘরের চারদিকে একবার তাকাল। তারপর সোফার মাঝখানে টিপয়ের নিচের তলায় টেপ রেকর্ডার আটকে উঠে দাঁড়াল। তাড়াতাড়ি এগুল দরজার দিকে। তাকে তাড়াতাড়ি লবিতে পোঁছতেই হবে। আলোচনা ওদের শুনতে না পেলেও লোক চেনা দরকার।

কিন্তু দরজার কাছে পৌছতেই আহমদ মুসা দরজার বাইরে পায়ের শব্দ পেল এবং পায়ের শব্দ এ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

পরক্ষনেই দরজার কী হলে চাবি লাগানোর শব্দ হলো। আহমদ মুসা বুঝল ডেভিড গোল্ড ওয়াটার ফিরে আসছে তাঁর ঘরে।

চিন্তা করার কোন সময় নেই। এক এ্যাক্রোব্যটিক জাম্প দিয়ে আহমদ মুসা তাঁর দেহটিকে লোকটির বেডের কাছে নিয়ে এলো এবং গড়িয়ে ঢুকে গেল চাদরের আড়ালে বেডের নিচে।

ঠিক তাঁর সাথে সাথেই এসে ঘরে ঢুকল ডেভিড গোল্ড ওয়াটার। তাঁর সাথে জেনারেল শ্যারন এবং আরও দু'জন।

গোল্ড ওয়াটার আর শ্যারন পাশাপাশি সোফায় বসল।

আগন্তুক দু'জন বসল সামনের সোফায় মুখোমুখি।

সবাই বসলে গোল্ড ওয়াটার চার পেগ মদ এনে তিনজনের হাতে তিনটা দিয়ে এবং নিজে একটি নিয়ে বসল।

মদে চুমুক দিতে দিতে বলল, 'লবী থেকে চলে এলাম কেন? এখানকার রেড ইন্ডিয়ান পুলিশ প্রধান খুব বাড়াবাড়ি করছে। দেখলে না কয়েকজন রেড ইন্ডিয়ান খুব ঘুর ঘুর করছে। কে জানে ওঁরা চিনক-এর চর কিনা।'

'কেন উপরে বসলে ব্যাটার ঘাড় মটকানো যায় না?' বলল আগন্তুক দু'জনের একজন।

'তা পারলে কি আর বলতে। সমস্যা হলো, রেড ইন্ডিয়ান রিজার্ভ এলাকার পুলিশ সেট আপে হাত দেয়ার ক্ষমতা সরাসরি স্টেট কিংবা ফেডারেল সরকারের হাতে নেই। কিছু করতে হলে করতে হবে ফেডারেল কমিশনারের মাধ্যমে। আবার ফেডারেল কমিশনার এমন কিছু করার আগে মত নিতে হবে লোকাল কমিশনের।'

'বিপদ তো দেখি তাহলে।'

'বিপদ আর কোথায় আজকের রাতের পর ওদের তো মুখ দেখারও প্রয়োজন হবে না।'

'এটা অবশ্য ঠিক কথা। তাহলে কি প্রয়োজন এসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে?'

'ঠিক। এস কাজের কথায় আসি'।

'বলুন।'

'আজকের কাজ খুব জটিল নয়। প্রফেসর আরাপাহোর বাড়িতে ঢুকতে হবে এবং দুজনকে কিডন্যাপ করতে হবে।' বলতে বলতে সান ওয়াকার ও আহমদ মুসার ফটোগ্রাফ আগন্তুক দু'জনের হাতে তুলে দিল।

'ওঁরা ওখানে আছে নিশ্চিত?' বলল ওদের একজন।

'নিশ্চিত। আমাদের লোক সার্বক্ষণিক পাহারায় আছে।'

'আর কোন নির্দেশ?'

'এই মিশনে ফেল করা যাবেনা।'

'এই সরল কাজ করা যাবেনা, এমন কি আশংকা আছে?'

‘আহমদ মুসাকে তোমরা জান। মুক্ত অবস্থায় সে বনের সিংহ, বনের রাজা।’

‘হতে পারে। কিন্তু বনের সিংহকেও মরতে হয়।’

একটু থেমে লোকটি আবার বলল, এক বাধার কথা বললেন, আর কি আছে? পুলিশের কোন পাহারা সেখানে?’

‘না সেখানে কোন পুলিশ নেই। আহমদ মুসা অতি আত্মবিশ্বাসী তো!’

‘শত্রু আত্মবিশ্বাসী হওয়া সুখবর। বাই দি বাই, সান ওয়াকারের ব্যাপারটা কি? তাকে আবার ধরাধরির ঝামেলা কেন? তাকে তো সরিয়ে দিলেই ল্যাটা চুকে যায়।’

‘তার আগে কিছু কাজ আছে। ‘আমেরিকান ইন্ডিয়ান মুভমেন্ট’ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তার কাছে রয়েছে। এ তথ্য আমরা চাই’।

‘আহমদ মুসা কি আমেরিকান রেড ইন্ডিয়ান মুভমেন্ট’-এর সাথে জড়িয়ে পড়ল?’

‘তা বোধ হয় নয়। আমরা তা চাই না।’

‘তা না চাইলে তাকে তাড়াতাড়ি রেড ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে সরিয়ে নিতে হবে। তা নিতে চাইলে তাড়াতাড়ি তাকে আমাদের হাতে তুলে দিতে হবে।’ বলল জেনারেল শ্যারন।

‘আজকেই তা পেয়ে যাবে। কিন্তু তাই বলে মনে করোনা আহমদ মুসাকে ভয় করি। সে এক ব্যক্তি।রেড ইন্ডিয়ানরা তাকে নিয়ে কি করতে পারে।’

‘ক্যারিবিয়ানে বেশি কিছু করেনি। কিন্তু যা করেছে তাতেই তোমাদের সব পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেছে।’

‘ক্যারিবিয়ান এবং আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র এক নয়’।

‘তা না হোক আমরা চাই।’ শ্যারন বলল।

‘আমরা উঠব, আমাদের জন্য আর কিছু নির্দেশ আছে?’ বলল আগন্তুকদের একজন।

‘সান ওয়াকার ও আহমদ মুসাকে ধরে সোজা নিয়ে আসবে এখানে। হেলিকপ্টার রেডি থাকবে। এনে সোজা ওদের হেলিকপ্টারে তুলতে হবে। আমরা

রেস্ট হাউজের সব ব্যাপার চুকিয়ে রেখেছি, বলে রেখেছি রাতেই চলে যাব। আমরা তোমাদের জন্য অপেক্ষা করব।'

আগন্তুক দু'জন বিদায় নিয়ে চলে গেল।

জেনারেল শ্যারনও উঠল। বলল, 'আমিও প্রস্তুত থাকব।'

জেনারেল শ্যারন বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। কিন্তু গোল্ড ওয়াটার বসেই থাকল সোফায়। খেতে লাগল একের পর এক সিগারেট।

আহমদ মুসা অধৈর্য হয়ে উঠেছে। সে আশা করছে গোল্ড ওয়াটার শুয়ে পড়লে বা টয়লেটে গেলে সে কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু গোল্ড ওয়াটারের ওঠার নাম নেই। রাতটা সে বসেই কাটাবে নাকি? একটা করে মিনিট তার কাছে এক বছরের মত মনে হচ্ছে। তাকে দ্রুত বাসায় ফেরা দরকার। বেশ কিছু করার আছে তার।

আহমদ মুসা ইচ্ছে করলে গোল্ড ওয়াটারকে কাবু করে অথবা হত্যা করে চলে যেতে পারে, কিন্তু শত্রুকে সতর্ক হতে দিতে চায় না সে। গোল্ড ওয়াটারকে হত্যা নয়, ওঁদেরকে ক্রিমিনাল হিসাবে সবার সামনে এনে দাড় করাতে চায়।

অবশেষে অপেক্ষার অবসান হলো। গোল্ড ওয়াটার টয়লেটে ঢুকল। টয়লেটের দরজা ভেড়ানোর শব্দ পেল আহমদ মুসা। সংগে সংগে বেডের নিচ থেকে বেরিয়ে এল সে। বেড়ালের মত নিঃশব্দে চলল দরজার দিকে। কিন্তু কয়েক ধাপ এগুতেই টয়লেটের দরজায় শব্দ হলো। আহমদ মুসা চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেবার আগেই গোল্ড ওয়াটার সামনে এসে আবির্ভূত হলো।

মুখোমুখি হওয়া ছাড়া কোনই বিকল্প ছিলনা আহমদ মুসার কাছে। আহমদ মুসা এঁকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা বলেই মনে করল।

শ্বেতাঙ্গ বেশে আহমদ মুসাকে চিনতে পারলো না গোল্ড ওয়াটার। সে ভুত দেখার মত চমকে উঠে বলল, 'কে তুমি? ঘরে ঢুকেছ কেন?'

'আপনার খোজে। কণ্ঠটা একটু অন্য রকম করে বলল আহমদ মুসা'।

'বিনা অনুমতিতে?'

চাইলে অনুমতি দিতেন না। আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করতেন কিন্তু পরিচয় আমি দিতে পারতাম না।'

‘কেন? নিশ্চয়ই ক্রিমিনাল কেউ তুমি?’

‘ক্রিমিনাল নই, ক্রিমিনাল ধরে বেড়াই।’

আহমদ মুসার এ কথায় কিছুটা ঘাবড়াল গোল্ড ওয়াটার। বলল, কি চাও তুমি?’

‘কিছু চাই না, চাই আপনি ভালো হয়ে যান। শেতাঙ্গদের কলঙ্ক আপনি’।

‘কি বলছ তুমি?’

‘বলছি, একটা বিরল প্রতিভা সান ওয়াকারকে ঘাঁটানো বন্ধ কর। তাকে একবার কিডন্যাপ করেছিলে, আবার কিডন্যাপ করার চেষ্টা করছ। এই খুনোখুনি বন্ধ কর।’

আহমদ মুসার কথা শেষ না হতেই গোল্ড ওয়াটার হঠাৎ পেছন ফিরে ছুট দিল বাইরে বেরুবার দরজার দিকে।

কিন্তু পারল না গোল্ড ওয়াটার। আহমদ মুসা এ্যাক্রোব্যটিক জাম্প দিয়ে গোল্ড ওয়াটারের ঘাড়ে গিয়ে পড়লো।

ধরে ফেলল আহমদ মুসা গোল্ড ওয়াটারকে। টেনে নিয়ে এলো ঘরের মাঝখানে। চিৎকার করতে যাচ্ছিল গোল্ড ওয়াটার।

আহমদ মুসা বাম হাত দিয়ে তার গলা চেপে ধরে বলল, ‘অনেক লোককে হত্যার তুমি নিমিত্ত। আমার হাতে আজ তোমার জান যাবে যদি একটু অন্যথা কর।’ বলে গলা ছেড়ে দিল তার।

ভয়ে ছানাবড়া হয়েছে গোল্ড ওয়াটারের চোখ। বলল, ‘তুমি শ্বেতাঙ্গ, আমি সব শ্বেতাঙ্গের স্বার্থে কাজ করছি। সান ওয়াকার শ্বেতাঙ্গ স্বার্থের শত্রু। তাই তাকে আমাদের সামনে থেকে সরিয়ে দিতে চাই। আমার অন্য কোন স্বার্থ নেই।’

আহমদ মুসা আর কথা বাড়াল না। পকেট থেকে ক্লোরোফরম সিরিঞ্জ বের করল।

খুদ্র সিরিঞ্জটির মাথায় যথারীতি একটা পাম্প আছে। তাঁর নিচে আছে ইনজেকশন নিডল-এর মত ফাপা পিন।

আহমদ মুসা সিরিঞ্জটি গোল্ড ওয়াটারের বাহুতে সেট করে উপরের পাশে চাপ দিল। সংগে সংগেই নিচের পিনটি ঢুকে গেল গোল্ড ওয়াটারের চামড়ার

মধ্যে। তাঁর সাথে তাঁর শরীরে ঢুকে গেল এ্যানাথেটিক ক্লোরফরম। সেকেন্ডের মধ্যেই গোল্ড ওয়াটার সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল।

আহমদ মুসা পকেট থেকে টেপ বের করে বেধে ফেলল তাঁর হাত-পা। মুখে লাগিয়ে দিল টেপ। তারপর বেডের নিচে যেখানে আহমদ মুসা ছিল সেখানে তাকে ঠেলে দিয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

বেরিয়ে আসার আগে টিপয়ের তলা থেকে রেকর্ডার চীপ নিয়ে নিল এবং ঘরটি লক করে চাবি নিজের পকেটে পুরল আহমদ মুসা।

রেস্টহাউজ থেকে বেরিয়ে একটা গাড়ি জোগাড় করে আহমদ মুসা সোজা চলল পুলিশ প্রধান চিনক এর অফিসে। প্রফেসর আরাপাহোর সাথে চিনকের কথায় বুঝেছে, চিনক গোল্ড ওয়াটারদের সন্দেহ করেছে, কিন্তু প্রমানের অভাবে এবং হাতে নাতে গোল্ড ওয়াটারকে ধরতে না পারায় কিছু করতে পারছে না।

আহমদ মুসা সান ওয়াকারকে কিডন্যাপের ষড়যন্ত্র সংক্রান্ত গোল্ড ওয়াটার ও অন্যান্যদের কথোপকথনের টেপটি চিনকের হাতে তুলে দিতে চায়। তাহলে চিনক গোল্ড ওয়াটারের প্রত্যক্ষ প্রমান হাতে পাবেন, সেই সাথে সান ওয়াকারকে কিডন্যাপের উদ্যোগ বানচাল করার জন্য পুলিশ প্রফেসর আরাপাহোর ওখানে যেতে পারেন।

পনের জন কমান্ডো নিয়ে সান ওয়াকার ও আহমদ মুসাকে কিডন্যাপের যে উদ্যোগ গোল্ড ওয়াটার নিয়েছে, তাঁর মোকাবেলা আহমদ মুসা একাই করতে পারে। কিন্তু আহমদ মুসা পুলিশকে এ কাজে জড়িত করতে চায় যাতে গোল্ড ওয়াটারকে আইনের ফাঁদে ফেলা যায় এবং দেশবাসীর সামনে তাঁর মুখোশ খুলে দেয়া যায়।

পুলিশ চিনক এর অফিস এবং বাড়ি পাশাপাশি। রাত তখন ১১টা। আহমদ মুসা চিনকের বাসায় যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু অফিসে আলো দেখে অফিসের দিকেই এগুলো।

চিনকের অফিসের গেটে দু'জন সেন্ট্রি। গেটে তাঁরা আহমদ মুসাকে আটকাল।

আহমদ মুসা বলল, ‘পুলিশ প্রধান চিনকের জন্যে জরুরী খবর আছে।’

সেন্ট্রি ওয়াকিটকিতে পুলিশ প্রধানকে খবরটি জানিয়ে তাঁর অনুমতি নিয়ে আহমদ মুসাকে সাথে করে একজন সেন্ট্রি চলল চিনকের অফিস কক্ষের দিকে।

আহমদ মুসা ও পুলিশ সেন্ট্রিটি যখন পুলিশ প্রধানের কক্ষের সামনে, তখন নাভাজোকে কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল আহমদ মুসা।

দু’জন দুজনকে দেখতে পেয়েছে।

আহমদ মুসা বিস্মিত হল তাকে এখানে দেখে। বলল, ‘কি ব্যাপার নাভাজো তুমি এখানে?’

নাভাজো হঠাৎ কেঁদে ফেলল। বলল, স্যার, আমি পাপী। আমি গোল্ড ওয়াটারের চাপ ও প্রলোভনে পড়ে তাঁর পক্ষ থেকে চোখ রাখছিলাম প্রফেসর আরাপাহোর বাড়ির উপর, যাতে সান ওয়াকার ও এশীয় লোকটি অন্য কোথাও না যায়, কিংবা অন্য কোথাও গেলে গোল্ড ওয়াটারকে খবর দিয়ে তাঁদের অনুসরন করা যায়। তখন আমি বুঝিনি তাঁদের মতলব। এখন দেখছি, তাঁরা সান ওয়াকারকে অপহরনের জন্য প্রফেসর আরাপাহোর বাড়ি ঘিরে ফেলেছে। আমি এই খবর দিতে এসেছি পুলিশকে। স্যার, তাঁরা খুব বিপদে। রাত একটায় কমান্ডোরা তাঁদের বাড়ি আক্রমন করবে’।

‘জানিয়েছ সব পুলিশ প্রধানকে?’

‘জ্বি’।

‘এখন তুমি কোথায় যাচ্ছ?’

‘ঠিক করিনি’।

‘তাহলে তুমি এখানে অপেক্ষা কর। আমি মিঃ চিনকের সাথে কথা বলে আসছি। অসুবিধা হবে তোমার?’

‘না স্যার। আমি থাকছি’।

আহমদ মুসা নক করল চিনকের দরজায়। দরজা খুলে গেল। দেখল চিনক দরজায় দাড়িয়ে। স্বাগত জানাল চিনক আহমদ মুসাকে।

বাইরের দিকে নজর পড়তেই দেখল নাভাজোকে। বলল, ‘তুমি যাওনি? দাড়িয়ে আছো যে?’

'আমি ওকে দাড়াতে বলেছি'। আহমদ মুসা বলল।

'আপনি তাকে চিনেন?' বলল চিনক।

'চিনি। আমি প্রফেসর আরাপাহো ও সান ওয়াকারের পরিবারের বন্ধু। প্রফেসর আরাপাহোর বাড়ির সামনে ওঁর সাথে আমার আলাপ হয়েছে'।

বলে আহমদ মুসা তাঁর মুখোশ খুলে ফেলল। মুখোশের সাথে মাথার সোনালি পরচুলাও উঠে গেল'।

শ্বেতাঙ্গের জায়গায় এক নিরেট এশীয় চেহারার লোক দেখে বিস্মিত হল চিনক। বিস্মির হয়েছে নাভাজোও।

'আপনার সাথে জরুরী কিছু কথা আছে'। চিনককে লক্ষ্য করে বলল আহমদ মুসা।

'আসুন'।

বলে চিনক দরজার এক পাশে সরে দাঁড়ালো। বিস্ময় তখনও চিনকের চোখ মুখ থেকে যায়নি।

আহমদ মুসা ঢুকে গেল ঘরের ভিতরে। দরজা বন্ধ করে চিনক ফিরে এল তাঁর চেয়ারে। আহমদ মুসাকে বলে নিজেও বসল তাঁর আসনে।

বিস্মিয়ের সাথে সাথে চিনক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করছিল আহমদ মুসাকে। বলল, 'কাঁধের নিচে আপনার বাহুটা কি আহত? মনে হচ্ছে ব্যান্ডেজ সেখানে।'

'ধন্যবাদ। আপনাদের পুলিশের চোখ সবই দেখতে পায়।'

বলে একটু থেমে আহমদ মুসা বলল, 'গুলিতে এ জায়গা আহত হয়েছে।'

ভ্রু কুঞ্চিত হল পুলিশ অফিসার চিনকের। চিন্তা করছিল সে। বলল, 'তাহলে আপনিই গোল্ড ওয়াটারের তিনজন লোক খুন করে উদ্ধার করেছিলেন সান ওয়াটারকে?'

'জ্বি'।

তাঁর মানে আপনিই হোয়াইট ঈগলের ওয়াশিংটনস্থ বন্দীখানা থেকে উদ্ধার করেছিলেন সান ওয়াকারকে?'

'জ্বি'।

সংগে সংগেই চিনক উঠে দাড়িয়ে হ্যান্ডশেকের জন্য হাত বাড়াল আহমদ মুসার দিকে। আহমদ মুসা উঠে হ্যান্ডশেক করল চিনকের সাথে।

‘আমরা রেড ইন্ডিয়ানরা কৃতজ্ঞ আপনার কাছে। সরকার যা পারেনি, পুলিশ যা পারেনি, আপনি তা করেছেন’।

বলে একটা দম নিয়ে বলল চিনক আবার, ‘আপনাকে আমার অফিসে পেয়ে ধন্য বোধ করছি। এখন বলুন। নিশ্চয় আপনি খুব বড় বিষয় নিয়ে এসেছেন’।

‘যে খবর নাভাজো দিয়েছে, সেই খবর আমিও দিচ্ছি। তাঁর সাথে বাড়তি আরও কিছু’।

আহমদ মুসা বিকেলে নাভাজোর মাধ্যমে ফেডারেল রেস্টহাউজে একটা কক্ষ বরাদ্দ নেয়া, গোল্ড ওয়াটারের ঘরে ঢুকা, তাঁর টিপয়ে রেকর্ডার চীপ সেট করা, গোল্ড ওয়াটারের বেডের নিচে লুকিয়ে থেকে গোল্ড ওয়াটার ও কমান্ডো নেতাদের সান ওয়াকারকে কিডন্যাপ করার পরিকল্পনা শোনা এবং গোল্ড ওয়াটারকে সংজ্ঞাহীন করে তাঁর কক্ষে বেধে রেখে আসা পর্যন্ত সব কথা বলে আহমদ মুসা তাঁর পকেট থেকে রেকর্ডার চীপ বের করে চিনকের দিকে এগিয়ে দিল।

চিনক টেপ চীপটি হাতে নিয়ে হাস্যোজ্জ্বল মুখে বলল, ‘তাঁর মানে এই চীপে গোল্ড ওয়াটারের কণ্ঠ আছে এবং ষড়যন্ত্রের সব পরিকল্পনা আছে?’

‘জ্বি’। বলল আহমদ মুসা। চিনক তাঁর মুখ ঊর্ধ্বমুখী করে বলল, ‘ঈশ্বর, এ রকম একটা দলিল চাচ্ছিলাম। তোমাকে ধন্যবাদ’।

তারপর আহমদ মুসার দিকে চেয়ে বলল, ‘আপনাকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা আমাদের নেই। ওঁরা টার্গেট সান ওয়াকারকে করেনি, টার্গেট করেছে রেড ইন্ডিয়ানদের অস্তিত্বকে। শ্বেতাঙ্গ প্রভাবিত পুলিশ এবং সরকার এদের ব্যাপারে নিস্ক্রিয়। রেড ইন্ডিয়ান রিজার্ভ এলাকায় ওদের বাগে পেয়েছি। ছাড়বনা ওদের আমরা’। উত্তেজিত কণ্ঠ চিনকের।

‘মিঃ চিনক, আমার পরামর্শ, এই ঘটনাকে আপনাদের জাতীয় রুপ দিতে হবে এবং আপনার অধিকার আদায়ের দাবিকে এর যৌক্তিক পরিনতি হিসাবে দাড় করাতে হবে।’

বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল চিনক আহমদ মুসার দিকে। সেই সাথে গভীর ভাবনার একটা ছাপ ফুটে উঠল তাঁর চোখে-মুখে। যেন নিমজ্জিত সে অথৈ চিন্তার এক সমুদ্রে। কথা বলে উঠল এক সময় স্বপ্নোতাড়িতের মত, ‘আপনি এমন একটা কথা বলেছেন, ভেবে বলেছেন কিনা জানিনা, যা চিন্তার এবং কাজের একটা নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। আপনি আপনার চিন্তাকে আরও একটু বিস্তারিত করবেন কি?’

‘আমি বলেছি, আপনাদের দাবী মুখ্য নয়, মুখ্য হলো তাঁদের আচরন। এই আচরণই রেড ইন্ডিয়ানদের দাবীকে অবয়ব দিয়েছে এবং তাঁর আদায়কে অপরিহার্য করে তুলেছে। রেড ইন্ডিয়ানদের অবস্থান যদি এটা হয়, তাহলে আপনাদের কার্যক্রম বিদ্রোহ না হয়ে হবে বাঁচার সংগ্রাম –মুক্তির যুদ্ধ।’ থামল আহমদ মুসা। চিনকের চোখ-মুখ বিস্ময় বিমুগ্ধ। তাঁর মনে প্রবল প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধের এমন এক বিস্ময়কর তত্বকথা কিভাবে সে বলতে পারছে। কে এই এশীয়? বলল চিনক, ‘আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি এমন একটা কথা বলেছেন যা আমাদের প্রত্যেকের শোনা দরকার, জানা দরকার। আমি কি অনুরোধ করতে পারি, আপনি আমাদের মাঝে কিছুদিন থাকুন।’

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘এসব এখন থাক। এখন উঠতে হয়। আমার খুব অস্বস্থি বোধ হচ্ছে। আমাদের যাওয়া দরকার এখুনি।’

‘চলুন, আমরাও যাব। আমি কয়েক গাড়ি পুলিশকে তৈরি হতে নির্দেশ দিয়েছি’।

‘তাহলে উঠা যাক।’

উঠল পুলিশ প্রধান চিনক। আহমদ মুসাও উঠল।

প্রফেসর আরাপাহোর বাড়ির কাছাকাছি পৌছতেই আহমদ মুসা নারী কণ্ঠের একটা ভয়ার্ত চিৎকার শুনতে পেল।

চমকে উঠল আহমদ মুসা। তাকাল পুলিশ প্রধান চিনকের দিকে।

পুলিশ তাঁদের গাড়ি মেইন রোডে রেখে সবাই হেঁটে আসছিল আহমদ মুসার সাথে।

চিনককে আহমদ মুসা বলল, 'ওঁরা কেউ বাড়িতে ইতিমধ্যেই ঢুকেছে বলে ভয় হচ্ছে। আপনি বাড়িটা ঘিরে ফেলে বাড়ির দিকে এগুন। আমি পেছন দিক দিয়ে বাড়িতে ঢুকছি। আপনারা আসুন'।

বলেই আহমদ মুসা বাড়ির পেছন দিকে ছুটল।

বাড়ির পেছন দিকটা প্রাচীর ঘেরা।

আহমদ মুসা প্রাচীর টপকে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করল। কিন্তু ভেতরের উঠোনে লাফিয়ে নামতে গিয়ে একেবারে বাঘের মুখে গিয়ে পড়ল। ভেতরে ফুলের গাছের আলো আধারীর মধ্যে ১৫ জনের একজন কমান্ডো লুকিয়ে ছিল। আহমদ মুসা প্রাচীর টপকে পড়তেই তাঁর উপর এসে লাফিয়ে পড়ল সে।

আহমদ মুসা তাকে আগে দেখতে না পেলেও সে সতর্ক ছিল। সুতরাং আহমদ মুসা তাঁর আকস্মিক আক্রমনে পড়ে গেলেও হাতের রিভলবার ছিটকে যায়নি হাত থেকে।

লোকটি যখন আহমদ মুসার উপর চেপে বসেছিল, তখন আহমদ মুসার ডান হাত লোকটির পেছন দিক দিয়ে লোকটির পিঠে রিভলবারের ব্যারেল ঠেকিয়ে গুলী করল।

উল্টে পড়ে গেল লোকটি আহমদ মুসার উপর থেকে।

আহমদ মুসা লোকটির স্টেনগান কুড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। এগুলো বাড়ির দিকে বিড়ালের মত নিঃশব্দে, দ্রুত।

পেছন দিক দিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢোকার প্রাইভেট দরজা রয়েছে যা বাড়ির লোকই শুধু মাঝে মধ্যে ব্যবহার করে থাকে।

আহমদ মুসা এগুলো সেই দরজার দিকে।

এক হাতে স্টেনগান ধরে, অন্য হাত মাটিতে ঠেস দিয়ে উবু হয়ে হাঁটছিল আহমদ মুসা। একটা ঝাউ গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো সে। ঝাউ গাছটা পার হলেই দরজা দেখা যাবে। আহমদ মুসা দ্রুত হাঁটছিল। ঝাউ গাছ পার হতেই একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেল এক স্টেনগানধারীর।

সে তাঁর স্টেনগান বাগিয়ে ওঁত পেতে দাড়িয়ে ছিল। আহমদ মুসাকে দেখতে পাওয়ার সাথে সাথে তাঁর স্টেনগানের ব্যারেল নড়ে উঠল।

আহমদ মুসা এর অর্থ বোঝে।

সংগে সংগেই আহমদ মুসা দু'হাতে স্টেনগান ধরে মাটিতে ছিটকে পড়ল।

আহমদ মুসা মাটিতে পড়তে মুহূর্ত দেরি হলেই তাঁর দেহ ঝাঁঝরা হয়ে যেত স্টেনগানের গুলীতে।

আহমদ মুসা মাটিতে পড়েই স্টেনগানের ট্রিগার টিপল লোকটিকে লক্ষ্য করে।

লোকটি স্টেনগানের টার্গেট ঘুরিয়ে নিতে যে বিলম্ব করেছিল, সেই সময়ের মধ্যে তার দেহ আহমদ মুসার গুলীর মুখে পড়ে গেল।

আহমদ মুসা ছুটল দরজার দিকে।

এ দরজা দিয়ে আগে বেরিয়েছে এবং ঢুকেছে আহমদ মুসা। সে জানে এ দরজা খোলার কৌশল।

আহমদ মুসা ছুটে গিয়ে দরজার ইস্পাতের চৌকাঠের উপর দাড়িয়ে জোরে চাপ দিল। সংগে সংগে দরজা খুলে গেল।

দরজাটি আসলে লিফটের দরজা। দরজা পেরিয়ে আহমদ মুসা লিফটে গিয়ে দাঁড়ালো।

লিফটা প্রচলিত সুইচ অফ-অনে চলে না। এর নিজস্ব জেনারেটর আছে। সে জেনারেটরের জন্য স্বতন্ত্র সুইচ রয়েছে, যাতে কোন ইনডিকেশন লেখা নেই। এ সুইচ অনের পর লিফটের সুইচ অন করে লিফট চালু করা যায়। আহমদ মুসা আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করল যে কৌশলটা তাঁর আগে থেকেই জানা আছে।

প্রফেসর আরাপাহোর বাড়ি তিনতলা। গ্রাউন্ড ফ্লোরে রান্না-বান্নার ব্যবস্থা, সার্ভেন্টস কোয়ার্টার, ইত্যাদি। দ্বিতীয় ফ্লোরে থাকে প্রফেসর আরাপাহোর পরিবার। আর তৃতীয় ফ্লোরে গেস্টরুম, স্টাডি রুম ধরনের ঘর।

কান্না-কাটি হচ্ছে দ্বিতীয় তলায়। আহমদ মুসা দু'তলার লিফট থেকে নামল। কথার শব্দ আসছে হল রুমের দিক থেকে।

আহমদ মুসা তাঁর ডান হাতে স্টেনগান এবং বাম হাতে রিভলবার বাগিয়ে বিড়ালের মত করিডোর ধরে এগুলো হল রুমের লক্ষ্যে।

এ সময় আহমদ মুসা তাঁর ঠিক পেছনেই পায়ের শব্দ শুনতে পেল। মনে হলো কেউ কোন দেয়ালের আড়ালে ওঁত পেতে ছিল তার জন্য। তারপর আওতার মধ্যে তাকে এনে পিছু নিয়েছে শিকারকে খেলিয়ে মারার জন্য।

আহমদ মুসা শব্দ শোনার সাথে সাথে ভাবল তাঁর পিছনের ফিরবার সময় নেই। অতএব সে বজ্রের ঝলকের মত মাথাটা পেছনে মাটির দিকে ছুড়ে দিল এবং পা দুটোকে লোহার দুই শলাকার মত উপরে তুলে আঘাত করল পেছনের শব্দ লক্ষ্যে।

আন্দাজের এ আক্রমন বৃথা গেলনা। পা দুটো স্টেনগানধারী একজন গরিলা-মার্কা লোকের একদম মুখে গিয়ে সজোরে আঘাত করেছে। লোকটি আকস্মিক এই আঘাতে চিত হয়ে পড়ে গেছে মাটিতে।

আহমদ মুসা তাঁর পা দিয়ে আঘাত করে মাটি থেকে দক্ষ এ্যাক্রোব্যাটের মত উঠে দাড়িয়ে ঝাপিয়ে পড়ল লোকটির উপর।

গরিলা সদৃশ লোকটিও ঝাপটে ধরল আহমদ মুসাকে।

আহমদ মুসার হাত থেকে স্টেনগান ছিটকে পড়েছিল, কিন্তু রিভলবারটা ছিটকে যায়নি।

আহমদ মুসা বুঝে নিয়েছিল এই গরিলা লোকটিকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে কাবু করতে সময় লাগবে; কিন্তু এই সময় তাঁর হাতে নেই।

আহমদ মুসা লোকটির উপর ঝাপিয়ে পড়ে ডান হাত দিয়ে তাঁর গলা চেপে ধরতে এবং বাম হাতের রিভলবার কাজে লাগাতে চেষ্টা করছিল। আর

লোকটি আহমদ মুসাকে দু'হাতে বুকে জাপটে ধরে আহমদ মুসাকে ঘুরিয়ে নিয়ে তাঁর বুকে চেপে বসার চেষ্টা চালাচ্ছিল।

আহমদ মুসার ডান হাতের সমস্ত শক্তি লোকটির গলা চেপে ধরার কাজে কেন্দ্রিভুত হওয়ায় এবং বাম হাতটির রিভলবার কাজে লাগাবার চেষ্টায় ব্যস্ত থাকায় শরীরের অবশিষ্ট অংশটা হালকা হয়ে গিয়েছিল। তাই লোকটি সহজেই আহমদ মুসার দেহ ঘুরিয়ে নিয়ে মাটিতে তাঁর উপর বসতে সফল হচ্ছিল।

কিন্তু আহমদ মুসার বাম হাত তার আগেই রিভলবারের নল একেবারে লোকটির মাথায় সেট করে গুলী করতে সফল হল।

গুলিবিদ্ধ লোকটির গুড়ো হয়ে যাওয়া মাথাটি ঝরে পড়ল আহমদ মুসার উপর।

প্রথম ঘটনাতেই আহমদ মুসার বুক রক্তে ভিজে গিয়েছিল। এবার মুখ মাথার অঞ্চলটা এই লোকটির রক্তে বলা যায় গোসল হয়ে গেল।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়ালো। রিভলবার ও স্টেনগান কুড়িয়ে আবার এগুলো সেই হল রুমে দিকে।

হল রুমটি ফ্যামিলি ড্রয়িং রুম। আকারে বিরাট। সোফায় সজ্জিত। সাদা কার্পেটের উপর লাল সোফাগুলো গুচ্ছাকারে সাজানো। হল রুমটির চার দিকেই দরজা।

আহমদ মুসা বিড়ালের মত সন্তর্পণে পশ্চিমের দরজার আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো।

উকি দিল হল রুমের ভিতরে। দেখল, আর সামনেই বিশাল বপু তিনজন লোক ওগলালা, মেরী রোজ ও শিলা সুসানকে এক হাত দিয়ে বগল দাবা করে ধরে আছে।অন্যহাতে তাঁদের স্টেনগান। আরও কিছু সামনে সামরিক সাজের মত করে সজ্জিত একজন লোক দু'হাতে দুই রিভলবার নিয়ে তাক করে আছে জিভারো ও সান ওয়াকারকে।

জিভারো ও সান ওয়াকার দু'জনেই আহত। সম্ভবত তাঁরা প্রথমে মারামারি করেছে হানাদার লোকদের সাথে। দু'জনেরই মাথা-মুখ রক্তাক্ত।

কথা বলছিল সামরিক সাজের মত সাজে সজ্জিত নেতা গোছের লোকটি।

এ সময় বাইরে থেকে ভেসে এলো স্টেনগানের একটানা শব্দ।

লোকটি কথা থামিয়ে মুহূর্তের জন্যে একটু উৎকর্ণ হয়ে হাসি মুখে আবার কথা শুরু করল, 'শোন প্রফেসর, আমি যে কমান্ডো দল নিয়ে এসেছি তাঁরা ইচ্ছা করলে তোমাদের চিনকের গোটা পুলিশ দলকে তাঁদের ব্যারাকে গিয়ে খতম করে আসতে পারে। এখন শোন, আমি আর সময় দেব না। আমি তিন পর্যন্ত গুনব। এর মধ্যে যদি তুমি আহমদ মুসা কোথায় আছে বা কোথায় লুকিয়ে রেখেছ তা না বল, তাহলে তোমাদের এই তিন মেয়ে ঐ তিনজনের দ্বারা ধর্ষিতা হবে এবং গুলী করে হত্যা করব জিভারোকে।'

বলে সে গুনা শুরু করল, 'এক...দুই...

দুই পর্যন্ত গুনতেই নড়ে উঠল প্রফেসর আরাপাহোর দেহ। দুই চোখ তাঁর ভয়ে বিস্ফরিত। ঠোট দু'টি ফাক হল তাঁর। বলে ফেলবে নাকি সে?

চিৎকার করে উঠল জিভারো এবং ওগলালা, না আব্বা আপনি বলবেন না, কোন কিছুর বিনিময়েই নয়। আমরা মরতে চাই...

তাঁদের কথা শেষ হলো না তাঁর আগেই নেতা লোকটির কণ্ঠে উচ্চারিত হলো-'তিন....'

তিন গুনার সংগে সংগেই নড়ে উঠল নেতা লোকটির রিভলবার জিভারোকে লক্ষ্য করে এবং ওঁরা তিনজন ওগলালা, মেরী রোজ ও শিলা সুসানকে আছড়ে ফেলল মাটিতে এবং ঝাপিয়ে পড়ল তাঁদের অপর ক্ষুধার্ত হায়েনার মত।

আহমদ মুসার বাম হাতের রিভলবার প্রস্তুত ছিল। নেতা লোকটির তর্জনী তাআর রিভলবারের ট্রিগারে চেপে বসার আগেই আহমদ মুসার শাহাদাত আঙুল তাঁর রিভলবারের ট্রিগারে চেপে বসল পর পর দু'বার।

আহমদ মুসার নিক্ষিপ্ত গুলী দুটি নেতা লোকটির ডান ও বাম হাতের কব্জিতে গিয়ে বিদ্ধ হলো। খসে পড়ল তাঁর দুই হাত থেকে দুটি রিভলবার।

পর পর দুইটি গুলী করার পর আহমদ মুসার রিভলবার থেমে যায়নি। তাঁর বাম হাতের সেই রিভলবারটি পর পর আরও তিনবার অগ্নি বৃষ্টি করল। গুলী তিনটি তিন নারী দেহের উপর ঝাপিয়ে পড়া তিনজনের মাথা গুড়িয়ে দিল। আহমদ মুসা ঘরে ঢুকল।

পালাচ্ছে নেতা গোছের লোকটি।

আহমদ মুসা তাঁর দিকে স্টেনগান তাক করে বলল, 'এক ইঞ্চি নড়বে না। স্টেনগানের সবগুল বুলেট ঢুকিয়ে দেব তোমার দেহে। আর পালাবে কোথায়? তোমার সাধের কমান্ডোরা তোমার কোন সাহায্যে আসবে না। তিনজনকে আমি মেরে এসেছি। এখানে তিনজন মরল। বাকী থাকে আর নয়জন। ওঁরা পুলিশের হাতে শেষ হবে, না হয় বন্দী হবে। সুতরাং পালানো আর হচ্ছেনা তোমার। মারবও না তোমাকে। সাক্ষী হিসাবে তোমাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই'।

বলে আহমদ মুসা দুই ধাপ এগিয়ে নেতা গোছের লোকটির মাথায় স্টেনগানের নল ঠেকিয়ে এক ধাক্কা দিল। পড়ে গেল লোকটি চিত হয়ে।

'জিভারো। ওঁর পা দুটি বেধে ফেল'। বলল আহমদ মুসা।

জিভারো বেধে ফেলল লোকটিকে।

ওগলালা, মেরী রোজ ও শিলা সুসান উঠে দাঁড়িয়েছে। জিভারো ও সান ওয়াকার এসে জরিয়ে ধরল আহমদ মুসাকে। তাঁরা বলল, 'ভাইয়া, আপনি রক্তাক্ত, আপনি আহত? আপনি ভালো আছেন?

ওগলালা, মেরী রোজ ও শিলা সুসান পাশাপাশি দাড়িয়ে। গড়িয়ে পরছে তাঁদের চোখ থেকে নীরব অশ্রুর প্লাবন। চোখ ভরা তাঁদের রাজ্যের মায়া, রাজ্যের কৃতজ্ঞতা।

অশ্রু গড়াচ্ছিল প্রফেসর আরাপাহোর চোখ থেকেও।

এ সময় কয়েকজন পুলিশ সহ ঘরে ঢুকল পুলিশ প্রধান চিনক।

সে ঘরের চারদিকে একবার তাকিয়ে ছুটে এলো আহমদ মুসার কাছে। বলল, 'আপনি আহত? আপনি ঠিক আছেন তো?'

'না। আমি সম্পূর্ণ ঠিক আছি'। বলল আহমদ মুসা।

পুলিশ প্রধান চিনক জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে। বলল, 'আপনাকে অভিনন্দন। বাইরে ওদিকে আরও তিনটি লাশ দেখে এলাম। নিশ্চয়ই আপনার হাতেই ওঁরা মরেছে। সব পুলিশ মিলে আমরা যা করেছি। আপনি একাই তা করেছেন। তাঁর উপর নেতাকে করেছেন বন্দী। আপনাকে অভিনন্দন'।

'এসব থাক। বাইরে কি অবস্থা জ্বনাব?'

ম্লান মুখ হল চিনকের। বলল, 'আমাদের দশজন পুলিশ মারা গেছে। আর পুলিশের হাতে মরেছে নয়জন কমান্ডো'।

'দুঃখিত দশজন পুলিশের জীবনহানীতে'। বলল আহমদ মুসা।

'আমি গর্ব বোধ করছি আমার পুলিশের জন্য'। চিনক বলল।

চিনক থামতেই আহমদ মুসা বলল, 'এখনি যেতে হবে রেস্ট হাউজে। মিঃ ডেভিডকে গ্রেপ্তার করতে হবে। পাশের ঘরে আইজ্যাক মুক্ত অবস্থায় আছেন। এ খবর নিশ্চয় সেখানে পৌঁছে গেছে। ডেভিডকে না পেলে খবরটা আইজ্যাককেই তাঁরা দিবে। আইজ্যাক ডেভিডের ঘরে ঢুকতে পারে তাকে খোঁজ করার জন্যে। সুতরাং তাড়াতাড়ি চলুন'।

বলে আহমদ মুসা প্রফেসর আরাপাহোর দিকে চেয়ে বলল, 'জনাব আমরা একটু রেস্ট হাউজ থেকে আসি। এখানে কিছু পুলিশ পাহারায় থাকবে।'

জিভারো ও সান ওয়াকার বলল, 'আমরা আপনার সাথে যাব?'

'ঠিক আছে।' আহমদ মুসা বলল।

'আমিও শরীক হতে চাই একটু।' বলল প্রফেসর আরাপাহো।

একটু ভেবে আহমদ মুসা বলল, 'ঠিক আছে।'

'তাহলে আমরা একা এ বাড়িতে থাকছিনা। আমরাও যাব।'

'ঠিক আছে এস'।

পুলিশ রেস্ট হাউজ ঘিরে ফেলল। আহমদ মুসা ও পুলিশ প্রধান চিনক এবং অন্যান্যরা যাচ্ছিল মিঃ ডেভিডের কক্ষের দিকে।

এ সময় রক্তাক্ত নাভাজো ছুটে এল আহমদ মুসা ও পুলিশ প্রধানের কাছে। বলল, 'স্যার মিঃ ডেভিড ও আইজ্যাক পালিয়েছে। খবর পাওয়ার পর আইজ্যাক গিয়ে মুক্ত করেছে ডেভিডকে। তারপর তাঁরা ছুটে গেছে হেলিকপ্টারের দিকে। আমি বাঁধা দিতে চেষ্টা করেছি। আমাকে গুলী করে ওঁরা পালিয়েছে। কিন্তু স্যার হেলিকপ্টার এখনও উড়েনি'।

'তাহলে হেলিকপ্টার খারাপ নাকি?' বলেই আহমদ মুসা পুলিশ প্রধান চিনককে বলল, 'চলুন, শীঘ্র।'

সবাই ছুটল ওদের হেলিকপ্টার যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে।

# ৭

হেলিকপ্টারের কাছাকাছি যখন ওঁরা পৌঁছল, তখন হেলিকপ্টার মাটি ছেড়ে আকাশে উড়ল।

একটা অট্টহাসি শোনা গেল সেই সাথে। একটা উচ্চস্বর ধ্বনিত হলো। সম্ভবত লাউড স্পীকারে কথা বলা হচ্ছে। কণ্ঠটি মিঃ ডেভিডের।

বলল, 'আহমদ মুসা, আমি তোমার জন্যই অপেক্ষা করছি। একটা সুখবর দেয়ার জন্য। সেই সাথে বলার জন্যে যে, এই যুদ্ধই শেষ যুদ্ধ নয়। তোমার জন্য সুখবর এই যে, এই মাত্র আমি জর্জ ফার্ডিন্যাডের কাছ থেকে খবর পেলাম যে, তোমার ডাঃ মার্গারেট এবং তোমার লায়লা জেনিফারকে আমেরিকায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। তাঁরা এখন আমাদের সন্মানিত মেহমান। সন্মানিত থাকবে তাঁরা আগামী পনের দিন। যদি আজ থেকে পনের দিনের মধ্যে তুমি আত্নসমর্পন না করো, তাহলে গণ ধর্ষণে নিহত ডাঃ মার্গারেট ও লায়লা জেনিফারের লাশ পড়ে থাকবে মিয়ামি বিচে।'

বলেই আবার হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল মিঃ ডেভিড ওরফে ডেভিড গোল্ড ওয়াটার। বলল আবার, 'আসি আহমদ মুসা। দেখা হবে আবার নতুন রণাঙ্গনে। যত রক্ত তুমি বইয়েছ, প্রতি ফোটার প্রতিশোধ নিব আমি।' কণ্ঠ থেমে গেল আবার এক অট্টহাসির মাধ্যমে।

উড়ে চলল হেলিকপ্টার। অদৃশ্য হল কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই।

পুলিশ প্রধান চিনকের চোখ দু'টি বিস্ময়ে বিস্ফরিত। তাঁর দুচোখ নিবদ্ধ আহমদ মুসার প্রতি। যেন গিলছে তাকে। বলল সে, 'জনাব, উনি যা বলছেন তা সত্যি? আপনি আহমদ মুসা?'

সংগে সংগেই চিনক আহমদ মুসার পায়ের উপর ঝুকে পড়ে দুই হাত দিয়ে আহমদ মুসার পদধূলি নিল আহমদ মুসা কিছু বুঝে উঠার আগেই।

তারপর উঠে দাড়িয়ে চিনক কয়েক ধাপ পিছিয়ে গিয়ে পা মাটিতে ঠুকে হাত কপালে তুলে আহমদ মুসাকে সামরিক স্যালুট করল। বলল, 'আপনাকে অভিনন্দন, স্বাগত আপনাকে আমাদের মাঝে পেয়ে। আপনি আমাদেরও নেতা।'

আহমদ মুসা কিছু বলল না। এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরল চিনককে। বলল, 'আমি কারোই নেতা নই। আমি আল্লাহ্‌র একজন বান্দা। আল্লাহ্‌র মজলুম বান্দাদের আমি সেবক।'

প্রফেসর আরাপাহো পাশেই দাঁড়িয়েছে। বলল আহমদ মুসাকে, 'পুলিশ প্রধান চিনকের আরেকটা পরিচয় আছে। সে আমেরিকান ইন্ডিয়ান মুভমেন্টের(AIM) গোপন নেতাদের একজন। সে মুভমেন্টের নির্বাহী সেক্রেটারি জেনারেল।'

আহমদ মুসা অভিনন্দন জানাল তাকে আরেকবার বুকে জড়িয়ে ধরে।

'জনাব, ওঁরা যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ দিয়ে গেল যাদের কেন্দ্র করে, সেই ডাঃ মার্গারেট ও লায়লা জেনিফার কে?' বলল চিনক।

'সবই জানতে পারবেন। বলব সব'। আহমদ মুসা বলল।

সবাই চলা শুরু করল রেস্ট হাউজের দিকে।

আহমদ মুসার দু'পাশে হাঁটছিল সান ওয়াকার, জিভারো,ওগলালা, মেরী রোজ এবং শিলা সুসান।

'সুসান, তুমি বড় বিপদে পড়লে দেখছি।' আহমদ মুসা বলল।

'কেমন করে?'

'বাপ মেয়ের মধ্যে লড়াই বাধবে দেখছি।'

'ভাইয়া এ বিপদ কি ডাঃ মার্গারেট ও লায়লা জেনিফারের চেয়ে বড়?'

'তা নয়।'

'আমার পা কাপছে ভাইয়া একথা শোনার পর থেকে।'

আহমদ মুসা কোন কথা বলল না।

ওগলালা বলল, 'কি ভাবছেন ভাইয়া?' শুকনো কণ্ঠস্বর ওগলালার।

'ভাবছি নতুন লড়াই এর কথা। ভাবছি বোনদের-ভাইদের ছেড়ে যেতে হবে, সেই কথা।'

সবাই নীরব। কোন কথা বলল না কেউ। অনেকক্ষণ পর ওগলালাই বলল, ‘লড়াইয়ের ময়দান কারও একার নয় ভাইয়া।’

হাসল আহমদ মুসা। কোন কথা বলল না। তাঁর দৃষ্টি তখন সামনে। সম্ভবত পথ সন্ধান করছে সামনের অন্ধকারে।

সাইমুম সিরিজের পরবর্তী বই

# আমেরিকার এক অন্ধকারে

**কৃতজ্ঞতায়ঃ**

1. Mohammad Shameem
2. Amin Islam
3. Kayser Ahmad Totonji
4. Hm Zunaid
5. Ahsan Bandarban
6. Mohammed Sohrab Uddin
7. Md Amdadul Haque Swapan
8. Elias Hossain
9. Sadik Hasan

সাইমুম- ২৮

# আমেরিকার এক অন্ধকারে

আবুল আসাদ

# ১

অবিরাম কেঁদে চলছে লায়লা জেনিফার।

ডাঃ মার্গারেট বলল, 'এভাবে কাঁদলে মরার আগেই মরে যাবে জেনিফার। মৃত্যু অবধারিত একটি বিষয়। সুতরাং ভয় কিসের? কাঁদবে কেন?'

'আমি মৃত্যুকে ভয় পাই না আপা। ইতোমধ্যে যদি ওরা আমাকে মেরে ফেলত, তাহলে খুশী হতাম'।

'তাহলে আর ভয় কিসের? এত কাঁদছ কেন?'

লায়লা জেনিফার মুখ খুলতে যাচ্ছিল কিছু বলার জন্যে। দরজায় শব্দ শুনে থেমে গেল সে। দরজা খোলার শব্দ হলো।

ভয়ে মরার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল জেনিফারের মুখ। সে ডাঃ মার্গারেটের পা ঘেঁষে বসল।

ডাঃ মার্গারেট জেনিফারের পিঠে সান্ত্বনাসূচক একটা হাত রাখল।

দরজা খুলে গেল। খাবারের ট্রলি ঠেলে প্রবেশ করল একজন। তার পেছনে আরেকজন। তার কোমরে রিভলবার ঝুলানো। হাতে একটা ওয়াকিটকি। সুবেশধারী লোকটি।

লোকটি চকচকে চোখে লায়লা জেনিফার ও ডাঃ মার্গারেটের দিকে তাকাল। লায়লা জেনিফারকে লক্ষ্য করে বলল, ‘বিনা কারণে কাঁদলে, কারণের সময় কাঁদার জন্যে চোখে পানি পাবেন কোথায়?’

ডাঃ মার্গারেট ও লায়লা জেনিফার কোনো কথা বলল না। মুখও তুলল না তারা। তাদের, বিশেষ করে লায়লা জেনিফারের অবস্থা আড়ষ্ট।

বলল লোকটাই আবার, ‘খুব তো ভয় দেখছি। আহমদ মুসার সংস্পর্শে যারা আসে, তাদের তো এমন ভয় থাকার কথা নয়। ভয়ংকর আহমদ মুসার পাল্লায় পড়েছিলেন আপনারা কেমন করে?’

ডাঃ মার্গারেট চকিতের জন্যে একবার মুখ তুলল। কিন্তু দু’জনের কেউই কোন উত্তর দিল না। কি বলবে তারা? আহমদ মুসা তো ভয়ংকর নয়, আল্লাহ তো তাকে ত্রাণকর্তা হিসেবে পাঠিয়েছেন। কিন্তু একথা তো বলা যাবে না। সুতরাং কিছু না বলাই ভালো।

ক্রোধে লোকটির মুখ লাল হয়ে উঠল। বলল সে চিৎকার করে, ‘কথা বলতে হবে। যাক না পনেরটা দিন। বসের নির্দেশ পনের দিন গায়ে হাত দেয়া যাবেনা। পনের দিনের মধ্যে যদি আহমদ মুসা আত্মসমর্পন না করে, তাহলে তোমরা আমাদের। তোমাদেরকে আমাদের হাতে তুলে দেবেন বস গণ-উৎসব করার জন্যে’।

ট্রলি ঠেলে নিয়ে আসা লোকটি খাবার নামিয়ে রেখেছে মেঝেতে। ট্রলি ঠেলে সে বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে।

লোকটি কথা শেষ করেই ঘুরে দাঁড়াল ঘর থেকে বেরুবার জন্যে। যাবার জন্যে পা তুলে একটু মুখ ঘুরিয়ে লোভাতুর দৃষ্টি ডাঃ মার্গারেট ও লায়লা জেনিফারের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, ‘কয়দিন খেয়ে-দেয়ে তৈরী হয়ে নাও ডার্লিং’।

বেরিয়ে গেল লোকটি। দরজা বন্ধ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গেই।

লোকটি কি বলছে বুঝতে বাকি ছিল না কারোরই। কাঁপছিল লায়লা জেনিফার।

ডাঃ মার্গারেটের চোখেও আতংকের ছায়া। তবু লায়লা জেনিফারের দিকে চেয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল, 'যারা অসহায়, তাদের আল্লাহ আছেন'।

'আলহামদুলিল্লাহ'। চোখ মুছে বলল লায়লা জেনিফার।

বলে একটু থেমেই আবার শুরু করল, 'পনের দিনের মধ্যে আত্মসমর্পনের কথা নিশ্চয় ওরা আহমদ মুসাকে বলেছে'।

'অবশ্যই'।

'আহমদ মুসা কি করবেন বলে মনে করেন?' শুকনো কন্ঠে বলল লায়লা জেনিফার।

মুখ ম্লান হয়ে গেল ডাঃ মার্গারেটের। তার মনেও এই প্রশ্নটাই বড় হয়ে উঠল। আহমদ মুসার মুখটি ভেসে উঠল তার চোখের সামনে। হৃদয়ের কোথাও চিন চিন করে উঠল পরিচিত সেই বেদনা। আবার আগের মতই চমকে উঠল সে। এই অন্যায় চিন্তাকে সে ভয় করে এবং মনের আড়ালে রাখতে চেষ্টা করে। কিন্তু সুযোগ পেলে চিন্তাটা মাথা তোলে এবং তাকে বিব্রত করে। আহমদ মুসা হিমালয়ের মত উঁচু এক ব্যক্তিত্বই শুধু নন, ডোনা জোসেফাইনের আহমদ মুসাকে নিয়ে তার ভাববার অধিকার কোথায়? চোখ দুটি ভারি হয়ে উঠল ডাঃ মার্গারেটের।

বলল মার্গারেট ধীরে ধীরে, 'যিনি নিজের চেয়ে পরের কথা বেশী ভাবেন, তিনি কি করতে পারেন তা বলা খুব সহজ নয় কি?'

'তার মানে তিনি আত্মসমর্পণ করবেন?'

'তা জানি না। এটুকু আমরা বলতে পারি যে, তিনি আসবেন'। বলল ডাঃ মার্গারেট।

আসার অর্থ দুটোই হতে পারে। আমাদের উদ্ধারের জন্যে তিনি লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়বেন অথবা ওদের দাবী অনুসারে নিজেকে তিনি ওদের হাতে তুলে দেবেন'। বলল লায়লা জেনিফার।

'ঠিক'।

বলে একটু থেমে আবার শুরু করল মার্গারেট, 'একটা জিনিস আমার কাছে খুব স্পষ্ট নয়। আহমদ মুসাকে ধরার জন্যে আমাদের পোর্ট বানানো কেন?'

আমরা তাঁকে চিনি, জানি। কিন্তু গোল্ড ওয়াটাররা কেমন করে ধরে নিল যে, আমাদের আটকালেই আহমদ মুসাকে আত্মসমর্পনে বাধ্য করা যাবে?'

'কেন, আহমদ মুসাই তো আপনাকে দুঃসাহসিক ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধার করেছিলেন'।

বলে একটু থামল লায়লা জেনিফার। তার বেদনা পীড়িত ঠোঁটে এক টুকরো মিষ্টি হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'শোনেননি, এরা কি বলে? ওদের ধারণা আপনাদের মধ্যে গভীর একটা সম্পর্ক আছে যা আহমদ মুসাকে এদিকে টেনে আনবেই'।

ডাঃ মার্গারেটের হৃদয়টা কেঁপে উঠল। তার মুখের উপর দিয়ে লজ্জার লাল আভা খেলে গেল। সেই সাথে বিব্রত একটা ভাবও ফুটে উঠল তার চোখে মুখে।

কিন্তু মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে প্রসঙ্গটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেবার জন্যে বলল, 'আসলে ভূল আমাদের। তোমার বাইরে না বেরুবার এবং আমার হাসপাতালের চাকরিতে যোগ না দেবার জন্য তাঁর কঠোর নির্দেশ ছিল। তাঁর আদেশ উপেক্ষা করে আমরা বিপদে পড়েছি। তাঁকেও বিপদগ্রস্ত করেছি'।

'ভূল বটে, তবে সেখানকার অবস্থা তো স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল। ঐ অবস্থায় ঘরে আবদ্ধ থাকার কি যুক্তি ছিল?' বলল লায়লা জেনিফার।

'যুক্তি যে ছিল তা এই বিপদ ঘটার পর তো প্রমাণিত হলো। আমি ভাবছি, জর্জও না আবার কোন বিপদে পড়ে'। ডাঃ মার্গারেট বলল।

ডাঃ মার্গারেট জর্জের নাম উচ্চারণ করতেই মুহূর্তে লায়লা জেনিফারের মুখ আঁধারে মেঘের মত হয়ে গেল। বেদনায় নীল দেখালো ওর চেহারা। ধীরে ধীরে বলল, 'ওর কথা ভুলে থাকতে চাই আপা। মনে হলে বুক কাঁপে। বুদ্ধির চেয়ে শক্তির উপর সে নির্ভর করতে চায় বেশী। জানি না সে কি করছে'। বলে কান্না রোধের চেষ্টায় দু'হাতে মুখ ঢাকলো লায়লা জেনিফার।

নরম কন্ঠে সান্ত্বনার সুরে ডাঃ মার্গারেট বলল, 'আল্লাহর উপর ভরসা করা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই। জর্জের জন্যে তুমি ভেব না। আহমদ মুসার সাথে যোগাযোগ না করে সে কিছু করবে না'।

‘আমাদের এই আচরণে আহমদ মুসা ভাই নিশ্চয় খুব বিরক্ত হবেন। তার এই বিরক্তির চেয়ে আমাদের মৃত্যুই ভাল ছিল। আহমদ মুসা ভাইকে এর মধ্যে না জড়িয়ে ওরা যদি আমাদের মেরে ফেলত সেই ভাল ছিল’। বলল লায়লা জেনিফার।

‘ঠিক আমিও এটাই ভাবছি। কিন্তু শয়তানদের মতলব ভিন্ন। ওরা তো আমাদের মারবেই, আহমদ মুসাকেও ফাঁদে আটকাবে’।

‘এটা নিশ্চয়ই আহমদ মুসা ভাই জানেন। তাহলে তিনি শুধু শুধু ফাঁদে পড়তে আসবেন কেন?’

‘নিশ্চয়ই ওদের ফাঁদে পড়তে নয়, আমাদের উদ্ধার করতে আসবেন’।

লায়লা জেনিফারের চোখে মুখে আরও একরাশ বেদনা এসে ছড়িয়ে পড়ল। বলল আর্তস্বরে, ‘আমাদের উদ্ধার করার জন্যে এই বিপদে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়বেন, এই কথা মনে হতেই বুক ফেটে যায়। কে আমরা? সামান্য দু’জন নারী। আমাদের মত হাজার জন মারা গেলেও পৃথিবীর কোন ক্ষতি হবে না’। থামল লায়লা জেনিফার।

একটা করুণ হাসি ফুটে উঠল ডাঃ মার্গারেটের মুখে। বলল ভেজা গলায়,'লায়লা তুমি ঠিক বলেছ। কিন্তু এ কথা বুঝাবে কে তাঁকে!’

‘অজানা অচেনা লায়লা জেনিফারের একটা চিঠি যাঁকে সুদূর মধ্যপ্রাচ্য থেকে টেনে আনতে পারে এই আমেরিকায়, তাঁকে এ কথা বুঝানো লাগে কি?’

‘এত কিছু ঘটবে তা কি জানতাম। জানলে তাঁকে কি ডাকতাম!’ লায়লা জেনিফার বলল।

‘তুমি ডাকনি, আল্লাহ ডেকেছিল। তুমি একটা উপলক্ষ মাত্র। আল্লাহ তাঁকে দিয়ে আমেরিকায় কিছু করতে চান। ভেবে দেখ আমাদের টার্কস দ্বীপপুঞ্জের কথা। এখানকার দুর্বল মুসলমানরা তাদের অস্তিত্ব বিলোপকামী ভয়াবহ ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা পাবে, জাতি গোষ্ঠীসহ সারা দুনিয়া এদের নিরাপত্তা বিধানে ছুটে আসবে। এটা কি কল্পনাও করতে পেরেছ? যা কল্পনা করনি, তাই ঘটেছে। তাঁর বুদ্ধি ও দূরদর্শিতা দিয়ে এটা তিনি ঘটিয়েছেন। আল্লাহ তাঁকে দিয়ে আরও কিছু ঘটাবেন আমেরিকায়’।

‘আপনার কথা সত্য হোক। এ বিপদ থেকে আল্লাহ্‌ তাঁকে উদ্ধার করুন’। জেনিফার বলল।

‘আমিন’। বলল মার্গারেট।

কথা বলছিল ইহুদী গোয়েন্দা প্রধান জেনারেল আইজ্যাক শ্যারন এবং শুনছিল মার্কিন ফেডারেল ব্যুরো এবং ইন্টেলিজেন্সের প্রধান জর্জ আব্রাহাম জনসন।

দীর্ঘ বক্তব্য শেষ করে থামল জেনারেল আইজ্যাক শ্যারন।

ঠোঁটে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠেছে জর্জ আব্রাহাম জনসনের। বলল, ‘আপনি যা বললেন, তার দু’একটা বিচ্ছিন্ন চিত্র আমাদের কাছেও এসেছে। তার মধ্যে রয়েছে কয়েকটা হত্যাকান্ডের ঘটনা। ওসবের সাথে গোল্ড ওয়াটারের সংশ্লিষ্ট থাকার বিষয়টা আঁচ করা গেছে। গোল্ড ওয়াটারের সাথে আপনাকেও দেখা গেছে। কিন্তু আপনি এসবের সাথে সংশ্লিষ্ট আছেন, এটা আমাদের কাছে নতুন’।

‘স্যরি। আহমদ মুসাকে হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছি, এই টেনশনে এত ব্যস্ত ছিলাম যে সৌজন্যমূলক একটু ‘হ্যালো’ বলব তারও সুযোগ পাইনি’। বলল জেনারেল শ্যারন।

‘তা আমি বুঝেছি। আহমদ মুসা এখন আপনাদের কাছে সাত রাজার ধন। কিন্তু বলুন তো, এক ব্যক্তির উপর এতটা ক্ষ্যাপা, একটু বেশী বেমানান নয় কি?’

‘যে আপরাধে আপনারা একটা ভিন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান নরিয়েগাকে ধরে এনে সারা জীবনের জন্যে জেলে ঢুকিয়ে দিলেন, তার চেয়ে হাজারগুণ, লক্ষগুণ বেশী অপরাধ করেছে সে আমাদের কাছে। আমাদের রাষ্ট্র ইসরাইল সে ধ্বংস করেছে এবং কেড়ে নিয়েছে আমাদের হাত থেকে। তারপরও কত ঘটনায়, কত লোক আমাদের শেষ হয়েছে ওর জন্যে, তার হিসেব কষলে আতংকিত হতে হয়।

তাকে একবার নয় শতবার হত্যা করলেও তার অপরাধ শেষ হবে না। কিন্তু আমরা তাকে হত্যা করব না। তাকে পণবন্দী করে যতটা পারা যায় আমাদের রাজনৈতিক স্বার্থ আমরা হাত করতে চাই আরবদের কাছ থেকে'।

'আমাদের আপত্তি নেই। এখন বলুন কি সাহায্য আপনি চান এফ. বি. আই (FBI) এর কাছে থেকে? বলল জর্জ আব্রাহাম জনসন।

'আহমদ মুসাকে খোঁজা এবং তাকে গ্রেপ্তার করার জন্য আপনাদের সাহায্য চাই'।

একটু চিন্তা করল জর্জ আব্রাহাম জনসন। বলল, 'কোন বড় অনুরোধ এটা নয়। কিন্তু গ্রেপ্তারের পেছনে এফবিআই এর লিগ্যাল গ্রাউন্ডটা কি হবে। তার বিরুদ্ধে আমাদের কাছে কোন অভিযোগ নেই'।

'চমৎকার এক অভিযোগ আছে। বিনা ভিসায় তার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ। তাকে গ্রেপ্তারের জন্যে এটাই যথেষ্ট'।

হাসল আব্রাহাম জনসন। বলল, 'আপনি কি মনে করেন এর মধ্যে সে ভিসা জোগাড় করেনি?'

একটু বিব্রত হলো জেনারেল শ্যারন। সঙ্গে সঙ্গে কোন জবাব দিল না।

জর্জ আব্রাহাম জনসনই আবার মুখ খুলল। বলল, 'আমরা আহমদ মুসাকে যতটা জানি, তার চিন্তা চলে সময়ের অনেক আগে। আমি নিশ্চিত তার পাসপোর্টে ক্যারিবিয়ান স্টেটগুলোর সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা অবশ্যই আছে'।

'আমিও আপনার সাথে একমত হচ্ছি মিঃ জনসন। কিন্তু অবস্থা তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে?'

'সেটাই তো কথা। তার বিরুদ্ধে কি ধরনের অভিযোগ দাঁড় করানো যাবে?'

'খুব সহজ পথ আছে। সে টেররিস্ট গ্রুপের নেতা। সন্ত্রাস ও সংঘাত সৃষ্টির লক্ষ্য নিয়ে সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছে'।

‘দুনিয়া কি বিশ্বাস করবে আহমদ মুসা টেররিস্ট গ্রুপের সদস্য? সকলেই তো জানে এ পর্যন্ত কি কি কাজ সে করেছে। তাকে আর যাই হোক সন্ত্রাসী বলে চালানো যাবেনা’। বলল জর্জ আব্রাহাম জনসন।

‘কেন যাবে না? সে যে খুন জখমে জড়িত হয়ে পড়েছে কাহোকিয়ার কয়েকটা ঘটনা দিয়ে তা প্রমাণ করা যাবে। এ থেকে সহজেই অভিযোগ আনা যাবে যে, আমেরিকার মুসলমানদের সন্ত্রাসী তৎপরতায় সাহায্য করার জন্যে আহমদ মুসা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসেছে’।

হাসল জর্জ আব্রাহম জনসন। বলল, ‘কাহোকিয়ার পুলিশ কি রিপোর্ট দিয়েছে জানেন? বলেছে, শ্বেতাংগ সন্ত্রাসবাদী গ্রুপ হোয়াইট ঈগল কাহোকিয়ার হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত। একটা রেড ইন্ডিয়ান দৈনিক পত্রিকায় এ রিপোর্ট প্রকাশিত ও হয়েছে। সুতরাং কাহোকিয়া হত্যাকান্ডের দায় তার উপর চাপানো যাবে না’।

‘এফ বি. আই-এর অফিসিয়ালী তাকে ধরার দরকার নেই। আনঅফিসিয়ালী এফ.বি.আই. আহমদ মুসাকে ধরে দিতে আমাকে সাহায্য করুক। এর জন্যে যে খরচ হবে, সেটা আমি দেব’। বলল জেনারেল শ্যারন।

আবার হাসল জনসন। তারপর গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, ‘ঠিক আছে জেনারেল শ্যারন, খরচ তো আপনি দেবেনই’।

বলে একটু থামল জর্জ আব্রাহাম জনসন। একটু নড়েচড়ে বসল। বলল, ‘আহমদ মুসা মার্কিন রাজনীতির বন্ধু নয়। সুযোগ এলে আমরা তাকে ছাড়ব না। কিন্তু তার আগে তার গায়ে হাত দেয়া বিপদজনক হবে। মুসলিম দেশগুলোর প্রতিক্রিয়াকে অবশ্যই আমাদের হিসেব করতে হবে। তবে আনঅফিসিয়ালি আপনাকে সাহায্য আমরা করব। কিন্তু আহমদ মুসা আমেরিকায় আছে এটা গোপন থাকা প্রয়োজন। এতে কাজের সুবিধা হবে, আমাদের ঘাড়ে কোন প্রকার দায় চাপানোর ভয় থাকবে না’।

জেনারেল আইজ্যাক শ্যারন খুশী হয়ে একগাল হেসে বলল, ‘তার আসার ব্যাপারটা গোপনই আছে। সে, আমরা এবং আপনারা কেউই চাই না এটা প্রকাশ হোক। সুতরাং প্রকাশ হবে না’।

কি যেন বলতে যাচ্ছিল জর্জ আব্রাহাম জনসন। হঠাৎ কি মনে হওয়ায় সে থেমে গেল। চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে জর্জ জনসনের। বলল, 'জেনারেল শ্যারন, বিরাট একটা সুযোগ সামনে। আপনার ভাগ্য ভাল হলে খুব সহজেই আপনার কাজ উদ্ধার হয়ে যাবে'।

'কি সে সুযোগ?' দ্রুত কন্ঠে বলল সে। সোজা হয়ে বসল।

ওয়াশিংটন ডিসির গ্রীন ভ্যালিতে আমেরিকান মুসলিম সমিতি ও সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিদের নিয়ে সাত দিনব্যাপি একটা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এখানে আহমদ মুসা নিশ্চয়ই সবচেয়ে সম্মানিত একজন অতিথি হবেন। খোঁজার কষ্ট না করে ওখান থেকেই তাকে ধরতে পারেন'। বলল জর্জ আব্রাহাম জনসন।

জেনারেল শ্যারনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'ধন্যবাদ আপনাকে একটা মহা সুযোগের সন্ধান আপনি দিয়েছেন। ওখানে আহমদ মুসা না এসেই পারেনা'।

ভাবছিল জর্জ আব্রাহাম জনসন। বলল, 'আপনার জন্যে মহা সুযোগ বটে। তবে একটা সমস্যা আছে। আহমদ মুসার সন্ধান বা তাকে ধরতে গিয়ে সেখানে যদি হতাহতের ঘটনা ঘটে যায়, তাহলে মার্কিন সরকার বিপদে পড়তে পারে। বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা মুসলিম প্রেসও সেখানে থাকবে'।

'আপনারা যদি সহযোগিতা করেন, কোন হতাহতের ঘটনা ঘটার প্রশ্নই আসেনা'।

'না, ওখানে এফ.বি.আই পরিচয় দিয়ে আমাদের কোন লোক ধরপাকড়ে যেতে পারবে না। আগেই তো বলেছি, আহমদ মুসাকে এই মুহূর্তে এফ.বি.আই-এর সরাসরি গ্রেপ্তার করার বৈধ কারণ নেই, আর কারণ ছাড়া গ্রেপ্তার ও করা যাবেনা। বিশেষ করে এই সম্মেলন থেকে সুপরিচিত কোন মুসলিম নেতাকে'।

'তাহলে?'

'কাজ আপনাদের লোক দিয়েই করতে হবে। তথ্যাদি দিয়ে কিছু সাহায্য আমরা করতে পারি'।

সঙ্গে সঙ্গে কোন উত্তর দিল না জেনারেল শ্যারন। ভাবছিল সে। এক সময় বলল, 'সম্মেলনটা কবে?'

'আর সাতদিন পরে'।

'সম্মেলনে আমন্ত্রিত অতিথিদের একটা তালিকা আমাকে যোগাড় করে দিতে পারেন?'

'ওটা দিয়ে কি হবে? আহমদ মুসা নিশ্চয় স্বনামে সেখানে আসছে না'।

'আমার জানা দরকার আমেরিকা থেকে কারা সম্মেলনে আসছে। নিরাপদে কাজ উদ্ধারের একটা পথ তো বের করতেই হবে'।

'ঠিক। লিস্ট আমাদের কাছে আছে। দিয়ে দেব আপনাকে'।

'ধন্যবাদ'।

বলে একটু থেমে অবার শুরু করল জেনারেল শ্যারন, 'ভবিষ্যত প্রশ্নে একটা কথা আমি পরিষ্কার করে বলতে চাই, মুসলমানদের ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহনের ক্ষেত্রে পদে পদে আইন দেখার সত্যিই কি কোন প্রয়োজন আছে? আপনারা যদি সাবধান না হন তাহলে ইসলাম কিন্তু আমেরিকাকে গিলে ফেলবে। ইসলামী আদর্শের সাথে পেট্রোডলার যোগ হবার পর ইসলাম কিন্তু অপ্রতিরোধ্য হয়ে দাঁড়াবে'।

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সাম্প্রদায়িকতা কোন প্রকারে আমাদের কাছে ঘেঁসতে পারবেনা। কিন্তু মানুষের ইসলাম গ্রহন আমরা ঠেকাবো কি করে? মানবিক অধিকারে তো আমরা হস্তক্ষেপ করতে পারিনা'।

'যদি না পারেন, তাহলে ঠেকাবার দায়িত্বটা হোয়াইট ঈগলের হাতে ছেড়ে দিন'।

কথা শুনে হাসল জর্জ আব্রাহাম জনসন।

পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে উঠল জর্জ জনসনের মুখ। বলল, 'আমরা হোয়াইট ঈগলের কোন কাজে বাধা দেই না। কাহোকিয়ার ঘটনা নিয়ে হোয়াইট ঈগলের কোন লোককে আমরা সামান্য জিজ্ঞাসাবাদও করিনি। কিন্তু তারা বোকার মত যে সব কাজ করছে, তাতে তারাও ডুববে, আমাদেরকেও বিপদে ফেলবে। দেখুন, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে কি কাজটাই না করল তারা। করতে কিছু পারেনি, মাঝখান

থেকে মুসলিম দেশগুলোসহ গোটা দুনিয়া এলার্ট হয়ে গেল। বলা যায়, গোটা ক্যারিবিয়ান অঞ্চল ফসকে গেল হোয়াইট ঈগলের হাত থেকে'।

'তবু আমি মনে করি জনাব, হোয়াইট ঈগলই আপনাদের ভবিষ্যত। নতুন পরিকল্পনা নিয়ে হোয়াইট ঈগল আবার যাতে ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে বসতে পারে, সে সাহায্য আপনাদেরকেই করতে হবে'। বলল জেনারেল শ্যারন।

আবার হাসল জর্জ জনসন। বলল, 'মনে হচ্ছে হোয়াইট ঈগলের চেয়ে আপনার আগ্রহই বেশী?'

'কারণ আছে। আপনারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে না নামলে, আমরা তাদের সাথে এঁটে উঠতে পারছি না। এক আহমদ মুসাই তো আমাদের ডুবিয়েছে'। জেনারেল শ্যারন বলল।

'আপনার সাথে আমি একমত। ব্যক্তিগত কারণে আমি আরও বেশী একমত। কিন্তু......'

জেনারেল শ্যারণ জর্জ জনসনকে বাধা দিয়ে বলল, 'আপনার ব্যক্তিগত কারণ বুঝলাম না'।

হাসল জনসন। বলল, 'আমার মা ইহুদী ছিলেন। আমার মাতুল পরিবার ইসরাইলে ছিলেন। ফিলিস্তিন বিপ্লবের পর তাদেরকে ফিলিস্তিন ছাড়তে হয়েছে, কারণ তারা ১৯৪৮ সালের পর ফিলিস্তিনে বসতি স্থাপন করেছিলেন'।

আনন্দে চিৎকার করে উঠল জেনারেল শ্যারণ। বলল, 'তাহলে তো আমাদের লোক আপনি। আমাদের দুঃখ আপনাকে বুঝাবার কোন প্রয়োজন নেই। এখন বলুন কি করতে পারেন আমাদের জন্যে'।

'কি করতে পারব বলছি'।

বলে একটু থেমেই আবার শুরু করল, 'আপনার কথা যদি সত্য হয়, আহমদ মুসা যদি এসেই থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, আর আপনারা যদি তাকে কিছু করতেই চান, তাহলে মনে হয় একটা সংকটের সৃষ্টি হবে আমাদের জন্যে। বলছি, মুসলিম বিশ্বের সাথে আমাদের সম্পর্কের কারণে আহমদ মুসার মত ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া কিছুই করতে পারবেন না। আপনারা যদি

গোপনে তাকে ধরে নিয়ে যেতে পারেন, তাহলে ভাল। কিন্তু যদি হত্যার মত কিছু ঘটে যায়, তাহলে আমরা অসুবিধায় পড়তে পারি'।

'কেমন করে? কাউকে তো আমরা জানাচ্ছি না'।

হাসল জর্জ আব্রাহাম জনসন। বলল, 'আপনাদের কারো দ্বারা প্রকাশ হতে পারে, আবার এফ.বি.আই এর কারো দ্বারাও প্রকাশ হতে পারে। আহমদ মুসাদের সাথীদের দ্বারা তো প্রকাশ হতে পারেই'।

'তাতেই বা কি হবে? আহমদ মুসা অঘোষিতভাবে আমেরিকায় এসেছে। সুতরাং তার কোন দায়-দায়িত্ব মার্কিন সরকারের নেই। তার তো শত্রু কম নেই। কার দ্বারা কোথায় সে নিহত হলো তার দায় নিশ্চয় আপনাদের উপর বর্তাবে না'।

'তাত্ত্বিকভাবে আপনার কথা ঠিক। যুক্তি হয়তো আমাদের পক্ষে থাকবে। কিন্তু মুসলিম দেশগুলো বিশেষ করে কয়েকটি মুসলিম দেশ আমাদের মাফ করবে না'।

'মুসলিম দেশগুলোর কথা এত বলছেন কেন? ওদের কি আছে? ভয় কি ওদের?'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না জর্জ আব্রাহাম জনসন। একটু সময় নিয়ে ধীরে ধীরে বলল, 'ভয় নয়, ভাব রাখতে চাই, সাহায্য সহযোগিতা দেয়ার পরিবেশ রাখতে চাই। বলবেন, কেন? কারণ, আমরা যা চাই, তা যদি তাদের দিয়ে করাতে হয়, তাহলে ভাব রাখতে হবে, সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে তাদের মাঝে ঢোকার সুযোগও নিতে হবে'।

'হাসালেন আপনি। যারা নিজের পায়ে হাঁটতে পারে না, যারা নিজের হাতে খেতে পারে না, তাদের দিয়ে কি করাবেন?' বলল জেনারেল শ্যারন মুখে হাসি টেনে।

'দেখুন, নেকড়ে মহিষকে একা পেলে মুহূর্তেই কাবু করতে পারে, কিন্তু দশটি মহিষ এক হলে সিংহও সে বুহ্যে ঢুকতে পারে না। মুসলিম দেশগুলো ঐক্যবদ্ধ হতে পারলে ঐ দুর্বলরই মহা বলবান হয়ে যাবে। আমরা তা হতে দিতে পারি না। তাই আমাদের নাক কেটে হলেও ওদের যাত্রা ভঙ্গের ব্যবস্থা করছি'।

‘নাক কাটতে গিয়ে মাথাটাই আবার কেটে না ফেলেন’। হেসে বলল জেনারেল শ্যারন।

‘এর উত্তর দিতে হলে অনেক আলোচনায় যেতে হবে। আজ থাক এ প্রসংগ। বলুন, আর কোন কথা আছে?’ হাতঘড়ির দিকে চকিতে একবার চোখ বুলিয়ে বলল জর্জ আব্রাহাম জনসন।

‘তেমন নেই। শেষ কথাটা তাহলে কি দাঁড়াল?’ বলল জেনারেল শ্যারন।

‘আপনি কাজ শুরু করুন। অবস্থা কি দাঁড়ায় দেখুন। তথ্যাদি দিয়ে আমরা সাহায্য করব। একান্ত দরকার হলে এফ.বি.আই এর শীর্ষ অপারেটরদের একটা সশস্ত্র গ্রুপ আছে, তাদের কাজে লাগাব। তবু এফ. বি. আইকে সাধারণভাবে ব্যবহার করতে পারবো না। যেহেতু জানাজানি এড়াতে চাই’।

‘ধন্যবাদ, আজকের মত এ পর্যন্তই’। বলে উঠে দাঁড়াল জেনারেল শ্যারন।

# ২

রাগবি মাঠের গ্যালারী। রাগবি খেলা এই মাত্র শেষ হলো। জয় পরাজয়ের প্রতিক্রিয়া তখন গ্যালারীতে। খেলা হচ্ছিল লস আলামোস ব্লু ও লস আলামোস স্টারের মধ্যে। 'ফ্রান্সিসকো ভাস্কোডি করোনাডো'র স্মৃতি টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা ছিল আজ।

ফ্রান্সিসকো প্রথম ইউরোপীয় যিনি নিউ মেক্সিকোতে পা রাখেন ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে। তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত টুর্নামেন্টটি নিউ মেক্সিকোর সর্ববৃহৎ রাগবি টুর্নামেন্ট। দেশের শীর্ষ ৩২টি দলের খেলা ১৬টি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়।

ফাইনাল খেলাটি বিভিন্ন বছর বিভিন্ন শহরে হয়ে থাকে। এ বছর হলো 'সান জেরিনিমো' স্টেডিয়ামে।

খেলা শেষের শেষ বাঁশিটি বাজার সাথে সাথে স্ট্যানলি নামের এক শ্বেতাংগ ছেলে লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে বলল 'শয়তান জেরিনিমোকে যেভাবে পাছায় শুল ঢোকানো হয়েছিল, সেভাবে আজ জেরিনিমো স্টেডিয়ামেই লস আলামোস স্টারকেও সিকি ডজন গোল ঢুকানো হলো। হুর-রে'।

'লস আলামোস স্টার রেড ইন্ডিয়ান অধ্যুষিত একটা দল। লস আলামোসের উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলে তাদের রিজার্ভ এলাকায় বাস করে আপাকি, জনি ও পাবলো ইন্ডিয়ানরা। লস আলামোস স্টারকে এদেরই দল ধরা হয়।

আর লস আলামোস ব্লুকে মনে করা হয় শ্বেতাংগদের দল।

স্ট্যানলির কথা শেষ হতেই জন নামের একজন আপাকি ইন্ডিয়ান ছাত্র ঝাঁপিয়ে পড়ল স্ট্যানলির উপর এবং বলতে লাগল, 'জেরিনিমো তোমার বাবা, জেরিনিমোর দেশ এটা। জেরিনিমোকে শয়তান বললি কেন? ফ্রান্সিসকোই তো শয়তান সন্ত্রাসী, অনুপ্রবেশকারী'।

জেরিনিমো ছিল আপাকি ইন্ডিয়ান এবং নিউ মেক্সিকোর সব ইন্ডিয়ানদেরই তিনি জাতীয় বীর। ইউরোপীয় শ্বেতাংগরা তাকে নিউ মেক্সিকোর 'টেরর' হিসেবে অভিহিত করত এবং বেশ কিছু লড়াইয়ের পর তাকে গ্রেপ্তার করে ১৮৮০ সালে।

স্ট্যানলি ও বিলির মধ্যে ভীষন মারামারি শুরু হয়ে গেল। দেখতে দেখতে দুই পক্ষেরই আরও কয়েকজন করে মারামারিতে যোগ দিল।

যারা মারামারিতে যোগ দিতে চায় না, তারা দ্রুত সরে গেল মারামারির জায়গা থেকে।

শেষ পর্যন্ত মারামারিটা শ্বেতাংগ ও ইন্ডিয়ানদের মধ্যে জাতিগত মারামারিতে পরিণত হলো।

মারামারির মধ্যেই তখনও গ্যালারিতে বসে ছিল সান ঘানেম নাবালুসি।

সে মারামারিতে যোগ দেয়নি, আবার উঠে পালায়নি।

সান ঘানেম ইন্ডিয়ান নয়, কিন্তু আবার পুরোপুরি শ্বেতাংগও নয়। গায়ের রং সাদাও নয়, সোনালীও নয়। তার নীল চোখটা শ্বেতাংগদের থেকে একেবারে ভিন্ন। কিন্তু চুল আবার সোনালী।

মারামারির মধ্যে দিয়েই ছুটে এল সান্তা আনা পাবলো সান ঘানেমের কাছে। সে সান ঘানেমের হাত ধরে টানতে টানতে বলল, 'এভাবে বসে কেন? এস পালাই'।

সান্তা আনা পাবলো ইন্ডিয়ান মেয়ে এবং পাবলো ইন্ডিয়ান গোষ্ঠীর। কিন্তু তার মুখ হ্যাটে অনেকটা ঢাকা থাকায় ইন্ডিয়ান বলে চেনা যাচ্ছে না। বোঝা যাচ্ছে হ্যাটে মুখ ঢেকে সান ঘানেমকে নিয়ে যাবার জন্যে সে এসেছে।

সান ঘানেম উঠে দাঁড়িয়েছিল। এমন সময় তার সামনেই সে দেখল একজন শ্বেতাংগ তরুণ আরেকজন রেড ইন্ডিয়ানের বুকের উপর ছুরি বসাচ্ছে।

সান ঘানেম সান্তা আনা পাবলোর হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো শ্বেতাংগ তরুনটির উপর এবং ছুরি সমেত তার

হাত ধরে ফেলল। তারপর ছুরি কেড়ে নিয়ে জোরে ছুঁড়ে মারল দূরে।

শ্বেতাংগ তরুনকে জাপটে ধরে রেখে কোন দিকে না তাকিয়েই ছুরিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল সান ঘানেম। কিন্তু ছুরিটা ছুটে গিয়ে একটু দূরে ফাঁকা জায়াগায় দাঁড়িয়ে থাকা একজন রেড ইন্ডিয়ান তরুনের বুকে আমূল বিদ্ধ হলো।

তরুনটি সংগে সংগে চিৎকার করে ঢলে পড়ল গ্যালারির উপর।

সান্তা আনা পাবলো সেদিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল, ভাইয়া!'

চিৎকার করেই সে ছুটল রেড ইন্ডিয়ান তরুনটির দিকে।

সান্তা আনা পাবলোর চিৎকারে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল সান ঘানেম। ছুরিবিদ্ধ রেড ইন্ডিয়ান তরুনটির উপর চোখ পড়তেই 'একি করলাম' বলে আর্তনাদ করে উঠল সান ঘানেম।

শ্বেতাংগ তরুনকে ছেড়ে দিয়ে সেও ছুটল সান্তা আনা পাবলোর মত।

এ সময় চারদিক থেকে পুলিশের বাঁশি বেজে উঠল। পুলিশ ছুটে এল মারামারির জায়গায়।

সান্তা আনা পাবলো ছুরিবিদ্ধ রেড ইন্ডিয়ান তরুনের কাছে পৌঁছে দু'হাত দিয়ে তার বুক থেকে ছুরিটা বের করে 'ভাইয়া' বলে ঝাঁপিয়ে পড়ল রেড ইন্ডিয়ান তরুনটির উপর।

রেড ইন্ডিয়ান তরুনটির নাম জিমি পাবলো। সান্তা আনা পাবলোর বড় ভাই।

সান ঘানেমও এসে পৌঁছল জিমি পাবলোর পাশে। তারপর বসে তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে সান ঘানেম আবার আর্তনাদ করে বলল, 'একি করলাম জিমি'।

ছুরিটা ঠিক হৃদপিন্ডে বিদ্ধ হয়েছিল। মুহূর্ত কয়েকের মধ্যেই মারা গেল জিমি পাবলো।

কয়েকজন পুলিশ এসে দাঁড়াল সেখানে। তাদের সাথে কিছু রেড ইন্ডিয়ান যুবক।

রেড ইন্ডিয়ান যুবকরা সবাই এক বাক্যে বলে উঠল সান ঘানেম খুন করেছে জিমি পাবলোকে।

সব পুলিশের প্রশ্নবোধক চোখ গিয়ে পড়ল সান ঘানেমের উপর। সান ঘানেমের বেদনা পীড়িত মুখ অসম্ভব রকম গম্ভীর হয়ে উঠেছে। সে জিমি পাবলোর পাশ থেকে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। পুলিশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ আমিই খুন করেছি জিমি পাবলোকে'।

সান্তা আনা পাবলো তখনও কাঁদছিল জিমি পাবলোর বুকের উপর পড়ে।

সান ঘানেমের কথা কানে যেতেই চমকে উঠে মুখ তুলল সান্তা আনা। ধীরে ধীরে সোজা হয়ে বসল।

হঠাৎ তার ঠোঁট দু'টি প্রবলভাবে কেঁপে উঠল। চোখ ফেটে নামল অশ্রু প্রবাহ।

যখন পুলিশ সান ঘানেমের হাতে হাতকড়া পরাচ্ছিল, তখন সান্তা আনা কিছু বলার চেষ্টা করল, কিন্তু কাঁপা ঠোঁট দু'টি ডিঙ্গিয়ে কোন শব্দ বেরুতে পারল না।

জিমি পাবলো ও সান ঘানেম দু'জনে সহপাঠি, তারা দু'জনেই রাজধানী সান্তাফে'র সান্তাফে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। জিমি পাবলোর ছোট বোন সান্তা আনাও একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী।

জিমি পাবলো ও সান ঘানেম শুধু সহপাঠি নয়, দু'জন দু'জনের ঘনিষ্টতম বন্ধুও।

পুলিশ অফিসার দু'জন পুলিশকে নির্দেশ দিল সান ঘানেমকে গাড়িতে তুলবার জন্য।

দু'জন পুলিশ দু'দিক থেকে এসে সান ঘানেমের দু'বাহু চেপে ধরল নিয়ে যাবার জন্যে।

পা বাড়াবার আগে সান ঘানেম অশ্রুতে ভেসে যাওয়া সান্তা আনার দিকে চোখ তুলে বলল, 'জিমিকে আমি হত্যা করেছি, সান্তা আনা তুমি আমাকে ক্ষমা করো না'। শেষের কথাগুলো সান ঘানেমের আবেগে অবরুদ্ধ গলা থেকে ভেঙে ভেঙে বেরুল।

বোবা দৃষ্টিতে চেয়েছিল সান্তা আনা সান ঘানেমেরে দিকে। সান ঘানেমের কথায় তার গোটা শরীর যেন থরথর করে কেঁপে উঠল। কি কথা যেন ঠোঁট ফুঁড়ে বেরুতে চাচ্ছে, পারছে না।

পুলিশ সান ঘানেমকে নিয়ে চলতে শুরু করলে সঙগা হারিয়ে সান্তা আনার দেহ গড়িয়ে পড়ল স্টেডিয়ামের সিঁড়িতে।

নিউ মেক্সিকোর রাজধানী সান্তাফে'র উপকন্ঠে এক্সপ্রেস ওয়ের কাছাকাছি বাগান ঘেরা বিশাল এক বাড়ি।

বাড়িতে মৃত্যুর নিরবতা।

বাড়িতে একজন শুভ্রকেশ বৃদ্ধা, একজন মাঝবয়সী মহিলা এবং একজন তরুনী।

কান্নায় মূহ্যমান সবাই। চোখে মুখে তাদের আতংক ও উদ্বেগ।

একটা গাড়ি বাড়ির খোলা গেট দিয়ে প্রবেশ করে গাড়ি বারান্দায় এসে থামল।

গাড়ি থেকে একজন লোক ও একজন মহিলা নামল।

বাড়ির বাইরের দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল সেই মাঝ বয়সী মহিলাটি। চোখ তার অশ্রুতে ভাসছিল। সে তাকিয়েছিল বাইরে। অপেক্ষা করছিল কারও।

গাড়িটি এসে থামতেই মহিলাটির চোখে মুখে আশার স্ফুরণ জাগল।

সোজা হয়ে দাঁড়াল সেই মাঝবয়সী মহিলাটি। গায়ের চাদরটা মাথার উপর তুলে দিয়ে বারান্দা ধরে কয়েক ধাপ এগিয়ে এল গাড়ি বারান্দার দিকে।

গাড়ি থেকে নেমেই মহিলাটি ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল মাঝবয়সী মহিলাকে। বলল, 'আপা ভেব না, সব ঠিক হয়ে যাবে'।

লোকটিও এসে দাঁড়াল তাদের পাশে। সালাম দিল কান্নারত মহিলাকে। বলল, 'চিন্তা করো না ভাবি, সান ঘানেম কোন অনুচিত কাজে জড়াতে পারে না, খুনতো নয়ই। কোন ব্যাপার আছে। ঠিক হয়ে যাবে সব'।

মহিলা চোখ মুছে বলল, 'এস তোমরা'। বলে অন্য মহিলাটির হাত ধরে ড্রইং রুমের দিকে হাটতে শুরু করল।

ড্রইং রুমে বসে ছিল বৃদ্ধা ও তরুনীটি, ওরা সবাই ড্রইং রুমে প্রবেশ করল। লোকটি সালাম দিয়ে সোজা গিয়ে বসল বৃদ্ধার পাশে। বলল, 'আম্মা তোমরা দেখছি খুবই ভেঙে পড়েছ। আল্লাহ আছেন'।

বৃদ্ধাটি তাকাল তার দিকে। বলল, 'অবশ্যই আল্লাহ আমাদের সহায় বেটা। কিন্তু আমরা মাত্র তিনজন বাসায়। সান ঘানেম কি অবস্থায় আছে, কে খোঁজ নেবে?

'ভেব না, ওদিকটা আমি দেখছি। ভাইয়া কবে গেছেন?' বলল যুবক ছেলেটি।

'ভাইয়া' মানে ছেলেটির বড় ভাই। এই বাড়ির মালিক। নাম কারসেন ঘানেম নাবালুসি। থাকে সান্তাফের উত্তরে সান্তা ক্লারা শহরে।

কারসেন ও সারাসিন সহোদর ভাই। বৃদ্ধা তাদের মা। মাঝবয়সী মহিলাটি মরিয়ম মইনি, কারসেন ঘানেমের স্ত্রী। আর তরুণীটি কারসেন ঘানেমের মেয়ে ফাতিমা ঘানেম।

'কারসেন কাল গেছে ওয়াশিংটন'। বলল বৃদ্ধা।

কারসেন ঘানেম নাবালুসি 'মুসলিম এসোসিয়েশন অব নিউ মেক্সিকো'র (MANEM) ডাইরেক্টর। ওয়াশিংটনের গ্রীন ভ্যালিতে আমেরিকান মুসলিম এসোসিয়েশনগুলোর সাত দিনব্যাপী যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, কারসেন সেখানেই গেছে গতকাল।

'আপনারা কিভাবে খবর পেলেন ভাবী?' মরিয়ম মইনিকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করল সারাসিন ঘানেম।

'আপনারা কিভাবে খবর পেলেন ভাবি?' মরিয়ম মইনিকে লক্ষ্য কর জিজ্ঞেস করল সারাসিন ঘানেম।

'আমাদের পাড়ার একটা মেয়ে সেখানে ছিল। সেই খবর দিয়েছে'। বলল মরিয়ম মইনি।

'প্রকৃতই কি ঘটেছিল, বলেছে কিছু?'

'মারামারির মধ্যে সে এটা খেয়াল করেনি। জিমি পাবলো ছুরিবিদ্ধ হয়ে আর্তনাদ করে উঠলে ওদিকে সকলের চোখ যায়। রেড ইন্ডিয়ানরা সবাই দোষ দিচ্ছে সান ঘানেম খুন....'।

কথা শেষ করতে পারলো না মরিয়ম মইনি কেঁদে উঠল।

রুমাল দিয়ে চোখ মুছে মায়ের বদলে কথা বলে উঠল ফাতিমা ঘানেম। বলল, 'রেড ইন্ডিয়ানরা সবাই এক কথাই বলছে। শ্বেতাংগরা কিছুই বলতে পারছে না। তারা নাকি খেয়াল করেনি। আমাদের পাড়ার মেয়েটা বলল, জিমি পাবলোর বোন নাকি ভাইয়ার পাশেই ছিল, সেই নাকি সব জানে। কিন্তু কোন কথা বলেনি সে'।

'তার কাছ থেকে জানার কিছু উপায় আছে? সেই তো আসল সাক্ষী'। বলল সারাসিন ঘানেম।

'আমাদের কারও ওদের বাড়িতে যাওয়া মুস্কিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে জানা যাবে। তবে.....'।

কি কথা বলতে গিয়ে থেমে গেল ফাতিমা ঘানেম।

'কি বলছিলে বল' বলল সারাসিন ঘানেম।

চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে ফাতিমা ঘানেমের। একটু দ্বিধা করে সে মুখ একটু নিচু করে বলল, 'সান্তা আনা ভালবাসে ভাইয়াকে'।

'কে সান্তা আনা? জিমি পাবলোর বোন?'

'জি আংকেল।

'তাহলে তো তার কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে!' বলল সারাসিন ঘানেম। তার চোখে আশার আলো।

'পাওয়া যাবে। আমার বিশ্বাস, ভাইয়া জিমি পাবলোকে খুন করতে পারে না। ভাইয়া এবং সে দুজন খুবই অন্তরংগ বন্ধু'।

'কেন, বোনকে নিয়ে সান ঘানেমের সাথে তার যদি কিছু ঘটে থাকে?'

'এমন কিছু ঘটার সম্ভাবনা নেই আংকল। জিমি পাবলো সব জানতো এবং তার সম্মতি ছিল'।

'তাহলে?'

‘আমি জানি না, কোন ষড়যন্ত্রও হতে পারে’।

‘কি ষড়যন্ত্র?সান ঘানেম ও সান্তা আনার মধ্যে বৈরিতা সৃষ্টি?’

‘হতে পারে’।

‘কিন্তু প্রমাণ করা যাবে কিভাবে?’

একটু ভাবল সারাসিন ঘানেম। তারপর বলল, ‘ভা্ইয়াকে কি খবর দেয়া হয়েছে?’

‘না খবর দেয়া হয়নি’। বলল মরিয়ম মইনি।

‘খবর তাঁকে জানানো দরকার নয়?’

‘হ্যাঁ’।

‘যদিও অতি গুরুত্বপূর্ণ মিটিং এ উনি, তবু তাঁকে জানানো দরকার আমিও মনে করি’। সারাসিন ঘানেম বলল।

‘সারাসিন তুমিই তাহলে টেলিফোন কর’।

‘ঠিক আছে’।

বলে মোবাইল তুলে নিয়ে ডায়াল করল সারাসিন ঘানেম। ওপারে রিং হচ্ছে। কিন্তু কোন উত্তর নেই। কেউ ধরছে না টেলিফোন।

‘হয়তো টয়লেট কিংবা আশে পাশে কোথাও গেছে’। ভাবল সারাসিন ঘানেম।

মিনিট দশেক পর আবার টেলিফোন করল। কিন্তু ঐ একই অবস্থা। ওপার থেকে কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

ভ্রু কুঁচকে তাকাল সারাসিন ঘানেম ভাবি মরিয়ম মইনির দিকে। বলল, ‘ভাইয়া টেলিফোন অফ না করে টেলিফোন তো এইভাবে কোথাও ফেলে রাখেন না’।

‘না, সব কিছুরই তো ব্যতিক্রম আছে। তুমি কনফারেন্স অফিসে টেলিফোন কর’।

মরিয়ম মইনি টেলিফোন নাম্বার তার আংকলকে দেয়ার জন্যে বলল ফাতিমা ঘানেমকে।

সারাসিন ঘানেম গ্রীন ভ্যালির কনফারেন্স অফিসে টেলিফোন করে চাইল কারসেন ঘানেম নাবালুসিকে।

একটু দেরী হলো। সম্ভবত কারসেনকে ডাকতে গেছে।

'মিঃ কারসেন এসে ধরেছে টেলিফোন'। ওপার থেকে জানাল।

কারসেনের সাথে সম্ভাষণ বিনিময়ের পর সব কথা জানালো সারাসিন ঘানেম।

কিন্তু কথা বলতে বলতে মুখটা গম্ভীর হয়ে উঠল সারাসিনের।

টেলিফোন রাখার পরেও চিন্তিত দেখাল সারাসিন ঘানেমকে।

'কি হলো সারাসিন, তোমাকে চিন্তিত দেখাচ্ছে? কিছু বলেছে কারসেন?' জিজ্ঞেস করল মরিয়ম মইনি।

'ভাইয়া হু, হ্যাঁ ছাড়া কোন কথা বলেনি। এত বড় ঘটনা শোনার পর তাঁর যে প্রতিক্রিয়া হওয়ার দরকার তা তার মধ্যে দেখলাম না'। বলল সারাসিন ঘানেম।

'হয়তো খুব ব্যস্ততার মধ্যে আছে'। চিন্তিত কন্ঠে বলল মরিয়ম।

'কিন্তু কন্ঠ? কন্ঠও তো ভাইয়ার মত মনে হলো না'। সারাসিনের চোখে মুখে বিস্ময়।

'এটা তুমি কি বলছ? সর্দি লাগলে গলা ভাংলে স্বরটা একটু ভিন্ন রকমের হয়, সে রকম একটা কিছু হবে'। মরিয়ম বলল।

'শুধু কন্ঠ নয় ভাবি, ভাইয়া আমার সাথে যেভাবে কথা বলেছে, তাতে মনে হয়েছে যেন তিনি রাতারাতি সব ভূলে গিয়ে নতুন মানুষ হয়েছেন। সম্পূর্ণ অপরিচিতের মত কথা বলেছেন'।

সারাসিন ঘানেম থামতেই মরিয়ম বলে উঠল, 'একই নামের ভিন্ন কারও সাথে কথা বলনি তো তাহলে? কারসেন নাম তো অনেকেরই থাকতে পারে'।

'সেটা কি করে সম্ভব? আমি চেয়েছি নিউ মেক্সিকোর প্রতিনিধি কারসেন ঘানেম নাবালুসিকে। তাছাড়া ভিন্ন লোক হলে কথার শুরুতেই তো তার কাছেও ধরা পড়ে যেত। কিন্তু উনি তো আমার সাথে কারসেন ঘানেম নাবালুসি হিসেবেই কথা বলেছেন'।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে পারল না মরিয়ম মইনি। ভাবছিল সে।

কথা বলে উঠল ফাতিমা ঘানেম, 'আংকল আবার টেলিফোন করে কনফারেন্স অফিস থেকে বিষয়টা কনফার্ম করে নিলে হয় না?'

'ঠিক বলেছ ফাতিমা, সেটাই করা যাক'।

বলে সারাসিন ঘানেম আবার টেলিফোন তুলে নিল হাতে।

আবার টেলিফোন করল ওয়াশিংটনের গ্রীন ভ্যালিতে অনুষ্ঠানরত 'আমেরিকান কাউন্সিল অব মুসলিম এসোসিয়েশন' (ACOMA) এর কনফারেন্স অফিসে।

ওখানে টেলিফোন ধরল রিসিপশনিস্ট।

সারাসিন ঘানেম বলল, 'কিছুক্ষণ আগে আমি টেলিফোন করেছিলাম। আমি কনফারেন্স এর কোন কর্তাব্যক্তির সাথে কথা বলতে চাই'।

রিসিপশনিস্ট জানাল, 'তাঁরা সবাই ভীষণ ব্যস্ত। ঘন্টা দুই পরে টেলিফোন করলে সবাইকে পেয়ে যাবেন। আর আপনার প্রয়োজন কি সেটা জানালে আমিও তাদের জানাতে পারি'।

'ধন্যবাদ। নিউ মেক্সিকোর প্রতিনিধি কারসেন ঘানেম নাবালুসি আমার ভাই। তাঁর সাথেই আমার কথা ছিল'।

'সুবহানাল্লাহ, তাঁর ব্যাপার নিয়েই তো ওরা ব্যস্ত। তাঁকে নিয়ে রুদ্ধদ্বার কক্ষে কি আলোচনা হচ্ছে'।

'কেন? কি আলোচনা?'

'আমি বলতে পারবোনা'।

'যিনি বলতে পারবেন তাকে দিন। আমি কারসেনের ভাই। আমার জরুরী প্রয়োজন'। শান্ত, কিন্তু শক্ত কন্ঠে বলল সারাসিন ঘানেম।

একটু ধরুন স্যার, চেষ্টা করে দেখি কাউকে পাই কিনা।

অল্প কয়েক সেকেন্ড পরেই সে বলল, 'আমি লাইন দিচ্ছি, কনফারেন্সের ডাইরেক্টরের সাথে কথা বলুন।

সালাম দিল সারাসিন ঘানেম।

সালাম গ্রহণ করে ওপার থেকে বলল, 'আপনি কি কারসেন ঘানেমের ভাই?'

'জি। আমি তার সম্পর্কে কিছু জানতে চাই। কারসেন ঘানেম, যার সাথে অল্পক্ষণ আগে কথা বললাম, তাঁকে আমার ভাই কারসেন ঘানেম বলে মনে হয়নি'।

'আপনাকে ধন্যবাদ। আমাদেরও সেই রকম সন্দেহ। আপনার ধারণা আমাদেরকে নিশ্চিত করল'।

'তাহলে ছদ্মবেশী কেউ কি কারসেনের ভূমিকায় অভিনয় করছে?'

'তাইতো এখন মনে হচ্ছে'।

'তাহলে কারসেন ঘানেম কোথায়?'

'সেটা আমাদেরও প্রশ্ন'।'

আতংকিত হয়ে উঠেছে সারাসিন ঘানেম। উদ্বেগ-উত্তেজনায় কাঁপছে তার দেহ। কম্পিত গলায় সে বলল, 'এখন কি করণীয়?'

'তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে। কি অবস্থা দাঁড়ায় আপনাদের জানাব। কারসেন ঘানেমের প্রতি আমাদেরও দায়িত্ব রয়েছে। এখনকার মত রাখি?'

সারাসিন ঘানেম টেলিফোন রাখতেই মরিয়ম মইনি আর্তকন্ঠে বলে উঠল, 'ওখানে কি ঘটেছে সারাসিন, কারসেনের কি হয়েছে?'

সারাসিন তখন নিজেই বিমূঢ় হয়ে পড়েছে। বজ্রপাতের মতই ভয়াবহ মনে হচ্ছে তার কাছে খবরটা্। কথা বলার শক্তিও যেন তার ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু তাকে এভাবে ভেঙে পড়লে চলবে কেন? কারসেন ঘানেম উপস্থিত নেই, সান ঘানেম নেই। তাকেই তো এখন সব কিছু করতে হবে।

একটু নড়ে-চড়ে বসল সারাসিন ঘানেম। বলল, 'ভাবি, এখন আমাদেরকে আল্লাহর প্রতি খুব বেশী ভরসা করতে হবে। ওখান থেকে স্পষ্ট কিছু জানা গেল না। তবে কারসেন ঘানেমের পরিচয় দেয়া লোকটি কারসেন ঘানেম নয়।....'

সারাসিন ঘানেম এতটুকু বলতেই মরিয়ম কেঁদে উঠল।

থেমে গিয়েছিল সারাসিন ঘানেম। তাকাল সে তার ভাবি মরিয়ম মইনির দিকে। বলল, ‘ধৈর্য্য ধরতে হবে ভাবি আমাদের। লোকটিকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। তার কাছ থেকেই ভাইয়ার খবর জানা যাবে। কনফারেন্স কর্তৃপক্ষ বলেছেন তারাও ব্যাপারটা সিরিয়াসলি দেখছেন’।

‘চারদিক থেকে আল্লাহ আমাদের একি বিপদ দিলেন! কি হবে এখন!’ আর্তকন্ঠে বলে উঠল বৃদ্ধা, কারসেন ঘানেম এবং সারাসিন ঘানেমের মা।

বলেই সে সারাসিন ঘানেমকে উদ্দেশ্য করে বলল, ‘এখন তো ওয়াশিংটন যেতে হবে তোর, কিন্তু সান ঘানেমের ব্যাপারটা দেখবে কে?’ কান্নারুদ্ধ কন্ঠ তার।

‘কনফারেন্স কর্তৃপক্ষ টেলিফোন করে জানাবে। ওদিকের পরিস্থিতি দেখে সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে আমাদের’। বলল সারাসিন ঘানেম।

মরিয়ম মইনি কিছু বলতে যাচ্ছিল, ‘টেলিফোন বেজে উঠল এ সময়।

টেলিফোন ধরল সারাসিন ঘানেম।

টেলিফোন ধরেই মরিয়ম মইনির দিকে চেয়ে বলল, ‘ভাবি আপনার টেলিফোন। সান্তা আনা নামে একটি মেয়ে করেছে’।

‘সান্তা আনা’ বলে ছুটে এসে টেলিফোন হাতে নিল মরিয়ম মইনি। টেলিফোন নিয়ে নিজের সিটে ফিরে যেতে ভূলে গেল। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলতে শুরু করল।

মরিয়ম মইনি বলছিল টেলিফোনে, ‘কেঁদো না মা বল কি ঘটেছিল। আমার সান ঘানেম তো খুন করতে.......’।

কথা শেষ করতে পারলো না মরিয়ম মইনি। কান্নায় রুদ্ধ হয়ে গেল তার কন্ঠ।

‘না, আন্টি, সান খুন করেনি। ও কাউকে খুন করতে পারে না’। কান্না জড়িত কন্ঠে বলল সান্তা আনা।

‘বল মা কি দেখেছ তুমি। তুমি নাকি ছিলে ঘানেমের কাছে’।

‘আমি মারামারির ভেতর থেকে সানকে আনতে গিয়েছিলাম আন্টি। আমি যখন ওকে টেনে আনছিলাম সে সময় পাশেই একজন শ্বেতাঙ্গ একজন

ইন্ডিয়ান ছেলের বুকে ছুরি বসাতে যাচ্ছিল। ইন্ডিয়ানকে বাঁচাবার জন্যে সান ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ছুরিটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কিন্তু ছুরি গিয়ে লাগে দূরে দাঁড়ানো ভাইয়ার বুকে। সান......’।

কথা শেষ করতে পারলো না সান্তা আনা। কান্নায় জড়িয়ে গেল তার কথা।

‘সান কি তোমার ভাই জিমিকে দেখেছিল?’ জিজ্ঞেস বরল মরিয়ম মইনি।

সান্তা আনা বলল, ‘না আন্টি, সান সে সময় শ্বেতাঙ্গ ছেলেটিকে জাপটে ধরেছিল, কোন দিকে তাকিয়ে সে ছুরি ফেলে দেয়নি’।

‘সত্য এই ঘটানাটা আর কেউ দেখেনি মা?’

‘যে ইন্ডিয়ান ছেলেকে সান বাঁচিয়েছে, সেই জনি লেভেনও এটা দেখেছে। কিন্তু এখন সে উল্টো কথা বলছে’।

‘কি বলছে?’

‘সান ঘানেম দেখেই ছুরি মেরেছে জিমি পাবলোকে’।

‘তার প্রাণ বাঁচাবার পরেও এই মিথ্যা কথা?’

‘ইন্ডিয়ানরা এখন এক জোট হয়েছে আন্টি। একজন ইন্ডিয়ান নিহত হয়েছে শ্বেতাঙ্গের হাতে, এই সেন্টিমেন্টটাকেই বড় করে তোলা হচ্ছে। তাছাড়া জনি লেভেন হিংসা করে সান ঘানেমকে’।

‘কেন?’কোন উত্তর দিল না সান্তা আনা।

‘জান না তুমি কেন ঈর্ষা করে?

‘জানি আন্টি’।

‘কি সেটা?’

‘কারণটা আমি আন্টি। আমি সান ঘানেমকে ভালবাসি, এটা সে দেখতে পারে না’। কান্নাজড়িতে কন্ঠে বলল সান্তা আনা।

‘এখন কি হবে মা? ওদিকে সানের আব্বাও......’। কান্নায় ভেঙে পড়ল মরিয়ম মইনি।

‘আপনি কাঁদবেন না আন্টি। ঈশ্বর আছেন। সানের জন্যে আমি সবকিছু.......’।

কথা শেষ করতে পারলো না।

টেলিফোন নিচে পড়ে যাওয়ার শব্দ ভেসে এল। তার সাথে শোনা গেল একটা ভারি গলা, 'বলা হচ্ছে না তুমি সানদের পরিবারের সাথে কোন যোগাযোগ করবে না, তাদের কিছুই জানাতে পারবে না। ওরা আমাদের ইন্ডিয়ানদের শত্রু। তুমি সেই খুনি সানকে বাঁচাবার অঙ্গীকার করছ'।

'আব্বা, আপনাকে বলেছি সানের কোন দোষ নেই। সে একজন ইন্ডিয়ানকে বাঁচাতে গিয়ে এই ঘটনা ঘটেছে'। কাঁদতে কাঁদতে বলল সান্তা আনা।

'এই কথা তুমি কয়জন ইন্ডিয়ানকে বলবে? আর তোমার কথা কে বিশ্বাস করবে, তুমি সানের পক্ষে তো বলবেই। আমার ছেলে তার ছুরিতে নিহত হয়েছে, এটাই আজ বড় সত্য। তারা এখন আমাদের শত্রু'।

'কিন্তু আব্বা, তারা তো শত্রু নয়, সত্যকে তো মিথ্যা দিয়ে .....'।

কথা সমাপ্ত হওয়ার আগেই ওপার থেকে সান্তা আনার কান্না ভেজা কন্ঠ বন্ধ হয়ে গেল।

নিশ্চয় টেলিফোন তার আব্বা মেঝে থেকে তুলে নিয়ে অফ করে দিয়েছে।

টেলিফোনটা সোফায় ছুঁড়ে দিয়ে ধপ্ করে বসে পড়ল মরিয়ম মইনি।

তার চোখের কোণে যে আশার আলো জ্বলে উঠেছিল তা দপ করে নিভে গেল।

ঘরের সবাই তার দিকে তাকিয়ে।

সারাসিন ঘানেম উদগ্রীব কন্ঠে বলল, 'কি ঘটেছে, কি শুনলেন ভাবি?'

'সান্তা আনা ও তার আব্বার মধ্যে তর্ক। তার আব্বা সান্তা আনাকে জিমি পাবলোর খুনি-পরিবারের সাথে কথা বলতে দেবে না। তাই তিনি টেলিফোন সান্তা আনার হাত থেকে ফেলে দিয়েছিলেন'।

থেমে একটা দম নিয়ে মরিয়ম মইনি সান্তা আনা ও তার আব্বার মধ্যে তর্কের গোটা বিবরণ দিয়ে বলল, এর পর সান্তা আনা শত ইচ্ছা করলেও আমাদের সান ঘানেমের পক্ষে সাক্ষী দিতে পারছে না। আর জনি লেভেন তো সাক্ষী বিরুদ্ধেই দিবে'।

'জনি লেভেন কে ভাবি?'

‘জনি লেভেন একজন ইন্ডিয়ান ছেলে’।

এই জনি লেভেনকেই এক শ্বেতাঙ্গ ছেলে ছুরি দিয়ে হত্যা করতে যাচ্ছিল। সান ঘানেম লেভেনকে বাঁচাবার জন্যে শ্বেতাঙ্গ ছেলেটিকে জাপটে ধরে তার হাত থেকে ছুরি ছিনিয়ে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল। এই ছুড়ে দেয়া ছুরিই ঘটনাক্রমে লাগে জিমি পাবলোর বুকে। এই ঘটনা সান্তা আনার মত জনি লেভেনও দেখে’।

‘লেভেনকে বাঁচাতে গিয়েই তো ঘটনা ঘটেছে, তাহলে লেভেন সান ঘানেমের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দেবে কেন?’ বলল সারাসিন ঘানেম।

উত্তরে মরিয়ম মইনি সান্তা আনা যা বলেছিল সব জানিয়ে বলল, ‘আমার সান ঘানেম নিরপরাধী হলেও গোটা অবস্থা তার বিরুদ্ধে গেছে’। মুখে রুমাল চেপে আবার কাঁদতে লাগল মরিয়ম মইনি।

সারাসিন ঘানেম বলল, ‘ভাবি। আল্লাহ একটা উপায় নিশ্চয় বের করে দেবেন। কোনভাবে যদি সান্তা আনাকে দিয়ে কোর্টে ঘটনাটা বলানো যায়, তাহলে লেভেন বিপক্ষে সাক্ষী দিলেও জেরায় সে ধরা পড়ে যাবে’।

‘কিন্তু সান্তা আনাকে হয়তো ওরা সাক্ষীই বানাবে না’। বলল বৃদ্ধা, সারাসিন ঘানেমের মা।

‘না আম্মা, তাকে সাক্ষী বানাতেই হবে, কারণ সেই প্রথম জিমি পাবলোকে ছুরিবিদ্ধ হতে দেখে এবং তার কাছে ছুটে যায়’। বলল সারাসিন ঘানেম।

‘কিভাবে সান্তা আনাকে দিয়ে সত্য কথা বলাবে! শুনলেই তো বৌমার কাছে সান্তা আনার বাপের আচরণের কথা। আর শুধু তো তার বাপ নয়, সব ইন্ডিয়ানরাই একজোট হয়েছে’।

‘বলেছি তো আম্মা। আল্লাহ একটা পথ অবশ্যই বের করে দেবেন’। সারাসিন ঘানেম বলল।

‘আংকেল, সান্তা আনাকে আমি জানি। সে মরে গেলেও ভাইয়ার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে না। আমার মনে হচ্ছে, তাকে তারা সাক্ষী হিসেবে না নেবার সব রকম

ব্যবস্থা করবে। এর প্রতিকার আমরা কিভাবে করব, সেটা আমাদের চিন্তা করা উচিত'।

'ঠিক বলেছ মা। কিভাবে করা যাবে সেটা একটা বড় বিষয় হওয়া উচিত'। বলল সারাসিন ঘানেম।

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল মরিয়ম মইনি। টেলিফোন বেজে উঠল।

থমকে গিয়ে মরিয়ম মইনি টেলিফোন তুলে নিল হাতে।

টেলিফোন ধরে সালাম নিয়েই শুনল, 'সারাসিন ঘানেম কে?' উত্তরে বলল 'ধরুন, দিচ্ছি'।

বলে মরিয়ম এস্তে উঠে দাঁড়িয়ে টেলিফোন সারাসিনের দিকে এগিয়ে ধরে বলল, 'নাও তোমার টেলিফোন, বোধ হয় ওয়াশিংটন থেকে'। কন্ঠস্বর কাঁপছে মরিয়ম মইনির।

'আসসালামু আলাইকুম। সারাসিন ঘানেম বলছি'। টেলিফোন ধরে বলল সারাসিন ঘানেম।

'ওয়া আলাইকুমুস সালাম। দুঃখিত মিঃ সারাসিন, আপনার ও আমাদের সন্দেহই সত্য হয়েছে। সে একজন ইহুদী গোয়েন্দা। কারসেন ঘানেমের পরিচয় নিয়ে আমাদের সম্মেলনে যোগদান করেছিল'।

'কারসেন ঘানেম কোথায়?'

'তাঁর সম্পর্কে সে একেকবার একেক কথা বলছে, তবে আমাদের ধারণা তাঁকে কোথাও বন্দী করে রেখে তার পরিচয় নিয়ে সে সম্মেলনে এসেছে'।

'কিন্তু যদি........'। বুকটা থরথর করে কেঁপে উঠল সারাসিন ঘানেমের এক অশুভ আশংকায়। কথাটা মুখেও আনতে পারলো না সে।

'বুঝেছি মিঃ সারাসিন ঘানেম। তার মুখ দেখে আমরা সে রকম কোন আশংকা করছি না'।

'আমি কি আসব ওয়াশিংটনে?'

'আমরা আপনাকে জানাব, যদি দরকার হয়। মিসেস ঘানেমকে আমাদের সালাম দেবেন এবং বলবেন কারসেন ঘানেমের ব্যাপারে যা যা করার সবই আমরা করব'।

‘কিন্তু ইহুদীরা যদি সত্যিই এ যুদ্ধে নেমে থাকে, তাহলে ব্যাপারটাতো সাংঘাতিক। ওরা তো এদেশে অপ্রতিদ্বন্ধী’। সারাসিন ঘানেমের কন্ঠে উদ্বেগের সুর।

‘ওরা অপ্রতিদ্বন্ধী ছিল। সব সময় থাকবে তা নয়। অন্তত এই যুদ্ধে ওরা অপ্রতিদ্বন্ধী নয়। বিশ্ব-ইহুদীরা প্রতিদ্বন্ধীতায় যাঁর কাছে বারবার হেরেছেন, সেই ব্যক্তিত্ব আল্লাহর রহমতে এখানে, আমাদের মাঝে উপস্থিত। তিনিই কারসেন ঘানেমের ব্যাপারটা দেখছেন’।

‘কে তিনি?’

‘দুঃখিত মিঃ সারাসিন, এটা টেলিফোন। নাম বলা বোধ হয় ঠিক হবে না। ঐটুকু আপনাকে বললাম আপনাদের সান্ত্বনার জন্যে। দোয়া করবেন। রাখি’।

বলে সালাম দিয়ে ওপ্রান্ত থেকে টেলিফোন রেখে দিল।

টেলিফোন রেখে সারাসিন ঘানেম ওয়াশিংটন থেকে শোনা সব কথাই ধীরে ধীরে জানাল সবাইকে।

কারসেন ঘানেমের স্ত্রী মরিয়ম মইনি দু’হাতে মুখ ঢেকে কান্না চাপতে চেষ্টা করল, মেয়ে ফাতিমা ঘানেম ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। রুমালে চোখ মুছতে লাগল ঘানেমদের বৃদ্ধা মা ও মিসেস সারাসিন।

ঘর জুড়ে নিঃশব্দ এক কান্নার বৃষ্টি। ইহুদী খুনীরা জার্মানির নাজীদের চেয়েও ভয়ঙ্কর বুদ্ধিতে এবং নৃশংসতায়। সকলের বুকই দুরুদুরু করে কাঁপছে।

নিরবতার মাঝে সারাসিন ঘানেম ধীর কন্ঠে বলে উঠল, ‘উদ্বেগ আতংকের পাশে আল্লাহর সাহায্যের দিকটাকেই এখন অমাদের বড় করে দেখতে হবে। নাম ওরা বলেনি বটে, একটা বড় আশার কথা তো ওঁরা জানিয়েছে। ঐ পথেই হয়তো আল্লাহর সাহায্য আসবে’।

‘অল পাওয়ারফুল বলে কথিত আমেরিকান ইহুদী চক্রের মোকাবিলায় আমাদের কে আছে? যার কথা তাঁরা বললেন?’ চোখ মুছতে মুছতে বলল ফাতিমা ঘানেম।

‘তোমার মতই আমি এ বিষয়ে অজ্ঞ মা’। বলল সারাসিন ঘানেম।

'কিন্তু কে সেই আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব, যাঁর কাছে বিশ্ব-ইহুদী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরেছে বারবার?' আবার জিজ্ঞাসা ফাতিমা ঘানেমের।

'থাকতে পারেন মা, সবার খবর আমরা জানি না'। বলল সারাসিন।

'আপনি ওয়াশিংটনে গেলে আমরা আরও কিছু জানতে পারতাম'। ফাতিমা বলল।

'ওঁরা জানাবেন। ওঁদের টেলিফোনের অপেক্ষা করতে হবে মা'।

বলে উঠে পড়ল সারাসিন ঘানেম। বলল, 'আম্মা, ভাবি, আমি পুলিশ অফিস থেকে আসি। একজন এডভোকেটের সাথেও আলোচনা করে আসি'।

'সান ঘানেমকে বলো, তার কোন চিন্তা নেই। আমরা সব রকম চেষ্টা করব। আল্লাহ্ আছেন'। বলল সান ঘানেমের দাদী, বৃদ্ধা মহিলাটি।

'সারাসিন, সানকে তার আব্বা সম্পর্কে কিছু বলো না'। বলল সান ঘানেমের মা মরিয়ম মইনি।

'আচ্ছা, ঠিক আছে। সালাম'।

বলে বেরিয়ে গেল সারাসিন ঘানেম।

# ৩

ইহুদী গোয়েন্দা প্রধান জেনারেল শ্যারন, হোয়াইট ঈগল প্রধান গোল্ড ওয়াটার এবং এফ.বি.আই প্রধান কলিন্স গ্রীন ভ্যালির হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টারের মুখোমুখি রাস্তার ওপারে কম্যুনিটি হলের একটি কক্ষে একটা টেবিল ঘিরে বসে আলোচনায় মশগুল। হিউম্যান ডেভলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টারেই 'আমেরিকান কাউন্সিল অব মুসলিম এসোসিয়েশনস' (ACOMA) এর ৭দিন ব্যাপি সম্মেলন শুরু হয়েছে।

হিউম্যান ডেভলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (HDRC) আমেরিকান মুসলমানদের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র।

জেনারেল কম্যুনিটি হলের যে কক্ষে কথা বলছিল তার জানালা দিয়ে HDRC'র প্রধান ফটক দেখা যায়।

'সেদিকে চোখ রেখে কথা বলছিল জেনারেল শ্যারন। তার মুখ দারুন আনন্দে উদ্ভাসিত। সে বলছিল, 'ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ। আহমদ মুসাকে আবার নাগালের মধ্যে পাওয়া গেছে। ভাবতে কি যে আনন্দ লাগছে, সে এখন সামনের ঐ বিল্ডিংটায় রয়েছে। আমরা তার খবর জানি, কিন্তু সে আমাদের খবর জানে না'।

'আসল আনন্দ হবে তাকে ধরার পর। তাকে ধরার কি পরিকল্পনা?' বলল গোল্ড ওয়াটার।

'ওটা কোন সমস্যা নয়। তিরিশজন কমান্ডো যোগাড় হয়েছে। যে কোন সময় ওখানে ঢুকে তাকে আমরা ধরে আনতে পারি'। বলল জেনারেল শ্যারন।

'কিন্তু তাতে রক্তপাত হবে, জানাজানি হবে, আন্তর্জাতিক নিউজ মিডিয়াতে চলে যাবে খবর, এটা করা যাবে না। আমার প্রতি এফ.বি.আই-এর নির্দেশ এটা'। বলল এফ.বি.আই এজেন্ট কলিন্স।

এফ.বি.আই প্রধান জেনারেল আব্রাহাম জনসন ও জেনারেল শ্যারনের মধ্যে আলোচনা অনুসারে এফ.বি.আই শ্যারনকে তথ্য দিয়ে সাহায্য করছে, প্রত্যক্ষ সাহায্য নয়। কলিন্সকে এখানে পাঠানো হয়েছে এটা নিশ্চিত করার জন্যে যে পুলিশকে জড়িয়ে পড়তে হয় এবং খবরের কাগজে যায় এমন ঘটনা যেন না ঘটে।

'কলিন্স ঠিকই বলেছে, এই সম্মেলনে এ ধরনের ঘটনা ঘটলে, তার ষোল আনা দায় গিয়ে পড়বে মার্কিন সরকারের ঘাড়ে'।

জেনারেল শ্যারন ভাবছিল। বলল, 'তাহলে কমপ্লেক্সের বাইরে তাকে ধরার ব্যবস্থা করতে হবে। এটা কঠিন হবে না। তবে এর জন্যে সার্বক্ষণিক পাহারার ব্যবস্থা থাকতে হবে'।

জেনারেল শ্যারন থামতেই গোল্ড ওয়াটার বলে উঠল, 'আহমদ মুসা কি নামে সম্মেলনে যোগদান করেছে'।

'আহমদ আবদুল্লাহ' ।বলল জেনারেল শ্যারন।

'কোন দেশী হিসেবে'। গোল্ড ওয়াটার বলল।

'সউদি এ্যারাবিয়ান'।

'পোশাক?'

'পশ্চিমী, কিন্তু মুখে দাড়ি। দাড়ির স্টাইলে সে এমন বদলে গেছে যে, ফটো সামনে রেখেও তাকে চেনা কঠিন'।

'তাহলে চোখ ও ভ্রুর পরিবর্তন ঘটিয়েছে সে?'

হতে পারে।

'তার থাকার জায়গাটা আপনাদের হোটেলের আশে-পাশে নয়?'

'না, সবার থাকার জায়গা ১১ তলা ভবনের টপ তিন ফ্লোরে, কিন্তু আহমদ মুসা আছেন তিন তলায়'।

'এর কি কারণ?'

জেনারেল শ্যারন কিছু বলার আগেই কলিন্স বলল, 'বিল্ডিংটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেই সেটা বুঝতে পারবেন'।

সবাই জানালা দিয়ে তাকাল। কিন্তু গোল্ড ওয়াটার ও জেনারেল শ্যারনের চোখে এখনও প্রশ্নবোধক দৃষ্টি।

কলিন্স বলল, 'দেখুন তিন তলা থেকে বিল্ডিংটা সোজা উপরে উঠে গেছে। কিন্তু তিন তলা থেকে গ্রাউন্ড ফ্লোর পর্যন্ত দু'টি স্টেপ একটি দোতালায়, অন্যটি এক তলায়'।

'সেটা তো দেখাই যাচ্ছে, তাতে কি হয়েছে?'

'আর দেখুন বিল্ডিংটার এই স্টেপগুলো উপর থেকে তিনতলা পর্যন্ত বিল্ডিংটার চারদিকেই'।

'হ্যাঁ ঠিক আছে'। বলল তারা দু'জনে এক সাথে।

'এর অর্থ আহমদ মুসাকে এমন স্থানে রাখা হয়েছে, যেখান থেকে বিল্ডিংটার যে কোন দিক দিয়ে বের হয়ে যাওয়ার সুযোগ আছে'।

কলিন্সের কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল জেনারেল শ্যারন ও গোল্ড ওয়াটার।

'তার মানে আহমদ মুসা যে কোন পরিস্থিতির জন্যে প্রস্তুত আছে'।

গোল্ড ওয়াটার বলল।

'আহমদ মুসার জন্যে এটাই স্বাভাবিক'। বলল কলিন্স।

'যতই প্রস্তুত থাকুক, এবার আহমদ মুসাকে ফাঁদে পড়তেই হবে। কমান্ডোরা গোটা কমপ্লেক্স ঘিরে রেখেছে'। বলল জেনারেল শ্যারন।

'ঈশ্বর আপনার কথাকে সত্য করুন'। গোল্ড ওয়াটার বলল।

জেনারেল শ্যারনের চোখে মুখে কিছুটা উদ্বেগের ছাপ।

গোল্ড ওয়াটার থামলেও কোন কথা বলল না শ্যারন। তাকাল ঘড়ির দিকে। সত্যিই তার ভ্রু দু'টি এবার কুঞ্চিত হলো।

গোল্ড ওয়াটার ও কলিন্স উভয়েই বিষয়টি লক্ষ্য করেছে।

'কি ব্যাপার জেনারেল?' বলল গোল্ড ওয়াটার।

'কোহেন একটা প্রোগ্রাম ফেল করল কেন তাই ভাবছি'। বলল শ্যারন।

কোহেন একজন বিখ্যাত ইহুদী গোয়েন্দা এজেন্ট। নিউ মেক্সিকোর প্রতিনিধি কারসেন ঘানেম নাবালুসি'র ছদ্মবেশে এই কোহেনই কনফারেন্সে যোগ

দিয়েছে। কারসেনের সাথে কোহেনের চেহারার কিছুটা মিল আছে। দু'জনই সেমিটিক-আফ্রো মিশ্রণ।

'কি প্রোগ্রাম ফেল করেছে কোহেন?' গোল্ড ওয়াটারের চোখে বিস্ময়।

'সাড়ে পাঁচটায় আছর নামাজের বিরতি হবে। সে সময় কোহেন বেরিয়ে এসে কনফারেন্স বিল্ডিংটার এ প্রান্তটায় যে ওয়েস্টেজ বক্স আছে, সেখানে এক খন্ড কাগজ ফেলে রেখে যাবার কথা। কিন্তু ৬টা বেজে যাচ্ছে, এখনও সে এল না'।

'কি কাগজ?' বলল গোল্ড ওয়াটার।

'কনফারেন্স বিল্ডিংটার ফ্লোর ও আউট গেট ডিজাইন এবং আহমদ মুসার বর্তমান ছদ্মবেশসহ তার ফটো'।

'দু'টোই তো খুব গুরুত্বপূর্ণ'। বলল এফ. বি. আই গোয়েন্দা কলিন্স।

'নামাজের বিরতি হলেও কোন প্রোগ্রামে হয়ত আটকা পড়েছে'।

গোল্ড ওয়াটার বলল।

'না মিঃ গোল্ড ওয়াটার। কোহেন এমন একজন গোয়েন্দা ব্যক্তিত্ব যার কর্মসূচীতে এক মিনিটও এধার ওধার কখনও হয় না। যতগুলো অসাধ্য সাধন সে করেছে, সবগুলোই নির্দিষ্ট সময়সূচীর ভেতরেই সে সম্পন্ন করেছে। এটা তাঁর রেকর্ড'।

'তাহলে?' বলল গোল্ড ওয়াটার চিন্তিত কণ্ঠে।

ভাবল কিছুক্ষণ জেনারেল শ্যারন।

তারপর জেগে উঠার মত দ্রুত তার ট্রাভেল কিট টেনে নিল। বের করল সিগারেট লাইটার সাইজের অয়্যারলেস রিসিভার। একটা বড় সাইজের স্পীকার বের করে তার সাথে কানেকশন জুড়ে দিল অয়্যারলেস রিসিভারের। বলল, 'চিন্তা করে লাভ কি? কিছু ঘটলে অয়্যারলেসই তা বলে দিবে'।

বলে অয়্যারলেসের মেসেজ স্কোরের 'কী'টা অন করে দিল।

স্পীকার সরব হয়ে উঠল।

প্রথম দিকে তেমন কিছুই পাওয়া গেল না। নানা কথা-বার্তা, আলাপ-আলোচনা-নিত্য দিনকার স্বাভাবিক ধারা বিবরণী।

নিউ মেক্সিকোর প্রতিনিধি মিঃ কারসেনের ছদ্মবেশে কনফারেন্সে যোগদানকারী ইহুদী গোয়েন্দা কোহেনের কাছে ছোট বোতাম আকৃতির যে অয়্যারলেস ট্রান্সমিটার আছে তা কোন সময় অফ করা যায় না। সব সময় অন থাকে এবং অব্যাহতভাবে শব্দ করে, যাই ঘটুক তা নিখুঁতভাবে পাঠায়।

টেবিলের উপর রাখা অয়্যারলেস স্পিকারে তখন বক্তৃতা ভেসে আসছে।

'কনফারেন্সে বক্তৃতা যেমন চলছে, সব বক্তৃতাই এভাবে রেকর্ড হবে। বিরাট দলিল এটা। এফ.বি.আই কিনতে চাইলে আমরা বিক্রি করতে পারি'। এফ.বি.আই এজেন্ট মিঃ কলিন্সের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলল জেনারেল শ্যারন।

'এই জন্যই বুদ্ধিতে আপনারা শ্রেষ্ঠ। তবে এক্ষেত্রে ব্যবসাটা হবে না। কারণ, প্রতি সেশনের ফুল প্রসিডিংস আমরা পেয়ে যাব'। বলল কলিন্স।

'পেয়ে যাবেন, কেমন করে?' বিস্মিত কন্ঠ জেনারেল শ্যারনের।

'এ ধরনের সম্মেলন করতে দেয়ার ক্ষেত্রে আমাদের একটাই শর্ত ছিল। সেটা হলো সম্মেলন সেশন গুলোর ফুল প্রসিডিংস এবং সম্মেলনে দাওয়াত প্রাপ্তদের তালিকা আমাদের দিতে হবে। তালিকা তারা দিয়েছে। সম্মেলনের সেশনগুলোর ফুল রেকর্ড তারা দিচ্ছে'। কলিন্স বলল।

'দিচ্ছে নয়, দিবে'। সংশোধন করতে চাইল শ্যারন।

'দেবে নয়, দিতে শুরু করেছে। প্রতিটি সেশন পরেই সে সেশনের রেকর্ড তারা পাঠিয়ে দিচ্ছে'।

স্পীকারে তখন বক্তৃতা চলছিল।

হঠাৎ বক্তৃতার শব্দ তরঙ্গের মাঝে একটা কন্ঠ ফিসফিস করে বলে উঠল, 'মিঃ কারসেন, আপনি একটু আসুন। জরুরী প্রয়োজন'। সামান্য একটু নিরবতা। তারপর আরেকটি কন্ঠ উচ্চারিত হলো, 'চলুন'।

শেষের এ কন্ঠটি ইহুদী গোয়েন্দা কোহেনের।

তারপর অবার নিরবতা। স্পীকারে বক্তৃতার শব্দ ক্ষীণ হতে হতে এক সময় থেমে গেল।

'তার মানে ডাকতে আসা লোকটি কোহেনকে নিয়ে সেমিনার হল থেকে বেরিয়ে এসেছে'। বলল জেনারেল শ্যারন।

'ঠিক তাই'। গোল্ড ওয়াটার বলল।

আরও কতকগুলো মুহূর্ত পার হলো।

একটা দরজা খোলার শব্দ স্পীকারে ভেসে এলো। তারপর ভেসে এলো তা বন্ধ হবার শব্দও।

'কোহেনকে নিয়ে লোকটি একটি ঘরে প্রবেশ করেছে। বলল জেনারেল শ্যারন।

'আসুন মিঃ কারসেন। আপনাকে সালাম দিতে পারলাম না বলে দুঃখিত'। নতুন একটি কন্ঠস্বর স্পীকারে শোনা গেল।

নতুন কন্ঠটি কথা শেষ করে মুহূর্ত কালের মধ্যেই আবার বলে উঠল, 'চমকে উঠলেন কেন মিঃ কারসেন? ঘানেম নাবালুসি তো সামান্য এই কথায় চমকে উঠার কথা নয়, বলুন'।

অয়্যারলেস স্পীকারে এই কথাগুলো শেষ হতেই চমকে উঠল জেনারেল শ্যারনও। তার চোখে মুখে সন্দেহ ও অস্বস্তির একটা ছায়া।

স্পীকারে কথা বলে উঠল আবার সেই নতুন কন্ঠটিই। বলল, 'আচ্ছা মিঃ কারসেন, আপনার ওয়াশিংটনে পৌঁছার কথা 'এয়ার আমেরিকার 'জিরো জিরো থ্রি' ফ্লাইটে, আর আপনি পৌঁছলেন প্রায় ১২ ঘন্টা পর 'জিরো সেভেনটিন' ফ্লাইটে, কেন?'

'এখন এসব প্রশ্নের আমি অর্থ বুঝতে পারছি না। আপনিই বা এ প্রশ্ন করছেন কেন? কনফারেন্স নেতৃবৃন্দ তো রয়েছেন'।

'কন্ঠটা কোহেনের, জানাল জেনারেল শ্যারন শুকনো গলায়।

'আপনি তো দেখছেন, কনফারেন্সের নেতৃবৃন্দ আমার পাশেই বসে আছেন। তাদের পক্ষ থেকেই এ প্রশ্ন আমি করছি'। বলল সেই নতুন কন্ঠ।

'আমাকে এভাবে প্রশ্ন করার অর্থ কি? ফ্লাইট ধরতে না পারা, ফ্লাইট চেঞ্জ খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার'। স্পীকারে ভেসে এল কোহেনের কন্ঠ।

‘ফ্লাইট ধরতে না পারলে, ফ্লাইট চেঞ্জ করলে মাত্র বার ঘন্টার ব্যবধানে টিকিট তো চেঞ্জ করার প্রয়োজন হয় না। আপনি টিকিট চেঞ্জ করেছেন কোন কারণে?’

নতুন কন্ঠটির স্বর উৎকর্ণ হয়ে শুনছিল জেনারেল শ্যারন। বলল সে শুকনো কন্ঠে, ‘মিঃ গোল্ড ওয়াটার চিনতে পারছেন এ কন্ঠ’।

‘না’। বলল গোল্ড ওয়াটার।

‘আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, এটা আহমদ মুসার কন্ঠ, যিনি আহমদ আবদুল্লাহ নামে সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন’।

কিছু বলতে যাচ্ছিল গোল্ড ওয়াটার। কিন্তু তার আগেই স্পীকারে কোহেনের হাসির শব্দ শোনা গেল। বলল, ‘এসব ছোট খাট জিনিস নিয়ে আপনারা সময় নষ্ট করছেন কেন বুঝতে পারছি না। কেউ টিকিট হারিয়ে ফেললে সে নতুন টিকিট করতে পারে’।

‘মিঃ কারসেন ১২ ঘন্টা পর ভিন্ন ফ্লাইটে আসার কারণ বলেছেন ফ্লাইট ধরতে না পারা, এখন নতুন টিকিট কাটার কারণ বলছেন টিকিট হারিয়ে যাওয়া। টিকিট হারিয়ে যাওয়ার কথাটা ভিন্ন ফ্লাইটে আসার কারণ হিসেবে আগেই আসতে পারতো। তা আসেনি, কারণ কথাটা পরে বানানো। ফ্লাইট ধরতে না পারা কথাটাও বানানো নয় কি?’

স্পীকারে ভেসে আসে আহমদ আবদুল্লাহ ওরফে আহমদ মুসার কথা শুনে মুখ চুপসে গেল জেনারেল শ্যারনের। বলল, ‘সর্বনাশ গোল্ড ওয়াটার, ওরা কোহেনকে সন্দেহ করছে’।

‘ঠিক মিঃ জেনারেল, কিন্তু এটুকু প্রমাণ দিয়ে কারও সম্পর্কে ফাইনাল কথা বলা যায় না। সন্দেহ করা যায় মাত্র’।

স্পীকারে ভেসে এল কোহেনের গলা। বলল, ‘দেখুন আমি আমন্ত্রিত অতিথি। এভাবে আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন না। এটা অপমান করা’।

‘আপনার দুটো কারণই বানানো, মিথ্যা –এ কথার তো কোন জবাব দিলেন না?’ আহমদ আবদুল্লাহর গলা ভেসে এল স্পীকারে।

‘অহেতুক বিষয় জবাব দেবার মত নয়’। কন্ঠ কোহেনের।

‘আচ্ছা মিঃ কারসেন এ দু’টো ডকুমেন্ট দেখুন। একটি হলো সম্মেলনে যোগদানের সম্মতিসূচক লেটার অব এ্যাকসেপট্যান্স, অন্যটি সম্মেলনে আসার পর রেজিষ্ট্রেশন ফরম। দু’টোতেই মিঃ কারসেন মানে আপনার দস্তখত আছে। দেখুন তো দুই দস্তখত কি একজনের?’ স্পীকারে আহমদ আবদুল্লাহর কন্ঠ।

স্পীকার নিরব। কোহেনের কোন উত্তর নেই।

স্পীকারে আহমদ আবদুল্লাহরই অনুচ্চ, অথচ অত্যন্ত শক্ত কন্ঠ ভেসে এল। বলছে সে, ‘না মিঃ কারসেন টেবিল থেকে হাত দু’টো যতটুকু টেনেছেন, আর টানবেন না। টানলে দু’হাতই হারাবেন, কারণ আমার গুলি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় না। আমি জানি, পড়ার জন্যে আপনার চশমার দরকার নেই। সম্মেলনে আসার পর লেখাপড়ার কোন কাজেই আপনি চশমা ব্যবহার করেননি। অতএব পকেট থেকে চশমা বের করবেন, এটা ঠিক নয়’।

কথায় একটু ছেদ নামল স্পীকারে। তারপরই আহমদ আবদুল্লাহ মানে আহমদ মুসার উচ্চকন্ঠ হাসি। তার কানে সাথে সাথেই ভেসে এল তার কন্ঠ, ‘আমি জানি, আপনার কোটের ভেতরের পকেটে যেখানে চশমা আছে, তার পাশেই শোল্ডার হোলস্টারে ঝুলছে নিউট্রন রিভলবার। সে রিভলবারের একটা বিষাক্ত ফায়ার কক্ষে উপস্থিত আমাদের ক’জনকে চোখের পলকে ঘুম পাড়িয়ে দেবে এবং অন্তত ছ’মাসের জন্যে নিষ্ক্রিয় করে দেবে’।

মুহূর্ত কালের জন্যে নিরব হলো স্পীকার।

পরক্ষণেই আবার স্পীকারে কন্ঠ ভেসে এল আহমদ মুসার। বলছে সে কাউকে উদ্দেশ্য করে, ‘তোমরা এর পকেট থেকে নিউট্রন রিভলবারটা বের করে নাও। সার্চ করে দেখ দু’পায়ের মোজার সাথে আটকানো রিভলবার পেতে পার। সব শেষ অস্ত্র হিসেবে কোমরে বেল্টের আড়ালে একটা সুইচ নাইফ নিশ্চয় সে রেখেছে’।

নিরব হলো স্পীকার।

‘লোকটা অন্তরদ্রষ্টা নাকি। যে যে অস্ত্রের কথা আহমদ মুসা বলেছে সে সে অস্ত্র কোহেনের সেভাবেই রয়েছে’। বিষ্ময় মিশ্রিত করুণ কন্ঠে বলল জেনারেল শ্যারন।

‘কিন্তু অয়্যারলেস ট্রান্সমিটার কোহেনের কাছে আছে এটা আহমদ মুসা বলতে পারেনি’। বলল গোল্ড ওয়াটার।

‘এ জন্যেই আহমদ মুসা সর্বদ্রষ্টা বা অন্তরদ্রষ্টা নয়। কিন্তু অদ্ভূত নিখুঁত অনুমান তার’। জেনারেল শ্যারন বলল।

‘এমনও হতে পারে। কোহেনকে সন্দেহ করার পর আহমদ মুসা কোহেনের অজান্তে তাকে এবং তার লাগেজ সার্চ করেছে’। বলল গোল্ড ওয়াটার।

‘হতে পারে, কিন্তু এভাবে কোহনেকে সার্চ প্রায় অসম্ভব। সার্চ করলে কোহেনের কাছে অবশ্যই তা ধরা পড়তো। আর ধরা পড়লে আগেই সে সাবধান হয়ে যেত। তাহলে এই বিপদে তাকে পড়তে হতো না’। বলল জেনারেল শ্যারন।

স্পীকার কথা বলে উঠল আবার।

স্পীকারে এবার অপরিচিত গলা। বলল, ‘মিঃ আহমদ আবদুল্লাহ, এদিকটা আপনি দেখুন। জরুরী টেলিফোন। আমি আসছি’।

‘ঠিক আছে,আসুন’। স্পীকারে আহমদ মুসার গলা।

স্পীকারে একটু নিরবতা।

মুহূর্ত কয়েকের মধ্যেই স্পীকারে ভেসে এল আহমদ মুসার গলা আবার। বলল, ‘দেখছেন তো অস্ত্রগুলো? একটা নিউট্রন রিভলবার, দুটো সাধারণ রিভলবার এবং একটা সুইচ নাইফ, মানে একটা যুদ্ধের অস্ত্র আপনার কাছে। মিঃ কারসেনের কাছে কি এগুলো থাকার কথা? মিঃ কারসেনের ছদ্মবেশে কে আপনি?’

স্পীকারে কোহেনের হাসির শব্দ ভেসে এল। হাসির সাথে সাথে তার কন্ঠও। বলল সে, ‘আহমদ মুসা আপনিও ছদ্মবেশ নিয়ে সম্মেলনে এসেছেন, আমিও ছদ্মবেশ নিয়ে সম্মেলনে এসেছি। আপনি জিতেছেন, আমি হেরে গেছি। এর বেশী আর কিছু জানতে পারবেন না’।

এবার স্পীকারে ভেসে এল আহমদ মুসার হাসি। বলল, ‘ভাল বলেছেন আপনি। দু’জনেরই ছদ্মবেশ। কিন্তু অনেক পার্থক্য।

সম্মেলনের উদ্যোক্তা ও অতিথি কারো কাছেই আমার ছদ্মবেশ নেই। সকলেই আমার পরিচয় ও নাম জানেন। কিন্তু আপনার নাম, পরিচয় আমরা কেউ জানি না। এখন আমরা সেটাই জানতে চাচ্ছি’।

স্পীকারে আহমদ মুসার কন্ঠ থেমে গেল। কিন্তু স্পীকার নিরব হওয়ার পরক্ষণেই আবা সরব হয়ে উঠল। স্পীকারে গলা পাওয়া গেল এবার টেলিফোন ধরতে যাওয়া সেই লোকটির। বলছে কন্ঠটি, ‘মিঃ আহমদ আবদুল্লাহ, মিঃ কারসেনের ভাই সারাসিন ঘানেম ফোন করেছিল ‘সান্তাফে’ থেকে। কিছুক্ষণ আগে উনি কথা বলেছেন এই মিঃ কারসেনের সাথে। কথা বলেই তাদের সন্দেহ হয়েছে। উনি টেলিফোন করেছিলেন জানার জন্যে যে, কি ঘটনা, তার ভাই কোথায়। এ নিয়ে তাদের বাড়িতে সবাই উদ্বিগ্ন’।

থেমে গেল স্পীকার। কথা শেষ করেছে লোকটি।

মহূর্ত মাত্র। স্পীকারে ভেসে এলো আহমদ মুসার গলা। বলছে কন্ঠটি, ‘বলুন মিঃ ছদ্মবেশী কারসেন, আপনি কে? মিঃ কারসেনকে কোথায় রেখেছেন, না তাকে হত্যা করেছেন?’ কঠোর কন্ঠ আহমদ মুসার।

‘কোন সাহায্যই আপনাকে করব না আহমদ মুসা’। স্পীকারে শক্ত গলা মিঃ কোহেনের।

চোখে মুখে ভীষণ উদ্বেগ জেনারেল শ্যারনের। গোল্ড ওয়াটার ও কলিন্সের মুখও শুষ্ক। তাদের মুখেও কোন কথা নেই।

কোহেনের কথার পর স্পীকার থেমে গিয়েছিল মুহূর্তের জন্যে। সেটা আবার সরব হয়ে উঠল। কঠোর কন্ঠ ভেসে এল আহমদ মুসার। সে বলছে, ‘এক আদেশ আমি দু’বার দেই না। বলুন শেষ সুযোগ এটা আপনার’।

‘বলেছি তো কোন সাহায্য আমার পাবেন না আপনি’ স্পীকারে কোহেনের কন্ঠ।

স্পীকার নিরব হলো।

হঠাৎ স্পীকার মোটা স্বরে ‘দুপ’ করে উঠল। তার সাথে সাথেই একটা আর্ত চিৎকার। চিৎকার কোহেনের।

আর্তনাদ করে উঠল জেনারেল শ্যারন। বলে উঠল আর্তস্বরে, ‘শয়তানটা কি কোহেনকে হত্যা করল?’

‘না, চিৎকারের ধরন সে কথা বলে না। আহমদ মুসা নিশ্চয় সাইলেন্সার লাগানো রিভলবার ব্যবহার করেছে। নিশ্চয় আহমদ মুসা কোহেনের এমন জায়গায় গুলি করেছে যাতে কষ্ট পায়। কোহেনকে কথা বলাতে চায় আহমদ মুসা’। বলল এফ.বি. আই গোয়েন্দা কলিন্স।

‘আমাদের কিছু করা দরকার। এখনও না মেরে থাকলে যে কোন সময় আহমদ মুসা তাকে মেরে ফেলবে। মিঃ কলিন্স, মিঃ গোল্ড ওয়াটার আমাকে সাহায্য করুন। এখনি আমাদের কমান্ডোদের পাঠিয়ে তাকে মুক্ত করে আনা উচিত’। উত্তেজিত কন্ঠে বলল জেনারেল শ্যারন।

‘তাতে বিরাট রক্তপাত হবে। অনেক লোক মারা যেতে পারে। এ হত্যাকান্ড জাস্টিফাই করা যাবে না। এ ঝুঁকি নেয়া যাবে না’। পরিষ্কার কন্ঠে বলল কলিন্স।

‘ওদের কাছে বে আইনি অস্ত্র আছে। বেআইনি অস্ত্র দিয়ে একজন লোককে তারা আহত করেছে, এই অভিযোগে এফ.বি.আই সম্মেলনে ঢুকে আহমদ মুসাকে গ্রেপ্তার ও কোহেনকে মুক্ত করতে পারে’। বলল জেনারেল শ্যারন।

হাসল মিঃ কলিন্স। বলল, মিঃ জেনারেল উত্তেজিত হয়ে বাস্তবতাকে আপনি ভূলে যাচ্ছেন। এখন এফ.বি.আই ভেতরে ঢুকলে বেআইনি কোন অস্ত্রও পাবে না এবং আহত মিঃ কোহেনকেও পাবেনা। আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছার আগে দু’টোকেই তারা সরিয়ে ফেলবে। আপনি ভূলে যাচ্ছেন কেন, সেখানে আহমদ মুসা আছে। সেই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে সেখানে’।

তাহল? কি করব আমরা? কিছু তো করতে হবে তাকে উদ্ধারের জন্যে’। বলল জেনারেল শ্যারন আকুল কন্ঠে।

'মিঃ জেনারেল, অয়্যারলেস রেকর্ডে কি ঘটেছে পুরো শুনুন। তারপর করণীয় ঠিক করা যাবে। এখন তাড়াহুড়ো করে কোন লাভ নেই। যখন ঘটনা রেকর্ড হয়েছে সে সময় এবং যখন আমরা শুনছি তা এক সময় নয়। হতে পারে এ দু' সময়ের মাঝে অনেক ব্যবধান'।

'হ্যাঁ কলিন্স ঠিক বলেছে জেনারেল'। গোল্ড ওয়াটার বলল।

'হ্যাঁ ঠিক বলেছেন। আমি সময়ের এই পার্থক্যের ব্যাপারটা একদমই ভূলে গিয়েছিলাম'। বলল জেনারেল চিন্তিত কন্ঠে।

স্পীকার সরব হয়ে উঠল আবার।

কন্ঠ ভেসে এল আহমদ মুসার। বলছে, 'ডান কান উড়ে গেছে, এবার বাম কান উড়ে যাবে মিঃ ছদ্মবেশী কারসেন। আপনার পরিচয় আর আমার দরকার নেই। পরিচয় আপনার আমি পেয়ে গেছি। আপনি জেনারেল শ্যারনের লোক। একজন ইহুদী গোয়েন্দা ছাড়া আর কিছু নন। বলুন, মিঃ কারসেনকে কোথায় রেখেছেন?'

নীরব হলো স্পীকার। মুহূর্ত পরেই ভেসে এল আহমদ মুসার গলা। বলছে, 'তিন পর্যন্ত গুনব। তিন উচ্চারিত হবার সাথে সাথে আমার গুলি ছুটবে'।

পরক্ষণেই স্পীকারে ভেসে এল আহমদ মুসার এক উচ্চারণের শব্দ।

স্পীকারে কন্ঠ শোনা গেল কোহেনের। বলছে, 'আমি যখন ধরা পড়েই গেছি, তখন মিঃ কারসেন কোথায় তা বলতে আপত্তি নেই। তবে একটা শর্ত'।

'কি শর্ত?' স্পীকারে কন্ঠ আহমদ মুসার।

'বিনিময় হতে হবে। আমাকে ছেড়ে দেবেন, তাকে আমরা ফিরিয়ে দেব'। স্পীকারে কন্ঠ মিঃ কোহেনের।

'আপনি বলেন, কারসেন কোথায়, তাকে পাওয়ার পর আপনার মুক্তির কথা বিবেচনা করব'। কন্ঠ আহমদ মুসার।

'এটা কিন্তু প্রতিশ্রুতি হলো না'। কন্ঠ কোহেনের।

'যা বলেছি, তার বাইরে আর কোন কথা নেই'। স্পীকারে ভেসে আসা এই দৃঢ় কন্ঠটি আহমদ মুসার।

'কাগজ কলম দিন, লিখে ও এঁকে দিচ্ছি'। কোহেনের কন্ঠ স্পীকারে।

নীরবতা নেমে এলো স্পীকারে বেশ কিছুক্ষণ।

'কোহেন নিশ্চয় লিখে দিচ্ছে ঠিকানা'। গোল্ড ওয়াটার বলল।

এতক্ষণে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠেছে জেনারেল শ্যারনের মুখে। বলল, 'কোহেন ঠিক কাজ করেছে। সময় পেল সে। আমরাও সময় পেলাম। মিঃ কারসেন এখন আমাদের কাছে মূল্যবান কেউ নয়। আহমদ মুসা অবশ্যই কিছুটা রিল্যাক্সড হবেন এখন। সেটা হবে আমাদের জন্যে সুযোগ তাকে খাঁচায় বন্দী করার'।

'ষড়যন্ত্র একটা হচ্ছে এখানে তাকে ঘিরে, এটা জেনে যাওয়ার পর আরও সাবধান হবে না?' বলল কলিন্স।

'তা হবে না। কিন্তু সম্মেলনের ভেতর থেকে কোন বিপদ আর নেই এটা জানার পর সে নিশ্চিন্ত হবে। আমি চাই সে সম্মেলন থেকে না পালাক। তাহলেই একটু সুযোগ আমরা পেয়ে যাব'। জেনারেল শ্যারন বলল।

জেনারেল কথা শেষ করার আগেই স্পীকার কথা বলে উঠছে। কন্ঠ এবার আহমদ মুসার। বলছে, 'ধন্যবাদ মিঃ ইহুদী গোয়েন্দা। ইহুদীরা যে নিজেদের ব্যাপারে খুব বাস্তববাদী, আপনিও তা প্রমাণ করলেন'।

একটু নিরবতা স্পীকারে।

স্পীকারে আবার কন্ঠ ভেসে এল আহমদ মুসার। বলছে, 'এর কানটায় ব্যান্ডেজ বেঁধে কিছু ঔষধ খাইয়ে দিন। তারপর ওর হাত পা বেঁধে ঘুম পাড়িয়ে দিন। আমি একেও নিয়ে যাব যাবার সময়। নিয়ে যেতে বলুন এঁকে'।

'কোথায় যাবেন?' ঘরের ভেতর থেকেই এক অপরিচিত কন্ঠ।

'আমি যাব নিউ মেক্সিকোতে মিঃ কারসেনের সন্ধানে'। কন্ঠটি আহমদ মুসার।

'এখনি?' জিজ্ঞাসা সেই অপরিচিত কন্ঠটির।

'এখনি', কন্ঠ আহমদ মুসার।

'ওঁকেও ওখানে নেবেন? অসুবিধা হবে না তো?' সেই অপরিচিত কন্ঠই আবার শোনা গেল।

‘না, ওকে নিচ্ছি না। নিরাপদ একটা স্থানে ওকে রেখে যাব। সম্মেলন কেন্দ্রে ওকে আর এক মূহুর্ত রাখাও নিরাপদ নয়’।

দরজা খোলার শব্দ এল স্পীকারে। বন্ধ করারও শব্দ পাওয়া গেল।

আর শোনা গেল না আহমদ মুসার কন্ঠ।

‘কোহেনকে আহমদ মুসার লোকরা বের করে এনেছে ঘর থেকে’। জেনারেল শ্যারন বলল।

‘ঠিক’। বলল মিঃ কলিন্স।

‘মিঃ কলিন্স আর দেরী করলে কোহেনকে উদ্ধার হয়তো আর কোন দিনই করা যাবে না। কিছু করতে হবে এবং তা এই মুহূর্তেই’। জেনারেল শ্যারন বলল।

‘উদ্ধার করা যাবে না কেন? আহমদ মুসা কোন প্রতিশ্রুতি উচ্চারণ করেনি বটে। কিন্তু তার কথা শুনে মনে হয়েছে মিঃ কারসেনকে পাওয়ার পর তারা কোহেনকে ছেড়ে দেবে’।

‘না দেবে না। কারণ, কারসেনকে পাওয়ার আগেই আহমদ মুসা আমাদের খাঁচায় বন্দী হবে’। বলল শ্যারন।

‘কি ভাবে?’ বলল কলিন্স।

‘কোহেন আহমদ মুসাকে মিঃ কারসেনের বন্দী করে রাখার স্থান বলে দিয়ে আহমদ মুসাকে ধরার একটা ফাঁদ আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে। আহমদ মুসা কারসেনকে উদ্ধার করতে গিয়ে নিজেই আমাদের হাতে চলে আসবে। এখন যদি আহমদ মুসাকে সম্মেলন কেন্দ্র থেকে ধরা না যায়, তাহলে এই মুহূর্তেই আমাদের যাত্রা করতে হবে নিউ মেক্সিকোতে’।

‘তাহলে কোহেনকে আর উদ্ধার করতে পারছেন না’। বলল গোল্ড ওয়াটার।

‘কেন?’ শ্যারন বলল।

‘কারণ, এখন কোহেন কিংবা আহমদ মুসা কেউই সম্মেলন কেন্দ্রে নেই। কোহেনকে নিরাপদ স্থানে রেখে আহমদ মুসা নিশ্চয় এখন মেক্সিকোর পথে রয়েছে’।

চমকে উঠল জেনারেল শ্যারন। বলল, 'সত্যি তো। ভূলেই গিয়েছিলাম, ঘটনা ঘটার সময় এবং ঘটনার রেকর্ড শোনার সময়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য'।

বলেই উঠে দাঁড়াল জেনারেল শ্যারন। আসুন আমরা প্রস্তুত হই। এখনি আমাদের নিউ মেক্সিকো যাত্রা করতে হবে'।

'কিসে যাবে?'

'আহমদ মুসা নিশ্চয় কোন এয়ার লাইন্সে নিউ মেক্সিকো যাচ্ছে। তার আগে আগে আমাদের পৌঁছতে হলে আপনার জেট বিমান ছাড়া কোন উপায় নেই। সব ধরনের খরচ আমি বহন করব। আপনি আপনার জেট প্রস্ত্তত করতে বলে দিন'।

'ঠিক আছে মিঃ শ্যারন। কিন্তু মনে থাকে যেন আহমদ মুসাকে আমাদের কাছে থেকে কেনার চুক্তি এখনও বাতিল হয়নি'। গোল্ড ওয়াটার বলল।

'না আমি ভূলিনি মিঃ গোল্ড ওয়াটার। আহমদ মুসাকে হাতে পেলে পয়সা আমাদের জন্যে কোন ব্যাপার নয়'।

'কিন্তু আমাকে নিউ মেক্সিকো যেতে হলে এফ.বি.আই কর্তৃপক্ষের অনুমতি দরকার'। বলল কলিন্স।

'না আপনাকে অবশ্যই যেতে হবে আমার সাথে। আপনি থাকলে একটা লিগ্যাল প্রটেকশন আমাদের সাথে থাকবে। ঠিক আছে আমি এখনি টেলিফোন করছি জর্জ আব্রাহাম জনসনকে'।

বলে জেনারেল শ্যারন টেলিফোন তুলে নিল হাতে।

সান্তাফে বিমান বন্দরে ল্যান্ড করল আহমদ মুসা।

খুব সাধারণ ছদ্মবেশ তার।

মুখে গোঁফ লাগানো হয়েছে, যা কোন সময়ই লাগায় না এবং মাথাভর্তি ঈষৎ কোঁকড়া চুল পরেছে।

এতেই আহমদ মুসা একদম অন্য মানুষ হয়ে গেছে।

সাথে কোন লাগেজ নেই। লাগেজ রাখবেই বা কোথায়?

যে ধরনের কাজে এসেছে তাতে সাথে লাগেজ বহনের অবকাশও নেই।

আহমদ মুসার সামনে হাঁটছিল এক বৃদ্ধ। বয়স আশি-নব্বই এর মত হবে। একটা ট্রলিতে ব্যাগ ঠেলে নিচ্ছিল সে।

কষ্ট করে ভারসাম্য রক্ষা করে হাঁটছে সে।

গ্যাংওয়ের একটা উঁচু লেয়ারে উঠতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল বৃদ্ধ।

আহমদ মুসা তাকে ধরে ফেলল।

'ধন্যবাদ'। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল বৃদ্ধটি।

বৃদ্ধটি রেড ইন্ডিয়ান, দেখল আহমদ মুসা।

'ওয়েলকাম। আমি যদি ট্রলিটা বহন করি, আপনি তা কি পছন্দ করবেন?'

বৃদ্ধটি তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'না আমি অপছন্দ করব না'।

আহমদ মুসা ব্যাগসহ ট্রলি ঠেলে বৃদ্ধের পাশাপাশি হাঁটতে লাগল।

লাউঞ্জ থেকে বের হবার সময় বৃদ্ধ আহমদ মুসাকে বলল, 'তুমি অবশ্যই বিদেশী। কিন্তু একেবারে যে খালি হাত!'

'বিদেশী হলেও চাকুরে, চাকুরীর মাধ্যমে অনেকেই এদেশী হয়ে গেছে। তাদের খালি হাতে সফর তো হতে পারে'। আহমদ মুসা বলল।

'তোমার কি সান্তাফে'তে বাড়ি বা বাসা আছে?' বলল বৃদ্ধ।

'নেই'।

'আত্মীয় স্বজন আছে?'

'নেই'।

'ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব আছে?'

'নেই'।

'তাহলে তো হলো না। তুমি ওয়াশিংটন থেকে আসছ নিউ মেক্সিকো। খালি হাতে খুব স্বাভাবিক নয়'।

বুড়োর বিশ্লেষণী শক্তি দেখে অবাক হলো আহমদ মুসা। মুখে হাসি টেনে বলল আহমদ মুসা, 'স্বাভাবিকের একটা ব্যতিক্রম তো আছে'।

'আছে! সেটা অস্বাভাবিক'।

'অস্বাভাবিক ঘটনা তো ঘটতেই পারে'।

লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে এসেছে তারা।

গাড়ি বারান্দায় আসার পর আহমদ মুসা ট্রলিটা রেখে বৃদ্ধকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'আপনার জন্যে গাড়ি ঠিক করব কি? কোথায় যাবেন আপনি?'

'ছেলের বাসা আছে এই সান্তাফে শহরেই। সেখানেই যাব, বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে। তুমি কোথায় যাবে?'

'যাবো সান্তা ফ্লারা। সেখান থেকে ক্লীফ ডোয়েলিং'।

'তার মানে ক্লীফ ডোয়েলিং যাবে। তুমি পর্যটক বুঝি?'

'দেশ বেড়ানো পর্যটন হলে আমি অবশ্যই পর্যটক'।

'কিন্তু তুমি তাহলে সান্তা ফ্লারা যাবে কেন? ওখান থেকে ক্লীফ ডোয়েলিং যাবার রাস্তা সরাসরি নেই। 'এস্পানোলা থেকে সরাসরি যোগাযোগ ক্লীফ ডোয়েলিং এর। আরও একটা সুখবর আমাদের বাড়ি এস্পানোলায়'।

'সত্যি সুখবর। ঠিক আছে আমি এস্পানোলা হয়েই যাই। কিন্তু আপনি তো যাচ্ছেন না'।

'হ্যাঁ যাচ্ছি। আমার বড় নাতি, আমার ছেলের বড় ছেলে খুন হয়েছে খেলার মাঠে হোয়াইটদের সাথে এক সংঘর্ষে। তুমি চল না আমার সাথে। ওদিককার অবস্থা একটু দেখে আমিও এস্পানোলা যাব, অথবা কাউকে দিয়ে তোমাকে পাঠিয়ে দেব'।

'ধন্যবাদ স্যার। আমি খুশী হতাম আপনার ছেলেদের সাথে পরিচিত হতে পারলে। কিন্তু আমার একটু তাড়া আছে'।

বলে আহমদ মুসা একটা গাড়ি ডেকে বৃদ্ধকে তুলে দিল গাড়িতে। লাগেজগুলো তুলে দিয়ে বিদায় নেবার জন্যে বৃদ্ধের কাছে যেতেই একটা টুকরো কাগজ আহমদ মুসার হাতে তুলে দিয়ে বলল, এতে এস্পানোলার যেখানে

আমাদের বাড়ি তার ঠিকানা আছে। তুমি সেখানে এস। আমি কালকের মধ্যেই আশা করি বাড়ি পৌঁছব'।

'যখন এখানে আমার কেউ নেই, তখন এ ধরনের আশ্রয়ের আহবান লোভনীয়'।

বলে গুডবাই জানিয়ে চলে যাচ্ছিল আহমদ মুসা।

বৃদ্ধ চিৎকার করে উঠল, 'শোন শোন তোমার নামটাই বলনি'।

আহমদ মুসা ফিরে দাঁড়িয়ে দু'পা সরে এসে বলল, 'আহমদ আবদুল্লাহ'।

'তুমি মুসলমান?'

'কেন খারাপ মনে করছেন না তো?'

'না হে, ভাল মনে করছি'।

'মুসলমানদের সাথে পরিচয় আছে?'

'বলব না, তুমি এস তখন বলব।

শুনলে তুমিও খুশী হবে'।

'ঠিক আছে, আল্লাহর ইচ্ছা'।

বলে চলে যাবার জন্যে পা বাড়াল আহমদ মুসা আবার।

কিন্তু পরক্ষণেই ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, লজ্জা বিজড়িত কন্ঠে, 'স্যার, আপনার ঠিকানা পেলাম, সেখানে তো আপনার নাম নেই'।

হাসল বৃদ্ধ, বলল, লিখে নাও, 'রসওয়েল পাবলো'।

আহমদ মুসা দ্রুত 'ক্লীফ ডোয়েলিং' পৌঁছতে চেয়েছিল। পারল না। একটা রাত এস্পানোলাতে তাকে থাকতে হলো।

থাকতে হলো খোঁজ খবর নেবার জন্যেও।

আহমদ মুসার গন্তব্য ক্লীফ ডোয়েলিং নয়। ক্লীফ ডোয়েলিং থেকে একটু দক্ষিণে 'লস আলামোসে'র দিকে একটু এগুলে গম্বুজাকৃতি একটা সবুজ পাহাড় আছে সেটাই তার গন্তব্য। সেই সবুজ পাহাড়ের মালিক ছিলেন একজন ইহুদী

বিজ্ঞানী। তিনি মৃত্যুর সময় তার বাড়ি সমেত সবুজ পাহাড়টি দিয়ে গেছেন তাদের ধর্মীয় 'সিনাগগ' কে। সেখানে সেই বিজ্ঞানীর স্মৃতিতে তৈরী হয়েছে এক 'সিনাগগ'। সেই সিনাগগকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ইহুদীবাদীদের একটা গোপন আস্তানা। এই গোপন আস্তানার একটা বড় কাজ হলো 'লস আলামোসে'র উপর গোয়েন্দাগিরি করা।

'লাস আলামোস' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে পুরোনো, সবচেয়ে সমৃদ্ধ পারমাণবিক গবেষণ কেন্দ্র। এই কেন্দ্রেই তৈরী হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম আণবিক বোমা। এখন এই গবেষণাগারে 'স্ট্রাটেজিক ডিফেন্স ইনিশিয়েটিভ' (SDI) এর নানা দিকের উপর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা চলছে। সবুজ পাহাড়ের ইহুদী সিনাগগ এ গবেষণার উপরই চোখ রাখছে। প্রতিটি উন্নয়ন এবং পরিকল্পনা ও প্রস্তাব তারা মনিটর করে।

আহমদ মুসা খোঁজ নিয়ে জেনেছে 'ক্লীফ ডোয়েলিং' থেকে তাকে যেতে হবে সবুজ পাহাড়ের সিনাগগের দিকে। ক্লীফ ডোয়েলিং থেকে দক্ষিণ দিকে 'লস আলামোস' পর্যন্ত এবং তার আশপাশ এলাকায় রাতে ব্যক্তিগত ছাড়া কোন ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস চলে না। আহমদ মুসাকে যেহেতু যেতে হবে ভাড়া গাড়িতে, তাই তাকে রাতটা অপেক্ষা করতে হলো এস্পানোলাতে।

এক রাত অপেক্ষা করাটা তার জন্যে শাপে বর হলো। ওয়াশিংটনে নকল কারসেনের কাছ থেকে ক্লীফ ডোয়েলিং ও লস আলামোস এর মাঝখানের গম্বুজাকৃতি সবুজ পাহাড়ের সিনাগগের নামটাই সে শুধু পেয়েছিল। কিন্তু এক রাতের সময় হাতে পাওয়ায় খোঁজ খবর নিতে গিয়ে আরও কিছু জানতে পারল সে। বিল নামে একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার তাকে বলল, 'স্যার আমার দশ বছর ট্যাক্সি চালানোর জীবনে এই প্রথম একজন প্যাসেঞ্জার পেলাম সবুজ পাহাড় সিনাগগে যাবার'।

'ইহুদীরা সিনাগগে যায় না?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'ওখানে কেন যাবে স্যার! 'সান্তাফে'তেই তো সিনাগগ আছে'।

'তাহলে ওখানে সিনাগগ করতে গেল কেন?'

'জানি না স্যার। পর্যটকরাও ওখানে যায় না'।

‘কেন?’

‘সিনাগগের কর্তৃপক্ষরা নাকি পছন্দ করে না। বলে, এটা নতুন সিনাগগ। ঐতিহাসিক হলে দেখার কিছু থাকতো’।

বলল, ‘তুমি কোনদিন গেছ সেখানে?’

‘ক্লীফ ডোয়েলিং থেকে লস আলামোসে যাবার একটা রাস্তা সবুজ পাহাড়ের পাশ দিয়ে গেছে। একবার লস আলামোস গেছি ঐ পথ দিয়ে। ফেরার পথে লস আলামোস থেকে একজন আমার গাড়িতে উঠেছিল। সে নেমেছিল ঐ সিনাগগে। তাকে নামিয়ে দেয়ার জন্যে আমি সিনাগগের গাড়ি বারান্দা পর্যন্ত গিয়েছিলাম। সাংঘাতিক ওদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা স্যার। গাড়ি বারান্দা পৌঁছতে আমাকে দু’বার চেক করেছে ওরা’।

‘ঐ লোকটিকে চেক করেনি?’

‘না, করেনি। বরং সে লম্বা লম্বা স্যালুট পেয়েছে’।

‘বিল তুমি বললে লস আলামোসে মাত্র একবার গেছ। কেন?’

‘লস আলামোসে যাবার আলাদা পথ আছে সান্তাফে থেকে। অন্য পথগুলো বিশেষ করে উত্তর-দক্ষিন-পশ্চিম বনাঞ্চলের প্রাইভেট পথগুলো রেস্টিকেটেড। বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া এ পথগুলো ব্যবহার করা যায় না’।

‘তাহলে তুমি সেদিন গিয়েছিলে কিভাবে?’

‘যাকে নিয়ে গিয়েছিলাম, সে লস আলামোসের একজন বিজ্ঞানী’।

‘যাকে তুমি নিয়ে এসেছিলে, সেও কি তাই?’

‘তা মনে হয়নি স্যার। সে লস আলামোস অফিস থেকে আমর গাড়িতে চড়েনি। গবেষণা কেন্দ্রের বাইরে একটা ঝোঁপের আড়ালে দাঁড়িয়েছিল। আমার গাড়ি সেখানে পৌঁছতেই সে রাস্তায় ছুটে আসে। মনে হয়েছিল, সে ওঁত পেতে ছিল গাড়ির অপেক্ষায়।

‘তাহলে নিশ্চয় সে লস আলামোসের চাকুরে নয়। কারণ চাকুরেরা সবাই পারমাণবিক গবেষণাগারের সেফটি কোড অনুসারে লস আলামোসেই থাকার কথা’।

‘কিন্তু তার গায়ে লস আলামোসের ইউনিফরম ছিল। আমার গাড়িতে উঠবার পর তড়িঘড়ি তা সে খুলে ফেলে’।

‘তড়িঘড়ি বলছ কেন বিল?’

‘গাড়িতে উঠেই দ্রুত সে ইউনিফরমের বোতাম খোলা শুরু করে’।

‘আচ্ছা তোমার গাড়িতে যাওয়া বিজ্ঞানী কি ইউনিফরম পরে ছিল?’

‘হ্যাঁ, কিন্তু এত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন কেন? যাবেন তো আপনি সবুজ পাহাড়ে,লস আলামোসে তো নয়’।

‘দেখ জানার প্রত্যেকটা বিষয় খুটেঁ খুটেঁ জানা আমার অভ্যাস’।

বলে আহমদ মুসা তাকে খুব সকালে গাড়ি নিয়ে হোটেলে আসতে বলে বিদায় নিয়েছিল।

পরদিন সকালে সবুজ পাহাড় সিনাগগে যাত্রা করল আহমদ মুসা।

এস্পানোলা শহরটি রেড ইন্ডিয়ান রিজার্ভ এলাকার মধ্যে। এলাকাটির সীমান্ত সান্তাফে জাতীয় ফরেস্ট এলাকার সাথে মিশে আছে।

রাজধানী সান্তাফেসহ নিউ মেক্সিকোর গোটা অঞ্চলটাই পার্বত্য উচ্চভূমি।

আহমদ মুসার মনে হলো গাড়িটা যেন ক্রমেই উঁচুতে উঠে যাচ্ছে। মনে পড়ল রুদ্ধ পর্বতমালার কি এক পাহাড় হবে সামনেই। ঐ পাহাড়ের দক্ষিণ ঢালেই তো ক্লীফগুলো।

আরও কিছু পথ চলার পর গাড়ি একটু বাম দিকে বাঁক নিল। তার মনে হলো গাড়ি এবার নিচে নামছে।

‘স্যার আমরা গ্রান্ডি নদীর সনি লুইস উপত্যকায় নামছি। এই উপত্যকাতেই আপনার সবুজ পাহাড়। এই উপত্যকারই আদিগন্ত বনরাজিবেষ্টিত উচ্চভূমিতে লস আলামোস ল্যাবরেটরী’।

‘বিল তোমরা নিউ মেক্সিকানরা লস আলামোস নিয়ে খুব গর্বিত তাই না?’

‘হ্যাঁ, স্যার। প্রথমটাসহ প্রথম দিকের সব আণবিক বোমা তো এই গবেষণাগারেই তৈরী হয়’।

‘শুধু তো তৈরী নয়, তোমাদের এই ট্রিনিটি ভ্যালিতে আণবিক বোমার প্রথম পরীক্ষাও সংঘটিত হয়’।

‘স্যার আপনি দেখছি এই এলাকার অনেক কিছুই জানেন’।

‘কেন, এটা তো সবাই জানার কথা। লস আলামোস, ট্রিনিটি ভ্যালি তো জগত বিখ্যাত। নিউ মেক্সিকো এলে কোন মানুষ এ দু’টো জায়গা না দেখে যায় না’।

গল্পে গল্পে অনেক সময় চলে গেল।

আহমদ মুসা বলল, ‘আর কতদূর তোমার সবুজ পাহাড়?’

‘আর দু’বাঁক ঘুরলেই স্যার’।

ড্রাইভার কথা শেষ করার সাথে সাথে হার্ড ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করাল।

ঝাঁকুনি সামলে উঠে সামনে তাকাতেই আহমদ মুসা দেখল, মুখোশ পরা একজন লোক স্টেনগান তাক করে গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

আপনাতেই আহমদ মুসার দৃষ্টি চারপাশ ঘুরে এল। দেখল, মুখোশ পরা আরও জনা পাঁচেক লোক স্টেনগান হাতে গাড়িটা ঘিরে ফেলেছে।

ছুটে এল দু’পাশ থেকে দু’জন গাড়ির জানালায়। একজন চিৎকার করে বলে উঠল, ‘এশিয়ান, এশিয়ান’।

পরক্ষণেই ছুটে এল বিশাল বপু আরেকজন লোক, তার হাতে একটা ফটো। সে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আহমদ মুসার দিকে, একবার হাতের ফটোগ্রাফের দিকে তাকাল। সেও বলে উঠল চিৎকার করে, ‘খুব একটা মিলছে না। কিন্তু এশিয়ান, এটাই বড় কথা। নামাও শালাকে। নিশ্চয় ছদ্মবেশে আছে’।

একজন সংগে সংগেই টান মেরে গাড়ির দরজা খুলে ফেলল। টানতে হলো না, আহমদ মুসা নিজেই নেমে এল গাড়ি থেকে। ভাবল, জেনারেল শ্যারনদেরই পাতা ফাঁদ কি? কিন্তু ওরা জানবে কি করে যে আহমদ মুসা নিউ মেক্সিকোর সবুজ পাহাড়ে আসছে! সে তো নিজ হাতে নকল কারসেন ওরফে ইহুদী কোহেনকে জর্জদের তত্বাবধানে রেখে এসেছে। সে মুক্ত হতে পেরেছে এটা বিশ্বাস হয় না। তাহলে এরা জানতে পারল কি করে? এরা যে আহমদ মুসাকেই খুঁজছে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

আহমদ মুসা নামতেই একজন তার চুল এবং আর একজন গোঁফ ধরে টান দিল। খুলে গেল দুটোই।

সেই মোটা লোকটা চিৎকার করে উঠল, 'মিলে গেছে। একেবারে মিলে গেছে। শয়তান আহমদ মুসাকে আবার আমরা হাতে পেয়েছি'।

নেমেই সে আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, 'উঃ তোমার জন্যে আমরা গতকাল দুপুর থেকে এখানে বসে আছি। কি যে কষ্ট দিয়েছ'।

'জানলে কি করে যে আমি আসব?' আহমদ মুসা স্বাভাবিক কন্ঠে জিজ্ঞেস করল।

মোটা লোকটি আহমদ মুসার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকাল। বলল,

'বাঃ তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন আমরা তোমাকে স্বাগত জানাতে এসেছি। হাফ ডজন উদ্যত স্টেনগানের সামনে কথা বলতে বুক একটুও কাঁপল না?'

'কাঁপবে কেন? তোমরা আমাকে হত্যা করতে পারবে না। সে ক্ষমতা তোমাদের নেই'।

লোকটির চোখ জ্বলে উঠল। সে তার স্টেনগানের বাঁট দিয়ে একটা আঘাত করল আহমদ মুসার মাথায়।

আহমদ মুসা মাথা সরিয়ে নেয়ায় আঘাতটা কান দিয়ে কাঁধে নেমে এল। কান ছিঁড়ে গেল। দর দর করে বেরিয়ে আসা রক্ত বুক, পৃষ্ঠদেশ ভাসিয়ে দিতে লাগল।

'ক্ষমতার কথা তুলছ, ক্ষমতা দেখবে চল'। আঘাত করার সাথে সাথে কথা কয়টি বলে হুংকার ছাড়ল সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে, এর হাত পা বেঁধে নিয়ে চল একে।

দু'জন ছুটে এল আহমদ মুসার দিকে।

'দাঁড়াও তোমরা, আমি ড্রাইভারকে ভাড়াটা দিয়ে নেই'।

বলে আহমদ মুসা পকেটে হাত দিয়ে এক গুচ্ছ নোট বের করে ড্রাইভারের সামনে তুলে ধরে বলল, 'নাও বিল, ধন্যবাদ তোমাকে'।

ড্রাইভার উদ্বেগ, আতংকে একেবারে পান্ডুর হয়ে গেছে। আহমদ মুসাকে ভাড়া দিতে দেখে চোখ দু'টি তার ছল ছল করে উঠল। বলল, 'থাক স্যার, আপনি.....'।

থেমে গেল, শেষ করতে পারল না। কথা আটকে গেছে তার গলায়।

আহমদ মুসা নোটগুলো ছুঁড়ে দিল ড্রাইভারের দিকে।

ওরা মহা উৎসাহে হাত পা বাঁধল আহমদ মুসার। তারপর চ্যাংদোলা করে নিয়ে চলল তাকে।

হঠাৎ ওদের একজন ঘুরে দাঁড়াল। চিৎকার করে উঠল ড্রাইভারকে উদ্দেশ্য করে, 'হারামজাদা, কি দেখছিস। এক মুহূর্ত দেরী করলে লাশ বানিয়ে দেব'।

ড্রা্ইভার তাড়াতাড়ি আহমদ মুসার দেয়া নোটগুলো কুড়িয়ে পকেটে ফেলে গাড়ি ব্যাক করে ছুটল সামনের দিকে।

শরীর কাঁপছে ড্রাইভারের। বুক তোলপাড় করছে আতংক ও বেদনায়।

তার মন বলে উঠল, যে লোক মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে ড্রাইভারের ভাড়া পরিশোধ করতে ভোলে না, সে কোন খারাপ লোক হতে পারে না। কিন্তু কেন ওরা ওঁকে ধরে নিয়ে গেল। কি দোষ তাঁর!

আবার বিস্মিতও কম হয়নি ড্রাইভার। সে যতখানি আতংক ও উদ্বিগ্ন হয়েছে, তার কণামাত্র উদ্বেগও ঐ লোকের চোখে মুখে দেখেনি। ব্যাপারটা অলৌকিক মনে হচ্ছে তার কাছে।

দু'জন আহমদ মুসার দেহ ঘরের মেঝেতে ছুড়ে দিয়ে বলে উঠল, 'দেখতে তো খুব হালকা পাতলা, কিন্তু পাথরের মত ভারি'।

আহমদ মুসার দেহ গিয়ে পড়ল জেনারেল শ্যারনের পায়ের কাছে।

সোফায় পাশাপাশি বসে ছিল জেনারেল শ্যারন, মিঃ গোল্ড ওয়াটার ও মিঃ কলিন্স।

জেনারেল শ্যারন ডান পা দিয়ে আহমদ মুসার পাঁজরে একটা ঘা দিয়ে বলল, 'কি ব্যাপার আহমদ মুসা নিউ মেক্সিকোর সবুজ পাহাড়ে যে তুমি? লস আলামোস দেখতে এসেছিলে নাকি? কিন্তু লস আলামোসের রাস্তা তো এটা নয়'।

‘ভনিতা করবেন না জেনারেল শ্যারন। আপনি জানেন আমি কেন এসেছি’। বলল আহমদ মুসা।

‘কিন্তু আহমদ মুসা, তুমিও দেখছি বোকামী কর মাঝে মাঝে। তুমি কেমন করে নিশ্চিত হলে যে কোহেনকে আটকালে আমরা টের পাবো না এবং কোহেন আটক হওয়র পর সবুজ পাহাড়ে তুমি আসবে এটা আমরা বুঝব না?’

‘সত্যিই বলেছেন। কোহেনের কাছে অয়্যারলেস ট্রান্সমিটার চীপস আছে, এ বিষয়টা আমাদের চিন্তায় আসেনি। আর আমি বোকামী না করলে আমাকে এভাবে আটকানো তোমার পক্ষে সম্ভব হতো কি করে?’

‘সেবার আমাদের বোকা বানিয়ে তুমি সরে পড়েছিলে। এবার তোমাকে বোকা বানিয়ে আমরা তোমাকে খাঁচায় পুরলাম’। বলে হো হো করে হেসে উঠল জেনারেল শ্যারন।

‘ঠিক আছে। আমাকে তো তোমরা পেয়েছ, এবার তোমরা মিঃ কারসেনকে ছেড়ে দাও। আর তোমাদের ওয়াদা অনুসারেই ডাঃ মার্গারেট ও লায়লা জেনিফারকে ছেড়ে দিতে হবে’।

আবার জেনারেল হেসে উঠল হো হো করে। বলল, ‘কোহেনকে পাওয়ার পর আমরা ছেড়ে দেব মিঃ কারসেনকে। কিন্তু বল ডাঃ মার্গারেট ও লায়লা জেনিফারকে ছাড়ি কি করে। ইতিমধ্যেই আমাদের লোকরা তাদের প্রেমে পড়ে গেছে। তুমিই বল আমি কেমন করে বঞ্চিত করি ওদের? ওরা তো এক সাগর তৃষ্ঞা নিয়ে আমাদের দেয়া মেয়াদ পনের দিন পার হওয়ার প্রহর গুনছে। এখন কিন্তু তুমি আমাদের হাতে, পনের দিনের মেয়াদ পার হওয়ার আর কোন প্রয়োজন নেই’।

‘কিন্তু আমি এও জানি মিঃ শ্যারন, আমি বেঁচে থাকতে তাদের গায়ে তোমরা হাত দেবে না’।

‘কেন?’

‘কারণ আহমদ মুসাকে তোমরা চেন’।

‘আহমদ মুসা, তোমার এই অতি আত্মবিশ্বাস তোমাকে অতীতে বহুবার বাঁচিয়েছে জানি, কিন্তু সব বার বাঁচাবে তা ঠিক নয়। সব কিছুরই একটা শেষ

আছে। সেই শেষ অবস্থায় তুমি পৌঁছে গেছ। আগামীকাল সকালে তোমাকে নিয়ে আকাশে উড়ব আমরা ইউরোপের কোন একটি দেশের উদ্দেশ্যে। আমরা মার্কিন সীমান্ত অতিক্রম করার পর ডাঃ মার্গারেট ও লায়লা জেনিফারকে ক্ষুধার্থ হায়েনারা ছিঁড়ে –ফেড়ে খাবে'।

বলে জেনারেল শ্যারন আবার হেসে উঠল হো হো করে।

'মনে হচ্ছে মিঃ শ্যারন তোমার নিজের এবং সবার ভাগ্যটা যেন তুমিই লেখ'। বলল আহমদ মুসা।

'ভাগ্য ঈশ্বরই লেখেন। তবে তোমাদের কবি ইকবালের একটা কথা আছে না, খুদিকে এমন বুলন্দ কর, যাতে খোদা বলেন, বল বান্দাহ তোমার ইচছা কি, আমি কি লিখব তোমার ভাগ্য। এখন ঈশ্বর তোমাদের ভাগ্য আমার হাতে দিয়ে দিয়েছেন'।

'সৌভাগ্য আপনার মিঃ শ্যারন'।

'আচ্ছা, মিঃ আহমদ মুসা আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে, আপনি এখন মুক্তির কথা ভাবছেন, না ভবিষ্যতটা অন্ধকার দেখছেন?' বলল এফ.বি.আই এজেন্ট কলিন্স।

'আপনি.....?'

'আমি কলিন্স'।

'আরেকটা পরিচয়ও আছে, আপনি এফ.বি. আই এর লোক'। বলল আহমদ মুসা।

বিষ্ময় দেখা দিল কলিন্সের চোখে মুখে। বলল, 'আপনি কি করে জানলেন?'

'এফ. বি. আই এজেন্টদের চোখেই তাদের পরিচয় লেখা থাকে সাধারণত'।

'সাধারণত বললেন কেন?'

'চেনা যায় না, এমন অসাধারণ ক্ষেত্রও বহু আছে'।

'আমার প্রশ্নের কি জবাব দেবেন?' বলল কলিন্স।

‘মুক্তি সম্পর্কে কোন ভাবনা আমার মাথায় এখন নেই। তাই বলে আমি সামনে অন্ধকারও দেখছি না। মৃত্যুকে যারা ‘অন্ধকার’ রূপে দেখে, তারা ভবিষ্যত অন্ধকার দেখতে পায়। কিন্তু মৃত্যু আমার কাছে আলোকিত এক সিংহ দরজা’। বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা একটু থামল। পরক্ষণেই আবার বলে উঠল, ‘কিন্তু জেনারেল শ্যারন ও মিঃ গোল্ড ওয়াটারের সাথে এফ.বি.আই এর লোক কেন? মার্কিন সরকার কি জেনারেল শ্যারনকে সাহায্য করছে?’

মিঃ কলিন্সের মুখে কিছুটা বিব্রত ভাব ফুটে উঠল। বলল, ‘সরকারের কোন পলিসির প্রশ্ন এখানে জড়িত নেই। জেনারেল শ্যারন একজন গন্যমান্য লোক, আমাদের দেশে এসেছেন, তাই তাকে একটু সঙ্গ দেয়া’।

‘মেহমানকে সঙ্গ দেয়া আর লোক কিডন্যাপের অভিযানে তাকে সঙ্গ দেয়া কি এক জিনিস?’ আহমদ মুসার কন্ঠে জিজ্ঞাসা।

‘দেখুন আমি ছোট চাকুরী করি। এসব প্রশ্নের জবাব আমার দেবার কথা নয়’। বলল কলিন্স।

কলিন্স থামতেই গর্জন করে উঠল জেনারেল শ্যারন। বলল, ‘তুমি এদেশে বেআইনিভাবে প্রবেশকারী একজন বন্দী। এফ.বি.আইকে তোমার কাছে জবাবদিহি করতে হবে? সাহস তুমি খুব বেশীই দেখাচ্ছ’।

‘আমি বেআইনী প্রবেশকারী হলে সেটা দেখার দায়িত্ব মার্কিন সরকারের, জেনারেল শ্যারনের নিশ্চয় নয়’।

‘আহমদ মুসা আমি তোমার প্রশংসা করি। কিন্তু তোমার এখন অবস্থা কি, আর তুমি আলোচনা করছ কোন বিষয়ে। তোমাকে আমরা ধরেছি, কেন ধরেছি, কিভাবে ধরেছি, সে জবাবদিহি আমরা তোমার কাছে করব না’। বলল জেনারেল শ্যারন।

‘সেটা আমি জানি। আমি কথা বলছিলাম মিঃ কলিন্সের সাথে। কারণ সে সরকারী লোক। এমনকি তার সাহায্যও আমি চাইতে পারি’।

‘তা চাইতে পার, কিন্তু তোমাকে সাহায্য করার এখন দুনিয়াতে আর কেউ নেই’। শ্যারন বলল।

‘দুনিয়ার কোন সাহায্যকারীর আমার দরকারও নেই। আমার আল্লাহ আমার জন্যে যথেষ্ট’।

‘ঠিক আছে, দেখা যাবে’।

বলে জেনারেল শ্যারন উচ্চস্বরে বলল, ‘কে আছ, এদিকে এস’।

ডাকার সঙ্গে সঙ্গে চারজন বড়ি বিল্ডার গেরিলার মত পা ফেলে এগিয়ে এল।

‘বিল্ডানীয় অন্ধকূপ আছে না, সেখানে একে রেখে দাও। হাত পা বাঁধা থাকবে’।

বলে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘তুমি বোধ হয় জান না, বিজ্ঞানী জন জ্যাকবের অতি পছন্দের বাড়ি এটা। যে সিনাগগ পেরিয়ে এলে সেটাও তাঁরই তৈরী। তাঁর অন্ধকূপে তুমি ভালই থাকবে। তুমি হয়তো বলবে বিজ্ঞানীর আবার অন্ধকূপ কি? বিজ্ঞানীর হবি ছিল মাঝে মাঝে কয়েকদিন ধরে কবরের নির্জনতায় বসবাস করা। তার অন্ধকূপ ঐ উদ্দেশ্যেই তৈরী। তুমি কাল সকাল পর্যন্ত ওখানে থেকে নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কর। একটা সুবিধা তোমাকে দেয়া হবে। সেটা হলো, অন্ধকার দূর করার জন্যে সেখানে তুমি আলো পাবে’। থামল জেনারেল শ্যারন।

তার থামার সাথে সাথেই ঐ চারজন এসে খেলনার মত আহমদ মুসাকে তুলে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল ঘর থেকে বাইরে বেরুবার জন্যে।

‘অন্ধকূপ থেকে বেরুবার চেষ্টা করো না। পারবে না। তাছাড়া সবুজ পাহাড়ের এই ঘাঁটি থেকে বেরুতে হলে তোমার সেনাবাহিনী দরকার’। চিৎকার করে বলল শ্যারন।

‘মিঃ কারসেনকে ছাড়ছেন কখন?’

‘দুঃখিত আহমদ মুসা, তুমি এখানে আসার আগেই মিঃ কারসেনকে এখান থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। তাকে আমরা ছাড়ব, তবে তার আগে আমরা কোহেনকে ফেরত পেতে চাই’।

জেনারেল শ্যারন যখন কথা শেষ করল, তখন আহমদ মুসাকে ঘরের বাইরে নেয়া হয়েছে। আহমদ মুসা আর কোন কথা বলার সুযোগ পেল না।

খুশী হলো আহমদ মুসা যে তারা কোন সময়ই আহমদ মুসার চোখ বাঁধেনি।

ছোট বড় অনেক করিডোর পেরিয়ে তাকে নিয়ে আসা হলো অনেকটা ছোট আকারের একটি কক্ষে।

দেখে মনে হল কক্ষটি স্টোর রুম। কক্ষে বহু ড্রয়ার ও তাক। তাকগুলোতে কাঁচের স্লাইডিং ডোর। তাকগুলোতে নানা সাইজের কার্টুন।

কার্টুনগুলো হিব্রু ভাষায় লেখা।

হিব্রু ইহুদীদের নিজস্ব ভাষা। ইহুদীদের বাইরে এ ভাষার প্রচলন নেই।

অধিকাংশ কার্টুনে হিব্রু ভাষায় লেখা 'প্রজেক্ট' শব্দের পাশে বিভিন্ন সংখ্যা।

কক্ষের দরজার বিপরীত দেয়ালে স্টীলের বড় আলমারি। রং করা, কিন্তু ময়লা ও ধূলায় রং বিকৃত হয়েছে। মনে হয় আলমারিটায় বহুদিন কেউ হাত দেয়নি।

যে দু'জন আহমদ মুসাকে বহন করছিল তারা তাকে একটা বটম শেলফের পাশে ছুঁড়ে দেয়ার মত রেখে বলল, 'শালার শরীরটা লোহার নাকি,এত ভারী কেন?'

আহমদ মুসার তখনও হাত পা বাঁধা।

আহমদ মুসা শেলফের পাশে পড়ার সময় এর স্লাইডিং ডোরে ধাক্কা খায়। দরজা সরে যাওয়ায় সেলফের এপাশের অনেকখানি ফাঁক হয়ে যায়। ভেতর থেকে একটা কাগজে আঁকা কার্টুন গড়িয়ে পড়ে আহমদ মুসার পাশেই।

কার্টুনটা ছোট, সম্ভবত বড় একটা কার্টুনের উপর ছিল, গড়িয়ে পড়েছে।

একটু মুখ ঘুরিয়ে চোখটা বাঁকিয়ে তাকাল কার্টুনটার দিকে। কার্টুনের গায়ে হিব্রু ভাষায় একটা সিল। পড়ল আহমদ মুসা 'ব্যবহার শেষ, ধ্বংস করুন'। সিলের নিচে একটা হিব্রু ইনিশিয়াল এবং তারিখ। তারিখটা মাত্র চারদিন আগের।

কার্টুনটার প্রতি আগ্রহী হলো আহমদ মুসা। এটা কি কাজে ব্যবহার করেছে, এখন ধ্বংস করারই বা হুকুম কেন?

আহমদ মুসা কার্টুনটার উপর শুয়ে পড়ে কার্টুনটাকে হাতের মুঠোয় নিল।

আহমদ মুসাকে রেখেই দু'জন এগুচ্ছিল আলমিরার দিকে। আর অন্য দু'জন স্টেনগান বাগিয়ে দাঁড়িয়েছিল ঘরের দরজায়। আহমদ মুসার কৌশলটা তাদের নজরে পড়েনি।

আলমিরার দিকে এগিয়ে যাওয়া লোক দু'জন থমকে দাঁড়িয়েছিল। বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, 'দেখ অসুখ-বিসুখের ভান করোনা। লাভ হবে না'।

বলেই তারা এগুলো আলমিরার দিকে।

আহমদ মুসা শুয়ে থেকেই কার্টুনটি চালান করল কোটের পকেটে।

আহমদ মুসা শুয়ে শুয়ে দেখছিল লোক দু'টিকে, যারা আলমিরার দিকে যাচ্ছে।

ওরা আলমিরার দিকে যাচ্ছে কেন? আলমিরা খুলবে নাকি। তাকে সোজা অন্ধকূপে নিয়ে যাওয়ার কথা তবে এখানে এই হল্ট কেন?

লোক দু'টি আলমিরার কাছে পৌঁছেছে। একজন হাত বাড়াল আলমিরার দরজার হাতলের দিকে। সে আলমিরার হাতলে হাত রাখতেই আলমিরা খুলে গেল।

বিস্মিত হলো আহমদ মুসা। হাতল তাকে ঘুরাতে হলো না। তার মানে আলমিরার দরজা খোলার জন্যে হাতলে চাপ দিতে হয়। অথবা হাতলে কোন বোতাম বা সুইচ আছে।

দরজা খুলতেই ওদের একজন বলল 'তাহলে সব ঠিক আছে। চল ব্যাটাকে নিয়ে আসি'।

ওরা এসে আহমদ মুসাকে নিয়ে গেল চ্যাংদোলা করে এবং ছুঁড়ে দিল আলমিরার ভেতর।

আলমিরাটা ফাঁকা, আলমিরার মেঝেয় ছিটকে পড়ে গেল আহমদ মুসা।

যারা আহমদ মুসাকে আলমিরার মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েছিল, তাদের একজন আহমদ মুসাকে বলল, যাও তুমি এখন ঠিক অন্ধকূপে পৌঁছে যাবে। তবে কূপটাতে অন্ধকার রাখা হয়নি, আলোকিত করা হয়েছে। তুমি নাকি খুব মূল্যবান, এজন্যে এই মর্যাদা তোমাকে দেয়া হয়েছে'।

তারা কথা শেষ করতেই আপনাতেই আলমিরার দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আর পরক্ষণেই নড়ে উঠল দরজা। নামতে শুরু করল আলমিরাটা নিচে।

নিজেকে বোকা মনে হলো আহমদ মুসার। আলমিরাটা যে লিফট সে ঘুনাক্ষরেও তা ভাবতে পারেনি।

লিফট নামছে তো নামছেই। কত নিচে অন্ধকূপটা?

আহমদ মুসার মনে হলো চারতলা পরিমাণ নেমে লিফট থেমে গেল।

ধীরে ধীরে খুলে গেল লিফটের দরজা।

খোলা দরজা পথে দেখতে পেল একটা গোলাকার মেঝে, কার্পেট মোড়ানো। মেঝের চারদিক থেকে উঠে গেছে গোল দেয়াল। দেয়ালটাও কার্পেট মোড়ানো।

এটাই তাহলে বিজ্ঞানীর সেই অন্ধকূপ। ভাবল আহমদ মুসা।

বিজ্ঞানীর অন্ধকূপের মেঝে একেবারে শূন্য। বিছানো কার্পেট ছাড়া তিল পরিমাণ জিনিসও মেঝেতে নেই। খাবার পানিটুকুও রাখা হয়নি।

চমকে উঠল আহমদ মুসা।

কিছুতেই সে লিফট থেকে অন্ধকুপে নামবে না। নিশ্চয় লিফট উঠে যাবে। তার সাথে আহমদ মুসাও উঠে যাবে। ভাবল আহমদ মুসা।

যেমন শুয়েছিল তেমনি শুয়ে থাকল আহমদ মুসা লিফটের মেঝেতে।

সময় বয়ে যায়। অনেক সময়।

কিন্তু লিফট নড়ার নাম নেই।

তাহলে কি সে লিফটে থাকা পর্যন্ত লিফট উঠবে না? ভাবল আহমদ মুসা। তাহলে কি মানুষের দেহের ওজনের সাথে লিফটের ওঠানামার সম্পর্ক আছে? যেমন সে লিফটে উঠার সাথে সাথে লিফট নেমে এলো, তেমনি তার ওজন লিফট থেকে সরে যাবার পর লিফট উঠে যাবে? ধরা যাক উঠে যাবে, কিন্তু আবার নামবে কি করে? কেউ নামিয়ে নিয়ে আসবে, না অন্ধকূপে লিফট নামিয়ে আনার ব্যবস্থা আছে?

এমন হাজারো চিন্তা মাথায় এসে ভীড় করতে লাগল আহমদ মুসার।

একটা ভাবনা আহমদ মুসাকে খুবই পীড়িত করতে লাগল। বিজ্ঞানী এই অন্ধকূপে একদিন, দু'দিন কয়েকদিন থাকতেন। তাহলে এখানে আসা, এখান থেকে বের হ্ওয়ার একটা স্বাধীন ব্যবস্থা থাকবে না কেন? এটা স্বাভাবিক নয় যে এখান থেকে বের হওয়ার ব্যাপারে তিনি অন্যের মুখাপেক্ষী ছিলেন।

শেষ এই ভাবনার মধ্যে আহমদ মুসা আশার প্রদীপ দেখতে পেল। তার মনে নতুন সাহসের ও সৃষ্টি হলো।

আহমদ মুসা হাত পায়ের বাঁধন খোলার পর লিফট থেকে নামার সিদ্ধান্ত নিল।

তার হাত পায়ের বাঁধন খুব একটা জটিল ছিল না। এই বাঁধন তারা দিয়েছিল সম্ভবত আহমদ মুসার আক্রমন থেকে বাঁচার জন্যে।

আহমদ মুসা বাঁধা হাত দুটো মুখের সামনে নিয়ে দাঁত দিয়ে হাতের বাঁধন খুলে ফেলল।

বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে আহমদ মুসা লিফট থেকে বেরিয়ে বিসমিল্লাহ বলে পা রাখল অন্ধকূপের মেঝেতে।

আহমদ মুসা লিফট থেকে নামার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে লিফট উঠে গেল।

লিফট উঠে যাওয়ার সাথে সাথে নিজেকে বড় একাকী মনে হলো আহমদ মুসার।

সত্যিই ভয়াবহ এক অন্ধকূপ এটা।

আহমদ মুসা উপর দিকে তাকিয়ে দেখল, গোলাকার দেয়াল উঠে গেছে উপরে। উপরের ছাদটি সে দেখতে পেল না।

মনে হয় গ্রাউন্ড ফ্লোরটাই এই অন্ধকূপের ছাদ, ভাবল আহমদ মুসা। এমন অন্ধকূপ যে কোথাও থাকতে পারে, কোনদিন ভাবেওনি সে। অভাবনীয় সেই অন্ধকূপে দাঁড়িয়ে সত্যিই কেমন একটা অজানা উদ্বেগ বোধ করল আহমদ মুসা।

পরক্ষণেই আগের সেই ভাবনাই ছুটে এল তার মনে। বিজ্ঞানী কেন এই অন্ধকূপ তৈরী করেছিলেন এই সবুজ পাহাড়ে তাঁর বাড়িতে? লোক বিচ্ছিন্ন হয়ে

নির্জনে এখানে এসে থাকবেন, এজন্যই? এ যুক্তিটা তাঁর কাছে মোটেই শক্তিশালী মনে হলো না।

এ সময় তাঁর হঠাৎ মনে পড়ল শেলফ থেকে পাওয়া পকেটে রাখা কার্টুনের কথা।

কার্টুনটি পকেট থেকে বের করল আহমদ মুসা।

খুলল কার্টুনটি।

অনেকগুলো টুকরো কাগজ বের হলো কার্টুনটির সাথে।

প্রত্যেকটি একই সাইজের।

কয়েকটিতে হিব্রু লেখা। অন্য সবগুলোতেই জটিল অংকন ও ডিজাইন। হিব্রুগুলো হাতে লেখা এবং ডিজাইন ও অংকনগুলো কম্পিউটার প্রিন্ট।

হিব্রু কাগজগুলো সম্ভবত ড্রইং কলম দিয়ে লিখা। অক্ষরগুলো ছোট ও সুক্ষ্ম।

পড়ল আহমদ মুসা, এস.ডি.আই ফেজ ফাইভ গাইডেড কম্পিউটার কমান্ড ডিজাইন এন্ড মিসাইল কমান্ড কোডস প্লাস ফোর্থ জেনারেশন এস.ডি.আই কমান্ড কম্পিউটার।

আহমদ মুসা পড়ে বুঝল, ডিজাইন ও অংকনগুলো স্ট্রাটেজিক ডিফেন্স ইনিশিয়েটিভের ফিফথ ফেজের হবে। কিন্তু এগুলো এই সিনাগগে কেন? আবার ভাবল, ইহুদী বিজ্ঞানীর এই বাড়ি ও সিনাগগ, তারই কোন কাজ হবে এ অংকন ও ডিজাইনগুলো। কিন্তু পরক্ষণেই মনে প্রশ্ন জাগল, এখন তো বিজ্ঞানী নেই। কে এগুলো ব্যবহার করলো এবং এগুলো ধ্বংস করারই বা প্রয়োজন কি? এ প্রশ্নের কোন জবাব পেল না সে।

ঘটনা কি বুঝতে না পারলেও আহমদ মুসা একটা জিনিষ বুঝলো, এস.ডি.আই ডাটাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সে জানে এস.ডি.আই এর উপর যে গবেষণা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চালাচ্ছে, তা এখন ফোর্থ জেনারেশনে। সুতরাং এই ফিফথ জেনারেশনের ডাটা অগ্রগামী গবেষণার ফল। অতএব এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে।

এই চিন্তা করে আহমদ মুসা ডকুমেন্ট পেপারগুলো কার্টুনে পুরে কোটের ভেতরের পকেটে রেখে দিল।

হাতের কাজটা শেষ হলে, আগের চিন্তায় ফিরে গেল আহমদ মুসার মন। ফুল কার্পেটে মোড়া এই অন্ধকূপ যদি বিজ্ঞানী কোন সময় এখানে কাটিয়ে দেবার জন্যে করে থাকেন, তাহলে এখানে বসবাসের উপকরণ কোথায়? উপকরণ রাখার জায়গাও তো নেই। এমন তো হতে পারে না। তাহলে কি ওরা মিথ্যা বলেছে? বিজ্ঞানী আসলে এখানে থাকতেন না? না থাকলে কোন প্রয়োজনে কেন কার্পেটে মোড়া প্রায় চল্লিশ ফিট গভীর এই অন্ধকূপ তৈরী করা হলো? বিজ্ঞানী এখানে আসতেন, এ কথাই ঠিক ধরে নিতে হবে।

তাহলে কিভাবে থাকতেন, এ প্রশ্নের জবাব কি?

অন্ধকারের চার দেয়ালে নজর বুলালো আহমদ মুসা।

কালো লোমশ কার্পেটে আবৃত দেয়াল। মেঝেও তাই। কার্পেটের লোমগুলো অস্বাভাবিক লম্বা।

তার দু'চোখ মেঝের উপর দিয়েও ঘুরে এল, কিন্তু দেয়াল কিংবা মেঝেতে অস্বাভাবিক কিছুই চোখে পড়ল না।

কি খুঁজছে তার দু'চোখ?

দেয়ালে গোপন কেবিন রাখা আধুনিক রুম ডেকোরেশনের একটা খুবই চালু পদ্ধতি। বিজ্ঞানী তা রাখতে পারেন তার গোপন খাজাঞ্চিখানা বা প্রয়োজনীয় স্টোর হিসেবে। যা তার অন্ধকূপে থাকাকালীন কাজে আসবে।

কিন্তু তেমন কিছু চোখে পড়ল না।

চোখ দু'টি তার ক্লান্ত হয়ে পড়ল।

শুয়ে পড়ল সে অন্ধকূপের মেঝেতে।

ফ্লোরে শুয়ে পড়ে আহমদ মুসা চোখ বুজতে যাচ্ছিল, এমন সময় সামনের দেয়ালটা যেখানে অন্ধকুপের মেঝের সাথে মিশেছে ঠিক সেখান থেকে একটা রূপালী আলোর ঝলক এসে তার চোখে লাগল। যেন কালোর অরণ্যে এক সূর্য বিন্দু।

সংগে সংগেই উঠে বসল আহমদ মুসা।

এগুলো সেই সূর্য বিন্দু লক্ষ্য করে। দেখল, সূর্য বিন্দুটা একটা পেরেকের শীর্ষভাগ। মনে হলো পেরেকটা কার্পেটকে দেয়ালের সাথে সেঁটে রাখার জন্যেই।

তাহলে এ ধরনের আরও আছে ভাবল আহমদ মুসা।

অকারণেই খুঁজতে লাগল সে পেরেকগুলো। পরে সে ভাবল, পেরেকগুলো খুলে কার্পেটের নিচের দেয়াল সে দেখতে পারে সেখানে রহস্যের কোন সমাধান পাওয়া যায় কিনা।

কিন্তু ব্যর্থ হলো আহমদ মুসা। তন্ন তন্ন করে খুজেঁও আর কোন পেরেক সে পেল না।

শোয়া অবস্থায় যেহেতু পেরেকটি চোখে পড়েছে, তাই মেঝেয় গড়িয়ে গড়িয়েও সন্ধান করল আহমদ মুসা। কিন্তু না, আর কোন পেরেক চোখে পড়ল না।

আহমদ মুসা ফিরে গেল সেই আগের পেরেকের কাছে।

পেরেকের কাছে মেঝেয় সে বসে পড়ল।

অবাক জিজ্ঞাসায় আবার দেখতে লাগল পেরেকটিকে। মাত্র একটা পেরেক দিয়ে কার্পেটটিকে তো আর আটকে রাখা যাবেনা। তাহলে? মাত্র একটা পেরেকের কি তাৎপর্য!

পেরেকের চেয়ে বেশী উজ্জ্বল মনে হচ্ছে পেরেকটিকে। আহমদ মুসা আরও খেয়াল করল, পেরেকের মাথায় যে খাঁজ কাটা থাকে এর তা নেই। তার মানে পেরেকটিকে ঘুরিয়ে নয়, পিটিয়ে লাগানো হয়েছে। কিন্তু এমনটা তো স্বাভাবিক নয়। কারণ এ ধরনের পেরেক মজবুত হয় না, সহজে তুলেও ফেলা যায়।

চিন্তাটার সংগে সংগেই আহমদ মুসা দুই আঙ্গুল দিয়ে পেরেকটি ধরে টান দিল।

সংগে সংগে হাতের সাথে উঠে এল পেরেকটি। কিন্তু পেরেক নয় বস্তুটা। নিচের দিকটা প্লেন এবং ব্ল্যাক স্টিল। যার চুম্বকত্ব আছে, তোলার সময়ই সে তা টের পেয়েছে। চুম্বকের আকর্ষণেই আরেকটা স্টিল বোতামের সাথে তা লেগে ছিল।

প্রথমটায় অবাক হয়েছিল আহমদ মুসা। পরে তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ভাবল, নিশ্চয় এর মধ্যে কোন রহস্য আছে।

কিন্তু কি হতে পারে সে রহস্যটা?

রহস্যটা যাই হোক, কোন সন্দেহ নেই যে, বিজ্ঞানী তার প্রয়োজনেই সেটা করেছিলেন।

আহমদ মুসা চাপ দিল কাল বোতামটিতে।

সংগে সংগেই দেয়ালের তিন বর্গফুটের মত একটা অংশ কিঞ্চিত সরে গিয়ে দেয়ালের আড়ালে চলে গেল। বেরিয়ে পড়ল একটা সুড়ঙ্গ পথ।

সুড়ঙ্গ পথটি আলোকিত।

সুড়ঙ্গ পথের মুখ তিন বর্গফুটের মত হলেও ভেতরটা আরও প্রশস্ত। একজন মানুষ অনায়াসে হেঁটে চলাফেরা করতে পারে।

স্টিলের মজবুত সুয়ারেজ পাইপ দিয়ে সুড়ঙ্গটি তৈরী।

খুশী হলো আহমদ মুসা, সুড়ঙ্গটি নিশ্চয় বাইরে বেরুবার জন্যে। কিন্তু কেন বিজ্ঞানী শুধুমাত্র বাইরে বেরুবার জন্যে এত ব্যয়বহুল ব্যবস্থা করলেন? তাহলে তিনি কি কোন বিপদের ভয় করতেন যে, সবুজ পাহাড়ের তাঁর বাড়ি থেকে বাইরে বেরুবার পথ বন্ধ হতে পারে, তখন তিনি এই নিরাপদ সুড়ঙ্গ পথ ব্যাবাহর করে বাইরে বেরুবেন? কিন্তু একজন বিজ্ঞানীর কি এমন বিপদ হতে পারে?

এ প্রশ্নের কোন উত্তর তার কাছে নেই।

এসব থাক, বের হবার একটা পথ পাওয়া গেছে, এটাই বড় কথা। ভাবল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা প্রবেশ করল সুড়ঙ্গে।

গোটা সুড়ঙ্গটাই আলোকিত।

বহুদিন এ সুড়ঙ্গে কেউ ঢোকেনি। তার অর্থ কি বিজ্ঞানীর মৃত্যুর পর আর কেউ এ সুড়ঙ্গে প্রবেশ করেনি? বলা মুশকিল। ভাবল আহমদ মুসা।

চলছে তো চলছেই। কত বড় এই সুড়ঙ্গ?

বাইরে বেরুবার জন্য এত বড় সুড়ঙ্গ কেউ কাটে?

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল আহমদ মুসা ৪০ মিনিট হলো সে সুড়ঙ্গে প্রবেশ করেছে।

ভ্রু কুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার। সবুজ পাহাড়ের বিজ্ঞানীর বাড়ি থেকে বাইরে বেরুবার সুড়ঙ্গ অবশ্যই এটা নয়।

কোথায় গেছে এ সুড়ঙ্গ? নিশ্চয় এমন কোথাও গেছে যা বাইরে বেরুবার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ।

এক ঘন্টা পার হয়ে গেল।

সুড়ঙ্গের সমান্তরাল পথ একটু একটু করে উপরে উঠতে শুরু করেছে।

গন্তব্যে তাহলে এসে গেছি, বলল মনে মনে আহমদ মুসা।

কতদূর হবে সে এসেছে সবুজ পাহাড় থেকে? অবশ্যই পাঁচ ছয় মাইলের কম নয়। আহমদ মুসার অনুমান যদি ভূল না হয়ে থাকে, তাহলে সে সবুজ পাহাড় থেকে পাঁচ ছয় মাইল দক্ষিণে এখন। এ অঞ্চলের ভৌগলিক পরিচয় তার জানা নেই। তাই বলা মুশকিল সে এখন কোথায়।

সারফেস লেভেলে প্রায় উঠে এসেছে সে। সতর্ক পদক্ষেপ এখন আহমদ মুসার।

যেখানে এসে সুড়ঙ্গ শেষ হলো, সেখানে সুড়ঙ্গের মুখে একটি কংক্রিটের স্ল্যাব। স্ল্যাবটি সুড়ঙ্গের মুখে এমন ভাবে সেট করা যে, স্ল্যাবটি নিচে নামানো যাবে না।

তাহলে উপরে তুলতে হবে।

কিন্তু এ সুড়ঙ্গের মুখটি কোথায়? সেটা কি ঘর? না উঠান? কিংবা পরিত্যক্ত কোন স্থান?

ঘর কিংবা জনসমাগমের কোন স্থান হলে স্ল্যাব তুললেই সে ধরা পড়ে যাবে। জংগল বা পরিত্যক্ত কোন স্থান হলে, তবেই নিরাপদ।

আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকাল। বেলা তখন ১টা।

আহমদ মুসা তায়াম্মুম করে নামাজ পড়ে নিল।

তারপর ভাবল, স্ল্যাবের অংশবিশেষ তুলে দেখা যাক, কেমন জায়গা এটা।

বিজ্ঞানী যখন এখানে উঠতেন বা এদিক দিয়ে যাতায়াত করতেন, তখন স্থানটা তাঁর নিজের অথবা তার কোন প্রতিপক্ষের কোন নিরাপদ জায়গা হবে।

কংক্রিট স্ল্যাবের একটা অংশ ধীরে ধীরে উপরে তুলতে লাগল আহমদ মুসা।

একটু তুলেই বুঝল জায়গাটায় কার্পেট বিছানো রয়েছে।

তাহলে এটা ঘর নিশ্চয়। আর ঘর হলে কোন মানুষ থাকার সম্ভাবনা থাকছেই।

বিজ্ঞানী এ পথ দিয়ে রাতে না দিনে যাতায়াত করতেন?

হঠাৎ আহমদ মুসার খেয়াল হলো এটা লাঞ্চ আওয়ার। এখন তো সব আমেরিকানদেরই অফ পিরিয়ড়। এ সময় তারা ঘরে কিংবা অফিসে থাকে না।

এই চিন্তার সাথে সাথেই আহমদ মুসা অতি সন্তর্পনে কংক্রিট স্ল্যাবটা সুড়ঙ্গের মুখ থেকে সরিয়ে কার্পেটের নীচ দিয়ে মেঝের উপর ঠেলে দিল।

তারপর নিজের দেহকেও স্ল্যাবের মত করেই সুড়ঙ্গের মুখ থেকে উপরে তুলে কার্পেটের নিচ দিয়ে মেঝের উপর ঠেলে দিল। নিজেকে সুড়ঙ্গের মুখ থেকে বের করে আনার পর তার প্রথম কাজ হলো স্ল্যাবটাকে আবার সুড়ঙ্গ মুখে বসিয়ে দেয়া।

কোন দিকে কার্পেটের নিকটতম প্রান্ত? কাপের্টের তলের শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে দ্রুত বেরুবার জন্যে এ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার কাছে বড় হয়ে উঠল।

আহমদ মুসা দ্রুত চারদিকে হাত ও পা দিয়ে পরীক্ষা করে দেখল কোন দিকে কার্পেটটা ঢিলা বেশী। তার চিন্তা হলো, নিশ্চয়ই সুড়ঙ্গ মুখ কার্পেটের একটা প্রান্তে হবে এবং যে দিকে প্রান্ত হবে সে প্রান্তের কার্পেটকে অপেক্ষাকৃত ঢিলা পাওয়া যাবে।

সফল হলো আহমদ মুসা। তার হাতের ডান দিকের কার্পেট খুবই ঢিলা পাওয়া গেল।

আহমদ মুসা গড়িয়ে ঢিলা প্রান্তের দিকে এগুলো।

একটা দেয়ালে কার্পেট শেষ হয়েছে।

আহমদ মুসা কার্পেটের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো।

এক সারি দৈত্যাকার কম্পিউটারের পেছনের দেয়াল ঘেঁষে নিজেকে দেখল আহমদ মুসা।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। সুড়ঙ্গ মুখটা কম্পিউটারের আড়ালে থাকায় এখানে কি ঘটছে এ ঘরে কেউ থাকলেও তা তার নজরে পড়ার কথা নয়। বিজ্ঞানীকে মনে মনে ধন্যবাদ দিল আহমদ মুসা।

কিন্তু এটা কোন জায়গা? কোথায় এসেছে সে?

আহমদ মুসা দুই কম্পিউটারের ফাঁক দিয়ে ঘরের ভেতরটায় উঁকি দিল, দেখল ঘরের প্রায় চারদিক দিয়েই এ ধরনের কম্পিউটারের সারি। ঘরের মাঝখানটা ফাঁকা।

আহমদ মুসা ঘরের যে প্রান্তে, তার বিপরীত প্রান্তে দরজা। ঘরে কেউ নেই। লাঞ্চে গেছে নিশ্চয়ই।

আহমদ মুসার গোটা শরীর ধুলি ধুসরিত। পকেট থেকে রুমাল বের করে মাথা ও কোট প্যান্ট যতটা পারল পরিষ্কার করল।

তারপর এক কম্পিউটারের পাশ দিয়ে ঘরের মাঝখানে প্রবেশ করল।

দ্রুত একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিল কম্পিউটারের দিকে। সবগুলো কম্পিউটারই চালু অবস্থায় আছে।

প্রত্যেকটা কম্পিউটারের টপ কভারে একটা নাম পড়ে ভীষণ চমকে উঠল আহমদ মুসা। টপ কভারে পেস্টিং করা সুন্দর কাগজে সুন্দর করে লেখা 'লস আলামোস ল্যাবরেটরী অব স্ট্রাটেজিক রিসার্চ'।

সবগুলো কম্পিউটারে এই একই শীর্ষ নাম।

তাহলে আহমদ মুসা এখন লস আলামোসের বিশ্ব বিখ্যাত স্ট্রাটেজিক রিসার্চ ল্যাবরেটরীর গ্রাউন্ড ফ্লোরে দাঁড়িয়ে। কিন্তু ইহুদী বিজ্ঞানী তার সুড়ঙ্গ এই ল্যাবরেটরীতে নিয়ে এসেছে কেন? সুড়ঙ্গটি কি এ ল্যাবরেটরীতে গোয়েন্দাগিরির একটা পথ ছিল? ইহুদী বিজ্ঞানী কি এ স্ট্রাটেজিক ল্যাবরেটরীর গবেষণা চুরি করেছেন এ পথে? বহুতল বিশিষ্ট গোটা ল্যাবরেটরীর যাবতীয় গবেষণার ফল নিশ্চয়ই এই দৈত্যাকার কম্পিউটারে প্রসেস ও স্টোর হয় এবং এই কম্পিউটার কক্ষই ইহুদী বিজ্ঞানীর সুড়ঙ্গের মুখ।

কি ঘটেছে ভাবতেই শিউরে উঠল আহমদ মুসা। মাথাটা ঘুরে যেতে চাইল।

মাথাটায় একটা ঝাঁকি দিয়ে আহমদ মুসা ভাবল সব চিন্তার আগে তাকে এই অত্যন্ত স্পর্শকাতর গবেষণাগার থেকে সরে পড়তে হবে। এখানে তাকে ধরা পড়া চলবে না কোনক্রমেই।

দরজার দিকে তাকাল আহমদ মুসা। দরজা বন্ধ।

এগোলো আহমদ মুসা দরজার দিকে। খুব সন্তর্পনে দরজার নব ঘুরাল সে। লক আলগা হয়ে গেল।

ধীরে ধীরে দরজা ফাঁক করল আহমদ মুসা।

উকিঁ দিয়ে দেখল, ইউনিফরম পরা একজন দরজার বিপরীত দিকে হেঁটে যাচ্ছে। তার হাতে ঝুলছে কাল কুচকুচে এক ভয়ংকর অটোমেটিকে কারবাইন।

আহমদ মুসা দ্রুত বের হয়ে কোন শব্দ না হয় এ জন্যে আলতো করে দরজা ছেড়ে দিয়ে লোকটি দরজার যেদিকে, তার বিপরীত দিকে বিড়ালের মত নিঃশব্দে ছুটল।

কোন দিকে কি আছে, বের হবার দরজাই বা কোন দিকে কিছুই জানা নেই আহমদ মুসার। অন্ধের মত সে ছুটছে।

দরজাটা পেরিয়ে কয়েক গজ এসেই একটা করিডোর পেল। করিডোর ধরে ডানদিকে এগোলো।

করিডোরটা ধরে কয়েক গজ এগোতেই একটা করিডোর জংশনের মুখে গিয়ে পড়ল সে। সেই সাথে মুখোমুখি হলো অটোমেটিকে কারবাইনধারী এক প্রহরীর।

করিডোর জংশনটা থেকে চারদিকে চারটা করিডোর বেরিয়ে গেছে।

প্রহরীটির মুখোমুখি হয়ে আকস্মিকতার একটা ধাক্কা খেয়েছিল আহমদ মুসা। কিন্তু প্রহরীটিই আহমদ মুসাকে দেখে হতচকিত হয়েছিল বেশী।

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল প্রহরীটি।

আহমদ মুসা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এক হাতে তার মুখ চেপে অন্য হাত দিয়ে তাকে জাপটে ধরে টেনে নিয়ে এল একটা দরজার দিকে।

দরজা ঠেলে প্রহরীকে ভেতরে ছুঁড়ে দিল। প্রহরীটি পড়তে পড়তে উঠে দাঁড়াল। তার হাতের ঝুলন্ত কারবাইন সে উপরে তুলছিল।

আহমদ মুসার ডান হাত তার আগেই সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তার হাতের একটা আঘাত গিয়ে পড়ল প্রহরীর কানের নিচে ঘাড়টায়।

লোকটি সংজ্ঞা হারালে আহমদ মুসা তার কারবাইনটা নিয়ে বেরিয়ে এলো করিডোরে। কোন দিকে যাবে সে?

সব করিডোরকেই আহমদ মুসার একই রকম মনে হলো। সুতরাং প্রহরীকে আটকাবার জন্যে আহমদ মুসা যে করিডোরে ঢুকেছিল সেই করিডোর ধরে এগোবার সিদ্ধান্ত নিল।

কিছুদুর এগোবার পর আরেকটা করিডোরের মুখোমুখি হলো আহমদ মুসা। সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো পায়ের শব্দ শুনতে পেল সে। তার মনে হলো, শব্দগুলো সিঁড়ি ভেঙে উপর থেকে নিচে নামছে সামনের করিডোর জংশনটার দিকে।

একটি করিডোরের শাখা এদিকে ডানে, অন্য দু'টি শাখা অন্য দু'দিকে চলে গেছে। আর সামনে সিঁড়ি। মনে হয় সিঁড়িটা দু'তলায় উঠে গেছে।

ঐ সিঁড়ি থেকেই শব্দগুলো ছুটে আসছে। ছুটে আসা লোকগুলো আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তার সামনে এসে যাবে।

আহমদ মুসা আশে পাশে চাইল। দেখল, তার দু'পাশেই দু'টি দরজা। বাম দিকের দরজাটাই তার কাছে।

আহমদ মুসা ছুটে গিয়ে দরজার নব ঘুরিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। একটা মেয়ে তার টেবিলে বসে কাজ করছিল।

কারবাইন নিয়ে আহমদ মুসাকে ঘরে ঢুকতে দেখে আতংকে উঠে দাঁড়াল মেয়েটি।

আহমদ মুসা তার কারবাইনের নল নিচে নামিয়ে তর্জনি নিজের ঠোঁটে ঠেকিয়ে মেয়েটিকে এক দিকে অভয় দিল, অন্যদিকে তাকে চুপ থাকতে বলল।

আতংকিত মেয়েটি কোন শব্দ না করে চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল।

আহমদ মুসা দরজার শ্যাডো গ্লাস দিয়ে বাইরে চোখ রাখল।

দরজার ওখান থেকে আহমদ মুসা সিঁড়ির নিচের অংশটা দেখতে পাচ্ছে।

সিঁড়ি দিয়ে পাঁচজন দৌড়ে নেমে এল। আহমদ মুসার করিডোর দিয়েই তারা ছুটে গেল আহমদ মুসা যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে। ওরা টের পেয়েছে, কিন্তু কিভাবে?

কিন্তু ভাববার সময় নেই আহমদ মুসার। বলল আহমদ মুসা মেয়েটিকে লক্ষ্য করে, 'ম্যাডাম বাইরে বেরুবার গেট কোন দিকে?'

মেয়েটি কথা বলল না।

সে সহজে কথা বলবেনা, নিশ্চিত হলো আহমদ মুসা।

হাতের অটোমেটিক কারবাইনটা তুলতে চাইল। কিন্তু একজন নারীর বিরুদ্ধে তার হাত উঠল না। বলল আহমদ মুসা, 'ধন্যবাদ ম্যাডাম'।

বলে আহমদ মুসা বেরিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু শুনতে পেল অনেকগুলো পায়ের শব্দ ছুটে আসছে এ দিকে।

ওরা কি ফিরে আসছে?

আহমদ মুসা আর কিছু ভাববার আগেই দেখল, ওরা ছুটে আসছে এ দরজা লক্ষ্যেই।

চট করেই চিন্তাটা আহমদ মুসার মাথায় এলো যে, এ মেয়েটিই ওদের সংকেত দিয়েছে। প্রত্যেকের কাছে এবং প্রত্যেক কক্ষেই কি তাহলে সংকেতের এ ব্যবস্থা আছে?

আহমদ মুসা চাইল মেয়েটির দিকে। দেখল তার মুখ ভয়ে কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে।

আহমদ মুসা বলল, 'ভয় নেই, ওদের সংকেত দিয়ে আপনি চরম বিপদকালেও দেশের প্রতি অনুপম দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছেন'।

বলে আহমদ মুসা দ্রুত দরজার সামনের চৌকাঠের ওপাশে দেয়াল ঘেষে দাঁড়াল কারবাইনের ব্যারেল উঁচু করে, যাতে দরজা খুললেই ওরা তার সামনে এসে যায়।

ওরা দৌড়ে আসার পর দরজার কাছাকাছি এসে বিড়ালের মত সন্তর্পণে এগিয়ে আসছে।

শ্যাডো কাঁচের ভেতর দিয়ে আহমদ মুসা ওদের দেখতে পাচ্ছে, ওরা কিন্তু দেখছে না আহমদ মুসাকে।

ওদের একজন আস্তে দরজার নব ঘুরাল, তারপর এক প্রচন্ড ধাক্কায় গোটা দরজাই খুলে ফেলল।

সংগে সংগেই আহমদ মুসার কারবাইন গর্জন করে উঠল। এক পশলা গুলির বৃষ্টি ছুটে গেল সামনে।

আহমদ মুসা উবু হয়ে বসে মাটির একফুট উপর দিয়ে গুলি করেছে।

সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়েছে মাটিতে। মাটিতে পড়েই কেউ কেউ কারবাইন তুলতে যাচ্ছিল।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়েছিল।

ওদের দিকে কারবাইন তাক করে বলল, 'আমি তোমাদের হত্যা করতে চাইনি বলেই গুলি নীচ দিয়ে করেছি। কেউ তোমরা কারবাইনে হাত দেবে না। গুলি এবার পায়ে নয় বুকে করব'।

বলে আহমদ মুসা দ্রুত কারবাইনগুলো কুড়িয়ে নিল।

কোন দিকে যাবে আহমদ মুসা?

মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়েছে। বলল, 'সামনেই দোতলা থেকে সিঁড়ি গেটে নেমে গেছে'।

আহমদ মুসা মুহূর্তের জন্যে চোখ ফিরাল মেয়েটির দিকে। বলল, 'ধন্যবাদ ম্যাডাম'।

ছুটতে ছুটতেই কথাগুলো বলল আহমদ মুসা।

দ্রুত সিঁড়ি ভেংঙে উঠতে লাগল দোতলায়।

তার হাতে উদ্যত কারবাইন। একটি কারবাইন তার কাঁধে ঝুলানো। আরও চারটি কারবাইন সে ফেলে দিয়ে এসেছে সিঁড়ির গোড়ায়।

সিঁড়ি থেকে দোতলার মেঝেতে পা দিতে যাবে, এ সময় আরও চারজন সামনে থেকে ছুটে আসছে দেখল আহমদ মুসা।

দেখতে পেয়েই আহমদ মুসা দৌড়ানো অবস্থাতেই গুলি করল ওদের পা লক্ষ্য করে।

ওরা গেটের দিক থেকে বিশাল প্রশস্ত সিঁড়ি ভেঙে উঠে আসছিল। সিঁড়িতেই ওরা আছড়ে পড়ল। কিন্তু সেদিকে দেখার সুযোগ নেই।

গুলি করেই আহমদ মুসা ছুটল সিঁড়ি ভেঙে নিচের দিকে।

সিঁড়ি একটা প্রশস্ত লনে গিয়ে শেষ হয়েছে। লনের পরেই বিশাল গেট। গেটের দু'পাশে দু'টি কক্ষ। সিকিউরিটি বক্স হবে নিশ্চয়ই ভাবল আহমদ মুসা।

লনের দু'পাশে দু'টি করে চারটি গাড়ি দাঁড়ানো। দু'টি কার, একটা জীপ এবং একটা সিকিউরিটি ক্যারিয়ার ধরনের গাড়ি।

গেট খোলা। দু'জন প্রহরী ছুটে আসছে খোলা গেট দিয়ে গুলি করতে করতে।

আহমদ মুসা নিজেকে ছুড়ে দিল সিঁড়ির উপর।

তারপর কারবাইন দু'টি বুকে ধরে দ্রুত গড়িয়ে নামতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে। চারপাশে গুলি এসে পড়ছে। একটা গুলি এসে বিদ্ধ করল আহমদ মুসার বাহু সন্ধিতে।

মনে হলো বাহুটা যেন কাঁধের সাথে নেই। গোটা শরীরটাই কেঁপে উঠছিল আহমদ মুসার।

কিন্তু মুহূর্তের জন্যও থামেনি সে, বরং গড়িয়ে পড়ে গতি আরও বাড়িয়ে দিল আহমদ মুসা। সিঁড়িতে তাকে টার্গেট করার যে সুবিধা নিচের লনে তা তারা পাবে না।

লনে পড়েই আহমদ মুসা ওদের গুলি বৃষ্টির মধ্যে মাথা নিচু করে গুলি করল ওদের লক্ষ্য করে।

ওরা দৌড়ে আসছিল। গুলি বৃষ্টি ওদের পা আঁকড়ে ধরেছে। আছড়ে পড়ল তারা লনের উপর।

গুলি করেই আহমদ মুসা দ্রুত গড়িয়ে চলল জীপের দিকে।

জীপের কাছে এসে শুয়ে থেকেই আহমদ মুসা নিজের দেহকে ছুঁড়ে দিল জীপের সিটে। জীপের লক হোলে চাবী ঝুলছে।

খুশী হলো আহমদ মুসা। ধন্যবাদ দিল আল্লাহকে। ভাবল এ গাড়িটাও নিশ্চয় সিকিউরিটিদের ব্যবহারের জন্যে প্রস্তুত ছিল। গাড়ি স্টার্ট দিল আহমদ মুসা।

দেখল, কারবাইন হাতে আরও দু'জন প্রহরী ছুটে এসেছে গেটে। গেট তখন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

আহমদ মুসার জীপও গেটের মুখে এসে পড়েছে।

গেট বন্ধ করার সুযোগ হলো না।

আহমদ মুসার জীপের বেপরোয়া গতি তীব্রভাবে আঘাত করল গেটে। চলন্ত গেটের একটা অংশ বাঁকিয়ে নিয়ে বাইরে ছিটকে পড়ল গাড়ি।

আহমদ মুসার ভাগ্য ভাল যে, জীপটি প্রায় উল্টে গিয়েও আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল।

গেটে আসা প্রহরী দু'জন জীপের সামনে পড়ায় বাঁচার জন্যে দু'পাশে দু'জন ছিটকে পড়েছিল। দু'জনের হাত থেকে কারবাইন দু'টিও ছিটকে পড়ে গিয়েছিল।

আহমদ মুসা তার গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে তীব্র গতিতে ছুটল সামনে।

প্রহরী দু'জন কারবাইন দু'টি কুড়িয়ে নিয়ে গুলি করার পজিশনে আসার পর দেখল, জীপটি তাদের রেঞ্জের বাইরে। তবু তাদের কারবাইন গর্জন করে উঠল। গুলি গুলোর অপচয় ছাড়া কোনই লাভ হলো না এতে।

কারবাইন ছুড়ে ফেলে ওরা দু'জন দু'হাত মুষ্টিবদ্ধ করে মাটিতে আঘাতের পর আঘাত করার মাধ্যমে ব্যর্থতার তীব্র গ্লানি হালকা করতে চাইল।

# ৪

কম্পন উঠল পেন্টাগন, সি. আই. এ, এফ.বি. আই সব মহলে। দেশের সবচেয়ে নিরাপদ স্থানে প্রতিষ্ঠিত ও সবদিক থেকে সংরক্ষিত তাদের সবচেয়ে মূল্যবান গবেষণাগার লস আলামোসে ইঁদুর ঢুকেছে। ঢুকলো কি করে?

লস আলামোস স্ট্রাটেজিক রিসার্চ ল্যাবরেটরীর চারদিকে কয়েক বর্গমাইল এলাকা জুড়ে সংরক্ষিত বনাঞ্চল। এ বনাঞ্চলে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ। কেউ যদি প্রহরীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে প্রবেশ করেও, কয়েক মিনিটের মধ্যে তার উপস্থিতি ও অবস্থান ধরা পড়ে যাবে। সূক্ষ্ম ইলেকট্রনিক ক্যারিয়ার ছেয়ে রয়েছে গোটা বনাঞ্চল।

রাজধানী সান্তাফে থেকে একটা সড়ক গেছে লস আলামোসে। সে সড়কেরও শেষের দু'মাইল সংরক্ষিত। বিশেষ অনুমতি প্রাপ্ত নয়, অথবা লস আলামোসের নিজস্ব রেজিস্ট্রিকৃত গাড়ি নয় এমন গাড়ি এ সংরক্ষিত সড়কে প্রবেশ করতে পারে না।

এস্পানোলা থেকে ক্লিফ ডোয়েলিং হয়ে একটা প্রাইভেট রোড লস আলামোস পর্যন্ত এসেছে। এ পথে অনেকগুলো চেকিং পার হতে হয়। আর এ পথে লস আলামোসের স্টাফরা ছাড়া কেউ আসতে পারে না।

এই অবস্থায় একজন লোক কিভাবে ঢুকল লস আলামোস ল্যাবরেটরীতে?

খবর পাওয়ার সংগে সংগেই প্রাপ্ত তথ্যাবলী নিয়ে বৈঠক বসেছিল এফ.বি.আই সদর দফতরে। এসেছিল সেখানে সি.আই.এ ও পেন্টাগনের প্রতিনিধি।

বৈঠকের শুরুতেই পেন্টাগনের স্ট্রাটেজিক উইনস ডেভলপমেন্ট চীফ উদ্বিগ্ন কন্ঠে বলল, 'কোন ঘরে সে প্রবেশ করেছিল, কিছু খোয়া গেছে কিনা আমাদের?'

এফ.বি.আই চীফ জর্জ আব্রাহাম জনসন বললেন, 'গ্রাউন্ড ফ্লোরের একটা করিডোরে প্রথম তাকে ডিটেক্ট করা হয়। উপর তলার কোন ঘরে এবং কম্পিউটার রুমে সে প্রবেশ করেছে কিনা তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কম্পিউটার অপারেশনে কোন ভিন্ন হাত পড়ার প্রমাণ মেলেনি। তবে আরও অনুসন্ধান না করে শেষ কথাটা বলা যাবে না'।

'কোন দিক দিয়ে ঢুকেছে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে?' জিজ্ঞেস করে সি.আই.এ'র প্রতিনিধি।

'না পাওয়া যায়নি। তবে সম্মুখ গেট দিয়ে নয়, এটা নিশ্চিত। সম্মুখ গেটের ক্যামেরা মনিটরিং এবং মূল ভবনে প্রবেশ মুখের ক্যামেরা মনিটরিং এ প্রমাণ হয়েছে সম্মুখ দিয়ে সে প্রবেশ করেনি'। বলল এফ. বি.আই চীফ জর্জ আব্রাহাম জনসন।

'যে লোকটি ঢুকেছিল, তার ফটো পাওয়া গেছে?' জিজ্ঞেস করল সি.আই.এ প্রতিনিধি।

'লস আলামোসের কক্ষ ও করিডোরের ক্যামেরাগুলো অফিস আওয়ারে বন্ধ থাকে। মূল ভবনের প্রবেশ মুখের ক্যামেরা থেকে তার মুখের ডান দিকের একাংশ ও পেছন দিকটার ফটো পাওয়া গেছে এবং গেটের ক্যামেরা থেকে তার সিঁড়িতে ও লনে গড়ানো ছবি পাওয়া গেছে, তাতে তার মুখাবয়বের পূর্ণ চিত্র পাওয়া যাচ্ছে না'।

'ব্যাড লাক, এখন কি করবেন ভাবছেন?' বলল পেন্টাগন প্রতিনিধি।

এ মিটিং শেষেই আমি যাচ্ছি লস আলামোসে। সেখানে গেলে হয়তো আরও কিছু বিষয় পরিষ্কার হবে। বলল আব্রাহাম জনসন।

আমাদের লোকরা যারা তাকে ফলো করেছিল, তাদের শেষ খবর কি?' বলল সি.আই.এ প্রতিনিধি।

খবর ভাল নয়। ক্লীফ ডোয়েলিং এবং এস্পানোলার মাঝখানে লস আলামোস থেকে যে গাড়ি নিয়ে পালিয়েছিল, সে গাড়ি আমরা পেয়েছি। কিন্তু তাকে পা্ওয়া যায়নি'। বলল এফ.বি.আই চীফ।

‘কেমন করে যে গাড়ি রেখে নিরাপদে পালাতে পারল?’ বলল পেন্টাগন প্রতিনিধি।

‘আমাদের তেরজন কমান্ডো গার্ড ছিল লস আলামোসের গেটে। এই তেরজনের নয় জনই পায়ে গুলিবিদ্ধ। মাত্র তিনজন সুস্থ ছিল। এরা তিনজন আবার ছিল বিভিন্ন জায়গায়। একত্রিত হয়ে তারা যখন লোকটিকে তাড়া করে, তখন তারা বেশ পেছনে পড়ে যায়। আর প্রমাণ হয়েছে লোকটির মত এক্সপার্ট ড্রাইভার আমাদের কমান্ডোরাও নয়’।

‘ব্যাড লাক। লোকটি যখন সান্তাফের মেইন রোডে না গিয়ে অনেক ঘোরা পথ ক্লীফ ডোয়েলিং ও এস্পানোলার পথ বেছে নিয়েছে, তখন মনে হয় ঐ পথেই সে এসেছে’। বলল পেন্টাগন প্রতিনিধি।

‘আমাদেরও সেই ধারণা। আমি ইতোমধ্যেই নির্দেশ দিয়েছি, ঘটনার দিন এবং তার আগের দিন যত গাড়ি ঐ পথে লস আলামোসের দিকে এসেছে, সে সবের হদিস বের করে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে’। বলল জর্জ আব্রাহাম জনসন।

‘ধন্যবাদ’। বলল পেন্টাগন প্রতিনিধি।

পেন্টাগন প্রতিনিধি থামতেই সি.আই.এ প্রতিনিধি বলে উঠল, ‘কিন্তু একটা বিষয় খুবই বিষ্ময়কর, কেউ নিহত হয়নি, নয় জনই আহত হয়েছে এবং আহতরা সবাই পা থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত স্থানে গুলিবিদ্ধ’।

‘ঠিক বলেছেন, এ ব্যাপারটা আমাকেও খুব বিষ্মিত করেছে। পা টার্গেট না করলে তো আহতরা প্রায় সবাই নিহত হওয়ার কথা কিন্তু পা লক্ষ্য করে গুলি করল কেন, তার জীবনের ঝুকিঁ নিয়েও?’

‘এ ধরণের ঘটনা আমি এর আগে কখনো শুনিনি। প্রতিপক্ষের গোয়েন্দার কাজ তো এটাই যে যত পারা যায় শত্রু নিধন করে পালাবার পথ পরিষ্কার করা। কিন্তু সে যেন হত্যা নয়, বাধাকে নিষ্ক্রীয় করে পালাবার পথ করে নিতে চেয়েছে’। বলল সি.আই.এ প্রতিনিধি।

‘ঠিক তাই’। বলল এফ.বি.আই চীফ।

এই মিটিং শেষ হয়েছিল অপরাহ্ন ৫টায়।

বিকেল সোয়া পাঁচটায় বিশেষ বিমানে চড়ে এফ.বি.আই চীফ জর্জ আব্রাহাম জনসন যাত্রা করে লস আলামোসের উদ্দেশ্যে।

রাত সোয়া আটটায় সে পৌঁছে লস আলামোস স্ট্র্যাটেজিক রিসার্চ ল্যাবরেটরীতে।

ল্যাবরেটরীতে পৌঁছেই এফ.বি.আ্ই চীফ লস আলামোস ল্যাবরেটরীর প্রধান পরিচালক ডঃ হাওয়ার্ডকে বলে, 'আমি ঘটনার স্থানগুলোতে যেতে চাই এবং সেখানেই আমি ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্টদের সাথে কথা বলতে চাই'।

'সবাই হাজির আছে চলুন'।

জর্জ আব্রাহাম জনসন প্রথম কথা বলল একজন প্রহরীর সাথে। ঐ প্রহরী আহমদ মুসাকে করিডোরে প্রথম দেখে। আহমদ মুসা তাকে পাশেই এক ঘরে নিয়ে সংজ্ঞাহীন করে ফেলে চলে যায়। তার মতে, 'আক্রমনকারী উত্তর অথবা পশ্চিমের কম্পিউটার রুমের দিক থেকে আসতে পারে। লোকটি শ্বেতাংগ নয়'।

ছবিতে যতটুকু তাকে দেখা যায়, তাতেও মনে হয় লোকটি শ্বেতাংগ নয়। মনে মনে চিন্তা করল জর্জ আব্রাহাম জনসন।

মিস সারা জেফারসনের কক্ষে এল জর্জ আব্রাহাম জনসন। আত্মগোপনের জন্যে এই সারা জেফারসনের অফিস কক্ষেই আহমদ মুসা প্রবেশ করেছিল।

মিস সারা জেফারসন লস আলামোস ল্যাবরেটরীর রিসার্চ লগ অফিসার। খুবই গোপন ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সারা জেফারসনের।

সারা জেফারসনকে বসতে বলে নিজে বসতে বসতে জর্জ আব্রাহাম জনসন বলল, 'এক উপলক্ষে আপনার সাথে দেখা হল। আপনাদের পরিবার আমাদের খুব শ্রদ্ধার পাত্র। প্রেসিডেন্ট জেফারসন ছিলেন আমেরিকার নিজস্ব চিন্তার জনক'।

'ধন্যবাদ স্যার'। বলল মিস সারা জেফারসন।

'ধন্যবাদ' বলে একটু থেমে জর্জ আব্রাহাম জনসন বলল, 'আপনি নাকি অনুপ্রবেশকারীকে বাইরে বেরুবার পথ বলে দেন?'

একটু হাসল সারা জেফারসন। তারপর গম্ভীর হলো বলল, 'জি স্যার'।

‘কেন?’

‘অদ্ভূত শত্রুটিকে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি স্যার’।

‘কেমন?’

‘কারবাইন হাতে লোকটি আমার রুমে ঢুকল, আমি আতংকে চিৎকার করতে যাচ্ছিলাম। লোকটি তার ঠোটেঁ আঙুল ঠেকিয়ে নিষেধ করল। তার চোখে মুখে খুনির রুদ্ররূপ দেখলাম না, খুব শান্ত অচঞ্চল সে। আমাদের কয়েকজন গার্ডকে যখন দৌড়ে যেতে দেখলাম পশ্চিম দিকে, বুঝলাম তারা এ লোকটিরই সন্ধান করছে। আমি ওদের সংকেত দিলাম। এ সময় লোকটি আমাকে বিল্ডিংটির গেট কোনদিকে জিজ্ঞেস করল। আমি বললাম না। আমি ভয় করছিলাম যে, এবার সে কিছু একটা করবে। কিন্তু ‘ধন্যবাদ ম্যাডাম’ বলে বাইরে বেরুবার উদ্যোগ নিল সে। এ সময়ই আমাদের গার্ডরা ছুটে এল এ দরজায়। লোকটি আমার দিকে এমন একটা সবজান্তা দৃষ্টি নিয়ে তাকাল যে, আমি বুঝতে পারলাম আমি গার্ডদের সংকেত দিয়ে ডেকে এনেছি সে সেটা বুঝতে পেরেছে। আমি ভয়ে কাঠ হয়ে গেলাম। কাঁপতে শুরু করলাম। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে লোকটি বলল, ‘ভয় নেই, সংকেত দিয়ে ওদের ডেকে এনে দেশের প্রতি আপনি অনুপম দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছেন’। তারপর দেখলাম, দরজা খুলে প্রবেশ করা আমাদের পাঁচজন গার্ডকেই সে হত্যা করতে পারতো, কিন্তু করলো না। আমাদের লোকরা পায়ে গুলি খাবার পর পড়ে গিয়ে আবার যখন কারবাইন তুলে নিচ্ছিল তখন সে বলে, ‘তোমাদের হত্যা কতে চাইনি। কিন্তু আবার কারবাইনে হাত দিলে গুলি এবার পা নয় বক্ষ ভেদ করবে’। শত্রুর এই মানবিকতা, বদান্যতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। এজন্যে দ্বিতীয় বার বেরুবার পথ সে জিজ্ঞেস না করলেও পথ বলে দেয়াকে আমি দায়িত্ব মনে করলাম’। দীর্ঘ বক্তব্য দিয়ে থামল মিস জেফারসন।

‘ধন্যবাদ মিস জেফারসন। আমাদের ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু আপনি তাকে উপযুক্ত বিনিময় দিয়ে দিয়েছেন’।

‘খুব কি ক্ষতি করেছি? সে যেমন অসাধারণ বুদ্ধিমান, তাতে গেট বের করা তার জন্য কঠিন হতো না’।

'তাও ঠিক'। বলে জর্জ আব্রাহাম জনসন কিছুটা চিন্তান্বিত হয়ে পড়ল। বলল, 'আপনার কথায় শত্রুর যে কয়টা বৈশিষ্ট ফুটে উঠল, তাতে রহস্যের জটিলতা আরও বাড়ল'।

'কিভাবে?' প্রায় একসাথেই কথাটা বলে উঠল লস আলামোসের প্রধান পরিচালক ডঃ হাওয়ার্ড এবং পেন্টাগনের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা প্রধান জেনারেল শেরউইন।

'যে লোক এখানে প্রবেশ করেছিল, সে লস আলামোসে ইতিপূর্বে আসেনি, এর ছবিও দেখেনি এবং এর ইন্টারন্যাল ডিজাইন সম্বন্ধেও তার জ্ঞান ছিল না। এমন একজন লোককে কোন শত্রুপক্ষই লস আলামোসে পাঠাতে পারেনা। দ্বিতীয়তঃ, লোকটির সাথে সরাসরি শত্রুতা হলে মিস জেফারসনের শত্রুতামূলক কাজকে দায়িত্বশীলতা বলা এবং গার্ডদের কাউকেই হত্যা না করা আমার কাছে খুবই রহস্যপূর্ণ মনে হচ্ছে। একজন শত্রুর এই ধরণের আচরণ হওয়া অস্বাভাবিক'।

'কিন্তু সে লস আলামোসে অনুপ্রবেশ করেছে এটাতো ঠিক?' বলল জেনারেল শেরউড।

'অবশ্যই'।

বলে একটু ভাবল জর্জ আব্রাহাম জনসন। তারপর বলল, 'দুই সত্যের মাঝখানে একটা মিসিং লিংক আছে, যা আমাদের সামনে নেই। লোকটিকে ধরতে পারলেই এর সমাধান হতে পারে'।

কথা শেষ করেই সে চট করে তাকাল মিস জেফারসনের দিকে। বলল, 'আপনি তো লোকটিকে খুব কাছে থেকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছেন। তার সম্পর্কে বলুন তো'।

লোকটি অবশ্যই এশিয়ান অরিজিন। লোকটিকে আরবী মনে হয়েছে, আবার কখনও মনে হয়েছে তুর্কি চাইনিজ মিশ্রণ। চোখ কালো, কালো চুল। সব সময় শান্ত নিরুদ্বিগ্ন মুখ। গায়ের রং উজ্জ্বল স্বর্ণাভ। আমি অবাক হয়েছি, দরজায় আমার ডেকে আনা তার শত্রুদের দেখেও স্বাভাবিক কন্ঠে আমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছে

এবং শত্রুর সাথে যখন মোকাবিলার জন্যে দাঁড়াচ্ছে তখন তার মুখ দেখে আমার মনে হয়েছে এটা যেন তার কাছে খেলা'।

মিস জেফারসনের চেহারার বর্ণনায় হঠাৎ করেই জর্জ আব্রাহাম জনসনের চোখের সামনে একটা মানুষের ছবি ভেসে উঠল। সে লোকটি ওহাইও নদীর প্রবল স্রোতে ডুবে যাওয়া তার নাতিকে উদ্ধার করেছিল। আবার মিস জেফারসন লোকটার যে চরিত্রের বর্ণনা দিল তাতে তার চোখে ভেসে উঠেছে সেই আহমদ মুসার ছবি। এফ.বি.আই-এর ফাইলে আহমদ মুসার ডসিয়ারে তার এই অস্বাভাবিক গুণের কথা লেখা হয়েছে।

মনের এ কথাগুলোকে চেপে গিয়ে জর্জ আব্রাহাম জনসন বলল, 'মিস জেফারসন আমি জানি আপনি ড্রইং-এ অত্যন্ত ভাল। আপনি যে ছবিটা ভাষায় তুলে ধরলেন, তা দয়া করে আমাদের এঁকে দিন'।

'দিতে পারি একটা শর্তে'।

'কি শর্ত?'

'তিনি ধরা পড়লে তার সাথে দেখা করে তাকে ধন্যবাদ দেবার আমাকে একটু সুযোগ দেবেন'।

'মঞ্জুর', হেসে বলল এফ.বি.আই চীফ।

জর্জ আব্রাহাম জনসন তার কথা শেষ করতেই মিস জেফারসন ড্রয়্যার থেকে দুই শিট কাগজ বের করে মেলে ধরল টেবিলে। বলল, 'কোনটি নেবেন নিন'।

একই লোকের দু'টি স্কেচ।

স্কেচ দেখে চমকে উঠল জর্জ আব্রাহাম জনসন, 'এ যে তাঁর নাতিকে উদ্ধার করা সেই লোকের মত'।

দু'টি থেকে একটি স্কেচ তুলে নিলেন জর্জ আব্রাহাম জনসন।

'ধন্যবাদ মিস জেফারসন' বলে উঠে দাঁড়াল জর্জ আব্রাহাম। তার সাথে সাথে সবাই।

ক্লিফ ডোয়েলিং এলাকা পেরিয়ে আহমদ মুসার জীপ তীর বেগে ছুটছে এবার এস্পানোলার দিকে।

কিন্তু কোথায় যাচ্ছে সে? এই রক্তভেজা শরীর আর রক্তে প্লাবিত জীপ নিয়ে শহরে ঢুকবে সে কেমন করে?

আহত বাহুর সন্ধি থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে, এখনও হচ্ছে। ব্যান্ডেজ তো দূরে, আহত জায়গা বাঁধবারও সময় সে পায়নি। পেছনে তাড়া করে আসছে সিকিউরিটির লোকেরা।

প্রচুর রক্তক্ষরণে দুর্বলও হয়ে পড়েছে আহমদ মুসা। মাথা ঝিমঝিম করছে অনেকক্ষণ থেকে। দৃষ্টিও তার ঝাপসা হয়ে আসছে যেন।

আহমদ মুসা বুঝতে পারল, এই অবস্থায় বেশীক্ষণ সে ড্রাইভ করতে পারবে না। আর এ গাড়িতে থাকলে সে মারা পড়ে যাবে।

বনাঞ্চল প্রায় পার হয়ে এসেছে। পাতলা হয়ে এসেছে গাছপালা। সামনেই মাঠ। কভার নেবার জায়গা সেখানে কম।

ক্লীফ ডোয়েলিং থেকে এস্পানোলা পর্যন্ত আসা ও যাওয়ার পথ পাশাপাশি, কিন্তু আলাদা। মাঝখানে আইল্যান্ড। তাতে গাছ পালা, ঝোপঝাড়ও আছে।

আহমদ মুসা সিদ্ধান্ত নিল। কারও সাহায্য তাকে নিতে হবে। এ জন্যে এস্পানোলা থেকে আসা গাড়ির জন্যে অপেক্ষা করা তার জন্যে নিরাপদ। এ রাস্তায় সিকিউরিটির লোকরা যে কোন সময় এসে পড়তে পারে।

আহমদ মুসা গাড়ি দাঁড় করাল।

এস্পানোলা থেকে আসা গাড়ির রাস্তা ডান দিকে। কিন্তু আহমদ মুসা নামল বাঁ দিকে। গাড়ি থেকে নেমে সে রাস্তা অতিক্রম করে বাঁদিকের জংগলের পাশে এসে দাঁড়াল। পেছন ফিরে দেখল, ফোটা ফোটা রক্ত রাস্তার উপর পড়েছে, তারপর রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আরও রক্ত পড়ার সুযোগ দিল।

এরপর আহমদ মুসা রুমাল দিয়ে ক্ষতস্থান চেপে ধরে রক্তপড়া যথাসম্ভব বন্ধ করে জংগলের ভেতরে ঢুকে গেল। টলতে টলতে এগোলো পেছনের দিকে।

কিছুটা এগিয়ে আবার এস্পানোলাগামী রাস্তা অতিক্রম করে এস্পানোলা থেকে আসা রাস্তাও অতিক্রম করল। সে রাস্তার ডানপাশে এক ঝোঁপের আড়ালে আশ্রয় নিল। একটা কারবাইন তখনও তার ডান কাঁধে ঝুলছে। যদি সে ধরা পড়েই যায়, তাহলে তার শেষ রক্ষার অস্ত্র এটা।

বেশী দেরী করতে হলো না। মাত্র দু'মিনিট পরেই লস আলামোসের সিকুরিটি ক্যারিয়ারটা তীর বেগে এসে তার ফেলে আসা জীপের পাশে দাঁড়াল।

জীপ ফাঁকা দেখার পর তারা হৈচৈ করে উঠল। তারা রাস্তার ওপাশে নেমে গেল। খুঁজতে লাগল তারা আশে পাশে। কিছুক্ষণ পর একজনের উচ্চ কন্ঠ চিৎকার করে উঠল, 'তোমরা সবাই চলে এস। এখানে দেখ জমাট বাঁধা অনেক রক্ত। নিশ্চয় তাকে কেউ গাড়ি করে তুলে নিয়ে গেছে এখান থেকে'।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা রক্তাক্ত জীপটাকে ক্যারিয়ারের পেছনে বেঁধে রাস্তার সামনের একটু অংশ ঘুরে আহমদ মুসার সামনের রাস্তা দিয়েই লস আলামোসের দিকে চলে গেল।

আহমদ মুসা শুনতে পেল অয়্যারলেসে কাউকে যেন তারা ব্রিফ করছে, 'লোকটি এস্পানোলার দিকেই গেছে কোন প্রাইভেট গাড়িতে। সবগুলো গাড়ির উপর নজর রাখতে হবে এবং সবগুলো ক্লিনিক হাসপাতাল পাহারা দিতে হবে। সে গুরুতর আহত, নিশ্চয় কোন হাসপাতাল বা ক্লিনিকে সে যাবে'।

ওরা চলে গেল।

ধরা পড়া থেকে বাঁচল আহমদ মুসা।

কিন্তু এরপর সে কি করবে? এখনো রক্ত পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটার সাধ্য তার নেই। তার উপর বুক ফাটা তৃষ্ঞা তাকে পাগল করে তুলেছে। মনে হচ্ছে এক সাগর পানিতেও তার তৃষ্ঞা মিটবে না।

তৃষ্ঞার এ অকথ্য যন্ত্রণা তার দেহের সব শক্তি যেন শুষে খাচ্ছে। কিন্তু তবু তাকে এগোতে হবে। একটা গাড়ি তাকে খুঁজে পেতে হবে। যে কাজ নিয়ে সে এসেছে, তার তো কিছুই হয়নি।

ঝোঁপ থেকে বেরিয়ে আহমদ মুসা এগোলো রাস্তার দিকে। ঝাপসা চোখে টলতে টলতে যাচ্ছে আহমদ মুসা।

রাস্তায় উঠে সে মনে করল, এস্পানোলা গামী গাড়িতে তাকে উঠতে হবে এবং এ জন্যে ওপারের ঐ রাস্তায় তার যাওয়া দরকার।

রাস্তা পার হবার জন্যে পা বাড়াল আহমদ মুসা।

তার বাম কাঁধে এখনো ঝুলছে কারবাইনটা।

আহত কাঁধে কারবাইনটাকে দশগুণ ভারী মনে হচ্ছে। আর এ কারবাইনটা তার জন্যে এখন বিপজ্জনক।

হাঁটতে হাঁটতেই আহমদ মুসার ডান হাত বাম কাঁধ থেকে কারবাইনটা নামাবার কাজ শুরু করে দিল।

বাম হাত একটু উপরে তুলতে গিয়ে তীব্র ব্যথা পেল আহমদ মুসা। সে একটু অমনোযোগী হয়ে পড়েছিল।

ব্যথা পাওয়ার পর দাঁড়িয়ে পড়েছিল সে।

ঠিক এ সময়েই কাছেই একটা হর্ণ বেজে উঠল। চমকে উঠে দ্রুত তাকাতে গিয়ে মাথা ঘুরে উঠল আহমদ মুসার। অন্ধকার হয়ে গেল তার চারদিকের পৃথিবীটা।

নিজের উপর তার সব নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গেল।

এস্পানোলা থেকে ক্লীফ ডোয়েলিং হয়ে যে রাস্তা কিউবো শহর পর্যন্ত গেছে, তা এক্সপ্রেস ওয়ে না হলেও কার্যত এক্সপ্রেস ওয়ে হিসেবেই ব্যবহৃত হয়।

একটা গাড়ি তীব্র বেগে চলছিল ক্লীফ ডোয়েলিং এর দিকে। একজন লোককে রাজার হালে রাস্তা পার হতে দেখে ড্রাইভার হর্ন দিল একটু বিরক্ত হয়েই।

কিন্তু লোকটি দ্রুত সরে যাবার বদলে রাস্তায় ঢলে পড়ে গেল।

যথাসময়ে গাড়ির ব্রেক কষলেও গাড়িটা লোকটির প্রায় গা স্পর্শ করে দাঁড়ালো।

একজন তরুনী ড্রাইভ করছিল গাড়িটা।

তরুণীটি সান্তা আনা পাবলো।

তার পাশে তার দাদা, সেই বৃদ্ধ রসওয়েল পাবলো।

পেছনের সীটে সান্তা আনার দাদী।

গাড়ি থামিয়েই একবার বিরক্তি ও উদ্বেগ নিয়ে গাড়ি থেকে নামল সান্তা আনা। বৃদ্ধ রসওয়েল পাবলোও নামল গাড়ি থেকে।

সান্তা আনাই প্রথম পৌঁছেছিল পড়ে যাওয়া লোকটির কাছে।

পড়ে যাওয়া লোকটি আহমদ মুসা।

সান্তা আনা রক্তাক্ত আহমদ মুসাকে দেখেই 'দাদু' বলে চিৎকার করে উঠল।

বৃদ্ধ রসওয়েল পাবলোও সেখানে পৌঁছেছে।

আহমদ মুসার মুখের উপর চোখ পড়তেই চমকে উঠল বৃদ্ধ রসওয়েল। বলল দ্রুত কন্ঠে, 'আরে এযে সেই ছেলেটা, এর এ দশা কেন?'

'দাদু তুমি চেন এঁকে?' জিজ্ঞেস করল সান্তা আনা।

'হ্যাঁ, খুব ভাল ছেলে। আমরা এক সঙ্গে প্লেনে এসেছি'।

'ভাল ছেলে বলছ, কিন্তু সাথে কারবাইন কেন? গুলিবিদ্ধ হয়েছে নিশ্চয় গোলাগুলি করতে গিয়ে'।

সান্তা আনার দাদী বৃদ্ধাও এসে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। বলল, 'তোমরা দাঁড়ায়ে কেন? ছেলেটা তো মারা যাবে। তাড়াতাড়ি গাড়িতে তোল'।

'একটা ঝামেলায় পড়া কি ঠিক হবে? কেন, কি ঘটেছে আমরা কিছুই জানি না'। সান্তা আনা বলল।

'কিছু জানার দরকার নেই, আমার চেনায় অবশ্যই ভূল হয়নি। ছেলেটি ভাল। নিশ্চয় কোন মারাত্মক বিপদে জড়িয়ে পড়েছে'।

বলে বৃদ্ধ আহমদ মুসাকে পাঁজা কোলা করে তুলে নেবার উদ্যোগ নিল।

আর কিছু না বলে সান্তা আনাও এগিয়ে এল। বলল, 'দাদু ওঁর সামনের দিকটা ধর, আমি পেছনটা ধরছি'।

দাদা নাতনি দু'জনে মিলে আহমদ মুসাকে পেছনে সিটে তুলে নিল।

বৃদ্ধা কারবাইনটাও গাড়িতে তুলছিল।

সান্তা আনা না না করে উঠল। বলল, 'দাদী, ঐ আপদ তুমি গাড়িতে তুলো না'।

'ঠিক আছে। বাছাটার জ্ঞান ফিরুক। তারপর ফেলে দেয়া যাবে। জিনিষটা ওর তো'।

আহমদ মুসাকে গাড়িতে তুলেই বৃদ্ধ রসওয়েল বোতল থেকে ঠান্ডা পানি আহমদ মুসার মুখে ছিটাতে লাগল।

সান্তা আনা তার গাড়ি রাস্তার পাশে একটা গাছের ছায়ায় নিয়ে দাঁড় করিয়েছে।

সামনে দুই সিটে দাদী ও নাতনী এবং পেছনের সিটে বৃদ্ধ রসওয়েল। সবাই তাকিয়ে আহমদ মুসার মুখের দিকে।

'আঘাত তার বাহু সন্ধিতে। আঘাতে সে সংজ্ঞা হারায়নি। সংজ্ঞা হারাবার কারণ হতে পারে রক্তক্ষরণজনিত দুর্বলতা। বলল বৃদ্ধ রসওয়েল।

'দাদু, তুমি লোকটাকে ভাল বলছ কিসের ভিত্তিতে?'

'ছেলেটার মুখ দেখ তো। এ কোন খারাপ লোকের চেহারা?'

'খারাবিটা মানুষের ভেতরের ব্যাপার, দেহের ব্যাপার নয়'। বলল সান্তা আনা।

'দেহের ব্যাপার নয় বোন, কিন্তু চেহারার ব্যাপার অবশ্যই। মানুষের চেহারায় তার পাপ অথবা পুণ্যের প্রকাশ অবশ্যই ঘটে'।

সান্তা আনা কিছু বলতে যাচ্ছিল।

নড়ে উঠল আহমদ মুসা। চোখ খুলল সে। আচ্ছন্নের মত তার দৃষ্টি।

শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়া ঠোঁট। সে দু'ঠোঁটের ফাঁক গলিয়ে অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে এল, 'পানি, পা....নি'।

বৃদ্ধ রসওয়েল আহমদ মুসার মাথা একটু উঁচু করে তুলে ধরে পানির বোতল তার মুখে ধরল।

একবারেই এক বোতল পানির সবটুকু খেয়ে ফেলল আহমদ মুসা।

পানির বোতল মুখ থেকে সরাতেই আহমদ মুসা মুখ ঘুরিয়ে যার কোলে তার মাথা তার দিকে তাকাল।

তাকিয়েই বিস্মিত আহমদ মুসা ডান হাত দিয়ে বাম হাত চেপে ধরে উঠে বসল। বলল, 'স্যার আপনি?'

তারপর চারদিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি গাড়িতে কি করে এলাম?' দুর্বল কন্ঠ আহমদ মুসার।

'এসব পরে শুনো। তোমাকে এখন তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নেয়া দরকার'।

'না জনাব, হাসপাতাল কিংবা ক্লিনিকে নয়। এতক্ষণে আশপাশের শহরসহ সব হাসপাতাল ও ক্লিনিকে পুলিশ নিশ্চয় পাহারা বসিয়েছে'।

'কেন তাদের সাথে তোমার বিরোধ কি, কি ঘটেছে?' উদ্বিগ্ন কন্ঠে বলল বৃদ্ধ রসওয়েল।

'ঘটনা অনেক বড়। তবে এটুকু জেনে রাখুন আমি নির্দোষ, কিন্তু সরকারের সিকিউরিটি ফোর্সের সাথে আমার সংঘাত ঘটেছে, এটা ঠিক। আমি তাদের গুলিতে আহত, তাদেরও অনেকে আমার গুলিতে আহত হয়েছে। এই কারবাইনটাও আমি সিকিউরিটি ফোর্সদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছি। আরও শুনুন, আমি হয়তো এখন তাদের তালিকায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যাকে তাদের অবশ্যই ধরা প্রয়োজন। আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ হবার পরেও এসব কিছু সত্য। এখন আপনারা আমাকে বিশ্বাসও করতে পারেন, অথবা আমাকে পুলিশের হাতেও দিতে পারেন'।

'দাদু মনে হচ্ছে গুরুতর কিছু ঘটেছে। তবে ওঁর কাছ থেকে সবকিছু না শুনে ওকেঁ আমরা পুলিশের হাতে দিতে পারিনা'। বলল সান্তা আনা।

'ও তো দুটি বিকল্প দিয়েছে। আমি প্রথমটিকেই গ্রহন করেছি। ওর প্রতি বিশ্বাস আমার নষ্ট হয়নি'। বলল বৃদ্ধ রসওয়েল পাবলো।

'তাহলে আমরা এখন এস্পানোলা ফিরি দাদু?' বলল সান্তা আনা।

'আমার মনে হয় সান্তা ক্লারা এবং এস্পানোলাগামী প্রতিটি গাড়ি আজ চেক করা হবে'। আহমদ মুসা বলল।

ভাবছিল বৃদ্ধ রসওয়েল।

'তাহলে দাদু ওঁকে আমরা আমাদের কম্যুনিটি হাসপাতালে নিয়ে যাই। ওটা এস্পানোলার বাইরেও হবে। ওখানে হোয়াইট পুলিশ মাতব্বরী করতে পারবেনা'।

‘ঠিক বলেছিস বোন। কিন্তু কোন পথে যাবি?’ বলল রসওয়েল।

‘ভেব না দাদু। আমি এস্পানোলা রোড ও এস্পানোলার আশে পাশে যাব না’।

বলে গাড়ি স্টার্ট দিল সান্তা আনা। গাড়ি ছুটে চলল।

‘কোথায় যাচ্ছিলাম, কোথায় যা্চ্ছি। একেই বলে ঈশ্বরের কাজ’। বলল বৃদ্ধা, সান্তা আনার দাদী।

‘তুমি তো খুশীই হয়েছ দাদী’। সান্তা আনা বলল।

‘ঈশ্বর যা করেন ভালোর জন্যই করেন’। দাদী বলল।

‘তোমরা আমাকে লুকিয়ে রাখছিলে, এটা বোধ হয় ঈশ্বর ভালোর জন্যেই করেছেন?’ সান্তা আনা মুখে ম্লান হাসি টেনে বলল।

‘নিশ্চয় তাই’। বলল সান্তার দাদী।

‘সত্যকে মিথ্যা দিয়ে ঢাকা বোধ হয় ঈশ্বরের কাজ?’ ভারি গলায় বলল সান্তা আনা।

আহমদ মুসা বিষ্মিত হলো আলোচনার এই সিরিয়াস মোড় পরিবর্তনে এবং সান্তা আনাকে কান্নার কাছাকাছি পৌঁছতে দেখে। পটভূমিতে কোন বড় ঘটনা আছে কি?

বৃদ্ধ রসওয়েল হাসল। বলল, ‘এ দিক ভেবে ড্রাইভ খারাপ করো না বোন। নিশ্চিত থাক, ঈশ্বর সত্যকে সত্যই রাখেন’।

সান্তা আনা কিছু বলল না।

তার দাদীও নয়।

কিন্তু সবার মনেই একটা তোলপাড়।

সান্তা আনার আব্বা আম্মা জোর করেই সান্তা আনাকে পাঠিয়ে দিচ্ছে তার দাদা দাদীর সাথে তাদের পূর্বপুরুষের নিবাস জেমিস পাবলোতে।

জেমিস পাবলো সান্তাফে জাতীয় বনাঞ্চলের দক্ষিণ পশ্চিম অংশে পাবলো রেড ইন্ডিয়ান সংরক্ষিত এলাকায়।

বনবাসের মতই ব্যাপার অনেকটা। সান্তার বাবা মা এবং ইন্ডিয়ানরা চায়, সান্তা আনা মাস খানেকের মত নাবালুসি পরিবারের সংস্পর্শ থেকে দুরে থাক

এবং মামলায় সাক্ষী দেয়ার কোন সুযোগ না পাক। এজন্যে সন্তাফে এবং এস্পানোলার কোন জায়গায় সান্তা আনার অবস্থান তারা নিরাপদ মনে করে নি।

অনেকক্ষণ পর সান্তা আনার দাদা রসওয়েল পাবলোই বলল, ‘বুঝলে সান্তা, হতে পারে ঈশ্বরের হাতই তোমাকে এস্পানোলা ফিরিয়ে নিচ্ছে’।

‘ধন্যবাদ দাদু’। বলল সান্তা আনা। তার শুষ্ক ঠোঁটের কোণে একটা বেদনার হাসি।

তার দৃষ্টি সামনে প্রসারিত।

কিন্তু তাতে একটা অসহ্য যন্ত্রণা।

সেই যে সান ঘানেমকে পুলিশ নেয়ে গেল, তারপর সান ঘানেমের আর কোন খবর সে পায় নি। দেখা করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু বাড়ি থেকে কোন মতেই তাকে বের হতে দেয়া হয়নি। কি ভাবছে সান ঘানেম তাকে? ভাবছে কি সে যে, সবার মত আমিও তাকে ভাইয়ার খুনি ভেবে তার কাছ থেকে সরে গেছি।

হঠাৎ কান্নার একটা জোয়ার উথলে উঠলো সান্তা আনার বুক থেকে।

সান্তা আনা ঠোঁট কামড়ে তা রোধ করার চেষ্টা করল।

কান্না চাপতে গিয়ে থরথর করে কেঁপে উঠল সান্তা আনার দেহ।

পাশ থেকে তার দাদী বুঝল সান্তা আনার মনের অবস্থা। ধীরে ধীরে সে তার বাম হাত সান্তার পিঠে রাখল। বলল, সব ঠিক হয়ে যাবে বোন। ঈশ্বর আছেন’।

দাদীর এ সান্ত্বনায় সান্তা আনার দু’চোখ বেয়ে নেমে এল নিরব অশ্রুর বন্যা।

এস্পানোলা শহর। বৃদ্ধ রসওয়েলের বাড়ি।

এস্পানোলার এক সবুজ টিলায় বাড়িটা। ছবির মত।

রসওয়েল পরিবার পাবলো রেড ইন্ডিয়ানদের এক সম্ভ্রান্ত ঘর। এখন আগের সেই সর্দারী সিস্টেম নেই। কিন্তু এক সময় তার পরিবারই নেতৃত্ব দিয়েছে বিশাল বিস্তৃত পাবলো ইন্ডিয়ান জনপদের।

জিমেস পাবলোতে রয়েছে তাদের বিশাল বাড়ি এবং বিপুল ভু-সম্পত্তি।

ইদানিং পরিবারটি বাস করছে এস্পানোলাতে। কিন্তু ছেলে চাকুরীতে ঢোকার পর সে এখন বাস করছে সান্তাফে-তে।

রসওয়েলের সুন্দর বৈঠকখানা।

আজ আহমদ মুসার গায়ে জ্বর নেই। আজই প্রথম সে বৈঠকখানায় এসে বসেছে।

রেড ইন্ডিয়ানদের কম্যুনিটি হাসপাতালে একদিন থাকার পর তাকে বাসায় নিয়ে এসেছে বৃদ্ধ রসওয়েল।

আহমদ মুসার বাহুসন্ধিতে অপারেশন করে গুলি বের করতে হয়েছে। দ্রুত সে সেরে উঠেছে। ডাক্তার বিস্মিত কন্ঠে বলেছে রসওয়েলকে ছেলেটার দেহে যাদু আছে। তিরিশ দিনের নিরাময়ের কাজ তার তিরিশ ঘন্টায় হয়ে যাচ্ছে। আর ক'দিনের মধ্যে সে দৌড় ঝাঁপ করতে পারবে।

'যাদুকে তুমি বিশ্বস কর ডাক্তার?' ডাক্তারের কথার উত্তরে বলেছে বৃদ্ধ রসওয়েল।

ডাক্তার হেসে বলেছে, 'আমি তার মানসিক শক্তিকে যাদু বলছি। যে মন সব সময় নিরুদ্বিগ্ন ও প্রশান্ত থাকে, তার নার্ভ অবিশ্বাস্য শক্তিশালী হয়। সে অসীম মানসিক শক্তির অধিকারী হয়। ছেলেটার মধ্যে আমার মতে ঐ ধরনের একটা মানসিক শক্তি আছে'।

'ঠিক বলেছেন, আংকল। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তার মুখ দেখে মনে হয়েছে তার কিছু হয়নি। কিন্তু আংকল এমন তো সাধারণত দেখা যায় না?' বলেছিল সান্তা আনা।

'এ এক অসাধারণ মানুষ মা'। বলেছিল ডাক্তার।

'কিন্তু তাঁকে দেখে তো অসাধারণ কিছু মনে হয় না। খুব ভাল ছেলে এই যা'। বলে ওঠে বৃদ্ধ রসওয়েল।

‘আমি ডাক্তার। আমি তার দেহের বাইরেরটাও দেখেছি, ভেতরটাও দেখেছি। তার শরীর নিখাদ এক পেটানো ইস্পাত, তার ভেতরের অবস্থানগুলোও তাই। দেখেছেন, এত রক্ত তার গেছে, কিন্তু এক ফোটা রক্তও তাকে বাহির থেকে দিতে হয়নি’। বলেছিল ডাক্তার। তাঁর কন্ঠে বিস্ময়।

এসব কথা আলোচনা করছিল বৃদ্ধ রসওয়েল ও সান্তা আনা করিডোর ধরে হাঁটতে হাঁটতে।

আলোচনার এক পর্যায়ে সান্তা আনা বলল, ‘আমি খুব খুশী দাদু কয়টা দিন কাজের মধ্যে দিয়ে কাটল। কিন্তু লোকটা চলে গেলে কি আমাকে জিমেস পাবলোতে পাঠিয়ে দেবে?’

‘জিমেস পাবলো জায়গাকে এত ভয় করছিস কেনো? জিমেস পাবলো ও এস্পানোলার মধ্যে কি খুব পার্থক্য আছে?’

পার্থক্য যদি নাই থাকে তাহলে আমি এস্পানোলাতে থাকলে তোমাদের আপত্তি কেন?’

‘আমার আপত্তি নেই। কিন্তু এই মুহূর্তে কিছু করার নেই। আমাদের ‘জিমি’ নিহত হওয়ার ঘটনা, শোক ও সেন্টিমেন্ট সৃষ্টিসহ এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে, যখন যুক্তির কথা কারও কানে যাবে না। জানি ইন্ডিয়ানরা বাড়াবাড়ি করছে, তারা হঠাৎ করে পাবলো ইন্ডিয়ানদের সাংঘাতিক মিত্র সেজে বসেছে। ওদের মতলবটা আমার অজানা নয়’। বলল রসওয়েল।

‘আরেকটা কথা তোমাকে বলি দাদু, আমি সান ঘানেমকে ভালবাসি, এটা জানি ইন্ডিয়ানদের বিশেষ করে জনি লেভেনের সহ্য হচ্ছে না। তার একটা মতলব ছিল আমাকে নিয়ে। ঈর্ষার কারনেই এখন মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে ওরা’।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল বৃদ্ধ রসওয়েল। প্রায় গর্জে উঠল, ‘কি বললি জনি ইন্ডিয়ানরা চোখ তুলে তাকাতে চায় পাবলো মেয়েদের উপর। চোখ ছিঁড়ে ফেলব না’।

বলে আবার হাঁটতে লাগল। দাদুর কথায় উৎসাহিত হয়ে উঠল সান্তা আনা। কিন্তু বুঝতে পারলো না কেন দাদু জনিদের বিরুদ্ধে এমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল!

কিছু বলতে যাচ্ছিল সান্তা আনা। কিন্তু ততক্ষণে তারা ড্রইং রুমে প্রবেশ করেছে। থেমে গেল সান্তা আনা।

ড্রইং রুমে আহমদ মুসাকে দেখে খুশী হলো বৃদ্ধ রসওয়েল। উচ্ছসিত কন্ঠে বলল, 'তুমি বৈঠকখানা পর্যন্ত এসেছ? বাঃ বেশ'।

বলে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে আহমদ মুসার কপালে হাত দিয়ে পরীক্ষা করে বলল, 'না, জ্বর নেই। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ'।

আহমদ মুসার পাশের সোফায় বসে পড়ল বৃদ্ধ রসওয়েল।

সান্তা আনা বসল তাদের সামনের সোফাটায়।

বসার পর বৃদ্ধ রসওয়েল বলল, 'আহমদ আবদুল্লাহ, তুমি ভাল হবার আগেই যাবো যাবো করছ, কিন্তু এদিকের খবর জান?'

'কি খবর? আমাকে পুলিশ সন্ধান করছে সেই খবর?' স্বাভাবিক কন্ঠে বলল আহমদ মুসা।

'তুমি বুঝলে কেমন করে?'

'খবরটা যখন ভয়ের, তখন পুলিশ আমাকে সন্ধান করা ছাড়া আর কি খবর হতে পারে?'

বলিনি তো আমি ভয়ের খবর দিচ্ছি'।

'তা বলেন নি, কিন্তু যাব যাব করছ বলে যে খবর দেবেন, তা বাইরে বেরুতে না পারার মত ভয়ের খবরই হবে'।

'তোমাকে ধন্যবাদ, তোমার আই কিউকে ধন্যবাদ। কিন্তু খবরটা সত্যি খুব ভয়ের। পুলিশ শুধু তোমার সন্ধান করছে তা নয়'।

'আরও কি করছে?'

'তোমার একটা ড্রইং করা ফটো সব পুলিশ স্টেশনে পৌঁছে দেয়া হয়েছে।

'ড্রইং ফটো, ফটোগ্রাফ নয়?'

'হ্যাঁ, ড্রইং ফটো'।

'আমার ফটোগ্রাফই ওদের কাছে থাকার কথা, তাহলে ড্রইং করা ফটো কেন? অনেকটা স্বগোতেক্তির মতই কথাগুলো বলল।

মনে মনে আহমদ মুসা আরও বলল, আহমদ মুসা যে লস আলামোস গবেষণাগারে প্রবেশ করেছিল, এ সম্পর্কে ওরা তাহলে নিশ্চিত হয়নি। ড্রইং ফটোটা নিশ্চয় তাহলে নিখুঁত নয়। হলে তাকে তো তারা চিনতেই পারতো।

মনে মনে খুশী হলো আহমদ মুসা।

'তোমার ফটো ওদের মানে সরকারের কাছে থাকার কথা বলছ কেন? কেন থাকবে তোমার ফটো সরকারের কাছে?' বলল বৃদ্ধ রসওয়েল।

'তার আগে বলুন, আর কি শুনেছেন?' আহমদ মুসার পাল্টা প্রশ্ন।

'পুলিশের উপর নির্দেশ এসেছে সংশ্লিষ্ট লোকটিকে ধরার সব রকম ব্যবস্থা করতে হবে'।

ড্রইং ফটোটা আমার বলে কি চেনা যায়?'

'বর্তমান অবস্থার সাথে খুব একটা মিল নেই। ড্রইং ফটোতে তোমার মুখে গোঁফ এবং মাথায় ঝাঁকড়া চুল আছে। এই বেশেই প্রথম তোমাকে আমরা দেখেছিলাম'।

বৃদ্ধ রসওয়েল একটা ঢোক গিলল এবং সংগে সংগেই বলে উঠল, 'আর কোন কথা নয়। এবার বল পুলিশ তোমাকে খুঁজছে কেন? সরকার এতটা ক্ষ্যাপা কেন তোমার উপর? তুমি আহত হলে কিভাবে? সরকারী কারবাইনটাই বা তুমি পেলে কোথায়?'

আহমদ মুসা গম্ভীর হলো। বলল, 'আমি একজন পণবন্দী মানুষকে উদ্ধার করার জন্যে নিউ মেক্সিকো এসেছি। তাকে ইহুদী গোয়েন্দা চক্র পণবন্দী করেছে।

ভ্রু কুঞ্চিত হলো রসওয়েলের। বিষ্ময় দেখা দিল সান্তা আনার চোখে মুখেও।

'লোকটি কে? আমেরিকান?'

'হ্যাঁ'।

'কে লোকটি?'

'সান্তাফে'তেই বাড়ি। নাম, কারসেন ঘানেম নাবালুসি'।

নামটা কানে যেতেই চমকে উঠল বৃদ্ধ রসওয়েল এবং সান্তা আনা দু'জনেই।

বিস্ময়ের ধাক্কায় দু'জনেই কথা বলতে পারলো না তৎক্ষনাৎ।

তাদের বিস্ময়ের কারণ কয়েকটি। কারসেন ঘানেম যে বন্দী বা পণবন্দী হয়েছে তা এই প্রথম শুনল তারা। দ্বিতীয় ব্যাপার হলো, ইহুদী গোয়েন্দারা কারসেন ঘানেমকে পণবন্দী করবে কেন? নিউ মেক্সিকোর মুসলমানদের সাথে ইহুদীদের তো তেমন কোন সম্পর্ক নেই। আর তৃতীয় কারণ, আহমদ আব্দুল্লার সাথে কারসেনের সম্পর্ক?'

সান্তা আনা বিস্মিত হবার সাথে সাথে ভয়ানক উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। একদিকে সান ঘানেম খুনের মিথ্যা অভিযোগে এখন জেলে, অন্যদিকে তার আব্বাও বন্দী হয়েছে কোন শত্রুর হাতে। ওদের যে এখন কি অবস্থা! ভাবতে গিয়ে বেদনায় মনটা মুষড়ে পড়ল।

'কারসেন ঘানেম পণবন্দী হলো কোন কারণে? ইহুদীদের সাথে তার শত্রুতা কিসের?' বলল রসওয়েল।

'আমারই কারণে সে পণবন্দী হয়েছে। আমি..........'।

কথা শেষ করতে পারলো না আহমদ মুসা। তাকে বাধা দিয়ে রসওয়েল বলল, 'তোমার কারণে? তুমি কারসেন ঘানেমকে চেন?'

'চিনি না। ঘটনাটা বলছি শুনুন'। বলে একটু থামলো আহমদ মুসা।

বৃদ্ধ রসওয়েল ও সান্তা আনার উদগ্রীব দৃষ্টি আহমদ মুসার উপর নিবদ্ধ। তাদের চোখে এখন বিস্ময়, সংশয়, সন্দেহ অনেক কিছু।

আহমদ মুসা সোফায় সোজা হয়ে বসে কথা শুরু করল আবার, 'ওয়াশিংটনের গ্রীণ ভ্যালিতে আমেরিকান মুসলিম এসোসিয়েশনগুলোর একটা সম্মেলনে হচ্ছে। আমি সে সম্মেলনে এসেছিলাম। সে সম্মেলনে নিউ মেক্সিকো মুসলিম সমিতির সভাপতি হিসেবে কারসেন ঘানেমেরও যাবার কথা ছিল। আন্তর্জাতিক ইহুদী গোয়েন্দা সংস্থা সম্মেলনে আমার যোগদানের বিষয় জানতে পারে। আমাকে ধরার জন্যে তারা সম্মেলনে অনুপ্রবেশের সিদ্ধান্ত নেয়। এই লক্ষ্যে তারা ওয়াশিংটন যাবার পথে কারসেন ঘানেমকে কিডন্যাপ করে এবং তার

ছদ্মবেশ নিয়ে সম্মেলনে যোগদান করে একজন ইহুদী এজেন্ট। আর কারসেন ঘানেমকে ওরা বন্দী করে রাখে ক্লিফ ডোয়েলিং এর দক্ষিণে সবুজ পাহাড়ে। কিন্তু সম্মেলনে যোগদানকারী ইহুদী এজেন্ট ধরা পড়ে যায়। তার কাছ থেকেই আমরা জানতে পারি এই সবুজ পাহাড়ে কারসেন ঘানেমকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। জানার সংগে সংগে ছুটে আসি তাকে উদ্ধারের জন্যে'। একটু থামল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা থামতেই বৃদ্ধ রসওয়েল বলল, 'তোমার আসার পথেই বুঝি প্লেনে তোমার সাথে আমার ঐ দেখা?'

জি। বলে আহমদ মুসা সোফায় গা এলিয়ে আবার শুরু করল, 'ঐ ইহুদী এজেন্ট ধরা পড়েছে এবং আমি যে কারসেন ঘানেমকে উদ্ধারের জন্য নিউ মেক্সিকোর সবুজ পাহাড়ে আসছি তা ওরা জানতে পারে। আমি এসে পৌঁছানোর আগেই ওরা কারসেন ঘানেমকে সবুজ পাহাড় থেকে সরিয়ে ফেলে এবং আমাকে ধরার জন্যে ওঁৎ পেতে থাকে। আমি ধরা পড়ে যাই ওদের হাতে'। থামল আহমদ মুসা।

'সাংঘাতিক রোমাঞ্চকার কাহিনী তোমার। কিন্তু এ বিরোধ তোমার ইহুদী গোয়েন্দা সংস্থার সাথে কেন? সরকার ও পুলিশের সাথে তোমার সংঘাত ঘটল কি করে? সরকার তোমার শত্রু হয়ে দাঁড়াল কেন?' বলল রসওয়েল।

'ওটা ঘটেছে ভাগ্যের ফেরে। একদম নিরপরাধ হয়েও ওদের কাছে আজ আমি সাংঘাতিক এক অপরাধী। ওরা আমাকে ৪০ ফুট মাটির গভীরে এক অন্ধকূপে বন্দী করে রাখে। ওখান থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করতে গিয়ে একটা গোপন সুড়ঙ্গ পথ পেয়ে যাই। মনে করলাম এ সুড়ঙ্গ পথে বাইরে বেরুনো যাবে, কিন্তু সে সুড়ঙ্গ পথে চলতে গিয়ে উঠলাম লস আলামোস স্ট্রাটেজিক ল্যাবরেটরীতে। সেখান থেকে পালাতে গিয়ে সংঘাত বাধল ওখানকার সিকিউরিটি ফোর্সের সাথে। আমি আহত হলাম, ওরাও অনেকে আহত হলো। সবকিছু জানতে পারলাম বটে, কিন্তু শত্রু হয়ে গেলাম আপনাদের সরকারের। তারা ভাবছে আমি বুঝি গোয়েন্দাগিরির জন্যে লস আলামোসে ঢুকেছিলাম'। বলল আহমদ মুসা।

রসওয়েল ও সান্তা আনা বিস্ময়ে নির্বাক।

অনেক্ষণ পর ধীর ও চিন্তান্বিত কন্ঠে বৃদ্ধ রসওয়েল বলল, ‘তোমাকে নির্দোষ প্রমাণ করা কঠিন। লস আলামোস ল্যাবরেটরীর ভেতরে তোমাকে পাওয়া গেছে, এটাই এখন সবচেয়ে বড় এবং ভয়ংকর এক সত্য। মনে করা হবে, কোন ভয়ানক কাজ নিয়ে তুমি সেখানে ঢুকেছিলে। তুমি এমন জায়গায় ঢুকেছিলে যেটা দেশের সবোর্চ্চ স্পর্শকাতর স্থানগুলোর একটি। আমি তোমার জন্যে উদ্বিগ্ন বৎস।‘

‘ঘরের বাইরে একটা পদক্ষেপও আপনার এখন নিরাপদ নয় দেখা যাচ্ছে’। উদ্বিগ্ন কন্ঠ সান্তা আনার।

‘আমি ভাবছি নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ তুমি কিভাবে করবে; এটাই এখন বড় চিন্তা হওয়া উচিত’। বলল রসওয়েল শুকনো কন্ঠে।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘না জনাব ঐ চিন্তা করার সময় নেই। আমি এখন বের হবো কারসেন ঘানেমের খোঁজে। তাঁকে উদ্ধার করার পর ভাবব ঐ ব্যাপারে কি করা যায়’।

‘কি বলছ তুমি, তোমার এখন জীবন বাঁচানো দায়, তুমি আরেক জনকে কেমন করে বাঁচাবে? বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে বলল বৃদ্ধ রসওয়েল।

‘আমার জন্যে বেচারার জীবন এখন বিপন্ন, আমার প্রথম দায়িত্ব হবে তাকে উদ্ধার করা’।

‘তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে তুমি যদি পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যাও, তাহলে তো দু’কুলই যাবে’। যুক্তি উত্থাপন করল রসওয়েল।

‘আল্লাহ যদি আমাকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেন, কারসেন ঘানেমকে উদ্ধার করার সুযোগ না দেন, তাহলে কারসেন ঘানেমের উদ্ধার করার দায়িত্ব বর্তাবে আল্লাহর উপর’। আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসার কথায় বৃদ্ধ রসওয়েল ও সান্তা আনা দু’জনেই হেসে উঠল।

‘আপনি যে কথা বললেন, তা আপনি বিশ্বাস থেকে বললেন? আল্লাহর প্রতি আপনার এতটা আস্থা আছে?’ বলল সান্তা আনা।

'নিছক আস্থা ও বিশ্বাস নয় সান্তা আনা, এটা আমার একিন যে আমার চেষ্টা যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে আল্লাহ ঐ নিরপরাধ মানুষকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করবেন'। বলল আহমদ মুসা।

হঠাৎ সান্তা আনার মুখ চোখে আবেগের এক জোয়ার যেন এল। বলল, 'ভাইয়া, কোন সাজানো খুনের কেসে যদি কোন নিরপরাধ ও ভালো মুসলিম ছেলেকে আটাকানো হয়, তাহলে আল্লাহ তাকে বাঁচাবেন না?'

সান্তা আনার শেষ দিকের কথাগুলো কান্নায় ভেঙে পড়ল।

আকস্মিক এই ঘটনায় আহমদ মুসা বিব্রত হয়ে পড়ল। একবার বৃদ্ধ রসওয়েল ও একবার সান্তা আনার দিকে তাকাতে লাগল আহমদ মুসা।

বৃদ্ধ রসওয়েলের চোখে মুখেও বেদনার একটা ছায়া পড়েছে।

সে আহমদ মুসার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'দুঃখিত আহমদ আবদুল্লাহ, তোমার বিপদের পাশে সান্তা আনা আরেক বিপদের কথা নিয়ে এল'।

'আমি বুঝলাম না জনাব, 'সাজানো খুনের মামলায় কোন মুসলিম ছেলে জড়িয়ে পড়েছে?'

সে আরেক কাহিনী আহমদ আব্দুল্লাহ।

বলে একটু থেমে বৃদ্ধ রসওয়েল আবার শুরু করল, 'ভেবেছিলাম কথাগুলো তোমাকে বলবনা, কিন্তু এখন দেখছি বলা দরকার। তোমার ঘটনার সাথে এর কিছুটা হলেও সম্পর্ক আছে। তুমি শুনেছ আমার নাতি সান্তা আনার ভাই জিমি পাবলো খুন হয়েছে। খুনের অভিযোগে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে কারসেন ঘানেম নাবালুসির ছেলে সান ঘানেম নাবালুসিকে। সমস্যা.....,

বৃদ্ধ রসওয়েলকে থামিয়ে দিয়ে আহমদ মুসা বলল, 'কি বলছেন আপনি, কারসেন ঘানেমের ছেলে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছে? খুন করেছে সে? আপনার নাতি খুন হয়েছে, সে খুনের জন্যে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা কেস সাজালো কে?'

'সেই কাহিনীই তো বলছি শোন'।

বলে বৃদ্ধ রসওয়েল খেলার মাঠে কিভাবে শ্বেতাংগ ও ইন্ডিয়ানদের মধ্যে দাংগা বাধল, কিভাবে একজন শ্বেতাংগের হাত থেকে একজন ইন্ডিয়ানকে

বাঁচাতে গিয়ে সান ঘানেম শ্বেতাংগের হাত থেকে কেড়ে নেয়া ছুরি ছুড়ে ফেলে দিলে তা জিমি পাবলোর বুকে গিয়ে বিদ্ধ হলো এবং সে মারা গেল। কিভাবে হত্যাকান্ডটির সাথে শ্বেতাংগ ও রেড ইন্ডিয়ান সেন্টিমেন্ট জড়িয়ে পড়ল, তার বিবরণ দিয়ে বলল, 'সান ঘানেম যে জিমি পাবলোকে লক্ষ্য করে ছুরি ছোড়েনি, একজন ইন্ডিয়ান ছাত্রকে খুন করতে উদ্যত শ্বেতাংগের ছুরি কেড়ে নিয়ে কোন দিকে কিছু না দেখেই যে ছুরিটা ছুড়ে ফেলে, এটা মাত্র দেখেছে সেই ইন্ডিয়ান ছেলে জনি লেভেন, যাকে সান ঘানেম বাঁচিয়েছিল আর সান্তা আনা। যেহেতু এখন প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে শ্বেতাংগ এবং ইন্ডিয়ান নিয়ে, তাই জনি লেভেন এখন বলছে সে দেখেছে সান ঘানেম দেখে শুনেই ছুরি মেরেছে জিমি পাবলোকে। বিশ্বাস করবার মত একটা কাহিনীও বানিয়েছে জনি লেভেন। সেটা হলো, সান ঘানেমের চোখ পড়েছিল সান্তা আনার উপর, জিমি এর বিরোধিতা করে, এই কারণেই সুযোগ পেয়ে সান ঘানেম হত্যা করে জিমি পাবলোকে'।

'কিন্তু সান্তা আনা সাক্ষী দিলেই তো সান ঘানেম বেঁচে যায়। জিমি পাবলোর বোন বলেই তার সাক্ষীই বেশী গ্রহনযোগ্য হবে'। আহমদ মুসা বলল।

'সমস্যা দাঁড়িয়েছে তো এখানেই। সান্তা আনার আব্বা আম্মা সান্তা আনাকে সাক্ষী দিতে দেবে না। যে কেস হয়েছে তাতেও সান্তা আনাকে সাক্ষীর তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে'।

'কেন সাক্ষী দিতে দেবে না?'

'দুই কারণে। এক, অনিচ্ছাকৃত দুর্ঘটনাবশত হলেও সান ঘানেমের নিক্ষিপ্ত ছুরিতেই জিমি পাবলো মারা গেছে। দুই, সান্তা আনা সান ঘানেমকে ভালোবাসে, এরও তারা বিরোধী। সুতরাং সান ঘানেম দৃশ্যপট থেকে সরে যাক, এটাই তারা চায়। আর সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করছে শুনলাম জনি লেভেনের গোত্রের রেড ইন্ডিয়ানরা। তারা আমার ছেলেকে, আমাদের পরিবারকে সাংঘাতিকভাবে উত্তেজিত করছে। সান্তাফে-তে থাকলে ঘানেমদের পরিবার সান্তা আনার সাথে যোগাযোগ করবে, আবার সান্তা আনাও ওদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে, এই আশংকায় তাকে রাজধানী থেকে দুরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল'।

‘কিন্তু জনাব, সান্তা আনা সাক্ষী না দিলে তো সান ঘানেমের শাস্তি হয়ে যাবে’। উদ্বিগ্ন কন্ঠে বলল আহমদ মুসা।

‘তা আমি জানি, কিন্তু করার কিছু পাচ্ছি না। বিষয়টা আমার পারিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে আমি সব কিছু করতে পারতাম, এমন কি আমাদের পাবলো ইন্ডিয়ানদের মধ্যে সীমিত থাকলেও, আমার কথা তারা শুনতো। কিন্তু জনি, জিয়া প্রভৃতি আশে পাশের সব ইন্ডিয়ানরা এক জোট হওয়ায় সমস্যা দেখা দিয়েছে’।

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় বাইরের কলিং বেল বেজে উঠল। থেমে গেল আহমদ মুসা।

সান্তা আনা উঠে দাঁড়ালো।

রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে সে দরজার দিকে এগুলো।

দরজা খোলার আগে লুকিং হোলে সে চোখ রাখল।

চোখ লাগানোর পরেই চমকে দরজা থেকে সরে এল।

তার মুখ অন্ধকার হয়ে গেছে।

একটু সরে তার দাদুকে লক্ষ্য করে বলল, দাদু, আব্বা আম্মা এসছেন’।

বলে সে এগিয়ে দরজা খুলে দিল।

‘গুড মর্নিং আব্বা আম্মা’। খুশী হবার চেষ্টা করে তাদের লক্ষ্য করে বলল সান্তা আনা। তার বাবা আরিসকো পাবলো জবাবে বলল,

‘জি, ধন্যবাদ’।

সান্তা আনার মা ভেতরে ঢুকে জড়িয়ে ধরলো সান্তা আনাকে। বলল, সাত দিনেই মনে হচ্ছে সাত বছর তোকে দেখিনি। সান্তা আনার কপালে চুমু খেল তার মা।

সান্তা আনার আব্বা আম্মা বৃদ্ধ রসওয়েলের দিকে এগোলে সে বলে উঠল, ‘এস আরিসকো, এস বৌমা, তোমরা যে আমাদের বিশাল সারপ্রাইজ দিলে। কি ব্যাপার বলত? একটা খবরও দিলে না?’

আজ ভোরে সিদ্ধান্ত নিতে হলো আপনার কাছে আসতে হবে, জিমেস পাবলোতে প্রথমে টেলিফোন করেছিলাম। শুনলাম আপনি মর্নিং ওয়াকে। আর সান্তা ঘুমিয়ে। তাড়া ছিল, তাই আর যোগাযোগ না করে চলে এলাম'।

'বেশ করেছ, বস'। বলল রসওয়েল।

বসল তারা সামনে, যেখানে সান্তা আনা বসেছিল।

সান্তা আনা এসে দাদুর পাশে একটা সোফায় বসল। পরে সান্তা আনার মা স্বামীর পাশ থেকে উঠে এসে সান্তা আনার পাশে বসল।

রসওয়েল আহমদ মুসার সাথে তার ছেলে ও বৌমা'র পরিচয় করিয়ে দিল। আহমদ মুসাকে দেখিয়ে বলল, ইনি আহমদ আব্দুল্লাহ, আমার মেহমান। এ্যাকসিডেন্ট করেছিল। হাসপাতাল থেকে আমি নিয়ে এসেছি'।

আহমদ মুসা তাদের সাথে সম্ভাষণ বিনিময় করে বলল, 'এ ক'দিন সান্তা আনার কাছে আপনাদের নাম অনেক শুনেছি।

'ধন্যবাদ'। সান্তা আনার আব্বা আম্মা দু'জনেই বলে উঠল।

'হঠাৎ করে এখানে আসার সিদ্ধান্ত কি ব্যাপার বলতো। কেস ফেসের কোন ব্যাপার নাকি?' জিজ্ঞেস করল রসওয়েল।

'জি আব্বা', বলে একটু দ্বিধান্বিত চোখে একবার তাকাল আহমদ মুসার দিকে।

বুঝতে পেরে রসওয়েল বলল, 'আহমদ আব্দুল্লাহ সব কথা জানে। কোন অসুবিধা নেই, বলে ফেল'।

'আজ ভোরে পুলিশ আমাকে টেলিফোন করেছিল। বলেছে, আমাদের তরফ থেকে আর একটা কেস হওয়া উচিত ঘানেম পরিবারের বিরুদ্ধে যে, তারা সান্তা আনাকে কিডন্যাপ করার চেষ্টা করেছে। তাকে সাক্ষী বানাতে চায় এবং জিমি পাবলো হত্যার কেসে যাতে আমরা না লড়ি সেজন্যে আমাদের উপর চাপ সৃষ্টি করতে চায়। জিমি পাবলো কেন সান্তা আনার জীবনও বিপন্ন। এই কথা গত রাতে আমাকে জনি লেভেনের বাবাও বলেছে'। বলল আরিসকো পাবলো, সান্তা আনার আব্বা।

‘তার মানে জনিরাই পুলিশকে দিয়ে ওটা করিয়েছে’। বলল বৃদ্ধ রসওয়েল।

‘আমারও তাই মনে হয় আব্বা’। বলল আরিসকো পাবলো।

‘আমাদের কেস নিয়ে ওদের এত মাথা ব্যথা কেন বলতে পারো?’ রসওয়েল বলল ক্ষুব্ধ কন্ঠে।

‘শ্বেতাংগদের বিরুদ্ধে ওদের ক্রোধটা যেন বেশী’।

‘কিন্তু তুমি যে কেসের কথা বললে, তাতে ঘানেম পরিবারের কতটা ক্ষতি হবে? এই অভিযোগ কোর্টে প্রমান করা যাবে না। ওরা নিশ্চিত নির্দোষ প্রমাণিত হবে। মাঝখানে কি হবে? আমাদের জিমি গেছে, এবার আমাদের সান্তা আনারও মান ইজ্জত সব যাবে। আমরা আমাদের মেয়েকে নিয়ে এসব খেলা খেলতে চাই না। কিন্তু ওরা এটাই চায়’।

‘কিন্তু কেন চাইবে?’ আমরা শ্বেতাংগদের বিরুদ্ধে এক সাথে লড়ছি’।

বৃদ্ধ রসওয়েল তৎক্ষনাৎ কোন জবাব দিল না।

‘মাফ করবেন, বিষয়টা আপনাদের পারিবারিক। আমি কি বলতে পারি কিছু?’

আরিসকো পাবলো এবং মিসেস আরিসকো দু’জনেই তাকাল আহমদ মুসার দিকে। আহমদ মুসার সরল নির্দোষ চেহারা এবং তার কথার আন্তরিকতা তাদের হৃদয় যেন স্পর্শ করল। অপরিচিত হবার পরেও আহমদ মুসাকে যেন অনেক চেনা বলে মনে হল। বলল আরিসকো পাবলো, ‘না,অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, বলুন’।

‘আমে যে কথাটা বলব, তা বলার আগেই আমি একটা প্রশ্নের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সান ঘানেম জনি লেভেনকেও হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল, এ কেস তারা কেন করে না? এটা প্রমাণ করার জন্যে যথেষ্ট সাক্ষী তারা জোগাড় করতে পারবে। শ্বেতাংগ বিদ্বেষই যদি মূল কারণ হবে। এ ধরেণের কেস তারা সাজাতেই বা যায়নি কেন?’

মুহূর্তের জন্যে একটু থেমে আহমদ মুসা অবার শুরু করল, আমি জনাব রসওয়েলের সাথে একমত। তারা আপনাদের, মানে পাবলোদের একটা

শীর্ষস্থানীয় পরিবারকে লাঞ্ছিত ও ছোট করতে চায়। রেড ইন্ডিয়ানদের একটা প্রাচীন মানসিকতা হলো, তারা কোন বংশ, গোত্র, বা পারিবারকে ছোট করতে বা তার উপর প্রতিশোধ নিতে চা্ইলে তাদের মেয়েদের লাঞ্ছিত করতো। জনাব রসওয়েল ঠিকই বলেছেন, ওরাও এটা চায়'।

'কিন্তু কেন?' সেটাইতো আমাদের প্রশ্ন।

'বলছি'।

বলে আহমদ মুসা একটু থামল। একটু ভাবল। যেন গুছিয়ে নিল নিজেকে। তারপর বলতে শুরু করল, 'কিছুদিন আমি কাহোকিয়াতে ছিলাম প্রফেসর আরপাহো আরিকারা'র অতিথি হয়ে। অমি.....'

আহমদ মুসা আগাতে পারল না। তাকে বাধা দিয়ে সান্তা আনার দাদু ও আব্বা দু'জনেই প্রায় একসাথে বলে উঠল, 'আপনি কাহোকিয়া গেছেন? আপনি প্রফেসর আরাপাহো আরিকারাকে চেনেন?'

'হ্যাঁ, কাহোকিয়াতে বেশ কিছুদিন ছিলাম। প্রফেসর আরাপাহো, সান ওয়াকার, প্রত্যেকের সাথেই আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল'।

'সান ওয়াকারকেও চেনেন আপনি?' জিজ্ঞেস করল সান্তা আনা।

'হ্যাঁ বোন, তার দুঃসময়ে আমরা এক সাথে কিছুদিন ছিলাম। তোমরা চেন তাকে?' আহমদ মুসা বলল।

'তাকে চিনব না আমরা? সেতো আমাদের গৌরব'। সান্তা আনা বলল।

বৃদ্ধ রসওয়েল, আরিসকো পাবলো এবং সান্তা আনা সকলের চোখেই বিস্ময়।

কিছু বলতে যাচ্ছিল রসওয়েল। কিন্তু আহমদ মুসাকে কথা শুরু করতে দেখে থেমে গেল।

আহমদ মুসা বলল, 'প্রফেসর আরাপাহোর 'রেড ইন্ডিয়ান ইনিস্টিটিউট অব হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ'-এ আমি বেশ সময় কাটিয়েছি। অনেক কথা, অনেক ইতিহাস শুনেছি আমি প্রফেসর আরাপাহোর কাছে। আমি শুনেছি তাঁর কাছে, জনি ইন্ডিয়ানদের সাথে পাবলো ইন্ডিয়ানদের পুরাতন একটা বিরোধের কথা। এই বিরোধের সাথে ষোড়শ শতকে আমেরিকার এ অঞ্চলের সবচেয়ে আলোচিত

ব্যক্তি ইস্তেভান এর নাম জড়িত। সম্ভবতঃ স্পেনীয়ানদের একজন হয়ে তিনি এসছিলেন আমরিকায়। আবার মুসলিম এই লোকটি তাঁর মেধা, দক্ষতা ও ব্যবহার গুনে রেড ইন্ডিয়ান এবং ইউরোপীয়-এশীয়দের মধ্যে এক সেতুবন্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। রেড ইন্ডিয়ান ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে তিনি এতটাই পরিচিত ছিলেন যে, রেড ইন্ডিয়ানরা তাঁকে তাদেরই একজন মনে করতো। বিশেষ করে টার্কো-মুসলিম কালচারের সাথে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ 'আনাসাজী' ইন্ডিয়ানদের উত্তরসূরী পাবলো ইন্ডিয়ানরা ইস্তেভান'কে তাদের কম্যুনিটির একজন সদস্য হিসেবে গ্রহণ করে। 'ইস্তেভান' বিয়ে করে একজন পাবলো সর্দারের মেয়েকে। পাবলো ইন্ডিয়ানদের সাথে 'ইস্তেভানে'র এই মিশে যাওয়াকে জনি ইন্ডিয়ানরা ঈর্ষার সাথে দেখতে থাকে। এর বড় কারণ ছিল অর্থনৈতিক। ইস্তেভান আমেরিকান ও ইউরোপীয়দের সেতুবন্ধ হিসেবে ছিলেন ব্যবসা বানিজ্যসহ অন্যান্য আর্থিক সংযোগের একটা উৎস। ইস্তেভান পাবলো ইন্ডিয়ানদের একজন সদস্য হয়ে পড়ায় জনি ইন্ডিয়ানরা নিশ্চিত ধরে নিল পাবলোরা আর্থিক সুযোগ সুবিধা একচেটিয়াভাবে পেয়ে যাবে। এই ধারণা থেকেই জনি ইন্ডিয়ানরা ধীরে ধীরে ইস্তেভানের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু ইস্তেভান এটা জানতো না। ইস্তেভানের একটা হবি ছিল ভাল কাজের পক্ষে ও মন্দ কাজের বিপক্ষে প্রচার করে বেড়ানো। তাই সে তার ব্যবসায় বানিজ্যের পাশাপাশি মানুষকে ভাল ও মন্দ বিষয়ে শিক্ষাদান করে বেড়াত। সব ইন্ডিয়ান অঞ্চলে তার যাতায়াত ছিল অবাধ। এভাবেই সে যায় জনি ইন্ডিয়ানদের অঞ্চলে। সুযোগ পেয়ে জনি ইন্ডিয়ানরা তাকে একদিন খুন করে। এ ঘটনা ঘটে ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে। এ নিয়ে জনি ইন্ডিয়ানদের সাথে পাবলো ইন্ডিয়ানদের প্রচন্ড বিরোধ বাধে এবং যুদ্ধও সংঘটিত হয়। যুদ্ধে জনি ইন্ডিয়ান সর্দার ও প্রধান পুরোহিত মারা যায়'।

থামল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা থামতেই বৃদ্ধ রসওয়েল বলল দ্রুতকন্ঠে, 'নামটা কি ইস্তেভান না 'ইস্তেপোনা?' মনে পড়ছে না আমার, তখন স্কুলের ছাত্র। দাদুর সাথে গিয়েছিলাম 'বান্দেলিয়ার মনুমেন্ট' দেখার জন্যে। এই মনুমেন্টের সাথে তখন ছিল একটা যাদুঘর। এই যাদুঘরও দেখেছিলাম। এই যাদুঘরেই আমি

দেখেছিলাম বহু রঙা আবক্ষ একটা ড্রইংচিত্র। দাদু বলেছিলেন, 'এই চিত্র ভালো করে দেখ, ইনি আমাদের একজন পূর্বপরুষ। ইউরোপীয় হলেও একজন সর্দারজাদীকে বিয়ে করে ইন্ডিয়ান হয়ে গিয়েছিলেন। এঁদেরই আমরা উত্তর পুরুষ। দাদু তার নাম বলেছিলেন ইস্তেপোনা। আমি দাদুকে বলেছিলাম, 'আমাদের পূর্ব পুরুষ হলে ছবিটা এখানে কেন?' দাদু বলেছিলেন, ছবিটা আমাদেরই কোন এক পূর্ব পুরুষ আঁকিয়ে নিয়েছিলেন এবং আমাদের বাড়িতেই ছিল। মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ নিয়ে এসেছেন। দেখ ছবির নিচে লেখা আছে আমাদের পরিবার মিউজিয়ামকে ওটা দান করেছে। দেখলাম, সত্যি তাই লেখা আছে'।

থামলো বৃদ্ধ রসওয়েল সম্ভবত দম নেবার জন্য। সে থামতেই আরিসকো পাবলো, বৃদ্ধের ছেলে বলে উঠল, 'আমার দাদু আমাকেও দেখিয়েছিলেন ছবিটা'।

ছবিটা বান্দেলিয়ার যাদুঘরে এখনো কি আছে?' আহমদ মুসা বলল।

'যাদুঘরই এখন সেখানে নেই। যাদুঘরটাকে লস আলামোসে নিয়ে লস আলামোস যাদুঘরের সাথে একিভূত করা হয়েছে। কিন্তু ছবিটা সেখানেও নেই। ছবিটি নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওয়াশিংটনের কেন্দ্রীয় যাদুঘরে ইউরোপ-ইন্ডিয়ান কানেকশনের একটা দলিল হিসেবে'। বলল বৃদ্ধ রসওয়েল। থামল সে।

বৃদ্ধ থেমেই আবার শুরু করল, 'নামের ব্যাপারে বলছিলাম আহমদ আব্দুল্লাহ'।

'জি হ্যাঁ, বলছি', বলে আহমদ মুসা শুরু করল, 'আসলে ইস্তেভান হলো প্রকৃত নামের অপভ্রংশ বা আমেরিকান ভাঙন, আর ইস্তেপোনা হলো তাঁর প্রকৃত নামের একটা অংশ। মূলতঃ তাঁর নাম ছিল ইসমাইল, আর জম্মস্থান ছিল ইস্তেপোনা। ইস্তেপোনা দক্ষিণ স্পেনের একটা শহরের নাম। 'ব্রোলটার' থেকে মাত্র ৩০ মাইল উত্তর পূর্বে জিব্রালটার সাগরের তীরে অবস্থিত শহরটা। মূল নাম এবং জম্মস্থানের নাম মিলিয়ে তার নাম হয়ে দাঁড়ায় 'ইসমাইল ইস্তেপোনা'।

'আপনি বলছেন তিনি আরব মুসলমান?' বলল আরিসকো পাবলো।

'আমি বলেছি প্রফেসর আরাপাহোর কাছে শুনে'।

'একই কথা। তাহলে দেখা যাচ্ছে আমাদের দেহে আরব মুসলিম ও ইন্ডিয়ান দুই রক্তই প্রবাহিত!'

'এটা গৌরবের কথা আরিসকো। আরব মুসলিম পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ বিজেতা জাতি এবং আজ তারা অর্থ বিত্তে দুনিয়ার সেরা'।

'ধন্যবাদ আব্বা'।

সান্তা আনা আলোচনায় অংশ নেয়নি। কিন্তু চোখ দু'টি তার আনন্দে নাচছে।

'কিন্তু জনাব আহমদ আব্দুল্লাহ, জনিদের সাথে পাবলোদের যে যুদ্ধের কথা বললেন, তা আমরা দাদুর কাছে শুনিনি এবং ইন্ডিয়ান সাহিত্যে তা আমরা পড়িনি'।

'কাহিনী আমার শেষ হয়নি জনাব'। আহমদ মুসা বলল।

'বলুন মিঃ আব্দুল্লাহ'।

আহমদ মুসা শুরু করল। 'যুদ্ধে জনিদের সরদার ও প্রধান পুরোহিত মারা যাওয়ায় তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং নতুন যুদ্ধের জন্যে সাহায্য যোগাড়ে তৎপরতা বৃদ্ধি করে। ইন্ডিয়ানদের মধ্যে ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ বাধার আশংকা দেখা দেয়। এই অবস্থায় আমেরিকান ইন্ডিয়ান সর্দাররা বৈঠকে বসে এবং উভয় পক্ষকে আপোশে পৌঁছতে বাধ্য করে। ঠিক হয় যে, ইসমাঈল ইস্তেপোনা একজন বিদেশী। সে জনিদের হাতে খুন হওয়ায় একজন বিদেশী খুন হয়েছে, কোন ইন্ডিয়ান খুন হয়নি। সুতরাং তার পক্ষ থেকে পাবলো ইন্ডিয়ানরা যে যুদ্ধ করেছে সেটা অন্যায় হয়েছে। আর অন্যদিকে ইসমাইল ইস্তেপোনা বিদেশী হলেও পাবলোদের মিত্র ও আত্মীয়, তাই জনি ইন্ডিয়ানরা তাকে খুন করে অন্যায় করেছে। সুতরাং তাদের যুদ্ধটাও অন্যায়ের পক্ষে হয়েছে। তাই তাদেরকে তাদের সর্দার ও প্রধান পুরোহিত নিহত হবার প্রতিশোধের দাবী ছেড়ে দিতে হবে। অতঃপর উভয়পক্ষ এই যুদ্ধের কথা ভূলে যাবে। রেড ইন্ডিয়ান কোন আঞ্চলিক বা জাতীয় সাহিত্যে এই যুদ্ধের কথা লিখা হবে না এবং ছাত্রদের পড়ানো বা জানানোও হবে না। এই সাথে পাবলোদেরকে ইসমাইল ইস্তেপোনা'র কাহিনীও ভূলে যেতে হবে, তার হত্যা নিয়ে প্রচার বা কোন লেখালেখি করা চলবে না। এই সিদ্ধান্ত পাবলো ও জনি ইন্ডিয়ান উভয় পক্ষই মেনে নেয়। কিন্তু প্রফেসর আরাপাহো বলেছিল, জনি ইন্ডিয়ানরা সিদ্ধান্ত মেনে নেয় বটে, কিন্তু তাদের সর্দার ও প্রধান পুরোহিতকে

পাবলোরা যে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে, সে কথা ভূলে যায়নি। বংশ পরম্পরায় এই প্রতিশোধের আগুনকে তারা জিইয়ে রেখেছে'।

'কিন্তু জনিদের এই মনোভাব সম্পর্কে প্রফেসর আরাপাহোর কাছে কি দলিল আছে?' বলল আরিসকো পাবলো।

'কত কি দলিল আছে আমি জানিনা। কিন্তু ইন্ডিয়ানদের মধ্যে একবার প্রতিশোধের আগুন জ্বললে তা যে বংশ পরম্পরায় সংক্রমিত হতে থাকে তার উদাহরণ দিতে গিয়ে প্রফেসর আরাপাহো আমাকে জনিদের একটা গোপন দলিল দেখিয়েছিলেন যাতে অনেক কিছুর মধ্যে এ কথা আমি লেখা দেখেছি, 'আমাদের নিহত সর্দারের ও প্রধান পুরোহিতের আত্মা এখনো শান্তি ও স্বস্তি পায়নি। পাবলোদের আমরা যতুটুকু লাঞ্ছিত ও অপমানিত করতে পারি, ততটুকু আমরা শান্তি পাব ও স্বস্তি লাভ করবে তাঁর আত্মা'। থামল আহমদ মুসা।

বৃদ্ধ রসওয়েল ও আরিসকো বিস্ময়ে নির্বাক। তারা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আহমদ মুসার দিকে। এক অকল্পনীয়, অবিশ্বাস্য কথা যেন তার কাছে থেকে তারা শুনছে। কিন্তু সান্তা আনার মুখ হয়েছে প্রসন্ন। তাতে একটা বিজয়ের আনন্দের ছাপ।

'ধন্যবাদ আহমদ আব্দুল্লাহ'। অনেকক্ষণ পর বলে উঠল আরিসকো পাবলো।

মুহূর্তের জন্যে থেমে আবার সে বলল, 'প্রফেসর আরাপাহোকে আমরা অবিশ্বাস করতে পারি না। তাছাড়া একথা আমার এখন মনে হচ্ছে, নানা রকম কেসে আমাদের জড়িয়ে আমাদের তারা হেনস্তা করতে চায়, তার সাথে আমাদের মেয়েকেও জনসমক্ষে হেয় ও লাঞ্ছিত করতে চায়। নতুন কেসের প্রস্তাব তারই একটা প্রমাণ'।

আরিসকো পাবলো থামতেই রসওয়েল বলল, 'আরেকটা কথা জান না, জনি লেভেনের খারাপ দৃষ্টি আছে সান্তা আনার উপর'।

চমকে উঠল আরিসকো পাবলো। চোখ মুখ তার লাল হয়ে উঠল। কিছু ভাবল সে। কিছুক্ষণ পর সে বলল, 'তাই হবে আব্বা, ওরা কি প্রস্তাব দিয়েছিল জান। সান্তা আনা নিরাপদ নয়। ঘানেম পরিবার মানে শ্বেতাংগরা যে কোন মূল্যে

সান্তা আনাকে হাত করতে চাইবে। ওকে কিছু দিনের জন্য জনিদের এলাকায় পাঠিয়ে দাও। জনি লেভেন তো তার বন্ধুই। তাদের এ প্রস্তাবের পরই আমি সান্তা আনাকে আপনার সাথে জিমেস পাবলোতে পাঠিয়েছিলাম'।

'শয়তানদের সাহস দেখ'। বলল রসওয়েল।

আমরা জিমির মৃত্যুতে একেবারে মুষড়ে পড়েছিলাম। তারই সুযোগ নেবার চেষ্টা করেছিল তারা । ঈশ্বর আমাদের বাঁচিয়েছেন'।

বলে আহমদ মুসার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'আপনাকে ধন্যবাদ, একটা বিপর্যয় থেকে আমাদের পরিবারকে আপনি বাঁচালেন। আপনাকে কথা দিচ্ছি সান ঘানেমের কেসে আমরা আর লড়ব না। সান্তা আনাকে সাক্ষী দিতে আমরা আর বাধা দেব না'।

'ধন্যবাদ বেটা। আরেকটা সত্য তোমার সামনে এসেছে নিশ্চয়, জনিরা আমাদের যতটা শত্রু ঘানেম পরিবার কিন্তু আমাদের ততটা মিত্র হতে পারে। কারণ আমাদের পূর্ব পুরুষ ও ঘানেমদের পুর্ব পূরুষ মিত্র ছিল'।

'তাও পরিষ্কার হয়েছে আব্বা। ঘানেম পরিবার মুসলমান, আর আমাদের বংশ ধারায় মুসলিম ইসমাইল ইস্তেপোনার রক্ত বহমান'। বলল আরিসকো পাবলো।

আরিসকো পাবলো থামতেই বৃদ্ধ রসওয়েল তাকাল সান্তা আনার দিকে কিছু বলার জন্যে। কিন্তু দেখল, সান্তা আনার দু'চোখ থেকে তার দু'গন্ড বেয়ে নিরব অশ্রুর দুই ধারা বইছে। রসওয়েল বলে উঠল, 'আনন্দের সময় আমার বোন কাঁদছে কেন?' মুখে হাসি রসওয়েলের।

'না আমি কাঁদিনি দাদু', বলে দু'হাতে মুখ ঢাকল সান্তা আনা।

আহমদ মুসা বলল, 'দুঃখের আঁধারে উদিত আনন্দের সোনালী সূর্য দুঃখের বরফ গলিয়ে আনন্দ্রাশ্রুতে পরিণত হয়েছে। সান্তা আনার সে বরফ গলতে দিন'।

বলে আহমদ মুসা বৃদ্ধ রসওয়েলের দিকে চেয়ে বলল, 'আপনি আপনাদের পূর্ব পুরুষ ও ঘানেমদের পূর্ব পুরুষের মৈত্রীর কথা বললেন, সেটা কি?'

'হ্যাঁ, সেটাও একটা বড় খবর। কিছুক্ষণ আগে আমি তোমাদের বান্দেলিয়া যাদুঘরের কথা বলেছি, যে যাদুঘরে আমি গিয়েছিলাম দাদুর সাথে। ঐ যাদুঘরে আমাদের পূর্ব পুরষ ইস্তেপোনা ছাড়াও আরেক জনের ড্রইং চিত্র আমি দেখেছিলাম। তাঁর নাম 'আব্দুর রহমান ইবনে ঘানেম নাবালুসি'। দাদু বলেছিলেন, আমাদের পূর্ব পুরুষ ইস্তেপোনার মত তিনিও এসেছিলেন স্পেন থেকে। আর ইস্তেপোনা'র মত তিনিও ছিলেন আরব মুসলমান। দু'জনেই সমসাময়িক এবং তাদের উভয়ের মাঝে গভীর বন্ধুত্ব ছিল। তাদের মধ্যে পার্থক্য এইটুকু ছিল যে, আব্দুর রহমান ছিলেন একজন সমর বিশেষজ্ঞ। মিলিটারী এক্সপার্ট হিসেবে স্পেনীয়রা তাকে এনেছিল।আর ইস্তেপোনা ছিলেন ব্যবসায়ী এবং মিশনারী। আব্দুর রহমান ইবনে ঘানেম নাবালুসির উত্তর পুরুষ হলো আজকের ঘানেম পরিবার'।

কথা শেষ করেই রসওয়েল ছেলে আরিসকো পাবলোকে সান ঘানেমের আব্বা ইহুদী গোয়েন্দাদের হাতে বন্দী হওয়া, তাকে উদ্ধার করতে আহমদ আব্দুল্লাহর নিউ মেক্সিকোতে আসা এবং পরবর্তী সকল ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করে বলল, 'আহমদ আব্দুল্লাহ এখন ভীষণ বিপদগ্রস্ত। তাকে ধরার জন্যে পুলিশ সর্বত্র ওঁৎ পেতে আছে'।

আরিসকো পাবলো বিস্মিত দু'চোখ মেলে আহমদ মুসার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, 'যেসব ঘটনা শুনলাম, আপনার সেই কাহোকিয়াতে যাওয়া এবং প্রফেসর আরাপাহো ও সান ওয়াকারের সাথে পরিচয় হওয়া প্রমাণ করছে আপনার সম্পর্কে আরো অনেক কথা আমরা জানি না। বলুন তো, সান ওয়াকারের বন্দী হওয়া ও তার উদ্ধার পাওয়া সম্পর্কে আপনি কি জানেন?'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'অনেক ঘটনাই আছে। সান ওয়াকারকে বন্দী করেছিল হোয়াইট ঈগলরা, তাকে আমি উদ্ধার করেছিলাম'।

'কিন্তু তাকে আপনি উদ্ধার করতে গিয়েছিলেন কেন?' বলল আরিসকো পাবলো।

‘আমি উদ্ধার করতে যাইনি। আমি হোয়াইট ঈগলের হাতে বন্দী হয়েছিলাম, আমি নিজেকে মুক্ত করার সময় সান ওয়াকারকেও উদ্ধার করে নিয়ে আসি’।

‘কিন্তু আপনার আরও পরিচয় সেটা কি?’ আরিসকো পাবলোর কন্ঠে কিছুটা কঠোরতা প্রকাশ পেল।

বিস্মিত হলো আহমদ মুসা। তার সতর্ক নার্ভ যেন এক সাথেই ঝংকার দিয়ে উঠল।

হাসল তবু আহমদ মুসা। বলল, ‘কি করে বুঝলেন যে আরও পরিচয় আছে?’

আহমদ মুসার কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই আরিসকো পাবলোর ডান হাত পকেট থেকে একটা রিভলবার নিয়ে ছুটে এল আহমদ মুসার দিকে। রিভলবারটা তাক হলো আহমদ মুসার ঠিক বুক বরাবর।

আহমদ মুসার নার্ভগুলো আবার ঝংকার দিয়ে উঠল। কিন্তু চমকে উঠল না। তার নার্ভ আগেই সতর্ক হয়ে উঠেছিল।

আহমদ মুসার বুক বরাবর রিভলবার ধরে আরিসকো পাবলো বলল, ‘আমরা জানি না আপনার আরও কি পরিচয় আছে, কিন্তু সে পরিচয় জানার জন্যেই আমরা পাগল হয়ে উঠেছি’।

আহমদ মুসার ঠোঁটে মিষ্টি এক টুকরো হাসি। বলল, ‘আমরা’ বলতে কাদেরকে বুঝাচ্ছেন?’

‘এফ.বি.আই-কে। আমি এফ.বি. আই এর মিডল গ্রাউন্ডের নিউ মেক্সিকোর সিটি ডিরেক্টর’। বলল আরিসকো পাবলো।

‘আপনি হাসালেন মিঃ আরিসকো। তাই যদি হতেন, এটা মিঃ রসওয়েল জানতেন না?’ আহমদ মুসা বলল হাসতে হাসতেই। যেন আহমদ মুসা বিষয়টাকে রসিকতা হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

‘আপনি আমার বন্দী আহমদ আব্দুল্লাহ। আমার পরিচয় সম্পর্কে সন্দেহ থাকলে দেখুন’।

বলে আরিসকো পাবলো বাম হাত দিয়ে পকেট থেকে আই.ডি. কার্ড বের করে কার্ডটি আহমদ মুসাকে দেখাবার জন্যে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। তার কার্ড ও রিভলবার ধরা দুই হাতই সমান্তরালভাবে মাঝখানের টিপয়ের উপর চলে এল।

আহমদ মুসাও কার্ড হাতে নিয়ে দেখার জন্যে সামনে একটু ঝুঁকে তার ডান হাত বাড়াল কার্ডের দিকে।

কিন্তু আহমদ মুসার হাত কার্ড না ধরে চোখের পলকে ছুটে গেল আরিসকো পাবলোর রিভলবার ধরা হাতের দিকে।

আহমদ মুসার ডান হাত আরিসকো পাবলোর কব্জি ধরে মোচড় দিল এবং তার বাম হাত আরিসকো পাবলোর হাত থেকে রিভলবার তুলে নিয়ে তাক করল আরিসকো পাবলোকে।

আরিসকো পাবলো কিছু বুঝার আগেই ভোজবাজির মত ঘটে গেল ঘটনাটা। চোখ দুটো তার বিষ্ময়ে বিষ্ফারিত। নিজেকে সামলে নেবার পর সে বলল, 'আহমদ আব্দুল্লাহ আপনার ক্ষিপ্রতার আমি প্রশংসা করছি। কিন্তু আপনি বাঁচতে পারবেন না। ধরা আপনাকে পড়তেই হবে'।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়েছে।

কয়েক ধাপ এগিয়ে সে আরিসকো পাবলোর পেছনে গিয়ে দাঁড়াল।

বৃদ্ধ রসওয়েল সান্তা আনা ও মিসেস আরিসকো পাথরের মত বসে আছে। বিষ্ময় ও আকষ্মিকতায় তারা নড়াচড়া এমনকি কথা বলার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছে। রসওয়েল অবাক হয়েছে তার ছেলে কবে এফ.বি.আই-তে যোগ দিল তা ভেবে। আর সান্তা আনা বিশ্বাসই করতে পারছে না তার আব্বা এফ.বি.আই-এর লোক।

আহমদ মুসাকে আরিসকো পাবলো বন্দী করার কথা শুনে আতংকিত হয়ে পড়েছিল রসওয়েল ও সান্তা আনা দু'জনেই। তাই যখন আহমদ মুসা রিভলবার কেড়ে নিল আরিসকো পাবলোর কাছ থেকে, তখন স্বস্তি লাভ করল তারা।

আরিসকো পাবলোর পেছনে দাঁড়িয়ে আহমদ মুসা বলল, 'মিঃ আরিসকো আপনার টাইটা কি আমাকে দেবেন। না আমিই খুলে নেব'।

আরিসকো টাইটা খুলে পেছনে ফেলে দিল। আহমদ মুসা তুলে নিল টাইটা। তারপর বলল, 'মিঃ আরিসকো আপনার হাত দু'টি পেছনে দিন। দেরী করে লাভ হবে না, আপনি সহযোগিতা না করলেও আমি আপনাকে বাঁধব, আপনি তা জানেন'।

আরিসকো হাত দু'টি পেছন দিকে দিল।

আহমদ মুসা রিভলবারের নল আরিসকোর মাথায় ঠেকিয়ে চাপ দিয়ে তার বসে থাকা দেহকে উঁচু করল। তারপর দাঁত দিয়ে রিভলবার ধরে টাই দিয়ে আরিসকোর দুই হাত পিছমোড়া করে বাঁধল।

পরে বলল, 'দুঃখিত মিঃ আরিসকো এবার আপনাকে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে হবে কার্পেটের উপর। জানি আপনার জন্যে এটা শোভনীয় মনে হচ্ছে না। কিন্তু আমার নিরাপত্তার জন্যে আপনার দু'টি পা না বেঁধে উপায় নেই। আপনি স্বেচ্ছায় রাজী না হলে আমাকে বল প্রয়োগ করতে হবে। সম্মানিত মুরুব্বী রসওয়েল ও মিসেস আরিসকো এবং বোন সান্তা আনার সামনে এ ধরনের সীন সৃষ্টি হোক তা আপনি আমি কেউই চাই না'।

একটু দ্বিধা করল আরিসকো তারপর হুকুম তামিল করল সে।

আহমদ মুসা নিজের টাই খুলে আরিসকোর পায়ে পায়ে বেড় লাগিয়ে টাই দিয়ে এমন করে বাঁধল যে কেউ খুলে না দিলে তার পক্ষে উঠে বসাও অসম্ভব।

বাঁধার পর উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে আহমদ মুসা বলল, 'দুঃখিত মিঃ আরিসকো, আমি এই আচরণ করলাম এফ.বি.আই অফিসারের সাথে, পরম সম্মানিত মিঃ রসওয়েলের সন্তান এবং সান্তা আনার আব্বার সাথে নয়'।

উঠে দাঁড়িয়ে আহমদ মুসা রসওয়েলকে লক্ষ্য করে বলল, 'জনাব আমি চলে যাচ্ছি। আমি চলে যাবার দশ মিনিটের মধ্যে একে ছেড়ে দেয়াটা আমার জন্যে নিরাপদ নয়'।

আহমদ মুসা থামতেই রসওয়েল বলে উঠল, 'তুমি তো সুস্থ হওনি। আর বাইরে ওঁৎ পেতে আছে পুলিশ!'

হাসল আহমদ মুসা, বলল, 'এমন শরীর নিয়ে চলাফেরার আমার অভ্যাস আছে। আর বিপদ তো সব সময় আমাকে ঘিরেই থাকে'।

কথা শেষ করে একটু থেমেই আবার বলল, 'আপনাদের যত্ন ও ভালোবাসার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ, চিরদিন আমার মনে থাকবে আপনাদের কথা'।

বলে আহমদ মুসা সান্তা আনার দিকে তাকাতেই সান্তা আনা বলে উঠল, 'আপনাকে থাকতে বলার কোন অধিকার আমাদের নেই, কোন সুযোগও এখন আমাদের নেই। আপনি একটু দাঁড়ান'।

শেষ কথা মুখে থাকতেই দৌড় দিয়েছে সান্তা আনা। তার দু'চোখে অশ্রু।

মুহূর্ত কয়েক পরে ফিরে এল একটি ব্যাগে করে আহমদ মুসার কাপড় চোপড় এবং একটি প্যাকেটে তার ঔষধ পত্র নিয়ে।

প্রেসক্রিপশন ও ঔষুধের প্যাকেট আহমদ মুসার দিকে তুলে ধরে বলল, 'ডাক্তার বলেছেন ঔষধগুলো কোর্স পুরো করে আপনাকে খেতে হবে। দয়া করে এ ব্যাপারে আপনি অবহেলা করবেন না'। ভারি কন্ঠস্বর সান্তা আনার।

আহমদ মুসার ঠোঁটে হাসি। কিন্তু দু'চোখের কোণ তার ভিজে উঠেছে অশ্রুতে। অনাত্মীয় এক বালিকার সহৃদয়তায়। বলল নরম কন্ঠে, 'বোন বাইরে বেরিয়ে কি ঔষধ খাওয়ার সময় সুযোগ আমি পাব? পাব না। তবু আমি নিচ্ছি। বোনের দান আমি ফিরিয়ে দেব না'।

'কিন্তু ঔষধ না খেলে আপনি ভাল হবেন কি করে? ঔষদের কোর্স পূরণ না করলে তো আপনার ক্ষতি হবে'। কান্না বিজড়িত কন্ঠ সান্তা আনার।

'যে ক্ষতি ঠেকানো আমার সামর্থ্যের বাইরে, সে ক্ষতি নিয়ে আমি ভাবি না। আমার আল্লাহর ভাবনার বিষয় সেটা'। বলে আহমদ মুসা কাপড়ের ব্যাগটা কাঁধে ঝুলাল।

তারপর বলল, 'এ কাপড়গুলো তোমাদের দান। তোমাদের অনেক ধন্যবাদ এজন্যে। অসি বোন'।

আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল।

'আমি আমার আব্বার পক্ষ থেকে আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি'।

কান্নায় জড়িয়ে গেল সান্তা আনার কন্ঠ। তার দু'গন্ড বেয়ে গড়াচ্ছিল অশ্রু।

আহমদ মুসা হাসার চেষ্টা করে বলল, 'তুমি অযথা কষ্ট পাচ্ছ বোন। তিনি যা করেছেন, তাঁর জায়গায় আমি হলে আমিও সেটাই করতাম। তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন না করলে অন্যায় হতো। এমন পিতার জন্যে তোমার গর্ব করা উচিত বোন'।

বলেই আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়াল। কিন্তু পা বাড়াতে গিয়েই মুখ ঘুরাল সান্তা আনার দিকে। বলল, তুমি কি এদিকে একটু আসবে বোন?'

আহমদ মুসা হাঁটা শুরু করল।

পিছে পিছে এল সান্তা আনা।

ড্রইং রুম-এর দরজার আড়ালে এসে দাঁড়াল আহমদ মুসা। সান্তা আনাও।

'সান্তা আনা যে জন্যে তোমাকে ডেকেছি। আমি সান ঘানেমের আব্বার খোঁজে বেরুচ্ছি, কিন্তু তার আগে সান ঘানেমদের বাসায় যাবো। ঠিকানা দিতে পার?'

আহমদ মুসা একথাগুলো বলছিল আর বাম জুতার গোড়ালীর ভেতর থেকে একটা ক্ষুদ্র প্যাকেট বের করছিল।

'ঠিকানাটা খুব সহজ। লিখে দেবো, না মুখে বললেই হবে?' বলল সান্তা আনা।

আহমদ মুসা প্যাকেটটি খুলে বের করছিল একটা শ্বেতাংগ স্কিন মাস্ক। বলল, 'বল, আমার মনে থাকবে'।

ঠিকানাটা বলল সান্তা আনা।

আহমদ মুসা ঠিকানাটা মুখে আওড়াতে আওড়াতে কাঁচের দরজায় নিজের মুখ দেখে তাতে পরিয়ে দিল স্কিন মাস্কটি। মুহূর্তেই এক শ্বেতাংগ যুবকে পরিণত হলো আহদম মুসা।

'বাঃ, একদম নিখুঁত হয়েছে। এখন দাদু দেখলেও আপনাকে চিনতে পারবে না'। এতক্ষণে এক টুকরো ম্লান হাসি ফুটে উঠেছে সান্তা আনার ঠোঁটে।

ব্যাগটা আবার কাঁধে তুলে নিয়ে আহমদ মুসা যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে বলল, 'তোমার আব্বাকে বলো তার রিভলবারটা আমি নিয়ে গেলাম। সুযোগ পেলে তাকে ফেরত দেব'।

আহমদ মুসা থামতেই সান্তা আনা বলল, 'ভাইয়া, সান ঘানেম আমাকে ভূল বুঝেছে। তাঁর পরিবারকে কি আমার কথা জানাবেন?' কান্নায় ভারি হওয়া কন্ঠ সান্তা আনার।

'তুমি না বললেও আমি বলতাম বোন। তোমার কথা এবং সব কথাই আমি তাঁদের জানাব। আর তুমিও তো এখন সান ঘানেমের সাথে দেখা করতে পারবে। দুই পরিবারের মধ্যে বৈরিতা তো মিটে গেল'। আহমদ মুসা বলল।

'এই কৃতিত্ব আপনার ভাইয়া। আমাদের পরিবারকে আপনি নতুন জীবন দিয়েছেন'।

'আমি নই, আমার মালিক যিনি সেই আল্লাহর কৃতিত্ব'।

আহমদ মুসা যাবার জন্যে পা বাড়াল।

'আবার কবে দেখা হবে ভাইয়া?' অসহায়ের মত এক কন্ঠ যেন সান্তা আনার।

'ভবিষ্যত সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না বোন'। না তাকিয়ে না দাঁড়িয়েই বলল আহমদ মুসা।

'একটা কথা জেনে রাখবেন, একজন বোনের দু'টি চোখ চিরদিন আপনার খোঁজ করবে'। আবেগরুদ্ধ কন্ঠ সান্তা আনার।

থমকে দাঁড়াল আহমদ মুসা। কিন্তু পেছনে তাকাল না। বলল, 'নতুন কষ্ট আমার যোগ করলে বোন!' আহমদ মুসার কন্ঠও ভারি।

বলেই দ্রুত পা বাড়াল আহমদ মুসা সামনে।

# ৫

কারসেন ঘানেম নাবালুসির বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল আহমদ মুসা।

ঘানেম পরিবারকে অনেক সময় দিতে হয়েছে। খেতেও হয়েছে ওদের অনুরোধে।

হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, বেলা ছয়টা বাজে। তিন ঘন্টা সময় খরচ হয়েছে। আহমদ মুসা সবুজ পাহাড়ে যেতে চায়। রাতে কোন গাড়ি ওদিকে যেতে চায় না। অথচ আহমদ মুসার ইচ্ছা, আজই সে ওখানে যাবে। ওখান থেকেই কারসেন ঘানেমকে ওরা কোথায় নিয়েছে তার ঠিকানা তাকে বের করতে হবে। ওখানে নিশ্চয় কোন ক্লু পাওয়া যাবে কিংবা ওখানকার কেউ বা অনেকেই জানতে পারে এ অঞ্চলে ইহুদী ঘাঁটি আর কোথায় আছে। জেনারেল শ্যারন, গোল্ড ওয়াটার এবং কলিন্সরা কেউই অবশ্য ওখানে নেই। আহমদ মুসা ওখান থেকে পালানোর পর ওখানে তারা থাকতে পারে না। এবং ওই ঘাঁটির গুরুত্বও তাদের কাছে অবশ্যই কমে গেছে। সুতরাং ওখানকার পাহারায় আগের সেই নিশ্ছিদ্রতা থাকবে বলে মনে হয় না। এটা আহমদ মুসার জন্যে সুযোগ। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে তাকে কারসেনকে উদ্ধারের একটা ক্লু বের করতেই হবে। ডাঃ মার্গারেট ও লায়লা জেনিফারের কথা তার মনে পড়ল। ওরা বন্দী। ওদের উদ্ধারেরও কোন ব্যবস্থা সে করতে পারেনি। কিন্তু ভাবল আহমদ মুসা, কান টানলেই মাথা আসবে। কারসেন ও ডাঃ মার্গারেটদের উদ্ধার হয়তো একটা ঘটনাই হয়ে দাঁড়াতে পারে।

গাড়ি বারান্দার দিকে এগোলো আহমদ মুসা।

বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল ঘানেম পরিবারের সদস্যরা। ওদের মুখে যদিও বিষন্নতার ছাপ, তবু উদ্বেগ তাদের কেটে গেছে। পাবলো পরিবারের পরিবর্তনের কথা এবং সান ঘানেমকে সহযোগিতার কথা শুনে তারা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছে। লাখো কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে তারা আহমদ আব্দুল্লাহ রূপী আহমদ মুসাকে। আহমদ মুসা তার ঘটনার যতটুকু বলেছে,

তাতেই তারা অনেকখানি আশ্বস্ত হয়েছে, কারসেনকে উদ্ধারের ব্যাপারে তার উপর আস্থা রাখা যায়।

গাড়িতে আহমদ মুসা। গাড়িটা সেই ড্রাইভার বিলের।

আহমদ মুসা সান্তা আনাদের বাড়ি থেকে বেরোবার পর সোজা ছুটে গিয়েছিল তার পরিচিত সেই ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে। তার মন চাইছিল বিল ড্রাইভারকে। তাকে পেলে খুবই ভালো হতো।

ভাগ্য ভালো আহমদ মুসার। বিলকে সে পেয়েছিল। কিন্তু বিল তাকে চেনেনি।

সান্তাফে'র কথা বলে গাড়িতে উঠে বসে আহমদ মুসা।

গাড়ি চলতে শুরু করলে আহমদ মুসা বলেছিল, 'বিল আমরা কয়টায় সান্তাফে পৌঁছাতে পারবো?'

বিস্মিত চোখে বিল মাথা ঘুরিয়ে তাকায় আহমদ মুসার দিকে। বলে, 'স্যার আমার নাম জানলেন কি করে?'

'তুমি আমাকে ভূলে গেছ, আমি তোমাকে ভূলিনি বিল। তুমি আমাকে সবুজ পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিলে মনে নেই?'

বিব্রতকর অবস্থা ফুটে ওঠে বিলের চোখে মুখে। বলে, 'স্যার আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আপনার কথার ধরন ও স্বর শুনে মনে হচ্ছে আমি আপনাকে চিনি। আমি যাকে সবুজ পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিলাম, তার মতই আপনার কন্ঠ। কিন্তু সে তো শ্বেতাংগ ছিল না'।

'তুমি জান, বিপদে পড়লে চেহারা অনেক সময় পরিবর্তন করতে হয়?' বলেছিল আহমদ মুসা।

বিব্রতভাব কাটেনি ড্রাইভার বিলের। সে একবার বোকার মত তাকাল আহমদ মুসার দিকে। কিছুই বোঝেনি সে।

আহমদ মুসা এক হাতের গ্লাভস্ খুলে হাতটা বিলের সামনে তুলে ধরল। বলল, 'দেখ আমি কি শ্বেতাংগ?'

হাসি ফুটে উঠল বিলের ঠোঁটে। বলল, 'এতক্ষণে বুঝেছি স্যার, মুখে আপনি মুখোশ পরেছেন। কিন্তু একেবারে নিখুঁত হয়েছে স্যার'।

তারপর একটু থেমেই বলল, ‘স্যার আপনি কবে কিভাবে ছাড়া পেলেন? আমি তো ধরে নিয়েছিলাম ওরা আপনাকে নিশ্চয়ই মেরে ফেলেছে। আমি পুলিশকে জানিয়েছি ব্যাপারটা’।

‘কি জানিয়েছ?’

‘আপনাকে কিডন্যাপের কথা। কিন্তু পুলিশ আমার কথা বিশ্বাস করেছে কিনা জানি না। কিন্তু এফ.বি.আই বিষয়টায় খুবই গুরুত্ব দিয়েছে। গত কয়েকদিন আমার কাছে অনেক বার তারা এসেছে’।

‘কেন?’

‘আপনার পুরো বিবরণ ও আপনার সাথে আমার যা যা কথা হয়েছে তা জানার জন্যে’।

‘ওরা কি করবে? উদ্ধার করতে যেতো নাকি?’

‘না স্যার, ওরা নাকি একজন এশিয়ানকে খুঁজছে। তার সাথে আপনার কোন মিল আছে কিনা তা নিশ্চিত হতে চেয়েছে তারা’।

‘অবশেষে তারা কি চিন্তা করেছে?’

‘তা জানি না। তবে মনে হয়েছে তারা আপনাকে চায়’।

‘কেন তোমার এটা মনে হলো?’

‘তাদের আমি মন্তব্য করতে শুনেছি, দু’জন এক ব্যক্তি যদি তারা নাও হয়, তাহলেও ক্ষতি নেই, একজনকে পাওয়া গেলে অন্যজনকেও পাওয়া যাবে’। আরও একটা ব্যাপার, আমাদের ট্যাক্সি ড্রাইভারদেরকে ক’দিন আগে পুলিশ অফিস থেকে বলে দেয়া হয়েছে, যে কোন বিদেশী, বিশেষ করে কোন এশিয়ানকে পেলেই যেন আমরা তাদের খবর দেই’।

‘খবর দেবে?’

‘কি যে বলেন স্যার। আপনি খুব ভাল মানুষ। অন্য কেউ হলে সেদিন আমি তার কাছ থেকে ভাড়া পেতাম না। আপনি একবার বিপদে পড়েছিলেন, আর আপনাকে বিপদে ফেলতে চাইনা। কিন্তু স্যার ওরা কারা, সেদিন আপনাকে ঐভাবে ধরে নিয়ে গেল?’

‘একজন লোককে কিডন্যাপ করে ওরা বন্দী করে রেখেছে। তাকেই আমি উদ্ধার করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আমার যাওয়ার খবর ওরা আগেই পেয়ে যায় এবং আমাকে ঐভাবে বন্দী করে’।

‘সে কি উদ্ধার হয়েছে?

‘না’।

‘সে কি আপনার কেউ?’

‘বন্ধু লোক’।

‘পুলিশকে বললেই তো পারেন’।

‘পুলিশ জানে, কিন্তু কিছুই হচ্ছে না’।

‘ঠিক বলেছেন স্যার, ইদানিং পুলিশ অনেক বিষয়ে যেন গরজ করতে চায় না’।

এইভাবে গল্পে গল্পেই তারা সান্তাফে’র উপকন্ঠে কারসেন নাবালুসির বাড়িতে এসে পৌঁছেছিল।

আহমদ মুসা গাড়িতে বসে গাড়ি বারান্দায় নেমে আসা কারসেনের মা, স্ত্রী ও মেয়ের উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে বলল, বিল এবার চল’।

গাড়ি স্টার্ট দিল বিল। কিন্তু কারসেন ঘানেমদের গেট পার হয়েই বিল গাড়ি দাঁড় করাল।

‘দাঁড়ালে কেন? বলেছি না যে, সবুজ পাহাড়ে যাব এখান থেকে বেরিয়েই’। বলল আহমদ মুসা।

ড্রাইভার বিল মাথা ঘুরিয়ে পেছনে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘স্যার একটা ব্যাপার ঘটে গেছে’। বিলের কন্ঠ শুকনো।

‘কি ব্যাপার বিল, মনে হয় তুমি ভয় পেয়ে গেছ?’ বলল আহমদ মুসা।

‘জি স্যার। আমি গাড়ি নিয়ে এখানে আসার সময় বাড়ির পশ্চিম কোণে রাস্তার ওপাশে একটা গাড়ি দাঁড়ানো দেখেছিলাম, সেটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে’।

‘দাঁড়িয়ে আছে তো কি হয়েছে। রাস্তার পাশে এ ধরনের গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে না?’

'গাড়ি রেখে আমি বাইরে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে দেখলাম গাড়ি থেকে তিনজনের মধ্যে একজন বেরিয়ে এই বাড়ির উদ্দেশ্যে আসতে লাগল। আমিও এলাম। আমাকে ওরা পথচারী মনে করেছিল, সন্দেহ করে নি। আমি দেখলাম, লোকটি গেট অতিক্রম করে আরও সামনে এগিয়ে ড্রইংরুম বরাবর প্রাচীরের নিচে দাঁড়াল। ড্রইংরুম ও সেই প্রাচীরের মাঝখানে ছিল বাগান। লোকটি চারদিক দেখে হঠাৎ প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল। আমি দূরে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। অমি ওদের নজরে পড়ে যাব এই ভয়ে গেট দিয়ে প্রবেশ করতে পারছিলাম না। প্রায় ২০ মিনিট পর লোকটি আবার প্রাচীর ডিঙিয়ে বেরিয়ে এল এবং দ্রুত ফিরে গেল গাড়িতে। এ সময় রাস্তায় কয়েকটা ট্রাক এল। আমি সেই ট্রাকের আড়াল নিয়ে গেট দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করি'।

থামল ড্রাইভার বিল।

আহমদ মুসার ভ্রু কুঞ্চিত হলো। বলল, 'ধন্যবাদ বিল। লোকগুলো কি শ্বেতাংগ?'

'শ্বেতাংগ'।

ওদের তিনজনের চুলের ছাঁট ছোট ও এক রকমের?'

'এক ঝলক দেখেছি, খেয়াল করিনি'।

'যাকে দেখছো তার?'

'তার চুল লম্বা'।

'খুশীর খবর বিল, ওরা পুলিশের লোক নয়। যারা আমাকে সবুজ পাহাড়ের ওখানে বন্দী করেছিল, এরা তারাই'।

'কিন্তু এখানে কেন?'

'আমার খোঁজে'।

'কেমন করে ওরা জানে আপনি এখানে আসবেন?'

'এই বাড়ির মালিক কারসেন ঘানেমকে ওরা বন্দী করে রেখেছে। আর আমি এসেছি কারসেন ঘানেমকে উদ্ধার করতে। সুতরাং আমি কারসেন ঘানেমের বাড়িতে আসব, এ ব্যাপারে তারা নিশ্চিত ছিল'।

'এটা তো খারাপ খবর, খুশীর খবর বললেন যে?'

‘আমিও তো ওদের খুঁজছি। পেয়ে গেলাম, এটা খুশীর খবর নয়?’

‘কিন্তু এখন তো বিপদ স্যার। আমাদের অপেক্ষায় ওরা বসে আছে’।

‘তাহলে চল যাই, দেখি ওরা কি বলে’।

‘আপনি মনে হয় ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। গেলে ওরা গুলি করবে, নয়তো আগের মতই আপনাকে বন্দী করবে। আমার মনে হচ্ছে, ওদের একজন যে ভেতরে গিয়েছিল সেটা কে এসেছে তা নিশ্চিত হবার জন্যে। তারা নিশ্চয়ই আপনার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছে’।

‘কিন্তু আমাকে চিনবে কি করে?’

ড্রাইভার তৎক্ষনাৎ উত্তর দিল না। কিন্তু একটু পরেই বলল, ‘স্যার ওদের একজন তো ভেতরে এসেছিল, নিশ্চয় আপনার কথা শুনে আপনার পরিচয় তারা জেনেছে’।

ঠিক বলেছ বিল। তোমার বুদ্ধি আছে। বৈঠক খানার পূর্ব ও দক্ষিণ দু’দিকের জানালই খোলা ছিল। আমাদের কথাবার্তা নিশ্চয় ওদের লোক শুনেছে’।

‘আমি তো সে কথাই বলছি স্যার। সব জেনে ওরা আঁট-ঘাঁট বেঁধে বসে আছে’।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘কিন্তু আমাদের তো যেতেই হবে, এখানে বসে থাকা তো যাবে না’।

‘তাহলে বলুন স্যার, কি করব এখন?’

‘তুমি রাস্তায় নেমে দ্রুত গাড়ি ছাড়বে। এমন ভাব প্রকাশ করবে যে, তুমি ওদের পাশ দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যেতে চাইছ। ওরা এটা ভেবে আমাদের ফলো করার প্রস্তুতি নেবে। কিন্তু তোমার গাড়ি আকস্মিকভাবে ওদের গাড়ির গা ঘেঁষে দাঁড়াবে।

‘তারপর?’

‘তারপর তুমি সিটের উপর শুয়ে পড়বে। যা করার আমিই করব’।

‘ঠিক আছে স্যার’। বলে গাড়িতে স্টার্ট দিল বিল। ছুটে চলল গাড়ি।

আহমদ মুসা রিভলবার বের করে হাতে নিল। বসেছে সে পেছনের সিটে, বাম দরজার গা ঘেঁষে। জানালা খোলা।

বিল এক্সপার্ট ড্রাইভার।

শত্রু গাড়িটার কাছে পৌঁছা পর্যন্ত গাড়ির গতি একটুও না কমিয়ে নিজের গাড়িকে শত্রুর গাড়ির সমান্তরালে এনে হার্ড ব্রেক কষল।

শত্রু গাড়ির পেছনের সিটে দু'জন বসে ছিল। আহমদ মুসা এসেছে ওদের ঠিক লাইনে।

গাড়ি ব্রেক কষার পর গাড়ির ঝাঁকুনি শেষ হবার আগেই আহমদ মুসার রিভলবার দু'বার গুলি বর্ষণ করল।

পাশের গাড়ির পেছনের সিটের দু'জন লোক মাথায় গুলি খেয়ে নিঃশব্দে ঢলে পড়ল সিটের উপর।

গুলি করেই আহমদ মুসা গাড়ি থেকে নেমে ছুটে গিয়ে ও গাড়ির দরজা এক ঝটকায় খুলে ড্রাইভিং সিটের পাশে বসল। তার রিভলবার ড্রাইভিং সিটে বসা লোকটির দিকে তাক করা। বলল সে লোকটিকে, 'বল, জেনারেল শ্যারন ও গোল্ড ওয়াটার কোথায়?'

লোকটির হতভম্ভ ভাব তখনো কাটেনি।

বিস্ফারিত নেত্রে তাকাল সে আহমদ মুসার দিকে। কোন উত্তর দিল না।

আহমদ মুসা তাকে লক্ষ্য করে গুলি করল। গুলিটা লোকটার কানের একটা অংশ ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেল।

লোকটি কঁকিয়ে উঠে একটা হাত দিয়ে কান চেপে ধরল।

'দশ সেকেন্ডের মধ্যে যদি কথা না বল তাহলে এবারের গুলি তোমার মাথা গুঁড়ো করে দেবে'।

বলে আহমদ মুসা রিভলবার তাক করল তার মাথা বরাবর।

লোকটির কন্ঠ চিৎকার করে উঠল, 'এই সামনেই এক্সপ্রেস ওয়ের ফোরটি ফোর্থ লেনের প্রায় মুখেই চার নাম্বার বাড়িতে ওরা আছে'।

'আর কে থাকে সেখানে?'

'আরও আছে চারজন প্রহরী'।

ক’ তলা বাড়ি?

দোতালা।

‘জেনারেল শ্যারন ও গোল্ড ওয়াটার এবং প্রহরী ছাড়া আর কেউ নেই সেখানে?’

‘আমি জানি না স্যার। বাড়ির ভেতরে কোনদিন আমি ঢুকিনি’।

আহমদ মুসা চারদিকে তাকাল।

সামনেই কিছু দূরে রাস্তার দক্ষিণ পাশে একটা টিলা এবং সংকীর্ণ উপত্যকা দেখতে পেল।

আহমদ মুসা ড্রাইভিং সিটের লোকটিকে ঐ উপত্যকার দিকে যাবার নির্দেশ দিল।

গাড়ি চলতে লাগল।

আহমদ মুসা বিলকে পেছনে পেছনে আসার নির্দেশ দিল।

টিলার গোড়ায় এসে পৌঁছল তাদের গাড়ি।

‘তুমি যে ঠিকানা দিলে সেখানে ওরা কত দিন আছে?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা লোকটিকে।

‘দশ বার দিন’।

‘তার আগে কোথায় ছিল?’

‘সবুজ পাহাড়ে’।

‘তুমি কোথায় থাক?’

‘ঐ ঠিকানার নিচের তলায়। শুধু রাতে থকি। দিনের ডিউটি মিঃ কারসেনের বাড়ি পাহারা দেয়া’।

‘কি জন্যে পাহারা দাও?’

‘একজন এশিয়ানকে ধরার জন্যে’।

‘তোমার বাড়ি কোথায়?’

‘ফ্লোরিডায়’।

‘নিউ মেক্সিকোতে কিভাবে?’

‘ওদের সাথে এসেছি’।

ফ্লোরিডায় তুমি কোথায় থাক?'

'ওদের সাথে'।

'ওরা কোথায় থাকে?'

'বীচ ইন্টারন্যাশনাল হোটেলে'।

'কেন ওদের বাড়ি বা ঘাঁটি নেই ওখানে?'

'আছে,কিন্তু আমি জানি না'।

আহমদ মুসার রিভলবারের নল উপরে উঠল।

আহমদ মুসার কঠিন মুখের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল লোকটি, 'ফ্লোরিডার মিয়ামীতে একটা সিনাগগ আছে। শহরের সবচেয়ে প্রাচীন গির্জা সেটা। তার সাথে রয়েছে একটা প্যালেস সদৃশ বাড়ি। এই পুরানো প্যালেস ও সিনাগগ নিয়েই ফ্লোরিডার মিয়ামীতে ওদের হেড কোয়ার্টার। সেখানে কোন প্রয়োজন হয়নি, তাই যাওয়াও হয়নি সেখানে। শুনেছি এটা তাদের দ্বিতীয় হেড কোয়ার্টার'।

'এফ.বি. আই-এর যে লোকটি ওদের সাথে থাকে সে কি এখনো আছে?'

নেই স্যার।

লোকটি থামলেও আহমদ মুসা কিছু বলল না। সে ভাবছিল, লোকটির কাছে তেমন কিছু আর পাবার নেই। প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে আহমদ মুসা বলল, 'তোমাদের ড্যাস বোর্ডে দেখছি ফার্স্ট এইড বক্স আছে, দেখত ওখানে কি আছে?'

সংগে সংগেই বিনা বাক্যব্যয়ে লোকটি ফার্স্ট এইড বক্সের কেবিনটা খুললো।

সন্ধানি চোখ বুলাতে লাগল আহমদ মুসা ফার্স্ট এইড বক্সের জিনিসগুলোর উপর। আহমদ মুসা খুঁজছে কোন ধরনের ক্লোরোফরম। তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস, হোয়াইট ঈগল ও জেনারেল শ্যারনরা তাদের কিডন্যাপ, হাইজ্যাক, ইত্যাদি কাজে ক্লোরোফরম ব্যবহারে অভ্যস্ত। একে ওরা খুবই নিরাপদ বলে মনে করে। সুতরাং এ বস্তুটা এ গাড়িতে কোথাও বা কারও কাছে পাবার কথা।

আহমদ মুসার অনুমান মিথ্যা হল না।

ফার্স্ট এইড বক্সে এ্যন্টি সেপটিক ক্রিম টিউবের পাশেই আরেকটা টিউব পাওয়া গেল সেটাই ক্লোরোফরম টিউব। টিউবের গায়ে লিখা আছে, 'সিক্স আওয়ার'স এ্যনেসথেশিয়া'। তার মানে যে কোন কাউকে এই ক্লোরোফরম দিয়ে ছয় ঘন্টা ঘুম পাড়িয়ে রাখা যায়।

আহমদ মুসা ক্লোরোফরম টিউবটি হাতে নিয়ে লোকটিকে লক্ষ্য করে বলল, 'তোমার পকেট থেকে রুমাল বের কর'।

লোকটি রুমাল বের করল। আহমদ মুসা তাকে বলল, 'রুমালে ক্লোরোফরম ঢাল'।

যন্ত্র চালিতের মত নির্দেশ পালন করল লোকটি।

'ক্লোরোফরম ভেজা রুমালটি নাকে চেপে ধরে বড় বড় নিঃশ্বাস নাও'।

বলে আহমদ মুসা আবার রিভলবার তাক করল লোকটিকে।

লোকটি আহমদ মুসার দিকে ভীত দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে ক্লোরোফরম ভেজা রুমাল নিজের নাকে চেপে ধরে বড় বড় নিঃশ্বাস নিতে লাগল।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড।

লোকটির হাত থেকে ক্লোরোফরম ভেজা রুমাল খসে পড়ল এবং সংগা হারিয়ে ফেলল লোকটি।

আহমদ মুসা ওদের তিনজনের কাছ থেকে তিনটি রিভলবার কুড়িয়ে নিয়ে গাড়ি থেকে বের হলো।

পেছনেই দাঁড়িয়েছিল বিলের গাড়ি।

আহমদ মুসা গিয়ে গাড়িতে উঠল।

'স্যার, কারসেনকে যারা বন্দী করে রেখেছে, এরা কি তারাই ছিল?' বলল ড্রাইভার বিল।

'হ্যাঁ, এরা সেই দলের। চল, দলের গোছা যেখানে, সেখানে যাব'।

'কোনদিকে যাবো স্যার?'

'এক্সপ্রেস ওয়েতে ওঠ। তারপর ফোরটি ফোর্থ লেনের মুখে গিয়ে দাঁড়াও।

গাড়ি ছাড়ল ড্রাইভার।

‘স্যার, ফোরটি ফোর্থ লেনে ইহুদীদের একটা সিনাগগ আছে’। ড্রাইভার বলল।

‘কত নাম্বার কিংবা কতটা ভেতরে জান?’

‘না স্যার, লেনের প্রায় মুখেই সিনাগগটা।

‘প্রায় মুখেই?’

জি স্যার’।

‘বাড়িটার নাম্বার যদি চার হয়, তাহলে ঐ বাড়িতেই আমরা যাচ্ছি’।

‘ঠিক আছে স্যার’। বলল ড্রাইভার।

‘কিন্তু আহমদ মুসা মানুষ, সে হাওয়া নয়। সশরীরেই তাকে পালাতে হয়েছে। তার পালানো রোধ করতে পারলো না তোমার লোকরা, আর কারণ খুঁজে বের করতে পারলো না আহমদ মুসা পালাল কিভাবে’।

বলল ক্ষোভের সাথে গোল্ড ওয়াটার।

‘আপনার ক্ষোভ ঠিক আছে মিঃ গোল্ড ওয়াটার। সত্যিই সমাধান করা গেল না, এই রহস্যের’। বিষন্ন মুখে বলল জেনারেল শ্যারন।

‘কিন্তু আমার মনে হয় কি জান, তোমার লোকরা তাকে অন্ধকুপে রাখার নাম করে পালিয়ে যেতে দিয়েছে’। গোল্ড ওয়াটার বলল।

‘কেন পালিয়ে যেতে দেবে?’

‘তা আমি জানি না। তবে অর্থ অবিশ্বাস্য ও অসংখ্য অনেক কিছুই ঘটাতে পারে’।

‘না, গোল্ড ওয়াটার, অর্থের বিনিময়ে কোন ইহুদী আহমদ মুসাকে ছেড়ে দেয়া তো দুরের কথা, কোন সাহায্যও করতে পারে না’।

‘এটা তো তত্ত্ব কথা’।

‘বাস্তবতা এটাই কি মিঃ গোল্ড ওয়াটার?’

‘তাহলে বলতে হবে আহমদ মুসা হাওয়াই হয়েছে’।

‘যা ইচ্ছা বলুন। কিন্তু আমার জীবনে এমন বিস্ময়ের মুখোমুখি কোনদিন হইনি আর’।

‘এখন বলুন সবুজ পাহাড় থেকে এক এশিয়ান যখন উধাও হলো, তখন আর এক এশিয়ান লস আলামোসে উদয় হলো কি করে?’ গোল্ড ওয়াটার বলল।

‘সে এশিয়ানের যে স্কেচ আমি পুলিশের কাছে দেখেছি, তাতে আমার মনে হয়েছে সে আহমদ মুসা’।

‘বললেই তো হবে না, তা প্রমাণ করবেন কি করে?’

‘প্রমাণ করতে পারলে তো এক মহাকাজ হয়ে যেত। গোটা আমেরিকা শুধু নয়, গোটা পশ্চিমী দুনিয়া আহমদ মুসাকে গ্রেপ্তার করার জন্যে পাগল হয়ে যেত’।

‘ঠিক বলেছেন জেনারেল। আমরা যদি এই একটা বিষয় প্রমাণ করতে পারি, তাহলে আহমদ মুসার দিন শেষ হয়ে যাবে। তখন সহজেই সে চিহ্নিত হবে যে সৌদি আরব, পাকিস্তান, ইরানের মত যত মুসলিম দেশ অথবা অন্য কোন সন্ত্রাসী দেশের পক্ষে সে নিউক্লিয়ার ও স্ট্রাটেজিক টেকনলজি চুরির কাজে লিপ্ত রয়েছে। তখন সে দুনিয়ার কোন দেশে আশ্রয় পাবে না এবং বাঁচার আর তার কোন পথও খোলা থাকবে না। আন্তর্জাতিক পুলেশের সাহায্যেও তখন তাকে গ্রেফতার করা যাবে’।

‘নিশ্চিত থাক গোল্ড ওয়াটার এটাই ঘটবে।একটু মুশকিল হয়েছে, লস আলামোসে কেউই তাকে ভালো করে দেখেনি, মাত্র এক মহিলা অফিসার ছাড়া। সে মহিলা আবার দেখা যাচ্ছে তার প্রতি দুর্বল। বুঝলেন মিঃ গোল্ড ওয়াটার, সেই মহিলা অফিসারের কাছে ঐ এশিয়ানের যে মহানুভব আচরণের কথা শুনেছি, এবং কাউকে হত্যা না করে শুধু পায়ে গুলি করে ওদের নিষ্ক্রীয় করে পালিয়ে যাওয়ার যে কাহিনী ওরা বলেছে, তাতে আমি নিশ্চিত হয়েছি সে আহমদ মুসা ছাড়া আর কেউ নয়’।

‘কিন্তু বলুন, এখন প্রমাণ করার পথ কি?’

‘চিন্তা করছি মিঃ গোল্ড ওয়াটার, অনেকগুলো অল্টারেনটিভ পথ আছে। দেখি কোনটা কাজে লাগে’।

‘আরেকটা কথা জেনারেল, আমরা মিঃ কারসেন ঘানেমের ভারটা বয়ে বেড়াচ্ছি কেন?’

‘ওদের হাতে বন্দী আমাদের কোহেনের মুক্তিপণ সে’।

‘ডাঃ মার্গারেট ও লায়লা জেনিফার আমাদের হাতে থাকার পর আর কিছুর প্রয়োজন নেই।

‘মিঃ কারসেন ঘানেম অন্তর্ধান হওয়ার বিষয় তার পরিবার এবং কাউন্সিল অব মুসলিম এ্যাসোসিয়েশনস-এর পক্ষ থেকেও পুলিশকে জানানো হয়েছে। বিষয়টা নিয়ে এফ.বি.আইও মাথা ঘামাচ্ছে। সুতরাং সে আমাদের কাছে থাকার মধ্যে একটা ঝুঁকিও আছে’।

‘আপনার কথার মধ্যে যুক্তি আছে মিঃ গোল্ড ওয়াটার। কিন্তু......

কথা শেষ করতে পারল না জেনারেল শ্যারন। গুলির শব্দ ভেসে এল নিচ তলা থেকে।

প্রথমে ব্রাস ফায়ারের শব্দ। তারপর রিভলবারের শব্দ।

জেনারেল শ্যারন কলিং বেলে টিপ দিয়ে সে এবং গোল্ড ওয়াটার দু’জেনই উৎকর্ণ হলো।

ঘরে প্রবেশ করল একজন প্রহরী।

‘কি ব্যাপার নিচে? বলল জেনারেল শ্যারন।

‘স্যার নিচে যাচ্ছিলাম। আপনার ডাকে ফিরে এসেছি’।

‘ঠিক আছে, তুমি........

জেনারেল শ্যারনের কথা শেষ না হতেই দু’টি স্টেনগানের ব্রাশ ফায়ারের শব্দ ভেসে এল।

কথা শেষ না করেই উঠে দাঁড়াল জেনারেল শ্যারন এবং তার সাথে গোল্ড ওয়াটার।

চল দেখি। প্রহরীকে উদ্দেশ্য করে বলল জেনারেল শ্যারন।

আগে আগে দ্রুত ছুটল প্রহরী। সে নামার সিঁড়ির মুখে গিয়ে পৌঁছতেই সিঁড়ির গোড়া থেকে গুলির শব্দ ভেসে এল। অব্যাহতভাবে নিচে থেকে ছুটে আসছে গুলি।

প্রহরী পেছনে তাকিয়ে চাপা কন্ঠে বলল, ‘স্যার কেউ গুলি করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে’।

‘আমাদের লোকরা কোথায়?’চিৎকার করল শ্যারন।

‘ওরা তিনজনই নিচে ছিল স্যার’।

‘তাহলে ওরা মারা পড়ল? তুমি গুলি কর, সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আসা লোকদের ঠেকাও’। বলল শ্যারন।

‘কিন্তু স্যার, সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসা গুলির বিরতি নেই।

‘কাপুরুষ’ বলে ধমকে উঠল জেনারেল শ্যারন।

প্রহরী লোকটি সংগে সংগেই গুলি করতে করতে এগুলো সিঁড়ির মুখে। কিন্তু সিঁড়ির মুখে পৌঁছতেই এবং নিজের স্টেনগানের নল সিঁড়ির গোড়ার দিকে ঘুরানোর আগেই তার দেহ ছুটে আসা গুলির ঝাঁকে ঝাঁঝরা হয়ে আছড়ে পড়ল সিড়িঁর মুখে।

সংগে সংগেই জেনারেল শ্যারন গোল্ড ওয়াটারের হাত ধরে টেনে যে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল সেই ঘরে ঢুকে গেল এবং দরজা বন্ধ করে ছুটল বিপরীত দিকের আরেক দরজার দিকে। খুলল সে দরজা। দরজার পরেই একটা সিঁড়ি বাড়ির পেছনের চত্বরে নেমে গেছে।

দরজাটা বন্ধ করে জেনারেল শ্যারন গোল্ড ওয়াটারকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নিচে নেমে গেল।

‘আমরা কি পালাচ্ছি জেনারেল শ্যারন?’ দৌড়াতে দৌড়াতেই বলল গোল্ড ওয়াটার।

‘না পালাচ্ছি না, অসম যুদ্ধ থেকে পশ্চাদপসরণ করছি। নিশ্চয় শত্রুরা সংখ্যায় অনেক এসেছে। প্রথম চোটেই তারা হত্যা করেছে নিচে আমাদের তিনজন প্রহরীকে।

থামল জেনারেল শ্যারন।

সিঁড়ির নিচেই বাড়িটার পেছনের চত্বরে একটা ছোট হেলিকপ্টার দাঁড়িয়ে আছে।

হেলিকপ্টারের দিকে ছুটছে ওরা দু’জন।

‘জেনারেল শ্যারন, বন্দী মিঃ কারসেনকে যে আমরা ফেলে এলাম?’

‘কেন তুমি যে বললে তাকে আর বয়ে বেড়ানোর দরকার নেই। সেজন্যেই তাকে আর নিলাম না’।

‘ভালই করেছ। একটা পুণ্য তো আমরা করলাম’। বলল গোল্ড ওয়াটার মুখ টিপে হেসে।

তখন ওরা হেলিকপ্টারে উঠে বসেছে।

হেলিকপ্টারের ড্রাইভিং সিটে বসেছে জেনারেল শ্যারন।

হেলিকপ্টার স্টার্ট নিয়ে যখন উঠে এসেছে বিল্ডিং সমান উঁচুতে, তখন তারা দেখতে পেল মাত্র একজন লোক দরজা ভেঙে পেছনের সিঁড়ি দিয়ে নিচের চত্তরে নেমে এল।

‘মিঃ জেনারেল মনে হচ্ছে আক্রমণটা মাত্র একজন লোকের ছিল’।

বলল গোল্ড ওয়াটার।

‘নিশ্চয় তাহলে সে আহমদ মুসা মিঃ গোল্ড ওয়াটার’। বলল জেনারেল শ্যারন।

কি করে বুঝলেন?

‘সে একা এবং হেলিকপ্টার লক্ষ্য করে একটা গুলিও সে ছুঁড়ল না। অন্য কেউ হলে গুলির ঝাঁক শূন্যে পাঠিয়ে মনের ঝাল মেটাতো। কিন্তু আহমদ মুসা কোন অনর্থক কাজ করে না’।

‘তাহলে জেনারেল শ্যারন আহমদ মুসাকে বলে দিন তার দিন ঘনিয়ে আসছে। আমেরিকাই তার শেষ শয্যা হবে’।

এ কথাটাই জেনারেল শ্যারন এভাবে বলল হেলিকপ্টারের মাইক চত্বরের দিকে তাক করে, ‘এখানে আমাদের কোন কাজ নেই। আমরা চললাম আহমদ মুসা। তোমার শেষ দিন ঘনিয়ে আসছে। আমাদের হাতে অথবা মার্কিন সরকারের হাতে তোমাকে ধরা দিতেই হবে। ডাঃ মার্গারেট ও লায়লা জেনিফার ভালই আছে। তোমার আত্মসমর্পণের জন্যে আরোও দশদিন বাড়িয়ে দিয়ে গেলাম, যদিও আমাদের লোকদের তর সইছে না তাদের কাছে পাওয়ার জন্যে’।

একটা কন্ঠ শোনা গেল চত্বর থেকে। কন্ঠটি চিৎকার করে বলল, ‘জেনারেল শ্যারন, তোমাদের হিসেব কোনদিনই ঠিক হয়নি, ঠিক কোনদিনই হবে না’।

জেনারেল শ্যারন বলল, মিঃ গোল্ড ওয়াটার নিশ্চয় চিনতে পারছেন কন্ঠটি আহমদ মুসার’।

কিছু বলতে চেয়েছিল জেনারেল শ্যারন, কিন্তু দেখল আহমদ মুসা চত্বর থেকে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘরে ঢুকে গেল।

জেনারেল শ্যারন তার হেলিকপ্টারের দিকে মনোযোগ দিল।

উপরে উঠে এল হেলিকপ্টার। নিচে নেমে গেল শহরের দৃশ্য। হেলিকপ্টার ছুটল এয়ার পোর্টের উদ্দেশ্যে।

আহমদ মুসা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ভাবল, কারসেন ঘানেম কি এখানে বন্দী ছিল? ওরা কি কারসেন ঘানেমকে নিয়ে গেল? কিন্তু জেনারেল শ্যারন তো শুধু ডাঃ মার্গারেট ও লায়লা জেনিফারের নাম বলল, কারসেন ঘানেমের নাম বলেনি। কারসেন ঘানেম যদি তাদের সাথে হেলিকপ্টারে থাকত, তাহলে তার কথা ভূলে যাবার কথা নয়। না কারসেন ঘানেম এখানে বন্দী ছিল না? সেটাও হতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রেও ডাঃ মার্গারেট ও লায়লা জেনিফারের সাথে কারসেন ঘানেমের নাম তার বলার কথা।

সিঁড়ি থেকে ঘরে প্রবেশ করে আহমদ মুসা ভাবল, ঘাঁটিটা একটু ভালো করে দেখা দরকার। ওরা তাড়াহুড়ো করে পালিয়েছে, দলিল দস্তাবেজ কিছু ফেলে যেতে পারে।

বাড়িটা দোতলা। সিনাগগেরই একটা অংশ এটা। দোতলার পথসহ ছয়টি বেডরুম। বেডরুমগুলো সিনাগগ করিডোরের সাথে যুক্ত। ফ্যামিলি হাউজ নয়, দেখতে অনেকটা গেস্ট হাউসের মত। হতে পারে সিনাগগের কর্তৃপক্ষ এবং গেস্টদের জন্যেই এটা তৈরী হয়েছে। আর নিচের তলায় কিচেন, ডাইনিং, ড্রইং ইত্যাদি।

আহমদ মুসা ঘরগুলো এক এক করে খুঁজল। দু’একটা কাগজ যা পেল পকেটে পুরল। সুযোগমত পরীক্ষা করা যাবে। সর্বশেষ ঘর, যার দেয়াল

সিনাগগের সাথে যুক্ত এবং যার একটি মাত্র জানালা ও একটি মাত্র দরজা, তালাবদ্ধ অবস্থায় পেল। অন্য ঘরগুলো সবই খোলা ছিল।

বদ্ধ দরজায় টোকা দিল আহমদ মুসা।

কিন্তু কোন সাড়া পেল না।

আরও কয়েকবার টোকা দেয়ার পর ভেতর থেকে শব্দ ভেসে এল 'কে?' ভয়মিশ্রিত কম্পিত কন্ঠ।

আহমদ মুসা আশান্বিত হল।

জবাব না দিয়ে আহমদ মুসা গুলি করল কি হোলে। খুলে ফেলল দরজা।

দরজা খুলতেই আহমদ মুসার নজর পড়ল ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া একটি মুখের উপর।

মাথার চুল তার উস্কো খুস্কো। পোশাক ময়লা, বিপর্যস্ত। চেহারা পুরো শ্বেতাংগ নয়। চোখ, মুখ ও রঙে সেমেটিক ছাপ আছে।

'আপনি কি কারসেন ঘানেম?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

গোলাগুলির শব্দে এমনি নার্ভাস হয়ে থাকার কথা। এই অবস্থায় গুলি করে দরজা খুলে একজন লোককে রিভলবার হাতে ভেতরে প্রবেশ করতে দেখলে যা হবার তাই হয়েছে। আসামীর মত তার অবস্থা। কথা সরছিল না তার মুখ থেকে। তাকিয়ে আছে সে ফ্যাল ফ্যাল করে আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা বলল, 'আমি আহমদ আব্দুল্লাহ। আপনি কারসেন ঘানেম নিশ্চয়?'

এতক্ষণে লোকটি সহজ হয়ে উঠে দাঁড়াল। তার মুখে ফুটে উঠল আনন্দের চিহ্ন। সে দ্রুত কন্ঠে বলল, 'হ্যাঁ আমি কারসেন ঘানেম'।

আহমদ মুসা গিয়ে হ্যান্ডশেক করল তার সাথে। বলল, ওরা পালিয়েছে, চলুন আপনি মুক্ত।

কিন্তু হ্যান্ডশেক করতে গিয়েই দেখতে পেল, তার ডান হাতে লাগানো হ্যান্ডকাফের সাথে লম্বা চেইন বাঁধা। চেইনের শেষ প্রান্তটা খাটিয়ার এক পায়ার সাথে যুক্ত।

আহমদ মুসা গুলি করে হ্যান্ডকাফটা ভেঙে ফেলল।

আলহামদুলিল্লাহ। আপনি কে জানি না, আপনাকে ধন্যবাদ।

আলহামদুলিল্লাহ। আসুন, পরিচয় পরে হবে।

বলে আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে চলল। কারসেন ঘানেম ও আহমদ মুসা করিডোর ও ড্রইং রুমে চারটি লাশ ডিঙিয়ে বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এল।

'যে লাশগুলো দেখলাম, ওগুলো আপনার হাতে নিহত?' সতর্ক ও ফিসফিসে কন্ঠে জিজ্ঞেস করল কারসেন ঘানেম।

'আমি গুলি করেছি, কিন্তু জান কবজ করেছে আজরাইল'। বলল আহমদ মুসা।

হেসে উঠল কারসেন ঘানেম। বলল, 'এই রক্তাক্ত পরিবেশেও আপনি হাসালেন। অদ্ভূত লোক তো আপনি'।

'অদ্ভূত তো হবোই কারণ এর আগে অবশ্যই আপনি আমাকে দেখেন নি'।

বলতে বলতে আহমদ মুসা মুখ বাড়িয়ে বারান্দা থেকে উঁকি দিল। দেখল, বিলের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে পাশেই।

আহমদ মুসা ডাকতে যাচ্ছিল। কিন্তু দেখল ডাকার আগেই গাড়িটি ছুটে এসে দাঁড়াল গাড়ি বারান্দায়।

'আসুন মিঃ কারসেন বলে আহমদ মুসা ছুটল গাড়ির দিকে।

দুজনেই গাড়িতে উঠে বসল। বলল বিলকে লক্ষ্য করে আহমদ মুসা, 'বিল তাড়াতাড়ি সরে পড়, পুলিশ এল বলে'।

'স্যার, ঘরের জানালা দরজাগুলো বোধ হয় এয়ারটাইট। শব্দ বাইরে খুব একটা আসেনি। আমি কাছে ছিলাম বলে কিছুটা শুনতে পেয়েছি'। বলল বিল।

'তোমাকে ধন্যবাদ বিল, এ জন্য যে তুমি পাশেই এসে অপেক্ষা করছিলে'।

'আপনি গাড়ি থেকে নামলে আমি কিছুতেই ওখানে থাকতে পারিনি। কি ঘটছে অন্ততঃ জানাও তো দরকার। এ জন্যেই আপনার আদেশ অমান্য করেই চলে এসেছি। তাতে একটা লাভ হয়েছে'।

'কি লাভ?'

'শব্দ শুনে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছিল। জিজ্ঞেস করেছিল আমাকে কি হচ্ছে ওখানে?'

আমি বলেছিলাম, ভিড়িওতে ওয়ার ফিল্ম চলছে ওখানে'।

ধন্যবাদ দিয়ে গাড়িটি চলে যায়।

'তোমার উপস্থিত বুদ্ধি তো দারুন!' বলল আহমদ মুসা।

'আই কিউ টেস্টে আমি ক্লাসে ফার্স্ট ছিলাম স্যার'। বলল বিল।

ধন্যবাদ বিল।

'স্যার ইনিই কি মিঃ কারসেন ঘানেম?'

হ্যাঁ বিল।

ড্রাইভার বিল বলল 'মিঃ কারসেন ঘানেম আপনার সামনের দিনগুলো শুভ হোক'।

'ওয়েলকাম মিঃ বিল'। বলল কারসেন ঘানেম।

'ধন্যবাদ স্যার'। বলে বিল আহমদ মুসার দিকে চেয়ে বলল, 'এখন গাড়ি কোথায় নেব স্যার?'

'বলত গাড়ি কোথায় নেবে? দেখি তোমার আই কিউ কেমন?'

'গাড়ি এখন মিঃ কারসেন ঘানেমের বাড়িতে নেব'। বলল বিল।

'ধন্যবাদ বিল', বলল আহমদ মুসা।

'আপনারা আমার বাড়ি চেনেন?' বিস্মিত কন্ঠে বলল কারসেন ঘানেম।

'চিনতাম না। আজ তিনটায় আপনার বাড়িতে গিয়েছিলাম। ওখানে লাঞ্চ করেছি। আপনার বাড়িতে আসাটা মহালাভজনক হয়েছে'। বলল আহমদ মুসা।

'কিভাবে?' বলল কারসেন ঘানেম।

কারসেন ঘানেম থামতেই বিল বলল, 'একটা কৌতুহল স্যার, কেউ কি মারা গেছে, এত গোলাগুলি হলো'।

'হ্যাঁ বিল, ওরা চারজন মারা গেছে। নেতা দু'জন হেলিকপ্টারে পালিয়েছে'।

‘তাহলে ওদের মোট মরল ছয়জন। বন্দী মুক্তি ও ছয়জন হত্যা, বিশাল বিজয় স্যার’।

‘আর দু’জন কোথায় মরল, চারজন তো দেখলাম’ বলল কারসেন ঘানেম’।

আর দু’জন মরেছে আপনার বাড়ির এক প্রান্তে, আমাদের সাথেই এক সংঘর্ষে।

কিছু বলতে যাচ্ছিল কারসেন ঘানেম। কিন্তু গাড়ি এসে গেল কারসেন ঘানেমদের বাড়ির গেটে।

গেট পেরিয়ে গাড়ি ভেতরে ঢুকল।

গাড়ি বোধ হয় চিনতে পেরেছিল কারসেন পরিবারের লোকেরা। গাড়ি বারান্দায় গিয়ে থামতেই দেখা গেল কারসেন ঘানেমের মা, স্ত্রী ও মেয়ে সবাই এসে বারান্দায় হাজির।

দাঁড়িয়ে আছে ওরা তিনজন। তিনজনেরই মাথা ও গায়ে চাদর।

প্রথমে তাদের সবারই মুখ ছিল উদ্বেগ ও আতংকে ঢাকা।

কিন্তু গাড়ির ভেতরে কারসেন ঘানেমকে দেখেই প্রথমে ঘানেমের মেয়ে ফাতিমা আব্বু বলে আনন্দে চিৎকার করে উঠল।

কারসেন ঘানেমের মা এবং স্ত্রীও দেখেছে। কিন্তু তারা চিৎকার নয়, দু’হাত উপরে তুলেছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে। তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু নেমে এসেছে ঝরঝর করে।

ফাতিমা আনন্দে চিৎকার করার পর মুহূর্তেই তার আনন্দ কান্নায় রূপান্তরিত হয়েছে।

কারসেন ঘানেম গাড়ি থেকে নামল।

উঠল সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায়। মা ও মেয়ে জড়িয়ে ধরল তাকে। পাশেই দাঁড়িয়ে তার স্ত্রী তখন বোবা কান্নায় ভাসছে।

মা ও স্ত্রী কারসেনকে ধরে ভেতরে নিয়ে চলল।

মেয়ে ফাতিমা ঘানেমও তাদের পেছনে পেছনে চলতে শুরু করল, কিন্তু সে হঠাৎ ফিরে দাঁড়াল। তাকাল গাড়ির দিকে। তারপর দৌড়ে নেমে এল গাড়ি

বারান্দায়। গাড়ির জানালা দিয়ে আহমদ মুসার দিকে চেয়ে বলল, ‘আংকেল নামেন নি কেন? আসুন। চলুন ভেতরে’। বলে গাড়ির দরজা খুলে ফেলল ফাতিমা ঘানেম’।

নামল আহমদ মুসা গাড়ি থেকে। বিলের দিকে চেয়ে বলল, ‘বিল একটু বস। মিঃ কারসেন ঘানেমের সাথে জরুরী কিছু কথা আছে আমার। আসছি আমি’।

বলে ফাতিমা ঘানেমের পেছনে পেছনে চলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসাকে নিয়ে গেল ড্রইংরুমে।

আহমদ মুসাকে বসতে বলে সামনের সোফায় সেও বসল।

আহমদ মুসা বসে বলল, ‘ফাতিমা তুমি যাও, তোমার আব্বুর সাথে কথা বল গিয়ে। আমি বসছি’।

‘না পরে বলব। আব্বুও তো এখানে আসবেন’। বলল ফাতিমা ঘানেম।

ফাতিমার কথা শেষ হতেই কারসেন ঘানেম ড্রইংরূপে প্রবেশ করল। সালাম দিল আহমদ মুসাকে। তারপর ফাতিমার দিকে চেয়ে বলল, ‘ধন্যবাদ ফাতিমা। মা, তুমি ওকে সাথে করে ভেতরে নিয়ে এসেছ। আমি ভূলেই গিয়েছিলাম’।

বলে আহমদ মুসার দিকে চেয়ে বলল, ‘আমি দুঃখিত মিঃ আহমদ আব্দুল্লাহ। পারিবারিক এক আবেগ আমাকে ভাসিয়ে নিয়েছিল। আমি দুঃখিত’।

‘দুঃখের কিছু নেই তো! আমি আপনার জায়গায় হলে এটাই ঘটতো। আর আপনি তো বাড়িতে ছিলেন না, আপনার মা-ই তো আপনার প্রতিনিধিত্ব করেছে। এখনও ঐ দায়িত্বই সে পালন করেছে’। আহমদ মুসা বলল।

‘ধন্যবাদ’।

বলে ফাতিমার দিকে চেয়ে বলল, ‘আবার ধন্যবাদ মা তোমাকে’।

একটু থেমে আবার বলল, ‘আমাদের সান ঘানেমের চেয়ে একটু বড় হবেন। মিঃ আব্দুল্লাহ তোমার ভাইয়ার মত। ভাইয়াই বলবে এঁকে।

ফিরল তারপর সে আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘আপনি একটু বসুন। আমি গোসল সেরে আসি। এক সাথেই খাব’।

বলে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল কারসেন ঘানেম। যেতে যেতে বলল, 'ফাতিমা তোমার ভাইয়ার সাথে কথা বল। আমি আসছি'।

তার আব্বা ভেতরে চলে যেতেই ফাতিমা ঘানেম বলল, 'আমরা আপনাদের এখানকার সংঘর্ষ দেখেছি'।

'গাড়িতে যে গোলাগুলি হলো সেটাও?' বলল আহমদ মুসা।

'হ্যাঁ'।

'কিভাবে?'

'আপনাদের চলে যাওয়া দেখার জন্যে আমরা ছাদে উঠেছিলাম'।

বলে একটু থামল। সংগে সংগেই আবার বলল, 'ওরা কারা ছিল?'

'তোমার আব্বাকে যারা কিডন্যাপ করেছিল, ওরা তাদেরই লোক ছিল?'

'ওরা কি করছিল এখানে? কি করে চিনলেন আপনি ওদের?'

আহমদ মুসা ঘটনাটা তাকে খুলে বলল। ফাতিমা ঘানেম চোখ কপালে তুলে বলল, 'সর্বনাশ, আমাদের বাড়িতে কে আসে, কে যায় সর্বক্ষণ ওরা পাহারা দিত? তাহলে তো ওরা আমাদের ক্ষতি করতে পারতো'।

'না ওরা শুধু একজনের জন্যে অপেক্ষা করেছে'।

'কার?'

'এসব কথা থাক। ঐ গাড়িটা পুলিশের চোখে পড়েছে'?

'জি না। স্টেট পুলিশ এতটা তৎপর হতে পারলে তো ভালই হতো।

'কিন্তু এফ.বি.আই ওরকম নয়?'

'না এফ. বি.আই খুব ভাল'।

'কিন্তু ভাল হওয়াটা আমার জন্যে খারাপ'।

কেন?'

'এসব পরে বলব। বলত নিউ মেক্সিকো থেকে ফ্লোরিডার রুট কোনটা ভাল?'

'কিন্তু আসল কথা সব আপনি পাশ কাটিয়ে যাচ্ছেন'।

হাসল আহমদ মুসা। 'পাশ কাটানো নয়, ভবিষ্যতের জন্যে তুলে রাখা'।

এভাবে আহমদ মুসা ও ফাতিমা ঘানেমের আলোচনায় বেশ সময় কেটে গেল। প্রায় এক ঘন্টা পরে নাস্তার ট্রলিসহ প্রবেশ করল কারসেন ঘানেম, তার স্ত্রী ও তার মা।

নাস্তা পরিবেশন করে কারসেন ঘানেমের স্ত্রী ও তার মা চলে গেল।

ড্রাইভার বিলকে ডেকে আনল কারসেন ঘানেম নাস্তার জন্যে।

নাস্তা শেষ হলে ড্রাইভার বেরিয়ে গেল।

মিসেস ঘানেম ও কারসেন ঘানেম নাস্তার টেবিল পরিষ্কার করে নাস্তার ট্রলি ভেতরে রেখে এল।

ড্রইংরুমে বসেছে সবাই।

কারসেন ঘানেম বসেছে আহমদ মুসার সামনের সোফায়।

কারসেন ঘানেম মধ্য বয়স অতিক্রম করেছে। মাথার চুলের বড় একটা অংশ পেকে গেছে। চোখে মুখে একটা কৃচ্ছতার ছাপ। সম্ভবত বন্দী অবস্থার চিহ্ন এটা।

কারসেন ঘানেমের স্ত্রী মিসেস ঘানেমই প্রথম শুরু করল। বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, 'আমাদের এখানে ডিনার করবেন কিন্তু, ব্যবস্থা করেছি'।

'ডিনার করতে গেলে তাড়াহুড়ো হবে। আজ রাতেই নিউ মেক্সিকো থেকে চলে যেতে হচ্ছে'। বলল আহমদ মুসা।

'কিন্তু এত তাড়া কিসের?' বলল কারসেন ঘানেম।

'জনাব আপনাকে পৌঁছে দিয়েই আমি চলে যেতাম, কিন্তু কিছু কথা আপনার কাছ থেকে শোনার আছে, তাই অপেক্ষা করেছি'।

'কিন্তু তার আগে আপনার পরিচয় জানার জন্যে উদগ্রীব আমরা। দয়া করে কি বলবেন কিছু?'

'ওটা পরেও হতে পারবে। কিন্তু আপনি বলুন, যারা আপনাকে বন্দী করে রেখেছিল, তাদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানতে পেরেছেন কি না?'

'ওরা কখনই আমার সামনে তাদের নিজেদের কোন ব্যাপারে আলাপ করতো না। আমি যতটা শুনেছি, তাদের আলাপের সিংহভাগই থাকত আহমদ মুসাকে নিয়ে। প্রথম দিনেই তারা আমাকে বলেছে, আহমদ মুসাকে বন্দী করতে

পারলেই আমাকে তারা ছেড়ে দেবে। অনেক কয়দিন পর তারা আমাকে বলল, তোমার কপাল খারাপ। আহমদ মুসাকে বন্দী করতে গিয়ে আমাদের একজন লোক ধরা পড়েছে। তাকে মুক্ত করা এবং আহমদ মুসাকে বন্দী করার আগে তোমার আর ছাড়া নাই। সেদিনই তারা ওখান থেকে আমাকে সরিয়ে ফেলল। ওখানে আহমদ মুসা নাকি আসছে আমাকে উদ্ধার করার জন্যে। এ দিনই সন্ধ্যায় ওরা আমাকে বলল, সুখবর, আহমদ মুসাকে আমরা বন্দী করেছি, এখন আমাদের লোক ছাড়া পেলেই তুমি মুক্তি পাবে। কিন্তু পরদিনই তারা আবার রাগে দুঃখে গর্জন করতে লাগল যে আহমদ মুসা তাদের বন্দীখানা থেকে হাওয়া হয়ে গেছে। ওদের একজন এসে আমাকে বলল, তোমার জন্যে দুঃসংবাদ এবং আমাদের জন্যে সুসংবাদ যে, আহমদ মুসা এবার সত্যিকার বিপদে পড়তে যাচ্ছে, যদি আমাদের অনুমান সত্য হয়। গোটা মার্কিন প্রশাসন তার বৈরী হওয়ার সাথে সাথে গোটা পশ্চিমা জগৎ তার বৈরী হয়ে দাঁড়াবে। সি.আই.এ, এফ.বি.আই ও অন্যান্য পশ্চিমী গোয়েন্দা সংস্থার যৌথ অভিযান আহমদ মুসা মাটির তলায় ঢুকলেও সেখান থেকে তাকে বের করে আনবে। আর আমরা যদি আগে ধরে ফেলতে পারি, তাহলে আর কথা নেই'। থামল কারসেন ঘানেম।

'ওদের আলোচনায় ওদের কোন ঘাঁটির নাম বা টেলিফোন নাম্বার কিছু পেয়েছেন'।

'না এ রকম কোন ঘটনা ঘটেনি। তবে একদিন তাদের আলোচনায় দু'জন মহিলা বন্দী ও তার সাথে আহমদ মুসা এবং একটি সিনাগগের নাম বলছিল'।

'কি বলছিল ওরা?' উদগ্রীব কন্ঠে জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা। 'ওরা বলছিল, আহমদ মুসা যতই চেষ্টা করুক সলোমন সিনাগগের সন্ধান সে পাবে না। আর সন্ধান পেলেও সেখানে ডাঃ মার্গারেট ও লায়লা জেনিফার বন্দী আছে তার সন্ধান পাবে না এবং ডাঃ মার্গারেট ও লায়লা জেনিফারকে উদ্ধারও করতে পারবে না। অবশেষে তাকে আমাদের কাছে আত্মসমর্পন করতেই হবে'।

'কি বলল সলোমন সিনাগগ সম্পর্কে? কোথায় এ সিনাগগটি?'

নাম সলোমন সিনাগগ, কিন্তু কোথায় তা তারা বলেনি'।

বলে মুহূর্তকাল থেমেই সে আবার বলল, ‘বলুন তো এ আহমদ মুসা কি সেই বহুল আলোচিত বিপ্লবী আহমদ মুসা?’

‘হ্যাঁ’।

‘আমিও তাই ভাবছি। তা না হলে আহমদ মুসাকে এত ভয় পাবে কেন? কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, আমার মত এক ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে উদ্ধার করার জন্যে তাঁর মত অত বিরাট ও মহান ব্যক্তিত্বের আগমন ঘটবে কেন? এটা কি এ জন্যেই যে, তার কারণেই আমি বন্দী হয়েছি?’

আহমদ মুসা একটু হাসল। বলল, ‘আপনাকে ধন্যবাদ। সিনাগগের নামটা দিলেন এটা একটা বড় সাহায্য’।

‘কিন্তু আপনি এ নাম দিয়ে কি করবেন?’

কিন্তু প্রশ্ন করেই হঠাৎ আবার বিস্ময়ে বিস্ফারিত হবার মত চোখ বড় বড় করে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘আপনিই কি তাহলে আহমদ মুসা?’

কারসেন ঘানেমের এই প্রশ্নে কারসেন ঘানেমের স্ত্রী মরিয়ম মইনি এবং মেয়ে ফাতিমা ঘানেমও চমকে উঠল। তাদেরও বিস্ময় দৃষ্টি গিয়ে নিবদ্ধ হলো আহমদ মুসার মুখের উপর।

আহমদ মুসার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠছে। বলল, মিঃ কারসেন ঘানেম, পরিচয়ের কি এখানে প্রয়োজন আছে?আমাদের কাজ করা প্রয়োজন।

‘দুঃখিত আমার আরো আগেই দৃষ্টি খুলে যাওয়া উচিত ছিল। স্ত্রীর কাছে আমি ইতিমধ্যেই শুনেছি পাবলো পরিবারের সাথে কথা বলে কিভাবে শত্রু থেকে তাদেরকে ঘানেম পরিবারের বন্ধুতে রূপান্তরিত করেছেন, তারপর নিজ চোখে আমি দেখলাম কিভাবে আপনি একা শত্রুদের নিহত ও বিতাড়িত করে আমাকে মুক্ত করে নিয়ে এলেন, এতেই আমার চোখ খুলে যাওয়া উচিত ছিল’।

বলে কারসেন ঘানেম উঠে গিয়ে আহমদ মুসার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে আহমদ মুসার দু’হাত নিয়ে চুমু দিয়ে বলল, ‘আমরা সৌভাগ্যবান যে, আপনার সাক্ষাৎ আমরা পেয়েছি, আপনার পদধুলি আমাদের বাড়িতে পড়েছে। আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করুন’।

‘সবার যিনি স্রষ্টা, তারই সব প্রশংসা মিঃ কারসেন ঘানেম। আমাকে তাহলে উঠতে হয়’।

‘রাতে না গেলেই কি নয়? রাতে থাকুন। কাল যাবেন’। বলল মরিয়ম মইনি, কারসেন ঘানেমের স্ত্রী।

‘আপনার ব্যাগ ব্যাগেজ কোথায়? হোটেলে? ওগুলো আমরা নিয়ে আসতে পারি’। উঠে দাঁড়িয়ে বলল ফাতিমা ঘানেম।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘গায়ে যা আছে এই নিয়ে আমি এসেছি নিউ মেক্সিকোতে। পাবলোদের ওখান থেকে আসার সময় সান্তা আনা একটা ছোট্ট ব্যাগে কিছু কাপড় চোপড় ও ঔষধ ভরে দিয়েছে। ওটা গাড়িতে আছে’।

‘ঔষধ কেন? আপনি অসুস্থ?’ বলল কারসেন ঘানেম।

আহমদ মুসা নিজের বাম বাহুর সন্ধি দেখিয়ে বলল, ‘এখানে গুলি লেগেছিল। আট দশদিন পড়েছিলাম পাবলোদের ওখানে। এখন ভাল’।

‘কি কারণ গুলি লাগল। ঐ ইহুদীদের সাথে সংঘর্ষে?’ বলল কারসেন ঘানেম।

‘ওদের এক আঘাতে কপালের কিছুটা ফেটে গিয়েছিল। কিন্তু গুলিটা লেগেছিল আলামোসে সরকারী সৈন্যদের সাথে সংঘর্ষকালে’।

‘তাহলে ওরা আপনার কথাই বলছিল। লস আলামোসে আপনিই ঢুকেছিলেন?

আহমদ মুসা কিছু বিষয় বাদ দিয়ে সংক্ষেপে গোটা ঘটনা ওদের জানিয়ে বলল, ‘এখনও মার্কিন সরকার জানে না যে, আহমদ মুসা লস আলামোসে ঢুকেছিল। তারা মনে করছে কোন একজন এশিয়ান ঢুকেছিল। এখন এ অঞ্চলে এশিয়ান যাকেই পাচেছ ধরছে এবং মেলাবার চেষ্টা করছে সে আহমদ মুসা কিনা। এ জন্যেই আমাকে শ্বেতাংগের ছদ্মবেশ পরতে হয়েছে’।

বলে আহমদ মুসা মুখ থেকে স্কিন মাস্ক খুলে ফেলল।

ঘরে উপস্থিতদের আরেকবার বিস্ময় ও আনন্দের পালা।

আরও কিছু আলোচনা চলল। আহমদ মুসা টয়লেটে গিয়ে স্কিন মাস্কটা পরে এসে বলল, ‘আমাকে উঠতে হবে। রাতে গেলেই সুবিধা বেশী’।

‘কোথায় যাবেন?’ জিজ্ঞেস করল কারসেন ঘানেম।

‘যাব ফ্লোরিডার দিকে’।

‘কেন?’

‘ডাঃ মার্গারেট ও লায়লা জেনিফারদের উদ্ধার করতে চেষ্টা করব। কোথায় ওদের পাব জানি না’।

‘ভয়াবহ এই বিপদ মাথায় নিয়ে আপনি চলাফিরা করবেন কি করে?’ বলল মরিয়ম মইনি।

‘আর মাত্র দশদিন সময় হাতে আছে। এর মধ্যেই ওদের উদ্ধার করতে হবে। উদ্ধার করতে না পারলে ওদের কাছে আমাকে ধরা দিতে হবে। না হলে দশদিন পর ওরা দু’জনকেই হত্যা করবে অনেক লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে’।

‘মেয়ে দু’টি আপনার কে?’ জিজ্ঞেস করল কারসেন ঘানেম।

‘আমার কেউ নয়। কিন্তু ক্যারিবিয়ানে যখন ছিলাম, ওরা আমাকে মূল্যবান সাহায্য করেছে। তাদের বিপদের কারণ মূলত এটাই। তাদের পণবন্দী করে ওরা মনে করছে, তাদের রক্ষার জন্যে আমি ওদের কাছে আত্মসমর্পন করব। অথবা ওদের উদ্ধার করতে গেলে আমাকে ধরার একটা সুযোগ তারা পেয়ে যাবে’।

‘ইহুদী গোয়েন্দা সংস্থা ও হোয়াইট ঈগলের সাথে সরকারও তৈরী হলে আপনি এগোবেন কি করে?’

‘আমার মনে হয় পশ্চিম এলাকার চাইতে পূর্ব এলাকায় এশিয়ানদের উপর সরকারের সন্দেহ কম থাকবে। তাছাড়া একটা ছদ্মবেশ আমার আছেই। অসুবিধা হবে না’।

আহমদ মুসা থামতেই ফাতিমা ঘানেম বলল, ‘আমি একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে পারি জনাব?’

‘অবশ্যই পার’। আহমদ মুসা বলল।

‘আপনার সম্পর্কে আমরা অনেক শুনেছি, কিন্তু দেশ কোথায় জানি না’।

‘দেশ বলতে যদি জন্মস্থান বল, তাহলে আমার দেশ চাইনিজ তুর্কিস্তান। আর দেশ বলতে যদি আমি কোন দেশের নাগরিক বুঝিয়ে থাক, তাহলে নির্দিষ্ট কোন দেশ আমার নেই। বলতে পার প্রায় সব মুসলিম দেশের আমি নাগরিক’।

‘আপনার কে আছে?’

আমার রক্ত সম্পর্কের কেউ বেঁচে নেই। আমার স্ত্রী আছেন’।

‘মাফ করবেন ভাইয়া, উনি কোন দেশের, কোথায় আছেন?’ বলল ফাতিমা ঘানেম।

‘উনি ফরাসী মেয়ে, উনি এখন আছেন মদিনায়। মদিনা চেন?’

‘জি হ্যাঁ, আমাদের রাসূলের রওযা শরীফ ওখানে। মদিনাই ছিল তাঁর রাজধানী।

‘ধন্যবাদ ফাতিমা। বলত ফাতিমা, মদিনা আল্লাহর রসূলের রাজধানী ছিল, সেটাই ইসলামী বিশ্বের রাজধানী হওয়া কি উচিত নয়?’

‘অবশ্যই জনাব। কিন্তু কিভাবে?’

‘সেটা তো তোমরা মুসলিম তরুণ তরুণীরাই বলবে। তোমাদেরকেই এটা করতে হবে’।

‘মুসলিম তরুণী হিসেবে আমার দায়িত্বের কথা ভাবিইনি কোনদিন’।

‘ভাবনি, কিন্তু এখন ভাবা কি উচিত নয়?’

এখন মনে হচ্ছে ভাবা দরকার’।

ধন্যবাদ, ফাতিমা’।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘আমি আসি’।

‘আপনাকে আমরা আটকাতে পারবোনা। কিন্তু মনে রাখবেন আজকের দু’টি ঘন্টা আমাদের জীবনের ‘স্বর্গীয় এক স্বপ্ন’ হয়ে থাকবে। যা আমাদেরকে আনন্দের চেয়ে বিচ্ছেদের কষ্টই বেশী দিয়ে চলবে’। বলল মরিয়ম মইনি। তাঁর কন্ঠ ভারি।

‘এমন শত সহস্র স্মৃতির জ্বলন্ত অংগার নিয়ে আমি বেঁচে আছি মিসেস ঘানেম’।

'কিন্তু আপনার হৃদয় আকাশের মতই বিশাল, আমাদের নয়'। বলল কারসেন ঘানেম।

আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করেছে। ফাতিমা বলল, 'ভাইয়া আপনি পরশ পাথর। আমাদের মত আত্মবিস্মৃত লোহারা আপনার পরশে সোনা হতে পারে। কিন্তু জগতের লক্ষ কোটি মুসলিম তরুণীরা এ পরশ পাবে কোথায়?'

আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়াল। বলল, 'একটু ভূল হলো বোন। পরশ পাথর আমি নই, পরশ পাথর হলো আল কোরআন এবং নবীর জীবন কথা। এ দুই পরশ পাথরের স্পর্শ নাও, দেখবে তুমি সোনা হয়ে গেছ, সবাই সোনা হয়ে যাবে'।

সবাইকে সালাম দিয়ে বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল আহমদ মুসা গাড়ি বারান্দায়।

সবাই এসে দাঁড়িয়েছে গাড়ি বারান্দায়।

সবার চোখে মুখে একটা কিছু হারিয়ে ফেলার বেদনা।

আহমদ মুসা গাড়িতে উঠে বসে সবার উদ্দেশ্যে হাত নাড়ল।

স্টার্ট নিল গাড়ি। ছুটে বেরিয়ে এল কারসেন ঘানেমদের বাড়ি থেকে।

'কোথায় যাব স্যার?'

'এয়ারপোর্ট'।

নির্দেশ দিয়ে গাড়ির সিটে গা এলিয়ে দিল আহমদ মুসা।

চোখে তন্দ্রা আসছিল। হঠাৎ আহমদ মুসার খেয়াল হল, তাকে ঔষধ খেতে হবে।

আহমদ মুসা ব্যাগটা টেনে নিল। ঔষদের প্যাকেট বের করল ব্যাগ থেকে। প্লাস্টিকের একটা সুন্দর চেন আটকানো প্যাকেটে ঔষধ।

চেন টেনে প্যাকেট খুলল। খুলেই দেখতে পেল একটি মানিব্যাগ। বিস্ময়ের সাথে মানিব্যাগ হাতে নিল আহমদ মুসা। দেখল, মানিব্যাগ ভর্তি ডলার।

সান্তা আনা এ মানিব্যাগের কথা তাকে বলেনি। গোপন করেছে আহমদ মুসা নিষেধ করবে ভেবে।

একজন বিদেশী মেয়ের এই সীমাহীন শুভেচ্ছা ও আন্তরিকতায় হৃদয়টা আলোড়িত হয়ে উঠল আহমদ মুসার। দু'চোখের কোণা ভারি হয়ে উঠল তার।

এই শুভেচ্ছা, এই আন্তরিকতার কোনই মূল্য দিতে পারবে না সে। মনে পড়ল বিদায়কালীন সান্তা আনার শেষ আকুতি, ‘একজন বোনের দুই চোখ চিরদিন আপনার খোঁজ করবে’। আহমদ মুসা কি পারবে একটি হৃদয়ের সবটুকু আন্তরিকতা নিংড়ানো এই দাবীর প্রতি সাড়া দিতে? এমন মমতার কত কুসুম যে সে পদদলিত করে এসেছে তার ইয়ত্তা নেই।

আহমদ মুসার আরো মনে হলো, সান্তা আনার ডলারগুলো আল্লাহ তায়ালার যেন এক বিশেষ রহমত। তার কোমরের বেল্টে যে ডলার গুলো লুকানো আছে তা গাড়ি ভাড়া দেয়া ও বিমানের টিকিট কেনার পর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। বর্তমান অবস্থায় সান্তাফে কিংবা এদিকের কোন সিটি থেকে তার গোপন কোড নম্বর ব্যাবহার করে ব্যাংক থেকে টাকা উঠানোও নিরাপদ নয়। ওয়াশিংটন কিংবা নিউ ইয়র্কের মত মাল্টি ন্যাশনাল সিটি ছাড়া তার ব্যাংকে যাওয়া সামনে হয়তো আরও কঠিন হয়ে উঠবে। সুতরাং সান্তা আনার টাকা তার খুবই উপকার করবে। সান্তা আনা যদি জানতে পারতো তার গোপনে দেয়া ডলারগুলো কত উপকারে আসছে।

# ৬

ওয়াশিংটনের কেনেডি বিমান বন্দরে নেমেই জেনারেল শ্যারন টেলিফোন করল এফ.বি.আই প্রধান জর্জ আব্রাহাম জনসনকে। বলল, ‘এখনি আমি আপনার সাথে দেখা করতে চাই। আপনাদেরও স্বার্থ আছে, আমাদেরও স্বার্থ আছে’।

‘সেটা কোন স্বার্থ?’ বলল জর্জ আব্রাহাম জনসন।

‘লস আলামোসের ঘটনায় আপনারা যে লোককে খুঁজছেন, সে লোককে চিহ্নিত করা ও ধরার ব্যাপারে’।

‘আচ্ছা আসুন, আমি অফিসে আছি’।

আধা ঘন্টার মধ্যেই জেনারেল শ্যারন এফ.বি.আই হেড কোয়ার্টারে পৌঁছে গেল।

এফ.বি.আই চীফ তার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন।

নিজের অফিস কক্ষে জেনারেল শ্যারনকে একটি চেয়ারে বসিয়ে জর্জ আব্রাহাম জনসন নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল। বলল, ‘বলুন জেনারেল, আপনার আহমদ মুসাকে ধরার কতদূর কি হলো?’ মুখে হাসি আব্রাহামের।

‘আপনি তো সবই জানেন’।

‘সব জানি কোথায়? সবুজ পাহাড়ে আহমদ মুসা আপনাদের বোকা বানিয়েছে, সেটা আমি জানি। তার আগের ঘটনা আপনাদের সবচেয়ে বাঘা গোয়েন্দা কোহেন যে কি দুর্দশার শিকার হয়েছেন, তা শুনেছি। তারপর আর কি করলেন আমি জানি না’।

‘আমরা কিছু করিনি জনাব, যা করার সেই করেছে। সান্তাফে সিনাগগে চারজন নিহত হওয়ার খবর আপনি শুনেছেন?’

‘হ্যাঁ শুনেছি, কিন্তু কারা করেছে, কেন করেছে সে রিপোর্ট পাইনি এখনো’।

'ঐ চারজনকে হত্যা করেছে আহমদ মুসা'।

'আহমদ মুসা! আহমদ মুসা ঐ সিনাগগে হত্যাকান্ড ঘটাতে গেল কেন? যে নিহত চারজনকে পাওয়া গেছে, তারা গুরুত্বপূর্ণ কেউ নয়। পুলিশ রিপোর্ট অনুসারে ওরা ভাড়ায় খাটা অস্ত্রধারী। আরও দুই যুবকের লাশ পাওয়া গেছে লং উপত্যকায়। একই ধরনের লোক ওরা। ওরাও আপনার লোক?'

'বুঝতে পারছি না'।

'নিউ মেক্সিকো-৭৩১১১ নম্বর গাড়িতে তাদের লাশ পাওয়া গেছে'।

ওরাও আমার লোক। কিন্তু তিনজন ছিল ওরা'।

'পালিয়েছে হয়তো একজন। কিন্তু কি ব্যাপার বলুন তো?' এফ.বি.আই এবং পুলিশের ধারণা হত্যাকান্ড লক্ষ্য ছিল না, ছিল উপলক্ষ্য। এই সাথে আরও একটা মজার ব্যাপার ঘটেছে। কিডন্যাপ হওয়া কারসেন ঘানেম নাবালুসি ঐ দিন রাতেই পুলিশের কাছে রিপোর্ট করেছে যে, সিনাগগ থেকে কে বা কারা তাকে উদ্ধার করেছে। এফ.বি.আই জানে না, কিন্তু আমি তো জানি, কারসেন ঘানেমকে আপনারা কিডন্যাপ করে তার জায়গায় কোহেনকে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়েছিলেন, গ্রীন ভ্যালি সম্মেলনে। তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে জেনারেল শ্যারন?' বলল জর্জ আব্রাহাম জনসন।

'আপনি ঠিক ধরেছেন মিঃ জর্জ। আহমদ মুসা আমাদের ছয়জন প্রহরীকে হত্যা করে ঐ সিনাগগ থেকে কারসেন ঘানেমকে উদ্ধার করেছে। আমি ও গোল্ড ওয়াটার সেখানে ছিলাম। পালিয়ে এসেছিলাম হেলিকপ্টার নিয়ে'। জেনারেল শ্যারন বলল।

'তাহলে আবার পরাজিত হলেন আহমদ মুসার কাছে?' বলল জর্জ আব্রাহাম জনসন। তার মুখে হাসি।

'আমাদের শুভাকাঙ্খী হিসেবে আপনি নিশ্চয় এতে ব্যথিত হবেন। আমি আপনার কাছে ছুটে এসেছি শেষ প্রতিকারের আশায়'।

'শেষ প্রতিকার বলার মত এত হতাশ হচ্ছেন কেন? ইতিহাস থেমে যাচ্ছে না। ঘটনা বহু ঘটবে। যাক, বলুন আপনার প্রতিকারের আশাটা'।

‘আপনি বলেছিলেন না যে, আহমদ মুসার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে আইনগত কোন ভিত্তি নেই। কিন্তু এবার তো সে ভিত্তি পেয়ে গেছেন। এবার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন’।

‘সেই আহনগত ভিত্তিটা কি?’

‘লস আলামোসের স্ট্রাটেজিক রিসার্চ ল্যাবরেটরীতে যে গোয়েন্দাগিরী করতে যায়, সে কতবড় অপরাধী বলুন তো?’

‘মার্কিন নিরাপত্তা আইনে সবোর্চ্চ অপরাধী বলে গণ্য হতে পারে’।

‘আহমদ মুসা এই অপরাধ করেছে’।

‘এর অর্থ আপনি বলতে চাচ্ছেন, লস আলামোসে আহমদ মুসা প্রবেশ করেছিল?’ গম্ভীর কন্ঠে জিজ্ঞেস করল জর্জ আব্রাহাম। ভ্রু কুঁচকে উঠেছে জর্জ আব্রাহাম জনসনের।

‘কোন সন্দেহ নেই’। বলল জেনারেল শ্যারন।

‘কিন্তু কিভাবে প্রমান করা যাবে? লস আলামোসে তার যে ফটো উঠেছে, তা খুবই আংশিক। নিশ্চিত হওয়ার মত নয়’।

‘আহমদ মুসার ছদ্মবেশহীন ফটো কি আপনাদের কাছে আছে?’

‘না, নেই’।

‘আমার কাছে আছে। আহমদ মুসার এই ছদ্মবেশহীন ফটোর সাথে ঐ আংশিক ফটোকে মিলান, তাহলে দেখবেন ও দুটো একই মানুষের। আর এ ফটো দেখান সারা জেফারসনকে, দেখবেন উনি এই কথাই বলবেন। সারা জেফারসনই সেদিন নিখুঁতভাবে আহমদ মুসাকে দেখেছেন। তার আঁকা স্কেচ আমি দেখেছি। সেই স্কেচের সাথে মিল আছে আহমদ মুসার ছদ্মবেশহীন ফটোর’।

বলে জেনারেল শ্যারন পকেট থেকে একটা ইনভেলাপ বের করে এগিয়ে ধরল জর্জ আব্রাহাম জনসনের দিকে।

জর্জ আব্রাহাম জনসন ইনভেলাপ থেকে ফটোটি বের করল। ফটোর উপর চোখ পড়তেই চমকে উঠল জর্জ আব্রাহাম জনসন। এতো সেই, যে ওহাইও নদীর মৃত্যু গহবর থেকে উদ্ধার করেছিল তার নাতিকে। মনে তার একটা তোলপাড় উঠল। মন যেন সর্বশক্তি দিয়ে বলতে চাইছে, এ আহমদ মুসা না হোক।

মুহূর্তের জন্যে বিব্রত হয়ে পড়েছিল জর্জ আব্রাহাম জনসন। নিজেকে সামলে নিয়ে সে মনের কথাটা বলল, 'এ ফটোই যে আহমদ মুসার, তার প্রমাণ?'

'আপনাদের ছদ্মবেশ পরা যে সব ফটো আছে সেগুলো এবং এ ফটো কোন এক্সপার্টকে দিন প্রমাণ হয়ে যাবে। আর সারা জেফারসনকে ফটোটি দেখান, সেও বলবে এই ফটোর লোকটিই সেদিন লস আলামোসে প্রবেশ করেছিল'।

'আচ্ছা ক' মিনিট, এখনি আমরা এ দু'টির রেজাল্ট পেয়ে যাব'।

বলে জর্জ আব্রাহাম জনসন একটা নোট লিখল, নোট ও ফটোর একটা ইনভেলাপ তুলে ছুঁড়ে দিল দেয়ালের সাথে সেঁটে থাকা একটা ট্রের উপর।

সংগে সংগেই ট্রের চলন্ত বটম ইনভেলাপ নিয়ে দেয়ালের অভ্যন্তরে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

মাত্র পাঁচ মিনিট। জর্জ আব্রাহাম জনসনের সাইড টেবিলের কম্পিউটার প্রিন্টার সচল হয়ে উঠল।

জর্জ আব্রাহাম জনসন হাত বাড়িয়ে মেসেজটি নিয়ে এল। নজর বুলাল মেসেজটির উপর। তারপর বলল, 'হ্যাঁ মিঃ জেনারেল শ্যারন, আপনার কথাই ঠিক। আমাদের ফটো এক্সপার্ট কনফার্ম করেছে আমাদের ফাইলের আহমদ মুসার ফটো এবং আপনার ফটো একই লোকের। আর মিস সারা জেফারসনও কনফার্ম করেছে, আপনার ফটোর লোককেই সে লস আলামোসে সেদিন দেখেছে'। ম্লান কন্ঠ আব্রাহাম জনসনের। মন যেন আহত বোধ করছে তার। এখনও মেনে নিতে চাইছে না, ওহাইও নদীতে দেখা তার নাতির উদ্ধারকারী সেই প্রাণবন্ত, লাজুক, পরোপকারী, নির্লোভ যুবকটিই আহমদ মুসা। কিন্তু বাস্তবতা অস্বীকার করবে সে কেমন করে। ফটো ছাড়াও এ কথা সত্য, লস আলামোসে প্রবেশ করা লোকটির সাথে সেদিনের গোটা ভূমিকা আহমদ মুসার সাথেই শুধু মিলে।

জর্জ আব্রাহাম থামতেই জেনারেল বিজয়ের উল্লাসে বলে উঠল, 'এবার বলুন মিঃ জর্জ। আহমদ মুসা তো এখন আপনাদেরই আসামী'।

‘সে আসামীকে ধরার ব্যবস্থা এখন আমরাই করব মিঃ জেনারেল। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই গোটা দেশের পুলিশ ও এফ. বি.আই এজেন্টদের কাছে আহমদ মুসার ফটো পৌঁছে যাচ্ছে। আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করব তাকে ধরার জন্যে’। বলল নিরস ও গম্ভীর কন্ঠে জর্জ আব্রাহাম জনসন।

হাসিতে মুখ ভরে গেল জেনারেল শ্যারনের। বলল, ‘আপনাদের সাথে আমাদের শক্তিও যুক্ত হবে মিঃ জর্জ। ঈশ্বর করুন, আমেরিকাতেই এবার আহমদ মুসার সব খেলার ইতি ঘটবে’।

ভাবছিল জর্জ আব্রাহাম জনসন। তার স্ত্রীর কথাও একবার মনে পড়ল, তার কাছ থেকে এ বিষয়টা গোপন রাখতে হবে। ওহাইও নদীর সেই মন কাড়া যুবকটিই যে আহমদ মুসা, এটা জানলে সে যতটা আহত হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী আহত হবে সে। নাতিকে আদর করার সময় সেই যুবকটির কথা একবার মনে সে করবেই। বলবে, তোমাকে পুনর্জীবন দিয়েছে। তুমি বড় হলে সে বৃদ্ধ হবে। তখন তাঁকে খুঁজে নিয়ে একটা বিনিময় তাঁকে দিও। এবার নাতির জন্মদিনে তার জন্যে একটা প্লেট করেছিল সে।

জেনারেল শ্যারন থামলে ভাবনার সূত্রটা ছিন্ন হয়ে গেল জর্জ আব্রাহাম জনসনের। তাকাল সে হাসিতে উজ্জ্বল শ্যারনের দিকে। একটু ভেবে বলল, ‘আহমদ মুসা লস আলামোসে অনুপ্রবেশ করেছিল, এটা নিশ্চিত হওয়া গেল কিন্তু কেন ঢুকেছিল, এই জিজ্ঞাসার পরিষ্কার জবাব মিলছে না’।

‘এটা কি চিন্তার কোন বিষয় হলো মিঃ জর্জ। আহমদ মুসা তো মুসলিম দেশগুলোর এজেন্ট। বিশেষ করে সউদি আরব, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ইরানের মত দেশে যারা মৌলবাদী এবং যারা স্ট্রাটেজিক অস্ত্রের ক্ষেত্রে পশ্চিমের সমকক্ষ হবার চেষ্টা করছে, তাদের স্বার্থেই তো আহমদ মুসা কাজ করছে। একটা অজুহাতে আমেরিকায় ঢুকেছে, কিন্তু আসল টার্গেট পরমাণু ও স্ট্রাটেজিক অস্ত্রের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি চুরি করা’।

চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছে জর্জ আব্রাহাম জনসন। তার কপাল কুঞ্চিত। ঐ অবস্থাতেই নিরাসক্ত কন্ঠে বলে উঠল সে, ‘আপনার চার্জ শীট প্রমাণিত হলে সেটা একটা বড় ঘটনা হবে মিঃ জেনারেল’।

‘প্রমাণ হবেই। তাঁকে খাঁচায় পুরে, কথা বলবার মন্ত্রগুলো প্রয়োগ করুন, দেখবেন সব প্রমাণ হাতে পেয়ে গেছেন’।

কথা শেষ করেই জেনারেল শ্যারন আবার বলে উঠল, ‘আরেকটি বিশেষ কথা আপনাকে বলার আছে মিঃ জর্জ’।

‘সেটা কি?’

‘আহমদ মুসাকে কিভাবে আমরা হাতে পেতে পারি, সে সম্পর্কে কিছু বলুন’।

‘আহমদ মুসা তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আসামী। মার্কিন সরকার তাকে ধরবে, তার বিচার করবে এবং শাস্তি দেবে। আপনারা কিভাবে তাকে পাবেন?’

‘কিন্তু তাকে আমাদের পেতেই হবে। আপনি তো আমাদের লোক। এ ব্যাপারে আপনার বিশেষ সাহায্য আমরা চাই’।

‘বিশেষ সাহায্যটা কি?’

‘আহমদ মুসাকে এখন আমরাও খুঁজব, আপনারাও খুঁজবেন। এইটুকু ব্যবস্থা করুন যে, আমরা তাকে খুজেঁ পাব। অর্থাৎ আমরা তাকে ধরতে পারি সে ব্যবস্থা করুন’।

‘এটা কিভাবে সম্ভব? আমাদের আসামীকে আমাদের লোকরা আপনাদের হাতে তুলে দেবে কিভাবে? এটা দেয়া যাবে না’।

‘কিন্তু সে তো আগে থেকেই আমাদের আসামী’।

‘তা অস্বীকার করছি না। কিন্তু সে এখন আমাদের আসামী এবং সে আমেরিকায়’।

‘সবই ঠিক আছে। কিন্তু এটা অসম্ভব নয় যে, আপনাদের সহযোগিতায় সে আমাদের হাতে ধরা পড়বে এবং আমরা সবার অলক্ষ্যে তাকে আমেরিকার বাইরে নিয়ে যাব। আর আপনারা বলবেন, আহমদ মুসা তার অন্য কোন শত্রুর দ্বারা কিডন্যাপ হয়েছে’।

‘আমাদের সহযোগিতা ছাড়া আপনারা যদি এটা করতে পারেন, তাহলে আমাদের আপত্তি নেই’।

‘আপনাদের অফিসিয়াল সহযোগিতার দরকার নেই। আনঅফিসিয়াল ও ইনডিভিজুয়াল লেভেলের সাহায্য আমরা নিজেরাই ম্যানেজ করব। আপনি শুধু চুপ থাকবেন’।

জর্জ আব্রাহাম জনসন হাসল। বলল, ‘আপনাদের টাকা আছে, কিন্তু কতজনকে কিনবেন?’

‘মাফ করবেন জর্জ। আপনি আমাদের নিজের লোক বলেই বলছি, আপনার গোয়েন্দা বাহিনীর বৃহত্তর অংশ আপনাদের যতটা অনুগত, তার চেয়ে বেশী অনুগত ইহুদী স্বার্থের প্রতি’।

‘আপনাদের কথা বললেন, মিঃ শ্যারন’।

‘বলতে পারেন এ কারণে যে, আমাদের রক্ত আপনার দেহেও প্রবহমান। আত্মীয় আপনি আমাদের’।

কিন্তু মিঃ শ্যারন, লস আলামোসের ঘটনা এবং আহমদ মুসা দু’টিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ব্যাপারে ইতিবাচক কোন সমাধানে যদি আমরা পৌঁছতে না পারি, তাহলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রবল ঝড় উঠবে। আমরা তা সামাল দিতে পারবো না’।

‘সামাল আমরা দেব মিঃ জর্জ। আপনার কি জানা নেই সিনেট প্রতিনিধি পরিষদে ইহুদী স্বার্থ প্রসংগে কোন ভোটাভুটি হলে চোখ বন্ধ করে আমরাই জিতবো? প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট যতই বলুন, আমাদের কথার বাইরে তারা যেতে পারেন না। অতীতে যারা যাবার চেষ্ট করেছে, তাদের কি পরিণতি হয়েছে, তা আপনার চেয়ে আর কে বেশী জানে মিঃ জর্জ’।

‘তাহলে মিঃ শ্যারন, সবচেয়ে ভাল হয়, প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা উপদেষ্টা যদি আমাকে বলেন যে, আমি যেন মিঃ শ্যারন যেভাবে চান সেভাবে তাঁর সহযোগিতা করি’।

‘হো হো করে হেসে উঠল জেনারেল শ্যারন। বলল, ‘পাবেন এ টেলিফোন, এক্ষণি পাবেন। আপনাকে টেলিফোন করার আগ আমি তার কাছে টেলিফোন করে গোটা বিষয় তাকে ব্রীফ করেছি। তিনি আমার সাথে নীতিগত ভাবে সম্মত হয়েছেন এবং বলেছেন যে, আহমদ মুসা একটা স্পর্শকাতর ইস্যু। এ

ঝামেলাকে ডিল করার দায়িত্ব যদি আপনারা নেন, তাতে আমরা বেঁচে যাই, মুসলিম দেশগুলোর সাথে তিক্ততায় আমাদের যেতে হয় না। তবে আমি প্রেসিডেন্টের সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করে জর্জ আব্রাহাম জনসনকে জানিয়ে দিচ্ছি'।

জেনারেল শ্যারনের কথা শেষ হতেই জর্জ আব্রাহাম জনসনের লাল টেলিফোন বেজে উঠল।

জর্জ আব্রাহাম জনসন তড়াক করে চেয়ারে সোজা হয়ে বসল। তুলে নিল টেলিফোনের রিসিভার।

ওপার থেকে কথা বলে উঠল প্রেসিডেন্টের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিলটনের কন্ঠ।

শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর আলেকজান্ডার হামিলটন বলল, 'মিঃ জর্জ জেনারেল শ্যারনের সাথে আপনার কোন কথা হয়েছে?'

'হয়েছে স্যার'। জর্জ আব্রাহাম জনসন বলল।

'আহমদ মুসা সত্যিই কি লস আলামোসের ঘটনার সাথে জড়িত?'

'এখন পর্যন্ত এটাই নিশ্চিত হওয়া গেছে স্যার'।

'জেনারেল শ্যারনের প্রস্তাব তো আপনি শুনেছেন। ব্যক্তিগতভাবে আমার খারাপ মনে হচ্ছে না। তারপর আমি প্রেসিডেন্টের সাথে ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করলাম। আহমদ মুসাকে তাদের হাতে দিতে তারও আপত্তি নেই। কিন্তু আহমদ মুসার কাছ থেকে জেনে নিতে হবে, লস আলামোসে গোয়েন্দাগিরির গোড়া কোথায়। তিনি বলেছেন, আহমদ মুসা বড় কথা নয়। বড় কথা হল কাদের, কি স্বার্থ পূরণের জন্যে এই উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। এটা আমাদের জানতে হবে। দ্বিতীয়ত, আহমদ মুসাকে সরাসরি তাদের হাতে দেয়া যাবে না। আসামীকে তো অনেক সময় কেড়ে নেয়া হয়, জোর করে মুক্ত করে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদেরকেও আসামী ঐভাবে ছিনিয়ে বা সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বুঝছেন তো আপনি ব্যাপারটা। প্রেসিডেন্ট যেভাবে বলেছেন, সেভাবেই কাজ হতে হবে'।

'জি স্যার, বুঝেছি, এভাবেই কাজ হবে'। বলল টেলিফোনে জর্জ আব্রাহাম জনসন।

উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল জেনারেল শ্যারন।

জর্জ আব্রাহাম জনসন টেলিফোন রাখতেই সে বলে উঠল, ‘কি বললেন উনি?’

‘উনি যুক্তিসংগত কথা বলেছেন। গ্রেফতারের পর আহমদ মুসা আমাদের কাস্টডিতে থাকবে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিস জানার পর আপনাদের হাতে তাকে দেয়া হবে। তবে এই দেয়াটা সরাসরি হাতে তুলে দেয়া নয়। আমাদের কাস্টডি থেকে তাকে কিডন্যাপ বা ছিনতাই করে নিতে হবে আপনাদেরকে। অবশ্য সে সুযোগ আমরা সৃষ্টি করব’।

‘একই কথা, তবে একটু ঘোরা পথে হলো এই আর কি!

‘অনেক হারের পর এক বড় বিজয় হলো আপনাদের জেনারেল শ্যারন’।

‘এতে আনন্দের কিছু নেই। এটা অবধারিত ছিল’।

‘হ্যাঁ তাই। আপনাকে বলতে বাধা নেই, আমরা তো একই রক্তের এবং আপনি সব জানেন। মার্কিন গণতন্ত্র ইহুদীদের টাকায় আজ এতটাই অষ্টে-পৃষ্ঠে বাধা যে, আমাদের কোন কথাই ফেলে দেয়ার কোন ক্ষমতা মার্কিন সরকারের নেই। মার্কিন গণতন্ত্র ও মার্কিন স্বাধীনতার এই অন্ধকার দিকের কথা অধিকাংশ মার্কিনীদেরও জানা নেই’।

‘মিঃ জেনারেল শ্যারন। আমি একজন মার্কিনী। আমি আপনাকে বলছি, টাকার কারণে মার্কিনীদের কারও মুখাপেক্ষী হওয়া, কারও কথা মেনে নেয়া আর মার্কিনীদের দক্ষতা, যোগ্যতা ও চিন্তা ভাবনা কিন্তু এক জিনিস নয়। সময়ে এর প্রমাণ পাওয়া যায়’।

‘অবশ্যই পাওয়া যায়। কিন্তু সেটা সাময়িক ব্যাপার। কিন্তু গণতন্ত্র এবং নির্বাচন স্থায়ী ব্যাপার, তেমনি টাকার মুখাপেক্ষিতাও স্থায়ী ব্যাপার। আর মিঃ জর্জ টাকার মুখাপেক্ষিতা বলতে প্রপাগান্ডা মিডিয়ার মুখাপেক্ষিতাও বুঝায়। গণতন্ত্র ও নির্বাচন যদি থাকে, তাহলে টাকা এবং টাকা কেন্দিক বিষয়ের প্রতি মুখাপেক্ষিতা ক্রমবর্ধমান হারে বাড়বেই’।

‘মিঃ শ্যারন আপনি জীবনের একটা দিকের কথা বলছেন। একটা দিক সবদিক নয়’।

‘সবদিক নয়, কিন্তু সবদিককে নিয়ন্ত্রণ করছে ঐ একদিক’।

‘কিন্তু মিঃ শ্যারন, আপনার কথায় একটা নগ্ন অহংকার প্রকাশ পাচ্ছে’।

জেনারেল শ্যারন হাসল। বলল, ‘বোধ হয় এটা ইহুদী রক্তেরই বৈশিষ্ট। স্মরণ করুন, আপনার মায়ের মধ্যেও এটা দেখতে পাবেন’।

‘দেখতে চাই না মিঃ শ্যারন। আমি এই অহংকারকে দু’চোখে দেখতে পারিনা’।

‘আপনার এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার’।

বলে একটু থেমেই জেনারেল শ্যারন বলল, ‘আমি এখন উঠব মিঃ জর্জ। শেষ কথাটা হয়ে যাক’।

‘কি শেষ কথা?’

‘আহমদ মুসা প্রথমে আপনার কাস্টডিতে যাচ্ছে, তারপর আমরা পাচ্ছি। তাহলে তাকে গ্রেপ্তারের ব্যাপারে আমাদের কোন করণীয় থাকছে না। তাই কি?’

‘আমরা আপনাদের সহযোগিতাকে স্বাগত জানাব’।

‘তাহলে ঠিক আছে। আমাদের জানা তথ্য আপনাদের দেব, আপনারাও আমাদের জানাবেন। এইভাবে হয়তো অতিসত্ত্বর আমরা আহমদ মুসাকে গ্রেপ্তার করতে পারবো’।

‘আমরা তাই আশা করছি। এফ.বি.আই., পুলিশ, সি.আই. এ সবাই এখন একযোগে কাজ করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে তার পালানোর পথও আমরা বন্ধ করছি’।

‘মিঃ জর্জ নিশ্চিত থাকুন, আহমদ মুসা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে পালাবে না’।

‘এতটা নিশ্চিত হচ্ছেন কেমন করে?’

‘কারণ, তার দু’জন ঘনিষ্ট লোক আমাদের হাতে বন্দী আছে। তাদের উদ্ধার না করে সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এক পা নড়বে না’।

‘কারসেন ঘানেম বন্দী ছিল, সে মুক্ত হয়েছে, আরও কারা বন্দী আছে?’

'টার্কস দ্বীপপুঞ্জের ডাঃ মার্গারেট এবং লায়লা জেনিফার। এদের মধ্যে ডাঃ মার্গারেট তার প্রেমিকা এবং লায়লা জেনিফার তার খুব স্নেহভাজন এবং বন্ধু পত্নী'।

'না, মিঃ শ্যারন আপনার তথ্যে ভূল আছে। আহমদ মুসা বিবাহিত। তার শত্রুও স্বীকার করে, তার জীবন অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র। তার প্রেমিকা থাকবে, এ কথাটা ঠিক নয়'।

'হতে পারে। এ তথ্য আমার নয়। অনেকের অনুমান এটা'।

'আপনি ঠিক বলেছেন, আহমদ মুসার যে চরিত্র তাতে দু'জন নারীকে অসহায় অবস্থায় ফেলে সে পালাবে না। এটা আমাদের জন্যে একটা প্লাস পয়েন্ট হলো যে, তাকে আমরা আমেরিকাতেই পাচ্ছি'।

বলল জর্জ আব্রাহাম।

অবশ্যই।

বলে শ্যারন উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আপনার অনেক সময় নিয়েছি, তবে আলোচনা আমাদের সফল। আপনাকে ধন্যবাদ।

জর্জ আব্রাহামও উঠে দাঁড়াল এবঙ বিদায়ী হ্যান্ডশেকের জন্যে শ্যারনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

'আমেরিকান' এয়ারলাইন্সের একটা যাত্রীবাহী বিমান তখন ছুটে চলেছে টিনেমির ন্যাসভিল শহরের উদ্দেশ্যে।

আহমদ মুসা প্রথম শ্রেনীর মাঝামাঝি জায়গায় মাঝের সারির প্রথম সিটে বসেছে। সিটটি প্লেনের মাঝ বরাবর দীর্ঘ করিডোরটির পাশে।

আহমদ মুসার গন্তব্য ফ্লোরিডার মিয়ামী। কিন্তু প্লেন যাচ্ছে এখন ন্যাসভিলে। সান্তাফে থেকে প্লেন আকাশে উড়ার পর প্লেন ডালাসে নেমেছে। ন্যাসভিলই শেষ স্টপেজ। এরপর সোজা মিয়ামীতে। সরাসরি মিয়ামীর প্লেন তখন না পাওয়ায় বাধ্য হয়ে আহমদ মুসাকে দুই স্টপেজের এই বিমানেই উঠতে হয়েছে।

রাত তখন তিনটা।

আহমদ মুসা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। প্যান্টের কাপড়ে টান পড়ায়

চমকে উঠে চোখ মেলল। দেখল, একটা কুকুর তার প্যান্টের কাপড় কামড়ে ধরেছে।

কুকুরটির গলায় চামড়ার সুদৃশ্য বেল্ট। তার সাথে রুপালী একটা চেন।

কুকুরটি দেখেই বুঝতে পারল আহমদ মুসা আসলে শিয়াল-জাতের এই কুকুরটি খুবই মূল্যবান।

পেছনের দিক থেকে একজন লোক ছুটে এল। এসে কুকুরের চেন ধরে টেনে নিল এবং আহমদ মুসার দিকে চেয়ে বলল, 'স্যরি, কুকুরটি আপনাকে ডিস্টার্ব করার জন্যে'।

লোকটি ছয় ফুটের মত লম্বা। পরণে কমপ্লিট স্যুট। চোখে গগলস।

লোকটি কুকুরটিকে টেনে নিয়ে চলে গেল।

আহমদ মুসার মুখে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল। মনে মনে বলল, স্যরি বলার দরকার নেই। চিনেছি তোমাকে কুকুরটিকেও। তোমার মতই কুকুরটিও এফ.বি.আই-এর গোয়েন্দা কর্মী।

বিস্মিত হলো আহমদ মুসা। এফ.বি.আই তাকে ধরার জন্যে এতটাই মরিয়া হয়ে উঠেছে যে, গন্ধ শুকেঁ তাকে ধরার জন্যে গোয়েন্দা কুকুরও ব্যবহার করছে।

আহমদ মুসার বোঝার বাকি রইল না, কুকুর এসে তার কাপড় কামড়ে ধরা বিনা কারণে নয়। শ'খানেক যাত্রীর মধ্যে তাকেই কুকুর টার্গেট হিসেবে চিহ্নিত করেছে। কুকুরের মিশন শেষ হবার পর কুকুরকে ওরা ফিরিয়ে নিয়ে গেল এবং চিনে গেল আহমদ মুসাকে।

এখন ওদের পরিকল্পনা কি?

ওরা কি তাকে মিয়ামী পর্যন্ত ফলো করবে?

প্লেনে তার কিছু করার নেই। সুতরাং ঘটনার নিয়ন্ত্রণ তার হাতে এখন নেই। যখন নেই তখন আর চিন্তা কেন? আল্লাহ ভরসা বলে আহমদ মুসা কুকুর ও লোকটির চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আবার ঘূমাবার চেষ্টা করলো।

চোখ বুজে সিটে গা এলিয়ে বসে আছে আহমদ মুসা।

ন্যাসভিল বোধহয় এসে গেছে।

প্লেন এখন নিচে নামছে। ঘোষণাও হলো কেবিন মাইকে। কিন্তু আহমদ মুসার নামার স্থান এটা নয়, এ জন্যে ঘোষণায় তার কাজ নেই। চেষ্টা করছে সে সেই ঘুমের পরিবেশে আবার ফিরে যেতে।

প্লেন ল্যান্ড করেছে।

প্লেন গড়িয়ে এসে এক সময় দাঁড়িয়ে পড়ল।

'এক্সকিউজ মি স্যার' শব্দটি কানে এলো আহমদ মুসার।

শব্দের উৎস উপলব্ধি করে বুঝল কথাটি তাকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে।

চোখ খুলল আহমদ মুসা। দেখল সেই লোকটি তার সামনে দাঁড়িয়ে। লোকটির পেছনে আরও দু'জন লোক। আহমদ মুসা বুঝল, এ লোকটির মত ওরাও এফ.বি.আই এজেন্ট।

আহমদ মুসা চোখ খুলতেই সামনের লোকটি আহমদ মুসার দিকে একটু ঝুঁকে একটা কার্ড আহমদ মুসার সামনে তুলে ধরে ফিস ফিসে কন্ঠে বলল, 'স্যার আমরা এফ.বি.আই এর লোক। আপনাকে এখানে নামতে হবে'।

'ওয়েলকাম', বলে সোজা হয়ে বসল আহমদ মুসা এবং বলল, 'ঠিক আছে চলুন'। আহমদ মুসার প্রশান্ত মুখে স্বাভাবিক এক টুকরো হাসি।

আহমদ মুসা পাশ থেকে তার ছোট্ট ব্যাগটি তুলে নিল হাতে। উঠে দাঁড়াল সে।

হাঁটতে শুরু করল প্লেনের দরজার লক্ষ্যে।

ওরা তিনজনও হাঁটছে আহমদ মুসার পেছনে। তাদের প্রত্যেকেরই একটি করে হাত কোটের পকেটে ঢোকানো। প্রত্যেকের হাত সেখানে রিভলবারের বাঁটে।

প্লেন থেকে তারা নামতেই আরও কয়েকজন আহমদ মুসাকে ঘিরে দাঁড়াল।

তারা সবাই তাকে চারদিক ঘিরে নিয়ে চলল কিছু দূরে রাখা এক বড় জীপ গাড়ির দিকে।

প্রথমে তারা আহমদ মুসাকে গাড়ির আড়ালে নিয়ে একজন বলল, 'স্যার আপনি হাত তুলে দাঁড়ান আমরা আপনাকে সার্চ করতে চাই'।

আহমদ মুসা হাত তুলে দাঁড়াল। তারা আহমদ মুসার কোট ও প্যান্টের পকেট হাতড়ে দু'টি রিভলবার বের করে নিল।

হাতের ব্যাগও তারা সার্চ করল কিছুই পেল না।

আট সিটের বিরাট জীপ গাড়ি।

আহমদ মুসাকে মাঝের রো'তে তুলে সবাই তার চারদিকে ঘিরে বসল।

মোটা ওরা সাত জন। আহমদ মুসা বুঝল, সবাই ওরা এফ. বি. আই-এর লোক। তাকে সম্ভবত ওরা নিয়ে যাচ্ছে ন্যাসিভিলের এফ.বি.আই কাস্টডিতে।

মুক্তির চিন্তা আহমদ মুসার মনে জাগল। কারণ জেনারেল শ্যারন তাকে দশদিন সময় দিয়েছে। এর মধ্যে আহমদ মুসা আত্মসমর্পন না করলে বা ডাঃ মার্গারেটদের উদ্ধার করতে না পারলে ওদের কি ভয়াবহ পরিণতি হবে, তা সে জানে। সুতরাং এফ.বি.আই এর হাতে বন্দী হয়ে থাকলে সময় নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু এফ.বি. আই-এর হাত থেকে মুক্তিটা খুব সহজ নয়।

কিন্তু সংগে সংগেই আহমদ মুসার মন বলে উঠল, আল্লাহ সব শক্তিশালীদের চেয়ে বড় শক্তিশালী।

দেখা যাক আল্লাহ কি করেন, ভাবল আহমদ মুসা।

ছুটে চলছে গাড়ি ন্যাসভিলের সুন্দর ও প্রশস্ত রাজপথ দিয়ে।

আহমদ মুসা কখনও ন্যাসভিলে আসেনি। সুন্দর সবুজ ন্যাসভিল।

রাস্তায় মানুষ নেই। আছে পিপড়ের সারির মত গাড়ি। এত রাতেও।

নিরব শহর, নিরব রাজপথ। মাঝে মাঝে গাড়ির দু'একটা হর্ন নিরবতার মাঝে স্পন্দন তুলছে।

হঠাৎ পেছন থেকে পুলিশের একাধিক গাড়ির সাইরেন শোনা গেল। সাইরেন অব্যাহতভাবে বাজছে। সেই সাথে একাধিক গাড়ির অব্যাহত হর্নও শোনা গেল। হঠাৎ চারদিকের গাড়িগুলোও যেন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, যেন তারা রাস্তা থেকে সরে যাবার জন্যে মরিয়া।

সামনে থেকে একজন এফ.বি.আই অফিসার ওয়াকি টকিতে কথা বলতে লাগল।

পেছনে একজন দ্রুত কন্ঠে চিৎকার করে উঠল গাড়ি সাইড়ে নাও। কিন্তু কন্ঠের শব্দ বাতাসে মেলাবার আগেই প্রচন্ড ধাক্কা গাড়িটিকে খেলনার মত ছুড়ে ফেলে দিল।

প্রচন্ড ধাক্কা খেয়ে গাড়িটা ছিটকে গিয়ে সামনের গাড়িগুলোর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তারপর উল্টে গিয়ে কয়েকবার ওলট পালট হলো।

গাড়িটা স্থির হওয়ার পর আহমদ মুসা আশ্বস্ত হতে পারল এবং গাড়ির চারদিকে তাকাল, দেখল, গাড়ির সামনের ও পেছনের দু'জন রক্তাক্ত অবস্থায় কেউ গাড়ির সিটে, কেউ গাড়ির মেঝেতে পড়ে আছে। আহমদ মুসার দুপাশের দুজনও মারাত্মক আহত, কিন্তু সংগাহীন নয়। আর আহমদ মুসার কপালের একটা অংশ থেঁতলে গেছে।

আহমদ মুসা গাড়ির দরজা খোলার চেষ্টা করল। পারল না। পাশের দু'জনের দু'টি রিভলবার গাড়ির মেঝেতে পড়ে ছিল।

আহমদ মুসা রিভলবার দু'টি তুলে নিল।

গুলি করে ভেঙ্গে ফেলল দু'পাশের জানালাগুলো।

তারপর আহমদ মুসা প্রথমে পেছনের ও সামনের মুমূর্ষু পাঁচজনকে জানালা দিয়ে বের করে আনল।

সবশেষে তার পাশের দু'জনকে বের করল। এদের মুখ ও মাথার এক পাশ থেঁতলে গেছে।

যদিও রাত তখন প্রায় চারটা। তবু প্রচুর গাড়ি রাস্তায়। গাড়ির ভিড় জমে গেছে।

সাহায্যের জন্যে ছুটে এসেছে অনেকে।

কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ির এবড়ো থেবড়ো ভিড়ে সাহায্যকারী গাড়িগুলো দ্রুত আসতে পারছে না কাছে।

দু'টো গাড়ি পরেই একটা টয়োটা ক্যারিয়ার দেখল আহমদ মুসা। তাতে ড্রাইভিং সিটে একজন মাত্র লোক।

আহমদ মুসা হাত তুলে তার দিকে ইশারা করল। ঐ গাড়ির ড্রাইভিং সিটের লোকটিও বেরিয়ে এসেছে। সেও এগিয়ে এল।

আহমদ মুসা মুমূর্ষদের একজনকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে গাড়ির দিকে ছুটল।

আহমদ মুসা আহতদের গাড়িতে তুলতে লাগল। আর গাড়ির লোকটি তাদের কিছু শুশ্রুষা করে দিল।

আহমদ মুসার পাশের আহত দু'জনের একজন তখনও বাকি। সে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছিল। আহমদ মুসা তার দিকে এগোচ্ছিল। আহমদ মুসা বলল তাকে হাঁটতে পারবেন?'

এফ.বি.আই এর এ লোকটির সাথেই প্লেনে আহমদ মুসার প্রথম দেখা হয়। সেই কুকুরটি আনার ছলে গিয়ে আহমদ মুসার সাথে কথা বলেছিল।

'চেষ্টা করি, আপনি অনেক কষ্ট করেছেন'। বলল লোকটি।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'চেষ্টা না করলেও পারেন, কারণ দেরী হবে এতে। তাড়াতাড়ি ওদেরকে হাসপাতালে নেয়া দরকার'।

বলে আহমদ মুসা তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে ছুটতে লাগল ঐ গাড়ির দিকে।

'আমরা আপনার শত্রু, আপনাকে বন্দী করেছি। পরিণামটা আপনি জানেন। আপনি এতক্ষণ পালাননি কেন?'

'মানুষ হিসেবে যে কাজটুকু করার, তা শেষ করেই আমি পালিয়ে যাব। আর যে বললেন আপনারা আমার শত্রু? এখন আপনারা মানুষ। সুস্থ হয়ে রিভলবার হাতে নিয়ে যখন আমাকে তাড়া করবেন, তখন হবেন আমার প্রতিপক্ষ'।

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই তারা গাড়ির পাশে পৌঁছে গেল।

আহমদ মুসা তাকে গাড়িতে রেখে গাড়ির লোকটিকে বলল, 'আপনি দয়া করে এদের হাসপাতালে পৌছেঁ দিন।

লোকটি দ্রুত গিয়ে ড্রাইভিং সিটে বসল।

আহমদ মুসা তার কাঁধের ব্যাগ থেকে একটা ওয়াকি টকি বের করে আহত সেই লোকটির হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'এটা আপনাদের ঐ সংঙ্গাহীন অফিসারের ওয়াকি টকি। ওয়াকি টকিতে এখনি আপনি জানিয়ে দিন গাড়ি

এ্যাকসিডেন্ট হওয়ার সুযোগ নিয়ে আহমদ মুসা পালিয়েছে। আর সত্যিই আমি এখন পালাচ্ছি'।

লোকটি ওয়াকি টকি হাতে নিল। বলল, 'আমি সত্যিই আনন্দিত যে, আপনাকে দেখতে পাওয়ার সৌভাগ্য আমার আজ হলো। আপনি কি মনে করেন আমার ভেতরে কোন বিবেক নেই?'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, আইনের যারা চাকর, তাদের ব্যক্তিগত বিবেক, ব্যক্তিগত বিচার বুদ্ধি থাকেনা'।

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা তার ডান হাত তুলে 'বাই' বলে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল।

সে সময় গাড়ি স্টার্ট নিয়ে চলতে শুরু করেছে।

আহমদ মুসা তার পেছনেই কিছু একটা সশব্দে আঁছড়ে পড়ায় চমকে উঠে পেছনে ফিরে তাকাল। দেখতে পেল একটা খন্ড বিখন্ড ওয়াকি টকি। আরও পেছনে তাকাল আবছা আলোতে দেখল, টয়োটা ক্যারিয়ারের পেছনে বসা এফ.বি.আই-এর সেই লোকটি হাসছে।

আহমদ মুসা আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল। তার সমস্ত শরীর রক্তাক্ত।

কপাল থেঁতলে গিয়ে মুখ এবং আহতদের তুলতে গিয়ে জামা প্যান্ট সব রক্তাক্ত হয়ে পড়েছে।

কোথায় যাবে আহমদ মুসা। একে রাত, তার উপর এ শহরের কিছু চেনে না সে।

একটা গাড়ির হেড লাইটের সামনে পড়ে গেল সে। গাড়িটা অল্প সামনে এস ব্রেক কষল।

গাড়ি থেকে বেরিয়ে একজন ছুটে এল তার দিকে। আহমদ মুসার সামনে এসে শশব্যাস্তে বলল, 'আপনি তো আহমদ। আসুন আমার গাড়িতে আসুন'।

আহমদ মুসাকে গাড়িতে বসিয়ে বলল, 'কোথায় লেগেছে আপনার?' বলুন, আমি ডাক্তার'।

‘আমার কপালের এক জায়গায় থেঁতলে গেছে। কিন্তু গাড়ির অন্যান্য মুমূর্ষদের উদ্ধার করতে গিয়ে রক্তে ভিজে গেছি’।

‘ওরা কোথায়?’

‘হাসপাতালে, কম আহত বলে অন্যদের জায়গা করে দিয়েছি’।

‘ধন্যবাদ। আপনাকে বিদেশী এশিয়ান মনে হচ্ছে’।

‘হ্যাঁ, বিদেশী। এই অল্পক্ষণ আগে প্লেন থেকে নেমেছি। এয়ারপোর্ট থেকে যাচ্ছিলাম শহরে। এই সময় এ্যাকসিডেন্ট’।

‘আমি ডাক্তার, কোন অসুবিধা হবে না। আমিও এক সময় এশিয়ান ছিলাম। আমার বাসায় যেতে আপনার আপত্তি নেই তো?’

‘ধন্যবাদ। কোথাও তো একটা আশ্রয় দরকার আমার’।

আহমদ মুসা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল যে, তাকে হাসপাতালে বা ক্লিনিকে যেতে হলো না। এফ.বি.আই-এর লোকটি যদিও খবরটা তার সরকার বা সংস্থাকে জানায়নি। কিন্তু শীঘ্রই তারা জেনে যাবে এবং শহরের হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোতেই প্রথম তারা হানা দেবে।

‘আমি খুশী হলাম’। বলে ডাক্তার স্টার্ট দিল তার গাড়ি।

ডাঃ আহমদ আশরাফের চোখেমুখে উত্তেজনা ও আনন্দ।

তীর বেগে এগিয়ে চলছে তার গাড়ি বাড়ির দিকে।

ক্লিনিক থেকে ফিরছে ডাঃ আহমদ আশরাফ। আজ সময়ের দু’ঘন্টা আগে সে বাসায় ফিরছে। প্রতিদিন একটায় বাসায় ফেরে সে। নামাজ ও লাঞ্চ সেরে রেস্ট নিয়ে আবার পাঁচটার দিকে ক্লিনিকে যায়।

শুধু অসময়ে ফেরা নয়, তার মনে হচ্ছে গাড়ির যদি পাখা থাকতো, তাহলে উড়ে যেত সে বাড়িতে।

চোখে মুখে উত্তেজনা ও আনন্দের সাথে সাথে তার মনে চিন্তারও তোলপাড়।

সে আহমদ ও এশিয়ান দেখে আগ্রহের সাথে তাকে বাসায় এনেছিল। তারপর ভোরবেলা যখন তাকে নামাজ পড়তে দেখল, তখন মুসলমান জেনে তার আনন্দ দ্বিগুন বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু আজ ক্লিনিকে গিয়ে এফ.বি. আই এজেন্টের কাছে তার ছবি দেখে এবং নাম পরিচয় পেয়ে আনন্দে তার বুক ফেটে যেতে চাইছে।

ডাঃ আহমদ আশরাফ ক্লিনিকে গিয়েছিল সকাল দশটায়। আর সাড়ে দশটার দিকে এফ.বি.আই-এর লোকেরা ক্লিনিকে এসেছিল। ক্লিনিক তারা সার্চ করেছিল আহমদ মুসা ক্লিনিকে আছে কিনা। যাবার সময় আহমদ মুসার একটা ফটো দিয়ে বলেছিল, 'এই লোকের নাম আহমদ মুসা। মার্কিন সরকার যে কোন মূল্যে তাকে গ্রেফতার করতে চায়'।

এফ.বি.আই এজেন্টরা ডাঃ আহমদ আশরাফকে খবরটা দিয়েছিল তাকে সাবধান করার জন্যে। কিন্তু খবারটায় ডাঃ আহমদ আশরাফ যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়ে গেল।। সে এবং তার পরিবার আহমদ মুসার কথা অনেক পড়েছে, অনেক কিছু জেনেছে। এমনকি সম্প্রতি টার্কস দ্বীপপুঞ্জ ও ক্যারিবিয়ানে যা ঘটেছে তাও তারা জানতে পেরেছে তার এক মুসলিম গোয়েন্দা বন্ধু ও মুসলিম এ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে। সেই কিংবদন্তীর, সেই স্বপ্নের আহমদ মুসা যে তার বাড়িতে এ কথা ভাবতেই তার বুক ফেটে যাচ্ছে আনন্দ ও গৌরবে।

ডাঃ আহমদ আশরাফ তাই এফ.বি.আই এজেন্টরা চলে যেতেই ছুটেছে বাড়ির দিকে।

ডাঃ আহমদ আশরাফকে সকাল ১১টায় বাড়ি ফিরতে দেখে তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল, অশুভ কিছু ঘটেনি তো! আজ রোববার বেল তার ছেলে মেয়েরা সবাই বাড়িতে।

সবাই এসে দাঁড়িয়েছে গাড়ি বারান্দার উপরের করিডোরে।

ডাঃ আহমদ আশরাফ গাড়ি থেকে নামতেই তার স্ত্রী বলে উঠল, কি ব্যাপার! ভাল আছ তো? সব ঠিক আছে তো?'

ডাঃ আহমদ আশরাফ বারান্দায় উঠে আসতে আসতে বলল, 'সব ঠিক আছে। কিন্তু একটা মহাখবর আছে, কিছু উদ্বেগের কথাও আছে'।

সবাই গিয়ে বসল ভেতরের ফ্যামিলি ড্রইংরুমে।

ডাঃ আহমদ আশরাফের ছোট্ট পরিবার। স্ত্রী ফায়জা আশরাফ, মেয়ে সারা সাদিয়া এবং ছেলে আহমদ আশফাক। ছেলে মেয়ে দু'জনেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে।

মেয়ে তার আব্বার পাশে বসেছিল, 'আব্বু তুমি আমাদের সবাইকে চমকে দিয়েছ। বল, কি ঘটনা?

'আমি তো ভেবেছিলাম ক্লিনিক নিয়ে কোন ঝামেলায় পড়লে কি না'। বলল ফায়জা আশরাফ, আহমদ আশরাফের স্ত্রী।

'আমি কিন্তু ভেবেছি, বাড়িতে একজন অসুস্থ মেহমান আছেন, এজন্যে বোধ হয় আব্বু রোববারটা বাড়িতে কাটাবেন'। বলল ছেলে আহমদ আশফাক।

'মেহমান কোথায়?' স্ত্রীর দিকে চেয়ে বলল ডাঃ আহমদ আশরাফ।

'শুয়ে আছেন তাই না?' ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল ফায়জা।

'না, উনি শোননি আম্মা। এতক্ষণ বাগানে পায়চারি করে বেড়িয়েছেন। এখন বই পড়ছেন'।

আব্বু উনি খুব স্পষ্ট কথা বলেন। আমি মার্কেট থেকে ফেরার পথে তাঁর সামনে পড়ে গিয়েছিলাম। আমি সালাম দিলাম। উনি সালাম নিয়ে বললেন, 'সারা একটা কথা বলব'।

আমি বললাম, 'বলুন'।

'তোমাকে আরও বড় ওড়না পরতে হবে এবং তা মাথায়ও দিতে হবে'।

'আমি খুবই লজ্জা পেয়েছিলাম। আবার রাগও হয়েছিল। আমি তাঁর উত্তরে কোন কথা বলিনি'।

'উনিই বললেন, 'কিছু মনে করো না বোন। তোমরা এমন মহান জাতির সদস্য যাদেরকে আচার ব্যবহারে, জ্ঞানে বিজ্ঞানে, সজ্জা শালিনতায় পৃথিবীতে অন্য সবার মডেল হতে হবে'।

'স্যরি আমরা এভাবে কোন দিন ভাবিনি'। বলে দৌড়ে পালিয়ে এসেছি আমি। সাংঘাতিক লোক আব্বা। কথা বলার সময় একবারও মুখ তোলেনি'।

‘আপু আরো কি ঘটেছে জানো না তো। বড় বোনকে লক্ষ্য করে বলল আশফাক’।

কি ঘটেছে? বলল সারা।

‘রিংয়ে ও বারে জিমনেশিয়ামের প্র্যাকটিস করছিলাম। উনি সেখানে গেলেন। উনি আজ যা শিখিয়েছেন, তা আমাকে কেউ শেখায়নি। উনি সাংঘাতিক জিমন্যাস্ট আব্বা। আমি কারাত ও কুংফুর কথা তুলেছিলাম। দেখলাম ও দুই বিষয়েও উনি মাস্টার। আমি তার সাথে অনেক বেড়িয়েছি। আমাকে উনি জিজ্ঞেস করেছিলেন বলত, মুসলমানদের পতনের কারণ কি? আমি বলেছিলাম, মুসলমানদের অনৈক্য এবং প্রতিপক্ষের জ্ঞান ও সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব। উনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, অনৈক্য এবং জ্ঞান ও সামরিক ক্ষেত্রে মুসলমানেদের পিছিয়ে থাকার কারণ কি? এ প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারিনি। তিনি বলেছিলেন, নিজে শিক্ষিত হওয়া ও অন্যকে শিক্ষা দেয়া, নিজে জ্ঞানি হওয়া ও অন্যকে জ্ঞান দেয়া, নিজে ভাল হওয়া, অন্যকে ভাল করা, নিজে পথের উপর থাকা অন্যকে পথে আনা মুসলমানদের অপরিহার্য্য দায়িত্ব। কিন্তু মুসলমানেরা যখন অন্যকে শিক্ষিত করা, ভাল করা ও পথ দেখানোর কাজ ছেড়ে দিল, তখন মুসলমানরা নিজেরাও অশিক্ষিত, জ্ঞানহীন, মন্দ চরিত্র ও পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ল। এ রকম একটি জাতির অনৈক্যের শিকার হওয়া ও সমর শক্তিতে দুর্বল হয়ে পড়া অবশ্যাম্ভাবী। যুদ্ধে অস্ত্রের চেয়ে বেশী প্রয়োজন হয় মানসিক শক্তির। আর এ মানসিক শক্তি আসে জ্ঞান, চরিত্র ও জাতিগত মহত্তর আদর্শ থেকে। মুসলমানরা এসব হারিয়ে ফেলার পর তাদের পতন ঘটেছে’।

‘আমি বলেছিলাম, এসব তো অতীতের কথা। ভবিষ্যতে মুসলমানদের কি হবে? সব জায়গায় তো মারা মার খাচ্ছে’।

‘উনি বললেন, মুসলমানদের ভবিষ্যত নির্ভর করছে তোমাদের মত তরুন মুসলমানদের ভবিষ্যতের উপর। একটি আদর্শ পরিবার যেভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় একক একটি লক্ষ্যে, তেমনিভাবে মুসলিম সমাজকে যদি গড়তে পার, যদি তোমরা নিজেরা বিশ্বাসদীপ্ত জ্ঞানী ও সুশিক্ষিত হয়ে তোমাদের জ্ঞান ও শিক্ষা ইসলাম প্রচারে ও মানুষকে পথ দেখানোর মিশনারী হিসেবে ব্যবহার কর,

যদি পুলিশের দক্ষতা ও সৈনিকের যোগ্যতা অর্জন কর, তাহলে বিজয় তোমাদের হাতে আসবে, বিশ্ব সাম্রাজ্য আবার তোমার ফিরে পাবে'। আরও অনেক কথা বলেছিলেন তিনি। সত্যি আব্বু এক ঘন্টায় আমি ওঁর কাছে যেন এক যুগের জ্ঞান শেখে ফেলেছি। আমি আমাকে ও মুসলিম সমাজকে যেন নুতন রূপে দেখছি'। থামল আহমদ আশফাক।

'আমাদের মেহমান মনে হচ্ছে মিশনারী লোক, না হয় ইতিহাসের ভাল অধ্যাপক'। বলল ফায়জা আশরাফ।

'কিন্তু আম্মা, আশফাক যা বলল তাতে তো তিনি ক্রীড়াবিদ কিংবা ফাইটার হয়ে যাচ্ছেন'। বলল সারা সাদিয়া।

হাসল ডাঃ আহমদ আশরাফ। বলল, 'তোমরা যা বলেছ, যা বলনি উনি সব'।

'বুঝলাম না আব্বা। বলল সারা সাদিয়া।

'শুনলে সব বুঝবে'।

'মহাখবরের যে কথা বললে, তা কি মেহমান সম্পর্কে?' বলল ডাক্তারের স্ত্রী ফায়জা আশরাফ।

'হ্যাঁ'।

বলে আহমদ আশরাফ একটু থামল। তারপর সে আজ তার অফিসে এফ.বি.আই গোয়েন্দারা এসে কি করল কি বলল তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে বলল, 'আমাদের মেহমানই সেই আহমদ মুসা'।

ডাঃ আহমদ আশরাফের কথা শুনে হঠাৎ ভূত দেখার মতই সকলের অবস্থা। সীমাহীন বিষ্ময়, অসীম কৌতুহল ও অনেক প্রশ্নের ভারে পীড়িত সকলের চোখ মুখ।

ডাঃ আহমদ আশরাফ কথা বলার পর পিনপতন নিরবতা। যেন কালের গতি এখানে থেমে গেছে।

নিরবতা অবশেষে ভাঙল সারা সাদিয়ার কন্ঠ। বলল সে, ছবিটা তোমার কাছে আছে আব্বু?

‘হ্যাঁ, বলে ছবি করে তার হাতে দিল। ছবিটা একে একে সবার হাত ঘুরল।

ফটোটা স্বামীর হাতে ফেরত দিতে দিতে ফায়জা বলল, ‘কোন সন্দেহ নেই, ইনিই আহমদ মুসা’।

‘কিন্তু এফ.বি.আই এমন মরিয়া হয়ে তাঁকে খুঁজছে কেন?’ বলল সারা সাদিয়া।

‘খোঁজার কারণ তারা বলেনি। শুধু বলেছে তার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ যে, মার্কিন সরকারের কাছে এই মুহূর্তে তার চেয়ে বড় আসামী আর কেউ নেই’।

শুকিয়ে গেল সবার মুখ। উদ্বেগ উৎকন্ঠায় ভারি হয়ে উঠল তাদের চেহারা।

সারা সাদিয়া বলল, ‘আহমদ মুসা কি ক্রিমিনাল যে সে মার্কিন সরকারের আসামী হতে যাবে?’

‘রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ক্রিমিনাল হওয়া ছাড়াও শত্রু হবার অনেক কারণ ঘটতে পারে। সে রকমই কিছু ঘটেছে হয়তো’। বলল ডাঃ আহমদ আশরাফ।

‘ওকে জিজ্ঞেস করলেই সব জানা যাবে’। বলল ফায়জা আশরাফ।

‘আব্বু কথা বলতে পারেন। আমার তো ভয় করছে, আগে তো দু’একটা কথা বলেছি। এখন তাও পারব না’। বলল সারা সাদিয়া।

‘ঠিক বলেছ আপা। এখন মনে হচ্ছে, আগে কথা যেভাবে বলেছি তাতে বেয়াদবিই হয়েছে। এখন লজ্জায় যেতে পারবো না তার কাছে’। আহমদ আশফাক বলল।

‘এসব কথা থাক। এখন বিপদের কথা ভাব। ওর বিপদ মানে আমাদের বেপদ। ওর বের হওয়াই এখন বিপজ্জনক’।

বলে স্বামীর দিকে চেয়ে ফায়জা বলল, ‘ওকে এসব জানানো দরকার নেই’।

‘অবশ্যই। উনি রাতেই আমাকে বলেছেন, জরুরী কাজ আছে, আজই উনি চলে যাবেন। আমি বলেছিলাম, দু’একটা দিন রেস্ট নিতে। ওর বাম বাহুর সন্ধিতে আমি গুলির ক্ষত দেখেছি। সে ক্ষত পুরোপুরি এখনো শুকায়নি’।

‘উনি কি বলেছিলেন?’ বলল ফায়জা।

‘ও কিছু না। এসব নিয়েই অনেককে চলতে হয়’। জানাল ডাঃ আহমদ আশরাফ।

‘মানে তাঁকে চলতে হয়’। বলল সারা সাদিয়া।

‘ঠিক বলেছ’। বলল ডাঃ আহমদ আশরাফ।

‘তোমার অফিসে এফ.বি.আই পুলিশ এসেছিল। তাকে সর্বত্র খুঁজছে। এই বিপদের খবর তো তাঁকে এখনই জানাতে হয়’। বলল ফায়জা।

‘ঠিক তাহলে তুমি চা দাও। উনাকে এখানেই ডাকি’। বলল ডাঃ আহমদ আশরাফ।

‘খুব ইচ্ছা করছে, তোমাদের সাথে ওঁর কথা শুনতে, কি বলেন উনি’। বলল সারা সাদিয়া।

‘ঠিক আছে, তোমরা একটু আড়ালে যাও। পাশের ঘরে দিয়ে বসলে সবই শুনতে পাবে’।

‘আমিও?’ বলল আহমদ আশফাক।

‘তোমার তো পর্দা নেই। তাহলে তুমি থাকতে পারবে না কেন?’

ডাঃ আশরাফ উঠল এবং আহমদ মুসাকে ডেকে এনে তাদের ফ্যামিলী ড্রইংরুমে বসাল। তারপর আদবের সাথে সামনের সোফায় ধীরে ধীরে বসে বলল, ‘জনাব একটু খবর আছে।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘আপনার ক্লিনিকের খবর তো? ওখানে এফ.বি.আই-এর লোক আমার খোঁজে এসেছিল এই তো?’

‘জনাব জানলেন কি করে?’

ওরা আপনাকে ফটো দিয়েছে, পরিচয় দিয়েছে এবং আপনি আমার পরিচয় জেনেছেন। খবর এটাই তো?’ বলল হাসতে হাসতে আহমদ মুসা।

অবাক দৃষ্টিতে তাকাল ডাঃ আহমদ আশরাফ আহমদ মুসার দিকে।

‘জিজ্ঞেস করেছেন, আমি জানলাম কি করে। আমি জানতাম আপনার ক্লিনিকে ওরা আসবে, যেমন সব ক্লিনিকেই ওরা যাবে’।

ডাঃ আহমদ আশরাফ উঠে দাঁড়াল। বলল বিস্মিত কন্ঠে, আদবের সাথে, ‘জনাব আমার ও আমার পরিবারের সব সদস্যের পক্ষ থেকে আপনাকে সালাম ও শুভেচ্ছা। আমরা সকলে আনন্দিত ও গর্বিত হয়েছি’।

‘বসুন জনাব আপনি প্রবীণ, আমি আপনার প্রায় ছেলের বয়সের। আপনি এভাবে দাঁড়িয়ে কথা বললে আমি অপরাধী হয়ে যাই’।

একটু থামল আহমদ মুসা। পরক্ষণেই আবার বলল, ‘আপনাকে আপনার পরিবারের সকলকে ধন্যবাদ আমার প্রতি স্নেহ ও শুভেচ্ছা প্রকাশের জন্য। কিন্তু বিপদ ঘাড়ে নিয়ে তো আনন্দিত হওয়া উচিত নয়’।

‘আলহামদুলিল্লাহ, সুখের জিন্দেগী আমাদের। কোন বড় বিপদ কখনও আমাদের ঘিরে ধরেনি। আপনার কথিত বিপদ ঘাড়ে নেওয়ায় যে বিপদই আসুক আমরা মেনে নিতে পারব’।

এ সময় কলিং বেল বেজে উঠল।

ডাঃ আহমদ আশরাফের পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিল আহমদ আশফাক। ‘আমি দেখছি আব্বা’ বলে বাইরের দরজার দিকে ছুটল।

একটু পরে ফিরে এসে বলল, ‘আব্বু পাশের বাসার বেঞ্জামিন বেকন সাহেব এখানে আসতে চাচ্ছেন’।

‘আমি তাহলে উঠি, কথা বলে নিন তার সাথে’। বলে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

ডাঃ আশরাফও উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘জনাব, চলুন পাশের এ ঘরটায় আপনাকে বসাই’।

আহমদ মুসাকে বসিয়ে দিয়ে বলল, ‘বেঞ্জামিন বেকন চমৎকার লোক জনাব। স্বভাবগতভাবে ইহুদী বিরোধী। ইহুদী বিরোধী কি এক সংগঠনের তিনি এক কর্মকর্তাও।

বলে বেরিয়ে এসে বসল ড্রইংরুমে। ছেলে আশফাক সাথে করে নিয়ে এল বেঞ্জামিন বেকনকে।

বেঞ্জামিন লম্বা, ঋজুদেহী মানুষ। হৃষ্টপুষ্ট মেদহীন শরীর তার। তার মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা দেখে বিস্মিত হলো ডাঃ আশরাফ। উঠে দাঁড়িয়ে তাকে

স্বাগত জানিয়ে বলল, 'কোন সমস্যা মিঃ বেঞ্জামিন। আপনার এই হাল কেন? আপনি কষ্ট করে এলেন। খবর দিলেই তো হতো আমি যেতাম'।

বেঞ্জামিন বেকন বসতে বসতে বলল, 'আমি চিকিৎসা করাতে আসিনি ডাঃ আশরাফ। এই সকালেই তো আমি হাসপাতাল থেকে ফিরলাম'।

'তাহেল আর কি খবর এই অসুস্থ অবস্থায়? কোথায় কি ঘটেছিল বলুন তো?' বলল ডাঃ আহমদ আশরাফ।

'এ্যাকসিডেন্ট ঘটেছিল। বড় বাঁচা বেঁচে গেছি। দু'জন মরে গেছে। তিনজন মৃত্যুর মুখ থেকে ফেরত এসেছে'।

'সাংঘাতিক'।

কখন, কোথায় কি ঘটল?'

গত রাতে'।

বলে একটু দম নিয়েই বলল বেঞ্জামিন, 'এ প্রসংগ থাক। আমি স্থির থাকতে পারলাম না বলেই এসেছি'।

'বলুন কি ব্যাপার?'

'আপনার এখানে কোন মেহমান এসেছেন?' ডাঃ আহমদ আশরাফের দিকে সরাসরি চেয়ে জিজ্ঞেস করল বেঞ্জামিন বেকন।

হঠাৎ মুখটা মলিন হয়ে উঠল ডাঃ আহমদ আশরাফের। বুক ধক ধক কর উঠল তার। মেহমান তো একজন এসেছেন। কি জবাব দেবে সে। বেঞ্জামিন কেন এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে তাকে? মেহমান আসার বিষয়টা সে কি জানতে পেরেছে?

এমনি সাত সতের ভাবতে গিয়ে জবাব দিতে দেরী হয়ে গেল ডাঃ আশরাফের।

কথা বলল আবার বেঞ্জামিনই। 'আমার কুকুরের ঘ্রাণ শক্তি যদি ঠিক হয়ে থাকে, তাহলে বলব একজন খুব বড় মেহমান এসেছেন আপনার বাড়িতে। কুকুরের অস্থিরতায় টিকতে না পেরে কুকুরের বদলে আমিই এলাম খোঁজ নিতে।

ডাঃ আহমদ আশরাফের বুক তখন কাঁপছে। কিন্তু বলতে হবে তাকে কথা। জেনেই ফেলেছে সে। আর মিথ্যা বলে কি লাভ। বলল, 'এসেছেন একজন মেহমান। খুব সম্মানিত মেহমান আমাদের'।

‘তা জানি এবং তিনিও আহত’।

‘কেমন করে জানলেন?’

‘আমরা শুধু এক গাড়িতে নয়, পাশাপাশি বসে ছিলাম। সুতরাং জানব না কেন?’

‘কিন্তু সেই লোকই যে আমার মেহমান একথাটা জানলেন কি করে?’

বললাম তো, আমার কুকুরের ঐ ঘ্রান শক্তি। সে চিনতে পেরেছে’।

‘কুকুর কি করে চিনবে?’

‘কারণ কুকুর এফ.বি.আই এর’।

‘এফ.বি.আই-এর? আপনার কাছে আপনার বাড়িতে কেন?’

‘কারণ আমিও এফ.বি.অই-এর লোক’।

শুনেই ডাঃ আহমদ আশরাফের দুই চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। গোটা দেহ কেঁপে উঠল তার। আর বলার শক্তিও সে হারিয়ে ফেলল।

এই অবস্থা এখন ডাঃ আশরাফের স্ত্রী, মেয়ে, ছেলে সবার। ভাবছে সবাই। তাদের মেহমান আহমদ মুসার ধরা পড়ার আর বিলম্ব নেই। কিংবা তার চেয়েও বাড় কিছু ঘটবে নাকি’।

হাসি ফুটে উঠল বেঞ্জামিনের ঠোঁটে, সম্ভবতঃ ডাঃ আশরাফের অবস্থা দেখে। বলল সে, ডাঃ আশরাফ, আমাকে নিয়ে চলুন আপনাদের মেহমানের কাছে। উনি আমাদের হাতে বন্দী ছিলেন। এ্যাকসিডেন্টের পর পালিয়ে এসেছেন’।

এ সময় আহমদ মুসা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, ‘আপনাকে যেতে হবে না, মেহমানই আপনার সামনে এসেছে’।

বলে আহমদ মুসা বসল বেঞ্জামিনের সামনের সোফায়। মুখে হাসি আহমদ মুসার। বলল, ‘আপনার আঘাত তাহলে গুরুতর নয়। সু খবর যে, দু’জন মারা গেছে। আমার আশংকা ছিল যে পাঁচ জনই মারা যাবে’।

ডাঃ আশরাফ ও পরিবারের সদস্যরা আহমদ মুসাকে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে এবং তার মুখে হাসি দেখে বিষ্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। আহমদ মুসা কি পরিস্থিতি বুঝছেন না? তার কি ভয় নেই?

‘আশংকা ঠিক ছিল। পৌছেতে আর পাঁচ মিনিট দেরী হলেও ওরা মারা যেত এবং এ বাঁচানোর কৃতিত্ব গোটাটাই আপনার’। বলল বেঞ্জামিন গম্ভীর কন্ঠে।

কথা শেষ করেই আবার বলে উঠল বেঞ্জামিন, ‘মিঃ আহমদ মুসা আপনি এখন আমার বন্দী’।

বলে পকেট থেকে রিভলবার বের করে হাতে নিল।

এক করছেন মিঃ বেঞ্জামিন। প্লিজ ইনি আমার সম্মানিত মেহমান। আর আপনি আমার প্রতিবেশী এবং বন্ধু। আমার অন্তত সম্মানটা রক্ষা করুন, অনুরোধ করছি’। আর্ত কন্ঠে বলল ডাঃ আহমদ আশরাফ।

বেঞ্জামিন বেকনের কথায় আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘আপনি আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারবেন না, এটা আপনি জানেন’।

বেঞ্জামিন আহমদ মুসার মুখ বরাবর রিভলবার তুলে বলল, ‘আপনাকে বন্দী করে আমরা এফ.বি.আই অফিসে ফিরছিলাম। এ্যাকসিডেন্টের ফলে আপনি পালিয়ে যাবার সুযোগ পেয়েছেন। আপনাকে আমি বন্দী করতে এসেছি। বন্দী করতে পারবো না কেন? এই রিভলবারের সামনে আপনার পালাবার সাধ্য নেই’।

আবারও হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আপনার রিভলবারে গুলি নেই, থাকলেও গুলি আপনি ছুড়তে পারতেন না’।

‘কি করে বুঝলেন গুলি নেই?’

‘ছয়টা গুলি থাকলে যে ওজন রিভলবারের হয়, সে ওজন আপনার রিভলবারের নেই। দ্বিতীয়, রিভলবার যখন পকেট থেকে বের করেন, তখন রিভলবারের ক্র্যাচ অন করা ছিল। রিভলবার লোডেড থাকলে কেউ ক্র্যাচ অন করে রিভলবার পকেটে রাখে না’।

অপার বিষ্ময়ের একটা ছায়া বেঞ্জামিনের চোখে মুখে পড়েই আবার মিলিয়ে গেল। বলল গম্ভীর কন্ঠে, ‘আমি আপনাকে বন্দী করতে পারবো না, এটা আপনার একটা মিথ্যা সান্ত্বনা’।

আহমদ মুসা গম্ভীর হলো। বলল, ‘আপনি যদি আমাকে বন্দী করতে চাইতেন, তাহলে একা আসতেন না। কারণ আপনি ভাল করেই জানেন আপনার

একার পক্ষে আমাকে বন্দী করা সম্ভব নয়। আপনি আমাকে বন্দী করতে চাইলে আমি এখানে আছি এটা জানার সংগে সংগে এফ. বি.আইকে জানাতেন, তারা একটা বাহিনী পাঠাত। তারপর আমাকে বন্দী করতে আসতেন। একা যখন এসেছেন শুভেচ্ছা নিয়েই এসেছেন, বন্দী করার জন্যে নয়'।

বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল বেঞ্জামিন বেকন।

এই ভাবেই বিস্ময়ে হা হয়ে গেছে ডাঃ আহমদ আশরাফ এবং তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মুখ। আহমদ মুসার চোখে, মনে কি যাদু আছে যে সে সব দেখতে পায়, বুঝতে পারে।

নিরবতা ভাঙ্গল বেঞ্জামিন বেকন। বলল, 'আমি আপনার বহু কাহিনী শুনেছি, কিন্তু আজ দেখে বুঝলাম যে আপনি কি। আপনার এই অন্তরদৃষ্টি, বিশ্লেষণী শক্তি রূপকথায় পাওয়া যাবে, বাস্তবে কোথাও মিলেব বলে আমি মনে করি না'।

'কিন্তু আপনার ব্যাপারটা কি বলুন তো? গতকাল আপনার ওয়াকি টকি ফেলে দেয়া থেকেই আমি বুঝেছি আপনার ভেতরে পরিবর্তনের একটা বিপ্লব ঘটে গেছে'।

'আপনার ইহুদী বিরোধী লড়াই এবং তারপর গতকালকের আপনার অকল্পনীয় মানবিক দায়িত্ববোধ থেকে আমি দু'টো জিনিষ বুঝেছি, এক, আপনি আমার কৌশলগত মিত্র, দুই, যে অভিযোগই আপনার বিরুদ্ধে তোলা হয়ে থাক, কোন অবৈধ কাজ আপনার দ্বারা হতে পারে না'।

'কিন্তু আপনার সরকার আমার বিরুদ্ধে তো অভিযোগ তুলেছে'।

'আমি সে সম্পর্কেও জানতে চাই। আমার মনে হয় ঘটনার আরও কোন দিক থাকতে পারে। আপনি হঠাৎ লস আলামোসে প্রবেশ করতে গেছেন, এটা অযৌক্তিক। আমি শুনেছি, এই প্রশ্ন এফ.বি.আই প্রধানের মনেও সৃষ্টি হয়েছে।

'আপনি যা জানতে চেয়েছেন তা জানার আগে আমাকে বলুন, আমি আপনার স্ট্রাটেজিক মিত্র হলাম কেমন করে?

'কারণ আপনি ইহুদীবাদের শত্রু এবং ইহুদীবাদীরা আপনার শত্রু বিশ্ব ইহুদী গোয়েন্দা চক্রের প্রধান জেনারেল শ্যারন আমেরিকা এসেছেন, আপনাকে

ধরে নিয়ে যাবার জন্যে। এই জেনারেল শ্যারনই এখন সওয়ার হয়েছে এফ.বি.আই-এর ঘাড়ে।

শুধু তো এফ.বি.আই নয়, মার্কিন সরকারও সাহায্য করছে জেনারেল শ্যারনকে।

'মার্কিন সরকার নয়, মার্কিন সরকারের ব্যক্তি বিশেষ। যেমন প্রেসিডেন্টের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা আলেকজান্ডার হামিল্টন এখন ইহুদী স্বার্থের শিখন্ডী হয়েছে। তিনি দেশকে প্রতিনিধিত্ব করছেন না, প্রতিনিধিত্ব করছেন নিজের স্বার্থকে। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার খায়েশ পোষন করেন এবং তাঁর এ উদ্দেশ্য পুরণের জন্যে ইহুদী অর্থ তাঁর চাই। এই হামিল্টন এখন তাঁর স্বার্থে প্রেসিডেন্টের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাচ্ছেন'।

'কেন, প্রেসিডেন্ট জানেন না এটা?'

'জানেন। কিন্তু তিনি দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করতে চান। তাই ইহুদী টাকা তারও প্রয়োজন। তাই তিনি সব জেনে ও চুপ করে আছেন, বরং তিনিও জেনারেল হামিল্টনকে ব্যবহার করতে চাচ্ছেন'।

'আপনি এফ..বি.আই-এর লোক। আপনি এসব বলছেন কি করে?'

'আমি এফ.বি.আই এর লোক। ইহুদীদের লোক নই। আমি এফ.বি.আই-এ ঢুকেছি ইহুদী স্বার্থ ও ইহুদী শিখন্ডীর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে'।

'আপনি একা কি করবেন?'

'আপনি জানেন না। আমাদের একটা সংগঠন আছে। নাম 'ফ্রি আমেরিকা'। ইহুদীবাদীদের কালো হাত থেকে আমেরিকাকে মুক্ত করাই এর লক্ষ্য। মিঃ আহমদ মুসা, এ ধরনের আরও কয়েক ডজন সংগঠন আছে আমেরিকায়'।

'মিঃ বেঞ্জামিন আমি ইহুদীদের বিরুদ্ধে যেমন লড়াই করেছি এবং করছি, তেমনি তো আমি কু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান, হোয়াইট ঈগল, প্রভৃতির বিরুদ্ধেও লড়াই করছি। শেষের দু'টো সংগঠন তো আপনাদের কাছের সংগঠন। তাহলে আমি পুরোপুরি আপনার স্ট্রাটেজিক মিত্র হচ্ছি কি করে?'

বেঞ্জামিন হাসল। বলল, ‘ও দু’টো সংগঠন অনেকটা সন্ত্রাসী সংগঠন, নাগরিক সংগঠন নয়। কিন্তু আমাদের ও আমাদের মত সংগঠনগুলো নাগরিক সংগঠন। ওরা ‘ফ্রি শ্বেতাংগে’ বিশ্বাসী, আর আমরা ‘ফ্রি আমেরিকায়’ বিশ্বাসী। ফ্রি আমিরিকায় শুধু শ্বেতাংগ থাকবে না, সাদা, কালো, পীত সবাই থাকবে’।

‘ধর্মীয় জনগোষ্ঠী সম্পর্কে আপনাদের অভিমত কি?’

‘প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করবে। প্রতিযোগিতা তাদের মধ্যে থাকবে, কিন্তু সেটা হবে বুদ্ধিবৃত্তিক এবং গণতান্ত্রিক’। বলল বেঞ্জামিন বেকন।

‘তাহলে ইহুদী ধর্মীয় গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আপনাদের বিদ্বেষ কেন?’

আহমদ মুসা বলল।

‘ইহুদী ধর্ম ও ইহুদী ধর্মানুসারীদের সাথে আমাদের কোন শত্রুতা নেই। কিন্তু ‘ইহুদীবাদী’রা কোন ধর্মীয় সংগঠন নয়, কোন রাজনৈতিক সংগঠনও নয়, তারা ষড়যন্ত্রকারী। এ ষড়যন্ত্রের কালো হাত আমেরিকাকে গিলে খেতে চায়। এ ষড়যন্ত্রের হাত থেকে আমরা আমেরিকাকে মুক্ত করতে চাই’।

‘আপনি আমার কথা, জেনারেল শ্যারনের কথা এফ.বি.আই-এর কাছে শুনেছেন?’

‘এ ব্যাপারে এফ.বি.আই সক্রিয় বেশী আগে থেকে নয়, আমি প্রথম জানতে পারি আমাদের সংগঠন সূত্রে। ইহুদীবাদীদের তৎপরতা মনিটর করার জন্যে আমাদের সেল আছে। সেই সেলই আমাদের তথ্য সরবরাহ করে’।

‘আপনি জানেন আমার দু’জন আত্নীয় জেনারেল শ্যারনদের হাতে বন্দী আছে?’

‘জানি। ওদের প্রথম আটক করে হোয়াইট ঈগল। অর্থের বিনিময়ে হোয়াইট ঈগল ওদের হস্তান্তর করে জেনারেল শ্যারনদের কাছে। এখন ওরা জেনারেল শ্যারনদের বন্দী’।

কথা শেষ করেই বেঞ্জামিন বেকন এটা দম নিয়ে বলল, ‘আপনার অনেক প্রশ্নের জবাব দিয়েছি। এবার আমার প্রশ্নের জবাব দিন’।

‘আপনার প্রশ্ন, আমার বিরুদ্ধে সরকারের অভিযোগ কেন?’

বলে একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর বলল, 'মার্কিন সরকারের সব বিষয় জানা নেই বলে অভিযোগ করছে, সবটা জানার পর শুধু অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেবে তাই নয়, খুশী হবে আমার প্রতি'।

'তাহলে কি আপনি লস আমালোসে ঢোকেন নি?'

'ঢুকেছি, কিন্তু এর জন্য আমি দায়ী নই। নিউ মেক্সিকো মুসলিম এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতিকে কিডন্যাপ করেছিল শ্যারনরা। আমি তাকে উদ্ধার করতে যাই। আগেই তারা জানতে পারে এবং ফাঁদ পেতে রাখে। আমি বন্দী হই। তাদের কোন এক অন্ধকূপে তারা আমাকে বন্দী করে রাখে। সেখান থেকে মুক্ত হতে গিয়ে একটা সুড়ঙ্গ পাই। সেই সুড়ঙ্গ আমাকে নিয়ে যায় লস আলামোস ক্যাম্পাসে। আমি পথহীনভাবে পথের সন্ধানে লস আলামোসে প্রবেশ করি এবং প্রবেশ করার পরই দেখতে পাই যে, ওটা লস আলামোস ল্যাবরেটরী অব স্ট্রাটেজিক রিসার্চ। ওখানে ধরা না দিয়ে যে কোন অবস্থায় বেরিয়ে আসতে গিয়েই ওদের সাথে আমার সংঘাত হয়েছে'। থামল আহমদ মুসা।

বেঞ্জামিন বেকন বিস্ফারিত চোখে বলল, 'আপনি যা বললেন তা যদি সত্য হয়, তাহলে এটা তো এটম বোমার মত ভয়াবহ ব্যাপার। ইহুদীবাদীরা তো দেখছি আমেরিকার হৃদপিন্ডে হাত দিয়েছে। জানতে পারলে সরকারের ঘুম হারাম হয়ে যাবে'।

'হ্যাঁ, তাই মিঃ বেঞ্জামিন। ইহুদীরা আমেরিকার গোড়া কাটছে এবং আমি যা বলেছি, তা একশ'ভাগ প্রমাণ করে দেব'।

বেঞ্জামিন বেকন সোজা হয়ে বসল। অস্থির কন্ঠে বলল, 'তাহলে আপনি বসে আছেন কেন? কিছু করছেন না কেন?'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'অবশ্যই কিছু করব। আমি ফ্লোরিডায় যাচ্ছিলাম। আমার দুই আত্মীয়াকে মুক্ত করার জন্যে। আপনারা যেতে দিলেন না, ধরে নিয়ে এলেন। আমি চেয়েছিলাম, ওদের মুক্ত করার পর আমি এদিকে মনোযোগ দেব'।

'কিন্তু না, দেরী হয়ে যাবে। আপনি নিজেকে অভিযোগমুক্ত করা এবং ঐ ভয়ংকর বিষয়ে সরকারকে অবহিত করার কাজটাই প্রথম আপনার করা দরকার'।

'কিন্তু তা করতে গেলে তো এদিকে দেরী হয়ে যাবে। জেনারেল শ্যারন আমাকে দশ দিনের সময় দিয়েছে। তার একদিন চলে গেছে। আর নয় দিন বাকি। এ নয় দিনের মধ্যে হয় আমাকে ওদের মুক্ত করতে হবে। না হয় ওদের হাতে আমাকে আত্মসমর্পন করতে হবে। নয় দিন পার হয়ে গেলে ওরা ডাঃ মার্গারেট এবং লায়লা জেনিফারকে চরমভাবে লাঞ্ছিত করার পর হত্যা করবে'।

'আপনি চিন্তা করবেন না। নয়দিন বিরাট সময় আপনি আগে সরকারের সাথে আপনার কাজটা সারুন'। সরকার এবং আমরা আপনাকে সাহায্য করব ওদের উদ্ধারের কাজে'।

কথা শেষ করে আহমদ মুসাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বলে উঠল, 'আপনার প্ল্যান কি বলুন তো, আপনার কথাটা সরকারকে কিভাবে বলতে চান?'

'আমি এফ.বি.আই প্রধান জর্জ আব্রাহাম জনসনের সাথে দেখা করব। তাকেই সব কিছু বলব'।

'ব্রাভো' বলে লাফিয়ে উঠল বেঞ্জামিন বেকন। কিন্তু পরক্ষণেই কিছুটা আত্মস্থ হয়ে বলল, 'যে অবস্থা তাতে ঐ শীর্ষ পর্যায়ে সাক্ষাতের প্রস্তাব করা নিরাপত্তার দিক দিয়ে ঠিক হবে কিনা এবং তিনি সাক্ষাত করতে রাজী হবেন কিনা!'

'আমি একশ ভাগ নিশ্চিত তিনি আমাকে সাক্ষাতকার দিতে রাজী হবেন'।

'না আপনি নিম্ন পর্যায়ে প্রস্তাব করে অফিসিয়াল প্রসেসের মাধ্যমে শীর্ষ পর্যায়ে যাবেন'।

'তা ঠিক হবে না। এতে দেরী হবে এবং প্রসেসের উপর আস্থা রাখাও সমস্যা আছে। একটাই আমার এখন চিন্তা, কম মসয়ে নিরাপদে ওয়াশিংটনে পৌঁছা'।

‘পৌঁছার চিন্তা আপনি করবেন না। আপনি যদি এই সিদ্ধান্তই নেন, তাহলে আমি আপনাকে নিয়ে যাব ওয়াশিংটনে’।

‘ধন্যবাদ’ বলে আহমদ মুসা হ্যান্ডশেক করল বেঞ্জামিন বেকনের সাথে। বলল, আমি অবিলম্বে ওয়াশিংটনে পৌঁছতে চাই। ক্নিতু আপনি তো আহত, অসুস্থ’।

‘এটা আবার একটা বাধা নাকি। মাথায় ব্যান্ডেজ আছে, কিন্তু হাত, পা ভাল আছে এবং মনও পরিপূর্ণ সুস্থ আছে।

বলে একটু থেমেই আবার বলল, ‘জানেন, গত রাতে আপনি কমপক্ষে তিনজন এফ.বি.আই গোয়েন্দার জীবন বাঁচিয়েছেন, এ রিপোর্ট আজই চলে যাচ্ছে হেড কোয়ার্টারে। বন্দী হিসেবে প্রথম সুযোগেই আপনার পালিয়ে যাবার কথা, কিন্তু তা না করে আপনি দুর্ঘটনা কবলিত মুমূর্ষ আপনার শত্রুদের গাড়ি থেকে একে একে বের করেছেন এবং তাদের বয়ে নিয়ে গাড়ি ডেকে সেই গাড়িতে তুলে হাসপাতালে নেয়ার ব্যবস্থা করেছেন, এটা খুবই উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে এফ.বি.আই অফিসে। সবাই আপনার মানবিকতার অকুন্ঠ প্রশংসা করেছে। অজন্তেই এফ.বি.আই-এর মধ্যে আপনার অনেক ভক্ত হয়ে গেছে’।

‘ধন্যবাদ মিঃ বেঞ্জামিন’।

একটু থেমেই আবার বলল, ‘আপনি রাজী হলে আজই আমরা ওয়াশিংটন যাত্রা করতে পারি’।

‘আমি রাজী মানে, আমি তৈরী’।

‘কিভাবে যাওয়া হবে?’

‘কার নিয়ে যেতে পারি, কিন্তু দেরী হবে। বিমানে গেলে কিছু ঝামেলা পোহাতে হবে। হেলিকপ্টারে সবচেয়ে নিরাপদ’।

‘হেলিকপ্টার ভাড়া পাওয়া যাবে?’

‘যাবে, কিন্তু অনেক টাকা নেবে’।

‘টাকা সমস্যা নয়, আপনি ব্যবস্থা করুন’।

‘ঠিক আছে। এক ঘন্টার মধ্যে আপনাকে জানাচ্ছি’।

বলে হ্যান্ডশেক করে উঠে দাঁড়াল বেঞ্জামিন বেকন।

আহমদ মুসাও উঠল। চলল তার পেছনে পেছনে গেট পর্যন্ত।

# ৭

আকাশে উড়ল হেলিকপ্টার।

জানালা দিয়ে আহমদ মুসা হাত নাড়ল ডাঃ আহমদ আশরাফ ও পরিবারের সদস্যদের উদ্দেশ্যে।

নিউ মেক্সিকো এয়ার ফিল্ডের হেলিপ্যাডে ডাঃ আহমদ আশরাফের পরিবারের সবাই এসেছে আহমদ মুসাকে বিদায় জানাবার জন্যে।

আহমদ মুসা খুব খুশী হলো হেলিপ্যাডে আসা ডাঃ আশরাফের স্ত্রী ফায়জা আশরাফ ও মেয়ে সারা সাদিয়ার পোশাক দেখে। ফুলহাতা ও পা পর্যন্ত নামানো গাউন পরেছে, তার উপর পরেছে বড় ওড়না। দেখেই মনে হচ্ছে এর চলমান সাধারণ জনস্রোত থেকে পৃথক, এরা মুসলিম।

আহমদ মুসার খুব কষ্ট লাগছে মনে, পরিবারটা খুবই আহত হয়েছে। ওদের দাবী ছিল দু'একটা দিন অন্তত থাকি। আবার পরিস্থিতির নাজুকতা দেখে বাধা দেয়ারও পথ পাচ্ছে না। এই অবস্থার টানা পোড়নে পরিবারটি ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। ডাঃ আহমদ আশরাফ ও ফায়জা আশরাফ পরিণত বুদ্ধির মানুষ বলে তাদের অবশেষে বুঝানো গেছে। কিন্তু অবুঝ সারা সাদিয়া এবং আহমদ আশফাকের জেদ থামানো যায়নি। যুক্তিতে না পেরে কেঁদে ফেলেছে তারা। কোন যুক্তি না পেয়ে আহমদ আশফাক কাঁদতে কাঁদতে বলেছে, আপনার সাক্ষাত লাভের সুযোগ ও সামর্থ আমাদের অতীতেও ছিল না এবং ভবিষ্যতেও হবে না। আল্লাহই আপনাকে আমাদের মাঝে নিয়ে এসেছেন। আল্লাহ যখন সুযোগ আমাদের দিয়েছেন, তখন আপনার উপর আমাদের একটা অধিকার রয়েছে। মেহমান তিন দিন যেমন থাকতে পারেন, তেমনি মেহমানকে তিন দিন আমরা রাখতেও পারি। মেহমানকে আমরা যেমন তিন দিন রাখতে নীতিগতভাবে বাধ্য, তেমনি মেহমানও তিন দিন থাকতে নীতিগতভাবে বাধ্য'।

যুক্তি শুনে হাসতে হয়েছে আহমদ মুসাকে। আহমদ মুসা বলেছিল তাকে, ‘আমি দোয়া করছি, আল্লাহ তোমাকে একজন নাম করা কুটনীতিক, না হয় সেরা একজন আইনজীবি করুন। তোমার যুক্তির কাছে আমি পরাজিত। কিন্তু থাকা সম্ভব হচ্ছে না ভাই’।

আহমদ আশফাকের যুক্তির চেয়ে সারা সাদিয়ার যুক্তি ছিল আরও প্রবল।

আহমদ মুসার পরিচয় পাওয়া এবং সেদিন আহমদ মুসা তাকে বড় ওড়না পরতে বলার পর সে আহমদ মুসার সামনে আর আসেনি।

কিন্তু বিদায়ের প্রস্তুতির সময় সারা সাদিয়া এসে ড্রইং রুমের দরজায় দাঁড়ায়। পরনে লম্বা গোলাপী গাউন। বড় সাদা চাদরে ঢাকা মাথাসহ গা। দরজায় দাঁড়িয়ে মুখ নিচু করে ভারী কন্ঠে বলেছিল সে, ‘এক ঝলক আলো জ্বেলে পথ দেখিয়ে, আবার অন্ধকারে নিমজ্জিত করে চলে যাচ্ছেন আপনি’।

‘না বোন, যে পথের কথা আমি বলেছি, তা কখনই অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় না। কোরআন এবং হাদিস তোমাদের ঘরেই রয়েছে। পথের দিশারী ওগুলোই’।

‘আমাদের কি সে যোগ্যতা আছে? থাকলে আপনি যা বলেছেন, তা আমরা আগে বুঝিনি কেন? কেউ আমাদের বোঝায়নি কেন?’

‘আরও পড়তে হবে। আরও বোঝার চেষ্টা করতে হবে, তাহলে দেখবে চলার পথটা তোমার সামনে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে’।

‘জ্ঞান ও যোগ্যতা অনুসারে মানুষ বোঝে। আমার বা আমাদের সে জ্ঞান ও যোগ্যতা থাকলে আগেই তো বুঝতাম। জ্ঞান ও যোগ্যতা শাণিত করার জন্যে অবশ্যই আপনাদের দরকার হয়’।

‘ঠিক বলেছ বোন। এ এক বাস্তব সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছে মুসলিম নেতৃবৃন্দরা। ওয়াশিংটনের গ্রীন ভ্যালিতে আমেরিকান কাউন্সিল অব মুসলিম এ্যাসোসিয়েশনের যে সম্মেলন হয়ে গেল, তার প্রধান এজেন্ডাই ছিল এটা। এ সমস্যার তারা দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করছেন’।

‘আমার অনেক বান্ধবীকে আমি টেলিফোনে বলেছি। তাদের নিয়ে একটা সভা করব। তারা একবারেই অন্ধকারে। আমিহ ভেবেছিলাম আপনি সেখানে কথা

বলবেন। তাহলে তাদের নিয়ে আমি এ্যাসোসিয়েশন গড়তে পারব, কিছু কাজ শুরু করতে পারব'।

আহমদ মুসা জুতার ফিতা বাঁধছিল।

সারা সাদিয়ার এই শেষ কথা আহমদ মুসার মনে আঘাত করে। ফিতা বাঁধা বন্ধ করে সে মুখ তুলে একটু ভাব। তারপর বলে, 'আমি খুবই দুঃখ বোধ করছি বোন থাকতে পারবো না বলে। কিন্তু খুবই খুশী হয়েছি যে, তুমি কাজ শুরু করেছ। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি কথা দিচ্ছি, আমি ওয়াশিংটনে গিয়ে তোমাদের সভার জন্যে একটা মেসেজ পাঠাব তোমার কাছে। আমর পক্ষ থেকে সেটা তুমি সভায় পাঠ করে শোনাবে'।

হাসি ফুটে উঠল সারা সাদিয়ার মুঝে। সে দু' চোখের পানি মুছে বলল, 'সত্যি আপনি পাঠাবেন?'

'কথা দিচ্ছি পাঠাব'।

'তাহলে আমি শুধু সেটা সভায় পড়েই শোনাব না, আয়না দিয়ে বাঁধিয়ে রাখব। এটা হবে আমাদের সংগঠবের অনুপ্রেরণার উৎস'।

'তাহলে খুশী তো?'

'ধন্যবাদ ভাইয়া'।

'তাহলে ভাইয়া আমার খুশীর কি হবে? বড় বলে এ একটা সান্ত্বনা পুরস্কার পেল, কিন্তু আমি?' আহমদ মুসার পাশে বসে থাকা আহমদ আশফাক বলে উঠেছিল অভিমান ক্ষুব্ধ কন্ঠে।

হেসে ছিল আহমদ মুসা। বলেছি, 'সারা এগিয়েছে। তুমি এগোওনি। ঠিক আছে, তুমি যাতে আগাও এজন্যে তোমাকে একটা চিঠি লিখব'।

'আপনি আমাকে সত্যিই চিঠি লিখবেন?' আনন্দে চিৎকার করে বলেছিল আহমদ আশফাক।

হেলিকপ্টার দ্রুত চলছিল। হেলিপ্যাড ছেড়ে ডাঃ আশরাফরা এক সময় চলে গেল চোখের আড়ালে।

আপনাতেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল আহমদ মুসার মুখ থেকে। এভাবেই স্মৃতি অতীতের অন্ধাকারে হারিয়ে যায়। আর ফিরে আসে না। ফিরে

যাওয়া যায় না। জীবনটা শুধু সামনে চলারই পথ, ফেরার পথ নয়। কিন্তু অতীত হয়েও তো অতীত হয় না। স্মৃতির আকাশে বেদনার তারা হয়ে অতীত তো জ্বলেই চলে।

পেছন দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে সামনে তাকাল আহমদ মুসা।

বাতাসের স্রোত কেটে দ্রুত এগিয়ে চলেছে জেট হেলিকপ্টার।

এ এক নতুন ধানের পরিবহন হেলিকপ্টার। ছোট বিমানের বিকল্প হিসেবে এগুলো আজ ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে।

অন্য হেলিকপ্টারের মত প্রচন্ড শব্দ হয় না। দু'টি শক্তিশালী জেট ইঞ্জিনে চলে এ হেলিকপ্টার।

'মিঃ আহমদ মুসা, আমার খুব আনন্দ হচ্ছে আপনাকে পেয়ে। মনে হচ্ছে কি জানেন? মনে হচ্ছে, এই প্রথম আমরা ইহুদীবাদীদের বিরুদ্ধে একটা সফল যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছি'। বলল বেঞ্জামিন বেকন।

'কেন তা মনে হচ্ছে?'

'কারণ ইস্যুটা ভাল এবং আপনার নেতৃত্বে। আপনি যখনই এফ.বি.আই প্রধান জর্জ আব্রাহাম জনসনের সাথে দেখা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তখানই বুঝেছি ছোটখাট কোন বিষয় হলে আপনি এ সিদ্ধান্ত নিতেন না। বড় ঘটনা ও অকাট্য প্রমাণ না থাকলে আপনি জর্জ আব্রাহাম জনসনের সাথে দেখা করার জন্যে এতটা আগ্রহী হতেন না'।

'মিঃ বেঞ্জামিন, কোন বিষয়কে আমি বড় মনে করলেই তিনি মনে করবেন তা নাও হতে পারে। তাছাড়া ইহুদীবাদীদের সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত ধারণা কি, তার উপরই অনেক কিছু নির্ভর করছে'।

'এই শেষ বাক্যটা আমাকে উদ্বিগ্ন করল আহমদ মুসা। আমাদের আজকের মার্কিন রাজনীতি ও আমলাতন্ত্রের যে যত উপরে আছে, তার উপর ততটা বেশী ইহুদীবাদীদের কালো হাত চেপে বসে রয়েছে'।

'শিক্ষিত ও ঐতিহ্যবাহী মার্কিন জাতির জন্যে সত্যিই এটা লজ্জাজনক নয় কি?'

‘অবশ্যই আহমদ মুসা। লজ্জাজনক আরও এই কারণে যে, আমরা মার্কিনীরা আমাদের ইতিহাসকে ভালবাসি, কিন্তু ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহন করি না। আমাদের পূর্ব পুরষরা ইহুদীদের ব্যাপারে যে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে গেছেন, সেদিকে আমরা কান দিচ্ছিনা। যেমন আমাদের কাউন্টার ফাদারস্ দের প্রথম ও শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্ব জর্জ ওয়াশিংটন বলেছেন, ‘তারা (ইহুদীরা) আমাদের শত্রু সৈন্যের চেয়েও অধিক দক্ষতার সাতে আমাদের বিরুদ্ধে কাজ করে। আমরা সার্বিক মুক্তির যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছি এবং যে মহৎ উদ্দশ্য সাধনের সংগ্রামে আমরা লিপ্ত তার শতভাগ বৈরী তারা। আমাদের প্রত্যেকটা স্টেট আগে থেকেই এ সামাজিক কীট (ইহুদীবাদীদের) দমনে যে তৎপর হয়নি, এ জন্যে আমাদের অনুশোচনা করতে হবে’। (Maxims of George Washington By A.A. Applaton & Co.) ঠিক অনুরূপ কথাই বলেছেন বেঞ্জামিন ফ্রাংকলীন ১৭৮৭ সালে ফিলাডেলফিয়ার কনস্টিটিউশনাল কনভেনশনে দেয়া তাঁর ভাষণে। তিনিও সে ভাষণে বলেন, ‘আমি জেনারেল ওয়াশিংটনের সাথে একমত যে, আমাদের এই নতুন জাতিকে একটি অপপ্রভাব ও অনুপ্রবেশ থেকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। ভদ্রমহোদয়গণ, সে ভয়ংকর অনুপ্রবেশের নাম ‘ইহুদী’। যে দেশেই ইহুদীরা কোন বড় সংখ্যায় প্রবেশ করেছে, সে দেশেই তারা সেখানকার নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় সূচিত করেছে ও ব্যবসায়িক সংহতি বিনষ্ট করেছে। ইহুদীরা সেখানে জনগণ থেকে নিজেদের আলাদা করে রেখেছে এবং কোন ক্রমেই সেখানকার মানুষের সাথে একাত্ম হয়নি। সে দেশের জাতীয়তার বুনিয়াদ যে খৃষ্ট ধর্মের উপর তার ক্ষতি করার চেষ্টা তারা করেছে। তারা সৃষ্টি করেছে রাষ্ট্রের মধ্যে আরেক রাষ্ট্র। আর বিরোধিতার সম্মুখীন হলেই তারা সে দেশে আর্থিক বিপর্যয় ঘটিয়েছে। এর দৃষ্টান্ত স্পেন ও পর্তুগাল।.......আমরা যদি তাদের তাড়াতে না পারি, তাহলে দু’শ বছরের মধ্যে আমাদের উত্তর-পুরুষরা এ দেশে কামলায় পরিণত হবে, আর ইহুদীদের হাত থেকে মুক্ত হবার জন্যে যদি চূড়ান্ত ব্যবস্থা আপনারা না করেন, তাহলে আমাদের উত্তর পুরুষরা আমাদের কবরের উপর অভিসম্পাত করবে। ভদ্রমহোদয়গন, ইহুদীরা যেখানেই জন্মগ্রহন করুক, যত জেনারেশনই তারা প্যালেস্টাইন থেকে বাইরে থাকুক, তাদের মধ্যে কোন

পরিবর্তন আসবে না। শত জেনারেশন তারা আমেরিকায় থাকলেও তাদের চিন্তাধারা কখনই তাদের আমেরিকান হতে দেবে না'। মিঃ আহমদ মুসা, এ ধরনের শত সহস্র সতর্কবাণী আমাদের পূর্ব পুরুষদের পক্ষ থেকে করা হয়েছে, কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ইহুদী টাকার গোলক ধাঁধাঁয় বন্দী হওয়ায় সে সবই বিফলে গেছে। তাই আমরা নাগরিকরা চেষ্টা করছি কিছু করার জন্যে'। থামল বেঞ্জামিন বেকন দীর্ঘ এক বক্তব্য দেয়ার পর।

'কি সাংঘাতিকে! আপনাদের জাতির যারা নির্মাতা, তাদের এসব স্পষ্ট সতর্কবাণী সত্ত্বেও আমেরিকান অর্থনীতি, মিডিয়া এবং রাজনীতি ইহুদী কুক্ষিগত হতে পারল কেমন করে?' বলল আহমদ মুসা।

'কি বলব জনাব, এ দুঃসহ জ্বালায় আমরা মরছি'। বেঞ্জামিন বেকন বলল।

'মিঃ বেঞ্জামিন, আপনাদের রাজনীতিকদের কাছে তাদের দেশপ্রেমের চেয়ে ইহুদী টাকাই কি বড় হয়ে গেল?'

'তা হয়নি জনাব। মার্কিন রাজনীতিকরা নগদ লাভ করতে গিয়ে ইহুদীদের নগদ কিছু কনসেশন দেন। এই কনসেশনগুলোর যোগফল ইহুদীদের জন্যে হয়েছে আশীর্বাদ, মার্কিনীদের জন্যে হয়ে উঠেছে অভিশাপ। মার্কিন রাজনীতিকরা এটা বোঝেন, কিন্তু নগদ লাভের প্রশ্ন তাদেরকে সক্রিয় হতে দেয় না। একটা মজার ব্যাপার দেখুন, মার্কিন সংবিধান দুবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবার সুযোগ আছে। তাই যিনিই প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন, তিনিই দ্বিতীয় টার্মেও নির্বাচিত হওয়ার আশা করেন। তাই আমরা দেখি প্রথমবার প্রেসিডেন্ট হবার পর প্রত্যেক প্রেসিডেন্টই হহুদী স্বার্থের অনুগত থাকেন যাতে দ্বিতীয় টার্মের নির্বাচনে ইহুদী অর্থ ও মিডিয়ার সাপোর্ট মেলে। কিন্তু দ্বিতীয় টার্মে নির্বাচিত হবার পর মার্কিন প্রেসিডেন্টরা স্বাধীন নীতি অনুসরণ করেন। কিন্তু যখনই স্বাধীন নীতি গ্রহন করেন, তখনই তারা ইহুদী চক্রান্ত ও ইহুদী ট্র্যাপে পড়ে নাজেহাল হন, এমনকি অনেককে ক্ষমতাও হারাতে হয়'।

'এই ভয়ংকর ইহুদী ট্র্যাপ থেকে মার্কিনীদের উদ্ধার কিসে?' বলল আহমদ মুসা।

‘আমি জানি না জনাব। তবে এবার আপনি একটা কিছু করতে পারেন’।

‘কিন্তু আমরা মুসলমানরাও তো মার্কিনীদের শত্রু’। আহমদ মুসা বলল।

‘না এটা ঠিক নয়। ইহুদী প্রপাগান্ডার ফলে কিছু বিভ্রান্তি আছে অবশ্য। কিন্তু থাকবে না। কারণ মুসলমানদের সোসাইটি ওপেন। আর ষড়যন্ত্র নয়, গণতন্ত্র ইসলামের পথ’।

‘ধন্যবাদ বেঞ্জামিন’।

তাদের এই আলোচনা অবিরাম চললই ওয়াশিংটন না পৌঁছা পর্যন্ত।

আহমদ মুসাদের হেলিকপ্টার যখন ওয়াশিংটনে ল্যান্ড করল, তখন রাত নেমেছে।

বেঞ্জামিন ন্যাসভিল থেকেই ওয়াশিংটনে ‘ফ্রি আমেরিকা’র লোকদের টেলিফোন করে দিয়েছিল।

বেঞ্জামিন বেকনদের হেলিকপ্টার ল্যান্ড করতেই একটা মাইক্রো ছুটে এল।

হেলিকপ্টারের পেমেন্ট আগেই করা হয়েছিল।

আহমদ মুসা ও বেঞ্জামিন বেকন হেলিকপ্টার থেকে নেমে গাড়িতে উঠল।

গাড়ি চলতে শুরু করল।

‘আমার কয়েকজন বন্ধু থাকেন ওয়াশিংটনে। আমি সেখানে উঠতে পারি’। বেঞ্জামিন বেকনকে লক্ষ্য করে বলল আহমদ মুসা।

‘আপনি যেটা ইচ্ছা করবেন, সেটাই হবে। তবে আমার অনুরোধ, জর্জ আব্রাহম জনসনের সাথে দেখা করার পূর্ব পর্যন্ত আপনি আমাদের সাথে থাকুন। আমি আপনার সম্পর্কে একটা এ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে ‘অনডিউটি’ ওয়াশিংটনে এসেছি। সুতরাং আপনার চলাফেরার ব্যাপারে আমি আপনাকে সহযোগিতা করতে পারব’।

‘আমার সম্পর্কে এ্যাসাইনমেন্ট কিভাবে নিলেন?’ বলল আহমদ মুসা বিস্মিত কন্ঠে?

‘আমি অফিসকে বলেছি, আমি আহমদ মুসাকে ফলো করব। ওয়াশিংটন পর্যন্ত আমাকে যেতে হতে পারে। এই এ্যাসাইনমেন্ট অফিস মঞ্জুর করেছে।

‘ধন্যবাদ বেঞ্জামিন। তাহলে আমি আপনাদের মেহমান হচ্ছি’।

‘ধন্যবাদ জনাব’। বলল বেঞ্জামিন খুশী হয়ে।

ছুটে চলছে তখন গাড়ি নিরবে ওয়াশিংটনের ব্যস্ত রাজপথ ধরে।

ওয়াশিংটনে পৌঁছার পর ৪০ ঘন্টা পার হয়ে গেছে। আজ বিকেল ছয়টায় জর্জ আব্রাহাম জনসনের সাথে আহমদ মুসার সাক্ষাতের সময় নির্দিষ্ট হয়েছে।

ওয়াশিংটনে আসার পরপরই সাক্ষাতের সময় করার জন্যে বেঞ্জামিন বেকন আহমদ মুসাকে বলেছিল। কিন্তু আহমদ মুসা তাকে বলেছিল, তার সাথে দেখা করার আগে ওয়াশিংটনে আমার কিছু কাজ আছে তা সারতে হবে। অনেকের সাথে কিছু কথাবার্তাও বলতে হবে।

আহমদ মুসা তার সে সব কাজ ও কথাবার্তা শেষ করার পর গতরাতে যোগাযোগ করেছিল জর্জ আব্রাহাম জনসনের সাথে।

জর্জ আব্রাহাম জনসনের সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হওয়ায় আহমদ মুসা ও বেঞ্জামিন বেকন দু’জনেই খুশী। তবে বেশী খুশী বেঞ্জামিন বেকন। তার ধারণা জর্জ আব্রাহাম জনসনকে কোন কিছু বুঝানো গেলে সি.আই এ এবং পেন্টাগণকে তা বুঝানো খুব সহজ হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীন নিরাপত্তা কমিটিতে জর্জ আব্রাহাম জনসন যেমন সিনিয়র, তেমন গৌরবপূর্ণ রেকর্ডের অধিকারী। সবার সমীহ সে পায়।

জর্জ আব্রাহাম জনসনের সাথে দেখা করার বিষয় ঠিক করতে গিয়ে আহমদ মুসাকে বেশ কথা বলতে হয়েছে।

আহমদ মুসার টেলিফোন পেয়ে প্রথমে ভূত দেখার মতই আঁৎকে উঠেছে জর্জ আব্রাহাম জনসন। প্রথমেই জিজ্ঞেস করেছে, ‘আপনি কি পুলিশ কাস্টডিতে, না মুক্ত অবস্থায় কথা বলছেন?’

আহমদ মুসা বলেছে, আপনার পুলিশ কাস্টডিতে যাওয়ার আগে আমি আপনার সাথে দেখা করতে চাই, অতি গোপনীয় কিছু বলার জন্যে, যে কথা আমি আর কাউকে বলব না'।

'আপনার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ আপনি জানেন?' বলেছিল জর্জ আব্রাহাম জনসন।

'জানি গুরুতর অভিযোগ'। বলেছিল আহমদ মুসা।

'তাহলে আপনি আত্মসমর্পন করে আমার সাথে সাক্ষাত করতে পারেন'। বলল জর্জ আব্রাহাম।

'আপনি ব্যবস্থা করে রাখবেন, আপনার সাথে কথা শেষ হওয়ার পরে আপনি আমাকে কাস্টডিতে নেবেন। আপনি সাক্ষাতকার না দেয়া পর্যন্ত আমি ধরা দেব না। আর আপনার পুলিশ ও গোয়েন্দারা ইচ্ছা করলেই যে আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারে, ব্যাপারটা তেমন নয়'। বলল আহমদ মুসা।

'ঠিক আছে, আমি সাক্ষাত করব। কিন্তু একটা বিষয় আপনি বলুন, আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগটা কি সত্যি?' জর্জ আব্রাহামের কন্ঠে অনুরোধের সুর।

'এফ.বি.আই চীফ হিসেবে অভিযোগ তো আপনিই দাঁড় করিয়েছেন। আপনি এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

'এফ.বি.আই চীফ হিসেবে এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছিনা, জিজ্ঞেস করছি ওহাইও নদীর মৃত্যু গহবর থেকে যে শিশুকে আপনি বাঁচিয়েছিলেন, সে শিশুর দাদা হিসেবে। আর এ জিজ্ঞাসা আপনার জন্যে আমার উদ্বিগ্ন স্ত্রীর পক্ষ থেকে'। বলে জর্জ আব্রাহাম।

ওহাইও নদীর সেই দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল আহমদ মুসার। ভেসে উঠেছিল চোখের সামনে জর্জ আব্রাহম জনসন এবং তার স্ত্রীর সেই ছবিও। মনটা ভিজে উঠে আহমদ মুসার। বলে, 'ঘটনাটা সত্য, অভিযোগ সত্য নয়, জনাব।

'গড ব্লেস ইউ মাই বয়। যদিও জানি তোমার অপরাধহীনতা তুমি প্রমাণ করতে পারবে না। তবু তোমার কথা আমি শুনব। তুমি এস। স্নেহ সিক্ত হয়ে উঠেছিল জর্জ আব্রাহাম জনসনের কন্ঠ।

‘ধন্যবাদ, বাই’। বলে টেলিফোন রেখে দিয়েছিল আহমদ মুসা।

জর্জ আব্রাহাম জনসনের সাথে আহমদ মুসার সাক্ষাতকার ঠিক হওয়ার আনন্দে বুঁদ হওয়ায় বেঞ্জামিন বেকনকে লক্ষ্য করে আহমদ মুসা বলল, ‘আপনি বলেছেন জর্জ আব্রাহাম সৎ ও দেশপ্রেমিক অফিসার। কিন্তু জানেন কি, এর সুবিধাও আছে, অসুবিধাও আছে?’

‘জানি, কিন্তু অপানার উপর আমার আস্থা আছে। জর্জ আব্রাহামকে বুঝানোর মন্ত্র আপনার কাছে না থাকলে আপনি তার সাথে সাক্ষাত করতে না’।

‘ধন্যবাদ মিঃ বেঞ্জামিন। আল্লাহ আপনার আশা সফল করুন’।

তখন বেলা ৪টা।

আহমদ মুসা বলল, ‘যাই তৈরী হয়ে নেই জর্জ আব্রাহামের ওখানে যাবার জন্যে’।

বেঞ্জামিন বেকন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, সবে বিকেল চারটা। দেখা করার সময় হলো বিকেল ছয়টা’।

আহমদ মুসা হাসল। উঠে দাঁড়িয়ে ভেতরে চলে গেল।

মিনিট পরেন পর বেরিয়ে এল একজন আরবী শেখের পোশাক পরে। বলল বিস্ময়ে হা হয়ে যাওয়া বেঞ্জামিন বেকনকে, ‘আমার নাম শাইখ আব্দুল্লাহ আলী আল নজদী। কয়েকদিন আগে আমি ওয়াশিংটন ইসলামিক সেন্টারের ডিরেক্টর হিসেবে সউদি আরব থেকে এসেছি। আজ বিকেল ৫টায় যাচ্ছি এফ.বি.আই চীফ জর্জ আব্রাহাম জনসনের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করতে এবং সেই সাথে সেন্টারের কাজ সম্পর্কে তাকে ব্রীফ করতে’। আহমদ মুসার মুখ ভরা হাসি।

‘ছদ্মবেশ ও নতুন নামের একটা যুক্তি আছে তা বুঝলাম, ক্নিতু সাক্ষাতকার ছয়টায়, পাঁচটায় কেন যাচ্ছেন? বলল বেঞ্জামিন বেকন। তার বিস্ময় তখনও কাটেনি।

ছয়টায় তো আহমদ মুসার সাথে তার সাক্ষাত, আর পাঁচটায় সাক্ষাত আমার সাথে, মানে শাইখ আব্দুল্লাহ আলী আল নজদীর সাথে’।

‘বুঝলাম না’।

‘খুবই সোজা। আমি এখন শাইখ আব্দুল্লাহ আলী আল নজদী হিসেবে দেখা করতে যাচ্ছি’।

তারপর?

তারপর দরকার হবে না, ছয়টায় যাওয়ার।

‘কিন্তু এর প্রয়োজন কি আমি বুঝতে পারছিনা। বরং আপনি যে শাইখ আব্দুল্লাহ নন, এটা এফ.বি. আই পুলিশ ইন্টেলিজেন্সের কাছে সহজেই ধরা পড়ে যাবে। কারণ এ ধরণের কোন লোক যখন সাক্ষাতকারে যান, তখন আগে থেকেই তাদের খোঁজ খবর রাখা হয়, এমন কি তাদের বাড়ির উপর চোখ রাখা হয়’।

‘দুপুরে খাবার পর পোশাক পরে একটা গাড়িতে শাইখ বেরিয়ে এসেছেন। আমি যতক্ষণ সাক্ষাতকারে থাকব, ততক্ষণ তিনি নিখোঁজ থাকবেন। তিনি যে গাড়ি নিয়ে দুপুরের পর বেরিয়েছেন, সেই গাড়িতেই আমি যাচ্ছি জর্জ আব্রাহামের সাথে দেখা করতে’।

‘সব বুঝলাম, কিন্তু প্রয়োজনটা বুঝছি না’।

বুঝছেন না?

‘না’।

‘দু’টি ঘটনার কথা ভাবুন তো। আমি আপনাকে জানিয়েছি, ন্যাসভিলে টেলিফোন করে ডাঃ আশরাফের কাছে জানতে পেরেছি আমি ও আপনি যে হেলিকপ্টারে ওয়াশিংটনে এসেছি তা ন্যাসভিলের ইহুদী লবী জানতে পেরেছে। আরেকটি ঘটনা আপনি আমাকে বলেছেন। এফ.বি.আই হেড কোয়ার্টারে আপনার ব্যাচমেট অন্যসব ডিউটি অফিসার ন্যাসভিলের সাথে আপনি কথা বললে তিনি জানতে চান বিকেল ছয়টায় আমার সাথে আপনি যাচ্ছেন কি না’। থামল আহমদ মুসা।

‘এ দু’টি ঘটনায় কি বুঝা যায়?’ বলল বেঞ্জামিন।

‘দু’টি জিনিষ পরিষ্কার হয়, আপনার সাথে আমি ওয়াশিংটনে এসেছি, এ গোপন কথা ইহুদী লবীর কারোই অজানা নেই। দ্বীতিয়তঃ, আজ বিকেল ছয়টায় আমি জর্জ আব্রাহামের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি, এটাও ইহুদী লবীর জানা হয়ে গেছে’, আহমদ মুসা বলল।

‘বুঝেছি জনাব, আপনি আশংকা করছেন ছয়টায় দেখা করা আপনার জন্যে নিরাপদ হবে না। এই জন্যে বিকল্প ব্যবস্থা । নির্ধারিত সময়ের আগেই সেখানে চলে যাবেন’।

শুষ্ক কন্ঠে কথাগুলো বলে একটু থামল বেঞ্জামিন বেকন। গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে আবার বলতে শুরু করল, ‘কি সর্বনাশ, ইহুদীদের এত সাহস হয়েছে! তারা এফ.বি.আই প্রধানের মেহমানকেও তাঁর সাথে দেখা করতে দেবে না!’ প্রয়োজন হলে কিডন্যাপ করবে!

একটু থেমে একটা ঢোক গিলে আবার বলল, ‘আপনি যান। আপনার পেছনে আমি থাকছি। আমার এখন রীতিমত ভয় করছে আমাদের প্ল্যান কার্যকরি হওয়ার বিষয়ে।

‘আসুন তবে, সাবধান!’

বলে আহমদ মূসা ব্রিফকেসটি হাতে নিয়ে ফিরে দাঁড়াল। চলতে শুরু করল।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ওঠল শাইখ আব্দুল্লাহ আলী আল নজদীর গাড়িতে।

দ্রুত একটা টেলিফোন সেরে বেঞ্জামিন বেকনও বাড়ীর গাড়ি বারান্দায় এসে আরেকটা গাড়িতে চড়ে বসল।

কিছু দূরত্বে দু’টি গাড়িই এগিয়ে চলছে FBI হেড কোয়ার্টারের দিকে।

পরবর্তী বই

## আমেরিকায় আরেক যুদ্ধ

## কৃতজ্ঞতায়ঃ Muhammad Shahjahan

সাইমুম-২৯

# আমেরিকায় আরেক যুদ্ধ

আবুল আসাদ

# ১

ওয়াশিংটন।

প্রধান রাস্তা থেকে এফ.বি.আই হেডকোয়ার্টার বেশ ভেতরে।

প্রধান রাস্তা থেকে লাল পাথরের একটা প্রশস্ত পথ, গিয়ে পৌঁছেছে বিশাল বিল্ডিং-এর গাড়ি বারান্দায়। প্রধান রাস্তাটিও গাড়ি বিরল।

পটোম্যাক নদীর এ এলাকাটা এমনিতেই জনবিরল। তার উপর আজ শনিবার। হঠাৎ দুএকটা দ্রুত গতির গাড়ি চোখে পড়ার পরই আবার হারিয়ে যাচ্ছে।

আহমদ মুসার গাড়ি সবে এই রাস্তায় গিয়ে পড়েছে।

রাস্তার দুই পাশে গাছের সারি। রাস্তার এক পাশ ধরে আহমদ মুসার গাড়ি দ্রুত এগিয়ে চলছে।

আহমদ মুসার চোখের দৃষ্টি সামনে প্রসারিত। হঠাৎ আহমদ মুসার চোখে পড়ল কিছু দূর সামনে একটা গাড়ি রাস্তার বাইরে নিয়ে পার্ক করা।

দুজন লোক গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। একজনের হাতে একটা ওয়াকিটকি।

আহমদ মুসার গাড়ি ঐ সমান্তরালে যেতেই দুজনের একজন হাত তুলে আহমদ মুসার গাড়ি থামাতে বলল। ড্রাইভার গাড়ি দাঁড় করাল। গাড়ি দাঁড়াতেই দুজন এগিয়ে এল। ওয়াকিটকিধারী ওয়াকিটকিতে কথা বলছিল। তার শেষ কথাটা আহমদ মুসা শুনতে পেল, 'বুঝলাম, তাকে যেতে দেব না। ওকে কমপক্ষে এক ঘন্টা আটকে...... ঠিক আছে।'

ওয়াকিটকিধারী আহমদ মুসাকে বলল, 'তুমি কি শেখ আবদুল্লাহ আলী?'

'জি, হ্যাঁ।' শেখ আবদুল্লাহ আলী রূপী আহমদ মুসা উত্তর দিল।

'এদিকে কোথায় যাচ্ছ? এ রাস্তা বন্ধ, এদিকে এখন যাওয়া যাবে না।'

বলে ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে নির্দেশ দিল, 'গাড়িটা রাস্তার বাইরে ওদিকে নিয়ে যাও।'

'আমি যাচ্ছি এফ.বি.আই প্রধান জর্জ আব্রাহামের সাথে দেখা করতে ৫টায় তার সাথে আমার এ্যাপয়েন্টমেন্ট' বলল শেখ আবদুল্লাহ রূপী আহমদ মুসা।

লোকটি মুখ বাঁকা করে বলল, 'জর্জ আব্রাহামের সাথে মৌলবাদীর কি দরকার! সন্ত্রাসী আহমদ মুসার পক্ষে তদবীর করতে? সৌদি সরকার পাঠিয়েছে? তা যাবে, ঘন্টা খানেক পরে।'

কথা শেষ করে আবার নির্দেশ দিল ড্রাইভারকে, 'গাড়ি ঘুরাও। নিয়ে চল ওদিকে।'

আহমদ মুসা বিস্মিত হলো, এরা যদি শেখ আবদুল্লাহ আলীর জন্য এই ব্যবস্থা করে থাকে, তাহলে আহমদ মুসার জন্য এরা কি আয়োজন করে রেখেছে আল্লাহই জানে।

ড্রাইভার নির্দেশের জন্য আহমদ মুসার দিকে তাকাল।

আহমদ মুসা ড্রাইভারকে কিছু না বলে ওয়াকিটকিধারীর দিকে চেয়ে বলল, 'একবার বলছেন রাস্তা বন্ধ। আবার বলছেন এক ঘন্টা যাওয়া যাবে না। রাস্তাটা কি এক ঘন্টা বন্ধ থাকবে?'

'ওসব কথা নয়। তোমার যাওয়া হবে না। জর্জ আব্রাহামের কাছে আহমদ মুসার পক্ষে দালালী করতে তোমাকে আমরা যেতে দেব না।' বলল ওয়াকিটকিধারী।

‘বারবার আহমদ মুসার সাথে আমাকে যুক্ত করছেন কেন? তার সাথে আমার এই যাওয়ার কি সর্ম্পক?’ হাসল শেখ আবদুল্লাহ আলী রূপী আহমদ মুসা।

‘ইস ন্যাকা সাজা হচ্ছে! ও নিয়েছে ৬টায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট, আর তুমি নিয়েছ ৫টায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট! বিনা যোগাযোগে? তুমি গিয়ে সৌদি সরকারের পক্ষ থেকে আহমদ মুসার জন্য তদবির করে আসবে, এরপর আহমদ মুসা যাবে ফায়দা নেবার উদ্দেশ্যে, এ সহজ কথাটা আমরা বুঝিনা, না?’ আহমদ মুসা মনে মনে হাসল। মনে মনেই বলল, বুঝবে না কেন, তোমরা তো একটা বুদ্ধির ঢেকি! প্রকাশ্যে বলল, ‘ঠিক আছে তাহলে ফিরে যাই।’

‘না ফিরে যেতে পারবে না।’

‘কেন?’

‘ফিরে গিয়ে আহমদ মুসাকে সাবধান করবে তা কি হতে দিতে পারি আমরা? সে আসুক এটাই তো আমরা চাচ্ছি। কত আয়োজন তার জন্য!’

‘আয়োজনটা আবার কি?’

‘তুমি আশেপাশে থাকলে, দেখতে পাবে। আধ ঘন্টার মধ্যেই সবাই এসে পড়বে।’

‘না, আমি থাকছি না।’

উত্তরে ওরা কিছু বলল না। হঠাৎ তাদের মুখের ভাব কঠোর হয়ে উঠল। দুজনের হাতেই রিভলবার উঠে এল। ওয়াকিটকিধারী তার রিভলবার ড্রাইভারের দিকে তাক করে বলল, ‘যা বলেছি সে আদেশ পালন কর।’

ড্রাইভার তাকাল আহমদ মুসার দিকে নির্দেশের জন্য।

‘ও আমার আদেশ......’

কথা শেষ করতে পারল না লোকটি।

পেছন থেকে পরপর তিনবার দুপ দুপ শব্দ হলো। সংগে সংগেই দেখা গেল, গাড়ির পাশে দাঁড়ানো ওদের হাত থেকে দুটি রিভলবার ও ওয়াকিটকি ছিটকে পড়ে গেল। আর্তনাদ করে উঠলো ওরা দুজনই। ওয়াকিটকিধারীর দুই হাত এবং অন্যজনের ডান হাত রক্তাক্ত।

আহমদ মুসা পেছনে তাকাল। দেখল, বেঞ্জামিন বেকনের গাড়ি পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। সাইলেন্সার লাগানো রিভলবার হাতে নেমে এসেছে গাড়ি থেকে বেঞ্জামিন বেকন।

আহমদ মুসা গাড়ি থেকে নামছিল।

বেঞ্জামিন বেকন 'না, না' বলে নিষেধ করল। বলল, 'ইয়া শেখ, আপনার নামার দরকার নেই। আপনি চলে যান। আমি এদের ব্যবস্থা করছি।' বলে বেঞ্জামিন বেকন তার রিভলবারের বাট দিয়ে দুজনের মাথায় দুটি ঘা লাগিয়ে বলল, 'চল, আমার গাড়িতে উঠ। একটু দেরী করলে রিভলবারের গুলি এবার মাথা গুড়িয়ে দেবে।'

লোক দুটি চলল বেঞ্জামিনের গাড়ি লক্ষ্যে।

আহমদ মুসার গাড়ি তখন স্টার্ট নিয়ে চলতে শুরু করেছে।

একটু পর আহমদ মুসা পেছনে ফিরে দেখল, লোক দুটি বেঞ্জামিনের গাড়িতে উঠছে। আর বেঞ্জামিন কিছু দড়ি নিয়ে এগুচ্ছে তাদের দিকে।

'বেঞ্জামিন তাহলে ওদের বেঁধে গাড়িতে রাখবে' ভাবল আহমদ মুসা। বেঞ্জামিনের সতর্কতাকে মনে মনে ধন্যবাদ দিল সে। মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানাল বেঞ্জামিন কে। সে এসে তাকে এই অপ্রীতিকর কাজে জড়িয়ে পড়া থেকে উদ্ধার করেছে। তার যে পরিচয় এবং পোশাক তা নিয়ে এই কাজে জড়িয়ে পড়া তার জন্য নিরাপদ ও শোভন হতো না। আল্লাহ তাকে বাঁচিয়েছেন।

আবার চোখ ফেরাল আহমদ মুসা পেছনে। দেখল, বেঞ্জামিনের গাড়ি ফিরে যাচ্ছে।

আহমদ মুসা পৌছে গেল এফ.বি.আই ভবনগামী সেই লাল পাথুরে রাস্তার মুখে।

সেই রাস্তার মুখে সাদা পোশাকে দুজন লোক দাড়িয়ে। তাদের হাতে ওয়াকিটকি, ওরা এফ,বি, আই-এর লোক, দেখেই আহমদ মুসা চিনল।

গাড়ি ওদের সামনে এসে দাঁড়াতেই ঐ দুজনের একজন গাড়ির ভেতরে উকি দিয়ে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে সসম্মানে বলল, 'আপনি কি মিঃ শেখ আবদুল্লাহ আলী?'

‘হ্যাঁ।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ওয়েলকাম স্যার।’ বলে রাস্তার একপাশে সরে দাঁড়াল ওরা দুজন।

আহমদ মুসার গাড়ি লাল পাথরের সড়ক ধরে এগিয়ে গেল এফ.বি.আই ভবনের দিকে, গাড়ি বারান্দায় গিয়ে প্রবেশ করল। গাড়ি বারান্দার পরেই প্রশস্ত করিডোর, তার পরেই বিল্ডিং-এ প্রবেশের বিশাল দরজা। দরজায় দুজন সেন্ট্রি।

আহমদ মুসার গাড়ি থামতেই একজন সেন্ট্রি ছুটে এল। আহমদ মুসার গাড়ির গেট খুলে ধরল।

আহমদ মুসা গাড়ি থেকে বেরুল।

স্যালুট দিল সেন্ট্রি।

সেন্ট্রি আহমদ মুসাকে নিয়ে উঠে গেল বারান্দায়।

বড় দরজার পাশেই আরেকটা ছোট দরজা। সেন্ট্রি আহমদ মুসাকে নিয়ে গিয়ে সেই ছোট দরজার সামনে দাঁড়াতেই দরজা খুলে গেল।

বিরাট একটি কক্ষ। সোফায় সাজানো।

অভ্যর্থনা কক্ষ এটা।

দরজার ডানপাশে একটি কাউন্টার। তৎপর একটি মহিলা সে কাউন্টারে বসে।

আহমদ মুসা ভেতরে ঢুকতেই ‘গুড ইভনিং!’ বলে স্বাগত জানাল আহমদ মুসাকে। এরপর টেলিফোন তুলে কার সাথে কি কথা বলে মেয়েটি উঠে এল। আহমদ মুসাকে নিয়ে একটা সোফায় বসার অনুরোধ করে বলল, ‘একটু বসুন স্যার, ভেতরে নিয়ে যাবার জন্য লোক আসছে।’

আহমদ মুসা বসল।

মেয়েটি ফিরে এল তার কাউন্টারে।

মিনিট দুয়েকের মধ্যে কক্ষটির ভেতরের দরজা দিয়ে একজন লোক এসে প্রবেশ করল। সোজা এসে ‘গুড ইভনিং স্যার’ বলে আহমদ মুসার সামনে দাড়াল। তার হাতে একটি কাগজ। একবার কাগজ ও একবার আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আসুন স্যার, আমার সাথে।’

বলে সে ঘুরে দাড়াল।

আহমদ মুসাও উঠে তার পিছু নিল।

এফ.বি.আই হেড কোয়ার্টার ১১ তলা একটা বিশাল বিল্ডিং।

একেবারে পটোম্যাক নদীর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে।

হেডকোয়ার্টারের দুটি ফ্রন্ট সাইড। একটা আহমদ মুসা যে দিক দিয়ে এল সেদিকে, আরেকটা পটোম্যাক নদীর সাথে। পটোম্যাক নদীতে ভাসছে এফ.বি.আই-এর উভচর হেলিকাপ্টার ও ছোট ছোট প্লেনগুলো।

আর শত গাড়ির গ্যারেজ রয়েছে আন্ডার গ্রাউন্ড টপ ফ্লোরে।

আহমদ মুসাকে নিয়ে লোকটি এল সাত তলায়। এই সাত তলার মাঝামাঝি পটোম্যাক প্রান্তের একটা বিশাল কক্ষে বসে এফ.বি.আই প্রধান জর্জ আব্রাহাম জনসন।

জন আব্রাহাম জনসনের কক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল তার পি,এস। আহমদ মুসাকে নিয়ে লোকটি সেখানে পৌছতেই জর্জ আব্রাহামের পি,এস লোকটিকে একটা ধন্যবাদ দিয়ে আহমদ মুসাকে নিয়ে দরজা ঠেলে প্রবেশ করল একটা ঘরে।

ঘরটা বেশ বড়। সোফায় সাজানো। দেখে ওয়েটিং রুমের মত মনে হয়। সে ঘরের পর একটা করিডোর। তারপর প্রবেশ করল আরেকটা বিশাল কক্ষে। দেখেই বুঝল আহমদ মুসা কক্ষটি কনফারেন্স রুম।

কনফারেন্স রুমের পর আবার করিডোর। তারপর প্রবেশ করল আরেকটি কক্ষে, এ ঘরও সোফায় সাজানো।

ঘরে ঢুকে একটা সোফা দেখিয়ে আহমদ মুসাকে বলল, ‘বসুন স্যার, চীফ স্যার এখনি এসে পড়বেন।’

বলে পি, এস বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বসতে বসতে আহমদ মুসা ভাবল পি, এস সাহেব তাকে সাধারণের চলাচলের পথ দিয়ে নিয়ে আসেনি, ডানদিকের সংক্ষিপ্ত পথে নিয়ে এসেছে। কক্ষটি দেখে আহমদ মুসা ভাবল এটা সাক্ষাতকার রুম। এমন সাক্ষাতদানের রুম হয়তো আরও আছে।

দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল এক প্রৌঢ় ব্যক্তি, মাথার চুলে মিলিটারি ছাঁট। মাথায় সাদা-পাকা চুলে বয়সের ছাপ আছে, কিন্তু দেহে তা নেই। দেখলেই বুঝা যায় মেদহীন পেটা শরীর।

আহমদ মুসা প্রথম নজরেই চিনতে পারল ওহাই নদীর মটর বোটে দেখা জর্জ আব্রাহাম জনসনকে। ছদ্মবেশে থাকায় আহমদ মুসাকে তার চেনার কথা নয়।

সে সময় জর্জ আব্রাহামের চোখের দিকে আহমদ মুসা তাকিয়েছিল কিনা মনে পড়ছে না, কিন্তু আজ দেখল বাজের মত শিকারী চোখ দুটি তার।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়েছিল।

জর্জ আব্রাহাম জনসনই প্রথম হাত বাড়াল হ্যান্ডশেকের জন্য।

আহমদ মুসাও হাত বাড়াল।

'আমি জর্জ আব্রাহাম জনসন।' হ্যান্ডশেক করতে করতেই বলল সে।

'আমি আহমদ মুসা।' হ্যান্ডশেক অবস্থাতেই বলল আহমদ মুসা।

মুখে যখন নিজের নাম উচ্চারণ করছিল আহমদ মুসা, তখন বাম হাত দিয়ে মুখের দাঁড়ি সে খুলে ফেলছিল।

প্রথমেই বিস্ময় ও বিব্রতকর অবস্থা ফুটে উঠল জর্জ আব্রাহামের মুখে। কিন্তু পরক্ষণেই তার চোখ দুটি জ্বলে উঠল বাঘের মত। চোখের পলকে তার বাম হাত পকেট থেকে রিভলবার বের করে এনে আহমদ মুসার কপাল বরাবর তাক করল। বলে উঠল তীব্র কন্ঠে 'এই প্রতারণার অর্থ কি আহমদ মুসা?'

জর্জ আব্রাহাম জনসন ও আহমদ মুসারে ডান হাত তখনও হ্যান্ডশেকে আবদ্ধ।

হাসল আহমদ মুসা। শিশুর মত নিদোর্ষ হাসি। বলল, 'আপনার সাথে দেখা করাটা নিশ্চিত করার জন্য।'

'কেন সাক্ষাতের জন্যে সময় তো নির্দিষ্ট আছে বিকেল ছটায়।'

'তখন আসতে পারতাম না। আসতে দেয়া হতো না। পথেই আটক করা হতো।'

'একটা অসম্ভব কথা বলছেন আহমদ মুসা।'

‘অসম্ভব নয়, এটাই বাস্তবতা। আমি মানে শেখ আবদুল্লাহ আলীকেও বাধা দেয়া হয়েছিল। বাধাদান কারী দুজনকে আমার সাহায্যকারী কাবু করে নিয়ে যায় তার ফলে আমি আসতে পেরেছি।’

‘কারা কেন শেখ আবদুল্লাহ আলীকে বাধা দিয়েছিল?’

‘শেখ আবদুল্লাহ আলীকে নাকি সৌদি সরকারের তরফ থেকে আহমদ মুসার পক্ষে তদ্বীর করার জন্য আপনার কাছে পাঠানো হয়েছে। এই তদ্বীর যাতে শেখ আবদুল্লাহ করতে না পারে এজন্য তাকে এক ঘন্টা আটকে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।’

একটু ভাবল জর্জ আব্রাহাম জনসন।

তার রিভলবার ধরা বাম হাত নিচে নেমে গেল এবং রিভলবারও গিয়ে পকেটে ঢুকল।

‘এখানে কথা বলা নিরাপদ নয় বলে মনে হচ্ছে, আপনি আমার অফিসে আসুন।’

বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটা শুরু করল জর্জ আব্রাহাম জনসন।

আহমদ মুসাও চলল তার পেছনে পেছনে।

বিরাট অফিস কক্ষ জর্জ আব্রাহাম জনসনের।

বড় টেবিল। তার বা পাশে দীর্ঘ প্রশস্ত ডেস্ক। ডেস্কটা ইন্টারনেট, ইন্টারকম, ফ্যাক্স ও নানা রকম টেলিফোনে ঠাসা।

পেছনে একটা বিগ সাইজ কম্পিউটার।

জর্জ আব্রাহাম টেবিলের সামনে একটা চেয়ার দেখিয়ে আহমদ মুসাকে বসতে বলে নিজে গিয়ে টেবিলের ওপাশে বসল নিজের চেয়ারে।

‘কিন্তু আমি বিস্মিত হচ্ছি আপনার সাথে এ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যাপারটা জানাজানি হলো কি করে? ব্যাপারটা আমি কাউকে জানাইনি। ঠিক করেছিলাম, আমি গিয়ে গেট থেকে আপনাকে নিয়ে আসব।’

‘আপনার টেলিফোন মনিটর হতে পারে না?’

‘এফ. বি. আই-এর সেন্ট্রাল সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ সব কিছুই রেকর্ড করে থাকে।’

‘সেখান থেকে তো এ তথ্য পাচার হতে পারে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘হতে পারে। কিন্তু বিস্মিত হচ্ছি, কারা এ নিয়ে মাথা ঘামাল এবং কেন?’

‘আমি বোধ হয় আপনাকে সাহায্য করতে পারি?’

‘কি সেটা?’ ভ্রু কুঞ্চিত করে বলল জর্জ আব্রাহাম।

‘আপনার একজন ডিউটি অফিসার বিষয়টা জানে। সে জড়িতও থাকতে পারে। তার এখন ডিউটি নেই, তবু সে অফিসে কিংবা আসে-পাশে আছে বলে জানি।’

চমকে উঠার মতই চোখটা চঞ্চল হয়ে উঠল জর্জ আব্রাহাম জনসনের। বলল, ‘ডিউটি অফিসারের নাম বলতে পারবেন?’

‘মিঃ ম্যাগগিল।’

‘ম্যাগগিল?’ চমকে উঠার মত নাম উচ্চারণ করেই হঠাৎ যেন কোন ভাবনায় ডুবে গেল জর্জ আব্রাহাম। সে চেয়ার হেলান দিয়ে তাকিয়ে আছে সামনে। কিন্তু তার দৃষ্টিতে শুন্যতা।

হঠাৎ সোজা হয়ে বসল জর্জ আব্রাহাম। ইন্টারকমের সামনে ঝুঁকে পড়ল। চাপ দিল একটা কীতে।

ওপার থেকে একটা কন্ঠ ভেসে এল, ‘সিকিউরিটি চীফ হারমান হেইঞ্জ বলছি।’

‘জর্জ আব্রাহাম, গুড ইভনিং।’ বলল জর্জ আব্রাহাম।

‘স্যার, গুড ইভনিং। কিছু নির্দেশ স্যার?’

‘হ্যাঁ। শোন, বিকেল ৬টায় আমার পার্সোনাল একটা এ্যাপয়েন্টমেন্ট। এটা ফাঁস হয়েছে। কারা করল, কেন করল, আমি জানতে চাই।’

‘স্যার, এ্যাপয়েন্টমেন্ট কিভাবে হয়েছিল?’

‘আমার সরাসরি টেলিফোনে।’

‘ধন্যবাদ। আরও কোন ইনফরমেশন আছে স্যার আমাকে সাহায্য করার মত?’

‘ফাঁস করার মাধ্যমে যারা জানে তাদের একজন ম্যাগগিল।’

‘ধন্যবাদ স্যার। কবে কয়টায় এ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছিল স্যার?’

‘আজ সকালে।’

‘অনেক ধন্যবাদ স্যার। আমি এখনি বিষয়টা দেখছি স্যার। আমি খবর পেয়েছি, ডিউটি শেষ হয়ে যাবার পরও ম্যাগগিল চলে যায়নি। ক্লাবে বসে আড্ডা দিচ্ছে।’

‘কতক্ষণে আমাকে জানাবে?’

‘৬টা বাজার আগেই, স্যার।’

‘ধন্যবাদ হেইঞ্জ।’

‘ওয়েলকাম স্যার।’

ইন্টারকম অফ করে দিয়ে আহমদ মুসার দিকে ফিরে জর্জ আব্রাহাম বলল, ‘খবরটা পাওয়ার আগে আপনার সাথে কোন কথা বলব না এই ব্যাপারে। আসুন চা খাই।’

আহমদ মুসা তার হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল সাড়ে পাঁচটা বাজে।

চা খেতে খেতে প্রথম নিরবতা ভাঙল জর্জ আব্রাহামই। বলল, ‘আমার সেই নাতিটা কেমন আছে, আপনি কিন্তু একবারও জিজ্ঞেস করেননি।’ জর্জ আব্রাহাম অস্পষ্ট একটা হাসি হাসল।

‘আপনার পারিবারিক কোন বিষয়কে আপনার অফিসে টেনে আনা ঠিক মনে করিনি। দ্বিতীয়ত আমি ব্যক্তি আহমদ মুসা হিসেবে আসিনি, এসেছি আপনাদের সাংঘাতিক এক অভিযোগের আসামী হিসেবে।’ বলল গম্ভীর কন্ঠে আহমদ মুসা।

‘ঠিক বলেছেন। ধন্যবাদ আপনাকে।’ বলল জর্জ আব্রাহাম। তারও গম্ভীর কন্ঠ।

আরও কিছুক্ষণ পর, এবারও নিরবতা ভাঙল জর্জ আব্রাহাম। বলল, ‘ন্যাসভিলের রিপোর্ট আমি পেয়েছি। রিপোর্ট পেন্টাগন, সি.আই.এ এবং প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা অফিসেও গেছে। সবাই আমরা বিস্মিত যে, সুযোগ পেয়েও আপনি পালানোর পরিবর্তে আহত মূমুর্ষু শত্রুদের উদ্ধার ও বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন। তার ফলে আমাদের তিনটা মূল্যবান প্রাণ রক্ষা পেয়েছে। বলুন তো এ রকম মানবতাবোধ যার, তিনি কেন খুনোখুনির জগতে?’

‘ঐ মূমুর্ষদের মত যারা মজলুম অসহায় তাদের সেবা করার জন্যে।’ গম্ভীর কন্ঠ আহমদ মুসার।

জবাবে তৎক্ষণাৎ কোন কথা বলল না জর্জ আব্রাহাম। ভাবছিল সে। অনেকক্ষণ পরে বলল, ‘ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আইন এবং শত্রুরা একথা মানবে না। লস-আলামোস ল্যাবরেটরী অব স্ট্রাটেজিক রিসার্চে আপনি ঢুকে ছিলেন, এটা প্রমাণিত হলে আইন অত্যন্ত কঠোরভাবে তা দেখবে।’

‘তাই দেখা উচিত জনাব।’ আহমদ মুসার ঠোঁটে মিষ্টি এক টুকরো হাসি।

সেদিকে তাকিয়ে জর্জ আব্রাহাম বলল, ‘আপনার মত শক্ত নার্ভের মানুষ আমি দেখিনি। আপনার জন্য আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আপনি আত্মসমর্পণ করতে এলেন কেন?’

‘কারণ, আপনারা আমাকে ধরে রাখতে পারবেন না।’

‘এফ.বি.আই অফিসে বসে একথা বলা কি সাজে?’

‘না সাজলে বলতাম না।’

‘তা ঠিক। কিন্তু এটা অমূলক একটা অহংকার আপনার।’

‘প্রকৃত মুসলমান যে সে অহংকার করে না, করতে পারে না।’

‘আবার মুসলমানিত্বকে টেনে আনছেন কেন, আমরা মানুষ হিসাবে কথা বলছি।’

‘কিন্তু আমি মানুষ হিসাবে কথা বলছি না, মুসলমান হিসাবে কথা বলছি।’

‘তার কোন দরকার কি আছে? মানুষ হওয়াটাই কি যথেষ্ট নয়?’

‘আচ্ছা বলুন তো, রাস্তার ভীড় থেকে একজনকে ধরে এনে আপনার চেয়ারে বসালেই সে কি এফ.বি.আই প্রধানের দায়িত্ব পালন করতে পারবে?’

‘পারবে না।’

‘কেন পারবে না।’

‘এফ.বি.আই-এর ট্রেনিং তার নেই এবং এফ.বি.আই প্রধানের দায়িত্ব-কর্তব্যও জানা থাকবে না তার।’

‘এই বিশ্ব সংসারে প্রতিটি মানুষ একজন করে শাসক। সে নিজেকে, পরিবারকে, কিছু মানুষকে এবং তার চারপাশের সৃষ্ট জগতকে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ

করে। এই শাসন ও নিয়ন্ত্রণ শেখার জন্যে এফ.বি.আই-এর মত আর ট্রেনিং ও দায়িত্ব-কর্তব্যের শিক্ষা থাকা দরকার কিনা?'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না জর্জ আব্রাহাম। একটু ভাবল। তারপর বলল, 'এ শিক্ষা তো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এবং সরকার দেয়।'

'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এবং সরকার প্রফেশনাল বা পেশাজীবী তৈরী করে, ঐ 'শাসক মানুষ' তৈরী করে না। সরকারের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ট্রেনিং কর্মসূচীতে মানুষের 'মৌলিক শিক্ষা'টা কি? -এই পৃথিবীতে মানুষের সৃষ্টি কেন? তার পরিণতি কি? ইত্যাদি। দেখুন আপনি আপনার চারদিকে সৃষ্ট জগতের দিকে চেয়ে, সবকিছুই সৃষ্টি হয়েছে মানুষের জন্য, মানুষের উপকারের জন্যে, মানুষের দ্বারা ব্যবহৃত হবার জন্যে। গাছ-পালা ও পশু-পাখি থেকে শুরু করে চাঁদের আলো, সূর্যের কিরণ, নদ-নদী-সমুদ্র-বৃষ্টি, সৌর-জাগতিক সম্বন্ধ, তারকাপুঞ্জের (গ্যালাক্সি) ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান সবই মানুষকে ঘিরে। কিন্তু সৃষ্ট জগতের উপর একচ্ছত্র শাসক মানুষের সৃষ্টি কোন উদ্দেশ্যে, কি তার কাজ? তার একটাই কাজ খঁজে পাওয়া যায়, আর সেটা হলো ঐ শাসন নিয়ন্ত্রণ যা সে নিজের উপর, পরিবারের উপর, অধিনস্ত কিছু মানুষের উপর এবং আয়ত্বাধীন সৃষ্ট জগতের উপর চালায়। এটাই তার মূল কাজ, মূল দায়িত্ব। এই কাজ সম্পাদন ও দায়িত্ব পালনের জন্যে কি শিক্ষার দরকার নেই? এই শিক্ষাই মানুষে মৌলিক শিক্ষা।'

'এটাতো দর্শণ শিক্ষা।'

'দর্শণ শিক্ষা বটেই, কিন্তু 'মানুষ প্লেটো', 'মানুষ হেগেল' প্রমুখের দর্শন নয়। তাঁদেরও যিনি স্রষ্টা সেই আল্লাহর দর্শন বা জীবন বিধানই হলো মূল শিক্ষা।'

'আপনি ধর্ম শিক্ষার কথা বলছেন?'

'ধর্ম শিক্ষা মানে তো মানুষ কি করবে, কি করবে না অর্থাৎ মানুষের জীবন পরিচালনার শিক্ষা।'

'এ নির্দেশ তো আমাদের সংবিধানেই আছে।'

'ও তো মানুষের তৈরী।'

'তাতে দোষ কি? জনমতের ভিত্তিতে জনগণের জন্যেই তৈরী এ সংবিধান।'

‘মানুষ যখন কিছু করে তার সংকীর্ণ স্বার্থে করে। মানুষের তৈরী আইন ও সংবিধান তাই সংকীর্ণ স্বার্থ-দুষ্ট হয়ে থাকে। আর আল্লাহর সংবিধান পৃথিবীর সকল মানুষের সার্বিক মঙ্গলের জন্যে। যেমন মদ খাওয়া খারাপ, কিন্তু আমেরিকান আইন জনমতের ভিত্তিতে এই খারাপ জিনিসকে বৈধ করেছে। কিন্তু আল্লাহর আইনে মদ পানের মত ক্ষতিকর কাজ বৈধ হবে না সব মানুষ চাইলেও। অনুরূপভাবে আমেরিকান আইনে অবৈধ ব্যভিচার যদি সম্মতিমূলক হয়, তাহলে শাস্তিযোগ্য হবে না, কিন্তু আল্লাহর সংবিধানে ব্যভিচার সম্মতিমূলক হোক বা অসম্মতিমূলক হোক উভয়ক্ষেত্রেই শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এমন হাজারো দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখানো যাবে যে, মানুষ নিজের ভালো নিজেই বোঝে না, নিজের হাতেই সে নিজের ধ্বংসের আইন রচনা করে (যেমন মৃত্যদন্ড রহিত করা আইন)। এর অর্থ, মানুষ তার জীবন পরিচালনার আইন তৈরী বা সংবিধান রচনার উপযুক্ত নয়। প্রকৃত পক্ষে এই অধিকারই মানুষ রাখে না। মানুষের জন্য সংবিধান আসবে আল্লাহর কাছ থেকে।’

‘তাহলে কি মানুষ আইন প্রনয়ন করবে না?’

‘করবে আল্লাহর দেয়া সংবিধানের ভিত্তিতে।’

‘থাক, মিঃ আহমদ মুসা। আর নয়। দেখছি, আর একটু এগুলে হয় তো আমি মৌলবাদীই হয়ে পড়বো। স্বীকার করছি, যা বলেছেন তার কোনটাই অযৌক্তিক নয়। এ ভারি বিষয়গুলো নিয়ে পরে আরও ভাববো। এখন আসল কথায় ফিরে আসি।’

বলে একটা দম নিয়ে জর্জ আব্রাহাম বলল, ‘তাহলে দাঁড়াল, আমরা আপনাকে আটকাতে পারব না, এটা আপনার কোন অমূলক অহংকারের কথা নয়।’

‘হ্যাঁ, তাই জনাব।’

‘আমি খুশি হবো যদি তাই হয় যে, আমরা আপনাকে আটকাচ্ছি না। কিন্তু জেনে রাখবেন আমাদের সকল আইন ভাল বা মন্দ হোক, এ আইনের হাত থেকে রেহাই আপনি পাবেন না। যদিও তাতে কষ্ট............।’

কথা শেষ করতে পারলো না জর্জ আব্রাহাম। তার ইন্টারকম কথা বলে উঠল। সিকিউরিটি চীফ হারমান হেইঞ্জের কন্ঠ। বলল, ‘গুড ইভনিং স্যার। আমি হারমান হেইঞ্জ।’

‘গুড ইভনিং। বল।’

‘ম্যাগগীল সহজেই কথা বলেছে। প্রাথমিক কাজ হয়ে গেছে স্যার। রিপোর্ট পাঠালাম। আর সামনে এগুতে হলে আপনার জরুরী নির্দেশ দরকার।’

‘অপেক্ষা কর, রিপোর্ট পড়ে নেই। ধন্যবাদ।’

বলে ইন্টারকম অফ করে দিল জর্জ আব্রাহাম।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কম্পিউটার থেকে একটা প্রিন্টেড শিট বেরিয়ে এল।

জর্জ আব্রাহাম দ্রুত চোখ বুলাতে লাগল প্রিন্টেড শিটটিতে।

পড়া তাঁর যতই এগুতে লাগল, তার মুখের ভাব ততই পরিবর্তিত হতে লাগল।

পড়া যখন শেষ হলো, তখন সাদা চেহারা তার লাল হয়ে উঠেছে। সেই সাথে শক্ত হয়ে উঠেছে তার মুখমন্ডল। বলল সে, ‘মিঃ আহমদ মুসা আপনার অনুমান সত্য। আপনি ৬টায় সত্যিই আসতে পারতেন না। আমাদের সামনের ‘পটোম্যাক ১১’ রোডের মুখে দুই গাড়ি বোঝাই লোক ওৎ পেতে ছিল। আপনি ঐ রোডে প্রবেশ করলেই সামনে ও পেছন থেকে আপনার গাড়ি ঘিরে ফেলা হতো।’

‘এ রকম ঘটবে আমি আগেই অনুমান করেছিলাম। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আপনার টেলিফোনের কথা ফাঁস হলো কাদের দ্বারা?’

‘জানতে চাইলেন না, ওৎ পেতে ছিল ওরা কারা?’

‘জানি আমি। ওরা জেনারেল শ্যারণ ও মিঃ গোল্ড ওয়াটারের লোক।’

‘না আহমদ মুসা। জেনারেল অত্যন্ত চালাক লোক। তার লোক এখানে পাঠিয়ে ধরা পড়ার ঝুঁকি নেবে না।’

‘তাহলে?’

‘আমাদের এফ.বি.আই-এর আটজন লোক ধরা পড়েছে।’

‘জেনারেল শ্যারণের ভাড়া করা?’

‘বলতে পারেন’

‘আর টেলিফোনের কথা ফাঁসের ব্যাপারটা?’

‘ডিউটি অফিসার ম্যাগগিল স্বীকার করেছে ফাঁস করার দায়িত্ব। কিন্তু সিকিউরিটি অফিসার হারমান হেইঞ্জের ধারণা আমাদের মনিটরিং ও কম্যুনিকেশন সেলেও ভূত থাকতে পারে।’

‘আমি আশ্চর্য হচ্ছি মিঃ জর্জ আব্রাহাম ইহুদী স্বার্থের কাছে এফ.বি.আই-এর মত প্রতিষ্ঠানও এত ভঙ্গুর!’

‘আপনার অভিযোগ সত্য, ওরা বিরাট দোষণীয় কাজ করেছে এটাও সত্য, কিন্তু নিশ্চয় দেশপ্রেম থেকেই ওটা করেছে বলে মনে করছে। এ রকমই তাদের বুঝানো হয়েছে।’ বলল জর্জ আব্রাহাম।

‘দেশপ্রেমের কাজ হলো কেমন করে?’

‘এ তথ্যটা আপনিও দিলেন। ব্যাপারটা এই রকম, সৌদি সরকারের চাপ পড়েছে মার্কিন সরকারের উপর আহমদ মুসাকে অভিযোগ থেকে মুক্তি দেবার জন্যে। এই চাপে আমি এফ.বি. আই চীফ বুঝাপড়ার মাধ্যমে ব্যাপারটা সেটেল করার জন্য আহমদ মুসাকে ডেকেছি আজ সন্ধ্যা ৬টায়। এই আলোচনার পর আহমদ মুসা অভিযোগ থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন। সুতরাং দেশপ্রেমিকরা আগেই আপনাকে কিডন্যাপ করে আপোষ রফা বানচাল করতে চেয়েছে। কিডন্যাপ করার পর তারা আহমদ মুসাকে তুলে দেবে ইহুদী গোয়েন্দা বিভাগের হাতে। প্রচার করা হবে যে, ইহুদী গোয়েন্দারা মার্কিন সরকারের অজান্তে আহমদ মুসাকে কিডন্যাপ করে আমেরিকার বাইরে নিয়ে গেছে। অতএব এতে মার্কিন সরকারকে দোষ দেয়া যাবে না। এতে দুই লাভ দেশপ্রেমিকরা দেখেছে। এক, আহমদ মুসাকে অভিযোগ থেকে মুক্তি দেয়া বন্ধ করা গেল, দুই, মার্কিনীদের বিশেষ বন্ধু ইহুদীদের একটা বড় উপকার হলো। এ রকম বুঝ যদি কেউ পায়, তাহলে কোন আমেরিকান এতে সম্মত হবে না বলুন?’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘যেভাবে যুক্তি দিলেন, তাতে মনে হচ্ছে আপনিও ঐ দেশপ্রেমিকদের একজন।’

‘অবশ্যই, তবে আমি আপনাকে গ্রেফতার করে ইহুদীদের হাতে তুলে দেব না, সোপর্দ্দ করব আপনাকে মার্কিন আইনের হাতে। নির্দোষ হলে ছাড়া পেয়ে যাবেন।’

বলে জর্জ আব্রাহাম আবার ইন্টারকম অন করল। ওপার থেকে কথা বলে উঠল হারমান হেইঞ্জ।

জর্জ আব্রাহাম তাকে নির্দেশ দিল, ‘টেলিফোনের কথা ফাঁস করার সাথে আর কে জড়িত, তার তদন্ত তুমি চালিয়ে যাও। আর যে আটজনকে গ্রেফতার করেছ, তাদের বিরুদ্ধে বাইরের সাথে অবৈধ ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থ বিরুদ্ধ যোগাযোগ, অবাধ্যতা এবং অফিস-শৃংখলা ভংগের অভিযোগ রেকর্ড কর এবং ডিপার্টমেন্টাল প্রসিকিউশন বিভাগে পাঠিয়ে দাও। আর ওদের ডিপার্টমেন্টাল সেলে বন্দী রাখ। ধন্যবাদ।’

ইন্টারকম অফ করে জর্জ আব্রাহাম ঘুরে বসল আহমদ মুসার দিকে, হাত ঘড়ির দিকে তাকাল। বলল, ‘ঠিক ৬টা, আপনার সাথে সাক্ষাতের সময় এটা। এখন বলুন, আমি আপনাকে কি সাহায্য করতে পারি?’

‘জনাব আমি কিছু বলার আগে আপনাদের কলিনস কোথায় জানতে চাচ্ছি।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আমাদের এফ.বি.আই এজেন্ট কলিনস?’

‘জি, হ্যাঁ।’

‘সে হেড কোয়ার্টারেই আছে। কেন বলুন তো?’

‘ওয়াশিংটনের গ্রীন ভ্যালিতে তিনি জেনারেল শ্যারন ও গোল্ড ওয়াটারের সাথে ছিলেন না?’

‘ছিল। অফিসের নির্দেশেই সে ওদের সাথে ছিল।’

‘তিনি কি ওদের সাথে নিউ মেক্সিকোতে গিয়েছিলেন না?’

‘গিয়েছিলেন। সেটাও অফিসের নির্দেশেই।’

‘তিনি নিউ মেক্সিকোর কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন, কি করেছিলেন, ইত্যাদি রিপোর্ট নিশ্চয় দিয়েছেন?’

'দিয়েছে। সে নিউ মেক্সিকোতে গিয়ে সব  সময় ওদের সাথে ছিল না। সবুজ পাহাড়ে যাওয়ার পরদিন সে ওয়াশিংটন ফিরে এসেছে।'

'দু'এক মিনিটের জন্য তাঁকে ডাকতে পারেন?'

'অবশ্যই। কিন্তু তাকে কি দরকার?'

'আমার অনুরোধ স্যার।'

'আচ্ছা ডাকছি।'

বলে জর্জ আব্রাহাম ইন্টারকমে নির্দেশ পাঠাল কলিনসকে এখনি তার কাছে পাঠাবার জন্যে।

দু'মিনিটের মধ্যে কলিনস এসে হাজির হলো। সে আহমদ মুসাকে দেখে বিস্মিত হলো না। অর্থাৎ আহমদ মুসা আসবে, এসেছে সে জানে।

'জনাব, আমি  মিঃ কলিনসকে দু'একটা প্রশ্ন করব। জর্জ আব্রাহামকে লক্ষ্য করে বলল আহমদ মুসা।

'ঠিক আছে।' বলল জর্জ আব্রাহাম।

আহমদ মুসা কলিনসের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'মিঃ কলিনস কোন তারিখ কতটার সময় আমাকে বন্দী ও আহত অবস্থায় সবুজ পাহাড়ে আপনাদের সামনে হাজির করা হয়েছিল?'

'গত ২১ তারিখ সকাল ১০টায়।' বলল কলিনস।

'সবুজ পাহাড়ের ঐ সিনাগগ কমপ্লেক্সের অন্ধকুপে নিয়ে আমাকে বন্দী করা হয়েছিল কয়টায়?'

'সোয়া দশটা হবে তখন।' একটু চিন্তা করে বলল কলিনস।

'২১তারিখ গোটা দিন তো আপনিও সবুজ পাহাড়ে ছিলেন তাই না?'

'ছিলাম।'

'সবুজ পাহাড়ের বন্দীখানার অন্ধকূপ থেকে আমি পালিয়েছি এমন কথা সবুজ পাহাড়ের কারও কাছে আপনি শুনেছিলেন?'

'না শুনিনি।'

কলিনসের কথা শেষ হলে, আহমদ মুসা জর্জ আব্রাহামকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'জনাব কলিনসকে জিজ্ঞেস করা আমার শেষ।'

কলিনস চলে গেলে আহমদ মুসা জর্জ আব্রাহামকে বলল, 'লস আলামোস স্ট্রাটেজিক রিসার্চ ল্যাবরেটরীতে কোন তারিখে কতটার সময় আমাকে দেখা যায় বলে রিপোর্ট এসেছে জনাব?'

'গত মাসের ২১ তারিখ বেলা ৩টার দিকে।'

'জনাব আমি সবুজ পাহাড়ে বন্দী হলাম সোয়া দশটায়, আর বেলা ৩টার দিকে আমাকে দেখা গেল লস আলামোস গবেষণাগারে, এটা কেমন করে হয়? এ নিয়ে আপনারা ভেবেছেন?'

'বিষয়টা নিয়ে আমরা ভেবে দেখিনি। আর এ সময়ের হিসাব দিয়ে কিন্তু প্রমাণ করা যাবে না যে, আপনি লস আলামোসে আসেননি। এসেছেন এটা বাস্তবতা।'

'এ বাস্তবতা আমি অস্বীকার করছি না, আমি তো টেলিফোনেই আপনাকে জানিয়েছি, ঘটনা সত্য কিন্তু অভিযোগ সত্য নয়।'

'ঘটনা সত্য হলে অভিযোগও সত্য হবে এটাই ঠিক, আর যদি আপনার কথা সত্য হয় তাহলে আর সময় নষ্ট না করার জন্য অনুরোধ করছি।' জর্জ আব্রাহামের কন্ঠ নিরস ও কঠোর শুনাল।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'আমার কথা শুরুই হয়নি জনাব।'

জর্জ আব্রাহামের চোখ যেন একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'আমিও তাই আশা করি। বলুন।'

'ঘটনা সত্য হলে অভিযোগও সব সময় সত্য হবে এটা ঠিক নয় আমি সে কথা বলার জন্যেই আপনার কাছে এসেছি।'

বলে আহমদ মুসা একটু থামল। পরে আবার শুরু করল, 'আপনি কি জন জ্যাকবকে চেনেন?'

'বিজ্ঞানী জন জ্যাকব?'

'জি, ইহুদী বিজ্ঞানী জন জ্যাকব।'

'হ্যাঁ, খুব ভাল করে চিনি। তিনি দেশের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের একজন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতীয় পুরস্কার 'সান অব দি নেশন' তাঁকে দেয়া হয়েছে।'

'তিনি কি লস আলামোসের বিজ্ঞানী ছিলেন?'

'না। আমেরিকার বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি ভিজিটিং প্রফেসর ছিলেন। ব্যক্তিগত গবেষণা ছিল তার সবচেয়ে বড় কাজ।'

'লস আলামোসের সাথে তার কোন সম্পর্ক ছিল কি?'

'ছিল না।'

'এখন সবুজ পাহাড়ের কারো সাথে লস আলামোসের কোন সম্পর্ক আছে বা সেখানকার কেউ কি লস আলামোসে আসা যাওয়া করে?'

'না। এদিনও লস আলামোসে গিয়ে বিষয়টা সম্পর্ক জেনে এসেছি। লস আলামোসে আসা যাওয়ার সম্পর্ক বাইরের কারো নেই। সেখানকার বিজ্ঞানী ও কলাকুশলী এবং মুষ্টিমেয় সাধারণ কর্মচারী সবাই লস আলামোসের বাসিন্দা। তারা সবাই বাহির থেকে বিচ্ছিন্ন। শুধুমাত্র ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদের সাথে তাঁদের সাক্ষাতের অনুমতি আছে। তাও লস আলামোসের বাইরে গিয়ে।'

'আচ্ছা, লস আলামোসের বৈজ্ঞানিক তথ্য কখনও চুরি গেছে বা বৈজ্ঞানিক তথ্য কোনভাবে খোয়া যাবার ঘটনা ঘটেছে কিনা?'

'না। চুরি বা খোয়া যাবার ঘটনা কখনও ঘটেনি। তবে বৈজ্ঞানিক ডাটা ব্যাংকের ইউজ রেজিস্টার এবং কম্পিউটারের নিজস্ব মেমোরি রেজিস্টার-এ দুয়ের মধ্যে একটা অসংগতি দীর্ঘদিন থেকে চলে আসছে। একে রেকর্ড এরর হিসাবে দেখা হচ্ছে।'

বলে একটু থেমেই জর্জ আব্রাহাম জিজ্ঞেস করল অবাক হয়ে, 'এসব দিয়ে আপনার কি কাজ আহমদ মুসা। আপনি নিজের কথা বলুন।'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'আচ্ছা জনাব আপনি কলিনসের কাছে শুনলেন, সবুজ পাহাড়ের বন্দীখানার অন্ধকূপ থেকে সেই ২১ তারিখের গোটা দিন আমার পালানোর কথা আপনি শুনেননি, তাহলে বেলা ৩টায় আমাকে লস আলামোসে দেখা গেল কি করে, এটা কি আপনার মনে বড় প্রশ্নের সৃষ্টি করছে না? কলিনসসহ সবুজ পাহাড়ের সবাই জানে আমি সবুজ পাহাড় থেকে পালাইনি, তাহলে ৩টার দিকে লস আলামোসে গেলাম কি করে?'

জর্জ আব্রাহামের কপাল কুঞ্চিত হলো, তীক্ষ্ণ হলো তার চোখ। বলল, 'বুঝতে পারছি আহমদ মুসা, এ বিষয়টার প্রতি আপনি খুব বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন।

এখানে নিশ্চয় বড় ঘটনা আছে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, সেটা কি হতে পারে।'

আহমদ মুসা আবারও হাসল। বলল, 'আচ্ছা জনাব, আমি যদি বলি বৈজ্ঞানিক জন জ্যাবক প্রতিদিন লস আলামোসে সবার অলক্ষ্যে আসতেন, আপনি তা বিশ্বাস করবেন?'

স্প্রিংয়ের মত লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল জর্জ আব্রাহাম জনসন। চোখে মুখে তার উত্তেজনা, দৃষ্টি বিস্ফোরিত। বলল, 'তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন, সবুজ পাহাড় থেকে লস আলামোস পর্যন্ত সুড়ংগ পথ আছে?' কথা তার অনেকটা আর্তচিৎকারের মত শুনাল।

'বলতে চাচ্ছি নয়, বলছি, সবুজ পাহাড়ের অন্ধকূপ থেকে একটি সুড়ঙ্গ পথ লস আলামোসের কম্পিউটার রুমে গিয়ে উঠেছে। আমি অন্ধকূপ থেকে বের হতে গিয়ে ঐ সুড়ঙ্গ পথে নিজের অজান্তেই গিয়ে উঠেছিলাম লস আলামোসে।'

ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল জর্জ আব্রাহাম জনসন। বলল, 'তাহলে বিজ্ঞানী জন জ্যাবক ঐ সুড়ঙ্গ পথে লস আলামোসে যেতেন, পাচার করে নিয়ে যেতেন সব বৈজ্ঞানিক তথ্য।' কান্নার মত শুনাল তার কন্ঠ। উদ্বেগ আতঙ্কে মুখ চুপসে গেছে।

'আমি তাই মনে করি জনাব।'

'এখনও তো পাচার চলছে।'

'আমার মনে হয় জন জ্যাবক এই পথের সন্ধান কাউকে দিয়ে যাননি, অথবা দিয়ে যাবার সময় পাননি।'

'কিন্তু আগের এক প্রশ্নে সবুজ পাহাড় ও লস আলামোসের মধ্যে কারও যাতায়াত আছে কিনা জিজ্ঞেস করেছিলেন? এখন বুঝছি এ প্রশ্নের অর্থ হলো সবুজ পাহাড় ও লস আলামোসে এখনও যাতায়াত আছে বলে মনে করেন? তার মানে পাচার এখনও চলছে কোন পথে, ঐ সুড়ঙ্গ পথ ছাড়া?'

'আমার মনে হয় অন্ধকূপের সুড়ঙ্গ পথের খবর সবুজ পাহাড়ের এখনকার লোকেরা জানে না। জানলে ঐ অন্ধকূপে ওরা আমাকে বন্দী করতে সাহস পেত

না। তবে অন্য পথে তথ্য পাচার হয়ে যাচ্ছে ঐ সবুজ পাহাড়ে , তা শুধু আমার অনুমান নয়। কিছু প্রমাণও আমার হাতে আছে।’

নতুন করে চমকে উঠল জর্জ আব্রাহাম। বলল, ‘আমাকে দয়া করে দেখাতে পারেন।’ বিনীত কন্ঠ জর্জ আব্রাহামের।

আহমদ মুসা পকেট থেকে বের করে হিব্রুতে ‘used, destroy’ লেখা সেই ছোট কার্টনটি তুলে দিল জর্জ আব্রাহামের হাতে।

জর্জ আব্রাহাম জনসন কার্টুনটির হিব্রু লেখা পড়ে, উলটে পালটে দেখে খুলল কার্টনটি। ভেতরে একই মাপের চিরকুটগুলোর উপর চোখ বুলাল সে গম্ভীর অভিনিবেশ সহকারে।

জর্জ আব্রামের মুখ উদ্বেগে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। ঠোঁট দুটি তার দারুণ শুকনো।

এক সময় চিরকুটগুলো থেকে চোখ তুলল এবং পাশের র‍্যাক থেকে বিশেষ সাইজের একটা মোবাইল তুলে দ্রুত কোথায় যেন টেলিফোন করল।

সঙ্গে সঙ্গে ওপার থেকে সাড়াও পেয়ে গেল। বলল, ‘ডঃ হাওয়ার্ড বলছি।’

ডঃ হাওয়ার্ড ‘লস আলামোস ল্যাবরেটরী অব স্ট্রাটেজিক রিসার্চ’- এর প্রধান।

জর্জ আব্রাহাম জনসন নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, ‘ডঃ হাওয়ার্ড আমি কম্পিউটার চিরকুটের কিছু ডাটা পড়ছি, আপনি নোট করুন এবং আমাকে বলুন যে, এগুলো কোন ক্লাসিফায়েড ডকুমেন্ট বা ইনফরমেশন কিনা।’

বলে জর্জ জনসন কার্টন থেকে পাওয়া চিরকুটের ডাটাগুলো গড়গড় করে পড়ে গেল।

অর্ধেক পড়া হতেই ওপার থেকে ডঃ হাওয়ার্ডের আর্তকন্ঠ শোনা গেল। বলল, ‘থামুন স্যার। বলুন এগুলো কোথায় পেলেন? এগুলো আমাদের ফিফথ জেনারেশন এস.ডি.আই (স্ট্রাটেজিক ডিফেন্স ইনিশিয়েটিভ) ক্ষেপনাস্ত্রের সদ্য আবিষ্কৃত অত্যন্ত টপসিক্রেট ডাটা। কোথায় পেলেন আপনি এগুলো? এগুলোর একটা বর্ণও এখনও আমাদের গবেষণাগারের বাইরে যায়নি।’

'গেছে মিঃ হাওয়ার্ড। না হলে আমি জানলাম কি করে?' বলল জর্জ আব্রাহাম। তার কন্ঠ শুকনো ও কম্পিত।

'স্যার, ডাটাগুলো যদি কম্পিউটার পেপার চিপসে থাকে, তাহলে সে চিপস জলছাপে তারিখ থাকবে। আপনি দয়া করে একটা চিপস আলোর সামনে ধরে তারিখটা দেখুন।' ওপার থেকে বিনীত কন্ঠে বল ডঃ হাওয়ার্ড।

সঙ্গে সঙ্গে জর্জ আব্রাহাম টেলিফোন এক হাতে রেখে অন্য হাতে একটা চিরকুট আলোর সামনে ধরে একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে বলল, 'হ্যাঁ ডঃ হাওয়ার্ড। তারিখটা হলো গত মাসের ১১ তারিখ।'

'তার অর্থ হলো, ঐ ১১ তারিখে আমাদের সিক্রেট কম্পিউটার কেবিন থেকে ঐ ডাটাগুলো পাচার হয়েছে। আমি এদিকে দেখছি স্যার। কোন নির্দেশ আমার প্রতি?' বলল ডঃ হাওয়ার্ড। ভীত তার কন্ঠস্বর।

'না ডঃ হাওয়ার্ড, এখন কাউকে কিছু বলা বা জিজ্ঞাসাবাদ করার দরকার নেই। শুধু একতলার কম্পিউটার কক্ষে সার্বক্ষণিক পাহারার ব্যবস্থা করুন।'

'ইয়েস স্যার।'

'ধন্যবাদ ডঃ।'

বলে টেলিফোন রেখে দিল জর্জ আব্রাহাম জনসন। সে ফিরল আহমদ মুসার দিকে।

উদ্বেগ উত্তেজনায় আচ্ছন্ন তার মুখ। বলল সে, 'মিঃ আহমদ মুসা, বিজ্ঞানী জন জ্যাকবের মৃত্যুর পরও তথ্য পাচার অব্যাহত আছে। আপনি কি মনে করেন, সেটা সুড়ঙ্গ পথে নয়?'

'আমি তাই মনে করি। আমার বিশ্বাস লস আলামোসে এমন কেউ আছে,সে মাঝে মাঝে সবুজ পাহাড়ে যায়। সে-ই এ তথ্য পাচার করছে।'

'আপনার এ বিশ্বাসের কারণ?' জিজ্ঞেস করল জর্জ আব্রাহাম।

'আমি যার গাড়িতে সবুজ পাহাড়ে গিয়েছিলাম তার কাছেই একটা গল্প শুনেছি। সে এক বিজ্ঞানীকে লিফট দিয়েছিল এস্পানোলা থেকে লস আলামোসে। সে ফেরার পথে লস আলামোসের বাইরে একটা ঝোপের আড়াল থেকে লস

আলামোসের ইউনিফরম পরে একজন লোক উঠেছিল তার গাড়িতে। উঠেই সে ইউনিফরম খুলে ফেলেছিল। তাকে ড্রাইভার নামিয়ে দিয়েছিল সবুজ পাহাড়ে।'

ভয়, উদ্বেগ, উত্তেজনায় ফ্যাকাশে হয়ে গেছে জর্জ আব্রাহাম জনসনের মুখ। টেবিলে রাখা তার হাতটি যেন কাঁপছে।

আহমদ মুসা কথা শেষ করলেও জর্জ আব্রাহাম কোন কথা বলল না। মূর্তির মত স্থির বসে। ভাবছিল সে।

হঠাৎ সে সচল হয়ে উঠল। হাতে নিল ছোট একটা সাদা টেলিফোনের রিসিভার।

সাথে সাথেই রিসিভারে কন্ঠ শোনা গেল, 'আমি কমান্ডার জন লিংকন।'

'শোন, তোমার কজন লোককে নির্দেশ দাও তারা যেন ইহুদী গোয়েন্দা প্রধান জেনারেল শ্যারনের উপরে তার অলক্ষ্যে সর্বক্ষণ নজর রাখে। আর নিউ মেক্সিকোয় তোমার লোকদের বলে দাও তারা যেন গোপনে সবুজ পাহাড়ের উপর নজর রাখে। কেউ সেখানে ঢুকলে আপত্তি নেই, কিন্তু কেউ বের হয়ে গেলে তাকে গোপনে ধরে রাখবে। এখন এ পর্যন্তই।'

রেখে দিল টেলিফোন জর্জ আব্রাহাম। দ্রুত টেনে নিল আরেকটি টেলিফোন। ক্রাডল থেকে রিসিভার তুলে নিতেই ওপার থেকে কন্ঠ শোনা গেল। 'এ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থার।'

এ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থার সি.আই.এ প্রধান।

'আমি জর্জ আব্রাহাম জনসন। নিরাপত্তা বিষয়ক খুবই জরুরী ব্যাপার। পরামর্শের জন্যে আপনার একটু সময় চাই। ঘন্টা খানেকের জন্যে কি আসতে পারেন, এখনি?'

'আপনি যখন জরুরী বলছেন, তখন তো আর দেরী করা যায় না মিঃ জর্জ। আসছি।'

'ধন্যবাদ, এ্যাডমিরাল।'

বলে হাতের রিসিভারটা ক্র্যাডেলে রেখে দিয়ে পাশের অন্য একটা টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিল জর্জ আব্রাহাম।

সাথে সাথেই রিসিভারে ভেসে এল ওপারের কন্ঠ। বলল, 'শেরউড বলছি।'

জেনারেল শেরউড পেন্টাগনের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিষয়ক চীফ।

জর্জ আব্রাহাম যে কথা এ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থারকে বলেছিল সে কথাই বলল জেনারেল শেরউডকে। জেনারেল শেরউডও এ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থারের মত রাজী হয়ে গেল।

বিশ মিনিটের মধ্যেই ওরা পৌছে গেল। এফ.বি.আই হেড কোয়ার্টারে।

ওদের মিটিং বসল জর্জ আব্রাহাম জনসনের মিটিং রুমে।

জর্জ আব্রাহাম আহমদ মুসাকে নিজের বিশ্রাম কক্ষে নিয়ে গিয়ে রেস্ট নিতে বলে চলল মিটিং-এ যোগ দেবার জন্য। কক্ষ থেকে বের হবার আগে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'মিঃ আহমদ মুসা মিটিং-এ আপনাকেও প্রয়োজন হতে পারে।'

চলে গেল জর্জ আব্রাহাম।

আহমদ মুসা ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিল। আলস্য এসে দেহটাকে তার ঘিরে ধরল। কিন্তু মাথা রইল সক্রিয়।

ভাবল সে, জর্জ আব্রাহামের এ মিটিংটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আহমদ মুসা জানে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার বিষয় সম্মিলিতভাবে দেখার জন্যে আমলা পর্যায়ের একটা শীর্ষ কমিটি আছে। সে কমিটির নাম ইন্টারন্যাল সিচুয়েশন টিম (আই.এস.টি)। সে কমিটির ৩জন সদস্য এফ.বি.আই চীফ, সি.আই.এ চীফ এবং পেন্টাগনের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা চীফ। এই টিমেরই বৈঠক বসেছে এখন। টিমের চেয়ারম্যান এফ.বি.আই চীফ জর্জ আব্রাহাম।

আহমদ মুসা মনে মনে খুশি হলো। লস আলামোসের বিষয়টাকে নিশ্চয় জর্জ আব্রাহাম টপ প্রায়োরিটি দিয়ে দেখেছে। না হলে এত দ্রুত আই.এস.টির মিটিং তিনি ডাকতো না।

টীম এ সমস্যাকে কিভাবে নেবে? জানাজানি তো হবেই। ইহুদী লবী একে কিভাবে গ্রহণ করবে? ইত্যাদি হাজারো চিন্তায় যখন আহমদ মুসা ডুবে গেছে, তখন দরজায় এসে দাড়াল জর্জ আব্রাহাম। বলল, 'এক্সকিউজ মি, আহমদ মুসা।'

আহমদ মুসা চমকে উঠে মুখ তুলে তাকাল জর্জ আব্রাহামের দিকে। 'মিঃ আহমদ মুসা, আমাদের মিটিং-এ যোগ দেবার জন্যে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাকে।'

‘ধন্যবাদ।’

বলে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

জর্জ আব্রাহাম হাঁটতে শুরু করল। সাথে সাথে আহমদ মুসাও।

আহমদ মুসা মিটিং রুমে প্রবেশ করতেই ঘরের অন্য দুজন, জেনারেল শেরউড ও এ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থার, উঠে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানাল।

আহমদ মুসা বসলে সবাই বসল।

‘মিঃ আহমদ মুসা, আমাদের ইন্টারন্যাল সিচুয়েশন টীমের পক্ষ থেকে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অত্যন্ত মূল্যবান একটি তথ্য আপনি আমাদের দিয়েছেন। আমাদের টীম সদস্যরাও আপনার সাথে কথা বলতে চান। আপনার সহযোগিতা আমরা চাই।’ এই ভাবে প্রথমে কথা শুরু করল জর্জ আব্রাহাম জনসন।

কথা শেষ করেই জর্জ আব্রাহাম আহমদ মুসাকে সি.আই.এ চীফ ও পেন্টাগনের অভ্যন্তরীণ চীফের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল।

জর্জ আব্রাহাম থামতেই সি.আই.এ চীফ এ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থার বলে উঠল, ‘ওয়েলকাম আহমদ মুসা। ঘটনাচক্রে যে অকল্পনীয় কিছু ঘটতে পারে, আপনার সাথে আমাদের এই সাক্ষাত তার একটা প্রমাণ। আমি ব্যক্তিগতভাবে খুবই আনন্দবোধ করছি।’

একটু থামল এ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থার। সোফায় সোজা হয়ে বসল। তারপর বলল, ‘হিব্রু লেখা ক্যাপসুল আপনি কোথায় পেয়েছিলেন আহমদ মুসা?’

‘যে ঘরে অন্ধকূপে নামার লিফট রুম, সেই ঘরে। সে ঘরের প্রায় চারদিকে র‍্যাক সাজানো। সে র‍্যাকগুলো ছোট বড় কার্টনে প্রায় ভর্তি। হাত পা বাঁধা অবস্থায় আমাকে ওরা সেই ঘরের মেঝেতে ছুড়ে ফেলেছিল। একটা র‍্যাকের সাথে আমি ধাক্কা খেয়েছিলাম। সে ধাক্কাতেই একটা কার্টুন পড়ে গিয়েছিল। কার্টুনের গায়ে হিব্রু লেখাটি পড়ে আমি আগ্রহী হয়ে ওটা তুলে নেই।’ বলল আহমদ মুসা।

‘কিন্তু আপনার হাত পা বাঁধা ছিল।’ এ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থার।

‘আমি কার্টুনটির উপর শুয়ে পড়েছিলাম এবং পিছন থেকে হাতে তুলে নিয়েছিলাম কার্টুনটি। পরে তা পকেটে পুরেছিলাম।’ বলল আহমদ মুসা।

'অন্ধকূপের তলায় সুড়ঙ্গ পথ আছে, যা আপনার চোখে পড়ল তার সন্ধান সবুজ পাহাড়ের কেউ বর্তমানে জানে না, এটা বিশ্বাসযোগ্য?' বলল জেনারেল শেরউড।

'এ প্রশ্নের উত্তর আমি জানি না। তবে আমি মনে করি, সুড়ঙ্গ পথের সন্ধান তারা জানলে আমাকে ওখানে বন্দী করে রাখতো না।' আহমদ মুসা বলল।

'এমনও তো হতে পারে, তারা জেনেশুনেই আপনাকে ওখানে নিয়ে গিয়েছিল মার্কিন সরকারের ট্র্যাপে আটকাবার জন্যে।' বলল সি.আই.এ চীফ।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'আমাকে তারা হাতের মুঠোয় পাবার পর মার্কিনীদের হাতে তুলে দেবার ব্যাপারটা একেবারেই অযৌক্তিক। দ্বিতীয়ত আমাকে ট্র্যাপে ফেলে তাদের সর্বনাশ তারা ডেকে আনতে পারে না।'

জর্জ আব্রাহাম, জেনারেল শেরউড ও এ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থার তিনজনই হাসল। বলল সি.আই.এ চীফ, 'ধন্যবাদ আহমদ মুসা। আমরাও এভাবেই ভাবছি। কিন্তু বলুন তো, লস আলামোসের ঘটনায় ইহুদীরা জড়িত হবার ঘটনা প্রকাশ পেলে ইহুদীদের সর্বনাশ হবে কেন?'

আবারও হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'এটা আমার দৃষ্টিকোণ, মার্কিন দৃষ্টিকোণ থেকে আলাদাও হতে পারে। মার্কিন রাজনীতি ইহুদীদের অনেক কিছুই হজম করছে, এটাও হজম হয়ে যেতে পারে।'

হাসল সি.আই.এ চীফ।

কিন্তু পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, 'রাজনীতির কথা বাদ দিন। আমরা রাজনীতিক নই। আমরা আপনার সাহায্য চাই আহমদ মুসা।'

'বলুন, কি সাহায্য?'

এ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থার জর্জ আব্রাহামের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বলুন মিঃ জর্জ।'

'আমরা সবুজ পাহাড়ে যেতে চাই। আমরা সুড়ঙ্গ দেখতে চাই। যতটা পারা যায় গোয়েন্দাগিরীর আলামত হাত করতে চাই। আমরা চাই, আপনি আমাদের সাথে থাকুন। আমরা বুঝতে পেরেছি, সুড়ঙ্গটা গোপন রাখা হয়েছে। আপনার সাহায্য দরকার হবে।' বলল জর্জ আব্রাহাম।

'আমি সুড়ঙ্গ দিয়ে পালিয়েছি, এটা তারা জেনে গেলে গোয়েন্দাগিরীর আলামত সব তারা ধ্বংস করে ফেলবে। তারা এটা জানতে পেরেছে বলে আপনারা মনে করেন?'

জর্জ আব্রাহাম, এ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থার ও জেনারেল শেরউড পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। কথা বলল জর্জ আব্রাহাম। বলল, 'জেনারেল শ্যারনের সাথে আমাদের কথা হয়েছে। তারা এটা জানে না। আপনি তাদের কাছে এখনও বিস্ময়।'

'এরপরও সবুজ পাহাড় থেকে বন্দী পালানোর পর ওখানকার ব্যপারে তারা সাবধান হতে পারে। তবু সম্ভাবনা আছে। তবে অভিযানটা দ্রুত ও আকস্মিক হতে হবে।'

'আপনার কিছু পরামর্শ আছে আহমদ মুসা?' বলল সি.আই.এচীফ।

'এ পর্যন্ত কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?' আহমদ মুসা বলল।

'সবুজ পাহাড় থেকে কোন মানুষ বা কিছু বাইরে যেতে না পারে তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। কেউ বাইরে বেরুলে তাকে গোপনে আটকাতে বলা হয়েছে।' বলল জর্জ আব্রাহাম।

'কিভাবে আপনারা সবুজ পাহাড়ে ঢুকবেন মনে করছেন?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'যতটুকু খবর এসেছে, ওখানে প্রতিরোধের জোরদার কোন ব্যবস্থা নেই। আমাদের গোয়েন্দা ও পুলিশরা যদি যায়, ওরা আপনাতেই আত্মসর্ম্পণ করবে। আমরা একে কঠিন কোন ব্যাপার মনে করছি না।' জর্জ আব্রাহাম বলল।

'আমিও তাই মনে করি। কিন্তু সবুজ পাহাড়ে পুলিশ ঢুকেছে, এটা জানতে পারার পর পাঁচ মিনিট সময়ও যদি পায় তাহলে ওরা প্রয়োজনীয় কম্পিউটার ডকুমেন্টসহ অন্যান্য প্রমাণাদি ধ্বংস করতে পারে।'

'ঠিক বলেছেন আহমদ মুসা। এতটুকু সময়ও তাদের দেয়া যাবে না।'

বলে একটু থেমে একটু চিন্তা করে আবার সে বলল, 'আকস্মিক হামলায় কমান্ডোরা যদি সবুজ পাহাড় কমপ্লেক্স দখল করে নেয়?'

'এতেও ঝুকি কিছুটা থেকে যায়। আমার মনে হয়, ট্যুরিস্ট বা ইহুদী প্রতিনিধি হিসাবে ছদ্মবেশে সবুজ পাহাড়ে ঢুকে একই সাথে ওদের কাবু করতে পারলে ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে।' আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ মিঃ আহমদ মুসা। খুব ভাল একটা প্রস্তাব। আমরা ভেবে দেখব।' বলল এ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থার।

'তবে আমার মনে হয় মিঃ এ্যাডমিরাল, সবুজ পাহাড়টা হলো ওদের গ্রহণ ও প্রেরণ কেন্দ্র। এমন জায়গায় কখনই বেশি কিছু পাওয়া যায় না। খুব বেশী হলে যে ক্যাপসুল আমি দিয়েছি, ঐ ধরনের আলামত এখনও বিনষ্ট করা হয়নি। এখনও ঐ ধরনের ক্যাপসুল পাওয়া যেতে পারে।' আহমদ মুসা বলল।

'গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ে আপনি অংগুলি সংকেত করেছেন আহমদ মুসা। এদিকটা আমরা এখনও ভাবিইনি।' কথা শেষ করে দেহটা সোফায় হেলান দিল। তারপর জর্জের দিকে চাইল। বলল, 'জর্জ, এদের তথ্য পাচারের গন্তব্য সম্পর্কে কি কোন চিন্তা করেছেন?'

'অবশ্যই সেটা করতে হবে। আমরা এ বিষয়টা পরে দেখব। আমার মনে হয়, নিউ মেক্সিকোর সবুজ পাহাড় যেমন উৎস কেন্দ্র তেমনি ওদের নিশ্চয় একটা প্রধান ট্রানজিট কেন্দ্র আছে। সেটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।' বলল জর্জ আব্রাহাম।

'ডিউটি অফিসার ম্যাগগিলের কাছে কিছু জানা গেল?' জিজ্ঞেস করল জেনারেল শেরউড।

'আগে যেটা বলেছি, সেটাই। ষড়যন্ত্রের কথা জানা গেছে, লিংকম্যানের পরিচয় পাওয়া গেছে এবং আমাদের এখানকার তার আরও কিছু সহযোগীর বিষয়ে জানা গেছে।' জর্জ আব্রাহাম।

'আমার মনে হয় সবুজ পাহাড় আগে আপনারা দেখুন। লস আলামোসেও আপনাদের যেতে হবে। তারপর করণীয় ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন।'

'আহমদ মুসা আপনাকে আমরা অবিশ্বাস করছি না। দেখতে যাচ্ছি, সেটা অপরিহার্য একটা রুটিন ডিউটি।' বলল এ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থার।

‘এখনি আমরা সবুজ পাহাড়ে যাত্রা করতে চাই, দয়া করে আপনাদের পরামর্শ বলুন।’ এ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থার ও জেনারেল শেরউডের দিকে চেয়ে বলল জর্জ আব্রাহাম।

‘আপনার সিদ্ধান্ত সঠিক। আপনি সব ব্যবস্থা করুন। ততক্ষণে আমরা আর একটু তৈরী হয়ে আসি বাসা থেকে।’ বলল এ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থার।

‘ঠিক আছে। আমারও একটু বাসায় যেতে হবে।’ বলল জর্জ আব্রাহাম।

উঠে দাঁড়াল জর্জ আব্রাহাম। উঠে দাঁড়াল ওরা দুজনও। আহমদ মুসাও।

জর্জ আব্রাহাম এ্যাডমিরাল ও জেনারেলের সাথে হ্যান্ডশেক করে ওদের বিদায় দিল।

পরে আহমদ মুসাকে বলল, ‘আপনি আমার সাথে আমার বাসায় যাবেন, নিশ্চয় কোন অসুবিধা নেই?’

‘না নেই।’ বলল আহমদ মুসা

ঠোঁটে হাসি আহমদ মুসার। দুজনেই বেরোল ঘর থেকে।

# ২

‘ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারছেন মিঃ গোল্ড ওয়াটার? জর্জ আব্রাহাম, এ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থার ও জেনারেল শেরউড অস্বাভাবিক ধরনের তাড়াহুড়া করে নিউ মেক্সিকো গেলেন কেন?’ উদ্বিগ্ন কন্ঠ জেনারেল শ্যারনের।

‘কিছু বুঝছি না। কালকের সন্ধ্যার ঘটনার সাথে এর কি কোন সম্পর্ক আছে?’ চিন্তান্বিত কন্ঠে বলল গোল্ডওয়াটার।

‘গতকালকের ঘটনা তো পরিষ্কার। এফ.বি.আই হেড কোয়াটারের ডিউটি অফিসার ম্যাগগিল শেখ আবদুল্লাহ আলী ও আহমদ মুসার সাথে জর্জ আব্রাহামের এ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যাপার আমাদের কাছে ফাঁস করে দেয়ার অপরাধে গ্রেফতার হয়েছে। এ নিয়ে জর্জ আব্রাহামের সাথে কথা বলেছি। তাকে বলেছি এ ধরনের ফাঁস করে দেয়ার ঘটনা অফিস শৃঙ্খলার বিরোধী, কিন্তু নতুন নয়। এ ধরনের ঘটনা অতীতেও ঘটেছে, কিন্তু এভাবে গুরুতর অপরাধ হিসাবে কোন সময়ই দেখা হয়নি। তিনি একথার কোন স্পষ্ট জবাব দেননি। আমিও তাকে আর কিছু বলিনি। বললে আরও পরে বলব, একজন আমলাকে তেল মাখানোর কোন প্রয়োজন নেই।’

‘আহমদ মুসা কি ওদের কান ভারি করেছে?’ বলল গোল্ড ওয়াটার।

‘কি আর ভারি করবে। তার কি বলার আছে। মার্কিন সরকার, মার্কিন প্রশাসন কি ইহুদীদের কাজ সম্পর্কে তার চেয়ে বেশী জানে না।’

‘কিন্তু আমি বিস্মিত হচ্ছি আহমদ মুসার বুদ্ধি দেখে। জর্জ আব্রাহামের সাথে এ গোপন এ্যাপয়েন্টমেন্ট করার পরও বাড়তি সতকর্তা হিসাবে শেখ আবদুল্লাহ আলীর নামে আরেকটা এ্যাপয়েন্টমেন্ট নেয়ার চিন্তা করেছিল কেন?’

‘এটা আহমদ মুসার একটা বৈশিষ্ট্য। পরিস্থিতির পেটে যতকথা থাকে সবই সে বুঝতে পারে। বাতাস থেকেই সে বিপদের গন্ধ পায়।’

‘আহমদ মুসার জন্য ওৎ পেতে থাকা আপনাদের দু’জন লোক গায়েব হলো কোথায়?’

‘সেটাও একটা বিস্ময়। খোঁজ নিয়ে জেনেছি, এফ.বি.আই গ্রেফতার করেনি। শেখ আবদুল্লাহ আলী রূপি আহমদ মুসাও ঠিক সময়ে সাক্ষাতের জন্যে এফ.বি.আই অফিসে পৌছেছে। সুতরাং সেও গায়েব করার কাজে জড়িত বুঝা যায় না।’

‘কেন আহমদ মুসার সাথে কেউ থাকতে পারে, তারা তাদের ধরে নিয়ে যেতে পারে।’

‘হ্যাঁ তা পারে। সেটা খোঁজ নেবার জন্যে বলেছি। আহমদ মুসার সাথে ওয়াশিংটনে আসা বেঞ্জামিন বেকনেরও খোঁজ নিচ্ছি আমরা।’

টেলিফোন বেজে উঠল। টেলিফোন ধরল জেনারেল শ্যারন।

টেলিফোনে কথা শুনতে শুনতে গোল্ড ওয়াটারের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘কিছু বুঝতে পারছি না গোল্ড ওয়াটার। আহমদ মুসাও নাকি গেছে জর্জ আব্রাহামদের সাথে।’

‘আহমদ মুসা গেছে ?কেন?’ বলল গোল্ড ওয়াটার।

‘সেটাই তো কথা। তবে আমার মনে হচ্ছে, লস আলামোসের ঘটনার ব্যাপারটাই তাকে নিয়ে গেছে।’ বলল জেনারেল শ্যারন।

‘তাহলে কি বলা যায় যে, আহমদ মুসা এখন সরকারের হাতে বন্দী?’

‘এটাই স্বাভাবিক মিঃ গোল্ড ওয়াটার।’

‘তাহলে তো বলতে হয়, আহমদ মুসা গায়ে পড়ে এসে ধরা দিয়েছে। কিন্তু আহমদ মুসার জন্য এটা কি স্বাভাবিক?’

‘স্বাভাবিক নয়। কিন্তু এটাই তো ঘটেছে।’

বলল জেনারেল শ্যারন। তার কপাল কুঞ্চিত। ভাবছে সে।

কথা শেষ করেই জেনারেল শ্যারন আবার বলে উঠল, ‘অংক মিলছে না মিঃ গোল্ড ওয়াটার। আহমদ মুসা একটা গোলক ধাঁধা সৃষ্টি করেছে। মতলব কি তার?’ স্বগতোক্তির মত করেই কথা শেষ শ্যারনের।

আবারও টেলিফোন বেজে উঠল জেনারেল শ্যারনের। টেলিফোন তুলে নিল শ্যারন।

ওপারের কথা শুনেই শ্যারন বলে উঠল, 'গুড মর্নিং, কি খবর বেন?'

ওপারের কথা শুনল জেনারেল শ্যারন। মুহূর্তেই মুখ চুপসে গেল তার। উদ্বেগ আতংকের এক অন্ধকার নেমে এল তার চোখেমুখে। বলে উঠল, 'কিছুই তোমরা টের পাওনি? কম্পিউটার মেমরী মুছে দিতে ক'সেকেন্ড লাগে? ওরা অন্ধকূপে নেমেছে কেন?'

ওপারে দীর্ঘ কথা শুনল জেনারেল শ্যারন। শুনতে শুনতে তার মুখ মরার মত পাংশু হয়ে উঠল। টেলিফোন ধরা তার হাত কাঁপছে।

টেলিফোনে কথা শেষ হওয়ার পরও কয়েক মুহূর্ত পাথরের মত নিশ্চল হয়ে বসে থাকল জেনারেল শ্যারন।

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে হোয়াইট ঈগল প্রধান গোল্ড ওয়াটার। বলল, 'কি ব্যাপার জেনারেল? খারাপ কিছু ঘটেছে?'

গোল্ড ওয়াটারের কথায় প্রায় চমকে উঠার মত তাকাল জেনারেল শ্যারন।

বিমূঢ় তার চেহারা। গোল্ড ওয়াটারের প্রশ্ন সে শুনতে পেয়েছে। কি জবাব দেবে সে? প্রকৃত ঘটনা বলা যাবে না গোল্ড ওয়াটারকে। বর্ণবাদী আন্দোলন করলেও সে নিরেট আমেরিকান। এই ঘটনায় তার মত আমেরিকানরা শ্যারনদের বিরুদ্ধে যাওয়াটাই স্বাভাবিক।

একটু ভেবে জেনারেল বলল, 'আমরা ষড়যন্ত্রের শিকার মিঃ গোল্ড ওয়াটার।' শুষ্ক কন্ঠ শ্যারনের।

'কি রকম?'

'জর্জ আব্রাহামরা আহমদ মুসাকে নিয়ে আমাদের সবুজ পাহাড় সিনাগগে অভিযান চালিয়েছে ও দখল করে নিয়েছে।'

'কেন, সবুজ পাহাড় কেন? ওখানে কি আছে?' বিস্মিত কন্ঠ গোল্ড ওয়াটারের।

'অভিযানের প্রধান টার্গেট সিনাগগের কাগজপত্র ও কম্পিউটার। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, আহমদ মুসার খপ্পরে পড়ে ওরা কোন ষড়যন্ত্র সাজাচ্ছে আমাদের

মানে ইহুদীদের বিরুদ্ধে। গোয়েন্দাবৃত্তির দায়ে অভিযুক্ত আহমদ মুসা মনে হচ্ছে তার দোষ আমাদের ঘাড়ে চাপাবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে।'

'একটা অসম্ভব কথা শুনালেন জেনারেল শ্যারন।'

'অর্থনীতিতে সবই সম্ভব মিঃ গোল্ড ওয়াটার। মধ্যপ্রাচ্যের পেট্রোডলার অনেক মার্কিন আমলারই মাথা কিনে নিচ্ছে। আহমদ মুসা জর্জ আব্রাহামের সাথে দেখা করার কারণ নিশ্চয় বড় কিছু। নিশ্চয় বড় কোন লেন-দেনের ব্যাপার ঘটেছে।'

'কিন্তু জর্জ আব্রাহামের সাথে সি.আই.এ চীফ এ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থার ও পেন্টাগনের প্রধান জেনারেল শেরউড তো আছেন?'

'তাদের হাত করা কি সিনিয়র আমলা জর্জ আব্রাহামের জন্যে কঠিন?' বলে একটু দম নিল। বলল আবার, 'শুনলাম ওরা অন্ধকূপেও নেমেছে।'

'অন্ধকূপে? কেন?'

'আমাদের লোক কিছু বলতে পারল না। আমাদের এ লোকটি কোনভাবে সরে পড়তে পেরেছে বলে টেলিফোনে খবরটা জানাতে পারল। অন্যদের সবাইকে আটক করা হয়েছে।'

'সাংঘাতিক কথা শুনালেন জেনারেল। কিছু একটা তো করতে হয়।' উদ্বিগ্ন কন্ঠে বলল গোল্ড ওয়াটার।

'মিঃ গোল্ড ওয়াটার আপনাদেরও আমি সাহায্য চাই। বিকালে আমি আপনার সাথে দেখা করব। এখনি আমাকে বেরুতে হবে।' বলল কম্পিত কন্ঠে জেনারেল শ্যারন।

উঠে দাঁড়াল গোল্ড ওয়াটার যাবার জন্যে। বলল, 'দুঃখিত জেনারেল এই অঘটনের জন্যে। আমাদের পূর্ণ সাহায্য আপনি পাবেন।'

গোল্ড ওয়াটার বেরিয়ে গেল ড্রইং রুম থেকে।

গোল্ড ওয়াটার বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সংগেই জেনারেল শ্যারন তার মোবাইল টেলিফোন হাতে নিল। প্রেসিডেন্টের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা আলেকজান্ডার হ্যামিলনের কাছে টেলিফোন করল সে।

তার চোখ মুখ থেকে উত্তেজনা ঠিকরে পড়ছে। তার দু'চোখে ক্রুর প্রতিহিংসার আগুন।

জেনারেল শ্যারন টেলিফোনে গোটা বিষয় ব্রিফ করল জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিলটনকে। সব কথা শুনে আলেকজান্ডার হ্যামিলটন বলল, 'আমি আপনাকে আর সময় দিতে পারছি না। আমি প্রেসিডেন্টের কাছে যাচ্ছি, ডেকেছেন তিনি। আপনি নিশ্চিত থাকুন। যা করার আমি করব। যা বলার আমি বলে দেব জর্জ আব্রাহাম ও এ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থারকে।'

প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা উপদেষ্টা আলেকজান্ডারের সাথে কথা শেষ করে জেনারেল শ্যারন আরেকটা নাম্বার ডায়াল করতে যাচ্ছিল কিন্তু তার তর্জনি মোবাইলের ডায়াল বাটন স্পর্শ করার আগেই টেলিফোন বেজে উঠল।

টেলিফোন ধরে ওপারের কথা শুনেই দ্রুত বলে উঠল, 'বেনইয়ামিন তুমি? কি খবর?' জেনারেল শ্যারনের কন্ঠে উদ্বেগ।

'খবর খুব খারাপ স্যার। সবুজ পাহাড়ের অন্ধকূপ থেকে লস আলামোসের কম্পিউটার কক্ষ পর্যন্ত একটা সুড়ঙ্গ খুঁজে পেয়েছে ওরা। ওরা একে গোয়েন্দাগিরীর পথ বলে অভিহিত করছে।'

কথাগুলো জেনারেল শ্যারনের কানে পৌছার সঙ্গে সঙ্গেই মরার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার মুখ। কেঁপে উঠল তার শরীর। হাত থেকে খসে পড়ল টেলিফোন। শিথিল হাতেই আবার টেলিফোন তুলে নিল সে।

মুহূর্তের জন্যে চোখ বুজে নিজেকে সংবরণ করল জেনারেল শ্যারন।

শক্ত হাতে চেপে ধরল সে টেলিফোন। ঠোঁট দু'টি তার শক্ত হয়ে উঠল। তীব্র হয়ে উঠল তার চোখের দৃষ্টি। বলল সে টেলিফোনে, 'বেনইয়ামিন তুমি লস আলামোসের আউটার গেটের সামনে গিয়ে লুকিয়ে অপেক্ষা কর। ডি.এস.কিউ (ডেথ স্কোয়াড) সেখানে মানে লস আলামোসে যাচ্ছে। তাদের কি করণীয় আমি তাদের বলে দেব। তোমার করণীয় হলো যা ঘটে তার খবর পাঠানো।'

বলে টেলিফোন রেখে দিল জেনারেল শ্যারন। তার চোখ দু'টো বাঘের মত জ্বলছে। মনে তার ঝড়। সে ঝড়ের একটাই মূল কথা, 'এখন জর্জ আব্রাহাম,

এ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থার ও জেনারেল শেরউড এবং তাদের সাথে আহমদ মুসার বেঁচে থাকার অর্থ আমেরিকায় ইহুদীদের বেঁচে না থাকা।'

ড্রইং রুমে প্রবেশ করতে গিয়ে 'বেনইয়ামিন ও লস আলামোস' শব্দ জেনারেল শ্যারনের কন্ঠে উচ্চারিত হতে শুনে হোঁচট খাওয়ার মত থমকে দাঁড়াল সারা বেনগুরিয়ান। এক বেনইয়ামিনের নাম সে জানে। যাকে ইহুদীদের পক্ষে গোয়েন্দাবৃত্তির দায়ে কিছুদিন আগে চীন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। চীন থেকে সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসেছে। আর লস আলামোসে একটা বড় ঘটনা ঘটেছে সেটাও সে জানে। ইহুদী গোয়েন্দা প্রধানের মুখে এই দুই নাম শোনাই তার হোঁচট খেয়ে থমকে দাঁড়াবার কারন তার এটাই। তার মনে হয়েছে এই কথা বলা অবস্থায় ড্রইং রুমে প্রবেশ করা জেনারেল শ্যারনের জন্যে হয়ত বিব্রতকর হতে পারে। তাছাড়া সাবা বেনগুরিয়ানের মনে কৌতূহলের সৃষ্টি হলো জেনারেল শ্যারনের কথা সম্পুর্ণটা শোনার জন্যে।

সাবা বেনগুরিয়ান ইসরাইলের প্রথম প্রধান মন্ত্রী ডেভিড বেনগুরিয়ান পরিবারের সন্তান। সে ওয়াশিংটনের জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আন্তর্জাতিক রাজনীতি' বিষয়ের ছাত্রী। তার পিতা আইজাক বেনগুরিয়ান একটা ব্যাংকের মালিক। তারা সকলেই খুবই সম্মানিত। তারা মার্কিন নাগরিক হলেও নিজ জাতি ইহুদীদের প্রতি তাদের দায়িত্ব ভোলেনি। তারা 'আমেরিকান জুইস পিপলস কমিটি'র সদস্য। এই কমিটি শুধু আন্তর্জাতিক ইহুদীবাদকে সাহায্য করা নয়, মার্কিন পলিসীকে ইহুদীমুখী রাখার জন্যেও সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। মার্কিন নির্বাচনের সময় এই কমিটিই চাঁদা উঠায় এবং সুপরিকল্পিতভাবে পছন্দনীয় নির্বাচন প্রার্থীদের সহায়তা করে। জেনারেল শ্যারন সাবা বেনগুরিয়ানের আব্বা আইজ্যাক বেনগুরিয়ানের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। শ্যারন ওয়াশিংটন এলে সাবাদের বাড়িতি ওঠে।

সাবা বেনগুরিয়ান জেনারেল শ্যারন টেলিফোনের বেনইয়ামিনকে যে নির্দেশ দিল তার সবটাই শুনল। শুনতে গিয়ে সে চমকে উঠল 'জি.এস.কিউ'-কে লস আলামোসে পাঠানোর কথা শুনে। এই 'জি.এস.কিউ'র অর্থ ইহুদী ডেথ স্কোয়াড তা বুঝতে তার দেরী হলো না। এই ডেথ স্কোয়াড লস আলামোসে কেন?

আর গোয়েন্দা বেনইয়ামিন লুকিয়ে কি দেখবে, কোন খবর পাঠাবে? আহমদ মুসা লস আলামোসে ঢুকেছিল। কিন্তু তার এখন ফেরার কোন সমস্যা নেই লস আলামোসে।

ডেথ স্কোয়াড যাচ্ছে সেখানে, যাচ্ছে কার বিরুদ্ধে? ইহুদী ডেথ স্কোয়াডকে মার্কিন প্রশাসন কি হায়ার করছে? তাই যদি হবে, তাহলে বেনইয়ামিন লুকিয়ে থেকে কি রিপোর্ট করবে জেনারেল শ্যারনকে?'

কোন প্রশ্নের উত্তরই সাবা বেনগুরিয়ান বের করতে পারলো না।

ওদিকে জেনারেল শ্যারন টেলিফোনে কথা শেষ করেছে। নিরব ড্রইং রুম।

সাবা বেনগুরিয়ান প্রবেশ করল ড্রইং রুমে।

ড্রইং রুমে প্রবেশ করে উচ্ছ্বসিত কন্ঠে বলল, 'আঙ্কেল, আব্বা টেলিফোন করেছিলেন আপনাকে আমাদের সাথে আজ লাঞ্চ খেতে হবে। প্রায়ই বাইরে খান, আজ নয়।'

জেনারেল শ্যারন হাসতে চেষ্টা করে বলল, 'কেন আজ কি কোন অকেশন আছে নাকি?'

শ্যারন হাসার চেষ্টা করলেও হাসিটা হলো তার কান্নার মত।

'কোন অকেশন নেই, জর্জ জন আব্রাহাম জুনিয়রও আজ এখানে লাঞ্চ করবে।' বলল সাবা বেনগুরিয়ান।

'জর্জ আব্রাহামের ছেলে?'

'হ্যাঁ।'

'সে কম্পিউটার বিজ্ঞানী না?'

'এই তো কয়দিন আগে সে সফটঅয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরুল। কয়েকটা আবিষ্কারের জন্যে তাকে বিজ্ঞানী বলা হচ্ছে বটে।'

'পেন্টাগনের টপসিক্রেট কম্পিউটার উইং এর কনসালট্যান্টও তো সে?'

'বিস্তারিত জানি না। শুনেছি পেন্টাগনে কিছু সময় সে দেয়।'

'হ্যাঁ সাবা সে পেন্টাগনের একজন গুরুত্বপূর্ণ কম্পিউটার বিজ্ঞানী। খুব ভাল ছেলে।'

'হ্যাঁ আঙ্কেল খুব ভাল ছেলে। প্রেসিডেন্ট তাকে দু'বার ডেকেছেন।'

‘তোমার বন্ধু না?’

‘জি, আঙ্কেল।’ সাবা বেনগুরিয়ানের মুখ লাল হয়ে উঠল।

‘তোমরা বিয়েও করছ, তাই না?’

‘জানি না আঙ্কেল, ও খুব কনজারভেটিভ আমেরিকান।’ বলতে গিয়ে সাবার মাথা লজ্জায় নুয়ে পড়ল।

‘তাতে কি? জান না, জর্জ আব্রাহামের মা ইহুদী কন্যা ছিলেন?’

‘তাই? আমি জানতাম না।’

‘তুমি কি জর্জদের বাড়িতে গেছ?’

‘হ্যাঁ গেছি।’

‘আজ যাও না ওদের বাড়িতে, এটা অনুরোধ।’

‘কেন এ অনুরোধ?’ চোখে মুখে বিস্ময় সাবা বেনগুরিয়ানের।

‘মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদী স্বার্থ আজ মহাসংকটে পড়েছে। তোমার সাহায্য দরকার।’

‘জর্জের বাড়িতে যাওয়ার সাথে এ সাহায্যের সম্পর্ক কি?’

‘জর্জের বাড়িতে গিয়ে জর্জ জনের আব্বা জর্জ আব্রাহামের নিজস্ব স্টাডিতে তাঁর পারসোনাল কম্পিউটার তোমাকে ব্যবহার করতে হবে।’

‘কেন? সেখানে কি করব?’

‘তুমি জান না, জর্জ আব্রাহাম জনসন এফ.বি.আই-এর চীফ। তার বিশেষ অভ্যাস হলো, প্রতিদিন তিনি যে গুরুত্বপূর্ণ দলিল ও ডাটা পান, যেখানেই থাকুন সঙ্গে সঙ্গেই তা মোবাইলে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অফিসের মাস্টার কম্পিউটারে পাঠান। বাড়তি সর্তকতা হিসেবে সঙ্গে সঙ্গেই তা আবার তিনি তার পারসোনাল কম্পিউটারে পাঠান। তোমাকে গত দু’দিন ও সর্বশেষ সময় পর্যন্ত আসা লস আলামোস ও সবুজ পাহাড় সংক্রান্ত সকল ডকুমেন্ট মুছে ফেলতে হবে।’

লস আলামোসের নাম শুনে চমকে উঠল সাবা বেনগুরিয়ান। কিছুক্ষন আগে জেনারেল শ্যারনের মুখেই সে লস আলামোসে ডেথ স্কোয়াড পাঠানোর কথা শুনেছে। তার সাথে কম্পিউটার থেকে ডকুমেন্ট মুছার কি সম্পর্ক আছে? ভেতরে ভেতরে শংকিত হয়ে উঠল সাবা বেনগুরিয়ান। তাকে দিয়ে গোয়েন্দাগিরী করাতে

চান জেনারেল শ্যারন? অস্বস্তিতে ভরে উঠল সাবা বেনগুরিয়ানের মন। বলল সে, ‘জর্জ জন জুনিয়রের অজ্ঞাতে এই কাজ করা যাবে না এবং আমি তা পারবও না। কিন্তু কেন করতে হবে ? কি ঘটেছে এমন?’

‘সব কথা তোমাকে বলতে পারবো না মা। তবে এটুকু জেনে রাখ অবিলম্বে যদি আমরা জর্জ আব্রাহামদের গতিরোধ করতে না পারি, তারা যদি লক্ষ্যে পৌঁছে যায়, তাহলে জার্মানীতে আমাদের অবস্থা যা দাঁড়িয়েছিল, তার পুনরাবৃত্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও ঘটতে পারে।’

শিউরে উঠল সাবা বেনগুরিয়ান। জার্মানীর ভয়াবহ দৃশ্যগুলো ফুটে উঠল তার চোখে। আমেরিকায় তার পুনরাবৃত্তি তারা কল্পনাও করতে পারে না। ভীত হয়ে পড়ল সাবা বেনগুরিয়ান। কথা বলার শক্তিও যেন সে হারিয়ে ফেলল। কথা বলল আবার জেনারেল শ্যারনই, ‘কাজটা তুমি কিভাবে করবে জানি না। কিন্তু এখন আমার বিশ্বাস এটা একমাত্র তুমিই করতে পারবে।’

কথা বলতে পারল না সাবা বেনগুরিয়ান। কিন্তু তার মনে হলো বেনগুরিয়ান কন্যার উপর একটা দায়িত্ব এসে চেপে বসেছে, যা প্রত্যাখ্যানের কোন শক্তি তার নেই। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবল, জর্জ জন জুনিয়রের সাথে কোন বিশ্বাসঘাতকতা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

জেনারেল শ্যারন উঠে দাঁড়াল। নির্বাক সাবা বেনগুরিয়ানকে বলল, ‘আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। লাঞ্চের সময় ঠিক এসে যাব।’

বলে বেরিয়ে গেল জেনারেল শ্যারন।

সাবা বেনগুরিয়ান ধপ করে বসে পড়ল সোফায়। দেহের ওজন যেন তার হঠাৎ করেই অনেক কমে গেছে।

গাড়ি থেকে নেমে সাবা বেনগুরিয়ানের হাত ধরে দৌড়াতে দৌড়াতে বাড়ির ভেতরে নিজের ব্যক্তিগত ড্রইংরুমে প্রবেশ করে সোফায় বসে সাবাকে টেনে নিতে নিতে বলল জর্জ জুনিয়র, ‘আজ কি যে সৌভাগ্য আমার। বেনগুরিয়ান রাজকন্যাকে সেধেও বাড়িতে আনা যায় না, সে কিনা আজ স্বেচ্ছায় ধরা দিল।’

‘সেধে ধরা দিলেই বুঝি দাম কমে যায়?’

বাহুর বাধনটা আরও দৃঢ় করে জর্জ জন জুনিয়র বলল, 'না দাম আরও বাড়ে।'

'আব্বা আম্মা কাউকে যে দেখছি না?'

'আব্বা গেছেন লস আলামোসে সরকারী কাজে। আর আম্মা গেছেন আজ সকালে ভাইয়ার বাড়িতে। আমিই আজ বাড়ির রাজা।'

সাবা বেনগুরিয়ান তার চুলে ঢাকা মুখটা জর্জ জন জুনিয়রের বুকে রেখে বলল, 'রাজা মশায়, আমি কেন এসেছি জান? তোমার কৃতিত্বকে সেলিব্রেট করার জন্যে।'

'কোন কৃতিত্ব?'

'তুমি দুনিয়ার সব কম্পিউটারে গোপন কুঠুরিতে ঢোকার পথ আবিষ্কার করেছ।'

'হ্যাঁ সাবা, এই আবিষ্কার আমাদের গোয়েন্দা সংস্থার অনেক পরিশ্রম কমিয়ে দেবে। কম্পিউটারের সিক্রেট কেবিনও আমাদের গোয়েন্দা বিভাগগুলোর মাথা ব্যথার কারণ ঘটাবে না।'

'সব কম্পিউটারই আনলক করতে পারে? এফ.বি.আই, সি.আই.এ'র গুলোও?'

'অবশ্যই। জান, এফ.বি.আই, সি.আই.এ'র কম্পিউটারগুলোর মধ্যে আব্বার পারসোনাল কম্পিউটারের সিক্রেট কেবিন সবচেয়ে প্রটেকটেড। আমি ওটাও খুলতে পারি চোখের পলকে।'

সাবা বেনগুরিয়ান জর্জ জন জুনিয়রের বুক থেকে মুখ তুলে বলল, 'সত্যি পার?'

'বিশ্বাস হচ্ছে না, চল দেখাচ্ছি।'

সাবা বেনগুরিয়ানকে নিয়ে উঠে দাঁড়াল জর্জ জন জুনিয়র।

কম্পিউটার টেবিলে সাবা বেনগুরিয়ানকে নিজের পাশে বসিয়ে জর্জ জন জুনিয়র বলল, 'নাও তুমিই হাত লাগাও সাবা। আমি বলে দিচ্ছি কি করতে হবে।'

অন্তরটা কেঁপে উঠল সাবার। সে প্রতারণা করছে জর্জ জন জুনিয়রকে। বিশ্বাসঘাতকতা করছে তার সাথে। জর্জ জুনিয়র সরল বিশ্বাসে তার হাতে তুলে

দিচ্ছে জগতের সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ একটি কম্পিউটারের গোপনীয়তা। আর সাবা গোয়েন্দাগিরীর কূটিল মনোভাব নিয়ে তা গ্রহণ করছে।

বিব্রত বোধ করল সাবা বেনগুরিয়ান। কিন্তু পরক্ষণেই জেনারেল শ্যারনের চেহারা ভেসে উঠল তার সামনে। ইহুদী গোয়েন্দা চীফের এক অলংঘনীয় হুকুম আবার তার উপর যেন চেপে বসল। তার সেই কথাও মনে পড়ল, জার্মানিতে যা হয়েছিল তার চেয়েও খারাপ অবস্থার মুখোমুখি হতে পারে ইহুদীরা আমেরিকায়। আবারও শিউরে উঠলো সাবা বেনগুরিয়ান। তার মনে হলো, সেই বিপর্যয় থেকে ইহুদীদের রক্ষার একটা মিশন জেনারেল শ্যারন তুলে দিয়েছে তার হাতে। সে দায়িত্ব সে কি পালন করবে না? করতেই যে হবে তাকে।

কম্পিউটারের কী বোর্ডে হাত রাখল সাবা বেনগুরিয়ান। কম্পিউটার বিজ্ঞানে সাবা বেনগুরিয়ানও দক্ষ কম নয়।

'সাবা, সব রোগের পাশে যেমন ঔষধ থাকে, তেমনি যে কোন কম্পিউটার সমস্যার সমাধানও তার পাশে মানে কী বোর্ডেই থাকে। রোগের যেমন ঔষধ আবিষ্কার করতে হয়, তেমনি কম্পিউটার সমস্যার সমাধানও কম্পিউটার কী বোর্ড থেকেই আসে।' বলে জর্জ জুনিয়র জগতের সবচেয়ে দুরুহ কম্পিউটারের লক আনলক করার জটিল কোড ব্রিফ করল সাবা বেনগুরিয়ানকে।

সে কম্পিউটার কোডটি সাবা বেনগুরিয়ান কম্পিউটার কী বোর্ডে কাজে লাগাল। কোডটি সম্পর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গেই কম্পিউটার স্ক্রীনে 'পাসওয়ার্ড ও,কে' সিগন্যাল ভেসে উঠল। তার পরেই পরবর্তী কমান্ড চাইল কম্পিউটার।

বুক কেঁপে উঠল সাবা বেনগুরিয়ানের। এবার ওপেন কী চাপলেই কম্পিউটারের গোপনগ্রন্থের পাতা তার সামনে খুলে যাবে। তারপর কী চেপে একের পর এক পাতা উল্টালেই শেষের পাতাগুলো সে পেয়ে যাবে।

কম্পিত তর্জনির শীর্ষ দিয়ে ওপেন কীতে চাপ দিল সাবা বেনগুরিয়ান।

কম্পিউটারের গোপনগ্রন্থের প্রথম পাতা ওপেন হলো সাবা বেনগুরিয়ানের সামনে।

হৃদয়ের কাঁপুনি বেড়ে গেল সাবা বেনগুরিয়ানের। সে অনেক কষ্টে হাসার চেষ্টা করে ধন্যবাদ দিল জর্জ জুনিয়রকে। বলল, 'সবচেয়ে গোপন দরজা খোলার মন্ত্র তুমি সত্যিই আবিষ্কার করেছ জর্জ জুনিয়র।'

একদিকে এই কথাগুলো বলছিল, অন্যদিকে তার ব্যস্ত তর্জনি বোতাম টিপে একের পর এক পাতা উল্টে যাচ্ছিল। সাবা বেনগুরিয়ান কোন পাতায় কি আছে তা দেখার জন্যে বিন্দুমাত্র ওয়েট করছিল না। তার লক্ষ্য সর্বশেষ এন্ট্রিগুলো।

জর্জ জুনিয়র সাবা বেনগুরিয়ানের পাশে বসে সাবার আঙ্গুলের খেলা দেখে যাচ্ছিল। সে মনে করছিল মজা বশতই সাবা কম্পিউটারের একের পর এক পাতা উল্টে যাচ্ছে।

সর্বশেষ এন্ট্রির সামনে আসতেই থমকে দাঁড়াল সাবা বেনগুরিয়ানের চোখ। সেই সাথে গোটাদেহে বয়ে গেলো প্রবল অস্বস্তির একটা শীতল স্রোত।

সাবা বেনগুরিয়ানের দু'টি চোখ নিবদ্ধ কম্পিউটারের সেই লেটেস্ট এন্ট্রি চার্টের উপর। আর তার তর্জনিটা ছুটে গেল ফাংশন কীর দিকে। পরপর তিনটি নির্দিষ্ট বাটন চাপলেই মুছে যাবে লেটেস্ট এন্ট্রিগুলো।

কিন্তু সাবা বেনগুরিয়ানের চোখ দু'টি লেটেস্ট এন্ট্রিগুলো পড়তে গিয়ে আঠার মত লেগে গেল। চোখ ফেরাতে পারল না সে। তার তর্জনি নেমে গেছে, ফাংশন বাটনে চাপ দিতে ভুলে গেল যেন।

পড়ছে সে এন্ট্রিগুলো। ইহুদী সিনাগগ কমপ্লেক্স সবুজ পাহাড়ে আহমদ মুসার বন্দী হওয়া এবং তার মুক্ত হওয়ার গোটা কাহিনী পড়ল সাবা বেনগুরিয়ান। তারপর আহমদ মুসার সাথে জর্জ আব্রাহামের সাক্ষাতের বিবরণও পড়ে ফেলল সে।

সাবা বেনগুরিয়ার অনুভব করল তার দেহ মনের উপর দিয়ে বুদ্ধি বিবেচনা ভোতাকারী এক শীতল স্রোত বয়ে যাচ্ছে।

পড়ে চলল সে। জর্জ আব্রাহাম, এ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থার ও জেনারেল শেরউডের তিন সদস্য বিশিষ্ট টিম তদন্তের গেছে আহমদ মুসার দেয়া তথ্যের সত্যতা প্রমাণের জন্যে। টিম সরেজমিনে দেখবে, ইহুদী বিজ্ঞানী জন জ্যাকব সবুজ পাহাড় থেকে লস আলামোস পর্যন্ত তৈরী করা গোয়েন্দা সড়ঙ্গের কথা সত্য

কিনা, সত্য হলে এ গোয়েন্দা সুড়ঙ্গ পথে কতদিন ধরে গোয়েন্দাবৃত্তি চলছে, আহমদ মুসা লস আলামোসে সাম্প্রতিক ইহুদী গোয়েন্দাবৃত্তির যে তথ্য দিয়েছে সে রকম গোয়েন্দাবৃত্তি ইহুদীরা কিভাবে, কার মাধ্যমে করছে। আহমদ মুসা কর্তৃক উদ্ধার করা সাম্প্রতিক গোয়েন্দাবৃত্তি সংক্রান্ত দলিল গোটাটাই কম্পিউটারে সে দেখল। কম্পিউটারের লেটেস্ট এন্ট্রির এখানেই শেষ।

পড়ার পর সাবা বেনগুরিয়ানের গোটা দেহ যেন কাঁপছে। মনে পড়ল জেনারেল শ্যারনের সেই কথা যে, যদি জর্জ আব্রাহামদের রোখা না যায় তাহলে জার্মানীতে ইহুদীদের যে অবস্থা হয়েছিল, সেই অবস্থা হবে আমেরিকার ইহুদীদের। হৃদয়টা থরথর করে কেঁপে উঠল সাবা বেনগুরিয়ানের। এই গোয়েন্দাগিরীর কথা যদি প্রচার হয়, যদি প্রমাণ হয় বিজ্ঞানী জন জ্যাকবের মত সর্বজন শ্রদ্ধেয় লোকও যদি ইহুদীদের পক্ষে গোয়েন্দাগিরী, লস আলামোস পর্যন্ত সুড়ঙ্গ তৈরী ও গোয়েন্দাবৃত্তি করে থাকে, তাহলে কোন ইহুদীই বিশ্বাসযোগ্য নয়, এটাই স্বতঃসিদ্ধ হয়ে উঠবে। আর তখন জার্মানীতে যা  হয়েছিল সেই অবস্থা এখানেও সৃষ্টি হতে পারে।

কম্পিত হৃদয়ে আরও ভাবল সাবা বেনগুরিয়ান, কিন্তু এ এন্ট্রিগুলো মুছে ফেললেই কি সব প্রমাণ মুছে যাবে? হঠাৎ তার মনে পড়ল লস আলামোসে জেনারেল শ্যারন 'ডেথ স্কোয়াড' পাঠানোর কথা। তার মানে তদন্ত টিমের সদস্যসহ আহমদ মুসাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়ে জীবন্ত প্রমাণ নষ্ট করার পরিকল্পনা করেছে জেনারেল শ্যারনরা?

গাটা কেঁপে উঠল আরেকদফা সাবা বেনগুরিয়ানের। সে বুঝতে পারল পরিকল্পনা। জীবন্ত প্রমাণ সরিয়ে দিতে ও কম্পিউটারের রেকর্ডগুলো মুছে ফেলতে পারলেই কেটে যেতে পারে সংকট।

কিন্তু এই পরিকল্পনা সাবা বেনগুরিয়ানকে আশ্বস্ত করার বদলে আরও আতংকিত করে তুলল। সে ইহুদী বটে, কিন্তু তাই বলে জর্জ জুনিয়রের এতবড় ক্ষতি চোখের সামনে দেখতে পারবে না, জর্জ জুনিয়রের পিতাকে যারা হত্যা করতে চায়, তাদের কোন সহযোগিতা করা তার পাপ হবে। জর্জ জুনিয়র তার সব।

প্রবল একটা আবেগ উথলে উঠল তার হৃদয় থেকে। চোখ দু'টি তার অশ্রুতে ভারি হয়ে উঠল।

কিন্তু পরক্ষণেই জেনারেল শ্যারনের কথা , স্বজাতির কথা, তার পিতার কথা মনে হলো। তার পিতার, তার স্বজাতির কোন বিপর্যয় কি সে সহ্য করতে পারবে? পারবে না। তাহলে সে কি করবে এখন? ফাংশন বাটনের উপর তার তর্জ্জনি তখন। চাপ দেবে কি বাটনে? জর্জ জুনিয়র তার পাশেই । তার দেহের মধুর উত্তাপ সে অনুভব করতে পারছে। সে জানে না কি সর্বনাশ করতে যাচ্ছে সে।

ফাংশন বাটনের উপর রাখা তার তর্জ্জনি ভীষণভাবে কেঁপে উঠল। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল সাবা বেনগুরিয়ান দু'হাতে মুখ ঢেকে। সে এলিয়ে পড়ল চেয়ারের উপর।

জর্জ জুনিয়র সাবা বেনগুরিয়ানের মতই কম্পিউটারের এন্ট্রিগুলো পড়ছিল। অকল্পনীয় একটা সত্যের মুখোমুখি হয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়েছিল সেও।

সাবা বেনগুরিয়ানকে কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে দেখে জর্জ জুনিয়র বুঝল সাবা অতিমাত্রায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে।

জর্জ জন সাবা বেনগুরিয়ানের পিঠে হাত রেখে বলল, 'এ তুমি কি করছ সাবা। এগুলো ইনফরমেশন মাত্র, রুটিন এন্ট্রি। এসব নিয়ে তুমি এত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লে কেন?'

সাবার কান্না আরও বেড়ে গেল।

জর্জ জন জুনিয়র কম্পিউটার অফ করে দিয়ে সাবা বেনগুরিয়ানকে টেনে নিয়ে এসে বসল সোফায়। বলল, 'তুমি এত নরম, ভাবনারও বাইরে ছিল আমার।' সাবা বেনগুরিয়ানের হাত নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে নরম কন্ঠে বলল জর্জ জুনিয়র।

'জর্জ তুমি জান না, তোমার সাথে আমি কি বিশ্বাসঘাতকতা করতে যাচ্ছিলাম।' দু'হাতে মুখ ঢেকে কান্না জড়িত কন্ঠে বলল সাবা বেনগুরিয়ান।

'তুমি আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে যাবে কেন? কি যা তা বলছ তুমি?' সাবা বেনগুরিয়ানের কথার কোন আমল দিল না জর্জ জুনিয়র।

মুখ তুলল সাবা বেনগুরিয়ান। অশ্রু ধোয়া তার মুখ।

তার চোখে মুখে একটা সিদ্ধান্তের ছাপ। বলল সে, 'বিশ্বাস করবে যদি বলি ইহুদী গোয়েন্দা প্রধান জেনারেল শ্যারন আমাকে এখানে পাঠিয়েছিল সাংঘাতিক একটা উদ্দেশ্যে?'

বিস্ময়ের একটা ঢেউ খেলে গেল জর্জ জুনিয়রের চোখে মুখে। কিছুক্ষণ সে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সাবা বেনগুরিয়ানের দিকে। বলল ধীরে ধীরে, 'তুমি মিথ্যা বলবে না। তোমাকে অবিশ্বাসের প্রশ্ন নেই। কিন্তু জেনারেল শ্যারনের সাথে তোমার কোথায় দেখা হলো? সাংঘাতিক সে উদ্দেশ্যটা কি?'

'জেনারেল শ্যারন আব্বার বন্ধু। ওয়াশিংটন এলে আমাদের বাসাতেই ওঠেন। তার উদ্দেশ্য ছিল, কম্পিউটারের লেটেস্ট এন্ট্রিগুলো মুছে ফেলা।'

বৈদ্যুতিক শক খাওয়ার মত চমকে উঠল জর্জ জুনিয়র। তার বিস্ফোরিত চোখ সাবা বেনগুরিয়ানের উপর নিবদ্ধ। বলল, 'তাহলে এন্ট্রিগুলোর সব তথ্য সত্য সাবা?'

'আমার তাই বিশ্বাস। না হলে জেনারেল শ্যারন ইহুদী জাতি বিপন্ন হওয়ার দোহাই দিয়ে এই কাজ করায় আমাকে রাজী হতে বাধ্য করতে আসবেন কেন?' চোখ মুছে ভারি গলায় বলল সাবা বেনগুরিয়ান

'কিন্তু এই এন্ট্রি মুছে ফেললেই কি সব প্রমাণ মুছে যাবে? তারা...............।'

জর্জ জুনিয়রকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বলে উঠল সাবা বেনগুরিয়ান, 'জর্জ তারা শুধু এই একটি কাজ নয়, আমার আশংকা তারা আরও ভয়াবহ কিছু ঘটাতে যাচ্ছে।

জর্জ জুনিয়রের ভ্রু কুঞ্চিত হয়ে উঠল। বলল, 'ভয়াবহ? সেটা কি?।'

সাবা বেনগুরিয়ান কম্পিত গলায় বলল, 'আজ সকালে আব্বার একটা মেসেজ জেনারেল শ্যারন আংকেলকে দেবার জন্যে আমাদের ড্রইং রুমে ঢুকছিলাম। ঠিক সে সময় আমি তাঁকে টেলিফোনে জনৈক বেনইয়ামিনকে বলতে শুনলাম যে, সে যেন লস আলামোসের প্রধান গেটের পাশে কোথাও আত্মগোপন করে থাকে এবং যে ডেথ স্কোয়াড তিনি লস আলামোসে পাঠাচ্ছেন তাদের খবরাখবর যেন সে পাঠায়।'

চমকে উঠে সোফায় সোজা হয়ে বসল জর্জ জুনিয়র। বলল, ‘ লস আলামোসে ইহুদী ডেথ স্কোয়াড? কি জন্যে? ওখানে আব্বারা আজ যাচ্ছেন, কিংবা তারা আজ ওখানেই আছেন? তাহলে কি......?’

কথা শেষ করতে পারল না জর্জ জুনিয়র।

‘আমি তোমার সাথে একমত জর্জ। তোমার আব্বার কম্পিউটার টার্গেট হবার সাথে সাথে তোমার আব্বাও টার্গেট হতে পারেন।’

কম্পিত কন্ঠে বলল সাবা বেনগুরিয়ান। তার চোখে মুখে আতঙ্ক।

ঝট করে উঠে দাঁড়াল জর্জ জুনিয়র। তারপর সাবার হাত ধরে টেনে নিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে বলল, ‘এস আব্বার কম্যুনিকেশন টেবিলে এস।’

কম্যুনিকেশন টেবিলে জর্জ জুনিয়র অয়্যারলেস কী বোর্ডের সবুজ বোতামে চাপ দিল।

‘ইয়েস স্যার।’ ওপার থেকে কথা বলে উঠল জন লিংকন।

জন লিংকন এফ.বি.আই-এর অপারেশন কমান্ডার।

‘আমি জর্জ জুনিয়র। আমি আব্বার সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি।’

‘কোন খবর আপনাদের কাছে আছে? আমরা তাঁর সাথে কনট্যাকটের চেষ্টা করছি।’

‘চেষ্টা করছি মানে, অয়্যারলেস, মোবাইলে তাকে কনট্যাকট করা যায়নি?’

‘কয়েকবার চেষ্টা করেছি, ব্যর্থ হয়েছি আমরা। আমরা ‘সান্তাফে’ ও ‘লস আলামোসে’ আমাদের ইউনিটকে বিষয়টা জানিয়ে দিয়েছি। যে কোন সময় ওদের উত্তর আশা করছি। এদিকে একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে। তাঁকে আমাদের জরুরী প্রয়োজন।’

‘সাংঘাতিক? কি ঘটেছে?’ বলল জর্জ জুনিয়র।

‘একটা বিস্ফোরণ ঘটে আমাদের মাস্টার কম্পিউটার ধ্বংস হয়ে গেছে।’

কেঁপে উঠল জর্জ জুনিয়র। সাবার দেয়া তথ্য তাহলে একশ ভাগ সত্য। ইহুদী গোয়েন্দাগিরী ও বিশ্বাসঘাতকতার সব প্রমাণ ধ্বংসের তারা একই সাথে উদ্যোগ নিয়েছে। তাদের বাসার প্রমাণ রক্ষা পেয়েছ। কিন্তু এফ.বি.আই অফিসের প্রমাণ ধ্বংস হয়েছে। লস আলামোসে তাদের ডেথ স্কোয়াড পাঠানো কি সফল

হয়েছে? তার আব্বার মোবাইল ও অয়্যারলেস নিরব কেন? তার গোটা দেহে আতংকের একটা হিমশীতল স্রোত বয়ে গেল।

নিজেকে সামলে জর্জ জুনিয়র বলল, 'এমন নাশকতামূলক ঘটনা কিভাবে ঘটল অমন সংরক্ষিত জায়গায়?'

'নাশকতামূলক ঘটনা বলছেন? কিন্তু প্রাথমিক তদন্তে বলা হয়েছে বৈদ্যুতিক ত্রুটি জনিত অভ্যন্তরীণ বিস্ফোরণ হতে পারে।' বলল এফ.বি.আই অপারেশন প্রধান জন লিংকন।

'না মিঃ লিংকন আমি এর প্রতিবাদ করছি। একটা শত্রু পক্ষ কম্পিউটারে সংরক্ষিত কিছু অতি সাম্প্রতিক দলিল ধ্বংস করার জন্যেই এই ঘটনা ঘটিয়েছে। ওরা লস আলামোসে আব্বাদের টিমের উপরও হামলা করতে পারে আমার আশঙ্কা।'

কমান্ডার জন লিংকন দ্রুত কন্ঠে বলল, 'মাফ করবেন, এটা আপনার অনুমান, না আপনার কোন নিশ্চিত তথ্য?'

'মিঃ লিংকন, অনেক গুরুতর ঘটনা ঘটে গেছে তারই প্রতিক্রিয়ায় শত্রু পক্ষ প্রমাণ ধ্বংস কৌশল হিসাবে এফ.বি.আই কম্পিউটারের রেকর্ড ধ্বংসের উদ্যোগ নেয়ার মত করেই ওরা লস আলামোসে আজ ডেথ স্কোয়াড পাঠিয়েছে।'

'সর্বনাশ! ধন্যবাদ মিঃ জর্জ জন। আমি বুঝতে পারছি। আমি এদিকের এবং লস আলামোসের বিষয়টা দেখার ব্যবস্থা করছি।'

অয়্যারলেস অফ করে দিয়ে জর্জ জন জুনিয়র ফিরল সাবা বেনগুরিয়ানের দিকে।

সাবা বেনগুরিয়ার সীমাহীন উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকিয়েছিল জর্জ জন জুনিয়রের দিকে। বলল, 'কি ব্যাপার জর্জ?'

'তোমার তথ্য সত্য সাবা। ওরা প্রমাণ মুছে ফেলার জন্যে সব ব্যবস্থাই করেছে। এফ.বি.আই-এর মাস্টার কম্পিউটার ওরা ধ্বংস করেছে।' শুকনো কন্ঠে বলল জর্জ জুনিয়র।

'ও গড! আর তোমার আব্বার কথা?' সাবা বেনগুরিয়ানের কন্ঠে উদ্বেগ।

জর্জ জুনিয়রের মুখ মলিন হয়ে উঠল। বলল, ‘কম্পিউটার বিস্ফোরণের পর এফ.বি.আই আব্বার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেছে। কিন্তু আব্বার মোবাইল ও ওয়্যারলেস দু’টিই কোন রেসপন্স করেনি।’

সাবা বেনগুরিয়ানের মুখ সাদা হয়ে গেল শোনার সাথে সাথেই। শুকনো ঠোঁট দু’টি তার কাঁপল, বলল, ‘স্যরি জর্জ, তোমাকে আরও আগে আমার জানানো উচিত ছিল। বিশ্বাস কর যখন আমি প্রথম ডেথ স্কোয়াডের কথা শুনি তখন কিছুই বুঝিনি। এমনকি জেনারেল শ্যারন যখন এই এ্যাসাইনমেন্টটি আমার উপর চাপিয়ে দেন, তখনও বুঝতে পারিনি। বুঝলাম এখানে এসে কম্পিউটারের লেটেস্ট এন্ট্রিগুলো পড়ার পর।’

জর্জ জুনিয়র সাবা বেনগুরিয়ানের একটা হাত হাতে নিয়ে বলল, ‘তোমার কোন ত্রুটি হয়নি সাবা, তুমি যথা সময়েই বলেছ।’

বলে একটু থামল জর্জ। একটু ভাবল। তারপর অনেকটা স্বগোতোক্তির মতই বলল, ‘ভাবছি লস আলামোসে যাব কিনা।’

‘তুমি গেলে আমিও যাব জর্জ।’ বলল সাবা বেনগুরিয়ান।

‘ঠিক আছে, আমি আরও একটু ভাবি। তোমাকে আমি টেলিফোন করব।’

‘ধন্যবাদ জর্জ।’

‘এখন উঠি তাহলে।’

বলে উঠে দাঁড়াল সাবা বেনগুরিয়ান। জর্জ জন জুনিয়রও উঠে দাঁড়াল। হাঁটছিল দু’জন।

জর্জের একটা হাত সাবা বেনগুরিয়ানের গলায় পেঁচানো। হাঁটতে হাঁটতে জর্জ সাবা বেনগুরিয়ানকে নিজের দিকে টেনে বলল, ‘তুমি না বললে কিছুই জানতাম না। তোমার জাতির স্বার্থে জেনারেল শ্যারনের অনুরোধ রক্ষা করলে না কেন? শুধুই কি আমার কারণে?’

সাবা বেনগুরিয়ান জর্জে দিকে চাইল। ম্লান হাসল। তারপর মুখ নিচু করল। বলল, ‘শুধুই তোমার কারণে নয়। শুধু তোমার কারনে হলে ওর দেয়া এই দায়িত্বই নিতাম না। ভাবতাম তোমাকে না জানিয়ে এ ধরনের কোন কিছুই করা

ঠিক নয়। কিন্তু তা না ভেবে ভেবেছিলাম জাতির পক্ষে ঐ অনুরোধ রক্ষা করলে তা একটা অন্যায় হবে আমার জন্যে, তোমার অমর্যাদা তাতে হবে না।'

'তাহলে জেনারেল শ্যারনের অনুরোধ শেষ পর্যন্ত রাখলে না কেন?' জর্জ বলল।

'এন্ট্রিগুলোর বিষয়বস্তু দেখে আমি তা মুছে ফেলতে পারিনি।' বলল সাবা।

'কেন? এন্ট্রিগুলো মুছে ফেলার জন্যে তোমার আগ্রহী হওয়া উচিত ছিলে। কারণ তোমার জাতির বিপদের কথা তখন তোমার কাছে আরও পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল।'

'দুই কারনে পারিনি। জাতির কিছু লোকের একাজকে আমার চরম বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে হয়েছে। দ্বিতীয়ত আমি আমেরিকান, আমেরিকার নাগরিক, এই চিন্তা তখন আমার কাছে বড় হয়েছিল।'

হাসল জর্জ জন জুনিয়র। আরও কাছে টেনে নিল সাবা বেনগুরিয়ানকে। বলল, 'তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সাবা। আমাকে আশ্বস্ত করলে।'

'কিভাবে আশ্বস্ত করলাম, কোন বিষয়ে?' ব্যস্ত কন্ঠে বলল সাবা।

'আশ্বস্ত হলাম যে, আমাকে কোন সময় তুমি ভালবাসতে না পারলেও দেশের প্রতি তুমি বিশ্বস্ত থাকবে। আর দেশের প্রতি এমন দায়িত্বশীল যে, সে তার সাথীর প্রতিও দায়িত্বশীল হতে বাধ্য।'

'তোমাকে ধন্যবাদ জর্জ। তুমি আমাকে বুঝতে পেরেছ? বিশ্বাস করেছ। তুমি ভুল বুঝলে, অবিশ্বাস করলে আমার বাচাঁ কঠিন হয়ে উঠতো।' কান্না ভেজা ভারি কন্ঠ সাবা বেনগুরিয়ানের।

'কিন্তু সাবা, তোমাকে অবিশ্বাস করার যন্ত্রণা তার চেয়েও বেশি কষ্ট আমাকে দিত।'

'ধন্যবাদ। আমি অতি ভাগ্যবান জর্জ।'

'আমিও।'

গাড়ি বারান্দায় তারা পৌছে গেছে।

জর্জ জন জুনিয়র এগিয়ে গিয়ে সাবা বেনগুরিয়ানের গাড়ির দরজা খুলে ধরল।

সাবা ড্রাইভিং সিটে উঠে বসলে জর্জ গাড়ির দরজা বন্ধ করে বলল, ‘গুড নাইট সাবা, বাই।’

‘বাই। আমি তোমার টেলিফোনের অপেক্ষা করব জর্জ।’

বলে গাড়িতে স্টার্ট দিল সাবা বেনগুরিয়ান।

# ৩

লস আলামোসের কম্পিউটার কক্ষ।

কক্ষটির পশ্চিম প্রান্তের তিনটি কম্পিউটার সরিয়ে ফেলা হয়েছে। সরিয়ে ফেলা হয়েছে এ পশ্চিম প্রান্তের কার্পেটিও।

লস আলামোসে স্ট্রাটেজিক রিসার্চ ল্যাবরেটরির প্রধান পরিচালক ডঃ হাওয়ার্ড বিস্ফোরিত চোখে তাকিয়ে আছে সুড়ঙ্গ মুখের দিকে।

সুড়ঙ্গ মুখে মেঝের সমান্তরালে যে স্ল্যাব ছিল তা তুলে ফেলা হয়েছে। সুড়ঙ্গ মুখ এখন উন্মুক্ত। নিচে অনেক খানি দেখা যাচ্ছে। সে দিকে তাকিয়েই পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে ডঃ হাওয়ার্ড।

ডঃ হাওয়ার্ডের পাশে নিউ মেক্সিকোর এফ.বি.আই ইনচার্জ এডমন্ড বার্ক। সীমাহীন শংকা ও উদ্বেগ নিয়ে তারও চোখ দু'টি নিবদ্ধ রয়েছে সুড়ঙ্গ মুখে উপর।

মিঃ এডমন্ড বার্কের হাতে মোবাইল টেলিফোন। তার টেলিফোনটি 'বিপ' দিয়ে উঠল।

টেলিফোনটি কানের কাছে তুলে ধরে নিচু স্বরে কথা বলল এডমন্ড বার্ক।

অল্প কয়েকটি কথা বলার পর কথা শেষ করে মিঃ এডমন্ড ডাকলো ডঃ হাওয়ার্ডকে। বলল, মিঃ হাওয়ার্ড ওরা সুড়ঙ্গের এ প্রান্তে চলে এসেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা এসে পড়বেন।

'ওরা কয়জন?'

'ওরা সেই তিনজন এবং তার সাথে আহমদ মুসা।'

'আমার বুক কাঁপছে এডমন্ড বার্ক।'

'এই সুড়ঙ্গ পথে কি যে ঘটেছে ! তবে আমি আনন্দিত যে আহমদ মুসা ঐ সবুজ পাহাড়ের অন্ধকুপে বন্দী হয়েছিল। তা না হলে আরও কতদিন যে এই সুড়ঙ্গ অনুদঘাটিত থাকতো কে জানে।' বলল ডঃ হাওয়ার্ড।

‘আজ এই সুড়ঙ্গ আবিষ্কার হওয়ায় আহমদ মুসাও বড় বিপদ থেকে বেঁচে যাবে। লস আলামোসে গোয়েন্দাগিরীর দায় তার ঘাড়ে আর বর্তাবে না।’ এডমন্ড বার্ক বলল।

‘তা বটে, দুঃখের মধ্যেও আমার আরও একটা ব্যাপারে আনন্দ লাগছে। সে দিন আহমদ মুসাকে দেখা হয়নি, আজ দেখা যাবে।’

‘অবাক কান্ড। আমিও এটাই ভাবছি ডঃ হাওয়ার্ড।’

এ সময় সুড়ঙ্গ থেকে কথা শোনা গেল।

‘ওরা এসে গেছেন।’ বলে এডমন্ড বার্ক সুড়ঙ্গের একেবারে পাশে এসে দাঁড়াল। তার সাথে সাথে ডঃ হাওয়ার্ডও।

সুড়ঙ্গে প্রথম দেখা গেল জর্জ আব্রাহাম জনসনকে।

‘গুড মর্নিং স্যার।’ বলে উঠল এডমন্ড বার্ক জর্জ আব্রাহামকে লক্ষ্য করে।

‘গুড মর্নিং এডমন্ড।’ বলল জর্জ আব্রাহাম। তার ঠোটে হাসি কিন্তু চোখ দু’টিতে বিষণ্নতা। কপাল কুঞ্চিত।

সুড়ঙ্গ থেকে সবাই এক এক করে উঠে এল। আহমদ মুসাও।

সবাই ঘর্মাক্ত, ক্লান্ত।

জর্জ আব্রাহাম আহমদ মুসাকে এডমন্ড বার্ক ও ডঃ হাওয়ার্ডের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল।

এডমন্ড বার্ক আহমদ মুসার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, ‘ওয়েলকাম, আহমদ মুসা। আমরা কৃতজ্ঞ।’

‘কৃতজ্ঞ কেন?’ হ্যান্ডশেক করতে করতে বলল আহমদ মুসা

‘গোয়েন্দাগিরীর ইতিহাসে সম্ভবত সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ঘটনা আপনি উদঘাটন করেছেন।’

‘এটা কৃতিত্ব না হয়ে নতুন এক অপরাধও তো হতে পারে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘বুঝলাম না জনাব।’ বলল এডমন্ড বার্ক।

‘আপনাদের সরকার আহমদ মুসাকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছে।’

‘সে তো আগের কথা।’

'না দেড় ঘন্টা আগের কথা।'

চোখে মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল এডমন্ড বার্কের। তাকাল সে এফ.বি.আই চীফ জর্জ আব্রাহামের দিকে। দেখল এফ.বি.আই চীফের চোখে সেই বিষণ্ন দৃষ্টি এবং তার কুঞ্চিত কপাল।

এডমন্ড বার্কে বিমুঢ় ভাব দেখে জর্জ আব্রাহাম বলল, 'চল বসি, সব বলব।'

বলে একটা দম নিয়েই জর্জ আব্রাহাম এডমন্ড বার্ককে লক্ষ্য করে আবার বলে উঠল, 'সুড়ঙ্গ ঢোকার সময় তোমাকে টেলিফোনে বলেছিলাম সব চেয়ে দ্রুতগামী একটা বিমান সান্তাফে বিমান বন্দরে রেডি রাখার জন্যে। তার কি করেছো?'

'ব্যবস্থা হয়ে গেছে স্যার।' বলল এডমন্ড বার্ক।

এডমন্ড থামতেই ডঃ হাওয়ার্ড বলে উঠল, 'জনাব, চলুন বসবেন।'

ডঃ হাওয়ার্ড সবাইকে নিয়ে কম্পিউটার কক্ষ থেকে বেরুল।

কক্ষ থেকে বেরুবার সময় জর্জ আব্রাহাম এডমন্ডকে বলল, 'এ ঘরটা চব্বিশ ঘন্টা সশস্ত্র পাহারায় থাকবে। ব্যবস্থা করেছো?'

'জি স্যার।'

সবাই এসে বসল ডঃ হাওয়ার্ডের ড্রইং রুমে।

টয়লেট থেকে ফ্রেশ হয়ে এসে বসেছে সবাই।

গরম কফিতে চুমুক দিতে দিতে জর্জ আব্রাহাম বলল, 'এডমন্ড, সবুজ পাহাড় এবং সুড়ঙ্গ পথের উপর একটা প্রাথমিক স্টেটমেন্ট আমি এবং এ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থার ও জেনারেল শেরউড যুক্ত হস্তখতে তৈরী করেছি। ওটার একটা কপি প্রেসিডেন্টের পার্সোনাল সেক্রেটারী এবং আরেকটা কপি এফ.বি.আই হেড অফিসে পাঠাবার ব্যবস্থা কর।'

স্টেটমেন্টটা নিয়ে উঠে গেল এডমন্ড। ফিরে এল মিনিট দুয়েক পর। বলল, 'আমাদের সিকিউরিটি অফিসারকে দিয়ে এলাম। পাঠাবার ব্যবস্থা হচ্ছে।'

কথা শেষ করে একটু থেমেই আবার বলল, 'স্যার কি যেন বলেছিলেন।'

‘ও আচ্ছা।’ বলে জর্জ আব্রাহাম আবার শুরু করল, ‘আহমদ মুসা ঠিকই বলেছেন। এই কৃতিত্ব যার তাঁকে কাস্টোডিতে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, সবুজ পাহাড়ে যাদের গ্রেফতার করা হয়েছিল, তাদের সবাইকে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। সবুজ পাহাড়ের দখলটাও আমাদের ছাড়তে হয়েছে। শুধু আমাদের পাহারাটাই ওখানে বজায় আছে মাত্র।’

বিস্ময়ে থ হয়ে গেছে এডমন্ড বার্কের চোখ-মুখ।

‘কিভাবে এটা ঘটল।’ বলল সে।

‘প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা উপদেষ্টার নির্দেশে আমরা এটা করেছি। সবাই তো আমরা জানি প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা প্রধান জেনারেল আলেকজান্ডারের সাথে ইহুদী গোয়েন্দা প্রধান জেনারেল শ্যারনের সম্পর্ক খুবই গভীর।’ জর্জ আব্রাহাম বলল।

‘প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা উপদেষ্টা আলেকজান্ডার হ্যামিল্টনকে সব কথা বোঝাননি?’ বলল এডমন্ড।

‘সব শুনেছেন, জেনেছেন, কিন্তু তার পরও বলেছেন, নিশ্চিত প্রমাণ হাতে না নিয়ে, প্রেসিডেন্টের অনুমতি না নিয়ে ওদের এ ধরনের গ্রেফতার ও কেন্দ্র দখল করা যাবে না। প্রেসিডেন্ট রাজনৈতিক কনসিকুয়েন্স বিচার না করে এ বিষয়ে অবশ্যই কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না।’ বলল জর্জ আব্রাহাম।

‘প্রেসিডেন্টের কথাও এটাই?’

‘হয়তো তাই। প্রেসিডেন্টের সাথে তিনি কথা বলেছেন।’

‘ডকুমেন্ট ধরা পড়া, গোয়েন্দাগিরীর সুড়ঙ্গ আবিষ্কার হওয়ার মত সাংঘাতিক ঘটনার পরও এ ধরনের নির্দেশ ওরা দিলেন?’ বিস্মিত কন্ঠে বলল ডঃ হাওয়ার্ড।

‘সুড়ঙ্গ তখনও আমরা আবিষ্কার করিনি, তখন ওটা ছিল আমাদের শোনা কথা।’ বলল জর্জ আব্রাহাম।

‘নিরাপত্তা উপদেষ্টার এই নির্দেশ অযৌক্তিক হয়েছে, আমাদের মতামতকে উপেক্ষা করা হয়েছে। পেন্টাগনও এটাই মনে করে। ওরাও প্রেসিডেন্টের সাথে যোগাযোগ করবেন।’ বলল জেনারেল শেরউড।

আহমদ মুসা সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে ওদের কথা শুনছিল। সোজা হয়ে বসল সে। বলল, ‘এসব আপনাদের নিজেদের ব্যাপার। আমি বাইরের লোক। তবু একটা কথা আমি বলব, বহুমুখী একটা বিষাক্ত সাপের অস্তিত্বে আপনারা হাত দিয়েছেন। একটামাত্র ছোবল দিয়েছে। ছোবল আরো আসছে।’

‘আপনার কথা ঠিক আহমদ মুসা। নিউ মেক্সিকো এয়ারপোর্টে প্লেন রেডি। আমরা সোজা যাব প্রেসিডেন্টের কাছে। সব কিছু তাঁর হাতে তুলে দেব। তারপর সব দায়িত্ব তাঁর।’ বলল জর্জ আব্রাহাম।

হাতের কফির কাপটা টিপয়ের উপর রেখে সবার দিকে চেয়ে জর্জ আব্রাহাম বলল, ‘এখন আমরা উঠতে পারি।’

তারপর এফ.বি.আই-এর নিউ মেক্সিকো চীফ এডমন্ডের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘তোমার গাড়ি প্রস্তুত তো?’

‘অবশ্যই স্যার, দু’টি গাড়িই স্টার্টিং পয়েন্টে দাঁড়িয়ে আছে।’ বলল এডমন্ড বার্ক।

উঠে দাঁড়াল জর্জ আব্রাহাম। সবাই উঠে দাঁড়াল।

‘মিঃ আহমদ মুসা কি সত্যই আপনাদের সাথে যাচ্ছেন?’ জিজ্ঞেস করল এডমন্ড বার্ক।

হাসল জর্জ আব্রাহাম। বলল, ‘যাচ্ছেন, কিন্তু বন্দী হিসাবে নয়, সহযাত্রী হিসেবে।’

সবাই বেরিয়ে আসছিল লস আলামোস ল্যাবরেটরী থেকে।

গ্রাউন্ড ফ্লোরের সর্বশেষ করিডোর অতিক্রম করছিল তারা।

অতিক্রম করছিল মিস সারা জেফারসনের অফিস।

অফিসের দিকে তাকিয়ে জর্জ আব্রাহাম থমকে দাঁড়াল। মনে পড়ল তার, মিস জেফারসনকে সে কথা দিয়েছিল আহমদ মুসাকে তার সাথে সাক্ষাত করিয়ে দেবে।

‘আপনারা একটু দাঁড়ান। আহমদ মুসাকে মিস জেফারসনের সাথে সাক্ষাত করিয়ে দেই। আমি মিস জেফারসনকে কথা দিয়েছিলাম।’

সবার উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলে জর্জ আব্রাহাম আহমদ মুসাকে নিয়ে ঢুকল মিস জেফারসনের অফিস কক্ষে।

মিস সারা জেফারসন যেন তাদেরই অপেক্ষা করছিল।

জর্জ আব্রহামরা কক্ষে ঢুকতেই মিস সারা জেফারসন উঠে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানাল জর্জ আব্রাহাম ও আহমদ মুসাকে। ওদের বসার অনুরোধ করে জর্জ আব্রাহামকে লক্ষ্য করে বলল, 'আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ যে, ছোট একটা প্রতিশ্রুতি আপনি মনে রেখেছেন।'

'ওয়েলকাম মিস জেফারসন। আমি বসছি না।'

তারপর আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, 'আপনি ওর সাথে কথা বলে আসুন আহমদ মুসা। আমরা গেটে অপেক্ষা করছি।'

বেরিয়ে গেল জর্জ আব্রাহাম।

আহমদ মুসা তখনও দাঁড়িয়েই ছিল।

জর্জ আব্রাহাম বেরিয়ে যেতেই মিস জেফারসন হাসি মুখে বলল, 'বসুন মিঃ আহমদ মুসা।'

আহমদ মুসা বসল। বসল মিস জেফারসনও।

বিস্ময় তখনও আহমদ মুসার কাটেনি। তার সাথে সাক্ষাত করিয়ে দেয়ার জন্যে মিস জেফারসন জর্জ আব্রাহামকে অনুরোধ করেছিল কেন?।

আহমদ মুসার ভাবনাটা ভেঙ্গে গেল মিস জেফারসনের কথায়। বলল, 'মনে করবেন না যে, সেদিন সবাইকে আহত করেছেন, আমাকে

আহত করেননি, সেই কৃতজ্ঞতায় আমি আপনার সাথে দেখা করতে চেয়েছি।'

'কেন?' বলল আহমদ মুসা মুহূর্তের জন্যে তার দু'চোখ মিস জেফারসনের উপর নিবদ্ধ রেখে।

'দুই কারণে। এক, আপনি আহমদ মুসা। দুই, ইহুদী অপকীর্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আপনি একজন সফল নায়ক।' বলল সারা জেফারসন ঠোঁটে একটুকরো মিষ্টি হাসি টেনে।

'শেষের কারণটা বুঝলাম না মিস জেফারসন।' বলল আহমদ মুসা।

‘ব্যাখ্যাটা আপনাকে বলতে পারি। আমি ফ্রি আমেরিকা ফোরামের একজন সদস্য এবং ফ্রি আমেরিকা কি আপনি জানেন।’

কথা শেষ করেই আবার বলে উঠল মিস জেফারসন, ‘বলুন তো এরপর আমি কি বলব? শুনেছি আপনি ভাল থট রিডার।’

আহমদ মুসা হাসল। মিস জেফারসনের দিকে না তাকিয়েই আহমদ মুসা বলল, ‘আপনি বেঞ্জামিন বেকনের কোন মেসেজ আমাকে দেবেন।’

প্রচন্ড বিস্ময় নেমে এল মিস জেফারসনের চোখে। স্তব্ধ হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ সে। তার বিস্ময় বিমূঢ় স্থির দৃষ্টি আহমদ মুসার মুখের উপর নিবদ্ধ।

‘আপনি জানলেন কি করে?’ মিস জেফারসনের চোখে বিস্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টি।

‘কেন, আপনিই তো বললেন, আমি থট রিডার।’ বলল আহমদ মুসা ঠোঁটের কোণে একটু হাসি টেনে।

‘কথার কথা আমি বলেছি। কোন থট রিডারই অতদূর যেতে পারে না।’ মিস জেফারসন বলল।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘থট রিডিং সম্পর্কে আমার জানা নেই। সুতরাং আমি বলতে পারবো না এ বিষয়ে।’

একটু থেমে কন্ঠে একটু গাম্ভীর্য টেনে বলল, ‘অন্য কিছু নয় আপনার কথা থেকেই বুঝছি, বেঞ্জামিন বেকনের কোন মেসেজ থাকতে পারে।’

‘কোন কথা?’

‘ফ্রি আমেরিকা’র সদস্য হিসেবে আপনার পরিচয় দেয়া।’

‘এ থেকে কি বুঝা গেছে?’

‘আপনি ফ্রি আমেরিকা’র সদস্য। ফ্রি আমেরিকা’র আরেকজন সদস্য বেঞ্জামিন বেকন। এখন নিউ মেক্সিকোতে এবং তিনি লস আলামোসের পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন। সুতরাং তার সাথে আপনার অবশ্যই যোগাযোগ হয়েছে। এবং যেহেতু বেঞ্জামিন আমার ব্যাপারে আগ্রহী। সুতরাং তার মেসেজ আপনার মাধ্যমে আসা স্বাভাবিক।’

‘মিঃ আহমদ মুসা আপনার যুক্তিগুলো থেকে ঠিকই ধরতে পারেন, বেঞ্জামিন বেকনের কোন মেসেজ আমার কাছে আছে। কিন্তু সে মেসেজটি আপনাকে দেয়ার জন্যে অপেক্ষা করছি, এটা প্রমাণ হলো কিসে?’

আবারও হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আমার ভুলও হতে পারে, আপনার চোখে মুখে কিছু একটা বলার উদগ্রীব অপেক্ষার দৃশ্য আমি লক্ষ্য করেছি।’

সারা জেফারসনের বিস্ময় বিমুঢ় চোখে মুখে একটা উজ্জ্বল হাসি ফুটে উঠল। পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে পড়ল। বলল, ‘ঠিক বলেছেন মিঃ আহমদ মুসা, আপনার সাথে দেখা হওয়া ও কথা বলার জন্যে উদগ্রীব ছিলাম। বেঞ্জামিন একটা জরুরী মেসেজ দিয়েছে।’

‘জরুরী? কি সেটা?’

দু’মিনিট আগে বেঞ্জামিন বেকন আমাকে জানিয়েছে, ফ্রি আমেরিকার নিউ মেক্সিকো মনিটরিং রিপোর্ট থেকে তিনি জানতে পেরেছেন ইহুদী চেহারার আরোহীদের নিয়ে ইহুদী চালিত তিনটি গাড়ি লস আলামোসের দিকে গেছে।’

বলে একটু থামল সারা জেফারসন। আবার শুরু করল তারপর, ফ্রি আমেরিকা’র এটা একটা রুটিন ইনফরমেশন। কিন্তু বেঞ্জামিন কোনভাবে এই খবরটি আপনাকে দিতে বলেছেন। সে জন্যে আমি উদগ্রীব ছিলাম আপনার সাথে কথা বলার জন্যে।’

‘ধন্যবাদ মিস জেফারসন। এই মুহূর্তের জন্য খবরটি খুবই মুল্যবান, যদিও আমি এর কোন তাৎপর্য বুঝতে পারছি না।’

হাসল মিস জেফারসন। বলল, ‘তবে মিঃ আহমদ মুসা এই খবর দেবার লক্ষ্যে আপনার জন্যে উদগ্রীব থাকাটা লেটেস্ট এ্যাডিশন। কিন্তু আপনার সাথে সেই সাক্ষাতের পর যখন জানতে পারলাম আপনি আহমদ মুসা, সেই থেকে আমি উদগ্রীব আপনার দেখা পাবার জন্যে।’

‘কিন্তু তখন তো আমাকে আপনার দেশের শত্রু ঠাওরানো হয়েছিল। সেটা জানার পরও?’

‘হ্যাঁ।’

‘কেন?’

‘আপনাকে আমার বাসায় এক ডিনারের দাওয়াত দিতে চাই।’

বিস্ময় ফুটে উঠল আহমদ মুসার চোখে। বলল, ‘তখন যে অবস্থা ছিল তাতে মার্কিন জেলে আমার স্থান হবার কথা। সম্ভাবনা অবশ্য এখনও আছে। এটা জানার পরও দাওয়াতের ইচ্ছা আপনার মাথায় এলো কি করে?’

‘আপনাকে আমি জানি এবং সেদিন আপনাকে দেখেও আমার স্থির বিশ্বাস হয়েছিল আপনি এ ধরনের ষড়যন্ত্রের মধ্যে থাকতে পারেন না।’

‘আমাকে জানেন কি করে?’

‘বিশ্বের অনেকেই আপনাকে যেমন জানে। বিশেষ করে ফ্রি আমেরিকা’র একজন সদস্য হিসেবে আপনাকে বেশিই জানার কথা।’

‘কেন?’

‘আপনি একটা জাতির মুক্তির জন্যে যেমন কাজ করছেন, তেমনি ফ্রি আমেরিকাও কাজ করছে তার জাতিকে মুক্তির জন্যে। ইহুদীবাদ আপনারও শত্রু, আমাদেরও শত্রু।’

‘বুঝলাম। কিন্তু ডিনারের দাওয়াতের অর্থ কি?’

ম্লান হাসি ফুটে উঠল সারা জেফারসনের মুখে। কিছুটা বিব্রত ভাবও। কিছুটা দ্বিধা করে বলল, ‘আপনি বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু ঘটনাটা সত্য। খুবই সাম্প্রতিক ঘটনা। ক্যারিবিয়ান টার্কস দ্বীপপুঞ্জে হোয়াইট ঈগলের কেলেংকারী নিয়ে (ফ্রি ওয়ার্ল্ড টেলিভিশন) যে চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেছিল, তার উপর তৈরী ফ্রি আমেরিকা’র একটি রিপোর্ট পড়ছিলাম সে দিন রাতে শোবার আগে। ঐ রিপোর্টেই জানলাম টার্কস দ্বীপপুঞ্জে গোটা কাজের কৃতিত্ব এককভাবেই আপনার।’

সত্যি ভাবছিলাম সেদিন আপনাকে নিয়ে গভীরভাবে। বিস্ময়ে হতবাক হচ্ছিলাম, একজন মানুষ কি করে পারে যেখানে প্রয়োজন সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়তে জাতির সেভিয়ার হয়ে! ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে দেখলাম একজনকে। তিনি আহমদ মুসা। তাকে নিয়ে বসলাম গিয়ে ভার্জিনিয়ার মন্টিসেলোতে গ্র্যান্ড গ্র্যান্ড গ্র্যান্ড দাদু টমাস জেফারসন স্টাডিতে।

সেই স্টাডিতে সেফ ভল্টে দাদুর নিজের হাতের লেখা ‘Declaration of Independence’ এর সে খসড়া রয়েছে, সেই খসড়া তুলে দিলাম আপনার হাতে। বললাম, আমার দাদুরা যে মুক্ত, স্বাধীন, সহজ, সুন্দর এক সহমর্মী আমেরিকার স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে আপনি আমাদের সাহায্য করুন। আপনি.........,

কথা আটকে গেল সারা জেফারসনের। আবেগে তার চোখ মুখ ভারি হয়ে উঠেছে। শেষের কথাগুলো তার কাঁপছিল। মুখ তার নিচু হয়ে গিয়েছিল আগেই। থেমেই দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে রুমাল দিয়ে চোখের সিক্ত কোণ মুছে ফেলল।

মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে ‘স্যরি’ বলে হাসার চেষ্টা করে আবার শুরু করল, ‘আপনি আমার বাড়ানো হাতে হাত রাখলেন। তারপর আমরা দুজন বেরিয়ে গেলাম স্টাডি থেকে পাশা পাশি হেঁটে।’ থামল সারা জেফারসন।

আবেগে রক্তিম ও ভারি তার মুখ তখনও।

আহমদ মুসা প্রথমে সারা জেফারসনের কথায় কৌতুক বোধ করছিল। পরে এই কৌতুক তার জন্যে বিব্রতকর বিস্ময়ে রুপান্তরিত হলো।

সারা জেফারসন থামলেও আহমদ মুসা কোন কথা বলতে পারছিল না।

কথা বলল সারা জেফারসনই আবার। সেই ম্লান হাসি তার ঠোঁটে। বলল, ‘যেদিন এখানে দেখলাম আপনাকে এবং জানলাম আপনিই আহমদ মুসা, তখনই আমার মনে হলো, ঐ স্বপ্ন আমার স্বপ্ন ছিল না। ওটা ছিল আমার জন্যে ঈশ্বরের বিধি লেখা। তাই আমি আপনাকে আমার দাদুর মন্টিসেলোর বাড়িতে দাওয়াত দিতে চাই। আমার স্বপ্নকে আমি বাস্তবে রূপ দিতে চাই। আমি দেখছি। আমার স্বপ্নের আহমদ মুসার চাইতে আমার বাস্তবের আহমদ মুসা আরও সুন্দর, আরও মহৎ।’

আবেগে সারা জেফারসনের গলা কাঁপছিল।

প্রবল অস্বস্তি আহমদ মুসার মনে।

মিস জেফারসনের এই আবেগের জবাবে সে কি বলবে?

শান্ত কন্ঠে আহমদ মুসা বলল, ‘মিস জেফারসন, আমি ও বেঞ্জামিন আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আমি আপনাদের কোন কাজে লাগলে সেটা আমার খুশিরই ব্যাপার হবে।’

‘ধন্যবাদ। মন্টিসেলোতে আমার দাওয়াতের ব্যাপারে বলুন।’

‘আমেরিকানদের অন্যতম গৌরবদীপ্ত ফাউন্ডার ফাদার টমাস জেফারসনের স্মৃতি বিজড়িত মন্টিসেলো আমার কাছে অবশ্যই আকর্ষণের। আমি সেখান যেতে পারলে খুশি হবো।’

‘ধন্যবাদ মিঃ আহমদ মুসা। এটুকুই আমার জন্যে যথেষ্ট। আমি নিশ্চিত। ঈশ্বরের যে বিধি লেখা আপনার সাথে আমার সাক্ষাত ঘটিয়েছে, সেই বিধি লেখার জোরেই আপনাকে আমি নিয়ে যেতে পারব গ্র্যান্ড দাদুর মন্টিসেলোতে।’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আপনার বোধ হয় ঈশ্বরের প্রতি খুব আস্থা?’

‘আপনার মত নয়।’

‘কেন নয়?’

‘আমাদের ধর্ম আপনার ধর্মের মত অত সুন্দর না হওয়াও বোধ হয় একটা কারণ।’

‘আমাদের ধর্ম সুন্দর কি করে বুঝলেন?’

‘জানি। আমার গ্রান্ড দাদুর স্টাডিতে ‘এভরি ডে লাইফ ইন ইসলাম’ নামে একটি বই পড়েছি। পড়ে বুঝেছি, ইসলাম বাস্তব জীবনের ধর্ম, খৃস্টান ধর্ম তা নয়। মানুষের জাগতিক জীবন পরিচালনার সাথে খৃস্ট ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই।’

‘ধন্যবাদ, মিস জেফারসন। নিজ ধর্মের প্রশংসা খুবই ভালে লাগে।’

‘এরপর কি প্রশ্ন করবেন?’

‘বলুন তো কি প্রশ্ন করবো?’

‘ভালোকে ভাল বলাই যথেষ্ট নয়। ভালোকে গ্রহণও করতে হয়। তাকি করেছেন?’ বলল সারা জেফারসন। তার মুখে মিষ্টি হাসি।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘ধরুন প্রশ্নটা যদি করি?’

‘আমি উত্তর দেব না।’

‘কেন?’

‘তাও বলব না। মন্টিসেলোতে গেলে বলব।’

বলে একটু থেমেই সারা জেফারসন দ্রুত বলে উঠল, ‘ওদিকে বোধ হয় জর্জ আংকেল আমার প্রতি বিরক্ত হচ্ছেন। আর আটকাবো না আপনাকে।’

উঠে দাঁড়াল সারা জেফারসন। আহমদ মুসাও উঠে দাঁড়াল।

সারা জেফারসন উঠে দাঁড়িয়ে আবার নিচু হলো। ড্রয়ার খুলে বের করল একটা শোল্ডার হোলস্টার। শোল্ডার হোলস্টারটি আহমদ মুসার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, ‘সেদিন আমাকে গুলী করেননি বলে এটা আপনার জন্যে সকৃতজ্ঞ উপহার।’ বলে হেসে উঠল সারা জেফারসন।

আহমদ মুসাও হাসল। বলল, ‘ওটাও নিশ্চয় বিধি লেখা ছিল।’

‘কৃতিত্বটা ঈশ্বরকে দেয়ায় আমার আপত্তি নেই।’

‘শোল্ডার হোলস্টারে কি আছে?’

‘সর্বাধুনিক মেশিন রিভলবার।’

‘ধন্যবাদ।’

‘ওয়েলকাম। ওটা কোটের ভেতরে ঘাড়ে পরে নিন। জর্জ আংকেলের চোখে পড়লে আতংক বোধ করতে পারেন। জানেন তো, এফ.বি.আই-এর লোকদের কাছে স্ত্রী থেকে শুরু করে কেউই সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়।’

‘আবারও ধন্যবাদ মিস জেফারসন।’

‘মিস জেফারসন নয়, শুধু ‘সারা’ বলে ডাকলে খুশি হবো।’

চকিতে আহমদ মুসা সারা জেফারসনের মুখের দিকে একবার তাকাল। আহমদ মুসার চোখে কিছুটা বিব্রত দৃষ্টি।

তারপর আহমদ মুসা শোল্ডার হোলস্টার কোটের ভেতরে কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে বেরুবার জন্যে পা বাড়াল।

মিস জেফারসন আগেই এসে দরজা খুলে ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

‘গুড ডে, সারা।’ বলে আহমদ মুসা বাইরে বেরিয়ে এল।

‘গুড ডে। আস-সালাম।’ উত্তরে বলল সারা জেফারসন। তার ঠোঁটে হাসি।

‘আস-সালাম’ শুনে আহমদ মুসা পেছনে ফিরে তাকাল সারা জেফারসনের দিকে।

সারা জেফারসন বলল, ‘আমি ঐ টুকুর বেশি জানি না।’ ঠোঁটে হাসি সারা জেফারসনের।

‘ধন্যবাদ।’ বলে আহমদ মুসা দ্রুত হাঁটতে শুরু করল।

সারা জেফারসনের মুগ্ধ দৃষ্টি অনুসরণ করল আহমদ মুসাকে। আহমদ মুসা সিড়ির বাঁকে হারিয়ে গেলেও দৃষ্টি তার ফিরে এল না।

লস আলামোস থেকে দু’টি গাড়ি আগে পিছে সারিবদ্ধ হয়ে এগিয়ে চলছিল সান্তাফে রোড ধরে সান্তাফে’র দিকে।

লস আলামোস থেকে সান্তাফে পর্যন্ত ৪০কিলোমিটার রাস্তার প্রায় অর্ধেক গেছে বনের মধ্যে দিয়ে। লস আলামোস থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটারের মত পথ গেছে সান্তা ফে ন্যাশনাল ফরেস্টের মধ্যে দিয়ে। রাস্তায় যাওয়া আসার লেন প্রায় পাশা-পাশি। মাঝখানে ৫ ফুটের ব্যবধান। ব্যবধানের এই পাঁচ ফুট জায়গায় স্বাভাবিক ভূমি উঁচু-নিচু, এবড়ো থেবড়ো।

বিশ কিলোমিটারের এই বনজ অংশে এপার-ওপার করার মাত্র তিনটি ক্রস পয়েন্ট রয়েছে।

আহমদ মুসা ও জর্জ আব্রাহামদের বহনকারী গাড়ি দু’টি তখন রাস্তায় বনজ অংশের মাঝামাঝি পৌছেছে।

সামনেই রাস্তার একটা ক্রসিং। ক্রসিংয়ের ওপাশটায় লস আলামোস মুখী রাস্তার ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে একটা গাড়ি।

একজন আরোহী গাড়ির ইঞ্জিন অংশের ঢাকনা তুলে ইঞ্জিনের উপর ঝুঁকে আছে। বিপরীত লেন দিয়ে আহমদ মুসাদের গাড়ি ঐ গাড়িটাকে ক্রস করল।

ক্রস করার সময় এক ঝলকের জন্যে আহমদ মুসার নজরে পড়ল একটা দুরবীণ তাদের দিকে তাক করা। একজন লোক দূরবীণে চোখ লাগিয়ে। তার পাশে আরও দু’জন লোক। মোট আরোহী পাঁচজন, বাইরের লোকটিসহ। ছুটে চলছিল আহমদ মুসাদের গাড়ি। বনজ এলাকার প্রান্তে প্রায় এসে গেছে তারা। সামনে আরেকটা ক্রসিং।

সেদিকে আহমদ মুসার চোখ পড়তেই দেখল ক্রসিংয়ের ওপারের মাথায় ওপারের রাস্তার ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে আরেকটা গাড়ি। তবে এ গাড়ির বাইরে কেউ নেই।

গাড়ির উপর নজর পড়তেই আহমদ মুসার চেতনার সমস্ত স্নায়ুমন্ডলীতে সতর্কতার এক সংকেত ধ্বনিত হলো। হঠাৎ তার মনে হলো পেছনের গাড়ি এবং এই গাড়ি একই উদ্দেশ্যে রওনা হতে পারে। পেছনের গাড়ির দূরবীণের কথা মনে পড়লো তার। ওরা দূরবীণ দিয়ে তাদের দেখছিল কেন? বিশেষ কোন লোক বা লোকদের তার প্রতীক্ষা করছিল। দূরবীণ দিয়ে গাড়িগুলোতে সেই লোকদেরই কি তারা দেখছিল। তার মনে ঝড়ের মত প্রবেশ করল সারা জেফারসনের কাছে শোনা বেঞ্জামিন বেকনের মেসেজের কথা, ইহুদীদের তিনটি গাড়ি লস আলামোসের দিকে আসার কথা। সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে হলো তারা সামনে ও পিছন থেকে ঘেরাও হয়ে গেছে।

'গাড়ী থামাও ড্রাইভার।' অগ্নিগিরির লাভার মতই বিস্ফোরিত হয়ে কথাগুলো বেরিয়ে এল আহমদ মুসার কন্ঠ থেকে।

কঠোর এই নির্দেশের প্রভাবে গাড়িটা একদম ডেডস্টপ হয়ে গেল। পর মুহূর্তেই দু'টি বিস্ফোরণের শব্দ হলো একই সাথে। তারা দেখল, একটি তাদের সামনের রাস্তার উপর বিস্ফোরিত হলো, আরেকটি আরও সামনে তাদের সিকিউরিটিদের বহনকারী গাড়িতে।

সবার চোখের সামনেই তাদের সামনের গাড়িটা প্রবল বিস্ফোরণে খেলনার মত শুন্যে উৎক্ষিপ্ত হলো এবং পরিণত হলো অগ্নি গোলকে।

'ও গড! আমাদের গাড়ি ডেডস্টপ না হলে যেখানে গিয়ে পৌছাত, সেখানেই রাস্তার উপর দ্বিতীয় বিস্ফোরণটি হয়েছে। আমাদের আগের গাড়ির মতই এতক্ষণে অগ্নি গোলকে পরিণত হতো এ গাড়ি। ও গড!' প্রায় একই সাথে চিৎকার করে উঠল জর্জ আব্রাহাম ও জেনারেল শেরউড।

কিন্তু এসব কথার দিকে আহমদ মুসার ভ্রুক্ষেপ নেই। গাড়ি থামতেই আহমদ মুসা তাকিয়েছিল পেছনের দিকে। তার অনুমান ঠিক।

পেছন দিক থেকে সেই গাড়িটি ছুটে আসছে।

আহমদ মুসা দ্রুত পেছন থেকে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল বিস্ফোরণের দিকে, তারপর সামনে ক্রসিং এ দাঁড়ানো গাড়িটার দিকে।

জর্জ আব্রাহাম ও জেনারেল শেরউডের কন্ঠের আর্তনাদ থামতেই আহমদ মুসা দ্রুত কন্ঠে বলল, 'গাড়ি থেকে নেমে পড়ুন, ডান দিকের ঝোপের দিকে দৌড় দিন। ওদের আঘাত আবার নিশ্চয় আসবে।'

গাড়ির আড়াল নিয়ে সবাই দৌড় দিল ঝোপের দিকে। তারা গাড়ি থেকে নামার পর মুহূর্তও পার হলো না। আহমদ মুসারা রাস্তাটা তখনও পার হয়নি, সামনের ক্রসিং এ দাঁড়ানো গাড়ির গ্রেনেড লাঞ্চার থেকে উৎক্ষিপ্ত একটি বিস্ফোরণ এসে আঘাত করলো তাদের দিকে। সিকিউরিটিদের গাড়ির মতই এ গাড়িও তীব্র বিস্ফোরণের মাধ্যমে সওয়ার হয়ে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হলো।

আগুন ও ধোঁয়ার দেয়াল সৃষ্টি হলো রাস্তার উপর। এরই আড়ালে আহমদ মুসারা দ্রুত গিয়ে ঝোপে প্রবেশ করল।

পেছন থেকে ছুটে আসা গাড়িটা তখন অনেকখানি সামনে চলে এসেছে।

বনাঞ্চলের এটা প্রান্ত হলেও ঝোপ ঝাড় এবং বড় বড় গাছ পালা প্রচুর।

রাস্তার পাশেই ঝোপটায় গিয়ে তারা আশ্রয় নিল।

একটা বড় গাছের গোড়ায় ঠেস দিতে দিতে জ্বলন্ত গাড়ি দু'টির দিকে তাকাল সি.আই.এ প্রধান এ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থার। বলল, 'বিপদ কিন্তু কাটেনি। সামনের গাড়িটা আমাদের দেখতে পায়নি এবং ওরা মনে করতে পারে সামনের গাড়ির আরোহীদের মতই আমাদের হাল হয়েছে। কিন্তু পেছনের গাড়িটা আমাদের দেখতে পেয়েছে আমরা জংগলে ঢুকেছি। দেখুন ওদের দৃষ্টি এদিকে। ওদের একজন দেখুন দূরবীণ দিয়ে আমাদের অবস্থান বের করার চেষ্টা করছে। আসুন সবাই আমরা গাছে আড়াল নেই।'

সবাই দ্রুত গাছের আড়াল নিল।

আহমদ মুসার দু'পাশের দু'গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়েছে জর্জ আব্রাহাম এবং সি.আই.এ প্রধান এ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থার।

জর্জ আব্রাহাম আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, 'এতবড় একটা কান্ড ঘটাল এরা কারা? আপনার অনুমান কি আহমদ মুসা?'

‘অনুমান নয় জনাব, নিশ্চিত বলছি, যাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবার জন্যে আপনারা প্রেসিডেন্টের কাছে যাচ্ছেন, তারাই সাক্ষীদের দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘তার মানে আপনি বলছেন, জেনারেল শ্যারন মানে ইহুদীরা এই আক্রমণ চালিয়েছে।’ বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে বলল জর্জ আব্রাহাম।

‘জি, হ্যাঁ।’ বলল আহমদ মুসা।

‘এত তাড়াতাড়ি এই সিদ্ধান্তে আসার পক্ষে আপনার যুক্তি কি?’ বলল সি.আই.এ প্রধান। তারও চোখে মুখে বিস্ময়।

‘তথ্য প্রমাণের প্রশ্ন না তুলে অবস্থার সাধারণ অঙ্ক কষেই এটা বলা যায়।’ আহমদ মুসা বলল।

কিছু বলতে যাচ্ছিল জেনারেল শেরউড । কিন্তু আহমদ মুসাই আবার কথা শুরু করায় থেমে গেল জেনারেল শেরউড। আহমদ মুসা বলছিল, রাস্তার দিকে উঁকি দিয়ে, ‘ওদিকে দেখুন।’

সবাই গাছে আড়াল থেকে ঝোপের মধ্যে দিয়ে উঁকি দিল রাস্তার দিকে।

পেছন থেকে ছুটে আসা গাড়িটা ঝোপের প্রায় বরাবর এসে রাস্তার উপর থেমে গেছে। রোড ক্রসিংয়ের ওপারে দাঁড়ানো আক্রমনকারী সেই গাড়িটিও এ রাস্তায় এসে আগের গাড়িটার পাশে দাঁড়াল।

গাড়ি থেকে নেমে এল প্রায় দশ জনের মত লোক। দু’জনের হাতে গ্রেনেড লাঞ্চার, অন্য সবার হাতে স্টেনগান।

‘ওরা এদিকে এগুবার জন্যে তৈরী।’ বলল জর্জ আব্রাহাম।

‘দ্রুত এগুবার কথা, এগুচ্ছে না তো।’ বলল সি.আই.এ প্রধান এ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থার।

‘ওরা আরও একটা গাড়ির মনে হয় অপেক্ষা করছে।’ বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার কথা শেষ হবার কয়েক মুহূর্ত পরেই আরেকটা গাড়ি রাস্তার ঐ লেন ধরে ঝড়ের বেগে এসে আগের দু’টি গাড়ির পাশে হার্ড ব্রেক কষে দাঁড়াল।

আগের দু’টি গাড়ি থেকে নেমে আসা দশজনই শিথিলভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের অস্ত্রগুলোর ব্যারেল নিচে নামানো। তাদের আনন্দিত চোখ ছুটে আসা

গাড়িটার দিকে। আগন্তুক গাড়িটা একটা জীপ। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, ড্রাইভিং সিটে একজন এবং তার পাশে একজন বসে। হাতে তাদেরও স্টেনগান, ট্রিগারে আঙ্গুল।

গাড়ি দেখে খুশি হওয়া দশ জনের চোখ যখন পড়ল গাড়িটার আরোহীর দিকে, তখন আনন্দ তাদের মিলিয়ে গেল। প্রায় এক সংগেই ওদের স্টেনগান উপরে উঠতে শুরু করল।

কিন্তু ততক্ষণে জীপের আরোহীর আঙ্গুল তার স্টেনগানের ট্রিগার চেপে ধরেছে। গুলীর বৃষ্টি ছুটল ওদের দশজনের দিকে।

ওদের দশজনের স্টেনগান জীপ লক্ষ্য করে উঠে আসার আগেই গুলী বৃষ্টি এসে ওদের ঘিরে ধরল। ভূমিশয্যা নিল সকলেই।

আহমদ মুসা লক্ষ্য করল ভূমিশয্যা নেয়া একজনের দেহ গড়িয়ে দক্ষিণের গাড়িটির দক্ষিণ পাশে চলে গেল। গড়িয়ে যাবার সময় তার হাতের গ্রেনেড লাঞ্চার সে ছাড়েনি।

আহমদ মুসা বুঝল বিপরীত প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকায় সে গুলী বৃষ্টি থেকে বেঁচে গেছে।

সে গাড়ির আড়ালে গিয়ে তার গ্রেনেড লাঞ্চার তাক করছে জীপটিকে লক্ষ্য করে।

জীপের আরোহী এটা দেখতে পায়নি। সে জীপ থেকে নেমে জীপের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

জীপের এ আরোহীকে চিনতে পেরেছে আহমদ মুসা। বেঞ্জামিন বেকন সে । আঁতকে উঠল আহমদ মুসা।

'বেঞ্জামিন সরে দাঁড়াও' বলে বুক ফাটা চিৎকার দিয়ে উঠে এক লাফে আহমদ মুসা গাছে আড়াল থেকে বেরিয়ে উন্মুক্ত একটা জায়গায় গিয়ে পড়ল। তার হাত ছিল তার মেশিন রিভলবারের ট্রিগারে। লাফ দিয়ে পড়েই আহমদ মুসা তার মেশিন রিভলবারের ট্রিগার চেপে ধরল।

মেশিন রিভলবারের এক ঝাঁক গুলী গিয়ে ছেঁকে ধরল গাড়ির দক্ষিণ পাশে গিয়ে লুকানো লোকটিকে।

কিন্তু তার আগেই তার গ্রেনেড লাঞ্চারের ট্রিগার টিপেছিল লোকটি।

গ্রেনেড গিয়ে আঘাত করল জীপটিকে।

আহমদ মুসার চিৎকার শুনতে পেয়েছিল বেঞ্জামিন বেকন। শুনার সাথে সাথেই বেঞ্জামিন বেকন এ্যাক্রোবেটিক কায়দায় তার হাত দু'টি বাম পাশে নিচের দিকে চালিয়ে দিয়ে দু'পা ছেড়ে দিল ওপর দিকে। চোখের পলকে বেঞ্জামিন বেকনের দেহ দু'তিনটি পাক খেয়ে প্রায় পনের ফুট দূরে গিয়ে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়িয়ে দেখল তার জীপটি তার সাথীসহ প্রচন্ড বিস্ফোরণে আকাশে উঠে গেছে।

প্রিয় সাথী এবং 'ফ্রি আমেরিকা'র একনিষ্ঠ এক সহকর্মীর মর্মান্তিক মৃত্যুর দৃশ্য দেখল সে। আহমদ মুসা সাবধান না করলে তার দেহও ঐ জীপের সাথে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেত।

তাকাল বেঞ্জামিন বেকন আহমদ মুসার দিকে। দেখল সে তার দিকেই এগিয়ে আসছে।

তাকাল সে গাড়ির আড়ালের সেই গ্রেনেড লাঞ্চারধারীর দিকে। তার দেহ রক্তে ডুবে থাকা দেখতে পেল। বুঝতে পারল আহমদ মুসার গুলীতেই সে প্রাণ হারিয়েছে। তাকে সাবধান করেই আহমদ মুসা তাহলে তাকে গুলী করেছিল।

আবার চোখ ফিরাল বেঞ্জামিন বেকন আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুস কাছাকাছি এসে গেছে।

ঝোপের আড়াল থেকে অন্যেরাও বেরিয়ে এগিয়ে আসছে।

বেঞ্জামিন বেকনও এগুলো আহমদ মুসার দিকে।

দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরল।

জর্জ আব্রাহাম, এ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থার ও জেনারেল শেরউডও তখন এসে গেছে।

'আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন আহমদ মুসা।' আহমদ মুসাকে জড়িয়ে ধরে থেকেই বলল বেঞ্জামিন বেকন।

কথা শেষ করেই সামনে দাঁড়ান দেখল এফ.বি.আই প্রধান জর্জ আব্রাহামকে।

আহমদ মুসাকে ছেড়ে দিয়ে বেঞ্জামিন বেকন এ্যাটেনশন হয়ে পা ঠুকে স্যালুট দিল। বলল, ‘স্যার আমি অন ডিউটিতে নই, ছুটিতে আছি।’

হাসল জর্জ আব্রাহাম। বলল, ‘এফ.বি.আই-এর সবাই ছুটিতেও অন ডিউটি অবস্থায় থাকে।’

‘ডিউটি সে পালন করেছে জনাব। ও বলেছে, আমি তার প্রাণ বাঁচিয়েছি। কিন্তু সে আমাদের সকলের প্রাণ বাঁচিয়েছে। এই ইহুদী সন্ত্রাসীদের আজকের মূল ষড়যন্ত্র তার সাহায্যেই বানচাল করা গেছে।’ বলল আহমদ মুসা।

একটু ভাবল জর্জ আব্রাহাম। বলল একটু সময় নিয়ে, ‘বুঝতে পারছি, বেঞ্জামিন কোনভাবে আপনাকে খবর পাঠায় যে, এরা আমাদের আক্রমণ করবে। তারপরও সে আক্রমণকারীদের অনুসরণ করে এই তো?’

‘ওরা আক্রমণ করবে, এ নিশ্চিত খবর সেও জানতো না। ও খবর পাঠিয়েছিল ইহুদী চেহারার লোকদের তিনটি গাড়ি লস আলামোসের দিকে যাচ্ছে। প্রথম ক্রসিং-এ একটা গাড়ি দাঁড়ানো দেখি, দ্বিতীয় ক্রসিং-এ আরেকটা গাড়ি ঐভাবে দাঁড়ানো দেখে আমার সন্দেহ হয়। প্রথম গাড়ির একজনকে দূরবীণ দিয়ে আমাদের গাড়ির দিকে তাকাতে দেখেছিলাম। আমার কোন সন্দেহ হয়নি। কিন্তু দ্বিতীয় গাড়ির জানালায় বন্দুকের ব্যারেল দেখলাম, তখন আমার কাছে সব পরিষ্কার হয়ে যায়। আমি তাড়াতাড়ি গাড়ি থামাতে বলি ও আপনাদের নিয়ে নেমে আসি। সাবধান করতে না পারায় আমাদের রক্ষীদের গাড়ি ওদের আক্রমণের শিকার হয়।’

জর্জ আব্রাহাম মনোযোগ দিয়ে শুনছিল আহমদ মুসার কথা। কিছু বলার জন্যে মুখ খুলছিল জর্জ আব্রাহাম। কিন্তু তার আগেই সি.আই.এ চীফ এ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থার বলে উঠল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, ‘আপনি তো সর্বক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন। কখন কিভাবে আপনি খবর পেলেন, আমরা জানতে পারলাম না।’

‘একটা সময় আমাদের সাথে ছিলেন না। সারা জেফারসনের সাথে সাক্ষাতের সময়। সারা জেফারসনই বেঞ্জামিন বেকনের মেসেজটা আহমদ মুসাকে দিয়েছে।’ বলল জর্জ আব্রাহাম।

‘সারা জেফারসন?’ বিস্ময় ফুটে উঠল এ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থারের কন্ঠে।

হাসল জর্জ আব্রাহাম জনসন। বলল, ‘বিস্ময়ের কিছু নেই এ্যাডমিরাল। সারা জেফারসন ফ্রি আমেরিকা’র একজন অতিগুরুত্বপূর্ণ সদস্য।’

‘ও গড।’ বলে একটু থামল। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ‘কিন্তু বেঞ্জামিন বেকন এফ.বি.আই চ্যানেলে আপনার কাছে খবর পাঠালো না কেন?’

জর্জ আব্রাহাম মুখ খোলার আগেই বেঞ্জামিন বেকন দ্রুত কন্ঠ বলে উঠল, ‘ছুটিতে থাকলেও এটাই আমার দায়িত্ব ছিল। কিন্তু আমি জানাইনি কারণ, এফ.বি.আই-এর কোন সূত্রে এ কথাটা এখানকার ইহুদীবাদীদের কাছে পৌছে যেতে পারে।’

জেনারেল শেরউড বিস্মিত চোখে তাকাল জর্জ আব্রাহামের দিকে। বলল, ‘বেঞ্জামিন যা বলল তার কতখানি ঠিক মিঃ জর্জ?’

‘আমি দুঃখিত। বেঞ্জামিনের অভিযোগ সাধারণভাবে সত্য। আমাদের এফ.বি.আই’তেও ইহুদীবাদীদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন লোক প্রচুর আছে। তাদের অনেকে এফ.বি.আই-এর দায়িত্ব পালনের চেয়ে ইহুদীবাদীদের কথা শোনাকে বেশী গুরুত্ব দেয়।’ বলল বিব্রত কন্ঠে জর্জ আব্রাহাম।

জর্জ আব্রাহাম থামলেও অন্য কেউ কোন কথা বলল না। সি.আই.এ প্রধানের মাথা নিচু।

কিছুক্ষণ পরে কথা বলল জেনারেল শেরউডই আবার। বলল সে, ‘ইহুদীবাদীরা এবং ইহুদী গোয়েন্দা প্রধান জেনারেল আইজ্যাক শ্যারনের যে অনুসারীরা আমাদের সবাইকে হত্যার ফাঁদ পেতেছিল এবং এক গাড়ি বোঝাই আমাদের সিকিউরিটি পারসোনালদের খুন করেছে, যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জঘন্য গোয়েন্দাবৃত্তিতে লিপ্ত, তাদেরই কথা শুনে প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা উপদেষ্টা হাতে নাতে ধরা পড়া ইহুদী ক্রিমিনালদের ছেড়ে দিতে বলেছেন এবং আমরা ছেড়েও দিয়েছি। আমার নিজেকে অপরাধী বোধ হচ্ছে মিঃ জর্জ আব্রাহাম, মিঃ ম্যাক আর্থার। এ মুহূর্তেই আমি পেন্টাগনকে গোটা বিষয়টা রিপোর্ট করতে চাই।’

‘সবুজ পাহাড় থেকে আপনি তো একটা রিপোর্ট পাঠিয়েছেন।’ বলল আহমদ মুসা।

‘পাঠিয়েছি। কিন্তু জানিয়েছি শুধু এইটুকু যে, গোয়েন্দাবৃত্তির সন্দেহে আটক সবুজ পাহাড়ের কিছু লোককে প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা প্রধানের আদেশে ছেড়ে দিতে হলো।’ জেনারেল শেরউড বলল।

‘রিপোর্ট আপনি পাঠান, কিন্তু এখন আমাদের প্রধান কাজ হলো ওয়াশিংটনে যত দ্রুত সম্ভব পৌছা।’ বলল জর্জ আব্রাহাম জেনারেল শেরউডকে লক্ষ্য করে।

জর্জ আব্রাহাম থামতেই আহমদ মুসা বলে উঠল, ‘আজকের এই সন্ত্রাসী ঘটনাও যে ইহুদীরা ঘটিয়েছে, তা প্রমাণ করবেন কিভাবে? আমার মনে হয় তাদের কাছে এমন কিছু পাবেন না যা দিয়ে প্রমাণ হবে যে তারা কোণ ইহুদী ষড়যন্তের সাথে যুক্ত।’

‘স্যরি, এদেরকে এবং এদের গাড়িগুলো তো সার্চ করা হয়নি। আসুন সার্চ করি। আহমদ মুসার অনুমান মিথ্যা হোক।’ বলে জর্জ আব্রাহাম এগুলো লাশগুলোর দিকে।

সবাই মিলে লাশগুলো এবং গাড়ি সার্চ করল। কিন্তু এমন কোন কিছু পেল না, যা দ্বারা প্রমাণ হতে পারে।

‘কিন্তু রেসিয়াল টেস্টে প্রমাণিত হবে এরা ইহুদী।’ বলল এ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থার।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘টিকানোর মত কোন প্রমাণ এটা হবে না। ইহুদীদের ব্যক্তি পর্যায়ের ক্রাইম তাদের জাতির ঘাড়ে চাপানো যাবে না।’

‘ঠিক বলেছেন আহমদ মুসা।’ বলল জর্জ আব্রাহাম। তার কন্ঠে হতাশা ফুটে উঠল।

‘প্রমাণ করতে হবে কি না, এটা পরের প্রশ্ন। দেখা যাক। এখন আমাদের প্রধান কাজ ওয়াশিংটনে পৌঁছা, মিঃ জর্জ এয়ারপোর্টে আপনাদের লোকদের বলে দিন, আমাদের দেরী হলো বটে, আমরা আসছি।’

‘ঠিক বলেছেন এ্যাডমিরাল।’ বলে সঙ্গে সঙ্গেই জর্জ আব্রাহাম পকেট থেকে ক্ষুদ্র মোবাইলটা বের করল। স্পীকার অন করে সান্তাফে এয়ারপোর্টে সিংগল স্ট্রোক ডায়াল করেই ভ্রু তার কুঞ্চিত হয়ে উঠল। লাইন জাম।

চোখে তার বিস্ময় চিহ্ন ফুটে উঠল। বলল দ্রুত কন্ঠে, ‘মিঃ ম্যাক আর্থার, মিঃ শেরউড দেখুন তো আপনাদের মোবাইল টেলিফোন কাজ করছে কি না?’

ম্যাক আর্থার ও শেরউড দ্রুত তাদের টেলিফোন পরীক্ষা করল এবং বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল জর্জ আব্রাহামের দিকে। বলল, ‘কম্যুনিকেশন জ্যাম।’

‘এর কি অর্থ দাঁড়ায়?’ বলল জর্জ আব্রাহাম। কন্ঠে তার উদ্বেগ।

উৎকণ্ঠা এবার সি.আই.এ চীফ এ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থারের চোখে মুখেও। বলল, ‘অর্থ দাঁড়ায় আমাদের টেলিফোন লাইন জ্যাম করে আমাদের কম্যুনিকেশনের পথ বন্ধ করেছে কেউ।’

‘কিন্তু এই ‘কেউরা’ এই টেকনোলজি পেল কোথায়? সদ্য আবিষ্কৃত এই টপসিক্রেট টেকনোলজি শুধু মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগগুলোই ব্যবহার করছে।’ বলল জর্জ আব্রাহাম বিস্ময় বিস্ফোরিত চোখে।

বিস্ময় আহমদ মুসার চোখে মুখেও। তার মনে এখন সন্দেহ নেই ইহুদী সন্ত্রাসীরাই এই টেলিফোন জ্যামের কাজ করছে। যেন বিপদ আচঁ করলেও তা কাউকে জানাতে না পারে এবং সাহায্য যাতে না পায়। তার অবাক লাগছে, ইহুদীরা এত আট ঘাট বেঁধে অগ্রসর হয়েছে।

আহমদ মুসার চিন্তায় ছেদ পড়ল জর্জ আব্রাহামের প্রশ্নে। বলছে জর্জ আব্রাহাম, ‘টেলিফোন জ্যাম ঘটনাকে আপনি কিভাবে দেখছেন মিঃ আহমদ মুসা?’

‘আমার মনে হয়, লস আলামোস থেকে বেরুবার পরেই টেলিফোন জ্যাম শুরু হয়েছে। সম্ভবত এর উদ্দেশ্য একটাই ছিল। সেটা হলো, ওদের হামলার ব্যাপারটা কিছুটা আপনাদের কাছে ধরা পড়লেও যাতে বাইরে কাউকে জানাতে না পারেন।’

‘ধন্যবাদ আহমদ মুসা, আমারও তাই মনে হয়।’ বলল জর্জ আব্রাহাম।

‘সান্তাফে পর্যন্ত রাস্তায় আর কি হামলা আসতে পারে না?’ বলল জেনারেল শেরউড।

‘বেঞ্জামিন বেকনের দেয়া খবর যেহেতু সত্য প্রমাণিত হয়েছে, তাই সে সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না।’ আহমদ মুসা বলল।

জর্জ আব্রাহাম নড়ে উঠল। সন্ত্রাসীদের পরিত্যক্ত সামনের গাড়িটার দিকে এগুতে এগুতে সে বলে উঠল, ‘আসুন। বেশ দেরী হয়ে গেছে আমাদের।’

সবাই গাড়িতে উঠল। আগে বেঞ্জামিন বেকনের গাড়ি। তার পেছনে আহমদ মুসাদের গাড়ি।

চলতে শুরু করল তীব্র বেগে দু’টি গাড়ি সান্তাফের দিকে।

সবাই চুপচাপ। অনেকক্ষণ পর নিরবতা ভাঙল জর্জ আব্রাহাম। বলল, ‘আমি বুঝতে পারছি না, জটিল এই জ্যামিং সিস্টেম ওরা কেমন করে পেল এবং এত তাড়াতাড়ি তা এখানে প্রয়োগ করতে পারল কেমন করে!’

কেউ কোন কথা বলল না। এবার নিরবতা ভাঙল আহমদ মুসা। বলল, ‘ওদের হাত যদি লস আলামোসে পৌছে থাকে, তাহলে এই জ্যামিং টেকনলজি পর্যন্ত পৌছবে না কেন?’ বলল আহমদ মুসা।

নেমে এল আবার নিরবতা।

আবারও নিরবতা ভাঙল জর্জ আব্রাহাম।

বলল, ‘জ্যামিং-এর আরেকটা টার্গেট ওদের আছে আহমদ মুসা। আমরা যাতে কোন খবরই উপরে পৌছাতে না পারি সেটা ওরা চায়।’

‘আপনাদের ঘিরে ওদের সমস্ত তৎপরতারই কেন্দ্র বিন্দু এখন ওটা।’ বলল আহমদ মুসা।

আবার নিরবতা।

ভাবছিল আহমদ মুসা, নিজের কথাটা নিয়েই। ওদের আত্মরক্ষার এখন বড় উপায়ই হলো ওদের তিনজনসহ আহমদ মুসাকে হত্যা করা। কিন্তু সবুজ পাহাড় থেকে লস আলামোস পর্যন্ত গোয়েন্দা সুড়ঙ্গকে ওরা ঢাকবে কি করে? হয়তো তারও ব্যাখ্যা তারা বের করে ফেলবে।

সবারই চোখে মুখে উদ্বেগ ও দুর্ভাবনার চিহ্ন। সবাই নিরব।

ছুটে চলছে দুই গাড়ি।

সান্তাফে বিমার বন্দর।

বোর্ডিং লাউঞ্জে বসে চা খাচ্ছে আহমদ মুসা, জর্জ আব্রাহাম, এ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থার এবং জেনারেল শেরউড।

আহমদ মুসার পাশেই বসেছিল জর্জ আব্রাহাম। জর্জ আব্রাহামের পায়ের কাছে কার্পেটের উপর পড়েছিল একটা সিগারেটের প্যাকেট। বার বার তার পা ঠেকছিল সিগারেটের সেই খালি বাক্সটায়।

এক সময় সে ঝুঁকে পড়ে সিগারেটের খালি বাক্সটি তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছিল ওয়েস্ট পেপার বক্সে ফেলে দেবার জন্যে।

আহমদ মুসারও দৃষ্টি পড়েছিল প্যাকেটটির উপর। প্রথমেই তার চোখটা আটকে গিয়েছিল প্যাকেটের গায়ে লেখা কয়েকটা হিব্রু অক্ষরের উপর।

আহমদ মুসা দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে প্যাকেটটির দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, ‘মাফ করবে, ওটা আমাকে একটু দেবেন?’

‘না আমিই ফেলে দিয়ে আসছি।’ হেসে বলল জর্জ আব্রাহাম।

‘না । ওটা একটু দেখব আমি।’ বলল আহমদ মুসা।

জর্জ আব্রাহামের হাত থেকে প্যাকেটটি নিয়ে বসে পড়ল আহমদ মুসা। পড়ল হিব্রু লেখা। কয়েকটি হিব্রু অক্ষর এবং কয়েকটি হিব্রু সংখ্যা। অক্ষর ও সংখ্যাগুলোর ইংরেজী অনুবাদ দাঁড়ায় ‘এফ.বি.আই.ভি ০০২১।’ বুঝল আহমদ মুসা এটা এয়ার লাইন্সের নাম্বার। আবার পড়ল নাম্বারটি। এটি কি এফ.বি.আই-এর নিজস্ব বিমান পরিবহন? কিন্তু হিব্রুতে কে লিখল এই এয়ার লাইন্সের নাম্বার? নাম্বারটি কোন বিমানের? তারা যে বিমানে যাচ্ছে, সে বিমানের নাম্বার কি?

প্রশ্নগুলো এক সঙ্গে জট পাকিয়ে তার মনে প্রবল উতসুক্য সৃষ্টি করল।

‘কি ভাবছেন আহমদ মুসা। বাক্সটিতে কি দেখছেন অমন করে?’ প্রশ্ন করল জর্জ আব্রাহাম।

‘আমরা কি এফ.বি.আই-এর নিজস্ব বিমানে যাচ্ছি?’ প্রশ্নের দিকে কান না দিয়ে জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘হ্যাঁ। কেন?’ বলল জর্জ আব্রাহাম।

‘নাম্বার কত?’

জর্জ আব্রাহাম তাকাল পাশেই আরেক সোফায় বসা এফ.বি.আই-এর স্থানীয় এক অফিসারের দিকে। বলল, ‘বল নাম্বারটা।’

নাম্বারটা বলল অফিসারটি।

সিগারেটের বাক্সে লেখা নাম্বারটিই বিমানের নাম্বার।

চমকে উঠল আহমদ মুসা। তাদের বিমানের নাম হিব্রুতে কে লিখল-এ কার্টুনে? কেন লিখল?

কেন লিখল তার জবাব নিজের কাছেই পেল আহমদ মুসা। লেখার আলগোছে ও বিশৃংখলা স্টাইল দেখে বুঝল, লেখক সচেতনভাবে এবং কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এটা লেখেনি। নিশ্চয় কারও সাথে খোশগল্প করা অবস্থায় বা কাজহীন বসা অবস্থায় আনমনে কলম চালিয়ে লেখাগুলো লিখেছে। তবে যেই লিখুক, হিব্রুই তার প্রধান ভাষা। লেখার আঁচড়গুলো পাঁকা।

কিন্তু কে সেই লোক? তার হাতে এ নাম্বার এলো কেন? বিমানটির সাথে তার কোন সম্পর্ক আছে?

এই চিন্তা করতে গিয়ে আঁৎকে উঠল আহমদ মুসা। ইহুদী ছাড়া খুব কম লোকই হিব্রু জানে। ইহুদী ছাড়া কারও প্রধান ভাষা তো হিব্রু নয়ই। সুতরাং ধরে নিতে হবে একজন ইহুদী তাদের বিমানের সাথে সম্পর্কিত হয়ে পড়েছে বা এ বিমান নিয়ে ভেবেছে।

আবারও ভীষণভাবে চমকে উঠল আহমদ মুসা। বলল জর্জ আব্রাহামের দিকে তাকিয়ে, ‘আমরা এখানে আসার আগে কে বা কারা এখানে বসেছিল, সেটা কি দয়া করে খোঁজ নিতে পারেন?’

আহমদ মুসার চিন্তান্বিত মুখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হলো জর্জ আব্রাহাম। বলল, ‘সেটা নিচ্ছি। কিছু ঘটেছে? অন্যকিছু ভাবছেন আপনি?’

‘বলার মত এখনও কিছু হয়নি। আপনি দয়া করে একটু খোঁজ নিন।’ হেসে বলল আহমদ মুসা।

জর্জ আব্রাহাম পাশের এফ.বি.আই অফিসারের কানে কিছু বলল।

উঠে গেল অফিসারটি।

মিনিট খানেকের মধ্যেই সে ফিরে এল ইউনিফরম পরা একজন লোককে নিয়ে। বলল, ‘ইনি বোর্ডিং লাউঞ্জের সিকিউরিটি অফিসার মিঃ মার্টিন। ইনি বলছেন, আমরা আসার আগে এখানে পাইলট ও ক্রুরা বসেছিল।’

পরিচয় শুনে ভেতরের সন্দেহটা আরও ঘনিভূত হলো আহমদ মুসার মধ্যে। বলল সে মার্টিনকে লক্ষ্য করে, ‘কোন বিমানের ওরা?’

‘স্যাররা এফ.বি.আই-এর যে বিমানে যাচ্ছেন, সেই বিমানের?’

‘সবাই বিমানে । শুধু একজন ফিরে গেছে তার বাসায়।’

‘ফিরে গেছেন কেন? কে তিনি?’

‘সে একজন পাইলট । আমি আর কিছু জানি না স্যার।’ বলল সিকিউরিটির লোকটি।

‘আমি জানি।’ বলে উঠল এফ.বি.আই-এর স্থানীয় অফিসারটি।

এতক্ষণে এ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থার ও জেনারেল শেরউডও আগ্রহী হয়ে উঠেছে বিষয়টার প্রতি। সবার দৃষ্টি এফ.বি.আই-এর অফিসারটির দিকে।

এফ.বি.আই অফিসার বলতে শুরু করল, ‘ফিরে গেছেন পাইলট জন আলফ্রেড। তারই এই ফ্লাইট চালাবার কথা ছিল। কিন্তু হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিমানেই একবার বমি করেন। পরে তিনি ককপিট থেকে নেমে আসেন। বিকল্প হিসাবে জনসন আসেন। তারা সবাই এখানে একত্রে বসে আলাপ করছিলেন ও চা খাচ্ছিলেন।’

এফ.বি.আই অফিসারের দেয়া এই তথ্যে ভ্রু কুঞ্চি হয়ে উঠল আহমদ মুসার। সন্দেহটা শংকার রূপ নিল। বলল আহমদ মুসা সিকিউরিটি অফিসার মার্টিনকে লক্ষ্য করে, ‘আচ্ছা মিঃ মার্টিন, আপনি কি বলতে পারেন, মিঃ জর্জ আব্রাহাম যেখানে বসে আছেন, সেখানটায় তাদের কে বসেছিলেন?’

লোকটি তৎক্ষনাতই উত্তর দিল, 'যিনি ফিরে গেছেন মানে পাইলট জন আলফ্রেড এখানে বসেছিলেন।'

'তার আশে-পাশে আর কারা বসা ছিল?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা

'কেউ ছিল না। তাঁর সামনের এদিকের সোফায় বসা ছিলেন অন্য ক্যাপটেন যিনি বিমানে উঠেছেন। অন্যান্য ক্রুরা অন্যান্য জায়গায় বসা ছিল।' বলল মার্টিন।

'ধন্যবাদ মিঃ মার্টিন।' বলে আহমদ মুসা জর্জ আব্রাহামের দিকে চেয়ে বলল, 'ওর সাথে কথা শেষ মিঃ জর্জ আব্রাহাম।'

মার্টিন চলে গেল।

মার্টিন চলে যেতেই জর্জ আব্রাহাম আহমদ মুসাকে কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই আহমদ মুসা কথা বলে উঠল। বলল এফ.বি.আই-এর সেই স্থানীয় অফিসারকে লক্ষ্য করে, 'জন আলফ্রেড কি আপনার পরিচিত?'

'জি, হ্যাঁ। তিনি এফ.বি.আই-এর অনেক দিনের পাইলট।'

'বলতে পারেন, তিনি কয়টি ভাষা জানেন?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'শুধু ইংরেজী। দেশের বাইরেও কখনও উনি যাননি।'

সন্দেহের মধ্যে পড়ে গেল আহমদ মুসা। তাহলে এ হিব্রু লেখা কি ফিরে যাওয়া পাইলটের নয়। তার আগে আর কেউ এখানে বসেছিল? তিনিই লেখা লিখেছেন? কিন্তু এফ.বি.আই-এর নিজস্ব এ ফ্লাইটের নাম্বার সে পাবে কি করে? সেও কি তাহলে এফ.বি.আই-এর কেউ ছিল?

গোলক ধাঁধাঁয় পড়ে গেল আহমদ মুসা। কিন্তু তার মন নিশ্চিত করে বলছে, হিব্রু ভাষায় তাদের এ গুরুত্বপূর্ণ ফ্লাইটের নাম্বার লেখা সময়ের বিচারে একেবারেই নিরর্থক নয়। ইহুদীদের হাত এ ফ্লাইট পর্যন্ত পৌছেছে। সে হাতের উদ্দেশ্যে কি? লোককে চিহ্নিত করতে পারলে উদ্দেশ্যটা বের হয়ে যেতো।

'কি ব্যাপার আহমদ মুসা? ঘটনা কি বলুন তো?' উদ্বিগ্ন কন্ঠ জর্জ আব্রাহামের । ভাবছে সে, আহমদ মুসা কোন ছোট ব্যাপার নিয়ে এতটা মাথা ঘামানোর কথা নয়।

'আমি এখনও কোন কিনারায় পৌছুতে পারিনি জনাব।'

বলে একটু দম নিয়ে বলল, 'আপনাদের বিমানের ক্যাপটেন ও ক্রুদের মধ্যে কেউ হিব্রু জানে?'

জর্জ আব্রাহামের চোখে মুখে ভাবনার চিহ্ন ফুটে উঠল। তাকাল সে এফ.বি.আই-এর স্থানীয় অফিসারের দিকে। তারপর বলল, এ রকম কেউ আছে বলে আমার জানা নেই। সি.আই.এ'র হিব্রু উইং আছে। আমাদের দরকার হলে সি.আই.এ'র সাহায্য নেই। এফ.বি.আই'তে হিব্রু শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই।'

জর্জ আব্রাহামে থামলে এফ.বি.আই-এর স্থানীয় অফিসারটিও বলে উঠল, আমাদের এ ধরনের কোন লোক সান্তাফে বা নিউ মেক্সিকোতে ফ্লাইট ক্রুদের মধ্যে নেই।

'হ্যাঁ তাই। হিব্রু ইহুদীদের জাতীয় ভাষা, ধর্মীয় ভাষা। সাধারণভাবে তারা এ ভাষা শেখে।'

'আহমদ মুসাকে আমি সমর্থন করছি। কিন্তু আহমদ মুসা, হিব্রু এবং বিমার ক্রুরা আপনার এ আলোচনায় আসছে কেন? খুলে বলুন সব।' বলল সি.আই.এ চীফ এ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থার।

আহমদ মুসা তার হাতের সিগারেট কার্টনটি তুলে ধরে বলল, 'এই কার্টনে হিব্রু ভাষায় আমরা যে ফ্লাইটে এখন যাব সেই ফ্লাইটের নাম ও নাম্বার লেখা। আমার বিশ্বাস এফ.বি.আই-এর ক্যাপটেন ও ক্রুদের কেউ এটা লিখেছে। কিন্তু আপনারা বলছেন তাদের মধ্যে হিব্রু জানা কোন লোক নেই।'

আহমদ মুসার কথা শোনার সাথে সাথে জর্জ আব্রাহাম ও এ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থারের চোখে মুখে চাঞ্চল্য ফুটে উঠল। তারা কথা বলল না। ভাবছিল তারা।

কথা বলে উঠল জেনারেল শেরউড, 'ব্যক্তিগতভাবে কেউ জানতেও পারে হিব্রু। কিন্তু আহমদ মুসা এর দ্বারা আপনি কি বুঝাতে চাচ্ছেন?'

'মারাত্মক কিছু বুঝাতে চাচ্ছেন জেনারেল। তিনি বলতে চাচ্ছেন, লস আলামোস থেকে আসার পথে আমরা ইহুদী সন্ত্রাসীদের দ্বারা ঘেরাও হয়েছিলাম, আবারও আমরা হতে যাচ্ছি।' বলল সি.আই. এ চীফ।

জর্জ আব্রাহাম তখনও গম্ভীর। ভাবছেন তিনি, সে আহমদ মুসার হাত থেকে সিগারেট কার্টুনটি নিয়ে লেখার উপরও চোখ বুলিয়েছে। এ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থারের কথা শেষ হলে সে বলল গম্ভীর কন্ঠে, 'এ হস্তাক্ষর পরীক্ষা করলেই লোক পাওয়া যাবে। আপনার কাউকে সন্দেহ হচ্ছে?'

'আমার অনুমান ভুল না হলে ফিরে যাওয়া ক্যাপটেন জন আলফ্রেড এটা লিখেছেন।'

জর্জ আব্রাহাম একটু ভাবল। তারপর বলল, 'ঠিক আছে লেখাটা পরীক্ষা করা ও তার সাথে মেলাবার নির্দেশ দিচ্ছি।'

'সেটা পরের কথা, কিন্তু এখন কি করতে চান?' বলল আহমদ মুসা।

'কেন, এখন তো আমাদের রওয়ানা হতে হবে।' জর্জ আব্রাহাম বলল।

'না, এই বিমানে এই ফ্লাইটে যাওয়া যাবেনা।'

'কি বলছেন আপনি?' বিস্মিত কন্ঠে বলল জর্জ আব্রাহাম।

একটু থেমেই আবার বলল, 'আপনার সন্দেহ যদি সত্যও হয় তাহলে সে চলে যাওয়ায় কোন ভয় তো এখন আমাদের নেই। সে তো বিমান চালাচ্ছে না।'

'আমার যুক্তি দু'টি। এক, আমাদের সন্দেহ যাকে সেই ছদ্মবেশী ইহুদী যে জন আলফ্রেড তা এখনও প্রমাণ হয়নি। বিমানটিতে এখন যিনি ক্যাপটেন, তিনি অথবা অন্যকোন ক্রুও তো আমাদের সন্দেহের তালিকায় আসতে পারেন। দ্বিতীয়ত, আমার বিশ্বাস জন আলফ্রেডের অসুখ হওয়ার ব্যাপারটা একটা ভান। তার বিমান থেকে নেমে যাওয়াটা উদ্দেশ্যমূলক।'

আহমদ মুসার কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই আসন থেকে লাফিয়ে উঠল জর্জ আব্রাহাম এবং এ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থার। দুই জনে প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠল, 'তার মানে বলতে চাচ্ছেন বিমানে কিছু সে পেতে রেখে গেছে?'

'আমার সেটাই সন্দেহ।' বলল আহমদ মুসা।

দু'জনেই ধপ করে সোফায় বসে পড়ল। দু'জনেরই মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। একটু দেরীতে বুঝেছেন জেনারেল শেরউড। বুঝতে পেরেই সে চিৎকার করে বলে উঠল, 'মিঃ আব্রাহাম এখনই গ্রেফতার করার নির্দেশ দিন জন আলফ্রেডকে।'

এফ.বি.আই-এর স্থানীয় অফিসারটি জর্জ আব্রাহামের সাথে সাথে দাঁড়িয়েছিল। আর বসেনি। সে কাঁপছে।

আহমদ মুসা তাকাল অফিসারটির দিকে। বলল, 'বিমানটি কমপ্লিট চেক করার ব্যবস্থা করুন, বিস্ফোরক ডিটেক্টর দিয়ে। বিমান থেকে কেউ যেন না নামে। দ্বিতীয়ত, হস্তাক্ষর পরীক্ষা ও জন আলফ্রেডের উপর চোখ রাখার ব্যবস্থা করুন, অবিলম্বে।'

অফিসারটি চলে গেল।

'আমি হেড কোয়ার্টারের সাথে কথা বলে আসি। আমার ই-মেইল ওরা পেলেন কি না।' বলে উঠে গেল জেনারেল।

জর্জ আব্রাহামও উঠে দাঁড়াল। বলল, 'জেনারেল আমরা বিশ্রাম কক্ষে আছি। আপনি ওখানে আসুন।'

বলে হাঁটার জন্যে পা বাড়িয়ে আহমদ মুসা ও এ্যাডমিরালের দিকে চেয়ে বলল, 'আপনারা আসুন।'

'বলুন আহমদ মুসা এখন কি করনীয়। বিমানে কোন অস্ত্র কিংবা কোন ধরনের কোন বিস্ফোরকের চিহ্ন পাওয়া যায়নি।' বলল জর্জ আব্রাহাম।

সার্চ টীমটিকেও সাথে নিয়ে এসেছিল এফ.বি.আই-এর অফিসারটি। টীমটির যিনি অধিনায়ক জিজ্ঞাসার জবাবে তিনিও বললেন, 'ইঞ্জিন রুম থেকে শুরু করে স্টোর রুম, টয়লেট প্রতিটি সিট মোটকথা বিমানের প্রতি ইঞ্চি জায়গা আলট্রা সেনসেটিভ ডিটেক্টর দিয়ে সার্চ করা হয়েছে। কিছুই পাওয়া যায়নি।'

আহমদ মুসা কিছু বলল না। তাকাল এফ.বি.আই-এর সেই অফিসারের দিকে। বলল, 'জন আলফ্রেডের খবর কি?'

অফিসারটি জবাব দেবার আগেই তার মোবাইল বেজে উঠল। টেলিফোন কল এসেছে।

মোবাইলে কথা বলল অফিসারটি। কথা বলতে গিয়ে তার মুখ অন্ধকার হয়ে উঠল। কথা বলা শেষ করে সে প্রায় আর্ত কন্ঠে বলল, 'স্যার, জন আলফ্রেডকে

কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। বাড়ি,হাসপাতাল, ক্লিনিক, ক্লাব , আত্মীয় বাড়ি সব জায়গায় খোঁজ নেয়া হয়েছে।'

'সর্বশেষ তাকে কে কোথায় দেখেছ।' উৎকণ্ঠিত কন্ঠে জিজ্ঞেস করল জর্জ আব্রাহাম।

'সে এয়ারপোর্ট থেকে ফ্ল্যাটে ফেরেনি।'

বোবা এক নিরবতা নেমে এল সবার মধ্যে। প্রবল এক অস্বস্তি, উৎকণ্ঠা সকলের মধ্যে।

নিরবতা ভাঙল আহমদ মুসা। বলল সে বিমান সার্চকারী বিস্ফোরক এক্সপার্টদের লক্ষ্য করে, কত প্রকার বিস্ফোরক পাতা যায় বলুনতো?'

সার্চ টীমের নেতা অনেক প্রকারের বিবরণ দিল।

'সব বলেছেন, কিন্তু একটা বাদ থেকে গেছে।' বলেই একটু থেমে আবার বলল, 'বলুন তো এ বিমানের ইঞ্জিনে রিমোট স্টার্টিং-এর ব্যবস্থা আছে?'

'আছে।' বলল সার্চ টীমের চীফ।

'তাহলে বিমান থেকে সবাইকে নামিয়ে বিমান ইঞ্জিন রিমোট স্টার্টের ব্যবস্থা করুন।'

টীমের চীফ জর্জ আব্রাহামের দিকে তাকিয়ে তার সম্মতি পেয়ে বেরিয়ে গেল তার টীমের লোকদের নিয়ে। টীমের লোকদের সাথে জর্জ আব্রাহামরাও বিশ্রাম কক্ষ থেকে বেরিয়ে আগের সেই বোর্ডিং লাউঞ্জে ফিরে এল।

ওখানে বসেই কাঁচের দেয়ালের মধ্যে দিয়ে দেখল সার্চ টীমকে বিমান থেকে বিমানের ক্যাপটেন ও ক্রু সবাইকে নামিয়ে আনতে। তার আগেই বিমানকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে গ্যাংওয়ে থেকে বেশ দূরে।

ক্যাপ্টেনের হাতেই দেখা গেল রিমোর্ট কন্ট্রোলার।

বিমান থেকে একটু দূরে এসে সবাই দাঁড়াল। ডান হাতের রিমোর্ট কন্ট্রোলার একটু উপরে তুলতে দেখা গেল ক্যাপ্টেনকে। রিমোর্ট স্টার্টের বোতামে চাপ দিয়েছে বোধ হয় ক্যাপ্টেন।

সঙ্গে সঙ্গেই ঘটল ভয়াবহ এক বিস্ফোরণ। প্রথমে বিমানের মধ্য থেকে সামনের অংশ উড়ে গেল। তারপর গোটা বিমানই অগ্নিগোলকের আকারে আকাশে উঠে গেল।

সকলের চোখ সেদিকে নিবদ্ধ। জর্জ আব্রাহাম, এ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থার ও জেনারেল শেরউডের চেহারা মরার মত পান্ডুর। পাথরের মত তারা স্থির ও নিস্তব্ধ। চোখে তাদের পলক নেই।

নিরবতা ভাঙল জেনারেল শেরউড। আসন থেকে উঠে সে ছুটে আহমদ মুসার পাশে এসে বসল। বলল, 'মিঃ আহমদ মুসা গত কয়েক ঘন্টায় আপনি দু'বার আমাদেরকে একেবারে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনলেন। আমি আপনার অনেক গুনের কথাও শুনেছি, কিন্তু আজ দেখলাম আপনি সর্বদর্শীও।'

'আল্লাহ মাফ করুন। আল্লাহই একমাত্র সর্বদশী। আমি একটা ক্লু পেয়ে সন্দেহ করেছি মাত্র, এটা এমন কিছু নয়।'

মুখ খুলল এবার জর্জ আব্রাহাম। বলল, 'মিঃ আহমদ মুসা কোন সন্দেহে আপনি রিমোট স্টার্টের এই ব্যবস্থা করলেন?'

'আমি তো বলেছিলাম, সার্চ টীমের নেতা বিস্ফোরনের সবগুলো প্রকারের কথা বলছেন, একটাই শুধু বলেননি। সেটা হলো, একটা বিস্ফোরক প্রযুক্তি অতিসম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে যা ডিটেক্টর-নিউট্রাল একটা আবরণে মোড়া থাকে। কোন প্রকার ডিটেক্টর দিয়েই তার সন্ধান মেলে না। এই বিস্ফোরক পাতা থাকে ইঞ্জিন অথবা ঘর্ষণসৃষ্টিকারী কোন বস্তুর সাথে। ইঞ্জিন বা ঘর্ষণসৃষ্টিকারী বস্তুটি চালু হলেই বিস্ফোরণ ঘটে যায়। আমার সন্দেহ হয়েছিল, ইহুদীরা যদি কিছু করেই থাকে, তাহলে এই সর্বাধূনিক প্রযুক্তিরই আশ্রয় নিয়েছে।'

'ধন্যবাদ আহমদ মুসা, আপনি বলার পর ঐ বিস্ফোরক প্রযুক্তির কথা আমার মনে পড়েছে। কিন্তু এই বিস্ফোরক তো এখনও মার্কেটে যায়নি, ওরা পেল কি করে?'

'যেভাবে রেডিও কম্যুনিকেশন জ্যাম করার সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ওরা পেয়েছে, সেভাবে এটাও ওরা পেয়েছে।' বলল জেনারেল শেরউড।

বলে একটা দম নিয়েই ক্ষুব্ধ কন্ঠে বলে উঠল, ‘ইহুদীবাদীদের কাছে মনে হচ্ছে আমাদের গোপন কিছুই আর গোপন নেই। ওদের গোয়েন্দাগিরী মনে হয় আমাদের আপাদ-মস্তক ছেয়ে ফেলেছে। দেখছি ঘরের শত্রু মহাবিভীষণ ওরা।’

‘উদার গণতন্ত্রমনাদের সংসারে যদি কোন কূট কুশলীর অনুপ্রবেশ ঘটে ,তাহলে এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে।’ বলল আহমদ মুসা কিছুটা হালকা সুরে।

‘দুঃখের মধ্যেও হাসালেন আহমদ মুসা। তাহলে আপনি মানে আপনারা স্বীকার করছেন মার্কিন জনগণ উদার ও গনতন্ত্রমনা।’ বলল জর্জ আব্রাহাম। মুখে তার ম্লান হাসি।

‘আমরা মানে মুসলমানরা তো এ কথা কখনও অস্বীকার করিনি যে আজ আমি স্বীকার করছি।’

‘আপনাদের গালির ভাষা কিন্তু তাই বলে, মিঃ আহমদ মুসা।’ বলল এ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থার।

‘মার্কিন সরকারের পলিসি এবং মার্কিন জনগণ কিন্তু এক নয়। মার্কিন সরকার বদল হয়,তার পলিসিও বদল হয়, কিন্তু মার্কিন জনগণ বদল হয় না। মার্কিন সরকার যে পলিসি নেয় তার সবটা মার্কিন জনগণ মেনে নেয় না। মার্কিন সরকার ভিয়েতনামে সৈন্য পাঠিয়েছিল, মার্কিন জনগণই তা ফেরত এনেছিল।’

‘যা হোক আহমদ মুসা। আপনি যে কথাটা বলেছেন, সেটা কিন্তু খুবই সত্য। ওরা আমাদের বিশ্বাসের ঘরে চুরি করেছে। আমাদের অস্ত্র হাত করে আমাদের উপরই প্রয়োগ করেছে।’ বলল জেনারেল শেরউড।

বলেই উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘যাই ব্যাপারটা হেড কোয়ার্টারে আমি রিপোর্ট করে আসি।’

এফ.বি.আই-এর স্থানীয় সিকিউরিটি যে অফিসার বাইরে গিয়েছিল, সে দ্রুত ফিরে এসে লাউঞ্জে ঢুকল এবং জর্জ আব্রাহামকে লক্ষ্য করে বলল, ‘স্যার, ওয়াশিংটনের আমাদের হেড কোয়ার্টার থেকে লোক আসছে প্লেন নিয়ে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ল্যান্ড করবে।’

‘ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি এমনটাই আশা করেছিলাম। যাক ঘটনা তুমি হেড কোয়ার্টারে রিপোর্ট করেছ?’ বলল জর্জ আব্রাহাম।

‘জি স্যার।’ বলল অফিসারটি।

‘আমি আসছি মিঃ আব্রাহাম। আমার ডকুমেন্টগুলো ওরা হেড কোয়ার্টারে পাঠাল কি না’ বলে লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে গেল এ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থার।

‘ওদিকে দেখে আমি আসছি স্যার।’ বলে বেরিয়ে গেল এফ.বি.আই-এর স্থানীয় অফিসারটিও।

এফ.বি.আই-এর বিমান বিস্ফোরণ নিয়ে তখন বাইরে এয়ারপোর্ট ও পুলিশের মধ্যে হুলুস্থুল চলছে। জন আলফ্রেডের সন্ধানে ছুটাছুটি শুরু করেছে তখন বাঘা বাঘা পুলিশ আর গোয়েন্দার দল।

হাতে কোন কাজ নেই। সোফায় গা এলিয়ে দিয়েছে আহমদ মুসা ও জর্জ আব্রাহাম।

কাঁচের দেয়ালের ভেতর দিয়ে তাদের দু’জনের চোখ নিবদ্ধ ছিল নীল আকাশের দিকে।

এক সময় সেই নীল আকাশের বুকে তাদের চোখে ছোট একটা সাদা বিমান ধরা পড়ল।

ওয়াশিংটন এফ.বি.আই হেড কোয়ার্টার থেকে আসা প্লেন।

ল্যান্ড করছে প্লেনটি।

# ৪

এবার নিয়ে দশবার টেলিফোন করল জর্জ জুনিয়র সাবা বেনগুরিয়ানের বাড়িতে। কোন উত্তর নেই সেখান থেকে।

বিস্মিত হলো জর্জ জুনিয়র। সাবার তো টেলিফোনের জন্যে অপেক্ষা করার কথা। তার এ সময় কোথাও যাবার প্রশ্ন আসে না। গেলেও তার মোবাইল তো সে রেখে যাবার কথা নয়।

জর্জ জুনিয়র অবশেষে টেলিফোন করল সাবাদের হাউজ-সেট টেলিফোনে। একবার, দু'বার, তিনবার, কোন সাড়া নেই ওপার থেকে। রিং হচ্ছে কিন্তু কেউ টেলিফোন ধরছে না।

বিস্মিত হলো জর্জ জুনিয়র। এমন হওয়াটা অসম্ভব। বাড়ি শুদ্ধ কোথাও গেলেও রিপ্লাই ব্যবস্থা অবশ্যই চালু রেখে যাবে।

ঘড়ির দিকে তাকাল জর্জ জুনিয়র। প্লেনের আর আধ ঘন্টা দেরী। আর দেরী করা যায় না। সাবাদের বাড়িতেই যেতে হবে। দরকার হলে প্লেনের সময় পাল্টিয়ে অন্য সময় ফ্লাইট ধরবে।

উঠল জর্জ জুনিয়র। তৈরী হয়ে বাড়ি থেকে বেরুল সে। তার গাড়ি ছুটল সাবা বেনগুরিয়ানের বাড়ির দিকে।

সাবা বেনগুরিয়ানের বাড়ির গেটে এসে থামল জর্জ জুনিয়রের গাড়ি।

গাড়ি থেকেই সে দেখল গেট বন্ধ। কিন্তু গার্ড বক্স থেকে কেউ বেরিয়ে এল না। অথচ গেটের সামনে গাড়ি থামার সাথে সাথেই গেটম্যান বেরিয়ে আসার কথা। কিন্তু কেউ আজ বেরিয়ে এল না।

জর্জ জুনিয়র কয়েকবার হর্ন বাজাল।

গেটের ভেতরে একটা শব্দ হলো। মনে হলো কেউ গেট খুলছে। খুলে গেল গেট। গেটে দাঁড়ান গেটম্যান।

গাড়ি নিয়ে এগুতে চাইল জর্জ জুনিয়র।

সরল না গেটম্যান গেট থেকে। হাত তুলে গাড়ি দাঁড় করাতে বলল। জর্জ জুনিয়র একেবারে তার গা ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করাল। জর্জ জুনিয়র বেরিয়ে এল গাড়ি থেকে।

গেটম্যান একজন এক্স মিলিটারি ম্যান। পুরোপুরি শ্বেতাংগ বলতে যা বুঝায় তা সে না। চেহারায় একটা মিশ্রণ আছে। সুতরাং ইহুদী ধরে নেয়া যায়।

জর্জ জুনিয়রকে একটি স্যালুট দিয়ে গেটম্যান বলল, 'কেউ বাড়িতে নেই স্যার। তবে ছোট মেম সাহেবের একটা মেসেজ আছে আপনার জন্যে।'

তার শেষের কথাটা জর্জ জুনিয়রের কানে সবটা পৌছার আগেই সে বলে উঠল, 'কোথায় গেছে ওরা?'

'আমি জানি না স্যার। একটা মাইক্রো এল। তা থেকে দু'জন লোক নেমে এল। তারা বাড়িতে ঢুকে বড় সাহেব ও ছোট মেম সাহেবকে নিয়ে তড়িঘড়ি করে ঐ মাইক্রোতে উঠে গেলেন।'

'তোমাকে কিছু বলে যাননি ওরা?'

'বড় সাহেব কিছুই বলেননি। তাঁর মুখ দেখে আমি কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পাইনি।'

'তার মানে? ওর মুখ কি রকম ছিল?'

'খুব বিষন্ন, বিরক্ত।'

'ওরা কি কোন দুঃসংবাদ পেয়েছিলেন?'

'বলতে পারবো না স্যার। তবে মাইক্রোটি আসার ১০ মিনিট আগে বড় সাহেবের বন্ধু মিঃ শ্যারন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। তাঁকেও বিষন্ন ও উদ্বিগ্ন দেখি।'

'মিঃ  শ্যারন বেরিয়ে গিয়েছিলেন? দশ মিনিট আগে?'

'জি হ্যাঁ।'

'এখন বাড়িতে কেউ নেই?'

'আছেন। হাউজ-স্টাফ। ওরা নিচের তলায়।'

'ওদের কাউকে কিছু বলে যাননি?'

'না, স্যার। ওরাই আমাকে জিজ্ঞেস করেছে।'

‘ওদের সাথে লাগেজ ছিল?’

‘বড় সাহেব ও ছোট মেম সাহেব দু’জনের হাতে দু’টো সুটকেস ছাড়া আর কিছুই ছিল না।’

‘ধন্যবাদ, আসি।’ বলে জর্জ জুনিয়র চলে আসছিল।

‘স্যার, ছোট মেম সাহেবের একটা চিঠি আছে আপনার জন্যে। নিন।’

গেটম্যান একটা মোটা ইনভেলাপ জর্জ জুনিয়রের দিকে বাড়িয়ে ধরল।

‘সাবার চিঠি?’ বলে আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মত গেটম্যানের হাত থেকে চিঠিটি লুফে নিল জর্জ জুনিয়র। ইনভেলাপটি হাতে দ্রুত জর্জ এসে গাড়িতে চড়ল।

ওদিকে গেট তখন বন্ধ হয়ে গেছে।

ইনভেলাপটি হাতে নিয়েই জর্জ জুনিয়র বুঝেছিল, একটা শক্ত কিছু ইনভেলাপের মধ্যে রয়েছে।

তর সইল না জর্জ জুনিয়রের। সাবা কি লিখেছে তা পড়ার জন্যে অস্থির হয়েছে সে।

ইনভেলাপটি খুলল সে। বেরিয়ে এল ভিডিও ক্যামেরার একটা ডিস্ক। কোন চিঠি ইনভেলাপে নেই।

প্রথমেই হতাশার একটা চোট লাগল তার মনে যে, সাবার কোন চিঠি ইনভেলাপে নাই। পরক্ষনেই ভিডিও ডিস্ক তার মনকে ভিন্ন দিকে নিয়ে গেল। কি আছে এতে? সাবা কেন তাকে দিয়েছে এ ডিস্ক দারোয়ানের মাধ্যমে?

হঠাৎ জর্জের মনটা খুশি হয়ে উঠল। ভাবল, এই  ডিস্কে নিশ্চয় এমন কিছু ডকুমেন্ট আছে যা থেকে তার প্রশ্নের জবাব মিলবে। না হলে সাবা কেন ডিস্কটা তাকে এভাবে দিয়ে গেছে। ডিস্কটা তার কাছে এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হলো।

জর্জ জুনিয়র ডিক্সটা রাখতে যাচ্ছিল তার জ্যাকেটের পকেটে, কিন্তু তা না রেখে চালান দিল তার মোজার ভেতরে, একজন পাকা গোয়েন্দার মত। ভাবল, জ্যাকেটে রাখলে তা ভুলেও যেতে পারে। কিন্তু মোজা খুলতে গেলে চোখে পড়বেই।

গাড়ি স্টার্ট দিল জর্জ জুনিয়র। চলল বাড়ির দিকে।

নিউ মেক্সিকো যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই সে বেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু সে পাল্টেছে তার সিদ্ধান্ত। সাবার ভিডিও টেপ না দেখে সে কোথাও পা বাড়াবে না।

সাবা বেনগুরিয়ানের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এ্যাপ্রোস রোড থেকে মূল রোডে পড়ার মুখেই জর্জ জুনিয়র দেখল একটা মাইক্রো দাঁড়িয়ে আছে। বোধ হয় হঠাৎ স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেছে। একজন লোক নেমে গাড়ির ইঞ্জিন পরীক্ষা করছে।

জর্জ জুনিয়রের গাড়ি দেখে ইঞ্জিনের উপর ঝুঁকে পড়া মাথা তুলে ইশারা করল জর্জ জুনিয়রের গাড়িকে অপেক্ষা করার জন্য।

জর্জ জুনিয়র গাড়ি রাস্তায় আড়াআড়ি দাঁড়ানো মাইক্রোর প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

জর্জ জুনিয়র গাড়ি থেকে বেরিয়ে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে বলল, 'হ্যালো, সমস্যা......'

জর্জ জুনিয়র কথা শেষ করতে পারল না।

মাইক্রো থেকে ছুটে এসে তিনজন লোক জর্জ জুনিয়রকে ঘিরে ফেলল।

জর্জ জুনিয়র কিছু বুঝে ওঠার আগেই একজন ডান হাত দিয়ে তার গলা পেঁচিয়ে বাম হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরল। অন্য দু'জন পা ধরে চ্যাংদোলা করে চোখের পলকে তাকে নিয়ে গাড়িতে তুলল।

মুখ চেপে ধরা লোকটি হাতে ক্লোরোফরম ভেজা রুমাল ছিল। ওরা জর্জ জুনিয়রকে যখন মাইক্রোর মেঝেতে নিয়ে রাখল, তখন সে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছে।

যখন তার জ্ঞান ফিরল সে দেখল একটা টেবিলের উপর শুয়ে আছে। সে চোখ মেলেই উঠার চেষ্টা করল।

টেবিল ঘিরে দাঁড়িয়েছিল কয়েকজন।

একজন জর্জ জুনিয়রের গালে বিরাশী কেজি ওজনের একটা থাপ্পড় কষে বলল, 'হারামজাদা। তো জ্ঞান ফিরতে বড্ড দেরী হয়েছে।'

জর্জ জুনিয়র ছিটকে পড়ল টেবিল থেকে মেঝের উপর।

সঙ্গে সংগেই আরেকজন তাকে তুলে বসাল। এই লোকটিই সবার মধ্যে উচ্চতায় বড়। একদম ইহুদী চেহারা। বলল সে হেঁড়ে গলায়, ‘তোদের বাসার সিকিউরিটি বক্সের টেলিফোন নাম্বার কত?’

‘কেন?’ ক্লান্ত কন্ঠে বলল জর্জ জুনিয়র লোকটির দিকে তাকিয়ে।

লোকটির ডান হাতে একটা মোবাইল।

লোকটি গর্জে উঠল, ‘দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করলে থাপ্পড়ে সব দাঁত খুলে ফেলব। যা জিজ্ঞেস করেছি তার জবাব দে।’

‘দেব না।’ বলল জর্জ জুনিয়র। জর্জ জুনিয়রের কথার রেষ বাতাসে মিলাবার আগেই লোকটির প্রচন্ড একটা ঘুষি গিয়ে পড়ল জর্জ জুনিয়রের মুখে। তার নাক ফেটে গল গল করে রক্ত বেরিয়ে এল।

ঘুষি মেরেই লোকটি বলে উঠল, ‘বলবি না কথা। চেয়ে দেখ তোর প্রেমিকার দিকে।’

বলে লোকটি ইংগিত করল জর্জ জুনিয়রের মাথার পেছনের দিকে।

জর্জ জুনিয়র চমকে উঠে মাথা ঘুরিয়ে সেদিকে তাকাল। দেখল, জেলখানার মত গ্রীল দেয়া দরজার ওপারে ছোট্ট একটা কক্ষে বসে আছে সাবা বেনগুরিয়ান। তার চুল উষ্ক-খুষ্ক। দু’চোখের কোণ ফোলা। তার নাক ফেটে রক্ত বেরুচ্ছে।

ক্রোধে গা জ্বলে উঠল জর্জ জুনিয়রের। বলল, ‘মনে করেছিস নির্যাতন করেই সবার কাছ থেকে কথা আদায় করতে পারবি?’

লোকটি হো হো করে হেসে উঠল। বলল, ‘পারব। কয়েকটা ঘুষি থাপ্পড় খাওয়ার পরও মিস সাবা এ ধরনের কথা বলছিল। কিন্তু একজন মানুষ হায়েনা যখন তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তার কাপড় খুলতে শুরু করল, তখন গলে গেল একদম মোমের মত। গড় গড় করে বলে গেল সব কথা। কম্পিউটারে কি দেখেছে, কি হয়েছে সব কিছু। তুইও বলবি।’

কথা শেষ করে লোকটি একটা তালি বাজাল। গরিলা মার্কা একজন লোক ঘরে প্রবেশ করল।

‘বিংগ যা সেল থেকে ম্যাডামকে নিয়ে আয়। তখন তোর হাত থেকে শিকার কেড়ে নিয়েছিলাম, এবার বোধ হয় তা তোর ভাগ্য জুটবে।’

শুনেই বিংগ ছুটল সেলের দিকে। দরজা খুলে পাঁজাকোলা করে সাবাকে নিয়ে এসে শুইয়ে দিল জর্জ জুনিয়রের সামনে, মেঝেতে।

'শেষবারের মত বলছি, আমাদের কথা শোন। তাহলে তোমার চোখের সামনে হায়েনারা তোমার প্রেমিকার দেহ লুটে-পুটে খাবে না।'

'তোমরা টেলিফোন নাম্বার কি করবে?' বলল জর্জ জুনিয়র। তার চোখে-মুখে উদ্বেগ। সে জানে, ওরা যা বলছে তার ষোল আনাই তারা করবে। সাবাকে সে কিছুতেই এই জঘন্য পরিণতির দিকে ঠেলে দিতে পারে না।

'টেলিফোন নাম্বার কি করবো সেটাও দেখতে পাবে।' বলল সেই লোকটি।

লোকটি থামতেই সাবা বেনগুরিয়ান বলে উঠল, 'জর্জ তুমি আমার কথা ভেবে ওদের সহযোগিতা করো না। ওরা আমেরিকার শত্রু।'

লোকটি দু'টি চোখ জ্বলে উঠল। সে ফুটবলের গোল কিকের মত একটা প্রচন্ড লাথি কষল সাবা বেনগুরিয়ানকে।

একবার 'কঁক' করে উঠার পর কুঁকড়ে গেল সে অসহ্য বেদনায়।

'আমি বলছি, তোমরা সাবা বেনগুরিয়ানের গায়ে হাত তুলবে না।'

বলে একটা দম নিয়েই তাদের বাড়ির সিকিউরিটি টেলিফোন নাম্বার সে বলল।

'ধন্যবাদ জর্জ জুনিয়র। তুমি আদর্শ প্রেমিকের কাজ করেছ। এবার এ কাগজটায় যা লেখা আছে তা তোমাদের সিকিউরিটি অফিসারকে জানিয়ে দাও।'

বলে লোকটি কাগজের একটা স্লিপ জর্জ জুনিয়রের হাতে তুলে দিল।

জর্জ জুনিয়র পড়ল কাগজটি। কাগজে লেখা আছে, 'পত্রবাহকের হাতে আব্বার কমুনিকেশন টেবিলের মাস্টার কম্পিউটারটি দিয়ে দেবে। বাসায় ওটা এখন নিরাপদ নয়। আব্বার পরামর্শেই এই চিঠি লিখলাম।'

লোকটি তার মোবাইলে জর্জ জুনিয়রের দেয়া টেলিফোন নাম্বার নক করে টেলিফোনটি তুলে দিল জর্জ জুনিয়রের হাতে।

জর্জ জুনিয়র টেলিফোনটি হাতে নিল। ওপার থেকে সিকিউরিটি অফিসারের কন্ঠ পাবার পর কাগজে যা লেখা ছিল, তা বলল খুব স্বাভাবিক কন্ঠেই।

‘ধন্যবাদ জর্জ জুনিয়র। তোমার টকিং পারফরমেন্স খুব ভাল হয়েছে। পুরষ্কার হিসেবে তোমার প্রেমিকার সাথে হানিমুনের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।’

জর্জ জুনিয়র ওদিকে কান না দিয়ে বলল, ‘তোমরা ঐ কম্পিউটার দিয়ে কি করবে? মনে করেছ কম্পিউটারের রেকর্ডগুলো মুছে গেলেই রক্ষা পেয়ে যাবে?’

‘শুধু ঐ রেকর্ড নয়, সব রেকর্ডই আমরা মুছে ফেলব।’

‘কিন্তু সব কিছুর পরেও সবুজ পাহাড়ে থেকে লস আলামোসে পর্যন্ত তোমাদের তৈরী সুড়ঙ্গ গোয়েন্দাগিরীর প্রমাণ হিসেবে থেকেই যাবে।’

হো হো করে হেসে উঠল লোকটি। বলল, ‘তোমরা আমেরিকানরা বিচার-বুদ্ধিদীন গনতন্ত্র করে মাথাটা একেবারে ফাঁকা করে ফেলেছ।’

বলে একটু থামল। বলল তারপর একটু গম্ভীর কন্ঠে, ‘প্রমাণ হবে সুড়ংগটি তৈরী হয় লস আলামোস থেকে এমারজেন্সী এক্সিটের একমাত্র পথ হিসেবে। যাতে লস আলামোসে কোন সোভিয়েট হামলার সময় অতিগুরুত্বপূর্ণ স্ট্র্যাটেজিক গবেষণা রক্ষা করা যায়। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে ইহুদী বিজ্ঞানী জন জ্যাকব সহায়তা করেছে মাত্র।

লোকটির কথা শুনে স্তম্ভিত হলো জর্জ জুনিয়র। তারও এখন মনে হচ্ছে তথ্যটা খুবই যৌক্তিক । একটা মিথ্যাকে তারা এভাবে সত্য হিসেবে দাঁড় করাতে পারবে? কোন কথা সরল না জর্জ জুনিয়রের মুখ থেকে।

লোকটি বলে উঠল, ‘এদের দু’জনকে ঐ হানিমুন কক্ষে ঢুকিয়ে দাও। আমাদের ঐ কম্পিউটার উদ্ধারে এখনি ছুটতে হবে।’ বলে সে বেরিয়ে গেল।

জর্জ ও সাবাকে গ্রীলের দরজার ওপারের সেলটাতে ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে ওরা সবাই বেরিয়ে গেল।

ডার্ক কাঁচের একটা মার্সিডিস গাড়ি জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিলটনের গেটের সামনে এসে দাঁড়াল।

সিকিউরিটি বক্সের একজন সৈনিক গাড়ির নাম্বারের দিকে একবার তাকিয়েই সুইচ টিপে দরজা খুলে দিল। গাড়ি ভেতরে প্রবেশ করে গাড়ি বারান্দার

দিকে গেল না। গাড়ি বারান্দার পাশ দিয়ে গিয়ে একটা ওয়ালের কাছে দাঁড়াল। দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই স্টিলের ওয়াল উপরে উঠে গেল।

গাড়ি ঢুকে গেল ভেতরে। ভেতরে আরেকটা গাড়ি বারান্দা রয়েছে। সেখানে গিয়ে গাড়িটা থামল।

গাড়ি থামতেই এক পাশে দাঁড়ানো একজন এসে গাড়ির দরজা খুলে জেনারেল শ্যারনকে স্বাগত জানাল।

'কেমন আছ রবিন?' গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলল জেনারেল শ্যারন।

রবিন প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিলটনের প্রাইভেট সেক্রেটারি।

'ভালো আছি স্যার। আপনি?'

'ভালো নেই।'

'জানি স্যার। আমাদের সাহেবকে প্রেসিডেন্ট জরুরী তলব করেছেন?'

'তাই?'

'জি হ্যাঁ।'

'কখন যাচ্ছেন উনি?'

'সম্ভবত ঘন্টা খানেক পরেই।'

'বিশেষ কারণ কিছু আছে?'

'আপনাদের সম্পর্কে প্রেসিডেন্টের কাছে আরও কিছু রিপোর্ট এসেছে।'

'আসারই কথা।'

এ রকম ছোটখাট দু'একটা কথা বলতে বলতে  তারা দু'তলার একটা কক্ষের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

'স্যার একটু দাঁড়ান, আমি আসছি।' বলে রবিন দরজা খুলে ঘরে ঢুকে গেল।

কয়েক মুহূর্ত পরে বেরিয়ে এসে বলল, 'সাহেব আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আসুন স্যার।'

জেনারেল আলেকজান্ডারের স্টাডি রুমে তার টেবিলে মুখোমুখি বসেছে জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন এবং জেনারেল শ্যারন।

কক্ষের সবগুলো দরজা বন্ধ।

আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন নিজে গিয়ে কক্ষের প্রধান দরজা বন্ধ করে এসেছে।

দু'জনের মুখই গম্ভীর, চিন্তাক্লিষ্ট।

'জেনারেল বলুন, কি করতে পারি আমি।' বলল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন।

'প্রেসিডেন্টের সাথে জর্জ আব্রাহাম ও এ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থারের দেখা করার পথ বন্ধ করতে হবে। ওরা এখন প্লেনে। আসছেন ওয়াশিংটনে।' শুকনো কন্ঠে বলল জেনারেল শ্যারন।

'কিন্তু কিভাবে? বরং যেসব রিপোর্ট প্রেসিডেন্টের কাছে এসেছে তা অত্যন্ত ভয়াবহ। সবুজ পাহাড় থেকে লস আলামোস পর্যন্ত গোয়েন্দাগিরীর সুড়ঙ্গ, জর্জ আব্রাহাম, এ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থার ও জেনারেল শেরউডকে সান্তাফে আসার পথে হত্যার চেষ্টা এবং ডজন খানিক মার্কিন সৈনিক নিহত হওয়া, সান্তাফে বিমান বন্দর থেকে এফ.বি.আই-এর যে বিমানে ওদের নিয়ে আসার কথা সে বিমানে বোমা পাতা, ইত্যাদি সব ভয়াবহ অভিযোগ এসেছে প্রেসিডেন্টের কাছে আপনাদের বিরুদ্ধে। এই অবস্থায় ওদের কোন কথা বলাই তো অসম্ভব।' বলল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন চিন্তান্বিত কন্ঠে।

জেনারেল শ্যারনের কথায় মুহূর্তের জন্যে জেনারেল শ্যারনের মুখ অন্ধকার হয়ে উঠেছিল, ঠিক চোর হাতে-নাতে ধরা পড়লে যেমনটা হয়। কিন্তু পরক্ষণেই হেসে উঠল। বলল, 'বলা যাবে। জর্জ আব্রাহামরা তাদের মৃত্যুবান নিজেরাই বয়ে বেড়াচ্ছে।'

'কি সেটা?' বলল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন। তার কন্ঠে উৎসুক্যের সুর।

'আহমদ মুসা তাদের সাথে আছে। এ পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে, তার পেছনে রয়েছে আহমদ মুসার হাত। আহমদ মুসার মত বুদ্ধিমান ও ধড়িবাজ লোক দুনিয়াতে খুব কমই আছে। সে মার্কিন সরকার ও জনগনের সাথে ইহুদীদের লড়াই বাধাবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে। লস আলামোস থেকে সান্তাফে আসার পথে যে ঘটনা ঘটেছে এবং সান্তাফে বিমান বন্দরে এফ.বি.আই বিমানে বোমা

পেতে রাখার যে ঘটনা ঘটল তা পরিষ্কারভাবে আহমদ মুসার সাজানো একটা নাটক। দেখুন দুই জায়গাতেই আহমদ মুসা বিষয়টাকে ডিটেক্ট করেছে। যেভাবে, যে পরিস্থিতিতে সে তা ডিটেক্ট করেছে তার বিবরণ নিয়ে দেখুন, আগে থেকে বিষয়টা তার জানা না থাকলে এটা তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হতো না।' অত্যন্ত আত্মবিশ্বাস ও সাবলীলতার সাথে কথাগুলো বলল জেনারেল শ্যারন।

জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টনের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। জেনারেল শ্যারনের কথাগুলো তার পছন্দ হয়েছে, এটারই প্রকাশ চেহারা ঐ ঔজ্জ্বল্য। বলল সে, 'কিন্তু একথা আরও যুক্তিগ্রাহ্য করা চাই। দেখুন, আহমদ মুসা একা মানুষ। যে দলবল নিয়ে আমেরিকা এসেছে এটার কোন প্রমাণ নেই। যে ঘটনাগুলোর কথা বললেন, তা করার জন্যে তার বেশ কিছু দক্ষ লোকের প্রয়োজন। এতবড় কাজ এক দু'জনের দ্বারা সম্ভব নয়।'

'আহমদ মুসা আমেরিকায় একা নয়। তার লোক আমেরিকায় আসেনি, একথা ঠিক। কিন্তু সে বুদ্ধিমান ও দক্ষ লোক পেয়েছে। ইহুদী বিদ্বেষী 'ফ্রি আমেরিকা' আন্দোলনের সব লোকই তাদের সাথে রয়েছে। এ লোকদের মাধ্যমে এফ.বি.আই ও সি.আই.এ'র মধ্যেও কিছু লোক সে পেয়ে গেছে। আপনি জানেন, বেঞ্জামিন বেকন আহমদ মুসাকে ন্যাশভিল থেকে ওয়াশিংটন নিয়ে আসে পুলিশ ও এফ.বি.আই সকলের চোখে ধলো দিয়ে। অথচ বেঞ্জামিন বেকনে মত বহু অফিসার ও কর্মী এফ.বি.আই ও সি.আই.এ-তে রয়েছে। তারাই এখন আহমদ মুসার শক্তি। এদের দ্বারাই আহমদ মুসা হত্যা চেষ্টা ও বোমা পাতার ঘটনা ঘটিয়েছে। আর জর্জ আব্রাহাম এবং এ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থার কান কথা শুনে আহমদ মুসার বশংবদে পরিণত হয়েছে। এদের দু'জনকে দায়িত্ব থেকে না সরালে, এফ.বি.আই ও সি.আই.এ আহমদ মুসার খপ্পর থেকে উদ্ধার পাবে না।'

সম্মোহিতের মত কথাগুলো গিলছিল জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন, তার চোখ-মুখের খুশিই প্রমাণ করছে, জেনারেল শ্যারনের প্রতিটি কথাকে সে গ্রহণ করেছে। জেনারেল শ্যারন থামতেই সে বলে উঠল, 'ধন্যবাদ জেনারেল, প্রকৃত রহস্য আপনি উদ্ধার করেছেন। বিষয়টা আমি এভাবে চিন্তা করিনি। তাহলে

দেখা যাচ্ছে, আহমদ মুসার সাথে এখন মূল নাটেরগুরু হলো 'ফ্রি আমেরিকা' আন্দোলন। দেখতে হবে এখন এদেরকেও।'

'ঠিক বলেছেন। প্রেসিডেন্টকে এ ব্যাপারে কনভিনস করতে হবে।' বলল জেনারেল শ্যারন।

'সেটা পারা যাবে। এক বেঞ্জামিন বেকনের দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। এখন...।' কথা শেষ করতে পারল না জেনারেল হ্যামিল্টন।

তাকে থামিয়ে জেনারেল শ্যারন বলে উঠল, 'খুব জরুরী কথা, লস আলামোস থেকে আসার পথে যে হত্যাকান্ড ঘটে, সেখানে বেঞ্জামিন বেকনকে দেখা গেছে। আর গোটা ওই সময়টা সে সান্তাফেতে ছিল। সুতরাং বোমা পাতার কাজ এফ.বি.আই-এর লোক দিয়ে সেই করিয়েছে।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ জেনারেল শ্যারন। আর প্রমাণের দরকার নেই। এখন বলুন, সবুজ পাহাড় থেকে লস আলামোস ল্যাবরেটরী পর্যন্ত সুড়ঙ্গকে আমরা প্রেসিডেন্টের কাছে কিভাবে তুলে ধরব?'

এই সুড়ঙ্গটা হলো দুর্যোগ ও জরুরী অবস্থাকালে লস আলামোস থেকে তার গবেষণা কর্ম সরিয়ে ফেলার ও সকলে বেড়িয়ে যাবার গোপন পথ হিসেবে তৈরী হয়। এটা তৈরী হয় ঠান্ডা-যুদ্ধের শুরুতেই। বিষয়টা এত গোপন ছিল যে প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইজেন হাওয়ার এবং লস-আলামোসের তদানিন্তন প্রধান পরিচালক জেনারেল জ্যাকসন শুধু মৌখিকভাবেই জানতেন। ঠান্ডা যুদ্ধ আমলের প্রেসিডেন্টরাও লস আলামোসের সেই সময়ের প্রধান পরিচালকরাও মৌখিকভাবেই জেনেছেন। ঠান্ডা যুদ্ধের পর কোনোভাবে এই মৌখিক জানাজানির ব্যাপারে ছেদ পড়ে যায়। এই গোপন বিষয়টাই কোনোভাবে এফ.বি.আই ও সি.আই.এ'র নজরে এসে গেছে। ধূর্ত আহমদ মুসা 'ফ্রি আমেরিকা' আন্দোলনের সহযোগিতায় এর সন্ধান পেয়ে একে ইহুদীদের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডার একটা হাতিয়ার বানিয়েছে।' বলল জেনারেল শ্যারন।

মুখ ভরা হাসি ঝলসে উঠল জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টনের মুখে। আনন্দের আতিশয্যে আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন উঠে হ্যান্ডশেক করল জেনারেল শ্যারনের সাথে। বলল, 'আমি দুশ্চিন্তায় মরে যাচ্ছিলাম। বাঁচালেন আপনি

আমাকে। মনে হচ্ছিল আহমদ মুসা আমেরিকাতেও হিরো হতে যাচ্ছে। ধন্যবাদ এবার তাকে জিরো শুধু নয়, জেলেও ঢুকানো যাবে।’

বলে একটু থেমেই আবার দ্রুত কন্ঠে বল, ‘দেখুন জেনারেল, জর্জ আব্রাহাম ও আহমদ মুসার মত লোকেরা বসে থাকবে না। তারাও সব কথা প্রমাণের চেষ্টা করবে। সে রকম কোন দুর্বলতা আপনাদের দিক থেকে আছে কিনা বলুন।’

‘সে রকম দুর্বলতা নেই। আপনাকে বলতে অসুবিধা নেই। আমাদের কম্যুনিটির একজন সদস্যার বিশ্বাসঘাতকতায় একটা অসুবিধা হতে যাচ্ছিল। আমরা সেটা ম্যানেজ করেছি। সে ও তার প্রেমিক এখন আমাদের হাতে। আর কোনদিন তারা কিছু করার বা বলার সুযোগ পাবে না।’

‘কি করেছিল তারা?’ উৎসুক কন্ঠে জিজ্ঞেস করল জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন।

‘আমাদের সে মেয়েটির সাথে প্রেম ছিল জর্জ আব্রাহামের ছেলে জর্জ জন জুনিয়রের। মেয়েটিকে আমি একটা দায়িত্ব দিয়েছিলাম। দায়িত্ব সে পালন করেনি, উপরন্তু সে আমার সব কথা বলে দিয়েছে জর্জ জন জুনিয়রকে।’ একটু দ্বিধান্বিত কন্ঠে কথাগুলো বলল জেনারেল শ্যারন।

কথা শেষ করেই জেনারেল শ্যারন আবার বলল, ‘স্যার এবার কিছু আশার কথা শোনান। আমরা খুবই সংকটে। এ রকম চরম অস্তিত্বের সংকটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদীরা কখনও পড়েনি।’

‘আমি মনে করি প্রেসিডেন্ট বুঝবেন। কিন্তু সমস্যা এফ.বি.আই-কে নিয়ে। ওরা আবার কি ফ্যাসাদ বাধায়। ওদের চোখ সবখানে।’ বলল জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন।

‘আপনি জর্জ আব্রাহাম ও অ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থারকে বের করে দেয়ার ব্যবস্থা করুন। এফ.বি.আই ও সি.আই.এ দুটোই ঠিক হয়ে যাবে। বেঞ্জামিন বেকনের মত ‘ফ্রি আমেরিকা’ আন্দোলনের ঘাপটি মারা লোকদের বের করে দিলেই সব সমস্যা দূর হবে।’ বলল জেনারেল শ্যারন।

‘কাজটা কঠিন জেনারেল শ্যারন। তবু আমি চেষ্টা করব। কিন্তু জেনারেল আমার ব্যাপারে আপনারা কি চিন্তা করেছেন?’ বলল জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন।

‘সে সিদ্ধান্ত আমাদের হয়ে গেছে। আগামী নির্বাচনে আপনি হবেন রানিংমেট, মানে ভাইস প্রেসিডেন্ট। পরবর্তী টার্মেই প্রেসিডেন্ট।’

‘ধন্যবাদ জেনারেল। আমি সারাজীবন আমেরিকার খেদমত করেছি। মার্কিন সর্বাধিনায়ক হিসেবে মার্কিন বাহিনীকে আমি সারা পৃথিবীর অভিভাবকত্বের মর্যাদায় উন্নীত করেছি। আমি চাই মার্কিন জাতিও সারা পৃথিবীর অভিভাবক হয়ে দাঁড়াক।’ বলল জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন। তার কন্ঠে আবেগ।

‘আপনি জানেন, এই নতুন বিশ্বায়নের ব্লুপ্রিন্ট নতুনভাবে তৈরী করেছিলেন বিজ্ঞানী জন জ্যাকব। দুর্ভাগ্যের বিষয় আহমদ মুসা এবং তার নতুন সাথী জর্জ আব্রাহাম ও অ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থার সেই বিজ্ঞানী জন জ্যাকবকেই গোয়েন্দাগিরীর অভিযোগে শেষ করে দিতে চাচ্ছেন। আসল লক্ষ্য এই বিশ্বায়ন পরিকল্পনা বানচাল করা।’ বলল জেনারেল শ্যারন।

‘ঠিকই বলেছেন জেনারেল। আমি যখন ব্রিগেডিয়ার তখন আমার আম্মার কাছে দেখি এই ব্লুপ্রিন্ট। আমার আব্বা একজন গোঁড়া ক্যাথলিক রাজনীতিক, কিন্তু আম্মা ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান ইহুদী। তিনি ছিলেন সিনাগগ-এর নিয়মিত সদস্য। আব্বা তখন নিউ ইয়র্কের সিনেটর, সে সময় আম্মা একদিন এই ব্লুপ্রিন্ট আমার হাতে দিয়ে বলেছিলেন, আমাদের সিনাগগ-এর এই দলিল তোকে দিলাম। এই আমানত রক্ষা করবি। আমি তাকে বলেছিলাম, রাজনীতিক হিসেবে আব্বাই তো এর আমানতদার হতে পারেন। তিনি বলেছিলেন, তিনি আমাকে ভালবাসেন সিনাগগকে নয়, সিনাগগ-এর দলিলকেও নয়। তোকে রাজনীতিক হতে হবে। যতটুকু পারিস এই বিশ্বায়নের পক্ষে কাজ করতে হবে। এই বিশ্বায়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে বিশ্ব নেতৃত্ব তো আমেরিকারই থাকবে। আম্মার এসব কথা আমি ভুলিনি। ভুলিনি বলেই রাজনীতি করতে চাই।’

আবেগে-উত্তেজনায় জেনারেল শ্যারনের মুখ লাল হয়ে উঠেছে। সে উঠে গিয়ে জড়িয়ে ধরল জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টনকে।

পাশেই আরেকটা কক্ষে জেনারেল আলেকজান্ডারের প্রাইভেট সেক্রেটারি রবিন, মানে রবিন নিক্সন, টেবিলে রাখা একটা ছোট্ট যন্ত্রের উপর ঝুঁকে পড়ে কথা শুনছে।

যন্ত্রটি একটা মাইক্রো রেকর্ডার। আধুনিকতম অয়্যারলেস মাইক্রো রিসিভার এটা। আধা বর্গ মাইলের মধ্যে কোথাও রাখা আলপিনের আগার মত মাইক্রো ট্রান্সমিটার চীপস যে তথ্য প্রেরণ করে, এই রিসিভার তা রিসিভ করে সংগে সংগেই ভাষায় রূপ দিয়ে রেকর্ড এবং রিলে বা ট্রান্সমিটও করতে পারে।

রবিন নিক্সন রেকর্ড রিলেটাই এখানে শুনছে।

জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টনের সাথে জেনারেল শ্যারনের যে কথোপকথন হলো সবই রবিন নিক্সন রেকর্ড করেছে।

জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টনের সামনে তার কলমদানির তলায় মেকার কোম্পানির সোনালী যে ষ্টিকার লাগানো আছে তার উপরেই পেষ্ট করা রয়েছে সোনালী ডট আকারে একটা মাইক্রো ট্রান্সমিটার চীপ। সেই ট্রান্সমিটারই ট্রান্সমিট করেছে দুই জেনারেলের আলোচনার গোটা বিবরণ।

শুনতে শুনতে বিস্ময় ও বেদনায় পাথরের মত হয়ে গেছে রবিন নিক্সন। রিলে কখন বন্ধ হয়ে গেছে সেদিকে তার খেয়াল নেই। যন্ত্র কানের কাছে স্থির রেখে বসে আছে সে।

তার ইন্টারকম কথা বলে উঠল।

সম্বিৎ ফিরে পেয়ে তড়িঘড়ি সোজা হয়ে বসল সে। তাড়াতাড়ি মাইক্রো অয়ারলেস রিসিভারটি হাতে তুলে নিয়ে ইন্টারকমে কথা বলতে বলতে যন্ত্রটাকে তার চশমার খাপে ঢুকিয়ে ফেলল। তারপর দরজা খুলে ছুটে বেরিয়ে এল।

তার ডাক পড়েছে। মেহমানকে বিদায় দিতে হবে।

দ্রুত গিয়ে সে হাজির হল জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টনের স্টাডি রুমের সামনে।

জেনারেল হ্যামিল্টন ও জেনারেল শ্যারন দুজনে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মুখোমুখি আলাপ করছে।

রবিনকে দেখেই বলে উঠল জেনারেল হ্যামিল্টন, 'রবিন তোমারও যাবার সময় হয়েছে। এক কাজ কর আমাদের গাড়িতে একে পৌছে দিয়ে তুমি বাসায় চলে যাবে। উনার ড্রাইভারকে গাড়ী নিয়ে অন্য এক জরুরী কাজে যেতে হবে।'

'ইয়েস স্যার।' মাথা নেড়ে বল রবিন নিক্সন।

হাঁটতে শুরু করেছে তখন জেনারেল শ্যারন।

রবিন নিক্সন ড্রাইভারের পাশের সিটে বসতে যাচ্ছিল। কিন্তু জেনারেল শ্যারন পেছনে তার পাশে বসতে বল।

বসল রবিন নিক্সন।

গাড়ি চলতে শুরু করেছে। রবিন নিক্সন বল, 'স্যার ড্রাইভারকে আপনার বাড়ির লোকেশন তো বলা হয়নি। আপনি কি আইজ্যাক বেনগুরিয়ানের বাড়িতেই আছেন?'

'ও, তুমি তো জানোই। হ্যা, ওরা সম্ভবত ওয়াশিংটনের বাইরে এখন। আমি চলে এসেছি। মনে হচ্ছে থাকতে হবে আরও বেশ কিছুদিন, তাই একটা বাসা নিয়েছি।'

রবিন নিক্সন কোন কথা বলল না।

কথা বলল জেনারেল শ্যারনই আবার। বলল, 'বলতো রবিন, তোমাদের আমেরিকার বড় শত্রু কে?'

'এটা রাজনৈতিক প্রশ্ন, রাজনীতিকরাই ভাল বলতে পারেন স্যার।' বলল রবিন নিক্সন।

'কিন্তু রবিন, দেশের শত্রু-মিত্রের ব্যাপারটা রাজনীতির বিষয় নয়, নাগরিকদের চেতনার বিষয়।'

'নাগরিক চিন্তার দিক দিয়ে দেখলে আমেরিকার কোন শত্রু নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ বিশ্বের বৃহত্তম শক্তি। তাকে চ্যালেঞ্জ করার মত কোন শত্রু আমি দেখি না।' বলল রবিন নিক্সন।

'আচ্ছা বলত, ইহুদীরা কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শত্রু হতে পারে?'

'বললাম তো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ এত বড় যে, কেউ গায়ে পড়ে তার সাথে শত্রুতা করতে আসবে না। ইহুদীরা আসবে কেন?'

'ছোটরা কি বড়দের সাথে শত্রুতা করতে যায় না?'

'অবশ্যই যেতে পারে। কিন্তু সেটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে। কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে মার্কিনীরা কারও শত্রু হতে পারে, আবার অন্য কেও মার্কিনীদের শত্রু হতে পারে। আমি বলেছি জাতিগত বা দেশগত শত্রু না থাকার কথা।'

'তুমি খুব বুদ্ধিমান ও ভালো ছেলে। আচ্ছা তুমি আহমদ মুসাকে জান? তার সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?'

ঠোঁটের কোণায় হাসি ফুটে উঠল রবিনের। বলল, 'তার সম্পর্কে কোন প্রত্যক্ষ ধারণা আমার নেই। কিন্তু যতটুকু শুনেছি তাতে বুঝেছি সব সময় তিনি মজলুমের পক্ষেই থাকেন।'

'এই তো ভুল করলে রবিন। যার সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা নেই তার সম্পর্কে এই রায় দেয়া তো ঠিক নয়।'

'ঠিক বলেছেন।'

'ধন্যবাদ রবিন।'

'ওয়েলকাম, স্যার।'

'ড্রাইভার, এসে গেছি। বাম দিকের গেটে দাঁড়াও।' বলল জেনারেল শ্যারন।

গাড়ি দাঁড়াল।

জেনারেল শ্যারন গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলল, 'রবিন নামবে নাকি?'

রবিন হাসল। বলল, 'স্যারের সাথে তো ফ্যামিলি নেই। নেমে কি হবে স্যার?'

‘কি হবে না বল? বিরাট বাড়ি। সবই এখানে আছে। উদ্যান থেকে জিন্দানখানা সবই এখানে থাকতে পারে।’

‘জিন্দানখানা?’

হেসে উঠল জেনারেল। বলল, ‘বাড়িটা ছিল এক সময় পুলিশ অফিস। পরে এটা হয় একটা প্রাইভেট গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানের দপ্তর। সুতরাং বুঝতেই পারছ।’

‘আর বলতে হবে না স্যার’ বলে গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখে নিল সে বাড়িটা। গেটের আলোতে বাড়ির নাম্বারটাও সে দেখতে পেল স্পষ্টভাবে।

রবিনদের গাড়ি বিদায় না হওয়া পর্যন্ত জেনারেল শ্যারন গেটে দাঁড়িয়ে থাকল।

প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টনের সাথে তার আলোচনার গোটা বিবরণ পেশ করল জেনারেল শ্যারন। বিশাল হলঘর ভর্তি মানুষ। একটা বিশাল গোল টেবিল ঘিরে দুই সারি হয়ে বসেছে তারা।

‘কাউন্সিল অব আমেরিকান জুইস অ্যাসোসিয়েশনে’র সদস্য সবাই। বিশ্ব ইহুদী গোয়েন্দাচক্রের প্রধান জেনারেল শ্যারনের জরুরী তলবে তারা হাজির হয়েছে।

জেনারেল শ্যারন থামতেই ডেভিড বেগিন বলে উঠল, ‘ধন্যবাদ জেনারেল। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। অদ্ভুত দক্ষতার সাথে যুক্তিগুলো আপনি সাজিয়েছেন। আমি আশা করছি প্রেসিডেন্টকে পক্ষে আনার জন্যে তা যথেষ্ট হবে।’

ডেভিড বেগিন ‘কাউন্সিল অব আমেরিকান জুইস অ্যাসোসিয়েশনে’র সভাপতি এবং আমেরিকার শ্রেষ্ঠ ধনীদের একজন।

ডেভিড বেগিন থামলে সামনের সারি থেকে আরেকজন সদস্য বলে উঠল, ‘মিঃ বেগিন, আপনিও প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন গতকাল। সে সম্পর্কে আমরা কিছু জানতে পারিনি।’

‘ধন্যবাদ সম্মানিত সদস্য। আমরা প্রথমে জেনারেলের রিপোর্ট শুনলাম। সেটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমার সাক্ষাত ছিল সৌজন্যমূলক। প্রসংগক্রমে আমি সব কথা বলারই সুযোগ নিয়েছি।’

একটা দম নিল ডেভিড বেগিন।

সামনের গ্লাস থেকে এক গ্লাস পানি পান করল। কথা শুরু করল আবার, ‘সৌভাগ্যের বিষয় হলো, প্রেসিডেন্টই প্রসংগটা তুলেছিলেন। বলেছিলেন তিনি, সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে জানেন তো? আমি বলেছিলাম, জানি মহামান্য প্রেসিডেন্ট। আপনি বিষয়টি তোলার জন্যে ধন্যবাদ। বিষয়টা নিয়ে আমিও কিছু বলতে চেয়েছিলাম। প্রেসিডেন্ট বলার অনুমতি দিলে আমি বললাম, মহামান্য প্রেসিডেন্ট, মনে হচ্ছে আমরা ষড়যন্ত্রের শিকার। যেদিনই শুনেছি, আহমদ মুসা আমেরিকা এসেছে সেদিনই ভয় পেয়েছিলাম সে কিছু না করে আমেরিকা থেকে যাবে না। তার দেহের প্রতিটি রক্ত কণিকায় রয়েছে ইহুদী বিদ্বেষ। আমেরিকান গণতন্ত্রের মহান শাসনে ইহুদীরা ভালো আছে, এটা তার সহ্য হবার কথা নয়। তাই হয়েছে। আসার পরেই ষড়যন্ত্র শুরু করেছে আমাদের বিরুদ্ধে। দেখুন, যতগুলো ঘটনা ঘটেছে, তার সাথে আহমদ মুসা কোন না কোনভাবে যুক্ত আছে। আমাদের সন্দেহ, সেই সবকিছুর নাটেরগুরু। আমাদের সন্দেহটাই মহামান্য প্রেসিডেন্টের কাছে তুলে ধরতে চাই। কোন প্রমাণ আমরা দিতে পারবো না। আমরা প্রেসিডেন্টের সাহায্য চাই, তিনি অমূলক অভিযোগ থেকে আমাদের রক্ষা করবেন। আমার মনে হয়েছে প্রেসিডেন্ট আমার কথায় খুশি হয়েছেন। তিনি বললেন, আমারও এই রকমই ধারণা মিঃ ডেভিড বেগিন। আমাদের গণতন্ত্রের যে সংগ্রাম, সেই সংগ্রামে ইহুদীরা আমাদের সহযোগী। তাদের কাছে থেকে বৈরী কোন আচরণ কোন সময় আমরা পাইনি, আশাও করিনা। তাই হঠাৎ করে সংঘটিত এ ঘটনাগুলো আমাকে খুবই কষ্ট দিয়েছে। আমি বিষয়টা ব্যক্তিগতভাবে দেখছি। প্রেসিডেন্টের কথা শেষ হলে আমি অনুনয়ে বললাম, মহামান্য প্রেসিডেন্ট, এফ.বি.আই প্রধান জর্জ আব্রাহাম ও সি.আই.এ চীফ অ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থার খুবই ভাল ও দক্ষ লোক, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য ইহুদীদের প্রতি তারা সহৃদয় নন। ছোট-খাট বিভিন্ন ঘটনায় এটা দেখা গেছে। তার উপর,

মহামান্য প্রেসিডেন্ট আমরা জানতে পেরেছি, আহমদ মুসা জর্জ আব্রাহামের নাতিকে ওহাইও নদীতে নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করায় তিনি তার প্রতি খুবই দুর্বল। আমার এ কথায় খুব কাজ হয়। প্রেসিডেন্টের চোখ-মুখ রাগে লাল হয়ে ওঠে। তিনি কঠোর কন্ঠে জিজ্ঞেস করেন, এ কথা কি সত্য? আমি বললাম, জি মহামান্য প্রেসিডেন্ট, জর্জ আব্রাহামের বোটের যিনি ড্রাইভার ছিলেন, তার কাছ থেকেই ঘটনাটা শোনা। ঐ ড্রাইভার এখন ওয়াশিংটনের পটোম্যাক নদীর একটি আর্মি সার্ভিসে কাজ করেন। তথ্যটি দেয়ার পর প্রেসিডেন্ট আমাকে ধন্যবাদ দেন এবং বলেন, রাষ্ট্রীয় কাজে যুক্তিগত প্রবণতার কোন স্থান নেই। কথা শেষ করেই তিনি আবার আমাকে জিজ্ঞেস করেন, জর্জ আব্রাহামের কোন ঘরের নাতি ওটা? আমি বলি, তাঁর বড় ছেলের ঘরের নাতি। এই একটি মাত্রই নাতি তাঁর। তাঁর বড় ছেলে জর্জ মুর আব্রাহাম প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার একজন কর্ণেল। পোস্টিং এ আছেন এখন আলাস্কায়। পরে বুঝলাম এই শেষ কথাগুলো না বলাই ভাল ছিল। আমি প্রেসিডেন্টের ভ্রু কুঞ্চিত হয়ে উঠতে দেখেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, আপনারা তো দেখছি অনেক খবর রাখেন। আমার ভুলটা বুঝতে পেরে আমি তাড়াতাড়ি বলেছিলাম, বিষয়টা আমি বাই দি বাই জেনেছি মহামান্য প্রেসিডেন্ট। আমি বিব্রতকর অবস্থা থেকে রক্ষা পেয়ে যাই কফি নিয়ে বেয়ারা এসে পড়ায়। কফি পানের পর আমি বিদায় হই। তিনি খুব আন্তরিকতার সাথে আমাকে বিদায় দেন এবং বলেন, আপনাদের সহযোগিতাকে খুবই মুল্য দেই মিঃ ডেভিড বেগিন। উদ্বিগ্ন হবেন না, দেখব আমি সব।' থামল ডেভিড বেগিন।

ডেভিড বেগিনের কথাগুলো গোগ্রাসে গিলছিল কক্ষে উপস্থিত সবাই। সবারই চোখ-মুখ আনন্দে উজ্জ্বল। সামনের সারি থেকে একজন বলে উঠল, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আপনার বলে আসা কথার পরে প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা উপদেষ্টা যদি জেনারেল শ্যারনের ব্রীফ করা কথাগুলো প্রেসিডেন্টকে বলেন, তাহলে তা মোক্ষম কাজে দেবে। আমি খুবই আশাবাদী। জেনারেল শ্যারন এবং মিঃ ডেভিড বেগিন দুজনকেই ধন্যবাদ।'

এবার কথা বলে উঠল ডেভিড বেগিনের পাশ থেকে পাকা চুল, পাকা গোঁফের সৌম্যদর্শন একজন বৃদ্ধ। বলল, 'আমরা তো ঘটনার আমাদের দিকটা

দেখছি বলে খুশি হচ্ছি। ঘটনার আরেকটি দিক আছে। সেখানে আমাদের কোন দুর্বলতা আছে কি না, সেটাও চিন্তা করা দরকার। তাহলে বিহিত-ব্যবস্থার বিষয়টাও আমরা ভাবতে পারব।'

'ধন্যবাদ আপনাকে। আপনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আমাদের দুর্বল দিকগুলোর কথা আপনারা সবাই জানেন। আমরা চেষ্টা করছি ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে আহমদ মুসার উপর দোষ চাপিয়ে সেসবের রিমেডি করতে। একটা বড় দুর্বল দিক হলো একটা জীবন্ত সাক্ষী, যে আমাদের বৈরী। সে সাক্ষী হলো আইজ্যাক বেনগুরিয়ানের মেয়ে জর্জ আব্রাহামের ছোট ছেলের প্রেমিকা সাবা বেনগুরিয়ান। সে আমাদের সব জানে এবং সবকিছু সে জানিয়েছে তার প্রেমিক জর্জ জন জুনিয়রকে। ঈশ্বরের দয়া। দুজনকেই আমরা পাকড়াও করেছি। তারা এখন আমাদের হাতে। এরা হাতছাড়া হলে আমাদের বিপদ হবে। এ দিকে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।' বলল জেনারেল আইজ্যাক শ্যারন।

'তাদের দুজনকে হত্যা করলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।' একজন বলে উঠল পেছন থেকে।

'আমাদের কম্যুনিটির একজন বিশিষ্ট সদস্য আইজ্যাক বেনগুরিয়ানের একমাত্র মেয়ে সাবা। তাকে কিংবা তার প্রেমিককে এ সময় হত্যা করা ঠিক হবে না। এ নিয়ে আমাদের নিজেদের মধ্যে এখন কোন সংকট সৃষ্টি হোক তা চাই না। আসল সংকট কেটে যাক। পরে দেখা যাবে।' বলল জেনারেল শ্যারন।

'জেনারেল ঠিকই বলেছেন। এ সময় আমাদের ঐক্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।' বলল ডেভিড বেগিন।

'আমাদের এখন আর কি করণীয়?' বলে উঠল একজন যুবক সদস্য পেছন থেকে।

'আমরা প্রেসিডেন্টের পদক্ষেপের অপেক্ষা করছি। কি পদক্ষেপ নেন তার ভিত্তিতেই আমাদের করণীয় ঠিক করতে হবে। সিদ্ধান্ত যদি আমাদের বিরুদ্ধে যায়, তাহলে রাজনৈতিক কৌশলের দিকে আমাদের যেতে হবে এবং প্রেসিডেন্টকে অসহায় ও বিচ্ছিন্ন করে কাজ আদায় করতে হবে। আর যদি সিদ্ধান্ত

পক্ষে আসে, তাহলে আমাদের বৈরী পক্ষের মানে জর্জ আব্রাহাম ও ম্যাক আর্থারের সামনে এগুবার সব পথ বন্ধ করতে হবে। আর আহমদ মুসাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়া আমাদের সব সময়ের প্রধান কাজ। আমাদের অস্তিত্ব যতখানি গুরুত্বপূর্ণ, এবিষয়টাও ততখানিই গুরুত্বপূর্ণ।' বলল জেনারেল শ্যারন।

'আহমদ মুসার ব্যাপারে মার্কিন সরকার কি সিদ্ধান্ত পাল্টেছে?' একজন জিজ্ঞেস করল।

'না, পাল্টায়নি। তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারের আদেশ এখনও বহাল আছে। তবে জর্জ আব্রাহামের কারণে আদেশটা কার্যকরী হচ্ছে না।'

'এ ব্যাপারে প্রেসিডেন্টকে বলা দরকার ছিল না?' বলল আরেকজন সদস্য।

'খোদ নিরাপত্তা প্রধান এ ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রেসিডেন্ট নির্দেশ দিয়েছেন বিষয়টি সেটেল্ড হওয়ার আগে আহমদ মুসাকে যেন ছাড়া না হয়।' জেনারেল শ্যারন উত্তর দিল।

'কিন্তু তবু আহমদ মুসা মুক্ত কিভাবে?' প্রশ্ন অন্য একজন সদস্যের তরফ থেকে।

'এটাও জর্জ আব্রাহামদের কারণে। আর এটা আমাদের জন্যে ভালই হয়েছে। জর্জ আব্রাহাম ও অ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থারের বিরুদ্ধে নতুন পয়েন্ট যোগ হয়েছে প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা জেনারেল আলেকজান্ডারের হাতে।' বলল জেনারেল শ্যারন হাস্যোজ্জ্বল মুখে।

জেনারেল শ্যারনের কথা শেষ হতেই তার টেলিফোন বেজে উঠল।

মোবাইল তুলে কথা বলল শ্যারন। মুহূর্তেই তার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

কথা শষ করে বলল সে সদস্যদের উদ্দেশ্যে, 'জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন টেলিফোন করেছিলেন, তাঁর মিশন সাকসেসফুল। প্রেসিডেন্ট তাঁর মতামতের প্রতি সায় দিয়েছেন।'

সকলে একযোগে বলে উঠল, 'আমেন।'

# ৫

এফ.বি.আই-এর বিমানটি ল্যান্ড করেছে ওয়াশিংটন এয়ারপোর্টের ননকমার্শিয়াল বিশেষ টারমাকটিতে।

বিমান থেকে নেমে এল চারজন, জর্জ আব্রাহাম, অ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থার, জেনারেল শেরউড এবং আহমদ মুসা।

সবশেষে নেমেছে আহমদ মুসা।

প্লেনের সিঁড়ির প্রায় মুখেই দাঁড়িয়েছিল পাশাপাশি তিনটি গাড়ি। একটি সেনাবাহিনীর গাড়ি। নিতে এসেছে জেনারেল শেরউডকে। আর দুটি গাড়ির একটি এফ.বি.আই-এর, অন্যটি সি.আই.এ'র। এফ.বি.আই ও সি.আই.এ'র গাড়ির সামনে দুই সংস্থার দুজন উর্ধ্বতন অফিসার দাঁড়িয়েছিল আগে থেকেই।

প্লেনের সিঁড়ি থেকে টারমাকে নামতেই এফ.বি.আই-এর অফিসার এগিয়ে এল জর্জ আব্রাহামের দিকে এবং সি.আই.এ'র অফিসার অ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থারের কাছে। সামরিক কায়দায় স্যালুট করে তারা দুজন দুজনের হাতে দুটি চিঠি তুলে দিল।

জর্জ আব্রাহাম ও অ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থার দুজনেই চিঠির উপর চোখ বুলাল। সংগে সংগে তাদের চোখে মুখে ফুটে উঠল বিস্ময়। পরক্ষণেই বিমর্ষতা এসে গ্রাস করল তাদের মুখ।

জেনারেল শেরউড ও আহমদ মুসা তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। তারা ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিল। জেনারেল কিছু বলতে যাচ্ছিল। সে সময় সেনাবাহিনীর গাড়িটা এসে তার সামনে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে একজন অফিসার নেমে স্যালুট করে বলল, 'আমরা প্রস্তুত স্যার।'

জেনারেল শেরউড আরেকবার জর্জ আব্রাহাম ও অ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থারের দিকে তাকিয়ে কিছু বলার ইচ্ছা চেপে গিয়ে গাড়িতে উঠল।

সংগে সংগে গাড়িটা স্টার্ট দিল।

গাড়িটা শ'দেড়েক গজ এগুতেই আরেকটা গাড়ি তীর বেগে এসে একেবারে আহমদ মুসার পাশে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা জর্জ আব্রাহাম ও অ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থারের হাতে চিঠি দেয়া ও তাদের চেহারা দেখে বড় একটা কিছু ঘটা সম্পর্কে আশংকিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কিছু বলার ব্যাপারে দ্বিধা করছিল।

এ সময় তীব্র গতির গাড়ি একেবারে পাশে এসে হার্ড ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ায় চমকে উঠে সেদিকে তাকাল। দেখল ড্রাইভিং সিটে বেঞ্জামিন বেকনকে। চোখে-মুখে উত্তেজনা বেঞ্জামিনের।

'কুইক।' মাত্র এই শব্দটাই উচ্চারণ করল বেঞ্জামিন বেকন।

গাড়ির স্টার্ট সে বন্ধ করেনি।

এতেই আহমদ মুসা অনেক কিছু বুঝে ফেলল। সে দ্রুত উঠে বসল বেঞ্জামিনের ড্রাইভিং সিটের পাশের সিটে।

ততক্ষণে চঞ্চল হয়ে উঠেছে এফ.বি.আই ও সি.আই.''র অফিসার দুজন। তারা চিৎকার করে উঠল, 'আহমদ মুসা তুমি মুভ করতে পার না। তুমি আন্ডার এ্যারেস্ট।'

কিন্তু গাড়ি তখন তীব্র গতিতে ব্যাকগিয়ার করে মুখ ঘুরিয়ে তীর বেগে ছুটতে আরম্ভ করেছে।

এফ.বি.আই ও সি.আই.এ'র অফিসার পকেট থেকে রিভলভার বের করে গাড়ি লক্ষ্যে গুলী করতে শুরু করেছে।

গাড়ি দুটি থেকে আরও চারজন লাফ দিয়ে নেমেছে। তারাও যোগ দিল গুলী বর্ষণে।

কিন্তু গাড়ি তখন তাদের নাগালের বাইরে।

বেঞ্জামিন বেকনের মাথায় ফেল্ট হ্যাট। কপালের শেষটা পর্যন্ত নামানো। আহমদ মুসার সাথে কথা বলার সময় মাত্র মুহূর্তের জন্যে হ্যাটটা একটু উপরে তুলেছিল।

'আপনি ঢুকলেন কি করে?' বলল আহমদ মুসা।

'কেন, ছুটিতে থাকলেও আইডেনটিটি কার্ড আমাদের কাছে থাকে।'

‘কি ঘটনা বলুন তো, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।’

‘বলব। দেখুন সামনে। বের হওয়া নিশ্চয় সহজ হচ্ছে না।’ সামনের দিকে চিন্তিত দৃষ্টি মেলে বলল বেঞ্জামিন বেকন।

আহমদ মুসা সামনে টারমাকের প্রান্তে একটু দূরে দুটি লাল আলো জ্বলতে দেখলো।

‘লাল আলো জ্বলছে ওটা কি গেট?’ আহমদ মুসা বলল।

‘হ্যা। একটা বেরুবার গেট, আরেকটা প্রবেশের।’

‘গেট কিসের তৈরী?’

‘অসুবিধা হবে না। দুটিই দুভাগে বিভক্ত গ্রীল গেট। এখন নতুন কোন ব্যারিয়ার না দিলেই হয়। তবে আমি বেরুব প্রবেশের গেট দিয়ে, নিশ্চয় ওদিকে ওদের নজর থাকবে কম।’

‘ঠিক বেঞ্জামিন। আমার বিশ্বাস সে সময় ওরা পাবে না। বিশেষ করে প্রবেশের গেটের কথা ওরা নাও ভাবতে পারে।’

আহমদ মুসার কথাই সত্য হলো।

গ্রীলের গেট বন্ধ। দেখা গেল, গেটের বাইরে ডান দিক থেকে একটা ২০ টনি বাঘা ট্রাক সবে এগিয়ে আসছে গেটের দিকে। ওটা দিয়ে গেট ব্লক করা ওদের টার্গেট। কিন্তু তার আগেই বেঞ্জামিন বেকনের গাড়ি প্রায় ১০০ মাইল বেগে আঘাত করল গ্রীলের গেটটিতে।

মুহূর্তে তালা ভেঙে গেটের দুই পাল্লা দুদিকে ছিটকে পড়ে গেল।

গাড়িটাও ছিটকে পড়ল বাইরে।

বেঞ্জামিন বেকন গাড়ি সামলে নিয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়ল।

পেছনে একবার তাকিয়ে বেঞ্জামিন বেকন বলল, ‘দুটো গাড়িই পিছু নিয়েছে।’

‘এরপর আপনার পরিকল্পনা কি?’ আহমদ মুসা বলল।

‘ওরা পিছু নেবে আমার পরিকল্পনায় সেটা আছে। ওদের কাঁচকলা দেখাবার ব্যবস্থাও রেখেছি।’

বলে গাড়ির স্পীড আরও বাড়িয়ে দিল বেঞ্জামিন বেকন।

বিশেষ এ ল্যান্ডিং টারমাকে প্রবেশ ও বের হওয়ার গেট সম্পূর্ণ আলাদা। রাস্তাও আলাদা। দুই রাস্তার মাঝখানে সমান্তরাল দুফুটের মত উঁচু দেয়ালের মধ্যে দিয়ে প্রলম্বিত গাছ-পালার সারি।

ছুটছিল বেঞ্জামিন বেকনের গাড়ি।

তার পেছনে ছুটে আসছে পেছনের দুটি গাড়ি।

এক জায়গায় রাস্তার প্রান্তের দেয়াল ঘেঁষে গাড়ির হার্ড ব্রেক কষল বেঞ্জামিন বেকন। লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলল, 'মিঃ আহমদ মুসা আসুন, কুইক।'

বেঞ্জামিন বেকন লাফ দিয়ে দেয়াল পার হয়ে গাছ-পালা ঠেলে লাফ দিয়ে ওপারের রাস্তায় গিয়ে পড়ল। তার পেছনে আহমদ মুসাও। ওখানে রাস্তার ধার ঘেঁষে একটা সাদা টয়েটা গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। লাফ দিয়ে ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল বেঞ্জামিন বেকন।

আহমদ মুসাও উঠে বসল তার পাশে।

সংগে সংগেই গাড়ি ছুটতে আরম্ভ করল।

আহমদ মুসা পেছনে তাকিয়েছিল। দেখল, ওরা চার পাঁচজন এসে দাঁড়িয়েছে তাদের পেছনে ফেলে আসা জায়গায়। তাকিয়ে আছে তাদের গাড়ির দিকে। কোন গাড়ি নেই তাদেরকে অনুসরণ করার।

তাদের অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা করে হাসি পেল আহমদ মুসার। দৃষ্টি ফিরিয়ে আনল সামনে। বলল, 'মিঃ বেঞ্জামিন বেকন সত্যিই আপনে ওদের কাঁচকলা দেখিয়েছেন। ওরা গাড়ি পায়নি। মনে হলো, আমাদের গাড়ির নাম্বারটাও ওরা নিতে পারেনি।'

'কেমন করে বুঝলেন?'

'বুঝলাম, কারণ ওরা মোবাইল বের করেনি। ওদের প্রথম কাজ ছিল আমাদের অনুসরণ করা। আর দ্বিতীয় কাজ ছিল, আমাদের গাড়ির নাম্বার পুলিশদের জানিয়ে দেয়া।'

'ধন্যবাদ। ঠিক বলেছেন। ওরা গাড়ির নাম্বার দেখতে না পাওয়ার একটা কারণ পেছনের লাইট আমি নিভিয়ে দিয়েছিলাম।'

‘কিন্তু এরপরেও ওরা বসে থাকবে না। গাড়ির রঙ ও ধরন তারা দেখেছে। এটুকুও পুলিশের জন্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।’ বলল আহমদ মুসা।

‘দেখবেন, আবারও কাঁচকলা দেখাব।’

গাড়ি বেরিয়ে এসেছে এয়ারপোর্ট এলাকা থেকে।

সামনেই একটা রোড জংশন।

এয়ারপোর্ট এলাকা থেকে বিভিন্ন দিকে এগুবার এটাই একমাত্র নিস্ক্রমন দরজা।

রোড জংশনে পৌঁছার আগেই একটা ফিলিং স্টেশন। তার পাশেই একটা পার্কিং হাউজ। অনেকে ভীর এড়াবার জন্যে এখানে গাড়ি রেখে এয়ারপোর্টে যায়।

বেঞ্জামিন বেকনের গাড়ি শা করে সে পার্কিং হাউজে প্রবেশ করে একটা আমেরিকান কালো ৬ সিটের ফোর্ড জীপের পাশে পার্ক করল এবং দ্রুত আহমদ মুসাকে নামতে বলে নিজে নেমে পড়ল।

দুজনেই দ্রুত গিয়ে উঠল সে কালো ফোর্ড জীপটায়। ড্রাইভিং সিটে বেঞ্জামিন বেকন।

গাড়ি পার্কিং হাউজ থেকে বেরিয়ে এসে ছুটতে শুরু করল রোড জংশনের দিকে।

‘দেখুন, এয়ারপোর্ট রোড থেকে জংশন রোডে প্রবেশকারী সব সাদা গাড়িকেই থামাচ্ছে পুলিশ।’ বলল বেঞ্জামিন সামনের দিকে স্থির চোখ রেখে।

‘আপনাদের এফ.বি.আই ও পুলিশের প্রশংসা করতে হয়। সত্যিই সময়ের সাথে ওরা পাল্লা দিয়ে চলে। এখানে সামান্য সুযোগকেও ওরা কাজে লাগাতে চেয়েছে।’

‘এটা ওদের প্যাট্রিওটিজম। কিন্তু ইহুদীবাদীরা আজ এই প্যাট্রিওটিজমকে ডিক্টেট করছে।’ বেঞ্জামিন বেকন বলল।

রোড জংশনে প্রবেশ করল গাড়ি।

পুলিশের নাকের ডগার উপর দিয়ে চলল বেঞ্জামিন বেকনের গাড়ি। তারা চোখ তুলেও দেখলো না।

গাড়ি এসে পরলো এক্সপ্রেস এভেনিউতে। সোয়াশ' কিলোমিটার বেগে ছুটতে লাগলো গাড়ি।

'ধন্যবাদ বেঞ্জামিন বেকন, সবগুলো বিপদ আপনি ডিঙিয়ে এসেছেন সুন্দরভাবে।' আহমদ মুসা গাড়ির সিটে গা এলিয়ে দিতে দিতে বলল।

'বিপদ ডিঙাতে পারলাম কই? বিপদ তো আরও গভীর হয়েছে।' বেঞ্জামিন বেকনের গলায় উদ্বেগ।

আহমদ মুসা আবার সোজা হয়ে বসল। বলল, 'কি ব্যাপার বলুন। ঘটনা কিন্তু আমি কিছুই বুঝিনি। আমাকে এভাবে ছোঁ মেরে নিয়ে এলেন। মিঃ জর্জ আব্রাহাম ও অ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থারকে কি যেন চিঠি পড়ে মুষরে পড়তে দেখলাম। কি ঘটেছে?' আহমদ মুসার কন্ঠেও উদ্বেগ।

'জর্জ আব্রাহাম ও অ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থারের কি চিঠি পেয়েছেন আমি জানি না। তবে তাঁরা সাময়িক বরখাস্ত পত্র পাবার কথা।' বলল বেঞ্জামিন বেকন।

'বরখাস্ত পত্র?' আহমদ মুসার কন্ঠ আর্তনাদের মত শোনাল। সে যেন আকাশ থেকে পড়ল।

'জি জনাব, বরখাস্ত পত্র। সেই সাথে গাড়ির সামনে দাঁড়ানো এফ.বি.আই অফিসারের কাছে ছিল আপনাকে গ্রেফতারের আদেশ পত্র।'

'আমাকে গ্রেফতারের আদেশ পত্রের অর্থ বুঝলাম। কিন্তু ওদের বরখাস্তের কথাটা কি ঠিক?'

'বললাম তো চিঠিতে কি আছে জানি না। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ওদের সাময়িক বরখাস্তের নির্দেশ দিয়েছেন, সেটা জানি।'

'কেন এই নির্দেশ? অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে আমার কাছে।'

'অবিশ্বাস্য হবে কেন? ইহুদীবাদীদের অসাধ্য কিছুই নেই। তাদের লম্বা হাত প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত সহজেই পৌঁছেছে এবং মুহূর্তেই বাদী আসামী হয়ে পড়েছে, আসামী হয়েছে বাদী।'

'আর একটু বিস্তারিত বলুন। এমন অসম্ভব কিভাবে সম্ভব হতে পারে? ইহুদীবাদীদের জঘন্য ষড়যন্ত্র হাতে-নাতে ধরা পড়েছে। যারা এটা ধরল তাদের জন্যে পুরস্কারের বদলে কারাগার বরাদ্দ হলো কি করে?'

‘বিস্তারিত সব আমিও জানি না। প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টনের পি,এস রবিন নিক্সন আমাদের ‘ফ্রি আমেরিকা’র সদস্য। এক ঘন্টা আগে আমাকে সে টেলিফোনে জানিয়েছে এই খবর যে, আহমদ মুসাকে গ্রেফতার এবং জর্জ আব্রাহাম ও অ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থারকে সাময়িক বরখাস্তের নির্দেশ প্রেসিডেন্ট দিয়েছেন। সে আমাকে আরও জানিয়েছে, সব ঘটনার এমন উল্টো ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে যাতে আহমদ মুসা প্রধান ষড়যন্ত্রকারী এবং জর্জ আব্রাহাম ও অ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থার তার সহযোগী হয়ে দাঁড়িয়েছেন। রবিন নিক্সন বলেছে নাটের গুরু হলো প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা উপদেষ্টা। তিনি জেনারেল শ্যারনের সাথে যোগসাজশ করেছেন এবং পরে প্রেসিডেন্টকে বুঝিয়ে স্বমতে আনতে পেরেছেন। রবিন আমার কাছে একটা ভিডিও টেপ পাঠিয়েছেন এবং বলেছেন ভিডিও টেপ দেখলেই সব কথা পরিষ্কার হয়ে যাবে।’

‘কিন্তু বেঞ্জামিন বেকন, আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, একটা জলজ্যান্ত সত্যকে কিভাবে মিথ্যায় পরিণত করা সম্ভব?’ আহমদ মুসার কন্ঠে তখনও অপার বিস্ময়।

‘চলুন, ভিডিও টেপ দেখবেন।’

‘আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?’

‘সারা জেফারসনের বাড়িতে ভার্জিনিয়ায়। ওখানেই আপনি আপাতত লুকাবেন।’

মুখটা আনন্দিত হয়ে উঠল আহমদ মুসার। বলল, ‘সারা জেফারসন কি ভার্জিনিয়ায়?’

‘না। উনি লস আলামোসে। তবে তিনি উইকএন্ডে কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে বাড়ি আসবেন।’

‘উনি নেই, ওখানে যাব কেন? এটা কি ঠিক হবে?’

‘আমাকে উনি এই নির্দেশই দিয়েছেন। আপনি তার ওখানে থাকবেন তিনি না আসা পর্যন্ত।’

‘নির্দেশ দিয়েছেন? আপনার চেয়ে বয়সে ছোট হবেন তিনি, নির্দেশ দেবেন কেন?’

একটু চমকে উঠল বেঞ্জামিন বেকন। বলল হেসে উঠে, 'ও কিছু না, কথার কথা বলেছি। একই 'ফ্রি আমেরিকা'র সদস্য তো আমরা।' বেঞ্জামিনের ঠোঁটে হাসি এলেও তার চোখে মুখে অপ্রস্তুত ভাব।

আহমদ মুসা মুহূর্তের জন্যে গম্ভীর হয়ে উঠেছিল। বলল গম্ভীর কন্ঠেই, 'তাহলে কি সারা জেফারসন 'ফ্রি আমেরিকা'র নেত্রী?'

চমকে উঠল বেঞ্জামিন বেকন। স্টেয়ারিং হুইলে রাখা তার হাত দুটিও কেঁপে উঠেছিল। সেই সাথে মুখটাও তার মলিন হয়ে উঠেছিল।

আহমদ মুসা সেদিকে তাকিয়ে একটা হাত বেঞ্জামিন বেকনের কাঁধে রেখে বলল, 'আমি জানি মিঃ বেঞ্জামিন বেকন, এ তথ্যটা অত্যন্ত গোপনীয়। আমার কাছেও গোপন থাকবে। ওকেও জানতে দেব না যে আমি জানি। আর এতে কোন দোষ ও নেই। কারণ আপনি আমাকে এ তথ্য জানান নি।'

'ধন্যবাদ মিঃ আহমদ মুসা। উনি হয়তো তার পরিচয় জানাতেও পারেন। আপনার মত ব্যক্তির কাছে তিনি নিজেকে গোপন রাখবেন বলেও মনে হয় না। সে যাক, আপনি এত দ্রুত কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন, এটা সত্যিই বিস্ময়কর।'

'বিস্ময়ের এতে কিছুই নেই। আমার বর্তমান অবস্থার বিষয়টা এত তাড়াতাড়ি উনার জানা এবং আপনার 'নির্দেশ' লাভের কথা থেকেই বিষয়টা আমার কাছে পরিষ্কার হয়েছে। আর তাকে না দেখলে, কথা না বললে নিশ্চয় বিষয়টা আমার নজর এড়িয়ে যেত। তাকে দেখেই বুঝেছি টমাস জেফারসনের নেতৃত্ব ও মৌলিকত্ব দুই গুণই যেনি তার মধ্যে আছে। আর আমাকে তার ভার্জিনিয়ার বাড়িতে দাওয়াত দেয়া থেকে তখনই আমার মনে হয়েছিল কোন চিন্তা-ভাবনা বা কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দুতে তিনি রয়েছেন।'

গাড়ি তখন পটোম্যাক ব্রীজ পার হয়ে ভার্জিনিয়ার পথ ধরে চলছিল। ডান দিকে অল্প দূরে পেন্টাগন। আর সামনে অরলিংটন সিমেট্রি। নিরব রাস্তার দুপাশে গাছ-পালা, ঝোপ-ঝাড়ের সারি।

বেঞ্জামিনের গাড়ি ফ্রি ওয়ে ধরে ছুটে চলেছে জেফারসনের বাড়ি মন্টিসেলোর দিকে।

অরলিংটন সিমেট্রি এলাকায় তখনও পৌঁছেনি গাড়ি।

হঠাৎ বেঞ্জামিনের খেয়াল হলো অরলিংটন না ঘুরে নতুন ডাইভারশন রোড হয়ে গেলে অনেক সময় বাঁচবে। চিন্তা করেই বেঞ্জামিন ডানদিকে অর্থাৎ পেন্টাগনের দিকে গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে নিল।

ডাইভারশন রোডটা পেন্টাগনের প্রায় পাশ দিয়েই চলে গেছে। মাঝখানে শুধু ঘন গাছ আচ্ছাদিত উঁচু ও দীর্ঘ টিলা।

গাড়ি চলছিল সে টিলার পাশ দিয়েই। আহমদ মুসা সে টিলার দিকে তাকিয়ে বলল, 'পেন্টাগনের এত কাছে জংগল কেন?'

'খুব পাশে নয় মিঃ আহমদ মুসা, দূরত্ব দেড় মাইলের কম হবে না। একে পেন্টাগনের ফাঁদ বলতে পারেন। এ জংগলের মাটি ও গাছের কান্ড, শাখা, পাতা কোন কিছুই শত্রুর জন্যে নিরাপদ নয়। এর বাইরে রয়েছে অদৃশ্য পাহারার একটা ব্যুহ।' বেঞ্জামিন বলল।

'সেটাই স্বাভাবিক।' বলল আহমদ মুসা।

কথা শেষ করেই উৎকর্ণ হয়ে উঠল আহমদ মুসা। বলল, 'শুনেছেন গুলীর শব্দ?'

'ঠিক, আমারও কানে এসেছে। একাধিক শব্দ।' বলল বেঞ্জামিন।

'একটু আগেও এ ধরনের শব্দ কানে এসেছে। সেগুলোও তাহলে গুলীর শব্দ ছিল।' আহমদ মুসা বলল।

'সামনে কিছু ঘটছে নিশ্চয়।' বলে বেঞ্জামিন বেকন তার গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিল।

জর্জ জুনিয়রের বুকে মাথা রেখে অস্থিরভাবে কাঁদছিল সাবা বেনগুরিয়ান। বলছিল, 'কেন তুমি ওই চিঠি লিখে দিলে? এ শয়তানদের হাতে ঐ মাস্টার কম্পিউটার পড়লে কি হবে তুমি জান?'

জর্জ জুনিয়র সাবার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল, ‘ঐ কম্পিউটারের চেয়ে তোমার সম্মান আমার কাছে অনেক বড়।’

‘ঐ কম্পিউটার তো শুধু কম্পিউটার নয়। ওটা তো দেশ।’

‘তুমি ভেব না সাবা, ওদের ষড়যন্ত্র সফল হবে না। কিছু রেকর্ড ধ্বংস করলেই দেশ শেষ হয়ে যাবে না।’

‘তোমার আব্বাদের কোন ভাল খবর না পাওয়া পর্যন্ত রেকর্ডের মূল্য তুমি অস্বীকার করতে পারবে না।’

আব্বার কথা মনে হতেই অসহনীয় এক খোঁচা লাগল তার বুকে। এক যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ল দেহের সকল স্নায়ুতন্ত্রীতে। সে নিউ মেক্সিকো যাবার জন্যে বেরিয়েছিল। যাওয়া তো হলোই না, উপরন্তু সে নিজেই বন্দী হয়ে পড়ল। ওদিকের অবস্থা কে জানে! ওদিকের সব প্রমাণ শেষ করেই কি এরা এদিকের সব প্রমাণ নির্মূল করার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে! বুকটা কেঁপে উঠল তার আতংকে। বলল, ‘তুমি ঠিক বলেছ সাবা। কিন্তু তোমার ক্ষতি সহ্য করার শক্তি কি আমার আছে!’

জর্জ জুনিয়রের বুকে মুখ গুঁজে সাবা বলল, ‘তা জানি। কিন্তু যে ক্ষতি হলো তার পরিমাপ নেই।’

‘ভেবো না সাবা। ঈশ্বর আছেন। অন্ধকারে আলো জ্বলবেই।’

‘কিন্তু আমি সবকিছুর উপরে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। আমার স্বজাতির যে বেঈমানী আমি দেখেছি, তাতে দুনিয়ায় কোন নীতিবোধ আছে বলে আমি মনে করতে পারছি না।’ বলল সাবা বেনগুরিয়ান।

‘নীতিবোধ তাদের নেই বলে কারও নেই, তা ভাবতে যাবে কেন?’

কিছু বলতে যাচ্ছিল সাবা বেনগুরিয়ান। হঠাৎ সামনের দিকে চোখ পড়তেই থেমে গেল সে। একজন লোক এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে বিড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে আসছে তাদের সেলের দিকে।

জর্জ জুনিয়রেরও চোখে পড়েছে লোকটা।

জর্জ জুনিয়র ও সাবা বেনগুরিয়ান দুজনেই সোজা হয়ে বসেছে। তাদের স্থির দৃষ্টি লোকটির দিকে।

লোকটি সেলের দরজার সামনে এসে ঠোঁটে তর্জনি চেপে চুপ থাকার ইংগিত করল।

পকেট থেকে একটা চাবি বের করে লোকটি তালা খুলে সেলের দরজা খুলে ফেলল। বলল দ্রুত ফিসফিস কন্ঠে, 'আসুন, পালাবার এই সুযোগ। দুজন ছাড়া সবাই চলে গেছে কম্পিউটার আনতে।'

'আপনি কে?' বলল জর্জ জুনিয়র বিস্মিত কন্ঠে।

'আমাকে চিনবেন না। আমি মিস সাবার আব্বা মিঃ আইজ্যাক বেনগুরিয়ানের একজন ভক্ত। জীবন বাঁচানো থেকে শুরু করে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ সব তাঁরই দয়ায় হয়েছে। সুযোগ পেয়েছি তাঁর জন্যে কিছু করার। আসুন, তাড়াতাড়ি।'

জর্জ জুনিয়র ও সাবা বেনগুরিয়ান দ্রুত উঠল এবং লোকটির পেছনে পেছনে বেরিয়ে এল সেল থেকে। চলতে চলতে ফিসফিস করে লোকটি বলল, 'মিঃ আইজ্যাক বেনগুরিয়ানকেও ওরা মেরে ফেলবে।'

'উনি কোথায়?' উদ্বিগ্ন কন্ঠে জিজ্ঞেস করল জর্জ জন জুনিয়র।

'ইনস্টিটিউট এনভায়রনমেন্ট স্টাডিজ' অফিসের রেসিডেন্সিয়াল

ব্লকে তাকে রাখা হয়েছে। তাকে বুঝানো হয়েছে এফ.বি.আই-এর জ্বালাতন থেকে দূরে রাখার জন্যেই লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাকে। আসলে তিনি এখন নজরবন্দী। মিস সাবাকে শেষ করার পর তাকেও হত্যা করা হবে।'

কেঁপে উঠল জর্জ জুনিয়র ও সাবা বেনগুরিয়ান দুজনেই। বলল সাবা বেনগুরিয়ান, 'এনভায়রনমেন্ট স্টাডিজ অফিসে কেন? আব্বাকে ওরা চিনবে না?'

'চিনলে কি হবে? অফিসের টপ টু বটম ইহুদীবাদীতে ভরা। শুধু এই ইনস্টিটিউট নয়, এনভায়রনমেন্ট স্টাডিজের দুনিয়াব্যাপী গোটা নেটওয়ার্কই তো এরা নিয়ন্ত্রণ করে।' বলল লোকটি।

খুব সামনেই দ্রুত পায়ের শব্দ শোনা গেল। থমকে দাঁড়াল লোকটি।

তার পেছনে থমকে দাঁড়াল জর্জ জুনিয়র এবং সাবা বেনগুরিয়ানও।

সামনেই একটা দরজা। দরজার ওপার থেকে পায়ের শব্দ আসছিল।

থমকে দাঁড়ানোর পর মুহূর্তেই দরজায় এসে উদয় হলো দুজন লোক। তাদের হাতে স্টেনগান। তাদের চোখেও আগুন। তাদের নাক বরাবর সামনেই ধরা পড়া চোরের মত দাঁড়িয়েছিল জর্জদেরকে উদ্ধারকারী লোকটি। তাদের একজন তার স্টেনগানটা ডান হাত থেকে বাম হাতে নিয়ে ডান হাতের এক প্রচন্ড ঘুষি চালাল লোকটিকে।

উদ্ধারকারী লোকটি ঘুষি খেয়ে দড়াম করে পড়ে গেল মেঝের উপর।

লোকটি ঘুষি মেরেই স্টেনগান তাক করল জর্জ জুনিয়র এবং সাবা বেনগুরিয়ানের দিকে। চিৎকার করে বলল, 'ভেবেছিলে পালাবে? যারা একবার এই সেলে ঢোকে তারা আর জীবিত বের হয়ে যেতে পারে না।'

বলে পেছনের লোকটিকে নির্দেশ করল, 'এদের বেঁধে ফেল, তারপর সেলে ঢোকাও।'

জর্জদের উদ্ধারকারী লোকটি মেঝেয় পড়ে গিয়েই ওদের অলক্ষ্যে পকেট থেকে রিভলভার বের করে নিয়েছিল। জর্জদের বেঁধে ফেলার নির্দেশ বাতাসে মেলাবার আগেই তার রিভলভার থেকে দুটি গুলী বের হয়ে এল।

স্টেনগানধারী দুজনই গুলীবিদ্ধ হয়ে পড়ে গেল মেঝেতে।

জর্জদেরকে উদ্ধারকারী লোকটি উঠে দাঁড়িয়েই জর্জদের লক্ষ্য করে বলল, 'আসুন।'

বলে সে ছুটল দরজা পেরিয়ে।

জর্জরাও তার পিছে পিছে ছুটল।

কিন্তু বাড়ি থেকে বেরুতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল লোকটি। ফিস ফিস কন্ঠে বলে উঠল, 'পুরো যে দলটি গিয়েছিল কম্পিউটার উদ্ধার করতে, তারা ফিরে এসেছে।' তার কন্ঠ তখন কাঁপছে।

প্রায় পাগলের মত সে এদিক ওদিক তাকিয়ে জর্জ জুনিয়র ও সাবা বেনগুরিয়ানকে টেনে নিয়ে পাশেই ছোট্ট একটা কক্ষে প্রবেশ করল। কক্ষটি জেনারেটর রুম। কক্ষটি বাড়িতে ঢোকার প্রবেশ পথ এবং সিঁড়ি দিয়ে দুতলায় উঠার মুখেই। সবই দেখা যায় কক্ষটি থেকে।

জর্জরা দেখল প্রায় দশ বার জন লোক ভেতরে প্রবেশ করল।

‘ওরা সবাই উপরে উঠে গেছে, আসুন এই সুযোগ।’ বলে লোকটিই দ্রুত বেরোল ঘর থেকে।

জর্জ জুনিয়র এবং সাবা বেনগুরিয়ানও তার পেছনে পেছনে ছুটে বেরিয়ে এল।

কিন্তু বেরিয়ে বাইরের করিডোরটায় পা দিয়েই তারা মুখোমুখি পড়ে গেল একজনের। লোকটি ঐ দলেরই একজন। সম্ভবত সেই গাড়ি ড্রাইভ করেছে। গাড়ি পার্ক করে আসাতে পেছনে পড়ে গেছে।

মুখোমুখি হয়ে দুপক্ষই প্রথমটায় হকচকিয়ে গিয়েছিল। উদ্ধারকারী লোকটি দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়েছিল। আর ড্রাইভার লোকটি তার নিজেদের লোকের সাথে জর্জ জুনিয়র ও সাবা বেনগুরিয়ানকে দেখে ব্যাপারটা বুঝে উঠতে দেরি করে ফেলেছিল। যখন বুঝে উঠে রিভলভার বের করতে যাবে, তখন তার বুক বরাবর তাক হয়ে উঠেছে জর্জদের উদ্ধারকারী লোকটির রিভলবার।

উপায়ন্তর না দেখে লোকটি চিৎকার করে উঠেছিল। আর সেই সাথেই বুকে গুলীবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ল লোকটি।

‘আসুন ঐ গাড়ির দিকে।’ বলে ছুটতে শুরু করেছে লোকটি।

গ্যারেজের দিকে পার্ক করা ছিল একটা মাইক্রোসহ দুটি জীপ। লোকটি ছুটছিল একদম সামনের জীপটার দিকে। শুধু ওটাই পার্ক করা ছিল গেটের দিকে মুখ করে। জীপটি জেনারেল মটরস-এর ৬ সিটের একটা বড় জীপ।

লোকটি ছুটে গিয়ে প্রথমেই ড্রাইভিং সিটের দরজা খুলে ফেলল।

জর্জরাও এসে পড়েছে।

‘গাদ্দার, তোরা পালাবি, তা হবে না।’ উপর থেকে একটা চিৎকার ভেসে এল। সম্ভবত নিচে গুলীর শব্দ পেয়ে কেউ নিচে তাকিয়ে ওদের দেখে ফেলেছে।

চিৎকারের সাথে সাথে স্টেনগানের গুলী ভেসে এল।

তখন গাড়ির দরজা দিয়ে প্রবেশ করছে জর্জরা। প্রথমে প্রবেশ করে জর্জ গিয়ে বসেছে ড্রাইভিং সিটে।

সাবা বেনগুরিয়ান উঠতে যাচ্ছে সেই সময়ই গুলী বৃষ্টি এবং সেটা গাড়ির দরজা লক্ষ্যেই।

জর্জদের উদ্ধারকারী লোকটি নিজের গা দিয়ে ঢেকে সাবা বেনগুরিয়ানকে গাড়িতে উঠিয়ে দিল। দরজাটাও সে বন্ধ করল। তার পরেই উদ্ধারকারী লোকটি তার ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া দেহটা নিয়ে গাড়ির দরজার নিচেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। সাবা বেনগুরিয়ান গাড়ির দরজা খুলে দেখতে যাচ্ছিল।

জর্জ জুনিয়র ঝুঁকে এসে চিৎকার করে উঠল, 'সাবা দরজা খুল না, মাথা নিচু কর। কি দেখবে, বেচারার দেহ ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।'

বলে জর্জ গাড়িতে স্টার্ট দিল। গুলী বৃষ্টি মাথায় নিয়ে গাড়িটি তীব্র গতিতে ছুটল গেটের দিকে।

গ্রীলের গেট ভেঙে জীপটি বেরিয়ে এল বাইরের রাস্তায়।

জীপটি যখন বাড়িটির এরিয়া ছাড়াচ্ছে, তখন ছেড়ে আসা গেটের সম্ভবত পেছনেই দুটি ইঞ্জিন গর্জন করে উঠার শব্দ পেল জর্জ জুনিয়র।

গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল জর্জ জুনিয়র।

একটা ট্রাফিক পয়েন্ট এড়াতে গিয়ে জর্জের গাড়ি পটোম্যাক রোডে গিয়ে পড়ল। পটোম্যাক রোড থেকে অরলিংটন হাইওয়ের রিং-এ গিয়ে পৌঁছল। রিংটা জর্জের গাড়িকে তার তাড়াতাড়িজনিত একটা ভুলের কারণে অরলিংটনমুখী হাইওয়ে চ্যানেলে নিয়ে ফেলল।

ঘাড়ের উপর বিপদ নিয়ে আর কিছু করার ছিল না।

জর্জের গাড়ি ছুটে চলল অরলিংটন হাইওয়ে ধরে। ওদের দুটি গাড়িও আঠার মত লেগে আছে পেছনে। বেপরোয়া গাড়ি চালাচ্ছে। দূরত্ব ক্রমশই কমে আসছে।

জর্জ জুনিয়র শেষ পর্যন্ত পেন্টাগনের রাস্তায় যেতে চেয়েছিল, পেছনের তাড়া খেয়ে সেদিকেও ঘুরতে পারল না। গাড়ি তাতে স্লো করতে হয়। এমনিতেই ওদের গুলীর রেঞ্জে তার গাড়ি এসে গেছে।

আরো সামনে এগিয়ে পেন্টাগন এলাকায় প্রবেশের জন্যেই জর্জ জুনিয়র তার গাড়ি পেন্টাগন এলাকা ঘেঁষে চলে যাওয়া ডাইভারশন রোডটির দিকে ঘুরিয়ে নিল।

রাস্তার এক জায়গায় এসে জর্জ জুনিয়র সাবা বেনগুরিয়ানকে বলল, 'আমি গাড়ি দাঁড় করাব। দাঁড় করানোর সাথে সাথেই তুমি নেমে পড়বে, আমিও। তারপর জংগলের মধ্যে দিয়ে পেন্টাগনের দিকে ছুটতে হবে। এটাই বাঁচার একমাত্র পথ।'

হার্ড ব্রেক কষে এক জায়গায় গাড়ি দাঁড় করাল জর্জ জুনিয়র। দুজনেই দুই দরজা খুলে পা বাড়াল নামার জন্যে।

পেছনের গাড়ি দুটি সম্ভবত এটাই আঁচ করেছিল। পেছন থেকে শুরু হলো গুলী বৃষ্টি।

বের হতে পারল না ওরা গাড়ি থেকে।

গুলী ছুড়তে ছুড়তে পেছনের দুটি গাড়ি এগিয়ে আসছে জর্জদের গাড়ির দিকে।

জর্জদের গাড়ি ততক্ষণে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

জর্জ জুনিয়র ও সাবা বেনগুরিয়ান গাড়ির মেঝেতে শুয়ে আত্মরক্ষা করছে।

অল্প এগিয়ে ছোট্ট একটা বাঁক পার হতেই আহমদ মুসা ও বেঞ্জামিন দুজনেই গাড়ি তিনটি দেখতে পেল।

'টার্গেট সামনের ঐ জীপটা। জীপটাকে তো এরা ভর্তা করে ফেলল।' বলল আহমদ মুসা।

'ও জীপটা থেকে কিন্তু উত্তর আসছে না। মুনে হয় যুদ্ধটা এক তরফা। ও জীপটা মজলুম আর পেছনের মাইক্রো ও জীপটি জালেমের ভূমিকায় দেখছি অবতীর্ণ হয়েছে।' বেঞ্জামিন বলল।

'আপাতত তাই মনে হচ্ছে।'

বলে একটু থেমেই আহমদ মুসা আবার বলল, 'জোরে চালাও, ওদের থামাতে হবে।'

কাছাকাছি পৌঁছে আহমদ মুসাই প্রথমে গুলী করল। গুলী করে দুটি গাড়ির পেছনের মাইক্রোটার পেছনের উইন্ড স্ক্রীন ভেঙে দিল। দ্বিতীয় গুলী পেছনের উইন্ড স্ক্রীনের ফাঁক দিয়ে প্রবেশ করে মাইক্রোর সামনের উইন্ড স্ক্রীনও ভেঙে দিল।

সামনের জীপ ও মাইক্রো দুটিই তখন দাঁড়িয়ে পড়েছে।

জীপ ও মাইক্রো থেকে গুলী করতে করতে কয়েকজন নেমে পড়ল।

আহমদ মুসা পিস্তল পকেটে রেখে স্টেনগান হাতে তুলে নিল। বেঞ্জামিনও।

ভয় দেখানোর জন্যেই তারা ফাঁকা গুলী করল লোকগুলীর পাশ দিয়ে, ওপর দিয়ে।

ভয় তারা পেল। দ্রুত তারা গাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল এবং গাড়ির জানালা দিয়ে গুলী চালাতে লাগল।

ঠিক এই সময় রাস্তার ডান পাশের জংগলের ভেতর থেকে একটা
হ্যান্ড লাউড স্পীকারের শব্দ ভেসে এল, 'আপনারা সবাই গুলী বন্ধ করুন। অস্ত্রগুলো রেখে সবাই গাড়ির ডানপাশে এসে দাঁড়ান। যে গাড়ি দেরী করবে সে গাড়িই উড়িয়ে দেয়া হবে।'

আহমদ মুসা ও বেঞ্জামিন মুহূর্ত দেরী না করে স্টেনগান গাড়ির ভেতরে রেখে বেরিয়ে এসে গাড়ির ডান পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল।

অন্যদিকে একদম সামনের জীপ থেকে জর্জ জুনিয়র ও সাবা বেনগুরিয়ান ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া গাড়ির মেঝে থেকে গড়িয়ে গাড়ির ডানপাশের রাস্তায় নেমে এল।

কিন্তু মাঝের গাড়ি দুটি থেকে তখনও কেউ নামেনি।

জবাব সংগে সংগেই এল।

জংগলের ভেতর থেকে একটা গোলা এসে নিঁখুত অপারেশনের মত মাইক্রোর ছাদটি উড়িয়ে নিয়ে গেল।

কাজ হলো এতে।

মাঝের জীপ ও মাইক্রো থেকে প্রায় দশ জন লোক খালি হাতে গাড়ির ডান পাশে এসে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা ওদের দেখছিল কিছুটা বিস্মিত দৃষ্টি নিয়ে। ওরা দশজন যারা নেমেছে তাদের কেউই পুরো শ্বেতাংগ নয়। গায়ের রং, দেহের গড়ন সবই বলে দেয় সেমেটিক বা এশিয়ান কোন মিশ্রণ ওদের দেহে আছে। হঠাৎ আহমদ মুসার মাথায় ঝড়ের মত একটা চিন্তা প্রবেশ করল। ওরা কি ইহুদী? জেনারেল শ্যারনের লোক হতে পারে?

আহমদ মুসা মুহুর্তের জন্য ভাবনায় ডুবে গিয়েছিল। কিন্তু ব্যাপারটা শেষ মুহূর্তে আহমদ মুসার চোখে পড়েছে।

দেখল ওদের দশজনের একজনের হাত শূন্যে উঠে গেছে। হাতে একটা গোলাকার বস্তু। তার হাতের টার্গেট সামনের ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া জীপ থেকে বেরিয়ে আসা সেই দুজন ছেলে মেয়ে।

কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে আহমদ মুসার বিলম্ব হয়নি।

বিদ্যুৎ বেগে আহমদ মুসার একটা হাত পকেটের ভেতরে ঢুকে বেরিয়ে এল এবং তা উপরে উঠল বিদ্যুৎ ঝলকের মত।

হাতের জিনিসটি ছোঁড়ার জন্যে লোকটির হাত একবার পেছনে এসে জোরে ছুটে যাচ্ছিল সামনে। সে মুহূর্তে আহমদ মুসার রিভলভারের গুলী গিয়ে আঘাত করল ঠিক লোকটির হাতে।

সামনের জীপ থেকে বের হওয়া ছেলে ও মেয়েটি শেষ মুহূর্তে বুঝতে পেরেছিল যে তারা বোমার শিকার হতে যাচ্ছে। তারা কুকড়ে গিয়েছিল ভয়ে।

গুলী লোকটির হাতে লাগার সাথে সাথে ভয়াবহ কান্ড ঘটে গেল।

হাতের জিনিসটা ছিল একটা গ্রেনেড। গ্রেনেডটির বিস্ফোরন ঘটল ঠিক ওদের মাঝখানে। মুহূর্তেই বিপর্যয় ঘটে গেল।

প্রচন্ড বিস্ফোরণে জনাদশেক মানুষের দেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল চারদিকে।

ধোঁয়া একটু হালকা হলে দেখা গেলো ওরা দশজনের সবাই আহত নিহতের তালিকায়।

জংগলের বুক ফেঁড়ে ঝড়ের বেগে বেড়িয়ে এল ৫জন সৈনিক।

পাঁচ জনের মধ্যে একজন কর্ণেল র‍্যাংকের অফিসার। অবশিষ্ট ৪ জনও বিভিন্ন র‍্যাংকের অধঃস্তন অফিসার। এসেই কর্ণেল র‍্যাংকের অফিসারটি অধঃস্তন অফিসারদের নির্দেশ দিল, আহত নিহতের সবাইকে একটা গাড়িতে তুলে আমাদের মিলিটারী হাসপাতালে নিয়ে যাও। আহত প্রত্যেককে পাহারায় রাখবে।

সৈনিকরা, আহমদ মুসা ও বেঞ্জামিন সবাই ধরাধরি করে আহত নিহতদের গাড়িতে তুলল।

সাবা বেনগুরিয়ান ও জর্জদের ভয় ও আতংকে কাঠ হয়ে যাওয়া অবস্থা তখনও কাটেনি।

দুজন অফিসার আহত নিহতদের গাড়ি নিয়ে চলে গেল। আর দুজন রয়ে গেল কর্ণেলের সাথে।

গাড়িটাকে বিদায় করে কর্ণেল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, 'ধন্যবাদ আপনাকে যে ওদের শেষ হামলা থেকেও এদের দুজনকে আপনি বাঁচিয়েছেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না, কেউ কেউ তো আহত নিহত হলোই।'

বলে একটু থেমে সেই ছেলে মেয়ে দুজনের দিকে ইংগিত করে বলল, 'ওরা ও আপনারা কি এক সাথের?'

'না, গোলাগুলী হতে দেখে আমরা এর সাথে জড়িয়ে পড়েছি।' বলল আহমদ মুসা।

জর্জ জুনিয়র ও সাবা বেনগুরিয়ান এগিয়ে এল তাদের দিকে। বলল জর্জ জুনিয়র সৈনিক ও আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, 'আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ। ওদের বন্দীখানা থেকে আমরা পালিয়েছি। ওরা আমাদের মেরে ফেলার জন্যেই ধাওয়া করেছিল। আপনারা বাঁচিয়েছেন।'

'আপনার নাম পরিচয় কি বলুন তো?' যেন চিনতে পারছে, জর্জ জুনিয়রের দিকে এমন দৃষ্টিতে চেয়ে কপাল কুঞ্চিত করে বলল কর্ণেল লোকটি।

'আমি জর্জ জন আব্রাহাম জুনিয়র। আমার পিতা জর্জ আব্রাহাম জনসন।' বলল জর্জ জুনিয়র।

'তার মানে তুমি আমাদের জর্জ মুর আব্রাহামের ছোট ভাই?' বলল কর্ণেল।

'হ্যাঁ।'

আহমদ মুসা ও বেঞ্জামিন দুজনেরই চোখ বিস্ময়ে ছানাবড়া হয়ে গেছে। জর্জ জুনিয়র ইহুদীদের হাতে বন্দী হয়েছিল? কেন? জর্জ জুনিয়রকে ওরা হত্যা করবে কেন? এসব প্রশ্ন ঝড়ের মত এসে আহমদ মুসার মনে ভিড় জমাল।

'তোমার আব্বার খবর জান? তুমি বন্দী হয়েছিলে কেন?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

জর্জ জুনিয়র চমকে উঠে আহমদ মুসার দিকে তাকাল। বলল, 'আপনি জানেন কিছু? কোন খবর আমি জানি না।'

'আমরা এক সাথেই নিউ মেক্সিকো থেকে এসেছি ওয়াশিংটনে, এই কিছুক্ষণ আগে।'

'তিনি ভাল আছেন?' জর্জ জুনিয়র জিজ্ঞেস করল।

'ভালো আছেন। কিন্তু তিনি এবং এ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থার সাসপেন্ড হয়েছেন তাদের পদ থেকে।' আহমদ মুসা বলল।

'অসম্ভব। কেন?'

'অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। কারণ বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হবে।'

'দয়া করে দুএকটা বলুন। নাহলে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।' জর্জ জুনিয়র বলল।

'তাঁর বিরুদ্ধে নির্দোষ ইহুদীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগ দেয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে। তিনি এবং অ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থার আহমদ মুসার পাতা ফাঁদে পা দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।' বলল আহমদ মুসা।

'মিথ্যা এ অভিযোগ। আমি তার জীবন্ত সাক্ষী। এজন্যেই ওরা আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল। আমার আব্বাকে ওরা নজরবন্দী করে রেখেছে।' বলল তীব্র কন্ঠে মেয়েটি।

'তুমি কে?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

কথা বলে উঠল জর্জ জুনিয়র। বলল, 'এঁর নাম সাবা বেনগুরিয়ান। আইজ্যাক বেনগুরিয়ানের মেয়ে।'

'অর্থাৎ ইহুদী ধনকুবের আইজ্যাক বেনগুরিয়ানের মেয়ে?' বলল বেঞ্জামিন বেকন।

'তুমি জীবন্ত সাক্ষী কি করে হলে?' বলল আহমদ মুসা সাবা বেনগুরিয়ানকে।

'ইহুদী গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান জেনারেল শ্যারন আব্বার বন্ধু। সেই সুযোগ নিয়ে তিনি আমাকে জর্জ আব্রাহামের মাস্টার কম্পিউটারের লস আলামোসের ইহুদী গোয়েন্দা সংক্রান্ত সব রেকর্ড মুছে ফেলার জন্যে কাজ করতে বাধ্য করেন। সেখানে গিয়েও আমি শেষ পর্যন্ত দেশের বিরুদ্ধে কাজ করতে পারিনি। আমি আরও কিছু বিষয় জানতে পারি। এ সব কারণেই আমাকে ও আব্বাকে বন্দী করা হয়েছে। আমার কাছ থেকে জেনারেল শ্যারনের বিষয়ে জর্জ জুনিয়র সব কিছু জেনেছে বলে তাকেও বন্দী করা হয়।'

সাবা বেনগুরিয়ান থামতেই কর্ণেল বলে উঠল, 'আপনারা যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন, সবই দেশের নিরাপত্তার সাথে জড়িত।
আর এখানে যা ঘটল তারও সম্পর্ক আছে দেশের নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিষয়ের সাথে। সুতরাং আপনাদের সবাইকে পেন্টাগনের অভ্যন্তরীণ সিকিউরিটি দফতরে যেতে হবে।'

কর্ণেল থামতেই জর্জ জুনিয়র বলে উঠল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, 'আপনার পরিচয় তো জানলাম না। আব্বাদের সাথে আপনি এলেন কেমন করে? সব বিষয়ই বা আপনি কি করে জানেন?'

'আমি গ্রেফতার এড়িয়ে পালিয়ে এসেছি। চলুন পেন্টাগনের অভ্যন্তরীণ সিকিউরিটি দফতরে গিয়েই সব আলোচনা করা যাবে।'

'চলুন যাওয়া যাক। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা দফতরের চীফ জেনারেল শেরউড আজই পৌঁছার কথা। তিনি নিশ্চয়ই পৌঁছেছেন।' বল কর্ণেলটি।

সবাই এগুলো গাড়ির দিকে।

পেন্টাগনের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা প্রধান জেনারেল শেরউড টেবিলে বসতেই তার টেলিফোন বেজে উঠল।

একটু বিরক্ত লাগলেও টেলিফোন তুলে নিল জেনারেল শেরউড।

জেনারেল শেরউড ক্লান্ত। তিনি নিউ মেক্সিকো থেকে অনেক ধকল আর দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে তার দফতরে এসে সবেমাত্র বসেছে। বাড়িতেও যায়নি সে।

টেলিফোন করেছে জেনারেল শেরউডের সহকারী ব্রিগেডিয়ার স্টিভ স্টিফেনসন।

তার কাছ থেকেই খবর পেল যে, জর্জ আব্রাহাম জনসনকে এফ.বি.আই চীফ-এর পদ থেকে এবং অ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থারকে সি.আই.এ চীফ-এর পদ থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। অন্যদিকে বিমান বন্দর থেকেই আহমদ মুসা পালিয়েছে। আরও জানল, জর্জ আব্রাহামের ছোট ছেলে জর্জ জন জুনিয়র নিখোঁজ। রহস্যের ব্যাপার হলো, তার চিঠি নিয়ে এসে জর্জ আব্রাহামের পার্সোনাল কম্পিউটার কারা যেন নিয়ে গেছে। তার কয়েক ঘন্টা আগে এফ.বি.আই হেড কোয়ার্টারের কম্পিউটার কক্ষ বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়েছে। খবরগুলো দিয়ে ব্রিগেডিয়ার স্টিভ স্টিফেনসন বলল, 'পরিস্থিতি খুব জটিল হয়ে উঠেছে স্যার। আপনার রিপোর্টে যা বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা অফিস তার উল্টো কথা বলছে। আমি পুরোটা আপনার কাছে পাঠাচ্ছি স্যার।'

'পাঠাও স্টিভ। আমি যে রিপোর্ট পাঠিয়েছি, তার প্রতিটা বর্ণ সত্য। আমরা বড় কোন ষড়যন্ত্রের মুখে স্টিভ।'

বলে টেলিফোন রেখে দিল জেনারেল শেরউড।

টেলিফোন রাখার পর হতভম্বের মত কিছুক্ষণ বসে থাকল জেনারেল শেরউড। ভাবছিল সে, জর্জ আব্রাহাম জনসনের মত প্রবীণ ও সুখ্যাত এবং অ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থারের মত ব্রিলিয়ান্ট অফিসার কখনও সাসপেন্ড হতে পারে! এতদূর এগিয়েছে ইহুদীবাদীরা। আহমদ মুসা গ্রেফতার এড়িয়ে পালিয়েছে, ভালই হয়েছে। তার বাইরে থাকা দরকার সত্য উদঘাটনের জন্যেই। এখন এই মুহূর্তে তার নিজের কি করণীয়?

হঠাৎ তার মনে হলো জর্জ আব্রাহামকে একবার তার টেলিফোন করা দরকার।

টেলিফোন করল। কিন্তু টেলিফোন কেউ ধরল না।

অনুসন্ধান করে জানতে পারল, তার টেলিফোন লাইন নষ্ট কোন কারণে।

মোবাইল টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করল জেনারেল শেরউড। কিন্তু জানা গেল এ লাইনটাও তার খারাপ।

বিস্মিত জেনারেল শেরউড। সে টেলিফোন করল অ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থারকে। তারও সব টেলিফোনের এই একই অবস্থা।

উদ্বেগ চরমে উঠল জেনারেল শেরউডের। তাদের টেলিফোন লাইনও নষ্ট, একথা তার বিশ্বাস হলো না। তার মনে হলো, তাদেরকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রাখা হয়েছে। তারা কি নজরবন্দীও?

লাল টেলিফোন তুলে নিল জেনারেল শেরউড। টেলিফোন করল সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটনকে।

জেনারেল শেরউডের গলা পেয়াই জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটন বলে উঠল, 'কখন তুমি ফিরলে শেরউড?'

'পাঁচ মিনিট আগে স্যার।'

'তিনজনের টীম গিয়েছিল লস আলামোসে। দুজন সাসপেন্ড, তুমি একজন বাকি।' বলল জেনারেল ওয়াশিংটন কতকটা রসিকতার সুরে।

'প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টনের হাত সম্ভবত আমার পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। স্যার, সবই আপনার জানার কথা। কিছু একটা করুন স্যার।' জেনারেল শেরউডের কন্ঠে উদ্বেগ।

'আহমদ মুসা সম্পর্কে রিপোর্টে যা লিখেছ, তা তোমার ইমপ্রেশন থেকে, না বিশ্বাস থেকে?'

'নিখাদ বিশ্বাস থেকে লিখেছি স্যার।'

'আহমদ মুসাকে আমিও কোনদিন পছন্দ করিনি। কিন্তু তার বিষয়ে একটা কথা আমি জানি, সে মিথ্যা কথা বলে না।'

'ধন্যবাদ স্যার। তার সাথে বেশ কিছু সময় থেকে আমার বিশ্বাস হয়েছে, উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাবার মত লোক সে নয়। তাছাড়া ঘটনার মধ্যে থেকে আমরা দেখেছি, প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা উপদেষ্টা যা বলেছেন তা সত্য নয়।'

'কিন্তু শেরউড, আহমদ মুসা মিরাকলগুলো ঘটাতে পারল কেমন করে?'

‘ওগুলো মিরাকল নয় স্যার, আহমদ মুসার অদ্ভুত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও বিশ্লেষণী শক্তির ফল। আমি সে সবের মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা দেখিনি স্যার।’

‘গ্রেফতার এড়িয়ে বিমান বন্দর থেকে তার পালানোর ব্যাখ্যা তুমি কিভাবে করবে? বলা হচ্ছে, ষড়যন্ত্রের মধ্যে ছিল বলেই এ পালাবার ব্যবস্থাও সে করে রেখেছিল।’

‘স্যার, আমার ধারণা ‘ফ্রি আমেরিকা’ আন্দোলনের দুঃসাহসী কেউ আহমদ মুসাকে সাহায্য করেছে। ইহুদীরা আহমদ মুসার পেছনে লাগায় ‘ফ্রি আমেরিকা’ আহমদ মুসাকে সাহায্য করছে।’ বলল জেনারেল শেরউড।

‘ফ্রি আমেরিকা’ আহমদ মুসাকে সাহায্য করায় ওরা কিন্তু সুযোগ পেয়েছে ঘটনাগুলো আহমদ মুসার সাজানো ষড়যন্ত্র বলার।’

‘ঠিক স্যার। কিন্তু কি করণীয়? ইহুদীরা তাদের এ ষড়যন্ত্র চাপা দিতে পারলে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। ইহুদী ষড়যন্ত্র সত্যিই আমাদের গিলে ফেলবে।’

‘কিন্তু প্রমাণ নেই শেরউড। প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা অফিস এবং প্রেসিডেন্টকে ওরা বুঝাতে পেরেছে। এখন কিছু করতে গেলে কাগজে-কলমে প্রমাণ করতে হবে।’

‘এ ধরনের ষড়যন্ত্র খুব কমই হাতে-কলমে প্রমাণ করা যায়। ইহুদী ঘাটি সবুজ পাহাড় থেকে লস আলামোস পর্যন্ত যে সুড়ঙ্গ আহমদ মুসা আবিষ্কার করেছেন, তার চেয়ে বড় প্রমাণ কি আর প্রয়োজন আছে স্যার?’

‘সে সুরঙ্গের একটা ব্যাখ্যা তারা দাঁড় করিয়েছে। প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা অফিস ও প্রেসিডেন্ট সে ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট।’

‘তাহলে ইহুদী কৌশলেরই কি জয় হবে স্যার?’

‘আমি তোমাকে একটা কথা বলি শেরউড। ইহুদীদের পাপের ভার বোধ হয় পূর্ণ হয়েছে। আহমদ মুসার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আগমন সম্ভবত তারই আলামত। এখন দরকার প্রমাণের। আহমদ মুসার গ্রেফতার এড়ানোর অর্থ একটা অবশ্যই আছে।’

‘ধন্যবাদ স্যার। মাফ করবেন স্যার, এফ.বি.আই এবং সি.আই.এ-কে নিষ্ক্রীয় করার পর আমার মতে সেনাবাহিনীই এখন জাতির ভরসা। সুতরাং আপনার উপর অনেক দায়িত্ব বর্তেছে স্যার।’

‘ধন্যবাদ শেরউড। বাই।’

জেনারেল শেরউড টেলিফোন রেখে সোজা হয়ে বসতেই আবার টেলিফোন বেজে উঠল।

ব্রিগেডিয়ার স্টিভ স্টিফেনসনের টেলিফোন। সে বলল, ‘স্যার আমাদের পেন্টাগন এলাকার সীমানায় একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে।’

‘কি ঘটেছে?’ উদ্বিগ্ন কন্ঠ জেনারেল শেরউডের।

‘দুটি গাড়ি একটা জীপকে তাড়া করে আমাদের দক্ষিণ প্রান্তের ডাইভারশন রোডে আসে। জীপটির আরোহী দুই ছেলে মেয়ে জীপ থামিয়ে পেন্টাগন এরিয়ায় পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু পেছনের দুটি গাড়ির গুলী বৃষ্টির মুখে তারা গাড়ি থেকে বের হতে পারে না। জীপের দুজন ছেলেমেয়েকে ওরা মেরেই ফেলতো। কিন্তু পেছন থেকে আরেকটি গাড়ি এ সময় এসে পড়ে। তারা সেই আক্রমণকারী গাড়ি দুটির উপর গুলী বর্ষণ করে ওদের থামিয়ে দেয়।

ঐ এলাকায় আমাদের প্রহরারত কর্ণেল তার পাঁচজন সাথী নিয়ে এ ঘটনায় হস্তক্ষেপ করে। সবাই নেমে আসে জীপ থেকে, দুই তরুণ তরুণী, মাঝের দুই গাড়ি থেকে দশজন এবং শেষে আসা গাড়ির দুজন। বিস্ময়ের ব্যাপার গাড়ি থেকে আমাদের লোকদের চোখের সামনে সেই দশজনের একজন গ্রেনেড ছুঁড়ে ঐ দুই তরুণ তরুণীকে হত্যার চেষ্টা করে। পেছনের গাড়ির দুজনের একজন ঠিক সময়ে গ্রেনেড নিক্ষেপকারী লোকটির হাত লক্ষ্যে গুলী করে। তরুণ তরুণী বেঁচে যায়, কিন্তু গ্রেনেডের ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে ঐ দশ জনের মাঝখানে। ওদের ৬ জন নিহত, ৪ জন মারাত্মক আহত। সবাইকে পেন্টাগনে নিয়ে আসা হয়েছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো তাদের পরিচয়। তরুণটি জর্জ আব্রাহাম জনসনের ছেলে আর মেয়েটি ইহুদী ধন কুবের আইজ্যাক বেনগুরিয়ানের মেয়ে। দুজনেই জেনারেল শ্যারনের বন্দীখানা থেকে পালিয়েছে। পেছনে ধাওয়া করা শ্যারনদের লোকরাই.........’

‘আর শোনার দরকার নেই, এই মুহূর্তে ওদের এখানে নিয়ে এস। আমিই শুনব ওদের কাছে। কোন গুরুতর ব্যাপার মনে হচ্ছে ব্রিগেডিয়ার।’ বলল জেনারেল শেরউড।

‘ঠিক আছে স্যার, আমি আসছি।’

টেলিফোন রেখে দিল জেনারেল শেরউড।

তার ভ্রু দুটি কুঞ্চিত হলো। চোখে মুখে একটা উত্তেজনা। এফ.বি.আই প্রধানের নিখোঁজ ছেলে জেনারেল শ্যারনদের হাতে বন্দী ছিল? তাহলে তার হাতে চিঠি লিখিয়ে নিয়ে শ্যারনদের লোকরাই জর্জ আব্রাহামের মাস্টার কম্পিউটার নিয়ে গেছে? এর অর্থ কি দাঁড়াচ্ছে, এফ.বি.আই হেড কোয়ার্টারের কম্পিউটার কক্ষটি জেনারেল শ্যারনের লোকরাই ধ্বংস করেছে?

দুচোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল জেনারেল শেরউডের। তার মনে হলো, সামনে এগুবার একটা দরজা যেন তার সামনে খুলে গেল।

মিনিট খানেকের মধ্যেই জেনারেল শেরউডের পি.এস টেলিকমে বলে উঠল, ‘স্যার ব্রিগেডিয়ার সাহেবরা এসেছেন।’

‘নিয়ে এস ওদের।’ জেনারেল শেরউড বলল।

ব্রিগেডিয়ার স্টিভ সবাইকে নিয়ে প্রবেশ করল জেনারেল শেরউডের অফিস কক্ষে।

সবাইকে স্বাগত জানানোর জন্যে জেনারেল শেরউড দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

সবার দিকে নজর বুলাতে গিয়ে আহমদ মুসার উপর নজর পড়তেই আনন্দ, বিস্ময় ও আকস্মিকতায় বিমূঢ় হয়ে পড়ল জেনারেল শেরউড। কিন্তু সেটা কয়েক মুহূর্তের জন্যে।

পরক্ষণেই সে ছুটল আহমদ মুসার দিকে। সে যে একজন জেনারেল তা যেন ভুলে গেল। ভুলে গেল তাদের সামরিক ফর্মালিটির কথা। জেনারেল শেরউড ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে। বলল, ‘এই মুহূর্তে আমি সবচেয়ে বেশি আশা করছিলাম আপনাকে। ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ।’

তারপর জেনারেল শেরউড আহমদ মুসাকে হাত ধরে টেনে এনে চেয়ারে বসাল। তারপর সবাইকে বসার অনুরোধ করল।

ব্রিগেডিয়ার স্টিভ স্টিফেনসনের দুই চোখ তখন বিস্ময়ে ছানাবড়া। জেনারেল শেরউডের মত কঠোর, রাশভারি ও সার্বক্ষণিক ফরমাল লোক এই লোকটিকে দেখে তার সব বৈশিষ্ট্য ভুলে গেলেন কি করে! কোন মানুষের বেলায়ই জেনারেল যা কোনদিন করেননি, এই লোকটির ক্ষেত্রে তা তিনি করলেন কেন? তার মত লোক তার অফিস কক্ষে সবার চোখের সামনে সিট থেকে উঠে এসে একজনকে জড়িয়ে ধরবেন, এটা একটা অকল্পনীয় ব্যাপার। অসীম ভাগ্যবান এই লোকটি কে?

কতকটা এই ধরনেরই প্রশ্ন জর্জ জুনিয়র ও সাবা বেনগুরিয়ানের মনেও। কে এই লোক? পেন্টাগনের একটি শীর্ষ পদের একজন ডাকসাইটে জেনারেল সিট থেকে উঠে এসে যাকে জড়িয়ে ধরেন এবং হাত ধরে নিয়ে গিয়ে সম্মানের সাথে চেয়ারে বসান, তাঁর পরিচয় কি হতে পারে? জর্জ জুনিয়র ও সাবা বেনগুরিয়ান দুজনেরই মনে পড়ল, এই লোকটি ঠিক সময়ে গুলী করে গ্রেনেড নিক্ষেপ না ঠেকালে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। কি তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, কি অদ্ভূত তাঁর ক্ষীপ্রতা। আব্বাদের সাথে নিউ মেক্সিকো থেকে এসে গ্রেফতার এড়িয়ে পালিয়েছেন। তাহলে তো উনি আব্বাদের সাথেরই লোক। কে তাহলে এই লোক? যাহোক ঈশ্বর তাঁকে পাঠিয়েছেন তাদের দুজনকে বাঁচাতে।

সকলকে বসতে বলে জেনারেল শেরউড গিয়ে তার চেয়ারে বসল।

বসেই ব্রিগেডিয়ার স্টিভকে বলল আহমদ মুসাকে দেখিয়ে, 'তুমি নিশ্চয় এঁকে চিনতে পারনি?'

'না স্যার।'

'তুমি তাকে জান, দেখনি। কিন্তু ফটো তো দেখেছ।' বলল জেনারেল শেরউড।

ভ্রু কুঞ্চিত হলো ব্রিগেডিয়ার স্টিভের। তীক্ষ্ণ হলো তার দৃষ্টি।

হঠাৎ লাফিয়ে উঠল চেয়ার থেকে। বলল, 'ইনি আহমদ মুসা! স্যার, ইনি আহমদ মুসা?' তার কন্ঠে একটা উচ্ছ্বাস, চোখে তার বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টি।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডশেক করল ব্রিগেডিয়ার স্টিভের সাথে। বলল, 'হ্যাঁ, আমি আহমদ মুসা।'

‘খুশি হলাম, স্যার।’ বলল ব্রিগেডিয়ার স্টিভ।

বিস্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টি তখন জর্জ জুনিয়র ও সাবা বেনগুরিয়ানেরও। সাবা বেনগুরিয়ানও অনেক শুনেছে আহমদ মুসা সম্পর্কে পিতার কাছে এবং জেনারেল শ্যারনের কাছে। তার কাছে ছিল আহমদ মুসার একটা ভয়ংকর রূপ। কিন্তু আহমদ মুসাকে এখন খুবই আকর্ষণীয় ও নিষ্পাপ এক ভদ্রলোক বলে মনে হচ্ছে তার কাছে। তাদেরকে বাঁচিয়েছেন বলেই কি! কিন্তু জেনারেল শেরউডের মত লোকদেরও সম্মান ও শ্রদ্ধা তিনি অর্জন করেছেন দেখা যাচ্ছে।

জর্জ জুনিয়র তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। সে অনেকটা দ্বিধাগ্রস্ত হাত বাড়াল আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘আব্বা-আম্মার কাছে আপনার অনেক গল্প শুনেছি। জর্জ এডওয়ার্ড মুর সম্পর্কে আলোচনা উঠলে আপনার কথা ওঠেই।’

জর্জ আব্রাহাম জনসনের নাতি এবং সেনা গোয়েন্দা অফিসার জর্জ মুর আব্রাহামের ছেলে জর্জ এডওয়ার্ড মুরকেই আহমদ মুসা ওহাইও নদীতে ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচিয়েছিল।

আহমদ মুসা হাসি মুখে তার সাথে হ্যান্ডশেক করল। বলল, ‘আলহামদুলিল্লাহ, এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তোমার সাথে দেখা হলো।’

‘কিন্তু মিঃ আহমদ মুসা, আপনার জর্জ আব্রাহামের নাতিকে বাঁচানো এখন জর্জ আব্রাহামের বিরুদ্ধে আপনার সাথে যোগসাজসের একটা বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।’

‘উপযুক্ত কারণ বটে।’ হেসে বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই জেনারেল শেরউড জর্জ জুনিয়রের দিকে চেয়ে বলল, ‘জর্জ, আমরা একটা কঠিন সময় অতিক্রম করছি। লস আলামোসের তদন্তে তোমার আব্বার সাথে আমিও ছিলাম। যা আমাদের কাছে সত্য, তা মিথ্যায় পরিণত হয়েছে। যে এফ.বি.আই চীফ বাদি হয়ে কেস দায়ের করবেন, তিনিই এখন আসামী। এই অবস্থায় কি সহযোগিতা করতে পার তোমরা? আমরা কিভাবে হাতে-কলমে প্রমাণ করব যে, তোমাদের ও অন্যসব ঘটনার সাথে জেনারেল শ্যারন জড়িত আছেন?’

জর্জ জুনিয়র কথা বলার আগেই সাবা বেনগুরিয়ান কথা বলে উঠল। বলল, ‘স্যার আমি নিজের কানে শুনেছি, জেনারেল শ্যারন টেলিফোনে ইহুদী গোয়েন্দা বেনইয়ামিনকে বলছেন যে, লস আলামোসে ডেথ স্কোয়াড পাঠানো হয়েছে এবং বেনইয়ামিনও যেন সেদিকে যায় ঘটনার বিবরণ সংগে সংগে দেবার জন্যে। তারপর তিনিই আমাকে নিয়োগ করেন জর্জ আব্রাহামের লস আলামোস সংক্রান্ত কম্পিউটার রেকর্ড নষ্ট করার জন্যে।’

‘তুমি জর্জ জুনিয়রের বন্ধু হিসেবে এই কথাগুলো সাজিয়েছ। তোমার বলার কি আছে? বল?’ বল জেনারেল শেরউড।

সাবা বেনগুরিয়ান কানে কানে জর্জ জুনিয়রের সাথে কথা বলল। জর্জ জুনিয়র সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। দুজনের মুখই আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

সাবা বেনগুরিয়ানই কথা বলল, ‘স্যার একটা ডকুমেন্ট বোধ হয় আমি আনতে পেরেছি। আমাদের বাড়ির চারদিকসহ গেট, গেটের পরের লন ও করিডোর এবং ড্রয়িং রুমে সার্বক্ষণিক ভিডিও ক্যামেরা পাতা আছে। আমার সাথে জেনারেল শ্যারন যেসব কথা বলেন এবং আমাকে ও আব্বাকে যখন জেনারেল শ্যারন অন্যত্র সরিয়ে নেবার প্রস্তাব করেন, তখন আব্বা ও জেনারেল শ্যারনের যে আলাপ হয়, তাতে জেনারেল শ্যারন বর্তমান বিপদ ও ভবিষ্যত নিয়ে অনেক কথা বলেন। আমি আড়াল থেকে শুনেছি। আমাকে ও আব্বাকে যখন তার লোকজন গিয়ে নিয়ে আসে তার আগেই আমি ভিডিও ক্যামেরার রীল বের করে নিয়ে নেই এবং আসার সময় গেটের দারোয়ানকে দিয়ে আসি জর্জ জুনিয়রকে দেবার জন্যে। ওটা জর্জের কাছে আছে।’

জেনারেল শেরউড ও আহমদ মুসা দুজনের মুখই আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

‘শ্যারনের বন্দীখানায় ওরা সার্চ করে ওটা নিয়ে নেয়নি?’ বলল ব্রিগেডিয়ার স্টিভ অনেকটা দ্রুত কন্ঠে। তার চোখে মুখে যেন কিছুটা অস্বস্তি।

‘খুব সাধারণ জায়গায় রেখেছিলাম। শুধু ওখানটায় ওদের সার্চ বাকি ছিল।’ বলল জর্জ জুনিয়র।

‘ধন্যবাদ জর্জ ও সাবা। একটা অতি ভাল খবর পাওয়া গেল। কিন্তু ভিডিওতো পরীক্ষা করা হয়নি?’ বলল জেনারেল শেরউড।

‘এখন পরীক্ষা করা যায় স্যার।’ বলল ব্রিগেডিয়ার স্টিভ। তার কন্ঠে উৎকণ্ঠিত আগ্রহ।

‘না থাক।’ এ কথা বলে জেনারেল শেরউড একটু থামল। তারপর আবার বলল আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে, ‘মিঃ আহমদ মুসা, প্রমাণ সংগ্রহ সম্পর্কে আপনি কিছু ভাবছেন?’

‘মিস সাবার আব্বাকে যেখানে বন্দী করে রাখা হয়েছে, সে ঠিকানা মিস সাবা জানে। তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করা গেলে সেটা একটা প্রমাণ হতে পারে।’

‘ঠিক। এ মিশন এই মুহূর্তেই আমরা হাতে নিতে পারি।’

এ সময় বেঞ্জামিন বেকন আহমদ মুসার কানে কানে কিছু বলল। আহমদ মুসার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল জেনারেল শেরউডকে লক্ষ্য করে, ‘মিঃ জেনারেল, আরও একটা ডকুমেন্ট আমাদের হাতে আছে।’

‘কি সেটা?’ উদগ্রীব কন্ঠে বলল জেনারেল শেরউড।

‘সে টেপটা এখনও পরীক্ষা করা হয়নি। টেপটা জেনারেল শ্যারন ও জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টনের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার একটা রেকর্ড।’

ভ্রু কুঞ্চিত হয়ে উঠল জেনারেল শেরউডের। ‘সত্যি সে রেকর্ড আপনাদের কাছে আছে? কিন্তু কোথায় পেলেন সেটা? আপনি তো আমাদের সাথেই এলেন।’

আহমদ মুসা বেঞ্জামিন বেকনের দিকে ইংগিত করে বলল, ‘ইনিই আমাকে এয়ারপোর্ট থেকে গ্রেফতার বাঁচিয়ে নিয়ে এসেছেন। টেপটা এরই সংগ্রহ।’

‘ও, হো! ওর সাথে পরিচয় তো হয়নি।’

বলে বেঞ্জামিন বেকনের দিকে জেনারেল শেরউড হাত বাড়িয়ে বলল, ‘হ্যাল্লো।’

আহমদ মুসা কথা বলে উঠল বেঞ্জামিন বেকনের আগে। বলল, ‘ওর পরিচয়টা একটু বিদঘুটে। ওর পরিচয়টা পরে হবে মিঃ জেনারেল।’

হাসল জেনারেল শেরউড। বলল, ‘একবার কথাটা উঠার পর পরিচয়টা হয়ে যাওয়াই সব দিক থেকে শোভন নয় কি আহমদ মুসা?’

‘ঠিক বলেছেন জেনারেল।’

বলে আহমদ মুসা বেঞ্জামিন বেকনের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, তারপর বলল, ‘ইনি এফ.বি.এই-এর অফিসার বেঞ্জামিন বেকন। ছুটিতে আছেন। তার আরেকটা পরিচয় তিনি ‘ফ্রি আমেরিকা’ সংগঠনের সদস্য।’

জেনারেল শেরউড উঠে দাঁড়িয়ে হ্যান্ডশেক করল বেঞ্জামিন বেকনের সাথে।

ব্রিগেডিয়ার স্টিভ বেঞ্জামিনের দিকে তাকিয়ে শুধু মাথা নাড়ল। উঠল না। তার চোখে মুখে একটা ভাবান্তর।

জেনারেল শেরউড তার ডান দিকের লাল টেলিফোনে হাত রেখে বলল, ‘মাফ করুন আপনারা, আমি একটু চীফ জেনারেল স্যারের সাথে কথা বলে নেই। আমার মনে হয় কোন কাজেই এখন আর এক মুহূর্ত দেরী করা ঠিক নয়। তাঁর সাথে এখনি সাক্ষাৎ হওয়া দরকার।’

ব্রিগেডিয়ার স্টিভ বলে উঠল, ‘স্যার, আমি কি একটু উঠতে পারী? পাঁচ মিনিট পর আসব।’

‘এস। চীফ স্যার তোমাকে উপস্থিত চাইতে পারেন।’

‘আসছি স্যার।’ বলে উঠে দাঁড়াল ব্রিগেডিয়ার স্টিভ।

ব্রিগেডিয়ার স্টিভ বেরিয়ে যেতেই আহমদ মুসা দ্রুত জেনারেল শেরউডকে বলল, ‘মাফ করুন জেনারেল, আপনাদের টেলিফোন মনিটরিং ব্যবস্থা নিশ্চয় আছে?’

‘আছে। কেন?’ উৎসুক কন্ঠ জেনারেল শেরউডের।

‘এই মুহূর্ত থেকে পাঁচ মিনিট পর্যন্ত আপনার এ বিভাগ থেকে যতগুলো টেলিফোন বাইরে যাবে, তা মনিটর করুন।’

‘কেন?’

‘আমার মনে হচ্ছে, কতকগুলো সিক্রেট কথা এ সময় বাইরে পাচার হবে।’

ভ্রু কুঁচকে উঠল জেনারেল শেরউডের। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে দ্রুত কন্ঠে বলল, 'আমি আপনার ইঙ্গিত বুঝতে পেরেছি মিঃ আহমদ মুসা।' তার কন্ঠে উত্তেজনা।

জেনারেল শেরউড দ্রুত উঠে পেছনের দরজা দিয়ে পাশের কক্ষে প্রবেশ করল।

বেঞ্জামিন বেকন, জর্জ জুনিয়র ও সাবা বেনগুরিয়ান সবার দৃষ্টি আহমদ মুসার দিকে। তারা সবাই অবাক হয়েছে। কিন্তু সবাই নিরব।

আহমদ মুসাই কথা বলল, 'জর্জ জুনিয়র, আমি জর্জ আব্রাহাম ও অ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থারের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিয়েও চিন্তিত।'

'আব্বা নিশ্চয় বাসায় ফিরেছেন। বাসাতেও নিরাপদ নন?' বলল জর্জ জুনিয়র।

'বাসাতে পাহারা এখনো থাকবে নিশ্চয়।'

'তা থাকার কথা। সাসপেন্ড তো চাকরীচ্যুতি নয়।'

তাদের মধ্যে আলোচনা চলছিল। কিছু সময় পর ঘরে প্রবেশ করল জেনারেল শেরউড। তার মুখ গম্ভীর। ভীষণ এক নিম্নচাপের লক্ষণ। চেয়ারে বসতে বসতে বলল, 'ধন্যবাদ আহমদ মুসা।'

ঘরে প্রবেশ করল ব্রিগেডিয়ার স্টিভ।

জেনারেল শেরউডের মুখটা যেন আরও কঠোর হয়ে উঠল। ব্রিগেডিয়ার স্টিভের দিকে না তাকিয়েই জেনারেল শেরউড বলল, 'তোমার টেলিফোন ঠিক পাঁচ মিনিটেই শেষ করেছ স্টিভ।' ব্রিগেডিয়ার স্টিভ ভূত দেখার মত চমকে উঠল। হঠাৎ তার মুখে যেন এক পোঁচ কালি কেউ ঢেলে দিল।

ঘরে প্রবেশ করল দুজন মিলিটারী পুলিশ।

সবাই তাকাল দুজন মিলিটারী পুলিশের দিকে। ব্রিগেডিয়ার স্টিভও। তার চোখে মুখে তখন চাঞ্চল্য।

দুজন মিলিটারী পুলিশ পা ঠুকে স্যালুট করল জেনারেল শেরউডকে।

‘ব্রিগেডিয়ার স্টিভকে গ্রেফতার কর।’ পুলিশ দুজনের দিকে একবার মাথা তুলে তাকিয়েই নির্দেশ দিল জেনারেল শেরউড। বজ্রপাতের মতই তার কন্ঠ স্থির, তীব্র।

উঠে দাঁড়িয়েছিল ব্রিগেডিয়ার স্টিভ। তার মুখ ফ্যাঁকাশে হয়ে গিয়েছিল। কাঁপছিল যেন সে। নিজেকে ঠিক রাখার চেষ্টা করে বলল, ‘আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আমার অপরাধ কি স্যার?’

‘যথা সময়ে মিলিটারী ট্রাইবুন্যালই তোমাকে জানাবে ব্রিগেডিয়ার স্টিভ।’ কঠোর কন্ঠ জেনারেল শেরউডের।

মিলিটারী পুলিশ দুজন ব্রিগেডিয়ার স্টিভের দুহাতে হাতকড়া লাগিয়ে তাকে নিয়ে বের হয়ে গেল ঘর থেকে।

ঘরে তখন পিনপতন নিরবতা। একমাত্র আহমদ মুসা ছাড়া অন্য সকলেই বিস্ময়-বিমূঢ়।

নিরবতা ভাঙল জেনারেল শেরউড। বলল, ‘আবার আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি আহমদ মুসা। এক বিশ্বাসঘাতককে আপনি ধরিয়ে দিয়েছেন।’

বলে একটু থামল। চেয়ারটা একটু টেনে নিয়ে নড়ে-চড়ে বসল। বলল, ‘বলুন তো ব্রিগেডিয়ার স্টিভকে কখন কিভাবে সন্দেহ হলো? তাকে কি আগে থেকে চিনতেন?’

‘না, চিনতাম না। কিছুক্ষণ আগে আজই প্রথম দেখা তার সাথে।’

বলে থামল আহমদ মুসা। একটু হাসল। বলল, ‘ঘটনা হয়তো বড় তেমন কিছু নয়। কিন্তু যা ঘটেছে তাতেই আমার নিশ্চিত বিশ্বাস হয়েছে, ব্রিগেডিয়ারের আরেকটা পরিচয় আছে।’

‘কি সে ঘটনা?’

‘প্রথমে তার হাতের সোনার আংটি আমার চোখে পড়ে। আংটিতে একটি হিব্রু অক্ষর খোদাই করা। সেটা জেনারেল শ্যারনের আদ্যাক্ষর। প্রথম সন্দেহ আমার সৃষ্টি হয় এখান থেকেই। ইহুদী ছাড়া অথবা ইহুদীদের প্রতি বড় রকমের ভালবাসা ছাড়া কারও মধ্যে এই হিব্রু প্রীতি থাকা সম্ভব নয়। আর .........’

আহমদ মুসার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে জেনারেল শেরউড বলে উঠল, 'মিঃ আহমদ মুসা, তার হাতের আংটি আমারও চোখে পড়েছে। চারদিকে হীরক খচিত তার আংটির প্রশংসা পর্যন্ত আমি করেছি। কিন্তু হিব্রু অক্ষর তো আমি খেয়াল করিনি।'

'হিব্রু অক্ষর আরবী ক্যালিওগ্রাফিক ঢংয়ে লেখা। খুব ভালো করে খেয়াল না করলে বোঝা খুব কঠিন।' বলল আহমদ মুসা।

'ধন্যবাদ। তারপর বলুন।' জেনারেল শেরউড বলল।

'দ্বিতীয় সন্দেহ হয় তার একটা টেলিফোন থেকে। আমাদের ঘটনা শোনার পর তিনি আপনার কাছে টেলিফোন করেন। কিন্তু তার আগে আরও এক জায়গায় টেলিফোন করেন তিনি। সে টেলিফোন নাম্বার আমাকে বিস্মিত করে। সন্দেহটাকে দৃঢ় করে। টেলিফোন নাম্বারটা পেন্টাগনের নয়, কিংবা নয় প্রেসিডেন্ট ভবনেরও। টেলিফোনে তিনি নিজের নাম বলেননি। যার কাছে করেছিলেন তাকে নাম ধরে সম্বোধনও করেননি। আমাদের ঘটনা এবং জর্জ জুনিয়র ও সাবা বেনগুরিয়ানের বিষয়ে যে সব তথ্য টেলিফোনে জানালেন, তা অনেকটা সাংকেতিক ধরণের। যা খুবই অস্বাভাবিক।'

'মিঃ আহমদ মুসা, টেলিফোন নাম্বারটা কি এই?' বলে একটা টেলিফোন নাম্বার বলল জেনারেল শেরউড।

আহমদ মুসা মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ এটাই সেই নাম্বার।'

'জানেন, কার নাম্বার এটা?'

'না।'

'নাম্বারটা 'আমেরিকান জুইস পিপললস লীগ' (AJPL)-এর সভাপতির নাম্বার। মাঝে মাঝে জেনারেল শ্যারনও এ টেলিফোনে কথা বলেন।'

'আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে তো আমাদের হাতে আরেকটা বড় প্রমাণ জুটল।' আহমদ মুসা বলল।

'এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আপনার আহমদ মুসা। আপনার অদ্ভূত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। একজন বিশ্বাসঘাতককে ধরিয়ে দিয়েছেন এবং শত্রুর হাতে অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য পাচার বন্ধ করতেও সাহায্য করেছেন।'

'কেন, টেলিফোন উনি করতে পারেননি?'

'উনি জানেন টেলিফোন তিনি করেছেন, কিন্তু তার কথার একটা শব্দও বাইরে যায়নি। আমাদের সুপার সেনসেটিভ গ্রাহক যন্ত্র ও ব্লকড সিস্টেম তার মোবাইলের প্রতিটি বর্ণ রেডিও ওয়েভ থেকে শুষে নিয়েছে।'

'ধন্যবাদ মিঃ জেনারেল। তথ্যগুলো ইহুদীদের হাতে পড়লে তারা আত্মরক্ষার সুযোগ পেত। সে সুযোগ আপনি তাদের দেননি।'

'আমি কি করলাম। আপনি যা বললেন আমি তো শুধু সেটুকুই করেছি। আচ্ছা বলুন তো, পাঁচ মিনিটের জন্য ব্রিগেডিয়ার স্টিভ বাইরে যাচ্ছেন টেলিফোন করার জন্যে এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত হলেন কি করে?' জেনারেল শেরউড বলল।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'বিশ্বাসঘাতকদের সাইকোলজী হলো, বিশ্বাসঘাতকতার কাজ তারা প্রথম সুযোগেই করে থাকে।'

'ধন্যবাদ মিঃ আহমদ মুসা।'

বলে একটু থামল জেনারেল শেরউড। একটু ভাবল। বলল, 'আমি চীফ স্যারের সাথে এখনই এসব বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই। তার আগে আসুন আমরা মিস সাবার বাসার ভিডিও এবং জেনারেল হ্যামিল্টন ও জেনারেল শ্যারনের কথোপকথনের ভিডিও দেখি। ব্রিগেডিয়ার স্টিভের টেলিফোন রেকর্ডও আপনারা শুনবেন।'

কথা শেষ করেই জেনারেল শেরউড উঠে দাঁড়াল এবং পাশের কক্ষে চলে গেল। একটু পরেই সবাইকে ডেকে নিল জেনারেল শেরউড। প্রবেশ করল পাশের ঘরে।

ঘরটি বেশ বড়। নানা যন্ত্রপাতিতে ঠাসা। বিভিন্ন টেবিলে অনেকগুলো চেয়ার।

চেয়ারগুলোকে ঘরের মাঝখানে সাজানো হয়েছে। সামনে একটা বড় কম্পিউটার স্ক্রীন। সাজানো-গোছানো একটা ড্রয়িং রুমের দৃশ্য ফুটে উঠেছে।

আহমদ মুসারা সবাই বসল।

‘প্রথমে সাবা বেনগুরিয়ানের ভিডিও ফিল্ম দেখানো হচ্ছে।’

শুরু হলো ভিডিও ফিল্মের প্রদর্শন।

মার্কিন সশস্ত্রবাহিনী প্রধান জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটনের বিশাল কনফারেন্স কক্ষ।

একটা গোল টেবিলের একপাশে একপাশে বসেছেন মার্কিন সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান রোনাল্ড ওয়াশিংটন। তার ডান পাশে বসেছে এ্যালাইড কমান্ড কমিটির দুজন সদস্য বিমান ও নৌ বাহিনী প্রধান। আর তার বাম পাশে বসেছে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান ও আভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার প্রধানদ্বয়।

গোল টেবিলের অন্যপাশে বসেছে আহমদ মুসা, বেঞ্জামিন বেকন, জর্জ জুনিয়র ও সাবা বেনগুরিয়ান।

সভার শুরুতেই জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটন বলেন, ‘কতিপয় ঘটনা আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে একটা সংকটের সৃষ্টি করেছে। সবুজ পাহাড় থেকে লস আলামোসের সুপার সেনসেটিভ কম্পিউটার কক্ষ পর্যন্ত একটা সুড়ঙ্গ আবিষ্কৃত হয়েছে। এটা যদি ইহুদীদের গোয়েন্দা সুড়ঙ্গ হয়, তাহলে এটা আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের এক মহাদূর্ঘটনা। আবার এটা কোন আপতকালীন গোপন বহিরাগমন পথ কিনা? তারপর আমাদের নিরাপত্তা গোয়েন্দা কমিটির সদস্যরা ফেরার সময় লস আলামোস থেকে সান্তাফে বিমান বন্দর পর্যন্ত হামলা, হত্যাকান্ড ও বিমান ধংসের যে দুটি ঘটনা ঘটেছে, তা কারা কোন উদ্যেশ্যে ঘটিয়েছে? এ সবের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা সরকারের কাছে এসেছে, তার কোনটি সত্য? তাছাড়া সাবা বেনগুরিয়ান ও জর্জ জুনিয়রকে কারা কেন কিডন্যাপ করেছিল? সাবা বেনগুরিয়ানের পিতাকে কারা কিডন্যাপ করেছে এবং কেন? এসব প্রশ্নের উত্তর আমাদের প্রয়োজন। সাবা বেনগুরিয়ান ও তার পিতার ঘটনাটি ছাড়া অন্য সব বিষয়ের বিবরণ সরকার ও আমাদের কাছে রয়েছে। প্রশ্নগুলোর একটা ব্যাখ্যা সরকারের কাছে রয়েছে। যার ফলে এফ.বি.আই ও সি.আই.এ চীফ বরখাস্ত

হওয়ার মত ঘটনা ঘটেছে। সত্য তিক্ত হলেও সত্য সত্যই। কিন্তু মিঃ আহমদ মুসা ও মিঃ জর্জদের কাছ থেকে অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য ও দলিল এসেছে। যা সরকারের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ পাল্টে দিতে পারে। সব চেয়ে বড় কথা এই সত্য উদঘাটনে আমাদের রাষ্ট্র উপকৃত হবে সবচেয়ে বেশি। এই চিন্তা করেই আমি আপনাদেরকে আমার এ্যালাইড কমান্ড কমিটির সামনে হাজির করেছি। সত্য উদঘাটনে আমরা আপনাদের সহযোগিতা চাই। তাতে আমরা লাভবান হবো এবং আহমদ মুসা আপনিও লাভবান হবেন। অভিযোগ থেকে মুক্তি পাবেন।' কথাগুলো বললেন জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটন আহমদ মুসাদের লক্ষ্য করে শান্ত ও গম্ভীর কন্ঠে।

উত্তরে আহমদ মুসা বলল, 'ধন্যবাদ জেনারেল ওয়াশিংটন। আমি নিজেকে অভিযোগ থেকে বাঁচানোর চাইতে মার্কিন জনগণের চোখের উপর থেকে অন্ধত্বের কালোপর্দা ছিঁড়ে ফেলতে চাই। আমাদেরকে এ সুযোগ দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ।'

জেনারেল ওয়াশিংটন ও তার টিমের অন্যান্য সদস্যদের চোখে মুখে অস্বস্তির একটা ছায়া নেমে এল। জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটন বলে উঠলেন, 'মন্তব্য একটু কঠোর হলো না মিঃ আহমদ মুসা? মার্কিন জনগণ স্বাধীন ও স্বনির্ভর, তারা অন্ধ নয়। আর তারা তাদের রক্ষা করতে সমর্থও।' জেনারেল ওয়াশিংটনের কন্ঠে কিছুটা সামরিক রুক্ষতা।

কিন্তু আহমদ মুসার চোখে মুখে কোনই ভাবান্তর এল না। বলল, 'আমি দুঃখিত জেনারেল। গণতান্ত্রিক দেশে সরকার যদি জনগণের দ্বারা ও জনগণের জন্যে হয়, তাহলে সরকারের অন্ধত্ব জনগণের অন্ধত্ব হয়ে দাঁড়ায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও তাই হয়েছে। বাইরে কোন স্থান থেকে লস আলামোস পর্যন্ত সুড়ঙ্গ আবিষ্কার হওয়ার মত মারাত্মক ঘটনা ঘটার পর সেখানে গিয়ে এফ.বি.আই, সি.আই.এ ও সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার শীর্ষ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত তদন্ত কমিটি যে প্রাথমিক রিপোর্ট পাঠাল তা শুধু উপেক্ষা নয়, সেই শীর্ষ ব্যক্তিদের দুজনকে বরখাস্ত করা হলো তারা ফেরার আগে এবং তাদের কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই। কোন গণতান্ত্রিক সরকার অন্ধ না হলে, জনগনকে অন্ধ মনে না করলে এই ধরণের পদক্ষেপ নিতে পারে না।'

‘আমি এ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করবো না।’

বলে একটু হাসল জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটন। তারপর বলল, ‘সময় নষ্ট না করে আসুন আমরা কাজের কথায় আসি। এ ব্যাপারে কিছু বলবেন আপনি?’

‘পুরো ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ আপনাদের কাছে আছে। আপনারা জানেন সবকিছু। এখন আপনাদের প্রয়োজন প্রশ্নগুলোর জবাব। আমি মনে করি অধিকাংশ প্রশ্নের জবাব আপনারা পেয়ে যাবেন সাবা বেনগুরিয়ানের বাসার এবং জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন ও জেনারেল শ্যারনের কথোপকথোনের টেপ থেকে। যদি কিছু বাকি থাকে, আমরা সাহায্য করব।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ধন্যবাদ মিঃ আহমদ মুসা।’

বলে জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটন জেনারেল শেরউডের দিকে তাকাল। তারপর বলল, ‘শুরু কর তাহলে শেরউড।’ তাদের গোল টেবিলের পাশেই একটা ট্রলিতে বড় একটা কম্পিউটার।

জেনারেল শেরউড রিমোট প্লেয়ার হাতে নিয়ে তার কীতে চাপ দিল। বিশাল কম্পিউটারের স্ক্রীনে একটা ড্রয়িং রুমের দৃশ্য ফুটে উঠল।

‘আমরা সাবা বেনগুরিয়ানদের ভিডিও থেকে শুরু করছি। আমরা দেখছি সাবা বেনগুরিয়ানদের বৈঠক খানার দৃশ্য।’ বলল জেনারেল শেরউড।

শুরু হল ভিডিও শো।

জেনারেলদের দৃষ্টি ধীরে ধীরে আঠার মত লেগে গেল কম্পিউটার স্ক্রীনে।

তাদের চোখে কখনও বিস্ময়, কখনও উদ্বেগ। পাথরের মত নিশ্চল বসে তারা। দুটি ভিডিও টেপেরই প্রদর্শন শেষ হলো। কিন্তু জেনারেলদের চোখ কম্পিউটার স্ক্রীন থেকে সরেনি। গভীর বিস্ময় ও উদ্বেগ তাদের চোখে মুখে।

ধীরে ধীরে জেনারেলরা চেয়ারে হেলান দিল। নিচু হলো তাদের মুখ।

জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটন সামনের গ্লাসের ঢাকনা সরিয়ে পানি পান করল, নড়ে চড়ে বসল সে।

তারপর তার দুপাশের জেনারেলদের সাথে ফিস ফিসে কন্ঠে কিছু পরামর্শ করল এবং তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘ধন্যবাদ আহমদ মুসা।

কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আপনাকে আমাদের সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে, আমার জাতির পক্ষ থেকেও।' আবেগপূর্ণ গম্ভীর কন্ঠ জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটনের।

বলে মুহূর্তকালের জন্যে একটু থেমে আবার বলল, 'আমার কোন জিজ্ঞাসা নেই আহমদ মুসা। ঘটনার যে বিবরণ আমাদের কাছে আছে, যেসব তথ্য আমরা পেয়েছি এবং যে জীবন্ত ডকুমেন্ট আমরা দেখলাম, তাতে আর কোন প্রমাণের প্রয়োজন আপাতত নেই। আমরা প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করছি। আমাদের অনুরোধ প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করা ও এর রেজাল্ট পর্যন্ত আপনারা আমাদের সাথে থাকুন। পেন্টাগনের অতিথি ভবনে আপনারা আমাদের মেহমান।'

'ধন্যবাদ জেনারেল। আমি তিনটি বষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করব। লস আলামোসে গোয়েন্দাগিরীর তদন্ত তো হবেই। কিন্তু তার সাথে 'খন্ড জ্যামিং টেকনোলজি' এবং 'ডিটেক্টর-নিউট্রাল জ্যাকেট মোড়া বোমা' তারা কিভাবে সংগ্রহ করল বা তৈরী করল তার তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। এবং অবিলম্বে সাবা বেনগুরিয়ানের আব্বা আইজ্যাক বেনগুরিয়ান-কে উদ্ধার করা দরকার। তিনি একটা বড় প্রমাণ হতে পারেন। আরও একটা বড় বিষয় আছে মিঃ জেনারেল। কথা উঠতে পারে লস আলামোসের সবুজ পাহাড় সুড়ঙ্গটি গোপন সুড়ঙ্গ নয়, ওটা লস আলামোসের গোপন একটা ইমারজেন্সী এক্সিট সুড়ঙ্গ। কিন্তু আমরা প্রমাণ করব লস আলামোস প্রতিষ্ঠার অনেক পরে ইহুদী বৈজ্ঞানিক জন জ্যাকবের আমলে তার তৈরী গোয়েন্দা সুড়ঙ্গ এটা। এজন্যে সুড়ঙ্গের পাথর ও মাটির কার্বন টেষ্টের একটা দলিল আপনার হাতে থাকতে হবে।' বলল আহমদ মুসা।

'ধন্যবাদ আহমদ মুসা এসব বিষয় স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যে। এ তিনটি বিষয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা অবিলম্বে কাজ শুরু করছি।'

একটু থেমে সবার দিকে চেয়ে বলল, 'তাহলে আমরা এবার উঠতে পারি।'

জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটন উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়াল অন্য সবাই।

'জেনারেল শেরউড তুমি মেহমানদের নিয়ে যাও। তাঁদের সব ব্যবস্থা কর।'

বলে জেনারেল ওয়াশিংটন হাত বাড়াল আহমদ মুসার দিকে। একে একে সে হ্যান্ডশেক করল জর্জ জুনিয়র, সাবা বেনগুরিয়ান এবং বেঞ্জামিন বেকনের সাথে। বেঞ্জামিনের সাথে হ্যান্ডশেক করতে গিয়ে বলল, 'ইয়ংম্যান তোমার সাথে

হ্যান্ডশেক করছি ‘ফ্রি আমেরিকা’র একজন হিরো হিসেবে, তোমাকে এফ.বি.আই-এর সদস্য এই মুহূর্তে মনে করছি না।’

‘ধন্যবাদ স্যার। ‘ফ্রি আমেরিকা’ সবার সহযোগিতা চায়। বিশেষ করে আপনাদের।’

‘এই তো সহযোগিতা করছি।’

‘ধন্যবাদ স্যার।’

সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

# ৬

'মিঃ জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটন, আপনার রিপোর্ট পড়লাম। তার সাথে সাথে এফ.বি.আই ও সি.আই.এ'র জর্জ আব্রাহাম ও অ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থারের পাঠানো রিপোর্ট আবার দেখলাম। তাদের রিপোর্ট থেকে আপনার রিপোর্টে কিছু ঘটনা বেশি আছে। এফ.বি.আই হেড অফিসে কম্পিউটার ধ্বংসের ঘটনা, সাবা বেনগুরিয়ান ও আইজ্যাক বেনগুরিয়ানের কাহিনী, জর্জ আব্রাহামের বাড়ি থেকে কম্পিউটার চুরির ঘটনা এবং সর্বশেষে পেন্টাগনের পাশের একটা ঘটনায় জর্জ জুনিয়র ও সাবা বেনগুরিয়ান উদ্ধার হওয়া ও আহমদ মুসার সাক্ষাৎ পাওয়ার এই ঘটনাগুলো জর্জ আব্রাহাম ও অ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থারের রিপোর্টে নেই। কিন্তু তাদের রিপোর্টের সাথে আপনার রিপোর্টের অন্য কোন পার্থক্য নেই। তাদের মত আপনিও সব দায় চাপিয়েছেন জেনারেল শ্যারন অর্থাৎ ইহুদীদের উপরে। এ বিষয়টা আমাকে বিস্মিত করেছে। সেই সাথে আমাদের এফ.বি.আই চীফ, সি.আই.এ চীফ, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা ব্যবস্থা ও সশস্ত্র বাহিনী প্রধান সকলেই আহমদ মুসার ফাঁদে পড়েছেন, এটাও আমি মনে করতে পারছি না। বিষয়টা আমাকে খুব ভাবিত করেছে বলেই যে সময়ে আপনি সাক্ষাৎ চেয়েছিলেন, তার আগেই আমাদের এ সাক্ষাৎ হচ্ছে। আমি উদ্বিগ্ন। আমি সত্যে পৌঁছাতে চাই জেনারেল।'

দীর্ঘ কথা শেষ করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট অ্যাডামস হ্যারিসন থামলেন। তার কপাল কুঞ্চিত। চোখে মুখে গভীর জিজ্ঞাসার ছাপ।

'ধন্যবাদ স্যার দ্রুত সাক্ষাতের সুযোগ দেয়ার জন্যে। স্যার আপনাকে আশ্বস্ত করতে পারি, সত্য দুই রকম হয় না বলেই আমি মনে করি ওদের রিপোর্টের সাথে আমাদের রিপোর্ট মিলে গেছে।' বিনীত কন্ঠ জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটনের।

‘কিন্তু আপনার জেনারেল শেরউড তো জর্জ আব্রাহাম ও অ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থারদেরই সাথী ছিলেন।’ বলল প্রেসিডেন্ট অ্যাডামস হ্যারিসন জেনারেল ওয়াশিংটনের মুখের উপর সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে।

‘মহামান্য প্রেসিডেন্ট আমি টেলিফোনে আপনাকে জানিয়েছি, কেউকে ডিফেন্ড বা ডিফেম করা আমার লক্ষ্য নয়। ভয়াবহ যে সত্য আমার সামনে এসেছে, তা মহামান্য প্রেসিডেন্টের অবগতিতে আনা আমি প্রয়োজন মনে করেছি।’

‘ধন্যবাদ জেনারেল।’ বলে একটু থামল প্রেসিডেন্ট এ্যাডামস হ্যারিসন। কপাল তার নতুন করে আবার কুঞ্চিত হলো। ফুটে উঠল চোখে মুখে জিজ্ঞাসা। বলল, ‘আহমদ মুসা সম্পর্কে আপনার অভিমত বলুন তো?’

মুখটা একটু ম্লান হলো জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটনের। আহমদ মুসার ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের প্রবল বিরক্তির কথা সে জানে। কি জবাব দেবে সে প্রেসিডেন্টের প্রশ্নের। কোন পক্ষে ঢলে পড়ার মত কথা বলা কি এই সময় ঠিক হবে।

উত্তর দিতে একটু দেরী হয়েছিল জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটনের।

আপনাকে খুবই স্পষ্টবাদী বলে জানি জেনারেল। না হলে এ প্রশ্ন আপনাকে করতাম না।’

‘ধন্যবাদ মহামান্য প্রেসিডেন্ট।’ বলে একটু থামল জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটন। একটু ভাবল। মনে হয় গুছিয়ে নিল কথা। তারপর বলল, ‘একজন পারফেক্ট জেন্টলম্যান মনে হয়েছে তাকে আমার কাছে। বিপ্লবীর কোন কঠোরতা তার চেহারা ও কথার মধ্যে সামান্যও নেই। লস আলামোসের ঘটনা তদন্তসহ গোটা মিশনে তিনি আমাদেরকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন বলে মনে হয়েছে।’

‘সেটা তো নিজে বাঁচার জন্যে। দায়টা যাতে ইহুদীদের ঘাড়ে চাপানো যায়।’ বলল প্রেসিডেন্ট এ্যাডমস হ্যারিসন।

‘মহামান্য প্রেসিডেন্ট ঠিকই বলেছেন। আর দোষ স্খলন, আমাদেরকে সহযোগিতা এবং সত্য উদ্ধার পরস্পর পরিপূরক হয়েছে।’

‘আপনার কথায় মনে হচ্ছে তাকে গ্রেফতার করা ঠিক নয়। জানেন তো, সে আইনের হাত থেকে পালিয়েছে?’

‘অবশ্যই আইন সবার উপরে মহামান্য প্রেসিডেন্ট। তিনি এখন আমাদের হাতেই পেন্টাগনে আছেন। তবে মাননীয় প্রেসিডেন্ট, সেদিন আইনের হাত থেকে পালিয়ে আসায় আমাদের অমূল্য লাভ হয়েছে। বলতে গেলে তার জন্যেই জর্জ জুনিয়র, সাবা বেনগুরিয়ানসহ ঘটনার অব্যর্থ দুটি প্রমাণ আমাদের হাতে এসেছে।’

‘তবু জেনারেল, আইন ভাঙাকে আইন ভাঙা হিসেবেই দেখতে হবে।’ হাসি মুখে বলল প্রেসিডেন্ট।

‘মাফ করবেন মহামান্য প্রেসিডেন্ট, আমি যা শুনেছি তাতে বুঝেছি তার সহযোগিতা নিতে গিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়নি। সেদিন বিমান বন্দরে তাকে জানানো হয়নি যে, পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে গেছে। সে চলে যাবার পর পুলিশ তাকে ঢালাওভাবে দোষ দেবার চেষ্টা করেছে।’

প্রেসিডেন্ট আবার হাসল। বলল, ‘তাঁর পক্ষে আপনার উপস্থাপনা সুন্দর হয়েছে। কিন্তু জেনে রাখুন জেনারেল, সে চরমপন্থী উৎকট এক মৌলবাদী। ছোবল দেওয়াই তার কাজ। তাকে ভদ্রলোক বলছেন। কোন ভদ্রলোক কি অবৈধভাবে কোন দেশে প্রবেশ করে। সে অবৈধভাবে আমেরিকায় প্রবেশ করেছে।’

‘আমি যতদূর জানি মহামান্য প্রেসিডেন্ট, হোয়াইট ঈগলরা তাকে কিডন্যাপ করে আমেরিকায় এনেছে। তারপর ঘটনাচক্র তাকে কোথাও স্থিরভাবে দাঁড়াতেই দেয়নি।’ বলল জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটন খুব নরম কন্ঠে।

‘সে ইতিহাস আমি এফ.বি.আই ও সি.আই.এ দুই তরফ থেকেই পেয়েছি। জানি সে কাহিনী। কিন্তু সে সুযোগ পেলে ছোবল মারবে, এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ নিশ্চয় করবেন না।’

‘আমি যতদূর জানি, তার জাতির স্বার্থের ব্যাপারে সে আপোষহীন। তবে সবগুলো অপারেশনই তার আত্মরক্ষামূলক। মহামান্য প্রেসিডেন্ট, যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জেনারেল শ্যারনরা তাকে হত্যা বা কিডন্যাপ করার জন্যে ঘুরে

বেড়াচ্ছে তখন আহমদ মুসা সান ওয়াকার, কারসেন ঘানেম, ডাঃ মার্গারেট ও লায়লা জেনিফারকে উদ্ধারের জন্যে নিজেকে বিপন্ন করেও কাজ করে যাচ্ছে।' বলল জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটন নরম কন্ঠে।

'তার মানে আপনি বলছেন, সমবেদনা তার প্রাপ্য?' গম্ভীর কন্ঠ প্রেসিডেন্টের।

'স্যরি মহামান্য প্রেসিডেন্ট, তা আমি বলতে পারি না। আমি শুধু ঘটনার কথাই বলেছি। তবে আহমদ মুসা ডেঞ্জারাস, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এত শার্প? এত সুক্ষ্মদর্শী কাউকে আমি দেখিনি মহামান্য প্রেসিডেন্ট। লস আলামোস থেকে আসার পথে তার সুক্ষ্মদর্শিতা যেভাবে আমাদের দলকে দুবার সাক্ষাত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে, যেভাবে পেন্টাগনে ব্রিগেডিয়ার স্টিভকে ধরিয়ে দিয়েছে তা অবিশ্বাস্য।' বলল জেনারেল ওয়াশিংটন।

'সত্যিই অবিশ্বাস্য জেনারেল। এজন্যেই তার ব্যাপারে সাবধান হতে হবে। সে এক মৌলবাদী এবং কুশলী সেভিয়ার সেই সাথে নিষ্ঠুর হত্যাকারীও।' প্রেসিডেন্ট বলল।

'তবে একটা সুবিচার তার প্রতি করতে হবে মহামান্য প্রেসিডেন্ট। আত্মরক্ষা ছাড়া হত্যার দৃষ্টান্ত তার খুব কমই আছে। আক্রমণকারী শত্রুকেও সে প্রয়োজনে সাহায্য করে। ন্যাসভিলের ঘটনা তো তার একটা দৃষ্টান্ত। এফ.বি.আই-এর একটি টিম তাকে তাড়া করেছিল গ্রেফতারের জন্যে। তাদের গাড়ি মারাত্মক এ্যাকসিডেন্ট করে। সংগে সংগেই দুজন মারা যায়। অবশিষ্টরাও ছিল মুমূর্ষ। আহমদ মুসা ওদেরকে নিজে গাড়ি ডেকে গাড়িতে তুলে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। আহমদ মুসার এ মানবিক রূপ অস্বীকার করলে তার প্রতি অবিচার করা হবে।' বলল জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটন।

প্রেসিডেন্টের মুখে প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠল। তারপর গম্ভীর হয়ে উঠল সে। বলল, 'আসল কথা কি জানেন। ওরা সমস্যা নয়, ওদের মৌলবাদটাকেই সমস্যা বলে মনে করা হয়। মুসলিম মৌলবাদীদের চরিত্র সম্পর্কে কোন অভিযোগ নেই। সকল অভিযোগের লক্ষ্যই তাদের মৌলবাদ।'

‘মহামান্য প্রেসিডেন্ট আইনের প্রতি একান্ত অনুগত কিংবা শেকড় সন্ধানী হওয়ায় সকলেই তো আমরা মৌলবাদী।’

‘আপনার মৌলবাদ ভয়ের নয়, ওদেরটা ভয়ের। দারুণ শক্তিশালী ওদের মৌলবাদ। দেখছেন না, আমরা গীর্জা বিক্রি করার পর্যায়ে গেছি, আর ওরা গীর্জা কিনে নিয়ে মসজিদ বানানোর পর্যায়ে এসেছে।’

‘গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এটা ভয়ের বিষয় তো নয় মহামান্য প্রেসিডেন্ট। স্বাভাবিক যা , মানুষ যা চায় আমরা তো তারই পক্ষে।’

‘এটা আমার আপনার কথা হতে পারে, কিন্তু সবার নয়।’

হাসল জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটন। বলল, ‘আপনার সহযোগিতা পেলে তার আর কিছুর দরকার হয় না।’

‘কিন্তু জানেন তো, গনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোটাররা স্বাধীন , আর প্রেসিডেন্ট ভোটারদের অধীন। সুতরাং আমার ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ।’

বলেই প্রেসিডেন্ট তার এ্যাপয়েন্টমেন্ট ওয়াচের দিকে তাকাল। বলল, ‘সময় হয়ে গেছে। প্রসঙ্গ থেকে আমরা দূরে সরে গেছি। এবার কাজের কথায় আসি। বলুন।’

‘মহামান্য প্রেসিডেন্ট আপনি বলেছেন, সত্য যা, আপনি সেখানে পৌছাতে চান। এটাই আমাদের সকলের কথা।’

একটু থামল জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটন। পরক্ষণেই আবার শুরু করল, ‘মহামান্য প্রেসিডেন্ট জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টনের নিরাপত্তা অফিস থেকে আমাদের কাছে ঘটনার উপর যে ব্রীফ পৌঁছেছে, তার সাথে দেখা সত্যের কোন সম্পর্ক নেই। এ পর্যন্ত যে ডকুমেন্ট সংগৃহীত হয়েছে, তাতে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রমাণিত হচ্ছে ইহুদী গোয়েন্দা প্রধান জেনারেল শ্যারন সব ঘটনার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এবং আমাদের সকল সিক্রেট গবেষণা ও স্থান তাদের অব্যাহত গোয়েন্দাগিরীর শিকার।’

থামল জেনারেল ওয়াশিংটন।

প্রেসিডেন্ট গভীর মনোযোগের সাথে জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটনের কথা শুনছিল। তার চোখে মুখে বিস্ময় এবং কিছুটা অস্বস্তিও।

জেনারেল ওয়াশিংটন থামতেই প্রেসিডেন্ট বলে উঠল, ‘আপনার প্রাথমিক রিপোর্টে যে কথা এসেছে, তার পক্ষে যে ডকুমেন্টগুলো রয়েছে তা সামনে নিয়ে আসুন।’

প্রেসিডেন্টের বাম পাশে একটা টেবিলটপ কম্পিউটার আগেই রেডি করে রাখা হয়েছিল।

জেনারেল ওয়াশিংটন তার হ্যান্ড ব্যাগ থেকে তিনটি কম্পিউটার ডিস্ক বের করে টেবিলে রাখল। তারপর এ থেকে একটি ডিস্ক নিয়ে সে টেবিলটপ কম্পিউটারে সেট করেল।

এসে বসল জেনারেল ওয়াশিংটন তার চেয়ারে।

কম্পিউটার স্ক্রীনে ভেসে উঠল একটা বাড়ি তার পর একটা বৈঠকখানার দৃশ্য।

‘মহামান্য প্রেসিডেন্ট কম্পিউটার স্ক্রীনে ওটা সাবা বেনগুরিয়ানদের বৈঠকখানার দৃশ্য। এই ভিডিও ফিল্মের দৃশ্যে আছে ইহুদী গোয়েন্দা এজেন্ট বেনইয়ামিনের সাথে জেনারেল শ্যারনের কথোপকথন, সাবা বেনগুরিয়ানের সাথে জেনারেল শ্যারনের কথোপকথন এবং আইজ্যাক বেনগুরিয়ানের সাথে জেনারেল শ্যারনের কথোপকথন।’

চলতে লাগল ভিডিও ফিল্মটি।

প্রেসিডেন্টের দুই চোখ কম্পিউটার স্ক্রীনে নিবদ্ধ।

এক সময় হঠাৎ চেয়ারে সোজা হয়ে বসল প্রেসিডেন্ট। বলল, ‘জেনারেল ডি.এস.কিউ মানে ডেথ স্কোয়াড পাঠাচ্ছেন জেনারেল শ্যারন লস আলামোসে?’

‘ঠিক বলেছেন মহামান্য প্রেসিডেন্ট।’ বলল জেনারেল ওয়াশিংটন।

‘তারিখটা?’

‘স্ক্রীনের নিচে বামে কোণায় দেখুন তারিখ ও সময়।’ জেনারেল ওয়াশিংটন।

‘সর্বনাশ এই তারিখে এই সময়ের দুঘন্টা পরেই তো লস আলামোস থেকে সান্তাফে পথে আমাদের তদন্ত টীমে আক্রান্ত হয়েছিল এবং আমাদের সিকিউরিটির আধ ডজন লোক নিহত হয়েছিল।’ প্রেসিডেন্টের কথায় বিস্ময় ও বেদনার সুর।

‘জি , মহামান্য প্রেসিডেন্ট।’

আবার নিরবতা। চলছে ভিডিও ফিল্ম।

প্রেসিডেন্টের দুই চোখ আঠার মত লেগে আছে কম্পিউটার স্ক্রীনে।

জেনারেল শ্যারন যখন ইহুদী জাতির চরম দুঃসময়ের কথা বলে জার্মানীর ঘটনার পুনরাবৃত্তির আশংকা করে জর্জ আব্রাহামের পার্সোনাল কম্পিউটারের লস আলামোস বিষয়ক এন্ট্রিগুলো মুছে ফেলার দায়িত্ব নিতে সাবা বেনগুরিয়ানকে বাধ্য করছিল, তখন বিস্মিত কন্ঠে প্রেসিডেন্ট বলল, ‘জেনারেল ওয়াশিংটন এন্ট্রিগুলো তাহলে সত্য। না হলে জেনারেল শ্যারন এত মরিয়া হয়ে উঠেছেন কেন এগুলো জর্জ আব্রাহামের কম্পিউটার থেকে মুছে ফেলার জন্যে!’

‘মহামান্য প্রেসিডেন্ট উনি একদিকে ডেথ স্কোয়াড পাঠিয়েছেন জর্জ আব্রাহামদেরকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্যে, অন্যদিকে সাবা বেনগুরিয়ানকে পাঠাচ্ছেন কম্পিউটারের দলিল মুছে ফেলার লক্ষ্যে।’ বলল জেনারেল ওয়াশিংটন।

‘কি সাংঘাতিক! তাহলে তো বোঝাই যাচ্ছে এফ.বি.আই হেড কোয়ার্টারের মাস্টার কম্পিউটারগুলো শ্যারনের লোকরাই ধ্বংস করেছে।’ বিস্ময়ে দুচোখ কপালে তুলে বলল প্রেসিডেন্ট।

‘অবশ্যই মহামান্য প্রেসিডেন্ট। জর্জ আব্রাহাম দায়িত্ব থেকে চলে যাবার পর তদন্ত ঠিকমত চলছে না। না হলে জড়িত লোকগুলোও ধরা পড়ে যেত।’ বলল জেনারেল ওয়াশিংটন।

কিছু বলল না প্রেসিডেন্ট। চেয়ারে গা এলিয়ে দিল। তার চোখে মুখে একটা হতাশা।

আবার নিরবতা। চলছে ভিডিও ফিল্ম।

প্রেসিডেন্টের সমস্ত মনোযোগ সেদিকে।

ভিডিও ফিল্মে তখন চলছে দায়িত্বপালনে ব্যর্থতার জন্যে জেনারেল শ্যারন কর্তৃক সাবা বেনগুরিয়ানকে ধমকানোর দৃশ্য। তার পর এল সাবা বেনগুরিয়ান ও তার আব্বা আইজ্যাক বেনগুরিয়ানকে বাড়ি ছেড়ে জেনারেল শ্যারনদের তত্ত্বাবধানে চলে যেতে বাধ্য করা সংক্রান্ত কথোকপকথনের দৃশ্য। যখন

জেনারেল শ্যারন বলছিল, 'সাবা বেনগুরিয়ান জাতির পক্ষে দায়িত্বপালনে অস্বীকার করেছে, তখন সে জাতির বিশ্বাসঘাতকতাও করতে পারে, আমি তাকে যা বলেছিলাম এবং যা সে জানে সব বলে দিতে পারে পুলিশকে, সুতরাং তাকে আমাদের কাস্টডিতে থাকতে হবে, যাতে সে কথা বলতে না পারে, আপনাকেও আমাদের সাথে যেতে হবে, যাতে আপনিও কিছু বলতে না পারেন', তখন প্রেসিডেন্ট বলে উঠল, 'তাহলে আপনাদের রিপোর্টে সাবা বেনগুরিয়ান ঘটনার যে বিবরণ দিয়েছে এবং জর্জ জুনিয়র ঘটনার যে বর্ণনা দিয়েছে তার সবই তাহলে সত্য। দেখছি, জেনারেল শ্যারনরা উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল সেদিন।'

'সত্য যা উদঘাটিত হয়েছে তা ওদেরকে উন্মাদ করার মতই মহামান্য প্রেসিডেন্ট।' বলল জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটন।

প্রেসিডেন্ট কোন কথা বলল না। চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছে আবার।

আবার সেই নিরবতা।

এবার কম্পিউটারে নতুন ডিস্ক ভরেছে জেনারেল ওয়াশিংটন। এ ভিডিও ফিল্মে রয়েছে প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন ও জেনারেল শ্যারনের মধ্যকার কথোপকথনের দৃশ্য।

চলছে ভিডিও ফিল্ম।

জেনারেল শ্যারন যখন জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টনকে বলছিল, 'প্রেসিডেন্টের সাথে জর্জ আব্রাহাম ও এ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থারের সাক্ষাতের পথ বন্ধ করতে হবে, ওরা আসছে প্লেনে ওয়াশিংটনে..', তখন প্রেসিডেন্ট সোজা হয়ে বসল চেয়ারে। তার চোখ ছানাবড়া। তারপর প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাত করতে গিয়ে প্রেসিডেন্টকে কি বুঝাতে হবে, ঘটনার কি ব্যাখ্যা তাকে দিতে হবে, সে বিষয়ে জেনারেল শ্যারন যে ব্রিফিং দিচ্ছিল জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টনকে, তা গোগ্রাসে গিলছিল প্রেসিডেন্ট। তার চোখ দুটি বিস্ময় বিস্ফোরিত। শেষে বলল প্রেসিডেন্ট, 'জেনারেল ওয়াশিংটন ধন্যবাদ দিতে হয় জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টনকে। যেভাবে জেনারেল শ্যারন তাকে ব্রিফ করতে বলেছিল, ঠিক সেভাবেই যে আমাকে ব্রিফ করতে পেরেছে। মিথ্যাকে সত্যের মত এত সুন্দর করে বলা যায় তাহলে!'

‘মহামান্য প্রেসিডেন্ট কাহিনী তৈরীতে ইহুদীদের চেয়ে দক্ষ আর কেউ নেই দুনিয়ায়। জার্মানীর ঘটনা নিয়ে যে হাজারো কাহিনী তারা সৃষ্টি করেছে, তা অভিভূত করেছে পশ্চিমের লোকদের। যার সুফল তারা ভোগ করছে অর্ধ শতাব্দী ধরে।’ বলল জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটন।

‘লস আলামোসের সবুজ পাহাড়ের সুড়ঙ্গ সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দিল সে সম্পর্কে আপনার মত কি?’ প্রেসিডেন্ট জিজ্ঞাসা করল জেনারেল ওয়াশিংটনকে।

‘ওটা একটা গাঁজাখুরি কথা মহামান্য প্রেসিডেন্ট। আপনি জানেন মহামান্য প্রেসিডেন্ট, আপনার কাছে একটা ‘সেফ ভল্ট’ আছে। ওটা খোলা যায় না, ভাঙা যায়। বিদেশী আগ্রাসনের সময় জরুরী মুহূর্তে ওটা আপনাকে ভাঙতে হবে এবং শেষ মুহূর্তের নির্ধারিত করণীয় ওতে পাবেন। অনুরূপভাবে লস আলামোসের মত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের কাছেও ঐ ধরনের একটি করে ‘সেফ ভল্ট’ আছে। বিদেশী আগ্রাসনের জাতীয় জরুরী মুহূর্তে প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে কি করতে হবে সেজন্যে তো ঐ ‘সেফ ভল্ট’ রয়েছে। মৌখিকভাবে থাকার বিষয়টা একেবারেই গাঁজাখুরি।’ জেনারেল ওয়াশিংটন বলল।

‘যাই হোক, সেফ ভল্টে যদি ঐ সুড়ঙ্গের কথা থেকে থাকে জেনারেল?’ প্রশ্ন তুলল প্রেসিডেন্ট।

‘সুড়ঙ্গটাই প্রমাণ যে ওটা অফিসিয়াল সুড়ঙ্গ নয়।’ বলল জেনারেল ওয়াশিংটন।

‘কেমন করে?’ বলল প্রেসিডেন্ট।

‘অফিসিয়াল হলে সুড়ঙ্গ হলে সুড়ঙ্গ মুখ আরও গোপন , নিরাপদ ও আরও স্থায়ী ধরনের জায়গায় হত। কম্পিউটার সরালেই , কার্পেট তুললেই ধরা পড়ে যাবে, এমন জায়গায় অফিসিয়াল সুড়ঙ্গ মুখ অবশ্যই হবার নয়। আর সুড়ঙ্গের শেষপ্রান্ত স্বাধীন জায়গায় না হয়ে ইহুদী অধিকারভুক্ত একটা জায়গায় হতে পারে না। তৃতীয়ত, ইহুদী বিজ্ঞানী জন জ্যাকব লস আলামোস ও সরকারের কেউ না হয়েও অফিসিয়াল সুড়ঙ্গের বিষয়টা জানবেন কোন সূত্রে? তাকে বিশ্বাসই বা করা হবে কেন? আপনার ভালোভাবেই জানার কথা মহামান্য প্রেসিডেন্ট, ইহুদীরা

আমাদের কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধা পেয়েছে ,কিন্তু আমাদের দায়িত্বশীল অগ্রজদের অখন্ড বিশ্বাস তারা কোন সময়ই পায়নি।' বলল জেনারেল ওয়াশিংটন।

'ধন্যবাদ জেনারেল। আমি বুঝেছি।'

নিরবতা নামল আবার।

ভিডিও ফিল্ম এগিয়ে চলছে একের পর এক দৃশ্য। যখন জেনারেল শ্যারন বলছিল জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টনকে যে 'এইবার সে ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং আগামীবারেই প্রেসিডেন্ট', তখন প্রেসিডেন্ট চেয়ারে হেলান দেয়া অবস্থাতেই হো হো করে হেসে উঠল। বলল, 'জেনারেল এতক্ষনে খুলল রহস্যের জট। আমার নিরাপত্তা উপদেষ্টা ইহুদীদের সাথে রাজনৈতিক ব্যবসায় নেমেছেন। ওর এত আগ্রহের কারণ এখানেই।'

'ইহুদীরা তাদের এই রাজনৈতিক অস্ত্র সব রাজনীতিকের উপরই প্রয়োগ করেন, মহামান্য প্রেসিডেন্ট।'

'কিন্তু সবাই তাদের শিকার হন না।'

জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটন কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ প্রেসিডেন্ট কম্পিউটার স্ক্রীনের দিকে মনযোগী হওয়ায় সে থেমে গেল।

ভিডিও ফিল্মে তখন জেনারেল শ্যারন ইহুদীদের বিশ্বায়ন পরিকল্পনার কথা বলছিল।

শ্যারনের কথা শেষ হলে জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন যখন তার ইহুদী মায়ের হাত থেকে ইহুদীদের বিশ্বায়ন পরিকল্পনা পাওয়া ও তার আব্বা সম্পর্কে মায়ের কথা বলছিল, তখন প্রেসিডেন্ট তার চেয়ারে সোজা হয়ে বসে বলল, 'জেনারেল হ্যামিল্টনদের আব্বা সিনেটর বব হ্যামিল্টন ছিলেন একজন খাঁটি আমেরিকান। সেই কারণেই তার মত স্বামীকে বিশ্বাস করেননি, আর ছেলেকে জানিয়েছেন নিজের মত দ্বৈত আনুগত্যের কথা।'

'ঠিক বলেছেন মহামান্য প্রেসিডেন্ট।' বলল জেনারেল ওয়াশিংটন।

'ওদের ঐ বিশ্বায়নটা কি জানেন জেনারেল?' বলল প্রেসিডেন্ট।

'ওই দলিল দেখিনি স্যার। জানা উচিত আমাদের।'

কথা শেষ করেই উঠে দাঁড়াল জেনারেল ওয়াশিংটন কম্পিউটার ডিস্ক পরিবর্তনের জন্যে।

'এখন কম্পিউটারে কি তুলবেন?' জিজ্ঞেস করল প্রেসিডেন্ট।

'আমাদের ব্রিগেডিয়ার যে তথ্য পাচার করেছিল জেনারেল শ্যারনের কাছে, তারই ভিডিও ফিল্ম।' বলল জেনারেল ওয়াশিংটন।

'ওটা আপনার রিপোর্ট আমি পড়েছি আর দেখার দরকার নেই।'

'মহামান্য প্রেসিডেন্ট, ঐ ভিডিও ফিল্মে পরিষ্কার দেখা যায় আমাদের ব্রিগেডিয়ার পদের দায়িত্বশীল অফিসাররাও জেনারেল শ্যারনের মত বাইরের লোকদের স্বার্থের কাছে কতখানি নতজানু।'

'বাগানে আগাছা কিছু জমতেই পারে।' প্রেসিডেন্ট বলল।

'কিন্তু মহামান্য প্রেসিডেন্ট, ওরা ওদের কালোহাত আমাদের জাতীয় জীবন ও জাতীয় স্বার্থের অনেক গভীরে প্রবেশ করাতে সমর্থ হয়েছে।'

'ঠিক বলেছেন, এটা স্বীকার করতেই হবে, ওদের কথা প্রেসিডেন্টের কান পর্যন্ত পৌঁছাতে ওরা সাফল্যের সাথে সমর্থ হয়েছে। এ বিষয়টার দিকে অবশ্যই আমাদের নজর দিতে হবে। কিন্তু সেটা কৌশলের সাথে জেনারেল।' প্রেসিডেন্ট এ্যাডামস হ্যারিসন বলল।

'অবশ্যই মহামান্য প্রেসিডেন্ট।' বলল জেনারেল ওয়াশিংটন।

প্রেসিডেন্ট নড়ে চড়ে বসল। বলল, 'জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে ধন্যবাদ, আপনাদের সংগৃহিত অমূল্য ডকুমেন্ট জাতির অশেষ উপকারে আসবে।'

'ওয়েলকাম মহামান্য প্রেসিডেন্ট। এ কৃতিত্বের অধিকাংশ 'ফ্রি আমেরিকা', আহমদ মুসা ও সাবা বেনগুরিয়ানদের প্রাপ্য।'

'সে কৃতজ্ঞতা আপনারা ওদের জানাবেন।'

বলে একটু থেমেই প্রেসিডেন্ট আবার বলল, 'আচ্ছা, ফ্রি আমেরিকা আন্দোলন সম্পর্কে আপনারা কি ভাবেন?'

'ফ্রি আমেরিকা দেশপ্রেমিক সংগঠন। আমরা মনে করি, এ ধরনের প্রেসার গ্রুপ দেশে থাকা প্রয়োজন।'

‘কেন?’

‘ফ্রি আমেরিকা বা সকল অপপ্রভাবমুক্ত আমেরিকা’র শ্লোগান দেশকে জাতীয় স্বার্থ পরিপন্থী ও ক্ষতিকর বাইরের ঘটনার সাথে জড়িয়ে পড়ার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।’

‘এমন প্রভাব কি আমাদের জাতীয় জীবনে আছে?’

‘অনেকেই মনে করেন, আমাদের জাতীয় জীবনে ইহুদীদের প্রভাব কোন কোন ক্ষেত্রে অপপ্রভাবের পর্যায়ে পৌঁছেছে। তারা মনে করেন, জাতির ফাউন্ডার ফাদারসরা ইহুদীদের সম্পর্কে যা ভাবতেন সেখান থেকে আমরা সরে গেছি।’

‘হ্যাঁ, এরকম কথা আছে।’

থামল এবং একটু ভাবল প্রেসিডেন্ট। তারপর বলল, ‘আচ্ছা, ফ্রি আমেরিকা আন্দোলনের স্ট্রেনথ কেমন? ওদের প্রধান কে?’

‘ওদের শক্তির বিষয়টা বলা মুস্কিল। বিশেষ করে তরুণ ও যুবকদের মধ্যে খুব পপুলার। সরকারী ও বেসরকারী সব ক্ষেত্রেই ওদের সমর্থক ছড়িয়ে আছে। ওদের প্রধান কে আমি জানি না।’

‘জনমতের ক্ষেত্রে ওরা একটা বড় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াচ্ছে, কি বলেন?’ প্রেসিডেন্টের কন্ঠে উতসুক্য।

‘ওদের প্রভাব বিবেচনা করলে তাই মনে হয়।’

‘আমি রিপোর্ট পেয়েছি, আমাদের দলেও ওদের সংখ্যা বাড়ছে। প্রতিপক্ষ দলেও নিশ্চয় ওরা কিছু আছে। ভাবছি, ওরা ভোট দেয় কাকে?’

‘শুনেছি ওদের ভোট ব্যক্তিকেন্দ্রিক। প্রার্থীর দৃষ্টিভংগী ও মতামতকেই তারা বেশি গুরুত্ব দেয়।’

‘বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একে আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে।’ বলে প্রেসিডেন্ট তার সামনে ফেলে রাখা একটা শিটের দিকে একবার তাকিয়ে বলল, ‘জেনারেল ওয়াশিংটন,আপনি কি জানেন জর্জ আব্রাহামের নাতিকে ওহাইও নদীতে ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করায় আহমদ মুসার প্রতি জর্জ আব্রাহাম দুর্বল?’

‘মহামান্য প্রেসিডেন্ট, এই অভিযোগ আর যাদের ক্ষেত্রেই সত্য হোক, জর্জ আব্রাহামের ক্ষেত্রে নয়। তার কাছে ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন এবং প্রফেশন

সম্পূর্ণ আলাদা। তার গোটা সার্ভিস লাইফে আত্মীয়-স্বজন ও আপনজনদের সামান্য প্রশ্রয় দেয়ারও কোন নজীর নেই।' থামল জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটন।

প্রেসিডেন্ট কথা বলল না। ভাবছিল।

একটু পর বলল, 'আরো একটা বিষয় জেনারেল, আহমদ মুসার মত ব্যক্তি এধরনের একটি কাজের বিনিময়ের মুখোমুখি হবে, এটাও স্বাভাবিক নয়। আর জর্জ আব্রাহামরা যে আহমদ মুসাকে সাথে করে লস আলামোসে নিয়ে গেলেন,এটা আহমদ মুসার স্বার্থে নয়, আমাদের স্বার্থে। বরং আহমদ মুসাই আমাদের উপকারে এসেছেন। সুতরাং জর্জ আব্রাহাম তাকে কোথায় কোন অন্যায় সুবিধা দিলেন?'

'আমিও এ ধরনেরই ভেবেছি মহামান্য প্রেসিডেন্ট।'

'জেনারেল আলোচনার আরও কোন বিষয় আছে?' বলল প্রেসিডেন্ট।

জেনারেল ওয়াশিংটন সোজা হয়ে বসল। বলল, 'অশেষ ধন্যবাদ মহামান্য প্রেসিডেন্ট আমাকে সময় দেয়ার জন্যে। আমার আর কোন বিষয় নেই আলোচনার।'

'ধন্যবাদ তো আমি আপনাকে দেব। বলা যায় সাজানো তথ্যের ভিত্তিতে মারাত্মক একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, অকাট্য প্রমাণ এনে আপনি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে রাষ্ট্রকে সাহায্য করলেন সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার। আমি আপনাদের জন্যে গর্বিত।' বলল প্রেসিডেন্ট।

'আমাদের প্রতি আপনার এটা বিশেষ ভালোবাসা মহামান্য প্রেসিডেন্ট। আমরা কৃতজ্ঞ।'

বলে একটু থেমে বিনীত কন্ঠে আবার বলল, 'আমাকে উঠার অনুমতি দিন মহামান্য প্রেসিডেন্ট।'

প্রেসিডেন্ট উঠে দাঁড়াল। জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটনও উঠে দাঁড়াল।

প্রেসিডেন্ট হাত বাড়িয়ে জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটনের সাথে হ্যান্ডশেক করতে করতে বলল, 'আমি নিশ্চিত জাতির পক্ষে আপনাদের এ প্রশংসনীয় তৎপরতা আপনারা আরও জোরদার করবেন। আশ্বাস দিচ্ছি, আমার কাছে জাতি

যা চায়, আপনারা যা চান, আইন যা চায়, তা আমি করব। তা করতে গিয়ে কোন সিদ্ধান্তকেই বড় বলে মনে করব না।'

'মহামান্য প্রেসিডেন্ট, এই কাজে আমরা আপনার সাথী।'

বলে জেনারেল ওয়াশিংটন চলে যাবার জন্যে পা বাড়াচ্ছিল। প্রেসিডেন্ট বলল, 'জেনারেল, আহমদ মুসাকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাবেন। অহেতুক তাঁর উপর অনেক ধকল গেছে। আমরা দুঃখিত।'

'ধন্যবাদ মহামান্য প্রেসিডেন্ট।' বলে জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটন ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

এফ.বি.আই-এর দুটি গাড়ি তীর বেগে এগিয়ে যাচ্ছে ওয়াশিংটনের একদম পূর্বপ্রান্তের বে রোড ধরে। দুই গাড়িতে মিলে এফ.বি.আই-এর নিরাপত্তা কর্মী মোট ষোলজন। এফ.বি.আই-এর চৌকশ অপারেশন কমান্ডার, জর্জ আব্রাহামের একটি বিশ্বস্ত হাত কমান্ডার বব কার্টার বসে আছেন সামনের গাড়ির সামনের সিটে। বাজপাখির মত তার শ্যেন দৃষ্টি সামনে নিবদ্ধ।

ভোর হবার খুব বেশী নেই। নির্জন পথ। কমান্ডার বব কার্টারের চোখ সামনে প্রসারিত। কিন্তু চোখের পেছনে মাথাটায় অনেক চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। এফ.বি.আই খবর পেয়েছে রাত ১২টায় জেনারেল শ্যারনকে বে-ভিউ রেসিডেন্সিয়াল ব্লকের একটা বাড়িতে প্রবেশ করতে দেখা গেছে, সে বাড়িটা পাহারা দিচ্ছে এফ.বি.আই-এর একজন লোক। খবর পাওয়ার পরই জর্জ আব্রাহাম সরাসরি নির্দেশ দিয়েছে জেনারেল শ্যারনকে গ্রেফতারের জন্যে।

বিরাট দায়িত্ব পেয়েছে সে তার চীফ বসের কাছ থেকে। তার স্বল্পভাষী চীফ বস দায়িত্ব দেবার সময় বলেছে, 'এই সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিকার লক্ষ্যে তুমি জাম্প দিচ্ছ, মূল্যবান সুযোগটা খুব কষ্টে কিন্তু আমরা পেয়েছি।' চীফের এই কথার অর্থ, বড় এই শিকার হাতছাড়া করা যাবে না। কারনটা সেও জানে। মাঝখানে জেনারেল শ্যারন এফ.বি.আই-এর চোখের বাইরে ছিল। জর্জ আব্রাহাম

দায়িত্বে ফিরে আসার পর জেনারেল শ্যারনকে পুনরায় দৃষ্টিসীমায় আনার অনেক চেষ্টার পর আজ তাকে নজরবন্দী করা গেছে। নজর থেকে এখন তাকে হাতে পেতে হবে।

কমান্ডার বব কার্টারের বাহিনী বে-ভিউ রেসিডেন্সিয়াল ব্লকের কিছুটা সামনে চৌমাথায় গিয়ে পৌছল। এ চৌমাথা থেকে পুবমুখী রাস্তা দিয়ে বে-ভিউ রেসিডেন্সিয়াল ব্লকে যাওয়া যায়। চৌমাথা থেকে বের হওয়া আরও দুটি রাস্তার একটি উত্তরে, আরেকটি পশ্চিমে চলে গেছে। বব কার্টারের বাহিনী আসছিল দক্ষিণ দিকে থেকে আসা রাস্তা দিয়ে। চৌমাথার মাঝখানে একটা বিরাট সার্কেল। পুবদিক থেকে আসা গাড়ি সার্কেলটির দক্ষিণ পাশ ঘুরে যেকোন দিকে যেতে পারে। অনুরূপ দক্ষিণ থেকে আসা গাড়ি দক্ষিণ হয়ে পশ্চিমে ঘুরে যেকোন দিকে যেতে পারে।

বব কার্টারদের গাড়ি সার্কেলটির দক্ষিণ হয়ে পশ্চিম উত্তর ঘুরে পুবমুখী রাস্তায় যাওয়ার জন্যে বাঁক নিতে যাবে, এমন সময় পুর্বদিকে একটা গাড়িকে পাগলের মত ছুটে আসতে দেখা দেখল। গাড়িটি বব কার্টারদের গাড়ির প্রায় পাশ ঘেঁষে সার্কেলটির দক্ষিণ দিক ঘুরে পশ্চিমমুখী রাস্তায় তীর বেগে ঢুকে গেল।

বব কার্টারদের থমকে যাওয়া গাড়ি সবে টার্ন নিয়ে পশ্চিম দিকে বাঁক নিতে যাচ্ছে। এমন সময় আরেকটি গাড়িকে আগের মতই উন্মত্ত স্পিডে ছুটে আসতে দেখল। বব কার্টারদের গাড়ি এটা দেখে আবারও ডেড স্লো হয়ে গেল।

কিন্তু উন্মত্ত স্পিডের গাড়িটি বব কার্টারদের গাড়ি পেরিয়ে কয়েকগজ যাবার পর হঠাৎ ডেড স্টপ হয়ে গেল।

সংগে সংগেই গাড়ি থেকে নামল একজন লোক লাফ দিয়ে। লোকটি গাড়ি থেকে নেমেই বব কার্টারদের গাড়ির দিকে মুখ করে ডাকতে লাগল।

বব কার্টার তার দিকে চোখ ফেলেই চিৎকার করে উঠল, 'এতো আমাদের এফ.বি.আই-এর কলিন্স। গাড়ি ওদিকে আগাও, কুইক।'

গাড়ি কলিন্সের কাছাকাছি হতেই সে চিৎকার করে বলল, 'জেনারেল শ্যারন পালাচ্ছে। তোমরা এস আমার সাথে।'

বলেই লাফ দিয়ে কলিন্স তার গাড়িতে উঠল। সংগে সংগেই ছুটতে শুরু করল তার গাড়ি।

বব কার্টারের বুঝতে বাকি রইল না আগের  পাগলের মত ছুটে চলে যাওয়া গাড়িটাই তাহলে ছিল জেনারেল শ্যারনের।

বুঝে উঠার সাথে সাথেই বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল বব কার্টারের। নজরবন্দী শিকার তাহলে পালাল?

বসের কথা ও কঠিন মুখটা ভেসে উঠল বব কার্টারের চোখের সামনে, গাড়ি আগেই স্টার্ট নিয়েছিল বব কার্টারের। বব কার্টার বলল ড্রাইভারের দিকে চেয়ে, ‘কলিন্সের গাড়ির আগে ছুটছিল যে গাড়িটা, সেটা আমাদের ধরতে হবে।’

ঝড়ের বেগে ছুটতে লাগল বব কার্টারদের গাড়িও। তখন সকাল হয়ে গেছে। রাস্তা-ঘাট তখনও প্রায় গাড়ি শুন্য। তিনটি গাড়িই চলছে ঝড়ের গতিতে। কলিন্সের গাড়ি এবং বব কার্টারের দুটি গাড়ি পর পর চলছে। জেনারেল শ্যারনের গাড়ি কিছুক্ষণের জন্যে দৃষ্টির বাইরে চলে গিয়েছিল, এখন শ্যারনের গাড়ি শুধু দেখা যাওয়া নয়, তার সাথে ব্যবধানও অনেক কমেছে।

হঠাৎ একটা অঘটন ঘটে গেল, একটা চৌমাথা ক্রস করতে যাচ্ছিল কলিন্সের গাড়ি। শ্যারনের গাড়ি চৌমাথা ক্রস করে চলে গেছে।

ঠিক সেই সময় রোড কনস্ট্রাকশন কোম্পানীর একটা ভারি রোলার গাড়ি রাস্তার ক্রসিং-এ এসে পৌঁছল, একেবারে মুখের উপর।

দুঘর্টনা এড়াতে হার্ড ব্রেক কষতে গিয়ে কলিন্সের গাড়ি উলটে গেল। কতকটা একই দশা হলো পেছনে বব কার্টারদের দুটি গাড়িরও।

বব কার্টারের গাড়ি একটা শার্প বাঁক নিয়ে ব্রেক কষতে গিয়ে রাস্তার পাশের গার্ডারের সাথে ধাক্কা খেল। আর কমান্ডার বব কার্টারের পেছনের গাড়ি ভারি রোলারটার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে গিয়ে কোন মতে নিজেকে রক্ষা করল, কিন্তু কাত হয়ে পড়ে গেল।

ধাক্কা খেয়ে গাড়ি থামতেই লাফ দিয়ে নেমেছে বব কার্টার গাড়ি থেকে।

তার চোখের সামনে দিয়েই কনস্ট্রাকশন কোম্পানীর রোলার গাড়িটি চলে গেল। তাড়া করবারও কোন সুযোগ পেল না। কারণ রাস্তার ঐ লাইনে তখনও জ্বলছিল গ্রীন সিগন্যাল, বব কার্টারদের জন্যে রেড সিগন্যাল।

বব কার্টার হতাশ হয়ে তাকাল জেনারেল শ্যারনের গাড়ির দিকে। ওটা দৃষ্টি সীমার বাইরে চলে গেল।

বব কার্টার এবার নজর দিল দুঘর্টনায় পড়া সহকর্মীদের দিকে।

এ সময় রোলার গাড়িটির চ্যানেল অর্থাৎ দক্ষিণ দিক থেকে আরেকটা গাড়ি রোড ক্রসিং এ এসে পৌছল।

তিনটি গাড়ির লন্ড-ভন্ড দশা দেখেই সম্ভবত গাড়িটা  রাস্তার এক প্রান্তে দাঁড়াল।

গাড়ি থেকে নামল তিনজন মানুষ। নেমেই তারা প্রথমে ছুটে গেল উল্টে যাওয়া কলিন্সের গাড়ির দিকে।

কলিন্স তখন তার উল্টে যাওয়া গাড়ি থেকে বের হচ্ছিল। ছুটে আসা তিনজন লোক  তাকে ধরাধরি করে বের করল।

কলিন্স উঠে দাঁড়িয়ে যে তাকে তুলে দাঁড় করাল তার দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল মুহূর্তের জন্যে। পরক্ষণেই আনন্দিত কন্ঠে বলে উঠল, ‘স্যার আপনি?’

তার পর পাশের দাঁড়ানো লোকটির দিকে নজর পড়তেই কলিন্স চিৎকার করে উঠল, ‘বেঞ্জামিন বেকন তুমি?’

বলে কলিন্স জড়িয়ে ধরল বেঞ্জামিন বেকনকে।

এদিকে বব কার্টারের দুটি গাড়ি থেকে সবাই বেরিয়ে এসেছে। কাত হয়ে যাওয়া গাড়িও দাঁড় করানো হয়েছে।

বব কার্টার ও অন্যান্যরা এসে দাঁড়াল কলিন্স ও বেঞ্জামিন বেকনদের কাছে।

বব কার্টার বেঞ্জামিন বেকনকে চিনতে পারছে, কিন্তু অন্য দুজনকে চিনতে পারেনি।

বব কার্টার এসে দাঁড়াতেই কলিন্স সোৎসাহে যে লোককে সে স্যার বলেছিল তাকে দেখিয়ে বলে উঠল, 'বব ইনিই আহমদ মুসা।'

নামটা শুনে বব কার্টার চমকে উঠল। অভাবিত একটা বিস্ময় আকস্মিকভাবে সামনে এসে দাঁড়ালে যেমন মানুষ বিমূঢ় হয়, কতকটা তেমনি দশা হলো বব কার্টারের। অজ্ঞাতসারেই যেন বব কার্টার স্যালুট দিয়ে বসল আহমদ মুসাকে। তার সাথে সাথে দুই গাড়ি থেকে নেমে আসা অন্যান্য এফ.বি.আই কর্মীরাও স্যালুট করল আহমদ মুসাকে।

আহমদ মুসা হ্যান্ডশেকের জন্যে হাত বাড়াল বব কার্টারের দিকে।

'ইনি, এই অপারেশনের কমান্ডার বব কার্টার।' বব কার্টারকে দেখিয়ে আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল কলিন্স।

কলিন্স থামতেই বেঞ্জামিন বেকন তাদের তৃতীয় সাথীকে দেখিয়ে বব কার্টারদের লক্ষ্য করে বলল, 'ইনি প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা উপদেষ্টার পার্সোনাল সেক্রেটারি রবিন নিক্সন।'

বব কার্টার আহমদ মুসার সাথে হ্যান্ডশেক করার পর রবিন নিক্সনের সাথেও হ্যান্ডশেক করল। কলিন্সও হ্যান্ডশেক করল রবিন নিক্সনদের সাথে।

কলিন্স রবিন নিক্সনের সাথে হ্যান্ডশেক শেষ করলে আহমদ মুসা বব কার্টারকে লক্ষ্য করে বলল, 'মিঃ বব কার্টার মিঃ কলিন্স যে অপারেশনের কথা বলল সেটা কি? আপনাদের এ অবস্থা কেন?'

বব কার্টার বে-ভিউ রেসিডেন্সিয়াল ব্লকের একটা বাড়ি থেকে জেনারেল শ্যারনকে ধরতে আসার বিবরণ দিয়ে বলল, 'কিন্তু স্যার, আমরা আসার আগেই জেনারেল শ্যারন পালায়। তাকে পাহারায় থাকা মিঃ কলিন্স তার পিছু নেয়। পথে দেখা হলে আমরাও পিছু নিই। এ পর্যন্ত পৌছার পর কনস্ট্রাকশন কোম্পানীর একটা রোলার গাড়ি আমাদের সব কিছু ভন্ডুল করে দেয়।' কিভাবে কি ঘটল তারও বিবরণ দিয়ে থামল বব কার্টার।

'সারারাত পালাল না, ভোরে পালাল কেন জেনারেল শ্যারন? এমন ভোরে তো জেনারেল শ্যারন জেগে থাকে না। আর আপনাকে দেখতে পাওয়ার মত

জায়গায় অবশ্যই আপনি ছিলেন না?' বলল আহমদ মুসা কলিন্সকে লক্ষ্য করে। আহমদ মুসার ভ্রু কুঞ্চিত হলো।

'তার কিছুতেই আমাকে দেখতে পাওয়ার কথা নয়।'

'জেনারেল শ্যারন যখন পালায় তখন আপনার মনে হয়েছিল কি যে আপনি পাহারায় আছেন জেনারেল শ্যারন সেটা জানে?'

'জি, আমার তাই মনে হয়েছে। সে পেছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে গাড়িতে উঠেছিল। গাড়িতে উঠেই পাগলের মত ছুটতে শুরু করে।' বলল কলিন্স।

'আমার মনে হচ্ছে একটা টেলিফোন পেয়ে জেনারেল শ্যারন ঘুম থেকে জাগে। টেলিফোনে তাকে বলে হয় মিঃ কলিন্স তার বাড়ির বাইরে পাহারা দিচ্ছে । আর বব কার্টারের বাহিনী তাকে ধরতে আসছে। নিশ্চয় কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।'

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা বব কার্টারের দিকে চেয়ে বলল, 'আপনার এ অপারেশনের বিষয় নিশ্চয় গোপন রাখা হয়েছিল?'

'জি স্যার, তার সাড়ে তিনটায় আমাদের চীফ জর্জ আব্রাহাম নিজে তাঁর মোবাইল টেলিফোনে আমাকে অপারেশনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তার আগে আমিও কিছু জানতাম না।'

'আপনি অপারেশনে বেরুনোর আগে বা পরে কাউকে কিছু বলেছিলেন?' বলল আহমদ মুসা।

'আমার সাথে আসা লোকজনদেরও বলিনি। তবে গোপন অপারেশন রেজিস্টারে আমি লিখে এসেছি।' বলল বব কার্টার।

'আমার বিশ্বাস জর্জ আব্রাহামের টেলিফোন এবং আপনাদের গোপন রেজিস্টার দুটোই শত্রু পক্ষ মনিটর করেছে।'

ভ্রু কুঞ্চিত হলো কমান্ডার বব কার্টার ও কলিন্স দুজনেরই।

ওরা কিছু বলার আগে আহমদ মুসাই কথা বলে উঠল, 'এখন কি করবেন বলে ভাবছেন আপনারা?'

বব কার্টার ও কলিন্সরা কিছু বলার আগেই কথা বলে উঠল রবিন নিক্সন। বলল, 'ওদের খুব নতুন একটা গোপন ঘাটির খবর আমি জানি। প্রেসিডেন্টের

সাবেক নিরাপত্তা প্রধান জেনারেল হ্যামিল্টনের নির্দেশে আমাদের গাড়িতে করে জেনারেল শ্যারনকে ঐ ঘাটিতে আমি নামিয়ে দিয়েছিলাম।'

আহমদ মুসা তাকাল বব কার্টারের দিকে।

বব কার্টার বুঝল আহমদ মুসার এ তাকানোর অর্থ। সংগে সঙ্গেই সে বলল, 'আমরা যেতে চাই সেখানে।'

'সে ঘাটিটা কোথায়?' আহমদ মুসা বলল রবিন নিক্সনের দিকে তাকিয়ে।

রবিন নিক্সন ঠিকানা বললে আহমদ মুসা বব কার্টারকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, 'মিঃ বব কার্টার, জেনারেল শ্যারনের গাড়ি যদি পশ্চিম দিকেই গিয়ে থাকে, তাহলে সে ঐ ঘাটির দিকেই গেছে বলে মনে হচ্ছে।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে স্যার।' বলল বব কার্টার।

'তাহলে আমরা যাত্রা করতে পারি।' বলল আহমদ মুসা।

'আপনি যাবেন স্যার?' বলল বব কার্টার। আনন্দে তার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

'অবশ্যই।' বলল আহমদ মুসা।

চারটি গাড়ি আবার যাত্রা শুরু করল।

আহমদ মুসা ও বব কার্টারদের গাড়ি যখন জেনারেল শ্যারনদের নতুন ঘাটির গেটে গিয়ে পৌছল, তখন সকালের নির্জনতা কেটে গেছে।

রাস্তায় তখন সচল গাড়ির মিছিল সরব হয়ে উঠেছে।

ঘাটির গেটে প্রথম গিয়ে থামল আহমদ মুসা ও বেঞ্জামিন বেকনের গাড়ি। পরক্ষণেই তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল বব কার্টারের গাড়ি এবং তার সাথেই কলিন্সের গাড়ি।

আহমদ মুসা গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বব কার্টারকে বলল , 'মিঃ বব কার্টার, আপনার চিড়িয়া উড়ে গেছে।'

'কি করে বুঝলেন স্যার?'

'দেখুন প্রধান গেটের দরজা খোলা। এর প্রথম অর্থ হলো জেনারেল শ্যারন আমাদের চ্যালেঞ্জ করছে। বলছে দরজা খোলা রেখেছি, প্রবেশ কর সাহস

থাকলে। দ্বিতীয় অর্থ হলো, জেনারেল শ্যারন আমাদের কাঁচকলা দেখাচ্ছে। বলছে, সব ফাঁকা করে গেছি, এস হাওয়া খেয়ে যাও।’

‘তাহলে কি দ্বিতীয়টাই ঠিক?’ বলল বব কার্টার।

‘অবশ্যই। কারণ, রাস্তার ধারে দিনের বেলায় সে এফ.বি.আই-এর সাথে বন্দুক যুদ্ধে আসবে না।’

‘এখন কি করব স্যার?’ বলল বব কার্টার হতাশ কন্ঠে।

‘চলুন নামি। তার ঘাটিটা দেখে যাই।’

বলে আহমদ মুসা গাড়ি থেকে নামল। সকলেই নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। রবিন নিক্সনও। আহমদ মুসা রবিন নিক্সনকে লক্ষ্য করে দ্রুত কন্ঠ বলল, ‘না মিঃ রবিন নিক্সন আপনি নামবেন না। আপনি নিরাপত্তা উপদেষ্টার পিএস। জেনারেল শ্যারনের জানা ঠিক হবে না যে, আপনি অপারেশনে নেমেছেন। আপনার নিরপেক্ষ পরিচয় থাকা ভাল।’

‘বুঝেছি, অনেক ধন্যবাদ স্যার।’ বলে আবার সে গাড়িতে প্রবেশ করল।

বব কার্টার বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘ধন্যবাদ স্যার, এতদূর আপনি দেখেন। কিন্তু একটা কথা স্যার, শ্যারনরা তো কেউ নেই। উনি নামলেও তো ওরা দেখতো না।’

‘মিঃ বব কার্টার, আপনারা সত্যিই ঘাটিতে এলেন কিনা, পেলেন কিনা, সেটা দেখার জন্যে জেনারেল শ্যারন অবশ্যই কাউকে কোথাও রাখবে বা পাঠাবে।’

‘বুঝলাম স্যার।’ হাসি মুখে বলল বব কার্টার।

সবাই ঢুকল ভেতরে। আহমদ মুসার কথাই সত্য হলো। একদম শূন্য ঘাটি। সব দরজা-জানালা খোলা। চেয়ার, টেবিল, খাট, শূন্য ফাইল কেবিনেট ছাড়া ঘরে আর কিছুই নেই।

ভ্রু কুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার।

জেনারেল পালিয়ে ঘাটিতে পৌছার পর যেটুকু সময় পেয়েছে তাতে ফাইলপত্র, কম্পিউটার, নানা ব্যবহার্য দ্রব্য ইত্যাদি নেয়া, গোছানো, সরানো এবং নিয়ে যাওয়া কি সম্ভব? সবচেয়ে বড় কথা হলো, এত সব জিনিস গেট দিয়ে বের

করে নিয়ে গেলে যে আবর্জনা পড়ে থাকার কথা। তার কোন চিহ্ন গেট এলাকায় নেই। এ সব ভাবতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল আহমদ মুসা।

হঠাৎ আহমদ মুসাকে এভাবে ভাবনায় পড়তে দেখে বেঞ্জামিন বেকন, বব কার্টার ও কলিন্স এসে তার পাশে দাঁড়াল। বলল বব কার্টার, 'কিছু ভাবছেন স্যার?'

'ভাবছি বব কার্টার। ভাবছি, যেসব জিনিস ওরা এ বাড়ি থেকে সরিয়েছে, তা অধিকাংশই বাইরে নিয়ে যায়নি। সেগুলো তাহলে রাখল কোথায়?'

'একথা কেন বলছেন স্যার?' বলল কলিন্স।

'প্রথম হলো, জেনারেল শ্যারন যে সময়টুকু পেয়েছিল, সে সময়ের মধ্যে জিনিসগুলো বাইরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়, এতসব জিনিস বাড়ি থেকে বের করলে বাড়ি থেকে বের হবার পথে যেসব চিহ্ন থাকার কথা তা নেই।' বলল আহমদ মুসা।

'ঠিক।' বেঞ্জামিন বেকন ও কলিন্স এক সাথে বলে উঠল।

'তাহলে আসুন সকলে খুঁজি এত জিনিস লুকিয়ে রাখা যায়, সেই জায়গাটা কোথায়।' বলল আহমদ মুসা।

গোটা বাড়ি খোঁজার পর বিভিন্ন দিক থেকে সকলে গিয়ে হাজির হলো নিচের ড্রইং রুমে। এ ড্রইং রুম থেকেই সিঁড়ি উঠেছে উপরে।

সবাই বলল, বাড়ির এক ইঞ্চি জায়গাও বাকি রাখা হয়নি। সব খোঁজা হয়েছে। দেয়ালগুলো বাজিয়ে দেখা হয়েছে, কিন্তু কোথাও কিছু নেই।

আহমদ মুসা সিঁড়ির দিকে মুখ করে একটা সোফায় বসে ছিল। ভাবছিল সে। ভাবছিল সে সামনের দিকে তার অলস দৃষ্টি মেলে। তার চোখে ভাসছিল সিঁড়িটার কারুকাজ।

সিঁড়িটা বাইরে থেকে ড্রইং রুমে প্রবেশ করার পর হাতের ডান পাশে পড়ে।

সিঁড়ি ও বাইরে বেরুবার দরজার মাঝখানে আরেকটি দরজা। দরজাটা সিঁড়ির শেষ ধাপের সমান্তরালে। সিঁড়ির ধাপ ও দরজাটির মাঝখানে দশ ইঞ্চির মত ব্যবধান। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, সিঁড়ির প্রস্থ ও দরজার প্রস্থ সমান। কেন? আর সিঁড়ি আর পাশের দরজার ব্যবধান মাত্র দশ ইঞ্চি কেন? প্রশ্ন জাগল

আহমদ মুসার মনে। ব্যবধান দশ ইঞ্চি এই কারণে কি যে সিঁড়ির প্রান্ত ঘেঁষে যে দেয়াল উঠে গেছে তা দশ ইঞ্চি পুরু? যদি তাই হয় তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় দরজাটি দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির প্রান্ত ঘেঁষে তৈরী হওয়া প্রটেকশন দেয়ালের পরেই। আর যেহেতু সিঁড়ির প্রস্থ ও দরজার প্রস্থ সমান , তাই ধরে নেয়া যায়, যে ল্যান্ডিং-এ সিঁড়িটি শেষ হয়েছে, সে ল্যান্ডিং-এরই আরেকটা অংশে দরজাটা দাঁড়িয়ে আছে।

চিন্তাটা এ পর্যন্ত আসতেই চমকে উঠল আহমদ মুসা। ল্যান্ডিং-এর এ অংশটা কেন তৈরী হলো? তাহলে দরজা ল্যান্ডিং-এর যে অংশের উপর দাঁড়িয়ে আছে, তার সাথে কোন সিঁড়ির যোগ আছে? কোন সিঁড়ি নিচে নেমেছে সেখান থেকে?

আহমদ মুসার মনটা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তার মনে পড়ল ওয়াশিংটনের প্রায় সব ভাল বাড়িরই বেসমেন্টে ঘর থাকে। সে ঘর অনেক ক্ষেত্রেই দুতলা তিন তলা পর্যন্ত নিচে গিয়ে থাকে।

আহমদ মুসা সোফায় সোজা হয়ে বসল। বলল বব কার্টারর দিকে তাকিয়ে, ‘সিঁড়ির পাশে ঐ দরজা খুলে দেখেছেন?’

‘জি স্যার। ওটা সুইচ রুম।’ বলল বব কার্টার।

‘দরজা খোলার পর মেইন সুইচগুলো দু’পাশের দেয়ালে, না শেষ প্রান্তের দেয়ালে?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা উৎসুক কন্ঠে।

‘দু’পাশের দেয়ালে, শেষ প্রান্তের দেয়ালে কোন সুইচ নেই।’ বব কার্টার বলল।

‘দু’পাশের দেয়ালে সুইচগুলো সামনের দিকে, না ভেতরের প্রান্তের দিকে?’

‘সবগুলো মেইন সুইচই দুপাশের দেয়ালে সামনের দিকে গাদাগাদি করে বসানো। ভেতরদিকে দুপাশের দেয়ালই এক দম ফাঁকা’ বলল বব কার্টার। তার চোখে মুখে তখন বিস্ময়।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘আমি নিশ্চিত এ দরজাটা একটা সিঁড়ির টপ ল্যান্ডিং-এর উপর দাঁড়িয়ে আছে।’

কথাটা শেষ করে আহমদ মুসা সোফায় হেলান দিয়ে বলল, ‘মিঃ বেঞ্জামিন বেকন, মিঃ কলিন্স, মিঃ বব কার্টার আপনারা একটু খুঁজে দেখুন তো।’

সকলেরই চোখে মুখে বিস্ময় , সেই সাথে আনন্দও।

তিনজনই ছুটল সে দরজার দিকে। অন্যেরাও গিয়ে দাঁড়াল দরজার সামনে।

মিনিট পনের পর বেঞ্জামিন বেকন, কলিন্স এবং বব কার্টার তিনজনেই দরজার বাইরে বেরিয়ে এল। বলল বেঞ্জামিন বেকন, ‘মিঃ আহমদ মুসা কোন ক্লু-ই খুঁজে পাওয়া গেল না। মেঝের কার্পেট উঠিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে। দেয়ালের প্রতি ইঞ্চি জায়গা পরখ করা হয়েছে। দরজার চৌকাঠের সবটা গা তিল তিল করে দেখা হয়েছে, কোথাও কিছু খুঁজে পাওয়া যায়নি। আমাদের মনে হয়, সিঁড়ি এখানে থাকলেও তার কন্ট্রোল বাইরে কোথাও।’

আহমদ মুসা কোন কথা না বলে চোখ বুজল। মুহূর্ত কয় পরে চোখ খুলে বব কার্টারের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘দেখে আসুন তো মিঃ বব কার্টার সবগুলো মেইন সুইচ অন কি না।’

‘ইয়েস স্যার।’ বলে ছুটল বব কার্টার দরজার দিকে। দরজা দিয়ে ঢুকল ঘরে।

মুহূর্ত কয়েক পর ফিরে এসে বলল, ‘স্যার সবগুলো মেইন সুইচ অন, মাত্র একটা মেইন সুইচ অফ করা।’

‘মিঃ বব কার্টার কাউকে বলুন ঐ মেইন সুইচ অন করতে। দেখবেন সিঁড়ির মুখ খুলে গেছে।’

সকলেই আহমদ মুসার কথা শুনছিল। সকলেরই বিস্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টি তার প্রতি নিবদ্ধ।

কয়েকজন এফ.বি.আই কর্মী দাঁড়িয়েছিল দরজার সামনেই। তাদের দিকে তাকিয়ে বব কার্টার একজনকে নির্দেশ দিল, ‘টমাস অফ করা সুইচটা অন করে দাও তো।’

টমাস নামের লোকটি ছুটল। ঢুকলো ঘরে।

পরক্ষণেই সুইচ অন করার খট করে একটা শব্দ হলো। বাইরে থেকেও সবাই শুনল।

খট করে শব্দ উঠার পরেই চিৎকার শোনা গেল টমাস নামের লোকটির, ‘পাওয়া গেছে স্যা......’

তার চিৎকার শেষ হলো না। স্টেনগানের আওয়াজ তার কন্ঠ ডুবিয়ে দিল। হারিয়ে গেল তার কন্ঠ।

দরজার সামনেই এফ.বি.আই-এর যারা দাঁড়িয়েছিল, তারা শুয়ে পড়ে তাদের স্টেনগান বাগিয়ে ধরল সেই দরজার দিকে।

ঝট করে উঠে দাঁড়িয়েছে আহমদ মুসা। বব কার্টার, বেঞ্জামিন বেকন ও কলিন্সও ঘুরে দাঁড়িয়েছে। বব কার্টারের হাতে স্টেনগান। বেঞ্জামিন বেকন ও কলিন্সের হাতে উঠে এসেছে রিভলবার।

আহমদ মুসা এগুচ্ছে দরজার দিকে। তার হাত খালি।

‘স্যার, নিচে শত্রু আছে। সিঁড়ি পথে ওরা গুলী চালিয়েছে।’ উদ্বিগ্ন কন্ঠে বলল বব কার্টার আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে।

‘ওরা উঠে আসার সাহস পাবে না এত তাড়াতাড়ি। চিৎকার করায় ভীত শত্রুর নির্বিচার গুলীর শিকার হলো বেচারা টমাস।’

বলতে বলতে এগুলো আহমদ মুসা দরজার দিকে।

আহমদ মুসার পেছনে বেঞ্জামিন বেকন, বব কার্টার ও কলিন্স।

দরজার চৌকাঠের আড়ালে দাঁড়িয়ে ভেতরে উঁকি দিল আহমদ মুসা। দেখল, টমাসের ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া দেহটা পড়ে আছে ল্যান্ডিং-এর উপর। সেই সাথে আহমদ মুসা দেখল কনক্রিটের একটা সিঁড়ি নেমে গেছে নিচে। সিঁড়িতে কোন রেলিং নেই। সিঁড়ির নিচে আলো। এক ঝলক দৃষ্টিতে কাউকেই দেখতে পায়নি আহমদ মুসা।

তার মানে, ভাবল আহমদ মুসা, শত্রুরা প্রথম দৃষ্টিতে চোখে পড়ার মত জায়গায় নেই।

আহমদ মুসা ফিরে দাঁড়াল বেঞ্জামিনদের দিকে। বলল, ‘টমাস মারা গেছে।’

মুহূর্তের জন্যে থামল আহমদ মুসা। তার পরেই বলে উঠল, ‘এ বাড়ির মাস্টার সুইচ কোথায়?’

‘কেন এখানেই সব সুইচ নয়?’ বলল বব কার্টার।

‘এটা সুইচ ঘর নয়। মেইন সুইচগুলো এখানে রাখা হয়েছে গোপন সিঁড়ির কনট্রোলকে ক্যামোফ্লেজ করার জন্যে। নিশ্চয় রিডিং মিটার সহ বাড়ির মাস্টার সুইচ অন্য কোথাও আছে।’ বলল আহমদ মুসা।

এফ.বি.আই কর্মীদের একজন বলে উঠল, ‘স্যার বাড়ির মূল প্রবেশ দরজায় পাশেই একটা ঘর আছে। ওখানেই একটা বড় মাস্টার সুইচ ও মিটারগুলো দেখেছি।’

সে কথা শেষ করতেই আহমদ মুসা তাকে বলল, ‘দেখে আসুন সেটা অন না অফ আছে।’

দৌড়ে চলে গেল লোকটি, ফিরে এলো মিনিট খানেকের মধ্যেই। বলল, ‘স্যার অন আছে সুইচটি।’

আহমদ মুসা লোকটিকে ধন্যবাদ দিয়ে সবাইকে কাছে ডাকল এবং তার পরিকল্পনা সবাইকে বুঝিয়ে বলল। এই পরিকল্পনায় কার কি দায়িত্ব তা বুঝিয়ে দিল।

শেষে কলিন্সের দিকে চেয়ে বলল, ‘মিঃ কলিন্স, আপনি যান মাস্টার সুইচের কাছে। বব কার্টার সংকেতটি বাজাবার পর সুইচ অফ করবেন এবং দ্বিতীয় সংকেতটি বাজাবার পর সুইচটি আবার অন করবেন।’

‘মিঃ আহমদ মুসা আপনি একা নামছেন নিচে, এটা ঠিক নয়। আমিও নামতে চাই।’ বলল বেঞ্জামিন বেকন।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘এটা যুদ্ধের প্রথম পর্যায়, এ পর্যায়ে যদি আমি ব্যর্থ হই। তাহলে দ্বিতীয় পর্যায়ে আপনি নামবেন।’

বেঞ্জামিন বেকন মুখ ভার করল। কিছু বলল না।

নির্দেশ পাওয়ার সংগে সংগেই কলিন্স বাইরে মাস্টার সুইচ বোর্ডের দিকে ছুটল।

বেঞ্জামিন বেকন এফ.বি.আই-এর একজন সৈনিক কর্মীকে সাথে করে স্টেনগান নিয়ে বসল দরজার ঠিক মাঝখানে। তাদের স্টেনগানের ব্যারেল রাখা হলো দরজার দুই প্রান্তের দুই কোণায়। ব্যারেলের মাথা সিঁড়ি এড়িয়ে নিচের দিকে কোণাকুণি তাক করা হলো। যাতে গুলী বৃষ্টি শুরু করলে সিঁড়ি সোজা মেঝে এলাকায় আঘাত না করে।

আহমদ মুসা মাথায় পাগড়ির মত করে একটা লম্বা কালো কাপড় পেঁচিয়ে নিয়েছে। সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে নিচে পড়ার সময় মাথায় আঘাত না লাগে তার জন্যেই এই ব্যবস্থা। কাপড়টা যোগাড় হয়েছে বাড়িটিরই এক আলমারি থেকে। সম্ভবত কিছু তৈরীর জন্যে কেনা হয়েছিল, কিন্তু তা আর তৈরী হয়নি।

আহমদ মুসার শোল্ডার হোলস্টারে ছিল সারা জেফারসনের দেয়া মেশিন রিভলবার। সেটা বের করে হাতে নিল। তারপর আহমদ মুসা দরজার মাঝ বরাবর বসা স্টেনগানধারী দুজনের মাঝে মাথাটা নিচু করে দরজার চৌকাঠের বরাবরে নিয়ে এল।

কিছুটা পেছনে দাঁড়িয়েছিল বব কার্টার।

আহমদ মুসা তার মাথা নিচু করে চৌকাঠ বরাবর নেয়ার সাথে সাথেই বব কার্টার একটা তীক্ষ্ণ শীষ দিয়ে উঠল।

সংগে সঙ্গেই নিভে গেল সব আলো, নিচে নেমে যাওয়া সিঁড়ি এবং সিঁড়ির নিচের ঘরেরও।

আলো নিভে যাওয়ার সাথে সাথেই আহমদ মুসা মাথা চৌকাঠে ঠেকিয়ে দেহের পেছনটা শূন্যে ছুঁড়ে দিল ল্যান্ডিং-এর উপর দিয়ে নিচের সিঁড়ির দিকে।

আহমদ মুসার দেহ সিঁড়িতে পড়ার শব্দ পাওয়ার পঁচিশ সেকেন্ড, যে সময়ের মধ্যে আহমদ মুসার দেহ সিঁড়ি দিয়ে নিচে গড়ানো শুরু করেছে, তখন গর্জে উঠল বেঞ্জামিন বেকন ও এফ.বি.আই-এর সৈনিক কর্মীটির স্টেনগান। বেঞ্জামিন বেকনের স্টেনগান কভার করল সিঁড়ির বাম পাশের এবং এফ.বি.আই-এর কর্মীর স্টেনগান কভার করল সিঁড়ির ডান পাশের এলাকা। লক্ষ্য হলো নিচে বেজমেন্টের ঘরে যে শত্রুরা আছে তারা যেন সিঁড়ির দিকে ছুটে আসতে না পারে এবং আহমদ মুসা যাতে নিরাপদে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে নিচে মেঝেতে গিয়ে সিঁড়ি

বরাবর সামনে এগিয়ে কোথাও আশ্রয় নিতে পারে। আহমদ মুসার পরিকল্পনার বক্তব্য হলো, শত্রুরা যখন দেখবে আলো নিভে যাওয়ার সংগে সংগে গুলী শুরু হয়েছে দরজা থেকে, তখন তাদেরও প্রাথমিক লক্ষ্য হবে দরজা। শত্রুর স্টেনগানকে দরজার দিকে আটকে রেখে সেই সুযোগ আহমদ মুসা সিঁড়ি বরাবর সামনে এগিয়ে কোথাও আশ্রয় নেবে। এরপরের লক্ষ্য হলো পেছন থেকে শত্রুর উপর আকস্মিক আক্রমণের সুযোগ নেয়া।

আলো নিভে যাবার পচিশ সেকেন্ড পর জ্বলে উঠল আবার আলো।

তখনও দরজার উপর চলছে মুষলধারে গুলী বর্ষণ।

আলো জ্বলার সংগে সংগে আহমদ মুসার পরিকল্পনা অনুসারেই গুলী বন্ধ করে দিয়েছিল বেঞ্জামিন বেকন ও এফ.বি.আই-এর সৈনিক কর্মী।

ওদিকে আহমদ মুসা অন্ধকারের সেই পচিশ সেকেন্ডে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ে গড়িয়েই দ্রুত এগোলো মেঝের উপর দিয়ে সিঁড়ি বরাবর সামনের দিকে। তার মাথার উপর দিয়ে তখন চলছে গুলী বৃষ্টি। আহমদ মুসা বুঝল, সে গড়িয়ে যেদিকে যাচ্ছে সেদিক থেকেও গুলী সিঁড়ির দিকে যাচ্ছে। তার অর্থ এ দিকেও শত্রুপক্ষের লোক আছে।

আহমদ মুসা একটা দেয়ালে গিয়ে ধাক্কা খেল।

আহমদ মুসা দেয়াল ধরে উঠে বসে ডানে-বামে হাতড়াতে গিয়ে দেখল বাম দিকে হাত দুয়েক পরেই দেয়াল শেষ হয়ে গেছে। তবে সেটা দরজা নয়। দরজা হলে চৌকাঠ বা চৌকাঠ ধরনের কিছু থাকত। কিন্তু তা নেই। তাহলে এটা করিডোর? তাই হবে ভাবল, আহমদ মুসা। অনুমানে আরও বুঝল এ করিডোরটি সিঁড়ির ঠিক বরাবর। আহমদ মুসা গড়াবার সময় একটু ডান দিকে সরে গিয়েছিল সিঁড়ি বরাবর আসা গুলী এড়াবার জন্যে।

তখনও দু'পক্ষের মধ্যে চলছে তুমুল গুলী বৃষ্টি।

আহমদ মুসা বাম পাশে খুঁজে পাওয়া করিডোরে মুখ বাড়াতে গিয়ে বুঝল, এ করিডোর থেকেও স্টেনগানের শব্দ আসছে। অখন্ড শব্দের মাঝে এই শব্দকে এতক্ষণ আহমদ মুসা আলাদা করতে পারেনি। সাবধান হলো আহমদ মুসা।

মেশিন রিভালবারের মুখ করিডোরে তাক করে করিডোর থেকে উত্থিত স্টেনগানের শব্দের উৎসকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করল আহমদ মুসা। বুঝল স্টেনগানের শব্দ করিডোরের মাঝ বরাবর একই উৎস থেকে আসছে। শব্দ একাধিক স্টেনগানের।

আহমদ মুসা তার মেশিন রিভলবারের নল সে শব্দ লক্ষ্যে তাক করে ট্রিগার চেপে ধরল তর্জনি দিয়ে।

ট্রিগারে তর্জনি চেপেই আহমদ মুসা মেশিন রিভালবারের নল বৃত্তাকারে ঘুরিয়ে নিল করিডোরের প্রস্থ আনুমানিকভাবে আন্দাজ করে নিয়ে। আর সেই মুহূর্তেই আলো জ্বলে উঠেছিল।

আলোর বন্যায় ভেসে গেল চারদিক।

আহমদ মুসা তার সামনের করিডোরের দিকে একবার চেয়েই দেহটাকে বাঁকিয়ে নিয়ে ছুড়ে দিল করিডোরের ভেতর।

করিডোরর পড়েই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

আগেই চোখে পড়েছিল করিডোরের মাঝ বরাবর তিনটি লাশ পরে আছে। আর একবার ভালো করে দেখল, তার মেশিন রিভলবারের প্রথম তিন শিকারকে।

আহমদ মুসা তার মেশিন রিভলবার পকেটে রেখে লাশের কাছে পড়ে থাকা তিনটি স্টেনগানের দুটি তুলে নিল। একটা ঘাড়ে ফেলে অন্যটি হাতে রাখল।

গুলী বৃষ্টির তীব্রতা তখন কমে গেছে। উপর থেকে গুলী পরিকল্পনা অনুসারেই থামিয়ে দেয়া হয়েছে অল্পক্ষণের জন্যে, যাতে আলো জ্বলে উঠার পর আহমদ মুসা প্রয়োজনে যে কোন দিকে মুভ করার সুবিধা পায়। কিন্তু এদিক থেকে গুলী বৃষ্টি বন্ধ হয়নি।

সিঁড়ির উপর দিয়ে গুলী গুলো হচ্ছে ঘরের ডান ও বাম দুই প্রান্ত থেকে। মাঝ বরাবার এলাকা থেকে কোন গুলী  হচ্ছে না। আহমদ মুসা নিশ্চিত হলো, ঘরের মাঝ এলাকায় ঘাপটি মেরে নিশ্চয় কেউ বসে নেই।

ঘরের ডান ও বাম এলাকা থেকে যারা গুলী করছে সিঁড়ি লক্ষ্যে, তারা কি দেখতে পেয়েছে আহমদ মুসাকে? প্রশ্ন জাগল আহমদ মুসার মনে।

এক ঝলক দেখে আহমদ মুসা যতটুকু বুঝেছে, সিঁড়ির নিচে ফাঁকা একটা প্রশস্থ চত্তর। চত্তরটির সামনের দিকে চত্তর থেকে একটি করিডোর বেরিয়ে এগিয়ে গেছে। সেই করিডোরটিতেই আহমদ মুসা দাঁড়িয়ে। অনুরূপভাবে চত্বরটি ডান ও বাম দিকে বেশ কিছুটা এগুবার পর চত্বর থেকে দুদিকেই করিডোর বেরিয়ে গেছে। আহমদ মুসার বিশ্বাস, ঐ দুই করিডোরের মুখ থেকে দেয়ালের আড়াল নিয়ে সিঁড়ির দিকে গুলী করা হচ্ছে।

ওরা আহমদ মুসাকে দেখতে পায়নি বলে মনে হচ্ছে আহমদ মুসার। আলো জ্বলার সময় স্বাভাবিকভাবেই ওদের চমকিত দৃষ্টি সিঁড়ি মুখের দিকে নিবদ্ধ হবার কথা। তাছাড়া এক ঝলক দেখতে পেলেও তাকে এ করিডোর থেকে বেরিয়ে যাওয়া নিজেদের লোক মনে করাটাই স্বাভাবিক। শত্রু মনে করলে অবশ্যই তাদের স্টেনগানের গুলী এদিকেও ছুটে আসত। চারদিকে স্টেনগানের আওয়াজের মধ্যে আহমদ মুসার মেশিন রিভলবারের অপেক্ষাকৃত মিঠা আওয়াজ নিশ্চয় তারা শুনতে পায়নি।

আহমদ মুসা খুশি হয়েছে, তবে করিডোরটির পেছন দিকে বেশি এগোয়নি।

পেছনের দিকে নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে আহমদ মুসা ধীরে ধীরে এগোলো করিডোরের মুখের দিকে।

উপর থেকে আবার একটি দুটি করে গুলী বর্ষণ শুরু হয়ে গেছে ঘরের ডান ও বাম প্রান্তের দিকে পরিকল্পনা অনুসারেই। এ গুলী বর্ষণের লক্ষ্য শত্রুদেরকে গুলী বর্ষণে ব্যস্ত রাখা যাতে তারা অন্যদিকে মনোযোগ দিতে না পারে এবং তাদের অবস্থান চিহ্নিত করাও সহজ হয়।

আহমদ মুসা বিড়ালের মত অতিসন্তর্পণে এগিয়ে দেয়ালের আড়াল থেকে প্রথম উঁকি দিল বাম দিকে। দেখল চত্বরের প্রান্তে করিডোরের মুখে ওরা চারজন বসে। ওরা দেয়ালের আড়ালে, কিন্তু তাদের স্টেনগানের ব্যারেল অর্ধেক দেয়ালের বাইরে।

এরপর আহমদ মুসা একটু সময় নিয়ে উকি দিল ডান চত্ত্বরের দিকে। ওখানে দেখল দুজনকে। ওরাও ঐ একই পজিশনে স্টেনগান বাগিয়ে গুলী করছে। আহমদ মুসা সরে এল। হাতের স্টেনগানের গুলীর চেম্বার পরীক্ষা করল।

তারপর আহমদ মুসা স্টেনগানের ট্রিগার হাত রেখে এগোলো প্রথমে বাঁদিকে।

দেয়ালের গা ঘেঁষে হাঁটু গেড়ে বসে স্টেনগানের ব্যারেল চোখের পলকে বাইরে নিয়ে ট্রিগার চাপল আহমদ মুসা বাঁদিকের চারজনকে লক্ষ্য করে। এক পশলা গুলী করেই আহমদ মুসা বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়িয়ে স্টেনগান তাক করল ডান করিডোরের দুজনের দিকে।

ওরা দুজন গুলীর শব্দে চমকে উঠে তাকিয়ে আহমদ মুসাকে দেখতে পেয়েই স্টেনগান ঘুরিয়ে নিচ্ছিল।

আহমদ মুসার হাত স্টেনগানের ট্রিগারেই ছিল। সূতরাং স্টেনগানের নল তাদের দুজনের দিকে ঘুরার সাথে সাথেই এক ঝাঁক গুলী গিয়ে ঘিরে ধরল তাদেরকে।

বিশ সেকেন্ডও গেল না। খেলা সাঙ্গ হয়ে গেল। ছয়জনই মুহূর্তে লাশ হয়ে রক্তে ভাসতে লাগল।

সিঁড়ির মাথায় দেখা গেল বেঞ্জামিন বেকন, বব কার্টার ও কলিন্সকে।

আহমদ মুসাকে স্টেনগান হাতে চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওরা ছুটে নেমে এল নিচে সিঁড়ি দিয়ে। তাদের পেছনে এফ.বি.আই-এর অন্যান্য সৈনিকরাও।

তারা পড়ে থাকতে দেখল নয়টি লাশকে।

বেঞ্জামিন বেকন জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে। বব কার্টার, কলিন্স আহমদ মুসাকে স্যালুট দিয়ে তাদের হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করল।

আর সৈনিকদের চোখে বিস্ময় ও আনন্দ।

‘জেনারেল শ্যারন তো তাহলে এখানে নেই।’ বলল বব কার্টার।

‘অবশ্যই। তিনি এখানে থাকার কথা নয় মিঃ বব কার্টার। তিনি এমন খোপে আশ্রয় নেবার মত লোক নন।’

‘ঠিক স্যার।’ বলল বব কার্টার। কথাটা শেষ করেই বব কার্টার আবার বলে উঠল , ‘স্যার আমরা এখন সার্চ করতে পারি?’

‘অবশ্যই সার্চ করে আপনারা উপরে আসুন। লাশগুলো নেয়ার ব্যবস্থা করুন। আমি ওদিকে দেখি রবিন নিক্সন কি করছে।’

বলে আহমদ মুসা উপরে উঠে এল। উপরে উঠে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

আহমদ মুসাকে গেটে দেখেই রবিন নিক্সন গাড়ির জানালা নামিয়ে হাত নেড়ে ডাকল আহমদ মুসাকে। আহমদ মুসা গিয়ে উঠল রবিন নিক্সনের গাড়িতে।

‘স্যার অনেকক্ষণ ধরে গুলীর শব্দ শুনলাম। খারাপ কিছু ঘটেনি তো? ওরা সবাই কোথায়?’ বলল উদ্বিগ্ন রবিন নিক্সন।

‘বড় ধরনের খারাপ কিছু ঘটেনি, আমাদের একজন সৈনিক মারা গেছে। ওদের কয়েকজন মারা গেছে। সার্চ শেষ করে আসছে সবাই।’ বলল আহমদ মুসা।

‘স্যার এদিকে আরেক ঘটনা। যাকে খুঁজতে গেছেন তিনিই তো বাইরে।’

‘কেমন?’

‘স্যার, এর মধ্যে জেনারেল শ্যারন এ রাস্তা দিয়ে দু’বার পাস করেছে।’

‘জেনারেল শ্যারন?’

‘জি স্যার।’

‘দুবার?’

‘জি স্যার।’

‘তাহলে তো এ ঘাটিতে মূল্যবান কিছু আছে, যার জন্যে সে খুবই উদ্বিগ্ন।’

‘তাই হবে স্যার।’

‘তার গাড়ির নাম্বার নিয়েছ?’

‘জি স্যার।’ বলে গাড়ির নাম্বারটা আহমদ মুসার হাতে তুলে দিল রবিন।

‘আরো একবার জেনারেল শ্যারন আসবে নাকি?’

‘আসতেও পারে স্যার।’

‘কিংবা নাও আসতে পারে। কোথাও দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত কি ঘটে তা দেখতে পারে।’

‘জি স্যার, সেটাও স্বাভাবিক।’

এসব বিষয় নিয়ে কথা চলছিল আহমদ মুসা ও রবিন নিক্সনের মধ্যে।

অবশেষে বব কার্টাররা এল। বব কার্টার গাড়ির জানালা দিয়ে আহমদ মুসাকে বলল, 'স্যার, কম্পিউটার ছাড়া নেবার মত ডকুমেন্ট কিছু পেলাম না।'

'আমার বিশ্বাস কম্পিউটারগুলোর মধ্যে মূল্যবান দলিল থাকতে পারে মিঃ বব কার্টার। আপনার শিকার জেনারেল শ্যারন কিন্তু এ রাস্তায় ঘুর ঘুর করছে।'

'তাই স্যার? তাহলে তো.........'

'এখন নেই। দুবার এ রাস্তা দিয়ে গেছে। অবশ্য যদি তৃতীয়বার আসে ,তাহলে আপনার একটা সুযোগ হতে পারে।'

'ঈশ্বরের করুণা হোক স্যার।'

'আমি স্যারকে টেলিফোন করেছিলাম। সব জানিয়েছি। তিনি পুলিশকে খবর দিতে বলেছেন। আমি পুলিশকে খবর দিয়েছি। ওরা আসছে। স্যার আপনাকে ধন্যবাদ দিয়েছেন।'

'কোন স্যার? জর্জ আব্রাহাম?'

'জি স্যার।'

'আপনি সব কথা তাকে বলেছেন?'

'উনিই খুঁটে খুঁটে জিজ্ঞেস করে জেনেছেন। আপনার মত উনি বলেছেন, কম্পিউটারগুলো খুব মূল্যবান হবে।'

'মুল্যবান না হলে সরাতো না এবং এভাবে পাহারায় লোকও বসাতো না।' আহমদ মুসা বলল।

'ডকুমেন্টগুলো ডেস্ট্রয়ও তো করতে পারে।' বলল বেঞ্জামিন বেকন।

'করতে পারত , কিন্তু করেনি। কারণ জেনারেল শ্যারনরা মনে করেছিল যে, তাদের গোপন আশ্রয়ে পৌঁছার পথ এফ.বি.আই খুঁজে পাবে না।' আহমদ মুসা বলল।

'জেনারেল শ্যারনের মনে করা ঠিক হয়েছিল। পথটা তো এফ.বি.আই খুঁজে পায়নি। পেয়েছে আহমদ মুসা।' বলল কলিন্স।

'এভাবে কথা বলা ঠিক নয়। আহমদ মুসা হাজির না থাকলে আপনারা ঠিকই খুঁজে পেতেন। সে ছিল বলে আপনারা যথাযথ দায়িত্ব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেননি।' আহমদ মুসা বলল।

‘ধন্যবাদ স্যার। অন্যকে মর্যাদা দেবার, অন্যকে বড় করে দেখবার আপনার এই দুর্লভ গুনের কারণে শত্রুরাও আপনাকে মর্যাদা দেয় স্যার। আমি জেনারেল শ্যারন ও গোল্ড ওয়াটারের সাথে বেশ কয়েকদিন থেকে দেখলাম, তারা আপনাকে যতটা ঘৃনা করে, তার চেয়ে অনেক বেশি মর্যাদা তারা আপনাকে দেয়। আপনাকে তারা যমের মত ভয় করে, কিন্তু সেই সাথে তারা মনে করে আপনার দ্বারা কোন অন্যায় তাদের হতে পারে না। আজকের দুনিয়ায় এমন শত্রু দুর্লভ।’ বলল কলিন্স।

‘না কলিন্স। মানুষ যদি আল্লাহকে ভালোবাসে, আল্লাহর হুকুম মেনে চলে, তাহলে মানুষ প্রকৃত ‘মানুষ’ হয়ে যায়। আর মানুষ ‘মানুষ’ হলে সে মানুষকে নিজের মত করেই ভালোবাসবে।’

‘স্যার, আপনি খুব ঈশ্বর বিশ্বাসী, না?’ বলল কমান্ডার বব কার্টার।

‘অবশ্যই। কারণ আমি চাই এই জীবনে আমি যেমন আছি, তার চেয়ে অনেক ভাল থাকি পরকালে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘মিঃ আহমদ মুসা, আমার খৃস্টান ধর্ম যদি আপনার ধর্মের মত কাজের ধর্ম হতো, সক্রিয় ধর্ম হতো, তাহলে আমিও ঈশ্বরে বিশ্বাসী বা ধর্ম পালনকারী হতে পারতাম। খৃস্টান ধর্মে আমি করার কিছু পাই না।’ বলল বেঞ্জামিন বেকন।

‘স্যারের ধর্মই তাহলে গ্রহণ করে ফেল।’ বলল বব কার্টার।

‘বলতে হবে না, আমি অর্ধেক মুসলমান হয়ে গেছি। দেখে দেখে আমি নামাজ প্রায় শিখে ফেলেছি। মিঃ আহমদ মুসার মত দিনে পাঁচবার নামাজ পড়ে দেখেছি শরীর ও মন দুটোই ভাল লাগছে।’ বলল বেঞ্জামিন বেকন।

হেসে উঠল কলিন্স। বলল, ‘শুনেছি নামাজে অনেক কিছু পড়তে হয়। শিখেছেন সেগুলো?’

‘শিখব কোত্থেকে, মিঃ আহমদ মুসা হাসবেন বলে আমি কিছু বলিনি।’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘হাসব কেন? ভালো কাজে অবশ্যই সহযোগিতা করব।’

‘মুসলমান হওয়ার কোন নিয়ম আছে খৃস্টানদের ব্যাপটাইজের মত?’ বলল বব কার্টার আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে।

‘ও রকম কোন নিয়ম নেই। শুধু একটা ঘোষনা দিতে হয়, তারপর আল্লাহর আদেশ-নিষেধ জীবনের সবক্ষেত্রে মেনে চলতে হয়।’

‘ঘোষনাটা কি?’ আগ্রহের সাথে বলল বেঞ্জামিন বেকন।

‘ঘোষনাটা হলোঃ কোনই উপাস্য নেই আল্লাহ ছাড়া। মুহাম্মদ (সা) তাঁর বার্তাবাহক।’ আহমদ মুসা বলল।

‘এ ঘোষনা দেয়ার অর্থ কি?’ বলল কলিন্স।

‘ঘোষনার অর্থ হলো, আল্লাহ ছাড়া দুনিয়ার আর কাউকেই, শাসক বা সমাজপতি যেই হোন, উপাস্য, মুনিব, মালিক, বিধান দাতা, রিজিক দাতা ইত্যাদি হিসাবে মানা যাবে না। আর আল্লাহ জগতের শেষ নবী মুহাম্মদ (সা) এর মাধ্যমে যে জীবন-বিধান পাঠিয়েছেন তা মেনে চলতে হবে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘এ ঘোষনা যদি আমি এখনই দেই?’ বলল বেঞ্জামিন বেকন, কলিন্স, বব কার্টার প্রায় একই সাথে।

আহমদ মুসা হাসি মুখে কিছু বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় পুলিশের দুটি গাড়ি এসে দাঁড়াল তাদের গাড়ির পাশে।

আহমদ মুসা থেমে গেল এবং প্রসংগ পাল্টে দ্রুত কন্ঠে বব কার্টারকে বলল, ‘তাড়াতাড়ি বাড়ি ও লাশ ওদের বুঝিয়ে দিন।’

‘জি স্যার, দিচ্ছি। কম্পিউটার ও অন্যান্য ডকুমেন্ট সবই গাড়িতে তোলা হয়েছে। ওদেরকে বাড়ির দায়িত্বটা বুঝিয়ে দিয়েই আমরা চলে যাব।’ বলল বব কার্টার।

‘আমরা তো এখন চলে যেতে পারি মিঃ বব কার্টার।’

বব কার্টার আহমদ মুসার দিকে আবার পরিপূর্ণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে শশব্যস্তে বলে উঠল, ‘না স্যার। আমি বলতে ভুলে গেছি। স্যার আপনাকে অনুরোধ করেছেন আমাদের সাথে হেড কোয়ার্টারে যেতে। জর্জ এডওয়ার্ড মুরকে নিয়ে তার স্ত্রী বাড়ি এসেছেন। স্যার বলেছেন এডওয়ার্ড মুরের সাথেও দেখা করার কথা।’

হাসল আহমদ মুসা। মনে মনে বলল, লোভ দেখিয়েছেন এডওয়ার্ড মুরের সাথে সাক্ষাতের। আসল মতলব, নিশ্চয় কোন আলোচনার বিষয় আছে। প্রকাশ্যে

বলল আহমদ মুসা, 'ঠিক আছে বব কার্টার। আপনার স্যারের হুকুম তো আর আমি ফেলতে পারি না। যাব।'

'হুকুম নয় স্যার। অনুরোধ করেছেন আপনাকে।'

'ঠিক আছে। আপনি কাজ সেরে নিন।' আহমদ মুসা বলল।

বব কার্টার চলল গাড়ি থেকে নেমে আসা এক পুলিশ অফিসারের দিকে।

আহমদ মুসা মুখ ফিরিয়ে নিল গাড়ির ভেতরে।

রবিন নিক্সনের সাথে আবার গল্প শুরু হলো তার।

# ৭

'প্রসিডেন্ট বলতে গেলে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করেছেন।' বলল জেনারেল শ্যারন। কান্নার মত ভেজা কন্ঠস্বর তার। ক্ষোভে-দুঃখে বিধ্বস্ত তার মুখ মন্ডল।

জেনারেল শ্যারন যাদের লক্ষ্য করে কথাগুলো বলল, তাদের সবার মুখ নিচু। ভাবনার দুর্বহ ভারে ঝুলে পড়েছে যেন সবার মাথা।

ওয়াশিংটনের বাইরে নির্জন এলাকার একটা বিশাল বাড়ির সাউন্ড প্রুফ ঘরে কাউন্সিল অব আমেরিকান জুইস এ্যাসোসিয়েশনস এবং আমেরিকান জুইস পিপলস লীগের নির্বাহী কমিটির যৌথ অধিবেশন বসেছে। আমেরিকান ইহুদীদের সব মাথাই এখানে হাজির। যাদের মধ্যে রাজনীতিক, শিল্পপতি, সাংবাদিক, কূটনীতিক, আমলা, আইনজীবী সব ধরনের লোক রয়েছে।

জেনারেল শ্যারন থামতেই একজন বলে উঠল, 'যুদ্ধটা কি, দয়া করে সবাইকে বলুন।'

'পূর্ব তথ্য সবই আপনারা জানেন। নতুন মারাত্মক যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তা হলো আমাদের চেষ্টায় আমাদের চরম বৈরী হয়ে ওঠা এফ.বি.আই চীফ ও সি.আই.এ চীফকে  বরখাস্ত করেছিলেন প্রেসিডেন্ট, কিন্তু এই দুজনকে আবার পুনরবহাল করা হয়েছে। সেই সাথে প্রেসিডেন্টের কাছে পৌছার আমাদের প্রধান অবলম্বন প্রসিডেন্টের নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেনারেল হ্যামিল্টনকে পদচ্যুত করা হয়েছে। এরপরই এফ.বি.আই ঝাঁপিয়ে পড়েছে আমাদের উপর। আমাদের একটা অফিস তারা ধ্বংস করেছে। আমাদের নয়জন লোককে তারা হত্যা করেছে, জিনিসপত্র নিয়ে গেছে। গ্রেফতারের জন্যে আমাকে তাড়া করে ফিরছে। সবচেয়ে ভয়াবহ হলো, আমেরিকান ইহুদী কম্যুনিটির বিরুদ্ধে একটা বিরাট ষড়যন্ত্র মামলা দাঁড় করাচ্ছে। যে মামলার আসামী হবেন বিজ্ঞানী জন জ্যাকব থেকে শুরু করে উল্লেখযোগ্য ইহুদী নেতৃবৃন্দ। এই ষড়যন্ত্র মামলার কাহিনী প্রচার

হওয়ার সাথে সাথে আমেরিকানদের ক্ষোভ, ক্রোধ গিয়ে আছড়ে পড়বে ইহুদীদের উপর।' থামল জেনারেল শ্যারন।

সংগে সংগেই একজন যুবক উঠে দাঁড়াল। বলল, 'এমন ষড়যন্ত্র মামলায় সুযোগ আমরা কেন দিলাম। এই গোয়েন্দাবৃত্তি কি অপরিহার্য ছিল?'

তার কথা শেষ হতেই প্রধান গোছের কয়েকজন উঠে দাঁড়াল। সমস্বরে বলে উঠল, 'আমাদের এই যুবক বন্ধু জাতির ইতিহাস জানেন না। যাকে গোয়েন্দাবৃত্তি বলছেন, তারও ইতিহাস জানেন না।'

কাউন্সিল অব জুইস এ্যাসোসিয়েশনসের সভাপতি এবং অনুষ্ঠানের সভাপতি ডেভিড উইলিয়াম জোনস বলে উঠল, 'আপনারা একজন কথা বলুন।'

সবাই বসল। কথা বলার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকল তাদের মধ্যে প্রবীণতম একজন। নিউইয়র্ক অঞ্চলের সভাপতি সে। বলল, 'আমাদের যুবক বন্ধু যাকে ষড়যন্ত্র বলেছেন, তা ষড়যন্ত্র নয় আমাদের বাঁচার মূলমন্ত্র। এই মূলমন্ত্রই আমাদেরকে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ শক্তি মার্কিন-জীবনের কেন্দ্র বিন্দুতে নিয়ে এসেছে। একে ষড়যন্ত্র বললে বিজ্ঞানী জন জ্যাকবকে ষড়যন্ত্রকারী বলতে হয়। কিন্তু জন জ্যাকব তো আমাদের জাতীয় বীর। তিনি তাঁর গোটা জীবনকে তিল তিল করে জাতির জন্যে বিলিয়ে গেছেন।' থামল বৃদ্ধ।

যুবকটি উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আমি দুঃখিত।' গম্ভীর কন্ঠে কথাটি বলেই সে বসে পড়ল।

আবার কথা শুরু হলো। এবার কথা বললো সভা সভাপতি ডেভিড উইলিয়াম জোনস। বলল, 'অপ্রয়োজনীয় কথা বলার সুযোগ এখন নেই। আজ যে পরিস্থিতির আমরা মুখোমুখি সবার কাছে তা পরিষ্কার। অন্য কোন কথা নয়, সবাই বলুন এখন কি করণীয়। এটাই আজকের একমাত্র এজেন্ডা।'

ডেভিড উইলিয়াম জোনস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খুবই সম্মানিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি ব্যাংকার, শিল্পপতি এবং মিডিয়া জায়ান্ট।

তার কথা শেষ হতেই আমেরিকান জুইস পিপলস লীগের সভাপতি কথা বলে উঠল। বলল, 'করণীয় নিয়েও বড় আলোচনার দরকার নেই। করনীয় আমাদের একটাই। সেটা হলো, মার্কিন সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদে আমাদের

যারা আছেন এবং যারা আমাদের হতে পারেন, তাদের সকলকেই সক্রিয় ও সোচ্চার করে তুলতে হবে। ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান দলের নেতা যারা আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল সেইসব নেতাদের পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে হবে। চারদিক থেকে শ্লোগান তুলতে হবে, প্রেসিডেন্ট মৌলবাদীদের পেট্রোডলারে বিক্রি হয়ে গেছেন। প্রেসিডেন্টের যে গোপন ফাইল আমরা সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধ করছি, তার ভিত্তিতে তিনি অনৈতিক কাজের সাথেও জড়িত তা প্রমাণ করতে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। এইভাবে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে তাকে 'ইমপীস' করা যায়। আর এই সব কাজে আমাদের অর্থ-বিত্ত, প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং মানষকে বশিভূত করার যত অস্ত্র আছে সব কাজে লাগাতে হবে। আর আমাদের এই কাজের একটা প্রধান ও প্রথম কাজ হবে যেকোন মূল্যে আহমদ মুসাকে শেষ করে দেয়া। সেই আজ আমাদের সকল দুর্গতির মূল। তাকে শেষ করা গেলে আমেরিকায় আমাদের অন্য কাজগুলো আরও সহজ হয়ে যাবে।'

আমেরিকান জুইস পিপলস লীগের সভাপতি থামতেই সভার সভাপতি ডেভিড জোনস তাকে ধন্যবাদ দিল এবং সবাইকে লক্ষ্য করে বলল, 'আপনারা সকলে তাঁর কথার সাথে একমত?'

সংগে সংগে সবাই দুই হাত তুলে তাদের সমর্থন ও শপথের কথা জানাল।

হাসি ফুটে উঠল ডেভিড জোনসের মুখে এবং জেনারেল শ্যারনের মুখেও।

'তাহলে সিদ্ধান্ত আমাদের হয়ে গেল। আমরা এখনকার মত উঠছি।' বলল ডেভিড জোনস।

কথাটা শেষ করেই ডেভিড জোনস জেনারেল শ্যারনের দিকে ফিরে বলল, 'মিঃ জেনারেল, বিভিন্ন মার্কিন গ্রুপের এ সময় আমাদের সমর্থন দরকার। হোয়াইট ঈগলের প্রধান গোল্ড ওয়াটার তো আপনার বন্ধু। তার মাধ্যমে হোয়াইট ঈগলকে কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করুন।'

মুখটা ম্লান হয়ে গেল জেনারেল শ্যারনের। বলল, 'তিনি আমার বন্ধু ছিলেন, কিন্তু এখন মনে হয় আর নেই। লস আলামোসের ঘটনা জানার পর তিনি বেঁকে বসেছেন। আমি তার সাহায্য চেয়েছিলাম। তিনি বলেছেন, দেখুন আমি

আমেরিকান বলেই হোয়াইট ঈগল করি। আমেরিকান হিসাবে দায়িত্বই আমার কাছে এক নম্বর।' থামল জেনারেল শ্যারন।

'কেন সে তো টাকার পাগল। তাকে দিন না কয়েক মিলিয়ন ডলার। দেখবেন কাত হয়ে গেছে।'

'পরোক্ষ ভাবে তাকে আমি পরখ করেছি। তিনি বলেছেন, টাকা তার দরকার হোয়াইট ঈগলের জন্যে। আর হোয়াইট ঈগল আমেরিকার জন্যে। অতএব তার টাকা দরকার আমেরিকার জন্যে। আমেরিকার ক্ষতি করে কোন টাকা তার চাই না।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডেভিড জোনস। বলল, 'এই নীতিবাগিশতা আমাদের জন্যে একটা বড় বিপদ। বস্তুবাদকে এত উপরে তোলার পরেও এই নীতিবোধ অধিকাংশ আমেরিকানদের মধ্যে থেকে দূর করা যায়নি।' থামল ডেভিড জোনস।

জেনারেল শ্যারনও কোন কথা বলল না। ভাবছিল সেও। দুজনের চোখেই তখন একটা ছবি ভাসছে। ভবিষ্যতের একটা ছবি। আমেরিকান এই নীতিবোধ ও প্যাট্রিওটিজমের বিরুদ্ধে তাদের বাঁচার এই যে লড়াই তার ভবিষ্যত কি?

প্রশ্নটি ভীতিকর আকারে জ্বল জ্বল করে উঠল তাদের চোখের সামনে। কিন্তু তার কোন উত্তর স্পষ্ট হয়ে উঠলো না।

একটা ভাবনা তাদের সামনে এখন প্রকট , কলম্বাসরা একদিন যাকে 'নিউ ওয়ার্ল্ড' বলেছিল, সেটা কি 'নিউ ওয়ার্ল্ড'ই হয়ে দাঁড়াবে, না একে তারা তাদের আরেক 'প্রমিজড ল্যান্ড'-এ পরিণত করতে পারবে?

পরবর্তী বই

# এক নিউ ওয়ার্ল্ড

**কৃতজ্ঞতায়ঃ**

1. Hafizul Islam
2. Gazi Salahuddin Mamun
3. Bondi Beduyin

# সাইমুম-৩০

# এক নিউ ওয়ার্ল্ড

আবুল আসাদ

# ১

আহমদ মুসার চোখ পটোম্যাক নদীর উপর নিবদ্ধ। কিন্তু তার দৃষ্টি পটোম্যাক নদীর কিছুই দেখছে না।

আহমদ মুসার শূন্য দৃষ্টিতে ভাসছে উদ্বেগের এক অশরীরী ছবি। লায়লা জেনিফার ও ডাক্তার মার্গারেট কেমন আছে? ওদের প্রতি দায়িত্বে হয়তো সে অবহেলা করেনি, কিন্তু যতটা তৎপর হওয়া উচিত ছিল তা কি সে হতে পেরেছে? পারেনি হয়তো। কিন্তু আহমদ মুসার করার কিছুই ছিল না। ঘটনা প্রবাহ তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। আহমদ মুসা একে আল্লাহর ইচ্ছা বলেই মনে করেছে। লায়লাদের নিশ্চয়ই কোন ক্ষতি হবে না এবং তাদের উদ্ধারে আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করবেন।

আহমদ মুসা তার ফ্লাটের সাউথ ব্যালকনিতে বসে নদীর দিকে তাকিয়ে আছে।

জর্জ ওয়াশিংটন মনুমেন্টের পুবে ও মার্কিন পার্লামেন্ট হাউসের দক্ষিণে পটোম্যাকের তীরে এই ফ্ল্যাটটি। যোগাড় করেছ বেঞ্জামিন বেকন জর্জ আব্রাহামের সাহায্যে। ফ্ল্যাটটি অফিসিয়াল এলাকায়। এই দিক থেকে অনেক নিরাপদ জায়গাটা।

একটা গাড়ির হর্নের শব্দ এল আহমদ মুসার কানে। শব্দটি এল নিচের গাড়ি বারান্দা থেকে। হর্নের শব্দ আহমদ মুসাকে চিন্তার জগত থেকে ফিরিয়ে আনতে পারল না।

হঠাৎ আহমদ মুসার অনুভব করল একটা হাত তার ঘাড়ে এসে থেকে গেল।

প্রথমটায় চমকে উঠেছিল আহমদ মুসা। ফিরে এসছিল চিন্তার আচ্ছন্নতা থেকে। চমকে উঠলেও পরক্ষণেই অনুভব করল হাতটি বেঞ্জামিন বেকনের। পেছন দিকে না তাকিয়েই আহমদ মুসা বলল, 'মি. বেঞ্জামিন বেকন, এই অসময়ে যখন, নিশ্চয় কোন খবর এনেছেন?'

'হ্যা, একটা ভাল খবর।'

'কি সেটা?'

'আমার সাথে আপনাকে এখনি বেরুতে হবে।'

'কোথায়?' পেছন ফিরে বেঞ্জামিন বেকনের দিকে তাকিয়ে বলল আহমদ মুসা।

'শোনার দরকার নেই, উঠুন।'

'সত্যিই উঠব?'

'সত্যি না হলে এই সাত সকালে এভাবে আসি?'

আহমদ মুসা উঠল। বেঞ্জামিন বেকনের উপর তার আস্থা আছে। অকাজে সে সময় খরচ করে না।

আহমদ মুসা তৈরী হয়ে বেঞ্জামিন বেকনের সাথে বেরিয়ে এল।

তারা গাড়িতে উঠল। গাড়ি ছুটল উত্তর ওয়াশিংটনের দিকে।

গাড়ি গিয়ে থামল সুন্দর একটা বাড়ির সামনে।

লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নামল বেঞ্জামিন বেকন। বলল, 'আসুন মি. আহমদ মুসা।'

আহমদ মুসাও নামল।

চত্বর থেকে এক ধাপ পেরিয়ে করিডোরে উঠে সামনে দরজার উপর নজর ফেলতেই দেখল, দরজা দিয়ে সান ওয়াকার ও জর্জ বেরিয়ে এল।

টার্কস দ্বীপের এই জর্জ ডা. মার্গারেটের ভাই ও লায়লা জেনিফারের স্বামী।

বিস্মিত আহমদ মুসা দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

ওরা এসে দুজনেই জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে।

আহমদ মুসা দুজনের পিঠ চাপড়ে বলল, 'সালাম দিতে বুঝি এভাবে ভুলে যায়?'

দুজনে আহমদ মুসাকে ছেড়ে দিয়ে হেসে উঠল। বলল দুজনেই, 'আসসালামু আলাইকুম।'

আহমদ মুসা সালাম নিল। সে কিছুই বলতে যাচ্ছিল।

তার আগেই বেঞ্জামিন কথা বলে উঠল। তার চোখে-মুখে বিস্ময়। বলল, 'মি. জর্জ, মি. সানওয়াকার আপনাদের এই নতুন ধর্মীয় পরিচয়ের কথা আমাকে বলেননি?'

'পরিচয় অনেক পুরানো হয়ে গেছে।' বলল সানওয়াকার।

'মি. আহমদ মুসা আপনি দেখছি যাদুকর! মনে করেছিলাম মাত্র আমরা এখানকার কজনই আপনার দলে ভিড়েছি। কিন্তু দেখছি, ওরা অনেক আগেই আপনার শিকার হয়ে গেছে।' বলল বেঞ্জামিন বেকন।

'মি. বেঞ্জামিন, সত্যের শক্তি যাদুর চেয়ে লক্ষ কোটি গুণ বেশি।' বলল আহমদ মুসা।

'সত্য যদি সত্য হয়।' বেঞ্জামিন বলল।

'কিন্তু সত্য একটা বিমূর্ত জিনিস। সত্য মূর্ত হয়ে ওঠে সত্যের যারা সাক্ষ্য দেন বা সত্যের যারা বাহক তাদের মাধ্যমে। সত্য মূর্ত হয়ে ওঠা বা সত্যকে মূর্ত করে তোলার বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং সত্য সত্য হওয়াই যথেষ্ট নয়।'

'সত্যিই তাই মি. আহমদ মুসা। সত্য যদি গুণের নাম হয়, তাহলে সত্যের বাহক হবেন গুণী। গুণীকে বাদ দিলে গুণ দৃশ্যমান হয়না।'

'ধন্যবাদ মি. বেঞ্জামিন। আপনার উদাহরণটা খুবই সুন্দর।'

বলে আহমদ মুসা মুহূর্তকাল থেমেই বেঞ্জামিনের দিকে চেয়ে বলল, 'মি. বেঞ্জামিন আপনার ভাল খবর যে জর্জ ও সানওয়াকারদের সাথে সাক্ষাত করিয়ে

দেয়া, তা কল্পনাতেও আমার আসেনি। সত্যিই আমার জন্যে এটা একটা অসম্ভব ভাল খবর। কিন্তু এদের সাথে পরিচয় হলো আপনার কেমন করে?'

'ভাল খবর শুধু এই একটাই নয় মি. আহমদ মুসা। আরও আছে। কিন্তু তার আগে আপনার শেষ প্রশ্নটার জবাব দিয়ে নেই।'

বলে বেঞ্জামিন বেকন একটু থামল। পরক্ষণেই শুরু করল আবার। বলল, 'ফ্রি আমেরিকা'র পক্ষ থেকে আমরা আমেরিকার সকল দেশপ্রেমিক সংগঠন ও সংস্থার সাথে যোগাযোগ করছি ইহুদীবাদীদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তাদের অবহিত করার জন্যে। এ কাজ করতে গিয়েই 'আমেরিকান ক্রিসেন্ট'-এর জর্জের সাথে আমার পরিচয় হয়। পরিচয় করতে গিয়ে বুঝলাম যে আমাদের সব পক্ষেরই নেতা আহমদ মুসা। তারপর আপনাকে নিয়ে এলাম সারপ্রাইজ দেবার জন্যে।'

'ধন্যবাদ মি. বেঞ্জামিন এই ধরনের সারপ্রাইজ দেবার জন্যে।' সবাইকে নিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল আহমদ মুসা।

দুতলা বাড়ির নিচে তলার বিশাল ড্রইংরুমে বসল সবাই।

বসার পর মুহূর্তের জন্যে বুজে গিয়েছিল আহমদ মুসার দুই চোখ। গম্ভীর হয়ে উঠেছিল তার মুখমন্ডল।

পরে তাকাল আহমদ মুসা জর্জের দিকে। বলল, 'তোমাকে জিজ্ঞেস করতে ভয় করছে যে তোমরা কেমন আছ। আমি দুঃখিত জর্জ।'

জর্জের মুখ মলিন হয়ে উঠল। মুখটা তার নিচু হয়ে পড়েছিল। বোধ হয় ভাবান্তরটা গোপন করার জন্যে। সংগে সংগেই আবার মাথা তুলল। বলল, 'যা ঘটবার তা ঘটেছে। কারোই কিছু করার ছিল না। ওরা বরং আপনার নির্দেশ ভংগ করেছিল।

জর্জের কথাগুলো যেন আহমদ মুসার কানেই গেলো না। যেন কতকটা স্বগোতক্তির মতই বলে উঠল, 'শ্যারনরা যে নতুন ডেট লাইন দিয়েছে, তাতে আরও কয়েকটা দিন হাতে আছে। এবার এ দিকে নজর দেবার সময় এসেছে জর্জ। দুঃখিত জর্জ, অনেক দেরী হয়েছে। তবে তাদের কোন ক্ষতি করতে সাহস পাবে না শ্যারনরা।'

'বৃথাই আপনি কষ্ট পাচ্ছেন ভাইয়া। কোন দেরী হয়নি। বিস্তারিত আমি শুনেছি মি. বেঞ্জামিনের কাছে। যা আশু করার আল্লাহ আপনাকে দিয়ে তাই করিয়েছেন। ওদের মুক্তির পথ এখন অনেক সহজ হয়েছে ভাইয়া।'

'তোমার কথা আল্লাহ সত্য করুন জর্জ।' বলল আহমদ মুসা। কথা শেষ করে আহমদ মুসা তাকাল সানওয়াকারের দিকে। বলল, 'প্রফেসর আরাপাহো কেমন আছেন?'

'ভালো আছেন। আমি আসার সময় আমার প্রতি তাঁর নির্দেশ ছিল আমি যেন প্রথম সাক্ষাতেই আপনাকে তার কাছে টেলিফোন করার জন্যে অনুরোধ করি।' বলল সানওয়াকার।

'আচ্ছা সানওয়াকার, আমি আজই তার কাছে টেলিফোন করব। আমি দুঃখিত, কিছুদিন এমন গেল যে, চারপাশের বর্তমান ছাড়া দূরের কোন কিছুর দিকে মনযোগই দিতে পারিনি।' আহমদ মুসা বলল।

'ভাবীর কথা, ভাইয়া?' বলল জর্জ।

'ওকে অনেক বার মনে পড়েছে, কিন্তু ওর সাথে যোগাযোগ করতে পারিনি। প্রথম গত রাতে ওর সাথে কথা বলেছি।'

'যা ঘটেছে, ঘটছে সব কি তাঁকে আপনি জানান?' আবার জিজ্ঞাসা জর্জের।

'সব জানাই না, তবে আমি কি করছি তা জানতে খুব আগ্রহী তাই একটা ব্রীফ তাকে করতে হয়।'

'মাফ করবেন, এ ব্রীফ-এর মধ্যে কতটুকু থাকে ভাইয়া?' আবার জর্জেরই প্রশ্ন।

'এটুকু জেনে রাখ, মুল ঘটনাগুলো ছাড়াও জর্জ ও লায়লা জেনিফারের কথা, সানওয়াকার ও মেরী রোজের কথা, সানঘানেম নাবালুসি ও সান্তা আনা পাবলোর কথা তিনি জানেন। ঠিক এমনি ভাবেই জানেন তিনি প্রফেসর আরাপাহো, ওগলালা কারসেন ঘানেম নাবালুসি পরিবার, পাবলো পরিবার, ডা. আহমদ আশরাফ পরিবার, বেঞ্জামিন বেকন, জর্জ জুনিয়র ও সাবা বেনগুরিয়ান, জর্জ আব্রাহাম জনসন, সারা জেফারসন প্রমুখ সবাইকে।' থামল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা থামতেই বেঞ্জামিন বেকন বলে উঠ, ‘আমাদের পরম সম্মানিতা ভাবী সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি এতকিছু জানার ধৈর্য্য তাঁর আছে?’

কথা বলতে যাচ্ছিল আহমদ মুসা। আহমদ মুসার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলল জর্জ, ‘ভাবীও কম নন মি. বেঞ্জামিন বেকন। ফ্রান্সের লুই রাজ পরিবারের একমাত্র উত্তরাধিকারী রাজকুমারী তিনি।’

‘কি বল জর্জ তুমি। সে রাজ্য নেই, সে রাজপরিবার নেই, রাজকুমারীও তিনি নন।’ আহমদ মুসা লাজুক কণ্ঠে বলল।

‘দেখুন ভাইয়া, হায়কালের লেখা মহানবী (সঃ) এর জীবনী আমি ইতিমধ্যে পড়ে ফেলেছি। বংশীয় সম্মান, বংশ পরিচয়কে ইসলাম গুরুত্ব দিয়েছে। সম্মানও দিয়েছে। এ পরিচয় পরিত্যাগ করতে নিষেধ করেছে।’ বলল জর্জ প্রতিবাদের কণ্ঠে। জর্জের কথা শেষ হবার সাথে সাথে বেঞ্জামিন বেকন বলে উঠল, ‘আমার এখন মনে হচ্ছে, জোড়া মেলানোর ক্ষেত্রেও স্রষ্টার সবিশেষ একটা পরিকল্পনা আছে। মি. আহমদ মুসার জোড়া শুধু ফরাসী রাজকুমারী ধরনেই কেউ হতে পারেন। তিনি শুধু স্ত্রী নন, সহযোগী, সহকর্মীও। তা না হলে সব ব্যাপারে এমন আগ্রহ তাঁর থাকবে কেন!’

‘আপনারা আলোচনা অন্যদিকে নিয়ে গেছেন। আসলে বিষয়গুলো জানার ওর আগ্রহের কারণ উনি ধারাবাহিক নোট রাখেন। ইতিহাসের গতিধারার উনি একজন অত্যন্ত সিরিয়াস পর্যবেক্ষক।’ বলল আহমদ মুসা।

একটু থেমেই আহমদ মুসা আবার বলল, ‘সানওয়াকার, ওদিকের অবস্থা কি? ওগলালা কি করছে?’

‘ভাইয়া, সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই জিভারো ও ওগলালা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছে। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া শুরু করেছি। মেরী রোজও আসছে।’ বলল সানওয়াকার।

‘ওগলালা ও জিভারো বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছে? তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া শুরু করেছ? মেরী রোজও? তারপর? কিছু ঘটেনি?’ আহমদ মুসার কণ্ঠে বিস্ময়।

‘না ভাইয়া যারা মানে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ছেলেরা আমাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া করেছিল, ধরে নিয়ে গিয়েছিল, তারাই আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে গেছে। তারা সবাই এখন বন্ধু হয়ে গেছে।’ বলল সানওয়াকার।

‘এ বিস্ময়কর পরিবর্তনটা কিভাবে ঘটল? আমার বিশ্বাস হতে চাইছে না।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ভাইয়া, এ কীর্তি বেঞ্জামিন বেকনের। আমি কিছুই জানি না। আমি ও জর্জ এখানে গোপনে ছিলাম এবং আপনার খোঁজ করছিলাম। হঠাৎ একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই বৈরী ছেলেরা এল এবং আমাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে গেল।’ বলল সানওয়াকার।

‘বেঞ্জামিন ও জর্জের সাথে তোমার পরিচয় হলো কিভাবে?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ।

‘কাহোকিয়ায় আমাদের পুলিশ অফিসার এবং ‘এইম’ (AIM-American Red Indian Movement)-এর সেক্রেটারী জেনারেল ‘চিনক’-এর রেফারেন্স নিয়ে মি. বেঞ্জামিন বেকন আমার এখানে আসেন। আর শিলা সুসান জর্জের সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন। শিলা সুসানও বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করছে।’ বলল সানওয়াকার।

সানওয়াকারের কথা শেষ হলে আহমদ মুসা তাকাল বেঞ্জামিন বেকনের দিকে। বলল, ‘কি ব্যাপার মি. বেকন। এ মিরাকল কিভাবে ঘটল?

হাসল বেঞ্জামিন বেকন। বলল, ‘আরেকটা সারপ্রাইজ বাকি আছে। তার আগে কিছু বলা যাবে না। এখানকার কাজ শেষ। এবার চলুন সেখানে।’

‘কোথায়?’ বলল আহমদ মুসা।

‘যেখানে সারপ্রাইজটা অপেক্ষা করছে সেখানে।’ বলল বেঞ্জামিন বেকন।

‘আপনার সারপ্রাইজের প্রতি আমার লোভ সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং চলুন।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ধন্যবাদ। আসছে সারপ্রাইজটা কিন্তু এই সারপ্রাইজের চেয়ে অনেক বড় হবে।’

বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল বেঞ্জামিন বেকন।

সবাই উঠে দাঁড়াল। সবাই গিয়ে গাড়িতে উঠল। এক গাড়িতেই চারজন।

আগের মত বেঞ্জামিন বেকনই গাড়ি ড্রাইভ করল।

পনের মিনিট চলার গাড়ি চারতলা একটা বিশাল বিল্ডিং-এর সামনে এসে দাঁড়াল।

বিল্ডিং-এ ইলেকট্রনিক একটা সাইনবোর্ড। তাতে বড় সাদা একটি ঈগল। তার নিচে লেখা 'আমেরিকান কনসাসনেস সোসাইটি' (ACS)।

সাইনবোর্ড দেখে ভ্রু কুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার। 'হোয়াইট ঈগলে'র সাইনকে আহমদ মুসা চেনে। আহমদ মুসা এও জানে, 'হোয়াইট ঈগলে'র প্রকৃত নাম 'আমেরিকান কনসাসনেস সোসাইটি'। কিন্তু এ নাম একেবারেই চাপা পড়ে গেছে। সাইন 'হোয়াইট ঈগল' অনুসারে তার নাম হয়ে গেছে 'হোয়াইট ঈগল'।

গাড়ি থেকে নেমে সেই বিল্ডিং-এর গেটের দিকে এগোলো তারা সকলে।

বেঞ্জামিন বেকনের সারপ্রাইজিং সারপ্রাইজ তাহলে কি ...। চিন্তা আর সামনে এগোল না আহমদ মুসার। এমন অসম্ভব কখনও সম্ভব হতে পারে না। তাহলে হোয়াইট ঈগল অফিসের কোথায় যাচ্ছে তারা?

আহমদ মুসা দেখল, বেঞ্জামিন বেকন এখানে পরিচিত। তাকে দেখেই প্রহরীরা স্যালুট দিয়ে সরে দাঁড়িয়েছে। আরও তার মনে হলো, প্রহরীরা সবাই যেন তাদেরই অপেক্ষা করছিল।

গোটা বিষয়টা আহমদ মুসার কাছে স্বপ্নের মতই অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে।

দুতলার মেষ প্রান্তের একটা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল বেঞ্জামিন বেকন।

দরজার সামনে স্টেনগান হাতে দাঁড়িয়েছিল একজন প্রহরী।

বেঞ্জামিন বেকন তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই প্রহরী দরজা খুলে ধরে বলল, 'স্যার আছেন। আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

প্রহরীকে ধন্যবাদ দিয়ে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আসুন মি. আহমদ মুসা, আসুন সকলে।'

বলে বেঞ্জামিন বেকন ভেতরে প্রবেশ করল।

তার সাথে সাথে আহমদ মুসা এবং সকলে।

ঘরে প্রবেশ করার পর আহমদ মুসার নজর প্রথম গিয়ে পড়ল একটা বিশাল টেবিলের উপর। দেখতে পেল আহমদ মুসা, টেবিলের ওপার থেকে হোয়াইট ঈগলের প্রধান ডেভিড গোল্ড ওয়াটার শশব্যস্তে দরজার দিকে আসছেন।

সত্যিই আহমদ মুসা স্তম্ভিত হয়েছে আকস্মিক এই ঘটনায়।

এগিয়ে আসা ডেভিড গোল্ড ওয়াটার বেঞ্জামিন বেকনকে পাশে ঠেলে দিয়ে পথ পরিষ্কার করে হাত বাড়াল স্তম্ভিত আহমদ মুসার দিকে।

স্বপ্নাচ্ছন্যের মতই আহমদ মুসা হাত বাড়াল গোল্ড ওয়াটারের দিকে। দুই হাত মিলিত হলো। হলো দুজনের হ্যান্ডশেক।

ডেভিড গোল্ড ওয়াটার আহমদ মুসার হাত ছাড়ল না। হাত ধরে টেনে নিয়ে এসে বসাল চেয়ারে এবং ফিরে গেল নিজের চেয়ারে।

'মি. গোল্ড ওয়াটার, মনে হচ্ছে আপনি যেন আমাকে চেনেন না এবং আহমদ মুসা ছাড়া আর কেউ যেন এ ঘরে আসেনি। আমরা স্বাগত সম্ভাষণও পেলাম না, বসতেও বললেন না আমাদের।' বলল বেঞ্জামিন বেকন ঠোঁটের কোণায় হাসি টেনে।

সংগে সংগেই ডেভিড গোল্ড ওয়াটার আবার উঠে দাঁড়াল। সলজ্জ হেসে বলল, 'সরি, ওয়েলকাম টু অল। মি. বেঞ্জামিন এবং আপনারা দয়া করে বসুন।'

'ধন্যবাদ মি. গোল্ড ওয়াটার।' বলে বেঞ্জামিন বেকন জর্জকে দেখিয়ে বলল, 'বলতে পারেন ইনি মি. আহমদ মুসার ছোট ভাই, জর্জ। আর ....'

'বলতে হবে না মি. বেঞ্জামিন বেকন। ওকে আমি জানি 'আমেরিকান ক্রিসেন্ট'-এর ও সভাপতি। ওর ফাদার ছিল আমার পরম উপকারী একজন।

বেঞ্জামিন বেকন সানওয়াকারের পরিচয় দিতে যাচ্ছিল। বেঞ্জামিনকে থামিয়ে দিয়ে গোল্ড ওয়াটার বলে উঠল, 'সারওয়াকারকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমাকে লজ্জা দেবেন না। অত্যন্ত এক খারাপ অবস্থায় আমরা একে অপরকে জেনেছি।'

ডেভিড গোল্ড ওয়াটার কথা শেষ করার পর মুহূর্ত কয়েকের জন্যে একটা নিরবতা নেমে এল। সে নিরবতা ভাঙল আহমদ মুসা। আহমদ মুসা একবার

বেঞ্জামিন বেকন, একবার ডেভিড গোল্ড ওয়াটারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না কি ঘটছে!'

'কিছুই বুঝতে পারছেন না মি. আহমদ মুসা?' বলল ডেভিড গোল্ড ওয়াটার। তার ঠোঁটের কোণায় হাসি।

'এটুকু বুঝতে পারছি, 'ফ্রি আমেরিকা'র (FAME) সাথে 'হোয়াইট ঈগল'-এর নিশ্চয় কোন ডায়ালগ হয়েছে। যার ফলে সানওয়াকার ও জর্জরা কনসেসন পেয়েছে এবং আমাদেরও এখানে আসার মত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু বুঝতে পারছি না মিরাকলটা কি, যা এটা ঘটাল।' বলল আহমদ মুসা।

'মিরাকল আপনিই ঘটিয়েছেন আহমদ।' বলল গম্ভীর কণ্ঠে ডেভিড গোল্ড ওয়াটার।

'আমি ঘটিয়েছি? বুঝলাম না।' বলল বিস্মিত কণ্ঠে।

'আপনি ঘটাননি? ঘটনা আপনি উদঘাটন করেছেন। লস আলামোসের সুড়ঙ্গ আবিষ্কার এবং তার পরবর্তী ঘটনাগুলো আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে।' বলল ডেভিড গোল্ড ওয়াটার।

'কিন্তু আপনি তো জেনারেল শ্যারনের সাথেই ছিলেন। তারপর কি ঘটল?'

'এই মিরাকলের কৃতিত্ব অবশ্য বেঞ্জামিন বেকনের। আমি জেনারেলর শ্যারনের সাথে ওয়াশিংটন ফেরার সময় পর্যন্ত বিষয়গুলো আমার কাছে স্বচ্ছ ছিল না। বরং বলতে পারেন বিভ্রান্তির মধ্যে ছিলাম। লস আলামোস থেকে সান্তা ফে আসার পথে যে হত্যাকান্ড- এবং সান্তাফে বিমান বন্দরে এফ বি আই'র বিমানে যে বিস্ফোরণ ঘটে, তার ব্যাখ্যায় জেনারেল শ্যারন যা বলেছিলেন তাতে আমি সন্তুষ্ট ছিলাম। সর্বশেষ তার কাছ থেকে আমি লস আলামোস সুড়ঙ্গের কাহিনী শুনি।

প্রথমবারের মত আমার মধ্যে আশংকার সৃষ্টি হয় যে, আমাদের সবচেয়ে স্পর্শকাতর গবেষণাগারের কোন সুড়ঙ্গ সংযোগ একটি ইহুদী প্রতিষ্ঠান বা সর্বসাধারণের প্রবেশযোগ্য একটা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে থাকবে কেন! এই প্রশ্নের মুখোমুখি হবার সাথে সাথে আমি আমার লোকদের অনুন্ধানের নির্দেশ

দিলাম। এফ বি আই প্রধান জর্জ আব্রাহাম ও সি আই এ চীফ এ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থারের বরখাস্তের সংবাদ আমাকে আহত করে। কারণ, তখন আমেরিকার স্বার্থের ব্যাপারে তাদের চেয়ে একনিষ্ঠ লোক আমার চোখে পড়েনি। কথা বলি প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেনারেল হ্যামিলটনের সাথে তার যুক্তি ও জেনারেল শ্যারনের কথার মধ্যে আমি কোন পার্থক্য দেখিনি। জাতীয় স্বার্থের পক্ষের কে আর কে বিপক্ষে এ নিয়ে সংকটে পড়ে যাই। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি সব বিষয় জানানর আগে কোন কাজে আর হাত দেব না। এই সময় জেনারেল শ্যারন তার সাথে কাজ করার জন্যে পরোক্ষভাবে আমাকে বিরাট অর্থের লোভ দেখান। আমার মনে বড় একটা ধাক্কা লাগে, একজন ইহুদী স্বার্থের প্রতিভূ এত টাকা আমাকে অফার করছে কেন? আমি তাকে স্পষ্ট বলে দেই, আমার টাকার দরকার তবে তা আমেরিকার স্বার্থে কাজ করার জন্যে। টাকা নেয়ার আগে আমাকে জানতে হবে এই টাকা আমেরিকার স্বার্থের পক্ষে যাবে কি না।

এ রকম অবস্থায় বেঞ্জামিন বেকন আমার সাথে দেখা করেন। তাঁর কাছেই আমি সব শুনি। শোনার সাথে সাথেই আমার সব কথা বিশ্বাস হয়। এরপর আমি প্রথমে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান জেনারেল শেরউডের সাথে যোগাযোগ করি। তিনি বেঞ্জামিন বেকনের সব কথাই কনফার্ম করেন। পরে কথা বলি সি এই-এর প্রধান এ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থার এবং এফ বি আই-এর প্রধান জর্জ আব্রাহামের সাথে। তাঁদের কাছেও সব শুনি। তারপরেই আমি নিঃসন্দেহ হয়ে যাই যে, জেনারেল শ্যারনরা আমাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাচ্ছেন, আমাদের ঘাড়ে বসে আমাদেরই মাথা ভাঙার চেষ্টা করছেন। বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠা মন আরও নিশ্চিত হলো, ইহুদীবাদীদের আমরা বুকে টেনে নিয়ে যতই আদর করি, তাদের প্রয়োজনে তারা আমাদের বুকে ছুরি মারবেই। এসব মনে আসার সাথে সাথে আরও অনেক কথা মনে পড়ে গেল। আমেরিকান এক ইতিহাসবিদের সাথে আমার পরিচয় ছিল। তিনি বলতেন, জার্মানীতে ইহুদী হত্যার যে প্রেক্ষাপট বলা হয়, তার গোটাটাই সাজানো। তাঁর কথা শুনে আমি বিশ্বাস করতাম না। ভাবতাম, বলতাম, আপনার মধ্যে এ্যান্টি সেমিটিক মনোভাব প্রবল। আজকের যুগে এমন সাম্প্রদায়িক মনোভাব চলে না। পরবর্তীকে ঐ ইতিহাসবিদ তার কয়েকজন

সমমনা বন্ধুদের নিয়ে একটি 'হিস্টোরিক্যাল ফাউন্ডেশন' গঠন করেছিলেন। এই ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে জার্মানীর গণহত্যা বিষয়ে প্রকৃত দলিল দস্তাবেজ যোগাড় করেছিলেন এবং এই বিষয়ে তারা গবেষণা করছিলেন। কাজ অনেকখানি এগুবার পর তারা ঘোষণা দেন যে, জার্মানীতে ষাট লক্ষ বা অনুরূপ অংকের ইহুদী হত্যার উপযুক্ত প্রমাণ যে হাজির করতে পারবে, তাকে পঞ্চাশ হাজার ডলার পুরষ্কার দেয়া হবে। শুনেছিলাম পুরষ্কার নেবার জন্যে কেউ তাদের কাছে প্রমাণ নিয়ে হাজির হয়নি। তার বদলে তাদের গবষণা ফাউন্ডেশনের গোটা কমপ্লেক্সটাই বিষ্ফোরণে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ইহুদীবাদীদের দাবীকে বানোয়াট প্রমাণ করার জন্যে যোগাড় করা অমূল্য সব তথ্য ও দলিল-দস্তাবেজ। এই ঘটনার পর ঐ ইতিহাসবিদকে আমি কাঁদতে দেখেছি ও বলতে শুনেছি, ইহুদীবাদীরা বিষ্ফোরণ ঘটিয়ে আমাদের 'হিস্টোরিক্যাল ফাইন্ডেশন' ধ্বংস করেছে তাই নয়, ধ্বংস করেছে আমেরিকান সচেতন ও স্বাধীন বিবেককে। সেদিন ঐ ঐতিহাসিকের প্রতি কিছু করুণা সৃষ্টি হওয়া ছাড়া তার কথার এক বর্ণও আমি বিশ্বাস করি।। বেঞ্জামিন বেকন ও অন্যান্যদের কথা শোনার পর ঐ ঐতিহাসিকের কথাই খুব বেশি করে মনে পড়েছিল। বুকের ভেতরে খুব বেদনার সঞ্চার হেয়ছিল। বুঝতে পেরেছিলাম, কত দুঃখে ঐ অভিজ্ঞ ইতিহাসবিদ কেঁদেছিলেন। এই বিষয়গুলো নিয়ে আমি যতই ভাবতে লাগলাম, আপনার প্রতি, মুসলমানদের প্রতি আমার মন ততই প্রসন্ন হয়ে উঠতে লাগল। শেষে আমার অজান্তেই আপনি জর্জ আব্রাহাম, এ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থার, জেনারেল শেরউড প্রমুখ শীর্ষ আমেরিকানদের মত আমার বন্ধু হয়ে গেলেন। এই পরিবর্তন নিঃসন্দেহে একটা মিরাকল এবং এই মিরাকলের নট হলেন বেঞ্জামিন বেকন।'

ডেভিড গোল্ড ওয়াটারের দীর্ঘ বক্তব্য শেষ হবার সাথে সাথে বেঞ্জামিন বেকন গোল্ড ওয়াটারকে লক্ষ্য করে বলল, ঠিকই বলেছেন আমি নট বা অভিনেতা। কিন্তু অভিনয়কারী তো আসল লোক নয়, যারা ভূমিকায় অভিনয় করা হয়, সেই আসল। আসল লোক আহমদ মুসা, যা আপনিও বলেছেন।'

ডেভিড গোল্ড ওয়াটার কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই আহমদ মুসা বলে উঠল, 'আমি মি. ডেভিড গোল্ড ওয়াটারকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি এবং সেই

সাথে আমার জানার খুব আগ্রহ যে, ক্যারিবয়ান দ্বীপে যা ঘটেছে, সে ব্যাপারে কিছু ভেবেছেন কি না?'

ডেভিড গোল্ড ওয়াটার সংগে সংগে উত্তর দিল না। চেয়ারে গা এলিয়ে দিল। বুজে গেল তার চোখ দুটি। ভাবছে সে। অল্পক্ষণ পরে বলল, 'মি. আহমদ মুসা আপনার এই প্রশ্নের উত্তর আমি এখন দিতে পারবো না। বিষয়টা নিয়ে আমি অনুসন্ধান শুরু করেছি। এখন পর্যন্ত যা জানতে পেরেছি, আমার আগে হোয়াইট ঈগলের চেয়ারম্যান ছিলেন গোল্ডম্যান। তাঁর সময়ে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে জনসংখ্যা নীতি অর্থাৎ মুসলিম জনসংখ্যা হ্রাসকরণ প্রোগ্রাম হোয়াইট ঈগল গ্রহণ করে। এই প্রোগ্রাম যার মাথা থেকে আসে তিনি হলেন হেনরী হ্যানসেন। একজন জনপ্রিয় ক্যাথলিক খৃষ্টান স্যোশ্যাল ওয়ার্কার ছিলেন তিনি। গোল্ডম্যান এবং 'হোয়াইট ঈগল'- এর অন্যান্যরা লুফে নেয়, হেনরী হ্যানসেনের পরিকল্পনা। শুরু হয়ে যায় তার বাস্তবায়ন ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে। পরবর্তীকালে এক ঘটনায় হঠাৎ প্রকাশ হয়ে পড়ে হেনরী হ্যানসেন ইহুদী এবং তাঁর প্রকৃত নাম সাবাত সালেম। সে সময় যখন তার এই ইহুদী পরিচয় পাই, তখন আমার কিছুই মনে হয়নি। কিন্তু আজ একে আমার কাছে খুব বড় বিষয় বলে মনে হয়েছে। ইহুদীরা কাঁকা দিয়ে কাঁটা তুলে সব কাঁটাকেই পথ থেকে সরাতে চায়। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে তাই হয়েছে। ওখানে মুসলমান ও খৃস্টানরা সাপ ও নেউলের লড়াইয়ের মত একে অপরকে ধ্বংস করতে এক পায়ে খাঁড়া। ইশ্বরকে ধন্যবাদ, মি. আহমদ মুসা শুধু ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের মুসলমানদের রক্ষা করেননি, আজ আমাদের চোখও খুলে দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন। আমি ইতিমধ্যেই ফার্ডিন্যান্ডকে বলেছি ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে মুসলমানদের সাথে সকল বৈরিতার অবসান ঘটাতে।' থামল গোল্ড ওয়াটার।

'ধন্যবাদ মি. গোল্ড ওয়াটার। কিন্তু ফার্ডিন্যান্ডের জন্যে বিষয়টা মেনে নেয়া বোধহয় কঠিন হবে। সে দারুণ মুসলিম বিদ্বেষী।'

হাসল গোল্ড ওয়াটার। বলল, 'আপনি তো ফার্ডিন্যান্ডের ঘরকেই দখল করে বসে আছেন।'

'কেমন?'

‘কেন? শিলা সুসান। শিলা সুসান তো ফার্ডিন্যান্ডের সব। আপনি জানেন না শিলা সুসান ইতিমধ্যেই তার বাপকে তৈরী করে ফেলেছে। আমি যখন ফার্ডিন্যান্ডকে বললনাম আমার কথা, তখন মনে হলো সে যেন বড় বিপদ থেকে বেঁচে গেল। বলল, ‘আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার, আমি ও কথাটা আপনাকে বলব বলে ভাবছিলাম। কিন্তু সাহস পাচ্ছিলাম না।’ থামল ডেভিড গোল্ড ওয়াটার।

আহমদ মুসা তাকাল সানওয়াকারের দিকে। বলল, ‘শিলা সুসান কোথায় মেরী রোজ জানে?’

‘ও বিশ্ববিদ্যালয়ে। কদিন আগে সে সানসালভাদর থেকে এসেছে।’ বলল সানওয়াকার।

‘ওকে আমার ধন্যবাদ দিও।’ আহমদ মুসা বলল।

হাসল সানওয়াকার। বলল, ‘ধন্যবাদ নেবে বলে মনে হয় না। ওরা সবাই ক্ষেপে আছে।’

‘কেন?’

‘সবাইকে আপনি উদ্বেগ-আতংকের মধ্যে রেখেছেন। কোন খবরও কাউকে দেননি, কাউকে খবর নেবার সুযোগও দেননি।’

‘ওদের অভিযোগ সত্য। ওদের বলবে, আমার দিন কাটছে পর্বত প্রমাণ এক উদ্বেগ মাথায় নিয়ে। কাহোকিয়া থেকে যে উদ্দেশ্যে দ্রুত বের হয়েছিলাম, তার এখনও কিছুই করতে পারিনি। ডাক্তার মার্গারেট ও লায়লা জেনিফারকে এখনও মুক্ত করা যায়নি।’ বলল আহমদ মুসা। তার কণ্ঠ ভারী।

আহমদ মুসা থামতেই ডেভিড গোল্ড ওয়াটার বলল, ‘মি. আহমদ মুসা, আমি ডা. মার্গারেট ও লায়লা জেনিফারের বিষয় নিয়েই আপনাকে আশা করছিলাম বেশি।’ গম্ভীর কণ্ঠ গোল্ড ওয়াটারের।

চমকে উঠে ফিরে তাকাল আহমদ মুসা গোল্ড ওয়াটারের দিকে। বলল, ‘ওদের কোন খবর আছে? আমি যতদূর জানি ওরা এখন শ্যারনদের হাতে।’

‘হ্যাঁ তাই। তাদের আগ্রহে আমরা ওদেরকে তাদের হাতে তুলে দিয়েছিলাম। তবে ওদের খবর আমরা রেখেছি। বিশেষ করে মার্গারেটের প্রতি আমার একটা দুর্বলতা আছে। সে আমার এক উপকারী বন্ধুর কন্যা। আমার মন

চায়নি তার কোন সর্বনাশ হোক। তাই ওদের খবর রাখার একটা ব্যবস্থা রেখেছিলাম। কিন্তু ......'। বলতে বলতে থেমে গেল গোল্ড ওয়াটার।

'কিন্তু কিছুক্ষণ আগে খবর পেলাম,' আবার বলতে শুরু করল গোল্ড ওয়াটার। 'আমার সেই লোকটিকে খুন করা হয়েছে। এর অর্থ সে ধরা পড়ে গেছে এবং ওখানকার খবর বাইরে যাবার পথ বন্ধ করার জন্যেই তাকে খুন করা হয়েছে।' থামল গোল্ড ওয়াটার।

চমকে উঠল আহমদ মুসা। প্রবল একটা আশংকা এসে মনটাকে তার ঘিরে ধরল। শ্যারনরা খ্যাপা কুকুরের চেয়েও ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। প্রতিশ্রুতির তোয়াক্কা না করে লায়লা জেনিফার ও ডা. মার্গারেটের কোন ক্ষতি তারা করে ফেলতে পারে। আহমদ মুসা তাদের হাতে ধরা দেবে এটা নিশ্চয় তারা এখন মনে করছে না। সুতরাং ভাবতে গিযে বুকটা কেঁপে উঠল আহমদ মুসার। তাকাল সে একবার জর্জের দিকে নিজেকে বড় অপরাধী মনে হচ্ছে তার নিজের কাছেই শেষে আহমদ মুসা তাকাল ডেভিড গোল্ড ওয়াটারের দিকে। বলল, 'আপনি কি ভাবছেন?'

গোল্ড ওয়াটার উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল আহমদ মুসাকে, 'আপনি এখন কি মনে করছেন? আমি আপনাকে নিয়ে আসার জন্য বেঞ্জামিন বেকনকে অনুরোধ করেছিলাম, একথা বলার জন্যেই।'

'আপনি তাদের ঠিকানা দয়া করে দিন। আমি এখনি সেখানে যাব।' আহমদ মুসা বলল। আবেগে ভারী আহমদ মুসার কণ্ঠ।

'ধন্যবাদ মি. আহমদ মুসা। কিন্তু আপনি একা নন, আমরাও যাব। পাপটা আমার, তাদের জন্যে কিছু করতে পারলে কিছুটা প্রায়শ্চিত্য হতে পারে।' বলল গোল্ড ওয়াটার।

'আপনারা কি প্রস্তুত?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'কিন্তু আপনি তো প্রস্তুত নন।' বলল ডেভিড গোল্ড ওয়াটার।

'আমি এটা জানি ইয়ংম্যান। সেজন্যে আমরা প্রস্তুত হয়েই আছি। প্লেন রেডি। আপনার সিদ্ধান্তের জন্যে আমরা সবাই অপেক্ষা করছি।' 'আমি আসব কি করে আপনি নিশ্চিত ছিলেন?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘আপনি আসবেন না এ চিন্তা আমার মাথা আসেইনি। আর আমি নিশ্চিত ছিলাম লায়লা জেনিফারদের খবর জানার পর আপনি এক মুর্হূতও দেরী করবেননা।’ গোল্ড ওয়াটার বলল।

‘ধন্যবাদ মি. গোল্ড ওয়াটার।’

বলে আহমদ মুসা তাকাল বেঞ্জামিন বেকনের দিকে। বলল, ‘আপনি যাচ্ছেন আমাদের সাথে?

‘আপনি কি মনে করছেন?’ বলল বেঞ্জামিন বেকন।

আহমদ হাসল। বলল, ‘প্রশ্ন আমি আগে করেছি। অতএব আপকি ভাবছেন সেটা আগে বলবেন।’

গম্ভীর হলো বেঞ্জামিন বেকন। বলল, ‘আমার উপর নির্দেশ এসেছে, চলমান ইস্যু ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে আপনার সিদ্ধান্তই ‘ফেম’ মানে ‘ফ্রি আমেরিকা’র সিদ্ধান্ত।’

ভ্রু কুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার। বলল, ‘কে নির্দেশ দিয়েছে।’

হাসল বেঞ্জামিন বেকন। বলল, ‘জনাব, এটা আমাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার।’

আহমদ মুসা হেলে তাকাল গাল্ড ওয়াটারের দিকে। বলল, ‘তাহলে আমরা সাবইতো এখন উঠতে পারি।’

‘আমরা মানে কি সানওয়াকার ও জর্জও যাচ্ছে আমাদের সাথে?’ বলল ডেভিব গোল্ড ওয়াটার।

‘সানওয়াকার নয়। ওর পড়াশুনার অনেক ক্ষতি হয়েছে।’

আহমদ মুসার কথায় মুখ মলিন হলো সানওয়াকারের। কিন্তু কোন প্রতিবাদ করল না। মনটা তার প্রতিবাদী হলেও সে ভাবল, আহমদ মুসার কোন সিদ্ধান্তই অনর্থক নয়।

সবাই উঠল।

উঠে দাঁড়ানোর সময় আহমদ মুসার চোখ পড়েছিল গোল্ড ওয়াটারের বাম পাশ সোজা দেয়ালে একটা পর্দা বুঝছিল তার দিকে। আহমদ মুসার মনে

হলো, পর্দার রংটা যেন হঠাৎ বদলে গেল। পর্দার মাঝখানের স্যাডো রংটা সরে গিয়ে তা যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

চট করে প্রশ্ন জাগল আহমদ মুসার মাথায়, পর্দার ওপারে কি কেউ দাঁড়িয়েছিল?'

আহমদ মুসা চোখ ফিরাল গোল্ড ওয়াটারের দিকে। বলল, 'মাফ করবেন মি. গোল্ড ওয়াটার আপনার পি, এ কি আছেন?'

'হ্যাঁ, আছেন। কেন?' বলল গোল্ড ওয়াটার।

'একটা কথা বলব।' আহমদ মুসা বলল।

'আচ্ছা ডাকছি' বলে মি. গোল্ড ওয়াটার ইন্টারকমের একটা বোতামে চাপ দিল। কিন্তু কোন রেসপন্স হলো না ওদিক থেকে। হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল গোল্ড ওয়াটার, 'স্যরি, মি. আহমদ মুসা, ও বলেছিল পাশেই কোথাও যেন যাবে। বোধহয় তাহলে সেখানেই গেছে। কোন জরুরী কিছু বলার ছিল?'

আহমদ মুসা একটু ভাবল। কথা যেন সাজিয়ে নিল। বলল, 'না ঠিক আছে। মনে করেছিলাম, সানওয়াকারের সাথে ওর পরিচয় করিয়ে দেব।'

কথাগুলো বলতে পেরে খুশি হলো আহমদ মুসা। তাৎক্ষণিকভাবে সাজানো কথাগুলো অসংগত হয়নি। কিন্তু সেই সাথে তার মনে পুরনো প্রশ্নটা আবার জেগে উঠল, সত্যিই পর্দার ওপারে কি কেউ আড়ি পেতে ছিল, না তার দেখার ভুল, কিন্তু চোখের সামনে জলজ্যান্ত যা ঘটল তা ভুল হতে পারে কেমন করে?

গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের মুখে মনে সন্দেহের একটা কালো মেঘ উদয় হওয়ায় স্বস্তিবোধ করল না আহমদ মুসা। তবে এখন আলোচনার যোগ্য নয় বলে বিষয়টাকে চেপে যাওয়াই ঠিক মনে করল আহমদ মুসা।

'পরিচয় না হলেও অসুবিধা হবে না। আমি বলে যাচ্ছি, সানওয়াকার আমার পি.এ'সহ যে কোন কারও সাথে যোগাযোগ করতে পারবে।'

বলে ডেভিড গোল্ড ওয়াটার ইন্টারকমে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিল। সবাই বেরিয়ে আসছিল গোল্ড ওয়াটারের অফিস কক্ষ থেকে। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল

ডিউটি অফিসার। ডেভিড গোল্ড ওয়াটারের হাতে এক শিট কাগজ তুলে দিতে দিতে বলল, 'এই মাত্র এল স্যার মিয়ামী থেকে। খুব জরুরী বলা হয়েছে।'

সবাই থমকে দাঁড়িয়েছিল।

ডেভিড গোল্ড ওয়াটার ডিউটি অফিসারের হাত থেকে কাগজটি নিল।

সবার চোখ গোল্ড ওয়াটারের দিকে।

কাগজটির উপর নজর বুলাচ্ছিল গোল্ড ওয়াটার। পড়ার সাথে সাথেই গোল্ড ওয়াটারের মুখটা মলিন হয়ে গেল।

গোল্ড ওয়াটারের এই পরিবর্তন আহমদ মুসার চোখে পড়ল। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল আহমদ মুসা। ডা. মার্গারেটদের কোন খারাপ খবর নয় তো?

দ্রুত কণ্ঠে আহমদ মুসা জিজ্ঞেস করল, 'কি খবর মি. গোল্ড ওয়াটার? কোন দুঃসংবাদ নয়তো?'

'পড়ে দেখুন আহমদ মুসা। আপনার জন্যেও মেসেজ রয়েছে।' বলে গোল্ড ওয়াটার কাগজ খন্ডটি তুলে আহমদ মুসার হাতে দিল এবং বলল, 'আসুন বসা যাক। কিছুটা ভাবতে হবে এখন।'

কথা শেষ করেই গোল্ড ওয়াটার ভেতরে ঢুকে গেল।

আহমদ মুসাও চিঠির উপর নজর রেখেই ফিরে চলল এবং গিয়ে গোল্ড ওয়াটারের পাশেই বসল।

পড়তে পড়তে তার মুখেও মলিনতার একটা ছায়া নামল।

পড়া শেষ করে তাকাল আহমদ মুসা গোল্ড ওয়াটারের দিকে। বলল, 'তার মানে ওরা লায়লা জেনিফার ও ডা. মার্গারেটকে অন্য কোথাও সরিয়ে নিয়েছে।'

'তাই বুঝা যাচ্ছে আহমদ মুসা। হঠাৎ আজ তাড়াহুড়া করে এটা করল কেন তা?' বলল গোল্ড ওয়াটার চিন্তিত কণ্ঠে।

'করল কারণ আপনার লোককে হত্যা করার মাধ্যমে আপনার সাথে যুদ্ধে নামার পর আপনার জানা জায়গায় ওদের রাখবে সেটা স্বাভাবিক নয়।' বলর আহমদ মুসা।

'ঠিক বলেছেন আহমদ মুস।' গোল্ড ওয়াটার বলল।

‘আপনার জন্যে ওতে কি মেসেজ আছে মি. আহমদ মুসা?’ বলল বেঞ্জামিন বেকন।

‘মেসেজটা একটা আপোশ প্রস্তাব, সেই সাথে কঠোর এক হুমকিও। বলা হয়েছে, আমি তাদের ভয়ানক ক্ষতি করলেও ডাক্তার মার্গারেট ও লায়লা জেনিফারকে তারা সম্মানের সাথে রেখেছে। আমি যদি অবিলম্বে আমেরিকা ত্যাগ করতে রাজী হই, তাহলে আমি প্লেনে উঠার সংগে সংগেই ওরা দুজনকে ছেড়ে দেবে। আর আমি যদি আগামী তিন দিনের মধ্যে আমেরিকা ত্যাগ না করি, তাহলে ৪র্থ দিন ভোর বেলায় তাদের লাশ পাওয়া যাবে ফ্লোরিডার কোন বীচে।’ বলল আহমদ মুসা। চোখে-মুখে তার চিন্তার ছাপ।

‘বুঝা যাচ্ছে, শ্যারনরা আহমদ মুসাকে আর হাতে পেতে চায় না। আহমদ মুসা আমেরিকা ছাড়লেই তারা বেঁচে যায়। ঠিকই এটা একটা আপোশ প্রস্তাব।’ বলল গোল্ড ওয়াটার।

কথা শেষ করে একটু থামল সে। নড়ে-চড়ে সোজা হয়ে বসে বলল, ‘মি. আহমদ মুসা, এই আপোশ প্রস্তাব নিয়ে কি ভাবছেন বলুন।’ ‘একজন বিশেষ আমেরিকান হিসাবে আপনি এ ব্যাপারে কি ভাবছেন বলুন।’ গম্ভীর কণ্ঠে পাল্টা প্রশ্ন করল আহমদ মুসা।

‘একটুও ভাবার প্রয়োজন নেই এ ব্যাপারে। ইহুদীবাদী শ্যারনরা যে কারণে চাইছেন আপনি তাড়াতাড়ি আমেরিকা ত্যাগ করুন, সেই একই কারণে আমেরিকা আপনাকে ছাড়তে পারে না।’ বলল গোল্ড ওয়াটার স্থির ও গম্ভীর কণ্ঠে।

নতুন উত্তরের জন্যে আহমদ মুসা একে একে তাকাল বেঞ্জামিন বেকন, সান ওয়াকার ও জর্জের দিকে। একই জবাব দিল সকলে। জর্জ তার সাথে আরও যোগ করল, ‘এখন মহাবিপদে পড়ে ওরা এসব আপোশের কথা বলছে। কিন্তু বিপদ কাটলে সবার উপর সুদে-আসলে দেবে, এরও নিশ্চয়তা নেই। আমার মাঝে মাঝে ভয় হয়, ওরা বেঁচেই আছে কিনা। তাই আমি মনে করি শেষ দেখার জন্যে এগোনই দরকার। আল্লাহ আমাদের ভরসা।’

‘ধন্যবাদ জর্জ। ধন্যবাদ সকলকে। আমারও এটাই মত।’

‘ধন্যবাদ মি. আহমদ মুসা। ধন্যবাদ সকলকে।’

বলে একটা দম নিয়ে আবার বলে উঠল গোল্ড ওয়াটার, ‘আমরা যাচ্ছিলাম মিয়ামীতে। কিন্তু নতুন পরিস্থিতিতে আমরা কি করব, কোথায় যাব?’ কিছু চিন্তা করেছেন মি. আহমদ মুসা?’

‘ও বিষয়টা মিয়ামীতে গিয়েই চিন্তা করা যাবে মি. গোল্ড ওয়াটার। ওরা মিয়ামী থেকে গাড়িতে করে উত্তরে গেছে, প্লেনে যায়নি। তার অর্থ ওরা ফ্লোরিডাতেই থাকবে আর উপকূল এলাকাতেই তারা থাকবে, কারণ তিন দিন পর ডাক্তার মার্গারেটদের লাশ তারা ফ্লোরিডার কোন বীচে ফেলে রাখবে।’

‘ঠিক আহমদ মুসা। তাহলে চলুন দেরী না করে যাত্রা করি।’ গোল্ড ওয়াটার বলল। বলতে উঠে দাঁড়াল গোল্ড ওয়াটার।

উঠে দাঁড়াল সাবই।

আটলান্টিকের নীলজল স্নাত মিয়ামী নগরী।

গ্লামার নগরী মিয়ামীর পূর্ব পাশে সাগর। উত্তর দিক থেকে উপকূল বরাবর হয়ে কয়েকটা রাস্তা প্রবেশ করেছে মিয়ামীতে। আবার একাধিক রাস্তা বেরিয়ে গেছে মিয়ামী থেকে দক্ষিণে। দুটি নদী পশ্চিম দিক থেকে ‘v’ আকারে এগিয়ে এসে অতিক্রম করেছে মিয়ামীকে। ‘v’-এর বটমটাই মিয়ামী নগরী।

মিয়ামীর পশ্চিম দিকে বেশ কিছুটা দূর থেকে দুটি উত্তর দক্ষিণ সমান্তরাল রাস্তা নদী দুটিকে ক্রস করেছে। দুই রাস্তা ও দুই নদীর মাঝখানের বিশাল ভূখন্ডই মিয়ামী বিমান বন্দর।

বিশাল বিমান বন্দরে ল্যান্ড করল ডেভিড গোল্ড ওয়াটারের ব্যক্তিগত বিমানটি।

বিমান সফরে আহমদ মুসার পাশেই বসেছিল গোল্ড ওয়াটার। আহমদ মুসার অন্য পাশে বসেছিল বেঞ্জামিন বেকন।

বিমান তখন টারমাকে গিয়ে স্থির হয়েছে। বিমানের দরজাও খুলে গেছে।

গোল্ড ওয়াটার সকলকে বাইরে বেরুবার জন্য প্রস্তুত হবার আহবান জানিয়ে নিজে উঠে দাঁড়িয়েছিল।

আহমদ মুসার মধ্যে নড়াচড়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। বরং সে গোল্ড ওয়াটারকে বসতে অনুরোধ করল।

গোল্ড ওয়াটার তার সিটে বসে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'কিছু বলবেন মি. আহমদ মুসা?'

'হ্যাঁ।' বলে আহমদ মুসা একটু ঘুরে বসল গোল্ড ওয়াটারের দিকে। বলল, 'আমরা ডা. মার্গারেটদের উদ্ধারের জন্য জেনারেল শ্যারনদের বিরুদ্ধে একটা অভিযানের লক্ষ্য নিয়ে এখানে এসেছি, এ বিষয়টা কি এখানকার কাউকে জানিয়েছেন?'

'অবশ্যই না। কারণ কোনভাবে এ কথা এখানে জানাজানি হয়ে গেলে শুরুতেই বাধা আসতে পারে।' বলল ডেভিট গোল্ড ওয়াটার।

'কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, আমাদের এ পরিকল্পনার কথা জেনারেল শ্যারনের কাছে পৌছে গেছে।' আহমদ মুসা একটু চিন্তিত কণ্ঠে বলল।

'অসম্ভব! কিভাবে? আপনার এমনটা মনে হচ্ছে কেন?' সিটে সোজা হয়ে বসে দ্রুত কণ্ঠে প্রত্যয়ের সাথে বলল গোল্ড ওয়াটার।

আমি নিশ্চিত, আপনার অফিসে বসে আমরা যখন এ পরিকল্পনা করছিলাম তখন কেউ একজন পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে আমাদের সব কথা শুনেছে।' আহমদ মুসা বলল।

বিস্ময়ে মুখ হা হয়ে গেল মি. গোল্ড ওয়াটারের।

কিন্তু গোল্ড ওয়াটারের কিছু বলার আগেই গোল্ড ওয়াটারের অফিস কক্ষ ও তার পিএ'র অফিস কক্ষের মাঝখানের খোলা দরজার পর্দার আড়াল থেকে একটা ছায়া সরে যেতে দেখার কথা বিস্তারিত বলল আহমদ মুসা।

'এ জন্যেই কি আপনি আমার পিএ'র খোঁজ করেছিলেন?' আপনি কি আমার পিএ'কেই সন্দেহ করছেন?' বলল গোল্ড ওয়াটার। তার চোখে মুখে চিন্তা ও উদ্বেগের চিহ্ন।

‘আপনার পিএ হতে পারে আবার অন্য কেউও হতে পারেন। সেদিন সে সময়ে আপনার অফিস স্টাফদের মুভমেন্ট মনিটরিং থেকেই আপনি এটা বের করতে পারবেন। কিন্তু এখন এই মুহূর্তের বড় বিষয় হলো, আমাদের করণীয় কি তা ঠিক করা। পর্দার আড়াল থেকে ছায়া মূর্তিকে সরে যেতে দেখার পরমুহূর্তেও খোঁজ করে আপনার অফিস কক্ষের আশে পাশে কাউকে পাওয়া যায়নি। তার অর্থ এও হতে পারে যে, খবরটা যথাস্থানে দ্রুত পাচার করার জন্যই সে দ্রুত সরে গিয়েছিল।’ বলল আহমদ মুসা।

‘তাহলে আপনি বলছেন, আমাদের অভিযানের কথা, আমরা এখানে আসছি, একথা ইতিমধ্যেই এখানে পৌছে গেছে?’ গোল্ড ওয়াটার বলল।

‘আমার তাই মনে হয়।’ বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা থামার পর সঙ্গে সঙ্গেই কথা বলল না ডেভিড গোল্ড ওয়াটার। ভাবছিল সে। কিছুক্ষণ পর সে বলল, ‘পর্দার আড়ালে আপনার ছায়ামুর্তি দেখা সত্য হলে যা বললেন সবটাই সত্য।’

বলে একটু থামল। তারপর আর শুরু করল সে, ‘এ সময় আপনি নিশ্চয় একটা কিছু চিন্তা করে বিষয়টা তুলেছেন। সে চিন্তাটা কি আহমদ মুসা?’

‘আমাদের এখান থেকে যাওয়ার এ্যারেঞ্জমেন্টটা কি হয়েছে?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার কথা শেষ হলো সেই সময় প্লেনের খোলা দরজায় একজন যুবক প্রবেশ করল। তাকে দেখে গোল্ড ওয়াটার উঠে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানিয়ে বলল, ‘গুড ডে মি. জ্যাক।’

তারপর আহমদ মুসার সাথে তাকে পরিচয় করিয়ে দিতে দিতে বলল, ‘এ মি. জ্যাকসন। হোয়াইট ঈগল মিয়ামীর স্টেশন কমান্ডার।’ আর আহমদ মুসার পরিচয় দিতে গিয়ে তার নাম বলল, ‘আহমদ আবদুল্লা। আমাদের মূল্যবান সাথী।’

আব্দুল্লা ছদ্ম পরিচয় দেয়ায় আহমদ মুসা খুশি হলো। মনে মনে গোল্ড ওয়াটারের পরিস্থিতি, সচেতনতার প্রশংসা করল আহমদ মুসা।

পরিচয় পর্ব শেষ করেই গোল্ড ওয়াটার মি. জ্যাককে লক্ষ্য করে বলল, ‘আমার গাড়িটা এবং সাত সিটের বড় জীপটা নিয়ে এসেছি।’ বলল জ্যাক।

‘জীপের কাঁচগুলো কি শ্যাডো কাঁচ?’ গোল্ড ওয়াটার কিছু বলার আগেই জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘শ্যাডো ও স্বচ্ছ দুই কাঁচের ব্যবস্থাই গাড়িতে আছে।’ বলল জ্যাক।

‘গুড। বলল আহমদ মুসা।

‘গাড়িগুলো কি টারমাকে নিয়ে এসেছ’ জ্যাককে জিজ্ঞেস করল গোল্ড ওয়াটার।

‘হ্যাঁ।’ বলল জ্যাক।

‘তাহলে উঠা যাক।’ সবাইকে লক্ষ্য করে বলল গোল্ড ওয়াটার। আহমদ মুসা উঠার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করল না। তার কপাল কুঞ্চিত। ভাবছিল সে।

গোল্ড ওয়াটার ব্যাপারটা খেয়াল করল। বলল, ‘কিছু ভাবছেন মিস্টার .......।’ কথা শেষ করল না গোল্ড ওয়াটার।

‘আমি ভাবছি মি. গোল্ড ওয়াটার, আমরা এয়ারপোর্ট লাউঞ্জে গিয়ে একটু বসি। চা খাব, কিছু কাজও আছে। আর মি. জ্যাক দুটি গাড়ি নিয়ে ফেরত যাবেন। ঘন্টা খানেক পরে ফিরে এসে লাউঞ্জে আমাদের সাথে মিলিত হবেন।’

কথা শেষ করেই দ্রুত কণ্ঠে আবার বলে উঠল আহমদ মুসা, ‘হ্যাঁ, জীপের শ্যাডো কাঁচ তুলে টারমাক থেকে বের হতে হবে।’

প্রবল জিজ্ঞাসা ও বিস্ময়ের একটা ছায়া খেলে গেল গোল্ড ওয়াটারের চোখে-মুখে। কিন্তু পরক্ষণেই স্বাভাবিক হয়ে এল গোল্ড ওয়াটার। তার জ্যাকের দিকে ফিরে বলল, ‘ঠিক আছে জ্যাক, বুঝেছো কি করতে হবে?’

‘জি স্যার।’ বলল জ্যাক।

‘তাহলে যাও, গুড ডে। গুড বাই।’

জ্যাকদের গাড়ি স্টার্ট নেবার শব্দ হলো।

‘কি ব্যাপার মি. আহমদ মুসা? জ্যাককে এভাবে বিদ্যায় করলেন কেন? ওরা তো ওয়েট করতে পারতো।’ বলল গোল্ড ওয়াটার।

‘ক্ষতি নেই। জ্যাকরা একটু ঘুরে আসুক! চলুন আমরা লাউঞ্জে যাই।’

বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

'চলুন। তথাস্তু। নিশ্চয় কোন কথা আপনার মনে আছে, বলছেন না। লাউঞ্জে আপনার কাজ দেখলেই বুঝবো। চলুন।'

উঠতে উঠতে বলল গোল্ড ওয়াটার।

লাউঞ্জে গিয়ে টয়লেট থেকে ফ্রেশ হয়ে এসে সবাই চা খেল।

চা খাওয়ার পর গোল্ড ওয়াটার আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল,

'মি. আহমদ মুসা কি যেন করবেন বলেছিলেন?'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'অপেক্ষা করাটাই এখনকার কাজ। এই অবসরে আপনি একটু ভাবুন, মিয়ামীর উত্তরে ফ্লোরিডার কোন শহরের সাথে জেনারেল শ্যারনের বিশেষ সম্পর্ক আছে কি না।'

সোফায় হেলান দিল গোল্ড ওয়াটার। ভাবল একটু। বলল, 'আমার জানা নেই। তবে কিছু দিন আগে জ্যাকসনভিল থেকে তার কাছে একটা টেলিফোন গিয়েছিল। শ্যারন ছিলেন না। আমি কথা বলেছিলাম। লোকটি তার পরিচয়ে বলেছিল, সে হাইম শামির, জ্যাকসনভিল সিনাগগের প্রধান। শুধু এই পরিচয়টাই শ্যারনকে বলতে বলেছিল, আর কিছু বলেনি।'

গোল্ড ওয়াটার কথা শেষ করতেই মি. জ্যাক হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করল লাউঞ্জে। তার চোখ-মুখে উত্তেজনা। চাপা কণ্ঠে অনেকটা চিৎকারের মত করে গোল্ড ওয়াটারকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, 'সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে স্যার। আহমদ আবদুল্লাহ আপনাদের সকলকে বাঁচিয়েছেন। তা না হলে সর্বনাশ হয়ে যেত স্যার।'

বিস্মিত, উৎকণ্ঠিত সবাই সোজা হয়ে বসল। উদগ্রীব হলো সব কথা শোনার জন্যে।

'ঘটনা কি বল?' উৎকণ্ঠিত, উদ্বিগ্ন গোল্ড ওয়াটার ধমকের সুরে বলল।

'স্যার, শহরে প্রবেশ করার মুখে ব্রীজের উপর আমাদের বড় গাড়িটা ধ্বংস হয়ে গেছে।' কম্পিত গলায় বলল জ্যাক।

'ধ্বংস হয়ে গেছে? কিভাবে?' জিজ্ঞেস করল গোল্ড ওয়াটার।

‘বড় গাড়িটা আমার গাড়ির পেছনে আসছিল। ভয়ংকর শব্দ শুনে পেছনে ফিরে দেখলাম, প্রবল বিস্ফোরণে আমাদের গাড়িটা শূন্যে উঠে ছিন্ন বিছিন্ন ও ধ্বংস হয়ে গেল। ড্রাইভারও পুড়ে ছাই হযে গেছে।’ বলল জ্যাক। ভয়ে পান্ডুর তার মুখমন্ডল।

‘বিস্ফোরণে ধ্বংস .........!’

কথা মেষ করতে পারল না গোল্ড ওয়াটার। মাঝ পথেই থেমে গেল।

বিস্ময়, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠায় সে যেন বোবা হয়ে গেল। তার বোবা দৃষ্টিতে ড্রাইভারের পোড়া লাশের দৃশ্য ভেসে উঠল। তাদেরও ঐ দশাই হতো, যদি আহমদ মুসা বাঁধা দিয়ে তাদের লাউঞ্জে না নিয়ে আসত।

মুহূর্তকাল পরেই গোল্ড ওয়াটারের শূন্য বোবা দৃষ্টি গিয়ে পড়ল আহমদ মুসার চোখের উপর।

আহমদ মুসা বুঝতে পারল তার চোখের ভাষা।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘বিস্ময়ের কিছু নেই মি. গোল্ড ওয়াটার। আমরা কোন উদ্দেশ্যে কখন কিসে এখানে আসছি, শ্যারনের এখানকার লোকদের তা জানানো হয়েছে এবং তারাই হত্যার এই পরিকল্পনা এঁটেছিল।’

‘আমাদের গাড়িতেই সেই ব্যবস্থা করেছে তা আপনি জানলেন কেমন করে?’ বলল গোল্ড ওয়াটার।’

‘যখনই বুঝলাম, শত্রুপক্ষ আমাদের এখানে আসার সব কথা জানতে পেরেছে, তখনই আমার মনে হলো, তাদের প্রথম কাজ হবে, আমাদের হত্যার চেষ্টা করা। বিশেষ করে আমি এ অভিযানে শামিল হচ্ছি জানার পর হত্যারই সিদ্ধান্ত নেয়া স্বাভাবিক। আমাকে সরিয়ে দেয়া হবে তাদের জন্যে সবচেয়ে লাভজনক। তারপর চিন্তা করলাম, হত্যার সুযোগ তারা কোথায় নিতে পারে। আমার মনে হলো, ওয়াশিংটনে বিমানে উঠার আগে, বিমানে এবং মিয়ামীতে বিমান থেকে নামার পর হত্যার ব্যবস্থা করাই তাদের প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সুযোগ। যখন ওয়াশিংটনে বিমানে উঠার আগে এবং বিমানে কিছুই ঘটনা না, তখন মায়ামীতে বিমান থেকে নামার পর শহরে পৌছার সময়টাকে আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হলো। আমি ভাবলাম, আমাদের গাড়ি বহরে

হামলা করে তারা আমাদের হত্যা করার সযোগ নিতে পারে, অথবা খোদ গাড়িতে বোমা পেতে রেখে তা বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। গাড়িতে বোমা পেতে রাখার ব্যাপারটা তাদের জন্যে আমার কাছে অসম্ভব মনে হয়নি। খোদ গোল্ড ওয়াটারের পিএ যদি শ্যারনদের লোক হতে পারে, তাহলে এখানেও হোয়াইট ঈগলের মধ্যে তাদের লোক থাকতে পারে। এসব চিন্তা করেই ভাবলাম আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে আসা গাড়ির শ্যাডো কাঁচ তুলে খালি পাঠিয়ে দেয়া হোক। যাতে শত্রু পক্ষ বুঝে আমরাই যাচ্ছি গাড়িতে। তাতে সন্দেহের টেস্ট হয়ে যাবে।' থামল আহমদ মুসা।

গোল্ড ওয়াটার কোন কথা বলল না।

তার দৃষ্টি তখনও আহমদ মুসার উপর নিবদ্ধ। তার চোখের দৃষ্টিতে এবার যুক্ত হয়েছে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার সাথে বিস্ময় বিমুগ্ধতা।

আহমদ মুসাই আবার কথা বলল। বলল জ্যাকসনের দিকে তাকিয়ে, 'বলুনতো ড্রাইভারের লাশ কি দেখা গেছে?'

'না দেখা যায়নি। কয়েকটা টুকরো মাত্র ব্রীজের উপর দেখা গেছে। আর সব নদীতে ছিটকে পড়েছে।' বলল জ্যাক।

'কয়জন আরোহী ছিল, কেউ তোমাকে জিজ্ঞেস করেছে।

'সে সুযোগ কেউ পায়নি। ঐ গাড়ি যে আমার সাথের গাড়ি তা বুঝেনি। পরে কাউকে কিছু না বলে আমি অন্য রাস্তা দিয়ে এসেছি।'

'ধন্যবাদ জ্যাকসন। খুব ভাল হয়েছে। এখন শত্রু পক্ষ বুঝবে, আমরা সবাই গাড়িতে ছিলাম এবং সবাই নিহত হয়েছি। অনুসন্ধান করেও এর বিপরীত কোন প্রমাণ তারা পাবে না। ডুবোরীরা নিহতদের লাশের টুকরো নদীতে পাবে না। কারণ নদীর স্রোত ততক্ষণে লাশের টুকরোগুলো সাগরে নিয়ে ফেলবে।' বলল আহমদ মুসা।

এতক্ষণে গোল্ড ওয়াটারের মুখে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'আপনার এত বুদ্ধি! এত চুলচেরা ভাবেন আপনি? আপনাকে ধন্যবাদ আহমদ মুসা আমাদের সকলের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে।'

‘আপনাদের বাঁচালাম কই আমি আমাকে বাঁচাবার জন্যেই এত কিছু করলাম। আমার সাথে আপনারাও বেঁচেছেন।’ আহমদ মুসার মুখে হাসি।

‘বুদ্ধির মত কথা প্যাঁচও দারুণ। আপনার সাথে পারা যাবে না। এখন বলুন, করণীয় কি?’ গোল্ড ওয়াটার বলল।

চোখে-মুখে গাম্ভীর্য নেমে এল আহমদ মুসার। ভাবল। বলল, ‘পরিস্থিতি সম্ভবত এমন দাঁড়াল যে, শত্রু পক্ষ কিছু সময়ের জন্যে ভাবছে গোল্ড ওয়াটারসহ আমরা বিস্ফোরণে নিহত হয়েছি। এই সময়ের মধ্যে তাদের অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে তাদের ঘাঁটিতে পৌঁছাতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু সে ঘাঁটি কোথায়? দ্বিতীয় যে কাজটি করা যায় তা হলো, অফিসে গিয়ে নিজেদেরকে প্রকাশ করে দেয়া, যাতে শত্রু পক্ষ এখনই জানতে পারে আমরা বেঁচে আছি। তাহলে সংঘাতের নতুন সূত্রপাত ঘটবে, যার মাধ্যমে তাদের ঘাঁটিতে পৌঁছার আমার সুযোগ সৃষ্টি হবে।’

‘ওদের একটা ঘাঁটির সন্ধান তো সেদিন আপনাকে বলেছিলাম।’ বলল গোল্ড ওয়াটার।

‘মনে আছে, ‘জ্যাকসন ভিল সিনাগগে’র হাইম শামিরের কথা আপনি বলেছিলেন। হ্যাঁ, ওটা জেনারেল শ্যারনের একটা আস্তানা হতে পারে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আমার মনে হয়, ওদের অসতর্ক রেখে আমরা এগোতে পারি। জ্যাকসন ভিল সিনাগগ থেকে আর কিছু না হলেও পথের সন্ধান মিলতে পারে।’ গোল্ড ওয়াটার বলল।

‘আপনি কি প্রস্তুত? আমরা কি এখন জ্যাকসন ভিল রওয়ানা হতে পারি?’

জ্যাকসন ভিল উত্তর ফ্লোরিডার সবচেয়ে বড় শহর। শহরটি আটলান্টিকের সাথে সেন্ট জন নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। সেন্ট জন নদীটি মধ্য ফ্লোরিডার একগুচ্ছ হ্রদ থেকে উৎপন্ন হয়ে জ্যাকসন ভিলে গিয়ে আটলান্টিকে পড়েছে। জ্যাকসন ভিলের মোহনা থেকে দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত সুদীর্ঘ জ্যাকসন ভিল বীচ।

‘অবশ্যই রওনা হতে পারি। পথে কোথাও আমরা লাঞ্চ সংগ্রহ করব। গাড়ির জন্যেও আমাদের অফিসে যাবার দরকার নেই। জ্যাকসনের গাড়িটা ভালো, ওতেই চলবে।

তাহলে ওঠা যাক।

উঠে দাঁড়াল সবাই।

লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে সবাই গিয়ে গাড়িতে উঠল।

‘অভিযানের প্রস্তুতি নিয়ে তো কিছু বললেন না মি. গোল্ড ওয়াটার।’ বলল আহম মুসা।

‘কি বলব? আপনি, বেঞ্জামিন ও জর্জ প্রস্তুতি না নিয়ে নিশ্চয় আমার অফিসে আসেননি। আর আমি সশস্ত্র আছি, জ্যাকসনও তাই।’

‘ধন্যবাদ মি. গোল্ড ওয়াটার।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ওয়েলকাম আহমদ মুসা।’ গোল্ড ওয়াটার বলল।

গাড়ি তখন ছুটতে শুরু করেছে।

লক্ষ্য ফ্লোরিডার সর্ব উত্তরের আটলান্টিকের ফেনিল গর্জন মুখরিত জ্যাকসন ভিল, হাইম শামিরের জ্যাকসন ভিল সিনাগগ।

# ২

'আমাদের সতর্কতা কি একটু বেশি পরিমাণে হয়ে যাচ্ছে না?' বলল বেগিন লিকুড। তার কণ্ঠে বিরক্তির প্রকাশ।

বেগিন লিকুড আমেরিকান জুইস পিপলস লীগের যুব বিভাগের একজন বেপরোয়া গোছের নেতা। ফ্লোরিডা অঞ্চলের যুব গ্রুপের দায়িত্বে সে।

বেগিন লিকুড যাকে লক্ষ্য করে কথা বলল সে হল হাইম শামির। সে জ্যাকসন ভিল সিনাগগের প্রধান এবং আমেরিকান জুইস পিপলস লীগের ফ্লোরিডা অঞ্চলের সভাপতি।

বেগিন লিকুডের কথা শুনে হাইম শামির একটু ম্লান হাসল। বলল, 'কোন সতর্কতার কথা বলছ? ডা. মার্গারেট ও লায়লা জেনিফারকে সরিয়ে রাখার কথা?'

'হ্যাঁ।' বলল বেগিন লিকুড।

'যে কারণে মিয়ামী থেকে সরিয়ে তাদের এ সিনাগগে আনা হয়েছিল, সে ধরনের কারনেই আবার পাশের আমাদের মিত্র ভারতীয়ের বাসায় তাদের সরিয়ে রাখা হলো।' বলল হাইম শামির।

'মিয়ামীর ঘাটি ওদের কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখানকার সন্ধান তো ওরা জানে না।' উত্তরে বলল বেগিন লিকুড।

'জানে না, একথা বলা যাবে না। আমাকে জেনারেল শ্যারন জানিয়েছেন, সিনাগগ, ক্লাব বা সমিতি জাতীয় ইহুদী কোন স্থান বা স্থাপনাই আজ নিরাপদ নয়। জেনারেল শ্যারনের কাছ থেকে এই সংকেত পাওয়ার পর এবং যখন শুনতে পেলাম যে, আহমদ মুসা ও গোল্ড ওয়াটার মিলিত হয়েছে এবং তারা অন্যান্যদের নিয়ে মায়ামীতে ল্যান্ড করেছে, তখন ওদের সিনাগগে রাখার আর সাহস পাইনি। বলল হাইম শামির।

'এই সতকর্ততার কি প্রয়োজন এবং তাদের জামাই আদরে রাখার কি দরকার? আহমদ মুসা ধরা দেবে, আমেরিকা ত্যাগ করবে? এসব অবাস্তব

কল্পনা। আমাদের হাতে ছেড়ে দিন ও দুজনকে! আমরা ওদের উপর প্রতিশোধ তুলব ইহুদীদের প্রতি ফোটা রক্তের, যা আহমদ মুসা ঝরিয়েছে। তারপর ছবিগুলি এক এক করে পাঠিয়ে দিতে থাকব আহমদ মুসার কাছে। তাহলেই না সে পাগল হবে, পাগল হলেই সে ভুল করবে। সেই ভুলের সুযোগ আমরা নিয়ে তাকে শেষ করতে পারব। বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল বেগিন লিকুড।

'শোন, আমাদের চেয়ে জেনারেল শ্যারন আহমদ মুসাকে অনেক বেশি চেনে। তিনি আহমদ মুসাকে হাতে পেতে চান, অথবা চান আমেরিকা থেকে সে চলে যাক, তাকে ক্ষেপাতে চান না।' বলল হাইম শামির শান্ত কণ্ঠে।

'দেখুন, জেনারেল শ্যারনকে আমরা শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি। কিন্তু তাঁর সতর্কতা তাকে জেতায়নি কোন সময়। আমেরিকাতেও তিনি হারছেন আহমদ মুসার কাছে। সুতরাং সতর্কতা নামের দুর্বলতা নয়, আমরা সোজা আঘাত করতে চাই আহমদ মুসাকে। মার্গারেট ও জেনিফার হবে আমাদের প্রথম শিকার। ওদের শতধা লাঞ্ছিতা ও ধর্ষিতা লাশ আমরা আহমদ মুসাকে উপহার দিতে চাই। যন্ত্রণার আগুনে আমরা আহমদ মুসার দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণুকে পোড়াতে চাই, ব্যর্থতার আগুনে জ্বালিয়ে ওকে আমরা উন্মাদ করে তুলতে চাই। দিন এখনি ওদের আমাদের হাতে তুলে দিন।' বলল বেগিন লিকুড।

'তোমরা তো পাচ্ছই। আর দুদিন। তিন দিনের সময় দেয়া হয়েছে আহমদ মুসাকে আমেরিকা ছাড়ার।' হাইম শামির বলল।

'তাকে বলা হয়েছিল আমেরিকা ছেড়ে যেতে, আর সে অভিযানে আসছে ফ্লোরিডায় আমাদের বিরুদ্ধে। আর আমরা আরও দুদিন তার আমেরিকা ছাড়ার অপেক্ষায় থাকব। ঠিক আছে আপনারা অপেক্ষায় থাকুন, আমাদের কাজ আমাদের করতে দিন। আমরা যাচ্ছি ভারতীয়ের বাসায় ওদের তুলে নিয়ে আসতে।'

এই সময়ে ঝড়ের মত ঘরে প্রবেশ করল শিমন। শিমন ইহুদী গোয়েন্দা সংস্থার একজন কর্মী, ফ্লোরিডায় জেনারেল শ্যারনের একজন প্রতিনিধি।

প্রবেশ করেই চিৎকার করে উঠল, 'হিপ হিপ, হুররে।'

'কি ব্যাপার শিমন? মিয়ামীর কি খবর?' বলল হাইম শামির।

‘সব খতম, আনন্দ কর, সব খতম।’ দুই হাত তুলে নাচতে নাচতে আবার চিৎকার করল শিমন।

‘কে খতম, কারা খতম? আহমদ মুসারা কি.........?’

কথা শেষ না করেই থেমে গেল বেগিন লিকুড। কি উচ্ছ্বাসে কথা তার গলায় আটকে গেল।

শিমন চেয়ারে বসে টেবিলে মুষ্ঠাঘাত করতে করতে বলল, ‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, আহমদ মুসা, গোল্ড ওয়াটারসহ তাদের টিমের সবাই খতম হয়ে গেছে।’

শিমনের কথাটা ঘরে বজ্রপাতের মতই শক ওয়েভের সৃষ্টি করল। হাইম শামির, বেগিন লিকুড সবাই কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলো না।

নিরবতা ভাঙল প্রথমে হাইম শামির। বলল, ‘তুমি যা বলছ বুঝে বলছ? সত্য বলছ? আবার বলত কানকে বিশ্বাস হচ্ছে না।

শিমন আনন্দে হাত দিয়ে টেবিল বাজাতে বাজাতে বলল, ‘যে গাড়ি নিয়ে আহমদ মুসা ও গোল্ড ওয়াটারদেরকে বিমান বন্দর থেকে আনতে যাবার কথা ছিল, সে গাড়িতে ভয়ংকর দূর নিয়ন্ত্রিত গাড়ি বোমা পেতে রেখেছিলাম। সেই বোমার বিস্ফোরণে তাদের নিয়ে গাড়িটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

আনন্দে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল হাইম শামির ও বেগিন লিকুডের। বলল বেগিন লিকুড, ‘ঘটনা বিস্তারিত বলল দুকানকে সার্থক করি। তাদের লাশ-টাশ দেখে এসেছ?’

‘তাদের লাশ পাবে কোথায়? সাথে সাথে পুড়ে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে পানিতে। কিছু টুকরো পড়ে থাকতে দেখেছি ব্রীজের উপর।’

বলে একটা দম নিয়ে আবার শুরু করল শিমন, ‘আমরা হোয়াইট ঈগলের মিয়ামী অফিসের গ্যারেজেই বোমা পাতার কাজ সেরেছিলাম। তারপর ব্রীজের কিছু দূরে নদীতে একটা বোটে বসে ওদের অপেক্ষা করছিলাম। আমাদের চোখের সামনে দিয়েই ব্রীজ পার হয়ে ওরা বিমান বন্দরে গেল। বিমান বন্দর থেকে ফেরার পথে গাড়িটা ব্রীজে উঠল। দেখলাম গাড়ির শ্যাডো কাঁচ তুলে দেয়া। আমরা খুশি হলাম, আহমদ মুসাদের মানুষের চোখ থেকে আড়ালে রাখার জন্যেই শ্যাডো কাঁচ তুলে রাখা হয়েছে। গাড়িটা যখন ঠিক ব্রীজের মাঝ বরাবর পৌছল, তখন কনট্রোল

সিস্টেমের লাল বোতামে আমরা চাপ দিলাম। সংগে সংগেই ঘটে গেল কিয়ামত কান্ড। শালারা কেউ বাঁচেনি।'

'গাড়িতে ওরা ছিল তোমরা নিশ্চিত?' বলল হাইম শামির।

'এয়ারপোর্টের বাইরে যে লোক আমাদের পাহারায় সেও আমাদের মোবাইলে জানায়, টারমাকে যাওয়া গাড়ি ওদের নিয়ে বেরিয়ে এল এবং চলে যাচ্ছে।' বলল শিমন।

'যদি তাই হয়, তাহলে তুমি যে পুরস্কার পাবে তা কল্পনাও করতে পার না। জান, আজকের জগতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে এটা, পুরস্কারও তেমনি বড় হবে।' বলল হাইম শামির।

'ওসব বাকি পুরস্কার বাকিতেই থাক। নগদ পুরস্কার এখনই চাই।' বলল শিমন।

'কি সেটা?'

'ডা. মার্গারেট ও লায়লা জেনিফার। সেই শুরুর দিন থেকে শালিদের পেছনে আছি। গায়ে ওদের হাত দিতে পারলাম না। বস আহমদ মুসার ভয় দেখিয়ে আর আশা দিয়ে আমাদের থামিয়ে রেখেছে। আর নয়। শালিদের মুসলমানিত্বের দেমাগ বের করে দিতে চাই। আহমদ মুসা শান্তিতে মরে গেছে। এদের উপর প্রতিশোধ নেব আহমদ মুসার সব জ্বালাতনের।'

হাসল হাইম শামির। বলল, 'বেগিন লিকুডরাও এ দাবী নিয়ে বসে আছে। ঠিক আছে। পুরস্কার পরে। আপতত এই বোনাস তোমরা নিয়ে যাও। আজকের আনন্দে এই বোনাস তোমাদের যোগ্য প্রাপ্য। তবে তোমরা একটু বস, আমি মায়ামী ও হোয়াইট ঈগলের অফিসে টেলিফোন করে ঘটনার শেষটা জেনে নেই।'

বলে হাইম শামির মোবাইলটা হাতে তুলে নিল।

হাইম শামির তার কথা শেষ করার আগেই বেগিন লিকুড ও শিমনরা উঠে দাঁড়িয়ে আনন্দে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে নাচতে শুরু করেছে। বলছে আশ্রাব্য সব কথা ডা. মার্গারেট ও জেনিফারের উদ্দেশ্যে।

এই হৈচৈ এর মধ্যেই টেলিফোনে কথা বলতে শুরু করেছে হাইম শামির।

ঘরের তালা খোলার শব্দ হলো।

ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল ডা. মার্গারেট ও লায়লা জেনিফার দুজনের মুখেই।

উঠে বসল দুজনেই।

দরজা খুলে ঘরে প্রবেশ করল ভ্যানিসা নেল।

ভ্যানিসা হাইম শামিরের সিনাগগের একজন পরিচারিকা। বয়স হবে পঞ্চাশের কাছাকাছি।

মার্গারেটরা তাদের গোটা বন্দী জীবনে একজন মাত্র মানুষের সন্ধান পেয়েছে, সে হলো এই ভ্যানিসা। আন্তরিক ব্যবহার, সহানুভুতির কথা শুধু তার কাছ থেকেই শুনেছে।

ভ্যানিসাকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে খুশি হলো, আবার উদ্বিগ্নও হলো দুজনে। বলল, 'কি ব্যাপার ভ্যানিসা আন্টি?'

'তোমাদের পালাতে হবে, না হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।' উদ্বিগ্ন কন্ঠে বলল ভ্যানিসা নেল।

'ওরা আসছে। তোমাদের দুজনকে নিয়ে যাবে। আড়াল থেকে সব শুনেছি। ওরা আজ মহোৎসব করবে তোমাদের নিয়ে।' দ্রুত কণ্ঠে বলল ভ্যানিসা নেল।

মার্গারেটের চোখে-মুখে আতংক দেখা দিল। ভয়ে চুপসে গেল তাদের মুখ। তাদের মনে হলো, হঠাৎ যেন তাদের চারদিকের পৃথিবীটা সংকীর্ণ হয়ে গেল। শ্বাসরুদ্ধকর একটা অন্ধকার যেন তাদের দিকে ধেয়ে এল।

কোন কথা তাদের মুখে যোগাল না। বোবা দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে রইল ভ্যানিসার দিকে।

'দেখ সময় নষ্ট করো না। চল তোমাদের বাইরে বের করে দেব।' বলল ভ্যানিসা।

‘কিভাবে? কেউ নেই এদিকে?’ বলল মার্গারেট।

‘আছে। তবে ওরা মনে করেছে আমাকে ওরা পাঠিয়েছে। তাই ওরা আপাতত অপেক্ষা করবে। আর এটাই সুযোগ।’ বলল ভ্যানিসা নেল।

ভয় ও উদ্বেগে আড়ষ্ট ডা. মার্গারেট ও লায়লা জেনিফার পুতুলের মত উঠে দাঁড়াল।

দ্রুত বের হলো তারা ঘর থেকে ভ্যানিসার সাথে।

ঘর থেকে বের হবার সময় ভ্যানিসা একটা রিভলবার তুলে দিল ডা. মার্গারেটের হাতে। বল, ‘লুকিয়ে রাখ, যদি দরকার হয় তাহলে......।’

ভ্যানিসা আগে, পেছনে ওরা দুজন।

ভ্যানিসা হঠাৎ মুখোমুখি হলো রবিন সেনে’র সাথে। সে সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল।

রবিন সেন একজন ভারতীয়। আমেরিকায় এসেছে তিরিশ বছর আগে। এখন আমেরিকান। কম্যুনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার রবিন সেন একটি আমেরিকান এয়ার লাইনসের অর্ধেকেরও বেশি শেয়ারের মালিক এবং সেই সাথে ব্যবস্থাপনা পরিচালকও। ইহুদী পুঁজিপতিদের সাথে তার গভীর সম্পর্ক। শুধু অর্থনৈতিভাবে নয়, তারা পরস্পর রাজনৈতিক মিত্রও। ব্যবসায়ের একটা রাজনৈতিক বিনিয়োগ আছে। সেই বিনিয়োগ রবিন সেন ইহুদী বন্ধুদের মাধ্যমেই সমাধান করে থাকে।

এসব বহুদর্শী ভ্যানিসা জানে। জানে বলেই স্বয়ং রবিন সেনের সাথে দেখা হওয়ার সাথে সাথে সে আড়ষ্ট হয়ে পড়ল। তুব মনের সমস্ত জোর একত্রিত করে ভ্যানিসা বলল, ‘গুড ইভনিং স্যার। ভালো আছেন?’

‘গুড ইভনিং। কিন্তু তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন? এ সাপের বাচ্চাদের নিয়ে কোথায় দৌড়াচ্ছো? কোন বিপদ হয়নি তো?’ বলল রসিন সেন। তার চোখে-মুখে কিছুটা উদ্বেগের ছায়া।

‘ওদের সিনাগগে নিয়ে যাচ্ছি স্যার। খুব তাড়া ওদিক থেকে।’ বলল ভ্যানিসা।

‘আচ্ছা।’ বলে রবিন সেন সিঁড়ি দিয়ে আবার উপরে উঠা শুরু করল।

আর ভ্যানিসারাও তখন আবার ছুটতে শুরু করল।

সিঁড়ি মুখের পরেই প্রশস্ত লাউঞ্জ। নানা আকারের সোফায় সাজানো। লাউঞ্জের তিনটি ধাপ পেরিয়ে উপরে উঠলে আবার একটা করিডোর। এ প্রশস্ত করিডোরের শেষ প্রান্তে বিরাট দরজা। দরজার পর আবার প্রশস্ত বারান্দা। এ বারান্দা থেকে সিঁড়ি নেমে গেছে বাইরের লনে। তারপর প্রাইভেট রাস্তা। রাস্তার ওপাশে ঠিক এ বাড়ির বিপরীতেই সিনাগগটি। তবে সিনাগগের গেট আরও একটু সামনে। রাস্তাটা দিয়ে সামনে এগুলে সিনাগগের গেটের পাশ দিয়ে সরকারী রাস্তায় পড়া যায়।

লাউঞ্জ পেরিয়ে করিডোর হয়ে ভ্যানিসারা বাইরের বারান্দায় বেরুবার দরজায় গিয়ে পৌছতেই ভ্যানিসা দেখল লন থেকে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে হাইম শামির, বেগিন লিকুড, মিশন ও আরও দুজন। তারা সিঁড়ি দিয়ে দরজার দিকে উঠে আসছে।

ওদের দেখে আতংকিত ভ্যানিসারা দরজায় দাঁড়িয়ে গেল।

হাইম শামিররাও দেখতে পেয়েছে ভ্যানিসাদেরকে। তারাও প্রথমে চমকে উঠেছে। তারপরেই তারা ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছে। সংগে সংগেই চিৎকার করে উঠল হাইম শামির। বলে উঠল, 'তুমি শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করলেই ভ্যানিসা.........।'

হাইম শামিরের কথা শেষ হতে না হতেই ছুটল বেগিন লিকুড ও শিমন ভ্যানিসাদের দিকে। টার্গেট ডা. মার্গারেট ও লায়লা জেনিফার।

কিন্তু সিঁড়ি থেকে তারা বারান্দায় পা রাখা পর্যন্তই। আর সামনে তারা এগুতে পারলো না। ভ্যানিসার রিভলবার তাদের দিকে উদ্যত হয়ে উঠেছে।

ভ্যানিসার দেখাদেখি ডা. মার্গারেটও তার রিভলবার বের করে তাক করল ওদের দিকে। ডা. মার্গারেট তার কম্পিত দেহটাকে ঠেস দিয়ে রেখেছে দরজার ডান দিকের চৌকাঠে। আর ভ্যানিসা বাম হাতে আঁকড়ে ধরে আছে দরজার ওপাশের চৌকাঠ। তার ডান হাতে রিভলবার।

হাইম শামিমের কথায় ভ্যানিসা চিৎকার করে উঠল, 'বিশ্বাসের কথা বলছ শামির! আমার সংসার বিরান করেছ, আমার জীবন বিরান করেছ তোমরা। ক্রীতদাসী হয়ে আছি তোমাদের। জীবনের নিস্ফলতাকে মেনে নিয়ে বেঁচে আছি

আমি। কিন্তু এই ঈশ্বর ভক্ত দুই মেয়েকে আমার ভাগ্য বরণ করতে আমি কিছুতেই দেব না।'

'তোমার ভাগ্য বরণের কথা বলছ কেন? ওদেরকে আমরা অন্য জায়গায় নিয়ে যাব। তোমার ভয় মিথ্যা। দেখ না ওদের গায়ে কেউ হাত দেয়নি।' বলল নরম কণ্ঠে শামির।

'মিথ্যা বলো না শামির। আমি সব কথা মোতাদের শুনেছি। তুমি ওদেরকে এই কুকুরদের হাতে তুলে দেবার আয়োজন করেছো। সব হারালেও আমি মেয়েই আছি। সুন্দর জীবনের দুই মেয়ের সর্বনাশ আমি হতে দেব না।' বলল ভ্যানিসা চিৎকার করে।

ভ্যানিসার কথা শেষ হতেই ক্রোধে উম্মত্ত বেগিন লিকুড চিৎকার করে বলল, 'বুড়ি হারামজাদী, তোর রিভলবারের ভয় আমরা করি না। শয়তান আহমদ মুসাকে আজ আমরা শেষ করেছি, বিশ্বাসঘাতক গোল্ড ওয়াটারকেও। তুই আমাদের কি করছি?'

বলে বেগিন লিকুড দ্রুত পকেট থেকে রিভলবার বের করতে গেল।

সংগে সংগে গর্জে উঠেছিল ভ্যানিসার রিভলবার।

বুক চেপে ধরে বেগিন লিকুড আছড়ে পড়ল সিঁড়ির উপর।

পরক্ষণেই বাড়ির ভেতর দিক থেকে দুটি গুলীর শব্দ হলো।

ভ্যানিসা ও ডা. মার্গারেট উভয়ের আহত হাত থেকে রিভলবার পড়ে গেল। দুজনেই তাদের আহত হাত অন্য হাত দিয়ে চেপে ধরে কঁকিয়ে উঠল।

ভীত লায়লা জেনিফার পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল দুই হাতে দুই রিভলবার নিয়ে করিডোরের মুখে দাঁড়িয়ে আছে রবিন সেন। তার দুই রিভলবারের নলে তখনও ধোঁয়া।

লায়লা জেনিফার যখন পেছন ফিরে তাকিয়েছে, তখন আহত হাত চেপে যন্ত্রণাকাতর ডা. মার্গারেট সামনের দিকে তাকিয়ে দেখল গুলীবিদ্ধ হয়ে পড়ে যাওয়া লোকের পাশের লোকটি রিভলবার তুলে তাক করেছে ভ্যানিসাকে।

সঙ্গে সঙ্গেই ডা. মার্গারেট ছুটে গিয়ে নিজেদের দেহ দিয়ে ভ্যানিসাকে আড়া করে দাঁড়াল।

ভ্যানিসাকে লক্ষ্য করে নিক্ষিপ্ত শিমনের গুলীটা গিয়ে বিদ্ধ করল ডা. মার্গারেটের বুক।

একটা আর্তনাদ উঠল মার্গারেটের কন্ঠে। তার সাথে সাথেই লুটিয়ে পড়ল তার দেহ দরজার উপর।

লায়লা জেনিফার চিৎকার করে উঠে ছুটে গিয়ে আছাড়ে পড়ল ডা. মার্গারেটের উপর।

আর ঠিক সে সময়েই লনের দিক থেকে গুলী বৃষ্টির শব্দ ভেসে এল।

লায়লা জেনিফার চোখ বন্ধ করে ডা. মার্গারেটের দেহ আঁকড়ে ধরে অপেক্ষা করছিল। তার দেহও ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়ার অপেক্ষা করছিল সে আন্তরিকভাবেই। কারণ এটাই তার এখন একমাত্র পথ।

কিন্তু গুলী এল না।

তার বদলে ভেসে এল মমতা জড়ানো এক ডাক 'লায়লা জেনিফার।'

এযে আহমদ মুসার কণ্ঠ!

বিস্ময়ে চোখ খুলল লায়লা জেনিফার। দেখল তার সামনে দাঁড়িয়ে আহমদ মুসা ও তার স্বামী জর্জ।

আবার চোখ বন্ধ করে চিৎকার করে কেঁদে উঠল, 'হে আল্লাহ, আমি কি স্বপ্ন দেখছি!'

'না স্বপ্ন নয়, উঠ বোন। মার্গারেটেকে নিতে হবে। সে আহত।'

জেনিফার উঠে দাঁড়িয়ে জড়িয়ে ধরল জর্জকে কান্না জড়িত কণ্ঠে বলল, 'আমার মার্গারেট আপা.....।'

কথা শেষ করতে পারল না কান্নার উচ্ছ্বাসে।

আহমদ মুসা তুলে নিল মার্গারেটের দেহ গাড়িতে নেয়ার জন্যে। এসময় পরপর দুটি গুলীর শব্দ হলো।

বেকন গুলী করেছে করিডোরে দাঁড়ানো একজন অশ্বেতাংগ এশীয়কে।

'মি. আহমদ মুসা, ওর দুই রিভলবার টার্গেট করেছিল আপনাকে ও ভ্যানিসাকে। তাকে হত্যা না করে উপায় ছিল না।' বলল বেঞ্জামিন বেকন।

আহমদ মুসা বেঞ্জামিনের কথার দিকে কান না দিয়ে বলল, ‘মি. বেঞ্জামিন এদের একটা গাড়িতে আপনি গোল্ড ওয়াটারদের নিয়ে উঠে বসুন। আমি এদের নিয়ে বাইরে দাঁড়ানো গাড়িতে উঠছি।’

বলে আহমদ মুসা ড. মার্গারেটকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে ছুটল লনের ওপাশের রাস্তায় রাখা তাদের গাড়ির দিকে।

দুটি গাড়িই স্টার্ট নিল।

গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে গোল্ড ওয়াটার বলল, ‘মন্দ হলো না মি. আহমদ মুসা, পুলি এসে দেখবে বাড়িওয়ালার সাথে সিনাগগের লড়াই? না কিভাবে ব্যাখ্যা করবে তারা ঘটনার?’

‘পত্রিকায় একটা নিউজ করিয়ে দিন, তাহলে পুলিশ তদন্তের লাইন খুঁজে পাবে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আমার বন্ধুর কন্যা মার্গারেট কেমন আছে? তাকে কোথায় নিচ্ছি আমরা?’ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল গোল্ড ওয়াটার।

পাশ থেকে ভ্যানিসা বলে উঠল, ‘চলুন আমি ক্লিনিক দেখিয়ে দেব।’

আহমদ মুসা ও তার কথাটা জানাল গোল্ড ওয়াটারকে।

ভ্যানিসা বসে আছে আহমদ মুসার পাশের সিটে। আর পেছনের সিটে ডা. মার্গারেটকে শুইয়ে তিয়ে তার পাশে গাড়ির মেঝেতে বসেছিল জেনিফার ও জর্জ।

ডা. মার্গারেট জ্ঞান হারায়নি।

গোল্ড ওয়াটারকে লক্ষ্য করে বলা আহমদ মুসার কণ্ঠ থামলেই জেনিফার আহমদ মুসাকে বলে উঠল আর্ত কন্ঠে, ‘ভাইয়া মার্গারেট আপা আপনার সাথে কথা বলতে চান। এখনি।’

গাড়ি তখন এগিয়ে চলছিল সেন্টজন নদীর তীর বরাবরের ব্যস্ত হাইওয়ে ধরে।

জ্যাকসন ভিল সিনাগগটি নদীর তীর ঘেঁষেই। মাঝাখানে শুধু হাইওয়েটা।

আহমদ মুসা গাড়ি দাঁড় করবার জন্যে একটা জায়গা খোঁজ করতে লাগল।

ভ্যানিসা বলে উঠল, ‘এই সামনেই রাস্তার পাশে নদীর উপর একটা ‘হেলথ রিজোর্ট’ আছে। ওখানে দাঁড়ানো যায়।’

আহমদ মুসা গাড়ির গতি আরও বাড়িয়ে দিল। বলল, ‘জেনিফার তাড়াতাড়ি কোন ক্লিনিকে পৌছা দরকার। সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না।’

বলতে বলতেই সামনে দেখতে পেল একটা এক্সিট লেন। সংগে সংগে আহমদ মুসা গাড়ি এক্সিট লেনে নিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড় করাল।

তারপর মুখ ঘুরিয়ে বলল, ‘জর্জ তুমি ড্রাইভিং সিটে এস। আমি ওদিকে দেখছি।’

বলে আহমদ মুসা গাড়ি থেকে দ্রুত নামল।

জর্জও নেমে এল।

আহমদ মুসা পেছনের সিটে উঠে রক্তে ভাসা ডা. মার্গারেটের মাথার কাছে গাড়ির মেঝেতে বসল।

ওদিকে জর্জ ড্রাইভিং সিটে উঠে গাড়ি স্টার্ট দিল।

নিঃশব্দ ঝড়ের গতিতে গাড়ি চলতে শুরু করল আবার।

চোখ বুজে ছিল ডা. মার্গারেট।

লায়লা জেনিফার সিটের নিচে বসে বাম হাত দিয়ে ডা. মার্গারেটকে জড়িয়ে ধরেছিল। আর তার ডান হাত চেপে ধরেছিল ডা. মার্গারেটের রক্তক্ষরণরত বুকের বাম পাশটা।

আহমদ মুসা বসলে সে ধীরে ধীরে চোখ খুলল। চাইল আহমদ মুসার দিকে। বলল ক্ষীণ কন্ঠে, ‘ওরা বলেছিল আপনাকে ও গোল্ড ওয়াটারসহ সবাইকে নাকি আজ ওরা শেষ করে দিয়েছে। ভেবেছিলাম, আর দেখা হলো না আপনার সাথে। আল্লাহর হাজার শুকরিয়া, আপনার দেখা পেলাম। বন্দী হবার পর সব সময় মৃত্যুর জন্যে তৈরী ছিলাম। কিন্তু একটা প্রার্থনা করেই চলেছিলাম আল্লাহর কাছে, মৃত্যুর আগে যেন একবার আপনার দেখা পাই। আল্লাহ আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ। একটা..........।’

আহমদ মুসা ডা. মার্গারেটের কথার মাঝখানেই বলে উঠল, 'মার্গারেট এসব কথা এখন নয়। তুমি ভাল হয়ে যাবে। আমরা ক্লিনিকে যাচ্ছি। কথা বলো না এখন, ক্ষতি হবে।'

ডা. মার্গারেটের দুই চোখ আহমদ মুসার দুই চোখ থেকে সরেনি। তার ঠোঁটে ফুটে উঠল ম্লান হাসির রেখা। বলল, 'কথা বলার আর সময় আমি পাবো না। জনাব, আমি ডাক্তার। আমি জানি একটুও সময় নেই আমার হাতে।'

একটু থামল ডা. মার্গারেট। তার চোখের দুই কোনায় দুই ফোটা অশ্রু এসে জমেছে।

বোধ হয় অশ্রু রোধ করার জন্যেই ডা. মার্গারেট চোখ বুজল। কিন্তু তাতে অশ্রু রোধ হলো না। অশ্রু তার গড়িয়ে পড়ল দুই গন্ড দিয়ে। ডান হাতটি তুলতে চেষ্টা করল ডা. মার্গারেট, বোধ হয় চোখ মোছার জন্যেই। কিন্তু হাত তুলতে পারল না।

অশ্রু সিক্ত দুচোখ আবার তুলল ডা. মার্গারেট আহমদ মুসার দিকে। ঠোঁট দুটি তার ফাঁক হয়েছিল কিছু বলার জন্যে, কিন্তু পরক্ষণেই প্রবল যন্ত্রণায় মুখ আড়ষ্ট হয়ে গেল তার। হাত কাঁপছে, গোটা শরীর কাঁপছে ডা. মার্গারেটের। সে আবার চোখ বুজেছে। তার মুখ শক্ত হয়ে উঠেছে, দাঁতে দাঁত চেপেছে সে। বুঝা যাচ্ছে, লড়াই করছে নিজেকে ধরে রাখার জন্য।

কেঁদে উঠল লায়লা জেনিফার।

আহমদ মুসা চেপে ধরল ডা. মার্গারেটের কম্পমান দুই হাত ডাকল, 'মিস মার্গারেট।'

চোখ খুলল মার্গারেট। তাকাল আহমদ মুসার চোখে।

ঠোঁট দুটি কাঁপছে মার্গারেটের।

চেষ্টা করছে কিছু বলার।

ফিস ফিসে কণ্ঠ আবার শোনা গেল মার্গারেটের। বলল, 'একটা প্রশ্ন, মুসলমান হিসাবে আমার তো কোনই সঞ্চয় নেই। জান্নাত কি আমার হবে? দেখা কি পাব সেখানে আপনার? খুব জানতে ইচ্ছা করছে আমার।'

ক্ষীণ থেকে ক্ষীনতর কণ্ঠ থেমে গেল ডা. মার্গারেটের।

আহমদ মুসা একটু ঝুঁকে পড়ল ডা. মার্গারেটের মুখের দিকে। 'মার্গারেট' 'মার্গারেট' বলে ডাকল দুবার। বলল কানের কাছে মুখ নিয়ে, 'মার্গারেট, তোমার এ মৃত্যু শহীদের মৃত্যু। আল্লাহ নিশ্চয় তোমাকে জান্নাত মঞ্জুর করবেন।' আহমদ মুসার কণ্ঠ অশ্রু সিক্ত, ভারী।

চোখ খুলল না আর ডা. মার্গারেট।

কিন্তু তার ঠোঁটে ফুটে উঠল ফুলের মত নিষ্পাপ এক টুকরো হাসির রেখা।

পরক্ষণেই তার মাথাটা এক পাশে কাত হয়ে পড়ল। কিন্তু ঠোঁটে থেকেই গেল ফুলের মত সুন্দর সেই এক টুকরো হাসি। ডুকরে কেঁদে উঠল লায়লা জেনিফার। আছড়ে পড়ল সে মার্গারেটের বুকে। ড্রাইভিং সিট থেকে জর্জ মুহূর্তের জন্যে পেছন ফিরে তার আপা মার্গারেটের স্পন্দনহীন দেহের উপর চোখ বুলাল। তারপর কান্নার প্রবল উচ্ছ্বাস রোধের জন্যে ঠোঁট কামড়ে ধরে সামনে দৃষ্টি প্রসারিত করল সে। পাশ থেকে ভ্যানিসা নেল পেছন দিকে একবার তাকিয়ে বুকে ক্রস এঁকে প্রার্থনা করে উঠল, 'ঈশ্বর! আমাকে বাঁচাতে গিয়ে তিনি জীবন দিলেন। তাঁর মঙ্গল করুন ঈশ্বর।'

আর আহমদ মুসা বলে উঠল, 'ইন্নালিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন' আমরা সকলে আল্লাহর জন্যে এবং আল্লাহর দিকেই আমাদের প্রত্যাবর্তন।'

পরদিন 'ফ্লোরিডা হোরাইজন'- এর একটি খবর গতকাল সেন্টজন নদী তীরে অভিজাত 'রিভার ভিউ' এলাকায় এক মর্মান্তিক হত্যাকান্ড ৬ জন লোক নিহত হয়েছে। এর মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে লাভজনক এয়ারলাইন্স 'ব্লু বার্ড' -এর বড় অংশীদার রবিন সেনও রয়েছে। তার লাশ তার বাসভবনে নিচের তলায় লাউঞ্জে পাওয়া গেছে। অবশিষ্ট ৫ জন পার্শ্ববর্তী সিনাগগের সদস্য বলে অনুমান করা হচ্ছে। এই ৫ জনের মধ্যে সিনাগগের পরিচালক হাইম শামিরও রয়েছে। এদের লাশ রবিন সেনের বাসভবনের উক্তর লাউঞ্জের সিঁড়িতে পাওয়া

গেছে। এই হত্যাকান্ডের জন্যে কাউকে সন্দেহ করা যায়নি, কেউ গ্রেফতারও হয়নি।

অনুসন্ধান থেকে জানা গেছে নিহত রবিন সেনের উক্ত বাড়িটি তার একটি অবকাশ ভিলা। এ ভিলায় চাকর-বাকর ছাড়া পরিবারের কোন সদস্য স্থায়ীভাবে থাকেন না। ঘটনার দিন রবিন সেন ছাড়া ঐ বাড়িতে তার পরিবারের কোন সদস্য ছিলেন না।

বাড়ির চাকর-বাকরদের জিজ্ঞাসাবাদ থেকে ঘটনার মূলে নারীঘটিত কোন ব্যাপার রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। চাকর-বাকরদের সূত্রে প্রকাশ, ঘটনার দিন সকালে পার্শ্ববর্তী সিনাগগের পরিচালক হাইম শামির ও তার কয়েকজন সঙ্গী দুজন মেয়েকে ধরে এনে রবিন সেনের ভিলার একটি ঘরে বন্দী করে রাখে। বিকেলে মেয়ে দুটিকে সিনাগগের লোকেরা কোথাও নিয়ে যাচ্ছিল। এ সময় মেয়ে দুটিকে উদ্ধার করতে আসা জনাপাঁচেক লোকের সাথে তাদের সংঘর্ষ বাধে। এই সংঘর্ষেই রবিন সেন ও সিনাগগের লোকেরা নিহত হয়েছে।

মনে করা হচ্ছে ভারতীয় বংশোদ্ভুত রবিন সেনের সাথে সিনাগগের অবৈধ সহযোগিতার কোন সম্পর্ক ছিল। অভিজ্ঞ-মহল এই হত্যাকান্ডের চেয়ে এর উৎস হিসেবে এই অবৈধ সহযোগিতার সম্পর্ককেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে।

খবরটি পড়ে আহমদ মুসা তাকাল বেঞ্জামিন বেকনের দিকে। বলল, 'মনে হচ্ছে এ আপনার কীর্তি।'

'কীর্তি নয়, একটা চেষ্টার ফল মাত্র।' বলল বেঞ্জামিন।

'ফেম মানে 'ফ্রি আমেরিকা'র কোন লোক আছে নাকি ঐ পত্রিকায়?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'আছে। তবে দেখুন একটা শব্দও কিন্তু মিথ্যা লেখেনি।'

'ও শেষ বাক্যটার কথা বলছেন? হ্যাঁ, ওটা কমেন্ট বটে, আবার ইনফরমেশনও। এই ইনফরমেশন দিয়ে একটি অশুভ সহযোগিতার প্রতি পুলিশ ও সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছে।' বলল বেঞ্জামিন বেকন।

‘ধন্যবাদ বেঞ্জামিন বেকন। এই ঘটনায় আমিও অবাক হয়েছি। ভারতীয় একজন ইঞ্জিনিয়ার। অত বড় ব্যবসায় ও পদের মালিক হয়েও সিনাগগের একটা জঘন্য কাজের সাথী হলো কেমন করে।’ বলল আহমদ মুসা বিস্ময়ের সুরে।

উত্তরে বেঞ্জামিন বেকন কিছু বলতে যাচ্ছিল । কিন্তু বলা হলো না। তার টেলিফোন বেজে উঠল।

বেঞ্জামিন বেকন তার মোবাইল হাতে তুলে নিল।

টেলিফোন কানে ধরেই বেঞ্জামিন বেকন সচকিত কন্ঠে বলে উঠল, ‘ম্যাডাম ক্লারা? গুড মর্নিং।’

ওপার থেকে ক্লারার কথা শুনতে গিয়ে মুখ মলিন হয়ে গেল বেঞ্জামিন বেকনের। একবার তাকাল সে আহমদ মুসার দিকেও। চোখে মুখে তার উদ্বেগের চিহ্ন। বলল সে, ‘কোথায় উনি?’

আহমদ মুসার সন্দেহ হলো, কোন খারাপ খবর আসছে নিশ্চয়, কোত্থেকে? কে এই ম্যাডাম ক্লারা।

‘নির্দেশ না দিলেও জানাতাম।’ ইয়েস ম্যাডাম, অবশ্যই জানাব’ বলে টেলিফোন রাখল বেঞ্জামিন বেকন।

‘কি ব্যাপার? কার টেলিফোন? মনে হয় খারাপ খবর আছে!’ বলল আহমদ মুসা।

‘মিস ক্লারা কার্টারের টেলিফোন। খুব খারাপ খবর।’ উদ্বিগ্ন কণ্ঠ বেঞ্জামিন বেকনের।

‘মিস ক্লারা কার্টার কে?’

‘উনি ম্যাডাম সারা জেফারসনের পার্সোনাল সেক্রেটারী।’ বলল বেঞ্জামিন বেকন।

‘খারাপ কোন খবর আছে কি মিস সারা জেফারসনের?’ আহমদ মুসার কণ্ঠেও উদ্বেগ।

‘হ্যাঁ। গত সন্ধ্যায় ম্যাডাম সারা জেফারসন মারাত্মক দুর্ঘটনায় পড়েন। উনি শার্লট ভিল থেকে মন্টিসেলোতে যাচ্ছিলেন। তার দুই গাড়ির সামনেরটা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটা গভীর খাদে পড়ে তাতে আগুন ধরে যায়। আর পেছনের

গাড়িটা সেই অবস্থায় হার্ড ব্রেক কষতে গিয়ে কাত হয়ে পড়ে যায়। ম্যাডাম কপালে আঘাত পেয়েছেন। আর সামনের গাড়ির কেউ বাঁচেনি।'

'ঐ গাড়িতে কে ছিল?'

'ম্যাডাম কে রিসিভ করতে আসা দুজন হাউজ স্টাফ ছিলেন। ম্যাডামের মন্টিসেলোর বাড়িতে তার মা থাকেন, আর তিনি। বাড়ি দেখাশোনার দায়িত্ব হাউজ স্টাফের।' বলল বেঞ্জামিন বেকন।

'আচ্ছা বলতে পারেন, এমন ঘটনা ঐ অঞ্চলে আরও কি ঘটেছে?' প্রশ্ন আহমদ মুসার।

'সম্ভবত ঘটেনি। কারণ মিস ক্লারা প্রথমেই একে বেনজির দুর্ঘটনা বলেছেন।' বলল বেঞ্জামিন বেকন।

'কেন? আমেরিকায় তো প্রচুর দুর্ঘটনা ঘটে। ওখানে ঘটবে না কেন?' আহমদ মুসা প্রশ্ন করল।

'আমি গ্রেট ভ্যালির ঐ এলাকায় গেছি। এ ধরনের এলাকায় গাড়ির স্পীড কম হয় এবং ড্রাইভারও বেশি সতর্ক থাকে। আর গাড়ির সংখ্যাও কম হয়। এসব কারণেই এমন এলাকাগুলোতে দুর্ঘটনা খুবই কম।' বলল বেঞ্জামিন বেকন।

'উনি এখন কোথায়?'

'মন্টিসেলোতে। শার্লট ভিলে চিকিৎসা নেয়ার পর তিনি মন্টিসেলোতে ফিরে গেছেন।

বলে একটু থেমেই বেঞ্জামিন বেকন বলল আহমদ মুসাকে, 'ম্যাডাম সারা জেফারসন বলেছেন এ বিষয়টা আপনাকে জানাবার জন্যে। এবং এজন্যেই মিস ক্লারা আমাকে টেলিফোন করেছিলেন।'

ভাবছিল আহমদ মুসা। বেঞ্জামিনের কথায় বলে উঠল, 'মি. বেঞ্জামিন, আমার কি মনে হচ্ছে জানেন। মনে হচ্ছে, বেনজির দুর্ঘটনাটা আমি একটু দেখে আসি।'

খুশি হলো বেঞ্জামিন বেকন। বলল, 'আমার ধারণা ম্যাডামও এটা চাচ্ছেন। আপনাকে জানাতে বলার মধ্যে দিয়ে তার এ চাওয়ারই প্রকাশ ঘটেছে।

‘প্রসঙ্গক্রমে বলছি মি. বেঞ্জামিন, আপনাদের নেতাকে এমন অরক্ষিত রেখেছেন কেন আপনারা?’ বলল আহমদ মুসা।

‘এ প্রশ্ন আমারও মি. আহমদ মুসা। কিন্তু তাকে এ কথা বুঝাবে কে? তিনি টমাস জেফারসনের সাক্ষাত প্রতিবিম্ব। কোন বাড়তি আয়োজনই তিনি বরদাশত করেন না। চাকুরী না করলেও উনি পারেন। কিন্তু তার যুক্তি হলো, জাতিকে প্রত্যক্ষভাবে তার কিছু দেয়া দরকার। বেঞ্জামিন বেকন বলল।

‘ধন্যবাদ আপনাদের নেতাকে। একজন অনুকরণযোগ্য দেশপ্রেমিক তিনি। বলল আহমদ মুসা।

‘তাহলে আপনি যাচ্ছেন? ব্যবস্থা করব?’

‘আপনি যাবেন না?’

‘তাঁর সেরকম নির্দেশ নেই। তাছাড়া আমার এখন ওয়াশিংটনে থাকা প্রয়োজন। নিশ্চয় শ্যারনরা বড় কিছু করছেন। এদিকে নজর রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।’

বলেই উঠে দাঁড়াল বেঞ্জামিন বেকন। বলল, ‘আপনি তৈরী হোন। আমি প্লেনের টিকিটের ব্যবস্থা করছি। ওয়াশিংটন থেকে ভার্জিনিয়ার শার্লট ভিল পৌনে দু’শ কিলোমিটারের বেশি হবে না। শার্লট ভিল থেকে মন্টিসেলো ২০ কিলোমিটারের মত। ঐ পথটুকু গাড়িতে যাবেন।’

‘মিস ক্লারা কার্টারকে কি আপনি জানাচ্ছেন, আমি যাচ্ছি সেখানে?’ বলল আহমদ মুসা।

‘অবশ্যই।’ বেঞ্জামিন বেকন বলল।

‘আমার মনে হয় জানানোর দরকার নেই।

‘ম্যাডাম সারা জেফারসন যদি হঠাৎ কোন প্রোগ্রামের অন্য কোথাও যান।’

‘ক্ষতি নেই, আমি তো যাচ্ছি এ্যাকসিডেন্ট দেখতে। তারপর একান্তই ওঁকে দরকার হলে আমি খুঁজে নেব।’

‘না জানালে ম্যাডাম যদি আমাকে এজন্যে দায়ী করেন?’ আপত্তি জানিয়ে বলল বেঞ্জামিন বেকন।

‘বলবেন জানাতে আমি রাজী হইনি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কিন্তু না জানানোর যুক্তি আমি বুঝতে পারছি না।’

‘কোন যুক্তি নেই। আমি নিজের সিদ্ধান্তে যাচ্ছি, কি দরকার জানিয়ে। জানিয়ে গেলে অতিথি সাজতে হবে।’

‘মনে আছে, আপনি বলেছিলেন ম্যাডাম আপনাকে মন্টিসেলোতে দাওয়াত দিয়ে রেখেছেন।

‘না জানিয়ে গেলে কি সেখানে হাজির হয়ে তার দাওয়াত নিতে পারবো না?

‘তথাস্তু, আপনার সিদ্ধান্তই বহাল।’ হেসে উঠে বলল বেঞ্জামিন বেকন। তারপর বেরিয়ে গেল।

# ৩

ট্যাক্সি করে মন্টিসেলোর দিকে এগুচ্ছে আহমদ মুসা।

শার্লট ভিল বিমান বন্দরে নেমে আহমদ মুসা ঘন্টা চুক্তিতে এ ট্যাক্সি ভাড়া করেছে মন্টিসেলো যাবার জন্যে।

ঘন্টা চুক্তির কথা শুনে ট্যাক্সিওয়ালা চোখ কপালে তুলে বরেছে, 'মন্টিসেলো পনের বিশ মিনিটের পথ, ঘন্টা দিয়ে কি হবে স্যার?'

হেসে বলেছে আহমদ মুসা, 'পথ তোমার পনের বিশ মিনিটের ঠিক আছে। কিন্তু পথে আমি দেরী করতে পারি, এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াতে পারি, এমনকি যার কাছে যাচ্ছি তার দেখা না পেলে আবার শার্লট ভিলে সংগে সংগে ফিরেও আসতে পারি।'

'বুঝেছি স্যার, ধন্যবাদ।' হেসে বলেছে ট্যাক্সি ড্রাইভার।

আয়নার মতই মসৃণ রাস্তা।

যাওয়া ও আসার রাস্তা পাশাপাশি। মাঝ খান দিয়ে উঁচ, নিচু, এবড়ো থেবড়ো মাটি, পাথর এবং গাছ ও ঝোপ-ঝড়ের স্বাভাবিক ব্যারিয়ার।

রাস্তাটি মন্টিসেলোর পাহাড়ের পাদদেশ ঘেঁষে চলেগেছে তার আরও পশ্চিমে গ্রেট ভ্যালির বিখ্যাত হাইওয়ের দিকে।

আহমদ মুসা ডিপারচার লাউঞ্জ থেকে বের হবার মুখেই পেয়ে যায় ট্যুরিষ্ট ষ্টল। সেখান থেকে আহমদ মুসা সংগ্রহ করে নেয় ভার্জিনিয়ার একটি রোড কমুনিকেশন মানচিত্র এবং গ্রেট ভ্যালি এলাকার একটা ট্যুরিষ্ট গাইড।

ট্যুরিস্ট স্টলের কথা মনে পড়তেই আহমদ মুসার চোখের সামনে ভেসে উঠে স্টলের সেলস গার্ল তরুণীটির চেহারা। আহমদ মুসার উপর চোখ পড়তেই তরুণীটি চমকে উঠেছিল। আহমদ মুসা নিশ্চিত সে আহমদ মুসাকে চিনেছে। মেয়েটিকে? এফ বি আই এর লোক? তার ছবির মাধ্যমে এফ বি আই এর অনেকেই তাকে এখন চেনে।

মন্টিসেলোতে যাতায়াতের এটাই একমাত্র পথ।

আহমদ মুসা এ বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছিল ট্যুরিষ্ট গাইড দেখে। আবার ড্রাইভারকেও জিজ্ঞেস করেছিল। ড্রাইভার বলেছিল, গাড়ির রাস্তা এই একটাই, তবে পায়ে হাঁটার পথ অনেক আছে।

আহমদ মুসার ট্যাক্সি চলছিল মাঝারি গতিতে রাস্তার সর্বশেষ একজিট ওয়ে'র লেন ধরে।

ব্যস্ত রাস্তা এটা নয়। গাড়ি চলছে, তবে দুই গাড়িকে কোথাও একত্রে দেখা যাচ্ছে না। এই হিসাবে রাস্তাটি গাড়ি বিরল এবং জনবিরলই।

গাড়ির ভেতর থেকে দেখা যাচ্ছে, চারদিকটা সবুজ পাহাড় আর সবুজ উপত্যকার সুন্দর চাদরে মোড়া। চোখ ফেরানো যায় না এ সবুজ সুন্দরের বুক থেকে।

আহমদ মুসার মুগ্ধ দুই চোখ আঠার মত লেগে আছে এ সুন্দরের বুকে।

অপরূপ ভার্জিনিয়ার এ এলাকাটি 'আপালোসিয়ান পর্বতমালা'র বিখ্যাত নীল শৈল শিলায় সাজানো সুন্দর পূর্বাচল। আবার আপালোসিয়ানের বুক চিরে প্রলম্বিত গ্রেট ভ্যালিরও অংশ একে বলা যায়।

বাইরের মৌন সবুজের বুকে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল আহমদ মুসা।

ড্রাইভারের কথায় সম্বিত ফিরে পেল সে। ড্রা্ভার বলছিল, 'স্যার আপনি যে একসিডেন্টের কথা বলেছিলেন, সেখানে আমরা এসে গেছি।'

আহমদ মুসা সোজা হয়ে বসল। চোখ ফিরিয়ে নিল রাস্তার পাশে। বলল, 'ওখানে কি দাঁড়ানো যাবে না ড্রাইভার?'

'জি স্যার। একসিডেন্ট পয়েন্টের পেছনেই পার্ক করার মত অনেক জায়গা আছে।

'ঠিক আছে গাড়ি ওখানে পার্ক করো।' নির্দেশ দিল আহমদ মুসা।

গাড়ি পার্ক করলো ড্রাইভার।

আহমদ মুসা গাড়ি থেকে নামল। বলল, 'দেখবো একসিডেন্ট এরিয়াটা।'

ড্রাইভারও নামল।

ড্রাইভার নিয়ে গেল আহমদ মুসাকে সেখানে গাড়ি রাস্তা থেকে ছিটকে এসে পড়েছিল, তারপর গড়িয়ে গিয়েছিল নিচে।

জায়গাটা দেখে বিস্মিত হলো আহমদ মুসা। এখানে ঢালটা অস্বাভাবিক রকম খাড়া। আর এখানে এসেই জায়গা হঠাৎ বড় রকমের বাঁক নিয়ে রাস্তার কাছাকাছি চলে এসেছে। একসিডেন্টের খুবই উপযুক্ত একটা জায়গা। আর এখানে এসেই একসিডেন্টটা হয়েছে।

এমন ঘটা অস্বাভাবিক নয়। কাকতলীয় এমন অনেক কিছুই ঘটে।

কিন্তু মন বড় খুঁত খুঁত করছে আহমদ মুসার। কাকতলীয় কিছু ঘটতে পারে, কিন্তু এখানে যা ঘটেছে সেটা ঐ কাকতলীয় ঘটনা কিনা?

আহমদ মুসা ঝুকে পড়ে তাকাল ঢালের নিচে। দেখল এক'শ ফুটের মত নিচে নালার মত খাদের তলায় পোড়া গাড়ির অবশিষ্ট কাঠামো উল্টে পড়ে আছে।

কোটের পকেট থেকে ছোট্ট একটা দূরবীন বের করল আহমদ মুসা। চোখে লাগিয়ে আবার তাকাল নিচের দিকে।

খুটিয়ে দেখতে লাগল গাড়িটা।

ছোট হলেও দূরবীনটা অত্যন্ত পাওয়ারফুল। একমাইল দূরে পড়ে থাকা আলপিন পর্যন্ত এর নজর এড়ায় না।

এক সময় আহমদ মুসা চোখ থেকে দূরবীন নামিয়ে চোখে-মুখে কিছুটা বিস্ময় নিয়ে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল ড্রাইভারকে।

এ সময় তাদের পেছনে একটা গাড়ি দাঁড়ানোর শব্দে আহমদ মুসা পেছনে ফিরে তাকাল। তাকিয়ে দেখতে পেল, তাদের ট্যাক্সির পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে একটি কার। কার থেকে নামছে সারা জেফারসন।

সারা জেফারসনকে এভাবে এখানে দেখে অনেকটা ভুত ধোর মতই চমকে উঠল আহমদ মুসা।

সারা জেফারসন ধীরে ধীরে আহমদ মুসার সামনে এসে দাঁড়াল।

সারা জেফারসনের পরনে সাদা ফুল প্যান্ট, গায়ে হাল্কা গোলাপী কোট এবং মাথায় প্রাচীন অভিজাত আমেরিকানদের মত কারুকাজ করা গোলাপী

হেডক্যাপ। হেডক্যাপের আড়াল থেকে দেখা যাচ্ছে তার কপালে ব্যান্ডেজের একটাংশ।

মুখটাও সাদা ও লালে মেশানো। গোটা মুখে প্রসাধনী ব্যবহারের কোন চিহ্ন নেই। আছে শিশু সুলভ সারল্যের স্নিগ্ধ লাবন্য। লিপিস্টিকহীন রক্তিম ঠোঁটে আনন্দের হাসি।

ড্রাইভার সারা জেফারসনকে এসে দাঁড়াতে দেখেই 'গুড ইভনিং ম্যাডাম মিস জেফারসন' বলে মাথা সামান্য ঝুকিয়ে বাউ করে সম্মানের সাথে পেছনে সরে গেল।

সারা জেফারসন তার দিকে তাকিয়ে হেসে জবাব দিল তার সম্বোধনের।

সারা জেফারসন ড্রাইভারের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে আহমদ মুসার দিকে মুখ তুলে বলল, 'গুড ইভনিং। আসসালামু আলাইকুম।'

বলে হেসে উঠল সারা জেফারসন। হাসতে হাসতেই বলল, 'দেখলেন, আপনাদের আপনাদের স্বাগত সম্বোধনটা আমি মুখস্ত করে ফেলেছি। অর্থও জানি। সত্যি, আপনাদের এ শুভ কামনার কোন তুলনা হয় না।'

'ধন্যবাদ মিস সারা জেফারসন। গুড ইভনিং।' আহমদ মুসার ঠোঁটেও টুকরো হাসি।

'বাহ, আপনাদের স্বাগত সম্ভাষণ 'সালাম' বলবেন না!' বলল সারা জেফারসন হাসি মুখে।

আহমদ মুসা তার চোখ নামিয়ে নিয়েছিল সারা জেফারসনের মুখ থেকে। হাসল আহমদ মুসা সারা জেফারসনের কথায়। বলল, 'আপনি আমাকে স্বাগত জানিয়েছেন আমাদের সম্বোধন দিয়ে, আর আমি জানলাম আপনাদের সম্বোধন দিয়ে।'

'তা ঠিক। কিন্তু আসল ঘটনা এটা নয়।' বলল সারা জেফারসন। মুখ টিপে হাসল সে।

'তাহলে কি?' মুখ তুলে হেসে বলল আহমদ মুসা।

‘আসল ঘটনা হলো, শুভকামনাসূচক আপনাদের স্বাগত সম্বোধনটা মুসলমানদের জন্যে এক্সক্লুসিভ। কোন অমুসলমানকে এ দিয়ে স্বাগত জানানো হয় না।’

‘আপনি এতো জানেন?’

‘আমার আম্মা কি বলেন জানেন, আমি আমার গ্রান্ড গ্রান্ড গ্রান্ড ফাদার টমাস জেফারসনের মতই নাকি বুক ওয়ার্ম। আসলে কিন্তু কিছুই না।’

কথা শেষ করে একটা দম নিয়ে সারা জেফারসন আবার বুলে উঠল, ‘আমাকে এখানে এভাবে দেখে খুব বিস্মিত হয়েছেন, তাই না?’

‘হয়েছিলাম, কিন্তু সেটা কেটে গেছে।’

‘কিভাবে?’

‘আমার মনে হয়েছে, এয়ারপোর্টের ট্যুরিষ্ট ষ্টলের মেয়েটি আমার আসার ব্যাপারে আপনাকে জানিয়েছে।

‘কি করে বুঝলেন? মেয়েটিকে চেনেন?’

‘চিনি না। কিন্তু তার তাকানো দেখে বুঝেছিলাম সে আমাকে চিনে ফেলেছে। তখন ভেবেছিলাম সে এফ বি আই-এর লোক হবে। এখন বুঝলাম সে ‘ফেম (FAME) মানে ‘ফ্রি আমেরিকা’র লোক।’

‘তারপর?’

‘আমি ট্যাক্সিতে আসছি সে কথাও আপনি জেনে ফেলেছেন।

তারপর আপনি এখানে চলে এসেছেন। আমাদেরকে পাস করার সময় আমাদের ট্যাক্সি দেখে এখানে থেমে গেলেন।

‘ধন্যবাদ। তাহলে এখন চলুন। এখানে কি দেখছিলেন, একসিডেন্ট?’

‘এই বেনজির একসিডেন্ট দেখে আপনার কিছু মনে হয়েছে?’

‘বেনজির আপনি ঠিক বলেছেন। এ ধরনের একসিডেন্ট এই এলাকায় এটাই প্রথম।’

বলে একটু থামল সারা জেফারসন। তারপর বলল, ‘একসিডেন্টকে আমার কাছে একসিডেন্টই মনে হয়েছে। আপনি এ প্রশ্ন করছেন কেন?’

এই বেনজির একসিডেন্টের কথা শুনে হঠাৎই আমার মনে হয়, একসিডেন্টটা একসিডেন্ট নাও হতে পারে। এখন মনে হচ্ছে, আমার ধারণাই ঠিক।'

সারা জেফারসনের মুখের আলো হঠাৎ দপ করে নিভে গেল। চোখে-মুখে ফুটে উঠল বিস্ময়। কথা বলতেও যেন সে ভুলে গেল।

আহমদ মুসাই কথা বলল। বলল, 'এ পর্যন্ত যতটুকু দেখেছি তাতে আমি অনেকটাই নিশ্চিত, এটা একসিডেন্ট ছিল না।'

কথা শেষ করে আহমদ মুসা পরিপূর্ণভাবে সারা জেফারসনের দিকে তাকাল। বলল, 'বলুন তো সেদিন দুই গাড়ির যেটিতে আপনি চড়েছিলেন, সেটিতেই কি আপনার চড়ার কথা ছিল?'

চমকে উঠল সারা জেফারসন। মুহূর্তের জন্যে তার উদ্বিগ্ন দৃষ্টি স্থির থাকলো আহমদ মুসার মুখে। তারপর বলল, 'যে গাড়িটা সেদিন ধ্বংস হয়েছে ওটাই আমার পার্সোনাল গাড়ি। ওটাতেই আমার চড়ার কথা ছিল। কিন্তু কেন জানি সেদিন আমি হঠাৎই উঠে বসি পেছনের গাড়িতে।'

'আল্লাহ আপনাকে বাঁচাবেন বলে উঠিয়েছিলেন পেছনের গাড়িতে।'

'তাহলে আপনি বলছেন ওটা ছিল আমাকে হত্যার পরিকল্পিত একটা ঘটনা?'

'আমার তাই মনে হচ্ছে।'

'কিন্তু কোন প্রমাণের ভিত্তিতে?'

'আপাতত অবস্থাগত কারণের ভিত্তিতে।'

'সেটা কি?'

আহমদ মুসা তার দূরবীন তুলে দিল সারা জেফারসনের হাতে। বলল, 'গাড়িটা গড়িয়ে পড়ার জায়গা থেকে শুরু করে পুড়ে যাওয়া গাড়ির বডিটা ভালো করে দেখুন।'

দূরবীন চোখে লাগাল সারা জেফারসন। কিছুক্ষণ দেখার পর দূরবীন চোখ থেকে নামিয়ে বলল, 'দেখলাম। এবার বলুন।'

‘আপনি দেখেছেন, গাড়ির তিনটি চাকা পুড়ে গাড়ির সাথে লেপ্টে আছে। বাম পাশের সামনের চাকাটা গাড়ির সাথে নেই। ওটা দেখেছেন মাঝপথে একটা পাথরের সাথে আটকে আছে।’

‘জি, দেখেছি।’ বলল সারা জেফারসন।

‘আটকে থাকা এই চতুর্থ চাকাটা পুড়েনি। এবং গাড়ির সাথে খাদের তলাতেও পড়েনি। এর অর্থ চাকাটা শুরুতেই গাড়ি থেকে খসে গেছে। আমার মত হলো, চাকাটা গাড়ি থেকে খুলে যাওয়ার কারণেই ধ্বংসাত্মক এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।’ আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসা থামলেও সংগে সংগে কথা বলল না সারা জেফারসন। ভাবছিল সে। বলল কিছুক্ষণ পর, ‘অবস্থাগত দিকগুলোর যে ব্যাখ্যা আপনি দিয়েছেন তার সাথে আমি একমত। চাকা খুলে যাওয়ার ফলে একসিডেন্ট ঘটেছে এটাও ঠিক। কিন্তু ভাবছি, গাড়ির চাকা খুলে যাবার সাথে কোন পরিকল্পনার যোগসূত্র আছে কিভাবে? চাকা আগে থেকে অবশ্যই খোলা ছিল না, তাহলে গাড়ি শুরু থেকেই চলতে পারতো না। আর চাকা নড়বড়ে থাকলে গাড়ি এতদূর আসতে পারতো না।’

‘ঠিক বলেছেন। আচ্ছা বলুন তো ঠিক দুর্ঘটনার মুহূর্তের কথা। কি দেখেছেন, কি শুনেছেন তখন?’

সারা জেফারসন বলল, ‘টায়ার ফাটার মত একটা বিকট শব্দ শুনেছি। তারপরই গাড়িটা যেন লাফ দিয়ে খাদে পড়ে গেল।’

‘খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন মিস জেফারসন। টায়ার ফাটলে তো যেদিকে গাড়িটি ছিটকে পড়েছে সে দিকের, বিশেষ করে খসে পড়া চাকাই ফেটে যাবার কথা।’

বলে একটু থেমেই আহমদ মুসা আবার বলল, ‘একটু দাঁড়ান মিস জেফারসন, আমি চাকাটা নিয়ে আসছি।’

আহমদ মুসা নামতে যাচ্ছিল ঢালে। সারা জেফারসন বাধা দিয়ে বলে উঠল, ‘এ কষ্টের কোন প্রয়োজন নেই মি. আহমদ মুসা। ধরুন, টায়ারটি ফেটেছে। কিংবা ধরুন, টায়ারটি ফাটেনি।’

‘তাতে আমরা কোন একটা নির্দিষ্ট উপসংহারে পৌছাতে পারবো না মিস জেফারসন। অথচ এ ধরনের একটা সিদ্ধান্তে আমাদের পৌছতে হবেই।’ বলল আহমদ মুসা।

সারা জেফারসনের মুখটা ম্লান হয়ে গেল। কিছু বলল না।

আহমদ মুসা নামল ঢাল বেয়ে।

অত্যন্ত খাড়া বলে সোজা নামা গেল না, অনেকটা ঘুরে পথে তাকে নামতে হলো।

দশ মিনিটের মধ্যেই চাকা হাতে উঠে এল আহমদ মুসা।

‘ধন্যবাদ মি. আহমদ মুসা। আপনাকে আমার ভোগানো বোধ হয় সবে শুরু। দেখছিতো টায়ারটি ফাটেনি।’ একটু বিব্রত কণ্ঠ সারা জেফারসনের।

‘ঠিকই বলেছেন মিস জেফারসন। টায়ারটি ফাটেনি। কিন্তু লক্ষ্য করুন চাকার স্টিল ফ্রেমের যে দিকটা বাইরে ছিল তার রং ও স্বাভাবিকতা ঠিকই আছে, আর যে দিকটা ভেতরের পাশে ছিল তার রং বিবর্ণ হয়ে গেছে এবং মসৃণ স্টিল সারফেসটা অমসৃণ হয়েছে।’ আহমদ মুসা বলল।

সারা জেফারসনও ব্যাপারটা পরীক্ষা করল। বলল, ‘এর অর্থ কি মি. আহমদ মুসা?’

‘আমার মনে হচ্ছে, ‘প্রেসার একপ্লোশন’- এর কাজ হতে পারে। ’

‘প্রেসার এক্সপ্লোশন’ কি?’

‘আল্ট্রা প্রেসার মাইক্রো সিলিন্ডার’ (APMC) নামে বিশেষ ধরনের একটি অস্ত্র আবিস্কার হয়েছে। সাবান কেসের চেয়ে বড় নয় যন্ত্রটা। কিন্তু অবিশ্বাস্য তার শক্তি। বোমায় ঘটে আগুনের বিস্ফোরণ, আর ওতে ঘটে চাপের বিস্ফোরণ। একটা ইস্পাতের দেয়ালে এটা সেট করলেও যন্ত্রটির চারদিকের এক বর্গফুট এলাকা পর্যন্ত ইস্পাতের দেয়াল প্রচন্ড চাপে খসে ছিটকে বেরিয়ে যায় বুলেটের মত। যন্ত্রটা স্বয়ংক্রিয় হয়, আবার দূরনিয়ন্ত্রিতও হতে পারে। আমার মনে হয় আপনার গাড়ির সামনের বাম চাকার ভেতরের পাশে যন্ত্রটি ফিট করা হয়েছিল। চাপের বিস্ফোরণে চাকা ছিটকে বেরিয়ে যায়। গাড়িও লাফিয়ে ওঠে এবং পড়ে ভয়ানক দুর্ঘটনায়।’

থামল আহমদ মুসা।

সম্মোহিতের মত তাকিয়েছিল সারা জেফারসন আহমদ মুসার মুখের দিকে। আহমদ মুসা থামলেও কথা বলতে পারলো না সারা জেফারসন। তার চোখে-মুখে বিস্ময়, উদ্বেগ, বিমুগ্ধতাও।

আহমদ মুসা চোখ নামিয়ে নিয়েছে অনেকক্ষণ। কিন্তু বুঝতে পারছে যে, সারা জেফারসনের অপলক দৃষ্টির বাধনে বন্দী।

আহমদ মুসা তাকাল ড্রাইভারের দিকে। সে একটু দূরে ভিন্ন দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বলল আহমদ মুসা, মিস জেফারসন, 'ড্রাইভার অনেক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে।'

আহমদ মুসার কথা মনে হয় সারা জেফারসন শুনতেই পায়নি। সারা জেফারসন বলল, 'প্রেসার এক্সপ্লোশন ডিভাইস' (APMC)টি কারা সেট করতে পারে গাড়িতে আমাকে হত্যা করার জন্যে?' সারা জেফারসনের কথা দূর থেকে ভেসে আসা নিস্তেজ, নিস্পৃহ, ঘুম জড়ানো এক কণ্ঠের মত শোনাল আহমদ মুসার কানে।

'বিষয়টি নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে।' বলল আহমদ মুসা। আহমদ মুসার একথাও সারা জেফারসন শুনল বলে মনে হলো না। সে বলল, 'মি. আহমদ মুসা আমি দেশের শীর্ষ স্ট্রাটেজিক রিসার্চ ল্যাব- এর রিসার্চ রেজিষ্ট্রেশন ডাইরেক্টর হিসেবে এর কেন্দ্র বিন্দুতে আছি, সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের রিসার্চ তালিকাও আমরা যোগাড় করি। কিন্তু APMC এর মত গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র সম্পর্কে আমি কিছু জানি না! সারা জেফারসনের কণ্ঠ আগের মতই শুনাল।

'মিস জেফারসন, 'ইউ এস ডিফেন্স এ্যালাটনেস' শীর্ষক গোপন রিপোর্টের দুমাসের আগের সংখ্যায় এই অস্ত্রের কথা আছে। মনে হয় অস্ত্রটি তৈরী করেছে মিলিটারী সাইনটিষ্টদের কেউ, ডিফেন্স ল্যাবরেটরী থেকে।' রিপোর্টটি মার্কিন ডিফেন্স কমান্ড এবং প্রেসিডেন্টের মধ্যেই সীমাবদ্ধ বলে আমার ধারণা।' আহমদ মুসা বলল।

'কিন্তু আপনি তো জানতে পেরেছেন।' বলল সারা জেফারসন। তার মুগ্ধ চোখে কৌতুহল।

‘জানাটা একটা একসিডেন্ট। কদিন আগে সান্তাফে’ নগরীতে হোয়াইট ঈগলের একটা ঘাটি আমরা দখল করেছিলাম। সেখানে গোল্ড ওয়াটারের সাথে জেনারেল শ্যারণও ছিলেন।। সে ঘাটিতে একটা ম্যাগাজিনের মধ্যে জেনারেল শ্যারনের নাম যুক্ত একটা ইনভেলাপ পেয়েছিলাম। সে ইনভেলাপের মধ্যেই পাই রিপোর্টটি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তার মানে ইহুদী গোয়েন্দা প্রধান জেনারেল শ্যারন রিপোর্টটি পেয়েছিল?’ বিস্ময়ে ভ্রু কুচকে উঠেছে সারা জেফারসনের।

হাসি ফুটে উঠল আহমদ মুসার ঠোঁটে। বলল, ‘মিস জেফারসন, শুধু APMC কেন, মার্কিনীদের কোন গোপন তথ্যটি ইহুদী প্রধানদের কাছে নেই?’

মুখটি ম্লান হয়ে গেল সারা জেফারসনের। অনেকটা স্বগত কণ্ঠেই বলল, ‘ওরা তো এখন আমাদের সরকারের মধ্যে আরেকটি সরকার চালাচ্ছে।’

কথাটি বলার সাথে সাথে জেফারসনের ম্লান মুখে ক্রোধ ফুটে উঠল। বলল, ‘আপনি কি ইনভেলাপসহ রিপোর্টটা আমাকে দিতে পারেন?’

‘অবশ্যই মিস জেফারসন।’

‘ধন্যবাদ।’

বলেই সারা জেফারসন তাকাল ট্যাক্সি ড্রাইভারের দিকে। বলল, ‘ওহ! ওকে আমরা বেকার বসিয়ে রেখেছি।’

বলে সারা জেফারসন এগুলো ট্যাক্সির দিকে।

সারা জেফারসনকে আসতে দেখে ড্রাইভার এ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল।

সারা জেফারসন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে পকেট থেকে টাকা বের করে ড্রাইভারের হাতে তুলে দিল। বলল, ‘ঘন্টা হিসাবে নিয়ে যা থাকে সেটা আপনার পরিবারের জন্যে আমার শুভেচ্ছা।’

ড্রাইভার টাকাগুলো নিয়ে গুণার পর টাকার একটা অংশ সারা জেফারসনকে ফেরত দিয়ে বলল, ‘আপনার কাছে থেকে মজুরী নেয়া আমাদের জন্যে কষ্টের। মজুরীটা ফেরত দিলাম, শুভেচ্ছা- অর্থটা রাখলাম। আপনার শুভেচ্ছা আমাদের জন্যে গৌরবের।

‘ধন্যবাদ ম্যাডাম।’

বলে ড্রাইভার সারা জেফারসন ও আহমদ মুসার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠল।

ট্যাক্সি চলে গেলে সারা জেফারসন আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, 'আপনার অভিযান শেষ, এবার আপনি আমার মেহমান।' মুখে হাসি সারা জেফারসনের।'

'দাওয়াত অনেক আগেই দিয়ে রেখেছেন। মেহমান অবশ্যই হবো। কিন্তু আমার অভিযান শেষ হয়নি।' বলল আহমদ মুসা।

সারা জেফারসন হাসল। মনে মনে বলল, আপনার বিনোদনের কথাটা ভূয়া। 'ফ্রি আমেরিকা' (FAME) এর নেত্রী সারা জেফারসনের জীবনে যে অলস বিনোদন নেই, তা আমি জানি।

মুখে আহমদ মুসা কিছু বলল না।

সারা জেফারসন তার গাড়ির দিকে এগিয়ে গাড়ির দরজা মেলে ধরে বলল, 'আসুন মি. আহমদ মুসা।'

'মিস জেফারসন আপনি অনুমতি দিলে গাড়ির ঐ চাকাটা আপনার গাড়িতে তুলে নিতে পারি।' আহমদ মুসা বলল।

'অল রাইট মুসা, আপনি গাড়িতে উঠুন। চাকাটা আমিই গাড়িতে তুলছি।'

বলে সারা জেফারসন এগুলো গাড়ির সেই চাকার দিকে।

আহমদ মুসাও এগুলো।

সারা জেফারসন চাকায় হাত দেবার আগেই আহমদ মুসা গাড়ির চাকাটা তুলে নিয়ে বলল, 'দেখুন মিস জেফারসন, নারীদের অন্যায়ভাবে খাটানো এবং তাদেরকে ক্ষমতা না দেয়ার অভিযোগ রয়েছে পুরুষদের বিরুদ্ধে, আপনি দয়া করে আর এ অভিযোগ বাড়াবেন না।'

সারা জেফারসন হাসল। বলল, 'আপনি উল্টো কাজ করছেন মি. আহমদ মুসা। নারীরা ক্ষমতা চায় মানে কাজ চায়। আপনিতো কাজ কেড়ে নিয়ে ক্ষমতা কেড়ে নিচ্ছেন।'

হাসল সারা জেফারসন। বলল 'ঠিক আছে এ বিতর্কের ফায়সালা আমার মাকে সামনে রেখে হবে। ফায়সালার জন্য একজন বিচারকতো দরকার! চলুন গাড়িতে উঠি।

'আমি রাজী।' বলে আহমদ মুসা চাকাটা গাড়িতে তুলে দিয়ে গাড়িতে উঠে বসল।

সারা জেফারসন গিয়ে বসল গাড়ির ড্রাইভিং সিটে।

গাড়ি চলতে শুরু করল।

পাশের সিটেই আহমদ মুসা বসেছিল। সে বলে উঠল, 'মিস জেফারসন, আপনাদের মানে আপনার মাকে বিরক্ত করলাম নাতো?'

হাসল জেফারসন। বলল, 'আমার মা আপনাকে আমার চেয়ে বেশি জানেন। দেখবেন তিনি কত খুশি হবেন।'

'আমি এসেছি জানিয়েছেন তাঁকে?' আহমদ মুসা বলল।

'হ্যাঁ, বলেছি। মন্টিসেলোতে আপনাকে আমি দাওয়াত করেছিলাম সেটাও আমি বলেছি। উনি কি বলেছেন, তিনি দাওয়াত খেতে যান নাকি? এমন সময় তাঁর আছে বলে মনে হয় না। আমি বলেছিলাম, এই তো আসছেন তিনি।

আম্মা বলেছিলেন, আমি বুঝতে পারছি না। হতেও পারে তিনি জেফারসন তনয়াকে আলাদা গুরুত্ব দিয়েছেন।'

'আপনার আম্মা অনেক অভিজ্ঞ।'

'কিন্তু শেষ কথাটা কি তিনি ঠিক বলেছেন?' বলল সারা জেফারসন তনয়া আমার কাছে শুধুই জেফারসন। তার চোখে-মুখে আনন্দ বিস্ময় দুটোই।

'জেফারসন তনয়া তা জানেন।' আহমদ মুসা তার দৃষ্টি সামনে প্রসারিত রেখেই কিছুটা গম্ভীর কণ্ঠে বলল।

সারা জেফারসনের মুখ হঠাৎ যেন যন্ত্রণার অপূর্ব শিহরণে রাঙা হয়ে উঠল। তার মনে হলো, তার বাইশ বছরের জীবনে তার শোনা কোন কথাই তাকে এতটা শিহরিত করতে পারেনি, তার সত্তাকে এতটা গৌরবান্বিত কেউ কখনও করেনি।

কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না সারা জেফারসন।

অসস্তিকর এক নিরবতা।

আহমদ মুসা তখন ভাবছিল অন্য কথা। মিস জেফারসনকে ওরা খুন করতে চেয়েছিল, এটা এখন নিশ্চিত। ‘ওরা’ কারা সেটাও স্পষ্ট। মিস জেফারসন খুন হননি, সেটাও তারা নিশ্চয় জেনে ফেলেছে সংগে সংগেই। এখন ওরা কি ভাবছে? হাত ফসকে যাওয়া শিকার ছেড়ে দিয়ে বসে থাকা ওদের দর্ম নয়। তাহলে?

এই ‘তাহলে’র উত্তর এখন আহমদ মুসার কাছে নেই। তবে আহমদ মুসা ভেবে খুশি হলো যে, মন্টিসেলোতে আসা তার বৃথা যায়নি। সারা জেফারসন শুধু জেফারসন তনয়া নন, তিনি আজকের আমেরিকার একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। ‘ফ্রি আমেরিকা’ (ফেম) মুভমেন্টের তিনি প্রধান। তার জীবনের আজ অনেক মূল্য। ‘স্বাধীন আমেরিকার মানস’ এর তিনি তরুণ প্রতিনিধি। আমেরিকার ফাউন্ডার ফাদারসরা যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, বিশেষ করে টমাস জেফারসন যে নতুন আমেরিকা ও নতুন পৃথিবীর আমেরিকান স্বপ্নকে সবাক রূপ দিয়েছিলেন, সে স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে সারা জেফারসনরাই পারেন। আর সে স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পেলে শান্তির সে পরিবেশে নতুন আমেরিকার সাথে মুসলমানদের সম্পর্কই সবচেয়ে গভীর হবে। সুতরাং আহমদ মুসা জেফারসনদের কোন কাজে এসে সেটা আহমদ মুসার জন্যে আনন্দেরই হবে। আহমদ মুসা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল যে, সে একটা ভালো সময়ে মন্টিসেলোতে আসতে পেরেছে।

সারা জেফারসন অল্প সময় পরে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। রাঙা তখনও তার মুখ।

আহমদ মুসাকে ভাবনায় নিমজ্জিত দেখে বলল সারা জেফারসন, ‘কি ভাবছেন মি. আহমদ মুসা?’

‘ভাবছি না, স্বপ্ন দেখছি।’ আহমদ মুসা হাসি মুখে সারা জেফারসনের দিকে না তাকিয়েই বলল।

সারা জেফারসনের চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তার রাঙা মুখটি আলো ঝল মল করে উঠল। বলল, ‘কি স্বপ্ন? বিপ্লবীরা কি স্বপ্ন দেখে?’

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু বলা হলো না। হঠাৎ রিয়ার ভিউ মিররে নিবদ্ধ হয়ে গেল তার চোখ। তাড়াতাড়ি দূরবীন চোখে লাগিয়ে পেছন ফিরে গাড়িটাকে কয়েক মুহূর্ত দেখে বলে উঠল, 'মিস জেফারসন, একটা গাড়ি দ্রুত আমাদের পেছনে আসছে। মনে হচ্ছে যেন আমাদের গাড়িকে ধরার চেষ্টা করছে।'

'কেন ওভারটেক করার প্রয়োজনও তো হতে পারে তার?' সহজ কণ্ঠে বলল সারা জেফারসন।

'কিন্তু একটা মজার ঘটনা ঘটল। গাড়িটা ফাস্ট লেন দিয়ে দ্রুত আসছিল। তার পেছনে আরেকটা দ্রুতগামী গাড়ি এসে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গেই ঐ গাড়িটি গতি স্লো করে আমাদের লেন অর্থাৎ সেকেন্ড লেনে চলে এসে পেছনের গাড়িকে চলে যাবার রাস্তা করে দেয়। পেছনের গাড়িটা চলে যাবার পর আবার সে স্পীড বাড়িয়ে ছুটে আসছে।' আহমদ মুসা বলল।

ভ্রু কুঞ্চিত হলো সারা জেফারসনের। বলল, 'বুঝেছি মি. আহমদ মুসা। ওভারটেক ওর লক্ষ্য হলে সে লেন চেঞ্জ করতো না এবং গতিও স্লো করতো না।'

বলে মুহূর্তকাল থেমে আবার বলল সারা জেফারসন, 'কিন্তু ফলো যদি করে, কোত্থেকে করল। আমরা একসিডেন্টের ওখানে অনেকক্ষণ ছিলাম। সে সময় নিশ্চয় ওরা সেখানে ছিল না। ওরা তো সেখানেই কিছু করার চেষ্টা করতে পারতো।'

'আমার মনে হয় ওরা বাড়ি থেকে আপনাকে ফলো করেনি। মনে হচ্ছে, ওরা খবর পেয়েছে কে একজন শার্লট ভিলে নেমে মন্টিসেলো যাচ্ছে। আরও বোধ হয় খবর পেয়েছে লোকটি মন্টিসেলো যাবার পথে একসিডেন্ট সাইট তদন্ত করেছে এবং একটি ডকুমেন্ট সেখান থেকে তুলে নিয়েছে। আরও খবর পেয়ে থাকতে পারে যে, মিস জেফারসন তাকে এগিয়ে নিতে এসেছে। এসব খবর পাওয়ার পর আগন্তুকটি কে সে সম্পর্কে জানা এবং সুযোগ পেলে কিছু করার জন্যেই ওরা এসেছে।'

কথা শেষ করে আহমদ মুসা তার সিটে সোজা হয়ে বসল। বলল, 'মিস জেফারসন আপনি গাড়িটা ডেড স্টপ করুন। দেখা যাক ওরা কি করে।'

সংগে সংগেই সারা জেফারসন শেষ লেনটিতে নিয়ে গিয়ে গাড়ি দাঁড় করাল।

গাড়ি দাঁড়াতেই আহমদ মুসা বলল, 'মিস জেফারসন আপনি একটু সাবধানে বসুন। আমি দেখি ইঞ্জিনটার কি হলো।'

আহমদ মুসা নেমে পড়ল গাড়ি থেকে।

'আপনার পরিকল্পনা আমি বুঝতে পারিনি। কিন্তু সাবধান, ওদের আন্ডারইস্টিমেট করবেন না।' গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে অনুরোধ করল সারা জেফারসন।

ইঞ্জিন সামনে।

আহমদ মুসা কভারটি খুলল।

কভারটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্প্রিং-এর উপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

আহমদ মুসা রাস্তার দিকটাকে সামনে রেখে একটু ঝুঁকে বাম হাত দিয়ে ইঞ্জিন পরীক্ষা করছে। আর তার ডান হাতটি তখন কোটের বুকের বোতাম নিয়ে খেলা করছে। হাতের তিন ইঞ্চি ব্যবধানে ঝুলছে তার মেশিন রিভলবার।

বিশ সেকেন্ডও পার হলো না।

পেছনের গাড়িটা আহমদ মুসাদের সমান্তরালে চলে এল।

কিন্তু সমান্তরালে আসার আগেই গাড়িটার গতি স্লো হয়ে গিয়েছিল।

ভ্রু কুঞ্চিত হয়েছিল আহমদ মুসার। ওরা তাহলে গাড়ি দাঁড় করাচ্ছে না? তারা দেখেই চলে যাবে? এমন প্লিজার ট্রিপে তারা কষ্ট করে এসেছে বলে মনে হয় না, বিশেষ করে তাদের প্রথম উদ্যোগ ব্যর্থ হবার পর। তাহলে?

সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল আহমদ মুসা।

ঠিক এসময় সারা জেফারসনের কথা সে শুনতে পেয়েছিল, 'বি কিয়ারফুল মি. আহমদ মুসা। ওরা.......।'

কথা শেষ করেনি সারা জেফারসন। সাথে সাথে একটা গুলীর শব্দ শুনল আহমদ মুসা। গুলী ছুড়ছে সারা জেফারসন।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়েই দেখতে পেয়েছিল এগিয়ে আসা গাড়ির দুজানালা দিয়ে হ্যান্ড রকেট লাঞ্চারের দুটি অগ্রভাগ বেরিয়ে আসছে।

বুঝেছিল আহমদ মুসা কি ঘটতে যাচ্ছে।

আহমদ মুসার ডান হাত আগেই চলে গিয়েছিল মেশিন রিভলবারের বাঁটে।

ট্রিগারে আঙুল রেখেই বের করে নিয়ে এসেছিল সে রিভলবার।

দুই রকেট লাঞ্চারের 'ফায়ার টিপ' জানালা দিয়ে বের হয়ে আসছে, এ দৃশ্য দেখার সংগে সংগেই আহমদ মুসা ফায়ার করল প্রথমে সামনের দুই সিট লক্ষ করে। রিভলবারের নল আর নড়াতে হয়নি আহমদ মুসার। গাড়ি সামনে এগিয়ে আসায় মেশিন রিভলবারের অবিরাম গুলী বৃষ্টি গিয়ে ঘিরে ফেলেছে পেছনের সিটের দুজনকেও।

প্রথম গুলী আহমদ মুসা ও সারা জেফারসন এক সাথেই করেছিল।

রকেট লাঞ্চারের শর্ট ডিস্ট্যান্স এ্যাডজাস্ট করতে গিয়ে সে দেরীটা তাদের হয়েছিল, তা আহমদ মুসাদের পক্ষে এসে গিয়েছিল। আহমদ মুসা ও সারা জেফারসনের প্রথম দুটি গুলী প্রথমেই দুই রকেট লাঞ্চারধারীকে আহত করেছিল।

ও গাড়ির রকেট লাঞ্চারধারী আহমদ মুসাদের গাড়ি খারাপ হওয়াও ইঞ্জিন পরীক্ষা করার মহড়াকে সম্ভবত সত্য মনে করেছিল এবং মনে করেছিল তাদেরকে আহমদ মুসারা মোটেই সন্দেহ করেনি। এই ভুলই তাদের জন্যে কাল হয়ে দেখা দিল।

আহমদ মুসা রিভলবারের ট্রিগার থেকে হাত সরিয়েই ইঞ্জিনের উপর ঢাকনা সেট করে ছুটল ঐ গাড়ির দিকে। দেখল গাড়িতে নিহত চারজনই মুখ্যত সেমিটিক চেহারার মানুষ।

আহমদ মুসা গাড়ির কোন কিছুতে হাত না দিয়ে সামনের সিটের নিহত একজনের শার্টের কলার ব্যান্ড উল্টিয়ে দেখল কলার ব্যান্ডের একটা সাদা বোতামে ছয় তারা আঁকা। অর্থাৎ এরা সবাই জেনারেল শ্যারনের বাহিনী।

বিস্মিত হলো আহমদ মুসা। জেনারেল শ্যারন সারা জেফারসনের এতটা বৈরী, তাকে হত্যার জন্যে এতটা মরিয়া হয়ে উঠেছে কেন? তাহলে সারা জেফারসনের আসল পরিচয় ওরা জেনে ফেলেছে?

ফিরে এল আহমদ মুসা গাড়িতে।

‘কি দেখলেন মি. আহমদ মুসা?’ জিজ্ঞেস করল সারা জেফারসন। তার চোখে-মুখে উদ্বেগ।

‘ওদের পরিচয়ের সন্ধ্যানে গিয়েছিলাম। দেখলাম অনুমান ঠিক। ওরা জেনারেল শ্যারনের লোক। ওদের শার্টের কলার ব্যান্ডে দেখলাম সেই ছয় তারকার বোতাম।’ আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসা থামতেই সারা জেফারসন বলে উঠল, ‘পুলিশের ইনফরম করা দরকার।’

‘অবশ্যই উচিত, কিন্তু মেশিন রিভলবারের গুলীর কি ব্যাখ্যা দেবেন?’

‘ওঠা ঠিক আছে। আমি যে মেশিন রিভলবার আপনাকে দিয়েছি, ওটা আমার নামেই লাইসেন্স করা।’ বলল সারা জেফারসন।

‘তাহলে ঠিক আছে। ধন্যবাদ আপনাকে।’

‘ওয়েলকাম’ বলে হাসল সারা জেফারসন। তারপর মোবাইল তুলে নিয়ে টেলিফোন করল পুলিশকে। গোটা ঘটনা পুলিশকে। গোটা ঘটনা পুলিশকে জানাল। অবশেষে বলল, ‘সেদিনের একসিডেন্টটা কিন্তু আমি এখন কোন শত্রুর অন্তর্ঘাতি কাজ বলে মনে করছি।’

পুলিশ এসে গাড়িটার দায়িত্ব নিলে আনুসাঙ্গিক ফর্মালিটি শেষ করে সারা জেফারসন আবার যাত্রা করল।

আহমদ মুসাকে পুলিশের কাছে তার বন্ধু বলে পরিচয় দিয়েছিল সারা জেফারসন। আহমদ মুসার গোঁফ তার চেহারায় অনেক পরিবর্তন এনেছিল।

পুলিশ প্রশংসা করেছিল সারা জেফারসন ও তার বন্ধুর। বলেছিল তারা সাহসের সাথে তাৎক্ষণিকভাবে পাল্টা আক্রমণে না গেলে সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে যেত। পুলিশের ভারপ্রাপ্ত অফিসারটি সারা জেফারসনকে অভয় দিয়ে বলেছিল, ‘আমরা বুঝতে পারছি লস আলামোস নিয়ে যা ঘটেছে, তারই একটা প্রতিক্রিয়া হয়তো আপনার উপর এসেছে। আপনি ভাববেন না, আপনার বাড়ির আশে-পাশে পুলিশ থাকবে, যে কয়দিন আপনি মন্টিসেলোতে থাকবেন। আর আপনিও একটু সাবধানে থাকবেন।’

আবার গাড়ি ছুটে চলছিল, মন্টিসেলোর দিকে।

গাড়ি ড্রাইভ করছে সারা জেফারসনই।

তার দৃষ্টি সামনে পথের উপর নিবদ্ধ। বলল এক সময় সামনে চোখ রেখেই, 'আমি বিস্মিত মি. আহমদ মুসা, একজন মানুষও একটা গাড়ির বিরুদ্ধে তারা রকেট লাঞ্চার নিয়ে এসেছে?'

'দূর কিংবা কাছে যে কোন জায়গা থেকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে রকেট লাঞ্চার একটা ভালো অস্ত্র। ওরা ব্যর্থ হতে চায়নি।' আহমদ মুসা বলল।

'আগের আক্রমণও তাহলে জেনারেল শ্যারনদেরই ছিল?' সামনে চোখ নিবদ্ধ রেখেই বলল সারা জেফারসন।

'আমার তাই মনে হয়।' আহমদ মুসা বলল।

'প্রত্যেক আক্রমণের পেছনে একটা পরিকল্পনা লাগে। ওরা সেই সময় আজ পেল কখন?' জিজ্ঞেস করল সারা জেফারসন।

'প্রথম আক্রমণ ব্যর্থ হবার পর পরবর্তী আক্রমণের জন্যে তারা ওৎ পেতেই বসেছিল। কোথাও বেরুলে আপনি গাড়ি নিয়ে বেরুবেন, এটা জানাই ছিল ওদের। সুতরাং কি প্রস্তুতি নিতে হবে সেটা আগে থেকে তাদের ঠিক করা ছিল।' বলল আহমদ মুসা।

'ওরা হঠাৎ এমন মরিয়া হয়ে উঠল কেন?' সারা জেফারসন বলল।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'জেনারেল শ্যারন আমার খুব খারাপ শত্রু। কিন্তু একটা বিষয়ে তার প্রশংসা করি, সময়ের কাজ সময়ে করতে সে একটুও দেরী করে না।'

সংগে সংগেই সারা জেফারসন মুখ ফিরাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'অর্থাৎ এই সময়ের সবচেয়ে বড় টার্গেট আমি!' সারা জেফারসনের ঠোঁটে হাসি।

'তাই তো মনে হচ্ছে?' আহমদ মুসা বলল।

'মনে হওয়ার কারণ?' জিজ্ঞেস করল সারা জেফারসন। তার ঠোঁটে আগের সেই হাসিই।

'যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে তার চেয়ে প্রশ্নকারীই ভাল জানেন এর জবাব।' বলল আহমদ মুসা।

তড়িত মুখ ঘুরিয়েছিল সারা জেফারসন কিছু বলার জন্যে। কিন্তু তার মোবাইলে কল এল এ সময়।

কথা তার বলা হলো না। সে মোবাইল তুলে নিল হাতে।

টেলিফোনে কথা শেষ করে সারা জেফারসন সামনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমরা এসে গেছি মি. আহমদ মুসা। ঐ দেখুন পাহাড়টার মাথায় মন্টিসেলো।

তাকাল আহমদ মুসা।

পাহাড়টা খুব উঁচু নয়। সাধারণ ওয়াকিং সীমার মধ্যেই।

পাহাড়ের গা সবুজ গাছ ও ছোট ছোট আগাছায় ঢাকা। মন্টিসেলো পাহাড়ের শীর্ষে। বাড়ির তিন দিক জুড়ে বাগান। আর সামনে একটা সুন্দর ছোট লেক।

পাহাড়ের সবুজ গা বেয়ে উঠতে লাগল গাড়ি।

আহমদ মুসার চোখ দুটি নিবদ্ধ আমেরিকার তৃতীয় প্রেসিডেন্ট টমাস জেফারসনের অতি আদরের মন্টিসেলোর প্রতি।

'সারা'র কথা কি বলব বেটা, ও তার গ্রান্ড ফাদার টমাস জেফারসনের মতই যেমন জনগণত প্রাণ, তেমনি ঐতিহ্যবাদী এবং তেমনি আপোষহীনও। এই মন্টিসেলোর কথাই ধর। সারা বলল, তার মহান পূর্ব পুরুষ টমাস জেফারসনের প্রিয় মন্টিসেলো যে কোন মূল্যে সে ফেরত নেবে। সে নিয়েই ছেড়েছে। এর জন্যে 'পিডমন্ট' ও 'স্যাডওয়েল' এলাকার মূল্যবান সম্পত্তির অধিকাংশই তাকে বিক্রি করতে হয়েছে। পরিবারের কেউই তার এ মত সমর্থন করেনি। কিন্তু কারও মতকে সে তোয়াক্কা করেনি। তার এক কথা, পরিবার অতীতে মহান গ্রান্ড দাদুর স্বপ্নের মন্টিসেলোকে রক্ষা করেনি, এটা পরিবারেরই ব্যর্থতা। এ ব্যর্থতার প্রতিবিধান সে করবে। সবকিছুর বিনিময়েই সে তা করেছে।'

বলে থামল জিনা জেফারসন। সারা জেফারসনের মা।

জিনা জেফারসন ও আহমদ মুসা বসে আছে মন্টিসেলোর চত্তরে, সুন্দর লেকটার একেবারে ধার ঘেষে।

মন্টিসেলোর বাড়তি ছাদটা লেকের ধার পর্যন্ত এসেছে।

সারা জেফারসনের মা জিনা জেফারসন একটু থেমেই আবারও তার কথা শুরু করতে যাচ্ছিল, 'পেছনে থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে সারা জেফারসন মায়ের পেছনে এসে দাঁড়াল। দুহাতে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'আম্মা এক ঘন্টা ধরে মেহমানকে আমার ব্যাপারে এসব কথাই বলছ বুঝি!'

জিনা জেফারসন কিছু বলার আগেই কথা বলে উঠল আহমদ মুসা। বলল, না মিস জেফারসন আপনার আম্মা আমাকে শুধু জেফারসন পরিবার নয়, শুধু এই সুন্দর ভার্জিনিয়া নয়, গোটা আমেরিকাকেই পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। আমেরিকার এই অন্তরচিত্র আমার জানা ছিল না। আপনার সম্পর্কে না বললে তো এই বলা সম্পূর্ণ হয় না। তাই সেটাও বলেছেন।' আহমদ মুসার মুখে হাসি।

জিনা জেফারসন দুই হাত দিয়ে তার ঘলায় পেচানো সারা জেফারসনেরই দুই হাত ধরে টেনে সামনে নিয়ে এল। বসাল নিজের কোলে। বলল, 'তোমার সম্পর্কে আজ কি বলতে পারি বল। আজ আমি খুব আনন্দিত। তোমাকে এমন হাসতে বহুদিন দেখিনি মা।'

তারপর সারা জেফারসনের মা চাইল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'বেটা এই সারাকে দেখে আমিই মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে উঠি। তুমি তার প্রথম বন্ধু যাকে সে বসায় নিয়ে এসেছে। তার..........।'

জিনা জেফারসনের কথা বন্ধ হয়ে গেল। সারা জেফারসন তার হাত চাপা দিয়েছে মায়ের মুখে। বলল, 'এই তো মা তুমি আমার বদনাম করছ। আমার কত বন্ধু আমেরিকা জুড়ে। আমেরিকানরা সবাই আমার বন্ধু।'

জিনা জেফারসন মেয়ের পিঠে আদরের একটা থাবা দিয়ে বলল, 'যার বন্ধু সবাই, তার কোন বন্ধু নেই, এই উদ্বেগের কথাই তো আমি বলছি।'

'আমি বুঝছি না আম্মা, কাকে তাহলে তুমি বন্ধু বলছ?' বলল সারা জেফারসন মায়ের বুক থেকে মুখ তুলে।

'এই দেখ আহমদ মুসাকে।' বলল জিনা জেফারসন।

সারা জেফারসন মিষ্টি হাসল। বলল, 'উনি তো মাত্র বন্ধু নন, বন্ধুর চেয়ে বড়। বন্ধুকে সব বলা যায় না, কিন্তু ওঁকে সব বলা যায় মা।'

জিনা জেফারসনও হাসল। বলল, 'আসলেই তোমার কোন বন্ধু ছিল না। তাই জান না যে, বন্ধুকে সব বলা যায়।'

'ঠিক আছে আম্মা। তোমার সব কথাই মানলাম। এবার চলো, টিজে (টমাস জেফারসন) দাদুর স্টাডিতে যাব ওঁকে নিয়ে। তুমিও যাবে।' বলল সারা জেফারসন।

'আমি কেন?'

'একা একা গিয়ে শুয়ে থাকার চেয়ে তোমার ওখানেই ভাল লাগবে।' সারা জেফারসন বলল।

জিনা জেফারসন ঘড়ির দিকে তাকাল। বলল, 'রাত এগারটা। ঠিক আছে ওষুধটা খেয়ে নিয়ে একটা কাজ সেরে আসছি। তোমরা যাও।'

বলে জিনা জেফারসন উঠে দাঁড়াল।

উঠে দাঁড়াল সারা জেফারসন এবং আহমদ মুসা।

জিনা জেফারসন হাঁটতে শুরু করে আহমদ মুসার দিকে ফিরে বলল, 'আসছি বেটা।'

'ওয়েলকাম।' বলল আহমদ মুসা।

জিনা জেফারসন এগুলো দুতলার সিঁড়ির দিকে। আর সারা জেফারসন ও আহমদ মুসা এগুলো একতলার জেফারসন স্টাডি রুমের দিকে।

পাশাপাশি হাঁটছিল আহমদ মুসা ও সারা জেফারসন।

'আম্মাকে আসতে বললাম কেন বলুন তো?' জিজ্ঞেস করল সারা জেফাসরন। তার মুখে হাসি।

'কেন?'

'আপনি স্বাচ্ছন্দ বোধ করবেন তাই। মুসলিম নীতিবোধ অনুসারে কোন নির্জন কক্ষে দম্পতি নয় এমন নারী-পুরুষের একান্ত সাক্ষাত বৈধ নয়।'

'ধন্যবাদ মিস জেফারসন।

আপনি আমাদেরকে এত জানেন?'

‘শুধু জানি নয় মিস্টার, মানিও যে এটা খুব ভাল একটা নীতিবোধ।’

‘কারণ ইসলামের অনুশাসনগুলো মানব প্রবণতার সাথে সংগতিশীল।’ আহমদ মুসা বলল।

‘সবগুলোই কি?’

‘সবগুলোই?’

‘জানি না, তাই ভেবে দেখারও সুযোগ হয়নি।’

‘জানার জন্য আগ্রহ দরকার।’

‘আপনাকে দেখার পর এ আগ্রহ মনে হচ্ছে দরুণভাবে বাড়ছে।’ মুখে একটা সলজ্জ হাসি ফুটে উঠল সারা জেফারসনের।

কথা শেষ করেই সারা জেফারসন সম্ভবত কথার মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেবার জন্যেই বলল, ‘মন্টিসেলো আপনার কেমন লাগছে?’

‘নামের মতই সুন্দর।’

‘নাম ভাল লেগেছে আপনার?’

‘অবশ্যই। ‘মন্টিসেলো’ মানে পাহাড়ে সঙ্গীত’। সুন্দর নাম। এই তো চত্তের বসে চারদিক দেখে মনে হচ্ছিল, গ্রেডভ্যালির মাথায় নীল পাহাড়-মেলার কোলে সবুজ-সমুদ্রের জমাট এক মৌনতার মাঝে সফেদ মন্টিসেলো যেন এক প্রশান্তির নাম।’

দাঁড়িয়ে পড়েছে সারা জেফারসন।

সারা জেফারসন দাঁড়িয়ে পড়ায় আহমদ মুসাও দাঁড়িয়েছে।

সারা জেফারসনের মুগ্ধ দুই চোখ আহমদ মুসাকে যেন নতুন করে দেখছে। তার ঠোঁটে মুগ্ন এক হাসি। বলল, ‘আপনি যা বললেন তা কবিতার এক অমর লাইন হতে পারে। ধন্যবাদ আপনাকে। মন্টিসেলোর স্রষ্টা ‘টিজে (T.J) দাদুও মনে হয় মন্টিসেলোকে এভাবে দেখেননি। বিপ্লবী দেখছি কবিও হয়।

‘আমি যা দেখেছি, সবাই তা দেখে। এর জন্যে কবি হবার কি প্রয়োজন আছে। ‘মন্টিসেলো’ নামটাই প্রমান করে সৌন্দর্যের এই পটভূমিই আপনার টিজে দাদুকে আকৃষ্ট করেছিল।’ বলল আহমদ মুসা।

‘কবি হবার প্রয়োজন আছে। তা না হলে আমাদের এক পুরুষ এই স্বপ্নের মন্টিসেলো বিক্রি করে দিয়েছিল কি করে? তাদের কাছে এর মূল জনবিচ্ছিন্ন এক প্রসাদ ছাড়া আর কিছুই ছিল না।’ সারা জেফারসন বলল।

‘তাহলে যিনি তার সর্বস্ব দিয়ে আবার এটা কিনেছে, তাকে কি বলতে হয় বলুন তো?’ আহমদ মুসা বলল।

সারা জেফারসনের মুখ রাঙা হয়ে উঠল লজ্জায়।

মাথার হ্যাটটা সে মুখের উপর আর একটু টেনে দিয়ে বলল ‘চলুন।’

সারা জেফারসনের পরনে হালকা নীল রঙের ফুল স্কার্ট, সাদা ফুল সার্ট, গলায় একটা সাদা স্কার্ফ পেচানো এবং মাথায় সাদা হ্যাট।

সারা জেফারসন চলতে শুরু করেছে।

আহমদ মুসাও।

টিজে মানে টমাস জেফারসনের বিশাল স্টাডি কক্ষটা গ্রাউন্ড ফ্লোরের শেষ প্রান্তে, দক্ষিণ পশ্চিম কোণায়।

স্টাডি রুমের দরজা কাঠের কারুকাজ করা।

দরজার ঠিক উপরে দরজার প্রস্থের সমান একটা সাইনবোর্ড। সাইনবোর্ডটা সুন্দর নীল। তার উপর সাদা অক্ষরে লেখাঃ ‘নিপীড়কের প্রতিরোধ করা হলো ঈশ্বরের আনুগত্য। ঈশ্বরের শপথ, মানব মনের উপর সকল পীড়নের বিরুদ্ধে আমার চিরন্তন সংগ্রাম’

কোটেশনটির নিচে দরখাস্ত আকারে ‘টমাস জেফারসন’-এর নাম লিখা।

নিচে টমাস জেফারসনের নাম পড়ার আগেই আহমদ মুসা বুঝেছিল এটা টমাস জেফারসনের বিখ্যাত একটা উক্তি। কিন্তু আহমদ মুসার কাছে প্রথম বাক্যটা পরিচিত নয়, দ্বিতীয় বাক্যটা খুবই পরিচিত, সকলেই জানে।

আহমদ মুসা পাশেই সারা জেফারসনের দিকে তাকাল। বলল, ‘প্রথম বাক্যটা আমার কাছে অপরিচিত। কোথায় তিনি বলেছিলেন কথাটা?

বাক্যটা পাওয়া গেছে তার অপ্রকাশিত একটা নোটে। পরে এটা তার ‘লেখা ও বক্তিতাগুলি’র কোন এক অডিশনে শামিল হয়েছে।’ বলল সারা জেফারসন।

‘মিস জেফারসন, আপনার টিজে দাদুর একথাগুলো পড়ে আমার কি মনে হচ্ছে জানেন? মনে হচ্ছে, ‘আমাদের ধর্মের মৌল কথাগুলোর দুটি আপনার টিজে দাদুর কথায় নতুন ভাষা পেয়েছে।’ আহমদ মুসা বলল।

সে দুটি কথা কি?

‘ইসলামে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসকে যতখানি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, ততখানিই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করার কাজকে। ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠগ্রন্থ আল-কোরআন বলেছে, ‘মানুষকে ন্যায়ের আদেশ দাও, অন্যায় থেকে বিরত রাখ এবং আল্লাহকে বিশ্বাস কর।’

‘চমৎকার। টিজে দাদুর প্রথম বাক্য বরং দায়িত্বের অর্ধেক বলা হয়েছে, কিন্তু এখানে পুরো দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে। নিপীড়কদের প্রতিরোধের সাথে সাথে ন্যায়কাজের নির্দেশ দেয়ার বিষয়ও আছে। এতো গেল একটা কথা, অন্য কথাটা কি?’

‘ইসলাম প্রতিটি মানুষের সার্বভৌম স্বাধীনতা ও সম্মান নিশ্চিত করেছে। ইসলাম বলে, মানুষ শুধু আল্লাহর অধীন হবে আর কারও নয়। এর মাধ্যমে ইসলাম মানুষের উপর মানুষের শারীরিক ও মানসিক সকল পীড়নকে নিষিদ্ধ করেছে। শুধু তাই নয়, মানুষকে তার নিজের উপর জুলুম করার অধিকারও দেয়া হয়নি।’

‘চমৎকার। কিন্তু মানুষ শুধু আল্লাহর অধীন হলেই কিভাবে মানুষের উপর মানুষের জুলুম বন্ধ হয়ে যায়?’

‘সকল মানুষ এক আল্লাহর অধীন হয়ে যাওয়া মানে সকল মানুষ সমান হওয়া। জুলুম যেখানে থাকে, সেখানে এই সমান মর্যাদার অনুভূতি থাকে না। অর্থ্যাৎ সকলে সমান মর্যাদার হলে জুলুমের সুযোগ থাকে না। নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু হলো, সকলে এক আল্লাহর অধীন হওয়ার অর্থ সকল মানুষ এক আল্লাহর আইনের অধীন হয়ে পড়া এখানে মানুষের আইন মানুষকে রুল করে না। তাই স্বেচ্ছাচারিতার কোন অবকাশ থাকে না। স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ হলে মানুষের উপর মানুষের জুলুমও বন্ধ হয়ে যায়।’

থামল আহমদ মুসা।

ভাবছির সারা জেফারসন। একটু সময় নিয়ে বলল, ‘মানুষের আইন মানুষকে রুল করবে না, কথাটা কি ইউটোপিয়ান হয়ে গেল না। বাস্তবতা হলো, মানুষ মানুষকে রুল করবেই, মানুষের আইন মানুষকে রুল করেই।’

হাসল আহমদ মুস। বলল, ‘আপনার কথা ঠিক মিস জেফারসন। কিন্তু রুলকারী মানুষ যদি আল্লাহর অধীন হয়, রুলকারী মানুষের আইন যদি আল্লাহর আইনের অধীন হয়, তাহলে মানুষের ‘রুল প্রকৃত অর্থে তখন মানুষের ‘রুল’ থাকে না এবং মানুষের আইনও তখন প্রকৃতপক্ষে মানুষের আইন থাকে না।’

হাসল সারা জেফারসনও। বলল, ‘এটাই কি তাহলে ‘রুল অব গড’?

‘হ্যাঁ, মিস জেফারসন। মানুষসহ এই ইউনিভার্সের প্রকৃত রুলার আল্লাহ। মানুষ তাঁর প্রতিনিধি। আমাদের কোরআনের ভাষায় ‘খলিফা’। একজন প্রতিনিধি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিনিধিদের উপর শাসন পরিচালনা করেন। এটাই আল্লাহর শাসন বান ‘রুল অব গড’।

সারা জেফারসনের চোখে মুগ্ধ দৃষ্টি, তার ঠোঁটে মুগ্ধ হাসি। বলল, ‘অনেক ধন্যবাদ আহমদ মুসা। একটা কঠিন জিনিসকে পানির মত সহজ করে দিয়েছেন আমার কাছে। বিশ্বাস করুন, পৃথিবী এবং পৃথিবীর মানুষ এখন এক নতুন অর্থ নিয়ে আমার সামনে আসছে।’

‘স্বাভাবিক মিস জেফারসন। কারণ আপনি আল্লাহর শ্রেষ্ঠ বান্দাহদের একজন।’

সারা জেফারসন তখন চলতে শুরু করেছে। দরজা খুলতে খুলতে বলল, তাই কি?’

সারা জেফারসন প্রবেশ করেছে স্টাডিতে।

আহমদ মুসাও প্রবেশ করল। বলল, ‘তাই মিস জেফারসন। ন্যাচারাল লিডারশীপ সব সময় শ্রেষ্ঠ বান্দাদের কাঁধে গিয়েই অর্পিত হয়।’

ঘরের মাঝখানে রাউন্ড টেবিলটার কাছে পৌছেছিল সারা জেফারসন।

টেবিল ঘিরে তিনটি চেয়ার। এ চেয়ারগুলো আধুনিক ডিজাইনের এবং ঘরের কারুকাজপূর্ণ পরিবেশের সাথে একেবারেই বেমানান। আহমদ মুসা বুঝল, চেয়ারগুলো ঘরের অংশ নয়। ঘরের বাইরে থেকে সদ্য আমদানি। ঘরের

একপাশে একটা বেদীর উপর আরেকটা বড় চেয়ার সুদৃশ্য কারুকাজ করা। খুবই যত্ন করে রাখা। আহমদ মুসার বুঝতে বাকি রইল না যে একটা টমাস জেফারসনের স্টাডি চেয়ার।

স্টাডি রুমের বুক শেলফগুলো, শতব্দীর পুরানো সুদৃশ্য আলমারি, ইত্যাদি সব জিনিস ঘুরে আহমদ মুসার দৃষ্টি এসে নিবদ্ধ হলো অবশেষে সারা জেফারসনের দিকে।

সারা জেফারসন ঘুরে দাঁড়িয়েছে আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসাকে বসতে বলে সে নিজেও একটা চেয়ারে বসল। বসল আহমদ মুসাও।

সারা জেফারসনের সামনে সুদৃশ্য একটি চামড়ার ফাইল।

সারা জেফারসনের দুটি হাত ফাইলের উপর। তার চোখে আহমদ মুসার উপর নিবদ্ধ। চোখে প্রশ্ন জ্বলজ্বল করছে।

আহমদ মুসা বসতেই সারা জেফারসন বলল, ‘আপনার শেষ বাক্যটা বুঝলাম না মি. আহমদ মুসা। ‘মুখে হাসি সারা জেফারসনের।

‘নিশ্চয় জানেন এর অর্থ আপনি।’ বলল আহমদ মুসা। আহমদ মুসার ঠোঁটেও হাসি।

সারা জেফারসন পরিপূর্ণভাবে আহমদ মুসার দিকে তাকাল। হাসল সে। বলল, ‘এ নিয়ে তিনবার আপনি কোনা বিশেষ পরিচয়ের দিকে ইংগিত করেছেন। বলুন তো সেটা কি?’

‘এসব বিষয় থাক। আমি আমার কথা প্রত্যাহার করলাম। এখন আপনার কথা বলুন।’

গম্ভীর হলো সারা জেফারসন। বলল, ‘আমার ক্ষুদ্র একটা পরিচয় আছে। আহমদ মুসার কাছে তা গোপন থাকেবে এবং গোপন থাকা উচিত, তা আমি মনে করি না। আমি দুঃখিত যে, বিষয়টা আমি নিজের থেকে আপনাকে বলিনি। প্রকৃতপক্ষে বলার সুযোগও পাইনি।

গম্ভীর হলো আহমদ মুসাও। বলল, ‘মিস জেফারসন, আপনি ‘ফ্রি আমেরিক’ (ফেম) মুভমেন্টের চেয়ারম্যান, এটা ছোট পরিচয় নয়। আমিও দুঃখিত

মিস জেফারসন, বিষয়টি আমার সরাসরি আপনার কাছে না জেনে বারবার সে দিকে ইংগিত করা শোভন হয়নি। '

'না জনাব, আপনার ইংগিত যথার্থই হয়েছে। এ ধরনের ক্ষেত্রে এটাই স্বাভাবিক। আমি হলেও এটাই করতাম। আমার পরিচয়টা এতটা গোপন করে আসা অনেকটা অবিশ্বস্ততার পরিচায়ক হয়েছে। আমি লজ্জিত জনাব।'

কথা শেষ করে মুহূর্তের জন্যে থেমেই আবার বলে উঠল, 'আসলে কি জানেন, আমি ভেবেছিলাম যেদিন আমার স্বপ্ন সফল হবে, সেদিন আপনি সব জানবেন। শুধু জানবেন না, জানার অধিকার আপনার উপরই বর্তে যাবে। স্বপ্নটাকে আমি মনে করি ঈশ্বরের বিধিলিপি।'

সারা জেফারসনের গম্ভীর কন্ঠ ধীরে ধীরে ভারী হয়ে উঠল। তারপর তার ভারী কন্ঠ কক্ষের পরিবেশকেই ভারী করে তুলল।

আহমদ মুসা কি বলবে সেই মুহূর্তে খুঁজে পেল না।

কথা বলতে বলতে সারা জেফারসনের মুখ নিচু হয়ে গিয়েছিল। মুখে নিচু রেখেই সে বলতে শুরু করল, 'মি. আহমদ মুসা, আমাদের প্রিয় আমেরিকা, আমাদের পিতামহদের প্রিয় আমেরিকায় সবই আছে, কিন্তু আমাদের গণতন্ত্রটা ব্যয়বহুল হয়ে পড়ায় ইহুদীদের ইহুদীবাদী ষড়যন্ত্রকারী শ্রেণীটি এর সুযোগ গ্রহণ করেছে। আমাদের ফাউন্ডার ফাদাররা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি তাদের প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র কিনে ফেলা যাবে বা কিনে ফেলা হবে। কিন্তু সেই অভাবনীয় ঘটনাই ঘটছে এখন। আমাদের গণতন্ত্র বিক্রয়যোগ্য পণ্যে পরিণত হচ্ছে। উন্নয়............

কথা গলায় আটকে গেল সারা জেফারসনের। 'স্যরি' বলে সে থেমে গেল।

খুব নরম কন্ঠে কথা বলছিল সারা জেফারসন। তার ভারী হয়ে ওঠা কন্ঠ অবশেষে আবেগে রুদ্ধ হয়ে গেল।

'মাফ করবেন আহমদ মুসা। এই আলোচনা আমাকে খুবই ইমোশনাল করে তোলে।' আবার বলতে শুরু করল সারা জেফারসন, 'যা বলছিলাম, উন্নয়নশীল দেশে স্বার্থান্ধ মহাজনরা যেমন দরিদ্র কৃষকদেরকে তাদের ক্ষেতের ফসলের উপর দাদন দেয় এবং ফসল উঠলে পানির দরে সিংহভাগ ফসল নিয়ে

নেয়, তেমনি আমাদের দেশে ইহুদীবাদীরা নির্বাচন সুফল কিনে ফেলে। যা তারা দাদন দেয় তার সহস্রগুন সুবিধা তারা আদায় করে নেয়। ব্যয়বহুল গণতন্ত্রের এই রন্ধ্র পথে সিন্দাবাদের ভূতের মত ইহুদীবাদীরা আমাদের ঘাড়ে চেপে বসেছে। তাদের স্বার্থে বাহন হয়ে পড়েছে আমাদের প্রিয় আমেরিকা।

থামল সারা জেফারসন। আবার আবেগ রুদ্ধ হয়ে গেল তার গলা।

'আপনার অনুভূতি আমিও শেয়ার করি মিস জেফারসন। আমিও কিছু কিছু জানি।' বলল আহমদ মুসা।

একটু থেমে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে সারা জেফারসন বলল, 'আরও জানুন মি.আহমদ মুসা। আমাদের ক্ষতি বিশ্বের বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্ষতি ডেকে আনছে। আমাদের গণতন্ত্রকে পণবন্দী করে ওরা একে বাহন সাজিয়ে উন্নয়নশীল দেশের গণতন্ত্র, অর্থনীতিক সব কিছুকেই কুক্ষিগত করতে চাচ্ছে। এর শেষ পরিণতি কোথায় আমি জানি না, কিন্তু সকলের সব রোষের শিকার হবে মার্কিনীরা, একথা দিবালোকের মত সত্য। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মার্কিন স্বার্থ, মার্কিনীরা, ক্ষতিগ্রস্ত হবে দুনিয়ার আর সবাই, সবদেশ। কিন্তু নাটের গুরু ইহুদীবাদীরা থাকবে অক্ষত। এ রকম নতুন একটা বিশ্বব্যবস্থা তারা চাচ্ছে। সব দুঃখ, সব বেদনা এবং সব হতাশার কেন্দ্র বিন্দু এটাই। এই বোধ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে, 'ফ্রি আমেরিকা' মুভমেন্ট। আমাদের প্রিয় আমেরিকাকে বাঁচাতে হলে এই ভয়াল ষড়যন্ত্রের হাত থেকে তাকে রক্ষা করতে হবে। এই কাজেই আমরা নেমেছি। আমরা আপনার সাহায্য চাই আহমদ মুসা।'

থামল সার জেফারসন।

মুখ নিচু করে শুনছিল আহমদ মুসা সারা জেফারসনের কথা। মুগ্ধ-বিস্মিত হচ্ছিল আহমদ মুসা সারা জেফারসনের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ দেখে। আহমদ মুসা আরও খুশি হলো এটা বুঝে যে, তারা বাইরে থেকে যে আমেরিকাকে দেখে তার ভেতরে আর এক আমেরিকা আছে। যেখানে আছে নিশ্চয় হাজারো সারা জেফারসন কিংবা হাজারো বেঞ্জামিন বেকন। কিন্তু সারা জেফারসন যে সাহায্যের আহবান জানাচ্ছে তার উত্তরে কি বলবে সে! বলল আহমদ মুসা, 'আমি এক

ব্যক্তিমাত্র আমেরিকায় এসেছি ঘটনাচক্রে। আর আপনার মিশন একটা 'মহামিশন'।'

ধন্যবাদ আপনার বিনয়ের জন্যে। আপনি ইতিমধ্যেই যা করেছেন, তাতে মূল কাজটা হয়ে গেছে। এখন দরকার একে সম্পূর্ণ রূপ দেয়া যাতে ওরা আমেরিকানদের কাছে মুখ দেখবার যোগ্য না থাকে। এর পরের কাজটা কঠিন হবে না।'

'পরের কাজটা কি?'

'এর পরের কাজ হলো আমাদের ফাউন্ডার ফাদারদের আমেরিকা গঠন ও বিশ্ব-ব্যবস্থার স্বপ্ন সফল করা।' বলল সারা জেফারসন।

বলেই সারা জেফারসন তার সামনের চামড়ার সুদৃশ্য ফাইলটা খুলল। বের করল লম্বা কয়েক প্রস্ত কাগজ। এক গুচ্ছ কাগজ দেখিয়ে বলল, এটা টিজে দাদুর নিজ হাতের লেখা ডিক্লারেশন অব ইন্ডিপেনডেন্স এর প্রথম খসড়া। এই খসড়ায় টিজে দাদু কতকগুলো বিষয়কে বোল্ড টাইপে (মোটা অক্ষরে) লিখেছেন। তার মানে এই বিষয়গুলোকে আমাদের আমেরিকান জিবনের জন্যে তিনি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন। যে বিষয়গুলোকে টিজে দাদু বোল্ড টাইপে লিখেছেন, তাকে মৌল তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন, (ক) জাতিসমূহের স্বধীনতার সত্যিকার দাবী প্রাকৃতিক বিধি ও ঐশ্বরিক বিধান কর্তৃক স্বীকৃত (Laws of Nature and Nature's of good entitle) অধিকার, (খ) স্রষ্টা মানুষকে সমান করে সৃষ্টি করেছেন এবং স্রষ্টা তাদের প্রত্যেকের জন্যে জীবন, স্বাধীনতা, সুখের সন্ধান, প্রভৃতিকে অবিচ্ছেদ্য অধিকারে পরিণত করেছেন, যা থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। সরকার আসলে স্রষ্টা প্রদত্ত এ অধিকার সংরক্ষণের জন্যেই, এবং (গ) জাতিসমূহ স্বাধীকার বা শাসনদন্ড পাওয়ার সাথে ঐশ্বরিক অর্থরিটির অধীনে এর আশ্রয় (a firm reliance on the protection of Divine providence) নিশ্চিত করার জন্যে তাদের বিশ্বের সর্বোচ্চ বিচারকের মুখাপেক্ষী (appealing to the supreme Judge of the world) হতে হবে।

থামল সারা জেফারসন। তার ঠোঁটে ফুটে উঠেছে মিষ্টি এক টুকরো হাসি। বলল, 'মি. আহমদ মুসা, 'আপনার রুল অব গড. 'মানুষ আল্লাহর খলিফা হওয়া,' 'মানুষের মর্যাদা ও অধিকার সমান হওয়া, ইত্যাদি বিষয়ের সাথে টিজে দাদুর বোল্ড টাইপে লেখা আমাদের ডিক্লারেশন অব ইন্ডিপেনডেন্স'-এর অংশ উপরোক্ত বিষয়গুলো মিলিয়ে নিন। দেখবেন, আপনাদের ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠগ্রন্থ কোরআন দেড় হাজার বছর আগে যা বলেছে, আমাদের ফাউন্ডার ফাদাররা ২শ ২৪ বছর আগে জাতি গঠন ও স্বাধীনতা ঘোষণার এক মহান সন্ধিক্ষণে ভিন্নভাষায় কতকটা সেই কথাই উচ্চরণ করেছেন। অতএব বলতে পারেন, আমাদের দুজনের এই সম্মিলনের মত আমাদের দুজনের মিশনও এক হয়ে যাচ্ছে। প্রায় এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে বড় একটা দম নিল সারা জেফারসন।

গম্ভীর হয়ে উঠেছে তার মুখ।

আহমদ মুসাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে আবার বলে উঠল সে 'মি. আহমদ মুসা, আমাদের ডিক্লারেশন অব ইন্ডিপেনডেন্স'-এর শুধু এই মৌল বিষয়গুলোকেই, যাকে টিজে দাদু বোল্ড টাইপে লিখেছেন, যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখবো, ইহুদীবাদীদের চক্রান্ত আমাদেরকে আমাদের ফাউন্ডার ফাদারদের দেখানোর পথ থেকে বহুদূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। আমরা আজ অন্যান্য সার্বভৌম জাতির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকারেই শুধু হস্তক্ষেপ করছি না, নিজ জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারকেও তাদের কাছে আমরা দূর্মল্য করে তুলেছি।

থামল সারা জেফারসন।

'ধন্যবাদ মিস জেফারসন অনেক মূল্যবান মন্তব্যের জন্যে। আপনাদের ডিক্লারেশন অব ইন্ডিপেনডেন্স'-এর কিছু বিষয়ের যে ইন্টারপ্রিটেশন দিয়েছেন তা সত্যই আমাকে আনন্দিত ও উৎসাহিত করেছে। বিশেষ করে এই ইন্টারপ্রিটেশনটা জেফারসন তনয়ার কাছ থেকে আসায় একে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি। এখন বলুন মিশন-এর কথা, সমস্যা আমি বুঝেছি।'

হাসল সারা জেফারসন। বলল, জেফারসন তনয়া না বললে কি গুরুত্ব থাকতো না। সত্য কি কোন ব্যক্তি নির্ভর?

'তা নয় মিস জেফারসন। কিন্তু মতের সাথে মতদানকারীর সম্পর্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যে অভিমত দিলেন তা আপনার পি এস ক্লারা কার্টার দিলে কি একই ওজনের হতো? অবশ্যই হতো না।'

'ধন্যবাদ মি. আহমদ মুসা। আমার মিশনের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। আমার মিশনের কথা তো বলেছি। যে সিন্দাবাদের ভূত আমাদের আমেরিকানদের ঘাড়ে চেপে বসেসে, তাকে নামাতে হবে। দ্বিতীয়ত, আমাদের গণতন্ত্রকে বিলোনিয়ারের ড্রইংরুম থেকে সাধারণ আমেরিকানের দোর গড়ায় নিয়ে যেতে হবে। এই দুটি জাতীয় লক্ষ্য অর্জিত হবার পর আমাদের তৃতীয় লক্ষ্য হলো, পৃথিবীর জাতিসমূহের সার্বভৌম মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করা, যার নিশ্চয়তা দিয়েছে আমাদের ডিক্লারেশন অব ইনডিপেনডেন্স। এই অধিকার নিশ্চিত হবার পর কাজ হবে জাতিসমূহের সমতা ও সহযোগীতাভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলা। সে ব্যবস্থায় জাতিসংঘ হবে সত্যিকার এ্যাসোসিয়েশন অব স্টেটস। এখনকার মত তখন সে তার আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক, ইউনেস্কো, ইউনিসেফ, ইত্যাদির মাধ্যমে জাতিসমূতের রাজনীতিন, অর্থনীতি, সংস্কৃতি-সমাজ, ইত্যাদি ধ্বংসের বরকন্দাজ হিসেবে কাজ করবে না।'

থামলো সারা জেফারসন।

আনন্দে মুখ ভরে গেছে আহমদ মুসার। বলে উঠল, আমিন।'

'শুধু আমিন নয় মিস্টার, বলুন যে কোন অবস্থায় তোমার সাথে আছেন।' বলে হেসে উঠল সারা জেফারসন।

'সাথে যখন আছিই, তখন 'সাথে আছি' বলার কোন অর্থ হয় না।' আহমদ মুসা বলল।

'ঠিক বলেছেন।'

বলে সারা জেফারসন হঠাৎ নিজের ডান হাত আহমদ মুসার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আসুন হাতে হাত রেখে কথাটা আর একবার বলি।'

লাউ লতিকার লকলকে ডগার মত অপরূপ কমনীয়, নরম হাত আহমদ মুসার সামনে প্রসারিত।

বিব্রত আহমদ মুসা বলে উঠল, 'স্যরি মিস জেফারসন।'

সারা জেফারসন লজ্জায় চুপসে গিয়ে দ্রুত হাতটা টেনে নিয়ে বলল, ‘স্যরি মি. আহমদ মুসা। ভুলেই গিয়েছিলাম আপনার মুসলিম কালচারের কথা।’

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল।

এ সময় সশব্দে দরজা ঠেলে ঘরে প্রবেশ করল সারা জেফারসনের মা জিনা জেফারসন।

তার চোখে-মুখে উদ্বেগ। তিনি হাঁপাচ্ছিলেন।

বলল সে, ‘বেটা আহমদ মুসা, বাইরে কিছু ঘটেছে। আমি দুতালা থেকে নামছিলাম। দেখলাম রেড টাইগার (শিকারী কুকুর) পাগলের মত ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল। আমি নেমে এসে দাঁড়ালাম। বেশ সময় পার হয়ে গেল। টাইগার একবার মাত্র গর্জন করে উঠেছিল। তারপর সব নিরব। টাইগার ফিরে এল না। ব্যাপার কি দেখার জন্য শেলটনকে পাঠালাম। সেও ফিরে আসেনি। গেটের দিকে মনে হলো একটা আর্ত চিৎকার শোনা গেল।’

জিনা জেফারসনের কথা শেষ হতেই আহমদ মুসা তার চেয়ার থেকে স্প্রিং-এর মত উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘মিস জেফারসন আপনি আপনার মাকে নিয়ে উপরে যান, আমার মনে হচ্ছে...........’।

আহমদ মুসার কথা শেষ হতে পারল না, কক্ষের বাইরে অনেকগুলো পায়ের শব্দ কানে এল।

মুখের কথা বন্ধ করে আহমদ মুসা তার বুকের পাশে ঝুলে থাকা মেশিন রিভলবারটা বের করে আনল ডান হাত দিয়ে।

কিন্তু ওরা ততক্ষনে দরজায় এসে পড়েছে ঝড়ের বেগে।

ওরা তিনজন। দুজনের হাতে রিভলবার এবং একজনের হাতে স্টেনগান। ব্যারেলগুলো উদ্যত।

‘মিস জেফারসন আপনারা শুয়ে পড়ুন’ বলে চিৎকার করে উঠেই আহমদ মুসা দুহাতে মেশিন রিভলবার ওদের দিকে তাক করে ট্রিগার চেপে রেখে ঝাঁপিয়ে পড়ল মেঝের উপর।

আহমদ মুসাকে দাঁড়ানো এবং তার হাতে রিভলবার দেখে তিনজনের গান-ব্যারেল এক সাথেই তাক করেছিল আহমদ মুসাকে।

উভয় পক্ষের গুলী এক সাথেই হয়েছিল। আহমদ মুসা ঝাঁপিয়ে পড়তে সেকেন্ড পরিমাণ দেরী করলে তার দেহ ঝাঁঝরা হয়ে যেত।

গুলী বর্ষণরত মেশিন রিভলবারের ট্রিগারে চেপে থাকায় আহমদ মুসার হাত দেহ থেকে উঁচুতে ছিল। ওদের একটা গুলী এসে আঘাত করল আহমদ মুসার বাম কব্জীর উপরের পাশটায়।

তার আহত বাম হাতটা ছিটকে গিয়েছিল রিভলবারের বাট থেকে।

তবে এক হাত আহত হওয়ার বিনিময়ে আহমদ মুসা ওদের তিনটি লাশ পেয়ে গেল।

লাশ তিনটি ছিটকে পেড়েছিল দরজার উপরে।

আহমদ মুসা মেঝের উপর ছিটকে উপর ছিটকে পড়ে দ্রুত দরজার দিকে গড়িয়ে গিয়ে উঠে দাঁড়াল।

সারা জেফারসন ও তার মা জিনা জেফারসন চেয়ারে বসা অবস্থা থেকে গড়িয়ে পড়েছিল টেবিলের নিচে।

উঠে দাঁড়িয়েই আহমদ মুসা বলল, ‘মিস জেফারসন আপনারা ঠিক আছেন?

‘জি হ্যাঁ।’ মেঝের উপর উঠে বসতে বসতে বলল সারা জেফারসন।

‘আপনার কাছে রিভলবার আছে?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘জি, না।’ বলল সারা জেফারসন।

আহমদ মুসা দ্রুত দরজার উপর পড়ে থাকা ওদের দুটি রিভলবার কুড়িয়ে নিয়ে সারা জেফারসনের দিকে ছুড়ে দিয়ে বলল, আপনারা এ ঘরেই থাকুন। দরজা রক্ষা করা আপনার দায়িত্ব। দরজায় কাউকে দেখলেই গুলী করবেন।

বলে আহমদ মুসা বেরিয়ে যাচ্ছিল।

সারা জেফারসনের আর্তকন্ঠ পেছন থেকে ধ্বণিত হলো, ‘আপনি তো আহত মি. আহমদ মুসা।’

কথাগুলো আহমদ মুসার কানে গেল। কিন্তু জবাব দেবার সময় ছিল না। ততক্ষণে সে দরজার বাইরে পৌছে গেছে।

কিন্তু দরজার বাইরে পৌছে দেখল, বিভিন্ন দিক থেকে সাত আটজন ছুটে আসছে এদিকে।

সম্ভবত গুলীর শব্দ পেয়েই ওরা ছুটে আসছে। দরজার বাইরে পড়ে থাকা তাদের সাথীর লাশও তারা দেখতে পেয়েছে।

আহমদ মুসা একদম ওদের গুলীর মুখে। পেছন ফিরে ঘরে যাবার সময় নেই। আশ্রয় নেবারও কোন জায়গা নেই।

আহমদ মুসার মেশিন রিভলবার সামনের দিকে তাক করাই ছিল। সে দুহাতে রিভালবার শক্ত করে ধরে ডান হাতের তর্জনি দিয়ে ট্রিগারচেপে বাঁ দিকের মেঝের উপর ড্রাইভ দিল।

যেখানে দাঁড়িয়েছিল আহমদ মুসা, সেখান দিয়ে এক ঝাঁক গুলী উড়ে গেল। কিছু বিদ্ধ করল দেয়াল। কয়েকটা ঘরের ভিতরেও প্রবেশ করল।

আহমদ মুসা গুলী করতে করতেই গড়িয়ে ছুটল কিছু দূরের বিশাল পিলারটার দিকে।

ওরাও সবাই একটা উন্মুক্ত অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছিল। আহমদ মুসার অব্যাহত গুলীবর্ষণ ওদেরকেও ঘিরে ধরেছিল। ওরাও আত্মরক্ষার জন্যে শুয়ে পড়েছিল মেঝেয়। সুতরাং গড়িয়ে যাওয়া আহমদ মুসাকে ওরা ইচ্ছামত টার্গেট বানাতে পারেনি।

অন্যদিকে আহমদ মুসা পিলারের শেল্টার পাওয়ায় সুবিধা পেয়ে গেল।

আহমদ মুসা এবার ওদের দিকে নজর দেবার সুযোগ পেল। গুলীবর্ষণ অব্যাহত রেখে সে তাকিয়ে দেখল, তার এতক্ষণে ছুঁড়া গুলী একেবারে বৃথা যায়নি। কয়েকটা লাশ পড়ে আছে।

আর অবশিষ্টরা শুয়ে থেকে গুলী করছে। বুঝা যাচ্ছে না আহত হয়েছে কজন।

গুলী করতে করতে ওরা কয়জন দোতলায় উঠার সিড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। লক্ষ্য সিঁড়ির আশ্রয় নেয়া।

পিলারের আড়াল থেকে আহমদ মুসাও লক্ষ্য ঠিক করে গুলী করতে পারছে না।

এসময় ‘আহমদ মুসা পেছনে’-সারা জেফারসনের এই চিৎকার শুনতে পেল আহমদ মুসা।

চিৎকার কানে আসার সাথে সাথেই আহমদ মুসা নিজের দেহকে ছুড়ে দিল মেঝেয়। একই সময়ে গুলীর শব্দ তার কানে এল।

মেঝেয় পড়ে আহমদ মুসা অনুভব করতে চেষ্টা করছিল গুলী তার লেগেছে কি না।

সে সাথে তাকাল সে পেছনে। দেখল একজন লোক গুরীবিদ্ধ হয়ে কাতরাচ্ছে।

আহমদ মুসা বুঝল সারা জেফারসন শুধু চিৎকারই করেনি গুলীও করেছে লোকটিকে। তা না হলে লোকটির গুলীর নিশ্চিত শিকার হতে হতো আহমদ মুসাকেই। লোকটির যে দশা হয়েছে সেই দশা আহমদ মুসার হতে পারতো।

আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল আহমদ মুসা।

ওদের গুলীর লক্ষ্য পাল্টে গেছে। এবার ওদের গুলী বৃষ্টি সারা জেফারসনের ঘরকে লক্ষ্য করেও ছুটে আসছে। সারা জেফারসনও দুএকটা করে গুলী করছে।

আহমদ মুসার মাথায় তখন নতুন বুদ্ধি এসেছে।

পেছনে থেকে আক্রমণকারী লোকটি নিশ্চয় দুতলা থেকে পেছনের কোন সিঁড়ি দিয়ে নেমেছে নিরাপদ আক্রমণের সুযোগ নেয়ার জন্যে। এখন আহমদ মুসা পেছনের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে সামনের ওদেরকে পেছন থেকে আক্রমণ করতে পারে।

চিন্তাটা সম্পূর্ণ হতেই আহমদ মুসা দ্রুত গড়িয়ে এগুলো পেছনে। পেছনের প্রান্তে পৌছে সে দেখল একটা ঘরের দরজা উন্মুক্ত। দেখা গেল সে ঘর থেকেই একটা সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে।

আহমদ মুসা গড়িয়ে ঢুকে গের ঘরে। তারপর ছুটল সিঁড়ি বেয়ে।

আহমদ মুসা দোতলা হয়ে পুবের প্রধান সিঁড়ি মুখে এসে দেখল ওরা কয়েকজন সিঁড়ি বেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে উপরে উঠে আসছে। সম্ভবত ওরাও চাচ্ছিল আবার পেছন থেকেই আক্রমণ রচনা করতে।

আহমদ মুসা যখন ওদের দেখল, ওরাও তখন আহমদ মুসাকে দেখে ফেলেছে।

কিন্তু ওরা আহমদ মুসার উদ্যত মেশিন রিভলবার হাতে দেখেই হকচকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আহমদ মুসার তা হয়নি। আহমদ মুসা ওদের দেখেই তর্জ্জনি চাপল তার মেশিন রিভলবারের ট্রিগারে।

মুহূর্তেই লাশ হয়ে গেল সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসা তিনজনের দেহ।

আহমদ মুসা খেয়াল করেনি সিঁড়ির গোড়ায় অবস্থান নিয়েছিল ওদের আরও কয়েকজন।

যখন ওদেরকে দেখতে পেল, আহমদ মুসার তখন কিছুটা দেরী হয়ে গেছে।

উপায়ান্তর না দেখে আহমদ মুসা চিৎ হয়ে পেছন দিকে দেহটাকে ছুড়ে দিল।

পড়তে গিয়ে রিভলবার ধরা হাত তার উঁচু হয়ে উঠেছিল। একটা গুলী এসে উঁচু হয়ে উঠা রিভলবারে আঘাত করল। গুলীটা আহমদ মুসার ডান হাতের বৃদ্ধা অঙ্গুলিকেও স্পর্শ করে গেল।

'আহমদ মুসার হাত থেকে ছিটকে পড়ল তার রিভলবার।

ছিটকে গেলেও রিভলবারটা কিন্তু গিয়ে পড়ল আহমদ মুসার মাথার কাছে।

আহমদ মুসা কুড়িয়ে নিল রিভলবার। মাথায় বুদ্ধি তার এসে গেছে। আহমদ মুসা ঠিক করল রিভলবার মুঠোয় নিয়ে গড়িয়ে পড়বে সে সিঁড়ি দিয়ে। ওরা বুঝবে আমি গুলী বিদ্ধ হয়ে গড়িয়ে পড়ছি। এই সুযোগে ওদেরকে টার্গেট করার একটা নিরাপদ সময় পাওয়া যাবে।

তাই করল আহমদ মুসা। গড়িয়ে পড়ল সে সিঁড়ি দিয়ে।

শেষ ধাপ থেকে মেছেতে গড়িয়ে পড়েই আহমদ মুসা সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়ানো লোকদের লক্ষ্যে তার মেশিন রিভলবারের ট্রিগার চেপে ধরল।

আর ওরা আহমদ মুসার দেহ গড়িয়ে পড়তে দেখে আনন্দ বিস্ময় নিয়ে ওদিকে তাকিয়েছিল। তারপর হঠাৎ যখন আহমদ মুসার রিভলবার তাদের দিকে

তাক হতে দেখল, তখন আর সময় পেল না। আহমদ মুসার মেশিন রিভলবার থেকে ছুটে আসা এক ঝাঁক বুলেটের অসহায় শিকারে পরিণত হলো তারা।

ওরা চারজন ভূমি শয্যা নিলেও আহমদ মুসা শুয়েই থাকল। বুঝতে চেষ্টা করল ওদের আর কেউ কোথাও আছে কি না।

গুলী কোন দিক থেকে এল না। কিন্তু পেছন দিক থেকে ছুটে আসতে শুনল পায়ের শব্দ।

শুয়ে থেকেই বিদ্যুৎ বেগে মাথা ঘুরাল আহমদ মুসা পেছন দিকে, সেই সাথে ঘুরল তার হাতের উদ্যত রিভলবারও।

কিন্তু দেখল কোন শত্রু নয়, ছুটে আসছে সারা জেফারসন।

ছুটে এসে সে হাটু গেড়ে বসে পড়ল আহমদ মুসার পাশে। দুহাত দিয়ে আহমদ মুসাকে আঁকড়ে ধরে বলল, 'এভাবে আপনি পড়ে গেলেন কেন? কিছু হয়নি তো আপনার? ভাল আছেন তো আপনি?' আর্ত চিৎকারের মত শুনাল সারা জেফারসনের কন্ঠ।

ততক্ষণে সারা জেফারসনের মাও এসে পড়েছে। তারও উদ্বিগ্ন কণ্ঠ, 'বেটা কেমন আছ তুমি? ভাল আছ তো?'

আহমদ মুসা উঠে বসল। হাসল, বলল, 'ভাল আছি আমি। ওদের বোকা বানাবার জন্যে গুলীবিদ্ধ হবার মত গড়িয়ে পড়েছিলাম সিঁড়ি দিয়ে। বোকা হয়েছে ওরা। জীবন দিয়ে খেসারত দিয়েছে বোকামির।'

'কে বলল আপনি ভাল আছেন। আপনার বাঁ হাতের কব্জি আগেই গুলীবিদ্ধ হয়েছে, এখন দেখছি ডান হাতের বুড়ো আঙুলও।'

বলে টেনে তুলল সারা জেফারসন আহমদ মুসাকে।

পকেট থেকে রুমাল বের করে সারা জেফারসন আহমদ মুসার আহত কব্জি জড়িয়ে বলল, 'চলুন উপরে। ফাস্ট এইড-এর ব্যবস্থা আছে। ইতিমধ্যে ডাক্তার এসে পড়বে।'

বলে আহমদ মুসার হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে লাগল সিঁড়ির দিকে।

আহমদ মুসা হাঁটার জন্যে পা তুলতে তুলতে বলল, 'কিন্তু নিচে এখন থাকা প্রয়োজন। শত্রু কোথাও লুকিয়ে থাকতে পারে।'

‘একটু ভালো করে শুনুন। পুলিশের গাড়ির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। ওরা এখনি এসে পড়বে। সুতরাং চিন্তা নেই। মা নিচে থাকছেন পুলিশকে রিসিভ করার জন্যে।’ বলল সারা জেফারসন।

‘পুলিশকে কে খবর দিয়েছে? আপনারা? আহমদ মুসা বলল।

আমি টেলিফোন করেছিলাম। আমি এফ বি আইকেও জানিয়েছি।’ বলল সারা জেফারসন।

‘ধন্যবাদ মিস জেফারসন।’

‘ধন্যবাদ কি এজন্যে যে, যুদ্ধে দর্শক সেজে বিরাট বীরত্বের কাজ করেছি! সারা জেফারসনের কণ্ঠ একটু ভারী শোনাল।

আহমদ মুসার কিছু বলতে যাচ্ছিল।

কিন্তু সারা জেফারসন বলল, ‘আর কোন কথা নয় আসুন।’

বলে হাত ধরে টেনে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগল।

নিয়ে বসাল আহমদ মুসাকে ফ্যামিলি ড্রইং রুমে। তারপর ফাস্ট এইড বক্স ও বড় এক গামলা পানি নিয়ে এল।

আহমদ মুসা বুঝলো বাধা দিয়ে কিছু হবে না। আর কব্জীর ক্ষতটা বেশ বড় ও গভীর হয়েছে। এক হাত দিয়ে ক্ষতের শুশ্রুষা সম্ভব হবে না।

তাই আহমদ মুাসা তার হাত ছেড়ে দিল সারা জেফারসনের হাতে।

আহমদ মুসার কব্জীর ক্ষত পরিষ্কার করে তাতে ঔষধ লাগিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিতে দিতে বলল, ‘আচ্ছা একটা কথা বলি?’ জিজ্ঞেস করল সারা জেফারসন আহমদ মুসার দিকে মুখ না তুলেই।

‘বলুন।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আপনার নার্ভ কি লোহা দিয়ে তৈরী যে তাতে চাঞ্চল্য আসে না কোন কিছুতেই?

‘কেন একথা বলছেন?’

‘এ রকম ক্ষত যদি আমার হতো এবং তা এইভাবে পরিষ্কার করতে গেলে আমি চিৎকার করে, কেঁদে লোক জোটাবার মত ব্যাপার করে ফেলতাম।

কিন্তু আমি আপনার মুখের সামান্য পরিবর্তনও হতে দেখিনি। মানুষের নার্ভ এত শক্ত হয়।'

'তাহলে আমি অমানুষ নাকি?'

'অমানুষ নয়, অতিমানব।' বলল সারা জেফারসন। তার ঠোঁটে রক্তিম হাসি।

'অতিমানব বলে কোন কিছু নেই।'

'অতিমানব বলে আলাদা কিছু অবশ্যই নেই, কিন্তু মানুষই অতিমানব হন।'

'এসব কল্পনা মিস জেফারসন। অতিমানব কেউ হলে নবী-রাসূলরা তা হতেন। কিন্তু তাঁরাও নিজেকে 'মানুষ' বলেছেন।'

'আপনি এটা বলেছেন অসাধারণ চিন্তা থেকে। কিন্তু আমি তো সাধারণ একজন মানুষ। আমরা অনেক কিছুই ভাবতে পারি।'

বলে সারা জেফারসন আহমদ মুসার ডান হাত টেনে নিল। বাম হাতের কব্জীর ব্যান্ডেজ শেষ।

'কিন্তু মিস জেফারসন, সাধারণরা কখনই নিজেকে সাধারণ মনে করে না।'

'আবার এটাও ঠিক অসাধারণরা নিজেকে অসাধারণ ভাবেন না।'

আহমদ মুসা ভাবছিল পরবর্তী কথাটা বলার জন্যে। কিন্তু তার আগেই সারা জেফারসন বলে উঠল, 'আর একটা কথা বলি।'

'অবশ্যই বলবেন।'

'আপনার হাত স্পর্শ করলে কেউ আপনাকে বিপ্লবী বলবে না।' আঙুলে ব্যান্ডেজ পরাতে পরাতে বলল সারা জেফারসন।

'কি বলবে তাহলে?'

'শিল্পী বলবে। যে শিল্পীর নরম মন কঠোরতার থেকে অনেক দূরে বসে সুন্দরের সাধনায় ব্যস্ত থাকে।

‘তাহলে মিস জেফারসন আপনিওতো ‘ফ্রি আমেরিকা’র মত বিপ্লবী সংগঠনের প্রধান হতে পারেন না। কারণ আপনার হাত বলছে, আমি শিল্পী হলে আপনি ডাবল শিল্পী।’

জোসে হেসে উঠল সারা জেফারসন।

আহমদ মুসার ডান হাতের বুড়ো আঙুলের ড্রেসিং হয়ে গিয়েছিল।

সারা জেফারসন হেসে উঠল আহমদ মুসার হাত ছেড়ে দিয়ে নিজের হাত দুটি নিজের কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল, ‘আমি আপনার হাত দেখেছি, আপনি কখন দেখলেন আমার হাত?’

বলেই উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘আসুন।’

সারা জেফারসন আহমদ মুসাকে নিয়ে প্রবেশ করল একটা বড় বেড রুমে।

কক্ষে বেড ছাড়াও যেসব জিনিস আছে তার মধ্যে রয়েছে একটা ছোট লেখার টেবিল, পাশাপাশি দুটি সুদৃশ্য সোফা, ডিভানের সাথে মানানসই এবং লেখার টেবিলের উপরেই দেয়ালে সুন্দর একটা বিলবোর্ড।

আহমদ মুসাকে সোফায় বসিয়ে পাশের ড্রেসিং রুম থেকে এক সেট পোশাক এনে আহমদ মুসার হাত দিয়ে বলল, ‘আপনি পোশাক পাল্টে আসুন। আমি বেডটা একটু ঠিক করে দেই।’

আহমদ মুসা শার্ট প্যান্ট নেড়ে চেড়ে বলল, ‘আপনাদের বাসায় তো কোন পুরুষ আত্মীয় থাকে না। পুরুষের এ পোশাক আপনি পেলেন কোথায়?’ আহমদ মুসার চোখে বিস্ময়।

‘ওটা ছাড়াও এক সেট স্যুটও আছে।’ বলল সারা জেফারসন।

‘কিন্তু কোত্থেকে এল?’

‘দোকান থেকে।’

‘কিন্তু এক সন্ধ্যার মধ্যে তো এমন অর্ডার সাপ্লাই হয় না।’

‘অনেক আগেই এসে আছে।’ বলল সারা জেফারসন। তার ঠোঁটে হাসি।

‘আগেই? কিভাবে?’

গম্ভীর হলো সারা জেফারসন। বলল, 'আমার স্বপ্নের কথা আপনাকে বলেছি। আমি জানতাম আমার স্বপ্ন সত্য হবে। আমার ডাক আপনি উপেক্ষা করবেন না। আপনি আসবেন। সেই আসার অপেক্ষায় আমি এগুলো তৈরী রেখেছি।' থামল সারা জেফারসন।

সারা জেফারসনের কথাগুলো আহমদ মুসার কান দিয়ে প্রবেশ করার পর তার চেতনার সত্ত্বার কোথাও যেন একটা শর বিদ্ধ হলো। চমকে উঠল আহমদ মুসা। আর মনে হলো, সারা জেফারসনের কথাগুলো যেন এক ব্যাকুল হৃদয়ের দুহাত বাড়ানো এক আকুল পিপাসার্ত কান্না। কেঁপে উঠল আহমদ মুসা। ঠিক এ সময় তার সামনে ভেসে উঠল ডোনা জোসেফাইনের স্নিগ্ধ, সুন্দর, প্রশান্ত মুখচ্ছবিটি। কেঁপে ওঠা তার হৃদয় আশ্রয় খুঁজে পেল।

আহমদ মুসাকে তার নিজের মধ্যে হারিয়ে যেতে দেখে এবং কোন উত্তর না পেয়ে সারা জেফারসন বলে উঠল, কি ভাবছেন আহমদ মুসা?'

সম্বিত ফিলে পেল আহমদ মুসা। নিজেকে সামলে নিল। হাসল একটু। বলল, 'ধন্যবাদ, মিস জেফারসন।

বলে আহমদ মুসা পোশাক পাল্টাবার জন্যে ড্রেসিংরুমে ঢুকে গেল।

বেড ঠিক করে সারা জেফারসন একটু বাইরে গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখল আহমদ মুসা ড্রেসিংরুম থেকে বেরিয়ে এসে সোফায় বসে আছে।

ঘরে ঢুকেই বলল সারা জেফারসন, 'একটু নিচে গিয়েছিলাম খোঁজ নিতে। আমাদের বাড়িতে ৩ জন পুলিশের একটা টিম পাহারায় ছিল। শ্যারনের লোকেরা তিন জন পুলিশ, আমাদের কুকুর এবং আমাদের নিরাপত্তা কর্মচারী শেলটনকে খুন করে আমাদের বাড়িতে প্রবেশ করে।'

'এরা জেনারেল শ্যারনদের লোক একথা কি পুলিশও বলছে?'

'না, এটা আমি বলছি। ওদেরকে একথা বলা হয়নি। পুলিশ নিশ্চয় খুঁজে বের করবে।' বলল সারা জেফারসন।

'একটা প্রমাণের কথা বলছি। পুলিশকে গিয়ে বলুন। ওদের কলার ব্যান্ডের ভেতরের পাশে ছয়তারা একটা সিম্বল আছে।এটা ইহুদী গোয়েন্দা এবং তাদের প্রাইভেট আর্মির সিম্বল।'

‘ধন্যবাদ। আমি বলব। কিন্তু তার আগে দেখে নিতে চাই সত্যিই তা আছে কি না।’ কথা শেষ করেই সারা জেফারসন আবার বলে উঠল, ‘আপনি শুয়ে পড়ুন। একটু রেষ্ট নিন। ডাক্তার এখনি এসে পড়বেন। ’

আহমদ মুসা বলল, ‘ঠিক আছে। শুয়ে পড়ছি। কিন্তু তার আগে বলুন ঐ বিল বোর্ডে টমাস জেফারসনের যে উক্তি লেখা আছে, তা কি পছন্দ করে ওখানে রেখেছেন, না নিছক তার কথা হিসেবে ওটা রেখেছেন?

ঘরে লেখার টেবিলের উপরের দেয়ালে টাঙানো একটা বিলবোর্ডের দিকে ইংগিত করে আহমদ মুসা কথাগুলো বলল।

বিলবোর্ডটিতে সুন্দর অক্ষরে টমাস জেফারসনের একটি উক্তি লেখা। উক্তিটি হলো, ‘স্বাধীনতার বৃক্ষকে অবশ্যই মাঝে মাঝে দেশপ্রেমিক ও জালেমদের রক্তে গোসল করতে হবে। তার স্বাভাবিক ম্যাচিউরিটির এটাই পথ (The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of partie-ots and tyrants. It is its natural nature)

আহমদ মুসার কথা শুনে সারা জেফারসনও বিলবোর্ডটির দিকে তাকাল। তাকিয়ে হেসে উঠল। বলল, ‘এ নিয়ে আবার ঝগড়া বাধাবেন বুঝি! ঝগড়ার কোন প্রয়োজন নেই। আমি স্বীকার করছি, টিজে দাদুর এই কথাটা আমার ভীষন পছন্দ। আপনার কথা বলুনতো?’

‘তার আগে আপনার কেন পছন্দ?’ আহমদ মুসা সোফা থেকে উঠে শোবার জন্য বেডে গিয়ে বসতে বসতে বলল।

আবার হাসল সারা জেফারসন। বলল, ‘শত্রুর বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াইয়ে আপনি অদ্বিতীয়। আপনি আইনজীবি হলে, বা ডিপ্লোম্যাট অথবা স্টেটম্যান হলেও দুনিয়াতে অদ্বিতীয় হতেন। মানুষের পেট থেকে কথা বের করায় আপনার জুড়ি নেই। আপনি সত্যিই মিরাকল।’

বলে মুহূর্তকাল থেমেই আবার শুরু করল, ‘টিজে দাদু তার অন্য একটা উক্তিতে বলেছেন, ‘সময় সময় দেশে ছোটখাট বিদ্রোহ বিপ্লব ঘটা ভাল জিনিস। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন তেমনি, যেমন প্রয়োজন প্রকৃতিতে ঝড়ের (I

hold that a little rebelion now and then is a good thind and as necessary in the physical)।' দেশে সংঘঠিত বিশৃংখলা বিপ্লব দেশের দেশপ্রেমিকদের চিন্তা চেতনা দায়িত্ববোধ শানিত করে এবং বিশ্বাসঘাতক ও বিভেদকারীদেরকে চিহ্নিত করার মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতাকে সংহত ও শক্তিশালী করে। স্রোত যেমন নদীর জীবন, তেমনি দেশপ্রেমিকদের শাণিত চিন্তা, চেতনা ও দায়িত্ববোধ একটি স্বাধীন দেশের প্রাণ। এই প্রাণ দেহে আছে কিনা মাঝে মাঝেই তার টেস্ট হওয়া প্রয়োজন।' থামল সারা জেফারসন।

আহমদ মুসার চোখে মুদ্ধ দৃষ্টি। বলল, 'ধন্যবাদ মিস জেফারসন। আপানর টিজে দাদুর কথার মতই আপনার ব্যখ্যা চমৎকার।'

'থাক ওসব। এবার আমার প্রশ্নের জবাব দিন।' সলজ্জ কন্ঠে বলল সারা জেফারসন।

আহমদ মুসার চোখে মুখে নেমে এল গাম্ভীর্য। বলল, 'আমাদের ধর্মগ্রন্থ আল কুরআনে স্রষ্টা বলছেন, 'লড়াই কর যতক্ষন না বিশৃংখলা, বিদ্রোহ ও জুলুম নিপীড়নের মূলোচ্ছেদ হয় এবং আল্লাহর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।' এ ধরনের আরও অনেক কথার মধ্যে তিনি একথাও বলেছেন, 'নিরপরাধ মানুষের হন্তাকে হত্যা করার মধ্যে রয়েছে মানুষের জীবন।' আমাদের ইসলামী জীবন-দর্শনের মূল কথাই হলো, পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে কল্যাণের শক্তি ও অকল্যাণের শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব চিরন্তন। এই লড়াই অবিরাম চলবে পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত। আল্লাহ চান, কল্যাণের শক্তি অকল্যাণের শক্তিকে পরাভূত করে মানুষের জন্যে শান্তি ও স্বস্তির রাজত্ব কায়েম করবে। এখন মিস জেফারসন আপনিই বলুন আপনার টিজে দাদুর উক্তি আমার কেমন লাগবে?

হাসল সারা জেফারসন।

চোখ বন্ধ করল সে।

একটু পর চোখ খুলে বলল, 'আল কোরআন যদি মহা পর্বতগাত্রের মহাহিমবাহ হয়, তাহলে টিজে দাদুর উক্তি সেই মহাহিমবাহ থেকে নেমে আসা একটা নির্ঝরিনী। সে নির্ঝরিণীকে তো আপনি আপানর বলেই দাবী করবেন।' মুগ্ধ চোখে, ঠোঁটে রক্তিম এক হাসি টেনে বলল সারা জেফারসন।

‘চমৎকার আপনার উদাহরণ, মিস জেফারসন।’ বলল আহমদ মুসা বিমুগ্ধভাবে।

‘তাহলে এ কৃতিত্বের জন্যে একটা পুরষ্কার চাইব।’ বলল সারা জেফারসন। ঠোঁটে তার সলজ্জ হাসি।

‘বলূন কি পুরষ্কার।’ বলল বটে আহমদ মুসা, কিন্তু তার ভেতরে তখন বিব্রতভাব।

সারা জেফারসন চোখ নামিয়ে নিল আহমদ মুসার দিক থেকে। মুখ তার নিচু হলো একটু। শান্ত নরম কন্ঠে বলল, ‘আমি ‘মিস জেফারসন’ নই। আমি শুধুই ‘সারা’।’

বলেই ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল সারা জেফারসন।

দরজায় গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সারা জেফারসন। বলর ‘আপনি শুয়ে পড়ুন। ডাক্তার এলে আমি আসব। আর শুনুন, কোন স্বাধীন চিন্তা ভাবনা কিন্তু আপনার এখন নেই, আপনি এখন ডাক্তারের অধীন।’

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সারা জেফারসন।

আহমদ মুসা তখন বালিশে হেলান দিয়ে সারা জেফারসনের শেস দিকের কথাগুলো ব্যাখ্যা খুঁজছিল আর ভাবছিল, মানুষের ভাবনা কত সীমিত। দৃষ্টি তাদের কত সীমাবদ্ধ। সব না জেনেই জানা হয়ে গেছে বলে সিদ্ধান্ত নেয়।

হৃদয়ে একটা নতুন বেদনা অনুভব করলো আহমদ মুসা।

# ৪

সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। পটোম্যাক বে'র একটি ছোট্ট দ্বীপ। দ্বীপের পুব প্রান্তের পানি ঘেঁষে একটা সুন্দর বাংলো।

ওয়াশিংটনের বে' এলাকায় এধরনের বাংলোগুলোর মালিক রাজনৈতিক ও অর্থনেতিক ভিআইপি'রা।

বাংলোটির ঘাটে একটা সুদৃশ্য বোট এসে ভিড়ল।

বোট থেকে নামল জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন। তিনি এখন রিটায়ার্ড। কদিন আগেও জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন ছিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট এ্যাডমাস হ্যারিসনের নিরাপত্তা উপদেষ্টা। ইহুদীবাদীদের সাথে অন্যায় অপরাধমূলক যোগসাজসের কারণে তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন একাই বোট ড্রাইভ করে এসেছে। বোট থেকে তীরে নেমে সে একবার বে'র দিকে তাকিয়ে দেখল কেউ তাকে অনুসরন করছে কি না, কাউকে সে দেখল না। নিশ্চিন্ত হয়ে পা বাড়াল বাংলোর দিকে।

বাংলোটি 'কাউন্সিল অব আমেরিকান জুইস এসোসিয়েশনে'র চেয়ারম্যান ডেভিড উইলিয়াম জোনস এর একটি অবকাশ কেন্দ্র।

বাংলোটির চারদিকেই বাগান। বাগানের চারদিকে উঁচু প্রাচীর।

বাগানের মাজখানে টিলামত উঁচু বেদির উপর তৈরী দুতলা বাংলোটি।

বে থেকে বাংলোটিকে দেখা যায় ছবির মত সুন্দর। আবার বাংলো থেকে বে'র সৌন্দর্য উপভোগ করা যায় খুব ঘনিষ্ঠভাবে।

ঘাটের উপর দাঁড়িয়েছিল একজন সুবেশধারী লোক। জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন বোট থেকে নেমে এগুতেই লোকটি এগিয়ে এল তার দিকে। সসম্মানে সম্ভাষণ বিনিময় করে বলল, 'স্যার আমি মি. জোনস-এর সেক্রেটারী। জেনারেল শ্যারন এসেছেন। ওরা আলোচনায় বসে গেছেন।'

‘গুড। আমার একটু দেরী হলো পৌঁছাতে।’ বলল জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন।

‘চলুন স্যার’

দুজনে হাঁটতে শুরু করল বাংলোর দিকে।

বাংলোতে প্রবেশ করে কয়েকটা দরজা ও কয়েকটা করিডোর পেরিয়ে অবশেষে একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ডেভিড উইলিয়াম জোনস- এর সেক্রেটারী।

দরজায় নক করল মি. জোনস-এর সেক্রেটারী।

মুহূর্তকাল পরে দরজা খুলে গেল। দরজায় দেখা গেল স্বয়ং মি. জোনসকে।

মি. জোনস স্বাগত জানাল জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টনকে এবং হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গেল।

দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

বেশ বড়-সড় ঘর।

একা সোফায় বসে আছে শ্যারন।

উঠে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানাল জেনারেল শ্যারন জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টনকে।

ঘরে অনেকগুলো সোফার সেট বিভিন্ন ডিজাইনে সাজানো। তারা গিয়ে বসল মুখোমুখি সাজানো তিনটি সোফায়।

একটু নিরবতা।

নিরবতা ভাঙল জেনারেল শ্যারন। বলল, ‘মি. জেনারেল হ্যামিল্টন, আপনার যোগাযোগের কতদূর?’

‘বলল, কিন্তু তার আগে বলুন এসব কি ঘটছে, আহমদ মুসা ও ‘ফ্রি আমেরিকা’ মুভমেন্ট-এর সংযোগ আগেই ঘটেছিল, এখন দেখা যাচ্ছে হোয়াইট ইগলও আহমদ মুসার সাথে এক হয়ে গেছে। আপনারা জানালেন, মিয়ামী বন্দরের পথে আহমদ মুসা, গোল্ড ওয়াটার, বেঞ্জামিন বেকনরা গাড়ি বিস্ফোরণে শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু উল্টো দেখা গেল তারাই জ্যাকসন ভীলে গিয়ে আপনাদের

লোকজনদের হত্যাকরে আপনাদের মূল্যবান বন্দিনীদ্বয়কে মুক্ত করে নিয়ে গেল। তারপর ....।

জেনারেল শ্যারন আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন থামিয়ে দিয়ে বলল, 'মি. জেনারেল হ্যামিল্টন, এটা আমাদের সাংঘাতিক একটা সেট ব্যাক। কিন্তু মি. হ্যামিল্টন আপনাকে স্মরণ রাখতে হবে, আমাদের সাথে সংঘাতে এসেছে আহমদ মুসা। যার বিবেচনা শক্তিটা অলৌকিক। মিয়ামী বিমান বন্দরের বাইরে আহমদ মুসার টিমটাকে ধ্বংস করার পরিকল্পনায় আমাদের ত্রুটি ছিল না। আহমদ মুসার টিমকে যে গাড়ি বহন করার কথা সে গাড়ি ঠিকই বিমান বন্দরে গেছে ওদের আনার জন্যে। বিমান বন্দরের টারমাকে ঢুকেছে ওদের বিমানের কাছে। তারপর শেড দেয়া কাঁচ তুলে গাড়িটি বেরিয়ে এসেছে বিমান বন্দর থেকে। তারা গাড়িতে নেই, বা উঠেনি এটা ধারণা করার কোনই অবকাশ ছিল না। গাড়িটা পরিকল্পিত স্থানেই এসে ধ্বংস হয়েছে। সুতরাং আমাদের লোকদের পরিকল্পনা ও চেষ্টার কোন ফাঁক ছিল না। কিন্তু আহমদ মুসারা কেন যে গাড়িতে উঠল না, কেন যে তারা খালি গাড়িটি ঐ ভাবে পাঠিয়েছিল সেটা একটা বিস্ময়। এমন বিস্ময়কর কান্ড ঘটাবার শক্তি আহমদ মুসার আছে এবং এটাই আমাদের বিপর্যয়ের কারণ। আর জ্যাকসন ভীলে যা ঘটেছে তা খুবই সোজা। মিয়ামীর খবর তাদের কাছে পৌছার পর তারা স্বাভাবিকভাবেই অসতর্ক ছিল। তার উপর বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আমাদের পুরনো একজন পরিচারিকা।'

থামল জেনারেল শ্যারন।

সে থামতেই জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন বলে উঠল, 'কিন্তু মি. জেনারেল, মন্টিসেলোর কি ব্যাখ্যা দেবেন। আমার মতে সর্বজনমান্য জেফারসন-পরিবারে আপনাদের এইভাবে হাত দেয়া ঠিক হয়নি। তারপর সেখানে লজ্জাজনক ব্যর্থতা, আপনাদের ডজন-দেড়ডজন লোকের লাশ সরকারের হাতে যাওয়া আমাদের জন্যে খুবই ড্যামেজিং হয়েছে। সারা জেফারসনের বিরুদ্ধে একবার নয়, দুবার নয়, আপনাদের তিনটা আক্রমণই ব্যর্থ হলো। শেষবারে আপনাদের সবাই সেখানে লাশ হয়ে পড়ে থাকল। জ্যাকসন ভীলে অসতর্ক থাকার কারণে হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে আপনাদের বিপর্যয় ঘটল। কিন্তু মন্টিসেলোতে

কি ঘটল? ওখানে আপনারা ছিলেন পরিকল্পিত আক্রমণে। আর ওপক্ষে ছিল কার্যত দুজন মহিলা একজন পুরুষ।' থামল জেনারেল হ্যামিল্টন।

জেনারেল শ্যারন বিব্রত, বিমর্ষ। ধীরে ধীরে বলল, 'মন্ডিসেলোতে সারা জেফারসনকে হত্যার উদ্যোগ নেয়া ছাড়া আমাদের কোন উপায় ছিল না। 'ফ্রি আমেরিকা' মুভমেন্ট আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে আসছে। আহমদ মুসা ও হোয়াইট ঈগলের শক্তি মূলত অস্ত্র ও বুদ্ধির লড়াইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু 'ফ্রি আমেরিকা' মুভমেন্ট রাজনৈতিকভাবেও অত্যন্ত শক্তিশালী ও প্রভাবশালী। অথচ আমাদেরকে বাঁচাতে হলে রাজনৈতিক লড়াই-এ আমাদের জিততে হবে। সুতরাং 'ফ্রি আমেরিকান' মুভমেন্টকে পঙ্গু করে দেয়া এখন আমাদের প্রধান কাজ। এ জন্যেই 'ফ্রি আমেরিকা'র নেত্রী সারা জেফারসনকে আমরা হত্যা করতে চেয়েছিলাম। আমরা জানি, 'ফ্রি আমেরিকা' মুভমেন্টের মূল শক্তি হলো সারা জেফারসনের নতুন আমেরিকা গড়ার স্বপ্ন। এ স্বপ্ন সারা জেফারসন আহরণ করেছে তার গ্রান্ড দাদু টমাস জেফারসন এবং আমেরিকান ফাউন্ডার ফাদারদের 'ডিক্লারেশন অব ইনডিপেডেন্স' থেকে। এই স্বপ্নই আমেরিকায় আমাদের মূল শত্রু। তাদের স্বপ্ন সার্থক হলে আমেরিকা ঘিরে আমাদের যে স্বপ্ন সে স্বপ্ন ব্যর্থ হবে। সুতরাং আমাদের মূল আদর্শিক শত্রু সারা জেফারসন। তাই তাকে হত্যার একটা সর্বাত্মক আয়োজন আমরা করেছিলাম। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আহমদ মুসা সেখানে গিয়ে ঠিক সময়ে হাজির হয়েছে।' থামল জেনালের শ্যারন।

জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই কথা বলে উঠল ডেভিড উইলিয়াম জোনস। বলল, 'মি. শ্যারন, আমাদের নতুন আমেরিকা ও নতুন বিশ্ব গড়ার স্বপ্ন এবং নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার মাথায় নতুন আমেরিকাকে স্থাপন করার যে কর্মসূচি সে বিষয়ে কি জেনারেল হ্যামিল্টন অবহিত? হাসল জেনারেল শ্যারন। বলল, জেনারেল হ্যামিল্টন বিষয়টি আমাদের অনেকের চেয়ে বেশি জানেন শুধু তাই নয়, এ স্বপ্ন সফল করার ব্যাপারে আমাদের অনেকের চেয়ে তিনি অনেক বেশি একনিষ্ঠ।

বিস্ময় ফুঠে উঠল ডেভিড উইলিয়াম জোনসের চোখে মুখে। বলল, 'অবাক করলেন জেনারেল শ্যারন। ঘটনাটা কি?

'জেনারেল হ্যামিল্টনের মা তাকে এ তালিম দিয়ে গেছেন। তাঁর কাছ থেকেই জেনারেল হ্যামিল্টন পান আমাদের ঐতিহাসিক দলিলের একটা কপি। সুতরাং জেনারেল হ্যামিল্টন তাঁর ইহুদী মা'র কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন আমাদের নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার কর্মসূচী।' বলল জেনারেল শ্যারন।

'নিঃসন্দেহে বড় একটা সুখবর এটা। আমার মনে হয়, ফরেন রিলেশন্স বিষয়ক 'সিনেট স্ট্যান্ডিং কমিটি'র চেয়ারম্যান দানিয়েল ময়নিহান এবং ইন্টেলিজেন্স বিষয়ক 'হাউজ সিলেক্ট কমিটির চেয়ারম্যান এ্যান্ড্রু জ্যাকবসকে এ বিষয়ে বিস্তারিত বলা দরকার। তাহলে তাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য আরও বেশি পাওয়া যাবে। দুজনেই কিন্তু প্রকৃতির দিক দিয়ে হিটলারের মতই ওভার এ্যাম্বিশাস।' ডেভিড উইলিয়াম জোনস বলল।

সংগে সংগেই কথা বলে উঠল জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন, 'মি. জোনস ওদের সাথেই তো যোগাযোগের দায়িত্ব আমাকে দিয়েছিলেন জেনারেল শ্যারন।'

'ব্রাভো, ব্রাভো!' বলে চিৎকার করে উঠল ডেভিড উইলিয়াম জোনস এবং বলল, 'যোগাযোগ আপনার হয়েছে?

'হ্যাঁ, গত রাতে ওদের দুজনের সাথেই কথা বলেছি। আজ রাত এগারটায় ওদের সাথে আপনাদের নিয়ে এ্যাপয়েন্টমেন্ট।'

'ওয়ান্ডারফুল, ওয়ান্ডারফুল মি. জেনারেল হ্যামিল্টন। এজেন্ডা ঠিক হয়েছে? ডেভিড উইলিয়াম জোনস বলল।

'হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। প্রেসিডেন্টকে ইমপিচ করার জন্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন। এ এজেন্ডার কথা জেনারেল শ্যারন আগেই আমাকে বলে দিয়েছিলেন।' বলল জেনারেল হ্যামিল্টন।

'কিন্তু এজেন্ডার সাথে 'নতুন আমেরিকা' ও 'নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থা'র বিষয়টিকেও রাখতে হবে। তারা উৎসাহিত হবেন।' ডেভিড উইলিয়াম জোনস বলল।

‘দেখবেন বিষয়টা আলোচনায় এমনিতেই এসে যাবে।’ বলল জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন।

কথাটা শেষ করেই জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন আবার বলে উঠল, এজেন্ডা নিয়ে আপনারা যথেষ্ট ভেবেছেন তো? সাপের লেজে পা দিলে কিন্তু বিপদ। একচোটেই সাপের মাথাটা ধরে ফেলতে হবে। জনমত হবে সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টর। এজন্যে জনবল, অর্থবল দুই-ই কিন্তু লাগবে।’

‘ভাববেন না। আমরা সবদিক দিয়েই প্রস্তুত।’ বলল জেনারেল শ্যারন।

‘ইহুদী নয় এমন সংস্থা সংগঠনের সমর্থন ও সহযোগিতা পাওয়া হবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ব্যাপারে আপনারা কি ভেবেছেন? জেনারেল হ্যামিল্টন বলল।

‘আপনি জানেন, প্রটেস্ট্যান্টদের সবচেয়ে জনপ্রিয় সংগঠন সেফ ওয়ে সেভিয়ার’ গ্রুপ আমাদের দীর্ঘ দিনের সহযোগী। তাদের নেতা ‘জন জেরা’ টেলিভিশন অনুষ্ঠান ‘টাইম উইথ গড’- এর জনপ্রিয় টকার হিসাবে আমাদেরকে অমূল্য সাহায্য দিয়ে আসছেন। তবে বর্তমান সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবর হলো, আমাদের প্রতি ভারতীয় গ্রুপের সমর্থন। তাদের একটা শীর্ষ বৈঠকে আজ আমি গিয়েছিলাম। আহমদ মুসার আমেরিকায় আগমন এবং তার প্রতি এফ বি আই ও সি আই এ প্রধান ও প্রেসিডেন্টের সমর্থনের সংবাদে তারা আমাদের চেয়ে উত্তেজিত। তারা জনবল, অর্থবল, তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি সবকিছু দিয়ে আমাদের সাহায্য করবে। সব সময়ই এই ভারতীয়রা আমাদের সহযোগী। কিন্তু এখন তাদের একটি সাহায্য পাওয়া যাবে এ বিষয়টা নিশ্চিত।’ জেনারেল শ্যারন বলল।

‘থ্যাংক গড, জেনারেল শ্যারন। আজকের সময়ের জন্য খবরগুলো সত্যিই অমুল্য।’ বলল জেনারেল আলেকজান্ডার।

‘কিন্তু সমস্যা হলো, সেনাবাহিনীতে বিশেষ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও শীর্ষ অপারেশন পর্যায়ে আমাদের কোন লোক নেই।’ বলল ডেভিড উইলিয়াম জোনস।

‘বিগ্রেডিয়ার স্টিভকে হারানো আপনাদের ঠিক হয়নি। সেও খুব বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। পেন্টাগন যে কতবড় সেনসেটিভ জায়গা সেটা সে মনে রাখেনি। তার ফলেই এই সেট ব্যাকটা।’ জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন বলল।

‘এখানেও সর্বনাশের হোতা আহমদ মুসাই। অনুসন্ধান থেকে আমরা জেনেছি, টেলিফোনে আঙুলের মুভমেন্ট দেখেই আহমদ মুসা ধরে ফেলে পেন্টাগনের বাইরে কোথাও সে টেলিফোন করছে। তারপর টেলিফোনে বিগ্রেডিয়ার স্টিভের কথার দুএকটা থেকেই সে সন্দেহ করে বলে’ বলল জেনারেল শ্যারন।

‘যাই হোক, এই ঘটনা সেনাবাহিনীর মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। সেনাবাহিনীর ইহুদী অফিসারদের মধ্যে ইহুদীবাদী কারা তা চিহ্নিত করার জন্যে জরুরী তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে। এক বিগ্রেডিয়ার স্টিভের ঘটনা সব ইহুদী অফিসারকেই আজ সন্দেহের মুখে ঠেলে দিয়েছে।’ জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন বলল।

‘আমাদের দুর্ভাগ্য জেনারেল। আহমদ মুসা আমাদের শনি হিসাবে আমেরিকায় আবির্ভূত হবে কে জানত। যাক, যা হবার হয়েছে। আর যাতে ওরা এগুতে না পারে সেটাই নিশ্চিত করতে হবে। বলল জেনারেল শ্যারন।

‘আমরা যে পুরো ঘটনাকে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে দিতে চাই, এ ব্যাপারে এ্যান্ড্রু জ্যাকবস এবং দানিয়েল ময়নিহান কিছু বলেছেন? জিজ্ঞেস করল ডেভিড উইলিয়াম জোনস জেনারেল হ্যামিল্টনকে।

‘প্রসঙ্গটি এ্যান্ড্রু জ্যাকবস নিজেই তুলেছিলেন। বলেছিলেন, বিষয়টা মিডিয়াতে যাচ্ছে না কেন? আমি বলেছিলাম, এ ব্যাপারে একটা পরিকল্পনা তৈরী হয়েছে। আপনাদের সাথে বৈঠকের পরই তা মিডিয়াতে যাবে। দানিয়েল ময়নিহানও এ ব্যাপারে কথা বলেছিলেন। তারও মত ছিল, ওদের বিরুদ্ধে জনমতকে যতটা বিক্ষুব্ধ করা যাবে, আমাদের কাজ তত সহজ হবে। সুতরাং মিডিয়াকেই প্রধান অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে হবে।’ থামল জেনারেল হ্যামিল্টন।

জেনারেল হ্যামিল্টন থামতেই ডেভিড উইলিয়াম জোনস সহাস্যে বলে উঠল, 'ওদের সাথে চূড়ান্ত আলোচনারই শুধু অপেক্ষা। টিভি নেট ওয়ার্ক ও নিউজ পেপারের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন দুটি রিপোর্ট রেডি হয়ে আছে। ওদের সাথে আজ আমাদের আলোচনা সফল হলে আজকেই রিপোর্টগুলো মিডিয়াতে দিয়ে দেয়া হবে। আমাদের টিভি নেট ওয়ার্ক ও নিউজ পেপারগুলোকে এ্যালার্ট থাকার জন্যে অলরেডি ইংগিত দেয়া হয়েছে।'

জেনারেল হ্যামিল্টনের চেহারা কিছুটা প্রশ্নবোধক হয়ে উঠল। বলল, 'আলোচনায় সফল হওয়ার প্রশ্ন উঠছে কেন? অসফলতারও কি কোন সুযোগ আছে?

হাসল জেনারেল শ্যারন। বলল, 'আমাদের আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে। গোটা বিষয় আমরা ওদের সাথে খোলাখুলি আলোচনা করতে চাই। সফলতার অর্থ হলো, যে পরিকল্পনা আমরা করেছি, তা বাস্তবায়নের জন্যে ওরা শুধু সমর্থন দেবেন ও নিজে কাজ করবেন তাই নয়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ওদের সর্বশক্তি কাজে লাগাতে হবে। প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেটে আমাদের শুভাকাঙ্খী সদস্যরা তো কাজ করবেনই, কিন্তু তাদের কাজ হবে খুবই গুরত্বপূর্ণ। আমাদের বেশি ভয় সিনেট চীফ চালর্স ডব্লিউ ওয়ারনার, হাউজ (হাউজ অব রিপ্রেজেনটেটিভ) চীফ জন জে, রিচার্ডসন, সিনেট ইনটেলিজেন্স স্পেশাল কমিটির চীফ আনা প্যাট্রেসিয়া এবং সিনেট ফরেন রিলেশনস স্ট্যান্ডিং কমিটির চীফ বব এইচ ব্রুসকে নিয়ে। স্বাধীন মতামত পোষণের ক্ষেত্রে এরা এতই বেপরোয়া যে এদের বাগে আনা মুশকিল। কিন্তু এদের পক্ষে আনতে হবে। সিনেট চীফ মি. ওয়ারনারের সাথে আমাদের মি. ডেভিড উইলিয়াম জোনস এর ভাল সম্পর্ক আছে, ব্যবসায়িক সম্পর্কও আছে, কিন্তু তিনি নিজে কিছু বললে উল্টো ফল হওয়ার ভয় আছে। অন্যদিকে দানিয়েল ময়নিহান তার এক সময়ের সহপাঠি শুধু নন, মি. ওয়ারনার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নানাভাবে ময়নিহানের উপর নির্ভরশীল। অনুরুপভাবে সৌভাগ্যক্রমে জন জে রিচার্ডসন, আনা প্যাট্রোসিয়া ও এ্যান্ড্রু জ্যাকবস তিন জনই ক্যালিফোর্নিয়ার মানুষ। আর বব এইচ ব্রুস এ্যান্ড্রু

জ্যাকবস-এর বন্ধু। সুতরাং মি. এ্যান্ড্রু জ্যাকবস ও মি. দানিয়েল ময়নিহানকে চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালাতে হবে।' দীর্ঘ বক্তব্য দেয়ার পর থামল জেনারেল শ্যারন।

শ্যারন থামতেই কথা বলে উঠল জেনারেল হ্যামিল্টন। বলল, 'আপনি মি. ময়নিহান ও মি. জ্যাকবস-এর যতটা ভূমিকা প্রয়োজন বলে ভাবছেন তা না লাগতে পারে। প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেটে আপনাদের শুভাকাঙ্খী সদস্যদের যে বিরাট শক্তি আছে এবং প্রেসের পক্ষ থেকে যে চাপের সৃষ্টি হবে, তাতে মি. রিচার্ডসন, ওয়ারনার, ব্রুস ও মিস প্যাট্রেসিয়ারা অনেকটাই কাত হয়ে পড়বেন বলে আমার বিশ্বাস।'

'ঠিকই বলেছেন মি. হ্যামিল্টন। মিডিয়ার সমর্থন আমরা একতরফা পেয়ে যাব। টিভি ও নিউজ পেপার এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে যে, প্রেসিডেন্ট এ্যাডামস হ্যারিসন ও তার গ্যাংরা বাইরে মুখ দেখাতেই পারবে না। তবে যেটা আমাদের প্রথম টার্গেট প্রেসিডেন্টের ইমপিচমেন্ট খুব সহজ হবে না। সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদে দুই তৃতীয়াংশের সমর্থন হাসিল করতে হবে।' বলল ডেভিড উইলিয়াম জোনস। তাঁর কন্ঠে চিন্তার সুর।

'কেন, সহজ হবে না কেন? প্রেসিডেন্টের দুর্নীতি, অসদাচরণ, যোগসাজস, ইত্যাদি সম্পর্কিত যে দারুন সব দলিলের কথা বলেছিলেন, সে সব তো আছে আপনাদের কাছে।'

মিষ্টি হাসল ডেভিড উইলিয়াম জোনস। বলল, 'আছে। রাজনৈতিক অফিসে তার সুন্দরী রাজনৈতিক সেক্রেটারী মিসেস শিলা জোসন এবং হোয়াইট হাউজে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী মিসেস উভা ব্রাউন আমার লোক। সুতরাং কি ধরনের সব ডকুমেন্ট থাকতে পারে তা চিন্তা করুন।'

'ধন্যবাদ মি. জোনস। যেদিন কলংকের কালিমায় প্রেসিডেন্টের মুখটা কালো হয়ে যাবে এবং পরাজয়ের গ্লানিতে তার মাথাটা নুয়ে পড়বে, সেদিন আমি সবাইকে নিয়ে এমন একটা গ্র্যান্ড পার্টি করব যা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।' বলল জেনারেল হ্যামিল্টন।

হাসল জেনারেল শ্যারন। বলল, 'মি. জোনস যে দলিল দস্তাবেজের কথা বলেছেন, সে সব দলিল দস্তাবেজ বের করার প্রয়োজন হবে না। পত্র-পত্রিকায়

একটা ইশারা এবং তাঁর সামনে নিয়ে কয়েকটা নমুনা তুলে ধরলেই পায়ে এসে পড়বে পদ রক্ষার জন্য। দেখবেন, কোথায় উড়ে যাবে আহমদ মুসা, জর্জ আব্রাহাম, এ্যাডমিরাল ম্যাক, আর্থার, জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটন এবং সারা জেফারসনদের দল'।

'আপনার কথা সত্য হোক মি. শ্যারন। আমরা ইতিহাসের এক মহা মুহূর্তে দাঁড়িয়ে। আমরা সময়ের কাছে পরাজিত হলে মহা এক বিপর্যয়ের মুখোমুখি আমাদের দাঁড়াতে হতে পারে। আর সময় যদি আমাদের বিজয় এনে দেয়, তাহলে শতাব্দীর সাধনা দিয়ে আমেরিকায় ভবিষ্যতের যে বীজ বপন আমরা করেছি, তা এক নতুন পৃথিবীর মুখ আমাদের দেখাতে পারে। যা শুধু এক আমেরিকার মাধ্যমেই আমরা দেখতে পারি।' বলল ডেভিড উইলিয়াম জোনস।

'আপনার মূল্যায়নটা একটু বেশি প্রান্তিক হয়ে গলে না? বর্তমান পরিস্থিতি কি এতটাই গুরুতর? বলল জেনারেল হ্যামিল্টন।

'মি. হ্যামিল্টন, আমি পরিস্থিকে যতটা গরুত্বপূর্ণ বলেছি, পরিস্থিতি মনে করি তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। তারা যা বলছে তা যদি প্রমান করতে পারে, তাহলে জার্মানীর মতই আমেরিকা আমাদের জন্যে এক দুঃস্বপ্নের দেশে পরিণত হতে পারে। মনে হবে আমি হতাশার কথা বলছি, কিন্তু না, সর্বোচ্চ সাবধানতা, সর্বোচ্চ সক্রিয়তা অবলম্বেনের জন্যেই একথা বলছি আমি।' বলল ডেভিড ইউলিয়াম জোনস শুকনো কন্ঠে।

ভ্রু কুঞ্চিত হলো জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টনের! বলল, 'যা সত্য নয়, যা সাজানো, তা কি প্রমান করা যায়? বিশেষ করে আমেরিকায়?

উত্তরে কোন কথা বলল না ডেভিড জোনস।

জেনারেল হ্যামিল্টনের কথা শেষ হতেই জেনারেল শ্যারণ নিজের হাতঘড়ির দিকে চেয়ে বলে উঠল, 'সময় হয়ে গেছে। মনে করি আমাদের যাত্রা করা উচিত।'

জেনারেল হ্যামিল্টন ও ডেভিড জোনস দুজনেই তাদের ঘড়ির দিকে তাকাল।

জেনারেল হ্যামিল্টন বলল, 'আরো পরেও যাত্রা করলে পারি। তবু ঠিক আছে। আমাদেরকে ঘুরা পথেই যেতে হবে। সরকারী গোয়েন্দাদের নজর এড়াবার প্রয়োজন আছে।' বলে উঠে দাঁড়াল জেনারেল হ্যামিল্টন। উঠে দাঁড়াল সবাই।

'এই হ্যারি এই তো এলি, তাড়াহুড়ো করে আবার এক রাতে বেরুচ্ছিস কোথায়। শোন, কথা আছে।' বলল ন্যান্সি ময়নিহান।

ন্যান্সি ময়নিহান সিনেটর ও সিনেটর পররাষ্ট্র বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান দানিয়েল ময়নিহানের বড় মেয়ে। আর হ্যারি, মানে হ্যারি এডওয়ার্ড, দানিয়েল ময়নিহানের ছেলে। এবং একমাত্র ছেলে। ন্যান্সি ময়নিহান এবার ওয়াশিংটন ষ্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে গ্রাজুয়েট হয়েছে এবং হ্যারি এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্র।

বড় বোনের ডাকে থমকে দাঁড়ালো হ্যারি। ফিরলো বোনের দিকে। বলল, 'বাইরে বেরুচ্ছি না আপা। আব্বার স্টাডিতে যাচ্ছি। জরুরী। এসে তোমার কথা শুনব। ঠিক আছে।

'আব্বার স্টাডিতে এ সময়? রাত দুপুরে? ঠিক আছে, তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।' বরল ন্যান্সি ময়নিহান।

হ্যারি এডওয়ার্ড তার হাত ঘড়ির দিকে তাকাল। রাত ১২টার কিছু বেশি।

ঘড়ি দেখেই ছুটল আবার হ্যারি।

পটোম্যাক নদীর তীরে 'প্যাসেফিক ব্লু' এলাকায় দানিয়েল ময়নিহানের বিশাল বাড়ি।

বাড়িটা বাংলো সাইজের দুতলা। নদীর সমান্তরালে তৈরী।

বাড়িটা প্রধান গেট দুটি, একটা পটোম্যাকের দিকে, অন্যটি বিপরীত দিকে, উত্তর পাশে।

উত্তর পাশের গেটটাই ব্যবহার হয় বেশি। পাবলিক রোড থেকে লাল পাথরের একটা প্রাইভেট রাস্তা এসে স্পর্শ করেছে গেটকে।

দুপাশে দুটি বাড়িকে বলা যায় দুভাগে ভাগ করে ফেলেছে। ব্যবহারে দিক দিয়েও বাড়িটা বিভক্ত।

বাড়ির পুব অংশের দুতলায় থাকেন দানিয়েল ময়নিহান। আর তার স্টাডি ও রাজনৈতিক অফিসগুলো পুব অংশের নিচতলায়। বাড়ির পশ্চিম অংশের দুতলায় ছেলে-মেয়েদের বেড, স্টাডি, ইত্যাদি। আর এদিকের নিচতলায় কিচেন, স্টোর ধরনের এ্যাকোমোডেশন।

পুব দিকের এক তলায় মেনে হ্যারি সোজা চলে গেল তার আব্বার পি এ ফিলিফের কক্ষে।

ফিলিফ ছাড়া আর কোন স্টাফ নিচে নেই। সবাই বিদেয় হয়েছে এগারটার মধ্যেই।

বিশেষ বা গোপন কোন বৈঠক এখানে হলে সেটা রাত দশটার পরই হয়।

পিএ ফিলিফ ছাড়া নিঃশর্ত বিশ্বাস আর কারও উপর দানিয়েল ময়নিহানের নেই। কৃষ্ণাংগ ফিলিফের পরিবার পুরুষানুক্রমে ময়নিহানদের পরিবারে আছে। আগে ছিল ক্রীতদাস হিসাবে, এখন আছে স্টাফ হিসাবে।

ফিলিফের ঘরে ঢুকে হ্যারি ফিস ফিস করে বলল, 'আংকল, শ্যাবন সাহেবদের সাথে আব্বা কোথায় বসেছেন? স্টাডিতে না?

ফিলিফের চোখ বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে উঠল। বলল, 'শ্যারন সাহেবরা এসেছেন, এ কথা তোমাকে কে বলল?

কেন এই তো দশটার দিকে আব্বাকে টেলিফোন করল। তখনই আব্বা ইন্টারকমে আপনাকে বললো, জেনারেল শ্যারনরা আসবেন, কোন লেট নাইট কাজ হবে না। এগারটার মধ্যে সবই যেন চলে যায়।

বলে একটু থামল হ্যারি। বলল আবার, 'আমার খুব ইচ্ছা জেনারেল শ্যারণকে দেখার । কিন্তু আসতে দেরী করে ফেলেছি।'

হাসল ফিলিফ। বলল, 'স্যার, দেরী করে ফেলেছেন। ট্রেন মিস।'

তার মানে চলে গেছেন? বিশ্বাস হচ্ছে না। আপনি আমাকে ঠকাচ্ছেন।আমি দেখে আসি।' বলে ঘুরে দাঁড়াল হ্যারি।

'ঠিক আছে, একবার স্টাডি ঘুরে এস।'

হ্যারি ছুটে গেল স্টাডিতে। স্টাডিকক্ষ শূন্য। খালি চেয়ারগুলো খাঁ খাঁ করছে।

স্টাডিতে ছোট্ট একটা কনফারেন্স টেবিল আছে। দরজা দিয়ে ঢুকতে সামনেই সে টেবিল।

দরজা পা হয়ে ঘরে ঢুকতেই হঠাৎ হ্যারির নজরে পড়ে গেল সামনের চেয়ারের নিচে পড়ে থাকা একটা লাইটার। লাইটারটা সুন্দর, রিয়ার মডেলের। লাইটারটা তুলে নিল হ্যারি। উল্টে-পাল্টে দেখল লাইটারটা।

দেখতে গিয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল লাইটিং ম্যাকানিজমের সাথে সম্পর্কহীন একটা সুইচ। সুইচে চাপ দিল হ্যারি।

চাপ দেয়ার সাথে সাথে একটা ডাকনা সরে যাওয়ায় একটা কেবিন উন্মুক্ত হয়ে পড়ল। কেবিন থেকে ভ্রু কুঞ্চিত হলো কম্যুনিকেশন সাইন্সের ছাত্র হ্যারির। দেখল কেবিনে মাইক্রো রেকর্ডার সেট করা। রেকর্ডারটা তখনও কাজ করছে।

বুঝল হ্যারি, বৈঠকে যারা এসেছিলেন তাদেরই কেউ বৈঠকের প্রসেডিং গোপনে রেকর্ড করেছেন। এ  কথা মনে আসার সাথে সাথে খুশি হয়ে উঠল হ্যারি, এতে নিশ্চয় জেনারেল শ্যারনের কথাও পাওয়া যাবে।

হ্যারি এডওয়ার্ড লাইটারের কেবিনটা আবার বন্ধ করে পকেটে পুরল লাইটারটা। স্টাডি থেকে বেরিয়ে এল হ্যারি। দরজা থেকে বেরোতেই দেখা হলো ফিলিপের সাথে। ফিলিপ দ্রুত আসছে স্টাডির দিকে।

'কি ব্যাপার, আংকল?

'তুমি যাও, স্টাডিতে একটু কাজ আছে আমার।' বলে ফিলিপ দ্রুত ঢুকে গেল স্টাডিতে। এই লাইটারটিই কি?

কৌতূহলী হলো হ্যারি। ফিলিপ যদি লাইটারটাই খুঁজতে গিয়ে থাকে, তাহলে তো জানা যাবে কে লাইটারটার খোঁজ করেছিল এবং কে সেই লোক যে

বৈঠকের বিবরণ গোপনে রেকর্ড করেছিল। লোক কে জানা গেলে তার উদ্দেশ্যেও জানা যাবে। হ্যারি মনে মনে এ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, রেকর্ডে কি আছে না জেনে এটা ফেরত দেয়া যাবে না।

এসব ভেবে হ্যারি এডওয়ার্ড গিয়ে ফিলিপের কক্ষে বসল।

কমিনিট পরে হন্ত-দন্ত, হয়ে ফিরে এল ফিলিপ। ঘরে ঢুকে হ্যারিকে বসে থাকতে দেখে খুশি হয়ে বলল, 'ধন্যবাদ যে, তুমি এখনও আছ।'

থেকে একটা দম নিয়ে আবার বলল, 'হ্যারি ঘরে তুমি কোন লাইটার পড়ে থাকতে দেখেছে?

'লাইটার? লাইটার ওখানে পড়ে থাকবে কেন?

'হ্যাঁ। এখনি জেনারেল শ্যারন টেলিফোন করলেন। তার মনে হচ্ছে তার লাইটারটা তিনি স্টাডিতে ফেলে গেছেন। যদি পেয়ে যাই, তাহলে এখনি উনি এসে তা নিয়ে যাবেন।'

হো হো করে হেসে উঠল হ্যারি এডওয়ার্ড। বলল, 'একটা লাইটারের জন্যে তিনি টেলিফোন করেছেন। আবার এই রাতে সেই লাইটারটা তিনি নিতেও আসতে পারেন। আপনি হাসালেন আংকল।'

'লাইটারটা ওনার নাকি খুব শখের।' বলল ফিলিপ।

মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে এঠেছে হ্যারি। শ্যারন সম্পর্কে যা সে শুনেছে তার চেয়েও দেখা যাচ্ছে ভয়ংকর এই শ্যারন। তার আব্বা নিশ্চয় শ্যারনকে সরল বিশ্বাসে সাক্ষাতকার দিয়েছিলেন। তাঁর ইনফরমাল কথাবার্তা নিশ্চয় খুব খোলামেলা হয়েছে। এগুলোই রেকর্ড করেছিল সে। নিশ্চয় তার আব্বাকে তিনি ব্ল্যাকমেইল করতেন। ঈশ্বর রক্ষা করেছেন তার আব্বাকে।

এসব চিন্তা চেপে রেখে প্রকাশ্যে বলল সে সহাস্যে, 'তাহলে আংকল স্টাডিটা আরও একবার ভালো করে খুঁজে দেখুন। তাঁর যখন শখের জিনিস, তখন আরও একটু কষ্ট করুন। আমি যাই।

বলে উঠল হ্যারি।

উঠে এল দোতলায়।

ন্যান্সি সত্যিই অপেক্ষা করছিল।

হ্যারি আসতেই তাকে ধরল ন্যান্সি।

বোনের পাশে সোফায় বসেই সে বলে উঠল, ‘আপা একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে।’

‘থাক তোর সাংঘাতিক ঘটনা আগে বল, যা শুনেছি তা সত্যি কিনা?

‘কি শুনেছ?’

‘তুই নাকি ‘ফ্রি আমেরিকা’ মুভমেন্টের ওয়াশিংটন ষ্টেট ইউনিভার্সিটি শাখার সভাপতি হলি?’

‘আপা, এটা তোমার এমন করে জিজ্ঞেস করার মত কোন খবর? ‘বলিস কি তুই? ‘ফ্রি আমেরিকা’ মুভমেন্টে তুই কবে যোগ দিলি সেটাই তো জানি না। তার উপর একটা শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের তোর সভাপতি হবার মত খবর যখন আসে, তখন সেটা কি আমাদের জন্যে বড় খবর নয়?

‘এ খবরটা তোমাদেরকে কে দিল আপা?

‘সেটা দিয়ে তোর কি দরকার?

‘বরিস নিক্সন বলেছে, না?

‘হ্যা।

‘দেখ আপা বরিস তোমাকে কত ভালোবাসে, আমার কথা তোমাকে বলতে তার দেরী হয়নি, কিন্তু তোমার কথা আমাকে চার বছরেও সে বলেনি।’

‘আমার কোন কথা?’

‘তুমি চার বছর আগে ‘ফ্রি আমেরিকা’ এর সদস্য হওনি?’

হাসল ন্যান্সি। বলল, ‘হয়েছি। কিন্তু কাজ তো কিছু করি না। তাই বলে বেড়বার কিছু নেই।’

কথা শেষ করেই ন্যান্সি বলে, ‘আমি তোকে অভিনন্দিত করছি হ্যারি। তুই আমার ছোট ভাই বলে আমর গর্ব হচ্ছে। তুই যে দায়িত্ব পেয়েছিস তা তোর বয়সের চেয়ে বড়।

‘ধন্যবাদ আপা।’

‘ওয়েলকাম। এখন তোর সাংঘাতিক কথাটা বল।

হ্যারি পকেট থেকে বের করে লাইটারটা ন্যান্সির হাতে দিল। তারপর লাইটারের সব কাহিনী খুলে বলল জেনারেল শ্যারনের টেলিফোনের কথা সহ।'

লাইটারটা খুলে ন্যান্সিও দেখল।

গম্ভীর হয়ে উঠল তার মুখ। বলল, 'এই গোপন রেকর্ডই প্রমাণ করে এই রেকর্ডে আব্বার এমন কোন কথা আছে, যা জেনারেল শ্যারন কাজে লাগাতে পারে। তার মধ্যে, তুই ঠিকই বলেছিস, ব্ল্যাকমেইল করাটাই বড়।'

'তাহলে তো দেখতে হয় এতে কি আছে?' হ্যারি বলল।

দেখতে হবে এবং এখনি?'

'তাহলে চল আমার স্টাডিতে। আমার মাস্টার রেকর্ড প্লেয়ারে সব ধরনের ক্যাসেট সেট করা যায়।' বলল হ্যারি।

বলেই উঠে দাঁড়াল সে। ন্যান্সিও উঠল। ক্ষুদ্র ক্যাসিটটি রেকর্ড প্লেয়ারে চড়িয়ে ন্যান্সি হ্যারি দুজনে দুটি চেয়ার নিয়ে রেকর্ড প্লেয়ারের সামনে বসল। দুজনের মুখেই একটা হাল্কা হাসি। টেপে রেকর্ড হয়েছে একদম শুরু থেকেই।

তার পিতা জেনারেল শ্যারনদেরকে স্বাগত জানাল। সম্ভাষণ বিনিময়রে পর অতিথিরা তাদের পরিচয় জানাল। জেনারেল শ্যারন ও ডেভিড উইলিয়াম জোনস নিজেদের পরিচয় দিল। জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন নিজের পরিচয় দিতে শুরু করলে সবাই হেসে উঠল। বলল, না আপনাকে আমরা দেখিনি এবং চিনিও না।

পরিচয় পর্ব শেষ হলে কথা শুরু করল ন্যান্সিদের আব্বা দানিয়েল ময়নিহান। বলল, মি. শ্যারন ও মি. জোনস, আমি মি. হ্যামিল্টনের কাছ থেকে সব শুনেছি, তবু আপনাদের কাছ থেকে আরো ভাল করে জানতে চাই আমাদের এ্যাডামস হ্যারিসন-সরকারের বিরুদ্ধে প্রকৃতপক্ষে অভিযোগটা কি। তাহলে প্রতিকারের পথটাও সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। সরকারকে সংশোধন করার পথ অবশ্যই আছে। প্রেসিডেন্টের ইমপিচমেন্ট সর্বশেষ একটা পদক্ষেপ। একটা কথা আমাদের সবাইকেই জানতে হবে, প্রেসিডেন্ট রিপাবলিকান দল থেকে নির্বাচিত। কিন্তু তিনি প্রেসিডেন্ট গোটা দেশের। তাঁর সুনাম দেশের মর্যদা বাড়ায়, আমাদের ডেমোক্র্যাটদেরও। আবার তাঁর অন্যায় যেমন দেশকে আহত করে, তেমনি

আমাদেরকেও! সুতরাং তার ভাল কাজের জন্যে বাহবা সব সময় না দিলেও, তাঁর অন্যায় আমরা এক মুহূর্তও বরদাশত করতে রাজী নই।

দানিয়েল ময়নিহান থামলে কথা বলে উঠল শ্যারন। সে দানিয়েল ময়নিহানকে ধন্যবাদ দিয়ে শুরু করল। এক নাগাড়ে দীর্ঘ বিশ মিনিট কথা বলল, জেনারেল শ্যারন। তার দীর্ঘ কথার সমাপ্তি টানতে গিয়ে বলল, 'মৌলবাদী সন্ত্রাসী নেতা আহমদ মুসা এভাবে আমাদের বিরুদ্ধে অমূলক একটা অভিযোগ আবিস্কার করে এবং অদ্ভুত কৌশলে রক্তক্ষয়ী ও ধ্বংসাত্মক ঘটনা একের পর এক সৃষ্টি করে তার দায় ইহুদী কম্যুনিটির উপর চাপিয়ে দিয়ে দেশে একটা বড় ধরনের বিভেদ সংঘাত সৃষ্টি করতে চায়। সে চায় আমেরিকাকে দুর্বল করে ও তার আকাশস্পর্শী ইমেজকে ধ্বংস করে দিয়ে আমেরিকার বিশ্ব নেতৃত্বের আসন ও তার নতুন বিশ্ব গড়ার মহান স্বপ্নকে বানচাল করতে। শৃগালের মত ধূর্ত আহমদ মুসা সম্মোহিত করেছে প্রেসিডেন্টকে, সম্মোহিত করেছে সশস্ত্র বাহিনী প্রধান, সি আই এ চীফ এফ বি আই প্রধানকে। আহমদ মুসাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দিতে এগিয়ে এসেছে ইহুদী বিদ্বেষী 'ফ্রি আমেরিকা' মুভমেন্ট। টাকার অংকে বিক্রি হয়ে গেছে গোল্ড ওয়াটারের 'হোয়াইট ঈগল'ও। এই অবস্থায় দেশের মান, ইজ্জত ও ভবিষ্যত রক্ষার জন্যে আপনাদের মত রাজনীতিককেই এগিয়ে আসতে হবে।' থামল জেনারেল শ্যারন।

এরপর আলোচনা শুরু হলো।

অনেক প্রশ্ন, অনেক উত্তর অনেক মন্তব্য ও পর্যালোচনা-পরামর্শের বিবরণ দিয়ে চলল ক্যাসেটের মাইক্রোটেপটি।

ন্যান্সি ও হ্যারি হালকা হাসির মধ্য দিয়ে টেপের বিবরণ শোনা শুরু করেছিল। কিন্তু হাসি তাদের এখন উবে গেছে। তারা এখন স্তম্ভিত, আতংকিত, রুদ্ধবাক প্রায়! জেনারেল শ্যারন শুধু আহমদ মুসার বিরুদ্ধে বিষোদগার নয়, 'ফ্রি আমেরিকা' ও 'হোয়াইট ঈগল' এর বদনামই শুধু নয়, গোটা আমেরিকান মিশনকেই সে বিকৃত করছে এবং এমন সব কথা বলেছে যা পরিস্কার রাজনৈতিক ঘুষের পর্যায়ে পড়ে। জেনারেল শ্যারন তার কথা শেষ করল এভাবে, 'সব শেষ আমি এইভাবে বলতে চাই, আমাদের উভয় পক্ষের বেনিফিটের জন্যে আমরা

পারস্পরিক সহযোগিতার আবেদন করছি। আপনি মি. দানিয়েল ময়নিহান ও এ্যান্ড্রি জ্যাকবস আপনাদের কমিটিগুলোকে ম্যানেজ করাসহ সিনেট চীফ চার্লস ডব্লিউ ওয়ারনার, হাউজ চীফ জন জে, রিচার্ডসন, সিনেট ইন্টিলিজেন্স স্পেশাল কমিটির চীফ আনা প্যাট্রেসিয়া এবং ফরেন রিলেশন্স সিনেট স্ট্যান্ডিং কমিটির চীফ বব এইচ ব্রুসকে আমাদের পক্ষে এনে দিতে হবে। যাতে প্রেসিডেন্টকে রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করা যায়, যাতে প্রয়োজনে তাকে ইমপিচ করার জন্যে প্রয়োজনীয় সদস্য যোগাড় সহজ হয়। আমাদের লাভ হবে আমরা ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের হাত থেকে রক্ষা পাব। আর আপনাদের লাভ হবে, আগামী নির্বাচন আপনাদের হবে। এর জন্যে যা কিছু করার, যত অর্থের প্রয়োজন হয় তার ব্যবস্থা আমরা করব। গ্যারান্টি হিসাবে ব্যাংক সার্টিফিকেটসহ তিনটি সাইন্ড ব্ল্যাংক চেক রেখে যাচ্ছি।'

টেপের বিবরণ শেষ হয়ে গেলে দানিয়েল ময়নিহানের কথার মাধ্যমে। সে বলল, 'আমাদের লাভের প্রশ্ন থাক, গ্যারান্টি, সিকুইরিটির প্রশ্ন ওঠে না। আপনাদের বিপদটা আমাদেরও বিপদ। সরকার যদি ভুল করে তার মাসুল জনগণকেই দিতে হবে। সর্বাত্মক সহযোগিতার ব্যাপারে নীতিগতভাবে আমরা একমত।' টেপের কথা শেষ হলো।

ক্যাসেট প্লেয়ার ক্লোজ করল হ্যারি। দুজনেই কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে বসে রইল।

নিরবতা ভাঙল ন্যান্সি। বলল, 'ওরা একটা বড় ঘটনা ঘটাতে যাচ্ছে, হ্যারি।'

'সে ঘটনার সাথে জড়িত করছে আব্বাকে।' হ্যারি বলল।

'হ্যাঁ তাই। আমরা প্রকৃত ঘটনার খুব অল্পই জানি। আব্বা তো কিছুই জানেন না। সুতরাং তিনি ওদের কথা বিশ্বাস করবেন সেটাই স্বাভাবিক।' বলল ন্যান্সি।

'ঘটনা সম্পর্কে তোমার ব্যাখ্যা কি আপা? আমাকে শুধু এইটুকু বলা হয়েছে। আহমদ মুসা এখন আর আমাদের শত্রু নয়, বন্ধু। সে আমেরিকানদের যে উপকার করেছে তার পরিমাপ করা যাবে না। আর প্রমাণ হয়েছে ইহুদীদের

একটা গ্রুপ আমাদের  জাতীয় শত্রু। শীঘ্রই এটা আদালতে প্রমাণ হবে।’ হ্যারি বলল।

‘তুমি ঠিকই শুনেছ হ্যারি। জাতির জরুরী প্রয়োজনেই ‘ফ্রি আমেরিকা’ আহমদ মুসাকে সহযোগিতা দিচ্ছে এবং তার সহযোগিতা নিচ্ছে। ঠিক এই একই কারণেই কিন্তু হোয়াইট ঈগলও আহমদ মুসাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছে। অথচ দেখ, এই আহমদ মুসাকে হোয়াইট ঈগলই কিডন্যাপ করে আমেরিকায় আনে প্রতিশোধ নেবার জন্যে।’ বলল ন্যান্সি।

‘আরেকটা বিষয় আপা, ঘুষ হিসাবে তাদের ব্ল্যাংক চেক অফার করা প্রমাণ করে ইহুদীবাদীরা কি ধরনের বিপদে পড়েছে। তাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ যদি মিথ্যা হতো, তাহলে এভাবে পেছন দরজা দিয়ে সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদের সদস্যদের হাত করার চেষ্টা না করে তারা আইনি মোকাবিলায় নামতো।’ হ্যারি বলল।

‘এখন কি করা যায় বলত। এই টেপ কিন্তু একটা সাংঘাতিক দলিল।’ বলল ন্যান্সি।

‘আমার মনে হয় টেপটা দুলাভাইয়ের হাতে পৌছে দাও। উনি ওটা মুভমেন্টের নেতাদের কাছে পৌছে দেবেন।’

ন্যান্সির চোখে-মুখে ফুটে উঠল কৃত্রিম ক্রোধ। সে হ্যারির পিঠে একটা কিল দিয়ে বলল, ‘সিরিয়াস বিষয়ের মধ্যে ইয়ার্কি কেন?’

‘দুটোই সিরিয়াস। ওটা দেশের জন্যে, আর এটা তোমার জন্যে।’ দম নিয়েই আবার শুরু করল, ‘বরিসকে কি টেলিফোন করবি?’

‘টেলিফোন কেন?’

‘ও এসে টেপটা নিয়ে যাক।’

‘ঠিক বলেছ আপা, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটা ঠিক জায়গায় পৌছে দেয়াই উচিত হবে।’

‘তাহলে টেলিফোন করি।’

‘হ্যা, ডাক তাকে আপা। তবে আপা, রথ দেখার সাথে সাথে কলা বেচার মতলব করছ না তো?’ আবার ন্যান্সি বড় ধরনের কিল তুলল হ্যারির পিঠ লক্ষ্যে।

দেখে লাফ দিয়ে ছুটে পালাল হ্যারি।

ন্যান্সি ক্যাসেট প্লেয়ার থেকে ক্যাসেটটা খুলে হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল মোবাইলটা নেয়াজেন্যে।

‘আপা, আমি শুতে গেলাম।’

‘কেন, ও আসুক। টেপটা উদ্ধার করার কৃতিত্ব তো তোরই।’

‘না আপা, বোন ও হবু দুলাভাইয়ের আসরে শালারা সব সময় আওয়ান্টেড। আর ও কৃতিত্বটা তোমাকেই দিয়ে গেলাম। ‘কই’ খাওয়া আর ‘বিল সেচা’র লোক সব সময় আলাদাই থাকে আপা। গুড নাইট।’

বলে হ্যারি হাসতে হাসতে ছুটে চলে গেল তার শোবার ঘরের দিকে।

হ্যারির এ স্টাডি রুমের ওপাশে তার শোবার ঘর। হ্যারি ও ন্যান্সির শোবার ঘরের মাঝখানে স্টাডি রুম ও বসার ঘরের ব্যবধান।

ন্যান্সি হ্যারির স্টাডি রুম থেকে বেরিয়ে পাশেই বসার ঘরে গিয়ে বসল।

টেলিফোন করল বরিস নিক্সনকে। পেল তাকে। টেপের কথা শুনে লাফিয়ে উঠল সে। বলল, ‘রাতে আসতে পারবো না মানে? এর জন্যে এ মুহূর্তে চাঁদে যাত্রা করতেও বললেও আমি রাজি। তার উপর ন্যাশনাল ইন্টারেষ্টের বাইরে এখানে একটা পার্সোনাল ইন্টারেষ্ট ও আছে।’

‘পার্সোনাল ইন্টারেষ্টকে পাশে রাখতে চাও? এটাই বোধ হয় তোমার দেশপ্রেম।?’

‘দেখ, দেশপ্রেম কাউকে বৈরাগী হতে বলে না। ও, কে। আসছি। বাই।’

বলে ওপাশে টেলিফোন রেখে দিল বরিস নিক্সন।

ন্যান্সিও মোবাইলটা রেখে দিয়ে সোফায় গা এলিয়ে দিল। কমপক্ষে বিশ মিনিট তাকে অপেক্ষা করতে হবে বরিসের জন্যে।

‘বিশ মিনিট’ কেন বিশ ঘন্টাও ওর জন্যে অপেক্ষা করতে তার একটুকুও ক্লান্তি আসবে না।

ন্যান্সি কেমন করে অস্বীকার করবে যে, বরিসকে কাল সকালে ডাকলেও চলত, কিন্তু একটা উপলক্ষ যখন পেয়েছে তখন বরিসকে কাছে পেতে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে তার মন চায়নি।

বরিস আসছে এই চিন্তা ন্যান্সির হৃদয় মনকে সজীব করে দিয়েছে।

হাসল ন্যান্সি। সে বরিসকে পার্সোনাল ইন্টারেস্টের জন্যে অভিযুক্ত করল। কিন্তু তার চাওয়া কি বরিসের চেয়ে কম? বরিসরা যা খোলামেলা বলে। ন্যান্সিরা তা চেপে থাকে এটাই মাত্র পার্থক্য।

নিচ থেকে একটা গাড়ির হর্ন বেজে উঠল।

চিনতে ন্যান্সির কষ্ট হলো না বরিসের গাড়ির হর্ণ।

উঠে দাঁড়িয়ে ন্যান্সি ছুটল সিঁড়ির দিকে বরিসকে নিয়ে আসার জন্যে।

ন্যান্সি ময়নিহান যখন চোখ খুলল, প্রথমেই চোখ পড়ল তার ডাক্তারের উপর। পাশেই দেখল তার আব্বা-আম্মাকে। দেখে চমকে উঠল। বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত তাদের চেহারা। আর এক দফা সে চমকে উঠল তার ঘরের দরজার বাইরে পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে।

মনে হচ্ছে কিছু ঘটেছে। কি ঘটেছে? লাফ দিয়ে উঠে বসল সে। কিছুই বুঝতে পাছে না সে। বরিসকে বিদায় দিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম তার ভাল হয়েছে। কিন্তু শরীল খুব দুর্বল লাগছে। কিন্তু তার পাশে ডাক্তার কেন?

উঠে বসেই ন্যান্সি তার পিতার দিকে চেয়ে বলল, ‘কিছু বুঝতে পারছি না আব্বা। কি হয়েছে? পুলিশ কেন? ডাক্তার কেন?

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলল ন্যান্সি।

ন্যান্সির আব্বা দানিয়েল ময়নিহান কোন উত্তর দিল না। তার মুখে গাম্ভীর্য যেন আরও গভীর হলো।

কেঁদে উঠল ন্যান্সির আম্মা।

সে এসে জড়িয়ে ধরল ন্যান্সিকে। বলল কান্না চাপার চেষ্টা করে, ‘সর্বনাশ হয়েছে মা। হ্যারিকে কেউ কিডন্যাপ করেছে, খুন হয়েছে ফিলিফ।’

‘হ্যারি কিডন্যাপ হয়েছে? ফিলিফ আংকল খুন হয়েছেন? চিৎকার করে উঠল ন্যান্সি। তড়িতাহতের মতই কেঁপে উঠল ন্যান্সি গোটা শরীল,

মাইক্রোটেপের কথা মনে পড়ে গেছে তার। ন্যান্সির গোটা সত্তা জুড়ে একটা চিৎকার উঠল। জেনারেল শ্যারনরা তাহলে ঐ টেপের জন্যে কিডন্যাপ করল হ্যারিকে? খুন করল ফিলিফকে?

সমগ্র স্নায়ুতন্ত্রে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত এই চিৎকার ন্যান্সির মুখ-ফেঁড়ে বেরিয়ে আসছিল। বহুকষ্টে তা রোধ করল ন্যান্সি।

চিৎকার রোধ হলো, কিন্তু সেই চিৎকার অসহায় কান্নার প্রবল বেগ নিয়ে বেরিয়ে এল ন্যান্সির ভেতর থেকে। ন্যান্সি কেঁদে উঠল তার মাকে জড়িয়ে ধরে।

ন্যান্সি সংগা ফিরে পাওয়ায় ডাক্তার বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। তার আব্বাও চলে গেল পুলিশের সাথে কথা বলতে বলতে।

ন্যান্সির আম্মা চোখ মুছে বলল, ‘তোকে নিয়েও আমরা মহাচিন্তায় পড়েছিলাম। তোর সংগা ফিরতেই সবচেয়ে বেশি দেরী হলো। ডাক্তার বলেছিল, নির্দিষ্ট সময়ে সংগা না ফিরলে বা সংগা ফেরাতে না পারলে জীবনহানিও ঘটে।

‘তার মানে তোমারও সংগা হারিয়েছিলে? কেন? কিভাবে? তাহলে কি ওরা ....।’

কথা শেষ না করেই থেমে গেল ন্যান্সি।

‘হ্যাঁ মা, খুনিরা এক বিশেষ ধরনের ক্লোরোফরম স্প্রে করে সবাইকে ঘুমিয়ে রেখে নিরাপদে কাজ সেরে গেছে।’

‘গেটের সিকিউরিটিরা কোথায়?’

‘তারাও সংগা হারিয়েছিল। কিন্তু তারাই প্রথম সংগা ফিরে পায়। ওরা বাইরে ছিল বলে ক্লোরোফরম ওদের উপর খুব গভীর ক্রিয়া করতে পারেনি। ওদের সংগা ফের পর ওরাই পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ এসে আমাদের ও তোদের ঘরের দরজা খোলে এবং ডাক্তারও ডাকে তারাই। ডাক্তার বলেছে, আমাদের ও তোর ঘর খুলে দিতে আরও দেরী হলে আমাদের জীবনহানি ঘটতে পারতো।’

বলে একটু থেমেই আবার কেঁদে উঠল। বলল, ‘হ্যারির ঘরে রক্ত দেখা গেছে। নিশ্চয় তাকে খুনিরা মারধোর করেছে। আমার সোনামনি বেঁচে.....।’

কথা শেষ করতে পারলো না ন্যান্সির মা। কান্নায় ভেঙে পড়ল সে।

কথা শেষ না করলেও ন্যান্সি বুঝল তার মা কি আশংকা করছে। ন্যান্সি ভেতরটা থর থর করে কেঁপে উঠল। কিন্তু এবার কান্নার বদলে ন্যান্সির মধ্যে হ্যারির জন্য প্রচন্ড ভয় ও উদ্বেগের সৃষ্টি হলো এবং জেগে উঠল তার মধ্যে কিছু করার প্রেরণা। ন্যান্সি এতটুকু বুঝল, ফিলিফের মত হ্যারিকে খুন না করে ওরা ওকে কিডন্যাপ করেছে এবং তাকে কিডন্যাপ করেছে ওরা টেপের জন্যেই।

আবার বুকটা কেঁপে উঠল ন্যান্সির। টেপ তো তার কাছে পায়নি, পাবে না। না পেলে কি খুন করবে ওরা হ্যারিকে?

আতংক ও উদ্বেগে ভেতরটা যেন কাঠ হয়ে উঠতে চাচ্ছে তার। ভাবল, টেপের খবর বলবে কি সে তার পিতাকে, পুলিশকে? তাহলে তো বলতে হবে বরিস নিক্সনদের কথা। কিন্তু তাতে কি লাভ হবে? টেপ ফেরত পেলেও সে টেপ কি পুলিশ দেবে শ্যারনদেরকে? দেবে না। তাহলে ফলই একই হচ্ছে।

এসব চিন্তা করতে গিয়ে ন্যান্সির মনে হলো, এই ঘটনার কথা এখন তার বরিসকে জানানো দরকার। হ্যারিকে উদ্ধার করার ক্ষেত্রে পুলিশের চেয়ে ফেম'ই (Free America) বেশি কার্যকরী হবে।

এ চিন্তার সাথে সাথেই ন্যান্সি উঠে দাঁড়াল। বলল, 'চল মা, 'হ্যারির ঘরটা একটু দেখব। কয়জন বন্ধু বান্ধবকে টেলিফোন করব। পুলিশ তার খোঁজ করবে, সাথে সাথে আমাদেরও কিছু করতে হবে মা।' বলে সে নেমে এল বেড থেকে।

তার মাও উঠল।

হ্যারির ঘর দেখে আঁৎকে উঠল ন্যান্সি। গোটা ঘর লন্ড-ভন্ড। ড্রয়ার, সেল্ফ, বেড কিছুই আস্ত নেই। ঘরের প্রতিটি ইঞ্চি জায়গা তছনছ করেছে কেউ। ন্যান্সির বুঝতে বাকি রইল না। ওরা এভাবে টেপটাই খুঁজেছে।

ন্যান্সি ফিরল মায়ের দিকে। বলল, 'হ্যারির স্টাডি'র দিকে তো খেয়াল করলাম না। ওটারও কি এই অবস্থা আম্মা?'

'হ্যাঁ, মা, স্টাডিরও কোন জিনিস আস্ত নেই। কম্পিউটার, আলমারি, সেলফ, বই-পুস্তক সব কিছুই ছড়ানো-ছিটানো। পুলিশ বলছে, খুনিরা কিছু একটা

খোঁজ করেছে। পরে সে জিনিসসহ হ্যারিকে তারা কিডন্যাপ করেছে। অথবা সে জিনিস না পেয়ে হ্যারিকেই নিয়ে গেছে।'

একটু থেমে আবার বলল, ন্যান্সির মা, 'পুলিশ আরও বলছে, 'জিনিসটা না পেয়ে হ্যারিকে ওরা নিয়ে গেছে। কিন্তু জিনিসটা পেলে হ্যারিকে হয়তো তারা ফিলিপের মতই খুন করে রেখে যেত।'

নিজেকে সামলে নিয়ে চোখ মুছে আবার সে বলল, 'কিন্তু ফিলিফকে হত্যার সাথে হ্যারির কিডন্যাপ হওয়ার বিষয়টাকে মিলাতে পারছে না পুলিশ। তবে অনুমান করছে, যে জিনিসের সন্ধানে খুনিরা হ্যারির কাছে এসেছিল সে জিনিসের কথা ফিলিপও জানত। ফিলিপকে ওরা হত্যা করেছে বুকে গুলী করে। কিন্তু তার আগে তাকে নির্যাতন করেছে। মুখেই তার আঘাত বেশি। পুলিশ মনে করছে তাকে কিছু বালানোর চেষ্টা করা হয়েছে। সম্ভবত কথা আদায় করার পর তাকে হত্যা করা হয়েছে। সেখান থেকেই খুনিরা এসেছে হ্যারির ঘরে।'

ন্যান্সি মনে মনে পুলিশের অনুমানের প্রশংসা করল। তাদের অনুমানের প্রতিটা বর্ন সত্য। ফিলিপের কাছে শ্যারনের লোকরা এসেছিল টেপের খোঁজ করতে। তার কাছ থেকেই জানতে পারে মিটিং- এর পর প্রথমে হ্যারিই সেখানে যায়। সুতরাং তারা ধরে নেয়, টেপটা যখন ফিলিপের কাছে নেই, তখন নিশ্চয় সেটা হ্যারিই প্রথমে গিয়ে খুঁজে পেয়েছে।

'কি ভাবছিস ন্যান্সি?' ন্যান্সিকে গম্ভীর হয়ে যেতে দেখে বলল তার মা।

'আম্মা আমি ভাবছি, কিছু করার কথা। যাই কয়েকটা টেলিফোন করে নেই।' বলে ন্যান্সি হ্যারির ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

নিজের ঘরে ফিরে ন্যান্সি টেলিফোন করল বরিস নিক্সনকে। প্রথম চেষ্টাতেই পেলো বরিসকে। বরিসকে জানাল সব ঘটনা ন্যান্সি। কাঁদল অনেক।

ওপার থেকে বরিস ন্যান্সিকে সান্তবনা দিয়ে বলল, 'কেঁদো না ন্যান্সি। তুমি এবং হ্যারি দেশের অমূল্য উপকার করেছ। ঈশ্বর হ্যারিকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। আমি এখনি চীফকে এটা জানিয়ে দিচ্ছি। FBI বিষয়টা এখনি জেনে যাবেন। পুলিশ যা করছে করুক, ওদিক থেকে উদ্ধার প্রচেষ্টা এখনি শুরু হয়ে যাবে।'

ন্যান্সি কিংবা বরিস কেউই টেপ-এর প্রসংগ তাদের কথায় আনল না। ‘ফ্রি আমেরিকা’ মুভমেন্টের নামও নয়। তারা সতর্ক যে, ন্যান্সিদের টেলিফোনে এখন আড়ি পাতা হবে জেনারেল শ্যারণদের পক্ষ থেকে তোব বটেই, পুলিশের পক্ষ থেকেও আড়িপাতা হতে পারে।

বরিসের কথা শেষ হলে ন্যান্সি বলল, ‘যা কিছু করার বরিস তাড়াতাড়ি করতে হবে। আব্বা-আম্মা খুবই ভেঙ্গে পড়েছেন।’

‘খুবই স্বাভাবিক। চিন্তা করো না। ঈশ্বর আছেন। তোমার সাথে আমার দেখা হওয়ার দরকার।’ বলল বরিস।

‘আমিও চাই। তুমি এস এখানে, আব্বাদের সাথেও কথা বলবে।’ ন্যান্সি বলল।

‘ঠিক আছে। আসব।’

‘কখন?’

‘দেখি হ্যারির ব্যাপারটা সবার সাথে আলোচনা করি। তার ব্যাপারে দ্রুত কিছু একটা করতে হবে। আজ সন্ধ্যার দিকে চেষ্টা করব।’ বলল বরিস।

‘ধন্যবাদ, আমাকে টেলিফোন করো।’ ন্যান্সি বলল।

‘ঠিক আছে। ওকে। বাই’ বলল বরিস।

‘বাই।’ বলে ন্যান্সিও টেলিফোন রেখে দিল।

টেলিফোন সেরে হ্যারির ঘরে দিকে আসতেই হ্যারির স্টাডির সামনে ন্যান্সির দেখা হলো তার আব্বা দানিয়েল ময়নিহানের সাথে।

‘আব্বা, বরিসকে টেলিফোন করেছিলাম। আসতে বললাম। সন্ধ্যায় আসবে। হ্যারিকে খুব স্নেহ করে সে। গত রাতেও এসেছিল। সবারই সাহায্য আমাদের দরকার আব্বা।’

বরিসের নাম শুনে ভ্রু কুঞ্চিত হলো ন্যান্সির আব্বা দানিয়েল ময়নিহানের। বলল, ‘হ্যাঁ দেখেছি তাকে। প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা উপদেষ্টার পি, এস ছেলেটাতো?’

বলে একটু থামল। ভাবল বোধ হয় একটু। তারপর বলল, ‘এস মা, তোমার সাথে একটু কথা বলি।’

বলে দানিয়েল ময়নিহান এগুলো সামনের বসার ঘরটার দিকে। দানিয়েল ময়নিহান ও ন্যান্সি সোফায় পাশাপাশি বসল।

দানিয়েল ময়নিহানের মুখ বিষন্ন। বেদনাক্লিষ্ট তার চোখের দৃষ্টি। ধীরে ধীরে বলল, 'কিছুক্ষণ আগে আমার এক গুরুত্বপূর্ণ বন্ধু আমাকে টেলিফোনে বলল যে 'ফ্রি আমেরিকা' (ফ্রেম) মুভমেন্ট এবং সরকারের প্রভাবশালী অংশ আমাকে ইহুদীপন্থী বলে মনে করে। বর্তমানে কয়েকটা ঘটনা নিয়ে সরকার ও 'ফ্রেম' ইহুদীদের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হয়েছে। এ নিয়ে খুব শীঘ্রই প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেটে শক্তির লড়াই হতে যাচ্ছে। পারিবারিক সংকট ও চাপে পড়ে যাতে আমি ঐ লড়াইতে কোন ভূমিকা না রাখতে পারি তারই একটা কৌশল হিসাবে এই ঘটনা ঘটানো হতে পারে। সেই আমাকে প্রথমে জানাল, গত রাত ১২টার পর বরিস নিক্সন আমার বাসায় এসেছিল। আর বরিস নিক্সনের সাথে 'ফ্রেম' (ফি আমেরিকা মুভমেন্ট)- এর খুব গভীর সম্পর্ক আছে।'

দানিয়েল ময়নিহান কথাগুলো বলে একটা দম নিয়ে পুনরায় বলল, 'এই মুহূর্তে ভেতরের দৃশ্যপট যে রকম সংঘাত-মুখর তাতে আমার বন্ধুর কথাগুলো শুনেই ন্যান্সি বুঝল তার পিতার এই বন্ধু নিশ্চয় জেনারেল শ্যারন হবেন। সে বিস্মিত ও আতংকিত বোধ করল যে, জেনারেল শ্যারনরা কিভাবে কত দ্রুত কাহিনী সৃষ্টি করতে পারে। সে বিস্মিত হলো এই ভেবেও যে, বরিস এখানে পাহারা বসিয়েছিল, না পুলিশের কাছ থেকে ওরা জেনেছে। পুলিশ নিশ্চয় গেটের লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছে এবং নিশ্চয় ওরা জানতে পেরেছে বরিস এখানে এসেছিল। পুলিশের কাছ থেকেও শ্যারনরা এই তথ্য জানতে পারে। পুলিশের মধ্যে ওদের প্রচুর লোক আছে।

এসব চিন্তা করে ন্যান্সি ভাবল, টেপের কথা, বরিসকে টেপ দেয়ার কথা তার আব্বাকে এখন বলা ঠিক হবে না। টেপ 'ফ্রি আমেরিকা' মুভমেন্টের হাতে দেয়ার ব্যাপার তার আব্বা মেনে নেবেন না। তাছাড়া টেপ হস্তান্তরের এই কথা তার আব্বার মাধ্যমে জেনারেল শ্যারনদের কানে চলে যেতে পারে। তাতে বরিসেরও বিপদ ঘটতে পারে। আবার ভাবল ন্যান্সি, টেপের ব্যাপারটা হ্যারির কাছ থেকেও শ্যারনরা জেনে নিতে পারে এবং এজন্যেই তাকে কিডন্যাপ

করেছে। পরক্ষণেই তার মনে একটা আশা জাগল যে, হ্যারি টেপ পেয়েছে এটা ফিলিফও জানত না। সুতরাং ফিলিফ তাদেরকে একথা বলতেও পারেনি। অতএব হ্যারিকে তারা ধরে নিয়ে গেছে সন্দেহ বশতই। আর হ্যারি মুখ না খুললে তাদের সন্দেহ সন্দেহই থেকে যাবে। নিছক সন্দেহ থেকেই কি তারা হ্যারিকে খুন করতে পারে!'

চিন্তা হয়তো ন্যান্সির আরও সামনে গড়াত। কিন্তু তার আব্বার কথায় তার চিন্তার সূত্রটা কেটে গেল। তার আব্বা বলছিল, 'কি মা কিছু বলছ না যে?'

'ভাবছিলাম আব্বা'

'কি ভাবছিলে?'

'প্রকৃত ঘটনা জানা না থাকলে কত অমূলক সন্দেহ মানুষ করে।'

'কি রকম? বলল ন্যান্সির আব্বা দানিয়েল ময়নিহান।

'আব্বা ঘটনা হলো, বরিস নিক্সন এদিক দিয়ে যাচ্ছিল, আমিই ডেকে তাকে বাড়িতে নিয়ে এসেছিলাম। হ্যারিও ছিল আর আব্বা, বরিস আমাদের ফিলিফ আংকলকে চেনেই না। তাকে খুন করতে যাবে কেন সে? গেটের নিরাপত্তা প্রহরীদের কাছে আপনি নিশ্চয় শুনেছেন এবং পুলিশও বলেছে, খুনিদের প্রথম টার্গেট ছিল ফিলিফ। সেখান থেকে এসেছে হ্যারির এখানে। আপনার বন্ধুর কথা সত্য হলে আব্বা, তাদের আক্রমণের শিকার আমরা হতাম, ফিলিফ নয় এবং ঐ কথা সত্য হলে ফিলিফ হত্যার কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। আব্বা, আর এই হত্যার দায় যদি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আপনার উপর চাপাতে চাইত আপনাকে বিপদে ফেলার জন্যে তাহলে খুনিরা হ্যারিকে কিডন্যাপ করতো না এবং সকলকে সংগাহীনও করতো না।

'তোমার কথার যুক্তি আছে মা। তাহলে এই খুন ও কিডন্যাপের মটিভ কি, কারা খুন করেছে?'

'আমার বিশ্বাস আব্বা, খুব শীঘ্রই তা জানা যাবে এবং খুনিরাও চিহ্নিত হবে।'

'এত নিশ্চিত করে বলছ কি করে মা?'

'আমার মন বলছে আব্বা'

ন্যান্সি থামলেও ন্যান্সির আব্বা সংগে সংগে কিছু বলল না। ভাবছিল। একটু পর বলল, 'তবু সব কিছু পরিস্কার হওয়ার আগে বরিসকে এখানে আসতে নিষেধ করো মা। আমি চাই না এনিয়ে কোন কথা উঠুক এবং তুমি তাতে জড়িয়ে যাও।'

'ঠিক আছে আব্বা তাকে বলে দিচ্ছি। কিন্তু আমি তার সাহায্য চেয়েছি। আপনি জেনেছেন সে 'ফ্রি আমেরিকা' মুভমেন্টের সাথে আছে। হ্যারিকে উদ্ধার করার ব্যাপারে তারা কিছু করতে পারে।'

'কেউ যদি সাহায্য করে আমাদের আপত্তি থাকবে কেন? কিন্তু ' ফ্রি আমেরিকা' এটা করছে, তা বলার দরকার নেই। একটা কথা তোমাকে বলি মা, ভেতরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভাল নয়। প্রেসিডেন্ট এবং তার প্রশাসন একজন কুখ্যাত মৌলবাদীকে রক্ষা করার জন্যে ইহুদীদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছে। এটা আমেরিকার স্বার্থের পরিপন্থী। আমেরিকার এই স্বার্থ বিরোধী কাজে প্রেসিডেন্টকে যারা সাহায্য করছে তাদের মধ্যে 'ফ্রি আমেরিকা' মুভমেন্টও রয়েছে। সুতরাং 'ফ্রি আমেরিকা' মুভমেন্ট বা তার কোন লোকের সংস্পর্শে যাওয়া আমাদের ঠিক হবে না। যেহেতু দেশের প্রতি আমার একটা বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে তাই দেশের স্বার্থেই আমাকে প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে যেতে হচ্ছে। এ সময় 'ফ্রি আমেরিকার' সাথে আমাদের কোন প্রকার সংশ্লিষ্টতা আমার রাজনীতির ক্ষতি করবে।'

ন্যান্সি বুঝল, তার পিতা তার রাজনীতিকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। প্রকৃত ব্যাপার তার আব্বাকে বুঝাতে চেষ্টা করবে কি ন্যান্সি? কিন্তু না, তা করতে গেলে বিপরীত ঘটতে পারে। তবু ন্যান্সি বলল, 'মাফ করবেন আব্বা, দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কি রকম সে বিষয়ে আমি খুব বেশি জানি না। কিন্তু তবু আমি বলব একজন মুসলিম মৌলবাদী এসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও তার প্রশাসনকে তার পক্ষে নিয়ে যাবে, আপনাদের মত শীর্ষ পর্যায়ের আমেরিকান বিবেককে নিশ্চয় এত ছোট, এত ভংগুর করে আপনি দেখবেন না।'

ভ্রু কুঞ্চিত হলো দানিয়েল ময়নিহানের। ভাবল সে। তারপর তার চোখে ফিরে এল মুগ্ধ দৃষ্টি। বলল ন্যান্সিকে, 'তুমি যা বলেছ মা যুক্তির দিক দিয়ে তা

ঠিক। কিন্তু যুক্তিতে আসে না, এমন দুর্ঘটনা রাজনীতিতে ঘটতে পারে। যখন এ ধরনের পরিস্থিতি আসে, তখন ঘটেনি প্রমাণ হওয়ার আগ পর্যন্ত ঘটেছেই ধরে নিতে হবে।'

'কিন্তু সেক্ষেত্রে আমি মনে করি আপনাদের মত শীর্ষ রাজনীতিকরা কোন এক পক্ষে জড়িয়ে না পড়ে সত্য উদ্ধারে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

হাসল দানিয়েল ময়নিহান। বলল, ধন্যবাদ ন্যান্সি। তুমি যা বলেছ সাধারণভাবে তা ঠিক। কিন্তু যখন যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, তখন এই ধরনের নিরপেক্ষতা সত্যের ক্ষতি করতে পারে। এই ধরনেরই পরিস্থিতি আজ। তবু তুমি যা বলেছ তা মনে রাখব মা। সত্য অনুসন্ধানে আমি চেষ্টা করব। প্রেসিডেন্টের পক্ষের বক্তব্যও আমি শোনা ও বুঝার চেষ্টা করব।

'ধন্যবাদ আব্বা।' বলে একটু দম নিল ন্যান্সি। তারপর বলল, 'তাহলে হ্যারির ব্যাপারে আমরা কি করছি আব্বা?'

'সব কিছুই করব মা। পুলিশ তো কাজ করছেই। এই মাত্র FBI চীফ জর্জ আব্রাহাম জনসন আমাকে টেলিফোন করেছিলেন। তিনি শুনেছেন সব। বললেন তিনি, আমরা কাজ শুরু করেছি। এফ বি আই এর একটা টীম যাচ্ছে আপনাদের ওখানে। আমিও আসব। কিছু তারা  আঁচ করেছেন কি না আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন, কোন পথে আমাদের এগুতে হবে সেটা আমাদের কাছে পরিস্কার হয়ে গেছে এবং কতটা এগুতে পারছি, আপনাকে সব জানাব।'

'জর্জ আব্রাহাম খুবই ভালো মানুষ আব্বা। আমাদের ক্লাসে কানাডার একজন ভিজিটিং প্রফেসর 'লয়ালটি টু নেশন ইন ক্রাইসিস' (সংকটের মুখে জাতীয় আনুগত্য) বক্তৃতায় জর্জ আব্রাহাম জনসনের নাম দিয়ে বলেছিলেন, এরা দেশ প্রেমের ক্লাসিকাল দৃষ্টান্ত। এঁদের দেশ প্রেমের নিকট ব্যক্তি স্বার্থ, স্বজন প্রীতি, গোষ্ঠী চিন্তা সবই কুরবানী হয়ে যায়।'

'আমিও তাই জানতাম মা। প্রেসিডেন্ট যখন FBI চীফ হিসেবে তাঁর নাম প্রস্তাব করেন, তখন আমিই তাকে সবচেয়ে বেশি সমর্থন দিয়েছিলাম। কিন্তু একজন মৌলবাদী আহমদ মুসা কেমন করে তাঁকে গিলে ফেলল তাই বুঝছি না।' বলল দানিয়েল ময়নিহান নরম কন্ঠে।

‘আব্বা, এটাই আগে বুঝার চেষ্টা করলে হয়তো জর্জ আব্রাহাম সম্পর্কে আজ আপনার ভিন্ন ধারণার সৃষ্টি হতো না।’

ন্যান্সি থামলেও সংগে সংগে কথা এল না দানিয়েল ময়নিহানের মুখে। ভাবছিল। হাসল সে অবশেষে। বলল, ‘ধন্যবাদ ন্যান্সি। তুমি সত্যিই আমার মা। মায়ের বকুনি আমি গ্রহণ করলাম। আগে না হলেও এখন আমি ব্যাপারটা বুঝার চেষ্টা করব।’

‘ধন্যবাদ আব্বা। আমি.........।’

ন্যান্সির কথার মাঝখানেই কথা বলে উঠল দানিয়েল ময়নিহান। বলল, ‘আরেকটা খবর ন্যান্সি। এদিকের কিছু খবর আগামীকাল নিউজ পেপার ও টেলিভিশন নেটওয়ার্কে আসছে। সেটা উপলক্ষ করে ওদিকের প্রকৃত ব্যাপার আমার জানার বিষয়টা খুবই প্রাসঙ্গিক হবে।’

‘ঠিক তাই আব্বা।’ বলে একটু থেমেই অনুমতি প্রার্থনা করল, ‘আমি তাহলে উঠি আব্বা!’

‘এস।’ বলল তার আব্বা।

ন্যান্সি উঠে দাঁড়িয়ে চলে যাচ্ছিল।

‘ন্যান্সি শুন।’ পেছন থেকে ডেকে উঠল দানিয়েল ময়নিহান।

ফিরে দাঁড়াল ন্যান্সি।

‘দেখ মা, বরিস নিক্সন ছেলেটাকে আমি খুব ভালো মনে করি। আমি যেটা বলেছি, সেটা রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা।’ দানিয়েল ময়নিহানের মুখে মিষ্টি হাসি।

ন্যান্সির মুখ রাঙা হয়ে উঠল। ঠোঁটে ভেসে উঠল সলজ্জ এক টুকরো হাসি। বলল, ‘অনেক ধন্যবাদ আব্বা।’

বলেই ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটে পালাল সে।

# ৫

বেরুবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে বসে আছে আহমদ মুসা। আজ ওয়াশিংটনে ফিরছে সে। অপেক্ষা করছে আহমদ মুসা সারা জেফারসনের জন্যে।

ঘুরে ঢুকল জিনা জেফারসন, সারা জেফারসনের মা।

'খালাম্মা, মিস জেফারসন কোথায়? আমি ওর জন্য অপেক্ষা করছি।'

হাসল জিনা জেফারসন। বলল, 'ওর মনটা বোধ হয় খারাপ। দেখলাম, ফ্যামেলি এ্যালবামের পাতা উল্টাচ্ছে।'

'মন খারাপের সাথে এ্যালবামের কি সম্পর্ক? জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা। আহমদ মুসার মুখেও হাসি।

'হ্যাঁ, ওর মন খারাপ হলে সে ফ্যামিলি এ্যালবামের পাতা উল্টায়।'

'চমৎকার। তার মানে তখন তিনি অতীতমুখী হন অথবা যারা ছিলেন কিন্তু এখন নেই, তাদের দৃষ্টান্ত সামনে এনে সান্তনা খোঁজেন। আহমদ মুসা বলল।

'তাই হবে।' জিনা জেফারসন বলল।

'কিন্তু মন খারাপ হলো কখন, এইতো তার সাথে কথা বললাম?

'সব ব্যাপারেই সে শক্ত, কিন্তু কাউকে বিদায় দেয়ার ব্যাপারে খুব নরম। আজ মনে হচ্ছে বেশি নরম হয়ে পড়েছে। তার উপর তোমাকে সে আরও একদিন থেকে যেতে বলেছিল, থাকছ না। শুধু তার কেন, আমারও মনটা খারাপ। আমি সবার মুখের হাসি দেখতে চাই। তার মনে যে আনন্দ দেখতে চাই, তুমি আসার পর গদ দুদিন আমি তা দেখেছি। ভয় হচ্ছে তুমি চলে যাবার পর আবার তার সেই বয়সোত্তার গাম্ভীর্য ফিরে আসে কি না।

মুখের আলো হঠাৎ নিভে গেল আহমদ মুসার। এখানে আসার পর থেকে যে অস্বস্তিটা তাকে পীড়া দিচ্ছে, সেটা আবার জেগে উঠল তার মনে। একটা বিব্রতকর ভাব ফুটে উঠল তার চেহারায়।

আহমদ মুসা কি বলবে তা খুঁজছিল। এমন সময় ঘরে প্রবেশ করল সারা জেফারসন।

তার মুখে হাসি। কিন্তু তার চোখে দুটো হাসছে না। কালো বিষণ্নতা সেখানে। ঘরে ঢুকেই সে বলল, 'স্যরি একটু দেরী হয়ে গেল।'

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই সারা জেফারসনের মা বলে উঠল, 'বেটা আহমদ মুসা, সারাকে বলে যেও মায়েরা সব সময় সন্তানের হাসিমুখ দেখতে চায়।'

সারা জেফারসন মিষ্টি হেসে মায়ের দিকে তাকাল। বলল, 'কি কথা বলছ মা, আমি কি হাসি না?'

'বেটি সারা, যখন তুমি তোমার মত একজন সন্তানের মা হবে, তখন বুঝবে সেই সন্তানের মুখে মা কি ধরনের হাসি দেখতে চায়। গত দুদিন তোমার যে হাসি, তোমার যে পরিতৃপ্ত চোখ, তোমার যে আনন্দ-রাঙা মুখ দেখেছি, তা আমি হারাতে চাই না। আমি সে কথাই আহমদ মুসাকে বলছিলাম।' সন্তান বাৎসল্যের গভীর আবেগ জিনা জেফারসনের কন্ঠকে ভারী করে তুলেছিল।

লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছে সারা জেফারসনের মুখ। সেই সাথে কিছুটা বিব্রত ভাবও। তার মা তাকে এতটা নগ্ন করে দেবে সে ভাবেনি। এমন ক্ষেত্রে সব মা বোধ হয় এমন পাগল হয়ে যায়!

লজ্জায় ভারী হয়ে ওঠা সারা জেফারসনের দুটি চোখ জোর করেই ছুটে গেল আহমদ মুসার মুখের উপর। সে দৃষ্টি যেন ছড়িয়ে দিল অশরীরী অজস্র চুম্বন। একটা যন্ত্রণার প্রশান্তি নেমে এল সারা জেফারসনের কম্পিত বুকে।

কিন্তু আহমদ মুসার আনত চোখের বদ্ধ দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে সারা জেফারসনের সে দৃষ্টি অবশেষে ফিরে এল। তার শুকনো ঠোঁটে ফুটে উঠল এক টুকরো বেদনার হাসি। বলল, 'আম্মা তুমি তো ওঁকে জান। ওঁর পৃথিবী কত বড়! একজনের মুখের হাসি উনি দেখবেন এমন আশা করা ওর প্রতি অবিচার।'

'কিন্তু মা, আহমদ মুসা যখন সন্তান হিসেবে সামনে আসে তখন মায়ের কোন দাবীই অবিচার নয়।' বলল জিনা জেফারসন, সারা জেফারসনের মা।

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল আহমদ মুসা ও সারা জেফারসন দুজনেই। এ সময় এ দিনের দৈনিক কাগজগুলো নিয়ে প্রবেশ করল পরিচারিকা।

সবাই সেদিকে তাকাল।

আহমদ মুসা ও সারা জেফারসনের কথা তাদের মুখেই থেকে গেল।

পরিচারিকা ঘরের মধ্যে এসে কাগজগুলো সারা জেফারসনের হাতে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

অনেক কয়টা দৈনিক। সবার উপরে ছিল 'ওয়াশিংটন পোস্ট।'

ওয়াশিংটন পোস্টের প্রধান শিরোনানের উপর আঠার মত লেগে গেল সারা জেফারসনের চোখ। প্রধান শিরোনামের উপরে লাল অক্ষরে একটা শোল্ডার। তারপর কালো অক্ষরে প্রধান শিরোনাম চার কলামব্যাপি। প্রধান শিরোনামের নিচে নিল কালিতে আরেকটা শোল্ডার। পড়ল সারা জেফারসন উপরের শোল্ডারে, 'মৌলবাদী আহমদ মুসার কালো হাত এবার আমেরিকায়।' আর প্রধান শিরোনাম পড়ল, 'প্রেসিডেন্ট এবং তার প্রশাসন মদদ দিচ্ছে সন্ত্রাসে।' বটম শোল্ডারের লেখা পড়ল সারা জেফারসন, 'মানবতাবাদী আমেরিকায় ভয়াবহ এ্যান্টি সেমেটিক ষড়যন্ত্র।'

পড়ে কেঁপে উঠল সারা জেফারসন। তার মুখের সব আলো এক সংগে দপ করে নিভে গেল। সেখানে ঝড়ের বেগে নেমে এল উৎকন্ঠা ও উদ্বেগের কালো ছায়া।

সারা জেফারসন দ্রুত একে একে 'নিউইয়র্ক টাইমস, ওয়ালষ্ট্রিট জার্নাল ও নিউইয়র্ক পোষ্টে'র উপর নজর বুলাল। ঐ একই বিষয়ের লিড শিরোনাম সব পত্রিকায়। হেডিং ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু একই কথা বলেছে চারটি পত্রিকাই।

হাত কাঁপছে সারা জেফারসনের। কাঁপছে গোটা শরীর। চোখে অন্ধকার দেখছে সারা জেফারসন।

আহমদ মুসা লক্ষ্য করছিল সারা জেফারসনের এই পরিবর্তন এবং এও বুঝেছিল পত্রিকার কোন খবর পড়েই তার এই অবস্থা।

তাড়াতাড়ি আহমদ মুসা হাত বাড়াল সারা জেফারসনের দিকে পত্রিকাগুলো নেয়ার জন্যে।

সারা জেফারসন তাকাল আহমদ মুসার দিকে।

রাজ্যের সব উৎকন্ঠা, উদ্বেগ এসে যেন বাসা বেধেছে সারা জেফারসনের চোশে, দেখল আহমদ মুসা।

সারা জেফারসন কম্পিত হাতে তুলে দিল পত্রিকাগুলো আহমদ মুসার হাতে।

ওয়াশিংটন পোষ্ট-এর লীড নিউজের উপর চোখ পড়তেই চমকে উঠল আহমদ মুসা।

দ্রুত আহমদ মুসা চারটি দৈনিকের উপরই চোখ বুলাল।

ওয়াশিংটন পোষ্ট ও নিউইয়র্ক টাইমস নিউজটিকে লীড করেছে। কিন্তু ওয়ালষ্ট্রিট জার্নাল ও নিউইয়র্ক পোষ্ট নিউজটিকে যথাক্রমে চতুর্থ ও তৃতীয় প্রধান শিরোনাম হিসেবে ছেপেছে।

নিউজটা দেখে প্রথমে চমকে উঠেছিল আহমদ মুসা। কিন্তু তা পরক্ষণেই দূর হয়ে গেল। ঠোঁটে তার ফুটে উঠল হাসি।

আহমদ মুসার দিকে তাকিয়েছিল সারা জেফারসন। আহমদ মুসার ঠোঁটে হাসি ফুঠে উঠতে দেখে বিস্ময় ফুটে উঠল তার চোখে। বলল, ‘আপনার ঠোঁটে হাসি দেছি। সত্যিই কি আপনি হাসছেন?’

সারা জেফারসনের প্রশ্নের ধরন দেখে আহমদ মুসা সশব্দে হেসে উঠল। বলল, ‘হাসির পেছনে অনেক সময় কান্না থাকে। আমার হাসির পেছনে কান্না নেই। সুতরাং এটা হাসিই।’

‘আমি বুঝতে পারছি না। এ নিউজে হাসার কিছু আছে? আমি কিন্তু উদ্বিগ্ন।’ বলল সারা জেফারসন শুকনো কন্ঠে।

‘নিউজে হাসির কিছু নেই। কিন্তু শত্রুর শেষ কথা, শত্রুর শেষ পদক্ষেপ জেনে ফেলার মধ্যে আনন্দ আছে। আমি সেই আনন্দেই হেসেছি।’

‘আমাকে উপলক্ষ বানিয়ে প্রেসিডেন্টের উপর প্রচন্ড রাজনৈতিক প্রেসার সৃষ্টি করা, যাতে করে তিনি ইহুদীবাদীদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার তদন্ত থেকে বিরত থাকেন। যদি প্রেসিডেন্ট এতেও বিরত না হন, তাহলে প্রেসিডেন্টকে ইমপীচ পর্যন্ত তারা অগ্রসর হবে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘অতদূর পর্যন্ত তারা যাবে?’ সারা জেফারসনের কন্ঠে বিস্ময়।

‘সে প্রস্তুতি না থাকলে তারা প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে এভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করতো না।’ আহমদ মুসা বলল।

সারা জেফারসন সংগে সংগেই কিছু বলল না। ভাবছিল সে। বলল, ‘নিউজ না পড়েই তোমরা আলোচনা শুরু করেছ। আমি পড়ছি তোমরা শোন। হেডিং যত বড় নিউজটা তত বড় নয়।’

বলে পড়ে শুরু করল জিনা জেফারসনঃ

‘‘আমেরিকায় অনুপ্রবেশকারী মৌলবাদী সন্ত্রাসী নেতা আহমদ মুসা ইহুদীদের প্রতি তার স্বভাব-বিদ্বেষ দ্বারা তাড়িত হয়ে এবং আমেরিকান স্বার্থের ক্ষতি ও তার আভ্যন্তরীণ শান্তি বিনষ্ট করার লক্ষ্যে ইহুদী কম্যুনিটি ও মার্কিন প্রশাসনের মধ্যে বিভেদ ও সংঘাত সৃষ্টির হীন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে।

ইহুদীদের বিরুদ্ধে অমুলক একটি অভিযোগ দাঁড় করিয়ে এবং অদ্ভুত কৌশলে রক্তক্ষয়ী ও ধ্বংসাত্মক ঘটনা একের পর এক সৃষ্টি করে তারও দায় ইহুদী কম্যুনিটির উপর চাপিয়ে দেশে বড় ধরনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি করতে চায়।

দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে গিয়ে সূত্র বলছে, কৌশলগত গবেষণাগার ‘লস আলামোসে’র একটা এমারজেন্সী এক্সিট সুড়ঙ্গ রয়েছে, এই সুড়ঙ্গকে আহমদ মুসা ইহুদীদের তৈরি গোয়েন্দা সুড়ঙ্গ হিসাবে মার্কিন প্রশাসনের কাছে তুলে ধরেছে।

এই অভিযোগ তোলার পর পরই বড় ধরনের দুটি সন্ত্রাসী ঘটনা সে ঘটিয়েছে। লস আলামোসে সুড়ঙ্গ বিষয়ে তদন্তে যাওয়া উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত টীমটি যখন ফিরছিল, তখন লস আলামোস ও সান্তাফে’র মধ্যবর্তীস্থানে এক সন্ত্রাসী ঘটনার মাধ্যমে টীমের সাথে সফররত ৬ জনেরও বেশি নিরাপত্তা প্রহরীকে হত্যা করা হয়। উল্লেখ্য এই তদন্ত টীমের সাথে আহমদ মুসাও ছিল। আহমদ মুসা ও টীম সদস্যরা অক্ষত থাকল, কিন্তু নিহত হল হতভাগ্য নিরাপত্তা প্রহরীরা।

অনুরূপভাবে সান্তা ফে’ বিমান বন্দর থেকে যে বিমানে করে টীম সদস্যরা ওয়াশিংটনে ফেরার কথা, সে বিমানও যাত্রার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে

বিস্ফোরনে ধ্বংস হয়। এবারও আহমদ মুসা ও টীম সদস্যরা অক্ষত থাকলেন, ধ্বংস হয়ে গেল বিমান।

সূত্রমতে দুটি ঘটনাই সন্ত্রাসী আহমদ মুসা ঘটিয়েছে সুপরিকল্পিতভাবে এবং এর দায় তুলে দিয়েছে ইহুদী কম্যুনিটির কাঁধে। তার মতলব মার্কিন প্রশাসনকে এটা বুঝানো যে, লস আলামোস সুড়ঙ্গ তন্দন্তে যাওয়া টীমকে ইহুদীরা ধ্বংস করতে চেয়েছে তাদের ফাইন্ডিং ধামা চাপা দেয়ার জন্যেই।

সূত্রমতে, আহমদ মুসার পরিকল্পনা ও কৌশল পুরোপুরিই কার্যকরী হয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও প্রশাসনের উপর। শৃগালের মত ধূর্ত আহমদ মুসা সম্মোহিত করেছে প্রেসিডেন্টকে, সি আই এ ও এফ বি আই চীফকে এবং মার্কিন প্রশাসনের একটা অংশকে।

আহমদ মুসাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দিতে এগিয়ে এসেছে ইহুদী বিদ্বেষী 'ফ্রি আমেরিকা' মুভমেন্ট এবং জানা গেছে গোল্ড ওয়াটারের 'হোয়াইট ঈগল' ও আহমদ মুসার পক্ষে যোগ দিয়েছে।

এ সবের পেছনে পেট্রোডলার বিরাট ভূমিকা পালন করছে বলে সূত্র মনে করছেন।

বলা হচ্ছে, আহমদ মুসা গোটা পরিকল্পনার লক্ষ্য হলো, ঘরে সংঘাত বাধিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দুর্বল করে ও তাঁর আকাশ স্পর্শী ইমেজকে ধ্বংস করে দিয়ে আমেরিকার বিশ্ব নেতৃত্বের আসন কেড়ে নেয়া ও তার নতুন বিশ্ব গড়ার মহান স্বপ্নকে বানচাল করা।

এই অবস্থায় দেশের মান, ইজ্জত ও ভবিষ্যত রক্ষার জন্যে সচেতন সকলেই মৌলবাদী সন্ত্রাসী নেতা আহমদ মুসা এবং আমাদের প্রেসিডেন্ট ও তার প্রশাসনের মধ্যেকার সর্বনাশা হানিমুনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবেন বলে ওয়াকিফহাল মহল মনে করেছেন''

পড়া শেষ করে জিনা জেফারসন বলল, 'বাকি তিনটি পত্রিকাতেও দেখা যাচ্ছে একই রিপোর্ট এসেছে। শব্দের কিছু পার্থক্য আছে, বক্তব্যে তেমন কিছু পার্থক্য নেই।' বলছিল আর কাগজগুলোর উপর নজর বুলাচ্ছিল জিনা জেফারসন।

পড়া শেষ হলে সারা জেফারসন তাকাল আহমদ মুসার দিকে সম্ভত প্রতিক্রিয়া হিসাবে আহমদ মুসা কি বলে তা জানার জন্যেই।

নিউজ শুনে উদ্বেগ আরও বেড়ে গিয়েছিল সারা জেফারসনের। প্রেসিডেন্ট এবং প্রশাসনকেও নিউজে এইভাবে আক্রমণ করা হবে তা সারা জেফারসনের কাছে অকল্পনীয় ছিল। যা নিউজ হয়েছে তাতে এখন প্রেসিডেন্টকে আত্মরক্ষার জন্যে ব্যতিব্যস্ত হতে হবে এবং বলতে হবে আহমদ মুসার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই, তাঁর প্রশাসনও আহমদ মুসাকে কোন সহযোগিতা করছে না। এমনকি দোষ স্থালনের জন্যে আহমদ মুসাকে সরকার গ্রেফতারও তো করতে পারে। এ সব ভাবতে ভাবতে বুকের কাপুনি সারা জেফারসনের আরও বেড়ে গেল। আহমদ মুসার উপর নিবদ্ধ তার দৃষ্টি অসহায় হয়ে উঠেছে।

আহমদ মুসা চোখ বন্ধ করে জিনা জেফারসনের পড়া শুনছিল।

পড়া শেষ হলে চোখ খুলল আহমদ মুসা।

জিনা জেফারসন কথা শেষ করতেই আহমদ মুসা বলে উঠল ‘খালাম্মা একটু দেখুন, কোন কাগজে এ ঘোষণা আছে কিনা যে, আজ কোন সময় বি বি এস (CBS) এন বি সি (NBC), এ বি বি (ABC)-দের কেই অথবা সকলেই মৌলবাদী সন্ত্রাসী নেতা আহমদ মুসা ও প্রেসিডেন্ট প্রশাসন ইহুদীদের বিরুদ্ধে যে যোগসাজস করেছে তার কাহিনী প্রচারিত হবে।

জিনা জেফারসন চোখ বুলাচ্ছিল ওয়াশিংটন পোষ্টের প্রথম পৃষ্ঠায়। সে চিৎকার করে উঠল, ‘বেটা তুমি কি ভবিষ্যত রক্তা নাকি? এই তো দেখ সেই বিজ্ঞপ্তি। এখানে বলা হয়েছে, আজ রাত ৭টা ও ১১টায় সি বি এস, এন বি সি ও এ বি সি’র ‘বিশেষ অনুসন্ধান’ প্রোগ্রামে আমেরিকায় অনুপ্রবেশকারী মৌলবাদী ও সন্ত্রাসী নেতা আহমদ মুসার ধ্বংসাত্মক তৎপরতা সম্পর্কে বিশেষ রিপোর্ট প্রচারিত হবে।’

‘বিজ্ঞপ্তিটি কে দিয়েছে খালাম্মা? কার নাম লেখা, কার বরাত দেয়া হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে? জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা। ‘বিজ্ঞপ্তির একেবারে বটমে মাত্র তিনটি অক্ষল ‘EMC’ ছাপা হয়েছে।’ বলল জিনা জেফারসন।

‘EMC মানে Electronic Media Club’ এটা ইহুদী গোয়েন্দা সংস্থা পরিচালিত ক্লাব যা টিভি নেটওয়ার্কগুলোর উপর চোখ রাখে, বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রমোট করে, আবার তাদের স্বার্থের পরিপন্থী কোন অনুষ্ঠান কোনভাবে প্রচারিত হয়ে গেলে তার বিরুদ্ধে জনমত সমীক্ষার মাধ্যমে বিরুদ্ধ জনমতের প্রকাশ ঘটায়।’

‘তার মানে আপনি বলছেন তিনটি টিভি নেটওয়ার্কে যে অনুষ্ঠান প্রচার হতে যাচ্ছে, তা ইহুদীবাদীরাই প্রমোট করতে যাচ্ছে।’ জিজ্ঞেস করল সারা জেফারসন।

‘অবশ্যই।’

‘নিউজ পেপারের এ নিউজগুলোর ক্ষেত্রেও তো তাহলে একই কথা?’ বলল সারা জেফারসন।

‘তাই।’ আহমদ মুসা বলল।

প্রশ্নটা করেই চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছে সারা জেফারসন। তার মুখ শুকনো। আট-ঘাট বেধেই এবার যুদ্ধে নেমেছে ইহুদীবাদীরা। ‘ফ্রি আমেরিকা’ মুভমেন্ট ও ‘হোয়াইট ঈগল’ কাউকেই ছাড়েনি। সবার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। আর অত্যন্ত নাজুক ফ্রন্টে তারা যুদ্ধ শুরু করেছে। তাদের মিডিয়া ফ্রন্টে যুদ্ধ শুরু করার অর্থ তারা রাজনৈতিক যুদ্ধ শুরু করেছে। আর ওরা মিডিয়া ও রাজনীতি দুই ফ্রন্টেই শাক্তিশালী। সুতরাং যুদ্ধে জিততে হলে এখন প্রচুর কাজ করতে হবে। কি করতে হবে সেটাও সিনেমার পর্দার মত তার সামনে উদয় হতে লাগল। ওদের মিডিয়া অফেনসিভের বিরুদ্ধে তাদেরকেও অফেনসিভে যেতে হবে। কিন্তু মিডিয়া অফেনসিভে যেতে হবে, এটা যেমন সত্য, তেমনি এটা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে এটাও সত্য। কারণ, মিডি.....।

চিন্তা আর এগুতে পারল না সারা জেফারসনের। আহমদ মুসার কথায় ছিন্ন হয়ে গেল তার চিন্তাসূত্র।

আহমদ মুসা বলছিল, ‘কি ভাবছেন মিস জেফারসন?’

চিন্তার জগত থেকে ফিরে এল সারা জেফারসন। কিন্তু মুখটা তার ম্লান হয়ে গেছে আহমদ মুসার সম্বোধন শুনে। ‘মিস’ সম্বোধন আহমদ মুসার কাছ

থেকে এলে বুকের কোথায় যেন লাগে তার। মনে হয় তার বুকের কোন নরম তন্ত্রীতে নির্দয় এক চাবুক যেন আঘাত হানছে।

বেদনা কম্পিত এক টুকরো হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল সারা জেফারসনের ঠোঁট থেকে। সে চোখ তুলল আহমদ মুসার দিকে। হাসল। নির্মল হাসি। বলল, 'কি ভাবছি বলুন তো?'

'ফ্রি আমেরিকা' নেত্রীর যা ভাবা উচিত।' গম্ভীর কন্ঠ আহমদ মুসার।

'একটা বিষয় ভাবতে পেরেছি। সেটা হলো আমাদের কাউন্টার অফেনসিভে যেতে হবে। মিডিয়া ওয়ার দিয়ে মিডিয়া ওয়ারের মোকাবিলা। কিন্তু যুদ্ধে রসদ কি হবে আমার মাথায় আসেনি।'

বলে মুহূর্তের জন্যে থামল সারা জেফারসন। মুখটা একটু নিচু করল। তারপর বলে উঠল, 'আপনার নির্দেশ চাচ্ছি।'

আহমদ মুসার চোখ ছিল নিচু। চোখ তুলল সে সারা জেফারসনের দিকে। বলল, 'ফ্রি আমেরিকা'র নেত্রীকে নির্দেশ?

'না, সারাকে।'

'সারা এবং ফ্রি আমেরিকার নেত্রী কি আলাদা?'

'তা নয়। কিন্তু সারা ফ্রি আমেরিকার নেত্রী বলে নির্দেশ দিতে পারেন।'

সারা জেফারসনের এই একান্ত 'নারী' রূপের প্রকাশ আহমদ মুসাকে বিব্রত করে তোলে। এই পুরানো বিব্রতকর অবস্থা বুক বেয়ে আহমদ মুসার চোখে-মুখে উঠে আসতে চাইল। সামলে নিয়ে আহমদ মুসা বলল, 'মিস জেফারসন মিডিয়া অফেনসিভের জন্যে মিডিয়া কি আপনার আছে? আমাদের সামনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই যে চারটি শীর্ষ জাতীয় দৈনিক রয়েছে। এদের দুটির মালিকানায় ইহুদী আধিপত্য রয়েছে, অবশিষ্ট দুটিতে শীর্ষ কয়েকটি পদে ইহুদী স্বার্থের প্রতি কমিটেড সাংবাদিক কাজ করছে। যে তিনটি চ্যানেল আজ রাতে আমাদের নিয়ে অনুষ্ঠান প্রচার করছে, সে তিনটি টিভি চ্যানেলের মালিকানাতেও ইহুদী আধিপত্য বর্তমান।'

হাসলা সারা জেফারসন। বলল, 'আমাদের আলাদা কোন মিডিয়া নেই, তবে সব আমেরিকান মিডিয়াই আমাদের মিডিয়া। আমেরিকার পক্ষে তাদের অবশ্যই কাজ করতে হবে।'

'এটা তো তত্ত্ব কথা, মিস জেফারসন।' বলল আহমদ মুসা।

'প্রত্যেক বাস্তবতা প্রাসাদ একটা করে তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকে।' সারা জেফারসন বলল।

'ঠিক।'

'ঠিক বলে কথা শেষ করলে চলবে না জনাব। অভিযোগের শক্ত জবাব চাই। আমার মাথায় কিছু নেই। যা আদেশ হবে তাই করব।'

'বড়দের বিনয় তাদের আরও বড় করে।' বলল আহমদ মুসা হাসি মুখে।

'তর্ক করব না। কারণ তর্কেও পারব না।'

বলে একটু থেমে কিছু বলার জন্যে আবার মুখ খুলেছিল, এ সময় তার টেলিফোন থেকে কল সিগন্যাল এল। তাড়াতাড়ি টেলিফোন তুলে নিল সারা জেফারসন।

টেলিফোন ধরেই বলল, 'গুড মর্নিং মি. বেকন।'

ওপারের কথা শুনে বলল, 'অডিও টেপ কার?'

ওপারের উত্তর শুনে বলল আবার,' ব্রাভো! নাইস। কোথায় পেলেন?'

'মিরাকল' শুনেছেন আপনারা টেপটা?

'বিষয়টা বলুন।'

'থ্যাংকস গড। কিন্তু পেলেন কি করে?'

'হ্যাঁ, ঘটনাটা আমি পত্রিকায় পড়লাম। ঘটনার ব্যাকগ্রাইন্ড তাহলে এটাই? বেচারাকে যে কোন মূল্যে উদ্ধার করতে হবে। বলেছেন বিষয়টা জর্জ আব্রাহামকে?

'বলে ঠিক করেছেন।'

'হ্যাঁ, এইমাত্র পড়লাম। ওঁর সাথে আমি এ বিষয় নিয়েই আলাপ করছিলাম।'

‘হ্যাঁ, আমরা এটাই চিন্তা করছি। মিডিয়ার মাধ্যমেই ওদের এক্সপোজ করতে হবে। কাজে নেমে পড়ুন এখনি। আমাদের মিডিয়া-সদস্যদের নিয়ে বসুন। কাগজ গুলোর কালকের ইস্যুতেই স্টোরি আনতে হবে। কি করতে হবে আপনারা করুন। আমি জর্জ আব্রাহাম, এ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থার, জেনারেল ওয়াশিংটন সবার সাথেই কথা বলল।’ ‘না, এ্যান্ড্র জ্যাকবস ও মি. ময়নিহানের সাথে কথা বলতে হবে। আমাদের নিউজটা বেরুবার পর। ইতিমধ্যে হ্যারিকে উদ্ধার করার চেষ্টা করতে হবে।

‘মিডিয়াতে আমরা কি বলল, ওটা আমি জানি না। আপনার স্যারের সাথে কথা বলুন। তাঁকে দিচ্ছি আমি।’

বলে সারা জেফারসন টেলিফোন আহমদ মুসার হাতে দিল।

আহমদ মুসা টেলিফোন ধরে বলল, ‘ওয়া আলাইকুম সালাম। মি. বেঞ্জামিন কেমন আছেন?

ওপারের কথা বেশ কিছুক্ষণ শুনল আহমদ মুসা। তারপর বলল ‘ঠিক আছে সব জেনে নেব আমি মিস জেফারসনের কাছ থেকে মিডিয়ায় বক্তব্যের কথা বলছ? আমি চিন্তা করছি। ইতিমধ্যে কিছু কাজ করতে হবে। যেমন, লস আলামোস থেকে সান্তা ফে’র পথে সন্ত্রাসী ঘটনায় নিহত সন্ত্রাসীদের জাতিগত পরিচয় উদ্ধার, সান্তা ফে বিমান বন্দরে বিস্ফোরিত বিমানের অসুস্থতার অজুহাতে সরে পড়া পাইলট আটক করা, ইত্যাদি যা করতে হবে সবই আমি জানাচ্ছি।’

‘সে পাইলটকে আপনারা আটক করেছেন? ব্রাভো।’

‘ঠিক আছে, ওদের জবাবের ব্যাপারটা আমি দেছি। জানাচ্ছি সব।’

‘আমি আসব।’

‘কখন? তোমাদের নেত্রীকে বল। আমি তো ওঁর কমান্ডে।’

‘তাহলে এপর্যন্তই।’

‘ওকে, ওয়াচ্ছালাম।’

টেলিফোন রেখে দিল আহমদ মুসা।

টেলিফোন চলার সময়ই জিনা জেফারসন বলল, ‘জটিল রাজনীতি শুরু হয়েছে, আমি এখন যাই।’ বলে সারা জেফারসনের মা জিনা জেফারসন উঠে গিয়েছিল।

আহমদ মুসা টেলিফোন রাখতেই সারা জেফারসন বলল, ‘আপনি কি সত্যি আমার কমান্ডে?’

সারা জেফারসনের মুখে কিছুটা দুস্টুমির হাসি।

‘আপনি শুধু আপনি নন, ‘ফ্রি আমেরিকা’র নেত্রী আপনি।’

‘নেত্রী সারা এবং ব্যক্তি সারা একই সত্তা। নেত্রী সারা কমান্ডা করতে পারে, ব্যক্তি কি পারে না?’

মুখ থেকে সেই দুষ্টুমির হাসি মিলিয়ে গেছে। সারার কন্ঠ হয়ে উঠেছে আবেগ জড়িত।

‘সত্তা একটা বলেই ব্যক্তি সারার কমান্ডও নেত্রী সারার হয়ে দাঁড়াল।’ বলল আহমদ মুসা।

‘সারার যে একটা ব্যক্তিগত পৃথিবী আছে, সেখানে অনেক কথা আছে, অনেক বলার, অনেক শুনার আছে, সেটা তাহলে যাবে কোথায়? ভারী কন্ঠস্বর সারা জেফারসনের।

‘বড়দের ক্ষেত্রে এটাই হয়।’

‘তাই বুঝি ‘মিস জেফারসন’ আর ‘সারা’ হতে পারছে না। আবেগে রুদ্ধ হয়ে গেল সারা জেফারসনের কন্ঠ। ছলছলে হয়ে উঠ সারা জেফারসনের দুচোখ।

আহমদ মুসার মুখ মলিন হয়ে পড়ল। তার পুরনো সেই বিব্রতকর অবস্থা তাকে আচ্ছন্ন করে দিতে চাইল। সুন্দরী, অপরূপা প্রিয়দর্শিনী একজন শীর্ষ মার্কিন তরুণীর অশ্রু ভেজা কন্ঠ ও ছলছলে চোখের আবেদন টর্নেডো হয়ে প্রবেশ করল আহমদ মুসার হৃদয়ে। টর্নেডোর প্রচন্ডগতি সব দুমড়ে-মুচড়ে গিয়ে হৃদয়রাজ্য জয় করে নিতে চাইল। কিন্তু হৃদয় সিংহাসনের গোড়ায় গিয়ে টর্নেডোর সব শক্তি মুখ থুবড়ে পড়ল। সেখানে সমাসীন প্রসন্ন, প্রশান্ত, প্রদীপ্ত আর এক মানবী।

আচ্ছন্নভাবে কাটিয়ে উঠে চোখ তুলে আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল, সে সময় সারা জেফারসনের মোবাইল টেলিফোন কলের সংকেত দিয়ে উঠল।

সারা জেফারসন আবার তুলে নিল তার টেলিফোন। সারার ছলছলে চোখ থেকে দুই গন্ডে দুফোটা অশ্রু খসে পড়ল। কিন্তু অশ্রু মোছার চেষ্টা করলো না সারা।

মাত্র ঐ দুফোটা অশ্রুই আহমদ মুসার কাছে নিদারুণ অস্বস্তির দুই পাহাড় হয়ে দাঁড়াল।

সারা জেফারসন টেলিফোন ধরে ওপারের কথা শুনেই ব্যস্ত কন্ঠে বলে উঠল, 'থ্যাংকস গড, আংকল আমি আপনাকে খুব বেশি আশা করছিলাম।

ও প্রান্তের কথা শুনল এবং উত্তরে বলল, 'আমরা পড়েছি আংকল। আমি ওঁর সাথে এ বিষয় নিয়েই আলাপ করছিলাম।'

'জি আংকল, আমরা ভেবেছি সংবাদপত্রে এবং টিভি চ্যানেলে এর জবাব দিতে হবে এবং আজই।'

'জি আংকল। এ কাজ কঠিন হবে। কিন্তু কোন বিকল্প নেই।'

'জি আংকল। এ কঠিন কাজ আমাদের-আপনাদের যৌথ হতে হবে।'

'হ্যাঁ, উনি আমার পাশেই আছেন। বিষয়টা আপনি ওঁকেই বলুন। টেলিফোন দিচ্ছি ওঁকে। বাই আংকল।'

বলে সারা জেফারসন টেলিফোন আহমদ মুসার হাতে দিল।

আহমদ মুসা টেলিফোন ধরে গুডমর্নিং বিনিময়ের পর ওপারের কথা শুনে বলল, 'আপনি আসবেন? এখানে? কখন?'

ওপারের উত্তর শুনে আহমদ মুসা আবার বলল, 'ঠিক আছে আসুন, এলেই সব শুনব। কিন্তু সময় অল্প, কাজ অনেক করতে হবে।'

'ও কে, আমি আপনার অপেক্ষা করছি। আসুন, বাই।'

টেলিফোন রাখল আহমদ মুসা।

'জর্জ আব্রাহাম আংকল কি এখানে আসছেন?' টেলিফোনে আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই বলল সারা জেফারসন।

'হ্যাঁ, আসছেন। উনি এখন যাচ্ছেন প্রেসিডেন্টের কাছে। প্রেসিডেন্ট ডেকেছেন। ওখান থেকেই আসবেন এখানে।' আহমদ মুসা বলল।

‘নিউজের ব্যাপারে কিছু বললেন তিনি।’ জিজ্ঞেবস করল সারা জেফারসন।

‘কথা-বার্তায় তাঁকে খুব দুর্বল মনে হলো। এই ব্যাপারেই নাকি প্রেসিডেন্ট তাঁকে ডেকেছেন।

‘যতই হোক জর্জ আব্রাহাম একজন আমলা। নিউজ পেপারের এই রিপোর্ট তাকে ভড়কে দেবেই। এখন প্রেসিডেন্ট দুর্বল না হলেই হয়। বলল সারা জেফারসন।

‘প্রেসিডেন্টকে দুর্বল করার জন্যে এই চাপ সৃষ্টি করেছে। প্রেসিডেন্ট সারেন্ডার করে জেনারেল শ্যারনদের সম্পর্কে তদন্ত বাতিল ও অভিযোগ প্রত্যাহার করলেই তাদের বাজিমাত হয়ে যায়।’ আহমদ মুসা বলল।

‘প্রেসিডেন্টের আত্মসমর্পণ মানে কি আমাদেরও পরাজয়?’ জিজ্ঞেস করল সারা জেফারসন।

‘তা হবে কেন? প্রেসিডেন্ট ইহুদীবাদীদের কাছে আত্মসমর্পণ করলে আমাদেরকে দুই প্রতিপক্ষরে বিরুদ্ধে লড়তে হবে, এই যা।’

‘আপনার কি মনে হয় প্রেসিডেন্ট আত্মসমর্পণ করবেন?’ জিজ্ঞাসা সারা জেফারসনের।

‘আমেরিকান রাজনীতির এই দিকটা নিয়ে এই মুহূর্তে আমর কোন ভাবনা নেই। জর্জ আব্রাহাম এখানে এলেই সব বোঝা যাবে। প্রেসিডেন্টের আত্মসমর্পণ মানেই হলো জর্জ আব্রাহাম ও এ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থারের বরখাস্ত।

‘ঠিক।’ বলে সারা জেফারসন একটু থেমে আহমদ মুসার দিকে পরিপূর্ণভাবে তাকিয়ে বলল, ‘আপনি কি ভাবছেন?’

প্রশ্ন শুনে আহমদ মুসা চেয়ারের গা এলিয়ে দিল। চোখ বুঝে গেল তার। একটু পরে ধীরে সুস্থে বলল, ‘আপনাদের চিন্তা ঠিক পথেই চলছে। যে দায়িত্ব দিয়েছেন, সে দায়িত্ব আমি পালন করব। নিউজ পেপার ও টিভি চ্যানেলের জন্যে স্ক্রিপ আমি তৈরি করে দেব। এ বিষয়ে জর্জ আব্রাহামের সাথেও আমার আলোচনা প্রয়োজন।’

মুহূর্তকালের জন্যে থামল আহমদ মুসা। তারপর আবার শুরু করল, ‘তবে আমার মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে জেনারেল শ্যারনদেরকে হাতে-নাতে পাকড়াও করার মত কিছু ঘটনা আমাদের চাই।’

থামল, আবার একটু ভাবল আহমদ মুসা। তারপর বলল, ‘আচ্ছা মিস জেফারসন, বেঞ্জামিন বেকনের সাথে কথা বলার সময় আপনি ‘টেপ পাওয়া’ কাউকে ‘উদ্ধার করা’ সম্পর্কে কিছু বললেন। ঘটনাটা কিন্তু আমাকে বলেননি।’

আবার সেই ‘মিস জেফারসন’ সম্বোধন। তার বুকের পুরনো কষ্টটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। বেদনায় মুখটা ম্লান হয়ে গেল তার। দুচোখও ভারী হয়ে উঠল।

মুখ নিচু করে দাঁত চেপে নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করল সারা জেফারসন। এ সময় অভিমানে প্রচন্ড এক তরঙ্গ এসে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। স্বাভাবিক কথা বলার সাধ্য তার থাকল না।

মুখ নিচু রেখেই ‘এক্সকিউজ মি’ বলে উঠে গেল সারা জেফারসন।

টেবিলে গিয়ে ঢক ঢক করে দুই গ্লাস পানি খেল সে। তারপর বেসিনে গিয়ে মুখে পানির ছিটা দিল। এরপর তোয়ালে দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে ফিলে এল চেয়ারে। বলল, ‘স্যারি।’

আহমদ মুসার ব্যাপারটা লক্ষ করেছিল। সারা জেফারসনের এই কষ্ট দারুনভাবে বিব্রত করল আহমদ মুসাকে। কিন্তু বিষয়টাকে এড়িয়ে গেল আহমদ মুসা। এ ধরনের বিষয় নিয়ে আলোচনার সময় এটা নয়। ডোনা জোসেফাইনের কথা সারাকে বলবে আহমদ মুসা, কিন্তু তার কোন প্রসংগ আহমদ মুসা পায়নি।

আহমদ মুসা বিষয়টা এড়িয়ে গেলেও তার মুখের বিব্রতভাব চাপা দিতে পারল না।

সারা ফিরে এসে বসলেও আহমদ মুসা মুখ তুলতে পারলো না।

সারাও ‘স্যরি’ বলে মুখ নিচু করেই ছিল।

কিন্তু তা মুহূর্ত কয়েকের জন্য নিজেকে সামলে নেবার লক্ষ্যে। পরে ধীর ধীরে বরল হ্যারির টেপ পাওয়া ও তার কিডন্যাপ হওয়ার কথা।

আহমদ মুসার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'আল-হামদুলিল্লাহ। খারাপ খবরটা যত বড়, তার চেয়ে বড় এই সুখবর।'

এ সময় সারা জেফারসনের মা ঘরে প্রবেশ করতে করতে বলল, 'কি সুখবর বেটা?'

আহমদ মুসা কিছু বলার আগে সারা জেফারসনই বলল, 'সত্যিই বড় খবর মা। সিনেটর দানিয়েল ময়নিহান ইহুদীবাদীদের প্রতি সহানুভূতিশীল। তার সাথে আলোচনার একটা গোপন টেপ করেছিল জেনারেল শ্যারন। সেটা মি. ময়নিহানের ছেলে আমাদের কর্মী হ্যারি এডওয়ার্ডের মাধ্যমে আমাদের হাতে এসেছে। এটা একটা দিক। অন্যদিক হলো, হ্যারিকে টেপ উদ্ধারের লক্ষ্যে জেনারেল শ্যারনরা কিডন্যাপ করেছে। এই দুটি দিক যদি ময়নিহানের নজরে আনা যায় তাহলে দারুন একটা রাজনৈতিক লাভ হবে আমাদের।

'সৌভাগ্য দেখছি আহমদ মুসার। হিসেব করে দেখ, আহমদ মুসা আমেরিকার মাটিতে পা দেবার পর থেকেই তোমাদের একের পর এক বিজয়ের ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে।' বলল সারা জেফারসনের মা।

'তা নয় খালাম্মা, ওদের বিজয়ের যুগে আমি আমেরিকায় পা দিয়েছি।'

এতক্ষণে হাসল সারা জেফারসন। বলল, 'জানি এটাই আপনি বলবেন। আমেরিকান কোন কিছুর সাথে আপনাকে সম্পৃক্ত না করলে, আপনি আরও খুশি হন। আমেরিকায় আপনি নিজের অনিচ্ছায় এসেছেন তো!

'কি বলছিস সারা! বাছা এ রকম ভাববে কেন? আমেরিকা থেকে সে কি যাবে, না তাকে যেতে দেব? তার জন্যে পায়ের বেড়ি আমি রেডি রেখেছি।' বলল সারা জেফারসনের মা।

প্রথমে আহমদ মুসার মুখে হাসি ফুটে উঠেছিল। কিন্তু সারা জেফারসনের মায়ের শেষ কথায় তার হাসিটা মলিন হয়ে গেল।

আর সারা জেফারসনের চোখে মুখে মায়ের ইংগিতমূলক কথায় লজ্জিত ও বিব্রত ভাব ফুটে উঠল। মায়ের কথা শেষ হতে না হতেই কিছু বলার জন্যে দ্রুত মুখ খুলেছিল সারা জেফারসন।

ঠিক এ সময়ই ঘরে প্রবেশ করল একজন পুলিশ অফিসার। বলল, 'মাফ চাচ্ছি সকলের কাছে বিরক্ত করার জন্য। এইমাত্র ওয়াশিংটন থেকে আমাকে জানানো হয়েছে, এফ বি আই প্রধান এখানে আসছেন। আমাকে জানানোর জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, ম্যাডাম সারা জেফারসন ও তার মেহমানকে জরুরী প্রয়োজনে তাদের সাথে ওয়াশিংটন যেতে হবে।' পুলিশ অফিসার চলে গেল।

সারা জেফারসন তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বরল, 'আমি কেন? সরকারী কোন প্রোগ্রামে তো আমি যাই না। যাওয়ার কথা তো শুধু আপনার।'

আহমদ মুসা হাসল। অনেক্ষণ পর হাসার সুযোগ পেল। বলল, 'ঘটনার ঘটক হয়ে বুঝি একথা বলা যায়?'

'অন্তত আপনি আমাকে এত উঁচুতে তুলবেন না। আছাড় খেলে মরে যাব।' সারা জেফারসনের কন্ঠ হঠাৎ ভারী হয়ে উঠেছে।

একটু থেমে দ্রুত সে নিজেকে সামলে নিয়ে আবার বলে উঠল, 'আমি ঘটক হলে আপনি কি?' হাসির চেষ্টা সারা জেফারসনের ঠোঁটে।

সারা জেফারসনের আগের কথাটা আহমদ মুসাকেও হঠাৎ একটা ধাক্কা দিয়েছিল। একটা শক ওয়েভ সৃষ্টি হয়েছিল তার মনে।

সারা জেফারসনের শেষের কথা আবার পরিবেশকে হাল্কা করে তুলল। আহমদ মুসা পরিবেশকে আরও হাল্কা করার জন্যেই বলল, 'অভিনেতার পাশে তো সহঅভিনেতা থাকে?'

'সহঅভিনেতা না বলে 'সাথী' বললে ক্ষতি কি?' বলল সারা জেফারসন। মুখে তার ম্লান হাসি।

'কোন ক্ষতি নেই।' আহমদ মুসা বলল।

'আছে ক্ষতি, সহঅভিনেতা পেছনে থাকে, সাথীকে কিন্তু পাশে রাখতে হয়।' বলেই সারা জেফারসন উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল, 'আম্মা ওনারা যে কোন সময় এসে পড়তে পারেন। কিছু গোছ-গাছ করে নেয়া প্রয়োজন।'

সারা জেফারসনের মা জিনা জেফারসনও উঠে দাঁড়াল। বলল, 'নিচটা পরিস্কার করতে বলে এসেছি। ওদিকটা দেখে আমি কিচেনের খোঁজ-খবর নেব। তুমি এদিকে তোমার গোছ-গাছটা করে নাও।'

বলে নিচ তলায় নামার জন্যে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হলো সারা জেফারসনের মা।

সারা জেফারসন যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াল। বলল আহমদ মুসাকে, 'আমার ওয়াশিংটন যাবার ব্যাপারে আপনি কিন্তু কিছু বলেননি।'

আহমদ মুসা গম্ভীর হলো। বলল, 'ফ্রি আমেরিকা' মুভমেন্টের এসব সিদ্ধান্ত আমাকে নিতে হবে তা কিন্তু আমি বুঝিনি।'

'এ নির্দেশ আমি সংগঠনকে দিয়েছি। আপনার সিদ্ধান্ত সংগঠনের সিদ্ধান্ত হিসাবে গণ্য হবে।'

'আমাকে এ সম্মান দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু আপনার এ সিদ্ধান্ত কি স্বাভাবিক?'

আবেগের এক উচ্ছ্বাস এসে সারা জেফারসনের চোখ-মুখ ভারী করে তুলল। বলল, 'আমার দেখা স্বপ্ন এ পর্যন্ত সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

আমার সে স্বপ্নেরই নির্দেশ এটা যে, আমার দায়িত্ব আপনার হাতে তুলে দেব।' আবেগে কম্পিত কন্ঠস্বর সারা জেফারসনের।

আহমদ মুসার ভেতরটা কেঁপে উঠল। যুক্তিবাদ ও বাস্তববাদের পীঠস্থান আমেরিকার শীর্ষ একটি পরিবারের সুশিক্ষিত তরুনী এমন অদৃষ্টবাদী হয়ে পড়ল কেমন করে! আহমদ মুসা তার এই অন্ধ আবেগের মোকাবিলা করবে কিভাবে!

আহমদ মুসা কথা বাড়াতে চাইল না।

বলল, 'ওদের ডাক যথার্থ। আপনার ওয়াশিংটনে অবশ্যই যেতে হবে।'

'ধন্যবাদ, স্যার।' সারা জেফারসনের মুখে তখন ফুটে উঠেছে দুষ্টুমির হাসি।

ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার হাঁটা দিল সারা জেফারসন।

হোয়াইট হাউজের দক্ষিণ অলিন্দে ল্যান্ড করল ছোট্ট একটি হেলিকপ্টার। অলিন্দটা নির্জন।

হেলিকপ্টারের ড্রাইভিং সিট থেকে নেমে এল এফ বি আই প্রধান জর্জ আব্রাহাম জনসন।

তার পরে নেমে এল আহমদ মুসা এবং সারা জেফারসন।

জর্জ আব্রাহাম জনসন একাই হেলিকপ্টার ড্রাইভ করে গিয়েছিল ভার্জিনিয়ার মন্টিসেলোতে। এমন একক সফরের কারণ হিসাবে বলেছিল, আলোচনার জন্য আরও কয়েকজনের আসার কথা ছিল। কিন্তু হোয়াইট হাউজ থেকে তার অনুমতি দেয়া হয়নি। সেখান থেকে জানানো হয়, আহমদ মুসা হোয়াইট হাউজে আসছেন। এ খবর জর্জ আব্রাহাম জনসন ও সারা জেফারসনের বাইরে এফ বি আই ও 'ফেম' এর কেউ যেন না জানে। সে জন্যে জর্জ আব্রাহাম জনসনকেই হেলিকপ্টার ড্রাইভ করতে হয়েছে।

হেলিকপ্টার ল্যান্ড করার পর আরোহীদের স্বাগত জানাতে কেউ আসেনি।

জর্জ আব্রাহাম জনসন নিজেই স্বাগত জানাল আহমদ মুসা ও সারা জেফারসনকে। জর্জ আব্রাহামই তাদের নিয়ে চলল হোয়াইট হাউজের ভেতরে।

জর্জ আব্রাহাম তাদেরকে এ করিডোর সে করিডোর ঘুরিয়ে, অনেক সিঁড়ি উঠানামা করিয়ে একটি কক্ষে নিয়ে ঢুকাল। মাঝারি সাইজের বর্গাকৃতি কক্ষ।

কক্ষের ঠিক মাঝখানে অর্থ বৃত্তাকার সুদৃশ্য একটা টেবিল। টেবিলের তিন দিক ঘিরে ছয়টি চেয়ার। আর টেবিলের অবশিষ্ট অন্য পাশটিতে একটিমাত্র আসন। সে আসনের সোজা পেছনে একটা দরজা।

আহমদ মুসারা এ দরজাটির বিপরীত দিকের দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করেছে।

কক্ষটি একটি মিটিং রুম। আহমদ মুসারা কক্ষে প্রবেশ করে দেখল তিনজন লোক বসে আছে। টেবিলের এ পাশে বসা বলে তাদের পেছনটা দেখা যাচ্ছে। বোধ হয় পায়ের শব্দ পেয়েছিল ওরা। তিনজনই এক সাথে পেছন ফিরে তাকাল।

তাকিয়েই তিনজন সহাস্যে উঠে দাঁড়াল। প্রায় একসাথেই দুজন বলে উঠল, 'ওয়েলকাম আহমদ মুসা। গুড মর্নিং টু অল।'

পূর্ব থেকে বসে থাকা তিনজনের একজন হলো এ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থার, সি আই এ প্রধান, দ্বিতীয় জন মার্কিন সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটন এবং তৃতীয়জন হোয়াইট ঈগলের প্রধান গোল্ড ওয়াটার। সবাই বসল।

ছয়জনের ঠিক মাঝখানে বসানো হয়েছে আহমদ মুসাকে। তার ডান পাশে সারা জেফারসন, বাম পাশে গোল্ড ওয়াটার। সারা জেফারসনের ডান পাশে একেবারে প্রান্তের চেয়ারে বসেছে জর্জ আব্রাহাম জনসন। আর গোল্ড ওয়াটারের বামপাশে বসেছে রোনাল্ড ওয়াশিংটন এবং তারপরে প্রান্তের চেয়ারটিতে বসেছে এ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থার।

সবাই বসলে সারা জেফারসন আহমদ মুসার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'বি রেডি, আপনিই চীফ গেষ্ট। আপনাকে বসানো হয়েছে প্রেসিডেন্টের চেয়ারের সোজা সামনে।

সকাল ১১টা বাজার সাথে সাথে টেবিলের ওপাশের খালি চেয়ারটার পেছনের দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে গেল।

সে দরজা দিয়ে প্রেসিডেন্ট প্রবেশ করল। তার মুখে হাসি। দৃঢ় পদক্ষেপ।

কক্ষে পা দিয়েই হাসি মুখে সকলের উপর দিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিল প্রেসিডেন্ট।

চেয়ারের কাছাকাছি এসে প্রেসিডেন্ট বলল, 'গুডমর্নিং টু অল।'

প্রেসিডেন্ট কক্ষে প্রবেশ করার সাথে সাথেই সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে। প্রেসিডেন্ট চেয়ারে এল।

প্রেসিডেন্ট বসার আগে চেয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে। প্রথম হাত বাড়িয়ে দিল আহমদ মুসার সাথে হ্যান্ডশেকের জন্যে। বলল মিষ্টি হেসে 'মি. আহমদ মুসা। নামের তুলনায় আপনি টু ইয়ং।

'ধন্যবাদ এক্সেলেন্সি। এটা আমার সৌভাগ্য।' হ্যান্ডশেক করতে করতে ঠোঁটে হাসি টেনে বলল আহমদ মুসা।

'দ্যাট'স ট্রু ইয়ংম্যান।' বলে প্রেসিডেন্ট হাত বাড়াল সারা জেফারসনের দিকে।

সারা জেফারসনের সাথে হ্যান্ডশেক করতে করতে বলল, ‘নাইস টু সি ইউ মিস জেফারসন। আপনার নতুন পরিচয় আমাকে আনন্দিত করেছে।

‘ধন্যবাদ মি. প্রেসিডেন্ট।’ বলল সারা জেফারসন।

তারপর প্রেসিডেন্ট হ্যান্ডশেক করল এফ বি আই চীফ জর্জ আব্রাহাম জনসনের সাথে। বলল, ‘আপনি অনেক কষ্ট করেছেন, ধন্যবাদ মি. জর্জ আব্রাহাম।’

আর গোল্ড ওয়াটারের সাথে হ্যান্ডশেক করতে করতে প্রেসিডেন্ট বলল, ‘মি গোল্ড ওয়াটার আপনিই না, মি. আহমদ মুসাকে ক্যারিবিয়ান থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এনে যত গন্ডগোল পাকিয়েছেন।’ প্রেসিডেন্টের মুখে হাসি।

‘আমার ধন্যবাদ পাওয়া উচিত মি. প্রেসিডেন্ট। কারণ এ গন্ডগোল সৃষ্টি না করলে অনেক সর্বনাশা গন্ডগোল দূর করা যেত না।’ বলল গোল্ড ওয়াটার।

‘সময়ই তা বলে দেবে মি. গোল্ড ওয়াটার।’ প্রেসিডেন্টের কন্ঠ কিছুটা গম্ভীর।

জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটন ও এ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থারের সাথে হ্যান্ডশেক করে প্রেসিডেন্ট এ্যাডামস হ্যারিসন তার চেআরে গিয়ে বসে পড়ল।

প্রেসিডেন্ট পঞ্চাশোর্ধ। কিন্তু তাকে দেখলে চল্লিশোর্ধের বেশি মনে হয় না।

শক্ত নার্ভের যতগুলো প্রেসিডেন্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসেছে, তাদের মধ্যে এই প্রেসিডেন্টও স্থান পাবেন। সাংঘাতিক টেনশনের সময়ও এ্যাডামস হ্যারিসন হাসতে পারে। তার আর একটি গুণ হলো তার কথায় স্বচ্ছতা আছে। মানুষ তার সাথে একবার কথা বললেই তাকে চিনতে পারে। প্রেসিডেন্ট বসেই বরল, এখনকার এই মিটিং ফরমাল ও ইনফরমাল দুইই। এই মিটিং এর আমার পাশে কাউকে রাখিনি। এই মিটিং এর কোন কিছুই নোট হবে না। এই মিটিং এ সাক্ষী হবার মত হোয়াইট হাউজে কেই নেই। প্রেসিডেন্টের সিকিউরিটি কমব্যাট ফোর্সই শুধু এখন হোয়াইট হাউজে আছে। সব স্টাফকে আমি ছুটি দিয়েছি আজ অবসর কাটাব বলে। সুতরাং আমাদের কথা-বার্তা পোশাক-আশাকহীন স্পষ্ট হলেই ভাল হয়।’

বলে প্রেসিডেন্ট মুহূর্তের জন্যে একটু থামল। একটু যেন আত্মস্থ হলো। তারপর মুখ তুলে সোজা তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বরল 'আমেরিকায় আপনাকে খোশ আহমদেদ আহমদ মুসা।'

'ধন্যবাদ মি. প্রেসিডেন্ট।' বলল আহমদ মুসা।

'আমি দুঃখিত, মৌলবাদী শব্দের কদর্থ হচ্ছে। যা হওয়া উচিত ছিল পুরস্কারের নিমিত্ত, তাকে করা হয়েছে তিরস্কারের বাহন। খ্রীষ্টের মৌল শিক্ষায় আমি অবিশ্বাসী নই, বাইবেল ছুঁয়ে শপথ নিয়ে আমি প্রেসিডেন্ট হয়েছি। তাই আমিও মৌলবাদী।' বলল প্রেসিডেন্ট শান্ত স্বরে।

'আমাকে 'সন্ত্রাসীও' বলা হয়েছে।' আহমদ মুসা বলল।

'এটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। 'অমুক সন্ত্রাসী' কিংবা 'আমি সন্ত্রাসী নই' কোনটারই মূল্য নেই। সত্য উদঘাটন থেকেই এর জবাব হয়ে যাবে।'

বলে একটু থেমেই প্রেসিডেন্ট আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, 'মি. আহমদ মুসা, আপনি কি ভয় পাচ্ছেন?'

'ভয় আসে হারানোর আশংকা থেকে। আমার কিছু হারাবার নেই মি. প্রেসিডেন্ট।' আহমদ মুসা বলল।

'কিন্তু সবচেয়ে মূল্যবান হলো জীবন। জীবনটা তো আপনার আছে।'

'জীবনটা আমি ধারণ করি মাত্র। কিন্তু এই জীবন থাকা, না থাকা আমার হাতে নয়, স্রষ্টার হাতে। তাই এ নিয়ে আমার কোন চিন্তা নেই মি. প্রেসিডেন্ট।'

'কিন্তু এ চিন্তা মানুষের সহজাত।' প্রেসিডেন্ট বলল।

'জীব হিসেবে তা সত্য, কিন্তু মানুষ হিসাবে আমাদেরকে এ শিক্ষা নিতে হয় যে, কোন শক্তির মৃত্যুর তারিখ এগিয়েও যেমন আনতে পারে না, তেমনি কোন-প্রয়াস মৃত্যুর সময়কে পিছিয়েও দিতে পারে না।'

প্রেসিডেন্টের মুখে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'ধন্যবাদ আহমদ মুসা আপনি সত্যিই দেখছি একজন অনুকরণীয় মৌলবাদী।'

বলে প্রেসিডেন্ট মুহূর্তের জন্যে থামল। তার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। পরক্ষণেই সকলের দিকে চেয়ে বলে উঠল, 'আহমদ মুসা নানাদিক দিয়ে একজন

আলোচিত ব্যক্তিত্ব তাই প্রথম সাক্ষাতে তারসাথে একটু আলোচনার সুযোগ নিলাম। এখন কাজের কথায় আসি।’

থামল প্রেসিডেন্ট। তাকাল জর্জ আব্রাহাম জনসনের দিকে। জর্জ আব্রাহাম জনসন মার্কিন নিরাপত্তা সিস্টেমের সবচেয়ে সিনিয়র আমলা।

জর্জ আব্রাহাম জনসন প্রেসিডেন্টকে তার দিকে তাকাতে দেখে নড়ে-চড়ে বসল। বুঝল প্রেসিডেন্টের ইংগিত যে, তাকেই একটা ভূমিকা নিতে হবে। বলল সে ‘বিশেষ এক পরিস্থিতিতে হোয়াইট হাউজে মহামান্য প্রেসিডেন্টের সামনে আমরা উপস্থিত হয়েছি। আজ দেশের প্রধান সংবাদপত্রগুলোতে একটা নিউজ পরিকল্পিতভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। এর মূল কথা, আহমদ মুসার যোগ-সাজসের শিকার হয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও তার প্রশাসন এবং মার্কিন দুটি সংগঠন, হোয়াইট ঈগল ও ‘ফেম’, ইহুদীদের সাথে সংঘাত সৃষ্টির জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। ওদের ঘোষণা থেকে মনে হচ্ছে, আজ সন্ধ্যায় কয়েকটি টিভি চ্যানেলেও এই কথাগুলো প্রচার করা হবে। এই অবস্থায় মত বিনিময়ের জন্যেই এই মিটিং। প্রেসিডেন্ট সরাসরি আপনাদের কাছ থেকে কিছু জানতে চান।’ থামল জর্জ আব্রাহাম।

থামার সংগে সংগেই প্রেসিডেন্ট বলে উঠল, ‘ধন্যবাদ মি. জর্জ।’

বলেই প্রেসিডেন্ট সরাসরি আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘মি. আহমদ মুসা, যে অভিযোগ ওরা নিয়ে আসছে তার প্রধান আসামী আপনার মতে কে?’

আহমদ মুসার দুচোখও প্রেসিডেন্টের চোখে নিবদ্ধ। প্রশ্নের ধরনেই বোধ হয় এক টুকরো হাসি ফুটে উঠেছে আহমদ মুসার ঠোঁটে। বরল, ‘মহামান্য প্রেসিডেন্ট যাকে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করেছেন, সেই আহমদ মুসাই প্রধান আসামী। নিউজে যা বলা হয়েছে তার সবটাই প্রেসিডেন্ট ও তা প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টির লক্ষ্যে, যাতে প্রেসিডেন্ট সংশ্লিষ্ট সব ঘটনাকে ইহুদী বিদ্বেষজাত সাজানো ঘটনা ধরে নিয়ে ইহুদীদের বিরুদ্ধে তদন্ত বন্ধ করে আহমদ মুসার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।’

‘প্রেসিডেন্ট যদি দেশের সংবাদপত্র ও টিভি নেটওয়ার্কের এই সাজেশনকে গ্রহণ করেন?’ বলল প্রেসিডেন্ট গম্ভীর কন্ঠে।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘প্রেসিডেন্ট তা করতে পারেন।

‘সেক্ষেত্রে আপনার ভূমিকা কি হবে?’ বরল প্রেসিডেন্ট।

‘কোন ভূমিকায় আমি অবতীর্ণ হব, তা নির্ভর করবে মিস জেফারসন ও মি. গোল্ড ওয়াটারের ভূমিকার উপর। ওরা যদি আমাকে সহযোগিতা করেন, তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থেকেই জেনারেল শ্যারনদের ষড়যন্ত্র নস্যাতের চেষ্টা করব। আর ওরা যদি প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তের সাথে থাকেন, তাহলে আমি মার্কিন সরকারের গ্রেফতার এড়িয়ে যুক্তিটাকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিয়ে যাব।’

‘আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিয়ে যাবার অর্থ?’ প্রেসিডেন্ট জিজ্ঞেস করল।

‘জেনারেল শ্যারনরা যে লড়াই মার্কিন মিডিয়াতে শুরু করেছে, তা আমি আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে নিয়ে যাব এবং ওদের মুখোশ ছিঁড়ে ওদের নগ্ন চেহারা বিশ্ববাসীর সামনে নগ্ন করে দেব।’ বলল আহমদ মুসা।

প্রেসিডেন্টের চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু মুখের গাম্ভীর্য ঠিকই থাকল। বলল প্রেসিডেন্ট, ‘মার্কিন গ্রেফতার এড়াবেন কি করে? আপনি হোয়াইট হাউজে, কার্যত বন্দীই বলতে পারেন।’

আহমদ মুসার হাসল। বলল, ‘আমি কার্যত বন্দী যেমন বলা যায়, তেমনি বন্দী মুক্তির পথ কার্যত খোলা আছে বলা যায়।’

প্রেসিডেন্টের ভ্রুকুঞ্চিত হলো। তারপর মুখে ফুটে উঠল কৌতুল। বলল, ‘সে পথ কেমন?’

আহমদ মুসার হাসল। বলল আমার শোল্ডার হোলস্টারে মেশিন রিভলবার এম ১০ আছে, কেউ সার্চ করেনি। এই ঘরে সবাইকে বন্দী করে আমি বেরিয়ে যেতে পারি। হেলিকপ্টার ল্যান্ড করা আছে সিঁড়ির প্রায় গা ঘেষেই। জর্জ আব্রাহাম চাবি রেখে এসেছে ড্যাশ বোর্ডের এ্যাসট্রেতে। প্রেসিডেন্টের অয়্যারলেস সংকেত পেয়ে হোয়াইট হাউজের সিকিউরিটি কমব্যাট ফোর্স হেলিকপ্টার লক্ষ্যে যখন প্রথম গুলী বৃষ্টি করবে তখন হেলিকপ্টার অন্তত পঞ্চাশ ফুট উপরে উঠে যাবে।’

প্রেসিডেন্টের ঠোঁটে হাসি।

জর্জ আব্রাহামের চোখে-মুখে বিস্ময়। বলল, 'কেউ দেখেনি নিশ্চিত হয়ে চাবিটা আমি ওখানে রেখেছি।'

জর্জ আব্রাহাম থামতেই জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটন বলল, 'হেলিকপ্টার গুলী করে নামাবো, ওটা হোয়াইট হাউজের এলাকা পার হবার আগেই।'

'জনাব জর্জ আব্রাহামের হেলিকপ্টারটি বুলেট প্রুফ। গোলা বর্ষণ করে যদি পাখা ফেলে দেয়া হয়, তবু এ বিশেষ হেলিকপ্টারটি ফ্লাই করতে পারে।' বলল আহমদ মুসা হাসি মুখে।

এবার প্রেসিডেন্টসহ সকলের চোখে মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন। বলল এফ বি আই চীফ জর্জ আব্রাহাম জনসন, 'হেলিকপ্টারের এই বৈশিষ্ট্য একটা ক্ল্যাসিফাইড ইনফরমেশন। আপনার জানার কথা নয়।'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'হেলিকপ্টারের ড্রাইভিং ডোরের ভেতরের পাশে মেক-আপ প্লেটে হেলিকপ্টারের স্পেসিফিকেশন লেখা আছে। ওটা থেকে তো যে কেউ ক্ল্যাসিফাইড ইনফরমেশন জেনে নিতে পারে।'

'ধন্যবাদ আহমদ মুসা। সত্যই বিস্ময়ের যে, হোয়াইট হাউজের গ্রেফতার এড়িয়ে সরে পড়ার চিন্তাও আপনি করে রেখেছেন।'

প্রেসিডেন্ট আহমদ মুসাকে এই কথা বলার পর সারা জেফারসন ও গোল্ড ওয়াটারকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'সরকার যদি মিডিয়ার সাজেশনকে গ্রহণ করে নেয়, তাহলে আহমদ মুসা তার পদক্ষেপ হিসাবে দুই বিকল্পের কথা বলেছে। একটিতে আপনাদের সহযোগিতা দরকার, অন্যটিতে তার নিজস্ব। আপনারা তাকে সহযোগিতা করছেন কি না?'

'মি. প্রেসিডেন্ট বলেছেন, আমি আহমদ মুসাকে আমেরিকায় এনে এই গন্ডগোল পাকিয়েছি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে তাঁকে এনে গন্ডগোল দূর করার ব্যবস্থা করেছি। সুতরাং আমি এবং আমার সংগঠন তাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করব।' বলল গোল্ড ওয়াটার।

প্রেসিডেন্ট তাকালেন সারা জেফারসনের দিকে।

সারা জেফারসনের মুখ গম্ভীর। বলল, ‘যুদ্ধ বা লড়াই যেটা শুরু হয়েছে, সেটা আমাদের লড়াই, আমেরিকানদের লড়াই। মি. আহমদ মুসার লড়াই নয়। তিনি ঘটনাক্রমে এর সাথে জড়িত হয়ে পড়েছেন এবং সবরকম সহযোগিতা করছেন। আমি আমেরিকার পক্ষ থেকে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে, আমেরিকা না চাইলেও এ লড়াই তিনি চালাবেন আমেরিকার বাইরে গিয়ে। এটা তাঁর পরম মানবিকতার প্রকাশ।’

সারা জেফারসনের কথা শেষে দিকে এসে আবেগে রুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। একটু থামল সারা জেফারসন।

‘স্যরি’ বলে মুখটা একটু ঘুরিয়ে একটু কেসে পরিস্কার করে নিয়ে আবার বলল, ‘আমেরিকানদের সরকার না চাইলেও আমেরিকানরা এ লড়াই চালাবে। আবেদন করব, এ লড়াই এ মি. আহমদ মুসা আমেরিকানদের সাথে থাকবেন।’

কন্ঠ আবার আবেগে রুদ্ধ হয়ে পড়ল সারা জেফারসনের।

থামল সারা জেফারসন। মুখ নিচু করল সে।

প্রেসিডেন্টের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। একটা আবেগের কম্পন তারও চোখে-মুখে।

প্রেসিডেন্ট সোজা হয়ে বসল। বলল, ‘ধন্যবাদ মিস জেফারসন। প্রেসিডেন্ট হিসাবে নয়, একজন আমেরিকান হিসাবে আপনাকে অভিনন্দিত করছি। আমি গর্বিত যে, আমেরিকানদেরই এক প্রিয় পূর্ব পুরুষের পরিবারের আপনি সন্তান।’ প্রেসিডেন্ট একটু থামল।

প্রেসিডেন্টের কথাও আবেগে ভারী হয়ে উঠেছিল।

থামার সাথে সাথে প্রেসিডেন্টের চোখ মুহূর্তের জন্যে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বোধ হয় প্রেসিডেন্ট আবেগ দূরে সরাতে চাইল। মুহূর্তকাল পরে প্রেসিডেন্ট বলল, ‘কিন্তু সব নাগরিকের সরকার হিসাবে, দেশের প্রেসিডেন্ট হিসাবে কোন জাতিগত দ্বন্দ্বে আমি কোন পক্ষ হতে পারি না।’

‘জাতিগত দ্বন্দ্ব কোথায় মি. প্রেসিডেন্ট?’ বলল সারা জেফারসন।

‘পরিস্কার যে, এই সংঘাতে ইহুদীরা এক পক্ষ হয়ে গিয়েছে।’

প্রেসিডেন্ট বলল।

‘পরিকল্পিতভাবে ওদের একটা পক্ষ করা হয়েছে মি. প্রেসিডেন্ট। দেশের বাইরে আন্তর্জাতিক একটি ইহুদী গোয়েন্দা গ্রুপ আমাদের দেশের ইহুদীদের একটা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর যোগসাজসে একটা ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। এটা হলো প্রকৃত ঘটনা। এই ঘটনার সাথে দেশের সাধারণ ইহুদীদের কোনই সম্পর্ক নেই। সুতরাং যে সংঘাত বেধেছে সেটা জাতিগত সংঘাত নয়। সংঘাত বেধেছে ষড়যন্ত্রকারী একটা চক্রের সাথে। ঘটনাক্রমে ষড়যন্ত্রকারী এই গোষ্ঠী দেশের ইহুদীদের একটা অংশ। আর এই ষড়যন্ত্রকারীরা ধরা পড়ার পর এখন চেষ্টা করছে দেশেসব ইহুদীদের তাদের সাথে টানার এবং একে জাতিগত রূপ দেয়ার। তারা দুটো অন্যায় করছে। প্রথমটা ওদের ষড়যন্ত্র, অন্যটা হলো তাদের কুকীর্তির সাথে গোটা ইহুদী কম্যুনিটিকে জড়িয়ে ফেলার। এইভাবে ইহুদী কম্যুনিটিকে ঢাল বানিয়ে তারা তাদের জঘন্য কুকীর্তিকে ঢাকতে চাচ্ছে। এটা আমরা হতে দিতে পারি না।

‘মিস জেফারসন আপনার সাথে আমি একমত। কিন্তু এ কথাগুলো সবই এখন মানুষের কাছে প্রমাণ সাপেক্ষ্য। প্রমানিত হবার আগে জনগণ যেমন পক্ষ নেবে না, তেমনি সরকারে এখন এক পক্ষে গিয়ে দাঁড়ানো কঠিন।’ প্রেসিডেন্ট বলল।

‘স্যরি মি. প্রেসিডেন্ট, এখানে পক্ষ নেবার প্রশ্ন উঠছে না। আপনার প্রশাসন একটা তদন্তে হাত দিয়েছে, সেটা এখন এগিয়ে নেয়ার প্রশ্ন।’ বলল সারা জেফারসন।

‘সেটা এগিয়ে যাবে মিস জেফারসন। কিন্তু সরকারকে এখন কথা বলতে হবে। সে কথায় সরকার বলবে, আহমদ মুসার পক্ষ এবং ইহুদীদের বিপক্ষ-কোন ব্যাপারেই এমন কোন বিবেচনা সরকারের মধ্যে নেই। প্রশাসন কিছু গুরুত্বপুর্ণ ব্যাপারে তদন্ত করছে। ব্যক্তি, পরিচয় নির্বিশেষে যে কারো কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতাকে ওয়েলকাম করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সম্মানিত ইহুদী নাগরিকদের সহযোগিতাকে বিশেষ মূল্যবান বিবেচনা করা হবে উপযুক্ত সময়ে সবকিছুই জনসমক্ষ্যে আনা হবে।’ প্রেসিডেন্টের দপ্তর থেকে আজই একথা ঘোষণা করা হবে।

'মি. প্রেসিডেন্ট তদন্ত বানচাল করার জন্যেই জেনারেল শ্যারনরা এতকিছু করছে। সুতরাং এই ঘোষণা কোনই কাজ দেবে না। এ তদন্ত তারা আগাতে দেবে না। প্রেসিডেন্টের উপর রাজনৈতিক চাপ কোন কাজ না দিলে তারা আরও বড় কিছু ঘটাবে। মি. প্রেসিডেন্ট নিশ্চিত থাকুন তারা সরকারের পতন পর্যন্ত যাবে।' সারা জেফারসন বলল।

'আমি জানি মিস জেফারসন। জর্জ আব্রাহাম ও ম্যাক আর্থাররাও একথা বলছেন।' বলল প্রেসিডেন্ট।

'তাহলে মি. প্রেসিডেন্ট ওদের আক্রমণের জবাবে আপনি অকার্যকর এই আত্মরক্ষার পথ নিচ্ছেন কেন?' বলল সারা জেফারসন।

'সরকার এর বেশি কিছু করতে পারবে না।' প্রেসিডেন্ট বলল।

'তাহলে?' হতাশ কন্ঠে গোল্ড ওয়াটার বলল।

'এ প্রশ্নের সমাধানের জন্যেই তো আপনাদের ডেকেছি। থ্যাংকস গড। যা চেয়েছিলাম তা পেয়েছি।' বলল প্রেসিডেন্ট।

'কি পেয়েছেন মি. প্রেসিডেন্ট?' জিজ্ঞেস করল সারা জেফারসন।

'আহমদ মুসা আমাকে নিশ্চিত করেছেন। তার এগিয়ে যাওয়াটা সরকার নির্ভর নয়। মি. গোল্ড ওয়াটার তাকে সহযোগিতা করবেন জেনে খুশি হয়েছি। আর মিস জেফারসন আপনার মধ্যে আমেরিকার সংগ্রামী নতুন প্রজন্মকে দেখছি। আমি আশান্বিত আপনারা ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে জয়ী হবেন।' বলল প্রেসিডেন্ট। তার কন্ঠে আবেগের সুর।

'কিন্তু মি. প্রেসিডেন্ট, জনগণের সংকট মোচনে জনগণের সরকার কিছু না করে সমাধান জনগণের উপর ছেড়ে দিলে সেটা কেমন হয়।' বলল সারা জেফারসন।

'দেশের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ধরনের কূটনীতির আশ্রয় নিতে হয়। একে প্রয়োজনীয় একটি কূটনীতি হিসেবেই দেখুন। তবে সরকার ওদের উপর ক্র্যাকডাউন করছে না ঠিকই, তবে প্রশাসনের সব ধরনের সহযোগিতা আপনারা পাবেন। সেটা নেয়ার দায়িত্ব আপনাদের, দেয়ার দায়িত্ব প্রশাসনের থাকবে না।'

প্রেসিডেন্ট সারা জেফারসনের উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলেই তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'মি. আহমদ মুসা, সামনে এগোনোর ব্যাপারে আপনারা কি চিন্তা করছেন, কিছু কি জানতে পারি?'

'এ প্রশ্নের উত্তর মিস সারা জেফারসন ভাল দিতে পারবেন। ওরা কিছু চিন্তা করেছেন মি. প্রেসিডেন্ট।'

প্রেসিডেন্টের চোখ ঘুরে গেল সারা জেফারসনের দিকে।

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই সারা জেফারসন শুরু করেছে তার কথা। বলছিল, 'বিস্তারিত আমরা কিছু ভাবিনি। তবে যে অস্ত্র দিয়ে ওরা আমেরিকানদের আঘাত করেছে, সে অস্ত্র দিয়ে আমরা ওদের আঘাত করব। অস্ত্র রেডি করার দায়িত্ব আমাদের, কিন্তু রসদ যোগাবেন জনাব আহমদ মুসা।'

'বুঝতে পারছি, কাজ আমাদেরই করতে হবে। কিন্তু সরকার আমাদের কোন দায় দায়িত্ব নেবেন না। বরং দরকার হলে সরকার আমাদের কাউকে গ্রেফতারও দেখাবেন।'

কথার মাঝখানে আহমদ মুসা একটু থামল। আবার শুরু করল। বলল, 'রসদ তৈরীর ব্যাপারে মি. জর্জ আব্রাহাম মি.ম্যাক আর্থার ও মি. রোনাল্ড ওয়াশিংটনদের কারো কারো সহযোগিতা দরকার হবে। ওদের সাথে যোগাযোগের কোন সুযোগ থাকছে কিনা?

'সত্যিই আপনি অসাধারণ আহমদ মুসা। আপনাকে গ্রেফতার দেখাবার মত পরিস্থিতি হতে পারে। জেনারেল শ্যারনদের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ঠেকাবার জন্যে শেষ পর্যন্ত প্রশাসনকে ঐ পর্যন্ত যেতে হতে পারে। আপনি এটা বুঝেছেন মানে মার্কিন রাজনীতির কিছুই বুঝা আপনার বাকি নেই। আপনাকে ধন্যবাদ।'

শেষ শব্দ উচ্চারণের পর প্রেসিডেন্ট একটা দম নিয়ে আবার শূরু করল, 'না ওদের কারো সাথে আপনি যোগাযোগের সুযোগ পাবেন না। আমাদের গোটা পুলিশ ও গোয়েন্দা এজেন্সীগুলোর চোখের বাইরে আপনাকে কাজ করতে হবে। যাতে জেনারেল শ্যারন ও সংশ্লিষ্টরা বোঝে আপনাদের কাজের সাথে সরকারের কোন সম্পর্ক নেই। লড়াই থেকে সরকার সরে দাঁড়িয়েছে। লড়াই চালাচ্ছেন

আপনারা। তবে জর্জ আব্রাহাম, মি. ম্যাক আর্থার ও জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটন ব্যক্তিগতভাবে আপনার সাথে যোগাযোগ করবেন প্রয়োজন হলে।'

'কিন্তু আমার প্রয়োজন হলে?' প্রেসিডেন্ট থামতেই বলে উঠল আহমদ মুসা।

'আমার সাথে বৈঠকের পর এখানেই ওদের সাথে আপনি বসবেন। আপনার প্রশ্নের জবাব ওরাই দেবেন।' বলল প্রেসিডেন্ট।

এ কথা শেষ করেই প্রেসিডেন্ট বলে উঠল, 'লেডিজ এন্ড জেন্টেলম্যান, আপনারা কষ্ট করে এখানে এসে আমাকে আলোচনার সুযোগ দেয়ায় আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। আমি এখন উঠতে চাই।'

উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে প্রেসিডেন্ট বলল, 'পাশের ঘরে আপনাদের চা অপেক্ষা করছে। সেখানে সকলকে আমি দাওয়াত দিচ্ছি। মি. জর্জ আব্রাহাম জনসনকে আমি অনুরোধ করছি তিনি আমার পক্ষ থেকে সম্মানিত মেহমানদের সাথে এ্যাটেন্ড করবেন।'

বলে প্রেসিডেন্ট উঠে দাঁড়িয়ে সকলের সাথে হ্যান্ডশেক করে যেমন এসেছিল, তেমনি পেছনের সেই দরজার দিকে এগুলো।

দরজায় গিয়ে আবার ফিরে দাঁড়াল প্রেসিডেন্ট। বলল সারা জেফারসনকে লক্ষ্য করে। বলল, 'সারা জেফারসন ফরমাল মিটিং শেষ, এখন তোমাকে মা বলতে পারি। শুন মা সারা জেফারসন, তোমার মন্টিসেলোতে থাকা ঠিক হবে না। লস আলামোস থেকেও তোমার এক মাসের ছুটি হয়েছে। তুমি এখন ওয়াশিংটনে থাকবে। তোমার মাকেও আনার জন্যে আমি বলে দিয়েছি। আহমদ মুসাও অবশ্যই ওয়াশিংটনে থাকবেন। জর্জ আব্রাহাম জনসন সব ব্যবস্থা করে দেবেন, এক বাড়ি কিংবা দুই বাড়ি যেটাই তোমার প্রেফার কর।'

প্রেসিডেন্ট চলে গেল।

সারা জেফারসন ঠোঁটে এক টুকরো হাসি নিয়ে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। তারপর চোখ ঘুরাল জর্জ আব্রাহাম জনসনের দিকে। বলল, 'আংকল আমাদের এক বাড়িই বোধয় আমার জন্যে নিরাপদ হবে, তাই না?' সারা জেফারসনের চোখ উজ্জ্বল।

জর্জ আব্রাহাম কথা বলার আগেই আহমদ মুসা মুখ খুলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই সারা জেফারসন দ্রুত বলে উঠল, ‘আমরা এখন উঠতে পারি।’ উঠে দাঁড়াল সারা জেফারসন।

উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে আরও বলল সারা জেফারসন, ‘আংকল জর্জ আব্রাহাম জনসনের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি চায়ের টেবিলে।’

‘ধন্যবাদ মা, প্রেসিডেন্ট যখন পাওয়ার ডেলিগেট করেছেন মি. জর্জকে তখন মি. জর্জও পারেন তা করতে।’ বলল এ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থার হাসতে হাসতে।

সবাই হেসে উঠল। উঠে দাঁড়াল সবাই।

# ৬

পটোম্যাক বে’র মুখে সুন্দর একটা দুতলা বাংলো। বাড়ির চারদিকের বাগানের গাছ-পালা এতই গভীর যে দূর থেকে বাড়িটার কোন অস্তিত্বই চোখে পড়ে না।

সুন্দর বাংলো বাড়িটার মালিক হাওয়ার্ড হেফলিন। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের বড় শেয়ারের মালিক এবং চেয়ারম্যান।

তখন সন্ধ্যা ৮টা। একটি বড় হাইল্যান্ডার জীপ গাড়ি এসে দাঁড়াল গেটে। গেটম্যান বেরিয়ে এল।

গাড়িটার ড্রাইভিং সিট থেকে নামল একজন। বলল, ‘ম্যাডাম সারা জেফারসনের গাড়ি।’

সংগে সংগে খুলে গেল প্রধান গেট।

গাড়ি ভেতরে প্রবেশ করে দাঁড়াল গাড়ি বারান্দায়।

ঠিক এ সময়ই ভেতর থেকে বেরিয়ে এল মধ্যবয়সী একজন লোক। হাওয়ার্ড হেফলিন।

সে সকলকে স্বাগত জানিয়ে প্রথমে হ্যান্ডশেক করল সারা জেফারসনের সাথে। বলল, ‘আপনার সাথে আমার এটা দ্বিতীয় দেখা মিস জেফারসন। প্রথম আপনাকে দেখেছিলাম টমাস জেফারসন মেমোরিয়ালের একটা অনুষ্ঠানে।’

‘ধন্যবাদ স্যার, এই মনে রাখার জন্যে।’

বলে সারা জেফারসন হাওয়ার্ড হেফলিনকে একে একে পরিচয় করিয়ে দিল আহমদ মুসা, গোল্ড ওয়াটার, বেঞ্জামিন বেকন এবং নিজের পি এস ক্লারা কার্টারের সাথে।

আহমদ মুসার সাথে হ্যান্ডশেক করার সময় হাওয়ার্ড হেফলিন বলল, ‘আপনার সাথে হ্যান্ডশেক করায় আনন্দ ও ভয় দুটোই অনুভব করছি। আনন্দ

অনুভভ করছি এই ভেবে যে, অভাবিত এক সৌভাগ্য আমার হলো। আর ভয়ের কারণ হলো আপনি যেখানেই পা দেন, সেখানেই নাকি পরিবর্তন আসে।'

আহমদ মুসাসহ সবাই হেসে উঠেছিল, মি. হাওয়ার্ড হেফলিনের এই কথায়। আহমদ মুসা বলল, পরিবর্তন ভালো হলে তো ভয়ের কিছু নেই।'

'জনাব, সেটা তো ফল পাবার পরের কথা।' বলল হাওয়ার্ড হেফলিন।

হাওয়ার্ড হেফলিন সকলকে নিয়ে ড্রইং রুমে এসে বসল। বসেই মিস জেফারসনকে লক্ষ্য করে বলল, 'মিস জেফারসন প্রতিবাদের যে  একটা কপি আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। তা আমি পড়েছি। দেখছি ভয়নাক ব্যাপার। পড়ার সময় মনে হয়েছে, আমি অবিশ্বাস্য এক স্বপ্ন দেখছি। কিন্তু প্রমাণগুলো এতই প্রশ্নাতীত যে অবিশ্বাসের কোন সুযোগ নেই। ভাবছি, দেশে বড় কিছু ঘটে যাবে।'

'ধন্যবাদ স্যার, সিদ্ধান্ত নিশ্চয় নিয়ে নিয়েছেন?' বলল সারা জেফারসন।

'ঐ তো ভয় করছি কিছু ঘটার আশংকা নিয়ে।'

বলে হাওয়ার্ড হেফলিন মুহূর্তের জন্য থামল। আরও একটু আত্মস্থ হবার ভাব ফুটে উঠল তার চোখে-মুখে। বলল, 'আরও একটু আলোচনার সুযোগ নেবার জন্যেই আপনাদের এভাবে কষ্ট দিয়েছি। আমি বলতে চাচ্ছিলাম, এই ভয়ানক সেনসেটিভ ব্যাপারটা জনসমক্ষে না এনে সরকারকে জানালেই হয়ে যায় না?'

'আমরা তো সেটাই চেয়েছিলাম। কিন্তু শ্যারন-চক্রই তো একে মিডিয়াতে নিয়ে এল। আমাদেরকেই বানাল জঘন্য ষড়যন্ত্রের আসামী। এখন শুধু আমাদের আত্মরক্ষা নয়, দেশ জনগণের স্বার্থেই গোটা বিষয় জনসমক্ষে আসা দরকার।' বলল সারা জেফারসন।

'এটাও স্বীকার করছি মিস জেফারসন। আগে কিছুটা আঁচ করতে পারলে আমি ওটা ছাপতে দিতাম না। আমার এডিটররা মনে করেছে শতাব্দীর সেরা জিনিস তারা হাতে পেয়েছে। তাই পাওয়ার সংগে সংগেই ছেপে দিয়েছে। এখন ওরা পড়েছে মহা সংকটে। এই মাত্র সম্পাদক সাহেব জনালেন, দেশ ও জাতিগত সম্প্রীতি মারাত্মকভাবে ভেঙে পড়বে যদি ওটা ছাপা হয়।'

থামল হাওয়ার্ড হেফলিন। তার চোখে মুখে গভীর চিন্তার ছাপ।

‘মাফ করবেন স্যার, আপনি কি জবাব দিয়েছেন?’ জিজ্ঞেস করল সারা জেফারসন।

‘জবাব দেইনি। ভাবছি। এ নিয়ে আরও সংকট দেখা দিয়েছে। প্রতিবাদটা আমাদের পত্রিকা অফিসে আসার পরই এর কপি সাংবাদিক কর্মচারীদের হাতেও দেখা গেছে। ভয়নাক উত্তেজনা এখন তাদের মধ্যেও। অধিকাংশ সাংবাদিক বলছে প্রতিবাদ না ছাপলে তারা প্রতিবাদের ভিত্তিতে নিউজ করবে। নিউজ না ছাপলে তারা পত্রিকা প্রকাশ হতে দেবে না। অন্যদিকে কিছু সিনিয়র এডিটরসহ সাংবাদিকদের একটা গ্রুপ এর বিরোধিতা করছে। এখন দেখছি আমার ঘরেই আগুন লাগার দশা। আমার অনুরোধ আপনারা একটা উপায় বের করুন।’ বলল খুব নরম কন্ঠে হাওয়ার্ড হেফলিন।

‘কি উপায়ের কথা বলছেন বুঝলাম না।’ বলল গোল্ড ওয়াটার।

‘কিছু মনে করবেন না আপনারা, আমি জানতে পেরেছি আমাদের তরুন ও যুবক সাংবাদিকদের উপর ‘ফেম’ মানে ‘ফ্রি আমেরিকা’ মুভমেন্টের দারুন প্রভাব। ‘ফেম’ ওদেরকে শান্ত করতে পারে।’ বলল হাওয়ার্ড হেফলিন দ্বিধা জড়িত কন্ঠে।

ভ্রুকুঞ্চিত হলো সারা জেফারসনের। তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে। সে তাকালো আহমদ মুসার দিকে। তারপর হাওয়ার্ড হেফলিনের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, ‘মি. হাওয়ার্ড আমাকে মাফ করবেন, সাংবাদিকদের শান্ত করা আপনার কাছে বড় হয়ে উঠল কেন? আপনি.......।’

সারা জেফারসনের কথার মধ্যেই হাওয়ার্ড হেফলিন বলে উঠল, ‘অন্যকিছু না মিস জেফারসন আমি আমার অফিসকে শান্ত করতে চাচ্ছি। দুএকদিন পর প্রতিবাদটা আমরা ছেপে দেব। অফিসের ঘটনায় আমি উদ্বিগ্ন এ কারণে যে, এ ধরনের ঘটনা কখনই ঘটেনি আমার অফিসে।’

‘স্যার বলুন, জেনারেল শ্যারনরা যা করেছে, সে ধরনের ঘটনাও কি এর আগে কখনও ঘটেছে?’ বলল সারা জেফারসন মি. হাওয়ার্ডকে লক্ষ করে।

‘না ঘটেনি।’ হাওয়ার্ড হেফলিন বলল।

‘স্যার, কোনদিন না ঘটা ঘটনা যখন ঘটে বসে, তখন তার প্রতিক্রিয়াও এমন হয় যা আগে কখনো হয়নি। সুতরাং আপনার অফিসে যা ঘটছে তা অস্বাভাবিক নয়।’

বলে একটু থেমে একটু চিন্তা করে আবার বলল, ‘স্যার এ সময়ের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো সত্য প্রকাশ করা। জাতিগত বৈরিতার যে ভয় করছেন, সেটা দূর হবে সত্য প্রকাশ হলে। ওরা তো ইহুদী কম্যুনিটিকে একটা পক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। অথচ ঘটনা এটা নয়। ঘটনা হলো আন্তর্জাতিক একটা ইহুদী গোয়েন্দা চক্র, আমাদের দেশের ইহুদীদের একটা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর যোগসাজসে ষড়যন্ত্র পাকিয়েছে। এই চক্র ও গোষ্ঠীর সাথে আমাদের ইহুদী নাগরিকদের কোন সম্পর্ক নেই। সত্য প্রকাশ হলেই শুধু এ বিষয়টা সকলের কাছে পরিস্কার হবে। সুতরাং সত্য যত তাড়াতাড়ি প্রকাশ হয় ততই ভাল।’ থামল সারা জেফারসন।

হাওয়ার্ড হেফলিন কোন জবাব দিল না। তাকিয়ে ছিল সারা জেফারসনের দিকে। যেন সারা জেফারসনের কথাগুলো বোঝা তার এখনও শেষ হয়নি।

সারা জেফারবসনই কথা বলে উঠল আবার। বলল, ‘আংকল হাওয়ার্ড, সবাইকে বিশেষ করে আহমদ মুসাকে নিয়ে আপনার কাছে এসেছি আপনাকে আমি জানি বলে। আংকল, আন্তর্জাতিকভাবে সক্রিয় একটা ইহুদীবাদী গোষ্ঠী আমেরিকানদেরকে যে আমেরিকানদের ঘরেই পরবাসী করে তুলছে এবং ব্যাপারটা অসহনীয় মাত্রায় পৌঁছে যাচ্ছে, এ বিষয়টা। মুষ্টিমেয় যে আমেরিকানরা বোঝে তাদের মধ্যে আপনিও একজন। জনাব আহমদ মুসা ইহুদী গোয়েন্দাদের ষড়যন্ত্র আবিস্কার করে আমেরিকানদের যে কি অমূল্য উপকার করেছেন তাও আপনি নিশ্চয় উপলব্ধি করেছেন। অথচ তাকেই সন্ত্রাসী সাজানো হয়েছে, ক্ষেপিয়ে তুলতে চেষ্টা করা হচ্ছে আমেরিকানদের তার বিরুদ্ধে। এই অবস্থায়ও কি আমরা সত্য প্রকাশ করব না? আপনার বিবেকের কাছে আমি এর ফায়সালা চাচ্ছি আংকল।’ থামল সারা জেফারসন।

ভাবনা ও বিষণ্নতার কালো ছায়া কেটে যাচ্ছিল হাওয়ার্ড হেফলিনের মুখ থেকে। উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার চোখ-মুখ। বলল, ‘ধন্যবাদ সারা জেফারসন। আমি আপনাদের সাথে আছি। আমি এখনি নির্দেশ দিচ্ছি আমার অফিসকে। আজই ছাপা হবে ঐ প্রতিবাদ।’

বলেই হাওয়ার্ড হেফলিন মুখ ঘুরালো আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘মি. আহমদ মুসা, এই ষড়যন্ত্র-সংঘাতের শেষ কিভাবে হবে আমি জানি না। কিন্তু প্রতিবাদের প্রতিটি শব্দ আমি বিশ্বাস করেছি। আমার মনে হচ্ছে, ঈশ্বর আপনাকে দিয়ে আমেরিকানদের জীবন এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা ঘটাল।’

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল এ সময় পাশে বসা বেঞ্জামিন বেকনের মোবাইলে টেলিফোন কল বেজে উঠল।

সে দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে হাওয়ার্ড হেফলিনের দিকে চেয়ে বলল, ‘মাফ করবেন স্যার, আমি টেলিফোন এ্যাটেন্ড করে আসছি।’ বলে বেঞ্জামিন বেকন দরজার দিকে চলে গেল।

আহমদ মুসা তার কথা বলার জন্যে আবার মুখ তুলল হাওয়ার্ড হেফলিনের দিকে। বলল, ‘ঠিকই বলেছেন জনাব, এটা ঈশ্বরই ঘটিয়েছেন। তাই আশা হয় জয় সত্যের দিকেই আসবে।’

আহমদ মুসা কথা শেষ করতেই সারা জেফারসন বলে উঠল, ‘আংকল, তাহলে এখন আমাদের উঠতে হয়। সামনের কয়েক ঘন্টা আমাদের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ।’

‘আর কোথায় যাচ্ছেন?’ জিজ্ঞেস করল হাওয়ার্ড হেফলিন।

‘ওয়াশিংটন পোষ্টে যেতে চাচ্ছিলাম।’ বলল সারা জেফারসন।

‘তবে চেয়ারম্যান বব বেনহামের কাছে নয়।’ বলল হাওয়ার্ড হেফলিন।

‘আমরা যাব ঠিক করেছি সম্পাদক ‘ওয়েন এ্যালার্ড’- এর কাছে।’ বলল সারা জেফারসন।

‘ওয়েন এ্যালার্ড ঠিক আছে। এ্যালার্ড প্যাট্রিয়ট এবং প্রফেশনাল। তারা সাহায্য আপনারা পাবেন। এতো গেল দুই পত্রিকার ব্যাপার, অন্যান্য পত্রিকার কি খবর?’ বলল হাওয়ার্ড হেফলিন।

‘সব পত্রিকায় প্রতিবাদ গেছে। আমাদের লোকও অফিসগুলোতে আছে। আমরা কথা বলেছি নিউইয়র্ক টাইমস ও নিউইয়র্ক পোষ্টের সাথে। আমাদের লোক সেখানে যাচ্ছে।’ সারা জেফারসন বলল।

এ সময় কক্ষে ফিরে এল বেঞ্জামিন বেকন।

‘ঈশ্বর আপনাদের সফল করুন’ বলেই হাওয়ার্ড হেফলিন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ‘আসুন আমরা একটু চা খাই’

‘এ সময় চা না হলেও চলত। আমরা খুব ব্যস্ততার মধ্যে আছি।

বলল সারা জেফারসন উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে। সবাই উঠল নাস্তার জন্যে। নাস্তা শেষে হাওয়ার্ডের কাছে বিদায় নিয়ে আহমদ মুসারা গাড়িতে উঠল। গাড়ি বেরিয়ে এল হাওয়ার্ড হেফলিনের বাড়ি থেকে। ড্রাইভ করছিল বেঞ্জামিন বেকন। হাওয়ার্ডের বাড়ি থেকে কিছুটা এসে গাড়ি দাঁড় করাল সে।

বেঞ্জামিনের পাশের সিটে বসেছিল আহমদ মুসা। পেছনের সিটে গোল্ড ওয়াটার। তারও পেছনের সিটে পাশাপাশি বসেছে সারা জেফারসন ও তার পিএস ক্লারা কার্টার।

গাড়ি দাঁড় করিয়েই বেঞ্জামিন বেকন আহমদ মুসাকে বলল, ‘ম্যাডামকে একটা ইনফরমেশন দিতে হবে জনাব। আপনিও শুনুন।’

বলে বেঞ্জামিন বেকন পেছনে সারা জেফারসনের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘ম্যাডাম, এখনি যে টেলিফোন পেলাম ওটা ন্যান্সি ময়নিহানের। সে দুটো ইনফরমেশন দিল। একটা হলো, মিনিট পাঁচেক আগে সে হ্যারির টেলিফোন পায়। হ্যারি বলে, ‘আমি হ্যারি, বে’ভিউ স্ট্রিট, সেভ .......।’ এ শব্দ একটি বলার পর তার কথা বন্ধ হয়ে যায়। তার বদলে টেলিফোনে ভেসে আসে হ্যারির আর্তচিৎকার।’ ন্যান্সির মত হলো, হ্যারিকে যেখানে বন্দী করে রেখেছে, সুযোগ পেয়ে সেখান থেকে সে টেলিফোনে তার ঠিকানা বলতে গিয়েছিল, কিন্তু পারেনি ধরা পড়ে যাওয়ায় সে নিশ্চয় বাড়তি নির্যাতনের শিকার হয়েছে। ন্যান্সির দ্বিতীয় ইনফরমেশন হলো, আগামীকাল সকাল ৮টায় জেনারেল শ্যারনদের সাথে ইন্টেলিজেন্স বিষয়ক হাউজ সিলেক্ট কমিটির চেয়ারম্যান এ্যান্ড্রু জ্যাকবস ও ফরেন রিলেশন্স বিষয়ক হাউজ স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান দানিয়েল

ময়নিহানের গোপন ও গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। এ বৈঠকে দাওয়াত দেয়া হয়েছে ইন্টেলিজেন্স বিষয়ক সিনেট স্পেশাল কমিটির চেয়ারম্যান আনা প্যাট্রিসিয়া, সিনেট ফরেন রিলেশন্স কমিটির চেয়ারম্যান বব ব্রুস, সিনেট স্পিকার চার্লস ডব্লিউ ওয়ারনার। প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার জন জে রিচার্ডসনসহ সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদের দুই সংখ্যাগুরু ও দুই সংখ্যালঘু নেতারাও উপস্থিত থাকবেন। এই বৈঠকে প্রেসিডেন্টকে ইমপীচ করার নীলনক্সা চূড়ান্ত করা হবে।' থামল বেঞ্জামিন বেকন।

'অত্যন্ত মূল্যবান খবর বেঞ্জামিন বেকন'। মিটিংটা কোথায় হবে? বলল আহমদ মুসা।

'আজ রাতের মধ্যেই ন্যান্সি তা জানাবে বলেছে।' বলল বেঞ্জামিন।

'ধন্যবাদ মি. বেঞ্জামিন বেকন।'

বলে সারা জেফারসন আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল 'মি. আহমদ মুসা, আমরা কি হ্যারিকে নিয়ে এখন কিছু ভাবতে পারি? ওকে উদ্ধার করা গেলে এই মুহূর্তে মূল্যবান তুরুপের তাস হতো সে।'

'অবশ্যই ভাবা উচিত। বে'ভিউ স্ট্রিট চেনা গেল। কিন্তু 'সেভ.....' বলতে 'সেভেন', 'সেভেনটিন, 'সেভেনটি থেকে সেভেনটি নাইন' ও 'সেভেন হানড্রেড' পর্যন্ত বুঝাতে পারে। বে'ভিউ স্ট্রিটের নাম্বার সেভেন হানড্রেড পর্যন্ত অবশ্যই যাবে না। তাহলে সেভেন হানড্রেড বাদ দিলে বাকি থাকে ১২টি নাম্বার। এই বারটি নাম্বার আমরা চেক করতে পারি। তার মধ্যে সেভেন ও সেভেনটিন আলাদা আলাদা, কিন্তু সেভেনটি থেকে সেভেনটি নাইন পর্যন্ত নাম্বার এক সাথেই পাওয়া যাবে। সুতরাং ওয়াশিংটন পোষ্টের সম্পাদকের বাসা থেকে ফেরার পথে বে'ভিউতে আমরা যেতে পারি একবার।'

সারা জেফারসনের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে এঠেছে। বলল, 'মি. আহমদ মুসা ধন্যবাদ আপনাকে। জটিল একটা সমস্যাকে, সম্পূর্ণ অনিশ্চিত একটা বিষয়কে ১২টি পয়েন্টে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছেন আপনি। এখন আমার মনে হচ্ছে, সাফল্য আমাদের মুঠোয়।' আনন্দে উচ্ছসিত কন্ঠে বলল সারা জেফারসন।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, এর মধ্যেও অনেকগুলো 'যদি' আছে মিস জেফারসন। যদি হ্যারি 'বে ভিউ স্ট্রিট' নামটি ঠিক বলে থাকে। কারণ সেখানে 'বে ভিউ এভেনিউ' 'বে ভিউ লেন' এবং 'বে ভিউ ফি ওয়ে' নামে আরও তিনটি রাস্তা আছে। যদি হ্যারি.......।'

আহমদ মুসার কথার মাঝখানেই কথা বলে উঠল সারা জেফারসন। বলল, 'মি. আহমদ মুসা ওয়াশিংটনকে আপনি এত ভাল জানেন? আমার জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে ওয়াশিংটনে। এর মধ্যে শত শতবার গেছি বে' এলাকায়। কিন্তু 'বে' নামের একাধিক রাস্তা আছে কি না কখনও লক্ষ্য করিনি, নাম জানা তো দূরের কথা।

'আপনি আমেরিকার নাগরিক, আর আহমদ মুসা প্রয়োজনে আমেরিকা এসেছেন। সুতরাং দুজনের আমেরিকা দেখা তো এক হবে না।' বলল বেঞ্জামিন বেকন।

আহমদ মুসা পিঠ চাপড়ে বেঞ্জামিনকে বলল, 'ঠিক বলেছেন মি. বেঞ্জামিন বেকন। এখন গাড়ি স্টার্ট করুন।'

গাড়ি চলতে শুরু করল আবার।

'তাহলে আমরা বে ভিউ' তে যাচ্ছি তো?' বলল সারা জেফারসন আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে।

'অবশ্যই, আমি মনে করি।' বলল আহমদ মুসা।

'ধন্যবাদ।' বলল সারা জেফারসন।

নিরব সবাই।

ছুটে চলেছে গাড়ি।

ক্লারা কার্টার সারা জেফারসনের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল 'উনি অবশ্যই' বলে থেমে যেতে পারতেন। এর সাথে 'আমি মনে করি' যোগ করলেন কেন?'

সারা জেফারসন হাসল। বলল ক্লারা কার্টারের কানে কাছে মুখ নিয়ে, 'অবশ্যই' সিদ্ধান্তটি উনি সবার উপর চাপাতে চান না। 'আমি মনে করি' বলে 'অবশ্যই' এর কার্যকারিতা তিনি নিজের উপর সীমাবদ্ধ রাখলেন।'

'বাব্বা! কি সচেতন আর সুক্ষদর্শীরে বাবা! বলল ক্লারা কার্টার চোখ কপালে তুলে।

'ও যে কদিন আমাদের মন্টিসেলোতে ছিল, তুমি তো ছিলে না। থাকলে দেখতে। সুক্ষদর্শী, দূরদর্শী, প্রিয়দর্শী-কি নন উনি!' বলল সারা জেফারসন মিষ্টি হেসে।

'প্রিয়দর্শীও বলছেন? মুখ টিপে হেসে বলল ক্লারা কার্টার।

তোমার চোখে কি বলে?' বলল সারা জেফারসন।

'আমার চোখ কি আপনার মত অত উপরে উঠতে পারে!' বলল ক্লারা কার্টার দুষ্টমির হাসি হেসে।

সারা জেফারসন ক্লারা কার্টারের পিঠে একটা কিল দিয়ে বলল, 'তার মানে? কি বলতে চাচ্ছ তুমি?

'কিছু নয়, এক্সকিউজ মি ম্যাডাম।'

বলে একটু থেমেই আবার বলল ক্লারা কার্টার, 'তাহলে বে'ভিউতে সত্যি আমরা যাচ্ছি? এই রাতে।

'হ্যাঁ।' বলল সারা জেফারসন।

'আমার কিন্তু ভয় করছে। কিছু যদি ঘটে সেখানে।' ক্লারা কার্টার বলল।

'ভয় করছে আহমদ মুসার সাথে থাকার পরেও? ও সাথে থাকলে আমি আগুনেও ঝাঁপ দিতে পারি এই বিশ্বাসে সে আগুনও পানি হয়ে যাবে ওঁর স্পর্শে।' সারা জেফারসনের হাল্কা কন্ঠ হঠাৎ ভারী হয়ে উঠল।

ক্লারা কার্টার স্তম্ভিত দৃষ্টিতে তাকাল সারা জেফারসনের দিকে। পাথরের মত শক্ত ও অনড় যার ব্যক্তিত্ব, বরফের মত ঠান্ডা যার আবেগ, সেই সারা জেফারসনের আজ এ দশা!

কোন কথা বলতে পারল না ক্লারা কার্টার।

হাসল সারা জেফারসন। বলল, 'অবাক হয়েছ না। অবাক হওয়ার কিছু নেই। মাধ্যাহ্নের শক্তি নিয়ে সূর্য যদি আসে, বরফের সব শক্তি তখন পানি হয়ে যায়।'

'এটাই বুঝতে চেষ্টা করছি ম্যাডাম।' বলল ক্লারা কার্টার।

‘কিন্তু বুঝবে না তুমি ক্লারা। মধ্যাহ্ন সূর্যের সেই দহন জ্বালা যে কি বরফকে তা কেমন করে পোড়ায়, গলায়, নিজে তা উপলবদ্ধি করা ছাড়া বুঝবে না।’ বলল সারা জেফারসন। তার ঠোঁটে এক টুকরো বেদনার হাসি।

ক্লারা কার্টার কিছু বলতে পারল না। সারা জেফারসনের একটা হাত তুলে নিল হাতে।

ক্লারা কার্টারের এই মমতার স্পর্শে সারা জেফারসনের পিয়াসা-বুভুক্ষ হৃদয়টা লজ্জাবতী গাছের মত নেতিয়ে পড়ল। সারা জেফারসনের মাথা ধীরে ধীরে নুয়ে পড়ল ক্লারা কার্টারের কাঁধে।

ক্লারা কার্টার আরেক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল সারা জেফারসনকে।

অনেক্ষণ পর ক্লারা কার্টার সারা জেফারসনের কানে ফিসফিসিয়ে বলল, ‘বরফবক্ষের এই বন্যাকে নিয়ে সূর্য কি ভাবছেন?’

‘ওদিকের কথা রাখ। সূর্যটা দৃষ্টিহীন, বাকহীন, অনুভুতিহীন এক পাথর। বন্যার আছড়ে পড়া শত আকুতি সে পাথরে কোন স্পন্দন তোলে না।’ বলল অস্ফুট, ম্লান কন্ঠে সারা জেফারসন।

‘এ অবিশ্বাস্য কথা।’

‘না এটা বিশ্বাস্য।

‘কারণ?’

‘কারণ আহমদ মুসা শুধু মানুষ নন, তিনি ‘মুসলিম মানুষ’। মুসলিম নৈতিকতা আমাদের জন্যে একটা অবিশ্বাস্য বস্তু। আর এই অবিশ্বাস্য বস্তুটিই আমাকে আরও পাগল করে তুলেছে।’ বলল সারা জেফারসন।

‘তাহলে?’

‘এই তাহলের উত্তর ভবিষ্যত বলবে, আমি কিছু জানি না, কিছু ভাবতে পারি না আমি।’

কাঁপা গলায় কথাগুলো বলতে বলতে সারা জেফারসন ক্লারা কার্টারের কাঁধ থেকে মাথা তুলে শরীরটা এলিয়ে দিল গাড়ির সিটে।

ক্লারাও নির্বাক হয়ে গেল।

চলছে তখনও গাড়ি ফুল স্পীডে।

পটোম্যাক বে'র ফ্রি ওয়ে' ধরে ছুটে চলেছে আহমদ মুসাদের গাড়ি।

বে'ভিউ ফ্রি ওয়ে থেকে প্রবেশ করা যাবে বে ভিউ এভেনিউতে এবং বে'ভিউ এভেনিউ দিয়ে প্রবেশ করতে হবে বে ভিউ স্ট্রিটে।

এই বে ভিউ স্ট্রিট আহমদ মুসাদের লক্ষ্য।

ঘড়ির দিকে তাকাল আহমদ মুসা। দেখল ১০টা পার হয়ে গেছে। আসলে ওয়াশিংটন পোস্টের সম্পাদক ওয়েন এ্যালার্ড -এর ওখানে সময়টা একটু বেশিই গেছে। তবে আহমদ মুসা খুশি যে, ওয়েন এ্যালার্ড এর কানে সব কথা তুলে দেয়া গেছে। আরও খুশি হয়েছে সে এটা দেখে যে, আমেরিকানদের মাথায় কাঠাল ভেঙে খাওয়া এবং আমেরিকানরা নিজ দেশে পরবাসী হওয়ার ব্যাপারটা ওয়েন এ্যালার্ডদের কাছে পরিস্কার। তিনি জানিয়েছেন, তার সাংবাদিকদের শতকরা আশিজনই 'ফ্রি আমেরিকা' মুভমেন্ট ও 'হোয়াইট ঈগল'- বিরোধী ঐ নিউজ বিশ্বাস করেনি। নিউজে মার্কিন প্রেসিডেন্ট, প্রশাসন ও আহমদ মুসার সাথে 'ফ্রি আমেরিকা' ও 'হোয়াইট ঈগল'কে ব্রাকেটেড করায় প্রেসিডেন্ট ও আহমদ মুসার প্রতিও সাধারণভাবে সমর্থন ও সিমপেথি বেড়েছে।

ওয়েন এ্যালার্ড'- এর সাথে আলোচনার কথা ভাবতে গিয়ে আহমদ মুসার সামনে এসে দাঁড়াল সারা জেফারসন। হাওয়ার্ড হেফলিন ও ওয়েন এ্যালার্ড- এর সাথে আলোচনায় সারা জেফারসন যে ভূমিকা পালন করেছে তা মুগ্ধ করেছে আহমদ মুসাকে। সারার কথা ছিল যেমন শক্ত ও তেমনি হৃদয়স্পর্শী। সত্যি সে টমাস জেফারসনের যোগ্য উত্তরসুরী। দুর্লভ সব মানবিক গুণাবলীর অধিকারী না হলে শুধু দেশপ্রেম দিয়ে এ ধরনের মানুষ তৈরি হয় না। ভাবী আমেরিকার সে হবে এক বিস্ময়কর নেত্রী।

হঠাৎ মন খারাপ হয়ে গেল আহমদ মুসার। অপরূপ চরিত্রের এ ধরনের অতুল সম্ভাবনাময় এক মেয়ে না জেনে না বুঝে অন্ধকার-বক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে কেমন করে!। আহমদ মুসা কখনও কোন সময় সারা জেফারসনের প্রতি

কোন দুর্বলতা দেখিয়েছে বলে মনে পড়ে না। একটি স্বপ্নকে সে তার জন্যে অবধারিত সত্য বলে ধরে নিয়েছে। মন কেঁপে উঠল আহমদ মুসার। সর্বাধুনিক মানুষও এভাবে কোন বিশ্বাসে বাঁধা পড়ে যেতে পারে, ভাবতেও বিস্ময়বোধ হয় তার।

আহমদ মুসার চিন্তায় ছেদ পড়ে গেল বেঞ্জামিন বেকনের কথায়। বেঞ্জামিন বেকন বলছিল, 'জনাব, আমরা বে ভিউ এভেনিউ- এর মাঝামাঝি এসে গেছি।'

আহমদ মুসা সম্বিত ফিরে পেয়ে তাকাল চারিদিকে। বলল, 'ঐ তো সামনে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সবুজের গুচ্ছ। ওটা বে বিউটি পার্কের মুখ। বে'পর্যন্ত নেমে গেছে পার্কটি। পার্কের এ পাশ মানে পূর্ব পাশ বরাবর উত্তরে বে পর্যন্ত বিলম্বিত বে ভিউ স্ট্রিট। এ স্ট্রিটে ঢুকে যান, তারপর রাস্তার সাইড লাইন দিয়ে ধীরে ধীরে গাড়ি চালান। প্রথমে দেখতে হবে রাস্তার নাম্বারিং এ্যারেজমেন্টা কি।

গাড়ি গিয়ে পৌঁছল বে ভিউ স্ট্রিটের মুখে।

স্ট্রিটের মুখে একটা গোল চক্কর। গোল চক্করটি একটা ছোট্ট বাগান। চক্করটির পূর্ব পাশ দিয়ে বে ভিউ স্ট্রিটে ঢোকার পথ, আর পশ্চিম পাশ স্ট্রিট থেকে গাড়ি বেরিয়ে আসার পথ। চারদিকটা অনেকটাই নির্জন। বিশেষ করে বে ভিউ স্ট্রিটে গাড়ি তেমন দেখা যাচ্ছে না।

আহমদ মুসাদের গাড়ি বে ভিউ স্ট্রিটে প্রবেশ করে দুশ গজের মত এগিয়েছে। এ সময় আহমদ মুসা দেখল দুটি গাড়ি এই পথ ধরে পাগলের মত ছুটে আসছে।

আহমদ মুসা এই বেআইনি ও অস্বাভাবিক ঘটনা দেখেই বুঝল, হয় দুই গাড়িই পালাচ্ছে, নয়তো সামনেরটা পালাচ্ছে পেছনের গাড়িটা তাকে তাড়া করছে।

আহমদ মুসা বেঞ্জামিন বেকনকে গাড়ি দাঁড় করাতে বলল।

সংগে সংগেই দাঁড়িয়ে পড়ল আহমদ মুসাদের গাড়ি।

আর প্রায় সাথে সাথেই সামনে থেকে ছুটে আসা সামনের গাড়িটা আহমদ মুসাদের গাড়ির প্রায় নাক ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং সংগে সংগেই একটা নারীকন্ঠ 'বাঁচাও' 'বাঁচাও' বলে চিৎকার করে উঠল।

সামনে থেকে আসা দ্বিতীয় গাড়িটাও তখন এসে পথম গাড়িটার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে।

আহমদ মুসা ও বেঞ্জামিন বেকন দুজন দুদিক থেকে নেমে পড়েছে।

আহমদ মুসা দেখল, দ্বিতীয় গাড়ি থেকে একজন লোক হাতে রিভলবার নিয়ে লাফিয়ে পড়ছে প্রথম গাড়িটার উপর।

মেয়েটার তখন চিৎকার বন্ধ হয়ে গেছে। সে কাঁপছে থর থর করে।

রিভলবারধারী লোকটা মেয়েটাকে বলল, 'তোমার কোন ভয় নেই। তোমাকে হাইজ্যাক করতে আসিনি। তোমার গাড়িতে আমাদের একটা জিনিস উপর থেকে ছিটকে এসে পড়েছে। ওটা নিয়েই আমি চলে যাব।'

আহমদ মুসা ও বেঞ্জামিন বেকন এসে দাঁড়িয়েছে মেয়েটির গাড়ির পশ্চিম পাশে। মেয়েটির বয়স চব্বিশ পঁচিশ বছরের মত হবে। তার গাড়িটা একটা ওপেনটপ কার। টপটা ফোল্ড হয়ে আছে পেছন দিকে।

মেয়েটা আহমদ মুসা ও বেঞ্জামিন বেকনকে দেখে কিছুটা সাহস পেয়েছে। সে গাড়ির এ প্রান্তে সরে এসেছে। এক পা সে নিচে নামিয়ে দিয়েছে। যাতে দরকার হলেই সে দৌড় দিয়ে আহমদ মুসাদের কাছে আসতে পারে।

'কি ঘটেছে ম্যাডাম?' বলল আহমদ মুসা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে।

মেয়েটি ভয়ে রিভলবারধারীর দিকে একবার তাকাল। তারপর বলল, 'সেভেনটি থ্রি বে ভিউ স্ট্রিটে আমার বান্ধবী থাকেন। সে বাইরে থেকে তখনও বাড়ি এসে পৌছায়নি। আমি তার অপেক্ষা করছিলাম। হঠাৎ এই লোকটি এসে বলে সে আমার গাড়ি দেখবে। বলে সে গাড়িতে উঠতে চেষ্টা করে। আমি প্রতিবাদ করি, বাধা দেই। সে রিভলবার বের করে। আমি সংগে সংগে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে পালাবার চেষ্টা করি।'

মেয়েটির বলা 'সেভেনটি থ্রি' শব্দটি আহমদ মুসার বুকটাকে ছ্যাঁত করে তোলে। আহমদ মুসারা যে নাম্বারগুলো খুঁজছে তার মধ্যে সেভেনটি থ্রিও রয়েছে।

'উনি বলছেন, আপনার গাড়িতে উপর থেকে কিছু ছিটকে এসে পড়েছে, এ কথাটি কি ঠিক?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা মেয়েটিকে।

'এ রকম কিছু ঘটেছে বলে আমার মনে পড়ছে না। আমি কোন শব্দ শুনিনি। ' বলল মেয়েটি দৃঢ়তার সাথে।

মেয়েটির কথা শেষ হতেই রিভলবারধারী লোকটি আহমদ মুসা ও বেঞ্জামিন বেকনের দিকে রিভলবার উচিয়ে বলল, তোমরা এখানে নাক গলাতে এস না। মানে মানে সরে পড়। না হলে ভাল হবে না।

আহমদ মুসা যেন রিভলবারধারীর কথা শুনতেই পায়নি এমন একটা ভাব নিয়ে লোকটিকে বলল, আপনিই বলুন তো এর গাড়িতে আপনাদের কি এসে পড়েছে?

লোকটি এমন প্রশ্ন যেন আশাই করেনি। মুখে তার বিব্রতভাব ফুটে উঠল। কিন্তু পরক্ষনেই তার মুখের বিব্রতভাব কেটে গিয়ে প্রচন্ড ক্রোধের চিহ্ন ফুটে উঠল চোখে মুখে। লোকটা তীব্র কণ্ঠে বলল, 'আপনারা এখান থেকে সরে না গেলে আমি কিন্তু এরপর কথা বলব না, গুলী করব।'

কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই লোকটার রিভলবার থেকে একটা 'ক্লিক' শব্দ উঠল। এর অর্থ তার রিভলবার এখন গুলী করার জন্যে প্রস্তুত।

আহমদ মুসা আবারও তার কথা শুনতেই পায়নি এমন ভাব করে বলল, 'আপনার জিনিসের আপনি নাম জানেন না। ঠিক আছে জিনিসটি আপনি খুঁজে বের করুন। তবে শর্ত হলো, আপনি আপনার জিনিসটা নিয়ে যেতে পারবেন আমাদেরকে ও মেয়েটাকে তা দেখানোর পর।'

ক্রোধে জ্বলে উঠল রিভলবারধারী লোকটি। তার তর্জ্জনি সক্রিয় হয়ে উঠল তার রিভলবারে.......।

আগে থেকেই আহমদ মুসার ডান হাতটি খেলা করছিল কোটের বোতাম নিয়ে।

চোখের পলকে তার হাতটি চলে গিয়েছিল কোটের নিচে। তার হতাটা সেখান থেকে বের হওয়া ও গুলী বর্ষণের ঘটনা এক সাথেই ঘটল।

রিভলবারধারীর হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল রিভলবার। আহমদ মুসার গুলী তার হাত গুড়িয়ে দিয়েছে।

লোকটির কাছে ঘটনাটা ভূত দেখার মতই সংঘটিত হয়েছে। লোকটির চোখে মুখে যন্ত্রণা ও বিস্ময়ের ছাপ।

আহমদ মুসার রিভলবার উদ্যত তখনও লোকটির প্রতি।

'নেমে আসুন গাড়ি থেকে।' নির্দেশ দিল আহমদ মুসা লোকটিকে। লোকটি একবার আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে নেমে এল গাড়ি থেকে।

'মি. বেঞ্জামিন দেখুন তো গাড়িতে কিছু পান কি না, যা বাইরে থেকে ছিটকে এসে পড়তে পারে।' বলল আহমদ মুসা বেঞ্জামিনকে লক্ষ্য করে।

মেয়েটা গাড়ি থেকে নেমে এসেছে। বেঞ্জামিন বেকন উঠে গেল গাড়িতে।

গাড়ির সিট এবং গাড়ির ফ্লোর সে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতে লাগল।

এমন সময় সে আনন্দে বলে উঠল, 'পেয়েছি মি. আহমদ মুসা। কিন্তু মজার জিনিস।

বেঞ্জামিন বেকন জিনিসটি নিয়ে উঠে দাঁড়াল। তার হাতে একটা পেন্সিল ব্যাটারি। ব্যাটারির সাথে একটা ভাজ করা কাগজ বাঁধা।

ভ্রুকুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার। পরক্ষণেই স্বাভাবিক হলো এই ভেবে যে, নিশ্চয়ই বান্ধবীর বাসার কেউ এই কায়দায় চিঠি পাঠিয়েছিল মেয়েটিকে। আবার কেউ মজাও করতে পারে এইভাবে।

'ম্যাডাম দেখুন তো, কাগজটা কি জিনিস। আপনার কি না।'

আহমদ মুসা বলল মেয়েটিকে।

মেয়েটি কম্পিত হাতে ব্যাটারির সাথে বাঁধা কাগজটি হাতে নিল।

এ সময় লোকটি মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েটির উপর।

সম্ভবত মেয়েটির হাত থেকে জিনিসটিকে কেড়ে নেয়ার জন্যে।

মেয়েটির হাত থেকে ছিঠকে পড়ল জিনিসটি। মেয়েটিও কাত হয়ে পড়ে গেল।

লোকটি তুলে নিচ্ছিল জিনিসটি।

আহমদ মুসা রিভলবারটি পকেটে রেখে নিচু হয়ে লোকটিকে টেনে তুলল।

তার হাত থেকে জিনিসটি কেড়ে নিয়ে তার ঘাড়ে একটা চাটি মেরে বলল, ঠিক ঠাক দাঁড়িয়ে থাক, আবার বেয়াদবী করলে আরও শাস্তি পাবে।'

বলে আহমদ মুসা কাগজটি খুলে নিল ব্যাটারি থেকে। ভাজ করা কাগজটি খুলে চোখের সামনে মেলে ধরল।

লেখার উপর চোখ পড়তেই প্রথমে তার চোখে মুখে বিস্ময় এবং পরে আনন্দে ভরে উঠল তার মুখ। ভাজ করা কাগজটির লেখা সে পড়লঃ

''আমি, হ্যারি, সেভেনটি টু বে ভিউ স্ট্রিটে বন্দী। পুলিশকে বলুন অথবা ৩৩৭-৫৩৯৫০ অথবা ৮৭৯-৯৭৯৫০তে টেলিফোন করুন।''

আহমদ মুসা কিছু না বলে কাগজটি বেঞ্জামিন বেকনের হাতে তুলে দিল। সে পড়েই চিৎকার করে উঠল, 'ইজ আলমাইটি।'

সারা জেফারসন ও গোল্ড ওয়াটার এসে আহমদ মুসার পাশে দাঁড়িয়েছে। দুজনেই প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়েছে আহমদ মুসার দিকে।

'মি. বেঞ্জামিন ওকে বেঁধে নিয়ে ওর গাড়িতে উঠুন।'

একথা বলার সময়ই আহমদ মুসা বেঞ্জামিনের হাতের কাগজটি নিয়ে সারা জেফারসনের হাতে দিল এবং তাড়া খেয়ে ছুটে আসা সেই মেয়েটিকে লক্ষ্য করে বলল, 'আপনি হ্যারি এডওয়ার্ড নামের কোন ছেলেকে নিশ্চয় চেনেন না। বিপদগ্রস্থ সেই হ্যারিরই ওটা একটা আবেদন।'

'না ও নামের কোন ছেলেকে আমি জানিনে।' ভীত চোখে শুকনো কন্ঠে বলল মেয়েটি।'

'অহেতুক আপনার একটা ধকল গেল, আপনি এখন যেতে পারেন বোন।' আহমদ মুসা বলল।

'যাব? আর কিছু ভয় নেই তো?' বলল মেয়েটি।

'লোকটিকে আমরা ধরে রাখছি। তাকে দরকার আমাদের। আপনার কোন ভয় নেই।' আহমদ মুসা বলল।

'পুলিশকে আমি কিছু বলব স্যার?' মেয়েটি বলল।

‘যা ঘটেছে সেটা বলে একটা ডাইরী আপনি অবশ্যই করতে পারেন। আপনাকে তাড়া করা এ লোকটির ঠিকানা এই চিঠি অনুসারে আপনার বান্ধবীর বাসার আগের বাসাটি মানে ‘সেভেনটি টু’।’

‘থ্যাংকস স্যার। থ্যাংকস অল।’ বলে মেয়েটি গিয়ে গাড়িতে উঠল।

‘থ্যাংকস গড। এযে আল্লাহর অভাবিত সাহায্য মি. আহমদ মুসা। সন্দেহ নেই আল্লাহ আমাদের বিজয়ী করবেন।’ বলল সারা জেফারসন আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে।

‘এখন তাহলে কি করণীয় মি. আহমদ মুসা?’ গোল্ড ওয়াটার বলল।

‘আমরা এখন হ্যারিকে উদ্ধার করতে যাব। বেঞ্জামিন লোকটাকে নিয়ে ঐ গাড়িতে উঠবে। ওরা আগে যাবে আমরা ফলো করবো। ‘সেভনটি টু’র পাশেই কোথাও গাড়ি দাঁড় করাতে হবে।’

কথাগুলো শেষ করেই আহমদ মুসা তাকাল বেঞ্জামিন বেকনের দিকে। বেঞ্জামিন বেকন লোকটিকে বেঁধে পাশের সিটে তুলে নিজে ড্রাইভিং সিঠে উঠে বসেছে। আহমদ মুসা তাকে বলল, ‘মি. বেঞ্জামিন, ওর কাছ থেকে দুএক মিনিটের মধ্যে সব কথা শুনতে চাই। ওর এক হাত গেছে, দরকার হলে আরেক হাত যাবে। দরকার হলে ওর মাথাটাও। সব কথা আমরা চাই।’ নরম কিন্তু অত্যন্ত শক্ত উচ্চারণে কথাগুলো বলল আহমদ মুসা।

লোকটি তার বাম হাত দিয়ে আহত ডানহান চেপে ধরে বসে আছে। বেঞ্জামিন বেকন পকেট থেকে রিভলবার বের করে সামনে ড্যাশ বোর্ডের উপর রাখতে রাখতে লোকটিকে লক্ষ্য করে বলল, ‘হ্যারি ও সেভনটি টু বাবা সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানালে রিভলবার ব্যবহারের দরকার হবে না।’

বেঞ্জামিন গাড়ি ঘুরিয়ে নেবার জন্যে গাড়ি স্টার্ট দিল।

আহমদ মুসারাও গাড়ির দিকে এগুলো।

বেঞ্জামিন বেকনের গাড়ি সেভনটি টু বাসাটির সামনে প্রাইভেট ওয়াকিং প্লেসে গিয়ে দাঁড়াল।

আহমদ মুসাও তার গাড়ি বেঞ্জামিন বেকনের গাড়ির পাশে নিয়ে দাঁড় করাল।

আহমদ মুসা গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়াল বেঞ্জামিন বেকনের দিকে।

বেঞ্জামিন বেকনও মুখ বাড়িয়েছে। বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, 'সহজেই কাজ হয়ে গেছে মি. আহমদ মুসা। সে বলছে, আজ বিকেলে ওদের পবিত্র সাবাত দিবসের অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে। সবাই চলে গেছে। সেই শুধু বাসায় ছিল। সুতরাং বাসা এখন খালি।' থামল বেঞ্জামিন বেকন।

আহমদ মুসার ভ্রুকুঞ্চিত হলো।

'তারপর'? বলল আহমদ মুসা।

'আমি পরীক্ষা করার জন্যে মোবাইল দিয়ে টেলিফোন করেছিলাম। কেউ ধরেনি। চারবার রিং হবার পর এ্যানসার মেশিন বলছে, সবাই বাইরে, মেসেজ থাকলে বলুন।'

'মেসেজ কিছু দিয়েছেন?' বলল আহমদ মুসা।

'না'। বলল বেঞ্জামিন বেকন।

আহমদ মুসার ঠোঁটে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল। রহস্যময় হাসি।

'টেলিফোন করতে কি লোকটিই বলেছিল?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'কথাটা সত্য কিনা পরীক্ষা করার জন্যে সেই বলেছিল। কেন জিজ্ঞেস করছেন এ কথা?' বেঞ্জামিন বেকনের চোখে সন্দেহের ছায়া।

আহমদ মুসা বেঞ্জামিন বেকনের জিজ্ঞাসার দিকে কান না দিয়ে পেছনে তাকিয়ে গোল্ড ওয়াটারকে বলল, আপনি ড্রাইভিং-এ আসুন এবং এ গাড়ি সামনে এগিয়ে নিয়ে নিরাপদ কোথাও পার্ক করুন। আমি এই গাড়িতে যাচ্ছি। ওগাড়ি এখানেই থাকবে।'

নেমে যাচ্ছিল আহমদ মুসা।

'জনাব, কি ঘটছে জানতে পারি কিনা?' পেছন থেকে গম্ভীর কণ্ঠে বলল সারা জেফারসন।

আহমদ মুসা না নেমে সিটে ফিরে এল। হাসল। বলল, 'স্যরি সিম জেফারসন, তাড়াহুড়ার মধ্যে আমি ভুলে গেছি। আমার মনে হচ্ছে, আমাদের উপস্থিতি শত্রুদের জানা হয়ে গেছে। 'বাড়িতে কেউ নেই, সবাই সাবাত অনুষ্ঠানে

গেছে' লোকটির এই কথা সত্য নয়। এবং লোকটি ঐ ভাবে টেলিফোন করিয়ে আমাদের মানে শত্রুর উপস্থিতি তাদের জানিয়ে দিয়েছে। এই অবস্থায় আমি চাচ্ছি আপনারা একটু দূরে গিয়ে অপেক্ষা করুন। আমরা এখানে ওদের অপেক্ষায় থাকব।'

'আমাদের করণীয়?' জিজ্ঞেস করল সারা জেফারসন।

'ঘটনা কোনদিকে গড়ায়........।' কথা শেষ করতে পারলো না আহমদ মুসা।

পাশের গাড়ি থেকে বেঞ্জামিন বেকন চিৎকার করে উঠল, 'মি. আহমদ মুসা, আমার মনে হচ্ছে সামনে ও পেছন থেকে ওরা আসছে।'

বেঞ্জামিন বেকনের কথা কানে আসার সাথে সাথেই গুলীর শব্দও কানে এল আহমদ মুসার।

আহমদ মুসা মুখ ঘুরিয়ে সামনে ও পেছনটা একবার দেখে নিল, পেছন থেকে একটা মাইক্রো এবং সামনে থেকে একটা জীপ গুলী করতে করতে ছুটে আসছে।

আহমদ মুসা একবার তাকাল সেভেনটি টু নাম্বার বাড়ির দিকে। বাড়ির সামনেটা নিচু প্রাচীর ঘেরা। ভেতরে বাগান। প্রাচীরের সামনের ওয়ালে গ্রিলের হাল্কা গেট। গেটের পর একটা রাস্তা বাগানের মধ্যে দিয়ে সোজা এগিয়ে মূল গেটে গিয়ে ঠেকেছে।

আহমদ মুসা গাড়ির দরজা বন্ধ করে সোজা হয়ে বসল সিটে। শক্ত হাতে ধরল স্টেয়ারিং হুইল।

মুখ ঘুরিয়ে জানালা দিয়ে বলল, 'মি. বেঞ্জামিন, ফলো মি।'

আর পেছন দিকে  মুখ না ঘুরিয়েই বলল, 'মিস জেফারসন আপনারা সিটে শুয়ে পড়ুন। শক্ত করে সিট ধরে রাখুন।'

কথা বলার সাথে সাথে আহমদ মুসা গাড়ি ঘুরিয়ে প্রচন্ড গতিতে ছুটা শুরু করেছে 'সেভেনটি টু' নাম্বার বাড়ির গেট লক্ষ্যে। কয়েক মুহূর্তে।

আহমদ মুসার ছয় সিটের বিরাট হাইল্যান্ডার জীপটি ‘সেভেনটি টু’ নাম্বার বাড়ির বহিঃ প্রাচীরের গ্রিলের গেটটি ভেঙে বাগানের পথটুকু পাড়ি দিয়ে তীব্র গতিতে বারান্দায় উঠে মূল গেটে আঘাত হানল।

মূল গেটটি সাবেক আমলের দুই পাল্লার বিরাট কাটের দরজা। তার গায়ে সাধারণ যাতায়াতের জন্যে উইনডো ডোর রয়েছে।

তীব্র গতিতে এসে ঝাঁপিয়ে পড়া কয়েকটা ওজনের গাড়ির প্রচন্ড আঘাতে দুপাশের দেয়ালের একাংশ ধ্বসিয়ে নিয়ে গেট ভূমিশয্যা নিল।

গেট পেরিয়ে আহমদ মুসার গাড়ি বাড়ির ভেতরে প্রকান্ড এক করিডোরে এসে দাঁড়াল।

গাড়ির বাম পাশ দিয়ে কয়েক ধাপ এগুলেই দুতলায় ওঠার সিঁড়ি।

গাড়ি দাঁড় করিয়েই আহমদ মুসা পেছন দিকে লক্ষ্য করে বলল, ‘মি. গোল্ড ওয়াটার আপনার সিটের নিচের দুটি ষ্টেনগান নিয়ে নেমে যান। আপনি এবং বেঞ্জামিন গেট রক্ষা করবেন। আমি ভেতরটা দেখছি।’

সংগে সংগে গোল্ড ওয়াটার স্টেনগান নিয়ে ভাঙা গেটের দিকে ছুটল। বেঞ্জামিনে গাড়ি তখন ভেতরের ভাঙা গেট পর্যন্ত এসে ঠেকেছে।

আহমদ মুসা গাড়ি থেকে মাটিতে পা রাখতেই উপরে সিঁড়িতে অনেকগুলো পায়ের শব্দ পেল। আহমদ মুসা চট করে দুপা পেছনে সরে এসে সামনের গাড়ির আড়াল নিয়ে বসল।

দ্রুত নেমে আসা পায়ের শব্দ আরও নিকটবর্তী হলো। আহমদ মুসা দেখল, ষ্টেনগান হাতে নিয়ে তিনজন লোক নেমে আসছে। সিঁড়ির শেষ ল্যান্ডিং-এ এসে ওরা গাড়ি দেখতে পেল। সংগে সংগে ওরা গাড়ি লক্ষ্যে শুরু করল গুলীবৃষ্টি।

এ অবস্থায় আহমদ মুসার পক্ষে দাঁড়ানো বিপজ্জনক। ল্যান্ডিং এ দাঁড়ানো ওদের ষ্টেনগানের গুলী যে এ্যাংগেলে আসছে, তাতে গুলীর টার্গেট হচ্ছে গাড়ির মাথার দিকটা।

আহমদ মুসা তার মেশিন রিভলবার বাগিয়ে মাটিতে গড়িয়ে গড়িয়ে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগুলো ল্যান্ডিং-এ দাঁড়ানো ওদেরকে টার্গেটে আনার জন্যে।

আহমদ মুসা গাড়ির মাথার দিকে বাম পাশের চাকার আড়ালে মুখ নিয়ে উঁকি দিল সিঁড়ির দিকে। খুশি হলো আহমদ মুসা। ওদের পায়ের দিকটা দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু তাদের দেহের উপরের অংশটা দেখা যাচ্ছে। আহমদ মুসা তার মেশিন রিভলবারের নল ওদের দিকে ঘুরিয়ে নিল।

এই সময় আহমদ মুসা দেখল ওরা তিনজন নামতে শুরু করেছে। গুলী কিন্তু ওদের চলছেই। সম্ভবত গুলীর কোন রিপ্লাই না পেয়ে ওরা নেমে আসছে।

ওরা সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করায় ওদের গুলীর গতি ডান দিকে একটু সরে গেছে। গাড়ির মাথা বরাবর আর গুলী আসছে না।

আহমদ মুসা চট করে উঠে দাঁড়াল। আহমদ মুসার রিভলবারের নল ওদের তিন জনের লক্ষ্যে উদ্যত।

আহমদ মুসার তর্জ্জনি রিভলবার ট্রিগারে। আহমদ মুসা দাঁড়ানোর সংগে সংগে ওরা দেখতে পেয়েছে আহমদ মুসাকে। চমকে উঠে ওরা ওদের ষ্টেনগানের নল ঘুরিয়ে নিচ্ছিল আহমদ মুসার দিকে।

'দেখ, মৃত্যু না চাইলে তোমরা ষ্টেনগান ফেলে দাও। হেরে গেছ তোমরা।' আহমদ মুসার গম্ভীর কণ্ঠে ধ্বনিত হলো কঠোর এই নির্দেশ।

কিন্তু ষ্টেনগানের নল ওদের ঘুরিয়ে নেয়া বন্ধ হয়নি।

আহমদ মুসার তর্জ্জনি চেপে বসল তার এম ১০ রিভলবারের ট্রিগারে। অবিরাম গুলীর বৃষ্টি গিয়ে ছেঁকে ধরল ওদের তিনজনকে।

ওদের ষ্টেনগানের নল পুরোপুরি ঘুরে স্থির হবার আগেই ঝরে পড়ে গেল ওদের তিনটি দেহ সিঁড়ির উপর।

আহমদ মুসা তার রিভলবার ঐ ভাবে ধরে রেখে মুহূর্তকাল অপেক্ষা করল। না কেউ এল না।

আহমদ মুসা তার রিভলবার বাগিয়ে ধরে সরে এল গাড়ির দরজার দিকে। সরা জেফারসনদের দরজা খুলে ফেলল বাম হাত দিয়ে। দেখল সারা জেফারসন ও ক্লারা কার্টার উঠে বসছে গাড়ির মেঝে থেকে।

জ্বলে উঠা গাড়ির ভতরের আলোতে আহমদ মুসা দেখল সারা জেফারসনের কপালের বাম পাশে একটা জায়গা থেঁতলে গেছে। রক্ত বেরুচ্ছে।

‘মিস জেফারসন, ভাল আছেন আপনি? আর কোনও আঘাত লাগেনি তো?’ উদ্বিগ্ন কণ্ঠ আহমদ মুসার।

‘না। ভাল আছি।’ বলল সারা জেফারসন নরম গলায়।

আহমদ মুসা তার হাত ধরে গাড়ি থেকে বের করে আনল।

তাড়াতাড়ি পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের আহত জায়গা থেকে গড়িয়ে আসা রক্ত মুছে ফেলে ক্ষতের উপর রুমালটা চাপা দিয়ে বরল, ‘রুমালটা এভাবে কিছুক্ষণ ধরে রাখুন রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যাবে।

গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল ক্লারা কার্টার।

বলল, ‘গাড়িটা বারান্দায় লাফিয়ে ওঠার সময় সাইডের গ্লাস লকের পয়েন্টটা ওর কপালে লেগেছে।’

গেটে তখন উভয় পক্ষের প্রচন্ড গোলাগুলী শুরু হয়ে গেছে।

‘মিস জেফারসন, মোবাইলটা আপনার ব্যাগে আছে?’ দ্রুত জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘জি আছে।’ বলল সারা জেফারসন।

‘আপনি জর্জ আব্রাহামকে টেলিফোন করুন। হ্যারিকে উদ্ধারের এই স্পটে ওদের আসা প্রয়োজন।’

সারা জেফারসন দ্রুত তার মোবাইল বের করল। কিন্তু টেলিফোন করার আগেই আহমদ মুসা বলল, ‘মিস জেফারসন ও মিস কার্টার আপনারা আমার সাথে আসুন। এখানে থাকা নিরাপদ নয়। উপরে আরও লোক থাকতে পারে। খুঁজে বের করতে হবে হ্যারিকে।’

বলে আহমদ মুসা ছুটল সিঁড়ির দিকে।

মিস জেফারসন ও মিস ক্লারা কার্টারও তার পেছনে পেছনে ছুটল।

সিঁড়ির উপর পড়ে থাকা ওদের তিনজেনর লাশ পার হয়ে যাবার সময় আহমদ মুসা বলল, ‘আমার অনুমান আরও একজন লোক ওদের আছে এবং সে হ্যারিকে পাহারা দিচ্ছে।’

দুতলায় উঠে ওরা দেখতে পেল সোফা সাজানো বিশাল ড্রইং রুম।

এই ড্রইং রুম থেকে কয়েকটি করিডোর এদিক ওদিক হয়ে বিভিন্ন কক্ষের দিকে চলে গেছে।

আহমদ মুসারা সারা জেফারসনকে বলল, ‘আপনি এ সিঁড়ি মুখটায় বসে জরুরী টেলিফোন সেরে নিন। আমি এদিক ওদিক ঘুরে একটু দেখে নেই।

সারা জেফারসন জর্জ আব্রাহামের নাম্বারগুলোর উপর নক করে মুখ তুলল আহমদ মুসার দিকে। তার মুখ গম্ভীর। বলল, ‘আপনাকে একা ছাড়ব না, আমিও একা থাকব না।’

হাসল আহমদ মুসা। বলল ‘ঠিক আছে কথা সেরে নিন। আমি এখানেই আছি।’

বলে আহমদ মুসা আশ-পাশটা দেখার জন্যে এগিয়ে গেল।

আহমদ মুসা অনুমান করল, রাস্তার দিকে জানালা আছে এমন একটা কক্ষে হ্যারিকে রাখা হয়েছে। এই অনুমান করে বাড়ির কক্ষগুলোর অবস্থান বুঝার চেষ্টা করল।

আহমদ মুসার মনে হলো, দুতলার সিঁড়ির মুখ থেকে যে করিডোর লম্বালম্বী দুদিকে চলে গেছে, তার পশ্চিম পাশের কোন একটা কক্ষেই হ্যারিকে রাখা হয়েছে।

হঠাৎ আহমদ মুসার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তার মনে পড়ল, হ্যারি চিঠি ছুঁড়ে দিয়েছিল ‘সেভেনটি থ্রি’ নাম্বার বাড়ির পাশে দাঁড়ানো গাড়িতে। তাহলে হ্যারি বন্দী আছে নিশ্চয় ‘সেভেনটি থ্রি’ নাম্বার বাড়ির দিকের যে কোন কক্ষে। এর অর্থ সিঁড়ির-মুখ হয়ে যে করিডোর উত্তর দিকে গেছে, সেই করিডোর দিয়ে এগুলেই বাম পাশে কোথাও হ্যারির কক্ষ পাওয়া যাবে।

আহমদ মুসা ফিরে এল সারা জেফারসনদের কাছে।

আহমদ মুসা আসতেই সারা জেফারসন হাসি মুখে আহমদ মুসাকে বলল, ‘আংকেলের সাথে কথা বলেছি। সব শুনেছেন উনি। আসছেন এখনি।’

‘ধন্যবাদ। এদিকে আরেক সমস্যার সমাধানও হয়ে গেছে। আমি মনে করি উত্তর দিকে যাওয়া এই যে করিডোরটা, এর পাশে কোথাও কোন কক্ষে আমরা হ্যারিকে খুঁজে পাব।’

আহমদ মুসা উত্তরমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। আর সারা জেফারসন ও মিস ক্লারা দক্ষিণমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

হঠাৎ আহমদ মুসার চোখে পড়ল উত্তরের সেই করিডোরে একজন লোক যেন ভুতের মত এসে আবির্ভুত হলো। তার হাতে ষ্টেনগান। তার হাতের ষ্টেনগানের নল উঠে আসছে এদিকে লক্ষ্যে।

'মিস জেফারসন আপনারা শুয়ে পড়ুন, পেছনে গুলী।' চিৎকার করে বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা তার এই চিৎকারের সাথে সাথে নিজের দেহ পাশে মেঝের উপর ছুড়ে দিয়ে রিভলবার ঘুরিয়ে নিল করিডোরের দিকে। রিভলবার ট্রিগার চাপল করিডোর লম্বালম্বী টার্গেট করে।

ওদিক থেকেও ব্রাশ ফায়ারের শব্দ কানে এল। গুলীগুলো আহমদ মুসাদের মাথার উপর দিয়ে চলে গেল।

আহমদ মুসা শুয়ে থেকেই তাকিয়ে দেখল লোকটি করিডোর থেকে উধাও হয়ে গেছে।

আহমদ মুসা নিশ্চিত হলো, এত তাড়াতাড়ি দৌড়ে কোথাও সে পালাতে পারে না, নিশ্চয় যেখানে সে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানেই পাশে কোন দিকে দরজা আছে। ঐ দরজা পথেই সে সরে গেছে এবং সে দরজা নিশ্চয়ই করিডোরের বাম পাশে হবে।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়াচ্ছিল সারা জেফারসনও।

'আপনারা ঠিক আছেন তো?' সারা জেফারসনের দিকে তাকিয়ে বলল আহমদ মুসা।

হ্যাঁ সুচক মাথা নাড়ল সারা জেফারসন। কথা বলতে গিয়ে তাকিয়ে ছিল আহমদ মুসা সারা জেফারসনের মুখের দিকে। দেখল, সারা জেফারসনের কপালের ক্ষত দিয়ে তখনও রক্ত ঝরছে। নিশ্চয় আহত জায়গাটায় আবার আঘাত লেগেছে, ভাবল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা সেই উত্তর করিডোরের দিকে একবার তাকিয়ে সরে এল সারা জেফারসনদের কাছে। বলল, 'ভুলে গিয়েছিলাম আমার পকেটে অটো ব্যান্ডেজ আছে। আপনার কপালের ক্ষত দিয়ে দেখছি রক্ত ঝরছে।'

আহমদ মুসা পকেট থেকে ক্ষুদ্র একটা প্যাকেট বের করে তার মধ্যে থেকে একটা ব্যান্ডেজ বেছে নিয়ে সারা জেফারসনের মুখোমুখি দাঁড়াল। সারা জেফারসনের কাছ থেকে রুমালটি চেয়ে নিয়ে তার চোখের প্রান্ত দিয়ে নেমে আসা রক্ত মুছে দিল। তারপর দ্রুত ক্ষতটা ভালো করে মুছে নিয়ে ব্যান্ডেজটা ভালো করে বসিয়ে তার চারদিকটা ভালো করে পেষ্ট করে দিল।

ব্যান্ডেজ লাগানোর সময় চোখ বুঁজে ছিলা সারা জেফারসন। প্রশান্তিতে প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল তার চেহারা।

ব্যান্ডেজ পেষ্টিং শেষে আহমদ মুসা বলল, 'আপনার নার্ভ দারুন শক্ত। আপনার মুখ দেখে মনে হলো না এ ধরনের একটা ক্ষতের ড্রেসিং আপনার হলো।'

তখন চোখ খুলেছে সারা জেফারসন। বলল, 'কোন কোন ব্যাথা কখনও কখনও আনন্দ দেয়। আমার তো মনে হচ্ছিল, এমন ক্ষত যদি আমার গোটা শরীরে হতো।!'

সারা জেফারসনের কথাগুলো আহমদ মুসার মুখে ঔজ্জ্বল্য যেন ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল।

আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্রুত কণ্ঠে বলল, 'মিস জেফারসন, আপনারা আমার সাথে আসুন।'

বলেই আহমদ মুসা উত্তর করিডোর ধরে ছোটা শুরু করল।

তার পেছনে পেছনে ছুটল সারা জেফারসন ও ক্লারা কার্টার।

লোকটিকে যেখানে দাঁড়ানো দেখেছিল, সেখানে গিয়ে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

খুশি হলো আহমদ মুসা। দেখল, পাশেই পশ্চিম দিকে একটা দরজা। এই দরজা দিয়ে লোকটি ভেতরে ঢুকে গেছে।

দরজায় আহমদ মুসা চাপ দিয়ে দেখল দরজা বন্ধ। সারা জেফারসনরা আহমদ মুসার পেছনে এসে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা পেছনে তাকিয়ে সারা জেফারসনকে বলল, ‘এই ঘরে শত্রুদের একজন রয়েছে।’

আহমদ মুসা ফিরে তাকাল দরজার দিকে। তার রিভলবারের নল সে সেট করল দরজার কি হোলে তারপর ট্রিগার চেপে রাখল কয়েক সেকেন্ড। এবং সংগে সংগেই এক ঝটকায় সরিয়ে দিল দরজা এবং সেই সাথেই বিস্ময়কর দ্রুততার সাথে নিজের দেহটা কয়েকবার শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে এগিয়ে গেল। দাঁড়াল গিয়ে ঘরের মাঝখানে।

ঘরের ভেতরে ষ্টেনগানধারী লোকটি ষ্টেনগান হাতে দাঁড়িয়েছিল চেয়ারে বেঁধে রাখা হ্যারির কাছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ভোজবাজির মত ঘটনা ঘটে গেল এবং ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ানো শত্রুর রিভলবার হ্যারির দিকে স্থির লক্ষ্যে উদ্যত এবং বিহ্বল হয়ে পড়া লোকটি শেষ মুহূর্তে মরিয়া হয়ে তার ষ্টেনগানের নল হ্যারির মাথায় ঠেকিয়ে চিৎকার করে উঠল, ‘এই মুহূর্তে তোমরা বেরিয়ে না গেলে হ্যারির মাথা গুড়ো হয়ে যাবে।’

ইতিমধ্যে সারা জেফারসনরাও ঘরে প্রবেশ করেছিল। সারা জেফারসনের হাতে রিভলবার।

কথা বলার সময় লোকটির দুচোখ নিবদ্ধ ছিল আহমদ মুসার দুচোখের দিকে।

লোকটির কথা শেষ হবার আগেই আহমদ মুসা লোকটির সোজা পেছনে জানালার দিকে তাকিয়ে দ্রুত একটা ইশারা করল। যেন জানালার দাঁড়ানো কাউকে কিছু নির্দেশ দিল আহমদ মুসা।

ষ্টেনগানধারী লোকটি আহমদ মুসার ইশারার প্রায় সংগে সংগেই কোন অমোঘ টানে পেছন দিকে তাকাল।

এই সুযোগটাই চাচ্ছিল আহমদ মুসা। লোকটির চোখ পেছন দিকে ঘুরতে শুরু করার সংগে সংগেই আহমদ মুসার প্রস্তুত রিভলবার গুলী করল লোকটির ষ্টেনগানের বাট লক্ষ্যে।

লোকটি যে বোকা বনেছে তা বুঝে চোখ আবার ঘুরিয়ে নেবার আগেই তার হাত থেকে ষ্টেনগান ছিটকে পড়ে গেল এবং তার দুই হাতও বিধ্বস্ত হয়ে গেল আহমদ মুসার মেশিন রিভলবারের গুলীতে।

লোকটি একটি আর্তচিৎকার করে বসে পড়ল মেঝেতে।

আহমদ মুসা রিভলবার পকেটে রেখে হ্যারির কাছে গিয়ে তার বাঁধন খুলে দিল।

হ্যারির চোখে মুখে আঘাতের চিহ্ন। গায়ের জামা ছেঁড়া। যে নাইট পোশাকে সে ঘুমিয়ে ছিল, সেই পোশাক এখনও তার পরনে। মাথার চুল তার পাগলের মত উস্কো খুস্কো।

আহমদ মুসা তার বাঁধন খুলে দিতেই হ্যারি কেঁদে উঠে জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে।

আহমদ মুসা হ্যারির পিঠ চাপড়ে আদর করে বলল, 'তোমার অনেক কষ্ট হয়েছে, কিন্তু তোমার জাতির তুমি অসম্ভব উপকার করেছ হ্যারি।'

হ্যারিকে বুক থেকে ছেড়ে দিয়ে বলল, তোমাদের নেত্রীকে চেন হ্যারি?

'কে, ম্যাডাম সারা জেফারসন?' চোখ মুছে বলল হ্যারি।

'হ্যাঁ।' বলে আহমদ মুসা সারা জেফারসনকে দেখিয়ে বলল, 'ইনি তোমাদের ম্যাডাম সারা জেফারসন।'

হ্যারির বিস্ময় ও অপার শ্রদ্ধা মিশ্রিত দুই চোখ মুহূর্তের জন্য স্থির হলো সারা জেফারসনের প্রতি। তারপর চোখ দুটি নিচু হলো তার। মাথা ঝুঁকিয়ে দীর্ঘ বাউ করল হ্যারি সারা জেফারসনকে। বরল, 'ম্যাডাম আমরা গর্বিত আপনার জন্যে।'

'ওয়েলকাম হ্যারি। তোমরা আমেরিকার গর্ব।'

বলে একটু থামল সারা জেফারসন। পরক্ষণেই আবার বলল হ্যারিকে লক্ষ্য করে, 'ওঁকে চেন, যিনি তোমাকে মুক্ত করলেন?'

হ্যারি আহমদ মুসার দিকে তাকাল।

বলল, 'জি না।'

‘আহমদ মুসাকে চেন? উনি সবার স্বপ্নের সেই আহমদ মুসা।’ বলল সারা জেফারসন।

শুনেই হ্যারি মুহূর্তের জন্যে পাথরের মত স্থির হয়ে গেল। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আহমদ মুসার পায়ের উপর। বলতে লাগল, ‘থ্যাংকস গড। আমি ভাগ্যবান স্যার।’

আহমদ মুসা তাকে টেনে তুলল।

এই সময় ঘরে প্রবেশ করল জর্জ আব্রাহাম, গোল্ড ওয়াটার ও বেঞ্জামিন বেকন।

জর্জ আব্রাহাম সোজা এসে আহমদ মুসার সাথে হ্যান্ডশেক করে বলল, ‘আমি সব শুনলাম। কৃতজ্ঞ আমরা আপনার কাছে আহমদ মুসা।’

‘ধন্যবাদ জনাব। কিন্তু যা হচ্ছে তা সবই আল্লাহর কাজ।’ বলল আহমদ মুসা। তারপর বেঞ্জামিন বেকনের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘ওদিকের খবর কি?’

উত্তর দিল বেঞ্জামিন বেকন। বলল, ‘আগেই একজন ছিল আমাদের হাতে। এখানে একজন ধরা পড়েছে। আর দুই গাড়ি থেকৈ ধরা পড়েছে আও ৮ জন। আর মারা পড়েছে পাঁচজন।

বেঞ্জামিন বেকন থামতেই জর্জ আব্রাহাম বলে উঠল, ‘আমরা C.B.S ও C.B.C টেলিভিশন নেটওয়ার্ককে খবর দিয়েছি। ওরা আসছে। এখানে আমাদের হ্যারি, মিস জেফারসন, গোল্ড ওয়াটার ও বেঞ্জামিন বেকনকে দরকার তাদের বক্তব্যের জন্যে। আমরা চাই এটা বড় একটা স্টোরি হোক।’

‘অসংখ্য ধন্যবাদ মি. জর্জ আব্রাহাম। সময়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে আল্লাহর সাহায্য এটা।’

থামল একটু আহমদ মুসা। আবার বলল, ‘তাহলে মি. জর্জ আব্রাহাম, আমি এখন এখান থেকে ছুটি পেতে পারি।’

‘ছুটি নয় একটু আড়ালে যাওয়া আর কি।’ বলল জর্জ আব্রাহাম।

‘তাহলে আমি চলি, ওরা হয়তো এসে পড়বে এখনি।’ বলে হ্যান্ডশেকের জন্যে হাত বাড়াল জর্জ আব্রাহামের দিকে।

মুখ মলিন হয়ে গেছে সারা জেফারসনের। আহমদ মুসাকে আড়ালে পাঠাবার সিদ্ধান্ত তার মন মেনে নিতে পারেনি।

জর্জ আব্রাহাম আহমদ মুসাকে কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই সারা জেফারসন বলে উঠল, 'আংকল আমিও এসব ফরমালিটির মধ্যে থাকতে চাই না।' বেঞ্জামিন বেকন 'ফ্রি আমেরিকা' মুভমেন্টের প্রতিনিধিত্ব করবে। আমি এখনি চলে যেতে চাই।'

জর্জ আব্রাহাম তাকাল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা কিছু না বলে তাকাল সারা জেফারসনের দিকে।

সারা জেফারসন বলল, 'ফ্রি আমেরিকার পক্ষ থেকে আমি কখনই জন সমক্ষে আসিনি। আজও আসতে চাই না। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট সবার থাকা বা কথা বলার দরকার নেই, যেমন আপনি থাকতে পারছেন না।'

জর্জ আব্রাহাম আবার তাকাল আহমদ মুসার দিকে।

'ঠিক আছে। আমার মনে হয় মিস জেফারসন ঠিকই বলেছেন।

তাছাড়া উনি আহতও।' বলল আহমদ মুসা।

জর্জ আব্রাহাম এবার মাথা নেড়ে সায় দিল আহমদ মুসার কথায়।

জর্জ আব্রাহাম থামতেই সারা জেফারসন বলে উঠল, 'চলুন মি. আহমদ মুসা, চল ক্লারা।'

'বেঞ্জামিন বেকন একটি ট্যাক্সি ডেকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে 'সেভেনটি থ্রি' নাম্বার বাড়ির সামনে। আপনারা বের হবেন পেছনের একটা বিকল্প দরজা দিয়ে। বেঞ্জামিন আপনাদের পৌছে দিয়ে আসবে।' বলল জর্জ আব্রাহাম।

সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আহমদ মুসা আর একদফা হ্যারির পিঠ চাপড়ে দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এল।

'সেভেনটি থ্রি' নাম্বার বাসার সামনে আহমদ মুসারা যখন গাড়িতে উঠল, তখন ঘড়িতে রাত সাড়ে ১১টা বাজে।

আহমদ মুসারা ওয়াশিংটন পোষ্টের সম্পাদক ‘ওয়েন এ্যালার্ড’ এর বাসা থেকে বের হয়ে আসার আধ ঘন্টা পরে ওয়াশিংটন পোষ্টের চেয়ারম্যানের কক্ষে জরুরী মিটিং বসেছে।

বড় টেবিলটার একপাশে বসেছেন ওয়াশিংটন পোষ্টের শেয়ারের বৃহত্তর অংশের মালিক ও পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান বব বেনহাম। এবং অন্যপাশে বসেছেন পত্রিকার সম্পাদক ওয়েন এ্যালার্ড। টেবিলে আরও হাজির আছেন পত্রিকার বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক বিল গ্রাহাম এবং ল’ অফিসার শিফার সিমশন।

খুবই অস্বাভাবিক ধরনের মিটিং এটা।

চেয়ারম্যান বব বেনহাম তার গোটা কার্যকালে এই প্রথমবার পত্রিকায় প্রকাশিতব্য একটা বিষয়ে আলোচনার জন্যে তার টেবিলে কল করছেন সম্পাদক এবং পত্রিকার আরও দুজন গুরুত্বপূর্ণ অফিসারকে।

চেয়ারম্যান বব বেনহাম পরিস্থিতি সম্পর্কে দীর্ঘ ব্রিফিং দেয়ার পর। সম্পাদক ওয়েন এ্যালার্ড বলল, ‘পরিস্থিতি খুবই নাজুক নিঃসন্দেহে। আমরা যদি ‘ফ্রি আমেরিকা’ মুভমেন্ট ও ‘হোয়াইট ঈগল’ এর দেয়া প্রতিবাদ ছাপি, তাহলে মার্কিন জাতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ ইহুদী কম্যুনিটির স্বার্থকে ও তাদের ভবিষ্যতকে একটা বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয়া হবে একথা সত্য। কিন্তু সমস্যা দাঁড়িয়েছে আমরা আমেরিকান জুইস পিপলস লগী (AJPL) এর সরবরাহ করা আহমদ মুসা সম্পর্কিত যে নিউজ ছেপেছি, তাতে ‘ফ্রি আমেরিকা’ মুভমেন্ট ও ‘হেয়াইট ঈগল কে প্রত্যক্ষভাবে জড়ানো হয়েছে। সুতরাং তাদের কথা বলা এবং আমাদের তা প্রকাশ করা তাদের লিগ্যাল রাইট হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয় বিষয় তাদের প্রতিবাদ ছাপার সময়। আমরা তা আজও ছাপতে পারি, দুদিন পরেও ছাপতে পারি। কিন্তু সমস্যা দাঁড়িয়েছে, ওরা নগদ টাকা পে করে আমাদের প্রথম পাতার এক চতুর্থাংশ স্পেস আজকের জন্যে কিনে নিয়েছে প্রতিবাদটা বিজ্ঞাপন আকারে ছাপার জন্যে। আমরা প্রতিবাদ না ছাপলেও এই স্পেস তারা আজ ব্যবহার করবে। সুতরাং নিউজ আকারে না ছাপলেও প্রতিবাদটা বিজ্ঞাপন আকারে যাচ্ছেই। প্রতিবাদটা যখন এভাবে যাচ্ছেই, তখন প্রতিবাদটা নিউজ আকারে না ছেপে আমরা আমাদের

ক্রেডিবিলিটি হারাতে যাবো কেন? তৃতীয় যে বিষয়টা আমাদের এই মুহূর্তে বিবেচ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে সেটা হলো আমাদের সাংবাদিক কর্মচারীদের সাধারণ সেন্টিমেন্ট। প্রতিবাদটার কপি তারা সকলে পেয়ে গেছে। তারা প্রতিবাদটা ছাপার জন্যে প্রবল চাপ সৃষ্টি করছে। তারা হুমকি দিয়েছে আমেরিকার জনগণের স্বার্থ ও জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সাংঘাতিকভাবে জড়িত ও প্রতিবাদ নিউজ যদি না ছাপা হয়, তাহলে আজ তারা পত্রিকা বের হতে দেবে না এবং তারা আইনেরও আশ্রয় নেবে। আমাদের জন্যে শেষ বিবেচ্য বিষয়টি হলো, আমাদের সহযোগী পত্রিকাগুলো কি করছে।' থামল সম্পাদক ওয়েন এ্যালার্ড।

কিছুক্ষণ নিরবতা। ভাবছিল সবাই।

অবশেষে নিরবতা ভাঙল বব বেনহাম। বলল ল' অফিসার শিফার সিমশনকে লক্ষ্য করে, 'আলোচনায় কতগুলো লিগ্যাল প্রশ্ন এসেছে, তোমার মত কি?'

'স্যার, প্রথম প্রশ্ন সম্পর্কে একথা আমরা সকলেই জানি, প্রতিবাদ ছাপা ওদের লিগ্যাল রাইট, তবে কবে, কতখানি ছাপা হবে এটা সম্পাদকের এখতিয়ার। দ্বিতীয়ত ওরা যদি সব ফর্মালিটি পূর্ণ করে স্পেস কিনে থাকে আজকের জন্যে, তাহলে ওদের বিজ্ঞাপনটি না ছাপা হলে ওরা কোটি কোটি ডলারের ক্ষতিপূরণ দাবী করে মামলা করতে পারে। তৃতীয় হলো সাংবাদিক কর্মচারীদের ইউনিয়ন দাবীর ব্যাপারা। আইনত ওদের পত্রিকা বন্ধ রাখার কোন এখতিয়ার নেই তবে তারা জাতীয় স্বার্থে ও নিরাপত্তার ইস্যু তুলে আইনের আশ্রয় নিতে পারে।' থামল ল' অফিসার শিফার সিমশন।

ল, অফিসারের ওপিনিয়নে সম্পাদক ওয়েন এ্যালার্ডের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু মলিন হয়ে পড়ল চেয়ারম্যান বব বেনহানের মুখমন্ডল।

চেয়ারম্যান বব বেনহাম তাকাল বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক বিল গ্রাহামের দিকে। বলল, 'ওদের স্পেস কেনার ব্যাপারটা কি?'

বিল গ্রাহাম নড়ে চড়ে বসল। বলল, 'স্যার, আইন মাফিক নগদ টাকায় আজকের জন্যে স্পেস কিনেছে ওরা।'

‘বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুও কি তোমরা ও.কে করে দিয়েছো? বলল বব বেনহাম ক্ষিপ্ত কণ্ঠে।

‘জি স্যার।’ শুকনো কণ্ঠে বলল বিল গ্রাহাম।

‘যে কোন বিজ্ঞাপনকেই কি ও.কে করা যায়?’ বব বেনহামের কণ্ঠে বিরক্তি।

‘রাষ্ট্র বিরোধী ও জাতীয় স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকারক হলে তা ও.কে করা যায় না স্যার। কিন্তু ওটা ছিল একটা নিউজ ক্ল্যারিফিকেশন বা প্রতিবাদ।’

জবাবে আর কোন কথা বলল না চেয়ারম্যান বব বেনহাম। চেয়ারে গা এলিয়ে দিল। চোখে মুখে তার হতাশার চিহ্ন। আর ভেতরে তার উদ্বেগের ঝড়। সে আমেরিকান জুইস পিপলস লীগের শীর্ষ উপদেষ্টাদের একজন। জুইস লীগের উপর যে আঘাত আসবে, তার একটা অংশ তার উপরও এসে পড়বে। কিন্তু কি করবে সে! আর এর দায় আমরা আমেরিকার শান্তিবাদী ইহুদীরা নেব কেন? কিন্তু উপায় কি? ঘরে আগুন লাগলে যে সবাই পুড়ব। তাহলে কি করা যায়?

সোজা হয়ে আবার বসল চেয়ারম্যান বব বেনহাম। বলল সম্পাদককে উদ্দেশ্য করে, ‘আইনগত সমস্যা আছে। কিন্তু আইনকে ভয় পাই না। এর মোকাবিলা করার সময় পাব। এখন মি. ওয়েন এ্যালার্ড আপনি দেখুন অন্য পত্রিকাগুলো কি করছে। এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।’

‘আমি মিটিং এর আসার আগে নিউইয়র্ক টাইমস ও নিউইয়র্ক পোষ্টের সাথে কথা বলে এসেছি। ওরা আলোচনা করার পর প্রতিবাদ ছাপার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আজ ওরা প্রতিবাদ ছাপছে। ওয়াল স্ট্রিট শুনেছি, তখন পর্যন্ত ওদের ছাপার সিদ্ধান্ত হয়নি।’

মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল বব বেনহামের। বলল, ‘ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের হাওয়ার্ড হেফলিন খুব শক্ত ও বিবেচক লোক। সে নাও ছাপতে পারে। তাহলে আমরা দুটি পত্রিকা অন্তত এক সাথে থাকতে পারি।’

বলে টেলিফোন তুলল বব বেনহাম। টেলিফোন করল ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের চেয়ারম্যান হাওয়ার্ড হেফলিনকে।

কথা শুরু করল বব বেনহাম খুব আনন্দের সাথে পরে মুখ তার অন্ধকার হয়ে গেল।

আলোচনা শেষ করে শিথিল হাতে টেলিফোনটা রেখে হতাশভাবে চেয়ারে গা এলিয়ে দিল। মুহূর্তখানেকের জন্যে চোখ বুজল।

তারপর চোখ খুলে হতাশভাবে তাকাল সম্পাদক ওয়েন এ্যালার্ড এর দিকে। বলল, 'মি. এ্যালার্ড, সবাই প্রতিবাদ ছাপছে। আপনি না ছেপে কেমন করে পারবেন? ঠিক আছে ছেপে দিন।'

বলে আবার চোখ বুজল বব বেনহাম।

ঘরে নামল এক অস্বস্তিকর নিরবতা।

প্রতিবাদ ছাপার সিদ্ধান্তে খুশি হয়েছে সম্পাদক ওয়েন এ্যালার্ড, ল' অফিসার সিমশন এবং বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক বিল গ্রাহাম। তবে চেয়ারম্যান বব বেনহামের কথা ভেবে তারা মনে খুবই পীড়া অনুভব করছে।

নিরবতা ভেঙে সম্পাদক ওয়েন এ্যালার্ড ধীর কণ্ঠে বলল, 'আমরা এখন উঠতে পারি? আর কোন নির্দেশ আমাদের প্রতি?'

চোখ বন্ধ রেখেই বব বেনহাম বরল, 'না মি. এ্যালার্ড আর কোন কথা নেই। আপনারা আসুন। গুড নাইট।'

উঠে দাঁড়াল ওরা তিনজন। ঘর থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে পা বাড়াল তারা সবাই।

# ৭

গভীর রাত। পশ্চিম ওয়াশিংটনের নিউ এজ সিনাগগের বিপরীত দিকে রাস্তার ওপারের একটা বিশাল বাড়ির ভেতরের একটি কক্ষ কয়েকটি সোফায় মুখোমুখি বসে আছে জেনারেল শ্যারন, কাউন্সিল অফ আমেরিকান জুইস এ্যাসোসিয়েশনস- এর চীফ ডেভিড উইলিয়াম জোনস এবং জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টনের হাতে 'ফ্রি আমেরিকা' ও 'হোয়াইট ঈগল' থেকে যে প্রতিবাদ পাঠানো হয়েছে পত্রিকাগুলোতে সেই প্রতিবাদলিপির একটা কপি। এই কপির উপরই চোখ বুলাচ্ছিল জেনারেল হ্যামিল্টন।

পড়া শেষ করে মুখ তুলল সে। তার বিমর্ষ চোখে মুখে এবার চরম বিস্ময়। বলল সে, 'মি. শ্যারন, আপনি তো প্রতিবাদের এ কপিটা পড়েছেন। আপনার অভিমত কি এ সম্পর্কে?'

'মি. হ্যামিল্টন ওতে যা আছে তা ওদের অভিমত।' বলল জেনারেল শ্যারন।

'সেটা বুঝেছি। কিন্তু এ অভিমত সত্য কিনা? তারা যে প্রমাণসমূহ উল্লেখ করেছে তা মিথ্যা প্রমাণ করতে আমরা পারব কিনা?' বলল জেনারেল হ্যামিল্টন।

'সেটা তো বিচারের প্রশ্ন। আমাদের প্রতিবাদ আমরা অবশ্যই করব।' জেনারেল শ্যারন বলল।

জেনারেল হ্যামিল্টনের মুখ ম্লান হয়ে গেল। বলল, 'মি. শ্যারন আমি বিচারের কথা বলছি না। আমি বলতে চাচ্ছি, আমাদের বক্তব্যকে আমরা সত্য বলছি কিনা? সত্য একটাই থাকে। আমাদের কথা সত্য হলে ওদের কথা মিথ্যা অবশ্যই হবে।'

জেনারেল শ্যারন তৎক্ষণাৎ জবাব দিল না। তাকাল ডেভিড উইলিয়াম জোনসের দিকে। তারপর বলল, 'জেনারেল হ্যামিল্টন আমাদের কথাকে সত্য আমাদের বলতেই হবে।'

'এর অর্থ আমরা যা বলছি তা সত্য নয়'। জেনারেল হ্যামিল্টন মুখ ম্লান করে বলল।

'মি. হ্যামিল্টন বিজ্ঞানী জন জ্যাকবের মত আমাদের পূর্ব পুরুষরা আমাদের জাতির জন্যে যা করে গেছেন, তাই ন্যায় ও সত্য। সে সত্যকে রক্ষার জন্য আমরা লাখো মিথ্যা বললেও তা আমাদের জন্য সত্য।' একটু শক্ত কণ্ঠে বলল ডেভিড উইলিয়াম জোনস।

উদ্বেগ ফুঠে উঠল জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টনের চোখে মুখে। সে দ্রুত কম্পিত কণ্ঠে বলল, 'তাহলে গোয়েন্দা সুড়ঙ্গের যে অভিযোগ উঠেছে, সেটা সত্য?

কিছু বলতে যাচ্ছিল জেনারেল শ্যারন। এ সময় টেলিফোন বেজে উঠল ডেভিড উইলিয়াম জোনসের। টেলিফোন ধরল সে।

টেলিফোনে ওপারের কথা শুনেই অন্ধকার হয়ে গেল ডেভিড উইলিয়াম জোনসের মুখ।

ওপারের সাথে কথা শেষ করে ডেভিড উইলিয়াম জোনস টেলিফোন রেখে প্রায় আর্তকণ্ঠে বলে, উঠল, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে, মি. শ্যারন। হ্যারিকে ওরা নিয়ে গেছে। আমাদের দশজন লোক ওদের হাতে ধরা পড়েছে। মারা গেছে আরও পাঁচজন।'

'অসম্ভব! কি করে ঘটল? কারা ঘটাল? পুলিশ? এফ বি আই? আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল জেনারেল শ্যারন।

'পুলিশ নয়, এফ বি আইও নয়। কারা যেন করেছে। পরে তারা আমাদের লোকদের তুলে দিয়েছে এফ বি আই-এর হাতে।' বলল ডেভিড উইলিয়াম জোনস।

'তাহলে ওরা আহমদ মুসা ছাড়া আর কেউ নয়। শয়তানের বাচ্চা, সে সব সর্বনাশের মূল। চিবিয়ে খাব আমরা ওকে।' চিৎকার করে বলে উঠল জেনারেল শ্যারন।

‘সেটা পরের কথা জেনারেল। এখন হ্যারি যদি মুক্তি পেয়ে থাকে তাহলে আমাদের গোমর ফাঁক হয়ে যাবে। আগামী কালের ৮টার মিটিং এ গিয়ে আমরা কি বলব?’ বলল জেনারেল হ্যামিল্টন।

জেনারেল হ্যামিল্টনের কথা শেষ হতেই আবার টেলিফোন বেজে উঠল। টেলিফোন বেজে উঠেছে এবার জেনারেল শ্যারনের। জেনারেল শ্যারন টেলিফোন ধরর।

টেলিফোনে ওপারের কথা শুনে মুখের চেহারাই পাল্টে গেল তার।

বলল, ‘ওয়াশিংটন পোষ্ট ও নিউইয়র্ক টাইমসও প্রতিবাদ ছাপছে?’ শুকনো কন্ঠ জেনারেল শ্যারনের।

ওপারের কথা শুনে আবার সে বলল, ‘কি বলছ তুমি, জাতিকে জবাই করার মত নিউজ ছাপার অনুমতি দিয়েছে আমাদের সব বেনহামরা?’

‘এ সব হচ্ছে কি মি. শ্যারন? তাহলে সরকারের চাপের কাছে পত্রিকাগুলো নতিস্বীকার করলো?’ চিৎকার করে বলে উঠল ডেভিড উইলিয়াম জোনস।

জেনারেল শ্যারন সোজা হয়ে বসল। বলল, ‘সরকার কোথায়? সরকারের ডিক্টেশন কি বব বেনহামরা শুনবেন! আসলে এ গুলো সবই শয়তান আহমদ মুসার পরিকল্পনা। একদিকে সাংবাদিক কর্মচারীদের ক্ষেপিয়েছে ওরা, অন্যদিকে সব পত্রিকার প্রথম পাতার বিরাট অংশ বিজ্ঞাপনের জন্য আগেই কিনে ফেলেছে। পত্রিকাগুলো প্রতিবাদ নিউজ আকারে না ছাপলেও বিজ্ঞাপন আকারে ছাপতে যাতে বাধ্য হয়ে পড়ে। এসব বুদ্ধি আহমদ মুসার মাথায়ই শুধু গজাতে পারে।’ থামল জেনারেল শ্যারন।

উত্তরে কেউ কোন কথা বলল না। আবার নিরবতা।

নিরবতা ভাঙল জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন। বলল, ‘মিথ্যা সব সময় মিথ্যাই প্রমাণিত হয় মি. শ্যারন। আর মিথ্যার পরিণতি এটাই হয়। আমি দুঃখিত জেনারেল শ্যারন ও মি. জোনস, আমি জানতাম না এটা মিথ্যার ব্যাপারটা। আমাকে নতুন করে সব কিছু ভাবতে হবে।’

‘কি ভাববেন?’ বলল ডেভিড উইলিয়াম জোনস। কণ্ঠ কঠোর তার।

‘আমি আপনাদেরকে ভালোবাসি, আপনাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে ভালোবাসি। কিন্তু সে ভালোবাসা আমার আমেরিকার স্বার্থেই। কিন্তু এখন...............?’ কথা শেষ করল না জেনারেল হ্যামিল্টন।

জেনারেল শ্যারনের ঠোঁটে ফুটে উঠেছে ক্রুর হাসি। বলল, ‘কথা শেষ করুন মি. হ্যামিল্টন। বলুন যে, এখন সে আমেরিকার বুকেই আমরা ছুরি মারছি।’

এই কথা বলার সাথে সাথে জেনারেল শ্যারনের হাত বেরিয়ে এল পকেট থেকে রিভলবার নিয়ে। রিভলবার তার উদ্যত হলো জেনারেল হ্যামিল্টনের বুক লক্ষ্যে।

‘একি করছেন মি. শ্যারন। আমি একটা সত্য আপনাদের জানিয়েছি মাত্র। আমি আপনাদের শত্রু নই।’ চিৎকার করে কম্পিত কণ্ঠে বলল জেনারেল হ্যামিল্টন।

‘এই সত্যই আমাদের শত্রু হ্যামিল্টন। এই সত্য আপনার মুখ দিয়ে বাইরে যাক আমরা তা চাই না।’

এই কথার সাথে সাথে জেনারেল শ্যারনের রিভলবার পর পর দুটি গুলী বর্ষণ করল।

বুক চেপে ধরে জেনারেল হ্যামিল্টন লুটিয়ে পড়ল সোফার উপর।

শেষ নিঃশ্বাসের আগে এ কথাটুকুই শুধু সে বলতে পারল, ‘আমার আমেরিকাকে ঈশ্বর রক্ষা করুন এই ষড়যন্ত্রের হাত থেকে। আমি আমেরিকার জন্যে নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখতাম। আমেরিকার সে নতুন পৃথিবী হোক আমাদের ফাউন্ডার ফাদার্সদের, কোন ষড়যন্ত্রের নয়।’

‘থ্যাংকস জেনারেল শ্যারন। প্যাট্রিওটিজম-এর বীজগুলোকে এভাবেই ধ্বংস করা উচিত।’ বলে একটা দম নিল ডেভিড উইলিয়াম জোনস।

একটু পরে বলল, ‘মি শ্যারন কাউকে ডেকে বলুন একে রেখে দিয়ে আসুক এর বাড়ির কাছে কোথাও। লাশের উপর যেন একটা চিরকুট রেখে আসে লেখা থাকবে, ‘দেশের বিরুদ্ধে জেনারেল শ্যারনদের সহযোগিতা করার এটাই শাস্তি।’

লাশ সরিয়ে নিয়ে গেলে পাশের ঘরে গিয়ে বসল ডেভিড উইলিয়াম জোনস এবং জেনারেল শ্যারন।

বলল ডেভিড উইলিয়াম জোনস, ‘মি. শ্যারন, এই বিপর্যয়টা খুবই বড়। কিন্তু আমরা শেষ হয়ে গেছি, তা হতে পারে না।

‘অবশ্যই নয়। আমাদের এই মুহূর্তের কাজ হলো, একটা পাল্টা প্রতিবাদ তৈরি করা এবং পরশুই তা ছাপাবার ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয় কাজ হলো, যে কোন মূল্যে আহমদ মুসাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়া। কাল থেকেই আমাদের সর্বশক্তি এই কাজে নিয়োগ করতে হবে। একাজে ভারতীয় আমেরিকানদের কাজে লাগাতে হবে। তৃতীয় কাজ হলো, গোল্ড ওয়াটার ও সারা জেফারসনকে উপযুক্ত শাস্তি দেয় এবং চতুর্থ কাজ রাজনৈতিক সমর্থন এখন আমাদের উচ্চমূল্যে কিনতে হবে। কেউ সমর্থক না হলে তাকে নিরপেক্ষ রাখতে হবে।’ বলল জেনারেল শ্যারন।

‘এই শেষ কাজটা অবশ্যই কঠিন হবে।’ বলল ডেভিড উইলিয়াম জোনস।

‘কঠিন হবে কেন? দুনিয়া টাকার বশ হলে মানুষ হবে না কেন? আমলাদের টাকার প্রতি খুব লোভ, আর রাজনীতিকদের টাকা খুব বেশী প্রয়োজন।’ বলল জেনারেল শ্যারন।

‘আর সিনেটরদের সাথে কাল ৮টার মিটিং এর কি হবে?’

‘মিটিং পরশু পর্যন্ত পিছিয়ে দেয়ার প্রস্তাব করুন। বলুন, আমাদের পাল্টা প্রতিবাদ পত্রিকায় আসার পর বৈঠকে বসা উপযুক্ত হবে।’ বলল জেনালে শ্যারন।

‘ঠিক তাই’ ডেভিড জোনস বলল।

‘এখনকার মত উঠা যাক।’ বলল জেনারেল শ্যারন।

‘চলুন।’ বলে উঠে দাঁড়াল ডেভিড উইলিয়াম জোনস।

দুজন বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

গাড়ি থেকে নেমে আহমদ মুসা ও সারা জেফারসন পাশাপাশি হেঁটে বাড়ির ভেতর দিকে এগুচ্ছে।

'আমার খুব আনন্দ লাগছে আহমদ মুসা, টিজে দাদুরা যে নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছিলেন, আর জেনারেল শ্যারনরা আমেরিকার মাথায় যে নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন চাপিয়ে দিয়েছিলেন তার মধ্যে টিজে দাদুদের স্বপ্নই জিতে যাচ্ছে। তার মানে মুক্তি পাচ্ছে আমেরিকার মানুষ, মুক্তি পাচ্ছে পৃথিবীর মানুষ এক কালো অক্টোপাশের কবল থেকে।' বলল সারা জেফারসন।

'আগামী কয়েকটা দিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এদিনগুলো ক্ষ্যাপা কুকুরের মত ওদের পাল্টা আঘাত হানার দিন, সর্বস্ব দিয়ে ময়দানে টিকে থাকার ওদের ব্যবস্থা করার দিন। আমরাও যা অর্জন করেছি তা, যেমন- প্রতিবাদ ছাপার সাফল্য, হ্যারিকে উদ্ধার করার সাফল্য, ইত্যাদি কাজে লাগাবারও দিন।' আহমদ মুসা বলল।

'আমি ভাবছিলাম, আপনার মাথা এবার হাল্কা হবে, কিন্তু দেখছি আরও ভারী হয়েছে।' বলল সারা জেফারসন মিষ্টি হেসে।

'সংসার সমরাঙ্গনের সৈনিকদের পরস্পরের এগুলো এক অশরীরী বাধন মিস জেফারসন।'

আহমদ মুসা কথা শেষ করতেই থমকে দাঁড়াল সারা জেফারসন

তার সাথে আহমদ মুসাও থমকে দাঁড়িয়েছে।

সারা জেফারসন মুখ তুলেছে আহমদ মুসার দিকে। হরিণীর মত টানা তার নীল দুটি চোখ আহমদ মুসার দুচোখে নিবদ্ধ। তীব্র এক যন্ত্রণার প্রকাশ তার চোখে মুখে। বলল, 'আপনার 'মিস' শব্দটি নিষ্ঠুর টর্নেডোর মত বার বার আমাকে তাড়া করে পৃথিবীর কোন এক প্রান্তে নিয়ে আছড়ে ফেলে আহমদ মুসা। আপনার কথিত সংসার সমরাঙ্গনের আমিও তো আপনার পাশের একজন সৈনিক। দুর্ভাগা 'মিস' কি 'সারা' হতেই পারল না!'

শেষ দিকে আবেগে রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল সারা জেফারসনের কণ্ঠ। তার দুচোখ ভরে উঠেছে অশ্রুতে।

এ সময় সারা জেফারসনের মা জিনা জেফারসন ‘বাছা তোমরা এতক্ষণে এলে, আমি সাত-পাঁচ চিন্তায় একদম শেষ হয়ে গেছি, আর দেরী নয় খাবার টেবিলে এস।’ বলতে বলতে আহমদ মুসাদের সামনে এসে দাঁড়াল। সারা জেফারসনের উপর চোখ পড়তেই বলে উঠল, ‘কি হয়েছে সারা? চোখে পানি কে?’

সারা জেফারসন কোন কথা বলল না। দুহাতে মুখ ঢেকে ছুটল তার ঘরের দিকে।

‘কি হয়েছে? কিছু ঘটেছে বাছা?’ জিনা জেফারসন জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসাকে। তার কণ্ঠে উদ্বেগ।

আহমদ মুসার জন্য এটা ছিল কঠিন বিব্রতকর এক অবস্থা। কিন্তু নিজেকে সামলে নিল আহমদ মুসা। বলল জিনা জেফারসনের প্রশ্নের জবাবে, ‘না খালাম্মা, বাইরে কিছু ঘটেনি। একটু ভুল বুঝাবুঝি। ঠিক হয়ে যাবে। চলুন।’ আহমদ মুসার মুখে কষ্ট-সৃষ্ট হাসি।

‘চল বাছা’ বলে হাঁটতে শুরু করল জিনা জেফারসন।

খাবার টেবিলে গিয়ে জানা জেফারসন বলল, ‘তুমি বস বাছা। আমি সারাকে নিয়ে আসি।’

জিনা জেফারসন এগুলো সারার ঘরের দিকে।

আহমদ মুসা ডাইনিং চেয়ারে গা এলিয়ে দিল। উর্ধ্বমুখী হলো তার চোখ।

ধীরে ধীর তার দুচোখ আচ্ছন্ন করে নেমে এল একরাশ বেদনা। মনে হলো কারো হৃদয় দলিত করার চেয়ে কঠিন কাজ দুনিয়াতে আর কিছু নেই।

সারার ঘরের ওদিক থেকে আসা পায়ের শব্দে চিন্তা সূত্র ছিন্ন হয়ে গেল আহমদ মুসার। সোজা হয়ে বসল সে।

পরবর্তী বই

# ফ্রি আমেরিকা

**কৃতজ্ঞতায়ঃ Foysal Ahmed**

# সাইমুম- ৩১

# ফ্রি আমেরিকা

আবুল আসাদ

# ১

ওয়াশিংটনের ভোর।

সকালের কুয়াশা তখন গভীর।

এরই মধ্যে ফেডারেল পুলিশ প্রধান বিল বেকারের মনে হল কুয়াশায় জড়িয়ে একজন মানুষ যেন পড়ে আছে রাস্তার পাশে।

'ড্রাইভার গাড়ি দাঁড় করাও।' সংগে সংগেই ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল বেকার।

গাড়ি দাঁড়াল।

ফেডারেল পুলিশ প্রধান বিল বেকার পাশের লোকটির দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'স্যার রাস্তার পাশে একটা মানুষ পড়ে আছে বলে মনে হচ্ছে।'

পাশে বসা লোকটি এফবিআই-এর প্রধান জর্জ আব্রাহাম জনসন।

জর্জ আব্রাহাম জনসন ও বিল বেকার ফিরছিল ভার্জিনিয়ার অরলিংটন থেকে। জরুরী প্রয়োজনে ভোর রাতে গিয়েছিল সেখানে। এখন ফিরছে।

বিল বেকারের কথা শুনে ভ্রুকুঞ্চিত হল জর্জ আব্রাহাম জনসনের। বলল, 'চলুন তো, নেমে দেখি।'

কাছাকাছি হয়ে তারা নিশ্চিত হল, ঠিক একজন মানুষ রাস্তার পাশে পড়ে আছে।

আরও কাছাকাছি হয়ে তারা আঁৎকে উঠল, একজন মানুষের রক্তাক্ত লাশ এটা। আরও কাছাকাছি গেল তারা।

লাশটি চিৎ হয়ে পড়ে আছে। পরনে কমপ্লিট স্যুট।

লাশের মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল জর্জ আব্রাহাম ও বিল বেকার দুজনেই।

লাশটি জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টনের।

উদ্বেগ উৎকন্ঠা নিয়ে লাশের উপর একটু ঝুঁকে পড়ল তারা।

বুকে গুলীবিদ্ধ হওয়ার কেন্দ্র দুটি। আর এই দুটি গুলীতেই সে নিহত হয়েছে।

দেহে যা রক্ত লেগে আছে তা জমাট বাধা। মাটিতে রক্তের তেমন কোন চিহ্ন নেই। তার মানে অন্য জায়গায় হত্যা করে এখানে এনে ফেলে রাখা হয়েছে।

আরেকবার ভ্রুকুঞ্চিত হল জর্জ আব্রাহাম জনসনের। হত্যা করে সদর রাস্তার পাশে এনে লাশ ফেলে রাখবে কেন?

এই প্রশ্নটা দেখা দিয়েছে ফেডারেল পুলিশ প্রধান বিল বেকারের মনেও।

হঠাৎ তাদের নজর পড়ল লাশের বুকে রক্তের সাথে লেপটে থাকা একটা চিরকুটের দিকে।

তারা আরও ঝুঁকে পড়ল চিরকুটটা কি ও কেন তা দেখার জন্য।

চিরকুটে একটা মাত্র লাইন টাইপ করে লেখা। চিরকুটটা স্পর্শ না করে রক্তের ফাঁক দিয়ে যতটা পড়া গেল তাতে এই লেখাঃ 'দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে ইহুদীদের সহযোগিতার এটাই পরিণাম।'

লেখা পড়ে চমকে উঠল জর্জ আব্রাহাম ও পুলিশ প্রধান বিল বেকার দুজনেই।

উঠে দাঁড়াল দুজনেই।

বিল বেকার তাকাল জর্জ আব্রাহাম জনসনের দিকে। বলল, 'আমি কিছু বুঝতে পারছি না স্যার। ওরা কি এধরনের কান্ড ঘটাতে পারে? 'ফ্রি আমেরিকা

মুভমেন্ট' ও 'হোয়াইট ঈগল' এতটা পাগল হতে পারে যে, এই কান্ড ঘটিয়ে তা আবার সদর রাস্তার ধারে এনে তাতে এই সাইনবোর্ড দিয়ে রাখবে!'

এই প্রশ্নগুলো ভীষণভাবে পীড়া দিচ্ছিল জর্জ আব্রাহাম জনসনকেও। কিছুতেই হিসাব মেলাতে পারছিল না। বিশেষ করে আহমদ; মুসা যেখানে সারা জেফারসন ও গোল্ডওয়াটারের পাশে আছে, সেখানে এই ধরনের কান্ড ঘটতে পারে কি করে? তাহলে কি তাদের অজান্তে অতি উৎসাহী কেউ এই কান্ড ঘটিয়েছে? এটাও জর্জ আব্রাহামের মন মেনে নিতে পারছে না।

জর্জ আব্রাহাম জনসন বিল বেকারের প্রশ্নের উত্তরে বলল, 'আমাকেও ব্যাপারটা অবাক করেছে। কিছু বুঝতে পারছি না বেকার।'

'ঝামেলার এই চিরকুটটি তাহলে সরিয়ে ফেলব কি স্যার?' বলল বিল বেকার আগ্রহী কন্ঠে।

জর্জ আব্রাহাম তাকাল বিল বেকারের দিকে। বলল, 'না বেকার, চিরকুট না নিয়ে যেভাবে আছে সেভাবেই থাকবে। অপরাধীকে আড়াল করা নয়, তাকে আইনের হাতে সোপর্দ করাই আমাদের দায়িত্ব।'

'ধন্যবাদ স্যার। আমি চিরকুটটাকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না তাই কথাটা বলেছি।' বলল বেকার।

'ধন্যবাদ বেকার। তুমি ওদের ডেকে পুলিশ কন্ট্রোলে টেলিফোন করতে বল। ওরা আসুক।'

জর্জ আব্রাহাম জনসনের গাড়ির পেছনেই ছিল তাদের টীম-পুলিশের গাড়ি।

বিল বেকার ডাকল তাদের।

গাড়ি থেকে ছয়জন পুলিশ নেমে দ্রুত এগিয়ে এল।

বিল বেকার ওদের মধ্যে যে অফিসার তাকে বলল, 'ডিউটি পুলিশকে টেলিফোন কর, ওরা আসুক।'

সংগে সংগেই পুলিশ অফিসার তার অয়্যারলেস নিয়ে একটু দুরে সরে দাঁড়াল কথা বলার জন্যে।

এ সময় জর্জ আব্রাহাম জনসন চারদিকে একবার তাকিয়ে দ্রুত বলে উঠল, 'বিল বেকার, এইতো সামনে আলেকজান্ডার হ্যামিলটনের বাড়ি। এতক্ষনে লাশের দিকে সব মনোযোগ থাকায় কোন দিকে তাকাবার ফুরসৎ হয়নি।'

'ঠিক স্যার। তাহলে কি পুলিশ পাঠাব ওদের খবর দেয়ার জন্যে?' বলল বিল বেকার।

'পুলিশ নয়, তুমি নিজে যাও বেকার। মিসেস হ্যামিল্টনকে তুমি নিজে এ খবরটা দাও।' জর্জ আব্রাহাম জনসন বলল।

'অলরাইট স্যার।'

বলে বিল বেকার একজন পুলিশকে সাথে নিয়ে পা বাড়াল জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টনের বাড়ির দিকে।

অল্পক্ষন পরে মিসেস আলেকজান্ডার হ্যামিল্টনকে সাথে নিয়ে ফিরে এল বিল বেকার। মিসেস হ্যামিল্টন কাঁদছিলেন। তার সাথে তার এক মেয়ে, সেও কাঁদছিল।

মিসেস হ্যামিল্টন লাশ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে আছড়ে পড়তে যাচ্ছিলেন মিঃ হ্যামিল্টনের লাশের উপর।

জর্জ আব্রাহাম তাকে ধরে ফেলে বলল, 'ম্যাডাম ধৈর্য্য ধরুন, তদন্তের স্বার্থে লাশটা এমনই রাখতে চাই। দয়া করে একটু ধৈর্য্য ধরুন, আমাদের সাহায্য করুন।'

মিসেস হ্যামিল্টন বুঝল। সে লাশ আর স্পর্শ করতে গেল না। কিন্তু বাঁধভাঙা কান্নায় তার দেহ লুটিয়ে পড়ল মাটির উপর।

জর্জ আব্রাহাম সদ্য আসা অপেক্ষমান সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসারকে সুরত হাল রিপোর্ট তৈরী করতে নির্দেশ দিল।

কাজে লেগে গেল পুলিশ অফিসার।

প্রথমেই চিরকুটটি জব্দ করল পুলিশ।

মিসেস হ্যামিল্টনও পড়ল চিরকুটটি। পড়ে কেঁদে উঠল। বলল, 'ও গড, তাহলে 'ফ্রি আমেরিকা' ও 'হোয়াইট ঈগল'রাই হত্যা করল আমার স্বামীকে

আহমদ মুসার কুমন্ত্রনায়! ও গড, আমি কত নিষেধ করেছি তাকে এই সব রাজনীতিতে না জড়ানোর জন্য।'

মিসেস হ্যামিল্টনের চোখের সামনে নিহত মিঃ হ্যামিল্টনের পকেটের মানি ব্যাগ, কলম, চিরুনীসহ ছোট খাট সব জিনিসকেই জব্দ তালিকায় নিয়ে আসা হলো।

মিঃ হ্যামিল্টনের নীচের পকেট ঘড়ি জব্দ করতে গিয়ে পুলিশ অফিসারের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। ভালো করে পরীক্ষা করতে গিয়ে অকস্মাৎ তার ভ্রুকুঞ্চিত হলো। সে ঘড়িটি পুলিশ প্রধান বিল বেকারের হাতে তুলে দিতে দিতে বলল, 'স্যার ঘড়ির ছদ্মবেশে এটা একটা টেপ রেকর্ডার।'

বিল বেকার ঘড়িটির উপর একটু নজর বুলিয়ে পুলিশ অফিসারের কথায় সায় দিয়ে তা জর্জ আব্রাহাম জনসনের হাতে দিয়ে বলল, 'আপনি দেখুন স্যার।'

রেকর্ডারটি পরীক্ষা করতে গিয়ে নতুন করে ভ্রুকুঞ্চিত হলো জর্জ আব্রাহাম জনসনের। বলল বিল বেকারকে লক্ষ্য করে, 'থ্যাংকস গড! বেকার টেপটা অন করা আছে। তার মানে যা ঘটেছে, তার সবই অডিও রেকর্ডার এই টেপে আছে।'

বলতে বলতে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল জর্জ আব্রাহামের।

'এটা এই ঘটনার সবচেয়ে মূল্যবান দলিল স্যার।' বলল বিল বেকার।

'থ্যাংকস গড! আমি চাই ঐ দুর্বৃত্তদের শাস্তি হোক।' বলল মিসেস হ্যামিল্টন।

'অবশ্যই হবে ম্যাডাম।' মুখে এই কথা বলল বটে জর্জ আব্রাহাম জনসন ও বিল বেকার দুজনেই, কিন্তু জর্জ আব্রাহাম ও বিল বেকার দুজনেরই মনের কোথায় যেন খচ করে উঠল। এতবড় ভুল 'ফ্রি আমেরিকা' মুভমেন্ট ও 'হোয়াইট ঈগলে'র লোকরা করতে পারল, তা ভাবতে তাদের কষ্ট লাগছে।

সুরতহাল রিপোর্ট তৈরী শেষে জর্জ আব্রাহাম বলল, 'এরা লাশ নিয়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে যাক এবং লাশের ময়নাতদন্তের ব্যবস্থা করুক। চল আমরা মিসেস হ্যামিল্টনকে পৌছে দিয়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে যাব। টেপটা শুনে তার কপি নিয়ে তবেই আমি ফিরব অফিসে।'

জর্জ আব্রাহাম জনসন ও বিল বেকার যখন পুলিশ হেডকোয়ার্টারে পৌছল তখন সকাল ৭টা।

পুলিশ প্রধান বিল বেকারের টেবিলে বসে রেকর্ডপ্লেয়ার বাজিয়ে টেপ শুনল তারা দুজন।

টেপ শুনে তারা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। তারপর ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠল তারা দুজন।

'স্যার, ডেভিড উইলিয়াম জোনস এবং জেনারেল শ্যারন খুন করেছে আলেকজান্ডার হ্যামিল্টনকে। এখনি, আমি মনে করি, ওদের গ্রেফতার করা প্রয়োজন।' বলল পুলিশ প্রধান বিল বেকার জর্জ আব্রাহাম জনসনকে লক্ষ্য করে।

'আমি তোমার সাথে একমত বেকার। কিন্তু জানত ডেভিড উইলিয়াম জোনস কে? তিনি কাউন্সিল অব আমেরিকান জুইস এ্যাসোসিয়েশনসে'র সভাপতি। সেদিক থেকে সে রাজনৈতিক ক্ষমতাধর ব্যক্তি। আর জেনারেল শ্যারন আন্তর্জাতিক ইহুদী গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান।তার গায়ে হাত দেয়ার মধ্যে বাইরের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার ভয় আছে। সুতরাং তাদেরকে গ্রেফতারের জন্যে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রয়োজন।'

'তাহলে?'

'প্রেসিডেন্টের অনুমতি নিতে হবে। দেখি প্রেসিডেন্টকে পাই কিনা।'

বলে জর্জ আব্রাহাম পকেট থেকে তার এফবিআই-এর মোবাইলটা বের করল।

প্রেসিডেন্টের বেড টেলিফোনে রিং করল।

এ টেলিফোন সরাসরি প্রেসিডেন্ট ধরেন।

ওপ্রান্তে প্রেসিডেন্টের গলা পেল জর্জ আব্রাহাম। বলল জর্জ আব্রাহাম দ্রুত নরম কন্ঠে, 'মিঃ প্রেসিডেন্ট, স্যরি। এসময় টেলিফোন করলাম খুব জরুরী প্রয়োজনে।'

'ধন্যবাদ মিঃ জর্জ। আমারও জরুরী প্রয়োজন। এই মুহুর্তে আপনাকে আশা করছিলাম। বলুন, আপনার প্রয়োজনটা কি?'

'আমি এবং মিঃ বিল বেকার আপনার সাথে দেখা করতে চাই।'

'এখন?' প্রেসিডেন্ট বলল।

'আমরা খুব উপকৃত হব মিঃ প্রেসিডেন্ট। বলল জর্জ আব্রাহাম

'ভালই হলো। উইলিয়াম রুজভেল্ট, রোনাল্ড ওয়াশিংটন, ম্যাক আর্থারকে ডেকেছি। আপনাকে খুঁজছিলাম। শুনলাম অরলিংটন গেছেন। আপনি বিলকে নিয়ে এখনি চলে আসুন।' বলল প্রেসিডেন্ট।

টেলিফোন রেখে দিয়ে জর্জ আব্রাহাম বিল বেকারকে প্রেসিডেন্টের কথা ব্রিফ করল এবং টেপটা পকেটে নিয়ে বলল, 'চলুন উঠি।'

তারা বেরিয়ে এল অফিস থেকে।

তাদের গাড়ি ছুটল হোয়াইট হাউজের উদ্দেশ্যে।

হোয়াইট হাউজে প্রেসিডেন্টের ওভাল অফিস। ওভাল টেবিলে প্রেসিডেন্টের চেয়ারে  প্রেসিডেন্ট এ্যাডামস হ্যারিসন আসীন।

তার সামনে ওভাল টেবিলের ওপাশে বসেছে প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা উপদেষ্টা উইলিয়াম রুজভেল্ট, জর্জ আব্রাহাম জনসন, এ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থার, বিল বেকার এবং জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটন।

বৈঠকে প্রেসিডেন্টই কথা শুরু করেছে। বলছিল সে, 'দেশ ও জনগনের স্বার্থের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত একটা বিষয়ে পরামর্শের জন্যে আমরা এখানে বসেছি। ইহুদী গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান জেনারেল শ্যারনরা যে নিউজ সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় প্রচার করেছিল তার জবাবে আহমদ মুসা, সারা জেফারসন ও গোল্ড ওয়াটাররা যে বক্তব্য সংবাদপত্র ও টিভি নেটওয়ার্কে পাঠিয়েছেন তার কপি এবং এ্যাডওয়ার্ড হ্যারি ময়নিহানের উদ্ধার সম্পর্কিত যে রিপোর্ট মিঃ জর্জ আব্রাহাম পাঠিয়েছেন তারও কপি রাতেই আপনারা সকলে পেয়েছেন। সব মিলিয়ে বিষয়টা এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে। এ সম্পর্কে এখন আমাদের করনীয় কি? আপনাদের কাছে সে পরামর্শই জানতে চাই।'

প্রেসিডেন্ট থামতেই জর্জ আব্রাহাম জনসন বলল, 'মিঃ প্রেসিডেন্ট, একটা বড় ঘটনা ঘটে গেছে। যে বিষয়ে কথা বলার জন্যে আপনার সাথে দেখা করতে চেয়েছিলাম। তা হচ্ছে, জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন গতরাতে খুন হয়েছেন। খুন......।'

জর্জ আব্রাহাম জনসনের কথার মাঝখানেই প্রেসিডেন্ট বলে উঠল, 'আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন খুন হয়েছে!'

অন্য সবার চোখেও বিস্ময়। সবাই সোজা হয়ে বসেছে।

'ইয়েস, মিঃ হ্যামিল্টন খুন হয়েছেন। খুন করেছে জেনারেল শ্যারন ও ডেভিড উইলিয়াম জোনস। আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন যখন ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারে, তখন আমেরিকার স্বার্থের বিরুদ্ধে যেতে সে অস্বীকার করে। আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন সব ফাঁস করে দেবে এই ভয়েই জেনারেল শ্যারনরা তাকে খুন করে।'

বলে জর্জ আব্রাহাম পকেট থেকে একটা টেপ বের করে টেবিলে রাখল। বলল, 'এই টেপে জেনারেল আলেকজান্ডারের হত্যা ও হত্যাকালীন সকলের কথঅ বার্তার রেকর্ড আছে।'

'রেকর্ডটা বাজিয়ে শুনান মিঃ জর্জ।' বলে প্রেসিডেন্ট তার বাঁ হাত দিয়ে টেবিলের নিচের তলায় গোপন একটা সুইচ প্যানেলের একটিতে চাপ দিল।

সংগে সংগে জর্জ আব্রাহামের সামনে টেবিল ফুঁড়ে বেরিয়ে এল একটা ক্ষুদ্র ক্যাসেট প্লেয়ার।

জর্জ আব্রাহাম টেবিল থেকে মাইক্রো ক্যাসেটটা নিয়ে প্লেয়ারে বসিয়ে দিল।

প্লেয়ারটি কথা বলে উঠল। সাথে সাথে প্রেসিডেন্ট বলল, 'জেনারেল শ্যারনের কথার মাঝখানে থেকে কথা শুরু হলো কেন মিঃ জর্জ?'

'মিঃ প্রেসিডেন্ট, মনে হয়, জেনারেল হ্যামিল্টন ক্যাসেট অন করতে ভুলে গিয়েছিলেন, অথবা হতে পারে তিনি ওদের সন্দেহ করার পর ক্যাসেটটি অন করেন দলিল হিসেবে ওদের কথা রেকর্ডের জন্যে।' বলল জর্জ আব্রাহাম।

'ধন্যবাদ মিঃ জর্জ। ওইরকমই একটা কিছু ঘটে থাকতে পারে।' প্রেসিডেন্ট বলল।

ক্যাসেট কথা বলে চলল।

সবার মনোযোগ হুমড়ি খেয়ে পড়েছে ক্যাসেট থেকে বেরিয়ে আসা শব্দগুলোর ওপর।

জেনারেল শ্যারন, ডেভিড উইলিয়াম জোনস এবং জেনারের হ্যামিল্টনের বাক বিনিময় তারা শুনল। শুনল জেনারেল হ্যামিল্টনের ভয়ার্ত কন্ঠ। তার জবাব শুনল জেনারেল শ্যারনের কন্ঠে। পরপরই তাদের কানের এল দুবার গুলীর শব্দ এবং জেনারেল হ্যামিল্টনের আর্তনাদ। জেনারেল হ্যামিল্টনের শেষ স্বগোতক্তি। সবশেষে ডেভিড উইলিয়াম জোনস জেনারেল হ্যামিল্টনের লাশ একটি চিরকুটসহ তার বাড়ির সামনে রেখে আসার যে নির্দেশ দিল সেটাও সকলে শুনল।

এরপর প্রেসিডেন্ট নিজেই ক্যাসেট প্লেয়ার বন্ধ করে দিল। বলল স্বগতকন্ঠে, 'ঈশ্বর তার আত্মার মঙ্গল করুন। বেচারা বিভ্রান্ত হয়েছিল জেনারেল শ্যারনদের দ্বারা। কিন্তু জীবন দিয়ে সে প্রমাণ করে গেল সে একজন দেশ প্রেমিক আমেরিকান।'

'নতুন বিশ্বব্যবস্থা(New World Order) প্রশ্নে ওদের মিষ্টি কথা অনেক আমেরিকানকেই বিভ্রান্ত করেছে। আমেরিকানদের কাছে বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া দরকার।' বলল জর্জ আব্রাহাম জনসন।

'শুধু 'অনেক আমেরিকানে'র কথা বলছেন কেন? সেদিন সারা জেফারসনের সাথে কথা বলার পর বিষয়টা নিয়ে আমি নতুন করে গভীরভাবে ভাবছি। জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন জীবন দিয়ে ঈশ্বরের কাছে তার যে প্রার্থনা রেখে গেলেন তা আমার হৃদয়কে আজ তীরের মত বিদ্ধ করছে মিঃ জর্জ।' বলল প্রেসিডেন্ট। তার কন্ঠে গভীর আবেগ।

বলেই প্রেসিডেন্ট সোজা হয়ে বসল। বলল উইলিয়াম রুজভেল্টের দিকে তাকিয়ে, 'বলুন মিঃ রুজভেল্ট আপনি কি ভাবছেন?'

উইলিয়াম রুজভেল্ট নড়ে-চড়ে সোজা হয়ে বসল। বলল, 'আইনকে তার নিজস্ব গতিতে চলতে দেয়ার আমি পক্ষে। তবে মিঃ প্রেসিডেন্ট আপনি এই সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে রাজনৈতিক ফ্রন্টের শীর্ষ ইহুদী নেতাদের ব্রীফ করতে পারেন।'

তারপর প্রেসিডেন্ট তাকালেন জর্জ আব্রাহাম জনসনের দিকে। এইভাবে একে একে সবার মত নিলেন প্রেসিডেন্ট। সবাই সমর্থন করল উইলিয়াম রুজভেল্টকে।

সবার মত শোনার পর প্রেসিডেন্ট বলল, 'আইনের গতিকে যদি শর্ত সাপেক্ষ করা হয় তাহলে তার নিজস্ব গতি থাকে না। সুতরাং শর্তের প্রয়োজন নেই।'

'মিঃ প্রেসিডেন্ট আমি আলোচনার প্রস্তাব এজন্যে করেছিলাম যে, রাজনৈতিক ফ্রন্টে আমরা যাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হই।' বলল উইলিয়াম রুজভেল্ট।

'মিঃ উইলিয়াম রুজভেল্ট ওদেরকে সব ব্যাপারে সম্মত করতে গেলে ওদের কিছু ব্যাপারে আমাদেরকে সম্মত হতে হবে। এই ভাবে সমঝোতা করলে আইনের নিজস্ব গতি বাধাগ্রস্থ হয়। রাজনৈতিক স্বার্থে এই সমঝোতা ঠিক নয়। 'ফ্রি আমেরিকা' ঠিকই বলছে যে, আমাদের রাজনীতি, আমাদের গনতন্ত্র, অর্থনীতি এর অনেক কিছু স্বার্থবাদী গ্রুপের হাতে পণবন্দী হয়ে পড়েছে। এই পণবন্দী অবস্থা শুধু আমাদের নয়, আমাদের জাতির স্বাধীন গতিকেও বাধাগ্রস্থ করেছে। আমাদের রাজনীতিকে এখন এখান থেকে সরিয়ে আনা দরকার।'

বলে প্রেসিডেন্ট একটু থামল। তাকাল জর্জ আব্রাহাম ও বিল বেকারের দিকে। বলল, 'আপনারা বোধ হয় আমার সাক্ষাত চেয়েছিলেন তাদের গ্রেফতার করার অনুমতির জন্যে। আমি আদেশ দিচ্ছি, আপনারা আপাতত জেনারেল হ্যামিল্টনকে হত্যার অপরাধে ডেভিড উইলিয়াম জোনস এবং জেনারেল শ্যারনকে গ্রেফতার করতে পারেন। তবে হ্যারিকে কিডন্যাপ ও লস আলামোসের ঘটনা তদন্ত শেষ হওয়ার পর নতুন গ্রেফতারের সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে।'

'মিঃ প্রেসিডেন্ট, ব্যাঙ্কার আইজ্যাক বেন গুরিয়ান ও সাবা বেন গুরিয়ানকে কিডন্যাপের ব্যাপারও আমরা সামনে আনতে পারি।' বলল জর্জ আব্রাহাম জনসন।

'অবশ্যই। 'ফ্রি আমেরিকা' ও 'হোয়াইট ঈগল'রা যে প্রতিবাদ পত্রিকায় পাঠিয়েছে তাতেও এ প্রসঙ্গ এসেছে। সুতরাং অবশ্যই এরও তদন্ত শেষ করতে হবে এবং অপরাধীদের পাকড়াও করতে হবে। তার সাথে জর্জ জুনিয়রকে কিডন্যাপ করার ব্যাপারটাও আমরা সামনে আনতে পারি। মোট কথা হলো, সংশ্লিষ্ট কোন কিছুই বাদ দেয়া যাবে না।' বলল প্রেসিডেন্ট।

'মিঃ প্রেসিডেন্ট, শুরুতেই গ্রেফতারে না গিয়েও আমরা আইনকে এগিয়ে নিতে পারি।' বলল প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা উপদেষ্টা উইলিয়াম রুজভেল্ট।

'শুরু কোথায়? লস আলামোস নিয়ে যে ঘটনা তার তো এটা মাঝপথ! আর শুরু হলেই বা ক্ষতি কি? খুনি এবং জঘন্য গোয়েন্দা বৃত্তিতে লিপ্ত কাউকে গ্রেফতার করা যাবে না, মার্কিন বিবেক এতটা অন্ধ, মার্কিন আইন এতটা দুর্বল হয়ে যায়নি।' প্রেসিডেন্ট বলল।

'মিঃ প্রেসিডেন্ট আজ সকাল আটটায় সিনেট ও হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ নেতৃবৃন্দের একটা গোপন বৈঠক আছে জেনারেল শ্যারনদের সাথে। প্রেসিডেন্টের আদেশ আমরা গ্রহন করলাম। কিন্তু আদেশটির বাস্তবায়ন হবে বৈঠকটির পর।' জর্জ আব্রাহাম জনসন বলল।

'তার মানে সিদ্ধান্তকে আপনি ঐ বৈঠকের ফল সাপেক্ষ করতে চান মিঃ জর্জ?' বলল প্রেসিডেন্ট। তার কন্ঠে বিরক্তির সুর।

'ঠিক বৈঠকের ফল সাপেক্ষ নয়। তবে আদেশ বাস্তবায়নের পন্থার মধ্যে নতুন কোন চিন্তা আসতে পারে মিঃ প্রেসিডেন্ট।'

প্রেসিডেন্টের মুখে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'একটা নতুন চিন্তা আমি যোগ করছি মিঃ জর্জ। ঐ গোপন বৈঠক থেকে ফেরার পথে জেনারেল শ্যারন ও মিঃ ডেভিডকে গ্রেফতার করুন।'

প্রেসিডেন্ট থামল। কিন্তু থেমেই আবার হঠাৎ বলে উঠল, 'ঠিক আছে মিঃ জর্জ বেলা ১২ টা পর্যন্ত এই আলোচনা আমরা মূলতবী করলাম। ঠিক ১২ টায় আমি আপনাদের এখানে চাই।'

'ধন্যবাদ মিঃ প্রেসিডেন্ট।' বলল জর্জ আব্রাহাম।

'ধন্যবাদ সকলকে।' প্রেসিডেন্ট বলল। তারপর উঠে দাঁড়াল।

সকলে হ্যান্ডশেক করে বিদায় নিল।

'বৈঠক বসেছে ইন্টেলিজেন্স বিষয়ক হাউজ সিলেক্ট কমিটির চেয়ারম্যান এ্যান্ড্রু জ্যাকবস এর বাসায়।

ঠিক আটটাতেই মিটিং-এ উপস্থিত হয়েছে সিনেট চীফ চার্লস ডব্লিউ ওয়ারনার, হাউজ অব রিপ্রেজেনটেটিভ চীফ বে রিচার্ডসন, সিনেট ইন্টেলিজেন্স স্পেশাল কমিটির চেয়ারম্যান আনা প্যাট্রিসিয়া এবং ফরেন রিলেশনস হাউজ সিলেক্ট কমিটির চেয়ারম্যান বব এইচ ব্রুস। তাদের একটু পরেই এসেছে সিনেট ও হাউজের ডেমোক্র্যাট দলের সংসদীয় দুই দলনেতা জন টার্নার ও স্ল্যাড গার্টন।

সিনেট ও হাউজের রিপাবলিকান দুই সংসদীয় দলনেতা আসার কথা, কিন্তু এসে পৌঁছাননি।

মিটিং-এর হোস্ট এ্যান্ড্রু জ্যাকবস সবাইকে জানায়, সিনেটর দানিয়েল ময়নিহান পারিবারিক সমস্যার কারনে একটু দেরীতে আসবেন।

যারা মিটিং-এ এসেছেন, তাদের সবারই চোখে-মুখে প্রবল উত্তেজনার ছাপ।

মিটিং-এর হোস্ট এ্যান্ড্রু জ্যাকবস সবাইকে হাসি মুখে তার বাড়িতে স্বাগত জানান বটে, কিন্তু দেখা যায় তাকে দারুন বিব্রত।

সবাই বসার পর প্রথমেই কথা বলে সিনেট চীফ চার্লস ডব্লিউ ওয়ারনার। বলে এ্যান্ড্রু জ্যাকবসকে লক্ষ্য করে, 'মিঃ জ্যাকবস জানলাম মিঃ ময়নিহান একটু দেরীতে আসবেন, মিঃ টার্নার ও গার্টনও নিশ্চয় এসেছেন। কিন্তু মিটিং যারা ডাকলেন, সেই মিঃ জোনসরা কোথায়?'

মুখটা মলিন হয়ে যায় এ্যান্ড্রু জ্যাকবসের। বলে সে, 'স্যরি মিঃ ওয়ারনার, স্যরি টু অল, মিনিট বিশেক আগে আমি মিঃ ডেভিড উইলিয়াম জোনসের টেলিফোন পেলাম। তিনি জানালেন, 'ফ্রি আমেরিকা' ও 'হোয়াইট ঈগল'-এর যে প্রতিবাদ পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে ও টেলিভিশন নেটওয়ার্কে

গেছে, তার পাল্টা প্রতিবাদ তৈরী নিয়ে তারা ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তারা সবার কাছে মাফ চেয়েছেন এবং আগামীকাল সকাল ৮টা পর্যন্ত মিটিং মূলতবী করার জন্যে সবার কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন।' থামে এ্যান্ড্রু জ্যাকবস।

কিন্তু কোন কথা কারো কাছ থেকে আসে না। গম্ভীর সবাই। অবশেষে কথা বলে বয়সে সবার প্রবীণ সিনেট চীফ চার্লস ডব্লিউ ওয়ারনার। বলে, 'আপনাদের মত বলুন।'

আবার নিরবতা।

সবার চোখে-মুখে একটা বিরক্তির ভাব।

এবার কথা বলে সিনেট ইন্টেলিজেন্স কমিটির চেয়ারম্যান আনা প্যাট্রিসিয়া। বলে, 'আমরা মিটিং মূলতবী করবো কিনা, সে বিষয়ে কিছু বলার আগে আমি সকলকে আহবান জানাচ্ছি বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্যে। আমাদের এই একত্র হওয়া এতে কাজে লাগবে এবং কালকের সিদ্ধান্ত নেয়াও সহজ হবে।'

'ভালো প্রস্তাব কিন্তু মিঃ জোনসের অনুপস্থিতিতে এই ব্যাপারে কি ফলপ্রসূ আলোচনা করা যাবে? তার চেয়ে আলোচনা তাদের প্রস্তাবমত কাল পর্যন্ত মূলতবী করাই কি ভালো নয়?' বলে এ্যান্ড্রু জ্যাকবস অনেকটা দ্বিধাজড়িত কন্ঠে।

তার কথা শেষ হতেই স্ল্যাড গার্টন এ্যান্ড্রু জ্যাকবসকে সমর্থন করে বলে, 'সত্যি মূল পক্ষের অনুপস্থিতিতে আলোচনা তেমন কাজে আসবে না। অনেক কিছুরই ব্যাখ্যা প্রয়োজন হবে।' গার্টনের কন্ঠও শক্তিশালী নয়, দ্বিধাজড়িত।

জন টার্নার কথা বলার জন্য মুখ খুলছিল, কিন্তু তার আগেই আনা প্র্যাট্রিসিয়া বলে ওঠে, 'আমরা বিচার করতে বসছি না। সুতরাং কোন পক্ষের শোনানি নেবার প্রয়োজন পড়ে না। আমরা স্বাধীন নাগরিক হিসাবে চলমান একটা অবস্থা পর্যালোচনা করব। যে পর্যালোচনাটা সময়ের জন্যে খুবই প্রয়োজনীয়।'

আনা প্র্যাট্রিসিয়ার কথা শেষ হবার সাথে সাথেই চার্লস ডব্লিউ ওয়ারনার, জন জে রিচার্ডসন এবং বব এইচ ক্রুস এক সঙ্গেই বলে ওঠে, 'ঠিক আছে। আলোচনায় দোষ কি! সময়টা কাজে লাগুক।'

এই কথার সাথে চার্লস ওয়ারনার আরও যোগ করে, 'আমার মনে হয় মিঃ শ্যারনরা আসেননি ভালই হয়েছে। ভোরে 'ফ্রি আমেরিকা'র প্রতিবাদ পড়ার পর মনে হয়েছে, মিঃ শ্যারনদের সাথে কথা বলার আগে আমাদের একটা পৃথক আলোচনা দরকার। মনে হচ্ছে ঈশ্বরও চান এ আলোচনা হোক।'

'ধন্যবাদ আপনাদের। ধন্যবাদ মিঃ ওয়ারনার। আমি ফ্রি আমেরিকার প্রতিবাদটা একবার নয়, কয়েকবার পড়েছি। সরকার, ফ্রি আমেরিকা সবাইকে অভিযুক্ত করে যে রিপোর্ট ছাপা হয়েছিল তার সাথে মিলিয়ে পড়েছি। এভাবে পড়তে গিয়ে আমি এত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম যে সংগে সংগে আমি অনেকগুলো জায়গায় টেলিফোন করে কিছু বিষয়ে যাচাই করার চেষ্টা করেছি। আর তাতে আমার উদ্বেগ আরও বেড়েছে। এই বিষয়গুলো আমি মনে করি দেশের স্বার্থেই আলোচন হওয়া প্রয়োজন। মিঃ ওয়ারনারের মত আমারও মনে হয়েছে এনিয়ে আমাদের একটা পৃথক আলোচনা হওয়া দরকার।' বলে প্যাট্রিসিয়া।

আনা প্যাট্রিসিয়ার কথা শেষ হতেই সিনেটের ডেমোক্র্যাট দলীয় নেতা জন টার্নার বলে ওঠে, 'ঠিক আছে মিস প্যাট্রিসিয়া। আলোচনায় নতুন কিছু পেলে সেটা আনন্দেরই হবে মনে হচ্ছে আপনি বিষয়টা নিয়ে বিশেষভাবে ভেবেছেন। সুতরাং আমি প্রস্তাব করছি, আপনিই প্রথমে আলোচনা শুরু করুন।'

অন্য সবাই জন টার্নারকে সমর্থন করে মাথা নাড়ে। শুধু এ্যান্ড্রু জ্যাকবস ও স্ল্যাড গার্টনের মুখ মলিন হয়ে উঠে।

'থ্যাংকস অল।' বলে কথা শুরু করে আনা প্যাট্রিসিয়া, 'আপনারা সকলেই পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট, টিভি চ্যানেলের সচিত্র বিবরণ দেখেছেন এবং এর প্রতিবাদটাও আপনারা আজ পড়েছেন। প্রথমে গোটা বিষয়ের উপর আমার ভাবনাটা তুলে ধরছি।'

বলে আনা প্যাট্রিসিয়া একটু থামে। মুখটা নিচু করে বোধ হয় নিজেকে একটু আত্মস্থ করে, চিন্তাকে গুছিয়ে নেয়। তারপর শুরু করে, 'গোটা বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো লস আলামোসের সুড়ঙ্গ।' আমাদের বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে গোয়েন্দা সুড়ঙ্গ হওয়ার ব্যাপারটা আহমদ মুসার অপপ্রচার, এটা আসলেই এক্সিট সুড়ঙ্গ। 'ফ্রি আমেরিকা' ও 'হোয়াইট ঈগল'-এর প্রতিবাদে এটা

প্রকৃতই যে গোয়েন্দা সুড়ঙ্গ তার পক্ষে কতকগুলো প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। প্রথম প্রমাণ হিসাবে সুড়ঙ্গের মাটি ও পাথরের কার্বন টেস্টের বরাত দিয়ে বলেছে, লস আলামোস স্ট্রাটেজিক রিসার্চ ল্যাবরেটরী যখন তৈরী হয়েছে, তখন সুড়ঙ্গ তৈরী হয়নি। সুড়ঙ্গ তৈরী হয়েছে সবুজ পাহাড়ে ইহুদী বিজ্ঞানী জন জ্যাকবের বাড়ি যখন তৈরী হয় তখন। দ্বিতীয় প্রমান হিসেবে সুড়ঙ্গের নির্মাণ-প্রকৃতির ব্যাপারে নির্মাণ-বিশেষজ্ঞদের বরাত দিয়ে বলেছে যে, সুড়ঙ্গটির নির্মাণ শুরু হয় সবুজ পাহাড়ের বিজ্ঞানী জন জ্যাকবের বাড়ি থেকে, লস আলামোস থেকে নয়। তৃতীয় প্রমাণ তারা দিয়েছে, সুড়ঙ্গে প্রবেশ-নিয়ন্ত্রনের ম্যাকানিজম রয়েছে সবুজ পাহাড়-প্রান্তের সুড়ঙ্গ মুখে। সবুজ পাহাড়ে জন জ্যাকবের বাড়িতে যিনি থাকবেন, তারই নিয়ন্ত্রণে থাকবে সুড়ঙ্গে প্রবেশ এবং বেরিয়ে আসার অধিকার। তাদের চতুর্থ প্রমাণ হলো, স্নায়ু-যুদ্ধকালীন সময়ের প্রেসিডেন্ট যারা বেঁচে আছেন এবং লস আলামোস স্ট্রাটেজিক রিসার্চ ল্যাবের সাবেক ডাইরেক্টরদের কেউই জানেন না এ ধরনের একটা সুড়ঙ্গের কথা।'

হাতের গ্লাসটা রেখে আসার জন্যে একটু থেমেছিলো আনা প্যাট্রিসিয়া।

প্যাট্রিসিয়া থামতেই সিনেট ডেমোক্র্যাট দলীয় নেতা জন টার্নার বলে ওঠে, 'প্রমান চারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যাচাই-এর প্রশ্ন আছে।'

গ্লাস রেখে এসে বসছিলো আনা প্যাট্রিসিয়া। সে কথা বলার জন্যে মুখ খোলে। কিন্তু তার আগেই সিনেট সভাপতি চার্লস ওয়ারনার বলে ওঠে, 'ইয়েস মিঃ টার্নার। প্রমাণগুলো একেবারে সঠিক। এখন চাই এগুলো যে ফ্যাক্ট তার কনফারমেশন।'

'ধন্যবাদ মিঃ ওয়ারনার, জন টার্নার। যদিও আমি জানি, সরকারী রিপোর্ট সব কথাকেই কনফার্ম করেছে। তবু আমি যাচাই করতে চেষ্টা করেছি। আমি লস আলামোসে ডঃ হাওয়ার্ডকে টেলিফোন করেছিলাম। তিনি সুড়ঙ্গে ঢুকেছিলেন। বললেন, তৃতীয় প্রমাণের কথাগুলো সত্য। সুড়ঙ্গটি শেষ হয়েছে সবুজ পাহাড়ের একটা অন্ধকূপে। সুড়ঙ্গমুখের এবড়ো-থেবড়ো একটা পাথুরে দরজা খুলে সে অন্ধকূপে ঢোকা যায়। কিন্তু এ দরজা খোলার চাবিকাঠি রয়েছে অন্ধকূপে।

অন্ধকূপের দিক থেকে দরজা খুলে যে সুড়ঙ্গে ঢোকে সেই শুধু পারে সুড়ঙ্গ থেকে দরজা খুলে অন্ধকূপে ঢুকে বাইরে বেরিয়ে যেতে। এরপর.....।'

আনা প্যাট্রিসিয়ার কথায় বাধা দিয়ে হাউজ অব রিপ্রেজেনটেটিভের ফরেন রিলেশন্স কমিটির চেয়ারম্যান বব এইচ ব্রুস বলে, 'আর কোন প্রমাণের দরকার নেই মিস প্যাট্রিসিয়া। সুড়ঙ্গটি এক্সিট সুড়ঙ্গ হলে এর নিয়ন্ত্রন থাকতো লস আলামোসে। এর নিয়ন্ত্রন সবুজ পাহাড়ে থাকা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে এটা গোয়েন্দা সুড়ঙ্গ। দুর্ভাগ্য আমাদের!' বব এইচ ব্রুসের কন্ঠ ভারী ও মুখ মলিন।

'তবু শোনা যাক না। সব বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়ার মধ্যে কোন ক্ষতি নেই।' ব্রুস থামতেই বলে ওঠে এ্যান্ড্রু জ্যাকবস। তার চোখে মুখে হতাশা।

এ্যান্ড্রুর কথা শেষ হলে আনা প্যাট্রিসিয়া বলে, 'যাচাই-এর জন্যে অন্য যে কয় জায়গায় আমি টেলিফোন করেছি , সব জায়গা থেকেই প্রমাণের পক্ষে ইতিবাচক জবাব মিলেছে। সুড়ঙ্গের সয়েল টেস্ট ও নির্মাণ টেস্ট দুটোই করেছে লস এঞ্জেলসের ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়াররা। 'ফ্রি আমেরিকা' প্রতিবাদে যা বলেছে, সে কথা তাদের কাছ থেকেও শুনেছি। আর ডঃ হাওয়ার্ড বলেছেন, লস আলামোস স্ট্যাটেজিক ল্যাবের সাবেক পরিচালকরা কেউই জানতেন না এ ধরনের সুড়ঙ্গের কথা। এমনকি স্নায়ু যুদ্ধের সবচেয়ে চরম মুহূর্ত ষাটের দশকে লস আলামোস ল্যাবের পরিচালক ছিলেন শতায়ু মিঃ বেঞ্জামিন বাকনুর। তিনি নিজেই টেলিফোন করেছিলেন ডঃ হাওয়ার্ডকে। তিনি ঐ ধরনের কোন এক্সিট সুড়ঙ্গ থাকার কথা অস্বীকার করেছেন।'

'ধন্যবাদ মিস প্যাট্রিসিয়া। অন্তত আমার কাছে আর কোন অস্পষ্টতা নেই। সব ঘটনার মূল ঘটনা হলো সুড়ঙ্গ। সুড়ঙ্গটা যেহেতু গোয়েন্দা সুড়ঙ্গ, সেহেতু ফ্রি আমেরিকার প্রতিবাদের সব কথাই সত্য বলে ধরে নিতে হবে।' বলে ওঠে বব এইচ ব্রুস।

কিন্তু মিঃ ব্রুস, তার অর্থ এই নয় যে মিঃ শ্যারন ও মিঃ ডেভিড জোনসরা মানে ইহুদীরা আসামী হবেন।' ক্ষুদ্ধ কন্ঠে বলে ওঠে এ্যান্ড্রু জ্যাকবস।

'তা ঠিক। কিন্তু আমরা এখানে আসামী নির্ধারন করছি না। দু'রকম তথ্যের মধ্যে থেকে সত্যটা বের করে নেয়ার চেষ্টা করছি।' বলে আনা প্যাট্রিসিয়া।

'মিস প্যাট্রিসিয়া, লস আলামোস রোড ও সান্তাফে বিমান বন্দরের দুই সন্ত্রাসী ঘটনা সম্পর্কে আপনি কি ভেবেছেন সেটা বলুন।' বলে ওঠে হাউজ অব রিপ্রেজেনটেটিভ ডেমোক্র্যাট দলীয় নেতা স্ল্যাড গার্টন। আলোচনার মধ্যে এই প্রথম কথা বলে সে।

'লস আলামোস-সান্তাফে রোডে যে সন্ত্রাসীরা নিহত হয়েছিল, তাদের কাছে তাদের পরিচয় প্রমাণ করার মত কিছু পাওয়া যায়নি। তারা কেউই আমেরিকান ব্ল্যাক বা শ্বেতাঙ্গ নয়। তাদের জাতিগত উদ্ভব সম্বন্ধীয় (Anthropology) টেস্ট হয়েছে জর্জ ওয়াশিংটন টেস্ট ইউনিভার্সিটির অ্যানথ্রোপলজি বিভাগে। পরীক্ষা করেছেন বিজ্ঞানী ডঃ লি এইচ হ্যামিল্টন। তাঁর কাছে জেনেছি তারা সবাই সাবেক ইসরাইল এলাকার ইহুদী বংশোদ্ভুত বলে পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে। অন্যদিকে সান্তাফে বিমান বন্দরে এফবিআই-এর যে বিমান বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়, সে বিমান যার চালানোর কথা ছিল এবং বিমানটি টেক অফের কয়েক মিনিট আগে যিনি অসুস্থ হয়েছেন বলে চলে যান। পরে প্রমানিত হয় অসুস্থতার ভান করে তিনি পালিয়ে যান, তিনি ধরা পড়েছেন। তিনি স্বীকার করেছেন বোমা পাতার কথা। জেনারেল শ্যারনরাই সে বোমা তাকে সরবরাহ করে অহমদ মুসাসহ তদন্ত টীমের কর্মকর্তাদের হত্যার জন্যে।' বলে আনা প্যাট্রিসিয়া।

আনা প্যাট্রিসিয়া কথা শেষ করলে একটা নিরবতা নেমে আসে।

সবাই ভাবছে।

নিরবতা ভংগ করল এ্যান্ড্রু জ্যাকবস। বলল, 'আমরা এভাবে ইহুদীদের প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করাচ্ছি এটা কি ঠিক? আর দু'একজনের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে জেনারেল শ্যারনের মত সম্মানিত ব্যক্তিকে আমরা আসামী হিসাবে দাঁড় করাব এটাও ঠিক নয়।'

'না, না, ইহুদীরা অবশ্যই প্রতিপক্ষ নয়। মাত্র একটা গ্রুপ ষড়যন্ত্রকারী হিসাবে আমাদের সামনে আসছে। এদের সাথে দেশপ্রেমিক ইহুদীদের কোনই সম্পর্ক নেই। আর জেনারেল শ্যারনের মত সম্মানিত লোককে বিনা তদন্তে, বিনা প্রমাণে আসামী....।'

কথা শেষ করতে পারল না চার্লস ওয়ারনার। ড্রইং রুমে প্রবেশ করল দানিয়েল ময়নিহান এবং সেই সাথে তার ছেলে হ্যারি এ্যাডওয়ার্ড ময়নিহান।

হ্যারি এ্যাডওয়ার্ডের বিধ্বস্থ চেহারা।

তার কপালে ও হাতে ব্যান্ডেজ।

ঘরে প্রবেশ করেই দানিয়েল ময়নিহান বলল, 'গুড মর্নিং টু অল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ মধ্যরাতে হ্যারিকে ফিরে পেয়েছি। আমি....।'

ময়নিহানের কথার মাঝখানেই কথা বলে উঠল আনা প্যাট্রিসিয়া, 'মাফ করবেন মিঃ ময়নিহান। হ্যারি মুক্ত হওয়ার সংবাদ আমরা পেয়েছি। কিন্তু মুক্ত করল কে? কিভাবে?'

'হ্যারিকে আমায় বাসায় নিয়ে এসেছে এফবিআই-এর লোকেরা। কিন্তু হ্যারিকে মুক্ত করার অভিযান চালিয়েছিল স্বয়ং আহমদ মুসা এবং সারা জেফারসন। হ্যারিকে মুক্ত করার পূর্ব মুহুর্তে তারা এফবিআইকে ডাকে ক্রিমিনালদের গ্রেফতার করার জন্য।'

'আহমদ মুসা ওকে উদ্ধার করেছে? তাহলে ওকে কিডন্যাপ করেছিল কে?' বলল এ্যান্ড্রু জ্যাকবস।

'কিডন্যাপ করেছিল জেনারেল শ্যারনরা।' বলল দানিয়েল ময়নিহান।

চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে এ্যান্ড্রু জ্যাকবসের। বিস্ময় ফুটে উঠেছে অন্য সবার চোখে মুখে।

'এটা কি বিশ্বাসযোগ্য মিঃ ময়নিহান? স্বীকার করতেই হবে ডেভিড উইলিয়াম জোনসের মত ইহুদী নেতাদের সাথে এবং সেই সুবাদে জেনারেল শ্যারনের সাথে আমাদের সম্পর্ক খারাপ নয়। কেন তারা কিডন্যাপ করবে আপনার ছেলেকে?' চোখে মুখে প্রবল অবিশ্বাস নিয়ে বলল এ্যান্ড্রু জ্যাকবস।

'মিঃ জ্যাকবস, অনেক সত্য আছে যা বিশ্বাসের আওতায় পড়ে না। এটা সে ধরনেরই একটা সত্য।' বলল দানিয়েল ময়নিহান। গম্ভীর কন্ঠ তার।

'তাহলে ফিলিপকে খুন করেছে জেনারেল শ্যারনরাই?' উত্তেজিত কন্ঠে বলল এ্যান্ড্রু জ্যাকবস। তার দুচোখ লাল হয়ে উঠেছে।

'হ্যাঁ তারাই খুন করেছে।' বলল দানিয়েল ময়নিহান।

'কিন্তু কেন? ফিলিপ একজন সামান্য হাউজ সেক্রেটারী। তাকে খুন করতে যাবে তারা কোন স্বার্থে?' বলল এ্যান্ড্রু জ্যাকবস।

'এর মূলে আছে একটা রেকর্ডেড ক্যাসেট।' বলল দানিয়েল ময়নিহান।

'বুঝলাম না।' এ্যান্ড্রু জ্যাকবস বলল।

'সেদিন আমরা জেনারেল শ্যারনদের সাথে যে বৈঠক করেছিলাম, তার গোটা আলোচনা আমাদের অজান্তে গোপনে রেকর্ড করে জেনারেল শ্যারন। সেটাই সে ভুলে ফেলে যায়। যেহেতু মিটিং-এর পর ঘরে একমাত্র ফিলিপই যাবার কথা এবং তারই ক্যাসেটটি পাবার কথা। আমরা যখন ঘুমিয়ে, তখন ক্যাসেটটি উদ্ধারের জন্যে জেনারেল শ্যারনরা আমার বাড়িতে ফিলিপের কাছে আসে।' দানিয়েল ময়নিহান বলল।

'কিন্তু ক্যাসেটটি ফিলিপ পেলে দিয়ে দেবার কথা। সে খুন হেবে কেন? আর হ্যারিইবা কিডন্যাপ হবে কেন?' বলল এ্যান্ড্রু জ্যাকবস।

'ক্যাসেটের কথা গোপন রাখতে হলে ফিলিপ ও হ্যারিকে সরিয়ে দেয়া ছাড়া তাদের উপায় ছিল না।' বলল দানিয়েল ময়নিহান।

'সাংঘাতিক ঘটনা। গোটা ব্যাপার একটু খুলে বলুন তো?' বলল চর্লস ওয়ারনার।

'ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল হ্যারি। এ জন্যেই ওকে নিয়ে এসেছি।' বলে দানিয়েল ময়নিহান তাকাল হ্যারির দিকে। বলল, 'বেটা বলত সেদিন কি ঘটেছিল?

হ্যারি সেদিন রাতে সেই মিটিং রুমে যাওয়া থেকে শুরু করে তার কিডন্যাপ হওয়া, তার বন্দী সময়ের অবস্থা, তার উদ্ধারের ঘটনা সব সংক্ষেপে বর্ননা করল।

সকলেই গভীর আগ্রহে হ্যারির কথা শুনল। হ্যারির কথা শেষ হতেই আনা প্যাট্রিসিয়া বলল, 'সাংঘাতিক দুঃসাহস জেনারেল শ্যারনদের। কিন্তু হ্যারি ক্যাসেটটা তোমার কাছে এতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল কেন?'

'গোপনে রেকর্ড করা হয়েছে বুঝতে পেরে এবং জেনারেল শ্যারন ক্যাসেটটাকে অত গুরুত্ব দেয়ায় আমার কৌতুহল সৃষ্টি হয়। নিশ্চয় এতে এমন

কিছু থাকতে পারে যা দিয়ে আমার আব্বাদের সে বিপদে ফেলতে পারে। তারপর ক্যাসেটটা শোনার পর আমি নিশ্চিত হই যে, শ্যারনরা একটা ষড়যন্ত্র করছে যা আমাদের আমেরিকান স্বার্থের পরিপন্থী।' বলল হ্যারি।

'কিন্তু ক্যাসেটটা তোমার আব্বাকে না দিয়ে রবিন নিক্সনকে দিলে কেন?' জিজ্ঞেস করল জন রিচার্ডসন।

হ্যারি তার আব্বার দিকে একবার তাকিয়ে মুখ নিচু করল। চোখে-মুখে নেমে এল তার বিব্রতভাব। জবাব দিল না প্রশ্নের।

হ্যারির আব্বা দানিয়েল ময়নিহান হাসল। বলল, 'তারা দু'ভাইবোন মনে করেছে ক্যাসেটটা পেলে আমি একে কাজে লাগাব না, এমনকি ব্যাপারটা জেনারেল শ্যারনরা জেনেও ফেলতে পারে। সে জন্যে ক্যাসেটটা রবিন নিক্সনকে পৌছিয়েছে এবং রবিন সেটা সংগে সংগেই 'ফ্রি আমেরিকা'র হাতে তুলে দিয়েছে।'

চর্লস ওয়ারনারের মুখে মিষ্টি হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'হ্যারি, তোমরা দু'ভাই-বোন কি তাহলে 'ফ্রি আমেরিকা' মুভমেন্টের সাথে আছ?'

হ্যারির বিব্রত অবস্থা বেড়ে গেল। সে মাথা তুলল না, জবাবও দিল না।

'মিঃ ময়নিহান, আপনার বাড়িই দেখছি আপনার বেদখল হয়ে গেছে।' বলল জন রিচার্ডসন।

হাসল দানিয়েল ময়নিহান।

অসহায় অবস্থা দাঁড়াল হ্যারির।

মিষ্টি হাসি ফুটে উঠল আনা প্যাট্রিসিয়ার ঠোঁটে। বলল, 'ভেবনা হ্যারি, আমরা কিন্তু সবাই খুশী।'

বলে একটু থামল আনা প্যাট্রিসিয়া। মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল তার। বলল আবার, 'আমেরিকা তোমাদের জন্য গর্ববোধ করবে হ্যারি। তেমার পিতার চেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছ দেশকে। তোমরাই প্রকৃত আমেরিকান। সত্যিই ফ্রি আমেরিকা তোমাদের দ্বারাই পুনর্জীবিত হবে।'

'ধন্যবাদ মিস প্যাট্রিসিয়া। আমিও গর্বিত হ্যারিদের জন্যে। বলল দানিয়েল ময়নিহান।

আবেগে উজ্জীবিত তরুণ হ্যারির দুগন্ড বেয়ে অশ্রু গড়াল। আনন্দের অশ্রু।

দানিয়েল ময়নিহান ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে তার পিঠ চাপড়ে বলল, 'ধন্যবাদ বেটা।'

দানিয়েল তার আসনে ফিরে এলে চার্লস ওয়ারনার বলল, 'ধন্যবাদ হ্যারি। তুমি এখন একটু বাইরে থেকে বেড়িয়ে এস?'

মুখ তুলল হ্যারি। তার ঠোঁটে হাসি। বলল, 'অবশ্যই স্যার। সকলকে ধন্যবাদ।'

বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল হ্যারি।

হ্যারি বেরিয়ে যেতেই চার্লস ওয়ারনার কলে উঠল, 'আমরা আমাদের আলোচনায় এবার উপসংহার টানতে পারি।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল জন রিচার্ডসন।

এসময় মোবাইলে কল এল আনা প্যাট্রিসিয়ার।

থেমে গেল রিচার্ডসন।

'মাফ করুন।' বলে মোবাইল তুলে নিল আনা প্যাট্রিসিয়া।

টেলিফোনে কথা বলতে গিয়ে, ভ্রুকুঞ্চিত হল আনা প্যাট্রিসিয়ার। 'ও গড!' বলে আর্তনাদ করে উঠল সে। শেষ দিকে চোখ-মুখ তার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করুন।'

মোবাইল অফ করে দিয়েই সবার দিকে চেয়ে সে বলে উঠল, 'একটা দুঃসংবাদ। জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন খুন হয়েছেন আজ রাতে। জর্জ আব্রাহাম জানালেন।'

'ও গড!' বলে সকলে বুকে ক্রস আঁকল। মলিন হয়ে উঠল সকলের মুখ।

কয়েকমুহূর্ত কেউ কোন কথা বলল না।

নিরবতা ভাঙল এ্যান্ড্রু জ্যাকবস। বলল, 'আর কিছু বলেছেন মিঃ জর্জ আব্রাহাম?'

'বলেছেন, নিহত জেনারেল আলেকজান্ডারের কাছ থেকে যে দলিল উদ্ধার হয়েছে তাতে জেনারেল শ্যারনদের সাথে তার মতানৈক্যের কারনেই তিনি

নিহত হয়েছেন। সম্ভবত জেনারেল আলেকজান্ডার তার বিপদ আঁচ করতে পেরে তাঁর পকেটের গোপন রেকর্ডার অন করে রেখেছিলেন। তাতে খুনীদের সাথে গোটা কথপোকথন, এমনকি গুলীর শব্দ এবং মুমূর্ষু জেনারেল আলেকজান্ডারের শেষ স্বগোতোক্তি পর্যন্ত ধরা পড়েছে।'

'ও গড! কে তার খুনী? জেনারেল শ্যারন?' আর্তনাদ করে উঠল চার্লস ওয়ারনারের কন্ঠ।

'ক্যাসেটে জেনারেল আলেকজান্ডার ছাড়াও আরও দুজন জেনারেল শ্যারন ও ডেভিড উইলিয়াম জোনসের কন্ঠ রয়েছে। ক্যাসেট অনুসারে জেনারেল শ্যারন গুলী করেছে জেনারেল আলেকজান্ডারকে।' বলল আনা প্যাট্রিসিয়া।

'ও গড! জর্জ আব্রাহামরা এখনও কি বসে আছেন?' প্রায় একসংগেই বলে উঠল সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদের ডেমোক্র্যাট দলীয় নেতা জন টার্নার ও স্ল্যাড গার্টন।

'না ওরা বসে নেই। ওরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। পথ থেকে টেলিফোন করেছেন জর্জ আব্রাহাম।' বলল আনা প্যাট্রিসিয়া।

'ঈশ্বর সাহায্য করুন!' বলে উঠল সকলেই। এ্যান্ড্রু জ্যাকবসও এদের মধ্যে রয়েছেন।

এ সময় ঝড়ের মত কক্ষে প্রবেশ করল সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদে রিপাবলিকান দলীয় নেতা ডন এ্যাডওয়ার্ড ও স্টিভ বায়ার।

ঘরে ঢুকেই ডন এ্যাডওয়ার্ড বলল, 'গুড মর্নিং টু অল, কিন্তু গুড নিউজ ও ব্যাড নিউজ আছে সকলের জন্যে এবং স্যরি ফর আওয়ার লেট।' এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলল ডন এ্যাডওয়ার্ড।

'গুড মর্নিং মিঃ এ্যাডওয়ার্ড ও মিঃ বায়ার। ব্যাড নিউজটা বোধ হয় আমরা জানি। গুড নিউজটা কি?' বলল চার্লস ওয়ারনার।

'গুড নিউজটা হলো ফ্রি আমেরিকার একটা চমৎকার প্রতিবাদ এসেছে পত্রিকায়।'

বলেই একটু থেমে আবার শুরু করল ডন এ্যাডওয়ার্ড, 'ব্যাড নিউজটা কি শুনেছেন আপনারা? জেনারেল আলেকজান্ডারের নিহত হওয়া?'

'হ্যাঁ।' বলল চার্লস ওয়ারনারই।

'কিন্তু খুনীরা কে জানেন?'

'জানি, জেনারেল শ্রারন ও ডেভিড উইলিয়াম জোনসকে সন্দেহ করা হয়েছে।' বলল চার্লস ওয়ারনার।

'সন্দেহ কি, একেবারে হাতে নাতে ধরা পড়ার মত ঘটনা। আমরা এফ বি আই অফিসে গিয়েছিলাম। রেকর্ড শুনে এলাম। টেপে জেনারেল হ্যামিল্টন, জেনারেল শ্যারন এবং ডেভিড উইলিয়াম জোনসের গলা একদম পরিষ্কার। সন্দেহের সামান্যও কোন অবকাশ নেই।'

'কিন্তু মিঃ এ্যাডওয়ার্ড, নিহত জেনারেল হ্যামিল্টনের পকেটে এ ধরনের টেপ পাওয়া কি অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে না?' বলল এ্যান্ড্রু জ্যাকবস।

'না, অস্বাভাবিক নয়। টেপ শুনলে আপনার কাছেও বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। টেপে তাদের গোটা আলোচনার রেকর্ড নেই। টেপে কথা হঠাৎ করে জেনারেল হ্যামিল্টনের একটা বক্তব্যের মাঝখান থেকে শুরু হয়েছে। এর অর্থ জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন যখনই জেনারেল শ্যারনদের সন্দেহ করেছেন, তখনই তার পকেটে রাখা মাইক্রো রেকর্ডারটা অন করেছেন। সম্ভবত তিনি চেয়েছিলেন জেনারেল শ্যারনদের ষড়যন্ত্রের দলিল যোগাড় করতে।'

আনা প্যাট্রেসিয়া কিছু বলার জন্য মুখ খুলেছিল, কিন্তু তার আগেই ডন এ্যাডওয়ার্ড আবার শুরু করল, 'জেনারেল শ্যারনদের যে ষড়যন্ত্র জেনারেল আলেকজান্ডার জানতে পারেন সেটা যাতে তিনি বাইরে প্রকাশ করতে না পারেন এজন্যে তাকে খুন করা হয়েছে। সম্ভবত জেনারেল শ্যারনকে রিভলবার বের করতে দেখেই জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন ভীতকন্ঠে চিৎকার করে উঠেছিলেন, 'একি করছেন মিঃ শ্যারন। আমি একটা সত্য আপনাদের জানিয়েছি মাত্র। আমি আপনাদের শত্রু নই।' জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টনের এই আকুল আবেদনের জবাবে জেনারেল শ্যারন কি বলেছিলেন জানেন? বলেছিলেন 'এই সত্যই আমাদের শত্রু হ্যামিল্টন। এই সত্য আপনার মুখ দিয়ে বাইরে যাক আমরা তা চাই না।' জেনারেল শ্যারনের এই কথার পর পরই দুবার গুলীর শব্দ শোনা গেছে। তার সাথে সাথেই শোনা গেছে জেনারেল আলেকজান্ডার

হ্যামিল্টনের আর্তনাদ। মুমূর্ষু জেনারেল হ্যামিল্টনের শেষ কথা কি ছিল জানেন? তাঁর শেষ কথা ছিল, 'আমার আমেরিকাকে ঈশ্বর রক্ষা করুন এই ষড়যন্ত্রের হাত থেকে। আমি আমেরিকার জন্যে নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখতাম, আমেরিকার সে নতুন পৃথিবী হোক আমাদের ফাউন্ডার ফাদারসদের, কোন ষড়যন্ত্রকারীদের নয়।'

থামল ডন এ্যাডওয়ার্ড। শেষের দিকে আবেগে ভারী হয়ে উঠেছিল ডন এ্যাডওয়ার্ডের কন্ঠ। তার দুচোখের কোণ সিক্ত হয়ে উঠেছিল অশ্রুতে।

সে কথা বলতে পারল না।

কথা বলে উঠল হাউজ অব রিপ্রেজেনটেটিভের রিপাবলিকান দলীয় নেতা স্টিভ বায়ার। বলল, 'জানেন জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টনের এই কথার পর ডেভিড উইরিয়াম জোনস কি বলেছিল? বলেছিল, 'থ্যাংকস জেনারেল শ্যারন। প্যাট্রিওটিজমের বীজগুলোকে এইভাবেই ধ্বংস করা উচিত।' থামল স্টিভ বায়ার।

সে থামতেই সিনেট ও হাউজ অব রিপ্রেজেনটেটিভের ডেমোক্র্যাট দলীয় নেতা জন টার্নার ও স্ল্যাড গার্টন প্রায় একসাথেই বলে উঠল, 'বিশ্বাসঘাতক জোনস প্যাট্রিওটিজমের বীজ উপড়ে ফেলতে চায়! তার দুঃসাহস কোথায় গিয়ে ঠেকেছে!'

'এই বিশ্বাসঘাতকদের কুমন্ত্রনাতেই আজ আমরা এখানে জমায়েত হয়েছিলাম। দুর্ভাগ্য আমাদের!' বলল সিনেটে রিপাবলিকান দলীয় নেতা ডন এ্যাডওয়ার্ড।

'শুধু জমায়েত নয়, আমরা প্রেসিডেন্ট এবং এফ বি আই ও সি আই এ চীফকে ইমপীচ করার সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছিলাম।' বলল দানিয়েল ময়নিহান।

'আমরা জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টনের মতই প্রতারিত হয়েছিলাম। ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করেছেন।' এ্যান্ড্রু জ্যাকবস বলল। তার কন্ঠে অনুশোচনার সুর।

'এর দ্বারা আমরা জাতির ভবিষ্যত নিয়ে কত কম ভাবি সেটাও প্রমাণ হয়ে গেল। শহীদ জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টনের শেষ কথাটাকে আমাদের খুবই গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি কামনা করেছেন, আমেরিকার নতুন

পৃথিবী যেন হয় আমাদের ফাউন্ডারস ফাদারসদের, কোন ষড়যন্ত্রকারীদের নয়। তাঁর কথিত এই 'ষড়যন্ত্রকারীদের নতুন পৃথিবীটা' কি, সেটা সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে।' বলল চার্লস ওয়ারনার।

‘শহীদ আলেকজান্ডার হ্যামিল্টনের ঐ টেপ থেকেই পরিষ্কার, জেনারেল শ্যারন ও জোনসরা 'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার'-এর নামে যে নতুন পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন আমেরিকার মাথায় চাপিয়ে দিয়েছে, সেটাই ঐ ষড়যন্ত্র।’ বলল ডন এ্যাডওর্য়াড।

'কিন্তু কেন এটা ষড়যন্ত্র আমি বুঝতে পারছি না। বরং আমি তো দেখছি, এই নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন আমেরিকার জন্যে বিশ্বনেতৃত্বের মুকুট নিয়ে আসবে। এতে দোষ কোথায়?' বলল এ্যান্ড্রু জ্যাকবস।

'এর একটা উত্তর আমি দিতে পারি আমার ছেলে হ্যারি এ্যাডওয়ার্ডের ভাষায়। কিছুদিন আগে আমাদের ফ্যামিলি গ্যাদারিং-এ নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার নিয়ে বিতর্ক উঠলে সে বলেছিল, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বনেতৃত্বের লোভ দেখিয়ে তাকে বিশ্বের 'খল নায়ক'-এ পরিনত করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, জাতিসংঘের বিশ্বায়ন কর্মসূচীর পেছনের সকল কলকাঠি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে। অর্থনীতি, সংস্কৃতি, রাজনীতি প্রভৃতির বিশ্বায়নকে যতই লোভনীয় মোড়কে বাজারজাত করা হোক, অধিকাংশ জাতি রাষ্ট্র এর বিরুদ্ধে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, তার সাথে আই এম এফ ও বিশ্বব্যাংক ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের মুখে পড়াই এর একটি প্রমাণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এই বিতর্কিত বিশ্বায়নের নেতা সাজিয়ে ও বিশ্বপুলিশের তকমা পরিয়ে তাকে বিতর্কিত ও বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে। আমেরিকার বন্ধুর বেশ পরে আমেরিকার বিরুদ্ধে এটা সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র। জেনারেল শ্যারনরা হিটলারকে ঘৃনা করেন, কিন্তু তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে 'হিটলারের জার্মানী' বানাতে চাচ্ছে। এর অর্থ তারা আমেরিকার জন্যে হিটলারের পরিনতি আশা করে।' বলল দানিয়েল ময়নিহান।

দানিয়েল ময়নিহান থামতেই এ্যান্ড্রু জ্যাকবস বলে উঠল, 'ভবিষ্যত সম্পর্কে এটা একটা ধারনা মাত্র।'

হাসল আনা প্যাট্রিসিয়া। বলল, 'ধারনা বলে একে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না মিঃ জ্যাকবস। দেখুন গোটা দুনিয়ায় ইউরোপ আমাদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্র। তার মধ্যে আবার বৃটিশরা আমাদের সবচেয়ে কাছের। সেই বৃটেনের শীর্ষ নীতি-নির্ধারকরা আড়ালে কি বলে থাকে জানেন? বলে, 'সবাই সব জায়গায় আজ দেখছে আমেরিকার বেপরোয়া জেদপনা ও একলা চল নীতিকে।' আমাদেরই হার্ভার্ডের একজন বিদেশ-নীতি বিশেষজ্ঞ (স্যামুয়েল হান্টিংটন) বলেছে, 'বিশ্বের জাতি-রাষ্ট্রসমূহ এবং জনগনের বিপরীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্রমবর্ধমানভাবে একাকী হয়ে পড়েছে।' তার মত হলো, 'আমেরিকা কখনই বিচ্ছিন্ন আর বন্ধু হারানোর নীতি গ্রহন করবে না।, কিন্তু তার পদক্ষেপই অবশিষ্ট দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে।' 'ফ্রি আমেরিকা'র হ্যারি এ্যাডওয়ার্ডরা 'নতুন বিশ্ব ব্যবস্থাকে' এই বিচ্ছিন্নকারী পদক্ষেপ হিসাবে অভিহিত করছে। তাদের এই মত ফেলে দেবার মত নয় যে, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গ্লোবালাইজেশন বা একক স্ট্যান্ডারডাইজেশন জাতি-রাষ্ট্রসমূহকে বৈরী করে তুলবেই এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেই। অন্তিম মুহূর্তে জেনারেল হ্যামিল্টন এই বোধ থেকেই একে 'ষড়যন্ত্রের বিশ্ব ব্যবস্থা' বলে অভিহিত করেছেন এবং এর জায়গায় চেয়েছেন ফাউন্ডার ফাদারসরা যে বিশ্বব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছেন সেই বিশ্ব ব্যবস্থা।'

নিরূপায়ের একটা হাসি ফুটে উঠল এ্যান্ড্রু জ্যাকবসের মুখে। বলল, 'আমাদের ফাউন্ডার ফাদারসদের আলাদা বিশ্ব ব্যবস্থাটা কি?'

'সেটা হলো, তোমার হাত তুমি ততটা সম্প্রসারিত করো, যতটা করলে অন্যের নাক স্পর্শ না করে। অর্থাৎ কারো স্বার্থে হস্তক্ষেপ না করে। যদি এ নীতিবোধে মানুষ উজ্জীবিত হয়, তাহলেই শুধু পারস্পরিক সমতা, সম্মান ও সহযোগিতা ভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থা গঠন সম্ভব। আমাদের ফাউন্ডার ফাদারসরা এ বিশ্ব ব্যবস্থারই স্বপ্ন দেখেছেন।'

আনা প্যাট্রিসিয়া থামতেই চার্লস ওয়ারনার বলে উঠল, 'এবার আমাদের বৈঠকের আমরা উপসংহার টানতে পারি।'

'আমরা দুজন শেষ মুহূর্তে এসেছি। জানিনা আগে আরও কি আলোচনা হয়েছে। তবে আমি মনে করি, এই বৈঠকের সমাপ্তি ঘটাতে পারি একটা প্রার্থনার

মধ্য দিয়ে। সেটা হলো, 'ঈশ্বর যেন আহমদ মুসাকে দীর্ঘ জীবন দান করেন। তিনি মৌলবাদী হলেও আমেরিকাকে একটা অক্টোপাসের কবল থেকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করলেন। তিনি শুধু ইহুদীদের ষড়যন্ত্র ধরেছেন তাই নয়, ষড়যন্ত্রকারীদের আইনের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবার সব ব্যবস্থাই সম্পন্ন করেছেন।' বরর ডন এ্যাডওয়ার্ড।

'মিঃ এ্যাডওয়ার্ডের সব কথা সাথে আমি একমত। তবে ষড়যন্ত্রটাকে ইহুদী ষড়যন্ত্র বলা ঠিক নয়। বিজ্ঞানী জন জ্যাকবস, ডেভিড উইলিয়াম জোনসও জেনারেল শ্যারনরা একটা ষড়যন্ত্রকারী গ্রুপ এং ইহুদী গ্রুপ বটে কিন্তু আমেরিকার যারা দেশপ্রেমিক ইহুদী তাদের প্রতিনিধি তারা নয়। সুতরাং একে ইহুদী ষড়যন্ত্র না বলে ইহুদীবাদী একটা গ্রুপের ষড়যন্ত্র বলা উচিত। দেখুন পত্রিকায় ফ্রি আমেরিকার যে প্রতিবাদ আজ প্রকাশিত হয়েছে তাতেই আছে ইহুদী ব্যাংকার আইজ্যাক বেনগুরিয়ান ও তাঁর মেয়ে সাবা বেনগুরিয়ান জেনারেল শ্যারনদের বিরোধিতায় জীবনের ঝুঁকি নিয়েছেন, তবু আমেরিকার স্বার্থ জলাঞ্জলী দিতে চাননি।' বলল আনা প্যাট্রেসিয়া।

'ধন্যবাদ মিস প্যাট্রেসিয়া। আপনার সাথে আমি একমত। তবে আহমদ মুসা সম্পর্কে বেশী বলার পক্ষে আমি নই। ঘটনাচক্রে তাঁর সাহায্য আমরা পেয়েছি। কিন্তু তাঁর মৌলবাদী চরিত্র সহজে যাবার নয়।' বলল এ্যান্ড্রু জ্যাকবস।

হাসল ডন এ্যাডওয়ার্ড। বলল, 'মৌলবাদ দেখে আমরা অভ্যস্তই। ইহুদীদের চেয়ে বড় মৌলবাদী দুনিয়াতে আর কেউ নেই। দুনিয়ার সবাইকে বুকে টেনে নেবার জন্য ইসলাম দুহাত বাড়িয়ে আছে। কিন্তু কোন নন-ইহুদী ইহুদী হতে পারে না, ইহুদী হওয়া চিরদিনের জন্য শুধু বনি ইসরাইলের জন্যে বরাদ্দ। আর আহমদ মুসা যেটুকু মৌলবাদী, সেটুকু মৌলবাদী আমরা অনেকেই। বাইবেলের মৌলবিধানকে আমরা অনেকেই দৃঢ়ভাবে মেনে চলতে চাই।'

ডন এ্যাডওয়ার্ড থামতেই চার্লস ওয়ারনার বলে উঠল, 'প্লিজ কথা না বাড়িয়ে আমরা আলোচনার উপসংহার টানতে চাই। মিস আনা প্যাট্রেসিয়া ঠিকই বলেছেন শ্যারন-জোনসদের ষড়যন্ত্রকে আমরা ইহুদী ষড়যন্ত্র বলবনা। আমেরিকা ও আমেরিকার বাইরে এ ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তৃত হলেও ইহুদীবাদী একটা গ্রুপ মাত্র

এর সাথে জড়িত। আর মিঃ এ্যাডওয়ার্ড উপসংহার সম্পর্কে যে পরামর্শ দিয়েছেন, সেটা ভালো। তবে আহমদ মুসার জন্যে ঐ প্রার্থনার প্রয়োজন নেই, আমরা আহমদ মুসাকে ধন্যবাদ জানাব, স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে ন্যায়ের পক্ষে ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে আহমদ মুসা হলো উন্মুক্ত তরবারী। আমরা আজ এখানে দুটি ব্যাপারে একমত হতে পারি, এক. আহমদ মুসা সম্পর্কে আমাদের এই অনুভুতি সরকারের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ভাবে তাকে আমরা জ্ঞাপন করবো, দুই. আমেরিকা থেকে এই ইহুদীবাদী ষড়যন্ত্র সমূলে উৎপাটনের জন্যে সব ব্যবস্থাই আমাদের সরকারকে গ্রহন করতে বলব এবং সরকার রাজনৈতিক ঝুঁকি নিয়েও যে ত্বরিত এই ষড়যন্ত্র উদঘাটনে এগিয়ে এসেছেন, এজন্যে আমরা সরকারকে ধন্যবাদ জানাব।' থামল চার্লস ওয়ারনার।

আনা প্যাট্রিসিয়া, দানিয়েল ময়নিহান ও ডন এ্যাডওয়ার্ডসহ প্রায় সকলেই একবাক্যে বলে উঠল, 'হ্যাঁ এই দুই বিষয়ে আমরা একমত হতে পারি।'

'আমার আপত্তি নেই, তবে আমরা ইনফরমাল বসেছিলাম। আমরা সম্মিলিতভাবে এসব কথা কি বলব?' বলল এ্যান্ড্রু জ্যাকবস।

'অবশ্যই মিঃ জ্যাকবস। আমরা জেনারেল শ্যারনদের দ্বারা প্রতারিত হয়ে এই যে এখানে বৈঠকের আয়োজন করেছিলাম তার প্রায়শ্চিত্ত হওয়া দরকার। আমি এখানে আসার আগে ফ্রি আমেরিকার সারা জেফারসন দেখতে এসেছিল হ্যারিকে। দেখলাম, তারা বৈঠকের খবর জানে। সারা জেফারসন আমার মাধ্যমে আপনাদের সবার কাছে আপীল করেছেন তাদেরকে সাহায্য করার জন্যে। আমি মনে করি, বৈঠকে আমরা যদি ঐ দুটি বিষয়ে একমত হই, তাহলে তাদেরকে সাহায্য করা হয়, আমাদেরও প্রায়শ্চিত্ত হয়।' বলল দানিয়েল ময়নিহান আবেগ জড়িত কন্ঠে।

আরও ভালো হতো, যদি আপনি সারা জেফারসনকে দাওয়াত দিতেন এ মিটিং-এ আসার জন্যে। তার জন্যে সত্যিই গর্ববোধ হয়। তিনি ইয়ং আমেরিকার যোগ্য নেত্রী।' বলল ডন এ্যাডওয়ার্ড।

'তাঁকে দাওয়াত দেয়ার কথাই আমার মাথায় আসেনি। তাছাড়া তাঁরও সময় ছিল না। তিনি এফ বি আই হেড কোয়ার্টারে যাবার পথে আমার বাসায় উঠেছিলেন।' বলল দানিয়েল ময়নিহান।

'আচ্ছা তাহলে আমরা উঠতে পারি।' বলে চর্‌্লস ওয়ারনার এ্যান্ড্রু জ্যাকবসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মিঃ জ্যাকবস আপনাকে সবার পক্ষ থেকে সুন্দর আতিথেয়তার জন্যে ধন্যবাদ'

বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল চার্লস ওয়ারনার। তার সাথে সাথে সবাই উঠে দাঁড়াল।

# ২

কাউন্সিল অব আমেরিকান জুইস এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডেভিড উইলিয়াম জোনস এতটাই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে মোবাইলটা কানে ধরে রেখেই চিৎকার করে উঠল, 'মিঃ শ্যারন, মিঃ শ্যারন।'

বাম হাত গাড়ির স্টিয়ারিং হুইলে রেখে ডান হাত দিয়ে মোবাইলটা ডান কানে ধরে চিৎকার করছিল ডেভিড জোনস।

জেনারেল শ্যারনের গাড়ি লনের এক্সিট সার্কেল ঘুরে গেটে এসে পৌছেছিল বাইরে বেরুবার জন্যে। জেনারেল শ্যারন নিজেই ড্রাইভ করছিল গাড়ি।

ডভিড জোনসের চিৎকারে সে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল। দেখল, মিঃ জোনস তাকে হাত নেড়ে ডাকছে।

জেনারেল শ্যারন তার গাড়ি ঘুরিয়ে নিল। গাড়ি নিয়ে গিয়ে দাঁড়াল মিঃ জোনসের গাড়ির পাশে।

মিঃ জোনস গাড়ি থেকে নেমে এল।

তার চোখে মুখে উত্তেজনা।

জেনারেল শ্যারনও গাড়ি থেকে নামল।

'কি ব্যাপার মিঃ জোনস?' উদ্বিগ্ন কন্ঠ জেনারেল শ্যারনের।'

'অনেক দুঃসংবাদের পর একটা ভাল খবর পাওয়া গেছে। আমাদের বেন ইয়ামিন এইমাত্র জানাল, পার্লামেন্ট ভবন থেকে একটু দক্ষিন-পূর্বে পটোম্যাক নদীর তীরে একটা বাড়িতে আহমদ মুসা ও সারা জেফারসন বাস করছে। তবে সেখানে পুলিশ ও এফ বি আই-এর লোকেরা পাহারায় রয়েছে।' বলল ডেভিড উইলিয়াম জোনস।

'দারুন খবর। আমরা যদি দুজনকে হগাত করতে পারি, তাহলে আমাদের বিরুদ্ধে সরকারী তদন্ত থামিয়ে দেয়া যাবে। এখনি এই রাতে আমাদের অভিযানে যাওয়া দরকার।' বলল জেনারেল শ্যারন।

'না এভাবে অভিযান করা যাবে না। পুলিশ ও এফ বি আই-এর সাথে লড়াইকরে তাদের ধরে আনা যাবে বলে আমি মনে করি না। কে তাদের উপর হামলা করেছে এটা জানতে পারলে আহমদ মুসা একাই একশ হবে। আমরা ব্যর্থ হবো। আপনি আহমদ মুসাকে চেনার পর এরকম প্রস্তাব দিলেন কেমন করে?' বলল ডেভিড জোনস।

'ঠিক বলেছেন মিঃ জোনস। আমি উত্তেজিত হয়ে বিচার বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছি। তাকে ফাঁদে ফেলতে হবে কৌশলে। বলুন আপনার কোনর প্রস্তাব আছে? বলল জেনারেল শ্যারন।

'সারা জেফারসনকে আমাদের দরকার নেই। তাকে কিডন্যাপ করলে পুরো আমেরিকায় হৈ চৈ পড়ে যাবে। লাভের চেয়ে ক্ষতি হবে আমাদের বেশী। এক আহমদ মুসাকে আমাদের হাতে আনতে পারলেই সরকার, ফ্রি আমেরিকা, হোয়াইট ঈগল, সবাই অন্ধ হয়ে পড়বে।' ডেভিড জোনস বলল।

'আপনার যুক্তির সাথে একমত।' বলল জেনারেল শ্যারন।

'আমি বলে দিয়েছি, বেন ইয়ামিন বাড়ির উপর নজর রাখবে। উপযুক্ত সুযোগ সৃষ্টি হলেই সে আমাদের জানাবে। আমরা তৈরী থাকব যে কোন মুহূর্তে অভিযান চালানোর জন্যে। আমি ঐ বাড়ি ও তার আশপাশের রাস্তাঘাটের একটা নকশা এঁকে দিচ্ছি, আপনি একটা নিখুঁত পরিকল্পনা তৈরী করুন।' ডেভিড জোনস বলল।

'পরিকল্পনা সকাল, বিকাল, দিন, রাত, কোন সময়ের হবে? সময় অনুসারে পরিকল্পনা হবে আলাদা।' বলল জেনারেল শ্যারন।

'যে এলাকায় বাড়ি, সেটা টাইট সিকিউরিটি জোন। রাতের বেলা কোন পাখি উড়লেও সেটা তাদের নজর এড়ায় না। দিনের বেলা এমন টাইট অবস্থা থাকে না। সকাল ও বিকেলের কথা আপনি ভাবতে পারেন। তবে সবকিছুই নির্ভর করছে বেন ইয়ামিনের খবরের উপর।' ডেভিড জোনস বলল।

'বাড়ি গিয়ে আর কাজ নেই। চলুন আপনার ওখানে গিয়ে বসি। আপনার ওখান থেকে পটোম্যাকের ঐ এলাকায় সরাসরি রাস্তা আছে।' বলল জেনারেল শ্যারন।

'ওয়েলকাম। চলুন যাই। পরামর্শ করে পরিকল্পনাটা তৈরী করতে হবে।' বলে ডেভিড উইলিয়াম তার গাড়ির দিকে এগোল। জেনারেল শ্যারনও গিয়ে তার গাড়িতে বসল।

দুই গাড়িই স্টার্ট নিয়ে চলতে শুরু করল।

বাড়িটার নাম পটোম্যাক লজ।

বাড়িটার সামনে সুন্দর সবুজ চত্বর। দুপাশ এবং পেছন দিকে বাগান।

চত্বর ও বাগান নিচু বাউন্ডারী ওয়াল দিয়ে ঘেরা।

বাউন্ডারী ওয়ালের সাথে বাড়িতে প্রবেশের হালকা একটি গেট। গ্রীলের তৈরী এবং তার উপর আয়রন শীট দিয়ে ঢাকা।

বাড়ির সামনে দাঁড়ালে ওয়ালের উপর দিয়ে চত্বর ও বাগানের অনেকখানি দেখা যায়।

এই বাড়িতেই এখন বাস করছে আহমদ মুসা, সারা জেফারসন ও সারা জেফারসনের মা জিনা জেফারসন। এফ বি আই-এর মেজর জো স্কিন বসেছিল গেটের বাইরে বেশ এবটু দুরে রাস্তার পাশে ঘাসে ঢাকা সবুজ একটা টিলায়।

তখন বেলা ৯ টা।

পটোম্যাক লজ থেকে বেরিয়ে একটা কনফেকশনারীর গাড়ি মেজর জো'র সামনের রাস্তা ধরে চলে যাচ্ছিল।

মেজর জো মুখ তুলে বলল, 'বিক্রি হলো কিছু?'

ট্রাকরে মত কনফেকশনারীর গাড়িটার ড্রাইভিং সিটসহ ইঞ্জিন অংশ আলাদা এবং তার পেছনে বিরাট কনটেইনার।

ড্রইভারের মাথায় ফেল্ট হ্যাট। মুখে কাঁচা-পাকা গোঁফ ও দাড়ি। মুখের গোঁফ-দাড়ি বড়ই অপরিপাটি, ব্যাস্ত ও কাজ পাগল মানুষের নিদর্শন।

ড্রাইভারটি মুখ ঘুরিয়ে মেজর জো'র দিকে তাকিয়ে বলল, 'গুড মর্নিং স্যার। এরা স্থায়ী কাস্টমার, আমাদের বিক্রি তো হবেই। আজ আমরা খুশী। ধন্যবাদ।'

গাড়িটা চলে গেল।

গাড়িটা যাওয়ার কিছুক্ষন পর পটোম্যাক লজের অন্যতম কেয়ারটেকার উইলিয়াম এল। হাতে কয়েকটা কনফেকশনারীর প্যাকেট ও কাগজের ব্যাগ ভর্তি জিনিসপত্র নিয়ে হাঁটছিল পটোম্যাক লজের দিকে।

মেজর জো স্কিন বসা থেকে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'হ্যালো উইলিয়াম, তুমি একগাদা কনফেকশনারীর জিনিস নিয়ে আসছ, আবার কনফেকশনারীর গাড়ি গিয়ে দিয়ে এল অনেক জিনিস। ডাবল শপিং কেন?'

উইলিয়াম চোখ কপালে তুলে বলল, 'কি বলছ মেজর, আমাদের কনফেকশনারীর গাড়ি সপ্তাহে দুদিন আসে। আজতো আসার দিন নয়!'

'কিন্তু গাড়িতো এসেছিল।' বলল মেজর জো শুকনো কন্ঠে। তার চোখে-মুখে ভাবনার চিহ্ন।

'কিন্তু এভাবে তো গাড়ি কোন দিন আসে না! যাই দেখি।'

বলে উইলিয়াম হাঁটতে শূরু করল।

মেজর জো স্কিনও হাঁটতে শুরু করেছে উইলিয়ামের সাথে। তার চোখে-মুখে ভাবনার চিহ্ন আরও গভীর।

উইলিয়াম বাইরের গেট পেরিয়ে বাড়ির ভেতর প্রবেশের দরজায় গিয়ে চাবি ঢুকাল তালা খুলার জন্যে দরজার কি হোলে।

কিন্তু চাবি ঘুরিয়ে দেখল দরজা খোলা। বিস্ময় ফুটে উঠল তার চোখে-মুখে। ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে ফেলল সে।

পেছনে একবার তাকিয়ে সে দ্রুত প্রবেশ করল ভেতরে।

মেজর জো স্কিন উইলিয়ামের পেছনেই ছিল। উইলিয়ামের চোখ-মুখের বিস্ময় ও উদ্বেগ তার নজর এড়াল না। দরজা খোলা দেখে মেজর জো'র বুকও ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল।

উইলিয়ামের সাথে সাথে মেজর জো স্কিনও দ্রুত ভেতরে ঢুকে গেল।

ভেতরে সব শূন্য।

দৌড়ে উইলিয়াম বাবুর্চিখানায় গেল, কেউ নেই। সার্ভেন্টস কোয়ার্টার দেখল, কেউ নেই। ফিরে এল আবার বাবুর্চি খানায়। হাতের প্যাকেটগুলো রেখে বাধরুমরে দিকে এগুলো। দেখল বাথরুম বন্ধ। তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, ভাবল নিশ্চয় কেউ বাথরুমে গেছে, আর অন্যরা নিশ্চয় ম্যাডামের সাথে পেছনের দিকে গেছে। কিন্তু শয়তানরা দরজা বন্ধ করেনি কেন?

কিন্তু পাক ঘরে ঢুকেই মেজর জো স্কিনের ভ্রু কুঁচকে গেল। সে বাতাসে ক্লোরোফরম গ্যাসের গন্ধ পেল। পাক ঘরের বাইরে তো এ গন্ধ পায়নি। পাক ঘরে এ গন্ধ কোত্থেকে এল!

এ ভাবনা তার মনে আসতেই সে জিজ্ঞেস করল উইলিয়ামকে, 'তোমার একজন না হয় বাথরুমে অন্য লোকরা কোথায়?'

'নিশ্চয় ম্যাডামের সাথে বাগানে হবে।' বলল উইলিয়াম।

'চল দেখি বাগানে।'

দুজন বাগানের দিকে এগুলো।

পেছন দিকে বেরুবার জন্যে একটা দরজা আছে। সে দরজা দিয়ে তারা পেছনের বাগানে প্রবেশ করল।

বাগানে কাউকেই চোখে পড়ল না।

হঠাৎ বাঁ পাশে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল উইলিয়াম।

উইলিয়ামের দৃষ্টি অনুসরণ করে জো সেদিকে তাকাল। দেখল ম্যাডাম জিনা জেফারসনের দেহ পড়ে আছে একটা ফুল গাছের ওপাশে।

দেখার সাথে সাথে সে লাফ দিয়ে ফুলের গাছ ডিঙিয়ে গিয়ে পৌছল পড়ে থাকা দেহের কাছে।

ঝুঁকে পড়ে নাক পরীক্ষা করল জিনা জেফারসনের। দেখল বেঁচে আছে, নিঃশ্বাস বইছে।

ঝুঁকে পড়তে গিয়ে সেই ক্লোরোফরমের গন্ধ আবার পেল মেজর জো। এবার বুঝল সে সংজ্ঞাহীন করারা জন্যেই কেউ ক্লোরোফরম গ্যাস ব্যবহার করেছে।

সে আরও বুঝল, নিশ্চয়ই আরও সর্বনাশ তারা করে গেছে।

চিন্তা করতেই বুকের রক্ত যেন তার হিম হয়ে গেল।

ঝুঁকে পড়া অবস্থা থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই বাড়ির ভেতর দিকে ছুটল। ছুটতে ছুটতেই বলল, 'ভয় নেই উইলিয়াম ম্যাডাম বেঁচে আছে। এসো মিঃ আহমদ মুসার খবর নিই।'

দুজনেই বাড়িতে ঢুকে ছুটল দোতালায় উঠার সিঁড়ির দিকে।

দৌড়ানো অবস্থায়ই উইলিয়াম বলল, 'সিঁড়ি গিয়ে উঠেছে ড্রইংরুমে। ড্রইংরুমের ঠিক পূর্ব পাশে থাকে আহমদ মুসা। আর সিঁড়ির পশ্চিম পাশে পাশপাশি দুটি রুমে থাকে সারা জেফারসন ও জিনা জেফারসন।'

ড্রইংরুমে উঠে তারা ছুটল আহমদ মুসার ঘরের দিকে।

দুজনেই গিয়ে দাঁড়াল আহমদ মুসার খোলা দরজায়। তাদের দুজনের চারটি চোখ গিয়ে আছড়ে পড়ল আহমদ মুসার শূন্য বেডের উপর।

দরজায় গিয়ে দাঁড়াতেই সেই ক্লোরোফরম সিক্ত ভারী বাতাস এস প্রবেশ করল তাদের নাকে।

মেজর জো ঘরের চারদিকে একবার নজর বুলাল।

দেখল ঘরের সবই ঠিক আছে। শুধু বিছানার চাদরের নিচের অংশের কিছুটা বেশী ঝুলে গেছে।

'এই আধা ঘন্টা আগে যখন বাইরে যাই, তখন তাঁকে আমি ঘুমানো দেখে গেছি। কি হলো ওঁর? কেউ কি ওঁকে....।'

কথা শেষ করতে পারল না। কথা গলায় আটকে গেল একটা উচ্ছ্বাস দমন করতে গিয়ে।

'হ্যাঁ উইলিয়াম, ঠিকই অনুমান করেছ। সর্বনাশ হয়ে গেছে। কোন শত্রু তাঁকে কিডন্যাপ করেছে বলে মনে হচ্ছে।'

বলে মেজর জো পকেট থেকে অয়্যারলেস বের করল। খবরটা জানিয়ে দিল সে এফ বি আই অপারেশন কমান্ডার বব কার্টারকে। খবরটা দিতে গিয়ে কন্ঠ ভারী হয়ে উঠেছিল মেজর জো'র। দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার চেয়ে যে ক্ষতি হলো তার অনুভূতিই তাকে পীড়া দিচ্ছে বেশী। কিন্তু কি দোষ তার! অস্বাভাবিকতা কিছুই সে দেখেনি।

কনফেকশনারীর এমন গাড়ি তো বাড়ির দরজায় দরজায় গিয়েই থাকে। কিন্তু ঐ গাড়িই যে এত বড় কান্ড ঘটাবে, তা ভাববে কেমন করে!

টেলিফোন শেষ করেই মেজর জো বলল, 'চল উইলিয়াম, ম্যাডামকে ভেতরে নিয়ে আসি।'

তারা দুজনে ধরাধরি করে জিনা জেফারসনকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে এল।

জিনা জেফারসনকে বিছানায় শুইয়ে মেজর জো বলল, 'উইলিয়াম যাও গিয়ে কিচেনের পাশের বাথরুমটা খোল। নিশ্চয় ওখানে তোমাদের কিছু লোককে আটকে রেখেছে। আমি দেখি এঁর সংজ্ঞা ফেরানো যায় কিনা।'

বাড়ির অবশিষ্ট সবাইকে পাওয়া গেল সংজ্ঞাহীন অবস্থায় কিচেনের সাথের বাথরুমটিতে।

পনের মিনিট পার হয়েছে।

কারও সংজ্ঞা ফেরানো যায়নি।

এ সময় এক ঝাঁক গাড়ি পর পর এসে দাঁড়াল পটোম্যাক লজের সবুজ চত্বরে।

তিনটি পুলিশের গাড়ি। একটি জীপ এফ বি আই-এর। তাদের সামনে আরও দুটি কার। একটি এফ বি আই চীফ জর্জ আব্রাহামের। আরেকটা সারা জেফারসনের।

পটোম্যাক লজের দুঃসংবাদ যখন মেজর জো এফবিআই হেড কোয়ার্টারে দেয়, তখন সারা জেফারসন সেখানেই ছিল। খবর পেয়ে জর্জ আব্রাহামদের সাথেই চলে এসেছে।

দুই কার থেকে জর্জ আব্রাহাম ও সারা জেফারসন প্রায় এক সাথেই নামল।

নেমেই সারা জেফারসন ছুটল বাড়ির দরজার দিকে। তার পেছনে পেছনে জর্জ আব্রাহাম। জর্জ আব্রাহাম সারা জেফারসনের মত না দৌড়ালেও দ্রুত এগোল।

সারা জেফারসন বাড়িতে ঢুকেই পেল উইলিয়ামকে। গাড়ির শব্দ পেয়ে সে বাইরে আসছিল।

উইলিয়াম সারা জেফারসনকে দেখেই হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। কাঁদতে কাঁদতেই বলল, 'বড় ম্যাডামকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পাওয়া গেছে পেছনের বাগানে। আর স্যার নেই......।'

সারা জেফারসনের মুখ মড়ার মত ফ্যাকাসে। রক্তিম ঠোঁট দুটো তার কাঁপছে বুক থেকে উঠে আসা কোন এক ঝড় চাপতে গিয়ে।

কোন কথা বলল না। দৌড়ে প্রায় টলতে টলতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল সারা জেফারসন।

আহমদ মুসার ঘরের দরজায় গিয়ে মুহূর্তের জন্যে দাঁড়াল। ঘরের চারদিকটা মনে হয় দেখল সে। তারপর ছুটে গেল আহমদ মুসার বেডে।

ব্যাকুলভাবে বালিশটা তুলল। বালিশের নিচে একটা রিভলবার ঠিকঠাকভাবে পড়ে আছে। তারপর সারা জেফারসনের চোখ দুটি আছড়ে পড়ল বেডের পেছনের হ্যাংগারে। না, সেখানে বাইরে বেরুবার সব সার্ট, টি-সার্ট, কোট-প্যান্ট সবই ঠিকঠাক আছে। এমনকি তাঁর শখের কলমটি পর্যন্ত জামার পকেটে শোভা পাচ্ছে।

সারা জেফারসনের ঠোঁটের কম্পন বেড়ে গিয়েছিল। তার চোখ খোলা, কিন্তু দৃষ্টি কোথায় যেন হারিয়ে গেছে।

এ সময় ঘরে প্রবেশ করল জর্জ আব্রাহাম।

জর্জ আব্রাহাম সারা জেফারসনের বিহ্বল অবস্থা দেখে বলল, 'স্যরি মিস জেফারসন। আমরা বোধ হয়....।'

কথা শেষ করতে পারল না জর্জ আব্রাহাম। সারা জেফারসন 'না' বলে চিৎকার করে উঠে বোঁটা থেকে ফল খসে পড়ার মত ঢলে পড়ল আহমদ মুসার বিছানার উপর।

ছুটে গেল জর্জ আব্রাহাম সারা জেফারসনের দিকে।

সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছে সারা জেফারসন।

জর্জ আব্রাহামের পরপরই ঘরে প্রবেশ করল পুলিশ প্রধান বিল বেকার।

'মিস সারা সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছে মিঃ বিল। হুইস্কি, বিয়ার, শ্যাম্পেন যা পাও দেখ নিয়ে এস অন্য ঘর থেকে। আহমদ মুসার ঘরে তো এসব পাওয়া যাবে না।'

বিল বেকার বেরিয়ে যাচ্ছিল। ঘরে প্রবেশ করল উইলিয়াম। বলল, 'স্যার বড় ম্যাডামের সংজ্ঞা ফিরেছে। সব শুনে উনি সাংঘাতিক কান্না শুরু করেছেন।'

'ঠিক আছে আমরা দেখছি্ তুমি বিয়ার হুইস্কির মত কিছু নিয়ে এস পাশের ঘর থেকে। তোমার ছোট ম্যাডাম সংজ্ঞা হারিয়েছে। তার সংজ্ঞা ফিরাতে হবে। যাও।' বলল জর্জ আব্রাহাম।

'কিন্তু স্যার মদ জাতীয় কিছুতো পাওয়া যাবে না এ বাড়িতে।' বলল উইলিয়াম।

'কেন?'

'স্যার এ বাড়িতে কেউ মদ খায় না। ছোট ম্যাডাম নন, বড় ম্যাডাম নন। আমরাও কেউ খাই না।'

'কি বলছ তুমি?'

'ঠিকই বলছি স্যার। স্যার মদ খেতেন না। তাই অন্য সবাইও মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন।'

'বুঝলাম। তুমি ঠিকই বলেছ। যাও রেফ্রিজারেটর থেকে ঠান্ডা পানি নিয়ে এস।' বলল জর্জ আব্রাহাম।

উইলিয়াম ছুটল পানি আনার জন্যে।

'আহমদ মুসা সম্পর্কে যে সব অবাক করা কথা শুনেছি, তাহলে সব সত্যি। মাত্র কয়েক দিনের সান্নিধ্যে যদি জেফারসন পরিবার মদ ছাড়তে পারে, তাহলে ইস্টের মানুষ তার যাদু স্পর্শে অনেক কিছূই করতে পারে।' বলল বিল বেকার।

'আহমদ মুসার যাদু তার চরিত্র। তার চরিত্রে এমন একটা শক্তি আছে যা অতিশক্ত মানুষকেও নরম করে দিতে পারে। স্বীকার করতে লজ্জা নেই বিল, সে মদ খায় না বলে তার উপস্থিতিতে কোন মদের পাত্র আশে-পাশে থাকলেও আমার লজ্জাবোধ হয়।' জর্জ আব্রাহাম বলল।

উইলিয়াম পানি নিয়ে ফিরে এল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই জ্ঞান ফিরে পেল সারা জেফারসন। উঠে বসতে বসতে বলল, 'স্যরি।'

তারপর তোয়ালে দিয়ে চোক মুখ মুছে বিছানায় পড়ে থাকা রুমালটা মাথায় দিয়ে বলল, 'স্যরি। এমন ঘটনার জন্যে কোন ভাবেই প্রস্তুত ছিলাম না।ও আমার সাথে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি নিষেধ করেছিলাম। চেয়েছিলাম গত রাতের বড় একটা ধকলের পর ও একটু রেস্টে থাক। তখন কি জানতাম এমন কিছু ঘটবে।' বলতে বলতে কেঁদে ফেলল সারা জেফারসন।

কাঁদতে কাঁদতেই বলল, 'এখনই কিছু করতে হবে। তাঁকে উদ্ধার করতে হবে বর্বর, পাষান্ড, খুনীদের হাত থেকে।'

বলে সারা জেফারসন তার মোবাইল বের করল।

জর্জ আব্রাহাম জনসন ও পুলিশ প্রধানের দিকে মুখ তুলে 'এক্সকিউজ মি স্যার' বলে মোবাইলে একটা কল করল। ওপার থেকে সাড়া পাওয়ায় বলল, 'হ্যাঁ আমি সারা জেফারসন। গুড মর্নিং বেঞ্জামিন। কিন্তু আমাদের সবার জন্যে খারাপ খবর, আজ সকাল সাড়ে ৮টায় আহমদ মুসা তার কক্ষে ঘুমন্ত অবস্থায় কিডন্যাপ হয়েছেন। তুমি সবাইকে জানিয়ে দাও। কাজে নেমে পড়। এটাই এখন আমাদের একমাত্র কাজ।'

আরও কয়েকটি কথা বলে  টেলিফোন রেখে দিয়ে সারা জেফারসন বলল, 'স্যারি মিঃ জর্জ আব্রাহাম, মিঃ বিল বেকার। টেলিফোনটা আমার জন্যে খুব জরুরী ছিল। বলুন, আপনারা কি ভাবছেন?'

'না মিস জেফারসন, টেলিফোনটা শুধু আপনার জন্যে নয়, আমাদের জন্যেও জরুরী। সবাই একসাথে এগুতে হবে।' বলে একটু থামল আব্রাহাম জনসন। পরক্ষনেই আবার বলে উঠল, 'আমাদের প্রথম ভাবনা হলো আহমদ মুসাকে কিভাবে কিডন্যাপ করা হয়েছে। আলামত থেকে পরিষ্কার আপনি যেটা বলেছেন ঘুমন্ত অবস্থায় ক্লোরোফরম গ্যাস স্প্রে করে তাকে সংজ্ঞাহীন করে ফেলা হয়। তারপর তাকে কনফেকশনারীর ভ্যানে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিডন্যাপকারী মূল বাহিনী প্রবেশ করে বাড়ির পেছন দিক দিয়ে। আপনার মাকে ঐ স্প্রে করেই সংজ্ঞাহীন করে। আমাদের দ্বিতীয় ভাবনা হলেঅ কারা একাজ করেছে। আপনার আম্মা ও কিচেন ক্রুরা কিডন্যাপকারীদের যাদের দেখেছে, তারা সবাই মুখোশ পরা ছিল। মেজর জো স্কিন কনফেকশনারীর গাড়ির ড্রাইভারকে দেখেছে, লম্বা লাল মুখ। নিশ্চিত ওটা ইহুদী চেহারা। তবে দেখার কথা বাদ দিয়ে চোখ বন্ধ করেই বলা যায়, এই ঘটনা জেনারেল শ্যারনের লোকরা ঘটিয়েছে।'

'প্রেসিডেন্ট কি এই খবর পেয়েছেণ?' জিজ্ঞেস করল সারা জেফারসন।

'আপনাকে বলা হয়নি, গাড়িতে বসেই আমি প্রেসিডেন্টকে ঘটনা জানিয়েছি। প্রেসিডেন্ট খুবই শক পেয়েছেন। তিনি জেনারেল শ্যারনদের গ্রেফতার ও আহমদ মুসাকে উদ্ধারের সর্বাত্মক উদ্যাগের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটনকে বলে দেবেন সশস্ত্র বাহিনী এবং তাদের গোয়েন্দা বিভাগও এই কাজে আমাদের সাহায্য করবে।'

'এখন আমাদের কি করণীয়? ওদের সব রাগের কেন্দ্র বিন্দু আহমদ মুসা। আমার ভয় হচ্ছে, প্রতিহিংসা পাগল হয়ে ওরা...।'

কথা শেষ করতে পারল না সারা জেফারসন। কান্নায় রুদ্ধ হয়ে গেল তার গলা।

'না মিস জেফারসন আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনি যা আশংকা করছেন তেমন কিছু ঘটবে না। এর কনসিকুয়েন্স কি জেনারেল শ্যারনরা নিশ্চয় উপলব্ধি করে।' বলল জর্জ আব্রাহাম জনসন।

সারা জেফারসন চোখ মুছে বলল, 'জানেন গতকাল রাতের অভিযান থেকে ফিরে যখন বললাম, মাথাটা এবার হাল্কা হলো। তখন উনি বলেছিলেন, ওরা এখন ক্ষ্যাপা কুকুরের মত। আগামী কয়েকদিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভাগ্যের পরিহাস যিনি জানতেন ওরা হবে ক্ষ্যাপা কুকুরের মত, সেই তিনিই সেই ক্ষ্যাপা কুকুরদের হাতে....।' সারা জেফারসনের কথা আবার কান্নায় আটকে গেল।

জর্জ আব্রাহাম ও বিল বেকারের মুখও ম্লান হয়ে গেছে। আহমদ মুসার উক্তি ও সারা জেফারসনের আশংকার প্রতিটি বর্ণ সত্য। সারা জেফারসনের এভাবে ভেঙে পড়াও যে খুবই স্বাভাবিক তাও তারা উপলব্ধি করে। তবু জর্জ আব্রাহাম সান্ত্বনার সুরে বলল, 'মিস জেফারসন, আহমদ মুসা নেই। আপনাকে শক্ত হতে হবে। আপনার উপর অনেক দায়িত্ব। 'ফ্রি আমেরিকা'র ইপর আমাদের অনেক নির্ভরতা।'

'স্যরি আংকল। আমার এভাবে কাঁদা ঠিক নয়।কিন্তু আহমদ মুসা নেই, সে জেনারেল শ্যারনদের মত খুনী শত্রুদের হাতে, এ কথা ভাবলেই মনকে আর ধরে রাখতে পারছি না। যদি .... যদি তার কিছু হয়ে যায়।'

আবারও কান্নায় জড়িয়ে গেল সারা জেফারসনের শেষের কথাগুলো।

'এমনটা ভাবা খুবই স্বাভাবিক। তবে আমি বলছি, তেমন কিছু ঘটা খুব সহজ নয়। আর আহমদ মুসাও সাধারন কেউ নন। খারাপ না ভেবে ভালটা ভাবুন। আহমদ মুসা ওদের হজম হবার মত কোন বন্দী নন।' বললজর্জ আব্রাহাম।

বলে একটু থেমেই আবার বলল, 'চলুন মিস জেফারসন, বাইরে যাই। কিছু কাজ, কিছু কথা এখনও বাকি আছে। চলুন পুলিশ কতদুর কি করল দেখি।'

বলে উঠে দাঁড়াল জর্জ আব্রাহাম।

বিল বেকারও উঠল।

উঠল সারা জেফারসনও।

পুলিশ ও গোয়েন্দাদের একটা দলকে পটোম্যাক লজের সার্বক্ষনিক পাহারায় বসিয়ে জর্জ আব্রাহাম ও বিল বেকার পটোম্যাক লজ থেকে যখন বের হলো, তখন ২ ঘন্টা পেরিয়ে গেছে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে জর্জ আব্রাহাম ও বিল বেকার পাশাপাশি হাঁটছিল।

'সত্যি মিস জেফারসন একবোরেই ভেঙে পড়েছেন।' বলল জর্জ আব্রাহাম।

'এটা কি সহযোদ্ধার প্রতি আন্তরিকতা বশত না এখানে হৃদয়ের কোন ব্যাপার আছে?' বলল বিল বেকার।

'দুজনে সোনায় সোহাগা। হৃদয় ঘটিত কিছূ থাকাটাই স্বাভাবিক, না থাকাটা অস্বাভাবিক।' জর্জ আব্রাহাম বলল।

'তাহলে কিন্তু মহাব্যাপার হবে। বাঘের ঘরে একদম ঘোঘের বাসা।' বলল বিল বেকার।

'আহমদ মুসা ঘোঘ নয় মিঃ বিল। সেও বাঘ। বাঘের সাথে বাঘের মিলন।'

'মিলন নয়, বলুন মহামিলন। একেবারে দুই সভ্যতার মিলন।'

দুজন গাড়ির কাছে এসে হিয়েছিল।

বিল বেকার নিজের গাড়ির দিকে এগুতে এগুতে বলল, 'তাহলে এই মুহূর্তে আমরা কি করতে যাচ্ছি?'

জর্জ আব্রাহাম নিজের গাড়ির দরজা খোলার জন্যে হাত বাড়িয়েছিল। একটু থমকে গিয়ে মুখটা ঘুরিয়ে বলল, 'অল্পক্ষনের মধ্যেই প্রাথমিক রিপোর্ট আমরা পেয়ে যাব। কিডন্যাপকারী কনফেকশনারী ভ্যানটি কোথায়, জেনারেল শ্যারন ও ডেভিড জোনসকে তাদের বাড়িতে পাওয়া গেল কিনা, ওয়াশিংটন শহরের প্রকাশ্য ও গোপন ইহুদী কেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠানের সার্চ রিপোর্ট অল্পক্ষনের মধ্যেই পেয়ে যাব। আহমদ মুসাকে বন্দী করে রাখতে পারে, ওয়াশিংটন শহর উপকন্ঠের সম্ভাব্য এমন স্থানগুলোর একটা রিপোর্ট খুব সত্ত্বর আশা করছি। গোটা দেশ থেকেও এ ধরনের রিপোর্ট  অল্পক্ষনের মধ্যেই আসা শুরু করবে বলে মনে করছি্ এসব হাতে আসার পর ভবিষ্যত কর্মপন্থা ঠিক করা যাবে।'

'ঠিক আছে। আমি আপনার কলের অপেক্ষা করব। আর আমি কিছু জানতে পারলে সংগে সংগেই আপনাকে জানাব। গোটা দেশেই পুলিশ কাজে লেগে গেছে।' বলে বিল বেকার গাড়িতে উঠে গেল।

জর্জ আব্রাহাম গাড়িতে ঢুকে তার ড্রাইভিং সিটে আসন নিয়েছে।

দুই গাড়িই পটোম্যাক লজ থেকে বেরিয়ে ছুটতে আরম্ভ করল।

এস এস সেন বলছিল, 'সব রকম সহযোগিতা আমরা করব, কিন্তু একটাই শর্ত ব্যাপারটা গোপন রাখতে হবে।'

'অবশ্যই গোপন রাখব। আমাদের স্বার্থেই গোপন রাখব। একটা মহাদুঃসময়ে আপনাদের আশ্রয় পেয়েছি। জানেন আহমদ মুসাকে কিডন্যাপ করে ফেরার পথে টেলিফোনে হোয়াইট হাউজ থেকে ইভা ব্রাউন জানাল যে, আমাকে ও ডেভিড উইলিয়াম জোনসকে গ্রেফতারের নির্দেশ প্রেসিডেন্ট দিয়েছেন। শুনে আকাশ থেকে পড়লাম। চারদিকে অন্ধকার দেখলাম। একদিকে আমাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, অন্যদিকে এর চেয়েও বড় প্রশ্ন দাঁড়াল আহমদ মুসাকে কোথায় রাখব। প্রেসিডেন্টের ঐ আদেশ থেকে বুঝেছিলাম, ইহুদীদের কোন বাড়ি, কোন সিনাগগ কিংবা ইহুদীদের কোন প্রতিষ্ঠানই আর নিরাপদ নয়। সরকারী পুলিশ ও গোয়েন্দারা সবটার উপর নজর রাখবে। এই অবস্থায় প্রথমেই আপনার কথা মনে পড়ল। সংগে সংগে গাড়ি ঘুরিয়ে আপনার এখানে চলে এলাম। আপনি আমাদের স্বাগত জানিয়েছেন। আমরা কৃতজ্ঞ। আপ.......।'

জেনারেল শ্যারনকে কথা শেষ করতে না দিয়েই এস এস সেন বলে উঠল, 'জেনারেল এত বিনয়ী হওয়ার দরকার নেই। এ সাহায্যের পেছনে আমাদেরও স্বার্থ আছে। আহমদ মুসারা যেমন আপনাদের জানের শত্রু, তেমনি তারা আমাদের প্রানের শত্রু। আমাদের ভারতকে কম জ্বালায়নি ওরা। এখনও কম জ্বালাচ্ছে না। আমাদের মাতৃসম ভারতকে তিন টুকরো করেছে। সেই জ্বালায় আমরা তড়পাচ্ছি। আমাদের অসহনীয় জ্বালা থামবে না যতদিন না ঐ দুটো

রাষ্ট্রকে আমরা হজম করতে পারছি। আহমদ মুসারা আমাদের লক্ষ্য অর্ঝনের পথে প্রধান বাধা। আমরা চাচ্ছি আধুনিকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার আবরনে ঐ দুই রাষ্ট্র থেকে মুসলমানদের মুসলিম পরিচয় ভুলিয়ে দিতে। আর আহমদ মুসারা এই মুসলিম পরিচয়কে আরও শাণিত করছে। তার উপর আহমদ মুসারা এসেছে আমেরিকায়। এরা এখানে সুবিধা পাওয়ার অর্থ আমাদের সর্বনাশ হওয়া। সুতরাং আপনাদের মত আমরাও আহমদ মুসাদের বিনাশ চাই।'

এস এস সেন এর পুরো নাম। শিব সংকর সেন। তার বাপ ছিল ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর একজন ডাকসাইটে অফিসার। শিব সংকর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কম্পিউটার পড়তে এসে এখানেই থেকে যায়। সে একজন প্রতিভাবান কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। দেশ প্রেমিক শঙকর চায়নি আমিরিকায় সেটলড হতে। কিন্তু তার বাবা শিব দাশ সেন তাকে বুঝিয়েছে, হিন্দুস্তানের স্বার্থেই তার স্থায়ীভাবে আমেরিকায় বাস করা প্রয়োজন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আগামী দিনের এক বিশ্ব। এ বিশ্বে আমরা ভাগ বসাতে চাই, এ বিশ্বকে আমাদের হিন্দুস্তানের স্বার্থে পেতে চাই। তা পেতে হলে মিভ শংকরদের মত হিন্দুস্তানগত প্রাণ ছেলেদের আমেরিকায় থেকে যাওয়া প্রয়োজন। পিতার এই কথায় সে সানন্দেই রাজী হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করার পর সে চাকরী নেয় বিখ্যাত আই বি এম কোম্পানীতে। এখন সে নিজেই বড় একটি কোম্পানীর মালিক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট সফটওয়্যার বিজনেসের প্রায় ২০ ভাগ তার পকেটে আসে। আমেরিকার অর্থনৈতিক ভাগ্যের চাকা যাদের হাতে তার মধ্যে সেও একজন। সে মনে করে তার বিত্ত-বৈভব তার হিন্দুস্তানের জন্যে।

তার সবচেয়ে বড় তৃপ্তি হলো, আমেরিকান সফটওয়্যার টেকনলজি সে পাচার করতে পেরেছে তার হিন্দুস্তানে। হিন্দুস্তানের হায়দারাবাদ সফটওয়্যার টেকনলজিতে এখন এক মিনি আমেরিকা।

শিব সংকরের এই বাড়িটি পেন্টাগনের ঠিক অপজিটে পটোম্যাক নদীর উত্তর তীরে। চার বিঘা জমির উপর বিশাল বাড়ি। বাড়ির চারদিকটা কৃত্রিম লেক আর বাগানে সজ্জিত।

বাড়িটা চারতলা। মাটির নিচে আরও দুটি ফ্লোর। পারমানবিক যুদ্ধের আশংকা সামনে রেখেই এ ফ্লোর দুটি তৈরী। মাটির তলায় সর্বশেষ ফ্লোর থেকে পটোম্যাক নদীতে বের হওয়ার একটা আধুনিক সুড়ঙ্গ পথও রয়েছে। যুদ্ধ শুরু হলে মাটির মাটির সারফেসের পথ কোন কারনে বন্ধ হয়ে গেলে সুড়ঙ্গটি পালাবার বিকল্প পথ।

পরিবার নিয়ে শিব শংকর এ বাড়িতেই বাস করে। আহমদ মুসা এই বাড়িরই ভূগর্ভস্থ শেষ তলার বাম পাশের একটি ঘরে বন্দী।

শিব শংকরের কথা শুনে জেনারেল শ্যারন ও ডেভিড জোনসের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'আপনাকে ধন্যবাদ মিঃ সেন। আমাদের একেবারে নিশ্চিন্ত করলেন। দেখা যাচ্ছে আমরা ও আপনারা একই লক্ষ্যে আমেরিকায় কাজ করছি। আপনাদের লক্ষ্য হিন্দুস্তান, আর আমাদের লক্ষ্য প্রোমিজড ল্যান্ড ইসরাইল। আর আমাদের সাধারন শত্রুও এক। আসুন আমরা এই শত্রুর বিরুদ্ধে এক সাথে লড়াই করি।' বলল ডেভিড উইলিয়াম জোনস। আবেগে ভারী ছিল তার কন্ঠ।

'লড়াই তো শুরু করেছি মিঃ জোনস। কিন্তু এটাতো লুজিং ব্যাটল। লস আলামোসের সুড়ঙ্গটা যে গোয়েন্দা সুড়ঙ্গ, তদন্ত টীমের সদস্যদের হত্যার জন্যে লস আলামোসের পথে আপনারাই যে সন্ত্রাসী হামলা চালিয়েছিলেন এবং একই লক্ষ্যে এফ বি আই বিমানে বোমা পেতে তা ধ্বংস করেছেন, তা তো প্রমাণ হয়েই গেছে।' বলল শিব শংকর সেন।

'হ্যাঁ। এগুলো সব শয়তান আহমদ মুসার কাজ।'

'কিন্তু আজকের নিউজ আরও মারাত্মক। জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টনের হত্যাকারী হিসাবে আপনাদের দুজনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। মিঃ হ্যামিল্টনের পকেটে পাওয়া একটা টেপ থেকে হত্যাকান্ডের গোটা বিবরণ নাকি তারা পেয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত সিনেটর ময়নিহানের ছেলে হ্যারিকে কিডন্যাপের কিডন্যাপ নাকি আপনারাই করেছিলেন। হ্যারি এবং আপনাদের যারা ধরা পড়েছে, তাদের জবানবন্দী ছেপেছে পত্রিকাগুলো।' বলল আবার শিব শংকর সেন।

'ভাগ্য আমাদের বিরুদ্ধে গেছে মিঃ সেন। এক আহমদ মুসা এসে আমেরিকায় আমাদের সাজানো সংসারকে লন্ড-ভন্ড করে দিল।' ডেভিড উইলিয়াম জোনস বলল।

'আহমদ মুসাকে ধরে রেখে কি পেতে চান আপনারা? যা করার তার সবকিছুই সে করে ফেলেছে। কি লাভ হয়েছে এখন তাকে ধরে?' বলল এস এস সেন।

'আপনি ঠিকই বলেছেন। তাকে ধরে আমেরিকায় কোন লাভ আমরা করতে পারবো না। কিন্তু আমরা একটা প্রতিশোধ তো নিতে পারলাম! আমরা দুর্বল হয়ে পড়িনি তাও বোঝানো গেল।' বলল জেনারেল শ্যারন।

'কিন্তু এর মূল্যটা অনেক বড় দিতে হবে। তাকে ধরে মার্কিন সরকারকেই একটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়া হয়েছে। এ চ্যালেঞ্জ অবশ্যই মার্কিন সরকার গ্রহন করবে। তার ফলে আপনাদের মুভমেন্ট এবং আহমদ মুসাকে বাইরে কোথাও সরিয়ে নেয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াতে পারে।'

'কিন্তু যে কোন মূল্যের চেয়ে আহমদ মুসা আমাদের কাছে মূল্যবান। তাকে নিয়ে আমেরিকার হয়তো দর কষাকষির কিছু নেই বটে, কিন্তু এশিয়ায় আছে। তাকে হত্যা করলে আমাদের জাতি যেন একটা স্থায়ী বিপদ থেকে মুক্ত হতে পারে, তেমনি তাকে হত্যা না করার শর্তে এশিয়া ও আফ্রিকার মুসলিম দেশগুলোর কাছ থেকে বড় বড় স্বার্থ আদায় হতে পারে। এমনকি ফিলিস্তিন উপকূলে 'গুড হোপ' দ্বীপে ইসরাইল রাষ্ট্রের নতুন যে প্রতিষ্ঠা হয়েছে তার প্রতিও স্বীকৃতি আমরা আদায় করতে পারি। তা পারা সম্ভব হলে ফিলিস্তিনের উপরও গিয়ে ইসরাইল রাষ্ট্রের পরোক্ষ অধিকার বর্তাবে।' বলল জেনারেল শ্যারন।

'কিন্তু সেটা করতে হলে তো আহমদ মুসাকে আমেরিকার বাইরে নেয়া চাই।' বলল এস এস সেন।

'আহমদ মুসাকে যদি কোন রকমে ইসরাইল দুতাবাসে নেয়া যায়, তাহলে সহজেই বাইরে পাচার করা যাবে।' ডেভিড উইলিয়াম জোনস বলে উঠল।

'খবরদার, এখন তাকে ইসরাইল দুতাবাসে নেয়ার নামও করবেন না। যে জায়গাগুলোতে সরকার এখন সার্বক্ষনিক চোখ রেখেছে, তার মধ্যে অবশ্যই

শীর্ষে আছে ইসরাইল দুতাবাস। তাদের নজর এড়িয়ে এখন সেখানে একটা সুঁচও পাচার করতে পারবেন না।' বলল এস এস সেন।

'ধন্যবাদ। আমরা সেটা আঁচ করেছি বলেই সেদিকে না গিয়ে আপনার আশ্রয়ে এসেছি।'

'আপনাদের সেবা করার এটুকু সুযোগ দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ।'

বলে একটু থেমে একটু চিন্তা করে এস এস সেন পুনরায় বলে উঠল, অবশ্য আমি অনেকটা একক সিদ্ধান্তেই এটা করেছি। আমাদের কম্যুনিটি ফোরামে একটা ফরমাল সিদ্ধান্ত এ ব্যাপারে হওয়া দরকার।'

'কেউ কি আপত্তি করতে পারে বলে মনে করেন?' জিজ্ঞেস করল উইলিয়াম জোনস।

'সে রকম সম্ভাবনা নেই। আপনাদের সাথে আমাদের ভারতের সম্পর্কতো আজকের নয়, সেই আদিকালের। ভারত নানা ভাবে কৃতজ্ঞ আপনাদের কাছে। ভারতের আজকের যে পারমানবিক শক্তি, কনভেশনাল অস্ত্র তৈরীতে যে উন্নতি, তার ভিত্তিতো আপনারাই গড়ে দিয়েছেন। আপনাদের সহযোগিতা না পেলে বহু আগেই আমাদের কাশ্মীর থেকে পাততাড়ি গুটাতে হতো। আমাদের কম্যুনিটির কেউই এসব কথা তুলতে পারে না। তাছাড়া ইতিমধ্যেই আমি অনেকের সাথে আলোচনা করেছি। তারা সকলেই সোৎসাহে এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। সুতরাং চিন্তার কিছু নেই।'

'ধন্যবাদ মিঃ সেন।' বলল ডেভিড উইলিয়াম জোনস।

'আরেকটা কথা মিঃ জোনস, আপনারা আহমদ মুসাকে কিডন্যাপ করেছেন, এটা কি আপনারা কাউকে বলেছেন বা এ সম্পর্কে কোন ঘোষনা দিয়েছেন?' জিজ্ঞেস করল এস এস সেন।

'মাথা খারাপ! আমরা স্বীকার করতে যাব কেন? বরং আমরা আমাদের মিডিয়াকে বলে দিয়েছি, আমরা আমাদের সন্দেহ করার প্রতিবাদ করছি, এটা যেন তারা জানিয়ে দেয়। তাছাড়া তারা যেন এ রকম স্টোরী করে যে, আহমদ মুসা ইহুদী বিরোধী তার স্বার্থ হাসিল করারা পর নিজের ইচ্ছাতেই আত্মগোপন

করেছে। এটা তার পুরনো অভ্যাস। যে জায়গাতেই তার মিশন শেষ হয়ে যায়, সেখান থেকে সে এভাবেই সরে পড়ে।' বলল জেনারেল শ্যারন।

'ব্রাভো! ব্রাভো! অনেক ধন্যবাদ আপনাদের। তারা বিশ্বাস করবে না একথা ঠিক। কিন্তু আপনাদেরও নির্দোষ দাবী করার একটা পথ হলো এর ফলে। জনগনের অন্তত একটা অংশকে বুঝ দেয়ার মত একটা কথা পাওয়া গেল।' এস এস সেন বলল।

কথা শেষ করেই উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে এস এস সেন বলল, 'এখনকার মত উঠি।'

'অবশ্যই। অনেক সময় দিয়েছেন। অশেষ ধন্যবাদ।'

বাইরের ড্রইং রুম থেকে বেরিয়ে গেল এস এস সেন।

লিফটটি বেজমেন্ট লাইব্রেরীর প্রায় দরজায় এসে দাঁড়ায়।

শশাংক সেন ও সাগরিকা সেন লিফট থেকে লাইব্রেরীর দরজায় নামল।

শশাংক সেন শিব শংকর সেনের একমাত্র ছেলে এবং সাগরিকা সেন তার একমাত্র মেয়ে।

দুই ভাইবোনের মধ্যে সাগরিকা সেন বড় এবং শশাংক সেন বয়সে ছোট।

দুজনেই ওয়াশিংটন স্টেট ইউনিভার্সিটির ছাত্র। একজন ইতিহাস ও একজন কম্পিউটার বিজ্ঞানের ছাত্র।

সাগরিকা সেন ইতিহাস এবং শশাংক সেন কম্পিউটার বিজ্ঞানে পড়ে।

মাঝে মাঝেই বেজমেন্টের লাইব্রেরীতে তাদের আসতে হয়।

বাড়ির আন্ডারগ্রাউন্ড দুটি ফ্লোর বাড়ির উপরের অংশের একদম বিকল্প হিসাবে গড়ে তোলা হয়। বোমায় যদি বাড়ির উপরের অংশ সম্পুর্ন উড়ে যায় তাহলেও প্রাত্যহিক জীবন পরিচালনার সবকিছু সহ আন্ডার গ্রাউন্ড ফ্লোর দুটি অবশিষ্ট থাকবে।

আন্ডার গ্রাউন্ড দুটি ফ্লোরের উপরেরটি স্টোর, কিচেন, অফিস ইত্যাদি। আর নিচের ফ্লোরটি শয়ন, লাইব্রেরী, ড্রইং এবং পারমানবিক ধ্বংসযজ্ঞ সময়ের জন্যে বিশেষভাবে তৈরী আশ্রয় কেন্দ্র নিয়ে গঠিত।

দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য ধরনের বই পুস্তক, ডকুমেন্ট রাখা হয়েছে আন্ডার গ্রাউন্ড ফ্লোরের লাইব্রেরীতে। এসব বই ও ডকুমেন্টের খোঁজেই তার প্রায়ই আসতে হয় আন্ডার গ্রাউন্ড ফ্লোরের লাইব্রেরীতে।

সাগরিকা সেন ও শশাংক সেন দুই ভাই বোন আজ দুষ্প্রাপ্য সেই বইয়ের খোঁজেই আন্ডার গ্রাউন্ড লাইব্রেরীতে এসেছে।

লাইব্রেরীর দরজা খুলতে খুলতে সাগরিকা সেন বলল, 'মনটা আজ ভাল লাগছে না। মনে হচ্ছে মাথায় যেন অশ্বস্তিকর বোঝারএকটা চাপ। বাবা কেন বাড়তি বোঝা মাথা পেতে নেন।'

'তুমি কিসের কথা বলছ দিদি, বুঝলাম না আমি?' বলল শশাংক সেন।

'ভুলে গেলে কেমন করে এরই মধ্যে। বাবা একজন বন্দীকে এন রেখেছেন না বেজমেন্টের এই ফ্লোরে!' সাগরিকা বলল।

'না ভুলিনি। এখন বুঝতে পেরেছি।'

বলে একটু থেমেই আবার বলল শশাংক সেন, 'সত্যিই বলেছ দিদি, আমার মনে হচ্ছে কি জান? মনে হচ্ছে এই ফ্লোরটা যেন এখন আর আমাদের নয়। কেমন একটা পর পর লাগছে।'

'ঠিক বলেছ শশাংক, এই অনুভূতিটা আমারও।' বলল সাগরিকা সেন।

'আসলে ঘটনাটা কি দিদি? কে এই বন্দী? কেন বন্দী? এবং আমাদের এখানে কেন?'

'মা বলতে চাচ্ছেন না। তবে মার সাথে বাবার কথা বার্তা আড়াল থেকে যতটুকু শুনেছি এবং মা দু একটা কথা যা বলেছেন, তাতে বুঝেছি বন্দীটি ডেভিড জোনস আংকেলদের। ওদের অসুবিধার কারনে বাবা সাময়িক আশ্রয় দিয়েছেন মাত্র।'

'ডেভিড জোনস আংকেল মানে এ বন্দী তাহলে ইহুদীদের।' বিস্ময় জড়িত কন্ঠে বলল শশাংক সেন।

একটু থেমে ঢোক গিলে আবার কথা বলে উঠল শশাংক সেন। বলল, 'তুমি গত কয়েকদিনের নিউজ লক্ষ্য করেছ দিদি?'

'কোন নিউজের কথা বলছ?' বলল সাগরিকা সেন।

'ঐ যে আহমদ মুসার উপর ষড়যন্ত্রের ব্লেম দিয়ে খবর বেরুল। খবরটা যদিও ছিল পত্রিকাগুলোর এক্সক্লুসিভ আইটেম, তবুও বোঝা গেছে খবরটার সরবরাহকারী ছিল ইহুদীরা। একদিন পর এই খবরের প্রতিবাদ বের হলো। দারুন চাঞ্চল্যকর। তাতে লস আলামোসের গোয়েন্দা সুড়ঙ্গসহ সবুকছুর জন্যে দায়ী করা হলো ইহুদী গোয়েন্দা সংস্থার ষড়যন্ত্রকে। খবরটা সাংঘাতিক হৈ চৈ এর সৃষ্টি করেছে।'

'আরও তো দারুন খবর বের হয়েছে কাল।' বলল সাগরিকা সেন।

'কোন খবরটার কথা বলছ দিদি?' জিজ্ঞেস করল শশাংক সেন।

'কেন জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন খুন হওয়ার কথা।' বলল সাগরিকা সেন।

'ও পড়েছি, পড়েছি। ও খুনের জন্যেও তো সরাসরি দায়ী করা হয়েছে ডেভিড জোনস আংকেল ও জেনারেল শ্যারন নামে ইহুদী গোয়েন্দা সংস্থার একজনকে।' শশাংক সেন বলল।

'তাহলে তো দেখা যাচ্ছে, ইহুদী গোয়েন্দা সংস্থা মানে ইহুদীরা অনেকগুলো ষড়যন্ত্রের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ল। আচ্ছা শশাংক, বিজ্ঞানী জন জ্যাকবের ব্যাপারটা কি? তুমি দ্বিতীয় দিনে প্রতিবাদমূলক যে নিউজের কথা বললে তাতে তো হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেয়া হয়েছে। গোয়েন্দা সুড়ঙ্গ তৈরী করেছে ইহুদী বিজ্ঞানী জন জ্যাকব এবং তিনি লস আলামোস থেকে গবেষণা তথ্য অব্যাহতভাবে পাচারও করেছেন ঐ গোয়েন্দা সুড়ঙ্গ দিয়ে। এ ঘটনা সত্য হলে তো তা বিড়াট ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।' বলল সাগরিকা সেন।

'বিরাট ব্যাপারই তো! বিজ্ঞানী জন জ্যাকবের মত লোক যদি ইহুদী স্বার্থের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করে থাকে, তাহলে কোন ইহুদীকে আর বিশ্বাস করা যাবে? এ প্রশ্ন কোন আমেরিকানই এড়িয়ে যেতে পারবে না।' শশাংক সেন বলল।

লাইব্রেরীর একটা ডেস্কের চেয়ারে বসতে বসতে সাগরিকা সেন বলল, 'নিউজে যেসব প্রমাণের কথা তুলে ধরেছে তা অকাট্য। আমি বুঝতে পারছি না হঠাৎ করে এমন সেনসিটিভ নিউজ এভাবে পত্রিকায় এল কেন? তাও আবার সরকারী সুত্রে নয়। 'ফ্রি আমেরিকা' ও 'হোয়াইট ঈগলে'র মত সংগঠন এসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে, সরকার নয় কেন?'

'দিদি, প্রথম দিনের নিউজে মনে হয় এর উত্তর আছে। প্রথম দিনের নিউজে ইহুদীদেরকে ব্লেম দেয়া, ইহুদীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করারা জন্যে আহমদ মুসার সাথে 'ফ্রি আমেরিকা' ও 'হোয়াইট ঈগল'কে দায়ী করা হয়েছিল। এমনকি বলা হয়েছিল, আহমদ মুসার অর্থের লোভে এ দুই সংগঠন আহমদ মুসার দিকে চলে গেছে। আরও বলা হয়েছিল, মৌলবাদী আহমদ মুসা সরকারের উপরও ভর করেছে। এতেই সম্ভবত ক্ষিপ্ত হয়ে 'ফ্রি আমেরিকা' ও 'হোয়াইট ঈগল' একবারে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছে।' বলল শশাংক সেন।

শশাংক ও সাগরিকা মুখোমুখি বসেছে।

'ফ্রি আমেরিকা' খুব পপুলার সংগঠন। সবাই জানে, প্যাট্রিওটদের এ সংগঠনটি দেশের স্বার্থ ছাড়া অন্য কোন স্বার্থে কাজ করে না। 'হোয়াইট ঈগল'ও আগে বর্ণবাদী সংগঠন ছিল, এখন তা আর নেই। এদের ছোবল দেয়া ইহুদীদের ঠিক হয়নি।' বলল সাগরিকা সেন।

'ঠিকই হয়েছে দিদি। সত্য প্রকাশের একটা পথ হয়েছে। ওদের ছোবল না দিলে ইহুদীদের এ ষড়যন্ত্রের কথা এভাবে জনসমক্ষে আসতো না।' শশাংক সেন বলল।

'এভাবে 'ইহুদীদের' বলে সব ইহুদীদের এক সাথে শামিল করা ঠিক নয়।' বলল সাগরিকা সেন।

'ঠিক দিদি। দেশের মেজরিটি ইহুদী এ ষড়যন্ত্রে সাথে নেই। কিন্তু বাস্তবতা হলো বদনামটা তাদেরকেও স্পর্শ করবে। নির্দোষ হয়েও অনেকে দুর্ভাগ্যের শিকার হবে।'

'অন্যের কথা না ভেবে, আমাদের নিজেদের কথাটাই ভাব না শশাংক। খুনের দায়ে অভিযুক্ত সেই মিঃ ডেভিড জোনসই আমাদের বাড়িতে এন্ট্রান্স পেয়ে গেল।'

'না সে তো পায়নি।'

'একই কথা। তার বন্দীকে আশ্রয় দেয়ার অর্থ কি? অর্থ কি এটা নয় যে আমরা মিঃ ডেভিড জোনসের পক্ষ নিলাম?'

'ঠিক বলেছ দিদি। ড্যাডি এটা কোন বিবেচনায় করলেন বুঝতে পারছি না। তিনি তো এসব ব্যাপারে খুবই সতর্ক।'

'সতর্ক বটে, কিন্তু তুমি তো জান, আমাদের পিতৃভূমি ভারতের সাথে ইসরাইল রাষ্ট্র ও ইহুদীদের সম্পর্ক খুবই গভীর এবং পুরোনো। অনুকূল, প্রতিকূল কোন অবস্থাতেই এই সম্পর্ক নষ্ট হয়নি। আমেরিকাতেও ইহুদীরা ভারতীয়দের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। ভারতীয়রা যে আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসায়-বানিজ্যে দ্বিতীয় অবস্থানে উঠে আসতে পেরেছে তার পেছনেও ইহুদীদের আন্তরিক সহযোগিতা রয়েছে।'

'কিন্তু তাই বলে জলজ্যান্ত ক্রাইমের সাথে তো আপোস করা যায় না। তাও সাধারন ক্রাইম নয়, দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। যা পরিস্কার রাষ্ট্রদ্রোহিতার পর্যায়ে পড়ে।'

'ড্যাডি ওদের একজন বন্দীকে আশ্রয় দিয়েছেন, এর বেশী তো আর কিছু করা হয়নি। সম্ভবত বন্দীকে রাখার মত ওদের কোন জায়গায়ই আজ আর নিরাপদ নয়। এই অবস্থায় ওদের একটা অনুরোধ আমাদের রক্ষা করতে হয়েছে। এমন ক্ষেত্রে তো 'না' বলা যায় না।'

'বন্দী লোকটা কে? কেন বন্দী সে?' প্রশ্ন করল শশাংক সেন।

'কথা প্রসঙ্গে মাকে একবার বলতে শুনেছি যে, বন্দীকে নাকি কোন শূল্য দিয়ে মাপা যাবে না, এমন অমূল্য সে। ইহুদীদের সকল দুর্ভাগ্যের কারনও নাকি এই লোকটাই।' বলল সাগরিকা সেন।

'তুমি যে বর্ণনা দিলে দিদি, তাতে তো লোকটিকে দেখতে ইচ্ছা করছে। অমূল্য বন্দীটি দেখতে তাহলে কেমন!'

'ঠিক বলেছ শশাংক। মা'র মুখ থেকে শোনার পর আমার মধ্যেও এই কৌতুহলের সৃষ্টি হয়েছে। একজন মানুষ এমন অমূল্য হতে পারে কেমন করে! আর একজন মাত্র একটা জাতির সকল দুর্ভাগ্যের কারণ হতে পারে কিভাবে! কিন্তু দেখার সুযোগ কিভাবে হতে পারে বলত?'

চিন্তা করছিল শশাংক সেন।

একটু পর হাসল। বিজয়ীর হাসি। বলল, 'উপায় পেয়েছি দিদি।'

'উপায়টা কি?'

'উপায় হলো ভেন্টিলেটর। আমাদের পারমানবিক শেল্টারগুলোরই কোন একটাতে তাকে রাখঅ হয়েছে। আর আমাদের পারমাণবিক শেল্টারের প্রত্যেকটা মূল কক্ষ বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত। তার মানে চার দিকের যে কোন দিক দিয়ে ঘরে যাওয়া যায়। ঞ্চরের চার দেয়ালের তিন দেয়ালেরই প্রায় ছাদ সমান উঁচু জায়গায় তিনটি ভেন্টিলেটরের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু অন্য সময় ভেন্টিলেটর খোলা থাকার কথা। নিচে আমাদের অটো ল্যাডার আছে। সেটা দিয়ে উপরে উঠে ভেন্টিলেটর দিয়ে সহজেই আমরা ঘরের ভেতর দেখতে পারি।'

সাগরিকা সেনেরও মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'ধন্যবাদ শশাংক। খুঁজে পেতে তুমি একটা ভাল পথ বের করেছ। চল ওঠ, এখনি যাব।'

সোৎসাহে সংগে সংগেই উঠে দাঁড়াল শশাংক। সাগরিকাও উঠল।

অটো ল্যাডারটি তারা দুজনে শেল্টারের পেছনের দেয়ালে নিয়ে এল।

পরপর পাঁচটি ঘর। অথবা বলা যায় একটা বড় কক্ষকে পাঁচটি কক্ষে বিভক্ত করা হয়েছে।

একদম শেষের ঘর থেকে বন্দী অনুসন্ধান শুরু করার সিদ্ধান্ত নিল তারা দুজন।

অটো ল্যাডারে একসাথে দুজন উঠা যায়। ল্যাডারে অটোমেটিক কন্ট্রোল প্যানেল রয়েছে। ল্যাডারে বসেই তারা অটো কন্ট্রোল প্যানেলের একটা কি'তে চাপ দিল এবং ল্যাডার বক্সকে পেছনের দেয়ালের এমন জায়গায় সেট করল যেখান থেকে দাঁড়িয়ে ভেন্টিলেটর দিয়ে ঘরের ভেতরটা পুরোপুরি দেখার সুযোগ নেয়া যায়।

তাদের প্রথম উদ্যোগই সাফল্যের মুখ দেখল। ভেন্টিলেটরে দুজন চোখ লাগাতেই বন্দীকে ঘরের মেঝেতে একটা খাটিয়ায় শোয়া অবস্থায় দেখতে পেল।

বন্দীর মাথাটা বিপরীত দিকে থাকায় তারা বন্দীর মুখসহ গোটা চেহারাটাই দেখতে পেল। বন্দীকে দেখে তারা দুজনেই হতাশ হলো।

বিশল দেহের, বিকট চেহারার কাউকে দেখবে এ রকমই তারা আশা করেছিল। তারা আরও আশা করেছিল, বন্দীকে ক্রুদ্ধ চেহারা বা হতাশ বদন নিয়ে বসে থাকতে দেখবে। তার বদলে তারা দেখল একজন ভদ্রলোককে, যাকে এই বন্দীখানার চেয়ে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশে তাদের পাশে মানায় বেশী। ক্রুদ্ধ বা হতাশার বদলে প্রসন্ন মুখ নিয়ে শুয়ে আছে। তার চেহারার প্রসন্নতা ও নিরুদ্বিগ্নতা দেখে মনে হচ্ছে সে যেন তার নিজের ঘরে নিজের বেডে শুয়ে একটু রেস্ট নিচ্ছে।

'এমন ভদ্র একজন ছেলে সাংঘাতিক বিপজ্জনক বন্দী কি করে হয়?' বলল শশাংক সেন।

'আমাদের ভুল হচ্ছে না তো? বন্দী হয়তো অন্য কোথাও আছে, যাকে দেখছি সে মনে হয় বন্দী নয়।' বলল সাগরিকা সেন।

'হতে পারে। তাহলে অন্য ঘরগুলো কি দেখব?' বলল শশাংক সেন।

'না এখন নয়, পরে আসব। এর মধ্যে জানার সুযোগ হতে পারে যে, বন্দী ছাড়া আরও কেউ আছে কি না।'

'ঠিক আছে। তাহলে চল দিদি। খবর নিয়ে পরেই আসা যাবে।'

ল্যাডার বক্স চালিয়ে দুজনে নেমে এল নিচে।

ফিরে এল তারা লাইব্রেরীতে।

# ৩

জেনারেল শ্যারন বলছিল, 'মিঃ আহমদ মুসা আপনি আমাদের জানেন, আমরাও আপনাকে জানি। আমরা আপনার সাথে একটা সন্ধিতে আসতে চাই, যদি আপনি রাজি হন।'

জেনারেল শ্যারন ও ডেভিড উইলিয়াম জোনস দুজনে আহমদ মুসার সামনে দুটি চেয়ারে বসে ছিল। দুজনের হাতেই রিভলবার। আর তাদের পেছনে আরও চারজন আহমদ মুসার দিকে স্টেনগান তাকক করে দাঁড়িয়ে আছে।

আহমদ মুসা বসে আছে তার খাটে দু পা উপরে তুলে অনেকটা যোগাসনের মত।

আহমদ মুসার গায়ে টি-সার্ট। পরনে ঢিলা ঢালা একটা ট্রাউজার। সেদিন সারা জেফারসনের বাড়িতে সকালে এই পোশাক পরেই নাস্তার পরে ঘুমিয়ে ছিল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার টি সার্ট ও ট্রাউজারে কোথাও কোথাও রক্তের দাগ।তার বাহু, বাজু, ঘাড়ে কয়েকটা ছোট ব্যান্ডেজ দেখা যাচ্ছে। টি- সার্ট ও ট্রাউজারের নিচে এ ধরনের আরও ব্যান্ডেজ আছে।

জেনারেল শ্যারন কথা বলছিল। আহমদ মুসা ভাবলেশহীন, নির্লিপ্ত। সে যেন জেনারেল শ্যারনের কথা শুনছিল না। তার কথা আহমদ মুসার কানে ঢুকছিল মাত্র।

জেনারেল শ্যারনের কথা শেষ হলেও আহমদ মুসা জবাবে কোন কথা বলল না। উত্তর দেবার কোন ভাবও তার চেহারায় নেই।

একটু অপেক্ষা করে জেনারেল শ্যারনই আবার বলে উঠল, 'মিঃ আহমদ মুসা আপনার সাথে আমাদের লোকরা যে আচরন করেছে আমরা তার জন্যে দুঃখিত। বলুন, ওদেরই বা দোষ কি? যুক্তরাষ্ট্র ছিল গোটা দুনিয়ায় আমাদের সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়। সে আশ্রয়ে আপনি আগুন দিয়েছেন।আমাদের লোকরা

কেমন করে নিজেদের সামলাবে বলুন? এই কারনে সেদির জ্ঞান ফেরার সাথে সাথে ওরা ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত আপনার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আমরা উপস্থিত থাকলে এমনটা হতে পারতো না। যাক, এ ধরনের অনাকাঙ্খিত গন-পিটুনির জন্যে আমরা দুঃখিত।' থামল জেনারেল শ্যারন।

শ্যারন যে কথা বলেছে সেটা ঠিক। সেদিন আহমদ মুসাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় কিডন্যাপ করে ইহুদী গোয়েন্দা সংস্থার একটা নামহীন ঘাঁটিতে নিয়ে তোলে। তারপর সংজ্ঞাহীন আহমদ মুসাকে রেখে জেনারেল শ্যারন ও জোনস গিয়েছিল জরুরী একটা বিষয়ে আলোচনার জন্যে পাশেই। ইতিমধ্যে আহমদ মুসার জ্ঞান ফিরে আসে। এই সুযোগে শ্যারন ও জোনসের উত্তেজিত লোকরা আহমদ মুসার উপর চড়াও হয়। ব্যাপারটা ঘটে মধ্যযুগীয় ইউরোপের রাজা-বাদশাহদের কায়দায়। তারা যেমন অনেক আসামীকে ক্ষুধার্ত নেকড়ের হাতে ছেড়ে দিত। তারপর দেখত নেকড়ের দ্বারা কিভাবে তাদের দেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়। আহমদ মুসার দেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়নি বটে, কিন্তু অমানুষিক ভাবে নির্যাতিত হয়েছে সে। আহমদ মুসা আবার জ্ঞান হারালে তবেই লোকেরা ক্ষান্ত হয়। তবে এটা ঠিক শ্যারনরা এস তাকে দেখার পর তারা ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা করে।

এবার জেনারেল শ্যারন থামতেই আহমদ মুসা বলল, 'মেকি দুঃখ প্রকাশের কোন প্রয়োজন নেই জেনারেল শ্যারন। আপনারা যাই করছেন তা আপনাদের পরাজয়ের কারন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আপনারা যা করেছেন, একটা পরাজিত বাহিনী এটাই করে থাকে। আপনাদের এই অধঃপতনের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করতে হয়।'

জেনারেল শ্যারনের দুটি চোখ জ্বলে উঠেও আবার নিভে গেল। মুখে কষ্টে-সৃষ্টে হাসি টেনে বলল, 'রাগ করেছেন আহমদ মুসা? আপনার মেজাজ ভাল করার জন্যে কিছূ সুখবর আপনাকে শোনাতে পারি।'

বলে একটু থেমেই আবার শুরু করল, 'আপনার নতুন প্রেমিকা সারা জেফারসন আপনাকে হারিয়ে পাগলের মত হয়ে গেছে। তাকে হাসপাতালে নিতে হয়েছে। তার টেনশন কমানোর জন্যে তাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হচ্ছে। তার 'ফ্রি আমেরিকা' পাগল হয়ে উঠেছে আপনাকে উদ্ধারের জন্যে।

অন্যদিকে মার্কিন সরকার রাষ্ট্রীয়ভাবে কেসটাকে গ্রহন করেছে। আপনাকে উদ্ধারের জন্যে পুলিশ, এফবিআই, সিআইএ, সেনাবাহিনী, কোস্টাল গার্ড, সীমান্ত রক্ষী প্রভৃতি সকল বাহিনীতে জরুরী অবস্থা ঘোষনা করা হয়েছে। তারা চষে ফিরছে গোটা দেশ। ইহুদীদের কোন সংস্থা, প্রতিষ্ঠান তারা সার্চ করতে বাদ রাখেনি। সীমান্ত সীল করা হয়েছে শুরুতেই। আপনি ভাগ্যবান আহমদ মুসা। মার্কিন সরকার আপনাকে ধরার জন্যে এক সময় যে শক্তি নিয়োগ করেছিল, তার শতগুন শক্তি তারা নিয়োগ করেছে আপনাকে উদ্ধারের জন্যে।' থামল জেনারেল শ্যারন।

শ্যারন থামতেই মুখে হাসি টেনে উইলিয়াম জোনস বলে উঠল, 'যা বলেছেন তার চেয়েও আহমদ মুসা ভাগ্যবান। সারা জেফারসন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঘোষিত ফার্স্টলেডি। যার ফার্স্ট পারসন নেই। এই ফার্স্ট পারসন হওয়ার জন্যে অনেক আমেরিকান বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করতে রাজি। আহমদ মুসা বিনা পয়সায় শুধু তাকে নয়, তার হৃদয়টাও পেয়ে গেছেন।'

'মিঃ ডেভিড উইলিয়াম জোনস আমি আপনাকে ভদ্রলোক মনে করতাম। কিন্তু কিছু না জেনে শুনে অশ্লীল কথা বলতে পারেন এই বয়সে তা জানতাম না। মিস জেফারসন একজন সম্মানিতা আমেরিকান। আপনি আমেরিকান হিসাবে তার মর্যাদা রাখা আপনার উচিত ছিল।' বলল বিক্ষুব্ধ কন্ঠে আহমদ মুসা।

'আমি আর আমেরিকান হতে পারলাম কই। ইহুদীই তো থেকে গেলাম। সুতরাং সে উচিত্যবোধের তোয়াক্কা আমি করি না।' বলল ডেভিড জোনস।

'ইহুদী হলেও ভদ্র হতে তো দোষ নেই।' বলল আহমদ মুসা।

'মুখ সামলে কথা বলুন মিঃ আহমদ মুসা। আপনি আমাদের বন্দী ভুলে যাবেন না।' বলল ডেভিড জোনস।

ডেভিড জোনস থামতেই জেনারেল শ্যারন বলে উঠল আহমদ মুসাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই, 'আমাদের আলোচনা অনেকখানি অন্য দিকে চলে গেছে। আমার মনে হয় মিঃ জোনস আমরা আলোচনায় ফিরে যেতে পারি।'

বলেই সে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আহমদ মুসা আমার প্রশ্নে আমি ফিরে যাচ্ছি। আমি বলছিলাম, 'আমরা আপনার সাথে একটা সন্ধিতে আসতে চাই। আপনার মত কি?'

আহমদ মুসা মনে মনে হাসল। মনে মনেই বলল, জেনারেল আমার সাথে সন্ধিতে আসতে চায়, এর চেয়ে ফেরেববাজী আর কি হতে পারে। তবু মুখে বলল, 'কি সন্ধি মিঃ শ্যারন? সন্ধি তো হয় যুদ্ধক্ষেত্রে। কিন্তু আমি তো আপনাদের বন্দী। বন্দীর কাছে সন্ধির প্রস্তাব কিসের?'

'আপনি বন্দী হলেও বন্দী নন। আপনি লড়াইয়ের ময়দানে আছেন, আমরাও। সুতরাং সন্ধি হতে পারে।' বলল জেনারেল শ্যারন।

'এই তো মিঃ জোনস এখনই বললেন আমি বন্দী আমি যেন এ কথা ভুলে না যাই।' আহমদ মুসা বলল। তার মুখে হাসি।

হাসল ডেভিড জোনসও। বলল, 'ঠিকই বলেছি। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, আপনি বন্দী মানেই বন্দী। আনি বন্দী হয়েও মুক্ত মানুষের চেয়ে শক্তিশালী। সে কথাই জেনারেল শ্যারন আপনাকে বলছেন।'

'আমি কি করতে পারি বলুন।' জেনারেল শ্যারনদের দিকে তাকিয়ে বলল আহমদ মুসা।

'একটা সন্ধিতে আসতে পারেন।' জেনারেল শ্যারন বলল।

'কি সন্ধিতে?'

'আমরা কিছু পেতে চাই এবং কিছু দিতেও চাই।'

'কি পেতে চান?'

'আমাদের ইসরাইল রাষ্ট্রের উৎখাতের পর হাইফা থেকে ৫০ মাইল সাগরের ভেতরে ফাক্কো বা 'গুড হোপ' দ্বীপে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত আছে, আপনি জানেন। আমাদের দাবী হলো এক. 'হাইফা থেকে তেল আবিব' পর্যন্ত এই এক চিলতে উপকূল ভুমি আমাদের দিতে হবে। দুই. ইসরাইল দখলে নেবার সময় ফিলিস্তিনিরা যে 'সেন্ট্রাল স্টেট লাইব্রেরী ও আরকাইভ' দখল করেছে, সেটা আমাদেরকে যেমন ছিল তেমন ফেরৎ দিতে হবে। তিন. আপনি আমেরিকা ত্যাগ

করবেন এবং তার আগে আমেরিকার সাথে আমাদের আপোশ করিয়ে দিয়ে যাবেন।'

আহমদ মুসা তাদের দাবী শুনে মনে মনে হাসল এবং বুঝল, ইহুদীরা কঠিন বেকায়দায় না পড়লে এমন প্রস্তাব নিয়ে তার কাছে আসতো না। বলল, 'আর আপনারা আমাকে কি দিতে চান?'

'বিনিময়ে আমরা আপনাকে মুক্তি দিতে চাই এবং শত্রুতার বদলে সহাবস্থান অফার করতে চাই।' বলল জেনারেল শ্যারন।

'আপনারা আমার মুক্তির যে বিনিময় দাবী করেছেন, আমার মূল্য অত নয় মিঃ শ্যারন।'

'মিঃ আহমদ মুসা আমাকে শেখাবার চেষ্টা করবেন না। আমরা আপনার বিনিময়ে সাবেক গোটা ইসরাইল রাষ্ট্র যদি দাবী করি, তাও পেতে পারি।'

'কেমন করে? কে দেবে?'

'আপনার প্রানের মূল্য সাবেক ইরাইল রাষ্ট্রের চেয়ে অনেক বেশী ফিলিস্তিন সরকারের কাছে।'

'এসব আপনাদের কল্পনা বিলাস। একজন ব্যক্তি একটা রাষ্ট্রের সমান হয় না, বিনিময় তো হয়ই না।'

'সেটা আমরা দেখব। আপনি রাজি কিনা বলুন?'

'আমার রাজি হওয়ার প্রশ্ন নেই। অন্যের সম্পত্তি, আমি দিতে রাজি হব কিভাবে?'

ফিলিস্তিন রাষ্ট্র অন্যের নয়। আপনি ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের জনক। জনকের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ফিলিস্তিন তার অর্ধেক ছেড়ে দিতে পারেই। আমরা অর্ধেক চাইনি। চেয়েছি হাইফা থেকে তেল আবিব পর্যন্ত ছোট্ট একটা করিডোর। এটা দেয়া তাদের জন্যে কিছুই নয়।'

'আমি আমার মুক্তি বা বাঁচার জন্যে ফিলিস্তিনের এক ইঞ্চি ভূমিও অন্য কারো হাতে দিতে রাজি হবো না।'

'বিষয়টা আপনার অবগতি ও সম্মতির জন্যে আপনার কাছে তুলেছিলাম। কিন্তু আপনি রাজি হওয়া, না হওয়াতে আমাদের কিছু এসে যায় না।

আমরা দাবী করবো ফিলিস্তিন সরকারের কাছে, আপনার কাছে নয়। দাবী পুরণ করবে ফিলিস্তিন সরকার, আপনি নন।'

'ভূমি ফিলিস্তিন সরকারের নয়, ফিলিস্তিন জনগনের। যাক সে কথা, আমার মুক্তির বিনিময়েও আমি আপনাদের ব্যাপারে কোন মিথ্যা কথা মার্কিন সরকারকে বলব না। সুতরাং তৃতীয় শর্তও আপনাদের পূরণ হবে না।'

'এ ব্যাপারে এখন আমরা আপনার সাথে কথা বলব না। আপনার মত ভবিষ্যতে পাল্টাতে পারে। একজন মানুষের কতদিন বন্দী থাকতে ভালো লাগে বলুন?'

'কিন্তু আমি বললেই কি আপনাদের ব্যাপারে মার্কিন সরকার ও জনগনের ধারনা পাল্টাবে, তাদের আগের বিশ্বাস ফিরে আসবে?'

'গনতন্ত্রে ব্যক্তি বা সরকার বড় কথা নয়। ব্যক্তি ও সরকার পাল্টালে নতুন সরকার এলে নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বিশ্বাসের মানদন্ড পাল্টে যায়। অবিশ্বাসী বিশ্বাসী হয়, আবার বিশ্বাসী অবিশ্বাসী হয়ে যায়। সেই জন্যেই তো গনতন্ত্র আমাদের কাছে এক প্রিয়।'

বলে জেনারেল শ্যারন একটু থামল তারপর বলল, 'আপনাকে শুধু বিজ্ঞানী জ্যাকবের ব্যাপারে বললেই চলবে। আপনি বলবেন, আপনার বিশ্বাস বিজ্ঞানী জন জ্যাকবের সময় সুড়ঙ্গটি গোয়েন্দা কাজে ব্যবহার হয়নি। তার অনুপস্থিতিকালে পরিবর্তন হতে পারে। বিজ্ঞানী জন জ্যাকবের উপর থেকে সন্দেহ চলে গেলে পরবর্তী কাজটা আমরা করতে পারব। মুক্তি যদি পেতে চান এই সহযোগিতাটা আপনাকে অবশ্যই করতে হবে।'

'আমার মুক্তির জন্যে আমি মিথ্যা কথা বলব একথা আপনারা ভাবলেন কি করে?' বলল বিদ্রূপকন্ঠে আহমদ মুসা।

হাসল জেনারেল শ্যারন। বলল, 'আপনার এই মনোভাব ভবিষ্যতে নাও থাকতে পারে। আপনি নিজ ইচ্ছাতেই আমরা যেভাবে বলব, সেভাবে আমাদের সহযোগিতা করবেন।'

'কেন করবো?' বিস্মিত কন্ঠে বলল আহমদ মুসা।

'কেন, বিজ্ঞান এত কিছু পারে, মানুষকে ইচ্ছা মত কথা বলাতে পারে না?'

'মানুষ যন্ত্রের দাস নয়, যন্ত্র মানুষের দাস। এজন্যেই পারে না।'

'ঠিক আছে, ভবিষ্যৎ কি বলে দেখবেন?' বলল ভাবলেশহীন কন্ঠে জেনারেল শ্যারন। এমন ভাব যেন নিশ্চিত ভবিষ্যৎটা সে দেখতে পাচ্ছে।

বিস্মিত হলো আহমদ মুসা।

বিজ্ঞান কথা বলাতে পারে ইচ্ছামত, এ কথার অর্থ কি? এমন যন্ত্র কি আবিষ্কৃত হয়েছে যা মানুষের উপর এমন প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে, যার ফলে যন্ত্র যেমনটা চায় সেভাবে মানুষকে কথা বলাতে পারে? হঠাৎ আহমদ মুসার মনে পড়ল ওমর বায়ার কথা। ওমর বায়ার প্রতিপক্ষরা যান্ত্রিক ইলেক্ট্রোওয়েভের মাধ্যমে ওমর বায়ার চিন্তাকে সম্পূর্ন ভিন্ন দিকে পরিচালিত করে তার কাছ থেকে স্টেটমেন্ট যোগাড়ের চেষ্টা করেছিল। এরাও কি এমন কিছুর ব্যবস্থা করেছে?

মনে মনে শিউরে উঠল আহমদ মুসা। আহমদ মুসাকে নির্যাতন করে মেরে ফেলা যাবে, কিন্তু তার কাছ থেকে কিছু আদায় করা যাবে না। এই আদায়ের জন্যে কে তারা ভিন্ন পথ নিয়েছে? এই জন্যেই কি আজ তারা মিষ্টি মিষ্টি কথা বলছে ও সন্ধির প্রস্তাব দিচ্ছে? ওমর বায়ার মত তার ক্ষেত্রেও কি এ ধরনের কোন ব্যবস্থা তারা গ্রহন করেছে? কি সে ব্যবস্থা? আহমদ মুসার মনে পড়ল হেলসিংকি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী অধ্যাপক বি. কন. চু-এর ১৩৪ পৃষ্ঠার দীর্ঘ প্রবন্ধের কথা। প্রবন্ধটির নাম, 'The Social Reality of Artificial Mind and Body Control.' এ প্রবন্ধের ভূমিকায় লিখেছেন, 'ইহুদীবাদীরা তাদের নিজেদের হাত নিরাপদ রাখার জন্যে 'মনোদৈহিক নিয়ন্ত্রণ' ব্যবহারের মাধ্যমে অন্যকে তারা বাঞ্চিত হত্যা ও অন্যান্য অপরাধ সংঘটনে বাধ্য করে। কেনেডি, রবার্ট কেনেডি, মার্টিন লুথার কিং, জর্জ ওয়ালেস প্রমুখের হত্যাকান্ড এই ব্যবস্থারই ফল। ইহুদীবাদ বিরোধী বহু নেতাকে রাজনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা বিসর্জন দিতে হয়েছে, এমনকি অনেকে জীবন দিয়েছে এই ব্যবস্থার ফাঁদে পড়েই।' বিজ্ঞানী চু-এর নিবন্ধ থেকেই আহমদ মুসার আরও মনে পড়ল 'মনোদৈহিক নিয়ন্ত্রণ'-এর ব্যাপারটা একটা জটিল বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় যাকে নিয়ন্ত্রণ করতে

চাওয়া হয় 'ব্রেইনওয়ে ট্রান্সমিশন' ও 'অপটোইলেক্ট্রনিক্যাল কন্ট্রোল' কৌশলের মাধ্যমে তার মানব দৈহিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে হয়। তবে আহমদ মুসার একটা কথা মনে পড়ল যে, এই নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা চরিত্রহীন বা শিথিল চরিত্রের লোকদের উপর যতটা কার্যকরীহয়, চুরত্রবান বা দৃঢ় চরিত্রের লোকদের উপর ততটা কার্যকরী হয় না। কিন্তু আহমদ মুসার এই জানাটা বহুদিন আগের। তারপর বিজ্ঞান অনেক দূর এগিয়েছে। নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থাতেও আরও পরিবর্তণ এসেছে। নিশ্চয় আরও কার্যকর করা হয়েছে এই ব্যবস্থাকে। এই ব্যবস্থাই কি তারা প্রয়োগ করবে তার উপর? আবার শিউরে উঠল আহমদ মুসা। এই অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে সে কিভাবে লড়াই করবে?

আহমদ মুসাকে অনেক্ষন কোন জবাব দিতে না দেখে জেনারেল শ্যারন বলে উঠল, 'কি কথা বলছেন না কেন মিঃ আহমদ মুসা? ভয় পেয়ে গেলেন নাকি?'

'ভয় নয়, ভাবছি ভবিষ্যতে কি দেখব তা নিয়ে।' বলল আহমদ মুসা।

'কিছুই দেখবেন না। কিছু করবেন মাত্র।' জেনারেল শ্যারন বলল।

'কিছু তো অবশ্যই করব, কিন্তু সেটা আপনারা বলছেন কি করে?' আহমদ মুসার প্রশ্ন।

'আমরা বলছি কারন, আমরা যা চাই, তাই আপনি করবেন।' জেনারেল শ্যারন বলল।

বলেই উঠে দাঁড়াল জেনারেল শ্যারন। বলল, 'চলুন মিঃ জোনস। আহমদ মুসাকে অনেক বিরক্ত করেছি আর নয়। আমাদের সন্ধি প্রস্তাব নিয়ে অবশ্যই উনি ভাববেন।'

উঠে দাঁড়াল ডেভিড উইলিয়াম জোনসও।

জেনারেল শ্যারন যাবার জন্যে ফিরে দাঁড়াতে গিয়ে বলল, 'মিঃ আহমদ মুসা আপনার বন্দী অবস্থাকে সুখদায়ক করতে সর্বোচ্চ যা করা যায়, তা আমরা করেছি। কোন অসুবিধা হলে বলবেন আমরা ভেবে দেখব।'

ওরা নিজ নিজ চেয়ার হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল। ওরা ঘর থেকে বের হবার সাথে সাথে ঘরের দরজাও বন্ধ হয়ে গেল।

রো চলে গেলে আরো অনেক চিন্তা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল আহমদ মুসার মাথায়।

বন্দীখানার এই সুব্যবস্থা আহমদ মুসার কাছ কিছুক্ষন আগ পর্যন্তও ভল লেগেছিল, কিন্তু সেই সুব্যবস্থা এখন আহমদ মুসার কাছে ষড়যন্ত্রমূলক বলে মনে হচ্ছে।

বন্দীখানায় তাকে আরামদায়ক বিছানা দেয়া হয়েছে।

বলা যায়, আনবিক বোমা প্রুফ একটি আশ্রয় কেন্দ্রে তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে।

এই কথা মনে হতেই একটা ভাবনা বিদ্যুত চমকের মত আহমদ মুসার মনে এসে প্রবেশ করল। এ ধরনের আশ্রয় কেন্দ্র থেকে বের হবারও একটা আন্ডারগ্রাউন্ড পথ থাকে। কারন, আণবিক বোমার আঘাতে উপরের সব কিছু যখন নষ্ট হয়ে যাবে, তখন আন্ডারগ্রাউন্ড আশ্রয়স্থল যতটা জরুরী, ততটাই জরুরী বের হবার জন্যে আন্ডার প্যাসেজ। সুতরাং এ আশ্রয় কেন্দ্রেরও নিশ্চয় সে ধরনের আন্ডার গ্রাউন্ড প্যাসেজ রয়েছে। খুশী হয়ে উঠল আহমদ মুসার মন।

এই সিদ্ধান্তে পৌঁছার সাথে সাথেই আহমদ মুসার মনে ঝড়ের মত প্রবেশ করল একটি চিন্তা। তাহলে কি মৃত পাখি বাইরের সম্ভাব্য আণবিক বিপর্যয়ের প্রতীক? মৃত পাখি একটাই দেখা যাচ্ছে। আর তা উপরের ফ্লোরের ছাদে চিহ্নিত এবং তা উপরে উঠে যাবার দরজা-চিহ্নিত স্থানে রয়েছে। এর অর্থ নিশ্চয় উপরে উঠার পথ ধ্বংস হয়ে যাওয়া বুঝাচ্ছে। এই ভাবনা থেকে আহমদ মুসার মনে হলো, নকশায় বের হবার মূল পথ বন্ধ বা বিনষ্ট দেখানো হয়ছে। অতএব আশ্রয় কেন্দ্র থেকে বের হবার বিকল্প পথও নিশ্চয়নকশায় চিহ্নিত থাকবে এবং সেখানে অবশ্যই পাখিকে দেখা যাবে। এই চিন্তার সাথে সাথেই তার মন বলে উঠল, তাহলে কি দক্ষিণ প্রান্তের দেয়ালে করিডোর যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে চিহ্নিত দরজাই বের হওয়ার গোপন পথ? সেখানে দরজা চিহ্নিত স্থানে একটা মুক্ত ডানার পাখি আঁকা রয়েছে। এখানে অঙ্কিত পাখি জীবিত ও মুক্ত ডানা অলা হওয়ার অর্থ নিশ্চয় এটাই যে, বের হবার জন্যে এ পথ নিরাপদ।

আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া আদায় করল আহমদ মুসা। তার এই চিন্তা ও অনুমান যদি সত্যি হয়, তাহলে এ জিন্দানখানা থেকে বের হওয়ার একটা উপায় সে পেয়ে গেছে।

আনন্দে মন ভরে গেল আহমদ মুসার।

এই প্রথমবারের মত নিজের বন্দী দশা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল আহমদ মুসা। সে এ বিজ্ঞানকে বিশ্বাস করে যে, বৈদ্যুতিক বা রেডিও ওয়েভ কিংবা অতিকার্যকরী কোন আলট্রাসনিক ওয়েভের ব্যবহার করে মানুষের চিন্তা ও মননে বৈকল্য এনে নতুন পথে একে প্রবাহিত করার পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক ভাবে সম্ভব হতে পারে। এধরনের কমান্ড কম্পিউটার শুনলে মানুষের ব্রেনের কোষও শুনতে পারে। এখানেই আহমদ মুসার ভয়। হিপনোটাইজড হওয়ার মত অন্যের হাতের পুতুলে পরিনত হওয়ার কথা আহমদ মুসা চিন্তাই করতে পারে না। এমন দুর্ভাগ্য আমার আগেই তাকে মুক্ত হতে হবে। উঠে বসল আহমদ মুসা।

এ বন্দীখানা থেকে বের হবার যে পথের কথা সে চিন্তা করছে তা যে ঠিক, তা দেখতেও তাকে এই কক্ষ থেকে বের হতে হবে। কিন্তু বের হবার পথ কি?

এবার উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

দেখল নকশাটা আবার।

দুটি ফ্লোরের সবগুলো ঘরের মুক্ত ডানার পাখি আঁকা। এর অর্থ বুঝতে পারছে আহমদ মুসা, দরজা অতিক্রম করাই বের হবার একমাত্র পথ। দরজায় পাখির উপস্থিতি একথাই বলছে।

কিন্তু দরজা অতিক্রম করবে কিভাবে?

আহমদ মুসা এই ঘরে ঢুকার সময় লক্ষ্য করেছে, দরজা খুলেছে ও বন্ধ হয়েছে স্বয়ংক্রিয় ভাবে।

আহমদ মুসা ঘরের দরজা ও তার আশ-পাশ আবার গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করল, কোন গোপন সুইচ বা কোন বোতাম আছে কিনা।

না তেমন কিছুই কোথাও নেই। অনেক সময় দরজার বটম ফ্লোরে ওয়েট নিয়ন্ত্রিত স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা থাকে। এই চিন্তা করে দরজায় বটম ফ্লোরে অনেক

চাপাচাপি ও নাচানাচি করল, কিন্তু কোন ফল হলো না। দরজার দুপাশের সাইড ওয়াল এবং দরজার উপরের ওয়ালটাও অনেক টিপাটিপি করল আহমদ মুসা। কাজে এল না কিছুই।

হতাশ মনে আহমদ মুসা আবার ফিরে এল বিছানায়। ছুড়ে দিল দেহকে বিছানার উপর।

ভাবল, হতে পারে দরজা দুর নিয়ন্ত্রিত।

কিন্তু পরক্ষনেই লাফ দিয়ে উঠে বসল। আপন মনে বলল, এটা তো পারমাণবিক আশ্রয় কেন্দ্র। এখানে মূল ব্যবস্থাই থাকতে হবে ভেতর থেকে খোলার। সবাই ঘরে আশ্রয় নিলে বাইরে থেকে খোলার লোক পাবে কোথায়? আবার দৌড় দিল দরজার দিকে।

আতি-পাতি করে আবার খুঁজল, সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায় কিনা। না কিছুই পেল না।

তাহলে দেয়ালের অন্য কোন জায়গায় কি দরজা খোলার কোন ব্যবস্থা গোপন রাখা হয়েছে?

এ চিন্তার সাথে সাথে আহমদ মুসা আবার চার দেয়ালের পরীক্ষায় লেগে গেল। আতি-পাতি করে খুঁজল চার দেয়ালের প্রতিটি ইঞ্চি জায়গা। না কোথাও কিছু পেল না। দেয়ালগুলোতে টোকা দিয়েও দেখেছে, কোথাও ফাঁপা কেতান জায়গা আছে কিনা, যেখানে সুইচ বা বোতাম লুকানো থাকতে পারে। সেরকম জায়গা কোথাও পেল না। পরিশেষে আহমদ মুসা বিছানা উল্টিয়ে খাট সরিয়েও দেখল সন্দেহ করার মত কোথাও কিছু পাওয়া যায় কিনা? কিন্তু কোন কিছুই চোখে পড়ল না।

ক্লান্ত হয়ে পড়েছে আহমদ মুসা।

শুয়ে পড়ল আবার। বলল মনে মনে স্রষ্টার উদ্দেশ্যে, 'হে আল্লাহ, আমার চেষ্টা শেষ। এবার তোমার সাহায্যের প্রত্যাশা করছি। তুমি সাহায্য কর।'

প্রার্থনা শেষ হয়নি, এ সময় হঠাৎ আহমদ মুসার মনে উদয় হলো দরজাগুলোতে মুক্ত ডানার ক্ষুদে পাখিগুলোর সেটিং নিখুঁতভাবে দরজাগুলোর একই জায়গায়। অপরিকল্পিত বা রেনডম সেটিং হলে এরকম হবার কথা নয়।

কিন্তু পরিকল্পিত ভাবে একই জায়গায় একই কায়দায় পাখিগুলোর সেটিং কেন? এর মধ্যে কি ইংগিত আছে?

ভাবার সাথে সাথেই আহমদ মুসা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ছুটল দরজার দিকে।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল ক্ষুদে পাখিটার দিকে মুহূর্তকাল। তারপর 'বিসমিল্লাহ' বলে তর্জনি দিয়ে জোরে চাপ দিল পাখির উপর।

চাপ দেয়র সাথে সাথেই নড়ে উঠল দরজা। এক প্রকার হিস হিস শব্দ তুলে দরজাটি ডান দিকে সরে গিয়ে ঢুকে গেল ডান দিকের দেয়ালের ভেতর।

আনন্দের আকস্মিকতায় আহমদ মুসা কিছুক্ষনের জন্যে চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। পরক্ষনেই সাবধান হয়ে দুপা এগিয়ে বাইরে উঁকি দিল, দেখল বাইরে প্রশস্ত করিডোর। কেউ নেই।

নিরস্ত্র আহমদ মুসা অত্যন্ত সতর্ক হয়ে এক পা দুপা করে করিডোরে বেরিয়ে এল।

করিডোরটা পশ্চিমে অল্প গিয়ে শেষ হয়েছে।

আহমদ মুসা করিডোর ধরে দ্রুত পূর্বদিকে এগুলো। দেখা নকশাঅ থেকে আহমদ মুসা অনুমান করছে পূর্বমুখী এই করিডোরটাই তাকে নিয়ে যাবে দক্ষিনমুখী করিডোরে যা শেষ দক্ষিন প্রান্তের দেয়ালে চিহ্নিত আছে দরজা এবং অংকিত আছে মুক্ত ডানার অতিক্ষুদ্র সেই পাখি। যা তার জন্যে মুক্তির বার্তাবহ হতে পারে।

আহমদ মুসা যে ঘরে বন্দী ছিল তার অনুরূপ কয়েকটা ঘর পার হতেই করিডোরটা একটা প্রশস্ত চত্বরে গিয়ে পড়ল। তারও চারদিকে ঘর। আহমদ মুসা দেখতে পেল চত্বরটির দক্ষিন পাশ থেকে একটি করিডোর আরও দক্ষিন দিকে এগিয়ে গেছে।

খুশী হলো আহমদ মুসা। ওটাই তার বাঞ্চিত দক্ষিনমুখী করিডোর।

কিন্তু দক্ষিন থেকে তার দৃষ্টি সামনে প্রসারিত হতেই আনন্দটা উবে গেল। দেখল, যমদূতের মত দুই স্টেনগানধারী তাদের উদ্যত স্টেনগান তার দিকে তাক করে মাত্র গজ পাঁচেক দূরে কোত্থেকে যেন ভুতের মত আবির্ভূত হয়েছে।

স্টেনগানধারীরা চোখে পড়ার পর আহমদ মুসা এক মুহূর্তও বিলম্ব করেনি।

তার মাথাটা একটু পেছনে ঝুঁকে পড়তে দেখা গেল। তার সাথে তার দেহটা একটু চিৎ হলো। তারপর তার দুপা মেঝে ঘেঁষে বিদ্যুৎ গতিতে ছুটল পাশাপাশি দাঁড়ানো স্টেনগানধারীদের দিকে।

আহমদ মুসার দেহ যখন ঝুঁকে পড়ছিল, তখন গুলী বৃষ্টি শুরু হলো দুজনের স্টেনগান থেকেই।

কিন্তু যখন বুলেটের ঝাঁক আহমদ মুসার দেহ লক্ষ্য করে ছুটে এল, তখন আহমদ মুসার দেহ মেঝে স্পর্শ করে ছুটে যাচ্ছে দুই স্টেনগানধারীকে লক্ষ্য করে।

মুহূর্তেই দৃশ্যপট পাল্টে গেল।

আহমদ মুসার চলন্ত দেহটা স্টেনগানধারীদের পায়ে গিয়ে আঘাত করেছে।

দুজন স্টেনগানধারীর দেহ মেঝেতে ছিটকে পড়েছে। স্টেনগান খসে পড়েছে তাদের হাত থেকে।

আর আহমদ মুসা তাদের দুই স্টেনগান কুড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। দুজনের দিকে স্টেনগান তাক করে বলল, 'দুই হাত মাথার উপর তুলে উঠে দাঁড়াও।'

অনিচ্ছা সত্বেও দুহাত উপরে তুলে তারা উঠে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা তাদের লক্ষ্য করে বলল, 'আমি নির্দেশ দেব, সংগে সংগে তা পালন করবে। অযথা রক্তারক্তি আমি পছন্দ করি না, কিন্তু নির্দেশের অন্যথা হলে তারপর এক মুহূর্তও তোমরা বেঁচে থাকবে না। তোমরা অনেক বুলেট নষ্ট করেছ, আমার বুলেট কিন্তু একটাও নষ্ট হয় না মনে রেখ।'

কথাটা শেষ করেই আহমদ মুসা একবার চারদিকে তাকাল। তাকাতে গিয়ে দেখতে পেল তার বাঁ দিকের বন্দীখানার ঘরগুলোর পূর্ব-উত্তর কোণে একজন তরুণ ও একজন তরুণী মূর্তির মত স্থির দাঁড়িয়ে আছে। তাদের চোখগুলোও পাথরের মত স্থির।

আহমদ মুসা দু'ধাপ পেছনে সরে গিয়ে একটি স্টেনগানের ব্যারেল তরুণ-তরুনীর দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে ভয়ংকর ঠান্ডা কন্ঠে বলল, 'স্টেনগানের ট্রিগার আশা করি আমার টিপতে হবে না।'

বলেই আহমদ মুসা মাথার উপরে হাত তুলে দাঁড়ানো দুজনকে বলল, 'তোমাদের জামা ও জুতা খুলে ফেল।'

সংগে সংগে তারা নির্দেশ পালন করল।

তারপর তাদের দুজনের একজনকে বলল, 'তুমি তোমার জামা দিয়ে ওর দুহাত পিছমোড়া করে ভেঁধে ফেল এবং জুতার ফিতা দিয়ে ওর দু'পা বেঁধে ফেল।'

লোকটি আহমদ মুসার নির্দেশ পালন করল। একজন বাঁধা হয়ে গেল।

দ্বিতীয় লোকটিকে আহমদ মুসা বলল, 'তুমি উপুড় হয়ে শুয়ে পড়।' শুয়ে পড়ল লোকটি।

মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকা তরুণ-তরুণীকে লক্ষ্য করে আহমদ মুসা বলল, 'মিঃ.. আপনি এখানে আসুন। আমাকে একটু সাহায্য করুন।'

সংগে সংগেই তরুনটি এল কম্পিত পায়ে। বলল, 'আমার নাম শশাংক সেন।'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'মিঃ শশাংক সেন, আপনি দয়া করে ঐ লোকটির মত এ লোকটিকে বেঁধে ফেলুন।

শশাংক সেন তৎক্ষনাৎ তার নির্দেশ পালন করল।

'ধন্যবাদ মিঃ শশাংক সেন। বলল আহমদ মুসা।

তরুনীটি ততক্ষনে তরুনটির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

দুজনেই ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আহমদ মুসার দিকে। বোধ হয় ভাবছে, এরপর শুরু হবে তাদের পালা।

কিন্তু আহমদ মুসা সেরকম কোন নির্দেশ দিল না। বলল তাদের দিকে চেয়ে, 'আমার অনুমান মিথ্যা না হলে বলতে পারি, আপনারা আমার শত্রু নন?'

'ঠিক বলেছেন, আমরা আপনার শত্রু পক্ষের বটে, কিন্তু আপনার শত্রু নই আমরা।' বলল তরুনীটি।

'কেন শত্রু নন শত্রু পক্ষের হয়েও?'

'আমরা দুজনের কেউই আপনাকে চিনি না, জানি না। অজানা, অচেনা লোক শত্রু হতে পারে কেমন করে? বলল তরুনীটিই।

'কিন্তু পরিচয় পেলে?' আহমদ মুসা বলল।

'সেটা জানি না। তবে আপনার সাথে অন্তত আমাদের দুজনের এমন কিছু ঘটেনি যাতে আপনি শত্রু হবেন।' তরুনীটিই বলল।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'আপনাদের পিতার যদি আমি শত্রু হই, তাহলে আপনাদের দু'ভাইবোনেরও কি শত্রু হয়ে যাব না?

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা আবার বলে উঠল, 'শত্রু না হলে বলুন তো, এরা দু'জন হঠাৎ কোত্থেকে এল?'

'উপরে ভূগর্ভস্থ শেল্টার গেটের ওরা প্রহরী। ভুগর্ভস্থ বিশেষ কিছূ কক্ষের দরজা খুললে ঐ গেটে এ্যালার্ম বাজে। এই এ্যালার্ম শুনেই এরা এসেছে। সামনে দেয়ালটির পরেই লিফট রুম। লিফট থেকে নেমে তারা এখানে এসেছে।'

'উপরে কজন প্রহরী থাকে? জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'এ দুজনই ছিল। তাও এরা আগে ছিল না। কদিন থেকে থাকছে।' তরুনটি বলল।

'তার মানে আমি বন্দী হবার আগে কোন দিন কোন বন্দী ছিল না।' বলল আহমদ মুসা।

'কোনদিনই ছিল না। এটা তো কোন বন্দীখানা নয়।' বলল এবার তরুণীটি।

'আমি এখানে এলাম কি করে? আপনারা তো ভারতীয় অরিজিন। তাহলে ভারতীয় হিন্দু স্বার্থ ও ইহুদী স্বার্থ কি এক হয়ে গেছে?'

'আমরা জানি না।' বলল তরুনীটি।

'ভূগর্ভস্থ বিশেষ বিশেষ কক্ষের দরজা খুললে এ্যালার্ম বাজার ব্যবস্থা আর কোথায় কোথায় আছে?'

'আরও কোথাও আছে নিশ্চয়, কিন্তু আমরা জানি না।' বলল তরুণীটি।'

'আপনাদের কোথায় বন্দী করি বলুন তো?'

'কেন?' প্রশ্ন তরুণের।

'আমি এখন বেরিয়ে যাব। কিন্তু এভাবে আপনাদের রেখে আমি যাব কি করে?'

'কেন, আমরা তো আপনার কোন ক্ষতি করছি না।'

'আমার ক্ষতি নয়, আপনাদেরকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে চাচ্ছি।'

'আমাদের কি ক্ষতি?'

'আমাকে পালানোর সহযোহিতা করার দায়ে আপনারা অভিযুকথ হতে পারেন।'

বলেই আহমদ মুসা তার স্টেনগান তুলে নির্দেশের ভংগিতে বলল, 'তাড়াতাড়ি করুন। হয় আমার বন্দীখানায় বন্দী হবেন, নয়তো অন্য কোথাও। তাড়াতাড়ি বলুন।'

'তাহলে আমাদের লাইব্রেরী কক্ষে।' বলল তরুলটি।

'চলুন লাইব্রেরীতে।'

ওরা দু'জন আগে আগে হাঁটল, পেছনে আহমদ মুসা।

ওদের লাইব্রেরীতে তুলে যখন দরজা লক করতে যাচ্ছিল, তখন তরুণীটি বলল, 'আপনার পরিচয় তো আপনি দেননি?'

'আপনাদের পরিচয়ও তো আমি পাইনি।'

'আমি সাগরিকা সেন। ওর নাম তো জেনেছেন। শিল্পপতি শিব শংকর সেন আমাদের পিতা। আমরা দুজনেই ছাত্র। এবার আপনার পরিচয় বলুন?'

হাসল আহমদ মুসা। শেষ মুহূর্তে শত্রুতা সৃষ্টি করে লাভ নেই। এখনও আমরা শত্রু নই, সেটাই থাক। পরে আমার পরিচয় আপনাদের পিতা, কিংবা যে কারো কাছ থেকে অবশ্যই জানতে পারবেন। তখন শত্রু হলেও আমি জানতে পারবো না।'

আহমদ মুসা দরজা লক করল।

তারপর চাবিটা নিচে পেলে রেখে বেরিয়ে যাচ্ছিল। সাগরিকা সেন জানালা দিয়ে বলল, 'আপনি যাবেন কিভাবে?'

'আন্ডার গ্রাউন্ড প্যাসেজ দিয়ে অথবা উপর দিয়ে। ধন্যবাদ। বাই।'

বেরিয়ে এসে আহমদ মুসা চত্বরটি পেরিয়ে প্রবেশ করল দক্ষিণমুখী সেই করিডোরে।

আহমদ মুসা সিশ্চিত যে আন্ডার গ্রাউন্ড প্যাসেজে বড় কোন জটিলতা থাকা স্বাভাবিক নয়।

আহমদ মুসার অনুমান সত্য হলো। করিডোরের দক্ষিণ প্রান্তের দেয়ালে যেখানে মুক্ত ডানার পাখি আঁকা আছে, তার উপর চাপ দিতেই দেয়াল সরে গিয়ে একটা প্যাসেজ বেরিয়ে পড়ল।

প্যাসেজটি অন্ধকার।

আহমদ মুসা বিসমিল্লাহ বলে প্রবেশ করল প্যাসেজে।

প্যাসেজে প্রবেশ করতেই পেছনের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আর দরজা বন্ধ হওয়ার সাথে সাথেই প্যাসেজটি আলোকিত হয়ে উঠল।

আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল আহমদ মুসা। অন্ধকার প্যাসেজ নিয়ে ভীষণ চিন্তায় পড়েছিল। কাছে টর্চ নেই, কি করে সে অন্ধকার প্যাসেজ দিয়ে সামনে এগুব! আল্লাহ সে সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন।

কিন্তু একটা বিষয় আহমদ মুসার মনে প্রবল অস্বস্তির সুষ্টি করল। সাগরিকা সেনদের কথায় আহমদ মুসা বুঝেছে, বন্দীখানার দরজা খুললে যে এ্যালার্ম বাজার ব্যবস্থা তা একাধিক জায়গায় রয়েছে। তাহলে মাত্র দুই প্রহরীই এল, আর কেউ খোঁজ নিল না কেন? বন্দীখানা থেকে বেরুলে আহমদ মুসাকে পালাবার জন্যে উপরে উঠতেই হবে এই নিশ্চিত বিশ্বাস নিয়ে কি ওরা ওপরেই প্রস্তুত হয়ে বসে আছে? কিংবা আন্ডারগ্রাউন্ড প্যাসেজ দিয়ে আহমদ মুসা পালাতে পারে এই বিষয়টা তারা কি বিবেচনাতেই আনেনি? আহমদ মুসা সম্পর্কে তারা এতটা নিশ্চিত হবে, এটা কি করে সম্ভব?

উত্তরহীন এ প্রশ্নগুলো থেকে সৃষ্ট অস্বস্তি নিয়েই আহমদ মুসা এগুচ্ছে প্যাসেজ দিয়ে।

এক জায়গায় এসে প্যাসেজ শেষ হয়ে গেল। সামনে দেয়াল। আহমদ মুসা বুঝল, এ দেয়ালেও একটা দরজা আছে এবং এটাই শেষ দরজা। এর পর তার মুক্তি।

আহমদ মুসা দরজার মুখোমুখি দাঁড়াল। দেখে খুশী হলো যে, এ দেয়ালেও নির্দিষ্ট স্থানে ক্ষুদ্রাকারে সেই মুক্ত ডানার পাখী আঁকা।

পাখিতে চাপ দিল আহমদ মুসা।

সংগে সংগে দেয়াল সরে গেল।

দেয়াল সরে যেতেই আহমদ মুসা দেখতে পেল একটা সিঁড়ি। সিঁড়িটা নিচে পানি পর্যন্ত নেমে গেছে।

সিঁড়ির গোড়ায় একটা বড় ধরনের মোটর বোট বাঁধা।

বোট দেখে আহমদ মুসা ভাবল, বোটটা বোধ হয় পারমাণবিক শেল্টার থেকে বেরুবার শেষ মাধ্যম।

আহমদ মুসা প্যাসেজ থেকে বেরিয়ে সিঁড়িতে এসে দাঁড়াল।

সংগে সংগেই পেছনে প্যাসেজের পথ বন্ধ হয়ে গেল।

সিঁড়ি হয়ে বোটে নামার জন্যে পা বাড়িয়েছে আহমদ মুসা, এই সময় বোটের কক্ষ থেকে ডেকে বেরিয়ে এল জেনারেল শ্যারন, ডেভিড উইলিয়াম জোনস এবং শিব শংকর সেন। তাদের তিনজনের পেছনে আরও চারজন স্টেনগানধারী।

'আসুন আহমদ মুসা। আপনাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। আসুন।' দুই হাত প্রসারিত করে আগ বাড়ানোর ভংগিতে বলল জেনারেল শ্যারন।

'আমরা আপনার প্রশংসা করছি আহমদ মুসা। আপনি বলেই সম্ভব হয়েছে পারমাণবিক শেল্টার থেকে এভাবে বেরিয়ে আসা। আপনি সত্যিই অনন্য।' বলল ডেভিড উইলিয়াম জোনস।

'আপনার মত প্রতিদ্বন্দ্বী থাকাও গৌরবের। সত্যিই আমার বিশ্বাস হতে চাইছিল না যে, আমার অতি সাবধানে তৈরী পারমাণবিক শেল্টার থেকে বের হওয়ার কোড আপনি ভাঙতে পারবেন। আপনি সত্যিই অপ্রতিরোধ্য।' শিব শংকর সেন বলল।

'দেরী করে লাভ নেই আহমদ মুসা। আসুন। আপনার পেছনে ফেরার পথ বন্ধ। সামনেই আপনাকে এগুতে হবে। আর আপনি সামনে এগুতে ভালও বাসেন।' বলল জেনারেল শ্যারন।

তার কথা শেষ হবার আগেই দুজন করে স্টেনগানধারী সিঁড়ির দুপাশ দিয়ে উঠে গিয়ে আহমদ মুসাকে ঘিরে ফেলল এবং ঘিরে রেখেই তাকে বোটে নামিয়ে নিয়ে এল।

'মিঃ আহমদ মুসা, আধুনিক কোন কলাকৌশল দিয়ে আপনাকে আটকানো সম্ভব নয়। তাই আমরা ভাবছি প্রাচীন পদ্ধতিতেই আপনাকে বন্দী রাখতে হবে। যদিও তা একটু অমানবিক হয়। আর তাতো হতেই হবে। আপনি তো মানুষ নন, অতিমানুষ। অতিমানুষের জন্যে অমানবিক পদ্ধতিই দরকার।' বলল জেনারেল শ্যারন।

'সে জন্যে আমরা যেখানে যাচ্ছি, সেই ব্রাইট ফিল্ডে আমার গোডাউনটাই ওর উপযুক্ত জায়গা হবে।' শিব শংকর সেন বলল।

'আপনার ব্রাইট ফিল্ডটা কোথায় আমি চিনতে পারছি না।' বলল ডেভিড উইলিয়াম জোনস।

'আমার গ্রীষ্মকালীন অবকাশকেন্দ্র যেখানে সেই 'আনাপোলিশ' তো আপনি চেনেন। ঐ আনাপোলিশ থেকে যে প্রধান সড়কটি ওয়াশিংটন গেছে, সেই সড়কটির সাথে বাল্টিমোর থেকে আসা সড়কটি যেখানে মিলেছে সেটাই ব্রাইট ফিল্ড। এই ব্রাইট ফিল্ডে আমার একটি সফটওয়্যার ফ্যাক্টরী ও একটি গোডাউন আছে। এখানে প্রধানত রিমডেলিং ও রিএ্যাসেম্বলের কাজ হয়। এখানকার গোডাউনটা বিশাল ও বিচিত্র। ওখানে আহমদ মুসার মত শত লোককে হজম করা যায়।'

'ধন্যবাদ মিঃ সেন। এরকমটাই আমরা চেয়েছিলাম।'

'ধন্যবাদ।' বলল শিব শংকর সেন।

আহমদ মুসাকে ততক্ষণে কোরবানীর গরুর মত আস্টে-পৃস্টে বাঁধা হয়েছে।

সেদিকে তাকিয়ে ডেভিড জোনস বলল, 'স্যরি, মিঃ আহমদ মুসা, এর চেয়ে ভালো কোন ব্যবস্থা আপনার জন্যে সম্ভব নয়। তবে এই দুঃখের মধ্যে একটা সুসংবাদ শুনাই। আপনার প্রেমিকাকে হাসপাতাল থেকে ছাড়া হয়েছে। তবে পুলিশ বেস্টনী থেকে ছাড়া পায়নি। এক ঝাঁক এফ বি আই-এর লোক সর্বক্ষণ

তার বাড়ি ঘিরে রেখেছে। তাদের আশংকা আমরা তাকে কিডন্যাপের পরিকল্পনা করেছি। সরকার তার একাকী কিংবা অবাধ যাতায়াত একেবারেই বন্ধ করে দিয়েছে। চিন্তা নেই, সে কিছূ করতে না পারলেও তার দল 'ফ্রি আমেরিকা' ভয়ংকর রকম তৎপর। তবে আফসোস, ইহুদী প্রতিষ্ঠান ও বাড়ি-ঘর তারা খুঁজে মরছে। আপনি যে ভারতীয় আশ্যয়ে এটা তারা কল্পনাই করছে না। অতএব আপনি মুক্ত হবেন, কেউ আপনাকে মুক্ত করবে এ আশা এবার ছাড়তে পারেন। আফসোস সারা জেফারসনের জন্যে। আপনাকে না পেলে বেচারা মরেই যাবে।'

আহমদ মুসা কোন কথা বলল না। ঘৃনার ভাব ফুটে উঠেছে তার মুখে। সে মুখ ফিরিয়ে নিল ডেভিড জোনসের দিক থেকে।

উটে দাঁড়াল জেনারেল শ্যারন, ডেভিড জোনস এবং শিব সংকর সেন।

আহমদ মুসাকে টেনে নিয়ে চলল বোটে তার বন্দীখানার দিকে।

হোয়াইট হাউজের 'Meet the Citizens' কক্ষে বসে আছে আমেরিকান ভারতীয় এ্যাসোসিয়েশনের(ABA) সভাপতি ভারত ভূষণ শিবাজী, নির্বাহী পরিচালক বিনোদ বিহারী মালাকর, এই এসোসিয়েশনের প্রধান উপদেষ্টা শরৎসিং বর্মন এবং চীফ প্যাট্রন শিব শংকর সেন।

এরা সবাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট নাগরিক। সবাই এরা বিজনেস ম্যাগনেট এবং টাকার কুমীর।

এরা বড় একটা টেবিল ঘিরে বসে আছে। হোস্টের চেয়ার তখনও খালি। হোস্ট স্বয়ং প্রেসিডেন্ট এ্যাডামস হ্যারিসন। প্রেসিডেন্ট তখনও আসেনি।

প্রেসিডেন্ট এলো। সবাই দাঁড়িয়ে তাকে স্বাগত জানালভ

প্রেসিডেন্ট বসতে বসতে বলল, 'স্যরি, একটা জরুরী টেলিফোন এ্যাটেন্ড করতে যেয়ে ২ মিনিট দেরী হয়েছে।'

'এ কিছুই নয় মহামান্য প্রেসিডেন্ট। আমরা বরং ভয়ে ভয়ে আছি মহামান্য প্রেসিডেন্ট আমাদের চিনবেন কিনা?' বলল এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ভারত ভূষণ শিবাজী।

প্রেসিডেন্ট হাসল। বলল, 'আমি কি মিঃ শিবাজী, মিঃ সেন, মিঃ বর্মন ও মিঃ মালাকরদের মত লোকদের ভূলতে পারি, না ভুলা উচিত! আমি ভুলব কি করে যে, একদিনের একটা অনুষ্ঠানে আমার ইলেকশন ফান্ডে আপনারা ৩০ লাখ ডলার ডোনেট করেছিলেন। ওটাই ছিল সে বছর আমার ইলেকশন ফান্ডের সর্বোচ্চ ডোনেশন। আপনাদের এ্যাপয়েন্টমেন্ট ঠিক করা দেখে আমিই বরং লজ্জা পেয়েছি। যেখানে আমার ডাকা উচিত ছিল, সেখানে আপনারাই আমাকে ডেকেছেন। সত্যিই আমি দুঃখিত।'

'মহামান্য প্রেসিডেন্ট, এই বিনয়ের জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। আমরা খুশী হয়েছি যে, আপনার স্মৃতি থেকে আমরা কেউই মুছে যাইনি।' বলল মিঃ শিবাজী।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, তিনি ভুলিয়ে দেননি।'

বলে প্রেসিডেন্ট একটু থেমে সকলের উপর একবার চোখ বুলিয়ে বলল, 'বলুন, আমি আপনাদের জন্যে কি করতে পারি?'

'মহামান্য প্রেসিডেন্ট, আমরা একটা বড় বিষয় নিয়ে এসেছি। আমরা আপনার ফেভার চাই।' বলল শিব শংকর সেন।

'আমার ফেভার আপনাদের প্রতি রয়েছে, বলুন বড় ব্যাপারটা কি?' প্রেসিডেন্ট বলল।

'মহামন্য প্রেসিডেন্ট, আপনার সরকার ইহুদীদের উপর ক্র্যাক ডাউন করছে, এ বিষয়টি আমরা পুনর্বিবেচনার জন্যে অনুরোধ জানাতে চাই। ডেভিড উইলিয়াম জোনস ও জেনারেল শ্যারনের উপর ওয়ারেন্ট জারীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই। আমাদের অনুরোধ তাদের ওয়ারেন্ট প্রত্যাহার করুন।'

প্রেসিডেন্টের হাসি মুখ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, 'আপনারা এই চাওয়াটা চাচ্ছেন কেন, বলুন?'

'তারা আমাদের দীর্ঘ দিনের সহযোগী। সীমাহীন উপকার তাদের কাছ থেকে পেয়েছি। আমেরিকার শান্তি-সমৃদ্ধিতে তাদের অবদান বিরাট। আমরা যারা আমেরিকাকে ভালবাসি এই বিপর্যয়ে তাদের পাশে না দাঁড়িয়ে আমাদের উপায় নেই।' বলল ভারত ভূষণ শিবাজী।

'আপনারা সাম্প্রতিক রিপোর্টগুলো কি দেখেছেন? প্রেসিডেন্ট বলল।

'দেখেছি মহামান্য প্রেসিডেন্ট। পত্রিকার দলিল দস্তাবেজ সব সময় ঠিক হয় না। তাছাড়া মহামান্য প্রেসিডেন্ট আমাদের মনে হচ্ছে, কোথাও যেন একটা ভুল হয়ে যাচ্ছে। তা না হলে জন জ্যাকবের মত সর্বজন শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানী বিশ্বাসঘাতক হয়ে যাবেন, এ কেমন কথা!' বলল শিব শংকর সেন।

'ভুল হওয়ার সুযোগ কোথায়? লস আলামোসে যে গোয়েন্দা সুড়ঙ্গ রয়েছে তা জন জ্যাকবের বাড়ি থেকে এবং তা তার সময়েই তৈরী। এই জলজ্যান্ত সত্যকে কিভাবে মিথ্যা প্রমাণ করা যাবে?' বলল প্রেসিডেন্ট।

'আপনার কথা ঠিক মিঃ প্রেসিডেন্ট। কিন্তু এর মধ্যেও কোথাও একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে, যা বলার জন্যে আজ বিজ্ঞানী জন জ্যাকব বেঁচে নেই। যখন বেঁচে নেই, তখন তাকে বিশ্বাসঘাতক না সাজিয়ে ঠান্ডা মাথায় আরও চিন্তা করা দরকার। তাহলে আমরা মনে করি, ঠান্ডা যুদ্ধের সেই ঘোরতর দিনে ঐ সুড়ঙ্গ খোঁড়ার নতুন কোন তাৎপর্য বেরিয়ে আসবে।' বলল ভারত ভূষণ শিবাজী।

'শুধু তো ঐ সুড়ঙ্গই নয়, আরও অনেক কিছুর মধ্যে আচে আলেকজান্ডার হ্যামিল্টনের হত্যা। সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হয়েছে যে, এই হত্যাকান্ড ঘটিয়েছেন জেনারেল শ্যারন এবং উইলিয়াম ডেভিড জোনস। তাদের পক্ষে এখন আর বলঅর কি আছে?' প্রেসিডেন্ট বলল।

'ভিডিও টেপ কিংবা অডিও টেপ কোন সন্দেহাতীত প্রমাণ নয়।' বলল শিব শংকর সেন।' বলল শিব শংকর সেন।

'শুধু তো অডিও টেপ নয়, আমাদের গোয়েন্দারা প্রমাণ পেয়েছে, যেখানে আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন খুন হয়েছেন, সে বাড়ির মালিক মিঃ ডেভিড জোনস। তাছাড়ড়া যে বুলেটে মারা গেছে সে বুলেটের স্পেসিফিকেশনের সাথে জেনারেল

শ্যারনের রিভলবার মিলে যায়। আরও কথা হলো, হ্যারি ময়নিহানের কিডন্যাপের কি ব্যাখ্যা দেয়া যাবে?' প্রেসিডেন্ট বলল।

'এসব কথা আমরা পত্রিকায় পড়েছি। তারপরও আমরা বলছি, কারও শতবছরের সেবা ও অবদান মাত্র এ কয়টি ঘটনা দিয়ে মুছে ফেলা যায় না, তা ঠিকও নয় মহামান্য প্রেসিডেন্ট।' বলল আবার শিব শংকর সেনই।'আপনাদের কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু ঘটনা কয়টি যাই হোক তা এখন অনুসন্ধান ও আদালতের বিচার্য বিষয়। আসুন, আমরা বিচারের রায় পর্যন্ত অপেক্ষা করি।' বলল প্রেসিডেন্ট।

'অবশ্যই করব মহামান্য প্রেসিডেন্ট। কিন্তু তার আগে মহামান্য প্রেসিডেন্ট, জেনারেল শ্যারন ও মিঃ জোনসের জন্যে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিন এবং তাদের বিরুদ্ধে, ইহুদীদের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী যে অপপ্রচার চলছে, তা বন্ধ করুন মহামান্য প্রেসিডেন্ট।' বলল ভারত ভূষণ শিবাজী।

'স্যরি মিঃ শিবাজী, আপনিও জানেন ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থে আমেরিকায় আেনের স্বাভাবিক গতিরুদ্ধ করার কোন সুযোগ নেই। অন্যদিকে স্বাধীন প্রেসের মুখে হাত চাপা দেবার কোন শক্তি তো মার্কিন সরকারের নেই।'

বলে প্রেসিডেন্ট থামল। একটু থেমেই আবার বলে উঠল, 'ওরা আহমদ মুসাকে কিডন্যাপ করেছে, এটা একটা বড় ইস্যু হয়ে পড়েছে। সরকার খুবই বেকায়দায় পড়েছে মুসলিম দেশগুলোর কাছে। এই কাজ কেন করল ওরা?'

'মহামান্য প্রেসিডেন্ট, ওরা অভিযোগ অস্বীকার করেছে। এ অস্বীকৃতির পর ওরা ঐ কাজ করেছে তা প্রমাণ হবার আগে তাদেরকে আর অভিযুক্ত করা ঠিক নয়।' বলল ভারত ভূষণ শিবাজী।

'আপনার এ কথা যেমন ঠিক, তেমনি শুধু অস্বীকার করেছে বলেই কাদেরকে সন্দেহ থেকে মুক্ত রাখা যাচ্ছে না। এই বাস্তবতাকেও আপনাদের জানতে হবে।' প্রেসিডেন্ট বলল।

'ঠিক মহামান্য প্রেসিডেন্ট।' বলে একটু থামল ভারত ভূষণ শিবাজী। তারপর বলল, 'মহামান্য প্রেসিডেন্ট, তাহলে আমরা কি নিয়ে ফিরছি?'

'আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।' বলল প্রেসিডেন্ট ।

'শুভেচ্ছা আমাদের যে বিষয়ে অনুরোধ সে পর্যন্ত সম্প্রসারিত হতে পারে না মহামান্য প্রেসিডেন্ট?'

'এই ক্ষেত্রে  আমি এ টুকু আশ্বাস দিতে পারি যে, আমি কোন অন্যায় ও উদ্দেশ্যমূলক কিছুকে প্রশ্রয় দেব না।'

'ধন্যবাদ মিঃ প্রেসিডেন্ট। আমাদের শুভেচ্ছা সব সময় আপনার সাথে থাকবে।' বলল ভারত ভূষণ শিবাজী।

'ধন্যবাদ, আপনাদের কথা ভুলবো না।' প্রেসিডেন্ট বলল।

সবাই উঠে দাঁড়াল।

# ৪

বাল্টিমোর থেকে ছুটে আসছে তিনটি গাড়ি ওয়াশিংটনের দিকে। তিনটি গাড়ির দুটি এফ বি আই-এর। অন্য গাড়িটি সারা জেফারসনের।

গাড়ি তিনটির সামনেরটিতে আছে এফ বি আই প্রধান জর্জ আব্রাহান জনসন। আব্রাহাম জনসনের গাড়ি ড্রাইভ করছে এফ বি আই-এর একজন ড্রাইভার। জর্জ আব্রাহাম জনসন বসে আছে পেছনের সিটে। তার সিটের পেছনে ধাঁধা এফ বি আই ডগ স্কোয়াডের শ্রেষ্ঠ কুকুর 'সোর্জ'।

রিচার্ড সোর্জ ছিলেন সফল গোয়েন্দা এজেন্ট, যে দিত্বীয় বিশ্বযুদ্ধের গতি পাল্টে দিয়েছিল এবং ফ্যাসিবাদের পতনের কারণ হয়েছিল।

'সোর্জ' সুপার সেনসেটিভ শিকারী কুকুর। এক বর্গমাইলের মধ্যে টার্গেট থাকলে গন্ধ থেকে তাকে টার্গেট করতে পারে সোর্জ।

দ্বিতীয় গাড়িতে সারা জেফারসন ও তার প্রাইভেট সেক্রেটারী ক্লারা কার্টার। তৃতীয় গাড়িতে ভর্তি এফ বি আই পুলিশ।

এফ বি আই-এর কোন গাড়িতেই এফ বি আই-এর চিহ্ন নেই। এফ বি আই পুলিশরাও সারা পোশাকে।

গাড়ি তিনটি সারিবদ্ধভাবে এগুচ্ছে।

সারা জেফারসনের গাড়ি মাঝে।

বাল্টিমোর ওয়াশিংটন রোড ও আনাপোলিষ ওয়াশিংটন রোড যেখানে মিলিত হয়েছে, সে সন্ধিতে পৌঁছতে যাচ্ছে গাড়ি।

ঠিক সেই সন্ধিতে আনাপোলিশ রোডে বাল্টিমোর রোডের মোহনায় একটা বিশাল এলাকা জুড়ে 'সেন সফটঅয়্যার ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রাঃ) লিমিটেড' অবস্থিত।

কারখানাটির পশ্চিম প্রান্ত জুড়ে বাল্টিমোর রোড এবং দক্ষিন প্রান্ত জুড়ে আনাপোলিশ রোড।

জর্জ আব্রাহাম জনসনের গাড়ি যখন সেন সফটঅয়্যার কারখানার পাশে বাল্টিমোর রোডের উপর পৌঁছল, তখন জর্জ আব্রাহামের পেছনে বাঁধা শিকারী কুকুর সোর্জ শেকল ছেঁড়ার জন্যে ভয়ানক বিদ্রোহ শুরু করে দিল।

পেছনে তাকাল জর্জ আব্রাহাম। দেখল কুকুরটির দৃষ্টি পাশের কারখানাটির উপর নিবদ্ধ। ছুটতে চাচ্ছে সেদিকেই।

ভ্রুকুঁচকালো জর্জ আব্রাহাম জনসন।

গাড়ি সংগে সংগেই দাঁড় করাল জর্জ আব্রাহাম।

পেছনের দুটি গাড়িও দাঁড়িয়ে পড়েছে।

গাড়ি থেকে নেমেছে আব্রাহাম জনসন। তাকাল সে ফ্যাক্টরীর দিকে আবার।

বিশাল ফ্যাক্টরী। সামনের দিকে ফ্যাক্টরী, পেছনের অংশে গোডাউন। গোডাউনটাও বিশাল।

গাড়ি থেকে নামল সারা জেফারসন এবং পুলিশরাও। একজন পুলিশ অফিসার ও সারা জেফারসন গিয়ে দাঁড়িয়েছে জর্জ আব্রাহামের পাশে। কুকুরের বিদ্রোহের বিষয়টি তারাও গাড়ি থেকে নামার আগেই টের পেয়েছে।

'ঘটনা কি? ওদিকে কি দেখছেন জনাব?' ফ্যাক্টরীর দিকে ইংগিত করে জিজ্ঞেস করল সারা জেফারসন।

'কুকুর এ ফ্যাক্টরীকে সন্দেহ করেছে।'

'সন্দেহটা কি আহমদ মুসার ব্যাপারে?' প্রশ্ন করতে গিয়ে বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল সারা জেফারসনের। আহমদ মুসার কথা মনে হলেই তার গোটা দেহে অসহনীয় এক জ্বালা ছড়িয়ে পড়ে। শয়তানদের হাতে পড়ে আহমদ মুসা কেমন আছে, এই চিন্তা মনে এলেই গোটা দেহ মন ঢুকরে কেঁদে উঠতে চায় সারা জেফারসনের ।

'আমার তাই মনে হচ্ছে। কুকুরের মাথায় তো এখন আহমদ মুসা ছাড়া অন্য কিছু নেই।'

'তাহলে এখন?' বলল সারা জেফারসন।

সারা জেফারনের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে জর্জ আব্রাহাম তার অধঃস্তন অফিসারকে নির্দেশ দিল, 'সোর্জকে নামিয়ে আনুন মিঃ নোভাক।'

সংগে সংগেই আদেশ পালন করল নোভাক।

কুকুর সোর্জকে নামিয়ে আনতেই সে ছুটে যেতে লাগল ফ্যাক্টরীর দিকে। অফিসার নোভাক শক্ত হাতে চেন ধরে আটকাল সোর্জকে। সামনে ছোটার গতি বন্ধ হলে সোর্জের গতি আকাশমুখী হলো। লাফিয়ে উঠতে লাগল আকাশের দিকে।

কুকুর সোর্জকে নামিয়ে পর্যবেক্ষন করার পর কুকুরের চেনটি হাতে নিল জর্জ আব্রাহাম। নির্দেশ দিল অফিসার নোভাককে, 'তোমার হাতে এখন ছয়জন পুলিশ রয়েছে। এই ছয়জনের পাঁচজনকে বল পেছনের গোডাউন ও এই ফ্যাক্টরী ঘিরে ফেলতে। অবশিষ্ট একজন আমাদের সাথে থাকবে।'

অফিসার নোভাক নির্দেশ পেয়ে ছুটল তার গাড়ির দিকে।

নির্দেশ পেয়ে পাঁচজন এফ বি আই এজেন্ট প্রত্যেকেই স্টেনগান হাতে নিয়ে ছুটল ফ্যাক্টরী ঘিরে ফেলার জন্যে।

অবশিষ্ট একজন এল অফিসার নোভাকের সাথে জর্জ আব্রাহামের কাছে।

নোভাক ফিরে এলে তাকে উদ্দেশ্য করে জর্জ আব্রাহাম বলল, 'এই এফ বি আই কর্মীকে সাথে নিয়ে যাও ফ্যাক্টরী অফিসে। যেই অফিসে থাক নিজের পরিচয় দিয়ে তাকে তুমি বল আমরা এই মুহূর্তে গোটা এলাকা সার্চ করব। তারপর তাকে সাথে নিয়ে চলে এস।'

নোভাক চলে গেল।

মিনিট তিনেকের মধ্যেই ফিরে এল একজনকে সাথে নিয়ে। তারা কাছে এলে সাথে আনা লোকটাকে লক্ষ্য করে জর্জ আব্রাহাম বলল,'আপনাকে কষ্ট দেয়ার জন্যে আমরা দুঃখিত। আমরা নিখোঁজ হওয়া একজন লোককে খুঁজছি। আমাদের গোয়েন্দা কুকুর এই এলাকাকে সন্দেহ করে বসেছে। তাই এলাকা সার্চ করতে হচ্ছে আমাদের। আমি আপনাদের মালিক শিব শংকর সেনকে চিনি। তিনি খুব ভাল লোক। তিনিও আমাকে জানেন। তিনি এই ঘটনাকে ওয়েলকামই করবেন।'

সাথে আসা লোকটি বলল, 'আমাদের কোন আপত্তি নেই স্যার। তবে গোডাউন এলাকায় যাওয়ার মনে হয় দরকার হবে না। ওদিকে কোন লোক থাকে না।

'গোডাউন, ফ্যাক্টরী বলে কোন কথা নেই। কুকুর যেখানে যাবে, আমরা সেখানে যাব।' বলল জর্জ আব্রাহাম।

বলেই জর্জ আব্রাহাম কুকুরের চেনটি এফ বি আই অফিসার নোভাকের হাতে তুলে দিল। বলল, 'স্টার্ট কর।'

নোভাক কুকুরের পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে চেন লুজ করে দিল।

কুকুর চলতে শুরু করল।

চেন এক হাতে ধরে রেখে তার পেছনে পেছনে হাঁটতে শুরু করল এফ বি আই অফিসার নোভাক।

নোভাকের পেছনে জর্জ আব্রাহাম জনসন। আব্রাহাম জনসনের পাশে সারা জেফারসন। তার পাশে সারা জেফারসনের সেক্রেটারী ক্লারা কার্টার। সবার পেছনে এফ বি আই-এর পুলিশ কর্মী। তার সাথে ফ্যাক্টরীর লোকটি।

বুক কাঁপছে সারা জেফারসনের। বলল জর্জ আব্রাহামকে লক্ষ্য করে, 'কুকুরের সন্দেহ নিয়ে কি ভাবছেন জনাব?'

'কুকুর ভুল করেনি।'

'এর অর্থ ক্রমেই তার কাছাকাছি হচ্ছি? এত সহজেই কি উদ্ধার সম্ভব? কিছু ঘটতে পারে সেখানে?' বলল সারা জেফারসন।

'আমরা তার জন্যে প্রস্তুত আছি। আপনারা প্রস্তুত থাকুন।' বলল জর্জ আব্রাহাম।

'অবশ্যই জনাব। কিছু না পারলে জান দিতে তো পারব।'

কুকুর কিছুক্ষন চলার পর ফ্যাক্টরীকে পাশে রেখে গোডাউন লক্ষ্যে চলতে শুরু করেছে।

নোভাক বলে ইঠল, 'আমরা ফ্যাক্টরী নয়, গোডাউনে যাচ্ছি স্যার।'

'কিন্তু গোডাউনগুলোর চাবি তো আমার কাছে নেই। তাছাড়া গোডাউন খোলার ক্ষমতাও আমার নেই।' বলল সাথে আসা ফ্যাক্টরীর লোকটি।

'চাবি থাকলে ভল হতো, না থাকলেও চলবে। তালা ভাঙার জন্যে আমাদের কাছে রিভলবার আছে।' বলল জর্জ আব্রাহাম।

'তাহলে স্যার আপনারা যান, আমি মালিকের কাছে গিয়ে টেলিফোন করি। তিনি এসে পড়তে পারেন।' কাঁপা কন্ঠে বলল লোকটি।

'না, কোথাও আপনি যেতে পারবেন না। আমাদের সাথে থাকবেন। টেলিফোনের দরকার হলে আরও লোক আছে তারা করবে।' বলল শক্ত আদেশের সুরে জর্জ আব্রাহাম জনসন।

কুকুর গোডাউনের দিকে যাত্রা শুরু করার পর সারা জেফারসন ও ক্লারা কার্টার দুজনের মন খুশী হয়ে উঠেছে। গোডাউনের মত জায়গায় আহমদ মুসা বন্দী থাকতে অবশ্যই পারে।

কিন্তু ফ্যাক্টরীর কথা মনে হতেই সারা জেফারসনের মনে প্রশ্ন জাগল, ফ্যাক্টরীর মালিকের নাম শুনে মনে হলো, উনি একজন ভারতীয় বংশোদ্ভুত শিল্পপতি। তার এখানে আহমদ মুসা বন্ধী থাকবে কেন? আমেরিকান ভারতীয়রা ইহুদীদের ভাগ্যের সাথে তাদের ভাগ্য জড়াবে কেন? এটা একেবারেই অবিশ্বাস্য ব্যাপার। মনের এই অবস্থায় প্রশ্ন করল সারা জেফারসন, 'জনাব আমেরিকান ভারতীয়দের এখানে আহমদ মুসা আসবে কি করে?'

'এটা তোমার একটা সংগত প্রশ্ন। কিন্তু তুমি তো জান না, এই ফ্যাক্টরীর মালিক শিব শংকর সেন সহ আমেরিকান ভারতীয় কমুঃনিটির লিডাররা কয়েকদিন আগে প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎ করেছে জেনারেল শ্যারন ও ডেভিড উইলিয়াম জোনসের পক্ষে তৎবির বরার জন্যে। এটা সত্যি হলে আমেরিকান ভারতীয়দের কাছে আহমদ মুসা বন্দী থাকতে পারবে না কেন?' বলল আব্রাহাম জনসন।

'সর্বনাশ। কথঅটা সত্যি হলে এটা হবে এটা হবে আমেরিকার জন্যে একটা অতি বড় ঘটনা। আমেরিকায় ভারতীয় কম্যুনিটি এবং ইহুদী কম্যুনিটি দুপক্ষই আমেরিকানদের মাথায় হাত বুলিয়ে অর্থ-বিত্ত ও সুযোগ সুবিধা অর্জনের ক্ষেত্রে সবার চেয়ে অর্থাৎ আমেরিকানদের চেয়েও এগিয়ে গেছে। অবস্থান ও সুযোগ সুবিধা লাভের এ সাদৃশ্যই কি দুই কম্যুনিটিকে ঐক্যবদ্ধ করেছে? তাহলে

তো আমাদের লড়াই-এর ফ্রন্ট আরো একটা বাড়ল।' বলল সারা জফারসন উদ্বিগ্ন কন্ঠে।

'কিন্তু এই সাথে আহমদ মুসারে উদ্ধার আগের চেয়ে আরও জটিল হয়ে গেল।' বলল জর্জ আব্রাহাম।

'আপনি এ কথা বলবেন না। বরং বলুন ঈশ্বর আজ যে সুযোগ আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন, সেই সুযোগেই আহমদ মুসা উদ্ধার হয়ে যাবে।' প্রায় আর্ত কন্ঠে বলে উঠল সারা জেফারসন।

'আমি ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনাই করছি মিস জেফারসন।' বলল জর্জ আব্রাহাম।

'ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করুন।' বলল সারা জেফারসন।

গোডাউনের এ ব্লক সে ব্লক পেরিয়ে একটা দরজা খোলা গোডাউনের দরজায় ছুটে গেল শিকারী কুকুর সোর্জ।

বুকটা তোলপাড় করে উঠল সারা জেফারসনের। এখানেই কি আহমদ মুসা বন্দী? কিন্তু ঘরের দরজা খোলা কেন?

কুকুরের ফেছনে পেছনে সবাই গোডাউনের দরজায় গেল।

দরজার বাইরের অংশটার উপর ভল করে নজর পড়তেই আঁৎকে উঠল সবাই।

দরজার বাইরে দু'জায়গায় চাপ চাপ রক্ত। রক্তের উপরটা শুকিয়ে গেছে।

কিন্তু কুকুর রক্তগুলো লাফ দিয়ে ডিঙিয়ে দরজায় গিয়ে পৌছল। দরজার চৌকাঠের কাছে কুকুর সোর্জ মুখ নিচু করে লেজ নাড়তে লাগল।

সকলে দরজায় গিয়ে পৌছল।

গোডাউনের ভেতর আলো জ্বলছে।

দরজাও আলোকিত।

দরজার ওপাশেও দেখা গেল কিছু রক্ত। সেই রক্তই শুকছে কুকুর সোর্জ।

কারোরই বুঝতে বাকি রইল না দরজার পাশের রক্ত আহমদ মুসার। আহমদ মুসার বলেই কুকুর সোর্জ তা শুকছে ও লেজ নাড়ছে।

গোডাউন শূন্য।

বুকটা হাহাকার করে উঠল সারা জেফারসনের।

যে আশায় এতক্ষন সে বুক বেঁধে ছিল, সে আশা ঘরের শূন্যতার মধ্যে দিয়ে উবে যাওয়ায় বুকটা একদম দুমড়ে মুচড়ে গেল। তার উপর আহমদ মুসার রক্ত দেখে আশংকা ও আতঙ্কে দম বন্ধ হওয়ার যোগাড় হলো সারা জেফারসনের।

ক্লারা কার্টার তা বুঝতে পেরেছিল। ক্লারা কার্টার তাকাল সারা জেফারসনের দিকে।

ক্লারা কার্টার তার দিকে এগিয়ে এসে প্রথমে কাঁধে হাত রেখে তাকে সচেতন করল। তারপর তাকে নিজের দেহের সাথে জড়িয়ে রাখল।

কুকুর সোর্জ দরজা থেকে ছুটল গোডাউনের মাঝখানে।

সেখানে মেঝের উপর একটা কার্পেট। কার্পেটের উপর পড়ে আছে কম্বল। এটা হলো একটা বিছনা। বিছানার উপর পড়ে আছে সিল্কের সরু কর্ডের অনেকগুলো খন্ড।

সোর্জ সেই বিছানায় উঠে কার্পেট ও কম্বল শুকতে লাকল আর নাড়তে লাগল তার লেজ।

সবাই এগুলো বিছানার দিকে।

'বুঝা যাচ্ছে, এই বিছানাতেই আহমদ মুসাকে রাখা হয়েছিল।' বলল জর্জ আব্রাহাম।

'কর্ডের এই খন্ডগুলো কেন?' জিজ্ঞেস করল সারা জেফারসন। কন্ঠ তার শুকনো, কম্পিত।

'আমার মনে হচ্ছে, আহমদ মুসা হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ছিল। পরে সে কোনভাবে বাঁধনগুলো কেটে মুক্ত হয়। খন্ড-বিখন্ড হওয়া কর্ডগুলো তারই প্রমাণ।' বলল জর্জ আব্রাহাম জনসন।

কুকুর সোর্জকে নিয়ে জর্জ আব্রাহাম বেরিয়ে এল।

সবাই বেরিয়ে এল গোডাউন থেকে।

বাইরে বেরিয়ে কুকুর সোর্জ মাটি শুকতে শুকতে দক্ষিণ দিকে চলতে লাগল।

'আহমদ মুসা সম্ভবত এ পথ দিয়েই বেরিয়ে গেছে। সোর্জ নিশ্চয় সে পথই অনুসরণ করছে। চল সবাই সোর্জকে অনুসরণ করি।' বলল জর্জ আব্রাহাম জনসন।

সবাই কুকুর সোর্জের পেছনে পেছনে চলতে লাগল।

হঠাৎ সারা জেফারসন আর্তকন্ঠে বলে উঠল, 'মিঃ জর্জ আব্রাহাম! ঘাসের উপর দেখুন রক্তের ফোঁটা।'

সবাই দেখল ঘাসের উপর ফোঁটা ফোঁটা রক্তের একটা ধারা সামনে এগিয়ে গেছে।

'সোর্জ রক্তের এই ধারাই অনুসরণ করছে মিস জেফারসন। নিশ্চিত, আহমদ মুসা এ পথ ধরেই এগিয়ে গেছে।'

সারা জেফারসনের চোখে-মুখে আষাঢ়ে মেঘের ঘনঘটা।

সবাই নিরবে কুকুরকে অনুসরণ করে এগুলো।

কুকুর সোর্জ ঘাসের কাছাকাছি পর্যন্ত মুখ নিচু করে এক গতিতে সামনে এগুচ্ছে।

আনাপোলিশ সড়কে উঠে গেল সোর্জ।

সড়কে উঠে একজায়গায় এসে সোর্জ থমকে দাঁড়াল। মুখ উপরে তুলে চারদিকে তাকাল।

জর্জ আব্রাহাম, সারা জেফারসনসহ সবাই ওখানে পৌঁছল দেখল, সেখানে রাস্তার একপ্রান্তে কুকুর সোর্জ এর সামনে বেশ কিছূ পরিমান রক্ত জমা হয়ে আছে।

রক্তের দাগ আর সামনে এগুয়নি।

'এই সড়কে উঠার পর আহমদ মুসা এখানে বসে বা শুয়ে ছিল। এই রক্ত জমা হয়েছে তার ফলেই। তারপর কেউ বা কোন গাড়ি তাকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে।' বলল জর্জ আব্রাহাম।

'কারা উঠিয়ে নিয়ে গেছে, অনুমান করা যায়?' বলল সারা জেফাসন। তার কন্ঠ ভেজা।

'বলা মুস্কল। এটুকু বলা যায় কোন গাড়ি যদি তাকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তারা শত্রু নাও হতে পারে। আর যাদের কারণে সে আহত হয়েছে তারা যদি তাকে ফলো করে এসে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তিনি আবার শতুর হাতেই পড়েছেন।'

শেষ বাক্যটা শুনে সারা জেফারসনের মুখে একটা পান্ডুর ছায়া নেমে এল। তার ঠোঁট কেঁপে উঠল থর থর করে। পেছন দিকে মুখ একটু ঘুরিয়ে নিল সারা জেফারসন।

কথা বলেই জর্জ আব্রাহাম মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে তাদের সাথে আসা ফ্যাক্টরীর লোকটির দিকে। বলল, 'আপনি আমাদের সাহায্য করতে পারেন।'

'আমি ঘন্টা তিনেক হলো অফিসে এসেছি। আমি কিছূই দেখিনি, কিছুই শুনিনি।' বলল লোকটি।

'কিন্তু গোডাউনে রক্তপাতের ঘটনা ঘটেছে, তা এক ঘন্টার বেশী আগে নয়। আপনি কোন গোলা-গুলীর শব্দ শুনেননি?'

'না, সেরকম কোন শব্দ শুনুন।' বলল সেই লোকটি।

'ঠিক আছে, আপনি একটা স্টেটমেন্ট লিখে দেবেন।' বলে জর্জ আব্রাহাম এফ বি আই অফিসার নোভাকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি এর সাথে এর অফিসে যাও। উনি আমাদের সাথে থেকে যা যা দেখেছেন, তার উপর একটা স্টেটমেন্ট লিখে দেবেন।'

কথা শেষ করেই আবার তাকাল ফ্যাক্টরীর লোকটির দিকে। বলল, 'ঠিক আছে?'

'জ্বি স্যার। আমি লিখে দিচ্ছি।'

ওরা দু'জন চলে গেল।

জর্জ আব্রাহাম ঘুরে দাঁড়াল সারা জেফারসনের দিকে। বলল, 'স্যরি সারা জেফারসন, মাত্র এক ঘন্টার ব্যবধান আমাদেরকে আহমদ মুসার সাক্ষাৎ পাওয়া থেকে বঞ্চিত করল।'

'দুর্ভগ্য আমাদের, এক ঘন্টা আগে আসতে পারলে আহমদ মুসাকে আহত ওয়া থেকেও বোধহয় আমরা বাঁচাতে পারতাম।' বলল সারা জেফারসন।

একটু থামল সারা জেফারসন। থেমেই আবার শুরু করল, 'গোটা বিষয় পর্যবেক্ষন করে আপনার কি মনে হচ্ছে?'

'কি ঘটেছে, সেই ব্যাপারটা?' বলল জর্জ আব্রাহাম।

'হ্যাঁ।' বলল সারা জেফারসন।

'ঘটনা খুবই সরল। হাত পা বেঁধে আহমদ মুসাকে ওরা বন্দী করে রেখেছিল। আজকে কোনওভাবে আহমদ মুসা হাত পায়ের বাঁধন কাটতে সমর্থ হয়। বাঁধন মুক্ত হয়ে আহমদ মুসা সম্ভবত দরজার সামনে শত্রুর আগমদনের অপেক্ষা করছিল। দরজা খোলার পর তাদের সাথে ধ্বস্তা ধ্বস্তি হয়। শত্রুরা সম্ভবত ছিল দু'জন। ওদের একজনের রিভলবার আহমদ মুসা কেড়ে নিয়ে ওদের গুলী করে। ওদের দু'জনের একজন অথবা দু'জনই আহত বা নিহত হয়। কিন্তু তাদের একজন আহমদ মুসাকে  আঘাত করতে সমর্থ হয়। সে আঘাত আহমদ মুসার পা, বুক, মাথা ছাড়া অন্য কোথাও লাগে। এর ফলে আহমদ মুসা গুরুতর আহত হলেও রাস্তা পর্যন্ত হাঁটতে সমর্থ হয়। রাস্তায় পৌঁছার পর রাস্তার এক জায়গায় বসে গাড়ির অপেক্ষা করেছে সে। তারপর সে শত্রুর হাতে পড়ল, না কোন গাড়ি তাকে নিয়ে গেল, তা অনুমান করা মুস্কিল। তবে আহমদ মুসা যে গাড়ির জন্যে বসেছিল, একজায়গায় ঐ পরিমান জমাট রক্ত তারই প্রমাণ।'

'আহমদ মুসা বন্দী হলে তাকে তো আবার বন্দীখানাতেই ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথঅ। তাতো তারা তকরেনি।' সারা জেফারসন বলল।

'হ্যাঁ। সেটাই হবার কথা। কিন্তু এর ব্যতিক্রমও হতে পারে। চিকিৎসা ও নিরাপত্তার জন্য তাকে অন্যত্র সরিয়েও নিতে পারে। তবে সব দেখে-শুনে আমার এখন মনে হচ্ছে, আহমদ মুসাকে অন্য কেউ তুলে নিয়ে গেছে।, এ দিকটাই প্রবল।'

থামল জর্জ আব্রাহাম।

'ঈশ্বর করুন, এই শেষ কথাটাই যেন সত্য হয়।' বলল সারা জেফারসন।

পাশ থেকে সারা জেফারসনের পিএ ক্লারা কার্টার বলে উঠল, 'আমেন।'

'চল আমার গাড়ির দিকে হাঁটি।'

বলে ওপারের বাল্টিমোর রোডের দিকে গাড়ির জন্যে হাঁটতে শুরু করল জর্জ আব্রাহাম।

সারা জেফারসনরাও হাঁটা শুরু করল।

সারা জেফারসন ও ক্লারা কার্টার পাশাপাশি হাঁটছে।

গোটা রাস্তায় একটা কথাও বলল না সারা জেফারসন। উদ্বিগ্ন ক্লারা কার্টারও। এ ধরনের নিরবতা সারা জেফারসনের স্বভাব বিরুদ্ধ।

গাড়িতে বসেও ঐ একই অবস্থা।

গাড়ির সিটে গা এলিয়ে চোখ বুজেছে সারা জেফারসন।

পাশেই বসেছে ক্লারা কার্টার। কিন্তু ঘাঁটাতে সাহস করছে না সারা জেফারসনকে। তার মন খারাপ সেটা তো ক্লারা কার্টার জানে। কিন্তু ভয় হচ্ছে তার অসুখ-বিসুখ করল কিনা। এই তো মাত্র ক'দিন আগে সে হাসপাতাল থেকে ফিরেছে।

পরীক্ষা করার জন্যে ক্লারা কার্টার তার হাত সারা জেফারসনের কপালে রাখল।

ধীরে ধীরে চোখ খুলল সারা জেফারসন।

বলল, 'না ক্লারা আমি অসুস্থ হয়ে পড়িনি। ভাল আছি।'

'কে বলল ভাল আছেন? গায়ের উত্তাপ অন্তত ডিগ্রি খানেক বেড়েছে।'

'অবস্থার পার্থক্যে অমন ফ্লাকচুয়েশণ হয়েই থাকে।'

'আসলে আপনার আসা ঠিক হয়নি। আন্টি ঠিকই বাধা দিয়েছিলেন।'

'ওকথা বলো না ক্লারা। না এল কেমন করে দেখতাম আহমদ মুসা মেঝেতে একটা কার্পেটের ওপর একটা কম্বল গায়ে দিয়ে কি সুখে বন্দী জীবন কাটিয়েছে! না এলে কেমন করে দেখা হতো তার দেহের জমাট রক্ত! কেমন করে দেখতাম আহমদ মুসা মুক্ত হবার প্রানান্ত চেষ্টা করেও....।'

কান্নায় জড়িয়ে গেল সারা জেফারসনের শেষের কথাগুলো। দু'হাতে মুখ ঢাকল সে। ক্লারা তার একটা হাত সারা জেফারসনের কাঁধে রেখে বলল, 'বৃথাই ভাবছেন। দেখবেন, উনি ঠিক মুক্ত হয়েছেন। আংকেল জর্জ আব্রাহাম ঠিকই বলেছেন, তার মুক্ত হবার সম্ভাবনার দিকটাই প্রবল।'

'সবাই আমরা এটাই কামনা করছি। কিন্তু আমরা যা চাচ্ছি সেটাই ঘটেছে তা নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারছি না। কষ্টটা এখানেই।'

সরা জেফারসন থামলেও ক্লারা কার্টার সংগে সংগে কোন জবাব দিল না। একটু সময় নিয়ে ধীরে ধীরে বলল, 'একটা কথা বলি মিস জেফারসন।'

'বল।' বলল সারা জেফারসন।

'আহমদ মুসা সম্পর্কিত আপনার সিদ্ধান্তকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তারপরও বলতে চাই, আহমদ মুসা একটা বুনো পাখি। পোষ মানবার মত নয়।' ক্লারা কার্টার বলল।

সারা জেফারসনও সংগে সংগে জবাব দিল না। বলল ধীরে ধীরে একটু সময় নিয়ে, 'আমি তো তাকে পোষ মানাতে চাইনি ক্লারা। কিংবা আমি তাকে আমার বানাতেও চাইনি। আমি শুধু চেয়েছি তার হতে।'

'ঐ একই কথা হলো। আপনি তার হতে গেলে তিনি আপনার হতে হবে।' বলল ক্লারা কার্টার।

'না, একই কথা নয়। নদী যখন সাগরে মিশে যায়, তখন নদী সাগরের হয় কিন্তু সাগর নদীর হয় না।'

'সাগরের ঘর-সংসার নেই। কিন্তু আপনার সংসার চাই, তারও সংসার চাই।'

'আমি এতকিছু ভাবিনি, ভাববার সময়ও পাইনি। তাকে দেখার আগে আমি তাকে স্বপ্নে পেয়েছি। এটা আমার নিয়তি ক্লারা। ঈশ্বর যা করেন, তার উপর তো হাত নেই কারও।'

'তাকে আপনার জানার দরকার ছিল।'

'কি দরকার ক্লারা। না জেনেই তো ভালবেসেছি। জানার কি প্রয়োজন আর।

'তিনি আপনাকে কিছু বলেন নি?'

'সেদিন অভিযান থেকে ফিরে আমাকে 'মিস সারা জেফারসন' বলায় আমি কেঁদে ফেলেছিলাস। তিনি গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। পরে একসময় তিনি

আমাকে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু আমি টেলিফোন ধরতে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় এবং তারপর আব্বা এসে পড়ায় তার বলা আর হয়নি।'

'তার সম্পর্কে কি ধরনের কথা তিনি বলতে শুরু করেছিলেন?'

'সবে তিনি বলতে শুরু করেছিলেন, 'স্যরি মিস সারা, মাত্র আমার নামটি ছাড়া আর কিছুই আপনাকে জানানো হয়নি।' একথা শেষ করেই তিনি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। এই সময় আমার টেলিফোন আসে।'

'বোঝা যাচ্ছে তার কিছু বলার আছে। অথচ আপনি কিছুই শোনেননি, জানেননি।'

'আমি তার সাথে কোন লেন-দেন করতে চাইনি যে, আমি হিসেব-নিকেশ করব। যা ঘটেছে তা একান্তই আমার, এতে তারও কোন শরিকানা নেই।

কথা শেষ করতেই সারা জেফারসন দেখল জর্জ আব্রাহাম তাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

সারা জেফারসন গাড়ি থেকে নামল।

জর্জ আব্রাহাম একটু নিকটবর্তী হলে সারা জেফারসন বলল, 'মিঃ নোভাক ফিরেছে। এখন করনীয়?'

'এখন ফেরা ছাড়া আর কি করার আছে।' বলল জর্জ আব্রাহাম।

'আপনি আপনার লোকদের আনাপোলিশসহ আশে-পাশের এবং ওয়াশিংটনের সকল হাসপাতাল ও ক্লিনিকে চোখ রাখতে বলুন। আমার বিশ্বাস, অন্য কেউ আহত আহমদ মুসাকে নিশ্চয় কোন হাসপাতাল বা ক্লিনিকে নিয়ে যেতে পারে।' বলল সারা জেফারসন।

খুশী হয়ে উঠল জর্জ আব্রাহাম। বলল, 'বর্তমান নিয়ে বেশী ব্যস্ত থাকায় ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছু ভাবতেই ভুলে গেছি। ধন্যবাদ মিস সারা জেফারসন।'

বলেই পা বাড়াল নোভাকের গাড়ির দিকে। বলল, 'যাই নোভাককে বলি এখনই মেসেজটা সব জায়গায় জানিয়ে দেবার জন্যে।'

জর্জ আব্রাহাম চলে গেল।

'মোবাইলটা দাও ক্লারা।'

মোবাইলটা সারা জেফারসনের হাতে দিতে দিতে ক্লারা বলল, 'বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতক্ষনে মেসেজটা সবাই জেনে গেলে ভাল হতো।'

'আমারও এইমাত্র মনে পড়ল।'

বলে সারা জেফারসন 'ফ্রি আমেরিকা'র ওয়াশিংটন অফিসে জানিয়ে দিল মেসেজটা।

এসময় জর্জ আব্রাহাম সারা জেফারসনের গাড়ির পাশ দিয়ে ফেরার সময় বলল, 'প্রস্তুত মিস সারা। আমরা এখনি স্টার্ট করব।'

অল্প কিছুক্ষনের মধ্যে সামনে জর্জ আব্রাহামের গাড়ি স্টার্ট নেবার শব্দ পাওয়া গেল।

স্টার্ট নিল সারা জেফারসনদের গাড়িও।

তিনটি গাড়ি আবার চলতে শুরু করল ওয়াশিংটনের উদ্দেশ্যে।

নোয়ান নাবিলা গাড়ি ড্রাইভ করছিল। তার পাশে বসেছিল সাগরিকা সেন।

ইহুদী মেয়ে নোয়ান নাবিলা ও সাগরিকা সেন দু'জন ঘনিষ্ঠ বান্ধবী।

নোয়ান নাবিলারা আনাপোলিশের স্থায়ী বাসিন্দা। তাদের বাড়ি থেকে অল্পদূরে একেবারে সমুদ্র তীরে একটি টিলার উপর সাগরিকা সেনদের গ্রীষ্মাবাস।

সামনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ নোয়ান নাবিলাই প্রথম দেখতে পেয়েছিল মাটিতে পড়ে থাকা লোকটিকে।

'সাগরিকা দেখ একজন লোক পড়ে আছে রাস্তার পাশে।' বলে উঠল নোয়ান নাবিলা।

তার বলা শেষ হতে না হতেই গাড়ি লোকটির সমান্তরালে চলে এল।

নোয়ান নাবিলার মত সাগরিকা সেনও তাকিয়ে ছিল লোকটির দিকে।

লোকটির কুকড়ানো দেহ পড়েছিল মাটির উপর। তার মুখ রাস্তার দিকে। রক্তাক্ত দেহের একটা অংশ।

লোকটির মুখের উপর চোখ পড়তেই ভীষণ চমকে উঠল সাগরিকা সেন। অন্তরের গভীর থেকে উচ্চারিত হলো, 'এ যে আহমদ মুসা!'

অন্তরের গভীর থেকে এ কথা উচ্চারিত হবার সাথে সাথেই সাগরিকা সেন এল উঠল চিৎকার করে, 'গাড়ি দাঁড় করাও নাবিলা।'

গাড়ি ডেড স্টপ হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ল।

'লোকটিকে কি সাহায্য করবে? বেঁচে আছে কি লোকটি?' জিজ্ঞাসা উচ্চারিত হলো নাবিলার কন্ঠে।

কোন উত্তর না দিয়ে লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে সাগরিকা সেন।

সে ছুটে গেল আহমদ মুসার কাছে।

প্রথমে তার একটা আঙুল দিল আহমদ মুসার নাকে।

বেঁচে আছে আহমদ মুসা, খুশী হলো সাগরিকা সেন।

এসময় আহমদ মুসা চোখ খুলল আচ্ছন্নের মত।

সাগরিকা সেন উঠে দাঁড়াল। বলল নাবিলাকে লক্ষ্য করে, 'একে গাড়িতে নিতে হবে নাবিলা।'

'তোমার পরিচিত নাকি?'

গাড়ি থেকে নামতে নামতে জিজ্ঞেস করল নাবিলা।

'হ্যাঁ।' সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল সাগরিকা সেন।

'তাহলে গাড়িতে নিয়ে কাজ কি? এই তো তোমাদের ফ্যাক্টরী। কাউকে ডাক দিয়ে বল। তারা এসে ব্যবস্থা করবে। তোমাকে কিছুই ভাবতে হবে না।' বলল নাবিলা।

'না। এ শুধু পরিচিত নয়, আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। একে আমি এদের হাতে দিতে পারি না। একে আমি গাড়িতে নেব।'

'তথাস্তু মিস সেন।' বলে নোয়ান নাবিলা সাগরিকা সেনের পাশে এসে দাঁড়াল।

তারপর দুজনে ধরাধরি করে আহমদ মুসাকে গাড়ির পেছনের সিটে তুলল।

গাড়িতে তুলে শুইয়ে দিতে দিতে নাবিলা বলল, 'আমি প্রথমে মেন করেছিরাম গাড়ির এ্যাকসিডেন্ট। কিন্তু এখন দেখছি তা নয়। হয় গুরী, না হয় সাংঘাতিক ধরনের ছুরিকাহতের ঘটনা। ভীষণ ব্লিডিং হচ্ছে। প্রথমেই রক্ত বন্ধ হওয়া দরকার।'

'ঠিক বলেছ নাবিলা। তুমি ড্রাইভিং সিটে যাও। গাড়ি স্টার্ট দাও। আর ফাষ্ট এইড বক্স থেকে তুলার বান্ডিল এবং ব্যান্ডেজ টেপটা আমাকে দাও।' বলল সাগরিকা সেন।

'তুমি পারবে কিছু করতে?' তুলার বান্ডিল  এবং ব্যান্ডেজ টেপ নিয়ে গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলল নোয়ান নাবিলা।

'অভ্যেস নেই, কিন্তু কমন সেন্স তো আছে।'

ড্রাইভিং সিটে গিয়ে বসল নোয়ন নাবিলা।

'কোথায় গাড়ি নেবো সাগরিকা, কোন ক্লিনিকে?' বলল নোয়ান নাবিলা।

'সোজা আনাপোলিশ চল।'

'আনাপোলিশের কোন ক্লিনিকে নেবে?'

'পরে বলছি।'

আহমদ মুসা চোখ খুলেছিল। কিছু বলতে যাচ্ছিল।

সাগরিকা সেন ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে কথা বলতে নিষেধ করল এবং সাথে সাথে অন্য দিকে তাকাল।

সাগরিকা সেন একদলা তুলা নিয়ে মূল ক্ষতস্থানের রক্ত মুছেই আবার সেখানে প্রকান্ড একদলা তুলা লাগিয়ে চেপে ধরল এবং চেপে ধরেই থাকল।

সাগরিকা সেন এতটুকু অন্তত জানে এভাবে কিছুক্ষন ধরে রাখলে সারফেসের রক্ত জমাট বাধলে ভেতর থেকে রক্ত বেরিয়ে আসা বন্ধ হবে। তাই হয় কিনা সেটাই দেখতে চায় সে।

আহমদ মুসা চোখ বন্ধ করে শুয়ে ছিল। সাগরিকা সেন যেমন বিস্মিত হয়েছে আহমদ মুসাকে দেখে, আহমদ মুসাও তেমনি বিস্মিত হয়েছে সাগরিকা

সেনকে দেখে। প্রথমে তার চিন্তা হয়েছিল যে, সাগরিকা সেন তাকে নিয়ে কি করে ঠিক নেই। সে নিশ্চিক হলো তখন, যখন সে দেখল এখানকার লোকদের হাতে তাকে ছেড়ে দিল না এবং এখানকার কোন ক্লিনিকেও তাকে নিল না। আহমদ মুসা বুঝল, তার বিপদ সাগরিকা সেন বুঝেছে। সম্ভবত সে আহমদ মুসাকে বিপদ থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে। অথচ তারই পিতার গোডাউনের অমানবিক পরিবেশে বন্দী ছিল আহমদ মুসা। বুকের উপরে কাঁধের একটু নিচের ছুরিকাঘাতটা খুবই মারাত্মক  নিঃসন্দেহে, কিন্তু এই আঘাত তাকে এত কাবু করতে পারতো না, যদি পেটে খাবার থাকতো। দু'একদিন পর পর আহমদ মুসাকে তারা যে খাবার দিয়েছে তা না দেবার মতই। দেহটা তার দুর্বল হয়ে পড়েছে এ কারনেই। তারা আহমদ মুসার সমস্ত শক্তি কেড়ে নিয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিল। যাতে মুক্ত হবার শক্তি তার না থাকে। সাগরিকা সেনের সাথের মেয়েটির কথা মনে পড়ল আহমদ মুসার। আহমদ মুসাকে তার সামনে কথা বলতে নিষেধ করল কেন সাগরিকা সেন? অবাঞ্ছিত কোন কথা বলে ফেলি কিনা এজন্যে? আর সাগরিকা সেন মেয়েটিকে আহমদ মুসার মিথ্যা পরিচয় দিয়েছে। আহমদ মুসা তো সাগরিকা সেনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু নয়। সব মিলিয়ে আহমদ মুসার পরিচয় সে গোপন করে গেছে।

যখন আহমদ মুসা এসব ভাবছিল, তখন সাগরিকাও আহমদ মুসার শিয়রে বসে চিন্তা করছিল। ভাবছিল আহমদ মুসার কথাই। সেদিন আহমদ মুসা তাদের দুভাই-বোনকে নিজের পরিচয় দেয়নি। পরের দিনই তারা তাদের মায়ের কাছ থেকে আহমদ মুসার পরিচয় জানতে পেরেছিল। জানতে পেরেছিল তাদের ভূগর্ভস্থ কক্ষে যিনি বন্দী ছিলেন তিনি বিশ্বখ্যাত বিপ্লবী আহমদ মুসা। নাম শুনে শিহরিত হয়েছিল সাগরিকা সেন। পত্র-পত্রিকা পড়ে সাগরিকা সেনের ধারনা হয়েছিল আহমদ মুসা হবে ভীম সদৃশ রুক্ষ চরিত্রের, যে হবে শুধু ভয়েরই পাত্র। কিন্তু যে আহমদ মুসাকে তারা দেখল, সে একেবারেই ভিন্ন। সরল, সুদর্শন এক ভদ্রলোক সে। যে কয়েক মিনিটের দেখায় একেবারে কাছে এসে গিয়েছিল, সমর্থন  ও সহানুভূতি আদায় করে নিয়েছিল। এমন লোককে শুধু বন্ধুই ভাবা যায়, শত্রু নয়। বিস্মিত হয়েছিল সাগরিকা সেন। এমন একজন লোক বিশ্ব বিপ্লবী

হয়েছে কিসের জোরে। শক্তি ও সন্ত্রাসের জোরে অবশ্যই নয়। শক্তি ও সন্ত্রাস তার অবলম্বন হলে সেদিন দু'জন প্রহরীকে সে হত্যা করত এবং তাদের উপরও নির্যাতন হতো, কিন্তু তা সে করেনি। তাদের দুই ভাই বোনকে আটকে রেখে গিয়েছিল তাদেরই ভালোর জন্যে তা পরে প্রমাণিত হয়েছে। তারা মুক্ত থাকলে তাদেরকে অনেক রকম প্রশ্নের শিকার হতে হতো। তারা তাদের পিতার কাছে তেকেই শুনেছিল আহমদ মুসা পালাতে পারেনি, ধরা পড়েছে। কিভাবে ধরা পড়েছে তাও তাদের বলেছে। ধরা পড়ার খবর শুনে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল সাগরিকা সেন ও তার ভাই শশাংক সেন দুজনেরই। এ নিয়ে দু'ভাই-বোন অনেক আলোচনা করেছে। ভেবেছে তারা, তারা যদি আহমদ মুসাকে মুক্ত করার জন্যে কিছু করতে পারতো। আজ সাগরিকা সেন সেই সুযোগই পেয়েছে।

সাগরিকা সেন মুখ ঘুরিয়ে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। চোখবন্ধ করে আছে আহমদ মুসা। নতুন করে আহমদ মুসার দিকে তাকাতে গিয়ে শিউরে উঠল সাগরিকা সেন। কিন্তু এমন সাধারন লোক এতবড় অসাধারন হয় কেমন করে! যে মুক সে দেখছে সেমুখে কোন মলিনতা, কোন আবিলতা, কোন পাপের স্পর্শ নেই। শিশুর মত নিষ্কলুষ এক মুখ। এই মুখ ও মুখের আড়ালে যে মন-এই তো সাধু-সন্তত্ব এবং শক্তি দু'য়েরই সম্মিলন ঘটেছে। এ কারনেই কি সাধারন হয়েও অসাধারন! শ্রদ্ধায় যেন নুয়ে পড়তে চাইল সাগরিকা সেনের মন।

আহমদ মুসার মুখ দেখে বিস্মিত হলো সাগিরকা সেন আরেকটা কারণেও। সেটা হলো, আহমদ মুসার দেহে যে বিপর্যয় ঘটে গেছে তার কোন প্রকাশ তার মুখে নেই। নিশ্চয় আহমদ মুসা এখন চেতন আছে। কিন্তু তার দেহ এখন যন্ত্রনায় যে জর্জরিত হচ্ছে, তার কোন প্রকাশ তার মুখে দেখা যাচ্ছে না। হয় তার নার্ভ পাথরের মত শক্ত, নয়তো এই যন্ত্রণা হজম করার মত মানসিক শক্তি তার আছে। অথবা সাধু-সন্ত বিপ্লবী হিসাবে তার দুটিই আছে।

সাগরিকা সেনের ভাবনার এই ভেলা আর কতদূর বয়ে চলত কে জানে। কিন্তু সামনের ড্রাইভিং সিট থেকে নোয়ান নাবিলা কথা বলে উঠল, 'আনাপোলিশ তো এসে গেলাম। বল কোথায় যাব। কোন হাসপাতালে? কোন ক্লিনিকে?'

'না কোথাও না।'

'তাহলে কোথায়? তোমার বাড়িতে?'

'না।'

'তাহলে?'

'নাবিলা তুমি তো আনাপোলিশের মেয়ে। তোমার কি এমন কোন ডাক্তারের কথা জানা আছে যিনি বাড়িতে চিকিৎসা করেন, বাড়িতে তার চিকিৎসার ফ্যাসিলিটি আছে, যেখানে একে চিকিৎসার জন্যে নিয়ে যেতে পারি।'

'কিন্তু হাসপাতালে, ক্লিনিকে অসুবিধা কি? সেখানে আরও বেটার হবে।'

'এর শত্রু আছে। খুব শক্তিশালী শত্রু। তারা হাসপাতালে-ক্লিনিকে নিশ্চয় খুঁজবে।'

'সে রকম ভয় থাকলে পুলিশের সাহায্য নাও না।'

'নিরাপদ নয়। বড় বড় পুলিশ অফিসার শত্রুর পক্ষে কাজ করতে অনেক সময় বাধ্য হয়।'

'তোমার বন্ধু কি এতবড় কেউ?'

'তার শত্রু বড়।' বলেই সাগরিকা সেন তার আগের প্রশ্নে ফিরে গেল। বলল, 'যা বললাম, তোমার পরিচিত তেমন কোন ডাক্তার আছে?

'আছেন একজন রাব্বী ডাক্তার। তিনি ভাল ডাক্তার, ভাল সার্জন। বাড়িতে চিকিৎসা করেন। জরুরী রোগী তার বাড়িতে রাখার ব্যবস্থাও আছে। তবে নার্স ভাড়া করতে হয়। আর ডাক্তারের ফি'টা একটু বেশী।'

'তা হোক। যত টাকা চান দেব। নার্স ভাড়া করব ক্ষতি নেই।

ধন্যবাদ তোমাকে নাবিলা। এখন তাহলে সেই ডাক্তারের ওখানেই চল।'

'অল রাইট।' বলে গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিতে দিতে বলল, 'শশাংক আজ কখন আসছে সাগরিকা?'

নাবিলা ও শশাংক সেন দু'জনে বন্ধু। শুধু বন্ধুই নয়, দু'জন দু'জনকে গভীরভাবে ভালবাসে। শশাংকের মাধ্যমেই এক পার্টিতে নোয়ান নাবিলার সাথে সাগরিকা সেনের পরিচয়।

'হয়তো এতক্ষনে এসেই গেছে। ভেব না নাবিলঅ। দেখি তাকে টেলিফোন করছি। এর কথা যদি ওকে বলি, দেখবে আমরা ডাক্তারের কাছে পৌঁছার আগেই সে পৌঁছে গেছে।'

'এত ভালবাসে?'

'ভালবাসে মানে একেবারে ভক্ত।'

'কিন্তু ইনি দেখছি এশিয়ান, আর তোমরা আমেরিকান। বন্ধুত্বটা কিভাবে?'

'এটা আবার কোন বাধা হলো নাকি? এক দেখাতেই অনেক সময় শতবার দেখার কাজ হয়ে যায়।'

'সে রকম কাজ তোমার হয়েছে নাকি?'

'বলতে পার।'

'আরও কিছু বলতে পারি না?' নোয়ান নাবিলার চোখে দুষ্টুমীর হাসি।

'দেখ ভিন্ন অর্থ খোঁজার কোন অবকাশ নেই। আর তার সময়ও এটা নয়।' কৃত্রিম গম্ভীর হবার চেষ্টা করে বলল সাগরিকা সেন।

'ঠিক আচে, সময়েই বলব।'

বলে স্লো হয়ে পড়া গাড়ির গতি আবার বাড়িয়ে দিল।

ছুটে চলল গাড়ি আনাপোলিশের দিকে।

'সাগরিকা মামনি কেবিনে যাচ্ছ?' বলল ডাঃ বেগিন বারাক।

ডাঃ বেগিন বারাকের কাছেই আহমদ মুসার চিকিৎসা হচ্ছে। ডাঃ বেগিন বারাকের বাড়ির বিরাট বাড়ির একটা অংশ নিয়ে সে তার মিনি ক্লিনিক সাজিয়েছে। সামনের বড় ঘরে তার ডাক্তারখানা। সে ডাক্তারখানার পেছনে বিভিন্ন আকারের পাঁচটি কেবিন আছে। অর্থাৎ আউটডোর চিকিৎসার বাইরে মাত্র পাঁচজন রোগী এক সংগে তার মিনি ক্লিনিকে ভর্তি হতে পারে। এ কেবিনগুলোতে চিকিৎসা সেবা ছাড়া ডাক্তারের পক্ষ থেকে শুশ্রুসা ও খাবার সুযোগের ব্যবস্থা

নেই। শুশ্রুসার জন্যে নার্স ভাড়া করা ও খাবার সরবরাহের ব্যবস্থা রোগীদের পক্ষ থেকে করতে হয়। যাদের সামর্থ নেই তাদের খাবার ব্যবস্থা পাশের চ্যারিটেবল অরফানেজ থেকে করা হয় আর শুশ্রুসার ব্যবস্থা ডাক্তার নিজের তহবিল থেকে করে থাকেন।

ডাঃ বেগিন বারাকের চিকিৎসা কাজ তার ধর্মজীবনের অংশ। ডাঃ বারাক ইহুদী রাব্বী পরিবারের সন্তান এবং নিজেও একজন রাব্বী বা ধর্মগুরু। তার এবং তার স্ত্রীর গোটা জীবনটাই ধর্মের কাজে উৎসর্গীত।ভ একজন নিষ্ঠাবান ইগুদী এবং বহুদর্শী ধর্মগুরু হিসাবে চারদিকে তার সুনাম আছে।

ডাঃ বেগিন বারাকের ডাক্তার খানার সামনে দিয়েই কেবিনগুলোতে যাবার করিডোর। কেউ কেবিনে যেতে চাইলে ডাক্তারখানার দরজা অতিক্রম করে যেতে হয়। আর ডাঃ বারাক তার ডাক্তারী চেয়ারে বসে বাইরের দরজার দিকে মুখ করেই। সযতরাং কেবিনের দিকে যেই যাক তার নজর এড়ায় না।

ডাঃ বেগিন বারাকের প্রশ্ন শুনে সাগরিকা সেন দাঁড়িয়ে গেল। ডাঃ বারাকের দিকে ফিরে বলল, 'গুড ইভনিং ডক্টর আংকেল। আমি কেবিনে একটু সুধাংশুর কাছে যাচ্ছি।'

আহমদ মুসাকে সাগরিকা সেন সুধাংশু সেন নামে ভর্তি করেছে ডাক্তারের ক্লিনিকে।

'যাবে, এদিকে একটু এস।' বলল ডাঃ বেগিন বারাক।

সাগরিকা সেন ডাক্তার খানায় প্রবেশ করল। দাঁড়াল গিয়ে ডাঃ বারাকের টেবিলের সামনে।

'বস মামনি একটু গল্প করি। রোগী-পত্র এখন নেই।'

সাগরিকা সেন একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

'তোমার আব্বাকে গতকাল টেলিভিশনে একটা ব্যবসায় সম্মেলনে দেখলাম, উনি কোথায়?' বলল ডাঃ বেগিন বারাক।

'ওয়াশিংটনে।'

'আচ্ছা, তোমার এ বন্ধুটিকে তুমি কতদিন থেকে চেন?'

হঠাৎ এমন প্রশ্নে সাগরিকা সেন বিব্রত হয়ে পড়ল। কিন্তু তাড়াতাড়ি প্রশ্নের উত্তর দিল, 'খুব বেশী দিন নয়।'

'কিভাবে পরিচয় হয়?'

আরও বিপদে পড়ল সাগরিকা সেন। এখন তো মিথ্যা কথা বলতে হবে। মিথ্যা কথাটা কি হবে তা গুছিয়ে নিয়ে বলল, 'হোটেলে একত নাচের পার্টিতে।'

জবাবটা দিয়েই প্রসঙ্গান্তরে যাবার জন্যে সাগরিকা প্রশ্ন করল, 'তাকে কেমন দেখছেন আংকেল, কতদিনে সেরে উঠতে পারে?'

'আমার চিকিৎসা জীবনে এমন রোগী পাইনি। অন্য রোগী হলে কমপক্ষে তিরিশ দিন তাকে শুয়েই কাটাতে হতো। কিন্তু সে তো তিনদিনেই উঠে দাঁড়িয়েছে। একটা মিরাকল বলতে পার।'

'কারন কি আংকেল?'

'কারন যেটুকু বুঝেছি সেটা হলো, তার মানসিক শক্তি প্রচন্ড। চিকিৎসা বিজ্ঞান বলে, এই মানসিক শক্তি অব্যার্থ মেডিসিনের কাজ করে। এই রকম প্রচন্ড মানসিক শক্তি সম্পন্ন মানুষ প্রথিবীতে বিরল।'

কথা শেষ করেই ডাঃ বেগিন বারাক তার প্রসংগে ফিরে এল্ বলল, 'তোমার এ বন্ধু তোমাদের বাড়িতে গেছে?'

'জি না আংকেল।'

'তোমার আব্বা কখনও তাকে দেখেছে?'

'না আংকেল।'

'বলছ এ তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধূ, তাহলে তো এর সম্পর্কে তোমার অনেক কিছুই জানার কথা। তাই না?'

প্রমাদ গুনল সাগরিকা সেন। তার সম্পর্কে যা জানে তা বলা যাবেনা। এখন কিছু জানি না বললেও বিশ্বাস করবে না। অবশেষে বলল, 'নাম-ধাম ছাড়া তেমন কিছুই জানি আংকেল।

'নাম জান, কিন্তু ধাম জান না।'

'কেমন বলে বলছেন?

'বল সত্য কিনা?'

সাগরিকা সেন জবাবা দিল না। প্রথমবারের মত নিরুত্তর হলো সে।

হাসল ডাঃ বেগিন বারাক। বলল, 'মামনি আমার কাছে যেটা লুকাচ্ছ, আমি সেটা জানি।'

আতংকিত হয়ে উঠল সাগরিকা সেন। সেটা তার চোখ-মুখের ভাবে প্রকাশও পেল। ধীরে ধীরে দ্বিধাজড়িত কন্ঠে বলল, 'আপনিও কি জানতে পেরেছেন আংকেল?'

'আমি জানি যে সে সুধাংশু সেন নয়। সে আহমদ মুসা।'

নামটি ডাঃ বেগিন বারাকের কন্ঠে উচ্চারিত হবার সাথে সাথে সাগরিকা সেনের চেহারা পাল্টে গেল। বাঘের সামনে পড়া হরিণীর মত হয়ে গেল তার চেহারা। কোনকথা বলতে পারল না সে।

হাসল ডাঃ বেগিন বারাক। বলল, 'ভয় নেই, আমি তাকে ধরিয়ে দেব না। আমি ডাক্তার। তার উপরে জেনারেল শ্যারন ও ডেভিড উইলিয়াম জোনসরা যা করে আসছেন তার আমি ঘোর বিরোধী।

'কেমন?' সাগরিকা সেনের চোখে যেন আশার একটা তরঙ্গ এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

'জেনারেল শ্যারন ও মিঃ জোনসরা ইহুদী জাতিকে নিছক একটা পলিটিক্যাল ইউনিট হিসেবে ধরে বিশ্বব্যাপি যে রাজনৈতিক ও গোয়েন্দা তৎপরতা চালাচ্ছে তার সাথে আমি শুরু থেকেই একমত নই। আমি ইহুদী জাতিকে সম্পূর্নভাবে ধর্মীয় ইউনিট মনে করি। অন্যের মাথায় বাড়ি দেবার মত রাজনীতি করার ইহুদীদের কোন অবকাশ নেই। ফিলিস্তিনিদের উপর জুলুম অত্যাচার করে শুধু ফিলিস্তিনিদের ক্ষতি নয় ইহুদী ধর্মের মাথায়ও বাড়ি দেয়া হয়েছে। ফিলিস্তিনে ইসরাইলীদের 'পিতৃভূমি' তত্ত্বের সাথেও আমি একমত নই। ইহুদীরা যে দেশের নাগরিক সেটাই তাদের পিতৃভূমি। জাতীয় কোন পিতৃভূমি থাকা অবান্তর। যেমন মুসলমানরা যে দেশে থাকে, সেটাই তাদের পিতৃভূমি, মাতৃভূমি। মক্কা বা আরব তাদের পিতৃভূমি বা মাতৃভূমি নয়, তীর্থকেন্দ্র মাত্র। এ নীতিগত বিরোধ তাদের সাথে থাকা ছাড়াও সম্প্রতি লস আলামোসে গোয়েন্দা সুড়ঙ্গকে কেন্দ্র করে আহমদ মুসা ইহুদীবাদীদের মুখোশ যে উন্মোচন করেছেন,

তাতে আমি তার প্রশংসা করি। এতে আমেরিকায় প্রকৃত ইহুদীদের পরিণামে উপকারই হবে।'

'ধন্যবাদ ডাক্তার আংকেল। আমাকে বাঁচালেন। আমি মরেই যাচ্ছিলাম ভয়ে। আমি ভাবছিলাম, আপনি যখন চিনতে পেরেছেন, তখন নিশ্চয় জেনারেল শ্যারনদের কিংবা আব্বাদের কাছে তার কথা জানিয়ে দিয়েছেন।'

'প্রথম দিন দেখেই আমি তাকে চিনতে পেরেছি।'

'কিভাবে?'

'আহমদ মুসার ফটো আমি কয়েকবার দেখেছি। সর্ব শেষে দিন কয়েক আগে সিনাগগে গিয়ে আহমদ মুসার ফটো নোটিশ বোর্ডে টাঙানো দেখে এসেছি।'

'জেনারেল শ্যারনদের ইহুদীবাদ সম্পর্কে আপনার মনোভাবের কথা কি সবাই জানে?'

'সবাই জানে। জেনারেল শ্যারনরাও জানে।'

'তাহলে আপনি তো তাদের শত্রু হয়ে পড়ার কথা।'

'এ মনোভাব তো আমার একার নয়। ধর্মপ্রান ইহুদীরা সবাই আমার মত একউ মনোভাব পোষণ করে। কিন্তু এরা ভোকাল নয় এবং তাদের কোন প্লাটফরম নেই বলে তাদের কথা মানুষ জানতে পারে না।'

'ধর্মপ্রাণ ইহুদীরা যদি শ্যারন ও জোনসদের পেছনে না থেকে থাকে, তাহলে ওরা শক্তি এবং অর্থবিত্তে এমন সমৃদ্ধ হয়ে উঠল কি করে?'

'সকলকে তারা ব্যবহার করে। ভয়ে কেউ কিছু বলে না। তারা পাইকারীভাবে বড় বড় অংকের চাঁদা তুলে। সবাই মুখ বুজে চাঁদা দেয়। সন্ত্রাসী শক্তির সাথে শান্তিপ্রিয় জনগন পারবে কেমন করে!' বলল ডাঃ বেগিন বারাক।

'কিন্তু আমি আশ্চর্য হচ্ছি শ্যারন ও জোনসরা আমাদের ভারতীয় আমেরিকানদের কাছে টানল কেমন করে?' বলল সাগরিকা সেন।

'আমাদের একেশ্বরবাদী ইহুদীদের ও পৌত্তলিক হিন্দুদের বিশ্বাসে বিপরীতমুখী হলেও রাজনৈতিক সখ্যতা খুব পুরানো। ফিলিস্তিনে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর ভারত রাষ্ট্র ইসরাইলের সহযোগী হয়ে যায়। মুসলমানরা উভয়ের কমন শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। তখন থেকে দুই রাষ্ট্র, তথা দুই জাতির মধ্যে গভীর সম্পর্ক

গড়ে উঠে। এ বিষয়টা বিশ্বের সব ইহুদী এবং ভারতের হিন্দু জনগন জানে। ফলে পরবর্তীকালে হিন্দু যারা আমেরিকায় এল তারা এখানকার ইহুদীদেরকে বন্ধু হিসেবেই পেল। এই বন্ধুত্ব এখন কৌশলগত মৈত্রীতে পরিনত হয়েছে। আমেরিকায় যেমন ক্ষুদ্র একটা কম্যুনিটি হয়েও ইহুদীরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবে আমেরিকাকে ডোমিনেট করছে, তেমনি আমেরিকায় হিন্দুরা তার চেয়ে ছোট কম্যুনিটি হয়েও অর্থনৈতিক ভাবে আমেরিকানদের মাথার উপর আসীন হয়েছে। উভয় কম্যুনিটি আমেরিকায় তাদের স্ব স্ব আসন ঠিক রাখার জন্যে আজ সহযোগী হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই ইহুদীদের বিপদ মুহূর্তে ভারতীয় আমেরিকানরা তাদের রক্ষার জন্যে এগিয়ে এসেছে।'

'ডঃ আংকেল এই যে বললেন, হিন্দুরা মানে ভারতীয় হিন্দুরা আমেরিকায় ছোট একটি কম্যুনিটি হয়েও অর্থনৈতিক ভাবে আমেরিকানদের মাথা উপর উঠে বসেছে, এটা এক শ্যেনীর শত্রুর রাজনৈতিক প্রপাগান্ডা নয় কি? আমি তাই মনে করি।' বলল সাগরিকা সেন।

'ফ্যাক্টকে তো স্বীকার না করে পারবে না মা মনি। গত আদম শুমারীতে এ তথ্য ধরা পড়েছে যে, শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানদের গড় গৃহস্থালী আয়ের চেয়ে ভারতীয় আমেরিকানদের গড় গৃহস্থালী আয় বেশী। গত আদম শুমারীকালে ভারতীয় আমেরিকানদের গড় আয় দাঁড়িয়েছে ৬১ হাজার মার্কিন ডলার। ভারতীয় আমেরিকানরা বছরে যে সম্পদ উপার্জন করে তার পরিমান ২৫০ বিলিয়ন আমেরিকান ডলার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ' ইউনাইটেড এয়ারলাইনস' ও 'ইউএস এয়ারওয়েজ'হস প্রায় ৫০০টি প্রথম শেনীর কোম্পানী ভারতীয় আমেরিকানরা পরিচালনা করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যত ইমিগ্র্যান্ট কম্যুনিটি রয়েছে তাদের মধ্যে ভারতীয় আমেরিকানরা সবচেয়ে স্বচ্ছল। একটা উদাহরন দিলেই বুঝা যাবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র শতকরা ৬ ভাগ ভারতীয় আমেরিকানরা দরিদ্র সীমার নিচে বাস করছে, অথচ বৃটেনের মত দেশ থেকে আসা ইমিগ্র্যান্টদের ক্ষেত্রে ও এই হার শতকরা ৮ ভাগ। আমার কথা বাদ দাও, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর তোমাদেরই একজন জগদ্বীশ ভগবতী কি লিখেছেন জান? লিখেছেন 'ভারতীয়

কম্যুনিটি বলা যায় আমেরিকার 'পরবর্তী ইহুদী' (Next Jews) হতে যাচ্ছে। তাছাড়া....'

সাগরিকা সেন ডাঃ বেগিন বারাককে বাধা দিয়ে বলল, 'থাক ডাঃ আংকেল। আর নয়। আপনি বলতে চাচ্ছেন, ইহুদী ও ভারতীয় আমেরিকানদের মধ্যে স্বার্থের ঐক্য হয়েছে।'

'বলতে পার।'

সাগরিকা সেন সংগে সংগে কথা বলল না। একটু ভাবল। তারপর বলল, 'আমারও তাই মনে হয় আংকেল। তা না হলে আমার আব্বার মত লোক জেনারেল শ্যারনদের বন্দীকে এভাবে আশ্রয় দেবেন কেন?'

'তোমার আব্বা খুব বাস্তববাদী ও বুদ্ধিমান মানুষ। জেনারেল শ্যারনদের সাথে তার সায় দেয়াটা সত্যিই বিস্ময়কর।' বলল ডাঃ বেগিন বারাক।

'আমার ভয় হচ্ছে আপনাদের কম্যুনিটি যে বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে, সে ধরনের বিপর্যয়কে আমরাও যেন স্বাগত জানাচ্ছি।' সাগরিকা সেন বলল।

'ঠিকই বলেছ। ব্যাপারটা খাল কেটে কুমির আনার মত। তোমর এ কথাটাও ঠিক যে, আমাদের কম্যুনিটি বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। তবে জেনে রাখ জেনারেল শ্যারনও মিঃ জোনসদের অপরাধের দায় আমাদের কম্যুনিটি নিচ্ছে না। আমি যে মত পোষণ করি, সে মতের লোকদের সংখ্যাই আমাদের কম্যুনিটিতে বেশী। কিন্তু তারা অসংগঠিত। তারা সংগঠিত হচ্ছে। শীঘ্রই তারা জেনারেল শ্যারনদের মুখোশ উন্মোচন করে নিজেদের অবস্থান পরিস্কার করবে। তারা পরিষ্কার বলে দিতে যাচ্ছে, ধর্মে আমরা ইহুদী, কিন্তু জাতিতে আমরা আমেরিকান। আমেরিকা আমাদের মাতৃভূমি, পিতৃভূমি সব, কোন 'প্রমিজড ল্যান্ড' নয়।' ডাঃ বেগিন বারাক বলল।

'ধন্যবাদ ডাঃ আংকেল। আপনার সাথে এই আলোচনা করে খুশী হলাম। যে কথা কোথাও বলতে পারি না তা বলতে পারলাম। আপনার শেষ কথাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এভাবে আমাদেরও চিন্তা করা দরকার।' সাগরিকা সেন বলল।

'ধন্যবাদ মা মনি। তোমাকে দেরী করিয়ে দিলাম। আহমদ মুসার জন্যে তুমি যা করছ, তার জন্যে ঈশ্বর তোমার প্রতি খুশী হবেন। আহমদ মুসার পরিচয়

যাই হোক, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিধাতার একটি অস্ত্র সে। সে তার জাতির জন্যে কাজ করছে বটে, কিন্তু সব জাতির জন্যে সে ণ্যায়পরায়নতার একজন শিক্ষক। আমি আনন্দিত যে, তার সেবা করার একটা সুযোগ আমি পেয়েছি।'

'সত্যি ডাঃ আংকেল, যতই তাকে দেখছি ততই অভিভূত হয়ে পড়ছি। এতগুনের সমাহার একজন মানুষের মধ্যে হয় কি করে? আমি সেদিন আমার আব্বার উইজডোম সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছিলাম। সংগে সংগে তিনি তার পুতিবাদ করলেন। পিতা সম্পর্কে এই ধরনের মন্তব্য ঠিক নয়। আপনার পিতা যা করেছেন জাতীয় স্বার্থ সামনে রেখেই করেছেন। জাতির বন্ধু-জাতিকে সাহায্য করাকে তিনি প্রয়োজন হিসাবে দেখেছেন। প্রয়োজন অনেক সময় নীতিবোধের উপরে উঠতে পারে। তা এই বাধ্যবাধকতার পতি সন্তান হিসাবে আপনি সমর্থন না দিলেও সহানুভূতিশীল হওয়া প্রয়োজন।' সাগরিকা সেন বলল। বলতে বলতে তার কথা আবেগপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

'এ জন্যেই বলছিলাম, আহমদ মুসা তার জাতির জন্যে কাজ করলেও সব মানুষেণ শিক্ষক হতে পারেন।'

'ধন্যবাদ ডাঃ আংকেল। আমি উঠি।'

'ধন্যবাদ, এস।'

সাগরিকা সেন বেরিয়ে এল।

চলল আহমদ মুসার কেবিনের দিকে।

ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখল আহমদমুসা নামাজ পড়ছে।

কেবিনের দরজা পূর্ব দিকে। আহমদ মুসা নামাজে দাঁড়িয়েছে পূর্বমুখী হয়ে।

দরজা থেকে আহমদ মুসার গোটা সম্মুখ দিকটা ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে।

সাগরিকা সেন আহমদ মুসার দিকে একবার তাকিয়েই বুঝল গভীর তন্ময়তায় ডুবে আছে আহমদ মুসা। এই তন্ময়তা ভাঙতে চাইল না সাগরিকা সেন। মোনাজাতের মাধ্যমে নামাজ শেষ হলে সাগরিকা সেন ঘরে ঢুকল।

নামাজ শেষে উঠে দাঁড়িয়েছিল আহমদ মুসা। সাগরিকা সেনকে ঘরে ঢুকতে দেখে বলল, 'আসুন মিস সেন।'

বেডের সামনে কোণাকুণি কের বসানো দু'টি সোফা এবং সামনে একটা টিপয়।

সাগরিকা সেন গিয়ে একটি সোফায় বসল।

অন্য সোফাটিতে বসল আহমদ মুসা।

প্রথম কথা বলল সাগরিকা সেন। বলল, 'প্রার্থনায় স্রষ্টার কাছে কি চাইলেন?' মুখে হাসি সাগরিকা সেনের।

'যা প্রয়োজন সব চেয়েছি।' বলল আহমদ মুসা। তার ঠোঁটে হাসি। কিন্তু মুখ নিচু।

'আপনার আবার কোন প্রয়োজন আছে নাকি?'

'শুধু নিজের জন্যে নয়, অন্যের প্রয়োজনও আমার প্রয়োজন।'

'এই 'অন্য' কে বা কারা?

'যিনি মুমূর্ষু একজনকে পথ থেকে তুলে এনে এই সুন্দর চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, তিনিও একজন।'

হাসল সাগরিকা সেন, লজ্জামিশ্রিত হাসি। বলল, 'তার জন্যে কি প্রার্থনা করেছেন?'

'বলেছি, তাকে মুক্তি ও চির মঙ্গলের পথে পরিচালনা করুন।'

সাগরিকা সেনের মুখ তেকে হাসি উবে গিয়ে সেখানে আবেগ জড়িত এক গাম্ভীর্য নেমে এল। বলল, 'মুক্তি কি থেকে? আর চির মঙ্গলের পথটা কি?'

'মানুষ যদি এ পৃথিবীতে ভাল করে, এজন্যে স্রষ্টার কাছে তার পুরস্কার আছে। আর যদি অবাঞ্চিত, অনুচিত খারাপ কাজ করে, তাহলে স্রষ্টার কাছে জবাবদিহী করতে হবে এবং অপরাধী হলে শাস্তি পেতে হবে। এ থেকে আমি মুক্তি চেয়েছি। আর চিত মঙ্গলের পথ হলো যে পথে চললে মৃত্যপরবর্তী অনন্ত জীবনে অনন্ত যুরস্কার লাভ হবে।' বলল আহমদ মুসা।

'তাহলে মুক্তি পাওয়া এবং অনন্তঝীবনে অনন্ত পুরসকার লাভ করা তো একই বিষয় হলো।'

'হ্যাঁ তাই।'

'যে পথে চললে অনন্ত জীবনে অনন্ত পুস্কার লাভ করা যাবে, সেই পথ কোনটি?'

'স্রষ্টার প্রতিনিধি নবী-রাসুলরা যে পথ মানুষকে দেখিয়ে গেছেন।'

হাসল সাগরিকা সেন। বলল, 'নাম বলুন।'

'যেমন স্রষ্টার সর্বশেষ রসুলের আনা পথ ইসলাম।'

'তার মানে আপনি আমাকে আপনার ধর্মের পথে চলার জন্যে প্রার্থনা করেছেন।'

'ঠিক তাই। কারন, নিজের জন্যে যা পছন্দ করি, অন্যের জন্যেও তা পছন্দ করতে হয়।'

হাসল সাগরিকা সেন। বলল, 'আমিও যদি এ কথাই বলি, আমার যে পথ পছন্দ সে পথ আপনারও হোক।'

'কিন্তু আপনি সে প্রার্থনা করেননি।'

সাগরিকা সেন ততক্ষণাৎ জবাব দিল না।একটু ভাবল। তারপর বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি নিজেযে মন্দিরে যাই না, সেখানে আপনাকে ডাকব কি করে?'

বলে একটু থামল। ভাবল। তারপর আবার বলল, 'আচ্ছা বলুন তো, কোন ধর্মের অনুসরণ কি মানুষের অপরিহার্য?'

'যে কোন ধর্মের নয়, সত্য ধর্মের অনুসরণ মানুষের জন্যে অপরিহার্য।'

'কেন?'

'দুনিয়ার জীবন পরিচালনায় পক্ষপাতহীন ও আখেরাতমুখী ব্যবস্থা লাভের জন্যে।'

'কোন মানুষ তার জীবন পরিচালনায় নিরপেক্ষ ব্যবস্থা নিজে তৈরী করতে পারে না?'

'মানুষ সাধারনভাবে আত্মকেন্দ্রিক। তার উপর মানুষের নিজের সম্পর্কে, জগত্-জীবন সম্পর্কে জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ। সবচেয়ে বড় কথা, আখেরাত বা মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানে না।' আহমদ মুসা বলল।

'পৃথিবীর জীবন পরিচালনায় মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কে জানা প্রয়োজন কেন?' বলল সাগরিকা সেন।

'দুনিয়ার জীবনটা কাজ করার আর আখেরাতের চিরন্তন জীবন সেই কাজের ফল ভোগ করার। দুনিয়ার সসীম জীবনে মানুষ যে কাজ করবে, আখেরাতের অসীম জীবন ধরে তারই ফল ভোগ করবে। সুতরাং দুনিয়ায় মানুষের সীমিত জীবনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দুনিয়ার জীবনটা আসলেই আখেরাতের অনন্ত জীবনের সূচনাকাল। আখেরাতের কি সাফল্যের জন্যে কি ধরনের জীবন চাই, তা না জানলে এ পৃথিবীতে সফল জীবন পরিচালনা করা যাবে না। সুতরাং আখেরাতের জ্ঞান দরকার। সে জ্ঞানের ভিত্তিতেই দুনিয়ার জীবন পরিচালনা করতে হবে।

'আখেরাতের ব্যাপারটা তো আপপনাদের ধর্মের কথা।'

'আমার ধর্মের কথা নয়, সত্য ধর্মের কথা।'

'আপনার ধর্মই একমাত্র ধর্ম একথা আমি মানব কেন?'

'মানবেন কারণ, আমার ধর্মই সর্বশেষ ধর্ম এবং আমার ধর্মের রাসুলই সর্বশেষ রাসুল।'

'সর্বশেষ হওয়া কি সত্য হওয়ার শর্ত?'

'একটা শর্ত।'

'অন্যান্য শর্তের কি হবে?'

'অন্যান্য শর্তও পূরণ হয়েছে। একমাত্র ইসলামের ধর্মগ্রন্থ ছাড়া আর কোন ধর্মগ্রন্থ অবিকৃত নেই। যেহেতু ধর্মগ্রন্থই অবিকৃত নেই তাই অন্য কোন ধর্মই আর সত্য নয়। সুতরাং অবিকৃত ধর্মগ্রন্থ ও অবিকৃত ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে ইসলামই এখন একমাত্র সত্য ধর্ম।'

হাসল সাগরিকা সেন। বলল, 'ধন্যবাদ সুন্দর যুক্তির জন্যে। তবে আমার হজম শক্তি দুর্বল। শক্ত জিনিস হজম করতেত আমার সসময় লাগবে।'

'সময় লাগুক, হজমের সম্ভাবনা আছে কিনা?'

আবার হাসল সাগিরিকা সেন। বলল, 'বলব না। ওটা একান্ত আমার ববব্যাপার।'

বলে একটু থেমে বলল, 'তবে একটা মজার খবর  শোনাতে পারি আপনাকে।'

'কি সেটা?'

'ডা: আংকেল শুরু থেকেই আপনাকে চিনতে পেরেছেন।'

'ডা: বেগিন বারাক আমাকে শুরুতেই চিনেছেন?' বিস্ময় ফুটে উঠল আহমদ মুসার কন্ঠে। তার বিস্মিত দৃষ্টি সাগরিকা সেনের মুখের উপর নিবদ্ধ।

মুখে হাসি সাগরিকা সেনের। বলল, 'নিশ্চয়।'

'উনি ধরিয়ে দেননি  কেন আমাকে এখনও?'

হাসল সাগরিকা সেন। বলল, 'উনি আপনাকে ভালবেসে ফেলেছেন।'

আহমদ মুসার মুখের গাম্ভীর্য তখনও কাটেনি। বলল, 'বলুন তো ঘটনাটা কি?

'আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না?'

হাসল আহমদ মুসা। প্রশ্ন এড়িয়ে বলল, 'আসল কথাটা বলুন।'

'কিন্তু সত্যিই তিনি আপনাকে ভালবাসেন।'

'কারন কি?'

'কারন ছাড়া কেউ ভালবাসতে পারে না?'

'ডা: বেগিন বারাক নিশ্চয় সেই লোক নন?'

'তিনি ইহুদী বলেই কি এই কথা বলছেন?'

'কতকটা তাই।'

'ইহুদীরা সব এক ধরনের নয় ও এক মতেরও নয়। ডাঃ আংকেল জেনারেল শ্যারনদের ঘোর বিরোধী।'

'আমি এরকম একটা কিছু ধারনা করেছিলাম। ডাঃ বারাক কি মত পোষণ করেন বলুন তো?'

সাগরিকা সেন কিছুক্ষন আগে  তার সাথে ডা: বেগিন বারাকের যে আলোচনা  হলো, তা বিস্তারিত আহমদ মুসাকে জানাল। সবশেষে বলল, 'সত্যি ডাঃ আংকেলের নীতিনিষ্ঠতা ও মহানুভবতার কোন তুলনা নেই।'

'সত্যি ডা: বেগিন বারাক একজন আদর্শ মানুষ, অনুকরনীয় ও বরনীয় একজন ব্যক্তিত্ব। কিন্তু মিস সেন আপনার শেষ কথাটার ব্যাপারে আমার আপত্তি আছে। তুলনার যদি কেউ না থাকে, তাহলে যিনি আমাকে তাঁর গোটা কম্যুনিটির স্বার্থের বিরুদ্ধে শুধু নয়, পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আমাকে মমূর্ষু অবস্থায় তুলে এনে চিকিতসার এমন দূর্লভ ব্যবস্থা করেছেন, তাকে কোথায় রাখব?'

সাগরিকা সেন গম্ভীর হয়ে উঠেছে। আরক্ত হয়ে উঠেছে তার দুই গন্ড। লজ্বা জড়িত তার দুই চোখ নিচু হয়েছে। বলল, 'ধন্যবাদ, ডাঃ আংকেলের প্রতিযোগী আমি হতে যাচ্ছি না। সুতরাং স্থান সন্ধানের প্রয়োজন আছে কি?'

'স্যরি মিস সেন, আমি এই অর্থে কথাটা বলিনি। আমি ঘটনাটা স্মরণ করতে চেয়েছি মাত্র। আমি...।'

কথঅ থেমে গেল আহমদ মুসার। খোলা দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে ডাঃ বেগিন বারাক।

'একটা কথা মিস সেনের উপস্থিতিতে আপনাকে বলা দরকার তাই এলাম। কিন্তু দরজা খোলা কেন?' বলল ডা: বেগিন বারাক।

'ডাঃ আংকেল এটা মিঃ আহমদ মুসাদের সংস্কৃতি। পারিবারিকভাবে সম্পর্কত নয় এমন একজন নারী ও একজন পুরুষ যখন কোন ঘরে একত্রিত হন, তখন দরজা খোলা রাখেন।' সাগরিকা সেন বলল। হাসল ডা: বেগিন বারাক। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, 'এজন্যেই ইসলাম মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। ঠিকই নির্জন একটি ঘরে একজন নারী ও একজন পুরুষের একত্রিত হওয়া স্বভাব পরিপন্থী এবং অস্বাভাবিকতার জন্ম দিতে পারে। ইসলাম তার

প্রতিবিধান করতে চেয়েছে।' আহমদ মুসাকে টেনে এনে সোফায় বসিয়ে নিজে আহমদ মুসার বেডে বসতে বসতে বলল।

ডাঃ বেগিন বারাককে স্থান করে দেবার জন্যে আহমদ মুসা সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের বেডের দিকে যাচ্ছিল।

সাগরিকা সেনও উঠে দাঁড়িয়েছিল। সে গিয়ে বেডে বসে ডাঃ বেগিন বারাককে সোফায় বসার জন্যে অনুরোধ করল।

ডাঃ বারাক সোফায় এসে বসল।

বসেই বলল, 'আমার কথাটা বলে ফেলি।'

বলে একটু দম নিয়ে বলল, 'মিস সেন কাল রোববার সকালে আমি আহমদ মুসার ব্যান্ডেজ খুলব। আমার মনে হচ্ছে আহমদ মুসাকে অন্য কোথাও শিফট করা দরকার। কিন্তু আগামী তিন চার দিন তার ভাল রেস্ট দরকার। সে জন্যে যেখানে শিফট করা হবে তা একটু নিরিবিলি হতে হবে।'

'কেন ডা: আংকেল, তিন চারদিন উনি তো এখানে থাকতে পারেন। টাকার জন্যে চিন্তা করবেন না আংকেল।' বলল সাগরিকা সেন।

'আহমদ মুসার ব্যাপারে কোন টাকার প্রশ্ন নেই মিস সেন। আহমদ মুসা চাইলে তার থাকার জন্যে আমার গোটা বাড়ি দিয়ে দিতে পারি। সেটা হবে আমার সৌভাগ্য। কিন্তু আমি অন্য চিন্তা করছি। আমি ভাবছি আহমদ মুসার নিরাপত্তার কথা। আমার ক্লিনিক তো বাজারের মত।' বলল ডাঃ বারাক।

ভাবছিল সাগরিকা সেন। একটু পর বলল, 'আমার তো ভয় ধরিয়ে দিলেন ডাঃ আংকেল। আমার বুক কাঁপছে। মনে হচ্ছে আজই কোথাও শিফট করি।'

'তার দরকার নেই। আমি কাল সকালে ব্যান্ডেজ খুলব। দুপুরের দিকে শিফট করলেই চলবে।'

বলে ডাঃ বেগিন বারাক উঠে দাঁড়াল।

সাথে সাথে আহমদ মুসাও উঠে দাঁড়াল। বলল, ' ডাঃ বারাক আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। মিস সেনের কাছে শুনলাম প্রথম দিনই আপনি আমাকে চিনতে পেরেছেন।'

হাসল ডা: বারাক। বলল, 'মিঃ আহমদ মুসা, আমি ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ যে, ঈশ্বর আমাকে আপনার কিছু সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। আমার জাতির কিছু পথভ্রষ্ট লোক আপনার এ অবস্থার জন্যে দায়ী। আমি আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।'

বলে ডাঃ বারাক আহমদ মুসার সাথে হ্যান্ডশেক করে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ডা: বারাক।

'তাহলে আমিও চলি মি: আহমদ মুসা। কালকের শিফটের ব্যাপার নিয়ে কিছু ভাবতে হবে।' বলল সাগরিকা সেন।

'মিস সেন আমি একটা কথা বলতে চাই।' আহমদ মুসা বলল।

'বলুন।'

'আমি সুস্থ। কাল ব্যান্ডেজও খোলা হবে। আমি যেতে চাই।'

'কেন, ডাক্তার আংকেল বলেছেন কয়েকদিন আপনার সম্পূর্ন রেস্ট দরকার। আপনি সম্পূর্ন সুস্থ নন।'

'কোন অসুবিধা হবে না মিস সেন।

'না, এভাবে আপনাকে আমি পালাতে দেব না। মনে করেছেন আমি আপনাকে শিফট করা নিয়ে ঝামেলায় পড়ব। তাই না? তা হবে না।'

সাগরিকা সেন বসেছিল। আবার উঠে দাঁড়াল। বলল, 'মাথা থেকে ওসব চিন্তা বাদ দিন। আমি চলি। সালাম।'

বলে সাগরিকা সেন দরজার দিকে হাঁটা শুরু করল। তার মুখে হাসি। 'সালাম' বলার সময় তার মুখে এই মিষ্টি হাসি ফুটে উঠেছিল।

# ৫

মেডিলিন মার্গারেট ও তার বয়ফ্রেন্ড ললয়েড ল্যাজিও রেস্টুরেন্টের একটা টেবিলে বসে আছে। ওদের খাওয়া-দাওয়া শেষ। এখন চা খাচ্ছে।

মেডিলিন মার্গারেট পেশায় নার্স। এখন সে কাজ করছে ডা: বেগিন বারাকের ক্লিনিকে। আহমদ মুসার নার্সিং-এর জন্যে ডাঃ বেগিন বারাক তাকেই কাজে লাগিয়েছেন। মেডেলিনের বয়ফ্রেন্ড একজন খেলোয়াড়।

খেলোয়াড় ললয়েডকে দেখেই তিনজন যুবক এগিয়ে এল তাদের টেবিলের দিকে। ললয়েড উঠে দাঁড়িয়ে তাদের স্বাগত জানাল। তারা ললয়েডের পরিচিত।

বসল তারা তিনজন টেবিলে।

তাদের তিনজনের একজনের হাতে একটি ফটো ছিল। তার হাতের ফটো সে টেবিলে রাখল।

সে বসেছিল মেডিলিন মার্গারেটের পাশে।

স্বাভাবিকভাবেই ফটোটির দিকে চোখ গিয়েছিল মেডিলিন মার্গারেটের।

ফটোটির দিকে চোখ পড়তেই অবাক হলো মেডিলিন। মি: সুধাংশুর ফটো এদের হাতে কেন? বলল, 'এ ফটো আপনাদের হাতে কেন?'

যুবকটি মুখ ঘুরিয়ে তাকাল মেডিলিনের দিকে। বলল, 'কেন বলছেন এ কথা? চেনেন একে?'

'ঠিক চিনি বলা ঠিক হবে না। আমি একটা ক্লিনিকে ওর নার্সিং করছি।'

'কোন ক্লিনিকে?'

'ডাঃ বেগিন বারাকের মিনি ক্লিনিকে।'

'আমাদের রাব্বী ডাঃ বেগিন বারাক?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু লোকটি কে? আপনাদের কাছে ছবি কেন?' বলল মেডিলিন মার্গারেট।

'আমাদের লোক। খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আপনার কাছে খোঁজ পেলাম। ধন্যবাদ আপনাকে।' ওদের একজন বলল। ওদের সকলের চোখ আনন্দে উজ্জ্বল।

ওরা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'চলি।'

'চা খাবেন না?' বলল ললয়েড।

'সময় হচ্ছে না। পরে দেখা হবে। গুড মর্নিং।'

বলে ওরা বেরিয়ে গেল।

'বুঝলাম না। ওরা এলন, আবার চলে গেলেন!' বলল মেডিলিন।

'ওরা এ ধরনেরই। সারা শহর ঘুরে বেড়পয় দল বেঁধে। ওদের অসাধ্য কিছু নেই। কিন্তু শুনেচি তোমার ঐ লোকটি খুব ভাল মানুষ, তাহলে এদের লোক হয় কি করে?'

'কিছু বুঝছি না। চল আমরা উঠি।'

তারা উঠে দাঁড়াল।

বেরিয়ে এল রেস্টুরেন্ট থেকে।

ঠিক তখন দুপুর বারটা।

ওদের তিনজনের জীপ এসে থামল ডাঃ বেগিন বারাকের ডাক্তার খানার গাড়ি বারান্দায়।

তিনজনের মধ্যে লিডার গোছের লোকটি ছিল ড্রাইভিং সিটে।

গাড়ি দাঁড়াতেই সে বলল, 'বেভিন, বেরেটা তোমরা শোন, ডাক্তার যদি সহযোগিতা করে ভাল। সহযোগিতা না করলে ডাক্তারকেও আমরা ছাড়ব না।'

'তা কি আর বলতে হয়, স্যামুয়েল।' বলল বেভিন নামের লোকটি।।

'বলছি এ কারণে যে ডাঃ বেগিন বারাক খুবই সম্মানী লোক। তাকে যত কম ঘাটানো যায় ততই ভাল। নেহায়েত যেটুকু না করলে আমাদের কার্যসিদ্ধি হবে না, সেটুকুই করব, তার বেশী নয়।' বলল লিডার গোছের স্যামুয়েল।

'যতই সম্মানী হোক, আহমদ মুসার পক্ষ নেবার পর তার আর সম্মান থাকে কোথায়?' বলল বেরেটা।

'আহমদ মুসা নিশ্চয় নাম ভাঁড়িয়ে এখানে ভর্তি হয়েছে। ডা: বেগিন বারাকের কোন দোষ নাও থাকতে পারে।' স্যামুয়েল বলল।

গাড়ি থেকে নামার আগে তিনজনই সিটের তলা হতে মিনি সাইজের ভয়ংকর শক্তিশালী কারবাইন বের করে কোটের ভেতর কাঁধে ঝুলিয়ে নিল। হাতের রিভলবার পকেটে রেখে তারা গাড়ি থেকে নেমে এল।

রোগী-পত্র তখন ছিল না। ডা: বেগিন বারাক ডাক্তার খানায় তার চেয়ারে বসে একটা মেডিক্যাল জার্নালে চোখ বুলাচ্ছিল।

ওরা তিজন প্রবেশ করল ঘরে।

ডাঃ বারাক জার্নাল থেকে মুখ তুলে তাকাল তিনজনের দিকে। তাকিয়ে বিস্মিত হলো ডা: বারাক। তিনজনের কেউই তার রোগীর মত নয়। তাদের হাঁটার মধ্যে একটা উদ্ধত ভাব।

ডাঃ বারাক উঠে দাঁড়াল। স্বাগত জানাল তাদেরক। বলল, 'কোন সমস্যা? বসুন।'

'ধন্যবাদ ডক্টর। বসব না, আমাদের সময় খুব কম। একটা জরুরী প্রয়োজনে আপনার কাছে এসেছি।'

'ওয়েলকাম। বলুন কি প্রয়োজন?'

'আপনি হয়তো জানেন না, আপনার ক্লিনিকে আহমদ মুসা চিকিতসাধীন আছে। আমরা তাকে নিয়ে যেতে এসেছি।' বলল স্যামুয়েল নামের লোকটি।

চমকে উঠল ডাঃ বেগিন বারাক। থরথর করে কেঁপে উঠল তার বুক। এমন ভয়ই সে করে আসছে। এজন্যেই আহমদ মুসাকে সে এখান থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল সাগরিকা সেন, নিতেও এসেছে। আর এক ঘন্টা সময় পেলেই আহমদ মুসাকে সরানো যেত। বিধাতা সে সময়টুকু দিলেন না।

উত্তর দিতে একটু দেরী হয়েছিল ডা: বেগিন বারাকের। স্যামুয়েল আবার বলে উঠল, 'ডাঃ বেগিন বারাক আমাদেরকে সহযোগিতা করুন।'

ডা: বারাক উঠে দাঁড়াল। বলল, 'অবশ্যই। কিন্তু আমার এখানে যারা চিকিতসা করাতে আসে, তারা সবাই আমার রোগী। তাদের পরিচয়, নাম ইত্যাদি আমার কাছে বড় নয়।'

'আপনার এই পেশা-দায়িত্বকে আমরা ওয়েলকাম  করি ডক্টর। আমরা পরিচয়টা দিলাম একারণে যে, তাকে আমরা চাই।'

'কিন্তু আমার কোন অসুস্থ রোগীকে এইভাবে কারো হাতে আমি তুলে দিই না।'

বলতে বলতে ডা:বেগিন বারাক তার চেয়ার থেকে উঠে টেবিলের পাশে সরে এল।

'আপনি তো তুলে দেবেন না। আমরা তুলে  নিয়ে যাব। আপনি সম্মানী ব্যক্তি। আপনাকে কিছু না বলে নিয়ে যাওয়াটা ভাল দেকায় না। তাই বলা।' স্যামুয়েল বলল।

ডাঃ বেগিন বারাক কয়েক ধাপ এগয়ে তাদের তনজনের সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, 'না, তা তোমরা করতে পার না। রোগী সুস্থ হয়ে আমার এখান থেকে বেরিয়ে যাবে, তারপর তোমরা যা ইচ্ছে তাই কর।'

একটা ক্রুর হাসি  ফুটে উঠল স্যামুয়েল এবং অন্য দু'জনের মুখে। বলল স্যামুয়েল, 'আমরা এধরনের কোন চুক্তি করতে আসিনি ডাঃ বেগিন বারাক। শুধু আমরা আপনাকে সম্মান প্রদর্শন করতে চেয়েছিলাম। আপনি থাকুন, আমরা যাচ্ছি আমাদের কাজে।

বলে স্যামুয়েল পা বাড়াল ঘর থেকে বেরুবার জন্যে।

ডা: বারাক ছুটে তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দুই হাত সম্প্রসারিত করে বলল, 'না আমি যেতে দেব না। আমি বেঁচে থাকতে তোমরা যেতে পারবে না।'

স্যামুয়েল পকেট থেকে রিভলবার বের করল। বলল, 'ডাঃ বেগিন বারাক, পাগলামি করলে আমি গুলী করতে বাধ্য হবো।'

'তোমার গুলী আমার নীতি ও দায়িত্বের চেয়ে বড় নয়।' বলে ডাঃ বেগিন বারাক আরো দৃঢ় ভাবে দাঁড়াল।

চোখদু'টি জ্বলে উঠল স্যামুয়েলের। সে তার রিভলবার তুলল। গুলী করল। গুলী উরুবিদ্ধ করল ডাঃ বেগিন বারাকের।

ডাঃ বেগিন বারাক বসে পড়ল যেখানে সে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই।

তাকে ডিঙিয়ে তারা সবাই ছুটে বেরুতে গেল।

ডাঃ বেগিন বারাক তার বাম হাত দিয়ে উরু চেপে ধরে ডান হাত দিয়েয় কোটের ভেতরের পকেট থেকে একটা রিভলবার বের করল।

ডাঃ বারাকের মুখ পাথরের মত শক্ত। চোখ দু'টি স্থির প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়।

দ্রুত হাতে সে রিভলবার তুলল। গুলী করল পর পর তিনটি। অব্যর্থ লক্ষ্য। তিনটি গুলী গিয়ে তিনজনের মাথা গুড়ো করে দিল। কেউই দরজা পার হতে পারল না। ঘরের মেঝেতে ঝরে পরল তিনটি দেহ।

পরক্ষনেই দরজায় এসে দাঁড়াল আহমদ মুসা ও সাগরিকা সেন। তাদের চোখে-মুখে উদ্বেগ ও বিস্ময়।

চিতকার করে বলে উঠল ডাক্তার বেগিন বারাক, 'আহমদ মুসা আপনি তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যান। সাগরিকা মা ওকে নিয়ে চলে যাও এনি। ওরা এসেছিল ওকে ধরে নিয়ে যেতে। আবারও কিছু ঘটতে পারে।'

ডাঃ বেগিন বারাক থামতেই সাগরিকা সেন বলে উঠল, 'উনি ঠিক বলেছেন মি: আহমদ মুসা। চলুন। সব ব্যবস্থা আমি ঠিক করে রেখে এসেছি।'

আহমদ মুসার মুখে ফুটে উটল একটা শুষ্ক হাসি। বলল, 'গুলীবিদ্ধ ডাঃ বারাককে ফেলে রেখে আমি কোথাও যাব না।' আহমদ মুসার কন্ঠ স্থির ও দৃঢ়।

ঘরে প্রবেশ করল আহমদ মুসা।

ডাঃ বেগিন বারাক আর্তকন্ঠে অনুরোধের স্বরে ববেল উঠল, 'প্লিজ মিঃ আহমদ মুসা, ওরা আপনাকে ধরে নিয়ে যাবে অথবা মেরে ফেলবে।। আপনার জীববন অনেক মূল্যবান। আপনি যান।'

আহমদ মুসা ওদের তিনজনের কাছ থেকে মিনি কারবাইন কুড়িয়ে নিঢে নিজের কাঁধে ঝুলাল। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই বলল, 'ডক্টর বারাক আমার

চিন্তা আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়ে দিন। আমার মৃত্যু বা বন্দী হওয়া যদি ওদের হাতে থাকে তবে কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। আর যদি না থাকে তাহলে ওরা আমার কিছুই করতে পারবে না।'

কিন্তু আহমদ মুসা, তাই বলে কি মানুষ আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে না, সাবধানতা অবলম্বন করে সা? আপনি আসুন।' কান্না জড়িত কন্ঠে বলে উঠল সাগরিকা সেন।

'ঠিক আছে মিস সেন চলুন আমরা ডাঃ বারাককে অপারেশন থিয়েটারে নিই। তারপর চলে যাবার সুযোগ আমরা পাব।'

বলে আহমদ মুসা ডাঃ বেগিন বারাককে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল। নিয়ে চলল অপারেশন থিয়েটারের দিকে।

অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল অপারেশন টেবিলে।

'মিঃ আহমদ মুসা, আপনি কি অপারেশন করতে পারেন?' বলল ডাঃ বেগিন বারাক।

'অপারেশন করতে জানি না, কিন্তু গুলীটা বের করার মত জ্ঞান আমার আছে।' বলল আহমদ মুসা।

কিছু বলতে যাচ্ছিল ডাঃ বেগিন বারাক।

এমন সময় একজন এ্যাটেনডেন্ট ছুটে এল ঘরে। বলর হাঁপাতে হাঁপাতে, 'দুই গাড়ি ভর্তি লোক এসছে। হাতে বন্দুক। বাড়ি ঘিরে ফেলেছে তারা। গাড়ি থেকে ম্যাডাম নোয়ন নাবিলাকেও নামতে দেখলাম।'

'নোয়ান নাবিলা?' এ্যাটেনডেন্টের দিকে তাকিয়ে ভ্রুকুঁচকে জিজ্ঞেস করল সাগরিকা সেন।

'হ্যাঁ ম্যাডাম।' বলল এ্যাটেনডেন্ট।

'নোয়ান নাবিলাকে কি ওরা ধরে নিয়ে এল?' প্রশ্নটা অনেকটা স্বগতোক্তির মত হল সাগরিকা সেনের।

'নাবিলা ম্যাডাম হাসিখুশী। হেসে হেসে সাথের বন্দুকধারীদের সাথে আলাপ করছে দেখলাম।' এ্যাটেডেন্ট বলল।

'কোথায় ওরা?'

'আমাদের গেটের সামনেই ওদের গাড়ি।' বলল এ্যাটেনডেন্ট।

'ঠিক আছে আমি দেখছি।' বলল সাগরিকা সেন।

'মিস সেন, আমার অনুমান মিথ্যা না হয়ে থাকলে, নোয়ান নাবিলাই জেনারেল শ্যারনের লোকদের নিয়ে এসেছে।' বলল আহমদ মুসা।

'শেষে আমাকেও অবিশ্বাস করবেন নাতো?' সাগরিকা সেন বলল।

'আপনি ও নোয়ান নাবিলা এক নন।' আহমদ মুসা বলল।

'না, ওদের সামনে আপনার যাওয়া চলবে না।'

'আপনি কথা বলবেন, আমি আড়ালে থাকব।'

সাগরিকা সেন আর কোন কথা বলল না। সে হাঁটতে শুরু করল।

'ডা: বেগিন বারাক, আপনার একটু কষ্ট হবে, আমি আসছি।' ডা: বারাককে লক্ষ্য করে বলল আহমদ মুসা।

'নোয়ান নাবিলা সম্পর্কে আপনার কথাই ঠিক আহমদ মুসা। আপনি ওদিকটা দেখুন। এই ইমারজেন্সী ফেস করাই এখন বেশী জরুলী। ঈশ্বর আপনাকে সাহায্য করুন।' বলল ডাঃ বেগিন বারাক।

আহমদ মুসা তখন সাগরিকা সেনের পিছে পিছে হাঁটতে শুরু করেছে।

সাগরিকা সেন অনেকটা সামনে চলে গিয়েছিল। আহমদ মুসা কিছুটা এগিয়েই শুনতে পেল নোয়ান নাবিলার কন্ঠ।

বলছে সে, 'সাগরিকা এস। শোন। তোমার বন্ধুকে তুমি চেন না। সে তো সাংঘাতিক একজন, নাম আহমদ মুসা। আমি আজ সিনাগগে গিয়ে ফটো দেখে তাকে চিনতে পেরেছি। আমার কাছে এরা শুন সংগে সংগেই চলে এসেছে। ওরা ভেতরে ঢুকছে। তুমি বেরিয়ে এস।'

'নাবিলা, তোমার লোকদের ভেতরে ঢুকতে নিষেধ করো। ফিরিয়ে নাও ওদের। আমি তোমার সাথে কথা বলি, তারপর যা করার করবে।' বলল শক্ত কন্ঠে সাগরিকা সেন।

আহমদ মুসা আর একটু এগিয়ে এটা দরজার আড়ালে গিয়ে লুকালো। সেখান থেকে নোয়ান নাবিলাকে একটু একটু করে দেখা যাচ্ছে। সাগরিকা সেন

ও তিন স্টেনগানধারী যারা করিডোর ধরে এগিয়ে আসছিল, তাদের খুব ভাল করে দেখতে পাচ্ছে সে।

স্টেনগানধারী তিনজন সাগরিকা সেন ও নোয়ান নাবিলার মাঝখানে ছিল। তারা দাঁড়িয়ে পড়েছিল নোয়ান নাবিলাকে সাগরিকা সেনের সাথে কথা বলতে দেখে।

সাগরিকা সেন থামতেই নোয়ান নাবিলা বলে উঠল, 'ঠিক আছে ওরা যাচ্ছে না। বল তোমার কথা।'

সাগরিকা সেন বলল, 'আমার বন্ধুর যে নামই হোক, যে পরিচয়ই হোক, সে আমার মেহমান। আমার লাশ না মাড়িয়ে তোমরা তার কাছে যেতে পারবে না।'

'তুমি পাগল হয়েছ সাগরিকা? তুমি আহমদ মুসাকে চেন না? বিষধর সাপ কি কথনও বন্ধু হয়?' বলল নোয়ান নাবিলা।

'দেখ আমি আহমদ মুসাকে চিনি, যেমন চিনি জেনারেল শ্যারন ও মিঃ জোনসদেরকে। আহমদ মুসা আমার মেহমান। আমার মেহমানের কোন ক্ষতি করতে দেব না।'

'মেহমান যদি জাতির শত্রু হয়?' বলল নাবিলা।

'আমি বিচারক নই। বিচারক যখন রায় দেবে, তখন আমি দেখব।'

'তুমি আমাদের আংকেল মানে তোমার আব্বার বিরুদ্ধেও যাচ্ছ, তাকি তুমি জান?'

'জানি।'

'কিন্তু এ তোমার অন্যায় জেদ সাগরিকা।'

'ন্যায়-অন্যায় বোঝার বয়স আমার হয়েছে নাবিলা। তুমি একটা গোষ্ঠীস্বার্থের পক্ষে কথা বলছ, এটা ঠিক নয়।'

'সাগরিকা, সে গোষ্ঠী যদি আমার হয়, তুমি তাদের সাহায্য করবে না?'

'ডাঃ বেগিন বারাক কি তোমার গোষ্ঠীর নয়? উনি তো আহমদ মুসার পক্ষ নেয়ায় গুলীবিদ্ধ হয়ে কাতরাচ্ছেন ।'

'কেমন করে গুলীবিদ্ধ হলেন?' বিস্মিত কন্ঠে প্রশ্ন করল নোয়ান নাবিলা।

'আহমদ মুসাকে নিয়ে যাবার জন্যে এর আগেও তিনজন এসেছিল।' বলল সাগরিকা সেন।

'তারা কোথায়?'

'তারা ডাঃ আংকেলকে গুলী করলে ডাঃ আংকেলও তাদের গুলী হরে হত্যা করেছেন।' বলল সাগরিকা সেন।

'ম্যাডাম নাবিলা, আপনারা কথা বলুন। আমরা যাচ্ছি ভেতরে।'

বলে তিনজন স্টেনগানধারী তাদের স্টেনগান উদ্যত করে ভেতরের দিকে যাবার জন্যে পা বাড়াল।

সংগে সংগে সাগরিকা সেন তাদের সামনে চলে এল এবং দু'হাত প্রসারিত করে তাদের সামনে দাঁড়াল। বলল, 'আমি যেতে দেব না।'

একজন স্টেনগানধারী ছুটে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে সামনে থেকে সরিয়ে দিল সাগরিকা সেনকে।

সাগরিকা সেন ছিটকে পাশে পড়ে গেল। দেয়ালের সাথে ঠুকে গেল তার মাথা।

সংগে সংগে আহমদ মুসা বেরিয়ে এল আড়াল থেকে। হাতে উদ্যত কারবাইন। স্টেনগানধারী তিনজনের দিকে তাক করা।

আহমদ মুসাকে দেখেই ওরা তাদের স্টেনগানের নল ঘুরাতে গেল আহমদ মুসার দিকে। শক্ত কন্ঠে নির্দেশ দিল আহমদ মুসা, 'স্টেনগান তোমরা ফেলে দাও, তা না হলে....'

আহমদ মুসা কথা শেষ করতে পরলো। ওদের স্টেনগানের নল শা তরে ঘুরল তার দিকে। আহমদ মু্সার তর্জ্জনি ট্রিগারেই ছিল। কথা বন্ধ করে আহমদ মুসা ট্রিগার চেপে কারবাইনটা ঘুরিয়ে নিল ওদের তিনজনের উপর দিয়ে। এক ঝাঁক গুলী ওদরে ঝাঁঝরা করে দিল। পড়ে গেল তিনটি লাশ করিডোরের উপর।

আহমদ মুসা একহাতে তার কারবাইন ধরে রেখে অন্য হাত দিয়ে টেনে তুলল সাগরিকা সেনকে।

উঠে দাঁড়াল সাগরিকা সেন।

এ সময় নোযান নাবিলার কন্ঠ শোনা গেল। সে চিতকার করে বলছে, 'তোমরা এদিকে এস। আমাদের লোকরা গুলী খেয়েছে।'

সাগরিকা সেনের কপালের একটা পাশ থেঁতলে গিয়েছিল। রক্ত বেরুচ্ছে সেখান থেকে। আহমদ মুসা পকেট থেকে রুমাল বের করে সাগরিকা সেনের ক্ষতের উপর চাপা দিয়ে বলল, 'রুমালটা চেপে ধরে থাকুন। রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে।'

'এ সামান্য ব্যাপার। ভাববেন না আপনি। দিকে দেখুন। নাবিলা ওদের রোকদের ডেকেছে।'

'ওদিকটা আমি দেখছি।'

বলে আহমদ মুসা একটা টেলিফোন নাম্বারের উল্লেখ করে বলল, 'এটা এফবিআই প্রদান জর্জ আব্রাহাম জনসনের টেলিফোন। আপনি এই ক্লিনিকের ঠিকানা দিয়ে এখানে যা ঘটছে তাকে বলুন।'

'তাতে আপনার কোন বিপদ হবে না তো?' উদ্বিগ্ন কন্ঠে বলল সাগরিকা সেন।

'না সে রকম কোনা ভয় নেই।' আহমদ মুসা বলল।

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল সাগরিকা সেন, এমন সময় করিডোরের সামনে থেকে গুলীবৃষ্টির শব্দ এলা। কয়েকটা গুলী তাদের সামনে এসেও পড়ল।

আহমদ মুসা দ্রুত যে দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছিল। এক দৌড়ে সাগরিকা সেনকে টেনে নিয়েয সে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

অব্যাহতভাবে চলছে গুলী। এবং গুলীর শব্দ দ্রুত নিকটবর্তী হচ্ছে। তার মানে ওরা গুলী রতে করতে এগিগেয় আসছে।

আহমদ মুসা সাগরিকা সেনকে ঘরের ভেতর দিকে ঠেলে দিয়েই দেয়ালের আড়াল নিয়ে দরজায় এসে দাঁড়াল।

ওরা গুলীর দেয়াল সৃষ্টি করে এগিয়ে আছে। এখনও কোন গুলী দরজার লক্ষ্যে আসেনি। তার মানে দরজা এখনও ওরা খেয়াল করেনি।

আহমদ মুসা মনে করল, এটাই সুযোগ ওদের পাল্টা আক্রমনের। দরজা একবার ওরা দেখতে পেলে দরজা হবে তখন বড় টার্গেট। সে অবথায় সরাসরি আত্রমন কঠিন হবে।

এই চিন্তার সাথে সাথে আহদ মুসা তার অটোমেটিক কারবাইনের নল দরজার কিনারে নিয়ে এসে ট্রিগারে আঙুল চেপে এক ঝটকায় মুখটা বাইরে নিয়ে এল। কারবাইন ধরা দু'হাত বাইরে এসছে আগেই কারবাইনের অবিরাম গুলী বৃষ্টির সাথে সাথে।

ওরা চারজন এগিয়ে আসছিল করিডোর ধরে। ওরা গুলীবৃষ্টি করছির করিডোর বরাবর। আহমদ মুসাকে যখন ওরা দেখতে পেল, তখন আহমদ মুসার কারবাইনের গুলীর ঝাঁক এসে তাদের ঘিরে ধরেছে। তারা তাদের স্টেনগানের নল ঘুরাবার আর সুযোগ পেল না। গুলীতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া দেহ নিয়ে তারা লুটিয়ে পড়ল করিডোরে।

আহমদ মুসা কিরিডোরে বেরিয়ে এল।

গুলী করতে করতে আরও কিছুটা সামনে এগুলো। দেখল করিডোরে আর কেউ নেই। আহমদ মুসা উঁকি দিয়ে দেখল, করিডোরের সামনে ডাক্তারখানার গা ঘেঁষে যে গাড়িটা দাঁড়িয়েছিল তার আড়াল থেকে বেরিয়ে নোয়ান নাবিলা দ্রুত সরে গেল চত্বরের প্রান্তের দিকে।

সাগরিকা সেনও বেরিয়ে এসেছে করিডোরে। ভয় ও উদ্বেগে তার মুখ পাংশূ হয়ে উঠেছে।

'মিস সেন, নোয়ান নাবিলা ওদিকে আছে। আপনি বরং তার কাছে যান। ওকান থেকে আপনি বাড়িতে ফিরে যাবেন।' বলল আহমদ মুসা।

'আর আপনি?'

'আমার কাছে আছে তিনটি কারবাইন। আরও সাতটি স্টেনগান ঐ দেখুন পড়ে আছে। এগুলোতে গুলী থাকা পর্যন্ত আমি আত্মরক্ষা করব।'

'তারপর?'

'গুলী যখন থাকবে না, তখন আমার প্রতিরোধের দায়িত্বও থাকবে না। তখন আল্লাহর যা ইচ্ছা তা হবে।'

'ওরা আপনাকে হত্যা করতে পারে, ধরে নিয়েও যেতে পারে।'

'ও দু'টির কোনটিতেই তখন আমা আপত্তি থাকবে না।'

'মিঃ আহমদ মুসা, আপনি কি মানুষ! মানুষ কেমন করে নিজের সম্পর্কে এম নির্বিকার হতে পারে? আপনার কথায় মনে হচ্ছে মৃত্যুটা পুতুল খেলার চেয়ে বেশী কিছু নয়।'

ববলে একটু থেমে আবার বলে উঠল, 'আমি যাচ্ছি না।' গম্ভীর ভারি কন্ঠ সাগরিকা সেনের।

ঠিক এই সময় বাইরে থেকে একজন লোক চিতকার করে বলে উঠল, 'আহমদ মুসা, বাড়িটা আমরা ঘিরে রেখেছি। তুমি পালাতে পারবে না। আমাদের আরও লোক আসছে। দরকার পড়লে বাড়িড়র সব ইট খুলে হলেও আমরা তোমাকে ধরব। হয় তুমি মরবে, না হয় ধরা পড়বে। এ দু'এর কোন বিকল্প নেই।'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, মিস সেন আপনি না গেলে ঐ দুই খারাপ পরিনিতির যে কোন একটা আপনাকে দেখতে হবে।'

'আমি টেলিফোনটা করে আসি, তারপর জবাব দেব।'

বলে সাগরিকা সেন ক্লিনিকের অফিসের দিকে ্এগুলো।

টেলিফোন করে ফিরে এল সাগরিকা সেন। বলল, 'মি: জর্জ আব্রাহামকে পেয়েছি। খবরটা মনে হয় তার হজম করতে সময় লেগেছে।কারণ, খবর শুনে মুহূর্তকাল উনি কথা বলতে পারেননি। তারপর উনি দ্রুত কন্ঠে বললেন, 'আহমদ মুসা ভাল আছে তো? তাকে কিছুক্ষন আত্মরক্ষা করতে বলুন।' বলেই টেলিফোন রেখে দিয়েছেন।'

'জানতাম উনি এই কথাই বলবেন।'

'কিছুক্ষনের কথা বললেন কেন?'

'দেখা যাক মিস সেন, তার কিছুক্ষনের অর্থ কি?'

'এদের ৭ জন লোক নিহত হবার পর মনে হয় এদের আর তেমন বেশী লোক এখানে নেই। তাই বেশী সংখ্যায় লোক আনাচ্ছে। আমরা এখন বেরিয়ে যেতে পারি না ওদের লোক আসার আগে?

'প্রথমত আমরা জানি না ওদের লোক আছে কি নেই। সুতরাং নিশ্চিত না হয়ে পা বাড়ানো মুশকিল। দ্বিতীয়ত আমরা ডাঃ বেগিন বারাককে এভাবে ফেলে রেখে যেতে পারি না।' বল দৃঢ় কন্ঠে আহমদ মুসা।

কথা শেষ করে মুহূর্তকাল থেমেই আবার বলল, 'মিস সেন, আপনি গিয়ে একটু ডাঃ বারাকের খবর নিয়ে আসুন। এদিকের খবরও বলুন।'

'ঠিক আছে।'

বলে সাগরিকা সেন চলল অপারেশন থিয়েটারের দিকে।

ফিরে এল অল্পক্ষন পরেই।

এল দৌড়াতে দৌড়াতে। বলল, 'মি: আহমদ মুসা, ওরা বিভিন্ন দরজা জানালা ভাঙার চেষ্টা শুরু করেছে।'

'টের পেয়েছি মিস সেন। ওরা করিডোরের মুখেও পজিশন নিয়েছে।' বলল আহমদ মুসা।

'তাহলে?' পাংশু মুখে বলল সাগরিকা সেন।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'স্টেনগান চালাতে পারবেন?'

'পারব। কিন্তু মানুষকে গুলী করতে পারব না।'

'মানুষ মারতে হবে না। এই করিডোরে স্টেনগান নিয়ে বসে থাকবেন। ওদের এগুনোর লক্ষণ পেলে শুধু অবিরাম গুলী চালিয়ে যাবেন।

তা পারব। কিন্তু আপনি থাকবেন না?'

'আমাকে দরজা-জানালা পাহারা দিতে হবে। প্রয়োজনে আমি আপনাকেও সহযোগিতা করতে পারবো।'

'আপনাকে শুধু দেখতে পেলেই চলবে।'

'দেখতে না পেলে?'

'ভয় করবে।'

'ভয় নেই। ওরা গুলী না করে সামনে এগুবে না। ওরা গুলী শুরু করলে আপনিও গুলী শুরু করবেন।'

'বুঝেছি।'

'কিন্তু এইটুকুই সব কথা নয়। ওরা কোন দরজা বা জানালা খুলতে পারলে এবং সেদিকে আমাকে ব্যস্ত দেখলে কোন প্রকার গুলী না করে গেরিলা কায়দায় প্রবেশ করার চেষ্টা করবে। এজন্যে করিডোরের দিকে আপনার তীক্ষ দৃষ্টি রাখতে হবে।'

'আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব।' বলর সাগরিকা সেন।

'আপ্রাণ চেষ্টা করার কথা যদি বলেন, তাহলে কিন্তু আপনাকে পাহারায় বসাব না। আপনার কোন ক্ষতি হোক তা আমি চাই না। আমার সাথে ওদের শত্রুতা, আপনার সাথে নয়। আমি যে কোন পরিনতির জন্যে প্রস্তুত আছি। জীবন-মৃত্যুর এই খেলায় আপনি জড়িয়ে পড়ুন, তা আমি চাইতে পারি না।'

'আমি আপনার কেউ নই ধরেই তো এমন ভাবে বলছেন?/'

'না, 'কেউ' ধরেই বলছি।'

আহমদ মুসার মুখে এই কথা শুনেই সাগরিকা সেন দু'চোখে রাজ্যের তৃষ্ঞা নিয়ে দু'চোখ তুলে ধরল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা তার দু'চোখ নামিয়ে নিল। দুই ঠোঁটে তার মিষ্টি হাসি ফুটিয়ে তুলল। বলল, 'বড় ভাই বেঁচে থাকতে ছোট বোনের গায়ে কোন আঁচড় লাগতে দিতে পারে না।'

হঠাৎ আছড়ে পড়লে যে অবস্থা হয়, সেই রকম মুখের অবস্থা হলো সাগরিকা সেনের। কথা বলতে পারলো না। খুশী হয়নি এমন একটা অস্বস্তি তার চোখে মুখে।

ঠিক এই সময় চারদিক থেকে পুলিশের গাড়ির একটানা শব্দ ভেসে এল।

'সাগরিকা সেন, জর্জ আব্রাহামের লোকরা এসে গেছে।

সাগরিকা সেনের ম্লান মুখে কোন পরিবর্তন এল না। অনেকটা স্বগতোক্তির মত বলল, 'কিন্তু পুলিশের সাথে তো ওদের সখ্যতা।'

'না সাগরিকা সেদিন চলে গেছে।' বলর আহহমদ মুসা।

বাইরে করিডোরের মুখের দিকে গাড়ি স্টার্টের শব্দ পেল আহমদ মুসা।

'সাগরিকা ওরা পালাচ্ছে, এস দেখি।'

বলে সাগরিকার হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল করিডোরের মুখের দিকে।

তারা দেখল, গাড়িগুলো স্টার্ট নিয়ে চলে যাচ্ছে।

'অভিনন্দন সাগরিকা তোমাকে, তোমার এক টেলিফোনে কি কাজ হয়েছে দেখ।'

'টেলিফোনটা তো প্রকৃতপক্ষে আমার নয়, আপনার ছিল।' ভাবলেশহীন নির্বিকার কন্ঠে জবাব দিল সাগরিকা সেন।

'কথা আমার ছিল, কিন্তু টেলিফোন করেছ তুমি।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল সাগরিকা সেন। এ সময় বাইরে প্রচন্ড গোলাগুলী শুরু হয়ে গেগল।

'ওদের পালাতে পুলি বাধা দিচ্ছে।' বলল আহমদ মুসা।

'পুলিশ কি ওদের এ্যারেস্ট করবে বলে মনে করেন?' কিছুটা উতগ্রীব কন্ঠে বলল সাগরিকা সেন।

'আমার তাই মনে হয়।' বলর আহমদ মুসা।

কথা শেষ কেরেই আকাশে হেলিকপ্টারের শব্দে উতকর্ণ হয়ে উঠল আহমদ মুসা।

হেলিকপ্টারের শব্দ ক্রমেই নিকটবর্তী হতে লাগল। একসময় তা মাথার উপরে চলে এল। শব্দটা নেমে এল ক্লিনিকের চত্বরে।

'সাগরিকা আমার অনুমান মিথ্যা না হলে এফবিআই প্রধান জর্জ আব্রাহাম জনসন আসছেন এ হেলিকপ্টারে।'

'উনি নিজে আসছেন?' কন্ঠে বিস্ময় প্রকাশ করল সাগরিকা সেন।

'আমি মনে করি তাই।'

সাগরকা সেনের মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'আপনি যে আহমদ মুসা ভুলে গিয়েছিলাম। তার জন্যে তো জর্জ আব্রাহামই আসবেন।'

সাগরিকা সেনর কথার ঢংয়ে আহমদ মুসার মুখ একটু ম্লান হলো। বলল, 'সাগরিকা তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট নও।'

'আমি খুবই সামান্য একজন মেয়ে।'

সাগরিকার এই কথার সাথে সাথেই বাইরে একটা কন্ঠ শোনা গেল, 'আহমদ মুসা কি ভেতরে?'

'আমরা তাই মনে করছি। ওরা তাই বলেছে।' একটা বিনীত কন্ঠ বলে উঠল।

আহমদ মুসা বুঝল আগের কন্ঠ জর্জ আব্রাহাম জনসনের এবং শেষের কন্ঠটি কোন পুলিশ অফিসারের।

'চল বেকার ভেতরে যাই। তোমরাও এস।' বাইরে থেকে একই কন্ঠে ভেসে এল।

'জর্জ আব্রাহাম ভেতরে আসছেন। সংগে পুলিশ প্রধান মি: বেকারও আছেন।' বলল আহমদ মুসা।

'মি: আহমদ মুসা, দেখবেন আমাদের যেন গুলী করবেন না।' জর্জ আব্রাহামের গলা শোনা গেল।

ওরা ভেতরে ঢুকছে। করিডোরে ঢুকে পড়েছে।

আহমদ মা ও সাগরিকা সেন দু'জনেই সামনে এগুলো।

করিডোরের যেখানে লাশগুলো পড়েছিল সেখানে উভয় পক্ষ মুখোমুখি হলো।

জর্জ আব্রাহাম জনসন ছুটে এসে আহমদ মুসাকে জড়িয়ে ধরল। বলল, 'স্বয়ং প্রেসিডেন্টও আপনার জন্যে উদ্বিগ্ন ছিলেন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, আপনাকে সুস্থ পেয়েছি।'

বলে জর্জ আব্রাহাম জনসন ফেডারেল পুলিশ প্রধান বেকারের সাথে আহমদ মুসার পরিচয় করিয়ে দিল।

আহমদ মুসা তার সাথে  হ্যান্ড শেক করল।

পরে আহমদ মুসা সাগরিকা সেনের সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দিল। বলল, 'ইনি বিখ্যাত শিব শংকর সেনের একমাত্র মেয়ে সাগরিকা সেন।আমাকে ওয়াশিংটন-আনাপোলিশ সড়ক থেকে মুমূর্ষু অবস্থায় তুলে এনে অত্যন্ত গোপনে এই ক্লিনিকে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। তারপর থেকে তিনিই আমার তত্ত্বাবধান করছেন।'

'মা, তুমিই আমার কাছে টেলিফোন করেছিলে তাই না?' বলল জর্জ আব্রাহাম জনসন সাগরিকা সেনকে লক্ষ্য করে।

'জি, মিঃ আহমদ মুসাই আমাকে টেলিফোন করতে বলেছিলেন।'

'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ মা।'

বলে জর্জ আব্রাহাম জনসন আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমাকে সেদিন সাগরিকা সেন ওয়াশিংটন-আনাপোলিশ সড়ক থেকে তুলে আনার পর পরই তোমার সন্ধানে আমি ও মিস সারা জেফারসন সেখানে পৌঁছেছিলাম।'

'আপনারা? কিভাবে? কি ঘটনা?' বিস্মিতত কন্ঠে প্রশ্ন করল আহমদ মুসা।

জর্জ আব্রাহাম জনসন আহমদ মুসাকে বাল্টিমোরে খোঁজ করে ফেরার পথে সাগরিকাদের ব্রাইট ফিল্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্সে এসে কিভাবে শিকারী কুকুরের দ্বারা আহমদ মুসার খোঁজ পেল, কিভাবে বন্ধীখানায় পৌঁছল, কিভাবে বন্দীখানা থেকে রক্তের দাগ ধরে কুকুরের পেছনে পেছনে রাস্তার সেই স্থানে এসে পৌঁছল সব জানিয়ে বলল, 'আমরা সেদিন ভীষণ উদ্বেগ নিয়ে ওয়াশিংটন ফিরি। মিস সারা জেফারসন তো অসুস্থ হযে পড়েন। উনি এখনও হাসপাতালে।'

'মিস সারা জেফারসন হাসপাতালে? কেমন আছেন তিনি?' আহমদ মুসার কন্ঠে উদ্বেগ।

'তার অসুখের কারণই হলো, তার বদ্ধমূল ধারণা আপনার কিছূ ঘটেছে। তাকে কিছুতেই স্বাভাবিক চিন্তায় ফিরিয়ে আনা যাচ্ছে না। আমি আসার সময় টেরিফোনে আপনার খবর তাকে দিয়ে এসেছি।' বলল আব্রাহাম জনসন।

আহমদ মুসা প্রসংগটা এড়িয়ে বলল, 'আসুন, এই ক্লিনিকের মালিক ও ডাক্তার আমাকে রক্ষা করতে গিয়ে গুলীবিদ্ধ হয়েছেন। তাড়াতাড়ি তার ব্যবস্থা হওয়া দরকার।'

'ভেতরে কয়টা লাশ আছে? আাপনাদের আর কোন ক্ষতি হয়নি তো? বলর ফেডারেল পুলিশ প্রধান বেকার।

'আল্লাহর অশেষ দয়া। আর কোন ক্ষতি আমাদের হয়নি। ভেতরে ওদের দশটা লাশ রয়েছে।'

পুলিশ প্রধান পাশে দাঁড়ানো পুলিশ অফিসারকে লাশগুলো সরিয়ে নেবার নির্দেশ দিল।

অপারেশন থিয়েটারের দিকে হাঁটতে তখন শুরু করেছে আহমদ মুসা।

সবাই চলল আহমদ মুসার পেছনে পেছনে।

জর্জ আব্রাহাম জনসন এবং পুলিশ প্রধান বেকার দুজনেই ডা: বেগিন বারাককে চিনতে পারল। বছর খানেক আগে ডা: বারাক আমেরিকান পিস এ্যাওয়ার্ড পায়। সেই উপলক্ষে তাদের সাথে ডা: বারাকের পরিচয় হয়।

জর্জ আব্রাহাম ডাঃ বারাককে অভিনন্দন জানাল আহমদ মুসার পপ্রতি তার সেবা ও সাহসী পদক্ষেপের জন্যে। তারপর একজন পুলিশ অফিসারকে নির্দেশ দিল, 'এ্যাম্বুলেনেসর লোকজনকে ডাকুন। ওনাকে এখুনি হাসপাতালে নিতে হবে।'

পুলিশ অফিসার দ্রুত বেরিয়ে গেল।

'ধন্যবাদ মিঃ জর্জ ও মিঃ বেকার, আহমদ মুসাকে সেবা করার সুযোগ পেয়ে আমি ধণ্য হয়েছি। তিনি যে অক্ষত আছেন সে জন্যে ঈশ্বরের শুকরিয়া আদায় করছি।' বলল ডা: বেগিন বারাক।

'ডাঃ বারাক আপনার সাথে আমরাও ঈশ্বরের কৃতজ্ঞতা আদায় করছি। আমরা এবং স্বয়ং প্রেসিডেন্টও উদ্বিগ্ন ছিলেন। আমরা মিস সেনেরও শুকরিয়া আদায় করছি যে তিনি আপনার মত একজন উদার ও নিরাপদ ডাক্তারের কাছে তাকে চিকিতসার জন্যে নিয়ে এসেছিলেন।' জর্জ আব্রাহাম জনসন বলল।

এ্যাম্বুলেন্সের লোকজন নিয়ে পুলিশ অফিসারটি এসে পৌঁছল।

সবাই ধরাধরি করে ডাঃ বেগিন বারাককে স্ট্রেচারে তুলল।

স্ট্রেচারে শোয়ার পর যখন এ্যাম্বুলেন্সেন স্টেট্রচারটা তুলে নিচ্ছে, তখন ডা: বেগিন বারাক আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, 'মিঃ আহমদ মুসা, আবার কবে দেখা হবে?'

'আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন। আমি আশা করছি, আপনার সাথে সাক্ষাত না করে আমি আমেরিকা থেকে যাব না।'

'ধন্যবাদ মি: আহমদ মুসা।'

'ধন্যবাদ ডা: বারাক।'

ডাঃ বারাককে নিয়ে যাবার পর জর্জ আব্রাহাম জনসন বলল, 'চলুন আমরাও চলি।'

সবাই ক্লিনিক থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে হাঁটা শুরু করল।

আহমদ মুসার কক্ষ বরাবর এল সাগরিকা সেন আহমদ মুসার কক্ষে ঢুকে গেল।

ঘরে ঢুকে সাগরিকা সেন আহমদ মুসার কাপড় চোপড় ও ব্যবহার্য জিনিস ব্যাগে পুরল। এগুলো সাগরিকাই কিনে দিয়েছিল আহমদ মুসাকে।

ব্যাগটি নিয়ে সাগরিকা  সেন যখন ক্লিনিকের বাইরে বেরিয়ে এল, তখন দেখল হেলিকপ্টারের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সবাই ক্লিনিকের দকে তাকিয়ে আছে।  সাগরিকা সেন বুঝল, সবাই তারই জন্যে অপেক্ষা করছে।

সাগরিকা সেন সেখানে পৌঁছলে জর্জ আব্রাহাম জনসন বলে উঠল, 'মা সাগরিকা আমাদের এখন যেতে হয়। আহমদ মুসা তোমার তত্বাবধানে ছিল। অনুমতি দাও, তাকে নিয়ে যেতে চাই মা।'

মুখ ম্লান হয়ে গেল সাগরিকা সেনের।

এগুলো সে আহমদ মুসার দিকে। হাতের ব্যাগটি আহমদ মুসার দিকে তুলে ধরে বলল, 'দাদা নাও তোমার কাপড় চোপড়।'

আহমদ মুসা ব্যাগটি সাগরিকার হাত থেকে নিয়ে নিল।

ব্যাগটি আহমদ মুসা নিলে সাগরিকা সেন আহমদ মুসার পায়ের কাছে বসে পড়ল। দুহাত দিয়ে বাহমদ মুসার পা স্পর্শ করে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। তা মুখ নিচু।

'বিদায়টা খুবই আকস্মিক হয়ে গেল সাগরিকা। তুমি আমাকে গুডবাই বলবে না?' আহমদ মুসা হাসার চেষ্টা করল।

সাগরিকা মুখ তুলল।

অশ্রুতে তার দুই গন্ড ভেসে যাচ্ছে।

তার দুই ঠোঁট কাঁপল। ফাঁক হলো। বলল সে, 'গুডবাই নয়, তুমি এস দাদা।' অশ্রুভেজা কম্পিত কন্ঠস্বর সাগরিকা সেনের।

সাগরিকা সেনের অশ্রু আহমদ মুসাকে বিব্রত করে তুলল। একটা আবেগগ এসে তাকেও ঘিরে ধরল। বলল, 'ধন্যবাদ সাগরিকা। তোমাদের

ওয়াশিংটন এবং এখানকার বাড়ি আমি চিনি। আমিই তোমাকে খুঁজে নেব। তুমি ঠিকই বলেছ। তোমার ভাই সত্যি বিদায় নিচ্ছে না।' ভারী কন্ঠস্বর আহমদ মুসার।

'ধন্যবাদ দাদা।' অশ্রুভেজা কন্ঠে বলল সাগরিকা সেন।

আহমদ মুসা উঠে গেল হেলিকপ্টারে।

একজন পুলিশ অফিসারের দিকে তাকিয়ে পুলিশ প্রধান বেকার বলল, 'ক'জন পুলিশ সাথে নিয়ে তুমি সাগরিকা সেনকে তার বাড়িতে পৌঁছে দাও।'

'আমার গাড়ি আছে।' বলল সাগরিকা সেন।

'তাহলে ওর গাড়ির সাথে সাথে তোমরা ওর বাড়ি পর্যন্ত যাবে।' পুলিশ প্রধান বেবকার বলল।

জর্জ আব্রাহাম জনসন, বেকার এবং সাথের অন্যান্য সবাই হেলিকপ্টারে উঠল।

হেলিকপ্টারে উঠতে উঠতে পুলিশ প্রধান বেকার চিতকার করে নিচে দাঁড়ানো তার পুলিশ অফিসারকে বলল, 'ওদের অস্ত্রধারী যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে, তাদের সাবধানে রাখবে। করণীয় সম্পর্কে আমি জানাচ্ছি।'

হেলিকপ্টারে সবাই উঠে গেল।

স্টার্ট নিল হেলিকপ্টার।

'আমাদের যে পরিনতি হয়, হবে। আমরা প্রতিশোধ নিতে চাই, প্রতিশোধ।' বোমা বিস্ফোরনের মত গর্জন করে উঠল জেনারেল শ্যারন।

'কিন্তু সে প্রতিশোধটা কি? আমাদের লোকরা যেখানে একা অক্যাত ক্লিনিকে অরক্ষিত অবস্থায় পেয়েও আহমদ মুসাকে পাকড়াও করতে পারলো, সেখানে আমাদের লোকেরা কি প্রতিশোধ নেবে?' ক্ষুদ্ধ কন্ঠে বলল ডেবিড উইলিয়াম জোনস।

'ঠিক বলেছেন মিঃ জোনস। বিস্ময়ের ব্যাপার, অসুস্থ আহমদ মুসাকে অরক্ষিত পেয়েও আমাদের লোকরা তাকে পাকড়াও করতে পারলো না। শুসলাম

আমাদের লোকরা সেখানে পৌছার প্রায় ৪০ মিনিট পরে পুলিশ পৌঁছেছে। এই চল্লিশ মিনিটে আমাদের এক ডজন লাক এক আহমদ মুসার সাথে পেরে উঠল না। মাঝখান থেকে লোক খোয়াল দশজন।' বলল জ্ঞাণী গযগাধর তিলক।

জ্ঞানী গঙ্গাধর তিলক আমেরিকায় ভারতীয় আমেরিকান সোসাইটির যুব উইং এর প্রধান। আমেরিকান ভারতীয়-আমেরিকান ও ইগুদীরা এক সাথে কাজ করার ব্যাপারে সে খুব উতসাহী। তার মতে, প্রতিভাবান ও বুদ্ধিমান এই দুই জাতি যদি আমেরিকায়  এক সাথে কাজ করে, তাহলে আমেরিকার ভবিষ্যতের তারাই হবে নিয়ন্তা।

জ্ঞানী গঙ্গাধর তিলক থামতেই ডেভিড উইলিয়াম জোনস বলে উঠল, 'এক ডজন লোক পেলেন কোথায়। সাতজনের মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর আরও দুই ডজন লোক পাঠানো হয়েছিল। তারা গিয়ে সবাই বীরদর্পে বন্দী হয়েছে।, এক পয়সার উপকার করতে পারেনি।'

'বন্দী কি হয়েছে মাত্র ২৪জন? টিভি বলল বন্দীর সংখ্যা ঊনত্রিশ জন?' বলল জ্ঞানী গঙ্গাধর তিলক।

'ঊনত্রিশ জনই ঠিক। আগের ৫জন, পরে পাঠানো ২৪জন, এই মোট ঊনত্রিশ জন। ডেভিড উইলিয়াম জোনস বলল।

'আফসোস, ঊনত্রিশ জন লোক তো বিল্ডি-এর ইট খুলেও ক্লিনিকে ঢুকতে পারতো। এই লজ্জা আমরা কোথায় রাখব, বলুন?' বলল জ্ঞানী গঙ্গাধর তিলক।

জেনারেল শ্যারনের মুখ লাল হয়ে উঠেছিল অস্বস্তি ও অপমানে। বলল, 'আপনাদের কথা ঠিক। কিন্তু সেই সাথে আপনাদের বিবচার করতে হবে যাকে তারা পাকড়াও করতে গিয়েছিল সে কে? সে এমন একজন লোক যে একা একটা রাস্ট্রের বিরুদ্ধে লড়ে বিজয়ী হয়। যেমন সোভিয়েত ইউনিয়ন। বুদ্ধি ও শক্তি উভয় ক্ষেত্রেই সোভিয়েত ইউনিয়ন তার কাছে পরাজিত হয়েছে। বুদ্ধিতে তার কাছে পরাজিত হওয়ায় সোভিয়েতের শক্তি কাজে লাগেনি। এই ঘটনাই ঘটেছে চীনে, মিন্দানাওয়ে, ইসরাইলে, ককেশাসে, স্পেনে প্রভৃতি স্থানে। সুতরাং আমাদের লেকরা যদি তার কাছে পরজিত হয়ে থাকে, তাহলে সেটা কি খুবই অস্বাভাবিক?'

'এই যদি ঘটনা হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে আর লড়ছি কেন?/ পারাই যখন যাবে না, তখন লড়ে কি লাভ! তার চেয়ে....।'

জেনারেল শ্যারন কথা বলে উঠায় বাধা পেয়ে জ্ঞানী গঙ্গাধর তিলক থেমে গেল। জেনারেল শ্যারন তখন বলছিল, 'আমরা লড়ছি আমাদের অস্তিত্বের জন্যে, লড়াইয়ের কোন বিকল্প নেই বলে।'

বলে একটু থামল জেনারেল শ্যারন। সামনের গ্লাস থেকে এক ঢোক মদ গিলে আবার শুরু করল, 'বিজয় তার বহু একথা ঠিক, কিন্তু আমরাও তাকে পরাজিত করেছি। বহুবার ফাঁদে আটকেছি। সে ফাঁদ কেটে বেরিয়ে গেছে একথাও ঠিক, যেমন এবার গেল। কিন্তু সব সময় যাােবে, তা ঠিক নয়। সুতরাং লড়াই আমাদের চালিয়ে যেতে হবে।'

'এখন আমরা কি করব, সেটা বলুন।' বলল জ্ঞহানী গঙ্গাধর তিলক।

'কিছূ করার জন্যে আমি একটা খবরের অপেক্ষা করছি।' জেনারেল শ্যারন বলল।

'কি খবর? উদগ্রীব কন্ঠে জিজ্ঞেস করল ডেভিড উইলিয়াম জোনস।

'খবর পেয়েছি, সারা জেফারসন জর্জ ওয়াশিংটন স্টেট হাসপাতালে চিকিতসাধীন রয়েছে। আমি লোক পাঠিয়েছিছ বিস্তারিত জানার জন্যে যে, কোন ওয়ার্ডে কোথায় কোন ডাক্তারের অধীনে চিকিততসাধীন রয়েছে। ডাক্তারের ডিউটি  আওয়ার কিরকম, কোন সময় তাদের ডিউটি চেঞ্জ হয়। যেখানে সারা জেফারসন ভর্তি রয়েছে, সেখান থেকে বের হবার সহজ ও সংক্ষিপ্ত  পথ কি?' বলল জেনারেল শ্যারন।

'তারপর?' জ্ঞানী গঙ্গাধর তিলক বলল।

'ঐ হাসপাতালের ডাক্তারের কয়েকটা এ্যাপ্রোন ও নার্সের পোমাক যোগাড় করতে বলেছি।' বলল জেনারেল শ্যারন।

'তারপর?' ডেভিড উইলিয়াম জোনস বলল।

'গীর্জার ফাদারের একসেট পোশাকও আনিয়ে রেখেছি।' বলল জেনারেল শ্যারন।

'আসল কথা বলুন, এসব দিয়ে কি হবে?' বলল জ্ঞানী গঙ্গাধর তিলক।

'বলা এখানেই শেষ। আর বলব না।, দেখাব।'

'কি দেখাবেন?' বলল ডেভিড উইলিয়াম জোনস।

'যখন দেখাব, ততখন দেখেবেন।' জেনারেল শ্যারন বলল।

তার কথা শেষ হতেই তার হাতের মোবাইল বেজে উঠল।

টেলিফোন ধরল জেনারেল শ্যারন।

ওপারের 'হ্যালো' শুনেই জেনারেল শ্যারন বলল, 'সব তথ্য পেয়েছ এবং যা যোগাড় করার তা করেছ?'

'সব জোগাড় হয়েছে।' ওপার থেকে বলল।

জনারেল শ্যারন হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'এখন সকাল ৯টা। তুমি তাড়াতাড়ি চলে এস। আমরা দশটায বের হতে চাই। ১২টায় ডিউটি বদলের অনেক আগে সব কাজ শেষ করতে চাই।'

'আপনার ওখানে সব রেডি?' বলল ওপার থেকে।

'ওসব চিন্তা করো না। সবাই রেডি হয়ে আছে। তুমি এলই যাত্রা শুরু করব।' জেনাারেল শ্যারন বলল।

'ওকে। আমি আসছি।'

'এস। বাই।'

বলে টেলিফোন অফ করে দিল জেনারেল শ্যারন।

'অপেক্ষার খবর তাহলে পেয়ে গেলেন?' বলল জ্ঞানী গঙ্গাধর তিলক।

'হ্যাঁ, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।'

বলে জেনারেল শ্যারন উঠে দাঁড়াল।

# ৬

তখন বেলা দশটা পয়তাল্লিশ মিনিট।

অভিজাত জর্জ ওয়াশিংটন স্টেট হাসপাতালের ৩৩ নাম্বার কেবিন ওয়ার্ডের ডক্টর'স লাউঞ্জ থেকে তিনজন ডাক্তার বেরিয়ে এল। অল্প দূরে দাঁড়ানো একজন নার্স তাদের সাথে এসে যোগ দিল।

তারা গিয়ে প্রবেশ করল ৩৩ নাম্বার কেবিন ওয়ার্ডের অফিসে।

অফিসটি কেবিন ওয়ার্ডের প্রবেশ মুখেই। এর সামনে দিয়ে একটা করিডোর দরজা পেরিয়ে ভেতরে চলে গেছে। এই করিডোরের দু'পাশে কেবিন।

কেবিন ওয়ার্ডের অফিসে তখন বসেছিল শুধু হেড নার্স। ডাক্তারের আসন খালি।

একজন নার্সসহ তিনজন ডাক্তার অফিসে প্রবেশ করতেই হেড নার্স উঠে দাঁড়াল। বলল ডাক্তারকে লক্ষ্য করে, 'গুড মর্নিং স্যার। কিছু প্রযোজন? আম কি সাহায্য করেতে পারি?'

তিনজন ডাক্তারের দুজন এবং নার্সটি সামনের কাঁচের দেয়াল আড়াল করে দাঁড়িয়েছে।

তৃতীয় ডাক্তার অফিসের হেড নার্সের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। হেড নার্সের প্রশ্নের জবাবে সে বলল, 'এ্যাটেন্ডিং ডাক্তার স্টিফেন কোথায়?'

'তাকে দরকার? উনি গিয়েছেন ২১ নাম্বার কেবিনে। রুটিন...'

কথা শেষ করতে ারল না হেড নার্স। তার সামনে দাঁড়ানো ডাক্তার একটা ক্লোরোফরম ভেজা রুমাল চেপে ধরল হেড নার্সের নাকে।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড।

নার্সের সংজ্ঞাহীন দেহ পড়ে যাচ্ছিল। ডাক্তার দু'হাতে তুলে নিল তার দেহ। তারপর দেহ নিয়ে সে প্রবেশ করল এটাচড বাথে। বাথরুমে দেহটা রেখে বাইরে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল ডাক্তার।

ডাক্তারদের সাথে আসা নার্স ইতিমধ্যেই হেড নার্সের চেয়ারে বসেছে।

ডাক্তার বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'মিস নোয়ান নাবিলা, আমরা সারা জেফারসনকে নিয়ে বাইরে বেরুনো পর্যন্ত এই অফিস আপনাকে দখলে রাখতে হবে।'

এই সময় একজন ফাদার প্রবেশ করল অফিসে। বলল, ''আইজাক, আমি নাবিলার সাথে অফিসে বসছি। আমি একটা প্যাশেন্ট ট্রলি নিয়ে এসেছি। ওটা নিয়ে তোমরা দ্রুত চলে যাও ২১ নাম্বার কেবিনে। একজন আগে যাবে ডাক্তারকে ট্যাকল করার জন্যে। অবশিষ্ট দু'জন যাবে ট্রলি নিয়ে।

ডাক্তার তিনজন বেরিয়ে গেল।

ওরা বেরিয়ে যাবার দু'মিনিট পরেই দুজন লোক এল কেবিনের অফিসে। তারা ডিউটি টেবিলের নার্স অর্থাত্ নোয়ান নাবিলাকে দু'টি কার্ড় দেখিয়ে বলল, 'আমরা এফবিআইয়ের লোক। এই নিন সারা জেফারসনের রিলিজ অর্ডার। রিলিজ সার্টিফিকেট দিন। আমরা তাকে নিয়ে যাব। গেটে সবাই অপেক্ষা....'

এফবিআই-এর লোকটি কথা শেষ করতে পারল না। ফাদার-এর পোশাক পরা লোকটি পেছন দিক থেকে তার ভারী মেশিন রিভলবারের দুটি ঘা মারলো দুজনের মাথায় পূর্ণ শক্তিতে। দুজনেই টলে উঠে পড়ে গেল মেঝেতে।

সংগে সংগেই চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল নোয়ান নাবিলা। দৌড়ে গিয়ে বাথরুমের দরজা খুলে ফেলল। তারপর দুজন দ্রুত সংজ্ঞাহীন এফবিআই-এর দুজনের দেহ নিয়ে বাথরুমে ঢুকল।

ওদিকে তিনজন যাক্তারের একজন আগেই ঢুকে গিয়েছিল কেবিনে।

গট গট করে হেঁটে সোজা গিয়ে সে ঢোকে ২১ নাম্বার কেবিনে। দেখে, ডাঃ স্টিফেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সারা জেফারসনের কেসকার্ডে কিছু লিখছেন।

পায়ের শব্দ পেয়ে ডাঃ স্টিফেন মুখ তুলল। অপরিচিত একজন ডাক্তারকে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে বলল, 'ডক্টর.... কোন খবর?'

'হ্যাঁ মিঃ স্টিফেন। ডাঃ এলিস আপনাকে জরুরী কল করেছেন।'

ডাঃ এলিস হাসপাতালের মেডিকেল বিভাগের ডাইরেক্টর।

'জরুরী কল'-এর কথা শুনেই ডাঃ স্টিফেন তড়িঘড়ি করে সারা জেফারসনের কেসকার্ডটা ঝুলিয়ে রেখে দরজার দিকে হাঁটা শুরু করে বলল, 'চলি তাহলে।'

ডাঃ স্টিফেন আগন্তুক ডাক্তারকে অতিক্রম করার সাথে সাথেই আগন্তুক ডাক্তার পেছন থেকে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সাথে বাম হাত দিয়ে ডাঃ স্টিফেনের গলা পেঁচিয়ে ধরল এবং ডান হাত দিয়ে ক্লোরোফরম ভেজা রুমাল ডাঃ স্টিফেনের নাকে চেপে ধরল।

ডাঃ স্টিফেন ছাড়া পাওয়ার জন্যে কিছু সময় ধ্বস্তাধ্বস্তি করল। তারপর ধীরে ধীরে তার শরীর নিস্তেজ হয়ে পড়ল।

আগন্তুক ডাক্তার সংজ্ঞাহীন স্টিফেনের দেহ টেনে নিয়ে এটাচ্ড বাথরুমে রাখল।

বাথরুমের দরজা বন্ধকরেই সে ছুটে এল সারা জেফারসনের কাছে। হাতের ক্লোরোফরম ভেজা রুমালটি এবার সে চেপে ধরল ঘুমন্ত সারা জেফারসনের নাকে।

সারা জেফারসন ঘুম ভেঙে যাওয়ায় চোখ মেলল ও নাক ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু অল্প কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তারও দেহ নিস্তেজ হয়ে গেল। সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল সে।

ডাক্তার বেমের অপর দু'জন এসময় ট্রলি নিয়ে সারা জেফারসনের কক্ষে পৌছে গেল।

দ্রুত তিনজন ধরাধরি করে সারা জেফারসনের দেহ ট্রলিতে তুলল এবং একটা সাদা চাদর দিয়ে সারা জেফারসনের আপাদমস্তক ঢেকে দিল।

ওরা বেরিয়ে এল কেবিন থেকে।

এসে পৌঁছল কেবিনের বাইরের করিডোরটিতে।

কেবিন ওয়ার্ডের অফিস অতিক্রম করতেই অফিস থেকে বেরিয়ে এল ফাদার--এর পোশাক পরা লোকটি এবং নার্স-এর পোশাক পরা নোয়ান নাবিলা।

ফাদার হাঁটতে শুরু করল ট্রলির আগে আগে। ট্রলির আগে দুজন ডাক্তার, পেছনে একজন। আর নার্স হাঁটছে ট্রলির মাঝ বরাবর।

ডাক্তারবেশী একজন জজ্ঞেস করল ফাদারকে, 'ডেথ সার্টিফিকেট তৈরী করে নেয়া হয়েছে তো?'

'হ্যাঁ। ওটা আমার কাছে আছে। আমিই গেটে দেখাব। আমি বলব, আমার একজন আত্মীয়া মারা গেছে। তোমরা লাশ পৌছাতে আমাকে সাহায্যকরছ।'

তারা এসে পৌঁছল হাসপাতালের ডিপারচার লাউঞ্জে। ডিপারচার লাউঞ্জে বেশ অনেক পুলিশ। লাউঞ্জের ডিপারচার গেটে দুজন গেটরক্ষী ছাড়াও অনেক কজন পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে।

একদম দ্বিধাহীন ভাবে তারা ট্রলি নিয়ে গেটে পৌছল।

'ফাদার ডেথ সার্টিফিকেট বের কের গেটম্যানের হাতে দিল। বলল, 'আমার বোন মারা গেছে। আমি একা মানুষ। ওরা আমাকে সহযোগিতা করছেন।'

গেটম্যানটি ডেথ সার্টিফিকেট অন্য গেটম্যানের হাতে দিয়ে বলল, 'রিলিজ সার্টিফিকেট দিন।'

ফাদার রিলিজ সার্টিফিকেট পকেট থেকে বের করে গেটম্যানের হাতে দিল।

গেটের পুলিশরাও ডেথ ও রিলিজ সার্টিফিকেট দেখল।

একজন গেটম্যান ওকে বলে গেট খুলে দিল।

ট্রলি নিয়ে বের হয়ে এল তারা।

বাইরেই ধীর্ঘ ও প্রশস্ত গাড়ি বারান্দা।

ডিপারচার গেট-সোজা গাড়ি বারান্দায় রাখা আছে তাদের গাড়ি।

গাড়িতে তোলা হয়েছে সারা জেফারসনকে।

গাড়ির পেছনটা লক করেদুজন এগিয়ে যাচ্ছে গাড়ির সামনের দিকে উঠার জন্যে। নোয়ান নাবিলা এবং আরেকজন আগেই গাড়িতে উঠেছে। ফাদারের পোশাকধারী শুধু দাঁড়িয়ে তখনও গড়ি বারান্দায়।

এ সময় অনেক কয়জন পুলিশকে ছুটে আসতে দেখা গেল গাড়ির দিকে।

আসতে আসতে একজন চিতকার করে বলল, 'একটু দাঁড়ান ফাদার।'

ওরা এল।

চারজন এসে ফাদারের সামনে দাঁড়াল এবং আরও দু'জন গিয়ে গাড়ির সামনে দাঁড়াল গাড়ির গতিরোধ করে।

একজন পুলিশ ফাদারকে বলল, 'গাড়ি খুলুন, আমরা লাশ দেখব।'

ফাদার দেখল আরও কয়েকজন পুলিশ এগিয়ে আসছে।

ভেতরটা জ্বলে ্উঠল ফাদারের। দাঁতে দাঁত চাপল সে। শক্ত হয়ে উঠল মুখমন্ডল। দ্রুত তার হাত চলে গেল আলখাল্লার ভেতরে। সামনে দাঁড়ানো পুলিশরা কিছু বুঝে উঠার আগেই মেশন রিভলবারের নর তাদের উপর দিয়ে ঘুরে এল।

চারজন পুলিশই গাড়ি বারান্দায় লুটিয়ে পড়ল।

গুলী করেই ফাদার ছুটে এসে গাড়িতে উঠল।

এদিকে গাড়ির সামনে দাঁড়ানো দুজন পুলিশ ফাদারকে গুলী করতে দেখে তাদের বন্দুক তুলেছিল ফাদারকে লক্ষ্য করে।

কিনন্তু গাড়ির ভেতর থেকে দুটি গুলী এসে তাদের নিরব করে দিল। ছিটকে পড়ল তাদের দেহ দু'টি রাস্তার উপর। তাদের উপর দিয়ে ফাদারদের গাড়িটা তীর বেগে বেরিয়ে এল হাসপাতালের এলাকা থেকে।

গাড়ি স্টার্ট নেবার সময় পেছনে চোখ রাখা ফাদারের চোখে পড়ল, এইমাত্র গাড়ি বারান্দায় প্রবেশ করল একটি গাড়ি। গাড়ি থেকে নেমে এল আহমদ মুসা এবং জর্জ আব্রাহাম জনসন।

একটা ক্রুর হাহসি ফুটে উঠল ফাদারের মুখে। গা থেকে ফাদার আরখাল্লাখুলে ছুড়ে ফেলে গাড়ির সকলকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'একটা সুখবর তোমার তোমাদের জন্যে, আহমদ মুসা ও জর্জ আব্রাহাম জনসন এইমাত্র হাসপাতালের গাড়ি বারান্দায় গাড়ি থেকে নামল।'

'মি: জেনারেল শ্যারন আমাদের সেদিনকার ব্যর্থতার ছেঅট হলেও একটা প্রতিশোধ নেয়া হলো।' বলল নোয়ান নাবিলা।

'এটা খুব ছোট প্রতিশোধ নয় মিস নাবিলা। আহমদ মুসা যখন গিয়ে দেখবে তার প্রেমিকা সারা জেফারসন নেই এবং যখন জানবে তর চোখের সামনে

দিয়েই আমরা তাকে নিয়ে গেছি, তখন হৃদয়টা তার খসে যাবে।' জেনারেল শ্যারন বলল।

'প্রেমিকা, না বন্ধু?' বলল নোয়ান নাবিলা।

'বন্ধুর শোকে অসুস্থ হয়ে কেউ হাসপাতালে আসে? আহত আহমদ মুসা আবার শত্রুর হাতে পড়েছে, অথবা কোথায় গিয়ে কি হলো এই চিন্তাতেই সারা জেফারসন অসুস্থ হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত তার অবস্থার অবনতি ঘটলে তাকে হাসপালালে নিয়ে আসতে হয়।' জেনারেল শ্যারন বলল।

'একজন ক্রিমিনালের জন্যে এটা কি স্বাভাবিক? জেফারসন কন্যা এমন একজন লোকের জন্যে পাগল হবেন?' বলল নোয়ান নাবিলা।

'কাকে ক্রিমিনাল বলছেন? আহমদ মুসা আমাদের জানি দুশমন, তাকে আবার হাতে পেলে হত্যাও করতে পারি, কিন্তু তাকে ক্রিমিনাল বলতে পারবো না। অত্যন্ত বর্নঢ্য বিপ্লবী জীবন তার। শুধু জেফারসন কন্যা কেন যে কোন কন্যাই তার সান্নিধ্যে আসতে গৌরব বোধ করবে।' জেনারেল শ্যারন বলল।

'তাহলে সে চরিত্রহীন?' বলল নাবিলা।

'তাও হয়তো নয়। আমরা যতদুর জানি, কন্যারা তার সান্নিধ্যে যায় বটে, কিন্তু সে কারও দিকে ফিরে তাকায় না। সে স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত বিশ্বস্ত, আইডিয়ালিস্ট।'

নাবিলা একটু চিন্তা করে বলর, 'আপনার কথা বোধ হয় ঠিক। আমাদের সাগরিকা সেন নিশ্চয় বোল্ড আউট হয়েছে। তার মধ্যে আগের সেই উতসাহ নেই। সে একেবারে ম্লান হয়ে গেছে। ঘটনার পর একবার দেখা হওয়াতেই এটা আমি বুঝেছি।'

বরৈ একটু থেমে আবার শুরু করল, 'তাহলে সারা জেফারসনের ব্যাপার কি?'

'বিষয়টা আমাদের কাছে এখনও দুর্বোধ্য।' বলর জেনারেল শ্যারন।

'নিশ্চিত না হয়ে সারা জেফারসনকে কিডন্যাপ করলেন?' নাবিলা বলল।

'কিডন্যাপ আমাদের ঠিক হয়েছে। সারা জেফারসনকে আমাদের হাত থেকে উদ্ধারের জন্যে আহমদ মুসা নিজের জীবনও বাজী রাখবে। এ বিষয়ে

আমাদের কোন সন্দেহ নেই। দেখুন বন্দীত্ব থেকে মুক্ত হবার পর আহমদ মুসা প্রথম সুযোগেই ছুটে এসেছে সারা জেফারসনের কাছে।'

'আমরা যেখান থেকে এসেছি, সেখানেই যাব স্যার?' জিজ্ঞেস করল ড্রাইভিং সিটে বসা আইজ্যাক।

'না, মিঃ জোনসের নতুন কেনা ওয়ামিংটন এভেনিউ-এর নতুন বাড়িতে নিয়ে চল। ওখানেই ওকে রাখা হবে।' বলল জেনারেল শ্যারন। থামল সে।

সবাই চুপচাপ।

ছুটে চলেছে গাড়ি।

নিজের বেডের পাশে একটা ইজি চেয়ারে বসেছিল সারা জেফারসন। বলছিল সে, 'আমাকে কিডন্যাপ করলেই কি আপনাদের কালো কাজ সাদা হয়ে যাবে?'

'তা হবে না, কিন্তু আহমদ মুসার শাস্তি হবে। যাতনা-যন্ত্রনায় তাকে যতটুকু বিপর্যস্ত করা যায় সেটুকুই আমাদের লাভ।' জেনারেল শ্যারন বলল।

'আমাকে কিডন্যাপ করে আহমদ মুসাকে কিভাবে শাস্তি দেবেন? যাতনা-যন্ত্রনায় কেন সে বিপর্যস্ত হবে?' বলল সারা জেফারসন।

হাসল জেনারেল শ্যারন। হাসল ডেভিড উইলিয়াম জোনসও।

উত্তরটা দিল ডেভিড উইলিয়াম জোনস। বলল, 'এ উত্তর কি আমাদের কাছ থেকে শুনতে চান? আপনি কি জানেন না মিস জেফারসন আপনার কাছে আহমদ মুসা কি? আর আহমদ মূসার কাছে আপনি কি?'

ম্লান হাসল সারা জেফারসন। বলল, 'আপনারা আহমদ মুসাকে জানেন না। দায়িত্ববোধের কাছে কোন দুর্বলতা তার কাছে প্রশ্রয় পায় না। আর সে রকম কোন দুর্বলতা তার আছে বলে আমি জানি না।'

শ্যারন হাসল। বলল, 'আহমদ মুসাকে আমি বহু বছর ধরে চিনি। যে দায়িত্ববোধের কথা আপনি বললেন, সেই দায়িত্ববোধই এখানে তাকে হিড় হিড়

করে টেনে আনবে।আমরা হিসেবে একটুও ভুল করিনি মিস জেফারসন। আহমদ মুসার কাছে আপনি কতটুকু তা আপনি জানেন, আহমদ মুসা আপনার কাছে কতটুকু তাও সে জানে। আর আহমদ মুসার কারনেই যে আপনার এ অবস্থা তা বুঝতে আহমদ মুসার এক মুহূর্তও দেরী হয়নি। এই অনুভূতি তাকে অসহনীয় যন্ত্রনায় জর্জরিত করছে। এই যন্ত্রনা তাকে পাগলের মত টেনে নিয়ে আসবে। নিজেকে যে কোন ঝুঁকির মধ্যে নিক্ষেপ করে সে আপনাকে মুক্ত করতে চাইবে। আমরা এটাই চাই।'

'আপনারা যা চান ঈশ্বর তা চান না। আপনাদের সব অপকীর্তি ঈশ্বর প্রকাশ করে দিয়েছেন।' বলল সারা জেফারসন।

'ঈশ্বর করেন নি, আহমদ মুসা করেছে। আহমদ মুসা আমেরিকায় না এলে আমাদের কিছু হতো না। আপনাদের ফ্রি আমেরিকা, এফ বি আই আমাদের কিছুই করতে পারতো না। আহমদ মুসা আমাদের সকল সর্বনাশের মূল। তাকে হাতে পেয়েছিলাম, হত্যা না করে আমরা ভুল করেছি। এ ভুল আর আমরা করব না। এবার আর বন্দী করে রাখা নয়, প্রথম সুযোগেই তাকে আমরা এবার হত্যা করব।' তীব্র কন্ঠে বলল জেনারেল শ্যারন।

সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল সারা জেফারসনের। জেনারেল শ্যারনের কথার একবিন্দুও তার অবিশ্বাস হলো না। জেনারেল শ্যারন ফ্রাস্ট্রেশনের যে পর্যায়ে পৌঁচেছে, সেখানে এমন কিছু করা তাদের জন্যে স্বাভাবিক। সারা জেফারসন নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'আহমদ মুসার উপর এই রাগ ঝেড়ে আপনাদের কি লাব হবে? তার হাতে তো এখন কিছু নেই। আপনাদের বিরুদ্ধে বিচারের আয়োজন করছে সরকার, আহমদ মুসা নয়।'

'কিন্তু আহমদ মুসার জন্যেই এসব হচ্ছে।' বলর শ্যারন।

'কিন্তু আহমদ মুসাকে হত্যা করলে তো এসব বন্ধ হচ্ছে না।' সারা জেফারসন বলল।

'আহমদ মুসাকে সরিয়ে দিতে পারলে আমাদের জন্যে অনেক কিছু করার সুযোগ আসবে। মার্কিন পলিটিশিয়ান ও মার্কিন আমলাদের মধ্যে আমাদের লোক কম নেই।' বলল জেনারেল শ্যারন।

'আচ্ছা মিঃ শ্যারন, আমেরিকা ও আমেরিকানদের ক্ষতি আপনারা কেন করছেন?'

'আমরা কারও ক্ষতি করছি না। আমরা আমাদের কিছু উপকার করছি। নিজের উপকারের জন্যে কিছু করার অধিকার সকলেরই আছে।' শ্যারন বলল।

'তাহলে আহমদ মুসাকে দোষ দিচ্ছেন কেন? সে আমেরিকানদের উপকারের জন্যে কিছু করেছে।'

'সে আমাদের সর্বনাশ করেছে।' বলল জেনারেল শ্যারন।

'তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমেরিকানদের উপকার মানে আপনাদের সর্বনাশ। আর আপনাদের উপকার মানে আমেরিকানদের সর্বনাশ। আমেরিকা ও আমেরিকানদের মোকাবেলায় এমন অবস্থান আপনারা বেছে নিলেন কেন?'

'আপনাদের ফ্রি আমেরিকা যে কারনে বলে আমেরিকা আমেরিকানদের। আপনাদের কাজকে আপনারা জাতিপ্রেম বলেন, আমাদের কাজকেও আমরা বলি জাতিপ্রেম।' বলল জেনারেল শ্যারন।

'এটা ঠিক নয়, আমরা করছি আমাদের দেশপ্রেম থেকে। কিন্তু আপনাদের কাজ পরিষ্কার ষড়যন্ত্র। এ ষড়যন্ত্রের সাথে শতকরা আশিভাগ আমেরিকান ইহুদী নেই। দেখছেন তো চারদিক থেকে অবিরাম বিবৃতি আসছে আমেরিকান ইহুদী সম্প্রদায়ের। তারা আপনাদের নিন্দা করছে এবয় বলছে, আপনাদের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং জাতিপ্রেম থেকে আপনারা কাজ করছেন, এটা ঠিক নয়। আপনারা শুধু আমেরিকানদের সাতে বিশ্বাসঘাতকতা করেন নি, নিজ সম্প্রদায়ের সাথের আপনারা বিস্বসঘাতকতা করেছেন।'

ক্রোধে জ্বলে উঠল জেনারেল শ্যারনের দুই চোখ। উঠে দাঁড়াল সে। আবার বসল। তার লাল চোখে-মুখে তীব্র রাগ ও অপমানের চিহ্ন।কথা ভলল না কিছুক্ষন। পরিশেষে বোমা ফাটার মত তীব্র কন্ঠে বলল, 'মিস জেফারসন, এটা আপনার বাড়ির ড্রইং রুম নয়। আপনি আমাদের বন্দী এবং বন্দীর মতই কথা বলবেন। আপনি জেফারসন কন্যা বলে আপনাকে আমি যথেষ্ঠ সম্মান করছি। আপনার গ্রেট গ্রান্ড ফাদার টমাস জেফারসনের উদার গনতন্ত্র আমাদের অসীম

উপকার করেছে। তাই জেফারসন পরিবারকে আমরা শ্রদ্ধা করি। কিন্তু দেখছি সে শ্রদ্ধার পাত্র আপনি নন। আহমদ মুসা আপনাকে গিলে খেয়েছে। সাবধান করে দিচ্ছি আপনার কোন ওদ্ধ্যত্য আমরা বরদাশত করবো না।'

'কিন্তু মিঃ শ্যারন, আহমদ মুসার সাথে আমার পরিচয় হওয়ার আগে আপনারা আমাকে কয়েকবার খুন করার চেষ্টা করেছেন।' বলল দৃঢ়কন্ঠে সারা জেফারসন।

'সেটা ছিল একটা ভুল বোঝাবুঝির ফল। আমরা বলেছিলাম আপনাকে ভয় দেখাবার জন্যে কিছু করার। কিন্তু আঞ্চলিক নেতারা বুঝেছিল অন্যরকম।'

'ধন্যবাদ জেনারেল শ্যারন।' বলল সারা জেফারসন।

'মিস জেফারসন আপনি কি আহমদ মুসাকে চিঠি লিকতে চান?'

'তাতে আপনাদের স্বার্থ?'

'আমাদের স্বার্থ তেমন নেই। তবে প্রিয়তমার চিঠি পেলে প্রিয়তমার কথা নতুন করে মনে পড়বে।, প্রিয়তমাকে উদ্দারের জন্যে অস্থির হয়ে উঠবে, এটা আমাদের লাভ।'

'আরেকটা লাভ আছে। সেটা হলো চিঠিতে আমার অনুরূপ হস্তক্ষরে এটা ভুয়া ঠিকানা লিখা থাকবে। যে ঠিকানায় আমাকে উদ্ধারের জন্যে আহমদ মুসা ছুটে যাবে এবং আপনাদের ফাঁদে আটকা পড়বে।'

'কিন্তু আহমদ মুসা যত তাড়াতাড়ি ধরা পড়বে, তত তাড়াতাড়ি আপনার মুক্তি। আহমদ মুসা আমাদের হাতে না আসা পর্যন্ত আমরা আপনাকে ছাড়ছি না। আহমদ মুসাকে আপিনি রক্ষা করতে পারবেন না। তাকে আসতেই হবে। আর ফ্লোরিডার জ্যাকসন ভিলে আমাদের যে ভুল হয়েছে, যার কারনে লায়লা জেনিফার ও ডঃ মার্গারেটকে সে মুক্ত করে নিয়ে যায়, সেই ভুল এবার আমরা করছি না।'

বলে উঠে দাঁড়াল জেনারেল শ্যারন।

ডেভিড উইলিয়াম জোনস উঠতে উঠতে বলল, 'শেষ কথাটাও ওকে বলে দিন মিঃ শ্যারন। আমরা এক মাসের বেশী আহমদ মুসার জন্যে ওয়েট করবো

না। আহমদ মুসাকে একটা আলটেমেটাম দেয়ার পর সে না এলে এবং এক মাস পার হয়ে গেলে কি হবে সেটাও মিস জেফারসনকে বলে দিন।'

জেনারেল শ্যারন যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছিল, থেমে গেল। বলল, 'ভাল কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন মিঃ জোনস। দন্যবাদ আপনাকে।'

বলে ফিরল সে মিস সারা জেফারসনের দিকে। বলল, 'আমরা তো অনির্দিষ্টকাল আপনার মত সুন্দরী ও বিবাহযোগ্যা মেয়েকে আমাদের সামষ্টিক কেয়ারে রাকতে পারবো না। তাই আমরা ঠিক করেছি, ৩০ দিন পার হওয়ার পর একত্রিশতম দিনে আপনাকে নিয়ে একটা লটারী হবে। লটারী হবে এইজন্যে যে, আমাদের সবাই আপনাকে চায়। কেউই তাদের দাবী ছাড়তে রাজী নয়। তাই আমরা যারা প্রার্থী তাদের মধ্যে লটারীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। যার ভাগ্যে আপনার নাম উঠবে, সে ভাগ্যবানই হবে আপনার মালিক। আমরা তার হাতে তুলে দেব আপনাকে। আপনার মর্যাদার কথা চিন্তা করে বিয়ের চির বন্ধনে আপনাকে না বাধার সিদ্ধান্ত হয়েছে। লিভ টুগেদারের সুবিধা হলো আপনারা কোন উপযুক্ত সময়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারবেন। আপাতত এই বন্দীখানাই হবে আপনাদের লিভ টুগেদারের ঠিকানা।'

কথাগুলো একটা একটা করে অত্যন্ত শীতল কন্ঠে বলল জেনারেল শ্যারন। প্রতিটি কথা চাবুকের মত আঘাত করল সারা জেফারসনকে। একজন নারীর দুর্বলতম স্থান যেটা সেখানেই আঘাত করেছে সে। জেনারেল শ্যারন ও ডেভিড উইলিয়াম জোনসের লোলুপ দৃষ্টি দেখেই সারা জেফারসনের মন বুঝল জেনারেল শ্যারনের একটা কথাও মিথ্যা নয়।

বুকের ভেতরটা কাঁপতে শুরু করেছে সারা জেফারসনের।

কথা শেষ করেই জেনারেল শ্যারন আবার ঘুরে দা৭ড়াল। চলতে শুরু করল।

ডেভিড উইলিয়াম জোনস হাঁটার জন্যে পা বাড়িয়ে আবার মুকটি ঘুরিয়ে সারা জেপারসনের দিকে চেয়ে বলল, 'একমাসের মধ্যে মুক্তি চাইলে আমাদের মতে আপনাকে চলতে হবে মিস জেফারসন। আপনি ভাবুন।'

বলে ডেভিড উইলিয়াম জোনসও হাঁটতে শুরু করল।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ওরা।

দরজা বন্ধ হয়ে গেল ঘরের।

বুকের কাঁপুনি সারা জেফারসনের গোট দেহকেই অসাড় করে তুলতে চাইল। তার মনে হলো, গেটা পৃথিবী তার সামনে বদলে যাচ্ছে।

সারা জেফারসন ইজি চেয়ার তেকে উঠে টলতে টলতে বিছানায় গিযে লুটিয়ে পড়ল। অসহায় এই সময়ে আহমদ মুসার অনুরূপ ছবিটিহৃদয় জুড়ে দেখা দেয়ার সাথে সাথে তার হৃদয় জুড়ে নেমে এল এক প্রশান্তিও। মন থেকে স্বস্তির এক কন্ঠ বলল, ৩০ দিনের মধ্যেই তার আহমদ মুসা তাকে উদ্ধার করবে।

তার আহমদ মুসা তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে কথাটা ভাবতে গিয়ে আবার কেঁপে উঠল সারা জেফারসন। কেমন করে আহমদ মুসার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে সে? আহমদ মুসাকে এখন তার মনে হচ্ছে এক নিষিদ্ধ ফলের মত। ওদিকে তার হাত বাড়াবার কোন অধিকার নেই। আহমদ মুসা বিবাহিত সে জানতো না। লায়লা জেনিফাররা তাকে হাসপাতালে দেকতে না এলে এতদিনেও কথাটা তার জানা হতো না। এ কথাই বোধ হয় আহমদ মুসা বার বার বলতে চেয়েছে, কিন্তু বলা হয়নি। শেষে কথাটা বলা আহমদ মুসার জন্যে বোধ হয় কঠিন হয়ে গিয়েছিল। এই আহমদ মুসার সামনে সে তার অসীম অপরাধ নিয়ে কেমন করে দাঁড়াবে? আহমদ মুসাকে বিব্রত করা আর তার ঠিক হবে না।

তাহলে কি করবে সে? দুচোখ বেয়ে আবার অশ্রু গড়াল তার। তার অপরাধ নিয়ে তাকে হামদ মুসার চোখের আড়ালে সরে যেতে হবে। কিন্তু তারপর কি হবে? তার অপরাধের প্রতিকার কিসে? সে কি আহমদ মুসাকে ভুলে যেতে পারবে? কেমন করে ভুলে যাবে? নিজের হৃৎপিন্ড ছিড়ে ফেলে কেউ কি বাঁচতে পারে?

বালিশে মুখ গুঁজল সারা জেফারসন।

নিরব কান্নার স্রোত নামছে তার দুচোখে।

আহমদ মুসা ও জর্জ আব্রাহাম জনসন গাড়ি থেকে গাড়ি বারান্দায় পা দিয়েই বিস্ময়ের সাগরে হাবুডুবু খেতে লাগল।

চারজন পুলিশের লাশ তাদের সামনে। আরও দুজন পুলিশের পিষ্ট হওয়া লাশ তারা দেখতে পাচ্ছে একটু দুরে রাস্তায়। দুরে একটা গাড়িকে পাগলের মত ছুটে পালাতে দেখতে পেল তারা।

এফ বি আই চীফ জর্জ আব্রাহাম জনসনকে দেখে এফ বি আই ও পুলিশ অফিসাররা ছুটে এল।

একজন এফ বি আই অফিসার ব্যস্ত কন্ঠে জর্জ আব্রাহামকে জানাল, 'স্যার, সাংঘাতিক ঘটনা ভোজবাজীর মত ঘটে গেল।'

'পুলিশদের কে মারল? কি করে ঘটল বলত?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

এফ বি আই অফিসারটি কিভাবে তিনজন ডাক্তার, একজন নার্স ও একজন ফাদার কাপড়ে ঢাকা একটা ডেডবডি নিয়ে এল এবং ডেথ ও রিলিজ সার্টিফিকেট দেখিয়ে গেট দিয়ে নিয়ে চলে গেল, তার বিবরন দিয়ে বলল, 'তারা চলে যাবার পরই একজন ডাক্তার বলল দুটি সার্টিফিকেটেরই সই জাল। তারপরই পুলিশ পাঠানো হয় গাড়ি থামাবার জন্যে। আমরা মনে করেছিলাম ডেডবডি চেক করতে হবে। পুলিশ যাবার পরই এমন ঘটনা ঘটল।'

তার কথা শেষ হতেই আহমদ মুসা বলল, 'মিস সারা জেফারসনকে নিয়ে যাবার জন্যে আপনারা এসেছেন শুনলাম। কি হল? তার রিলিজ হয়েছে।?

'তার রিলিজ নেবার জন্যে দুজন এফ বি আই অফিসার গেছেন। আমরা তাদেরই অপেক্ষা করছি।' বলর এফ বি আই অফিসারটি।

'মিস সারা জেফারসন কত নাম্বার কেবিনে আছেন? আহমদ মুসা জিজ্ঞেস করল।

'তিনি ২১ নাম্বার কেবিনে আছেন।' বলল এফ বি আই অফিসারটি।

'আর ডেডবডি কত নাম্বার কেবিন থেকে এসেছিল?' আহমদ মুসা জিজ্ঞেস করল।

'ঐ ২১ নাম্বার কেবিন থেকেই।' বলল অফিসারটি।

'আপনার অফিসারদের এতক্ষনে ফেরার কথা তাই না?' দ্রুত কন্ঠে বলে উঠল আহমদ মুসা।

'অবশ্যই। কাগজপত্র সব রেডি আছে, এখন শুধু নিয়ে আসা।' বলর অফিসারটি।

আহমদ মুসা দ্রুত মুখ ঘুরাল জর্জ আব্রাহাম জনসনের দিকে। বলল, 'আমার মনে হচ্ছে, একটা বড় ঘটনা ঘটে গেছে। চলুন ২১ নাম্বার কেবিনে কি ঘটেছে দেখি।'

ভ্রুকুঁচকে গেল জর্জ আব্রাহাম জনসনের। বলল আহমদ মুসাকে, 'তার মানে আপনি মিস জেফারসন সম্পর্কে খারাপ কিছু ভাবছেন?'

বলেই জর্জ আব্রাহাম জনসন হাসপাতালের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

সবাই চলল তার সাথে।

২১ নাম্বার কেবিন হাসপাতালের মাঝ বরাবর ভি আই পি সেকশনে অবস্থিত।

২১ নাম্বার কেবিনের কাছাকাছি হতেই আহমদ মুসারা ডাক্তার ও নার্সদের ছুটাছুটি দেখতে পেল।

আহমদ মুসারা আরও কাছাকাছি হতেই একজন প্রবীন ডাক্তার ছুটে এল এফ বি আই প্রধান জর্জ আব্রাহাম জনসনের দিকে। বোধ হয় সে চিনেছে জর্জ আব্রাহাম জনসনকে। বলর সে হাঁপাতে হাঁপাতে, 'স্যার মিস সারা জেফারসনকে তার কেবিনে পাওয়া যাচ্ছে না। তার কেবিনের ডাক্তারকে বাথরুমে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পাওয়া গেছে। এদিকে এই ওয়ার্ডের হেড নার্স ও দুজন এফ বি আই অফিসারকে পাওয়া গেছে ওয়ার্ড অফিসের বাথরুমে সংজ্ঞাহীন অবস্থায়।'

মুখ ম্লান হয়ে গেল জর্জ আব্রাহাম জনসনের। তাকাল সে আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসার ভাবলেশহীন মুখ। বলল, 'বুঝা গেছে মিঃ জর্জ আব্রাহাম। তবু চলুন ওয়ার্ড অফিস এবং মিস সারা জেফারসনের কেবিন দেখে আসি।'

ওয়ার্ড অফিস এবং মিস সারা জেফারসনের কেবিন দেখে ফেরার পথে এফ বি আই প্রধান আহমদ মুসাকে বলল, 'নতুন কিছু বোঝা গেল মিঃ আহমদ মুসা?'

'তেমন কিছু না। অন্যদের মত মিস জেফারসনকেও তারা ক্লোরফরম করে কিডন্যাপ করেছে। মসি জেফারসন সেসময় ঘুমিয়ে ছিলেন।'

'দেখা যাচ্ছে, ওরা ছিল পাঁচজন লোক। কিন্তু এতজন লোককে ওরা ক্লোরফরম করল, কোন গোলাগুলী হলো না, ধ্বস্তাধ্বস্তি হরো না? কেমন করে ঘটল?' বলল আব্রাহাম জনসন।

'ডাক্তারের ছদ্মবেশ নেয়ার কারনে সুবিধা হয়েছে। অতর্কিত চড়াও হয়ে কাজ সেরেছে। সবাই বলছে ফাদার হোয়াইট নয়। অন্যরাও পিওর হোয়াইট নয়। আমার ধারনা 'ফাদার' ছদ্মবেশে জেনারেল শ্যারন এসছিল। অন্যরাও আমেরিকান ইহুদী।' আহমদ মুসা বলল।

'গাড়ির নাম্বারও কেউ বলতে পারছে না।' জর্জ আব্রাহাম বলল।

'তাতে লাভ হতো না মিঃ জর্জ আব্রাহাম। গাড়ির নাম্বার ভুয়া ছিল।'

'একরন কি করনীয় বলুন তো? ইহুদীদের পরিচিত সব সামাজিক ও ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের উপর আমাদের চোখ আছে।'

'আমার ধারনা ইহুদীদের কোন পরিচিত বাড়ি বা প্রতিষ্ঠানে মিস জেফারসনকে রাখা হবে না। যেমন আমাকেও তারা রাখেনি। আমাকে সবসময় তারা ভারতীয় আমেরিকানদের আশ্রয়ে রেখেছে।'

'আমি অবাক হচ্ছি ভারতীয় আমেরিকানরা কেন এভাবে ইহুদী একটি গ্রুপের সকল কুকর্মের সহযোগী হয়ে গেল?'

'এই দুটি জাতির জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও রাজনৈতিক লক্ষ্যের মধ্যে প্রচুর মিল আছে। দুটি জাতিই বিশ্বাসগত ভাবে সাম্প্রদায়িক। জন্মগত হলেই কেউ যেমন ইহুদী হতে পারে, তেমনি হিন্দুদেরকেও জন্মগতভাবে হিন্দু হতে হয়। হিন্দুদের কাস্ট সিস্টেমটা জন্মগত। কনভারশনের মাধ্যমে কেউ হিন্দু বা ইহুদী হতে পারে না। আমেরিকায় দুই জাতির রাজনৈতিক লক্ষ্যও এক। অর্থনীতি ও

তথ্য-মাধ্যমের মত ক্ষমতার কেন্দ্রগুলোকে দখল করে তাদের সংখ্যালঘু আধিপত্য কায়েম করা।' আহমদ মুসা বলল।

'হ্যাঁ মিঃ আহমদ মুসা, তাদের আচরন দ্বারা এটাই তারা আমাদের বলে দিচ্ছে।'

বলে একটু থামল জর্জ আব্রাহাম। একটু ভাবল। বলল, 'মিঃ আহমদ মুসা প্লিজ আমাদের অফিসে চলুন, আলোচনা আছে।'

তারা এফ বি আই হেড কোয়ার্টারে পৌছল।

অফিসে বসেই জর্জ আব্রাহাম প্রেসিডেন্টসহ প্রয়োজনীয় সবার কাছেমিস জেফারসনের কিডন্যাপ হওয়ার খবর জানিয়ে দিল।

তারপর আহমদ মুসার মুখোমুখি হয়ে বলল, 'মিঃ আহমদ মুসা সারা জেফারসন কিডন্যাপ হওয়ার খবর এখনি জনগনকে জানানো ঠিক হবে না বলে মনে করছি।'

'কেন?' বলল আহমদ মুসা।

'সারা জেফারসন কিডন্যাপের সংবাদ মার্কিন জনগন ও 'ফ্রি আমেরিকা' আন্দোলনের সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে ক্ষুদ্ধ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে এবং তা খারাপ দিকে টার্ণ নেতে পারে বলে আমি, আশংকা করুছি।'

জর্জ আব্রাহাম জনসন বলল।

'খারাপ টার্ণটা কি?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'খবর প্রচারিত হওয়ার সংগে সংগেই সবাই ধরে নেবে এই কিডন্যাপের কাজ শ্যারন ও উইলিয়াম জোনসদের। ক্ষুদ্র একটি ইহুদী গ্রুপ কিডন্যাপের সাথে জড়িত, কিন্তু মানুষের ক্রোধ গিয়ে ড়পতে পারে সাদারনভাবে ইহুদি কম্যুনিটির উপর। বিশেষ করে 'ফ্রি আমেরিকা'র সদস্যরা ত্বরিত প্রতিশোধ গ্রহনে এগিয়ে আসতে পারে।' বলল জর্জ আব্রাহাম জনসন। চিন্তিতি কন্ঠ তার।

'আপনার অনুমান ঠিক মিঃ জর্জ আব্রাহাম। আমারও এখন তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু এখন তাহলে কি করনীয়? খবরটি তো গোপন রাখা যাবে না।' বলল আহমদ মুসা।

'না, যাবে না। আমরা সরকারী ভাবে কিছু না জানালেও হাসপাতাল সহ বিভিন্ন সুত্রে খবরের কাগজগুলো নিউজটি পেয়ে যাবে।' জর্জ আব্রাহাম বলল।

'তাহলে?' বলল আহমদ মুসা।

'আপনাকে দ্রুত কিছু কাজ সারতে হবে আহমদ মুসা।' জর্জ আব্রাহাম বলল।

'কি কাজ?'

'বেঞ্জামিন বেকনসহ 'ফ্রি আমেরিকা'র শীর্ষ নেতাদের সাথে আপনি অবিলম্বে বসুন। তাদের মাধ্যমে আঞ্চলিক নেতাদের কাছে আপনি একটা মেসেজ পাঠান। তাদের কাছে আপনি আবেদন করে বলুন, সারা জেফারসনকে মুক্ত করার সার্বিক ব্যাবস্থা গ্রহন করা হচ্ছে। আপনারা শান্ত থেকে এই কাজে সহযোগিতা করুন। বিশেষ করে কেউ যেন ইহুদীদের উপর কোন প্রতিশোধ নিতে না যায়।'

থামল জর্জ আব্রাহাম জনসন।

আহমদ মুসা বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না আমি এ আবেদন করব কেন? তারা আমার এ আবেদন শুনবে কেন?'

জর্জ আব্রাহাম একটু নড়ে চড়ে বসল। একটা বিব্রতভাব দেখা গেল তার চোখে-মুখে। পরক্ষনেই তার চোখে-মুখে নেমে এল দায়িত্বের গাম্ভীর্য। বলল, 'আপনি জানেন না মিঃ আহমদ মুসা, 'ফ্রি আমেরিকা' আন্দোলনের নেতা কর্মী সকলেই জানে তাদের প্রাণ প্রিয় নেত্রী সারা জেফারসন আপনাকে ভালবাসে। আপনি জেনারেল শ্যারনদের হাতে বন্দী হলে সারা জেফারসনের অবস্থা সবাই দেখেছে। 'ফ্রি আমেরিকা' আন্দোলনের নেতা কর্মীরা সারা জেফারসনের মত আপনাকেও ভালবাসতে শুরু করেছে। আপনার এই মুহূর্তের যে কোন আবেদনকে তারা তাদের নেত্রীর নির্দেশ বলেই মনে করবে।' থামল জর্জ আব্রাহাম জনসন।

আহমদ মুসার চোখে-মুখে বিব্রত ভাব। তার মুখে লজ্জার একটা লাল আভাও ফুটে উঠেছে। বলল আহমদ মুসা, 'আমি দুঃখিত মিঃ জর্জ আব্রাহাম। সবাই যেভাবে ভাবছে, ব্যাপারটা তেমন নয় মোটেই। তবে, আপনি যে আবেদন জানানোর কথা বলছেন, সে আবেদন আমি অবশ্যই জানাব।

কিছু বলতে যাচ্ছিল জর্জ আব্রাহাম জনসন। তার টেলিফোন বেজে উঠল। মোবাইলটা হাতে তুলে নিল জর্জ আব্রাহাম জনসন। ওপারের হ্যালো শুনেই জর্জ আব্রাহাম জনসন সোজা হয়ে বসল। বলল, 'গুড মর্নিং মিঃ প্রেসিডেন্ট।'

'গুড মর্নিং জর্জ। আমি সারা জেফারসনের কিডন্যাপরে খবরে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি। খবরটা আমার কাছে পৌঁছার পর তোমাকে টেলিফোন করছি। কি ভাবছ তোমরা এখন?' বলল ওপার থেকে প্রেসিডেন্ট।

'আমি আহমদ মুসাকে নিয়ে বসেছি। কোন ভাবেই চেষ্টার কোন ত্রুটি হবে না মিঃ প্রেসিডেন্ট। এটা এখন আমাদের নাম্বার ওয়ান অগ্রাধিকার।' জর্জ আব্রাহাম বলল।

'দেখুন জেফারসন পরিবারের মেয়ে মানে আমারও মেয়ে। সে উদ্ধার না পাওয়া পর্যন্ত স্বস্তি পাব না।' বলল প্রেসিডেন্ট।

'আমরা অনুভব করছি মিঃ প্রেসিডেন্ট। সর্বশক্তি ও সকল উপায় প্রয়োগ করে আমরা চেষ্টা করব।' জর্জ আব্রাহাম বলল।

'আর শ্যারন-জোনসদের কেসের অগ্রগতি কি? ওদের অপরাধ তো আরও একটা বাড়ল।'

'আশা করছি দুএকদিনের মধ্যেই কোর্টে কেস উঠবে মিঃ প্রেসিডেন্ট। আসামীদের অনুপস্থিত রেখেই বিচার কাজ শুরু হবে।'

'ধন্যবাদ মিঃ জর্জ। টেলিফোনটা আহমদ মুসাকে দিন।'

আহমদ মুসা টেলিফোন নিয়ে বলল, 'গুড মর্নিং মিঃ প্রেসিডেন্ট।'

'গুড মর্নিং আহমদ মুসা। ওয়েলকাম।'

'ধন্যবাদ মিঃ প্রেসিডেন্ট।'

'মিঃ আহমদ মুসা, আপনার মুক্তির জন্যে যে সবচেয়ে উৎগ্রীব ছিল, তার কিন্তু আপনার মুক্তি দেখা হলো না। তার আগে সে নিজেই কিডন্যাপ হলো।'

'খুবই দুঃখজনক, উদ্বেগজনক ঘটনা মিঃ প্রেসিডেন্ট।' বলল আহমদ মুসা।

'তার উদ্ধারের ব্যাপারে আমরা আপনার উপর অনেকখানি নির্ভর করছি আহমদ মুসা।'

'এটা আমার দায়িত্বও মিঃ প্রেসিডেন্ট।'

'আমি জানি মিঃ আহমদ মুসা। ধন্যবাদ আপনাকে।'

'ধন্যবাদ মিঃ প্রেসিডেন্ট।'

টেলিফোন অফ করে জর্জ আব্রাহামের হাতে দিতে দিতে আহমদ মুসা বলল, 'প্রেসিডেন্ট সারাকে নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন। কি করা যায় বলুন তো?'

'আমি সেটাই ভাবছি। ইহুদী গ্রুপটির সাথে ভারতীয় আমেরিকানরা যুক্ত হওয়ায় বিষয়টি আরও জটিল হয়েছে।' বলল জর্জ আব্রাহাম।

জর্জ আব্রাহাম থামলেও আহমদ মুসা কথা বলল না। ভাবছিল সে। অনেক্ষন পর সে বলল, 'এগুবার এখন একটাই পথ আমি দেখতে পাচ্ছি।'

'সেটা কি?' উদগ্রীব কন্ঠে বলল জর্জ আব্রাহাম।

'আমি আমার নিজেকে ওদের হাতের নাগালের মধ্যে নিয়ে যাওয়া।'

'তাতে কি হবে?'

'তাতে আমি ওদের ধরার সুযোগ পাব, কিংবা আমি ওদের হাতে ধরা পড়ব।'

'এর অর্থ?'

'আমি ওদের ধরতে পারলে সারাকে মুক্ত করতে পারবো। আর যদি ধরা পড়ি, তাহলে্রে সারা মুক্তি পাবে।'

'ওদের ধরতে পারলে সারাকে মুক্ত করার সুযোগ পাবেন, এটা বুঝলাম। কিন্তু আপনি ওদের হাতে ধরা পড়লে সারা কিভাবে মুক্তি পাবে?'

আহমদ মুসা ম্লান হাসল। বলল, 'জেনারেল শ্যারনকে আমি জানি। আমি নিশ্চিত যে, আমাকে ফাঁদে ফেলার টোপ হিসেবে ওরা সারা জেফারসনকে বন্দী করেছে। ওদরে বিশ্বস সারাকে উদ্ধার করার জন্যে অবশ্যই আমি যাব এবং সেই সুযোগ তারা গ্রহন করবে। সারা একজন জনপ্রিয় আমেরিকান। সারার উপর কিছু ক্রোধ থাকলেও তারা সারার কোন ক্ষতি করতে চাইবে না জনমতের ভয়ে। আমাকে ধরার সংগে সংগেই তারা সারাকে মুক্তি দেবে।'

'বুঝলাম আহমদ মুসা। আমি আপনার যুক্তির সাথে একমতও। কিন্তু আমরা তো এটা চাই না। আমরা চাই সারাকে মুক্ত করতে, ওদের হাতে সারার সাথে আপনাকে বিনিময় করতে নয়।'

'আমিও চাই না। কিন্তু আমি এছাড়া কোন উপায় দেখছি না। সারা ওদের হাতে একদিনও থাকুক তা আমাদের কারও কাম্য নয়।'

'তা নয়, ঠিক। কিন্তু আহমদ মুসার মূল্যে আমরা সারা জেফারসনকে উদ্ধার করব, এটা আমি মেনে নিচ্ছি না।' বলল জর্জ আব্রাহাম দৃঢ় কন্ঠে।

'কিন্তু আমার সামনে এটাই এখন একমাত্র পথ। এই পথেই আমাকে অগ্রসর হতে হবে। আমার কারনেই সারা জেফারসন আজ চরস বিপদগ্রস্থ। তাকে উদ্ধার করার নৈতিক দায়িত্ব আমার উপরই সবচেয়ে বেশী বর্তায়।' থামল আহমদ মুসা।

জর্জ আব্রাহাম উঠল। উঠে গিয়ে আহমদ মুসার পেছনে দাঁড়াল। একটা হাত রাখল আহমদ মুসার কাঁধে। বলল, 'তাহলে আমরাও বলতে পারি আহমদ মুসা, আমরেকিার কারনে, আমেরিকার জন্যেই আজ আপনি একটি ইহুদী গ্রুপের চরম শত্রুতে পরিনত হয়েছেন। সুতরাং ওদের হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করা আমাদেরও প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব।'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'আমি আমেরিকার কাছে কৃতজ্ঞ। আমি বন্দী হবার পর আমাকে মুক্ত করার কোন চেষ্টাই সে বাদ রাখেনি। আবারও যদি বিপদে পড়ি আবারও তা করবে। কিন্তু আমি বিপদে পড়ব এই যুক্তি তুলে আমেরিকা সারাকে উদ্দার করার আমার চেষ্টায় বাধা দেবে, তা হয় না, হওয়া উচিত নয়।

জর্জ আব্রাহামের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, আপনি সিদ্ধান্ত নিলে সেখান থেকে আপনাকে ফেরানো যাবে না সেটা আমি জানি। পরার্থে এমন করে নিজেকে বিলিয়ে দেয়াই বোদহয় আপনার বৈশিষ্ট্য। মনে পড়ছে অনেকদিন আগের কথা আহমদ মুসা। আমার বালক নাতিকে রক্ষার জন্য সেদিন ওহাইও নদীর বিপজ্জনক ঘূর্ণি স্রোতে আপনাকে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখেছিলাম। সেই আপনি আজ আরও মহৎ হয়েছেন। আমি আপনাকে অভিবাদন করি আহমদ মুসা।' আবেগ কম্পিত ভারী কন্ঠে বলল জর্জ আব্রাহাম জনসন।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

মুখোমুখি হলো জর্জ আব্রাহাম জনসনের। বলল, 'আপনার স্নেহের দৃষ্টির জন্যে আমি কৃতজ্ঞ মিঃ জর্জ আব্রাহাম জনসন।'

জর্জ আব্রাহাম জনসন দুহাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে। বলল, 'আমি প্রেসিডেন্টকে সব বলে দেব। তিনি খুশী হবেন। অমানুষের ভীড়ে মানুষের সাক্ষাৎ আজ দুর্লভ হয়ে উঠেছে।'

# ৭

মার্কিন ফেডারেল কোর্ট।

'রাষ্ট্র বনাম শ্যারন-জোনস এন্ড আদারস' কেসের চার্জশীটের শুনানী চলছে।

আসামীদের ডায়াস খালি। জেনারেল শ্যারন ও ডেভিড উইলিয়ামের অনুপস্থিতিতেই তাদের বিচার শুরু হলো।

আসামীদের বিরুদ্ধে ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে ভিন্ন ভিন্ন মামলার ভিন্ন ভিন্ন চার্জশীট সরকারী প্রসিকিউটরের ফাইলে।

প্রথমে চলছে 'জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন হত্যা মামলা'র চার্জশীট পাঠ।

দীর্ঘ চার্জশীট পাঠ শেষ করে সরকারী প্রসিকিউটর তার এই উপসংহার পাঠ করল, ' এটা নিছক একটা হত্যা মামলা নয়। এর সাথে জড়িত হয়েছে জাতি ও রাষ্ট্রের সুদূর প্রসারী স্বার্থের কথা এবং জাতি ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর ষড়যন্ত্রের বিষয়। আমেরিকার একজন শ্রেষ্ঠ সন্তান জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টনকে প্রাণ দিতে হয়েছে অবশেষে তিনি আমেরিকার বুকে ছুরি মারতে রাজি হননি বলে। জেনারেল শ্যারনের নিজ উক্তিই প্রমান করে তারা আমেরিকার বুকে ছুরি মারছেন। এই ভয়ানক 'সত্য'টিই জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন জানতে পেরেছিলেন। তাঁর মাধ্যমে যাতে ষড়যন্ত্রের এই সত্যটি বাইরে না যায়, তাই চিরতরে তার মুখ বন্ধ করার জন্যেই তাকে হত্যা করা হয়েছে। ষড়যন্ত্রের সব সত্য বিবরণ জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন প্রকাশ করে দেংয়ার সুযোগ পাননি বটে, কিন্তু মৃত্যু-মুহূর্তে তার শেষ কথায় তিনি সেই ষড়যন্ত্রের হাত থেকে আমেরিকাকে রক্ষার জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন এবং সর্বশেষ দুটি কাক্যে ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কিছু ইংগিতও দিয়ে গেছেন। সর্বশেষ দুটি বাক্যে তিনি বলেছেন আমেরিকার জন্যে যে নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন তিনি দেখতেন, সে নতুন

পৃথিবী যেন হয় ফাউন্ডার ফাদার্সদের, ষড়যন্ত্রের নয়। এর অর্থ আমেরিকার জন্যে ষড়যন্ত্রের এক নতুন পৃথিবী অর্থাৎ নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার-এর পরিকল্পনাও আছে, যার সাথে জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন যুক্ত ছিলেন এবং শেষ মুহূর্তে যখন তিনি টের পেলেন এটা ষড়যন্ত্র,তখনই তাকে জীবন দিতে হলো। তাহলে আমেরিকার জন্যে ষড়যন্ত্রের নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার পরিকল্পনার প্রণেতা মিঃ শ্যারন ও মিঃ জোনসরা। এই কথাই 'ফ্রি আমেরিকা' মুভমেন্টও বলে থাকে। তাদের অভিযোগ হলো, জেনারেল শ্যারন ও ডেভিড উইলিয়াম জোনসদের মত অশুভ নেতৃত্বের অধীন শক্তিশালী ও সক্রিয় একটা ইহুদী গ্রুপ তাদের বিত্ত ও প্রচারের জোরে আমেরিকার ঘাড়ে ষড়যন্ত্রমূলক নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার চাপিয়ে দিয়েছে। যা জাতি-রাষ্ট্র, জাতি-সংস্কৃতি ও জাতি-অর্থনীতির বিলোপ সাধন করে এক কেন্দ্রিক এক বিশ্বায়নের দিকে পৃথিবীকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। এই চেষ্টা পরিণামে আমেরিকাকে সবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। 'ফ্রি আমেরিকা' মুভমেন্ট বলে এবং জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টনও তার অন্তিম বার্তা হিসেবে বলেছেন, আমেরিকাকে এই লক্ষ্যের দিকে পরিচালনা করা আমেরিকার ফাউন্ডার্স ফাদার্সদের চিন্তার একেবারেই পরিপন্থী। 'ফ্রি আমেরিকা' মুভমেন্ট তাই এক ফ্রি আমেরিকা'র দাবী করছে, যে আমেরিকা ফাউন্ডার্স ফাদার্সদের ইচ্ছা অনুসারে হবে বিশ্বে শান্তির পুরাধা, জাতিসমূহের পারিস্পরিক সমতাভিত্তিক সহাবস্থানের সহযোগী এবং দেশ-কাল-পাত্র-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আমেরিকান জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি এখানে উত্থাপিত হত্যা-মামলার হত্যা-মোটিভের সাথে অংগাংগিভাবে জড়িত। সুতরাং হত্যার সাথে এটাও পৃথক ভাবে বিচার্য বিষয় হওয়া উচিত। জেনারেল হ্যামিল্টনের আত্মদানের দাবীও এটা। ফাউন্ডার্স ফাদার্সদের চাওয়া 'ফ্রি আমেরিকা' গঠন ও জেঁকে বসা অক্টোপাশের বিদায়ের মাধ্যমেই শুধু জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টনের মহান আত্মত্যাগকে সম্মানিত করা যেতে পারে।'

জেনারেল আলেকজান্ডার হ্যামিল্টনের হত্যা-মামলার চার্জশীট উত্থাপন শেষে এর উপসংহার পাঠ করার পর সরকারী প্রসিকিউটর 'লস আলামোসের গোয়েন্দা সুড়ঙ্গ মামলা'র চার্জশীট পেশ করা শুরু করল।

'আরও চারটি মামলার চার্জশীট রয়েছে সরকারী প্রসিকিউটরের ফাইলে। তার প্রথমটি হলো, 'আইজ্যাক বেনগুরিয়ান ও সাবাহ বেনগুরিয়ান কিডন্যাপ মামলা', দ্বিতীয়টি হলো, 'হ্যারি ময়নিহান কিডন্যাপ মামলা।' অন্যটি 'আহমদ মুসা কিডন্যাপ মামলা।' সর্বশেষে রয়েছে, 'সারা জেফারসন কিডন্যাপ মামলা'র উপস্থাপনা।

সরকারী প্রসিকিউটরের সহকারী ফিস ফিস করে মামলার এই তথ্যগুলো দিল একজন সাংবাদিককে তার একটা প্রশ্নের জবাবে।

সরকারী প্রধান প্রসিকিউটর তখন পড়ে চলছিল 'লস আলামোস গোয়েন্দা সুড়ঙ্গ মামলা'র দীর্ঘ চাঞ্চল্যকর চার্জশীট।

এফ বি আই হেড কোয়ার্টার।

এফ বি আই প্রধানের খাস ড্রইং রুমে দুটি মুখোমুখি সোফায় বসেছিল আহমদ মুসা ও জর্জ আব্রাহাম জনসন। আব্রাহাম জনসনের কোলে তার নাতি জর্জ জনসন জুনিয়র।

'উনি কে বলত দাদু?' আহমদ মুসাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল জর্জ আব্রাহাম জনসন তার নাতিকে।

'আংকেল।' বলল জর্জ জুনিয়র।

'ওকে তুমি জান?'

'হ্যাঁ'

'কি জান?'

'আমি ওহাইও নদীতে ডুবে গিয়েছিলাম। উনি ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে বাঁচিয়ে ছিলেন।' বলল জর্জ জনসন জুনিয়র।

'তুমি সংজ্ঞাহীন ছিলে। জান না। কার কাছে শুনেছ তুমি এ কথা?'

'কেন, আম্মু বলেন, আব্বু বলেন।'

'তুমি কেমন করে জান যে ইনি সেই লোক?'

'বারে, আমাদের বাড়িতে আংকেলের ফটো টাঙানো আছে না?'

'ফটো টাঙানো আছে? কোথায় পেয়েছ?'

'কেন, আব্বা এনেছেন।'

'তোমার আংকেলকে ধন্যবাদ দাও জনসন।'

'সিওর।'

বলে দাদুর কোলে থেকেই মুখ ঘুরিয়ে আহমদ মুসার দিকে চেয়ে বলল, 'ধন্যবাদ আংকেল।'

আহমদ মুসা 'ওয়েল কাম সুইট বয়' বলে কিছু বলতে যাচ্ছিল।

এসময় জর্জ আব্রাহাম জনসনের টেলিফোন বেজে উঠল।

'এক্সকিউজ মি' বলে টেলিফোন ধরল জর্জ আব্রাহাম জনসন।

টেলিফোনে কথা বলেই জর্জ আব্রাহাম জনসন টেলিফোনটা আহমদ মুসার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'মিস সাগরিকা সেনের টেলিফোন।'

আহমদ মুসা টেলিফোন ধরেই বলল 'গুড মর্নিং সাগরিকা। কেমন আছ?'

'আসসালামু আলাইকুম দাদা, না মানে ভাইয়া ভাল আছি।'

'খুশী হয়েছি সাগরিকা, তুমি টেলিফোন করেছ।'

'খুশী হয়েছি তোমকে পেয়ে ভাইয়া। ভাইতেই পারিনি, মিঃ জর্জ আব্রাহামকে টেলিফোন করে তোমাকে পেয়ে যাব। ভেবেছিলাম ওনার কাছ থেকে তোমার টেলিফোন নাম্বার জোগাড় করব।'

'আল্লাহ আমাদের সাহায্য করেছেন। একন বল সালাম কোত্থেকে শিখলে?'

'কেন, ইসলামের উপর দখল বুঝি আপনার একার? আমার থাকতে পারে না?'

'অবশ্যই পারে। আমি সেটাই জানতে চাচ্ছি।'

'যাক ভাইয়া। আমি যে জন্যে আপনাকে টেলিফোন করেছি। নোয়ান নাবিলা আমাকে টেলিফোন করেছিল। বলল, 'তোমার বন্ধু আহমদ মুসাকে শীঘ্রই আমাদের হাতের মুঠোয় আসতে হবে। সে ব্যবস্থা হয়ে গেছে।' আমি বললাম কি ব্যবস্থা হয়ে গেছে? সে প্রশ্নের জবাব দিল না। বলল, 'জান জেফারসন পরিবারের

মিস সারা জেফারসনও আহমদ মুসাকে ভালবাসে?' আমি বললাম, 'দাদাকে সবাই ভালবাসতে পারে, তুমিও ভালবাসতে পার।' তার সাথে আরও অনেক কথা হয়েছে ভাইয়া। কিন্তু ভাইয়া বলুন, কি ঘটনা? নাবিলা কেমন করে বলে যে আপনি তাদের হাতের মুঠোয় যাচ্ছেন?'

থামল সাগরিকা।

ভ্রু কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে আহমদ মুসার। চোখে-মুখে তার ভাবনার প্রকাশ। বলল, 'ও কিছুনা সাগরিকা, তাদের অনুমান। জেনারেল শ্যারনের লোকরা সারা জেফারসনকে কিডন্যাপ করেছে। তাই তারা মনে করতে পারেসারা জেফারসনকে উদ্ধার করতে গিয়ে ওদের হাতে গিয়ে পড়ব। কিন্তু বলতো সাগরিকা, নোয়ান নাবিলা সারা জেফারসনের কথা জানল কি করে? আর এ প্রসঙ্গ হঠাৎ তোমার কাছে তুলল কেন?'

থামল আহমদ মুসা।

'এ সংক্রান্ত কোন প্রশ্নের সে জবাব দেয়নি ভাইয়া' বলল সাগরিকা সেন।

'সে জবাব না দিলেও বুঝেছি সাগরিকা। সারা জেফারসনকে কিডন্যাপ করা, আমার সম্পর্কে জেনারেল শ্যারনদের পরিকল্পনা সবই সে জানে।

বলতে বলতে আহমদ মুসার মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠল। শ্যারনদের কাছে পৌছার অবলম্বন পেয়ে গেছে সে।

'হতে পারে ভাইয়া। আমি তো তার বন্ধু। জানি আমি যে সে রহস্যজনক মেয়ে।' সাগরিকা সেন বলল।

'রহস্যজনক বলছ কেন?'

'মাঝে মাঝে কোথাও উধাও হয়ে যায়। জিজ্ঞেস করলে বলে না।'

'ধন্যবাদ সাগরিকা। আমি তোমাদের ওদিকে আসব।'

'আসবেন? কবে? কখন? খুব খুশী হবো আমি।'

'হঠাৎ করেই একদিন হাজির হবো।'

'কিন্তু ভাইয়া, আমার ছুটি যে শেষ হয়ে যাচ্ছে। এখন তো ওয়াশিংটনেই বেশী থাকব।'

'কিন্তু আনাপোলিশে আমাকে যেতে হবে।'

'বুঝেছি। কিন্তু আমি না থাকলে নাবিলাকে নাও পেতে পারেন।'
'তাহলে?'
'আমি যাব ভাইয়া।'

পরবর্তী বই

# অক্টোপাশের বিদায়

কৃতজ্ঞতায়ঃ Bondi Beduyin

# সাইমুম-৩২

# অক্টোপাশের বিদায়

## আবুল আসাদ

# ১

আহমদ মুসার রক্ষা নেই। তাকে ফাঁদে পড়তেই হবে।’ বলল জেনারেল শ্যারন।

‘কিছুক্ষণ আগে শশাংকের সাথে কথা হলো। সে বলল, ‘আজ সন্ধ্যার দিকে নাকি আহমদ মুসা আনাপোলিশে যাচ্ছে। অথচ তার যাওয়ার কথা ছিল না। শশাংক ও সাগরিকাই ওয়াশিংটনে যাবে শুনেছিলাম।’ বলল নোয়ান নাবিলা।

‘ধন্যবাদ নাবিলা। এখন দেখবে আহমদ মুসার পরবর্তী কাজ হবে তোমাকে ফলো করা। সে নিশ্চিত মনে করেছে তুমি আমাদের সাথে জড়িত এবং তুমি সারা জেফারসন সম্পর্কে সবকিছু জান।’ বলল জেনারেল শ্যারন।

‘এটাইতো চাই। আমাকে ফলো করবে আর আমি তাকে ফাঁদের মধ্যে নিয়ে যাব।’ নোয়ান নাবিলা বলল।

‘আর আমরা তাকে টুক করে খাঁচায় পুরব।’ বলে হেসে উঠল জেনারেল শ্যারন।

‘আমি সবচেয়ে বেশি খুশি, সাগরিকাকে তার হাত থেকে রক্ষা করার এটা একটা পথ হবে।’ নাবিলা বলল।

‘শুধু তো সাগরিকা সেন নয়, আমাদের তথ্য মতে শশাংক সেনও আহমদ মুসার দারুণ ভক্ত হয়ে উঠেছে।’ বলল জেনারেল শ্যারন।

‘সেটা আহমদ মুসা সাগরিকার বন্ধু হওয়ার কারণে। সাগরিকাকে সরাতে পারলে শশাংক এমনি সরে যাবে।’ নাবিলা বলল।

‘মি. শ্যারন, আহমদ মুসাকে আটকাবার আরও সুযোগ পাচ্ছি, এটা আশার কথা। কিন্তু আমি মামলা নিয়ে সত্যিই উদ্বিগ্ন। মামলার চার্জশিটগুলো আমি পড়েছি। আমাদের জন্য আইনি লড়াই চালাবার কোন সুযোগই নেই।’ বলল আমেরিকান কাউন্সিলর জুইস এ্যাসোসিয়েশনস এর প্রধান ডেভিড উইলিয়াম জোনস। তার কন্ঠে উদ্বেগ।

‘এ জন্যেই আইনের চোখকে অন্যদিকে ঘুরাতে হবে।’ বলল জেনারেল শ্যারন।

‘কিভাবে?’ জিজ্ঞেস করল ডেভিড উইলিয়াম জোনস।

‘কেন আপনিও তো জানেন, বিজয়ের আনন্দে আহমদ মুসা এমন কিছু করে বসবে যা তাকে আমেরিকানদের কাছে ঘৃণার পাত্রে পরিণত করবে।’ বলল জেনারেল শ্যারন।

‘সেটা কি? কি রকম? দারুণ উৎসুক কন্ঠে জানতে চাইল নোয়ান নাবিলা।

জেনারেল শ্যারন ও ডেভিড জোনস দু’জনেই তাকাল নোয়ান নাবিলার দিকে। কিছুটা বিব্রত ভাব দু’জনের চোখে-মুখেই। জবাব দিল জেনারেল শ্যারন। বলল মুখে হাসি টেনে, ‘ও কিছুনা । আহমদ মুসা আমেরিকার ইহুদীদের বিরুদ্ধে আরেকটা ষড়যন্ত্র করছে।’

‘কি ষড়যন্ত্র?’ নোয়ান নাবিলা বলল।

‘সবই জানতে পারবে। এইটুকু জেনে রাখ, বিজয়ের আনন্দে অন্ধ হয়ে সে হিটলার সাজতে চাচ্ছে।’

দরজায় এ সময় নক হলো।

সেদিকে না তাকিয়েই জেনারেল শ্যারন বলল, ‘এস বেন ইয়ামিন।’

দরজা ঠেলে ঘরে প্রবেশ করল বেন ইয়ামিন।

নিরেট ইহুদী চেহারা বেন ইয়ামিনের। স্পাই হিসেবে, যে কোন ষড়যন্ত্রের সফল অপারেটর হিসেবে জেনারেল শ্যারনের অস্ত্রশালায় সে অদ্বিতীয়।

সে ঘরে ঢুকতেই জেনারেল শ্যারন বলল, ‘কি খবর বেন?’

‘সব ঠিক-ঠাক।’

‘মিশন কয়টায় যাচ্ছে?’

‘সন্ধ্যা ছ’টায়।’

‘কি বুঝলে কোন রেসিষ্ট্যান্স হবে? কিংবা কোন অসুবিধা?’

‘তেমন সম্ভাবনা নেই। তবে সমস্যা হলো, দু’জন সাংবাদিক সেখানে থাকে। তবে যে সময় আমাদের অপারেশন, সে সময় তারা অফিসে থাকবে।’

‘গুড।’ উচ্ছ্বসিত কন্ঠে বলে উঠল জেনারেল শ্যারন।

একটু থেমেই সে আবার বলল, ‘ওখানে সাংবাদিকের বাসা থাকায় সুবিধাই হলো। মিডিয়াগুলো ইস্যুটাকে সাংঘাতিকভাবে হাতে তুলে নেবে।’

‘আরেকটা সুবিধা আছে স্যার। আমেরিকার পূর্ব উপকূলে এটাই ইহুদীদের প্রথম বসতি। মার্কিন ইহুদীদের পিতা বলে কথিত দি গ্রেট ডেভিড দানিয়েল এই বসতিতেই জন্মগ্রহন করেন। তার জন্মস্থানটা এখন সিনাগগে পরিণত হয়েছে। সিনাগগের পাশেই তার ভূমিষ্ট হওয়ার ঘরটি এখনও বর্তমান। ওটা মার্কিন ইহুদীদের একটা পবিত্র স্থান। ওখানে কেউ হাত দিলে মার্কিন ইহুদীদের কলিজায় হাত দেয়া হবে।’

‘ব্রাভো, ব্রাভো। ওটায় শুধু হাত দেয়া নয়, নিশ্চয় ওটা আগুনের গ্রাসে যাবে।’ বলতে বলতে জেনারেল শ্যারনের মুখে একটা ক্রুর হাসি ফুটে উঠল।

নোয়ান নাবিলা জেনারেল শ্যারনের সামনে মুখোমুখি এক শোফায় বসেছিল। তার ভ্রুদুটি কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে। অনাহুতভাবে এ রকম আলোচনায় অংশগ্রহন অসংগত বলে নোয়ান নাবিলা কিছু বলল না। কিন্তু মনটি তার খুব উৎসুক হয়ে উঠল।

কথা শেষ করে একটু দম নিয়েছিল জেনারেল শ্যারন। তারপর একটু নড়ে-চড়ে বসে পকেট থেকে একটা অদ্ভুত লাল মোড়ক বের করে বেন ইয়ামিনের দিকে তুলে ধরে বলল, ‘এটা তোমার মিশনের কমান্ডারকে দিয়ে দিও।

পরিকল্পনার সাথে এটাও যুক্ত হবে। অপারেশন শেষে ফেরার সময় সে যেন এটা ওখানে ফেলে রেখে আসে।'

বেন ইয়ামিন ওটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বলল, 'ভয়ংকর বিস্ফোরক। তৈরী হয়েছে লিবিয়ার ত্রিপোলীতে। অতএব............।'

কথা শেষ না করেই হো হো করে হেসে উঠল বেন ইয়ামিন।

'অতএব বেরিয়ে পড়বে আহমদ মুসার কানেশন। শুধু এটাই নয় আরও কিছু জিনিস এটা প্রমাণ করবে।' বেন ইয়ামিনের সাথে হাসিতে যোগ দিয়ে বলল জেনারেল শ্যারন।

বেন ইয়ামিন বেরিয়ে গেল।

নোয়ান নাবিলাও বেরুতে চাচ্ছিল। জেনারেল শ্যারন তাকে লক্ষ করে বলল, 'নাবিলা আনাপোলিশে তুমি কখন ফিরছ?'

'বিকেলে একটা প্রোগ্রাম আছে। সন্ধ্যায় যাব আমি।' বলল নাবিলা।

'তুমি তো বললে আহমদ মুসাও সন্ধ্যায় আনাপোলিশে পৌছবে। রোড না ইয়ারে যাচ্ছে জানতে পেরেছো কিছু?'

'না জানতে পারিনি। সাগরিকা জানে কি না জানি না।'

'খুব ভালো হতো যদি আহমদ মুসা সাড়ে আটটা নয়টা পর্যন্ত রাস্তায় থাকতো।' বলল জেনারেল শ্যারন।

'কেন?'

'আমাদের পরিকল্পনাকে পাকা-পোক্ত করার জন্য এটা প্রয়োজন।'

একটু থেমেই আবার বলে উঠল জেনারেল শ্যারন, 'সন্ধ্যা ক'টায় আহমদ মুসা আনাপোলিশে পৌছবে সেটা আমাদের জানা প্রয়োজন।'

'আমি জানাতে পারি, আপনারাও টেলিফোন করতে পারেন।'

'ধন্যবাদ নাবিলা, তোমার টেলিফোন না পেলে ন'টার দিকে আমি টেলিফোন করব।'

'আমাকে কোন কারণে না পেলে শশাংককে জিজ্ঞেস করলেও জানতে পারবেন।' বলল নোয়ান নাবিলা। বলে নোয়ান নাবিলা উঠে দাড়াল।

সন্ধ্যা তখন সাড়ে সাতটা।

নোয়ান নাবিলার গাড়ি তীর বেগে এগিয়ে চলছিল আনাপোলিশের দিকে।

এক্সপ্রেস হাইওয়ে থেকে কাউন্টি রোডে পড়ার পর গাড়ির গতি কমে গিয়েছিল। তার উপর সেভেরা নদীর খাড়ি অতিক্রম করার সময় ব্রীজের উপর গাড়ির গতি আরও কমে যায়। এই আয়েশি গতিতেই নোয়ান নাবিলার গাড়ি নিউ হারমানে প্রবেশ করল।

প্রবেশ করেই বন্দুকের বিক্ষিপ্ত গুলীর শব্দে চমকে উঠল নোয়ান নাবিলা। আরও কিছুটা অগ্রসর হলো তার গাড়ি। রাস্তার দু'পাশ থেকেই মানুষের আর্ত চিৎকার কানে এল তার।

উৎকর্ণ হলো নোয়ান নাবিলা।

আপনাতেই যেন থেমে গেল তার গাড়ি।

ঠিক এ সময় কয়েকটা গাড়ি দু'পাশের বসতি থেকে মাতালের গতিতে বেরিয়ে উত্তরের এক্সপ্রেস হাইওয়ের দিকে ছুটে গেল। সবগুলো গাড়ির আলো নেভানো। শুধু তার কাছের একটা বাইলেন দিয়ে ছুটে যাওয়া একটা গাড়ির পেছনের নেমপ্লেটে আলো দেখতে পেল। নাম্বারটাও পড়তে পারল সে।

প্রবল সন্দেহ নিয়ে গাড়ি থেকে নামল নোয়ান নাবিলা।

নিউ হারমান এলাকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা প্রাচীন ইহুদী বসতি। নিউইয়র্ক নগরীর পত্তনের সময়ই আনাপোলিশের প্রতিষ্ঠা হয়। আনাপোলিশের পরেই মেরিল্যান্ডে যে প্রথম জনবসতি গড়ে ওঠে, সেটা নিউ হারমান। এখানে প্রথম বসতি গড়ে কিছু জার্মান ক্যাথলিক। পরে জার্মান ক্যাথলিকরা নিউ হারমান বিক্রি করে দিয়ে আরও উত্তরে উৎকৃষ্টতর জায়গায় সরে যায়। ইহুদীরা ক্যাথলিকের ছদ্ম পরিচয়ে নিউ হারমান কিনেছিল। অনেক পরে তাদের পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ে। এখন নিউ হারমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা বনেদী ইহুদী বসতি।

নিউ হারমান বসতিটা খুবই সুন্দর লোকেশনে। নিউ হারমান থেকে আধা কিলোমিটার পুবে আনাপোলিশের গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহ্যবাহী নৌ-ঘাঁটি। আর পৌনে এক কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে মেরিল্যান্ডের ঐতিহাসিক ষ্টেট হাউজ। নিউ হারমান থেকে আনাপোলিশের দূরত্ব এক কিলোমিটারের কম।

নিউ হারমান নোয়ান নাবিলার পরিচিত। তার এক আত্মীয় পরিবার এখানে থাকে। নাবিলা এখানে আসে।

নোয়ান নাবিলা এক পা দু'পা করে কিছুটা এগিয়েছিল। সে দেখল, একজন লোক এদিকে টলতে টলতে এগিয়ে আসছে।

নোয়ান নাবিলা এগুলো তার দিকে।

কিন্তু নাবিলা লোকটার কাছে পৌছার আগেই লোকটা লুটিয়ে পড়ল মাটির উপর।

নোয়ান নাবিলা ছুটে গিয়ে তার পাশে বসল।

লোকটা রক্তাক্ত।

দেখেই বুঝল নোয়ান নাবিলা, লোকটা বুলেট বিদ্ধ হয়েছে।

মারা গেল নাকি লোকটা?

নোয়ান নাবিলা তাড়াতাড়ি লোকটার একটা হাত তুলে নিয়ে নাড়ি দেখল। নাড়ি নেই। মারা গেছে লোকটা।

উঠে দাড়াচ্ছিল নাবিলা। হঠাৎ তার চোখে পড়ল, লোকটার হাতে একটা ক্যাসেট-ভিডিও ক্যাসেট। ভ্রুকুঞ্চিত হলো নাবিলার।

নাবিলা লোকটার হাত থেকে ক্যাসেটটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

শংকা ও উদ্বেগে মন তখন অস্থির হয়ে উঠেছে নাবিলার। নিউ হারমানে বড় কিছু ঘটেনি তো! গাড়িগুলো ওভাবে আলো নিভিয়ে পালালো কেন?

নাবিলা দ্রুত গাড়িতে উঠে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে আত্মীয়ের বাসার দিকে চলল।

দু'পাশে বাড়ি, মাঝ দিয়ে চলছে নাবিলার গাড়ি। ঘর বাড়িতে আলো জ্বলছে। কিন্তু চারদিকে মৃতের স্তব্ধতা। বাতাস যেন ভারী। কিসের গন্ধ! তাজা রক্তের? লোকটার রক্তের গন্ধ কি তার নাকে লেগে আছে এখনও?

চলছে তার গাড়ি।

দেখল একটা বাড়ির বারান্দার পাশ দিয়ে একটা লাল স্রোত গড়িয়ে মাটিতে এসে পড়ছে।

শিউরে উঠল নাবিলা। চলছে তার গাড়ি।

সামনেই দু'টো বাড়ি।

আনমনা হয়ে পড়া নাবিলা হঠাৎ সামনের একটা দৃশ্যে আঁৎকে উঠে ব্রেক করল গাড়ির। একবারে গাড়ির মুখের কাছে রাস্তার উপর দু'টো রক্তাক্ত লাশ।

সামনে আশে-পাশে তাকাল নাবিলা কম্পিত বুকে। দেখল, দু'পাশের বাড়ির লনে আরও রক্তাক্ত মানুষ পড়ে আছে।

রাজ্যের আতংক এসে ঘিরে ধরল নাবিলাকে। কোন লোকজন নেই কেন? মানুষ এভাবে খুন হয়েছে দেখেও মানুষ আসছে না কেন? কোথাও কারো কোন কথা নেই কেন? সবাই মরে গেছে নাকি?

থর থর করে কেঁপে উঠল নাবিলার গোটা শরীর। গাড়ি ঘুরিয়ে লাশ দু'টিকে পাশ কাটিয়ে সামনে এগুলো নাবিলা। সামনেই তার আত্মীয়ের বাড়ি।

তার ফুফুর বাড়ি এটা।

গাড়ি নিয়ে খোলা গেট দিয়ে প্রবেশ করল।

কারো কোন সাড়া শব্দ নেই বাড়িতে।

লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে দৌড়ে বারান্দায় উঠল।

ভেতরে ঢোকার দরজা খোলা।

ভেতরে ঢুকতে গিয়ে রক্তের স্রোতে ধাক্কা খেল নাবিলা।

রক্তে ভেসে যাচ্ছে ঘরের মেঝে। রক্তে ভাসছে কয়েকটি মানুষ।

ভীত নাবিলার কন্ঠে আপনা থেকেই একটা আর্ত-চিৎকার বেরিয়ে এল, 'আন্টি'।

তার এ চিৎকার উঠার সাথে সাথে ঘরের মেঝেতে লুটোপুটি খাওয়া একটা লাশের মাথা নড়ে উঠল। একটু উপরে উঠল মাথা। ধ্বনিত হলো একটা আর্তনাদ, 'কে, বাঁচাও আমাদের, বাঁচাও।' মেয়েলি কন্ঠ।

নাবিলা চিনতে পারল তার আন্টির কন্ঠ।

নাবিলা পাগলের মত ছুটল তার আন্টির কাছে।

তার আন্টির মাথার কাছে বসে পড়ে কোলে তুলে নিল তার মাথা।

‘ওরা সবাইকে মেরে ফেলেছে। আমি কেন মরলাম না। আমি গুলী বৃষ্টির মুখে পড়ে গেলে ওরা মনে করেছে আমিও মরে গেছি।’ কান্নায় ভেঙে পড়ে বলল নাবিলার আন্টি।

‘ওরা কারা আন্টি? তুমি এখানে কখন এলে? তুমি তো আনাপোলিশে ছিলে?’ বলল নোয়ান নাবিলা।

‘সন্ধ্যায় এসেছি।’

বলে মাথাটা নাবিলার কোলে এলিয়ে দিয়ে বলল, ‘ওরা শয়তান কশাই। যাবার সময় আবার বলে গেল, তোদের কোরবানী দিলাম আমেরিকার ইহুদীদের বাঁচাবার জন্যে।’

কথাগুলো নোয়ান নাবিলার কানে গেল, কিন্তু তার মনোযোগ তখন অন্যদিকে। সে দেখল তার আন্টির কাঁধ, বাহু ও উরুতে গুলী লেগেছে।

বলে উঠল দ্রুত নোয়ান নাবিলা, ‘আন্টি তুমি মারাত্মক আহত। আর কথা বলো না তুমি। এখনি তোমাকে ক্লিনিকে নিতে হবে।’

বলে নাবিলা তার আন্টিকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল।

বহুকষ্টে টলতে টলতে তার আন্টিকে নিয়ে গাড়িতে তুলল।

গাড়ি ষ্টার্ট দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল।

এ সময় চারদিক থেকে সাইরেনের শব্দ এল। পুলিশ আসছে। এবার মনে সাহস পেল নাবিলা।

চলতে লাগল নাবিলার গাড়ি।

কয়েক গজ সামনে এগুতেই পথ রোধ করে দাঁড়াল পুলিশের গাড়ি।

গাড়ি থেকে নামল এক পুলিশ অফিসার।

নাবিলাও নামল গাড়ি থেকে।

পুলিশ কথা বলার আগেই নোয়ান নাবিলা নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, ‘আমি আমার গুলীবিদ্ধ মূমুর্ষ আন্টিকে নিয়ে যাচ্ছি।’

পুলিশ অফিসারটিও আনাপোলিশের। চিনতে পারল নোয়ান নাবিলাকে। বলল, 'কিন্তু আপনি এখানে কোত্থেকে?'

নোয়ান নাবিলা সংক্ষেপে তার সব কথা বলল। শুধু ভুলে গেল ভিডিও ক্যাসেট ও গাড়ির নাম্বারের কথা বলতে। উদ্বেগ-উত্তেজনায় সব কথা সে গুছিয়েও বলতে পারছিল না।

'আপনার ও আপনার আন্টির ষ্টেটমেন্ট আমাদের দরকার হবে। তাকে কোন ক্লিনিকে রাখছেন দয়া করে জানাবেন। আপনাদের দেরী করাবার জন্য দুঃখিত। বাই।'

বলে পুলিশ অফিসারটি তার গাড়িটি নাবিলার গাড়ির সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে আরও সামনে এগুলো।

গাড়ি আবার ষ্টার্ট দিল নোয়ান নাবিলা। ছুটে চলল তার গাড়ি আনাপোলিশ হাসপাতালের উদ্দেশ্যে।

জর্জ আব্রাহাম জনসন পাথরের মত বসে আছে তার চেয়ারে।

তার বিশাল অফিস-টেবিলের উপর তার সামনেই পড়ে আছে সেদিনের খবরের কাগজগুলো। দেখেই বুঝা যাচ্ছে পড়েই কাগজগুলো আলু-থালু করে ভাঁজ করে রাখা হয়েছে।

জর্জ আব্রাহাম জনসনের মুখ পাথরের মত স্থির, নিশ্চল দেহটা চেয়ারে হেলান দেয়া। চোখে-মুখে একটা বিহবল ভাব।

ইন্টারকম কথা বলে উঠল, 'স্যার পুলিশ প্রধান বিল বেকার এসেছেন।' কন্ঠ জর্জ আব্রাহামের পিএ'র।

'নিয়ে এস।' বলে জর্জ আব্রাহাম জনসন সোজা হয়ে বসল।

একটু পরেই দরজায় নক হলো।

জর্জ আব্রাহাম উঠে দাঁড়িয়েছিল আগেই। কয়েক ধাপ এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে স্বাগত জানাল পুলিশ প্রধান বিল বেকারকে।

বিল বেকারকে বসতে বলে জর্জ আব্রাহাম তার চেয়ারে ফিরে এল।

'থ্যাংক ইউ ফর কলিং। আমি আপনাকে টেলিফোন করতে যাচ্ছিলাম, সে সময় আপনার টেলিফোন পেয়েছি।' বসেই বলল পুলিশ প্রধান বিল বেকার।

'থ্যাংকস মি. বেকার। আজকের কাগজের নিউজগুলো পড়েছেন?' জিজ্ঞেস করল আব্রাহাম জনসন।

'পড়েছি। ঐ বিষয়েই তো আপনাকে টেলিফোন করতে যাচ্ছিলাম।' বিল বেকার বলল।

কথা শেষ করে একটু থেমেই আবার বলে উঠল, 'কি ভয়াবহ খবর! আমি তো চোখে অন্ধকার দেখছি মি. জর্জ। আপনি কি ভাবছেন বিষয়টা নিয়ে?'

'খুব বেশি ভাবার নেই। আইন তার নিজের গতিতে চলবে। আহমদ মুসা কিংবা কেউই আইনের চেয়ে বড় নয়।' বলল জর্জ আব্রাহাম গম্ভীর কন্ঠে।

একটু থেমে একটা খবরের কাগজ বিল বেকারের দিকে তুলে ধরে বলল, 'এ সম্পর্কে আরও কথা বলার আগে আসুন নিউজটা আর একবার পড়ে নেই। নিউজটা আপনি পড়লে বাধিত হবো।'

কাগজ হাতে নিল বিল বেকার। বলল, 'শিওর।'

বলে ওয়াশিংটন পোস্ট থেকে নিউজ পড়া শুরু করল বিল বেকার।

''নিউ হারমানে গণহত্যা। নারী-শিশু যুবক-বৃদ্ধসহ ৮০ জন ইহুদী নিহত। বিড়াল তপস্বী ভুমিকার অবসান ঘটিয়ে আহমদ মুসার স্বরূপে আবির্ভাব।'' আনাপোলিশ থেকে জন হ্যানসন।

গত সন্ধ্যায় গণহত্যার এক নৃশংস ঘটনায় ৮০ জন ইহুদী নারী-শিশু যুবা-বৃদ্ধ নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে ২০ জন। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, সকলকেই হত্যা করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ভাগ্যজোরে এ কয়জন বেঁচে যায়। আহতদেরকে মৃতের স্তুপের মধ্যে পাওয়া গেছে।

আহতদের বক্তব্য থেকে জানা গেছে, অস্ত্রধারীরা অতর্কিতে প্রবেশ করে নির্বিচারে গুলী বর্ষণ শুরু করে। সবাই নিহত হয়েছে নিশ্চিত হবার পরই শুধু তাদের গুলী বর্ষণ বন্ধ হয়। হন্তারা কোন জিনিসে হাত দেয়নি, তাকিয়েও দেখেনি

কোন জিনিসের দিকে। এ থেকে ধারণা করা হচ্ছে গণহত্যার উদ্দেশ্যেই তারা আসে।

অস্ত্রধারীরা একই ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করে। নিউ হারমানের বাড়িগুলো থেকে উদ্ধারকৃত বুলেট থেকেই এটা জানা গেছে।

হন্তারা সংখ্যায় কতছিল তা জানা না গেলেও সব বাড়ি একই সাথে আক্রান্ত হওয়া থেকে অনুমান করা হচ্ছে তারা কমপক্ষে ২৫ জনের মত ছিল।

ঘটনাটিকে সাম্প্রতিক ইতিহাসের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর, নৃশংস ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হিসেবে মানুষ মনে করছে। কাউন্টি পুলিশ, সেই সাথে ফেডারেল পুলিশ ও এফবিআই একই সঙ্গে তদন্ত শুরু করেছে।

এই তদন্ত কাজে পুলিশ ও এফবিআই ঘটনাস্থল থেকে প্রাপ্ত কয়েকটি জিনিস ও একটি লাশকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে। ঘটনাস্থল থেকে কুড়িয়ে পাওয়া লিবিয়ায় তৈরী বিস্ফোরকের একটি প্যাকেট, একটি মানিব্যাগ থেকে একটি নেমকার্ড ও কম্পিউটার প্রিন্ট করা একটি চিরকুট পাওয়া গেছে। তদন্তের স্বার্থে নেম কার্ড ও চিরকুটের বিষয়বস্তু গোপন রাখা হয়েছে। তবে এটুকু জানা গেছে কম্পিউটার মেসেজটি আরবী ভাষায় এবং এর সাথে আহমদ মুসার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। অন্যদিকে ৮০টি লাশের বাইরে আরেকটি লাশ ঘটনাস্থলে পাওয়া গেছে। তাকে আক্রমনকারীদের একজন বলে মনে করা হচ্ছে। তার পকেটে একটি মোবাইল পাওয়া গেছে। মোবাইল সূত্রে তার যে নাম উদ্ধার করা গেছে তা হলো 'আব্দুল্লাহ'।

সব মিলিয়ে পুলিশ নিশ্চিত যে, এই গণহত্যার পেছনে আহমদ মুসার প্রত্যক্ষ হাত রয়েছে। মনে করা হচ্ছে, বিভিন্ন ঘটনার সাথে সংশিস্নষ্ট করে আইনে প্যাঁচে ইহুদী নেতৃবৃন্দকে জড়িয়ে এখন ইহুদীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী অভিযান শুরু করা হয়েছে। এ হিটলারী অভিযানের মাধ্যমে আহমদ মুসার বিড়াল তপস্বী রূপ উবে গিয়ে তার আসল রূপ প্রকাশ হয়ে পড়েছে বলে সচেতন মহল মনে করছেন।''

খবরটি পড়া শেষ করে পুলিশ প্রধান বিল বেকার খবরের কাগজটি টেবিলে রেখে চেয়ারে হেলান দিল হতাশ ভংগিতে। বলল, 'আমি কিছু বুঝতে পারছি না মি. জর্জ।'

জর্জ আব্রাহাম জনসনের দৃষ্টিতে বিমর্ষতা। বিল বেকারের কথায় সে নড়ে-চড়ে বসল। এক টুকরো হাসি মুখে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করল। বলল, 'সত্য অনেক সময় অবিশ্বাস্য আকারেও সামনে আসে।'

'কিন্তু আহমদ মুসা এই কাজ করল?' প্রশ্ন তুলল বিল বেকার।

'হ্যাঁ না-কোনটাই বলতে পারব না মি. বেকার। আমরা পুলিশ, বিচারক নই। আসুন আমরা আমাদের কাজ করি।' বলল জর্জ আব্রাহাম ম্লান হেসে।

'এ ব্যাপারে আপনি কিছু চিন্তা করেছেন?'

'আমি প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলেছি। তিনিও মনে করেন এই মুহূর্তে আহমদ মুসাকে গ্রেপ্তার করা ছাড়া কোন বিকল্প নেই।' বলল শুস্ক কন্ঠে জর্জ আব্রাহাম।

পুলিশ প্রধান বিল বেকার মুহূর্তকয় জর্জ আব্রাহাম জনসনের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'ঠিক আছে স্যার। আমি এখনি পদক্ষিপ নিচ্ছি। কিন্তু আমি বলছি, এ ব্যাপারে এতটা তাড়াহুড়া না করলে হতো না? ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত পুলিশ রিপোর্ট পাওয়ার পর আমরা এগুতে পারি।'

'আহমদ মুসা গা ঢাকা দেবে না, পালাবে না, এ কথা নিশ্চিত করে আমি আপনি কেউ বলতে পারি না।'

আহত হওয়ার চিহ্ন ফুটে উঠল পুলিশ প্রধান বিল বেকারের চোখে-মুখে। বলল, 'আহমদ মুসা পালাবে? পালাবার ইচ্ছা থাকলে তো ইতিমধ্যেই পালিয়েছে।'

'না পালাতে পারেনি। আমি খবর পেয়েছি রাতেই। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবস্থা নিয়েছি। আমাদের লোকরা রাত দশটার মধ্যেই আহমদ মুসাকে আনাপোলিশে ডা. বেগিন বারাকের বাড়িতে খুঁজে পেয়েছে। তখন থেকেই বাড়ির

চারদিকে আমরা গোপন পাহারার ব্যবস্থা করেছি। সে পালাতে চাইলেও পালাতে পারতো না।' বলল জর্জ আব্রাহাম। তার কন্ঠ শুস্ক।

ম্লান হাসল বিল বেকার। বলল, 'স্যার, পুলিশ নয়, মানুষ হিসেবে আপনাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি। একজন মানুষ হিসেবে আপনার মন কি বলে, আহমদ মুসা এই ঘটনা ঘটিয়েছে?'

এক টুকরো বেদনার হাসি ফুটে উঠল আব্রাহাম জনসনের মুখে। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, 'আহমদ মুসার জন্যে ভালো আইনজীবী পাওয়া না গেলে চাকুরী ছেড়ে দিয়ে আমি তার পক্ষে দাঁড়াব। কিন্তু এখন যতটুকুই প্রমাণ মিলেছে, তাতে আহমদ মুসা নির্দোষ প্রমাণিত হওয়া ছাড়া তাকে আমি নির্দোষ বলতে পারবোনা।'

'ঠিক আছে। কিন্তু মি. জর্জ আমার মনে হচ্ছে প্রাথমিক তদন্ত ছাড়া আহমদ মুসাকে গ্রেপ্তার করা উচিত হচ্ছে না। ঘটনাস্থলে মানিব্যাগ থেকে পাওয়া নেমকার্ড, মেসেজ এবং কিলারদের একজনের লাশের ছবি আমি দেখেছি। তার পরও মন আমার আশ্বস্ত হয়নি। কতকগুলো প্রশ্ন আমাকে পীড়া দিচ্ছে। কিলাররা ধীরে-সুস্থে চলে গেল, অথচ তাদের একজনের লাশ ফেলে গেলে কেন? মানি ব্যাগটাও আমার কাছে রহস্যপূর্ণ। এ ধরনের অপারেশনে কেউ পকেটে ঐ ধরনের মানি ব্যাগ নিয়ে যায় না।' বলল পুলিশ প্রধান বিল বেকার।

'লাশসহ জিনিসগুলো আমিও পেয়েছি। কিন্তু প্রশ্ন উঠলেই কোন কিছু মিথ্যে হয়ে যায় না। তাছাড়া প্রেসিডেন্ট বলছেন, আমেরিকার জন্যে এই গণহত্যার ঘটনাটা খুবই বড়। ইতিমধ্যেই তিনি ডজন খানেক টেলিফোন পেয়েছেন। যার মধ্যে সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদের প্রভাবশালী সদস্যও রয়েছেন। ঘটনাটা অপরাধমূলক হওয়ার চাইতে রাজনৈতিক রূপই বেশি পাবে। সুতরাং আহমদ মুসাকে গ্রেফতার না করে কোন উপায় নেই। আর যে প্রমাণগুলো মিলেছে তা প্রত্যক্ষ ও পাওয়ারফুল। আহমদ মুসাকে রক্ষা করার কোন উপায় দেখা যাচ্ছে না।' বলল জর্জ আব্রাহাম জনসন।

'আর একটা বিষয়, আহমদ মুসা এখান থেকে গেছেন ক'টায়, আর আনাপোলিশে পৌছেছেন ক'টায়? জিজ্ঞেস করল বিল বেকার।

'ঐ হিসাব ঠিক আছে মি.বেকার। আহমদ মুসা ওয়াশিংটন থেকে বেরিয়েছে সাড়ে ৫টার দিকে। আনা পোলিশ পৌছেছে ৭ টার আগেই। ওঁর সাথে ছিল বেঞ্জামিন বেকন। বেঞ্জামিন বেকনকে টেলিফোন করে আমি জেনেছি, স্বাভাবিক সময়ের আগেই তারা আনাপোলিশ পৌছেছে।' বলল জর্জ আব্রাহাম।

'আর বেঞ্জামিন বেকন তার সাথে ছিল, সে পথিমধ্যে আহমদ মুসাকে সন্দেহজনক কিছু করতেও তো দেখি নি।' বিল বেকার বলল।

'সব হিসাবই ঠিক আছে মি. বেকার। তবু নিউ হারমানে গণহত্যার ঘটনা ঘটেছে এবং সেখানে একজন মুসলমানের লাশ, একজন মুসলমানের নেমকার্ড এবং আহমদ মুসার একটি ফ্যাক্স মেসেজ পাওয়া গেছে এবং আহমদ মুসা ঐ দিন ঘটনার সামান্য আগে নিউ হারমান অতিক্রম করেছে। সুতরাং আহমদ মুসা সবদিক থেকেই ঘটনার সাথে জড়িয়ে পড়ছে।' বলল জর্জ আব্রাহাম। শেষের দিকে তার কন্ঠ আরও শুষ্ক হয়ে উঠেছিল।

'ঠিক বলেছেন মি. জর্জ। ঈশ্বর তাঁকে রক্ষা করুন।' বিল বেকার বলল। তার কন্ঠ ভেজা।

বিল বেকারের কথা শেষ হতেই জর্জ আব্রাহাম জনসনের বিশেষ অয়্যারলেস মোবাইলটি বেজে উঠল। লাল রংয়ের সিগারেট লাইটারের মত যন্ত্র ওটা।

মোবাইলটা হাতে তুলে কানের কাছে নিয়ে ওপারের কথা শুনেই শশব্যস্ত বলে উঠল, 'গুড মর্নিং মি. প্রেসিডেন্ট।'

তারপর ওপারের কথা শুনল। তারপর বলে উঠল, 'ইয়েস মি. প্রেসিডেন্ট, ওদিকের সব ব্যাবস্থা করেছি। আহমদ মুসা যেখানে আছে, সে বাড়িটা ঘিরে আছে আমাদের সিকুরিটির লোকেরা।'

আবার ওপারের কথা শুনল সে। মুখটা তার ম্লান হয়ে উঠল। বলল, 'স্যরি মি. প্রেসিডেন্ট, গ্রেপ্তারের নির্দেশ এখনও দেইনি। তবে সে নিশ্চয় পালাবার চেষ্টা করবে না মি. প্রেসিডেন্ট। আর আমি তাকে টেলিফোন করব আত্মসমর্পণ করার জন্যে।'

তারপর 'গুড মর্নিং মি. প্রেসিডেন্ট।' বলে মোবাইল নামিয়ে রাখল জর্জ আব্রাহাম জনসন।

পুলিশ প্রধান বিল বেকার এ্যাটেনশন কায়দায় উন্মুখ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল জর্জ আব্রাহামের দিকে।

জর্জ আব্রাহাম মোবাইলটা রেখে মুহূর্তকাল আত্মস্থ থেকে তাকাল বিল বেকারের দিকে। বলল, 'মি. বেকার, প্রেসিডেন্ট ঘটনা নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। দেশের ভেতর ও বাইরে থেকে তিনি মারাত্মক চাপের মধ্যে পড়েছেন। তিনি ভয় করছেন, আহমদ মুসা কোনক্রমে যদি হাত থেকে বেরিয়ে যায়, তাহলে বড় রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি হতে পারে।'

'আমরা দেখতে চাচ্ছি ঘটনার ভেতরের দিকটা, আর প্রেসিডেন্ট দেখছেন ঘটনার ফলাফলের দিকটা। আমার মনে হয় তিনি ঠিকই করছেন।' বলল বিল বেকার।

'হ্যাঁ, ইহুদী লবিটা প্রপাগান্ডার একটা অমুল্য অস্ত্র পেয়ে গেল। এখন তারা চেষ্টা করবে মি. শ্যারনদের বিরুদ্ধে আনিত কেসগুলো নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করতে। তারা বলবে, কেসগুলোর পক্ষে যে ডকুমেন্ট যোগাড় করা হয়েছে, তার সবই ইহুদী বিদ্বেষী খুনি আহমদ মুসার সুদূর প্রসারী ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি।' কথা শেষ করার সাথে সাথে জর্জ আব্রাহামের একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

পাশ থেকে মোবাইলটা তুলে নিল জর্জ আব্রাহাম। 'ওখানকার পুলিশকে আহমদ মুসাকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়ে দেই, আর আহমদ মুসার সাথেও কথা বলি।' বলে জর্জ আব্রাহাম তার মোবাইলের 'কি' বোর্ডের দিকে তর্জনি এগিয়ে নিল।

তখন সকাল ৮টা।

সাগরিকা সেন ডা. বেগিন বারাকের গাড়ি বারান্দায় তার গাড়িটা পার্ক করে এক ঝটকায় গাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়ির দরজা বন্ধ না করেই পাগলের মত

ছুটে গিয়ে প্রবেশ করল ডা. বারাকের ড্রইং রুমে। দেখল ডাক্তার বারাক সোফায় বসে আছে। দু'হাতের দু'কনুই হাটুতে রেখে দুহাতে মাথা চেপে ধরে সোফায় বসে আছে সে। তার সামনে টিপয়ে সেদিনের অনেকগুলো কাগজ।

সাগরিকা সেনের পায়ের শব্দে মুখ তুলল ডাক্তার বারাক। তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো সাগরিকা সেনের দিকে। কিন্তু তার মুখে সব সময়ের সেই হাসিটি ফুটে উঠল না। চোখে তার শূন্য দৃষ্টি। বিপর্যস্ত তার চেহারা।

সে উঠে দাঁড়িয়ে সাগরিকা সেনকে স্বাগতও জানাল না।

সাগরিকা সেন গিয়ে ডাক্তার বারাকের পাশের এক সোফায় মুখোমুখি হয়ে বসল। বসেই বলে উঠল, 'আংকল পত্রিকা এসব কি লিখেছে?'

সংগে সংগেই উত্তর দিল না ডা. বারাক। ধীরে ধীরে সে মুখ ঘুরাল সাগরিকা সেনের দিকে। তার চোখে ভাবলেশহীন দৃষ্টি।

বেশ অনেক পরে ধীর কন্ঠে বলল, 'শুধু তো পত্রিকা নয় সাগরিকা, সবগুলো টিভি চ্যানেল এই একই কথা বলেছে।' শুষ্ক কন্ঠ ডাক্তার বারাকের।

'কিন্তু এগুলো তো সত্য নয়, সত্য হতে পারে না।' কান্নাজড়িত আর্তকণ্ঠ সাগরিকা সেনের।

'একথা আমিও জানি। কিন্তু কে বিশ্বাস করবে?' শুষ্ক দুর্বল কণ্ঠ ডাক্তার বারাকের।

'ঘটনা ঘটেছে সাড়ে সাতটার দিকে। কিন্তু আহমদ মুসা সন্ধ্যা সোয়া ৭টা থেকে আনাপোলিশে আমাদের মাঝে ছিলেন। কি করে তিনি এই ঘটনার সাথে যুক্ত থাকতে পারেন?' বলল সাগরিকা সেন তীব্র প্রতিবাদী কণ্ঠে।

জবাবে কোন কথা বলল না ডা. বারাক। তার মুখ নিচু। ভাবছিল সে। একটু পর মুখ তুলে ধীরে ধীরে বলল, 'আমি খুবই উদ্বেগ বোধ করছি সাগরিকা। পত্র-পত্রিকা ও টিভি চ্যানেলগুলোর রিপোর্ট আগুনের মত ছড়িয়ে পড়বে গোটা দেশে। আর সংগে সংগেই হিটলারী গণ-হত্যার সাথে ব্রাকেটেড করা হবে আহমদ মুসাকে। এক মুহুর্তেই তিনি হয়ে দাঁড়াবেন ইহুদী হন্তা এক হিটলার। হয়ে দাঁড়াবেন তিনি সভ্যতা ও মানবতার শত্রু। কাকে ক'জনকে বুঝাব আমরা আমাদের কথা!'

ভয় ও উদ্বেগে ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে সাগরিকা সেনের মুখ। সে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না। বলল একটু সময় নিয়ে, ‘কিন্তু কিছু একটা করতে হবে। কি করা যায়............।’ অসহায় কণ্ঠস্বর সাগরিকার। ভেঙে পড়েছে সে।

‘করার একটাই আছে। সেটা হলো আহমদ মুসার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ করা।’ বলল ডা. বারাক। হতাশ কণ্ঠ তার।

‘কিভাবে?’ ত্বরিত প্রশ্ন ভেসে এল সাগরিকা সেনের কণ্ঠ থেকে।

‘জানি না।’ ডা. বারাক বলল।

খোলা দরজা দিয়ে ড্রইং রুমে প্রবেশ করল আহমদ মুসা। তার মুখে হাসি। এসে বসল ডা. বারাকের সামনের এক সোফায়। বলল, ‘সব কাগজের রিপোর্ট পড়া শেষ করে এলাম। রিপোর্টগুলোর তথ্য একই, উপস্থাপনা শুধু ভিন্ন।’

ডাক্তার বারাক ও সাগরিকা সেন কেউই কোন কথা বলল না। তাদের মুখ নিচু। তারা তাকাতে পারছিল না আহমদ মুসার দিকে। কি বলবে তাও মুখে আসছিল না।

আহমদ মুসাই আবার কথা বলল। বলল, ‘আমাকে নিয়ে আপনারা খুবই বিপদে পড়েছেন ডা. বারাক, তাই না?’ আহমদ মুসার মুখে নিশ্চিন্ত এক টুকরো হাসি।

ডা. বারাক এবং সাগরিকা সেন দু’জন একই সাথে মুখ তুলে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। তারা দেখল আহমদ মুসার মুখের নিশ্চিন্ত হাসিটা। বিস্ময় ফুটে উঠল দু’জনের মুখেই।

সোজা হয়ে বসল ডা. বারাক। বলল, ‘কি ঘটেছে আপনি কি ঠিক বুঝতে পেরেছেন মি. আহমদ মুসা?’ কণ্ঠে তার উদ্বেগ ঝরে পড়ল।

‘হ্যাঁ। আমেরিকানদের, কোটি কোটি পাশ্চাত্য ও বিশ্ববাসির ক্রোধ ও ঘৃণা প্রবলবেগে ধেয়ে আসছে আমার দিকে।’

‘তবু হাসতে পারছেন?’ প্রায় কান্না জড়িত কণ্ঠ সাগরিকা সেনের।

সংগে সংগে জবাব দিল না আহমদ মুসা।

ধীরে ধীরে তার মুখটা গম্ভীর হয়ে উঠল। সোজা হয়ে বসল আহমদ মুসা। বলল, 'হাসতে পারছি কারণ, আল্লাহর উপর নির্ভর করা ছাড়া আমার এখন কোন করণীয় নেই। তাই আমি নিশ্চিন্ত। যা করার আল্লাহই করবেন।'

'করণীয় নেই কেন?' প্রশ্ন ছুটে এল সাগরিকা সেনের মুখ থেকে। আর্ত কণ্ঠ তার।

'আমার করণীয় নেই।'

'নেই কেন?' আবার জিজ্ঞেস করল সাগরিকা সেন।

'কিছু করতে হলে আমাকে বাইরে বেরুতে হবে। যেতে হবে নিউ হারমানে এবং অনেক জায়গায়। মিথ্যা প্রমাণ করতে হবে ডকুমেন্টগুলোকে।' বলল আহমদ মুসা।

'বাইরে বেরুতে পারবেন না কেন?' জিজ্ঞেস করল ডা. বারাক।

'আমি কার্যত জর্জ আব্রাহাম জনসনের আতিথ্যে রয়েছি। সেখান থেকেই তাঁর গাড়ি নিয়ে আমি এখানে এসেছি। বর্তমান অবস্থায় আমি যদি তাঁকে কিছু না জানিয়ে এখান থেকে সরে পড়ি, তাহলে সেটা পালানো হবে।' বলল আহমদ মুসা।

'কেন টেলিফোনে তাঁকে এখনই জানিয়ে দিতে পারেন।' সাগরিকা সেন বলল।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'আমি যদি জর্জ আব্রাহাম জনসন হতাম এবং তিনি আহমদ মুসা হতেন, তাহলে আমি আহমদ মুসাকে আমার হাতের মুঠোর বাইরে চলে যেতে দিতাম না। আমি ঠিক জানি না জর্জ আব্রাহাম জনসন এই মুহূর্তে কি ভাবছেন। কিন্তু আমাকে তাঁর গ্রেপ্তার করা বর্তমান পরিস্থিতির অপরিহার্য দাবী। আমার মনে হচ্ছে, আমি যদি তাকে এখন টেলিফোন করি, তবে তিনি আমাকে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বলবেন।'

বিস্ময় ফুটে উঠল ডা. বারাক ও সাগরিকা সেন দু'জনের চোখে-মুখেই। বলল সাগরিকা সেন, 'জর্জ আব্রাহাম জনসন আপনাকে গ্রেপ্তার করবেন?'

‘এ ছাড়া তার কোন উপায় নেই। আমি তাদের কাষ্টোডিতে গেলে সরকারের উপর মানুষের রোষ কিছু কমবে। আর পালিয়ে গেলে সরকার নানা রকম অপপ্রচারের শিকার হবেন এবং বিপদে পড়বেন।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তিনি তার বিপদের কথা ভাববেন, আপনি আপনার বিপদের কথা ভাববেন না? তাঁকে বা সরকারকে বিপদ থেকে রক্ষার জন্যে আপনি গ্রেপ্তারী বরণ করবেন কেন?’ বলল সাগরিকা সেন। তীব্র ক্ষোভ ফুটে উঠল তার কণ্ঠে।

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল, এ সময় ঘরে প্রবেশ করল ডা. বারাকের কর্মচারী। তার চোখে-মুখে উদ্বেগ। বলল সে ডা. বারাককে লক্ষ করে, ‘স্যার ভোর থেকেই কিছু লোক বাড়ির চারদিকে ঘুরঘুর করছিল। এইমাত্র পুলিশ এসে বাড়ির চারদিকটা ঘিরে ফেলেছে।’

‘কি বলছ তুমি?’ ভীত স্বরে কথাটা বলেই তড়াক করে উঠে দাঁড়াল ডা. বারাক।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘প্লিজ ডা. বারাক উদ্বিগ্ন হবেন না। যা স্বাভাবিক, সেটাই ঘটেছে।’

সাগরিকা সেনের মুখ কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে।

ডা. বারাক ধপ করে শোফায় বসে পড়ে বলল, ‘আমি এখনি জর্জ আব্রাহামকে টেলিফোন করব। তিনি কি আহমদ মুসাকে বন্দী করে এক পক্ষের মুখ বন্ধ করে দিয়ে একতরফাভাবে কেস চালাতে চান।’

বলে টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াল ডা. বারাক।

ঠিক এ সময়েই টেলিফোনটা বেজে উঠল।

ডা. বারাক টেলিফোনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে, স্পিকার-এর ‘কি’তে চাপ দিল।

সংগে সংগেই ওপার থেকে কণ্ঠ ভেসে এল, ‘হ্যালো, ডা. বারাক।’ কণ্ঠ জর্জ আব্রাহাম জনসনের।

‘হ্যালো, মি. জর্জ। গুড মর্নিং।’ বলল ডা. বারাক।

‘গুড মর্নিং। কেমন আছেন ডাক্তার?’

‘ভালো নেই। আপনার পুলিশ আমার বাড়ি ঘিরে বসে আছে।’ ডা. বারাকের কণ্ঠে ক্ষোভ ফুটে উঠল।

‘আমি দুঃখিত ডা. বারাক। খুবই দুঃখিত। আমি......।’

জর্জ আব্রাহামের কথায় বাধা দিয়ে ডা. বারাক বলল, ‘এসব ঢাক ঢোলের কিছুই প্রয়োজন ছিল না মি. জর্জ আব্রাহাম। ভোর থেকেই আহমদ মুসা গ্রেপ্তারী বরণ করার জন্যে বসে আছেন। আমরা হাজার চেষ্টা করেও তাকে সরে যেতে রাজী করাতে পারিনি।’ ডা. বারাকের ক্ষোভ এবার প্রায় কান্নায় রূপান্তরিত হলো।

‘আমি জানি ডা. বারাক। আমি আহমদ মুসাকে চিনি। যে আহমদ মুসা নিজের জীবন বিপন্ন করে মানুষের বিপদ মোচন করেন, সেই আহমদ মুসা কি করে চাইবেন আমার গায়ে আচড় লাগুক।’ ভারী কণ্ঠস্বর জর্জ আব্রাহাম জনসনের।

‘সেই আহমদ মুসাকে তাহলে গণহত্যার দায়ে গ্রেপ্তার করছেন কি করে?’ ক্ষোভের সাথে বলল ডা. বারাক।

‘আইনের দিক থেকে আপনি যেটা বলছেন, সেটাই ঠিক। কিন্তু আসল কথা হলো, আমরা তাঁকে গ্রেপ্তার দেখাচ্ছি পরিস্থিতিকে ঠান্ডা করার জন্যে। সামনে অবস্থা কি দাঁড়াবে জানি না, তবে আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি ডা. বারাক প্রয়োজনে আমি চাকুরী ছেড়ে দিয়ে আহমদ মুসার পক্ষে আইনি লড়াই-এ নামব।’ বলল জর্জ আব্রাহাম। প্রত্যয়দীপ্ত তার কণ্ঠস্বর।

মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ডা. বারাকের এবং সাগরিকা সেনের। বলল ডা. বারাক, ‘ধন্যবাদ মি. জর্জ, অনেক ধন্যবাদ। আমার আর কোন ক্ষোভ নেই।’

‘ধন্যবাদ ডাক্তার। আহমদ মুসা কি আপনার পাশে?’

‘হ্যাঁ, আমার পাশে।’

‘তাঁকে টেলিফোনটা দিন।’

‘দিচ্ছি। আবার আপনাকে ধন্যবাদ।’ বলে ডা. বারাক টেলিফোন এগিয়ে দিল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা টেলিফোনটা সামনে নিয়ে সেদিকে একটু ঝুঁকে পড়ে বলল, ‘হ্যালো মি. জর্জ আব্রাহাম, কেমন আছেন?’

‘ভালো আছি বলতে পারছি না। জীবনে মনে হচ্ছে এতবড় সংকটে পড়িনি। নিউ হারমানের হত্যাকান্ড সরকারকে পাগল করে তুলেছে।’ জর্জ আব্রাহাম জনসন বলল।

‘আমি গ্রেপ্তার হয়েছি প্রচার হলে মানুষ কিছু শান্ত হবে, পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটবে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তা ঘটবে। কিন্তু আমার মত অনেকের সংকট বাড়বে। তবে আনন্দের বিষয় হবে যে, আপনি হাতের কাছে থাকায় আপনার সাহায্য পাব।’ বলল জর্জ আব্রাহাম।

‘যদি বন্দীর সাহায্য করার মত আরো কিছু থাকে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘নিউ হারমানের গণহত্যার ঘটনা সম্পর্কে আপনার প্রাথমিক ধারণা কি মি. আহমদ মুসা?’

‘নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রা ভঙ্গের চেষ্টা করা হয়েছে।’ এক মুহূর্ত দেরী না করে বলল আহমদ মুসা।

‘নিজের নাক কাটা’র এই লোকরা কারা?’

‘নাক যাদের তারাই তো হবে।’

‘বুঝেছি। কিন্তু প্রমাণের কোন পথ দেখি না।’

‘তাহলে যার বা যাদের যাত্রা ভংগ হবার কথা, তাদের যাত্রা ভংগ হবে।’ বলল আহমদ মুসা। তার মুখে হাসি।

‘মি. আহমদ মুসা, একটা কঠিন কথা খুব সহজভাবে বললেন। জানেন, যা ঘটেছে তার শাস্তি কি হতে পারে?’

‘মিথ্যা প্রমাণ করতে না পারলে যা পরিণতি হবার তা হতেই হবে।’

‘মিথ্যা প্রমাণ করার ব্যাপারে আপনারও কিন্তু দায়িত্ব আছে।’ জর্জ আব্রাহাম বলল।

‘প্রমাণের বিষয়টা বাইরের ব্যাপার। আমি গ্রেপ্তার হবার পর বাইরের কোন কাজের দায়িত্ব আমার উপর বর্তায় না।’ বলল আহমদ মুসা।

‘মি. আহমদ মুসা, আপনি আইনত অন্তরীণ থাকলেও কার্যত আপনি আমাদের সহযোগী হবেন। আমরা আপনার সাহায্য চাই। আপনিই শুধু বিপদগ্রস্ত

নন, আমেরিকাও বিপদগ্রস্ত। নিউ হারমানে যা ঘটেছে তার মূল যদি আমরা উপড়ে ফেলতে না পারি তাহলে ইহুদী প্রপাগান্ডা নিউ হারমানকে জার্মানীর 'আসউইথ'-এ পরিণত করবে। আমেরিকায় আমরা এমন কিছু হতে দিতে পারি না।' জর্জ আব্রাহাম বলল। আবেগ জড়িত উদ্বিগ্ন কণ্ঠ জর্জ আব্রাহামের।

আহমদ মুসার ঠোঁটে বেদনাজড়িত এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'মি. জর্জ জার্মানীর আসউইথে ইহুদী গণহত্যার রহস্য অর্ধশতাব্দীর বেশী সময়েও বের করা যায়নি। যারাই বের করতে গেছে তারা এক অদৃশ্য শক্তির দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয়ে থেমে যেতে বাধ্য হয়েছে। নিউ হারমানে ইহুদী গণহত্যার এই রহস্যও উদ্ধার করা সহজ হবে না। আমি পত্রিকাগুলো পড়েছি। তাতে যে ডকুমেন্টগুলো তারা এনেছে, সেগুলো তারা সবদিক থেকেই অকাট্য করার চেষ্টা করেছে।'

'তা ঠিক মি. আহমদ মুসা। কিন্তু অপরাধীরা কোন না কোন দূর্বলতা বা ফাঁক রেখে যায়ই। সেটাই আমাদের ভরসা।'

'আল্লাহ আপনাদের সহায় হোন।' বলে আহমদ মুসা মুহূর্তের জন্য থামল। পরক্ষণেই বলল, 'আমি সারা জেফারসনের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন মি. জর্জ। আমি তাড়াতাড়ি আনাপোলিশে চলে এসেছি তার উদ্ধারের কাজ শুরু করার জন্যে।'

'আমরা দুঃখিত আহমদ মুসা। তবে আমাদের সবগুলো নিরাপত্তা বিভাগ সারা জেফারসনের উদ্ধারের জন্যে কাজ করছে। আনাপোলিশে আপনি যদি কোন ক্লু পেয়ে থাকেন, আমাদের সাহায্য করতে পারেন।' বলল জর্জ আব্রাহাম।

'আমি আনাপোলিশে এসেছিলাম সাগরিকার বান্ধবী ও শশাংকের প্রেমিকা ইহুদী মেয়ে নোয়ান নাবিলাকে ফলো করার জন্যে। আমার বিশ্বাস সারা জেফারসন সম্পর্কে সে সবকিছু জানে। এ ব্যাপারে সাগরিকা আপনাদের সাহায্য করতে পারবে।' থামল আহমদ মুসা।

বলল জর্জ আব্রাহাম ওপার থেকে, 'সাগরিকা ওখানে আছে?'

'আছে।'

'ওকে দিন।'

বলেই জর্জ আব্রাহাম একটা দম নিয়ে আবার বলল, ‘তার আগে শুনুন মি. আহমদ মুসা, এখনি আপনি ওয়াশিংটনে আমাদের কাছে আসছেন।’

‘আমার দু’হাত হাতকড়া পরার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে মি. জর্জ।’

বলে হেসে উঠল আহমদ মুসা।

‘আমি দুঃখিত মি. আহমদ মুসা।’ গম্ভীর ও বেদনাহত কন্ঠ জর্জ আব্রাহামের।

‘ধন্যবাদ জর্জ আব্রাহাম।’ বলে আহমদ মুসা টেলিফোন তুলে দিল সাগরিকা সেনের হাতে।

# ২

নোয়ান নাবিলার চোখ দু'টি খবরের কাগজের উপর নিবদ্ধ।

গোগ্রাসে গিলছে নোয়ান নাবিলা নিউজটা।

নিউজ পড়া শেষ হয়েছে।

কিন্তু তার চোখ দু'টি উঠে আসেনি খবরের কাগজ থেকে। তার শূন্য দৃষ্টি নিবদ্ধ খবরের কাগজে। বসে আছে সে পাথরের মত স্থির হয়ে।

তার সামনে গরম চা ঠান্ডা পানি হয়ে গেছে।

নোয়ান নাবিলার শূন্য দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে তখন গতকাল সন্ধ্যায় তার দেখা নিউ হারমানের গণহত্যার দৃশ্য। খবরের কাগজে যা লিখেছে তার চেয়ে সহস্রগুণ ভয়াবহ তা। লাল রক্তের স্রোত এবং লাশের স্তুপ তার চোখের সামনে আবার জীবন্ত হয়ে উঠল। শিউরে উঠলো নোয়ান নাবিলা। তার গোটা সণায়ুতন্ত্রীতে জাগল একটা শীতল শিহরণ। তার সাথে তার মনে ছুটে এল প্রশ্নের এক তীর-বিদ্ধ-ধাক্কা। আহমদ মুসা এই গণহত্যা সংঘটিত করেছে? ঠান্ডা মাথায় এক এক করে এই মানুষ মারার কাজ আহমদ মুসা করেছে?

জগত জোড়া ক্রোধ, ঘৃণায় ভরে গেল নোয়ান নাবিলার মন। হিটলার যেমন ছিল, আহমদ মুসাও তো সে ধরনেরই কশাই। কিন্তু কেন? হিটলারের একটা রাজ্য ছিল, কমপক্ষে গোটা ইউরোপ নিয়ে তার রাজ্য গড়ার শখ ছিল। তাই ইহুদীদের হত্যা করে তার দেশের, জাতির, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি নিষ্কন্টক করা তার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আহমদ মুসা মার্কিন ইহুদীদের উপর এই গণহত্যা চালাল কিসের আশায়? কোন প্রয়োজনে?

বিস্ময়ের শেষ নেই নোয়ান নাবিলার। আহমদ মুসাই, মার্কিন ইহুদীদের আজ কাঠগড়ায় তুলেছে। তার হিংসারতো প্রশমন ঘটার কথা। কিন্তু তা না হয়ে হিংসায় আরও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল কি করে?

কিন্তু আহমদ মুসা কি রক্ষা পাবে?

অপরাধ সে চাপা রাখতে পারেনি। ঘটনার নিউজের সাথে তার অপরাধও প্রকাশ হয়ে পড়েছে। তাকেও আইনের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এবং সেটা গণহত্যার দায়ে। তার বাঁচার পথ নেই।

হঠাৎ নোয়ান নাবিলা প্রচন্ড ধাক্কা খেল তার চিন্তায়। তার মনে পড়ল গতকাল বিকেলে জেনারেল শ্যারন ও উইলিয়াম জোনসের আলোচনার কথা। জেনারেল শ্যারন তাকে বলেছিল, আহমদ মুসা মার্কিন ইহুদীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। এই গণহত্যাই কি সেই ষড়যন্ত্র? আর জেনারেল শ্যারন উইলিয়াম জোনসের সাথে আলোচনায় বলেছিলেন, বিজয়ের আনন্দে আহমদ মুসা এমন কিছু করে বসবে যাতে সে আমেরিকানদের কাছে ঘৃণার পাত্রে পরিণত হবে। 'এমন কিছু' বলতে কি এই ঘটনার দিকেই ইংগিত করা হয়েছিল? এই ঘটনাতো নিশ্চিতই আহমদ মুসাকে আমেরিকানদের ঘৃণার পাত্রে পরিণত করবে। দেখা যাচ্ছে জেনারেল শ্যারনের গতকাল বিকেলের বলা কথা পরবর্তী রাতেই ফলে গেল। এমন নিশ্চিত কথা তিনি বললেন কি করে? এত নিখুঁতভাবে তিনি জানলেন কি করে আহমদ মুসার ষড়যন্ত্র এবং কি ষড়যন্ত্র সেই কথাও? তাছাড়া ষড়যন্ত্রের কথা জানার পর তো প্রতিকার-প্রতিরোধের পদক্ষেপ নেয়া উচিত ছিল। তা তিনি করেননি কেন?

আরেকটি ধাক্কা খেল নোয়ান নাবিলা তার চিন্তায়। খুব বড় হয়ে তার সামনে এসে দাড়াল জেনারেল শ্যারন ও শ্যারনের দক্ষিণ হস্ত ইহুদী স্পাই মাষ্টার বেন ইয়ামিনের কথোপকথন। ওরা একটা মিশনের কথা বলেছিলেন। যে মিশনটা যাত্রা করার কথা গতকাল সন্ধ্যা ৬টায়। যে মিশনটা কোন রেসিষ্ট্যান্সের সম্মুখীন হবে না ওরা বলছিলেন। এই 'রেসিষ্ট্যান্স হবে না' কথাটার ব্যবহার প্রমাণ করে মিশনটা আক্রমণাত্মক। ভাবল নোয়ান নাবিলা। ওদের কথোপকথনের মাধ্যমে একথা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, মিশনটা যেখানে যাবে সেটা ইহুদী বসতি। এবং তা পূর্ব উপকূলের প্রথম ইহুদী বসতি যেখানে দি গ্রেট ডেভিড দানিয়েল জন্মগ্রহণ করেন।

এ কথা মনে হতেই শিউরে উঠল নোয়ান নাবিলা। দি গ্রেট ডেভিড দানিয়েল তো নিউ হারমানে জন্মগ্রহণ করেন এবং নিউ হারমানই এ অঞ্চলের

সবচেয়ে পুরোনো ইহুদী বসতি। ভ্রু কুঞ্চিত হলো নোয়ান নাবিলার। তাহলে কি জেনারেল শ্যারন গত সন্ধ্যায় বেন ইয়ামিনদেরকে নিউ হারমানে কোন আক্রমণাত্মক মিশনে পাঠিয়েছিলেন যা আহমদ মুসার বিরুদ্ধে আমেরিকানদের মনে ঘৃণার সৃষ্টি করবে? ভীষণ কেপে উঠল নোয়ান নাবিলার বুক। নিউ হারমানের ইহুদী বসতিতে কি বেন ইয়ামিনরাই আক্রমণ করেছিল? সেখানকার গণহত্যা কি তাদের কাজ? নোয়ান নাবিলা মরিয়া হয়ে ভাবতে চেষ্টা করল, বেন ইয়ামিনদের মিশন ছিল নিউ হারমানে আহমদ মুসাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করা কি। কিন্তু যুক্তিটা নোয়ান নাবিলা মেলাতে পারল না। অভিযানটা নিউ হারমানে আহমদ মুসার আক্রমণ ঠেকানোর জন্যে হলে বেন ইয়ামিন কেমন করে নিশ্চিতভাবে বলেছিল যে, সেখানে কোন রেসিষ্ট্যান্স হবে না। বেন ইয়ামিনের এই কথার অর্থ হলো, নিউ হারমান থেকে তাদের অভিযানের বিরুদ্ধে কোন রেসিষ্ট্যান্স হবে না এবং এটাই প্রমাণ হয়েছে নিউ হারমানের ইহুদী অধিবাসিরা কোন রেসিষ্ট্যান্স করতে পারেনি। জেনারেল শ্যারন ও বেন ইয়ামিনের গোটা কথোপকথনে তাদের মিশন আহমদ মুসাদের বিরুদ্ধে কিংবা তাদের মিশন মোকাবিলায় আহমদ মুসার কোন ভূমিকা থাকবে তার উল্লেখ নেই। বরং যে কথাটা তাদের বক্তব্যে এসেছে সেটা হলো, এমন কিছু ঘটবে যাতে আহমদ মুসা আমেরিকানদের ঘৃণার পাত্র হবে। অন্যকথায় নিউ হারমানের গণহত্যা ঘটনার দায় আহমদ মুসার উপর বর্তাবে। সেটাই বর্তেছে। এবং জেনারেল শ্যারনাই তাদের গণহত্যার দায় চাপিয়েছে আহমদ মুসার উপর।

তাহলে নিউ হারমানের কাজ কি কোন আত্মঘাতি কাজ? জেনারেল শ্যারনরা ইহুদী স্বার্থের রক্ষক সেজে নিরপরাধ ইহুদীদের ছাগল-ভেড়ার মত করে হত্যা করল? এই প্রশ্ন নোয়ান নাবিলার গোটা সত্তা, সমস্ত সণায়ুতন্ত্রীতে যেন আগুন ধরিয়ে দিল।

হাতের কাগজটা ছুড়ে ফেলে লাফ দিয়ে উঠে দাড়াল নোয়ান নাবিলা।

অস্থিরভাবে সে পায়চারি করতে লাগল।

তার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছে এই জ্বালা যে, আমাদের কম্যুনিটির শীর্ষস্থানীয় যারা কম্যুনিটির স্বার্থরক্ষার জন্যে কাজ করছে তারাই নৃশংসভাবে

হত্যা করল কম্যুনিটির লোকদের। অবিশ্বাস্য এটা! কি করে এটা সম্ভব হতে পারে! তার হিসেবে কি কোন ভুল হচ্ছে? সে কি জেনারেল শ্যারন ও বেন ইয়ামিনের কথার ভুল অর্থ করছে? আসলেই বেন ইয়ামিনের মিশন নিউ হারমান না হয়ে অন্য কোথাও ছিল? আহমদ মুসাকে ঘৃণার পাত্র করার মত ঘটনা আরও কোথাও ঘটবে? নিউ হারমানের ঘটনা কি কাকতালীয়ভাবে মিলে গেছে জেনারেল শ্যারন ও বেন ইয়ামিনের কথার সাথে?

নিউ হারমানকে নিয়ে এইভাবে হাজারো কথা ভাবতে গিয়ে হঠাৎ নোয়ান নাবিলার মনে পড়ল নিউ হারমানে একজন নিহত ব্যক্তির কাছ থেকে নেয়া ভিডিও ক্যাসেটের কথা। ওতে কি আছে? কেন মৃত লোকটির হাতে ওটা ছিল?

ক্যাসেটটা জ্যাকেটের পকেটেই ছিল।

ছুটে গেল নোয়ান নাবিলা। ক্যাসেট নিয়ে ফিরে এল। ওটা কম্পিউটারে ঢুকিয়ে সুইচ অন করে সোফায় এসে বসল সে।

কম্পিউটার স্ক্রীনে দৃশ্য ফুটে উঠার সাথে সাথেই গুলীর অনেকগুলো শব্দ শুনতে পেল নোয়ান নাবিলা। শব্দগুলোর কোনটা খুব কাছের, কোনটা অপেক্ষাকৃত দূর থেকে ভেসে আসা। সেই সাথে শুনতে পেল মানুষের কান্না ও চিৎকার।

শব্দের সাথে সাথে স্ক্রীনে যে দৃশ্যটি ফুটে উঠল তাতে সে দেখল দু'জন পৌঢ় নারী পুরুষ, একজন যুবতি ও একজন শিশু একটা দরজা দিয়ে ছুটে এসে একটা বড় ঘরে প্রবেশ করল।

ঘরটি একটা বড় শোবার ঘর।

ঘরে একটা বড় খাট। ঘরের এক কোণে ছোট একটা রাইটিং টেবিল। খাটের শিয়রে দেয়ালে টাঙানো একটা পেইন্টিং। রাইটিং টেবিলের পাশে দেয়ালে একটা আলমিরা।

দৌড়ে সবচেয়ে শেষ ঘরে প্রবেশ করেছে প্রৌঢ় লোকটি। সে ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করতে চাইল। কিন্তু পারল না। এক ঝাঁক গুলী এসে দরজাটাকে ছিটকে খুলে দিল। আর গুলীর ঝাঁকে পড়ে গেল পৌঢ় লোকটি।

গুলীতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া দেহ নিয়ে দরজাতেই পড়ে গেল লোকটি।

প্রৌঢ়ের সাথের অন্যেরা তখন মেঝেতে শুয়ে পড়েছে।

গুলী ছুড়তে ছুড়তে একজন লোক ঘরে ঢুকল। লাথি মেরে দরজার সামনে থেকে প্রৌঢ়ের লাশটি এক পাশে একটু ঠেলে দিয়ে মেঝেয় শুয়ে পড়া প্রৌঢ়া মহিলা, যুবতি ও শিশুর দিকে এগুলো। তার ষ্টেনগানের ব্যারেল একটু নিচু করে তাক করল তাদেরকে।

ওদের কারো মুখে তখন আর কান্না নেই।

ভয়ে কুঁকড়ে গেছে ওরা সবাই। ভয়ে চোখগুলো ওদের যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে।

লোকটার ষ্টেনগানের নল গুলী বর্ষণ করল। গুলীর ঝাঁক গিয়ে ঘিরে ধরল ওদের তিনজনকে।

মুহূর্তেই রক্তের বন্যায় ডুবে গেল ওরা।

হঠাৎ মাথা ঘুরিয়ে ষ্টেনগানধারী লোকটি ডানদিকে তাকাল এবং তীব্র কণ্ঠে বলে উঠল, ‘কোন হারামজাদার বাচ্চা তুমি দেখাচ্ছি মজা।’ তার ষ্টেনগানের নল চোখের পলকে ডানদিকে ঘুরে গেল। আর সেই সাথেই নড়ে গেল দৃশ্য। অন্তর্হিত হয়ে গেল ঘরের দৃশ্য। তার বদলে ঝড়ের বেগে একের পর এক দৃশ্য আসছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে। কখনও দেয়ালের ছবি কখনো করিডোরের ছবি, ইত্যাদি।

বুঝা গেল ক্যামেরাম্যান পালাচ্ছে।

এক সময় দৃশ্য উঠে গেল।

অন্ধকার নেমে এল কম্পিউটার স্ক্রীনে।

এসব দেখছিল বটে নোয়ান নাবিলা। কিন্তু ষ্টেনগানধারীকে দেখার পর বিস্ময় বিস্ফোরিত নোয়ান নাবিলার শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা।

কম্পিউটার স্ক্রীনে ষ্টেনগান হাতে গুলী করতে করতে বেন ইয়ামিনকে ঘরে ঢুকতে দেখে প্রথমে ভুত দেখার মত আঁৎকে ওঠে নোয়ান নাবিলা। দৃশ্যটা তার বিশ্বাস হতে চায়নি। মনে হয়েছে সে যেন এক দুঃস্বপ্ন দেখছে।

কিন্তু দুঃস্বপ্ন তো নয়।

সে সকাল থেকে নিজের বাড়িতে বসে গত সন্ধ্যায় নিউ হারমান থেকে উদ্ধারকৃত ভিডিও ক্যাসেটটি বারবার দেখছে তার নিজের কম্পিউটার স্ক্রীনে।

আরও অবাক হলো নোয়ান নাবিলা যে, গতকাল বিকেলে জেনারেল শ্যারনের সাথে সাক্ষাতের সময় বেন ইয়ামিনকে যে কালো পোশাকে দেখেছিল, এখানে সে পোশাকেই দেখছে।

দৃশ্যটার দর্শন শুরু হলে নোয়ান নাবিলা উত্তেজিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে পড়েছিল, এখন ধপ করে বসে পড়ল। তার দেহের সমস্ত শক্তি যেন কোথায় উবে গেল। দেহের যেন এক ফোটা ওজনও তার নেই। তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লেও এতটা বিস্মিত হতো না যতটা বিস্মিত হয়েছে সে বেন ইয়ামিনকে নিজ হাতে তার ইহুদী ভাইদের নৃশংসভাবে খুন করতে দেখে।

তার কেবলই মনে হতে লাগল, জেনারেল শ্যারন, বেন ইয়ামিনরা কারা? তাদের আসল পরিচয় কি? ওরা ইহুদী, কিন্তু কি চায় ওরা? ওরা আহমদ মুসাকে ধ্বংস করতে চায়, কিন্তু সেটা কি নিউ হারমানের নারী, শিশু বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলকে হত্যা করে তার দায় আহমদ মুসার ঘাড়ে চাপিয়ে? এদের তুলনায় আহমদ মুসা তো দেবতুল্য নিষ্পাপ। আহমদ মুসা এক মুসলমান হওয়া ছাড়া তার কোন অপরাধ দেখি না। সে তার জাতির জন্যে কাজ করে বটে, কিন্তু অন্য জাতির ক্ষতি করে নয়। দু'একটি ঘটনায় সে আহমদ মুসাকে নিকট থেকে দেখেছে। আহমদ মুসা আত্মরক্ষার প্রয়োজন ছাড়া কাউকে হত্যা করেনা। আহমদ মুসাকে ধরা অথবা হত্যা করার জন্যেই নাবিলা ইহুদী কমান্ডোদের নিয়ে এসেছিল ডা. বেগিন বারাকের বাড়িতে। এদিক থেকে নোয়ান নাবিলাকে আহমদ মুসা জানের শত্রু মনে করার কথা। কিন্তুও সে সাগরিকাকে বলেছে, নোয়ান নাবিলা যেটা করেছে, তার জায়গায় আমি হলে আমিও সেটাই করতাম। কোন দিক দিয়েই সে অন্যায় কিছু করেনি। আহমদ মুসার এই মানবিকতার পাশে জেনারেল শ্যারন বেন ইয়ামিনরা একেবারেই অমানুষ।

ভীষণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল নোয়ান নাবিলার মন। ডা. বারাক আংকেলরা ঠিকই বলেন, জেনারেল শ্যারন, ডেভিড উইলিয়াম জোনস এবং বিজ্ঞানী জন জ্যাকবরা মার্কিন ইহুদীদের জন্যে 'শনি' হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন। ওরা মার্কিন

ইহুদীদের একটা পলিটিক্যাল ইউনিটে পরিণত করতে চাচ্ছে যাদের একমাত্র লক্ষ মার্কিন জনগণের উপর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা। নোয়ান নাবিলার মনে হলো, এটা অন্যায় ও অসংগত একটা অভিলাষ। অন্যায় অসংগত বলেই এই লক্ষ অর্জনের পথে নিউ হারমানের নিরপরাধ স্বজাতিকে তাদের খুন করতে হলো। ডা. বারাক ইহুদী হয়েও ঘৃণা করেন জেনারেল শ্যারনদের এবং ভালোবাসেন আহমদ মুসাকে। মনে পড়ল ডা. বারাকের কথা। তিনি বলেন, মুসলমানদের কোন ইসরাইল নেই, প্রমিজড ল্যান্ড নেই। তাই তাদের নেই কোন পিছু টান। তারা যে দেশে যায়, সে দেশেরই হয়ে যায়............।

‘নাবিলা।’ পেছন থেকে ডেকে উঠল শশাংক সেন।

চিন্তা সূত্র ছিন্ন হয়ে গেল নোয়ান নাবিলার।

ঘুরে বসল সে।

‘হ্যালো নাবিলা কেমন আছ?’ বলে শশাংক এসে নাবিলার পাশে বসে তাকে জড়িয়ে ধরল। বলল, ‘ডার্লিং তোমাকে কিন্তু খুব বিমর্ষ দেখাচ্ছে।’

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে নোয়ান নাবিলা বলল, ‘তুমি তো এ সময় আস না, ব্যাপার কি?’

‘তুমি খুব খুশী হবে, এমন একটা খবর তোমাকে দিতে এসেছি।’

‘কি খবর?’ বলল নাবিলা।

‘আহমদ মুসার খুব বিপদ। খবর তুমি নিশ্চয় আজকের কাগজে পড়েছো। সাগরিকা কিছুক্ষণ আগে টেলিফোনে বলল, আহমদ মুসা নিউ হারমানে গণহত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়ে যাচ্ছে। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। ভাবলাম বলে যাই তোমাকে খবরটা।’

চমকে উঠল নোয়ান নাবিলা।

কিন্তুও নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, ‘তোমার জন্যে এটা তো খুশীর খবর নয়।’

‘অবশ্যই না। আমি মনে করি আহমদ মুসাকে অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। সে এ কাজ করতেই পারে না।’

মনে আবার একটা খোঁচা খেল নোয়ান নাবিলা। অস্থির একটা ভাবনা জাগল তার মনে, কে অপরাধ করেছে, আর কে পাকড়াও হচ্ছে। এই প্রথম বারের মত আহমদ মুসার জন্যে একটা দরদের সৃষ্টি হলো নোয়ান নাবিলার মনে। সে ভাবল নিউ হারমান থেকে পাওয়া ক্যাসেটের কথা শশাংক সেনকে বলা দরকার।

মুখ খুলেছিল নাবিলা শশাংককে বলার জন্যে। এ সময় কলিংবেল বেজে উঠল।

কথা বলা হলো না নাবিলার। সে উঠে গিয়ে গেট-ইন্টারকমের সুইচে চাপ দিয়ে বলল, 'হ্যালো ওখানে কে?'

'গুড মর্নিং। আমি জেনারেল শ্যারন ম্যাডাম। আপনার সাথে আমার জরুরী কাজ আছে।' ও প্রান্ত থেকে কথা ভেসে এল।

জেনারেল শ্যারনের কণ্ঠ শুনেই মুখ অন্ধকার হয়ে গেল নোয়ান নাবিলার।

কিন্তু মুহুর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে গেট ওপেনের সুইচে চাপ দিয়ে বলল 'গুড মর্নিং স্যার। ভেতরে এসে ড্রইং-এ বসুন। আমি নিচে আসছি।' বলে অফ করে দিল গেট-ইন্টারকম।

নোয়ান নাবিলার দিকে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে আছে শশাংক সেন। বলল, 'নাবিলা তোমাকে খুব বিমর্ষ ও ভীত দেখাচ্ছে। তুমি কি অসুস্থ? শশাংকের কণ্ঠে উদ্বেগ।

নাবিলা ধীরে ধীরে চোখ তুলল শশাংকের দিকে বলল, 'বিপদ শুধু আহমদ মুসার নয়। বিপদ মার্কিন ইহুদীদেরও। জেনারেল শ্যারনদের ষড়যন্ত্র আমাদের ধ্বংস করবে। তোমাকে সব কথা বলার সময় নেই। জেনারেল শ্যারন এসেছেন, আমি নিচে যাচ্ছি।'

কথা শেষ করেই নাবিলা কম্পিউটারের দিকে এগুলো। কম্পিউটার থেকে একটা ক্যাসেট বের করে শশাংকের দিকে তুলে ধরে বলল, 'এই ক্যাসেটটা নাও। ক্যাসেটটা সাগরিকা অথবা আহমদ মুসার হাতে পৌছাতে হবে। মনে রেখ? এই ক্যাসেটের মুল্য আমার, তোমার জীবনের চেয়ে অনেক বেশী।'

নোয়ান নাবিলার অবস্থা দেখে শশাংকের মুখে বিস্ময় লেগেই ছিল। এবার সেখানে উদ্বেগ দেখা দিল। বলল, 'এত মুল্যবান জিনিস। তাড়াহুড়া কেন। তুমিই ওদের কাছে এটা পৌছে দিও। আমি অন্য এক জায়গায় যাবার জন্যে বেরিয়েছি।'

নোয়ান নাবিলার চোখ-মুখ উদ্বেগে ভরে গেল। বলল, 'না শশাংক। ক্যাসেটটা নিয়ে এক্ষনি তোমাকে চলে যেতে হবে। হঠাৎ করে এখানে এ সময় জেনারেল শ্যারনের আগমনের কারণ বুঝতে পারছি না। আমার ভয় করছে। জেনারেল শ্যারন যে কোন মুল্যে এই ক্যাসেট হাত করতে চাইবে। তুমি এই মুহুর্তে ক্যাসেটটি এই বাড়ি থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও।'

শশাংকের চোখেও ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল। বলল, 'তোমার কোন বিপদ হবে না তো?'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না শশাংক। যাই হোক। আহমদ মুসাকে এবং মার্কিন ইহুদীদের বাঁচাতে হবে। ক্যাসেট তুমি তাড়াতাড়ি আহমদ মুসার হাতে পৌছাও।'

'আমিও তোমার কিছুই বুঝতে পারছি না নাবিলা।'

'ক্যাসেটটি আহমদ মুসাকে দাও, উনিই সব বুঝিয়ে দেবেন। যাও তুমি, আমি নিচে নামার আগেই তোমাকে বেরিয়ে যেতে হবে।' অনুনয়ের সুরে বলল নোয়ান নাবিলা।

ক্যাসেটটি হাতে নিয়ে নোয়ান নাবিলার দিকে একবার গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'যাচ্ছি ডার্লিং। গড ব্লেস ইউ।'

শশাংক ঘুরে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

শশাংক বেরিয়ে যাবার কিছু পরে নোয়ান নাবিলা নিচে নেমে এল।

সিড়ি মুখের বিরাট হল ঘরটাই ড্রইং রুম।

'দুঃখিত স্যার। একটু ঝামেলায় ছিলাম। সেরে আসতে দেরী হলো।' মুখে হাসি টেনে বিনয়ের সাথে বলল নোয়ান নাবিলা।

'না, না। অল রাইট। আমিই বরং অসময়ে বিনা নোটিশে এসে গেছি। এটা ঠিক হয়নি। কিন্তু কি করব জরুরী পরিস্থিতি তো!' বলল জেনারেল শ্যারন।

জেনারেল শ্যারনের কথায় পুরান অস্বস্তিটা বাড়ল নোয়ান নাবিলার।

ভেতরের ভাবটা চেপে নাবিলা বলল, ‘বলুন স্যার। নিশ্চয় কোন জরুরী ব্যাপার?’

‘নাবিলা, আমরা নিউ হারমানের ব্যাপারে তথ্য যোগাড় করতে শুরু করেছি। খবর পেয়েছি, শয়তান আহমদ মুসা জঘন্য গণহত্যা সংঘটিত করার পর তুমিই প্রথম নিউ হারমানে গেছ সেই জন্যেই তোমার কাছে ছুটে এসেছি। তোমার কাছ থেকে কিছু জানা দরকার।’

‘হ্যাঁ, আপনার ওখান থেকে বেরিয়ে একজন ফ্রেন্ডের বাসায় গিয়েছিলাম। সেখান থেকে বাসায় ফেরার পথে ঐ ঘটনার মুখে পড়েছিলাম।’ খুব সহজ কণ্ঠে বলল নোয়ান নাবিলা।

‘তুমি কি দেখলে, কি বুঝলে, তোমার এই কথাগুলো আমাদের জন্য খুবই মুল্যবান।’ জেনারেল শ্যারন শান্ত ও উদগ্রীব কণ্ঠে বলল।

নোয়ান নাবিলা ভাবল, ধড়িবাজ শ্যারনের লোকরা হয়তো তাকে দেখে থাকবে, এমনকি তাকে হয়তো ফলোও করেছে। সবই তারা দেখেছে। এখন তাকে বাজিয়ে দেখতে এসেছে, আমি তাদেরকে কতটুকু দেখেছি। সুতরাং তার সব কথাই বলা দরকার। এই চিন্তা করে নোয়ান নাবিলা বলল, ‘দু’একটা গুলীর শব্দ ও চিৎকারের শব্দে আমি গাড়ি থামাই। যেহেতু শব্দগুলো নিউ হারমানের বিভিন্ন দিক থেকে আসছিল। আমার সন্দেহ হওয়ায় গাড়ি থেকে নামি। এই সময় নিউ হারমানের বিভিন্ন স্থান থেকে কয়েকটা গাড়িকে আমি দ্রুত বের হয়ে যেতে দেখি। এর পরই দেখতে পাই, একজন লোক টলতে টলতে রাস্তার দিকে এগিয়ে আসছে। দেখে আমার মনে হলো, লোকটি আহত। আমি দ্রুত তার দিকে এগুলাম। কিন্তু আমি তার কাছে পৌছার আগেই সে মাটিতে পড়ে গেল। আমি ছুটে গিয়ে তার কাছে যখন বসলাম তখন তার দেহ নিশ্চল-নিথর। আমি হাত দিয়ে পরীক্ষা করে বুঝলাম যুবকটি মারা গেছে। সে ছিল গুলী বিদ্ধ।

আমি উঠে দাড়ালাম। সেই সময় আমার চোখে পড়ল, যুবকটির ডান হাত সামনের দিকে ছড়ানো। তার হাতে একটি ক্যাসেট..............।’

নোয়ান নাবিলার মুখের কথা শেষ না হতেই জেনারেল শ্যারন দ্রুত কণ্ঠে বলে উঠল, ‘ক্যাসেট?’

নোয়ান নাবিলা ধীর কণ্ঠে বলল, ‘হ্যা ক্যাসেট।’

‘ক্যাসেট তোমার কাছে?’ হাতে আকাশের চাঁদ পাওয়ার মত বলে উঠল জেনারেল শ্যারন।

‘বলছি।’

বলে নোয়ান নাবিলা আবার শুরু করল, ‘গুলীর শব্দ শোনা চিৎকার, তারপর এই যুবককে গুলীবিদ্ধ দেখে আমার আন্টির কথা মনে......।’

‘এসব কথা পরে শুনব, আগে বল ক্যাসেটটা কোথায়, তোমার কাছে?’ জেনারেল শ্যারন নোয়ান নাবিলার কথায় বাধা দিয়ে বলে উঠল। তার অধৈর্য্য কণ্ঠ।

এই ভাবে বাধা পেয়ে নোয়ান নাবিলা বিব্রত হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া জবাবে কি বলবে, সেটাও রেডি ছিল না। কি বলবে তা ঠিক করতে একটু সময় গেল। বলল সে, ‘আমি ওটা পুলিশকে দিয়েছি। আমি আহত আন্টিকে নিয়ে ফেরার পথে পুলিশ আমাকে আটকেছিল। আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। আমি তাদের ক্যাসেট দিয়ে বলেছিলাম। একজন মুমুর্ষ লোক মনে হয় এটা কাউকে পৌছবার চেষ্টা করছিল। আমার মনে হয়েছিল পুলিশের ওটা কাজে লাগতে পারে।’

ক্রোধে জেনারেল শ্যারনের চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। ক্রোধ ও ক্ষোভের একটা তীব্র ঝড় এক সাথে তার ভেতর থেকে বের হতে যাচ্ছিল। ফলে সে প্রায় বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। মুহূর্ত কয়েক পরে বলল, ‘পুলিশকে দিয়েছ? পুলিশের নাম চেহারা মনে আছে?’ গর্জন করে উঠল জেনারেল শ্যারনের কণ্ঠ।

‘চারদিকের অবস্থায় তখন আমি দারুণ ভীত। আহত আন্টিকে নিয়ে ব্যস্ত। তার উপর পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করায় আমি আরও বিব্রত হয়ে পড়েছিলাম। মনের এ অবস্থা নিয়ে আমি পুলিশের মুখের দিকে মাত্র একবার তাকিয়েছিলাম। তার চেহারা আমার মনে নেই।’ কথাটা এইভাবে বলতে পেরে খুশি হলো নোয়ান নাবিলা। মিথ্যাটা সত্যের মতই হয়েছে।

নোয়ান নাবিলার কথা শুনে মুখটি চুপসে গেল জেনারেল শ্যারনের। উদ্বেগের চিহ্নও তার চোখে-মুখে স্পষ্ট হয়ে উঠল। বলল, 'ঐ মৃত লোকটি একজন সাংবাদিক। ঐ ক্যাসেটে শয়তান আহমদ মুসাদের সম্পর্কে জীবন্ত সাক্ষ্য পাওয়া যাবে। ক্যাসেটটা আমাদের অবশ্যই চাই। নিউ হারমানে গতকাল যেসব পুলিশ অফিসার গিয়েছিল, তাদের যদি ছবি দেখ বলতে পারবে না?'

'বলা মুস্কিল। একেতো রাত, তার উপর তার মাথায় হ্যাট ছিল। হ্যাটের ছায়া ছিল তার চোখে-মুখে। উপরন্তু মুখটা তার আমি ভাল করে দেখিনি।' দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে বলল নোয়ান নাবিলা।

'না তাকে খুঁজে পেতেই হবে নাবিলা এবং আজকেই। তুমি তার কণ্ঠ শুনলে অবশ্যই চিনতে পারবে।' কণ্ঠটা কঠোর শুনাল জেনারেল শ্যারনের।

কথা শেষ করেই জেনারেল শ্যারন তার হাতের মোবাইলে একটা কল করল।

তারপর মোবাইলটা কানে তুলে নিয়ে বলল, 'গুড মর্নিং বেন ইয়ামিন। শুন, গতকাল যে পুলিশ অফিসাররা নিউ হারমানে গিয়েছিল, তাদের সবার কণ্ঠ আমাদের দরকার। কারা গিয়েছিল তা তো আমরা জেনেই গেছি। আমাদের অডিও লাইব্রেরীতে যদি তাদের কণ্ঠ না থাকে, তাহলে পুলিশ রেকর্ড থেকে এখনি তোমাকে যোগাড় করে আনতে হবে। পারবে না?'

'অবশ্যই। রেকর্ড কিপার অফিসার আমাদের লোক। বলে দিচ্ছি। আপনি এলেই পেয়ে যাবেন।' বলল ওপার থেকে বেন ইয়ামিন।

'ধন্যবাদ বেন। আমি আসছি। বাই।'

বলে জেনারেল শ্যারন মোবাইল অফ করে দিয়ে তাকাল নোয়ান নাবিলার দিকে। বলল, 'নাবিলা, তোমাকে যেতে হবে আমার সাথে।' তার কণ্ঠে সুস্পষ্ট নির্দেশ।

নোয়ান নাবিলার মুখ চুপসে গেল। ভয়ও পেল সে। বলল সে, 'কিন্তু স্যার। এখন তো আমার যাওয়া হবে না।'

'না, কোন কথা নয়। তোমাকে যেতেই হবে।' গর্জন করে উঠল যেন জেনারেল শ্যারনের গলা।

'আমার আব্বা আম্মা দু'জনেই সকালে বাইরে গেছেন, তারা না ফেরা পর্যন্ত........।' কথা শেষ না করেই থেমে গেল নোয়ান নাবিলা। ভয় মিশ্রিত তার কণ্ঠ।

'না নাবিলা। এখনি আমার সাথে তোমাকে যেতে হবে। এখন প্রতিটি সেকেন্ড আমাদের কাছে এক একটি বছর।'

বলে উঠে দাড়াল জেনারেল শ্যারন।

শুধু ভয় পাওয়া নয়, ভেতরটা তখন কাঁপতে শুরু করেছে নোয়ান নাবিলার। তার চোখে ফুটে উঠেছে নিউ হারমান হত্যার দৃশ্য। নাবিলার চোখে জেনারেল শ্যারনরা কশাই ছাড়া আর কিছুই নয়। তার মিথ্যা ধরা পড়লে তাকে হত্যা করতে এক মুহুর্তও দেরী করবে না।

আনমনা হয়ে পড়েছিল নোয়ান নাবিলা।

জেনারেল শ্যারন তাকে হাত ধরে টেনে তুলল। বলল, 'এক মুহূর্তও আমি দেরী করতে পারছি না।'

নোয়ান নাবিলা শংকিত হয়ে পড়ল। তাকে জেনারেল শ্যারন জোর করেই নিয়ে যাবে। নিজের ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বেগ বোধ করল নোয়ান নাবিলা। হঠাৎ তার মাথায় একটা চিন্তা ঝিলিক দিয়ে উঠল, তাকে যেখানে যেখানে নিয়ে যেতে পারে, তার ঠিকানা শশাংকের কাছে রেখে যাওয়া দরকার। তাহলে উপরে গিয়ে তাকে টেলিফোন করতে হবে মোবাইলে। এবার মনে একটু সাহস ফিরে পেল সে। বলল, 'স্যার, আপনি একটু দাঁড়ান। আমি কাপড় পাল্টে আসি।'

নোয়ান নাবিলার পরণে তখনও ব্রেকফাস্টের পোশাক। সুতরাং জেনারেল শ্যারন সময় দিতে আপত্তি করল না।

নোয়ান নাবিলা উপরে উঠে গেল।

ডা. বেগিন বারাক ও সাগরিকা সেন পাথরের মত বসেছিল।

শশাংক প্রবেশ করল।

শশাংককে দেখেই সাগরিকা সেন বলে উঠল, 'শশাংক আহমদ মুসাকে এফবিআই পুলিশরা গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল।' ভারী কণ্ঠস্বর সাগরিকা সেনের।

শশাংক সাগরিকা সেনের পাশে বসতে বসতে বলল, 'আমি কিছু বুঝতে পারছি না দিদি। ওদিকে জেনারেল শ্যারন নাবিলাকে বাসা থেকে ধরে নিয়ে গেল।' শুষ্ক কণ্ঠে বলল শশাংক সেন।

'জেনারেল শ্যারন নাবিলাকে ধরে নিয়ে গেল? অবিশ্বাস্য কথা বলছ তুমি শশাংক।' বিস্মিত কণ্ঠে বলল সাগরিকা সেন।

'অবিশ্বাস্য, কিন্তু সত্য দিদি। একটা ভিডিও ক্যাসেটের সন্ধানে এসেছিল জেনারেল শ্যারন নাবিলার কাছে। তার আসার কথা জানতে পেরেই নাবিলা তাড়াতাড়ি ক্যাসেটটি আমার হাতে পাঠিয়ে দিয়েছে তোমাকে অথবা আহমদ মুসাকে দেবার জন্যে। ক্যাসেটটি উদ্ধারের জন্যে নাবিলাকে জেনারেল শ্যারন ধরে নিয়ে গেছে।'

'ক্যাসেটে কি আছে শশাংক?' বিস্মিত কণ্ঠে দ্রুত জিজ্ঞেস করল সাগরিকা সেন।

'জানি না। জেনে নেবার সময়ও দেয়নি আমাকে নাবিলা। তবে নাবিলা বলেছে, তার ও আমার জীবনের চেয়েও ক্যাসেটটি মুল্যবান। জেনারেল শ্যারন যে কোন মুল্যে ক্যাসেটটি উদ্ধার করতে চাইবে।' শশাংক বলল।

ভ্রুকুঞ্চিত হলো সাগরিকা সেন ও ডা. বেগিন বারাকের। উদগ্রীব কণ্ঠে ডা. বারাক বলল, 'ক্যাসেট কাকে দিতে বলেছে, সাগরিকা বা আহমদ মুসাকে?'

'হ্যাঁ।' বলল শশাংক।

'তাহলে ওতে সাংঘাতিক কিছু আছে সাগরিকা।' ডা. বারাক বলল।

'আমারও তাই মনে হয়। চলুন ক্যাসেটে কি আছে দেখা যাক।' বলল সাগরিকা সেন।

তারা উঠে এল কম্পিউটার টেবিলে।

শশাংক কম্পিউটার চালু করে দিয়ে ক্যাসেটটা কম্পিউটারে সেট করে তারপর সাগরিকা সেনের পাশে এসে বসল।

নিউ হারমানের সেই দৃশ্যাবলী কম্পিউটার স্ক্রীনে একের পর এক ফুটে উঠতে লাগল।

ঘরে পিনপতন নিরবতা।

ওরা গোগ্রাসে গিলছে দৃশ্যগুলো।

এক সময় নিরবতা ভেঙে খান খান হয়ে গেল ডা. বারাকের চিৎকারে। সে চিৎকার করে বলে উঠল, 'গুলী করছে ঐ লোকটি বেন ইয়ামিন। জগৎবিখ্যাত ইহুদী গোয়েন্দা। জেনারেল শ্যারনের দক্ষেণ হস্ত।' উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ডা. বারাকের।

ডা. বারাকের উত্তেজিত কণ্ঠ আবার ধ্বনিত হলো, 'ঘটনা কোথাকার? নিউ হারমানের?'

চমকে উঠল সাগরিকা ও শশাংক সেন দু'জনেই। তারা এক সাথেই মাথা ঘুরিয়ে তাকাল ডা. বারাকের দিকে। বলল তারা দু'জনেই বিস্ময়মিশ্রিত দ্রুত কণ্ঠে, 'নিউ হারমানের? তাহলে যে বললেন গুলী করছে ইহুদী গোয়েন্দা, জেনারেল শ্যারনের লোক!'

'আমি ঠিক ঠিক বলতে পারছি না দৃশ্যগুলো নিউ হারমানের কিনা। কিন্তুও খবরের কাগজে নিউ হারমানের হত্যাকান্ডের যে বিবরণ বেরিয়েছে, তার সাথে দৃশ্যগুলো মিলে যায়।' ডাক্তার বারাকের কন্ঠ শুষ্ক ও উত্তেজিত। চোখে-মুখে তার বিস্ময় বিমূঢ় ভাব।

কোন কথা বলতে পারল না সাগরিকা ও শশাংক। প্রশ্ন ঠিকরে বেরুচ্ছে তাদের চোখ-মুখ থেকেও।

ডাক্তার বারাকই আবার বলে উঠল, 'ঘটনা কোথাকার নাবিলা জানত এবং সে জন্যেই ক্যাসেটটি আহমদ মুসার কাছে পাঠিয়েছে। এ থেকে প্রমাণ হয় ক্যাসেটটি আহমদ মুসার খুবই প্রয়োজন। অন্যদিকে জেনারেল শ্যারনও ক্যাসেটটি যে কোন মূল্যে পেতে চায় এবং ক্যাসেট উদ্ধারের জন্য নাবিলাকে পর্যন্ত ধরে নিয়ে গেছে। আর এই ঘটনা ঘটেছে নিউ হারমানের ঘটনার একদিন পরে। সুতরাং নিউ হারমানের ঘটনার সাথে এই ক্যাসেটের সম্পর্ক আছে আমরা ধরে নিতে পারি।'

‘এর অর্থ কি দাঁড়ায় ডাক্তার আংকেল? প্রশ্ন করল শশাংক। তার কণ্ঠে উত্তেজনা।

বিস্ময় বিমূঢ় ভাব আরও গভীর হয়ে উঠল ডাক্তার বারাকের চোখে-মুখে। বলল, ‘অর্থ পরিষ্কার জেনারেল শ্যারনরা খুন করেছে আমাদের একটি ইহুদী বসতির কিছু নিরপরাধ মানুষকে।’

‘কেন করেছে? উদ্দেশ্য কি?’ বলল শশাংক।

ডা. বারাকের মনে পড়ল জর্জ আব্রাহামকে বলা আহমদ মুসার কথা। আহমদ মুসার কথার পুনরাবৃত্তি করে ডাক্তার বারাক বলল, ‘নিজেদের নাক কেটে আহমদ মুসার যাত্রা ভংগ করতে চেয়েছে। আহমদ মুসার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়েছে।’

‘তাহলে তো এই ক্যাসেট অবিলম্বে ওয়াশিংটনে আহমদ মুসা বা জর্জ আব্রাহাম জনসনের হাতে পৌছাতে হয়।’ বলল দ্রুত কণ্ঠে সাগরিকা সেন।

‘অবশ্যই সাগরিকা। আমরা এখনই রওয়ানা হতে পারি।’ ডাক্তার বারাক বলল সোজা হয়ে বসে।

‘আমিও যাব।’ বলল শশাংক।

‘হ্যা, তোমাকে যেতেই হবে, তুমিই ক্যাসেট এনেছ নাবিলার কাছ থেকে।’ সাগরিকা সেন বলল।

উঠে দাড়াল ডাক্তার বারাক। বলল, ‘আমি গাড়িটা ঠিকঠাক করে নিচ্ছি। তোমরা এস।’

দশ মিনিটের মধ্যেই ডাক্তার বারাকের গেট দিয়ে একটা গাড়ি বেরিয়ে এল। গাড়ির ড্রাইভিং সিটে শশাংক। তার পাশের সিটে ডা. বারাক। পেছনের সিটে বসেছে সাগরিকা সেন।

ওয়াশিংটন-আনাপোলিশ ফ্রি ওয়ে ধরে ঝড়ের গতিতে চলেছে গাড়িটি।

ডিষ্ট্রিক্ট অব কলামবিয়া অর্থাৎ ওয়াশিংটনে প্রবেশের আগে মেরিল্যান্ডের শেষ শহর হলো শিভারলী।

শিভারলীতে ঢুকতে যাচ্ছে ডা. বারাকের গাড়ি। ফ্রিওয়য়ের লেনের বাইরে ফুটপাতের উপর একটা গাড়ি দাড়িয়েছিল। গাড়ির গায়ে ঠেস দিয়ে দাড়িয়েছিল একজন লোক।

ডা. বারাকের গাড়ি কাছাকাছি আসতেই লোকটি হাত তুলল।

শশাংক ডা. বারাকের দিকে একবার তাকিয়ে গাড়ি দাড় করাল ফুটপাতে দাঁড়ানো গাড়ির পাশে।

শশাংকরা দেখল গাড়ির ভেতরে আরও তিনজন লোক। তাদের একজনের হাতে দূরবীন।

শশাংক গাড়ি দাড় করাতেই গাড়ি থেকে আরও একজন লোক বেরিয়ে এল। চোখের পলকে তারা দু'জন ডা. বারাকের গাড়ির দু'পাশে এসে দাঁড়াল। শশাংকরা কিছু বুঝে উঠার আগেই দু'জন দু'পাশ থেকে সাগরিকার দু'পাশে উঠে এসে বসল।

বসেই দু'জন রিভলবার বের করে একজন তাক করল ড্রাইভিং সিটে বসা শশাংককে। বলল তাকে লক্ষ করে, 'চালাও গাড়ি।'

কি ঘটতে যাচ্ছে শশাংক বুঝতে পেরেছিল। লোকটির কথা শেষ হবার আগেই শশাংক দেহটাকে গুটিয়ে সিটের আড়ালে নিয়ে গাড়ির দরজা খুলে বাইরে গড়িয়ে পড়ল।

পেছনে যে লোকটি শশাংকের দিকে রিভলবার তাক করেছিল সে বুঝতে পারল ড্রাইভিং সিটের লোকটি পালাল। সেও দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে পড়ল এবং এগুলো শশাংকের দিকে।

শশাংক পড়ে গিয়ে পা গুটিয়ে ছিল। ভাবটা এই রকম যেন সে ভীষণ ভয় পেয়েছে।

লোকটি কাছাকাছি আসতেই শশাংক গুটানো পা স্প্রিঙের মত পেছনে ঠেলে আঘাত করল লোকটির পায়ের গোড়ালির উপরের জায়গাটায়।

লোকটি অপ্রস্তুত ছিল। এই আঘাত খেয়ে লোকটি পড়ে গেল।

সংগে সংগে শশাংক লোকটির হাতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে রিভলবার কেড়ে নিল।

রিভলবার হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েই শশাংক দেখল পাশের গাড়ি থেকে দু'জন রিভলবার হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসছে।

ঠিক এই সময়েই পুলিশের একটা গাড়ি শশাংকের গাড়ির ঠিক পেছনে এসে দাঁড়াল এবং সংগে সংগেই দু'জন পুলিশ রিভলবার বাগিয়ে বেরিয়ে এল।

পুলিশের গাড়ি দেখে পাশের গাড়ির যে দু'জন রিভলবার হাতে বেরিয়ে আসছিল তারা আবার গাড়িতে উঠে গাড়ি ষ্টার্ট দিয়ে ছুটতে লাগল।

পুলিশের গাড়ি দেখে পাশের গাড়ির যে দু'জন রিভলবার হাতে বেরিয়ে আসছিল তারা আবার গাড়িতে উঠে গাড়ি ষ্টার্ট দিয়ে ছুটতে লাগল।

আর শশাংকের সামনে মাটিতে পড়ে যাওয়া লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে দৌড়ে পালাতে লাগল। রিভলবার হাতে যে লোকটি গাড়িতে সাগরিকা ও ডাক্তার বারাককে পাহারা দিচ্ছিল, সেও গাড়ি থেকে বেরিয়ে দৌড় দিল।

পুলিশ দু'জন ফাকা ফায়ার করে উচ্চ স্বরে আদেশ দিল, এরপরও পালাতে চেষ্টা করলে গুলী করব।

লোক দু'টি দাঁড়িয়ে গেল।

পুলিশ দু'জন এগিয়ে গিয়ে লোক দু'টির হাতে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে তাদের গাড়িতে নিয়ে এল।

ততক্ষণে ডা. বারাক ও সাগরিকা গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল। ডা. বারাক পুলিশকে তাদের পরিচয় দিল এবং বলল, 'ওরা হাত তুলে আমাদের গাড়ি থামিয়ে আকস্মিকভাবে আমাদের গাড়িতে উঠে রিভলবার বাগিয়ে তাদের নির্দেশ মত গাড়ি চালাবার হুকুম দিয়েছিল। শশাংকের বুদ্ধিতে ওরা বাধা পায়। আপনারা এসে আমাদের বাঁচিয়েছেন। অনেক ধন্যবাদ আপনাদের।'

'স্যার কারণ কি বলুন তো? আপনাদের এরা চেনে? না, এটা কোন ছিনতাই-এর ঘটনামাত্র?' একজন পুলিশ বলল।

ডা. বারাক সংগে সংগে জবাব দিল না। একটু চিন্তা করে বলল, 'নিছক কোন ছিনতাই-এর ঘটনা নয় বলেই আমার বিশ্বাস। কোন বড় কারো দ্বারা নিয়োজিত লোক এরা হতে পারে। ওদের একজনের হাতে দূরবীন ছিল। ওরা আগে থেকে দেখে-শুনেই আমাদের গাড়ি থামিয়েছে। আমরা এফবিআই চীফ

আব্রাহাম জনসনের কাছে যাচ্ছি। আমাদের বাধা দেয়াই ওদের লক্ষ হতে পারে বলে আমার মনে হচ্ছে।’

এফবিআই চীফের কাছে যাওয়ার কথা শুনে পুলিশ অফিসারটি নড়ে-চড়ে দাঁড়াল। একটু সমীহের সুরে বলল, ‘স্যার, তাহলে এদেরকে একটি ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে অপহরণ ও হত্যা প্রচেষ্টা’র অভিযোগে গ্রেপ্তার দেখাতে পারি। অভিযোগকারী হিসাবে আপনাদের নাম থাকবে।’

‘ঠিক আছে।’

‘ধন্যবাদ। চলুন স্যার, আপনাদের পৌছে দিয়ে আমরা অফিসে ফিরব।’ বলল পুলিশ অফিসারটি।

‘কিন্তু এর কি দরকার হবে?’

‘স্যার, যা ঘটেছে তার পরিপ্রেক্ষেতে এটাকে আমরা আমাদের দায়িত্ব মনে করছি। ওদের দু’জন পালাতে পেরেছে বলেই এই প্রয়োজনটা আমরা বেশি অনুভব করছি।’

‘ধন্যবাদ অফিসার, চলুন।’

সবাই গাড়িতে উঠল। চলতে শুরু করল গাড়ি।

আগে ডা. বারাকের গাড়ি, পেছনে চলছে পুলিশের গাড়ি।

‘ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আংকেল। আপনি ঠিকই বলেছেন ক্যাসেটের ঘটনার সাথে এর সম্পর্ক আছে।’ ডা. বারাকের দিকে চেয়ে বলল সাগরিকা সেন।

‘কিভাবে সেটা সম্ভব দিদি? আমরা সন্দেহের মধ্যে পড়ব কেন? বলল শশাংক।

‘নাবিলার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে জেনারেল শ্যারন তোমাকে দেখেছে না?’ সাগরিকা বলল।

‘দেখেছে।’ বলল শশাংক।

‘জেনারেল শ্যারন তোমাকে চেনে না?’

‘চেনে’

‘সুতরাং অবস্থার প্রেক্ষিতে নাবিলার পর দ্বিতীয় সন্দেহ তোমাকে করবে। তাছাড়া, কোন চাপে পড়ে নাবিলা তোমার নাম বলে দিতে বাধ্য হতে পারে।’

মুখ শুকনো হয়ে গেল শশাংকের। উদ্বেগ ফুটে উঠল তার চোখে-মুখে। বলল, 'তা হতে পারে দিদি?'

'ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক আমরা একটা বড় যুদ্ধে জড়িয়ে গেছি শশাংক।' বলল ডা. বারাক।

'ওরা কি নাবিলার সাথে খারাপ ব্যবহার করবে?' শশাংকের কণ্ঠে উদ্বেগ।

'ভেব না শশাংক, ঈশ্বর আছেন।' সান্তনার সুরে বলল সাগরিকা সেন।

'ওরা কিন্তু আমাদের আব্বাকে এবং আমাদের ইন্ডিয়ান-আমেরিকান কম্যুনিটিকে ব্যবহার করছে দিদি। এটা আমরা হতে দিতে পারি না।' ক্ষুব্ধ কণ্ঠ শশাংকের।

'জেনারেল শ্যারন ও ইহুদীবাদীরা মার্কিন ইহুদীদেরও ব্যবহার করছে শশাংক।' বলল ডা. বারাক।

'তবু তারা একই কম্যুনিটি ভুক্ত। কিন্তু ইন্ডিয়ান-আমেরিকান কম্যুনিটি তাদের স্বার্থের বলি হবে কেন?' শশাংক বলল।

'কারণ ইহুদীবাদীদের আধিপত্যবাদী অভিলাষের সাথে ইন্ডিয়ান-আমেরিকান কম্যুনিটির অনেকের আকাঙ্খার মিল আছে।' বলল ডা. বারাক।

'আমাদের আব্বাও কি এই আকাঙ্খা পোষণ করেন?' শশাংক বলল।

'এই প্রশ্নের উত্তর তুমি দাও সাগরিকা?' ডা. বারাক সাগরিকাকে উদ্দেশ্য করে বলল।

'নিজের স্বার্থ দেখা মানুষের একটা প্রকৃতি। এই প্রকৃতি ইন্ডিয়ান-আমেরিকান কম্যুনিটির আছে। আব্বারও আছে। স্বার্থের একটা ঐক্য ইহুদীবাদীদের সাথে ইন্ডিয়ান-আমেরিকান কম্যুনিটির রয়েছে। কিন্তু আব্বা ইহুদীবাদীদের কোন ষড়যন্ত্রে যুক্ত আছেন বলে আমি বিশ্বাস করি না। ওদের বিপদে আব্বা সাহায্য করেছেন মাত্র।' বলল সাগরিকা সেন।

'আমারও তাই বিশ্বাস সাগরিকা।' ডা. বারাক বলল।

ডা. বারাক থামল।

কোন কথা কেউ বলল না।

সবার দৃষ্টি সামনে। এফবিআই হেড কোয়ার্টার প্রায় এসে গেছে। চলছে দু'টি গাড়ি পরপর একই গতিতে।

জর্জ আব্রাহাম জনসনের অফিস কক্ষ।

জর্জ আব্রাহাম তার চেয়ারে বসে।

তার টেবিলের সামনে বসে আছে পুলিশ প্রধান বিল বেকার, আহমদ মুসা, সাগরিকা সেন, শশাংক ও ডা. বেগিন বারাক।

টেবিলের এক পাশে কম্পিউটার স্ক্রীনে ডা. বারাকদের নিয়ে আসা ভিডিও ক্যাসেটের শেষ দৃশ্য এই মাত্র কম্পিউটার স্ক্রীন থেকে মিলিয়ে গেল।

ঘরে পিনপতন নিরবতা।

জর্জ আব্রাহাম জনসন ও পুলিশ প্রধান বিল বেকারের চোখে-মুখে আনন্দের উজ্জ্বল্য ঝিকমিক করে উঠেছে। আহমদ মুসার চেহারা ভাবলেশহীন।

ডা. বারাক, সাগরিকা ও শশাংক তাকিয়ে আছে এখন তাদের মুখের দিকে।

'ধন্যবাদ ডা. বারাক, সাগরিকা ও শশাংক। অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সর্বকালের জঘন্য এক ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচনে আপনারা সাহায্য করেছেন।' নিরবতা ভেঙে প্রথম কথা বলল জর্জ আব্রাহাম জনসন।

'ধন্যবাদ নাবিলার প্রাপ্য। সে নিজেকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দিয়ে এই কাজ করেছে।' বলল ডা. বারাক।

'ঠিক বলেছেন ডাক্তার বারাক। সে মিত্র পক্ষের বিরুদ্ধে যাবার ঝুঁকি নিয়ে নিজের কম্যুনিটি ও নিজ দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছে। এই ভিডিও ক্যাসেট না পেলে জঘন্য ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচনের আর কোন পথ ছিল না। নিরপরাধ হয়েও আহমদ মুসা শুধু নয়, মুসলমানদের ঘাড়ে সর্বকালের জঘন্য এক অপরাধের দায় চেপে বসত।'

‘বেন ইয়ামিনকে দেখে ঘটনার সাথে জেনারেল শ্যারন ও ইহুদীবাদীদের জড়িত থাকার কথা বুঝা গেল, কিন্তু দৃশ্যের ঘটনা যে নিউ হারমানের তা কি করে প্রমাণ হবে?’ বলল ডা. বারাক।

‘প্রথমতঃ নাবিলার স্বাক্ষ্য। দ্বিতীয়ত, দৃশ্যে যাদের পালাতে ও নিহত হতে দেখা যাচ্ছে, নিউ হারমানের নিহতদের মধ্য থেকে তাদের চিহ্নিত করা। তৃতীয়ত, যে ঘরগুলোর দৃশ্য ছবিতে দেখা যাচ্ছে, নিউ হারমানের সে ঘরগুলো খুঁজে বের করা। এই প্রমাণই যথেষ্ট হবে।’

বলে জর্জ আব্রাহাম জনসন একটু থামল এবং বিল বেকারের দিকে তাকাল। বলল, ‘আপনি শিঘ্রই এই ক্যাসেটের একটা কপি পুলিশ হেড কোয়ার্টারে পাঠান এবং একজন দায়িত্বশীল অফিসারকে নির্দেশ দিন প্রমাণগুলো রেকর্ডে আনার জন্যে। ফিল্মে ঘরগুলো ও মানুষের ছবি যে এ্যাংগলে, সে এ্যাংগলেই যেন ছবিগুলো নেয়া হয়। ফিল্মের ছবির লোকদের নাম, ঠিকানাও রেকর্ডে আনতে হবে। ঘরে যে রক্তের আলামত পাওয়া যাবে, তা যে এই ফটোর লোকদেরই তাও নিশ্চিত করতে হবে।’

‘ধন্যবাদ মি. জর্জ। এখনই ব্যবস্থা করছি।’

বলেই সে মোবাইল তুলে নিয়ে হেড কোয়ার্টারে টেলিফোন করল। প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিল এবং এখনি আসতে বলল এফবিআই হেড কোয়ার্টারে।

টেলিফোনে কথা শেষ করে বিল বেকার বলল, ‘ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমরা চোখে অন্ধকার দেখছিলাম। তিনি আলো জ্বেলে দিলেন অন্ধকারে।’

বলে বিল বেকার তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘আপনি ভাগ্যবান আহমদ মুসা। ঈশ্বর আপনার পক্ষে কাজ করেছেন।’

‘আল-হামদুলিল্লাহ। আল্লাহ সত্যপন্থীদের সব সময়ই সাহায্য করেন। আল্লাহ এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেও বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন।’ দীর্ঘ নিবরতা ভেঙে বলল আহমদ মুসা।

‘বিশেষ সাহায্যটা কি?’ প্রশ্ন করল পুলিশ প্রধান বিল বেকার।

‘লস আলামোসের গোয়েন্দা সুড়ঙ্গ উদঘাটন ও সংশিস্নষ্ট ঘটনার মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর যে অদৃশ্য ষড়যন্ত্র চেপে বসেছিল তার মুখোশ উন্মোচিত

হয়েছে এবং অবশেষে নিউ হারমানের ঘটনার মধ্যে দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধার্মিক শান্তি প্রিয় ইহুদী এবং ষড়যন্ত্রকারী ইহুদীবাদীদের আল্লাহ আলাদা করে দিলেন। এর মাধ্যমে আল্লাহ মার্কিন জাতীয় সংহতিকে আরও নিরুপদ্রব করে দিলেন।' আহমদ মুসা বলল।

'সুন্দর ব্যখ্যা দিয়েছেন আহমদ মুসা। আমি প্রেসিডেন্টকে এটা জানাব।' বলল জর্জ আব্রাহাম জনসন।

'ধন্যবাদ। মি. জর্জ আব্রাহাম, আমি উদ্বিগ্ন সারা জেফারসন ও নোয়ান নাবিলাকে নিয়ে। জেনারেল শ্যারন কতটা জঘন্য, খুনি হয়ে উঠেছে নিউ হারমানের ঘটনা তার প্রমাণ। সারা জেফারসন ও নোয়ান নাবিলাকে যা ইচ্ছে তাই করতে তার একটুও বিবেকে বাধবে না।' আহমদ মুসা বলল। তার কণ্ঠস্বর ভারী।

গম্ভীর হয়ে উঠল জর্জ আব্রাহাম ও পুলিশ প্রধান দু'জনেরই মুখ।

জর্জ আব্রাহাম বলল, 'আমি এখনি প্রেসিডেন্টের কাছে যাচ্ছি। তাঁকে সব জানাব। তার নির্দেশ বলে আজই এই ক্যাসেটের সচিত্র বিবরণ সংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেলে যাবে। আমি আশা করছি, আজই আপনি মুক্ত মানুষ হিসেবে আপনার বাসায় ফিরে যাবেন। সারা জেফারসন ও নোয়ান নাবিলাকে উদ্ধার করার জন্যে আপনার সাহায্য আমরা চাই।'

'ধন্যবাদ মি. জর্জ।' বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা থামতেই শশাংক বলে উঠল দ্রুত কণ্ঠে, 'নাবিলা জেনারেল শ্যারনদের হাতে পড়ার পূর্বক্ষণে আমাকে টেলিফোন করে ওয়াশিংটনের দু'টি ঠিকানা দিয়েছে। বলেছে, এখানেই নাবিলাকে এবং সারা জেফারসনকেও পাওয়া যাবে।'

শশাংক থামার প্রায় আগেই আহমদ মুসা বলে উঠল, 'ঠিকানা তোমার কাছে এখন আছে?'

'আছে।' বলল শশাংক।

শশাংক পকেটে হাত দিয়ে এক টুকরো কাগজ বের করল এবং আহমদ মুসার দিকে তুলে ধরল।

আগ্রহের সাথে আহমদ মুসা কাগজটি হাতে নিয়ে ঠিকানা দু'টির উপর ভালোভাবে চোখ বুলিয়ে নিল। স্মৃতিতে তার গেঁথে নিল ঠিকানা দু'টো। তারপর আহমদ মুসা কাগজটি এগিয়ে ধরল জর্জ আব্রাহামের দিকে।

জর্জ আব্রাহাম ঠিকানা দু'টির উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে তা এগিয়ে দিল বেকারের দিকে। বলল, 'টুকে নিন ঠিকানা দু'টো বিল বেকার।'

তারপর দ্রুত আব্রাহাম জনসন নক করল ইন্টারকমের একটা কি'তে।

সংগে সংগেই কথা বলে উঠল এফবিআই-এর অপারেশন কমান্ডার। জর্জ আব্রাহাম তাকে ঠিকানা দু'টো দিয়ে নির্দেশ দিল, কারো সন্দেহের সৃষ্টি না হয় এভাবে ঠিকানা দু'টোর উপর সার্বক্ষণিক নজর রাখ। কেউ সেখানে ঢুকুক ক্ষতি নেই, কিন্তু কেউ বেরুলে তাকে দূরে সরিয়ে এনে সবার অলক্ষে গ্রেপ্তার করতে হবে। এর অর্থ কেউ যেন ঠিকানা দু'টো থেকে বেরিয়ে পালিয়ে যেতে না পারে।'

কথা শেষ করে জর্জ আব্রাহাম তাকাল বিল বেকারের দিকে। বলল, 'বলুন মি. বেকার। আর কি করণীয়।'

'ঠিকানা দু'টোতে আজই অভিযান হওয়া দরকার এবং এই অভিযান আহমদ মুসার হাতে দিলে কেমন হয়।' বলল বিল বেকার।

'ধন্যবাদ মি. বেকার। আমিও একথাই ভাবছিলাম। আহমদ মুসা আমাদের সাথে থাকবেন শুধু নয়, সব দায়িত্ব তাকেই পালন করতে হবে।

কথাগুলো বলে একটু থেমে আহমদ মুসার দিকে চেয়ে বলল, 'এবার আপনি বলুন আহমদ মুসা।'

'আমি সাথে থাকব অবশ্যই।' বলল আহমদ মুসা।

'আপনি এর বেশী কিছু বলবেন না তা জানি।'

বলে জর্জ আব্রাহাম জনসন তাকাল শশাংকের দিকে। বলল, 'শশাংক তোমাকে সহস্র ধন্যবাদ দিলেও ধন্যবাদ শেষ হবে না। দেশ তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।'

'স্যার আমি বাহক মাত্র। যা করার সব করেছে নাবিলা।' বলল শশাংক।

‘নাবিলা এ দেশের ইহুদীদের আদর্শ হতে পারে। তার কম্যুনিটির স্বার্থে, দেশের স্বার্থে আমাকে ধরিয়ে দেয়াকে যখন সে ঠিক মনে করেছে, তখন আমার সাথে তার পরিচয়, সাগরিকার সাথে তার বন্ধুত্ব, শশাংকের সাথে তার সম্পর্ক সব ভুলে গিয়ে সে ইহুদী কমান্ডোদের সাথে নিয়ে আমাকে ধরতে ছুটে এসেছিল। আর আজ দেশ ও তার কম্যুনিটির স্বার্থেই সে একান্ত মিত্র জেনারেল শ্যারনদের মৃত্যুবান শুধু আমাদের হাতে তুলে দেয়া নয়, নিজেকেও বিপদের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। ধন্যবাদ নাবিলাকে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমাদের ডা. বারাক আংকলের প্রকৃত শিষ্য সে।’ বলল সাগরিকা সেন।

‘আমরা তার জন্যে গর্বিত।’ ডা. বারাক বলল।

‘মানুষে মানুষে কত পার্থক্য। একই কম্যুনিটির, কিন্তু নাবিলাকে যদি বলা হয় ফেরেশতা, তাহলে জেনারেল শ্যারনকে বলতে হয় শয়তান।’

‘জার্মানীতে যে ইহুদী হত্যাকান্ড ঘটেছে, তা শুধু নাজীদের কাজ নয়, তার মধ্যে এই শয়তানদের হাত ছিল।’ বলল আহমদ মুসা।

‘নিউ হারমানে হত্যাকান্ডের উদ্দেশ্য ছিল আপনাকে ফাঁদে ফেলা, জার্মানীর হত্যাকান্ডে যদি তাদের হাত থাকে, তাহলে তার উদ্দেশ্য কি ছিল?’ সাগরিকা সেন বলল।

‘ইহুদীদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করে ফিলিস্তিনে মাইগ্রেট করতে বাধ্য করা। দ্বিতীয় আর একটি কারণ ছিল, বিশ্বের মানুষের মধ্যে ইহুদীদের প্রতি দরদ সৃষ্টি করা এবং ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্রের পক্ষে বিশ্ব জনমত সৃষ্টি করা। দুই উদ্দেশ্যই তাদের সফল হয়েছে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘জার্মানীর ব্যাপারটা অনেক আগের, যুদ্ধকালীন অবস্থায় তা ঘটেছিল। সে সব আমাদের কাছে খুব স্পষ্ট নয়। কিন্তু নিউ হারমানের ঘটনা আমেরিকানদের হতবাক করে দেবে।’ বিল বেকার বলল।

‘শুধু হতবাক নয়, অর্ধশতকেরও বেশি কাল ধরে ইহুদীবাদীরা যে ইমেজ গড়ে তুলেছিল তা ধুলিস্মাত হয়ে যাবে। আর আমেরিকানদের জন্যে এর খুব বেশী প্রয়োজন ছিল।’ বলল জর্জ আব্রাহাম জনসন।

জর্জ আব্রাহাম থামতেই আহমদ মুসা বলে উঠল, ‘বেঞ্জামিন বেকনের সাথে আমার জরুরী যোগাযোগ প্রয়োজন মি. জর্জ।’

‘অল রাইট আহমদ মুসা আপনি আপনার রেষ্ট রুমে ফিরে যান। ওখানে গিয়েই সুসজ্জিত একটা ব্যাগ পেয়ে যাবেন। তাতে সবরকম যোগাযোগ এবং আপনার অভিযানের রশদ-পত্রও পেয়ে যাবেন। আমিও এখন উঠছি। প্রেসিডেন্টের ওখানে যাব।’

একটু থামল জর্জ আব্রাহাম। তারপর সাগরিকা সেনদের দিকে চেয়ে বলল, ‘অনুগ্রহ করে আপনারাও কি মি. আহমদ মুসার সাথে যাবেন। সেখানে আপনাদের রেষ্টের ব্যবস্থা হচ্ছে। অন্তত প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত আপনারা আমাকে সময় দিন।

‘অবশ্যই মি. জর্জ। আমরা যাচ্ছি আহমদ মুসার সাথে।’

‘ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে।’

আহমদ মুসা, ডা. বারাকসহ সকলে উঠে দাড়াল।

উঠে দাড়াল জর্জ আব্রাহাম জনসন এবং পুলিশ প্রধান বিল বেকারও।

জর্জ আব্রাহাম বিল বেকারের দিকে চেয়ে বলল, ‘আপনি একটু বসুন মি. বেকার। আপনি আমার সাথে প্রেসিডেন্টের কাছে যাবেন। আমি তৈরী হয়ে আসছি।’

আহমদ মুসারা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আর জর্জ আব্রাহাম জনসন কয়েকটা ফাইল, ক্যাসেট, কয়েকটা টুকিটাকি জিনিস ব্রীফকেসে পুরে তার পাশের কক্ষের দিকে এগুলো।

বিল বেকার মনোযোগ দিল খবরের কাগজের দিকে।

# ৩

'নাবিলা তুমি আমাদের সাথে অসহযোগিতা করছ। যে পুলিশ তোমার সাথে কথা বলেছে, যে পুলিশের সাথে তুমি কথা বলেছ, তার ফটো দেখে, কণ্ঠস্বর শুনেও চিনতে পারবে না, এটা অসম্ভব।' কর্কশ কণ্ঠে বলল জেনারেল শ্যারন।

'দুঃখিত আমি চিনতে পারছি না। আমি তার স্বাভাবিক কণ্ঠ শুনেছি, আর এখানে শুনছি যান্ত্রিক কণ্ঠ। সে কারণেই আমি আইডেন্টিফাই করতে পারছি না।' বলল স্বাভাবিক কণ্ঠে নাবিলা।

জেনারেল শ্যারন চেয়ারে বসেছিল। উঠে দাঁড়াল। কক্ষে পায়চারি করতে লাগল অস্থিরভাবে।

কক্ষটা বলা যায় একটা হল ঘর।

কক্ষের মাঝখানে একটা ডিম্বাকৃতি টেবিল। টেবিলের চারপাশে চেয়ার।

এরই একটা চেয়ারে বসেছিল জেনারেল শ্যারন। তার চেয়ারের ঠিক বিপরীত দিকের চেয়ারে বসে আছে নোয়ান নাবিলা। টেবিলে আরও কয়েকজন বসে আছে। তাদের মধ্যে একজন হলো বেন ইয়ামিন। তার পাশেই বড় চেয়ারটায় বসে আছে আমেরিকান কাউন্সিল অব জুইস এ্যাসোসিয়েশনসের চেয়ারম্যান ডেভিড উইলিয়াম জোনস। জোনসের পাশে বসে আছে আমেরিকান জুইস পিপলস লীগের যুব বিভাগের প্রধান শামির লিকুদ।

পায়চারিরত অস্থির জেনারেল শ্যারন বেন ইয়ামিনের পাশে এসে দাঁড়াল। বলল, 'বেন, ভিডিওতে কি আছে বলে মনে কর?'

'ওকে দেখতে পেয়েছি আমি শেষ মুহূর্তে। তখন ওখানকার অপারেশন শেষ। আমার মনে হয় ঐ বাড়িতে অপারেশনের গোটা দৃশ্যই সে ধারণ করতে পেরেছে।' বলল বেন ইয়ামিন চিন্তিত কণ্ঠে।

'তার মানে বাড়ির নিহত লোকদের ছবি, ঘরগুলোর ছবি, তার সাথে গুলী বর্ষণরত তোমার ছবিও উঠেছে।' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল জেনারেল শ্যারন।

'আমার তাই আশংকা হয়।' বেন ইয়ামিনের কণ্ঠে অপরাধীর সুর।

'সর্বনাশ এই ভিডিও ক্যাসেট পুলিশ বা শত্রু কারও হাতে গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। বলল ডেভিড উইলিয়াম জোনস। ডেভিড জোনসের কথার পর গোটা কক্ষ জুড়ে নতুন করে আতংকের পরিবেশ নেমে এল।

ভীতিকর এক থমথমে নিরবতা।

'মিস নাবিলা, আপনি আমাদের সাহায্য করুন। পুলিশকে আইডেন্টিফাই করে দিন। আমরা যে কোন মূল্যে ক্যাসেট উদ্ধার করে আনব। এ জন্যে আমরা সবাই মরতে রাজি আছি এবং সবাইকে মারতেও আমরা প্রস্তুত। আমাদের শত লোকের জীবনের চেয়ে ঐ ক্যাসেটের মূল্য অনেক বেশী।' বলল শামির লিকুদ বিনয়ের সুরে।

'আমি দুঃখিত। না চিনেই কাউকে চিহ্নিত করে তো কোন লাভ হবে না।' নাবিলা বলল।

এ সময় জেনারেল শ্যারনের মোবাইলে টেলিফোন এল। মোবাইলে কথা বলল সে।

কথা শেষ করেই ঝট করে ফিরল নাবিলার দিকে। বলল তীব্র কণ্ঠে, 'নাবিলা তুমি মিথ্যা কথা বলছ, কোন পুলিশকে তুমি সেদিন কোন ক্যাসেট দাওনি।'

জেনারেল শ্যারন থামতেই কথা বলল ডেভিড উইলিয়াম জোনস। বলল, 'কার টেলিফোন ছিল ওটা। কি বলল সে?'

'আমাদের একজন পুলিশ কর্মীকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম, যে পুলিশরা সেদিন রাতে নিউ হারমানে গিয়েছিল তাদের সকলকে কৌশলে জিজ্ঞেস করতে যে ভিডিও ক্যাসেটের মত কোন প্রমাণ তারা যোগাড় করতে পেরেছে কিনা। সে এক এক করে সকলের সাথে দেখা করেছে, জিজ্ঞেস করেছে। কিন্তু কোন পুলিশই সে ধরনের কিছু পায়নি।' বলল জেনারেল শ্যারন।

'পুলিশ সে রকম কিছু পেলে ঘটা করেই বলার কথা, কৃতিত্ব জাহিরের জন্যে, গোপন করার কথা নয়। আর পুলিশ সেদিন ওখানে প্রমাণ হিসেবে যা

পেয়েছিল, তার সবই পত্রিকায় এসেছে। কিন্তু ভিডিও ক্যাসেটের কথা আসেনি। তার মানে এটাই ঠিক যে, পুলিশ এ ধরনের কিছু পায়নি।'

'ঠিক বলেছেন মি. জোনস। নাবিলা নিশ্চয় মিথ্যা কথা বলছে।'

বলে জেনারেল দৃঢ় পদক্ষেপে গিয়ে নাবিলার সামনে দাঁড়াল। আকস্মিকভাবে জোরে একটা থাপ্পড় কষল সে নাবিলার গালে। তার সাথে সাথে বলে উঠল, 'তোকে বলতে হবে কাকে দিয়েছিস ক্যাসেট।'

আকস্মিক থাপ্পড় খেয়ে পড়ে গিয়েছিল নোয়ান নাবিলা।

নিজেকে সামলে নিয়ে সে মেঝেয় উঠে বসল। প্রথমে তার দুই চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে সে ভাব তার চলে গেল। সেখানে ফুটে উঠল এক দৃঢ়তা।

নাবিলাকে থাপ্পড় মারার ঘটনা ঘরের সবাইকে চমকে দিয়েছিল। সবাই নিরব।

গোটা কক্ষ ঘিরে নিরবতা।

আবার মোবাইল বেজে উঠল জেনারেল শ্যারনের।

কথা বলল মোবাইলে সে।

কথা বলার সময়ই তার চোখ-মুখ আবার জ্বলে উঠল।

কথা শেষ করে অগ্নি ঝরা দৃষ্টিতে সে তাকাল নোয়ান নাবিলার দিকে। সে নাবিলার কাছেই দাঁড়িয়েছিল। জেনারেল শ্যারনের একটা পা ছুটল নাবিলার দিকে।

নাবিলা মেঝেয় বসেছিল। জেনারেল শ্যারনের বিদ্যুত গতির লাথি নাবিলার কাঁধ হয়ে মুখে গিয়ে আঘাত করল।

পড়ে গেল নাবিলা।

ঠোঁট ও নাক তার থেঁথলে গেছে।

নাক ও ঠোট থেকে ঝর ঝর করে রক্ত বেরিয়ে এল তার।

লাথি মেরেই ডেভিড জোনসের দিকে তাকিয়ে জেনারেল শ্যারন বলল, 'আমরা যাদেরকে পাঠিয়েছিলাম শশাংক ও সাগরিকার উপর চোখ রাখার জন্যে তাদের মধ্যে দু'জন পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে।'

‘পুলিশের হাতে? কিভাবে?’ বলল ডেভিড জোনস।

‘শশাংক, সাগরিকা ও ডাক্তার বারাক ওয়াশিংটনে ঢুকছিল। নির্দেশ অনুসারে ওরা গাড়ি সমেত তাদেরকে হাইজ্যাক করতে চেষ্টা করে। হঠাৎ পুলিশ এসে পড়ায় তাদের চেষ্টা ভন্ডুল হয়ে যায় এবং আমাদের দু’জন লোক ধরা পড়ে যায়। অবশিষ্ট দু’জন পালায় এবং ওদের ফলো করে। পুলিশ পাহারায় শশাংকরা এফবিআই হেড কোয়ার্টারে যায়। শশাংকরা বেরুবে এই অপেক্ষায় আমাদের লোকেরা প্রায় দু’ঘন্টা ওৎ পেতে থাকে। কিন্তু দু’ঘন্টাতেও তারা বের হয়নি। আমাদের লোকেরা এখনও সেখানে পাহারায় আছে। আমি ওদের চলে আসতে নির্দেশ দিয়েছি। ওদের ওখানে যাবার পথেই বাধা দেয়ার দরকার ছিল, এখন পাহারা দিয়ে লাভ নেই।’

কথাগুলো বলে জেনারেল শ্যারন আবার তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল নাবিলার দিকে। বলল, ‘বল শশাংকরা কেন দল বেঁধে এফবিআই হেড কোয়ার্টারে গেল? কাকে দিয়েছিলি তুই ক্যাসেট?’

নাবিলা ধীরে ধীরে মেঝেয় উঠে বসেছিল। তার মুখ ভেসে যাচ্ছে রক্তে। সে রক্ত মুছার চেষ্টা করেনি। তার চোখে-মুখে আগের সেই দৃঢ়তা। শ্যারনের প্রশ্নের জবাবে সে বলল, ‘আমি যা বলেছি তার বাইরে আমার আর কিছু বলার নেই। শশাংকদের কথা আমি জানি না।’

‘বলতে হবে তোকে, সবই বলতে হবে। জানবি তুই সবই।’

বলে জেনারেল শ্যারন পাশের ওয়াল ক্যাবিনেট থেকে একটা চাবুক বের করে নিল এবং চাবুক দিয়ে নির্দয়ভাবে প্রহার শুরু করল নাবিলাকে।

নাবিলা দাঁতে দাঁত চেপে চোখ বন্ধ করে নিয়েছে। চিৎকার করে আর্তনাদ করে এদের করুণা পাওয়া যাবে না। যারা নিউ হারমানে ঠান্ডা মাথায় নিজের কম্যুনিটির লোককে খুন করেছে, তারা মানুষ নয়। এদের কাছে কান্নার কোন অর্থ নেই।

এতটুকুও কাঁদল না নাবিলা।

গা ফেটে ঝর ঝর করে রক্ত বেরিয়ে এল। দাঁতে দাঁত চেপে সব সহ্য করল নাবিলা।

চাবুকের কয়েকটা ঘা পড়তেই নাবিলা নাক গুঁজে মেঝেয় পড়ে গেল।

'আশ্চর্য, এই চাবুকের ঘা খেয়ে ঘোড়াও চিৎকার করতো। কিন্তু নাবিলার মুখে একটি রা'ও উচ্চারিত হলো না। বড় শক্ত চীজ জেনারেল শ্যারন।' বলল ডেভিড জোনস।

জ্বলে উঠল জেনারেল শ্যারনের চোখ। তার হাতের চাবুক আরও দ্রুত হলো, আরও নির্মম হলো।

মুখ তুলল নাবিলা। বিপর্যস্ত চেহারা। কিন্তু চোখ দু'টি জ্বলছে। বলল, 'তোমরা মানুষ নও। তোমরা আমেরিকার শত্রু। নিউ হারমানের নিরপরাধ মানুষদের তোমরা খুন করেছ।'

থেমে গেল জেনারেল শ্যারনের চাবুক।

তার চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল। চাবুক হাতে গুটাতে গুটাতে বলল, 'কে বলল আমরা খুন করেছি। কে বলল তোকে। তুই জানলি কেমন করে?'

'আমেরিকার শত্রু শয়তান। মনে করেছিলি কেউ জানবে না। ভিডিও ক্যাসেট তোদের মুখোশ খুলে দেবে, নগ্ন করে দেবে তোদেরকে।' বলল তীব্র কণ্ঠে নোয়ান নাবিলা।

পাগল হয়ে উঠল যেন জেনারেল শ্যারন। তার হাতের চাবুক শপাং করে ছোবল হানল নাবিলার মুখে। বলল চিৎকার করে, 'বল হারামজাদি, ক্যাসেট কোথায়? বলতে হবে তোকে?'

'বলব না আমি। আমাকে মেরে ফেললেও না। আমি মরে যাব কিন্তু তোরা কেউ বাঁচবি না।' বলল নাবিলা আর্ত কণ্ঠে। রক্তে জড়িয়ে গেল তার কথা।

আবার চাবুকটি হাতে গুটিয়ে নিয়ে জেনারেল শ্যারন চেয়ারে বসল। চাবুক তার ব্যর্থ হয়েছে বুঝে নিয়েছে সে। তার চোখে-মুখে ভাবনার চিহ্ন।

'মি. শ্যারন, চাবুক তার কিছু করতে পারেনি, পারবেও না তা পরিষ্কার। ভিন্ন পথে নিন। যার দেহ শক্ত, তার মান ও মর্যাদায় ঘা দিতে হয়। আদর্শবাদীরা জীবনের চেয়ে মানকে বড় করে দেখে।' বলল ডেভিড জোনস।

শুনেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল জেনারেল শ্যারন। বলল, 'ধন্যবাদ মি. জোনস। পেয়েছি, হারামজাদিকে কথা বলাবার অস্ত্র পেয়েছি।'

বলে উঠে গেল নাবিলার কাছে। নাবিলারই কাপড়ের এক প্রান্ত নিয়ে তার মুখের রক্ত পরিষ্কার করল। বলল, ‘নাবিলা তোমার সুন্দর মুখ একটু আহত হয়েছে বটে, দেহটাও কিছু ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, কিন্তু তোমার অপরূপ সুন্দর, নরম দেহটা যে কোন পুরুষের কাছে লোভনীয়। বিশেষ করে আমাদের গেটের সিকুরিটি সাড়ে ছয় ফুট উচ্চতার পর্বতসম মানুষ কৃষ্ণাংগ আলফ্রেডের কাছে তোমার দেহটা খুবই মজার খাদ্য হবে। তুমি এই মুহূর্তে ক্যাসেট কোথায় না বললে তাকে ডাকব। ভেবেছ তুমি মরে রক্ষা পাবে? না তোমাকে মারব না। আলফ্রেডদের দিয়ে তোকে কুরে কুরে খাওয়াব।’

বলে উঠে দাঁড়াল জেনারেল শ্যারন।

‘শয়তান তোদের কোন সাহায্য আমি চাইব না, ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করবেন।’ নাবিলা কিন্তু কথাটা খুব দৃঢ় কণ্ঠে বলতে পারল না। তার যে দেহ-মন চাবুকের নির্দয় আঘাত সহ্য করেছে নিরবে, কিন্তু সেই মন তার এখন কেঁপে উঠেছে জেনারেল শ্যারনের কথায়। এই অপমান তার মন সইতে পারবে না। কিন্তু কি করবে সে।

নাবিলার চিন্তা বাধা পেল জেনারেল শ্যারনের কথায়। শ্যারন বলছে, ‘এই তোর শেষ কথা? ডাকব আলফ্রেডকে?’

‘আমি কোন কথা তোমাদের বলব না। ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করবেন।’ কম্পিত কণ্ঠে কথাগুলো বলল নাবিলা। বুক কাঁপছে তার।

‘ঈশ্বর তোকে বাঁচাবে না নাবিলা। ঈশ্বর তোর কপালে যা লিখেছেন, তাই এখন ঘটবে।’

বলে শামির লিকুদের দিকে চেয়ে জেনারেল শ্যারন বলল, ‘যাও তুমি আলফ্রেডকে নিয়ে এস শামির লিকুদ।’

শামির লিকুদ গিয়ে আলফ্রেডকে নিয়ে এল।

আলফ্রেডকে দেখেই জেনারেল শ্যারন বলল, ‘আলফ্রেড, তোমার জন্যে ভাল ভোজের ব্যবস্থা করেছি। নাবিলা ম্যাডামকে নিশ্চয় তোমার পছন্দ হবে।’

আলফ্রেডের কুত কুতে চোখ চক চক করে উঠল। তাতে ঝরে পড়ল লালসার আগুন। আলফ্রেডকে দেখেই চোখ বন্ধ করেছে নাবিলা।

'চোখ বন্ধ করলেও তোমার দেহ রক্ষা পাবে না নাবিলা। জেনে রাখ আলফ্রেড মাথা ধোলাই করা এক কুকুর। আদেশ পালন ছাড়া আর কিছু বুঝে না। কারো প্রতি কোন দয়া-মায়াও তার নেই। এখনও ভেবে দেখ।'

নাবিলা চোখ বন্ধ করেই থাকল। কোন কথা বলল না।

'আলফ্রেড যাও, নাবিলা এখন তোমার। শুধু দেখবে হারামজাদি যাতে জ্ঞান হারিয়ে না ফেলে। সজ্ঞানে রেখে তাকে ভোগ করতে হবে।'

আলফ্রেড হেলে দুলে এগুলো তার দিকে। বাঘ যেন এগুচ্ছে হাতের মধ্যে পাওয়া শিকারের দিকে।

হঠাৎ কথা বলে উঠল শ্যারন। বলল, 'থাম আলফ্রেড। এত বড় মহোৎসবের এটা উপযুক্ত জায়গা নয়। ওকে নিয়ে চল সারা জেফারসনের ঘরে। সেখানেই অনুষ্ঠিত হবে তোমার ভোজের মহোৎসব।'

বলে ডেভিড জোনসের দিকে তাকিয়ে জেনারেল শ্যারন বলল, 'এটাই ভাল মি. জোনস। আমরা সারা জেফারসনেরও সাহায্য দাবী করব নাবিলাকে কথা বলাবার জন্যে।'

'ভাল আইডিয়া, চলুন।'

শ্যারন ও ডেভিড জোনস উঠে চলে এল সারা জেফারসনের কক্ষে। বেন ইয়ামিন শ্যারনের কানে কানে কিছু বলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

সারা জেফারসন শুয়ে ছিল।

দরজা খুলতেই সে উঠে বসেছে।

রক্তাক্ত নাবিলাকে দেখে সে চমকে উঠল।

নাবিলাকে সারা জেফারসন চেনে না।

জেনারেল শ্যারন নাবিলাকে ধাক্কা দিয়ে সারা জেফারসনের দিকে ঠেলে দিল। বলল, 'তোমার আহমদ মুসার ভক্ত শশাংকের প্রেমিকা এ নাবিলা। আমাদের একটি ভিডিও ক্যাসেট চুরি করে কাকে দিয়েছে বলছে না। শেষ পর্যন্ত আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি তাকে আমাদের এ ক্ষুধার্ত আলফ্রেডের হাতে ছেড়ে দেব। আলফ্রেড তাকে কুরে কুরে খাবে, দেখি কত সহ্য করে, কথা বলে কিনা। তার আগে তোমার কাছে নিয়ে এলাম। তুমি একে কথা বলাতে পারো কিনা। এ মুহূর্তে

আমাদের জানা দরকার ক্যাসেটটি কার কাছে। পাঁচ মিনিট সময় দিলাম তোমাকে। এ সময়ের মধ্যে কথা না বললে তোমার সামনে এখানেই আলফ্রেড তার কাজ শুরু করবে।'

জেনারেল শ্যারনের কথা শুনে ভীষণভাবে কেঁপে উঠল সারা জেফারসন। তার দেহের সমস্ত রক্ত জমে যাওয়ার অবস্থা হলো। এ ভয়ংকর অবস্থা কোন নারী সহ্য করতে পারে না, কোন নারীর চোখ তা দেখতে পারে না। মুহূর্তেই সারা জেফারসন তার দেহের সব শক্তি, সব ওজন যেন হারিয়ে ফেলল। তাকাল সে নাবিলার দিকে।

নাবিলা সারা জেফারসনের পায়ের কাছে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

সারা জেফারসন উঠে দাঁড়িয়ে টেনে তুলল নাবিলাকে। নাবিলা সারা জেফারসনকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল। সারা জেফারসনও তাকে জড়িয়ে ধরল।

বলল সারা জেফারসন নাবিলাকে বুকে জড়িয়ে ধরে রেখেই, 'বোন ভিডিও ক্যাসেটের কথা ওদের বলে দাও।'

নাবিলা ধীরে ধীরে মুখ তুলল সারা জেফারসনের বুক থেকে। বলল, 'আপা আপনাকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে আহমদ মুসাকে ফাঁদে আটকাতে চাচ্ছে। এরপর আহমদ মুসাকে মার্কিন সরকার ও মার্কিন জনগণের কাছে ঘৃণিত অপরাধী প্রমাণের জন্যে ওরা নিজেরাই নিউ হারমানের ইহুদী জনপদে যে গণহত্যা চালিয়েছে সেই দায় চাপিয়ে দিতে চাইছে আহমদ মুসার উপর। সেখানকার বাসিন্দা এক সাংবাদিকের একটা ভিডিও ক্যাসেট পেয়েছি আমি, যা প্রমাণ করে ঐ হত্যাকান্ড জেনারেল শ্যারন ঘটিয়েছে, আহমদ মুসা নয়। এদেরকে অপরাধী প্রমাণের এবং আহমদ মুসাকে নির্দোষ প্রমাণিত করার একমাত্র অবলম্বন এই ভিডিও ক্যাসেট। আমি বলব না এটা আমি কাকে দিয়েছি। শুধু আহমদ মুসাকে নির্দোষ প্রমাণ নয়, আমেরিকান ইহুদীদেরকে এদের ষড়যন্ত্রের হাত থেকে বাঁচাতেও চাই আমি। আমার জীবন দিয়ে আমি এটা করব।'

নিউ হারমানের কাহিনী সারা জেফারসনও আজ পড়েছে। সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল নাবিলার কথায়। সেই সাথে নাবিলার প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধায় ভরে গেল তার মন। পরক্ষণেই কেঁপে উঠল তার হৃদয় নাবিলার পরিণতি চিন্তা

করে। সারা জেফারসন নিশ্চিত, ঐ ক্যাসেট উদ্ধারের জন্যে কোন কিছু করতেই তাদের বাধবে না। এক নারী মন নিয়ে নারী নাবিলার এই দিকটা চিন্তা করতে গিয়ে এটাই তার কাছে বড় হয়ে উঠল। সারা জেফারসন আরও ভাবল, ক্যাসেটটি কাকে দিয়েছে তা বলে দেয়ার অর্থ ক্যাসেটটি জেনারেল শ্যারনরা পেয়ে যাওয়া নয় কিংবা সেই লোকটি শ্যারনদের হাতে ধরা পড়ে যাওয়া নয়। নাবিলা ধরা পড়ার পর সে লোকটি নিশ্চয় ইতিমধ্যে নিজেকে ও ক্যাসেটকে রক্ষার ব্যবস্থা করেছে। সুতরাং নাবিলা কথাটা বলে দিলে ক্ষতি নেই। এই কথা চিন্তা করে সারা জেফারসন নাবিলাকে বলল, 'নাবিলা, বোন, আমি ভেবে দেখলাম নামটা তুমি বলতে পার।'

'না, আপা। এদের কোন সহযোগীতা আমি করব না। নাম বললেও এরা আমাকে বাঁচতে দেবে না, আমার মর্যাদা রক্ষা করবে না। যারা অন্যকে ফাঁসাবার জন্যে নিজের স্বজাতির উপর গণহত্যা চালায়, তাদের আমি বিশ্বাস করি না।' কাঁদতে কাঁদতে বলল নাবিলা।

নাবিলার কথা শেষ হতেই জেনারেল শ্যারন ঝাঁপিয়ে পড়ল নাবিলার উপর এবং নাবিলাকে সারা জেফারসনের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ছুড়ে দিল আলফ্রেডের কাছে।

আলফ্রেড তাকে বুকে জড়িয়ে কামড় বসাল নাবিলার রক্তাক্ত গালে। জেনারেল শ্যারন সারা জেফারসনের এক ফুটের ব্যবধানে দাঁড়িয়েছিল। তার কোটের সাইড পকেটে রিভলবার। রিভলবারের ভারীতে পকেটের মুখ কিছুটা ফাঁক হয়ে আছে।

সারা জেফারসন এটা লক্ষ করার সংগে সংগে চোখের পলকে ডান হাত দিয়ে তার পকেট থেকে রিভলবারটি তুলে নিয়ে রিভলবারের নল জেনারেল শ্যারনের মাথায় ঠেকিয়ে বলল, 'জেনারেল শ্যারন, নাবিলাকে ছেড়ে দিতে বল আলফ্রেডকে। না হলে এখনি তোমার মাথা উড়ে যাবে।'

ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল জেনারেল শ্যারন। সে দ্রুত বলল, 'আলফ্রেড ছেড়ে দাও নাবিলাকে।'

আলফ্রেড নাবিলাকে ছেড়ে দিল।

ছাড়া পেয়ে ডেভিড উইলিয়াম জোনসের সামনে দিয়ে নাবিলা আসছিল সারা জেফারসনের কাছে।

হঠাৎ ডেভিড জোনস একটু নিচু হয়ে দু'হাত নাবিলার কোমর বরাবর নিয়ে দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে ছুঁড়ে দিল সারা জেফারসনের দিকে।

নাবিলা হুমড়ি খেয়ে গিয়ে পড়ল সারা জেফারসনের উপর।

ঘটনা এতটাই আকস্মিকভাবে ঘটে গেল যে, সারা জেফারসন সাবধান হবারও সুযোগ পেল না। নাবিলা তার গায়ের উপর এসে পড়ায় সারা জেফারসন ভারসাম্য রক্ষা করতে না পেরে পড়ে গেল।

সংগে সংগে জেনারেল শ্যারন ঝাঁপিয়ে পড়ে রিভলবার কেড়ে নিল সারা জেফারসনের হাত থেকে।

উঠে দাঁড়াল জেনারেল শ্যারন।

বিকট শব্দে হো হো করে হেসে উঠল সে। বলল সে, 'ধন্যবাদ ডেভিড জোনস।'

তারপর সে ফিরে দাঁড়াল সারা জেফারসনের দিকে শয়তানের মত ক্রুর দৃষ্টি নিয়ে। বলল, 'শয়তানি। তোকে আমরা যথেষ্ট সম্মান দিয়েছি, আর নয়। তুই বাঁচাতে চেয়েছিলি নাবিলাকে আলফ্রেডের হাত থেকে। এবার তাহলে তুইই প্রথমে আলফ্রেডের স্বাদটা গ্রহণ কর।'

বলে জেনারেল শ্যারন নিচু হলো সারা জেফারসনকে ধরার জন্যে।

সারা জেফারসন তখন মাটিতে পড়েছিল। সে লক্ষ করছিল জেনারেল শ্যারনকে।

হঠাৎ সারা জেফারসনের একটি পা বিদ্যুত বেগে ছুটে গেল জেনারেল শ্যারনের রিভলবার ধরা হাত লক্ষে।

জেনারেল শ্যারনের হাত থেকে রিভলবার ছিটকে গিয়ে পড়ল সারা জেফারসনের মাথার পেছনে।

রিভলবার মাথার পেছনে পড়তেই সারা জেফারসন তার দু'পা পেছন দিকে ছুড়ে দিয়ে দেহটা উল্টিয়ে রিভলবারের উপর গিয়ে পড়ল।

রিভলবার হাতে নিয়েই উঠে দাঁড়াল সারা জেফারসন। তার রিভলবারের নল তাক করা জেনারেল শ্যারনের দিকে।

কিন্তু সারা জেফারসন লক্ষ করেনি ডেভিড উইলিয়াম জোনস তার রিভলবার বের করে নিয়েছে হাতে। তার রিভলবারের নল উঠে আসছে সারা জেফারসনের লক্ষে।

ডেভিড জোনসের গুলী এসে বিদ্ধ করল সারা জেফারসনের রিভলবার ধরা হাতকে।

হাত থেকে রিভলবার ছিটকে পড়ে গেল।

আকস্মিক এই গুলী খেয়ে সারা জেফারসন কঁকিয়ে উঠে বাঁ হাত দিয়ে চেপে ধরল আহত ডান হাতটা।

জেনারেল শ্যারন ক্ষীপ্র গতিতে মেঝে থেকে তুলে নিল রিভলবার।

আবার সেই অট্টহাসি জেনারেল শ্যারনের। বলল সারা জেফারসনকে লক্ষ করে, 'তুই যে এতবড় বাঘিনী তা জানতাম না। 'ফ্রি আমেরিকার' নেত্রী যে তুই ভুলেই গিয়েছিলাম।'

বলে একটু দম নিল জেনারেল শ্যারন। তারপর হেসে উঠে বলল, 'সারা জেফারসন, তোর মত বাঘিনী আলফ্রেডের মত গেরিলার বাহু বন্ধনে পড়লে কেমন হয় দেখতে ভালই লাগবে আমাদের।'

কথা শেষ করে জেনারেল শ্যারন সারা জেফারসনকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে ছুড়ে দিল আলফ্রেডের কাছে।

আলফ্রেড গেরিলার মত দু'হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরল তাকে।

চিৎকার করে উঠল নাবিলা, 'জেনারেল শ্যারন ছেড়ে দাও সারা জেফারসনকে। ক্যাসেটের খবর তোমাদেরকে দিচ্ছি।'

'বল।' বলল জেনারেল শ্যারন।

'শশাংককে দিয়েছি।'

'শশাংককে দিয়েছ? সে তো এখন জর্জ আব্রাহাম জনসনের কাছে। সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু ধরতে চেষ্টা করেও আমরা পারিনি।'

বলেই পাগলের মত হেসে উঠল। বলল, 'শয়তানি আমাদের সর্বনাশ করেছিস, তোদের সর্বনাশ আমরা করব।'

তারপর আলফ্রেডকে বলল, 'তুমি ছেড় না আলফ্রেড, ও বড় শয়তানি। আমরা চাই, শয়তানির শাস্তি যেন সে সারা জীবন মাথায় বয়ে বেড়ায়।'

ঘুরে দাঁড়াল আবার সে নাবিলার দিকে। নাবিলাকে তাক করে তুলল তার রিভলবার।

অন্যদিকে আলফ্রেড সারা জেফারসনকে মেঝেয় ছুড়ে ফেলে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর।

এ সময় তার রিভলবারের একটা গর্জন জেনারেল শ্যারনের কানে এসে পৌছল। রিভলবারের ট্রিগারে জেনারেল শ্যারনের তর্জনি স্থির হয়ে গেল। সে তাকাল দরজায় দাঁড়ানো ষ্টেনগানধারীর দিকে। দেখতে পেল দু'জন ষ্টেনগানধারীর মধ্যে একজনকে। বলল,'দেখ হারজেল কোথায় গেল? শব্দটা তার রিভলবারের?

ষ্টেনগানধারী দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

আলফ্রেডও তখন থমকে গেছে।

মুখ ঘুরিয়ে তাকাল আলফ্রেড জেনারেল শ্যারনের দিকে।

টার্গেট বাড়িটার আর একটা বাড়ির পরেই জর্জ আব্রাহাম জনসন গাড়ি দাঁড় করাতে বলল।

দাঁড়াল গাড়ি। গাড়িতে আরোহী পাঁচ জন।

ড্রাইভিং সিটে আহমদ মুসা। তার পাশের সিটে আব্রাহাম জনসন। পেছনের সিটে বেঞ্জামিন বেকন এবং সাদা পোশাকে একজন পুলিশ ও একজন এফবিআই অফিসার।

পেছনে আরেকটা মাইক্রো। তাতে রয়েছে আরও দশ বারোজন এফবিআই ও পুলিশের লোক।

গাড়ি দাঁড়াতেই আব্রাহাম জনসন তার ওয়াকিটকিতে বলল, ‘স্টিফেন গত দু’ঘন্টার রিপোর্ট বল।’

ওপার থেকে বলল, ‘স্যার ১ ঘন্টা ৪০ মিনিট আগে জেনারেল শ্যারন নাবিলাকে নিয়ে এ বাড়িতে ঢুকেছে। তার সাথে ছিল ডেভিড উইলিয়াম জোনস এবং আরও দু’জন। গত দু’ঘন্টায় তারাই শুধু বাড়িতে ঢুকেছে কেউ বের হয়নি। সারাদিনই গেটের সিকুরিটি বক্সে পর্বতাকার নিগ্রো লোকটা বসেছিল। মিনিট পনের বিশ আগে একজন এসে তাকে ভেতরে ডেকে নিয়ে গেছে। গেটে অন্য একজন লোক বসেছে।’

‘ওভার।’ বলে ওপ্রান্তের কণ্ঠ থামলে জর্জ আব্রাহাম বলল, ‘বাড়ি সম্পর্কে খোঁজ নিতে বলা হয়েছিল। কোন তথ্য তোমার কাছে এসেছে?’

ওপারের কণ্ঠ আবার ভেসে এল, ‘স্যার, বাড়িটা শিব শংকর সেনের। একটা প্রাইভেট ডিটেকটিভ ফার্মের কাছে বাড়িটা ভাড়া ছিল দীর্ঘদিন। দিন পনের আগে খালি হয়েছে। নতুন কোন ভাড়াটিয়া আসেনি। শিব শংকর সেনের লোকদেরই এখানে দেখা গেছে। ওভার।’

কথা শেষ করে ওয়াকিটকি অফ করে জর্জ আব্রাহাম বলল, ‘তাহলে মি. আহমদ মুসা, অবস্থা দাঁড়াচ্ছে, সারাদিন কেউ বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়নি, ঘন্টা দু’য়েকের মধ্যে ঢুকেছে নাবিলাসহ পাঁচজন। আপনার ভাবনা কি বলুন মি. আহমদ মুসা।’

‘আমার মনে হয় এটা জেনারেল শ্যারনদের কোন ঘাঁটি নয়। তাদের একটা সাময়িক আশ্রয় এটা। খুব বড় কোন নিরাপত্তার ব্যবস্থা আছে বলে আমার মনে হয় না।’

‘ধন্যবাদ আহমদ মুসা। এখন আমরা কি করব?’ বলল জর্জ আব্রাহাম।

‘আমাদের এ গাড়িটা গেট পর্যন্ত নেব। পেছনের গাড়ির ওরা এখানে কোথাও গাড়ি পার্ক করে বাড়ির চারদিকে অবস্থান নিক। পরে যেভাবে বলা হয়েছে, সেভাবে কাজ করবে।’ বলল আহমদ মুসা।

পেছনের পুলিশ অফিসার আহমদ মুসার এ নির্দেশ ওয়াকিটকিতে জানিয়ে দিল পেছনের গাড়িকে।

আহমদ মুসার গাড়ি ষ্টার্ট নিল আবার।

গাড়ি গিয়ে গেটের মুখোমুখি দাঁড়াল।

লাফ দিয়ে আহমদ মুসা গাড়ি থেকে নামল।

গেটের পাশে গেটের সাথে লাগানো সিকুরিটি বক্স।

গাড়ি দাঁড়াতেই সিকুরিটি বক্সের দরজায় একজন লোক এসে দাঁড়াল। যুবক একহারা পেটা শরীর। কিন্তু দাঁড়ানোর মধ্যে একটা গাছাড়া ভাব। আহমদ মুসা বুঝল এ পেশাদার কেউ নয়।

আহমদ মুসা গেটের কাছে তাকে ডাকল। লোকটি এলে সে বলল, 'আমি শিব শংকর সেনের পরিচিত। তোমার গেট বক্সে কি টেলিফোন আছে। আমি জেনারেল শ্যারনের সাথে একটু কথা বলব।'

আহমদ মুসার কথাগুলো এত সহজ, স্বাভাবিক ছিল যে কোন কিছু ভাববার তার সুযোগই হলো না। নিজেদের লোককে যেভাবে স্বাগত জানায়, সেভাবেই স্বাগত জানিয়ে আহমদ মুসাকে সেই বক্সে নিয়ে গেল।

লোকটি আগে আগে যাচ্ছিল, আহমদ মুসা পেছনে।

গেট বক্সে ঢুকেই আহমদ মুসা পেছন থেকে দরজাটা ঠেলে দিয়ে বাঁ হাতে লোকটির গলা পেঁচিয়ে ধরে ডান হাতে ক্লোরোফরম প্যাড তার নাকে চেপে ধরল।

কিছুক্ষণ দু'হাতের বাঁধন খোলার চেষ্টা করে লোকটি নেতিয়ে পড়ল। সংজ্ঞাহীন লোকটিকে আহমদ মুসা চেয়ারে বসিয়ে টেবিলে ঠেস দিয়ে রেখে দিল, যেন সে ঘুমোচ্ছে এই ভাবে।

বেরিয়ে এসে আহমদ মুসা গেট খুলে গাড়ি ভেতরে নিল। তারপর গেট বন্ধ করে গাড়ি নিয়ে গাড়ি বারান্দায় দাঁড় করাল।

'ধন্যবাদ আহমদ মুসা, গেটকে যেভাবে সহজে ম্যানেজ করেছেন, সেভাবেই সামনের কাজ ইশ্বর সহজ করে দেবেন।' বলল জর্জ আব্রাহাম জনসন আহমদ মুসাকে লক্ষ করে।

আহমদ মুসা গাড়ি থেকে নামার জন্যে পা বাড়িয়ে জর্জ আব্রাহামের দিকে ফিরে বলল, 'মি. জর্জ সব কথাই তো হয়েছে। আপনারা আসুন। আমি ভেতরে ঢুকছি।'

আহমদ মুসা নামল গাড়ি থেকে।

গাড়ি বারান্দা থেকে কয়েকটা ধাপ পেরিয়ে উপরের বারান্দায় উঠল আহমদ মুসা। সামনেই বড় একটা দরজা। ভেতরে ঢোকার এটাই প্রধান গেট।

আস্তে দরজার নবে চাপ দিল আহমদ মুসা। নব ঘুরে গেল। তার মানে দরজা খোলা।

নব ঘুরিয়ে আহমদ মুসা আসেত্ম আসেত্ম দরজা ফাঁক করে উঁকি দিল। ভেতরে কার্পেট মোড়া সোফা সাজানো বিরাট হলঘর। হলঘরের শেষ প্রান্তটা থেকে একটা সিঁড়ি দোতালায় উঠে গেছে। সিঁড়ির এ পাশে মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটায় কয়েকজন গোল হয়ে বসে খবরের কাগজ দেখছে। ওরা ছয়জন। তাদের প্রত্যেকের কাঁধে ছোট ব্যারেলের হালকা সাইজের আধুনিকতম ষ্টেনগান।

আহমদ মুসা সোল্ডার হোলষ্টার থেকে তার প্রিয় এম-১০ মেশিন রিভলবারটা ডান হাতে নিয়ে বাঁ হাতে নিঃশব্দে দরজা ফাঁক করে ভেতরে ঢুকে গেল। বেড়ালের মত কয়েক ধাপ এগুলো সামনে। এবার গোটা হলঘর তার নজরে এল। চারদিকে তাকিয়ে দেখল আর কেউ কোথাও নেই।

আরও কয়েক ধাপ এগুলো আহমদ মুসা। ওদের সাথে ব্যবধান এখন মাত্র দু'তিন গজের।

এক সাথেই ওদের সবার নজরে পড়ে গেল আহমদ মুসা। সংগে সংগে সবাই হাত দিয়েছিল তাদের ষ্টেনগানে।

'হাত আর কেউ একতিল নড়াবে না। যে যে অবস্থায় আছ উপুড় হয়ে শুয়ে পড়।' অনুচ্চ কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

ওরা একবার আহমদ মুসার দিকে, আরেকবার তার এম-১০ মেশিন গানটার দিকে তাকিয়ে শুয়ে পড়ল মেঝের উপর।

এ সময় জর্জ আব্রাহাম ঘরে ঢুকল অবশিষ্ট দু'জনকে নিয়ে।

আহমদ মুসা অফিসার দু'জনকে বলল, 'আসুন ওদের গায়ের জামা ছিড়ে মুখে পুরে দিয়ে ওদেরকে বেঁধে ফেলুন।'

বলে আহমদ মুসা এগুলো ওদের দিকে।

একজনের কাছে গিয়ে বসল। তার চুল ধরে মাথাটা ঘুরিয়ে মুখ সামনে এনে বলল, 'বল জেনারেল শ্যারন এখন কোথায় রয়েছে? কোন ঘরে, কোন দিকে?

লোকটি মিট মিট করে তাকাল। কথা বলল না।

আহমদ মুসা বাঁ হাত দিয়ে পকেট থেকে ছোট একটা রিভলবার বের করল। তার মাথায় ঠেকিয়ে বলল, 'এখনি জবাব না দিলে গুলী করব।'

লোকটির চেহারা বদলে গেল।

মৃত্যুভয় ফুটে উঠল তার চোখে-মুখে। বলল, 'দু'তলার দক্ষেণে করিডোর ধরে গিয়ে একেবারে মুখোমুখি যে দরজা পড়বে সেই ঘরে উনি আছেন।'

'আর তোদের কয়জন লোক আছে এ বাড়িতে?'

কথা বলতে দ্বিধা করল লোকটি।

আহমদ মুসা তার রিভলবারের ব্যারেলে চাপ বাড়াল।

লোকটি 'বলছি' বলে আবার শুরু করল, 'উপরে জেনারেল শ্যারন ও ডেভিড জোনসসহ চারজন আছেন।'

'থ্যাংকস।' বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

দু'জন অফিসার তখন ওদের ছয়জনকে বাঁধছিল।

'আসুন আমরা উপরে যাই।'

জর্জ আব্রাহাম ও বেঞ্জামিন বেকনকে লক্ষ করে কথাটা বলে আহমদ মুসা এগুল সিড়ির দিকে।

জর্জ আব্রাহাম আহমদ মুসার পেছনে চলতে শুরু করল।

সিড়ির কয়েক ধাপ উঠতেই আহমদ মুসা শুনতে পেল 'রবিন' নাম ধরে ডাকতে ডাকতে কেউ এগিয়ে আসছে।

শুনেই আহমদ মুসা তার এম-১০ বাগিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে উপরে উঠতে লাগল। আহমদ মুসার লক্ষ, আসছে যে লোকটি সে মার্ক করার আগেই তাকে মার্ক করতে হবে।

দু'তলায় উঠতে আরও দু'ধাপ বাকি।

লোকটির সাথে মুখোমুখি হলো আহমদ মুসা। দু'জন দু'জনকে একই সাথে দেখতে পেয়েছে। কিন্তু লোকটির ষ্টেনগান হাতে নেই, কাঁধে আছে, আর আহমদ মুসার দু'হাতের দু'রিভলবার তার দিকে উদ্যত।

লোকটি আহমদ মুসাকে দেখে ভুত দেখার মত চমকে উঠে থমকে দাঁড়িয়েছে।

উদ্যত রিভলবারের মুখে পড়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েছে সে।

আহমদ মুসা জেনারেল শ্যারনদের কাছে পৌছার আগে গুলী বর্ষণের মত কোন শব্দ করতে চায় না। তাকে সাবধান হবার কোন সুযোগই দিতে চায় না আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা রিভলবার বাগিয়ে লোকটির দিকে অগ্রসর হলো। লোকটির কাছে পৌছে গেছে আহমদ মুসা। আহমদ মুসার ইচ্ছা, লোকটির কাঁধ থেকে ষ্টেনগান কেড়ে নিয়ে নিচতলায় ঠেলে দেবে বেঁধে ফেলার জন্যে।

আহমদ মুসা লোকটির কাছে পৌছতেই অকস্মাৎ লোকটি পড়ে গেল মেঝের উপর। দেখে মনে হলো সে ভিমরি খেয়ে পড়ে গেল।

কিন্তু পড়ার পর তার একটা পা প্রচন্ড শক্তিতে আঘাত করল আহমদ মুসার পায়ের টাকনুর উপরের জায়গায়।

আহমদ মুসা আকস্মিক এই আঘাতে ভারসাম্য হারিয়ে আছড়ে পড়ল মেঝের উপর।

লোকটি প্রস্তুত করে নিয়েছিল নিজেকে। ঝাঁপিয়ে পড়ল আহমদ মুসার উপর।

আহমদ মুসা পড়ে গেল বটে, কিন্তু রিভলবার ছাড়েনি হাত থেকে। লোকটি রিভলবার হাত করার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল রিভলবার লক্ষ করেই।

কিন্তু সে রিভলবারটি ধরে ফেলার আগেই রিভলবার সমেত হাত টেনে নিয়েছিল আহমদ মুসা। তার ফলে আহমদ মুসার রিভলবার সমেত হাত লোকটির বুকের নিচে পড়ে গেল।

আহমদ মুসা যা চাচ্ছিল না তাই করতে হলো তাকে। রিভলবার একটু ঘুরিয়ে পজিশনে নিয়ে ট্রিগার টিপলো সে রিভলবারের। রিভলবারের নল প্রায় বুক স্পর্শ করেছিল লোকটির।

লোকটি প্রচন্ড কেঁপে উঠে কাত হয়ে পড়ল।

আহমদ মুসা লোকটিকে ঠেলে ফেলে দ্রুত উঠে দাঁড়াল। ছুটল করিডোর ধরে সর্ব দক্ষেণের সেই কক্ষের দিকে।

ততক্ষণে জর্জ আব্রাহাম জনসন ও বেঞ্জামিন বেকন সিঁড়ির উপর এসে পৌছেছিল। তারাও ছুটল আহমদ মুসার পেছনে।

করিডোর ধরে দৌড়ে আহমদ মুসা দরজার কাছে পৌছে গেছে।

দরজা খোলা।

দরজায় দাঁড়ানো একজন লোক ঘুরে দাঁড়াচ্ছে দেখতে পেল আহমদ মুসা। তার হাতে ষ্টেনগান।

আহমদ মুসার দু'হাতের রিভলবার উদ্যত ছিল দরজার লক্ষে।

আহমদ মুসা ট্রিগার টিপলে তার ডান হাতের রিভলবারের কয়েকটা গুলী ছুটল দরজার দিকে।

দরজার ষ্টেনগানধারী ঘুরে দাঁড়িয়েই ছুটে আসা আহমদ মুসাকে দেখতে পেয়েছিল। ষ্টেনগান তুলতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু তার আগেই গুলী খেয়ে পড়ে গেল।

ষ্টেনগানধারী পড়ে যেতেই উন্মুক্ত দরজায় আহমদ মুসা দেখতে পেল জেনারেল শ্যারনকে। শ্যারনও দেখতে পেয়েছে আহমদ মুসাকে।

সে ভূত দেখার মত চমকে উঠেই ঘুরিয়ে নিচ্ছিল তার রিভলবার। কিন্তু আহমদ মুসার রিভলবার ওদিকে হা করেই ছিল। তার তর্জনি আবার চেপে বসল মেশিন রিভলবারের ট্রিগারে সেকেন্ডের জন্যে।

কয়েকটি ক্ষুধার্ত বুলেট ছুটে গেল জেনারেল শ্যারনকে লক্ষ করে।

একটি গুলী জেনারেল শ্যারনের ডান হাতের কব্জি বিদ্ধ করল।

তার হাত থেকে রিভলবার পড়ে গেল। বাঁ হাত দিয়ে ডান হাত চেপে ধরল শ্যারন।

আহমদ মুসা দরজায় এসে দাঁড়াল।

তার আগেই মেঝেয় বসা নাবিলা জেনারেল শ্যারনের ছিটকে পড়া রিভলবার তুলে নিয়েছে। সে দেখছিল ডেভিড উইলিয়াম জোনস তার রিভলবার দরজার দিকে ঘুরিয়ে নিচ্ছে। সে দরজার বাম পাশে একটু দেয়াল ঘেষে থাকায় আহমদ মুসা তাকে দেখতে পায়নি। নাবিলা রিভলবার তুলে নিয়েই গুলী করল ডেভিড উইলিয়াম জোনসকে।

তাড়াহুড়া করে ছোঁড়া নাবিলার গুলী বিদ্ধ করল উইলিয়াম জোনসের ডান কাঁধকে।

রিভলবার পড়ে গেল উইলিয়াম জোনসের ডান হাত থেকে।

বাঁ হাতে কাঁধ চেপে ধরে বসে পড়ল সে মেঝের উপর।

দরজায় এসে দাঁড়ানো আহমদ মুসা গুলী অনুসরণ করে তাকিয়ে দেখতে পেল জোনসকে, দেখতে পেল সারা জেফারসনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া আলফ্রেডকে।

সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল আহমদ মুসার।

তার বাঁ হাতের তর্জনি চেপে বসল রিভলবারের ট্রিগারে, একবার নয় কয়েকবার।

একের পর এক কয়েকটা গুলী গিয়ে বিদ্ধ করল পর্বতসম-মানুষ আলফ্রেডের পৃষ্ঠদেশকে।

ভুমিকম্পের কবলে পড়ার মত তার দেহটা প্রবলভাবে ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে ছিটকে পড়ে গেল এক পাশে।

সারা জেফারসন উঠে দাঁড়িয়ে পাগলের মত ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে। সর্বশক্তি দিয়ে আঁকড়ে ধরতে চাইছে আহমদ মুসাকে।

আহমদ মুসা রিভলবার পকেটে রেখে ডান হাত সারা জেফারসনের পিঠে বুলিয়ে বলল, 'তুমি ঠিক আছ তো সারা। আর ভয় নেই।'

ডুকরে কেঁদে উঠল সারা।

দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে তখন জর্জ আব্রাহাম জনসন ও বেঞ্জামিন বেকন।

বেঞ্জামিন বেকন আহমদ মুসাকে জড়িয়ে থাকা সারা জেফারসনের গুলীবিদ্ধ রক্তাক্ত ও ভীষণভাবে কম্পমান ডান হাতটা দেখতে পেল। দ্রুত কণ্ঠে বলল, 'আহমদ মুসা ভাই মিস সারা জেফারসন আহত, তার ডান হাত গুলীবিদ্ধ।'

আহমদ মুসা পাগলের মত কাঁদতে থাকা সারা জেফারসনকে বুক থেকে তুলে দাঁড় করিয়ে টেনে নিল তার ডান হাত। হাতের অবস্থা দেখে আঁৎকে উঠল আহমদ মুসা। বলল, 'সারা, তুমি এভাবে আহত হয়েছ?'

'মি. আহমদ মুসা, ডেভিড জোনস তাকে গুলী করে তার হাত থেকে রিভলবার ফেলে দিয়েছিল। প্রচন্ড লড়াই করেছে সে। আমাকে সেই মরার হাত থেকে বাঁচিয়েছে।' বলল নাবিলা।

আহমদ মুসা তাকাল সারা জেফারসনের দিকে। আহমদ মুসার দিকে চোখ তুলেছে সারা জেফারসনও।

সারার চোখে এখন ভয়ের চিহ্ন নেই। হঠাৎ যেন তার দু'চোখে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে লজ্জা ও রক্তিম অনুরাগের প্রবল বন্যা।

শুকনো ঠোঁট কাঁপছে তার।

আহমদ মুসা বলল, 'ধন্যবাদ সারা।'

বলে দু'হাতের দু'তর্জনি দিয়ে আলতোভাবে সারা জেফারসনের দু'চোখের নিচে দু'টো অশ্রুর ধারা মুছে দিয়ে বলল, 'তোমার চোখে অশ্রু নয়, আগুন চাই সারা।'

এক স্বর্গীয় ঔজ্জ্বল্যে ভরে গেল সারার দু'চোখ। নামিয়ে নিল সে চোখ দু'টি।

জর্জ আব্রাহাম জনসন এ সময় চিৎকার করে উঠল, 'জেনারেল শ্যারন পালাচ্ছে।'

বিদ্যুত বেগে চোখ ঘুরালো আহমদ মুসা। দেখল, দেয়ালের গা ঘেষে মেঝেতে সৃষ্ট হওয়া একটা সুড়ঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল জেনারেল শ্যারন।

দেখেই আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়িয়ে দেহের সব শক্তি দু'পায়ে এনে লাফিয়ে উঠল এবং ঝাঁপিয়ে পড়ল সুড়ঙ্গে।

চোখের নিমিষে ঘটে গেল ঘটনা।

বেঞ্জামিন বেকন লাফ দিয়ে ছুটে গেল সেই সুড়ঙ্গের দিকে। কিন্তু সে সুড়ঙ্গে পৌছার আগেই সুড়ঙ্গ পথ বন্ধ হয়ে গেল। দেখা গেল নিরেট মেঝে ছাড়া সুড়ঙ্গের চিহ্ন কোথাও নেই।

হতবাক বেঞ্জামিন বেকন মেঝের উপর পরপর কয়েকটি লাথি চালাল, লাফালাফি করল। কিন্তু সুড়ঙ্গ পথ খুলল না।

জর্জ আব্রাহাম জনসন হাসল। এগিয়ে গেল সেদিকে। বলল, 'বেঞ্জামিন লাথি দিলে বা লাফালাফি করলে ঐ পথ খুলবে না। জেনারেল শ্যারনের সাথে রিমোট কন্ট্রোল ছিল। সুড়ঙ্গ খুলেছিল সেটা ব্যবহার করে। এই ব্যবস্থায় সুড়ঙ্গ খুলে যাবার পর নির্দিষ্ট কয়েক সেকেন্ড খোলা থাকে। তারপর আপনিই বন্ধ হয়ে যায়। আহমদ মুসা আর একটু দেরী করলে সে সুড়ঙ্গ খোলা পেত না।'

'সত্যি, সৌভাগ্য শুধু আহমদ মুসার জন্যেই অপেক্ষা করে।' বলল হতাশ কণ্ঠে বেঞ্জামিন বেকন।

হাসল জর্জ আব্রাহাম জনসন। বলল, 'সৌভাগ্য তার জন্যে অপেক্ষা করে না, সৌভাগ্যকে সে ছিনিয়ে আনে। আমরা সবাই জেনারেল শ্যারনকে লাফিয়ে পড়তে দেখলাম। কিন্তু সেই শুধু সঠিক সময়ে জেনারেল শ্যারনকে অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারল, আমরা পারলাম না।'

বলেই জর্জ আব্রাহাম জনসন পকেট থেকে ওয়াকিটকি বের করে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই সারা জেফারসন বলল, 'জর্জ আংকেল, দেখুন দু'টি রিভলবারই উনি ফেলে গেছেন। খালি হাতে উনি পিছু নিয়েছেন জেনারেল শ্যারনের। এই সুড়ঙ্গ তাদের কোন ফাঁদও হতে পারে।'

কণ্ঠে উদ্বেগ ঝরে পড়ল সারা জেফারসনের।

'ঠিকই বলেছ মা। সুড়ঙ্গের সন্ধানে আমরা এখনই কাজ শুরু করব। তার আগে এদিকের ব্যবস্থা হওয়া দরকার। আর আহমদ মুসার জন্যে ভেব না মা। সে এতটাই আত্মবিশ্বাসী ও ঈশ্বর বিশ্বাসী যে, তার সুযোগ ও সাহায্যের অভাব হয় না।'

বলে ওয়াকিটকিতে নির্দেশ দিল, 'তোমরা চলে এস। গেটে গাড়িগুলো ও এ্যাম্বুলেন্স লাগাও। বন্দী ও আহতদের নিতে হবে।'

কথা শেষ করে ওয়াকিটকি পকেটে রেখে বেঞ্জামিনকে লক্ষ করে বলল, ‘কয়েকজন পুলিশ নিয়ে একটা পুলিশের গাড়ি করে সারা মাকে তুমি তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাও। আমি এদিকে সব ব্যবস্থা করে আসছি। নাবিলা মা, তুমিও সারার সাথে যাও। আমি না যাওয়া পর্যন্ত সারা মার সাথে তুমি হাসপাতালেই থাকবে। তোমার সাথে অনেক কাজ আছে।’

নাবিলা উঠে এসে সারা জেফারসনকে ধরে হাঁটতে শুরু করল। পেছনে পেছনে হাঁটতে লাগল বেঞ্জামিন বেকন।

সারা জেফারসনরা যখন বেরিয়ে যাচ্ছে, তখন জর্জ আব্রাহাম জনসন ওয়াকিটকিতে পুলিশ প্রধান বিল বেকারকে বলছে, ‘এদিকের খবর খুব ভাল। সারা জেফারসন ও নাবিলা মুক্ত। ডেভিড উইলিয়াম জোনস আহত এবং বন্দী। ওদের দু’জন মারা গেছে, আরও ছয়জন বন্দী হয়েছে। আহত জেনারেল শ্যারন পালাতে পারলেও আহমদ মুসা তাকে অনুসরণ করছে। এখন......।’

জর্জ আব্রাহামকে বাধা দিয়ে ওপার থেকে বিল বেকার বলল, ‘অভিনন্দন মি. জর্জ। আপনাদের সাথে এ ঐতিহাসিক অভিযানে থাকতে পারলাম না শেষ মুহূর্তে কাজে আটকা পড়ে। আমার দুর্ভাগ্য।’

বিল বেকার থামতেই জর্জ আব্রাহাম বলে উঠল, ‘তাহলে সৌভাগ্যের কিছু কাজ কর। শোন, এ বাড়িটা যে প্রাইভেট গোয়েন্দা সংস্থা ব্যবহার করেছে, তাদের কর্তা ব্যক্তিকে এখনি ফোন কর বাড়িটার ইন্টারন্যাল ডিজাইনটা পাওয়ার জন্যে। শ্যারন কিভাবে কোথায় কোন দিকে পালাল তা জানার জন্যে এখনি এটা প্রয়োজন।’

‘ঠিক আছে জর্জ, এখনি ব্যবস্থা করছি।’ ওপার থেকে কণ্ঠ ভেসে এল বিল বেকারের।

‘ধন্যবাদ বেকার।’

কথা শেষ করে রিভলবারের নল ডেভিড জোনসের দিকে তাক করে বলল, ‘উঠুন, চলুন।’

ডেভিড জোনস উঠে হাঁটতে হাঁটতে বলল, ‘আমরা, অন্তত আমি এসব চাইনি মি. জর্জ।’

রিভলবার বাগিয়ে ধরে ডেভিড জোনসের পেছনে হাঁটতে হাঁটতে জর্জ আব্রাহাম বলল, 'এসব কিছু চাননি, কিন্তু সব কিছুই হয়েছে, নিউ হারমানের গণহত্যা পর্যন্ত।'

'বিশ্বাস করুন জর্জ, ইহুদীবাদীদের কাজ-কর্মের সাথে আমি আছি। সেটা আমাদের কম্যুনিটির স্বার্থ সৌভাগ্য গড়ার জন্যে। কিন্তু নিউ হারমানের ঘটনা ঘটুক, মনে প্রাণে আমি চাইনি। আমি চেয়েছিলাম সারা জেফারসনকে টোপ বানিয়ে আহমদ মুসাকে ধরার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেটা নিয়েই থাকা হোক। আহমদ মুসার উপর প্রতিশোধ নিতে পারলেই আমাদের সবকিছু হয়ে যাবে। কিন্তু শ্যারনসহ সবাই জোর দিল যে, আহমদ মুসাকে আমরা বন্দী বা হত্যা করলে কোন লাভ হবে না। বরং তাতে সে আরও 'হিরো' হবে আমেরিকানদের কাছে, আর আমরা হবো নিন্দিত। আমেরিকানদের কাছে আহমদ মুসাকে ঘৃণার পাত্র করতে পারলেই শুধু আমেরিকায় আমাদের অবস্থান ফিরে পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে। এই যুক্তির মোকাবিলা আমি করতে পারিনি।'

আব্রাহাম জনসনরা এক তলায় পৌছে গিয়েছিল। বাইরে পুলিশ ও এফবিআই কর্মীরা সবাই এসে গেছে। গাড়ি বারান্দায় কতকগুলো গাড়ি দাঁড়াবার শব্দ পাওয়া গেল।

একজন পুলিশ অফিসারকে ডাকল জর্জ আব্রাহাম জনসন প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবার জন্যে।

# ৪

আহমদ মুসা লাফ দিয়ে একটা চলন্ত এস্কালেটরে গিয়ে পড়ল। নরম স্পঞ্জে ঢাকা এস্কালেটর না হলে তার মাথা শরীর আস্ত থাকতো না।

এস্কালেটর চলছে ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে।

জেনারেল শ্যারন এই এস্কালেটরেই আছে। পাঁচ ছয় সেকেন্ডর বেশী ব্যবধান হয়নি তাদের দু'জনের লাফ দেয়ার মধ্যে। সুতরাং খুব বেশী দুরে নয় জেনারেল শ্যারন।

এই ভাবনার মধ্যেই আহমদ মুসা ছিটকে পড়ল একটা শক্ত মেঝেতে।

জায়গাটা একটা ছোট্ট চত্বর, দেখল আহমদ মুসা।

পড়েই লাফ দিয়ে উঠে বসল সে। দেখতে পেল জেনারেল শ্যারন চত্বরে দাঁড়ানো একটা গাড়িতে উঠছে।

আহমদ মুসা আশে-পাশে তাকিয়ে দেখল আর কোন গাড়ি নেই। আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়ে ছুটল জেনারেল শ্যারনের দিকে। ততক্ষণে ষ্টার্ট নিয়েছে শ্যারনের গাড়ি।

আহমদ মুসা গাড়ির পেছনে ছুটে গিয়ে রাস্তায় উঠল।

তার সামনেই পড়ল একটা গাড়ি। স্পোর্টস কার। একজন তরুনী চালাচ্ছে। হাত দিয়ে ইশারা করে গাড়ি থামাতে আবেদন করল আহমদ মুসা।

গাড়ি থামাল তরুণী।

'আপনি কি হাসপাতালে যাচ্ছেন?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'না।' বলল তরুণীটি

'কোন জরুরী কাজে?'

'না।'

'তাহলে আমাকে গাড়িটি দিন। ঐ গাড়িতে বড় একজন ক্রিমিনাল যাচ্ছে, তাকে আমি ফলো করব।'

তরুণীটি চোখ তুলে আহমদ মুসাকে একবার দেখল। তারপর নেমে এল ড্রাইভিং সিট থেকে।

আহমদ মুসা ড্রাইভিং সিটে বসতে বসতে বলল, 'ধন্যবাদ বোন। এফবিআই প্রধান জর্জ আব্রাহামকে টেলিফোন করলে সব জানতে পারবেন।'

কথা শেষ হওয়ার আগেই চলতে শুরু করেছে আহমদ মুসার গাড়ি।

চলছে দুটি গাড়ি।

খুশি হলো আহমদ মুসা যে, শ্যারনের গাড়িটা নজরের মধ্যেই রয়েছে।

আরও খুশি হলো আহমদ মুসা গাড়িটা একেবারে নতুন আমেরিকান গাড়ি। ভালো স্পীড আছে।

শ্যারনের গাড়ি ছুটছে অরলিংটনকে ডাইনে রেখে হাইওয়ে ধরে স্পিংফিল্ডের দিকে।

ভার্জিনিয়ার প্রান্তর দিয়ে চলছে তখন দু'টি গাড়ি। গাছ-গাছালিতে ভরা চড়াই উতরাই এর মধ্য দিয়ে। মাঝে মাঝেই দু'পাশে ছবির মত সবুজ বসতি চোখে পড়ছে।

কোথায় যাচ্ছে শ্যারন? তার ডান হাত বিধ্বস্ত। বাম হাত মাত্র সচল। গাড়ি চালানো অবস্থায় রিভলবার চালাতে পারবে না। টেলিফোন করতে চাইলেও তাকে থামতে হবে। এ অবস্থায় দ্রুত তাকে কোন আশ্রয়ের সন্ধান করতে হবে।

গাড়ির গতির মতই দ্রুত এই চিন্তাগুলো আবর্তিত হচ্ছে আহমদ মুসার মাথায়।

সন্ধ্যা নামার খুব দেরী নেই।

আহমদ মুসা গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল।

গাড়ি চলছিল উপত্যকার মত এক নিচু এলাকা দিয়ে। সামনেই একটা টিলা। সুন্দর সাজানো একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে টিলার মাথায়।

টিলার পাশ দিয়ে চলে গেছে হাইওয়ে। হাইওয়ে থেকে একটা রাস্তা উঠে গেছে টিলার বাড়িটার দিকে।

আহমদ মুসা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করল আহমদ মুসার গাড়ির স্পীড বাড়লেও শ্যারনের গাড়ি একই গতিতে চলছে।

স্পীড বাড়ালো না মানে এখন সে লড়াই করতে চায়? কিন্তু কি ভাবে? তার তো লড়াই করার অবস্থা নেই। ভাবল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার গাড়ি জেনারেল শ্যারনের গাড়ির বিশ পঁচিশ গজের মধ্যে পৌছে গেছে।

আহমদ মুসা পায়ের মোজার সাথে গুজে রাখা রিভলবারটা হাতে নিল।

হঠাৎ আহমদ মুসা লক্ষ করলো জেনারেল শ্যারনের গাড়ির পেছনের টপটা উঠে যাচ্ছে। তার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল কয়েকটা ব্যারেল।

আঁতকে উঠল আহমদ মুসা। মেশিন গান ও গ্রেনেড লাঞ্চারের ব্যারেল দেখেই সে চিনতে পেরেছে। মাত্র সুইচ টিপে ওগুলো অপারেট করা যায়।

আহমদ মুসার চিন্তা শেষ হবার আগেই সামনে থেকে গর্জন করে উঠল মেশিনগান। এক ঝাঁক গুলী এসে আহমদ মুসার গাড়ির উইন্ডস্ক্রিন উড়িয়ে নিয়ে গেল। ঝাঁঝরা করে দিল গাড়ির সামনের দিকটা।

আহমদ মুসা সিটের উপর কাত হয়ে পড়ে নিজেকে রক্ষা করল। কিন্তু সেই সাথে বুঝল আরও কি ঘটতে পারে।

আহমদ মুসা গাড়ির ষ্টার্ট বন্ধ করে দিয়ে তাড়াতাড়ি হাতড়িয়ে গাড়ির কাগজপত্র যা পেল নিয়ে দেহটাকে নিচে গড়িয়ে দিল।

কিন্তু তার দেহটা মাটিতে পড়ার আগেই তার ডান বাহুর একটা মাসল ছিড়ে নিয়ে গেল বুলেট।

আহমদ মুসা সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে দেহটাকে গাড়ির রাস্তার পাশে নিয়ে গেল।

ঠিক সে সময়েই একটা গ্রেনেড বিস্ফোরিত হলো আহমদ মুসার গাড়িতে। মুহূর্তেই টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল গাড়ি। দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল আগুন।

শুয়ে থেকেই আহমদ মুসা দেখল জেনারেল শ্যারনের গাড়ি দ্রুত এগিয়ে বাঁক নিয়ে টিলার রাস্তা ধরে উপরে উঠে গেল।

আহমদ মুসা বাঁ হাত দিয়ে ডান বাহু চেপে ধরে উঠে দাঁড়াল।

উঠে দাঁড়িয়েই দেখতে পেল বিপরীত দিক থেকে একটা গাড়ি ছুটে আসছে।

আহমদ মুসা একটু এগিয়ে হাত তুলল। সেই সাথে দেখল গাড়ি একটি নয় দুটি। একটি জীপ, আরেকটি পিকআপ।

গাড়ি দু'টি আহমদ মুসার বরাবর এসেই থেমে গেল। সংগে সংগেই খুলে গেল গাড়ির দরজা। গাড়ি থেকে নেমে এল সামরিক ইউনিফর্ম পরা একজন লোক। ছুটছে সে আহমদ মুসার দিকে। তার পেছনে আরও দু'জন অফিসার।

আহমদ মুসা ছুটে আসা সামনের জনকে দেখেই চিনতে পারল। খুশি হলো এই দুঃসময়ে মার্কিন সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটনকে দেখে।

'গুড ইভনিং।' বলে স্বাগত জানাল আহমদ মুসা রোনাল্ড ওয়াশিংটনকে।

কিন্তু জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটন আহমদ মুসার কথার দিকে খেয়াল করল না। সে দ্রুত আহমদ মুসার কাছে এসে তার আহত বাহুটা একবার দেখে গোটা দেহের দিকে নজর বুলিয়ে বলল, 'মি. আহমদ মুসা আর কোন ক্ষতি হয়নি তো? আপনি ঠিক আছেন তো? কি ঘটেছে? কেন এমন ঘটল? আপনি...........।' জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটনের কণ্ঠে উদ্বেগ।

আহমদ মুসা জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটনের কথায় বাধা দিয়ে বলল, 'মি. জেনারেল, আমি ভাল আছি। সব বলছি আমি। কিন্তু তার আগে আপনি দয়া করে ঐ টিলার বাড়িটা ঘিরে ফেলার নির্দেশ দিন। জেনারেল শ্যারন ওখানে পালিয়েছে'।

আহমদ মুসা যখন এ কথাগুলো বলছিল, তখন আরও একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল এবং তা থেকে ২ জন নারী পুরুষ নেমে ছুটে এসে আহমদ মুসার পাশে দাঁড়িয়েছিল।

আহমদ মুসা কথা বলতে বলতেই তাদের দিকে তাকিয়েছিল। সান ওয়াকার ও মেরী রোজ আলেকজান্ডারকে দেখে হাসিতে মুখ ভরে গিয়েছিল আহমদ মুসার।

'জেনারেল শ্যারন দি কালপ্রিট?' আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই ফুসে উঠল জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটনের কণ্ঠ।

বলেই জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটন তার পাশে দাড়ানো দু'জন অফিসারের একজনকে বলল, 'কর্ণেল বব আপনি কর্ণেল ষ্টিভেনকে বলুন তিনি লোকদের নিয়ে যেন টিলার বাড়িটা চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেন।'

নির্দেশের সাথে সাথে কর্ণেল বব ছুটল পিকআপ গাড়িটার দিকে। জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটন যখন ববকে নির্দেশ দিচ্ছিল, সেই সময় আহমদ মুসা সান ওয়াকারের দিকে ফিরে বলল, 'তোমরা? এ সময় কোত্থেকে? ভাল আছ তো? ওগলালা কেমন আছে?'

আহমদ মুসার এত প্রশ্নের কোনটির জবাব না দিয়ে সান ওয়াকার বলল, 'আহমদ মুসা ভাই, আপনি সাংঘাতিক আহত। মারাত্মক ব্লিডিং হচ্ছে।' কণ্ঠে উদ্বেগ সান ওয়াকারের।

ববকে নির্দেশ দিয়েই জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটন তার দ্বিতীয় অফিসারকে বলল, 'কর্ণেল টনি স্মিথ তুমি গিয়ে গাড়ি থেকে ফাস্ট এইড নিয়ে এসে ওর আহত জায়গাটা বেঁধে দাও, রক্ত বন্ধ হওয়া দরকার।'

কথা শেষ করে জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটন আহমদ মুসার দিকে ফিরতেই আহমদ মুসা সান ওয়াকারদের দেখিয়ে তাকে বলল, 'এ সান ওয়াকার, তুখোড় ছাত্র, রেডইন্ডিয়ান মুভমেন্ডের একজন নেতা এবং ও মেরী রোজ আলেকজান্ডার, চীফ জাষ্টিস আলেকজান্ডারের মেয়ে। এরা আমার ভাই বোন।'

জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটন ওদের সাথে সম্ভাষণ বিনিময় করে আহমদ মুসার দিকে ফিরে বলল, 'ঘটনা কি মি. আহমদ মুসা?'

জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটনের অফিসার কর্ণেল টনি স্মিথ তখন আহমদ মুসার ডান বাহুর আহত জায়গাটা বাঁধছিল। আহমদ মুসা জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটনের জিজ্ঞাসার জবাবে বলল, 'জেনারেল শ্যারনদের এক ঘাটিতে অভিযান চালিয়ে সারা জেফারসন ও নোয়ান নাবিলাকে উদ্ধার করা হয়েছে। ডেভিড উইলিয়াম জোনস বন্দী হয়েছেন। আহত অবস্থায় পালাতে পেরেছিলেন জেনারেল শ্যারন। তাকে ফলো করেই আমি এখানে এসেছি।'

জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটনের চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, ‘ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।’

বলে মুহূর্তকাল থেমেই আবার শুরু করল, ‘কিন্তু আপনার গাড়ি ও আপনার এই অবস্থা হলো কি করে?’

‘জেনারেল শ্যারনের গাড়িটা ছিল বিশেষ ধরনের। গাড়ির পেছনে টপের কভারে অটোমেটিক মেশিনগান ও গ্রেনেড লাঞ্চার ফিট করা ছিল। আমি সেটা বুঝতে পারিনি। তাকে ধরার জন্যে তার গাড়ির কাছে এসে পড়েছিলাম। তারপর যা ঘটার তাই ঘটেছে। আমি মাটিতে পড়ে থেকেই দেখতে পেলাম, শ্যারন গাড়ি নিয়ে টিলার বাড়িটিতে উঠে গেল।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। মৃত্যুর মুখ থেকে তিনি আপনাকে বাঁচিয়েছেন।’ এক সাথেই বলে উঠল জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটন এবং সান ওয়াকাররা।

কথা শেষ করেই জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটন তাকাল সান ওয়াকারের দিকে। বলল, ‘মি. সান ওয়াকার, আমি একজন ষ্টাফ সার্জেন্টকে সাথে দিচ্ছি। আপনারা আহমদ মুসাকে পেন্টাগনের সামরিক হাসপাতালে দয়া করে পৌছে দিন।’

‘কিন্তু আমি জেনারেল শ্যারনের শেষটা না দেখে যাই কি করে?’ জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটনের প্রস্তাব শুনেই বলে উঠল আহমদ মুসা।

‘প্লিজ মি. আহমদ মুসা, প্লিজ। আপনার এখনই ট্রিটমেন্ট দরকার। শ্যারনকে খুঁজে বের করতে এবং ধরতে কতটা সময় যাবে বলা যাচ্ছে না। আপনাকে সে সময় পর্যন্ত রাখা যায় না, উচিত নয়। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, নিউ হারমানের দুষকর্মই তার শেষ দুষকর্ম। ওকে আমরা ধরে নিয়ে আসছি। আপত্তি করবেন না। যান এদের সাথে। প্লিজ।’

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘ঠিক আছে জেনারেল। আল্লাহ আপনাদের সফল করুন।’

খুশি হয়ে উঠল সান ওয়াকার ও মেরী রোজ আলেকজান্ডারের মুখ। ওরা আহমদ মুসাকে নিয়ে চলল ওদের গাড়ির দিকে।

সান ওয়াকার ড্রাইভিং সিটে বসে আহমদ মুসাকে বলল, ‘ভাইয়া মেরী আপনার সাথে পেছনে উঠুক।’

‘না সান ওয়াকার, সাথী হিসেবে অস্ত্রধারী এবং সার্জেন্ট আমার জন্যে ভাল হবে।’ বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার কথা শুনেই সান ওয়াকার তার ভুল বুঝতে পারল। বিকল্প থাকা অবস্থায় কোন মেয়েকে আহমদ মুসা তার পাশে বসা এ্যালাউ করবেন না।

সান ওয়াকার হাসল। বলল, ‘ভুল হয়েছে আমার ভাইয়া। ইসলামের সব এটিকেট এখনও শিখে উঠতে পারিনি। পদে পদেই ভুল হয়।’

হাসল আহমদ মুসাও। বলল, ‘মেরী রোজ দেখবে তোমাকে ছাড়িয়ে যাবে এ ব্যাপারে।’

‘ভাইয়া সান ওয়াকারকে জিজ্ঞেস করুন তো, সে প্রতিদিন কতটুকু কোরআন শরীফ পড়ে, এ পর্যন্ত কতগুলো হাদিস ও পড়েছে।’ বলল মেরী রোজ গাড়িতে উঠতে উঠতে।

‘এখন পড়ার খুব চাপ যাচ্ছে। এ কারণেই কিছুটা পিছিয়ে পড়েছি ভাইয়া।’ বলল গম্ভীর মুখে সান ওয়াকার।

‘কোন চিন্তা নেই সান ওয়াকার। মেরী রোজ দেখবে তোমাকে ঠিক করে দেবে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ধন্যবাদ ভাইয়া। আগাম কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি মেরীকে।’ বলল সান ওয়াকার।

সবাই গাড়িতে উঠেছে।

ছুটতে শুরু করল গাড়ি।

হোয়াইট হাউজের একটি কমিটি কক্ষ।

প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা কমিটির একটা বৈঠক চলছে। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত আছেন প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা উপদেষ্টাসহ সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান

জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটন, সিআইএ প্রধান এ্যাডমিরাল ম্যাক আর্থার, এফবিআই প্রধান জর্জ আব্রাহাম জনসন, পুলিশ প্রধান বিল বেকার। আজ বিশেষ আমন্ত্রণে উপস্থিত আছেন সিনেটের গোয়েন্দা বিষয়ক স্পেশাল কমিটির চেয়ারম্যান আনা প্যাট্রেসিয়া, প্রতিনিধি পরিষদের গোয়েন্দা বিষয়ক সিলেক্ট কমিটির চেয়ারম্যান এ্যান্ড্রু জ্যাকবস এবং সিনেটের পররাষ্ট্র বিষয়ক বিশেষ কমিটির চেয়ারম্যান বব এইচ ব্রুস।

আলোচনা চলছিল।

কথা বলছিল তখন সিনেট ইনটেলিজেন্স কমিটির চেয়ারম্যান আনা প্যাট্রেসিয়া। বলছিল যে, 'আমি উদ্বিগ্ন, আমাদের মিডিয়ার ক্রেডিবিলিটি মারাত্মক হুমকির মুখে। সেবার আমাদের ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে দারুণ ফলাও করে খবর বেরুলো যে, লস আলামোসের গোয়েন্দা সুড়ঙ্গের ব্যাপারটা ভুয়া। ওটা আহমদ মুসার কল্পনার সৃষ্টি, মার্কিন ইহুদীদের বিপদে ফেলার জন্যে এবং তার সাথে সাথে বলা হলো লস আলামোসের ঘটনার পরবর্তী যে কিলিং ও সান্তাফে বিমান বন্দরে বিমান ধ্বংস হওয়ার যে ঘটনা ঘটাল, তা আহমদ মুসার নৃশংসতা। কিন্তু একদিন পরেই মূলত আহমদ মুসা ও ফ্রি আমেরিকার চেষ্টায় মিডিয়াতে একদম বিপরীত খবর বেরুল। একেবারে অকাট্য দলিল দস্তাবেজ দিয়ে প্রমাণ করা হলো যে, লস আলামোস ও সবুজ পাহাড়ের সংযোগকারী গোয়েন্দা সুড়ঙ্গটা ইহুদীদের তৈরী এবং পরবর্তী কিলিং ও বিমান ধ্বংসের ঘটনা ইহুদীবাদী শ্যারনরাই ঘটিয়েছে লস আলামোস ঘটনার তদন্তকারী টিমকে হত্যার জন্যে। আবার গতকালই মিডিয়া সাংঘাতিক খবর দিল, আহমদ মুসাই নিউ হারমানে গণহত্যা ঘটিয়েছে। এই অভিযোগে আহমদ মুসাকে গ্রেপ্তারও করা হলো। কিন্তু আজকেই আবার আমাদের মিডিয়া সম্পূর্ণ উল্টো খবর প্রকাশ করতে বাধ্য হলো। যাতে ভিডিও টেপের মাধ্যমে প্রমাণ করা হলো মার্কিন ইতিহাসের এই জঘন্য হত্যাকান্ড ইহুদীবাদী জেনারেল শ্যারনরাই ঘটিয়েছে। সেই সাথে খবর বেরুল, আহমদ মুসা সারা জেফারসন ও নাবিলাকে উদ্ধার এবং ডেভিড উইলিয়াম জোনস ও জেনারেল শ্যারনকে বন্দী করার ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে।'

একটু থামল আনা প্যাট্রেসিয়া, তারপর আবার বলল, ‘আমি একথাগুলো বললাম এজন্যে যে, নিজেরা কিছু অনুসন্ধান না করে, মোটামুটি নিশ্চিত না হয়ে খবর ছাপানোর ফলে মিডিয়ার এই যে ক্রেডিবিলিটি বিপর্যয় তার কারণ হচ্ছে আমাদের মিডিয়ার বৃহত্তর অংশ আজ ইহুদীবাদী শ্যারনদের দখলে।’ থামল আনা প্যাট্রেসিয়া।

‘আমি মিস আনা প্যাট্রেসিয়া সাথে একমত। কিন্তু সমস্যা হলো মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার কোন আইন মার্কিন গণতন্ত্রে নেই। একটাই বিকল্প, সেটা হলো দেশ প্রেমিক মিডিয়া সৃষ্টি করা। যাহোক, বিষয়টা এখানেই থাক। আমার মনে হয় প্রসঙ্গ থেকে আমরা একটু সরে এসেছি।’ বলল সিনেটের পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান বব এইচ ক্রুস।

প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা উপদেষ্টা দ্রুত ফ্লোর নিল। বলল, ‘লস আলামোস ও নিউ হারমানের ঘটনা মার্কিন জনগনের বিশ্বাস ও সেন্টিমেন্টে মারাত্মক ঘা দিয়েছে। জেনারেল শ্যারন, ডেভিড উইলিয়াম জোনস ও বেন ইয়ামনিসহ প্রধান কালপ্রিটরা ধরা পড়েছে। অবশিষ্টরাও ধরা পড়বে। আইন অনুসারে তাদের বিচার হবে। ইহুদীবাদী যে প্রবণতা নিউ হারমানে গণহত্যা চালাল নিজ কম্যুনিটির উপর এবং লস আলামোসে বিশ্বাসের ঘরে ডাকাতি করল, তা এ ধরনের ডাকাতি কত করেছে, আরও কত করবে কে জানে! এরা বিপদে ফেলেছে মার্কিন জনগণকে, বিপদে ফেলেছে মার্কিন ইহুদী জনগোষ্ঠিকেও। এখন ভাববার বিষয় হলো, এদের হাত থেকে মার্কিন জনগণকে উদ্ধারের জন্যে আমরা কি করব?’ থামল প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা উপদেষ্টা।

‘কিছু একটা অবশ্যই করতে হবে। ডেভিড উইলিয়াম জোনস মার্কা ইহুদীবাদীরা আমেরিকান নয়, প্যাট্রিয়ট তো নয়ই। এদের আনুগত্য প্রমিজড ল্যান্ড ইসরাইলের প্রতি। তারা ইসরাইলের জন্যেই কাজ করে। টাকা-পয়সা থেকে বৈজ্ঞানিক তথ্য পর্যন্ত সবই তারা ইসরাইলের জন্য যোগাড় করে। জন জ্যাকবসের মত সম্মানিত বিজ্ঞানীও আমেরিকান হতে পারেননি। গোয়েন্দা সুড়ঙ্গ গড়ে লস আলামোস থেকে ইসরাইলের জন্যে বৈজ্ঞানিক তথ্য পাচার করে তিনি বিশ্বাসের ঘরে চরম ডাকাতি করেছেন। জন জ্যাকব যখন বিশ্বাসী হননি, তখন

কোন ইহুদীবাদীকেই বিশ্বাস করা যায় না। এরা অক্টোপাশের মত। এই অক্টোপাশের বিদায় করা ছাড়া আমেরিকানদের মুক্তির কোন উপায় দেখি না।' বলল সিনেট ইনটেলিজেন্স কমিটির চেয়ারম্যান আনা প্যাট্রেসিয়া।'

'ধন্যবাদ মিস আনা প্যাট্রেসিয়া। আপনি যেটা বললেন, সেই বিদায়টা কি? কিভাবে? বলল প্রেসিডেন্ট।

'এই বিদায় আক্ষরিক, অনাক্ষরিক দুই-ই হতে পারে মি. প্রেসিডেন্ট। অনাক্ষরিক বিষয়টা হলো, আমরা আমাদের প্রশাসন, অর্থনীতি, ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিক্ষা-স্বাস্থ্যে কোন ক্ষেত্রেই ইহুদীবাদীদের কোন আশ্রয় প্রশ্রয় দেব না। তাহলে তারা নিজেরাই ধীরে ধীরে আমাদের দেশ ত্যাগ করবে। দ্বিতীয়ত, ইহুদীবাদীদের প্রমিজড ল্যান্ড ইসরাইলের সাথে সর্বনিম্ন পর্যায়ের কূটনৈতিক সম্পর্কের বাইরে কোন সহযোগিতা, সমঝোতায় আমরা থাকব না।' আনা প্যাট্রেসিয়া বলল।

'এটা শুধু অনুকূল জনমত, গণসচেতনতা ও গণ পর্যায়ের প্রতিরোধের মাধ্যমেই সম্ভব। সরকারের এখানে বেশি কিছু করার সুযোগ খুবই কম।' বলল প্রেসিডেন্ট এ্যাডামস হ্যারিসন।

'মি. প্রেসিডেন্ট ঠিক বলেছেন। আমার মনে হয় এই গণ সচেতনতা ও জনমত সৃষ্টি হবে। ইতিমধ্যেই যে মামলাগুলো ইহুদীবাদীদের বিরুদ্ধে হয়েছে এবং নিউ হারমানের গণহত্যা, সারা জেফারসন ও নাবিলার কিডন্যাপকে কেন্দ্র করে আরও যে কেসগুলো হতে যাচ্ছে সে সবই এই সচেতনতা সৃষ্টি করবে। কেসের প্রসিডিংসগুলো যেভাবে মিডিয়াতে আসবে তাতে আমরা যা চাই সেই জনমতের সৃষ্টি হয়ে যাবে। প্রতিরোধ উঠে আসবে জনগণের পর্যায় থেকেই।' বলল এফবিআই প্রধান আব্রাহাম জনসন।

'এমন যদি শুরু হয়, তাহলে মুসলমানদের নিয়েও তো প্রশ্ন উঠতে পারে?' প্রেসিডেন্ট এ্যাডামস হ্যারিসন বলল।

'না মি. প্রেসিডেন্ট, এ ধরনের প্রশ্ন তোলার কোন সুযোগ হবে না। মুসলিম জাতীয়তার একটা আন্তর্জাতিক রূপ আছে সত্য, কিন্তু মুসলমানদের ভূমিগত কোন আন্তর্জাতিক কেন্দ্র নেই। মক্কা মুসলমানদের প্রার্থনা ও তীর্থ কেন্দ্র, কিন্তু মক্কা বা আরবের প্রতি মুসলমানদের কোন রাজনৈতিক আনুগত্য বা

কমিটমেন্ট নেই। আরবকে তারা তাদের জাতীয় আবাসভূমি মনে করে না এবং সেজন্য অর্থ-বিত্ত, শ্রম, বুদ্ধি ইত্যাদি দিয়ে একে গড়ে তোলারও কোন প্রয়োজনীয়তা তারা অনুভব করে না। মুসলমানরা গোটা দুনিয়াকেই আল্লাহর ভূমি মনে করে এবং তাই যে দেশেই তারা বসতি স্থাপন করে সে দেশকেই তারা নিজের দেশ হিসেবে গ্রহণ করে। সুতরাং মুসলমান আমেরিকানরা সত্যিকারের আমেরিকান। ইহুদীবাদীদের সাথে তাদের তুলনা হয় না। তাই তাদের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন উঠবে না। পৃথিবীতে মাত্র দুটি জাতি আছে, ইহুদী ও হিন্দু, যারা তাদের ধর্ম বিশ্বাসের সাথে তাদের ভূমিকে এক করে ফেলেছে। ইসরাইল ইহুদীদের প্রমিজড ল্যান্ড। তেমনি হিন্দুস্তানকে হিন্দুরা তাদের জাতীয় আবাসভূমি মনে করে। এ জন্যে হিন্দুরা হিন্দুস্তানে অন্যজাতির অস্তিত্ব বরদাশত করতে পারে না। হিন্দুস্তানে আসা সব জাতিকেই তারা গ্রাস করেছে। বৌদ্ধদের মত বড় জাতিকেও তারা ভারত থেকে নির্মূল করেছে। পারেনি শুধু মুসলমানদের। তাই বলে চেষ্টা তারা পরিত্যাগ করেনি।' বলল আনা প্যাট্রেসিয়া।

'ধন্যবাদ মিস প্যাট্রেসিয়া, আপনি ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। শ্যারনদের তৎপরতার সাথে ভারতীয় আমেরিকানদেরও তো জড়িত দেখা যাচ্ছে। এ ব্যাপারটাও আমাদের বিবেচনায় আসা দরকার।' প্রেসিডেন্ট বলল।

'ইয়েস মি. প্রেসিডেন্ট ইহুদীবাদী শ্যারনদের সাথে ইন্ডিয়ান আমেরিকানরা দেখা যাচ্ছে গভীরভাবেই জড়িয়ে পড়েছে। শ্যারনরা আহমদ মুসাকে বন্দী করে রেখেছিল ভারতীয় আমেরিকান এ্যাসোসিয়েশনের চীফ প্যাট্রোন শিব শংকর সেনের বাড়িতে ও তার ফ্যাক্টরী গোডাউনে, আবার সারা জেফারসন ও নাবিলাকেও বন্দী অবস্থায় পাওয়া গেছে তারই আরেক বাসায়। সর্বশেষে আমরা শ্যারনকে যেখান থেকে উদ্ধার করলাম, সে বাড়িটাও ঐ এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ভারত ভূষণ শিবাজীর। প্রেসিডেন্টের মনে আছে জেনারেল শ্যারনদের পক্ষে তদ্বির করতে এসেছিলেন ভারতীয় আমেরিকান এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ভারত ভূষণ শিবাজী, নির্বাহী ডাইরেক্টর বিনোদ বিহারী মালাকার, উপদেষ্টা শরৎসিং বর্মন এবং চীফ প্যাট্রোন শিব শংকর সেন।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে ভারতীয় আমেরিকানরা ব্যক্তিগতভাবে নয়, সামষ্টিকভাবে জেনারেল শ্যারনদের ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত।' বলল জর্জ আব্রাহাম জনসন।

'মি. প্রেসিডেন্ট, জেনারেল শ্যারনদের বিরুদ্ধে যে সব মামলা দায়ের হয়েছে, তার সাথে শিব শংকর সেন এবং ভারত ভূষণ শিবাজী জড়িত হয়ে পড়েছেন।' পুলিশ প্রধান বিল বেকার বলল।

'আমার মনে হয় এখনকার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট। দেখা যাক আইন তাদের কতটা জড়ায়। তাদের এ ভূমিকা তাদের ভুল বোঝার কারণেও হতে পারে।' প্রেসিডেন্ট বলল।

'ধন্যবাদ মি. প্রেসিডেন্ট, এভাবেই চিন্তা করা হবে। তবে তাদের এই আতাতটা ট্রেডিশনাল। এই দুই কম্যুনিটির মধ্যে সম্পর্ক ও সহযোগিতার বিষয়টা খুবই পুরানো। ইহুদীবাদী শ্যারনদের আজকের বিপর্যয়ে তাদের কোন প্রকার ভূমিকা অব্যাহত থাকতে পারে। এমনকি ওদের কাজ কিছুটা এরাও আনজাম দিতে পারে।' বলল জর্জ আব্রাহাম জনসন।

'ধন্যবাদ মি. জর্জ। এদের উপর চোখ রাখতে হবে এবং এদের মধ্যে আবার শ্যারনদের সৃষ্টি না হয়, সেটা নিশ্চিত করতে হবে।' প্রেসিডেন্ট বলল।

'ইয়েস মি. প্রেসিডেন্ট।' জর্জ আব্রাহাম জনসন বলল।

'অবাক লাগছে মি. প্রেসিডেন্ট। ঈশ্বর কখন কাকে দিয়ে কি কাজ করান! আমরা কি কেউ ভাবতে পেরেছিলাম, আহমদ মুসা এদেশে এসে যুগ যুগ ধরে চলে আসা একটি প্রাণঘাতি ষড়যন্ত্রজাল ছিন্ন করে আমেরিকাকে রক্ষা করবেন!' বলল আনা প্যাট্রোসিয়া।

'সত্যিই অভাবনীয় মিস আনা প্যাট্রোসিয়া। শ্যারনদের ষড়যন্ত্রে আমরা বারবার তাকে সন্দেহ করেছি, তাকে গ্রেপ্তার করেছি, গ্রেপ্তারের জন্যে পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছি। কিন্তু তার কাজ সে করেই গেছে। লাখ লাখ টাকা দিয়ে নিয়োগ করলেও কারো কাছ থেকে এই ধরনের কাজ পাওয়া দুষ্কর। সত্যি আহমদ মুসা অতুলনীয়। এ ধরনের লোক পৃথিবীর সম্পদ, পৃথিবীর মানুষের সম্পদ।' প্রেসিডেন্ট শেষোক্ত বাক্যটা পূর্ণ করেই পানির গ্লাস তুলে নিলেন। পানি খেলেন। মনে হয় পানি খাওয়ার জন্যেই তিনি থেমেছিলেন।

প্রেসিডেন্ট তার হাতের গ্লাসটা টেবিলে রাখার আগেই জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটন বলল, ‘এই লোকটি মৌলবাদী বলে তার কি ভয়ংকর রূপ আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল! অথচ তার মধ্যে যে মানবিকতা দেখেছি তা অনন্য। তিনি তার ধর্মের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, তিনি ধর্মের ছোট-খাট নির্দেশও অত্যন্ত যত্নের সাথে পালন করেন। তিনি তার জাতিকে ভালোবাসেন, জাতির কাজেই তিনি তার জীবনকে বিলিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এই সাথে তিনি অন্য ধর্মকে অশ্রদ্ধা করেন না। অন্য ধর্মের লোকদের তিনি ভালোবাসেন, নিজের লোকদের যেমন ভালোবাসেন। মানুষ হিসেবে সবাই তার কাছে সমান। তাঁর এই অবস্থানকে বিপরীতমুখী এক দ্বৈত রূপ মনে হতে পারে। কিন্তু আহমদ মুসা এই বৈপরিত্যকে জয় করেছেন। তিনি অত্যন্ত গোঁড়া ধার্মিক এবং অত্যন্ত গোঁড়া এক মানবতাবাদী।’

জর্জ আব্রাহাম জনসনের মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। বলল সে, ‘মি. প্রেসিডেন্ট আহমদ মুসা কি বলেন জানেন। তিনি বলেন, যে যত ভালো মুসলমান, সে তত ভালো মানবতাবাদী। তার যুক্তি হলো, ‘আল্লাহ সকলের স্রষ্টা, সকলের পালনকর্তা, সকলের প্রত্যাবর্তন তাঁরই কাছে। তিনি সকল মানুষকে ভালোবাসেন। অন্যদিকে একজন ভালো মুসলমান আল্লাহকে ভালোবাসে নিজের জীবনের চেয়ে বেশি এবং এ কারণেই দুনিয়ার মানুষকেও সে ভালোবাসে অনুরূপভাবে। এটা তাদের রাসুলেরও শিক্ষা। আহমদ মুসা তাদের রাসুলের মানব প্রেমের অনেক কাহিনী বলেন। তার মধ্যে একটি হলো, অন্য ধর্মের এক বৃদ্ধা রাসুল মোহাম্মদকে কষ্ট দেবার জন্যে তার চলার পথে প্রতিদিন কাঁটা বিছিয়ে রাখত। একদিন রাসুল তার চলার পথে কাঁটা দেখলেন না। তিনি বৃদ্ধের খোঁজ নিলেন। জানলেন, বৃদ্ধা অসুস্থ। সংগে সংগে রাসুল বৃদ্ধার বাড়িতে গেলেন। রাসুলের সাহায্য ও শুশ্রুসাতেই বৃদ্ধা ভালো হয়ে উঠে। আহমদ মুসা বলেন, মানুষকে ভালোবাসা আল্লাহকে ভালোবাসারই অংগ।’ থামল জর্জ আব্রাহাম জনসন।

‘চমৎকার মি. জর্জ। এই আহমদ মুসা যদি মৌলবাদী হয়, তাহলে এই মৌলবাদ দুনিয়ার জন্যে সবচেয়ে বেশি কাম্য।’ বলল প্রেসিডেন্ট।

‘কিন্তু একটা জিনিস আমি বুঝতে পারি না মি. প্রেসিডেন্ট, ইসলাম প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অব্যাহত যুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছে এবং আল্লাহর ধর্ম প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ অব্যাহত রাখতে বলেছে। ইসলামের শান্তিবাদিতার সাথে এটা মিলে কি করে?’ বলল প্রতিনিধি পরিষদের গোয়েন্দা কমিটির চেয়ারম্যান এ্যান্ড্রু জ্যাকবস।

‘কিন্তু মিঃ জ্যাকবস আমরা আলোচনা করছি আহমদ মুসাকে নিয়ে, ইসলামকে নিয়ে নয়।’

এ কথা বলে প্রেসিডেন্ট জর্জ আব্রাহাম জনসনের দিকে চেয়ে বলল, ‘মি. জর্জ, মি. জ্যাকবস যা বললেন সে ব্যাপারে আপনি কি কিছু বলবেন?’

‘ইয়েস মি. প্রেসিডেন্ট।’ বলে একটু থামল জর্জ আব্রাহাম। তারপর আবার শুরু করল, ‘আহমদ মুসা ও ইসলাম আলাদা নয়। আহমদ মুসা ইসলামেরই প্রতিকৃতি, প্রতিটি সত্যিকার মুসলমানও তাই। মি. জ্যাকবস যে বিষয়ে বলেছেন সেটা পরিভাষাগত ভুল বুঝাবুঝির ফল। ইসলাম কোন ব্যক্তি বা গ্রুপ কিংবা কোন ধর্মকে লড়াইয়ের প্রতিপক্ষ মনে করেনা। ইসলামের লড়াই জুলুম, অশান্তি ও অবিচারের বিরুদ্ধে। এ হিসেবে জালেম ও শান্তিভংগকারীরাই ইসলামের প্রতিপক্ষ। মি. প্রেসিডেন্ট, মুসলিম রাষ্ট্র আরব সীমান্তে রোমান শাসনকর্তা সুহরাবিল বহুদিন রাজত্ব করেন। ইসলামের নবী তাকে আক্রমণ করেননি, তার সাথে কোন বিরোধও বাধেনি। কিন্তু সুহরাবিল যখন বিনা কারণে আন্তর্জাতিক রীতি লংঘন করে একজন মুসলিম দূতকে হত্যা করল, তখন ইসলামের নবী এই জুলুম ও অবিচারের প্রতিকারের জন্যে যুদ্ধ যাত্রার নির্দেশ দিলেন। সুহরাবিলের অধীনে তখন লক্ষাধিক সৈন্য, কিন্তু মুসলমানরা তিন হাজারের বেশি সৈন্য যোগাড় করতে পারেনি। এরপরও ইসলামের নবী পরিণতির কথা চিন্তা না করে অবিচারের প্রতিকারকেই বড় করে দেখেন। প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ইসলামের যুদ্ধের হুকুমের অর্থ এটাই। আল্লাহর ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্যে অব্যাহত লড়াইয়ের নির্দেশের অর্থও এই ধরনের। ইসলামে ইহকালীন ও পরকালীন শান্তি, স্বস্তি ও মুক্তির পথকেই আল্লাহর ধর্ম বলা হয়েছে। জুলুম, অশান্তি ও অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নীতি হিসাবেই ইসলাম মানুষের জন্যে শান্তি,

স্বস্তি ও সুবিচারের প্রতিষ্ঠা চায় এবং এ জন্যে অব্যাহত লড়াইয়ের নির্দেশ দেয়। এ লড়াইকে তারা মানবতার জন্যে অপরিহার্য মনে করে। আর এ লড়াই কলমের লড়াই এবং বুদ্ধি ও যুক্তির লড়াই। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অস্ত্রের লড়াইও এর সাথে শামিল। এ অস্ত্রের লড়াইয়ের দৃষ্টান্ত সুহরাবিলের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ যাত্রা।'

দীর্ঘ বক্তব্যের পর থামল জর্জ আব্রাহাম জনসন।

'ধন্যবাদ মি. জর্জ। ভালো বলেছেন। দেখছি, ইসলাম যে কারণে যুদ্ধ করে তা সার্বজনীন। এ কারণে সবাই যুদ্ধ করে এবং করতে বাধ্য। 'আল্লাহর ধর্ম' এর যে অর্থ করেছেন তা চমৎকার। তাঁর শান্তি, সুবিচার, ইত্যাদির কথাতো সব ধর্মই বলে। তাহলে ইসলামের আলাদা বৈশিষ্ট্য কোথায়?' বলল প্রেসিডেন্ট।

'সব একত্ববাদী ধর্মই ঈশ্বরের। তবে ওদের দাবী হলো, ইসলাম সর্বকনিষ্ঠ ও পূর্ণাংগ। মানব জীবনের সকল বিভাগে শান্তি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার পূর্ণাংগ দার্শনিক ও প্রায়োগিক বিধান ইসলাম দেয়, যা অন্য কোন ধর্মে নেই।' জর্জ আব্রাহাম বলল।

'এ বিষয়গুলো খুবই নাজুক মি. জর্জ, আসুন আমরা আমাদের আলোচনার মূল প্রসংগে ফিরে যাই। অক্টোপাশের মত যারা আমাদের আবদ্ধ করে রেখেছিল, শ্যারনের সেই ইহুদীবাদীরা শুধু আমেরিকায় নয় বাইরেও আসন গেড়ে বসে আছে। তারা প্রভাবশালীও। তাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া অবশ্যই হবে। চাপও আসবে শ্যারনদের ছেড়ে দেবার। এ দিকটি নিয়ে আপনারা কেউ কিছু বলেননি।' বলল প্রেসিডেন্ট।

'মি. প্রেসিডেন্ট, এটা বড় কোন সমস্যা হবে না। আমরা জনগণের স্বার্থে কঠোর ভূমিকা গ্রহণ করবো। বিশ্ব জনমতের কাছে তাদের স্বরূপ আমরা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরব। এর ফলে তারা আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে যেতে বাধ্য হবে। তারা বেশি কিছু করার অবকাশ পাবে না। তারা এক সময়ের চরম অবিশ্বস্ত ও নিন্দিত অবস্থানে আবার ফিরে যেতে বাধ্য হবে।' বলল সিনেটের ফরেন রিলেশন্স কমিটির চেয়ারম্যান বব এইচ ব্রুস।

‘সকলকে ধন্যবাদ। আমরা এখন উঠতে পারি। তার আগে মি. জর্জ বলুন, আহমদ মুসা কেমন আছেন? সুরিনামের আরেকজন লোককে উদ্ধার করেছিলেন, তার খবর কি?’ প্রেসিডেন্ট বলল।

‘আহমদ মুসা সুস্থ হয়ে উঠেছেন মি. প্রেসিডেন্ট। দু’একদিনের মধ্যেই ছাড়া পাবেন। সুরিনামের লোকটি সেখানকার সাবেক প্রধানমন্ত্রী আহমদ হাত্তা নাসুমন। দৈহিক নির্যাতন ছিল তার অসুস্থতার কারণ। সেও সুস্থ হয়ে উঠেছে। আহমদ মুসার পাশের ঘরে তাকে রাখা হয়েছে।’ বলল জর্জ আব্রাহাম জনসন।

প্রেসিডেন্ট সকলের দিকে একবার তাকিয়ে বলল, ‘দেখুন আমি মনে করছি, আহমদ মুসাকে মার্কিন নাগরিকত্ব অফার করা উচিত। সে যে এলাকা প্রেফার করবে সেখানে একটা বাড়িও দিতে চাই। আমি যতদূর জানি সৌদি সরকার মক্কা ও মদিনায় তাকে দু’টি বাড়ি দিয়েছে। এ ছাড়া কোন দেশে তার কিছু নেই। তার অবদান মার্কিন জাতি কোন দিন ভুলবে না। ইহুদীবাদী অক্টোপাশ আমাদেরকে আমাদের ফাউন্ডার ফাদারসদের নির্দেশিত জাতীয় লক্ষ থেকে অনেক দূর সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে আমরা ফিরে আসছি। অবশ্য সারা জেফারসনের ‘ফ্রি আমেরিকা’ এই লক্ষে আগে থেকেই কাজ করছিল। কিন্তু আহমদ মুসা না এলে, তাঁর সহযোগিতা না হলে এই কামিয়াবী আসতো না। সত্যিকার ‘ফ্রি আমেরিকা’ তার পরশ পেয়েই ধন্য হয়েছে। এই কথা মার্কিন জাতির ভোলা উচিত নয়।’ থামল প্রেসিডেন্ট।

‘আমরা মি. প্রেসিডেন্টের সাথে একমত। সবাই খুশি হবে এই প্রস্তাবে। সবচেয়ে বেশি খুশি হবে ‘ফ্রি আমেরিকা’ ও সারা জেফারসন।’ সমবেত কণ্ঠে বলে উঠল সবাই।

‘ধন্যবাদ সকলকে।’ বলেই প্রেসিডেন্ট তাকাল জর্জ আব্রাহামের দিকে। বলল, ‘সারা জেফারসন ও আহমদ মুসার সম্পর্কের ব্যাপারে মি. জর্জ কি নতুন কিছু জানেন?’

‘দু’জনই এতটা চাপা, এতটা সংযত, এতটা সতর্ক যে আমরা কিছুই জানতে পারছি না। মি. প্রেসেডিন্ট।’ বলল জর্জ আব্রাহাম।

‘মি. জর্জ ওরা দুই সাগর। পৃথক একটা সংযোগ খাল তৈরী ছাড়া ওদের মিলন হবে না। এই সংযোগের জন্যে তৃতীয় পক্ষ চাই।’ প্রেসিডেন্ট বলল।

হাসল জর্জ আব্রাহাম। বলল, ‘মি. প্রেসিডেন্টের ইচ্ছা আমি বুঝেছি। এই দায়িত্ব আমি নিলাম।’

‘সকলকে আবারও ধন্যবাদ।’ বলে প্রেসিডেন্ট উঠে দাড়াল।

উঠে দাঁড়াল সবাই।

পেন্টাগন মিলিটারী হাসপাতাল। হাসপাতালের ভিআইপি উইং।

আহমদ মুসা তার কক্ষের বাইরে দক্ষেণমুখী প্রশস্ত বারান্দায় একটা সোফায় বসে। তার সামনে টি টেবিল।

টি টেবিলের ওপারে আরেক সোফায় বসে আছে পঞ্চাশোর্ধ একজন মানুষ। মুখের আদলটা তার ইন্দোনেশীয় ধরণের। চেহারায় আভিজাত্য। নাম আহমদ হাত্তা নাসুমন।

আহমদ হাত্তা নাসুমন দক্ষেণ আমেরিকার আটলান্টিক তীরের দেশ সুরিনামের একটি প্রাচীন ও সম্মানিত পরিবারের সন্তান এবং সেখানকার একজন প্রভাবশালী রাজনীতিক।

সেদিন জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটন সেই টিলার বাড়িটিতে জেনারেল শ্যারনকে ধরার জন্যে যে অভিযান চালিয়েছিল, সেই অভিযানে তারা আহমদ হাত্তা নাসুমনকেও উদ্ধার করে বন্দীদশা থেকে।

আহমদ হাত্তা নাসুমনের ম্লান মুখে শংকার ছায়া। কথা বলছিল সে। বলছিল, ‘গত নির্বাচন সুরিনামের মুসলমানদের জন্যে বিপদ ডেকে আনে। ঐ নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের শতকরা ৪৫ ভাগ আসনে মুসলমানরা নির্বাচিত হয়। জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশনে আমাকে পরিষদ নেতা নির্বাচিত করে। ফলে সংবিধান অনুসারে আমিই হই দেশের প্রধানমন্ত্রী। আর জাতীয় পরিষদের বিরোধী দলীয় নেতা নির্বাচিত হন রমেশ আগরওয়াল। ইউরোপিয়ান কম্যুনিটির সাহায্য নিয়ে তিনি চেষ্টা করছিলেন প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্যে। পারেনি। তখন থেকেই...।’

‘জাতীয় পরিষদে মুসলমানরা এত সীট পেল কি করে?’ আহমদ হাত্তা নাসুমনকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘সুরিনামে জনসংখ্যার আবাসিক বিভাজনটা নৃতত্বীয় জাতি ভিত্তিক। যেমন হিন্দুস্তানী, ক্রোলস (ইউরোপীয় ও আফ্রিকানদের মিশ্রণ), ইন্দোনেশীয়ানস, নিগ্রো, আমেরিকান, ইন্ডিয়ানস, চাইনীজ ইত্যাদি। সেখানে ভোট হয় এই জাতি ভিত্তিক বিভাজন অনুসারে। ঐ নির্বাচনে মুসলমানরা হঠাৎ বিশেষ একটা সুবিধা লাভ করে। হিন্দুস্তানী, ক্রোলস ও ইন্দোনেশীয়ানদের একটা বড় অংশ মুসলমান। যখন শিক্ষার প্রসার কম ছিল, সচেতনতা কম ছিল, তখন নির্বাচনে ধর্ম পরিচয় তেমন একটা প্রভাব বিস্তার করতো না। কিন্তু শিক্ষার হার যত বাড়ছে, ধর্মীয় প্রভাব ততই শক্তিশালী হয়ে উঠছে। গত নির্বাচনে এটা পরিষ্কার বোঝা গেছে। বড় প্রত্যেক জাতির গ্রুপ থেকে মুসলমানরা প্রচুর পরিমাণে নির্বাচিত হয়েছে। এমনকি চীনাদের মধ্যে থেকেও দু’জন নির্বাচিত হয়েছে। সব মিলিয়ে মুসলিম সদস্যদের সংখ্যা দাঁড়ায় পয়তাল্লিশ।’ বলল আহমদ হাত্তা নাসুমন।

‘তার মানে মুসলিম বোধ সেখানে বাড়ছে?’ আহমদ মুসা বলল।

‘হ্যাঁ, তাই।’

‘শিক্ষার প্রসারই কি এর কারণ, ইসলামের পক্ষে সেখানে কোন কাজ হচ্ছে!’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘রাবেতা আলমে আল ইসলামীর একটা অফিস সুরিনামের রাজধানী পারামারিবো’তে রয়েছে। রাবেতা কোরআন, হাদিসসহ কিছু বইয়ের অনুবাদ সুরিনামের সাধারণভাবে কথিত ভাষা ‘টাকি টাকি’তেও করেছে। ইংরেজী, ডাচ, হিন্দী, উর্দু বিভিন্ন আফ্রিকান ভাষার ইসলামী বইও রাবেতা সেখানে বিতরণ করেছে। সুরিনামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পর্যন্ত রাবেতা মসজিদ, মাদ্রাসা তৈরী করেছে। এ সবের বড় একটা প্রভাব অবশ্যই আছে। কিন্তু মুসলমানদের সচেতন করে তোলার সবচেয়ে বড় কাজ করেছে হিন্দুস্তানী হিন্দুরা। তারা ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্প কারখানায় খুব প্রভাবশালী। তাদের মধ্যে স্বজনপ্রীতি খুব বেশি থাকে এবং তারা মুসলমানদেরকে বিদ্বেষের চোখে দেখে। তারা যেখানেই থাকে, সেখানে

মুসলমানরা প্রবেশাধিকার পায় না। তাদের দেখাদেখি ইউরোপীয়রাও অনেক ক্ষেত্রে মুসলমানদের সাথে বৈষম্যমুলক আচরণ করে। এর ফলে মুসলমানরা চাকরী-বাকরী ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে বহুল পরিমাণে বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। উদ্ভুত এই বিরূপ পরিস্থিতিই মুসলমানদেরকে তাদের স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন করেছে।'

'ব্যবসায়-বাণিজ্য ও চাকরী-বাকরীতে মুসলমানরা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে নেই?' প্রশ্ন করল আহমদ মুসা।

'চাকরী-বাকরীতে যা কিছু আছে ক্রোলস জাতীয় মুসলমানরাই আছে। হিন্দুস্তানী মুসলমানরা চাকরী-বাকরিতে নেই বললেই চলে, কিছু আছে ব্যবসায়-বাণিজ্যে। ইন্দোনেশীয় মুসলমানরা প্রায় সকলেই কৃষিক্ষেত্রে। আর নিগ্রো মুসলমানদের অবস্থা আরও খারাপ। তারা থাকে জংগলে ও পাহাড় এলাকায়। সব মিলিয়ে শহর জীবনে মুসলমানদের প্রভাব উল্লেখযোগ্য নয়।' আহমদ হাত্তা নাসুমন বলল।

'বর্তমান বিরোধের সূত্রপাত কিভাবে হলো?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'আজ থেকে ছয় মাস আগে সংবিধান অনুসারে মেয়াদ শেষে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্যে আমার নেতৃত্বাধীন মন্ত্রী সভা ভেঙে দেয়া হয়। প্রেসিডেন্ট ইউরোপীয় জাতি গোষ্ঠির। তিনি তত্বাবধায়ক সরকার গঠন করেন এবং তার প্রধান হিসবে নিয়োগ করেন আরেকজন ইউরোপীয় বংশোদ্ভুত সাবেক আমলাকে। মহাখুশি হয় হিন্দুস্তানী বংশোদ্ভুত হিন্দু জাতিগোষ্ঠিরা। ইউরোপীয় ও তারা এক হয়ে যায়। শুরু হয় ষড়যন্ত্র। মাত্র একমাসে বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রায় ৪শ' মুসলিম রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী হারিয়ে যায়। তারা বেঁচে আছে কিনা তাও জানা যায়নি, আর মরে যাবার কোন চিহ্নও পাওয়া যায়নি। তারপর শুরু হয় আমার পরিবারের উপর হামলা। আমার একমাত্র সন্তান ফাতিমা নাসুমন পারামারিবো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। সেই আমার সবচেয়ে দুর্বলতম স্থান। এই দুর্বলতম স্থানেই তারা আঘাত করে। মিথ্যা প্রেমের খবর রটনা করে হিন্দুস্তানী এক রাজনীতিকের ছেলে তাকে জোর করে বিয়ে করতে চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যর্থ হয়। এরপর তাকে দু'বার কিডন্যাপ করার চেষ্টা করে। এই অবস্থায় দিশেহারা

হয়ে আমি ফাতিমাকে গোপনে ওয়াশিংটনে পাঠিয়ে দেই। এতে তারা ভীষণ ক্ষীপ্ত হয়ে ওঠে। তারা আমার হবু জামাতা, অত্যন্ত সম্ভাবনাময় যুবনেতা ওয়াং আলীকে কিডন্যাপ করে। তারা দাবী করেছে ফাতিমাকে ওদের হাতে তুলে না দিলে ওরা ওয়াং আলীকে হত্যা করবে। ওদিকে মন্ত্রীসভা ভেঙে দেয়ার তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন হওয়ার কথা, কিন্তু তা হলো না। আইন শৃংখলার কথা তুলে নির্বাচন তিন মাসের জন্যে পিছিয়ে দেয়া হলো। উদ্দেশ্য, নির্বাচনের আগে আরও সময় নেয়া যাতে মুসলমানদের শিক্ষিত ও সক্রিয় অংশকে ধ্বংস করা যায়। তাই হলো। মুসলমানদের শিক্ষিত ও সক্রিয় অংশ, বিশেষ করে যুবকরা হারিয়ে যেতে থাকল। আতংক সৃষ্টি হলো দেশ জুড়ে। মুসলিম যুবকরা দেশ থেকে পালাতে লাগল। পুলিশ নির্বিকার। পুলিশ ও সরকার স্বীকারই করল না যে, দেশ থেকে কেউ হারিয়ে গেছে। তারা একে নির্বাচন সামনে রেখে অপপ্রচারের একটা কৌশল হিসেবে প্রচার করল। কোন কোন ক্ষেত্রে লুকিয়ে রেখে, দেশ থেকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাবার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে, এমন কথাও বলা হতে লাগল। এই সূত্র ধরে যে পরিবারের যুবক ছেলে হারিয়ে গেল সেই পরিবারের উপর জুলুমও নেমে এল। শিক্ষিত ও সচেতন শত শত মুসলিম ঘরে আজ কান্নার রোল। মুসলিম পরিবারগুলো বিপুল সংখ্যায় পার্শ্ববর্তী দেশ ব্রাজিল, গায়না, ফ্রেঞ্চ গায়না প্রভৃতি দেশে পালিয়ে যাচ্ছিল। ব্যাপারটা বহিরবিশ্বে জানা-জানি হয়ে যাবে এই ভয়ে সরকার ও হিন্দুস্তানীদের প্রাইভেট বাহিনী সীমান্ত পথগুলোতে পাহারা বসাল। ফলে পালাবার পথও মুসলমানদের বন্ধ হয়ে গেল। খাঁচায় পুরা গিনিপিগের মতই মরতে লাগল মুসলমানরা। নির্বাচন পিছিয়ে দেয়ার দুমাস পর একদিন আমিও কিডন্যাপ হলাম। কিডন্যাপের পর ওরা আমাকে ছেড়ে দেয়ার জন্যে তিনটি শর্ত দিলঃ এক. আমাকে রাজনীতি ছাড়তে হবে, দুই. আমাকে দেশ ত্যাগ করতে হবে এবং তিন. আমার মেয়ে ফাতিমা নাসুমনকে ওদের হাতে তুলে দিতে হবে। আমি অস্বীকার করলে ওরা আমার উপর অকথ্য নির্যাতন চালায় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসে। ওদের পরিকল্পনা ছিল, সুরিনামে নতুন নির্বাচন হওয়া ও ফাতিমাকে উদ্ধার করার পর আমাকে হত্যা করবে।'

‘আপনার মেয়ে ফাতিমাকে হাতে পেতে ওরা এতটা মরিয়া কেন? শুধুই কি নারী দেহ টার্গেট?’ বলল আহমদ মুসা।

‘না তা নয়। ফাতিমাকে বাইরে রেখে আমাকে হত্যা করলে আমার কথা ও সুরিনামের পরিস্থিতি প্রকাশ হয়ে পড়ার ভয় থাকে। দ্বিতীয়ত, আমার মেয়েকে বাগে এনে আমার বিরাট জমিদারী তারা কব্জা করতে চায়। সুরিনাম উপকূলে কৃষিযোগ্য এলাকার মধ্যে আমাদের জমিদারীটাই সবচেয়ে বড় ও প্রাচীন। তৃতীয়ত, আমাকে ও আমার মেয়েকে শেষ করার মাধ্যমে আমাদের পরিবার ধ্বংস করতে পারলে তারা মনে করে, সুরিনামে মুসলিম রাজনীতির মেরুদন্ড আপাতত ভেঙে পড়বে।’ আহমদ হাত্তা নাসুমন বলল।

‘ইন্দোনেশীয়, হিন্দুস্তানী, ক্রোলস, চীনা ইত্যাদি সব কম্যুনিটি থেকেই যেহেতু লোক হারাচ্ছে এর কোন প্রতিক্রিয়া নেই? সংবাদপত্রগুলো কিছু লেখে না?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘প্রতিক্রিয়া আছে, কিন্তু তা ভীতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। আর প্রতিক্রিয়া জানাবে কার বিরুদ্ধে? সরকার, হিন্দুস্তানী ও ইউরোপীয়রা এর সাথে জড়িত, তার কোন প্রমাণ নেই। কিডন্যাপগুলো হচ্ছে খুবই পরিকল্পিতভাবে। বাড়ি থেকে কেউই হারাচ্ছে না। হয়তো একজন শহরে গেল, আর ফিরে এল না। হয়তো কেউ গঞ্জ-বাজারে গেছে, সেই যাওয়া তার শেষ যাওয়া হলো। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনেক সময় গায়েব হয়ে যাচ্ছে মুসলিম যুবকরা।’ থামল আহমদ হাত্তা নাসুমন।

‘তার মানে কিডন্যাপগুলো একটি সংঘবদ্ধ কোন গ্রুপের কাজ, যারা তাদের টার্গেটেড ব্যক্তির প্রতিদিনের গতিবিধি পাহারা দিয়ে একদিন সুযোগ মত তাকে কিডন্যাপ করে। আপনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, বলতে পারেন এ ধরনের কোন গ্রুপ সুরিনামে আছে?’ আহমদ মুসা বলল।

‘না এ ধরনের কোন গ্রুপ ছিল না। ক্রিমিনালদের ছোট ছোট গ্যাং ছিল, কিন্তু কোন পলিটিক্যাল মটিভে তারা উদ্বুদ্ধ ছিল না। তবে ‘মাতৃ সন্তান’ নামে একটা গ্রুপ ছিল। এরা সীমাবদ্ধ ছিল হিন্দুস্তানী হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে। তরুণ ও

যুবকরাই এই গ্রুপের সদস্য। গ্রুপটা সাংস্কৃতিক। প্রতিদিন সকালে ঈশ্বর বন্দনা, ইতিহাস থেকে গল্পের আসর পরিচালনা ও শরীর চর্চা তাদের একমাত্র কাজ।'

বলে একটু থামল আহমদ হাত্তা নাসুমন। তারপর শুরু করল আবার, 'আমার মনে হয় কিডন্যাপকারী গ্রুপটা বিদেশী, হায়ার করা। আমাকে যারা কিডন্যাপ করেছিল তাদের প্রায় সবাই বিদেশী। সুরিনামের মাত্র একজন যুবক ছিল তাদের সাথে। তাদের কথা শুনে মনে হয় তারা কারও পক্ষে কাজ করছে।' থামল আহমদ হাত্তা নাসুমন।

'সেই বিদেশীরা কি শ্বেতাংগ, না কৃষ্ণাংগ?' প্রশ্ন করল আহমদ মুসা।

'কৃষ্ণাংগ কেউ ছিল না। তবে শ্বেতাংগরাও পিউর শ্বেতাংগ কেউ ছিল না। দেহের রং ও গড়ন এশিয়ার কোন কোন এলাকার মানুষের মত।'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'আর তাদের সাথে সুরিনামের যে লোকটি ছিল, সে নিশ্চয় হিন্দুস্তানী ছিল?'

'হ্যাঁ, তাই।' বলল আহমদ হাত্তা নাসুমন।

'তার মানে হিন্দুস্তানীরা হায়ার করেছিল ইহুদী সন্ত্রাসীদের ক'জনকে?' আহমদ মুসা বলল।

'ওরা ইহুদী ছিল?' হাত্তা নাসুমনের কণ্ঠে বিস্ময়।

'আপনি যেখানে বন্দী ছিলেন, সে বাড়িটা ছিল ভারতীয় আমেরিকানদের নেতা ভারত ভূষণ শিবাজীর। আর ঐ বাড়ি থেকে পুলিশ যে দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে, তাদের একজন বিশ্ব ইহুদী গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান জেনারেল শ্যারন, অন্যজন দুর্ধর্ষ্য ইহুদী গোয়েন্দা বেন ইয়ামিন।' বলল আহমদ মুসা।

বিস্ময়ে চোখ দু'টি বড় বড় হয়ে উঠেছে আহমদ হাত্তা নাসুমনের। বিস্ময়-বিমূঢ় সে। কিছু বলতে পারল না।

আহমদ মুসাই শুরু করল। বলল, 'বিস্ময়ের কিছু নেই মি. হাত্তা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় আমেরিকানরা সহযোগিতা করছে ইহুদীবাদীদের, আর সুরিনামের ইহুদীবাদীরা সহযোগিতা করতে পারে ভারতীয় সুরিনামীদের।'

'আশ্চর্য আতাঁত। কিন্তু আমাদের সুরিনামে তো ইহুদী নেই! কিভাবে আতাঁত গড়ে উঠল?' বলল আহমদ হাত্তা নাসুমন।

‘আমার ধারণা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভারতীয় কম্যুনিটির সাথে আপনাদের ভারতীয় কম্যুনিটির যোগাযোগ আছে। এই যোগাযোগ থেকেই ওরা ইহুদীবাদীদের সাহায্য পেয়েছে।’ । আহমদ মুসা বলল।

‘দুর্ভাগ্য সুরিনামের।’ বলল আহমদ হাত্তা নাসুমন। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার বুক থেকে।

‘নির্বাচনের আর কত দেরী?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘তিন মাস।’

‘এখন আপনি কি করবেন?’

‘এই অবস্থায় আমরা সেখানে নির্বাচন করতে পারব না। আমাদের পাঁচ ছ’শ সক্রিয় নেতা-কর্মী হারিয়ে গেছে। আর এর সাথে সংশিস্নষ্ট করে এর চেয়েও বেশি নেতা-কর্মীকে জেলে পুরা হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হলো, নিরাপত্তার অভাব। কেউ সক্রিয় হলেই তার আর রক্ষা থাকবে না। হারিয়ে যেতে হবে, নয়তো জেলে যেতে হবে মামলায় পড়ে। আমাদের মুসলিম কম্যুনিটির প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই কান্নার রোল, বিষাদের ছায়া। সাহস করে দাঁড়াবার শক্ত মেরুদন্ড কারোর নেই। এই অবস্থায় তারা নির্বাচন করবে কি করে?’

বলতে বলতে কণ্ঠ ভারী হয়ে উঠেছে আহমদ হাত্তা নাসুমনের তার দু’চোখের কোণায় জমে উঠেছে অশ্রু।

আহমদ মুসার মনও ভারী হয়ে উঠেছে। তার চোখের সামনে ফুটে উঠল সুরিনামের ক্রন্দন কাতর মুসলিম জনপদের দৃশ্য। একটা অদৃশ্য কালো থাবা সেই জনপদগুলোকে গ্রাস করছে, ভেসে উঠল তার চোখে সেই দৃশ্যও। হৃদয়টা মোচড় দিয়ে উঠল আহমদ মুসার।

ভাবছিল আহমদ মুসা। বেশ একটু পর ধীরে ধীরে বলল, ‘আচ্ছা বলুন তো এতগুলো লোক নিখোঁজ হলো বা অপহৃত হলো, কোন ক্ষেত্রেই কি ওরা বাঁধা পায়নি, ধরা পড়েনি?’

‘না। ভোজবাজীর মতই ঘটে গেছে সব ঘটনা। মনে হয় তারা উপযুক্ত সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করেছে। সুযোগ পাওয়ার পর বাধা দেবার আর কোন সুযোগ দেয়নি।’

‘এই অদৃশ্য শত্রুকে আপনারা খুঁজে বের করার কোন সংঘবদ্ধ উদ্যোগ নেননি!’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

ম্লান হাসল আহমদ হাত্তা নাসুমন। বলল, ‘তা করা হয়েছে। একাধিকবার কমিটি গঠন করা হয়েছে। মুসলিম পুলিশ ও আমলাদের সাহায্য নেয়া হয়েছে। কিন্তু পা বাড়াবার পর তারাই আক্রান্ত হয়েছে। কমিটির সদস্যরাই কিডন্যাপের শিকার হয়েছে। এ ধরনের কয়েকটি ঘটনার পর কোন লোক এমন উদ্যোগ গ্রহণেও আর সাহস পায়নি।’

‘নিখোঁজরা কি সব নিহত বলে মনে করেন?’ আহমদ মুসা বলল।

‘এমন মনে করতে ভয় হয়। কিন্তু মেরে না ফেললে এত লোককে তারা রাখবে কোথায়? কেন রাখবে?’

‘মেরেই যদি ফেলে থাকে, তাহলে কিডন্যাপ করে কেন? মেরে ফেলে চলে যেতে পারে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘একই কম্যুনিটির এত লোক নিহত হলে দেশ ছাড়াও বিদেশে এর প্রতিক্রিয়া হবে। এই অসুবিধা বোধ হয় তারা এড়াতে চেয়েছে।’

‘এতবড় ঘটনা ঘটাবার ওদের প্রধান উদ্দেশ্য কি?’ প্রশ্ন করল আহমদ মুসা।

‘প্রথমত, মুসলমানদের নির্বাচন থেকে বিরত রাখা এবং যে মুসলমানরা রাজনীতিতে প্রধান শক্তি হতে যাচ্ছিল, তাদেরকে পেছনে ঠেলে দেয়া। কিন্তু আসল লক্ষ হলো, সুরিনামের হিন্দুস্তানীকরণের পথ সুগম করা। ইউরোপীয়দেরকে তারা হাত করেছে। এখন মুসলমানদের রাজনীতির মঞ্চ থেকে সরিয়ে দিতে পারলেই তারা নিরাপদ।’ বলল আহমদ হাত্তা নাসুমন।

‘ধন্যবাদ মি. হাত্তা। আমারও তাই মত।’ বলে একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর আবার শুরু করল, ‘সুরিনামের এই মহাবিপদে আপনি এখন কি করবেন ভাবছেন?’

‘আমার ওখানে যাওয়াই বিপজ্জনক। কিভাবে কি করব বুঝতে পারছি না।’ বলল হাত্তা নাসুমন হতাশ কণ্ঠে।

‘একটা সন্ত্রাসই তাহলে সেখানে জয়ী হয়ে যাবে?’ আহমদ মুসা বলল।

‘ওরা সংগঠিত, অন্যেরা অসংগঠিত।’ বলল হাত্তা নাসুমন।

আহমদ হাত্তা নাসুমন থামলেও আহমদ মুসা কোন কথা বলল না। ভাবছিল সে। অনেক্ষণ পর মাথা তুলল আহমদ মুসা। বলল, ‘আপনি এখন সুস্থ। হাসপাতাল থেকে কোথায় যাবেন, কি করবেন?’

‘আমার মেয়েকে খুঁজে বের করব। তারপর চিন্তা করব কি করা যায়। এখনো কিছু ভাবিনি।’ বলল হাত্তা নাসুমন।

‘আপনার মেয়ের কি নাম বলেছিলেন?’

‘ফাতিমা নাসুমন।’

‘পড়ছেন? কোথায় থাকেন?’

‘না এখনও ভর্তি হয়নি। কোথায় আছে আমি জানি না। যেখানে ছিল, সেখানে নিশ্চয় নেই। আমি কিডন্যাপ হবার পর নিশ্চয় সে জায়গা পরিবর্তন করেছে।

হাত্তা নাসুমন তার কথা শেষ করতেই তার এ্যাটেনডেন্ট এসে বলল, ‘স্যার ডাক্তার এসেছেন।’

শুনেই ‘স্যরি’ বলে উঠে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা তাকে উদ্দেশ্য করে বলল, ‘শুনুন, আমি হাসপাতাল থেকে রিলিজ নিয়ে নিচ্ছি। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে প্রথমেই যাব আমি যার গাড়ি নিয়ে শ্যারনকে ফলো করেছিলাম তার কাছে। গাড়ির ক্ষতিপূরণ দিতে। আপনিও আমার সাথে থাকবেন। আপনার মেয়েকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত আপনি আমার মেহমান।’

খুশিতে মুখ ভরে উঠল আহমদ হাত্তা নাসুমনের। ধপ করে সে আবার সোফায় বসে পড়ল। দু’হাত চেপে ধরল সে আহমদ মুসার। বলল, ‘এতবড় সৌভাগ্য হবে আমার? আমি আহমদ মুসার মেহমান হতে পারব? আমাকে নিয়ে, আমাদের নিয়ে ভাবছেন আপনি?’

বলে আহমদ মুসার দু’হাত ছেড়ে দিয়ে হাত দু’টি উপরে তুলে বলল, ‘হে আল্লাহ, অসহায় আমরা, আমাদের সাহায্য করুন।’

কথা শেষ করেই উঠে দাঁড়াল হাত্তা নাসুমন। আহমদ মুসাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে দ্রুত তার কক্ষের দিকে এগুলো। তার দু'চোখের কোণায় অশ্রু চিক চিক করছিল।

আহমদ মুসা উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু দেখল বারান্দা দিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে লায়লা জেনিফার ও তার স্বামী জর্জ এবং সান ওয়াকার ও তার স্ত্রী মেরী রোজ। লায়লা জেনিফার ও মেরি রোজ দু'জনের গায়েই ফুল হাতা জামা। মাথার রুমাল ওদের গলা ও বুক জড়িয়ে আছে।

খুশি হলো আহমদ মুসা। নড়ে-চড়ে বসল সোফায় আবার।

ওরা এসে পড়লে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়ে ওদের স্বাগত জানাল সালাম দিয়ে এবং বলল, 'মনে পড়ল বুঝি আমার কথা?'

'ভাইয়া, জানি একথা আপনি বলবেন। কিন্তু জানেন, আমরা দু'দিন এসে ফিরে গেছি। আপনি ঘুমিয়ে ছিলেন।' অভিমান ক্ষুব্ধ কণ্ঠ জেনিফারের।

'জানি জেনিফার। তোমাদের স্লিপ তো পড়েছি। কিন্তু টেলিফোন নাম্বার ছিল না কোন স্লিপে?' আহমদ মুসা সোফায় বসতে বসতে বলল।

'আপনি যেহেতু ঘুমিয়ে ছিলেন ভাইয়া, টেলিফোন নাম্বারটা অন্যের হাতে পড়ার সম্ভাবনা ছিল। সেজন্যেই........।'

জেনিফারের কথার মাঝখানেই আহমদ মুসা বলে উঠল, 'বাঁ চমৎকার তুমি তো গোয়েন্দা হয়ে উঠছ জেনিফার।' আহমদ মুসার মুখে হাসি।

'কখনো না। আপনাকে যা দেখছি। তারপর ঐ পথে পা বাড়াব আমি?' বলল জেনিফার কৃত্রিম ভয়ের সুরে।

'ভাইয়া, জেনিফার কিন্তু এখন আমেরিকান ক্রিসেন্টের টার্কস দ্বীপপুঞ্জ শাখার সভানেত্রী।' জেনিফার থামতেই বলে উঠল জর্জ।

'অভিনন্দন জেনিফার। যতই মুখে বল, বোন কি ভাইয়ার পথ ছাড়তে পারে? ' বলে হেসে উঠল আহমদ মুসা। তারপর কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে সবাইকে লক্ষ করে বলল, 'আমি এই হাসপাতালে তোমরা জানলে কি করে?'

‘ভাইয়া নিউ হারমানের আগের দিনের কাহিনী পড়ে আমাদের শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা হয়েছিল। এরপর কি ঘটে? এ ষড়যন্ত্রই কি সত্য হবে? এমন হাজারো প্রশ্ন আর মনের আকুলতা নিয়ে আমরা তাকিয়ে ছিলাম টিভি চ্যানেল ও সংবাদপত্রের দিকে। আলহামদুলিল্লাহ, পরের দিনই আমরা জানলাম আপনার সব কাহিনী এবং সত্য ঘটনা। সংবাদপত্রেই জানলাম আপনি আহতাবস্থায় হাসপাতালে। আপনি কোন হাসপাতালে তা বহুকষ্টে জোগাড় করে আমরা সেদিন সকালেই এখানে ছুটে এসছিলাম। কথা বলতে না পারলেও দেখেছিলাম আপনাকে। সেদিন আমাদের সাথে ওগলালাও ছিল।’

‘ওগলালা কেমন আছে?’ আহমদ মুসা বলল।

‘ভাল।’ বলল সান ওয়াকার।

‘ওকে আমার সালাম দিও। আর আসতে বলো।’ আহমদ মুসা বলল।

‘অবশ্যই ভাইয়া।’ বলল সান ওয়াকার।

‘ভাইয়া সারা জেফারসন আপা কেমন আছেন? ওর হাসপাতালে গিয়েছিলাম, কিন্তু সিকুরিটির লোকরা দেখা করতে দেয়নি।’ লায়লা জেনিফার বলল।

‘তুমি সারা জেফারসনকে চিনলে কি করে?’ আহমদ মুসার কণ্ঠে কিছুটা বিস্ময়।

‘ওঁর মত মহান নেত্রী ও বিখ্যাত এক আমেরিকানকে আমরা জানব না কেন? জানেন, আপনি যখন শ্যারনদের হাতে বন্দী, সারা জেফারসন যখন হাসপাতালে তখন আমরা সবাই, ওগলালাও ওঁর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। প্রায়........।’

জেনিফারের কথায় বাধা দিয়ে আহমদ মুসা বলে উঠল, ‘দেখাও করেছ ওর সাথে?’

‘অবশ্যই। প্রায় দু’ঘন্টা ছিলাম ওঁর সাথে। কত গল্প আমরা করেছি। খুব খুশি হয়েছেন উনি। আপনাকে নিয়ে কত যে প্রশ্ন করেছেন তিনি। খুঁটে খুঁটে আপনার সব কথা জেনে নিয়েছেন। সারা আপা খুব আবেগ প্রবণ। ভাবীর সাথে কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন? সত্যিই ভাইয়া........।’

জেনিফারকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে আহমদ মুসা আবার বলল, ‘তার মানে ‘ভাবী’ মানে ডোনা জোসেফাইনের সাথে সারা কথা বলেছে! কেঁদেছে!’ আহমদ মুসার কণ্ঠে শুস্কতা, মুখ ম্লান।

‘হ্যাঁ ভাইয়া। আমরা ভাবীর গল্প করার পর উনি কিছুতেই কথা না বলে ছাড়বেন না।’

বলে একটু থামল লায়লা জেনিফার। বলে উঠল পরক্ষণেই, ‘সত্যি ভাইয়া সারা জেফারসন আপার মত এত মিষ্টি মানুষ আমি দেখিনি। শুধু থাকতেই ইচ্ছে করে ওঁর কাছে। আর আপনি ওঁর কাছে দেবতার চেয়ে বড়। আমরা বিদায়ের সময় উনি কি বললেন জানেন, ‘তোমরা তোমাদের ভাইয়ার প্রতি সুবিচার করছ না জেনিফার। যে লোক নিজের দিকে দেখে না, তাঁকে সবাই মিলে দেখা উচিত।’ এ কথা বলার সময় হাসতে গিয়ে কেঁদে ফেলেছিলেন সারা আপা।’

লায়লা জেনিফারের কথাগুলো তীরের মত বিদ্ধ করল আহমদ মুসার হৃদয়কে। কেঁপে উঠল আহমদ মুসা। অসহনীয় যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ল তার গোটা দেহে। সারা জেফারসনের ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত হৃদয় যেন তার সামনে একেবারে উন্মুক্ত।

আহমদ মুসা বহুকষ্টে নিজেকে সম্বরণ করে প্রসঙ্গটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেবার জন্যে বলল, ‘সারা জেফারসন ভালো আছে। ও হাসপাতাল থেকে ক’দিন আগেই বাসায় ফেরার কথা। যাক। এখন বল, তোমাদের কাজকর্ম কেমন চলছে?’

‘কিন্তু ভাইয়া, আমাদের কথা বলার আগে আপনার কথা আমরা জানতে চাই।’ আক্রমণের মুড নিয়ে বলল জেনিফার।

‘কি কথা?’

‘ভাবী কেমন আছেন?’

‘ভাল।’

‘প্রতিদিনই কথা বলি। আজও সকালে বলেছি।’

‘হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে কোথায় যাবেন?’

'একজনের গাড়ি কেড়ে নিয়ে জেনারেল শ্যারনকে ফলো করেছিলাম। সে গাড়ির ক্ষতিপূরন দেয়ার জন্যে তার কাছে যাব। তারপর যাব সারা জেফারসনকে দেখতে। সেখানে আমার ব্যাগ-ব্যাগেজও আছে।'

'তারপর?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না আহমদ মুসা। সোফায় গা এলিয়ে দিল। চোখ বন্ধ করল। বেশ কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে বলল, 'তারপর অনিশ্চিত এক যাত্রা।'

অস্বস্তিকর এক নিরবতা নামল।

নিরবতা ভাঙল জেনিফারই। বলল, 'কোথায়?'

চোখ খুলল। ম্লান হাসল।

তারপর সোজা হয়ে সোফায় বসল। বলল, 'বলার মত হয়নি এখনও। পরে বলব তোমাদের।'

লায়লা জেনিফার এ কথায় সন্তুষ্ট হয়নি। কিছু বলতে যাচ্ছিল।

আহমদ মুসা তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'এখন আর কোন কথা নয়। চল কিছু খাই।'

বলে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

তার সাথে সবাই উঠে দাঁড়াল।

আধ ঘন্টা পর ওরা ক্যান্টিন থেকে ফিরে এসে আবার বসল সেই বারান্দায়। ঠিক এ সময় আহমদ মুসা দেখল জর্জ আব্রাহাম জনসন তার দিকে আসছে।

আহমদ মুসা তাকে স্বাগত জানিয়ে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিল।

'সবাইকে তো দেখেছি। ধন্যবাদ সবাইকে।' বলে বসল জর্জ আব্রাহাম।

'তোমরা একটু ভেতরে যাও, আমি মি. জর্জের সাথে কথা সেরে নেই।' বলল আহমদ মুসা জেনিফারদের লক্ষ করে।

'অবশ্যই।' বলে উঠে দাঁড়াল জেনিফার এবং সকলে। বলল জেনিফার, 'আমরা ওদিক থেকে একটু ঘুরে আসি ভাইয়া।'

বারান্দা ধরে লিফটের দিকে এগুলো সবাই।

‘স্যরি, আপনাদের কথার মাঝখানে এসে পড়েছি আমি।’ বলল জর্জ আব্রাহাম।

‘না, না। ওরা দেখতে এসেছে। বসে বসে খোশ গল্প করছিলাম।’

আহমদ মুসা একটু নড়ে চড়ে বসে বলল, ‘ধন্যবাদ মি. জর্জ। হাসপাতালের ব্যবস্থা এত ভাল যে একমাসের কিউর এক সপ্তাহে হয়ে গেছে।’

‘কিন্তু ডাক্তাররা তো অন্য কথা বলেন মি. আহমদ মুসা। তাদের মতে আপনার শরীরে বিধাতার দেয়া কোন মেডিসিন বক্স আছে, যা থেকে শরীর তার নিজের চিকিৎসা নিজেই করতে পারে।’ বলল জর্জ আব্রাহাম।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘ঘটনা তা নয়, কারও শরীরে কিউর তাড়াতাড়ি হয়, কারও হয় ধীরে ধীরে। এটা সবারই জানা।’

‘থাক ওসব। আপনার ও আমাদের সকলের জন্যে সুখবর আহমদ মুসা। প্রেসিডেন্ট আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। তিনি আপনাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অফার করেছেন। সেই সাথে এক খন্ড জমি। আপনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যেখানে চান, সেখানেই আপনাকে জমি খন্ডটি দেয়া হবে।’ বলল জর্জ আব্রাহাম।

বিব্রতকর এক লজ্জায় ছেয়ে গেল আহমদ মুসার চোখ-মুখ। বলল, ‘আল হামদুলিল্লাহ। আমার প্রতি প্রেসিডেন্টের এই শুভেচ্ছাকে গ্রহণ করলাম। তার এই শুভেচ্ছা আমার কাছে অমূল্য। আল্লাহ তার ও আমেরিকার মঙ্গল করুন।’

‘ধন্যবাদ আহমদ মুসা। প্রেসিডেন্টকে আপনার এই সুন্দর আবেগের কথা আমি জানাব।’ বলল জর্জ আব্রাহাম।

‘ধন্যবাদ মি. জর্জ।’ বলে একটু থেমেই আবার মুখ খুলল, ‘জেনারেল শ্যারনদের খবর কি?’

‘তিনি এখন সুস্থ। বেন ইয়ামিনও। তাদের রাখা হয়েছে ফেডারেল কারাগারে। নতুন করে আরও দুটি কেস তাদের বিরুদ্ধে করা হয়েছে। একটা নিউ হারমানের ঘটনার বিষয়ে, আরেকটা সারা জেফারসন ও নাবিলাকে কিডন্যাপ করার দায়ে।’ বলল জর্জ আব্রাহাম।

‘চাপ আসছে না আপনাদের উপর?’

‘এসেছে। তার জবাবও দেয়া হয়েছে। জবাবে একজন জঘন্য ক্রিমিনালের পক্ষে ওকালতি করার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে। আর সিদ্ধান্ত হয়েছে সকল চাপকে উপেক্ষা করার।’

‘ধন্যবাদ। কিন্তু আপনারা কি সত্যই ইহুদীবাদী অক্টোপাশকে আমেরিকা থেকে বিদায় করতে পারবেন?’ আহমদ মুসা বলল।

হাসল জর্জ আব্রাহাম। বলল, ‘বিষয়টা যতটা কঠিন ভাবছেন, তা নয়। ইতিমধ্যেই দেশের সকল অঞ্চল থেকে সাধারণ ও ধার্মিক ইহুদীদের প্রতিক্রিয়া এসেছে প্রেসিডেন্টের কাছে। তারা সকলেই জেনারেল শ্যারন ও ডেভিড উইলিয়াম জোনসের ষড়যন্ত্রের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত থাকার কথা অস্বীকার করেছে। তারা তীব্র সমালোচনা করেছে নিউ হারমানের ঘটনার। তারা জেনারেল শ্যারন ও তার সহযোগীদের কঠোর শাস্তি দাবী করেছে। আর মার্কিন জনগণ এ ব্যাপারে এক পায়ে খাড়া। তাদের কাছে আপনি এখন এক ‘মহান হিরো’ আহমদ মুসা।’

‘ধন্যবাদ মি. জর্জ। আমি ভাবছি, কেসগুলোর মাধ্যমে সব ইহুদীদের তো আপনারা চিহ্নিত করতে পারছেন না।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তা সম্ভবও নয়। তবে ইহুদীবাদীদের মেরুদন্ড ভেঙে দেয়া হচ্ছে, তাদের উঠে দাঁড়াবার শক্তি আর রাখা হচ্ছে না। ইহুদীবাদীদের সকল সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে। যে কমিটি এই সুপারিশ করবে, সেই কমিটিতে ডা. বেগিন বারাক, আইজ্যাক বেনগুরিয়ানের মত বেশ কয়েকজন সম্মানিত ইহুদী নাগরিক থাকছেন। তাছাড়া ইসরাইল রাষ্ট্রের দূতাবাস ছাড়া ইসরাইল রাষ্ট্রের অন্যসব প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। যে দূতাবাস থাকছে, সেখানে সমাজ-সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সমর বিষয়ক কোন বিভাগ ও কোন প্রতিনিধি থাকছে না। ইসরাইলের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক কোন সম্পর্ক থাকছে না। এ সব সিদ্ধান্ত ইহুদীবাদীদের গোড়া কেটে দেবে। উপরন্তু আমেরিকান জুইস এ্যাসোসিয়েশন ও আমেরিকান জুইস কনফারেন্স সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কোন ইহুদীবাদীকে তারা তাদের সমিতির সদস্য করবে না, কোন ইহুদীবাদী তাদের সমিতির সদস্য থাকতে পারবে না।’ থামল জর্জ আব্রাহাম।

‘আল্লাহ আমেরিকার মঙ্গল করুন।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ধন্যবাদ।’ বলে জর্জ আব্রাহাম একটু নড়ে-চড়ে বসে বলল, ‘মি. আহমদ মুসা আজ আপনি ছাড়া পাচ্ছেন, তারপর সোজা কিন্তু আমার বাড়িতে গিয়ে উঠবেন।’

‘কেন?’ ঠোঁটে হাসি টেনে বলল আহমদ মুসা।

‘আমার ছেলে জন মুর ও নাতি জুনিয়র আব্রাহাম আসছে। নাতি এসেই আপনার কাছে নিয়ে আসার জন্য জুলুম শুরু করবে। আমার স্ত্রী আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছে।’ জর্জ আব্রাহাম জনসন বলল স্নেহপূর্ণ হাসি হেসে।

আহমদ মুসার মুখ এক মিষ্টি হাসিতে ভরে গেল। বলল, ‘জুনিয়র আব্রাহামরা ক’দিন থাকছে?’

‘দিন সাতেক। জন মুরের কিছু কাজ আছে ওয়াশিংটনে।’ বলল জর্জ আব্রাহাম।

‘তাহলে আজ আমি যাচ্ছি না, জরুরী কিছু কাজ আছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘সবে রিলিজ হচ্ছেন, এখনি কোন ‘জরুরী’ কাজে লেগে পড়া ঠিক নয়। ক’দিন আপনার বিশ্রাম চাই।’ বলল জর্জ আব্রাহাম।

‘সে রকম কোন ঝুঁকির কাজ নয়। আমি হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যাব সেই মেয়েটির বাসায় যার গাড়ি আমি বলতে গেলে কেড়ে নিয়ে এসেছিলাম। গাড়ির ক্ষতিপূরণ আমি নিজে গিয়ে দিয়ে আসতে চাই।’ আহমদ মুসা বলল।

‘হ্যাঁ, এটা একটা বড় কাজ অবশ্যই। আপনি কি ক্ষতি পূরণের টাকাটা পেয়েছেন এফবিআই থেকে?’

‘হ্যাঁ পেয়েছি। ধন্যবাদ আপনাকে।’

‘আমি বিস্মিত হয়েছি। আমেরিকান মেয়েরা সাধারণত এভাবে গাড়ি দেয় না। তাকে আমাদের তরফ থেকেও ধন্যবাদ দেবেন।’ জর্জ আব্রাহাম বলল।

‘ক্ষণিকের দেখা, তবু যতটুকু দেখেছি তাতে মেয়েটিকে আমার ইউরোপীয় বা আফ্রিকান শ্রেণীর আমেরিকান বলে মনে হয়নি।’

‘ইউরোপীয়ান, আফ্রিকান শ্রেণীর ছাড়াও বহু জাতির আমেরিকান আছে এদেশে ইয়ংম্যান।’

‘তা আছে।’

‘হাসপাতাল থেকে গিয়ে উঠছেন তো সারা জেফারসনদের ওখানেই? না লায়লা জেনিফাররা ধরে নিয়ে যাবে?’ জর্জ আব্রাহাম বলল।

‘এসেছে ওরা এ উদ্দেশ্যেই। কিন্তু আমি মেয়েটির সাথে দেখা করে সারা জেফারসনদের ওখানেই যাচ্ছি। ও সুস্থ হওয়ার পর ওর সাথে দেখা হয়নি। আমার ব্যাগ-ব্যাগেজও আছে ওখানে।’ বলল আহমদ মুসা একটু হেসে।

জর্জ আব্রাহাম আহমদ মুসার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। একবার ভাবল সারা জেফারসন ও আহমদ মুসার ব্যাপারে যে দায়িত্ব প্রেসিডেন্ট তাকে দিয়েছেন সে কথা আহমদ মুসার কাছে এখনই পাড়বে কিনা। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবল, না তাকে বাসায় নিয়ে গিয়ে ভাল পরিবেশে বলতে হবে। প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে জর্জ আব্রাহাম বলল, ‘আমেরিকান সরকার যে একখন্ড জমি আপনাকে দিতে চান, সেটা কোথায় নেবেন জানতে চাই মি. আহমদ মুসা।’

লজ্জা মিশ্রিত বিব্রতকর এক হাসি ফুটে উঠল আহমদ মুসার মুখে। বলল, ‘ঠিক আছে। আমেরিকার তো আমি সবকিছু চিনি না। সারা জেফারসনের সাথে একটু আলোচনা করে নেই।’

মিষ্টি হাসি ফুটে উঠল জর্জ আব্রাহামের ঠোঁটে। বলল, ‘ওকে ইয়ংম্যান।’

কথা শেষ করেই জর্জ আব্রাহাম মোবাইলটা হাতে তুলে নিয়ে বলল, ‘উঠি মি. আহমদ মুসা।’

‘দু’মিনিট, একটা কথা আছে।’ সচকিত হয়ে উঠে বলল আহমদ মুসা।

তারপর সে আহমদ হাত্তা নাসুমনের সমস্যার কথা সংক্ষেপে জর্জ আব্রাহামকে জানাল এবং বলল, ‘ওঁকেও আমার সাথে রিলিজের ব্যবস্থা করুন। আমি তাঁকে সাথে নিয়ে বেরুব।’ আহমদ মুসা থামল।

ভ্রু কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে জর্জ আব্রাহাম জনসনের। দ্রুত তার মুখে নামল ভাবনার একটা ছায়া। বলল, ‘তার মানে মি. আহমদ মুসা আপনি মি. হাত্তার কেসটা টেক আপ করছেন?’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘এখন প্রথম কাজ হলো তাঁর মেয়েকে খুঁজে দেয়া।’

‘তারপর?’

‘তারপর কি ঘটে দেখতে হবে।’

গম্ভীর হলো জর্জ আব্রাহাম জনসনের মুখ। সে দু’হাতে আহমদ মুসার একটা হাত চেপে ধরে বলল, ‘মি. আহমদ মুসা, বয়সে ছোট হয়েও আপনি অনেক বড়, কিন্তু আমার ছেলের মত। আমার স্ত্রী আপনাকে তার দ্বিতীয় ছেলে দাবী করে। আমি বলছি, দীর্ঘ ধকল গেছে আপনার উপর দিয়ে। দীর্ঘ একটা বিশ্রাম বা ছুটি আপনার প্রয়োজন। আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা আমরা করছি। এ জন্য আমাদেরকে সময় দিতে হবে আপনার।’

আহমদ মুসা তাকাল জর্জ আব্রাহামের দিকে। আবেগে ভারী হয়ে উঠেছে আহমদ মুসার চোখ-মুখ। বলল, ‘জানি আপনারা খুব ভালোবাসেন আমাকে, খালাম্মা আমাকে খুবই আদর করেন। এটা আমার সৌভাগ্য। কিন্তু আপনি তো বুঝবেন, কিছু কাজ, কিছু দায়িত্ব এমন আছে যা এড়ানো যায় না, উচিতও নয়।’

বলে মুহূর্তকালের জন্যে থামল আহমদ মুসা। তারপর বলল, ‘আমি যাই করি, খালাম্মার অনুমতি না নিয়ে করব না।’

স্নেহের আবেগে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে জর্জ আব্রাহাম জনসনের চোখ-মুখ।

‘ধন্যবাদ, বেটা।’ বলে উঠে দাঁড়াল জর্জ আব্রাহাম। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, ‘জানেন, আপনার খালাম্মা আপনার ধর্মের উপর অনেক বই যোগাড় করেছে। বলে কি জানেন, যে ধর্ম আমার ছেলেকে এতবড় বানিয়েছে, সেটা আমারও ধর্ম। আর এ বিষয়ে তার সবচেয়ে উৎসাহী ছাত্র হলো আমাদের নাতি।’

আহমদ মুসাও উঠে দাঁড়িয়েছে। মিষ্টি হাসি তার মুখে। বলল, ‘আল হামদুলিল্লাহ। খালাম্মাকে বলবেন, আমি দারুণ খুশি হয়েছি। আমি গিয়ে তাঁকে মোবারকবাদ জানাব।’

‘অবশ্যই আহমদ মুসা। আসি। ভালো থাকুন। গুড মর্নিং, আসসালাম।’

ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল জর্জ আব্রাহাম জনসন।

আহমদ মুসাও হাঁটতে লাগল তার সাথে কিছুটা এগিয়ে দেবার জন্যে।

# ৫

চারতলা একটা বাড়ির গাড়ি বারান্দায় গাড়ি থেকে নামল আহমদ মুসা।

গাড়িতে বসা ছিল হাত্তা নাসুমন।

আহমদ মুসা গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির দরজা বন্ধ করতে করতে বলল, ‘মি. হাত্তা, আপনি একটু বসুন। দেখি মেয়েটি বাড়ি আছে কিনা।’

বলে আহমদ মুসা ছুটল গেটের দিকে। বন্ধ গেট।

দরজার ডানপাশে দেয়ালে ইন্টারকম।

ইন্টারকমের দিকে হাত বাড়াল আহমদ মুসা। কিন্তু সমস্যায় পড়ে গেল। কোন ফ্ল্যাটে কল করবে সে। ৪ তলা বাড়ি। ৪টি ফ্ল্যাট। গাড়ির ব্লু বুকে শুধু মেয়েটির নাম ‘এ্যানি এন্ডারসন’ ও বাড়ির নাম্বার আছে। ফ্ল্যাট নাম্বার নেই।

ভাবল আহমদ মুসা, দু’তলার ফ্ল্যাট সিকুরিটির জন্যে ভালো। প্রথমে দু’তলায় দেখা করব। না হলে সব তলায় নক করতে হবে।

‘বিসমিল্লাহ’ বলে আহমদ মুসা দু’তলার ইন্টারকমে ক্লিক করল।

সেকেন্ডের মধ্যেই ওপর থেকে সাড়া এল। একটা তরুণী কণ্ঠ কথা বলে উঠল, ‘কে ওখানে?’

‘আমি আহমদ মুসা। সেদিন জোর করে আপনার গাড়ি নিয়ে গিয়েছিলাম। গাড়ি ফেরত দেয়ার ব্যাপারে এসেছি।’

‘আহমদ মুসা মানে আপনি মুসলিম?’

‘হ্যাঁ, আমি মুসলিম।’

‘ঠিক আছে, আপনি আসুন।’

তরুণীটির এই কথার সাথে সাথে গেটের তালায় একটা ক্লিক শব্দ উঠল। তার অর্থ গেট খুলে দেয়া হয়েছে।

আহমদ মুসা মুখ ঘুরিয়ে তার গাড়ির দিকে চেয়ে বলল, ‘মি. হাত্তা আসুন।’

হাত্তা নাসুমন এসে গেল।

আহমদ মুসা প্রবেশ করল তাকে নিয়ে।

আহমদ মুসা দু'তলার ল্যান্ডিং-এ সবে এসে দাঁড়িয়েছে। তার পেছনে হাত্তা নাসুমনও।

একটা তরুণী দু'তলার দরজা খুলে বেরিয়ে এল।

নীল রংয়ের ঢিলা ফুলহাতা একটা গাউন তার গোটা দেহ ঢেকে আছে। মাথায় একটা রুমাল।

দরজা খুলেই সে তাকিয়েছে আহমদ মুসার দিকে। কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার দৃষ্টি পেছনের আহমদ হাত্তার উপর পড়তেই বিস্ময়ে তার চোখ বিস্ফোরিত ও মুখ হা হয়ে উঠল। 'আব্বা' বলে একটা চিৎকার দিয়ে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল আহমদ হাত্তা নাসুমনকে।

'মা, একি তুমি!' বলে হাত্তা নাসুমনও জড়িয়ে ধরেছে তরুণীটিকে।

আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়াল তাদের দিকে। তার চোখে-মুখেও বিস্ময় ও আনন্দের খেলা। আহমদ মুসা বুঝে নিয়েছে সে যার কাছে এসেছে অর্থাৎ এই তরুণী এ্যানি এন্ডারসনই ফাতিমা নাসুমন, হাত্তা নাসুমনের মেয়ে।

একটা বিরাট স্বস্তি নেমে এল আহমদ মুসার চোখে-মুখে। খুশি হলো সে।

পিতা ও কন্যা দু'জনের চোখেই অশ্রুর ঢল। কাঁদছে দু'জনেই।

প্রাথমিক আবেগটা সামলে নেবার পর হাত্তা নাসুমন মেয়েকে আহমদ মুসার দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলল অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে, 'মি. আহমদ মুসা, এই আমার মেয়ে ফাতিমা নাসুমন। আল্লাহ আমার মেয়েকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন আহমদ মুসা।'

বলেই হাত্তা নাসুমন ল্যান্ডিং-এর উপরই সিজদায় পড়ে গেল। পিতার সাথে সাথে সিজদা করল ফাতিমা নাসুমনও।

তারা সিজদা থেকে উঠে দাঁড়াল।

'আপনারা, পিতা-কন্যা, দু'জনকেই মোবারকবাদ।' বলল আহমদ মুসা তাদের লক্ষ করে।

'শুকরিয়া।' বলল মেয়েটি। তার দু'চোখ তখনও অশ্রুতে ভাসছে।

‘লক্ষ বার শুকরিয়া আদায় করলেও আপনার শুকরিয়া আদায় হবে না আহমদ মুসা।’ প্রায় মেয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠল হাত্তা নাসুমন।

‘দেখুন, মি. হাত্তা, আল্লাহর নিরংকুশ অধিকারে কারও ভাগ বসাতে চাচ্ছেন আপনি।’ আহমদ মুসার ঠোঁটে হাসি, কিন্তু কণ্ঠে একটা মিষ্টি শাসনের সুর।

কিছু বলতে যাচ্ছিল হাত্তা নাসুমন।

ফাতিমা নাসুমন তাকে বাঁধা দিয়ে বলল, ‘ভেতরে চলুন আব্বা।’ তারপর আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আসুন জনাব।’

সবাই ভেতরে ঢুকল।

দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকার পর ছোট্ট একটা করিডোর, দু’পাশে দেয়াল।

করিডোর গিয়ে পড়েছে বিশাল একটা ড্রইংরুমে।

ড্রইংরুমে প্রবেশ করল তারা।

সমস্ত ড্রইং রুম জুড়ে কয়েক সেট সোফা গুচ্ছাকারে সাজানো। হালকা নীল কার্পেটের উপর সাদা সোফার গুচ্ছগুলোকে সাগর বুকের সফেদ তিলক বলে মনে হচ্ছে।

ড্রইং রুমে আহমদ মুসাকে একটা সোফায় বসার অনুরোধ করে ফাতিমা নাসুমন তার আব্বাকে নিয়ে মুখোমুখি আরেকটা সোফায় গিয়ে বসল।

বসেই ফাতিমা নাসুমন আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘মাফ করবেন জনাব, শুরুতেই আমি একটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছি।’

‘করুন।’ বলল আহমদ মুসা।

ফাতিমা নাসুমন ত্বরিত তাকাল তার পিতার দিকে। বলল, ‘আব্বা ওঁকে বলুন আমাকে ‘তুমি’ বলার জন্যে। আমি নিশ্চয় ছোট হব।’

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘ঠিক আছে ছোট বোন, তোমার শুরুর প্রশ্নটা কর।’

সলজ্জ আনন্দে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ফাতিমা নাসুমনের। সে দ্রুত উঠে দাঁড়াল। ছুটে গেল আহমদ মুসার দিকে। তার পায়ের কাছে বসল এবং দু’হাত আহমদ মুসার দু’পায়ে ঠেকিয়ে সালাম করল।

আহমদ মুসা তার দু'পা টেনে নিতে নিতে বলল, 'এ কি করছ ফাতিমা? পায়ে হাত দিয়ে তো সালাম করে না।'

'না, আমাদের সুরিনামে আমরা গুরুজনকে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করি।'

বলে ফাতিমা নাসুমন ফিরে এল তার আসনে, পিতার পাশে।

বসেই সে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'জনাব আমি জানতে চাচ্ছি, গত কিছুদিন ধরে আমেরিকার পত্র-পত্রিকায় যে আহমদ মুসার কথা লেখা হচ্ছে, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের ইতিহাস সৃষ্টিকারী ঘটনাগুলোতে যে আহমদ মুসার নাম শুনেছি এবং চীন, রাশিয়া, ফ্রান্স, আফ্রিকা, ফিলিপাইন, ফিলিস্তিন, ককেশাস, বলকান প্রভৃতি দেশের নানা ঘটনায় যে আহমদ মুসাকে পেয়েছি, সেই আহমদ মুসাই তো আপনি?'

আহমদ মুসা মুখ খোলার আগেই আহমদ হাত্তা নাসুমন মুখ খুলল। বলল, 'হ্যাঁ মা আমরা ভাগ্যবান। সেই আহমদ মুসাই তোমার গাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন, সেই আহমদ মুসাই আমাকে মুক্ত করেছেন এবং সেই আহমদ মুসাই এখন আমাদের সামনে বসে আছেন।'

'ও গড!' বলে বিস্ময়-বিমুগ্ধ ফাতিমা নাসুমন উঠে দাঁড়াল। দ্রুত আহমদ মুসার দিকে ছুটে গিয়ে আগের মতই তার পায়ের কাছে বসে দু'হাতে আহমদ মুসার দু'পা স্পর্শ করে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'এটা সালাম নয়। পায়ের ধুলো নিলাম।'

ফাতিমা নাসুমন তার আসনে ফিরে আসছিল। আহমদ মুসা বলল, 'পায়ের ধুলো নেয়ার প্রচলনও কি সুরিনামে আছে?'

'হিন্দুস্তানীদের মধ্যে এটা খুব বেশি প্রচলিত। দেখাদেখি মুসলিম সমাজেও এর কিছু চল আছে।' বলল হাত্তা নাসুমন।

হাত্তা থামতেই ফাতিমা নাসুমন বলে উঠল, 'আব্বা একটা কথা বলি। সেদিন আমি ওভাবে গাড়ি দেবার কথা নয়। ওঁর হাতে অস্ত্র ছিল না। আমি চেঁচামেঁচি করে লোক ডাকার কথা। কিন্তু আমি পারিনি। মনে হয়েছিল, উনি যা বলছেন সব সত্যি। তাঁর কথা আমার মানা দরকার। আমি তাঁকে গাড়ি দিয়ে

দিয়েছি। পরে আমি অনেক ভেবেছি, আমি তখন ঐ ভাবে চিন্তা করেছিলাম কেন? কেন পুতুলের মত ওঁর হাতে গাড়ি তুলে দিলাম। আজ বুঝতে পারছি, উনি আহমদ মুসা ছিলেন বলেই ওঁর নির্দেশ না মেনে উপায় ছিল না।'

বলেই ফাতিমা নাসুমন ওপর দিকে মুখ তুলল। বলতে লাগল, 'ও আল্লাহ, জনাব আহমদ মুসাকে অসাধ্য সাধনের আরও শক্তি দান করুন। তাঁকে জর্জ ওয়াশিংটনের মত সফল করুন।' আবেগে ভারী হয়ে গেল ফাতিমা নাসুমনের কণ্ঠ।

'ধন্যবাদ বোন। সেদিন তোমার সাহায্য আমাদের বিরাট উপকার করেছে।' বলল আহমদ মুসা।

'ধন্যবাদ। আমার খুব ইচ্ছা করছে সেদিন গাড়ি নিয়ে যাবার পর কি ঘটেছিল তা জানতে।' বলল ফাতিমা নাসুমন আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে।

'এ ইচ্ছা খুবই স্বাভাবিক।' বলে আহমদ মুসা সেদিন গাড়ি নিয়ে জেনারেল শ্যারনকে ফলো করা, শ্যারনদের গাড়ি থেকে গোলা-গ্রেনেড নিক্ষেপ, ফাতিমার গাড়ি ধ্বংস হওয়া, আহমদ মুসার গাড়ি থেকে নেমে যাওয়া ও গুলীবিদ্ধ হওয়া, জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটন ও সান ওয়াকারদের আগমন, জেনারেল শ্যারনদের গ্রেপ্তারের দায়িত্ব জেনারেল ওয়াশিংটনের নেয়া এবং আহমদ মুসা হাসপাতালে যাওয়ার সব কথা সংক্ষেপে জানিয়ে বলল, 'তোমার গাড়ি ধ্বংস হয়ে গেছে। গাড়ির ক্ষতিপূরণ দেবার জন্যেই আজ আমার এখানে আসা।'

বলে আহমদ মুসা পকেট থেকে টাকার কয়েকটা বান্ডিল বের করল এবং সামনের টিপয়ের উপর বান্ডিলগুলা রেখে বলল, 'তোমার গাড়িটা নতুন ছিল। নতুন একটা স্পোর্টস কারের দাম এতে আছে।'

ফাতিমা নাসুমন হাসল। বলল, 'আপনি গাড়িতে থাকা অবস্থায় গ্রেনেডটা যদি গাড়িতে পড়ত, আপনার জীবনের ক্ষতিপূরণ কিভাবে হতো বলুন তো?'

আহমদ মুসাও হাসল। বলল, 'ঐ ক্ষতিপূরণ করা যেত না বলেই ক্ষতিটা হয়নি ফাতিমা।'

গম্ভীর হলো ফাতিমা। বলল, 'আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন আমাদের সবার উপর।'

একটু থেমেই আবার প্রশ্ন করল, ‘আব্বার মুক্তির ঘটনা কিভাবে ঘটল?’

‘ওটা খোদ মি. হাত্তাই বলতে পারবেন।’ বলল আহমদ মুসা।

আহমদ হাত্তা নাসুমন সংক্ষেপে বলল জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটন, জেনারেল শ্যারন ও বেন ইয়ামিনকে আহতাবস্থায় বন্দী করার পর কিভাবে গোটা বাড়ি সার্চ করতে গিয়ে বন্দীখানা থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়। সে আরও বলল পেন্টাগন সামরিক হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর কিভাবে একজন জেনারেলের কাছে আহমদ মুসার কাহিনী শুনে এবং আহমদ মুসার সাথে পরিচয় হয়। আরও বলল, কি আগ্রহের সাথে আহমদ মুসা সুরিনামের সব কথা শুনে এবং হাসপাতাল থেকে রিলিজ হওয়ার সময় তাকেও সাথে করে নিয়ে এসেছে ফাতিমা নাসুমনকে খুঁজে দেয়ার জন্য। উচ্ছসিত আবেগ নিয়ে কথা শেষ করল সে এই ভাবে, ‘আমার কেবলই মনে হচ্ছে আহমদ মুসার সাথে আমার দেখা হওয়াটা আমাদের সৌভাগ্যের সুর্যোদয়।’

‘ঠিকই বলেছেন আব্বা, ওঁর সাথে দেখা হওয়ার পর আমি তোমাকে খুঁজে পেয়েছি, যে আশা আমি কল্পনাতেও করতে পারিনি।’ বলল ফাতিমা নাসুমন। তারও কণ্ঠ আবেগে ভারী।

বিব্রত আহমদ মুসা প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে বলল, ‘ফাতিমা এ টাকাগুলো তোমার নেয়া প্রয়োজন।’

‘না আমি নিতে পারি না।’ বলল ফাতিমা নাসুমন।

‘এ টাকা আমার নয়, আমি তোমাকে দিচ্ছি না। মার্কিন সরকার এ টাকা দিয়েছে তাদের আইন অনুসারেই।’ আহমদ মুসা বলল।

‘এ টাকা দিয়েছে তারা জনৈক এ্যানি এন্ডারসনকে, আহমদ হাত্তা নাসুমনের মেয়ে ফাতিমা নাসুমনকে নয়। তারা আমার পিতার প্রতি যে এহসান করেছে এবং আমার গাড়ি দেয়াতে যে কাজ হয়েছে, তাতে এ টাকা গ্রহণ করলে আমার বিবেক মরে যাবে।’ বলল ফাতিমা নাসুমন। আবেগে তার চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল আহমদ মুসার মুখ। বলল, ‘ধন্যবাদ ফাতিমা, আমি আমার অনুরোধ ফিরিয়ে নিচ্ছি। তোমার যুক্তি আমি গ্রহণ করেছি।’

‘ধন্যবাদ ভাইয়া, আমি জানতাম আপনি বুঝবেন।’

বলে একটু থামল ফাতিমা নাসুমন। তারপর পিতার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, ‘আব্বা আপনি ওয়াং আলীর শেষ খবর বোধ হয় জানেন না।’

‘না, জানি না। কোন খারাপ খবর নেই তো?’ দ্রুত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল হাত্তা নাসুমন। তার কণ্ঠে উদ্বেগ।

‘আগের চেয়ে খারাপ।’ বলল ফাতিমা নাসুমন।

‘কি?’

‘গতকাল ইয়াং আমিরের একটা মেসেজ পেয়েছি। তাতে সে লিখেছে, গত পরশু ওয়াং আলীকে অপহরণকারীরা একটা ক্লিনিকে নিয়ে যায়। সে অসুস্থ না আহত জানা যায়নি। মেসেজের সাথে সে গত পরশুর ছাপা হওয়া একটা বিজ্ঞাপন পাঠিয়েছে। বুঝা যাচ্ছে বিজ্ঞাপনটা ছাপিয়েছে অপহরণকারীরা ওয়াং আলীর নামে। আর সম্বোধন করা হয়েছে নিখোঁজ ফাতিমা নাসুমনকে। বলা হয়েছে, আগামী ২১ তারিখের মধ্যে যদি তার কাছে না ফিরি, তাহলে সেও হারিয়ে যাবে, কোনদিনই আর তাকে দেখা যাবে না। বিজ্ঞাপনে আরও লেখা হয়েছে, ‘২১ তারিখ সন্ধ্যা ৬টা সহ প্রত্যেকদিন সন্ধ্যা ৬টায় পারামারিবো এয়ারপোর্টের কারপার্কে তোমার জন্যে গাড়ি অপেক্ষা করবে। অভিমান ভুলে ফিরে এস। তোমার উপস্থিতিই শুধু আমাকে বাঁচাতে পারে।’ শেষ দিকে ফাতিমা নাসুমনের কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হয়ে পড়ল।

ইয়াং আমির ওয়াং আলীর ছোট ভাই।

ফাতিমা নাসুমনের কথা শোনার পর আহমদ হাত্তা নাসুমনের মুখ উদ্বেগ আতংকে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। বলল সে, ‘তার মানে ২১ তারিখে পর ওয়াং আলীকে ওরা মেরে ফেলবে।’

ফাতিমা নাসুমন কিছু বলল না।

দু’হাতে মুখ ঢাকল সে।

তার দু’গন্ড থেকে দু’হাতের ফাঁক দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল।

আহমদ মুসা গভীর মনোযোগ দিয়ে ওদের কথা শুনছিল। সে তাদের আলোচনায় যোগ দেয়নি।

অল্পক্ষণ পর ফাতিমা নাসুমন রুমাল দিয়ে চোখ মুছে ধীরে ধীরে মুখ তুলল।

বলল, ‘স্যরি।’

তারপর পিতার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আব্বা ইয়াং আমির আরও জানিয়েছে, নির্বাচন সিডিউল অনুসারেই অনুষ্ঠিত হবে। মনোনয়ন পত্র জমা দেবার শেষ দিন ২২ তারিখ বিকেল পাঁচটা। সে আরও জানিয়েছে, ওরা অদৃশ্য এমন একটা ব্যবস্থা করেছে যার ফলে কোন কম্যুনিটিরই উল্লেখযোগ্য কোন মুসলমান মনোনয়ন পত্র জমাই দিতে পারবে না।’

আহমদ হাত্তা নাসুমনের দু’চোখও অশ্রুতে ভরে উঠেছিল। সে চোখ মুছে বলল, ‘কিছু করার নেই মা। ওরা ওয়াক ওভার নিতে চায়। তা নিক বলে এটা মেনে নেয়া যেতো, কিন্তু প্রশ্ন হলো তাদের উদ্দেশ্যের এটা শেষ নয়, শুরুমাত্র। তারা যদি একচেটিয়া পার্লামেন্ট দখল করতে পারে, তাহলে তাদের পরবর্তী কাজ হবে সুরিনাম থেকে ধীরে ধীরে মুসলমানদের উচ্ছেদ করা। আঘাতটা প্রথম আসবে ইন্দোনেশীয় মুসলমানদের উপর। আমাদের জমিদারীসহ কয়েকটা জমিদারী তারা দখল করতে পারলে খুব সহজেই তারা মুসলিম চাষীদের ভূমি কেড়ে নিয়ে তাদের উচ্ছেদ করতে পারবে।’

‘উচ্ছেদ করে সমস্যা বাড়ানোর চাইতে তারা একটা দু’টা করে মুসলমানদের মেরেই শেষ করবে। এই ক’দিনে ছ’শরও বেশি মানুষকে তারা মেরেছে। একটা খবরও বেরুল না, একটা লাশও পাওয়া গেল না, দুনিয়াও জানতে পারল না। শত শত পরিবারের নিরন্তর কান্না ও অশ্রুর পস্নাবন কোন মূল্য পেল না।’

বলতে বলতে আবার কেঁদে ফেলল ফাতিমা নাসুমন। কাঁদতে কাঁদতেই বলল, ‘ওয়াং আলীরও দিন ঘনিয়ে আসছে, সবার অলক্ষে সবার মত সেও হারিয়ে যাবে।’ কান্নায় রুদ্ধ হয়ে গেল ফাতিমা নাসুমনের শেষ কথাগুলো।

ফাতিমা নাসুমনের কথাগুলো ছবি হয়ে ভেসে উঠেছিল আহমদ মুসার চোখে। আহমদ মুসা দেখতে পাচ্ছিল যেন সুরিনাম-উপকূলের কৃষিগ্রামগুলো এবং পাহাড় ও বনাঞ্চলে সংগ্রাম করে বাঁচা মানুষগুলোকে। সেখানকার গ্রাম-

জনপদ থেকে ভেসে আসা কান্না যেন শুনতে পাচ্ছিল সে। এই কান্না তার প্রতিটি রক্ত কণিকায়, অস্তিত্বের প্রতি রন্ধ্রে অক্ষমের আর্তনাদ নয়, বিক্ষোভের জ্বালা ছড়িয়ে দিল। যেন অজান্তেই তার ঠোঁটের বাধন ভেদ করে বের হয়ে এল প্রতিবাদী কয়েকটি শব্দ, 'না ফাতিমা ওয়াং আলী হারিয়ে যাবে না।'

ঘরের অশ্রু সজল নরম পরিবেশে বেসুরে কর্কশ হয়ে বেজে উঠল আহমদ মুসার কথা।

ফাতিমা নাসুমন ও আহমদ হাত্তা নাসুমন অনেকটা চমকে উঠে তাকাল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা তার আসনে নড়ে-চড়ে সোজা হয়ে বসল। তার চোখে-মুখে স্থির সিদ্ধান্তের একটা দ্যুতি। ঠোঁটে তার ফুটে উঠল কঠিন এক টুকরো হাসি। তাকিয়েছিল ফাতিমা নাসুমনদের দিকে। বলল, 'মি. হাত্তা, ফাতিমা, হ্যাঁ, আমি চেষ্টা করব ওয়াং আলী যাতে হারিয়ে না যায়, চেষ্টা করব সুরিনাম থেকে আর কেউ যাতে না হারায়।'

বিস্ময় ফুটে উঠল হাত্তা নাসুমন ও ফাতিমার চোখে-মুখে। বলল হাত্তা নাসুমন, 'কিভাবে, কেমন করে?'

সোফায় গা এলিয়ে দিল আহমদ মুসা। বলল, 'আমি সুরিনাম যাচ্ছি।'

হঠাৎ যদি আকাশের চাঁদটা আকাশ থেকে হাতে এসে পড়ে, তাহলে যে অবস্থা দাঁড়ায় সেই অবস্থা হলো হাত্তা নাসুমন ও ফাতিমার। তাদের দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল আহমদ মুসার মুখের উপর। বিস্ময়ের ধাক্কায় তারা কথা বলতে ভুলে গেল।

বিস্ময়ের ঘোর কাটলে প্রথমে কথা বলল ফাতিমা নাসুমন, 'আপনি যাবেন সুরিনামে?' তার দুই চোখ আনন্দ ও বিস্ময়ের আলোয় চিক চিক করছে।

'কেন বিস্মিত হচ্ছ ফাতিমা?' প্রশ্ন আহমদ মুসার।

'অখ্যাত এক গরীব দেশ আমাদের। অবহেলিত ও অজ্ঞাত কিছু মানুষ আমরা। এমন দেশে আমরা আহমদ মুসাকে আশা করতে পারি?' বলল ফাতিমা নাসুমন।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'এর অর্থ আহমদ মুসার প্রতি তোমরা সুবিচার করছ না। আহমদ মুসাকে তোমাদের পাশ থেকে দুরে সরিয়ে দিচ্ছ।'

‘ঘটনা তা নয় আহমদ মুসা। আপনি আমাদের দেশ সুরিনামে যাবেন এটা কল্পনার চেয়েও অবিশ্বাস্য এক ব্যাপার। তাই বিশ্বাস করতে আমাদের কষ্ট হচ্ছে।’ বলল হাত্তা নাসুমন।

‘আমিও তো কোনদিন কল্পনায় ভাবিনি সুরিনামে আমি যাব। বাস্তবতা সব সময় কল্পনার চেয়ে বিস্ময়কর।’ বলল আহমদ মুসা।

ফাতিমা নাসুমন সোফা থেকে উঠে আহমদ মুসার সামনে কার্পেটের উপর হাঁটু মুড়ে প্রার্থনার ভংগিতে বসে বলল, ‘আপনি সত্যিই সুরিনামে যাবেন?’ আবেগের আকুলতায় গলা কাঁপছিল তার।

‘অবশ্যই এবং তা ২১ তারিখের আগে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আল্লাহু আকবর। বলে কাবামুখী হয়ে সিজদায় পড়ে গেল ফাতিমা নাসুমন।

অনেক্ষণ পর মুখ তুলল সে।

অশ্রুতে ধুয়ে গেছে তার মুখ। বলল, ‘অনেকদিন পর আমার মনে হচ্ছে, বুকের উপর থেকে একটা জগদ্দল পাথর নেমে গেল। বুক ভরে নিশ্বাস নিতে পারছি আজ আমি।’

উঠে দাঁড়াল ফাতিমা নাসুমন। বলল, ‘আব্বা আপনারা একটু বসুন। আমি চা নিয়ে আসছি।’

চলে গেল ফাতিমা।

‘মেয়েটার উপর দিয়ে খুব ধকল গেছে। আমি কিডন্যাপড হলাম, তার পর পরই ওয়াং আলীকেও তারা অপহরণ করল। দেশ তার জন্যে হয়ে উঠেছিল মৃত্যুর উপত্যকা। মৃত্যু সব সময় তাকে তাড়া করে ফিরেছে। এই পরিস্থিতিতে বারবার ঠিকানা পরিবর্তন করে সে স্বজনহীন এই বিদেশে বাস করত।’ বলল হাত্তা নাসুমন।

‘রাত যত গভীর হয়, সোবহে সাদেক ততই এগিয়ে আসে।’ আহমদ মুসা বলল।

ক’মিনিটের মধ্যেই ফাতিমা ফিরে এল একটা ট্রলি ঠেলে নিয়ে। আহমদ মুসা সেদিকে চেয়ে বলল, ‘তুমি চা আনতে গিয়ে নিয়ে এলে খাবার।’

'আমার ক্ষুধা লেগেছে, আপনাদেরও ক্ষুধা লাগার কথা।' বলল ফাতিমা।

'দাও, ক্ষুধা না লাগলেও খেতে পারব। ক'দিন ধরে হাসপাতালের খানা খেয়েছি তো। বাড়ির খাবার অমৃত লাগার কথা।' আহমদ মুসা বলল।

'ভাইয়া অমৃত না হলেও সুরিনামের খাবার অরুচিকর হবে না।'

ফাতিমা খাবার পরিবেশন করল।

তিন জনই খাচ্ছে।

'একুশ তারিখ আসতে মাত্র দিন কয়েক বাকি। আমার মনে হয় চিন্তা করার অনেক বিষয়ই থাকতে পারে।' ফাতিমা বলল।

'ঠিক বলেছ ফাতিমা। অনেক কিছুই ভাবতে হবে। তার জন্যে সময় আমি মনে করি কম নেই। এই মুহূর্তে যে সিদ্ধান্তটা হয়ে যেতে পারে তা হলো, আমি ১৯ তারিখে মি. হাত্তাকে নিয়ে সুরিনামে যাবার জন্যে গায়নার নিউ আমষ্টারডামে নামব। সেখান থেকে জলপথ-স্থলপথে যাব সুরিনামের পারামারিবো। আর একুশ তারিখে ফাতিমা নামবে সুরিনামের পারামারিবো এয়ারপোর্টে। ঠিক ছ'টায় সে প্রবেশ করবে এয়ারপোর্টের কারপার্কে।' বলল আহমদ মুসা।

ফাতিমা নাসুমনের মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল আহমদ মুসার কথা শুনে। বলল, 'আমি একা যাব? ছ'টায় কারপার্কে তো ওরা থাকবে? কারপার্কে গেলেই তো ওরা ধরে ফেলবে আমাকে।'

আহমদ হাত্তা নাসুমনের চোখে-মুখেও উদ্বেগের ছায়া।

আহমদ মুসা বলল, 'আমি তো সেটাই চাই তুমি ওদের হাতে পড়। ভয় নেই আমি আশে পাশেই থাকব।'

'তবু আমার ভয় করছে। ওরা কশাই, মানুষ নয় ভাইয়া।' ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল ফাতিমা।

'আমি জানি। কিন্তু এ ছাড়া কোন বিকল্প নেই বোন। তুমি আমার উপর আস্থা রাখতে পার।'

সংগে সংগেই কথা বললো না ফাতিমা নাসুমন। মুখ নিচু করেছিল সে।

কয়েক মুহূর্ত পরেই মুখ তুলল। বলল সে, 'মাফ করবেন ভাইয়া। নির্দেশ দিচ্ছেন, আপনি যে আহমদ মুসা তা ভুলে গিয়েছিলাম। আপনার নির্দেশ আমি

পালন করব, যেভাবে বলবেন ঠিক সেভাবেই।’ ফাতিমা ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করল। তার চোখে-মুখে দৃঢ়তা।

খুশি হলো আহমদ মুসা। বলল, ‘ধন্যবাদ বোন। দেখবে তুমি যত সাহসী হয়েছ, শত্রুরা তত দূর্বল হয়ে পড়েছে।’

‘ধন্যবাদ ভাইয়া।’ বলে একটু থামল ফাতিমা নাসুমন। বলল, ‘আমার জানতে ইচ্ছা করছে ভাইয়া, আপনি গায়ানা, সুরিনামে যাননি। নিউ আমষ্টারডাম দেখেননি। নিউ আমষ্টারডাম হয়ে সুরিনাম প্রবেশের এই পরিকল্পনা হঠাৎ কেন, কিভাবে করলেন?’

‘আমি খুব ভেবে করিনি। আমি নিশ্চিত হয়েছি যে, তোমার আব্বাকে নিয়ে পারামারিবো এয়ারপোর্ট হয়ে দেশে প্রবেশ করা যাবে না। চাই না এই মুহুর্তে শত্রুরা তাকে দেখে ফেলুক। তারা এটা জেনে নিশ্চিন্ত থাকুক যে, মি. হাত্তা এখনো বন্দী আছেন। দেশে ফিরতে পারছেন না। তাদের নির্বাচন নির্বিঘ্নেই হয়ে যাবে। এ অবস্থায় দেশে ফেরার জন্যে জল ও স্থল পথ বাকি থাকল। হঠাৎ তোমার আব্বার মত অতি পরিচিত লোককে নিয়ে দেশের কোন বন্দরে নামাও ঠিক হবে না। প্রথমে গায়ানা গিয়ে সেখান থেকে সুরিনামে প্রবেশ করব। সুরিনাম উপকূলের সবচেয়ে নিকটবর্তী বড় শহর হলো নিউ আমষ্টারডাম। তাই প্রথমে সেখানে নেমে সুরিনামে প্রবেশের চিন্তা করেছি।’

চোখ দু’টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল ফাতিমার। বলল, ‘ভাইয়া অবাক ব্যাপার, আপনি না জেনে সুরিনামে প্রবেশের যে রুট ঠিক করেছেন, তার কোন বিকল্প নেই। গায়ানার পূর্বাঞ্চলে একমাত্র নিউ আমষ্টারডাম থেকেই সুরিনামে প্রবেশের জল পথ স্থল পথ দুই-ই আছে। আপনার চিন্তা একেবারেই নির্ভূল।’

‘আল হামদুলিল্লাহ। এভাবেই আল্লাহ সাহায্য করেন ফাতিমা।’ আহমদ মুসা বলল।

ফাতিমা উচ্ছসিত হয়ে উঠল। বলল, ‘ভাইয়া খুব আনন্দ লাগছে। মনে হচ্ছে নতুন জীবন ফিরে পেলাম।’

‘আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলের উপর সদয় হোন।’ বলল আহমদ হাত্তা নাসুমন।

তারপর একটু থেমে একটু পানি খেয়ে নিয়ে সে আবার বলল, 'মি. আহমদ মুসা, আমরা কি জর্জ আব্রাহাম মানে মার্কিন সরকারের কাছে কোন সাহায্য চাইতে পারি?'

'হ্যাঁ চাইতে পারি। তারা আন-অফিসিয়ালী সাহায্য করতে পারে। কিন্তু এই মুহূর্তে তার প্রয়োজন নেই। আমরা গিয়ে কাজ শুরু করি। প্রয়োজন হলে ওদের বলব।'

'ধন্যবাদ মি. আহমদ মুসা। একটা কথা বলি আহমদ মুসা, ওরা কিন্তু সাংঘাতিক দুর্ধর্ষ্য, বিশাল ওদের সংখ্যা। হঠাৎ করে ফাতিমাকে ওদের হাতে তুলে দিলে বিপদ হবে না তো!' বলল নরম ও বিনীত কণ্ঠে হাত্তা নাসুমন।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'আপনার কথা সত্য, উদ্বেগ স্বাভাবিক। কিন্তু ওয়াং আলীকে বাঁচাতে হলে, দ্রুত ওদের পরিচয় পেতে হলে, ২১ তারিখে ফাতিমাকে ওদের মুখোমুখি দাঁড় করাতে হবে। ২১ তারিখের পর এই সুযোগ আমরা হারিয়ে ফেলব।'

'আব্বা বিপদের বিষয়টি না ভেবে আপনি দেখুন যে এটা কার পরিকল্পনা। স্বপ্নের সেই আহমদ মুসা বিমূর্ত হয়ে নেমে এসেছেন আমাদের মাঝে। তিনি আমাদের চালিত করছেন। আমার আর কোন ভয় নেই আব্বা। এখন আমার মনে হচ্ছে, তার নির্দেশ পালন করতে গিয়ে মৃত্যু এলেও আমি তা হাসি মুখে বরণ করতে পারবো।'

'ঠিক বলেছ মা। আহমদ মুসা যে আমাদের সামনে বসে, তিনি স্বয়ং যে সুরিনামে যাচ্ছেন, একথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম।'

একটু থেমে হাত্তা নাসুমন তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'আমরা সুরিনামে যাবার জন্যে প্রস্তুত আহমদ মুসা।'

'ধন্যবাদ মি. হাত্তা, ধন্যবাদ বোন ফাতিমা।'

'ধন্যবাদ ভাইয়া।' বলে উঠে দাঁড়াল ফাতিমা। তারপর বলল, 'আপনারা গল্প করুন আমি ট্রলিটা রেখে আসি এবং দুপুরের খাবারের ব্যবস্থাটাও দেখে আসি।'

‘ফাতিমা আমার জন্যে ভেব না। আমি কিন্তু দুপুরে খাচ্ছি না। আমি এখনি বেরুব।’

‘কোথায়?’

‘সারা জেফারসনদের ওখানে যাব।’

‘আপনি কোথায় থাকছেন?’

‘ওখানেই আমার ব্যাগ-ব্যাগেজ আছে।’

‘তাহলে?’

‘আমি যেখানেই থাকি, আজ বিকেলেই এখানে একবার আসব। অনেক কথা আছে, অনেক বিষয় নিয়ে ভাবতে হবে।’

‘ধন্যবাদ ভাইয়া।’ বলে ফাতিমা নাসুমন ট্রলিটা ঠেলে নিয়ে চলে গেল।

আহমদ মুসাও উঠে দাঁড়াল যাবার জন্যে।

দরজা খুলেই আহমদ মুসাকে দেখে জিনা জেফারসন, সারা জেফারসনের মা আনন্দে জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে। বলল, ‘বাছা আমি হাসপাতালে টেলিফোন করেছিলাম। ওরা বলল তুমি সেই কোন সকালে রিলিজ নিয়েছ। এখন বেলা ১টা। এত দেরী হলো কেন বাছা আসতে? আর রিলিজ নেবে আমাকে জানাওনি কেন? আমি তো প্রতিদিনই টেলিফোন করছি।’

এতগুলো প্রশ্নের জবাবে আহমদ মুসা বলল, ‘আমার সাথে আরেকজন রিলিজ নিয়েছিল। তাকে পৌছে দিয়ে এলাম।’

‘ঠিক আছে, চল বাছা। তোমার উপর দিয়ে অনেক ধকল গেল। তুমি অনেক শুকিয়ে গেছ।’ বলল জিনা জেফারসন আহমদ মুসাকে টেনে নিয়ে এগুতে এগুতে।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘খালাম্মা মাত্র এই দেড় সপ্তাহে আমার ওজন ১ কেজি বেড়েছে।’

‘তা বাড়লে কি হবে, আয়নাতে গিয়ে দেখ একবার তোমাকে।’ বলল জিনা জেফারসন।

আহমদ মুসা ড্রইংরুমে বসতে যাচ্ছিল। কিন্তু জিনা জেফারসন আহমদ মুসাকে হাত ধরে টেনে তার ঘরের দিকে নিতে নিতে বলল, ‘এখন আর বসাবসি নয় বাছা। সোজা ঘরে গিয়ে কাপড় ছাড়। তারপর গোসল কর। আমি টেবিলে খাবার আনছি।’

বলে জিনা জেফারসন আহমদ মুসার ঘরের দরজা টেনে দিয়ে চলল ডাইনিং-এর দিকে।

আরও এক ঘন্টা পর।

আহমদ মুসা এসে খাবার টেবিলে বসল।

গোসল করে ফ্রেস জামা-কাপড় পরে বেশ ভাল বোধ হচ্ছে আহমদ মুসার।

কিছুক্ষণ পর ফিরে এল জিনা জেফারসন।

বসল আহমদ মুসার বিপরীত দিকের চেয়ারে। আহমদ মুসার প্লেটে খাবার তুলে দিতে দিতে বলল, ‘এখন অনেক ফ্রেশ লাগছে বাছা তোমাকে। তুমি শরীরের উপর খুব অবিচার কর। খাওয়ার পর কিন্তু লম্বা ঘুম দেবে।’

আহমদ মুসা কাঁটা চামচ একবার হাতে তুলে নিয়ে আবার রেখে দিয়ে বলল, ‘খালাম্মা, সারা এল না? ও নেই?’

জিনা জেফারসন কাঁটা চামচ হাতে নিয়ে আহমদ মুসার দিকে না তাকিয়েই বলর, ‘না। তুমি খেয়ে নাও বাছা। কি করব, তোমরা কেউ তো কথা শোননা। নিজের ইচ্ছাকেই বড় ভাব।’ জিনা জেফারসনের কণ্ঠে ক্ষোভের প্রকাশ।

আহমদ মুসা কথা বাড়ালো না। বুঝল, সারা নিশ্চয় খালাম্মার নিষেধ না মেনে এই অসময়ে কোথাও বেরিয়েছে। তাই রেগে আছেন তিনি।

খাওয়ার পর আহমদ মুসা তার ঘরে চলে এল।

তখন বিকেল সাড়ে চারটা।

আহমদ মুসা ঘুম থেকে উঠে টয়লেট সেরে ফ্রেশ হয়ে এসে বসেছে।

ঘরে ঢুকল জিনা জেফারসন।

তার মুখ মলিন।

সেই মলিন মুখেই হাসি টেনে বলল, ‘বাছা রেষ্ট হয়েছে তো?’

‘হ্যাঁ, খালাম্মা। সারা এসেছে?’

জবাব না দিয়ে জিনা জেফারসন আহমদ মুসার সামনের সোফায় বসল। ধীরে ধীরে বলল, ‘সারা আসবে না বাছা।’ জিনা জেফারসনের কণ্ঠ কান্নার মত ভেজা।

আহমদ মুসা চমকে উঠে তাকাল জিনা জেফারসনের দিকে। বলল, ‘আসবে না? সারা কোথায় খালাম্মা?’

‘লস আলামোসে।’

‘লস আলামোসে?’ এই জিজ্ঞাসা উচ্চারণ করার সাথে সাথে আহমদ মুসা যেন আকাশ থেকে পড়ল। অবিশ্বাস্য মনে হল জিনা জেফারসনের কথা।

প্রশ্নটা উচ্চারণ করার পর একটু থেমে আহমদ মুসা আবার বলল, ‘কই আমাকে তো কিছু বলেনি! এ সময়ে হঠাৎ লস আলামোসে কেন? সে তো আরও দু’মাস ছুটি পেয়েছে! আর সম্পূর্ণ সুস্থ কি সে হয়েছে?’

মুখ তুলল জিনা জেফারসন।

তার মুখ বেদনায় জীর্ণ।

ভেঙে পড়া অবস্থা তার।

বিস্মিত হলো আহমদ মুসা।

জিনা জেফারসন আহমদ মুসার কোন প্রশ্নের জবাব না দিয়ে একটা ইনভেলাপ তুলে ধরল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা ইনভেলাপটি হাতে নিল। ইনভেলাপে আহমদ মুসার নাম লেখা। দেখেই বুঝল হস্তাক্ষর সারা জেফারসনের।

সারা জেফারসনের চিঠি? বুকের ভেতরটায় ধক করে উঠল আহমদ মুসার। না জানিয়ে, অন্তত টেলিফোনে একটা কথাও না বলে এভাবে চিঠি রেখে গেছে?

বুকের কোন অজানা প্রান্ত থেকে একটা অপরিচিত অভিমান প্রবল বেগে মাথা তুলতে চাইল।

তা সত্ত্বেও চিঠি খুলল আহমদ মুসা।

ইনভেলাপের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ল সারা জেফারসনের প্যাডের পরিচিত সেই নীল কাগজ।

সারা জেফারসনের চিঠি।

চিঠিটি মেলে ধরল আহমদ মুসা চোখের সামনে।

পড়তে লাগলঃ

''আসসালামু আলায়কুম।

অনেক চিন্তা করেও সম্বোধনের কোন ভাষা খুঁজে পেলাম না।

তাই সম্বোধন ছাড়াই এই চিঠি লিখছি।

আমি লস আলামোসে যাচ্ছি। আরও দু'মাস ছুটি মঞ্জুর হয়েছে। কিন্তু ছুটি এখন আমার কাছে অসহনীয় লাগছে। আমি কাজের মধ্যে ডুবে যেতে চাই, ডুবে থাকতে চাই। ভুলতে চাই আমার অস্তিত্বকে।

আপনি আহত অবস্থায় হাসপাতালে। আপনাকে বলে যেতে পারলাম না বলে বুক আমার ভেঙে যাচ্ছে। কিন্তু আমার বুক ভাঙার চেয়ে আপনাকে বলা আমার জন্যে কঠিন ছিল।

না বুঝে আপনাকে আমি অনেক কষ্ট দিয়েছি। আপনার কোন দোষ নেই। আপনি আমাকে এভয়েড করতেন। কিন্তু এটাই আমার কাছে আপনাকে আরও মূল্যবান করে তুলেছিল। আপনি সামান্য প্রশ্রয়ও আমাকে কোনদিন দেননি। আপনার এই অসাধারণ গুণই আপনাকে আমার কাছে আরও গৌরবদীপ্ত করে তুলেছিল। আমি আমাকে আরও জড়িয়ে ফেলেছিলাম। কষ্টও আপনার বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। অনেকবার আপনি আপনার সম্পর্কে বলার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আমি সুযোগ দেইনি। অবশেষে অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালের বেডে শুয়ে একদিন সব শুনলাম লায়লা জেনিফারদের কাছে। শুনে এতদিন যে কষ্ট আপনাকে দিয়েছি সব কষ্ট শতগুণ আকারে ফিরে পেলাম আমার বুকে। আমার অন্যায়ের এ শাস্তি আমি মাথা পেতে নিয়েছি।

আমার বুকে জেগে উঠেছিল আকাশস্পর্শী আকাঙ্খা, সে আকাঙ্খা এখন নেই। আমার বুকে ছিল এক সাগর তৃষ্ণা, সে তৃষ্ণার জ্বালাও এখন নিভে গেছে। একদিন আমি আপনার 'সারা' হবার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছিলাম, কিন্তু হতে পারিনি। যখন সব আকাঙ্খা, সব তৃষ্ণা আমার শেষ হয়ে গেছে, তখন সেদিন জেনারেল শ্যারনের বন্দীখানায় আপনি আমাকে 'সারা' বলে সম্বোধন করলেন। সেদিন আমি আপনাকে আমার সব শক্তি দিয়ে জড়িয়ে ধরেছিলাম আতংক তাড়িত হয়ে প্রাণ ভয়ে। আপনি আমাকে জড়িয়ে ধরেননি। পিঠে হাত বুলিয়ে সান্তনা দিয়েছিলেন মাত্র। আপনার এই নিবিড় স্পর্শ এবং 'সারা' সম্বোধন তখন পেলাম যখন চাইনি। আমার আল্লাহর এই মর্জির আমি অর্থ বুঝতে চেষ্টা করেছি। অবশেষে বুঝেছি, এই পাওয়াটুকুকে আল্লাহ আমার জীবনের পাথেয় বানাতে চান। আমি এই পাথেয়কে পরম পাওয়া হিসেবে গ্রহণ করেছি। আমি জানি, এতে আপনার আপত্তি থাকবে, জোসেফাইন আপারও আপত্তি থাকবে। কিন্তু আমি এও জানি যে, একজন মানুষের বাঁচার অবলম্বনকে আপনারা কেড়ে নেবেন না। আপনাদের দু'জনের কাছেই আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

সব শেষে আমার প্রার্থনা, সারা জেফারসন নামের কোন মেয়ের সাথে আপনার কখনও দেখা হয়েছিল, একথা দয়া করে ভুলে যাবেন। কিন্তু আমরা আমেরিকানরা আপনাকে ভুলতে পারবো না। কারণ আপনি আজকের আমেরিকার একজন ভ্রাতা। আমাদের ফাউন্ডার ফাদারসদের আমেরিকাকে আপনি আবার আমেরিকানদের মাঝে ফিরিয়ে এনেছেন।''

একজন আমেরিকান মেয়ে,

'সারা জেফারসন'

চিঠি পড়া শেষ হলো, কিন্তু চিঠি থেকে মুখ তুলতে পারল না আহমদ মুসা। দু'চোখ থেকে তার গড়ানো অশ্রু ফোটায় ফোটায় ঝরে পড়তে লাগল চিঠির বুকে।

জিনা জেফারসন ধীরে ধীরে উঠে এল তার আসন থেকে। আহমদ মুসার পেছনে দাঁড়িয়ে আস্তে একটা হাত রাখল আহমদ মুসার কাঁধে। বলল নরম কণ্ঠে, 'বেটা তুমি কাঁদলে সারা আরও কষ্ট পাবে।'

আহমদ মুসা জিনা জেফারসনের হাত আঁকড়ে ধরে বলল, 'খালাম্মা আমি সারার সর্বনাশ করেছি, ওকে সাবধান করার সুযোগ পাইনি।' অশ্রুজড়িত কণ্ঠ আহমদ মুসার।

'না বেটা, দোষ তোমার নয়, দোষ সারারও নয়। এটাই ছিল আমার মেয়ের ভাগ্য।' নরম ও উদাস কণ্ঠ জিনা জেফারসনের।

'এখন কি হবে খালাম্মা। ওকে কিছু বলতেও পারলাম না।' বলল আহমদ মুসা।

জিনা জেফারসন আহমদ মুসার পেছন থেকে সোফা ঘুরে এসে আহমদ মুসার পাশে বসল। বলল, 'বলে কোন লাভ হবে না বেটা। আমি সারাকে তো চিনি। হতভাগী যা বলেছে তাই সে করবে।' কান্নায় জড়ানো জিনা জেফারসনের কথা।

একটু থেমেছিল, আবার শুরু করল জিনা জেফারসন, 'আমি ওর মা। আমি ওকে বুঝিয়েছি, অনুরোধ করেছি। সব কথার জবাবে একটা কথাই সে বলেছে, মা আমাকে যদি বাঁচতে দিতে চাও, তাহলে বাঁচার অবলম্বন আমার কাছ থেকে কেড়ে নিও না। তারপর সেও কেঁদেছে, আমিও কেঁদেছি। আর কিছু বলার ছিল না তাকে।'

'খালাম্মা আমার এখন কি কর্তব্য?' আহমদ মুসা বলল।

'কিছু করার নেই বেটা। তুমি সবকিছু ভুলে যাও। একদিন সেও সবকিছু ভুলে গিয়ে স্বাভাবিক হতেও পারে। আমি সেদিনেরই অপেক্ষা করব। তবে বেটা তোমার এ মাকে ভুলে যেও না। সারার ব্যাপারে কোন সাহায্যের দরকার হলে তা আমি তোমার কাছে চাইব।' বলল জিনা জেফারসন।

'অবশ্যই খালাম্মা। আপনার এ ছেলেকে যখনই ডাকবেন, হাজির হবো।'

'ধন্যবাদ বেটা।' বলে উঠে দাঁড়াল জিনা জেফারসন। তারপর বলল, 'নামাজ পড়ে চায়ের টেবিলে এস বেটা।'

জিনা জেফারসন চলে গেল।

আহমদ মুসা সারার চিঠিটা সুন্দর করে ভাজ করে ইনভেলাপে ভরে উঠে দাঁড়াল। মনে মনে ভাবল, সারার চিঠিটা ডোনা জোসেফাইনের কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে দু'একদিনের মধ্যেই।

# ৬

গায়ানা এয়ারলাইনসের একটা ডোমিষ্টিক ফ্লাইট ল্যান্ড করল নিউ আমষ্টারডাম এয়ারপোর্টে।

নিউ আমষ্টারডাম গায়ানা উপকূলের দক্ষেণাংশের একমাত্র বড় শহর।

বিমান থেকে সবশেষে নামল দু'জন এশিয়ান। তাদের একজন শিখ। দু'জনের পরনেই ইউরোপীয় ট্যুরিষ্টের পোশাক। তাদের হাতে ট্যুরিষ্ট ব্যাগ এবং পায়েও ট্যুরিষ্ট জুতা।

শিখ লোকটা আহমদ হাত্তা নাসুমন, আর অন্য লোকটি আহমদ মুসা।

ওরা দু'জন বাইরের লাউঞ্জে বেরিয়ে এল। লাউঞ্জে কয়েকটি ট্যুরিষ্ট কোম্পানীর কাউন্টার দেখল।

সবচেয়ে সামনের যে ট্যুরিষ্ট কাউন্টারটি ছিল তার নাম 'সেভেন হেভেন ট্যুরস'।

নামটি মজার।

আহমদ মুসা এগুলো কাউন্টারটির দিকে। কাউন্টারে হাস্যোজ্জ্বল একজন মাঝবয়েসি লোক বসে।

আহমদ মুসা কাউন্টারে পৌছতেই মাঝবয়েসি লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানাল, 'গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ইয়ংম্যান।'

'গুড মর্নিং স্যার।' হেসে জবাব দিল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা কাউন্টারে একটু ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। আগের হাসিটি অব্যাহত রেখেই বলল, 'সেভেন হেভেন ট্যুরস মানে সাত স্বর্গ আপনারা সফর করাতে পারেন?'

লোকটিও হাসল। বলল, 'চুড়ান্ত হিসেবে আটটির বেশি স্বর্গ নেই। আমরা সাতটি স্বর্গ সফর করাতে পারি মানে সবকিছুই আমরা সফর করাতে পারি দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া। যেমন, দক্ষেণ সীমান্তে কেলডন পর্যন্ত আপনাদের

আমরা হেসে-খেলে নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু যদি বলেন, কেলডনের এক ইঞ্চি দক্ষেণে যাবেন। আমরা নিয়ে যেতে পারব না। যদি বলেন গায়ানা-সুরিনাম সীমান্তের সুন্দর নদী ‘কোরাজ’ এ আপনারা নামবেন, আমরা মাফ চাইব।’

আহমদ মুসা লোকটির কথার ভংগিতে হাসল, কিন্তু ভেতরে ভেতরে শংকিত হয়ে উঠল কেলডনের দক্ষেণে এক ইঞ্চি যাওয়া যাবে না শুনে।

কেলডন গায়ানার দক্ষেণ সীমান্তের সর্বশেষ শহর। এখান থেকে সুরিনামের সীমান্ত এক কিলোমিটারও নয়। আহমদ মুসাদের লক্ষ হলো কেলডন থেকে দক্ষেণে এগিয়ে ‘কোরাজ’ নদী পার হয়ে সুরিনামে প্রবেশ করা। কিন্তু ট্যুরিষ্ট কোম্পানীর লোকটির কথা শুনে তারা আকাশ থেকে পড়ল।

‘কেলডনের দক্ষেণে এক ইঞ্চিও যাওয়া যাবে না কেন?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘ও আপনারা তাহলে জানেন না। সুরিনাম সরকার বেশ কয়েকদিন হলো তাদের সীমান্ত সীল করে দিয়েছে। পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে গায়ানা সরকারও গতকাল তার সীমান্ত সীল করেছে।’ বলল লোকটি।

বিস্মিত হলো আহমদ মুসা। তাকাল সে আহমদ হাত্তা নাসুমনের দিকে। হাত্তা নাসুমনের চোখে-মুখেও বিস্ময়।

আহমদ মুসা আবার মুখ ঘুরালো ট্যুরিষ্ট কাউন্টারের লোকটির দিকে। বলল, ‘এসব সীল করা করি কেন? পাল্টা পাল্টি কেন?’

‘সুরিনামে তো নির্বাচন। সেখানে গন্ডগোল হচ্ছে। অনেক কথা শোনা যাচ্ছে। যাই হোক, লোক যাতে পালাতে না পারে, কিংবা অবাঞ্চিত কেউ যাতে প্রবেশও করতে না পারে, এজন্যেই সুরিনাম সরকার সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছে। গায়ানার পাল্টা ব্যবস্থা স্বাভাবিক।’

লোকটির কথা শুনে ভ্রু কুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার। চিন্তার ছায়া জেগে উঠল মুখে। একটু ভাবল, তারপর বলল, ‘নানা কথা শোনা যাচ্ছে বললেন, কি কথা শোনা যাচ্ছে?’

লোকটি এদিক ওদিক তাকাল। গলার স্বর একটু নিচে নামিয়ে বলল, ‘ওখানে দেদারসে লোক হারিয়ে যাচ্ছে, লোক খুন হচ্ছে।’

আহমদ মুসা ও হাত্তা নাসুমন মুখের ভাব এমন করল যেন সাংঘাতিক একটা খবর তারা শুনেছে। তারা কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে থাকল। তারপর আহমদ মুসা, 'মহা ঝামেলায় পড়া গেল মশায়।' বলতে বলতে তেতো খাওয়ার মত মুখ করল।

'কি ঝামেলা?' ট্যুরিষ্ট কাউন্টারের লোকটি জিজ্ঞেস করল।

'দেখুন স্থল পথে উপকূল সফর করা আমাদের হবি। ক'বছর আগেই এই নিউ আমষ্টারডাম পর্যন্ত আমরা কভার করেছি। এবার এসেছি নিউ আমষ্টারডাম থেকে উপকূল পথে সুরিনামের পারামারিবো পর্যন্ত যাবে বলে।' বলল আহমদ মুসা। কণ্ঠে তার কৃত্রিম হতাশার সুর।

লোকটি বিস্মিত হলো। বলল, 'যাবেন কি করে? বর্ডার সীল তো আছেই। তার উপর কেলডন থেকে সুরিনামের 'নিও নিকারী' শহর পর্যন্ত এই চল্লিশ মাইলে কোন রাস্তা নেই।

'এটাই তো মজার মশাই। রাস্তা নেই, কিন্তু আমরা রাস্তা বের করে যাব- এটাই তো রোমাঞ্চ।' বলল আহমদ মুসা।

'বুঝেছি, আপনারা জাত ট্যুরিষ্ট।' বলল লোকটি।

'জাত ট্যুরিষ্ট হলে কি হবে! বিপদে তো পড়লাম। কিন্তু আমরা তো ফিরতে পারিনা। একটা পথ বের করুন। আমরা আগামীকাল সন্ধ্যায় পারামারিবো পৌছতে চাই।' আহমদ মুসা জোর দিয়ে বলল।

'আজ উনিশ তারিখ, কাল বিশ তারিখ।' স্বগত কণ্ঠে উচ্চারণ করল লোকটি। মুহূর্ত কয় চিন্তা করে আহমদ মুসার দিকে মুখ তুলে বলল, 'কেলডনে চলুন। ওখানে একটা গ্রুপের সাথে পরিচয় করিয়ে দেব। ওরা আপনাদের নিও নিকারীতে পৌছে দেবার ব্যবস্থা করবে। কিছু বেশি খরচ হবে। রাজী আছেন?'

'হ্যাঁ আমরা রাজী।' বলল আহমদ মুসা।

'ধন্যবাদ। আমি আপনাদের কেলডনে নেবার ব্যবস্থা করছি।

সেদিনই বেলা ১২টার দিকে আহমদ মুসারা কেলডনে পৌছেছে। একটা হোটেলে উঠে গোসল ও খাওয়া সেরে আহমদ মুসারা একটা লম্বা ঘুম দিয়েছে।

ঘুম ভাঙতেই তার হাত ঘড়িতে দেখল বেলা সাড়ে তিনটা বাজে।

উঠে বসল আহমদ মুসা। ‘সেডিড’ নামক লোকটা সাড়ে তিনটার দিকেই তো আসার কথা।

সেভেন হেভেন ট্যুরসের পক্ষ থেকে ‘সেডিড’ আহমদ মুসাদের সাথে কেলডনে এসেছে। তাকেই সব নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছে সেভেন হেভেন ট্যুরসের পক্ষ থেকে।

বিছানায় উঠে বসেছিল আহমদ হাত্তা নাসুমনও।

আহমদ মুসা হাত্তার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘মি. হাত্তা দুই দেশের সরকার সীমান্ত সীল করে দেয়ার পরিস্থিতিতে আমাদের সুরিনামে প্রবেশ নিয়ে আপনি কি ভাবছেন?’

‘এই সীমান্ত নিয়ে বিরোধ আছে। সীমান্ত সীল হওয়ার ঘটনা আগেও ঘটেছে। এবার ঘটেছে সুরিনামের অভ্যন্তরীণ কারণে। সুরিনামে যা ঘটছে, বাইরের দুনিয়াকে তা তারা জানতে দিতে চায় না। বর্ডার সীল করে যাতায়াত, বিশেষ করে অবৈধ যাতায়াত বন্ধ করা যায় না। এবার কি ঘটেছে জানি না। পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর পাশে রাজনৈতিক ক্যাডাররা এবার বেশি তৎপর হবে।’ বলল আহমদ হাত্তা নাসুমন।

হাত্তা নাসুমনের কথা শেষ হতেই দরজায় নক হলো।

আহমদ মুসা গিয়ে দরজা খুলল। দেখল দরজায় দাঁড়িয়ে সেডিড ও আরেকজন লোক।

‘গুড ইভনিং, আসুন।’ বলে আহমদ মুসা দরজার একপাশে সরে দাঁড়াল।

ঘরে প্রবেশ করল ওরা দু’জন।

আহমদ মুসা দরজা বন্ধ করে ফিরে এল। ইতিমধ্যে হাত্তা নাসুমন উঠে দাঁড়িয়ে ওদের স্বাগত জানিয়েছে এবং বসতে দিয়েছে।

ওরা যে সোফায় বসেছে তার বিপরীত দিকের সোফায় পাশা পাশি আহমদ মুসা ও হাত্তা নাসুমন বসল।

সেডিড তার সাথীর পরিচয় দিতে গিয়ে বলল, 'নাম জিগান। সে সুরিনামের নাগরিক, আবার গায়ানারও নাগরিক। দু'দেশেই তার অবাধ গতি। তার অসাধ্য কিছু নেই।'

জিগান লোকটি তাকাল আহমদ মুসাদের দিকে। আহমদ মুসাও তাকে দেখছিল। জাত ক্রিমিনালের চেহারা জিগানের। তার দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছে সে শুধু আহমদ মুসাদের দেখছে না, তাদের ভেতরটাও সে যেন পাঠ করছে।

জিগান তার চোখের সার্চ আহমদ মুসাদের উপর অব্যাহত রেখে জিজ্ঞেস করল ভাঙা ইংরেজীতে, 'আপনাদের সাথে মালামাল কি আছে?'

'কোন মালামাল নেই, দু'জনের শুধু দু'টি হ্যান্ড ব্যাগ।' আহমদ মুসা বলল।

জিগান দাঁত বের করে হাসল। বলল, 'ও ভুলে গিয়েছিলাম, আপনারা তো ট্যুরিষ্ট। কিন্তু বিনা লাভে এত কষ্ট করবেন?'

'কষ্টের অভিজ্ঞতাই আমাদের লাভ।' বলল আহমদ মুসা।

'আপনারা কোন পথে যাবেন?' জিজ্ঞেস করল জিগান।

'আমাদের কোন ধারণা নেই, আপনিই বলুন কোন পথে যাওয়া ভাল হবে?' আহমদ মুসা বলল।

'দু'পথের যে কোন একটা পছন্দ করতে পারেন- জল পথ ও স্থল পথ। জল পথ কোরাজ নদী হয়ে গায়ানা উপসাগর পথে নিও নিকারীতে যাওয়া যাবে। জল পথটা আরামদায়ক, কিন্তু কোষ্ট গার্ডদের হাতে ধরা পড়ার ভয় আছে। আর স্থল পথ কোন পথ নয়। কোরাজ নদী পার হয়ে ৪০ মাইল হাঁটতে হবে জঙ্গল জলাভূমি ও উঁচু-নিচু পথ ধরে নিও নিকারী পর্যন্ত। এ পথ তুলনামুলকভাবে নিরাপদ। নিও নিকারী পর্যন্ত দুই পথের খরচ একই, আড়াই হাজার মার্কিন ডলার।' কথাগুলো মুখস্থের মত গড় গড় করে বলে গেল জিগান।

আহমদ মুসা একবার আহমদ হাত্তার দিকে চাইল। তারপর বলল, 'খরচটা বেশি হলো না?'

হো হো করে হাসল জিগান। বলল, 'খরচ সর্বনিম্ন ধরেছি। এর মধ্যে খাওয়া, যাওয়া ও কমিশন সবই রয়েছে।'

'কমিশন কি?' মুখে কৃত্রিম বিস্ময় টেনে বলল আহমদ মুসা।

সব জান্তার হাসি হাসল জিগান। বলল, 'নতুন আপনারা জানবেন কি করে? সীমান্তের দুই পাশে সরকারী-বেসরকারী অনেক গ্রুপ ও গ্যাং আছে যাদের আমাদের সন্তুষ্ট রাখতে হয়। এই সন্তুষ্টির ফি অনেক বড়।'

'ঠিক আছে মি. জিগান। দাবী অনুসারে খরচ পাবে। কিন্তু আগামী কাল সন্ধ্যার মধ্যে আমাদের পারামারিবো পৌছতে হবে।' বলল আহমদ মুসা।

'চিন্তা নেই বিকেলের আগেই আপনারা সেখানে পৌছে যাবেন।' জিগান বলল।

'আমরা যাত্রা করছি কখন?' আহমদ মুসা জিজ্ঞেস করল।

'আপনারা প্রস্তুত থাকলে এক ঘন্টার মধ্যেই।' জিগান বলল।

'আমরা প্রস্তুত।' বলল আহমদ মুসা।

'আমাদের প্রস্ত্ততিও এক ঘন্টার মধ্যে হয়ে যাবে। বলে উঠে দাঁড়াল জিগান। নিজের হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমরা ঠিক সাড়ে চারটায় যাত্রা করব। সেডি আপনাদেরকে আমাদের ওখানে নিয়ে যাবে।'

'ঠিক আছে।' বলল আহমদ মুসা।

কথা শেষ করেই জিগান ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটা শুরু করেছে।

কোরাজ নদী দুই ঘন্টা আগে পেরিয়ে এসেছে তারা।

রাত ৮টায় তারা এক টিলায় পৌছেছে।

টিলাটি ছোট-খাট একটা পাহাড়। ঘন গাছ-গাছড়ায় আচ্ছাদিত।

এই পাহাড়ের মাথায় ঘন গাছ-গাছড়ার মধ্যে টিনের তৈরী একটা বিশাল বাড়ি। দেয়াল ও চাল সবই টিনের তৈরী।

এই বাড়ির একটা বড় কক্ষে দু'টি বিছানা পাতা। সেখানে আহমদ মুসা ও হাত্তা নাসুমনের থাকার স্থান নির্ধারিত হয়েছে।

আহমদ মুসা ও হাত্তা নাসুমন দু'জনেই বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছে।

কোরাজ নদী পার হয়ে তারা সুরিনামে প্রবেশ করেছে এবং এ পর্যন্ত দু'ঘন্টার পথ তারা পাড়ি দিয়েছে বড় চাকার রিক্সা ভ্যানে। এ রিক্সা ভ্যানটি রাস্তাছাড়াও এবড়ো-থেবড়ো জমি ও জলজভূমির উপর দিয়েও চলতে পারে।

রিক্সা ভ্যান টেনেছে দু'জন নিগ্রো। আর ভ্যানের আরোহী ছিল চারজন। আহমদ মুসারা দু'জন এবং জিগান ও তার সাথী জয়সা।

আহমদ মুসা ও হাত্তা নাসুমন দু'জনেই চোখ বন্ধ করে বিশ্রাম উপভোগ করছে। প্রায় ২৪ ঘন্টা পর তাদের পিঠ বিছানার সাক্ষাত পেয়েছে।

দরজায় নক হলো।

আহমদ মুসা চোখ খুলল। বলল, 'আসুন।'

ঘরে প্রবেশ করল জিগান।

আহমদ মুসা উঠে বসে তাকে স্বাগত জানাল ও বসতে বলল।

দুই বেডের মাঝখানে বিরাট খালি জায়গায় একটা টেবিল ও দু'টি চেয়ার ছিল। তারই একটিতে বসল জিগান। বসে আহমদ মুসা হাত্তা নাসুমন দু'জনের দিকে একবার তাকিয়ে বলল, 'স্যাররা কেমন আছেন, কেমন লাগছে।'

'না, বেশ ভালো। ভ্যান বেশ জোরেই এসেছে। খুব ভাল টেনেছে ওরা। নিগ্রোদের কোথায় পেলেন? গায়ানা ও সুরিনামের এ অঞ্চলে যা দেখলাম সবই তো এশিয়ান অরিজিন।' বলল আহমদ মুসা।

জিগান হাসল। বলল, 'এরা দারুণ পরিশ্রমী শ্রমিক। অনেক পশ্চিমে সুরিনামের ওয়েলহেলমিনা পর্বত এলাকায় এদের বাস। কাবালোবা নদী বেয়ে এরা প্রায়ই নেমে আসে অর্থ উপার্জনের জন্যে। খুব সস্তায় কেনা যায় এদের শ্রম।'

'এই জংগলে এই সুন্দর বাড়ি কি করে পেলেন?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'হবেই তো। এটা নিকারী জমিদারদের একটা তহশিল অফিস ছিল কিছুদিন আগেও। এখান থেকে এই এলাকার বনজ ও জলজ সম্পদের এবং কিছু কৃষি জমি আছে তার খাজনা আদায় হতো। সেই সাথে এটা ছিল পুলিশ ফাঁড়িও।' বলল জিগান।

'ছিল মানে, এখন নেই?' প্রশ্ন আহমদ মুসার।

‘নেই। জমিদারের পুলিশ মানে পাইক-পিয়াদা ও খাজনা আদায়কারীরা পালিয়ে গেছে না হারিয়ে গেছে কিছু একটা হয়েছে।’ বলল জিগান।

‘এখন কে থাকেন এখানে?’ বলল আহমদ মুসা।

‘নতুন সরকারের লোকরা।’ জিগান বলল।

‘সরকারের লোকরা মানে সরকারী কর্মচারীরা? তাহলে তো সুবিধাই হবে।’ আহমদ মুসা কৃত্রিম উৎসাহ দেখিয়ে বলল।

‘না সরকারী কর্মচারীরা কেউ নেই। সরকার পক্ষের লোক আছে। ওরা নতুন জমিদার। দেখছেন না এলাকায় লোকজন নেই বললেই চলে। নতুন জমিদারের লোকজনরা পুরানো প্রজাদের উচ্ছেদ করেছে।’ বলল জিগান।

আহমদ মুসার মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠেছে। তার কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে, হাত্তা নাসুমন ও ওয়াং আলীরা যে কালো থাবার শিকার সে কালো থাবা এখানেও এসে পৌছেছে। বলল সে, পুরাতন প্রজারা কোথায় গেল?’

‘কেউ বলে নিখোঁজ হয়েছে, কেউ বলে পালিয়েছে, কেউ কেউ বলে সীমান্তের ওপারে চলে গেছে। সবাই বলে, নির্বাচন পর্যন্ত এই অবস্থা চলবে।’ জিগান বলল।

কথা শেষ করেই জিগান দ্রুত আবার বলল, ‘তবে নতুন জমিদারের লোকরা আসায় আমাদের সুবিধা হয়েছে। এরা শুধু পয়সা চায়। পয়সা দিয়ে যা ইচ্ছে তাই করা যায়। আগে তহসিলের মেহমান খানায় আমরা বিনা পয়সায় থাকতে পারতাম বটে, কিন্তু অন্য কোন সুযোগ নেয়া যেত না। এখন দেখুন পয়সা দিয়ে তহসিল অফিসের সবচেয়ে ভালো রুম আমরা পেয়ে গেছি।’

‘তাহলে তো লোকরা ভালই। কি বলেন?’ আহমদ মুসা বলল।

‘টাকা খোর স্যার। এখন পয়সা না দিলে মেহমান খানাতেও থাকা যায় না।’

কথা শেষ করে একটু থেমে প্রসংগ পাল্টিয়ে সে বলল, ‘স্যার ভোর পাঁচটায় আমরা যাত্রা করব। দশটার মধ্যেই নিও নিকারীতে পৌছে যাব।’ বলে উঠে দাঁড়াল জিগান।

বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আহমদ মুসা উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করে এসে বিছানায় বসল।

আহমদ মুসা জিগানের সাথে কথা বলার সময় শিখবেশী হাত্তা নাসুমন একটি কথাও বলেনি।

আহমদ মুসা এসে তার বিছানায় বসতেই কথা বলে উঠল হাত্তা নাসুমন। বলল, 'আহমদ মুসা এই এলাকা ছিল নিকারীর এক জমিদার নাসের সুকামোর রাজ্য। দু'মাস আগেও এই এলাকা তারই দখলে ছিল।'

বলে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল হাত্তা নাসুমন। বলল, এই ভাবেই ওরা হিটলারী কায়দায় দেশের মুসলিম কম্যুনিটির প্রভাব, প্রতিপত্তি, শক্তি সব ধ্বংস করতে চাচ্ছে।

'মি. হাত্তা, আমি যতটা আঁচ করছিলাম তার চেয়েও পরিস্থিতি ভয়াবহ। তবে শহরাঞ্চলে এই ভয়াবহতা একটু কম হবে। শহরে তারা লোকদের গুম করার মাধ্যমে মুসলমানদের ভিত ও দুর্বল করেছে। কিন্তু প্রত্যন্ত গ্রাম এলাকা তারা দখল করে নিচ্ছে।' বলল আহমদ মুসা।

'ঠিক। পরিস্থিতি এটাই মি. আহমদ মুসা।'

আহমদ মুসা শুয়ে পড়ল। বলল, 'আল্লাহ ভরসা। শুয়ে পড়ুন মি. হাত্তা। পাঁচটায় যেতে হলে আমাদের চারটায় উঠতে হবে।'

'ঠিক।' বলে হাত্তা নাসুমনও শুয়ে পড়ল।

গভীর রাত।

আহমদ মুসা ও হাত্তা নাসুমন ঘুমিয়ে।

তাদের দরজায় ধীরে ধীরে নক হলো।

একবার। দু'বার। তিনবার। তৃতীয় বারের সময় আহমদ মুসা চোখ খুলল। উঠে বসল বিছানায়। দেখল, হাত্তা নাসুমনও চোখ খুলেছে।

'কে দরজায়?' দরজার দিকে তাকিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

জবাব এল না, কিন্তু দরজায় আরেকবার নক হলো।

আহমদ মুসা বালিশের তলা থেকে রিভলবার নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

‘না মি. আহমদ মুসা, কথা না বললে দরজা খুলবেন না। শুনেছেন তো, এদিকের অবস্থাও ভাল নয়।’ অনুচ্চ কণ্ঠে বলল হাত্তা নাসুমন।

‘মি. হাত্তা, আমার মনে হচ্ছে দরজায় যে নক করছে, সে আমাদের শত্রু নয়। শত্রু হলে দরজা খুলবার জন্যে কথা বলত। তবু আমি রিভলবার নিলাম।’

বলে আহমদ মুসা দরজার দিকে এগুল।

ডান হাতে রিভলবার বাগিয়ে রেখে বাঁ হাতে দরজা খুলল আহমদ মুসা।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একজন নিগ্রো। আহমদ মুসার হাতে রিভলবার দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। সংগে সংগেই সে দু’হাত উপরে তুলেছে। তারপর সে ডান হাত একটু নিচে নামিয়ে তর্জনি তার ঠোঁটে ঠেকিয়ে আহমদ মুসাকে কথা বলতে নিষেধ করল।

আহমদ মুসা নিগ্রোর চেহারা দেখেই বুঝেছে সে শত্রুতা করতে আসেনি এবং আরও বুঝল সে আহমদ মুসা ছাড়াও অন্য কাউকে ভয় করছে এবং তার আসাকে গোপন করতে চাচ্ছে।

আহমদ মুসা দরজার একটু পাশে সরে গিয়ে তাকে লক্ষ করে ফিস ফিস কণ্ঠে বলল, ‘ভেতরে এস।’

নিগ্রোটি যেন এ কথারই অপেক্ষা করছিল। আহমদ মুসা ভেতরে আসার আহবান করার সাথে সাথে সে ভেতরে ঢুকে গেল।

আহমদ মুসা বাঁ হাতে দরজা বন্ধ করে ডান হাতের রিভলবারটা নিগ্রোর দিক থেকে সরিয়ে নিয়ে চেয়ার দেখিয়ে তাকে বসতে বলল।

সে চেয়ারে বসল না। বলল, ‘স্যার জিগান ও জয়সাকে ওরা মেরে ফেলেছে। আপনাদেরকেও ধরা বা মারার জন্যে যে কোন সময় এসে পড়বে।’ ভয় ও উত্তেজনায় গলা কাঁপছে নিগ্রোটির।

তার কথা শুনে আহমদ মুসা আকাশ থেকে পড়ল। বিস্ময়ের ধাক্কা কাটাতে তার মুহুর্ত খানেক সময় লাগল। তারপর বলল, ‘কারা মেরে ফেলেছে?’ আহমদ মুসার কণ্ঠ কঠোর। তার চোখে নিগ্রোর প্রতি সন্দেহ দৃষ্টি।

‘স্যার, নতুন জমিদারের লোকরা।’ জবাব দিল নিগ্রোটি।

‘নতুন জমিদারদের লোকরা? কেন মেরেছে?’ বলল আহমদ মুসা। তার ভ্রু দু’টি কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে। ভাবছে সে।

‘নতুন জমিদাররা জানতে পেরেছে আপনারা মুসলমান। তাই জিগানকে তারা বলেছিল আপনাদেরকে তাদের হাতে তুলে দিতে এবং বিষয়টা গোপন রাখতে। কিন্তু জিগান তাতে রাজী হয়নি কিছুতেই। কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে ওরা জিগান ও জয়সা দু’জনকেই গুলী করে মেরেছে।’ বলল নিগ্রোটি ভয় জড়িত কণ্ঠে।

‘ওরা এখন কোথায়?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘সবাইকে ডেকে নিয়ে ঘরে ঢুকেছে। মনে হয় পরামর্শ করতে বসেছে।’ বলল নিগ্রোটি।

‘কেমন করে বুঝলে, ওরা যে কোন সময় আক্রমণে আসবে?’

‘ওরা বলেছে স্যার। জিগানদের খুন করেই ওদের একজন চিৎকার করে বলেছে, ‘চল তাড়াতাড়ি ছদ্মবেশী শয়তান দু’টোকে ধরতে হবে। কিন্তু অন্য একজন বলেছে, চল তার আগে একটু পরামর্শ করে নেই। এরপর ওরা ঘরে ঢুকেছে।’

‘ধন্যবাদ.........। কি যেন তোমার নাম বলেছিলে?’

‘বোংগো। ওমর বোংগো।’

তার নাম শুনে চমকে উঠল আহমদ মুসা। তার উপর সন্ধানী দৃষ্টি রেখে আহমদ মুসা বলল, ‘তুমি মুসলিম? কিন্তু আগে তো বোংগো নাম বলেছিল, ওমর বোংগো বলনি?’

‘কাজের জন্যে এলে আমরা আমাদের মুসলিম পরিচয় গোপন করি। আপনারা মুসলিম জেনেই আমাদের মুসলিম পরিচয় দিলাম।’ বলল ওমর বোংগো।

‘তোমার সাথী কোথায়? তার নাম কি?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘সে ওদের ঘরের বাইরে এক স্থানে লুকিয়ে ওদের উপর চোখ রাখছে। তার নাম ‘কাসিমী ওয়ে এমবা।’ বলল ওমর বোংগো

‘আমরা মুসলমান বলেই তোমরা আমাদের সাহায্য করেছ?’ আহমদ মুসা বলল।

‘জি স্যার। তাছাড়া আমরা আপনাদেরই সাথী। আপনাদের নিউ নিকারীতে পৌছানো আমাদের দায়িত্ব।’ বলল ওমর বোংগো।

আহমদ মুসা দু’ধাপ এগিয়ে গভীর আবেগে জড়িয়ে ধরল ওমর বোংগোকে। বলল, ‘ধন্যবাদ ওমর বোংগো। আমরা খুব খুশি হয়েছি তোমরা মুসলমান জেনে।’

আহমদ মুসা ওমর বোংগোকে আলিংগন থেকে ছেড়ে দিয়ে বলল, ‘ওমর বোংগো, আমাদের স্যার বলবে না, ভাই বলবে। আর শোন তুমি এখন তোমার সাথীর কাছে ফিরে যাও এবং ওদের উপর নজর রাখ। কোন ভয় নেই, ওদেরকে আমাদের এখানে আসতে দাও।’

ওমর বোংগোর চোখে-মুখে আনন্দ ও কৃতজ্ঞ দৃষ্টি।

কথা শেষ করে আহমদ মুসা হাত্তা নাসুমনকে বলল, ‘আপনি কিছু বলবেন ওমরকে?’

‘ধন্যবাদ ওমর। আমরা খুব খুশি হয়েছি। জান ওরা কতজন লোক আছে?’ হাত্তা নাসুমন বলল।

‘ওরা চারজন। দু’জন নতুন জমিদারের লোক। আর দু’জন প্রহরী।’ বলল ওমর বোংগো।

‘ধন্যবাদ ওমর।’ হাত্তা নাসুমন বলল।

‘ধন্যবাদ, আসসালাম।’ বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ওমর বোংগো।

আহমদ মুসা হাত্তা নাসুমনের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, ‘আপনার প্রশ্নের জন্যে ধন্যবাদ। ওদের সংখ্যা জানা আমাদের খুব প্রয়োজন ছিল।’

‘ওয়েলকাম। মি. আহমদ মুসা, আপনি এ ঘটনাকে কোন দৃষ্টিতে দেখছেন?’ বলল হাত্তা নাসুমন।

‘জিগানদের মৃত্যু খুবই বেদনাদায়ক। তবে শত্রুদের এত তাড়াতাড়ি দেখা পাওয়ায় খুব খুশি হয়েছি।’

‘ওদের জন্যে অপেক্ষা না করে আমরাই ওদের খুঁজে নিলে হতো না?’

‘ওরাই প্রথম আক্রমণ করুক মি.হাত্তা।’

বলে আহমদ মুসা গিয়ে দরজা বন্ধ করে এসে বিছানায় গা এলিয়ে দিল এবং বলল, ‘আসুন মি. হাত্তা একটু ঘুমিয়ে নেয়া যাক।’

‘এই অবস্থায় আপনার ঘুম ধরবে?’ হাত্তা নাসুমনের কণ্ঠে বিস্ময়।

‘চিন্তার কিছু নেই, ওরাই তো এসে ডেকে তুলবে।’ বলল আহমদ মুসা ঠোঁটে হাসি টেনে।

বলে আহমদ মুসা চোখ বুজল।

হাত্তা নাসুমনও শুয়ে পড়ল।

কিন্তু ঘুমাতে পারল না সে।

রাজ্যের ভাবনার আনাগোনা মাথায় নিয়ে কত সময় তার গেল কে জানে।

হঠাৎ তার মনে হলো দরজার বাইরে অনেকগুলো পায়ের শব্দ। উৎকর্ণ হলো সে। ঠিক পায়ের শব্দগুলো একদম দরজার গোড়ায় এসে গেছে।

উঠে বসল হাত্তা নাসুমন।

আহমদ মুসাকে ডাকবে বলে দ্রুত নামতে গেল। এমন সময় দরজায় যেন বাজ পড়ল।

সেই ভীষণ শব্দের রেশ বাতাসে মিলাবার আগেই দেখা গেল ঘরের দরজা মেঝেয় এসে ছিটকে পড়েছে।

ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে দু’জন। তাদের হাতে রিভলবার। তাদের পেছনে আরও দু’জন দাঁড়িয়ে। তাদের হাতে ষ্টেনগান।

দরজা ভাঙার শব্দে আহমদ মুসাও ঘুম থেকে জেগে গেছে। সে উঠে বসেনি।

বালিশে ঠেস দিয়ে আধ বসা অবস্থায় সে। তার দু’হাতও বালিশের দু’পাশে ঠেস দেয়া।

আর হাত্তা নাসুমন তার বিছানায় বসে। তার দু’পা নিচে নামানো।

দরজায় দাঁড়ানো দু’জন মাঝ বয়সী রিভলবারধারী। চেহারা এ্যাংলো ইন্ডিয়ান। শক্ত-সমর্থ ক্রিমিনাল আকৃতির দেখতে।

দু'জনের একজন চিৎকার করে বলল, 'তোমরা নাম ভাঙিয়ে ছদ্ম পরিচয় নিয়ে বেআইনিভাবে সুরিনামে প্রবেশ করেছ। তোমাদের...........।'

আহমদ মুসা তার কথায় বাঁধা দিয়ে নেহায়েত গোবেচারার মত শান্ত গলায় বলল, 'কিছুই বুঝতে পারছি না আপনাদের কথা। আমাদের কথা শোনেননি। আমাদের কাগজপত্র দেখেননি। কি করে বুঝলেন আমরা বেআইনিভাবে প্রবেশ করেছি?'

আহমদ মুসা একদিকে কথা বলছে, অন্যদিকে তার ডান হাত এক সুতা এক সুতা করে বালিশের তলায় এগিয়ে যাচ্ছে তার এম-১০ হাত করার জন্যে।

আহমদ মুসা থামলে সেই দু'জনের একজন চিৎকার করে উঠল, 'কোন কাগজপত্র আমাদের দেখার দরকার নেই। তোমরা মুসলমান। পরিচয় ভাড়িয়ে তোমরা সুরিনামে প্রবেশ করেছ।'

'না কোন পরিচয় ভাড়ানো হয়নি। আমাদের পাসপোর্ট-ভিসায় আমার নাম পরিষ্কার লেখা আছে। দেখুন কাগজ পত্র'। বলল আহমদ মুসা একেবারে শান্ত কণ্ঠে।

'তোমাদের একজনের শিখের চেহারা ও পোশাক। এটা কি পরিচয় ভাড়ানো নয়?'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'আপনারা দেখছি, মুসলমানদের কিছুই জানেন না। শিখদের অনেক অনেক আগে থেকে মুসলমানরা এই ধরনের দাড়ি রাখে ও পাগড়ি পরে।'

আহমদ মুসার হাসি দেখে ওরা আরও জ্বলে উঠল। বলল, 'শয়তান মুসলমানের বাচ্চা। দেখাচ্ছি মজা।'

বলে লোকটি তার রিভলবার তুলছিল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসার ডান হাত তখন তার এম-১০ এর বাঁটে। আহমদ মুসা বলে উঠল, 'তোমরা এসব কি কথা বলছ। আমরা তোমাদের...........।'

আহমদ মুসার এ কথার সাথে সাথে তার ডান হাত এম-১০ নিয়ে বিদ্যুত বেগে বেরিয়ে এল।

ওরা আহমদ মুসাদের তরফ থেকে পাল্টা আক্রমণের কল্পনাও করেনি। তাই তারা খাঁচায় পোরা পাখির মতই খেলছিল আহমদ মুসাদের নিয়ে। আহমদ মুসার এম-১০ মেশিন রিভলবারকে যখন তাদের দিকে ঘুরে আসতে দেখল, তখন অবিশ্বাস্য এই পরিস্থিতি তাৎক্ষণিকভাবে তাদের বিমূঢ় করে দিল। তাদের হাতের রিভলবার কাজে লাগাতে পারল না।

আহমদ মুসার এম-১০ মেশিন রিভলবার থেকে বেরিয়ে আসা গুলীর ঝাঁক এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের উপর।

সামনের দু'জন রিভলবারধারী, পরে পেছনের দু'জন ষ্টেনগানধারী গুলীবিদ্ধ হয়ে ভূলুন্ঠিত হলো।

আহমদ মুসা লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে ওদের দিকে এগুল। ওদের কাউকে জীবন্ত তার চাই।

কিন্তু চারজনের মধ্যে পেছনের ষ্টেনগানধারী একজনকে কথা বলার পর্যায় পেল। কিন্তু সে লড়ছিল মৃত্যুর সাথে। কোন প্রশ্নের জবাব সে দিল না। কিছুক্ষণের মধ্যে সেও মারা গেল।

হতাশভাবে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা। হাত্তা নাসুমনও এসে আহমদ মুসার পাশে দাঁড়িয়েছিল।

'ওদের এই চারজনকে প্রথম পাওয়া গেল, কিন্তু জীবিত পাওয়া গেল না। অথচ নিখোঁজ হওয়া মানুষ কোথায় যাচ্ছে, এটা জানা খুবই দরকার।' হতাশ কণ্ঠ আহমদ মুসার।

এ সময় ওমর বোংগো তার সাথী কাসিমী ওয়ে এমবাকে নিয়ে ছুটে এল। আহমদ মুসার কাছে এসে ওমর বোংগো বলল দ্রুত কণ্ঠে, 'আমি আড়ালে দাঁড়িয়েছিলাম। সব দেখেছি স্যার। আল্লাহ আপনাকে আরও শক্তি দিন। একটা খবর আছে স্যার।'

'কি খবর?' আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'আমি গিয়েছিলাম ওয়ে এমবাকে ডাকতে। আমি তাকে বাইরে পাহারায় রেখেছিলাম। সে একটা খবর বলল।'

তারপর ওমর বোংগো ওয়ে এমবার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘স্যারকে বল খবরটা।’

ওয়ে এমবার বয়স কম। তারুণ্য এখনও কাটেনি। তার চোখে-মুখে ভয় ও জড়তা। সে আহমদ মুসার দিকে চোখ তুলে একবার তাকাল এবং বলল, ‘স্যার একটা বড় আলো এদিকে এ বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছিল। গুলীর শব্দ হওয়ার সাথে সাথে সে আলো নিভে গেছে। আর জ্বলেনি।’

ভ্রু কুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার।

‘স্যার একদল বা কিছু লোক এদিকে আসছিল। গুলীর শব্দ শুনে এ বাড়িকে সন্দেহ করে তারা আলো নিভিয়ে দিয়েছে।’ বলল ওমর বোংগো।

‘কি করে বুঝলে একদল লোক আসছিল?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘আমাদের জংগল পথে এ ধরনের বড় আলো কোন দল না হলে জ্বালায় না। দু’একজন হলে টর্চ ব্যবহার করতো।’

‘কেন জ্বালায় না?’

‘রাতে জংগলে আলো নিয়ে চলা বিপদের কারণ ঘটায়। তাই আলো সবাই পরহেজ করে চলে। আর বেশি লোক হলে আলো প্রয়োজন হয়। আর তখন আলো জ্বালানোও হয়। এ আলো তখন এই সংকেতও দেয় যে, আমাদের শক্তি কারও চেয়ে কম নেই। আবার হঠাৎ যখন এ আলো নিভে যায়, তার অর্থ দাড়ায় তারা ভয় পেয়েছে বা কোন ষড়যন্ত্র আঁটছে।’ ওমর বোংগো বলল।

‘তাহলে একদল লোক বা কিছু লোক আসছিল, ভয়ে তারা আলো নিভিয়ে দিয়েছে?’ প্রশ্ন করল আহমদ মুসা।

‘তাই মনে হচ্ছে।’ বলল ওমর বোংগো।

‘ওরা কারা বলতে পার?’ আহমদ মুসা বলল।

একটু চিন্তা করল ওমর বোংগো। বলল, ‘স্যার, হয় ওরা চোরা চালানী, না হয় কোন গোপন কাজে লিপ্ত।’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করছি বোংগো। এখন বলত, দুই ধরনের মধ্যে কোন ধরনের লোক ওরা?’

‘বলতে পারছি না স্যার। দু’দিকেই আমার সমান সন্দেহ।’ বলল ওমর বোংগো।

‘আমার বিশ্বাস ওরা কোন গোপন কাজে লিপ্ত। চল দেখি।’

বলে আহমদ মুসা বাইরে যাওয়ার জন্যে হাঁটা শুরু করল।

আহমদ হাত্তা নাসুমন ও ওমর বোংগোরা আহমদ মুসার পেছন পেছন চলল।

বাড়ির গেটে গিয়ে আহমদ মুসা ঘর থেকে কুড়িয়ে আনা মৃত একজনের রিভলবার হাত্তা নাসুমনের হাতে দিয়ে বলল, ‘আপনি গেটের ভেতরে দাঁড়ান যাতে নজর এড়িয়ে কেউ ভেতরে আত্মগোপন করতে না পারে।’

আহমদ মুসা ওমর বোংগোদের দু’জনকে নিয়ে সামনে হাঁটতে শুরু করল।

গেটের সামনে ছোট-খাট একটা খালি চত্বর। তারপর বড় বড় গাছ-পালা ও ঝোপ-ঝাড়ের শুরু। এই গাছ-পালা ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে একটা মেঠো পথ টিলার নিচে সমভূমিতে নেমে গেছে।

চত্বরের মাঝে দাঁড়িয়ে আহমদ মুসা জিজ্ঞেস করল ওয়ে এমবাকে, ‘তুমি বড় আলোটা কোথায় দেখেছিলে?’

ওয়ে এমবা একটু পেছনে সরে গেল। গেটের পাশে বড় একটা গাছের গুড়ির উপর দাঁড়িয়ে বলল, ‘ঐখানে টিলার নিচে।’

আহমদ মুসাও গাছের গুড়িতে উঠল। দেখে বলল, ‘সমতলের যেখান থেকে রাস্তাটা টিলায় উঠে এসেছে, সেখানেই তাহলে আলোটা দেখা গেছে। তার অর্থ ওরা টিলায় উঠতে আসছিল।’

আহমদ মুসা লাফ দিয়ে নামল গাছের গুড়ি থেকে।

ওমর বোংগোদের বলল, ‘তোমরা এস আমার সাথে।’

বলে আহমদ মুসা হাঁটতে শুরু করল চত্বর দিয়ে টিলা থেকে নেমে যাওয়া রাস্তার দিকে।

ওমর বোংগোরাও চলল তার পেছনে।

চারদিকে ঘন অন্ধকার।

চত্বরটায় অন্ধকার একটু ফিকে, কিন্তু টিলা থেকে সমতলে নেমে যাবার রাস্তাটা ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঢাকা।

সেই রাস্তার মুখে পৌছল আহমদ মুসা।

পেছনে একবার তাকিয়ে দেখল, ওমর বোংগোরা কতটা পেছনে। তারপর মেশিন রিভলবারটা হাতে তুলে নিয়ে রাস্তা দিয়ে নামা শুরু করল।

দু'পাশে উঁচু গাছ-পালা ও ঝোপ ঝাড়।

দশ বারো গজ সবে এগিয়েছে।

হঠাৎ এ সময় আহমদ মুসার মনে হলো ওপর থেকে কি একটা তার দেহের উপর পড়ে তাকে জাপটে ধরল। তার সাথে সাথেই প্রবল একটা হ্যাচকা টানে পড়ে গেল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার প্রথমে মনে হয়েছিল গাছের উপর থেকে কেউ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝল কোন মানুষ নয় জালের ফাঁদ তাকে আটকে ফেলেছে। সে আরও বুঝল, গাছ থেকেই কেউ তার উপর জালের ফাঁদ নিক্ষেপ করেছে।

আহমদ মুসা মাটিতে পড়েই ওমর বোংগো ও ওয়ে এমবার চিৎকার শুনতে পেল। আহমদ মুসা বুঝল ওরাও জালের ফাঁদে আটকা পড়েছে।

মাটিতে পড়ে স্থির হবার পর আহমদ মুসা খুশি হলো তার ডান হাতে রিভলবার ঠিকমতই আছে।

ওমর বোংগো এবং ওয়ে এমবার চেঁচামেচি তখনও চলছিল। তারা সম্ভবত লড়াই করছে জালের বাঁধন থেকে বের হবার জন্যে। আহমদ মুসা বুঝল এই চেঁচামেচি, হাত-পা ছুড়োছুড়িতে কোন লাভ নেই, বরং তাতে জালের বাঁধন আরও শক্ত হবে।

আহমদ মুসা নিরবে অপেক্ষা করতে লাগল জালের পেছনে যে মানুষ আছে সেই মানুষের জন্যে।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। পাশে মানুষ দাঁড়িয়ে থাকলেও তা চোখে পড়ার মত নয়।

কিছু দেখতে পেল না, কিন্তু শব্দ শুনতে পেল আহমদ মুসা। ভারী কিছু মাটিতে পড়ার শব্দ। তাহলে ওরা কি গাছ থেকে নামল, ভাবল আহমদ মুসা।

এই সময় একটা চাপা কণ্ঠ কথা বলে উঠল সুরিনামের কথ্য টাকি টাকি ভাষায়, 'ফাঁদগুলো তোমরা লক করেছ?'

ফাঁদ লক করার অর্থ হলো ফাঁদে শিকার আটকাবার পর জালের খোলা মুখ বেঁধে ফেলা।

'হ্যাঁ, লক করা হয়েছে।' প্রায় একই সংগে অন্ধকারের মধ্য থেকে তিনটি কন্ঠ কথা বলে উঠল।

'তাহলে জানোয়ারদের টেনে চত্বরে নিয়ে চল।' আগের সেই কণ্ঠ নির্দেশ দিল।

আহমদ মুসা বুঝল এখানে ওরা চারজন রয়েছে। এই চারজনই কি, না ওরা আরও আছে?

আহমদ মুসার ভাবনা হোঁচট খেল। তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া শুরু হয়েছে। উঁচু-নিচু মাটিতে হোঁচট খেয়ে ধাক্কা খেয়ে তার দেহ চলতে শুরু করেছে।

ফাঁদ জালের মুখের প্রান্ত ধরে অল্প সামনে থেকে কেউ তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, এটা বুঝল আহমদ মুসা। লোকটি তখনও তার চোখে পড়েনি।

আহমদ মুসা সামনে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে লোকটিকে চোখের আওতায় আনার চেষ্টা করতে লাগল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর অল্প সামনে একটা জমাট অন্ধকারকে চলন্ত দেখল। আহমদ মুসা নিশ্চিত হলো, এটা সেই লোকের অবয়ব যে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

আহমদ মুসা তার মেশিন রিভলবার পজিশনে নিয়ে এল। এখন ইচ্ছা করলে এই লোকটিকে সে হত্যা করতে পারে। কিন্তু তাতে লাভ হবে না। আরও তিনজন আছে। তারা প্রতিশোধ নেবে। সুতরাং তাদেরকে এক সংগে না পেলে তাদের উপর চড়াও হওয়া ঠিক হবে না।

এক সময় তাকে টেনে নেয়া বন্ধ হলো।

আহমদ মুসা বুঝল তাদেরকে চত্বরে নিয়ে আসা হয়েছে।

চত্বরের ফিকে অন্ধকারের আহমদ মুসা ওদের দু'জনকে দেখতে পেল জমাট অন্ধকারের মত তাদের কিছু দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে।

তাদের দু'জনের একজন বলে উঠল, সুদীপ ও সম্বা আমরা এদের দেখছি। তোমরা দু'জনে ভেতরে যাও। দেখে এস কি ঘটেছে। মনে হয় এদের কোন লোক ভেতরে নেই। থাকলে এদের চেঁচামেচিতে নিশ্চয় এতক্ষণ বেরিয়ে আসার কথা।'

চত্বরের অন্ধকার তখন আহমদ মুসার অনেকখানি চোখসহা হয়ে গেছে। সে দেখল, যেখানে ওমর বোংগো ও ওয়ে এমবাকে রাখা হয়েছে, সেখান থেকে দু'টি ছায়ামুর্তি বাড়িতে প্রবেশের জন্য গেটের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

খুশি হলো আহমদ মুসা। হাত্তা নাসুমনকে গেটে রেখে আসা হয়েছে। সে ঐ দু'জনকে কাবু করতে পারবে। তাহলে..........।

আহমদ মুসার চিন্তা শেষ হতে পারলো না। গেটের ভেতর পরপর দু'টি গুলীর আওয়াজ হলো।

গেটের সামনে পৌছে গিয়েছিল ওরা দু'জন। দু'জনের কণ্ঠ থেকেই আর্তনাদের শব্দ বেরিয়ে এল।

গুলীর শব্দ শুনেই আহমদ মুসার সামনে যারা দাঁড়িয়েছিল, তারা নড়ে উঠল। অন্ধকারকে খান খান করে দিয়ে গর্জে উঠল ওদের ষ্টেনগান।

আহমদ মুসা দেখল, এরা দু'জন গুলী করতে করতে এগুচ্ছে গেটের দিকে।

আহমদ মুসা ওদের আর সুযোগ দিল না। তার এম-১০ ওদের দিকে তাক করে ট্রিগার চাপল।

বেরিয়ে গেল এক ঝাঁক গুলী।

ছায়ামূর্তি দু'টি আর্তনাদ করে উঠারও সুযোগ পেল না। নিরবে ভূমি শয্যা নিল চত্বরে।

তারপর সব নিরব।

মুহূর্ত কয়েক উৎকর্ণ হয়ে থেকে আহমদ মুসা ওমর বোংগোকে ডাকল। বলল, 'তোমরা ভাল আছ তো?'

‘জি স্যার। কিন্তু বের হতে পারছি না। শালারা কোথায় কিভাবে গিরে দিয়েছে বুঝতে পারছি না।’ বলল ওমর বোংগো।

‘মি. আহমদ মুসা, আমি আসছি। ওরা তাহলে আপনাদের জালের ফাঁদে আটকেছে?’ গেটের দিক থেকে শোনা গেল হাত্তা নাসুমনের কণ্ঠ।

আহমদ মুসা তখন তার মোজার ভেতর থেকে ছুরি বের করে জালের নাইলনের কর্ড কাটতে শুরু করেছে।

‘কোথায় আপনি মি. আহমদ মুসা। আমি এসেছি।’ চত্বরের মাঝামাঝি থেকে হাত্তা নাসুমনের কণ্ঠ শোনা গেল।

‘মি. হাত্তা আমি জাল কাটা শুরু করেছি। আপনি ওমর বোংগোদের সাহায্য করুন।

সবাই মুক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল।

হাত্তা নাসুমন আহমদ মুসাকে জড়িয়ে ধরল। প্রায় কাঁদ কাঁদ কণ্ঠে বলল, আমি ওমর বোংগো এবং ওয়ে এমবার অব্যাহত চিৎকার শুনে এবং আপনার কোন কণ্ঠ না শুনে প্রায় মরেই গিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, আপনার কোন বড় রকমের ক্ষতি করে ওরা ওমর বোংগো ও ওয়ে এমবাকে ধরেছে। তারপর ওদের একজন যখন চিৎকার করে বলল, আমরা এদের দেখছি, তোমরা দু’জন ভেতরে যাও, তখন বুঝলাম যেভাবেই হোক আপনারা আছেন। তখন মনে হলো, প্রাণটা যেন আমার ফিরে এল।’

‘ধন্যবাদ মি. হাত্তা, আপনার কাজ আপনি ঠিকভাবে করেছেন। ওদের আমি এক সাথে পাচ্ছিলাম না বলে গুলী করতে পারছিলাম না।’

হাত্তা নাসুমনকে কথাটা বলেই আহমদ মুসা ফিরল ওমর বোংগোর দিকে। বলল, ‘ওমর তোমরা চিৎকারটা একটু বেশি করেছ।’

‘স্যার এটা জংগলের একটা গোপন নিয়ম। ধরা পড়লে চিৎকার ও কান্নাকাটি ঠিকভাবে করতে পারলে শত্রুর আঘাতটা একটু দেরীতে আসে এবং আত্মরক্ষার জন্যে কিছু সময় পাওয়া যায়।’ বলল ওমর বোংগো।

‘এই কারণেই কি যে, শত্রুরা তার শিকারকে ভীতু ও দুর্বল মনে করে তাকে আর আঘাত করার প্রয়োজন মনে করে না এবং তাদের দিক থেকে নিশ্চিন্ত থাকে?’ আহমদ মুসা বলল।

‘ঠিক স্যার।’ বলল ওমর বোংগো।

‘মি. আহমদ মুসা, আমার মনে হয় এদের আরও লোক আছে।’ বলল হাত্তা নাসুমন।

‘কিভাবে বুঝলেন?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা। ভ্রু কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে তার।

‘আমি গেট থেকে টিলার গোড়ায় একটা টর্চের আলো জ্বলে উঠতে দেখেছি।’ হাত্তা নাসুমন বলল।

আহমদ মুসা চিন্তা করছিল। বলল, ‘ওদের আরো লোক থাকাই স্বাভাবিক। ওরা চারজন এসেছিল এদিকের খোঁজ নিতে।’

একটু থামল আহমদ মুসা। বলল আবার, ‘মি. হাত্তা, আপনি ও ওয়ে এমবা দু’জন ষ্টেনগান নিয়ে দরজায় দাঁড়ান। ওরা রাস্তা ছাড়া অন্য কোন দিক দিয়ে আসতে পারে এবং তাহলে বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করবে। আপনারা তাদের আটকাবেন। আমি ওমর বোংগোকে নিয়ে টিলার গোড়ায় যাচ্ছি।’

বলে আহমদ মুসা তার সামনের মৃত দু’জনের ষ্টেনগান একটি নিজে নিয়ে অন্যটি ওমর বোংগোর হাতে তুলে দিল।

তারপর সবাইকে সালাম দিয়ে রাস্তার দিকে হাঁটতে শুরু করল। রাস্তার মুখে গিয়ে ওমর বোংগো ফিস ফিস করে বলল, ‘স্যার আবার যদি ফাঁদে পড়ি?’

আহমদ মুসা থমকে দাঁড়াল। বলল, ‘ঠিক বলেছো ওমর বোংগো। সাবধান হওয়া ভালো?’

থামল একটু। ভাবল আহমদ মুসা। বলল বোংগোকে, ‘শোন রাস্তার মাঝখানে দিয়ে যাবে না। তুমি যাবে রাস্তার বাম কিনার দিয়ে, আর আমি যাব রাস্তার ডান কিনার দিয়ে। রাস্তার এত কিনারে ফাঁদ পাতা হয় না।’

চলতে শুরু করল ওরা দু’জন।

টিলার গোড়ায় নেমে এল আহমদ মুসা ও ওমর বোংগো। এখানে ছোট-খাট ঝোপ-ঝাড়। বড় গাছ-পালা নেই। এর মধ্যে দিয়ে তারা হামাগুড়ি দিয়ে এগুচ্ছে।

এক জায়গায় এসে ছোট খাট ঝোপ ঝাড়ও শেষ হয়ে গেল।

এরপর সমতল ঘাসে ঢাকা জমি। তবে দু'একটা ছোট-খাট গাছ আছে।

সমতলে নেমে যাওয়া রাস্তার পাশে ঝোপের আড়ালে শুয়ে তাকাল আহমদ মুসারা সামনের দিকে।

এখানে অন্ধকার অনেক ফিকে। আকাশে চাঁদ নেই, কিন্তু মেঘহীন আকাশে তারার মেলা বসেছে। ধীরে ধীরে আহমদ মুসাদের সামনে চারদিকটা স্বচ্ছ হয়ে এল।

আহমদ মুসা দেখতে পেল, 'খুব কাছেই দু'জন লোক পায়চারী করছে এবং অনেকগুলো লোক বসে আছে।'

আরও ভালো করে দেখার চেষ্টা করল আহমদ মুসা। দেখতে পেল, পায়চারীরত দু'জনের হাতে ষ্টেনগান।

তাকিয়ে আছে আহমদ মুসা ওদের দিকে

আরও কিছুটা সময় পার হয়ে গেল।

আহমদ মুসা বুঝতে পারলো না, মাত্র দু'জন দাড়িয়ে আর সবাই বসে কেন? আর বসে থাকা লোকদের আশে-পাশে ষ্টেনগানধারী দু'জনের পায়চারী করার অর্থও বুঝল না আহমদ মুসা।

বিষয়টির দিকে ওমর বোংগোর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, 'এর অর্থ বলতো?'

'স্যার আমাদের জংগলের রীতি অনুসারে মনে হচ্ছে ওরা হয় বন্দী, না হয় পরাজিত ও আত্মসমর্পিত কেউ। আর ষ্টেনগান নিয়ে যারা পাহারা দিচ্ছে তারা ওদের মনিব।' বলল ওমর বোংগো।

ওমর বোংগোর কথা চাবুকের মত ঘা দিয়ে জাগিয়ে তুলল আহমদ মুসাকে। চমকে উঠল সে। হঠাৎ তার মনে হলো, ঐ বসে থাকা লোকরা কি তাহলে সুরিনামের হারিয়ে যাওয়া লোকদেরই কেউ হবে?

কথাটা মনে আসার সাথে সাথে গোটা দেহ শক্ত হয়ে উঠল আহমদ মুসার। অজান্তেই তার তর্জনিটা চলে গেল তার মেশিন রিভলবারের ট্রিগারে।

কিন্তু আহমদ মুসা তর্জনি সরিয়ে নিল ট্রিগার থেকে। সিদ্ধান্ত নিল আরও কিছুটা এগুতে হবে।

চিন্তা করেই আহমদ মুসা ওমর বোংগোকে বলল, 'আড়াল নিয়ে ক্রলিং করে আরও কিছুটা সামনে এগোও।'

ক্রলিং করে শিকারী বাঘের মত নিঃশব্দে এগুতে লাগল আহমদ মুসা। একেতো রাত, তার উপর মাঝে মাঝেই দু'একটা ছোট গাছ, লম্বা ঘাস। ফলে আহমদ মুসারা কারও দৃষ্টি গোচর হলো না।

ষ্টেনগানধারীরা আর মাত্র দশ গজের মত দূরে। আর এভাবে এগুনোর দরকার নেই, ভাবল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা তার মেশিন রিভলবার ডান হাত থেকে বাঁ হাতে নিল এবং পকেট থেকে ছোট রিভলবার ডান হাতে তুলে নিল।

ষ্টেনগানধারী দু'জন তাদের ষ্টেনগান ডান হাতে ঝুলিয়ে পায়চারী করছে। আহমদ মুসার ইচ্ছা এদের জীবন্ত ধরা, হত্যা না করা। এজন্যে এদের সাথে মুখোমুখি লড়াই এড়ানো দরকার। সেটা করতে হলে তাদের নিরস্ত্র করতে হবে।

ওদের ষ্টেনগান ঝুলানো হাত তাক করল আহমদ মুসা। ওদের দু'জনের ডান হাতকে একই সাথে তাক করার জন্য অপেক্ষা করতে হলো তাকে।

পেয়ে গেল এক সময়।

তাক করা রিভলবার থেকে ধীরে সুস্থে দু'টি গুলী ছুড়ল আহমদ মুসা।

ওদের দু'জনের হাত থেকেই ষ্টেনগান খসে পড়ল। ওরা আহত হাত চেপে ধরে গুলীর লক্ষে এদিকে ঘুরে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা ততক্ষণে লাফ দিয়ে উঠে দু'হাতে দুই রিভলবার বাগিয়ে ওদের সামনে হাজির হয়েছে। বলল কঠোর স্বরে, 'দেখ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাক। কোন চালাকির চেষ্টা করো না। একটা করে হাত গেছে, এবার কিন্তু প্রাণটাও যাবে।'

বিস্ময় ও ভয়ে ওদের দু'জনের চোখ বিস্ফোরিত। গোবেচারার মত দাড়িয়ে থাকল ওরা।

আহমদ মুসার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল ওমর বোংগো। আহমদ মুসা তাকে বলল, 'ওমর তুমি ওদের জামা ছিড়ে নিয়ে ওদের হাত ব্যান্ডেজ করে দাও যাতে রক্ত পড়া বন্ধ হয়। তারপর ওদের পিছমোড়া করে বাঁধ।'

ওমর বোংগো কাজে লেগে গেল।

আহমদ মুসা রিভলবার বাগিয়ে পাহারা দিচ্ছিল।

হাত বাঁধা হয়ে গেলে ওদের দু'জনকে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে নির্দেশ দিল আহমদ মুসা।

তারপর আহমদ মুসা বসে থাকা লোকদের দিকে এগুল।

আহমদ মুসাকে ওদিকে যেতে দেখে বসে থাকা লোকদের মধ্য থেকে একজন যুবক বলে উঠল, 'আমাদের বাঁচান স্যার। আমরা নির্দোষ। এরা আমাদের ধরে নিয়ে যাচ্ছিল।'

আহমদ মুসা ওদের কাছে গিয়ে দেখল, 'ওদের প্রত্যেকের দু'হাত বাঁধা। প্রত্যেকের কোমরে দড়ি পেঁচিয়ে একে অপরের সাথে বাঁধা ওরা। এমনভাবে বাঁধা যে, একজন উঠলে সবাইকে উঠতে হবে, আবার একজন বসলে সবাইকে বসতে হবে। চললে সবাইকে সমানতালে চলতে হবে।

আহমদ মুসার যদিও এখন বোঝার বাকি নেই। তবু যুবকটির আবেদনের উত্তরে আহমদ মুসা বলল, 'তোমরা কে? তোমাদেরকে গরু ছাগলের মত বেঁধে এরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?'

'খুব বেশি দূরে নয়, পশ্চিম নিকারী এলাকায় আমাদের বাড়ি। আমাদের বিভিন্ন স্থান থেকে অপহরণ করেছে। কয়দিন যাবত আমাদের খেতে দেয়নি, অকথ্য নির্যাতন করেছে। এখন কোথায় নিয়ে যাচ্ছে জানিনা স্যার।' বলল সেই আগের যুবকটি।

'কেন তোমাদের অপহরণ করেছে?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'আমরা ঠিক জানি না স্যার। বিভিন্ন স্থান থেকে অপহরণ আরও হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, আহমদ হাত্তা নাসুমনকে প্রধানমন্ত্রী হতে দেবে না, এজন্যেই বেছে

বেছে লোক অপহরণ করা হচ্ছে। আহমদ হাত্তা নাসুমনকেও অপহরণ করা হয়েছে। তাকে মেরেই ফেলা হয়েছে বলে মানুষ মনে করছে।' যুবকটি বলল।

'বেছে বেছে কাদেরকে অপহরণ করছে?' বলল আহমদ মুসা।

কথা বলল না যুবকটি।

আহমদ মুসা বুঝল বেছে বেছে মুসলমানদের অপহরণ করছে, একথা বলতে যুবকটি ভয় করছে। তার মানে মুসলিম পরিচয় যুবকটি দিতে চায় না।

আহমদ মুসা বলল, 'বেছে বেছে কি মুসলমানদের অপহরণ করছে?'

'জি স্যার।' নরম ও ভীত কণ্ঠস্বর ছেলেটির।

'তোমার নাম কি?'

যুবকটি এবারও কথা বলল না। একবার মাথা তুলে আবার নিচু করল।

আহমদ মুসা প্রবল একটা খোঁচা খেল বুকে। অবস্থা কোন পর্যায়ে গেলে একজন মানুষ এভাবে তার পরিচয় দিতে ভয় করে! সুরিনামের অবস্থা এই পর্যায়ে গেছে!

আহমদ মুসা ওমর বোংগোর দিকে তাকিয়ে একটি ছুরি তার হাতে দিয়ে বলল, 'ওদের সকলের বাঁধন কেটে দাও।'

সবাই মুক্ত হয়ে গেলে আহমদ মুসা যুবকটির কাছে গেল। বলল, 'আমিও মুসলমান। মুসলিম পরিচয় দিতে ভয় পাচ্ছ কেন?'

যুবকটি কেঁদে ফেলল। বলল, 'ওরা আমাদের উপর নির্যাতন করেছে আর বলেছে, মুসলমান নাম নিতে পারে এমন কাউকে তারা এদেশে রাখবে না।'

আহমদ মুসা যুবকটির পিঠ চাপড়ে বলল, 'আল্লাহ আছেন, আল্লাহর শক্তি সবার চেয়ে বড়। কি নাম তোমার?'

যুবকটি চোখ মুছে বলল, 'হাবিব থিয়াম।'

'খুব সুন্দর নাম।' বলে আহমদ মুসা যুবকটির আরেকবার পিঠ চাপড়ে দিয়ে সবাইকে লক্ষ করে উচ্চ কণ্ঠে বলল, 'আমি আপনাদের একজন ভাই। আপনাদের আর কোন ভয় নেই। যারা আপনাদের বন্দী করে এনেছিল তাদের মধ্যে এই দুইজন ছাড়া সবাই নিহত হয়েছে। আপনারা সবাই টিলার উপরে চলুন। ওখানে একটা বাড়ি আছে।'

কথা শেষ করে আহমদ মুসা ওমর বোংগোকে বলল, ‘তুমি দেখ ওদের লাইটটা কোথায় আছে। ওটা জ্বেলে দাও।’

আহমদ মুসা কথা শেষ করার সাথে সাথে আরেক জন যুবক একটা হ্যাজাক জাতীয় লাইট হাতে তুলে বলল, ‘এই যে লাইট স্যার। জ্বালব?’

‘ধন্যবাদ। জ্বেলে দাও।’ বলল আহমদ মুসা।

মাটিতে উপুড় হয়ে থাকা বন্দী দু’জনের কাছে এল আহমদ মুসা। ওদের টেনে তুলে বসাল সে। তারপর রিভলবার ওদের একজনের দিকে তাক করে বলল, ‘দেখ এক প্রশ্ন আমি দু’বার জিজ্ঞেস করি না। এখন বল, এদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলে?’

দু’জনেই মুখ তুলে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। ভয়ে তাদের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। কিন্তু কথা বলল না তারা।

ওমর বোংগোসহ মুক্তি পাওয়া লোকজন সবাই চারদিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। দেখছে সবাই।

আহমদ মুসার রিভলবারের নল নড়ে উঠল। গর্জন করে উঠল রিভলবার। একটা বুলেট লোকটির কানের ক্ষুদ্র একটা অংশ ছিড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

লোকটি আর্তনাদ করে উঠল। রক্তের একটা ধারা নেমে এল তার আহত কান থেকে।

‘এখন আর্তনাদ করছ। এরপর আর্তনাদ করারও আর অবসর পাবে না। পরের বুলেট তোমার মাথা গুড়ো করে দেবে।’

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই তার রিভলবারের নল ঘুরে এসে স্থির হলো লোকটির কপাল লক্ষে।

‘বলছি স্যার বলছি, আমাকে মারবেন না।’ বলে চিৎকার করে উঠল লোকটি।

‘বল।’ বলল আহমদ মুসা।

লোকটি কেঁদে উঠল। বলল, ‘স্যার আমাদের কোন দোষ নেই। আমরা গায়ানার লোক। মোটা টাকার লোভ দেখিয়ে আমাদের শরীক করেছে।’

‘আমার জিজ্ঞাসার জবাব দাও।’ কঠোর কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

‘স্যার আজ রাতে এদের এখানে রাখা হতো। কাল সকালে এদেরকে এখান থেকে দু’মাইল পশ্চিমে জংগলের গভীরে জনমানবশূন্য ‘সিকিমা’ হ্রদের তীরে নিয়ে যাওয়া হতো। ওখানে ওদের হত্যা করে পাথর বেঁধে পানিতে ডুবিয়ে দেয়া হতো।’

বুকটা কেঁপে উঠল আহমদ মুসার।

চারদিকে দাঁড়িয়ে যারা শুনছে তারাও কেঁপে উঠল। মুখ শুকিয়ে গেল সবার।

‘ওখানে এভাবে এ পর্যন্ত কত লোককে ডুবিয়ে মারা হয়েছে?’ প্রশ্ন করল আহমদ মুসা।

‘স্যার আমরা নতুন। এই প্রথম এই অপারেশনে এসেছি।’ বলল আহত লোকটি।

‘আচ্ছা বলত, যখন মারবেই, তখন এতদূরে এনে কেন?’

লোকটি বলল, ‘আমাদের বলা হয়েছে কোন লাশ কারও চোখে পড়া চলবে না, কোন লাশ যেন কেউ কোন দিনে খুঁজে না পায়।’

‘ধন্যবাদ।’ বলে আহমদ মুসা ওমর বোংগোকে বলল, ‘এর কানে একটা ব্যান্ডেজ বেঁধে দাও।’

ওমর বোংগোর ব্যান্ডেজ বাঁধা হলে টিলায় ওঠার শুরুতে সবার দিকে লক্ষ করে আহমদ মুসা বলল, ‘তোমরা সকলে একবার ‘আল্লাহু আকবার’ ধ্বনি দাও এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো, তোমাদেরকে যেভাবে আজ আল্লাহ বাঁচিয়েছেন, সেভাবে সব মজলুমকে আল্লাহ যেন রক্ষা করেন।’

সংগে সংগেই সম্মিলিত কণ্ঠের ‘আল্লাহু আকবার’ শেস্নাগান রাতের নিরবতাকে ভেঙে খান খান করে দিল।

সবার আগে আলো নিয়ে চলল উমর বোংগো। তার পেছনে সবাই। সবার পেছনে আহমদ মুসা। উঠছে সকলে টিলার উপরে।

# ৭

বেলা ১২টার মধ্যেই আহমদ মুসারা নিও নিকারীতে পৌছে গেল।

ওমর বোংগো ও ওয়ে এমবা তাদেরকে নিও নিকারীতে পৌছে দিল।

ওমর বোংগো ও ওয়ে এমবাসহ সেদিন রাতে উদ্ধার করা ২৫ জনকে আহমদ মুসা পরামর্শ দিয়েছে গ্রামে না থেকে নিও নিকারীতে থাকার জন্যে। কারণ আহমদ মুসা আশংকা করেছে এদিন রাতের এই বিপর্যয়ের খবর শত্রুর কানে পৌছবে। সেক্ষেত্রে রক্ষা পাওয়া লোকদের তারা সন্ধান করবে এবং গোটা ঘটনা জানার তারা চেষ্টা করবে। সুতরাং গ্রামে থাকলে তারা বিপদে পড়বে। আহমদ মুসা পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া বা অন্যকোন ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত তারা ওখানেই থাকবে। ওমর বোংগোদের মত বুদ্ধিমান ছেলেদের প্রয়োজন বলে ওদেরকেও আহমদ মুসা নিও নিকারীতে থাকতে বলেছে। এদের যাবতীয় খরচ বহনের দায়িত্ব নিয়েছে হাত্তা নাসুমন। তার জমিদারী এলাকা টটনস নিও নিকারী থেকে ৮০ মাইলের মধ্যে।

খাওয়া দাওয়া সেরে হোটেলে একটু বিশ্রাম নিয়ে আহমদ মুসা বেরিয়েছিল ট্যুরিষ্ট অফিসে একটা গাড়ি বন্দোবস্তের জন্যে। কিন্তু সেখানে গিয়ে যা শুনল তাতে তার মাথায় রক্ত উঠে এল। ট্যুরিষ্ট ম্যানেজমেন্ট অফিস থেকে তাকে জানানো হলো, সুরিনামের নাগরিক নয় এবং সুরিনামে কোন চাকুরী বা ব্যবসায় কিংবা বৈধভাবে কর্মরত কোন এনজিওর সাথে যুক্ত নয় এমন সকলকে অবিলম্বে সুরিনাম ত্যাগ করতে বলা হয়েছে। বিশেষ করে রাজধানী পারামারিবোতে এমন কাউকে ঢুকতেই দেয়া হবে না। এই ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিশ্চিত করার লক্ষে পারামারিবো পর্যন্ত রাস্তায় অনেকগুলো চেকপোষ্ট বসানো হয়েছে। ট্যুরিষ্ট অফিস থেকে হোটেলে ফেরার পথে এই বিষয় নিয়েই আকাশ পাতাল ভাবছিল আহমদ মুসা। শেষে ভাবল, ট্যাক্সি ক্যাব বা রেন্ট-এ-কার এর একটা গাড়ি যদি হাতে পাওয়া যেত, তাহলে তার ড্রাইভার সেজে হাত্তা নাসুমনকে

আরোহী বানিয়ে পারামারিবো যাওয়া যেত। কিন্তু এমন গাড়ি পাওয়া যাবে কোথায়? হঠাৎ তার খেয়াল হলো ঘণ্টা দেড়েক ধরে এই যে ট্যাক্সি ক্যাব নিয়ে সে ঘুরছে, এর ড্রাইভারকে একটু বাজিয়ে দেখা যায়। কোন সাহায্য সে করতে পারে কিনা। ট্যাক্সি ক্যাবটির ড্রাইভার বুদ্ধিদীপ্ত এক তরুণ যুবক। চেহারা মিশ্র বর্ণের। এ্যাংলো-আফ্রিকান হতে পারে, আবার ইন্দো-আফ্রিকানও। চুল ও মুখের কাঠামো আফ্রিকান, কিন্তু রং ফর্সা এবং চোখ অনেকটা এশিয়ানদের মতো কালো ও টানা।

'তোমার নাম কি ইয়ংম্যান?' আহমদ মুসা জিজ্ঞেস করল ড্রাইভারকে।

'জোয়াও বারনারডো।' বলল ড্রাইভার।

'তোমার গাড়িটা তোমার নিজের, না কোম্পানীর?'

'আমার নিজের।'

'কত দাম গাড়িটার।'

'সেকেন্ড হ্যান্ড, বিশ হাজার গিল্ডার দিয়ে কিনেছি।'

বলেই সে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। প্রশ্ন করল, 'দাম জিজ্ঞেস করছেন কেন স্যার?'

জিজ্ঞাসার জবাব না দিয়ে আহমদ মুসা বলল, 'এই গাড়িটা যদি আমি এখনি কিনতে চাই তাহলে কত দাম নেবে?'

জোয়াও বারনারডো হাসল। বলল, 'আমার সাথে রসিকতা করছেন।'

আহমদ মুসা গম্ভীর হলো। বলল, 'রসিকতা নয়। আমি বিপদে পড়েছি। আমাকে আজ সন্ধ্যার মধ্যে পারামারিবো পৌছতে হবে। কিন্তু আমি বিদেশী ট্যুরিষ্ট বলে সেখানে যাওয়া আমার জন্যে নিষিদ্ধ। এ রকম একটা ট্যাক্সি ক্যাব পেলে আমি পারামারিবো যেতে পারি ট্যাক্সি-ক্যাবের ড্রাইভার সেজে।'

গম্ভীর হলো বারনারডো। বলল, 'বুঝতে পেরেছি স্যার। নতুন গাড়ি নয়, একটা রেজিষ্টার্ড ট্যাক্সি-ক্যাবের ড্রাইভার হওয়া আপনার প্রয়োজন।'

'ঠিক ধরেছো। এখন বল তোমার কথা।' আহমদ মুসা বলল।

'ড্রাইভারের কাগজপত্র তো চেক হতে পারে।'

‘তোমার গাড়ির সাথে তোমার কাগজপত্রও নিয়ে নেব। তোমাকে উপযুক্ত পয়সা দেব, দরকার হলে নতুন কাগজপত্র করে নেবে। অথবা কয়েকদিন পর সব কাগজপত্র তোমাকে ফেরত দিয়ে দেব।’

‘আমার লাইসেন্সে তো আমার ফটো আছে। যদি ধরা পড়ে যান।’

‘এতটা চেক হবে আশা করি না। আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি বারনারডো, তোমার কোন ক্ষতি আমার দ্বারা হবে না।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আপনার পারামারিবো যাওয়া এতটা কেন জরুরী বলুন তো?’ জিজ্ঞেস করল বারনারডো।

‘আগামীকাল সকালের প্লেনে আমার একজন আত্মীয়া আসবেন পারামারিবোতে। আমি তাকে যদি রিসিভ করতে না পারি, সে মহা বিপদে পড়বে। আমি যখন এই এ্যারেঞ্জমেন্টটা করি তখন এখানকার নতুন আইন-কানুন আমার জানা ছিল না। আমি নিউ আমষ্টারডাম হয়ে নিও নিকারীতে এসেছি।’

‘আপনি আপনার আত্মীয়াকে রিসিভ করার পর মানে পারামারিবোতে পৌছার পর তো আপনার গাড়ির কোন প্রয়োজন নেই। তাই তো?’

‘ঠিক তাই।’ বলল আহমদ মুসা।

‘তাহলে এই সামান্য সময়ের জন্যে আপনি এত টাকা খরচ করবেন কেন? এক কাজ করুন। আপনি গাড়ি নিয়ে যান। গাড়ি ফেরত পেলে আপনার টাকা আমি ফেরত দেব। ইতিমধ্যে যে সময় যাবে, তার উপযুক্ত ভাড়া আপনি দিয়ে দেবেন।’ বলল বারনারডো।

খুশি হলো আহমদ মুসা। বলল, ‘ধন্যবাদ বারনারডো। হোটেলে পৌছে তুমি আমাকে গাড়ির চাবি দিয়ে দেবে, আমি তোমাকে দিয়ে দেব ২০ হাজার গিল্ডার।’

‘ঠিক আছে স্যার। আপনি গাড়ি নিয়ে চলে যান। আমি কাল সকালেই পারামারিবো পৌছব। আপনি ইচ্ছা করলে তখন আমাকে গাড়ি দিয়ে দিতে পারবেন, অথবা পরেও দিতে পারবেন।’

‘ধন্যবাদ বারনারডো। তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ থাকবো।’

‘কোথায় আমি দেখা করবো, সেটা আমাকে বলে দিন।’

'কোথায় কোন হোটেলে উঠব, কোন হোটেলে জায়গা পাব এখনও জানি না। তুমি কাল সকাল ৯ টায় এয়ারপোর্টের কারপার্কে আমার সাথে দেখা করবে।'

'ঠিক আছে।'

'ধন্যবাদ বারনারডো।'

'ধন্যবাদ স্যার।'

বারনারডোর গাড়ি ছুটে চলল হোটেলের দিকে।

আহমদ মুসা আহমদ হাত্তা নাসুমনকে সরকারের নতুন আইনের কথা বলতেই উদ্বেগে প্রায় আর্তনাদ করে উঠল। বলল, 'মি. আহমদ মুসা আমার মেয়ের কি হবে। আপনি যদি পারামারিবো পৌছতে না পারেন, তাহলে আমার ফাতিমা এয়ারপোর্টে পৌছেই নির্ঘাত ওদের হাতে পড়ে যাবে। ওয়াং আলীও শেষ হবে। ফাতিমারও সর্বনাশ হবে।'

হতাশা, উদ্বেগে ভেঙে পড়ল হাত্তা নাসুমন।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'মি. হাত্তা আপনি অর্ধেক কথা শুনেছেন। পুরোটা শুনুন।'

বলে আহমদ মুসা ট্যাক্সি ক্যাবের মালিক জোয়াও বারনারডো'র সাথে তার চুক্তির কথা সব বলল এবং জানাল যে, 'টাকা তাকে দিয়ে দিয়েছি, চাবি আমার হাতে, গাড়ি হোটেলের কারপার্কে দাঁড়িয়ে আছে।'

'আল হামদুলিল্লাহ। মি. আহমদ মুসা কি আর বলব। আমি শুধু বলব, আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবি করুন।'

একটু থামল হাত্তা নাসুমন। চিন্তা করল। তারপর বলল, 'ধরে নিলাম ড্রাইভার হিসেবে আপনার কাগজপত্র পুলিশ দেখবে না, কিন্তু আমার পরিচয় কি হবে?'

'আপনার শিখের পোশাক থাকবে না, কিন্তু দাড়ি থাকবে, মাথায় আলগা চুলও থাকবে। একান্তই প্রয়োজন পড়লে আপনার সঠিক পরিচয় দেয়া হবে।'

‘কিন্তু এতে বিপদ ঘটতে পারে।’

‘হ্যাঁ তা পারে। ড্রাইভার হিসেবে আমার ভূঁয়া পরিচয়ও ধরা পড়ে যেতে পারে। তাতেও বিপদ ঘটতে পারে। কিন্তু ঝুঁকি না নিয়ে উপায় নেই। রাতের মধ্যে আমাদেরকে অবশ্যই পারামারিবো পৌছতে হবে।’

‘কিন্তু রাস্তায় যদি বিপদ ঘটে?’ উদ্বিগ্ন কণ্ঠ হাত্তা নাসুমনের।

‘শত বিপদ মাথায় নিয়েই আমাদেরকে পারামারিবো পৌছতে হবে। ফাতিমা নাসুমনকে বিপদে ফেলা যাবে না।’

‘সত্যিই তাই মি. আহমদ মুসা। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন।’ অসহায় কণ্ঠস্বর হাত্তা নাসুমনের।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়ালো। বলল, ‘গোছ-গাছ করে নেয়া যাক। মিনিট পনেরোর মধ্যেই আমরা বেরুব।’

বেলা তখন ৪টা।

আহমদ মুসা ট্যাক্সি ক্যাবের ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল। পাশে তার ব্যাগটি।

পেছনের সিটে উঠল আহমদ হাত্তা নাসুমন।

‘গাড়ি ছাড়ব স্যার?’ বলল আহমদ মুসা হাত্তা নাসুমনকে লক্ষ করে। মুখে তার মিষ্টি হাসি।

‘মি. আহমদ মুসা আমাকে আর লজ্জা দেবেন না। আসুন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আপনার পরিকল্পনাকে সফল করেন।’ বলল হাত্তা নাসুমন বিব্রত কণ্ঠে।

‘আমিন।’ বলল আহমদ মুসা। গাড়ি ষ্টার্ট নিল।

বেরিয়ে এল হোটেলের কার পার্ক থেকে।

ছুটতে শুরু করল গাড়ি।

পরবর্তী বই

# সুরিনামের সংকটে

কৃতজ্ঞতায়ঃ Mahfuzur Rahman

## সাইমুম-৩৩

# সুরিনামের সংকটে

আবুল আসাদ

# ১

নিও নিকারী থেকে একটা মাত্র হাইওয়ে দক্ষিণে বেরিয়ে টটনস ও গ্রোনজা শহর হয়ে গেছে রাজধানী পারামারিবোতে।

আহমদ মূসার গাড়ি বেরিয়ে এল নিও নিকারী শহর থেকে।

শহর থেকে বের হওয়া বিভিন্ন রাস্তা গিয়ে মিশেছে হাইওয়েতে।

আহমদ মূসার গাড়ি গিয়ে সেই হাইয়েওতে প্রবেশ করল।

একজন পুলিশ অফিসার দাঁড়িয়েছিল রাস্তার পাশে। তার কোমরে ঝোলানো রিভলবার এবং তার হাতে একটা দূরবীন।

পুলিশ অফিসারটি রাস্তার পাশ থেকে হাত তুলে আহমদ মূসাকে গাড়ি দাঁড় করাতে বলল।

চেকপোস্ট নয়, অথচ গাড়ি দাঁড় করাতে বলা হোল।

এভাবে গাড়ি দাঁড় করার আদেশ পাওয়ায় বিরক্ত হলো আহমদ মুসা।

গাড়ি দাঁড় করাল।

গাড়ি দাঁড় করাতেই পুলিশ অফিসারটি জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিয়ে বলল, মাফ করবেন, 'আমরা একজন লোক খুঁজছি'।

'কাকে খুঁজছেন?' প্রশ্ন করল ড্রাইভার রূপী আহমদ মুসা।

পুলিশ অফিসারটি একটা ফটো আহমদ মুসার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এই লোকটি।'

ফটোটির দিকে তাকিয়ে আহমদ মুসা চমকে উঠলো। এ যে আহমদ হাত্তা নাসুমনের ফটো।

আহমদ মুসা জিজ্ঞেস করল, লোকটি চোর-ডাকাত, হাইজ্যাকার নাকি?

'না ইনি পলিটিশিয়ান। ফেরার। এখন শোনা যাচ্ছে, সে গোপনে সুরিনামে প্রবেশ করেছে'।

'কোথায় গিয়েছিল সে?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'দেশের বাইরে কোথাও।'

'কি করে জানা গেল সুরিনামে প্রবেশ করেছেন তিনি।'

'সেটা জেনে লাভ নেই। এখন দরকার তাকে পাওয়া। ছবিটা দেখে রাখুন। তাকে পেলে পুলিশে ফোন করবেন।'

বলে লোকটি গাড়ির জানালা থেকে মুখ সরাতে গিয়ে হাত্তা নাসুমনের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল। বলল, 'আপনাকে পরিচিত মনে হচ্ছে'।

পুলিশ অফিসারের কথা শেষ না হতেই আহমদ মুসা সামনের সিটের দরজা খুলে দিয়ে বলল, 'স্যার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলার চাইতে গাড়িতে বসুন। বসে কথা বলুন'।

পুলিশ অফিসারটি উঠে বসল। তার মুখ গম্ভীর। চোখে সন্ধানী দৃষ্টি। আহমদ মুসার পাশের সিটে উঠে বসতে বসতে হাত্তা নাসুমনকে সে বলল, 'আপনার নাম কি?'

'আবুল হাত্তা'। বলল আহমদ হাত্তা নাসুমন।

'আবুল হাত্তা, না আহমদ হাত্তা?

বলেই পুলিশ অফিসারটি পেছনের সিটে বসেই চোখের পলকে তার বাম হাতটা আহমদ হাত্তার দিকে চালনা করে তার দাড়ি ধরে টান দিল। দাড়ি খসে এল তার হাতে। সংগে সংগে চিৎকার করে উঠল পুলিশ অফিসার, 'ও গড, পাওয়া গেছে। ইউরেকা, ইউরেকা'।

আবার পরক্ষণেই চিৎকার থামিয়ে পুলিশ অফিসারটি গম্ভীর কন্ঠে বলে উঠল, ‘গাড়ি থেকে নামুন মি. আহমদ হাত্তা নাসুমন। আপাতত নাম ভাঁড়ানো, ছদ্মবেশ নিয়ে প্রতারণা, ফেরার হওয়া, দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা, ইত্যাদি অভিযোগে আপনাকে আমি গ্রেফতার করলাম’।

বলে গাড়ির দরজা খুলতে গেল পুলিশ অফিসার।

ড্রাইভার রূপী আহমদ মুসা বলল, দরজা লক করে দিয়েছি পুলিশ অফিসার। আপাতত আমরা আপনাকেই এরেস্ট করলাম।

আহমদ মুসার কথা শুনে পুলিশ অফিসার হুংকার দিয়ে আহমদ মুসার দিকে মুখ ঘুরাল। মুখ ঘুরিয়ে দেখল, আহমদ মুসার রিভলবার তার দিকে হা করে তাকিয়ে আছে।

‘একি ড্রাইভার কি করছ তুমি। পুলিশের দিকে তুমি রিভলবার তাক করেছ, এর পরিণতি কি জান?’ ধমকের সুরে কথা কয়টি বলল পুলিশ অফিসার।

‘পরে জানলেও চলবে পুলিশ অফিসার, আপনার রিভলবারটি আমাকে দিন। দেরি করলে আমার প্রথম গুলিটার লক্ষ্য হবে আপনার ডান হাত’। কঠোর কন্ঠে বলল আহমদ মুসা।

পুলিশ অফিসার একবার আহমদ মুসার চোখের দিকে তাকাল। তারপর আস্তে রিভলবারটা বের করে আহমদ মুসার হাতে দিল।

‘ধন্যবাদ পুলিশ অফিসার’। বলে আহমদ মুসা পুলিশের রিভলবার পেছনের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, ‘মি. হাত্তা, আপনি পুলিশ অফিসারের মাথা তাক করে রাখুন। কোন বেয়াদবি করার চেষ্টা করলে তার মাথাটা একেবারে উড়িয়ে দেবেন’।

আহমদ মুসা নিজের হাতের রিভলবারটা স্টিয়ারিং হুইলের সামনের ড্যাশ বোর্ডে রেখে পুলিশ অফিসারের দিকে চেয়ে বলল, মি. পুলিশ অফিসার আপনি মি. হাত্তার যে অপরাধের তালিকা দিলেন, তার মধ্যে তাঁর আসল দোষটাই তো নেই। জানেন দোষটা কি? দোষটা হলো, একুশ তারিখে তিনি তাঁর মনোনয়ন পত্র জমা দেয়ার জন্যে দেশে এসেছেন’।

পুলিশ অফিসারটি মুখ হাঁড়ি করে বসেছিল। সে ভীতও। কোন কথা বলল না সে। তাকাল না সে আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা আবার বলল, ‘মি. পুলিশ অফিসার, আপনি বললেন মি.হাত্তা ফেরার। তিনি কি ফেরার হয়েছিলেন, না তাঁকে কিডন্যাপ করা হয়েছিল? তাঁর মেয়েকে কারা দেশ ছাড়া করেছে পুলিশ অফিসার? কারা তাঁর হবু জামাতাকে পণবন্দী করে রেখেছে? দেশে অপহরণ, কিডন্যাপের সয়লাব সৃষ্টি করেছে কারা? এসব অপরাধ কি মি. হাত্তার?

‘তুমি একজন ড্রাইভার। এসব তুমি জান কেমন করে? বলছ কোন স্বার্থে? মরার জন্যে পাখা উঠেছে বুঝি! চল চেকপোষ্টে, দেখবে, কি ঘটে?’ সাহস দেখিয়ে অপমান-ক্ষুব্ধ কন্ঠে বলল পুলিশ অফিসারটি।

‘ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন মি. পুলিশ অফিসার। চেকপোষ্টগুলোর ঝামেলা এড়াবার জন্যে আপনার সাহায্য আমাদের প্রয়োজন এবং আমরা আশা করি আপনি তা করবেন’। বলল আহমদ মুসা মুখে মৃদু হাসি টেনে।

‘চল দেখা যাবে। ওখানে গিয়ে রিভলবার তোমাদের লুকাতে হবে। তারপর কি ঘটে দেখবে’। পুলিশ অফিসারটি রাগে গরগর করতে করতে বলল।

‘মি. পুলিশ অফিসার, একজন উচ্চ পদস্থ পুলিশ অফিসারের গাড়ি চেকপোস্টে চেক হতে যাবে কেন? দেখবেন, আপনি তা হতে দেবেন না’।

‘পাগলের প্রলাপ থামাও ড্রাইভার’। বলে ভিন্ন দিকে মুখ ঘুরাল পুলিশ অফিসার।

আহমদ মুসার ঠোঁটে মিষ্টি হাসি ফুটে উঠল।

আহমদ মুসা পেছনে না তাকিয়েই আহমদ হাত্তা নাসুমনকে লক্ষ্য করে বলল, ‘মি. হাত্তা, একটু বিশ্রাম করতে চাই। সামনে কোথাও কি আড়াল পাওয়া যাবে?’

আহমদ হাত্তা নাসুমন পুলিশ অফিসারের দিকে তার রিভলবার তাক করেছিল বটে, কিন্তু তার মনে কোন জোর ছিল না। একজন পুলিশ অফিসারকে এভাবে কিডন্যাপ করায় ভীত হয়ে পড়েছে সে। বিষয়টা জানাজানি হবেই। তখন

সাংঘাতিক বিপদে পড়তে হবে তাদেরকে। কিন্তু আহমদ মুসার সিদ্ধান্তের বাইরে তার করার কিছু নেই। সে পুলিশ অফিসারের সাথে আহমদ মুসার কথার কোন অর্থ খুঁজে পাচ্ছেনা। পুলিশ অফিসারকে আহমদ মুসা কি পুতুল মনে করছে! পুলিশ অফিসারের ধমককেই যুক্তি মনে হচ্ছে তার কাছে। আহমদ মুসা না হয়ে অন্য কেউ হলে হাত্তা এসব অর্থহীন কথাবার্তা থামিয়ে দিত ও বাস্তববাদী হতে বলত। কিন্তু আহমদ মুসার ক্ষেত্রে এ ধরনের কিছু ভাবার অবকাশ নেই। আহমদ মুসা কি ভেবে, কোন পরিকল্পনায় কি বলছে তা তার মত লোকদের মাথায় আসার কথা নয়।

আহমদ মুসার কথা আহমদ হাত্তা নাসুমনের চিন্তার সূত্র ছিন্ন করে দিল।

আহমদ মুসার বিশ্রাম নেবার কথা শুনে বিস্মিত হলো হাত্তা নাসুমন। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হলো, নিশ্চয় আহমদ মুসা নতুন কিছু ভাবছে। আহমদ মুসার প্রশ্নের জবাবে বলল সে, 'আধা মাইল সামনে রাস্তার বাম পাশেই একটা বাগান পাওয়া যাবে। বাগানে একটা পুকুরও আছে'।

'ধন্যবাদ মি. হাত্তা। আমাকে দেখিয়ে দেবেন'।

আহমদ মুসা থামল।

সবাই নিরব।

ছুটে চলছে গাড়ি।

রাস্তার বাম পাশে একটা বাগান আহমদ মুসা দেখতে পেল। বলল, 'মি. হাত্তা ওটাই কি আপনার সেই বাগান?'

'হ্যাঁ'। বলল হাত্তা নাসুমন।

হাইওয়ে থেকে একটা মেঠো রাস্তা বাগানে গিয়ে প্রবেশ করেছে।

আহমদ মুসা গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে মেঠো পথ ধরে বাগানে প্রবেশ করল।

বাগানটা ফলের নয়, বনজ। মূল্যবান বনজ গাছে ভরা বাগান। সেই সাথে ঝোপ-ঝাড়ে ভর্তি।

খুশি হলো আহমদ মুসা। এ ধরনের বাগানই তার চাই।

আহমদ মুসা একটা ঘন ঝোপের আড়ালে নিয়ে গাড়ি দাঁড় করাল। বলল, 'মি. হাত্তা আপনি রিভলবারসহ বের হোন'।

বের হলো হাত্তা নাসুমন।

তারপর আহমদ মুসা পুলিশ অফিসারের পাশের দরজা আনলক করে দিয়ে বলল, 'মি. পুলিশ অফিসার আপনি বের হোন'।

চারদিকে তাকাল পুলিশ অফিসার।

তার চোখে-মুখে ভয়ের চিহ্ন দেখা গেল। বলল, 'কেন নামতে হবে এখানে?'

'কাজ না থাকলে এমনি তো আর আসিনি মি. পুলিশ অফিসার। নামুন মি. অফিসার, এক আদেশ আমি দুবার করি না'। আহমদ মুসার কন্ঠ কঠোর শোনাল।

গাড়ি থেকে নামল পুলিশ অফিসার।

ব্যাগ থেকে বেল্ট জাতীয় একটা ভারী জিনিস এবং সেই সাথে রিভলবার হাতে নিয়ে নামল আহমদ মুসা।

গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশ অফিসারটি। তার সামনে উদ্যত রিভলবার হাতে দাড়িয়ে আছে হাত্তা নাসুমন।

আহমদ মুসা গিয়ে পুলিশ অফিসারকে তার জামা খুলতে বলল।

পুলিশ অফিসার ভীত দৃষ্টিতে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। মৃত্যুভয় ফুটে উঠেছে তার চোখে-মুখে।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'ভয় নেই মি. পুলিশ অফিসার, এখানে তোমাকে মারতে নিয়ে আসিনি। দেরি করো না'।

পুলিশ অফিসার জামা খুলে ফেলল।

আহমদ মুসা পুলিশ অফিসারের পেছনে দাড়িয়ে হাতের বেল্টটা তার বুকের উপর দিয়ে পরিয়ে দিল।

পেছনে হুক দিয়ে আটকে দিল বেল্ট।

বেল্ট দেখেই চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে পুলিশ অফিসারের।

'ঠিক অনুমান করেছ পুলিশ অফিসার। তোমার বুকের উপর বেল্টের সাথে আটকানো ওটা বিশেষ ধরনের একটি এক্সপ্লোসিভ বুলেট, ঠিক বোমা নয়।বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে চারদিক ধ্বংস করে দেয়। আর এই এক্সপ্লোসিভ

বুলেটের বিস্ফোরণ চারদিকে ছড়ায় না। বুলেটের মত ভেতরে ঢুকে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটায়। সেই লোকটির ভেতরের সবকিছু শেষ হয়ে যায় কিন্তু বাইরে অক্ষত থাকে। আশে-পাশের লোকদের গায়ে আঁচড় ও লাগেনা'। বলল আহমদ মুসা।

'আমাকে তোমরা এভাবে হত্যা করতে চাইছ কেন?' লোকটির কন্ঠ আর্তনাদ করে উঠল।

'না, আমরা তোমাকে হত্যা করছি না। আমাদের কথা মেনে চললে তোমার কোন ক্ষতি হবে না'। বলল আহমদ মুসা।

'তোমাদের কি কথা?' বলল পুলিশ অফিসার।

'চেকপোস্টগুলোতে যাতে গাড়ি না দাঁড় করাতে হয় সেই ব্যবস্থা তোমাকে করতে হবে'।

কথা শেষ করেই আবার বলল, 'জামাটা এবার পরে নাও পুলিশ অফিসার।

যন্ত্রের মত হুকুম তামিল করল সে।

তারপর পুলিশ অফিসারকে গাড়িতে তুলে দিয়ে হাত্তা নাসুমনকে গাড়িতে উঠতে বলে আহমদ মুসা আবার ড্রাইভিং সিটে বসল।

বসার পর ব্যাগ থেকে সাদা রংয়ের একটা যন্ত্র বের করে স্টিয়ারিং হুইলের বাটে বাঁধল এবং পুলিশ অফিসারকে লক্ষ্য করে বলল, 'এই সাদা যন্ত্রটা আপনার বুকে পাতা 'বিস্ফোরণ বুলেট'টার রিমোট কনট্রোল। সাদা যন্ত্রটায় এই যে লাল বোতাম দেখছেন, এটা ডেটোনেটর। এটায় চাপ দিলেই আপনার বুকে বোমাটার বিস্ফোরণ ঘটবে'।

পুলিশ অফিসারের মুখ রক্তহীন সাদা হয়ে গেল।

'কি আমাদের প্রস্তাবে রাজি তো মি. পুলিশ অফিসার?' বলল আহমদ মুসা।

'ঠিক আছে। কিন্তু জেনে রেখ একজন পুলিশ অফিসারের উপর জুলুম করার ফল ভাল হবে না'। ভীত ও ক্ষুব্ধ কন্ঠে বলল অফিসার।

'মনে রেখ, তোমরা জুলুম করার জন্যে আহমদ হাত্তা নাসুমনকে গ্রেফতার করতে এসেছিলে এবং আরও যে সব জুলুম করেছ, তার কিছু শাস্তি তোমারও পাওনা'।

বলে একটু থেমেই আবার স্মরণ করিয়ে দিল পুলিশ অফিসারকে, মনে রেখ, পুলিশরা গাড়ি চেক করতে আসলেই কিন্তু লাল সুইচে চাপ দিয়ে আমি বিস্ফোরণ ঘটাব'।

'দেখ, পুলিশ গাড়ির দিকে আসার অর্থ গাড়ি সার্চ হওয়া নয়। হঠাৎ আবার লাল বোতামে চাপ দিয়ে বসো না। আমি বলছি গাড়ি সার্চ হবে না'।

বলল পুলিশ অফিসার ভীত কন্ঠে।

'দেখ অফিসার তুমি এমন ব্যবস্থা করবে যাতে গাড়ি না দাঁড় করাতে হয়। আমরা এটা চাই'। আহমদ মুসা বলল।

'ঠিক আছে'। বলল পুলিশ অফিসার।

'ধন্যবাদ মি. পুলিশ অফিসার'। বলে আহমদ মুসা গাড়ি স্টার্ট দিল।

গাড়ি আবার উঠে এল হাই ওয়েতে। ছুটতে লাগল গাড়ি আবার।

সামনেই মধ্য উপকূলের একমাত্র শহর টটনস। টটনস শহরের মুখে একটা চেকপোস্ট।

চেকপোস্টের কাছাকাছি হলো গাড়ি। পুলিশ রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে। দেখা গেল তারা দুটি গাড়ি দাঁড় করিয়ে চেক করছে।ও দুটি গাড়ি চেক শেষ হওয়ার আগেই আহমদ মুসার গাড়ি তাদের বরাবর পৌঁছে গেল।

আহমদ মুসার গাড়িতে বসা পুলিশ অফিসার তার মাথার টুপি ড্যাশ বোর্ডে খুলে রেখেছিল। চেকপোস্টের কাছাকাছি হতেই সে টুপি পরে নিয়েছে।

আহমদ মুসার গাড়ি চেকপোস্টের কাছাকাছি পৌছতেই দুজন পুলিশ আহমদ মুসার গাড়ির দিকে তাকিয়েছিল। একজন পুলিশ অফিসারকে গাড়িতে দেখেই তারা স্যালুট দিল এবং গাড়ি চালিয়ে যেতে ইশারা করল।

আহমদ মুসার গাড়িতে বসা পুলিশ অফিসার হাত তুলে তাদের স্যালুট গ্রহণ করল এবং হাত নেড়ে হাসি মুখে তাদের ধন্যবাদ জানাল।

গাড়ি চেকপোস্ট পেরিয়ে এল।

আহমদ মুসা ধন্যবাদ জানাল পুলিশ অফিসারকে।

তারপর শস্যশ্যামল উপকূল-উপত্যকার পথ ধরে গাড়ি পাড়ি দিল এক দীর্ঘ পথ। দু'ঘন্টা পর গাড়ি পৌছল ট্যুরিস্টদের বড় আকর্ষনীয় উপকূল শহর গ্রোনিনজনে। শহরে ঢোকার পথে কোন চেকপোস্ট নেই। চেকপোস্ট এল শহর থেকে বের হবার পথে। এখানেও গাড়ি দাঁড় করাতে হলো না। গাড়িতে একজন পুলিশ অফিসারকে দেখেই গাড়ি চালিয়ে চলে যেতে ইশারা করল।

গ্রোনিনজন শহরের তিরিশ কিলোমিটার দক্ষিণে রাজধানী পারামারিবো।

রাজধানীর উপকন্ঠে রয়েছে বড় চেকপোস্ট। আহমদ মুসা আশংকা করল এ চেকপোস্টে উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার থাকতে পারে। গাড়ি তারা দাঁড় করাতেও পারে। কিন্তু দাঁড় করাতে হলো না গাড়ি। চেকপোস্টের কাছে এসেই আহমদ মুসাদের পুলিশ অফিসারটি রাস্তার পাশে দাঁড়ানো পুলিশদের উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে স্বাগত জানাল। পুলিশরাও হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করল।

ওঁরা গাড়ি দাঁড় করাতে ইশারা করল না।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল আহমদ মুসা। বলল, 'ধন্যবাদ মি. পুলিশ অফিসার'।

'ধন্যবাদ দিতে হবে না। সামনে আর চেকপোস্ট নেই। এবার দয়া করে আমার বুক থেকে আজরাইলটাকে নামান'। বলল পুলিশ অফিসারটি।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'আপনার ডিউটি অফিসের টেলিফোন নম্বর দিন'।

'কেন?' পুলিশ অফিসারের চোখে-মুখে বিস্ময়।

আমি ওদের সাথে যোগাযোগ করে দিচ্ছি, ওদের সাথে আপনাকে কথা বলতে হবে'। বলল আহমদ মুসা।

'কি কথা?'

'আপনি অফিসকে বলবেন, পারিবারিক জরুরী পরিস্থিতিতে হঠাৎ আপনাকে পারামারিবো আসতে হয়েছে। আরও তিনদিন আপনার ছুটি প্রয়োজন'। আহমদ মুসা বলল।

আমার তো ছুটির প্রয়োজন নেই। আপনারা পারামারিবো পৌঁছে গেছেন, আমি আজই ফিরব'। বলল পুলিশ অফিসার।

'আপনার ছুটির প্রয়োজন নেই, কিন্তু আমাদের আছে'।

'তার অর্থ?' ভ্রু কুঞ্চিত করে বলল পুলিশ অফিসার।

'নির্বাচনের নমিনেশন পেপার সাবমিট হবার পর আগামী ২২ তারিখে আপনি ছাড়া পাবেন। আমরা কোন ঝুঁকি নিতে চাইনা। আহমদ হাত্তা পারামারিবো এসেছেন, এটা শুধু আপনিই জানেন। আপনি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে সবাই এটা জানবে এবং এমন কিছু করা হবে, যাতে মি. হাত্তা নমিনেশন পেপার সাবমিট করতে না পারেন, ভোটে দাঁড়াতে না পারেন'।

'তার মানে আপনারা আমাকে বন্দী করে রাখতে চান'।

'হ্যাঁ একে বন্দী বলতে পারেন'। বলল আহমদ মুসা।

একটু থেমেই আবার বলল আহমদ মুসা, 'বলুন আপনার ডিউটি অফিসের নম্বর বলুন'।

হঠাৎ পুলিশ অফিসারটির চোখেমুখে ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল। বলল একটু সময় নিয়ে, 'মোবাইল আমাকে দিন, আমি টেলিফোন করছি'।

'না। আমি যোগাযোগ করে দেব, আপনি কথা বলবেন। আমি নিশ্চিত হতে চাই, ডিউটি অফিস আপনার কথা জেনেছে'। আহমদ মুসা বলল।

'না জানালেও তো চলে'। বলল পুলিশ অফিসারটি।

'অবশ্যই জানাতে হবে। না হলে একজন পুলিশ অফিসার নিখোঁজ হওয়া নিয়ে দেশব্যাপী হুলস্থুল পড়ে যাবে। আপনাকে রাস্তার চেকপোস্টে পুলিশরা দেখেছে। সুতরাং আমাদের গাড়ি উদ্ধার ও আমাদের ধরার জন্য পুলিশরা হন্যে হয়ে উঠবে'।

পুলিশ অফিসারটি কথা বলল না। তার চোখে-মুখে সেই ভয়ের চিহ্নটা আরও বাড়ল।

আহমদ মুসার মুখ কঠোর হয়ে উঠল। বলল, 'আমাদের সময় নষ্ট করছেন মি. পুলিশ অফিসার। আপনি যদি নাম্বারটা না বলেন, তাহলে পুলিশরা

যাতে কোন দিনই আপনাকে খুঁজে না পায় সেই ব্যবস্থা করব। সে জন্যে ডেটোনেটরের ঐ লাল বোতামটায় একটা চাপ দিতে হবে মাত্র'।

ভয়ে আঁৎকে উঠল পুলিশ অফিসার। বলল ভীত কন্ঠে, 'নাম্বারটা এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে না'।

ভ্রুকুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে তাকাল পুলিশ অফিসারটির দিকে। একটু চিন্তা করল। বলল তারপর, 'আপনি কি তাহলে পুলিশ নন, ভুয়া পুলিশ? এজন্যেই কি আপনার ইউনিফর্মে নেমপ্লেট নেই?'

পুলিশ অফিসারটির মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কথা বলল না।

'আপনার নাম কি?' তীব্র কন্ঠে জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

পুলিশ অফিসারটি আহমদ মুসার দিকে একবার চোখ তুলে তাকাল। তার চোখে-মুখে মৃত্যু ভয়। মুখ আবার নিচু করল। বলল, 'রবার্ট ম্যাকভাল রায়'।

'জন্ম ইউরোপে, না ভারতে?'

'ইউরোপে'।

'আপনাকে কেউ নিয়োগ করেছে, না আপনি নিয়োগকর্তাদের একজন?'

আহমদ মুসার জিজ্ঞাসার কোন জবাব দিল না রবার্ট ম্যাকভাল রায়। আহমদ মুসা আবার জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের কত জন ভূয়া পুলিশ অফিসার এভাবে আহমদ হাত্তাদের বিরুদ্ধে কাজে নেমেছেন?'

এবারও জবাব দিল না রবার্ট রায়।

'মি হাত্তা তাহলে আমরা আর হোটেলে যাচ্ছি না। আপনি পারামারিবোর যে ঠিকানাগুলো আমাকে দিয়েছিলেন, তার এক নম্বর ঠিকানায় আমি যেতে চাই'। পেছনে না তাকিয়েই আহমদ হাত্তা নাসুমনকে উদ্দেশ্য করে বলল আহমদ মুসা।

'কেন ওখানে কেন? হোটেল নয় কেন?' বলল হাত্তা নাসুমন।

'রবার্ট রায়ের ব্যাপারটা আগে সেটেল করতে চাই মি. হাত্তা'। আহমদ মুসা বলল।

এয়ারপোর্ট থেকে জায়গাটা অনেক দূরে হবে। কালকে ফাতেমাকে নিয়ে প্রোগ্রামে কোন অসুবিধা হবে না তো?'

'অবশ্যই না'।

‘ঠিক আছে চলুন। ওখানে কোন অসুবিধা নেই’।

‘এখন তো শহরে ঢুকেছি। রাস্তা বলে দিবেন মি. হাত্তা’। আহমদ মুসা বলল।

‘ঠিক আছে’। বলল হাত্তা নাসুমন।

‘বুঝলেন মি. হাত্তা, এরা আট-ঘাট বেঁধে নেমেছে। বর্ডার সীল করার আরেকটা কারণ দেখা যাচ্ছে আপনাকে ঠেকানো’। আহমদ মুসা বলল।

‘তাই তো মনে হচ্ছে’। হাত্তা নাসুমন বলল।

‘আচ্ছা রবার্ট রায়, আপনাকে একটা সহজ প্রশ্ন করি। আহমদ হাত্তা নাসুমন উদ্ধার পেয়েছেন, সুরিনামে আসছেন, এটা আপনারা জানলেন কি করে?’ রবার্ট রায়ের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল আহমদ মুসা।

রবার্ট রায় নির্বিকার। কোন জবাব দিল না।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘বুঝেছি আপনি এখন নিশ্চিত, আপনার সব কথা না জেনে আপনাকে আমরা হত্যা করব না। অতএব আর কোন কথা নেই আপাতত। ঠিক আছে তাই হোক’।

বলে আহমদ মুসা চুপ করল।

সবাই চুপচাপ।

চলছে গাড়ি।

‘মি. রবার্ট রায় আবার আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেই এক প্রশ্ন আমি দুবার করি না। প্রথমে আপনাকে সেই সহজ প্রশ্নটাই করছি, ‘আহমদ হাত্তা মুক্ত হয়েছেন, সুরিনামে আসছেন, এটা আপনারা কিভাবে জেনেছেন?’ প্রশ্ন করল আহমদ মুসা রবার্ট ম্যাকভাল রায়কে।

রবার্ট রায় বসে আছে আহমদ মুসার সামনে এক চেয়ারে। মাঝখানে একটা টেবিল।

বেশ বড় ঘরটি। আগা-গোড়া কার্পেট মোড়া।

আহমদ মুসাদের পাশেই কিছু দূরে সোফায় বসে আছে আহমদ হাত্তা নাসুমন।

দরজায় দাঁড়িয়ে দুজন লোক। হাতে তাদের কোন অস্ত্র নেই। কিন্তু পকেটে তাদের রিভলবার রয়েছে। এরা হাত্তা নাসুমনের লোক। পার্টি ক্যাডারের সদস্য এরা।

এ বাড়িটাও পার্টির একটি রেস্টহাউজ। সুরিনাম নদীর ধার ঘেষে বাড়িটা। সুরিনাম নদীর ভেতর থেকেই উঠে এসেছে বাড়িটার দক্ষিণের দেয়াল। দক্ষিনের জানালায় দাঁড়ালে সুরিনাম নদীর স্নিগ্ধ বাতাসের পরশ পাওয়া যায়।

যে ঘরটিতে আহমদ মুসা বসে আছে, সে ঘরটিও দক্ষিণের নদী প্রান্তের একটি ঘর।

সুরিনাম নদীর দুপাড় নিয়েই গড়ে উঠেছে পারামারিবো শহর। তবে শহরের মূল অংশ নদীর উত্তর প্রান্তে।

পারামারিবোতে প্রবেশের পর নদীর পাড় বলতে আর কিছুই নেই। নদী-তীরের বাড়িগুলো নদীর পানিতে যেন ভাসছে।

আহমদ মুসার প্রশ্ন শুনে রবার্ট রায় আহমদ মুসার দিকে তাকাল। বোধ হয় আহমদ মুসাকে বুঝতে চেষ্টা করলো। বলল, আমি যতটুকু জানি তা হলো, তার উদ্ধার হওয়ার খবর নাকি সেখানকার কোন কাগজে বের হয়। সেই খবর টেলিফোনে সুরিনামে জানানো হয়'।

'উনি সুরিনামে আসছেন, এটা জানা গেল কি করে?'

রবার্ট রায় একটু ভাবল। তারপর বলল, 'আমি সব কথা জানি না। তবে মনে হয় ব্যাপারটা এরকম যে, তিনি মুক্তি পেলে দ্রুত সুরিনামে চলে আসবেন এটা মনে করাই স্বাভাবিক'।

'আহমদ হাত্তাকে কারা কিডন্যাপ করেছিল, তাদের মধ্যে আপনি ছিলেন?'

'না'।

'কারা ছিল?'

'আমি তাদের চিনি না। ঐ কিডন্যাপের সাথে জড়িত ছিল পারামারিবোর লোকেরা, নিও নিকারীর কেউ ছিল না'।

'আপনাদের নেতাকে তো চিনেন?'

উত্তর দিল না রবার্ট রায়। সে মাথা নিচু করল।

আহমদ মুসা টেবিল থেকে রিভলবারটা হাতে তুলে নিল। বলল, 'প্রথমে হাত যাওয়া পছন্দ করবেন, না কান যাওয়া পছন্দ করবেন?'

রবার্ট রায় মুখ তুলে ভীত দৃষ্টিতে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'বলছি স্যার'।

বলে একটু থামল। তারপর শুরু করল, মাসুস(মায়ের সূর্য সন্তান) নামে একটি সংগঠন আছে। গোটা দেশে হিন্দুদের মধ্যে এই সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছে। এই সংগঠনের নেতা হলেন 'তিলক লাজপত পাল'। তার নির্দেশেই সব কিছু হয়। ইউরোপীয় ও ইন্ডিয়ান কম্যুনিটির রাজনীতি এদেশে তিনিই নিয়ন্ত্রণ করেন'।

'ওর হেড কোয়ার্টার কোথায়?'

'ব্লুমেন্টেইন হ্রদের তীরে ব্রুকোপনডো'তে।

ব্রুকোপনডো'তো একটা বড় শহর। এ শহরের কোথায় তার হেড কোয়ার্টার?'

জবাব দিল না রবার্ট রায়।

'বিরক্ত করবেন না রবার্ট রায়। বার বার রিভলবার নাচাতে আমি পারবো না। যা জিজ্ঞেস করব, সঙ্গে সঙ্গে ঠিক ঠিক তার জবাব দেবেন'। তীব্র কন্ঠে বলল আহমদ মুসা।

চমকে উঠে মুখ তুলল রবার্ট রায়। ভযে চোখ-মুখ তার কুঞ্চিত। বলল, স্যার আমি ব্রুকোপনডো'তে যাইনি। তবে আমি শুনেছি, সেখানে 'শিবাজী কালী মন্দির' নামে একটা মন্দির আছে। সেখানে বা তার পাশেই তিলক লাজপত পালের হেড কোয়ার্টার'।

'গুম, হত্যা, অপহরণ, ইত্যাদি করছে কে? তিলকের লোকরা?'

‘এই কাজে ‘মাসুস’ কে সহযোগিতা করছে ইউরোপীয় ইন্ডিয়ান রাজনৈতিক দল ‘সুরিনাম পিপলস কংগ্রেস পার্টি’।

‘পারামারিবো’তে তিলক লাজপত পালের অফিস বা ঘাঁটিগুলো কোথায়?’

একটু দেরী করে আবার দ্রুত মুখ তুলল এবং বলতে লাগল সে, ‘সুরিনাম ও সাবামাক্কা নামে দুটি কালী মন্দিরে বা তার পাশে তিলকের দুটি অফিস বা ঘাঁটি আছে পারামারিবোতে। আর প্রত্যেক মহল্লায় মাসুস-এর একটা করে ইউনিট আছে। তার অফিসই ‘মাসুস-এর অফিস বলে পরিচিত’।

‘এ মন্দিরগুলো কোথায়?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

দুটি মন্দিরই সুরিনাম নদীর ধারে এবং উত্তর পাশে। নদী পথ ও সড়ক পথ দুপথেই যাওয়া যায়। অধিকাংশ মন্দিরেই মন্দিরের পাশে পুরোহিতদের বাড়ি থাকে।

‘মাসুস-এর অফিস বা ঘাঁটি কি ঐ ধরনের বাড়িতে?’

‘ওয়াং আলীকে ওরা কোথায় রেখেছে?

আমি জানিনা। তবে আমি জানি যে, প্রত্যেক মন্দিরেই বন্দীখানা আছে। এ রকম জায়গায় বন্দী করে রাখা সবচেয়ে নিরাপদ। পুলিশরা মন্দিরকে সাধারণত এড়িয়ে চলে’।

‘আপনি জানেন ওয়াং আলীকে কোথায় রাখা হয়েছে?’ কঠোর কন্ঠে বলল আহমদ মুসা।

রবার্ট রায় মুখ তুলে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। তার মুখে একটা অসহায় ভাব ফুটে উঠল। বলল, ‘সত্যিই আমি জানি না। একদিন আলোচনায় ওয়াং আলীর কথা উঠলে একজন বলেছিল, ওয়াং আলীকে কেউ উদ্ধার করতে পারবে না। পাশেই থানা। থানাও আমাদের। সংকেত পেলেই পুলিশ এসে পড়বে’।

আহমদ মুসার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, ‘মি. রবার্ট রায়, আপনি ‘মাসুস’ এর কোন দায়িত্বে?’

রবার্ট রায় আহমদ মুসার দিকে মুখ তুলে চাইল। তার চোখে ভয়। বলল, ‘আমি কোন দায়িত্বে নেই, নির্বাহী কমিটির সদস্য মাত্র’।

‘নির্বাহী কমিটির সদস্য কয়জন?’

‘দশজন’।

‘মাত্র দশজন?’

‘মহাকালী দশভূজা বলে ‘মায়ের সূর্য সন্তান’দের শীর্ষ কমিটিও দশজন’।

তাহলে তো আপনি অনেক কিছুই জানেন। আপনি মিথ্যা কথা বলছেন যে, আপনি ব্রুকোপনডোতে যান নি’।

‘না স্যার, আমি ব্রুকোপনডোতে যাইনি। ওখানে নির্বাহী কমিটির কোন মিটিং হয় না। ওটা হেড কোয়ার্টার হলেও তিলক লাজপত পাল তার পার্সোনাল স্টাফদের নিয়ে ওখানে থাকেন। বাইরের লোকদের কোন যাতায়াত সেখানে নেই’। বলল রবার্ট রায়।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘ধন্যবাদ মি. রবার্ট রায়’।

আহমদ মুসা যেতে শুরু করলে রবার্ট রায় বলল, ‘স্যার আমাকে আর দরকার আছে? নিও নিকারীতে আমার পরিবার খুব অসুবিধায় আছে’।

‘আগে দেখি আপনার দেয়া তথ্য কতটা সত্য। আমাদের কাজ শেষ হলেই আপনি ছাড়া পাবেন’। আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসা বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তার সাথে সাথে বেরিয়ে এল হাত্তা নাসুমনও।

দুজন গিয়ে বসল আহমদ মুসার কক্ষে।

‘কেমন মনে হলো রবার্টের কথাকে?’ জিজ্ঞেস করল হাত্তা নাসুমন।

‘আমার মনে হয় ও যা বলেছে সত্য বলেছে। তাকে তো ছাড়ছি না। সত্য না বলে যাবে কোথায়’। আহমদ মুসা বলল।

‘এখন কি করণীয়? ওয়াং আলী ঠিক কোথায় আছে তাতো বলতে পারল না’। বলল হাত্তা নাসুমন।

‘যে ঠিকানাগুলো ও দিয়েছে তা যাচাই করার জন্য এখনই আমি বের হচ্ছি। আপনাদের লোকদের বলুন ছোটখাট একটা বোট জোগাড় করতে’।

‘বোট আমাদেরই আছে। কিন্তু এতবড় জার্নি করে আসার পর এখনি আবার বেরুবেন এটা ঠিক নয়’।

‘এখন সময় আমাদের খুব মূল্যবান। আগামী কাল সকালেই ওদের মুখোমুখি হতে হবে। তার আগেই ওদের সম্পর্কে যতটা পারা যায় জানা দরকার।

‘নদী পথে কেন?’

‘পারামারিবোতে ওদের যে দুটো ঘাঁটির সন্ধান রবার্ট দিয়েছে, সে দুটোই নদীর তীরে কালী মন্দির বা তার পাশে। নদী পথে গেলে নদী তীরের কালী মন্দির সহজেই বের করা যাবে’।

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘যাই পোশাক পাল্টে নেই’।

বলে আহমদ মুসা এগুলো ড্রেসিং রুমের দিকে।

‘আমি কি পোশাক পরব?’ বলল আহমদ হাত্তা নাসুমন।

থমকে দাঁড়াল আহমদ মুসা। বলল, ‘আপনি তো এখন বেরুচ্ছেন না’।

‘কেন? তাহলে কে যাবে সাথে?’

‘কেউ নয়। এমন কি বোটও আমিই চালাব’।

হাত্তা নাসুমন যেন আকাশ থেকে পড়ল। চোখে-মুখে এমন বিষ্ময় নিয়ে সে বলল, ‘যে সাংঘাতিক পরিস্থিতি তাতে এ ধরনের কাজে আপনার একা বেরুনো ঠিক নয়। তার উপর আপনি এখানে নতুন’।

‘মি. হাত্তা, অবস্থা সাংঘাতিক বলেই দলে ভারী হয়ে নয়, একা বেরুনো দরকার। আমি বিদেশী ট্যুরিস্ট, শহর দেখতে বেরিয়েছি। সাথে লোক দরকার কি’।

একটু থেমেই আহমদ মুসা আবার বলল, মি. হাত্তা, আপনার জরুরী কাজ আছে। আপনি কি দেশের সব জায়গায় এ মেসেজ দিয়েছেন যে, যাদের ভোটে দাঁড়ানোর কথা সবাইকেই ভোটে দাঁড়াতে হবে। জেল বা হাজতে যারা আছে তাদেরকেও’।

‘ব্যবস্থা করেছি। সকালের মধ্যে সবাই খবার পেয়ে যাবে’। বলল হাত্তা নাসুমন।

‘২১ তারিখে নমিনেশন পেপার সাবমিট হবে, এই তারিখেই বিকালে জনসভার ব্যবস্থা করুন। সে জনসভায় বলে দেবেন আপনাকে কারা কিডন্যাপ করেছিল এবং কিভাবে মার্কিন প্রশাসন আপনাকে উদ্ধার করেছে’।

‘এত তাড়াতাড়ি এই কনফ্রন্টেশনে যাওয়া কি ঠিক হবে?’ বলল হাত্তা নাসুমন।

কনফ্রন্টেশন নয়, প্রকৃত ঘটনা জনগনকে অবহিত করবেন মাত্র। বর্তমান অবস্থায় অবশ্য এটা কিছুটা আক্রমণাত্মক হবে বটে, কিন্তু এটাই হবে আপনাদের সবচেয়ে বড় ডিফেন্স। অত:পর আপনাকে নিরাপত্তা দেয়া হবে সরকারের দায়িত্ব। সরকার যদি আপনাকে গ্রেফতারও করে সেটা হবে আপনার জন্যে লাভজনক।‘ আহমদ মুসা বলল।

‘ওয়াং আলী তো এখনও ওদের হাতে’। হাত্তা নাসুমনের মধ্যে দ্বিধা।

‘একুশ তারিখ বিকেল আসতে এখনও ৪৩ ঘন্টার মত বাকি। আল্লাহর উপর ভরসা করুন’।

বলে আহমদ মুসা ঢুকে গেল ড্রেসিং রুমে।

মিনিট দশেক পর বেরিয়ে এল ইউরোপীয় ট্যুরিস্ট হয়ে। তার হাতে পারামারিবো শহরের ট্যুরিস্ট গাইড।

ইঞ্জিন বোটটা স্টার্ট দেবার আগে আহমদ মুসা শহরের মানচিত্রটার উপর চোখ বুলাল। দেখল, সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেটা শহরের পূর্ব প্রান্তে। এর একটু পূর্বেই সাগর। আটলান্টিকের গর্জন বেশ কানে আসছে। তার মানে তাকে যেতে হবে পশ্চিম দিকে। শহরটির নব্বই ভাগই পশ্চিমে।

বোট স্টার্ট দিল আহমদ মুসা।

বোটটি সুরিনাম নদী ধরে এগিয়ে চলল।

আহমদ মুসার চোখ নদীর ডান পাড়ে, উত্তর পাশে। তার চোখ দুটি সন্ধান করছে কালী মন্দিরের ঐতিহ্যবাহী চূড়া।

সুরিনাম সুন্দর নদী। দেশের দীর্ঘতম এ নদীটি পশ্চিম সুরিনামের ইভার্ট দা মাউন্টেন থেকে বের হয়ে আটলান্টিকে গিয়ে পড়েছে।

নানা বর্ণ ও নানারকম বোটের আনাগোনায় মুখরিত থাকে নদীর বুক। কিন্তু নদীর বুক এখন অনেকটাই শান্ত। রাত বেশ হয়েছে।

সবচেয়ে সুন্দর লাগছে নদীর দুপাশে আদিগন্ত আলোর মেলা। যেন নদীটি পরেছে আকাশী তারার মালা।

মিনিট পনের চলার পর আহমদ মুসা দেখতে পেল একটা মন্দিরের আলোকজ্জ্বল চূড়া। মন্দিরটি নদীর তীর ঘেঁষে।

মন্দিরের একটা ঘাট রয়েছে। বেশ বড় ঘাট। একটা অংশ জেটির আকারে তৈরী।

আহমদ মুসা মানচিত্রে দেখেছে এ মন্দিরের আশে-পাশে কোথাও থানা নেই, থানা আছে সামনের সাবামাক্কা মন্দিরের কাছে। থানা আছে ব্রুকোপনডোর শিবাজী মন্দিরের পাশেও।

মন্দিরটা দেখার জন্যে নামতে ইচ্ছা হলো আহমদ মুসার। কিন্তু পরক্ষণে ভাবল, দ্বিতীয় মন্দিরটাও তার খুঁজে পাওয়া দরকার। সাবামাক্কা মন্দির দেখে এসে ফেরার পথে এ মন্দির দেখা যাবে।

আবার জোরে ছুটতে শুরু করল আহমদ মুসার বোট।

আরও বিশ মিনিট চলার পর অন্য আর একটা মন্দিরের চূড়া দেখতে পেল আহমদ মুসা।

কাছে এসে দেখল এ মন্দিরের ও একটা ঘাট আছে। ঘাটের সাথে জেটিও। জেটিতে একটা মটর বোট বাঁধা।

আহমদ মুসার বোট ধীরে ধীরে পা বাড়াল জেটির দিকে। ইতোমধ্যে আহমদ মুসা মন্দিরের চারদিকে যতটা সম্ভব চোখ বুলাল।

মন্দিরটা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রাচীর ও মন্দির বিল্ডিং এর মাঝখানে কিছুটা ফাঁকা জায়গা আছে আন্দাজ করা যাচ্ছে। মন্দিরের পশ্চিম পাশেই থানাটা। সুরিনামের পতাকা উড়তে দেখেই বুঝল ওটা থানা।

মন্দিরের জেটিতে বোট বেঁধে নামল আহমদ মুসা ঘাটে। এক দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে মন্দিরের চত্বরে পা রাখল সে। মন্দির দক্ষিণ মুখী। মন্দিরের উত্তরের প্রাচীরে আরেকটা বড় গেট আছে। প্রাচীরের বাইরে দিয়ে প্রাচীর ঘেঁষে রাস্তা।

আহমদ মুসা চারদিকটা দেখে ফিরে এল মন্দিরের সম্মুখ চত্বরে।

মন্দিরটা গোল পিরামিড আকৃতির।

মন্দিরে ঢোকার একটাই দরজা।

অনেকগুলো সিঁড়ি ভেঙ্গে সে দরজায় পৌঁছতে হয়। দরজা দুতলা পরিমাণ উঁচুতে।

দরজা পেরুলে বিশ ফুটের মত দীর্ঘ এক করিডোর। করিডোরের পর বিল্ডিং এর ঠিক কেন্দ্রে ডিম্বাকৃতি এক বিশাল হলঘর। হলঘরের চারদিকে অসংখ্য ঘর ও কুঠরী। হলঘরের অবস্থানই বলে দেয় হলঘরের নিচেও রয়েছে অনেক ঘর। আন্ডার গ্রাউন্ড বেজমেন্টেও থাকতে পারে গোপন কুঠরী।

ডিম্বাকৃতি হলঘরের শেষ কৌণিক প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে বিশাল কালী মূর্তি।

কালী মূর্তির সামনে বসেছে কীর্তনের আসর। ধুপের ধোঁয়ায় চারদিক প্লাবিত, বাতাস ভারী।

দুজন পুরোহিত কালী মূর্তির সামনে ধ্যানমগ্ন। আরেকজন পুরোহিত সার্বিক তদারকিতে রয়েছে। সে বসছে, আবার মাঝে মাঝে উঠেও যাচ্ছে।

ট্যুরিস্ট রূপী আহমদ মুসা কীর্তন আসরের একপাশে দাঁড়িয়ে। তার বামদিকে একটু সামনেই কালী মূর্তি। ঠিক তার সামনেই একটু দূরে বসে আছে ধ্যানমগ্ন দুই পুরোহিত। তৃতীয় পুরোহিতও তার সামনে দিয়েই যাওয়া আসা করছে।

একবার পুরোহিতটি উঠে এলে আহমদ মুসা তার দিকে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে বলল, 'মহারাজ, আমি একজন ট্যুরিস্ট। মন্দিরটা আমি ঘুরে ফিরে দেখতে চাই'।

পুরোহিত লোকটি থমকে দাঁড়াল এবং দেখল আহমদ মুসাকে। বলল, 'এইতো দেখছেন, আর কি দেখতে চান?'

'যেখানে যাই, মন্দির আমি দেখি। মন্দিরের নির্মাণ শৈলীর ব্যাপারে আমি খুব আগ্রহী'। বলল আহমদ মুসা।

পুরোহিত আবার তার চোখ স্থির করল আহমদ মুসার দিকে। তারপর মুখ ঘুরিয়ে একটু ভাবল। তারপর বলল, 'হ্যাঁ ট্যুরিস্টরা কেউ কেউ মন্দির এভাবে দেখতে চায়। ঠিক আছে। আজ শনিবার আষাঢ়ের অমাবস্যা, এখনি কীর্তন শেষ হবে। তারপরই শুরু হবে ভৈরবী নৃত্য। ওটা চলবে শেষ রাত পর্যন্ত। নাচ শুরু হলেই আমি আপনাকে ঘুরিয়ে সব দেখাব'।

'অনেক ধন্যবাদ'। বলল আহমদ মুসা।

'নমস্তে'। বলে হাঁটতে শুরু করল পুরোহিত।

আহমদ মুসা ফিরে এল যেখানে সে আগে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে। পনের মিনিট পর শুরু হলো ভৈরবী নৃত্য।

পুরোহিত এসে ডেকে নিয়ে গেল আহমদ মুসাকে।

হল সংলগ্ন বড় একটা ঘরে প্রবেশ করল তারা। ঘরটি বসার ঘর। ঘরে কার্পেট আছে। গোটা ঘর সোফায় সাজানো।

পুরোহিত বলল, 'যে হল ঘর থেকে আমরা এলাম, সেই হলঘরের চারদিকে এই রকমের দু'সারি ঘর আছে। প্রথম সারিতে এই ধরনের কয়েকটা বসার ঘর আছে। প্রথম সারির বাদ বাকি ঘরগুলো বিভিন্ন দেবতা ও মুনি-ঋষির নামে উৎসর্গিত। দ্বিতীয় সারির ঘরগুলো পুরোহিতদের অফিস। এই ঘরগুলোর উপরে অর্থাৎ মন্দিরের তৃতীয় তলায় পুরোহিত ও মেহমানদের আবাসস্থল। আর মন্দিরের চতুর্থ তলা প্রধান পুরোহিতের বাসস্থান। হল রুমের নিচে মন্দিরের প্রথম তলা মন্দিরের সংগ্রহশালা। এই তো আমাদের ছোট্ট এই মন্দিরের বিবরণ'।

পুরোহিত থামতেই আহমদ মুসা চোখে-মুখে দারুন আগ্রহ এনে জিজ্ঞেস করল, 'সংগ্রহশালায় কি আছে?'

পুরোহিতের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। গর্বের ঔজ্জ্বল্য। বলল, 'বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা দেব-দেবীর মূর্তি, মুনি-ঋষিদের মূর্তি, চিত্র,

ভারতের অজন্তার মত মন্দিরের দেয়াল চিত্রের অনুচিত্র, রামকৃষ্ঞ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধীর মত হিন্দু মহাগুরুদের ছবি, বাণী, চিত্র, ইত্যাদি।

'অপূর্ব সংগ্রহশালা। না দেখলেই নয়। সব বাদ দিয়ে এই সংগ্রহ শালাই আমি দেখতে চাই'। বলল আহমদ মুসা এমন ভাব করে যে এই সংগ্রহশালা দেখতে তার দারুণ আগ্রহ।

'রাতে তো এটা দেখানো যাবে না'। বলল পুরোহিত।

'সর্বনাশ। আমি তো ব্যস্ত। আমার তো আর সময় হবে না!' বলল আহমদ মুসা চরম হতাশ কন্ঠে। আহমদ মুসার চিন্তা, যে কোনভাবেই হোক মন্দিরের নিচের অংশটা দেখতে হবে। আহমদ মুসা আরো ভাবল, পুরোহিত তো বেসমেন্ট ফ্লোরের (আন্ডার গ্রাউন্ডের) কথা কিছু বলল না। সে কি এড়িয়ে গেল, না এ ধরনের কোন ফ্লোর এখানে নেই?

আহমদ মুসা হতাশা প্রকাশের পর পুরোহিত ভাবছিল। একটু পরে বলল, ঠিক আছে চলুন। মা দশভূজার পেছন দিক দিয়ে সিঁড়ি। ওদিক দিয়েই নামতে হবে'।

সিঁড়ি দিয়ে নামল তারা গ্রাউন্ড ফ্লোরে।

আলো জ্বালালো পুরোহিত।

গ্রাউন্ড ফ্লোর একটা হলঘর। কিন্তু এত পিলার যে এক নজরে কিছুই দেখা যায় না। তার উপর প্রত্যেক দুই পিলার আবার অর্ধ বৃত্তাকার গাঁথুনি দ্বারা সংযুক্ত। দু' পিলার কার্যতঃ একটা দরজার আকার নিয়েছে। ফলে গোটা হলঘর চার দরজাওয়ালা অনেকগুলো ঘরের সমাহার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সত্যি হলঘরটা দেব-দেবতার মূর্তি, চিত্র ও চিত্রলিপিতে ঠাসা। দেখার মত সংগ্রহ বটে। আহমদ মুসা জিজ্ঞেস করল, 'এত বড় বড় মূর্তি কি করে ঢুকালেন? ঐ সংকীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে?'

পুরোহিত হাসল। বলল, 'নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন বা সামনে দেখবেন হলের বাইরের অংশে মা্ঝে মাঝে স্টিলের দেয়াল। আসলে ওটা দেয়াল নয় দরজা। যার গা তালা দিয়ে লক করা। এরকম মোট চারটা দরজা আছে হলঘরে। এগুলো দিয়েই মূর্তিগুলো আনা হয়েছে'।

অযাচিতভাবে এই তথ্যটি জানতে পেরে দারুণ খুশি হলো আহমদ মুসা।

পুরোহিতের সাথে সে ঘুরে ঘুরে দেখছে বটে, কিন্তু তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে একটাই চিন্তা। এই মন্দিরেই কি ওয়াং আলী বন্দী আছে? পারামারিবো শহরে সুরিনাম নদী তীরের দুই মন্দিরের মধ্যে এ মন্দিরের সাথেই একটা থানা আছে। রবার্ট রায়ের কথা অনুসারে থানা সংলগ্ন এ মন্দিরেই তো ওয়াং আলী থাকার কথা।

ঘুরতে ঘুরতে তারা মেঝের উপর এক বেঢ়প দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। বিল্ডিং এর সাইড ওয়াল থেকে চার ফুট দুরত্বের সমান্তরালে দুটি দেয়াল মেঝের অনেকখানি ভেতরে চলে এসেছে। দু' দেয়ালের মুখে এক বিশাল দরজা।

বেশ দূরত্বে অবস্থিত বেঢ়প এই দরজা আহমদ মুসার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এটা ঘর হওয়ার মত প্রশস্ত নয়, আবার আলমারী হওয়ার মত ছোট নয়। তাহলে কি?

এ সময় আহমদ মুসার কানে একটা চিৎকার ভেসে এল।

উৎকর্ণ হলো আহমদ মুসা। সেই চিৎকার আর তার কানে এল না। কিন্তু একটু পরেই সেই ক্ষীণ চিৎকার ভেসে এল আবার।

উৎকর্ণ আহমদ মুসার মনে হলো বেঢপ ঐ দরজার দিক থেকেই চিৎকারটা ভেসে আসছে।

চমকে উঠল আহমদ মুসা। দরজাটা কি বন্দী সেলের? কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো চিৎকারটা এত কাছের নয়। চিৎকারটা মনে হয় কোন দূরবর্তী স্থান হতে ভেসে আসছে।

চট করে এ সময় আহমদ মুসার মাথায় এল, তাহলে এ দরজাটি কোন সিঁড়ি ঘরের? চিৎকারটা কি সিঁড়ি দিয়ে আন্ডার গ্রাউন্ড থেকে ভেসে আসা কোন শব্দ?

এই কথা মনে হতেই আহমদ মুসার গোটা দেহে উত্তেজনার একটা উষ্ণ স্রোত বয়ে গেল। গোটা সত্ত্বা জুড়ে একটা প্রশ্ন জেগে উঠল, ওয়াং আলী কি এই আন্ডার গ্রাউন্ডে বন্দী আছে?

আহমদ মুসা পুরোহিতের দিকে মুখ ফিরাল। বলল, 'এই বড় দরজাওয়ালা ঘরটি কি জন্যে মহারাজ?'

পুরোহিত চমকে উঠে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। প্রথম দিকের একটা বিব্রতভাব কাটিয়েই সে বলে উঠল, 'এর ভিতরে বিশেষ কিছু মূল্যবান বস্তু রাখা হয়েছে'।

বলেই পুরোহিত চলতে শুরু করল। বলল, 'আসুন দেরি হয়ে যাচ্ছে'।

আহমদ মুসা পকেট থেকে রিভলবার বের করল। রিভলবার পুরোহিতের দিকে তাক করে বলল, 'দাঁড়ান মহারাজ। দরজাটা খুলুন'।

পুরোহিত ঘুরে দাঁড়াল। তার দিকে রিভলবার তাক করা আহমদ মুসাকে দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠল সে।

'দরজা খুলুন মহারাজ'। রিভলবার নাচিয়ে নির্দেশ দিল আহমদ মুসা।

'প্রধান পুরোহিত ছাড়া এ দরজা কেউ খুলতে পারেনা'। ভয়ার্ত কন্ঠে বলল পুরোহিত।

আহমদ মুসা রিভলবারের ট্রিগারে আঙুল চেপে বলল, 'আমার রিভলবারে সাইলেন্সার লাগানো আছে। আপনাকে হত্যা করব, একটুও শব্দ হবে না'।

'আমাকে মেরে ফেললেও আমি দরজা খুলতে পারবো না। এর চাবি থাকে প্রধান পুরোহিতদের কাছে'। বলল পুরোহিতটি কাঁদো কাঁদো কন্ঠে।

আহমদ মুসা তার কথা বিশ্বাস করল। বলল, 'ঠিক আছে তাহলে বল, নিচে কি বন্দী খানা?

পুরোহিত কম্পিত কন্ঠে বলল, হ্যাঁ।

আহমদ মুসা রিভলবার ঘুরিয়ে নিল দরজার দিকে। দরজার কী হোলে তাক করল তার রিভলবারের নল।

এ সময় পুরোহিত বলে উঠল, 'তালা ভাঙলেও আপনি ভেতরে ঢুকতে পারবেন না। দরজার সাথে এ্যালার্ম সংযুক্ত আছে। দরজা খুললেই এলার্ম বেজে উঠবে। ছুটে আসবে মন্দিরের প্রহরীরা নিচে। এক রিভলবার দিয়ে আপনি কিছুই করতে পারবেন না'।

কিন্তু এই ভবিষ্যত ভাবার সময় তার ছিল না।আহমদ মুসা নিশ্চিত যে, এখানেই ওয়াং আলী বন্দী আছে। তাকে উদ্ধার করতেই হবে।

আহমদ মুসা গুলী করল কী হোলে।

কী হোল উড়ে গেল।

খুলে গেল দরজা।

আহমদ মুসা পুরোহিতের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘চল’।

দরজা থেকেই একটা সিঁড়ি নেমে গেছে নিচের দিকে।

পুরোহিত তার দিকে রিভলবার তাক করা আহমদ মুসার কঠোর মুখের দিকে একবার চেয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে শুরু করল।

আহমদ মুসা দরজা বন্ধ করে পুরোহিতের পিছু পিছু সিঁড়ি দিয়ে আন্ডার গ্রাউন্ড ফ্লোরে নামতে শুরু করল।

নিচে সিঁড়ির পরেই বড় গোলাকার একটা হলঘর। হলঘরটিতে অনেকগুলো বড় বড় বাক্স। হলঘরের চারদিক ঘিরে অনেক কক্ষ।

সিঁড়ির সামনে দুটি ঘরের পরের ঘর থেকেই চিৎকার শোনা যাচ্ছে।

আহমদ মুসা পুরোহিতকে নিয়ে সেই ঘরের সামনে এসে হাজির হলো।

‘দরজা খোল মহারাজ’। বলল আহমদ মুসা পুরোহিতকে।

‘স্যার আমার কাছে চাবি নেই। এসব চাবি থাকে প্রধান পুরোহিতের কাছে’। অসহায় কন্ঠে বলল পুরোহিত।

আহমদ মুসাকে আবার রিভলবার ব্যবহার করতে হলো।

দরজার কী হোলে গুলী করে দরজা খুলে ফেলল আহমদ মুসা।

ঘরে ঢুকে দেখল একজন যুবককে উবু করে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে। আহমদ মুসাকে রিভলবার হাতে ঘরে ঢুকতে দেখে যুবকটি আরো জোরে চিৎকার করে উঠল, ‘আমি কিছুই করিনি, আমি কিছুই জানি না। আমাকে আর কষ্ট দেবেন না, মেরে ফেলুন আমাকে’।

যুবকটি খুব ফর্সা। তার চেহারার মধ্যে চীনা বৈশিষ্ট্য আছে, ইউরোপীয় বৈশিষ্ট্যও আছে, আবার রেড ইন্ডিয়ান বৈশিষ্ট্যও আছে।

আহমদ মুসা ভাবল এই-ই ওয়াং আলী।

যুবকটিকে দেখে আহমদ মুসা একটু বেশী এগিয়ে গিয়েছিল। রিভলবার ধরা হাতটাও তার নিচে নেমে এসেছিল। আর পেছনে পড়ে গিয়েছিল পুরোহিত।

পেছনে পড়া পুরোহিতের মুখটা হঠাৎ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। শক্ত হয়ে উঠেছিল তার মুখ।

হঠাৎ তার হাতটা চলে গেল তার গৈরিক চাদরের ভেতরে।

আহমদ মুসা একটু মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'মহারাজ আপনার ছুরিটার খুবই দরকার। ছুরিটা বের করে ওর পায়ের বাঁধন কেটে দিন'।

পুরোহিতের মুখ ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কম্পিত হাতে ছুরি বের করল সে। ঘরের খাটিয়াটা টেনে এনে তার উপর উঠে যুবকটির পায়ের বাঁধন কেটে দিল সে।

যুবকটির দেহ আহমদ মুসা দুহাত দিয়ে ধরে নিল এবং ধীরে ধীরে দাঁড় করাতে লাগল।

আহমদ মুসার মনোযোগ পুরোহিতের দিক থেকে একটু বিচ্ছিন্ন হয়েছিল।

পুরোহিত এরই সুযোগ গ্রহণ করল। ছুরি বাগিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল আহমদ মুসার উপর।

আহমদ মুসার দুহাত তখনও যুবকটিকে ধরে আছে। তাই পুরোহিতকে শেষ মূহুর্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখতে পেয়েও আত্মরক্ষার জন্যে কিছুই করতে পারল না সে। শুধু সেই মূহুর্তে যুবকটিকে নিয়ে সামনের দিকে সে ঝুঁকে গিয়েছিল।

পুরোহিত ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আহমদ মুসার উপর। আহমদ মুসা তার মাথার বাম কানের পাশে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করল।

যুবকটিকে নিয়ে আহমদ মুসা পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু পুরোহিত যা চেয়েছিল সেভাবে আহমদ মুসাকে ছুরি বসিয়ে জাপটে ধরে পড়তে পারেনি। তার ছুরির ফলা লাগে আহমদ মুসার মাথার বাম পাশে। শেষ মূহূর্তে আহমদ মুসা তার দেহটা সামনের দিকে সরিয়ে নেয়ায় পুরোহিতের দেহটা কিছুটা ভারসাম্য হারায়

ও আহমদ মুসার পাশে পড়ে যায়। তবে তার হাতের ছুরিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও আহমদ মুসার মাথার বাম পাশের অনেকটা জায়গা চিরে বেরিয়ে যায়।

আহমদ মুসা পড়ে গিয়েই তার হাত থেকে খসে পড়া রিভলবার কুড়িয়ে নিয়ে রিভলবারের ট্রিগারে হাত চেপেই নিজেকে ঘুরিয়ে নিল পুরোহিতের দিকে। দেখল পুরোহিতের চেহারা হয়ে উঠেছে হিংস্র বাঘের মত। তার হাতের উদ্যত ছুরি ছুটে আসছে তার বুক লক্ষ্য করে।

আহমদ মুসা তার তর্জনি চাপল রিভলবারের ট্রিগারে।

আহমদ মুসার বুক লক্ষ্যে ছুটে আসা পুরোহিতের ছুরি তখন মাঝ পথে।

আহমদ মুসার রিভলবারের গুলি পুরোহিতের ছুরি ধরা ডান হাতের কব্জীতে গিয়ে আঘাত করল।

ছুরি পড়ে গেল তার হাত থেকে।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

বা হাত দিয়ে আহমদ মুসা তার মাথার আহত স্থানটার একটা ধারণা নেয়ার চেষ্ট করল। দেখল ছুরির ফলায় চার ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা চিরে গেছে।

যুবকটিও এ সময় ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ইস, আপনার মাথার আহত জায়গা দিয়ে ভীষণ রক্ত বেরুচ্ছে'।

উপরে এ সময় অনেকগুলো উত্তেজিত কথা-বার্তা ও পায়ের শব্দ শোনা গেল।

আহমদ মুসা বুঝল, দরজা খোলার সংকেত পেয়েই নিশ্চয় ওরা এসেছে। এখনি ওরা নিচে আসবে।

আহমদ মুসা দ্রুত বলল যুবকটিকে, 'তুমি রিভলবার চালাতে জান?'

যুবকটিও উপরের কথাবার্তা ও দৌড়াদৌড়ির শব্দ শুনতে পেয়েছে। ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে তার মুখ। বলল, 'পারব'।

আহমদ মুসা তার পায়ের মোজায় গুঁজে রাখা একটা রিভলবার বের করে যুবকটির হাতে দিল।

তার পর আহমদ মুসা পুরোহিতকে টেনে তুলে দাঁড় করাল। বলল, 'চল আমাদের সাথে'।

আহমদ মুসা তাকে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এল। পেছনে পেছনে এল যুবকটি।

সিঁড়ির গোড়ায় আসতেই আহমদ মুসা সিঁড়ির মুখেই অনেকগুলো পায়ের শব্দ পেল।

এক ঝটকায় আহমদ মুসা পুরোহিতকে টেনে নিয়ে পেছনে সরে এল। পুরোহিতকে যুবকটির দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, 'তুমি এর দিকে নজর রাখ। কোন শয়তানী যেন না করতে পারে'।

যুবকটি পুরোহিতকে টেনে নিয়ে তার দিকে রিভলবার বাগিয়ে সিঁড়ির তলায় গিয়ে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা তার ডান হাতে এম-১০ বাগিয়ে সিঁড়ির গোড়ায় গিয়ে গুঁড়ি মেরে বসল। ঘরের আলোটা সিঁড়ির বিপরীত দিকের প্রান্তে থাকায় সিঁড়ির ছায়া পড়েছে এদিকে। সে কারণে সিঁড়ির গোড়াটা মোটামুটি অন্ধকার।

সিঁড়ি মুখের দরজাটা প্রচন্ড শব্দে খুলে গেল। আহমদ মুসা সিঁড়ি দিয়ে নামার আগে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এসেছিল।

আহমদ মুসা বুঝল, কারও প্রচন্ড লাথিতে দরজাটা খুলে গেছে।

দরজা খুলে যাবার পরই গুলির বৃষ্টি ছুটে এলো সিঁড়ি দিয়ে নিচে।

পায়ের শব্দ পাচ্ছে আহমদ মুসা। অনেকগুলো পায়ের শব্দ। বুঝল, গুলী করতে করতে ওরা নামছে।

যতই ওরা নামছে, গুলি বৃষ্টির গতি সিঁড়ির গোড়া থেকে ততই সরে যাচ্ছে।

এক সময় গুলীর গতি সিঁড়ির গোড়া থেকে আরও সরে গেল এবং অনেকটা মেঝের সমান্তরাল হয়ে উঠল।

আহমদ মুসা বুঝল, ওরা সিঁড়ির মাঝামাঝি অংশে পৌঁছে গেছে।

আহমদ মুসা এম-১০ এর ট্রিগারে তর্জনি চেপে এক ধাপ পরিমাণ সামনে এগিয়ে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল। তার এম-১০ মেশিন রিভলবারের নল তখন সিঁড়ির সমান্তরালে উপরের দিকে।

সিঁড়িতে ওরা তখন চারজন আর সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়েছিল দুজন। আহমদ মুসার আকস্মিক আক্রমণের মুখে ওরা ওদের স্টেনগান আহমদ মুসার দিকে ঘুরিয়ে নিতে পারল না।

আহমদ মুসা তার ভয়ংকর এম-১০ এর ট্রিগার মাত্র কয়েক সেকেন্ড চেপে রেখে সিঁড়ির ঐ লোকদের উপর ঘুরিয়ে নিয়ে এল। ছয়টি দেহ বুলেটের আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে গেল। ঝরে পড়ল সিঁড়ির উপর।

গুলি থামিয়েই আহমদ মুসা ডাকল যুবকটিকে। যুবকটি পুরোহিতকে সঙ্গে করে নিয়ে আহমদ মুসার কাছে এল। আহমদ মুসা পুরোহিতকে সামনে নিয়ে বলল, 'ওঠ সিঁড়ি দিয়ে'।

পুরোহিত গুলিবিদ্ধ তার ডান হাতকে বাঁ হাত দিয়ে চেপে ধরে আছে। সে আহমদ মুসার নির্দেশের সংগে সংগে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগল। আহমদ মুসা তার ঠিক পেছনে। আর যুবকটি আহমদ মুসার পেছনে।

সিঁড়ির মুখের কাছাকাছি গিয়েই আহমদ মুসা তার বাঁ হাত দিয়ে পুরোহিতের গলা পেঁচিয়ে নিজের দেহের সাথে সেঁটে নিয়ে যুবকটিকে নির্দেশ দিল, 'তুমি ঠিক আমার পেছনে থাকবে এবং পেছন দিকটা সামলাবে'।

পুরোহিতকে ঢাল হিসেবে সামনে রেখে আহমদ মুসা উঠে এল সিঁড়ির মাথায়। তার ডান হাতে উদ্যত এম-১০ মেশিন রিভলবার।

সিঁড়ির মাথায় উঠতেই আহমদ মুসা দেখল ওরা আরও চারজন ছুটে আসছে সিঁড়ির মুখের দিকে। ওদেরও হাতে উদ্যত স্টেনগান। কিন্তু গুলি করতে গিয়ে মুহূর্তের জন্যে দ্বিধার সৃষ্টি হয়েছিল তাদের মধ্যে। তারা দেখল, তারা গুলি করলে প্রথমেই মারা পড়ে পুরোহিত।

তাদের এই দ্বিধার সুযোগ নিল আহমদ মুসা। তার এম-১০ রিভলবার এক ঝাঁক গুলি ওদের চারজনকে ছেঁকে ধরল। ওদের চারজনের রক্তাক্ত দেহ ঝরে পড়ল মাটিতে।

দুতলা থেকে নেমে আসা সিঁড়ি দিয়ে আরো দুজন নামছিল। তারা চারজনের এই অবস্থা দেখে ছুটে পালাল সিঁড়ি দিয়ে উপরে।

শোনা যাচ্ছে, উপরে বিরাট হৈ চৈ চলছে।

আহমদ মুসা ভাবল দোতালার পথে প্রধান গেট দিয়ে বেরুনো সম্ভব নয়। মনে পড়ল তার পুরোহিতের কাছে শোনা এ হলঘরের চারটি স্টিলের গেটের কথা।

খুশি হয়ে উঠল আহমদ মুসা। তার বাঁ পাশেই এ হলঘরের দক্ষিণ দেয়াল। এ দেয়ালে খুব সামনেই এ ধরনের একটা গেট।

আহমদ মুসা পুরোহিতকে ঐভাবে সামনে ধরে রেখে পিছু হটে চলল দক্ষিণ দেয়ালের সেই স্টিল গেটের কাছে।

আহমদ মুসা আরও খুশি হলো এই ভেবে যে, এ দেয়ালের পর চত্বরটা। তার পরেই নদী।

বন্ধ স্টিল গেটের সামনে গিয়ে আহমদ মুসা ছেড়ে দিল পুরোহিতকে। সে বিস্মিত হলো, ওরা আর কেউ এ হলঘরে আসছে না কেন? নিহত এই দশজনই কি ওদের সশস্ত্র প্রহরী ছিল, না অন্য কোন পরিকল্পনা?

আহমদ মুসা স্টিলের দরজার কী হোলটা পরীক্ষা করতে করতে পুরোহিতকে জিজ্ঞেস করল, 'মন্দিরে আপনাদের প্রহরী কতজন?'

'চৌদ্দজন। দুজন ছুটিতে'। বলল পুরোহিত।

'এতক্ষণে কি পুলিশ এসে পৌঁছেছে বাইরে?' বলল আহমদ মুসা।

'পুলিশ?' বিস্ময় প্রকাশ করল পুরোহিত।

আহমদ মুসা তার দিকে রিভলবার তাক করে বলল, 'ভনিতা ছাড় মহারাজ। কোন ঘটনা ঘটলে সংগে সংগে পুলিশকে সংকেত দেবার ব্যবস্থা মন্দিরে আছে। আমি জিজ্ঞেস করছি, পুলিশ নিশ্চয় এসেছে। কিন্তু তারা এখানে আসছে না কেন?'

পুরোহিত বেদনায় কুঁকড়ে গিয়ে বিস্মিত চোখে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। আহমদ মুসা ঐ গোপন বিষয়টা কি করে জানল এটাই বোধ হয় তার বিস্ময়ের কারণ। একটু সময় নিয়ে বলল সে, 'পুলিশ উপরের হলরুমে এসে অপেক্ষা করতে পারে, আবার মন্দিরের চত্বরে পজিশন নিতে পারে। আমি ঠিক জানি না'।

আহমদ মুসা যুবকটির দিকে তাকাল। বলল, ‘এই দরজার পরে একটা চত্বর। তার পরেই নদী। নদীর ঘাটে গিয়ে আমাদের নৌকায় উঠতে হবে। আমার পেছন পেছন আসবে। যদি দরকার হয় পেছন দিকটা সামাল দেবে’।

আহমদ মুসা এবার ফিরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে মনোযোগ দিল। গুলি করে তালা ভাঙা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। কিন্তু এ তালা ভাঙার শব্দে শত্রু পক্ষ আমাদের অবস্থান জেনে যাবে এবং আমাদের পরিকল্পনা কি তাও বুঝতে পারবে। কিন্তু গুলি করে তালা ভাঙা ছাড়া কোন উপায়ও নেই।

দরজার কী হোলে রিভলবারের নল ঠেকিয়ে গুলি করল আহমদ মুসা।

খুলে ফেলল দরজা এক ঝটকায়। তার হাতে উদ্যত এম-১০। অন্যদিকে পুরোহিতকে ধরে রেখেছে সামনে।

জায়গাটা মন্দিরের বিশালাকার মূল প্রবেশ সিঁড়ির পাশেই। সোজা এগুলে সিঁড়ির পাশ দিয়ে তারা প্রাচীরের দক্ষিণ দরজায় পৌঁছে যাবে।

আহমদ মুসা সামনে কাউকেই দেখল না। তবে সিঁড়ির উপর দিকে মানুষের হৈ চৈ ও পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। আহমদ মুসা বুঝতে পারল ওরা নিচে শব্দ শুনে আসছে।

পেছনে তাকিয়ে আহমদ মুসা দ্রুত কন্ঠে যুবককে বলল, ‘তুমি সব সময় আমার পেছনে থাকবে’।

বলেই আহমদ মুসা পুরোহিতকে ঠেলে নিয়ে ছুটল সিঁড়ির গোড়া বরাবর।

সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছেই আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়াল। এম-১০ এর ট্রিগারে ছিল তার আঙুল। ঘুরবার সময় ট্রিগারে চেপে বসেছিল তার তর্জনিটা।

বৃষ্টির মত গুলি ছুটে গেল গোটা সিঁড়ি কভার করে উপর দিকে।

সিঁড়ি ধরে নামছিল কয়েকজন পুলিশ ও আরও কয়েকজন মানুষও।

গুলি বৃষ্টি হওয়ার সংগে সংগে পুলিশ ও লোকগুলো সিঁড়ির উপর পড়ে গেল। কয়জন গুলী খেয়ে পড়ল আর কয়জন বাঁচার জন্যে শুয়ে পড়ল তা বুঝল না আহমদ মুসা। বুঝার সময়ও তার নেই।

পুলিশ ও লোকগুলো সব সিঁড়ির উপর পড়ে যেতেই আহমদ মুসা পুরোহিতকে ছেড়ে দিয়ে বাম হাত দিয়ে পকেট থেকে ডিমের মত স্মোক বোমা বের করে ছুঁড়ে মারল সিঁড়ি লক্ষ্যে।

বোমা ফাটার চেয়ে হাল্কা শব্দে স্মোক বোমা বিস্ফোরিত হলো। সংগে সংগে কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে গেল সিঁড়ি ও তার আশ পাশটা।

প্রাচীরের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে যুবককে বলল, 'দৌড় দাও'।

তারপর আহমদ মুসা পুরোহিতকে বলল, 'তুমি এখানে শুয়ে পড়, না হলে গুলীতে মরবে'। বলে সে ছুটল প্রাচীরের দরজার দিকে। তার পেছনে ছুটছে যুবকটি। সিঁড়ির দিক থেকে গুলীর শব্দ হতে লাগল। কিন্তু আন্দাজের উপর ছোঁড়া গুলীর দু'একটা গুলী আশ-পাশ দিয়ে চলে গেল। আহমদ মুসারা নিরাপদে পার হল প্রাচীরের দরজা।

প্রাচীরের পাশের রাস্তা ধরে ছুটে চলল আহমদ মুসা ও যুবকটি। আহমদ মুসার লক্ষ্য ঘাটে বেঁধে রেখে আসা বোট।

বোটে উঠল তারা দুজন।

আহমদ মুসা বসল গিয়ে ড্রাইভিং সিটে। বোট স্টার্ট দিয়ে তার রিভলবার তাক করল জেটিতে বেঁধে রাখা অন্য একটি বোটকে। ট্রিগার টিপল আহমদ মুসা। কয়েকটা গুলী গিয়ে বিদ্ধ করল বোটের ওয়াটার লাইন ঘেঁসে। বোটের গায়ে কয়েকটা গর্তের সৃষ্টি হলো। আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'ওরা ঐ বোটটা নিয়ে পঞ্চাশ গজও এগুতে পারবে না'।

আহমদ মুসার বোট তখন চলতে শুরু করেছে। তারা দেখল তিনজন পুলিশ ও আরও কয়েকজন লোক মন্দিরের দিক থেকে ছুটে এসে জেটিতে বাঁধা সেই বোটে উঠল। স্টার্ট নিয়ে ছুটে চলতে শুরু করল তাদের বোট।

মাত্র কয়েক মিনিট, দূর থেকেই আহমদ মুসারা আলোর আঁকা বাঁকা গতি দেখে বুঝল ঐ বোটে হৈ চৈ শুরু হয়ে গেছে। আলোর গতি বেঁকে গেল। বোট তারা কুলে ভেড়াবার চেষ্টা করছে বুঝল আহমদ মুসারা। কিন্তু পারল না। আলোটা তলিয়ে গেল। তলিয়ে গেল বোট। অনুমান করল আহমদ মুসারা পানিতে হাবুডুবু খাচ্ছে নিশ্চয় ওরা সাত আটজন মানুষ।

আহমদ মুসারা তখন অনেক দূর চলে এসেছে। পুলিশরা বা ওরা নতুন করে বোট জোগাড় করে আবার আহমদ মুসাদের পিছু নেবে সেটা অসম্ভব।

স্বস্তির চিহ্ন ফুটে উঠেছে যুবকটির চোখে মুখে। বলল সে আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, 'ওদের বোট ফুটো করে আসতে হবে এই চিন্তাটা তখন আপনার মাথায় এলো কি করে?'

'দেখ বাঁচার চেষ্টা যখন মানুষের মধ্যে মুখ্য হয়ে উঠে, তখন কত বুদ্ধি বের হয়!' বলল আহমদ মুসা।

'আপনাকে ধন্যবাদ স্যার। আপনি রীতিমত এক যুদ্ধ করেছেন। আমি নিজ চোখে না দেখলে একে মনে হতো এক সিনেমার গল্প। একজন মাত্র লোক এমন অসাধ্য সাধন করতে পারে, তা আমার কাছে এতদিন অবিশ্বাস্য ছিল'। বলল যুবকটি।

আহমদ মুসা কোন জবাব দিল না।

যুবকটিই আবার কথা বলল। বলল সে, 'স্যার আজকের রাতই আমার শেষ রাত ছিল। আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন। কে আপনি স্যার?

যুবকটির প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আহমদ মুসা জিজ্ঞেস করল,

'তুমি কি ওয়াং আলী?'

'জি না। আমি ওভানডো এল টেরেক। আপনি ওয়াং আলীকে চেনেন?' বলল ওভানডো এল টেরেক নামের যুবকটি।

'তুমি চেন?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'চিনি না। ওদের কথাবার্তায় ওয়াং আলীর নাম শুনেছি। উনি তো এখানেই ছিলেন। আজ বিকেলে অন্য কোথাও নিয়ে গেছে'।

'কোথায় নিয়ে গেছে?'

'তা জানতে পারিনি। তবে ওদের কথা থেকে শুনেছি আগামী কাল বিশ তারিখের পর তারা ওয়াং আলীকে হত্যা করবে। কিন্তু আপনি তাকে চেনেন?'

'চিনি না, কিন্তু জানি। তাকে উদ্ধার করার জন্যেই আমার এই ঘোরাঘুরি'।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ তাকে উদ্ধার করতে এসে আমাকে উদ্ধার করলেন'।

‘আমিও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমার অভিযান ব্যর্থ হয়নি। ওয়াং আলীকে উদ্ধার করত না পারলেও তোমাকে উদ্ধার করেছি’।

‘কিন্তু স্যার বিপদ আমার কাটেনি। আজ সন্ধ্যায় ওদের একজনের কাছে শুনলাম, আজই ওরা আমার স্ত্রীকে কিডন্যাপ করবে। তাকে এনে অত্যাচার করে আমাকে কথা বলতে বাধ্য করবে’। ভেঙে পড়া কন্ঠে বলল ওভানডো।

‘তোমাকে কি বলাতে চায়? কি শত্রুতা ওদের সাথে তোমার?’

‘বলল, ‘সে অনেক কথা স্যার। বলছি। কিন্তু তার আগে আপনার মাথার আঘাত থেকে রক্ত বন্ধ করা দরকার’।

উঠে দাঁড়াল ওভানডো।

‘না, ওভানডো বস। রক্ত যা পড়ার তা পড়ে গেছে। এখন তেমন একটা পড়ছে না।এখনই বন্ধ হয়ে যাবে।তুমি বল তোমার কথা’।

ওভানডো বসল আহমদ মুসার কাছাকাছি এসে। বলল, ‘স্যার এই সুরিনাম নদীর মুখে নদীর ঠিক উত্তর উপকুল ঘেঁষে, এই পারামারিবো শহরের পূর্ব প্রান্তে আমাদের পাঁচশ একরের একটা স্টেট আছে। স্টেটের ঠিক মাঝ বরাবর আমাদের বাড়ি। বাড়িটা প্রায় বিলীন হয়ে গেছে সেই দুর্গের মধ্যে। দুর্গকে ‘কাপ্তান দুর্গ’ বলত। সেই হিসেবে আমাদের বাড়িকেও ‘কাপ্তান বা টেরেক বাড়ি’ বলা হয়। ওদের চোখ দুর্গ এলাকার উপর। ওরা আমাদের গোটা স্টেটটাই দ্বিগুন-তিনগুন দাম দিয়ে কিনতে চেয়েছিল। আমরা রাজী হইনি। শেষে ওরা দুর্গ এলাকা কিনতে চায় এবং আমাদেরকে বাড়ি সরিয়ে নিতে বলে। ওরা কয়েক গুন বেশি দামে জায়গাটা কিনবে এবং অন্যত্র বাড়িও তারা তৈরী করে দেবে। কিন্তু এতে আমরা সম্মত হইনি। এটা নিয়েই বিরোধের সূত্রপাত। শেষ পর্যন্ত ওরা আমাকে কিডন্যাপ করেছে। ওরা আমার কাছে দুটি জিনিস জানতে চাচ্ছে। একটি হলো, পরিবারের পুরনো কাগজ পত্রের বাক্সটা কার কাছে, কোথায় আছে? দ্বিতীয়টি হলো, দুর্গ এলাকা বিক্রি করার সম্মতি’।

‘জায়গাটা তোমরা ছাড়ছো না কেন? পুরনো কাগজ পত্রে কি আছে?’

‘ঐ স্টেট-এর সাথে, ঐ দুর্গের সাথে আমাদের শতশত বছরের পারিবারিক ইতিহাস জড়িত। কোন মূল্যেই এটা আমরা কাউকে দিতে পারি না’।

‘আর পারিবারিক পুরনো কাগজ পত্র?’

‘ওটাও আমাদের পরিবারের এক অতি মূল্যবান সম্পদ। ঐ কাগজ পত্রের আমরা অনেক কিছুই বুঝিনা। ব্যবহারিক কোন মূল্যও নেই। তবু আমাদের পরিবার ওটা এতদিন যক্ষের ধনের মত আগলে রেখেছে। কাউকে কোন মূল্যেই আমরা দিতে পারিনা ওটা’।

‘এ সবের জন্য ওরা এমন মরিয়া হয়ে উঠেছে কেন?’

‘আমরা এর রহস্য জানতাম না। কিন্তু ওদের কাছ থেকে একটা কাহিনী শুনেছি। কয়েকদিন আগে চোখ বন্ধ করে মরার মত পড়েছিলাম। দীর্ঘক্ষণ নানারকম নির্যাতন চালাবার পর ওরা বসে জিরিয়ে নিচ্ছিল।ওরা মনে করেছিল আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি। ওরা দুজন গল্প করছিল। ওদের গল্প থেকে জানলাম, দুর্গের কোন এক বিশেষ স্থানে জাহাজ ভরে আনা সোনা পুঁতে রাখা আছে। আমাদের পারিবারিক কাগজপত্রে কোথায় স্বর্ণ রাখা আছে তার সংকেত পাওয়া যাবে’।

‘এ ধরণের গুপ্তধনের কথা তোমার পরিবার জানে না, কিন্তু এরা জানল কি করে?’

‘ওদের গল্পে এ বিষয়েও কিছু জানলাম। ওরা বলল, ত্রিনিদাদের সামনে কোথায় যেন কলম্বাসের জাহাজ বহর হ্যারিকেনের কবলে পড়েছিল। সবাই জানে সে হ্যারিকেনে বিশটি জাহাজ ডুবে যায়, কিন্তু আসলে ডুবে উনিশটি। একটি জাহাজ ক্যাপ্টেনের অদ্ভূত দক্ষতায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও বেঁচে যায়। কিন্তু হ্যারিকেন তাড়িত হয়ে চলে আসে সুরিনাম উপকুলে। ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজ ডুবে যাবার আগেই জাহাজের ক্যাপ্টেন আরহমেন এল টেরেক জাহাজ বোঝাই সোনা কূলে নামিয়ে নেয়’।

‘শুনতে রূপকথার মত লাগল। সোনা পাগল ইউরোপীয়দের এমন হাজারো গল্প আছে। আবার হতে পারে এটা সত্য ঘটনা’।

‘আপনি ঠিকই বলেছেন। আমার কাছেও একে রূপ কথার মত মনে হয়েছে। ইউরোপের কথা বলছেন কেন, সোনা নিয়ে লাখো কাহিনী আছে আমাদের আমেরিকাতেও’।

‘আর সে গল্পের অনুসরণে সোনা খুঁজতে গিয়ে কত লোক যে কতভাবে হারিয়ে গেছে তার ইয়াত্তা নেই’।

‘যেমন আমরা ওদের সোনা খোঁজার পাল্লায় পড়ে সব হারাতে বসেছি’।

কথা বলেই ওভানডো দ্রুত চোখ তুলে আহমদ মুসার দিকে তাকাল এবং দ্রুত কন্ঠেই বলল, স্যার আমার ওয়াইফকে কিডন্যাপ করতে ওদের আজ যাওয়ার কথা, যদি গিয়ে থাকে!’ ওভানডো’র কথায় যেন কান্না ঝরে পড়ল।

আহমদ মুসা বোটের স্পিড বাড়িয়ে দিল। বলল, ‘আল্লাহ ভরসা ওভানডো। চল দেখা যাক। কিডন্যাপ করলে ওরা ওকে কোথায় নিয়ে যাবে?’

‘আমি যেখানে বন্দী ছিলাম সেখানে আমার কাছে ওঁকে নিয়ে যাবার কথা’।

‘আচ্ছা চল দেখা যাক’।

বলে আহমদ মুসা আবার সামনের দিকে মনোযোগ দিল।

ওভানডো বলে উঠল, ‘স্যার, আপনি আমার বাসায় যাবেন?’

‘কেন, আমাকে নিয়ে যাবার ইচ্ছা নেই?’

‘আছে বলেই জিজ্ঞেস করছি স্যার। আমার মা, আমার দাদী আপনাকে পেলে খুব খুশী হবে’।

‘তোমার দাদী আছে? কত বয়স?’

‘একশ পাঁচ’।

‘তাহলে বিরাট বহুদর্শী তো তিনি। আর কে আছে তোমার?’

‘আব্বার কথা বলছেন তো? তিনি নেই’।

‘স্যরি’। বলল আহমদ মুসা।

কোন উত্তর দিল না ওভানডো।

আহমদ মুসার দৃষ্টি সামনে নিবদ্ধ।

সবটুকু শক্তি দিয়ে এগিয়ে চলেছে বোট।

# ২

ওভানডো এল টেরেকের স্টেটে প্রবেশ করল ওভানডোদের গাড়ি। ড্রাইভ করছিল আহমদ মুসা।

স্টেটের মাঝখানে ওভানডোদের বাড়ি। বাড়ির চারদিকে স্টেট জুড়ে বাগান ও ফসলের ক্ষেত। মাঝে মাঝে জংগালাকীর্ণ টিলা।

নদীর তীর থেকে একটা প্রশস্ত পাথুরে রাস্তা স্টেটের গেট পেরিয়ে স্টেটের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেছে বাড়ির দিকে।

পাথুরে রাস্তার দুধারে ফসলের ক্ষেত। দু একটা টিলাকেও অতিক্রম করতে হয়েছে রাস্তাকে।

স্টেটের উত্তর ও পশ্চিম অংশে বাগান।

গোটা স্টেটটাই প্রাচীর দিয়ে ঘেরা।

স্টেটের রাস্তা দিয়ে বাড়িতে পৌঁছার মাঝামাঝি পথে এসেছে আহমদ মুসার গাড়ি।

আহমদ মুসা দেখল ওভানডোর বাড়ির দিক থেকে চারটি হেডলাইট দ্রুত এগিয়ে আসছে।

'তোমাদের কয়টি গাড়ি ওভানডো?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'দুটো গাড়ি। এই একটা আর বাড়িতে আছে একটা'। বলল ওভানডো।

'তাহলে এত রাতে তোমাদের বাড়ি থেকে দুটো গাড়ি একসাথে বেরিয় আসছে কেন?' প্রশ্ন আহমদ মুসার।

'আমিও তাই ভাবছি? তাহলে কি.....?'

কথা শেষ না করেই থেমে গেল ওভানডো। তার কন্ঠে ঝরে পড়ল উদ্বেগ।

'তোমার আশংকা মনে হয় ঠিক ওভানডো'।

বলেই আহমদ মুসা তার গাড়ি রাস্তার ঠিক মাঝ বরাবর নিয়ে এগিয়ে চলল।

রাস্তা প্রশস্ত হলেও পাশাপাশি দুটি গাড়ি চলার মত পথ।

আহমদ মুসার গাড়ি রাস্তার মাঝখানে আসায় তার গাড়ি পাশ কাটিয়ে যাবার আর পথ থাকলো না।

রাস্তার দুপাশেই ধানের ক্ষেত। ক্ষেত রাস্তা থেকে নিচু এবং তাতে পানি রয়েছে।

'ওভানডো গাড়ি দুটির গতি দেখে মনে হচ্ছে শত্রু পক্ষেরই। মনে হয় মিশন শেষ করে পালাচ্ছে'। আহমদ মুসা বলল।

'তাহলে কিডন্যাপ করেছে ওরা আমার স্ত্রীকে?' প্রায় আর্তনাদ করে উঠল ওভানডোর কন্ঠ।

'ওভানডো দুর্বল হয়ে পড়ার সময় এটা নয়'।

বলে আহমদ মুসা তার গাড়ি ডেড স্টপ করার মত থামিয়ে দিল।

ঝোঁক সামলাতে না পেরে ওভানডো ড্যাশ বোর্ডের উপর মুখ থুবড়ে পড়তে যাচ্ছিল। আহমদ মুসা বাঁ হাত দিয়ে তাকে আটকে দিল।

সোজা হয়ে বসে ওভানডো বলল, 'গাড়ি থামিয়ে দিলেন যে'।

'থামিয়ে দেইনি। বলতে হবে আমাদের গাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে'। আহমদ মুসা বলল।

'তাতে কি হবে?' জিজ্ঞেস করল ওভানডো। তার কন্ঠে বিস্ময়।

'আমাদের গাড়ির পাশ কাটিয়ে ওরা যেতে পারবে না। থামাতে বাধ্য হবে ওদের গাড়ি। তারপর দেখবে কি ঘটে'। আহমদ মুসা বলল।

সামনের দুটি গাড়ি একদম কাছে চলে এসেছে। সাইড দেবার জন্যে অবিরাম হর্ন দিচ্ছে।

আহমদ মুসা তার রিভলবারটা কোটের বাম পকেটে রেখে ডান হাতে নিল এম-১০ মাইক্রো মেশিন গান। বলল ওভানডোকে, 'তুমি গাড়িতেই বসে থাকবে। গোলাগুলী শুরু হলে তখন তুমি গাড়ির মেঝেয় শুয়ে পড়বে'।

আহমদ মুসা গাড়ি থেকে নামার সময় ওভানডো বলল, 'আমার কাছেও রিভলবার আছে। আমিও নামতে পারি'।

'তোমার পরিবারের কেউ যদি ওদের গাড়িতে থাকে, তাহলে আমাদের পক্ষ থেকে গুলী-গোলায় সাবধান হতে হবে। আপাততঃ গাড়িতেই থাক'।

আহমদ মুসা নামল গাড়ি থেকে। তারপর দ্রুত এগিয়ে গাড়ির সামনের ঢাকনা তুলে ফেলল। একটু ঝুঁকে পড়ে গাড়ির ইঞ্জিনের এটা ওটা পরীক্ষা করতে লাগল। যেন খারাপ গাড়ি সারাবার চেষ্টা করছে সে।

বাম হাত দিয়ে ইঞ্জিনের এটা ওটা দেখলেও তার কান সতর্ক এবং ডান হাতে তার এম-১০ প্রস্তুত।

ওদের দু গাড়ি এসে আহমদ মুসার গাড়ির পাঁচ ছয় গজ সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

গাড়ি দাঁড় করিয়েই দু গাড়ি থেকে চার পাঁচজন এক সাথে নেমে পড়ল। প্রায় সমস্বরে চিৎকার করে উঠল। অকথ্য গালি দিয়ে তারা বলে উঠল, 'শুয়োরের বাচ্চা গাড়ি সরা'।

আহমদ মুসা সোজা হয়ে দাঁড়াল। নরম কন্ঠে বলল, 'কি করব স্যার, হঠাৎ গাড়ি খারাপ হয়ে গেল'।

'কি করবি, গাড়ি ঠেলে ফেলে দে নিচে'। ওদের একজন চিৎকার করে বলল।

'স্যার একটু অপেক্ষা করুন। আমি 'কাপ্তান বাড়ি' থেকে এক খন্ড তার নিয়ে আসি। তাহলেই গাড়ি ঠিক হয়ে যাবে'। আহমদ মুসার কন্ঠে অনুনয়ের সুর।

আরও দুজন ওদের গাড়ি থেকে নামল। ওরা এক সাথে চিৎকার করে উঠল, 'এক মুহূর্তও সময় দেবনা। ঠেলে ফেলে দাও গাড়ি নিচে'।

'স্যার, কাপ্তান বাড়ির একজন সম্মানিত মেহমান আছে গাড়িতে'। আহমদ মুসার অসহায় সুর।

'শালা আবার কথা বলে। জাহান্নামে যাক কাপ্তান বাড়ির মেহমান। শালা সরা গাড়ি। না হলে গুলী খাবি কিন্তু'। বলল ওদের একজন চিৎকার করে।

‘আমি তো একা গাড়ি ঠেলে ফেলতে পারবো না স্যার। ফেললে তুলতে পারবো না। আপনারা একটু রহম করুন স্যার। আপনারাও তো কাপ্তান বাড়ি থেকেই এলেন’। আহমদ মুসা যেন ওদের বুঝাবার জন্য মরিয়া।

‘হ্যাঁ এলাম। আমরা কাপ্তান বাড়ির মাথায় বাড়ি মেরে এলাম। একটু কান পেতে শোন, ও বাড়ির কান্না শুনতে পাবি। আমরা ওদের ধ্বংস করতে চাই’।

বলেই লোকটি ওদের সবাইকে আহবান করে বলল, ‘এসো তোমরা সবাই। ও শালাকে দিয়ে হবে না। আমরা গাড়ি ফেলে দিয়ে পথ পরিষ্কার করি।

ওর সবাই এগিয়ে আসছে আহমদ মুসার গাড়ির দিকে।

দু’পক্ষের গাড়ির মাঝের ফাঁকা জায়গাটায় ওরা এসে পৌঁছেছে। সাতজন ওরা।

আহমদ মুসার ডান হাত বিদ্যুত বেগে বেরিয়ে এল তার কোটের আড়াল থেকে। তার তর্জনি ছিল এম-১০ এর ট্রিগারেই। শুধু তর্জনি চেপে ধরল সে ট্রিগারটায়। আর ঘুরিয়ে নিল এম ১০এর নল ওদের উপর দিয়ে।

আহমদ মুসার এম-১০ এর নল থেকে তখনও ধোঁয়া বেরুচ্ছিল। এ সময় দেখতে পেল সামনের কারটির এদিকের দরজা আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে। একজন লোক আধখোলা দরজার ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। তার হাতে তাক করা রিভলবার। সে মাটিতে পড়ার সাথে সাথেই তার রিভলবার থেকে গুলি বেরিয়ে আসত। কিন্তু আহমদ মুসা প্রস্তুত ছিল তার আগে থেকেই। তার এম ১০-এর এক ঝাঁক গুলি গিয়ে দরজা ও লোকটিকে আঘাত করল। গুলীর ধাক্কায় দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় লোকটির গোটা দেহই চলে এল আহমদ মুসার এম-১০ এর আওতায়। গুলীর ঝাঁক লোকটিকে একেবারে ভর্তা করে ফেলল।

এম ১০ বাগিয়েই আহমদ মুসা ছুটল গাড়ি দুটির দিকে।

কিন্তু সামনের গাড়িতে কাউকে দেখল না। পেছনের গাড়িতে লোকটির লাশ যেখানে পড়েছিল, সেই দরজার জানালা দিয়ে আহমদ মুসা দেখল একজন মেয়ে মুখ বাঁধা অবস্থায় পেছনের সিটে বসে আছে।

মেয়েটিকে দেখেই আহমদ মুসা মুখ ফিরিয়ে ডাকল, ‘ওভানডো বেরোও গাড়ি থেকে, এদিকে এসো’।

ছুটে এল ওভানডো।

আহমদ মুসা গাড়ির দরজা আগেই খুলে ফেলেছিল। ওভানডো দরজা দিয়ে একবার তাকিয়ে ঢুকে গেল ভেতরে। মুখের বাঁধন খুলে ফেলল মেয়েটির। বলল দ্রুত কন্ঠে, 'জ্যাকি তুমি ঠিক আছ তো?'

ঢুকরে কেঁদে উঠল মেয়েটি। ঝাঁপিয়ে পড়ল ওভানডোর বুকে।

ওভানডো মেয়েটির পিঠ চাপড়ে বলল, 'আর ভয় নেই জ্যাকি। আমি ফিরে আসতে পেরেছি, তুমি মুক্ত হয়েছ'।

ওভানডো মেয়েটিকে গাড়ি থেকে বের করে আনল।

এখান থেকে ওভানডোর বাড়ি বেশি দুরে নয়।

সেদিকে তাকিয়ে ওভানডো চিৎকার করে ডাকল, 'জন, আলফ্রেড, দিয়েগো'।

তার ডাকার সাথে সাথেই ওদিকের অন্ধকার থেকে কয়েকটি টর্চ জ্বলে উঠল এবং কয়েকটি কন্ঠ চিৎকার করে উঠল, 'আমরা আছি, আমরা আসছি'।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ছুটে এল পাঁচজন লোক।

পাঁচজনের মধ্যে রয়েছে একজন তরুণী। সে এসেই কেঁদে উঠে জড়িয়ে ধরল ওভানডোকে।

ওভানডো তাকে সান্ত্বনা দিয়ে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে তরুণীটিকে দেখিয়ে বলল, 'এ আমার ছোট বোন লিসা টেরেক'।

আহমদ মুসা হাতের এম-১০ মেশিন রিভলবার কোটের নিচে শোল্ডার হোলস্টারে রাখতে রাখতে তরুণীটিকে স্নেহের স্বরে বলল, 'কান্না কেন? ভাইকে ফিরে পেয়েছ, এখন হাসতে হবে'।

'শুধু ভাইকে নয় ভাবীকেও ফিরে পেয়েছ'। বলল ওভানডো।

তরুণীটি সংগে সংগেই ওভানডোর পেছন দিকে তাকিয়ে ছুটে গেল। জড়িয়ে ধরল ভাবীকে।

'ও! আমি ভূলে গিয়েছিলাম। তাহলে আনন্দ তো ডবল'।

বলে থামল আহমদ মুসা। অন্যান্য যারা এসেছে তাদের দিকে তাকাল।

ওভানডো বলল, 'ওরা সবাই আমাদের স্টেটের কর্মচারী'।

একজন মাঝবয়সীকে দেখিয়ে বলল, ‘ইনি আমাদের স্টেটের ম্যানেজার’।

ওভানডো থামতেই আহমদ মুসা বলল, ‘ওভানডো তোমার এখানে কোন কাজ নেই। তুমি ম্যাডামকে নিয়ে বাড়িতে যাও’।

‘আপনিও চলুন’। বলল ওভানডো।

‘কথা বলো না। তুমি যাও। এদিকের কাজ সেরে ওদের নিয়ে আমি আসছি’। আহমদ মুসা বলল।

‘এখানে তো আর কোন কাজ নেই’। বলল ওভানডো।

‘ওভানডো আমি এদের আটজন এবং গাড়ি দুটো সার্চ করে দেখব। তারপর লাশগুলো ও গাড়ির ব্যবস্থা করে আমি আসছি’। আহমদ মুসা বলল।

‘লাশগুলোর ব্যবস্থা কি? ম্যানেজার পুলিশকে খবর দিলেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে’। বলল ওভানডো।

‘আমি মনে করি পুলিশ জটিলতার সৃষ্টি করবে। যারা এই ঘটনা ঘটাল, সেই গ্রুপের সাথে বর্তমান সরকারের গভীর সম্পর্ক আছে এবং সেই সুত্রে পুলিশও এদের কথাই শুনবে’। আহমদ মুসা বলল।

উদ্বিগ্ন দেখাল ওভানডোকে। একটু চিন্তা করে বলল, ‘ঠিকই বলেছেন আপনি। আমি বন্দী থাকাকালে ওদের মুখে এ ধরনের কথাই শুনেছি। গতকাল বিকেলেও ওরা আমাকে বলেছে, সরকারও আমাদের, পুলিশও আমাদের। কারও সাহায্য তোমরা পাবে না’।

বলে একটু চিন্তা করে ওভানডো বলল, ‘তাহলে আপনি কি করতে চান?’

‘গাড়িতে তুলে তোমার লোকরা লাশগুলো নদীতে ফেলে দিয়ে আসবে। অল্পক্ষণেই ওগুলো চলে যাবে সাগরে’। আহমদ মুসা বলল।

‘ঠিক আছে আপনি তাই করুন। কিন্তু তাড়াতাড়ি চলে আসুন আপনি’।

বলে বোন লিসাকে নিয়ে স্ত্রী জ্যাকির হাত ধরে বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল ওভানডো।

ওভানডোর শোবার ঘরে ওভানডো, তার স্ত্রী জ্যাকুলিন, তার মা ও দাদী বসে গল্প করছিল। ঘরে প্রবেশ করল ওভানডোর ছোট বোন লিসা টেরেক। বলল, 'সাতটা বাজে ভাইয়া। তোমার মেহমানকে তো ডাকতে হবে সাড়ে ৭টায়'।

'এই তো ঘুমালো সাড়ে চারটায়, সাড়ে ৭টায় উঠবে কি করে?' বলল ওভানডোর মা।

'কিন্তু উনি বার বার বলেছেন সাড়ে ৭টায় ওঁকে উঠতে হবে'।

জোর দিয়ে বলল লিসা টেরেক।

'ওঁর চেয়ে দেখি তোমার গরজ বেশি'।

মুখ লাল হয়ে উঠল লিসার।

লিসার বয়স ২০ বছরের মত হবে। পারামারিবো স্টেট ইউনিভার্সিটিতে পড়ে।

লিসা নিজেকে সামলে নিয়ে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। বলল, ভাবী, মাত্র ঘন্টা দুয়েকের কথা-বার্তায় আমরা সবাই দেখেছি উনি কথা কম বলেন। কিন্তু যা বলেন, তার মধ্যে কথার কথা থাকেনা'।

'তুমি এত খেয়াল করেছ লিসা?' বলল তার ভাবী জ্যাকি।

মুখ লাল করে কিছু বলতে যাচ্ছিল লিসা। তার মা তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'ছেলেটার মাথা কিন্তু সাংঘাতিক আহত হয়েছে। নিশ্চয় অনেক রক্ত পড়েছে'।

'হ্যাঁ মা, গোটা পথই রক্ত পড়েছে। আমি একবার কাপড় দিয়ে বেঁধে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তিনি রাজী হননি। বলেছিলেন, রক্ত পড়া কমে গেছে, এমনিতেই বন্ধ হয়ে যাবে। অদ্ভূত লোক মা, মাথায় অতবড় আঘাত পেয়েছে, তার কথা বার্তা ও আচার আচরণে কখনও তা মনেই হয়নি'। বলল ওভানডো।

'ও মানুষ নয় বেটা। ও নিশ্চয় কোন দেবদূত। তোমার কাছে ও বৌমার কাছে যা শুনলাম, যেভাবে তোমাকে ও জ্যাকিকে সে উদ্ধার করেছে, তা কোন একজন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। ভেবে দেখো এই রাতে আঠার উনিশজন লোক মরেছে তার হাতে। নিজের জীবন বিপন্ন করেই সে এটা করেছে। ঈশ্বর বাছার মঙ্গল করুন'। বলল ওভানডোর মা।

'যে ওয়াং আলীকে তিনি উদ্ধার করতে গিয়েছিলেন, সে ওয়াং আলী কে ভাইয়া?' বলল লিসা।

'তা ওঁকে জিজ্ঞেস করিনি'। বলল ওভানডো।

'এক ওয়াং আলীর কথা আমি জানি। উনি আমাদের বিশ্ব বিদ্যালয়ের বোধ হয় শেষ বর্ষের ছাত্র। খুব ভালো ছাত্র, কিন্তু রাজনৈতিক কর্মী। ছাত্র আন্দোলনে সব সময় সক্রিয়। খুব জনপ্রিয়। শুনেছি উনি নিখোঁজ। ওর সাথে আমাদের সাবেক প্রধান মন্ত্রী আহমদ হাত্তা নাসুমনের মেয়ে ফাতিমা নাসুমনের বিয়ের কথা ছিল'। বলল লিসা।

'সে ওয়াং আলীও হতে পারে। আমি জানি না'। ওভানডো বলল।

'তোমার মেহমানের নাম কি ভাইয়া?'

ওভানডোর মুখে বিব্রত ভাব দেখা দিল। তারপর হাসল সে। বলল, 'তাঁর নাম জিজ্ঞেস করার সুযোগ আমি পাইনি। বিরাট ভূল আমার এটা'।

'আমার মনে হয় সে মুসলমান ভাইয়া'। বলল লিসা।

'কেমন করে বুঝলি?' জিজ্ঞেস করল ওভানডো।

'সে শোবার আগে প্রার্থনা করছিল। মুসলমানরা ওভাবে প্রার্থনা করে'। বলল লিসা।

'হতে পারে যাকে খুঁজছেন তিনি সেই ওয়াং আলীও তো মুসলমান'। বলল ওভানডো।

'তোরা কি জানিস, আমাদের দুর্গে একটা 'মস্ক' মানে মসজিদ ছিল'। বলল ওভানডোর দাদী।

'বল কি দাদী, আমাদের দুর্গে মসজিদ ছিল?' ওভানডো বলল।

'হ্যাঁ ওভানডো। আমি যখন নতুন বউ হয়ে আসি এ বাড়িতে, সে সময় একদিন দাদী শ্বাশুড়ী আমাকে ঘুরে ঘুরে দুর্গ দেখাচ্ছিলেন। একটা বড় ভাঙা ঘরের সামনের পাকা চত্বর পার হতে গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, বোন পায়ের জুতা খুলে ফেলো। বলে তিনিও তাঁর পায়ের জুতা খুলে ফেললেন। আমি জুতা খুলতে খুলতে বললাম, পায়ের জুতা খুলতে হবে কেন দাদী? তিনি বললেন, 'এই ঘর একটা প্রার্থনার জায়গা। এই চত্বরও তার অংশ'। এ পবিত্র জায়গায়

জুতা পায়ে ওঠা নিষেধ। আমি বললাম, কি বলছ তুমি দাদীমা, মন্দির, গীর্জা সব প্রার্থনার ঘরেই জুতা পায়ে ঢোকা যায়। তিনি বললেন, এটা মন্দির বা গীর্জা নয়, এটা মুসলমানদের মস্ক। এ প্রার্থনা গৃহে জুতা পায়ে ঢোকা যায় না। প্রার্থনা ঘরটির দেয়াল কোন কোন জায়গায় এখনও খাড়া আছে'।

ওভানডোর দাদী কথা শেষ করল।

ওভানডোর চোখে-মুখে বিস্ময়। বলল, 'কিন্তু দাদী, এ দুর্গে মুসলমানদের মসজিদ এল কি করে?'

'আমি জানিনা। তোমার দাদা একটা গল্প করেছিলেন। গল্পটা তিনি শুনেছিলেন তার আব্বার কাছে। সে সময় নাকি একজন পুরাতত্ত্ববিদ পর্যটক দুর্গ এলাকা পর্যবেক্ষণ করে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। তিনি নাকি বলেছিলেন, এ দুর্গের কথা ইউরোপীয় বা আমেরিকান কোন বিবরণে নেই। অথচ বিশাল এই দুর্গটা তৈরী হয়েছে কলম্বাসের সময়ে। কলম্বাসের কোন জাহাজ সুরিনামে ল্যান্ড করার কোন দলীল নেই। দুর্গের মসজিদ দেখেও তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন, দুর্গের অবস্থানের বিচারে এই মসজিদই ছিল দুর্গের কেন্দ্রবিন্দু। তার মতে দুর্গের ভবনগুলোর মধ্যে মসজিদটাই সবচেয়ে সুনির্মিত। তার কথা সত্য। দেখ, গোটা দুর্গ মাটির সাথে মিশে গেছে। কিন্তু মসজিদের দেয়ালের অনেকাংশ এখনও খাড়া। আর মেঝে প্রায় অক্ষত'।

থামল ওভানডোর দাদী।

হঠাৎ ওভানডোর মুখটা ম্লান হয়ে গেল। বলল, 'দাদী এই রহস্যের সাথে আরও রহস্য যোগ হয়েছে। আমাকে কিডন্যাপ করা হযেছিল কেন জান?'

হ্যাঁ, সেটা বলেছিস। স্টেট, স্টেট না হলে দুর্গ এলাকা বিক্রিতে রাজী হতে বাধ্য করার জন্যে'। বলল ওভানডোর মা।

'কিনতে চায় কেন তার মধ্যেই রয়েছে আসল রহস্য আম্মা। আমি আড়ি পেতে ওদের আলোচনা শুনে জানতে পেরেছি, এই দুর্গ এলাকার কোথাও জাহাজ বোঝাই করে আনা স্বর্ণ পুঁতে রাখা হয়েছে। কোথায় পুঁতে রাখা হয়েছে, সেটাও নাকি পাওয়া যেতে পারে আমাদের পারিবারিক পুরনো কাগজ পত্রে। সে জন্যেই ওরা দুর্গ এলাকা কিনতে চায় এবং আমাদের পারিবারিক পুরনো কাগজ-পত্র চায়।

শত নির্যাতনেও যখন রাজী হচ্ছিলাম না, তখন জ্যাকিকে ওরা কিডন্যাপ করার সিদ্ধান্ত নেয়। যাতে তার উপর অত্যাচার করলে বাধ্য হই বলতে'।

থামল ওভানডো।

সবার চোখে উদ্বেগ ও বিস্ময়।

ওভানডোর মা-ই প্রথম কথা বলে উঠল। বলল, 'ঈশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। জ্যাকিকে তিনি রক্ষা করেছেন। কিন্তু তুমি একি খবর শোনালে। ওরকম গুপ্তধন থাকলে সেটা আমাদের জন্যে একটা বড় ঘটনা। কিন্তু তার চেয়েও বড় ঘটনা হলো, এ গুপ্তধন পাওয়ার জেদ যখন ওদের মাথায় চেপে বসেছে, তখন আমরা শান্তিতে থাকতে পারবো না। যে কোন সময় যে কোন ঘটনা ওরা ঘটাতে পারে। এর থেকে বাঁচার পথ বাড়ি-ঘর সব ছেড়ে চলে যাওয়া। কিন্তু...........!'

কান্নায় ভেঙে পড়ল ওভানডোর মা।

ওভানডোর মা কাঁদছে। আর অন্য সবার চোখে-মুখে ছড়িয়ে পড়েছে আতংক।

'এভাবে ভেঙে পড়ো না আম্মা। দেখ ওদের কথা আমি শুনেছি, শুনেও কিন্তু ঠিক আছি'। বলল ওভানডো।

'ঠিক থাকবি কি করে? আসলেই মহাবিপদ আমাদের উপরে। আমার ভয় হচ্ছে, ওরা দরকার হলে আমাদের গোটা পরিবারকেই ধ্বংস করবে'। বলল ওভানডোর মা।

ওভানডোর মা'র কথা এবার ওভানডোকেও উদ্বিগ্ন করে তুলল। বুঝল তার মা'র ভেঙে পড়ার মধ্যে যুক্তি আছে। মায়ের কথার উত্তরে কি বলবে ওভানডো তা খুঁজে পাচ্ছিল না।

এ সময় কাজের মেয়ে এসে খবর দিল, 'মেহমান ঘুম থেকে উঠেছেন। ডাকছেন।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ওভানডো।

ওভানডোর মাও উঠল। বলল, 'চল আমিও যাব'।

ওভানডোর দাদীও তার হাতের লাঠিটা খাড়া করে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'চল আমরাও যাই। রাতে তো কথা বলা হয়নি'।

'নাস্তা কি রেডি?' কাজের মেয়েকে জিজ্ঞেস করল ওভানডোর মা।

'হ্যাঁ রেডি'।

'তাহলে টেবিলে দাও'। বলে ওভানডোর মা ওভানডোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'যাও মেহমানকে নিয়ে এস।নাস্তা করে কথা বলা যাবে'।

ওভানডো চলে গেল মেহমানখানার দিকে। ওভানডোর মা চলল নাস্তার টেবিলের দিকে।

নাস্তা শেষে সবাই এসে ওভানডোদের ফ্যামিলি ড্রইংরুমে বসল।

ওভানডোর দাদী সোফায় আহমদ মুসার পাশে বসতে বসতে বলল, 'ভাই, রাতেও তুমি মুরগী, খাসি কিছুই খাওনি। শুধু ডিম খেয়েছ। এখনও শুধু ডিম আর ব্রেডই খেলে। সবজিও খেলে না। কারণ কি বলত?'

আহমদ মুসাকে একটু বিব্রত দেখাল। বলল, 'স্যরি দাদী আপনাদের বিপদে ফেলেছি। কিন্তু কি করব, আমাদের ধর্মের বিধান হলো, আল্লাহর নাম নিয়ে জবাই করা নয় এমন গোশত খাওয়া যাবে না। সাধারণত আমেরিকান দেশগুলোতে সবজিতে শুকরের গোশত ব্যবহার করে। এজন্যে আমি সবজি খাওয়া এড়িয়ে গেলাম'।

'তুমি আগে বলনি কেন ভাই?' বলল ওভানডোর দাদী।

হাসল আমদ মুসা। বলল, 'খুবই ছোট একটা ব্যাপার জানিয়ে আপনাদের কষ্ট দেয়া আমি ঠিক মনে করিনি'।

'কিন্তু নিজেকে কষ্ট দেয়া ঠিক বুঝি'।

বলেই ওভানডোর দাদী প্রসংগ পরিবর্তন করে বলে উঠল, 'তোমাদের ঐ বিধানের তাৎপর্য কি বলত?'

আহমদ মুসা গম্ভীর হলো। বলল, 'দু' এক কথায় এর জবাব দেয়া মুশকিল। স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক, সৃষ্টির পেছনে স্রষ্টার উদ্দেশ্য, স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির দায়িত্ব ইত্যাদি অনেক কথা বলতে হয়। সংক্ষেপে এটুকু বলতে পারি, সব কিছু আল্লাহর সৃষ্টি। এক সৃষ্টির অধিকার নেই আরেক সৃষ্টিকে হত্যা করার। তা করতে পারা যায় শুধু আল্লাহর বিধান অনুসারে। সে বিধান হলো, এক সৃষ্টিকে আরেক সৃষ্টির জন্য হালাল করা। আল্লাহ মুরগী, খাসি, গরু মানুষের জন্যে হালাল

করেছেন। মানে খেতে বলেছেন। সুতরাং ওগুলো মানুষ জবাই করে খেতে পারে। কিন্তু জবাই করতে হবে আল্লাহর নাম নিয়ে, অর্থাৎ আল্লাহর বিধানকে স্মরণ করে'। তাহলেই জবাই বৈধ হবে, খাওয়াও বৈধ হবে'।

'চমৎকার, চমৎকার দাদী'। বলল লিসা।

'আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়েছিস লিসা। আমি ওকথা বলতে যাচ্ছিলাম'। বলে লিসার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভাই তুমি জান না, তুমি কি সাংঘাতিক কথা বলেছ। আমার এখন কি মনে হচ্ছে জান, এতদিন আমাদের গোশত খাওয়াটা অবৈধ হয়েছে। যাক আল্লাহকে স্মরণ করার মন্ত্রটা তুমি শিখিয়ে দিও'।

বলে একটু থামল। তারপরে আবার বলল, 'তুমি বোধ হয় খুব ধর্ম পালন কর ভাই?'

'হ্যাঁ দাদী। আল্লাহর নাম স্মরণ না করলে যেমন গোশত খাওয়া অবৈধ হয়ে যায়, তেমনি ধর্ম না মানলে মানুষের জীবন অবৈধ ও ক্ষতির পথে পরিচালিত হয়'। বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা কথা শেষ করল।

কিন্তু সংগে সংগে কোন উত্তর দিতে পারলো না ওভানডোর দাদী। হা করে তাকিয়ে থাকল আহমদ মুসার দিকে। তার চোখে-মুখে বিস্ময়। বলল কিছুক্ষণ সময় নিয়ে, 'তোমার কথার তাৎপর্য অনুভব করতে পারছি, বোঝার জন্যে যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না। একটু বুঝিয়ে বলতে পার?'

'এখানেও অনেক কথা বলতে হবে। বিষয়টা সংক্ষেপে এভাবে বলা যায় যে, শান্তি না থাকার অর্থ অশান্তি, সুখ না থাকলে দুঃখের সৃষ্টি হয়, সমাজ-সম্পর্ক বিপর্যস্ত হলে মানুষের জীবন সংকট হয়, মানুষের জীবনধারা অসুস্থ হলে অন্যায়, অবিচার ইত্যাদির সৃষ্টি হয়। আর মানুষের জীবনধারা অসুস্থ হয়, মানুষের সমাজ-সম্পর্ক বিপর্যস্ত হয় এবং মানুষের শান্তি সুখ ধ্বসে পড়ে তখন, যখন আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করে, তার দেয়া বিধান বা ধর্ম উপেক্ষা করে কোন মানুষ নিজে প্রভূ সেজে বসে এবং অপরাপর মানুষকে তার স্বার্থের শিকার হিসেবে গণ্য করে। মানুষের এই স্বেচ্ছাচারিতাই সকল অন্যায়, অবিচার, চুরি, ডাকাতি, হত্যা,

লুন্ঠন, আত্মসাৎ ইত্যাদি অপরাধের মূল উৎস। সুতরাং যে সমাজ ও যে মানুষ ধর্মের বিধান মেনে চলবেনা, সে মানুষ ও সে সমাজ ক্ষতি ও ধ্বংসের পথে পরিচালিত হবে'।

থামল আহমদ মুসা।

ওভানডোর দাদীসহ সকলের চোখে-মুখে স্তম্ভিত দৃষ্টি।

আহমদ মুসার উপর পলকহীন চোখ রেখে ওভানডোর দাদী বলল, আসলেই কি তুমি একজন ধর্ম প্রচারক ভাই? কিন্তু তাই বা কি করে বলি? গত রাতে তুমি নাকি দু'ডজন লোক হত্যা করেছ, ওভানডোদের মুক্ত করেছ'।

'কেন দাদী, যাঁরা ধর্ম মেনে চলে, তারা কি অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে না!' আর আমাদের ধর্মে ধর্ম প্রচারক বলে কোন গোষ্ঠী নেই। যারা ধর্ম মেনে চলে, তারা অন্যকেও ধর্ম মানাবার চেষ্টা করে। সুতরাং যে ধর্ম মেনে চলে সে ধর্মের প্রচারকও'। বলল আহমদ মুসা।

ওভানডোর দাদী কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই বলে উঠল লিসা টেরেক, 'আপনি ধর্মের যে রূপ তুলে ধরেছেন, সে রূপ সব ধর্মের নেই। যেমন আমাদের খৃষ্ট ধর্ম। তা থেকে আমরা আমাদের প্রাত্যাহিক জীবনের জন্যে কোন নির্দেশই পাই না'।

আহমদ মুসা লিসার দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। বলল, 'তোমার কথা ঠিক লিসা। তোমাদের কাছে মাফ চেয়ে বলছি, খৃষ্ট ধর্ম সর্বযুগের ধর্ম নয়। ঐ ধর্ম দুহাজার বছর আগের একটা সময়ের এক শ্রেণীর মানুষের জন্যে এসেছিল। এই ধর্ম সেই মানুষের জন্যে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এখন অচল হয়ে পড়েছে। পরবর্তীকালে ইসলাম এসেছে সর্বযুগের সকল মানুষের জন্যে। আধুনিক, উত্তর-আধুনিক সব মানুষের প্রয়োজন পূরণ করে ইসলাম'।

লিসার মুখে হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'আপনার সাজেশন আমি বুঝেছি। কিন্তু সব মানুষ কি ইসলাম গ্রহন করবে? আমরা না হয় আপনার চমৎকার ব্যাখ্যায় সব বুঝলাম, আপনি ক'জনকে......'।

'লিসা এখন থাম, এ জটিল বিষয় নিয়ে পরে ওঁর সাতে আলোচনা করো'।

বলে একটু থামল ওভানডোর মা। তারপর আহমদ মুসার দিকে তাকাল। বলল, 'বাছা, তোমাদের কথায় বাধা দেয়ার জন্য আমি দুঃখিত। এটা আমি করছি, কারণ তোমাকে কিছু কথা বলার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছি'।

'কি কথা আম্মা, বলুন'। আহমদ মুসা বলল।

'ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন বাবা। তুমি আমার ছেলেকে উদ্ধার করেছ নিজের জীবন বিপন্ন করে। আমার বউমাকেও বাঁচিয়েছ। এর ফলে আমরা মরা দেহে প্রাণ ফিরে পেয়েছি। কিন্তু বাবা আমরা হাসবার সুযোগ পাচ্ছিনা। আরও গুরুতর বিপদ আমাদের উপর চেপে বসেছে'।

থামল ওভানডোর আম্মা।

'ওরা আবার হামলা করবে, কিডন্যাপ করবে সেই চিন্তা করছেন?' বলল আহমদ মুসা।

'এই বিরান দুর্গের কোথাও জাহাজ বোঝাই সোনা এনে পুঁতে রাখা হয়েছে কিনা জানিনা। কিন্তু এই বিষয়টা যখন ওদের মাথায় ঢুকেছে, তখন আমাদের রক্ষা নেই। আমাদের গোটা পরিবারকে ধ্বংস করে হলেও ওরা শেষ দেখে ছাড়বে'। বলতে বলতে কান্নায় ভেংঙে পড়ল ওভানডোর মা।

আহমদ মুসার চোখে-মুখে একটা বিব্রত ভাব ফুটে উঠল।

'আমার বৌমা ঠিকই বলেছে ভাই। আগে ছিল ওদের আমাদের উৎখাত করার টার্গেট। এবার প্রতিশোধ স্পৃহাও যোগ হলো।

গতরাতের প্রতিশোধ নিতে ওরা আসবে অবশ্যই। কিংবা আরও কোনভাবে প্রতিশোধ নিতে পারে'। বলল ওভানডোর দাদী।

আহমদ মুসা ভাবছিল। বলল, 'ঠিক দাদীমা, ওরা এটা করতে পারে। পরাজয় ও ক্ষতির প্রতিশোধ ও ওরা নিবে। তবে ভয় পাবেন না। আল্লাহই সাহায্য করবেন'।

'তুমি ক'দিন থাক বাবা। তাছাড়া তুমি অসুস্থ। ক'দিন বিশ্রামও নেয়া হবে'। বলল ওভানডোর মা।

'কিন্তু আমাকে তো এখনি যেতে হবে'। বলল আহমদ মুসা চিন্তিত কন্ঠে।

'কোথায়?' বলল ওভানডোর মা।

'আপনাদের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আহমদ হাত্তা নাসুমনের মেয়ে সকাল দশটায় নামছে পারামারিবো বিমান বন্দরে। আমাকে সে সময় বিমান বন্দরে থাকতে হবে'। আহমদ মুসা বলল।

'তোমার শরীরের এ অবস্থা নিয়ে?' বিস্ময় প্রকাশ করল ওভানডোর মা।

'আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এসেছি এয়ারপোর্টে হাজির থাকার জন্যে। আজ ২০ তারিখ সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে যদি আহমদ হাত্তার মেয়ে ফাতিমা নাসুমন ওদের হাতে ধরা না দেয়, তাহলে ওরা ফাতিমা নাসুমনের ভাবী স্বামী ওয়াং আলীকে হত্যা করবে। বাধ্য হয়ে ফাতিমা নাসুমনকে দেশে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। ওয়াং আলী........'।

আহমদ মুসার কথায় বাধা দিল লিসা টেরেক। বলল, 'আপনারা ফাতিমা নাসুমনকে ওদের হাতে তুলে দিবেন?' লিসার কন্ঠে বিস্ময়।

'আমরা ফাতিমা নাসুমন ও ওয়াং আলী দুজনকেই বাঁচাতে চাই। ফাতিমা নাসুমনের পারামারিবো বিমান বন্দরে ল্যান্ড করার কথা ছিল আজ সন্ধ্যা ৬টায়। সন্ধ্যা ৬টায় সন্ত্রাসীদের গাড়ি অপেক্ষা করবে ফাতিমা নাসুমনের জন্যে। আমরা সময়টা এগিয়ে সকাল দশটায় এনেছি। শুরুতেই ফাতিমাকে ওদের হাতে তুলে দিতে চাই না'। বলল আহমদ মুসা।

'এই যে বললেন ওয়াং আলী ও ফাতিমা নাসুমন দুজনকেই বাঁচাতে চান। তাহলে আবার ফাতিমা নাসুমনকে ওদের হাতে তুলে দেবার প্রশ্ন উঠছে কেন?' বলল লিসা।

'ফাতিমা নাসুমনকে ওদের হাতে তুলে দেয়া দরকার ওদের সন্ধান লাভের জন্যে। যাতে ফাতিমা নাসুমন ও ওয়াং আলী দু'জনকেই বাঁচানো যায়'। আহমদ মুসা বলল।

'তাহলে আবার সন্ধ্যা ৬টার বদলে ফাতিমা নাসুমনকে সকাল ১০টায় আনছেন কেন? সন্ত্রাসীদের গাড়িতো সন্ধ্যা ৬টায় থাকবে ফাতিমার জন্যে!'

'ফাতিমা নাসুমন যাতে আমাদের চোখের সামনেই ওদের হাতে পড়ে, সে জন্যেই এই ব্যবস্থা। সন্ধ্যা ৬টায় সন্ত্রাসীরাও বিমান বন্দরে থাকবে। বিমান বন্দরের ভেতর থেকেও ফাতিমাকে তারা কিডন্যাপ করতে পারে। তাহলে আমরা

কিছুই জানতে পারবো না এবং তাদের ফলোও করতে পারবো না। তাতে ওদের দুজনকে বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়বে। এ জন্যে আমরা ফাতিমাকে আগে নিয়ে আসছি। সন্ধ্যা ৬ টায় সে এয়ারপোর্টে আসবে। তখন আমরা ফাতিমার পেছনে পেছনেই থাকব'। আহমদ মুসা বলল।

'বুঝতে পারছি বাছা, তুমি যাবে। কিন্তু আমাদের কি হবে'। বলল ওভানডোর মা উদ্বিগ্ন কন্ঠে।

ওভানডোর মা থামতেই ওভানডোর দাদী বলে উঠল, 'তুমি কোথায় থাকছ ভাই? উঠেছো কোথায়?'

'কোথাও থাকার সুযোগ পেলাম কই? পারামারিবোতে পৌঁছার কিছুক্ষন পরই বেরিয়ে এসেছি। প্রথম তো ঘুমালাম আপনাদের এখানেই। আপনাদের সাবেক প্রধানমন্ত্রী রেস্টহাউস জাতীয় বাড়িতে তুলেছিলেন। আমাদের সাথে একজন বন্দী ছিলেন। কয়েক ঘন্টা ছিলাম সেখানে'। আহমদ মুসা বলল।

'তাহলে ভাই আমাদের বাসাতেই থাক। আমরা সাহস পাব'। বলল ওভানডোর দাদী।

'আমাদের একটা গাড়ি আপনার সাথে থাকবে। চলা ফেরায় কোন অসুবিধা হবে না'। ওভানডো বলল।

'ঘটনা আমাকে কখন কোথায় নিয়ে যাবে, আমি জানি না। রাতে যদি ঘুমাবার সময় পাই, তাহলে আপনাদের এখানেই আসব'। বলল আহমদ মুসা।

'ধন্যবাদ বেটা। মায়ের অনুরোধ তুমি শুনেছ। সত্যিই আমি আতংক বোধ করছি'। ওভানডোর মা বলল।

'ওয়াংকে যারা কিডন্যাপ করেছে, ফাতিমা নাসুমনের পেছনে যারা লেগেছে, যারা দেশে একটা বিরাট রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করেছে, তারা আপনাদের পেছনেও লেগেছে। এদের বিরুদ্ধে কাজ শুরু হয়েছে। আল্লাহর কাছে দোয়া করুন'। বলল আহমদ মুসা।

'এরা তাহলে তো খুব বড় শক্তি! এরা কারা?' জিজ্ঞেস করল ওভানডো।

‘কারা ঠিক জানি না। তবে তোমাদের সাবেক প্রধানমন্ত্রী হাত্তা নাসুমনের বিরুদ্ধে যে রাজনৈতিক জোট তৈরী হয়েছে, তাদের সাথে এদের যোগ রয়েছে’। আহমদ মুসা বলল।

‘রাজনৈতিক সংকটের কথা কি যেন বললেন?’ বলল ওভানডো।

‘এরা সুরিনামের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে নির্বাচন পিছিয়ে দিতে বাধ্য করেছে। আহমদ হাত্তার পক্ষের লোকদের ওরা ব্যাপকভাবে কিডন্যাপ করছে। ওরা আহমদ হাত্তার পক্ষের কাউকে নির্বাচনে দাঁড়াতে দিবে না। আহমদ হাত্তাকেও ওরা কিডন্যাপ করেছিল। ওদের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে গত রাতে তিনি এখানে এসে পৌঁছেছেন। এই সংকটের কথাই তোমাকে বলেছি’।বলল আহমদ মুসা।

‘জনগন ওদের এ ষড়যন্ত্র মানবে কেন? আমরা তো সকলে আহমদ হাত্তার সমর্থক’। বলল ওভানডো।

‘জনগণ জানতে পারলে তো? যেমন তোমরাও ব্যাপারটা জানতে না’।

‘আমরা এমনিতেই আহমদ হাত্তার পক্ষের’। বলল ওভানডো।

‘সব সময়?’ প্রশ্ন আহমদ মুসার।

‘শুধু তাঁকে নয়, সব সময় আমরা মুসলমানেদের সাথে আছি’। ওভানডো বলল।

‘কেন?’ প্রশ্ন করল আহমদ মুসা।

‘জানি না। আমি আমার আব্বাকে এ রকমই করতে দেখেছি। তবে আজ দাদীর কাছে এক মজার কথা শুনলাম। আমাদের ধ্বংস হওয়া দুর্গের মধ্যে নাকি একটা মসজিদ ছিল’। বলল ওভানডো।

‘মসজিদ ছিল?’ আহমদ মুসা বলল। চোখে-মুখে তার বিস্ময়ের প্রকাশ।

প্রশ্ন করেই আহমদ মুসা একটু থেমে আবার বলল দাদীকে লক্ষ্য করে, ‘সত্যি দাদীমা? ওভানডো ঠিক বলছে?’

‘হ্যাঁ ভাই’। বলল ওভানডোর দাদী।

‘মসজিদটা নিশ্চয়ই এখন নেই। কি করে চেনা গেল মসজিদ?’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমি চিনতে পারিনি’। বলে ওভানডোর দাদী দুর্গ দেখেতে গিয়ে যা ঘটেছিল, দাদী শ্বাশুড়ীর কাছে যা শুনেছিল সব বলল।

‘মসজিদের কোন চিহ্ন এখন নিশ্চয় নেই?’ আহমদ মুসার চোখে-মুখে আনন্দ। কন্ঠে ঝরে পড়ল অপার আগ্রহ।

‘গোটা দুর্গের মধ্যে মসজিদের দেয়ালেরই কিছুটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে, মেঝেও অক্ষত আছে’। বলল ওভানডোর দাদী।

‘এখনি মসজিদের ধ্বংসাবশেষটা দেখতে ইচ্ছা করছে। ভাবতে ইচ্ছা করছে সুরিনামের প্রাচীন ও একমাত্র দুর্গে এই মসজিদ এল কি করে?’ আহমদ মুসা বলল।

‘চলুন, এখনি চলুন। আমরা সবাই যাব’। বলল লিসা টেরেক।

আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, ‘না এখন আর সময় হবে না। আমাকে ৯টার মধ্যে বিমান বন্দরে পৌঁছাতে হবে। আহমদ হাত্তা নাসুমনের সাথে টেলিফোনে কথা হয়েছে। উনিও ৯-টার মধ্যে বিমান বন্দরে এসে পৌঁছবেন’।

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা সবার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘তাহলে আমাকে এখন উঠতে হয়’।

‘তাহলে আমিও তৈরী হয়ে নেই। আমি আপনাকে পৌঁছে দেব এয়ারপোর্টে’। বলল ওভানডো।

‘না ওভানডো, তোমার রেস্ট দরকার। তাছাড়া তোমার বাড়ি ছাড়া চলবেনা এখন’। আহমদ মুসা বলল।

ওভানডোর মুখ ম্লান হয়ে গেল। বলল, ‘আপনি কোন কিছুর আশংকা করেন?’

‘দিনের বেলা তেমন আশংকা করি না। তবে ওদের কেউ না কেউ যে কোনভাবে খোঁজ নিতে আসবে, এটা নিশ্চিত। ফেরিওয়ালা বা কোন প্রকার হোম সার্ভিসের ছদ্মবেশেও আসতে পারে’। আহমদ মুসা বলল।

ওভানডোসহ সবার মুখ উদ্বেগ-আতংকে ভরে গেল। কেউ কোন কথা বলল না। বলতে পারলো না।

আহমদ মুসাই আবার বলল, ‘ভয়ের কিছু নেই দিনের বেলা তেমন কিছু ঘটবে না বলে মনে করি। তবে আমার অনুরোধ কেউ একা শহরে বেরুবেন না। কথা দিচ্ছি ওদিকের কাজ শেষ হলেই আমি চলে আসব। আহমদ মুসা বলল।

মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওভানডোর মায়ের। বলল, ‘বাবা তুমি আমাদের জন্যে ঈশ্বরের সাহায্য। আমরা তোমার পথ চেয়ে থাকব’।

মায়ের কথা শেষ হতেই ওভানডো আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, ‘তাহলে একটা গাড়ি নিয়ে যান। অসুবিধা হবে না’।

‘দরকার হবে না ওভানডো। একটু হাঁটতে ভালই লাগবে। রাস্তায় উঠলেই গাড়ি পেয়ে যাব। আর যে গাড়ি নিয়ে আমরা গতকাল নিও নিকারী থেকে এসেছি, সে গাড়ি বিমান বন্দরে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে’।

বলে আহমদ মুসা উঠতে যাচ্ছিল। ওভানডোর মা বাধা দিয়ে বলল, ‘একটু বস বাবা। সবই হলো, কিন্তু তোমার নাম পরিচয়টাই জানা হয়নি আমাদের’।

এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল আহমদ মুসার ঠোঁটে। মুখ নিচু করে থাকল। তারপর বলল, ‘আমি একজন মানুষ। আপনাদের শুভাকাঙ্খী। এটুকু পরিচয় থাকলে চলে না?

‘কি বল বাবা, তোমার নাম ধরে ডাকবো না?’ তোমার বাড়ি-ঘরের কথা জানবো না?’ বলল ওভানডোর মা মিষ্টি হেসে।

‘নাম আমার একটা আছে। কিন্তু আমার তো সে রকম কোন বাড়ি ঘর নেই’। আহমদ মুসা বলল।

‘কি বল বাছা! অমন কথা মুখে এনো না। প্রাসাদ দরকার নেই। একটা ঠিকানা হলেই চলে’। বলল ওভানডোর মা।

‘অমন একটা স্থায়ী ঠিকানা তো আমার নেই আম্মা’। বলল আহমদ মুসা।

ম্লান হয়ে গেল ওভানডোর মায়ের মুখ।

‘এরপর কি বলবে ভাই যে, তোমার নামও নেই?’ মিষ্টি হেসে বলল ওভানডোর দাদী।

‘না দাদী তা বলব না, আমার নাম আহমদ মুসা’। হাসতে হাসতে বলল আহমদ মুসা। উঠেও দাঁড়াল সেই সাথে।

নাম শুনেই বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে লিসা ছুটে এল আহমদ মুসার সামনে। বলল দ্রুত কন্ঠে, ‘কিছুদিন আগে টার্কস দ্বীপপুঞ্জের ঘটনা এবং সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিছু ঘটনা নিয়ে যার নাম পত্র-পত্রিকা ও টেলিভিশনে এসেছে সেই আহমদ মুসা আপনি?’

‘ধরে নাও তাই’। হাসি মুখে কথাটা বলেই আহমদ মুসা সবার উদ্দেশ্যে বলল, আসি আমি, দেরি হয়ে যাবে আমার’। তারপর ওভানডোকে বলল, ‘এস তুমি আমাকে একটু এগিয়ে দেবে’।

আহমদ মুসা পা বাড়াল ঘর থেকে বেরুবার জন্যে।

ঘরের সবাই নির্বাক। সবার চোখে বিস্ময় ও অসংখ্য প্রশ্ন। ওভানডোর অবস্থাও তাই। আহমদ মুসার নির্দেশ পেয়ে সে মন্ত্রমুগ্ধের মত তার পেছন পেছন চলল।

ওভানডো তাদের স্টেটের গেট পর্যন্ত আহমদ মুসাকে এগিয়ে দিয়ে এল। গোটা রাস্তায় ওভানডো একটা কথাও বলতে পারেনি। শুধু শুনেছে অহমদ মুসার কথা। নাম শুনে আহমদ মুসাকে সে চিনতে পারেনি। পরে লিসার কথা শুনে তার মনে পড়েছে আহমদ মুসার কথা। টার্কস দ্বীপপুঞ্জে যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে ঐতিহাসিক কান্ড ঘটাল সেই আহমদ মুসা ইনি, তার পাশে, তার বাড়িতে? এ কথা মনে আসতেই তার বাকরোধ হয়ে যাচ্ছে।

আহমদ মুসাকে বিদায় দিয়ে ফিরে এসে ওভানডো ঘরে ঢুকতেই লিসা ছুটে তার সামনে গিয়ে বলল, ‘ভাইয়া উনি আর কিছু বলেছেন?’

‘অন্য বিষয়ে বলেছেন। তার বিষয়ে শুধু বলেছেন, তাঁর সুরিনামে আসার ব্যাপারটা এই মুহূর্তে কাউকে না জানাতে’।

বলে ওভানডো ধপ করে বসে পড়ল সোফায়। বলে উঠল, ‘আজ বুঝতে পারছি, আমাকে যেভাবে উদ্ধার করেছেন, যেভাবে জ্যাকিকে বাঁচিয়েছেন, তা আহমদ মুসা বলেই সম্ভব হয়েছে। ঈশ্বর সবচেয়ে বড় সাহায্যটাই আমাদের জন্যে পাঠিয়েছেন। আমার আর কোন ভয় নেই’।

লিসা ওভানডোর পাশে বসতে বসতে বলল, 'ভয় নেই বলছ কেন ভাইয়া?'

'কারণ আহমদ মুসা বলেছেন ভয় নেই'। বলল ওভানডো।

'আমার বিশ্বাস হতে চাচ্ছে না ভাইয়া যে, আহমদ মুসা আমাদের বাসায় এসেছিলেন, রাতে আমাদের বাসায় ঘুমিয়েছেন এবং এখন তিনি আমাদের সবার সামনে দিয়ে চলে গেলেন। সবই স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে। জানো ভাইয়া, পরশু আমাদের সেমিনার ক্লাসে সমসাময়িক ঘটনার আলোচনায় আহমদ মুসার প্রসঙ্গ উঠেছিল। আমাদের ভিসি স্যার তার সমাপনী বক্তব্যে বলেছিলেন, বিপ্লব যে কল্যাণের হতে পারে, বিপ্লবীর বুলেট যে মঙ্গলের হতে পারে, বিপ্লবী যে মহান মানবতাবাদী হতে পারেন, বিশ্বব্যাপী অসংখ্য ঘটনায় আহমদ মুসা তা প্রমাণ করেছেন'।

'আমার এখন ভয় করছে, এত বড় বিশ্ব ব্যক্তিত্বকে কোথায় রাখবো। তিনি আসতে চেয়েছেন, অবশ্যই আসবেন'। আবেগ ঝরে পড়ল ওভানডোর কন্ঠে।

'কি যে বলছিস! আমি তো দেখছি ও শান্ত, সুন্দর, লাজুক এক ছেলে আমার। থাকা, খাওয়া নিয়ে কোন চাওয়া নেই, অহংকার নেই। আমাদের অসুবিধা হবে ভেবে তার অসুবিধার কথা আমাদের জানতে দেয়নি। ওভানডো তুই তো এমনটা কোনদিনই পারবি না'। বলল ওভানডোর মা।

'তুমি ঠিকই বলেছ বউমা, সামান্য সময়েই সে আমার শতবছর পরিচয়ের নাতি হয়ে গেছে। এক নিমিষে যে অমনভাবে মিশে যেতে পারে, সে বড়ত্বহীন খুব বড় মানুষ। তাকে নিয়ে ভাবছিস ওভানডো!' ওভানডোর দাদী বলল।

'কিন্তু দাদী আমার খুব ভয় করছে। আমরা না কোন ভূল করে বসি, কোন অমর্যাদা হয়ে যায় তাঁর। উনি কোন গোশতই খান নি আল্লাহর নাম নিয়ে জবাই করা নয় বলে। এটার আমরা কি করব?' বলল জ্যাকি, ওভানডোর স্ত্রী।

'আমরা আল্লাহর নাম নিয়েই জবাই করতে পারি তো'। বলল ওভানডোর মা।

‘কিভাবে আল্লাহর নাম নিয়ে জবাই করলে খাওয়া যায় তাতো আমরা জানি না’। ওভানডো বলল।

‘ঠিক আছে, আহমদ মুসা আজ এলে তার কাছ থেকে শিখে নিয়ে জবাই করলেই হবে’। বলল ওভানডোর মা।

‘দেখেছ মা, ওঁর প্রার্থনাটা কত সুন্দর। আমরা শিখতে পারি না?’ লিসা বলল।

‘তাহলে মুসলমান হবে নাকি? উনি তো মুসলমান’। বলল জ্যাকি। তার মুখে হাসি।

‘আমরা তো মন্দির, গীর্জা কোথাও যাই না। ক্ষতি কি, মুসলমান হলে? তাহলে বাড়িতে বসেও তো প্রার্থনা করা যাবে। আর আমাদের দুর্গে তো এককালে মসজিদ ছিলই’। বলল লিসা।

‘ঠিক বলেছিস লিসা। ভাইটি আমার আসুক। বলব যে, মুসলমান হতে হলে কি কি করতে হবে আমাদের শিখিয়ে দাও’। বলল ওভানডোর দাদী।

‘তাহলেতো ভালই হবে দাদীমা। আহমদ হাত্তা নাসুমনদের সাথে এক জাতি হয়ে যাব আমরা’। ওভানডো বলল।

‘আর তাহলে তো আমি ফাতিমা নাসুমনকে বলতে পারব, আমিও মুসলমান’। বলল লিসা।

‘দুর্গের মসজিদটাকেও তো তাহলে আমরা নতুন করে গড়তে পারব’। ওভানডোর মা বলল।

বলেই ওভানডোর মা উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘যাই ওদিকে অনেক কাজ পড়ে আছে’।

তার সাথে সাথে ওভানডোর স্ত্রী জ্যাকিও উঠে দাঁড়াল। বলল সে ওভানডোকে লক্ষ্য করে, ‘তুমি গিয়ে রেস্ট নাও’।

ওরা সবাই বেরিয়ে গেলে লিসা গিয়ে দাদীর পাশে বসে তার গলা জড়িয়ে ধরল।

‘কিরে তোকে তো খুব খুশি দেখাচ্ছে। ব্যাপার কি?’ বলল ওভানডোর দাদী নাতনীকে আরও কাছে টেনে নিয়ে।

‘ব্যাপার কি আবার? ভাইয়া উদ্ধার পেয়েছে, ভাবী রক্ষা পেয়েছে। তুমি খুশি হওনি?’ লিসা বলল।

‘কিন্তু তোর খুশিতে লাল রং দেখছি’।

‘তোমার চশমা আবার বদলাতে হবে দাদী’।

‘আমার নতুন ভাইটিকে কেমন দেখলিরে? নাত জামাই.....’।

লিসা তার দাদীর কথা শেষ হতে দিল না। দাদীর মুখে আঙুল চাপা দিয়ে বলল, ‘যাকেই দেখ সেই তোমার নাত জামাই হয়ে যায়, অন্তত এঁকে তুমি রক্ষা কর’।

লিসার দাদী মুখ থেকে লিসার হাত সরিয়ে দিয়ে বলল, ‘কেন? আমার নাতনি কম কি! তার জন্যে সবচেয়ে ভালটাই আমি চাই’।

লিসা তার দাদীর দুই হাত জড়িয়ে ধরে বলল, ‘তোমার হাত ধরে অনুরোধ করছি দাদী, তোমার পাগলামী যেন ওঁর কান পর্যন্ত না যায়। তুমি জান না তোমার নাতনীর মত লক্ষ নাতনী জোড়া দিলেও তাঁর সমান হবে না। তাঁকে তুমি অপমান করো না দাদী’।

‘তুই আমার এ ভাইটিকে চিনতেই পারিস নি। এক নিমিষে আমি তাকে শত বছরের চেনা চিনেছি’। বলল দাদী হাসতে হাসতে।

দাদীকে ছেড়ে দিয়ে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল লিসা। বলল, দাদী তুমি যদি এই কথা দ্বিতীয় বার আর কারো কাছে বল, তাঁর যদি কানে যায়, তাহলে জেনো এক দন্ড আর এ বাড়িতে থাকব না আমি’।

বলে মধ্যমা আঙুলের একটা গাট্টা দাদীর মাথায় মেরে ছুটে বেরিয়ে গেল লিসা।

# ৩

সুরিনাম নদীর উত্তর তীরে নদীটির একমাত্র ব্রীজের পশ্চিম পাশে সুরিনাম হাইওয়ের গা ঘেঁষে বিশাল এলাকা জুড়ে পার্লামেন্ট কমপ্লেক্স। এখানে পার্লামেন্ট ভবন ছাড়াও আছে এমপিদের হোস্টেল, প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী ও সিনিয়র সেক্রেটারিয়েট স্টাফদের বাড়ি এবং প্রধান সেক্রেটারিয়েট ভবন।

তখন সকাল সাড়ে দশটা।

প্রেসিডেন্ট ভবনের ফ্যামিলি গাড়ি বারান্দাটা নদীর গা ঘেষে।

জনসাধারণের জন্যে এটা নিষিদ্ধ এলাকা। প্রেসিডেন্ট ভবনের অফিসিয়াল অংশ হলো সুরিনাম হাইওয়ে সংলগ্ন পূর্ব দিকে।

ফ্যামিলি গাড়ি বারান্দার ঠিক উপরে দুতলায় ফ্যামিলি ড্রইংরুম।

রুদ্ধ দ্বার ড্রইংরুম।

ড্রইংরুমে কথা বলছে তিনজন লোক। একজন জুলেস মেনডেল, সুরিনামের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রেসিডেন্ট। অন্যজন রোনাল্ড রঙ্গলাল, সুরিনাম পিপলস কংগ্রেস (এসপিসি)-এর সভাপতি। আর তৃতীয় জন হলেন দক্ষিণ আমেরিকার চরমপন্থী হিন্দু সংগঠন 'মায়ের সূর্য সন্তান'(মাসুস)-এর সুরিনাম শাখার সভাপতি তিলক লাজপত পাল।

তিনজনই ভয়ানক গম্ভীর।

কথা বলছিল রোনাল্ড রঙ্গলাল। বলছিল, 'আমাদের সব আশা দেখি গুড়ে বালি হবার পথে। রিপাবলিকান পার্টির একটা সূত্র থেকে খবর পাওয়া গেল আহমদ হাত্তা নাসুমন গত রাতে পারামারিবোতে পৌঁছেছেন। আগামীকাল নমিনেশন পেপার সাবমিটের মাধ্যমে ভোটে দাঁড়াবার সব প্রস্তুতি তিনি নাকি নিচ্ছেন। দেশের সব এলাকায় নাকি খবর পাঠানো হচ্ছে প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকার সম্ভাব্য সব প্রার্থীকে নমিনেশন পেপার সাবমিট করার জন্যে। পরে বাছাই করে একজনকে মনোনয়ন দেয়া হবে। দশটার দিকে টেলিফোন পেলাম,

আজ সকাল দশটার দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে পোর্টেরিকো হয়ে যে ফ্লাইট আসছে, তার যাত্রী তালিকায় এফ. নাসুমন নামে একটা মেয়ের নাম আছে। মনে করা হচ্ছে ফাতিমা নাসুমন এই ফ্লাইটে পারামারিবো আসছে'।

থামল রোনাল্ড রঙ্গলাল। থেমেই সামনে থেকে গ্লাস টেনে নিয়ে ঢক ঢক করে এক গ্লাস পানি খেয়ে নিল।

এই ফাঁকে তিলক লাজপত পাল নড়ে-চড়ে বসে বলে উঠল, 'ফাতিমা নাসুমন আসছে, এই খবরটুকুই দিয়েছে? আর কিছু বলেনি?'

পানি খেয়ে গ্লাসটা টেবিলে রেখে রোনাল্ড রঙ্গলাল বলে উঠল, 'হ্যাঁ, এয়ারপোর্টের লোকেরা খবর পাঠাবার পরই আমাদের লোকরা ছুটে গেছে এয়ারপোর্টে। ফাতিমা যদি আসেই, তাহলে তাকে ওখান থেকে কিডন্যাপ করা হবে'।

'হ্যাঁ, এটা খুব দরকার। তাহলে আহমদ হাত্তাকে জব্দ করার একটা পথ হবে। ওয়াং আলী আমাদের হাতে তো রয়েছেই'। বলল তিলক লাজপত পাল।

'কিন্তু পরিস্থিতি তো পাল্টে যাচ্ছে মি. পাল। কোরাজ নদীর কাছে সিকিমা এলাকায় যে শক্ত ঘাঁটি আমরা পেয়েছিলাম তার পতন ঘটেছে। ওখানে আমাদের বারজন লোকের সবাই খুন হয়েছে। সবচেয়ে উদ্বেগের ব্যাপার হলো, পশ্চিম নিও নিকারীর পঁচিশজন মুসলিম যুবককে সিকিমা হ্রদে নিয়ে যাচ্ছিল। যারা ওদের নিয়ে যাচ্ছিল তাদের দুজনের লাশ পাওয়া গেছে আমাদের সিকিমা ঘাঁটির নিচের সমতলে। অপর দুজনের কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না, আর সেই পঁচিশজন যুবক নিও নিকারীর দিকে গেছে বলে খবর পাওয়া গেছে'। বলল রোনাল্ড রঙ্গলাল।

তিলক লাজপত পালের মুখ অন্ধকার হয়ে গেছে। বলল সে, 'আমাদের চারজনের অপর দুজন ওদের হাতে ধরা পড়েছে। আমাদের সিকিমা ঘাঁটির নিচের সমতলে একটা নোটবুক কুড়িয়ে পাওয়া গেছে। নোট বুকটি ওদের হাতে গড়া গায়ানার নিকি এমবার'।

'ওরা কারা, যারা এই সর্বনাশ ঘটাল?' আমাদের দুজনের কাছ থেকে তো ওরা সব জেনে নেবে'। বলল রোনাল্ড রঙ্গলাল। তার কন্ঠে উদ্বেগ।

‘ওরা কারা জানতে পারলে তো ল্যাঠাই চুকে যেত। দেখে নিতাম তাকে। তবে ঐ দুর্গম অঞ্চলে কে যাবে। আমার যতদূর মনে হয় স্থানীয় কেউ বা কিছু লোক সুযোগ বুঝে এই কাজ করেছে’। বলল তিলক লাজপত পাল।

‘আপনি বিষয়টাকে যত সহজ করে দিলেন, বিষয়টা কি অতই সহজ? বলুন তো গত রাতে আমাদের অত লোককে খুন করে দূর্ভেদ্য স্থান থেকে ওভানডোকে মুক্ত করে নিয়ে গেল কে? মাত্র একজন এসে এতবড় কান্ড ঘটিয়ে গেছে বটে, কিন্তু সে অবশ্যই একা নয়। এদেরকে ছোট করে দেখা যায় না’। বলল রোনাল্ড রঙ্গলাল।

সে থামতেই তিলক লাজপত পালের মোবাইল বেজে উঠল।

মোবাইল তুলে নিল তিলক লাজপত পাল। কথা শুরু করল হাসি মুখে। কিন্তু ওপারের কথা শুনে মুহূর্তেই তার মুখে অমাবস্যার অন্ধকার নেমে এল। সব কথা শুনে মোবাইল রাখতে রাখতে সে বলল, ‘আরেকটা উদ্বেগজনক খবর। ওভানডোর স্ত্রীকে ধরার জন্যে দুগাড়ি লোক পাঠানো হয়েছিল। ওরা কেউ ফিরে আসেনি এবং কোন খবরও দেয়নি’। শুষ্ক কন্ঠ লাজপত পালের।

‘কি বলছেন মি. লাজপত। দশ বারো জন লোক হাওয়া হয়ে গেল? খোঁজ নেবার জন্যে ওখানে লোক যায়নি?’ বলল রোনাল্ড রঙ্গলাল উদ্বিগ্ন কন্ঠে।

‘ফল বিক্রেতার ছদ্মবেশ একজন লোককে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু স্টেটের ভেতরে গিয়ে অস্বাভাবিক সে কিছুই দেখেনি। স্টেটের চাকর-বাকর স্টেটের জমিতে কাজ করছে। তারাও স্বাভাবিক। থানা ও হাসপাতালেও খোঁজ নেয়া হয়েছে। নগরীতে কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি। আমাদের মন্দিরের হত্যাকান্ড ছাড়া নগরীতে কোন হত্যাকান্ডের ঘটনাও ঘটেনি। ওভানডো বাড়িতে ফিরে আসার ঘটনা পুলিশ জানে। কিন্তু ও বাড়িতে গতরাতে কিছু ঘটার কথা পুলিশ বলেনি’। বলল লাজপত পাল উদ্বিগ্ন কন্ঠে।

সোফায় ঠেস দিয়ে বসল রোনাল্ড রঙ্গলাল। তার চোখে-মুখে হতাশা।

দীর্ঘ নিরবতা ভেঙে প্রেসিডেন্ট জুলেস মেনডেল বলল, ‘আপনারা কি ভাবছেন জানি না, তবে আমি মনে করছি সিকিমার ঘটনা এবং আহমদ হাত্তা ও ফাতিমা নাসুমনের ফিরে আসার ঘটনা পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। এখন ওভানডো

উদ্ধার হওয়া ও ওভানডোর বাড়িতে পাঠানো দুগাড়ি মানুষ গায়েব হয়ে যাওয়ার ঘটনাকে আগের তিন ঘটনার সাথে জোড়া দেয়া যায় কিনা দেখুন'।

প্রেসিডেন্ট থামতেই রোনাল্ড রঙ্গলাল বলে উঠল, 'আগের তিন ঘটনাকে এক সাথে জুড়ে দেয়া যায়। তবে ওভানডো ও ওভানডোর বাড়ি কেন্দ্রিক ঘটনা মনে হয় বিচ্ছিন্নই। ওভানডোদের পরিবার একেবারে অরাজনৈতিক'।

থামল রোনাল্ড রঙ্গলাল। সঙ্গে সঙ্গেই কথা বলে উঠল লাজপত পাল। বলল, 'আমার মনে হয় ওভানডোর আলোচনা এখন থাক। দুগাড়ি মানুষকে গায়েব করার সাধ্য ওভানডো পরিবারের নেই। সে দুগাড়ি মানুষ কোথায় গেল, ওভানডো মুক্ত হলো কিভাবে এ বিষয়টা আমরা পরে দেখব। যে কোন সময় আমরা হাতে টিপে মারতে পারি ওভানডো পরিবারকে। আজ রাতে সময় হলে আমি নিজেই আরেক অভিযানে নেতৃত্ব দেব। এ বিষয়টা থাক। এখন আমরা আহমদ হাত্তার আলোচনায় আসি। কালকে নমিনেশন পেপার সাবমিটের গুরুত্বপূর্ণ দিন। যা সিদ্ধান্ত নেয়ার আজকেই নিতে হবে'।

থামল লাজপত পাল।

সংগে সংগে কেউ কথা বললো না। সবাই ভাবছে।

নিরবতা ভাঙল স্বয়ং প্রেসিডেন্ট। বলল, 'মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর থেকে একটা নোট পেয়েছি। নোটে তারা বলেছে, 'সুরিনামের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আহমদ হাত্তা নাসুমনকে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা বাড়ি হতে বন্দী অবস্থা থেকে উদ্ধার করে।বাড়িটা ইহুদী গোয়েন্দা ও ভারতীয় আমেরিকানদের একটা সংস্থার নিয়ন্ত্রণে ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মনে করে সুরিনামের কোন রাজনৈতিক পক্ষের স্বার্থে ওরা তাঁকে ওভাবে বন্দী করে রাখে'। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই নোটের ভাল মন্দ দুটি দিক আছে। মন্দ দিক হলো, আহমদ হাত্তার যাই ঘটুক, সে ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা আগ্রহ থাকবে আর ভাল দিক হলো, আহমদ হাত্তার যাই ঘটুক, তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে নতুন বলে মনে হবে না। তারা মনে করবে, পুরনো সেই রাজনৈতিক বৈরিতা থেকেই ঘটনাটা ঘটেছে। এই দিকটা সামনে আনার পর আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছি তা হলো, আহমদ হাত্তা নতুন করে পাবলিক প্ল্যাটফর্মে যাবার আগেই যা করার তা করতে হবে। মানুষের একটা

মোটামুটি বিশ্বাস দাঁড়িয়েছে যে, আহমদ হাত্তা নিখোঁজ নয় নিহতই হয়েছে। এই অবস্থার সুযোগ নেয়া। আহমদ হাত্তা যদি নতুন করে আবার জনগণের কাছে যাবার সুযোগ পায় এবং জনগণকে তার উপর নির্যাতন ও বন্দী জীবনের কাহিনী বলতে পারে, তাহলে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তার আরও অনুকুলে চলে যাবে। তার ফলে বিপুল ভোটাধিক্যে বিজয়ের পথ তার জন্যে পরিষ্কার হয়ে যাবে। তাতে আমার ও আপনাদের সবারই রাজনৈতিক সমাধি রচিত হবে। সে ক্ষমতায় আসতে পারলে তার উপর নির্যাতনের শোধ সে সুদে আসলে গ্রহণ করবে'।

থামল প্রেসিডেন্ট জুলেস মেনডেস।

আবার নিরবতা।

এ নিরবতা ভেঙে রোনাল্ড রঙ্গলাল বলল, 'মি. লাজপত, এসব ব্যাপারে আমরা আপনার উপরই নির্ভর করি বেশি। বলুন আপনি কি ভাবছেন?'

তিলক লাজপত পাল সোজা হয়ে সোফায় বসল। বলল, 'আমার কথা হলো, আগামীকাল তাকে কোন মতেই নমিনেশন পেপার সাবমিট করতে দেয়া যাবে না'।

'কিভাবে?' বলল রোনাল্ড রঙ্গলাল।

'আজ দিন ও রাতের মধ্যে তাকে জীবিত অথবা মৃত আমাদের হাতে আনতে হবে। তাকে যদি না পাওয়া যায়, তাহলে কাল নির্বাচন অফিস আমাদের ঘেরাও করে রাখতে হবে। সে ওখানে পৌঁছার সাথে সাথে পাকড়াও করতে হবে। আর আজ ও আগামীকাল নমিনেশন পেপার ফাইলের পূর্ব পর্যন্ত সে যাতে কোন পাবলিক প্রোগ্রামে না যেতে পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে চারদিকে পাহারা বসাবার মাধ্যমে। এবং সব শেষ কাজটি হলো, সে যে সুরিনামে ফিরেছে এ ধরনের কোন নিউজ যেন আগামীকালের পত্রিকায় না যায়'। বলল তিলক লাজপত পাল'।

'ধন্যবাদ মি.লাজপত। আমাদের এগুবার একটি সুন্দর পথ আপনি বের করেছেন'।

কথাটা বলে রোনাল্ড রঙ্গলাল তাকাল প্রেসিডেন্টের দিকে। বলল, 'মি. প্রেসিডেন্ট, মি. লাজপতের অভিমত সম্পর্কে আপনি কি ভাবছেন?'

'মি. লাজপত যা বলেছেন তার বাইরে কোন পথ খোলা নেই। প্রশ্ন হলো এর বাস্তবায়ন কিভাবে? আমি এই সহযোগিতা করতে পারি যে, আপনাদের পাশাপাশি আমাদের গোয়েন্দা বিভাগের একটা বিশ্বস্ত অংশকে কাজে লাগাব তাকে খুঁজে বের করার জন্যে। পত্র-পত্রিকায় তার প্রত্যাবর্তনের নিউজ যাতে না বের হয়, সে চেষ্টা আপনারাও করবেন, আমাদের গোয়েন্দা বিভাগও করবে। আর কাল নমিনেশন পেপার সাবমিটের সময় আপনারা যাই করুন, আমাদের পুলিশ সেদিকে তাকাবেনা'।

থামল প্রেসিডেন্ট।

রোনাল্ড রঙ্গলাল খুশিতে দু'চোখ উজ্জ্বল করে বলল, 'ধন্যবাদ মি. প্রেসিডেন্ট। আপনার ঐটুকু সাহায্য পেলেই আমাদের চলবে'।

'আরেকটা কথা আমরা আহমদ হাত্তাকে নমিনেশন পেপার সাবমিট করা থেকে বিরত রাখতে পারলেও তার দলের লোকেরা নমিনেশন পেপার সাবমিট করেই ফেলবে। নমিনেশন পাওয়া নির্দিষ্ট কেউ থাকলে সেটা রোধ করার চেষ্ট করা যেত। কিন্তু তাতো হচ্ছে না। যেহেতু অনেকেই নমিনেশন পেপার ফাইল করতে আসবে, কাকে আমরা বাধা দেব'। বলল তিলক লাজপত পাল।

'দরকার নেই কাউকে বাধা দেওয়ার। আহমদ হাত্তা যদি নমিনেশন পেপার ফাইল করতে না পারে, তাহলে ওরা এমনিতেই পালিয়ে যাবে'। বলল রোনাল্ড রঙ্গলাল।

'ঠিক বলেছেন মি. রঙ্গলাল'। বলল প্রেসিডেন্ট।

'আজ অনেক কাজ আমাদের। উঠতে পারি আমরা এখন'। বলল রঙ্গলাল।

'ধন্যবাদ আপনাদের'। বলল প্রেসিডেন্ট।

প্রেসিডেন্ট উঠে দাঁড়াল।

সাথে সাথে সবাই উঠে দাঁড়াল।

ড্রইং রুম থেকে বেরুতে বেরুতে প্রেসিডেন্ট বলল, ‘ওভানডোদের ব্যাপারটা আমাকে উদ্বিগ্ন করেছে। ওভানডোর উদ্ধার এবং দুগাড়ি লোক উধাও হওয়া খুব বড় ঘটনা। দেখি আমিও চেষ্টা করব আমার অফিসিয়াল চ্যানেলে ঘটনা কি তা জানার জন্য’।

‘ধন্যবাদ প্রেসিডেন্ট। আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব’। বলল রোনাল্ড ও লাজপত পাল দুজনেই।

হাসল প্রেসিডেন্ট। বলল, ‘আমিও বিনা লাভে কিছু করছি না। আপনারা দেশ পাবেন, আর আমি পাব প্রেসিডেন্টের স্থায়ী চেয়ার। আমার পাওনাটাও খুব ছোট নয়’।

হেসে উঠল তিনজনই।

ডিপারচার লাউঞ্জের কারপার্কে প্রচুর গাড়ি।

সামনের সারিতে পাশাপাশি দুটি গাড়ি। একটা গাড়ি দামী জাপানী পাজেরো, তাতে শেড দেয়া কাঁচ। আরেকটা লেটেস্ট মডেলের আমেরিকান ট্যাক্সি।

পাজেরোর পেছনের সিটে বসে আছে আহমদ হাত্তা নাসুমন। আর ড্রাইভার তার সিটে। ফাতিমা নাসুমন এলে এই গাড়িতেই উঠবে।

ট্যাক্সিটায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শিখের পোশাক পরা আহমদ মুসা। তার পাশে দাঁড়িয়ে জোয়াও বার্নারডো, ট্যাক্সির মালিক যার কাছ থেকে ট্যাক্সিটি ভাড়া নিয়েছিল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা, আহমদ হাত্তা নাসুমন, জোয়াও বার্নারডো সকলের দৃষ্টি ডিপারচার লাউঞ্জের গেটের দিকে।

প্লেন ল্যান্ড করেছে ৪৫ মিনিট হলো। অর্ধেকের বেশী যাত্রী বেরিয়ে গেছে। কিন্তু ফাতিমা নাসুমনের এখনো দেখাই নেই। সবার উদগ্রীব দৃষ্টি সন্ধান করছে ফাতিমা নাসুমনকে।

আহমদ মুসার ট্যাক্সির তিন চার গজ দূরে আর একটা প্রাইভেট কার। ডিপারচার লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে দুজন লোক গাড়িটার কাছে এল। দুজনের একজন তার হাতের ব্যাগ ড্রাইভারের হাতে দিয়ে গাড়ির দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, 'দেশটা দেখছি মগের মুল্লুকে পরিণত হয়েছে। প্রকাশ্য দিবালোকে সকলের চোখের সামনে একটা মেয়েকে এইভাবে হাইজ্যাক করল। পুলিশও কিছুই বলল না। একজন সাবেক প্রধান মন্ত্রীর মেয়ের যদি এই দুর্দশা হয় তাহলে সাধারণ মানুষ কোথায় যাবে!'

লোকটির সবগুলো কথাই আহমদ মুসার কানে গেল। তার বুকটা ছ্যাত করে উঠল। সাবেক প্রধান মন্ত্রীর মেয়ে? তাহলে কি.......।

আর চিন্তা করতে পারল না আহমদ মুসা। ছুটে গেল লোকটির কাছে। বলল, 'মাফ করবেন, কি বললেন আপনি, একজন সাবেক প্রধান মন্ত্রীর মেয়ে হাইজ্যাক হয়েছে? কোথেথকে? কোথায় ওরা?'

লোকটা গাড়ির দরজা খুলেছিল, সে ঘুরে দাঁড়াল। বলল, হ্যাঁ লাউঞ্জের ভেতর থেকে হাইজ্যাক হলো সাবেক প্রধানমন্ত্রী আহমদ হাত্তা নাসুমনের মেয়ে। সবাই দেখেছে। ঐ দেখুন তাকে স্ট্রেচারে করে রোগী সাজিয়ে মাইক্রোতে তুলছে। ঢেকে রাখা কাপড়টা তুললেই দেখা যাবে মেয়েটির মুখ ও হাত-পা বাঁধা''।

লোকটির অংগুলি সংকেত অনুসরণ করে তাকিয়ে আহমদ মুসা মাইক্রোটি দেখতে পেল। স্ট্রেচার থেকে মেয়েটিকে গাড়িতে তোলা তখন হয়ে গেছে। স্ট্রেচারটি মাটিতে ফেলে দিয়ে পাঁচ ছয় জনকে গাড়িতে উঠতে দেখা গেল।

আহমদ মুসা ছুটল আহমদ হাত্তা নাসুমনের গাড়ির দিকে।

আহমদ মুসাকে আসতে দেখে আহমদ হাত্তা তাড়াতাড়ি গাড়ির দরজা খুলে ফেলল।

আহমদ মুসা একটু ঝুঁকে গাড়ির জানালায় মুখ নিয়ে বলল, 'মি. হাত্তা, ফাতিমাকে ওরা লাউঞ্জের ভেতর থেকেই কিডন্যাপ করেছে। ওরা পালাচ্ছে। আপনি বাসায় ফিরে যান। আমি ওদের ফলো করছি। আল্লাহ ভরসা'।

বলে আহমদ মুসা আহমদ হাত্তার কোন উত্তরের অপেক্ষা না করে ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটল তার ট্যাক্সির দিকে।

ট্যাক্সির ড্রাইভিং সিটের দরজা খুলে উঠে বসতে বসতে বলল, ‘বার্নারডো তুমি আমার সাথে যেতেও পার, কিংবা তোমার হোটেলে আমার জন্য অপেক্ষা করতে পার’।

বলে আহমদ মুসা গাড়ির দরজা বন্ধ করে গাড়ি স্টার্ট দিল।

‘অবশ্যই আমি যাব’। বলে জোয়াও বার্নারডো ড্রাইভিং এর পাশের সিটে উঠে বসল।

মাইক্রোটি তখন কারপার্ক পার হয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়েছে।

আহমদ মুসার গাড়ি ছুটল তার পেছনে।

এয়ারপোর্টটি পারামারিবো শহর থেকে উত্তর পূর্ব দিকে সাগর তীরের বিস্তৃত এলাকায়।

এয়ারপোর্ট থেকে একটা প্রশস্ত রাস্তা তীরের মত সোজা গিয়ে প্রবেশ করেছে পারামারিবো শহরে।

গাড়ি কম নয় এয়ারপোর্ট রোড়ে। এর মধ্যেও মাইক্রোটি বেশ স্পীড়ে চলছে। কিন্তু আহমদ মুসার গাড়িটিও নতুন। সুতরাং আহমদ মুসা অল্পক্ষণের মধ্যেই মাইক্রোটির কাছাকাছি পৌঁছে গেল।

‘মাইক্রোটি বোধ হয় সন্দেহ করল আহমদ মুসার ট্যাক্সিকে।

হঠাৎ স্পীড বেড়ে গেল মাইক্রোটির।

আহমদ মুসাও স্পীড বাড়িয়ে দিল।

এই অবস্হায় শহরে প্রবেশ করল দুটি গাড়ি।

মাইক্রোটি এ রাস্তা সে রাস্তা ঘুরে অনেক চেষ্টা করল আহমদ মুসার ট্যাক্সিকে পেছনে ফেলতে, কিন্তু পারল না। আহমদ মুসা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, মাইক্রোটির ঠিকানায় অবশ্যই তাকে যেতে হবে। মাইক্রোটি যেখানে যাবে, সেখানেই তার উপর চড়াও হবে। হৈ চৈ গোলযোগ সৃষ্টি হলে তার লাভ। সে মানুষকে বলতে পারবে, ওরা সাবেক প্রধান মন্ত্রী আহমদ হাত্তার মেয়েকে কিডন্যাপ করে নিয়ে এসেছে। আর মানুষ তো জলজ্যান্ত দেখতেই পাবে তাকে। এতে তাদেরই বিপদ বেশি হবে।

মাইক্রো বোধ হয় আহমদ মুসার বেপরোয়া মনোভাব বুঝতে পেরেছিল। এক সময় দেখা গেলো, মাইক্রোটি সোজা পশ্চিম দিকে চলতে শুরু করেছে।

পারামারিবো রাজধানী শহর পার হয়ে আরও পশ্চিমে এগিয়ে চলল মাইক্রোটি।

আহমদ মুসার পাশ থেকে জোয়াও বার্নারডো বলল, 'স্যার আমরা এখন ব্লুমেস্টেইন হাইওয়ে ধরে এগুচ্ছি। হাইওয়েটি ব্লুমেস্টেইন হ্রদের তীরস্থ ব্রুকোপনডো শহরে গিয়ে শেষ হয়েছে'।

'মাইক্রোটি নিশ্চয় তাহলে ব্রুকোপনডোতেই যাচ্ছে। ওখানে ওদের একটা বড় ঘাঁটি আছে'। বলল আহমদ মুসা।

উপকূলের সমভূমি এলাকা পার হয়ে গাড়ি তখন প্রবেশ করেছে জংগলাকীর্ণ টিলাময় এলাকায়। উঁচু-নিচু পথ। গাড়ির গতি আগের চেয়ে কমে গেছে।

জংগলাচ্ছাদিত একটা প্রশস্ত টিলায় উঠল আহমদ মুসার ট্যাক্সি।

টিলায় উঠে আহমদ মুসা তার রিয়ারভিউতে দেখতে পেল সামনের মাইক্রোর মতই আরেকটা মাইক্রো টিলার গোড়ায়, উঠে আসছে টিলার উপরে।

অন্যদিকে সামনে তাকিয়ে আহমদ মুসা বিস্মিত হলো যে, সামনের মাইক্রোটি তার স্পীড কমিয়ে দিয়ে আয়েশি ভংগিতে চলছে।

চমকে উঠল আহমদ মুসা, ওরা কি তাকে ফাঁদে আটকালো? এই ফাঁদে আটকানোর জন্যে ওরা শহরের বাইরে এসেছে? এটাই ঠিক। শহর থেকে দূরে সবার অলক্ষ্যে সামনে ও পেছন থেকে আক্রমন করে তাকে ওরা শেষ করতে চায়।

হাসল আহমদ মুসা।

জায়গাটাও ওরা ভাল বেছে নিয়েছে। টিলাটাকে দৈর্ঘ্য-প্রস্থের দিক দিয়ে একটা বড় চড়াই বলা যায়। জংগল ও বড় বড় গাছ পালায় ঘেরা। কাউকে গুম করার উপযুক্ত জায়গা বটে। নিশ্চয় ওরা মোবাইলে যোগাযোগ করে এই জায়গাটা নির্ধারণ করেছে।

দাঁতে দাঁত চাপল আহমদ মুসা। ওদের খোশ-খেয়াল সফল হতে সে দেবে না। সামনে পেছনে একসাথে লড়াই না করে ভিন্ন ভিন্নভাবে লড়ার সিদ্ধান্ত নিল সে।

ট্যাক্সির গতি বাড়িয়ে দিল।

মাইক্রোটি রিভলবারের রেঞ্জে আসার সংগে সংগে আহমদ মুসা ড্যাশ বোর্ডে রাখা এম-১০ রিভলবারটি ডান হাত দিয়ে তুলে নিল এবং জানালায় হাত নিয়ে ধীরে সুস্থে গুলী করল মাইক্রোর পেছনের টায়ারে।

টায়ার সশব্দে ফেটে গেল এবং ঝাঁকি খেয়ে গাড়িটা রাস্তার বাঁ পাশে দাঁড়িয়ে গেল।

মাইক্রোটি দাঁড়ানোর সংগে সংগেই মাইক্রো থেকে নেমে এল ওরা ছয় জন গুলী করতে করতে।

ছয়জনের হাতেই রিভলবার।

একযোগে আহমদ মুসার ট্যাক্সি লক্ষ্যে গুলী করতে করতে ওরা ছুটে আসছে।

আহমদ মুসা তার হাতের রিভলবার আগেই রেখে দিয়েছিল ড্যাশ বোর্ডে। এবার সে তুলে নিল এম-১০ মেশিন রিভলবার।

জোয়াও বার্নারডোকে আহমদ মুসা আগেই সিটের উপর শুয়ে পড়তে বলেছিল।

আহমদ মুসা মাথা নিচু করে এম-১০ এর ট্রিগারে তর্জনি স্পর্শ করে এর নল জানালার বাইরে নিয়ে ট্যাক্সির মাথার উপর দিয়ে ওদের তাক করল।

ওরা তখন এসে গেছে ট্যাক্সি ও মাইক্রোর মাঝ বরাবর।

আহমদ মুসা তর্জনি চেপে ধরল এম-১০ এর ট্রিগারে।

ট্যাক্সির মাথার উপর দিয়ে গুলির ঝাঁক ছুটে গেল ৬ জন রিভলবারধারীর দিকে।

ওদের লুকাবার কোন জায়গা ছিল না। শুয়ে পড়ারও সময় পেল না। এক ঝাঁক গুলীতে ঝাঁঝরা হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল ৬টি লাশ।

আহমদম মুসা বার্নারডোর দিকে তার ড্যাশ বোর্ডের রিভলবার এগিয়ে ধরে বলল, 'আমি মাইক্রোতে যাচ্ছি। তোমার উপরে দায়িত্ব হলো পেছনের মাইক্রোটি রিভলবারের রেঞ্জে আসার সংগে সংগে যতটা পার গুলী করবে মাইক্রোটির টায়ারে। আমি চাই ওরা গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে আসুক। পারবে তো?'

'পারবো'। রিভলবার লাগবে না। আমার কাছে রিভলবার আছে'। বলল বার্নারডো।

'ধন্যবাদ'। বলে আহমদ মুসা নেমে পড়ল ট্যাক্সি থেকে।

দৌড়ে গিয়ে উঠল মাইক্রোতে।

মুখ ও হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বসে আছে ফাতিমা নাসুমন।

তার দুচোখে আতংক ঠিকরে পড়ছিল। আহমদ মুসাকে দেখে যেন প্রাণ ফিরে পেল ফাতিমা নাসুমন। তার দুচোখে আনন্দের বিদ্যুত খেলে গেল।

আহমদ মুসা দ্রুত তার হাতের বাঁধন খুলে দিল। বলল, 'আরেকটা মাইক্রোতে ওরা আসছে। আমি ওদিকটা দেখি। তোমার বাঁধনগুলো খুলে নাও তুমি'।

বলে আহমদ মুসা ছুটে গেল মাইক্রোর পেছন দিকে। এম-১০ এর বাট দিয়ে মাইক্রোর পেছনের কাঁচ কিছুটা ভেঙে ফেলল।

দেখল পেছনের মাইক্রোটি উঠে এসেছে টিলায়। ছুটে আসছে ট্যাক্সির দিকে। আরও কিছুটা আসতেই রিভলবার গর্জন করে উঠার শব্দ পেল আহদম মুসা। পরপর কয়েকটা গুলির শব্দ।

খুশি হলো আহমদ মুসা। বার্নারডো ঠিক সময়েই গুলী করেছে।

গুলী খাওয়ার পরক্ষণেই বাঁ দিকের চাকা হারিয়ে মাইক্রোটি বাঁ দিকে একটু কাত হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল।

সংগে সংগেই মাইক্রোটি থেকে গুলী করতে করতে পাঁচজন লোক নেমে এল, তাদের সবার হাতে স্টেনগান।

তাদের লক্ষ্য ট্যাক্সিটি।

ছুটে আসছে ওরা ট্যাক্সির দিকে গুলী বৃষ্টি করতে করতে।

ওরা তখন ট্যাক্সি এবং ওদের মাইক্রোর মাঝামাঝি জায়গায়।

আহমদ মুসার তর্জনি চেপে ধরল এম-১০ এর ট্রিগার।

গুলীর ঝাঁক বেরিয়ে যেতে লাগল এম১০ থেকে।

ওরা মাইক্রোর দিক থেকে আক্রমণ আশা করেনি। লক্ষ্য ছিল ওদের ট্যাক্সির দিকে।

সুতরাং এম-১০ এর গুলী ওদের অরক্ষিত অবস্থায় পেল। মুহূর্তেই ঝাঁঝরা হয়ে গেল ওদের দেহ। পাঁচটি লাশ আছড়ে পড়ল রাস্তায়।

এদিকে ফাতিমা তার মুখ ও পায়ের বাঁধন খুলে ফেলেছিল।

আহমদ মুসা এগিয়ে গেল ফাতিমার কাছে। বলল, 'তুমি ঠিকঠাক আছ ফাতিমা?'

কেঁদে উঠল ফাতিমা। কোন কথা বলতে পারল না সে।

'আর কাঁদা কেন ফাতিমা? আল্লাহ আমাদের সাহায্য করেছেন'।

বলে মাইক্রো থেকে নামতে নামতে আহমদ মুসা বলল, 'এস ট্যাক্সিতে যাই'।

আহমদ মুসা ও ফাতিমা এল ট্যাক্সির কাছে। দেখল আহমদ মুসা জোয়াও বার্নারডো শোয়া অবস্থা থেকে উঠেছে। বলল আহমদ মুসা, 'তুমি ঠিক আছ তো বার্নারডো? মাইক্রোর চাকায় ঠিক সময়েই গুলী করেছিলে। ধন্যবাদ তোমাকে'।

জোয়াও বার্নারডো ড্রাইভিং সিটের পাশেই তার সিটে ফিরে আসতে আসতে বলল, 'স্যার, আপনি যে অসাধ্য সাধন করলেন, এজন্য কে ধন্যবাদ দেবে আপনাকে?'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'আমি ধন্যবাদ চাই না। আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি চাই বার্নারডো'।

বলেই আহমদ মুসা গাড়ির দিকে মনোযোগ দিল। বলল, 'আলহামদুলিল্লাহ, গাড়ির চাকাগুলো ঠিক আছে। কিন্তু বডি শেষ হয়ে গেছে। আমরা বাঁচলেও তোমার গাড়িটা ঝাঁঝরা হয়ে গেছে'।

গাড়ির পেছনের দরজা খুলে ফাতিমাকে বসতে বলে আহমদ মুসা ফিরে এল তার ড্রাইভিং সিটে।

গাড়ি স্টার্ট দিল।

ছুটে চলল গাড়ি পারামারিবো শহরের দিকে।

এক সময় মুখটা পেছেনের দিকে একটু ঘুরিয়ে বলল, ‘ফাতিমা বাড়ি যাওয়া তোমার ঠিক হবে না। তোমার আব্বাও বাড়িতে থাকছেন না। তোমাদের পার্টির বেনামী কতগুলো বাড়ি আছে। তারই একটিতে তোমার আব্বাসহ আমরা উঠেছি। সেখানেই আমরা এখন যাব’।

আপনার মত আমার মত ভাইয়া’। বলল ফাতিমা।

সামনেই বাড়ি।

বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছতেই আহমদ মুসা দেখল, বাড়ির সামনে জটলা।

অস্বাভাবিক মনে হলো ব্যাপারটা আহমদ মুসার কাছে।

গাড়ি বারান্দায় পৌঁছার আগেই আহমদ মুসা গাড়ি দাঁড় করাল। এম-১০ কোটের ভেতরে শোল্ডার হোলস্টারে নিয়ে এল।

গাড়ির দরজা খুলল।

গাড়ি থেকে নামার আগে ফাতিমাকে বলল, ‘তুমি গাড়িতে থাক ঘটনা কি আমি দেখি’।

আহমদ মুসা নামল গাড়ি থেকে।

জটলার মধ্যে বাড়ির গেটে দাঁড়িয়েছিল দলের কয়েকজন এবং বাড়ির এটেনডেন্ট সুকর্ণ।

আহমদ মুসা শিখের পোশাকে থাকলেও সুকর্ণ আহমদ মুসাকে চিনতে পারল। কারণ সকালে আহমদ মুসা এই পোশাক তার সামনেই পরেছে।

ছুটে এল সুকর্ণ আহমদ মুসার কাছে। বলল, ‘স্যারকে ধরে নিয়ে গেছে’। বলেই কেঁদে উঠল সুকর্ণ।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে আহমদ মুসার গোটা শরীরে শীতল স্রোত বয়ে গেল। বলল সুকর্ণকে লক্ষ্য করে, ‘কে ধরে নিয়ে গেছে, কখন ধরে নিয়ে গেছে?’

‘কারা জানি না। স্যার বিমান বন্দর থেকে এসে কাপড় ছেড়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, এই সময় দুটি গাড়িতে দশ বারো জন লোক আসে। তাদের সবার কাছে রিভলবার, স্টেনগান ইত্যাদি ছিল। ওরাই ধরে নিয়ে গেছে’। বলল সুকর্ণ।

‘গেটে পাহারা ছিল না?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘দুজন পাহারায় ছিল। কিন্তু তারা কিছু বুঝে উঠার আগেই তাদের উপর চড়াও হয় এবং বেঁধে ফেলে’। সুকর্ণ বলল।

‘যারা ধরে নিয়ে গেছে তারা কোন কথা বলেছিল?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘কোন কথা বলেনি। গাড়িতে তোলার সময় ওদের সরদার মত লোকটা বলেছে স্যারকে লক্ষ্য করে, আবার প্রধানমন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন স্যার। সে আশা আর পুরণ হলো না। তবে জামাই, মেয়ে নিয়ে একসাথে স্বর্গে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেব’। বলল সুকর্ণ।

‘গাড়ির নম্বর রেখেছ?’ বলল আহমদ মুসা।

‘জ্বি হ্যাঁ’ বলে একটা চিরকুট আহমদ মুসার হাতে তুলে দিতে দিতে বলল, ‘দুই গাড়ির নাম্বারই এতে আছে’।

আহমদ মুসা নম্বর দুটি কাগজে টুকে নিয়ে চিরকুটটা সুকর্ণকে ফেরত দিতে দিতে বলল, ‘এই নম্বর দিয়ে তোমরা থানায় একটা মামলা করবে আজই’।

একটু থেমেই আহমদ মুসা আবার বলল, ‘তোমাদের ছোট ম্যাডাম ফাতিমাকে উদ্ধার করা হয়েছে। সে এই গাড়িতে আছে। তাকে অন্য কোথাও নিয়ে যাচ্ছি। এখানে বা বাড়িতে সে নিরাপদ নয়। আর শোন একজন লোককে আমি এখানে রেখে যাচ্ছি। আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই এখানে ফিরে আসছি’।

বলে আহমদ মুসা ট্যাক্সিতে ফিরে গেল।

আহমদ মুসাকে ফিরতে দেখেই উদ্বিগ্ন ফাতিমা নাসুমন বলল, ‘কি ঘটেছে? খারাপ কিছু?’

‘হ্যাঁ, বোন। তোমার আব্বা কিডন্যাপ হয়েছেন। আমি চলে গিয়েছিলাম তোমাকে যে গাড়ি কিডন্যাপ করেছে তার পেছনে, আর তিনি বাসায় ফিরে এসেছিলেন। ফিরে আসার কিছুক্ষণের মধ্যে উনি কিডন্যাপ হন। আমার মনে হয় বিমান বন্দরে কেউ তাকে দেখেছিল এবং তারা তাঁকে অনুসরণ করে’। বলল আহমদ মুসা।

ফাতিমা নাসুমন কিছু বলল না। আহমদ মুসা দেখল, সে দুহাত দিয়ে মুখ ঢাকছে'।

আহমদ মুসার বুঝতে বাকি রইল না, ফাতিমা নাসুমন কান্না রোধ করার চেষ্ট করছে।

আহমদ মুসা ফাতিমাকে কিছু না বলে তাকালো বার্নারডোর দিকে। বলল, বার্নারডো তুমি এ বাড়িতে কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। আমি আসছি'।

গাড়ি থেকে নামল বার্নারডো।

সুকর্ণ পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে লক্ষ্য করে বলল আহমদ মুসা, 'সুকর্ণ একে নিয়ে যাও, আমি আসছি'।

সুকর্ণ বার্নারডোকে নিয়ে চলে গেল।

আহমদ মুসা ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল।

ফাতিমা নাসুমন পেছনের সিট থেকে এসে আহমদ মুসার পাশের সিটে বসল।

গাড়ি চলতে শুরু করল।

কিছুক্ষণ পর ফাতিমা চোখ মুছে বলল, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

গতকাল পারামারিবোতে আসার পরই একজন মা পেয়ে গেছি, একজন দাদী পেয়ে গেছি, সেখানেই আপাতত তুমি থাকবে। তোমাকে ওখানে রেখে আমি বেরুবো মি. হাত্তার সন্ধানে'।

ফাতিমা নাসুমন তাকাল আহমদ মুসার দিকে। তার দুগন্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল অশ্রুর দুটি ধারা। কিছুই বলল না সে।

আহমদ মুসাই আবার কথা বলল। বলল, 'আল্লাহর উপর ভরসা কর বোন। ইনশাআল্লাহ আমরাই জিতব'।

চোখ মুছল ফাতিমা নাসুমন।

কিছুক্ষণ পর বলল, 'কোথায় তাদের বাড়ি?'

'টেরেক স্টেটে। টেরেক স্টেটটাই ওদের'।

‘টেরেক স্টেটের নাম শুনেছি। ঐ স্টেটেই সুরিনামের একমাত্র ও প্রাচীনতম দুর্গের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। তবে টেরেক পরিবারের কাউকে চিনিনা’। বলল ফাতিমা নাসুমন।

‘কিন্তু তোমাদের ওরা চেনে। তোমার আব্বার ভক্ত ওরা। ঐ পরিবারের মেয়ে লিসা টেরেক তো তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়ে’। আহমদ মুসা বলল।

‘তাহলে দেখলে হয়তো চিনতেও পারি’। বলল ফাতিমা নাসুমন।তার মুখ অনেকখানি স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।

‘আমি আশা করি ভালই থাকবে তুমি সেখানে। খুব পুরাতন ঐতিহ্যবাহী পরিবার ওরা। আমার মনে হয় ওদের একটা মুসলিম ব্যাকগ্রাউন্ড থাকতে পারে’। আহমদ মুসা বলল।

‘কেন, কিভাবে?’

‘ওদের বিরান হওয়া দুর্গে নাকি একটা মসজিদ ছিল। দুর্গ বিরান হয়ে গেলেও মসজিদের কিছু দেয়াল এবং মেঝে নাকি এখনো অক্ষত আছে’। বলল আহমদ মুসা।

ফাতিমা নাসুমন বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘সুরিনামের প্রাচীন ইতিহাসের উপর আমার অনুসন্ধান আছে। কিন্তু প্রাচীন ও বিরান এই দুর্গের সাথে মুসলমানদের কোন সম্পর্ক থাকার কথা আমি কোথাও পাইনি। দুর্গ সম্পর্কে সকলেই একমত যে, ইউরোপীয়ান কলোনাইজেশনের সেই কালে কোন জলদস্যুদের ঘাঁটি এখানে ছিল। তারাই এই দুর্গ তৈরী করে। তবে, একথা অনেকেই লিখেছে, জলদস্যুরা স্পেন, পর্তুগাল, বৃটেন যে দেশেরই হোক মুসলিম স্থাপত্য সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা ছিল। স্পেনীয় মুসলিম স্থাপত্যের বহু জিনিসের এখানে অনুকরণ করা হয়েছে’।

‘কিন্তু আমি অন্য আরেক কাহিনী শুনেছি ফাতিমা। গত রাতে আমি পারামারিবো পৌঁছার পর রাতেই ওয়াং আলীর খোঁজে ওদের একটা ঘাটিতে ঢুকেছিলাম। সেই ঘাঁটি থেকে বন্দী একজন যুবককে উদ্ধার করে নিয়ে আসি। আমি মনে করেছিলাম সেই ওয়াং হবে। কিন্তু পরে দেখলাম সে ওভানডো টেরেক’।

বলে আহমদ মুসা ওভানডোর স্ত্রী জ্যাকুলিনের ঐ রাতে কিডন্যাপ হওয়া ও উদ্ধার কাহিনীসহ ওভানডো যে কাহিনী অপহরণকারীদের কাছ থেকে শুনছিল সব কথা ফাতিমার কাছে বর্ণনা করে শুনাল।

ফাতিমা বিষ্ময়ে চোখ কপালে তুলে বলল, 'বলেন কি? ক্যারিবিয়ানের স্পেনীয় গভর্ণর ওভানডোর ডুবে যাওয়া ২০টি জাহাজের একটি তাহলে ডুবেনি এবং সেটা ভেসে এসছিল সুরিনাম উপকূলে? ঐ জাহাজের ক্যাপ্টেন কি কোন মুসলিম ছিল? সেই কি তৈরী করেছিল এই দুর্গ?'

থামল ফাতিমা। তার কন্ঠে প্রবল একটা আবেগ ঝরে পড়ল।

'আমি কিছু জানি না ফাতিমা। তোমরা সুরিনামের মানুষ। এসব প্রশ্নের উত্তর তো তোমাদের কাছে আমরা চাই। বলল আহমদ মুসা।

'জাহাজ ভরা সোনা এনে দুর্গের এলাকায় পুঁতে রাখা সম্পর্কে আপনি কি বলেন?' ফাতিমা জিজ্ঞেস করল।

'বলা মুশকিল। সেটা এমন একটা সময় ছিল যখন বিশ্বাস করা না করা উভয় অবস্থাই যুক্তিযুক্ত মনে হতে পারে'। বলল আহমদ মুসা।

'কিন্তু বিশ্বাস করার পেছনে যুক্তিটাই বেশি শক্তিশালী। ওভানডোর সেই জাহাজ বহরে সোনা বোঝাই জাহাজ ছিল, ডুবে যাওয়া থেকে বেঁচে গিয়ে সোনা বোঝাই একটা জাহাজ স্পেনে পৌঁছেছিল, এটা ইতিহাস। ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া একটা জাহাজ যদি স্পেনে পৌঁছেতে পারে, তাহলে আরেকটা জাহাজ ঝড় তাড়িত হয়ে সুরিনামেও পৌঁছতে পারে'। ফাতিমা বলল।

'তোমার কথায় যুক্তি আছে ফাতিমা। সত্য হলে সেটা খুশির কথাই হবে'। বলল আহমদ মুসা।

'খুশির কারণ বলছেন কেমন করে? এই সোনা লোভীদের হাতে টেরেক পরিবার ধ্বংস হবার পথে। আমি নিশ্চিত, দুর্গের তলায় সোনা থাকার কথা যখন রটেছে, তখন টেরেক পরিবারের আর রক্ষা নেই। সোনা নিয়ে যে রক্তারক্তি আমেরাকায় হয়েছে, সে রকম রক্তারক্তি আমেরিকার যুদ্ধগুলোতেও হয়নি'। বলল ফাতিমা।

'আমিও এ ব্যাপারটা নিয়ে উদ্বিগ্ন ফাতিমা'।

বলে একটু থেমেই আহমদ মুসা আবার বলল, 'আচ্ছা বলতে পার, তোমার আব্বার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ আর এই সোনা সন্ধানীরা এক হয়ে গেল কি করে?'

'এক হয়ে যায়নি। ওরা একটাই শক্তি। আর সম্পদ সংগ্রহে ওরা মরিয়া। ওরা বলে 'মায়ের' জন্যে তাদের ওগুলো। এ জন্যেই তারা তাদের রাজনৈতিক দল সুরিনাম পিপলস কংগ্রেসের পাশাপাশি 'মায়ের সূর্য সন্তান' (মাসুস) নামে একটা সন্ত্রাসী সংগঠন গড়েছে। ওরা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করে যেমন রাজনীতিকে ওদের মনোপলি করতে চায়, তেমনিভাবে ওরা সম্পদও দখল করবে, এটাই স্বাভাবিক। আমার মনে হয় এক জাহাজ স্বর্ণের লোভ ওদের কাছে একটা দেশ দখলের চেয়ে কম নয়। তাই আমরা যে বিপদে পড়েছি, তার চেয়ে টেরেক পরিবারের বিপদ কোন অংশে ছোট নয়'। ফাতিমা বলল।

'ফাতিমা, তুমি দেখছি আমাকে ভয় ধরিয়ে দিলে'। বলল আহমদ মুসা।

'তা যদি পেরে থাকি, তাহলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি'।

'কেন?'

'তাহলে টেরেক পরিবারের বাঁচার একটা পথ বের হবে। আপনাকে তারা পাশে পাবে, যেমন আমরা পেয়েছি'। হেসে বলল ফাতিমা।

'ফাতিমা, আমরা এসে গেছি। ঐ তো ওদের বাড়ি। দেখো, গেটে দাঁড়িয়ে দুজন এদিকে তাকিয়ে আছে। ওদের একজন ওভানডো টেরেক, অন্যজন তার বোন লিসা টেরেক'।

বলেই আহমদ মুসা গাড়ির জানালা দিয়ে তাদের দিকে হাত নাড়তে লাগল।

উত্তরে ওরাও হাত নাড়ল এবং দৌড়ে আসতে লাগল গাড়ির দিকে।

তৈরী হয়ে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

ঘরে উপস্থিত ওভানডোর মা, ওভানডোর দাদী, ওভানডো, ওভানডোর স্ত্রী জ্যাকুলিন, লিসা টেরেক, ফাতিমা নাসুমন সকলেই।

লিসা টেরেক জড়িয়ে ধরে আছে ফাতিমা নাসুমনকে।

আহমদ মুসা যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালে ওভানডোর মা কাঁদো কাঁদো কন্ঠে বলে উঠল, 'বাবা গত রাতের সব কথা তো আমি জানি। ফাতিমার কাছ থেকে আজ সকালের কথাও শুনলাম। গত রাত থেকে তোমার শরীরের উপর দিয়ে ঝড় বয়ে যাচ্ছে, এ শরীর নিয়ে তুমি কেমন করে বেরুচ্ছ?'

ওভানডোর মা থামতেই ফাতিমা বলে উঠল, 'গত রাত থেকে নয় খালাম্মা, ১৯ তারিখে গায়ানার নিউ আমস্টারডামে পৌঁছার পর আজ পর্যন্ত যা ওর উপর দিয়ে ঘটে গেছে, তা দিয়ে এক মহাকাব্য লেখা যাবে'।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'কাহিনী শেষ হবার পর তো মহাকাব্য লেখা হয়, কাহিনী তো এখনও শেষ হয়নি। এখন যে বেরুচ্ছি, তা কাহিনীরই একটা অংশ'।

গম্ভীর হলো ফাতিমার মুখ। বলল, 'আপনি কোথায় বেরুচ্ছেন, আমরা জানতে পারি না?'

'আমার কাছেও এখনও স্পষ্ট নয় যে, আমাকে কোথায় যেতে হবে। একাধিক বিকল্প আমার কাছে আছে। পথে বের হবার পর আমি আশা করছি আল্লাহই ঠিক করে দেবেন, আমাকে কোথায় যেতে হবে'। গম্ভীর কন্ঠ আহমদ মুসারও।

ঘরের পরিবেশটা হঠাৎ করে ভারী হয়ে উঠেছে।

'আপনার মত এমন করে আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করতে পারি না কেন?' বলল লিসা। তার দু'চোখ ছল ছল হয়ে উঠেছে।

'এই যে অনুভূতি তুমি লাভ করেছ, এটাই আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার দিকে তোমাকে নিয়ে যাবে। ভালোবাসলে তার উপর ভরসা করা যায় লিসা'। আহমদ মুসা বলল।

'আপনার কথা সত্য হোক'। বলল লিসা।

যাবার জন্য ব্যাগটা হাতে তুলে নিল আহমদ মুসা।

ওভানডো বলে উঠল, ‘আমাদের কিছু বলবেন ভাইয়া?’

আহমদ মুসা তার ডান হাতটা ওভানডোর ঘাড়ে রাখল। বলল, ‘সাবধান থেকো। রাত পর্যন্ত আমি ফিরে আসব ইনশাআল্লাহ’।

বলেই আহমদ মুসা তাকাল ফাতিমার দিকে। বলল, ‘চিন্তা করো না ফাতিমা। আল্লাহর সাহায্য আমাদের সাথে আছে’।

ফাতিমা কিছু বলতে পারলো না। ভিজে উঠেছে তার চোখের দু’কোণ।

‘আসি, সবাই দোয়া করবেন’। বলে বাইরে বেরুবার জন্যে পা বাড়াল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসাকে গাড়ি পর্যন্ত এদিয়ে দিল ওভানডো। বলল, ‘ভাইয়া এ গাড়ি তো শেষ হয়ে গেছে। আমারটা নিয়ে যান’।

আহমদ মুসা গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসতে বসতে বলল, ‘এ গাড়ি নিয়ে যুদ্ধে একবার জিতেছি। এ গাড়ি দিয়েই আবার বিসমিল্লাহ করতে চাই’।

গাড়ির দরজা বন্ধ করে গাড়ি স্টার্ট দিল আহমদ মুসা।

ছুটতে শুরু করল গাড়ি।

পৌছল আহমদ মুসা আহমদ হাত্তার বাড়িতে।

গাড়ির শব্দ পেয়েই বেরিয়ে এল ভেতর থেকে জোয়াও বার্নারডো ও সুকর্ণ। আহমদ মুসা তাদের নিয়ে ভেতরে গিয়ে বসল।

আহমদ মুসা বার্নারডোর দিকে তাকিয়ে বলল, ‘তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। তুমি রেস্ট নাওনি?’

‘একটু বাইরে গিয়েছিলাম’। বলল জোয়াও বার্নারডো।

‘ও আচ্ছা’ বলে আহমদ মুসা একটু থামল। একটু ভাবল। তারপর বলল, ‘সুকর্ণ ওরা তোমার স্যারকে নিয়ে যাবার সময় বলেছিল যে, জামাই, মেয়ে ও তোমাকে এক সংগে স্বর্গে পাঠাব, একথা ঠিক তো?’

‘জি স্যার’। উত্তর দিল সুকর্ণ।

সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজল আহমদ মুসা। ভাবছে সে। কিছুক্ষণ পর চোখ খুলে জোয়াও বার্নারডোর দিকে তাকিয়ে বলল, ‘বার্নারডো ফাতিমা

নাসুমনকে ওরা ব্রুকোপনডোর দিকে মানে ব্রুকোপনডোতে নিয়ে যাচ্ছিল তাই না?’

‘হ্যাঁ সার, আমিও তাই মনে করি’। বলল বার্নারডো।

‘আমার মনে হয় ওয়াং আলীকে ওরা ব্রুকোপনডোতেই বন্দী করে রেখেছে’। আহমদ মুসা বলল।

‘কেন মনে করছেন?’ বলল বার্নারডো।

‘ঐ যে ওরা বলেছে তিনজনকে একসাথে স্বর্গে পাঠাবে। মানে তিনজনকে তারা একত্রিত করবে। আমার মনে হচ্ছে আহমদ হাত্তাকেও ওরা ব্রুকপনডোতেই নিয়ে গেছে’। আহমদ মুসা বলল।

বিস্ময় ফুটে উঠল জোয়াও বার্নারডোর মুখে। বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, ‘আপনি অদ্ভূত নিখুঁত একটি অংক কষেছেন ওদের একটা উক্তিকে কেন্দ্র করে। ধন্যবাদ আপনাকে’।

‘এ অংকটা নিখুঁত কি করে বুঝলে?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

জোয়াও বার্নারডো একটু হাসল। বলল, ‘আপনি চলে গেলে আমি একটু বাইরে গিয়েছিলাম। আমার পারিচিত মহলে কিছু খোঁজ খবর নিলাম। গাড়ির নম্বর দুটো চেক করে ওরা বলল, এ নাম্বারের দুটি গাড়ি সাড়ে ১১ টার সময় ব্রুকোপনডোর দিকে যেতে দেখা গেছে। আজ সাড়ে ১১টার সময় যে টিলায় ম্যাডাম ফাতিমাকে নিয়ে ঘটনা ঘটল ওরা সেই টিলা অতিক্রম করেছে’।

আহমদ মুসার চোখ দুটো চঞ্চল হয়ে উঠল। সে গভীর দৃষ্টিতে একবার তাকাল বার্নারডোর দিকে। একটু ভাবল। চোখ দুটি এক সময় উজ্জ্বল হয়ে উঠল আহমদ মুসার। বলল, ‘বার্নারডো তুমি তো গোয়েন্দা রিপোর্ট দিলে’।

চমকে উঠে বার্নারডো তাকাল আহমদ মুসার দিকে। কিন্তু পরক্ষণেই তারও মুখে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল। বলল, ‘আপনি এটাও বুঝে ফেলেছেন?’

‘বুঝার কিছুটা বাকি আছে’। আহমদ মুসা বলল।

‘কি?’ বলল বার্নারডো।

‘গোয়েন্দা অফিসারদের মধ্যে আত্মীয় বন্ধু আছে, না তুমিও গোয়েন্দা অফিসার?’ আহমদ মুসা বলল।

বিস্ময় ফুটে উঠল বার্নারডোর চোখে মুখে। কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আহমদ মুসার দিকে। তারপর বলল, ‘আপনার মত এমন দ্বিতীয় মানুষ আমি জীবনে দেখিনি। আপনার পরিচয় আমি জানি না। কিন্তু আপনি সাধারণ কেউ নন’।

বলে একটু থামল বার্নারডো। পরক্ষণেই আবার বলে উঠল, ‘আপনার দ্বিতীয় অনুমানটাই ঠিক। আমি একজন গোয়েন্দা অফিসার। তবে আরেকটা পরিচয় আমার আছে। আপনি সেটা অনুমান করতে পারেন নি’। মুখে হাসি বার্নারডোর।

আহমদ মুসার মুখেও হাসি ফুটে উঠল। বলল, ‘আগে অনুমান করতে পারিনি, কিন্তু এই মুহূর্তে অনুমান করতে পারছি’।

‘বলুন তো সেটা কি?’ বলল বার্নারডো হাসি মুখে।

‘তুমি মুসলমান’। আহমদ মুসা বলল।

বিস্ময় ও আনন্দে চোখ দুটো নেচে উঠল বার্নারডোর। সে ছুটে এসে আহমদ মুসার পায়ের কাছে বসল। বলে উঠল, ‘আপনি অসাধারণ, অসাধারণ আপনি। বিশ্বাস করুন স্যার, শুরু থেকেই আমি গর্ববোধ করছি যে, এ ধরণের অসাধারণ মানুষ আমাদের মুসলমানদের মধ্যেও আছে’।

‘শুরুতে কি করে বুঝলে আমি মুসলমান?’ আহমদ মুসা বলল।

‘আপনি যখন আমার ট্যাক্সিতে উঠেন, তখনই আপনার কপালে সিজদার দাগ দেখে বুঝি যে আপনি মুসলমান। কোন বিশেষ কারণে আপনি শিখের ছদ্মবেশ নিয়েছেন। তারপর আপনি যখন পারামারিবো আসার জন্যে গাড়ি চাইলেন, তখন কেন জানি আমার মনে হয়েছিল, আপনাকে আমার সহযোগিতা করা দরকার’। বলল বার্নারডো।

‘তুমি পারামারিবো আসার সিদ্ধান্ত নিলে কেন? এটা আমাকে বিস্মিত করেছে’। আহমদ মুসা বলল।

‘গাড়ি ফিরিয়ে নেওয়া একটা কারণ ছিল বটে, কিন্তু সবচেয়ে বড় কারণ ছিল আপনাদের সম্পর্কে আমার কৌতুহল। একজন মুসলিম শিখ সাজা এবং শুধু পারামারিবো যাবার জন্যে একটা গাড়ি কিনে ফেলা কম কথা নয়’। বলল বার্নারডো।

‘কিন্তু তোমার নাম জোয়াও বার্নারডো কেন?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘সে অনেক কথা। কোপেনাস নদী তীরের উইটাগ্রো এলাকায় আমার বাড়ি। উইটাগ্রোসহ চারদিকের লোকেরা ছিল ট্রাইবাল ধর্মে বিশ্বাসী। উইটাগ্রো শহরে ছিল বেশ কিছু ক্যাথলিক খৃস্টান। দূর্গম এলাকা বলেই

হয়তো সেখানে তখনও কোন এশিয়ান যায়নি। উইটাগ্রোতে তখন ছিল একটাই স্কুল। মালিক ছিল ক্যাথলিক খৃষ্টানরা। সেই স্কুলে ভর্তি হতে হলে সবাইকে কোন ইউরোপীয় নাম নিতে হতো। তা না হলে বিনামূল্যে বই, টিফিন ও অর্থ সাহায্য পাওয়া যেতো না। সে জন্যে সবাই ইউরোপীয় নাম নিয়ে স্কুলে ভর্তি হতো। সবার মত আমিও আমার মুসলিম নাম মহসিন মুহাম্মাদ পরিবর্তন করে ইউরোপীয় নাম নিয়েছি’। বলল জোয়াও বার্নারডো।

‘তোমার মুসলিম নাম তো খুব সুন্দর’।

বলে আহমদ মুসা একটু থামল। পরক্ষণেই বলে উঠল, ‘এস এবার কাজের কথায় আসি মহসিন বার্নারডো। কি করা যায় বল তো? এটা বোধ হয় নিশ্চিত যে, আহমদ হাত্তাকে ওরা ব্রুকোপনডোতেই নিয়ে গেছে’।

বার্নারডো একটু ভাবল। তারপর বলল, ‘সুরিনামের অতিরিক্ত আইজিপি এবং পারামারিবোর সহকারী পুলিশ কমিশনার (অপারেশন) সাবেক প্রধানমন্ত্রী আহমদ হাত্তার সমর্থক। তারা ভালোবাসেন আহমদ হাত্তাকে। তাদের একটা পরামর্শ নেয়া যায় কিনা চিন্তা করে দেখুন’।

আহমদ মুসার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, ‘তাদের সাথে কি তোমার জানাশোনা আছে’।

‘হ্যাঁ, অতিরিক্ত আইজি আমার ট্রেইনার ছিলেন। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করেন। গোয়েন্দা বিভাগের জন্য তিনিই আমাকে বাছাই করেন। আর

পারামারিবোর সহকারী পুলিশ কমিশনার আমার এলাকার লোক। তিনিই আমাকে উৎসাহ দিয়ে পুলিশে ঢুকিয়েছেন'। বলল বার্নারডো।

'আলহামদুলিল্লাহ। খুব সুখবর দিলে তুমি। কিন্তু বলত ওরা কোন ধর্মের কোন এলাকার লোক?' আহমদ মুসা জিজ্ঞেস করল।

'সহকারী পুলিশ কমিশনার কোন এলাকার তাতো আমি আগেই বলেছি। তিনি আফ্রো-ইউরোপীয় জাতি গোষ্ঠীর এবং খৃষ্টান। সৎ ও স্বাধীনচেতা অফিসার বলে সামরিক সরকারের আমলে তিনি অনেক নিগ্রহের শিকার হন ও তার পদাবনতি ঘটে। সামরিক শাসন পরবর্তী গণতান্ত্রিক সরকারের কাছেও তিনি সুবিচার পাননি। আহমদ হাত্তার সরকার তার সততার মূল্যায়ন করেন এবং তিনি দ্রুত পদোন্নতি পান। তিনি আহমদ হাত্তার সরকারকে পক্ষপাতহীন সুবিচারক সরকার বলে মনে করেন। আর অতিরিক্ত আইজিপি আহমদ হাত্তার এলাকার লোক। অহমদ হাত্তাদের জমিদারীতেই তাদের বাস। অতিরিক্ত আইজিপি সাহেবের বড় ভাই স্কুল থেকে কলেজ জীবন পর্যন্ত আহমদ হাত্তার সহপাঠী ও বন্ধু ছিলেন। পারিবারিক ভাবেই ওরা আহমদ হাত্তার ভক্ত'।

থামল বার্নারডো।

আহমদ মুসা কোন কথা বলল না। চিন্তা করছিল। এক সময় হাসি মুখে বলল আহমদ মুসা, 'এই দুজন পুলিশ অফিসারের সন্ধান পাওয়াকে আল্লাহর সাহায্য বলে মনে হচ্ছে। বার্নারডো তুমি যাও ওদের কাছে। সব কথা গিয়ে বল। তারা কি বলেন, শুনে এস'। বলল আহমদ মুসা।

খুশি হলো বার্নারডো। বলল, 'তাহলে যাচ্ছি স্যার'।

বলে বার্নারডো উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের বাইরে চলে গেল।

ফিরে এল বার্নারডো পাকা তিন ঘন্টা পর।

আহমদ মুসা শুয়ে রেস্ট নিচ্ছিল। বার্নারডো ফিরে এসেছে একথা শুনেই আহমদ মুসা উঠে বসল।

বার্নারডো যেমন ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল, তেমনি ছুটে ঘরে প্রবেশ করল। তার হাতে একটা বড় প্যাকেট এবং মুখে হাসি।

'তোমাকে তো খুব খুশি দেখাচ্ছে, মিশন সফল?' বলল আহমদ মুসা।

বার্নারডো বসতে বসতে বলল, 'মিশন সফলও বলব না, ব্যর্থও বলবনা'।

'না বার্নারডো, মিশন ব্যর্থ না হলেই তা সফল'। আহমদ মুসা বলল।

'তাহলে সকলে আমরা আলহামদুলিল্লাহ পড়ব'। বার্নারডো বলল।

'আলহামদুলিল্লাহ কখনই কন্ডিশনাল নয় বার্নারডো। আলহামদুলিল্লাহে রাব্বিল আলামিন ওয়া আলা কুল্লে হালিন। সুখ-দুঃখে, সাফল্য-ব্যর্থতা সব অবস্থাতেই আমরা আল্লাহর প্রশংসা করি। বল, তোমার কথা বল'।

'আমি প্রথম দেখা করেছি, এডিশনাল আইজি'র সাথে। দেখলাম ঘটনা তাঁরা জানতে পেরেছেন। কিন্তু হোম মিনিস্ট্রি এই ঘটনার সাথে পুলিশকে জড়িত হতে নিষেধ করেছে। তিনি বলেছেন এ ব্যাপারে পুলিশের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়। সুতরাং যা কিছু করার বেসরকারীভাবে করতে হবে। বলে তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন সহকারী পুলিশ কমিশনারের সাথে সাক্ষাৎ করতে। তিনি যা বলার পুলিশ কমিশনারের কাছে বলে দিলেন। এলাম সহকারী পুলিশ কমিশনারের কাছে। উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্যে তিনি দুঃখ প্রকাশ করলেন। বললেন, আমাদের কিছুই করার নেই। অন্তবর্তীকালীন সরকার কথায় নিরপেক্ষ, কিন্তু কাজ করছেন সুরিনাম পিপলস কংগ্রেসের রোনাল্ড রঙ্গলাল এবং 'মায়ের সূর্য্য সন্তান' (মাসুস) এর তিলক লাজপত পালের নির্দেশ ক্রমে। স্যারের সাথে আমার কথা হয়েছে। আমরা এটুকু করতে পারি, পুলিশের একটা গাড়ি ও কিছু পোশাক তোমাদের দেব। যা কিছু করার তোমাদের করতে হবে'।

একটু দম নিয়েই বার্নারডো তার হাতের প্যাকেটের দিকে ইংগিত করে বলল, 'এতে পুলিশের পাঁচ সেট পোশাক আছে। আর গাড়িটা ঠিক পাঁচটায় আমাদের গলির মুখে থাকবে'। থামল বার্নারডো।

আহমদ মুসা বলল, 'মি. হাত্তা এখন কোথায় সে ব্যাপারে কিছু বলেনি?

'হ্যাঁ, বলেছেন। সর্বশেষ গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুসারে ব্রুকোপনডোর শিবাজী কালী মন্দিরের পেছনে মানে পশ্চিম দিকে একটা বাড়ি আছে। সে বাড়ির পরেই একটা বিরাট জিমনেশিয়াম আছে। জিমনেশিয়ামটা জংগী সংগঠন 'মায়ের

সূর্য সন্তান' (মাসুস) এর ট্রেনিং কেন্দ্র। এরই আন্ডার গ্রাউন্ড ফ্লোরে মি. হাত্তাকে রাখা হয়েছে'। বলল বার্নারডো।

'আলহামদুলিল্লাহ। খুব মূল্যবান ইনফরমেশন দিয়েছেন ওঁরা। আমরা গিয়ে খুঁজে মরতাম শিবাজী কালী মন্দিরে। পেতাম না'।

আহমদ মুসা একটু থামল এবং পোশাকের প্যাকেটটা টেনে নিতে নিতে বলল, 'তোমার মিশন আশাতীত সফল বার্নারডো। পুলিশ নিজে এ্যাকশনে যাবে, তা আমি কোন সময়ই ভাবিনি। তারা যে সাহায্য করেছে তা অমূল্য'। থামল আহমদ মুসা।

'এখন আপনার পরিকল্পনা কি বলুন'। বলল বার্নারডো।

'এখন পাঁচ সদস্যের একটা শক্তিশালী পুলিশ টীম গঠিত হবে। পাঁচ সদস্যের মধ্যে আমরা দুজন আছি, আর দরকার তিনজন। তুমি যাও মি. হাত্তার লোকদের মধ্য থেকে তিনজন লোককে বাছাই করে নিয়ে এস। যারা ভালো গুলী চালাতে পারে এবং মি. হাত্তাকে উদ্ধারের জন্যে মরতে রাজী আছে'। আহমদ মুসা বলল।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল বার্নারডো। বলল, আমি এখুনি বাছাই করে নিয়ে আসছি'। চলে গেল বার্নারডো।

আধা ঘন্টা পর মি. হাত্তার বাড়ি থেকে পাঁচজন পুলিশ বেরিয়ে এল।

তাদের ইউনিফর্মে বড় বড় অক্ষরে লেখা সিআইবি পুলিশ।

সিআইবি (সেন্ট্রাল ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো) পুলিশ সুরিনামের বেসামরিক প্রশাসনের সবচেয়ে শক্তিশালী বাহিনী। তারা তদন্তের স্বার্থে যে কোন জায়গায় যে কোন সময় প্রবেশ করতে পারে। বিনা ওয়ারেন্টে যে কোন কাউকে গ্রেফতার করতে পারে।

পাঁচজন পুলিশের মধ্যে একজনের ইউনিফর্মের কাঁধে লাল রংয়ের ডবল স্টার। তার মানে তিনি এসপি পর্যায়ের একজন সিনিয়র অফিসার। তার কোমরে ঝুলানো রিভলবার। শোল্ডার হোলস্টারে ঝুলানো এম-১০। অন্যদের কাঁধে ঝুলানো স্টেনগান।

এসপি'র পোশাকে আহমদ মুসা এবং জোয়াও বার্নারডোসহ অন্যরা সার্জেন্টের ইউনিফর্মে।

তারা গলির মুখে এসে দেখল, ঠিক সিআইবি পুলিশের একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

আহমদ মুসা জোয়াও বার্নারডোকে বসতে বলল ড্রাইভিং সিটে এবং নিজে তার পাশের সিটে গিয়ে বসল। অন্য তিনজন পেছনের সিটে উঠল।

সবাই উঠলে বার্নারডো তাকাল আহমদ মুসার দিকে। আহমদ মুসা বলল, 'বিসমিল্লাহ'।

গাড়ি স্টার্ট দিল বার্নারডো।

গাড়ি ছুটে চলল পশ্চিমে ব্রুকোপনডোর দিকে।

# ৪

চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

আহমদ হাত্তা অনুমান করতে পারছে না এখন রাত না দিন। তাকে এখানে নিয়ে আসার পর কতটা সময় গেছে বুঝতে পারছে না সে। হাতের ঘড়িটা তারা খুলে নিয়েছে, সময় মাপার কোন উপায় নেই।

চোখ বেঁধে তাকে নিয়ে এসেছে, চোখ বেঁধেই তাকে এখানে ঢুকিয়েছে। তাই সে এখন কোন এলাকায় কোথায় তা জানার সুযোগ হয়নি।

ব্যথা বেদনায় গোটা শরীর তার টনটন করছে। দুই হাতসহ শরীরকে চেয়ারের সাথে এমনভাবে বেঁধেছে যে তিল পরিমাণ নড়াচড়ার ও কোন উপায় নেই। কয় ঘন্টা ধরে সে এভাবে চেয়ারের সাথে বাঁধা আছে? হয় তো হবে নয় দশ ঘন্টা। কিন্তু তার মনে হচ্ছে কয়েকদিন কেটে গেছে। গোটা শরীর তার পাথরের মত স্থির হয়ে গেছে। পাথরের বেদনা যন্ত্রণা থাকে না, কিন্তু তার শরীরে এটাই এখন প্রধান সমস্যা।

যারা তাকে ধরে নিয়ে এসেছে তারা মুখোশ পরা ছিল। তাদের কাউকেই চেনা যায়নি। কিন্তু আহমদ হাত্তার বুঝতে কষ্ট হয়নি যে, তারা কারা?

হঠাৎ তার মনে পড়ল ফাতিমার কথা। বুকটা তার কেঁপে উঠল। আহমদ মুসা কি তাকে উদ্ধার করতে পেরেছে? যদি না পেরে থাকে! না পারলে কি ঘটেছে, বা কি ঘটতে পারে, তা ভাবতে পারছে না আহমদ হাত্তা। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চাচ্ছে তার।

এরই মধ্যে ঘরে একটা তীব্র লাল বাতি জ্বলে উঠল। অসহনীয় একটা আলো ছড়িয়ে পড়ল গোটা ঘরে। এর তুলনায় অন্ধকার ছিল আশীর্বাদের মত।

চোখ খুলতে কষ্ট হচ্ছে আহমদ হাত্তার।

এ সময় পশ্চিম দেওয়ালে ঘরের একমাত্র দরজাটা নিঃশব্দে খুলে গেল। ঘরে প্রবেশ করল মুখোশধারী একজন লোক। তার পেছন পেছন আরও চারজন

লোক এসে ঘরটির সেই দরজায় দাঁড়াল। তাদেরও মুখে মুখোশ। হাতে স্টেনগান।

ঘরে ঢোকা মুখোশধারী এগিয়ে এল আহমদ হাত্তার দিকে।

আহমদ হাত্তার মুখোমুখি দাঁড়াল সে। বলল, তোমার জন্যে খুশির খবর হাত্তা যে, তোমার মেয়েকে আমাদের লোকেরা ধরে আনতে পারেনি। আমাদের এগারজন লোককে খুন করে কে একজন তাকে উদ্ধার করে নিয়ে গেছে। আমাদের ধারণা এই লোকই সেদিন মন্দির থেকে আমাদের বার তেরজন লোককে খুন করে ওভানডো টেরেককে মুক্ত করে নিয়ে গেছে। আমাদের বিশ্বাস সে ওয়াং আলীকে উদ্ধার করতে এসে ওভানডোকে পেয়ে যায়। আমাদের ধারণা এই দুঃসাহসী ঘটনা যে ঘটিয়েছে, সে লোকই সেদিন আমাদের দুই গাড়ি ভর্তি নয় দশজন লোককে খুন করে ওভানডোর স্ত্রীকে উদ্ধার করেছে। আমরা জানতে চাই মি. হাত্তা, এই সর্বনেশে লোকটি কে বা কারা?'

খুশি হলো আহমদ হাত্তা, দারুণ খুশি। অন্ততঃ ফাতিমা এ পশুদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। সেই সাথে কৃতজ্ঞতায় নুয়ে এল আহমদ হাত্তার হৃদয় আহমদ মুসার প্রতি। ফাতিমার কিছু হবে না বলে যে নিশ্চয়তা তিনি দিয়েছিলেন, তা তিনি রক্ষা করেছেন। কিন্তু এক রাতে এত লোক নিহত হয়েছে! আহমদ মুসাকে তাহলে কত কঠোর পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়েছে!

চিন্তায় ডুবে গিয়েছিল আহমদ হাত্তা। উত্তর পেল না মুখোশধারী। ধমকে উঠল সে, 'বলুন। আমার প্রশ্নের জবাব দিন। এই সব হত্যাকান্ড কে ঘটিয়েছে?'

'তাকে খুঁজে বের করার গরজ আপনাদের। আমি সাহায্য করবো কেন?'

'এভাবে উত্তর দেবেন না। এটা আপনার সাংবাদিক সম্মেলন নয় যে, প্রশ্ন পাশ কাটিয়ে যাবেন। সত্ত্বর জবাব দিন'। বলল মুখোশধারী।

'আপনারা সুরিনামের অনেক ক্ষতি করেছেন। আপনাদের কোন প্রশ্নের জবাব আমি দেবো না'। আহমদ হাত্তা বলল।

'বলবেন, বলবেন। ওয়াং আলীকে চেনেন?' বলল মুখোশধারী।

'আপনারা তো তাকে বন্দী করে রেখেছেন'। আহমদ হাত্তা বলল।

‘আর বন্দী করে রাখবো না। আমার প্রশ্নের উত্তর না দিলে তাকে এখনি যমের বাড়ি পাঠাবো’।

বলে মুখোশধারী গেটের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘যাও একজন গিয়ে ওয়াং আলীকে নিয়ে এস’।

সংগে সংগেই একজন প্রহরী ছুটল।

দু’মিনিটের মধ্যে হাত বাঁধা ওয়াং আলীকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল সে।

একুশ বাইশ বছরের সুন্দর যুবক ওয়াং আলী। চীনা চেহারা। তার সাথে কিছুটা সেমেটিক মিশ্রণ আছে, যা তাকে আরও সুন্দর করে তুলেছে। কিন্তু বিধ্বস্ত চেহারা তার। মাথার চুল উস্কু-খুস্কু। জামা-কাপড় ময়লা-কুচকানো। মলিন চেহারা।

ওয়াং আলীকে দেখেই আহমদ হাত্তা বলে উঠল, ‘একি অবস্থা করেছ তার? তার তো কোন অপরাধ নেই’।

‘রাখুন ওসব কথা। আমাদের প্রশ্নের জবাব দিবেন কিনা বলুন’।

বলেই সে দেয়ালে টাঙ্গানো চাবুক নিয়ে এসে প্রচন্ড এক ঘা লাগাল ওয়াং আলীকে।

কঁকিয়ে উঠল ওয়াং আলী।

বলল মুখোশধারী, ‘সবে এক ঘা লাগিয়েছি। মৃত্যু পর্যন্ত তার উপর চাবুকের ঘা পড়তেই থাকবে, জলদি আমাদের প্রশ্নের জবাব দিন’।

‘দেখ এই জুলুমের পরিণতি তোমাদের ভাল হবে না’।

‘ভালো হবে না’। বলে হো হো করে হেসে উঠল মুখোশধারী। বলল, ‘ভালো হবে না তো কি হবে? তুমি আবার প্রধানমন্ত্রী হবে ভেবেছ? কাল নমিনেশন পেপার সাবমিটের শেষ দিন। তুমি ছাড়া পাচ্ছো না এবং কোন দিনই ছাড়া পাবে না। ভাবছ তোমার দল ক্ষমতায় আসবে, পার্লামেন্টে আসবে? তাতেও গুড়ে বালি। তারা নমিনেশন পেপার সাবমিট করলেও নির্বাচন করতে পারবে না। আমাদের এবং আমাদের অনুমোদিত লোক ছাড়া কেউই প্রার্থী থাকবে না। সবাই প্রার্থীতা প্রত্যাহার করবে। যে প্রত্যাহার করবে না দুনিয়া থেকেই তাকে বিদায় হতে হবে, নির্বাচন করার সুযোগ তার হবে না’।

‘কিন্তু মনে রেখ, সবার উপরে আল্লাহ আছেন’। আহমদ হাত্তা বলল।

‘আল্লাহ-মাল্লার কথা আমি শুনতে চাই না। এখন বলুন, আমার প্রশ্নের জবাব দেবেন কিনা?’

আহমদ হাত্তা কিছু বলার আগেই ওয়াং আলী বলে উঠল, ‘স্যার আপনি এদের কোন সহযোগিতা করবেন না। লাভ হবে না। এরা এমনিতেই আমাকে মেরে ফেলবে। আপনি ওদের সহযোগিতা করলেও আপনাকে আমাকে ওরা বাঁচতে দেবে না। সুতরাং আল্লাহর উপর ভরসা করুন। এদের কোন কথা শুনবেন না’।

ওয়াং আলীর কথা শেষ হতেই মুখোশধারীর হাতের চাবুক ছুটে এল ওয়াং আলীর দিকে। তারপর চাবুকের এলোপাথাড়ি ছোবল পড়তে লাগল তার উপর অবিরামভাবে।

রক্তে ভিজে উঠেছে ওয়াং আলীর জামাকাপড়। মেঝের উপর এলিয়ে পড়েছে তার দেহ। কিন্তু ওয়াং আলীর মুখে শব্দ নেই। দাঁতে দাঁত চেপে সে সহ্য করছে অসহনীয় যন্ত্রণা। চিৎকার করলে, কাঁদলে ওদের উৎসাহ আরও বাড়বে, আর দুর্বল হয়ে পড়বেন আহমদ হাত্তা। অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেই এসব ভাবছে ওয়াং আলী।

আহত, রক্তাক্ত, লুটিয়ে পড়া দেহের উপরই অবিরাম চাবুক চালাচ্ছে মুখোশধারী।

চোখ বন্ধ করেছে আহমদ হাত্তা। মনে মনে আকুল প্রার্থনা করছে সে, ‘হে আল্লাহ, ওয়াং আলীকে তুমি রক্ষা কর, বাঁচাও তুমি তাকে। আমি আহমদ মুসার নাম ওদের দিতে চাই না। আহমদ মুসাও চান, সুরিনামে তার আগমনের কথা গোপন থাকুক’।

মেঝের উপর গড়াগড়ি দিয়ে কাতরাচ্ছিল ওয়াং আলী।

এক সময় দেখা গেল তার কাতরানী কমে গেছে। থেমে যাচ্ছে তার গড়াগড়ি।

এটা দেখে চিৎকার করে উঠল আহমদ হাত্তা, তোমরা খুন করে ফেললে ওয়াংকে’।

বলেই উপর দিকে মুখ তুলে কঁকিয়ে উঠল আহমদ হাত্তা, ‘হে আল্লাহ তুমি বাঁচাও ওয়াং আলীকে’।

তার কন্ঠ বিশাল ঘরটায় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হলো।

ঠিক এই ধ্বনি প্রতিধ্বনির সাথে হঠাৎ মিশে গেল কয়েকটা স্টেনগান ও মেশিন রিভলবারের অব্যাহত গুলি বর্ষনের শব্দ।

ঘরের দরজায় দাঁড়ানো চার স্টেনগানধারী ছুটে গেল ওদিকে।

অবিরাম গুলীর শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না।

হাতের চাবুক থেমে গেছে মুখোশধারীর। তার হাতে উঠে এসেছে রিভলবার। দু’চোখ দরজার দিকে স্থির নিবদ্ধ। বোধ হয় চার স্টেনগানধারী কি খবর আনে তারই অপেক্ষা করছে।

না তারা এল না।

কিন্তু দ্রুত গুলির শব্দ এগিয়ে আসছে এদিকে।

এ সময় একজন স্টেনগানধারী ছুটে এল ঘরে। বলল হাঁপাতে হাঁপাতে, ‘বস, সিআইবি পুলিশ এসেছে। ওপরের ঘরগুলো তারা সার্চ করেছে। তারা আন্ডার গ্রাউন্ড ফ্লোরে নামতে চাইলে আমাদের লোকেরা বাঁধা দেয়। বাধা অমান্য করে তাঁরা এগুতে চাইলে আমাদের লোকরা গুলী চালাতে গেলে তারা পাল্টা গুলি বর্ষণ শুরু করে। ওরা এগিয়ে আসছে’।

‘কয়জন পুলিশ?’

‘ঢুকেছে চারজন পুলিশ’।

‘চারজনকে শেষ করতে এতক্ষণ লাগে?’

‘মনে হয় ওপরে আমাদের কোন লোক বেঁচে নেই। এখন নিচে আমাদের তিনজন স্টেনগানধারী গিয়ে ওদের বাধা দিচ্ছে’।

‘চল দেখে আসি পুলিশের বাচ্চাদেরকে’। বলে সে ছুটল দরজার দিকে। তার পেছনে স্টেনগানধারী।

দরজা ওরা পার হতেই অবিরাম গুলীর ঝাঁক এসে ওদের ঘিরে ধরল। চোখের নিমিষে দরজার মুখে লুটিয়ে পড়ল তাদের দুজনের ঝাঁঝরা দেহ।

মুখ উপরে তুলে আহমদ হাত্তা কম্পিত কন্ঠে উচ্চারণ করল, আলহামদুলিল্লাহ।

পরক্ষণেই দুজন পুলিশ অফিসার ঘরে প্রবেশ করল।

একজন ছুটে এল আহমদ হাত্তার কাছে। বলল, 'মি. হাত্তা, আপনি ঠিক আছেন? মেঝেয় ওকি ওয়াং আলী?'

'আপনি আহমদ মুসা? পুলিশের পোশাকে?' বিষ্মিত কন্ঠ আহমদ হাত্তার।

আহমদ মুসা আহমদ হাত্তার বাঁধন খুলে দিতে দিতে বলল,'ও কি ওয়াং আলী?'

'হ্যাঁ'।

'ঠিক আছে সে?'

'আল্লাহর ইচ্ছা' ।বলল আহমদ হাত্তা।

বাঁধন খোলা হয়ে গেলে ছুটে গেল আহমদ মুসা ওয়াং আলীর কাছে এবং পাঁজাকোলা করে তুলে নিল তাকে। সাথের পুলিশ সার্জেন্টকে আহমদ মুসা বলল আহমদ হাত্তাকে চলতে সাহায্য করার জন্যে।

'পাঁজাকোলা করে নিয়ে একটু এগুতেই চোখ খুলল ওয়াং আলী। তাকাল আহমদ মুসার দিকে।

'ওয়াং আলী তুমি ঠিক আছ?' বলল আহমদ মুসা তাকে লক্ষ্য করে।

'শুকরিয়া, আমাদের বাঁচিয়েছেন স্যার। ওরা বলে, সব পুলিশ নাকে ওদের। সব পুলিশ ওদের অবশ্যই নয়'। বলল ওয়াং আলী অনেকটা আচ্ছন্ন স্বরে।

'অবশ্যই নয়, ওয়াং'। আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসার উঠে এল গ্রাউন্ড ফ্লোরে।

গ্রাউন্ড ফ্লোরের সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে ছিল আরও দুজন সিআইবি পুলিশ। আহমদ মুসা গ্রাউন্ড ফ্লোরে উঠে এলে তাদের একজন বলল, 'স্যার বাইরের গেটে অনেক লোক জমেছে। ওসিসহ থানার কয়েকজন পুলিশ এসেছে। ওরা ভেতরে ঢুকতে চাচ্ছিল, কিন্তু গেটে দাঁড়ানো বার্নারডো ওদের বাধা দিয়েছে'।

‘থানায় খবর কে দিয়েছে, এদের কেউ কি?’ আহমদ মুসা বলল।

‘কেউ বোধহয় খবর দেয়নি। থানা নাকি পাশেই। গোলা-গুলির শব্দ শুনে ওরা এসেছে’।

‘ঠিক আছে, চল’।

বলে আহমদ মুসা আগে আগে চলল। তার পেছনে আহমদ হাত্তা। সব শেষে তিনজন পুলিশ।

হঠাৎ আহমদ মুসা থমকে দাঁড়াল। আহমদ হাত্তার দিকে তাকিয়ে বলল, মি. হাত্তা, আপনার গায়ের জামাটা ছিঁড়ে খুলে ফেলুন’।

আহমদ হাত্তার উদ্দেশ্যে কথা শেষ করেই একজন পুলিশকে লক্ষ্য করে বলল আহমদ মুসা, ‘তুমি ছেঁড়া জামাটার একটা অংশ রক্তে ভিজিয়ে মি. হাত্তার কপালে বেঁধে দাও যাতে ব্যান্ডেজ বঁধা জামার একটা অংশ মুখের একপাশ দিয়ে নেমে আসে। আমরা চাই সাবেক প্রধানমন্ত্রী মি. হাত্তাকে থানার পুলিশসহ কেউ না চিনুক এবং সেই সাথে তাদের এটাও বুঝাতে হবে যে, জরুরী অবস্থায় মি. হাত্তার জামা ছিঁড়ে তার কপালে ব্যান্ডেজ বাঁধা হয়েছে’।

আহমদ মুসার কথা শেষ হবার আগেই মি. হাত্তা তার গায়ের জামা ছিঁড়ে ফেলেছে।

মেঝের এখানে ওখানে লাশ। রক্তে ভাসছে মেঝে। সেই রক্তে জামার একটা অংশ ভিজিয়ে একজন সিআইবি পুলিশ আহমদ হাত্তার কপাল ও মাথা জুড়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল।

একেতো গায়ে জামা নেই। তার উপর চোখের প্রান্ত পর্যন্ত নামানো ব্যান্ডেজ ও অর্ধেক মুখ ঢাকা। চেনাই যাচ্ছে না আহমদ হাত্তাকে।

‘ফাইন হয়েছে’। বলল আহমদ মুসা।

আবার হাঁটতে শুরু করল সে।

বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে।

বাউন্ডারী ওয়ালের সাথের গ্রীলের গেটটি বন্ধ। গ্রীল গেটের এ পারে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশ বেশে বার্নারডো। ওপারে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন পুলিশ। পুলিশের পেছনে কৌতুহলী কিছু মানুষ।

গট গট করে হেঁটে আহমদ মুসা গেটে দাঁড়ানো বার্নারডোর কাছাকাছি হয়েই বলল, ‘গেট খুলে দাও, এদের গাড়িতে তুলতে হবে’।

আহমদ মুসার কোলে পাঁজাকোলা করে ধরে রাখা আহত রক্তাক্ত ওয়াং আলী।

গেট খুলে গেল।

গেটের সামনে পৌঁছে আহমদ মুসা পুলিশদের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘থানার ওসি সাহেব কে?’

গেট খোলার সাথে সাথে গেটের ওপারে দাঁড়ানো থানার পুলিশরা গেটের এক পাশে সরে দাঁড়িয়েছিল।

তাদের একজন এক ধাপ সামনে এগিয়ে এসে আহমদ মুসাকে স্যালুট করে বলল, ‘আমি স্যার’।

‘আপনাদের থানার পাশে ক্রিমিনালদের এত বড় আড্ডা ছিল?’ বলল আহমদ মুসা।

থানার ওসির মূখে একটা বিব্রত ভাব ফুঠে উঠল। বলল, ‘আমরা জানতাম এরা খুব ভালো লোক স্যার। সাতদিন আগে একজন মন্ত্রী এদের একটা পুরুষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। উপরের পুলিশ অফিসারেরাও মাঝে মাঝে এখানে আসেন’।

‘সবাইকে এরা বোকা বানিয়েছিল। আমাদের উদ্ধার করা এ দুজন লোককে তারা কিডন্যাপ করে এনেছিল। আমাদের পৌঁছতে দেরী হলে এদের মেরেই ফেলতো ওরা’।

বলে একটু থেমেই আহমদ মুসা আবার বলল, ‘ওসি সাহেব আপনারা ভেতরে গিয়ে লাশের ব্যবস্থা করুন। যা দেখলেন ও শুনলেন তার উপর একটা মামলা রেকর্ড করুন। এদের হাসপাতালে পৌঁছিয়েই প্রয়োজনীয় আরও বিষয় আমি আপনার থানাকে জানিয়ে দেব’।

আহমদ মুসা থামতেই ওসি লোকটি বলে উঠল, ‘আমাদেরকে এতক্ষণ ভেতরে ঢুকতে দেয়নি স্যার’।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আমার নির্দেশ ছিল কাউকে ঢুকতে না দেবার। থানার পুলিশও ঢুকতে পারবে না, সে নির্দেশ আমার ছিল না। সে ভূল করেছে। তবে সে আমার নির্দেশ পালন করেছে’।

‘ধন্যবাদ স্যার। আমি বুঝেছি’। বলল থানার ওসি।

‘ধন্যবাদ ওসি সাহেব। আপনারা তাহলে ভেতরে যান। আমরা চলি’।

বলে আহমদ মুসা প্রাচীরের বাইরে দাঁড়ানো গাড়ির দিকে চলল। কৌতুহলী মানুষ যারা গেটের বাইরে ছিল তারা দূরে সরে গেছে।

আহমদ মুসার সাথে বাইরে বেরিয়ে এল সবাই।

সবাই গাড়িতে উঠল।

গাড়ির পেছনে তিনজন সিআইবি পুলিশবেশীর সাথে তোলা হলো আহমদ হাত্তা ও ওয়াং আলীকে। আর গাড়ির ড্রাইভং সিটে বসল বার্নারডো। তার পাশে আহমদ মুসা।

গাড়ি তখন চলতে শুরু করেছে। আহমদ মুসা বলল, ‘ধন্যবাদ বার্নারডো’।

‘কি জন্যে স্যার?’ বলল বার্নারডো।

‘তুমি গেটে থানা পুলিশকে ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিলে এজন্যে’। আহমদ মুসা বলল।

‘ওসি সাহেব জোরাজুরি শুরু করেছিলেন ঢোকার জন্যে। বলছিলেন যে, নিশ্চয় সিআইবি’র কিছু ভূল হচ্ছে। এখানে যারা থাকেন তারা সরকারেরই লোক। আমরা তাদের চিনি। আমি সিআইবি’র স্যারের সাথে কথা বললেই তিনি সব বুঝবেন’। আমি ধমক দিয়ে বলেছিলাম, গেটের এক ইঞ্চি ভেতরে ঢুকলে গুলি করবো। তারা আর ঢোকেনি, কিন্তু গজরাচ্ছিল’। বলল বার্নারডো।

‘তুমি ঠিক করেছ। ধন্যবাদ বার্নারডো’। আহমদ মুসা বলল।

‘ধন্যবাদ স্যার’। বার্নারডো বলল।

তীর বেগে চলছিল গাড়ি।

কিছুক্ষণের মধ্যে ব্রুকোপনডোর বাইরে বেরিয়ে এল গাড়ি। রাস্তা ছেড়ে প্রবেশ করল জংগলে।

জংগলটা একটা টিলা, টিলার শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়াল গাড়ি। টিলার পরেই বিশাল এক জলাশয়।

সেখানে একটা মাইক্রো দাঁড়িয়েছিল।

আহমদ মুসা লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নামল। সাথে সাথে সবাই নেমে পড়ল।

পরিকল্পনা আগেই করা ছিল। সবাই পুলিশের পোশাক খুলে মাইক্রোতে রাখা নিজ নিজ পোশাক পরে নিল। পুলিশের পোশাক রেখে দিল সিআইবি পুলিশের গাড়িতে। আহমদ হাত্তাকে নতুন পোশাক পরানো হলো।

মাইক্রোতে আগেই তোলা হয়েছে ওয়াং আলীকে। আহমদ হাত্তাও মাইক্রোতে উঠলেন।

আহমদ মুসা অন্যদের নিয়ে সিআইবি পুলিশের গাড়িটাকে ঠেলে নিচের জলাশয়ে ফেলে দিল।

তারপর সবাই গাড়িতে উঠে বসল।

এবারও ড্রাইভিং সিটে বার্নারডো।

গাড়ি স্টার্ট নিল।

উঠে এল তাদের গাড়ি পারামারিবো হাইওয়েতে।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন গাঢ় হয়ে উঠেছে। গাড়িতেই মাগরিবের নামাজ পড়ে নিল সবাই। নামাজ পড়ল বার্নারডোও। নামাজ শেষে বার্নারডো বলল, 'যতদিন গ্রামে পরিবারের সাথে ছিলাম নামাজ পড়েছি। আজ পনের বছর পর আবার নামাজ পড়লাম। খুব ভাল লাগল। মনে হচ্ছে আজ আমি নতুন মানুষ'।

আবার গাড়ি চলতে শুরু করল পারামারিবোর উদ্দেশ্যে।

'মি. আহমদ মুসা, আপনাকে ধন্যবাদ। আপনাদের পুলিশের পোশাকে দেখে যে বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছিল তা আমার এখনও কাটেনি'। বলল আহমদ হাত্তা নাসুমন। প্রথম মুখ খুলল সে।

'এ জন্যে ধন্যবাদ দিতে হবে এ্যাডিশনাল আইজিপি ও পারামারিবোর সহকারী পুলিশ কমিশনারকে। আপনার স্বার্থে ওরা এই সহায়তা দিয়েছেন'। আহমদ মুসা বলল।

'কিন্তু ওদের সাথে যোগাযোগ হলো কি করে?' পুনরায় জিজ্ঞেস করল আহমদ হাত্তা।

'এজন্য ধন্যবাদ দিতে হবে বার্নারডোকে। সেই যোগাযোগ করে পুলিশের পোশাক ও পুলিশের গাড়ির বন্দোবস্ত করেছে'। বলল আহমদ মুসা।

'কিন্তু বার্নারডো এটা কিভাবে করল? সে তো নিও নিকারীর লোক। সকালে এসেছে পারামারিবোতে'। আহমদ হাত্তা বলল।

'ও! আপনি জানেন না। তার আরও দুটি বড় পরিচয় আছে। একটি হলো, সে একজন গোয়েন্দা অফিসার। ট্যাক্সিক্যাব চালানো তার একটা ছদ্মবেশ। তাছাড়া পারামারিবোর সহকারী পুলিশ কমিশনার আপনার ভক্ত ও তার এলাকার লোক। এ্যাডিশনাল আইজি আপনার লোক এবং বার্নারডোর পূর্ব পরিচিত। সুতরাং তাদের সাথে সাক্ষাত করতে তার অসুবিধা হয়নি'। আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ বার্নারডো'। বলল আহমদ হাত্তা।

আহমদ মুসা তড়িঘড়ি করে বলে উঠল, 'একটু পরে ধন্যবাদ দেবেন। বলতে ভূলে গেছি, বার্নারডোর আরেকটা বড় পরিচয় আছে। সে মুসলমান'।

'ও! অভিনন্দন বার্নারডো। দেখছি, আল্লাহ আমাদেরকে সব দিক থেকেই সাহায্য করেছেন'। উচ্ছসিত কন্ঠে বলল আহমদ হাত্তা।

একটু থেমেই আহমদ হাত্তা আবার বলে উঠল, 'মি. আহমদ মুসা আপনাকে আপনার টিমকে ধন্যবাদ। আপনারা পৌঁছতে আরেকটু দেরী হলে ওয়াং আলীকে বাঁচানো যেতো না'।

'আল্লাহ যেটা চেয়েছেন, সেটাই হয়েছে। সব প্রশংসা তাঁরই'। আহমদ মুসা বলল।

'আলহামদুলিল্লাহ। ফাতিমা কোথায় মি. আহমদ মুসা?' বলল আহমদ হাত্তা।

'আপনি ওভানডোকে চেনেন, গতরাতে মন্দিরের বন্দীখানা থেকে তাকে উদ্ধার করেছি, ফাতিমা তার বাড়িতে আছে। ওভানডোর বোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে এবং ফাতিমার সাথে পরিচিত'। আহমদ মুসা বলল।

আপনি ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আহমদ মুসা। তাকে বাড়িতে রাখা ঠিক হতো না এবং অন্য কোথাও তাকে রাখাও যেত না'। বলল আহমদ হাত্তা।

'কিন্তু ওভানডোরা খুব বিপদে। সে কিডন্যাপ হয়েছিল, তার স্ত্রীকেও কিডন্যাপ করে নিয়ে যাচ্ছিল। তাদের বাড়ি আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তিলক লাজপত পালের 'মাসুস'-এর লোকরা এর সাথে জড়িত'। আহমদ মুসা বলল।

'সর্বনাশ। তাহলে.......'।

কথা শেষ না করেই থেমে গেল আহমদ হাত্তা। তার কন্ঠে উদ্বেগ।

'একটা বিহিত না হওয়া পর্যন্ত আমি ওখানে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি'। আহমদ মুসা বলল।

'কিন্তু তাদের এ বিপদ কেন?' জিজ্ঞেস করল আহমদ হাত্তা।

'এর পেছনে গুরুতর একটা কাহিনী আছে। আপনাকে পরে বলব। তবে একটা কথা বলে রাখি ওভানডোদের টেরেক পরিবার ও তাদের বিরান দুর্গের একটা মুসলিম ব্যাকগ্রাউন্ড আছে'। আহমদ মুসা বলল।

'অদ্ভূত কথা শোনালেন আহমদ মুসা। গল্প শুনেছেন, না এর পেছনে কোন ফ্যাক্ট আছে?' বিস্ময়-বিজড়িত কন্ঠে বলল আহমদ হাত্তা।

'ফ্যাক্ট আছে, রূপকথা নয়'। হেসে বলল আহমদ মুসা।

'তবু আমার কাছে অবিশ্বাসই মনে হচ্ছে'। চিন্তিত কন্ঠে বলল আহমদ হাত্তা।

'আপনার সংশয় ইনশাআল্লাহ দূর হবে'।

কথাটা শেষ করেই আহমদ মুসা একটু থামল এবং পরক্ষণেই আবার বলে উঠল, 'আপনি কোথায় উঠবেন ঠিক করেছেন? বাড়িতে নিশ্চয় নয়?'

'আপনার মত চাই আহমদ মুসা'। বলল আহমদ হাত্তা।

'কালকে নমিনেশন পেপার সাবমিট পর্যন্ত অন্তত আপনার একটু সরে থাকা দরকার'। আহমদ মুসা বলল।

‘আমিও তাই ভাবছি। তাহলে আমাদের আরও একটা রেস্ট হাউজ আছে, সেখানে উঠতে চাই। ওটাও একটা প্রাইভেট বাসার মত। আমার পরিবার ছাড়া এর সন্ধান আর কেউ জানেনা’। বলল আহমদ হাত্তা।

‘নিরাপত্তা ব্যবস্থা ওখানে কেমন?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘গেটের সিকিউরিটি বক্সে দুজন করে সার্বক্ষণিক প্রহরী থাকে। ওখানে গিয়ে আরও কিছু বাড়তি ব্যবস্থা করে ফেলা যাবে’। বলল আহমদ হাত্তা।

‘ঠিক আছে, তাদের সাথে বার্নারডো এবং এরা তিনজনও আপনার ওখানে থাকুক’। আহমদ মুসা বলল।

‘ওরা তিনজনতো থাকবেই। বার্নারডো থাকলে খুবই ভালো হয়। আমি খুবই কৃতজ্ঞ হবো’। বলল আহমদ হাত্তা।

‘ঠিক আছে, তাহলে এই কথাই। আমি আপনাদের ওখানে নামিয়ে ওভানডোর ওখানে যাবো’। আহমদ মুসা বলল।

‘ওখানে তো আপনার যেতেই হবে। কিন্তু আগামী কাল নিয়ে কি চিন্তা ভাবনা করছেন। আমি কিছুই ভাবতে পারছি না’।

‘নমিনেশন পেপার সাবমিট করতে যাওয়ার বিষয় নিয়ে কাল সকালে আমরা ভাবব। বার্নারডোকে কথা বলতে হবে সহকারী পুলিশ কমিশনারের সাথে। ইতোমধ্যে আপনাকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো, আপনাদের নির্বাচনী অফিসের চারদিকটা কাউকে বুঝতে না দিয়ে আপনাদের নিজেদের লোকদের দখলে আনতে হবে। কটায় আপনি যাবেন সেটা তাদের জানানো হবে আপনি সেখানে পৌঁছার ৫ মিনিট আগে। তাদের দায়িত্ব হবে নির্বাচনী অফিসে ঢোকার পথটাকে নিরাপদ রাখা’। আহমদ মুসা বলল।

‘হ্যাঁ, এ ব্যবস্থা আমি রাতেই ঠিক করে ফেলব’। বলল আহমদ হাত্তা।

‘বাকি কাজটা আমি করব। আরও করণীয় থাকলে সেটা সহকারী পুলিশ কমিশনার করবেন’। আহমদ মুসা বলল।

‘ধন্যবাদ মি. আহমদ মুসা। এখন গাড়িটা সামনের এভিনিউ ধরে ডান দিকে যাবে’। এই এভিনিউ-এর শেষ মাথায় সুরিনাম নদীর একদম তীরের উপর রেস্ট হাউজটা’। বলল আহমদ হাত্তা।

আর মাত্র দশ মিনিটের মধ্যেই গাড়িটা পৌঁছে গেল এভিনিউটির শেষ মাথায় সুরিনাম নদীর তীরে।

গাড়ি দাঁড়াল।

'মি. হাত্তা, ওয়াং আলীর চিকিৎসা নিশ্চয় বাসায় মানে এখানেই হবে?' আহমদ মুসা বলল।

'হ্যাঁ, মি. আহমদ মুসা। নিজস্ব ক্লিনিক আছে, তবু কোন ঝুঁকি নিতে চাইনা। এখানে কোন অসুবিধা হবে না। আমাদের পারিবারিক ডাক্তারকে টেলিফোন করলে এখুনি এসে যাবে'। বলল আহমদ হাত্তা।

'আপনি ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মি. হাত্তা'। আহমদ মুসা বলল।

বার্নারডো নেমে গেছে ড্রাইভিং সিট থেকে। পেছনে ওরা নামিয়ে নিচ্ছে ওয়াং আলীকে। শেষে নামলেন আহমদ হাত্তা।

আহমদ মুসাও নামল।

প্রশস্ত গাড়ি বারান্দা।

রেস্ট হাউজটি চারতলা। খুব সুন্দর দেখতে।

মি. হাত্তা, এখানকার টেলিফোন নাম্বারটি দিন'। বলল আহমদ মুসা, আহমদ হাত্তাকে লক্ষ্য করে।

'উপরে চলুন আহমদ মুসা, একটু দেখবেন'। বলল আহমদ হাত্তা।

'না মি. হাত্তা, পোশাক আশাকের এই অবস্থা নিয়ে নয়'। আহমদ মুসা বলল।

রক্তাক্ত ওয়াং আলীকে কোলে নেয়া আহমদ মুসার দুহাত ও সামনের দিকটা রক্তে ভিজে গিয়েছিল। জামা পাল্টালেও নতুন সাদা শার্টটা নষ্ট হয়ে গেছে রক্তের দাগ লেগে।

'ঠিক, তাহলে আজ নয়'। বলে আহমদ হাত্তা কিছু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা কেয়ার টেকারের দিকে এগিয়ে গেল। তাকে কিছু বলতেই সে পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে মি. আহমদ হাত্তার হাতে দিল। আহমদ হাত্তা কার্ডটি নিয়ে আহমদ মুসাকে দিল।

আহমদ মুসা কার্ডে একবার চোখ বুলিয়ে দেখল তাতে রেস্টহাউজের ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর দুই-ই রয়েছে।

'তাহলে চলি মি. হাত্তা'। বলে আহমদ মুসা হাত্তার সাথে হ্যান্ডশেক করে এগুলো ওয়াং আলীর দিকে।

ওয়াং আলীকে তখন স্ট্রেচারে তোলা হয়েছে। পূর্ণ সজ্ঞানে এখন ওয়াং আলী।

আহমদ মুসা তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'সব ঠিক হয়ে যাবে ইয়াংম্যান। আল্লাহ তোমাকে সত্বর সুস্থ করুন'।

ওয়াং আলী প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল অপরিচিত ও অসাধারণ আকর্ষণীয় যুবক আহমদ মুসার দিকে। বিষ্ময় ফুটে উঠল তার চোখে রক্তের দাগ লাগা আহমদ মুসার জামা-কাপড় দেখে।

পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল আহমদ হাত্তা নাসুমন। সে ওয়াং আলীকে বলল আহমদ মুসার দিকে ইংগিত করে, 'ইনিই আমাদের উদ্ধার করেছেন ওয়াং। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তোমাকে কোলে করে বের করে এনেছেন ইনিই। আরও অনেক চমকপ্রদ কাহিনী আছে, শুনবে তুমি'।

আহমদ মুসা সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পাশের বার্নারডোকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'সাবধান থেকো বার্নারডো'।

'জ্বি স্যার। দোয়া করুন'। বলল বার্নারডো।

'রাতেই তোমার সাথে একবার আমি কথা বলব। তোমাকে সকালেই সম্ভবতঃ সহকারী পুলিশ কমিশনারের কাছে যেতে হবে'।

'ঠিক আছে স্যার। আমি সব সময়ের জন্য প্রস্তুত'। বলল বার্নারডো।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'আর স্যার নয় বার্নারডো। মুসলমানরা সবাই ভাই ভাই'।

'আসি'। বলে সবাইকে সালাম জানিয়ে আহমদ মুসা এসে গাড়িতে উঠল।

স্টার্ট নিয়ে গাড়ি উঠে এল এভিনিউতে।

ছুটল গাড়ি পূর্ব পারামারিবোর টেরেক স্টেটের দিকে।

ওভানডোদের টেরেক স্টেটের এলাকায় পৌঁছে গেছে আহমদ মুসা।

টেরেক স্টেট এর নাম মনে পড়ায় আহমদ মুসার মনে প্রশ্ন জাগল 'টেরেক' কোন ভাষার শব্দ। ডেনিস, পর্তুগীজ, স্প্যানিশ কিংবা ইংরেজী ভাষায় এ ধরণের শব্দ নেই। সুরিনামের কোন ভাষারও শব্দ এটা নয়। আফ্রিকান কোন ভাষা থেকেও এ শব্দ আসেনি। ওভানডোরা ছাড়াও অনেককে জিজ্ঞেস করে আহমদ মুসা এ শব্দের কোন হদিস পায়নি। কারও নাম অনুসারে হয়তো এই নামকরণ করা হয়েছে। কিন্তু এমন নামতো কারো হবার কথা নয়।

আহমদ মুসার গাড়ি এখন চলছে টেরেক স্টেটের বাউন্ডারী ওয়ালের পাশ দিয়ে।

বিশাল টেরেক স্টেটটি চারদিক থেকে বাউন্ডারী প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। টেরেক স্টেটের পশ্চিম পাশে সরকারী অফিস এলাকা। বিশেষ করে কোর্ট ভবনগুলো এখানে অবস্থিত। উত্তর পাশে সমুদ্র উপকূলের সমান্তরালে বিশাল এলাকা জুড়ে সেনা ছাউনি এবং সেনা বাহিনীর সদর দফতর। দক্ষিণের বাউন্ডারী ওয়ালের সমান্তরালে ওসেয়ান হাইওয়ে। হাইওয়েটি সামনে বীচ পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে উত্তর দিকে মোড় নিয়ে বীচের পশ্চিম প্রান্ত ধরে এগিয়ে গেছে উত্তর সুরিনামের দিকে। টেরেক স্টেটের পূর্ব বাউন্ডারী ওয়ালের ধার ঘেঁষেই এ রাস্তা উত্তরে এগিয়েছে। আর টেরেক স্টেটের দক্ষিণ বাউন্ডারী প্রাচীরের পরেই যে ওসেয়ান হাইওয়ে তার সমান্তরালেই সুরিনাম নদী বয়ে গেছে সাগরের দিকে।

সবদিক থেকেই টেরেক স্টেটের অবস্থান অত্যন্ত লোভনীয়। খুব ভালো লাগে টেরেক স্টেট আহমদ মুসার। আহমদ মুসার যখন ভালো লেগেছে, তখন সবারই ভালো লাগার কথা। তার উপর এর সাথে যোগ হয়েছে টেরেক স্টেটের মাটির তলায় জাহাজ বোঝাই স্বর্ণ মজুদ থাকার কথা। সব মিলিয়েই আজ মহাবিপদ চেপেছে টেরেক স্টেটের মাথায়।

টেরেক স্টেটের একটাই মাত্র গেট। সেটা দক্ষিণ প্রাচীরে, ওসেয়ান হাইওয়ের মুখোমুখি।

টেরেক স্টেটের দক্ষিণ বাউন্ডারী প্রাচীরের সমান্তরালে ওসেয়ান হাইওয়ে ধরে চলছে আহমদ মুসার গাড়ি।

টেরেক স্টেটের গেট আর বেশি দূরে নয়। গেটের দুপাশের দুটি আলো দেখতে পাচ্ছে আহমদ মুসা।

হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ ও কর্কশ শব্দ কানে এল আহমদ মুসার।

শব্দটা সামনে থেকেই আসছে।

সামনে তাকিয়ে উৎকর্ণ হলো আহমদ মুসা।

হ্যাঁ, শব্দটা টেরেক স্টেটের গেট থেকে আসছে। কেউ ভারী রড দিয়ে যেন গেটে আঘাত করছে।

বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল আহমদ মুসার। কেউ কি বাইরে থেকে গেট খোলার চেষ্টা করছে।

গাড়ির গতি স্লো করে দিয়েছিল আহমদ মুসা। এখন একেবারে থামিয়ে দিল গাড়ি।

আহমদ মুসা গাড়ির জানালা দিয়ে উঁকি মারল। গেটের আলোয় সে দেখতে পেল গেটের সামনে দুটি মিনি মাইক্রো দাঁড়িয়ে আছে।

দুজন লোক তাদের হাতের রড দিয়ে গেটে আঘাত করছে আর ডাকছে কাউকে। নিশ্চয় গেটম্যানকে।

দুটি গাড়িই অপরিচিত মানে ওভানডোদের নয়। আর গাড়ি দুটি ওভানডোদের হতে পারে না এই কারণে যে, ওভানডোরা গেটে ধাক্কাবার কথা নয়। নির্দিষ্ট সংকেত আছে সে সংকেত অনুসারে হর্ণ বাজালেই কিংবা টোকা দিলেই দরজা খুলে যায়।

সুতরাং গাড়ি দুটি বাইরের।

ঘড়ির দিকে তাকাল আহমদ মুসা। রাত ১১টা বাজে। এ সময় খবর না দিয়ে বাইরের কেউ টেরেক স্টেটে আসার কথা নয়। তাহলে কি ঐ শত্রুদের কেউ?

আহমদ মুসা গাড়ির আলো আগেই নিভিয়ে দিয়েছে। গাড়িটাকে প্রাচীরের পাশে অন্ধকার এলাকায় সরিয়ে নিল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা হোলস্টারে হাত দিয়ে তার এম-১০ একবার স্পর্শ করল। তারপর গাড়ি থেকে নেমে এল আহমদ মুসা।

গাড়ি থেকে নেমে আহমদ মুসা প্রাচীরের গোড়া ধরে ছায়ান্ধকারের মধ্যে দিয়ে বিড়ালেল মত নিঃশব্দে এগুতে লাগল। দেয়ালের গোড়া দিয়ে মাঝে মাঝে ছোটখাট গাছ-গাছড়া থাকায় এগুতে তার সুবিধা হলো।

গেটের একদম পাশে একটা ছোট্ট গাছের আড়ালে গুঁড়ি মেরে বসল আহমদ মুসা। গেটের সবটা দেখা যায় সেখান থেকে।

আহমদ মুসা দেখল, যে দুজন রড দিয়ে দরজায় আঘাত করে গেটম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছিল, তারা গেট থেকে সরে গাড়ি দুটির কাছে এসে বলল, 'এভাবে দরজা খোলা যাবে না'। এর পরেই গাড়ি থেকে একজনের ভারী কন্ঠ ধ্বনিত হলো, 'তোমরা সবাই নেমে পড়। গেট টপকাতে হবে'। কন্ঠটি থেমে যাবার সংগে সংগেই দুগাড়ি থেকে দশজন লোক নেমে এল। তাদের সবার হাতে স্টেনগান।  সামনের গাড়ির সামনের সিট থেকে সর্বশেষে নামল গেরুয়া ইউনিফরম পরা কপালে তিলক আঁকা প্রায় ছয়ফুট দীর্ঘ একজন মধ্যবয়সী মানুষ। নেমেই সে বলল, 'সবাই গেট ডিঙানোর দরকার নেই। চারজন গেটের উপরে উঠবে। দুজন পাহারা দেবে আর দুজন নিচে নেমে গেট খুলে দেবে'।

আহমদ মুসা চিন্তা করল, ওদেরকে গেট খুলে ভেতরে ঢোকার সুযোগ দেয়া ঠিক হবে না। এদের মটিভ এখন আহমদ মুসার কাছে পরিষ্কার। এরা তিলক লাজপত পালের 'মায়ের সূর্য সন্তান' দলের লোক নিশ্চয়। এসেছে ওভানডোর বাড়িতে হত্যা অভিযানে।

আহমদ মুসা তার এম-১০কে ওদের দিকে তাক করল। তারপর তর্জনি নিয়ে গেল এম-১০ এর ট্রিগারে।

উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা। বলে উঠল উচ্চ কন্ঠে, 'আপনাদের মতলব সিদ্ধ হবে না। সবাই অস্ত্র ফেলে দিন'। ছুরির তীক্ষ্ণ ফলার মত ধারালো আহমদ মুসার কন্ঠস্বর।

ওরা সবাই চমকে ফিরে তাকিয়েছিল আহমদ মুসার দিকে। কিন্তু গেরুয়া ইউনিফরম ধারীর চোখ আহমদ মুসার দিকে ফেরার সাথে সাথে তার ভয়ংকর উজিগানটাও ফিরেছিল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসার অতি সতর্ক দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল কি ঘটতে যাচ্ছে। চোখের পলক পরিমাণ সময়ও নষ্ট হয়নি তার। তার তর্জনি চেপে বসেছিল এম-১০ এর ট্রিগারে। গুলীর প্রথম ঝাঁকটা ছুটে গেল গেরুয়া ইউনিফরমধারীকে লক্ষ্য করে। তারপর চোখের পলকে তার এম-১০ এর ব্যারেল ঘুরে এল দুটি মাইক্রোর পাশে দাঁড়ানো লোকদের উপর দিয়ে।

ওদের কল্পনার বাইরে আকষ্মিকভাবে ঘটে গেল ঘটনা। আক্রমন ও আত্মরক্ষার কোন সুযোগই তারা পেল না। গেরুয়া ইউনিফরমধারী দারুণ ক্ষিপ্রতার সাথে আক্রমনে আসার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সময়ে কুলায়নি। আহমদ মুসার প্রস্তুত এম-১০ তার আগেই আক্রমণে অবতীর্ণ হয়েছে। এরই ফল হিসেবে দুগাড়ির পাশে ৯টি লাশ পড়ে গেল।

এদের উপর দিয়ে এম-১০ ঘুরিয়ে নেবার পর আহমদ মুসা এম ১০-এর ট্রিগার থেকে তর্জনী সরিয়ে নিয়েছিল। তার এম-১০ এর নলও নিচের দিকে একটু নুইয়ে পড়েছিল। এ সময় হঠাৎ আহমদ মুসার খেয়াল হলো ওদের চারজন তো গেটে উঠছিল।

বিদ্যুত বেগে আহমদ মুসার চোখ ঘুরে গেল গেটে। দেখল, গেটের একজনের স্টেনগানের ব্যারেল উঠে আসছে তাকে লক্ষ্য করে।

দেখার পর এক মুহূর্তও সে নষ্ট করেনি। পা দুটোকে ঠিক রেখে দেহটাকে সে ঠেলে দিল প্রাচীরের গোড়ায়।

আহমদ মুসাকে তাক করা লোকটিও গুলী করতে দেরি করে ফেলেছিল। এক হাতে গেট ধরে রেখে অন্য এক হাতে স্টেগান আগলাতে একটু দেরি করে ফেলেছিল সে। তার গুলীর ঝাঁক যখন ছুটে এল আহমদ মুসার লক্ষ্যে, তখন আহমদ মুসার দেহটি প্রাচীরের গোড়ায়। গেটের পাল্লায় দাঁড়িয়ে ছোঁড়া গুলী দেয়ালের এই গোড়ায় আসা সম্ভব নয় মাঝখানে প্রাচীরের কোণা আড়াল সৃষ্টি করার কারণে।

কিন্তু ওদের স্টেনগানের গুলি সমানে ছুটছে আহমদ মুসা যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেই স্থান লক্ষ্যে।

আহমদ মুসা দেয়ালের গোড়া ধরে ক্রলিং করে দ্রুত এগুতে লাগল গেটের দিকে।

আহমদ মুসা লক্ষ্য করল, ওদের স্টেনগানের গুলীর উচ্চতা কমে আসছে। এর অর্থ ওরা গুলী ছুঁড়তে ছুঁড়তে ধীরে ধীরে গেট থেকে নেমে আসছে, বুঝল আহমদ মুসা। আহমদ মুসা তার ক্রলিং দ্রুত করল।

গেটের দিক থেকে এক গুচ্ছ শব্দ ভেসে এল। ওরা গেটের পাল্লা থেকে নিচে মাটিতে লাফিয়ে পড়েছে, বুঝল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা থেমে গেল।

তার এম -১০ তাক করল প্রাচীরের সমান্তরালে। তাকে খোঁজার জন্যে ওদেরকে অবশ্যই গেট ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে হবে। বেরিয়ে না এলে তাকে টার্গেটও করতে পারবে না। ওদের চেয়ে আহমদ মুসা সুবিধাজনক অবস্থানে আছে। খুশি হলো আহমদ মুসা।

ওদের গুলী বন্ধ হয়ে গেছে। বুঝল আহমদ মুসা এটা ঝড়ের পূর্বক্ষণ।

আহমদ মুসার তর্জনি এম-১০ এর ট্রিগারে।

রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে সে।

হঠাৎ ঝড় শুরু হয়ে গেল। ওরা চারজন গুলি করতে করতে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এল।

আহমদ মুসার তর্জনি পলক পরিমাণ সময়ও বিলম্ব করেনি। ওদের দেহ প্রাচীরের সমান্তরাল রেখা অতিক্রম করে দৃশ্যমান হবার সাথে সাথে তর্জনি চেপে বসেছে এম-১০ এর ট্রিগারে।

গুলীর অব্যাহত ঝাঁক ছুটে গেল গেটের সামনের প্রাচীরের সমান্তরাল এলাকা জুড়ে।

ওরা গুলী করতে করতে বেরুল বটে, কিন্তু এম-১০ এর গুলী বৃষ্টির দেয়াল তারা অতিক্রম করতে পারল না। ঝাঁক ধরে আসা বুলেটের আঘাত নিয়ে ওদের দেহ ছিটকে পড়ল এদিকে সেদিকে।

এ সময় পূর্ব দিক থেকে পুলিশের একাধিক হুইসেলের আওয়াজ ভেসে এল।

আহমদ মুসা বুঝল, গুলীর আওয়াজ পেয়ে টহল পুলিশ এদিকে এগিয়ে আসছে।

আহমদ মুসা সিদ্ধান্ত নিল, এই মুহূর্তেই তাকে এখান থেকে সরে যেতে হবে। পুলিশের হাংগামা চুকলে তারপর ফিরে আসা যাবে।

মাথা নিচু করে গুড়ি মেরে আহমদ মুসা দৌড় দিল প্রাচীরের গোড়া ধরে পশ্চিম দিকে।

কিছু দুরে প্রাচীরের পাশে আহমদ মুসার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

আহমদ মুসা গিয়ে গাড়িতে উঠল। গাড়ির আলো নিভিয়ে রেখেই দ্রুত গাড়ি সে ঘুরিয়ে নিল।

ছুটল আহমদ মুসার গাড়ি ওসেয়ান হাইওয়ে ধরে পশ্চিম দিকে। একবার পেছনে তাকিয়ে আহমদ মুসা দেখল, পুলিশ গেটের কাছাকাছি পৌঁছেছে। আহমদ মুসা ভাবল, পুলিশের চোখ গেটের দিকে কেন্দ্রিভূত থাকায় তার আলো নেভানো গড়ি তাদের নজরে নাও পড়তে পারে।

কোর্ট কমপ্লেক্সের পশ্চিমে এবং সুরিনাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বে মাঝখানের জায়গাটিতে একটা পার্ক আছে। নাম ইস্ট পার্ক। পার্কের বাউন্ডারী ও রাস্তা বরাবর মাঝখানে অনেক জায়গা। এ জায়গায় সারিবদ্ধ ঝাউ ও অন্যান্য গাছ।

আহমদ মুসা এইসব গাছের আড়াল নিয়ে তার গাড়ি দাঁড় করাল।

ঘড়ি দেখল আহমদ মুসা। রাত সাড়ে ১১টা বাজে।

আহমদ মুসা নিশ্চিত তাকে দীর্ঘ সময় এখানে কাটাতে হবে। ওখানকার পুলিশ হাংগামা কতক্ষণে চুকবে, তারপরই সে যেতে পারবে। পুলিশ নিশ্চয় ওভানডোদের ডাকবে, কারণ তাদেরই গেটে ঘটেছে ঘটনা।

পুলিশ কি ওভানডোদের জড়াতে পারে ঘটনার সাথে? তা পারবে না। লাশগুলোর অবস্থান ও আহত হওয়ার প্রকৃতি থেকেই প্রমাণ হবে গুলী পশ্চিম দিক থেকে হয়েছে। নিশ্চয় তাদের অনুসন্ধানে গুলীর খোশাও বেরিয়ে পড়বে।

এসব সাত পাঁচ চিন্তা নিয়ে অনেকক্ষণ বসে কাটাল আহমদ মুসা কিন্তু ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়ছে তার। বসে থাকতে পারছে না।

ড্রাইভিং সিটে মাথা রেখে পা ছড়িয়ে দিল পাশের সিটের উপর। কোন রকমে শোয়ার একটা ব্যবস্থা হলো।

খারাপ লাগছে না আহমদ মুসার। শোবার এতটুকু সুযোগকেই এখন তার কাছে অমৃত বলে মনে হচ্ছে।

হাসি পেল আহমদ মুসার। সময় ও সুযোগের পরিবর্তনে মানুষের চাওয়া-পাওয়ার প্রকৃতি কত যে রূপ পাল্টায়।

কাছেই কোথেথকে প্যাঁচার ডাক কানে এল আহমদ মুসার। নিশ্চয় পাশেই পার্কের কোন গাছে এসে বসেছে প্যাঁচাটা।

ডেকেই চলল প্যাঁচাটা।

রাতের নিঃশব্দ প্রহরে এই ডাক অপরিচিত এক পরিবেশের সৃস্টি করল।

হঠাৎ মনে পড়ল ডোনা জোসেফাইনের কথা। আহমদ মুসার ঠোঁটে এক টুকরো মিষ্টি হাসি ফুটে উঠল। এই প্যাঁচার ডাককে ডোনা অপছন্দ করে, ভয় করে। মনে পড়ল সৌদি আরবের আসির অঞ্চলের এক মরুদ্যানে রাত কাটাবার কথা। সেটা ছিল মরুভূমির ভীতিকর এক নিঃশব্দ রাত। মৃতপুরীর মত নিরবতা চারদিকে। এই সময় নিরবতার বুকে বোমা বিষ্ফোরণের মত ডেকে উঠেছিল প্যাঁচার কন্ঠ।

ডোনা বিছানার ওপ্রান্ত থেকে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরেছিল আহমদ মুসাকে। প্যাঁচা চলে না যাওয়া পর্যন্ত ডোনা তাকে ছাড়েনি। আহমদ মুসা হাসলে ডোনা বলেছিল, 'রাতের নিঃশব্দ প্রহরে প্যাঁচার ডাকের মধ্যে একটা হাহাকার আছে, আমি ওটা সহ্য করতে পারি না'। আহমদ মুসা ডোনাকে জড়িয়ে ধরে লুকিয়ে ফেলেছিল বুকের মধ্যে।

অতীতের এই স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল আহমদ মুসার।

মনটা তার ছুটে গেল ডোনা জোসেফাইনের কাছে।

ডোনা এখন কি করছে? সৌদি আরবে এখন রাত সাড়ে ৮টা। ডোনা রাতের ডিনার সেরে এখন নিশ্চয় বাগান সংলগ্ন বারান্দায় পায়চারি করছে, অথবা ইজি চেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় কোন বই পড়ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শুতে যাবে ডোনা। শেষের চিঠিটায় ডোনা লিখেছে, শোবার সময় সে পশ্চিমের জানালাটা খুলে দেয়। বালিশে মাথা রেখে জানালা দিয়ে পশ্চিম দিগন্তের দিকে তার দুচোখ মেলে ধরে। তার চোখের সামনে এসে দাঁড়ায় ছবির মত সাজানো আমেরিকা দেশটি। আহমদ মুসা জীবন্ত রূপ ধরে হাজির হয় তার চোখে। সেদিকে অপলক তাকিয়ে হাজারো কল্পনার জাল বুনতে বুনতেই সে ঘুমিয়ে পড়ে।

আহমদ মুসারও দুচোখ হাজার হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে হাজির হলো মদিনা শরীফের তার সুন্দর বাড়িটিতে। দেখতে পাচ্ছে সে ইজি চেয়ারে আধশোয়া ডোনা জোসেফাইনকে। আরও অপরূপ হয়েছে ডোনা জোসেফাইন। তার পলকহীন চোখ তাকে দেখছে তো দেখছেই, মন বুনছে নানা সুখ-স্বপ্নের জাল।

এক সময় ধীরে ধীরে বুজে গেল আহমদ মুসার চোখ। ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে গেল সে।

ঘুম ভাংতেই তড়িঘড়ি করে উঠে বসল আহমদ মুসা। দেখল, চারদিকটা একদম ফর্সা হয়ে গেছে। পাখির কল-কাকলীতে ভরে গেছে পাশের পার্ক। একটু মন খারাপ হয়ে গেল আহমদ মুসার। শেষ পর্যন্ত রাতটা এখানেই কেটে গেল। কখন ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝতেই পারেনি। ওদিকে ওভানডোদের কি অবস্থা কে জানে।

আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি নিচে নেমে তায়াম্মুম করে নামাজ পড়লো।

তারপর গাড়িতে উঠে গাড়ি চালিয়ে চলে এল রাস্তায়। ছুটে চলল গাড়ি ওভানডোদের বাড়িরে দিকে।

কিছুদূর থাকতেই ওভানডোদের গেটের দিকে লক্ষ্য করল আহমদ মুসা। না, গেটে কেউ নেই। গেট পরিষ্কার। আহমদ মুসা আশংকা করেছিল গেটে পুলিশ পাহারা বসতে পারে। পুলিশ কর্তৃপক্ষ যদি গেটের ঘটনার জন্যে ওভানডোদের সন্দেহ করে, তাহলে গেটে পুলিশ পাহারা বসতে পারে। আবার পুলিশ যদি ওভানডোদের নিরাপত্তার আশংকা করে, তাহলেও পুলিশ পাহারা বসতে পারে। মনে হয় পুলিশ ওভানডোদের সন্দেহ করে নি, আবার তাদের নিরাপত্তার আশংকাও করেনি। তাহলে কি পুলিশ গেটের ঘটনাকে রাস্তার কোন ঘটনা বলে মনে করেছে যা ঘটনাক্রমে ওভানডোদের গেটে সংঘটিত হয়েছে।

ওভানডোদের স্টেটের গেটে গিয়ে দাঁড়াল আহমদ মুসার গাড়ি।

নির্দিষ্ট নিয়মে দুবার হর্ণ বাজতেই খুলে গেল দরজা।

গেট খুলে দরজায় এস দাঁড়িয়েছে দুজন। আহমদ মুসাকে দেখে ওরা ভীষন খুশি হয়ে উঠল।

আহমদ মুসা গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ওদের কুশল জিজ্ঞেস করতেই ওদের একজন চোখে মুখে আতংকের ভাব সৃষ্টি করে গড় গড় করে বলে চলল রাতে গেটে কি মহাঘটনা ঘটেছিল সেই কাহিনী। সব শেষে বলল, 'স্যার বাড়ির কেউ আজ ঘুমায়নি, সবাই জেগে বসে আছে আপনার জন্যে। চিন্তিত সবাই'।

গেটম্যানদের ধন্যবাদ দিয়ে আহমদ মুসা চলল ওভানডোদের বাড়ির দিকে।

গাড়ি বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছতেই আহমদ মুসা দেখল, বাড়ির সবাই বেরিয়ে এসেছে। ওভানডোর দাদী পর্যন্ত তাদের মধ্যে রয়েছে। সবার চেহারার মধ্যে একটা বিপর্যস্ত ভাব। সত্যিই তাহলে ওরা ঘুমায়নি, ভাবল আহমদ মুসা। গেটের ঘটনা নিয়ে অবশ্যই সারারাত ওদের উদ্বেগে কেটেছে।

আহমদ মুসাকে দেখে ওদের বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যে নতুন জীবনের একটা আনন্দ ফুটে উঠেছে।

আহমদ মুসা ওদের সামনে গাড়ি দাঁড় করাতে যাচ্ছিল।

ওভানডোর মা দুধাপ এগিয়ে এসে হাত নেড়ে আহমদ মুসাকে গাড়ি দাঁড় করাতে নিষেধ করল। বলল, ‘বাছা তুমি যাও’।

রাস্তার উপর দাঁড়ানো ওরা সবাই দুধারে সরে গিয়ে গাড়ির পথ করে দিল।

আহমদ মুসা ধীরে ধীরে গাড়ি চালাল। গাড়ির দুধার দিয়ে ওরা হাঁটছে।

আহমদ মুসার ড্রাইভিং জানালার পাশ দিয়ে হাঁটছে ওভানডো, লিসা এবং ফাতিমা।

আহমদ মুসাকে উদ্দেশ্য করে লিসা বলল, ‘জানেন আমরা সারারাত কেউ ঘুমাতে পারিনি। আপনি কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলেন?’

‘হারিয়ে গিয়েছিলাম মানে?’ বলল আহমদ মুসা।

‘বা! আপনি ফাতিমার আব্বার ওখান থেকে বেরিয়েছেন সাড়ে দশটায়, তারপর সারারাত খোঁজ নেই’। বলল লিসা অভিমান ক্ষুব্ধ ক্ষোভের সাথে।

‘এ খবর জানলে কি করে?’ আহমদ মুসা বলল।

‘রাত ১২টার দিকে ফাতিমার আব্বা টেলিফোন করেছিলেন। তারপর সারারাত ধরেই উনি টেলিফোন করেছেন। অন্ততঃ বিশবার তিনি টেলিফোন করেছেন। ওনার এবং আমাদের সবারই শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা’। আবেগ অভিমানে কাঁপছিল লিসার গলা।

গাড়ি তখন পৌঁছে গেছে গাড়ি বারান্দায়।

আহমদ মুসা গাড়ি থেকে নামল।

নেমেই লিসার কথার জবাব দিল। বলল, ‘এমনটা ঘটা স্বাভাবিক, সত্যি আমি দুঃখিত’।

ততক্ষণে আহমদ মুসার শরীরের উপর নজর পড়ে গেছে সবার। সবাই ছুটে এল।

‘গায়ে এত রক্ত?’ তোমার কি হয়েছে বাছা?’ ‘আপনি ঠিক আছেন তো?’ প্রায় সবাই এক সাথে নানা প্রশ্ন করল আহমদ মুসাকে।

ওভানডো এসে জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে। বলল, ‘চলুন, ভেতরে চলুন’।

'তোমরা বাছাকে না দেখে-শুনেই তার সাথে ঝগড়া শুরু করে দিয়েছ'। বলল ওভানডোর মা লিসাকে লক্ষ্য করে।

আহমদ মুসা বুঝাতে চেষ্টা করল যে, তার কিছু হয়নি, ভালো আছে সে। কিন্তু তাকে কথা বলতেই দিল না কেউ। তাকে ধরে নিয়ে চলল বাড়ির ভেতর।

একেবারে তাকে নিয়ে গেল তার শোবার ঘরে। তাকে শুইয়ে দেবে, এই অবস্থা দাঁড়াল।

আহমদ মুসা ওভানডোর হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সোফায় গিয়ে বসল। সবাই তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। সবাই দেখতে চায় তার আঘাত কোথায়। ডাক্তার ডাকা, এ্যাম্বুলেন্স ডাকা, ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে।

আহমদ মুসা সোফায় বসে দুহাত তুলে সবাইকে বসতে বলে বলল, 'আপনাদের ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই। আমি আহত হইনি, আমি ভালো আছি। আমার গায়ে যে রক্ত দেখছেন তা ওয়াং আলীর রক্ত। তাকে আহত অবস্থায় কোলে নিতে হয়েছিল'।

কথাটা শেষ করেই তাকাল ফাতিমা নাসুমনের দিকে। বলল, 'তুমি আবার ভয় পেয়ো না। ওয়াং আলী গুরুতর আহত নয়। নিশ্চয় শুনেছ সে ভালো আছে'।

'আলহামদুলিল্লাহ। আপনাকে ধন্যবাদ ভাইয়া। এবারও আব্বাকে আপনিই উদ্ধার করলেন, সেই সাথে ওয়াংকেও'। শেষের কথাগুলো কান্নায় বুঁজে গেল ফাতিমার।

লিসা ফাতিমাকে কাছে টেনে নিয়ে তার পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে আহমদ মুসাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'স্যরি, আগের প্রশ্নই করছি, সারা রাত আপনি কোথায় ছিলেন?'

'ইস্ট পার্কের সামনের ঝাউ গাছগুলোর আড়ালে গাড়ি রেখে গাড়িতে ঘুমিয়ে কাটিয়েছি সারা রাত।

বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়ালো এবং সবাইকে উদ্দেশ্যে করে বলল, 'দু মিনিট প্লিজ, আমি কাপড় ছেড়ে আসছি'।

আহমদ মুসা দুপ্রস্ত কাপড় নিয়ে টয়লেটে ঢুকে গেল।

ওভানডোর মা ওভানডোর স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলল, 'বউমা তুমি গিয়ে বাছার জন্যে নাস্তা আর চা দিতে বলে এস। বাছা রাতে নিশ্চয় কিছু খায়নি'।

ওভানডোর স্ত্রী জ্যাকুলিন চলে গেল।

ঠিক দুমিনিট পর আহমদ মুসা নতুন কাপড় পরে তোয়ালে দিয়ে হাত-মুখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে এল।

বসল আহমদ মুসা তার সোফায়।

এ সময় ওভানডোর স্ত্রী জ্যাকুলিন নাস্তার ট্রলি ঠেলে নিয়ে এসে পৌঁছল।

লিসা তাড়াতাড়ি ট্রলি থেকে আহমদ মুসার সামনে নাস্তা সাজাতে সাজাতে বলল, 'এগুলো কিন্তু আপনার রাতের খানা। নাস্তার সময় আবার আমাদের সাথে নাস্তা করতে হবে'।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'যা ক্ষুধা লেগেছে, তাতে দুবার কেন, তিনবারও নাস্তা করতে পারব'।

সবাই হেসে উঠল।

আহমদ মুসা ফলের ঝুড়ি থেকে দুটো আঙুর তুলে নিয়ে পাশে বসা ওভানডোর দাদীর মুখোমুখি হয়ে বলল, 'দাদী হা করুন, দুটো আঙুর খেয়ে শুরু করে দিন। আমি শেষ করব'।

ওভানডোর দাদী খুশিতে হা করল। আহমদ মুসা দুটো আঙুর পুরে দিল তার মুখে।

ওভানডোর দাদী আঙুর চিবোতে চিবোতে বলল, 'ওভানডো দেখলি, তোর চেয়ে এ ভাই আমাকে বেশি ভালোবাসে। তুই খাবার সময় আমার কথা কখনও মনে করিস?'

হাসল ওভানডো। বলল, 'ঠিক আছে, উনি তোমার নম্বর ওয়ান নাতি হলে আমি দু নম্বর নাতি হতে রাজি আছি'।

ওভানডো থামতেই লিসা বলে উঠল, 'দাদী আমি কিন্তু এক নম্বর নাতনী'।

বলেই লিসা তাকাল ফাতিমার দিকে। বলল, ‘না তুমি আমার এক নম্বর আসন কেড়ে নেবার মতলব আঁটছ?’

হাসল ফাতিমা। সবাই হেসে উঠল।

আহমদ মুসা তখন খেতে শুরু করেছে। লিসা বলে উঠল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, ‘এবার তাহলে আমার প্রশ্ন শুরু করতে পারি?’

আহমদ মুসা কিছু বলার আগেই ওভানডোর মা বলে উঠল, ‘লিসা তোর পুলিশী জেরা এখন থাক। আমি বাছার সাথে একটু কথা বলি’।

তারপর ওভানডোর মা চাইল আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘তুমি সত্যিই ইস্ট পার্কে গাড়িতে শুয়েছিলে বাছা?’

‘জি হ্যাঁ’।

‘কিন্তু ঘটনা কি বাছা?’

আহমদ মুসা হাসল। বলছি আম্মা। তার আগে ওভানডোর কাছ থেকে একটা বিষয় জেনে নেই।

ওভানডোর দিকে তাকিয়ে আহমদ মুসা বলল, ‘ওভানডো, গেটের ঘটনার পর পুলিশ তোমাদের ডেকেছিল?’

‘হ্যাঁ ডেকেছিল’।

‘কেন ডেকেছিল?’

‘জিজ্ঞেস করেছিল, গাড়ি ও গাড়ির লোকদের আমরা চিনি কিনা। আমি বলেছিলাম, চিনি না। তারপর জিজ্ঞেস করেছিল, বাড়িতে কোন সময় ডাকাতি হয়েছে কিনা? আমি বলেছি, না হয়নি। এরপর জিজ্ঞেস করেছিল, ওরা গেটে ধাক্কা-ধাক্কি করেছিল কিনা? আমি না –সূচক জবাব দেই। আমাকে আর কিছু বলেনি ওরা’। বলল ওভানডো।

‘ঘটনা কিভাবে ঘটল, কে ওদের হত্যা করল এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেছে ওরা?’ আহমদ মুসা বলল।

‘ওদের আলোচনায় শুনলাম, গোলাগুলি শুনে পুলিশরা যখন গেটের দিকে ছুটে আসছিল, তখন ওদের দুজন নাকি একটা আলো নেভানো গাড়িকে পশ্চিম দিকে ছুটে যেতে দেখেছে। পুলিশের কথা শুনে মনে হলো, তিলক লাজপত

পালের সংগঠন ও অন্য কোন সংগঠনের মধ্যেকার পারস্পরিক বৈরিতার ফলেই এই হত্যাকান্ড ঘটেছে। তিলক লাজপত পাল স্বয়ং নিহত হয়েছে এই ঘটনায়'। বলল ওভানডো।

তিলক লাজপত পাল নিহত হওয়ার কথা শুনে চমকে উঠল আহমদ মুসা। বলল দ্রুত কন্ঠে, 'তিলক লাজপত পাল নিহত হয়েছে! তাহলে ঐ গেরুয়া ইউনিফরম পরা লোকটিই কি তিলক লাজপত পাল ছিল?'

বলে নাস্তার প্লেট থেকে হাত তুলে সোজা হয়ে বসল আহমদ মুসা। বলতে লাগল, 'যদি তা ঘটে থাকে, ঐ লোকটিই যদি তিলক লাজপত পাল হয়ে থাকে, তাহলে বড় একটা ঘটনা ঘটেছে'।

লাজপত পালকে ওভানডোরা কেউ চেনে না। কিন্তু লাজপত পাল সম্পর্কে আহমদ মুসার কথা সকলের মধ্যে বিষ্ময় সৃষ্টি করেছে। বলল লিসা, 'গেরুয়া ইউনিফরমধারীকে দেখলেন কি করে? সে খুন হয়েছে জানলেন কি করে?'

হাসল আহমদ মুসা। বলল রাতের সব ঘটনা। সব শেষে বলল, 'পুলিশ এসে পড়ায় আমি আর ভেতরে ঢুকিনি। ভেবেছিলাম ইস্ট পার্কের ওখানে কিছুটা অপেক্ষা করে পুলিশ চলে গেলে ভেতরে ঢুকব। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ায় তা আর হয়নি'। থামল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার কাহিনী সবাই শুনল। আহমদ মুসা থামলেও কেউ কোন কথা বলল না। আতংক ও উদ্বেগের ছায়া সকলের চোখে-মুখে। ওভানডোর মা উঠল তার সোফা থেকে। ধীরে ধীরে গিয়ে দাঁড়াল আহমদ মুসার পেছন দিকে। ডান হাত দিয়ে আহমদ মুসার মাথা স্পর্শ করে বলল, 'বাবা তোমাকে কি বলে আশীর্বাদ করব তার ভাষা আমার জানা নেই। ভাবতে আতংক বোধ হচ্ছে, তুমি ঠিক সময়ে গেটে না পৌঁছলে কিংবা ওদেরকে ঐভাবে শেষ করতে না পারলে ওরা ভেতরে প্রবেশ করত, তাহলে কি ঘটত! তুমি তৃতীয় বারের মত আমাদের পরিবারকে সর্বনাশ থেকে বাঁচালে বাবা'।

গম্ভীর হলো আহমদ মুসা। বলল, 'আল্লাহর ইচ্ছায় সব হয়েছে, আমি নিমিত্তমাত্র।গুলী করতে আমার সেকেন্ড পরিমাণ বিলম্ব হলে তিলক লাজপতের

গুলীতে আমার দেহ ঝাঁঝরা হয়ে যেত। অন্যদিকে তিলক লাজপত পালের গুলী করতে সেকেন্ড পরিমাণ দেরী হওয়ায় আমার গুলীতে তার দেহই শুধু ঝাঁঝরা হয়নি, তাদের সবাইকেই মরতে হয়েছে। জীবন-মৃত্যু নির্ধারিত হয়েছে সেকেন্ডের ব্যাবধানে। এই ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহর ইচ্ছায়'।

'আর বলোনা বাছা। বুক কাঁপছে আমার। এক সেকেন্ড আগে যদি সে গুলী ছুঁড়ত, তাহলে তোমার কি হতো বাছা। এসব কি শুরু হলো?' ভারী শোনাল ওভানডোর মায়ের কন্ঠ।

ওভানডোর মা ফিরে এল আসনে।

'জীবন-মৃত্যুর এ খেলায় আপনি নেমেছেন পরের জন্যে, আপনার খারাপ লাগে না?' বলল লিসা।

'পরের জন্যে কোথায় লিসা?' আমরা সকলে এক আদমের সন্তান না? আর কে কার জন্যে কি করবে, এটা আল্লাহই নির্ধারণ করে দেন। আমি তো কোনো দিন ইচ্ছা করিনি সুরিনামে আসবো। কিন্তু এসে গেছি। আল্লাহই আমাকে নিয়ে এসেছেন। আমি যা করছি আল্লাহরই কাজ করছি, আল্লাহর জন্যেই করছি'। বলল আহমদ মুসা।

কিছু বলতে যাচ্ছিল লিসা।

টেলিফোন বেজে উঠল। ধরল টেলিফোন ওভানডো। ওভানডো ওপারের কথা শুনেই বলে উঠল, 'স্যার আপনি ওঁর সাথেই কথা বলুন'।

বলে টেলিফোন আহমদ মুসার হাতে তুলে দিতে দিতে বলল, 'সাবেক প্রধানমন্ত্রী স্যারের টেলিফোন'।

আহমদ মুসা টেলিফোন ধরল। প্রথম কিছু সময় গেল গত রাতে বাড়িতে না ফেরার কারণ ব্যাখ্যায়। আহমদ মুসা টেলিফোনে যতটুকু বলা যায় ততটুকু বলল। তারপর জানাল, আমি ঠিক সকাল সাড়ে এগারটায় আপনার ওখানে পৌঁছব। আপনাকে সাথে নিয়ে সাড়ে বারটায় যাত্রা করব ইলেকশন অফিসের উদ্দেশ্যে। আমাদের থাকবে দুটি গাড়ি। সামনের গাড়ি ড্রাইভ করব আমি। আমার পাশে থাকবে বার্নারডো। পেছনের সিটের মাঝখানে বসবেন আপনি। আপনার এক পাশে বসবে আপনার দলের নির্বাচন পরিচালক, আরেক পাশে আপনার

সেক্রেটারী বসবে। আর পেছনের গাড়িতে থাকবে আপনার বাছাই করা পাঁচজন লোক। তাদের প্রত্যেকের কাছে রিভলবার থাকতে হবে। সাড়ে বারটায় স্টার্ট করার আগেই সব কাগজ পত্র তৈরী, ফরমাদি ফিলাপ করে ব্রীফকেসে রেখে দেবেন। জামানতের টাকার ড্রাফটাও যেন কাগজপত্রের সাথে থাকে'।

থামল আহমদ মুসা। ওপারের কিছু কথা শোনার পর আহমদ মুসা বলল, 'আপনি টেলিফোনটা বার্নারডোকে দিন'।

বার্নারডো টেলিফোন ধরলে আহমদ মুসা তার সাথে কুশল বিনিময়ের পর বলল, 'আমি কিছু কথা মি. হাত্তাকে বলেছি। তুমি সেগুলো ওঁর কাছ থেকে জেনে নিও। আর তোমার জন্যে কথা হলো, তুমি এ্যাসিস্টেন্ট পুলিশ কমিশনারের সাথে দেখা করো। আমরা সাড়ে বারটার দিকে নির্বাচন অফিসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছি। ইলেকশন অফিসের জন্যে আমরা যা করেছি, সেটা ওঁকে বলে তাঁকে অনুরোধ করবে তাঁর যদি কিছু করণীয় থাকে তিনি যেন করেন। ঠিক আছে?'

ওপার থেকে বার্নারডোর কথা শুনে আহমদ মুসা বলল, 'ঠিক আছে, রাখছি। ওয়াস সালাম'।

টেলিফোন আহমদ মুসা রেখে দিতেই ওভানডোর মা বলে উঠল, 'সাড়ে এগারটায় আবার বেরুচ্ছ বাছা?' তার কন্ঠে বিস্ময়।

'হ্যাঁ আম্মা। আজ নির্বাচনের জন্যে নমিনেশন পেপার সাবমিট করার শেষ দিন। ওরা সর্বাত্মক চেষ্টা করবে আহমদ হাত্তা যেন নমিনেশন পেপার জমা দিতে না পারে। আমরা চেষ্টা করব জমা দেয়ার জন্যে। আপনাদের সকলের দোয়া প্রয়োজন'। বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা থামলেও কেউ কোন কথা বললো না। সবাই ভাবছে। ঘটনার গুরুত্ব অনুভব করতে পারছে সবাই। তাদের পক্ষের, তাদের পছন্দের রাজনৈতিক শক্তি টিকে থাকা না থাকার সাথে তাদের ভাগ্যও কম জড়িত নয়। আহমদ হাত্তা সরকারের মেয়াদ শেষ হবার পর দেশ আজ সন্ত্রাসে ভরে গেছে। তাদের টেরেক পরিবারের উপর বিপদ নেমেছে এই সময়েই।

অবশেষে নিরবতায় ছেদ নামল। নিরবতা ভেঙে ওভানডোর দাদী বলল, 'বুঝতে পারছি। একটা সংকটকাল চলছে। এ সংকটে তোমারই প্রধান দায়িত্ব।

কিন্তু তুমি তোমার কথা ভাববে না ভাই। তুমি ঠিক না থাকলে কিছুই যে ঠিক থাকবে না'।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'আমি যদি আমাকে নিয়ে ভাবি, তাতে কোন লাভ হবে না। বরং তাতে দুর্বলই হয়ে পড়ব। যিনি ভাবলে আমার লাভ হবে, সেই আল্লাহ নিশ্চয়ই আমাকে নিয়ে ভাবছেন'।

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই লিসা বলে উঠল, 'জানেন আমরা একটা কুরআন শরীফ জোগাড় করেছি। ফাতিমা আমাদের শেখাচ্ছে'।

'এ সুখবরের জন্য ধন্যবাদ লিসা তোমাদেরকে'। তারপর ফাতিমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ফাতিমা তোমাকে ধন্যবাদ। তুমি কি কুরআনের অর্থও করতে পার?'

'জি হ্যাঁ ভাইয়া। আমি পরিবার থেকেই এটা শিখেছি। ছোটকালেই গৃহ শিক্ষকের কাছে আরবী ভাষা শেখা হয়ে গেছে। এখন হাদিস কুরআন সবই অর্থসহ পড়তে পারি'। বলল ফাতিমা নাসুমন।

'মোবারকবাদ ফাতিমা'। আহমদ মুসা বলল।

কিছু বলতে যাচ্ছিল লিসা।

কিন্তু তার আগেই ওভানডোর মা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলে উঠল, 'সবাই উঠ, আর কোন কথা নয়। বাছাকে বিশ্রাম করতে দাও'।

সবাই উঠে দাঁড়াল।

উঠতে উঠতেই লিসা বলল আহমদ মুসাকে, 'আচ্ছা আপনার মত মনকে ভয়হীন করতে হলে কি করতে হবে?'

'আল্লাহকে ভয় করতে হবে। আল্লাহকে যদি সত্যিকারের অর্থে ভয় কর, তাহলে অন্য সব ভয় মন থেকে দূর হয়ে যাবে। কারণ তখন তুমি ভাবতে শিখবে, আল্লাহ সব শক্তির বড় শক্তি। তিনি যখন ইচ্ছা করেন, তখনই তা হয়ে যায়, অতএব তার উপর ভরসা করলে কাউকে ভয় করার প্রশ্নই উঠে না'। বলল আহমদ মুসা।

'আমি বুঝতে পারছি না, কিভাবে আমার মনটা ঐ রকম হবে'। হতাশ কন্ঠ লিসার।

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই দাদী বলে উঠল, 'মুখের কথায় হবে না বোন, বিশ্বাসের শক্তিতে মনকে সজ্জিত করতে হবে'।

দাদীর মুখে এ কথা শুনে বিস্মিত হলো আহমদ মুসা। বলল, 'দাদী এ কথাই আমি বলতে যাচ্ছিলাম। আপনি এটা শিখলেন বা পড়লেন কোথায়?'

দাদীর মুখ গম্ভীর হলো। বলল, 'আমার দাদী শ্বাশুড়ীর ঘরে টাঙ্গানো কাঠের একটা বিলবোর্ডে এ ধরনের একটা কথা লেখা ছিল। বিল বোর্ডটা শুনেছি দুর্গের কোথাও ওঁরা পেয়েছিলেন'।

'বিল বোর্ডটা এখন নেই দাদী?' বলল আহমদ মুসা উৎসুক কন্ঠে।

'থাকতে পারে পুরনো কোন বাক্স-পেটরায়। দুর্গের অংশ নিয়ে তৈরী পুরনো বাড়িটা ভেঙে এ নতুন বাড়ি তৈরী করা হয়। নতুন বাড়ি সাজাবার সময় পুরনো অনেক জিনিষই ব্যবহার করা হয়নি। তোমার কথায় বিলবোর্ডটার প্রতি আমার আগ্রহ জেগেছে। দেখব খুঁজে পাওয়া যায় কিনা'। দাদী বলল।

'তুমি খুঁজবে কি দাদী, আমিই খুঁজে বের করব'। বলল লিসা।

হ্যাঁ, তুমি এক জিনিস বের করতে গিয়ে দশ জিনিস নষ্ট করবে। পুরনো কিছুতে তোমার হাত দিতে হবে না'।

কিছু বলতে যাচ্ছিল লিসা।

তার আগেই তার মা বলে উঠল, 'না আর কথা নয়। যাও ওদিকে গিয়ে দাদীকে বুঝাতে চেষ্টা কর যে, পুরনো কোন জিনিস খোঁজার মত যথেষ্ট ধৈর্য্য তোমার আছে'।

'আম্মা তুমি দাদীর পক্ষ নিলে'। প্রতিবাদের সুরে এ কথা বলতে বলতে লিসা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

ঘরের বাইরে এল সবাই।

# ৫

প্রেসিডেন্ট ভবনের পারিবারিক অংশ দক্ষিণ অলিন্দের পারিবারিক ড্রইংরুম।

প্রেসিডেন্ট জুলেস মেনডেল বসে আছেন এক সোফায়। মুখটা তার ঈষৎ নিচু। বিমর্ষ চেহারা।

তার সামনের সোফায় পাশাপাশি বসে আছে রাজনৈতিক দল সুরিনাম পিপলস কংগ্রেস (এসপিসি) এর চেয়ারম্যান রোনাল্ড রঙ্গলাল এবং মাসুস (মায়ের সূর্য সন্তান) সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান শিবরাম শিবাজী। তাদের দুজনকেই দেখাচ্ছিল উত্তেজিত।

'মাসুস' সংগঠনের চেয়ারম্যান ছিলেন তিলক লাজপত পাল। গত রাতে টেরেক স্টেটের গেটে অন্যদের সাথে সে নিহত হওয়ায় শিবরাম শিবাজী 'মাসুস'এর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।

কথা বলছিল শিবরাম শিবাজী। বলছিল সে, 'মাত্র দুরাত দুদিনে সবকিছু লন্ডভন্ড হয়ে গেল আমাদের। প্রথম ঘটনা ঘটেছে উত্তর সুরিনামে কোরাজ নদী সংলগ্ন আমাদের ঘাঁটিতে। সেখানে আমাদের ৮ জন লোক নিহত হয়েছে, ঘাঁটি হাত ছাড়া হয়েছে এবং প্রথমবারের মত আমাদের হাত থেকে দু'ডজনের মত বন্দী পলিয়ে গেছে। এরপর গত দুরাত একদিনে আমাদের ৬০ জনের মত লোক নিহত হয়েছে, আমাদের শীর্ষ নেতা তিলকসহ। ওভানডো মুক্ত হয়েছে এবং ওয়াং মুক্ত হয়েছে। ফাতিমা ও আহমদ হাত্তাকে ধরেও আমরা রাখতে পারিনি। ভূমিকম্পের মত এ ঘটনাগুলো কিভাবে ঘটল, কে ঘটাল আমরা বুঝতে পারছি না'।

থামল শিবরাম শিবাজী। তার কন্ঠ ভীষণ উত্তেজিত। চোখ-মূখ তার লাল।

‘আমাদের কাছে এটা চরম বিস্ময় যে, এ ঘটনাগুলো কে ঘটাল, কিভাবে ঘটল। আমরা আহমদ হাত্তাদের রিপাবলিকান পার্টির সবাইকে জানি। তাদের সাধ্য নেই এ ধরনের ঘটনা ঘটানোর’। বলল রোনাল্ড রঙ্গলাল। তার কন্ঠে উদ্বেগ।

‘তাহলে আহমদ হাত্তারা কি বাইরে থেকে লোক হায়ার করেছে?’

বলল প্রেসিডেন্ট জুলেস মেনডেল।

‘কিন্তু যে ঘটনাগুলো ঘটেছে, তাতে বেশী লোকের ভূমিকা দেখছিনা। মন্দিরের বন্দীখানা থেকে ওভানডোকে উদ্ধার করেছে একজন লোক। টেরেক স্টেটের গেটে গতরাতে যে ঘটনা ঘটেছে, পুলিশের বক্তব্য অনুসারে তা ঘটিয়েছে একজন লোক। ফাতিমাকে উদ্ধার করতে গিয়েছিল মাত্র দুজন লোক। শুধু আহমদ হাত্তা ও ওয়াংকে উদ্ধারের জন্যে পুলিশের পোশাকে পাঁচজন গিয়েছিল। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী পুলিশের ধারণা হলো সেখানে সব ঘটনা একজনই ঘটিয়েছে। বাইরে থেকে এমন একজন দুজন লোক এসে এসব ঘটাতে পারে?’ বলল রোনাল্ড রঙ্গলাল।

‘তাহলে কি এসব এ দেশের কোন টপ টেররিস্ট কিংবা সাবেক কোন পুলিশ বা গোয়েন্দা অফিসারের কাজ? তারাতো ‘মাসুস’ ও সুরিনাম পিপলস পার্টির দুর্বলতা সম্পর্কে জানে’। বলল পেসিডেন্ট।

‘আমাদের পুলিশ ও গোয়েন্দাদের আমরা চিনি মি. প্রেসিডেন্ট। তাদের কারো মধ্যেই এই সাহস ও ক্ষিপ্রতা নেই’। বলল রোনাল্ড রঙ্গলাল।

‘তাহলে শত্রুকেই আমরা যখন চিনছি না, তখন আমরা তাদের মোকাবিলা করব কি করে? পারামারিবোতে আমাদের যে ফাইটিং ফোর্স ছিল, যে ফোর্স বছরের পর বছর ধরে গড়ে তুলেছিলাম, সে ফোর্স প্রায় নিঃশেষ। আমি এ বিপর্যয়কে কিছুতেই স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে পারছিনা’। বলল শিবরাম শিবাজী।

‘অস্বাভাবিক কি আপনি চিন্তা করছেন?’ বলল রোনাল্ড রঙ্গলাল।

‘আমার মনে হচ্ছে দেশের পরিস্থিতিতে বড় রকমের একটা পরিবর্তন ঘটেছে। আমরা দেশের মুসলিম রাজনৈতিক শক্তিকে উৎখাত করতে চেয়েছিলাম। এ লক্ষ্যে কয়েক হাজার মুসলিম রাজনীতি সচেতন যুবককে শেষ

করেছি। তাদের নেতাকে কিডন্যাপ করে দেশের বাইরে বন্দী করে রেখেছিলাম। আমার মনে হচ্ছে গত দুরাতেই এ পরিবর্তন হয়, তাহলে আমি মনে করি খুব বড় একটা শক্তি আমাদের দেশে প্রবেশ করেছে। যারা আমাদের প্রতি একটা মারাত্মক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে'। বলল শিবরাম শিবাজী।

'আমি আপনার সাথে একমত মি. শিবরাম। নিশ্চয় ঐ রকম একটা কিছু ঘটেছে'। বলল রোনাল্ড রঙ্গলাল।

'কিন্তু গত এক মাসে দেশের বিমান বন্দর ও সমুদ্র বন্দর দিয়ে যারা দেশে প্রবেশ করেছে এবং গত এক মাসে হোটেলগুলোয় যারা এসেছে, তাদের পূর্ণ তালিকা আমার কাছে আছে। অপরিচিত ও উল্লেখ করার মত কোন বিদেশী তাদের মধ্যে নেই'। বলল প্রেসিডেন্ট।

'আসলে তারা ওভাবে জানান দিয়ে আসবে না'। শিবরাম শিবাজী বলল।

'ঠিক আছে ধরে নেয়া হলো একটা গ্রুপ দেশে প্রবেশ করেছে। এখন কি করণীয়?' বলল রোনাল্ড রঙ্গলাল।

'যদি এ রকম কোন গ্রুপ দেশে এসে থাকে রিপাবলিকান পার্টিকে সহযোগিতা করার জন্যে, তাহলে অবশ্যই তারা আহমদ হাত্তাসহ রিপাবলিকান নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ রাখবে। সুতরাং আহমদ হাত্তাসহ রিপাবলিকান নেতৃবৃন্দের উপর সার্বক্ষণিক নজর রাখতে হবে'। বলল শিবরাম শিবাজী।

'আমাদের পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ তাদের উপর নজর রাখছে। ঠিক আছে এটা আরও জোরদার করা যাবে'। প্রেসিডেন্ট বলল।

'ধন্যবাদ মি. প্রেসিডেন্ট। শুধু পুলিশের রুটিন পাহারা দিয়ে ওদের ধরা যাবে না। আমি মনে করি, দলের সাহসী ও চৌকশ ছেলে-মেয়েদেরকেও পুলিশের পাশাপাশি কাজে লাগাতে হবে'। বলল শিবরাম শিবাজী।

'আমিও একমত। এখন আপনারা আসুন আজকের বিষয় নিয়ে আলোচনা করি। আজ নমিনেশন পেপার ফাইলের শেষ দিন। আহমদ হাত্তাকে কিছুতেই নমিনেশন পেপার দাখিল করতে দেয়া যাবে না। এখন কি করা উচিত বলুন'। রোনাল্ড রঙ্গলাল বলল।

‘আপনারা কি চিন্তা করেছেন বলুন। পুলিশের পক্ষে কিংবা সরকারীভাবে সরাসরি কিছু করা সম্ভব হবে না’। বলল প্রেসিডেন্ট।

‘অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠনের পর এ পর্যন্ত আমরা যে সব পদক্ষেপ নিয়েছি তার লক্ষ্যই হলো আহমদ হাত্তার রাজনীতি বন্ধ করে দেয়া, তাকে নির্বাচনে দাঁড়াতে না দেয়া। আজ যদি আমরা তাকে নমিনেশন পেপার দাখিলে বাধা দিতে ব্যর্থ হই, তাহলে আমাদের এতদিনকার সব কাজ ব্যর্থ হয়ে যাবে। সুতরাং যে কোন মূল্যে তাকে আজ বাধা দিতে হবে। আমরা এ পর্যন্ত যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি তা হলো নির্বাচন অফিসমূখী সব রাস্তায় আমাদের পাহারা থাকবে। প্রত্যেকটা গাড়ি সার্চ করা হবে।আহমদ হাত্তাকে যে কোন মূল্যে আটকানো হবে’। বলল রোনাল্ড রঙ্গলাল।

রোনাল্ড রঙ্গলাল থামতেই প্রেসিডেন্ট বলে উঠল, ‘গত দুদিনের ঘটনা সামনে রাখার পর আপনারা কিভাবে নিশ্চিত হচ্ছেন যে আহমদ হাত্তাকে আপনারা আটকাতে পারবেন?’

‘তারা রাস্তায় মারামারি করে হত্যাকান্ড ঘটিয়ে নমিনেশন পেপার জমা দিতে আসবে এবং জমা দিয়ে চলে যাবে আমরা এটা মনে করি না। আমাদের লোক যারা আহমদ হাত্তাদের বাধা দেবে, তাদেরকে যদি ওরা খুন করে, তাহলে সংগে সংগে অন্য চারটি স্থানে পাহারায় বসা লোকরা মোবাইলে খবর পেয়ে যাবে এবং তারা সংগে সংগেই চলে আসবে নির্বাচন অফিসের সামনে। তারা একযোগে আহমদ হাত্তাকে আটক করবে খুনি হিসেবে এবং নমিনেশন পেপার দাখিলের সময় পার হয়ে গেলে তাকে থানায় সোপর্দ করবে অথবা অন্য কোন ব্যবস্থা করবে’। বলল রোনাল্ড রঙ্গলাল।

‘অন্য কি ব্যবস্থা করবেন?’ জিজ্ঞেস করল প্রেসিডেন্ট।

‘যেমন ধরুন আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করার পর পুলিশ ডেকে তাদের হাতে তুলে দিলাম। থানায় নিয়ে যাবার পথে আহমদ হাত্তা পালাতে গিয়ে পুলিশের গুলীতে মারা যাবে, ইত্যাদি’। বলল রোনাল্ড রঙ্গলাল।

‘না, না এরকম কিছু করা যাবে না। এতে আমাদের সরকারের বদনাম হবে। তার চেয়ে ভালো হবে যদি এ রকম হয় যে, আপনাদের গ্রুপগুলো নির্বাচন

অফিসের সামনে থেকে তাকে ধরে নিয়ে গেল, কিন্তু কে ধরে নিয়ে গেল তা কেউ স্বীকার করল না। গায়েব হয়ে গেল আহমদ হাত্তা। এতে সরকারের উপর দায়টা কম বর্তাবে'। বলল প্রেসিডেন্ট।

'প্রেসিডেন্ট, আপনি মোক্ষম ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন তাতে সাপও নিশ্চিত মারা পড়বে কিন্তু লাঠির কিছুই হবে না'। বলল শিবরাম শিবাজী উচ্ছসিত কন্ঠে।

রোনাল্ড রঙ্গলালও প্রেসিডেন্টকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'আমারও ধন্যবাদ গ্রহণ করুন মি. প্রেসিডেন্ট। আপনি যে রকম বলেছেন, সে রকম ঘটা মানুষের কাছেও যুক্তিযুক্ত হবে। মানুষ মনে করবে, নির্বাচন নিয়ে রাস্তায় হানাহানিরই ফল এটা এবং আহমদ হাত্তাকে কেউ ধরে নিয়ে যেতে পারে, আবার পালিয়ে আত্মগোপনও করতে পারে খুনের দায় থেকে বাঁচার জন্যে'।

হেসে উঠল প্রেসিডেন্ট ও শিবরাম শিবাজী দুজনেই। বলল প্রেসিডেন্ট, 'আর এ বিষয়টা মানুষকে বিশ্বাস করাবার মত প্রপাগান্ডা মেশিন আমাদের হাতে রয়েছে'।

কথাটা শেষ করে প্রেসিডেন্ট জুলেস মেনডেল গম্ভীর হয়ে উঠল। ভাবনার একটা চিহ্ন তার চোখে-মুখে ফুটে উঠল। বলল, 'আহমদ হাত্তাকে না হয় এভাবে সরানো গেলো, কিন্তু ঐ অদৃশ্য শক্তির কি হবে যা মাত্র দুরাত এক দিনে আমাদের ষাট-সত্তর জন লোককে খুন করে আমাদের সব পরিকল্পনাকে লন্ড-ভন্ড করে দিল? আহমদ হাত্তার যদি এ রকম কিছু ঘটে তাহলে ঐ শক্তি নিশ্চয় প্রতিশোধ নিতে পাগল হয়ে উঠবে'।

রোনাল্ড রঙ্গলাল বলে উঠল, 'প্রতিশোধ নিতে ছুটে আসতে পারে, আবার আহমদ হাত্তা নেই দেখে পালাতেও পারে। ভাড়াকারী বা হায়ারকারী না থাকলে, ভাড়ায় আসা লোকেরাও থাকে না'।

'আপনার যুক্তি ঠিক মি. রোনাল্ড। কিছুই ঘটবে না, ওরা পালিয়ে যাবে। কিন্তু এ ভালো চিন্তার পাশে খারাপ দিকটাও আমাদের বিবেচনা করা দরকার'। বলল প্রেসিডেন্ট গম্ভীর কন্ঠে।

'আপনি ঠিক বলেছেন মি. প্রেসিডেন্ট। খারাপ দিকটা নিয়েও আমাদের ভাবা দরকার। ঐ অদৃশ্য শক্তির মোকাবিলায় আমরা ব্যর্থ হয়েছি। নতুন সংঘাত

বাধলে এ ব্যর্থতা আরও প্রকট হতে পারে। আমাদের স্বীকার করতেই হবে, আমাদের ট্রেইন্ড ও কার্যকরী জনশক্তি গত দুদিনে প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আজ আহমদ হাত্তাকে ঠেকাবার জন্যে বিভিন্ন রাস্তায় যাদের আমরা পাহারায় বসাচ্ছি, তাদের অধিকাংশই সাদা পোশাকের পুলিশ। সিভিল ড্রেসে তারা আমাদের সহায়তা করছে। কিন্তু এভাবে পুলিশ দিয়ে আর কতদিন ওদের মোকাবিলা করা যাবে? এই অবস্থায় আমাদের নতুন কিছু চিন্তা করা দরকার'। শিবরাম শিবাজী বলল গম্ভীর কন্ঠে।

'নতুন চিন্তাটা কি হতে পারে বলুন?' বলল রোনাল্ড রঙ্গলাল।

'বলছি। তার আগে আরেকটা কথা বলি, পারলে গোটা টেরেক স্টেট, না পারলে অন্তত টেরেক দুর্গ কব্জা করা ও তার মাটির তলা থেকে এক জাহাজ পরিমাণ লুকিয়ে রাখা সোনা উদ্ধার করা আমাদের বড় টার্গেট। এ জন্যেও আমাদের শক্তি প্রয়োজন। সব মিলিয়ে আমি মনে করি, কোন মাফিয়া গ্রুপের সাহায্য নেয়া আমাদের প্রয়োজন। তারা অত্যন্ত কূশলী ও পেশাদার যোদ্ধা। তারাই পারবে এখানকার অদৃশ্য শক্তির মোকাবিলা করে আমাদের কার্যোদ্ধার করে দিতে।

আমার মনে হয় হাত্তারাও কোন মাফিয়া গ্রুপকেই হায়ার করেছে। না হলে এত অল্প সময়ে এতবড় বিপর্যয় আমাদের ঘটতে পারে না'। শিবরাম শিবাজী বলল।

শিবরাম শিবাজী থামলেও সংগে সংগে কথা বলল না প্রেসিডেন্ট কিংবা রোনাল্ড রঙ্গলাল। তারা গম্ভীর হয়ে উঠেছে।ভাবছে তারা। মুখ খুলল প্রথমে প্রেসিডেন্ট। বলল, 'তারা এ জন্যে বিরাট বিনিময় চাইবে। তাছাড়া রয়েছে অতগুলো সোনা উদ্ধারের ব্যাপার'।

'আমার মনে হয় সোনার একটা ভাগ দিতে চাইলে আর কিছুই তারা চাইবে না'। শিবরাম শিবাজী বলল।

'সোনার ভাগ কি তাদের দেয়া ঠিক হবে? আর সোনা যদি অবশেষে না পাওয়া যায়?' বলল রোনাল্ড রঙ্গলাল।

হাসল শিবরাম শিবাজী। বলল, ‘সোনা না থাকার প্রশ্নই উঠে না। তিলক লাজপত পাল লক্ষ ডলার খরচ করে সান্টো ডোমিঙ্গোর তদানিন্তন গভর্নর ওভানডোর উত্তরাধিকারী পাওলো রোসীর কাছ থেকে যে পুরনো ডুকমেন্টগুলো কিনেছিলো, তার একটিতে ওভানডো নিজের হাতে লিখেছে, ‘১৫০২ সালের ১লা জুন কলম্বাসের পরামর্শ উপেক্ষা করে দুটি সোনা বোঝাই জাহাজসহ ২৭টি জাহাজ স্পেনের উদ্দেশ্যে সমুদ্রে পাঠালাম। সবাই জানে এর মধ্যে ২০টি জাহাজ ঝড়ের কবলে পড়ে ক্যারিবিয়ান সাগরে ডুবে গিয়েছিল। আর ছয়টি ফিরে এসেছিল সান্টো ডেমিঙ্গোর উপকূলে। আর একটি সোনা বোঝাই জাহাজ পৌছেঁছিল স্পেনে। কিন্তু আসল ঘটনা হলো জাহাজ ডুবেছিল ১৯টি। একটি জাহাজ ঝড়ের ভিন্ন একটা ঘূর্নাবর্তে পড়ে দক্ষিণে ভেসে গিয়েছিল। এই জাহাজটি ছিল সোনা বোঝাই দ্বিতীয় জাহাজ। জাহাজের সৎ ও সত্যবাদী ক্যাপ্টেন সর্বশেষ বার্তায় আমাকে জানিয়েছিল, তার ক্ষতিগ্রস্ত ও নিমজ্জমান জাহাজটি সুরিনাম উপকূলে ল্যান্ড করেছে। তারপর সব যোগাযোগ তার সাথে আমার বন্ধ হয়ে যায়। এ জাহাজের তথ্যটি সবার থেকে আমি গোপন করি দুই কারণে। প্রথমতঃ স্পেন সরকারের অধিকতর শাস্তির হাত থেকে বাঁচতে, দ্বিতীয়তঃ সবাইকে বিশ্বাস করাতে পারব যে জাহাজটি ডুবে গেছে। আমার ইচ্ছা ছিল সুরিনাম থেকে সোনাগুলো নিজে উদ্ধার করার। কিন্তু পরিস্থিতি আমাকে সে সুযোগ দেয়নি। পরে এক সময় ভাবতে শুরু করি, যাক জাহাজটির ক্যাপ্টেন অত্যন্ত ভালো মানুষ সোনাগুলো ক্যাপ্টেন আব্দুর রহমান আল তারিকের কাজে লাগুক। সে আটলান্টিকের সমুদ্র অভিযান গুলোতে অমূল্য অবদান রেখেছে। সেই তূলনায় সে বঞ্চিত হয়েছে। নির্লোভ ও ভাল মানুষ বলে তাকে ঠকানো হয়েছে। সোনাগুলো বিধাতাই তাকে পুরুস্কার হিসেবে দিয়েছে’। ডকুমেন্টের এই কথাগুলোর পর কি কোন সন্দেহ থাকে যে, টেরেক দুর্গের মাটির তলায় সোনা নেই?’

‘আমি সন্দেহ করিনি। একটা আশংকা প্রকাশ করেছি মাত্র’। বলল রোনাল্ড রঙ্গলাল।

‘আশংকার কোন কারণ নেই। তিলক লাজপত পাল টেরেক দূর্গ সম্পর্কে অনেক অনুসন্ধান করেছেন এবং তিনি নিশ্চিত হয়েছেন যে, সোনা বোঝাই জাহাজ

পারামারিবোতেই নোংগর করেছিল এবং সেই জাহাজের লোকরাই এই টেরেক দূর্গের নির্মাতা। তাছাড়া তিলক লাজপত পাল হাজার হাজার ডলার খরচ করে দক্ষিণ আমেরিকার এই অঞ্চলের ভূ-সম্পদ ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপগ্রহ মনিটরিং রিপোর্ট যোগাড় করেছিলেন, তাতেও পারামারিবো এলাকায় সলিড গোল্ডের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে'। শিবরাম শিবাজী বলল।

প্রেসিডেন্ট ও রোনাল্ড রঙ্গলালের চোখগুলো লোভে চকচক করে উঠল। বলল রোনাল্ড রঙ্গলাল, 'উপগ্রহ মনিটরিং রিপোর্ট ও পাওলো রোসীর কাছ থেকে কেনা ওভানডোর ডকুমেন্টগুলো কোথায়?'

'এগুলো ছিল তিলকের পার্সোনাল গোপন ডকুমেন্ট। কোথায় রেখেছেন বলা মুস্কিল। আপনারা সবাই উদ্যোগ নিয়ে তার পরিবারকে বলে খোঁজাখুঁজি করলে নিশ্চয় পাওয়া যাবে'। বলল শিবরাম শিবাজী।

'ঠিক আছে ওটা দেখা হবে। এখন আসুন আমরা ঠিক করি, কোন মাফিয়া গ্রুপের আমরা সাহায্য নিতে পারি'। বলল রোনাল্ড রঙ্গপাল।

'এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে আপনার সহকারী সাগর আগরওয়াল। মধ্য ও ল্যাটিন আমেরিকায় তার ব্যবসা চালাতে গিয়ে অনেক মাফিয়ার সংস্পর্শে তাকে আসতে হয়েছে। মধ্য আমেরিকা ও আমাদের ল্যাটিন আমেরিকার মাফিয়ারাই এখন পৃথিবীকে ডমিনেট করছে'। বলল শিবরাম শিবাজী।

খুশি হয়ে রোনাল্ড রঙ্গলাল বলল, 'তাহলে তো কাজটা অনেক সহজেই হয়ে গেল'।

এ কথার পর রোনাল্ড রঙ্গলাল প্রেসিডেন্টের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওদের তো অর্থ দিলেই চলে, ওদের সাথে সোনা ভাগাভাগির দরকার আছে?'

'সোনা ও অর্থ একই একই কথা। সোনার কথা যখন ওরা জানতেই পারবে, উদ্ধারও করবে তারা সোনা, তখন সোনার একটা অংশ তাদের দেয়াই সুবিধাজনক হবে। কারণ সোনা উদ্ধারকে তখন ওরা তাদের প্রাপ্তির সাথে সম্পর্ক যুক্ত হিসেবে দেখবে। ভাল কাজ পাওয়া যাবে তাদের কাছ থেকে'। বলল প্রেসিডেন্ট।

‘তাহলে তাই হবে। মি. প্রেসিডেন্ট আমরা এখন উঠি’।

বলে উঠে দাঁড়াল রোনাল্ড রংলাল। উঠতে উঠতে বলল, ‘মি. প্রেসিডেন্ট আপনিও একটু আইজিকে বলবেন নির্বাচন অফিসে পুলিশ যেন নিষ্ক্রিয় থাকে। যা করার আমাদের লোকরাই করবে। তারা যেন ঠিক সময়ে একটু সরে থাকে’।

প্রেসিডেন্টও উঠে দাঁড়িয়েছিল। বলল, ‘ঠিক আছে বলব আমি তাকে’।

বলার পরেই প্রেসিডেন্টের মুখমন্ডলে ভাবনার ছায়া প্রকাশ পেল। হঠাৎ মাথা নিচু করে একটু ভাবল। তারপর বলল, ‘মি. রোনাল্ড, পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে, হাঙ্গামার সময় একটু সরেও থাকতে পারে, কিন্তু নির্বাচন অফিসের ভেতর থেকে বাড়তি কোন সুযোগ আপনারা পাবেন না। দেশ-বিদেশের সাংবাদিকরা সেখানে থাকবে। ইচ্ছা থাকলেও কোন অবৈধ সহযোগিতা তারা দিতে পারবে না’।

‘ইয়েস মি. প্রেসিডেন্ট, এটা আমরা জানি। পুলিশের ঐটুকু সহযোগিতা হলেই আমাদের চলবে’। বলল রোনাল্ড রঙ্গলাল।

বলেই হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডশ্যাক করে তারা বিদায় নিল’।

সেন্ট্রাল রোড ধরে এগুচ্ছে আহমদ মুসাদের গাড়ি। দুটি গাড়ি এক লাইনে সামনে এগুচ্ছে।

আগের গাড়িটি পাজেরো শ্রেণীর আমেরিকান জীপ। আহমদ মুসা ড্রাইভ করছে। পাশের সিটে বার্নারডো। পেছনের সিটের মাঝখানে আহমদ হাত্তা। তার এক পাশে তার দলের নির্বাচন পরিচালক, অন্য পাশে আহমদ হাত্তার সেক্রেটারী।

পেছনের গাড়িটা একটা মিনি মাইক্রো। তাতে পাঁচজন লোক।

আহমদ মুসার জীপটির ফ্ল্যাগ স্ট্যান্ডে রিপাবলিকান পার্টির পতাকা।

গাড়িতে আহমদ হাত্তা এভাবে পতাকা তুলতে চায়নি। কিন্তু আহমদ মুসার ইচ্ছাতেই গাড়িতে পতাকা লাগাতে হয়েছে। এর স্বপক্ষে যুক্তি হিসেবে আহমদ মুসা বলেছে, ‘আপনি সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং রিপাবলিকান পার্টির

প্রধান। আপনি গাড়িতে পার্টির পতাকা তুলে সবাইকে জানিয়ে নির্বাচন অফিসে যাচ্ছেন নমিনেশন পেপার দাখিল করতে। এরপর যদি আপনাকে বাধা দেয়ার মত কিছু ঘটে সেটা হবে পরিকল্পিত সন্ত্রাস। এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবে গোটা দুনিয়া'।

আহমদ মুসার এ যুক্তি হাসি মুখে মেনে নিয়েছিল আহমদ হাত্তা।

ঠিক ১২টা দশ মিনিটে গাড়ি সেন্ট্রাল সার্কেল পার হয়ে সেন্ট্রাল রোড ওয়ান-এ প্রবেশ করল।

সেন্ট্রাল সার্কেল নগরীর সবচেয়ে অভিজাত ও জনবহুল বাজার এলাকা। সার্কেলের মাঝখানে পার্কিং-এর বিশাল জায়গা।

সেন্ট্রাল সার্কেল থেকে সেন্ট্রাল রোড দু' শাখায় বিভক্ত হয়ে পশ্চিমে এগিয়ে নির্বাচন অফিসের সামনে সুরিনাম এভিনিউতে গিয়ে পড়েছে। সেন্ট্রাল রোড ওয়ান হলো যাবার এবং সেন্ট্রাল রোড টু হলো ফেরার।

সেন্ট্রাল রোড ওয়ানে প্রবেশ করেই একটু সামনে দুটি মাইক্রোকে রাস্তার দু পাশে বেআইনিভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। এই অসংগতি দেখে রাস্তার দুপাশে মনোযোগ দিল আহমদ মুসা। দেখতে পেল, রাস্তার দুপাশেই ফোল্ডিং চেয়ার পেতে বসে আছে বারো চৌদ্দজন লোক। প্রায় একই বয়সের। দেখেই মনে হচ্ছে রাস্তা পাহারা দিচ্ছে ওরা।

ভ্রু কুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার।

ওদেরও দৃষ্টিতে পড়ে গেছে আহমদ মুসাদের গাড়ি। ওদের সবার দৃষ্টি আহমদ মুসাদের গাড়ির দিকে।

ওদের মধ্যে থেকে একটা চিৎকার ভেসে এল, 'রিপাবলিকান পার্টির পতাকা গাড়িতে। শালা আহমদ হাত্তা এ গাড়িতেই যাচ্ছে নির্বাচন অফিসে। উঠে দাঁড়াও সকলে, আটকাও গাড়িকে'।

ওদের মধ্যে ছুটাছুটি শুরু হয়ে গেল। ওদের সবার হাতে উঠে এসেছে স্টেনগান।

কয়েকজন স্টেনগান উঁচিয়ে আহমদ মুসাদের গাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। কয়েকজন ছুটে আসছে গাড়ির দিকে।

মুহূর্তেই ঘটে গেল এ ঘটনাগুলো।

আহমদ মুসার কাছে বিষয়টা তখন পরিষ্কার হয়ে গেছে। ওরা তাদেরই আপেক্ষায় বসে ছিল। যে কোন মূল্যে গাড়ি আটকাবে।

আহমদ মুসা রিভলবার তুলে নিল হাতে। বলে উঠল একটু উচ্চ কন্ঠে, 'সবাই সিটের উপর শুয়ে পড়ুন। বার্নারডো তুমি বাম দিকের মাইক্রোর টায়ার ফুটো করে দাও'।

বলেই আহমদ মুসা গুলী ছুঁড়লো ডানদিকের মাইক্রোর পেছনের চাকার উদ্দেশ্যে।

প্রায় একই সাথে দুটি টায়ার ফাটার শব্দ উঠল।

গুলী করেই আহমদ মুসা সামনের রাস্তার উপর চোখ বুলিয়ে মাথা নিচু করে গাড়ি চালিয়ে দিল তীব্র গতিতে। ওদের স্টেনগান থেকে গুলী বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। প্রথম সেই গুলীর ঝাঁক আসতে লাগল সামনের দিক থেকে। পরক্ষণে পাশ থেকেও।

কিন্তু পাশ থেকে যখন গুলী বৃষ্টি শুরু হয়েছে, তখন আহমদ মুসাদের গাড়ি পাশের অস্ত্রধারীদের প্রায় পাশ কাটিয়ে চলে এসেছে সামনে। মাত্র কয়েকটা গুলী দুপাশ থেকে গাড়ির পাশটাকে আঘাত করল।

সামনের গুলী গাড়ির সামনের উইন্ড শিল্ডকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। ভাঙা কাঁচের বৃষ্টি এসে পড়ছে আহমদ মুসা ও বার্নারডোর গায়ে।

কিন্তু যে পাঁচ ছয়জন অস্ত্রধারী গাড়ি আটকাবার জন্যে গাড়ির সামনে অবস্থান নিয়েছিল ও গুলী বৃষ্টি করছিল প্রাণপনে, তারা সকলেই আহমদ মুসার গাড়ির চাকায় পিশে গেছে।

পাঁচ সাত সেকেন্ড পরে আহমদ মুসা মাথা তুলল। দেখল, সামনের রাস্তা পরিষ্কার। রিয়ার ভিউতে তাকিয়ে দেখল, কতগুলো লাশ পড়ে আছে রাস্তায়, আর অন্যেরা ছুটাছুটি করছে।

পাশ থেকে বার্নারডো বলে উঠল, 'স্যার ওরা আমাদের পিছু নেবার জন্যে মাইক্রোতে উঠছে। এতটাই বেদিশা হয়ে গেছে যে, গাড়ি দুটোর চাকা যে

ফেটে গেছে, সে কথা কারো মনে নেই। কিংবা খেয়ালও করেনি। মোবারকবাদ স্যার, গাড়ি দুটোর চাকা নষ্ট করার আপনার সিদ্ধান্তকে'।

'আল্লাহ এভাবেই ষড়যন্ত্রকারীদের সাজানো স্বপ্নকে গুঁড়িয়ে দেন'।

বলে আহমদ মুসা একবার ঘড়ির দিকে তাকাল। বলল, 'আর পাঁচ মিনিটে কি আমরা পৌঁছব নির্বাচন অফিসে?'

'হ্যাঁ আমরা পৌঁছতে পারব'। বলল বার্নারডো।

আহমদ মুসা পেছন দিকে মাথা ঘুরিয়ে বলল, 'মি. হাত্তা, আপনি আপনার লোকদের নির্দেশ দিন, নির্বাচন অফিসমূখী সব রাস্তা যেন তারা বন্ধ করে দেয়। কোন রাস্তা দিয়ে কোন গাড়ি যাতে নির্বাচন অফিসে পৌঁছতে না পারে। আমার মনে হচ্ছে, নির্বাচন অফিসমূখী সব রাস্তায় ওরা এভাবে পাহারা বসিয়েছে। মোবাইলে নিশ্চয় তারা জানতে পারবে যে, তাদের বাধা ভেঙে আমরা নির্বাচন অফিসে পৌঁছতে যাচ্ছি। জানতে পারার পর তারা সকলেই নির্বাচন অফিসের দিকে ছুটবে। এরা যাতে নির্বাচন অফিসে পৌঁছতে না পারে'।

'ধন্যবাদ আহমদ মুসা আপনাকে। আমাদের বিস্ময়ের ঘোর এখনো কাটেনি। এক সময় মনে হচ্ছিল চারদিকের ছুটে আসা বুলেট আমাদের ভর্তা করে ফেলবে। কিন্তু পর মুহূর্তেই সব পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমাদের নির্বাচন পরিচালক ও আমার সেক্রেটারী তো এখনও কাঁপছে'।

বলে আহমদ হাত্তা মোবাইল তুলে নিল হাতে। একে একে পাঁচটি টেলিফোন করল। কথা বলল ও তাদের নির্দেশ জানিয়ে দিল। টেলিফোন শেষ করে আহমদ মুসাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'মি. আহমদ মুসা, আমরা যা চেয়েছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি লোকের সমাগম হয়েছে। ওরা বলছে, নির্বাচন অফিস সংলগ্ন পাঁচটি রাস্তা এমনিতেই বন্ধ হয়ে গেছে। পাঁয়ে হাঁটা লোক ছাড়া কেউ এদিক ওদিক যেতে পারছে না। আমাদের সেন্ট্রাল রোডও বন্ধ। এখন আমাদের গাড়ি যাওয়ার প্যাসেজ ওরা তৈরী করছে'।

'পুলিশ নেই? পুলিশ কিছু করছে না রোড ব্লক দূর করার জন্যে?' বলল আহমদ মুসা।

‘না পুলিশ কিছু করছেনা। ওরা জানাল, পুলিশ একেবারে নিষ্ক্রিয়’। আহমদ হাত্তা বলল।

সত্যি গাড়িটা আর কিছু দূর এগুতেই রাস্তায় লোকের ভীড় দেখা যেতে লাগল। যতই গাড়ি সামনে এগুচ্ছে ভীড় ততই বাড়ছে। এক সময় রুদ্ধ হয়ে গেল গাড়ির গতি।

যখন মানুষ জানতে পারল গাড়িটা আহমদ হাত্তা নাসুমনের, তখন শ্লোগান উঠতে লাগল চারদিক থেকে, ‘আহমদ হাত্তা নাসুমন জিন্দাবাদ, রিপাবলিকান পার্টি জিন্দাবাদ’।

জনতা ও দলের কর্মীরা সকলে মিলেই গাড়ির জন্যে প্যাসেজ সৃষ্টি করতে লাগল। সেই প্যাসেজ ধরে গাড়ি এগুলো।

গাড়ি যখন নির্বাচন অফিসের সামনে পৌঁছল, তখন চারদিকে জনসমূদ্র। সকলে মুহূর্তে জেনেও গেল তাদের প্রিয় নেতা আহমদ হাত্তা নাসুমন নির্বাচন অফিসে পৌঁছে গেছে। চারদিক থেকে গগন বিদারী ঐ একই শ্লোগান উঠল, ‘আহমদ হাত্তা নাসুমন জিন্দাবাদ, রিপাবলিকান পার্টি জিন্দাবাদ’।

উৎসাহী সমর্থকদের ভীড় ঠেলে আহমদ হাত্তার গাড়ি নির্বাচন অফিসের গাড়ি বারান্দায় পৌঁছল। একদল দেশী-বিদেশী সাংবাদিক এসে ঘিরে ধরল আহমদ হাত্তাকে।

গাড়ির নিশ্চিহ্ন উইন্ড শিল্ড ও বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া গাড়ির সামনের দিকটা সকল সাংবাদিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। আহমদ হাত্তাকে প্রথমেই প্রশ্ন করল একদল বিদেশী সাংবাদিক, ‘গাড়ির এ অবস্থা কেন? মনে হচ্ছে গাড়ি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এল!

আহমদ হাত্তা বলল, ‘যুদ্ধক্ষেত্র নয়, আক্রমণ ক্ষেত্র বলতে পারেন। সেখানে যুদ্ধ হয়নি। ওরা আক্রমণ করেছে, আমরা আক্রমণের শিকার হয়েছি। গাড়ি চালিয়ে কোন মতে আমরা বেঁচে আসতে পেরেছি।

‘কারা, কেন আক্রমণ করেছিল?’ প্রশ্ন করল আরেকজন সাংবাদিক।

‘রোনাল্ড রঙ্গলালের নেতৃত্বাধীন সুরিনাম পিপলস কংগ্রেসের লোকরা আক্রমণ করেছিল। ওদের লক্ষ্য ছিল আমাকে নির্বাচন অফিসে আসতে না দেয়া।

সুযোগ পেলে হত্যা করা। তারা ভরাডুবির ভয়ে আমাকে এবং রিপাবলিকান পার্টির জনপ্রিয় নেতা কর্মীদের নির্বাচন করতে দিতে চায় না। এই উদ্দেশ্যে তারা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে আমাদের নেতা, কর্মী ও সমর্থকদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। তাদের হত্যা ও গুমের শিকার হয়েছে অসংখ্য মানুষ'।

আহমদ হাত্তা থামতেই অন্য একজন সাংবাদিক বলে উঠল, 'এ ধরনের কোন খবর তো পত্র-পত্রিকায় আসেনি। বিষয়টা আপনি বিস্তারিত বলুন'।

'মাফ করুন নমিনেশন পেপার জমা দিতে আমি এসেছি। আমি এখন এতটা সময় দিতে পারবো না। দু এক দিনের মধ্যেই সাংবাদিক সম্মেলন করে সব ঘটনা আমি আমার দেশের জনগন ও দুনিয়াবাসীকে জানাব'।

বলে আহমদ হাত্তা, তার সেক্রেটারী ও দলের নির্বাচন পরিচালক সাংবাদিকদের ভীড় ঠেলে নির্বাচন অফিসে উঠে গেল।

আহমদ মুসা ও বার্নারডো গাড়িতে বসে রইল।

আহমদ মুসার পরনে শিখ ড্রাইভারের পোশাক।

নমিনেশন পেপার দাখিল শেষে প্রায় এক ঘন্টা পর বেরিয়ে এল আহমদ হাত্তা। ডেকে নিল আহমদ মুসা ও বার্নারডোকে ওয়েটিং রুমে। বলল আহমদ মুসাকে, 'আপনি যেভাবে বলেছিলেন, সেভাবে আমি প্রেসিডেন্টকে টেলিফোনে সব ঘটনা জানিয়েছি। উনি আইজিকে বলে দুগাড়ি পুলিশ পাঠাচ্ছেন। ওরা আমাদের পৌঁছে দেবে। প্রেসিডেন্ট আরও বলেছে, আমার বাড়িতে যাতে উপযুক্ত পুলিশ পাহারা থাকে, এ জন্যে তিনি আইজিকে বলে দেবেন'।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'তাদের মনে যাই থাক, এই বাহ্যিক পাহারাতেও অনেক কাজ হবে'।

'ঠিক আছে, পুলিশ আসা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করি'। বলল আহমদ হাত্তা।

'ঠিক আছে। তবে পুলিশের দুটি গাড়িই সামনে থাকবে, একটি সামনে একটি পেছনে এভাবে নয়'। আহমদ মুসা বলল।

'কিন্তু এভাবে নয় কেন? এভাবেই নিরাপদ বেশি'। বলল আহমদ হাত্তা।

কেন নয় একথা বুঝিয়ে বলা মুশকিল। তবে পুলিশ সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে তাদের আগে পিছে রেখে এগুবার পিছুবার পথ বন্ধ করা ঠিক নয়'। আহমদ মুসা বলল।

আহমদ হাত্তা কিছু বলল না।

স্থির, স্তম্ভিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল আহমদ হাত্তা আহমদ মুসার দিকে। আকস্মিকভাবে সে জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে। বলল, 'আল্লাহ আপনাকে এত দূরদর্শী করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ'।

এই সময় একটি টেলিফোন এল বার্নারডোর মোবাইলে। টেলিফোন ধরল সে। নিচু স্বরে কথা বলল। কথা বলতে গিয়ে তার চেহারায় উদ্বেগ ফুটে উঠল।

বার্নারডো টেলিফোন শেষ করতেই আহমদ মুসা জিজ্ঞেস করল, 'কার টেলিফোন বার্নারডো?'

'সহকারী পুলিশ কমিশনারের'। বলল বার্নারডো।

'কোন খারাপ খবর?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'সহকারী পুলিশ কমিশনার সাহেব বললেন, দেশের গোপন হত্যা-সন্ত্রাস পরিস্থিতির যে বিবরণ সাবেক প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে ঘোষণা করবেন বলেছেন, তা ভেতরের পরিস্থিতিকে অগ্নিগর্ভ করে তুলেছে। যে কোন সময় যে কোন ঘটনা ঘটতে পারে। ওরা মরিয়া হয়ে উঠেছে। খুব উদ্বিগ্ন মনে হলো সহকারী পুলিশ কমিশনারকেও'। বলল বার্নারডো।

'আর কিছু বলেছে?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'বলেছেন পুলিশের উপর নির্ভর করে বসে থাকা যাবে না'। বলল বার্নারডো।

আহমদ হাত্তা এক ধাপ এগিয়ে এসে অনুচ্চকন্ঠে বলল, 'মি. আহমদ মুসা, সহকারী পুলিশ কমিশনার আপনার কথাই কনফারম করলেন। কিন্তু কয়েক মাসের ব্যবধানে ওরা সব পুলিশকে পাল্টে ফেলেছে?'

'সব পুলিশকে পাল্টাবার দরকার নেই। সব পুলিশকে ওরা সব কাজে ব্যবহার করে না'। বলল আহমদ মুসা।

এ সময় আহমদ হাত্তার সেক্রেটারী ওয়েটিং রুমে প্রবেশ করল। বলল আহমদ হাত্তাকে, 'স্যার, পুলিশের গাড়ি দুটি এসেছে।

আহমদ হাত্তা তাকাল আহমদ মুসার দিকে। আহমদ মুসা বলল, 'চলুন'।

আহমদ হাত্তা চলতে শুরু করে আবার ফিরে দাঁড়াল সেক্রেটারীর দিকে। বলল, 'তুমি পুলিশ অফিসারক বলে দাও পুলিশের গাড়ি দুটি আমাদের গাড়ির সামনে থাকবে'।

'ঠিক আছে স্যার, এখনি বলে দিচ্ছি'। বলে সেক্রেটারী তখনই বেরিয়ে গেল।

আহমদ মুসারাও বেরিয়ে এল ওয়েটিং রুম থেকে।

নামল গাড়ি বারান্দায়।

আহমদ মুসা গাড়ি বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই তাদের দ্বিতীয় গাড়ির একজন আরোহী আহমদ মুসার কাছে এসে দাঁড়াল।

তাকে দেখেই আহমদ মুসা একটু সচকিত হল। বলল, 'সর্বক্ষণ নজর রেখেছিলে এদিকে?'

'জি স্যার। অন্য কোন মানুষ গাড়ির কাছে আসেনি। মাত্র একজন ফটো-সাংবাদিক গাড়ির ভেতর ও বাইরের ফটো নিয়েছে'।

ভ্রুকুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার। বলল, 'ভেতরের ফটো কিভাবে নিল?'

'স্যার, গাড়ির সামনের টপের উপর উঠে উইন্ড শিল্ডের ভাঙা জায়গা দিয়ে ভিতরে মুখ বাড়িয়ে ফটো তুলেছে'। বলল লোকটি।

'কতগুলো স্ন্যাপ নিয়েছে?' আহমদ মুসা প্রশ্ন করল।

'চার পাঁচটা'।

'তুমি স্ন্যাপ নেয়া দেখেছ, না 'ক্লিক শুনে বুঝেছ? এ গাড়ির বন্ধ কাচেঁর মধ্যে দিয়ে পেছন থেকে তোমার কিছু শুনতে পাওয়ার কথা নয়'। বলল আহমদ মুসা।

'ফ্লাসের আলো দেখেছি'। লোকটি বলল।

'ফ্লাসগুলো পরপর হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'প্রথম ফ্লাসের কিছুপর অবশিষ্ট ফ্লাসগুলো হয়েছে'। লোকটি বলল।

‘ঠিক আছে। যাও। ধন্যবাদ’। বলল আহমদ মুসা।

লোকটির সাথে কথা শেষ করে ফিরে তাকিয়ে দেখল, বাইরের শ্লোগনারত হাজার হাজার লোকের প্রতি হাত নাড়া শেষ করে আহমদ হাত্তা উঠে যাচ্ছে গাড়িতে। পাশে দলের নির্বাচন পারিচালক লানসানা কনটে গাড়িতে উঠার জন্য অপেক্ষা করছে। আহমদ মুসা বলে উঠল, ‘মি হাত্তা, গাড়িতে উঠবেন না’।

থমকে দাঁড়াল আহমদ হাত্তা। ফিরে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। ভাবান্তর লক্ষ্য করল আহমদ মুসার চোখে মুখে।

আহমদ হাত্তা দ্রুত এসে দাঁড়াল আহমদ মুসার সামনে। বলল, ‘মি. আহমদ মুসা, আপনি কিছু ভাবছেন মনে হচ্ছে?’

এ সময় আহমদ হাত্তার সেক্রেটারী এসে দাঁড়াল তাদের সামনে। বলল, ‘স্যার, ডিএসপি সাহেবকে বলেছি, তাদের দুটি গাড়ি আমাদের গাড়ির সামনে থাকবে। ডিএসপি সাহেব জানালেন, সবদিক বিবেচনা করে কর্তৃপক্ষ যাবার পথ এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঠিক করে দিয়েছেন। পুলিশের দুগাড়িই থাকবে পেছনে যাতে সামনের দিকে চোখ রেখে পেছনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারি। পেছনে পুলিশ থাকলে সামনে আক্রমনের সুযোগ পাবেনা। কিন্তু পুলিশ সামনে থাকলে পেছনটা একেবারেই অরক্ষিত হয়ে পড়বে’। ডিএসপি সাহেবের একথার জবাবে আমি বলে দিয়েছি, পুলিশের দুগাড়ি সামনে থাকবে আমার প্রতি স্যারের এটাই নির্দেশ’। আমার এ কথার পর তিনি বলেছেন, স্যার যেটা বলেছেন সেটাই হবে’।

‘যাবার পথ কোনটা হবে বলেছেন?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘আমরা আসার পথে যেহেতু একবার এ্যাকসিডেন্ট ঘটেছে, সেজন্যে ঐ পথে ওরা যাচ্ছে না। উত্তরের রিং রোড ধরে ওসেয়ান হাইওয়ে হয়ে স্যারের বাড়িতে পৌঁছা যাবে’। বলল আহমদ হাত্তার সেক্রেটারী।

‘মন্দ নয়। রাস্তা ফ্রি, গাড়ি-ঘোড়া খুবই কম। তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে’। আহমদ হাত্তা বলল।

আহমদ হাত্তার কথা শেষ হতেই আহমদ মুসা বলল, ‘ঠিক আছে’।

বলেই আহমদ মুসা আহমদ হাত্তার সেক্রেটারীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি ডিএসপি সাহেবকে বল, আমাদের এ গাড়িটা এক্সপ্লোসিভ ডিটেক্টর দিয়ে চেক করতে হবে'।

শুনেই আহমদ হাত্তা, লানসানা ও আহমদ হাত্তার সেক্রেটারীর চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠল। বলল আহমদ হাত্তা, 'আপনি এজন্যেই আমাকে গাড়িতে উঠতে নিষেধ করেছেন?' তার কন্ঠে উদ্বেগ ঝরে পড়ল।

'হ্যাঁ, আমি সন্দেহ করছি মি. হাত্তা'। বলল আহমদ মুসা।

'কিছু ঘটেছে ইতোমধ্যে?' আহমদ হাত্তা জিজ্ঞেস করল।

'আমি ওয়েটিং রুমে যাবার সময় আপনার একজন লোককে আমাদের এ গাড়ির দিকে চোখ রাখতে বলে গিয়েছিলাম। তার কাছ থেকে শুনলাম একজন ফটো সাংবাদিক এ গাড়ির ফটো নিতে সামনের টপে উঠে উইন্ড শিল্ডের ভাঙা অংশ দিয়ে মুখ ভেতরে নিয়ে ভেতরের ছবি তুলেছে। কোন ফটো সাংবাদিক এভাবে ভেতরের ছবি তোলার কথা নয়। আমি নিশ্চিত নই, কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে গাড়ির মধ্যে কিছু একটা ঘটানো হয়েছে'। বলল আহমদ মুসা।

মুখ শুকিয়ে গেল আহমদ হাত্তার।

'স্যার, আমি ডিএসপি সাহেবকে বলি'। বলে দৌড় দিল আহমদ হাত্তার সে্ক্রেটারী।

মিনিট খানেকের মধ্যেই ডিএসপি ছুটে এল। বলল আহমদ হাত্তাকে, 'স্যার সন্দেহ যখন হয়েছে, তখন এ গাড়িতে চড়া যাবে না। কিন্তু আমাদের কাছে তো বিস্ফোরক ডিটেক্টর নেই'।

'তাহলে?' বলে উঠল অহমদ হাত্তা।

'স্যার, ভিন্ন একটা গাড়ির ব্যবস্থা করতে হবে'। ডিএসপি বলল।

'ডিএসপি সাহেব, সে ব্যবস্থা করা যাবে। তার আগে আপনি আমাদের গাড়িটার সামনে একটা দড়ি বেঁধে টেনে বাইরে নেবার চেষ্টা করুন। আমার মনে হয় বোমা যদি গাড়ির ভেতরে পাতা হয়ে থাকে, তাহলে সে বোমা সাউন্ড অথবা স্পীড সেনসিটিভ হবে। স্পীড সেনসিটিভ হলে গাড়ি গতি পাওয়ার সাথে সাথেই বোমার বিষ্ফোরণ ঘটে যাবে'। বলল আহমদ মুসা।

ডিএসপি বিষ্মিত দৃষ্টিতে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল আহমদ হাত্তাকে লক্ষ্য করে, 'স্যার আপনার এই লোক অনেক কিছু জানেন দেখছি এবং খুব বুদ্ধিমান। আমার মাথায় এ চিন্তা আসতোই না। ঠিক আছে স্যার, এ পরীক্ষা আমি করছি'।

বলে ডিএসপি ছুটে গেল তার গাড়ির কাছে। কয়েকজন পুলিশ ও দড়ি নিয়ে ফিরে এল। ইতোমধ্যে আহমদ মুসার নির্দেশে আহমদ মুসাদের দ্বিতীয় গাড়ি বাইরে পুলিশের গাড়ির পেছনে নেয়া হলো।

ইতোমধ্যে বাইরে অপেক্ষমান লোকদের মধ্যে খবর রটে গেছে যে, আহমদ হাত্তার গাড়িতে বোমা রাখা আছে। এই খবরে মানুষ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। নানারকম শ্লোগান উঠতে শুরু করেছে বাইরে।

ডিএসপিসহ আহমদ মুসারা গাড়ি বারান্দা থেকে অফিসের ভেতরে চলে গেল।

আহমদ মুসাদের গাড়ির সামনে লম্বা দড়ি বেঁধে চারজন পুলিশ তার শেষ প্রান্ত ধরে টানা শুরু করল। প্রথমে আস্তে, তারপর গাড়ির গতি বাড়তে লাগল। গাড়ি রানিং কন্ডিশনে উঠতেই ঘটল গাড়িতে প্রচন্ড বিষ্ফোরণ।

তখন গাড়িবারান্দা পার হয়ে গাড়িটি শূন্য চত্বরে গিয়ে পৌছেঁছিল। প্রচন্ড বিষ্ফোরণে গাড়ি টুকরো টুকরো হয়ে বিশ পচিঁশ গজ উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হলো। বিষ্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠল গোটা বিল্ডিং, কেঁপে উঠল চারদিকের মাটি ভূমিকম্পের মত। ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক। ধোঁয়া প্রবেশ করেছে নির্বাচন অফিসেও।

ডিএসপিসহ আহমদ মুসারা ওয়েটিং রুমের মেঝেয় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। বোমা বিষ্ফোরণের প্রচন্ড শব্দ ও কম্পনে সবাই তাদের অলক্ষ্যেই সে মেঝেয় বসে পড়েছিল, শুধু দাঁড়িয়েছিল আহমদ মুসা।

বোমা বিষ্ফোরণের প্রচন্ড শব্দের রেশ তখনও মিলিয়ে যায়নি, আতংকের ঘোর তখনও কাটেনি।

আহমদ মুসা বলে উঠল, 'ডিএসপি সাহেব আসুন দেখি পুলিশ চারজনের কি হলো?'

বলে আহমদ মুসা বাইরে ছুটলো। বিস্ফোরণের জায়গাটাকে পাশ কাটিয়ে আহমদ মুসা সামনে এগিয়ে দেখল, চারজন পুলিশই মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছে। প্রথম দৃষ্টিতে বুঝল, সবাই কিছু কিছু আহত হয়েছে, তবে মনে হয় মারাত্মক কিছু নয়। কিন্তু আতংক অবস্থা ওদের এখনো কাটেনি।

আহমদ মুসা ওদেরকে একে একে গেটের কাছে নিয়ে রাখল। শেষ জনকে যখন নিয়ে গেল, তখন ডিএসপি সাহেব এসে পৌঁছল, পুলিশরাও গাড়ি থেকে নেমে এল।

আহত পুলিশের রক্তে আহমদ মুসার জামাও রক্তাক্ত হয়ে গেছে। ডিএসপি সাহেব আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, 'ধন্যবাদ ইয়াংম্যান। আপনি শুধু বুদ্ধিমান নন, সাহসীও'।

নির্বাচন অফিস এলাকায় যে পুলিশ অফিসার দায়িত্ব পালন করছে, সেও এ সময় এসে পৌঁছল।

'আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? আমি আসার পর আপনাকে দেখিনি'। পুলিশ অফিসারটিকে লক্ষ্য করে বলল ডিএসপি।

'স্যার, বাইরে বিরাট উচ্ছৃঙ্খল জনতা, আমি ওদিকটা দেখছিলাম'। বলল পুলিশ অফিসারটি অপরাধীর কন্ঠে।

'ঠিক আছে, এখন এদিকের সবকিছু বুঝে নিন'। বলে ডিএসপি সাহেব আহমদ হাত্তার গাড়িতে একজন ফটো সাংবাদিকের বেশধারী লোক কর্তৃক বোমা রাখার ঘটনা থেকে শুরু করে যা ঘটেছে তার একটা ব্রীফ দিল পুলিশ অফিসারকে।

আহমদ হাত্তা নেমে আসছিল গাড়ি বারান্দায়, তখন তাকে দেখতে পেল ডিএসপি সাহেব। সংগে সংগে চিৎকার করে বলে উঠল 'স্যার, আপনি বারান্দা থেকে নামবেন না। গাড়ি ঠিক করে আপনাকে ডেকে আনব'।

'অফিসার গাড়ি পাওয়া গেছে। আমাদের একজন লোকের গাড়ি পার্কিং-এ আছে, নিয়ে আসছে'। বলল আহমদ হাত্তা অফিসের বারান্দায় যেতে যেতে।

ডিএসপি সাহেব তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'স্যার যে গাড়ির কথা বললেন, সেটা নেয়া যায় কিনা আপনি দেখুন'।

‘ঠিক আছে অফিসার’। আহমদ মুসা বলল।

পুলিশকে এ্যাম্বুলেন্সে উঠানো হচ্ছে। মারাত্মক আহত নয় তারা। কিন্তু প্রত্যেকেরই শরীরে দু চারটা করে স্প্রিন্টার ঢুকেছে।

নির্বাচন অফিসের পার্কিং থেকে একটা গাড়ি এল গাড়ি বারান্দায়।

আহমদ মুসা এল গাড়ির কাছে। গাড়িটি রিপাবলিকান পার্টির একজন কর্মকর্তার। জিজ্ঞেস করে নিশ্চিত হলো আহমদ মুসা যে গাড়িতে সব সময় মানুষ ছিল। বাইরের কেউ গাড়ি স্পর্শ করেনি।

এ সময় বাইরে প্রবল হৈ চৈ শুরু হলো। বোমা বিস্ফোরণের পর মানুষ আতংকগ্রস্ত হয়ে এদিক ওদিক সরে গিয়েছিল। তারা ফিরে এসেছে আবার। নতুন উদ্যোগে সংগঠিত হয়ে উঠেছে হাজার হাজার লোক। প্রবল শ্লোগান উঠছে সুরিনাম কংগ্রেস পার্টির বিরুদ্ধে, কংগ্রেস পার্টির নেতা রোনাল্ড রঙ্গলালের বিরুদ্ধে। বোমা পেতে আহমদ হাত্তাকে হত্যা প্রচেষ্টার বিচার ও উল্লেখিত নেতাদের তারা ফাঁসি দাবী করছে।

বাইরে কিছু উচ্ছৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হলে ডিএসপি সাহেব আহমদ হাত্তাকে অনুরোধ করে বললেন জনতাকে শান্ত করার জন্যে কিছু করতে। আহমদ হাত্তা পার্টির নির্বাচন পরিচালক ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লানসানা কনটেকে নির্দেশ দিল বাইরে গিয়ে জনতাকে সব কিছু বুঝিয়ে বলতে যে, আমরা এখনি চলে যাচ্ছি, তারাও সবাই যেন চলে যায়।

লানসানা কনটে বাইরে বেরিয়ে গেল।

আহমদ মুসাদের গাড়ি প্রস্তুত। পুলিশের গাড়িও প্রস্তুত।

আহমদ হাত্তা বারান্দা থেকে গাড়ি বারান্দায় নামতে যাচ্ছিল।

নির্বাচন কমিশনার বেরিয়ে এল তার অফিস থেকে। আহমদ হাত্তার সামনে এসে বলল, ‘জনাব, আমি ও আমার অফিসের পক্ষ থেকে দুঃখ প্রকাশ করছি নির্বাচন অফিসে এসব ঘটনার জন্যে। ঈশ্বর আপনাকে বাঁচিয়েছেন, এজন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমি এই নিরাপত্তাহীনতার কথা প্রেসিডেন্টকে বলব’।

আহমদ হাত্তা নির্বাচন কমিশনারকে ধন্যবাদ জানিয়ে নেমে এল গাড়ি বারান্দায়।

লানসানা কনটেও এসে পৌঁছল।

আহমদ হাত্তারা গাড়িতে উঠে বসল। পুলিশরাও।

প্রবল শ্লোগানরত জনতার ভীড় ঠেলে যাত্রা শুরু হলো।

প্রথমে পুলিশের দুটি গাড়ি।

আহমদ মুসাদের দুটি গাড়ি তার পেছনে।

# ৬

চারটি গাড়িই ছুটে চলল রিং রোডের দিকে।

সামনের দুটি গাড়ি পুলিশের। পেছনে দুটির একটিতে আহমদ মুসা ও আহমদ হাত্তারা, অপরটিতে আহমদ হাত্তার নিজস্ব নিরাপত্তা প্রহরী।

পুলিশের দুগাড়ির একটি ছয় সিটের জীপ। এই গাড়িতেই ডিএসপি সাহেব রয়েছে। ডিএসপি ছাড়াও রয়েছে একজন ড্রাইভার ও চারজন পুলিশ।

এ জীপের পেছনেই রয়েছে পুলিশের দ্বিতীয় গাড়ি। ক্যারিয়ার শ্রেণীর। পেছনটা খোলা। এতে রয়েছে আটজন পুলিশ।

পুলিশের এই ক্যারিয়ারের তুলনায় আহমদ মুসার কারটা খুবই ছোট দেখাচ্ছে।

আহমদ মুসা তার কারটা ক্যারিয়ার থেকে বেশ পেছনে রেখে চালাচ্ছে, যাতে সামনের দিকটা একটু ওয়াইডভাবে দেখা যায়।

নিঃশব্দে চলছে গাড়ি। গাড়ির ভেতরেও কোন কথা নেই।

এক সময় কথা বলে উঠল আহমদ হাত্তা। বলল, 'মি. আহমদ মুসা, সবার সামনে প্রাণ খুলে আপনাকে ধন্যবাদ দিতে পারিনি। ভেবেছিলাম মহান ভাইকে বুকে জড়িয়ে ধরব, তাও পারিনি। আল্লাহ আপনার মাধ্যমে এবার শুধু আমাকে নয়, গাড়িশুদ্ধ লোককে মর্মান্তিক মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করলেন। অথচ খুব ছোট্ট একটা ঘটনা, আমার একজন লোককে গাড়ির দিকে চোখ রাখতে বলে গিয়েছিলেন। এই ছোট কাজটাই পরে পর্বত প্রমাণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াল। একেই বলে সত্যিকার দূরদৃষ্টি। তারপর ফটো-সাংবাদিকের কাজকে আপনি যে দৃষ্টিতে দেখেছেন, সেটাও এক অসাধারণ সূক্ষ দৃষ্টির ব্যাপার। এই দূরদৃষ্টি ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি কিভাবে আমরা অর্জন করতে পারি আহমদ মুসা?'

‘এ কথার দ্বারা আপনি বলতে চাচ্ছেন, এ গুণগুলো আপনার নেই। আল্লাহ এ গুণগুলো আপনাকে দেন নি। আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ কি আনা যায়?’ বলল আহমদ মুসা।

‘না না, মি. আহমদ মুসা, কথাটা আমি এ অর্থে বলিনি। আমি বুঝাতে চেয়েছি, আপনার মাথায় যা এসেছে, আমাদের মাথায় তা আসেনি। কিভাবে তা আনা যায়’। শশব্যস্তে বলল আহমদ হাত্তা।

‘মি. আহমদ হাত্তা মানুষের দেহ-মন-মগজ আল্লাহর দেয়া অসীম শক্তির ভান্ডার, এ ভান্ডার থেকে আল্লাহর দেয়া নেয়ামতগুলো বের করে আনতে হয় চেষ্টার মাধ্যমে। জিমন্যাস্টদের দেখে আমরা বিস্মিত হই, রাবারের মত এমন ইলাস্টিক দেহ তারা কিভাবে তৈরী করল। বডি বিল্ডারদের দেখে আমরা অবাক হই, লোহার মত পেশীওয়ালা এমন শরীর তারা গড়ল কি করে? এসব কিন্তু আকস্মিকভাবে পেয়ে যায়নি। চেষ্টার মাধ্যমেই অর্জন করেছে। জ্ঞান-বুদ্ধির ক্ষেত্রেও এই একই কথা। চর্চার মাধ্যমে জ্ঞানের বিস্তার ঘটাতে হয়। নিজেদের মধ্যে যে সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে, তা খুঁজে বের করা জ্ঞান চর্চারই একটা অংশ। মি. আহমদ হাত্তা, আপনি কি কোনদিন একান্তে বসে নিজের ভেতরের দিকে চোখ ফেলে খোঁজ নেবার চেষ্টা করেছেন যে, আল্লাহ কি কি শক্তি সম্পদে আপনাকে সজ্জিত করেছেন? এ শক্তি-সম্পদকে কি আপনি চর্চায় আনার চেষ্টা করেছেন?’

‘স্যরি আহমদ মুসা, নিজেকে কোনদিন আমি এ দৃষ্টিতে দেখিইনি’। বলল আহমদ হাত্তা।

‘আসলে মি. আহমদ হাত্তা, আল্লাহ আমাদেরকে কি দিয়েছেন, আল্লাহ আমাদের কাছে কি চান, এ মূল বিষয়টাই আমরা জানি না। আমাদের ব্যর্থতার যাত্রা শুরু এখান থেকেই’। বলল আহমদ মুসা।

‘স্যরি মি. আহমদ মুসা, এমন ধরনের ভাবনাও যে আছে, এমন ধরনের ভাবনা যে জীবনের জন্যে অপরিহার্য্য, এ বোধই তো কোনদিন আমার মধ্যে জাগেনি। এখান থেকেই প্রশ্ন জাগে আহমদ মুসা, জীবন সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গি এবং এই জীবন জিজ্ঞাসার অনুভূতি মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে কিভাবে? সবাইকে কি দর্শন পড়তে হবে?’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'মি. হাত্তা, গোটা কুরআন শরীফ কি অর্থসহ পড়েছেন?' অন্ততঃ মূল হাদিস গ্রন্থগুলো কি পড়েছেন? কুরআন ও হদিসের ভিত্তিতে যে বিশাল ইসলামী সাহিত্যের ভান্ডার গড়ে উঠেছে, তা কি পড়েছেন?'

'স্যরি, আহমদ মুসা মাত্র কয়েকটা ছোট সূরার অর্থ পড়েছি। ৪০ হাদিস ও মাছলা মাছায়েলের একটা বই পড়েছি'। বলল আহমদ হাত্তা।

'আপনি যা পড়েছেন তা মৌল জ্ঞান সমুদ্রের এক ফোঁটা পানি মাত্র। আপনি জীবনকে কিভাবে জানবেন? কিভাবে জানবেন আপনার পরিচয়? জানবেন কি করে আল্লাহর ইচ্ছাকে?' আহমদ মুসা বলল।

'আমি লেখাপড়া করেছি সুরিনামে। পিএইচডি করেছি আমেরিকা থেকে। কিন্তু কোথাও এই সুযোগ হয়নি, সুযোগ ছিল না'। বলল আহমদ হাত্তা বিনীত কন্ঠে।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'আপনি সুরিনামের প্রধানমন্ত্রী হয়েও কিন্তু সুরিনামের এই শিক্ষার ব্যবস্থা করেন নি'। আহমদ মুসা বলল।

'আমাকে এমন কিছু করতে হবে তাওতো কোনদিন আমার মাথায় আসেনি'।বলল আহমদ হাত্তা।

আহমদ মুসা গম্ভীর হলো। বলল, 'একটা শক্ত কথা বলি মি. হাত্তা, আহত হবেন না তো?'

আহমদ হাত্তা হাসল। তারপর গম্ভীর হয়ে উঠল তার চেহারা। উপচে পড়া আবেগের বিচ্ছুরণ ঘটল তার চোখে-মূখে। বলল, মি. আহমদ মুসা, এখন যদি আমার গায়ে চাবুক চালান, তাহলেও মনে করব, এটা আমার জন্যে আশীর্বাদ। বলুন আপনি'।

'মি. হাত্তা আমি যে কথা বলব তা শুধু আপনার জন্যে নয়, আমাদের অনেকের জন্যে প্রযোজ্য। আমরা অনেকেই পিতা-মাতা সূত্রে মুসলমান, কিন্তু কার্যত আমরা মুসলমান হইনি'। আহমদ মুসা বলল।

সংগে সংগে উত্তর দিল না আহমদ হাত্তা। একটা আকষ্মিক ভাবনা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। কিছুক্ষণ পর ধীর কন্ঠে বলল, 'কিভাবে তাহলে মুসলমান হতে হয়?'

'একজন মুসলিম কতগুলো গুণের সমাহার থেকে তৈরী হয়। যেমন সে আল্লাহকে পালনকর্তা ও বিধান দাতা একমাত্র প্রভূ বলে মানে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে আল্লাহর সর্বশেষ বার্তাবাহক হিসেবে মানে, সে বিশ্বাস করে যে, দুনিয়ায় তার প্রতিটি ভালো কাজের জন্যে আখেরাতে পুরুষ্কার পাবে ও প্রতিটি মন্দ কাজের জন্য তাকে আখেরাতে জওয়াবদিহী করতে হবে ও শাস্তির সম্মূখীন হতে হবে। এই ভয়কে সামনে রেখে আল্লাহ এবং তার রাসূল যা নিষেধ করেছেন তা সে পরহেজ করে চলে এবং যা করার নির্দেশ করেছেন তা যত্নের সাথে পালন করে থাকে।কোন লোভ তাকে এ পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। ইত্যাদি। এই গুণগুলো কারও মধ্যে সৃষ্টি হলে সে মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহন না করলেও সে মুসলমান হয়ে যায়, অন্যদিকে মুসলিম ঘরে জন্ম গ্রহণ করার পরও কারও মধ্যে যদি এই গুণগুলো না থাকে, তাহলে সে কার্যতঃ মুসলমান থাকে না'। থামল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা থামলেও হাত্তা কথা বলল না। ভাবছিল সে। বলল একটু পর, 'এই গুণগুলো আয়ত্ব সাপেক্ষ এবং জানা ও শেখা সাপেক্ষ। না জানলে, না শিখলে তো এ গুণগুলো আয়ত্ব করা যাবে না'।

'এ জন্যেই তো মুসলমানদের জন্যে জ্ঞানার্জন ফরজ, ধর্মীয় ও জাগতিক সব জ্ঞানই'। বলল আহমদ মুসা।

'এটা তো আমরা করিনি, আমাদের লোকরা করেনি'। আহমদ হাত্তা বলল।

'এ জন্যে প্রধানত দায়ী সমাজের নেতারা, জাতির নেতারা'। বলল আহমদ মুসা।

'তার মানে আমি দায়ী হচ্ছি'। আহমদ হাত্তা বলল।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'শুধু দায়ী নন, প্রধান দায়ী'।

'কেন?' বলল আহমদ হাত্তা।

'আল্লাহ যখন কাউকে ক্ষমতায় বসান, তার অপরিহার্য কাজগুলোর একটি হয়ে দাঁড়ায় মানুষকে ভাল কাজের নির্দেশ দেয়া, মন্দ কাজ থেকে বিরত

রাখা। এই কাজটাই মানুষকে মুসলমান বানাবার কাজ। আপনি এ দায়িত্ব পালন করেন নি'। আহমদ মুসা বলল।

'কিন্তু কি করতে হবে, তা জানতাম না এবং ঐ রকম কিছু করা যে আমার দায়িত্ব তাও জানতাম না'। বলল আহমদ হাত্তা।

'এখন জানার পর কি করবেন?' বলল আহমদ মুসা।

'আল্লাহ যদি আমাকে ক্ষমতায় যাবার সুযোগ দেন, তাহলে প্রথমেই দুটি কাজ করব। একটি হলো, মুসলমানদের জন্যে ইসলামী জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা। দ্বিতীয় কাজ হিসেবে মানুষকে ভালো কাজের নির্দেশ ও মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবো'। বলল আহমদ হাত্তা।

'ধন্যবাদ মি. হাত্তা। আল্লাহ্ আপনাকে আপনার জাতির নেতৃত্ব দেবার সুযোগ দিন'। আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসা সামনে তাকিয়ে কথা বলছিল। হঠাৎ একটা ব্রীজ তার চোখে পড়ল। সামনে রাস্তাটা ধনুকের মত বেঁকে পূর্ব দিকে মোড় নিয়েছে। ধনুকের ঠিক মধ্যভাগের কিছুটা পরেই ব্রীজটা।

আহমদ মুসা তার মুখের কথাটা শেষ করেই আহমদ হাত্তাকে লক্ষ্য করে বলল, 'মি. হাত্তা ব্রীজ দেখছি। ব্রীজ কোথেথকে এলো?'

'কেন, সুরিনাম নদীরই একটা শাখার উপর এই ব্রীজ। ব্রাউনস ওয়ে থেকে এ শাখা সুরিনাম নদীর মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে'। বলল আহমদ হাত্তা।

'কিন্তু আমি নগরীর কোথাও আর তো ব্রীজ দেখিনি। এ শাখা কি সুরিনামে পড়েনি?' আহমদ মুসা বলল।

'না শাখাটি বাঁক নিয়ে শহরে প্রবেশ করে আবার বেঁকে গিয়ে সোজা আটলান্টিকে পড়েছে'। বলল আহমদ হাত্তা।

'তার মানে আমাদের এখন দুটি ব্রীজ পেরুতে হবে'। আহমদ মুসা বলল।

'হ্যাঁ'। বলল আহমদ হাত্তা।

'আমরা তো অনেক ঘোরা পথে যাচ্ছি, তাই না?' প্রশ্ন করল আহমদ মুসা।

'হ্যাঁ'। বলল আহমদ হাত্তা।

'এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত রাস্তা ছিল না?' আহমদ মুসা বলল।

'ছিল। মনে হয় ভীড় কম ফ্রী রাস্তা বলেই এ রাস্তা বেছে নেয়া হয়েছে'। বলল আহমদ হাত্তা।

যুক্তিটা আহমদ মুসার কাছে মনোপুত হলো না। পারামারিবোর কোন রাস্তাই এমন ভীড়ের নয় যে এজন্যে এতটা ঘোরা পথ বেছে নিতে হবে।

হঠাৎ মনটা খারাপ হয়ে গেল আহমদ মুসার। দুর্বল লাগল খুব নিজেকে। এর প্রভাব পড়ল গাড়ি চালনার উপরও। আহমদ মুসার গাড়ি পুলিশের ক্যারিয়ার ভ্যান থেকে কিছুটা পিছিয়েই পড়ল।

পুলিশের জীপটি ব্রীজে উঠে পড়েছে। পরক্ষণে পুলিশের ক্যারিয়ার ভ্যানটিও ব্রীজে উঠে পড়ল।

ব্রীজের উপর কিছুটা এগিয়েছে গাড়ি দুটো।

আহমদ মুসার গাড়ি ব্রীজের মুখ থেকে এখনও কিছুটা দূরে।

এ সময় সামনে থেকে প্রচন্ড বিষ্ফোরণের শব্দ হলো।

ভূমিকম্পের মত প্রচন্ডভাবে কেঁপে উঠেছে রাস্তা, প্রবল ঝাঁকুনি খেয়েছে গাড়ি।

আহমদ মুসার পা যেন অজান্তেই ব্রেক কষেছে গাড়ির।

আহমদ মুসা দেখল সামনে প্রলয়কান্ড ঘটে গেছে। ধোঁয়ার মধ্য দিয়েই দেখা যাচ্ছে, ব্রীজের এ দিকের অংশটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সেই সাথে দুটি গাড়িও।

বিমূঢ় অবস্থা কেটে যেতেই আহমদ মুসা দ্রুত গাড়ি থেকে নামল। গাড়ি থেকে নামল বার্নারডোও। পেছনের গাড়ির নিরাপত্তা গার্ডরাও নেমে এল গাড়ি থেকে। নেমে এসেছে গাড়ি থেকে আহমদ হাত্তা ও অন্যরাও।

সকলের চোখে মুখেই বিমূঢ় আতংকভাব, শংকিত প্রশ্ন।

এরই মধ্যে বার্নারডো আহমদ হাত্তাকে লক্ষ্য করে বলল, ‘স্যার আপনার বাইরে বেরুনো ঠিক হয়নি। আপনি ভেতরে যান স্যার। ষড়যন্ত্র করেই আমাদের গতিরোধ করা হয়েছে’।

‘না বার্নারডো, ওদের ষড়যন্ত্রের কাজ শেষ হয়েছে। ওরা আমাদের দুগাড়িকে ধ্বংস করার জন্যেই ব্রীজে বোমা পেতেছিল। ওদের দুর্ভাগ্য, আমাদের গাড়ির বদলে পুলিশের দুগাড়ি বোমার শিকার হলো’। শান্ত কন্ঠে বলল আহমদ মুসা।

আহমদ হাত্তার মুখে বিস্ময়ের বিস্ফোরণ। এই সাথে তার দুচোখ ভরা আতংক। বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, ‘মি আহমদ মুসা আপনার মাধ্যমে আল্লাহ আবার আমাদের সবাইকে রক্ষা করলেন। পুলিশের দুটি গাড়িকে আগে দিয়ে আমাদের গাড়ি দুটিকে পেছনে না রাখলে আমরাই বোমার শিকার হতাম। আপনাকে……..?

আহমদ মুসা আহমদ হাত্তার কথায় বাধা দিয়ে বলল, মি. হাত্তা আপনি এখনি প্রেসিডেন্টকে টেলিফোনে ঘটনার কথা জানান ও উদ্ধারের জন্যে আবেদন করুন’।

আহমদ হাত্তার সাথে কথা বলা শেষ করেই আহমদ মুসা আহমদ হাত্তার সেক্রেটারীকে বলল, ‘আপনি টেলিফোন করুন আইজিকে এবং তাড়াতাড়ি সাহায্য পাঠাতে বলুন’।

আবার আহমদ মুসা ফিরল বার্নারডোর দিকে। বলল, ‘বার্নারডো, তুমি মি. হাত্তাকে নিয়ে এখানে থাক। মি. হাত্তার সেক্রেটারীও এখানে থাকবে। আমি অন্য সবাইকে নিয়ে নদীতে যাচ্ছি, দেখি কিছু করা যায় কিনা’।

বলে আহমদ মুসা পাঁচজন নিরাপত্তা গার্ডকে নিয়ে রাস্তা থেকে নদীতে নামার জন্য যাত্রা শুরু করল।

সকাল আটটা। ঘুম ভাঙেনি আহমদ মুসার তখনও।

গত রাত দুইটায় আহমদ মুসা বাসায় ফিরেছে।

গতকাল অত্যন্ত ব্যস্ত দিন গেছে আহমদ মুসার।

ব্রীজের বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় দুগাড়ি পুলিশের কেউ বাচেঁনি।

এই ঘটনার পর আহমদ মুসা আহমদ হাত্তাকে নিয়ে সোজা চলে গিয়েছিল থানায়। দুটি কেস দায়ের করেছিল। তাকে হত্যার জন্যেই নির্বাচন অফিসে তার গাড়িতে বোমা পেতে রাখা হয়েছিল। আবার তাকে হত্যার জন্যেই ব্রীজে বোমা পেতে রাখা হয়। পুলিশ কর্তৃপক্ষ আহমদ হাত্তার জন্যে প্রেরিত পুলিশ টিমকে ব্রীফ করেছিল, পুলিশের গাড়ি দুটি আহমদ হাত্তার গাড়ি দুটির পেছনে থাকবে। আহমদ হাত্তার ফেরার জন্যে রিং রোডকে তারা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল। এই তথ্য রোনাল্ড রঙ্গলালের সুরিনাম পিপলস কংগ্রেস ফাঁস করতে সমর্থ হয় এবং ব্রীজে বোমা পেতে তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে।

থানায় মামলা দায়েরের পরই আহমদ মুসা আহমদ হাত্তাকে নিয়ে চলে যায় জাতীয় প্রেস ক্লাবে। পূর্বেই আহমদ হাত্তার সেক্রেটারীকে প্রেস ক্লাবে পাঠানো হয়েছিল জরুরী ভিত্তিতে সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজনের জন্যে। রাত আটটায় দেশী-বিদেশী সাংবাদিকদের নিয়ে সুরিনামের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আসন্ন নির্বাচন প্রার্থী আহমদ হাত্তার জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সফল সাংবাদিক সম্মেলনের পর গত চার মাসের মধ্যে প্রথম বারের মত আহমদ হাত্তা পার্টি অফিসে যায় এবং পার্টির নির্বাহী কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

আহমদ হাত্তাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে ওভানডোদের ওখানে পৌঁছতে আহমদ মুসার রাত দুটো বেজে যায়।

রাত সাড়ে তিনটায় শুয়েছে আহমদ মুসা।

ঠিক সকাল আটটায় টেবিলে নাস্তা সাজানো হলো।

ওভানডো আগেই এসে বসেছিল ভেতরের ড্রইংরুমে। ধীরে ধীরে সেখানে ওভানডোর দাদী, ওভানডোর মা, ওভানডোর স্ত্রী জ্যাকুলিন, লিসা, ফাতিমা সবাই এসে বসল।

তারা যেখানে বসেছে সেখান থেকে আহমদ মুসার শোবার ঘরের দরজা দেখা যায়।

লিসা এসেই ওভানডোকে বলল, 'ভাইয়া উনি উঠেছেন কিনা দেখেছ, নাস্তার সময় তো চলে যাচ্ছে'।

'রাখ তোমার নাস্তা। কাল ওঁর উপর দিয়ে যে ধকল গেছে, তাতে দুতিন দিন ওঁকে ঘুমানো দরকার'। বলল ওভানডো।

'রাতে ফাতিমার আব্বা আমাদের সাবেক প্রধানমন্ত্রী সাহেব টেলিফোন করেছিলেন আহমদ মুসা বাসায় পৌঁছেছে কিনা জানার জন্যে। তিনি ফাতিমাকে বলেছেন, এক দিনে আহমদ মুসা যা করেছে, তাতেই দেশের পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। রিপাবলিকান পার্টি শুয়ে পড়েছিল, আহমদ মুসা একদিনেই দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন'। বলল ওভানডোর মা।

ওভানডোর মা থামতেই ফাতিমা বলে উঠল, 'গতকাল তিনবার উনি আব্বাকে তার লোকজন সমেত সাক্ষাত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন'। বলে ফাতিমা তার আব্বার কাছ থেকে যা শুনেছিল সব একে একে বলল।

'কিন্তু আহমদ মুসা তো রাতে এসবের কিছু বলেনি। তার কথা শুনে মনে হয়েছে বড় তেমন কিছু ঘটেনি'। বলল ওভানডোর মা।

'প্রয়োজনের বেশী তিনি একটুও বলেন না। দেখুন না, কদিন হলো আমাদের সাথে পরিচয়। কিন্তু কি জানি তার দেশ কোথায়, কে আছে তার? জানি না'। বলল জ্যাকুলিন, ওভানডোর স্ত্রী।

'গত ১৯ তারিখ রাত থেকে আজ ২১ তারিখ পর্যন্ত দুদিন তিন রাতে আহমদ মুসা ভাই যে কাজ করেছেন তা আমরা তিন বছর তিন যুগেও পারতাম না। সাবেক প্রধানমন্ত্রী জনাব আহমদ হাত্তা ঠিকই বলেছেন দুদিনে তিনি সুরিনামের পরিস্থিতি পাল্টে দিয়েছেন। যারা কাজ করেন তারা কথা বলেন না। যারা বড় তারা বড়ত্ব প্রচার করেন না। আজ সকালের বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকার দুটি বুলেটিনই আমি শুনেছি। তাতে গত দিন ও রাতের সব ঘটনা বিস্তারিত বলেছে এবং সব কৃতিত্ব দেয়া হয়েছে জনাব আহমদ হাত্তার শিখ ড্রাইভারকে। তার মানে আহমদ মুসার মত লোক জনাব আহমদ হাত্তার ড্রাইভারে পরিণত হলেন। শুনতে আমার খুব খারাপ লেগেছে, মনটা খছ খছ করেছে। ইচ্ছা হয়েছে চিৎকার করে বলি, তিনি ড্রাইভার নন, তিনি বিশ্ববিখ্যাত আহমদ মুসা।

কিন্তু আমার কাছে যা খুবই খারাপ লেগেছে সেটা আহমদ মুসার কাছে কিছুই নয়। বলল ওভানডো।

'বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকা আর কি বলেছে ভাইয়া?' লিসা বলল।

'অনেক কথা বলেছে। একদম হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছে। নির্বাচন অফিসে জনাব হাত্তার গাড়ি ও ব্রীজে বোমা বিস্ফোরণের জন্য রোনাল্ড রঙ্গলালের সুরিনাম পিপলস কংগ্রেসকে দায়ী করা হয়েছে। বলা হয়েছে, নমিনেশন পেপার জমা দেয়ার আগেই জনাব হাত্তাকে রঙ্গলালরা আটকাতে চেয়েছিল, তা না পেরে নমিনেশন পেপার জমা দেয়ার পর তাকে হত্যা করার চেষ্টা করে। বেশ কিছু তথ্য প্রমাণ দিয়ে বিবিসি- ভয়েস অব আমেরিকা বলেছে, এসব ঘটনায় পুলিশের একাংশের ঘনিষ্ঠ যোগসাজস আছে। অন্যদিকে প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে সাবেক প্রধানমন্ত্রী আহমদ হাত্তা হাটে হাঁড়ি ভাঙার কাজ কমপ্লিট করে দিয়েছেন। বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকা এই সাংবাদিক সম্মেলনের উপর বিস্তারিত রিপোর্ট করেছে। সাংবাদিক সম্মেলনে আহমদ হাত্তা তার নির্বাচন করা বন্ধ করার জন্য রঙ্গলালের সুরিনাম কংগ্রেস কিভাবে তাকে কিডন্যাপ করে দেশের বাইরে নিয়ে গিয়েছিল, কিভাবে তার মেয়েকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছিল, কিভাবে গত চারমাসে সুরিনামের হাজার হাজার তরুন নেতা-কর্মীকে কিডন্যাপ করে হত্যা করেছে, কিভাবে তাকে গোপনে নাম ভাঁড়িয়ে দেশে প্রবেশ করতে হয়, দেশে ফিরলে তাকে ও তার কন্যাকে কিভাবে কিডন্যাপের চেষ্টা করা হয়, ওয়াং আলীর উপর কিভাবে নির্যাতন চালানো হয়, নমিনেশন পেপার জমা দেয়ার জন্যে নির্বাচন অফিসে যাওয়ার পথে কিভাবে তার উপর হামলা চালানো হয় এবং সব শেষে কিভাবে গাড়ি ও ব্রীজে বোমা পেতে তাকে হত্যার চেষ্টা করা হয় তার বিস্তারিত বিবরণ তথ্য প্রমাণ, তারিখ ইত্যাদি সমেত সাংবাদিকদের সামনে উপস্থিত করেন। জনাব আহমদ হাত্তা এসব ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করেছেন এবং এসব অপরাধের জন্য রোনাল্ড রঙ্গলালসহ সুরিনাম কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের বিচার ও তাদেরকে নির্বাচনের অযোগ্য ঘোষণার দাবী জানিয়েছেন'।

থামলো ওভানডো।

ওভানডো থামতেই লিসা বলে উঠল, 'এবার দেখো আহমদ হাত্তা আংকেল ও রিপাবিলিকান পার্টি আগের চেয়ে অনেক বেশি আসন নিয়ে জয়লাভ করবে'।

এ সময় আজকের সংবাদপত্রগুলো দিয়ে গেল কাজের ছেলেটা।

খবরের কাগজগুলো পেয়ে তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল সবাই।

লিসা ঘুরে ঘুরে সবার কাছে গিয়ে সব কাগজের উপর চোখ বুলানো শেষ করে বলল, 'একি ভাইয়া কংগ্রেস সমর্থক কাগজগুলোও তো সব খবর ভালোভাবে দিয়েছে'।

'না দিয়ে যাবে কোথায়। বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকার মাধ্যমে সবাই সব খবর জানতে পেরেছে। এখন খবর চাপা দিলে তো পাঠকদের কিল খেতে হবে'। বলল ওভানডো।

'ভাবছি, কংগ্রেসের রঙ্গলাল বাবুরা এখন মুখ দেখাবে কি করে?' বলল লিসা।

'বল কি তুমি, আজকেই সাংবাদিক সম্মেলন করে ওরা বলবে, 'হাত্তা যা বলেছে সব মিথ্যা'। ওভানডো বলল।

'মানুষ তা বিশ্বাস করবে কেন?' বলল লিসা।

'মানুষ বিশ্বাস না করুক, মুখ দেখানোর কাজটা হয়ে গেল'। ওভানডো বলল।

আহমদ মুসার ঘরের দরজায় শব্দ হলো।

সবাই তাকালো সেদিকে।

দেখলো সবাই, আহমদ মুসার দরজা খুলে গেছে। এখনি বেরিয়ে আসবে সে।

জ্যাকুলিন, লিসা ও ফাতিমা তিনজনেই তাদের মাথার ওড়না কপাল পর্যন্ত টেনে নিল। ঠিক ঠাক করল ওড়নার গায়ের অংশও।

আহমদ মুসা ড্রইংরুমে প্রবেশ করল। সালাম দিল সবাইকে।

আহমদ মুসাকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়েছে ওভানডোর দাদী। বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, ভাই চল নাস্তার টেবিলে।

সবাই উঠে দাঁড়াল।

নাস্তার টেবিলে আহমদ মুসার পাশে বসতে বসতে ওভানডো বলল, ‘আহমদ মুসা ভাই, আপনার মিশন সাকসেসফুল। এবার কয়েকদিন শুধু আপনাকে ঘুমাতেই হবে’।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘নাটকের একটা অংকের সমাপ্তিকে নাটকের সমাপ্তি বলো না ওভানডো’।

‘রঙ্গলালদের আর কি করার আছে ভাইয়া?’ ওভানডো বলল।

‘রঙ্গলাল ও তিলক লাজপত পালের উত্তরসূরীরা কি করতে পারে তা বলে তোমার মন খারাপ করাবো না, তার চেয়ে বল আজকের কাগজগুলো কি লিখেছে’। বলল আহমদ মুসা।

‘কি লেখেনি সেটা বলুন ভাইয়া। কিছু বাদ দেয়নি। কংগ্রেসের কাগজগুলো যে হঠাৎ আজ মানুষ হয়ে গেছে’। ওভানডো বলল।

ওভানডো থামতেই লিসা বলে উঠল, ‘বলুনতো পুলিশের দুগাড়িকে আগে থাকতে বলেছিলেন কেন, বোমার কথা জানতেন?’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘ঝড়ে বক পড়ে, ফকিরের কেরামতি বাড়ে’ ব্যাপারটা এই রকম। আমি পুলিশকে সন্দেহ করেছিলাম। পুলিশ পেছনে থাকতে চেয়েছিল। রাজী হইনি। কারণ পুলিশের সাথে শত্রুপক্ষের যোগসাজশ থাকলে এবং শত্রুরা সামনে আক্রমণ করলে দুদিকের চাপে আমরা চিড়া চ্যাপ্টা হয়ে যাব। তাই পেছনটা উম্মুক্ত রাখতে চেয়েছিলাম। বোমার ব্যাপারটা জানলে পুলিশকে বাঁচানোও আমাদের অবশ্য কর্তব্য হতো।

আহমদ মুসা থামতেই ফাতিমা বলে উঠল, ‘নির্বাচন অফিসে গাড়ি বোমার ঘটনায় আপনি ফটো সাংবাদিককে সন্দেহ করলেন কেন? সে বোমা রাখতে পারে ভাবলেন কি করে?’

‘কেন পত্রিকায় লেখেনি? ফটো সাংবাদিককে গাড়ির সামনের টপে উঠে ভেতরে মুখ নেয়া এবং শেষের স্ন্যাপগুলো দেরি করে নেয়ার কথা শুনেই আমার সন্দেহ হয়েছে যে, সে গাড়িতে অন্য কিছু করেছে। অন্য কিছু মানে, সে যদি শত্রু হয় তবে বোমা পাতাই স্বাভাবিক’।

আহমদ মুসা থামল।

ওভানডোর মা গম্ভীর হয়ে ভাবছিল। আহমদ মুসা থামতেই সে বলে উঠল, 'তুমি বললে বাছা, নাটকের একটা অংক শেষ, নাটক শেষ হয়নি। তার মানে নাটকের আরও অংক বাকি। কি সে অংক বাবা?'

আহমদ মুসা কিছু বলার জন্য মুখ খুলেছিল। এ সময় টেলিফোন বেজে উঠল। ওভানডো টেলিফোন ধরে কথা বলে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভাইয়া আপনার টেলিফোন। সাবেক প্রধানমন্ত্রী মি. আহমদ হাত্তা কথা বলবেন'।

আহমদ মুসা উঠে গেল টেলিফোন ধরতে।

# ৭

'হ্যাঁ, আমাদের কিছু অসুবিধা হয়েছে। গত তিন দিনে আমাদের মূল্যবান লোকক্ষয় হয়েছে ও আমাদের প্রায় অর্ধডজন পরিকল্পনা মাঠে মারা গেছে। আহমদ হাত্তা এর ফলে কিছু প্রচার সুবিধা পেয়ে গেছে। কিন্তু আমরা পরাজিত হইনি। গত তিন দিনের ব্যর্থতা আহমদ হাত্তাদের কাছে আমাদের পরাজয় নয়। বাইরে থেকে হায়ার করা শক্তি দিয়ে যে বিজয় অর্জন করেছে, তা তাদের বিজয় নয়। আমরা তাদের সাময়িক এ সাফল্যের উৎস বের করার কাজে হাত দিয়েছি। আমরা..........'।

রোনাল্ড রঙ্গলাল বাধা পেল। সামনে বসা সুরিনাম কংগ্রেসের প্রেসিডিয়াম সদস্যদের মধ্যে থেকে একজন 'মি. চেয়ারম্যান' বলে উঠে দাঁড়িয়েছে।

উদ্ভূত পরিস্থিতির বিষয়ে আলোচনার জন্যে সুরিনাম পিপলস কংগ্রেসের নির্বাহী কমিটির বৈঠক ডেকেছে দলের চেয়ারম্যান রোনাল্ড রঙ্গলাল। বৈঠকে 'মায়ের সূর্য সন্তান' সংগঠনের অস্থায়ী প্রধান শিবরাম শিবাজীসহ নির্বাহী কমিটির সকলকেই দাওয়াত দেয়া হয়েছে।

প্রেসিডিয়াম সদস্যটি 'মি. চেয়ারম্যান' বলে উঠে দাঁড়ালে রোনাল্ড রঙ্গলাল থেমে গিয়ে বলল, 'বলুন কি বলতে চান'।

বলল সদস্যটি, 'আপনি যে সব কথা বলেছেন, তা আমরা সকলেই জানি। আহমদ হাত্তার একজন ড্রাইভারের কাছে গতকাল আপনাদের সব পরিকল্পনা ধরা পড়ে গেছে, এই লজ্জার কথা শুনে আমাদের লাভ নেই। হায়ার করা লোকের কথা বলছেন। গতকালকের তিনটি ঘটনায় কোথায় ছিল হায়ার করা লোক? গত তিন দিনের ঘটনা সম্পর্কে আমরা অন্ধকারে ছিলাম। এখন বলছেন, ওদের সাফল্যের উৎস খুঁজতে শুরু করেছেন। চোখের সামনে যে ঘটনা ঘটল, তার সাফল্যের উৎস কি ঘটনার সাথেই নেই? অনুসন্ধানের কি কোন প্রয়োজন

আছে? এসব কথা শুনে কোন লাভ নেই। জানতে চাই, আপনার কাছে ভবিষ্যতের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা’।

রোনাল্ড রঙ্গলালের চোখ-মুখ অপমানে লাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু কিছু বলার নেই। প্রেসিডিয়াম সদস্যটি যা বলেছে, তা অযৌক্তিক নয়।

প্রেসিডিয়াম সদস্যটি থামলেও রোনাল্ড রঙ্গলাল সংগে সংগে কিছু বলতে পারল না। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলল, ‘সম্মানিত যুবক সদস্য যে আবেগ নিয়ে কথা বলেছেন, তাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। সেই সাথে বাস্তবতা অনুধাবন করার অনুরোধ করছি। আমি বুঝতে পারছি যুবক প্রেসিডিয়াম সদস্যের আবেগ দারুনভাবে আহত হয়েছে, কিন্তু গত তিন দিনের ঘটনায় আমার গোটা অস্তিত্বে আগুন ধরে গেছে। দিশেহারা হয়ে গেছি আমি। মনে হচ্ছে, মহাকালীর কৃপাণ, শিবের মহাস্ত্র চক্র যেন ওরা পেয়ে গেছে। মহাকালীর কৃপাণ ও শিবের চক্রে আমরা কচুকাটা হয়ে গেলাম! কিন্তু এটা ঠিক মহাকালীর কৃপাণ ও শিবের চক্র ওদের পাবার কথা নয় এবং পায়নি। তাহলে এই অসাধ্য সাধন ওরা করছে কোন শক্তিতে? এই শক্তিকে চিহ্নিত করতে পারলেই শুধু তার প্রতিরোধ ও প্রতিকার আমরা করতে পারবো। এই কথাই আমি বলছিলাম সম্মানিত প্রেসিডিয়াম সদস্যগন’। থামল রোনাল্ড রঙ্গলাল।

প্রেসিডিয়াম সদস্যরা কেউ সংগে সংগে কথা বলল না। ভাবনার প্রকাশ তাদের চোখে-মুখে।

সেই যুবক প্রেসিডিয়াম সদস্যই আবার উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘স্যরি মি. চেয়ারম্যান, আমার বক্তব্য হলো ‘চিহ্নিত করতে হবে’ এটা আমরা শুনতে চাই না, চিহ্নিত করা হয়েছে, প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হয়েছে, আমরা শুনতে চাই এই খবর’।

‘আমি আপনাদের আশ্বস্ত করার জন্য অংগীকার করছি সত্বরই এ খবর আপনাদের দেব’। বলল রঙ্গলাল।

‘মি. চেয়ারম্যান আপনি বলেছেন আপনি ওদের সাফল্যের উৎস বের করার কাজে হাত দিয়েছেন, সে কাজটা কি?’ বলল আর একজন প্রেসিডিয়াম সদস্য।

‘আমরা মনে করি, আমাদের মোকাবিলা করার জন্যে শক্তিশালী কোন মাফিয়া গ্রুপকে আমদানী করেছেন আহমদ হাত্তা। আমরাও আমেরিকার সবচেয়ে সেরা, সব চেয়ে শক্তিশালী মাফিয়া গ্রুপকে নিয়ে আসছি। তাদের অগ্রবর্তী একটা দল ইতোমধ্যেই পারামারিবো পৌঁছে গেছে। আমি এ বৈঠকের পর তাদের সাথে বসব’। বলল রোনাল্ড রঙ্গলাল।

রোনাল্ড রঙ্গলালের কথা শেষ হতেই একজন প্রেসিডিয়াম সদস্য চট করে উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘কিন্তু দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ের সাথে মাফিয়াদের জড়িত করা কি ঠিক হবে? ওরা টাকায় ক্রয়যোগ্য দুধারী তলোয়ার। টাকা দিয়ে শত্রুরাও ওদের কাজে লাগাতে পারে। তাছাড়া আমাদের দুর্বলতা টের পাবার পর আমাদের ঘাড়ে যদি ওরা সিন্দাবাদের ভূতের মত চেপে বসে?’

হাসল রোনাল্ড রঙ্গলাল। বলল, ‘এ ভয় অমূলক সম্মানিত সদস্য। মাফিয়ারা তাদের অংগীকারের প্রতি বিশ্বস্ত হয়ে থাকে। যে কাজের জন্যে তারা টাকা নেয়, জীবন দিয়ে হলেও তা তারা সমাধা করে। না পারলে তাদের নিজের থেকেই টাকা ফেরত দেবার দৃষ্টান্তও আছে। আর তাদের না ডেকে উপায়ও তো নেই। আহমদ হাত্তারা যে অস্ত্র দিয়ে লড়াই করছে, সে অস্ত্র আমাদেরও ব্যবহার করতে হবে’।

‘কিন্তু আহমদ হাত্তারা মাফিয়াদের ডেকেছে, তাতো প্রমাণিত হয়নি’।বলল অন্য আর একজন প্রেসিডিয়াম সদস্য।

‘তা ঠিক, প্রমাণিত হয়নি। কিন্তু আমাদের অনুমান মিথ্যা নয়। গত তিন দিনে আমাদের ট্রেইন্ড ও অত্যন্ত সুদক্ষ সত্তর আশিজন লোক যেভাবে কচুকাটা হয়েছে তা প্রফেশনাল কিলার মাফিয়াদের পক্ষেই শুধু সম্ভব। প্রথম যে ঘটনায় ওয়াং হাতছাড়া হয়, সে ঘটনা ঘটিয়েছে মাত্র একজন লোক। অসম্ভব ক্ষিপ্র ও অবিশ্বাস্য দুঃসাহসী সে লোক। ব্রুকোপনডো হাইওয়ের যে হত্যাকান্ড তাও ঘটিয়েছে মাত্র দুজন লোক। আগাম খবর পেয়ে আমাদের দুগাড়ি লোক তাদেরকে দুদিক থেকে ঘিরে ফেলেও সবাই নিহত হয়েছে। টেরেক স্টেটের গেটের যে হত্যাকান্ড তাও ঘটিয়েছে একজন লোক। এমন লোক আহমদ হাত্তার রিপাবলিকান পার্টিতে কেন, কোন দেশের কোন রাজনৈতিক দলের হাতে থাকা

অসম্ভব। আসলে আহমদ হাত্তারা চূড়ান্ত মার খাবার পর অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে মাফিয়াদেরই আশ্রয় নিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বন্দী অবস্থা থেকে ছাড়া পাবার পর সে ওখানেই মাফিয়াদের সাথে একটা বন্দোবস্ত করে ফেলেছে। তা না হলে সে এবং তার মেয়ে ফাতিমা এদেশে পা রাখার সাহস পায়?'

'আমরা আমাদের 'মাসুস' (মায়ের সূর্য সন্তান) কর্মীদের খুব দুর্ধর্ষ্য মনে করতাম। তারা কি করল? দুগাড়ি স্টেনগানধারী সাথে থাকার পরও মাত্র একজনের মোকাবিলায় তিলক লাজপত পালের মত ব্যক্তিত্বও বাঁচতে পারেনি। তাহলে কি দিয়ে আমরা 'মায়ের রাজ্য' কায়েম করার আশা করছি? বলল আরেকজন প্রেসিডিয়াম সদস্য।

'আমাদের উদ্বেগ তো ওখানেই। আমাদের 'মাসুস' সদস্যরা অযোগ্য নয়। তারাই তো গত চার মাসে আহমদ হাত্তা, তার রিপাবলিকান পার্টি, সুরিনামের মুসলিম জনশক্তি ও তাদের সহযোগীদের 'জিরো'তে নিয়ে এসেছিল। এ নির্বাচনে আহমদ হাত্তা দাঁড়াবারই সাহস পেত না এবং কোন মুসলমান ও তাদের সহযোগীরা এই নির্বাচনে নির্বাচিত হবার সুযোগ পেত না। কিন্তু মাত্র তিন দিনের ঘটনা সব ওলট পালট করে দিল। যারা এই ওলটপালট করে দিল, তারাই এখন আমাদের টার্গেট। তাদের শেষ করতে পারলে আহমদ হাত্তাদের 'জিরো' তে নিয়ে যেতে আমাদের দেরী হবে না'। বলল রোনাল্ড রঙ্গলাল।

কথা শেষ করে একটু থেমেই রোনাল্ড রঙ্গলাল আবার বলে উঠল, 'বৈঠকের অবশিষ্ট এজেন্ডাগুলো আলোচনায় আমাদের ভাইস চেয়ারম্যান সাহেব সভাপতিত্ব করুন। মাফিয়া প্রতিনিধিরা অপেক্ষা করছে। আমি ওখানে যাচ্ছি। আমার সাথে শিবরাম শিবাজীও আসুন'।

বলে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল রোনাল্ড রঙ্গলাল। রোনাল্ড রঙ্গলাল ও শিবরাম শিবাজী মিটিং কক্ষ থেকে বের হয়ে গেল।

রোনাল্ড রঙ্গলাল ও শিবরাম শিবাজী পাশাপাশি সোফায় বসে।

তাদের সামনের সোফায় বসে আরও দুজন। তীরের মত ঋজু তাদের শরীর। গায়ের রং বাদামী। মিশ্র চেহারা, তবে মধ্য আমেরিকান ধাঁচটা বেশি।

দুজনের একজন ন্যাড়া মাথা। অন্যজনের চুল লম্বা, পেছনে ঘোড়ার লেজের মত করে বাঁধা। দুজনেরই উচ্চতা ছ'ফুটের কম হবে না।

দুজনেরই চোখ ছুরির মত ধারাল। মুখে কাঠিন্য ও আক্রমনাত্মক ভাব। দেখে মনে হয় এখনি যেন ঝাঁপিয়ে পড়বে। খুন এদের কাছে কথা বলার মত সহজ, তা দেখেই বোঝা যায়।

খুশি হয়েছে রোনাল্ড রঙ্গলাল ও শিবরাম শিবাজী। একেই বলে প্রফেশনাল। এ রকম লোকই তো তাদের চাই।

কথা বলছিল রোনাল্ড রঙ্গলাল। গত তিন দিনে তাদের কি বিপদ ঘটেছে তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে বলল, 'সুরিনামে আমদানি হওয়া এই শত্রুদের আমরা সমূলে শেষ করতে চাই, এজন্যেই আমরা আপনাদের দ্বারস্থ হয়েছি। বলুন কিভাবে আমাদের সহযোগিতা করতে পারেন'।

'টাকার অংক আমরা জানিয়েছি। আপনারা রাজী?' বলল বড় চুলওয়ালা লোকটা।

'এ ব্যাপারে আমরা কিছু বলতে চাই'। বলল রোনাল্ড রঙ্গলাল।

'না, আমরা এক কথায় কাজ করি। আমরা যা বলেছি তাতে ইয়েস করলে আপনারা যা বলেছেন তাতেও আমরা ইয়েস করব। তৃতীয় কোন কথার সুযোগ নেই'। বলল চুলওয়ালা সেই লোকটিই।

'ঠিক আছে। কিন্তু শত্রুর বিনাশ চাই'। বলল রোনাল্ড রঙ্গলাল।

'আপনাদের সেই শত্রুদের তালিকা দিন। টাকা অর্ধেক পাওয়ার পর কাজ শুরু করব'। বলল সেই চুল ওয়ালা।

'অর্ধেকটা আজই পেমেন্ট করব। কিন্তু গত তিন দিনে যে বা যারা ঘটনা ঘটাল, তাদের নাম পরিচয় তো আমরা জানি না। তবে আহমদ হাত্তা, তার মেয়ে ফাতিমা, হবু জামাতা ওয়াং এবং রিপাবলিকান পার্টির অন্যান্য নেতাদের তালিকা তৈরী করে দিয়ে দিচ্ছি। আমাদের ইচ্ছা হলো, নির্বাচনের আগে এদের হত্যা করা যাবে না। 'এ্যাকসিডেন্টের মত ঘটনায় তাদের নিহত হতে হবে'।

‘সেটা আমরা জানি। লিস্টটা দিন। লিস্ট ধরে টান দিলেই অদৃশ্যরাও এসে হাজির হবে, নাম পারিচয় দরকার নেই।

বলে একটু থেমেই চুলওয়ালা বলে উঠল, ‘টেরেক দুর্গের সোনা উদ্ধার সম্পর্কে বলুন। এক চতুর্থাংশ সোনা চেয়েছি এবং টাকার একটি অংক চেয়েছি। সোনা বের না হলে ঐ টাকার বাইরে আমাদের কোন দাবী থাকবেনা। আপনারা রাজী?’

রোনাল্ড ও শিবরাম শিবাজী পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ী করল। শেষে শিবরাম শিবাজী ইতিবাচক মাথা নাড়ল। রোনাল্ড রঙ্গলাল সংগে সংগে বলে উঠল, ‘আমরা রাজি’।

‘টেরেক পরিবারের একটা তালিকা আমাদের দিন’। বলল চুলওয়ালা লোকটি।

‘সেটা রেডি’। বলল রঙ্গলাল।

কথা শেষ করে পরক্ষণেই আবার রোনাল্ড রঙ্গলাল বলে উঠল, ‘আপনাদের নেতা জোয়াও গোলার্ট কবে আসছেন? তার সাথে আরও কিছু কথা বলতে পারলে আমরা খুশী হবো’।

চুলওয়ালা লোকটির চোখ দুটো হঠাৎ জ্বলে উঠল। বলল, ‘জোয়াও গোলার্ট এর সাথে কোনদিনই আপনাদের দেখা হবে না। আপনারা কাজ নেবেন। আমাদের ব্যাপারে কোন কৌতুহল যেন আপনাদের মধ্যে না জাগে। আর ‘জোয়াও গোলার্ট’ নামটা ভূলে যাবেন’।

‘ঠিক আছে। আপনাদের থাকার বন্দোবস্ত.......’।

কথা শেষ করতে পারল না রোনাল্ড রঙ্গলাল। বাধা দিল চুলওয়ালা। বলল, ‘একবার তো বলেছি, শুধু কাজ বুঝে নেয়া ছাড়া আমাদের কোন ব্যাপারে কোন কিছু ভাববেন না আপনারা। আমরা থাকব আকাশে না পাতালে সেটা আমাদের ব্যাপার’। বিরক্তির সাথে কথাগুলো বলল চুলওয়ালা।

রঙ্গলাল ও শিবরাম শিবাজী দুজনেই বিব্রত হয়ে পড়েছিল চুলওয়ালার কথার ধরনে। নিজেকে সামলে নিয়ে রঙ্গলাল বলল, ‘ধন্যবাদ, বুঝেছি’।

রিপাবলিকান পার্টির অফিসগুলোর ঠিকানা এবং যে নামগুলো আমাদের দিয়েছেন তাদের ঠিকানা আমাদের দেবেন’। বলল চুলওয়ালা।

‘রেডি আছে সবকিছু। আমাদের লোকেরা তাদের বাড়ি ও অফিসগুলো দেখিয়েও দেবে’। বলল রঙ্গলাল।

‘খুঁজে বের করা আমাদের কাজ। আপনাদের কোন লোক কখনই আমাদের সাথে কোথাও যাবেনা। এই দেখা হবে কাজ শেষ হলে ফাইনাল পেমেন্টের সময়’। চুলওয়ালা বলল।

কথা শুনে একদিকে খুশি হলো রঙ্গলাল যে, নিজেদের কোন দায়দায়িত্ব থাকছে না। অন্যদিকে ভাবনার সৃষ্টি হলো। পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে যদি কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। এই চিন্তা থেকে রোনাল্ড রঙ্গলাল বলল, ‘যদি কিছু বলার প্রয়োজন হয়, যদি কোন সংশোধনের বা সংযোজনের প্রয়োজন হয়, তাহলে সেটা কিভাবে হবে?’

‘সে চিন্তা আজকেই করতে হবে’। বলল চুলওয়ালা।

‘ভাবনায় পড়ে গেল রোনাল্ড রঙ্গলাল।

কিন্তু শিবরাম শিবাজী বলল, ‘বাদ দিন এ চিন্তা। সে ধরনের কোন কিছুর প্রয়োজন হবে না’।

‘ঠিক আছে। প্রয়োজন হবে না’। বলল রঙ্গলালও।

‘বলে রোনাল্ড রঙ্গলাল টেবিলের উপর হতে নাম ও ঠিকানা সম্বলিত একটা ইনভেলাপ তুলে নিল হাতে। এগিয়ে দিল চুলওয়ালার দিকে।

চুলওয়ালা ব্রীফ কেস খুলে টাকার বান্ডিলগুলো নিয়ে ব্রীফকেস বন্ধ করল। ইনভেলাপ পকেটে পুরল।

উঠে দাঁড়াল এবং ‘গুডবাই’ বলে হাঁটা শুরু করে দিল।

ওরা দুজন বেরিয়ে যেতেই শিবরাম শিবাজী বলে উঠল, ‘মাফিয়াদের ‘ভদ্র’ হতে নেই নাকি?’

‘রাখুন ওসব। এখন যদি কেউ গালে একটা থাপ্পড় দিয়েও কাজ করে দেয়, সেটাই ভাল’। বলল রোনাল্ড রঙ্গলাল।

‘মাফিয়া এ গ্রুপটার নাম কি?’ জিজ্ঞেস করল শিবরাম শিবাজী।

‘কে জিজ্ঞেস করবে বলুন। জিজ্ঞেস করলে হয়তো ডিল বাতিল করে উঠে যেত’। বলল রঙ্গলাল।

হেসে উঠল শিবরাম শিবাজী এবং উঠে দাঁড়াল।

রোনাল্ড রঙ্গলাল ও উঠল।

‘পরনাম’ শহর থেকে পারামারিবো ফিরছিল আহমদ হাত্তা। বেলা দেড়টার মত ‘অড’ সময় তখন।

আহমদ মুসা ড্রাইভ করছে। আহমদ হাত্তা তার পাশের সিটে। পেছনের সিটে আহমদ হাত্তার সেক্রেটারী এবং ওয়াং।

রাস্তায় গাড়ি খুব কম।

রিয়ারভিউতে আহমদ মুসা দেখল পেছনে একটা কার দেড়গুণ বেশী গতিতে ছুটে আসছে।

সামনেই একটা ক্রসিং।

ক্রসিং এ প্রায় পৌঁছে যাচ্ছে আহমদ মুসার গাড়ি। পেছনের গাড়িটিও এসে গেছে তার গাড়ির সমান্তরালে।

সমান্তরালে এসেই গাড়িটি তার বাড়তি স্পীড কমিয়ে দিয়েছে।

আহমদ মুসা কিছুটা বিষ্মিত হয়ে সেদিকে চোখ ফেরাতে যাচ্ছিল।

ঠিক এই সময়েই আহমদ মুসার নজরে পড়ল, বাম পাশের ‘পরনাম’ গামী সড়ক দিয়ে ছুটে আসা একটা ট্রাক হঠাৎ ক্রসিং এ বাঁক নিয়ে ক্রসিং দিয়ে তাদের রাস্তার দিকে ছুটে আসছে।

ট্রাকটি একেবারে আহমদ মুসার গাড়ির ঘাড়ে পড়ার যোগাড়। ডান দিকে টার্ন নেবার পথ বন্ধ পেছনের গাড়িটি পাশে চলে আসায়।

একটা চিন্তা হঠাৎ আহমদ মুসার মাথায় ঝিলিক দিয়ে উঠল এটা কি তার গাড়ি পিষে ফেলার একটা ফাঁদ?

পরবর্তী বই

# সুরিনামে মাফিয়া

কৃতজ্ঞতায়ঃ Muhammad Shahjahan

# সাইমুম-৩৪

# সুরিনামে মাফিয়া

আবুল আসাদ

# ১

হ্যারিকেন ঝড়ের মত ঘাড়ের উপর এসে আপতিতপ্রায় ট্রাকটি দেখে শেষ মুহূর্তে যে আশঙ্কার চিন্তা আহমদ মুসার মাথায় ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল, তা তার অনুভূতিকে ভোঁতা করে দেয়া নয় বরং তার ব্রেনের কমান্ড অফিসকে বিদ্যুৎগতির সক্রিয়তা দান করেছিল। আহমদ মুসার ব্রেনের কমান্ড যত দ্রুত ছিল, তার চেয়েও দ্রুত গতিতে গাড়ির ব্রেক কষল আহমদ মুসার পা।

তার মানে ট্রাকের সর্বনেশে মতলবের চিন্তাটা আহমদ মুসার মাথায় ঝিলিক দিয়ে ওঠার সাথে সাথেই সে কঠিন এক ব্রেক কষেছিল গাড়ির। গাড়ি আর এক ইঞ্চিও না এগিয়ে ডেডস্টপ হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু আহমদ মুসার গাড়ির সমান্তরালে চলে আসা গাড়িটা দাঁড়ায়নি। আহমদ মুসার গাড়িকে অতিক্রম করে এগিয়ে গেল সামনে।

আহমদ মুসার গাড়িকে অতিক্রম করে পাঁচ ফুটও এগোয়নি গাড়িটা। ঘটে গেল মর্মান্তিক ঘটনা।

দু'হাতে স্টিয়ারিং ধরে বিমূঢ়ভাবে সামনে তাকিয়ে থাকা আহমদ মুসার চোখের উপর চলন্ত দেয়ালের একটা পর্দা সৃষ্টি করে আহমদ মুসার গাড়ির প্রায় নাক ঘেষে ট্রাকটি গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল গাড়িটার উপর।

আহমদ মুসা সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নামল।

গাড়ির পেছন ঘুরে দ্রুত সে গেল গাড়িটার কাছে যার ঘাড়ে এসে পড়েছে ট্রাকটি।

গাড়িটা দুমড়ে-মুচড়ে একদম ভর্তা হয়ে গেছে।

গাড়ির আরোহীর কি অবস্থা হয়েছে সেটা দেখার জন্যে আহমদ মুসা গাড়িটার ঘনিষ্ঠ হচ্ছিল।

এ সময় ট্রাকটির ইঞ্জিন গর্জন করে উঠল। সেই সাথে নড়ে উঠল ট্রাকটি।

পিছু হটছে ট্রাক।

পালাচ্ছে?

গাড়ির দিক থেকে ট্রাকটির দিকে ঘুরে দাঁড়াল আহমদ মুসা। সেই সাথে আহমদ মুসার হাতে উঠে এসেছে তার রিভলবার।

আহমদ মুসা ট্রাকের টায়ারে গুলী করতে গিয়ে তার চোখ পড়ল ট্রাকের জানালা দিয়ে ড্রাইভিং সিটের উপর। দেখল, একজন নেড়ে মাথা লোকের বাম হাত স্টিয়ারিং হুইলে এবং তার রিভলবার ধরা ডান হাত প্রসারিত হচ্ছে তার দিকে।

দেখেই আহমদ মুসা ঝাপ দিল ট্রাকের গাড়ির বিপরীত দিকে ছিঁড়ে-চ্যাপটা হওয়া গাড়িটির পাশে এবং মাটিতে পড়েই আহমদ মুসা অবিরাম চারটি গুলী করল। তার দুটি ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে উইন্ডস্ক্রিনে, অন্য দুটি ট্রাকের সামনের দুই টায়ারে।

প্রথম দুটি গুলীতে উইন্ডস্ক্রিন সম্পূর্ণটাই ভেঙ্গে পড়েছে। কিন্তু নেড়ে মাথা লোকটি বেঁচে গেছে। তবে একটা কাজ হয়েছে নেড়ে মাথা লোকটির রিভলবার আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে একটা ব্যর্থ গুলী করার পর তাক করছিল গাড়ির লোকদের যাদের মধ্যে রয়েছে আহমদ হাত্তা ও ওয়াং আলী। কিন্তু আহমদ মুসা গুলীর মুখে পড়ে সে তার রিভলবার সরিয়ে নিয়েছিল এবং শরীরটাকে সিটের সাথে গুটিয়ে ট্রাক পেছনে সরিয়ে নিচ্ছিল।

কিন্তু আহমদ মুসার তৃতীয় গুলী ট্রাকের সামনের একটি চাকা ফাটিয়ে দিল।

ভারী ট্রাকের সামনের চাকা মুখ থুবড়ে পড়ার পর ট্রাক আর এক ইঞ্চিও পেছনে সরতে পারলো না।

ট্রাকের চাকা বিস্ফোরিত হতেই আহমদ মুসা চিৎকার করে বলল, 'ওয়াং তুমি গাড়ি পেছনে সরিয়ে নিয়ে যাও।'

এই কথাগুলো বলার সাথে সাথেই আহমদ মুসা শোয়া অবস্থাতেই শরীরটাকে দ্রুত গড়িয়ে চিড়ে-চ্যাপটা হয়ে পড়া গাড়ির পেছনে নিয়ে এল।

আহমদ মুসার আশঙ্কা ঠিক, ট্রাকের টায়ার ফেটে যাওয়ার পর যখন গাড়িকে আর পেছনে নেয়া গেল না, তখন ন্যাড়ামাথা লোকটি তার রিভলবার ফেলে স্টেনগান হাতে তুলে নিয়ে সামনে ডানে বেপরোয়া গুলী করতে শুরু করেছে।

ততক্ষনে ওয়াং তাদের গাড়িকে অনেক-খানি সরিয়ে নিয়েছে। আহমদ মুসা গাড়ির পেছনে সরে না গেলে এবং ওয়াং গাড়িটাকে সরিয়ে না নিলে আহমদ মুসা যেমন স্টেনগানের গুলীর মুখে পড়ে যেত, তেমনি গাড়িটাও ঝাঁঝরা হয়ে যেত।

আহমদ মুসা গাড়িতে বসে হাসল। মনে মনে বলল, ন্যাড়া মাথা বন্ধু, তোমার ট্রাকের দুই পাশই এখন এম-১০ এর পাহারায়। তোমাকে তো নামতেই.........।

আহমদ মুসার চিন্তা তখনও শেষ হয়নি।

ন্যাড়ামাথা লোকটি বাম দরজার সমান্তরালে স্টেনগানের নল দক্ষিণমুখী করে অবিরাম তার গুলী বৃষ্টির মধ্যে ট্রাক থেকে নেমে ঐ গুলীর কভারে ট্রাকের পুবপাশে ঘেষে উত্তর দিকে ছুটল।

আহমদ মুসা অপ্রস্তুত থাকায় আগেই গুলী বৃষ্টি শুরু করতে পারেনি। ন্যাড়া লোকটির অবিরাম গুলী বৃষ্টির মুখে দরজার সমান্তরালে তার এম-১০ কে আর তুলে ধরতে পারলো না।

কিন্তু আহমদ মুসা গুলীর মুখোমুখি অবস্থান থেকে সরে যাবার বিকল্প ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলেছে।

আহমদ মুসা গুঁড়ি মেরে বসা তার শরীরটাকে পুবদিকে দু'বার উল্টিয়ে নিল। বিধ্বস্ত গাড়িটির পুব মাথায় গিয়ে পৌঁছল।

গুলীর নিশানা থেকে বেরিয়ে এল আহমদ মুসা। ন্যাড়া লোকটি তখন পিছু হটে ছুটছিল, আর একই নিশানায় গুলী ছুঁড়ছিল। এরই সুযোগ গ্রহণ করলো আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা এম-১০ রেখে রিভলবার তুলে নিয়ে ধীরে সুস্থে লোকটির স্টেনগান ধরা ডান হাত লক্ষ্যে গুলী করল।

ন্যাড়া লোকটির হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল স্টেনগান।

আহমদ মুসা রিভলবার বাগিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়াল। বলল চিৎকার করে, 'শুন ন্যাড়া মাথা বন্ধু, ডান হাতটা গেছে, জীবন হারাতে না চাইলে বাঁ হাত উপরে তুলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাক।'

বলে আহমদ মুসা লোকটির উপর চোখ রেখেই চিৎকার করে উঠল, 'ওয়াং গাড়ি নিয়ে এসো।'

মুহূর্ত কয়েকের মধ্যেই ওয়াং গাড়ি এনে আহমদ মুসার পাশে দাঁড় করাল।

ন্যাড়া মাথা লোকটি আহমদ মুসার নির্দেশ মানেনি। হাত তোলেনি সে। তাকিয়ে আছে সে আহমদ মুসার দিকে। দু'চোখে তার আগুন ঝরছে।

আহমদ মুসা এগুলো তার দিকে।

লোকটি মরিয়া হয়ে বাঁ হাত দিয়ে স্টেনগান তুলে নিতে যাচ্ছিল।

আহমদ মুসা বেপরোয়া এই লোকটিকে নিস্ক্রিয় করার জন্যে গুলী করে তার বাম হাতকেও নিস্ক্রিয় করে দিল। বলল আহমদ মুসা, 'তোমাকে মারব না। ধরতে চাই তোমাকে। কার ভাড়া খাটছ তোমরা তা জানতে চাই।'

ন্যাড়া মাথা লোকটি হো হো করে হেসে উঠল।

বলল, 'মারতে তুমি পার, ধরতে পারবে না আমাদের।' বলেই তার আহত ডান হাতটি মুখে তুলে কামড়ে ধরল একটা আঙুল।

সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারল আহমদ মুসা, নিশ্চয় লোকটির হাতে সাইনায়েড বিষের আংটি আছে। সেটাই সে কামড়ে ধরেছে।

দৌড় দিয়েছিল আহমদ মুসা লোকটিকে বাঁচাবার জন্যে। কিন্তু পারল না। আহমদ মুসা যখন গিয়ে তার হাতটি মুখ থেকে সরিয়ে নিল, তখন তার নিষ্প্রাণ দেহটি আহমদ মুসার হাতেই ঢলে পড়ল।

লোকটিকে বাঁচাতে না পারা আহমদ মুসাকে যতখানি কষ্ট দিল, তার চেয়ে অনেক বিস্মিত হলো সে ধরা পড়া থেকে বাঁচার জন্যে আত্মাহুতি দেয়ার এ ঘটনায়।

ঝড়ের বেগে অনেক প্রশ্ন অনেক ভাবনা এসে প্রবেশ করল আহমদ মুসার মনে।

কোন পলিটিক্যাল একটিভিস্টরা এ ধরনের কাজ করতে পারে না! তারা রাজনীতি করে জীবনের জন্যে, তারা এভাবে ধরা পড়ার ভয়ে জীবন বিসর্জন দিতে পারে না। কিংবা কোন পলিটিক্যাল ক্রিমিনাল এভাবে জীবন বিসর্জন দেবে কেন? একথা তারাও জানে এবং সবাই জানে যে রাজনৈতিক রাঘব বোয়ালরা তাদের নিয়োগ করে। সুতরাং তারা ধরা পরলে তাদের ক্ষতি তো তেমন নেই। বিশেষ করে সুরিনামে যারা আহমদ হাত্তাদের বিরুদ্ধে কাজ করেছে, তারা তো সরকারের আশীর্বাদ পুষ্ট। তারা ধরা পড়লে থানায় গেলেই ছাড়া পেয়ে যেতে পারে। কিংবা কোর্টে গেলেও তারা বেল পেয়ে যাবে। সুতরাং তারা ধরা পড়ার ভয়ে মরতে যাবে কোন দুঃখে? কিন্তু এ লোক তাহলে এভাবে আত্মহত্যা করল কেন?

অবাক করা এই নতুন চিন্তাগুলো আহমদ মুসাকে পেয়ে বসেছিল।

আহমদ হাত্তা, ওয়াং আলীরা কখন তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে টের পায়নি আহমদ মুসা। অবশেষে আহমদ হাত্তা বলে উঠল, 'কি ব্যাপার মি. আহমদ মুসা? কি ভাবছেন? লোকটি কি মারা গেল?'

আহমদ মুসা তাকাল আহমদ হাত্তার দিকে। বলল, 'লোকটি পটাশিয়াম সাইনায়েড খেয়ে আত্মহত্যা করেছে।'

আহমদ মুসা লোকটির দেহ মাটিতে রেখে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'চলুন মি. হাত্তা, গাড়ির লোকটির কি অবস্থা হয়েছে দেখি।'

সবাই চলল গাড়ির দিকে।

গাড়িটা একদম চিড়ে-চ্যাপটা হয়ে গেছে, কেউ বাঁচার নয়। গাড়িটা ছিল লেফট হ্যান্ড ড্রাইভ। তার উপর বাঁ দিক থেকেই আঘাত খেয়েছে।

গাড়ির ড্রাইভিং সিটের আরোহীই একমাত্র আরোহী ছিল।

সবাই গাড়ি ঘিরে দাঁড়াল।

উঁকি দিয়ে দেখা গেল, ড্রাইভার লোকটার শরীরের পেছন দিকের বৃহত্তর অংশ অদৃশ্য, দুমড়ে আসা গাড়ির একটা অংশের নিচে চাপা পড়ে আছে। যেটুকু দেখা যাচ্ছে তা রক্তে ভাসছে।

আহমদ মুসা কোন মতে একটা হাত ঢুকিয়ে পরীক্ষা করে দেখল লোকটা মারা গেছে।

লোকটির বাম হাত প্রায় গুঁড়ো হয়ে গেছে, আর ডান হাতটা কাঁধ ও পিঠের নিচে পড়ে গেছে।

আহমদ মুসা টেনে বের করল তার হাতটা। তার অনামিকায় একটা আংটি দেখতে পেল। পরীক্ষা করে নিশ্চিত হলো, এটাও ঐ লোকটার মতই সাইনায়েড রিং।

ভ্রুকুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার। তার মনে পড়ল এ পর্যন্ত সুরিনামে প্রতিপক্ষের যারা নিহত হয়েছে, তাদের যাদেরকে তার পরীক্ষা করার সুযোগ ঘটেছে, কারও হাতেই এই সাইনায়েড রিং দেখেনি। কিন্তু এখানে দুজনের হাতে সাইনায়েডের রিং পাওয়ার অর্থ হলো, এরা দুজন একদলের শুধু নয়, বিশেষ একটা গ্রুপের অংশ।

আহমদ মুসা এই নতুন ভাবনার সাথে সাথে ধীরে ধীরে গাড়ির দিকে এগুলো।

গাড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আহমদ হাত্তার সেক্রেটারীকে লক্ষ্য করে বলল, 'আপনি মি. আহমদ হাত্তার সেক্রেটারীর পরিচয় দিয়ে পুলিশকে টেলিফোন করুন। বলুন যে, এখানে অন্তর্ঘাতমূলক এ্যাকসিডেন্ট ঘটেছে। দুজন মারা গেছে। আপনারা শীঘ্র আসুন। আমরা অপেক্ষা করছি।'

আহমদ হাত্তার সেক্রেটারী তার মোবাইল তুলে নিল টেলিফোন করার জন্য।

সেক্রেটারীর টেলিফোন শেষ হতেই আহমদ হাত্তা আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলে ওঠল, 'মি. আহমদ মুসা, বিশেষ কিছু আপনি ভাবছেন বলে মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ মি. হাত্তা। আমার মনে হচ্ছে গত কয়েকদিন যাদের সাথে আমাদের সংঘাত হয়েছে, গত কয়েকদিন যারা আমাদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করেছে, তারা এবং এরা এক নয়।' বলল আহমদ মুসা।

'কেন একথা বলছেন?' আহমদ হাত্তা বলল।

'রঙ্গলালদের লোক হলে এরা ধরা পড়ার ভয়ে এইভাবে আত্মহত্যার কথা নয়। যারা কোন মতেই নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করতে চায় না, কিংবা নিজেদের কোন তথ্য বাইরে প্রকাশ হতে দিতে চায় না, তারা এইভাবে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। কিন্তু রঙ্গলালের লোকরা তো এসব চিন্তা করার কথা নয়। তাদের ষড়যন্ত্র এখন সবাই জানে এবং রঙ্গলালের মত রাজনীতিকরা এসবকে ভয়ও করে না।' বলল আহমদ মুসা।

'এভাবে বিষয়টাকে তো আমি ভাবিনি! ঠিকই বলেছেন আপনি। রঙ্গলাল ও 'মাসুস' – এর ক্যাডাররা এমন প্রফেশনাল নয়।'

একটু থামল আহমদ হাত্তা এবং পরক্ষণেই আবার বলে উঠল, 'তাহলে এরা কারা?' রঙ্গলালরা আমাদের রাজনৈতিক শত্রু হওয়া ছাড়া আর তো কোন শত্রু আমাদের নেই।'

'আরেকটা বিষয় লক্ষ্য করেছেন, লোকগুলোর চেহারা কিন্তু পুরোপুরি সুরিনামের নয়, কলম্বিয়া বা ভেনিজুয়েলানদের সাথে এদের মিল বেশি।' বলল আহমদ মুসা।

বিস্মিত চোখে তাকাল আহমদ হাত্তা আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'প্রথম দেখে আমার মনে প্রশ্ন জেগেছিল। কিন্তু সেটা খুব দুর্বল প্রশ্ন। আপনি বিষয়টাকে এত গভীরভাবে দেখেছেন? ঠিকই বলেছেন, এদের ইউনিফরম পরালে ঠিক কলম্বিয়ান সৈনিক অথবা ড্রাগ বাহিনীর সদস্যদের মত দেখাবে।'

'ওদের পোশাকের দিকে খেয়াল করেছেন? যে ধরনের শার্ট ও প্যান্ট ওরা পরে আছে, এ পর্যন্ত সুরিনামে কারো পরনে এমন ডিজাইনের শার্ট-প্যান্ট আমি দেখিনি।'

ট্রাকের পাশে পরে থাকা লাশের দিকে আবার তাকাল আহমদ হাত্তা। একটু দেখে নিয়ে বলল, 'ঠিক বলেছেন মি. আহমদ মুসা, প্যান্টের বটম ফল্ডিংটা সুরিনামে, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে একেবারেই অনুপস্থিত। শার্টের কলার ও চেস্ট প্লেটও সুরিনামে নতুন।'

বলে একটু হাসল আহমদ হাত্তা তারপর বলল, 'কিন্তু আহমদ মুসা এত সব বিষয় এক সাথে আপনার নজরে পড়ল কি করে? আমিও দেখেছি, আমার তো কিছু মনে হয়নি?'

'সব দেখা, দেখা নয় মি. হাত্তা। আপনি মনোযোগ দিয়ে দেখলে ওসব আপনার চোখেও ধরা পড়তো।' আহমদ মুসা বলল।

'সব দেখা যেমন দেখা নয়, তেমনি সব চোখেই সব দেখার আইকিউ থাকে না- এটাও সম্ভবত ঠিক। যাক। এখন বলুন, এরা সুরিনামের লোক না হলে তার অর্থ কি দাঁড়ায়?' বলল আহমদ হাত্তা।

'এরা বাইরের এবং প্রফেশনাল। এটা ঠিক হলে বলতে হবে আপনার শত্রু সংখ্যা বাড়লো। এখন দেখতে হবে এই শত্রু কারা, এই শত্রু এবং আগের শত্রুর মধ্যে সম্পর্ক কি, কিংবা দুই শত্রু এক শত্রু কিনা। তবে আমার মনে হচ্ছে এরা বিপজ্জনক। কারণ যারা বিনা দ্বিধায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারে, তাদের সামনে ভয় বলে কোন জিনিস থাকে না। এমন বেপরোয়া শত্রুকে সামাল দেয়া খুবই কঠিন।' থামল আহমদ মুসা।

মুখ শুকিয়ে গেল আহমদ হাত্তার। বলল, 'আজ ওদের টার্গেট কি ছিল?'

'ওদের টার্গেট ছিল আমাদের গাড়িকে ধ্বংস করা।' আহমদ মুসা বলল।

'তার অর্থ আমাকে হত্যা করা।' বলল আহমদ হাত্তা।

'সাধারণ হিসেব এটাই। কিন্তু শত্রুকে চেনার আগে এটা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। বিষয়টা কোন মিস ফায়ারিং-এর ঘটনাও হতে পারে। আবার নিছক এক্সিডেন্টও হতে পারে।' আহমদ মুসা বলল।

‘কিন্তু তাদের আত্মহত্যার ঘটনা এবং এক্সিডেন্টের পর আমাদেরকে হত্যা চেষ্টার কি ব্যাখ্যা হবে তাহলে?’ বলল আহমদ হাত্তা।

‘হ্যাঁ, মি. হাত্তা। এ দুটি ঘটনার ব্যাখ্যা পাওয়া কঠিন। বিষয়টা আমাদের ভাবতে হবে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘পুলিশ তো আসছে, পুলিশকে আমরা কি বলব?’

‘যা ঘটেছে, যা আমরা দেখেছি সব বলব। তবে আমরা যা বুঝেছি সেটা বলব না।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমরা কি বুঝেছি?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ হাত্তা।

‘আমরা বুঝেছি এরা পেশাদার সন্ত্রাসী এবং এরা সম্ভবত সুরিনামের বাইরের লোক। আরেকটা জিনিস আমরা বুঝেছি। সেটা হলো, এদের আক্রমণের টার্গেট ছিলাম আমরা। শুধু আমরা বুঝতে পারিনি, আমরাই যদি এদের আক্রমণের টার্গেট হয়ে থাকি, তাহলে কেন এই আক্রমণ? এরা কারা?’ আহমদ মুসা বলল।

এ সময় পুলিশের গাড়ির সাইরেন তাদের কানে এল।

সামনে তাকিয়ে তারা দেখল পারামারিবোর দিক থেকে পুলিশের গাড়ি আসছে। দুটি গাড়ি।

সবাই ঘুরে দাঁড়াল সামনের দিকে।

অপেক্ষা করতে লাগল তারা পুলিশের গাড়ির।

খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে সেদিনের সচিত্র লিড নিউজটার উপর নজর পড়তেই চিৎকার করে উঠল শিবরাম শিবাজী, ‘সর্বনাশ মি. রঙ্গলাল, সর্বনাশ।’

শিবরাম শিবাজীর চোখ সচিত্র নিউজটার একটা ছবির উপর নিবদ্ধ।

বিস্ময় ও আতংক ঠিকরে পড়ছে তার চোখ দিয়ে।

রোনাল্ড রঙ্গলাল উঠে গিয়েছিল তার রাইটিং প্যাড ও কলম আনতে।

ছুটে এল রঙ্গলাল।

বসল শিবরাম শিবাজীর পাশের সোফায়। শিবরাম শিবাজী তার হাতের কাগজটা একটু এগিয়ে সচিত্র খবরটা মেলে ধরল রোনাল্ড রঙ্গলালের চোখের সামনে।

ছবির ন্যাড়া মাথা একটা লোকের উপর চোখ পড়তেই ভীষণ চমকে উঠল। রঙ্গলাল বলল, 'একি! এযে আমাদের সেই মাফিয়া দুই নেতার একজন!'

দ্রুত নজর বুলাল সে ক্যাপশনের উপর। পড়ল, 'এক্সিডেন্ট ঘটিয়ে একজন লোক হত্যার পর ধরা পড়ার ভয়ে পটাশিয়াম সাইনায়েড রিং চুষে আত্মহত্যা করেছে এই অজ্ঞাত পরিচয় লোকটি।'

ক্যাপশন পড়েই তাড়াতাড়ি দৃষ্টি ফেরাল নিউজ আইটেমের হেডিং এর দিকে।

পড়লঃ 'আহমদ হাত্তাকে হত্যার আবার পরিকল্পিত প্রচেষ্টা। দুর্ঘটনায় অজ্ঞাতনামা একজন নিহত। হন্তা ট্রাক ড্রাইভারের আত্মহত্যা।'

হেডিং পরে রোনাল্ড রঙ্গলালের ভ্রু-কুঞ্চিত হয়ে উঠল। বলল দ্রুত, 'আবারও ব্যর্থ? পড়ুন তো মি. শিবরাম শিবাজী নিউজটা।' কম্পিত কণ্ঠ রঙ্গলালের।

শিবরাম শিবাজী পত্রিকাটা তার দিকে টেনে নিল। পড়তে শুরু করলঃ

গতকাল ব্রুকোপনডো হাইওয়েতে পরনাম শহর ও রাজধানী পারামারিবোর মাঝামাঝি জায়গায় এক ভয়াবহ ঘটনায় একটি ট্রাক একটি কার কে পিষ্ট করলে কারটির একমাত্র আরোহী ড্রাইভার নিহত হয়। হন্তা ট্রাকটির ড্রাইভার ধরা পড়া আসন্ন দেখে পটাশিয়াম সাইনায়েড রিং চুষে আত্মহত্যা করে। অন্যদিকে ড্রাইভারের অপূর্ব দক্ষতার জন্যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও তার ভাবী জামাতা ওয়াং আলী অল্পের জন্যে সাক্ষাত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যান।

তদন্তকারী পুলিশ ও সাংবাদিকদের মতে মর্মান্তিক ঘটনাটি সাবেক প্রধানমন্ত্রী আহমদ হাত্তাকে হত্যারই একটা প্রচেষ্টা ছিল। প্রাপ্ত আলামত ও ঘটনার সুরতহাল রিপোর্টের ভিত্তিতে গঠিত পুলিশের প্রাথমিক ধারণা হলো, হন্তা ট্রাকের আত্মহত্যাকারী ড্রাইভার ও পিষ্ট কার- এর নিহত একমাত্র আরোহী একই গ্রুপের, তাদের উভয়ের হাতেই পটাশিয়াম সাইনায়েড রিং পাওয়া গেছে। পুলিশের মতে

ষড়যন্ত্রটা ছিল এই রকম- পিষ্ট কারটি আহমদ হাত্তার গাড়িকে ডান দিক থেকে ব্লক করবে, যাতে আহমদ হাত্তার গাড়ি টের পেয়ে গেলেও দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য শেষ মুহূর্তেও ডান দিকে টার্ন নিতে না পারে। নির্দিষ্ট পয়েন্টে পৌঁছতেই ক্রসিং-এর পথে দ্রুত বেগে আসা ট্রাক আহমদ হাত্তার গাড়িকে আঘাত করবে। আর তার আগেই ব্লক করে থাকা সহযোগী কারটি থেমে যাবে। তার ফলে বেঘোরে পিষ্ট হয়ে যাবে আহমদ হাত্তার গাড়ি সব যাত্রী সমেত।

কিন্তু এ ষড়যন্ত্র সফল হয়নি। আহমদ হাত্তার অতিদক্ষ ড্রাইভার বিপদ আঁচ করার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রেক কষে গাড়ি ডেডস্টপ করতে সমর্থ হয়। ডানদিক থেকে আহমদ হাত্তার গাড়ি ব্লককারী কারটি কিন্তু তা পারেনি। কারটি সামনে এগিয়ে যায়। ফলে ঘটনাটা সেমসাইড হয়ে যায়। ট্রাকটি যেখানে পিষ্ট করার কথা আহমদ হাত্তার গাড়িকে, সেখানে তা পিষ্ট করে তার সহযোগীকে।

আহমদ হাত্তার সেক্রেটারির মোবাইলে খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে হাজির হয়।

থানায় আহমদ হাত্তার দায়ের কৃত মামলার বিবরণ থেকে ঘটনার আরও বিবরণ পাওয়া গেছে। হন্তা ট্রাকটি যখন ঘটনার পর পালাতে চেষ্টা করে তখন আহমদ হাত্তার ড্রাইভার ট্রাকটির টায়ার লক্ষ্যে গুলী করে এবং গুলীতে টায়ার ফেটে যাওয়ায় ট্রাকটি থেমে যায়। ট্রাকটির ড্রাইভার তখন আহমদ হাত্তার গাড়ির লক্ষ্যে গুলী করতে করতে ট্রাক থেকে নেমে আসে। আকস্মিক এই গুলীর মুখে পরে আহমদ হাত্তার কারটি দ্রুত পেছনে সরে যায়। এই সুযোগে ট্রাকের লোকটি তার ট্রাকের আড়াল নিয়ে ছুটে পালাতে চেষ্টা করে। তখন আহমদ হাত্তার কারটি দ্রুত আবার সামনে চলে আসে। আহমদ হাত্তার গাড়িকে তার পেছনে আসতে দেখে লোকটি ঘুরে দাঁড়িয়ে গাড়ি লক্ষ্যে স্টেনগানের ব্রাশ ফায়ার করতে চেষ্টা করে। কিন্তু তার আগেই আহমদ হাত্তার ড্রাইভারের গুলী খেয়ে লোকটি আহত হয়ে পড়ে যায় এবং ধরা পড়া আসন্ন দেখে সাইনায়েড খেয়ে আত্মহত্যা করে।

ঘটনাস্থলে পরবর্তীতে উপস্থিত সহকারী পুলিশ কমিশনার একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। তার মতে আক্রমণ করা লোক দুটি সুরিনামের নয়। কলম্বিয়া বা ল্যাটিন অঞ্চলের অন্য কোন দেশের হতে পারে। তবে তিনি এও

জানান পরীক্ষার পরেই এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যাবে। তিনি বলেন, তাদের এই অনুমান যদি সত্য হয় তাহলে তা দেশের আইন-শৃঙ্খলার জন্যে খুবই উদ্বেগজনক হবে। কারণ আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বাইরের কেউ বা কোন গ্রুপ আগ্রহী হলে বা দেশের কেউ বা কোন গ্রুপ যদি তাদের হীন স্বার্থ চরিতার্থের জন্যে বাইরের সন্ত্রাসীদের দেশে ডেকে আনে, তাহলে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটতে পারে।

সব মিলিয়ে নির্বাচনের প্রাক্কালে দেশের অশান্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতির সাথে উদ্বেগজনক নতুন মাত্রা যোগ হলো বলে ওয়াকিফহাল মহল মনে করেন। তারা মনে করছেন, এই ঘটনার পর রাজনীতিকদের বিশেষ করে সাবেক প্রধানমন্ত্রী আহমদ হাত্তার জন্যে শক্তিশালী নিরাপত্তা ব্যবস্থা দরকার।'

পড়া শেষ করেই শিবরাম শিবাজী বলে উঠল, 'এবারও দেখছি ড্রাইভারই বাঁচাল আহমদ হাত্তাকে এবং ড্রাইভারই গুলী করে ফেলে দেয় আত্মহত্যাকারী ন্যাড়া মাথাকে।'

'তাতো হলো, কিন্তু আমাদের হায়ার করা মাফিয়াদের দুজন পরিকল্পনা করে দুদিক থেকে ঘিরেও কাবু করতে পারলো না এক ড্রাইভারকে?' বলল রঙ্গলাল।

'শিখ ড্রাইভারতো, নিশ্চয় তাঁর সামরিক ট্রেনিং আছে। ড্রাইভার ও বডিগার্ড দুয়ের দায়িত্ব পালন করছে।' বলল শিবরাম শিবাজী।

মুখ তখন ভীষণ গম্ভীর হয়ে উঠেছে রোনাল্ড রঙ্গলালের। বলল, 'এই আক্রমণটায় আমাদের কোন লাভ হলো না, লাভ হলো শত্রুদের আর ক্ষতিগ্রস্ত হলাম আমরা।'

'যেমন?'

'আরও বেশি সহানুভূতি অর্জন করবে আহমদ হাত্তা। অন্যদিকে এই হত্যা প্রচেষ্টার দায় আমাদের ঘাড়েই চাপাবে অনেক মানুষ। আমরা তাদের সমর্থন হারাব। তাছাড়া মাফিয়ারা যে এদেশে প্রবেশ করেছে এবং আমাদের সহায়তার জন্যেই প্রবেশ করেছে, এটাও প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে।' রঙ্গলাল বলল।

‘এর মধ্যে রাজনৈতিক দিকটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ মি. রঙ্গলাল। এমনিতেই বিরাট সমবেদনা ভোট তার দিকে চলে গেছে। এই ঘটনার পর তার সংখ্যাটা আরও বাড়ল।’ শিবরাম শিবাজী বলল।

‘কিন্তু মি. শিবাজী, এই ক্ষতির চেয়েও বড় ক্ষতি হয়ে গেল।’

‘সেটা কি?’

‘সেটা হলো, এখন আহমদ হাত্তা যেভাবে যেখানেই নিহত হোক, তার জন্যে আমাদেরকেই সন্দেহ করা হবে। ইতিহাসেও এ দায় আমাদের বহন করতে হবে।’ বলল রঙ্গলাল।

‘আহমদ হাত্তাকে যদি এখনই সরিয়ে দেয়া যায়, টেরেক দুর্গের স্বর্ণ যদি আমরা পেয়ে যাই, তাহলে এ দায় বহন করতে রাজি আছি।’ শিবরাম শিবাজী বলল।

‘কিন্তু তা পারছি কই? দুজন মাফিয়ার মৃত্যু বিরাট ঘটনা। কিন্তু লাভ কিছুই হলো না।’ বলল রঙ্গলাল।

‘ক্ষতি হয়েছে মাফিয়াদের কিন্তু একটা লাভ আমাদের হয়েছে।’

‘কি সেটা?’

‘এতে নিশ্চয় ক্ষেপে গেছে মাফিয়ারা। সাপের লেজে পাড়া দিলে সাপ যেমন ছোবল মারে সঙ্গে সঙ্গেই, তেমনি মাফিয়ারাও পাগলের মত ছোবল মারতে ছুটে যাবে আহমদ হাত্তাকে।’

কিছু বলতে যাচ্ছিল রঙ্গলাল, এ সময়ে টেলিফোন বেজে উঠল।

টেলিফোন ধরল রঙ্গলাল। বলল, ‘গুড মর্নিং।’

ওপারের কণ্ঠ শোনা গেল। বলল, ‘গুড মর্নিং স্যার। কিন্তু সময় খুব ভালো ঠেকছে না।’

‘কেন, কি হয়েছে?’ বলল রঙ্গলাল।

‘গতকাল ব্রুকোপনডো হাইওয়েতে যে ঘটনা ঘটেছে, সে রিপোর্ট নিশ্চয় পড়েছেন স্যার।’ বলল ওপার থেকে।

‘হ্যাঁ পড়েছি।’

'রিপোর্টে পুলিশের বরাত দিয়ে ভিকটিম দুজনকে বিদেশী বলা হয়েছে। আর গোয়েন্দা রিপোর্ট ঘটনাকে একটা হত্যা ষড়যন্ত্র বলেছে। বলা হয়েছে, সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং নির্বাচন প্রার্থী আহমদ হাত্তাকে হত্যার জন্যেই এই ষড়যন্ত্র করা হয়। এর সাগথে সদ্য ক্ষমতাত্যাগী প্রধানমন্ত্রী রঙ্গলালদের যোগসাজস থাকতে পারে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করেছে।' বলল টেলিফোনের ও প্রান্ত থেকে।

'খুনের চেষ্টা করল বিদেশী সন্ত্রাসীরা। আমাকে জড়ানো হবে কেন?' রঙ্গলাল বলল।

'সন্দেহ করা হচ্ছে ওরা ভাড়াটিয়া পেশাদার। আপনারা তাদের নিয়োগ করেছেন।' বলল ওপার থেকে।

'সন্দেহ করলেই হলো?' রঙ্গলাল বলল।

'তদন্ত শুরু হয়েছে। সাবধানে থাকবেন। আপনি কোথায় যান, কার সাথে চলেন, সব মনিটর করা হচ্ছে। আমি পুলিশের প্রধান হলেও আমার কিছু করার নেই।' বলল টেলিফোনের ওপার থেকে।

'করুকগে, কিছুই পাবে না।' বলল রঙ্গলাল।

'কিন্তু কয়েকদিন আগে দুজন বিদেশী আপনার ও শিবরাম শিবাজীর সাথে দেখা করেছিল।'

'তাতে কি প্রমাণ হয়? আমি রাজনীতিক, সেই সাথে বড় ব্যবসায়ীও। বিদেশীরা তো আসতেই পারে আমার কাছে।' রঙ্গলাল বলল।

'যারা ব্রুকোপনডো হাইওয়ের ঘটনায় মারা গেল এবং যারা আপনার সাথে দেখা করেছিল, তারা একই গ্রুপের এবং তাদের ব্যবসায়ী বলে মনে করা হচ্ছে না। তারা কোন হোটেলে ওঠেনি। কৌশলে তারা তাদের থাকার জায়গা আড়াল করে রাখছে।'

'তার মানে তুমিও আমাকে সন্দেহ করছ?'

'সন্দেহ নয় সাহায্য করতে চাচ্ছি।'

'বল কি পরামর্শ।' রঙ্গলাল বলল নরম গলায়।

'নির্বাচনের আগে আহমদ হাত্তার যাতে কোন ক্ষতি না হয়, আপনি দেখুন। এটা আপনার স্বার্থেই। কারণ মানুষের সব সন্দেহ এখন আপনার দিকে।

আইন যাই করুক, তাঁর কিছু হলে মানুষের অসন্তোষ থেকে আপনি বাঁচবেন না।' বলল টেলিফোনের ওপ্রান্ত থেকে।

'নির্বাচনের ফল সম্পর্কে কি ভাবছ?'

'সিমপেথী ভোট আহমদ হাত্তার পক্ষে গেছে! দয়া করে আর বাড়তে দেবেন না। এখনও আপনার হতাশ হবার কিছু নেই বলে আমি মনে করি।'

'থ্যাংকস অফিসার।' বলল রঙ্গলাল।

'থ্যাংকস স্যার।' বলল টেলিফোনের ওপ্রান্ত থেকে।

কথা শেষ করে টেলিফোন রেখেই রঙ্গলাল শিবরাম শিবাজীর দিকে চেয়ে বলল, 'এখন কি করা যায়?'

'কি বলল পুলিশের কর্তা?' শিবরাম শিবাজী বলল।

'নির্বাচনের আগে আহমদ হাত্তার যেন কিছু না হয় তা দেখার জন্যে।'

ভাবল শিবরাম শিবাজী একটু। তারপর বলল, 'কিভাবে সেটা সম্ভব?'

'পুলিশের কর্তা কথা ঠিকই বলেছেন, কিন্তু ওদের নিষেধ করতে চাইলেও তো সে সুযোগ নেই। ওদের কোন ঠিকানা তো আমরা জানি না।' বলল রঙ্গলাল।

'তীর ছোড়া হয়ে গেছে মি. রঙ্গলাল। এখন কি করার আছে।'

'চিন্তা নেই শিবরাম। ভালটাই আমরা করেছি। আহমদ হাত্তাকে যদি দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে দেয়া যায়, তাহলে আর কিছুই ঘটবে না। সব ঠিক হয়ে যাবে, সবাই ঠিক হয়ে যাবে।'

'আর ওরা যদি তাকে দৃশ্যপট ঠেকে সরিয়ে দিতে না পারে?' শিবরাম শিবাজী বলল।

'যদি নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই। তুমি যা বলেছো তীর ছোড়া তো হয়েই গেছে। দেখা যাক। এটাই শেষ তীর নয়। চল উঠা যাক।'

বলে উঠে দাঁড়াল রোনাল্ড রঙ্গলাল।

উঠল শিবরাম শিবাজীও।

# ২

'হ্যালো।' টেলিফোন কানেকশন পেতেই বলে উঠল ফাতিমা নাসুমন।

'হ্যালো, ফাতিমা আপা, কেমন আছেন?' টেলিফোনের ও প্রান্ত থেকে বলল লিসা টেরেক, ওভানডো টেরেকের বোন।

'ভালো, কিন্তু খোঁজ তো নাওনা।' বলল ফাতিমা।

'দুদিন মাত্র তো টেলিফোন করিনি। সময়টা খুব টেনশনে যাচ্ছে আপা। আপনারও তো।' লিসা টেরেক বলল।

'ঠিক বলেছ লিসা, আব্বাকে নিয়ে খুব উদ্বেগের মধ্যে আছি।' বলল ফাতিমা।

'এ সময় আহমদ মুসা না থাকলে যে কি হতো! কল্পনা করতেও ভয় লাগে।' লিসা টেরেক বলল।

'উনিতো সাক্ষাত আল্লাহর সাহায্য। উনি না থাকলে হয়তো আব্বাকেই উদ্ধার করা যেত না, তাঁর দেশে আসা ও নির্বাচন করা তো দূরের কথা।' বলল ফাতিমা।

কথা শেষ করেই ফাতিমা নাসুমন আবার বলে উঠল, 'উনি কোথায়? জরুরী কথা আছে।'

'নামাজ পড়ছেন।' লিসা জানাল।

'তুমি নামাজ পড়ছ তো?' বলল ফাতিমা।

'আমি শুধু একা কেন সবাই পড়তে শুরু করেছে। এদিকে কি হয়েছে তাতো জানেন না।'

'কি হয়েছে?' উদগ্রীব কণ্ঠে বলল ফাতিমা।

'গত পরশু আহমদ মুসা ভাই আমাদের পরিবারের লাইব্রেরীর একটা পুরানো বইয়ের ভেতর থেকে কাগজের কয়েকটা শিট পেয়েছেন, তা পরীক্ষা করে এক অকল্পনীয় জিনিস আবিষ্কার করেছেন।'

কথায় একটু ছেদ নেমে আসতেই ফাতিমা বলে উঠল, 'অকল্পনীয় জিনিসটা কি?'

'বলছি, সাংঘাতিক জিনিস, অকল্পনীয় ব্যাপার।' বলে আবার থামল লিসা টেরেক।

অস্থির কণ্ঠে বলল ফাতিমা নাসুমন, 'আমাকে আর অন্ধকারে রেখ না। তাড়াতাড়ি বল।'

'আমাদের পুরনো দলিল বইয়ের ভেতর থেকে পাওয়া কগজের শিটগুলো আরবী ভাষায় লেখা একটা খসড়া দলিলের কয়েকটা পাতা। তা তিনি পেয়েছেন সুরিনামে আমাদের বংশের প্রতিষ্ঠাতা ও টেরেক দুর্গের নির্মাতা ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে স্পেনের প্রথম গভর্নর এবং তিনি ওভানডোর একজন ক্যাপ্টেন ছিলেন। ১৫০২ সালে আটলান্টিকে কথিত ডুবে যাওয়া জাহাজগুলোর একটি ছিল তার জাহাজ। জাহাজটি ছিল সোনা বোঝাই। আসলে জাহাজটি তখন ডোবেনি, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং ঝড়ের ধাক্কায় ভাসতে ভাসতে এসে ঠেকেছিল আমাদের সুরিনাম উপকূলে।' একটু থামল লিসা টেরেক।

সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠল ফাতিমা, 'টেরেক দুর্গের স্বর্ণ-সন্ধানীরা তো এই একই কথাই বলে। তাহলে তাদের কথা তো দেখা যাচ্ছে ঠিক। এই কথা বলতে চাচ্ছিলে?'

'না। আসল কথাই তো বলিনি।' বলল লিসা টেরেক।

'সেটা আবার কি? বল তাড়াতাড়ি।'

'আমাদের ঐ পূর্ব পুরুষ মুসলমান ছিলেন। নাম আব্দুর রহমান আল-তারিক। তার আল-তারিক নাম অনুসারেই দুর্গের ও আমাদের পরিবারের নাম 'এল-টেরেক' হয়েছে।'

লিসা টেরেক কথা শেষ করলেও এদিক থেকে ফাতিমা কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলো না। বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিয়ে উঠে একটু পর বলল, 'সত্যি বলছ লিসা? আমার সাথে মজা করছ না তো?'

'কাগজের কয়েকটা শিটে তার যেটুকু অসম্পূর্ণ জীবন কাহিনী আছে তাও এক রুপকথা আপা।'

‘তোমাদের অভিনন্দন লিসা। ভাগ্যবান তোমরা। কাহিনী পড়তে আসব আমি সুযোগ পেলেই।’

‘পরবেন কি করে, সে তো আরবী ভাষায় লেখা। শুধু.........।’

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল লিসা, আহমদ মুসা এ সময় এসে পড়ল।

লিসা তার মাথার কাপড়টা কপাল পর্যন্ত টেনে নিতে নিতে বলল, ‘ফাতিমা আপা, ভাইয়া এসে গেছে। তুমি তার সাথে কথা বল। পরে এক সময় আমি তোমার সাথে কথা বলব।’

আহমদ মুসা টেলিফোন হাতে নিল। বলল, ‘আসসালামু আলাইকুম। ফাতিমা, কি খবর?’

‘ওয়া আলাইকুমুস সালাম। ভাইয়া, আপনি কি আব্বার পিএসকে কিছুক্ষণ আগে টেলিফোন করেছিলেন?’

‘না। এ প্রশ্ন কেন? এ ধরনের টেলিফোন তিনি পেয়েছিলেন?’

‘হ্যাঁ, তিনি বললেন, আপনি কিছুক্ষন আগে টেলিফোন করেছিলেন।’ বলল ফাতিমা।

‘বুঝেছি, কেউ আমার নামে টেলিফোন করেছিলেন। তিনি কি বলেছিলেন?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘আব্বা আছেন কিনা জিজ্ঞেস করেছিলেন। পিএস সাহেব যখন বলেন, ‘আছেন ঘুমুচ্ছেন’ তখন তিনি বলেন, ‘ঠিক আছে ডিস্টার্ব করব না। পরে আবার টেলিফোন করব’ বলে টেলিফোন রেখে দেন। পিএস সাহেব এ খবর আমাকে জানাবার পর আমি আপনাকে টেলিফোন করলাম কি কারণে টেলিফোন করেছিলেন তা জানার জন্যে।’

‘বুঝেছি ফাতিমা। ওটা শত্রুর টেলিফোন ছিল। তোমার আব্বা কোথায়?’

‘ঘুমুচ্ছেন।’

‘ঠিক আছে। আমি আসছি। তোমরা সাবধানে থেকো। গেটে পুলিশ পাহারা আছে তো?’

আহমদ মুসার কণ্ঠে উদ্বেগ।

‘হ্যাঁ ভাইয়া, গেটে পুলিশ পাহারা আছে। খারাপ কিছু আশংকা করছেন?’ ফাতিমা নাসুমনের কণ্ঠেও উদ্বেগ।

ফাতিমার প্রশ্ন এড়িয়ে আহমদ মুসা বলল, ‘আল্লাহ ভরসা। আমি আসছি।’

বলে আহমদ মুসা সালাম দিয়ে টেলিফোন রেখে দিল।

দ্রুত ছুটল ঘরের দিকে তৈরি হওয়ার জন্যে।

আহমদ মুসা যখন তৈরি হয়ে ঘর থেকে বেরুচ্ছিল তখন সামনে পড়ে গেল ওভানডো। লিসাও দাঁড়িয়েছিল ওখানে।

আহমদ মুসাকে ওভাবে তাড়াহুড়ো করে বেরুতে দেখে ওভানডো জিজ্ঞেস করল, ‘কোথায় বেরুচ্ছেন ভাইয়া?’

মি. হাত্তার ওখানে। আমার অনুমান মিথ্যা না হলে সেখানে একটা ঘটনা ঘটতে পারে।’

‘আমি যেতে পারি?’ বলল ওভানডো।

আহমদ মুসা থমকে দাঁড়িয়ে ওভানডোর দিকে ফিরে বলল, ‘না ওভানডো বাসায় থাকা দরকার। গেটে পুলিশ থাকলেও সাবধানতার প্রয়োজন আছে।’

বলে আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়িয়ে পা বাড়াল বাইরে বেরুবার জন্যে।

একটা কার এবং তার পিছে একটা মাইক্রো সেন্ট্রাল রোড ধরে এসে নর্থ-সাউথ রোডে পড়ে তীব্র গতিতে এগিয়ে চলল।

এ রাস্তাতেই আহমদ হাত্তার বাড়ি। বাড়িটা রাস্তার একদম শেষ প্রান্তে সুরিনাম নদীর একেবারে তীর ঘেঁষে।

কারে আরোহী চারজন। দুজন সামনের সিটে দুজন পেছনে। চারজন আরোহী মাইক্রোতেও।

৮ জন আরোহীর সকলেই সুরিনাম সেনাবাহিনীর কমান্ডোর পোশাক পরা। মাথায় বাঁধা কাল কাপড় পিঠ পর্যন্ত নেমে এসেছে। গায়ে কাল জামা, পরনে কাল ট্রাউজার। আর চোখে কাল গগলস।

কার যে ড্রাইভ করছে তার কাঁধে দুটি লাল স্টার। আটজনের টিমটির সেই সবচেয়ে বড় অফিসার। মুখটা তার পাথরের মত শক্ত। তার চোখ দুটির দৃষ্টি মানুষকে ভীত করে তোলার মত কঠোর। অন্য সকলের মত তার কোমরে ঝুলানো ফুট খানেকের মত লম্বা ভয়ংকর 'উজি' স্টেনগান। একটা রিভলবার, একটা খাপবদ্ধ ছুরি ও একটা ওয়্যারলেস সেট। কাঁধ ঝুলে থাকা একটা বোমা ভর্তি থলে, তবে যে জিনিসটা তার কাছে বেশি আছে সেটা হলো তার গলায় ঝুলানো একটা পকেট কম্পিউটার। এই কম্পিউটারে রেকর্ড করা আছে শহরের বিভিন্ন রাস্তা ও উল্লেখযোগ্য বাড়ি-ঘরের অবস্থান এবং বাড়ি-ঘরের অভ্যন্তরীণ নক্সা। এ ধরনের গোনী কম্পিউটার গোয়েন্দা বিভাগের শীর্ষ পর্যায়ের জন্যে সংরক্ষিত।

একই গতিতে এক লাইনে চলছিল কার ও মাইক্রোটি।

কারের ড্রাইভিং সিটে বসা লোকটি সামনে প্রসারিত তার দৃষ্টি না ঘুরিয়েই পাশের লোকটিকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'এনড্রা, সবাইকে তাদের 'উজি'তে সাইলেন্সার লাগাতে বল।'

এনড্রা নামের পাশের লোকটি ওয়্যারলেস তুলে নির্দেশ দিল সবাইকে এবং সেই সাথে নিজের 'উজি'তেও সাইলেন্সার লাগিয়ে নিল।

'নিচের তলায় ছয়জন পুলিশ গার্ড ছাড়া আর তো কোন প্রহরী নেই মনে হয়।' বলল এনড্রা নামের লোকটি।

ড্রাইভিং সিটের লোকটি আগের মত সামনে চোখ রেখেই ধীর কণ্ঠে জবাব দিল, 'পুলিশ গুনছ কেন? পুলিশের সংখ্যা বেশি হলে কি ফিরে যাবে?

ধীর কিন্তু কঠোর শুনাল তার কথা।

মুহূর্তে মুখের ভাব পরিবর্তিত হয়ে গেল এনড্রার। ভয় পেয়েছে বুঝা গেল। বলল সে, 'মাফ করুন বস। ভয় শব্দটি মাফিয়া কিনিক কোবরা-এর অভিধানে নেই। আমি ভয় পেয়ে পুলিশের সংখ্যা গুণিনি, আমি সাবধান হতে চেয়েছি।'

‘কিন্তু তোমার সাবধানী চিন্তা এই প্রথম দেখলাম।’

এনড্রা নামের লোকটা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর না দিয়ে একটু চিন্তা করে বলল, ‘ধন্যবাদ বস। আপনি ঠিক ধরেছেন। কি জানি ব্রুকোপনডো হাইওয়েতে আমাদের ভেলাকুয়েজ ও হামবারটো নিহত হওয়ার ঘটনা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না। ওরা ‘কিনিক কোবরা’-এর দুই অজেয় সদস্য ছিল। প্রথম পরাজয় ও মৃত্যু তাদের একই সাথে ঘটল।’

‘পরাজিত হবার পর বাঁচার তাদের অধিকার ছিল না।’ কঠোর কণ্ঠ ধ্বনিত হলো বসের।

‘কিনিক কোবরা’-এর এটাই বিধান এবং এজন্য তাদের মৃত্যুতে আমি গর্বিত। কিন্তু ‘ব্রুকোপনডো’র ঐ ঘটনা আমি স্মরণ করছি অন্য কারণে। আমি বুঝতে পারছি না বস আমরা কার মোকাবিলা করছি? সেকি আহমদ হাত্তা নাসুমন?’ বলল এনড্রা।

‘তাহলে কি আমরা মোকাবিলা করছি শিখ ড্রাইভারকে?’

‘তাও ভাবতে পারছি না বস।’

‘কেন পারছ না, এখন পর্যন্ত সব ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে তো সে-ই?’

‘কিন্তু অজেয় ‘কিনিক কোবরা’-এর প্রতিদ্বন্দ্বী হবে কি একজন ড্রাইভার?’

‘তুমি ঠিক বলেছ এনড্রা। আমরা সত্যিই এক ধাঁধায় পড়েছি। অতীতে কোন সময়ই এমন হয়নি। টার্গেট হিসেবে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে আহমদ হাত্তা নাসুমন। কিন্তু সে কিছুই করছেই না। অদৃশ্য কে যেন হাত্তার পক্ষ থেকে সব কিছু সম্পাদন করে চলছে।’

‘বস আমার মনে হয়, কান টানলে মাথা আসার মত, সব কিছুই আমরা জানতে পারব যদি আহমদ হাত্তাকে হাতের মুঠোয় আনি।’

‘আমিও সেই কথাই ভাবছি এনড্রা। আমরা আহমদ হাত্তাকে কিডন্যাপ করব। রঙ্গলালের সাথে আমাদের চুক্তি তাকে খুন করার। কিন্তু খুন করলে সব ক্লু হারিয়ে যেতে পারে। তাহলে ভেলাকুয়েজ ও হামবারটো হত্যার প্রতিশোধ নেয়া

হবে না। এখন আমাদের দুটি টার্গেট। এক, রঙ্গলালদের দেয়া মিশন পুরা করা এবং দুই, আমাদের লোক হত্যার প্রতিশোধ নেয়া।'

'তাহলে আমরা আজ আহমদ হাত্তাকে হত্যা না করে তাকে কিডন্যাপ করব এই তো?'

'হ্যাঁ। তার পেছনে অদৃশ্যে কে কাজ করছে তা জানার এটাই পথ।'

'অল রাইট বস। এই পরিকল্পনার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।'

বলে মুহুর্তের জন্যে থেমেই আবার শুরু করল এনড্রা। বলল, 'একটা বিষয় লক্ষ্য করুন বস, আহমদ হাত্তা আমেরিকায় বন্দীদশা থেকে মুক্ত হবার পর হঠাৎ করে যেন শক্তিশালী হয়ে গেছে। তার বিজয় শুরু হয়ে গেছে সে সময় থেকেই। আমি ভাবছি, মার্কিন সরকার মানে সিআইএ তাকে সাহায্য করছে কিনা। জানা গেছে, বন্দী দশা থেকে মুক্ত হবার সে সামরিক হাসপাতালের ভিআইপি সেকশনে চিকিৎসা পেয়েছে। এই চিন্তার সমর্থনে আরেকটা বিষয়ও সামনে আনা যায়। সেটা হলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদীদের বিপর্যয় ঘটার পর মার্কিন সরকার মুসলমানদের বন্ধু হয়ে গেছে। আহমদ হাত্তাও একজন মুসলিম রাজনীতিক।' থামল এনড্রা।

ড্রাইভিং সিটে বসা 'বস' সম্বোধন পাওয়া লোকটি এই প্রথমবারের মত এনড্রার দিকে তাকাল। কিন্তু তার মুখের পাথুরে কাঠিন্যে একটুও পরিবর্তন আসেনি। বলল সে গম্ভীর কণ্ঠে, 'ধন্যবাদ এনড্রা, তোমার এই ভাবনার জন্যে। যুগ-যুগান্তের ইহুদী ষড়যন্ত্র ধ্বংসে মুসলমানদের সাহায্য পাবার পর মার্কিন সরকার মুসলমানদের বন্ধু হয়ে গেছে একথা ঠিক। কিন্তু সিআইএ আহমদ হাত্তাকে সাহায্য করলে 'কিনিক কোবরা' তা জানতে পারতো। তোমার অজানা নয়, সব মাফিয়া দলের সাথে সিআইএ-র গোনী সম্পর্ক আছে, পারস্পরিক সহযোগিতা আছে যদি প্রয়োজন পড়ে। সুতরাং আহমদ হাত্তার সাথে সিআইএ যুক্ত থাকলে আমরা জানতে পারতাম এবং সেক্ষেত্রে রঙ্গলালদের সাথে কোন 'ড্রীল' আমরা করতাম না।'

‘তাহলে কারা জুটল আহমদ হাত্তার সাথে? আহমদ মুসা আমেরিকায় অসাধ্য সাধন করেছেন। তিনি কি আসতে পারেন আহমদ হাত্তার সাহায্যে?’ বলল এনড্রা।

এতক্ষণে ‘বস’ লোকটার ঠোঁটে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল। তাচ্ছিল্যের হাসি। বলল, ‘কিসে আর কিসে ধানে আর তুষে। আহমদ মুসা আসবে সুরিনামে! জান তার মাথার মূল্য এখন কত? বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার। ইহুদীরা তাকে পাওয়ার জন্যে যা চাইবে তাই দেবে। চুনোপুটি আহমদ হাত্তার জন্যে সে আসতে যাবে কেন?’

‘যাই বলুন আহমদ মুসা লাকী মানুষ। সে যেখানে যায়, সাফল্য তার আগে আগে যায়।’ বলল এনড্রা।

‘না তা ঠিক নয় এনড্রা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তার অমানুষিক কষ্ট করতে হয়েছে সাফল্য ছিনিয়ে আনার জন্যে। এক সময় এমন হয়েছিল মার্কিন সরকারসহ গোটা দেশ তার বৈরী। পা রাখার নিরাপদ জায়গা ছিল না তার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।’

‘কিন্তু আমার মনে হয় আহমদ মুসা বাঁচতে পারবে না ইহুদীদের হাত থেকে।’ বলল এনড্রা।

‘আমারও তাই মনে হয়। ইতিমধ্যেই ইহুদী গোয়েন্দা সংস্থা আমেরিকা ইউরোপের সব মাফিয়া গ্রুপের সাথে আলোচনা করেছে। সকলের সাহায্য চেয়েছে আহমদ মুসাকে ধরে দেয়ার জন্যে।’

‘আহমদ মুসা একজন ব্যক্তিমাত্র। তার কোন দল নেই। সে কি করে মাতব্বরী করছে?’ এনড্রার কণ্ঠে বিস্ময়।

‘তিনি দল নিয়ে ঘুরে বেড়ান না এটা ঠিক। কিন্তু তার দল নেই কে বলল? যেখানে যে দেশেই বাস করুক প্রতিটি মুসলিম তার দলের সদস্য। এখন অজস্র খৃষ্টানও তার পক্ষ হয়ে গেছে।’

‘এটা কি করে সম্ভব হলো?’ বলল এনড্রা।

‘তিনি এক নীতিবোধের পক্ষে কাজ করছেন। সেটা জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমকে সাহায্য। এ জন্যেই দুনিয়ার সব মজলুম ও বিবেকবানরা তাকে ভালোবাসে।’

‘কিন্তু সে তো দেখছি শুধু মুসলমানদের পক্ষেই কাজ করে।’

‘কারণ মুসলমানরাই আজ জাতি হিসেবে নির্যাতন-নিপীড়ন ও ষড়যন্ত্রের শিকার। যেমন দেখছ এই সুরিনামে। রঙ্গলালরা কিছুতেই মুসলমানদের শাসন ক্ষমতায় আসতে দেবে না।’

‘কিন্তু আমরা যে এই রঙ্গলালদেরই সাহায্য করছি?’

‘কারণ আমরা আহমদ মুসার নীতিবোধকে বহু আগেই পদ-পিষ্ট করে শেষ করে এসেছি। ‘কিনিক কোবরা’র এখন টাকা কামানোর যন্ত্র। ‘কিনিক কোবরা’র অর্থ সূর্যের ছোবল জান? মানুষ একে দেখে না, জানে না, বুঝে না, কিন্তু এর সর্বগ্রাসী দহনজ্বালায় সে শেষ হয়ে যায়। আমরা পৃথিবীটাকেই জ্বালিয়ে দিতে চাই। আহমদ মুসাকেও।’

‘বস’ লোকটি থামল।

কিন্তু কোন জবাব এল না এনড্রার কাছ থেকে। ‘বস’ লোকটিই আবার বলল, ‘জান, কেন?’

‘জানি না।’ বলল এনড্রা সম্ভ্রমের সাথে।

‘স্বার্থের সর্প গোটা পৃথিবীকে তার অক্টোপাসে বেঁধে ফেলেছে। তার বিষ নিঃশ্বাসে জ্বলছে গোটা দুনিয়া। এ দুনিয়া আজ ধংসের যোগ্য। আর......।’

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল ‘বস’ লোকটি। তাকে বাঁধা দিয়ে এনড্রা বলে উঠল, ‘বস’ এই তো আমরা এসে গেছি। ঐ সামনের পুব পাশের গেটটাই আহমদ হাত্তা নাসুমনের।’

‘বস’ বলে কথিত লোকটির হাত ছিল স্টিয়ারিং হুইলে। এনড্রার কথা শুনে সে সোজা হয়ে বসল।

তার দু’চোখে ছুটে গেল আহমদ হাত্তা নাসুমনের বাড়ির দিকে। নিবদ্ধ হলো গিয়ে বাড়ির উপর।

আহমদ হাত্তার তিন তলা বাড়িটি বিরাট। বন্ধ গেট।

দুটি গাড়ি গিয়ে গেটের সামনে দাঁড়াতেই ‘বস’ বলে কথিত লোকটি লাফ দিয়ে গেটের সামনে দাঁড়াল। একই সময়ে দুজন পুলিশ পাশের গার্ড রুম থেকে বেরিয়ে এল। তারা সুরিনাম আর্মির কমান্ডো অফিসারকে দেখেই কড়া একটা স্যালুট দিল।

‘আমরা স্যারকে নিতে এসেছি।’ বলল কমান্ডো অফিসারের পোশাকে ‘বস’ বলে কথিত লোকটি।

এসময় আরও দুজন পুলিশ বেরিয়ে এল। তারা সালাম ঠুকে গেট খোলার কাজে অন্য দুজন পুলিশকে সাহায্য করতে লেগে গেল।

গেট খুলতেই কমান্ডো অফিসারের পোশাক পরা ‘বস’ লোকটি গট গট করে ভেতরে ঢুকে গেল। তিনজন কমান্ডো তার পেছন পেছন চলল। অবশিষ্ট চারজনের দুজন গেটের দরজা একটু ভেজিয়ে দিয়ে চারজন পুলিশ কে সামনে রেখে গেটের ভেতরে দাঁড়াল। অন্য দুজন গেটের বাইরে গাড়ির পাসে এ্যাটেনশন অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল।

কমান্ডো অফিসারবেশী ‘বস’ লোকটি ভেতরে ঢুকেই সিঁড়ি দিয়ে এক লাফে দোতলায় উঠে গেল। তার পেছনে তিনজন কমান্ডোও।

দোতলায় উঠার সিঁড়ির মুখেই অভ্যর্থনা কক্ষ। সেখানে বসেছিল আহমদ হাত্তার পিএস হাসান মুসতো।

কমান্ডো অফিসারকে দেখেই সে ছুটে বেরিয়ে এল। কমান্ডো অফিসারের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, ‘কি ব্যাপার? আপনারা?’

‘আমরা স্যারকে নিয়ে যেতে এসেছি।’ বলল অফিসারবেশী কমান্ডো।

‘আমরা তো কিছু জানি না। এ ধরনের কোন নির্দেশ তো আমাদের কাছে আসেনি।’ বলল হাসান মুসতো।

‘তা আমরা জানি।’ বলে কমান্ডো অফিসার তিন তলায় উঠার জন্য পা বাড়াল সিঁড়ির দিকে।

দু’ধাপ এগিয়ে গেলে বাঁধা দিল হাসান মুসতো। বলল, ‘একটু দাঁড়ান, আমি স্যারকে জিজ্ঞেস করি।’

বলে মোবাইল বের করলো হাসান মুসতো। সঙ্গে সঙ্গে অফিসারবেশী কমান্ডোর ‘উজি’র নল উঠে এল হাসান মুসতোর লক্ষ্যে। বেরিয়ে এল এক ঝাঁক গুলী নিঃশব্দে।

ছিটকে পড়ল হাসান মুসতোর দেহ সিঁড়ির মুখে এবং গড়িয়ে পড়ে গেল নিচে, এক তলায়।

চারজন পুলিশেরই বোধ হয় চোখে পড়েছিল ব্যাপারটা। হাসান মুসতোর দেহ গড়িয়ে পড়ে স্থির হবার আগেই ছুটে আসা চারজন পুলিশকে সেখানে এসে দাঁড়াতে দেখা গেল। তারা তাকাল উপরে। দেখল, অফিসারবেশী কমান্ডোর ‘উজি’ ধরা হাত তখনও উদ্যত।

অকস্মাৎ অভাবিত দ্রুততায় উঠে এল পুলিশের চারটি স্টেনগানের নল।

কিন্তু পরক্ষণেই পেছন থেকে এক ঝাঁক গুলী এসে ঝাঁঝরা করে দিল তাদের দেহ। হাসান মুসতোর লাশের পাশেই পড়ে গেল তাদের লাশ।

গেটের ভেতরে দাঁড়ানো দুজন কমান্ডো ওদের গুলী করেছিল।

‘থ্যাংকস টু আওয়ার শুটারস’ বলে অফিসারবেশী ‘বস’ কমান্ডো লাফিয়ে উঠতে লাগল তিন তলার সিঁড়ি দিয়ে।

সাথের তিনজন কমান্ডোর একজন দোতলার সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে থাকল। আর দুজন উঠে গেল অফিসারবেশী কমান্ডোর সাথে। অফিসার কমান্ডো লোকটি তিন তলায় উঠেই লিভিং রুমের মধ্যে দিয়ে ছুটল এবং ছোট্ট একটা করিডোর অতিক্রম করে একটা দরজায় প্রচণ্ড জোরে একটা লাথি মারল।

তার যেন সব মুখস্ত। কোন পথে কোথায় কোন ঘরে যেতে হবে তা আগে থেকেই যেন ঠিক করে রাখা। আসলেই তাই। এখানে আসার আগে বিস্তারিত মুখস্ত করে কোন ঘরে এ সময় আহমদ হাত্তা রেস্ট নেন তা জেনেই তারা এসেছে।

অফিসার কমান্ডোর সাথে তিনতলায় উঠে আসা দুজন কমান্ডোর একজন তিন তলার সিঁড়ির মুখে অবস্থান নিলে, অন্যজন অফিসার কমান্ডোর পেছনে ছুটে এল।

প্রচণ্ড লাথিতে দরজার হুক ছিটকে গিয়ে দরজা খুলে গেল। আফিসার কমান্ডো দেখতে পেল আহমদ হাত্তা বিছানায় বসা এবং একজন তরুণী টেলিফোনে ব্যস্ত।

কমান্ডো অফিসারকে দরজায় দেখতে পেয়েই আহমদ হাত্তা শক্ত কণ্ঠে বলে উঠল, 'অনুমতি না নিয়ে তোমরা এখানে কেন? তোমরা পুলিশকে খুন করেছ কেন?' ভয় মিশ্রিত উত্তেজিত কণ্ঠ আহমদ হাত্তার।

কমান্ডো অফিসার কোন উত্তর দিল না। পাশে দাঁড়ানো তার কমান্ডোকে একটা ইংগিত করলো। তারপর রিভলবারের ব্যারেল ফাতিমার হাতে ধরা টেলিফোনের দিকে ফিরিয়ে গুলী করলো। টেলিফোনের রিসিভার ধরা থাকল আহমদ হাত্তার মেয়ে ফাতিমার হাতে, কিন্তু টেলিফোন সেটটি গুঁড়ো হয়ে গেল।

এদিকে অফিসারের ইংগিত পাওয়ার পর সাথে সাথে অন্য কমান্ডো ঝাঁপিয়ে পড়েছে আহমদ হাত্তার উপর এবং ক্লোরোফরম ভেজানো একটা রুমাল চেপে ধরেছে তার নাকে। সেই অবস্থাতেই হাত-পা ছোঁড়া রত আহমদ হাত্তাকে সে কাঁধে তুলে নিল।

'আমার আব্বাকে নিয়ে যেও না' বলে প্রচণ্ড চিৎকার দিল ফাতিমা নাসুমন এবং পরে তার সংজ্ঞাহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল মেঝের উপর।

আহমদ হাত্তার দেহ কাঁধে তুলে নিয়েই ছুটল কমান্ডোটি। ইতিমধ্যেই কমান্ডো অফিসারটি ঘরের বাইরে গিয়ে পৌঁছেছিল।

কাঁধে নেয়ার পরও হাত-পা ছুঁড়ছিল আহমদ হাত্তা। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই নিস্তেজ হয়ে পড়ল তার দেহ।

কমাডো অফিসারটি ও অন্য কমান্ডোরা দ্রুত নামছিল নিচে সংজ্ঞাহীন আহমদ হাত্তাকে নিয়ে।

দুতলা থেকে নামার সিঁড়ির মুখে পৌঁছতেই বাইরে থেকে ব্রাশ ফায়ারের শব্দ কানে এল।

কমান্ডো অফিসারটি দুতলায় নামার সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল এবং বলল, 'নিশ্চয় বাইরে পুলিশ এসেছে। হাত্তার ঐ মেয়েটাই তাহলে পুলিশকে ডেকেছে।'

তারা সিঁড়ি দিয়ে এক তলায় নেমে এসে সেই লাশগুলোর পাশে দাঁড়াল। বাইরে ব্রাশ ফায়ার তখনও চলছে।

যে দুজন কমান্ডো গেটের ভেতরের চত্বরে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা তখনও সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। কমান্ডো অফিসারের সাথে তিনজন কমান্ডোও গিয়ে তাদের পাশে দাঁড়াল। তাদের একজন বলল কমান্ডো অফিসারকে লক্ষ্য করে, 'বস, আমরা কি বাইরে বেরুব?'

'বাইরে পরিস্থিতি ট্যাকেল করার দায়িত্ব তাদের দুজনের। শত্রুরা ভেতরে এলে, তবেই তোমাদের দায়িত্ব বর্তাবে ওদের মোকাবিলা করার।'

বলে একটু থামল, তারপর আবার শুরু করলো, 'চিন্তা করো না, প্রথম দিকে পুলিশের পাল্টা গুলীই ছিল প্রবল, কিন্তু এখন চলছে আমাদের এক তরফা গুলী। সম্ভবত পুলিশ ভিতরে ঢোকার জন্যে এক সাথে সবাই নেমেছিল। সুতরাং সবাই এক সাথে গুলীর মুখে পড়েছে। আমাদের লোকরা ছিল গাড়িতে, আড়ালে, আর ওরা উন্মুক্ত রাস্তার উপর। তাই লড়াই বেশিক্ষণ চলেনি।'

কমান্ডো অফিসারের কথা থামতেই বাইরের গুলীও থেমে গেল।

'অল ক্লিয়ার। চল গাড়িতে সকলে।' বলল দ্রুত কণ্ঠে কমান্ডো অফিসার এবং নিজেও ছুটল বাইরে বেরুবার জন্যে।

বাইরে বেরিয়ে গেটের সামনেই পাঁচজন পুলিশের লাশ দেখতে পেল।

আহমদ হাত্তাসহ ওরা মাইক্রোতে উঠার পর কমান্ডো অফিসার কার-এ উঠার সময় মাইক্রোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'জরগ, ইউরিকো তোমাদের ধন্যবাদ, পুলিশ তোমাদের প্রতিরক্ষা লাইন অতিক্রম করতে পারেনি।'

কার ও মাইক্রো গাড়ি দুটি এবাউট টার্ন করে যে দিক থেকে এসেছিল সেদিকে আবার এগিয়ে চলল।

তীব্র গতিতে ছুটে আসছিল আহমদ মুসার গাড়ি। কিন্তু ওসেয়ান রোড থেকে নর্থ-সাউথ রোডে পড়ার সময় সাবধানতার জন্যে গতি কমিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু তারপরও তীব্র গতিতে ছুটে আসা একটা প্রাইভেট কার আহমদ মুসার কার-এর ফ্রন্ট গার্ডারের সাথে ঠোকর খেল।

সঙ্গে সঙ্গে আহমদ মুসার কার বাম দিকে বেঁকে গিয়ে কয়েকবার ঘুরপাক খেয়ে উল্টে গিয়েও আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল রাস্তার কিনারায় এসে। অন্যদিকে প্রবল বেগে ধাক্কা দেয়া কারটি ডান দিকে ছিটকে যায় এবং কারের পেছনের দরজাটি খুলে যায়। ফলে অন্য গাড়ির সাথে এ্যাক্সিডেন্ট হওয়া থেকে বেঁচে যায়।

এই এ্যাক্সিডেন্টের পর পরই আগের কারটির মতই বিদ্যুৎবেগে ধেয়ে আসা একটা মাইক্রো এ্যাক্সিডেন্ট এর জায়গায় হার্ড ব্রেক কষে থেমে যায়। হার্ড ব্রেকের ফলে প্রবল ঝাঁকুনি খায়।

মাইক্রোটি থামতেই সামনের কারটিও থেমে যায়। বেরিয়ে আসে কারের পেছনের সিট থেকে একজন। চিৎকার করে বলে মাইক্রোটিকে লক্ষ্য করে, 'জরগ, ইউরিকো, তোমরা ওকে?'

মাইক্রো থেকেও একজন লোক নেমে এসেছিল। সে জবাব দিল। বলল, 'ওকে ট্রিজিল্লো, তোমরা ঠিক আছ?'

'হ্যাঁ তাড়াতাড়ি এস।' বলে সামনের গাড়ির ট্রিজিল্লো নামের লোকটি গাড়ির দরজা খুলে যাওয়ার ফলে রাস্তায় ছিটকে পরা হাতব্যাগটা তুলে নিয়ে গাড়িতে ঢুকে গেল।

প্রায় একই সাথে মাইক্রোর লোকটিও গাড়িতে উঠে গেছে।

ভাবছিল আহমদ মুসা, সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে এ্যাকসিডেন্ট ঘটাল, অথচ একটু দুঃখ প্রকাশ করল না! সুরিনাম আর্মির সৌজন্যবোধের মান কি এত নিচু! এ্যাকসিডেন্ট ঘটানো কার ও মাইক্রো থেকে বেরিয়ে আসা লোক দুজনের পোশাক দেখেই আহমদ মুসা বুঝতে পেরেছিল ওরা সুরিনাম আর্মির কমান্ডো ইউনিটের লোক।

হঠাৎ আহমদ মুসার মনে আরেকটা চিন্তার উদয় হলো, কারের লোকটি কলম্বিয়া রাষ্ট্রের একটা ক্ষুদ্র গোষ্ঠী মোল্লটোদের ভাষায় কথা বলল কেন? আর মাইক্রোটির লোকই বা গুয়েতেমালা রাষ্ট্রের মায়া ভাষায় কথা বলল কেন? এই

প্রশ্ন আহমদ মুসাকে আরেকটা প্রশ্নের দিকে টেনে নিয়ে গেল। লোক দুটিকে আহমদ মুসা যতটুকু দেখেছে, তাতে মনে হয়েছে ওরা সুরিনামের লোক নয়। ওদের একজন কলম্বিয়ার মোল্লটো গোষ্ঠীর, অন্যজন গুয়েতেমালার মায়া গোষ্ঠীর লোক হবে। তাহলে কি সুরিনাম আর্মিতে কলম্বিয়া, গুয়েতেমালাসহ মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য দেশের লোকও আছে? কিন্তু আহমদ মুসার মন মানতে চাইলো না, একটা দেশের কমান্ডো ইউনিটে কি করে অন্য দেশের লোক থাকতে পারে! তাহলে কি ওরা সুরিনামের নাগরিক? বাইরে থেকে এসে এখানে বসতি গড়েছে। যদি তাই হয় তাহলে সেনাবাহিনীর সবচেয়ে এলিট অংশে চাকুরী করেও বিদেশের ভাষায় ওরা কথা বলবে এবং দুজন দুই ভিন্ন ভাষায়!

অবাক হলো আহমদ মুসা।

এসব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়াল আহমদ মুসা। নিজের গাড়ির দিকে ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে তার চোখ পড়ল রাস্তার উপর। দেখল একটা ক্যাশ মেমোর মত কাগজ রাস্তার ওদিক থেকে উড়ে এসে তার গাড়ির চাকায় আটকে গেল।

মেমোটিকে আনকোরা নতুন দেখে খেয়াল বশেই উদ্দেশ্য বিহীনভাবে তুলে নিল আহমদ মুসা। শহরের একটা বিখ্যাত লন্ড্রীর মেমো। নামের দিকে চোখ পড়তেই আগ্রহ বেড়ে গেল আহমদ মুসার। 'ট্রিজিল্লো' মানে যে কার তার গাড়িকে ধাক্কা দিয়েছিল, সেই গাড়ি থেকে নেমে আসা লোকটিরই তাহলে স্লিপটা। তারিখ দেখল, সেটা মাত্র একদিন আগে। তার মানে লন্ড্রীর স্লিপটা তার জন্যে খুব মূল্যবান। আপাতত স্লিপটা নিজের কাছে রেখে দেয়ার চিন্তা করল আহমদ মুসা। পকেটে রাখার আগে ঠিকানার দিকে নজর বুলাল সে। দেখল ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর দুই-ই আছে। খুশি হলো আহমদ মুসা। ওদের কারটা তাকে আঘাত করলেও তাদের সে একটা উপকার করতে পারবে।

মেমোটা পকেটে ফেলে আহমদ মুসা গাড়িতে উঠে বসল। আহমদ মুসা খুশি হলো গাড়ির সামনের পাশটা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও গাড়ির সবকিছু ঠিক আছে।

গাড়ি স্টার্ট দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে ছুটে চলল নর্থ-সাউথ রোড ধরে।

বেশ কিছুটা সময় নষ্ট হয়েছে এই ঘটনায়। গতি বাড়িয়ে দিল সে গাড়ির।

ফাতিমা নাসুমনের টেলিফোন পাওয়ার পর থেকেই একটা অস্বস্তি তাকে পেয়ে বসেছে। অস্বস্তিটা দূর হচ্ছে না কিছুতেই। আহমদ মুসার পরিচয় দিয়ে কারা টেলিফোন করতে পারে আহমদ হাত্তার খোঁজ নেবার জন্যে, নিশ্চয় তারা সহজ এবং সাধারণ কেউ নয়। আহমদ মুসা বেশ কিছু দিন আহমদ হাত্তার গাড়ি ড্রাইভ করছে, কিন্তু তার পরিচয় ড্রাইভার তা কেউ মনে করছে না। সবাই মনে করছে ড্রাইভাররূপী ব্যক্তিটি আহমদ হাত্তার নিরাপত্তার দায়িত্বশীল কিংবা আরও ঘনিষ্ঠ কেউ। আহমদ মুসার পরিচয় ব্যবহার করে যা তারা জানতে চেয়েছে সেটা নিশ্চয় খুব বড় ও গুরুতর বিষয়। নিশ্চয় ঐ টেলিফোনের দ্বারা তারা নিশ্চিত হতে চেয়েছে আহমদ হাত্তা বাসায় আছেন কিনা। কিন্তু কেন? দিনের বেলায় পুলিশ প্রহরাধীন বাসায় হামলা হওয়ার কথা নয়। তাহলে?

অস্বস্তিটার কোন কিনারা হলো না। ভাবনাও তার শেষ হলো না।

গাড়ি এসে গেছে।

বাঁকটা ঘুরলেই আহমদ হাত্তা নাসুমনের গেট দেখা যাবে।

বাঁক ঘুরল গাড়ি।

আহমদ হাত্তার বাড়ি নজরে এল আহমদ মুসার। আহমদ হাত্তার গেটে পুলিশের অনেকগুলো গাড়ি ও পুলিশের ছুটাছুটি দেখে বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল আহমদ মুসার। বড় কিছু না ঘটলে পুলিশের এত গাড়ি ও এত পুলিশের সমাগম হতে পারে না।

কি ঘটতে পারে?

নানা আশংকায় দুলে উঠল আহমদ মুসার মন।

গেটের আরও কাছে আসতেই পুলিশ চলাচলের ফাঁক দিয়ে গেটের সামনে এবং আরও একটু পিছনে রাস্তার উপর বিক্ষিপ্ত কিছু লাশ দেখতে পেল।

প্রবল আশংকায় কেঁপে উঠল তার মন। বড় ধরনের সংঘাত ছাড়া তো এত লাশ পড়তে পারে না।

সংঘাতের কেন্দ্র বিন্দুতে আহমদ হাত্তা নিশ্চয়। তিনি কেমন আছেন?

আহমদ মুসার আশংকা কাতর মনে কথাগুলো একের পর এক উঠে আসতে লাগল।

আহমদ হাত্তার গেটের কয়েক গজ সামনে দাঁড়াল আহমদ মুসার গাড়ি।

গাড়ি থেকে নামল আহমদ মুসা। এগুলো গেটের দিকে।

দেখল গেটের ওপাশের লাশগুলো পুলিশের। ডানদিকে একটু এদিকে যে লাশগুলো পড়ে আছে তাও পুলিশের। সে লাশগুলোর পাশেই পুলিশের পেট্রোল গাড়ি।

আহমদ মুসা বুঝল, গেটের ওপাশের লাশগুলো বাড়ির প্রহরী পুলিশদের। কিন্তু এই পুলিশরা কোত্থেকে এল, মারা পড়ল কিভাবে?

আহমদ মুসা গেটের দিকে অগ্রসর হলে পুলিশ বাঁধা দিল। বলল, 'উপরের স্যারদের হুকুম ছাড়া ভেতরে কাউকে যেতে দেয়া হবে না।'

'আপনার স্যারদের বলুন আমাকে ভেতরে যেতে হবে। কিন্তু তার আগে বলুন আহমদ হাত্তা ঠিক আছেন তো?'

'স্যার ঠিক থাকলে কি আর হুলস্থুল হতো? কারা যেন তাকে কিডন্যাপ করেছে।' বলল একজন পুলিশ।

আহমদ হাত্তার কিডন্যাপের খবরটি দারুণভাবে বিদ্ধ করল আহমদ মুসার হৃদয়কে।

দ্রুত কন্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'তাঁর মেয়ে ফাতিমা নাসুমন কেমন আছে?'

'ভাল আছেন, তবে আহত।' বলল পুলিশটি।

'আমাকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে। সময় এখন খুব মূল্যবান। আপনি আপনার স্যারদের খবর দিন।' আহমদ মুসা বলল।

এই সময় পুলিশ কমিশনারকে দ্রুত আসতে দেখা গেল আহমদ মুসার দিকে। একটু কাছাকাছি এসেই বলে উঠল, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে মি. আব্দুল্লাহ। এত কিছু করেও শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। স্যারকে ওরা নিয়ে গেছে।'

পুলিশ কমিশনার থামতেই আহমদ মুসা বলে উঠল, 'মি. কমিশনার, তাকে কিডন্যাপ হতে কে দেখেছে?'

'যারা দেখেছেন তাদের মধ্যে ম্যাডাম ফাতেমাই শুধু বেঁচে আছেন। নিচের তলার চাকর-বাকরদেরও দুএকজন দেখেছে।' বলল পুলিশ কমিশনার।

'মি. কমিশনার, আমি ম্যাডাম ফাতেমার সাথে কথা বলতে চাই। দয়া করে তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করুন।'

'ঠিক আছে একজন অফিসার পাঠাচ্ছি। তার অনুমতি নিয়ে আসার। উনিও কিছুটা আহত।' বলে পুলিশ মুখ ঘুরিয়ে একজন পুলিশ অফিসারকে নির্দেশ দিল।

এ সময় তিন তলার বারান্দা থেকে একটা কণ্ঠ ভেসে এল, 'ভাইয়া আপনি আসুন।' ভারী ও কান্না চাপা কণ্ঠটি।

আহমদ মুসাসহ সবাই তাকাল সেদিকে। দেখল, তিন তলার বারান্দায় মুখে রুমাল চেপে দাঁড়িয়ে আছে ফাতিমা নাসুমন।

'আসছি ফাতিমা।' বলে ভেতরে যাবার জন্যে পা বাড়াল আহমদ মুসা।

'চলুন।' বলল পুলিশ কমিশনার।

ফাতিমা নাসুমন দাঁড়িয়েছিল তার আব্বার ঘরের দরজায়।

আহমদ মুসা তিন তলায় উঠে ফাতিমা নাসুমনের নিকটবর্তী হতেই ফুফিয়ে কেঁদে উঠল ফাতিমা।

'ধৈর্য ধর ফাতিমা সব ঠিক হয়ে যাবে।' গম্ভীর কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

একটু থেমেই আবার বলল, 'চল কোথা থেকে ওঁকে নিয়ে গেছে একটু দেখতে চাই।'

ফাতিমা নাসুমন রুমালে চোখ মুছে বলল, 'আসুন।'

তারা প্রবেশ করল আহমদ হাত্তার শোবার ঘরে।

ঘরের ডিভানটা দেখিয়ে বলল ফাতিমা, 'আব্বা এখানে শুয়েছিলেন। ওরা দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকলে তিনি উঠে বসেন। ঐ অবস্থা থেকেই তাকে ক্লোরোফরম করে ধরে নিয়ে গেছে।' কান্নায় আবার ভেঙ্গে পড়ল ফাতিমার কণ্ঠ।

আহমদ মুসা বেড এবং চারদিকটায় ভালো করে নজর বুলাল। না বাড়তি কোন চিহ্ন কোথাও নেই। ঘর, করিডোর সব জায়গায় কার্পেট থাকায় জুতার দাগও কোথাও পড়েনি। কিন্তু হতাশ হলো না সে।

'চল ফাতিমা আমরা বসি। বসে কথা বলি।' বলল আহমদ মুসা ফাতিমা নাসুমনকে। পাশেই একটা প্রশস্ত করিডোর। করিডোরের টি সার্কেলে গিয়ে

দাঁড়াল তারা। পুলিশ কমিশনারও তাদের সাথে গেল। গিয়ে তারা একটা টি টেবিল ঘিরে তিনজন তিন সোফায় বসল।

বসেই আহমদ মুসা পুলিশ কইমিশনারকে বলল, 'ঘটনার যেটুকু ফাতিমা নাসুমন জানেন, সেটুকু তো আপনারা জেনে নিয়েছেন, না?'

'হ্যাঁ সেটা জেনেই আমরা চারদিকে খোঁজ-খবর নেবার নির্দেশ দিয়েছি। সহকারী পুলিশ কমিশনার নিজে এ ব্যাপারটা হাতে নিয়েছেন।' বলল পুলিশ কমিশনার।

'এখন আমিও একটু জেনে নিতে চাই।' আহমদ মুসা বলল।

'মাফ করবেন, আপনার কথা আমার সহকারী কমিশনারের কাছ থেকে অনেক শুনেছি। অবশ্য আমি এখনও জানি না, আপনার সাথে মি. হাত্তার সম্পর্ক কি।' বলল পুলিশ কমিশনার অনেকটা সংকোচের সাথে। সংকোচ ভাবটা মেকি। আসলে আহমদ মুসার আগমন তার পছন্দ হয়নি।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'আমেরিকায় ওনার সাথে আমার পরিচয় হয়। ওনার নানা রকম বিপদ আপদ যাচ্ছে। ওনার সাথে থাকার জন্যে এমন সার্বক্ষণিক একজন লোকের প্রয়োজন পড়ে যিনি তাকে পরামর্শও দিতে পারবেন। সেই সময় হতে আমি তার সাথে থেকে যাই, তারপর এখনও আছি।'

'আপনি তো সব সময় তার সাথে আছেন, আজ যা ঘটল এমন ঘটনার কি তিনি কোন আশংকা করেছিলেন?' বলল পুলিশ কমিশনার।

'সব সময়ই তিনি নানা আশংকার মধ্যে ছিলেন। কিন্তু বাসায় হামলা হবে, এমন আশংকা তিনি কখনও করেননি।' আহমদ মুসা বলল।

'আজ যারা ভূয়া নামে টেলিফোন করে স্যারের বাড়িতে থাকা সম্পর্কে কনফার্ম হয়েছিল, তারাই তাকে কিডন্যাপ করেছে। তারা আপনার নাম নিয়ে যেহেতু টেলিফোন করেছে, বুঝা যাচ্ছে তারা আপনাকে চেনে।' বলল পুলিশ কমিশনার কূটনৈতিক ডায়ালগের ঢংগে।

'আহমদ হাত্তা সাহেবের যারা শত্রু, তারা তো অবশ্যই আমাকে চিনবে।' বলল আহমদ মুসা।

‘তা ঠিক তা ঠিক। ঠিক আছে আপনি ওর সাথে কথা বলুন।’ কিছুটা অপ্রস্তুত হওয়ার ভঙ্গিতে বলল পুলিশ কমিশনার।

আহমদ মুসা সোফায় হেলান দিল। একটু ভাবল। তারপর আবার সোজা হয়ে বসল। ফাতিমাকে লক্ষ্য করে বলল, ‘ফাতিমা ঘটনা যা দেখেছ বল।’

‘টেলিফোনে যখন আপনি আমাদের এখানে এক্ষুনি আসছেন বললেন এবং সাবধান থাকতে বললেন, তখনি অজানা আশংকায় আমার বুক কেঁপে ওঠে। আপনার টেলিফোন রাখার তিন চার মিনিটের মধ্যেই আমাদের গেটে দুটি গাড়ি দাঁড়াবার শব্দ পেলাম। কেন জানি বুকটা আমার ছ্যাৎ করে উঠল সঙ্গে সঙ্গেই। আপনি তো অতদূর থেকে এসময় আসার প্রশ্নই ওঠে না, তাহলে কে এল? আমি বেরিয়ে গিয়ে ব্যালকনি থেকে উঁকি দিলাম গেটে। দেখলাম একটা সাদা কার ও একটা সাদা মাইক্রো গেটে এসে দাঁড়িয়েছে। তা থেকে নামছে আমাদের সেনাবাহিনীর কালো ইউনিফরম পরা কমান্ডোরা। সেটি.........।’

ফাতিমাকে বাঁধা দিয়ে বলল, ‘তুমি কি বললে একটা সাদা কার ও একটা সাদা মাইক্রো। তুমি এটা ঠিক দেখেছো তো?’

‘হ্যাঁ ঠিক দেখেছি।’

‘তুমি কি ঠিক বলছ ওরা সেনাবাহিনীর কমান্ডোর কালো পোষাকে অন্য কেউ তো হতে পারে!’ আহমদ মুসা বলল।

‘তা হতে পারে। কিন্তু আমি ওদের ইউনিফর্মে আমাদের সেনাবাহিনীর ইনসিগনিয়ার সাথে কমান্ডো ইউনিটের ইনসিগনিয়া পরিষ্কার দেখেছি।’ বলল ফাতিমা দৃঢ়তার সাথে।

‘ঠিক আছে, বলে যাও।’ আহমদ মুসা বলল।

একটু থেমেই সে আবার বলতে শুরু করল, ‘সেনাবাহিনীর কমান্ডোদের নামতে দেখে আমি খুশি হলাম। ভাবলাম, সরকার আমাদের নিরাপত্তার জন্যে ওদের পাঠিয়েছি। আমি ব্যালকনিতে দাঁড়িয়েই থাকলাম এই আশায় যে, নিশ্চয় আব্বার পিএ হাসান মুসতো আমাকে ডাকবে এবং আমাকে কিছু বলতে হবে। ওরা ঢুকে গেল ভেতরে। আমি দাঁড়িয়েই আছি। মাত্র কয়েক মুহূর্ত। হঠাৎ দেখলাম চত্বরের চারজন পুলিশ বাড়ির ভেতরে দিকে কাউকে লক্ষ্য করে স্টেনগান তুলছে।

পরক্ষণেই চারজন পুলিশ একসাথে গুলী বিদ্ধ হয়ে পড়ে গেল। গুলীগুলো ভেতর দিক থেকে এসেছে এবং সাইলেন্সার লাগানো থাকায় কোন শব্দ হয়নি। সঙ্গে সঙ্গেই আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল কমান্ডোরা আমাদের মিত্র নয়, শত্রু। বিষয়টা বুঝতে পেরেই আমি দ্রুত ছুটে এলাম আব্বার ঘরে আব্বাকে সব কিছু জানাবার ও পুলিশকে টেলিফোন করার জন্যে।

এরপর আমি ঘরে এসেই ছিটকিনি লাগিয়ে দিয়ে আব্বার কাছে গেলাম তাঁকে জাগাবার জন্যে। কিন্তু ভাবলাম এতে দেরী হয়ে যাবে টেলিফোন করতে। আব্বাকে না ডেকে ছুটলাম টেলিফোন করতে। পুলিশকে টেলিফোন করা প্রায় শেষ হওয়ার পথে এই সময় দরজা ভেঙ্গে দু'জন কমান্ডো ঘরের ভেতরে ঢুকল। তাদের একজন গুলী করে আমার টেলিফোনের সেট ভেঙ্গে ফেলল। আরেকজন আব্বাকে নিয়ে ক্লোরোফরম করে তাকে কাঁধে তুলে নিল। 'আমার আব্বাকে নিয়ে যেও না' বলে চিৎকার করে উঠেছিলাম, তারপরে আর কিছু মনে নেই। সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিলাম আমি।' থামল ফাতিমা নাসুমন।

'ঠিক আছে আপনারা কথা বলুন আমি ওদিকে একটু দেখি।' বলে উঠে দাঁড়াল পুলিশ কমিশনার। চলে গেল সে।

সে চলে যেতেই আহমদ মুসা প্রশ্ন করল ফাতিমাকে, 'আচ্ছা বলত, তুমি কার ও মাইক্রো এই গাড়ি দুটোকে যখন গেটে দেখলে, তখন গাড়ি দুটোর মাথা কোন দিকে ছিল?'

'উত্তর দিকে।'

'মাইক্রোর দরজা দুপাশে, না এক পাশে ছিল, মনে করতে পার তুমি?'

'অবশ্যই, মাইক্রোর পশ্চিম পাশের দরজা দিয়ে নেমে গাড়ি ঘুরে ওরা এদিকে এসেছে। সুতরাং দরজা একপাশেই ছিল।'

আহমদ মুসা চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

কথা শেষ করে ফাতিমা একটু থেমেই আবার বলে উঠল, 'এ তথ্যে সাংঘাতিক আগ্রহ দেখছি আপনার! কিন্তু কি হবে এসব দিয়ে?'

'পরে বলব। তুমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছে। এখন বল, কমান্ডোদের মুখের চেহারা তো দেখেছ, বিশেষ করে যারা কিডন্যাপ করতে ঘরে ঢুকেছিল?'

'হ্যাঁ দেখেছি। ওদের কাউকেই সুরিনামের বলে মনে হয়নি।'

'কোথাকার লোক বলে মনে হয়েছে?'

'ওদের যে দুজন ঘরে ঢুকেছিল তাদের একজন 'মায়া', আরেকজনের চেহারায় 'মোল্লাটো'র ভাব বেশি ছিল।'

ভ্রু-কুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার। রাস্তায় যে কারটির সাথে তার এক্সিডেন্ট হয়েছিল, তার একজনের নাম সে শুনেছে 'ট্রিজিল্লো' এবং 'জারগো ইউরিকো'। এ দুটির একটি 'মায়া' নাম, আরেকটা 'মোল্লাটো' জাতির মানুষের নাম এবং এরা কেউ সুরিনামের নয়। 'মায়া'দের প্রধানত বাস গুয়েতেমালায় আর 'মোল্লাটো' জাতির প্রধান আবাস কলম্বিয়ায়। তাহলে তো ফাতিমার বর্ণনার সাথে সবকিছু মিলে যাচ্ছে। তাহলে ঐ গাড়ি দুটিই কি আহমদ হাত্তাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে ঐ ভাবে পাগলের মত ছুটছিল!

'আপনি কি কিছু ভাবছেন?' বলল ফাতিমা।

ফাতিমার কথায় সম্বিত ফিরে পেল আহমদ মুসা।

'হ্যাঁ ভাবছি ফাতিমা। আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ। মি. হাত্তাকে যারা কিডন্যাপ করে নিয়ে যাচ্ছিল, তাদের সাথে মনে হয় রাস্তায় সাক্ষাত হয়েছিল।' বলল আহমদ মুসা।

বিস্ময় ও প্রবল উতসুক্য ফুটে উঠল ফাতিমা নাসুমনের চোখে-মুখে। সোজা হয়ে বসল। বলল, 'দেখা হয়েছিল? কিভাবে?'

আসার সময় তার এক্সিডেন্টের উল্লেখ করে আহমদ মুসা বলল, 'বেপরোয়া গতির একটা কার আমার কারকে ধাক্কা দেয়। চরকির মত আমার কারটি ঘুরপাক খেলেও আমার গাড়ি বড় ধরনের এক্সিডেন্ট থেকে বেঁচে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। এই সময় একটা মাইক্রোও সেখানে এসে দাঁড়িয়ে যায় এবং আমার গাড়িকে ধাক্কা দেয়া কারটাও সামান্য একটু এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। ঐ কার ও মাইক্রো থেকে দুজন লোক নামে। তারা একে অপরের নাম ধরে ডেকে কথা

বলছিল। তোমার বর্ণনা শুনে মনে হচ্ছে তারাই মি. হাত্তাকে কিডন্যাপ করেছে।' বলল আহমদ মুসা।

'কিন্তু কেন মনে হচ্ছে? কি প্রমাণ পেয়েছেন?' ফাতিমা নাসুমন বলল।

'প্রথম প্রমাণ হলো কিডন্যাপকারীদের একটা কার ও একটা মাইক্রো ছিল, ওখানেও তাই। দুই ক্ষেত্রেই গাড়ির রং সাদা। তুমি বলেছ কমান্ডোরা সুরিনামের নয়, আমি যে দুজনকে দেখেছি তারাও সুরিনামের নয়। সবচেয়ে বড় কথা হলো, যে দুজন ঘরে ঢুকেছিল তাদের একজনকে 'মায়া' অন্যজনকে 'মোল্লাটো' বলে তোমার মনে হয়েছে। অন্যদিকে আমি যে দুজনকে দেখেছি তাদের একজনের নাম 'মায়া'দের অন্য নামটি 'মোল্লাটো' গোষ্ঠীর।' থামল আহমদ মুসা।

কথা বলল না ফাতিমা। বিমর্ষভাব তার চেহারায়। একটু পর ভাঙ্গা গলায় বলল, 'ওরা তো চলে গেছে। এখন কি হবে। গাড়ির নম্বর আপনি দেখেছেন?'

হতাশ কণ্ঠ ফাতিমার।

'দেখার চেষ্টা করিনি। দেখলেও এবং মনে রাখলেও কোন লাভ হতো না। গাড়িতে লাগানো নম্বর অবশ্যই ভূয়া ছিল।'

কথা শেষ করেই আহমদ মুসার মনে পড়ে গেল লন্ড্রির স্লিপের কথা। ওতে তো গাড়ির অন্যতম আরোহী ট্রিজিল্লোর ঠিকানা আছে।

খুশিতে ভরে গেল আহমদ মুসার মুখমন্ডল। মুখ ফুড়ে সে বলে ফেলল, 'আল হামদুলিল্লাহ।' আনন্দের উচ্ছাস তার কণ্ঠে।

'কি ব্যাপার ভাইয়া, কি হল?' বলল ফাতিমা।

'আমি এখন বেরুতে চাই ফাতিমা।' আহমদ মুসা বলল।

'কোথায়?'

'মি. হাত্তার সন্ধানে।'

'ওদের ঠিকানা জেনেছেন তাহলে?' বলল ফাতিমা। তার চোখ-মুখে ফুতে উঠেছে আশার আনন্দ।

'মনে হচ্ছে।' বলে আহমদ মুসা লন্ড্রির স্লিপের সব কথা তাকে জানিয়ে বলল, 'আল্লাহ্ তার বান্দাহদের প্রয়োজনে এভাবেই সাহায্য করে থাকেন।'

‘আল হামদুলিল্লাহ। আপনি এখনি বের হবেন?’ ফাতিমা বলল।

‘হ্যাঁ।’

‘পুলিশকে বলবেন না?’

‘পুলিশ কমিশনারকে বলব না। আমি নিঃসন্দেহ যে রঙ্গলালের লোকরাই আহমদ হাত্তাকে কিডন্যাপ করেছে এবং এখন আমার মনে হচ্ছে, রঙ্গলালরা বাইরে থেকে মাফিয়া ভাড়া করে এনেছে। সেদিন ব্রুকোপনডো হাইওয়ের ঘটনায় যারা মরেছে, তারা এবং আজকের কিডন্যাপকারীরা একই গ্রুপের লোক, রঙ্গলালরা নিজে না পেরে মাফিয়াদের ডেকে এনেছে। সাংঘাতিক কিছু ঘটানো ওদের লক্ষ্য। আমি একটা ঠিকানা পেয়েছি এটা পুলিশ কমিশনার জানতে পারলে সঙ্গে সঙ্গেই সে তা জানিয়ে দেবে রঙ্গলালকে। তার ফলে আমি ঠিকানায় পৌঁছার আগেই ওরা হাওয়া হয়ে যাবে।’ থামল আহমদ মুসা।

‘বুঝেছি ভাইয়া। আপনি একা মাফিয়া ও রঙ্গলালদের বিরুদ্ধে এভাবে যাওয়া কি ঠিক হবে?’ বলল ফাতিমা চোখে-মুখে অসহায় ভানব নিয়ে।

‘তুমি টেলিফোনে ওভানডো বা লিসাকে ঠিকানাটা জানিয়ে দাও। আর বলে দাও এখনি যেন তারা এটা বার্নারডোকে জানিয়ে দেয়। বার্নারডো সহকারী পুলিশ কমিশনারকে বিষয়টা জানাবে এবং নিজের কর্তব্যও সে ঠিক করে নেবে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘বার্নারডো আপনার সাহায্যে সঙ্গে সঙ্গে যেন যায় এটা বলব না?’

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘সেটা বার্নারডোকেই ঠিক করতে দাও।’

‘আপনি আশ্চর্য লোক ভাইয়া। তাকে আপনি হুকুম দেবেন না, সব দুর্বহ ভার একাই বইবেন।’ বলল ফাতিমা ভারী কণ্ঠে।

‘তা নয় ফাতিমা। নিউ নিকারী থেকে গতকাল সে সিনিয়র গোয়েন্দা অফিসার হিসেবে বদলী হয়ে এসেছে পারামারিবোতে। সে তো এখন আমার হুকুমের অধীন নয়।’

বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

# ৩

'যতই অত্যাচার-নিপীড়ন কর তোমাদের পরিচয় না বললে তোমার কোন প্রশ্নেরই জবাব আমি দেব না। তোমরা আমাদের সেনা-কমান্ডোদের পোশাকে পরে এই অপরাধ করেছ। কারা তোমরা?' আহত ও কম্পিত কণ্ঠ আহমদ হাত্তা নাসুমনের।

আহমদ হাত্তা পড়ে আছে মেঝেতে।

তার জামা-কাপড়ে রক্তের দাগ। চুল তার উস্কো-খুস্কো। বিপর্যস্ত চেহারা।

তার পাশেই এক চেয়ারে বসে আছে সেই বস কমান্ডো অফিসার লোকটি।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে গুন্ডা মার্কা একজন লোক। তার হাতে চামড়ার একটি চাবুক। চাবুকে রক্তের দাগ।

এই চাবুক দিয়েই নির্যাতন করা হয়েছে আহমদ হাত্তাকে।

আরও একজন লোক রয়েছে ওখানে। সে পাথরের মত স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে চেয়ারে বসা লোকটির ঠিক পিছনে। অনেকটা এটেনন্ডেট কিংবা বডিগার্ডের মত।

ঘরটি একটি হলঘর।

চারদিকেই দরজা। মনে হয় সম্মেলন কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

আহমদ হাত্তা থামতেই চেয়ারে বসা সাপের মত ঠান্ডা দৃষ্টি ও ইস্পাতের মত কঠিন কাঠামোর লোকটা বলে উঠল, 'আমাদের পরিচয় জানার জন্যে অত ব্যস্ত হয়ে উঠছেন কেন? পরিচয় জানলেও পৃথিবীর কাউকে তা বলার সুযোগ পাবেন না। বাড়িতেই আমরা আপনাকে হত্যা করে আসতাম। কিন্তু হত্যা করিনি একটা কারণে। সেটা হলো, আমরা আপনার বডিগার্ড-কাম ড্রাইভারকে হাতে পেতে চাই এবং জানতে চাই তার পরিচয়, যা আপনাকে আগেই বলেছি। এতক্ষণ আপনি বেঁচেও আছেন এই কারণেই। আমাদের কাছে আপনার কোন মূল্য নেই।

এখন আপনার বডিগার্ড-ড্রাইভার আমাদের কাছে মূল্যবান। সে আমাদের দুজন লোককে হত্যা করেছে। তার প্রতিশোধ আমরা তার উপর নেব।'

'তাহলে তোমরা আমাকে খুন করতে চাও কেন?' বলল আহমদ হাত্তা।

'আমরা চাই না, অন্যেরা এটা চায়। সেই 'অন্য'দের আমরা সাহায্য করছি।' বলল চেয়ারে বসা লোকটা।

'অর্থের বিনিময়ে?'

'অবশ্যই।'

'তাহলে তোমরা ভাড়াটে মাফিয়া। শুধু টাকার জন্যে তোমরা এত নিচে নেমেছ?' বলল আহমদ হাত্তা।

'শুধু টাকার অভাব যখন মানুষকে নিচে নামায়, তখন টাকা উপার্জনের জন্যে মানুষ নিচে নামবে না কেন?'

'শুধুই টাকার অভাব সত্যিকার মানুষকে নিচে নামাতে পারে না।' আহমদ হাত্তা বলল।

হাসল লোকটা। ঠান্ডা হাসি।

বলল, 'দুএকজনকে পাবেন, তারা কোন না কোনভাবে সুবিধাভোগী ভাগ্যবান। বাকি ৯০ ভাগ অভাগ্যবানরা টাকার অভাবে সব হারায়। সব পাবার জন্যে এদের কাছে টাকাই সবচেয়ে বড়, অন্য সব কাজই টাকার চেয়ে ছোট।'

সাপের মত ঠান্ডা দৃষ্টির এবং ইস্পাতের কাঠামোর লোকটার মুখ থেকে বেরিয়ে আসা এই কথাগুলোকে অনেকটা বিলাপের মত মনে হলো।

আহমদ হাত্তা কিছুটা অবাক হয়ে তাকাল লোকটার দিকে। মুখ খলেছিল কিছু বলার জন্যে। কিন্তু তার আগেই গর্জে উঠল লোকটার কণ্ঠ।

'বলুন লোকটি কে?'

'তোমার পরিচয় এখনও বলনি। তুমিই তো দেখছি দলনেতা।' বলল আহমদ মুসা।

'আমার পরিচয় তো আপনিই বলেছেন। আমি মাফিয়া। টাকার বিনিময়ে সব কাজ করি।' বলল লোকটি।

‘এটা কোন পরিচয় নয়। কাজের পরিচয় বল। তোমাদের দলের নাম কি? তোমার নাম কি? রঙ্গলালই তোমাদের নিয়োগ করেছে কিনা?’ বলল আহমদ হাত্তা।

হাসল চেয়ারে বসা লোকটা। করুণার হাসি। বলল, তাহলে বাঁচার আশা এখনও করেন! এসব জেনে রঙ্গলালের বিরুদ্ধে কাজে লাগাবেন, এ সুখ স্বপ্ন এখনও দেখছেন! অথচ মৃত্যু আপনার জন্যে অবধারিত। এখন বলুন আপনার গার্ড-কাম ড্রাইভার লোকটি কে, তার নাম কি?’

‘বারবার একই প্রশ্ন কেন? এ প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না। এ প্রশ্নের উত্তর না দেয়া পর্যন্তই তো আমি বেঁচে আছি। মরবার জন্যে এ প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না।’ বলল আহমদ হাত্তা।

‘অনেক সময় মৃত্যুর চেয়ে জীবন বেশি ভীতিকর হতে পারে। এখন মৃত্যুর ভয়ে যা বলছেন না, জীবনের ভয়ে তা বলবেন।’ বলল চেয়ারে বসা নেতা লোকটি।

‘জীবনের কোন ভয়ই মৃত্যুর ভয়ের চেয়ে বড় হতে পারে না।’ আহমদ হাত্তা বলল।

চেয়ারে বসা লোকটির চোখ দুটি আরও ঠান্ডা, মুখ তার আরও শক্ত হয়ে উঠল। বলে উঠল ঠান্ডা গলায়, ‘বলবেন না তাহলে?’

‘বলব না। কিন্তু কি করবে তার পরিচয় দিয়ে? আমার মত তাকেও তোমরা মারতে চাও। মারার জন্যে ঠিকানা দরকার, তার পরিচয় দরকার হয় না।’

‘আমাদের লোক হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে তাকে মারা প্রয়োজন। কিন্তু এর চেয়ে বেশি প্রয়োজন তার পরিচয় জানা। আমাদের ‘কিনিক কোবরা’র কোন সদস্যকে এ পর্যন্ত দুনিয়ার কেউ কোথাও হত্যা করতে পারেনি। সেই প্রথম আমাদের দুজনকে হত্যা করেছে। শুনেছি, সুরিনামে আরও কিছু অসাধ্য সাধন সে করেছে। সব মিলিয়ে সে আমাদের কাছে অজানা এক বিস্ময়। সেজন্য তার পরিচয় আমাদের জানতেই হবে।’ বলল লোকটি।

‘ঠিক আছে তার পরিচয় তাহলে উদ্ধার কর।’ আহমদ হাত্তা বলল।

'হ্যাঁ সে চেষ্টাই আমি এবার করব।' আরও অস্পষ্ট ঠান্ডা গলায় সে বলল। তার সাপের মত ঠান্ডা চোখ দুটি আরও ছোট হয়ে এল।

বলেই লোকটি চাবুকধারীর দিকে তাকাল। বলল, 'এঁকে নাচের আসনে নিয়ে বসাও।'

চাবুকধারী এগিয়ে এল আহমদ হাত্তার দিকে। আহমদ হাত্তাকে সে দুহাতে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল এবং অল্প দূরে ঘরের দেয়ালের সাথে সেঁটে রাখা একটা উঁচু চেয়ারে নিয়ে বসিয়ে দিল।

চেয়ারটা বিশেষ ধরনের। উঁচু ও মজবুত লোহার তৈরি। চেয়ারের চারটি পায়া বিশেষ কংক্রিট বেদির সাথে আটকানো। চেয়ারের আসন ও পেছনটা সলিড কাঠের।

আহমদ হাত্তা চেয়ারে বসতে বসতে চেয়ারে বসা সেই লোকটিকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'তোমার দলের নাম খুবই সুন্দর ভয়ংকর। তোমার নাম কি?'

চেয়ারে বসা নেতা লোকটির ঠান্ডা চোখ দুটি নিবদ্ধ হলো আহমদ হাত্তার প্রতি। তার ঠান্ডা চোখে হাল্কা একটা ঔজ্জ্বল্য। বলল, 'ভয়ংকর শব্দের আগে সুন্দর শব্দ আপনাদের মত গণতন্ত্রীরা, আইনের ধ্বজাধারীরা বসাতে পারেন না। এটা 'কিনিক কোবরা'র একক অধিকার। সব নিষ্ঠুরতা তার কাছে শিল্প, সব ভয়ংকরতা তার কাছে আনন্দের।'

'ধ্বনিগত সৌন্দর্যের কথা বলেছি। কোবরার অঙ্গ-কাঠামো একটা শিল্প হলেও তার ছোবলে আছে মৃত্যু, তা আমি জানি। তবুও জিজ্ঞেস করছিলাম এজন্য যে তোমার নামটাও এরকমই কিনা।'

'শুনবেন না, এখনি দেখবেন।' বলে উঠল সেই নেতা লোকটি।

ততক্ষণে আহমদ হাত্তাকে চেয়ারের সাথে বাঁধা শুরু হয়ে গেছে। চেয়ারের দুই হাতলের সাথে তার দুই হাত বাঁধা হলো। তার দেহকেও বাঁধা হলো চেয়ারের সাথে। চেয়ারের পাদানিতে আটকে দেয়া হয়েছে তার দু'পাকে।

আহমদ হাত্তা তার দেহের বাঁধনের দিকে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'মেরে ফেলার চেয়ে বড় তোমরা আর কি করতে পার?'

দুটি তামার ক্লিপ পরানো হলো আহমদ হাত্তার পায়ের দুই বুড়ো আঙ্গুলে রিং-এর মত করে। তামার দুই ক্লিপের সাথে বিদ্যুতের তার বাঁধা।

'তা এখনি দেখবেন মি. হাত্তা।' বলল লোকটি।

বাঁধা শেষ করে চাবুকধারী লোকটি একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াল। তার হাতে একটা ক্ষুদ্র সুইচ বোর্ড। সে সুইচ বোর্ড থেকে একটা তার গিয়ে আহমদ হাত্তার দুই বুড়ো আঙ্গুলে যুক্ত হয়েছে। তারের আরেকটা প্রান্ত দেয়ালের সুইচ বোর্ডে।

'স্যার বুঝতে পেরেছেন, কি ঘটতে যাচ্ছে? দেখুন, ঐ লোকটির হাতে সুইচ আছে। সুইচ চাপ দিলেই বিদ্যুৎ প্রবাহ গিয়ে ছোবল হানবে আপনার দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে।' বলল নেতা লোকটি খুবই নিরাশক্ত ভঙ্গিতে ঠান্ডা গলায়।

মুহূর্তের জন্যে চোখ বুজেছিল আহমদ হাত্তা। ধীরে ধীরে চোখ খুলল সে। তার চোখে-মুখে একটা চাঞ্চল্য। বলল, 'তুমিই বলেছ, আরও আগেই আমার মরে যাবার কথা ছিল। সুতরাং মৃত মানুষকে ভয় দেখিয়ে লাভ কি!'

'ঠিক আছে।' বলে নেতা লোকটি তাকাল সুইচ হাতে দাঁড়ানো লোকটার দিকে।

লোকটি মুহূর্তেই এটেনশন হয়ে দাঁড়াল। তার ডান হাতটি উঠে এল আরেকটু সামনে। বুড়ো আঙ্গুল তার চেপে ধরল সুইচ বোর্ডের লাল বোতাম। বোতামটির সামনেই একটা মনিটরিং মিটার-উইনডো। লাল বোতাম চাপ দেবার সাথে সাথেই একটা লাল ইনডিকেটর ডানে ছুটে চলল।

অন্যদিকে লোকটি লাল বোতাম চাপ দেবার সাথে সাথেই আহমদ হাত্তার দেহ লাফ দিয়ে উঠার মত ভয়ানকভাবে কেঁপে উঠল। সেই সাথে বুক ফাটা চিৎকার বেরিয়ে এল আহমদ হাত্তার মুখ থেকে। চোখ দুটি বড় বড় হয়ে চক্ষু কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইল। অসহ্য যন্ত্রণা তাড়িত দেহের প্রবল ঝাঁকুনিতে হাত ও দেহের বাঁধনগুলো আরও কামড়ে ধরল দেহকে।

সুইচ ধরা লোকটির নজর ছিল সুইচ ইনডিকেটরের দিকে। চলমান বৈদ্যুতিক কাঁটাটা লাল ডটলাইন স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গেই সুইচ অফ করে দিল লোকটি। লাল ডটলাইনটা ডেঞ্জার পয়েন্ট। এ পয়েন্ট অতিক্রম করলে মানুষ

মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হয়। আহমদ হাত্তার দেহ থেকে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হতেই চিৎকার থেমে গেল তার। চোখ বুজল সে। দেহটা নেতিয়ে পড়ল চেয়ারের উপর।

'স্যার কেমন লাগল। আমাদের কথায় কি রাজী আছেন? বলবেন কি লোকটার পরিচয়?'

আহমদ হাত্তা কোন কথা বলল না। চোখ খুললও না।

নেতা লোকটার ঠান্ডা চোখ উঠল বিদ্যুতের সুইচ ধরা লোকটির দিকে।

সঙ্গে সঙ্গেই লোকটি তার চোখ ফিরিয়ে নিল হাতের সুইচ বোর্ডটার দিকে তার বুড়ো আঙ্গুল আবার চেপে বসল লাল বোতামটার উপর।

কানফাটা শব্দে আবার কঁকিয়ে উঠল আহমদ হাত্তা। বিস্ফোরিত চোখ দুটির গোলাকার অক্ষিগোলক তার যেন ছিটকে বেরিয়ে পড়বে। চিৎকাররত আহমদ হাত্তার মুখের ভাঁজে ভাঁজে অসহনীয় যন্ত্রণার ছাপ।

এর আগের মতই এক সময় আহমদ হাত্তার দেহ থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলো।

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার থেমে গেল আহমদ হাত্তার এবং এর সাথে সাথেই মাথাটা তার নেতিয়ে পড়ল চেয়ারের উপর। চোখ দুটিও তার বুজে গেছে। কম্পিত শ্বাস-প্রশ্বাসে তার অসীম ক্লান্তি।

হাসল চেয়ারে বসা লোকটি সেদিকে তাকিয়ে। বলল ঠান্ডা কণ্ঠে, ' মাত্র দুই ছোবলেই এতটা ভেঙ্গে পড়েছেন মি. হাত্তা। বিদ্যুতের এই ছোবল চলতেই থাকবে যতক্ষণ আপনি না বলবেন লোকটির পরিচয়। বলুন কি ভাবছেন?'

আহমদ হাত্তার মধ্যে লোকটার কথার কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। তার দেহটা চেয়ারের উপর যেমন নেতিয়ে পড়েছিল, তেমনি পড়ে থাকল। মাথাটা সামান্যও নড়ল না। চোখ দুটিও তার খুলল না।

কয়েক মুহূর্ত জবাবের জন্যে অপেক্ষা করে প্রথম বারের মত অসহিষ্ণু কণ্ঠে গর্জন করে উঠল, 'মি. হাত্তা কথা আপনাকে বলতেই হবে। মরে বাঁচবেন সে পথ আপনার নেই। মরতে চাইলেও আমাদের প্রশ্নের উত্তর আপনাকে দিয়েই তবে মরতে হবে।' থামল লোকটি।

পল পল করে আবার বয়ে চলল সময়।

আহমদ হাত্তার মধ্যে কোনই ভাবান্তর নেই। যেন কোন কিছুই শুনছে না।

লোকটি বলে উঠল, ‘ঠিক আছে, কথা না বললে চিৎকারই আমরা তাহলে শুনি। নির্দেশ দিচ্ছি আবার ছোবল মারার জন্যে।’

লোকটি থামতেই চোখ খুলল আহমদ হাত্তা। কিন্তু মাথাটি তার খাড়া হলো না। বলল ধীরে ধীরে, ‘শোন, ইসলামের নবীকে জীবন্ত করাত দিয়ে চেরা হয়েছে। তোমার দেয়া যন্ত্রণা তার চেয়ে বড় নয়। কিন্তু তাঁদের তুলনায় আমি দুর্বল ব্যক্তি। সহ্য করতে পারছি না এই যন্ত্রণা। কিন্তু যন্ত্রণা যদি তুমি দাও, সহ্য করা ছাড়া আমার কোন উপায় নেই। তাঁর পরিচয় গোনী রাখার যে কথা দিয়েছি, সে কথা ভাঙ্গার চাইতে আমার নিঃশেষ হয়ে যাওয়া অনেক সহজ। সুতরাং অযথা কথা বাড়াচ্ছ কেন?’

জ্বলে উঠল লোকটির চোখ। তাকাল সে সুইচ বোর্ডধারীর দিকে। বলল, ‘শুরু কর ছোবল এবং অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাও। তুমি মাঝে মাঝে থামবে, কিন্তু তাকে স্বাভাবিক নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ দেবে না। তাঁর দেহের নাচন আর চিৎকার যেন স্থির হবার সুযোগ না পায়।’ বলে লোকটা চেয়ার থেকে উঠে ধীর পদক্ষেপে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

নড়ে-চড়ে দাঁড়াল সুইচধারী লোকটি। সুইচ বোর্ডটি এবার সে বাঁ হাতে নিল। ডান হাতের চার আঙ্গুল নিল বাঁ হাতের নিচে এবং ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল ন্যাস্ত করল লাল সুইচটির উপর। দুহাতে সে সুইচ বোর্ডটি চোখের আরও কাছে তুলে নিল।

ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল তার চেপে বসল লাল সুইচটার উপর।

প্রবল ঝাঁকুনি খেল আহমদ হাত্তার দেহ। মুখ ফেটে তাঁর বেরিয়ে এল আবার সেই আর্ত চিৎকার, অসহ্য যন্ত্রণায় অসহায় বুক ফাটা চিৎকার।

বাড়ির নেম প্লেটের উপর নজর পড়তেই খুশি হয়ে উঠল আহমদ মুসার মন। কাঠের প্লেটের সাদা অক্ষরে লেখা- '১৩১ ক্যানাল স্ট্রীট'। এই ঠিকানাই লেখা আছে লন্ড্রির স্লিপে।

বাড়িটা ক্যানাল স্ট্রীটের পশ্চিম পাশের শেষ বাড়ি। তার পরেই একটি খাল। খালটি গিয়ে পড়েছে সুরিনাম নদীতে।

রাস্তার শেষ প্রান্ত হওয়ার কারণে গাড়ি-ঘোড়া নেই বললেই চলে। অনেকটাই নির্জন-নিরিবিলি পরিবেশ। দুষ্কৃতকারীদের অবস্থানের জন্য এ ধরণের স্থান খুবই লোভনীয়।

কিন্তু আহমদ মুসা নেম প্লেটের উপরে দ্বিতীয়বার চোখ বুলাতে গিয়ে দমে গেল। প্লেটের ঠিকানার উপরে নামের জায়গায় লেখা রয়েছে 'সিভিল ডিফেন্স-৩'। তার মানে এটা সিভিল ডিফেন্সের তিন নম্বর অফিস, ভাবল আহমদ মুসা।

তাহলে কি লন্ড্রির স্লিপে ভুল ঠিকানা লেখা হয়েছে? ধাঁধায় পড়ে গেল আহমদ মুসা।

হতাশ ভঙ্গিতে আহমদ মুসা তাকাল বাড়িটার দিকে।

প্রাচীর ঘেরা বাড়ি।

নিচু প্রাচীর।

স্টিলের গেট। গেট বন্ধ।

প্রাচীরের উপর দিয়ে বাড়ির গোটা অবয়ব দেখা যাচ্ছে। তিন তলা বাড়ি।

প্রাচীরের পর ছোট ঘাসে ঢাকা একটা চত্বর। চত্বরের পর তিন ধাপের সিঁড়ি ডিঙিয়ে বারান্দায় উঠা যায়। তারপর সোজা এগুলেই বাড়ির ভেতরে ঢোকার দরজা। দরজা বন্ধ। বাড়ির এদিকের কোন জানালা খোলা নেই।

এটা সিভিল ডিফেন্সের কোন অফিস, না বাসা? ভেতরে গিয়ে খোঁজ নেয়া যায়। পরক্ষণেই আবার ভাবল আহমদ মুসা, লন্ড্রির স্লিপের ঠিকানা ঠিকও হতে পারে। লোকটি সিভিল ডিফেন্স অফিস কিংবা বাসাতেও তো থাকতে পারে! শেষের এ চিন্তাকেই আহমদ মুসা সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প বলে ধরে নিল।

চারদিকে তাকালো। জন মানুষের চিহ্ন কোথাও নেই। আবার বাড়ির দিকে তাকাল আহমদ মুসা। চারদিকের মত বাড়িটাও নিরব। কোন মানুষ দেখা যাচ্ছে না, কোন শব্দও আসছে না।

ভেতরে ঢুকবে কি আহমদ মুসা।

মনে পড়ল আহমদ হাত্তার কথা। তাকে উদ্ধারের একটাই মাত্র ক্লু তার হাতে। সেটা হলো এই ঠিকানা। সুতরাং এই ঠিকানার সূত্র ধরে আগানো ছাড়া কোন বিকল্প তার কাছে নেই।

আহমদ মুসা প্রাচীরের পাশ থেকে সরে এসে এগুলো গেটের দিকে।

গেটে তালা নেই। হুক দিয়ে গেট বন্ধ। খুশি হলো আহমদ মুসা। বাড়ি বা অফিসটিতে নিশ্চয় মানুষ আছে। না থাকলে গেটে তালা দেয়া থাকত। গেটে তালাটি ঝুলছে।

হুক খুলে আহমদ মুসা প্রবেশ করল ভেতরের চত্বরে।

এগুলো বারান্দার দিকে। বারান্দায় উঠে দরজায় নক করবে সে? নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করল আহমদ মুসা। অফিস বাঁ বাসার নিশ্চয় কেউ বেরিয়ে আসবে। কিন্তু বাসায় যদি ট্রিজিল্লোরা থাকে, তাহলে তো জিজ্ঞেস করলে হিতে বিপরীত ঘটবে।

তাহলে কি করবে সে?

অন্য কোনভাবে বাড়িতে ঢুকতে চেষ্টা করবে? তাতে চোর হিসেবে ধরা পড়ার সম্ভাবনা আছে।

সেটাই বরং ভালো। সে অবস্থায় মোকাবিলা করা যাবে।

পরক্ষণেই আবার ভাবল আহমদ মুসা, যদি এটা নিছকই একটি সিভিল ডিফেন্স অফিস হয়, তাহলে এখানে এভাবে ঢোকা বিব্রতকর হবে। ট্রিজিল্লোরা এখানেই থাকে এটা নিশ্চিত না হয়ে ঢোকা উচিত হবে না।

তাহলে?

আবার প্রথম চিন্তাতেই ফিরে এল আহমদ মুসা। গেটে নক করেই সে ঢুকবে। ট্রিজিল্লো যদি দরজা খোলে, তাহলে বুঝা-পড়া সেখানেই শুরু হয়ে যাবে।

ট্রিজিল্লো দরজা না খুললে যে খুলবে তাকে ট্রিজিল্লো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে হবে। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেয়া যাবে।

বিসমিল্লাহ বলে আহমদ মুসা উঠলো বারান্দায়। এগুলো দরজার দিকে।

বারান্দা পাকা। লাল রং-এর। দরজা সামনে বেশ ধুলা। ধুলায় একাধিক মানুষের পায়ের এবড়ো থেবড়ো চিহ্ন। ভাবল আহমদ মুসা, তার মানে ভেতরে লোক আছে।

দ্বিধাহীনভাবে দরজায় নক করলো আহমদ মুসা। থেমে থেমে তিনবার দরজায় নক করলো সে। তৃতীয় বার নক করার পর ঘরের ভেতরে পায়ের শব্দ পেল আহমদ মুসা।

কয়েক মুহূর্ত। দরজা খুলে গেল।। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একজন যুবক। পরনে জিন্সের প্যান্ট। গায়ে টি সার্ট, ইন করা কোমরে চওড়া বেল্ট। দুই বাহু পেশীবহুল। পেট, মুখ কোথাও বাড়তি মেদ নেই। চোখে-মুখে উত্তেজনা। নতুন করে বিরক্তির ভাব ফুটে উঠেছে তাতে। এই মাত্র কোথাও মারামারি করে এল, অনেকটা এই রকম ভাব। তবে এটা পরিষ্কার যে, আহমদ মুসাকে সে অনাকাঙ্ক্ষিত অতিথি হিসেবে নিয়েছে।

আহমদ মুসার পরনে শিখের পোশাক নেই। শিখের সেই দাঁড়িও নেই। পোশাকে-আষাকে এক নিরীহ ভদ্রলোকের চেহারা আহমদ মুসার।

'কি চাই আপনার?' বিরক্তির সাথে জিজ্ঞেস করল লোকটি।

'আমি ট্রিজিল্লোর কাছে এসেছি।'

আহমদ মুসা এমন নিশ্চিত কণ্ঠে কথাটা বলল যেন সে জানে ট্রিজিল্লো এখানে আছে।

লোকটির চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

তাতে সন্ধানি দৃষ্টি। বলল, 'কে আপনি?'

প্রশ্নটা শুনে খুব খুশি হলো আহমদ মুসা। বুঝল সে, ট্রিজিল্লো এখানে না থাকলে এমন প্রশ্ন লোকটি করত না। বলল, 'ট্রিজিল্লোকে ডাকুন। সে আমাকে চেনে। সেই আসতে বলেছে আমাকে।'

লোকটির চোখে-মুখে বিস্ময়। তারপর সেখানে প্রবল অবিশ্বাসের চিহ্ন ফুটে উঠল। পরে তার ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল এক টুকরো বাঁকা হাসি। সে হাসির মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ছাপ আছে।

'ট্রিজিল্লোর সাথে দেখা করবেন, তাহলে ভেতরে আসুন।'

বলে লোকটি একপাশে সরে দাঁড়াল এবং আহমদ মুসাকে ভেতরে ঢোকার জায়গা করে দিল।

লোকটির চোখ-মুখের অবিশ্বাস ও তার ঠোঁটের সূক্ষ্ম হাসিটা আহমদ মুসার নজর এড়ায়নি।

কিন্তু গোবেচারা লোকের মতই আহমদ মুসা ঘরে ঢুকল। সাথে সাথেই লোকটি বন্ধ করে দিল দরজা। দরজা বন্ধ করেই লোকটি পকেট থেকে রিভলবার বের করে তেড়ে এল আহমদ মুসার দিকে। রিভলবারটি সে আহমদ মুসার মাথায় তাক করে বলল, 'তুমি নিশ্চয় সরকারের গোয়েন্দা কিংবা আহমদ হাত্তার লোক। কিন্তু এই ঠিকানা পেলে কি করে?'

আহমদ মুসা মুখে বিস্ময় ও ভয়ের ভাব ফুটিয়ে তুলে বলল, 'এসব কি বলছেন! আমি তো ট্রিজিল্লোর সাথে দেখা করতে এসেছি।'

'ভনিতা ছাড়। 'কিনিক কোবরা'র লোকরা নিজের পিতা-মাতা, স্ত্রীকেও বিশ্বাস করে না, তারা কাউকেই ঠিকানা জানায় না। আর তোমাকে.........।'

লোকটি কথা শেষ করতে পারল না। আহমদ মুসার ডান পা বুলেটের গতিতে গিয়ে লোকটির পায়ের গোড়ালীর উপরের স্থানটায় আঘাত করল। লোকটির বাম পা ছিটকে গেল পেছন দিকে এবং গোড়া কাটা গাছের মত লোকটি আহমদ মুসার বাঁ পাশ দিয়ে আছড়ে পড়ে গেল। মেঝের উপর।

লোকটি মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল মাটির উপরে। রিভলভার ধরা ডান বাহুটা তার বুকের তলে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার রিভলবার সমেত ডান হাতটা বাইরে বেরিয়ে ছিল।

আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়িয়ে বাম পা দিয়ে লোকটির কব্জি চেপে ধরল এবং বাঁ হাত দিয়ে কেড়ে নিল রিভলবার।

কিন্তু এই সময়েই লোকটি আকস্মিকভাবে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সাথে তার দেহটাকে ডান দিকে মোচড় দিয়ে দেহের সবটুকু ভার ছুড়ে দিল আহমদ মুসার পা লক্ষ্যে।

আহমদ মুসা দেহের ভারসাম্য হারিয়ে লোকটির দেহের উপর দিয়ে কাত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। পড়ে গিয়েও আহমদ মুসা তার হাতের রিভলবার ছাড়েনি।

লোকটি মোচড় দেয়ায় তার দেহটি চিৎ হয়ে পড়েছিল এবং আহমদ মুসা পড়ে যাওয়ায় লোকটি তৈরি হওয়ার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল। লোকটি উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল আহমদ মুসার উপর। আহমদ মুসা তার রিভলবার রেডি করে নিয়েছিল এবং ইচ্ছে করলে লোকটির মাথা উড়িয়ে দিতে পারতো। কিন্তু আহমদ মুসা এখনি রিভলবার ব্যবহার করে অন্যদের এ্যালার্ট করতে চায় না। সুতরাং অন্য পথ বেছে নিল আহমদ মুসা।

একজন দক্ষ এ্যাক্রব্যাটের মত আহমদ মুসা তার পা দুটি আকাশের দিকে ছুড়ে দিল এবং তার দেহ অর্ধচন্দ্রাকারে ঘুরে মাটিতে গিয়ে পড়ল। আহমদ মুসার দেহের প্রবল ধাক্কা লোকটির দেহকেও ছিটকে দিয়েছিল। দুই দেহ যখন ছিটকে মাটিতে পড়ল, তখন আহমদ মুসা লোকটির বুকের উপর। রিভলবার তখনও আহমদ মুসার হাতে।

আহমদ মুসা রিভলবারটা লোকটার কপালে চেপে ধরে বলল, ‘একেবারে চুপ, সামান্য বেয়াদবি করলে মাথা গুড়ো করে দেব। মনে রেখ এক কথা আমি দু’বার বলি না। বল আহমদ হাত্তাকে তোমরা কোথায় রেখেছ?’

লোকটি একটুও ভয় পেল না। বলল ক্রুদ্ধ কণ্ঠে, ‘তুমি আমাকে মেরে ফেলতে পার, কিন্তু ‘কিনিক কোবরা’র ছোবল থেকে দুনিয়ার কেউ তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না। আহমদ হাত্তার খোঁজ করে লাভ নেই, কিনিক কোবরা’র হাতে পড়লে আর কেউ বাঁচে না।’

লোকটার কথা বাগাড়ম্বর নয়। তা বিশ্বাস করল আহমদ মুসা। তার মনে পড়ে গেল ব্রুকোপনডো রোডে ওদের একজন ধরা পড়া এড়াতে গিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। আহমদ মুসার নজরে পড়েছে এরও হাতে সেই সাইনায়েড রিং।

এই সিদ্ধান্তের সাথে সাথেই আহমদ মুসার রিভলবার ধরা হাতটি ওপরে উঠল এবং বিদ্যুৎবেগে গিয়ে আঘাত করল লোকটার কানের উপরের নরম জায়গায়টায়।

আহমদ মুসার মুঠো থেকে বেরিয়ে থাকা রিভলবারের ভোতা মাথা ভয়ংকর হাতুড়ির কাজ করল। মুহূর্তেই লোকটি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। চারদিকে তাকিয়ে দেখল সে একটা করিডোরে দাঁড়িয়ে। করিডোরটা বাড়িতে ঢোকা ও বেরুনোর প্যাসেজে। প্যাসেজটির দু'পাশে দেয়াল। দেয়ালে একটি করে দরজা। দরজা দুটির একটি বন্ধ, অন্যটি খোলা।

আহমদ মুসা দ্রুত সংজ্ঞাহীন লোকটাকে টেনে নিয়ে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

ঘরটি বেশ বড়।

তারপর সংজ্ঞাহীন লোকটাকে টেনে পাশের ঘরের দরজার পাশে অপেক্ষাকৃত অন্ধকার কোণটায় রাখল।

লোকটিকে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই ঘরের দরজার বরাবর বিপরীত দিকের দেয়ালে একটা স্টিকার দেখতে পেল। তাতে লেখাঃ আপনার প্রয়োজন রিসেপশনিস্টকে বলুন এবং অপেক্ষা করুন।

আহমদ মুসা দেখল ঘরটি সিভিল ডিফেন্স অফিসের অভ্যর্থনা কক্ষ। কিন্তু চেয়ার-টেবিল কোথায়? কোন আসবাবপত্র নেই কেন?

মনের কোণে একটা চিন্তা ঝিলিক দিয়ে উঠল আহমদ মুসার। তাহলে কি সিভিল ডিফেন্স অফিস এখান থেকে উঠে গেছে? বাড়িটা ছেড়ে দিয়েছে তারা? বাড়িটা অন্য কেউ ভাড়া নিয়েছে? কিন্তু গেটের সাইনবোর্ডটা বদলায়নি কেন? ভুল হতে পারে। পরক্ষণেই আবার ভাবল আহমদ মুসা, এটা ক্যামোফ্লেজও হতে পারে। কি বলল লোকটা?

'কিনিক কোবরা'? তাহলে ওদের দলের নাম ওটা, ভাবল আহমদ মুসা। নামই বলছে সাংঘাতিক এক মাফিয়া চক্র এটা। 'কিনিক কোবরা'ই তাহলে

বাড়িটা ভাড়া নিয়েছে। ক্যামোফ্লেজ হিসেবে ব্যবহার করছে সিভিল ডিফেন্স অফিসের সাইনবোর্ডটাকে।

দরজার দিকে এগুলো আহমদ মুসা। দরজা দিয়ে মুখ বাড়াতেই একজনের মুখোমুখি হয়ে গেল সে। এ লোকটির পরনেও জিন্সের প্যান্ট। তবে গায়ে হাফ জ্যাকেট। এ লোকটিও আগের লোকটির মতই পেশীবহুল, পেটা শরীর। পায়ে তার কেটস। মনে হচ্ছে যেন সে মারামারি করতে বেরিয়েছে।

এই মুখোমুখি হওয়াটা আহমদ মুসার কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল, তেমনি লোকটিও ভূত দেখার মত চমকে উঠেছিল আহমদ মুসাকে দেখে।

কিন্তু তা মুহূর্তের জন্যেই। মুহূর্তেই বিমর্ষ ভাব উবে গিয়ে জ্বলে উঠল তার চোখ-মুখ। নেকড়ের মত সে ঝাঁপিয়ে পড়ল আহমদ মুসার উপর।

আহমদ মুসা এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না। এই অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতা তার কাছ থেকে আহমদ মুসা কল্পনাও করেনি। বিস্মিত হলো আহমদ মুসা, অকল্পনীয়ভাবে শত্রুর মুখোমুখি হবার চরম বিমূঢ় ভাব কাটিয়ে কেউ এত দ্রুত আক্রমণে যেতে পারে! এই শত্রুর ব্যাপারে তার অবমূল্যায়ন হয়েছে।

এসব চিন্তা নিয়েই আহমদ মুসাকে ভূমি শয্যা নিতে হলো। আত্মরক্ষার কোনই সুযোগ নিতে পারল না সে। লোকটি তার বুকের উপর চেপে দু'হাত দিয়ে শাঁড়াসির মত টিপে ধরেছে তার গলা।

ঝিম ঝিম করে উঠল আহমদ মুসার মাথা। বুঝতে পারল সে, মাথায় অক্সিজেন সাপ্লাই হচ্ছে না। তার মানে শ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে তার।

দুই হাত দিয়ে গলা থেকে লোকটির দু'হাত খুলে ফেলার মত যথেষ্ট শক্তি সে হাত দুটিতে পাচ্ছে না।

আবার বেকায়দা অবস্থার জন্যে দু'হাত দিয়ে তার গলা টিপে ধরার সুযোগও সে করতে পারছে না।

পা দুটি তার মুক্ত আছে।

পা দুটি উপরে ছুঁড়ে লোকটিকে বুক থেকে ছিটকে ফেলার দু'একবার চেষ্টা করল, কিন্তু লোকটিকে বুক থেকে নড়ানো গেল না।

নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ায় বুকে চাপ বাড়ছে আহমদ মুসার। অসহনীয় অবস্থার দিকে যাচ্ছে সে।

মরিয়া হয়ে আহমদ মুসা হাঁটু ভাঁজ করে দু'পা মাটির উপর খুঁটির মত দাঁড় করিয়ে সমস্ত শক্তি দু'পায়ের উপর কেন্দ্রীভূত করে প্রবল এক ঝাঁকুনি দিয়ে কোমরটাকে উপরে ছুঁড়ে দিল।

এতে কাজ হলো।

লোকটা নড়ে উঠল। কিছুটা ছিটকে সে সামনের দিকে সরে এসেছিল।

আহমদ মুসার পা দুটি এবার এর সুযোগ গ্রহণ করাল। পা দুটি তার ছিটকে উঠে দেহটাকে উল্টে দিয়ে পিছনে গিয়ে পড়ল।

লোকটির হাত দুটি খসে গেল গলা থেকে। পাশেই গড়িয়ে পড়ল লোকটি।

বুক ভরে শ্বাস নিয়ে স্প্রিং এর মত উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

লোকটিও উঠে দাঁড়িয়েছে।

জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকাচ্ছিল সে।

আহমদ মুসা তার ডান পা'টা তীব্র গতিতে ছুঁড়ে দিল লোকটির ডান পা লক্ষ্যে।

লোকটি বাঁ দিকে কাত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে, অনেকটা আহমদ মুসার দিকে মুখ করে।

আহমদ মুসার ডান পা ততক্ষণে আবার প্রস্তুত হয়েছে। এবার ডান পায়ের লাথি চালাল সে লোকটির তলপেট লক্ষ্যে।

কুঁকড়ে গেল লোকটির দেহ। তার কুঁকড়ে যাওয়া দেহের উন্মুক্ত ঘাড়ের উপর কানের পাশ লক্ষ্যে আরও একটা কারাত চালাল আহমদ মুসা।

সংজ্ঞা হারাল লোকটি।

এ লোকটিকে আগের লোকটির পাশে টেনে এনে তাদের জামা ছিড়ে পিছমোড়া করে তাদের হাত-পা বেঁধে ফেলল। কিছুটা মুখে পুরে চিৎকারের পথ বন্ধ করে রাখল।

ঘর থেকে বেরিয়ে এল আহমদ মুসা।

রিভলবার সমেত হাত পকেটে পুরে এগুলো সামনে। করিডোরটি শেষ হয়েছে বিশাল লেগাকার লাউঞ্জে। লাউঞ্জটি ফাঁকা। এটি সম্ভবত সম্মেলন, সমাবেশসহ নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। লাউঞ্জটির চারদিক ঘিরে ঘরের সারি। থামের লেগাকার সারি রয়েছে হল ঘরটির চারদিক ঘিরে।

কোন দিকে যাবে আহমদ মুসা? সন্দেহ নেই এখানেই বন্দী রয়েছে আহমদ হাত্তা। কিন্তু কোথায়? উপরের দুটি ফ্লোরের কোথাও?

উপরে উঠার সিঁড়ি কোথায়?

এ সময় একটা নারী কণ্ঠ ভেসে এল আহমদ মুসার কানেঃ 'ক্রিস্টিনা আসছ না কেন? এস। আমি যাচ্ছি।'

নারী কণ্ঠটি উপর থেকে নিচে নেমে আসার মত শোনাল।

আহমদ মুসা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার বিপরীত দিকে অর্থাৎ লাউঞ্জটির পশ্চিম দিকের ঘর থেকে এই কণ্ঠ ভেসে এল। তার মানে ওখানেই কোথাও উপরে ওঠার সিঁড়ি।

কিন্তু ব্যাপারটা বিদঘুটে লাগল আহমদ মুসার কাছে। অফিসের প্রবেশ পথ থেকে অত দূরে উপরে উঠার সিঁড়ি হতে পারে না।

আবার ভাবল আহমদ মুসা, এদিকেও আরেকটা সিঁড়ি থাকতে পারে। হয়তো সিঁড়ি ঘরে দরজা বন্ধ থাকার জন্যে তার চোখে পড়ছে না।

যে নারী কণ্ঠটি কথা বলল, সে কি বেরিয়ে আসছে? তাহলে তো এখনি লাউঞ্জে বেরিয়ে পড়বে।

একটা থামের আড়ালে লুকালো আহমদ মুসা। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। না, কেউ বেরিয়ে এল না।

মেয়েটি তাহলে গেল কোথায়?

চিন্তায় পড়ে গেল আহমদ মুসা।

থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে আহমদ মুসা বন্ধ দরজারগুলোর সামনে দিয়ে ধীরে ধীরে এগুলো পশ্চিম দিকে। সহজে কারো চোখে পড়ে যেতে না হয় এজন্যে সে লাউঞ্জের মধ্যে দিয়ে সোজা যাওয়ার পথ পরিহার করেছে।

যে দরজার দিক থেকে নারী কণ্ঠের আওয়াজ সে পেয়েছিল, সে দরজার সামনে গিয়ে সে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা আনন্দিত হলো যে, দরজাটা অন্যান্য দরজা থেকে চওড়া। তার মানে এটা সিঁড়ি ঘরের দরজা হবারই কথা।

আস্তে করে দরজায় চাপ দিল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসাকে বিস্মিত করে দিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এক ঝটকায় দরজা খুলে গেল।

আহমদ মুসা দেখল, কোন নারীর বদলে তার সামনে একজন যুবক। তার হাতে রিভলবার। তার রিভলবারের নল আহমদ মুসার নাক বরাবর তোলা।

এ যুবকটির পরনেও সেই জিন্সের প্যান্ট। তবে গায়ে গোল গলার হাতাওয়ালা পুরু গেঞ্জি।

ফাঁক হওয়া দরজা আকস্মিকভাবে খুলে যেতে দেখেই কি ঘটতে যাচ্ছে আহমদ মুসা বুঝতে পেরেছিল। যে কোন পরিস্থিতির জন্যে সে প্রস্তুত হয়েছিল।

তার নাক বরাবর উদ্যত রিভলবার দেখে বিন্দুমাত্র চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটেনি আহমদ মুসার। সে জানে এই পরিস্থিতিতে তার পরিচয় না জেনে কিংবা কথা না বলে গুলী করবে না লোকটি। এরই সুযোগ গ্রহণ করল আহমদ মুসা।

দরজা খুলে যাওয়া এবং রিভলবারের নল তার দিকে তাক করা এটা দেখার সাথে সাথে আহমদ মুসার মাথা তড়িত গতিতে নিচু হলো এবং পা দুটি তার ছুটল সামনে। মনে হবে আহমদ মুসা অবস্থার আকস্মিকতায় ভয়ে ভীমরি খেয়ে চিৎপটাং হয়েছে। হয়তো যুবকটিও তাই মনে করেছিল। দেখা গেল তার রিভলবারের নল কয়েক মুহূর্ত পর্যন্ত স্থির ছিল।

কিন্তু যখন বিপদ আঁচ করতে পারল, আহমদ মুসার তীরের মত ছুটে যাওয়া পা দুটি তখন তার দুই পায়ে তীব্র গতিতে আঘাত করেছে। সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

যুবকটি পড়ে যেতেই আহমদ মুসা পাশ ফিরে উঠে বসল এবং ডান হাতের কুনই দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত হানল লোকটির ঘাড়ে। তার হাত থেকে কেড়ে

নিল রিভলবার। রিভলবারের বাঁট দিয়ে আরেকটা প্রচণ্ড আঘাত করল যুবকটির মাথায়।

ঘাড়ের আঘাতেই যুবকটি নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। মাথায় ঘা খেয়ে সে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল।

যুবকটিকে আহমদ মুসা টেনে নিয়ে গেল সিঁড়ির নিচে। সেখানে একটা প্যাকিং বাক্সের সাথে প্লাস্টিক কর্ড পেল। যুবকটির পা সহ হাত পিছ মোড়া করে বাঁধল এবং গায়ের গেঞ্জি ছিঁড়ে তার মুখে ঢুকিয়ে দিল।

উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা। আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করল সে। এখনও রিভলবার ব্যবহার করতে হয়নি, নিরবেই তিন জনকে নিস্ক্রিয় করা গেছে।

সিঁড়ির গোড়ায় এসে আহমদ মুসা উপর দিকে তাকাল। এ সময় আহমদ মুসার আবার মনে পড়ল নারী কণ্ঠের কথা। আহমদ মুসার নিশ্চিত বিশ্বাস মেয়েটি দু'তলা থেকে নামতে নামতে কথা বলেছে।

কিন্তু এক তলায় নেমে 'আমি যাচ্ছি' বলে মেয়েটি গেল কোথায়? সিঁড়ি ঘর থেকে না বেরিয়ে নিচ তলার আর কোন ঘরে যাবার তার উপায় নেই।

হঠাৎ আহমদ মুসার নজরে পড়ল অস্বাভাবিক অবস্থানে একটা দরজা।

দু'তলা থেকে আসা সিঁড়ির দেয়াল ল্যান্ডিং-এর বাউন্ডারী ওয়াল হয়ে ঘরের দেয়ালের সাথে গিয়ে মেশার কথা। সিঁড়িঘরের গঠনও এই কথাই বলে। কিন্তু এখানে একতলার ল্যান্ডিংটা ডানদিকে প্রায় ৪ ফুট পরিমাণ বেড়ে গেছে। এই বাড়তি ল্যান্ডিং-এর মুখোমুখি সিঁড়ির দেয়ালের সাথে লাগানো একটা দরজা। এই বিদঘুটে দরজার অর্থ খুঁজে পেল না আহমদ মুসা।

দরজার দিকে এগুলো সে।

দরজার দুই পাল্লায় টানা বা ঠেলার হাতল। দরজার একটা পাল্লায় চাবি প্রবেশ করানোর ছিদ্র দেখে বুঝা যাচ্ছে দরজায় বডিলক।

আহমদ মুসা দুই দরজার দুই হুক হাত দিয়ে ধরে টান দিল। সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল দরজা।

খোলা দরজা দিয়ে সামনে তাকিয়ে বিস্ময়ে হা হয়ে গেল তার মুখ। দেখল, দরজার পর ছোট্ট একটা স্ট্যান্ডিং। তারপর নিচের দিকে একটা সিঁড়ি নেমে গেছে।

বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেলে আনন্দে ভরে গেল আহমদ মুসার মন। এই সিঁড়ির অর্থ নিচে আন্ডার গ্রাউন্ড ফ্লোর রয়েছে এবং নিঃসন্দেহ যে, এই বিল্ডিং-এ যদি আহমদ হাত্তা বন্দী থাকে, তাহলে এই আন্ডার ফ্লোরেই রয়েছে। আর 'আমি যাচ্ছি' বলে মেয়েটি কোথায় গেছে, তাও এই সিঁড়িটাই বলে দিচ্ছে।

মেয়েটির ব্যাপারে আরেকটা প্রশ্নের সে সমাধান পাচ্ছে না। 'কিনিক কোবরা'র কথা মাফিয়ারা তাদের পিতা, মাতা, স্ত্রীকেও বলে না, তাদের ঘাঁটি দেখায় না। তাহলে এই মেয়েটা এখানে এল কোত্থেকে। মেয়াটাও কি তাহলে একজন মাফিয়া সদস্য।

আহমদ মুসা দরজা পার হয়ে সিঁড়ির স্ট্যান্ডিং-এ গিয়ে দাঁড়াল এবং সিঁড়ি মুখের দরজাটা বন্ধ করে দিল।

সিঁড়ির দরজা বন্ধ করতেই সিঁড়িতে আলো জ্বলে উঠল। সিঁড়ির আল-অন্ধকার তাহলে সিঁড়ির দরজা খোলা বন্ধ করার সাথে সম্পর্কিত বুঝল আহমদ মুসা।

সিঁড়ির দরজা কি সিঁড়ির আলোর সাথেই শুধু সম্পর্কিত? কোন এলার্ম এর সাথে সম্পর্কিত থাকতে পারে না? থাকতে পারাটাই স্বাভাবিক। যদি তাই থাকে, তাহলে এখিনি কেউ ছুটে আসবে।

আহমদ মুসা দুই পকেট থেকে দুই রিভলবার দু'হাতে তুলে নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

পল পল করে সময় বয়ে চলল।

দু'মিনিট পার হয়ে গেল কেউ এল না।

আহমদ মুসা নিশ্চিন্ত হলো যে, এলার্ম বেল নেই। তারপর দরজা খুলে রাখল। সিঁড়ি অন্ধকার হলে ক্ষতি নেই। অন্ধকারই তার প্রয়োজন। দরজা খোলা রেখেই অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে অতি সন্তর্পণে নামা শুরু করল।

সিঁড়ির অর্ধেকটা নামতেই চিৎকারের শব্দ তার কানে এল।

উৎকর্ণ হলো আহমদ মুসা। মনে হচ্ছে চিৎকারটি আহমদ হাত্তার।

সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নামতে লাগল আহমদ মুসা। যখন সিঁড়ির গোড়ায় নামল, তখন চিৎকারটা বন্ধ হয়ে গেল।

চিৎকারটা কোন দিক থেকে এসেছিল, তা ঠিক করার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না।

সিঁড়ি থেকে যেখানে নামল সেটাও একটা লাউঞ্জের মত। সম্ভবত এই আন্ডার গ্রাউন্ড ফ্লোর বিপদকালীন আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে তৈরি হয়েছিল, অনুমান করল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা চারদিকে তাকাল। দেখল, লাউঞ্জ থেকে অনেকগুলো করিডোর বিভিন্ন দিকে চলে গেছে। দেখে আহমদ মুসার মনে হলো আন্ডার গ্রাউন্ড ফ্লোরে অনেক কক্ষ রয়েছে।

এক মিনিটও হয়নি আবার শুরু হলো সেই চিৎকার।

আহমদ মুসা তখনও সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে। এবার আহমদ মুসা নিশ্চিত হলো, বাঁ দিকের কোন ঘর থেকে আহমদ হাত্তার এই চিৎকার আসছে।

আহমদ মুসা ছুটল সেদিকে।

লাউঞ্জ থেকে করিডোরে প্রবেশ করল আহমদ মুসা। শিকারের পেছনে ধাওয়া করা নেকড়ের মত নিঃশব্দে ছুটছে সে। অনেক ঘর, আড়াআড়ি অনেক করিডোর পার হলো সে। অবশেষে একটা দরজায় এসে করিডোরটা শেষ হলো। এই ঘর থেকেই চিৎকারের শব্দ আসছে।

আহমদ হাত্তাকে নির্যাতন করছে, এটা সে বুঝতে পারছে। কি নির্যাতন করা হচ্ছে তাকে? এমন বুক ফাটা চিৎকার করছে কেন?

করিডোরের শেষ প্রান্তে ঘরটির দরজায় এসে যখন সে পৌঁছেছে, তখন আবার চিৎকার থেমে গেল।

আহমদ মুসাও একটু থমকে দাঁড়াল দরজায়। আন্ডার গ্রাউন্ডে নামার পর কোন বাধা সে এখনও পায়নি। আন্ডার গ্রাউন্ডের প্রবেশ পথ ও হল ঘর এলাকায় কোন প্রহরী তারা রাখেনি। বুঝা যাচ্ছে বাইরে তিনজনকে পাহারায়

রেখেই তারা নিশ্চিত হয়েছে। তবে ঘরের ভেতর নিশ্চয় লোক আছে। সুতরাং ঢুকতে হলে হিসেব করেই ঢুকতে হবে।

আবার চিৎকার শুরু হলো আহমদ হাত্তার।

চঞ্চল হয়ে উঠল আহমদ মুসা।

হিসেব করার সময় নেই।

আহমদ মুসা দুই হাতে দুই রিভলবার নিয়ে ডান হাতের রিভলবারের নল দিয়েই দরজা ঠেলা দিল।

দরজা খুলে গেল। বেশ বড় একটা হল ঘর।

বাঁধা অবস্থায় একটা চেয়ারে বসে আছে আহমদ হাত্তা। দেখেই বুঝল আহমদ মুসা, আহমদ হাত্তাকে ইলেকট্রিক শক দেয়া হচ্ছে।

আহমদ হাত্তার একটু দূরে একজন লোককে দেখতে পেল আহমদ মুসা। তার দুই হাতের মুঠো থেকে দুটি বৈদ্যুতিক তার বেরিয়ে আসা দেখেই বুঝল তার হাতে বৈদ্যুতিক সুইচ। জ্বলে উঠল আহমদ মুসার শরীর। চিন্তা করার জন্যে আর অপেক্ষা সে করতে পারল না। গর্জে উঠল তার ডান হাতের রিভলবার। গুলী গিয়ে বিদ্ধ করল সুইচ ধরা লোকটার দুই হাতকে এক সাথে।

লোকটিও আহমদ মুসাকে দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু কিছু ভাবার আগেই মুঠোবদ্ধ দুই হাতে গুলী খেয়ে আর্তনাদ করে বসে পড়ল।

আহমদ হাত্তার চেয়ারের সাথে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। চিৎকার বন্ধ হয়ে গেছে আহমদ হাত্তার।

আহমদ মুসা ছুটল আহমদ হাত্তার কাছে।

ভীষণ ক্লান্তিতে আহমদ হাত্তা ধুঁকছিল। তার দুই চোখ বন্ধ।

'মি. হাত্তা আমি এসেছি। আর ভয় নেই।' এই কথাগুলো বলতে বলতে আহমদ মুসা ডান হাতের রিভলবার পকেটে পুরে বাম হাতের রিভলবারকে পাহারায় রেখে ডান হাতে আহমদ হাত্তার বাঁধন খুলছিল।

আহমদ মুসার কথা শুনে চোখ খুলল আহমদ হাত্তা। বলল, 'আমি জানতাম আল্লাহ আপনাকে পাঠাবেন। তাই ওদের শত নিপীড়ন সত্ত্বেও ওদের

কাছে নতি স্বীকার করিনি। ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করছিলাম। আল হামদুলিল্লাহ। আল্লাহরই সব প্রশংসা।’

‘আপনাকে মেরে ফেলা বা বন্দী রাখার কথা নির্বাচন পর্যন্ত, নির্যাতন করবে কেন!’ বাঁধন খুলতে খুলতেই বলল আহমদ মুসা।

‘ওরা আমাকে নির্যাতন করছিল আপনার পরিচয় জানার জন্যে। আপনার পরিচয় জানা পর্যন্ত ওরা আমার হত্যা স্থগিত রেখেছিল এবং মৃত্যুর চেয়েও ভয়াবহ যন্ত্রণা দিচ্ছিল আমার মুখ খোলার জন্যে। ওদের আসল নেতা লোকটা এখন নেই। চলে গেল এই মিনিট খানেক আগে। একেবারে ঠান্ডা মাথার লোকটা।’ বলল আহমদ হাত্তা।

বাঁধন খোলা হয়ে গেছে আহমদ হাত্তার। ঠিক এই সময় ঘরের দুই প্রান্তের দুই দরজা দিয়ে গুলী করতে করতে দুই গ্রুপকে আসতে দেখল আহমদ মুসা। আহমদ হাত্তাকে চেয়ার সমেত ধাক্কা দিয়ে ওদিকে ফেলে দিয়ে নিজে শুয়ে পড়ল এবং সেই সাথে শোল্ডার হোলস্টার থেকে এম-১০ বের করে নিল। শুয়ে থেকেই আহমদ মুসা গুলী করতে লাগল একবার এ দরজায়, আরেকবার ওই দরজায়। যারা গুলী করতে করতে আসছিল তারা দরজার আড়ালে পিছিয়ে গেছে। আড়াল থেকেই দু’একটা গুলী করছে।

এ সময় দরজার দিক থেকেই দুটি বোমা এসে সশব্দে বিস্ফোরিত হলো ঘরের মাঝখানে।

মুহূর্তে কাল অন্ধকারে ঢেকে গেল গোটা ঘর। আহমদ মুসা বুঝতে পারল ওদের চালাকি। সে একবার এ দরজায় আবার ওই দরজায় গুলী বৃষ্টি অব্যাহত রাখল।

কিন্তু ওদিক থেকে কোন গুলীর শব্দ এল না। মিনিটেরও বেশি পার হয়ে গেল। হঠাৎ আহমদ মুসার খেয়াল হলো, ঘরটিতে মাত্র ঐ দুটি দরজাই নয়, আরও দুটি দরজা রয়েছে। নিশ্চয় ওই দরজা পথে ওরা এতক্ষণ আহমদ হাত্তাকে নিয়ে গেছে।

উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

এ সময় আহমদ মুসা যে দরজা দিয়ে ঢুকেছিল তার বিপরীত দিকের দরজার দিক থেকে একটা শব্দ ভেসে এল, 'দেখো এ লোকটিও যেন পালাতে না পারে।' ধীর ঠাণ্ডা কণ্ঠস্বর লোকটির।

'এই উত্তেজনাকর মুহূর্তে এত ঠান্ডা কণ্ঠস্বর! এই কি 'কিনিক কোবরা'র নেতা, আহমদ হাত্তার কথায় যে 'ঠান্ডা শয়তান!' ভাবল আহমদ মুসা। ভাবার সাথে সাথে ধোঁয়ার অন্ধকার ঠেলে আহমদ মুসা ছুটল ঐ দরজার দিকে, ঐ শব্দে লক্ষ্যে।'

দরজার ওপাশে ধোঁয়া অনেক পাতলা। আহমদ মুসা দেখল ইংলিশ পোশাক পরা সুবেশধারী একজন লোক রাজার মত হেঁটে এগিয়ে যাচ্ছে।

আহমদ মুসার মনে কোন সন্দেহ রইল না, এই সেই ঠান্ডা গলায় কথা বলা লোক, মানে 'কিনিক কোবরা'র নেতা।

আহমদ মুসা তার পিছু নিল। সে নিশ্চিত যে, আহমদ হাত্তাকে যেখানে নিয়ে গেছে, কিনিক কোবরা'র নেতাও নিশ্চয় সেখানে যাচ্ছে।

আহমদ মুসা ওপারের করিডোর দিয়ে আসার সময় যা দেখেছে, এখানেও তাই দেখল। দু'পাশে কক্ষের সারি। মনে হয় সিভিল ডিফেন্সের লোকরা কক্ষগুলোকে স্টোর হিসেবে ব্যবহার করেছে।

লোকটি একই গতিতে চলছে। আহমদ মুসা অনেক খানি দূরত্ব বজায় রেখে বিড়ালের মত নিঃশব্দে তার পিছু পিছু যাচ্ছে।

এক সময় লোকটি ডান দিকে মোড় নিয়ে রুট পরিবর্তন করল।

ডানে ঘোরার সময়ও লোকটি পেছন ফিরে তাকাল না। হাঁটার গতি চোখের ডাইরেকশন একই রেখে শুধু রাইট টার্ন করে একই গতিতে হেঁটে চলল।

লোকটি রোবট নাকি, ভাবল আহমদ মুসা। রোবটই এভাবে পথ চলে, কোন জ্যান্ত মানুষ এভাবে চলার কথা নয়।

রাইট টার্নের পর করিডোর দিয়ে কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে বাঁ দিকে আবার টার্ন নিল আগের সেই একই ভঙ্গিতে।

এবার এ করিডোর ধরে এগিয়ে চলল লোকটি।

অনেক খানি দূরত্ব রেখে আহমদ মুসা তাকে অনুসরণ করছে।

এ করিডোরটি একটা দরজায় গিয়ে শেষ হয়েছে।

লোকটি দরজার মুখোমুখি হয়েই বাম হাত তুলে বাম পাশের চৌকাঠ স্পর্শ করল। সঙ্গে সঙ্গে দরজার দুই পাল্লা খুলে দেয়ালের ভেতরে ঢুকে গেল।

আহমদ মুসা বুঝল, দরজাটা নিয়ন্ত্রিত।

লোকটি ঘরে ঢুকে গেল।

কিন্তু দরজা বন্ধ হলো না। লোকটা দরজা বন্ধ করল না।

আহমদ মুসা কাছাকাছি হয়েছে দরজার।

দরজা বরাবর ঘরের ভেতরে ওপ্রান্তে দুটি সোফা নজরে পড়ল আহমদ মুসার। সোফার পেছনে দেখতে পেল একটি দরজা। লোকটা ঘরে ঢুকে সোফা সামনে রেখে দাঁড়িয়ে এ দিকে পেছন ফিরে সিগারেট ধরাচ্ছে। সিগারেট ধরানো শেষ হলে লোকটি লাইটার রাখার জন্যে পকেটে হাত রাখল।

আহমদ মুসা তখন দরজায় পৌঁছে গিয়েছিলো। ঘরে না ঢুকে দরজায় থমকে দাঁড়াল সে।

আহমদ মুসা দরজায় থমকে দাঁড়াতেই লোকটি হা হা করে একটা ঠান্ডা হাসি দিয়ে উঠল।

এই হাসির সঙ্গে সঙ্গেই দরজার পাল্লা দেয়ালের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল বিদ্যুৎ গতিতে এবং দরজার পাল্লার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল চারটি রোবট হাত। আহমদ মুসা কিছু বুঝে উঠার আগেই দরজা এসে দু'দিক থেকে তাকে চেপে ধরল এবং চারটি রোবট হাত তাকে অক্টোপাসের মত জড়িয়ে ফেলল।

দরজার পাল্লা দুটিকে তার দিকে আসতে দেখে আহমদ মুসা হাত দুটি তুলেছিল বাঁধা দেয়ার জন্যে। তার ফলে দুই হাত তার আটকে পড়া থেকে বেঁচে গেল।

আহমদ মুসা হাত দুটি আটকে পড়া থেকে বেঁচে যাওয়ার কারণে লোকটির হাসি বন্ধ হয়ে গেল। হাসি বন্ধ করেই ঘুরে দাঁড়াল লোকটি।

লোকটির উপর চোখ পড়তেই আহমদ মুসা বুঝল, সে মায়া জাতি-গোষ্ঠী বা মায়া-মেস্টিগো মিশ্রণ জাতি-গোষ্ঠীর কেউ হবে লোকটা।

ঠান্ডা হাসি শুনে তাকে যতটা বীভৎস ক্রিমিনাল মনে করেছিল আহমদ মুসার, ততটা বীভৎস সে নয়। তার মুখের পাপের চিহ্নগুলো বাদ দিলে তার মুখের পরিচ্ছন্ন কাঠামোই বেরিয়ে আসে। তবে তার চোখের দৃষ্টি ও মুখের ভাব দেখে তাকে একজন খুব ঠান্ডা মাথার ক্রিমিনাল বলে মনে হয়।

ঘুরে দাঁড়িয়ে আহমদ মুসার উপর চোখ ফেলেই লোকটি বলে উঠল, 'ও তুমি বিদেশী। তাইতো আহমদ হাত্তাকে উদ্ধারের জন্যে বোকার মত এখানে আসতে পেরেছ।' ঠান্ডা গলা লোকটির।

'তুমিও তো বিদেশী। তুমি আহমদ হাত্তাকে কিডন্যাপ করেছ কোন স্বার্থে কোন সাহসে?' বলল আহমদ মুসা শান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে।

'তোমার দেখছি ভয়ও নেই। মনে হচ্ছে তোমার বৈঠকখানায় বসে তুমি আমাকে শাসন করছ! কে তুমি?'

'আমারও ঐ একই প্রশ্ন, কে তুমি আহমদ হাত্তাকে কিডন্যাপ করেছ?' বলল আহমদ মুসা।

'দেখ আমি সাহস পছন্দ করি, কিন্তু বেয়াদবি সহ্য করতে পারি না।

তোমাকে এভাবে না আটকে গুলী করে মারতে পারতাম। কিন্তু মারিনি, তুমি কে তা জানার আগ্রহ জেগেছে। তুমি যে কায়দায় আমার তিনজন লোককে কুপোকাত করেছ, সে রকম যোগ্যতার লোক আমেরিকায় আছে বলে আমার বিশ্বাস হয়নি। আমার বিশ্বাসই ঠিক। তুমি নন আমেরিকান। দেখ, আমি তিন পর্যন্ত গুনব, এর মধ্যে তুমি কে, কোন দেশের লোক না বললে আমি তোমাকে গুলী করে মারব।' বলল লোকটি খুব শান্ত কণ্ঠে।

'যদি বলি, তাহলে তুমি কি করবে?' হেসে বলল আহমদ মুসা।

'আশ্চর্য! তুমি হাসছ? পাগল নাকি তুমি?' লোকটি বলল।

'হাসছি তোমার ভাব দেখে। মনে হচ্ছে জীবন এবং মৃত্যু দুটোরই মালিক তুমি।' বলল আহমদ মুসা।

'অবশ্যই, আমার রিভলবারের আজকের প্রথম বুলেটে তোমার মৃত্যু, সে বুলেট না ছুড়লেই তোমার জীবন।' বলল লোকটি।

‘তুমি কেন দুনিয়ার কোন মানুষ একথা বলতে পারেনা। মানুষ তার ভবিষ্যতের এক ইঞ্চিও দেখতে পায় না।’ আহমদ মুসা বলল।

‘এখনই তা প্রমাণ হবে। আমি গুণতে শুরু করছি তিন পর্যন্ত।’

বলেই লোকটি গুণা শুরু করল, এক.........

জীবন-মৃত্যু লোকটির হাতে নেই এটা আহমদ মুসার দৃঢ় বিশ্বাস। তবে সে যে গুলী করতে চেয়েছে, এ কথায় সে অবিশ্বাস করেনি।

আহমদ মুসার চিন্তা ঘুরছিল শত মাইল বেগে।

হঠাৎ আহমদ মুসার মনে হলো, এ দরজারটি সুইচ টিপে এবং দূর নিয়ন্ত্রণ দুভাবেই ব্যবহার করা যায়। লোকটাও দু’পন্থাই ব্যবহার করেছে।

মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আহমদ মুসা বাম হাতটা কোনভাবে দরজার বাঁ পাল্লাটার বাইরে টেনে নিয়ে বাঁ চৌকাঠের কোণায় অবস্থিত বোতাম হাতড়িয়ে বের করে নিয়ে টিপে দিল।

লোকটা তখন গুনছিল, দুই......

আহমদ মুসা কি করছে সে তা খেয়াল করেনি।

সুইচ টিপতেই চোখের নিমিষে দরজার রোবট হাতসহ দরজার পাল্লা দুটি দেয়ালের মধ্যে ঢুকে গেল।

চোখের সামনে ঘটা অভাবিত ঘটনা বোধ হয় বুঝার চেষ্টা করছিল লোকটি।

কিন্তু আহমদ মুসা এক মুহূর্তও নষ্ট করেনি।

দরজার ফাঁকে পড়া তার দু’হাত উপরে তোলাই ছিল। দরজা সরে যেতেই আহমদ মুসা দু’হাত মেঝের উপর ছুঁড়ে দিয়ে পা দুটি শূন্যে তুলে বৃত্তাকারে তা চালিয়ে দিল লোকটাকে লক্ষ্য করে।

আহমদ মুসার দু’পা গিয়ে আঘাত করল লোকটির বুকে। লোকটি ছিটকে পড়ে গেল সোফার উপর। আর আহমদ মুসা চিৎ হয়ে পড়ে গেল মেঝের উপর। আহমদ মুসা পড়ে গিয়েই দক্ষ এ্যাক্রোব্যাটের মত দেহকে উপরে ছুঁড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। সেই সাথে পকেট থেকে রিভলবারটাও তার হাতে উঠে এসেছে।

লোকটি সোফায় পড়েই সোজা হয়ে বসেছে। তার হাতও পকেট থেকে বের হচ্ছিল। হাতে রিভলবার।

‘হাত যেভাবে আছে, সেভাবেই রাখ। তোলার চেষ্টা করো না, মাথার খুলি উড়ে যাবে।’

শান্ত, কিন্তু কঠোর কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা রিভলবার লোকটার দিকে তাক করে।

এই সময় আকস্মিকভাবে একটি বালিকা ‘মাম্মি’ ‘মাম্মি’ বলে ডাকতে ডাকতে লোকটির পেছনের দরজা দিয়ে ছুটে ঘরে প্রবেশ করল এবং উদ্যত রিভলবার হাতে দাঁড়ানো আহমদ মুসার উপর চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়াল। ততক্ষণে সে লোকটির পাশে পৌঁছে গিয়েছিল।

লোকটি চোখের পলকেই মেয়েটিকে সামনে নিয়ে রিভলবার তুলল আহমদ মুসার দিকে। হেসে উঠল। বলল, ‘রিভলবার ফেলে দাও তুমি। না হলে তোমার মাথাই ছাতু হয়ে যাবে।’

মেয়েটি আট নয় বছরের। সুন্দর ফুট-ফুটে নিষ্পাপ চেহারা। কিন্তু আতংকে বিস্ফারিত দুই চোখ।

মুশকিলে পড়ে গেল আহমদ মুসা।

মেয়েটিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছে লোকটি। লোকটিকে গুলী করতে গেলে মেয়েটিই হয়তো প্রথম বলি হবে তার বুলেটের।

পারল না আহমদ মুসা গুলী করতে।

এ সময় ঘরের পাশের আরেক দরজা দিয়ে একটি মেয়ে ছুটে এসে প্রবেশ করল ঘরে। চিৎকার করে বলে উঠল, ‘জোয়াও, তোমাদের লড়াইতে আমার মেয়েটিকে গিনিপিগ বানিও না। ছেড়ে দাও তাকে।’

আটাশ উনত্রিশ বছরের মেয়েটি খুবই সুন্দরী। কিন্তু মায়া বা মেস্টিগো চেহারা নয়। কিছুটা সুরিনামীয়, কিছুটা আবার এশীয়।

লোকটি মেয়েটির কথায় কর্ণপাত করল না। আবার বলে উঠল, ‘তুমি সুযোগ হারিয়েছ। মেয়েটিকে মারতে পারোনি। অতএব আমাকেও আর মারতে

পারবে না। ফেলে দাও রিভলবার।' শান্ত, ঠান্ডা এবং কতকটা কৌতুকপূর্ণ কণ্ঠ তার।

সত্যিই মেয়েটিকে সে যেভাবে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছে তাতে মেয়েটিকে না মেরে লোকটিকে আঘাত করার সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না। এই অবস্থায় আহমদ মুসাই এখন অরক্ষিত হয়ে পড়েছে। লোকটি তাকে রিভলবার ফেলে দিতে না বলে গুলীও করতে পারতো। সম্ভবত আহমদ হাত্তার মত তাকেও লোকটি বাঁচিয়ে রাখতে চায়। ভাবল আহমদ মুসা। পরক্ষণেই আবার প্রশ্ন জাগল, কেন বাঁচিয়ে রাখতে চায়? হতে পারে, আহমদ হাত্তার শিখ ড্রাইভারের পরিচয় উদ্ধারের যে প্রয়োজনে আহমদ হাত্তাকে এতক্ষণ বাঁচিয়ে রেখেছে, সেই একই প্রয়োজনে হয়তো তাকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়।

অবশেষে আহমদ মুসা সিদ্ধান্ত নিল, হাতের রিভলবার ফেলে না দিয়ে তার উপায় নেই। তাছাড়া পকেটে রিভলবার তার আরও আছে। পরবর্তী কোন সুযোগের অপেক্ষা তাকে করতে হবে।

আহমদ মুসা হাতের রিভলবার ফেলে দিতে দিতে বলল, 'তোমার পরিচয় কি আমি জানি না। কিন্তু একজন শিশুকে ঢাল বানানোর চেয়ে বড় কাপুরুষতা আর নেই।'

লোকটির মুখে এক টুকরো নিরুত্তাপ হাসি দেখা দিল।

ঠিক এই সময়ে যে পথ দিয়ে আহমদ মুসা প্রবেশ করেছিল ঘরে, সে পথ দিয়ে দুজন লোক হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করল। তারা দরজা পেরিয়েই একযোগে কিছু বলতে যাচ্ছিল লোকটিকে লক্ষ্য করে।

আহত-রক্তাক্ত লোক দুজনের দিকে একবার গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়েই জোয়াও লোকটি ধমকে উঠল, 'থাম, তোমরা কি বলবে আমি তা জানি। এখন এই লোকটিকে বেঁধে ফেল।'

জোয়াও তার রিভলবারের নল কোন সময়ই একটু নড়ায়নি আহমদ মুসার দিক থেকে।

লোক দুজন এসে আহমদ মুসাকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল।

তারা যখন তাকে বাঁধছিল, তখন জোয়াও লোকটি তাদেরকে প্রশ্ন করে, ‘আমাদের ক’জন লোককে ওরা মেরেছে?’

দুজনের একজন জবাবে বলল, ‘পাঁচজন।’

‘আহমদ হাত্তাকে উদ্ধার করে নিয়ে গেল ওরা কারা? পুলিশ নিশ্চয় নয়।’ জিজ্ঞেস করে জোয়াও।

‘নয় বলেই মনে হয়। সাদা পোষাকে ওরা চারজন ছিল। আমরা আহমদ হাত্তাকে নিয়ে বের হবার মুখে ওরা অতর্কিত আক্রমণ করে বসে।’ বলে দুজনের সেই আগের লোকটিই।

‘আহমদ হাত্তাকে নিয়ে সবাই তো চলে যায়নি।’ বলল জোয়াও।

‘না, একজন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।’ বলল দুজনের সেই একজন।

‘ওরা আবার আসবে। লোকটি পুলিশের অপেক্ষা করছে। লোপেজ কোথায়?’ বলল জোয়াও।

আহমদ মুসা ওদের কথা শুনছিল। খুব খুশি হলো এই ভেবে যে, আহমদ হাত্তা উদ্ধার হয়েছে। পরশু তার নির্বাচন। খুব প্রয়োজন ছিল তার বাইরে বেরুনোর। কিন্তু তাকে উদ্ধার করল কে? চারজন কারা ছিল? তাহলে বার্নারডো এসেছিল আরও তিনজনকে নিয়ে? মনে মনে ধন্যবাদ দিল বার্নারডোকে। সে যোগ্য-সাথীর কাজ করেছে। বাইরে রাস্তায় কে দাঁড়িয়ে আছে? নিশ্চয় বার্নারডো। এই জোয়াও লোকটি ঠিক বলেছে সে পুলিশের অপেক্ষা করছে। আহমদ মুসা মনে মনে প্রশংসা করল জোয়াও লোকটির। পরিস্থিতি অনুধাবন করার তার অসীম ক্ষমতা দেখে আহমদ মুসা মুগ্ধ হয়েছে। মাফিয়ার নেতার এমন ঠান্ডা আচরণ ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বিস্ময়কর নিঃসন্দেহে।

লোকটি থামতেই দুজনের একজন কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল। ঠিক এই সময় ঘরে দৌড়ে প্রবেশ করল একজন।

তাকে দেখেই জোয়াও বলে উঠল, ‘কি ব্যাপার লোপেজ?’

লোকটি জোয়াও-এর সামনে এসে চারদিক তাকাতে গিয়ে চোখ পড়ল তার হাত বাঁধা আহমদ মুসার উপর। লোকটাকে দু’চোখ যেন আটকে গেল

আহমদ মুসার মুখে। প্রথমে তার চোখে-মুখে ফুটে উঠল বিস্ময়। পরক্ষণেই তার চোখে-মুখে নেমে এল বিহ্বলতা।

কোন কথা ফুটল না তার মুখে।

বোবা হয়ে গেছে যেন।

জোয়াও তার হাত বাঁধা বন্দীর দিকে লোপেজকে ঐভাবে চেয়ে থাকতে দেখে এবং লোপেজের বিহ্বল অবস্থা দেখে সে ভাবল, লোপেজ লোকটাকে চেনে নাকি? তা না হলে তার এ বিহ্বলতা কেন? বন্দী লোকটা ভয়ের বস্তু হলেও বন্দী অবস্থায় তাকে তো ভয় পাবার কথা নয়! এসব চিন্তা থেকেই জোয়াও লোপেজকে জিজ্ঞেস করল, 'লোপেজ লোকটাকে তুমি চেন নাকি? মনে হচ্ছে তুমি বাঘের মুখে পড়েছ। কি ব্যাপার বলত?'

'এ শুধু বাঘ নয় বস, এ হাজার বাঘের বাপ। কোত্থেকে এলেন ইনি? আমার ভয় হচ্ছে, আমি স্বপ্ন দেখছি কিনা!' বলল লোপেজ লোকটা।

ভ্রুকুঞ্চিত হলো জোয়াও-এর। লোপেজ 'কিনিক কোবরা'র টপ অপারেশন কমান্ডোদের একজন। বিশ্বের দূরতম অঞ্চলে এবং কঠিন অপারেশনের প্রতিই তার বেশি আগ্রহ। একটাও বাজে কথা বলার লোক সে নয়। কিন্তু সেই লোপেজ যাকে দেখে বিহ্বল হয়ে পড়তে পারে সে ব্যক্তিটি কে? জিজ্ঞেস করল জোয়াও, 'হেয়ালী করো না লোপেজ। খুলে বল লোকটি কে?'

লোপেজ জোয়াওকে মাথা ঝুঁকিয়ে একটা বাউ করে বলল, 'স্যরি বস। সত্যিই এঁকে দেখে আমার বুদ্ধি লোপ পাবার অবস্থা। আকাশের চাঁদ যদি হঠাৎ করে হাতে এসে যায়, তাহলে ব্যাপারটা কেমন হবে! চাঁদ হাতে পাওয়ার চেয়েও বড় ঘটনা এটা। অনুর্বর চাঁদ কখনো কেউ মূল্য দিয়ে কিনবে না। কিন্তু এই লোকটির যা ওজন তার কয়েকগুন বেশি ডলার এর বিনিময়ে পাওয়া যেতে পারে বস।'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল জোয়াও। তার দুই চোখ বিস্ফারিত। বলল, 'কে ইনি? আহমদ মুসা! আমাদের আন্ডার ওয়ার্ল্ডের খবরে এমন মূল্যবান ব্যক্তি বর্তমানে আহমদ মুসাই!'

'হ্যাঁ, বস। ইনি সেই সাত রাজার ধন আহমদ মুসা।'

বিস্ময়ে কিছুক্ষণের জন্যে যেন নির্বাক হয়ে গেল জোয়াও। আহমদ মুসার দিকে নির্বাক অপলক দৃষ্টি ফের প্রশ্ন করল, 'লোপেজ, তুমি ঠিক চিনেছ?'

'কোন সন্দেহ নেই বস। এঁর ফটো আমি অনেকবার দেখেছি ইউরোপে থাকা কালে। সম্প্রতি ইহুদি গোয়েন্দা সংস্থা ইরগুনজাই লিউমি ও ইসরাইল গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ তাঁর ছবি আবার সরবরাহ করেছে। আপনিও দেখেছেন।' থামল লোপেজ।

কিন্তু তৎক্ষণাৎ কথা বলল না জোয়াও। ভাবছিল সে। শোনা আহমদ মুসার সাথে এই দেখা আহমদ মুসাকে সে মিলিয়ে নিচ্ছিল। তাঁর মনে হতে লাগল এ পর্যন্ত এই লোকের যে বৈশিষ্ট্য সে দেখেছে তাতে এই লোকটি আহমদ মুসা হলেই শুধু মানায়। যেভাবে দরজায় আটকে পড়া অবস্থা থেকে মুক্ত হলো, তার আগে আমাদের তিনজন লোককে সংজ্ঞাহীন করে এ ঘাটিতে যেভাবে প্রবেশ করেছে, তা আহমদ মুসার মত সর্বময় প্রতিভার অধিকারীর পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু যে জিনিসটি তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিল সেটা হলো, জোয়াও নিজেকে রক্ষার জন্যে একজন শিশুকে ঢাল বানাল, কিন্তু লোকটি একটি শিশুকে হত্যা না করে নিজেকে বন্দী হওয়ার মত চরম বিপদের মধ্যে ঠেলে দিল। আজকের বিপ্লবী ও অস্ত্র-বাজদের মধ্যে এই মহত্ গুণ শুধু আহমদ মুসার মধ্যেই আছে। তাছাড়া তাকে ঘাঁটিতে ঢোকার পথে বাধাদানকারী তাদের 'কিনিক কোবরা'র তিনজন লোকের একজনকেও সে হত্যা করেনি, সংজ্ঞাহীন অবস্থায় বেঁধে রেখে তাদের নিস্ক্রিয় করেছে মাত্র। পারতপক্ষে কোন মানুষকে হত্যা না করার মত গুণ শুধু আহমদ মুসারই আছে।

মুগ্ধ দৃষ্টি ফুটে উঠল জোয়াও-এর চোখে। কিন্তু তারপরেই তার দুই চোখকে আচ্ছন্ন করল চকচকে লোভ। তার দুই ঠোঁট প্রসন্ন হাসিতে ভরে গেল। বলল, 'তোমাকে ধন্যবাদ লোপেজ। কিনিক কোবরার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দিন আজ। মোসাদ ও লিউমি আহমদ মুসার কত দাম দেবে বলতে পার?'

'তুমি যতটা চাইতে পার জোয়াও। আহমদ মুসার বিনিময় হিসেবে কোন অঙ্কই তাদের কাছে বড় হবে না।'

‘হ্যাঁ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বশেষ ঘটনায় চূড়ান্ত মার খাওয়ার পর ইহুদীরা আহমদ মুসার প্রতি আগুন হয়ে আছে।’

মুহূর্তের জন্যে থামল জোয়াও। তারপর আহমদ মুসার দিকে চেয়ে বলল, ‘আপনাকে ওয়েলকাম স্যার। আমাদের অতিথ্যে আপনার সময় ভালই কাটবে। আপনি এখন আমাদের সবচেয়ে বড় পুঁজি।’

বলে জোয়াও আবার থামল। তাকাল আহমদ মুসাকে যারা বেঁধেছিল সেই লোক দুজনের দিকে। একজনকে লক্ষ্য করে বলল, ‘যাও তুমি পায়ের বেড়ি ও হ্যান্ডকাফ নিয়ে এস।’

দৌড়ে বেরিয়ে গেল সেই লোকটি। দেড় দু’মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল বেড়ি ও হ্যান্ডকাফ নিয়ে।

জোয়াও এবার তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘এক্সকিউজ মি স্যার, আমরা এভাবে আপনাকে রেখে আমাদের মনের ভয় দূর করতে পারছি না। আমরা এখন মুভ করবো তো! আমরা যাতে নিশ্চিন্তে থাকতে পারি এজন্যেই আপনার হাত পায়ে এ দুটি পরিয়ে দিতে চাই। কিছু মনে করবেন না।’

কথা শেষ করে হ্যান্ডকাফ যে এনেছিল তাকে ইংগিত করল।

লোকটি আহমদ মুসার হাত ও পায়ে লোহার শিকল পরিয়ে দিল এবং তা তালাবদ্ধ করে চাবি দুটি তুলে দিল জোয়াও-এর হাতে।

আহমদ মুসা শান্তভাবে দাঁড়িয়ে থেকে ওদের কথা শুনছিল ও কাজ দেখছিল।

হাত ও পায়ের শিকল পরানো হয়ে গেলে আহমদ মুসা বলল, ‘আমার হাত পা লক করেই কি নিশ্চিন্তে থাকতে পারবেন?’

জোয়াও এবার আহমদ মুসার দিকে তাক করা রিভলবার সরিয়ে নিয়ে পকেটে পুরে বলল, ‘নিশ্চিন্ত হবার জন্যে নিরাপদ জায়গায় আপনাকে আমরা রাখব। আমরা জানি বর্তমান অবস্থায় আপনি শত চেষ্টা করলেও সেখান থেকে বের হতে পারবেন না। জেনে রাখুন, কিনিক কোবরা বাগাড়ম্বর করে না।’

আহমদ মুসা হাসল। কিছু বলল না।

‘মোসাদ ও লিউমি’র হাতে আপনাকে তুলে দেবার কথা শুনে আপনার কি মনে হচ্ছে?’ বলল জোয়াও।

‘দুই কারণে খুশি লাগছে। এক, এর দ্বারা আপনারা অনেক টাকা পাবেন। দুই, পুরনো বন্ধুদের সাথে আমার আবার দেখা হবে।’ শান্ত কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

বিস্ময় ফুটে উঠল জোয়াও-এর চোখে-মুখে। লোপেজের মুখও বিস্ময়ে হা হয়ে গেছে।

মহিলাটি তখনও দাঁড়িয়েছিল যে দরজা দিয়ে সে প্রবেশ করেছিল সেই দরজার সামনেই। বালিকাটিও জোয়াও-এর হাত থেকে ছাড়া পেয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার মাকে ফিস ফিস করে বলল, ‘লোকটির ভয় নেই কেন আম্মা?’

মহিলা স্তম্ভিত অবস্থায় স্থানুর মত দাঁড়িয়েছিল। জোয়াও ক্রিস্টিনাকে রক্ষা করতে গিয়ে বন্দী হলো। এ ঘটনায় হতবাক হয়ে গিয়েছিল মহিলাটি। তারপর লোপেজের কাছে আহমদ মুসার পরিচয় শোনার পর বুঝেছে আহমদ মুসা বলেই একটি বালিকাকে বাঁচানোর মত মহত্ কাজটা করতে পেরেছে। এখন আরেক ধরণের বিস্ময় তাকে অভিভূত করে তুলছে। আহমদ মুসাকে চোখের সামনে দেখার অসম্ভব ঘটনায় সে বুদ্ধিলোপ পাবার মত আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।

ক্রিস্টিনার কথায় সম্বিত ফিরে পেল মহিলাটি।

মহিলাটি বালিকার দিকে তাকাল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে বলল, ‘দুনিয়াতে অনেক মানুষ আছে ক্রিস্টিনা যারা কোন কিছুতেই ভয় পায় না।’

‘কোন কিছুতেই না? কেন?’ বলল বালিকা ক্রিস্টিনা।

‘তা ওরাই বলতে পারে ক্রিস্টিনা।’ বলল মহিলাটি।

‘সত্যিই লোকটিকে কি বিক্রি করা হবে মাম্মি?’ ক্রিস্টিনার কণ্ঠে উদ্বেগ।

‘কেন জিজ্ঞেস করছ?’ জিজ্ঞেস করল মহিলাটি।

‘লোকটা ভালো মাম্মি। আমাকে গুলী করেনি।’

মহিলাটি কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল।

ওদিকে জোয়াও বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, 'মি. আহমদ মুসা, আপনি না বুঝে এ কথাগুলো বলেছেন তা আমি মনে করি না। আবার আপনি বেশি সাহসের বড়াই দেখাবেন তাও মানতে আমার মন চায় না। তাহলে ঘটনা কি বলুন তো!'

'এসব কথা থাক।' বলল আহমদ মুসা। কথা শেষ করেই আহমদ মুসা আবার বলল, 'বলুন তো আপনারা আহমদ হাত্তার পিছনে লেগেছেন কেন? আপনারা বিদেশী। তিনি বা তাঁর দল তো আপনাদের কোন ক্ষতি করেনি!'

আহমদ মুসার কথা শোনার পর জোয়াও অল্পক্ষণের জন্যে মাথা নিচু করল। তারপর সোজা আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মি. আহমদ মুসা, কিনিক কোবরা'র কার্যক্রম সম্পর্কে কোন প্রশ্নের জবাব আমরা দেব না। তবু এটুকু বলি, আহমদ হাত্তাকে আমরা হত্যা করবো। কে বা কারা তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে গেছে জানি না। তবে আজ সে ছাড়া পেয়েছে, কাল তাকে মরতেই হবে। 'কিনিক কোবরা' কাউকে টার্গেট করলে সে আর বাঁচে না।'

বলেই জোয়াও তাকাল মহিলার দিকে। তাকিয়ে বলল, 'লিন্ডা তুমি ক্রিস্টিনাকে নিয়ে সুড়ঙ্গ পথে বোটে চলে যাও এখনি।'

মহিলাটিকে অর্থাৎ লিন্ডাকে নির্দেশ দিয়েই জোয়াও তাকাল লোপেজসহ তাঁর লোকদের দিকে। বলল, 'তোমরা আহমদ মুসাকে সুড়ঙ্গ পথে বোটে নিয়ে চলে যাও। আমি এদিকের ব্যবস্থা করে আসছি। আমার ধারণা মিথ্যা না হলে এখন থেকে দশ-পনের মিনিটের মধ্যে পুলিশ এসে পৌঁছবে।'

তারপর জোয়াও তাকাল আবার আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'আপনি ভাববেন না। আপনাকে বেটার জায়গাতেই আমরা নিচ্ছি। তবে একটু অসুবিধা আপনার হবে। সেটা হলো ওখান থেকে পালানো কঠিন হবে। পালাতে চেষ্টা করলে নির্ঘাত মারা পড়বেন।' বলে জোয়াও উঠে দাঁড়াল।

মেয়েটি ক্রিস্টিনাকে নিয়ে লিন্ডা এবং লোপেজরা আহমদ মুসাকে নিয়ে তখন ঘর থেকে বেরুবার যাত্রা শুরু করেছে।

‘লিন্ডা লোরেন, সুরিনামে আমার কাজ সমাপ্ত হওয়ার পথে। এখন আমার কাজটুকুই...।’

জোয়াও-এর কোথায় ছেদ নামল লিন্ডা কথা বলে উঠায়। লিন্ডা বলল, ‘কাজ শেষ হবার পথে! আহমদ হাত্তাই তো বেঁচে আছে। কোথায় কাজ শেষ হলো?’

‘কিনিক কোবরা’র জীবনে এটাই প্রথম ওয়াদা খেলাপী। আমি রঙ্গলালকে তাদের দেয়া অগ্রীম টাকা ফেরত দিয়েছি। আহমদ হাত্তা আমাদের হাত থেকে মুক্ত হবার একদিন পরেই নির্বাচন হয়েছে, তাতে তিনি প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন। একটা দেশের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার চুক্তি তাদের সাথে আমাদের হয়নি। তাছাড়া আহমদ মুসাকে পাওয়ার পর এসব ছোট-খাটো কাজের প্রতি আকর্ষণ কমে গেছে। এখন টেরেক স্টেট-এর কাজটা হলেই আমরা চলে যাব। তুমি ডকুমেন্টটা আমাদের দাও।’

ডকুমেন্টের কথা শুনতেই লিন্ডা লোরেনের মুখ বিষণ্ন হয়ে গেল। বলল, ‘তুমি জান, তোমার এ সব কাজে কোন সহযোগিতা আমি করবো না। তবু কেন তুমি আমাকে সুরিনামে নিয়ে এসেছ?’

‘তোমাকে আমার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু পরিস্থিতি তোমাকে নিয়ে এসেছে, তা তুমি জান। তুমি বলেছ, তোমার ডকুমেন্ট সুরিনামে আছে তাই তোমাকেও সুরিনামে আসতে হয়েছে। ডকুমেন্টটা তুমি আমার হাতে দিলে, তখনই তুমি চলে যেতে পারবে সুরিনাম থেকে।’ শান্ত ঠান্ডা কণ্ঠে বলল জোয়াও লেগার্ট।

‘আগে কি করতাম জানি না। কিন্তু এখন সবকিছু জানার পরে এ ডকুমেন্ট তোমাকে আমি দেব না। ভালো লোকদের সম্পদ তোমাদের মত লোকদের হাতে পড়ুক, তা আমি চাই না।’

রুখে দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে বলল লিন্ডা লোরেন।

ঠান্ডা হাসি হাসল জোয়াও লেগার্ট। বলল, 'তোমার এই কোথায় আমি রাগছি না। কারণ আমি জানি ডকুমেন্টটা তুমি আমাদের দেবে। কারণ তুমি জান, আমি যা চাই তা আদায় করেই ছাড়ি।'

'কি করে আদায় করবে?'

'অমানুষ হবো।'

'অমানুষ হবার তোমার কিছু বাকি আছে? একবার তুমি নিজের দিকে চেয়ে দেখ, কোথায় ছিলে কোথায় এসেছ।'

'আমি পেছনে তাকাই না। ভাল চাইলে আমার কথা তোমাকে শুনতে হবে।' বলল জোয়াও লেগার্ট।

'আমাকে তুমি অমঙ্গলের ভয় দেখিও না। আমার অমঙ্গলের তুমি কি বাকি রেখেছ। আমি আর মানুষ নেই। জীবনের প্রতিও আমার কোন মায়া নেই।' শুষ্ক কণ্ঠে বলল লিন্ডা লোরেন।

'তোমার জীবনের প্রতি মায়া না থাকলেও ক্রিস্টিনার জীবনের প্রতি মায়া তোমার আছে।' শয়তানের মত ক্রুর কণ্ঠ জোয়াও লেগার্টের।

চমকে উঠল লিন্ডা লোরেন।

ভয়ে তাঁর মুখ কুচকে গেল। বলল, 'তোমার এ কথার অর্থ কি জোয়াও লেগার্ট?'

'আমার কথার অর্থ তুমি জান। ক্রিস্টিনা আমার মূল্যবান অস্ত্র। তোমাকে লাইনে আমার জন্য এটাই শেষ অস্ত্র সব সময় ছিল, এখনও আছে।'

'তুমি কি করতে চাও ক্রিস্টিনাকে? তুমি সেদিন নিজেকে রক্ষার জন্যে তাকে ঢাল বানিয়েছিলে। একজন শত্রু যে মানবতার পরিচয় দিয়েছে, সেটাও তুমি দেখাতে পারনি।' বলল লিন্ডা লোরেন ক্ষুব্ধ কণ্ঠে।

'ক্রিস্টিনাকে কি করবো সেটা পরের কথা। আগে তুমি বল, ডকুমেন্ট তুমি দিচ্ছ কি না।'

কথা বলল না লিন্ডা লোরেন।

জোয়াও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল।

তারপর বলল, 'আমার সময় এখন খুব মূল্যবান লিন্ডা। নষ্ট করার মত সময় আমার নেই। আজই আমি ডকুমেন্টটা চাই। আসছে রাত ভোর ৪টায় একটা জাহাজ এখানে আসবে। সে জাহাজে করে আহমদ মুসাকে নিয়ে বাইরে যাব ক'দিনের জন্যে। যাবার আগে আমাকে ডকুমেন্টটা হাতে পেতেই হবে। আমি এখন বাইরে যাচ্ছি। ডকুমেন্ট ঠিকঠাক করে রাখবে। আমাকে তুমি চেন। আর একবারও তোমাকে আমি অনুরোধ করবো না। এরপর দেখবে, আমি কি করতে পারি।'

বলে উঠে দাঁড়াল জোয়াও লেগার্ট।

বেরিয়ে গেল ধীর পায়ে সে ঘর থেকে।

জোয়াও লেগার্টের শেষ কথায় লিন্ডা লোরেনের চোখে-মুখে নতুন করে আবার ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল। তাঁর ভয়ার্ত দুই চোখ তাকিয়ে থাকল ধীর গতিতে বেরিয়ে যাওয়া লেগার্টের দিকে। জোয়াও যত ধীর, কথায় যত ঠান্ডা হয়, ততই সে নিষ্ঠুর হয়।

জোয়াও লেগার্ট চলে গেল।

লিন্ডা লোরেন কিন্তু সে দিকেই চেয়ে আছে। চোখে তাঁর শুন্য দৃষ্টি।

অতীতে চলে গেছে তাঁর মন।

ডুবে গেল মন স্মৃতির অথৈ সমুদ্রে।

দু'চোখের কোণায় জমে উঠল অশ্রু।

# ৪

বিছানায় উঠে বসল লিন্ডা লোরেন। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে সে।

সে তো মরে গেছেই। ক্রিস্টিনাকেও সে বাঁচাতে পারবে না। তাই ডকুমেন্ট সে কিছুতেই জোয়াওদের হাতে তুলে দেবে না। এই ডকুমেন্ট তার বংশীয় আমানত। তাছাড়া এখানে এসে সে জানতে পেরেছে, এই ডকুমেন্টে যে ডায়াগ্রাম রয়েছে, সেটা অনুসরণ করে যাওয়া যাবে টেরেক স্টেটের এক স্বর্ণ ভান্ডারে। যে স্বর্ণ তার পূর্ব পুরুষ কলম্বাসের ক্যাপ্টেন সঞ্চিত করে রেখেছেন, সেটা উদ্ধার করা যাবে। এই পবিত্র সম্পদ সে কিছুতেই সন্ত্রাসীদের হাতে তুলে দেবে না। এই সম্পদ ওদেরকে দিলেও ওরা ক্রিস্টিনাকে মানুষের মত বাঁচতে দেবে না, যেমন সে নিজেকে বাঁচাতে পারেনি। পিতৃপুরুষের এই সম্পদ রক্ষার জন্যে তার জীবন দিতে হলেও দেবে। তার আগে চেষ্টা করবে আহমদ মুসার মত ভালো মানুষকে উদ্ধার করতে। আহমদ মুসার মত বিশ্ব ব্যক্তিত্ব নিজের জীবন বিপন্ন করে একজন অখ্যাত বালিকাকে বাঁচিয়েছেন। তাঁকে বাঁচাতে যদি তাদের দুই মা-বেটির জীবন কোরবানি হয়, তাতে পৃথিবীই উপকৃত হবে।

হাত ঘড়ির দিকে তাকাল লিন্ডা। রাত ১২ টা বাজে।

উঠে দাঁড়াল লিন্ডা।

ঘরের গুমোট বাতাসে হাঁপিয়ে উঠেছে সে।

ছাদের উন্মুক্ত বাতাসের জন্যে মন আকুলি-বিকুলি করে উঠল।

লিন্ডার কক্ষটি চারতলায়। সিঁড়ির পাশেই। এখানে আসার পর থেকে সুযোগ পেলেই সময়টা সে ছাদে গিয়ে কাটিয়েছে।

লিন্ডা উঠে গেল ছাদে।

ছাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বুক ভরে শ্বাস নিল লিন্ডা। মুক্ত পরিবেশ, মুক্ত আকাশ তার ভালো লাগে। এ খোলা প্রকৃতি তার বিশালত্ব ও উদারতা দিয়ে তার বুক ভরা বেদনায় শান্তির পরশ বুলায়।

ছাদের বেঞ্চিটার উপর বসল লিন্ডা।

তার চোখটা ঘুরে এল একবার চারদিক।

সমুদ্রে ভাসমান একটা টিলার উপর এই বাড়িটা। চারদিকেই পানি। অবশ্য পশ্চিম দিকে অল্প দূরেই উপকূল। সুরিনাম নদীর মোহনাতেই বলতে গেলে এই টিলাটা। সুরিনাম নদীর পলি দিয়েই গড়ে উঠেছে এটা। নদী মুখে পারামারিবো বন্দরের আলো চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে, কোলাহলও শোনা যাচ্ছে কিছু কিছু।

লিন্ডা শুনেছে, টিলার এই বাড়িটা তৈরি করেছিল সুরিনামের এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ী দ্বীপটা কিনে নিয়ে। কিন্তু চোরাচালান আর সন্ত্রাসীদের অত্যাচারে সে টিকতে পারেনি। বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে। এখন এটা মাফিয়া চক্রের রাজধানী। কিনিক কোবরা কয়েকদিনের জন্যে এটা নিয়েছে।

চারদিকের পরিবেশসহ বাড়িটা লিন্ডার ভাল লেগেছিল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে বাড়িটা একটা বন্দীখানা। এখান থেকে আহমদ মুসাকে কেমন করে সে পালিয়ে যেতে সাহায্য করবে?

লিন্ডা লোরেন আবার তার ঘড়ির দিকে তাকাল। রাত সোয়া ১২টা।

উঠল বেঞ্চি থেকে। নেমে এল তার ঘরে আবার।

দ্রুত পড়ে নিল ক্যাবারে ড্যান্সারের মত সেক্সী পোশাক। তাকে নির্লজ্জ মাতাল ক্যাবারে ড্যান্সারের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে, তা না হলে আহমদ মুসার কাছে পৌঁছানো যাবে না।

কাপড় পড়ে তার সেতারের পকেট থেকে বের করল ছোট্ট একটা রিভলবার এবং তা গুজে রাখল ঘাড়ের সাথে লেগে থাকা আস্তিনের একটা পকেটে।

প্রস্তুত হয়ে পার্টিশন ডোর দিয়ে প্রবেশ করল পাশের কক্ষে। সে ঘরে একটা বেডে অঘোরে ঘুমুচ্ছে ক্রিস্টিনা।

বেডের উপর ঝুঁকে পড়ে একটা চুমু খেল ক্রিস্টিনাকে।

ঘর থেকে বেরিয়ে এল লিন্ডা।

দাঁড়াল করিডোরে।

কি করতে হবে তা আরেক বার তাকে ঠিক করে নিতে হবে।

আহমদ মুসাকে রাখা হয়েছে আন্ডারগ্রাউন্ড ফ্লোরের একটা রুমে।

দোতলার সিঁড়ির পাশের একটি কক্ষে রয়েছে আন্ডারগ্রাউন্ডে নামার সিঁড়ি। জোয়াও লেগার্ট স্বয়ং থাকে ঐ কক্ষটিতে।

দোতলা থেকে একতলা পর্যন্ত রয়েছে টাইট নিরাপত্তার ব্যবস্থা। দোতলার সিঁড়ির মুখে এবং জোয়াও লেগার্টের কক্ষের দরজায় দুজন করে চারজনের সার্বক্ষণিক পাহারা সে দেখেছে। এক তলায় নিরাপত্তার কি ব্যবস্থা রয়েছে তা সে জানে না। তবে জোয়াও লেগার্টের কাছে সে শুনেছে, এখান থেকে যেই পালাতে চেষ্টা করুক মারা পড়বে। কেন মারা পড়বে তা সে জানতে পারেনি।

এসব চিন্তা করতে করতে তার মাথাটা ভারী হয়ে উঠল।

কিন্তু পরক্ষণেই সে মাথা সোজা করে দাঁড়াল। সব চিন্তা সে ছুড়ে ফেলল মাথা থেকে। সে ভাবল, এসব তার ভাবনা নয়। তার লক্ষ্য আহমদ মুসাকে মুক্ত করা। তারপর যা ঘটার ঘটবে।

চারতলা থেকে নামার সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল লিন্ডা লোরেন।

অভিনয় শুরু করল। টলতে টলতে নামছে সে। মুখে তার অসংলগ্ন কথা।

দেখলেই মনে হবে মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে লিন্ডা লোরেন।

দোতলার ল্যান্ডিং-এ নামল সে টলতে টলতে।

নেমেই সে দেখতে পেল এক তলায় নামার সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে দুজন প্রহরী।

মাথাটা একদিকে ঝুঁকিয়ে টলায়মান অবস্থায় থমকে দাঁড়াল লিন্ডা লোরেন। তারপর বলল ওদেরকে লক্ষ্য করে মাতালের মত জড়িত ভাষায়, ‘এই তোরা কি করছিস এখানে! জোয়াও কোথায়? কোথায় আমার ডারলিং?’

বলে ওদের দিকে এগুলো।

প্রহরী দুজন দু’ধাপ পিছিয়ে সিঁড়ির একেবারে মুখে গিয়ে দাঁড়াল। তাদের চোখে বিস্ময় ও সম্ভ্রমের দৃষ্টি। তারা জানে, লিন্ডা তাদের বস এর খাস লোক। বস তাকে মানিয়ে চলে।

তার কোন অসুবিধা বস হতে দেয় না।

একজন প্রহরী সংকুচিতভাবে সম্ভ্রম জড়িত কণ্ঠে বলল, ‘ম্যাডাম, বস বাইরে গেছেন।’

‘তোরা সব মিথ্যাবাদী। এইতো জোয়াও আমাকে আসতে বলল।’ বলে লিন্ডা প্রহরীদের থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে জোয়াও-এর ঘরের দিকে চলল।

জোয়াও-এর ঘরের সামনেও ছিল দুজন প্রহরী।

লিন্ডা টলতে টলতে বলল, ‘তোরা এখানে কি করছিস? তোদের ষড়যন্ত্র সব বলে দেব জোয়াওকে। যা দুর হ।’

বলে সাতার কাটার মত কষ্ট করে এগুতে লাগল দরজার দিকে।

দরজার দুজন প্রহরী স্তম্ভিত ও ভীত। একজন কিছুটা এগিয়ে লিন্ডাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে বলল, ‘ম্যাডাম, দরজা বন্ধ। বস দরজা লক করে বাইরে গেছেন। আপনি......।’

লিন্ডা চলা অব্যাহত রেখে মুখ ঘুরিয়ে জড়িত কণ্ঠে বলল, ‘চুপ, একটা কথাও নয়। জোয়াও তোদের আস্ত রাখবে না।’

দরজায় পৌঁছে গেছে লিন্ডা।

ধাক্কা দিল দরজায়। বন্ধ দরজা।

মাতাল কণ্ঠে লিন্ডা বলে উঠল, ‘জোয়াও ডার্লিং, দরজা খোল। আমি তোমার কাছে এসেছি।’

কথা শেষ করে পরক্ষণেই বলে উঠল, ‘কি জোয়াও দরজা খুলবে না। ঘুমিয়ে গেছ? আমার সাথে রসিকতা?’

বলে লিন্ডা পকেট থেকে তার দ্বিতীয় রিভলবার বের করে নিয়ে মাতাল –কম্পিত হাতে রিভলবারের নল অতিকষ্টে দরজার কিহোলে লাগিয়ে গুলী করল।

দরজার লক গুড়ো হয়ে গেল।

দরজা ফাঁক করল লিন্ডা। বলে উঠল, ‘তুমি কোথায়? আমার খুব ঘুম পাচ্ছে।’

বলে দু’ধাপ ভেতরে এগিয়ে পেছনে না ঘুরেই দরজা বন্ধ করে দিল এবং বলে উঠল। ‘কোথায় তুমি, আমি ঘুমাব, আমি ঘু..মা....ব।’

কথা শেষে লিন্ডা সোজা হয়ে দাঁড়াল। ঘুরে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে দরজার উপর ও নিচের দুটি ছিটকিনিই লাগিয়ে দিল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে রিভলবারটা পকেটে রেখে এগুল ঘরের একমাত্র আলমারিটার দিকে। সে জোয়াও-এর কাছ থেকেই শুনেছে এই ঘর থেকেই আন্ডারগ্রাউন্ডে নামবার সিঁড়ি আছে। ঘরের মেঝেতে এমন কোন সিঁড়ি সে দেখেনি। নিশ্চয় তাহলে সিঁড়িটা আলমারির ভিতর থেকে নিচে নেমে গেছে।

আলামারির সামনে গিয়ে দাঁড়াল লিন্ডা। হাত ঘুরিয়ে আলমারি খোলার চেষ্টা করল।

আলমারি বন্ধ।

আবার রিভলবার বের করল।

আলমারির কিহোলে রিভলবারের নল লাগিয়ে গুলী করল।

খুলে গেল আলমারি।

আলমারি খুলে ভেতরে তাকিয়ে একেবারে চুপসে গেল লিন্ডা। আলমারি থেকে সিঁড়ি জাতীয় কিছু নেই। ফাঁকা আলমারি। আলামারিতে কোন তাকও নেই। দেখতে ঠিক ওয়ানম্যান মিনি লিফট রুমের মত। আলমারির তলায় শুধু একটা মিনি মেশিনগান 'উজি' ও তার সাথে কয়েকটা ম্যাগাজিন পড়ে আছে মাত্র।

উদ্বিগ্ন হলো লিন্ডা। তার হাতে সময় বেশি নেই। সাধারণত সে শেষ রাতে ফিরলেও কোন সময় যে সে এসে পড়বে তার ঠিক নেই।

লিন্ডা আলমারির পাল্লা লাগিয়ে সরে এল। নজর বুলাল গোটা মেঝের উপর। খাটের তলাসহ সবটা মেঝে সে পরীক্ষা করল। মিনি মেশিনগান 'উজি'র বাঁট দিয়ে টোকা দিয়ে দেখল দেয়ালও। না সন্দেহ করার মত কিছুই সে পেল না।

দাঁড়াল সে মেঝের মাঝখানে।

ঘড়ির দিকে তাকাল লিন্ডা। রাত পৌনে একটা বাজে।

আতংক, ক্লান্তি এসে তাকে ঘিরে ধরল। ঘাম ঝরে পড়তে লাগল কপাল থেকে।

আকুলি-বিকুলি করে উঠল তার মন। তাহলে কি সে ব্যর্থ হয়ে যাবে? এ ব্যর্থতার অর্থ আহমদ মুসা, সে এবং ক্রিস্টিনা সবারই জীবন যাবে। আর সফল হলে অন্তত আহমদ মুসার মত একজন ভালো লোক বেঁচে যাবে।

মনটাকে আবার শক্ত করল লিন্ডা।

সিঁড়ি খোঁজার জন্যে আবার মরিয়া হয়ে উঠল সে।

আলমারির পাশের দেয়াল পরীক্ষা করতে গিয়ে হঠাত্ তার নজরে পড়ল, আলমারিটা দেয়ালের ভেতর সেঁটে যাওয়া। এমন কেন? পরক্ষণেই তার মনে হলো, আলমারির পিছনটা সিঁড়ি মুখের দরজা হতে পারে।

ভাবনাটা মাথায় আসতেই ছুটল লিন্ডা আলমারির দিকে। পাল্লা খুলে ফেলল আলমারির। ডান হাত বাড়িয়ে চাপ দিল আলমারির পেছনটায়। না, নড়ার কথা নেই, বেশ শক্ত। মনে মনে কথাগুলো আওড়াল লিন্ডা। আলমারির পেছনটায় চাপ দিতে গিয়ে লিন্ডা একটা জিনিস খেয়াল করল, আলমারির পেছনের পাল্লাটার তিন দিকে ওয়েল্ডিং করে আলমারির সাথে আটকে দেয়া নেই। তার উপর সে দেখল পেছন পাল্লার ডানদিকের উপর-নিচ লম্বা-লম্বি প্রান্তটা কব্জা দিয়ে আলমারির সাথে আটকানো। অর্থাত্ এটা সিড়িঁর মুখের দরজা নি:সন্দেহে বুঝল লিন্ডা।

কিন্তু দরজাটা খুলবে কিভাবে?

ছিটকিনি, হাতল অথবা বৈদ্যুতিক বোতামের সন্ধানে প্রতিটি ইঞ্চি স্থানে নজর বুলাল লিন্ডা। কিন্তু কিছুই পেলনা। হাত দিয়ে আবার ধাক্কা-ধাক্কি করল। কিন্তু অনড় দরজা।

আবার হতাশা এসে ঘিরে ধরল লিন্ডাকে। দরজা খুলতে না পারলে তো সব চেষ্টাই তার বৃথা যাবে। তার ও ক্রিস্টিনার জীবন যাবে, কিন্তু এ জীবন দান কোন কাজে আসবে না।

অস্থির হয়ে পড়ল লিন্ডা।

এ সময় ঘরের দরজার বাইরে থেকে জোয়াও-এর গলা শোনা গেল। লিন্ডাকে ডাকছে সে।

কয়েকটা ডাকের পর লিন্ডার সাড়া না পেয়ে দরজায় করাঘাত করতে লাগল।

জোয়াও-এর কণ্ঠ শুনেই লিন্ডার গোটা শরীর উদ্বেগ-আতংকে অসাড় হয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে। সাজানো দুনিয়া তার কাছে উলট-পালট হয়ে গেল। জোয়াও-এর কণ্ঠকে তার আজরাঈলের কণ্ঠ বলে মনে হচ্ছে।

দরজার ধাক্কা বেড়ে গেল।

এবার লাথি পড়ছে দরজায়।

লিন্ডার বুঝতে বাকি রইলনা এখনি দরজা ওরা ভেঙে ফেলবে। কি করবে লিন্ডা এখন?

লিন্ডা আতংকের সাথে দেখল দরজার নিচের ছিটকিনি ভেঙে খসে পড়েছে। উপরেরটাও এখনি ভেঙে পড়বে। লিন্ডা তখনও দাঁড়িয়ে আলমারির ভেতর। সে আর কোন দিশা না পেয়ে আলমারির দরজা লাগিয়ে দিল। দেখল, আলমারির দরজার ভেতর দিকে উপরে ও নিচে দুটি ছিটকিনি আছে।

লিন্ডার মনে হল স্বয়ং ঈশ্বর যেন ছিটকিনি তার জন্যেই এইমাত্র তৈরী করে দিলেন।

লিন্ডা ত্বরিত হাত চালিয়ে আলমারির দরজার দুটি ছিটকিনিই লাগিয়ে দিল।

ছিটকিনি বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে গেল অভাবনীয় ঘটনাটা। আলমারির পেছনের স্টিলের পাল্লাটা খুলে গেল।

লিন্ডা পিছনের ক্লিক শব্দে পেছন ফিরে দেখল। স্তম্ভিত হয়ে গেল সে। তার সামনে আলোকজ্জ্বল সিঁড়ি।

তার বিস্ময় পরক্ষণেই আনন্দে রুপান্তরিত হলো।

পেছনে ঘরের ভেতর ভীষণ শব্দে কি যেন ভেঙে পড়ল। নিশ্চয় ঘরের দরজা ভেঙে পড়েছে, ভাবল লিন্ডা। আতংকিত হয়ে উঠল সে। এক হাতে 'উজি' কারবাইন, অন্য হাতে রিভলবার নিয়ে দৌড় দিল সিঁড়ি পথে।

সিঁড়ি গিয়ে শেষ হয়েছে লাউঞ্জ ধরনের একটা হলঘরে। প্রায় চারদিক ঘিরেই ঘর।

চারদিকে তাকিয়ে নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করে বসল লিন্ডা, কোথায় বন্দী আহমদ মুসা? সময় তো বেশি নেই। এখনি জোয়াও আলমারির দরজা ভেঙে ফেলবে। তারপর যা ঘটবে, তা কল্পনাও করতে পারে না সে। সবাই তারা বেঘোরে মারা পড়বে। বাঁচতে হলে আহমদ মুসাকে বাঁচাতে হবে, জোয়াও আসার আগে আহমদ মুসাকে মুক্ত করতে হবে।

কিন্তু কিভাবে তাকে মুক্ত করব? সব ঘর খোঁজা তার পক্ষে সম্ভব?

প্রচন্ড শব্দ এল উপর থেকে।

ওরা আলমারির দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে।

বিমূঢ় হয়ে পড়ল লিন্ডা। সে ব্যাকুল কণ্ঠে চিতকার করতে লাগল, 'মি আহমদ মুসা আপনি কোথায়?'

এ সময় সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়ানো লিন্ডার ঠিক নাক বরাবর সামনে লাউঞ্জের ওপারের একটি কক্ষের দরজা থেকে শব্দ এল। লিন্ডা ছুটল সে দরজার দিকে নিশ্চয় আহমদ মুসাই তার ডাকে সাড়া দিয়েছে।

দাঁড়াল দরজার সামনে।

দরজাটি মজবুত কাঠের। তাতে ইস্পাতের শীট বসানো।

লিন্ডা দরজার কিহোলে রিভলবারের নল লাগিয়ে গুলী করল। একবার নয়, দুবার। আতংকিত লিন্ডার বুদ্ধি-জ্ঞান হারিয়ে যাবার দশা।

আলমারিতে ধাক্কানো বন্ধ হয়ে গেছে। সিঁড়ির মাথার দিক থেকে শব্দ আসছে। ঢুকে পড়েছে জোয়াওরা।

লিন্ডার গুলীর তোড়েই দরজার লক ভেঙে দরজা খুলে গেছে। লিন্ডার চোখে পড়ল দরজার বাঁ দিকের দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে আছে আহমদ মুসা তার হাতে পায়ে লোহার কড়া পরানো।

লিন্ডা দ্রুত কিছু বলতে যাচ্ছিল আহমদ মুসাকে। কিন্তু মুখ খুললেও তা থেকে শব্দ বেরুল না। পেছন থেকে গর্জে উঠেছে জোয়াও-এর কণ্ঠ, 'লিন্ডা আর এক ইঞ্চিও এগিয়ো না। হাত থেকে অস্ত্র-ফেলে দাও। হাত উপরে তোল।'

লিন্ডার বাম হাতে 'উজি' এবং ডান হাতে ছিল রিভলবার।

লিন্ডা জোয়াও-এর নির্দেশের সাথে সাথেই দুহাত থেকে অস্ত্র ছেড়ে দিল। কিন্তু 'উজি' মিনি মেশিনগানটাকে সে আর একটু বাঁ দিকে ছুঁড়ে দিল। যাতে অস্ত্রটা দরজার একটু আড়াল হয় এবং সেটা আহমদ মুসা পায়।

অস্ত্র ফেলে দিয়ে দুহাত উপরে তুলেছে লিন্ডা।

পেছন থেকে জোয়াও-এর কণ্ঠ আবার দ্রুত ধ্বনিত হলো, 'ডোমান তাড়াতাড়ি যাও অস্ত্রগুলো কুড়িয়ে নাও।'

ডোমান আসা শুরু করল।

লিন্ডা দুহাত উপরে রেখেই ঘুরে দাঁড়াল। তার ভেতরে তখন ঝড় বইছে। সবই তো শেষ হয়ে যাচ্ছে। এখন শেষ চেষ্টা করেই সে মরবে।

লিন্ডার মাথার উপরে তোলা দু হাত কান বরাবর নেমে এসেছে। তার হাত থেকে ঘাড়ের আস্তিনে গুঁজে রাখা রিভলবারের বাটের দূরত্ব তিন ইঞ্চির বেশি হবে না।

ওদিকে আহমদ মুসা গুটি গুটি এগিয়ে এসে বসে পড়েছে মেঝেয়। হ্যান্ডকাফে বাধা দু হাত এগিয়ে নিচ্ছে সে 'উজি' কারবাইনটার দিকে। সে বুঝেছে লিন্ডা তার জন্যেই অস্ত্রটাকে তার দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে। মনে মনে লিন্ডার বুদ্ধির প্রশংসা করল আহমদ মুসা এবং ঠিক করল যা করবার ডোমান লোকটা আসার আগেই করতে হবে।

লিন্ডা ঘুরতেই জোয়াও বলে উঠল, 'লিন্ডা পেছন ফিরেই থাকো, মুখটা দেখাতে লজ্জা...।' কথা শেষ করতে পারল না জোয়াও। লিন্ডার ডান হাতে উঠে এসেছে আস্তিনে গুজে রাখা রিভলবার এবং চোখের পলকে তা থেকে ছুটে যাওয়া গুলী গিয়ে বিদ্ধ করল জোয়াও-এর ডান কাঁধের প্রান্তের ডান বাহুর সন্ধিস্থলকে।

আহমদ মুসার দুহাতে উঠে এসেছিল 'উজি'টা।

লিন্ডার গুলীর প্রায় সাথে সাথেই আহমদ মুসার উজিটাও গর্জন করে উঠল এবং এক ঝাঁক গুলী গিয়ে ডোমান, জোয়াও এবং সিড়ির গোড়ায় দাড়ানো তিনজনকে ঘিরে ধরল।

পাঁচটি দেহই ভুলুণ্ঠিত হলো।

ঘুরে দাঁড়াল লিন্ডা। বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, 'ধন্যবাদ মি. আহমদ মুসা। একবার মেয়েকে রক্ষা করেছিলেন, এবার আমাকে রক্ষা করলেন।'

'ধন্যবাদ আমিই তো আপনাকে দেব। আপনিই ...।'

কথা শেষ করতে পারলো না আহমদ মুসা। লিন্ডা তার কথায় বাধা দিয়ে বলল, 'আপনার হাত-পায়ের লোহার কড়া এখন কিভাবে খুলব বলুন। নিচের লোকরা উপরে এসে পড়তে পারে।'

'আপনার রিভলবার দিযে কড়া দুটোর লক-এ গুলী করুন।' বলল আহমদ মুসা।

সঙ্গে সঙ্গে লিন্ডা হাতের রিভলবার তুলে গুলী করল লকের কিহোল দুটোর উপর।

খুলে গেল আহমদ মুসার হাত-পায়ের কড়া।

আহমদ মুসার হাতেই ছিল 'উজি'টা, উঠে দাঁড়াল সে।

লিন্ডা চলতে শুরু করে বলল, 'আসুন মি. আহমদ মুসা।'

লিন্ডা জোয়াও-এর পাশে গিয়ে থমকে দাঁড়াল।

জোয়াও-এর কাধে একটা গুলী লেগেছে। এছাড়া আরও দুটি গুলী লেগেছে। একটা পাঁজরে, অন্যটি বাম বাহুতে।

বলল লিন্ডা তাকে লক্ষ্য করে, 'তোমাকে মারতে চাইনি এবং মারব না জোয়াও। তোমার হাতে গুলী করেছিলাম লেগেছে কাঁধে। তুমি এভাবে গুরুতর আহত হবার জন্যে আমি দু:খিত। তোমার লোকদের বলছি তোমাকে হাসপাতালে নিতে।'

বলে হাঁটতে শুরু করেই আবার থমকে দাঁড়াল লিন্ডা। বলল, 'তুমি আমাকে এবং আমার ক্রিস্টিনাকে হত্যা করতে চাইবে। আমি আর মৃত্যুকে ভয় করি না। বিদেশী একজন ভালো মানুষ আহমদ মুসাকে মুক্ত করতে পেরে আমি খুশি এবং এইভাবে আমার পিতৃপুরুষের পবিত্র সম্পদ তোমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারলে আমি খুশি হবো।'

কথা শেষ করেই আবার হাঁটতে শুরু করল লিন্ডা।

তার পেছনে পেছনে চলল আহমদ মুসা। উঠে এল তারা দু'তলার বারান্দায়।

বলল লিন্ডা আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, 'নিচে এদের আরও কিছু লোক আছে। তাদের সাফ করতে পারলেই আপনি ঘাটে পৌঁছবেন। সেখানে একাধিক বোট আছে। আমি কি ...।'

লিন্ডার কথার মাঝখানে আহমদ মুসা বলে উঠল, 'না আরও কিছু আছে নিচে। এদের একদল শিকারী কুকুর আছে, যারা বন্দুকধারী লোকদের চেয়েও বেশি বিপজ্জনক। এছাড়া পাতা আছে বিদ্যুতের ফাঁদ।

লিন্ডা আহমদ মুসার খালি পায়ের দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল, 'আহমদ মুসা অবশ্যই সব কিছু জানবেন, সেটাই স্বাভাবিক। আমি আপনাকে রাবার সোলের এক জোড়া জুতা দিচ্ছি। সেটা পায়ে থাকলে বিদ্যুতের ফাঁদ কোন কাজে আসবে না। ওরা বন্দীদের খালি পায়ে এ জন্যেই রাখে যাতে বন্দী পালালে খালি পায়ে পালাতে বাধ্য হয়।'

কথাটুকু শেষ করে একটু দম নিয়েই আবার বলে উঠল, 'কুকুরগুলো আমাকে চেনে। ওদের ভয় নেই। ওদের পার করে দিয়ে আসব আমি আপনাকে।'

'আসব মানে, আপনি যাবেন না আমার সাথে?'

'কোথায় যাব?'

'আপাতত আমার সাথে বের হবেন। জোয়াও তো এখনি আপনাকে ও আপনার মেয়েকে মেরে ফেলবে।' আহমদ মুসা বলল। 'কোথাও গিয়েই আমি জোয়াও এর হাত থেকে বাঁচতে পারব না। ওদের কিনিক কোবরা'র হাত থেকে কারও নিস্তার নাই। সুতরাং আমি পালিয়ে কারও আশ্রয়ে গিয়ে আরো অনেককে বিপদগ্রস্ত করতে চাই না।' থামল একটু।

কিন্তু আহমদ মুসা কথা শুরু করার আগেই আবার বলে উঠল, 'একটু দাঁড়ান, আমি আপনাকে জুতা এনে দেই।'

বলেই ছুটল জোয়াও-এর পাশের ঘরে। সেখান থেকে একটা কেটস এনে আহমদ মুসাকে দিল। বলল, 'পরে নিন।'

আহমদ মুসার জুতা পরা হলে বলল, ‘চলুন আপনাকে কুকুর বাহিনীর রাজত্ব পার করে দিয়ে আসি।’

‘না আপনি আসবেন না, আমার সাথে যেতে হবে আপনাকে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমি কি বলেছি বুঝেছেন তো?’ বলল লিন্ডা।

‘বুঝেই বলছি। আপনাকে মৃত্যুর মুখে ফেলে আমি যাবনা। এই আমি বসলাম।’ বলেই সত্যিই বসে পড়ল আহমদ মুসা।

একটু বিব্রত হলো লিন্ডা। একটু ভাবল। তারপর বলল, ‘আপনি নিজে বিদেশী। আপনি দয়া করে বিপদ বাড়াবেন না। আমার ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দিন।’

‘ঠিক আছে, তাহলে আমি সাথেই থাকছি। কি হয় সেটা দেখেই আমি যাব।’ আহমদ মুসা বলল।

‘প্লিজ দয়া করে আমার সাথে আপনাকে জড়াবেন না। আমি জানি আপনার জীবন অনেক মূল্যবান। দুনিয়ার অনেক কাজ হবে আপনাকে দিয়ে।’ বলল লিন্ডা।

‘আমার এই মুহূর্তের কাজ হলো, আপনাকে এবং ক্রিস্টিনাকে রক্ষা করা। সুতরাং আমাকে আপনাদের সাথেই থাকতে হবে।’ আহমদ মুসা বলল।

লিন্ডা চোখ তুলে আহমদ মুসার দিকে একবার তাকাল। বুঝল, আহমদ মুসা যা বলছে তাই করবে। বলল, ‘ঠিক আছে। আপনি একটু দাঁড়ান আমি ক্রিস্টিনাকে নিয়ে আসি।’

বলেই সে দৌড়ে উপরে উঠতে লাগল।

আহমদ মুসা দাঁড়াল দোতলার সিঁড়ির মুখে। আহমদ মুসার মাথায় নানা চিন্তা ঘুর পাক খাচ্ছে। লিন্ডা জোয়াওকে মারতে চায় না, আবার জোয়াও-এর হাতে সে ও ক্রিস্টিনা মরবে, কোথাও গিয়ে বাঁচবেনা, এ ব্যাপারে লিন্ডা নিশ্চিত। তাহলে সে জোয়াওকে মারতে চায়না কেন? জোয়াও-এর সাথে লিন্ডার কি সম্পর্ক?

তারা অবশ্যই স্বামী-স্ত্রী নয়। তাহলে ক্রিস্টিনা কি জোয়াও-এর মেয়ে? তারা কি বন্ধু ছিল? বা এখনও আছে? লিন্ডার পিতৃপুরুষের সম্পদের বিষয়টা কি? কেন লিন্ডা জীবন দিয়েও সে সম্পদ জোয়াও-এর হাত থেকে বাঁচাতে চায়? সব সম্পদ দিয়ে হলেও সবাই নিজেকে বাঁচাতে চাইবে, এটাই তো সাধারণ প্রবণতা?

আহমদ মুসা একটু আনমনা হয়ে পড়েছিল। সিঁড়িতে পায়ের শব্দে সম্বিত ফিরে পেল সে। তাকাল সিঁড়ির দিকে। চারজন উঠে আসছে সিঁড়ি দিয়ে। তাদের চারজনের হাতে মিনি মেশিনগান ‘উজি’। একজেনর ‘উজি’ আহমদ মুসার দিকে তাক করা।

আহমদ মুসার ‘উজি’টা ঝুলছে তার হাতে।

কি করণীয় দ্রুত ভাবছে আহমদ মুসা।

এ সময় আহমদ মুসার পেছনে তিন তলার সিড়ির দিক থেকে একটা গুলীর শব্দ এল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসা চারজনের যে লোকটির ‘উজি’ আহমদ মুসার দিকে তাক করা ছিল তার হাত থেকে ‘উজি’টা ছিটকে পড়ে গেল। আর লোকটি আর্তনাদ করে উঠে তার গুলীবিদ্ধ ডান হাতটি বাঁ হাত দিয়ে চেপে ধরে বসে পড়ল।

আহমদ মুসা শব্দ শুনেই বুঝতে পেরেছিল লিন্ডা তিন তলার সিঁড়ি দিয়ে নামছে। সেই গুলী করেছে। আহমদ মুসাও এক মুহূর্ত নষ্ট করেনি। লোকটির হাত থেকে ‘উজিটি’ ছিটকে পড়ার সাথে সাথেই আহমদ মুসার ‘উজি’ উঠে এসেছিল সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসা অবশিষ্ট তিনজনের লক্ষ্যে।

আহমদ মুসা ‘উজি’র ট্রিগার চেপে ধরেছিল বেশ কয়েক সেকেন্ড। গুলি বৃষ্টি গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসা চারজনকেও ঝাঁঝরা করে দিল।

ক্রিস্টিনাকে নিয়ে নেমে এসেছে লিন্ডা।

এসে দাঁড়াল সে আহমদ মুসার পাশে।

আহমদ মুসা তার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘ধন্যবাদ লিন্ডা দ্বিতীয়বার আপনি গুলীর মুখ থেকে আমাকে বাঁচালেন। ’

‘লজ্জা দেবেন না। আপনার চোখ তো সিঁড়ির দিকে ছিল। কিন্তু ওরা উঠে আসছে তা টের পেলেন না কেন?’ বলল লিন্ডা।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘স্যরি, একটা ভাবনায় ডুবে গিয়েছিলাম।’

‘এমন জরুরী ভাবনাটা কি?’ বলল লিন্ডা।

‘বলব এক সময়, এখন আসুন, চলি।’ আহমদ মুসা বলল।

চলতে শুরু করে ক্রিস্টিনাকে লক্ষ্য করে বলল, ‘এস মা ক্রিস্টিনা।

আমাকে এবং ক্রিস্টিনাকে আগে যেতে হবে মি. আহমদ মুসা। দরজা পেরোলেই কিন্তু ছুটে আসবে কুকুর বাহিনী।’ বলে লিন্ডা ক্রিস্টিনার হাত ধরে আহমদ মুসাকে ডিঙিয়ে আগে চলতে শুরু করল।

‘নিচে কি এদের আরও লোক আছে?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘মনে হয় নেই। এত গুলী গোলার শব্দ শোনার পর কেউ বাইরে থাকার কথা নয়। ‘কিনিক কোবরা’র যারা সুরিনামে এসেছে, তাদের বেশির ভাগই থাকে মূল শহরে। জোয়াও-এর কয়জন খাস লোকই শুধু এখানে থাকে, এখানকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে।’

তারা এক তলায় নেমে এল।

এক তলায়ও কাউকে দেখা গেল না।

বাইরে বেরুবার গেটে এসে পৌঁছল তারা। গেটের বাইরে একটা ফাঁকা চত্বর। এ চত্বরটা বাড়িটাকে চারদিক থেকে ঘিরে আছে। এ চত্বরটাকেই পাহারা দেয় কুকুর বাহিনী।

চত্বরটার পর পানির ধার ঘেঁষে চারদিক জুড়ে ঘিরে আছে কাঁটাতারের বেড়া।

গেট খুলে প্রথম বেরুল লিন্ডা। তার সাথে ক্রিস্টিনা। সবশেষে আহমদ মুসা।

গেট থেকে পাথর বিছানো একটা পথ চলে গেছে ঘাট পর্যন্ত। ঘাট পাওয়ার আগে কাঠের তৈরি আরেকটা গেট পার হতে হয়। দুই দিক থেকে কাঁটাতারের বেড়া এসে রাস্তাটার দু’প্রান্তে শেষ হয়েছে। দু’প্রান্তের বেড়াকে সংযোগ করে দাঁড়িয়ে আছে গেটটা। গেটের নিচের রাস্তায় বসানো হয়েছে একটা

ইস্পাতের বড় শীট। গেটের এপ্রান্ত-ওপ্রান্ত জুড়েই রয়েছে শীটটা। গেট পার হতে হলে এই লোহার শিটে সবাইকে পা রাখতে হবে।

আহমদ মুসারা বাড়ি থেকে বের হওয়ার প্রায় সাথে সাথেই দুদিক থেকে ছুটে এল পাঁচ ছয়টা কুকুরের একটা দল। তাদের মুখে হিংস্র হুংকার। কুকুর গুলোর জ্বলন্ত চোখগুলো যেন আহমদ মুসাকে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে চায়।

আহমদ মুসা দাড়িয়েছে লিন্ডা ও ক্রিস্টিনার মাঝখানে।

লিন্ডা ও ক্রিস্টিনা দুজনেই হাত তুলে মুখে এক প্রকার শব্দ করে কুকুরগুলোকে শান্ত করার চেষ্টা করল।

লিন্ডা ও ক্রিস্টিনার কথায় কুকুরগুলো শান্ত হলো ও লেজ নাড়তে শুরু করল। নিশ্চয় কুকুরগুলো বুঝেছে আহমদ মুসা অপরিচিত হলেও অনাত্মীয় নয়।

ধীরে ধীরে ফিরে গেল কুকুরগুলো।

তিনজন এগিয়ে চলল ঘাটের দিকে।

সবার সামনে ছিল লিন্ডা।

লিন্ডা কাঠের গেটটা খুলতে খুলতে বলল, 'গেটের নিচে রাস্তার উপর এই যে আইরন শীটটা দেখছেন, তা সম্পূর্ণটাই বিদ্যুতায়িত এবং বাড়ির চারদিক ঘিরে এই যে কাঁটাতারের বেড়া দেখছেন এটাও বিদ্যুত্ বহন করছে। এই বাড়িতে আটক কোন বন্দী পালাতে গেলে ভেতরের প্রহরী ও বাইরের কুকুরের হাত থেকে কোনভাবে বাঁচলেও কাটাতারের বেড়া অথবা গেটের এই বৈদ্যুতিক ফাঁদ থেকে বাঁচতে পারবেনা।'

'কিন্তু আমি বেঁচে গেলাম। যাদের বাঁচার কথা, তারা এভাবেই বেঁচে যায়।' বলল আহমদ মুসা।

'তা ঠিক।' বলল লিন্ডা।

ঘাটে পৌঁছল তারা।

ঘাটে একটা বোট বাঁধা আছে।

বোটটি আটলান্টিকের অব্যাহত তরঙ্গ দোলায় অবিরাম দুলছে। লিন্ডা গিয়ে বোটে উঠল এবং ক্রিস্টিনাকে হাত ধরে বোটে তুলল।

আহমদ মুসা বোটে উঠতে উঠতে বলল, 'একটিই তো বোট দেখছি। আমরা নিয়ে গেলে এরা তো আটকা পড়ে যাবে।'

'না আশে-পাশে কিংবা বন্দর এলাকায় এদের আরও বোট আছে। ওগুলো কালোবাজারিতে লিপ্ত। মোবাইলে সংকেত পেলে সংগে সংগেই চলে আসবে।' বলল লিন্ডা।

'তাহলে এখনও আমরা বিপদমুক্ত নই! ওরা মোবাইল করলে বোটগুলো আমাদের ধাওয়া করতে পরে।' আহমদ মুসা বলল।

'তা পারে, যদি জোয়াও তাদের মোবাইল করতে পারে। কিন্তু জোয়াও এর কাছে মোবাইল নেই। জ্যাকেটসহ তার মোবাইলটা ছিল সিঁড়ি ঘরের বাইরের রেলিং-এ। আমি মোবাইলটা নিয়ে এসেছি।' বলল লিন্ডা।

'ধন্যবাদ আপনাকে । এ পর্যন্ত আপনার প্রত্যেকটা কাজই একজন ঝাঁনু গোয়েন্দার মত ।'

আমহদ মুসা বলল।

হাসল লিন্ডা। ম্লান হাসি। বলল, 'আমি কিনিক কোবরা'র সদস্য ছিলাম না । কিন্তু অনেক বছর থেকে তাদের দেখছি । সুতরাং কিছু তো শেখার কথা।'

'আপনি কিনিক কোবরা'র সদস্য নন, কিন্তু তারা আপনাকে তাদের কাজ দেখতে দিচ্ছে কেন?' আহমদ মুসা বলল।

ম্লান হয়ে গেল লিন্ডার মুখ।

কিছু বলতে যাচ্ছিল লিন্ডা, কিন্তু তার আগেই ক্রিস্টিনা বলল, 'ঘুম পাচ্ছে আম্মা আমার ।'

ব্যস্ত হয়ে উঠল লিন্ডা। বলল, 'মি. আহমদ মুসা আমি আসছি ওকে শুইয়ে দিয়ে।'

বলে ক্রিস্টিনাকে নিয়ে দোতলার কেবিনে উঠার জন্যে অগ্রসর হলো লিন্ডা।

'ঠিক আছে আপনি আসুন। আমি ততক্ষণে বোট স্টার্ট দিয়ে দেই।'

বলে আহমদ মুসাও এগুলো বোটের ইঞ্জিনের দিকে।

মিনিট পাঁচেক পর ফিরে এল লিন্ডা । বসল সে আহমদ মুসার ড্রাইভিং চেয়ারের পাশের চেয়ারটায়।

লিন্ডা বসতেই আহমদ মুসা বলে উঠল, 'আপনি ক্রিস্টিনাকে আনতে গেলে দোতলার সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আমি আপনার কথাই ভাবছিলাম।'

'কি ভাবছিলেন?' ম্লান কণ্ঠ লিন্ডার।

'আমি ভাবছিলাম, আপনি সুযোগ পেয়েও জোয়াও কে মারলেন না, অথচ জোয়াও আপনাকে ও ক্রিস্টিনাকে মেরে ফেলবে, এটা আপনি নিশ্চিতভাবে জানেন। আপনাকে আমি বলতে শুনেছি আপনার পিতৃপুরুষের পবিত্র সম্পদ তার হাত থেকে রক্ষা করতে চান। আপনার সাথে জোয়াও-এর সম্পর্কটা কি? আপনার পিতৃপুরুষের সম্পদ পবিত্রই বা হলো কি করে? এসব প্রশ্নই আমার মাথায় তখন কিলবিল করছিল।'

প্রায় এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে গেল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা থামলেও কথা বলল না লিন্ডা। তার মুখ নিচু এবং ম্লান। ভাবছিল সে। একটু পর মুখ তুলল লিন্ডা। বলল, 'প্রশ্নগুলোর উত্তর অনেক কাহিনীর সাথে জড়িত। এক অখ্যাত-অজ্ঞাত ভাগ্যাহত মহিলার সে কাহিনী আপনার শুনে কি লাভ!'

'কি লাভ হবে আমি জানি না। কিন্তু জোয়াও-এর কারাগার থেকে আপনার দ্বারা মুক্তি লাভের মাধ্যমে যে লাভ আমি পেয়েছি, তাতে এ জিজ্ঞাসার জবাব আমার জানা দরকার।'

আহমদ মুসা বলল।

'আপনি আমাকে দয়া করতে চান, তাই না?' বলল লিন্ডা।

'হ্যাঁ। কারণ আপনি আমাকে দয়া করেছেন।' আহমদ মুসা বলল।

উত্তরে কিছু বলল না লিন্ডা।

মুখ নিচু করে চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। একটু পর মুখ তুলল। তাকাল আহমদ মুসার দিকে। লজ্জামিশ্রিত এক টুকরো ম্লান হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটে। বলতে শুরু করল, 'আমার পুরো নাম লিন্ডা লোরেন। আমরা ও জোয়াও লেগার্টরা গুয়েতেমালার রাজধানী গুয়েতেমালা শহরের এক অভিজাত এলাকায় প্রতিবেশী

ছিলাম। আমার আব্বা ছিলেন জাতি-সংঘের একটা এজেন্সীর কর্মকর্তা, আর জোয়াও লেগার্টের আব্বা ছিলেন একজন ধনী রাজনীতিক। আমরা একই স্কুলে পড়তাম। আমরা খুব ঘনিষ্ঠ ছিলাম। পরে আমি উচ্চতর লেখাপড়ার জন্যে চলে যাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় এবং অবশেষে পেশা হিসবে বিমান বালার চাকুরী গ্রহণ করি সেন্ট্রাল আমেরিকান এয়ার লাইন্সে। আমি বিমানবালা হিসেবে খুব সফল হই দীর্ঘদেহী ও একটু ভিন্নতর চেহারা হওয়ার কারণেই। একজন পাইলটকে বিয়ে করি। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রিস্ট্রিনা হওয়ার কিছুদিন পর আমার স্বামী বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান। আমি ফিরে আসি গুয়েতেমালায় বাবার কছে। তখন তিনি জাতিসংঘের চাকুরী থেকে অবসর নিয়ে গুয়েতেমালার স্থায়ী বাসিন্দা হয়েয়েছন। আমি গুয়েতেমালায় আসার পর জোয়াও লেগার্টের সাথে ঘনঘন দেখা হওয়া শুরু হয়। আগের সেই সম্পর্ক আবার ফিরে আসে। অনেক দিন পর বুঝতে পারি এই জোয়াও লেগার্ট আগের জোয়াও লেগার্ট নয়। তার পিতার রাজনৈতিক বিপর্যয়ের পর তার স্নেহময় সৎ রাজনীতিক পিতার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে সে যোগ দেয় এক সন্ত্রাসী দলে। যখন আমি এ বিষয়টা জানতে পারি, তখন সে সন্ত্রাসী দল 'কিনিক কোবরা'র এক নম্বর নেতা।' তখন আমার আব্বা মারা গেছেন। অসহায় আমি তখন । সব জেনেও আমি জোয়াও লেগার্টের কাছ থেকে সরে যেতে পারিনি। জোয়াও তা হতে দেয়নি। ক্রিস্টিনার নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে এবং তার বড় হবার অপেক্ষায় আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে কোরবানী দেই। সবশেষে আমাদের পবিত্র সম্পদ হস্তগত করার সে চেষ্টা করে, তাতে রাজী না হলে আমাদের দুই মা-বেটিকে হত্যা করার সে সিদ্ধান্ত নেয় এবং এজন্যে সে আমাকে ও আমার মেয়েকে গুয়েতেমালা থেকে সুরিনামে নিয়ে এসেছে। আর....।'

'সুরিনামে কেন?' লিন্ডার কথার মাঝখানে বলে উঠল আহমদ মুসা।

'তাদের কথায় 'অমূল্য সেই সম্পদ' সুরিনামে আমার পিতৃপুরুষের ভিটার তলায় লুকায়িত আছে।' বলল লিন্ডা।

'পিতৃপুরুষের ভিটা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'আমি ঠিক জানিনা, দলিলেই নাকি সব লেখা আছে। দলিলটা আমি ঠিক বুঝিনা। কৌতূহল বশে জোয়াও ওটা আমার কাছে থেকে নিয়ে অন্য কারো কাছ থেকে পড়িয়ে নেয়। তখন কিন্তু জোয়াও দলিলগুলোকে গুরুত্ব দেয়নি।' কিন্তু রঙ্গলালদের এ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে সুরিনাম আসার পর কি ঘটল আমি জানি না। হঠাৎ করে গুয়েতেমালায় ফিরে যায় এবং দলিলগুলো আমার কাছ থেকে নিতে চায়। তার উদ্দেশ্য নিয়ে আমার সন্দেহ হয়। তাছাড়া দলিলগুলো পিতার পবিত্র আমানত আমার কাছে। সেই আমানত আমি একজন সন্ত্রাসী নেতার হাতে দেব কেন? অথচ দেব না বলে রক্ষা পাওয়াও মুশকিল। অবশেষে আমি মিথ্যা বলি। তাকে জানাই যে, আমি যখন কিছু দিন আগে সুরিনাম গিয়েছিলাম ইউনেস্কোর এক সম্মেলনে তখন দলিলগুলো নিয়ে গিয়েছিলাম একজন পুরাতত্ত্ববিদকে দেখাবার জন্যে। ওখানেই এক বিশ্বস্ত স্থানে রেখে এসেছি। সে আমার কথায় সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে এবং ভীষণ রেগে যায়। সে ভাবে, আমি দলিলগুলো নিয়ে কোন মতলব আঁটছি। সঙ্গে সঙ্গেই সে আমাকে ও ক্রিস্টিনাকে সুরিনাম নিয়ে আসে জোর করে এবং তখন থেকেই দলিলগুলো হাত করার জন্যে মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আগে আমি বুঝিনি দলিলগুলো সে কেন চায়। কিন্তু সুরিনাম এসে ধীরে ধীরে জানতে পারলাম, দলিলগুলোর মধ্যে ডায়াগ্রাম ও দিকনির্দেশনা আছে যা অনুসরণ করে আমার পিতৃপুরুষের রাখা বিশাল সম্পদ মাটির তলা থেকে তুলে আনা যাবে। এটা জানার পর আমি আরও শক্ত হয়ে যাই এবং জীবন গেলেও পবিত্র ঐ পৈত্রিক সম্পদ তার মত সন্ত্রাসীর হাতে যেতে দেবনা, এই সিদ্ধান্ত নেই।'

'আপনার পৈত্রিক সম্পত্তি সুরিনামে কেন?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'এর সবটুকু উত্তর আমার জানা নেই। তবু এটুকু বলতে পারি, আমি শুনেছি আমার গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার ছাত্র জীবনে সুরিনাম থেকে সান্টো ডোমিংগোতে চলে আসেন এবং সেখানেই স্থায়ী নিবাস গড়েন। দাদাও সান্টো ডোমিংগোতে বাস করেন। আব্বা লেখা-পড়া করেন ফ্লোরিডায়। সেখান থেকেই জাতিসংঘ সংস্থায় চাকুরী নিয়ে আসেন গুয়েতেমালায়। দাদার মৃত্যুর পর আব্বা গুয়েতেমালাতেই স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। আব্বা দলিলগুলো পেয়েছিলেন দাদার কাছ থেকে। আব্বা এগুলো আমাকে দিয়ে যান। তিনি সুরিনামে আমাদের

পুর্বপুরুষ ও আত্মীয়স্বজন সম্পর্কে তেমন কিছু জানতেন না। শুধু বলতেন দাদার কাছে তিনি শুনেছেন সুরিনামে ছিল তাদের বিরাট ও প্রাচীন পরিবার। রাজধানী পারামারিবো নাকি তাদেরই গড়া। যখন তাদের সুদিন ছিল, তখন তাদের বাড়িই প্রায় একটা শহর ছিল। দাদা কোনদিন যান নি। তবে আব্বা সুরিনামে তার পরিবারের জন্য গর্ব করতেন। এই গর্ব আমাদের মধ্যেও আছে। সুরিনামে এলে মন আকুলি-বিকুলি করে পরিবারের সন্ধান করার জন্যে। কিন্তু কিছুই তো জানি না এখানকার পরিবার সম্পর্কে।

'দলিলে কিছু নেই এ সম্পর্কে?' আহমদ মুসা বলল।

'দলিল আমি পড়িনি। দলিলটা ইংরেজি ভাষায় নয়।'

'তাহলে কি সুরিনামের ভাষায়?'

'তাও নয়।'

'তাহলে কি ভাষায়?'

'আব্বাও পড়তে পারতেন না বলে আমিও কোনদিন ভাল করে দেখার চেষ্টা করিনি।' বলল লিন্ডা।

'দলিলটা কোথায়? আমাকে কি দেখানো যাবে?' আহমদ মুসা বলল।

'আপনাকে দেখাতে না পারলে দুনিয়ার কাউকে আর দেখানো যাবে না।' বলল লিন্ডা।

'এই বিশ্বাসের কারণ?'

'কারণ অনেকগুলো। একটি হল, জীবনের প্রতি আপনার কোন লোভ নেই। দুনিয়ার প্রতি যার কোন লোভ থাকে না, দুনিয়ার সম্পদের প্রতিও সে কোন লোভ রাখে না। আরেকটি কারণ হল, আপনি মুসলমান।' বলল লিন্ডা।

'মুসলমানদের প্রতি আপনার এই পক্ষপাতিত্ব কেন?' আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

'জানি না। তবে আমি এয়ার হোস্টেস থাকা কালে অনেক জাতির মানুষের সংস্পর্শে এসেছি। তাদের মধ্যে মুসলমানদেরকেই আমি মদ ও নারীর ব্যাপারে সবচেয়ে সংযত দেখেছি। আর তারা ধর্ম পালন করা জাতিও। প্লেনের মধ্যেও তারা প্রার্থনা করতে ভোলে না। আর সবচেয়ে বড় হল, দাদুর কাছে একটা

শোনা কথা। তিনি বলতেন, আমাদের পরিবারের সাথে মুসলমানদের একটা যোগসূত্র রয়েছে। তাছাড়া আপনি মুসলমান জেনে সত্যিই আমার খুব খুশি লেগেছে।'

'মিস লিন্ডা, আপনার কথা শুনে আমারও খুশি ও কৌতূহল দুই-ই সৃষ্টি হয়েছে। আপনার সেই দলিলগুলো কোথায়?' আহমদ মুসা বলল।

হাসল লিন্ডা। বলল, 'দলিলগুলো আমার এই হ্যান্ডব্যাগের তলায় চামড়ার দুই লেয়ারের মাঝখানে রয়েছে।'

'আপনার নাইস বুদ্ধিতো!' হেসে বলল আহমদ মুসা।

ততক্ষণে লিন্ডা লোরেন ব্যাগ থেকে ছোট করে একটা কাঁচি বের করে ব্যাগের তলা কাটতে শুরু করেছে। ব্যাগের একটা প্রান্ত কেটে ভেতরে দুই আঙ্গুল ঢুকিয়ে বের করে আনল কয়েকখণ্ড কাগজ। কাগজের ভাঁজ খুলতে লাগল লিন্ডা।

আহমদ মুসা কাগজের দিকে চেয়ে বলল, 'মিস লিন্ডা, কাগজগুলো খুব প্রাচীন মনে হচ্ছে না।'

'ঠিকই বলেছেন। এগুলো আসলে মূল দলিলের ফটোকপি। দেখেই বোঝা যায়। সম্ভবত আমার গ্রেট গ্রান্ডফাদার যখন ফাইনালি সুরিনাম থেকে চলে আসেন তখন দলিলগুলো ফটোকপি করে নিয়ে আসেন। মূল দলিল নিশ্চয় পরিবারের মূল অংশের সাথেই রয়েছে।'

এতক্ষণে কাগজগুলোর ভাঁজ খোলা হয়ে গেছে।

কথা শেষ করে একটু থেমেই আবার বলল, 'দলিলগুলোর মধ্যে একটা পাল তোলা জাহাজের স্কেচ আছে, অর্ধ ডুবন্ত। পাশেই উপকূল। উপকূলের নাম ও জাহাজের নাম স্প্যানিশ ভাষাতেই লেখা আছে। জাহাজের নাম দেখছি সান্তামারিয়া এবং উপকূলের নাম দেখছি সুরিনাম কোস্ট।' থামল লিন্ডা লোরেন।

'কলম্বাসের প্রথম সমুদ্র যাত্রায় যে জাহাজগুলো ছিল, তার একটির নাম সান্তামারিয়া। কিন্তু কলম্বাসের প্রথম অভিযানতো সুরিনাম কোস্ট পর্যন্ত আসেনি। তাহলে এখানে সান্তামারিয়া ডুববে কেন?' বলল আহমদ মুসা।

'মি. আহমদ মুসা, বোটের হুইলটা আমি ধরেছি। আপনি এ কাগজগুলো একটু দেখুন। আপনি বুঝতে পারেন কি না। দলিলগুলোর মধ্যে সান্তামারিয়াকে

সুরিনাম কোস্টে যখন ডুবতে দেখেছি তখন দলিলগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকতে পারে।’

বলে লিন্ডা উঠে বোটের হুইলটা ধরল এবং আহমদ মুসা ড্রাইভিং সিট থেকে পাশের সিটে সরে এল।

আহমদ মুসা চেয়ারে বসে ডেক টেবিল থেকে তুলে নিল দলিলগুলো। দলিলগুলোর উপর নজর পড়তেই ভূত দেখার মত চমকে উঠল আহমদ মুসা। দলিলগুলো সবই আরবীতে লেখা। দ্রুত চোখ বুলাল সে। প্রথম দলিলটির শিরোনাম ‘আমার কথা’। দ্রুত পাতা উল্টিয়ে শেষ পাতায় দেখল নাম স্বাক্ষর ‘আব্দুর রহমান আত-তারিক’। পরিচয় লেখা আছে ‘ক্যাপ্টেন, শিপ সান্তামারিয়া।’ দ্বিতীয় দলিলটির শিরোনাম ‘আল্লাহর দান আল্লাহর জন্যে’। এ দলিলেরও শেষ পাতায় সেই একই স্বাক্ষর ও একই পরিচয়। তৃতীয় দলিলটা হল ‘সান্তামারিয়া জাহাজের স্কেচ’। এর শিরোনাম আগামী দিনের সুরিনামিদের জন্যে সুভেনীর। এখানেও ঐ একই স্বাক্ষর এবং পরিচয়।

বিস্ময়-আনন্দে বোবা হয়ে গেল আহমদ মুসা। তার মনে এখন আর কিছুমাত্র সন্দেহ নেই, টেরেক দুর্গেরই এসব দলিল পত্র। টেরেক, মানে আল-তারিক দুর্গের প্রতিষ্ঠাতা সান্তামারিয়া জাহাজের ক্যাপ্টেন আব্দুর রহমান আল-তারিক! এটা মুসলিম দুর্গ! সম্ভবত সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকার এটাই প্রথম এবং হয়তো একমাত্র মুসলিম নির্মিত দুর্গ। আর ওভানডোরা এবং লিন্ডা লোরেনরা একই পরিবার।

আরও কতক্ষণ আহমদ মুসা বিস্ময় ও আনন্দের সমুদ্রে সম্বিতহারা হয়ে থাকতো কে জানে। কিন্তু লিন্ডা লোরেনের কথায় সম্বিত ফিরে পেল আহমদ মুসা। লিন্ডা লোরেন বলছিল, ‘কি ব্যাপার মি. আহমদ মুসা, আপনি এরকম হয়ে গেলেন কেন? ভূত দেখলেন নাকি?’

আহমদ মুসা ধীরে ধীরে মুখ তুলল। বলল, ‘না মিস লিন্ডা, ভূতের চেয়ে বড় কিছু।’

‘কি ব্যাপার?’ বলল লিন্ডা। তার চোখে-মুখে উদ্বেগ।

‘জানেন, দলিলগুলো আরবীতে লেখা।’

‘আঁকা-বাঁকা হাতের লেখা দেখে আমি বুঝতে পারি নি। তবে শুনেছি বিদেশী ভাষায় লেখা। কিন্তু এর কারণ কি? আরবী ভাষায় কেন?’ বলল লিন্ডা।

‘শুধু আরবী ভাষার কথা নয়। যার দলিল তিনি একজন মুসলমান!’ আহমদ মুসা বলল।

‘মুসলমান?’ চোখ কপালে তুলে বলল লিন্ডা লোরেন।

‘হ্যাঁ। নাম আব্দুর রহমান আল-তারিক।’

‘তার মানে আমাদের পূর্বপুরুষ মুসলমান এবং তার নাম আব্দুর রহমান আল-তারিক?’ প্রায় চিৎকার করে বলল লিন্ডা লোরেন। তার চোখে-মুখে আবার বিস্ময়।

‘আমিও বিস্মিত মিস লিন্ডা। কিন্তু বিস্মিত এই কারণে যে, আমার অপূর্ণ জিজ্ঞাসার জবাব এই দলিলে মিলবে তা ভাবিনি।’ বলল আহমদ মুসা।

‘বুঝলাম না মি. আহমদ মুসা।’

‘আপনার অপূর্ণ জিজ্ঞাসাটা কি ছিল?’ লিন্ডা বলল।

মুখে হাসি টেনে আহমদ মুসা বলল, ‘আমার দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা ছিল, আপনার পরিচয় সম্পর্কে আপনার পিতৃপুরুষের বিশাল স্টেট ধ্বংস প্রাপ্ত দুর্গে মুসলমানদের প্রার্থনা গৃহ মসজিদের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। আপনার আত্মীয়-স্বজনরা এখনও সেখানে বসবাস করেন।’

লিন্ডা লোরেনের চোখে বিস্ময়। বলল, ‘আমার পূর্ব পুরুষের স্টেট আছে, তাদের ভাঙ্গা দুর্গ আছে, আমি জানি না। আপনি জানলেন কি করে?’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আপনার পূর্ব পুরুষের স্টেটেই তো আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।’

‘সেটা আমার জন্য মহা আনন্দের কথা। কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব তো দিলেন না, আমার পিতৃ পুরুষের পরিবার, তাদের স্টেট আপনি চিনলেন কি করে?’ বলল লিন্ডা।

‘আমি সেখানে থাকি। আপনার পিতৃপুরুষের পরিবারের আমি অতিথি।’ বলল আহমদ মুসা।

‘কিন্তু আপনি বিদেশী। পরিচয় হল কি করে তাদের সাথে?’ জিজ্ঞেস করল লিন্ডা।

আহমদ মুসা ওভানডোকে কিভাবে উদ্ধার করে, তারপর কি সব ঘটে এবং কিভাবে সে তাদের স্থায়ী অতিথি হয়ে গেল, বলল সব সংক্ষেপে।

‘ধন্যবাদ মি. আহমদ মুসা। অশেষ ধন্যবাদ ঈশ্বরকে। আমার জীবনের সবচেয়ে খুশির দিন আজ। সৌভাগ্য যে আপনার সাথে দেখা হয়েছিল। এখনও আমার কাছে সবকিছু স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে। ঈশ্বর এ সৌভাগ্যস্বপ্ন যেন ভেঙ্গে না দেন।’ বলল লিন্ডা।

‘আপনার চেয়ে আমার আনন্দ কম নয় মিস লিন্ডা। সুদূর সুরিনামে এসে যদি দেখি যে আধুনিক সুরিনামের প্রতিষ্ঠাতা একজন মুসলমান, আমার ভাই, তাহলে আনন্দ রাখার জায়গা কি থাকে?’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমার পূর্ব পুরুষ আব্দুর রহমান আল-তারিককে যদি আপনি ভাই বলেন, তাহলে আমি তো আপনার বোন হয়ে গেলাম।’

‘বোন হয়ে গেলেন নয়, বোন হয়ে গেছেন। কিন্তু একটা কথা স্মরণ করিয়ে দেই, আব্দুর রহমান আল-তারিক মুসলমান ছিলেন। কিন্তু বোন লিন্ডা লোরেন কিন্তু আব্দুর রহমান আল-তারিকের ধর্মে নেই।’

‘দেখুন ভাইজান, আমি তো আগেই বলেছি মুসলমানদের আমার ভাল লাগে। আহমদ মুসার বোন হওয়ার আগে মুসলমানদের ভাল লেগে থাকলে, আহমদ মুসার বোন হবার পর এবং পিতৃপুরুষের মুসলিম পরিচয় পাবার পর মুসলমান হবার বাকি থাকে কি!’ বলল লিন্ডা।

‘ধন্যবাদ বোন। এটা আমার জন্য আরেকটা খুশির খবর।’ আহমদ মুসা বলল।

‘বুঝা গেল আমি মুসলমান না হলে আপনার এই খুশিটা পেতাম না। আপনি তো সাম্প্রদায়িক খুব!’ হাসতে হাসতে বলল লিন্ডা লোরেন।

‘কল্যাণ গ্রহণ ও তার প্রতিষ্ঠায় একনিষ্ঠ হওয়া যদি সাম্প্রদায়িকতা হয়, তাহলে অবশ্যই আমি সাম্প্রদায়িক এবং সব মানুষেরই সাম্প্রদায়িক হওয়া উচিত।’ আহমদ মুসা বলল।

‘মুসলমানিত্ব ও কল্যাণকে তাহলে তো আপনি এক করে ফেলেছেন।’ বলল লিন্ডা।

‘আমি এক করে ফেলছি না। মুসলমানিত্ব ও কল্যাণ আসলেই এক। ইসলাম হল মানুষের জন্য স্রষ্টার মনোনীত জীবন-যাপন পদ্ধতি। মানুষের ইহকালীন সব কল্যাণ, পরকালীন মুক্তি এই জীবন-যাপন পদ্ধতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আপনি যা বললেন এই বিশ্বাসের প্রতি যদি একনিষ্ঠ হতে হয়, তাহলে তো মানুষকে এই পথে নিয়ে আসার জন্য শক্তি প্রয়োগও বৈধ, যেমন ঔষধ খাওয়ার জন্যে রোগীর উপর প্রয়োজন হলে ডাক্তার শক্তি প্রয়োগ করেন।’ বলল লিন্ডা লোরেন।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘ইসলাম ঔষধ নয়। রোগীর ঔষধ খাওয়া-না খাওয়ার পিছনে তার বেঁচে থাকা, না থাকার প্রশ্ন জড়িত। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করা- না করার সাথে এই প্রশ্ন জড়িত নয়। কল্যাণের পথ যদি মানুষ গ্রহণ না করে, তাহলে তার অকল্যাণ হবে। তখন সে অকল্যাণ থেকে সতর্ক হবে ও কল্যাণের পথে ফিরে আসতে চাইবে। তাকে এই পথে সাহায্য করতে হবে মাত্র। এজন্যই ইসলাম বা কল্যাণের পতাকাবাহীকে নিরন্তর কল্যাণের পথ মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে। মানুষ চাইলে তা গ্রহণ করবে, না চাইলে তা গ্রহণ করবে না। মানুষের মাথায় বাড়ি মেরে বা বাধ্য করে মানুষকে ইসলামের পথে আনা ইসলামের পথ নয়।’

‘তাহলে তো ইসলাম অর্থাৎ কল্যাণের প্রতিষ্ঠা হবে না।’ বলল লিন্ডা লোরেন।

‘কল্যাণের প্রতিষ্ঠা না হলে অকল্যাণের প্রতিষ্ঠা হবে। অকল্যাণের প্রতিষ্ঠা হলে মানুষ অকল্যাণ সম্পর্কে সতর্ক ও সচেতন হবে এবং কল্যাণের দিকে ফিরে আসবে। কল্যাণের পথ অব্যাহতভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরে মানুষের এই পরিবর্তনকেই উৎসাহিত করতে হবে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘যদি মানুষের পরিবর্তন না হয়? অধিকাংশ মানুষ যদি কল্যাণের পথে না আসে?’ জিজ্ঞেস করল লিন্ডা।

‘যে আসবে না, তার পরিণতি সেই ভোগ করবে। দুনিয়াতে সে অকল্যাণের মধ্যে নিমিজ্জিত হবে এবং পরকালে তাকে জাহান্নামের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। স্রষ্টা তো এজন্য পুরস্কার ও শাস্তির জায়গা বেহেশত ও দোজখ দুই-ই সৃষ্টি করে রেখেছেন’।

‘তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন, ইসলাম আইনের পথ, গণতন্ত্রের পথ এবং মানুষের স্বাধীন চিন্তাকে স্বীকার করে নেয়ার পথ।’ বলল লিন্ডা।

‘ঠিক স্বীকার করে নেয়া নয়। ইসলাম মানুষের অকল্যাণের পথে চলার স্বাধীন চিন্তাকে পরিবর্তন করার অবিরাম প্রচেষ্টা, কিন্তু সেটা গায়ের জোরে নয়, ঘৃণা ছড়িয়ে নয় কিংবা অসহযোগ করে নয়।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তাহলে তো এটা আইন ও গণতন্ত্রের পথ হল।’ বলল লিন্ডা।

‘হ্যাঁ অবশ্যই।’

‘ঠিক আছে। তাহলে আপনি সাম্প্রদায়িক নন, চরমপন্থীও নন। কিন্তু একটা প্রশ্নের উত্তর দিন, অমঙ্গলের স্বাধীন চিন্তাকে আপনি গায়ের জোরে বাঁধা দিচ্ছেন না, আইনানুগ ও গণতন্ত্রের পথে তার পরিবর্তনের চেষ্টা করছেন, কিন্তু অমঙ্গলের পথচারীরা যদি গায়ের জোরে আপনার অর্থাৎ ইসলামের এই চেষ্টায় বাঁধ সাধে, তাহলে কি হবে?’

‘তাহলে এই বেআইনি ও অগণতান্ত্রিক বাঁধা ডিঙানোর সব বৈধ উপায়ই গ্রহণ করতে হবে। অমঙ্গল যে শক্তি নিয়ে আসবে, মঙ্গলের শক্তিকে তার চেয়ে বেশী শক্তি নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। তাতে যুদ্ধ লড়াই সবই হতে পারে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আপনি অমঙ্গলের বেআইনি ও অগণতান্ত্রিক বাঁধা ডিঙানোর সব বৈধ পথ গ্রহণের কথা বলেছেন। এখানে ‘বৈধ পথ’ বলতে কি বোঝাতে চেয়েছেন?’ বলল লিন্ডা।

‘যারা বাঁধা দিতে আসছে, যারা লড়াই করতে আসছে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করুন। কিন্তু প্রত্যক্ষ লড়াই-এ নেই এমন অসামরিক, নিরপরাধ মানুষ, নারী, শিশুকে হত্যা করা, নির্যাতন করা বৈধ পথ নয়। প্রত্যক্ষ যুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট

না হলে শত্রুপক্ষের হলেও ধর্মস্থান, ফসলের ক্ষেত, বাগান ইত্যাদি ধ্বংস করাও বৈধ কাজ নয়। ইসলাম এগুলোকে অবৈধ ঘোষণা করেছে।'

আহমদ মুসা বলল।

থামল আহমদ মুসা। প্রশান্ত মুখ লিন্ডার। আহমদ মুসা থামার পর একটু ভেবে নিয়ে সে বলল, 'আইন ও গণতন্ত্রের পথে চলেও এবং মানুষের মঙ্গল কামনা করে কল্যাণের পথে চলার পরেও কিন্তু ইসলাম যুদ্ধ বন্ধ করতে পারল না ভাইজান।'

'পৃথিবী যতদিন থাকবে, আদম ও ইবলিসও ততদিন থাকবে এবং ইবলিস- আদমের শান্তির সংসারে হানা দেবেই। তাই আদম অর্থাৎ মঙ্গলের শক্তি চাইলেও যুদ্ধ-লড়াই বন্ধ হচ্ছে না।' থামল আহমদ মুসা।

কথা বলল না লিন্ডাও। ভাবছিল সে। একটু পর বলল, 'এসব ভারী কথা এখন থাক ভাইজান। দলিলগুলোতে কি আছে তা দেখতে অনুরোধ করেছিলাম আমি।'

আহমদ মুসা প্রথম দলিলটা তার চোখের সামনে তুলে ধরল। ডেক টেবিলের আলোটা এডজাস্ট করে নিয়ে বলল, 'বোন আমি অনুবাদটাই শুধু আপনাকে শোনাচ্ছি। শুনুন।' বলে আরবীটা আস্তে আস্তে পড়ে অনুবাদটা জোরে বলতে লাগলঃ

> 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আমি আমার ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য কিছু কথা লিখে যাচ্ছি। আমার মাতৃভাষা আরবীতেই লিখছি। স্বর্ণভাণ্ডারের নির্দেশিকা দলিলটাও আরবীতে লিখলাম। কারণ, আমি চাই আরবী পাঠোদ্ধারের মত এক উপযুক্ত সময়ে আল-তারিক দুর্গের ইতিহাস ও দুর্গের তলার স্বর্ণভাণ্ডার আমার বংশধরদের হাতে পড়ুক। আমি চাই, আল্লাহর দন এই স্বর্ণ ভাণ্ডারের বৃহত্তর অংশ আল্লাহর কাজে ব্যয় হোক।
>
> আমি আব্দুর রহমান আল-তারিক। ১৫০১ সালের দিকে স্পেনের রাজা ফার্ডিনান্ড ও রানী ইসাবেলা ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের হিসপানিওয়ালা এলাকার গভর্নর হিসেবে ওভানডোকে প্রেরণ করেন

৩০ টি জাহাজসহ। আমাকে জোর করে জাহাজ বহরের চীফ নেভীগেটর ও অগ্রবর্তী জাহাজটির ক্যাপ্টেন করে গভর্নর ওভানডোর সাথে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে পাঠানো হয়। কিন্তু আমি এ জীবন চাইনি।

আমি আমার ছাত্র জীবনের শুরু থেকেই ভূগোল ও সমুদ্রবিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত। আমার ছাত্রজীবনের সকল পর্যায়ে আমি এই দুই বিষয়ে ভাল রেজাল্ট করেছি। আমি এই দুই বিষয়ে কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করি। আমার আবাল্য স্বপ্ন ছিল কর্ডোভার মত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হব। আমি শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভ করি এবং এর মাধ্যমে আমার সে স্বপ্ন সফল হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য, শিক্ষক হিসেবে ক্লাস নেয়া শুরু করার আগেই কর্ডোভা এলাকা মুসলমানদের হাত ছাড়া হয়ে যায় এবং ফার্ডিনান্ড ও ইসাবেলার বাহিনী কর্ডোভা দখল করে নেয়। অন্যান্য অনেকের সাথে আমিও পালিয়ে যাই কর্ডোভা থেকে। কিন্তু শীঘ্রই আমার কপাল ভাঙে। আমার এক খৃস্টান সহপাঠী আমার ব্যাপারে ফার্ডিনান্ডকে বলে দেয়। আমাকে ভূগোল সমুদ্র বিজ্ঞানী হিসেবে ফার্ডিনান্ডের কাছে তুলে ধরা হয়। ফার্ডিনান্ড সরকার আমার সন্ধান করতে থাকে। আমি তখন গ্রানাডা থেকে তিরিশ-চল্লিশ মাইল দূরে এক সুন্দর পার্বত্য উপত্যকায় আমার নিজের গ্রাম 'ওয়াদিউল গানী'তে বাস করছি। আমি তখনও বিয়ে করিনি। এক বৃদ্ধা মা ছাড়া আমার কেউ ছিল না। দুজনের অত্যন্ত সুখী ও স্বচ্ছল সংসার আমাদের। এক রাতে সেখানেই হাজির হল ফার্ডিনান্ডের লোকরা। রাস্তা চিনিয়েছিল আমার সেই খৃস্টান সহপাঠী। জোর করে আমাকে তুলে নিয়ে আসে আমার শয্যা থেকে। পাশের ঘরে ঘুমিয়ে থাকা মা'র কাছ থেকেও বিদায় নিতে দেয় নি। এভাবেই আমাকে শামিল করা হয় ওভানডোর জাহাজ বহরে। আমার নতুন নাম হয় 'কটিজ পিজারো'।

এক মাসের সমুদ্র যাত্রা শেষে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে আমরা সান্টো ডোমিংগোতে পৌঁছলাম।

ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের হিস্পানিওয়ালা অঞ্চলের রাজধানী তখন এই সান্টো ডোমিংগো। ’ সান্টো ডোমিংগোর সমুদ্র তীরে এক ছোট বাড়িতে হল আমার নিবাস। কিন্তু এক মুহুর্তের জন্যে একে আমার নিবাস বলে মেনে নিতে পারিনি। প্রতিদিনের অবসর সময়টা জানালায় বসে ক্যারিবিয়ান সাগরের দিকে নিস্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা ছিল আমার অভ্যাস। ক্যারিবিয়ান সাগর পেরিয়ে আটলান্টিক সাগর পাড়ি দিয়ে আমার মন ছুটে যেত স্পেনের পাহাড় ঘেরা ‘ওয়াদিউল গানী’তে। চোখে ফুটে উঠতো মায়ের মমতাময়ী চেহারা। পরক্ষণেই আবার চোখের সামনে ফুটে উঠতো পাগল পারা হয়ে আমাকে খুঁজে ফেরা মায়ের দৃশ্য। ভাবতাম মা আমার নিশ্চয় বেঁচে নেই। সন্তানের খোঁজে ছুটে বেড়ানো নাওয়া-খাওয়াহীন মা কোথায় পড়ে একদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে! এসব ভাবতে গিয়ে চোখ দিয়ে অবিরাম অশ্রু গড়াত।

এমনি অবস্থায় যখন আমার কাল কাটছে, তখন একদিন গভর্নর ওভানডো আমাকে ডেকে পাঠাল। আমি হাজির হলে বলল, ‘দেশে যাবার জন্যে তুমি পাগল হয়ে আছ। কিছুদিনের জন্যে তোমাকে দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছি। জিনিসপত্রসহ ২৪টি জাহাজের একটা বহর পাঠাচ্ছি স্পেনে। তুমি একটা জাহাজের ক্যাপ্টেন থাকবে।’

সম্ভবত তারিখটা ১৫০২ সালের জুনের ১৫ তারিখ। আমরা ২৪টি জাহাজ নিয়ে সান্টো ডোমিংগো বন্দর ত্যাগ করে আটলান্টিকে পাড়ি জমালাম। নোঙর তোলার মুহূর্তে গভর্নর এসে আমাকে বলল, ‘বহরের দুটি জাহাজে স্বর্ণ বোঝাই আছে। দুটি জাহাজের মধ্যে তোমারটা একটা। সাবধানে যেও।’ কিন্তু সাবধানতা কাজে এল না। যাত্রা করার দ্বিতীয় দিন শেষে ভয়াবহ হারিকেন ঝড়ে আক্রান্ত হল আমাদের জাহাজ বহর। চোখের সামনেই একের পর এক জাহাজ ডুবে যেতে লাগল। আমার জাহাজ মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হল। অর্ধেকের বেশী নাবিক মারা গেল। সামনে এগুবার চিন্তা বাদ দিয়ে জাহাজকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করে ঝড়ের হাতে সপে দিলাম জাহাজের ভাগ্য। দিনের কোন হিসেব

ছিল না। সম্ভবত দিন সাতেক পর আমার জাহাজ একটা কূলে ভিড়ল। কূলে ভেড়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই জাহাজ ডুবে গেল। অস্ত্র-শস্ত্র, খাবার ও অতি প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসসহ আমরা তীরে নেমে এলাম। এই দেশটি হল সুরিনাম। আর জায়গাটা ছিল সুরিনাম নদীর পারামারিবো মোহনা।

আমরা জাহাজ থেকে নেমেছিলাম ১৭ জন। এই ১৭ জনের মধ্যে ১০ জন নাবিকই ছিল মুসলমান। অবশিষ্টরা ছিল ক্যাথলিক। আমরা ১৭ জন একটা পরিবারে পরিণত হলাম। গড়ে তুললাম সুরিনামে ইউরোপের প্রথম কলোনি। কলোনি গড়লেও কলোনিয়ালিস্টদের মত আচরণ আমরা করিনি। সুখে-দুখে সব কাজে সব সময় স্থানীয় রেড ইন্ডিয়ানরা ও আমরা একসাথে থেকেছি। ধীরে ধীরে অতি গোপনে আমরা সোনা খালাশ করছিলাম জাহাজ থেকে। রেড ইন্ডিয়ান ও স্থানীয় উপজাতিদের আমরা বিষয়টা না জানালেও একটা ভাগ হিসেব করে প্রচুর অর্থ আমরা ওদের দিয়েছি।

সকলের সহযোগিতা নিয়ে প্রচুর অর্থ খরচ করে সুরিনাম নদীর মোহনার পাশে আমরা আল-তারিক দুর্গ গড়ে তুললাম। দুর্গটার ডিজাইন করলাম স্পেনের প্রথম মুসলিম দুর্গ 'আত-তারিক' এর অনুকরণে। দুর্গের কেন্দ্রে তৈরী করলাম বিশাল মসজিদ। নিজের বাড়িটা তৈরী করলাম মসজিদের পাশে। আমাদের ১৭ জনের পরিবারের ক্যাথলিক কয়জনও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। দুর্গের মধ্যেই অবশিষ্ট সতের জনের বাড়ি তৈরি হল। আমরা সকলেই তখন বিয়ে করেছি রেড ইন্ডিয়ান পরিবারে। এই বিবাহ-সূত্রে রেড ইন্ডিয়ানরা আর আমরা এক হয়ে গেলাম। তাদেরও আধুনিক বাড়িঘর তৈরি করে দেয়া হল পারামারিবো মোহনায়। এভাবে ভিত্তি স্থাপিত হল পারামারিবো শহরের।

দুর্গ তৈরির পর ষোল জনকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী স্বর্ণ দিয়ে অবশিষ্ট স্বর্ণের বিশাল ভাণ্ডার আমি সঞ্চিত করে রাখলাম মাটির তলায়। আল্লাহর দান এ স্বর্ণ আমি আল্লাহর জন্যেই রাখলাম মাটির তলায়।

আল্লাহ আমার ইচ্ছাকে কবুল করুন। পরিবার পরিজন নিয়ে আমি সুখী। সুরিনামকে নিজের দেশ হিসেবে গ্রহণ করেছি। মা'র জন্য কাঁদা আমার অনেক কমে গেছে। ধরে নিয়েছি এবং সত্যও যে মা এতদিনে মারা গেছেন। অতএব তাঁকে দেখার, তিনি কেমন আছেন তা জানার জন্যে মন আকুলি-বিকুলি করে ওঠে না। কিন্তু এর পরও স্পেনের আমার দুঃখী স্বজন-স্বজাতির জন্যে মন কাঁদে। আমার প্রিয় 'ওয়াদিউল গানী' কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় ও কর্ডোভা-গ্রানাডার কথা মনে হলে আমি আবার পাগল হয়ে যাই। অশ্রু নেমে আসে দু'গাল বেয়ে। ঘুমের মধ্যে 'ওয়াদিউল গানী' ছাড়া কোন স্বপ্নই আমি দেখি না। দিনের সজাগ মুহূর্তে আমি থাকি এই সুরিনামের আল-তারিক দুর্গে। কিন্তু রাতের স্বপ্নে আমি ফিরে যাই আমার শৈশব, কৈশোর আর যৌবনের স্বপ্নভূমি ওয়াদিউল গানীতে। কোনদিন আর কি যেতে পারব সেখানে? আমি না পারলেও আমার বংশধররা কেউ সেখানে যাবে। আমার মায়ের কবর কি তারা খুঁজে পাবে সেখানে? এ প্রশ্নের উত্তর আমি জানি না। কিন্তু তবু লিখে গেলাম আমার হৃদয়ের আকুতি। আল্লাহ একে কবুল করুন।'

দলিলটা পড়া যখন আহমদ মুসা শেষ করল, তখন তার চোখের ফোটা ফোটা অশ্রুতে দলিলের অনেকখানি ভিজে গেছে।

পড়া শেষ করে আহমদ মুসা চোখ তুলল লিন্ডা লোরেনের দিকে। দেখল তার অপলক চোখ দুটি সামনের দিকে নিবদ্ধ। দুচোখ থেকে নেমে আসা অশ্রুর ঢলে তার দুই গণ্ড ধুয়ে যাচ্ছে। তার দাঁত কামড়ে ধরেছে তার নিচের ঠোঁটটাকে।

পড়া শেষ হলেও অনেকক্ষণ কেউ কথা বলল না।

প্রথম নিরবতা ভাঙল লিন্ডা লোরেন। বলল, 'আমি গর্বিত ভাইজান এমন একজন পূর্বপুরুষের উত্তর সূরী আমি।' তার কণ্ঠ ভেঙে পড়ল কান্নায়।

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে আবার বলে উঠল, 'মনে হচ্ছে কি জানেন! তার 'ওয়াদিউল গানী'টা যেন আমার ওয়াদিউল গানী। মন আমার ছুটে যেতে চাচ্ছে সেখানে।' থামল লিন্ডা লোরেন।

আহমদ মুসাও কথা বলল না। তার শূন্য দৃষ্টিটা হারিয়ে গেছে সাগরের অন্ধকারে।

এক সময় ধীর কণ্ঠে আহমদ মুসা বলল, 'আজ টেরেক স্টেটে অর্থাৎ আল তারিক স্টেটে কিভাবে ঢুকব তাই ভাবছি। আব্দুর রহমান আল-তারিকের গড়া স্টেটের ধুলি কণায় পা পড়লে, তার বিশাল দুর্গের দিকে চাইলে, মসজিদের ধ্বংসাবশেষের পাশে তার বাড়িটা দেখতে না পেলে মনটা হুহু করে কেঁদে উঠবে।'

'আর আমার হবে আরেক অভিজ্ঞতা। মনে হবে আমি প্রবেশ করছি স্বপ্নের দেশ অর্থাৎ চাঁদের দেশে।' বলল লিন্ডা লোরেন উদাস কণ্ঠে।

আহমদ মুসা আবার তার চোখ ফিরিয়ে আনল দলিলের পাতায়। পাতা উল্টিয়ে দ্বিতীয় দলিল সে বের করল। বলল, 'এবার তাহলে মিস লিন্ডা স্বর্ণ ভান্ডারের নির্দেশিকাটা পড়ি?'

লিন্ডা সংগে সংগেই জবাব দিল না। কিছুক্ষণ পর বলল, 'না ভাইজান। ওটা বরং আপনি ওভানডো ভাইজানকে পড়ে শোনাবেন। ঐ স্বর্ণের সাথে যে দায়িত্ব জড়িয়ে আছে তার ভার বহন করার ক্ষমতা আপনার আছে, ওভানডো ভাইয়ারও হতে পারে। আমি অনুরোধ করব, আমাকে স্বর্ণ ভান্ডরের নির্দেশিকা নয়, আমাকে দয়া করে আপনি 'ওয়াদিউল গানী'র দিক নির্দেশিকা শোনান। আর কিছু না হোক, আমার মহান দাদুর শেষ ইচ্ছাটুকু যদি পূরণ করতে পারি, তবে জীবন জনম সব আমার সার্থক হবে।' কান্নায় জড়িয়ে গেল তার শেষ কথাগুলো।

লিন্ডা লোরেনের হৃদয় ভাঙা আহমদ মুসাকেও স্পর্শ করেছে। তার দু'চোখের কোনায়ও জমে উঠেছে অশ্রু।

আহমদ মুসা কোন কথা বলল না। তার দু'চোখ আবার ফিরে গেছে সাগরের অন্ধকারে। লিন্ডা লোরেনেরও দুই চোখ সামনে নিবদ্ধ।

জমাট নিরবতা।

এই নিরবতার মাঝে বোট তার ইঞ্জিনের বেসুরো শব্দ চারদিকে ছড়িয়ে তীব্র গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে পারামারিবো বন্দর ছাড়িয়ে টেরেক স্টেটের নিজস্ব ঘাটের দিকে।

# ৫

‘না মা, আজও আহমদ মুসার কোন খোঁজ মেলেনি।’ নীচু কণ্ঠে বিষণ্ন মুখে বলল সুরিনামের নতুন প্রধানমন্ত্রী আহমদ হাত্তা।

পাশেই আরেক সোফায় মাথা নিচু করে দু’হাতের তালুতে মুখ রেখে বসেছিল ফাতিমা নাসুমন। ছল ছল করছে তার দুই চোখ। বলল, ‘আমার খুব খারাপ লাগছে আব্বা। তুমি কিডন্যাপ হবার পর তোমাকে খুঁজে পেতে আহমদ মুসার সময় লাগেনি। কিন্তু আজ কয়েক দিনেও তোমার গোটা পুলিশ বাহিনী মিলেও আহমদ মুসার সন্ধান করতে পারলো না।’

‘আহমদ মুসার পাশে আমাদের গোটা পুলিশ বাহিনীকেও দাঁড় করানো চলে না মা। তুমি তো জান, গোটা মার্কিন গোয়েন্দা ও পুলিশ বিভাগ বছরের পর বছর ধরে যা পারেনি, আহমদ মুসা তাই পেরেছি। তবু মা, আমাদের পুলিশ বাহিনী চেষ্টার কোন ত্রুটি করছে না। পারামারিবোর সন্দেহজনক প্রতিটি বাড়ি-ঘর তারা তন্নতন্ন করে খুঁজছে। মনে হচ্ছে আহমদ মুসা পারামারিবোতেই নেই।’ বলল আহমদ হাত্তা।

‘আমার মনে হয় রঙ্গলালরা জানে আব্বা। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে?’ বলল ফাতিমা নাসুমন।

‘পুলিশ তাকে নজরে রেখেছে। কথাও বলেছে তার সাথে। আমিও তাকে ডেকেছিলাম। কথা বলেছি। সব দোষ সে স্বীকার করেছে, তবে আমাকে কিডন্যাপ করা ও আমার ড্রাইভার (আহমদ মুসা) উধাও হবার ব্যাপারে সে কিছুই জানে না বলে জানিয়েছে। তাদের অজান্তেই মাফিয়ারা কিছু করে থাকতে পারে তাদের লোক হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্যে। আমি বন্দী অবস্থায় তাদের যে কথা শুনেছি, তাতে রঙ্গলালের কথা সত্য। মাফিয়াদের সব রাগ আহমদ মুসার উপর। তারা নিশ্চিত যে, আহমদ মুসার হাতেই তাদের লোক মরেছে।’

ভয়ে-উদ্বেগে আরও ফ্যাকাসে হয়ে উঠল ফাতিমা নাসুমনের মুখ। বুক তার থরথর করে কেঁপে উঠল, আহমদ মুসা তো ওদের হাতেই পড়েছে! আর চিন্তা করতে পারল না ফাতিমা। তার পিতা থামলেও কোন কথা সে বলতে পারল না।

তার পিতা প্রধানমন্ত্রী আহমদ হাত্তাই আবার কথা বলল। বলল, 'আমার খুব খারাপ লাগছে মা। সারা রাত ধরে এই আনন্দ প্রোগামটা আমি করতে চাইনি। কিন্তু দেশের রেওয়াজ হিসেবে আমাকে রাজী হতে হয়েছে। তোমার মতই আমারও অনুষ্ঠান ভালো লাগছে না বলে এখানে এসে বসেছি।'

'স্যরি আব্বা। রাষ্ট্রের যে নিয়মনীতি তা তো মেনে চলাই উচিত। বুক থেকে উদ্বেগের পাথরটা সরাতে পারছি না বলেই হৈ হুল্লোড় থেকে একটু সরে এসেছি।' বলল ফাতিমা।

'তার জন্যে আমাদের এই উদ্বেগ স্বাভাবিক মা। তার সাহায্য না পেলে প্রধানমন্ত্রী হওয়া দূরের কথা ওদের হাতে আটক অবস্থাতেই হয়তো আমার জীবন শেষ হয়ে যেত। তোমারও দেখা পেতাম না।' বলতে বলতে আহমদ হাত্তার কণ্ঠ কান্নায় ভারী হয়ে উঠল। তার দুই চোখ অশ্রুতে ভরে উঠেছে।

ফাতিমা নাসুমন উঠে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে উঠে এল তার আব্বার কাছে। আস্তে পিতার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'আব্বা তুমি দুর্বল হয়ে পড়বে না। তুমি ভেঙে পড়লে আমরা আশ্রয় পাব কোথায়। এতক্ষণ তোমার অনুষ্ঠানের বাইরে থাকা ভাল দেখাচ্ছে না। চল আব্বা, আমিও যাচ্ছি তোমার সাথে।'

ফাতিমার কথা শেষ হতেই দরজায় প্রধানমন্ত্রীর পিএস-এর কণ্ঠ শোনা গেল। সে ভেতরে আসার অনুমতি চাচ্ছিল।

আহমদ হাত্তা তাড়াতাড়ি রুমাল দিয়ে চোখ মুছে বলল, 'এস।'

পিএস ঘরে ঢুকে বলল, 'স্যার পুলিশ প্রধান ও গোয়েন্দা প্রধান আপনার সাথে কথা বলতে চান।'

'যাও আসতে বলো।' বলল প্রধানমন্ত্রী।

চলে গেল পিএস।

আহমদ হাত্তা ঘড়ির দিকে তাকাল। বলল ফাতিমাকে লক্ষ্য করে, 'মা রাত তিনটা বাজে। তুমি পাশের ঘরে গিয়ে রেস্ট নাও। আমি তোমাকে ডাকব।'

‘ধন্যবাদ আব্বা।’ বলে ফাতিমা চলে গেল পাশের ঘরে।

ঘরে ঢুকল পুলিশ প্রধান আলী সিলভু ও গোয়েন্দা প্রধান আহমাদু সিফু।

প্রধানমন্ত্রী আহমদ হাত্তা উঠে ওদের স্বাগত জানিয়ে বলল, ‘মি. আলী এবং মি. আহমাদু কোন খবর পেলেন?’

পুলিশ প্রধান আলী সিলভু ও গোয়েন্দা প্রধান আহমাদু সিফূ বসল। তাদের চোখে–মুখে বিষণ্নতা। বলল আলী সিলভু, ‘স্যার গতকাল পর্যন্ত আমরা প্রধানত বিদেশী ও মি. রঙ্গলালদের দলে ও অবস্থানে আমাদের অনুসন্ধান সীমাবদ্ধ রেখেছিলাম। আমরা আমাদের পুলিশ ও গোয়েন্দা শক্তির গোটাটাই এই কাজে নিয়োজিত করেছিলাম। কিন্তু তার কোন খোঁজ আমরা পাইনি। আজ আমরা ভিন্ন আরেকটা চ্যানেল ওপেন করেছি।’

‘কি সেটা?’ উদগ্রীব কণ্ঠে বলল প্রধানমন্ত্রী আহমদ হাত্তা।

পুলিশ প্রধান আলী সিলভু গোয়েন্দা প্রধান আহমাদু সিফুকে লক্ষ্য করে বলল, ‘বলুন মি. আহমাদু। আপনিই তো বিষয়টা প্রত্যক্ষভাবে ড্রীল করছেন।’

নড়ে-চড়ে বসল গোয়েন্দা প্রধান আহমাদু সিফু। বলল সে প্রধানমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে, ‘স্যার আমাদের বিশ্বাস এবং রঙ্গলালের সাথে আলোচনা করে যা বুঝেছি, আটক করার ঘটনাটা একটা মাফিয়া গ্রুপের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে এবং আমরা নিশ্চিত রঙ্গলাল সাহেবরা যে মাফিয়া গ্রুপকে হায়ার করে এনেছিল ঘটনাটা তারাই ঘটিয়েছে। আমরা......।’

গোয়েন্দা প্রধান আহমাদু সিফের কথা শেষ হলো না, তার আগেই কথা বলে উঠল প্রধানমন্ত্রী, ‘তারা কোন গ্রুপ, কোথাকার, তাদের নেতা কে, এটা কি রঙ্গলালরা বলেছে?’

‘স্যার, রঙ্গলালরা তা বলতে পারেনি। আর মাফিয়ারা কখনই তা জানতে দেয় না স্যার।’ বলল আহমাদু সিফু।

‘ইয়েস, আপনার কথা শেষ করুন মি. আহমাদু।’ প্রধানমন্ত্রী বলল।

‘ইয়েস স্যার।’ বলে আহমাদু সিফু আবার কথা শুরু করল, ‘স্যার আন্ডার ওয়ার্ল্ডের এক বিদেশী গ্রুপের সাথে আজ যোগাযোগ করেছি। ব্রুকোপনডোর ঘটনায় যারা নিহত হয়েছে এবং আপনাকে উদ্ধারের ঘটনায় যারা

নিহত হয়েছে, সেই বিদেশী মাফিয়াদের লাশের ছবি আমরা তাদের দেখিয়েছি। তারা দেখেই বলেছে নিহত লোকরা 'কিনিক কোবরা'র মাফিয়া দলের সদস্য। ওরা শুনেছে 'কিনিক কোবরা'র নেতাও নাকি এখন পারামারিবোতে।'

'কিনিক কোবরা' কারা?' জিজ্ঞেস করল প্রধানমন্ত্রী।

'কিনিক কোবরা' মধ্য আমেরিকার একটা দুর্ধর্ষ মাফিয়া চক্র। গুয়েতেমালায় ওদের হেড কোয়ার্টার হলেও গোটা আমেরিকা জুড়েই ওরা ঘুরে বেড়ায়। কখন কোথায় থাকে তার ঠিক নেই।' বলল গোয়েন্দা প্রধান আহমাদু সিফু।

'রঙ্গলালরা তাহলে এদেরকেই হায়ার করেছিল?' জিজ্ঞেস করল প্রধানমন্ত্রী।

'তাইতো প্রমাণ হচ্ছে স্যার।' বলল গোয়েন্দা প্রধানই।

'আসল কথা কি হয়েছে, তাদের কাছে কোন সহযোগিতা চেয়েছ?' জিজ্ঞেস করল প্রধানমন্ত্রী আহমদ হাত্তা। তার কণ্ঠে অধৈর্য্য ভাব।

'ঠিক ফরমাল সাহায্য আমরা চাইনি। তবে কোন সাহায্য তাদের করার আছে কিনা, এমন প্রশ্ন আমরা তুলেছিলাম। তারা যে জবাব দিয়েছে, তাকে আমাদের ইতিবাচক বলে মনে হয়নি। তারা বলেছে, 'কিনিক কোবরা' তাদের সিনিয়র দল। তাদের সাথে সংঘাতে নামা ওদের জন্যে অসৌজন্যমূলক হবে, বিশেষ করে 'কিনিক কোবরা' যখন তাদের কোন ক্ষতি করেনি। তারা আরও বলেছে, 'কিনিক কোবরা'র মত দুর্ধর্ষ গ্রুপ আর আমেরিকায় নেই। কোন অপারেশনে তাদের লোক মারা যাবার কোন নজীর নেই। অথচ সুরিনামে এ পর্যন্ত তারা প্রায় পৌনে একডজনের মত লোক হারিয়েছে। এর ভয়াবহ রকমের প্রতিশোধ না নিয়ে ওরা ছাড়বে না।' থামল গোয়েন্দা প্রধান।

'কিনিক কোবরা'র কোন লোকেশন বা ঠিকানা পেয়েছে কি না তারা?' প্রধানমন্ত্রী আহমদ হাত্তার আবার জিজ্ঞেসা।

'কেন কিনিক কোবরা'র সুরিনামে'- এই কৌতুহল থেকে তারা নিজেরাই কিনিক কোরবা'র সন্ধান শুরু করেছে। কিন্তু এখনো পায়নি তাদের ঠিকানা।'

‘তাহলে এখন এগুবেন কোন পথে?’ জিজ্ঞেস করল প্রধানমন্ত্রী আহমদ হাত্তা।

‘স্যার, গুয়েতেমালা সরকারকে অনুরোধ করেছি ‘কিনিক কোবরা’ মাফিয়া গ্রুপের প্রধানসহ তার লোকদের ফটো সরবরাহ করতে। আশা করছি সত্তরই আমরা পেয়ে যাব। ফটোগুলো পেলেই আমরা চিরুনী তল্লাশিতে নেমে যাব।’ বলল গোয়েন্দা প্রধান আহমাদু সিফু।

প্রধানমন্ত্রী আহমদ হাত্তা কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল। এ সময় বেজে উঠল তার পাশের মোবাইলটা।

আহমদ হাত্তা মোবাইলটা হাতে তুলে নিল।

সালাম বিনিময়ের পর ওপারের কথা শুনে ভ্রু কুঞ্চিত হলো আহমদ হাত্তার। বলল, ‘ঠিক আছে। তোমরা দরজা খুল না আর যতটা পার বাধা দাও। আমাদের পুলিশ যাচ্ছে।’

বলে টেলিফোন রেখে দিল আহমদ হাত্তা। উত্তেজিত সে। পুলিশ প্রধান আলী সিলভু ও গোয়েন্দা প্রধান আহমাদুর চোখে-মুখেও উদ্বেগ ফুটে উঠেছে। তারা উদগ্রীবভাবে অপেক্ষা করছে প্রধানমন্ত্রীর কথার।

টেলিফোন রেখে দিয়েই আহমদ হাত্তা বলে উঠল, ‘মি. আলী সিলভু আপনি তাড়াতাড়ি টেরেক স্টেটে ওভানডোদের বাড়িতে পুলিশ পাঠান। নতুন পুলিশ কমিশনার সাহেব যেন নিজে একটা বড় পুলিশ দল নিয়ে সেখানে যান।’

‘কি ঘটনা স্যার?’ বলল পুলিশ প্রধান আলী সিলভু।

‘ওভানডোর বাড়িতে কে বা কারা হামলা করেছে। হামলাকারীরা তাদের ঘরের দরজা ভাঙতে চাচ্ছে।’ বলল প্রধানমন্ত্রী এক নিশ্বাসে।

‘ও আল্লাহ।’ বলে উঠল পুলিশ প্রধান এবং ঘুড়ে দাঁড়াল। বলল, ‘স্যার, পুলিশ কমিশনার সাহেব এখানেই আছেন। আমি তাকে এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি স্যার।’ বলে সালাম দিয়ে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল পুলিশ প্রধান।

গোয়েন্দা প্রধান বলল, ‘আমিও উঠতে চাচ্ছি স্যার, অনুমতি দিন। আমিও একটু খোঁজ-খবর নেই।’ বলে উঠে দাঁড়াল গোযেন্দা প্রধানও।

‘আপনারা আসুন। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন।’ বলে প্রধানমন্ত্রী তার মোবাইলটা আবার তুলে নিল হাতে।

‘ইয়েস বস, আমরা এখন টেরেক স্টেটে। ওভানডোদের বাড়ি আমরা ঘিরে ফেলেছি। গেটের তিনজন পুলিশ আমাদের ঠেকিয়েছিল। কিন্তু তাদের দিকে স্টেনগান তাক করে তিনটি একশ ডলারের নোট তাদেরকে দেখিয়ে বলেছিলাম, তোমরা জান দেবে, না টাকা নেবে। তারা টাকাই পছন্দ করেছে। তবে তাদের অনুরোধে তাদেরকে ক্লোরেফরম দিয়ে ঘুম পাড়াতে হয়েছে।’ এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে থামলো লিউনার্দো।

টেলিফোনের ওপ্রান্ত থেকে জবাব এল, ‘ধন্যবাদ লিউনার্দো। কিন্তু আসল কাজটা ঠিকমত হওয়া চাই। যে কোন মূল্যে ওদের বাড়িতে ঢুকতে হবে। বাড়ির সবাইকে বেঁধে ফেলে বাড়ি দখল করে বসে থাকতে হবে। আজ রাতে আহমদ মুসা অবশ্যই সেখানে যাবে। গেলে দরজা খুলে সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে আহমদ মুসা ও লিন্ডার উপর। তাদের দু’জনকেই আমি জীবন্ত চাই লিউনার্দো। আমার দেহের যত ফোটা রক্ত ওরা ঝরিয়েছে, প্রতি ফোঁটা রক্তের মূল্য আমি ওদের গা থেকে তুলব। ঠিক আছে?’ ওপ্রান্তের কণ্ঠ থেমে গেল।

লিউনার্দো বলে উঠল, ‘ইয়েস বস, আমরা সব বুঝেছি। আমরা আপনার নির্দেশ পালন করব।’ থামল লিউনার্দো।

ওপ্রান্ত থেকে কথা ভেসে এল আবার, ‘চেষ্টা করবে দরজা না ভেঙে এবং দরজায় কোন গুলী-গোলার দাগ না রেখে প্রবেশ করতে। আহমদ মুসার চেয়ে ধড়িবাজ আর কেউ নেই। সে এসব দেখলে সন্দেহ করবে এবং সরে পড়তে পারে। সে সুযোগ তাকে দেয়া যাবে না লিউনার্দো।’ থামল ওপারের কণ্ঠ।

লিউনার্দো বলল, ‘ইয়েস বস, আমরা এই চেষ্টাই করব। আরেকটা কথা বস, আমরা যদি কয়েকজন বারে অবস্থান করি এবং কয়েকজন ভেতরে ঢুকে

অপেক্ষা করি, তাহলে কেমন হয়? তাতে তার পালানো আটকানো যাবে এবং সামনে-পিছনে দুদিক থেকেই তাকে আক্রমণ করা যাবে।' থামল লিউনার্দো।

ওপ্রান্ত থেকে আবার কথা বলে উঠল, 'তোমরা যা ভাল বোঝ তাই কর। আমি চাই তারা তোমাদের হাতে ধরা পড়ুক, তা যেভাবেই হোক। আমি আর ভাবতে পারছি না।'

'জানি আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে বস। অপারেশনের পর সব ঠিক হয়ে যাবে। অপারেশনের সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে যায়নি ইতিমধ্যে?' থামল লিউনার্দো।

ওপার থেকে বলল, 'হ্যাঁ, লিউনার্দো। ডাক্তার প্রস্তুত, অপারেশেনের সব কিছু প্রস্তুত। অপারেশনের টেবিলে শোবার আগে তোমাকে এই টেলিফোন করেছি।' থামলো ওপারের কন্ঠ।

লিউনার্দো বলল, 'ঈশ্বর সাহায্য করুন।'

'ধন্যবাদ, গুডবাই লিউনার্দো।' বলল ওপারের কণ্ঠ।

ওপার থেকে লাইন কেটে গেছে। লিউনার্দো মোবাইল অফ করে পকেটে রাখল। টেলিফোনের ওপ্রান্ত থেকে লিউনার্দোর সাথে কথা বলল ভীষণভাবে আহত জোয়াও লেগার্ট।

আহমদ মুসা ও লিন্ডা জোয়াও কে আহত অবস্থায় রেখে চলে আসার পর সে বহুকষ্টে শরীরের সব শক্তি ব্যবহার করে উঠে আসে আন্ডার গ্রাউন্ড কক্ষ থেকে উপরে তার যোগাযোগ কক্ষে। টেলিফোন করে পারামারিবো শহরে অবস্থানকারী তার প্রধান সহকারী লিউনার্দোকে। সব কথা তাকে জানিয়ে নির্দেশ দেয় তখনি টেরেক স্টেটে ওভানডোদের বাড়িতে অভিযান চালাতে সবটা জনশক্তি নিয়ে। নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথেই লিউনার্দো তার এগারজন কমান্ডো নিয়ে যাত্রা করে টেরেক স্টেটে ওভানডোদের বাড়িতে। রাত পৌনে তিনটার মধ্যেই তারা টেরেক স্টেটের বাইরের গেটে পৌছে যায়।

জোয়াও লেগার্টের সাথে কথা বলে টেলিফোন পকেটে রেখে দিয়েই মুখ তুলল তার সহকারীর দিকে। বলল, 'ওদিকের কি খবর?'

'ধাক্কিয়ে, ডাকাডাকি করে দরজা খোলানো যাবে না। প্রথমে দু'একটা কথা বলেছে। এখন একেবারে নিরব।' বলল লিউনার্দোর সহকারী রবার্তো।

‘বস বলেছেন, বাইরের দিকের দরজা ভাঙা যাবে না কিংবা গুলী করে তালা আনলক করা ও ছিটকিনি নষ্ট করাও যাবে না। কারণ বাইরে থেকেই বাড়িতে কিছু ঘটেছে এটা আঁচ করতে পারলে আহমদ মুসা পালিয়ে যাবে।’ বলল লিউনার্দো।

‘তা হবে কেন? আমরা তাকে পালাতে দেব কেন। আমরা যদি চারদিকে ওঁৎ পেতে থাকি, পালাতে পারবে কেমন করে সে?’ বলল রবার্তো।

‘আমার যুক্তিও তোমার মতই অনেকটা। কিন্তু বস অতি সাবধানী। তিনি আহমদ মুসা ও ম্যাডাম লিন্ডাকে চার দেয়ালের মধ্যে ঢুকাতে চান, তারপর তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা বলেছেন। তার কথায় বাস্তবতা আছে। আহমদ মুসাকে তিনি আমাদের চেয়ে বেশি চেনেন। জানো কিছুক্ষণ আগে দুর্ভেদ্য বন্দীখানা থেকে আমাদের কিনিক কোবরা’র ৮ জনকে হত্যা করে এবং বসকে মারাত্মক আহত করে লিন্ডা ও তার মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে। কল্পনা করতে পার কতবড় ধড়িবাজ কুশলী সে!

বন্দী অবস্থায় আটজনকে হত্যা করে যে পালিয়ে আসতে পারে, আমরা ১১জন বাইরে লড়াই করে তাকে হারাতে পারব, এ নিশ্চিত দাবি আমরা কি করতে পারি? এই কারণেই বস চান নিঃসন্দেহ মনে অপ্রস্তুত অবস্থায় যেন সে আমাদের ফাঁদে পা দেয়, তার ব্যবস্থা করতে। থামল লিউনার্দো।

অপ্রস্তুত তিনি নাও তো থাকতে পারেন। আমরা এসেছি দরজা ধাক্কিয়েছি, ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছি, এ সব বিষয় ভেতরের সবার জানা হয়ে গেছে এবং আমরা যে তাদের শত্রু পক্ষ সে সম্বন্ধে তাদের মনে সন্দেহ নেই। যদি তাই হয় তাহলে এতক্ষণে বিষয়টা তারা পুলিশে জানিয়ে দিয়েছে। বলল, রবার্তো।

কিন্তু টেলিফোনের সব লাইন তো আমরা কেটে দিয়েছি। বলল লিউনার্দো।

মোবাইল যদি ওদের থাকে। বলল, রবার্তো।

ওহ গড এ কথা তো মনে আসে নি। আছে কি ওদের কারো মোবাইল? বলল লিউনার্দো।

জানি না। কিন্তু আছে ধরে নিতে হবে। বলল রবার্তো।

ঠিক বলেছ রবার্তো।

কথাটার পর একটু থেমেই আবার বলে উঠল লিউনার্দো, রবার্তো তুমি দু'জনকে নিয়ে চলে যাও গেটে। সংজ্ঞাহীন তিনজন পুলিশের পোশাক খুলে নিয়ে তা তোমরা তিনজন পরে নিয়ে গেটে অপেক্ষা কর। পুলিশ যদি আসে তাহলে তারা যেন এ বাড়ি পর্যন্ত পৌছতে না পারে তার ব্যবস্থা করবে। কি ভাবে করবে তা তোমরাই ঠিক করবে। তোমাদেরকে ওরা সন্দেহ করবে না, এটাই হবে তোমাদের জন্যে বড় প্লাস পয়েন্ট। আর এদিকে ফাঁদ পাতার কাজটা আমরা করছি। থামল লিউনার্দো।

লিউনার্দো থামতেই রবার্তো বলে উঠল, যাচ্ছি বস। একটা কথা বলে যাই। আমি বাড়িটার চার দিক ঘুরে দেখেছি। দূর্গের নিয়মে তৈরী বাড়িটা। কোন প্রাচীর নেই যে টপকে ভেতরে যাওয়া যাবে। চার দিক দিয়েই ঘরের সারি। দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকতে না চাইলে ছাদে উঠতে হবে। আমার বিশ্বাস ভেতরে বাড়ির মাঝখানে একটা চত্বর আছে। ছাদ দিয়ে সেখানে নামতে পারলে বাড়ির লোকদের সহজে কব্জায় আনা যাবে।

বলা শেষ করে ধন্যবাদের অপেক্ষা না করে রবার্তো দু'জনকে নিয়ে ছুটল গেটের দিকে।

গেটের কাছাকাছি চলে এসেছে রবার্তোরা। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে তারা গেট। কিন্তু গেট খোলা দেখে রবার্তোরা বিস্মিত হলো। সংজ্ঞাহীন পুলিশ তিনজনকে গেটের এপাশে রেখে গেটতো তারা ভেতর থেকে বন্ধ করে গিয়েছিল। কে গেট খুলল। যেই খুলুক তাকে প্রাচীর ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকতে হয়েছে। আর যদি কেউ ভেতরে ঢুকে থাকে, গেট খুলে থাকে তাহলে তো তারা গেটের পাশের সংজ্ঞাহীন পুলিশদেরকেও দেখতে পেয়েছে, আহমদ মুসা কি এসেছে লিন্ডাকে নিয়ে? না আহমদ মুসা গেট বন্ধ দেখলে প্রাচীর ডিঙিয়ে ঢুকবে না। তাছাড়া টেরেক স্টেটে ঢুকবার একটা গোনী পথ নাকি আছে। সেটা আহমদ মুসা অবশ্যই জানে। সে লিন্ডাকে নিয়ে টেরেক স্টেটে ঢুকবার জন্যে সামনের গেট অবশ্যই ব্যবহার করবে না। তাহলে কি পুলিশ এসেছে? হতে পারে।

রবার্তোরা রাস্তা ছেড়ে দিয়ে পাশেই একটা টিলার পাশে গুঁটি মেরে বসল।

এক মিনিটও গেল না।

গেট দিয়ে পুলিশের দু'টি জীপ এবং দু'টি বড় ক্যারিয়ার প্রবেশ করল।

পুলিশের গাড়িবহর এগুচ্ছে ওভোনডোদের বাড়ির দিকে।

তার ওপর নির্দেশ পুলিশকে বাঁধা দিতে হবে ওভানডোদের বাড়ি যাওয়া থেকে। কিন্তু কিভাবে এটা সম্ভব? পুলিশের সংখ্যা ত্রিশের বেশী হবে। পুলিশরা যেহেতু গাড়ির প্রোটেকশনে এবং আড়াল অবস্থায় আছে তাই তাদের স্টেনগানের প্রথম আক্রমণে ক'জনকেই বা তারা নিষ্ক্রিয় করতে পারবে? কিন্তু তারপরেই তারা এ্যাকশনে আসবে। তাদের হাতে গাড়ি থাকায় তারা সুবিধা বেশী পাবে। তার ফলে পুলিশদেরকে ওভানডোদের বাড়ি যাওয়া থেকে বিরত রাখা যাবে না। এই অবস্থায় পুলিশকে দু'দিক থেকে আক্রমণ করে কাবু করতে পারলে আহমদ মুসার জন্যে নিরাপদে অপেক্ষা করার একটা সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে।

এই চিন্তা করে রবার্তো তার মোবাইলে ফোন করল লিউনার্দোকে। তাকে বলল তার চিন্তার কথা। লিউনার্দো সব শুনে তাকে বলল রবার্তো যে প্রস্তাব দিয়েছে সেটাই এখন বেষ্ট বিকল্প। কিন্তু পুলিশের লড়াইয়ে নামলে আহমদ মুসাকে ফাঁদে আটকাবার আমাদের পরিকল্পনা মাঠে মারা যেতে পারে। একটাই শুধু আশা, আমরা যদি পুলিশের ঝামেলাটা তাড়াতাড়ি মিটিয়ে ফেলতে পারি, তাহলে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হতে পারে। উত্তরে রবার্তো তাকে বলল, আসুন আমরা এ চেষ্টাই করি। ওপ্রান্ত থেকে লিউনার্দো সম্মতি জানালো, ঠিক আছে আসছি।

টেরেক স্টেটে ঢোকার পর পুলিশের গাড়ি ধীর গতিতে এগুচ্ছে। রবার্তো তার দু'ই সাথীদের নিয়ে যতটা সম্ভব দেহ গুটিয়ে মাথা নিচু করে দ্রুত এগিয়ে চলল গাড়ির পেছনে। গাড়ির সাথে একটা অনূকুল এ্যাংগেলে আসার পর তার দুই সাথীকে লক্ষ্য করে বলল, তোমরা গাড়ীগুলোর উপরের অংশে ফায়ার কর আর আমি গাড়িগুলোর টায়ার কতটা নষ্ট করা যায় দেখি।

রবার্তোদের ফায়ার শুরু হলো।

গাড়িগুলো তখন ওভানডোদের বাড়ির পথে অর্ধেকেরও বেশি এগিয়েছে?

রবার্তোদের ফায়ার শুরু হবার সাথে সাথে চারটি গাড়িই থেমে গেল।

দু'টি টায়ার ফাটার শব্দ হলো, তাও পেছনের দু'টি ক্যারিয়ারের।

গাড়ির ওপর গুলীবর্ষণ চলতে থাকল অবিরামভাবে যাতে ওরা গাড়ি থেকে নেমে পজিশন নেওয়ার সুযোগ না পায়। আর যদি গাড়ির ওপাশে ওরা নামার চেষ্টা করে তাহলে লিউনার্দো ওদের টার্গেট করবে।

রবার্তোর এই চিন্তার সাথে সাথেই ওপার থেকে অনেকগুলো স্টেনগান গর্জন করে উঠল। গাড়ীর আরও কয়েকটি টায়ার ফাটার শব্দ হলো।

গাড়ি থেকে কোন গুলী হচ্ছে না। এদিক থেকে রবার্তো ওদিক থেকে লিউনার্দো গুলী বর্ষণ অব্যাহত রেখে গাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের টার্গেট গাড়িগুলোকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে লড়াইটাকে মুখোমুখি পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া। কারণ তাদের দরকার তাড়াতাড়ি লড়াই সমাপ্ত হওয়া।

কিন্তু রবার্তো ও লিউনার্দো গাড়ির কাছাকাছি পৌঁছতেই চারটি গাড়ি থেকে একসাথে গুলী বর্ষণ শুরু হলো।

রবার্তো ভাবল পুলিশ তাদের কাছে আসারই অপেক্ষা করছে যাতে তারা টার্গেট সুনির্দিষ্ট করতে পারে।

কিন্তু তাদের টার্গেট সুনির্দিষ্ট হচ্ছে না। পুলিশকে এলোপাতাড়ি গুলী ছুড়তে হচ্ছে।

গাড়ি চারটি ঝাঁঝরা হয়ে গেল। কিন্তু পুলিশ কয়জন আহত-নিহত হয়েছে বুঝতে পারল না রবার্তোরা। তবে পুলিশ অবরুদ্ধ হয়ে বেকায়দায় পড়েছে নিঃসন্দেহ।

আবারও হঠাৎ পুলিশের গুলী বর্ষণ একসাথে বন্ধ হয়ে গেল। লিউনার্দো রবার্তোকে টেলিফোনে জানাল পুলিশ আমাদের আরও ক্লোজ করতে চাচ্ছে তাদের কাছে। এর অর্থ তাদের আরও সুনির্দিষ্ট হওয়ার সুযোগ দেয়া অথবা লড়াই লংগার করার জন্যে তাদের গুলী তারা সাশ্রয় করতে চাচ্ছে।

রবার্তো উত্তরে বলল, এ সুযোগ তাদের দেয়া যাবে না বস। সময় পেলে টেলিফোন করে আরও পুলিশ তারা আনবে। আমরা তাতে বিপদে পড়ব। আমার প্রস্তাব হলো আমরা চারদিক থেকে গুলী অব্যাহত রাখি, আর কয়েকজন ক্রলিং করে গিয়ে গাড়ি দখল করুক। এই অন্ধকারে ওদের চোখকে ফাঁকি দেয়া যাবে। তাছাড়া ওদের নজর থাকবে গুলীর উৎসের দিকে।

লিউনার্দো বলল টেলিফোনে, ঠিক আছে। আমি পাঁচজনকে পাঠাচ্ছি, তুমি একজনকে পা..................। হঠাৎ কন্ঠ থেমে গেল লিউনার্দোর।

ওভানডোদের বাড়িতে প্রায় এসে গেছে আহমদ মুসা। দু'শ গজ দূরেও নয় আর বাড়িটা। হঠাৎ প্রচন্ড গোলা-গুলীর শব্দে থমকে দাঁড়াল আহমদ মুসা এবং লিন্ডা ও ক্রিস্টিনাও।

আগে হাঁটছিল আহমদ মুসা। আহমদ মুসার পেছনে ক্রিস্টিনা। সবার শেষে লিন্ডা।

রবার্তোর ধারণাই ঠিক। আহমদ মুসা টেরেক স্টেটে প্রবেশ করেছে গোপী দরজা দিয়ে। দরজাটা ধ্বংস প্রাপ্ত দুর্গ থেকে সোজা পূর্বদিকের প্রাচীরে।

গোপী দরজার জায়গাটায় সমুদ্র-তীরের কোষ্টাল হাইওয়ে এবং টেরেক স্টেটের মাঝখানে রয়েছে ভাঙা মিনারের মত উঁচু স্থাপনা। এক সময় এটা বাতিঘর ছিল বলে মনে করা হয়। ভাঙা মিনারটি টেরেক স্টেটেরই অংশ। টেরেক স্টেটের প্রাচীর এবং ভাঙা মিনারের পশ্চিম দেয়াল একই। এই দেয়ালের মাঝ বরাবর প্রায় ছয় ফুট উঁচুতে দেখা যাবে একটা মরিচা ধরা পেরেকের মাথা। আর ঠিক তার নিচে মেঝে থেকে দুই ফুট উপরে আড়াই বর্গফুট আয়তনের একটা জানালা। জানালাটা ভারী ইস্পাতের প্লেট দিয়ে ঢাকা। এটাই টেরেক স্টেটে ঢোকার গোপী দরজা। স্প্রিং লকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পেরেকের মাথাটা টানলে দরজা উপরে উঠে যায়। দরজা পার হয়ে ওপারে গিয়ে দরজাটা টেনে নিচে নামিয়ে আনলে পেরেকটা

আবার ভেতরে ঢুকে গিয়ে দরজা বন্ধ রাখে। ভেতরের পাশেও অনুরুপ পেরেকের সুইচ আছে।

গুলী গোলার শব্দে থমকে দাঁড়িয়েই আহমদ মুসা শব্দ লক্ষ্যে ফিরে তাকাল। বলল, 'লিন্ডা সংঘর্ষটা চলছে টেরেক স্টেটের ভেতরে দুই গ্রুপের মধ্যে। আমি মনে করছি, এই সংঘর্ষের সাথে ওভানডোদের সর্ম্পক আছে। তোমরা এস, আমার সাথে দৌড়াও।'

বলে আহমদ মুসা ছুটল ওভানডোদের বাড়ির দিকে।

দাঁড়াল গিয়ে ওভানডোদের গেটে। দরজা বন্ধ। বাইরে কেউ নেই, ভেতরেও কোন সাড়া শব্দ নেই। তাহলে ঘুমুচ্ছে কি সবাই? সংঘর্ষটা তাহলে কাদের মধ্যে? গেটে কয়েকবার করাঘাত করল। কেউ সাড়া দিল না।

ইতিমধ্যে লিন্ডা ও ক্রিস্টিনা এসে আহমদ মুসার পাশে দাঁড়িয়েছে।

আহমদ মুসা তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'লিন্ডা এটাই ওভানডোদের বাড়ি। দুর্গ থেকে সরে আসার পর এখানেই একটা বাড়ি বানানো হয়। সেটাও ভেঙে গেলে পরে এই বাড়ি বানানো হয়েছে।'

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা বলল, 'লিন্ডা ও ক্রিস্টিনা তোমরা এখানে দাঁড়াও বা আসতে পার। ওদিকে গিয়ে ডেকে দেখি। এখান থেকে ওদের জাগানো যাবে না।

'আমাদের ভয় করছে, আপনার সাথে যাব।'

বলে লিন্ডা ও ক্রিস্টিনা হাঁটা শুরু করল আহমদ মুসার পেছনে পেছনে।

ওভানডোর ঘরটা বাড়ির দক্ষিণ দিকের একেবারে মাঝামাঝি জায়গায়।

আহমদ মুসা গিয়ে দাঁড়াল ওভানডোর জানালা বরাবর নিচে।

ওভানডো থাকে দোতলায়। লোহার গরাদে ঢাকা। আহমদ মুসা সেখানে দাঁড়িয়ে উপর দিকে চোখ তুলতে গিয়ে একতলার গরাদের ফাঁক দিয়ে আলো দেখতে পেল। কথার অস্পষ্ট শব্দও তার কানে এল।

যে ফাঁক দিয়ে আলো আসছে সে ফাঁকে চোখ লাগাল আহমদ মুসা। ফ্যামিলি গ্যাদারিং-এর সবচেয়ে বড় লাউঞ্জ এখানে। এবং এখানেই বাড়ির আন্ডার গ্রাউন্ড সেন্টারে নামার গোনী সিঁড়িপথ রয়েছে।

আহমদ মুসা চোখ লাগিয়ে পরিষ্কার কিছু দেখতে পেল না। তবে বুঝল, লোকজন রয়েছে ভেতরে।

আহমদ মুসা হাত দিয়ে নক করল লোহার গরাদে। কোন ফল হলো না।

অবশেষে জানালার গরাদে ধাক্কালো এবং গরাদের ফাঁকে মুখ নিয়ে 'ওভানডো, ওভানডো, বলে ডাকা শুরু করল।

মিনিট খানেক পরে লোহার গরাদটা দু'ইঞ্চি খুলে গেল। বাইরে অন্ধকার, কিছু দেখতে পাচ্ছে না। কণ্ঠ ভেসে এল, 'কে আহমদ মুসা ভাই?' ভয়ার্ত কণ্ঠ ওভানডোর।

'হ্যাঁ, আমি আহমদ মুসা ওভানডো।' বলল আহমদ মুসা গরাদের ফাঁকে মুখ নিয়ে।

সংগেই সংগেই গোটা জানালাটা খুলে গেল। দেখা গেল ভেতের পরিবারের সবাই। ভয়ে কুকঁড়ে আছে সকলে।

জানালা খুলতেই আহমদ মুসা দ্রুত কণ্ঠে বলল, 'ওভানডো তাড়াতাড়ি গেট খুলে দাও। কথা পরে বলছি।'

'ভাইয়া, আপনি গেটে যান। আমি যাচ্ছি গেটে।' বলেই ওভানডো ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটল।

আহমদ মুসারাও ছুটল গেটের দিকে। গেট খুলল ওভানডো। তার সাথে পরিবারের সবাই হাজির। ওভানডো জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে। শিশুর মত কেঁদে উঠল ওভানডো। বলল, 'আপনি ফেরেশতা ভাইজান। আল্লাহ আপনাকে ঠিক সময়েই পাঠান।'

ভয়ে কুঁকড়ে যাওয়া ওভানডোর বোন লিসা, মুখে ওড়না দিয়ে কান্না চাপার চেষ্টা করছে। ওভানডোর মা, দাদী, স্ত্রী সবার চোখেই পানি।

আর এদিকে লিন্ডা ও ক্রিস্টিনা বিস্ময়ভরা চোখে দেখছে পরিবারের সবাইকে।

আহমদ মুসা ওভানডোর কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'ওভানডো এখন ভয় বা আবেগ প্রকাশের সময় নয়, তুমি বল কি ঘটেছে?'

ওভানডো চোখ মুছে বলল, 'স্যরি।'

তারপর সে কোন অজ্ঞাত শত্রু কর্তৃক তাদের বাড়ি ঘিরে ফেলার কথা, দরজা ধাক্কানীর কথা এবং ওদের দরজা খোলার নানা চেষ্টার বিবরণ দিয়ে বলল, 'হঠাৎ করেই এই সংঘর্ষ ওখানে শুরু হয়ে গেছে। আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে এইটুকু বুঝতে পারছি, এই সংঘর্ষ শুরু না হলে ওরা এতক্ষণে আমাদের দরজা ভেঙে বাড়িতে ঢুকে যেত।'

'তোমরা কি পুলিশে টেলিফোন করেছিলে?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'হ্যাঁ, লিসা টেলিফোন করেছিল।' বলল ওভানডো।

আহমদ মুসা তাকাল লিসার দিকে। লিসা চোখ মুছছিল। বলল, 'ভাইয়া আমি টেলিফোন করেছিলাম প্রধানমন্ত্রীকে, ফাতিমার আব্বাকে। উনি সংগে সংগেই পুলিশ পাঠাচ্ছেন বলেছিলেন।'

'ধন্যবাদ লিসা, তুমি ঠিক জায়গায় টেলিফোন করেছিলে। পুলিশের কাছে টেলিফোন করলে পুলিশ অতটা গুরুত্ব নাও দিতে পারতো।'

একটু থেমে ওভানডোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'সন্দেহ নেই ওভানডো, পুলিশের সাথে সেই অজ্ঞাত শত্রুদের সংঘর্ষ হচ্ছে। তবে আমি মনে করি, শত্রু অজ্ঞাত নয়। মাফিয়া অর্থাৎ 'কিনিক কোবরা'র সদস্যরাই এখানে অভিযানে এসেছে।'

'কিনিক কোবরা?' বিস্মিত ওভানডোর মুখে প্রশ্ন ফুটে উঠল।

'তোমার প্রশ্নের উত্তর পরে হবে।' বলে সকলকে উদ্দেশ্য করে লিন্ডা ও ক্রিস্টিনাকে দেখিয়ে বলল, 'এদের আপনারা ভেতরে নিয়ে যান। এদের পরিচয় এদের কাছ থেকেই আপনারা জেনে নেবেন। আমি ওদিকে যাই। কি ঘটছে দেখি। পুলিশকে ওরা কাবু করতে পারলে ওরা হামলা করবে এখানে।'

আহমদ মুসা তার মিনি মেশিনগান 'উজি' হাতে নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে চলতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল। বলল ওভানডোকে, 'তুমি ঘর থেকে আমার এম-১০ টা এনে দাও। ম্যাগজিন ঠিক আছে কিনা দেখো।'

ওভানডো ছুটল ভেতরে। ওভানডোর মা লিন্ডাকে লক্ষ্য করে বলল, 'মা তুমি ভেতরে এস।' বলে নিজের এবং পরিবারের সবার পরিচয় দিল লিন্ডাকে।

‘মা, আমার পরিচয়টা? আমি দেখছি পরিবারের বাইরের হয়ে গেলাম!’ ঠোঁটে হাসি টেনে বলল আহমদ মুসা।

মিস্টি হাসল ওভানডোর মা। বলল, ‘তুমি আমার বড় ছেলে, আমার এই নতুন মা তা ভালো করেই জানে। পরিচয় দিতে হবে কেন?’

‘আমি কিন্তু মা আপনার সবচেয়ে বড় সন্তান। মি. আহমদ মুসা ভাইয়া নিশ্চয় বয়সে আমার ছোট হবেন।’ বলল লিন্ডা ওভানডোর মাকে লক্ষ্য করে।

‘নিশ্চয় মা, ওয়েলকাম।’ বলে ওভানডোর মা দুই হাত বাড়ালো লিন্ডার দিকে। লিন্ডা গিয়ে জড়িয়ে ধরল ওভানডোর মাকে।

লিন্ডা একে একে দাদী, ওভানডোর স্ত্রী জ্যাকি, লিসা সবাইকে জড়িয়ে ধরল।

লিসা লিন্ডাকে ছেড়ে দিয়েই কাছে টেনে নিল ক্রিস্টিনাকে। বলল, ‘মামনি, আমি তোমার আন্টি।’

‘দাদী, এই মুহুর্তে লিন্ডা ও ক্রিস্টিনা যে আদর পেল এক মাসেও তা আমি পাইনি। তাই তো মানুষ বলে, ‘রক্তের টান সবচেয়ে বড় টান।’ কৃত্রিম অভিমানের স্বরে বলল আহমদ মুসা।

‘যে সব সময় মারামারি আর গোলাগুলী নিয়ে থাকে, সে মানুষের আদর-মমতা বুঝবে কি করে! যাক সে কথা ভাই, রক্তের টানের কথা বলছ কেন? লিন্ডা কে?’

এ সময় এম-১০ নিয়ে হাজির হলো ওভানডো।

আহমদ মুসা তার হাত থেকে এম-১০ নিয়ে নিল। বলল দাদীর কথার উত্তরে, ‘দাদী এ প্রশ্নের জবাব আমার চেয়ে লিন্ডাই ভাল দিতে পারবে।’

বলে ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছিল আহমদ মুসা। ওভানডো বলল, ‘ভাইয়া আমি আপনার সাথে যাব। আমার জন্যে স্টেনগান নিয়ে এসেছি একটা।’

আহমদ মুসা থেমে গিয়ে শক্ত দৃষ্টিতে ওভানডোর দিকে তাকিয়ে বলল, ‘এত বড় বাড়িতে এই পরিস্থিতিতে এতগুলো জীবনের পাহারায় একজন পুরুষ কি থাকা উচিৎ নয় ওভানডো?’

ওভানডো মুখ নিচু করল। কিছু বলতে পারলো না।

আহমদ মুসা আবার ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছিল। ওভানডোর দাদী বলে উঠল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, 'ভাই তুমি তো কারও মমতা, ভালবাসার দিকে এক বিন্দুও তাকাও না। এইতো ওভানডোর মমতাকে তুমি কর্তব্যের হাতুড়ি দিয়ে কিভাবে গুড়িয়ে দিলে!'

আহমদ মুসা থমকে দাঁড়িয়েছিল। বলল, 'মমতা-ভালবাসার সুশীতল অংগন সবার জন্যে নয় দাদী!'

আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্রুত হাটতে শুরু করল।

সবার অপলক দৃষ্টি আহমদ মুসার দিকে। ওভানডোর দাদী বলে উঠল, 'আমার কর্তব্য-পাগল এ ভাইটিকে দেখলে মনে হয় সে অন্য কোন কিছুরই তোয়াক্কা করে না। কিন্তু তার ভেতরে রয়েছে কান্নার এক সাগর। কান্নার এ বুভুক্ষা মমতার পিয়াসী।' ধীর স্বগতোক্তির মত কণ্ঠস্বর ওভানডোর দাদীর।

দক্ষিণ দিক থেকে ভেসে আসা অবিরাম গুলী বর্ষণের উত্তপ্ত তরঙ্গে বেসুরো লাগল ওভানডোর দাদীর মমতার সুর।

ওভানডো ধীরে ধীরে এগিয়ে দরজা বন্ধ করতে করতে বলল, 'ভাইয়াকে জীবন-মৃত্যুর খেলায় ঠেলে দিয়ে এভাবে তার পেছন থেকে দরজা বন্ধ করতে খুব খারাপ লাগছে।'

'আহমদ মুসা সবার জন্যে ভালোটাই চিন্তা করে ওভানডো।' বলল ওভানডোর মা।

'শুধু নিজের ভালোটা ছাড়া, আম্মা।' বলল ওভানডো দরজা বন্ধ করে ফিরতে ফিরতে।

'আমি পারবো না, কিন্তু তোর কথার জবাব আমার ঐ ছেলের কাছে আছে।' বলে ওভানডোর মা লিন্ডার এক হাত ধরে বলল, 'চল মা।'

ওভানডোর মা লিন্ডাকে নিয়ে হাঁটা শুরু করল। তার সাথে চলল ক্রিস্টিনাও।

ওদিকে আহমদ মুসা ওভানডোদের বাড়ির এলাকা পার হবার পর সংঘর্ষের স্থানটাকে মোটামুটি চিহ্নিত করে নিয়ে দ্রুত পৌঁছাবার জন্যে মাঠের মধ্যে দিয়ে ছুটল। রাস্তা দিয়ে গেলে দেড়গুণ রাস্তা বেশি অতিক্রম করতে হয়।

আহমদ মুসা গোলাগুলীর রেঞ্জে আসার পর মাটিতে শুয়ে পড়ে ক্রলিং করে এগুতে লাগল। প্রায় ১০০ গজের মধ্যে এসে গেছে আহমদ মুসা। এখন সামনের সবটাই তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। রাস্তার উপর চারটি গাড়ি দাঁড়িয়ে। দুটি জীপ এবং দুটি ক্যারিয়ার। আহমদ মুসা নিশ্চিত ৪টি গাড়িই পুলিশের। বোঝা যাচ্ছে পুলিশের গাড়ি আক্রান্ত হয়েছে 'কিনিক কোবরা'দের দ্বারা। ভাল করে খেয়াল করে সে বুঝল, এই মুহূর্তে গাড়ি থেকে গুলী আসছে না। উত্তর দিক থেকে বেশির ভাগ গুলী যাচ্ছে। দক্ষিণ দিক থেকেও গুলী আসছে, তবে কম। খুশি হলো আহমদ মুসা। কারণ সে এগুচ্ছে দক্ষিণ দিকে। দক্ষিণ দিক থেকে গুলী এলে এগুনো কঠিন হতো।

যেখানে গাড়ি চারটি দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে রাস্তা উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম কোনাকুনি। আর আহমদ মুসা সোজা দক্ষিণে এগুচ্ছে। অতএব গাড়িগুলো তার মুখোমুখি। যতটা সে বুঝতে পারলো গাড়িগুলোর টায়ার নষ্ট করে দেয়া হয়েছে, যাতে গাড়িগুলো চলতে না পারে। গাড়ি না চলুক পুলিশের তরফ থেকে গুলী আসছে না কেন? সব পুলিশ মারা গেছে, এটা অসম্ভব। তাহলে এটা তাদের কোন কৌশল?

পুলিশের গাড়ির দিকে গুলী যাচ্ছে যেহেতু উত্তর দিক থেকে বেশি, সেহেতু আহমদ মুসা নিশ্চিত হলো 'কিনিক কোবরা'দের মূল শক্তি উত্তর দিকে।

আহমদ মুসা তার গতি পরিবর্তন করে পশ্চিম দিকে এগুলো। 'কিনিক কোবরা'দের ঠিক পেছনে গিয়ে ওদের দিকে অগ্রসর হবার জন্যে।

আহমদ মুসা এগুলো নিঃশব্দে, সাপের মত। 'উজি' কারবাইনটা কাঁধে ঝুলানো, আর হাতে রয়েছে তার প্রিয় এম-১০।

আহমদ মুসা পশ্চিম দিকে এগিয়ে ওদের পেছনে পৌছার পর এগুতে লাগল কিনিক কোবরা'র দিকে।

অনেকটা এগিয়েছে আহমদ মুসা, মাঝখানে দশগজও দুরত্ব নেই। ছায়ামূর্তির মত ওদের প্রত্যেককেই দেখতে পাচ্ছে আহমদ মুসা। ওরা ছয়-সাতজন হবে।

আহমদ মুসার এম-১০ রেডি। এম-১০ এর ট্রিগারে রয়েছে তার তর্জনি।

আহমদ মুসা স্পষ্ট করে তাদের দেখতে চায়।

আরও সামনে এগুতে লাগল সে।

হঠাৎ একটা ধাড়ি ইঁদুর তার সামনে দিয়ে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে চলে গেল। যাবার সময় ইদুরটা কয়েকটা শুকনো পাতা সজোরে উল্টিয়ে দিয়ে গেল। ঠিক সেই সময় গুলী বর্ষণে একটা ছেদ নেমেছিল। নিরবতার মধ্যে শুকনো পাতার শব্দ যেন বুলেটের মতই শব্দ করে উঠল।

শংকিত ও সর্তক আহমদ মুসা দেখল মোবাইল কানে ধরে রাখা একজন লোক এদিকে ফিরে তাকিয়েছে এবং আহমদ মুসাকে দেখতেও পেয়েছে। দেখতে পাওয়ার সাথে সাথে তার হাতের মোবাইলটা পড়ে গেল এবং ডান হাতের দিকে ছুটে গেল তার বাম হাত।

কি ঘটতে যাচ্ছে আহমদ মুসা বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু লোকটার স্টেনগান গর্জে উঠার আগেই আহমদ মুসার এম-১০ গর্জে উঠল। শুধু ঐ লোকটিই নয়, ওদের সবার উপর দিয়ে একবার ঘুরে এল তার এম-১০।

গুলী করার পর কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল আহমদ মুসা। 'কিনিক কোবরা'র এ লোকদের তরফ থেকে আর কোন সাড়া এল না।

আহমদ মুসা এগুলো ওদের দিকে। দেখল, গুলী খেয়ে পড়ে যাওয়া লাশগুলোর উঠে দাঁড়াবার কোন লক্ষণ নেই। মোবাইলে যে লোকটি কথা বলছিল তার লাশের পাশে মোবাইলটা পাওয়া গেল। মোবাইলটা তুলে নিল আহমদ মুসা। মোবাইলটা অন ছিল তখনও। মোবাইলটা আহমদ মুসা কানে ধরল। ওপার থেকে একটা কণ্ঠ চিৎকার করছে, 'লিউনার্দো, কি ব্যাপার? কি ঘটেছে? কথা বলছ না কেন?'

'লিউনার্দোসহ এখানে সাতজন মারা গেছে। তোমরা অস্ত্র ফেলে দিয়ে সারেন্ডার কর।' উচ্চ কণ্ঠে নির্দেশ দিল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার কণ্ঠ গাড়ির পুলিশরাও শুনতে পেয়েছিল। দৃশ্যপটে তৃতীয় পক্ষ হাজির হয়েছে এবং এই তৃতীয় পক্ষই যে উত্তর পাশের শত্রু গ্রুপের উপর গুলী বর্ষণ করেছে তাও তারা দেখেছে।

আহমদ মুসার কণ্ঠ থামার সাথে সাথে সামনের জীপের মেঝেতে আশ্রয় নেয়া পুলিশ কমিশনার জীপের মেঝেতেই উঠে বসে বলল, 'আপনি কে জানি না। আপনাকে ধন্যবাদ। শত্রু এখন শুধু এক দি....।'

তার কথা শেষ হলো না, গুলী বর্ষণ শুরু হলো দক্ষিণ দিক থেকে।

পুলিশের সেই কণ্ঠ কথা অসমাপ্ত রেখেই পুলিশের উদ্দেশ্যে নির্দেশ দিল, 'ফায়ার'।

পুলিশ গুলী ছুড়ছে তাদের গাড়ি থেকে সুনির্দিষ্ট টার্গেট না করে। অন্যদিকে দক্ষিণ দিক থেকে কিনিক কোবরা'র লোকরা যে গুলী ছুড়ছে তার সুনির্দিষ্ট কোন কিছুকে টার্গেট নিয়ে নয়, গাড়ির দিকে।

আহমদ মুসার মনে হলো, পুলিশের টার্গেট শত্রুদের পরিশ্রান্ত করা, তাদের অধৈর্য করে তোলে শেল্টারের বাইরে নিয়ে আসা এবং ওদের গুলী শেষ করা।

পুলিশের এ প্রচেষ্ট সময় সাপেক্ষ। তাছাড়া শত্রু গুলী শেষ হবার আগে আশ্রয় থেকে বেরিয়ে না এসে পালিয়েও যেতে পারে।

আহমদ মুসা পুলিশের সনাতন ও দায়সারা কৌশলের উপর নির্ভর না করে ক্রলিং করে আরও পশ্চিম দিকে এগিয়ে অনেক দূর দিয়ে পুলিশের গাড়ি অতিক্রম করে দক্ষিণ দিকে এগুলো। 'কিনিক কোবরা'র লোকেরা যে অবস্থানে থেকে পুলিশের গাড়ির দিকে গুলী ছুড়ছে, তার পেছনে না পৌঁছা পর্যন্ত আহমদ মুসা তার দক্ষিণ মুখে যাওয়া অব্যাহত রাখল। কিনিক কোবরা'দের পেছন বরাবর পৌঁছার পর আহমদ মুসা তার এগুনোর দিক পরিবর্তন করে কিছুটা পূব দিকে এগিয়ে তারপর উত্তর দিকে এগুতে লাগল।

অল্পক্ষণের মধ্যে আহমদ মুসা ওদের পেছনে চলে এল। প্রায় দশ গজের মধ্যে। একদিকে গুলীর শব্দ, অন্যদিকে মনোযোগ সামনের দিকে নিবদ্ধ থাকায় কিনিক কোবরা'র লোকেরা কিছুই টের পেল না।

আহমদ মুসা দেখল, কিনিক কোবরা'র লোকরা মাত্র তিনজন। ওরা একটা ঢিবির আড়ালে পাশাপাশি হাঁটু গেড়ে বসে গুলী করছে।

আহমদ মুসা তার এম-১০ তুলে ধরল। তারপর এম-১০ এর নল তাক করল ওদের দিকে। আহমদ মুসা তার তর্জনি রাখল এম-১০ এর ট্রিগারে। তারপর সে মুখে একটা শীষ দিয়ে উঠল ওদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে।

আহমদ মুসা শীষ দেবার সাথে সাথেই ওরা তিনজন একসাথে বিদ্যুত্ বেগে মুখ ফিরাল এবং ঘুরে এল তাদের স্টেনগানসহ অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে গুলী বর্ষণ অব্যাহত রেখেই।

আহমদ মুসা ওদের অবিশ্বাস্য দ্রুততায় সেকেন্ডের জন্যে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। স্থির হয়ে পড়েছিল ট্রিগারে রাখা তার তর্জনি। পরক্ষণেই আহমদ মুসা সামলে নিয়েছিল নিজেকে। তার তর্জনি চেপে ধরেছিল এম-১০ এর ট্রিগারে। ওরা স্টেনগান ঘুরিয়ে নিয়েছিল এবং গুলীর বৃষ্টিও বেরিয়ে এসেছিল তাদের তিনজনের স্টেনগান থেকে কিন্তু তাদের স্টেনগানের নল ভূমি এ্যাংগেলে নেমে আসার সময় পায়নি, ফলে শুয়ে থাকা আহমদ মুসাকে নাগাল পায়নি সেই গুলীগুলো। আহমদ মুসার আড়াই ফিট তিন ফিট উপর দিয়ে চলে যায় গুলীর ঝাঁক। সেই সুযোগে আহমদ মুসার এম-১০ এর গুলীর বৃষ্টি ঝাঁঝরা করে দিয়েছে ওদের তিনজনকে।

মৃত্যুরুপী বুলেটের ঝাঁক থেকে তাকে রক্ষা করায় সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল।

এখনও গুলী বৃষ্টি হচ্ছে পুলিশের গাড়ি থেকে।

আহমদ মুসা শুয়ে থেকেই চিতকার করে উঠল, পুলিশদের উদ্দেশ্যে, ‘আপনারা গুলী বন্ধ করুন। এরা সবাই মারা গেছে। আমি প্রধানমন্ত্রী আহমদ হাত্তার লোক বলছি।’

এর কয়েক সেকেন্ড পর গুলী থেমে গেল এবং তার সংগে সংগে গাড়ি থেকে নেমে ছুটে এল পুলিশ। তাদের সবার হাতেই টর্চ।

আহমদ মুসা ভূমিশয্যা থেকে উঠে বসল।

আহমদ মুসার উপর চোখ পড়তেই একজন পুলিশ আনন্দে চিতকার করে উঠল, ‘স্যার, এ যে দেখছি প্রধানমন্ত্রীর ড্রাইভার-কাম-সিকিউরিটি, যিনি কিডন্যাপ হয়েছিলেন।’

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল পুলিশ কমিশনার। আহমদ মুসা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। তার একহাতে 'উজি' কারবাইন, অন্যহাতে এম- ১০।

আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে পুলিশ কমিশনার বলল, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, শত কোটি ধন্যবাদ যে, আপনাকে পাওয়া গেছে। মহা খুশি হবেন এ খবর পেলে প্রধানমন্ত্রী মহোদয়।'

বলেই পকেট থেকে মোবাইল বের করল পুলিশ কমিশনার। বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, 'দাঁড়ান মিস্টার, আপনার সাথে পরে কথা বলছি। প্রধানমন্ত্রী মহোদয়কে খবরটা জানিয়ে দেই।'

পুলিশ কমিশনারের কথা শেষ হলো, তার সাথে সাথে মোবাইলে সে প্রধানমন্ত্রীকে পেয়েও গেল। বিগলিত কন্ঠে সম্ভাষণ জানিয়ে সে বলতে শুরু করল, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্যার, সুখবর। কিডন্যাপ হওয়া আপনার 'ড্রাইভার-কাম-সিকিউরিটি' সাহেবকে পাওয়া গেছে।'

'হ্যাঁ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, উনি ভাল আছেন। এই তো আমার সামনে। ওর এক হাতে এখনও এম ১০ এবং অন্যহাতে 'উজি' কারবাইন।'

'এখানকার গন্ডগোল এখন শেষ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। সংঘর্ষে আমরাই জিতেছি। অবশ্য উনি এসে না পড়লে লড়াই ভোর পর্যন্ত চলত। চারদিকের গুলী বৃষ্টির মাঝখানে আমরা চারটা গাড়িতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলাম। উনি একা ওদের সবাইকে হত্যা করেছেন। তারপর আমরা গাড়ি থেকে নেমে এলাম।'

'স্যার, উনি কিভাবে কোত্থেকে এসে পৌঁছলেন আমি এখনও শুনিনি স্যার। আর আমরা মি. ওভানডোদের বাড়িতে পৌঁছতেই পারিনি। টেরেক স্টেটের মাঝ বরাবর যখন গাড়ি বহর, তখন আমরা মাফিয়াদের দ্বারা আক্রান্ত হই।'

'হ্যাঁ প্রধানমন্ত্রী মহোদয় স্যার। আমরা যাব মি. ওভানডোদের বাড়িতে এবং কয়েকজন পুলিশ রেখে আসব তাদের বাড়িতে।'

'হ্যাঁ স্যার, ইয়েস স্যার। টেলিফোন দেব ওঁকে? দিচ্ছি। স্যার বিদায়, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।'

কথা শেষ করে পুলিশ কমিশনার মোবাইলটা আহমদ মুসার হাতে তুলে দিয়ে বলল, ‘নিন, তাড়াতাড়ি ধরুন। প্রধানমন্ত্রী মহোদয় কথা বলবেন।’

আহমদ মুসা টেলিফোন ধরল। সালাম ও কুশল বিনিময়ের পর বলল, ‘না আপনি ব্যস্ত হবেন না, উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই। আমি একদম ভাল আছি। আমি এসে সব বলব।’

‘বলছি, আজ রাত ১ টায় ওদের বন্দীখানা থেকে মুক্ত হতে সমর্থ হই। সমুদ্র উপকুলে টিলার মত একটা ছোট্ট দ্বীপের এক বাড়িতে আমাকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। মুক্ত হবার পরই আমি ওভানডোদের এখানে ছুটে আসি। এসে দেখি সংঘর্ষ চলছে।’

‘সে অনেক কথা। এসে বলব।’

‘হ্যাঁ, ওভানডোরা সবাই ভাল আছে। আমার মনে হয় পুলিশ এসে না পড়লে ওদের ক্ষতি হতে পারতো।’

‘না মি. হাত্তা। যে কাজটাকে আমার বলছেন, সেটা করার আমি একটা নিমিত্ত মাত্র। আল্লাহ সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং আমাকে সামর্থ্যও দিয়েছেন। অতএব প্রশংসার যদি কিছু থাকে, সেটা মহান আল্লাহরই প্রাপ্য।’

‘ঠিক আছে। আজকেই দেখা হবে।’

‘না না। আমার পুলিশ প্রটেকশন দরকার নেই। ওভানডোদের বাড়িতে কয়েকজন পুলিশ থাকলেই চলবে।’

‘ঠিক আছে। এখনকার মত এটুকুই। পরে দেখা হবে।’

সালাম দিয়ে মোবাইলটা আহমদ মুসা পুলিশ কমিশনারের দিকে তুলে ধরে বলল, ‘পুলিশের লোকজনকে এদের লাশ নিয়ে যেতে বলুন। চলুন আমরা ওভানডোদের ওখানে যাই।’ পুলিশ কমিশনারকে লক্ষ্য করে বলল আহমদ মুসা।

পুলিশ কমিশনার কয়েকজন পুলিশকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে অন্য পুলিশদের সাথে নিয়ে ওভানডোদের বাড়ির দিকে যাত্রা শুরু করল।

আহমদ মুসার সাথে হাঁটছে তারা।

# ৬

খাওয়ার টেবিল থেকে ড্রইংরুমের সোফায় এসে বসল আহমদ মুসা। সোফায় গা এলিয়ে দিল সে। নিজেকে খুব পরিতৃপ্ত ও প্রশান্ত অনুভব করছে আহমদ মুসা।

এর একটা কারণ বোধ হয় এই যে, দীর্ঘ ঘুম দিয়েছে সে। ফজরের নামাজ পড়ে ৫ টায় সে ঘুমিয়েছিল, উঠেছে বেলা ১ টায়।

গোসল, নামাজ ও খাওয়া সেরে এই এসে বসল ড্রইং রুমে।

তার পরিতৃপ্তি ও প্রষন্নতার আরেকটা কারণ হতে পারে মারিয়া জোসেফাইনের চিঠি। ঘুম থেকে উঠেই স্ত্রী মারিয়া জোসেফাইনের চিঠি পেয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসার সময় সে জোসেফাইনকে চিঠি লিখে এসেছিল। সেই চিঠিরই জবাব পেয়েছে সে আজ। প্রিয় হাতের স্পর্শ জড়িত চিঠি তার জন্যে নিয়ে এসেছে অমৃতের স্বাদ। বারবার সে পড়েছে চিঠিটা।

পকেট থেকে আবার সে বের করল সেই চিঠি। পড়তে লাগলঃ

প্রিয়তম, আসসালামু আলাইকুম।

আমার এ চিঠি যখন সুরিনামে ওভানডোদের বাড়িতে পৌঁছবে, তখন তুমি সুরিনামে থাকবে কিনা জানি না। তবু আমার এ চিঠি তোমার হাতে পৌঁছবে এ আশা নিয়েই লিখছি। পাখির মত তোমার এই উড়ে বেড়ানোর মধ্যে প্রয়োজনটাই নিয়ামক শক্তি, তা তোমার মত আমিও জানি এবং মানি। কিন্তু এর মধ্যে, আমার মনে হয় তোমার জন্যে একটা বাড়তি রোমাঞ্চ আছে, কিন্তু আমার জন্যে রয়েছে অনিশ্চয়তার দ্বারা তাড়িত হবার বাড়তি একটা কষ্ট, একথা তোমাকে না বললে অবিশ্বস্ততা হয়। তবে, প্রিয়তম, এই কষ্টের মধ্যেও প্রাপ্তির একটা প্রশান্তি আছে যা আমার কাছে অমূল্য। এই অমূল্যের স্বাদ আমাকে সৌভাগ্যের শীর্ষে তুলেছে।

তোমার আমেরিকার চিঠি এবং তার সাথে সারা জেফারসনের চিঠি, যা তুমি পাঠিয়েছ, আমি বার বার পড়েছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আমি যেন নতুন করে আবিষ্কার করলাম। বুঝলাম, ইহুদী বিজ্ঞানী জন জ্যাকবদের পদপীড়িত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আর সারা জেফারসনের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক জিনিস নয়। সারা জেফারসনের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাকে মুগ্ধ করেছে। যে দেশে বিশাল হৃদয় সারা জেফারসনের বাস, সে দেশটিকে আমি একবার দেখতে চাই প্রিয়তম। একবার যাব আমি সেখানে। সারা জেফারসনের 'মন্টিসেলো' আমার কাছে যেন এক খন্ড স্বপ্নের স্বর্গ। তাই বলে আমি সুরিনামকে কোনভাবেই ছোট করছি না, একথা ওভানডো, লিসা, ফাতিমাদের বলো। আমার একটা পরামর্শ তোমার কাছে, জোয়াও বার্নারডো এবং লিসাকে এক সাথে মানাবে বেশ। তুমি ভেবে দেখো।

আমি ভাল আছি। আমাদের 'ভাবী ভবিষ্যত' নিয়ে মাঝে মাঝেই স্বপ্ন দেখি জান। একদিন দেখলাম, একটা সাদা সামরিক হেলিকপ্টারে সওয়ার হয়ে সে এসে রাহমাতুল্লিল আলামিনের শয়নাগার, মসজিদে নববীর নীল গম্বুজে কলেমাখচিত ও জাতিসংঘের মোহরাংকিত সবুজ পতাকা উড্ডীন করছে। পারবে কি সে বিজয় যুগের এমন একজন সিপাহসালার হতে!

তুমি কেমন আছ জানতে চাইব না। তুমি ভাল থাক এটা আমার সব সময়ের প্রার্থনা। এক সময় খুব উদ্বেগে থাকতাম। কিন্তু ধীরে ধীরে বুঝেছি, এই উদ্বেগে পীড়িত হওয়া রাব্বুল আলামীনের উপর একজন মুমিনের অটুট আস্থার বুকে দুর্বলতার একটা কালো দাগ। এই দুর্বলতার স্পর্শ থেকে বাঁচবার জন্যে অবিরাম চেষ্টা করি। তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে, তুমি সব সময় সব খবর জানিয়ে আমাকে সাহায্য কর।

চিঠি শেষ করার আগে একটা বিষয়ের দিকে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, কারণ বিষয়টা তোমার নজর এড়িয়েও যেতে পারে। আজার বাইজান, কুর্দিস্তান, আফগানিস্তান, মধ্যএশিয়া জুড়ে নতুন যে কালোদানব তার ছায়া ফেলতে যাচ্ছে সেটা তুমি জান। ঠিক এই বিষয়টির সাথে সংশ্লিষ্ট এক কাহিনী বের হয়েছে ফ্রান্সের লা'মন্ডের এই মাসের প্রথম তারিখের ইস্যুতে। খবরটি খুবই

উদ্বেগজনক। কাটিংটি এই মুহূর্তে খুঁজে পাচ্ছি না। তুমি খুঁজে পাবে কাগজটা। অথবা ইন্টারনেটেও পেতে পার। পড়ে নিও।

আজ এ পর্যন্তই। আসি। ওয়াসসালাম।

তোমার মারিয়া জোসেফাইন।

চিঠি পড়া অনেকক্ষণ আগে শেষ হয়েছে। কিন্তু চিঠির দিকে নিস্পলক তাকিয়ে আছে আহমদ মুসা। তার চোখে শূন্য দৃষ্টি। হারিয়ে গেছে যেন সে চিঠির জগতে।

ড্রইং রুমে একে একে প্রবেশ করল ওভানডোর মা, লিসা, ওভানডোর স্ত্রী জ্যাকুলিন, ওভানডো এবং লিন্ডা।

সবাই বসল। কিন্তু লিসা এগুলো আহমদ মুসার দিকে। বিড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে আহমদ মুসার কাছে পৌঁছে ডান হাতের তর্জনী দিয়ে আহমদ মুসার হাতের চিঠিতে একটা টোকা দিয়ে বলল, 'ভাইয়া, ভাবীর চিঠি নিয়ে কি দিবাস্বপ্ন দেখছেন?'

সম্বিত ফিরে পেল আহমদ মুসা। হাসল।

চিঠিটা ভাঁজ করে হাতের মুঠোয় নিয়ে আহমদ মুসা তাকাল লিসার দিকে। আহমদ মুসা কথা বলার জন্যে মুখ খুলেছিল। কিন্তু তার আগেই লিসা বলে উঠলো, 'গোয়েন্দা সাহেব আপনাকে টেলিফোন করেছিলেন।'

'কোন গোয়েন্দা সাহেব?' আহমদ মুসা বলল।

'গোয়েন্দা অফিসার।'

'কোন গোয়েন্দা অফিসার?' আহমদ মুসা মুখ টিপে হেসে বলল।

'তাও বলতে হবে? মিঃ মোহাম্মদ জোয়াও বার্নারডো '। বলল লিসা মুখটা উজ্জ্বল করে।

'বার্নারডোর নামে তো "মোহাম্মদ" নেই! এটা পেলে কোথায়?' বলল আহমদ মুসা। আগের হাসি তখনও তার মুখে।

'জোয়াও বার্নারডো' নাম শুনলে 'মুসলমান' বলে বুঝা যায় না। তাই মোহাম্মদ লাগিয়ে দিলাম।' বলল লিসা খুব হালকা কণ্ঠে।

‘আরো অনেকের নাম শুনলে মুসলমান বলে বুঝা যায় না। সেখানে তো ‘মোহাম্মদ’ লাগাও নি!’ হেসে বলল আহমদ মুসা।

মুহুর্তের জন্যে একটা বিব্রত, সলজ্জভাব ফুটে উঠল লিসার মুখে। সঙ্গে সঙ্গেই সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে উঠল, ‘কারণ খুব ভালো মুসলমান হওয়ার জন্যে সে উঠে পড়ে লেগেছে।’

'তুমি জানলে কি করে?' অনেকটা চোর ধরার আনন্দ নিয়ে বলল আহমদ মুসা।

'আমার প্রশ্নের উত্তর এখনও দেন নি। আপনার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে কেন?' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল লিসা।

হাসল আহমদ মুসা। ঠিক আছে তোমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। তারপর বলল আহমদ মুসা, 'আমি দিবা স্বপ্ন দেখছিলাম না, ভাবছিলাম।'

'কি ভাবছিলেন?' লিসা বলল।

'তোমার ভাবী একটা পরামর্শ দিয়েছে, সেই পরামর্শ নিয়ে।' বলল আহমদ মুসা।

'কি পরামর্শ?'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'চিঠির ঐ অংশটা তোমাকে দেখাচ্ছি। তুমিই পড়ে দেখ কি পরামর্শ।'

বলে আহমদ মুসা চিঠির ভাঁজ খুলে চিঠির ঐ অংশটা লিসার সামনে তুলে ধরল।

লিসা আহমদ মুসার সামনে কার্পেটের উপর বসে আহমদ মুসার হাতে ধরা চিঠি থেকে ঐ অংশটা পড়তে লাগল। পড়তে পড়তে তার মুখ লাল হয়ে উঠল। পড়া শেষ করেই চিঠি ছেড়ে দিয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে চিৎকার করে উঠল, 'ভাবীকে পেলে আমি মারব।' বলে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে পালাল ড্রইংরুম থেকে।

ড্রইংরুমে উপস্থিত সবাই উদগ্রিব হয়ে উঠেছে। লিসা ছুটে পালাতেই ওভানডোর স্ত্রী জ্যাকি বলে উঠল, 'কি পরামর্শ দিয়েছেন উনি ভাইজান?'

'আমি পড়ছি, শুনুন।' বলে আহমদ মুসা চিঠির অংশটা পড়ে শোনাল। পড়া শেষ হবার সাথে সাথেই ওভানডোর স্ত্রী 'ওয়েলকাম, ওয়েলকাম' বলে

চিৎকার করে উঠল। মুখ টিপে হাসতে লাগল ওভানডোর মা। আর 'হিপ হিপ হুররে' বলে লাফিয়ে উঠল ওভানডো।

ওভানডো থামতেই ওভানডোর মা আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, 'বৌমা তো তোমাকে পরামর্শ দিয়েছে বেটা। এখন তোমার কথা বল।'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'আপনার বৌমা আমার মনের কথা জানতে পেরেছেন।'

'আল হামদুলিল্লাহ।' সংগে সঙ্গে বলে উঠল ওভানডোর মা।

'কিসের 'আল হামদুলিল্লাহ' পড়ছ বৌমা?' ড্রইংরুমে প্রবেশ করতে করতে বলল ওভানডোর দাদী।

ওভানডোর দাদী বসল আহমদ মুসার পাশে।

ওভানডোর মা চিঠির পরামর্শসহ যা ঘটেছে সব কথা খুলে বলল। শুনে ওভানডোর দাদীও 'আল হামদুলিল্লাহ' পড়ে বলল, 'ও এজন্যেই লিসা মুখ লাল করে ওদিকে পালাল। খুব ভালো হলো, কথাটা এভাবে এসে যাওয়ায়। বৌমা, আমার মদিনার নাতবৌকে তুমি ধন্যবাদ পাঠাও।'

কথা শেষ করে ফিরল ওভানডোর দাদী আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'তুমি আজ একটা ঘুম দিয়েছো বটে। দু'তিনবার এসে ফেরত গেছি।'

'কেন কি ব্যাপার দাদী? বলুন।'

'বলব কি ভাই। তুমি আল্লাহর ফেরেশতা হয়ে এ বাড়িতে এসেছ।একের পর এক বিপদ থেকে আমাদের উদ্ধার করছ, এটাই শুধু নয়, তুমি আমাদের অতীতকে ফেরত দিয়েছ। আমাদের পুর্ব পুরুষ মুসলমান ছিল, এটা তোমার কাছ থেকেই আমরা জানার সুযোগ পেয়েছি। সব শেষে তুমি ভাই আমাদের ভাঙ্গা পরিবারকে আবার জুড়ে দিয়েছ। তুমি আমাদের ফিরিয়ে দিয়েছ লিন্ডা লোরেন এবং ক্রিষ্টিনাকে আমাদের কাছে। আজ থেকে চার পুরুষ আগে লিন্ডার গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার সুরিনাম থেকে চলে যাবার পর পরিবারটা ভেঙ্গে পড়েছিল, সম্পর্কহীন হয়ে পড়েছিল। আজ লিন্ডা ও ক্রিষ্টিনা ফিরে আসার পর পরিবারটা আবার জোড়া লাগল। এর সবটা তোমার কৃতিত্ব ভাই!' বলতে বলতে আবেগে কণ্ঠ ভারী হয়ে উঠল ওভানডোর দাদীর কণ্ঠ। থামলো ওভানডোর দাদী।

‘লিন্ডার সাথে আপনাদের সব পরিচয় হয়ে গেছে দাদী?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘সব পরিচয় কোত্থেকে আসবে ভাই। লিন্ডা তার গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদারের নাম এবং তিনি সুরিনাম থেকে গেছেন, এটুকু ছাড়া আর কিছুই জানে না।’ বলল দাদী।

‘তাহলে পরিচয় হলো কি করে?’

‘ওর গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদারের নাম শুনেই আমি চিনতে পেরেছি।’

‘আপনি তাঁকে চিনতেন?’

‘আমার শ্বশুরের ছোট ভাই চিনবো না কেন? তবে খুব বেশী দিন দেখিনি। আমি নতুন বউ হয়ে এ বাড়িতে আসার কয়েক মাস পরেই আলফ্রেড টেরেক, ওর গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার, পড়তে যায়। এরপর কয়েকবার সে এসেছে। একবার এসে পারিবারিক দলিল পত্র কপি করে নিয়ে যায়। সেই তার শেষ যাওয়া। খুব বেশিদিন না দেখলেও আলফ্রেডের চেহারা আমার বেশ মনে আছে।’ কথা বলতে বলতে দাদীর চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

দাদী থামলে আহমদ মুসা বলল, ‘ওরা এবং আপনারা কেউ আর কখনও যোগাযোগ করেননি?’

‘কিছুদিন মানে আলফ্রেড টেরেক বেঁচে থাকা পর্যন্ত কিছু কিছু চিঠি যোগাযোগ ছিল। তার এক চিঠিতে তার বিয়ে করার খবর জানতে পারি। আর এক চিঠিতে সে তার প্রথম ছেলে ‘জোস ভাসকুয়েজ’ হবার কথা জানিয়েছিল।’

‘লিন্ডার দুঃখের কথা শুনেছেন দাদী?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘সব বলেছে। সবই ভাগ্য। সে যদি পরিবারের মধ্যে থাকতো, একা না পড়ে যেতো, তাহলে কি এসব ঘটতে পারতো! তোমাকে ধন্যবাদ ভাই, আমাদের দুঃখী লিন্ডাকেও তুমি বাঁচিয়েছ।’ দাদী বলল।

‘লিন্ডাও আমাকে বাঁচিয়েছেন দাদী।’ বলল আহমদ মুসা।

‘কিন্তু সেটা আপনি ক্রিস্টিনাকে বাঁচিয়েছেন বলেই। আপনাকে আমার বাঁচানোটা নিঃস্বার্থ ছিল না।’ মিষ্টি প্রতিবাদ করে বলল লিন্ডা।

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল। তাকে থামিয়ে দিয়ে দাদী বলল, ‘তোমাদের আশেপাশের ঝগড়াটা একটু পরে করো। সকাল থেকে যে কথা বলার জন্য ঘুরছি, সেটা আগে বলতে দাও।’

‘সেটা আবার কি দাদী?’

‘লিন্ডার কাছে শুনলাম, আমাদের পারিবারিক দলিলের একটা কপি তুমি লিন্ডাকে পড়ে শুনিয়েছ। লিন্ডার কাছে তার বিস্তারিত আমরা শুনেছি। ভাই, আরব্য উপন্যাসের চেয়েও চাঞ্চল্যকর এবং মর্মান্তিক এ কাহিনী। কিন্তু সেই সাথে আমাদের পরিবারের জন্য মহা আনন্দের। আমরা আমাদের শিকড় খুঁজে পেয়েছি। খুঁজে পেয়েছি আমাদের পরিচয়। আর ভাই, তুমি আমাদের সৌভাগ্য সূর্য। তুমি আসার পর একের পর এক সুখবরই তুমি দিচ্ছ। আল্লাহকে অশেষ ধন্যবাদ যে তিনি তোমাকে মূর্তিমান সাহায্য হিসেবে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। এখন...।’

‘দাদী, আপনাদের নিয়ে আমার আনন্দটাই বেশি। সুরিনামে এসে আপনাদের আতিথ্যে থেকে একমাত্র আপনাদের পরিবারের সাথেই মিশেছি। একটা গভীর সম্পর্কেরও সৃষ্টি হয়েছে। যখন বুঝলাম, জানলাম আপনাদের পূর্ব পুরুষ মুসলমান ছিলেন তখন যে আনন্দ পেয়েছি, সে আনন্দ দাদী আপনারা পাননি। আপনারা আপনাদের অতীত পরিচয় জানার পর এখন আপনাদেরকে বিশ্বাস ও সংস্কৃতির পরিবর্তন করতে হচ্ছে, অন্যদিকে আমার বিশ্বাস ও সংস্কৃতির নতুন সাথী হিসাবে আপনাদের পেয়েছি। আপনারা একটা হারিয়ে আরেকটা পেলেন। আর আমি কোন কিছু হারাইনি, বরং আরও পেয়েছি। সুতরাং আমাকেই আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করে আপনাদের ধন্যবাদ দিতে হবে ।’ বলল আহমদ মুসা।

দাদী কিছু বলতে যাচ্ছিল। তাঁকে থামিয়ে দিল ওভানডো। বলল, ‘স্যরি দাদী, আমি আগে বলে নিই। আমি প্রমাণ করবো যে, আমরাই বেশি আনন্দ পেয়েছি আহমদ মুসা ভাই আমাদের মাঝে আসার কারণে।’ বলে একটু থেমেই ওভানডো আবার শুরু করল, ‘ভাইয়া আপনার সাহায্যে শুধু আমরা নই, সুরিনামের সব মুসলমানরা যে উপকার পেয়েছে তা বলে শেষ করা যাবে না।

আপনি তাদের নতুন জীবন দিয়েছেন। আপনি আহমদ হাত্তা নাসমুনকে আমেরিকা থেকে নিয়ে এসে, তাঁকে নিরাপত্তা দিয়ে, রঙ্গলালদের সব ষড়যন্ত্র বানচাল করে দিয়ে আহমদ হাত্তাসহ আরও মুসলিম রাজনীতিককে এবং তাদের দলকে শুধু ক্ষমতায় পাঠিয়েছেন তা নয়, সুরিনামের রাজনীতির গোটা মানচিত্রই আপনি পাল্টে দিয়েছেন। রঙ্গলালদের 'সুরিনাম পিপলস কংগ্রেস' এবং শিবরাম শিবাজীদের 'মায়ের সূর্য সন্তান' সংগঠন আহমদ হাত্তা নাসুমনকে কিডন্যাপ করে, সক্রিয় মুসলিম নেতা, যুবক ও তরুণদের কিডন্যাপ ও নিধনের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে প্রথমে সুরিনামের রাজনীতি থেকে উচ্ছেদ এবং পরে দেশ থেকে তাদের নির্মূল করতে চেয়েছিল। এই কাজে তারা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিল। কয়েক হাজার মুসলিম যুবক ও তরুণ ইতিমধ্যেই নিখোঁজ হয়েছে। এই ভাবেই তারা সুরিনামকে আরেক স্পেনে পরিণত করতে চেয়েছিল। আপনি সুরিনামের মুসলমানদের রাজনীতি এবং তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করেছেন। অন্যদিকে দেশ বিদেশের মিডিয়াকে আপনি ব্যবহারের যে কৌশল করেছেন, তাতে রঙ্গলাল ও শিবরাম শিবাজীদের অপরাধ দেশের জনগণসহ বিশ্ববাসীর কাছে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। তাদের বিচার ও শাস্তির বিষয়টা অবধারিত হয়ে পড়েছে। জানেন ভাইয়া, রঙ্গলালরা এখন আপোশের জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে। ওরা 'মায়ের সূর্য সন্তান'-এর মত মুসলিম বিদ্বেষী সংগঠনকে ভেঙ্গে দিয়েছে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী কিছু শীর্ষ নেতাকেও তারা সুরিনাম পিপলস কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করতে রাজি হয়েছে। সুরিনামে মুসলিম রাজনীতির এই সাফল্যের একক স্থপতি আপনিই আহমদ মুসা ভাই। কিন্তু দুঃখ হলো, আপনার এই মহান অবদানের কথা সুরিনামবাসীরা জানে না, এমনকি প্রধানমন্ত্রী আহমদ হাত্তা এবং তার মেয়ে ফাতিমা ছাড়া সরকার এবং মুসলমানদেরও কেউ জানে না। সুতরাং আপনি আমাদের ধন্যবাদ জানাবেন তার কোন সুযোগ নেই। আমরা শত-কোটি ধন্যবাদ কিংবা কোন কিছু দিয়ে সুরিনামের মুসলমানরা আপনার দান শোধ করতে পারবে না।' থামল ওভানডো।

ওভানডো থামতেই আহমদ মুসা কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল। কিন্তু তার আগেই ওভানডোর মা বলে উঠল, 'তোমার কথা তুমি মানুষকে, এমনকি সরকারের অন্যদেরকেও জানতে দিতে চাও না কেন?'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'প্রথম কথা হলো, এর কোন প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয়ত, এই কাজটা করা হলে সুরিনামের বর্তমান ঘটনাবলির সাথে আহমদ মুসা জড়িয়ে গেলে সুরিনাম আন্তর্জাতিকভাবে কারো শ্যেন দৃষ্টিতে পড়ার সম্ভাবনা আছে। বিনা কারণে সুরিনামের মুসলমানদের এমন বিপদে জড়ানো হবে কেন?'

আহমদ মুসা থামলেও সংগে সংগে কেউ কথা বলল না। একটু পরে ওভানডোর মা'ই বলে উঠল, 'আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন বাছা। এ ধরণের ভাবনা ভাবা শুধু তোমার পক্ষেই সম্ভব। আমাদের ভালোটাও আমাদের বুঝার শক্তি নেই বাছা!'

ওভানডোর মা থামতেই ওভানডোর দাদী বলে উঠল, 'তোমরা আমার আলোচনা অন্যদিকে অনেক দূর ঠেলে নিয়ে গেছ। আমি যা বলতে এসেছি তা এখনও বলাই হয়নি।'

'কিন্তু আপনি তো বললেন অনেক কথা। ঠিক আছে বলুন। আমি প্রস্তুত দাদী।' হেসে বলল আহমদ মুসা।

দাদী নড়ে-চড়ে বসল। গম্ভীর হয়ে উঠল তার মুখ। বলল, 'টেরেক দুর্গের কোথাও আমাদের পূর্ব পুরুষ পরম সম্মানিত আব্দুর রহমান আল-তারিক যে স্বর্ণ মওজুদ রেখেছেন সেই সম্পর্কেই বলব। লিন্ডার কাছেও এ ব্যাপারে শুনেছি। কিন্তু দেখলাম সে এ বিষয়ে একেবারেই আগ্রহী নয়। তার একটাই এখন স্বপ্ন সে পিতৃপুরুষের বাসস্থান স্পেনের 'ওয়াদিউল গানী'তে যাবে। আমি তাকে অভিনন্দন জানাই। সেই সাথে আমি ওভানডোদেরও বলব, আমাদের পরিবারের শিকড় সন্ধানে তারাও স্পেনে যাক। শুধু তো স্পেন নয়। স্পেনে আমাদের শিকড়ের মূল পাওয়া যাবে না, সে মূল পেতে হলে আমাদের যেতে হবে আরব ভূমিতে, হেযাযে এবং মক্কায়। আর...।' আবেগে ভারী হয়ে উঠল দাদীর কণ্ঠ। অবশেষে তা রুদ্ধ হয়ে গেল।

সামলে নিল দাদী নিজেকে। একটু থেমেই আবার বলতে শুরু করল, 'আর শিকড় খুঁজতে গেলে বিচিত্র ইতিহাস এবং ভয়াবহ এক বাস্তবতার সম্মুখীন আমরা হবো। যে ব্যাপারে তোমার চেয়ে আর কেউ বেশি জানে না ভাই। সুরিনামে মুসলমানদের যে অবস্থা হয়েছিল, সে অবস্থা মুসলমানদের বহু দেশেই। এতদিন এগুলো শুধু পড়েছি, আজ এই নির্যাতিতদের একজন হিসাবে দায়িত্বও অনুভব করছি। টেরেক দুর্গে যে অর্থ আছে তা প্রয়োজনের তুলনায় খুব বেশি হয়তো হবে না। কিন্তু যতটাই পারা যায় তাকে কাজে লাগাতে চাই। তাই সম্পদগুলো-টেরেক দুর্গ থেকে উদ্ধার করা হোক তা আমি চাই। এই মুহুর্তেই সেই কাজ শুরু কর ভাই।'

বলে কাপড়ের ভেতর থেকে একটা কাগজের প্যাকেট বের করে দাদী আহমদ মুসার দিকে বাড়িয়ে ধরল এবং বলল, 'এগুলো মূল দলিল। লিন্ডার কাছে যা দেখেছ সেগুলো ফটোকপি। তুমি এ দলিলগুলোর ভেতর থেকে স্বর্ণ মজুদ সংক্রান্ত দলিলটা বের কর। দেখে বল, এখন আমাদের কি করতে হবে।'

আহমদ মুসা প্যাকেটটি হাতে নিয়ে দলিলগুলো থেকে স্বর্ণ মজুদ সংক্রান্ত দলিল আলাদা করে হাতে নিল। নজর বুলাল দলিলটির উপর।

দলিলটার শীর্ষে একটা শিরোনাম

'পবিত্র আমানত"।

এরপর কয়েকটা লাইন আরবিতে লেখা। তার নিচে একটা ডায়াগ্রাম এবং কিছু সংকেত। আহমদ মুসা দলিল থেকে মুখ তুলে বলল, 'এ দলিলের শিরোনাম দেয়া হয়েছে "পবিত্র আমানত" তারপর শিরোনামের নিচে আরবিতে কয়েকটা বাক্য লেখা হয়েছে। আমি অনুবাদ পড়ছিঃ 'আমি আল্লাহর দেয়া স্বর্ণের একটা বিশাল ভান্ডার আমানত হিসাবে রেখে যাচ্ছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে আমার প্রার্থনা, আমার বংশের কোন উপযুক্ত বংশধর এই আমানত উদ্ধার করুন এবং নিজেদের বৈধ প্রয়োজনে কিছু রেখে অবশিষ্ট সব অর্থ আমাদের নতুন দেশ সুরিনাম ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে খরচ করুন। আমার বংশের যে বা যারা এই দায়িত্ব পালন করবেন, তাদের উপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার রহমত বর্ষন করুন। তাদের জন্য রইলো আমার প্রাণঢালা ভালোবাসা।' পড়া শেষ করে থামল আহমদ মুসা।

উদগ্রীব হয়ে সমস্ত মনোযোগ দিয়ে সবাই আহমদ মুসার পড়া শুনছিল। আবেগে ভারী হয়ে উঠেছে সবার চোখ-মুখ।

আহমদ মুসা থামতেই দাদী বলে উঠল, 'ওভানডো, লিন্ডা, লিসা তোমরা কি পারবে না মহান পুর্ব পুরুষের দেয়া এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে? পারবে না আল্লাহ্‌র রহমত ও সেই মহান পুর্ব পুরুষের প্রাণঢালা ভালোবাসার মালিক হতে? আবেগ-কম্পিত কণ্ঠ দাদীর।

চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ওভানডো, লিন্ডা ও লিসার। তারা সমস্বরে বলল, 'পারব দাদী।' বলতে গিয়ে তাদের কণ্ঠও কাঁপল। লিন্ডা ও ওভানডোর চোখ ভিজে উঠেছে অশ্রুতে।

চোখ মুছে লিন্ডা বলল, দাদী আমিও এ দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। কিন্তু এ দায়িত্বের সব কার্যকরী ভার ও অধিকার আমি ওভানডোর উপর অর্পণ করলাম।

'আমিও।' বলল লিসা।

লিসা অনেক আগেই আবার ফিরে এসেছে ড্রইংরুমে।

ওভানডো ছিল নতমুখে। মুখ তুলল সে। বলল, 'বোনরা পাশে থাকলে বোনদের দেয়া দায়িত্ব আমি গ্রহণ করতে রাজি আছি। তবে মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে খরচ করার যে দায়িত্ব তা গ্রহণ করতে আমি ভাইয়া আহমদ মুসাকে সবার তরফ থেকে অনুরোধ করছি।'

'অবশ্যই সে এই দায়িত্ব গ্রহণ করবে। সেকি আমাদের বড় ছেলে নয়?' বলল ওভানডোর মা।

'বৌমা ঠিকই বলেছ। আর আমার ভাইটার এটাই তো কাজ।' দাদী সমর্থন করল ওভানডোর মাকে।

'দায়িত্ব নেবার প্রয়োজন পড়ে না। আমি তো ওভানডোকে সাহায্য করবই।' বলল আহমদ মুসা।

'ঠিক আছে ভাই, দায়িত্ব পালনটা যদি সাহায্যের আকারে হয় ওভানডো আপত্তি করবে কেন? এ নিয়ে কথা খরচ না করে বরং তারপর দলিলে কি লেখা আছে সেটা পড়।' বলল দাদী।

আহমদ মুসা নজর বুলাল আবার দলিলের উপর। দলিলের পরবর্তী অংশটা দুর্গের নক্সা। নক্সার কেন্দ্র বিন্দুতে রয়েছে মসজিদ। চারদিকে গভীর রেখা দিয়ে ঘেরা বাক্সের মধ্যে দুর্গের নক্সা। দুর্গের নক্সার উপর একটা দুই লাইনের কবিতা। কবিতায় বলা হয়েছে

'অপূর্ণকে পূর্ণ কর,
পূর্ণের নিচের পথ ধর।'

আরবী এ কবিতা পড়েই আহমদ মুসার মনে হলো, এ কবিতাই গুপ্তধনের কোড বা চাবি।

আহমদ মুসা গভীরভাবে দুর্গের নক্সা পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। কিন্তু এতে কোন প্রকার সংকেত পেল না। কোড বা কবিতা থেকে বুঝা যাচ্ছে, একটা অপূর্ণতাকে পূর্ণ করতে হবে। কিন্তু দুর্গের কাঠামোতে বা অংকনে কোথাও অপূর্ণতা খুঁজে পেল না আহমদ মুসা।

দুর্গের নক্সার আউট লাইন রেখার নিচে দৃষ্টি পড়তেই সে দেখতে পেল কতকগুলো বিক্ষিপ্ত ছবি। প্রথমেই দাঁড়ানো আরবী পোষাকে দাড়িওয়ালা একজন বুজর্গ। তার মাথায় গোল টুপি। তার পাশে পড়ে আছে লম্বালম্বি ভাঁজ করা লম্বা এক প্রস্থ সাদা কাপড়। তারও একটু দূরে পড়ে আছে একটা লম্বা লাঠি। তারপর রয়েছে তিন স্টেপের একটা সিঁড়ি।

সবগুলো জিনিসের উপর একবার নজর পড়তেই আহমদ মুসার কাছে বিষয়টা অনেকখানি পরিস্কার হয়ে গেল। জিনিসগুলো আলাদা আলাদাভাবে অপূর্ণ। এগুলোকে পূর্ণ করা যায়।

বুজর্গের পাশে পড়ে থাকা লম্বা-লম্বি কাপড়কে পাগড়ী হিসেবে ধরে বুজর্গের মাথায় পাগড়ী বাঁধা যায় তারপর তার হাতে লাঠি তুলে দিলে একজন চলমান বৃদ্ধ বুজর্গের চিত্র পূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু তিন ষ্টেপের সিঁড়িটার অর্থ কি? বুজর্গ ব্যক্তিটি কি লাঠি হাতে সিঁড়ি দিয়ে কোথাও উঠবেন? কিন্তু তিন ষ্টেপের সিঁড়ি দিয়ে কোথায় উঠবেন? তিন ষ্টেপের সিঁড়ি কেন?

হঠাৎ বিদ্যুত চমকের মত একটা চিন্তা এসে তার মাথায় ঢুকল। বুজর্গ ব্যক্তিটি লাঠি হাতে প্রথম ষ্টেপে পা রেখে তৃতীয় ষ্টেপে বসলেই তো সিঁড়িটা জুমআ মসজিদের মিম্বর হয়ে যায়। মসজিদের মিম্বরের সিঁড়ির ধাপ তো তিনটাই হয়।

খুশি হলো আহমদ মুসা। কোড-এর প্রথম শর্তের অপূর্ণতাকে পূর্ণ করা গেছে। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হলো মিম্বরে ইমাম বসলেই তো মিম্বর পূর্ণতা পায় না। মিম্বরের পূর্ণতার জন্য জুমআ মসজিদ অপরিহার্য।

হঠাৎ চমকে উঠার মত আহমদ মুসার দুই চোখ ছুটে গিয়ে দুর্গের নক্সায় আছড়ে পড়ল মেহরাবের ডান পাশের স্থানটিতে। না সেখানে মিম্বরের জায়গায় মিম্বর নেই। দেখেই আহমদ মুসা আনন্দে উচ্চস্বরে বলে উঠল, 'আল্লাহু আকবার।'

সকলের দৃষ্টি আহমদ মুসার উপর নিবদ্ধ। সবাই জানে আহমদ মুসা দলিলের নক্সা ও সংকেত পরীক্ষা করছে, বুঝার চেষ্টা করছে। হঠাৎ আহমদ মুসার উচ্চস্বরে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি সবাইকে কিছুটা চমকে দিল। আহমদ মুসা সব সময় মৃদু ভাষী, মিষ্ট ভাষী। উচ্চস্বরে কথা সে বলে না।

সবার আগে বিস্মিত দাদীই বলে উঠল, 'কি ভাই, কি হল?'

'পেয়ে গেছি দাদী, স্বর্ণ ভান্ডারের সন্ধান পেয়ে গেছি। ধাঁধার সমাধান করতে পেরেছি।'

বলে আহমদ মুসা সামনের টি টেবিলটা কাছে টেনে নিল। রাখল নক্সার দলিলটা টেবিলের উপর। তারপর ডাকল সবাইকে। বলল, 'আপনারা আসুন, দেখুন ধাঁধাটা। কিছু বুঝতে পারেন কি না।'

সবাই এসে টি টেবিলের চারপাশে কার্পেটের উপর বসল। শুধু ওভানডোর দাদী ও মা বসল সোফায় আহমদ মুসার দু'পাশে।

প্রথমে আহমদ মুসা নক্সার মাথার আরবী কবিতার অর্থ করে শোনাল। তারপর দুর্গের নক্সা ও এর মধ্যেকার মসজিদ দেখালো। পরে নক্সার নিচের আরবী পোশাক পরিহিত দাড়ী ও টুপিওয়ালা বুজর্গ, লম্বা-লম্বি ভাঁজ করা কাপড় খন্ড, লাঠি ও তিন ধাপের সিঁড়ি দেখাল এবং বলল, 'এখন বের করতে হবে স্বর্ণ ভান্ডারে পৌঁছার পথ কোথায় হবে।'

সবাই নক্সার উপরে ঝুঁকে পড়ে দুর্গের নক্সা ও সংকেত বুঝার চেষ্টা করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর দাদী ও ওভানডোর মা বলল, 'কিছুই মাথায় ঢুকছে না, কিছুই বুঝতে পারছি না।'

ওভানডো বলে উঠল, 'অপূর্ণতাই খুঁজে পাচ্ছি না, পূর্ণ করব কি?'

লিসা তার আগেই হাল ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে বসে আছে।

লিন্ডা বলল, 'কোড বা কবিতার নির্দেশ বুঝতে পারছি এবং বুঝতে পারছি যে, নক্সার নিচের আইটেমগুলোর কোড-এ এর সমাধান রয়েছে। কিন্তু নক্সার সংকেতগুলো একেবারেই দুর্ভেদ্য। ওভানডোর মত আমিও কোথাও অপূর্ণতা খুঁজে পাচ্ছি না।'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'আপনাদের পুর্ব পুরুষ আব্দুর রহমান আল তারিক তার স্বর্ণ ভান্ডারকে এমন এক ধাঁধাঁয় আটকে রেখে গেছেন, যার সমাধান মুসলিম সমাজ জীবন সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান ছাড়া কারো পক্ষে বুঝা সম্ভব নয়। তার অর্থ তিনি চাননি অমুসলমানরা এই স্বর্ণ ভান্ডার খুঁজে পাক।

'আমাদের বুঝিয়ে বলুন ভাইয়া, আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না।' বলল ওভানডো।

'ধাঁধার মূল কথা হলো...' বলতে শুরু করল আহমদ মুসা, 'অপূর্ণকে পূর্ণ করতে হবে। কিভাবে করতে হবে? সংকেতের উপস্থিতি বলে দিচ্ছে, সংকেতগুলোর ব্যবহারের মাধ্যমেই তা করতে হবে। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে সংকেতগুলো অপূর্ণ। মুসলমানদের রীতি নীতি, পোশাক, সামাজিকতা সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে ও কিছুটা বুদ্ধিমান হলে এই অপূর্ণতা পরিস্কার হয়ে যায়। আপনারা দেখুন, প্রথমেই রয়েছে আরবী পোশাক পরা টুপি ও দাঁড়িওয়ালা একজন লোক, তার পাশেই রয়েছে লম্বা-লম্বি গুটানো এক খণ্ড কাপড়। কাপড়টা পাগড়ী। পাশে পাগড়ী থাকায় লোকটির পোশাক হয়েছে অপূর্ণ। তাকে মাথায় পাগড়ী পরতে হবে। আবার তার পাশেই রয়েছে লম্বা লাঠি। পাশের লাঠি ছাড়াও লোকটি অপুর্ণ থেকে যায়। তাকে লাঠি হাতে নিতে হবে। এরপর থাকে তিন ষ্টেপের সিঁড়ি। ধাঁধার এই অংশটা জটিল। কিন্তু একজন প্র্যাকটিসিং মুসলমানের জন্যে মোটেই কঠিন

নয়। লাঠিটা অস্বাভাবিক লম্বা, প্রায় বুক পর্যন্ত দীর্ঘ। এ ধরণের লাঠি পথ চলার জন্যে কোন মানুষ ব্যবহার করে না। যে নিয়মিত জুমআর নামাজ পড়ে সে জানে জুমআর খোৎবা দেয়ার সময় ইমাম সাহেব এই ধরণের লাঠি ব্যবহার করেন । এই বিষয়টি তার মনে হবার সংগে সংগে সে বুঝবে তিন ষ্টেপের সিঁড়িটা মসজিদের মিম্বর যা ইমাম সাহেব খোৎবা দেয়ার সময় বসা ও দাঁড়াবার জন্যে ব্যবহার করেন। লাঠি ধরা পাগড়ী পড়া লোকটি তিন ষ্টেপের মিম্বরে বসার পর সংকেতগুলোর অপূর্ণতা পূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু এর পরেও আরেকটা অপূর্ণতা থাকে, সেটা হলো ইমাম সাহেবের বসার মিম্বর যেখানে আছে সেখানে থাকে না, থাকে মসজিদের মেহরাবের পাশে নির্দিষ্ট স্থানে। সুতরাং মিম্বরের অবস্থানকে পূর্ণ করতে হলে একটা জামে মসজিদ দরকার। এরপর মসজিদের সন্ধানে দুর্গের মসজিদের দিকে নজর দিন। দেখুন সেখানে মিম্বরের জায়গা খালি আছে কিনা।'

বলে আহমদ মুসা তার তর্জনিটা নিয়ে গেল দুর্গের মসজিদে মিম্বরের পাশে একটা নির্দিষ্ট স্থানে। বলল, 'ঠিক এই জায়গায় মিম্বর থাকার কথা, কিন্তু নেই। ফলে মসজিদ এখানে অপূর্ণ হয়ে যায়। অন্যদিকে সংকেতের মিম্বরটা মসজিদ ছাড়া অপূর্ণ হয়ে রয়েছে। এখন সংকেতের মিম্বর মসজিদের খালি জায়গাটায় নিয়ে এসে বসালেই মসজিদ ও মিম্বর দুই-ই পূর্ণতা পেয়ে যায়। এই মিম্বরের নিচে বা পাশেই রয়েছে স্বর্ণ ভান্ডারে যাবার পথ।' থামল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা থামলেও কেউ কোন কথা বলল না। বোবার মত নির্বাক সকলে। সকলের অপলক দৃষ্টি আহমদ মুসার প্রতি নিবদ্ধ।

প্রথম কথা বলল লিন্ডা। বলল, 'ওয়ান্ডারফুল! মনে হচ্ছে দলিলটা আপনার তৈরি, ধাঁধা আপনার পরিকল্পনা! এক মুহূর্তে দেখেই শত শত বছরের পুরনো একটা জটিল ধাঁধার এই 'জলবৎ তরলৎ' ব্যাখ্যা কি করে সম্ভব!'

ওভানডোর মা বলল, 'ঠিকই বলেছ লিন্ডা মা। আমরা কেন সুরিনামের কারো পক্ষেই এই ধাঁধার আসল রহস্য উদ্ধার করা সম্ভব ছিল না। কিনিক কোবরা'র জোয়াও লেগার্টরা এই দলিল হাত করতে চেয়েছিল। পেলেও তাদের কোনই লাভ হতো না। হাজার বছরেও ধাঁধার সমাধান তারা করতে পারতো না।'

'আমি অন্য কথা ভাবছি আম্মা। স্বর্ণ ভান্ডারের চাবি হিসেবে এই ধাঁধাটি রেখে যাওয়ার মাধ্যমে আমাদের পুর্ব পুরুষরা আশা করেছিলেন তাদের উত্তর পুরুষরা সবাই মুসলমান থাকবে। কিন্তু আমরা তো মুসলমান থাকতে পারিনি। আমরা আধা খৃষ্টান, আধা জংলী ধর্মে বিশ্বাসী হয়ে গিয়েছিলাম। আমি ভাবছি, এই স্বর্ণ ভান্ডার আমাদের পুর্ব পুরুষরা তাদের 'উপযুক্ত বংশধর'দের জন্যে রেখেছেন, যাদের জন্যে তারা দোয়া করেছেন এবং প্রাণঢালা ভালোবাসা দিয়েছেন। আমরা তাদের সেই ভাগ্যবান বংশধর নই।' বলল ওভানডো গম্ভীর কন্ঠে।

আহমদ মুসা কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল, কিন্তু তার আগেই দাদী বলে উঠল, 'তোমার অনুভূতি ঠিক ওভানডো, কিন্তু গোটা ব্যাপারকে তুমি এক সাথে করে দেখছো না কেন? তুমি আমাদের পুর্ব পুরুষদের যে উপযুক্ত বংশধরদের কথা বলছ, সে উপযুক্ত বংশধর গড়ে দেয়ার জন্যেই তো আল্লাহ্ আহমদ মুসাকে সুরিনামে পাঠিয়েছেন। আমরা আধা খৃষ্টান ও আধা জংলী ধর্মে ছিলাম বটে, কিন্তু এখন তো নেই। আমরা সকলেই ইসলাম ধর্মে ফিরে গিয়েছি। সেই 'উপযুক্ত পুর্বপুরুষ' তোমরা হয়ে গিয়েছ। এর আরেকটা প্রমাণ হলো ধাঁধার সমাধান হয়ে গিয়েছে। দায়িত্ব গ্রহণের জন্য উপযুক্ত পুর্বপুরুষ না থাকলে আল্লাহ্ অবশ্যই ধাঁধার সমাধান করে দিতেন না।' থামলো দাদী।

দাদী থামতেই চট করে ওভানডো বলে উঠল, 'ধাঁধার সমাধান তো আহমদ মুসা ভাই করেছেন, আমরা করিনি।'

'আহমদ মুসা ভাই শুধু ধাঁধার সমাধানই করেনি, আমাদের মুসলমানও বানিয়েছে এবং আমাদের ভাঙ্গা পরিবারকে একত্রিতও করেছে। তুমি তার এই কাজগুলোকে একটি থেকে আরেকটিকে আলাদা করছ কেন? বলল দাদী।

'ঠিক দাদী। বিষয়টাকে আপনি ঠিকভাবে তুলে ধরেছেন। আপনাকে ধন্যবাদ। একটা জিনিস বুঝতে চেষ্টা করো ওভানডো, শত শত বছর গেছে কিন্তু তোমাদের পরিবারের সামনে স্বর্ণ ভান্ডারের ধাঁধাটা আসেনি, তার সমাধানও হয়নি, শত শত বছর গেছে তোমরা ইসলাম ধর্মে ফিরে আসার সুযোগও পাওনি। কিন্তু আজ তোমাদের ইসলামে ফিরে যাওয়া এবং স্বর্ণ ভান্ডারের ধাঁধা তোমাদের

সামনে আসা ও সমাধান হওয়ার ঘটনা এক সাথে ঘটল কেন? ওভানডো এর অর্থ এই যে, তোমরাই সেই 'উপযুক্ত' ও 'সৌভাগ্যবান' উত্তর পুরুষ যাদের জন্যে তোমাদের সেই পুর্বপুরুষরা আন্তরিক দোয়া ও প্রাণঢালা ভালোবাসা দিয়ে গেছেন।'

'কিন্তু ভাইয়া আমি কি আমরা কি এই দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত, তাঁদের সেই মহান দোয়া ও ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য?' বলতে বলতে আবেগ রুদ্ধ হয়ে গেল ওভানডোর কণ্ঠ। দু'হাতে মুখ ঢেকে কান্না রোধের চেষ্টা করতে লাগল সে।

আহমদ মুসা ওভানডোর কাঁধে হাত রেখে নরম কণ্ঠে বলল, 'দায়িত্বের প্রতি যে লোভ করে না, সে-ই প্রকৃতপক্ষে দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত। তোমার ও তোমাদের এ গুণের জন্যেই তোমাদের পুর্বপুরুষদের সেই 'উপযুক্ত বংশধর' হিসেবে আল্লাহ তোমাদের মনোনীত করেছেন। এ দায়িত্ব গ্রহণ করে 'আল হামদুলিল্লাহ' বল।'

ওভানডো আহমদ মুসার হাত জড়িয়ে ধরে বলল, 'আল হামদুলিল্লাহ।'

ওভানডোর সাথে সাথে লিসা, লিন্ডা, ওভানডোর দাদী, মা, স্ত্রী সকলেই বলে উঠল, 'আল হামদুলিল্লাহ।'

আহমদ মুসাও বলল, 'আল হামদুলিল্লাহ।' এর পর সবাই নিরব। কিছু সময় কেটে গেল এই নিরবতার মধ্য দিয়ে।

নিরবতা ভাঙল ওভানডোর দাদী। বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, 'ভাই এখনি তাহলে বিরান ঐ মসজিদটার আসল জায়গাটা দেখিয়ে দাও, কোথায় খুঁড়তে হবে। পরিবারের কয়েকজন বিশ্বস্ত লোককে লাগিয়ে দাও খোঁড়ার জন্যে।'

'এত তাড়া কেন দাদী?' বলল আহমদ মুসা।

'কখন তোমাকে পাব কখন পাব না তার ঠিক নেই ভাই। আমি চাই স্বর্ণের সব ফায়সালা তোমার উপস্থিতিতে তোমার দ্বারা হতে হবে।' বলল দাদী এবং সেই সাথে উঠে দাঁড়াল।

উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা এবং সবাই।

আহমদ মুসা মসজিদের দিকে হাঁটা শুরু করে বলল, ঠিক আছে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমার হাতে সময় আছে, সন্ধ্যায় যাব প্রধানমন্ত্রী আহমদ হাত্তার ওখানে। হাতের সময়টা এখন কাজে লাগানো যাক।'

চলল সবাই দুর্গের বিরান মসজিদের দিকে।

# ৭

পুলিশ প্রধান আলী সিলভু ও গোয়েন্দা প্রধান আহমাদু সিফু ভারী পর্দা ঠেলে প্রধানমন্ত্রীর ড্রইংরুমে প্রবেশ করল। চোখে-মুখে দারুণ উত্তেজনার ছাপ।

বসল তারা। তাদের পেছনে পেছনে প্রবেশ করেছিল প্রধানমন্ত্রীর পিএস।

প্রধানদ্বয় বসলে পিএস বলল, 'স্যার আপনারা বসুন। প্রধানমন্ত্রী স্যার এখনি আসছেন।'

বলে প্রধানমন্ত্রীর পিএস ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পিএস বেরিয়ে যেতেই গোয়েন্দা প্রধান সিফু পুলিশ প্রধানকে বলল, 'অসময়ে আমরা হঠাৎ এভাবে এসে পড়লাম। স্যার হয়তো বিরক্ত হবেন।'

'বিরক্ত হবেন কি, যে খবর আমরা নিয়ে এসেছি তা শোনার পর আকাশ থেকে পড়বেন। বলবেন খবরটা আরো আগে আমরা দেইনি কেন। খুশি হবেন তিনি খবরটা নিয়ে আমরা স্বয়ং তাঁর কাছে আসার জন্যে।' বলল পুলিশ প্রধান আলী সিলভু।

পুলিশ প্রধানের কথা শেষ হতেই প্রধানমন্ত্রী ড্রইংরুমে প্রবেশ করল।

পুলিশ প্রধান ও গোয়েন্দা প্রধান শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। তারা এতটাই উত্তেজিত ও বিব্রত ছিল যে প্রধানমন্ত্রীকে সালাম দিতেও ভুলে গেল।

প্রধানমন্ত্রী আহমদ হাত্তা তাদের সালাম দিয়ে তাদের বসতে বলে নিজে বসল।

পুলিশ প্রধান বসতে বসতে বলল, 'স্যার আমরা দুঃখিত, অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করলাম। কিন্তু এমন একটা জরুরী খবর যে, নিজেরাই চলে আসা ঠিক মনে করলাম।'

'কি খবর?' প্রধানমন্ত্রী আহমদ হাত্তা উৎসুক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

'স্যার, আমরা মাফিয়া 'কিনিক কোবরা'র বিরুদ্ধে যে মাফিয়া গ্রুপকে খবর সংগ্রহের জন্য নিয়োগ করেছিলাম, তাদের লোক এই কিছুক্ষণ আগে

আমাদের অফিসে এসেছিল। গুরুত্বপূর্ণ খবর আমরা তার কাছ থেকে পেলাম।' বলল পুলিশ প্রধান।

'খবরটা কি?' জিজ্ঞেস করল প্রধানমন্ত্রী।

'স্যার আপনার লোক মি. আব্দুল্লাহ যাকে কিনিক কোবরার লোকরা কিডন্যাপ করেছিল, তিনি কিনিক কোবরার দশ বারোজন লোককে হত্যা করে পালিয়েছেন। কিনিক কোবরার নেতা জোয়াও লেগার্ট আহত হবার পর গতকাল মারা গেছে। আপনি জানেন, গত রাতেই জোয়াও লেগার্টের নির্দেশে কিনিক কোবরার লোকরা ওভানডোদের বাড়ি আক্রমণ করতে যায়। চার গাড়ি পুলিশ পাঠানো হয় আপনার নির্দেশে। কিন্তু হঠাৎ পুলিশের চার গাড়িই কিনিক কোবরার লোকদের দ্বারা ঘেরাও হয়ে চারদিকের অবিরাম গুলী বর্ষণের মুখে বিপন্ন হয়ে পড়ে। পাঁচজন পুলিশ মারা যায়। এই সময় আপনার সেই লোক এসে পুলিশকে উদ্ধার করে। কিনিক কোবরা'র এগারজন লোকের সবাই তার হাতে মারা যায়।' থামলো পুলিশ প্রধান।

'আমিও এসব খবর শুনেছি। তবে কিনিক কোবরা'র প্রধান জোয়াও লেগার্ট মারা যাবার খবর শুনিনি এবং কিনিক কোবরা ও পুলিশের কত লোক মারা গেছে তার সংখ্যাও শুনিনি। এই খবরগুলো দেয়ার জন্য ধন্যবাদ।' বলল প্রধানমন্ত্রী আহমদ হাত্তা প্রসন্ন মুখে।

'স্যার, আরও খবর আছে। সাংঘাতিক খবর।' বলল পুলিশ প্রধান।

'কি খবর?' উদগ্রীব কন্ঠ প্রধানমন্ত্রীর।

নড়ে-চড়ে বসল পুলিশ প্রধান। বলল, 'আপনার ড্রাইভার-কাম-সিকিউরিটি মি. আবদুল্লাহ লোকটা কে আপনি জানেন স্যার?'

'কেন একথা বলছ?' বলল প্রধানমন্ত্রী।

'স্যার, আমাদের ঐ মাফিয়া নেতা বলল, 'ঐ লোকটা আহমদ মুসা। ছদ্মবেশ নিয়ে আপনার সাথে আছে।' বলল গোয়েন্দা প্রধান।

'আপনারা আহমদ মুসাকে চেনেন?' জিজ্ঞেস করল প্রধানমন্ত্রী।

'চিনলে তো ধরেই ফেলতাম। তাকে আমরা জানি স্যার।' বলল পুলিশ প্রধান।

‘তিনি একজন বিপ্লবী মুসলিম নেতা। সম্প্রতি আমেরিকায় তিনি সাংঘাতিক নাম করেছেন। ক্যারিবিয়ানেও তিনি বিখ্যাত হয়েছেন। তবে ইহুদীরা তাকে পেলে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার মূল্যে কিনতে রাজি।’ বলল গোয়েন্দা প্রধান পুলিশ প্রধানের কথা শেষ হতেই।

‘আপনারা তাকে কেমন মনে করেন?’

‘তাকে খারাপ ভাবার কিছুই আমরা পাইনি স্যার। কিন্তু তিনি ছদ্মবেশে এখানে কেন, সেটা ভাবছি।’ বলল তারা দুজনে।

এ সময় ঘরে প্রধানমন্ত্রীর পিএস প্রবেশ করল।

পিএস প্রবেশ করার আগেই প্রধানমন্ত্রী বলল, ‘আহমদ মুসা এসেছেন?’

‘জি স্যার।’ বলল পিএস।

‘আসতে বল তাঁকে।’ নির্দেশ দিল প্রধানমন্ত্রী।

পুলিশ প্রধান ও গোয়েন্দা প্রধানের চোখে-মুখে বিস্ময়।

পিএস বাইরে চলে গেল। পর মুহূর্তেই আবার আহমদ মুসাকে সাথে করে ঘরে এনে পৌঁছে দিয়ে চলে গেল ।

আহমদ মুসা ঢুকতেই প্রধানমন্ত্রী আহমদ হাত্তা উঠে দাঁড়াল এবং সালাম দিল আহমদ মুসাকে।

সালাম দিয়েই কয়েক ধাপ এগিয়ে গিয়ে আহমদ মুসাকে জড়িয়ে ধরল। বলল, ‘কেমন আছেন? শরীর ভাল আছে তো?’

‘ভাল আছি।’ বলল আহমদ মুসা। একটু থেমেই আবার বলে উঠল, ‘প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ মি. হাত্তা।’

‘ভাইয়া আপনি আব্বুকে অভিনন্দন জানাবেন, না আব্বু আপনাকে অভিনন্দন জানাবেন তাকে প্রধানমন্ত্রী করার জন্য?’ কথাগুলো বলতে বলতে দৌড়ে ড্রইংরুমে প্রবেশ করল ফাতিমা নাসুমন।

ঢুকে কথা শেষ করেই ফাতিমা সালাম দিল আহমদ মুসা এবং পুলিশ ও গোয়েন্দা প্রধানদ্বয়কে।

আহমদ মুসা সালাম গ্রহণ করে বলল, 'বোন আল্লাহ্'র সাথে কাউকে শরীক করা যায় না। আল্লাহ তোমার আব্বুকে প্রধানমন্ত্রী করেছেন। আমাকে এর সাথে জড়িয়ে গোনাহগার করছ কেন?'

হাসল ফাতিমা। বলল, 'আল্লাহই করেছেন, ঠিক আছে। কিন্তু আল্লাহই আপনাকে পাঠিয়েছেন তার কাজটা করার জন্যে।'

'তাহলে কৃতিত্বটা আল্লাহরই হলো।' হেসে বলল আহমদ মুসা।

'ভাইয়া, আপনার সাথে যুক্তিতে পারবো না। কিন্তু আপনি কি কৃতজ্ঞতাও জানাতে দেবেন না। আমার ও আব্বুর নতুন জীবন লাভ করা, আব্বার বিপন্ন অবস্থা থেকে আজ প্রধানমন্ত্রী হওয়া, নৈরাজ্যে নিমজ্জিত সুরিনাম নতুন জীবনে প্রবেশ করা, ইত্যাদি কাজে যিনি জীবন বিপন্ন করে কাজ করেছেন, তাকে কৃতজ্ঞতাও জানাতে পারব না।' থামল ফাতিমা। আবেগে ফাতিমার কণ্ঠ ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছিল।

মুহুর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে ফাতিমা আবার বলে উঠল, 'ভাইয়া, কৃতজ্ঞ হওয়াকে আল্লাহ ভালবাসেন। আপনি নিষেধ করবেন কেন?'

'স্যরি বোন। তুমি বিষয়টাকে সিরিয়াসলি নিয়েছ। যাক শোন। প্রশংসা মানুষের মধ্যে অহমিকার সৃষ্টি করে। আর অহমিকা মানুষকে ধ্বংস করে, যেমন ফেরেশতাতুল্য আযাযীল ধ্বংস হয়ে হয়েছে ইবলিস।' বলল আহমদ মুসা।

'আমি প্রশংসার কথা বলিনি, কৃতজ্ঞতার কথা বলেছি ভাইয়া।' দ্রুত বলল ফাতিমা।

'প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার মধ্যে ভেদরেখা খুবই সুক্ষ্ম বোন। কৃতজ্ঞ হওয়া ভাল গুণ, কিন্তু কৃতজ্ঞতার প্রকাশ অপ্রয়োজনীয়। কৃতজ্ঞতার প্রকাশ এক পর্যায়ে গিয়ে প্রশংসা হয়ে পড়তে পারে।' আহমদ মুসা বলল।

হেসে ফেলল ফাতিমা। বলল, 'ধন্যবাদ ভাইয়া, আপনার ব্যারিষ্টার হওয়া উচিত ছিল।' বলেই জিব কাটল। বলল, 'স্যরি, এটা প্রশংসা হয়ে গেল।'

অপার বিস্ময় নিয়ে আকাশ-পাতাল চিন্তা করছিল পুলিশ প্রধান ও গোয়েন্দা প্রধানদ্বয়। প্রধানমন্ত্রী আহমদ মুসাকে জড়িয়ে ধরা এবং আহমদ মুসা, প্রধানমন্ত্রী ও ফাতিমার কথোপকথন থেকে তাদের নিকট পরিস্কার হয়ে গেছে যে,

আহমদ মুসা হিসেবেই সে প্রধানমন্ত্রী ও তার পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠ। তারা অবাক হলো যে, এতবড় একটা বিষয় তারা জানতে পারেনি, কিংবা প্রধানমন্ত্রীও তাদের কাছে বলেননি।

আহমদ মুসার মত মহা-খবর প্রধানমন্ত্রীকে জানাতে এসে হঠাৎ করে সেই ব্যক্তিত্বকে সামনে হাজির দেখে দারুণ সংকুচিতও হয়ে পড়েছিল তারা।

আহমদ হাত্তা তাদের দিকে একবার চেয়ে আহমদ মুসাকে বলল, 'পুলিশ প্রধান ও গোয়েন্দা প্রধানদ্বয়কে তো আপনি নিশ্চয় চেনেন আহমদ মুসা?'

আহমদ মুসা তাদের সাথে আগেই হ্যান্ডশেক করেছিল। এবার বলল, 'আমি ওদের দুজনকেই চিনি।'

থামল একটু আহমদ মুসা। তারপর বলে উঠল পুলিশ প্রধানকে লক্ষ্য করে, 'গতরাতে ওভানডোদের বাড়িতে পুলিশ পাঠানোর জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। যথাসময়ে পুলিশ না পৌছলে ওভানডোদের ক্ষতি হতো।'

'আর আপনি যথাসময়ে এসে না পৌছলে আমাদের গোটা পুলিশ প্লাটুনটাই ধ্বংস হয়ে যেত।'

একটু থেমেই আবার বলল পুলিশ প্রধান আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, 'স্যার, আমাদের মাফ করবেন। আমরা আপনাকে চিনতে পারিনি। অনেক বেয়াদবী হয়ে গেছে, আপনাকে আমাদের মাঝে দেখে খুবই আনন্দিত ও গর্ববোধ করছি স্যার।'

'ধন্যবাদ আপনাদের মি. আলী ও মি. আহমাদু। বেয়াদবীর কোন প্রশ্ন নেই। আমি আপনাদের ভাই ছাড়া আর কিছু নই।' আহমদ মুসা বলল।

'স্যার সত্যিই আপনি আমাদের ভাই, কিন্তু এমন ভাই আর আমরা পাইনি।' বলল গোয়েন্দা প্রধান।

'মি. আলী ও মি. আহমাদু, মি. আহমুদ মুসার পরিচয় এখানে কাউকে দেইনি দুটি কারণে। তিনি এখানে এসেছেন, আমাদের সাথে আছেন, একথা প্রকাশ হয়ে গেলে আমাদের শত্রুরা সাবধান হবে। দ্বিতীয়ত, তিনি এখানে আছেন প্রকাশ হলে গোটা দুনিয়ার তার শত্রুরা এখানে ছুটে আসতো। তার ফলে

এখানকার সংকট জটিল হতো এবং আমাদের নিজেদের সমস্যা সমাধান কঠিন হয়ে পড়তো।' প্রধানমন্ত্রী বলল।

'আপনি ঠিক বলেছেন স্যার, আপনাদের সিদ্ধান্তটা সঠিক ছিল।' বলল পুলিশ প্রধান।

'এখনও আমরা চাই মি. আহমাদু ও মি. আলী, মি. আহমদ মুসার ব্যাপারটা এবং তার এখনকার কাজগুলো পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ না হোক। এটা আপনাদের নিশ্চিত করতে হবে। মাফিয়ারা যখন জেনেছে, তখন কিছু প্রচার তো হবেই। সেটুকু হোক আমাদের আপত্তি নেই।' বলল প্রধানমন্ত্রী আহমদ হাত্তা।

'আপনার নির্দেশ পালিত হবে স্যার।' বলল পুলিশ প্রধান আলী সিলভু।

কথা শেষ করেই আলী সিল্ভু আবার বলে উঠল প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে, 'আর কোন নির্দেশ স্যার, আমরা উঠতে পারি?'

'ধন্যবাদ মি. আলী ও মি. আহমাদু।' বলল প্রধানমন্ত্রী আহমদ হাত্তা।

উঠে দাঁড়াল পুলিশ প্রধান ও গোয়েন্দা প্রধান। দুজনেই আহমদ মুসাকে তাদের অফিস পরিদর্শনের জন্যে আবেদন জানাল। বলল, 'স্যার, আপনি এলে আমাদের অফিস স্মরণীয় হয়ে থাকবে, যদি আমাদের অফিসে আসেন।'

'ধন্যবাদ। চেষ্টা করব আমি।' বলল আহমদ মুসা।

ওরা বেরিয়ে যেতেই আহমদ মুসা বলল প্রধানমন্ত্রীকে, 'মি. হাত্তা, আমি লা'মন্ডের যে সংখ্যার কথা আপনার পিএসকে বলেছিলাম সেটা সে সংগ্রহ করল কি না?'

'কি ব্যাপার মি. আহমদ মুসা লা'মন্ডের ঐ কপিতে কি আছে? ঐ কপিটা আমাদের দেশে আসেনি। খোঁজ নিয়ে জানা গেল দক্ষিণ আমেরিকার কোন দেশেই লা'মন্ডের ঐ দিনের কপি আসেনি। আলজেরিয়ার রাষ্ট্রদূত এসেছিলেন আজ বিকেলে। তিনিও বললেন, লা'মন্ডের ঐ সংখ্যা সেদিন উত্তর আফ্রিকায়ও পাওয়া যায়নি। তিনি জানালেন, লা'মন্ডের ইন্টারন্যাশনাল এডিশন সেদিন বাইরে ডেসপাচই করা হয়নি। তার বদলে কোথাও কোথাও পাঠানো হয়েছে ইউরোপীয় এডিশন।' বলল প্রধানমন্ত্রী।

‘আমার স্ত্রী তার চিঠিতে আমাকে ঐ দিনের লা’মন্ডে পড়তে বলেছেন। কি পড়তে হবে, কেন পড়তে হবে তা তিনি জানাননি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তাহলে তো নিশ্চয় ভাবী সাহেবা ঐ কাগজটা পড়েছেন।’ বলল প্রধানমন্ত্রী আহমদ হাত্তা।

‘ওর কাছে কাটিংও ছিল। কিন্তু হারিয়ে ফেলেছেন। পাঠাতে পারেননি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘দেখা যাচ্ছে উনি তো তাহলে কাগজ পেয়েছিলেন।’ প্রধানমন্ত্রী বলল।

‘হয়তো সৌদি আরব সরাসরি ঐ পত্রিকার কাছ থেকে কিছু কপি জোগাড় করে থাকতে পারে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তাই হবে। যাক। আমরা ইন্টারনেট থেকে কয়েকটা কপি তৈরি করছি। এখনি এসে পড়বে।’ বলল প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রীর কথা শেষ হতেই প্রধানমন্ত্রীর পিএস ঘরে ঢুকল। তার হাতে দুটি লা’মন্ডে। সে এক কপি দিল প্রধানমন্ত্রীকে ও আরেক কপি দিল আহমদ মুসার হাতে।

পত্রিকা পেয়েই দ্রুত তাতে চোখ বুলাতে লাগল আহমদ মুসা। একের পর এক হেডিং পড়ে যেতে লাগল সে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিষয়সহ মুসলিম বিশ্বের অনেক নিউজ তার চোখে পড়ল, যা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তাকে পড়তেই হবে এমন মনে হলো না সেগুলোর কোনটি দেখেই। হঠাৎ সিংগেল কলাম হেডিং এর উপর তার চোখ আটকে গেল। হেডিংটা হলো ‘একটি মুসলিম গোয়েন্দা ফার্ম-এর রহস্যজনক অন্তর্ধান’। এই হেডিং- এর নিচে বটম শোল্ডারও দেয়া আছে। তাহলো, ‘রাজনীতিকদের সন্তানরা গোয়েন্দা হয়েছিল।’

নিউজটির শিরোনাম পড়ে আহমদ মুসা নিউজটা না পড়ে আর থাকতে পারলো না।

পড়লো নিউজটা।

‘ষ্ট্রাসবার্গ থেকে বুমেদিন বেল্লাহ।।

‘স্পুটনিক’ নামক সন্ত্রাসবিরোধী কার্যক্রমে ইউরোপীয় ইউনিয়নের তিনবার স্বর্ণপদক বিজয়ী প্রাইভেট গোয়েন্দা ফার্ম রহস্যজনকভাবে পুড়ে ছাই

হয়ে গেছে চার দিন আগে। বাইরে থেকে বিল্ডিং-এর কোন ক্ষতি দেখা যায় না। কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করে দেখা গেছে কোন এক অজ্ঞাত ধরণের উত্তাপে ফাইলপত্র ও কম্পিউটার সফটওয়্যার জাতীয় সব কিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ষ্টিলের সেফভল্টে থাকা ফাইলপত্র ও কম্পিউটার ডিস্কেরও হয়েছে একই অবস্থা।

ডিটেকটিভ ফার্মটির ৭ জন কার্যরত গোয়েন্দাদেরও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। গত দুই দিনেও উক্ত ৭ জন গোয়েন্দা ও তাদের কর্মচারীরা বাড়ি না ফিরলে বাড়ি থেকে তাদের অফিসে খোঁজ করা হয়। টেলিফোনে না পেয়ে বাড়ির লোকরা অফিসে যায় এবং অফিসের অবস্থা দেখে পুলিশে খবর দেয়।

পুলিশের মতে বিশেষ ধরণের কেমিকেল ব্যবহার করে অফিসের ভেতরটা পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এ বিশেষ ধরণের কেমিকেল নির্দিষ্ট এক পরিসীমার মধ্যে বাতাসের সাথে মিশে যে কোন স্থানে প্রবেশ করে কাগজ ও কম্পিউটার সফটওয়্যার জাতীয় সব কিছু ধ্বংস করে ফেলতে পারে। পুলিশ একে বড় ধরণের নাশকতামূলক কাজ বলে মনে করছে।

ডিটেকটিভদের পারিবারিক ও বন্ধুদের সূত্রে জানা গেছে ৭ জন গোয়েন্দারই বিশেষ পরিচয় আছে। তাঁরা সকলেই বিখ্যাত বিখ্যাত রাজনীতিকদের সন্তান অথবা বংশধর।

জানা গেছে, ৭ জনের একজন হলেন মিসরের বাদশাহ ফারুকের উত্তর পুরুষ আলী আবদুল্লাহ আল-ফারুক। দ্বিতীয়জন লিবিয়ার বাদশাহ ইদরিসের বংশধর আহমদ আল সেনুসী। তৃতীয় ও চতুর্থজন হলেন তুরস্কের সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদের ৭ম পুরুষ ওসমান আব্দুল হামিদ ও মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের ৬ষ্ঠ পুরুষ কামাল সুলাইমান। পঞ্চমজন ইরানের বাদশাহ রেজাশাহ পাহলবীর উত্তরসুরী মোহাম্মদ আলী রেজা, ৬ষ্ঠজন ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট আহমদ সোকার্নোর উত্তর পুরুষ মোহাম্মাদ সুকর্ণ এবং সপ্তমজন স্পেনের বিস্মৃত উমাইয়া রাজ বংশের বিস্মৃত এক রাজপুত্র আব্দুর রহমান। এদের সকলেই কেউ ফ্রান্স, কেউ জার্মানীর নাগরিক। সকলেই ফ্রান্স ও জার্মানীর বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র এবং কাকতালীয়ভাবে সবাই ইনফরমেশন ইঞ্জিনিয়ারিং-এ সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী।

ষ্ট্রাসবার্গের ইউরোপীয় ইউনিয়ন হেডকোয়ার্টারে সন্ত্রাসবিরোধী এক সেমিনারে এই সাতজনের পরিচয় ঘটে এবং এই পরিচয়ই সন্ত্রাস-সন্ধানী গোয়েন্দা ফার্ম 'স্পুটনিক'- তাদের একত্রিত করে। 'স্পুটনিক' গঠিত হবার কয়েক বছরের মধ্যে ৭টি সন্ত্রাসী গ্রুপকে তারা চিহ্নিত করে তাদের পাকড়াও কাজে ইউরোপীয় ইউনিয়নকে সাহায্য দেয়। সাফল্যের এই রেকর্ড ইউরোপে সর্বোচ্চ। এই কারণে ফার্মটি তিনবার ইউরোপীয় ইউনিয়নের স্বর্ণপদকে ভূষিত হয়।

অনুসন্ধান থেকে জানা গেছে, সম্প্রতি তারা অতীতের বড় বড় কয়েকটি সন্ত্রাসী ঘটনার শিকড় সন্ধানে কাজ করছিল। এর মধ্যে রয়েছে নিউইয়র্কের লিবার্টি টাওয়ার ও ডেমোক্র্যাসি টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনাসহ কয়েকটি দেশের মার্কিন দূতাবাসে আক্রমণের ঘটনা। গোয়েন্দাদের পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, বড় বড় এইসব সন্ত্রাসী ঘটনার অনুসন্ধানে তারা অডিও, ভিডিওসহ মুল্যবান দলিল-দস্তাবেজ যোগাড় করেছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তারা এ সংক্রান্ত রিপোর্ট ফাইনাল করতে যাচ্ছিলেন। জানা গেছে, এই ক্ষেত্রে কাজ শুরু করার পর থেকেই হুমকি ধমকিসহ নানারকম আক্রমণের শিকার তারা হয়েছেন। পুলিশ রেকর্ডে এসবের উল্লেখ রয়েছে বলে তারা জানায়।

গোয়েন্দাদের উধাও হওয়া সম্পর্কে অভিজ্ঞ মহলের অভিমত হলো তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে এ সম্ভাবনা খুবই কম। তাদেরকে কোথাও আটকে রাখা হয়েছে এবং তাদের কাছ থেকে তাদের অনুসন্ধান সম্পর্কে আরও তথ্য উদ্ধার ও তারা তাদের সংগৃহীত তথ্য আরও কোথাও সরিয়ে রেখেছে কিনা তা বের করার সব রকম চেষ্টা করা হবে, এটাই স্বাভাবিক।

'স্পুটনিক' ধ্বংস এবং গোয়েন্দাদের যারা অপহরণ করেছে তাদেরকে খুবই শক্তিশালী ও সুবিস্তৃত এক চক্র বলে মনে করা হচ্ছে। 'স্পুটনিক'-এর সর্বশেষ অনুসন্ধান কার্যক্রম ও স্পুটনিক ধ্বংস হওয়া থেকে অভিজ্ঞ মহল মনে করছেন, লিবার্টি এবং ডেমোক্র্যাসি টাওয়ারদ্বয় ধ্বংসের ঘটনাসহ সেই সময়ে কিছু মার্কিন দূতাবাসে হামলার পেছনে অনুদঘাটিত কোন বড় সত্য লুকিয়ে আছে। উল্লেখ্য, এই সব ঘটনায় কিছু মুসলিম সক্রিয়তাবাদী' সংগঠনকেও

চরমপন্থী ও সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করে দেশে দেশে তাদের বিরুদ্ধে উৎখাত অভিযান চলছিল। সুতরাং শান্তিকামী, মানবতাবাদী ও সত্যসন্ধানী 'স্পুটনিক' সংস্থাটির ধ্বংস হওয়া ও এর পরিচালকরা অপহৃত হওয়ার ঘটনার দিকে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন।

এ ঘটনা সম্পর্কে আরও একটি উদ্বেগজনক দিকের প্রতি পর্যবেক্ষক মহল দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সেটা হলো একটি অজ্ঞাত মহল স্পুটনিক ধ্বংসের ঘটনাকে ধামা চাপা দেবার চেষ্টা করছে। তারা চাচ্ছে যে এ সম্পর্কিত কোন খবর যেন পত্র-পত্রিকায় না আসে। অজ্ঞাত কারণে স্ট্রাসবার্গের স্থানীয় পত্রিকায় এ খবরটা আজ পর্যন্ত উঠেনি। লা'মন্ডের এই সংবাদদাতাও বাধার সম্মুখীন হন। ধ্বংস প্রাপ্ত 'স্পুটনিক' কার্যালয় পরিদর্শন এবং এ সংক্রান্ত তথ্যানুসন্ধান থেকে ফেরার পথে তার গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়ে। সংবাদদাতাও আহত হন। তার ক্যামেরা, রেকর্ডার ও ব্যাগ হারিয়ে যায়।

জানা গেছে, 'স্পুটনিক'- এর এ ঘটনার তদন্তভার ইউরোপীয় ইউনিয়নের গোয়েন্দা বিভাগ গ্রহণ করেছে বটে, কিন্তু গত চার দিনেও তারা ঘটনাস্থলে যাননি এবং ভিকটিমদের আত্মীয় স্বজনদের সাথেও কোন যোগাযোগ করেননি। তবে আশার কথা হলো, মার্কিন ফেডারেল গোয়েন্দা বিভাগ ইতি-মধ্যেই ঘটনাস্থলে গেছেন। বর্তমান মার্কিন প্রশাসন সত্যানুসন্ধানে এগিয়ে আসতে পারেন বলে পর্যবেক্ষক মহল মনে করছেন।'

নিউজটা পড়ে আহমদ মুসার মনে হলো, এই নিউজটার প্রতিই ডোনা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। মনে মনে ধন্যবাদ জানালো তাকে এবং সেই সাথে বিস্মিতও হলো, এত বড় খবর অথচ তার নজরে এল বহু পরে! সব দিকের বিচারে সাম্প্রতিক কালের সবচেয়ে বড় ঘটনা এটা। আহমদ মুসাকে সবচেয়ে বেশি অভিভূত করেছে ৬টি প্রভাবশালী মুসলিম দেশের ৭জন রাষ্ট্রনায়ক ও রাজনীতিকের সন্তানদের স্পুটনিকের প্লাটফরমে বিস্ময়কর একত্র সম্মেলন। আর কিছু না হোক, এই সাতজন বিখ্যাত সন্তান একত্রে অপহরণ হওয়াই দুনিয়ার একটি বড় খবর। তার উপর 'স্পুটনিক'-এর মাধ্যমে তারা যা করেছে এবং যে অনুসন্ধান তারা চালাচ্ছিল তা অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর। সুতরাং ঘটনাটা দুনিয়ায়

ব্যাপক প্রচার পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হয়নি। লা'মন্ডে খবর ছেপেছে বটে, কিন্তু সিংগেল কলামে। খবরটি অন্যকোন পত্রিকা লিফট করেছে বলে তার নজরে পড়েনি। বিশ্বের বড় বড় সংবাদ মাধ্যম ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া খবরটা এড়িয়ে গেছে। ওয়ার্ল্ড নিউজ এজেন্সি এবং ফ্রি ওয়ার্ল্ড টিভি এই নিউজ কভার করতে পেরেছে কিনা কে জানে! সর্বব্যাপি নিউজ কিল- এর এই ঘটনা যারা ঘটিয়েছে তারা খুব বড় শক্তি। কারা এই শক্তি!...

'মি. আহমদ মুসা, নিশ্চয়ই বড় কোন বিষয় নিয়ে ভাবছেন! হঠাৎ কি পেলেন? পেয়েছেন কি নিউজটা?' বলল প্রধানমন্ত্রী আহমদ হাত্তা।

'পেয়েছি মি. হাত্তা। সেটা নিয়েই ভাবছি।' আহমদ মুসা বলল ।

'বুঝতে পারছি ভাবী সাহেবা তাহলে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকেই আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। কি সে নিউজটা?' জিজ্ঞেস করল প্রধানমন্ত্রী আহমদ হাত্তা।

ফাতিমাও তাকাল আহমদ মুসার দিকে। তার চোখেও জিজ্ঞাসা।

আহমদ মুসা কাগজটা আবার হাতে তুলে নিল এবং পড়ে শোনাল পুরো নিউজটা।

নিউজ শুনে আহমদ হাত্তা এবং ফাতিমা দুজনেই কিছুক্ষণ কিছু কথা বলতে পারলো না। ভাবনার চিহ্ন তাদের চোখে-মুখে।

'সাংঘাতিক খবর?' প্রথম প্রতিক্রিয়া হিসেবে বলল আহমদ হাত্তা।

'হ্যাঁ মি. হাত্তা খুবই সাংঘাতিক খবর। সবচেয়ে সাংঘাতিক হলো মুসলমানদের ৭ জন শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মিলিত হবার পর এই ভাবে এক সাথে হারিয়ে যাওয়া।'

'ঠিক বলেছেন মি. আহমদ মুসা। বিস্ময় লাগছে, সাত শ্রেষ্ঠর সাতজন শ্রেষ্ঠ সন্তান এইভাবে একত্রিত হওয়া একটি অবিশ্বাস্য ঘটনা। কিভাবে এটা ঘটল?' বলল প্রধানমন্ত্রী।

'মনে হয় আল্লাহ বিশেষ উদ্দেশ্যেই এটা ঘটিয়েছেন।' আহমদ মুসা বলল।

‘অনুসন্ধান এবং তার প্রকাশ ও প্রচার। বিশ্বমানে গ্রহণযোগ্য এই কাজ করার কেউ আমাদের ছিল না। কয়েকজন শ্রেষ্ঠ সন্তান এই কাজ শুরু করেছিলেন।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আফসোস। কাজটা কিন্তু শুরু হয়েও আগাতে পারলো না।’ বলল প্রধানমন্ত্রী আহমদ হাত্তা।

আহমদ হাত্তা থামলেও আহমদ মুসা কোন কথা বলল না। ভাবছিল সে।

আহমদ মুসাকে ভাবনায় ডুবে যেতে দেখে আহমদ হাত্তাও কিছু বলল না। কিছুক্ষণ পর অধৈর্য্য হয়ে ফাতিমা বলল, ‘কি ভাবছেন এত ভাইয়া?’

‘হিসেব করছি।’ বলল আহমদ মুসা।

‘কি হিসেব?’ ফাতিমা বলল।

‘মদিনা শরীফ হয়ে ষ্ট্রাসবার্গ যাব, না সরাসরি যাব।’ বলল আহমদ মুসা ভাবনায় ডুবে থেকেই।

‘কি বলছেন ভাইয়া আপনি?’ বলে চিৎকার করে উঠে দাঁড়াল ফাতিমা। আবার বলে উঠল, ‘এখন কিছুতেই আপনার যাওয়া হবে না সুরিনাম থেকে।’

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল আহমদ হাত্তা। কিন্তু তার আগেই আহমদ মুসা বলল, ‘মি. হাত্তা আপনার টেলিফোনটা একটু ব্যবহার করতে পারি?’

‘ওয়েলকাম, অবশ্যই।’ বলল আহমদ হাত্তা।

আহমদ মুসা টেলিফোন হাতে নিয়ে রিং করলো ওভানডোকে। বলল, ‘ভাই ওভানডো, কাল সকালেই যদি লিসার সাথে বার্নারডোর বিয়ে হয় তাতে তোমাদের আপত্তি আছে?’

‘অবশ্যই নেই।’ বলল ওভানডো ওপার থেকে।

‘না, তুমি আম্মা, দাদী এমনকি লিসাকে জিজ্ঞেস করে আমাকে বল।’ বলল আহমদ মুসা।

‘একটু ধরুন ভাইয়া।’ বলে টেলিফোন রেখে দিল। কিছুক্ষণ পর আবার টেলিফোন ধরে বলল, ‘না ভাইয়া কোন সমস্যা নেই। আপনার ইচ্ছাই আমাদের ইচ্ছা।’

'ধন্যবাদ ওভানডো। তোমরা আয়োজন কর। আমি বার্নারডোকে জানাচ্ছি।' বলে আহমদ মুসা টেলিফোন রেখে দিল।

তারপর আহমদ হাত্তা ও ফাতিমার দিকে মুখ তুলে বলল, 'আপনাদের দাওয়াত বার্নারডো ও লিসার বিয়েতে। ওয়াং আলীকেও দিচ্ছি ফাতিমা।'

তবুও কোন কিছু কানে না তুলে বলল, 'না ভাইয়া আপনাকে এত তাড়াতাড়ি যেতে দেব না। আপনি যেতে পারবেন না।' কান্না ভেজা আবেদন ফাতিমার।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'যেতেই তো হবে বোন। মায়া বাড়িয়ে লাভ আছে বল? আজ যে কষ্ট তোমার হচ্ছে, দশদিন পর সে কষ্ট আরও বাড়বে।'

'আমি কোন কথা শুনব না। আব্বু তাকে এভাবে যেতে দিও না।' বলে কান্না চাপতে চাপতে ভেতরে ছুটলো ফাতিমা।

ফাতিমা চলে যেতেই প্রধানমন্ত্রী আহমদ হাত্তা বলল, 'মি. আহমদ মুসা, আপনার কোন কাজেই বাধা দিতে আমরা পারবো না। একদিন আমরা না বললেও আপনি এসেছিলেন, আবার আজ আমরা বাধা দিলেও আপনি চলে যাবেন জানি। কিন্তু আমরা কেউ এটা মেনে নিতে পারবো না। আপনার তৈরি নতুন সুরিনামকে আপনি আরও সময় দেবেন, এ আশা আমরা করেছিলাম।' আবেগে ভারী হয়ে উঠল আহমদ হাত্তার শেষ কথাগুলো।

আহমদ মুসা উঠে গিয়ে আহমদ হাত্তার পিঠে হাত রেখে বলল, মিঃ হাত্তা, ফাতিমা কাঁদবে, ওয়াং আলী, ওভানডো, লিসারাও কাঁদবে, কিন্তু আপনার দুর্বল হলে চলে না। আপনি একজন মুসলিম রাষ্ট্রের প্রধান। আপনার দায়িত্ব শুধু সুরিনামের জনগণ নিয়ে নয়, বিশ্বের অন্যান্য অংশের মুসলমানদের সমস্যার কথাও আপনাকে ভাবতে হবে।'

আহমদ হাত্তা উত্তরে কোন কথা বলতে পারল না। কিছুক্ষণ পর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'দোয়া করুন আপনি, এভাবে ভাবার যোগ্যতা যেন আল্লাহ্ আমাকে দেন।'

চোখ মুছল আহমদ হাত্তা। একটু ম্লান হাসি ফোটাবার চেষ্টা করল মুখে। তারপর বলল, 'চলুন ফাতিমা খাবার নিয়ে বসে আছে।'

বলে আহমদ হাত্তা উঠল।

আহমদ মুসাও উঠতে উঠতে বলল, ‘মি. হাত্তা আপনার টেলিফোনটা আরেকটু দিন। ওয়াশিংটনে এফবিআই চীফ মি. জর্জকে ঘটনাটা জানিয়ে রাখি। তার সাহায্যের আমার প্রয়োজন হবে।’

সন্ধ্যার সুরিনাম এয়ারপোর্ট।

সুরিনাম সেনাবাহিনী ও পুলিশের একটি দলের গার্ড অব অনার নিয়ে আহমদ মুসা এগুলো প্লেনের দিকে।

তার চারপাশ ঘিরে হাঁটছে আহমদ হাত্তা, ওভানডো, ফাতিমা এবং ওয়াং আলী।

ওভানডোর মা ও দাদী আহমদ মুসার কপালে বিদায়ী চুমু দিয়ে বলল, ‘যতদিন বাঁচবো তোমার অপেক্ষা করবো বাছা।’

বিমানের সিঁড়িতে ওঠার আগে ওভানডো আহমদ মুসাকে এক পাশে টেনে নিয়ে গেল। আহমদ মুসার হাতে পাঁচ কোটি ডলারের পাঁচটি ড্রাফট তুলে দিয়ে বলল, ‘টেরেক দুর্গের স্বর্ণের চারটি ভাগ করা হয়েছে। এক ভাগ আমাদের পরিবারের। আরেক ভাগ সুরিনামের জন্য। অবশিষ্ট দুই ভাগ বিশ্বের মুসলমানদের জন্যে। তার মধ্য থেকে পাঁচ কোটি ডলার আপনাকে দিলাম। অবশিষ্ট অংক জেদ্দাস্থ ইসলামী ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে আপনার একাউন্টে জমা হবে।’

‘এই মুহূর্তে এত ডলার দিয়ে আমি কি করব ওভানডো?’ বলল আহমদ মুসা।

‘ভাইয়া, যে মিশন নিয়ে আপনি যাচ্ছেন, সে মিশনের ব্যয়ভার মনে করুন একে।’ বলল ওভানডো।

‘সুরিনামের অংশটা কি করবে?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘প্রধানমন্ত্রী মি. হাত্তাকে এ ব্যাপারে আমি বলেছি। এটা তাঁর দায়িত্বে থাকবে।’

‘ধন্যবাদ ওভানডো।’

বলে বিমানের সিঁড়িতে উঠল আহমদ মুসা। সিঁড়িতে উঠে একবার পেছন ফিরে তাকাল। দৃষ্টি ফেরাল একবার অশ্রু সজল সব মুখের দিকে। কিছু বলতে চাইল আহমদ মুসা। কিন্তু পারল না। হঠাৎ বুক থেকে উঠে আসা একটা কান্না তার কণ্ঠ রুদ্ধ করে দিল। দু’ফোটা অশ্রু এসে জমা হল তার দু’চোখের কোণায়। এই পিছনে তাকানোটাই আহমদ মুসার জন্যে সব চেয়ে বেশি বেদনার। দু’হাত নাড়তে নাড়তে আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি সামনের দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল প্লেনে।

আহমদ মুসা বসেছে গিয়ে সিটে। একটু পরেই তার পাশে এসে বসল ক্রিস্টিনা। তারপর ক্রিস্টিনার পাশে এসে বসল লিন্ডা লোরেন, এখন লিন্ডা আল তারিক।

আহমদ মুসার বিস্ময়ভরা চোখ লিন্ডার দিকে। লিন্ডা বলল, ‘ভাইয়া, আপাতত আপনার সাথে মদিনা শরীফ, মক্কা শরীফ হয়ে ষ্ট্রাসবার্গে। তারপর আমি ক্রিস্টিনাকে নিয়ে যাব স্পেনে পুর্ব পুরুষের ইতিহাস খুঁজতে।’

‘ধন্যবাদ লিন্ডা।’

‘ওয়েলকাম ভাইয়া।’

ছুটছে বিমান আটলান্টিকের উপর দিয়ে। বাইরে নিকশ কালো অন্ধকার। সেই অন্ধকারের বুকে হারিয়ে গেছে আহমদ মুসার মন। মন যেন তার খুঁজে ফিরছে আর এক মিশনের গন্তব্য। কোথায় তারা? তাদের জন্যে আবার তৈরি হয়নি তো আরেক ‘গুলাগ দ্বীপপুঞ্জ’? আলেকজান্ডার সোলঝেনিৎসিনের গুলাগ দ্বীপপুঞ্জের পর রচিত হয়েছিল আরেক গুলাগ ক্যারিবিয়ানে।’ তারপর এটা হবে কি আর এক নতুন ‘গুলাগ!’

পরবর্তী বই

# নতুন গুলাগ

## কৃতজ্ঞতায়ঃ

1. Misbah Ahmad Chowdhury Fahim
2. Neehon Forid
3. Nazrul Islam
4. Mujtahid Akon
5. Jamirul haqe
6. Abu Taher
7. Ashrafuj Jaman
8. kayser ahmad totonji
9. Misbah Ahmad Chowdhury Fahim
10. Towhidur Rahman
11. Neehon Forid
12. Sohel Shazuli
13. Shaikh Noor-E-Alam

# সাইমুম-৩৫

# নতুন গুলাগ

আবুল আসাদ

# ১

'তাহলে বলবে না ডকুমেন্টগুলো কোথায় রেখেছ?' বলল রাগে চোখ মুখ লাল করে এক সারিতে তিনটি চেয়ারে বসা তিনজনের মাঝের জন সামনে হাঁটু ভেঙে দাঁড়ানো তিন বন্দীকে লক্ষ্য করে।

হাঁটু ভেঙে দাঁড়ানো তিন বন্দীর খালি গা। পরনে পাতলা কাপড়ের হাফ ট্রাউজার।

বন্দীদের চেহারা বিপর্যস্ত। শরীরে শত নির্যাতনের চিহ্ন।

তিন বন্দীই কাঁপছিল। পা, হাঁটু তাদের দেহের ভার বইতে পারছিল না। কিন্তু বসার উপায় নেই, নিচে তীক্ষ্ণ পেরেক আঁটা চেয়ার। আবার সোজা হয়ে দাঁড়াবারও সুযোগ নেই, মাথার চার ইঞ্চি উপরেই অনুরূপ তীক্ষ্ণ পেরেক আঁটা ইস্পাতের বোর্ড স্থির হয়ে আছে।

'এই প্রশ্ন তোমরা শতবার করেছ। এ পর্যন্ত শতবারই জবাব দিয়েছি, তোমরা আমাদের স্পুটনিক অফিস পুড়িয়ে সব কিছু ধ্বংস করে দিয়েছ।' কান্নায় ভেঙে পড়া কন্ঠে বলল তিন বন্দীর মাঝের জন।

'আমরা বিশ্বাস করি না তোমাদের কথা। তোমরা কম ধড়িবাজ নও। ডকুমেন্টগুলোর শুধু একটি করে কপি তোমাদের কাছে ছিল এটা অবিশ্বাস্য।

তোমাদের বলতে হবে ডকুমেন্টগুলোর ডুপ্লিকেট কোথায়।' বলল চেয়ারে বসা সেই মাঝের জনই।

বন্দীরা তাদের সহ্য ও শক্তির শেষ সীমায় পৌঁছেছিল। তাদের দেহে কম্পন বেড়ে গেছে। শরীর তাদের আঁকা-বাঁকাভাবে দুলতে শুরু করেছে। চোখ তাদের বিস্ফোরিত হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ তিনটি দেহ তাদের এক সাথেই খসে পড়ল সারি সারি পেরেক আঁটা চেয়ারের উপর। সঙ্গে সঙ্গে তাদের তিনটি কন্ঠই যন্ত্রনায় বুকফাটা চিৎকার দিয়ে উঠল।

চেয়ারে বসা তিনজন হো হো করে হেসে উঠল। বলল তিনজনের ডান পাশের জন, 'তোদের ঈমান গেল কোথায়? দাঁড়িয়ে থাকতে পারলি না তো ঈমানের শক্তিতে। তোদের আল্লাহ শক্তি যোগাল না হাঁটুতে এবং পায়ে?'

তিন বন্দীই যন্ত্রনায় আর্তনাদ করছিল। কিন্তু আর উঠে দাঁড়াতে পারছিল না। কারণ পেরেক আঁটা সেই ইস্পাতের বোর্ড নেমে এসেছে ঠিক আগের মতই মাথার চার ইঞ্চি উপরে।

চারদিক থেকে শত শত যন্ত্রনা-জর্জরিত চোখ দেখছিল তাদের অসহ্য আহাজারি।

স্থানটা বিশাল একটি গোলাকার হলঘর। নিচু ছাদ আট-নয় ফুটের বেশি উচুঁ হবে না।

হলঘরটার চারদিক ঘিরে মোটা লোহার গ্রীল ঘেরা ছোট ছোট ঘর। ঘরগুলোকে খোঁয়ার বলাই ভাল। ঘরগুলোতে দাড়ানো যায় না, পা মেলে শোয়াও যায় না। ঘরের মেঝেগুলো এবড়ো-থেবড়ো কাঠের তৈরী। মাথার উপরের কংক্রিটের ছাদগুলো মুভেবল। সুইচ টিপে সেগুলো সরিয়ে দেয়া যায়, আবার লাগানো যায়। দরকার হলে বন্দীদের রোদে পোড়ানো, আবার বরফ বৃষ্টিতে শাস্তি দেবার জন্যেই এই ব্যবস্থা।

বিশাল ঘরের ঠিক মাঝখানে প্রায় ২০ বর্গফুট আয়তনের গোলাকার একটা কংক্রিটের বেদী। এই চত্বরের উপরের ছাদটা গম্বুজের মতো উঁচু। বিশেষভাবে নির্মিত এই গম্বুজে এবং বেদীর নিচে নির্যাতনের হাজারো উপকরণ

সাজিয়ে রাখা। যখন যেটা তাদের প্রয়োজন সুইচ টিপলেই উপর থেকে নেমে আসে এবং নিচ থেকে উঠে আসে। বন্দীদের একাকী বা দলবদ্ধভাবে এখানে এনে নির্যাতন করা হয়। নির্যাতনের যতপ্রকার মারাত্মক পন্থা আছে, সবই তারা পরীক্ষা করেছে এখানে বন্দীদের উপর।

হলঘরের চারপ্রান্তের দু'একটি ছাড়া সবগুলো খোঁয়াড়েই বন্দী রয়েছে। তাদের সংখ্যা দু'শ জনের কম হবে না। তাদেরই বেদনা জর্জরিত চোখ অসহায় দৃষ্টিতে দেখছে তিন বন্দীর উপরে চলমান নির্যাতন। কেউ কেউ চোখ বন্ধ করে কানে আঙুল দিয়ে চেষ্টা করছে বাঁচতে। কিন্তু মনের কষ্ট তাতে এক বিন্দুও লাঘব হচ্ছে না। কেউ কেউ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে প্রার্থনার হাত উপরে তুলে।

তিন বন্দীর অসহায় কাতরানী ছাপিয়ে ধ্বনিত হচ্ছে চেয়ারে বসা তিনজনের উল্লাস ধ্বনি।

এক ঝাঁক পেরেক বিদ্ধ স্থান থেকে রক্ত ঝরছে তিন বন্দীর। রক্ত চেয়ার থেকে গড়িয়ে পড়ছে বেদিতে।

নির্যাতনকারী টিমের তিনজনের মাঝের জনই টিম লিডার। তার বয়স অন্য দু'জনের চেয়ে কিছু বেশী। তবে কারো বয়স চল্লিশের বেশি নয়। তিনজনের পরনেই ইউরোপিয়ান স্যুট। তবে ইউরোপিয়ানদের মত সাদা নয়। মুখের গড়নও এ্যাভারেজ ইউরোপীয় থেকে আলাদা। যারা ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেগীন, ইয়াহুদ বারাক, এ্যারিয়েল শ্যারনদের দেখেছেন, তারা বলবেন এরা তিনজন ঐ প্রধানমন্ত্রীদের ভাই হবেন কোন না কোন দিক থেকে। এরা যে নিখাদ ইহুদী তা তাদের দিকে একবার তাকিয়েই ওয়াকিফহাল যে কেউ বলে দিতে পারে।

তিন চেয়ারের মাঝের লোকটি তার ডান পাশের লোকটিকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, 'মি. আইজ্যাক, সুইচে এবার হাত দিন। রক্ত বেশি গেলে আমাদের ক্ষতি।'

হাসল আইজ্যাক শামির। বলল, 'ঠিক বলেছেন মি. দানিয়েল ডেভিড, ওদের তো আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আমাদের ডকুমেন্টের মতই ওদের রক্ত আমাদের কাছে মুল্যবান। ওরা বাঁচলে ডকুমেন্ট বের হবেই।'

বলে আইজ্যাক শামির তার চেয়ারের পাশেই মেঝের উপর সেট করা একটা বাক্সের ঢাকনা খুলে ফেলল একটা হুক অন করে। ওটা ইলেক্ট্রনিক কনট্রোল বক্স। প্যানেলে সারি সারি অনেক সুইচ। একটা প্যানেলের একটা সুইচকে আইজ্যাক শামির রেড কেবিন থেকে গ্রীন কেবিনে নিয়ে গেল। সংগে সংগেই তিনজন বন্দীর নিচ থেকে পেরেক আঁটা চেয়ার মেঝের ভেতর ঢুকে গেল এবং অনুরূপভাবে মাথার উপর থেকে পেরেক বিছানো ইস্পাতের আয়তাকার বোর্ডটিও চোখের নিমেষে উঠে গম্বুজে ঢুকে গেল।

আহত রক্তাক্ত বন্দী তিনজন আছড়ে পড়ল মাটিতে। বসবার তাদের শক্তি ছিল না, উপায়ও ছিল না। তাদের তিনটি দেহই মেঝেতে শুয়ে পড়ল।

নির্যাতনী টীমের জিজ্ঞাসাবাদকারী তিনজনের নেতা দানিয়েল ডেভিড বলে উঠল সংগে সংগেই, 'না তোমরা শুতে পারবে না, আরাম তোমাদের কপাল থেকে মুছে গেছে। পরকালে যখন বেহেশত আশা কর, তখন জাহান্নামের শাস্তিটা এখানেই ভোগ করে যাও।'

বলে দানিয়েল ডেভিড চেয়ারের হাতলে তার হাতের নিচেই থাকা একটা সুইচে চাপ দিল। চাপ দেয়ার সাথে সাথেই বেদিটির এক প্রান্ত থেকে ৩ বর্গফুটের মত জায়গার মেঝে একটু নিচে নেমে মেঝের আড়ালে হারিয়ে গেল এবং উঠে এল একটা লিফট। লিফটে একজন মানুষ। লোকটির পরনে সামরিক ইউনিফর্ম। কুস্তিগীরের মত চেহারা।

'এসটি জিরো ওয়ান, তুমি ওদের আমাদের সামনে সারিবদ্ধ করে বসিয়ে যাও। আর এক পেগ করে ব্রান্ডি দাও ওদের।' লিফট দিয়ে উঠে আসা ইউনিফরমধারীকে লক্ষ্য করে বলল দানিয়েল ডেভিড।

আদেশ শুনে এসটি জিরো ওয়ান লিফটে করে আবার নিচে নেমে গেল। এক বোতল ব্রান্ডি নিয়ে ফিরে এল আধা মিনিটের মধ্যেই।

জিরো ওয়ান লোকটি তিনটি চেয়ারের সামনে তিনজন বন্দীকে খেলনার মত তুলে এনে বসিয়ে দিল।

বন্দীদের এভাবে বসার ক্ষমতা ছিল না। বসেই তারা কঁকিয়ে উঠল ব্যথায়। ক্লান্তি ও যন্ত্রনায় তারা মাথা সোজা করে বসে থাকতে পারছিল না।

জিরো ওয়ান পেগ ভর্তি ব্রান্ডি ওদের সামনে রেখে বলল, ‘খেয়ে নাও। এ হলো এখনকার জন্যে মেডিসিন। খেলেই দেখবে মাথা সোজা করতে পারছ।’

‘তোমরা এতদিনে নিশ্চয়ই বুঝেছ, মদ, ব্রান্ডি ধরনের হারাম জিনিস আমাদের খাওয়াতে পারবে না। কিছু দিতে চাইলে আমাদের পানি দাও।’ বলল তিনজনের সারি থেকে মাঝের বন্দী।

‘ব্রান্ডি না খেলে তোমাদের পানি দেওয়া হবে না।’ দানিয়েল ডেভিড বলল।

দানিয়েল ডেভিড ৩ জনের জিজ্ঞাসাবাদকারী দলের নেতা।

বন্দীরা কেউ কোন কথা বলল না।

দানিয়েল ডেভিড তার বাম পাশের লোকের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, ‘মি. হাইম হারজেল তাহলে আপনার জিজ্ঞাসাবাদটা সেরে নিন।’

হাইম হারজেল নড়ে চড়ে বসল।

তাকাল বন্দীদের দিকে।

চোখ তার নির্দিষ্ট করল মাঝের জনের দিকে। বলল, ‘কামাল সুলাইমান, অনেক কথাই বলেছ। এখন বল, মোস্তাফা কামাল আতাতুর্কের বংশধর হবার পরেও তোমার এই পরিবর্তন কেন?’

‘কোন পরিবর্তন?’ হাইম হারজেলের দিকে চোখ তুলে জিজ্ঞেস করল কামাল সুলাইমান।

এই কামাল সুলাইমান ৭ জনের গোয়েন্দা সংস্থা স্পুটনিক এর প্রধান। সে কামাল আতাতুর্কের বংশধর, একমাত্র জীবিত বংশধর।

‘তোমাদের মৌলবাদ গ্রহনের কথা বলছি। কামাল আতাতুর্কের যুক্তি ও প্রগতির পথ পরিত্যাগ করে তোমরা মৌলবাদী পথ বেছে নিতে গেলে কেন? যেমন ধর তোমার নামের দুটো অংশ ‘কামাল’ ও ‘সুলাইমান’। কামাল ঠিক আছে, এটা পারিবারিক ঐতিহ্য ও ইতিহাসের প্রতি স্বীকৃতি। কিন্তু সুলেমান কেন ?‘সুলেমান’ তো ওসমানীয় খলিফাদের একজনের নাম। কামাল আতাতুর্ক এদের পরিত্যাগ করেছিলেন। এদের একজন তোমার নামের অংশ হলো কি করে?’ বলল হাইম হারজেল।

‘নামটা রেখেছিলেন আমার পিতা। তিনি আমার নাম রাখার সময় পারিবারিক ইতিহাস এবং জাতীয় ঐতিহ্য দুই-ই সামনে রেখেছিলেন’। বলল কামাল সুলাইমান।

‘জাতীয় ঐতিহ্য কোনটা? সুলেমান নাম?’ জিজ্ঞেস করল হাইম হারজেল।

‘হ্যাঁ, সুলাইমান নাম’। বলল কামাল সুলাইমান।

‘সুলাইমান জাতীয় ঐতিহ্য হলো কি করে? কামাল আতাতুর্ক তো এই ঐতিহ্য পরিত্যাগ করেছিলেন’। বলল হাইম হারজেল।

‘কামাল আতাতুর্ক যাঁকে এবং যাঁদেরকে পরিত্যাগ করেছিলেন, আমার পিতা নিশ্চয় তাঁদেরকেই গ্রহন করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন ওসমানীয় খিলাফতের মহান বিজেতা, মহান শাসক এবং ইউরোপের মহাভয়ের ঝান্ডা সুলাইমানকে আবার আমাদের মাঝে ফিরিয়ে আনতে। তার চাওয়ার স্মারক আমার ‘সুলাইমান নাম’। বলল কামাল সুলাইমান।

‘তার মানে তোমার পিতা তাহলে কামাল আতাতুর্কের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, তুর্কিরা শুধুই তুর্কি এবং তুর্কিদের পরিচালনা করবে তুরস্ক ও পাশ্চাত্যের জ্ঞান, ইসলাম নয়-এই মতবাদ পরিত্যাগ করেছিলেন?’ বলল হাইম হারজেল।

‘শুধু আমার পিতা কেন, সাধারণভাবে তুর্কিরা সবাই এই মতবাদ পরিত্যাগ করেছে’। কামাল আতাতুর্ক ১৭ বার সামরিক আইন ব্যবহার করে তুর্কি জনগণকে ধর্মনিরপেক্ষ বানানোর জন্যে বহু আইন করেছেন, কিন্তু এরপরও মসজিদে বসার আসন স্থাপন মসজিদে জুতা ,পায়ে নামাজ আদায়, নামাজের ভাষা হিসেবে তুর্কি ভাষা চালু, আরবী বিলোপ, নামাজে সেজদার নিয়ম বাতিল, মসজিদে প্রার্থনাকে সুন্দর করার জন্যে আধুনিক বাদ্যযন্ত্র চালু ইত্যাদির মত পরিকল্পনা তাকে প্রত্যাহার করতে বাধ্য হতে হয়। সেই তুর্কি জনগণ আজ আরও স্বাধীন এবং শক্তিশালী’। বলল কামাল সুলাইমান।

‘আচ্ছা তোমার পিতার কথা বাদ দিলাম। তোমার পিতা আংকারা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সাধারণ গ্রাজুয়েট। কিন্তু তুমি তো ইউরোপের

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করেছ, ইউরোপের সংস্কৃতি-সভ্যতার মধ্যে বড় হয়েছ, কিন্তু তুমি মৌলবাদী হলে কি করে?' জিজ্ঞেস করল হাইম হারজেল।

'মৌলবাদ বা মৌলবাদী পরিভাষা পশ্চিমের একশ্রেণীর সংবাদ মাধ্যমের উদ্দেশ্যমূলক সৃষ্টি। মুসলিম জাতির ক্ষেত্রে এই পরিভাষা প্রযোজ্য নয়। সুতরাং আমাকে মৌলবাদী নই, বলতে পারেন ধর্মনিরপেক্ষতা পরিহার করে আমি মুসলিম হলাম কি করে'। বলল কামাল সুলাইমান।

'ঠিক আছে বল, গোঁড়া মুসলিম হলে কি করে?' বলল হাইম হারজেল।

'গোঁড়া বা অগোঁড়া মুসলমান বলে কিছু মুসলিম জাতির মধ্যে নেই'। 'মুসলিম' হওয়ার গুণগুলো যার মধ্যে যত বেশি বর্তমান সে তত বেশি পূর্ণাংগ মুসলমান, যার মধ্যে যত কম সে তত অপূর্ণাংগ।' কামাল সুলাইমান বলল।

'আচ্ছা বল, যে কামাল আতাতুর্ক একদিন বলেছিলেন, 'কেবলমাত্র ইসলামের কর্তৃত্ব নির্মূল করার পরই তুর্কিরা অগ্রগতি লাভ করতে পারে এবং সম্মানিত আধুনিক জাতিতে পরিণত হতে পারে', সেই কামাল আতাতুর্ক পরিবারের ছেলে হয়ে পূর্ণাংগ মুসলমান হলে কি করে? বলল হাইম হারজেল।

'এই প্রশ্নের জবাবের সাথে আমার বন্দী হওয়া বা তোমাদের স্বার্থের তো সম্পর্ক দেখছি না?' কামাল সুলাইমান বলল।

'দেখ, তোমাদের 'স্পুটনিক' সংস্থা ধ্বংস ও তোমাদের বন্দী করার পেছনে নিউইয়র্কের ডেমোক্র্যাসি ও লিবার্টি টাওয়ার ধ্বংস বিষয়ে তোমাদের তদন্ত বানচাল করা ছিল একটি বড় কারণ মাত্র, সব কারণ নয়। আমাদের উদ্বেগের বিষয় হলো, ধর্মনিরপেক্ষতা, ধর্মহীনতা, ভোগ-বিলাস আর চরিত্রহীনতার সয়লাবের মধ্যে থেকে তোমরা এবং তোমাদের মত হাজার হাজার যুবক কি করে নিখাঁদ ইসলামে ফিরে এলো!এই ফিরে আসার পথগুলো, কারণগুলো আমরা চিহ্নিত করতে চাই। এ জন্যেই দেখ আমরা তো তোমাদের সাতজনকেই মাত্র ধরিনি। এই বন্দীখানাতেই তোমরা আছ দু'শজনের মত। তোমাদের সাথে আরও যারা এখানে আছে, তারা সবাই তোমাদের মত নেতৃস্থানীয় এবং 'ডু অর ডাই' ধরনের সাংঘাতিক এ্যাকটিভিস্ট যুবক। তাদের ধরে তাদের আন্দোলন বানচাল

করতে চেয়েছি এটা ঠিক, কিন্তু আসল কারণ এদের আদর্শবাদিতার উৎস সন্ধান করা। এক্সরে করার মত করে সব অজানা রহস্য জেনে নেয়া। এই একই কারণে তোমাকে এই জিজ্ঞাসাবাদ। এখন বল, উত্তর দাও'। বলল হাইম হারজেল। তার দুই চোখে ঠান্ডা সাপের মত ক্রুরতা।

'এই অজানাকে জানা তোমাদের কোন কাজে লাগবে?' জিজ্ঞেস করল কামাল সুলাইমান।

ঠান্ডা হাসি হাসল হাইম হারজেল। বলল, 'রোগ জীবানু কি, কেমন, তার ধর্ম কি জানলেই তো কেবল প্রতিষেধক তৈরী করা যায়। তোমাদের মৌলবাদ কোত্থেকে কিভাবে এল জানলে তবেই তো প্রতিবিধানের পথ বের করা যাবে। আচ্ছা বল, আমার প্রশ্নের জবাব দাও।

'তুমি যে প্রশ্ন করেছ, এক কথায় তার কোন জবাব নেই। অনেক কথা বলতে হবে এজন্য'। বলল কামাল সুলাইমান।

'ক্ষতি নেই বল। আমরা শুধু তা শুনবই না রেকর্ডও করব।' বলল হাইম হারজেল।

'তুমি ঠিকই বলেছ, ধর্মনিরপেক্ষতা, ধর্মহীনতা এবং ভোগবাদিতার সয়লাবের মধ্যে আমি মানুষ হয়েছি জার্মানীর এক অভিজাত পল্লীতে। আমার পিতার মধ্যে ঐতিহ্য-প্রীতি প্রবল ছিল। কিন্তু সেটা ছিল তার মনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বাইরের কাজ-কর্মে তার কোন প্রকাশ ছিল না। জার্মান-সংস্কৃতির আবহাওয়ায় আর দু'দশজনের মতই আমি মানুষ হয়েছিলাম। চেতনা আমার প্রথম ধাক্কা খেল নূরী এ্যারেন-এর Turkey today and tomorrow বইয়ের কয়েকটা লাইন পড়ে। কামাল আতাতুর্কের অনাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের মধ্যে ৪৬ জন কুর্দি নেতাকে কামাল এক সাথে ফাঁসি দিয়েছিলেন। ফাঁসির মঞ্চে একজন কুর্দি নেতা শেখ সাইদ হত্যাকারীকে যে কয়টি বলেছিলেন, নূরী এ্যারেন তার বইতে সে কথাগুলো উল্লেখ করেছেন। শেখ সাইদ বলেছিলেন, 'তোমার প্রতি আমার কোন ঘৃণা নেই। তুমি ও তোমার মনিব কামাল আল্লাহর নিকট ঘৃণিত। শেষ বিচারের দিনে আল্লাহর কাছে আমাদের ফায়সালা হবে।' শেখ সাইদের এ কথাগুলি প্রথমবারের মত আমার মনে চাবুকের মত আঘাত করে। এই ঘটনার

পরপরই আরেকটা বড় ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনা আমার কাছে প্রায় অপরিচিত আমাদের গ্রন্থ আল কোরআন-এর মর্যাদা আমার কাছে আকাশস্পর্শী করে তোলে। ঘটনাটি হলো, একটা ম্যাগাজিনে বৃটিশ রাজনীতিক গ্লাডস্টোন-এর একটা উক্তি পাঠ। উক্তিটি বৃটিশ পার্লামেন্টে গ্লাডস্টোন-এর ভাষণের একটা অংশ। এতে বৃটিশ পার্লামেন্টের 'সেক্রেটারী ফর কলোনিজ' মি. গ্লাডস্টোন বলেছিলেন। 'যতদিন মুসলমানদের আল কোরান থাকবে, আমরা ততদিন তাদেরকে বশ করতে পারবো না। হয় আমাদেরকে তাদের কাছ থেকে এটি কেড়ে নিতে হবে, অথবা তারা যেন এর প্রতি ভালোবাসা হারিয়ে ফেলে তার ব্যবস্থা করতে হবে। (So long as the Muslims have the Quran, "we shall be unable to dominate them. We must either take it from them, or make them lose their love of it.") এই বক্তব্য পাঠ করার সংগে সংগে আমার মনে ঝড়ের বেগে একটি কথা প্রবেশ করল এবং সেটা হলো, 'আল কোরআনই আমাদের মানে মুসলমানদের স্বাধীনতার শক্তি, মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার গ্যারান্টি। আরও মনে হলো, আমার পূর্ব-পুরুষ মোস্তফা কামাল তাহলে হয়তো তার অজান্তেই গ্লাডস্টোনদের পরিকল্পনাই বাস্তবায়ন করেছিলেন। এই চিন্তা হঠাৎ করে আমাকে নতুন মানুষে পরিণত করল। পাল্টে গেল আমার জীবন ধারা। পড়া-শোনার বিষয় আমার পাল্টে গেল। পরিবারের সবাইকে বিস্মিত করে আমি নামাজী বনে গেলাম। এই সময় আমি মোস্তফা কামালের সমসাময়িক তুরস্কের নির্ভীক জননেতা বদিউজ্জামান নূরসীর জীবন ও কর্মের উপর একটা গ্রন্থ পড়লাম যা আমার জীবনকে আমূল পাল্টে দিল। তার অনেক কথা আমার কাছে অথৈ সমুদ্রে পথহারা নাবিকের কাছে 'বাতি ঘর' এর মত জীবনদায়িনী মনে হলো । যেমন মোস্তফা কামাল এক ঘটনায় নামাজকে কটাক্ষ করে উক্তি করলে জনাব নুরসী তুরস্কের লৌহ মানবের মুখের উপর বলেছিলেন, 'পাকা, ঈমানের পর ফরয নামাজই তো ইসলামের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যারা নামাজ আদায় করে না, তারা বিশ্বাসঘাতক। আর বিশ্বাসঘাতকের অভিমত গ্রহন করা যায় না।' ইসলামের প্রতি ভালোবাসাও আমি নূরসীর কাছ থেকে শিখেছি। মোস্তফা কামালের শাসনে তুরস্কে ইউরোপীয় সংস্কৃতির সয়লাব

যখন অপ্রতিরুদ্ধ হয়ে উঠল, তখন স্বাস্থ্যগতভাবে নুরসী খুবই ভেঙে পড়লেন, অথচ তার কোন রোগ ছিল না। এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেছিলেন, 'আমি আমার নিজের দুঃখ গুলো সইতে পারি। কিন্তু ইসলামের দুঃখ আমাকে বিধ্বস্ত করে ফেলেছে। ইসলামী দুনিয়ার উপর আমি প্রদত্ত প্রতিটি আঘাত আমার অন্তরের উপর হানা দেয়। তাই আমি এমন ভেঙে গেছি। শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলের উপর নীতি ও আইনকে স্থান দেয়া, মানুষকে ভালোবাসা, মুসলমানদেরকে ভালোবাসার শিক্ষাও আমি জনাব নুরসীর কাছ থেকে পেয়েছি। মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক জনাব নুরসীর উপর জেল-জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন, নির্বাসন কতই না করেছেন। কিন্তু যখন মোস্তফা কামালের বিরুদ্ধে অস্ত্র, সৈন্য, গোলা-বারুদ সব প্রস্তুত করে তার কাছে যুদ্ধের অনুমতি চাওয়া হলো, তখন তিনি বলেছিলেন, 'আপনারা কার বিরুদ্ধে লড়াই করতে চান? মোস্তফা কামালের সৈন্য কারা? ওরা এদেশেরই ছেলে। আপনি কাদেরকে হত্যা করবেন? তারা কাকে হত্যা করবে? আপনি কি চান আহমদ মুহাম্মদকে আর হাসান হোসাইনকে হত্যা করুক।' যে কোন অবস্থায় অস্ত্রের চেয়ে যুক্তিকে, বুদ্ধিকে অগ্রাধিকার দেবার শিক্ষা আমি নূরসীর কাছ থেকেই পেয়েছি। তিনি সশস্ত্র তৎপরতার ঘোর বিরোধী ছিলেন। যুক্তি ও বুদ্ধি অস্ত্রকেই তিনি সবচেয়ে শক্তিশালী ও কার্যকর মনে করতেন। আমরা 'স্পুটনিক' গড়েছি তা অনেকটা তাঁর এ শিক্ষা থেকেই। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যুক্তি ও বুদ্ধির অস্ত্র দিয়েই আপনাদের এবং সকলের সব ষড়যন্ত্র আমরা নস্যাত করতে পারব।' থামল কামাল সুলাইমান।

'যদি বেঁচে থাক।' বলেই হাইম হারজেল চোখ ফেরাল কামাল সুলাইমানের বামপাশে বসা ওসমান আবদুল হামিদের দিকে। তুরস্কের ওসমানীয় খিলাফতের শেষ সক্রিয় খলিফা সুলতান আবদুল হামিদের বংশধর। তার দিকে চোখ তুলে ধরে বলল হাইম হারজেল, 'তোমার পূর্ব পুরুষদের কামাল আতাতুর্ক সুইজারল্যান্ডে নির্বাসন দিয়েছিল। পরবর্তীকালে তোমাদের পরিবার নিরেট একটি ইউরোপীয় পরিবারে পরিণত হয়। আরবী ভাষার চর্চা তাদের মধ্য থেকে উঠে যায়। আরবী ভাষা ভুলে যায় তারা। তুমি কিভাবে মৌলবাদী হলে মানে

পূর্ণাংগ মুসলমান হলে সে কাহিনী তোমার কাছ থেকে শুনেছি। শুধু একটা বিষয়ই জানার বাকি আছে সেটা হলো, তুমি আরবী শিখলে কোথায়?'

'আরবী আমি শিখিনি। আরবী ভাষা আমি জানি না। সবে শিখতে শুরু করেছি।' বলল ওসমান আবদুল হামিদ।

'জান না? তাহলে কোরআন ও হাদিস পড় কি করে?' হাইম হারজেল বলল।

'ইংরেজী অনুবাদ পড়ি।' জবাব দিল ওসমান আবদুল হামিদ।

'ও, আচ্ছা।' বলে হাইম হারজেল ফারুকের বংশধর এবার আবদুল্লাহ আল ফারুকের দিকে তাকাল। তাকে উদ্দেশ্য করে বলল হাইম হারজেল, 'সেদিন তোমার কাছ থেকে কিছু জেনেছি, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা বিষয় জিজ্ঞেস করতে বাকি রয়ে গেছে। বল, তোমার ঘরে ফেরার উপলক্ষ বা কারণটা কি?'

'ঘরে ফেরা মানে কি ইসলামে ফিরে আসা?' জিজ্ঞেস করল আবদুল্লাহ আল ফারুক।

'হ্যাঁ ঠিক, ইসলামে ফেরা।' বলল হাইম হারজেল।

'এটা ঠিক ইসলামের চর্চা আমাদের পরিবার থেকে লোপ পেয়েছিল। কিন্তু আমরা মুসলমান এ কথা কেউ আমরা কখনোও ভুলিনি। তারপর নানা কার্যকারণ ও ঘটনায় পূর্ণাংগ ইসলামে আমি ফিরে এসেছি। সে অনেক কথা, কোনটা বলব আমি?' বলল আবদুল্লাহ আল ফারুক।

'শুধু বল, কোরআন হাদিস পড়ে, না কিভাবে তোমরা প্রথম চোখ খুলল?' বলল হাইম হারজেল।

সংগে সংগে উত্তর দিল না আবদুল্লাহ আল ফারুক হারজেলের প্রশ্নের। ভাবছিল সে। একটু পর সে বলল, 'আমি তখন প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। একদিন লাইব্রেরীতে বসে নোট তৈরী করছিলাম। নোট শেষে বসে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম আমার হাতের কাছেই ইবনে খালদুনের মুকাদ্দামা পড়ে আছে। এই বিখ্যাত বইটির অনেক নাম শুনেছি। কিন্তু কোন দিন হাতে নিয়ে দেখিনি। কাছে পেয়ে আজ হাতে তুলে নিলাম। সূচীটা দেখে নিলাম। তারপর পাতা উল্টাতে লাগলাম। এক জায়গায় কয়েকটা লাইন সবুজ মার্কার দিয়ে চিহ্নিত

করা দেখলাম। ভাবলাম আমার মতই নোটকারী পাঠকের কাজ। আগ্রহ নিয়ে মার্ক করা লাইন কটি পড়তে লাগলামঃ ‘নবীর আল্লাহ প্রদত্ত বাণী ছাড়া রাজনৈতিক ও স্থায়িত্ব অর্জনে আরবরা অক্ষম। কারণ চারিত্রিক কঠোরতা, গর্ব, বর্বরতা এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে পরস্পরের প্রতিহিংসা তাদের মজ্জাগত। ইচ্ছা ও আকাঙ্খার ঐক্য ছাড়া এগুলো দূরিভূত হওয়া খুবই কষ্টকর। নবীর ধর্মই তাদের রুক্ষতা ও প্রতিহিংসাকে দমন করতে পারে। কারণ এই ধর্মই তাদেরকে বর্বর জাতি থেকে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করেছে। তাদের মধ্যে এ সময় এমন ব্যক্তির আবির্ভাব হওয়া উচিত যিনি তাদেরকে সত্যের দিকে আহ্বান করবেন এবং অসত্য থেকে বিরত রাখবেন তবেই তারা ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে এবং নেতৃত্ব দানে সক্ষম হবে।’ ইবনে খালদুনের এ বক্তব্য একবার দু’বার নয় অনেকবার পড়লাম। কথাগুলো সম্মোহিত করে ফেলল আমাকে। আমার মনে হলো এই লাইন কয়টিতে পৃথিবীর সমাজ বিজ্ঞানের জনক ইবনে খালদুন যা বলেছেন তার চেয়ে বড় সত্য আর কিছু নেই। এক মুহূর্তেই আরব দেশগুলোর অনৈক্য, দূর্বলতা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বহুমুখিতা, পারষ্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত ইত্যাদির কারণ আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। মনে হলো, নবীর শিক্ষা ও আদর্শের শক্তিই আরবদের এবং মুসলমানদের আবার শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করতে পারে। এই চিন্তা আমার সত্ত্বা জুড়ে তড়িত প্রবাহের মত ছড়িয়ে পড়ল। আমি যেন নতুন চিন্তা চেতনায় নতুন মানুষে পরিণত হলাম। তারপর কয়েকদিনে আমি ইবনে খালদুনের এই মুকাদ্দামা পড়ে শেষ করলাম। তখন শুধু আরব জীবন, আরব ইতিহাস নয়, গোটা পৃথিবীর ইতিহাস ও সভ্যতা নতুন পরিচয় নিয়ে আমার সামনে আবির্ভুত হলো। আমার মনে হলো মুসলমানরা ঈমান, কোরআন ও হাদীসের ভূমিকা পরিহার করলে তাদের সংস্কৃতি সভ্যতার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না-আরবতত্ত্ব নয়, জাতিতত্ত্ব নয়, লীন হয়ে যেতে হয় বৈরী সভ্যতা সংস্কৃতি ও জাতিদেহের মধ্যে। সেদিনই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম শুধু স্বাধীন ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন নিয়ে বাঁচার জন্যে নয়, সুন্দর মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী চিরন্তন শান্তির জন্যে আমাকে ইসলামে ফিরে আসতে হবে। এই হলো আমার ঘরে ফেরার কাহিনী।’ থামল আবদুল্লাহ আল ফারুক।

আবদুল্লাহ আল ফারুক থামতেই দানিয়েল ডেভিড বলে উঠল আবদুল্লাহ আল ফারুকদেরকে লক্ষ্য করে, 'তোমরা খুব সরল এবং সৎ। কিন্তু স্বাধীন ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন তোমাদের ভাগ্যে নেই, সুন্দর মৃত্যুও নয়। পরকালীন শান্তি হয়তো পাবে। কারণ আর যাই হোক আজকের বিশ্ব পরিচালনা তোমাদের দ্বারা সম্ভব নয়।'

'হ্যাঁ, জানোয়ারের বিশ্ব যদি হয় তা পরিচলানা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু মানুষের বিশ্ব পরিচালনা সম্ভব। আর এ বিশ্ব জানোয়ারদের নয় মানুষের।' বলল কামাল সুলাইমান।

'জানো মানুষই সবচেয়ে বড় জানোয়ার?' বলল দানিয়েল ডেভিড।

'তাদের মানুষ করার জন্যই তো শেষ নবীর শেষ রেসালত।' কামাল সুলাইমান বলল।

'কিন্তু তা করতে পারেনি তোমাদের শেষ নবীর শেষ রেসালত। এই কারণেই তো জানোয়ার বন্দী করতে পারনি, যাদের জানোয়ার বল তারা তোমাদের বন্দী করে এনেছে।' বলল দানিয়েল ডেভিড।

'তোমার কথাই শেষ কথা নয়, দেখো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তোমাদের লীলা-খেলার ইতি ঘটছে, ঘটবে। সেখানে জেনারেল শ্যারনসহ তোমাদের অনেকেই বিচারের সম্মুখিন হচ্ছে।'

চোখ দুটি জ্বলে উঠলো দানিয়েল ডেভিডের। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'তার শোধ নিচ্ছি আমরা এবং নেব।'

বলে একটু থামল দানিয়েল ডেভিড। একটু পর বলল, 'তোমাদের আস্ফালন বুদবুদের মত। জানো, মি.হাইম হারজেল তোমাদের কাছ থেকে কি জেনে নিল?'

কামাল সুলাইমানরা এ জিজ্ঞাসার জবাবে কিছুই বলল না। দানিয়েল ডেভিডই আবার কথা বলে উঠল। বলল, 'তোমাদের ঈমান ও শক্তির গভীরতা তিনি যাচাই করলেন। দেখলেন, মূল কোরআন হাদিস থেকে কোন শিক্ষা তোমরা পাওনি। কোরআন হাদিসের গোটা শিক্ষাও তোমরা জান না। কিছু কার্যকারণের

মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে একটা জাতীয় আবেগের সৃষ্টি হয়েছে মাত্র এবং এটা পরীক্ষায় টিকবে না। তোমরা আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে।'

হাসল কামাল সুলাইমান। বলল, 'ইসলামের প্রথম যুগে যাঁরা মক্কায় শহীদ হয়েছিলেন, বদর প্রান্তরে যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন, ওহোদ-খন্দকে শহীদ হয়েছিলেন যাঁরা, তাঁরা সকলে গোটা কোরআন পড়েছেন-জেনেছেন বলেছেন বলেই শহীদ হননি। বরং ঈমানের জন্যে নয় আমলের জন্যে গোটা কোরআন জানা শর্ত। আর মানুষ জীবন দিতে পারে ঈমানের যুক্তিতেই। সুতরাং তোমাদের ইচ্ছা এতদিন পূরণ হয়নি, কোনদিনই পূরণ হবে না।'

চোখ দু'টি আবার জ্বলে উঠল দানিয়েল ডেভিডের। শক্ত হয়ে উঠল তার চোয়াল। সে তার ডান দিকে বসা আইজ্যাক শামিরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে কিছু নির্দেশ দিতে যাচ্ছিল এমন সময় একটা শক্তিশালী বীপ বীপ শব্দ ভেসে এল।

সংগে সংগে নিজেকে সামলে নিয়ে লাল চোখে কামাল সুলাইমানের দিকে চেয়ে বলল, 'বস আসছে। এখন আর সময় নেই। যে মুখে এই অহংকারের কথা বললে, সে মুখ গুঁড়ো করে দেব। তৈরী থেক।'

কথা শেষ করল এবং তার পরেই দু'পাশের দু'জনকে বলল, 'চল এদের খোঁয়াড়ে রেখে আসি।'

বলেই বন্দী তিনজনকে টেনে নিয়ে ওরা ছুটল খোয়াড়ের দিকে।

ওদের খোয়াড়ের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে, গ্রীলের দরজায় বিশাল তালা ঝুলিয়ে দ্রুত ফিরে এল নিজ নিজ চেয়ারের কাছে।

বীপ বীপ শব্দ তখনও চলছিল।

কিন্তু তাদের সামনের মেঝের চেহারাটা পাল্টে গেছে। বন্দীদের রক্তে ভেজা মেঝেটা কোথায় সরে গেছে। তার জায়গায় শোভা পাচ্ছে শ্বেত পাথরের সুন্দর মেঝে।

ওরা তিনজন ফিরে এসে চেয়ারে বসল না। তাদের দৃষ্টি শ্বেত পাথরের মেঝের দিকে। অপেক্ষা করছে তারা তাদের বসের।

মাত্র কয়েক মুহূর্তের অপেক্ষা।

তার পরেই শ্বেত পাথরের ওপাশ ঘেঁষে অনেকখানি জায়গায় মেঝে সরে গেল এবং সেখানে চোখের পলকে উঠে এল একটা চেয়ার সমেত একজন মানুষ। চেয়ারে বসা লোকটার তীরের মত ঋজু দেহ। লাল মুখটা পাথরের মত কঠিন। চোখের দৃষ্টিটা শূণ্য। তাতে কোন ভাষা নেই। গায়ে সামরিক পোশাক। হাতে সোনার একটি গ্লোব। গ্লোবের মাঝে জেরুসালেমের প্রোথিত নল আকারের একটা সোনারই দন্ড। তার মাথায় ছয় তারকার একটা পতাকা।

ইনিই আজর ওয়াইজম্যান। 'ওয়ার্ল্ড ফ্রিডম আর্মির' অবিসংবাদিত নেতা। তার হাতের গ্লোবটি নেতার মনোগ্রাম। নেতার হাতেই শুধু এটা শোভা পায়।

ওরা তিনজন দাঁড়িয়েই ছিল।

আজর ওয়াইজম্যান উঠে এসে স্থির হতেই ওরা তিনজন তাকে সামরিক কায়দায় স্যালুট দিল।

আজর ওয়াইজম্যানও একজন সর্বাধিনায়কের মত সামরিক কায়দায় স্যালুট গ্রহন করল এবং তাদেরকে 'গুড মর্নিং' বলে স্বাগত জানিয়ে বসতে বলল।

বসল ওরা তিনজন।

'মি.দানিয়েল ডেভিড, আপনাদের মুখ দেখেই বুঝতে পারছি, আপনাদের হাত শূণ্য। কিন্তু আজ তিন সপ্তাহ যাচ্ছে।' বলল আজর ওয়াইজম্যান।

'আমরা দুঃখিত। আমাদের হাত সত্যিই শূণ্য। অবিশ্বাস্য ব্যাপার স্যার, শারীরিক এধরনের নির্যাতনে হাতিও কথা বলে কিন্তু এই নির্যাতনেও তাদের কথা বলা পারছে না।' বলল দানিয়েল ডেভিড।

'বিস্ময়ের কথা বলছেন কেন? এটা তো জানা কথা। আর হাতির সাথেও তুলনা চলে না। হাতি পশু, মানুষ নয়। সুতরাং মানুষ হাতির চেয়ে শক্ত হবে। আর মানুষের মধ্যে মুসলমানরা শক্তিশালী, একথা বাইরে না বললেও তোমাদের তো মনে রাখা উচিত।' আজর ওয়াইজম্যান বলল।

'ঠিক বলেছেন স্যার। নির্যাতনের এখানকার সকল প্রক্রিয়াই ব্যর্থ হয়েছে তাদের কথা বলাতে। তারা বলে জাহান্নামের শাস্তি এর চেয়েও ভয়াবহ।' বলল দানিয়েল ডেভিড।

‘এটাই তো ওদের শক্তি। মৃত্যুকে যারা সোনালী জগতে প্রবেশের সোনার সিংহদ্বার বলে মনে করে, তারা দুনিয়ার সব ভয়কেই জয় করে। কিন্তু মি.দানিয়েল ডেভিড, তাদের কথা বলাতে হবে। ডকুমেন্টের ডুপ্লিকেট তাদের কাছে অবশ্যই আছে এবং সেগুলো আমাদের অবশ্যই চাই।’ আর ওয়াইজম্যান বলল।

‘ডুপ্লিকেটগুলো যখন ওদের কাছে আছে, নিশ্চয় তারা কোথাও সেগুলো রেখেছে। স্যার, সেগুলো খুঁজে পাওয়া কি সম্ভব নয়?’ বলল দানিয়েল ডেভিড।

‘তা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা আমরা করেছি। ফল হয়নি। আবার চেষ্টা আমরা শুরু করতে যাচ্ছি। এই সাতজনের আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব কাউকেই এই অনুসন্ধান তালিকা থেকে বাদ দেয়া হবে না। এরপর আমরা চিন্তা করেছি, এই সাতজনের যাদের স্ত্রী-সন্তান-সন্ততি আছে তাদের এখানে নিয়ে আসব। তাদের কথা বলাবার এটাই শেষ পথ।’ আজর ওয়াইজম্যান বলল।

আজর ওয়াইজম্যানের শেষের কথাগুলো শুনে তিনজনের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল দানিয়েল ডেভিড, ‘স্যার ওদের কথা বলাবার হন্যে ওদের স্ত্রী সন্তান ও মায়েরাই হবে অব্যর্থ অস্ত্র। স্যার, আমার মতে এই সাতজনের আত্মীয় বন্ধুদের সন্ধানে সময় ব্যয় না করে অবিলম্বে এদের পরিবার পরিজনদের এখানে আনলেই কাজ হবে বেশি।’

‘হ্যাঁ, সেটাও আমরা ভাবছি। আমি যাচ্ছি স্ট্রাসবার্গে দু’একদিনের মধ্যে।’ আজর ওয়াইজম্যান বলল।

‘আপনাকেই যেতে হবে? খুব বড় কাজ তো ওটা নয়। নির্দেশ দিলেই তো ওদের এখানে নিয়ে আসবে।’ বলল দানিয়েল ডেভিড।

‘ওখানে যেতে হবে। মনে হচ্ছে আমরা নতুন এক বিপদের মুখে পড়তে যাচ্ছি। খবর পাওয়া গেছে, আহমদ মুসা নাকি স্ট্রাসবার্গের উদ্দেশ্যে সুরিনাম ছেড়েছে। আমরা খবরটাকে অবিশ্বাস করছি না। যে মাফিয়া গ্রুপের কাছে থেকে খবর পাওয়া গেছে তাদের সাথে ভাল সম্পর্ক সুরিনাম সরকারের। তাদের মাধ্যমে আহমদ মুসার টিকিটের বিস্তারিত বিবরণ পেয়ে গেছি। সে সুরিনাম থেকে

মদিনায়, মদিনা থেকে আসছে স্ট্রাসবার্গে। এই স্ট্রাসবার্গে আসার দিনক্ষণটাই অনিশ্চিত রয়ে গেছে আমাদের কাছে।' আজর ওয়াইজম্যান বলল।

'কেন সে আসছে স্ট্রাসবার্গে?' জিজ্ঞেস করল দানিয়েল ডেভিডের পাশ থেকে হাইম হারজেল।

'ইউরোপের একমাত্র কার্যকর মুসলিম গোয়েন্দা সংস্থা স্পুটনিক ধ্বংস হয়েছে, সংস্থার ৭জন পরিচালকের সবাই নিখোঁজ। স্ট্রাসবার্গে এমন সাংঘাতিক ঘটনা ঘটার পর জিজ্ঞাসার প্রয়োজন আছে কি যে আহমদ মুসা সেখানে কেন আসছে!'

'স্যরি। ঠিক বলেছেন স্যার। কিন্তু আমি ভাবছিলাম, ইউরোপের বাঘা বাঘা গোয়েন্দারা যেখানে স্পুটনিক ঘটনার কোন কুল কিনারা করতে পারেনি, সেখানে আহমদ মুসা এসে কি করবে।' বলল হাইম হারজেল।

'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আহমদ মুসা কি ঘটিয়েছে এটা দেখার পরেও আপনি একথা বলছেন? মার্কিন এফবিআই বহু বছরেও যার টিকির নাগাল পায়নি, আহমদ মুসা তার শুধু নাগাল পাওয়া নয়, ইহুদীদের শত বছরের সব আয়োজনই তো সে ধ্বংস করে দিয়েছে। ইহুদি গোয়েন্দা প্রধান জেনারেল শ্যারনের গায়ে কেউ কোন দিন হাত দিতে পারে নি। কিন্তু আহমদ মুসা তাকে মার্কিন কারাগারে নিক্ষেপ করে এমন মামলায় জড়িয়েছে যে জেলের বাইরে আসাই হয়তো তার পক্ষে আর সম্ভব নয়।' আজর ওয়াইজম্যান বলল।

মুখ শুকিয়ে গেছে হাইম হারজেলের। মুখ নিচু করল সে। কথা বলতে পারল না।

মুখ খুলল দানিয়েল ডেভিড। বলল, 'স্ট্রাসবার্গে আহমদ মুসার আগমন সত্যিই খুব খারাপ খবর। আজ পর্যন্ত দুনিয়ার যে জায়গাতেই সে পা দিয়েছে, সেখানেই ভাগ্যের আনুকুল্য সে পেয়েছে। আর.........।'

'মি.হাইম হারজেল আহমদ মুসাকে জিরো করতে চেয়েছিলেন। আর আপনি তাকে 'হিরো' করতে চাচ্ছেন। আমরা যদি তাকে অজেয় হিরোই মনে করি, তাহলে তো আমাদের করার কিছুই থাকে না।' বলল আজর ওয়াইজম্যান।

'স্যরি স্যার।' দানিয়েল ডেভিড বলল।

‘ধন্যবাদ মি.দানিয়েল ডেভিড। আসলে কি জানেন, অতীতে আহমদ মুসা সম্পর্কে আমাদের পলিটিক্স ঠিক হয়নি। তাকে বন্দী করে আমরা আর্থিক ও রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করতে চেয়েছি। এটা ঠিক হয়নি। তার মত লোককে যে বন্দী রাখা যায় না, এটা বুঝতে আমরা ভুল করেছি। সুতরাং এবার আমাদের সিদ্ধান্ত সুট অন সাইট। দেখা মাত্রই তাকে গুলী করা হবে। তাকে আমাদের দরকার নেই, তার লাশ দরকার।’

‘স্ট্রাসবার্গে আপনি কবে যাবেন স্যার?’ জিজ্ঞেস করল দানিয়েল ডেভিড।

‘আজই।’ আজর ওয়াইজম্যান বলল।

‘একটা কথা স্যার।’ বলল দানিয়েল ডেভিড।

‘কি কথা?’

‘স্পুটনিকের ৭জন ছাড়া আর ২শর মত যারা আছে, তারা কিন্তু এদের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। মুখ থেকে মুখে, কান থেকে কানে এই পদ্ধতিতে তারা তথ্য আদান-প্রদান ও শিক্ষা ক্লাস চালু করেছে। এদের এক সাথে এইভাবে রাখা আমাদের লক্ষ্যের পক্ষে কল্যাণকর হচ্ছে না।’ বলল দানিয়েল ডেভিড।

হাসল আজর ওয়াইজম্যান। বলল, ‘মি.ডেভিড, স্পুটনিকের সাতজন ছাড়াও যাদের এখানে রাখা হয়েছে, তারা প্রত্যেকেই তাদের স্ব স্ব অঞ্চলের ইসলামের নেতা। তারা প্রত্যেকেই একটি করে শক্তির জেনারেটর। এখানে তাদের শেখার এবং শেখাবার কিছু নেই মি.ডেভিড।’

বলে একটু থামল আজর ওয়াইজম্যান। শুরু করল আবার, ‘আমাদের এটাকে ‘ক্যাম্প গ্রিনডার’ বলতে পারেন। মানুষকে পেষণ করে তার রস নিংড়ে নেয়াই এই ক্যাম্পের লক্ষ্য। ওদের কাছ থেকে সব তথ্য, সব কথা নিংড়ে নিয়ে ওদের আমরা আটলান্টিকে ডুবিয়ে দেব।’

‘কিন্তু ওদের সন্ত্রাসী সংগঠন ও অস্ত্রপাতি সম্পর্কে তো কিছুই জানা যাচ্ছে না। বলছে না কিছুই ওরা শত নির্যাতনেও।’ বলল তিনজনের একজন আইজ্যাক শামির।

‘থাকলে তো বলবে কিছু ওরা। ওরা সন্ত্রাসী নয়, সন্ত্রাসী কোন সংগঠনও ওদের নেই।’ আজর ওয়াইজম্যান বলল।

‘কিন্তু আমরা ওদের সংগঠনকে নিষিদ্ধ করেছি সন্ত্রাসী সংগঠন হওয়ার অভিযোগে এবং ওদেরও তো আটক করেছি ভয়ানক সন্ত্রাসী হিসেবে।’ বলল সেই আইজ্যাক শামিরই।

আজর ওয়াইজম্যানের পাথুরে মুখে হাসি ফুটে উঠল বলল, ‘তোমরা জান, ওটা আমাদের প্রোপাগান্ডা, ওদের সংগঠন নিষিদ্ধ করা ও ওদের আটক করার একটা ওজর। আসলে আমরা চাই, ইসলামী পূণর্জাগরনের সব সংস্থা সংগঠন ধ্বংস করতে এবং ওদের পুনর্জাগরণের গোপন কথাগুলো জানতে।’

‘কিন্তু সেরকম কোন তথ্য আমরা বের করতে পারছি কি?’ বলল হাইম হারজেল।

‘প্রচার। এই কিছুক্ষণ আগে কামাল সুলাইমানের কাছ থেকে যে কথাগুলো বের করলেন, তার প্রিন্টের উপর আমি আসার সময় চোখ বুলিয়ে এসেছি। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সে দিয়েছে। আমাদের উদ্বেগের বিষয় হলো, গত ৫০ বছরে মুসলিম বিশ্বে এমন কি ঘটল যে, মুসলিম তরুণরা, যুবকরা হঠাৎ করে ধর্ম নিরপেক্ষ, এমন কি তাদের অতিপ্রিয় ভাষা ও আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ ছেড়ে দিয়ে ইসলামের প্রতি অসীম ভালোবাসায় পাগল হয়ে উঠল। এই রহস্য উদঘাটন হচ্ছে। এই তো ক’মিনিট আগে কামাল সুলাইমানদের কাছ থেকে যা শুনলে, তাতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে।’ থামল আজর ওয়াইজম্যান।

সে থামতেই দানিয়েল ডেভিড বলে উঠল, ‘সেটা কি?’

‘এক ধরনের ইতিহাস, এক ধরনের বই-পুস্তক এবং এক ধরনের ঘটনাবলী এমনকি সেকুলার মুসলিম যুবকদেরকেও ইসলামে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে প্রবল শক্তিশালী জেনারেটরের ভূমিকা পালন করছে। কামাল সুলাইমানদের দেয়া তথ্য থেকে এই বিষয়টা সুনির্দিষ্টভাবে জানা গেল।’ বলল আজর ওয়াইজম্যান।

‘এই জানায় লাভ কি?’ কামাল সুলাইমান বলল।

'জানায় লাভ হলো, আমরা এখন মুসলিম পাবলিকেশন্স এবং মুসলিম লাইব্রেরীসহ সব পাবলিকেশন্স ও লাইব্রেরীর দিকে নজর দেব। কিছু দিনের মধ্যেই দেখবেন, লাইব্রেরী থেকে ঐ ধরনের বইগুলো উধাও হয়ে গেছে, পুস্তক বিক্রেতাদের দোকান থেকে ঐ ধরনের বই সব রাতারাতি বিক্রি হয়ে গেছে এবং কোন প্রকাশনাই আর ঐ ধরনের বই প্রকাশ করছে না। দু'একটা প্রকাশনা যদি বেয়াড়া হয়, তাহলে স্পুটনিকের মতই সেগুলো জন্মের মতো ধ্বংস হয়ে যাবে। তাছাড়া সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অংশ হিসেবে আমরা মুসলিম সরকারগুলোকে বাধ্য করবো যাতে মৌলবাদী, উত্তেজক, প্ররোচক ঐসব বই এর প্রকাশনা শান্তির স্বার্থেই বন্ধ করে দেয়া হয়।' থামল আজর ওয়াইজম্যান।

দানিয়েল ডেভিডের চোখ-মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল দানিয়েল ডেভিড, 'ধন্যবাদ স্যার। আমরা ঠিক পথেই এগোচ্ছি। কিন্তু স্যার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার নিয়ে কি করবেন? ওরা আমাদের বিরুদ্ধে তো উঠে পড়ে লেগেছে। জেনারেল শ্যারনকে ওরা মনে হয় ফাঁসি দিয়েই ছাড়বে।'

চিন্তা করছিল আজর ওয়াইজম্যান। দানিয়েল ডেভিড থামার একটু পর বলল, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গণতান্ত্রিক দেশ। মার্কিন জনগণ তাদের স্বার্থে আঁচড় লাগাতে দিতেও নারাজ। আমরা ইহুদীবাদীরা এই বাস্তবতাকে গুরুত্ব দেইনি। আমরা তাদের পাতের ভাত কেড়ে খেতে শুরু করেছিলাম। কিছু মানুষকে হয়তো চিরদিনই বোকা বানিয়ে রাখা যায়, তবে সব মানুষকে সব সময়ের জন্যে বোকা বানিয়ে রাখা অসম্ভব, আমরা এ সত্যটাকেও আমলে দেইনি। নিউইয়র্কের লিবার্টি টাওয়ার ও ডেমোক্রাসি টাওয়ার ধ্বংসের দায় মুসলমানদের ঘাড়ে সফলভাবে চাপাবার পর যে মহাসুযোগ আমরা পেয়েছিলাম, তা আমাদেরকে বেশি বেপরোয়া করে তুলেছিল। এটা আমাদের ক্ষতি করেছে। আর আহমদ মুসা আমেরিকায় গিয়ে এরই সুযোগ গ্রহন করেছে। এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোটা পরিবেশ আমাদের প্রতিকূলে। নতুন করে যাত্রা শুরু করতে হবে আমাদের সেখানে। ভয়ের কিছু নেই, আমরা চিন্তা করছি, আগামী নির্বাচনে মার্কিন কংগ্রেসে আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল লোকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ করার চেষ্টায় আমরা হাত দিয়েছি এবং পরবর্তী মার্কিন প্রেসিডেন্ট আমাদের পছন্দনীয় হয় তার জন্যে আমরা সর্বাত্মক

চেষ্টা করছি। কিন্তু আমাদের এসব প্রচেষ্টা বানচাল হয়ে যাবে যদি নিউইয়র্কের লিবার্টি ও ডেমোক্র্যাসি টাওয়ার ধ্বংসের আসল রহস্য মার্কিন জনগনের সামনে এসে যায়। এজন্যেই আমরা স্পুটনিক ধ্বংস করেছি, স্পুটনিকের হোতা সাত শয়তানকে আমরা আটক করেছি এবং তাদের সংগ্রহ করা লিবার্টি ও ডেমোক্র্যাসি টাওয়ার ধ্বংসের প্রকৃত প্রমাণাদি আমরা হাত করার চেষ্টা করছি। ঐ সাত শয়তানের কাছ থেকে যে কোন মূল্যে আমাদেরকে ঐ ডকুমেন্ট উদ্ধার করতেই হবে। দরকার হলে ওদের সব আত্মীয় পরিজনকে এখানে নিয়ে আসব এবং সাত শয়তানের মুখ খোলার জন্যে এদের গিনিপিগ বানাব। সুতরাং এই সাও তোরাহ দ্বীপের আমাদের মিশন সফল হওয়ার উপরই নির্ভর করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের ভবিষ্যত। নিউইয়র্কের লিবার্টি ও ডেমোক্র্যাসি টাওয়ার ধ্বংসের রহস্য ফাঁস হয়ে গেলে শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নয়, গোটা দুনিয়ার কাছে আমরা বিশ্বাসঘাতকে পরিণত হবো।' থামল আজর ওয়াইজম্যান।

আজর ওয়াইজম্যানের পাথুরে মুখ ভাবলেশহীন। কিন্তু দানিয়েল ডেভিডের চোখে মুখে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে। বলল দানিয়েল ডেভিড, 'স্যার, সাও তোরাহ মিশন ব্যর্থ হবে না স্যার। সাত শয়তানকে অবশেষে কথা বলতেই হবে। তবে আহমদ মুসাকে ঠেকানো দরকার স্যার।'

'হ্যাঁ, আহমদ মুসার ব্যাপারটা আমরা দেখছি। যে যাতে স্পুটনিকের ঘটনার ব্যাপারে নাক গলাতে না পারে, সে ব্যবস্থা আমরা যে কোন মূল্যেই করব। আমি আজই যাচ্ছি সেখানে।'

কথা শেষ করেই 'গুড মর্নিং টু অল। উইথ ইউ গুডলাক' বলে চলে গেল আজর ওয়াইজম্যান।

'গুড মর্নিং' বলে দানিয়েল ডেভিডরাও তড়িঘড়ি উঠে দাঁড়াল।

ততক্ষনে চেয়ার সমেত আজর ওয়াইজম্যান অদৃশ্য হয়েছে।

তিনজনই আবার বসে পড়ল চেয়ারে। ঘড়ির দিকে তাকাল দানিয়েল ডেভিড। বলল, 'চলুন আমাদেরও সময় হয়েছে যাবার।'

# ২

উপর থেকে দেখতে অদ্ভুত সুন্দর লাগছে স্ট্রাসবার্গ শহরকে। বিমানটি তখন চক্কর দিচ্ছে স্ট্রাসবার্গের আকাশে। সবুজ রাইন উপত্যকা। গাঢ় সবুজ উপত্যকার পশ্চিম বরাবর নেমে আসা পাহাড়ের দেয়াল। ইউরোপের প্রধান ধমনী রাইন নদী বয়ে চলেছে আকাশের রংধনুর মত এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্তে। উপত্যকার সবুজ শাড়িতে রাইন যেন জীবন্ত এক রূপালী পাড়।

আহমদ মুসার মুগ্ধ চোখ দু'টি রাইন উপত্যকা ঘুরে এসে নিবদ্ধ হলো স্ট্রাসবার্গের উপর।

সবুজের সমুদ্রে লাল-সাদায় মেশানো সুন্দর শহর স্ট্রাসবার্গ। শহরের সবকিছু ছাড়িয়ে সবার উপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে ঐতিহাসিক 'গথিক গীর্জা'। গথিক গীর্জার উপর নিবদ্ধ হলো আহমদ মুসার উৎসুক দু'টি চোখ। শহরের সবচেয়ে পুরানো অংশ এই ঐতিহাসিক গীর্জার সামনেই 'দি রাইন ইন্টারন্যাশনাল হোটেল'। এ হোটেলে সিট বুক করা আছে আহমদ মুসার।

আহমদ মুসার নজর পড়ল সুন্দর পাহাড়ী নদী 'রাইনে'র উপর। এই নদীটি ঘিরেই গড়ে উঠেছে স্ট্রাসবার্গ নগরী। 'রাইন' থেকে একটা ক্যানেল গিয়ে পড়েছে রাইনে। এর ফলেই স্ট্রাসবার্গ কার্যত সমুদ্র বন্দরে পরিণত হয়েছে।

স্ট্রাসবার্গ এয়ারপোর্টে নামল আহমদ মুসা। স্ট্রাসবার্গ এয়ারপোর্ট থেকে রাস্তাটা তীরের মত সোজা গিয়ে প্রবেশ করেছে স্ট্রাসবার্গে। গাড়ির রিয়ার ভিউতে দীর্ঘ পথ এবং পথে গাড়ির দীর্ঘ সারির গোটাটাই নজরে আসে।

স্ট্রাসবার্গে ঢুকে বিস্মিত হলো আহমদ মুসা। খুবই প্রাচীন শহর, কিন্তু রাস্তাগুলো আধুনিক। এয়ারপোর্ট রোডের মতই রাস্তাগুলো সোজা, ছবির মত সাজানো। গাড়ি থেকে সামনে পেছনে অনেকদূর দেখা যায়। চোখ রাখা যায় অনেক দূর।

ভাড়া করা ট্যাক্সির পয়সা মিটিয়ে দিয়ে আহমদ মুসা প্রবেশ করল দি রাইন ইন্টারন্যাশনাল হোটেলে।

রিসেপশন কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই রিসেপশনিস্ট মেয়েটা জার্মান মিশ্রিত ফরাসী ভাষায় আহমদ মুসাকে স্বাগত জানাল। আর মেয়েটাকেও পুরো জার্মান মনে হলো না, আবার পুরো ফরাসীও নয়।

ভাষা ও চেহারাগত দিকটা এই রাইন উপত্যকা এবং এর সন্নিহিত এলাকার একটা বৈশিষ্ট্য। কারণ ফ্রান্স ও জার্মান বর্ডারের এই এলাকাটা শত শত বছর ধরে ফ্রান্স-জার্মান সংঘাতের শিকার। এই অঞ্চলটা কখনও ফ্রান্সের অংশ থেকেছে, কখনওবা জার্মানীর অংশ হয়েছে। ১৫০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই এলাকা জার্মানরা শাসন করেছে। তারপর ফরাসীরা এটা দখল করে। জনগণ তাদের উপর ফরাসী পরিচয় চাপিয়ে দেয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করে। কিন্তু এই জনগনই আবার ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবের পর ফরাসী হবার জন্যে পাগল হয়ে ওঠে। ১৮৭১ সালে জার্মানরা যখন এই এলাকা দখলে করে নেয়, তখন এই এলাকার মানুষ জার্মানদের প্রত্যাখ্যান করে ফ্রান্সে হিজরত করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফরাসীরা এই এলাকা জার্মানদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতেই জার্মান এ অঞ্চলটা আবার দখল করে নেয়। যুদ্ধের পর ফ্রান্স অঞ্চলটা আবার ফিরে পায়।

রিসেপশনিস্ট মেয়েটা স্বাগত জানালে আহমদ মুসা তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বলল, 'আমি বিদেশী বলেই আমার কৌতূহল। আমি বুঝতে পারছি না আপনি জার্মান না ফরাসী।'

মেয়েটা হাসল। বলল, 'আপনার কি মনে হয়?'

'জার্মান ও ফরাসী দুই-ই মনে হয় আমার কাছে।' আহমদ মুসা বলল।

'আমি ইউরোপীয়।' বলে আবার হাসল মেয়েটি। বলল আবার আহমদ মুসাকে কথা বলবার সুযোগ না দিয়েই, 'এটা বললাম কেন জানেন, স্ট্রাসবার্গ ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাজধানী, মানে এখানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের হেড কোয়ার্টার।'

'জানি।' আহমদ মুসা বলল।

‘আরও কি জানেন, স্ট্রাসবার্গ সম্রাট শার্লেম্যানের স্পিরিচুয়াল ক্যাপিটাল ছিল?’ হেসে বলল মেয়েটি।

‘জানি। কিন্তু শার্লেম্যানের ধর্মরাজ্যের স্পিরিচুয়াল ক্যাপিটালকে ইউরোপীয় নেতৃবৃন্দ তাদের ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাজধানী হিসেবে বেছে নিলেন কেন?’ হাসির সাথে হালকা কন্ঠেই বলল আহমদ মুসা।

প্রায় ৫০ বছর আগে জার্মানী ও ফ্রান্সের দুই রাষ্ট্রপ্রধান এই স্ট্রাসবার্গে বসেই শার্লেম্যানের আদর্শে ইউরোপকে ঐক্যবদ্ধ করার নীল নক্সা করেছিলেন বলে বোধ হয়।’

‘শার্লেম্যানের খৃষ্টীয় মৌলবাদী আদর্শে নব্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন!’ আহমদ মুসার চোখে মুখে কৃত্রিম বিস্ময়।

‘তা জানি না।’ হেসে উঠে কথাটা বলেই মেয়েটি মুখে সিরিয়াস ভাব ফুটিয়ে তুলে বলল, ‘ওকে স্যার। এবার নিশ্চিন্ত থাকুন আমি একজন ফরাসী।’

‘আমি আহমদ আবদুল্লাহ। সৌদি আরব থেকে একটা কক্ষ বুক করা আছে। বুকিং নাম্বার ডবল ‘এ’ ডবল ‘জিরো’ ডবল ‘নাইন’।

‘প্লিজ স্যার, বলে মেয়েটি কমপিউটার কী বোর্ডে আঙুল ঘুরিয়ে স্ক্রীনের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে বলল, ‘ওকে স্যার। ওয়েলকাম।’

ফরমালিটিজ সেরে আহমদ মুসার হাতে চাবি তুলে দিতে গিয়ে হঠাৎ কিছু মনে পড়ায় বলে উঠল, ‘মি.আহমদ আবদুল্লাহ, একটা খবর দিতে ভুলে গেছি। আপনার দুজন বন্ধু আপনি এসেছেন কিনা, কবে আসবেন জানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নাম বলেননি।’

ভ্রুকুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার। বলল, ‘আমার বন্ধু, নাম বলেনি!’

‘স্যার, ব্যাপারটা খুবই অসৌজন্যমূলক এবং অগ্রহনযোগ্য। সেজন্যে বিষয়টার আমরা ফরমাল রেকর্ডও করিনি।’ বলল মেয়েটি।

‘মাফ করুন, বলতে পারেন কন্ঠ দুটি কি জার্মান না ফরাসী ছিল?’

‘ওকে স্যার। জার্মান-ফরাসী কোনটিই নয়। খাঁটি বৃটিশ উচ্চারণ।’ বলল মেয়েটি।

ভাবছিল আহমদ মুসা। এমন কোন বৃটিশ বন্ধু নেই যারা তার এখানে আসার কথা জানে এবং এখানে সিট বুক করার কথা জানতে পারে!আবার ভাবল, ভুলও তো ওদের হতে পারে? আবার এমনও হতে পারে মুসলিম নামে বুকিং দেখে সরকারী কোন এজেন্সী অথবা অন্য কোন মহল পরিচয় চেক করার জন্যেই টেলিফোন করতে পারে। বেদনাদায়ক হলেও এটা সত্য যে, নিউইয়র্কের লিবার্টি ও ডেমোক্রাসি টাওয়ার ধ্বংসের পর থেকে মুসলমানদেরকে ইউরোপ আমেরিকায় সন্দেহের চোখে দেখা হচ্ছে। কিন্তু সেটা হলে সব মুসলিম বোর্ডারের ব্যাপারেই খোঁজ-খবর নেয়া হবে। সেটা হচ্ছে কি?

এটা চিন্তা করেই আহমদ মুসা রিসেপশনিস্ট মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করল, 'হোটেলে কি আর কোন মুসলিম বোর্ডার আছেন?'

'আছেন। দু'জন। একজন জার্মান ছাত্রী 'ফাতিমা কামাল', অন্যজন ফরাসী ছাত্র যায়েদ ফারুক। কিন্তু কেন বলুন তো?'

'তাদের ব্যাপারে কেউ কি টেলিফোনে কিছু জিজ্ঞেস করেছে?'

'না ।' ভ্রুকুঞ্চিত হয়ে উঠেছে মেয়েটির। বলল সে আবার, 'মি.আহমদ আবদুল্লাহ, আপনি কিছু সন্দেহ করছেন?'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'ভাবছিলাম। বেনামী টেলিফোন তো!'

'মি.আহমদ আবদুল্লাহ, আপনি ইচ্ছা করলে পুলিশকে জানাতে পারেন।'

আবার হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'আপাতত থাক। ধন্যবাদ আপনাকে।'

আহমদ মুসা কক্ষের চাবি নিয়ে চলে গেল তার কক্ষে।

কক্ষ পছন্দ হলো আহমদ মুসার। কক্ষের স্টাইল গথিক গীর্জার মত ট্রেডিশনাল হলেও উপকরণ সবই আধুনিক ।

আহমদ মুসা গোসল সেরে বিশ্রামে যেতে যেতে ভেবে নিল। কাজ শুরু করার আগে শহরটাকে ভালো করে দেখে নেবে । আজ পূর্ণ বিশ্রাম, কাল থেকে শহর দেখে শুরু।

সেদিন আহমদ মুসা ফিরছিল 'ইউরোপা' রোড হয়ে । বিখ্যাত এই ইউরোপা রোডেই ইউরোপীয় ইউনিয়নের হেড কোয়ার্টার। আহমদ মুসা রাস্তার

থার্ড লেইন ধরে গাড়ি চালাচ্ছিল। অভ্যাস বশতই রেয়ারভিউতে চোখ যাচ্ছিল তার।

এক সময় বিস্মিত আহমদ মুসার চোখ দুটি আঠার মত লেগে গেল রেয়ারভিউতে। দেখল, দু'টি গাড়ি, একটা ব্রাউন, অন্যটি এ্যাশকালার, অনেক্ষণ ধরে তার পেছনে আসছে একই গতিতে। গাড়ি দুটি মাঝে মাঝেই সমান্তরালে চলে যাচ্ছে, আবার আগে পিছে চলে আসছে। তাও আবার বাই রোটেশানে একবার ব্রাউনটা আগে আসছে, পরে আবার এ্যাশকালারটা। হঠাৎ আহমদ মুসার মনে পড়ল গতকালও গাড়ি দুটিকে সে তার পেছনে দেখেছে এবং এয়ারপোর্ট থেকে আসার সেই প্রথম দিনেও এই গাড়িই তার পেছনে ছিল । হতে পারে অন্যান্য দিনেও গাড়ি দুটি তার পেছনে ছিল, কিন্তু হয়তো তার চোখে পড়েনি।

ভাবল আহমদ মুসা। এটা কি কোন কো-ইন্সিডেন্ট, না কেউ তাকে ফলো করছে? সিদ্ধান্ত নিল আহমদ মুসা, আগামীকালও সে এ বিষয়টি পরীক্ষা করবে।

হোটেলের পার্কিং প্লেসে গাড়ি পার্ক করে গাড়ি থেকে নামল আহমদ মুসা। গাড়ি থেকে নেমেই গীর্জা ও হোটেলের মাঝের রাস্তার উপর চোখ ফেলল, না গাড়িটা এ রাস্তায় ঢোকেনি। গীর্জার মোড়ে বাঁক নিয়ে তাকে গীর্জার রাস্তায় প্রবেশ করতে হয়েছে। হতে পারে, ওরা বাঁকের আড়ালে দাঁড়িয়ে এদিকে চোখ রাখছে।

আহমদ মুসা ঢুকে গেল হোটেলে।

পরদিন আহমদ মুসা যাচ্ছিল ধ্বংস হয়ে যাওয়া স্পুটনিক অফিসে। সেদিন এসেই একবার গেছে। কিন্তু আরও ভালো করে দেখা প্রয়োজন।

যা ভেবেছিল তাই। গাড়ি দু'টি আসছে তার পেছনে।

ওরা ফলো করছে তাকে, এটা নিশ্চিত। কিন্তু ওরা কারা? ওরা কি তাকে নবাগত মুসলিম ব্যক্তিত্ব হিসেবে ফলো করছে, না তাকে আহমদ মুসা হিসেবে ফলো করছে? কিন্তু তাকে আহমদ মুসা হিসেবে চিনবে কি করে? সন্দেহ নেই, তার ফটো ইহুদী গোয়েন্দা সংস্থা 'ইরগুন যাই লিউমি' ও 'মোসাদে'র কাছে আছে। কিন্তু আহমদ মুসার এই স্বাভাবিক চোহারার ফটো তাদের কাছে নেই। তাছাড়া তাকে আহমদ মুসা হিসেবে যদি চিনেই থাকে, তাহলে তাকে শুধু ফলো

করবে কেন? তাকে এ কয়দিনে হত্যা বা বন্দী করার উদ্যোগ নেয়াই স্বাভাবিক ছিল। তাহলে কি ওরা আমাকে ধরার আগে আমার কন্ট্যাক্ট পয়েন্টগুলে চিহ্নিত করতে চায়? যাদেরকে তাদের দরকার হতে পারে? শুধু মুসলিম ব্যক্তিত্বেবলে পরিচয় জানা বা কন্ট্যাক্ট পয়েন্টগুলোর সন্ধান করার জন্যে এভাবে কেউ পেছনে লেগে থাকতে পারে? হয়তো পারে। তবে আহমদ মুসার মন বলল, ওরা নিছক একজন মুসলিম ব্যক্তিত্বে সন্ধানে ঘুরছে না। তাহলে? তাহলে কি তারা তাকে আহমদ মুসা হিসেবে চিনতে পেরেছে, না আহমদ মুসা হিসেবে সন্দেহ করছে?

গ্রীন সার্কেলে পৌঁছে গেছে আহমদ মুসা। এই গ্রীন সার্কেলেই স্পুটনিকের অফিস ছিল।

গ্রীন সার্কেলটা বিশাল একটি সার্কুলার মার্কেট। বিশাল সার্কুলার মার্কেটটির মাঝখানে বিরাট গ্রীন সার্কেল, বৃত্তাকার বিরাট বাগান। বাগানটা গাছে ঠাসা। মাঝে মাঝে বসার বেঞ্চি ও বাচ্চাদের দোলনা। বৃত্তাকার বাগানটির মাঝখানে আবার ঘাসে ঢাকা বৃত্তাকারি একটি উন্মুক্ত চত্বর। বৃত্তাকার বাগান ও তার চারপাশ ঘিরে বৃত্তাকার মার্কেটটি, মাঝখান দিয়ে বৃত্তাকার একটি রাস্তা। আবার বৃত্তাকার মার্কেটটির বাইরের চারপাশ ঘিরে একটা প্রশস্ত সার্কুলার রোড।

আহমদ মুসার গাড়ি প্রবেশ করল এই সার্কুলার রোডে। দিনটা রোববার। বিকেল। মার্কেট বন্ধ।

সার্কুলার রোডে গাড়ি ছিল না বললেই চলে।

আহমদ মুসার এক মিনিট পর অনুসরণকারী গাড়ি দুটি প্রবেশ করল সার্কুলার রোডে।

আহমদ মুসা কি করবে সে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে। যে লেন দিয়ে স্পুটনিক অফিসে প্রবেশ করতে হয়, সেই লেন দিয়ে আহমদ মুসা ধীর গতিতে প্রবেশ করল মার্কেট ও বৃত্তাকার বাগানের মাঝের ইনার সার্কুলার রোডে।

গাড়ি দুটিও প্রবেশ করল।

বাগানে দু'চার জন লোক দেখা যাচ্ছে। ছুটির দিনে বাগানে যে ভীর হয়, তা এখনও হয়ে ওঠেনি।

আহমদ মুসা তার গাড়ির রিয়ারভিউতে দেখল, গাড়ি দুটো দুরত্ব আগের চেয়ে কমিয়ে দিয়েছে। সার্কুলার রোড হওয়ার কারণে আহমদ মুসার গাড়ি যাতে চোখের আড়ালে না যায়, সেজন্যেই এ দূরত্ব কমিয়ে দেয়া হয়েছে।

পেছনের গাড়ি দুটি পাশাপাশি ড্রাইভ করে আহমদ মুসার পেছনে পেছনে আসছিল।

আহমদ মুসা এক সময় চোখের পলকে তার গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে তীব্র বেগে এগিয়ে গাড়ি দুটি ব্লক করে তাদের সামনে দাঁড়াল এবং তার সাথে সাথেই গাড়ি থেকে বেড়িয়ে এল আহমদ মুসা।

গাড়ি দুটিও হার্ড ব্রেক কষে দাড়িয়ে পড়েছিল। প্রথমটায় তারা হচকচিয়ে গিয়েছিল। সে ভাবটা কাটিয়ে উঠে আহমদ মুসাকে সামনে দাড়িয়ে থাকতে দেখেই ওরা গাড়ির দুপাশে দুজন বেরিয়ে এল। তারা দুদিক থেকে দুজন এক পা দু'পা করে এগিয়ে আসতে লাগল। তাদের একজনের হাতে রিভলবার কোটের আড়ালে লুকানো। আরেকজনের হাতে রেশমি ফাঁস। ওরা এত তাড়াতাড়ি এগ্রেসিভ হয়ে উঠবে, আহমদ মুসা তা ভাবে নি। আর আহমদ মুসা এভাবে এখানে রিভলভার ব্যবহার করাকেও ভাল মনে করছে না।

আহমদ মুসা তার ভাবনা শেষ করে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগেই সে দেখল, যার হাতে ফাসি তার ফাঁসিটা আকাশে উড়তে শুরু করেছে।

সংগে সংগেই আহমদ মুসা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল এবং এ্যাক্রোব্যাটিক কায়দায় দু'হাত প্রসারিত করে সামনে মাটির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে পা আকাশ দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে শূন্যেই শরীরটাকে একবার ঘুরিয়ে নিয়ে দু'পায়ের প্রচন্ড লাথি মারল রিভলবার হাতে নিয়ে দাড়াঁনো লোকটির মাথায়।

লোকটি রিভলবার তুলেছিল এবং গুলিও করেছিল আহমদ মুসার লাথি তার মাথায় আঘাত করার সময়। কিন্তু গুলিটা ৭৫ ডিগ্রী কোণ করে আসা আহমদ মুসার দেহের অনেক নিচ দিয়ে চলে গেল।

জোড়া পায়ের লাথি খেয়ে লোকটির দেহ ছিটকে পড়ে গেল গাড়ির পাশে। তার সাথে আহমদ মুসার দেহও ভূপাতিত হলো।

মাটিতে পড়েই উঠে বসল আহমদ মুসা। লোকটির হাত থেকে ছিটকে পড়া রিভলবার কুড়িয়ে নিয়েছে সে।

লোকটি উঠে বেসেছিল। আহমদ মুসা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে রিভলবারের বাট দিয়ে তার মাথায় প্রচন্ড এক ঘা দিল।

লোকটি সংগা হারিয়ে ফেলল।

আহমদ মুসা উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করল ফাঁসিওয়ালা লোকটি কোথায়। কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না।

আহমদ মুসা ক্রলিং করে গাড়ির পেছনে ঘুরে গাড়ির ওপাশটায় উকি দিল। কিন্তু কেউ নেই।

'তাহলে কি ওপাশের গাড়ির ওপারে লুকিয়েছে?' ভাবল আহমদ মুসা।

ভাবার সংগে সংগেই আহমদ মুসা হাতে রিভলবার বাগিয়ে ধরে কয়েক লাফে ওগাড়ির পেছনে চলে গেল। তার পর মুহূর্তকাল থেমেই গাড়ির ওপাশটায় উঁকি দিল। না কেউ নেই। তাহলে কি পালিয়েছে?

পরক্ষনেই তার মনে হলো, সে তো তাকে বোকা বানায়নি?

সংগে সংগেই স্প্রিং এর মত উঠে দাড়িয়ে পেছন ফিরল আহমদ মুসা। কিন্তু তখন দেরী হয়ে গেছে। তার চোখের সামনে দিয়ে প্রথম গাড়িটা সাঁ করে বেড়িয়ে গেল। দেখল, যাবার সময় দ্বিতীয় লোকটি তার সংগাহীন সাথিকে তুলে নিয়ে গেছে। বুঝল আহমদ মুসা, সে যখন দু'গাড়ির এপাশ ওপাশ দেখছিল, তখন ঐ দ্বিতীয় লোকটি প্রথম গাড়ির সামনের দিকটায় গিয়ে লুকিয়েছিল। তারপর সে দ্বিতীয় গাড়ির দিকে চলে যাওয়ায় তার সুযোগ নিয়ে সাথিকে সহ পালিয়েছে।

বোকার মত কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে থাকল আহমদ মুসা। তারপর রিভলবারটা পকেটে ফেলে এগুলো দ্বিতীয় গাড়িটার দিকে। টার্গেট হলো, ওদের খোঁজ পাওয়ার মত কোন কাগজপত্র ওদের গাড়িতে পাওয়া যায় কিনা।

গাড়িতে লাইসেন্স, ব্লুবুক ছাড়া কাগজ জাতীয় আর কিছুই পেল না।

লাইসেন্স ও ব্লুবুকের ঠিকানাগুলো টুকে নিয়ে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল আহমদ মুসা।

আসরের নামাজের সময় তখন যায় যায় অবস্থা। আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি বাগানে প্রবেশ করে একটা গাছের আড়াল খুঁজে নিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম অর্থাৎ কাবামুখী হয়ে নামাজে দাঁড়িয়ে গেল।

চারটি চোখ আহমদ মুসাকে ফলো করছিল। একজন তরুনীর দুই চোখ এবং একজন তরুনের দুই চোখ। এই চার চোখ আহমদ মুসার সাথে দুই গাড়িওয়ালার সংঘাত –সংঘর্ষটাও দেখেছে। কিভাবে আহমদ মুসার গাড়িটা অনুসরণকারী দু'গাড়ির মুখোমুখি হলো, কিভাবে আহমদ মুসা একজন রিভলবারওয়ালা ও একজন ফাঁসওয়ালার মুখোমুখি হলো, কেমন দক্ষ এ্যাক্রোব্যাটিক কায়দায় আহমদ মুসা একই সাথে ফাঁস থেকে বাচল এবং রিভলবারধারীকে কুপোকাৎ করল, কিভাবে একজন গাড়িওয়ালা সংগাহীন একজন সাথীকে নিয়ে পালিয়ে বাঁচল, সবই তাদের চার চোখ অবলোকন করেছে বাগানের এক গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে। আহমদ মুসা বাগানে প্রবেশ করার পরও সে তাদের চোখের সামনেই ছিল। তাদের সে বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি যে, একজন শান্তশিষ্ট চেহারার ও সাধারণ মাপের একজন মানুষ কিভাবে দু'জন ষন্ডামার্কা ফরাসীকে নাকে খত দিয়ে ছাড়ল!কিন্তু তারা যখন আহমদ মুসাকে নামাজ পড়তে দেখল তখন তাদের চার চোখ বিস্ময়ে ছানাবড়া হয়ে গেল। দু'জন এক সাথেই স্বগত কন্ঠে বলে উঠল, 'লোকটি তাহলে মুসলমান।'

ধীরে ধীরে তাদের দু'জনের চোখমুখের বিস্ময় কেটে গিয়ে সেখানে আনন্দের প্রকাশ ঘটল। আহমদ মুসা মুসলমান একথা জানার পর তাদের মনে আনন্দের অন্ত রইল না। তারা ভেবে খুশি হলো যে, একজন এশিয়ান মুসলিম দু'জন বন্দুকধারী ফরাসীকে অবলীলাক্রমে পরাজিত করতে পারল।

দুজনেই ধীরে ধীরে এগুলো নামাজরত আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা তখন মুনাজাত করছে।

আহমদ মুসার পাশে গিয়ে থমকে দাঁড়াল ওরা।

আহমদ মুসাও মুনাজাত এই সময় শেষ করেছিল। ঘাসের উপর পায়ের ক্ষীণ নরম শব্দ আহমদ মুসার কান এড়ায়নি। তাকাল আহমদ মুসা ওদের দিকে।

আহমদ মুসার চোখে ছিল ক্ষীপ্র এক সতর্কতা। চোখ যখন সে ওদের দিকে ঘুরাচ্ছিল, তখন তার হাত চলে গেল গিয়েছিল রিভলবারের বাঁটে।

পাশে এসে দাঁড়ানো তরুণ-তরুণীদেরও এটা চোখে পড়েছিল।

আহমদ মুসার চোখ ওদের উপর পড়তেই তরুণীটি বলে উঠল, 'আসসালামু আলাইকুম।'

'আসসালামু আলাইকুম।' তরুণটিও বলে উঠল তরুণীটির কন্ঠ থামতেই।

তরুণ তরুণী দু'জনের চেহারাই ইউরোপ-এশিয়ায় মেশানো। চোখ ও চুল ওদের এশিয়ান। কিন্তু গায়ের রং ইউরোপীয়, তবে তার সাথে একটা সোনালী মিশ্রণ আছে যা তাদেরকে অপরূপ করে তুলেছে।

এমন এক জোড়া তরুণ-তরুণীর কাছ থেকে আকস্মিক সালাম পেয়ে আহমদ মুসা বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেল। সে এ সময় তার শত্রুদেরকেই আশা করেছিল।

আহমদ মুসার মুহূর্তকালের নিরবতার সুযোগে তরুণীটিই আবার বলে উঠল, 'রিভলবার হাতে রাখার দরকার নেই। আমরা আপনার বন্ধু। আপনার মারামারি আমরা দেখেছি। আপনি মুসলিম দেখে পরিচয়ের জন্যে আমরা এলাম।' মেয়েটির মুখে মিস্টি হাসি।

আহমদ মুসার মুখেও হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'দু'টি সংশোধনী। আপনারা আমার বন্ধু না হয়ে ভাই বোন হলে খুশি হবো। দ্বিতীয়ত, ঘটনাটা মারামারি ছিল না। ওরা আমাকে মারতে চেয়েছিল, আমি আত্মরক্ষা করেছি।'

তরুণ তরুণী দু'জনেই হাসল। আহমদ মুসার সামনে বসতে বসতে বলল, 'ওয়েলকাম। আমরা আনন্দের সাথে ভাই-বোন হতে রাজী আছি। তবে শর্ত 'আপনি' সম্বোধন 'তুমি' তে নিয়ে আসতে হবে। দ্বিতীয়টাও আমরা মেনে নিচ্ছি। দু'গাড়িওয়ালারা আসলে, যতদূর বুঝেছি, আপনাকে ওরা ফলো করছিল এবং সেখান থেকেই ঘটনার সৃষ্টি। সুতরাং তারাই আক্রমনকারী।'

'কিন্তু ভাইয়া, কোন জার্মান-ফরাসীকে আমি কোনদিন এইভাবে এশিয়ানের হাতে কুপোকাত হতে দেখিনি। এই বিজয়ের জন্যে আপনাকে

ধন্যবাদ এবং সেই সাথে জানাচ্ছি ওরা কিন্তু আপনাকে ছাড়বে না। আর কি ঘটনা আছে জানি না, কিন্তু ওদের আর্য অহং এ দারুণ ঘা লেগেছে।' বলল তরুণীটি।

'বোন, জার্মান ফরাসী ও এশিয়ান এই দৃষ্টিতে বিষয়টিকে না দেখাই ভাল। এটা যেমন ন্যায়-অন্যায়ের একটা দ্বন্দ্ব ছিল, তেমনি যখন কোন সংঘাত বাধে সেটা কোন অন্যায় থেকেই বাধে। কিছু ক্রিমিনাল ছাড়া সব জার্মান ফরাসীই ন্যায়ের পক্ষে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে।' বলল আহমদ মুসা।

তরুণীটি আহমদ মুসার মুখের শেষ শব্দ সম্পূর্ণ হবার আগেই বলে উঠল, 'আপনি কে জানি না। আপনার চিন্তা অবশ্যই মহৎ। কিন্তু সাধারণভাবে এটা বাস্তব নয়। পশ্চিমের যারা এশিয়া আফ্রিকা দখল করে একদিন এশিয়া আফ্রিকার মানুষকে যথেষ্ট শাসন শোষনের শিকারে পরিণত করেছিল, তারা এখনও এশিয়া আফ্রিকার মানুষকে সেই একই দৃষ্টিতে দেখে। শাসন শোষনের কৌশল শুধু তারা পাল্টেছে।'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'তোমার কথা আমি অস্বীকার করছি না বোন। কিন্তু একে পূব-পশ্চিমের সংঘাত বা পশ্চিমের শোষণ হিসাবে দেখো না। বেদনাদায়ক হলেও যেটা ঘটছে, সেটাই স্বাভাবিক। প্রত্যেক ব্যক্তির মত প্রতিটি জাতি গোষ্ঠীই তাদের ভাল চিন্তা করবে, স্বার্থ চিন্তা করবে এটাই স্বাভাবিক। পশ্চিম আজ 'গণতন্ত্রের' নামে এশিয়া আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের রাজনীতিতে যে হস্তক্ষেপ করছে, মুক্ত অর্থনীতির নামে এশিয়া আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের রাজনীতিকে যে কব্জা করছে, মানবাধিকারের শ্লোগান তুলে এশিয়া আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের জাতি গঠন ও সংহতিকে যে বাধাগ্রস্থ করছে এবং তথাকথিত 'সাসটেইনেবল ফেইথ বা ভ্যালুজে'র নামে তারা জাতীয় সংস্কৃতি ও ধর্মের উপর যে ছড়ি ঘুরাতে চাচ্ছে, সেটা পশ্চিমী বিভিন্ন রাষ্ট্র বা জাতির 'ভাল' বা 'স্বার্থ' চিন্তা করেই। প্রশ্ন হলো তাদের এই 'ভাল' বা 'স্বার্থ' চিন্তা আমাদের ক্ষতি করছে। আমাদের এই ক্ষতি তারা করতে পারছে তাদের বুদ্ধি ও শক্তির বলে। এর প্রতিকার ভিক্ষা চেয়ে পাওয়া যাবে না, কারণ ভিক্ষুকের আবেদনে তারা কিছু ভিক্ষা দিতে পারে, কিন্তু তাদের 'ভাল' বা 'স্বার্থ' যাতে, সেখান থেকে সরে দাঁড়াবে না। এর অর্থ হলো

আমাদের ‘ভালো’ আমাদের ‘স্বার্থ’ আমাদের দেখতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে।’ থামল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা থামতেই তরুনীটি বলে উঠল, ‘আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি চিন্তার একটা বাস্তব ও বিপ্লবাত্মক দিগন্ত উন্মোচিত করেছেন। কিন্তু এটা কিভাবে? আপনিই তো বললেন, ওরা শক্তি ও বুদ্ধির জোরে এটা করছে। শক্তি বা বুদ্ধি কোন যুদ্ধেই তো আমরা ওদের সাথে পারবো না।’

‘না পারা পর্যন্ত মার খেতেই হবে। দুর্বলরা এভাবেই মার খায়।’ বলল আহমদ মুসা।

‘কেচ্ছার কি এখানেই শেষ? কোন পথ তাহলে নেই?’ বলল তরুনীটি।

‘আছে। ইউরোপের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে হবে। ইউরোপ যদি তাদের স্বার্থে একক মুদ্রা, একক অর্থনীতি, একক একটি পার্লামেন্ট গড়তে পারে, তাহলে মুসলিম দেশগুলো অর্থাৎ এশিয়া আফ্রিকার দেশগুলো নিজস্ব বানিজ্য ব্যবস্থা, নিজস্ব বিনিয়োগ ব্যবস্থা ইত্যাদি গড়তে পারবে না কেন?’ আহমদ মুসা হাসল।

‘আপনার মারামারি দেখে মনে হয়েছিল, আপনি সাংঘাতিক একজন লড়াকু ব্যক্তি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আপনি একজন সাংঘাতিক পলিটিশিয়ান। আসলে..........।’

তরুণীটি তরুণকে বাধা দিয়ে বলে উঠল, ‘এই প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে, আগে বিশ্ব রাজনীতিটা শেষ হোক।’

তরুণীটি মুহূর্তের জন্যে থামল। মুখ ঘুরিয়ে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, আপনি মুসলিম দেশ ও আফ্রো-এশীয় দেশগুলোকে যা করতে বলেছেন, তার জন্যেও তো রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি দরকার।’

‘সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ন্যায়কে ভালোবাসা এবং অন্যায়ের সাথে কোন সমঝোতায় না যাওয়ার শক্তি। এই শক্তি অন্যসব শক্তি সৃষ্টি করে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আপনি এক দূর্লভ শক্তির কথা বললেন, যার দুর্ভিক্ষ এখন সবচেয়ে প্রকট।’ আহমদ মুসা থামতেই দ্রুত কন্ঠে বলে উঠল তরুণটি।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘এই দুর্ভিক্ষ প্রকট বলেই আমাদের ভোগান্তিও প্রকট।’

‘ধন্যবাদ। রাজনীতির কথা এখন থাক। বলুন, দুই ইউরোপীয় আপনাকে তাড়া করছিল কেন? চেনেন ওদের? বলল তরুণটি।

‘ওদের চিনি না। কিন্তু তাড়া করার কারণ বোধ হয় জানি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কি কারণ?’ বলল তরুণীটি।

আহমদ মুসা ওদের দুজনের দিকে তাকাল। বলল, ‘তার আগে তোমাদের পরিচয় জানা দরকার।’

সংগে সংগে তরুণীটি বলে উঠল, ‘আমি ফাতিমা কামাল। জার্মানীর ‘বন’ এ বাড়ি। বনের স্টেট ইউনিভার্সিটির ছাত্রী।’

তরুণীটি কথা শেষ না হতেই তরুণটি বলা শুরু করল, ‘আর আমি যায়েদ ফারুক। প্যারিসে বাড়ি। প্যারিস ইউনিভার্সিটির ছাত্র।’

বিস্ময় ও আনন্দের চিহ্ন আহমদ মুসার চোখে মুখে। তরুনটির কথা শেষ হতেই আহমদ মুসা বলল, ‘তোমরা কি দি রাইন ইন্ট্যারন্যাশনাল হোটেলে থাক?’

‘হ্যাঁ। কি করে জানলেন?’ এক সাথে বলে উঠল তরুণ-তরুণী দু’জনেই।

‘আমিও ঐ হোটেলেই উঠেছি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কিন্তু আমাদের কথা জানলেন কি করে?’ বলল তরুণীটি।

‘আমি যেদিন হোটেলে আসি, সেদিনই আমি কাউন্টারে খোঁজ নিয়েছিলাম আর কোন মুসলিম এই হোটেলে আছে কিনা? তারাই আমাকে তোমাদের দু’জনের নাম বলেছিল।’

বলে একটু থেমেই আবার শুরু করল, ‘কিন্তু তোমরা তো দুই প্রান্তের দুইজন, তোমাদের পরিচয় কিভাবে? না বন্ধু ছিলে তোমরা?’

‘না কেউ কাউকে চিনতাম না। আমি যেদিন হোটেলে আসি, সেদিন রিসেপশনে ‘হালাল’ খাবার নিয়ে আলাপ করছিলাম। এ সময় যায়েদ পাশে দাড়িয়ে ছিল। সে অযাযিতভাবেই আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। এভাবেই আমাদের পরিচয়।’ বলল তরুণীটি।

‘তোমরা কি হালাল-হারাম মান? জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা। ঠোটে এক টুকরো হাঁসি।

‘না মানলে মুসলমানিত্ব থাকবে কি করে?’ তরুণটি বলল।

আহমদ মুসার ঠোটে আরও স্পষ্ট মিস্টি হাসি ফুটে উঠল। বলল, ‘মুসলমানিত্ব রক্ষার জন্যে আর কি কর? তোমরা দুজন কি আসরের নামাজ পড়েছ?’

তরুণ-তরুণী দুজনের মুখই ম্লান হয়ে গেল। মুখ নিচু হয়ে গেল তাদের। একটু পরেই তরুনীটি মুখ তুলল। বলল, ‘স্যরি ভাইয়া। আমি নামাজ পড়ি। তবে বাইরে বেরুলে অনেক সময় অবস্থার কারণে পড়তে পারি না। কিন্তু কাজা পড়ে নেই।’

যায়েদ ফারুকের মুখ লাল। তরুনীটি মানে ফাতিমা কামাল থামতেই যায়েদ ফারুক বলে উঠল, ‘আমার জবাব দেবার কিছু নেই ভাইয়া। আমাকে কেউ কোনদিন এভাবে বলেনি। নামাজ না পড়ার অপরাধ-বোধ আমার ভেতরে আছে। আমি আজ থেকে নামাজ পড়ব ভাইয়া।’

‘তোমাদের ধন্যবাদ।’

বলে একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর বলল, ‘তোমরা জিজ্ঞেস করছিলে ওরা আমাকে তাড়া করার কারণ কি, তাই না? আমি স্ট্রাসবার্গ বিমানবন্দরে নামার পর থেকেই ওরা আমাকে ফলো করছে। আমি যেখানে যাচ্ছি, তারা পিছু পিছু যাচ্ছে। প্রথম দু’দিন আমি বুঝতে পারিনি। আজ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম ওদের মুখোমুখি হবো। তাদের মুখোমুখি হতে গিয়েই এই সংঘর্ষ।’ থামল আহমদ মুসা।

ফাতিমা ও যায়েদ দু’জনের চোখে মুখে বিস্ময়। আহমদ মুসা থামতেই তারা বলল, ‘সাংঘাতিক ঘটনা। কিন্তু এ শক্রতার কারণ কি?’

‘কারণ কি আমি জানি না। তবে আমি যেটা অনুমান করি, সেটা হলো ব্যাপারটা খুবই বড়।’ বলল আহমদ মুসা।

‘কি সেটা?’ বলল ফাতিমা কামাল। তার চোখে শংকা।

আহমদ মুসার চোখে মুখে নেমে এল গাম্ভীর্য। ধীরে ধীরে বলল, ‘আমার মনে হয় ‘স্পুটনিক’ নামের গোয়েন্দা সংস্থা যারা ধ্বংস করেছে এবং এর গোয়েন্দাদের যারা কিডন্যাপ করেছে, তারা বা তাদের ভাড়া করা লোক এরা।’ আহমদ মুসা থামল।

‘স্পুটনিকে’র নাম শুনেই চমকে উঠেছে যায়েদ ও ফাতিমা দু’জনেই। আহমদ মুসা যখন তার কথা বলা শেষ করল, তখন বিস্ময় শংকায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে তাদের চেহারা।

আহমদ মুসা থামলেও কয়েক মুহূর্ত তারা কথা বলতে পারল না। পরে ফাতিমা কামালই ধীরে ধীরে বলল, ‘আপনি স্পুটনিকের ঘটনা জানেন? কিন্তু ওরা আপনার পেছনে লাগবে কেন?’

‘জানি। লা-মন্ডে পত্রিকায় পড়েছি।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আর ওরা আপনার পেছনে কেন? বলল ফাতিমা কামাল।

‘ওরা বোধ হয় ধরে নিয়েছে আমি যখন স্ট্রাসবার্গে এসেছি, তখন স্পুটনিকের ব্যাপার নিয়ে নিশ্চয় আমি কিছু করব। এ জন্যেই তারা আমার গতি বিধির উপর নজর রাখছে।’

যায়েদ ও ফাতিমার বিধ্বস্ত চার চোখ আহমদ মুসার উপর নিবদ্ধ।

এক সময় ফাতিমার ধীর কন্ঠ থেকে বের হয়ে এল, ‘আপনি কে ভাইয়া? আপনার কথা থেকেই প্রমাণ হচ্ছে স্পুটনিক ধ্বংসকারীরা আপনাকে চেনে এবং স্ট্রাসবার্গে এলে আপনি স্পুটনিক ঘটনার অনুসন্ধান করতে পারেন, তাও তারা জানে। কে তাহলে আপনি ভাইয়া?’

ফাতিমা থামতেই যায়েদ বলে উঠল, ‘ঠিক, আমরা এ পর্যন্ত তো আপনার কিছু জানি না। এমনকি আপনার নাম পর্যন্তও না। বলুন ভাই।’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আমাকে আহমদ আবদুল্লাহ বলে ডাকাই যথেস্ট নয় কি?’

‘আপনি কোত্থেকে এসেছেন?’ বলল ফাতিমা।

‘সৌদি আরব থেকে।’ আহমদ মুসা বলল।

'কিন্তু আপনি এখানে এলেই স্পুটনিক ব্যাপারে অনুসন্ধান করবেন এটা তারা ভাবতে গেল কেন? আপনাকে কেমন করে ওরা চেনে?' জিজ্ঞেস করল যায়েদ ফারুক।

'আমি গোয়েন্দা কাজে খুব আগ্রহী। বিশেষ করে মুসলমানরা এ ধরনের কোন বিপদে পড়লে আমি সেখানে যাই।' আহমদ মুসা বলল।

'কিন্তু মনে হচ্ছে ওরা আপনাকে ভয় করে। সে জন্যে আপনার গতিবিধি ওরা পাহারা দিচ্ছে এবং সুযোগ পেয়েই আপনাকে আটকাবার বা মারার চেষ্টা করেছিল। এটা কেন?' বলল ফাতিমা।

'স্পুটনিকের ব্যাপারে কেউ খোঁজখবর নিক, কেউ এর সাথে জড়িয়ে পড়ুক তা নিশ্চয় তারা চায় না। কারণ এটাই।' আহমদ মুসা বলল।

'আমরাও তো এই কাজেই এসেছি এবং এ নিয়ে প্রাইভেট গোয়েন্দা সংস্থার সাথেও আলাপ করেছি। আমরা তাদের আত্মীয়। আমরা এ ঘটনায় জড়িত হয়ে পড়তেই পারি। কিন্তু আমাদের উপর তাদের চোখ পড়েনি।' বলল ফাতিমা।

'তোমরা তাদের আত্মীয়? কে তোমরা?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

ফাতিমাই প্রথম কথা বলে উঠল। বলল, 'আমি স্পুটনিকের নাম্বার ওয়ান গোয়েন্দা পরিচালক কামাল সুলাইমানের ছোট বোন। আমি বনের পারিবারিক বাড়িতে থাকি। স্পুটনিকের ব্যাপারে অনুসন্ধানের জন্যেই এখানে এসেছি। শত্রু চোখ এড়াবার জন্যেই ভাইয়ার বাড়িতে উঠিনি। আর যায়েদও স্পুটনিকের দ্বিতীয় গোয়েন্দা পরিচালক আবদুল্লাহ ফারুকের ছোট ভাই। সেও একই লক্ষ্যে স্ট্রাসবার্গে এবং আমার মত একই কারণে হোটেলে উঠেছে।'

'তোমাদের অভিনন্দন। তাহলে আমরা একই উদ্দেশ্যে স্ট্রাসবার্গে এসেছি এবং কাকতালীয়ভাবে একই হোটেলে অবস্থান করছি। শুধু একটাই পার্থক্য। আমি স্পুটনিকের সাতজন ঐতিহাসিক পরিচালকের কারও সাথেই কোনভাবে সম্পর্কিত নই।' আহমদ মুসা বলল।

'আপনাকেও ধন্যবাদ। আমাদের মধ্যে আরেকটা পার্থক্য আছে। সেটা হলো আমরা এসেছি রক্তের টানে, আর আপনি এসেছেন হৃদয়ের টানে। রক্তের টানের চেয়ে হৃদয়ের টানটাই বেশি মূল্যবান।' বলল ফাতিমা কামাল।

‘এসব কথা থাক বোন। তোমরা এবার কাজের কথায় এস। কিছুক্ষণ আগে যা ঘটল, তাতে শত্রুর লেজে পা পড়েছে। এরা দ্রুত একটা পাল্টা ছোবল মারবে।’ বলল আহমদ মুসা।

যায়েদ ও ফাতিমা দু’জনেরই চোখে মুখে শংকা ফুটে উঠল। যায়েদ বলল, ‘তার মানে ওরা আক্রমন করবে?’

‘আমার তাই বিশ্বাস।’

বলে আহমদ মুসা একটু থামল। একটু ভাবল। তারপর বলল, ‘আক্রমনকারী গাড়ি দুটির নাম্বারসহ থানায় একটা ডায়েরী করতে চাই যে, গ্রীন সার্কেলের ইনার সার্কুলার রোডে আমি আক্রান্ত হই। দু’টি গাড়িতে দু’জন লোক আমাকে কিডন্যাপ করার চেষ্টা করে। ওদের একটা গাড়ি এবং তোমরা ঘটনার সাক্ষী।’

‘আমরা সাক্ষী হতে রাজি আছি। কিন্তু পুলিশের কাছে বিশেষ কোন সাহায্য মিলবে না।’ বলল যায়েদ।

‘আমি পুলিশের সাহায্য চাই না, আইনকে আমার পক্ষে চাই। এ জন্যেই এই ডায়েরী।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আপনার চিন্তা ঠিক ভাইয়া। গ্রীন সার্কেলের একটু পরেই একটা থানা আছে। যাবার সময় ডায়েরী করা যাবে।’ ফাতিমা বলল।

‘যে গাড়ি ফেলে ওরা পালিয়েছে, সেই গাড়িও পুলিশের হাতে দেওয়া দরকার।’ বলল যায়েদ।

‘সার্কেল পুলিশকে ডেকে বললেই হবে।’ ফাতিমা বলল।

‘যায়েদ-ফাতিমা, ঘটনার ব্যাপারে তোমরা কি পরিমাণ এগিয়েছ?’ বলল আহমদ মুসা।

‘না ভাইয়া। আমরা কিছুই এগুতে পারিনি। আমাদের দু’জনের পরিচয় হবার পর আমরা চেষ্টা করছি ভাইয়ারা যে সব করেছেন ও করছেন তার ভিত্তিতে ভাইয়াদের শত্রুদের একটা তালিকা করার।’ ফাতিমা বলল।

‘কিভাবে করছ?’ বলল আহমদ মুসা।

‘অতীতের পত্র-পত্রিকা ঘেঁটে ও ভাইয়াদের বন্ধু-বান্ধবদের জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে।’ বলল যায়েদ।

‘আপনার কাজ কতদূর ভাইয়া?’ ফাতিমা বলল।

‘সবে আজ কাজ শুরু হলো। এ কয়দিন আমি শহর দেখে বেড়িয়েছি।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আজ কিভাবে কাজ শুরু হলো’, ফাতিমা বলল।

‘কিছুক্ষণ আগে গ্রীন সার্কেলে ওদের আক্রমনের মাধ্যমে। শুরুটা খুবই ভাল হয়েছে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘কিভাবে?’ যায়েদ বলল।

‘শত্রুরা আক্রমন করা মানে শত্রুর সাথে দেখা হওয়া। তার মাধ্যমে শত্রুদের পরিচয় উদ্ধারের একটা সুযোগ সৃষ্টি হলো। গাড়ি চুরি করা ও গাড়ির লাইসেন্স ও ব্লবুক ভূয়া হতে পারে, কিন্তু ওগুলোতে হাতের যে ছাপ আছে তা ভূয়া নয়। সবচেয়ে বড় কথা হলো, এই সংঘাত আরও সংঘাতের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। সুতরাং আমি খুশি যে, আবারও তাদের দেখা পাব।’ বলল আহমদ মুসা।

ফাতিমা ও যায়েদের চোখে মুখে বিস্ময়। ফাতিমা বলল, ‘ওরা আবার আক্রমন করবে। আরও সংঘাত হবে। এতে আপনি খুশি। কিন্তু আমাদের তো বুক কাঁপছে।’

‘বুঝলাম, আপনি জাত গোয়েন্দা ভাইয়া। কিন্তু সংঘাতের রেজাল্ট পক্ষে-বিপক্ষে দুই-ই হতে পারে। বিপক্ষে যাবে সে ভয় আপনার নেই?’ বলল যায়েদ।

‘এসব ভাবলে তো এগুনো যাবে না।’ আহমদ মুসা বলল।

‘বুঝা গেল, আপনি আমাদের মত সাধারণ কেউ নন এবং এও বুঝা গেল ওরা আপনাকে ভয় করে কেন?’ বলল ফাতিমা।

‘আমরা আনন্দিত ভাইয়া। আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করুন। আমরা যা করছি, সেটা পুলিশ যা করছে সে রকমই। কিছুই হবে না এতে।’ যায়েদ বলল।

যায়েদ থামতেই ফাতিমা কামাল বলে উঠল, ‘ভাইয়া, আমাদের দু’জনকে কি আপনি সাথে নিতে পারেন?’

ফাতিমার হঠাৎ এই প্রশ্নে আহমদ মুসা মুখ তুলে তাদের দিকে তাকাল। তারপর মুখ নিচু করে কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, 'নিতে পারি। কিন্তু একটা সমস্যা আছে।'

'কি সমস্যা?' বলল ফাতিমা।

'সমস্যা হলো তোমরা দু'জন বিবাহিত নও।' আহমদ মুসা বলল।

ফাতিমা ও যায়েদ দু'জনের মুখেই বিস্ময় ফুটে উঠল তারপর লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল মুখ।

সংগে সংগে কথা বলতে পারল না তারা। একটু পর ফাতিমা বলল, 'আপনার কথা বুঝলাম না ভাইয়া। বিয়ের সাথে আমাদের প্রস্তাবের সম্পর্ক কি!'

'অনধিকার চর্চার জন্যে মাফ করো বোন। আমি তোমাদের দু'জনের মধ্যেকার বিয়ের কথা বলছি। তোমাদের দু'জনের মধ্যে বিয়ে না হয়ে থাকলে কিংবা বিয়ে না হলে তোমরা দু'জনে যেমন একত্রে এভাবে কাজ করতে পার না, তেমনি তোমরা দু'জনে বিবাহিত হলেই শুধু তোমরা একত্রে আমার সাথে কাজ করতে পার।' বলল আহমদ মুসা।

'এর কারণ কি ভাইয়া?' ফাতিমাই বলল আবার।

'ইসলামের বিধান অনুসারে যাদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ নয়, এমন ছেলে মেয়েরা বিবাহ ছাড়া এভাবে মেলামেশা করতে পারে না। এমনকি ইচ্ছাকৃতভাবে নিভৃতে দু'জনের মধ্যে কিছুক্ষনের জন্যেও দেখা হওয়া নিষিদ্ধ।'

'নিষিদ্ধ? মানে হারাম?' বলল ফাতিমা।

'হ্যাঁ, তাই।' আহমদ মুসা বলল।

'কারণ?' বলল ফাতিমা।

'কারণ শয়তান মানুষকে খারাপ পথে টেনে নেবার জন্যে সদা প্রস্তুত। আর ইসলাম সকল অঘটনের পথ বন্ধ করতে চায়।'

'বুঝেছি।' লাজ রাঙা মুখে বলল ফাতিমা।

একটু থেমেই আবার বলে উঠল, 'কিন্তু ভাইয়া আমি ও যায়েদ এমন নিভৃতে অনেক বসেছি, মিশেছি।'

‘কিছু ঘটেনি। কিন্তু ঘটবে না এমন কথা কি নিশ্চিত করে বলা যায়? আর ব্যতিক্রম তো থাকতেই পারে। কিন্তু আইন হয় সকলের জন্যে। সকলকেই সেই আইন মানতে হয়। ব্যতিক্রম যারা, তাদেরকেও।’ বলল আহমদ মুসা।

‘তাহলে তো আমরা এতদিন অপরাধ করেছি ভাইয়া। কিন্তু আমাদের কি দোষ? আমাদের জার্মানীতে মুসলিম পরিবারে এমন মেলামেশা আছে।’ ফাতিমা বলল।

‘আপনি কি ইসলামের সকল বিধিবিধান মেনে চলেন ভাইয়া?’ বলল যায়েদ।

‘পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে অনেক সময়ই পারি না। কিন্তু মানার ইচ্ছা আছে, চেষ্টা আছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমাদেরও তাই করা উচিত। কিন্তু ভাইয়া আপনি যে বিষয়ে প্রস্তাব করেছেন, সেটা নিয়ে আমি কখনও ভাবিনি। যায়েদ ভেবেছে কিনা জানি না।’ বলল ফাতিমা।

যায়েদের মুখে সলজ্জ হাসি ফুটে উঠল। বলল, ‘আমি ভাইয়ার কাছে মিথ্যা বলব না। মিস ফাতিমা আমাকে মাফ করুন, আমি তাঁকে নিয়ে ভেবেছি।’

‘কিন্তু আমার অজ্ঞাতে সেটা, আমাকে কিছু বলনি কখনও।’ বলল ফাতিমা লজ্জায় লাল হয়ে।

‘দুঃখিত, ভাবনাটা কখন যে আমার মনে এসেছে বলতে পারব না। যখন ভাবনাটা আমার জন্যে সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছে, তখন বিষয়টা বার বার আমি তোমাকে বলতে চেয়েছি, কিন্তু তুমি একে কিভাবে নেবে তাই বলতে সাহস পাই নি।’

‘তাহলে তুমি আমাকে ভয় কর দেখছি?’ ফাতিমার ঠোঁটে লজ্জা ও হাসির মিশ্রণ।

‘কারণ, সত্যিই তোমার প্রতি আমি দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম।’ বলল যায়েদ মুখ নিচু করে।

‘ও, এই কারণেই অপ্রয়োজনেও তোমাকে আমার কক্ষে আসতে দেখেছি।’ বলল ফাতিমা। তার কন্ঠে শাসনের সুর।

'আমি দুঃখিত ফাতিমা আমার দূর্বলতার জন্যে।' বলল যায়েদ নরম কন্ঠে।

ফাতিমা হেসে উঠল। বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, 'ভাইয়া, আল্লাহ আমাদের মাফ করুন। আমরা ধরা পড়ে গেছি। আমি বিয়ের কথা ভাবিনি বটে, কিন্তু শুধু যায়েদ নয়, আমিও দেখছি ওর প্রতি দূর্বল হয়ে পড়েছিলাম। আমি ওর ঘরে যাইনি বটে, কিন্তু আমি মনে মনে চাইতাম ও আমার ঘরে আরও বেশি আসুক। আমি আরও স্বীকার করছি ভাইয়া। আপনার কথাই ঠিক। কিছু ঘটেনি বটে, কিন্তু সব কিছুই ঘটতে পারতো। আমি আপনার প্রস্তাবে রাজী ভাইয়া। এখন ওর মত জিজ্ঞাসা করুন।' ফাতিমার শেষের কথাগুলো কান্নাজড়িত আবেগে রুদ্ধ হয়ে পড়েছিল।

যায়েদ মুখ তুলে বলল, 'অন্যায় অবাঞ্চিত গোপন দূর্বলতার জন্যে আল্লাহ আমাদের মাফ করুন। অবাধ মেলামেশারই এটা স্বাভাবিক পরিণতি ছিল। ভাইয়া, আপনি ঠিকই বলেছেন এই অবস্থা অব্যাহত থাকা আর এক মুহূর্তও উচিত নয়। ফাতিমাকে ধন্যবাদ। ফাতিমা কি ভাববে এজন্যে আমার রাজী থাকার কথা বলতে পারিনি। আমি আনন্দের সাথে আমার মত দিচ্ছি।'

যায়েদ থামতেই ফাতিমা বলে উঠল, 'আনন্দ শব্দ যোগ করার কোন দরকার ছিল না। ভাইয়া সম্মতির কথা জানতে চেয়েছেন, কোন বিশেষণ নয়।'

'স্যরি। তবে এটা খারাপ বিশেষণ নয়, ভাল বিশেষণ।' যায়েদ বলল।

'প্যারিসের লোকদের ঘরোয়া বুদ্ধি মোটা শুনেছিলাম। আজ প্রমাণ পেলাম। আমাদের 'বনে' ব্যক্তির লজ্জাশীলতা এখনও আছে, প্যারিসে তা নেই।' বলল ফাতিমা।

'দেখুন ভাইয়া, ফাতিমা প্যারিস তুলে কথা বলছে। বন আর জার্মানীর কথা আমরা কম জানি না।' কৃত্রিম ক্ষোভ ফুটে উঠল যায়েদের কন্ঠে।

ফাতিমা কিছু বলতে যাচ্ছিল। আহমদ মুসা বাধা দিয়ে বলল, 'বিয়েটা বন-প্যারিসের মধ্যে হচ্ছে না, হচ্ছে ফাতিমা ও যায়েদের মধ্যে। তাদের কালচার শুধুই বন ও প্যারিস ভিত্তিক নয়।'

থামল আহমদ মুসা। থেমেই আবার বলে উঠল, ‘তাহলে তোমরা তোমাদের অভিভাবকদের সাথে কথা বলো। শুভ কাজ সত্ত্বরই হয়ে যাওয়া উচিত।’

বলে আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘মাগরিবের সময় হয়ে গেছে। তোমরা যাও অজু করে এস। দু’জনেই আমার সাথে নামাজ পড়বে।’

ওরাও আহমদ মুসার সাথে উঠে দাড়িয়েছে। আনন্দের সাথে ওরা চলল অজু করার জন্যে।

ঘুম ভেঙ্গে গেল আহমদ মুসার।

একটা শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেছে।

কিসের শব্দ?

ধীরে ধীরে চোখ খুলল আহমদ মুসা।

ঘর অন্ধকার। কিন্তু দক্ষিনের দেয়াল জোড়া নীল পর্দার মধ্যে দিয়ে বাইরের নগর রাতের নিস্তব্ধতা এসে ঘরের দক্ষিণ প্রান্তের স্বচ্ছতা কিছুটা ফিঁকে করে ফেলেছে।

আহমদ মুসা চোখ খোলার পর তার চোখ আশপাশটা ঘুরে এসে প্রথমেই সোজা গিয়ে নিবদ্ধ হলো দক্ষিণ দেয়ালের পূব প্রান্তের তার বরাবর পর্দার উপর। চোখ পড়তেই আটকে গেল সেখানে তার চোখ। পর্দা নড়ছে।

কেন নড়ছে? দক্ষিণে গোটাটাই কাঁচের দেয়াল। কোন ফাঁক নেই। বাতাসের প্রবাহ প্রবেশের কোন সুযোগ নেই। তাহলে নড়বে কেন পর্দা?

নড়ে উঠা পর্দা আবার স্থির হয়েছে।

আহমদ মুসা চোখ সরায়নি পর্দার সেই অংশের উপর থেকে।

মুহূর্তকাল পরেই পর্দা ধীর গতিতে আবার দুলে উঠল এবং সেই সাথে একটা চলন্ত ছায়ামূর্তি পর্দা ঠেলে বেরিয়ে এল।

ঘরের অন্ধকারে ছায়ামূর্তিটিকে আরও গাঢ় অন্ধকার দেখাচ্ছে। অন্ধকারের মধ্যে আহমদ মুসা দেখল ছায়ামূর্তিটির ডান হাত কোমর পর্যন্ত উচুঁতে প্রসারিত। দেহটি সামনের দিকে একটু বেঁকে আসা।

লোকটির ডান হাতে রিভলবার এবং সে আক্রমণাত্মক ভংগিতে পা পা করে অতি সাবধানে তার বেডের দিকে এগিয়ে আসছে।

বুঝল আহমদ মুসা কি ঘটতে যাচ্ছে।

শক্ত হয়ে উঠল আহমদ মুসার দেহ। তার চোখ দু'টি স্থির নিবদ্ধ লোকটির উপর।

আস্তে আস্তে আহমদ মুসা তার ডান হাত বালিশের তলায় নিল। কিন্তু হঠাৎ আহমদ মুসার মনে পড়ল কার রিভলবারটা জ্যাকেটের পকেটেই রয়ে গেছে। গত রাতে বাইরে থেকে ফেরার পর রিভলবারটা রীতি অনুসারে পকেট থেকে বের করে বালিশের তলায় রাখা হয়নি।

মনটা খারাপ হয়ে গেল আহমদ মুসার। যেদিন প্রয়োজন সেদিনই তার এ ভূলটা হয়ে গেছে।

লোকটি এগিয়ে আসছে।

শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ঘুমের ভান করে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আহমদ মুসা। যেহেতু ওর হাতে রিভলবার, তাই সে দূরে থাকতে প্রতিরোধ বা প্রতিআক্রমনের চেষ্টা করে লাভ নেই।

লোকটি খাটের কাছাকাছি পৌঁছে খাট ঘুরে আহমদ মুসার পেছন দিক থেকে সামনের দিকে অগ্রসর হলো। খাটের পশ্চিম পাশ দিয়ে আহমদ মুসার মাঝ বরাবর আসার পর লোকটি বাম হাত থেকে ডান হাতে রিভলবারটি নিল এবং লোকটির ডান হাত ঢুকে গেল তার পকেটে। বেরিয়ে এল সাদা রঙের কিছু একটা নিয়ে।

আহমদ মুসা বুঝল ওটা একটা সাদা রুমাল। সাদা রুমাল কেন? মনে প্রশ্নটা জাগার সাথে সাথেই আহমদ মুসা বুঝল, নিশ্চয় ঐ রুমালের ভেতর রাখা আছে ক্লোরোফরম ক্যাপসুল। হাতের চাপে ওটা ভেঙে নিয়ে রুমাল নাকে চাপার সেকেন্ডের মধ্যেই একজন মানুষ সংগা হারিয়ে ফেলে।

লোকটির পরিকল্পনা বুঝে খুশি হলো আহমদ মুসা। এখন আহমদ মুসা নিশ্চিত যে, সে প্রথমেই গুলী করবে না।

লোকটি আহমদ মুসার ডান পাশ ঘুরে তার মাথার পেছনে আসছিল। তার রিভলবার ধরা বাম হাতটি তখন আহমদ মুসার ডান বাহুর উপরে। রিভলবারের নল আহমদ মুসার দেহকে তাক করে নয়, বুকের উপর দিয়ে সমান্তরাল।

আহমদ মুসা বুঝতে পারল, লোকটি মাথার পেছনে দাঁড়িয়ে তাকে ক্লোরোফরম করতে চায়। যাতে আহমদ মুসার ঘুম ভাঙলেও হাত দিয়ে আক্রমন করার উপযুক্ত সুবিধা না পায়।

তার আগেই তার হাতে যে সুবর্ণ সুযোগ এসেছে তার সদ্ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিল। এমন একটি নিরাপদ সুযোগেরই সে অপেক্ষা করছিল।

সিদ্ধান্তের সাথে সাথেই কাজ।

আহমদ মুসার ডান হাত বিদ্যুত বেগে উঠে এল এবং আঘাত করল লোকটির রিভলবার ধরা বাম হাতে।

রিভলবার তার হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল।

আহমদ মুসা তার দেহটাকে একটা পাক দিয়ে মেঝেয় নেমে দাঁড়াল। কিন্তু আহমদ মুসা স্থির হয়ে দাঁড়াবার আগেই লোকটি আহমদ মুসার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আহমদ মুসা সরে দাঁড়াবার সুযোগ পেল না। সে পড়ে গেল মেঝের উপর এবং তার দেহের উপর এসে পড়ল লোকটি।

লোকটি এসে পড়ার সাথে সাথেই আহমদ মুসা তাকে কঠিনভাবে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ফেলল, যাতে সে এ্যাকশনে যাবার সুযোগ না পায়। তারপর আহমদ মুসা লোকটির পাল্টা কিছু শুরু করার আগেই নিজের দেহটায় একটা মোচড় দিয়ে লোকটিকে নিচে ফেলল। তারপর তাকে কাবু করার জন্যে আহমদ মুসা তার বুকে উঠে বসার জন্যে দেহটাকে একটু গুটিয়ে নিতে গেল। তার ফলে স্বাভাবিকভাবেই আহমদ মুসার দেহের চাপ কিছুটা লুজ হয়েছিল মুহূর্তের জন্যে। এই সুযোগই কাজে লাগাল লোকটি। সে দেহটাকে একটা প্রচন্ড ঝাঁকুনি দিয়ে আহমদ মুসাকে ছিটকে ফেলে আবার সে আহমদ মুসার উপর চেপে বসল।

কিন্তু সেও আহমদ মুসাকে সামলাতে পারল না। আহমদ মুসা আবার লোকটিকে ফেলে দিয়ে তার উপর চড়ে বসল।

ঠিক এই সময় অন্ধকারের ভেতর থেকে একজন এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল আহমদ মুসার উপর।

আহমদ মুসার উপর ঝাপিয়ে পড়া এই লোকটি দক্ষিণ দেয়ালের পশ্চিম পাশ দিয়ে কাঁচ কেটে ভিতরে প্রবেশ করেছিল। আহমদ মুসার নজর শুধু পুব দিকে নিবদ্ধ ছিল বলে পশ্চিম দিক দিয়েও যে আরেকজন ঘরে প্রবেশ করছে সেটা দেখতে পায়নি।

লোকটি এতক্ষন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে শত্রু-মিত্র চেনার চেষ্টা করেছে। নিশ্চিত হয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়েছে আহমদ মুসার উপর।

আহমদ মুসা ছিটকে পড়ল পাশেই। আকষ্মিক এই আক্রমনের জন্যে প্রস্তুত ছিল না আহমদ মুসা। ঘাড়ে আঘাত পেল সে।

ছিটকে পড়ার পর নিজেকে সামলে নিতে একটু দেরী হলো আহমদ মুসার। নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা। এ সময় ওরা দু'জন এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর।

আহমদ মুসা চিৎ হয়ে আছড়ে পড়ল আবার।

আছড়ে পড়ার পর আহমদ মুসা অনুভব করল তার ডান হাত গিয়ে পড়েছে একটা শক্ত ধাতব জিনিসের উপর। হাত নেড়ে পরীক্ষা করে আনন্দিত হলো আহমদ মুসা ধাতব জিনিসটি একটি রিভলবার। আহমদ মুসার মনে পড়ল এই রিভলবারটিই প্রথম লোকটির হাত থেকে ছিটকে পড়েছিল।

ওরা দু'জন এসে চেপে বসেছিল আহমদ মুসার উপর। ক্লোরোফরমের গন্ধ আবার পেল আহমদ মুসা। বুঝল, ওরা তাকে সংগাহীন করার চেষ্টা করছে।

আহমদ মুসা তার ডান হাত সক্রিয় করল। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, রিভলবার ব্যবহার না করে উপায় নেই।

ডান হাতটা টেনে এনে আহমদ মুসা প্রথম গুলীটা করল তার উপর চেপে বসা একজনের বুকের পাঁজরে ঠেকিয়ে।

লোকটা বুক ফাটা চিৎকার করে তার বুকের উপর থেকে উল্টে পড়ল তার পাশের লোকটির উপর।

আহমদ মুসা আর ঝুঁকি নেয়া ঠিক মনে করল না। দ্বিতীয় লোকটির হাতে রিভলবার থাকতে পারে। সে এবার রিভলবার ব্যবহারে মরিয়া হয়ে উঠবে।

ইতিমধ্যে পাশের লোকটি চিৎকার করে উঠেছে, 'কুত্তার বাচ্চা গুলী করেছ। তোমাকেও মরতে.....'

লোকটি কথা শেষ করতে পারল না। আহমদ মুসার রিভলবার শব্দ লক্ষ্যে পর পর দু'বার অগ্নিবৃষ্টি করল।

লোকটি চিৎকার করারও সুযোগ পেল না। নিরব হয়ে গেল।

উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা। কক্ষের আলো জ্বেলে দিয়ে সোজা টেলিফোনের কাছে গেল। টেলিফোন করল হোটেল সিকুরিটিকে। বলল, 'আমার ঘরে দু'জন লোক ঢুকে আমাকে আক্রমন করেছিল। দু'জনেই নিহত হয়েছে। আপনার আসুন, পুলিশে খবর দিন।'

সংগে সংগেই হোটেল সিকুরিটির লোকেরা এসে গেল। দশ মিনিটের মধ্যেই এসে গেল পুলিশ। এল গোয়েন্দা বিভাগের লোকজনও।

পুলিশের হাঙ্গামা শেষ হতে সকাল ৮টা বেজে গেল। পারিপার্শ্বিক সব তথ্যাদি পাওয়ার পর পুলিশ আহমদ মুসার বক্তব্য গ্রহন করেছে। প্রথমত, প্রমাণিত হয়েছে লোক দু'জন হোটেলের সম্মুখ দরজা দিয়ে বৈধভাবে প্রবেশের কোন রেকর্ড নেই। দ্বিতীয়ত, প্রমাণিত হয়েছে অসৎ উদ্দেশ্যে তারা লাইলন কর্ড ব্যবহার করে পেছন দেয়াল বেয়ে আহমদ মুসার ঘরে প্রবেশ করেছে। লোক দু'জনের জুতার তলায় হোটেলের দেয়ালের পিংক রং পাওয়া গেছে। তৃতীয়ত, গোয়েন্দা পুলিশের মাইক্রো এক্সরে ক্যামেরায় দক্ষিণ দেয়ালের যে গ্লাস কেটে ওরা দু'জন প্রবেশ করেছিল, তাতে তাদের আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে। চতুর্থত, ক্লোরোফরম লোক দু'জনই বহন করেছে তার প্রমাণ তাদের পকেট থেকে পাওয়া গেছে। সর্বশেষ আহমদ মুসার হাতে যে রিভলবার আছে তাতে নিহত দু'জনের একজনের হাতের আঙুলের ছাপও পাওয়া গেছে। সব মিলিয়ে পুলিশ নিশ্চিত হয়েছে, আহমদ মুসা নির্দোষ এবং লোক দু'জন আহমদ মুসাকে কিডন্যাপ করতে

এসেই নিহত হয়েছে। তাদের মোটিভ হিসেবে রেকর্ড করেছে, স্পুটনিক ঘটনায় অপহৃতদের দু'জন আত্মীয় আহমদ আবদুল্লাহ (আহমদ মুসা)সহ এসেছেন স্ট্রাসবার্গে স্পুটনিকের ব্যাপারে খোঁজ নিতে এবং স্পুটনিকের ঘটনা যারা ঘটিয়েছে তাদের আক্রমনের এরা শিকার হয়েছে।

পুলিশ এই কেসকে ডাকাতি ও অপহরণ করার চেষ্টার মামলা হিসেবে গ্রহন করে আহমদ মুসাকে সব সন্দেহ ও দায় থেকে অব্যাহতি দিয়েছে এবং পুলিশবাদী কেস হিসেবে একে গ্রহন করা হয়েছে।

আহমদ মুসার কক্ষকে পুলিশ সীল করল। হোটেল কর্তৃপক্ষ আহমদ মুসাকে হোটেলের সর্বোচ্চ তলায় একটা অধিকতর নিরাপদ কক্ষ বরাদ্দ করল।

পুলিশ চলে যেতেই ফাতিমা কামাল আহমদ মুসাকে বলল, 'ভাইয়া, বেয়ারা আপনার সুটকেস আপনার ঘরে নিয়ে যাক। আপনি এখন আমার ঘরে চলুন। ওখানে যায়েদ অপেক্ষা করছে। অনেক জরুরী কথা আছে।'

বলেই, ফাতিমা কামাল বেয়ারাকে আহমদ মুসার সুটকেস তার কক্ষে নিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়ে আহমদ মুসার হ্যান্ড ব্যাগটা হাতে তুলে নিয়ে হাঁটতে শুরু করে বলল, 'আসুন ভাইয়া'।

আহমদ মুসা তার সাথে হাঁটতে শুরু করল।

ফাতিমা কামালের ঘরে এসে বসল সবাই।

আহমদ মুসা বসতেই যায়েদ বলে উঠল, 'আল্লাহর হাজার শোকর যে, তিনি ভয়ংকর ঘটনা থেকে আপনাকে রক্ষা করেছেন, আমাদেরকেও সাহায্য করেছেন।'

'আমার কিন্তু এখনও স্বপ্ন মনে হচ্ছে যায়েদ। অন্ধকার রাত। দু'জন লোক টার্গেট করে দেখে শুনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু যারা আক্রমন করল তাদেরকে তাদেরই রিভলবার দিয়ে হত্যা করা হলো। এ যেন জগতের শীর্ষ এক গোয়েন্দা কাহিনী।' বলল ফাতিমা কামাল।

'তুমি ঠিকই বলেছ ফাতিমা। আশায় আমার বুক ভরে উঠেছে। আমাদের জন্যে যা অসম্ভব, আমাদের জন্যে যা অকল্পনীয়, সেটাই আমাদের এই নতুন

ভাইয়ার জন্যে খুবই সাধারণ। আল্লাহ তাঁকে পাঠিয়েছেন আমাদের মহাসংকটে। বুক আমার ভরে উঠেছে আশায়।' বলল যায়েদ।

'একজন গোয়েন্দা অফিসার কি মন্তব্য করেছেন জান। বলেছেন, 'আটঘাট বাধাঁ ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচা অসম্ভব ছিল। মি.আহমদ আবদুল্লাহ নিশ্চয় অসাধারণ লোক।' বলল ফাতিমা কামাল।

'এই জন্যেই বিপদ তাঁর উপর এসে চেপে বসেছে। নতুন বিপদও আসন্ন।' যায়েদ বলল।

'কি বিপদ?' সংগে সংগেই প্রশ্ন করে উঠল ফাতিমা কামাল। উদ্বেগে তার দু'চোখ কপালে।

'ঐ বিপদের কথাই তো তোমাকে বলেছি। ভাইয়াকে এখনই আসতে বলেছিলাম সে কথা বলার জন্যেই।' বলল যায়েদ।

'বল তাড়াতাড়ি।' ফাতিমা কামাল বলল।

'রাতে ঘটনার খবর পাওয়ার পর থানা কর্মকর্তার সাথে পুলিশের যে বড় অফিসার, সহকারী পুলিশ কমিশনার এসেছিলেন, তিনি আমার পরিচিত। আমার এক বন্ধুর বড় ভাই। ভোর পর্যন্ত তিনি এখানে ছিলেন। তারপর চলে যান। দশ মিনিট আগে আমাকে টেলিফোন করে ভয়াবহ খবর দিলেন। সেটা হলো, পুলিশ কমিশনার হঠাৎ উল্টে গেছেন। তিনি পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন সুযোগমত কোন রেকর্ড বা সাক্ষী না রেখে ভাইয়াকে গ্রেপ্তার করতে। তিনি মনে করেন, ভাইয়াকে যারা অপহরণ করতে গিয়েছিল তাদের পেছনে সাংঘাতিক বড় কোন পক্ষ আছে, হতে পারে তারা স্পুটনিক ধ্বংস ও এর ৭জনকে অপহরণ করার সাথে জড়িত। তিনি আশংকা করেন পুলিশ ভাইয়াকে ধরে নিয়ে গিয়ে ঐ পক্ষের হাতে তুলে দিবে।' থামল যায়েদ।

সংগে সংগেই ফাতিমা কামাল বলে উঠল, 'কিভাবে পুলিশ গ্রেফতার করবে? পুলিশের স্পট ইনভেস্টিগেশন রিপোর্টের (SIP) যে কপি ভাইয়াকে পুলিশ দিয়েছে তাতে তাকে সব সন্দেহ থেকে মুক্ত করা হয়েছে।'

‘বললাম তো, পুলিশ তো আইনের মাধ্যমে গ্রেপ্তার দেখাবে না। কোন রেকর্ড বা সাক্ষী না থাকে এমনভাবে কথা বলার জন্যে তাকে তুলে নিয়ে এবং তারপর গায়েব করবে।’ বলল যায়েদ ফারুক।

‘ফরাসী পুলিশের একজন শীর্ষ অফিসারকে এইভাবে মুহূর্তে পাল্টে ফেলল, এই পক্ষটা আসলে কে?’ ফাতিমা কামাল বলল।

যায়েদ ফারুক কিছু বলল না।

আহমদ মুসার ঠোঁটের কোণে কেবল এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল। বলল, ‘চিন্তা করো না ফাতিমা। নিশ্চয় শীঘ্র তাদের পরিচয় দিনের আলোতে বেরিয়ে আসবে। সে পর্যন্ত ধৈর্য্য ধর।’ বলল আহমদ মুসা শান্ত কন্ঠে।

‘আল্লাহ সেটা করুন, কিন্তু তার আগে তো মহাবিপদ। সব তো শুনলেন ভাইয়া, আমরা এখন কি করব?’ ফাতিমা কামাল বলল।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘চিন্তার কিছু নেই। শত্রুরা এসব করে আমাদেরই সাহায্য করছে।’

‘কিভাবে ভাইয়া?’ দু’চোখে কপালে তুলে প্রশ্ন করল যায়েদ ফারুক।

‘শত্রুরা আমাদেরকে চেনে, আমরা তাদের চিনি না। তারা এ্যাকশনে না এলে আমরা এ্যাকশনে যাব কি করে?’ বলল আহমদ মুসা।

‘বুঝলাম। তারা এ্যাকশনে এল। সেই পরিমাণে এ্যাকশনে যাবার ক্ষমতা কি আমাদের আছে? তার উপর দেখছি পুলিশ ওদের সহযোগিতা করবে বলল।’

‘এটা নতুন কিছু নয়। পুলিশের একটা গ্রুপ নিশ্চয় ওদের সহযোগিতা করে আসছে। তা না হলে স্পুটনিক মামলাটা এগুচ্ছে না কেন?’

‘ডবল বিপদ। এখন তাহলে আমাদের কি করণীয়? বুঝা যাচ্ছে, পুলিশ এখন ওঁৎ পাতছে আপনাকে ধরার জন্যে।’ উদ্বিগ্ন কন্ঠে বলল ফাতিমা কামাল।

‘এত উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই বোন। হোটেল কর্তৃপক্ষকে আমি এখনি জানিয়ে দিচ্ছি। হোটেলে কক্ষ আমার ঠিকই থাকবে। কিন্তু নিরাপত্তার কারণে আমি বাইরে থাকব।’ শান্ত কন্ঠে বলল আহমদ মুসা।

‘আমরা কোথায় যাবো?’ জিজ্ঞেস করল ফাতিমা কামাল।

‘তোমাদেরকে হোটেল ছেড়ে দিতে হবে। তোমরা তোমাদের আত্নীয়ের বাড়িতে গিয়ে উঠবে। অথবা বাড়ি চলে যাও।’ বলল আহমদ মুসা।

‘না ভাইয়া। আত্নীয়রা এমনিতেই বিপদের মধ্যে আছে। তাদের বিপদ বাড়াতে চাই না। আপনাকে সে খবর তো এখনও বলিনি। আমাদের দু’জনের আত্নীয়ের বাসা আজ রাতে তন্ন তন্ন করে সার্চ করা হয়েছে। অন্যান্য..............’

কথা শেষ করতে পারলো না যায়েদ। আহমদ মুসা তার কথার মাঝখানে বলে উঠল, ‘তোমাদের দু’জন আত্নীয় মানে আব্দুল্লাহ আল ফারুক ও কামাল সুলাইমানের বাসা?’

‘জি ভাইয়া।’ বলল যায়েদ।

‘কারা সার্চ করেছে, পুলিশ?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘পুলিশ নয়। অন্য কেউ। বাড়ির সবাইকে ক্লোরোফরম করে অঢেল সময় নিয়ে তারা বাড়িতে কি যেন খুঁজেছে। প্রতিটি সুটকেস, ব্যাগ, কাপবোর্ড, ড্রয়ার, আলমিরাসহ বাড়ির প্রতিটি ইঞ্চি জায়গা তারা সার্চ করেছে। এমন কি সোফা, চেয়ারের গদিও তারা ফেঁড়ে দেখেছে।’ বলল যায়েদ।

‘অন্য পাঁচজনের বাসা?’ আহমদ মুসা জিজ্ঞেস করল।

‘খবর জানতে পারিনি। তবে আরও জানতে পেরেছি, আব্দুল্লাহ আল ফারুক ও কামাল সুলাইমানের বন্ধু বান্ধব ও আত্নীয় স্বজন যারা স্ট্রাসবার্গে আছেন, তাদের বাসাও এভাবে সার্চ করা হয়েছে।’ বলল যায়েদ।

‘বল কি?’

বলে আহমদ মুসা অল্প কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, ‘কোন অতিমূল্যবান দলিল বা কোন প্রমাণ তারা হাত করতে চায়। কিন্তু সে দলিল বা প্রমাণ কোথায় আছে তা তারা জানে না। আমার মনে হচ্ছে, অন্য পাঁচজনের বাড়ি ও তাদের বন্ধু-বান্ধব, আত্নীয় স্বজনের বাড়িও আজ রাতে সার্চ করা হয়েছে।’

থামল আহমদ মুসা। কিন্তু তার কপাল তখনও কুঞ্চিত। ভাবছে সে। আবার সে বলা শুরু করল, ‘এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আমার তিনটা জিনিস মনে হচ্ছে-এক, ৭জন যাদের অপহরণ করা হয়েছে তাদের ইন্টেরোগেট করেও কোন এক মূল্যবান দলিলের হদিস বের করতে শত্রুরা পারেনি। অবশেষে নিজেরাই

দলিল উদ্ধারে বের হয়েছে। দুই, সবকিছু সমেত স্পুটনিক অফিস পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও কোন অতি গুরুত্বপূর্ণ দলিল বা প্রমাণ এখনও অক্ষত আছে যা স্পুটনিক অফিসের বাইরে কোথাও সরিয়ে রাখা হয়েছিল। তিন, আমার মনে আশা জাগছে, এই দলিল হাত করার পূর্ব পর্যন্ত অপহৃতদের শত্রুরা হত্যা করবে না।' থামল আহমদ মুসা।

ফাতিমা ও যায়েদ হা করে তাকিয়ে আছে আহমদ মুসার দিকে। ফাতিমার দু'চোখের কোনায় অশ্রু চিক চিক করছে।

দু'জনেই কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না।

প্রথম তাদের নিরবতা ভাঙল ফাতিমা। বলল, 'ভাইয়া, আল্লাহ আপনার কথা মঞ্জুর করুন। তারা বেঁচে আছেন, একথা সত্য হোক।' কান্নায় ভারী হয়ে গেল ফাতিমার কন্ঠ।

'ভাইয়া, আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। আপনার মত সাহসী, শক্তিমান ও তীক্ষ্ণধী সংগ্রামী মানুষের আমাদের প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ তা পূরণ করেছেন।'

বলে একটু থেমেই আবার বলা শুরু করল, 'ভাইয়া, বাড়ি সার্চ করা থেকে আপনি যে তিনটি জিনিস বের করে আনলেন, তার প্রতিটি অক্ষর আমার কাছে সত্য মনে হচ্ছে। ভাইয়া বলুন, এখন আমরা কি করতে যাচ্ছি। আমরা তিনজনেই তো একটা বাড়ি নিতে পারি।'

'না, তোমরা এক সাথে বাড়ি নিতে পার না। তোমরা..........'

আহমদ মুসাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে মাঝখান থেকে যায়েদ বলে উঠল, 'ভাইয়া, আমি ও ফাতিমা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। দু'জনের পরিবারকেও জানিয়েছি। এখন আপনার অনুমতি হলেই আমরা বিয়ে করতে পারি।' লজ্জা সংকোচে বিব্রত কন্ঠ যায়েদের।

লজ্জা এসে ছেয়ে ফেলেছে ফাতিমার মুখে। রাঙা হয়ে উঠেছে তার মুখমন্ডল। নত মুখে সেও বলে উঠল, 'ভাইয়া, ও ঠিকই বলেছে।'

'আমার অনুমতি কেন?' আহমদ মুসা বলল।

‘ভাইয়া, আপনাকেই আমরা প্রকৃত অভিভাবক মনে করছি। আপনি যেভাবে আমাদের কল্যাণ কামনা করেছেন, যেভাবে আপনি আমাদের ব্যক্তি জীবনের দিকে তাকিয়েছেন, খোলামেলা পরামর্শ দিয়েছেন, সেভাবে আমাদের পরিবার আমাদের দিকে কখনও তাকায়নি।’ বলল যায়েদ।

‘তবু আমি তোমাদের পরিবারের কেউ নই। পরিবারের অনুমতি তোমাদের অবশ্যই নিতে হবে। তোমরা পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়ার মাধ্যমে তাদেরকে দায়িত্বশীল করে তুলতে হবে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কিন্তু সব মুসলমানই তো ভাই ভাই এবং একটি পরিবারের মত।’ বলল ফাতিমা কামাল।

‘হ্যাঁ, ইসলাম এটা বলেছে। কিন্তু সেই সাথে পারিবারিক বন্ধনকে আরও দৃঢ় করতে বলেছে এবং পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়া প্রথম কর্তব্য বলে উল্লেখ করেছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ঠিক আছে ভাইয়া। আমরা পরিবারকে জানিয়েছি মানে তাদের অনুমতিও নিয়েছি।’ বলল ফাতিমা।

‘ধন্যবাদ। তাহলে যায়েদ তুমি প্যারিসে তোমার দু’একজন নিকটতম লোকদের নিয়ে জার্মানির বনে ফাতিমার বাড়িতে যাও। সেখানেই বিয়ে অনুষ্ঠিত হোক।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ভাইয়া, তাহলে আপনাকে যেতে হবে। সবাই খুশি হবে।’ বলল ফাতিমা।

‘পরে যাব। তোমাদের দু’জনের শুধু নয়, স্পুটনিকের ৭জনের পরিবার সম্পর্কে আমার দারুণ আগ্রহ। পরিবারগুলোকে আমি দেখতে চাই, তাদের কথা শুনতে চাই। কি করে এই ঐতিহাসিক ও সেকুলার পরিবারগুলো থেকে স্পুটনিকের জন্ম হলো, তা জানার আমার ইচ্ছা অসীম। এই পরিবারগুলো একদিন মুসলিম বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছে, মুসলিম উম্মাহর বর্তমান বিপর্যয়ের জন্যে এই পরিবারগুলো বিরাটভাবে দায়ী। সেই পরিবার থেকেই আবার স্পুটনিকের জন্ম কেমন করে হলো তা আমি জানতে চাই।’ থামল আহমদ মুসা। আবেগে তার কন্ঠ ভারী হয়ে উঠেছিল।

ফাতিমা ও যায়েদের বিস্ময় ও শ্রদ্ধামিশ্রিত চার চোখ নিবদ্ধ ছিল আহমদ মুসার উপর। বলল, ভাইয়া, চাচাতো ভাই কামাল সুলাইমানের পরিবর্তন কিভাবে হলো সেটা আমাদের কাছে বিস্ময়। মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের উত্তর পুরুষ কামাল সুলাইমান কামাল আতাতুর্কের মতই ইসলামের প্রতি ক্রিটিক্যাল ছিল। নিউইয়র্কের টুইন (লিবার্টি ও ডেমোক্রেসি)টাওয়ার ধ্বংসের জন্যে মুসলমানরা যখন অভিযুক্ত হলো, তখন সে ইসলাম ও মৌলবাদী মুসলমানদের গালিগালাজ করার ব্যাপারে অন্যান্যা জার্মানদের চেয়েও অগ্রণী ছিল। তারপর হঠাৎ করে তার পরিবর্তন ঘটল। শুধু তার পরিবর্তন নয়, গোটা পরিবারকেও সে পরিবর্তন করে ছেড়েছে। আমার সাথে দেখা হলেই বলতো, 'হাসবি কম। মনে রাখবি তুই মজলুম মুসলিম জাতির একজন সদস্য।' মাঝেই মাঝেই আরও বলত, 'জানিস মুসলমানদের উপর আজ যে যুলুম চলছে তার জন্যে মুসলমানরা দায়ী নয়, দায়ী একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। যারা মুসলমানদের ঘর বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করেছে, যারা তাদের সহায় সম্পত্তি কেড়ে নিয়েছে, তারাই পুলিশ সেজে চুরি ডাকাতির অভিযোগে মুসলমানদের গ্রেফতার করছে এবং নিজেরা চুরি ডাকাতি ও খুন জখম সংঘটিত করে মুসলমানদের ফাঁসিতে লটকাচ্ছে।' থামল ফাতিমা। কান্নায় রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল তার কন্ঠ।

আহমদ মুসা সংগে সংগে কথা বলল না। তারও মুখ গম্ভীর হয়ে উঠেছে।

যায়েদের মুখ নিচু।

আহমদ মুসাই নিরবতা ভাঙল। বলল, 'আলহামদুল্লিাহ। কামাল সুলাইমান 'কামাল' না হয়ে 'সুলাইমান' হয়েছেন।'

'বুঝলাম না ভাইয়া।' বলল যায়েদ।

'অর্থ হলো কামাল সুলাইমান তুরস্কের মোস্তফা কামাল না হয়ে তুরস্কের ওসমানীয় খিলাফতের 'সুলাইমান, দি ম্যাগনিফিসেন্ট' হয়েছেন। সুলাইমান দি ম্যাগনিফিসেন্ট (১৪৯৪ খৃঃ-১৫৬৬খৃঃ) তুর্কি খিলাফতের সবচেয়ে সফল শাসক। গোটা ভূমধ্যসাগরে তার নৌবাহিনী ছিল অপ্রতিরোধ্য।'

কথা শেষ করে একটু থামতেই আহমদ মুসা আবার বলে উঠল, 'ইতিহাসের এসব কথা থাক। এস, বর্তমান নিয়ে ভাবি।'

ফাতিমা কামাল চোখ মুছে বলল, ‘আপনিও আমাদের সাথে ‘বন’ এ যাবেন, একথা এখনও বলেননি।’

‘না বোন এ সময় নয়। শত্রুরা অনেক কাছাকাছি এসেছে। এ সময় দূরে সরা যাবে না। ওরা আমাদের বাড়িতে ঢুকেছে, এখন আমরা ওদের বাড়িতে ঢুকতে চাই।’ বলল আহমদ মুসা নরম কন্ঠে।

‘তাহলে ‘বন’ থেকে ওদের আসতে বলি। যায়েদও বলুক তার পরিবারকে আসার জন্যে। বিয়ে স্ট্রাসবার্গেই হবে।’ ফাতিমা বলল দৃঢ় কন্ঠে।

‘ফাতিমা ঠিকই বলেছে। এটাই হবে।’ বলে একটু থামল যায়েদ। একটু ভেবে নিয়ে আবার বলল, ‘তাহলে বাড়ি নেয়ার কি হবে? আজ এ মুহূর্তেই তো আপনার হোটেল থেকে সরা দরকার ভাইয়া।’

‘ঠিক আছে। একটা বাড়ি আজই ঠিক করে ফেল। লোকেশন যাতে নিরিবিলি ও নিরাপদ হয়। বাড়িটার এক অংশে আমি থাকব। অন্য অংশে বিয়ের পর তোমরা থাকবে।’

‘তাহলে ভাইয়া, আমি বাড়ির খোঁজে বের হচ্ছি। উঠব, অনুমতি দিন।’

‘ঠিক আছে, আমিও বের হচ্ছি। চল।’

বলে আহমদ মুসা উঠে দাড়াল।

‘কিন্তু বাইরে তো পুলিশ ওঁৎ পেতে আছে।’ এক সাথে বলে উঠল ফাতিমা ও যায়েদ। তাদের কন্ঠে প্রতিবাদের সুর।

‘শুধু পুলিশ কেন, ওরাও ওঁৎ পেতে থাকার কথা।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তাহলে বেরুবেন কেন?’ দুজনেই আবার বলে উঠল।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘পুলিশ এবং ওরা জানে আমি হোটেলে আছি। এই অবস্থায় বাইরে যাওয়া ও ভেতরে থাকা এক কথাই। পুলিশ পক্ষে থাকলে হোটেলের ভেতরটা ওদের জন্যে আরও সুবিধাজনক।’

বলে আহমদ মুসা সোফায় সোজা হয়ে বসল। বলল, ‘তোমরা চিন্তা করো না। আল্লাহ আছেন।’

উঠে দাড়াল আহমদ মুসা।

যায়েদও উঠে দাড়াল। বলল, 'আপনি এগোন ভাইয়া, আমি আমার রুম থেকে আসছি।'

যায়েদ সালাম দিয়ে কক্ষ থেকে বেরুবার জন্যে হাঁটতে শুরু করল।

আহমদ মুসাও।

নিরব ফাতিমা। উদ্বিগ্ন তার দু'চোখ। শূন্য দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকল ওদের যাত্রা পথের দিকে।

# ৩

আজর ওয়াইজম্যানের চোখ দু’টি তার সামনে টেবিলে রাখা দু’টি ফটোর উপর স্থিরভাবে নিবদ্ধ।

দু’টি ফটোই আহমদ মুসার বলে কথিত। একটি ফটো ওয়াইজম্যানদের ফটো। আহমদ মুসার ফটো হিসাবে ফাইলে সংরক্ষিত। আরেকটি ফটো স্ট্রাসবার্গ পুলিশের কাছ থেকে সদ্য সংগৃহীত। ফটোটি পুলিশ তুলেছে আহমদ মুসার হোটেল কক্ষে দু’জন নিহত হওয়ার ঘটনার পর।

আজর ওয়াইজম্যানের হাতে একটা পাওয়ারফুল এ্যামপ্লিফায়ার লেন্স। সেটা দিয়ে খুঁটে খুঁটে সে পরীক্ষা করছে ফটো দু’টিকে।

আজর ওয়াইজম্যান ওয়ার্ল্ড ফ্রিডম আর্মির (WFA) প্রধান। সাও তোরাহ দ্বীপ থেকে মাত্র কিছুক্ষণ আগে সে স্ট্রাসবার্গে পৌছেছে।

ফটো দুটি গভীর মনোযোগের সাথে পরীক্ষা করার পর মুখ তুলল আজর ওয়াইজম্যান। হাতের লেন্সটা টেবিলে রেখে সামনে বসা WFA এর স্ট্রাসবার্গ এর স্টেশন চীফ লাইবারম্যানকে উদ্দেশ্য করে বলল, ‘আমাদের ফাইল ফটোর সাথে হোটেলের কথিত আহমদ মুসার ফটোর মুখের আদল হুবহু মিলে যাচ্ছে। কিন্তু চোখ-মুখের মাইক্রো রিডিং মিলছে না। একেবারেই আলাদা। এটা কি করে সম্ভব বুঝতে পারছি না।’

আজর ওয়াইজম্যান থামতেই লাইবারম্যান বলে উঠল, ‘কিন্তু হোটেলের এই লোক আহমদ মুসা হতেই হবে। গ্রীন সার্কেল ও হোটেলের সাংঘাতিক ঘটনা প্রমাণ করছে লোকটি আহমদ মুসা না হয়েই পারে না। হোটেলের ঘটনায় পুলিশ পর্যন্ত বিস্মিত হয়েছে। সাফল্যের সাথে আমাদের লোকেরা হোটেল কক্ষে প্রবেশ করেছিল। পুলিশের মতে তারা প্রথমে আক্রমণ করারও সুযোগ পেয়েছিল। ক্লোরোফরম ভেজা রুমাল খাটের পাশে পাওয়ার অর্থ আহমদ মুসাকে তারা নিদ্রিত অবস্থায় পেয়েছিল এবং তাকে সংগাহীন করার জন্যে ক্লোরোফরমসহ

রুমালও তারা বের করেছিল। কিন্তু নিদ্রিত অবস্থায় প্রথমে আক্রমণ করেও দু'জনে আহমদ মুসাকে এঁটে উঠতে পারেনি। আহমদ মুসার মত অসাধারণ কেউ না হলে এটা সম্ভব ছিল না।'

'আমার কথাও এটাই। মদিনা থেকে স্ট্রাসবার্গে আসা আহমদ মুসার সিডিউলের সাথে এ লোকটির স্টাসবার্গে আসার সিডিউল মিলে যাচ্ছে। চেহারা ও মুখের আদলটাও মিলে যাচ্ছে। কিন্তু আসল জায়গায় তো মিলছে না', বলল আজর ওয়াইজম্যান।

'কোন কারণ নিশ্চয় আছে। কিন্তু লোক যে একই এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।' লাইবারম্যান বলল।

'সে কারণটা কি হতে পারে?' জিজ্ঞেস করল আজর ওয়াইজম্যান।

'হতে পারে দুটি ফটোগ্রাফের কোন একটিতে আহমদ মুসার ছদ্মবেশ আছে।' বলল লাইবারম্যান।

'কিন্তু ছদ্মবেশ তো মুখের মাইক্রোরিডিং পাল্টাতে পারে না।' আজর ওয়াইজম্যান বলল।

'পারে স্যার। প্লাস্টিক মেকআপ সম্পর্কে আমার বিশেষ পড়াশুনা আছে। আমি জানি, সর্বাধুনিক এমন কিছু প্লাস্টিক মেকআপ আছে যা সব দিক দিয়ে চামড়ার মত। চামড়ার মতই এতে রেখা, লোম ও লোমকূপ আছে। আলট্রা মাইক্রো লেন্সেও চামড়ার সাথে এর কোন ভিন্নতা ধরা পড়ে না।' বলল লাইবারম্যান।

'ধন্যবাদ লাইবারম্যান। আপনার এ মত আমি গ্রহন করছি এবং আমরা এখন এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, হোটেলের এই লোকটি আহমদ মুসাই।' আজর ওয়াইজম্যান বলল।

'অবশ্যই।' বলল লাইবারম্যান।

'তাহলে একথাও বলা যায় যে, সে এখন আমাদের হাতের মুঠোয়।' আজর ওয়াইজম্যান বলল।

'তা আমরা বলতে পারি। হোটেল কক্ষে নিহত হওয়ার ঘটনার পুলিশ রিপোর্টটি আহমদ মুসার পক্ষে গেলেও পুলিশ আমাদেরকে সহযোগিতা করবে

তার ব্যবস্থা হয়েছে। পুলিশ কমিশনার পুলিশের প্রতি কিছু নির্দেশ দিয়েছেন। তারা সুযোগমত আহমদ মুসাকে গ্রেপ্তার করে আমাদের হাতে তুলে দেবে।' বলল লাইবারম্যান।

'পুলিশের সাহায্য একটা বাড়তি বিষয়। তাদের উপর নির্ভর করে বসে থাকা যাবে না।' আজর ওয়াইজম্যান বলল।

'না স্যার। আমরা বসে নেই। হোটেলের চারদিকে আমরা ২৪ ঘন্টা পাহারা বসিয়ে রেখেছি। আমরা আহমদ মুসাকে চোখের আড়াল হতে দেব না। সুযোগ পেলে আমরা পুলিশের অপেক্ষা করব না। আমরা নিজেরাই তাকে জালে আটকাব।' বলল লাইবারম্যান।

'আমি চাই আহমদ মুসাকে 'সাও তোরাহ' দ্বীপের খাঁচায় পুরতে। তাকে খাঁচায় ভরতে পারলে শুধু বহু তথ্য পাওয়া যাবে তা নয়, গোটা দুনিয়ায় আমাদের মিশন নিরাপদ হয়ে যাবে।' আজর ওয়াইজম্যান বলল।

'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের এতবড় বিপর্যয় ঘটাতে আহমদ মুসা পারল কিভাবে?' জিজ্ঞেস করল লাইবারম্যান।

'আহমদ মুসা শৃগালের মত ধূর্ত, বাঘের মত ক্ষিপ্র, সিংহের মত সাহসী এবং স্যার এ.এইচ. ডুনান্টের চেয়েও মানবিক এবং পোপের চেয়েও দয়ালু। কোন গুণের ঘাটতি তার ভেতর নেই। নিজের জীবন বিপন্ন করে বিপজ্জনক ওহাইও নদীতে ডুবে যাওয়া থেকে এফবিআই চীফ মি.জর্জের নাতিকে উদ্ধার করে আহমদ মুসা এফবিআই চীফের হৃদয় জয় করে নেয়। সবুজ পাহাড় ও লস আলামাসের মধ্যকার আণবিক ও সামরিক তথ্য পাচারের ইহুদী গোয়েন্দা সুড়ঙ্গ আবিষ্কার করে তা মার্কিন সরকারের হাতে তুলে দেয়াসহ বহু নিঃস্বার্থ ও উপকারী কাজের মাধ্যমে সে মার্কিন প্রেসিডেন্টের আস্থা অর্জন করে। অন্যদিকে সে আমাদের বেশ কিছু অপরাধমূলক বড় ধরনের কাজকে হাতে নাতে ধরিয়ে দেয়। এভাবেই সে গত একশ বছরে মার্কিন মাটিতে প্রোথিত আমাদের শেকড়কে আমূল উপড়ে ফেলার ব্যবস্থা করেছে। মার্কিন সরকার, মার্কিন কংগ্রেস ও মার্কিন সমাজে আমাদের শক্তিশালী লবি আজ সম্পূর্ণই অকার্যকর হয়ে পড়েছে এক আহমদ মুসার তৎপরতায়। এই আহমদ মুসাই এসেছে স্ট্রাসবার্গে। স্পুটনিক যে

কাজ হাতে নিয়েছিল, সে কাজ করার জনেই সে যদি স্ট্রাসবার্গে এসে থাকে, তাহলে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। কয়েক বছর আগে সংঘটিত নিউইয়র্কের 'লিবার্টি ও ডেমোক্র্যাসি' টাওয়ার ধ্বংস আমরাই করেছি একথা যদি সে প্রমাণ করতে পারে, তাহলে দুনিয়ার কোথাও আমাদের জায়গা হবে না। সুতরাং স্ট্রাসবার্গে এখন আমাদের একমাত্র কাজ সর্বশক্তি দিয়ে আহমদ মুসাকে ধ্বংস করা।'

দীর্ঘ বক্তব্য দেয়ার পর থামল আজর ওয়াইজম্যান। তার চোখে-মুখে সফরের ক্লান্তি এবং কন্ঠে হতাশার সুর।

'স্যার, আপনি কি নিশ্চিত আহমদ মুসা 'স্পুটনিক মিশন' নিয়ে স্টাসবার্গ এসেছে?' বলল লাইবারম্যান উদ্বিগ্ন কন্ঠে।

'এছাড়া কোন কাজে সে স্ট্রাসবার্গ আসবে? আহমদ মুসার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, এ ধরনের মিশন নিয়ে সে বার বার বিভিন্ন জায়গায় গেছে। আর 'স্পুটনিক মিশনে'র ব্যাপারটা সফল হয়, তাহলে একদিকে মুসলিম জাতিকে তারা ইতিহাসের জঘণ্য অপরাধের দায় থেকে বাচাঁতে পারবে, অন্যদিকে আমাদের তারা আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারবে।' আজর ওয়াইজম্যান বলল।

'স্পুটনিকের সবই তো ধ্বংস হয়ে গেছে। তাছাড়া স্পুটনিকের সাত শয়তানও আমাদের হাতে। আহমদ মুসা যতই করিতকর্মা হোক, আমার বিশ্বাস খুব বেশি সামনে এগুতে পারবে না। আরেকটা বড় বিষয় হলো, স্ট্রাসবার্গ পুলিশের কাছ থেকে সে ভাল সহায়তা পাবে না।' লাইবারম্যান বলল।

লাইবারম্যানের চোখে-মুখে যতটা স্বস্তির ভাব ফুটে উঠেছিল, ততটাই অস্বস্তি প্রকাশ পাচ্ছিল আজর ওয়াইজম্যানের মুখে। তার কপাল কুঞ্চিত। অস্বস্তিকর ভাবনায় ডুবে যাওয়া তার মুখমন্ডল। লাইবারম্যান থামার পর একটু সময় নিয়ে ধীরে ধীরে সে বলল, 'স্পুটনিক অফিসের সবরকমের দলিল দস্তাবেজ আমরা ধ্বংস করেছি। কিন্তু অফিসের দলিল দস্তাবেজই যে সবটুকু এটা কে বলবে। এ সবের কপি তারা অন্যকোন নিরাপদ জায়গায় রাখবে, এটাই স্বাভাবিক। এগুলো তো আহমদ মুসা পেয়েও যেতে পারে। কারণ, স্পুটনিকের

সাথে জড়িত সব পরিবার থেকেই সে সমান সহযোগিতা পাবে।' থামল আজর ওয়াইজম্যান।

উদ্বেগে ভরে উঠেছে লাইবারম্যানের চোখ-মুখ। বলল, 'তাহলে এ দলিলগুলো তো আমাদের যে কোন মূল্যে খুঁজে পেতে হবে। সাও তোরাহে ওদের কাছ থেকে কিছু জানতে পারেননি, বলেনি কিছু তারা?' লাইবারম্যানের কন্ঠে উত্তেজনা।

'না কিছুই বলেনি। কোনওভাবেই তাদের মুখ খোলা যায়নি। যে নির্যাতনে হাতিও চিৎকার করবে, সে নির্যাতনও তারা হজম করে।' আজর ওয়াইজম্যান বলল।

'মানুষ এমন হতে পারে?' বিস্ময় লাইবারম্যানের কন্ঠে।

'তারা ভিন্ন মানুষ।' বলল ওয়াইজম্যান।

'কেমন?'

'মৃত্যুকে ওরা সাফল্যের সিংহদ্বার বলে মনে করে। সেই সাফল্যের তুলনায় এই কষ্টটা নাকি খুবই ছোট।' ওয়াইজম্যান বলল।

'তাহলে?'

'পথ একটাই, আহমদ মুসাকে সরিয়ে দেয়া।' বলল ওয়াইজম্যান।

'সেটা তো এক নাম্বার কাজ। স্পুটনিক পরিবারে কি হানা দেয়া যায় না এই দলিল দস্তাবেজের সন্ধানে?' লাইবারম্যান বলল।

'কেন, গত রাতে তো স্পুটনিকের ৭ নেতার বাড়িসহ ওদের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের বাড়ি আদ্যপান্ত সার্চ করেছ।' বলল আজর ওয়াইজম্যান।

'আচ্ছা, তাহলে এসব কাগজই কি খুঁজেছি গত রাতে? কিন্তু কিছুই তো মেলেনি!' লাইবারম্যান হতাশ কন্ঠে বলল।

'মিলবে কি এত সহজে! ওদের বৌ-বেটিকেও নিয়ে যেতে হবে সাও তোরাহতে। দেখা যাবে তারপর তাদের মুখ বন্ধ থাকে কতক্ষণ।' বলল ওয়াইজম্যান।

‘ঠিক বুদ্ধি। ওদের দেহ যতটা শক্ত, তাদের নৈতিকতা ততটাই স্পর্শকাতর। বৌ বেটির ইজ্জত যেতে দেখলে, স্রোতের মত বেরিয়ে আসবে ওদের মুখ থেকে কথা।’

বলে একটু থেমেই সে আবার বলা শুরু করল, ‘তাহলে এই কাজে আমরা দেরি করছি কেন? নির্দেশ দিন আমরা শুরু করি।’

‘না মি.লাইবারম্যান। আহমদ মুসাকে ধ্বংস করাই প্রথম কাজ। তাকে শেষ করলে, অন্য কাজ ধীরে সুস্থে করায় কোন ক্ষতি হবে না।’

এ সময় টেলিফোন বেজে উঠল লাইবারম্যানের।

টেলিফোন কানের কাছে তুলে নিল লাইবারম্যান। ওপ্রান্তের কথা শুনে সে বলে উঠল, ‘জরুরী খবর? বল বল।’

ওপারের খবর শুনল। তারপর এক ঝলক তাকাল সে ওয়াইজম্যানের দিকে এবং বলল ওপ্রান্তকে, ‘একটু হোল্ড কর, কথা বলি স্যারের সাথে।’

বলে টেলিফোন এক পাশে সরিয়ে নিয়ে ওয়াইজম্যানকে লক্ষ্য করে দ্রুতকন্ঠে বলল, ‘স্যার, আহমদ মুসা হোটেল থেকে বেরিয়েছে। সে একা একটি ট্যাক্সিতে চড়ে বিষমার্ক রোড ধরে এদিকেই এগিয়ে আসছে।’ থামল লাইবারম্যান।

লাইবারম্যান থামতেই আজর ওয়াইজম্যান বলে উঠল, ‘ওরা যারা আছে সবাইকে পিছু নিতে বল। ঈল পার্কের মোড়ে ওকে চারদিক থেকে আটকাতে হবে। এ অঞ্চলটায় মানুষের যাতায়াত খুবই পাতলা। এখানেই ওর নিপাত ঘটাতে হবে। বলে দাও আমরা আসছি।’

লাইবারম্যান সব কথা ওদের বুঝিয়ে বলে টেলিফোন রাখল।

ওয়াইজম্যান লাইবারম্যানকে লক্ষ্য করে বলল, ‘আরও যাদের দরকার তাদের বলে দাও সেখানে যেতে। দেখ, আমাদের ব্যর্থ হওয়া চলবে না। আর তৈরী হও এখনি।’

বলে ওয়াইজম্যান উঠে দাঁড়াল।

উৎসাহের সাথে উঠে দাড়াল লাইবারম্যানও।

ওয়াইজম্যান তার কক্ষের দিকে পা বাড়াতে গিয়ে পাশে ফিরে তাকিয়ে লাইবারম্যানকে বলল, 'পুলিশ কমিশনারকে কি আমাদের এই মিশনের কথা বলবে?'

'হ্যাঁ, বলল তাদের সাহায্যও পাওয়া যেতে পারে।' লাইবারম্যান বলল।

চিন্তা করছিল ওয়াইজম্যান। বলে উঠল, 'না লাইবারম্যান, পুলিশকে জড়িয়ে লাভ নেই। তাদের কারণে কোন সমস্যারও সৃষ্টি হতে পারে।'

বলে সে পুনরায় চলতে শুরু করল তার কক্ষের দিকে তৈরী হওয়ার জন্যে।

লাইবারম্যানও এগুলো তার কক্ষের দিকে।

ঈল পার্কটি স্ট্রাসবার্গ শহরের মতই পুরাতন।

পার্কটি নদীর সমান্তরালে। বিরাট জায়গা জুড়ে।

পার্কের পাশ দিয়ে রাস্তা। রাস্তার সমান্তরালে নদীর তীর ঘেঁষে মাঝে মাঝে হোটেল ও ট্যুরিস্ট ভিলায় মাঝে মাঝে রয়েছে বাগান। এ বাগানগুলো নদীর পানি পর্যন্ত নেমে গেছে।

শান্ত নিরিবিলি এলাকা। শহরের হৈ-হুল্লোড়ের বিন্দুমাত্রও এখানে নেই।

পার্কের পাশের সড়ক ধরে চলছে আহমদ মুসার গাড়ি।

আহমদ মুসার টার্গেট নগরীর মেয়র অফিস। মেয়র অফিসের রেজিস্ট্রেশন বিভাগ থেকে আহমদ মুসা একটা ঠিকানা যোগাড় করতে চায়। গতকাল বিকেলে তাড়া খেয়ে যে গাড়ি ছেড়ে ওরা পালিয়েছিল, সে আমেরিকান গাড়িটার কাগজপত্রে যে নাম ঠিকানা পাওয়া গেছে, তাতে রাস্তার নাম আছে, কিন্তু বাড়ির নাম ও নাম্বার নেই। মেয়র অফিস থেকে এই নাম নাম্বার পাওয়া যায় কিনা, সেটাই সে দেখতে চায়।

আহমদ মুসার গাড়ি চলছিল মধ্যম গতিতে।

সামনেই ঈল পার্কের একটা মোড়। মোড়টা ত্রিরাস্তার একটি সংযোগ স্থল। এই মোড় থেকে একটা রাস্তা ঈল নদীর কিনারা পর্যন্ত নেমে গেছে।

মোড়টাতেও তেমন ভীড় ও গাড়ি ঘোড়ার সমাগম নেই। তবে বেশ কিছু গাড়ি পার্ক করা আছে দেখতে পেল আহমদ মুসা। সবগুলো গাড়িরই মুখ মোড়ের দিকে। হয়তো আরোহীরা নেমে পার্কে ঢুকেছে ভাবল আহমদ মুসা।

মোড়ে প্রবেশ করল আহমদ মুসার গাড়ি।

আহমদ মুসার গাড়ি তখন মোড়ের মাঝামাঝি এসে পৌঁছেছে। হঠাৎ আহমদ মুসা বিস্ময়ের সাথে দেখল, সামনে ও বাম দিক থেকে এক জোড়া করে দুই জোড়া গাড়ি তীরবেগে এগিয়ে আসছে। প্রথমে আহমদ মুসা মনে করেছিল মোড় ঘুরে গাড়িগুলো কোন দিকে চলে যাবে। কিন্তু পরক্ষনেই তার বুঝতে বাকি রইল না গাড়িগুলো তার গাড়ি লক্ষ্য করেই পাগলা গতিতে এগিয়ে আসছে।

হঠাৎ করেই ব্রেক কষেছে আহমদ মুসা তার গাড়ি। সামনে এগুনো যায় না, বামেও না। আর ডাইনে পার্কের দেয়াল। পেছনে হটা ছাড়া পথ নেই।

কিন্তু পেছনে হটতে গিয়ে রিয়ারভিউতে চোখ পড়তেই দেখল, পেছন থেকে আর এক জোড়া গাড়ি সেই একই গতিতে তার দিকে এগিয়ে আসছে।

গাড়িতে আবার ব্রেক কষে গাড়ি থেকে আহমদ মুসা বেরোতে যাবে এমন সময় তিন দিক থেকে বৃষ্টির মত গুলী শুরু হলো।

তিন দিকের গুলির বৃষ্টি এসে ছেঁকে ধরল তার গাড়িকে। গাড়ির সামনে ও পেছনের উইন্ড স্ক্রিন ও সব জানালা মুহূর্তেই উড়ে গেল। ঝাঁঝরা হতে লাগল গাড়ি।

হোটেল থেকে ভাড়ায় আনা গাড়িটার জন্যে কষ্ট লাগল আহমদ মুসার। গাড়ির মেঝেয় শুয়ে নিজের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করল।

পাল্টা আক্রমনের কোন সুযোগ পেল না আহমদ মুসা। তিন দিকের অবিরাম গুলিবৃষ্টির মধ্যে মুহূর্তের জন্যেও মাথা তোলার কোন সুযোগ নেই। আর একটা মাত্র রিভলবার দিয়ে সে সামলাবে কোন দিকে।

হঠাৎ গুলীবর্ষণ তিন দিক থেকেই থেমে গেল। কি ব্যাপার? মুখ ঘুরিয়ে চোখ উপরে তুলল আহমদ মুসা। দেখল, চারদিক থেকেই ছয়টি স্টেনগানের নল প্রবেশ করেছে আহমদ মুসার গাড়ির মধ্যে।

আহমদ মুসা গাড়ির মেঝে থেকে উঠে বসল। শান্ত স্বাভাবিক কন্ঠে বলল, 'কি ব্যাপার? কে তোমরা? এভাবে কেন আমাকে আক্রমন করেছ, আমার গাড়ি ধ্বংস করেছ?'

'বাঃ আহমদ মুসা বাঃ! ছয় ছয়টি স্টেনগানের মুখে দাঁড়িয়েও এমন স্বাভাবিক কন্ঠে কথা বলতে পার তুমি?' বলল সাড়ে ছয় ফুট লম্বা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও নেতা গোছের একজন লোক।

বলেই সে একজনকে নির্দেশ দিল, 'ওকে বের করে আন।'

তাদের পেছন থেকে আরও দু'তিন জন লোক ছুটে এল। তাদের একজন টান দিয়ে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া একটা দরজা খুলে ফেলল।

দু'জনে হিড় হিড় করে টেনে আহমদ মুসাকে গাড়ি থেকে বের করল এবং শুইয়ে দিল রাস্তায়।

সাড়ে ছয় ফুট লম্বা সেই লোকটি এগিয়ে এল আহমদ মুসার কাছে। বলল, 'ওয়েলকাম আহমদ মুসা। গত দুদিন ছিল তোমার, আজ তৃতীয় দিনটা আমাদের এবং এই তৃতীয় দিনটাই ফাইনাল। তোমাকে হত্যা করতেই চেয়েছিলাম। কিন্তু দেখলাম, তোমার পেটের অনেক কথা তাহলে চিরদিনের জন্যে হারিয়ে যাবে। সে কথাগুলো আমাদের খুবই দরকার। এ জন্যেই এখনও তুমি প্রাণে বেঁচে আছ।'

'আমার সৌভাগ্য।' বলল আহমদ মুসা লোকটির দিকে তাকিয়ে। এই সাথে ভাবল আহমদ মুসা, এই লোকটিই কি স্পুটনিক ধ্বংসের নেতা? নেতা না হলে নেতা গোছের যে কেউ হবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

'সৌভাগ্য নয়, প্রমাণ হবে এটাই চরম দুর্ভাগ্য, যখন যাবে 'সাও তোরাহ'তে। আলেকজান্ডার সোলঝেনিৎসিনের 'গুলাগ'টা কাল্পনিক ছিল, ঈশ্বরের এই 'গুলাগ' কিন্তু কাল্পনিক নয়।'

'ঈশ্বরের কোন 'গুলাগ' থাকে না মি.। তাঁর আছে জাহান্নাম।' আহমদ মুসা বলল।

'হ্যাঁ 'গুলাগ' না বলে 'জাহান্নাম'ও একে বলতে পার। কারণ এখানেও লোক ঢোকে, কিন্তু বের হয় না।' বলল সেই সাড়ে ছয় ফুট লম্বা লোকটা।

‘দুনিয়ার সাজা নকল ঈশ্বরদের জাহান্নাম সম্পর্কে এ দাবী করা যায় না মি.।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমরা দুনিয়ার ঈশ্বর নই, অধীশ্বর আহমদ মুসা। জাহান্নাম সম্পর্কে ঐ কথা বলছ? ঠিক আছে তোমাকে দিয়েই তার প্রমাণ হবে, তুমি দেখতে পাবে।’

বলেই লোকটি যারা আহমদ মুসাকে টেনে বের করেছিল, তাদের একজনকে লক্ষ্য করে বলল, ‘একে ক্লোরোফরম লাগাও।’

সংগে সংগেই লোকটি এগিয়ে এল।

আহমদ মুসার কাছে এসে পকেট থেকে বের করল ক্লোরোফরম স্প্রেয়ার।

আহমদ মুসাও তাকাল ক্লোরোফরম স্প্রেয়ার কনটেইনারের দিকে। দেখেই চিনল ওটা ভয়ংকর ধরনের একটা ক্লোরোফরম। এ ক্লোরোফরম দিয়ে কাউকে অজ্ঞান করলে দশ বারো ঘন্টার আগে তার জ্ঞান ফেরে না। এর কার্যকারিতাও অত্যন্ত দ্রুত। কারো নাকে স্প্রে করার দুই তিন সেকেন্ডের মধ্যে সে সম্পূর্ণ জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। আবার এর আরেকটা গুণ হলো, কোথাও এটা স্প্রে করলে তিন চার গজের মধ্যে কেউ থাকলে সেও জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। সুতরাং এটা যে ব্যবহার করে তাকে একটা ছোট গ্যাস মাস্ক পরতে হয়। তবে এর একটা অসুবিধা রয়েছে। সেটা হলো, এর সংজ্ঞাহীন করার কার্যকারিতা স্প্রে করার এক মিনিটের বেশি স্থায়ী হয় না।

লোকটি ক্লোরোফরম স্প্রেয়ার হাতে নেয়ার সাথে সাথে নাকে গ্যাস মাস্কও পরে নিয়েছে।

গ্যাস মাস্কের ট্রিগারে তার তর্জনি স্থাপন করল লোকটি।

আহমদ মুসাকে ঘিরে রাখা স্টেনগানধারীরা তাদের স্টেনগান আহমদ মুসার দিকে উদ্যত রেখেই ওরা চার পাঁচ গজ দূরে সরে গেল।

আহমদ মুসাকে চিৎ করে শুইয়ে রাখা হয়েছে।

লোকটি স্প্রে করতে লাগল আহমদ মুসার নাকে। প্রায় পাঁচ সেকেন্ড সে স্প্রেটা ধরে রাখল আহমদ মুসার নাকের উপর।

পাঁচ সেকেন্ড স্প্রে করার পর স্প্রে বন্ধ করে সে দু'তিন সেকেন্ড অপেক্ষা করল। তারপর হঠাৎ আকষ্মিকভাবে সে লোহার স্পাইকওয়ালা জুতার গোড়ালী দিয়ে প্রচন্ড এক ঘা দিল আহমদ মুসার বাম হাতের তালুতে। আহমদ মুসার দেহ নড়ল না, হাতও নয়। শুধু মুখ থেকে অস্ফুট 'আ....আ' শব্দ বেরিয়ে এল। তার গলার স্বরটা ঘুমিয়ে পড়ছে এমন মানুষের কন্ঠস্বরের মত শোনাল।

লোকটি আবার সেকেন্ড খানেক সময় নিয়ে আহমদ মুসার নাকে স্প্রে করল।

তারপর সেকেন্ড দেড়েক অপেক্ষ করে আগের মত লোহার স্পাইক দেয়া গোড়ালি দিয়ে আকষ্মিকভাবে প্রচন্ড এক আঘাত করল আহমদ মুসার পায়ের পাতায়।

কিন্তু এবার আর আহমদ মুসার মুখ দিয়ে কোন শব্দ বেরুল না।

'ধন্যবাদ জ্যাকব, তোমার কাজ শেষ। এখন তুমি ওকে টেনে নিয়ে লাইবারম্যানের মাইক্রোটার কাছে চল।' বলল সেই সাড়ে ছয়ফুট লম্বা লোকটি ক্লোরোফরম স্প্রে করা 'জ্যাকব' নামক লোকটিকে লক্ষ্য করে।

জ্যাকব আহমদ মুসাকে টেনে নিয়ে এল লাইবারম্যানের মাইক্রোর কাছে।

লোকটি এখানে পৌঁছে তার নাক থেকে গ্যাস মাস্ক খুলে ফেলল।

সবাই সেখানে এল।

সেই সাড়ে ছয়ফুট লম্বা লোকটিও।

সে বলল লাইবারম্যানকে লক্ষ্য করে, 'লাইবারম্যান, মিশন সফল। পূর্ণ সফল হবে যখন একে 'সাও তোরাহ'তে নিয়ে খাঁচায় পুরতে পারব। এর জন্যে সেখানে একটা সোনার খাঁচা তৈরী করব। অন্য খাঁচায় একে মানায় না।'

বলে একটু থেমে লাইবারম্যানকে লক্ষ্য করে আবার বলে উঠল, 'আহমদ মুসাকে নিয়ে তোমার মাইক্রোর মেঝেতে শুইয়ে দাও। আরও চারজন স্টেনগানধারীকে নাও তোমার মাইক্রোতে। সে দশ বারো ঘন্টার আগে জাগবে না। তবু সাবধান থাকবে। নিয়ে গিয়ে হাত পা বেঁধে খাঁচায় ফেলে রাখবে। আমি 'রাইন ইন্টারন্যাশনাল হোটেল' হয়ে ঘাঁটিতে ফিরব।

‘রাইন ইন্টারন্যাশনাল হোটেলে কেন মি.আজর ওয়াইজম্যান?’ বলল লাইবারম্যান।

‘আহমদ মুসার নতুন রুম কোনটি, তার হ্যান্ডব্যাগসহ তার লাগেজ কোথায় সে সব খোঁজ নিয়ে আসব। ওগুলো হাত করার ব্যবস্থা করতে হবে। যে ডকুমেন্টগুলো আমি খুঁজছি তা আহমদ মুসার কাছে থাকার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি। সাত গোয়েন্দার অসমাপ্ত কাজ এর পক্ষেই করা সম্ভব। দেখা যাক, এর কাছে ঐ সব কোন কিছু তথ্য পাওয়া যায় কিনা।’ বলল সাড়ে ছয় ফুট লম্বা আজর ওয়াইজম্যান লোকটি।

‘ঐ ছুঁড়ি-ছোঁড়া দু’জনের কি করা যায়?’ লাইবারম্যান বলল।

‘ওরা জিরো। ওদের গায়ে হাত দিয়ে খামাখা কেন পুলিশের ঝামেলায় পড়তে যাবে?’ বলল ওয়াইজম্যান।

‘ঠিক আছে স্যার।’ লাইবারম্যান বলল।

কথা শেষ করেই লোকজনের দিকে চেয়ে বলল, ‘তোমরা আহমদ মুসাকে আমার মাইক্রোতে তোল। আর স্টেনগানওয়ালা চারজন ওঠ আমার গাড়িতে।’

বলে লাইবারম্যান এগুলো তার গাড়িতে ওঠার জন্যে।

ওয়াইজম্যানও এগুলো তার কারের দিকে।

অল্পক্ষনের মধ্যেই এলাকাটা ফাঁকা হয়ে গেল। শুধু পড়ে থাকল আহমদ মুসার ভাড়া করে আনা ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া গাড়িটা।

চলছে লাইবারম্যানের মাইক্রোবাসটি। গাড়ির মেঝের উপর উপুড় হয়ে আছে আহমদ মুসা।

তার পাশেই গাড়ির সিটে পাশপাশি বসে আছে চারজন লোক।

আর গাড়ির ফ্রন্ট সিটে বসে আছে লাইবারম্যান। তার পাশে ড্রাইভিং সিটে আরেকজন ড্রাইভ করছে গাড়ি।

স্টেনগানধারী একজন তার জুতা দিয়ে আহমদ মুসার গায়ে টোকা দিয়ে বলল, ‘ব্যাটা নাকি খুব সাংঘাতিক। কিন্তু আমাদের বুদ্ধির কাছে কুপোকাত!এমন ফাঁদে ফেলা হয়েছে যে, কিছুই করতে পারল না।’

‘আমাদের দু’জন লোক মেরেছে গত রাতে এই লোক। মজা করে শোধ নেয়া যাবে।’ বলল তার পাশের আরেকজন স্টেনগানধারী।

‘কি শোধ নেবে, এতো দেখছি লিকলিকে ছেলে মানুষ। এর সম্পর্কে শোনা কথাগুলো আমার খুব বিশ্বাস হয় না।’ বলল আরেকজন।

‘একে আমার কোথায় নিচ্ছি, শার্লেম্যানের ৫নং বাড়িতে, না বড় বসের ফ্ল্যাটে?’ চতুর্থজন বলে উঠল।

‘কেন বলছ একথা?’ প্রথমজন বলল।

‘শোধ তোলার কথা বলছ তাই। ফ্ল্যাটে নিলে তো সেখানে আমাদের শোধ নেয়া যাবে না।’ চতুর্থজন উত্তর দিল।

‘চিন্তা করো না, তোমাদের সব ইচ্ছা পূরন হবে। তোমরা যেখানে চাচ্ছ সেখানেই নেয়া হবে।’ বলল লাইবারম্যান।

তাদের এই সব গল্প কথা চলতেই থাকল।

আহমদ মুসা সবই শুনছিল। ক্লোরোফরম তাকে সংজ্ঞাহীণ করতে পারে নি। ক্লোরোফরম স্প্রে করার সময় থেকে পাকা দেড় মিনিট সে নিঃশ্বাস বন্ধ করে ছিল। তাকে গাড়ির দিকে টেনে নেয়ার সময় যখন সে নিঃশ্বাস নিয়েছে, তখন ক্লোরোফরম এর কার্যকারিতা শেষ।

সংজ্ঞাহীন হওয়ার ভান করতে গিয়ে তাকে দারুণ কষ্ট করতে হয়েছে। জুতার লোহার স্পাইকওয়ালা গোড়ালী দিয়ে তার হাতের তালুতে আকস্মিক এমন আঘাত করেছে যে চুপ করে থাকা অসম্ভব। আহমদ মুসা ধৈর্য্যের সব শক্তি একত্রিত করে চুপ থেকেছে শুধু একটা ক্ষীণ ‘আহ’ শব্দ করার মাধ্যমে। এটুকু শব্দ আহমদ মুসা ইচ্ছা করেই করেছে এটা প্রমাণ করার জন্যে যে, আহমদ মুসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছে। পায়ের তালুতে দ্বিতীয় আঘাতও তাকে হজম করতে হয়েছে কোন শব্দ না করে।

তাদের গল্পের মাঝে আহমদ মুসা একবার পলকের জন্যে চোখ খুলল। তার ভাগ্য ভাল যে উপুড় অবস্থায় তার মুখ স্টেনগানধারীদের দিকে ফেরানো ছিল। ফলে পলকটুকুতেই দেখতে পেল তার পাশেই গাড়ির সিটে বসা চারজনকে। তাদের পাগুলো আহমদ মুসার গা প্রায় স্পর্শ করে আছে। তাদের

একজনের স্টেনগানটা কোলে। অন্য তিনজনের স্টেনগান মাটিতে রেখে ব্যারেল কোলে ঠেসে দেয়া। একজনের স্টেনগানের গোড়া আহমদ মুসার ডান বাহু স্পর্শ করে আছে।

আহমদ মুসা হিসেব কষল, সামনে থেকে লাইবারম্যানের এ্যাকশনে আসতে কতক্ষন সময় নেবে? এর মধ্যে সে কি পেছনটা নিকেশ করতে পারবে? কিন্তু এছাড়া তো উপায় নেই।

মসৃণ রাজপথের উপর দিয়ে মাইক্রোটা চলছিল তীরের বেগে।

চোখ দুটি আহমদ মুসা আবার অর্ধ নির্মিলিতের মত খুলে স্টেনগানের বাটটা আবার দেখে নিল।

তারপর চোখের পলকে আহমদ মুসা বাট ধরে স্টেনগানটা টেনে নিয়েই দেহটা ঘুরিয়ে চিৎ হয়ে গেল।

ওদের চারজনেরই চোখ পড়ে গিয়েছিল আহমদ মুসার উপর। কিন্তু ভুত দেখার মত আৎকে উঠেছিল সবাই। তাদের এই আৎকে ওঠার ভাব তারা কাটিয়ে ওঠার আগেই আহমদ মুসার হাতের স্টেনগান ওদের চারজনের উপর দিয়ে ঘুরে এল।

কি রেজাল্ট হয়েছে না দেখেই শোয়া অবস্থাতেই মুখটা ডানদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে স্টেনগান তাক করলো লাইবারম্যানকে।

চেয়ারের আড়ালে সে। তবু তার চেয়ারের ডানপাশ দিয়ে তার শরীরে ডান পাশের কিছু দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আহমদ মুসার হাতে নিখুঁত টার্গেট নেবার সময় ছিল না। সঠিক লক্ষ্যেই আহমদ মুসার স্টেনগান থেকে গুলির ঝাঁক বেরিয়ে গেছে।

গুলি করেই আহমদ মুসা উঠে দাড়াল। গাড়ি কিন্তু ছুটে চলছে তীর বেগেই।

আহমদ মুসার হাতের স্টেনগান তাক করা ড্রাইভারের দিকে। বলল, 'ড্রাইভার, সামনে গাড়ি দাঁড় করাও। মনে রেখ দ্বিতীয়বার বলব না, গুলী করব।'

বলার সংগে সংগেই ড্রাইভার গাড়ির লেন চেঞ্জ করে রাস্তার কিনারে নিয়ে গেল। কয়েক গজ গিয়েই গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল।

আহমদ মুসা হাতের স্টেনগানটা গাড়ির পেছনে ছুঁড়ে দিয়ে দরজা খুলে নামতে নামতে বলল, 'ড্রাইভার, এখনি এদের কোন ক্লিনিকে নিলে এদের কেউ কেউ বেঁচে যেতে পারে।'

কথা শেষ হবার আগেই আহমদ মুসা গাড়ি থেকে নেমে পড়েছিল।

আহমদ মুসা গাড়ি থেকে নেমে ওখানেই দাড়িয়ে থাকল। মাইক্রোটি চোখের আড়ালে চলে যাবার পর একটা ট্যাক্সি ডেকে তাতে উঠে বসতে বসতে বলল, 'হোটেল রাইন ইন্টারন্যাশনাল'।

হোটেল রাইন ইন্টারন্যাশনাল যাওয়ার কথা আহমদ মুসা বলল বটে, কিন্তু পরে চিন্তায় এল, ওদের বড় বস আজর ওয়াইজম্যান তো হোটেল রাইনেই গেছে। সে সেখানে কি করবে, কি বলবে কে জানে!হুট করে হোটেলে যাওয়া তার ঠিক হবে কিনা। কিন্তু হোটেলে না গেলে সে যাবে কোথায়? সে যে লাইবারম্যানদের হাত থেকে মুক্ত হয়েছে একথা আজর ওয়াইজম্যান এখনি জানতে পারবে। জানতে পারার সংগে সংগে সে নিশ্চয় এবার পুলিশকে লেলিয়ে দেয়ার ব্যাপারে তৎপর হবে। এই সাথে ওয়াইজম্যানরাও আরও মরিয়া হয়ে উঠবে। এই অবস্থায় খোঁজ খবর না নিয়ে হোটেলে প্রবেশ করা তার জন্যে ঠিক হবে কিনা। তাছাড়া হোটেলের টুরিস্ট সেকশনের যে গাড়ি সে ভাড়ায় নিয়ে গিয়েছিল, সেটা কোথায় এ প্রশ্নও উঠবে। গাড়ি হারিয়ে গেছে এ কথাও বলা যাবে না, আবার যে হাল হয়েছে গাড়ির সেটাও বলা যাবে না। কারণ তাতে অনেক প্রশ্ন উঠবে, যার জবাব সে দিতে পারবে না।

এসব চিন্তার মধ্যেই আহমদ মুসা পৌঁছে গেল হোটেলের কাছে। সে ঠিক করল হোটেলে না গিয়ে আপাতত সে গীর্জার সামনে নেমে যাবে।

গীর্জার পার্কিং এ নেমে পাশের একটা গাড়ির দিকে তাকাতেই খুশি হয়ে উঠল আহমদ মুসা। দেখল, ফাতিমা ও যায়েদ একটা গাড়িতে বসে।

ওদের দেখে খুশি হওয়ার পরক্ষনেই আবার চিন্তিত হয়ে পড়ল আহমদ মুসা। ফাতিমারা হোটেলের বদলে গীর্জার পার্কিং এ কেন? হোটেলে কি কিছু ঘটেছে?

আহমদ মুসা এগুলো ওদের দিকে।

ওরাও দেখতে পেয়েছে আহমদ মুসাকে।

ওরা ছুটে এল আহমদ মুসাকে দেখে।

ওদের মুখে এ সময় যে হাসিটা থাকা স্বাভাবিক সেটা নেই।

ওদের এই অবস্থা দেখে আহমদ মুসাও হাসতে পারল না।

ওরা কাছে আসতেই আহমদ মুসা বলল, 'কি ব্যাপার, তোমরা এখানে? ভাল আছো তো?'

আহমদ মুসার জিজ্ঞাসার কোন জবাব না দিয়ে ফাতিমা ও যায়েদ এক সাথে বলে উঠল, 'আপনি সুস্থ আছেন, আপনি ভাল আছেন তো ভাইয়া?' তাদের কন্ঠে উদ্বেগ।

'তোমরা একথা বলছ কেন? উদ্বিগ্ন কেন তোমরা এত?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'ভাইয়া আপনাকে ওরা ধরে নিয়ে যায়নি?' বলল যায়েদ চোখ কপালে তুলে।

'হ্যাঁ গিয়েছিল। মুক্ত হয়ে আসলাম। কিন্তু তুমি জানলে কি করে?'

'এই তো ক'মিনিট আগে আমি আসার সময় ঈল পার্কের মোড়ে আপনার গাড়ি ঝাঁঝরা অবস্থায় দেখলাম। আমি গাড়ির নাম্বার দেখে চিনতে পারি ও গাড়ি থেকে নেমে পড়ি। জিজ্ঞেস করে সেখানে জড়ো হওয়া লোকদের একজনের কাছে শুনলাম, ছয় সাতটা গাড়ি এ গাড়িটাকে ঘিরে ফেলে বিরামহীন মেশিনগানের গুলী চালিয়ে গাড়ির এ হাল করেছে। এ গাড়ি থেকে একজনকে বের করে ঐ গাড়িওয়ালারা ধরে নিয়ে গেছে। কি ঘটেছিল ভাইয়া, কি করে আপনি মুক্ত হলেন?' বলল যায়েদ।

আহমদ মুসা সংক্ষেপে ঘটনাটা ওদের বলল। ঘটনা শুনে ওদের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। বলল ফাতিমা, 'ভাইয়া মাত্র ১২ ঘন্টার মধ্যে আপনি দ্বিতীয়বার জীবন পেলেন।'

তারপর যায়েদ ও ফাতিমা দু'জনেই হাত উপরে তুলে বলল, 'আলহামদুলিল্লাহ। হে আল্লাহ, আমাদের ভাইয়ার বুদ্ধি, শক্তি, সাহস আরও বাড়িয়ে দিন। এ ধরনের সব বিপদেই তিনি যেন জয় করতে পারেন।'

তারা থামতেই আহমদ মুসা বলল, 'তোমরা এখানে কি করছ? ঐ শয়তানদের একজন নেতা আজর ওয়াইজম্যান তো হোটেলে আসার কথা আমার রুমের খোঁজ খবর নেবার জন্যে!'

'সে এসেছিল এবং খোঁজ নিতে আপনার কক্ষেও ঢুকেছিল। সে যখন কাউন্টারে কথা বলছিল, তখন আমি কাউন্টারের পাশে ছিলাম। সব আমি শুনি এবং তাকে ফলো করি। তার ছবিও আমি নিয়েছি। যেভাবে অথরিটির সাথে সে কথা বলছিল এবং কাজ করছিল, তাতে আমার মনে হয়েছে সে ষড়যন্ত্রকারীদের একজন বড় কেউ হবেন। যাই হোক, তার কথা শুনে আমি বুঝে যে, আপনার কোন বিপদ হয়েছে। সেজন্যে হোটেলের লবিতে বসেই আমি যায়েদের অপেক্ষা করি। সে এলে তার কাছে সব শুনে গাড়ি নিয়ে আমরা হোটেল থেকে সরে এসে এখানে অপেক্ষা করি। আমাদের ভয় হচ্ছিল আপনাকে হস্তগত করার পর আমাদের কক্ষেও ওরা হানা দেবে।' বলল ফাতিমা কামাল।

'দিতে পারে। কারণ তারা যে জিনিস খুঁজছে তা আমার সুটকেসে পায়নি। আমার হ্যান্ডব্যাগ ও তোমাদের ব্যাগেজ দেখার জন্যে তোমাদের কক্ষেও হানা দিতে পারে।' আহমদ মুসা বলল।

'কি খুঁজছে ভাইয়া ওরা?' বলল যায়েদ।

'স্পুটনিকের গোয়েন্দারা নিউইয়র্কের টুইন (লিবার্টি ও ডেমোক্রাসি) টাওয়ার ধ্বংসের প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে যে দলিল দস্তাবেজ যোগাড় করেছিল, সে সবেরই কতকগুলো বা কোনটি সম্ভবত তারা খুঁজছে। লা-মন্ডের রিপোর্টে গোয়েন্দা অপহরণ করার কারণ হিসাবে এ ধরনের কিছুকেই সন্দেহ করা হয়েছিল। আজ আজর ওয়াইজম্যানের মুখেও এ ধরনের কথাই শুনেছি।' আহমদ মুসা বলল।

'ভাইয়া, আপনি ওদের জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার পর ওরা নিশ্চয় দারুণ ক্ষেপে গেছে। এই অবস্থায় হোটেল আপনার জন্যে আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে, আমাদের জন্যেও। কি করা যায় এখন। বাড়ি একটা পেয়েছি। ভাড়া একটু বেশি হলেও আপনি যেমন চেয়েছিলেন, সেরকমই বাড়িটা। বাড়িটাতে কালকে উঠলে ভাল হয়, 'তবে আজকেও উঠা যায়।' বলল যায়েদ।

'আমরা এখনি হোটেল ছেড়ে দেব। আমি ও যায়েদ গিয়ে উঠব ভাড়া করা বাড়িতে। আর ফাতিমা উঠবে আপাতত তার আত্মীয়ের বাড়িতে।' আহমদ মুসা বলল।

ম্লান হয়ে গেল ফাতিমা কামালের মুখমন্ডল। পরক্ষনেই লজ্জায় ছেয়ে গেল তার মুখ। ফুটে উঠল ঠোঁটে লজ্জা মিশ্রিত হাসি। বলল, 'ভাইয়া, আপনার জন্যে আরও কিছু খবর আছে। কামাল সুলাইমান ভাইয়ার বাসা থেকে অল্পক্ষন আগে জানিয়েছে, আজ বাদ আসর স্ট্রাসবার্গ মসজিদ কম্যুনিটি হলে দু'পক্ষই বিয়ের আয়োজন করার ব্যাপারে রাজী। আপনার মত পেলেই এটা চূড়ান্ত হবে।'

আহমদ মুসার মুখে ফুটে উঠল মিস্টি হাসি। বলল, 'ওয়েলকাম বোন। আমার আগের কথা বাতিল। তুমিও আজ যায়েদের সাথে ভাড়াবাড়িতে উঠবে। ওদের বলে দাও। শুভস্য শীঘ্রম।'

'ধন্যবাদ ভাইয়া।' মুখ নত করে বলল ফাতিমা কামাল।

আহমদ মুসার মুখে সংকোচ জড়িত এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'ফাতিমা, যায়েদ, মনে করতে পারো আমি তোমাদের উপর অন্যায় চাপিয়ে দিয়েছি। ভাবতে পার যে, তোমাদের ইনটিগ্রিটিকে আমি সন্দেহ করছি। আমি.........'।

আহমদ মুসার কথায় বাধা দিয়ে ফাতিমা কামাল বলে উঠল, 'ভাইয়া আপনার কথা ঠিক নয়। আপনি আমাদের সত্যিকার অভিভাবকের কাজ করেছেন। আপনি আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন, আমরা আমাদের অল্পই জানি, স্রষ্টা জানেন সবটুকুই। সুতরাং আমাদের জন্যে তাঁর নির্দেশই চূড়ান্ত।' ফাতিমার কন্ঠ আবেগাপ্লুত ও দৃঢ়।

'ধন্যবাদ বোন', বলে একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর বলল, 'চল হোটেলের বিল চুকিয়ে আমরা চলে আসি।'

আহমদ মুসাসহ ওরা দু'জন আবার গিয়ে গাড়িতে বসল।

গাড়ি চলতে শুরু করল হোটেলের দিকে।

'ভাইয়া, আমরা হোটেল থেকে বেরিয়ে কোথায় যাচ্ছি?' বলল ফাতিমা কামাল।

‘বাদ আসরের অনুষ্ঠান পর্যন্ত তুমি তোমার ভাইয়া কামাল সুলাইমানের বাড়িতে থাকবে। আমি যায়েদকে নিয়ে ভাড়া বাড়িতে উঠব। যায়েদ বাসায় উঠে বাড়ি গুছাবে। আর আমি পরবর্তী অভিযানের জন্যে কিছু খোঁজ-খবর নেয়ার চেষ্টা করব।’

‘কি অভিযান?’ জিজ্ঞেস করল ফাতিমা।

‘ও কথা এখন থাক। পরে বলব।’ বলল আহমদ মুসা।

গাড়ি প্রবেশ করল হোটেলের কার পার্কিং এ।

সত্যিই আহমদ মুসা যেমন চেয়েছিল, সে রকমই বাড়িটা।

আহমদ মুসার কক্ষটি বেশ বড়। এটাচড বাথ। কক্ষ থেকে ফ্ল্যাটের বাইরে বেরুবার ইন্ডিপেনডেন্ট প্যাসেজ। অন্যদিকে দুটি বেডরুম আর একদিকে গেস্টরুম নিয়ে ফাতিমা যায়েদদের অংশ। আহমদ মুসার কক্ষ থেকে ডাইনিং ড্রইং এ প্রবেশের একটা দরজা রয়েছে। এই দরজা বন্ধ থাকলে ফ্ল্যাটের দুই অংশ বলা যায় আলাদাই হয়ে পড়ে। দরজাটা দুই দিক থেকেই বন্ধ করা যায়। সিদ্ধান্ত হয়েছে দরজাটা দুই দিক থেকেই বন্ধ রাখা হবে। দুই পক্ষের কারও প্রয়োজন হলে নক করে দরজা খুলতে হবে। ফ্ল্যাট থেকে বাইরে বেরুবার জন্য ফাতিমা-যায়েদদের প্যাসেজও আলাদা।

নতুন দম্পতি হিসেবে ফাতিমা ও যায়েদ ফ্লাটে উঠেছে মাগরিবের নামাজের আধা ঘন্টা আগে। স্ট্রাসবার্গ মসজিদ কম্যুনিটি হলে তাদের বিয়ের অনুষ্ঠানটি হয়েছে খুবই সুন্দর, কিন্তু সংক্ষিপ্ত। স্ট্রাসবার্গের পনেরটি মুসলিম পরিবার যোগ দিয়েছিল এই বিয়ের অনুষ্ঠানে। বিয়ের পর ফাতিমা ও যায়েদের আত্মীয় স্বজনরা তাদেরকে ফ্ল্যাটে তুলে দিয়ে গেছে।

রাত ১১টা। আহমদ মুসা নক করল ফাতিমা-যায়েদদের অংশে ঢোকার পার্টিশন ডোরে।

খুলে গেল দরজা।

দরজা খুলে দিয়েছে যায়েদ।

আহমদ মুসা সালাম দিল যায়েদ ও ফাতিমা দুজনকে।

ফাতিমা কামাল বসেছিল সোফায়।

আহমদ মুসা দরজায় এসে সালাম দিতেই সালামের জবাব দিয়ে উঠে দাড়াল ফাতিমা। আরও বলল, 'ওয়েলকাম ভাইয়া।'

বিয়ের পোশাকটা নেই ফাতিমা কামালের পরনে। কিন্তু যে পোশাক পরেছে তাতেও তাকে নববধুই লাগছে। ফুলহাতা কামিজ তার পা পর্যন্ত নেমেছে। মাথার রুমাল কপাল ঢেকে গলা জড়িয়ে বুক পর্যন্ত নেমে এসেছে। ফাতিমা কামালের শ্বেতাভ গোলাপী দেহে গোলাপী এই পোশাক তাকে অপরূপ করে তুলেছে।

নত দৃষ্টিতে আহমদ মুসা যায়েদের সাথে গিয়ে সোফায় বসল।

ফাতিমা কামালও বসল।

যায়েদ গিয়ে বসেছে ফাতিমার পাশে। আর আহমদ মুসা তাদের সামনের আরেকটি সোফায়।

ফাতিমার চোখে মুখে লজ্জার ছাপ। লাল হয়ে উঠেছে মুখ।

যায়েদও অনেকটাই বিব্রত।

প্রথম নিরবতা ভাঙল আহমদ মুসাই। বলল, 'নতুন সংসার, কোন অসুবিধা নেই তো তোমাদের?'

'আলহামদুলিল্লাহ। কোন অসুবিধা নেই ভাইয়া।' বলল যায়েদ। তার মুখে সলজ্জ হাসি।

'ভাইয়া, আমরা তো জানি না, আপনি কি বাইরে বেরিয়েছিলেন? ফিরলেন এখন?' বলল ফাতিমা।

'না তো, কোথাও বের হইনি? কেন বলছ এ কথা?' আহমদ মুসা বলল।

'বাইরের পোশাক আপনার পরনে।' বলল ফাতিমা।

'ও' বলে হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'বাইরে বের হইনি, বের হবো। সে কথাই তোমাদের বলতে এসেছি।' আহমদ মুসা বলল।

‘এই রাত ১১টায় বাইরে বেরুবেন? কোথায়?’ বলল ফাতিমা ও যায়েদ একই সাথে। তাদের কন্ঠে বিস্ময়।

‘বলেছিলাম তো এক অভিযানে বেরুতে হবে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কোথায়?’ বলল যায়েদ।

‘ওদের একটা আস্তানার সন্ধান পেয়েছি। আমি যখন সংজ্ঞাহীন হওয়ার ভান করে ওদের গাড়ির মেঝেতে পড়েছিলাম, তখন ওদের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে আমি ওদের একটা ঘাঁটির ঠিকানা পেয়ে যাই। সেখানেই যাব। দেখি, ওদের পরিচয়, পরিকল্পনা এবং অপহৃত সাতজনকে কোথায় রেখেছে-এসব ব্যাপারে কোন তথ্য উদ্ধার করা যায় কিনা।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আজই একটা বড় ঘটনা ঘটেছে। ওরা সাংঘাতিক ক্ষেপে আছে আপনার উপর। এই অবস্থায় এত রাতে আপনার একা তাদের ঘাঁটিতে যাওয়া ঠিক হবে না।’ বলল ফাতিমা দৃঢ় প্রতিবাদের কন্ঠে।

‘না ফাতিমা। শত্রুকে আঘাত করার পর শত্রু পাল্টা আঘাত করার আগেই যদি তাকে আবার আঘাত করা যায়, তাহলে শত্রুকে তাড়াতাড়ি কাবু করা যায়। আজ ওরা যে আঘাত খেয়েছে, তার পাল্টা আঘাতের চিন্তায় ওরা এখন ব্যস্ত। নতুন আঘাত আসতে পারে এটা তারা ভাবছে না এবং আত্মরক্ষারও কোন চিন্তা তাদের মাথায় নেই। সুতরাং এটা একটা বড় সুযোগ।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আপনার সাথে যুক্তিতে পারবো না ভাইয়া। আপনার এই যুক্তির জবাবে কি বলতে হবে আমার জানা নেই। কিন্তু আমি যেটা জানি, সেটা হলো আপনার একা ঐ শত্রুপুরীতে যাওয়া ঠিক নয়’।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘এসব অভিযান দল বেধে হয় না ফাতিমা। দলবল নিয়ে গেলে শত্রুদের আগাম জেনে ফেলার সম্ভাবনা থাকে। তাতে লোকক্ষয় হলেও লক্ষ্য অর্জন হয় না। এ জন্যে একা যাওয়াটাই নিরাপদ ও ফলপ্রসু’।

‘কিন্তু একা গিয়ে যদি আপনি বিপদে পড়েন, কোন সাহায্যের যদি আপনার দরকার হয়? না ভাইয়া, আপনার একা যাওয়া হবে না’। বলল ফাতিমা।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘সবচেয়ে বড় সাহায্যদাতা যিনি, তিনি তো সাথেই আছেন। তিনিই সাহায্য করবেন ফাতিমা। আমাদের তার উপরই নির্ভর করা উচিত’।

‘আল্লাহর কথা বলছেন ভাইয়া? তিনি তো আছেনই। তিনি অবশ্যই সাহায্য করবেন। কিন্তু তিনিই তো শত্রু মোকাবিলায় আমাদের উপযুক্ত প্রস্তুতি নিতে বলেছেন। কিন্তু আপনি তা করেছেন না ভাইয়া’। বলল ফাতিমাই।

‘আমার সাধ্য যা সেভাবেই আমি প্রস্তুতি নিয়েছি ফাতিমা। বলতে পার, লোক সাথে নেই, একা যাচ্ছি। কিন্তু শত্রুর বিরুদ্ধে এমন অনেক কাজ আছে যা একা করতে হয়। আমি সে রকম একটা কাজেই যাচ্ছি। আমি গোপনে তাদের ঘাঁটিতে ঢুকব। অনুসন্ধান করব। তাদের সম্পর্কে তথ্যাদি যোগাড়ের চেষ্টা করব। এমন ধরনের কাজে একা যেতে হয়। আমি সেটাই করছি বোন’। আহমদ মুসা বলল।

‘বুঝলাম। কিন্তু ভাইয়া, এ ধরনের কাজেও তো সংঘর্ষ হয়। প্রয়োজনীয় সাহায্যের দরকার হয়’। বলল ফাতিমা।

‘দোয়া কর তোমরা বোন। এই সাহায্য যেন আল্লাহ করেন, আমাকে তোমরা বাধা দিওনা। আমি এই কাজ নিয়ে একাই তো এসেছি শুধুমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে। সর্বজ্ঞ আল্লাহ এটা জানেন এবং তিনিই আমাকে সাহায্য করবেন’।

ফাতিমা কোন জবাব দিল না। তার অপলক দু’চোখ তাকিয়ে আছে আহমদ মুসার দিকে।

যায়েদের বিস্ময় বিমুগ্ধ দু’চোখ নিবদ্ধ আহমদ মুসার মুখের উপর।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘ভাই বোনরা এভাবে তাকিয়ে কেন?’

‘ভাবছি ভাইয়া’। ফাতিমা বলল।

‘কি ভাবছ?’ বলল আহমদ মুসা।

‘ভাবছি, ভাইয়ার পরিচয় জানার ভাগ্য কি আমাদের এখনও হলো না? আমি নিশ্চিত ভাইয়া, আপনার এমন একটা পরিচয় আছে যা এত বড় যে আমরা সামান্য মানুষ হয়ে তা জানা ঠিক নয়’। ফাতিমা বলল।

আহমদ মুসা ম্লান হাসল। বলল, ‘ফাতিমা, যায়েদ, গত দু’তিন দিনের পরিচয় থেকে, আমার আচরণ থেকে কি তোমাদের এই বিশ্বাসই হয়েছে?’

‘না ভাইয়া, এ বিশ্বাস নয় বরং উল্টো বিশ্বাসই হয়েছে এবং এ কারণেই মনে কষ্ট লাগছে যে, এত আপন করে যিনি আমাদের নিয়েছেন, স্নেহ ও অভিভাবকত্বের ছত্রছায়া যিনি আমাদের পরম আকাঙ্খিত এক নতুন জীবনে নিয়ে এসেছেন, তার পরিচয় আমরা জানি না, আমাদের জন্যে এটা অবশ্যই বড় কষ্টের ভাইয়া’। বলল ফাতিমা আবেগে ভারী কন্ঠ তার।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘তোমার কথা বুঝতে পারছি বোন। তোমাদের কাছ থেকে আমার পরিচয় গোপন করার কোন সিদ্ধান্ত আমি নেইনি। আমি এই মিশনে এখানে আসার আগে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, আমার পরিচয় আমি কোথাও প্রকাশ করব না। তাতে আমার কাজ অনেকখানি সহজ হবে এবং শত্রুকে অনেকখানি অসতর্ক ও অপ্রস্তুত অবস্থায় পাওয়া যাবে। কিন্তু শত্রুরা আমার পরিচয় যেভাবেই হোক জেনে ফেলেছে। আমার পরিচয় আগাম জেনেই আজ সকালে ওরা আমাকে ঐভাবে আট-ঘাট বেঁধে বন্দী করতে এসেছিল। শত্রুদের কাছ থেকে আমার পরিচয় গোপন রাখার জন্যেই নিজের পরিচয় গোপন রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। শত্রুরা সেই পরিচয় যখন জেনেই ফেলেছে, তখন আর পরিচয় গোপনের প্রয়োজন দেখি না’।

বলে আহমদ মুসা সামনের টি টেবিল থেকে স্লিপ পেপারের একটা পাতা ছিড়ে নিয়ে তাতে খস খস করে নিজের নাম লিখল এবং তা স্লিপ প্যাডের নিচে চাপা দিয়ে একটু হেসে বলল, ‘আমি আমার পরিচয় লিখে রাখলাম, পরে পড়ে নিও’।

বলে আহমদ মুসা একটু থামল। গম্ভীর হয়ে উঠল তার মুখ। পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে তা যায়েদের হাতে দিয়ে বলল, ‘এতে আমি যেখানে যাচ্ছি তার ঠিকানা লেখা আছে। আমি যদি ভোর পর্যন্ত না ফিরি, তাহলে তোমার পরিচিত পুলিশ অফিসারকে এবং পুলিশ স্টেশনকে এই ঠিকানা জানিয়ে বলবে, স্পুটনিক যারা ধ্বংস করেছে, স্পুটনিকের ৭ গোয়েন্দাকে যারা কিডন্যাপ

করেছে, তাদের একটা ঘাঁটির ঠিকানা এটা। ঠিকানাটায় আপনারা এখনি রেড করুন’।

যায়েদ স্লিপটা হাত পেতে নিল। কিন্তু কোন কথা বলল না।

ফাতিমাও কিছু বলল না।

হঠাৎ করে তাদের দু’জনের দু’চোখ ছল ছল করে উঠেছে। উদ্বেগে-আশঙ্কায় তাদের মুখ পান্ডুর।

ফাতিমার দু’চোখের অশ্রু তার দু’গন্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল।

আহমদ মুসা তাদের অশ্রু দেখে আরও গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, ‘তোমাদের এই মমতার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু তোমরা চিন্তা করো না। আল্লাহই আমাদের সহায়’।

বলে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

সালাম দিয়ে ঘুরে দাড়িয়ে আহমদ মুসা ফ্ল্যাটের গেটের দিকে এগুলো।

ফাতিমা ও যায়েদ দু’জনেই উঠল। তারা আহমদ মুসার পেছন পেছন গেট পর্যন্ত এগুলো। তারপর ‘ফি আমানিল্লাহ, আল্লাহ হাফেজ’ বলে বিদায় জানাল আহমদ মুসাকে।

আহমদ মুসাও ‘আল্লাহ হাফেজ’ বলে লিফটের দিকে এগুলো।

লিফট নেমে গেলেও ফাতিমা ও যায়েদ দু’জনেই গেটের দু’চৌকাঠে ঠেস দিয়ে সামনে শূণ্য দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে থাকল।

অনেকক্ষন পর ফাতিমা একইভাবে সামনের দিকে দৃষ্টি মেলে বলে উঠল, ‘যায়েদ, ভাইয়া তো আসলেই আমাদের কেউ নন। কিন্তু মন মানছে না কেন? তার বিপদের ভয় এমন করে মনকে পীড়া দিচ্ছে কেন? এ কিসের টান যায়েদ?’

যায়েদও ঐভাবেই স্বগতোক্তির মত জবাব দিল, ‘আমিও জানি না ফাতিমা। তবে এটুকু অনুভব করি, তিনি তার অসীম মমতা দিয়ে আমাদের মন জয় করে নিয়েছেন। বলতে পার ফাতিমা, তার মত এত মমতা এত দায়িত্ববোধ, এত মধুর শাসন আর কারও কাছ থেকে কখনও আমরা পেয়েছি?

‘কিন্তু কেন তিনি এত আদর করেন, কেন তাঁর এই দায়িত্ববোধ, কেন এই মধুর শাসন যায়েদ? আমরা তো তাঁর কেউ নই’। বলল ফাতিমা উদাস কন্ঠে।

‘হতে পারে এটা এক আদর্শের সহমর্মিতা’। যায়েদ বলল।

‘কিন্তু আদর্শিক ভাইদের সাথে তো আমাদের কম দেখা হয়নি। এমন তো দেখিনি কখনও’।

‘হতে পারে খাঁটি আদর্শে গড়া এক মানুষের সন্ধান আমরা এই প্রথম পেলাম’। যায়েদ বলল।

কে তাহলে আমাদের অদেখা, অচেনা অতুলনীয় এই মানুষটি? জিজ্ঞাসা ফুটে উঠল ফাতিমার কন্ঠে।

‘চল দেখি, তাঁর পরিচয়, তিনি কি লিখে গেছেন’। বলে যায়েদ সোজা হয়ে দাঁড়াল।

সম্বিত ফিরে পাওয়ার মত চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়াল ফাতিমা। ভেতর দিকে ছুটতে ছুটতে বলল, ‘ধন্যবাদ যায়েদ, তুমি স্মরণ করিয়ে দিয়েছ। এস তুমি’।

ফাতিমা ছুটে গিয়ে না বসেই স্লিপ প্যাডের নিচ থেকে আহমদ মুসার রাখা কাগজটা তুলে নিল। কাগজের উপর চোখ বুলাতে বুলাতে সোজা হয়ে দাঁড়াল ফাতিমা।

স্লিপে লেখা ‘আহমদ মুসা’ নাম পড়ে প্রচন্ড এক ধাক্কা খেল ফাতিমা। সমস্ত সত্তায় তার যে ধাক্কাটা ব্যঞ্জয় হয়ে উঠল তা হলোঃ ‘আহমদ মুসা। কোন আহমদ মুসা? ক্যারিবিয়ান, আমেরিকা ও সুরিনামের ঘটনায় সদ্য আলোচিত সেই আহমদ মুসা, যিনি ফ্রান্সে, সুইজারল্যান্ড, কংগো, ফিলিস্তিন, রাশিয়া, মধ্য এশিয়া, মিন্দানাওয়ের অসংখ্য সুঘটনার জনক?’

এই সব জিজ্ঞাসার মধ্যে হারিয়ে গেল ফাতিমা। কাগজের স্লিপটা তার হাতে ধরা। তার উপর আঠার মত লেগে আছে ফাতিমার চোখ। মূর্তির মত নিরব-নিশ্চল ফাতিমা।

যায়েদও ফাতিমার কাছে এসে পৌছাল। বলল, ‘কি ফাতিমা, কি দেখলে? কি নাম, কি পরিচয় লিখেছেন তিনি?’

কোন কথা বলল না ফাতিমা।

নির্বাক মূর্তির মত হাতের কাগজটা যায়েদের হাতে তুলে দিয়ে ধপ করে বসে পড়ল সোফায়।

কাগজটিতে দ্রুত চোখ বুলাল যায়েদ।

'আহমদ মুসা'র নাম পড়ে চমকে উঠল যায়েদ। কয়েকবার পড়ল নামটা। না তার পড়া ঠিক। এই নামটাই লেখা আছে কাগজে। কাগজ থেকে মাথা তুলে ভাবল একটু আহমদ মুসার কথা। তারপর 'ও গড' বলে বসে পড়ল সোফায় ফাতিমার পাশে।

দু'জন পাশাপাশি বসে।

দু'জনেই নিরব।

দু'জনের চোখে-মুখেই বিস্ময় ও বিহবলতার ভাব।

নিরবতা ভাঙল যায়েদ। বলল, 'আমি ভাবতে পারছি না ফাতিমা। আমরা তিন দিন ধরে আহমদ মুসার সাথে আছি। ভাবলেই আমার কাছে স্বপ্ন মনে হচ্ছে যে, ঐ ঘরটিতে বিশ্ব বিখ্যাত আহমদ মুসা থাকেন, আর এইমাত্র তিনি বেরিয়ে গেলেন আমাদের সাথে কথা বলে'।

ধীরে ধীরে ফাতিমা মুখ খুলল। সম্মোহিত কন্ঠে স্বগতোক্তির মত বলল, 'বিশ্বাস হচ্ছে না আমারও, আহমদ মুসা এত সহজ, এত সরল, এত সাধারণ। আবার বিশ্বাস হচ্ছে এই কারণে যে, গত তিন দিনে তিনি যা করেছেন সেটা আহমদ মুসারই কাজ। আজকের পাশ্চাত্যের দুর্বিনীত, অহংকারী যোগ্যতাকে এভাবে ধুলায় মিশিয়ে দিতে আহমদ মুসাই পারেন, আর কেউ নয়'। আবেগে কন্ঠ ভারী হয়ে উঠেছে ফাতিমার।

'আমার কাছে স্বপ্ন মনে হচ্ছে যে, আহমদ মুসা স্ট্রাসবার্গে এসেছেন, স্পুটনিক ধ্বংসের কেসটাকে তিনি গ্রহন করেছেন এবং মুসলামানদের এইটুকু বিপদও তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে'। আবেগে ভারী হয়ে উঠেছে যায়েদের কন্ঠও।

ফাতিমার স্বগত কন্ঠ আবার, 'বড়ত্বের প্রকাশ একটুও তাঁর মধ্যে নেই। কিন্তু স্নেহ-মমতার সিড়ি বেয়ে তিনি কখন যেন আমাদের মাথার উপর উঠে

বসেছেন। তিনি যা বলেন তা করা আমাদের জন্য অমোঘ হয়ে যায়। এ ভাবেই বুঝি তিনি নেতা না হয়েও সবার নেতা’।

‘আলহামদুলিল্লাহ ফাতিমা। আমি আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ। স্ট্রাসবার্গে আহমদ মুসার সাথী হবার জন্যে আল্লাহ আমাদেরকেই বেছে নিয়েছেন’। বলল আবেগ জড়িত কন্ঠে যায়েদ।

ফাতিমা একটু ঘুরে বসে যায়েদের দু’হাত চেপে ধরে বলল, ‘তুমি ঠিক বলেছ যায়েদ। এটা আমাদের জন্যে পরম গর্বের’। থামল ফাতিমা।

যায়েদ কিছু বলল না। দু’জনেই নিরব।

একটু পর নিরবতা ভাঙল ফাতিমাই। বলল, ‘কিন্তু আমরা তাকে কোন সহযোগিতা করতে পারছি কই? বিপজ্জনক ও সংঘাতের সব কাজ তিনি একাই করেছেন। আজও তাই গেলেন। আজ সকালের ঘটনায় তিনি বন্দী হয়েছিলেন। ভাবতে পার, যদি তিনি মুক্ত হতে না পারতেন। তার মত এত মূল্যবান মানুষ এতটা নিরাপত্তাহীন থাকা কি ঠিক?’

‘আমরা কি সহযোগিতা করব, আর কি সহযোগিতা তিনি নেবেন। আমরা রিভলবার চালাতে পারা ছাড়া এই লাইনে আর কোন অভিজ্ঞতাই নেই। আচ্ছা বল, এখন যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাতে আমাদের কি করণীয়?’ বলল যায়েদ।

‘আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে’। বলল ফাতিমা।

‘কি বুদ্ধি?’ জিজ্ঞেস করল যায়েদ।

‘পরে বলছি। বুদ্ধিটা একটু পাকিয়ে নেই’।

কথা শেষ করে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল ফাতিমা, ‘তার আগে একটু গড়িয়ে নেব’।

যায়েদও উঠে দাড়িয়েছে। বলল, ‘আমি?’

‘তোমার পথ তুমি দেখ? তোমার বেডরুম ওদিকে’। বলল ফাতিমা। তার ঠোঁটে হাসি।

‘কিন্তু আজ দুই পথ তো এক হয়ে গেছে।’ বলল যায়েদ। তারও মুখে হাসি।

‘তা ঠিক। কিন্তু আমরা তো যুদ্ধক্ষেত্রে।’ ফাতিমা বলল।

হাসল যায়েদ। বলল, ‘যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, বলতে পার যুদ্ধের তাঁবুতে। এক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূলের (স.) দৃষ্টান্তই আমাদের পথ দেখাতে পারে’। হাসল যায়েদ।

সলজ্জ হাসিতে রাঙা হয়ে উঠল ফাতিমার মুখ। বলল, ‘মনে থাকে যেন সব ক্ষেত্রেই আল্লাহর রাসূলের (সঃ) এর দৃষ্টান্ত এভাবে খোঁজ করা হবে’।

‘অবশ্যই’। বলে যায়েদ তার এক হাত বাড়িয়ে দিল ফাতিমার দিকে।

ফাতিমার এক হাত এগিয়ে এসে ধরল যায়েদের হাত।

দু’জনেই এক সাথে পা বাড়াল সামনে।

# ৪

শার্লেম্যান রোডের ৫ নাম্বার বাড়িটা বেশ বড়। তিনতলা বাড়ি। প্রাচীর ঘেরা।

গেটের উপর বিরাট সাইনবোর্ড। তাতে লেখা, 'হিউম্যান রাইটস ইউনিভার্সাল গ্রুপ, স্ট্রাসবার্গ'। সাইনবোর্ডে রাস্তার নামও নেই, বাড়ির নাম্বারও নেই।

আহমদ মুসা বিকেলে এসে দেখে না গেলে এই বাড়ি খুঁজে পাওয়া মুস্কিল হতো। আশে পাশের লোকদের জিজ্ঞেস করে তবেই আহমদ মুসা 'হিউম্যান রাইটস ইউনিভার্সাল গ্রপে'র অফিসকে ৫ নাম্বার বাড়ি বলে চিনতে পেরেছিল।

বাড়িটা চেনা আছে বলে আহমদ মুসা খুব নিশ্চিন্তে বাড়ি থেকে বেশ দূরে গাড়ি থেকে নেমে গাড়িটা ছেড়ে দিল।

পথচারীর মত হেঁটে হেঁটে বাড়িটার প্রান্তে এসে মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

আর কিছুটা এগুলে গেট। কিন্তু আহমদ মুসা গেট দিয়ে প্রবেশ করতে চায় না।

আহমদ মুসা যেখানে এসে দাড়িয়েছিল, সেখান থেকেই বাড়িটার প্রাচীর শুরু। সেখান থেকে একটা প্রাচীর শার্লেমান সড়কের পাশ ঘেঁষে দক্ষিণে এগিয়ে গেছে। এই প্রাচীরেই বাড়িতে প্রবেশের গেট। আরেকটা প্রাচীর বাড়ির উত্তর সীমান্ত দিয়ে পশ্চিমে এগিয়ে গেছে। এই প্রাচীরটাই বাড়ির পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমানা ঘুরে শার্লেম্যান রোডের প্রাচীরের সাথে এসে মিশেছে।

আহমদ মুসা তাঁর হাত ঘড়ির দিকে তাকাল। দেখল, রাত সাড়ে এগারটা বাজে।

সে উত্তরের প্রাচীরের ধার ঘেঁষে পশ্চিম দিকে এগুলো।

আহমদ মুসা ঠিক করেছে প্রাচীর টপকে সে ভেতরে ঢুকবে। এভাবে সবার অলক্ষ্যেই সে ভেতরে ঢুকবে। মারামারি বা শত্রু নিধনে তার কোন লাভ নেই। তার চাই কিছু দলিল-প্রমাণ। যা থেকে জানা যাবে, স্পুটনিকে কি ঘটছে, কেন ঘটছে এবং স্পুটনিকের ৭ গোয়েন্দা কোথায়। এজন্যে গোপনে সে বাড়ি সার্চ করতে চায়। সে নিশ্চিত যে, এভাবেই সে একদিন এখান থেকে বা সেখান থেকে প্রয়োজনীয় দলিল দস্তাবেজ পেয়েই যাবে।

আহমদ মুসা পশ্চিম প্রাচীরের মাঝামাঝি জায়গায় গিয়ে দাড়াল।

এ প্রাচীরের পর একটা ফলের বাগান। তারপর বাড়িটা। বাড়িটার উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে ফুলের বাগান। ফলের বাগান শুধু পশ্চিম দিকেই।

বাড়িটাতে পৌঁছা পর্যন্ত গাছের আড়াল পাওয়া যাবে বলেই আহমদ মুসা এ দিকটা বেছে নিয়েছে। প্রাচীরটা সাত ফুটের মত উঁচু।

কোন কষ্টই হলো না আহমদ মুসার প্রাচীর ডিঙ্গাতে।

একটু দৌড়ে এসে কয়েক ফুট প্রাচীর বেয়ে উঠে গিয়ে প্রাচীরের মাথা ধরে ফেলে খুব সহজেই প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে গেল আহমদ মুসা।

বাগানের গাছগুলো বেশ দূরে দূরে। তার ফলেই গাছগুলো বড় বড়।

আহমদ মুসা বিড়ালের মত নিঃশব্দে এগোচ্ছে বাড়ির দিকে।

বাড়ির চারদিকে চারটি আলোর ব্যবস্থা আছে। সেই আলোতে বাড়ি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, কিন্তু বাগানের জমাট অন্ধকার একটুও দূর হয়নি। অনেকটা অন্ধের মতই হাঁটছে আহমদ মুসা।

চোখে কিছু দেখছে না বলেই কান দু'টি সে বেশি সতর্ক রেখেছে। হঠাৎ তার মনে হলো, নরম ঘাসের উপর তার পায়ের যে শব্দ, সে রকম অনেকগুলো শব্দ তার কানে আসছে। যেন তার ডানে, বামে, পেছনে অনেকগুলো পা তার মত করেই সামনে অগ্রসর হচ্ছে, এই অনুভূতি হওয়ার সাথে সাথেই থমকে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

চারদিকে সতর্ক চোখ বুলাচ্ছে সে।

এই সময় একটা গম্ভীর কন্ঠে ধ্বনিত হলো, 'ঠিকই সন্দেহ করেছ আহমদ মুসা। আমরা ঘিরে ফেলেছি তোমাকে চারদিক থেকে। ডজনখানেক

স্টেনগান তোমাকে তাক করে আছে। আমাদের প্রত্যেকের চোখে ইনফ্রারেড গগলস। তোমার সবকিছুই আমরা দেখছি। কোন বেয়াদবীর দূর্মতি হলে একেবারে ভর্তা হয়ে যাবে। যেভাবে হাঁটছিলে, সেভাবেই সামনে এগুতে থাক'। কন্ঠটি থেমে গেল।

তার প্রত্যেকটি কথাই আহমদ মুসা বিশ্বাস করল। মনে খুব কষ্ট লাগল আহমদ মুসার, এমন দিনেই সে তার ইনফ্রারেড গগলস নিয়ে আসেনি।

হাঁটতে লাগল আহমদ মুসা। সেই কন্ঠটি অন্ধকারে হো হো করে হেসে উঠল। বলল, আজ গাড়িতে আমাদের একজন লোক বোকার মত এই ৫ নাম্বার বাড়ির কথা উচ্চারণ করেছিল, তুমি পালাবার পর আমরা বুঝেছি তুমি ৫ নাম্বার বাড়িতে আসবে। কিন্তু এত দ্রুত আসবে, আজই আসবে, সেটা আমরা কল্পনাতেও ভাবিনি। কিন্তু আহমদ মুসা তুমি চালাক হয়েও এই বোকামি কেন করলে। প্রকাশ্যে দিবালোকে তুমি বাড়ি দেখতে আসবে, বাড়ি দেখে যাবে, আর তোমাকে কেউ দেখবে না, এটা তুমি ভাবতে পারলে কেমন করে। এটাই ঈশ্বরের মার বুঝলে?'

'তোমরা ঈশ্বর মান নাকি?' আহমদ মুসা বলল। তার কন্ঠে বিদ্রুপ।

'মায়ের কাছে মাসির কথা বল না আহমদ মুসা। তুমিও জান ইহুদীরা মানে বনি ইসরাইলা ঈশ্বরের চিরকালীন বাছাই করা সন্তান'। বলল কন্ঠটি।

'বাছাই করা ঠিকই, তবে সেটা বেহেশতে যাওয়ার জন্যে নয় নিশ্চয়'। আহমদ মুসা বলল।

বাড়ির পেছনে তখন তারা পৌঁছে গেছে। আলোর মধ্যে সবাই দাড়িয়ে।

আহমদ মুসা দেখল, ঠিকই প্রায় চৌদ্দজন স্টেনগানধারী তাকে ঘিরে আছে।

'আহাম্মকের কথার কোনো জবাব হয় না আহমদ মুসা'।

আহমদ মুসা দেখল কন্ঠটি ওয়ার্ল্ড ফ্রিডম আর্মির স্ট্রাসবার্গের স্টেশন চীফ লাইবারম্যানের।

লাইবারম্যানের বাম হাতে রিভলবার। আর ডান হাতটা গলার সাথে ঝুলিয়ে রাখা। আহমদ মুসা বুঝল, লাইবারম্যান সকালের ঘটনায় শুধু আহতই হয়েছিল।

কথা শেষ করেই লাইবারম্যান ঘুরে দাঁড়াল বাড়ির দিকে। তারপর রিভলবারটা পকেটে রেখে পকেট থেকে বাঁ হাত দিয়ে ক্ষুদ্র মোবাইল সেটের মত একটা কিছু বের করল।

সামনেই ছিল একটা দরজা। বাড়ির পেছনের দরজা এটাই।

লাইবারম্যান তার বাম হাত উঁচু করল দরজাটির সমান্তরালে। সংগে সংগে দরজাটা খুলে গেল। আহমদ মুসা বুঝল লাইবারম্যানের হাতের ওটা রিমোট কনট্রোল।

দরজা খুলে যেতেই একজন লোক বেরিয়ে এল দরজা দিয়ে। তার হাতে একটি হ্যান্ডকাফ।

তাকে দেখেই লাইবারম্যান বলে উঠল, 'হ্যাঁ, তুমি আহমদ মুসাকে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে দাও। সকালের ভুল আমরা করব না'।

আহমদ মুসাকে হ্যান্ডকাফ পরানো হলে তাকে নিয়ে সবাই বাড়ির ভেতর প্রবেশ করল। সবার আগে লাইবারম্যান। তার পেছনে আহমদ মুসা। অন্য অস্ত্রধারীরা আহমদ মুসার পেছনে।

বাড়ির ভেতরে ঢুকে আহমদ মুসাকে নিয়ে সবাই এল একটা সিড়ি ঘরে। এখান থেকে সিড়ি উঠে গেছে দু'তলা, তিনতলায়।

সিঁড়ি ঘরে ঢুকেই বৈদ্যুতিক বোর্ডের সুইচের সারি থেকে একটা সুইচে চাপ দিল লাইবারম্যান। সুইচটা অন করার সাথে সাথেই সিড়িঘরের মেঝের একাংশ সরে গেল। বেরিয়ে পড়ল নিচে নামার সিড়ি।

সিড়ি দিয়ে নামল ওরা আহমদ মুসাকে নিয়ে।

নিচের আন্ডারগ্রাইন্ড ফ্লোরটার মাঝখানে সোফা সজ্জিত একটা লবী ছাড়া গোটাটাই ছোট বড় বিভিন্ন কক্ষে ভরা।

আহমদ মুসাকে নিয়ে ওরা একটি কক্ষে তুলল। কক্ষটি বেশ বড়। কক্ষের একপ্রান্তে সিংগল সাইজের লোহার খাট। খাটটি মেঝের সাথে ফিক্সড করা।

আহমদ মুসাকে কক্ষে ঢুকিয়েই লাইবারম্যান বলল, 'আহমদ মুসা এটাই তোমার ঘর। তবে বেশিক্ষণ তোমাকে এখানে থাকতে হবে না। ঘন্টা দুয়েকের মধ্যেই আজর ওয়াইজম্যান আসছেন। তিনি ফিরে এলেই আমরা এখানে আসব। আমরা আসার আগ পর্যন্ত তুমি শুয়ে শুয়ে তোমার জীবনের একটা হিসেব নিকেষও করে নিও। কারণ আমরা আসার পর আর তুমি সুযোগ পাবে না'। থামল লাইবারম্যান।

'পাব না যদি তুমি ঈশ্বর হও। কিন্তু তুমি ঈশ্বর নও মি.লাইবারম্যান'। বলল আহমদ মুসা।

'ঈশ্বর হওয়ার প্রয়োজন নেই আহমদ মুসা। ঈশ্বর অনেক স্বাধীনতাই মানুষকে দিয়ে দিয়েছেন'। থামল লাইবারম্যান।

কিন্তু আহমদ মুসা কোন উত্তর দিল না। ভাবল, বেহুদা আলোচনায় কোন লাভ নেই।

লাইবারম্যানই আবার কথা বলে উঠল। বলল, 'আহমদ মুসা আজ সকাল পর্যন্ত তুমি অসংখ্যবার সুযোগ পেয়েছ। কিন্তু সব কিছুরই একটা শেষ আছে আহমদ মুসা। সেই শেষ মাথায় তুমি পৌঁছে গেছ। আর তোমাকে নিয়ে আমরাও ধৈর্য্য সহ্যের শেষ মাথায় পৌঁছেছি। তোমার লাশ পড়ত ঐ অন্ধকার বাগানেই। কিন্তু আজর ওয়াইজম্যান নিজেই তোমার শেষ বিচারটা করতে চান বলেই তুমি কিছুটা সময় পেয়ে গেলে'।

বলেই ঘুরে দাঁড়াল লাইবারম্যান। কিন্তু ঘুরে দাঁড়িয়েই আবার ফিরল সে। বলল সে একজনকে লক্ষ্য করে, 'লেগ চেইনটা আননি?'

'ইয়েস বস'। বলল লোকটি।

'লাগাওনি কেন এতক্ষণ?' ক্রুদ্ধ কন্ঠে বলল লাইবারম্যান।

'বস আমি আপনার নির্দেশের অপেক্ষা করছি'। বলল লোকটি।

কথা শেষ করেই লোকটি তড়িঘড়ি করে আহমদ মুসার পায়ের কাছে বসে পড়ল। পায়ে বেড়ি পরিয়ে দিল আহমদ মুসার এবং সেটা লক করে দিল।

লাইবারম্যান বলে উঠল, ‘তোমার ব্যাপারে আমরা আর কোন ঝুঁকি নিতে চাই না আহমদ মুসা। সকালে তোমার হাত-পায়ে শৃঙ্খল পরালে আমাদের তিনজন লোককে জীবন দিতে হতো না, আমিও আহত হতাম না’।

‘এখন তোমরা নিশ্চয় নিশ্চিন্তই লাইবারম্যান?’ আহমদ মুসা বলল।

‘বলতে পার। তুমি পালাতে পারছ না, তোমার হাত-পা নিষ্ক্রিয় করা গেছে এব্যাপারে আমরা নিশ্চিত। সকালের ভুল আমরা শুধরে নিয়েছি’।

বলে ঘুরে দাঁড়াল লাইবারম্যান। বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে।

তার সাথে সাথে অন্য সকলেও।

লাইবারম্যান তার শেষ কথাটার কোন জবাব পেল না আহমদ মুসার কাছ থেকে। কিন্তু ঘুরে না দাঁড়িয়ে আহমদ মুসার মুখের দিকে তাকালে সে দেখতে পেত একটা হাসি। এ হাসি বিদ্রুপ করছে লাইবারম্যানকে।

আহমদ মুসার পেছনে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

দরজা বন্ধ হতেই বসে পড়ল আহমদ মুসা মেঝেতে।

তার হাতের হ্যান্ডকাফের মতই পায়ের চেইনটা। ছয়সাত ইঞ্চির বেশি লম্বা নয়।

দুই হাঁটু দুই দিকে ছড়িয়ে বসতে পারল না আহমদ মুসা। ঐভাবে বসতে পারলে জুতার গোড়ালী হাতের বেশি কাছে পেত। দুই হাটু একদিকে নিয়ে দুই পা এক সাথে ছড়িয়ে বসল আহমদ মুসা।

পা দু’টি গুটিয়ে যথাসম্ভব কাছে নিয়ে এল সে। তারপর দু’হাত দিয়ে ডান জুতায় হুক দিয়ে আটকানো গোড়ালিটা খুলে ফেলল।

জুতার গোড়ালী হাতে নিয়ে আহমদ মুসা গোড়ালীর ভেতরের পাশের একটা বিশেষ স্থানে চাপ দিতেই গোড়ালীর গোটা সারফেসটাই ক্লিক করে উঠে গেল। বেরিয়ে পড়ল একটা কেবিন। কেবিন থেকে আহমদ মুসা বের করে আনল সিগারেটের চেয়ে সরু এবং আধা সিগারেটের মত লম্বা সুচবিহীন সিরিঞ্জের মত একটা ছোট বস্তু। এটাই ‘মাইক্রো লেসার টর্চ’। এর লেসার বীম দিয়ে যে কোন তালা, সরু সাইজের যে কোন আইরন বার এবং আধা ইঞ্চি পরিমাণ পুরু স্টিলশিট গলিয়ে ফেলা যায়, কেটে ফেলা যায়।

আহমদ মুসা জুতার গোড়ালিটা আবার লাগিয়ে দিয়ে হাত-পায়ের শৃঙ্খল কাটার দিকে মনোযোগ দিল।

লেসার বীম দিয়ে হ্যান্ডকাফের লক এবং পায়ের চেইনের লক গলিয়ে শেষ করে দিতেই হাত পায়ের চেইন খুলে গেল আহমদ মুসার।

আহমদ মুসা লেসার টর্চ পকেটে পুরে হ্যান্ডকাফ ও পায়ের চেইন কুড়িয়ে নিয়ে উঠে দাড়াল। এগুলো খাটের দিকে।

স্টিলের খাটের উপর রঙিন কাপড়ে মোড়া ফোমের তোষক। পায়ের দিকে একটা কম্বল মুড়িয়ে রাখা। কম্বল দেখে খুশি হলো আহমদ মুসা। কম্বল মুড়ি দিয়ে তার হাত-পাকে সে ওদের চোখের আড়ালে রাখতে পারবে।

আহমদ মুসা হাতের হ্যান্ডকাফ ও পায়ের চেইন তোষকের তলে রেখে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল।

ঘুমাবার আগে আহমদ মুসার একটাই অস্বস্তি ছিল যে, তার কাছে কোন অস্ত্র নেই। সার্চ করে সব অস্ত্রই ওরা কেড়ে নিয়েছে। এমনকি ঘড়ি, কলমও। তার ভাগ্য ভাল যে জুতা জোড়া খুলে নেয়নি তারা।

দরজা খোলার শব্দে আহমদ মুসার তন্দ্রা ভাঙল। কিন্তু চোখ খুলল না সে। কিন্তু অনুভব করল ঘরে অনেক লোক প্রবেশ করেছে।

প্রথম কন্ঠ শুনতে পেল সে লাইবারম্যানের। বলছিল সে, ‘ঘুমাচ্ছে আহমদ মুসা’।

‘এই অবস্থায় মানুষের ঘুম আসে। আচ্ছা লোক এই আহমদ মুসা’। একটি ভারী কন্ঠ বলে উঠল। আহমদ মুসা বুঝতে পারল এ কন্ঠ আজর ওয়াইজম্যানের।

‘শেষ ঘুম তো স্যার’। বলল লাইবারম্যান।

বলে একটু থেমেই বলে উঠল সে আবার, ‘এই ঘুমটাই তার শেষ ঘুম হোক স্যার’।

‘না লাইবারম্যান, মৃত্যুটা তাহলে খুব শান্তির হবে তার। সে মরবে খুবই অসহায়ভাবে এবং অসহ্য যন্ত্রনা তাকে পেতে হবে’।

বলে একটা দম নিয়ে হাতের রিভলবারটাকে একবার চেক করে একজনকে লক্ষ্য করে বলল, 'তুমি গিয়ে ওকে লাথি মেরে জাগিয়ে দাও। দেখুক সে যম তার শিয়রে'।

আহমদ মুসা অনুভব করল একজন তার দিকে এগিয়ে আসছে। লোকটির পায়ের শব্দ যখন প্রায় মাথার পাশ পর্যন্ত এল, তখন আহমদ মুসা চোখ ও মুখকে ঘুম কাতর রেখেই দু'চোখের পাতা সামান্য খুলল। দেখতে পেল, স্টেনগানধারী একজন লোক দু'হাতে স্টেনগান ধরে ব্যারেল উচু করে রেখে তার ডান পা তুলছে আহমদ মুসার বুকে লাথি মারার জন্যে।

তার লাথিটা আহমদ মুসার বুক স্পর্শ করার আগেই চোখের পলকে আহমদ মুসার দু'হাত ছুটে গিয়ে লোকটির স্টেনগান কেড়ে নিল এবং শুয়ে থেকেই তার আগুন ঝরা স্টেনগানকে ঘরের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ঘুরিয়ে নিতে লাগল।

তার মধ্যেই সে দেখতে পেল একজনকে ঢাল সাজিয়ে তার আড়ালে দাঁড়িয়ে পিছু হটে কে একজন ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

ঘরে তখন কেউ দাড়িয়ে নেই। সবার রক্তাক্ত দেহ মাটিতে লুটানো। রক্তে ভাসছে তারা।

আহমদ মুসা ষ্টেনগান হাতে রেখেই উঠে দাঁড়াল। লাশগুলোর দিকে একবার নজর করল। লাইবারম্যানের লাশ সে দেখতে পেল, কিন্তু আজর ওয়াইজম্যানকে দেখতে পেলনা। বুঝল সে, আজর ওয়াইজম্যানই তাহলে তাদের একজনকে ঢাল সাজিয়ে নিজেকে রক্ষা করে পালিয়ে গেছে। কিন্তু তাকে পেলে তো সব পাওয়া হয়ে যায়।

চিন্তাটা মাথায় আসতেই আহমদ মুসা ছুটল তার পিছু নেবার জন্য।

আহমদ মুসা ঘর থেকে বেরিয়ে দৌড়ে সিঁড়িতে এল।

সিঁড়ি মুখটা বন্ধ।

আহমদ মুসা দেখল সিঁড়ি মুখের কোথাও কোন বোতাম বা কোন সুইচ নেই।

দ্রুত নেমে এলো আহমদ মুসা সিঁড়ি ঘরে। সিঁড়ি ঘরে সে পেয়ে গেল সুইচবোর্ড। দেখল, সব সুইচ অন, শুধু একটাই অফ। অফ সুইচটাকে অন করে দিয়ে আহমদ মুসা সিঁড়ির গোড়ায় ছুটে এল। দেখতে পেল, সিঁড়ির মুখ খুলে গেছে।

আহমদ মুসা দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠল। সিঁড়ি ঘরে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত চোখে পড়ল তার। ফোঁটা ফোঁটা রক্তের দাগ দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

আহমদ মুসা নিশ্চিত হলো যে, আজর ওয়াইজম্যান আহত হয়েছে।

রক্তের দাগ অনুসরন করে ছুটল আহমদ মুসা।

বাইরের গেটে যখন এসে দাঁড়াল, দেখতে পেল ছুটন্ত একটা গাড়ির পেছনের লাল আলো।

‘ঐ গাড়িতেই পালাল আজর ওয়াইজম্যান, ভাবল আহমদ মুসা।

এ সময় পাশে একাধিক পায়ের শব্দ শুনে ষ্টেনগান তাক করে তাড়াক করে ঘুরে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

‘ভাইয়া, আমরা বলে চিৎকার করে উঠল সামনে থেকে।

আহমদ মুসা তার ষ্টেনগানের ব্যারেল সংগে সংগেই নিচু করল।

এক ঝাঁক গুলী গিয়ে মাটিতে বিদ্ধ হলো। আহমদ মুসা ততক্ষনে ষ্টেনগানের ট্রিগার থেকে তার তর্জ্জনি সরিয়ে নিয়েছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে তার সামনে এসে দাঁড়াল যায়েদ এবং ফাতিমা।

প্রচন্ড বিস্ময় ও বিরক্তি আহমদ মুসার চোখে মুখে। ধমকের স্বরে বলল, এ তোমরা কি পাগলামী করেছ, এখনি সাংঘাতিক কিছু ঘটে যেতে পারতো।

‘আমাদের ভুল হয়েছে ভাইয়া। কথা না বলে এভাবে এগোনো ঠিক হয়নি।’ ভয় মিশ্রিত ভেজা গলায় বলল ফাতিমা।

‘তার চেয়ে বড় ভুল হয়েছে এভাবে তোমাদের আসা।’ বলল
আহমদ মুসা।

‘ফাতিমা প্রস্তাব করল। আমিও ঠিক মনে করলাম। তাই........।’

কথা শেষ না করেই থেমে গেল যায়েদ।

যায়েদ থামতেই ফাতিমা বলে উঠল, ‘মাফ করবেন ভাইয়া, আমরা সব জানার পর ঘরে শুয়ে থাকতে পারিনি। বিশেষ করে যখন ভেবেছি আমরা বাসায় রাত যাপন করছি, আর আমাদের এক ভাই আমাদের জন্য মৃত্যুর সাথে লড়াই করছে, তখন ঘরে থাকা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়েছে।’ ফাতিমার আবেগ জড়িত কন্ঠে কান্নার সুর।

আহমদ মুসার মুখে হাসি ফুটে উঠল। বলল, ‘ধন্যবাদ তোমাদের দায়িত্ববোধের জন্য। আমি হয়তো ঠিক মনে করছি না। কিন্তু তোমরা যা করা উচিত, সেটাই করেছ।’

‘ধন্যবাদ ভাইয়া। আপনার মন, আপনার বিচারবোধ এবং আপনার স্নেহ এত বড় বলেই আপনি এত বড় এবং আহমদ মুসা। আপনার প্রতি আমাদের অভিনন্দন। আজ আমরা দু’জন আমাদের কে সব চেয়ে ভাগ্যবান মনে করছি।’

‘ওয়েলকাম বোন তোমাদের। তোমাদের কান্ড দেখে আমার স্ত্রী জোসেফাইনের কথা মনে পড়ছে। ঘটনাগুলো বিয়ের আগের। আমি ওকে নির্দেশ দিয়ে আসতাম। কিন্তু আমার অনুপস্থিতির সময় সে তার বিচারবোধ দ্বারা পরিচালিত হতো। বেশ কিছু অভিযানে সে আমার নির্দেশ অমান্য করে আমার পিছু নিয়েছে এবং আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে আমাকে বাঁচিয়েছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ভাইয়া, ভাবীকে এজন্যে কি আপনি বকেছেন?’ বলল ফাতিমা মুখে হাসি টেনে।

‘বকেছি। কিন্তু তার যুক্তিতে তিনি অনড়। আমার অনুপস্থিতিতে তাঁর বিচারবোধ দ্বারা পরিচালিত হবার অধিকার তাঁর রয়েছে বলে তিনি মনে করেন।’

ফাতিমার মুখে মিষ্টি হাসি ফুটে উঠল। বলল, ‘এ জন্যেই তিনি আমাদের ভাবী এবং আপনার উপযুক্ত সঙ্গিনী।’

ফাতিমা থামতেই যায়েদ তড়িঘড়ি বলে উঠল, ‘ভাইয়া আপনি শুধু আমাদের ভাইয়া নন, আমাদের মানে ফরাসীদের জামাই আপনি। এটা আমাদের একটা বড় গর্ব, যেটা ফাতিমাদের নেই।’ কি রকম? বুঝলাম না। ভাইয়া ফরাসীদের জামাই কি করে? বলল ফাতিমা। তার কন্ঠে বিস্ময়।

‘ও, তুমি জানই না। ভাবী তো মারিয়া জোসেফাইন লুই, ফ্রান্সের সর্বশেষ রাজবংশ বরবুনদের রাজকুমারী। ‘লুই দ্যা গ্রেট’ নামে পরিচিত ফ্রান্সের শক্তিমান সম্রাট চতুর্দশ লুই-এর তিনি সরাসরি বংশধর।’ বলল যায়েদ চোখ–মুখ উজ্জ্বল করে।

‘ও গ্রেট নিউজ আমাদের জন্যে। কিন্তু যায়েদ ফরাসী হিসাবে তোমার যে গর্ব, তার চেয়ে আমার গর্ব বড়, মুসলমান হিসাবে।

আমার একজন ভাই বিয়ে করেছেন তোমাদের রাজকুমারীকে।’

ফাতিমা বলল।

‘সেই হিসাবে তো আমার গর্ব ডবল। ফরাসী হওয়ার পাশা পাশি আমি মুসলমানও।’ চট করে বলল যায়েদ।

ফাতিমা কিছু বলতে যাচ্ছিল। আহমদ মুসা তাকে বধা দিয়ে বলল, তোমরা ঝগড়াটা বাড়িতে গিয়ে করো। এখন কাজের কথায় এস।

তোমরা এসে ভালই হয়েছে, এত বড় বাড়ি সার্চ করতে হবে, তোমাদের সাহায্য দরকার। চলো ভেতরে। বলে আহমদ মুসা চলতে শুরু করল।

যায়েদ ও ফাতিমা চলল তার পেছনে পেছনে।

সিঁড়ি রুমে ঢুকে আহমদ মুসা বলল, ‘চলো যাই আগে আন্ডার গ্রাউন্ড ফ্লোরে। ওখানে ডজন খানেক মানুষ মরে পড়ে আছে। ওদের সার্চ করা থেকেই কাজ শুরু করি।’

আহমদ মুসা সুইচ অন করে সিঁড়ি মুখ উন্মুক্ত করে নামতে লাগল সিঁড়ি বেয়ে। যায়েদ ও ফাতিমা তার পেছনে পেছনে চলল।

তারা পৌছল সেই রক্ত প্লাবিত কক্ষ।

ঘরে রক্তের বন্যা ও লাশের স্তুপ দেখে আঁৎকে উঠল ফাতিমা।

বলল, এত রক্ত এত লাশ।

‘ফাতিমা, এই কক্ষ আমার লাশ পড়ে থাকার কথা ছিল, কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় পড়ে আছে তাদের লাশ। আমি এখানে আসব, আগেই ওরা আঁচ করতে পেরেছিল। তার ফলে আমি এসেই ওদের ফাঁদে পড়ে যাই এবং বন্দী হই। হাত পায়ে বেড়ি লাগিয়ে এ ঘরেই ওরা আমাকে বন্দী করে রেখেছিল। আজ রাতেই

আমাকে হত্যা করার কথা। সে উদ্দেশ্যেই-অল্প ক'মিনিট আগে ওরা আমার ঘরে ঢুকেছিল। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল ভিন্ন। মারতে এসে সবাই ওরা মরেছে শুধু পালাতে পেরেছে ওদের শীর্ষনেতা লোকটি।' বলে থামল আহমদ মুসা।

ফাতিমা ও যায়েদ দু'জনেরই বিস্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টি আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা থামলেও সংগে সংগে কথা বলল না ওরা।

একটু পর যায়েদ বলে উঠল, 'একজন আহত, রক্তাক্ত লোককে আমরা গাড়ি করে পালাতে দেখলাম। সেই তাহলে নেতা?'

যায়েদ থামতেই ফাতিমা বলল, 'আলহামদুলিল্লাহ। আপনাকে অভিনন্দন ভাইয়া।' মাত্র দুই দিনে চারটি অভূতপূর্ব বিজয়। আগের অবস্থায় বিস্মিত হতাম, কিন্তু এখান সেই অবস্থা নেই। এসব বিজয় আহমদ মুসার জন্য কিছুই নয়। শুধু বলব, আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন।

আহমদ মুসা তখন মৃতদের সার্চ শুরু করে দিয়েছে। যায়েদ ও আহমদ মুসাকে সহযোগিতা করতে লাগল। কিন্তু তাদের কাছে কিছুই পাওয়া গেল না।

আহমদ মুসা সোজা হয়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, ওদের পকেটে কোন তথ্য-প্রমাণ না পেলে ও একটা বড় জিনিস পাওয়া গেছে। সেদিন হোটেলে মৃত দু'জনের সার্টের কলারে যে ইনসিগনিয়া পাওয়া গিয়েছিল, এদেরও সার্টের কলারে সেই ইনসিগনিয়াই রয়েছে। তারা যে একই দলের লোক পুলিশ এটা সহজেই বুঝতে পারবে।এটা স্পুটনিক কেসের জন্য ভালই হবে।

'কিন্তু এই ঘটনায় পুলিশ কি আপনাকে সন্দেহ করবে?' বলল ফাতিমা।

'পুলিশ বুঝবে কিনা জানি না, কিন্তু পুলিশকে বুঝানো হবে। আজর ওয়াইজম্যান বেঁচে গেছে। সেই পুলিশের বিশেষ কাউকে জানাতে পারে এবং আমার পিছনে পুলিশকে লেলিয়ে দেয়ার কাজ জোরদার করতে পারে। তবে আইনগতভাবে পুলিশের চিন্তা আজর ওয়াইজম্যানদের বিরুদ্ধেই যাবে।'

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা দরজার দিকে হাঁটা শুরু করল। বলল, 'এস উপরে সব ফেলার সার্চ করতে হবে, নিশ্চয় কিছু পাওয়া যাবে।'

ফাতিমা ও যায়েদ আহমদ মুসার পিছে পিছে চলল।

নিচের তলায় তারা কিছুই পেল না। দেখে তাদের মনে হলো, নিচের তলাটা এক সময় ষ্টোর ও চাকর বাকরদের বাসস্থান হিসেবেই ব্যবহৃত হতো। অবশ্য কয়েকটিতে কিছুক্ষন আগেও লোক ছিলো বলে তাদের মনে হলো।

দু'তলাটা সুসজ্জিত। দু'তলার ঘরগুলো প্রায় সবগুলই চেয়ার- টেবিল- সোফায় সাজানো অফিস ও সিটিং কক্ষ। তবে কাগজপত্র নেই কোন টেবিলে। আফিসগুলো পরিত্যক্ত মনে হলো তাদের। টেবিলের ড্রয়ার, আলমারি হাতড়িয়ে কিছু কাগজপত্র ও কয়েকটা টেলিফোন ইনডেক্স যা পেল তা সবই ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানের এবং পুরানা।

তিন তলার অধিকাংশ কক্ষই ফাঁকা। দক্ষিন দিকে পেল চারটা বেড রুম একই সারিতে। দেখে মনে হলো, এ বেড রুমগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে। চারটি বেড রুমের পাশে একটা কম্পিউটার কক্ষ খুঁজে পেয়ে গেল। ঘরটি একদম তাজা। কিছুক্ষন আগেও ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে হলো তাদের। কয়েকটি বাটনে ক্লিক করে আহমদ মুসা নিশ্চিত হলো যে, কম্পিউটার আজও ব্যবহৃত হয়েছে।

ঘুরে দাঁড়াল আহমদ মুসা ফাতিমা ও যায়েদের দিকে। বলল, যায়েদ, ফাতিমা এবার তোমাদের বিদ্যার পরীক্ষা হবে। দু'টা কম্পিউটার টার্মিনালের সব ফাইল, সব কিছু তোমাদের খুঁটে খুঁটে সার্চ করতে হবে। আমি ততক্ষণে অন্য কক্ষগুলো দেখে আসি।'

বলে আহমদ মুসা ঘর থেকে বেরুতে যাচ্ছিল। যায়েদ পেছন থেকে বলে উঠল, কম্পিউটারের সিক্রেট ফাইলগুলো আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বেশি। নিশ্চয় ওগুলোর কোড কোথাও রেখে যায় নি। কোন ফাইলে বা কোন প্রোগ্রামে কোড বা কোডগুলোকে ক্যামোফ্লেজ করে রেখে গেলেও তা এত তাড়াতাড়ি বের করা অসম্ভব হতে পারে। ওদের কোড কি হতে পারে, এ ব্যাপারে আপনি কিছু অনুমান করেন কি না।

থমকে দাঁড়িয়েছিল আহমদ মুসা। তার চেখে মুখে নেমে এল ভাবনার ছাপ। মুখ নিচু হলো তার। চোখ দু'টিও বন্ধ হয়ে গেল মুহুর্তের জন্য। বুঝা গেল গোটা ভাবনাকে সে কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা করছে।

একটু পর চোখ খুলল আহমদ মুসা। মুখ তুলল সে।

যায়েদের মুখে দুই চোখ নিবদ্ধ করে বলল আহমদ মুসা, 'অত্যন্ত কঠিন, মানে অসম্ভব একটা প্রশ্ন করেছে যায়েদ। তবে আমি যদি ওদের কেউ হতাম, তাহলে যে কোডগুলো আমি ব্যবহার করতাম, সেটা তোমাকে বলতে পারি।'

বলে আহমদ মুসা মুহূর্তকাল চিন্তা করে বলল, 'তোমাকে অনেকগুলো অপশন নিয়ে ট্রাই করতে হবে। তার প্রথমটি হলো, 'Harzel' অথবা 'H', দ্বিতীয় 'Azr Wiseman' অথবা AW, তৃতীয় 'World Freedom Army' অথবা 'WFA, চতুর্থ 'HAWWFA', পঞ্চম 'HAWFA' এবং ষষ্ঠ 'New Gulag' অথবা 'NG', হলো সর্বশেষ।'

আহমদ মুসা থামতেই বিস্মিত কন্ঠে ফাতিমা বলল, 'World Freedom Army'(WFA) থেকে যে কোড নিয়েছেন তার যুক্তি

বুঝলাম।ওটা ওদের সংগঠনের নাম। সংগঠনের নামে কোড হতে পারে। কিন্তু অন্য কোডগুলোর যুক্তি বুঝছি না। ওগুলো কি আপনার নিছক কল্পনা?

'কোনটাই কল্পনা নয় ফাতিমা। ইহুদীরা ইতিহাস ও ঐতিহ্য প্রিয়। Hazrel (H) ইহুদীবাদের জনক। Azr Wiseman (AW) এর Wiseman একজন বৃটিশ ইহুদী বিজ্ঞানী, তিনি বলা যায় ইসরাইল রাষ্ট্রের জনক। আর 'Azr' হলো 'World Freedom Army' (WFA) আন্দোলনের জনক। 'HAWWFA' and 'HAWFA' উপরোক্ত তিনটি নামের শব্দগুলোর আদ্যাক্ষরের সমাহার। সব শেষ সাবেক সোভিয়েতের 'New Gulag' সংস্কৃতির প্রতি ইহুদীদের আকর্ষণ খুব বেশি। সর্ব কনিষ্ঠ হিসাবে সাবেক সোভিয়েতের 'নির্মূলকরণ' সংস্কৃতি তারা অনুসরণ করছে। সুতরাং তাদের জন্য 'New Gulag' সুন্দর কোড ওয়ার্ড হতে পারে। বলল, আহমদ মুসা।

'ধন্যবাদ ভাইয়া। কিন্তু একটা কথা। ইহুদীরা ইতিহাস-ঐতিহ্য প্রিয় হলে তো' Temple' 'Solomon' 'Sabat' ইত্যাদি ঐতিহ্যবাহী শব্দও তো তাদের কোড ওয়ার্ড হতে পারে। কিন্তু এগুলোকে তো আপনি বাদ দিয়েছেন।'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'ইসরাইল, ইহুদী গোয়েন্দা সংস্থা 'মোসাদ' 'ইরগুনজাইলিউমি' 'ওয়ার্ল্ড ফ্রিডোম আর্মি' প্রভৃতি ধর্মবাদী নয়, ইহুদীবাদী,

আধিপত্যবাদী ঐতিহ্যের প্রতি তাদের আগ্রহ বেশি। এ কারণে ওদের ধর্মবাদী ঐতিহ্যের চেয়ে ইহুদীবাদী ঐতিহ্যের প্রতিই নজর দিতে হবে।

'ধন্যবাদ ভাইয়া।'

হাসি মুখে এক সাথে বলে উঠল ফাতিমা ও যায়েদ। পরে যায়েদ আবার বলল, 'আল্লাহ আপনার চিন্তাকে কবুল করুন এবং আমাদের কামিয়াব করুন।'

বলে যায়েদ কম্পিউটারের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। ফাতিমাও।

আহমদ মুসাও আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে হাটা শুরু করেছে।

আধা ঘন্টা পরে আহমদ মুসা ফিরে এলো হতাশ হয়ে। তিনতলার অবশিষ্ট ঘরগুলো সার্চ করে কিছুই পাওয়া যায়নি।

আহমদ মুসা কম্পিউটার রুমে ঢুকতেই ফাতিমা চাপা চিৎকার করে বলে উঠল, 'ইউরেকা, ইউরেকা। আমরা যা খুঁজছিলাম তা বোধ হয় পেয়ে গেছি ভাইয়া। সব আমরা বুঝছি না, আপনি বুঝবেন। আসুন।

আহমদ মুসা গিয়ে যায়েদের পাশে বসল।

কথা শেষ করেই ফাতিমা আবার বলে উঠল, আপনাকে আরও অভিনন্দন ভাইয়া। আপনার অনুমান সত্য। আপনার দেয়া কোড দিয়ে দুই কম্পিউটারের সিক্রেট ফাইলগুলো খোলা গেছে।'

'কোন দু'টি?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'New Gulag এবং Harzel' উত্তর দিলো ফাতিমা।

আহমদ মুসা আর কোন কথা না বলে মনোযোগ দিল কম্পিউটারের স্ক্রীণের দিকে।

'ভাইয়া মনে হয় আমরা সাংঘাতিক জিনিস পেয়ে গেছি।' বলল যায়েদ। তারপর যায়েদ 'কিবোর্ডে' একটা বোতাম চাপ দিয়ে স্ক্রীনের একটা জিনিসের দিকে ইংগিত করে বলল, ওটা কি চিনতে পারছেন ভাইয়া।

হ্যাঁ , ওটা 'স্পুটনিক।' রাশিয়ার প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ।' আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ ভাইয়া।' স্পুটনিকের নিচের হেডিংটা পড়ুন। বলল, যায়েদ।

'এর বিপজ্জনক পরিকল্পরা'-পড়ল শিরোনামটি আহমদ মুসা।

স্ক্রীনের শিরনাম দেয়া পাতাটি যায়েদ ধীরে ধীরে উপরে তুলল। বলল, ‘ভাইয়া, এবার স্পুটনিকের বিপজ্জনক পরিকল্পনাটা, পড়ুন।

পড়তে লাগল আহমদ মুসা। পাতাটি ধীরে ধীরে উপরে উঠছে আর পড়ছে তা আহমদ মুসা।

পড়ার এক পর্যায় এসে আহমদ মুসা আনন্দে যায়েদের পিঠ চাপড়ে চিৎকার করে উঠল, ‘যায়েদ, এ তো আমাদের স্পুটনিকের পরিকল্পনা!

নিউইয়র্কের ‘লিবার্টি’ ও ডেমোক্রাসি’ টাওয়ার ধ্বংসের রহস্য উন্মোচনে স্পুটনিক তদন্তের যে পরিকল্পনা করেছিল এবং এর যে উদ্দেশ ছিল, এ সবইতো এখানে বলা হয়েছে ! আলহামদুলিল্লাহ। থামল আহমদ মুসা।

কম্পিউটার স্ক্রীনে পাতাটি থেমে গিয়েছিল। আবার তা উপরে উঠতে লাগল। সামনে এসে দাঁড়াল পাতার দ্বিতীয় শিরনাম। যায়েদ বলল, ‘ভাইয়া পড়েন শিরোনামটা।’

‘ষ্টার ওয়ারঃ স্পুটনিককে গুলি করে নামানো’ পড়ল শিরোনামটি আহমদ মুসা। বলল, ‘তার মানে এবার স্পুটনিক ধ্বংসের পরিকল্পনা। আগাও যায়েদ।’

কম্পিউটার স্ক্রীনে পাতা উপরে উঠতে লাগল। উম্মুক্ত হতে লাগল পাতার লেখাগুলো। বলল যায়েদ, ‘ধীরে ধীরে পড়তে থাকুন ভাইয়া’ পড়তে লাগল আহমদ মুসা। তার পড়া যতই এগুলো, তার চোখে-মুখে আনন্দ-বিস্ময়ের খেলা ততই বাড়তে লাগল।

এক সময় পাতাটা কম্পিাউটার স্ক্রীনে স্থির হয়ে গেল। তার মানে দ্বিতীয় শিরোনামের বক্তব্য শেষ।

যায়েদ বলল, ‘কি বুঝলেন ভাইয়া?’

আহমদ মুসা ভাবছিল। তার ভাবনায় ছেদ নামল যায়েদের কথায়।

তাকাল সে যায়েদের দিকে। বলল, একটু ক্যামোফ্লেজ করেছে। কিন্তু ষড়যন্ত্র বুঝতে একটুও কষ্ট হয় না। ওদের ‘ষ্টার ওয়ার’ টা হলো নিউইয়র্কের টাওয়ার ধ্বংসের রহস্য অনুসন্ধানে স্পুটনিকের পরিকল্পনা। ‘ষ্টার ওয়ার’ বর্জন মানে স্পুটনিকের তদন্ত বর্জন করার জন্য তারা স্পুটনিকের পিসফুল ডেথ ঘোষনা করেছে। ষড়যন্ত্রের এই প্রকল্পে আরও দেখা যাচ্ছে ওদের কাছে স্পুটনিকের চেয়ে

বড় হলো স্পুটনিকের সাত নির্মাতা। কারণ ‘স্পুটনিক ওয়ান’ হারালে ‘স্পুটনিক টু’ তৈরী করতে পারে। তাই স্পুটনিকের জন্য যে দন্ড সেই দন্ড সাত নির্মাতার জন্যও। তবে তার আগে সাত নির্মাতার এক্সরে প্রয়োজন ‘ষ্টারওয়ার’ অর্থাৎ টুইন টাওয়ার ধ্বংসের রহস্য সন্ধানে তারা কতটুকু এগিয়েছে, কাদেরকে আরও তারা জানিয়েছে তা বের করার জন্য।’ থামল আহমদ মুসা।

‘ধন্যবাদ ভাইয়া, আমরা এটাই বুঝেছি। তবে স্পুটনিকের ‘পিসফুল ডেথ’ ব্যাপারটা বুঝিনি।’ বলে উঠল যায়েদ ও ফাতিমা প্রায় এক সংগেই।

‘পিসফুল ডেথ’ মানে উত্তাপ-উত্তেজনাহীন নিরব মৃত্যু। স্পুটনিককে এভাবেই ধ্বংস করা হয়েছে। স্পুটনিকের সবই ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু বিল্ডিং-এর গায়ে কোন আঁচড় লাগেনি, আসবাবপত্রও সব ঠিক আছে। শুধু নেই ফাইল কাগজ-পত্র, ফিল্ম এবং কম্পিউটারের সফটওয়ার ও ডিস্কগুলো। এগুলো নেই, কিন্তু কি হয়েছে এগুলোর সামান্য নির্দশনও কোথাও নেই। মনে হতে পারে, স্পুটনিকের সাত গোয়েন্দা অফিস ছেড়ে দিয়ে ফাইল-পত্র নিয়ে কোথাও উধাও হয়েছে। এটাকে বলা হয়েছে স্পুটনিকের পিসফুল ডেথ।’ আহমদ মুসা বলল।

‘অদ্ভুত এ কৌশল ভাইয়া। ফারাসী গেয়েন্দারা যদি স্পুটনিকের অফিসের কেমিকেল টেষ্ট না করত, তাহলে যে ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে তার কিছুই জানা যেত না, বলল ফাতিমা।

ফাতিমা থামতেই যায়েদ বলে উঠল, আরও মজার জিনিস ভাইয়া, আমরা যার কিছুই বুঝতে পারিনে।’

কথা বলতে বলতেই যায়েদ কম্পিউটারের কীবোর্ডে তার আঙুল চালনা শুরু করেছে। আহমদ মুসা তাকিয়ে আছে কম্পিউটারের স্ক্রীনের দিকে। বলল, মজার জিনিসটা কি যায়েদ?

‘একটা মানচিত্র ভাইয়া।’ বলেই যায়েদ কম্পিউটার স্ক্রীনের দিকে আঙুলি সংকেত করল, দেখুন ভাইয়া তৃতীয় একটা শিরোনাম।’

আহমদ মুসা আবার চোখ ফিরাল কম্পিউটার স্ক্রীনের দিকে। তাকাতেই চোখে পড়ল ‘নিউগুলাগ’ শিরোনামটা। ভ্রুকুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার।

শিরোনামটা উপরে উঠে এল।

তার সাথে সাথে স্ক্রীনে ভেসে উঠল একটা মানচিত্র।

মানচিত্রটা যে একটা দ্বীপের, তা পরিস্কার বুঝা যায় তার চারদিকের রং দেখে। মানচিত্রেও বিভিন্ন বর্নের ল্যান্ড স্কেপ। মানচিত্রের নীচে লেখা 'নিউ গুলাগ সাও তোরাহ।'

কম্পিউটার স্ক্রীনের উপর ঝুঁকে পড়েছে আহমদ মুসা।

যায়েদ, ফাতিমাও নিরব।

কিছুক্ষন পর মাথা সোজা করে বসল আহমদ মুসা। চোখ বন্ধ তার।

ভাবছে আহমদ মুসা।

মূহূর্ত কয়েকপর চোখ খুলল আহমদ মুসা। বলল, 'এটা মজার জিনিস নয় যায়েদ। এটা ভয়ংকর একটা স্থানের মানচিত্র। মানচিত্রের নিচে ফুট নেট আকারে তারকা চিহ্নিত দু'টো প্যারাগ্রাফ পড়েছ যায়েদ?'

'জ্বি, ভাইয়া।' যায়েদ বলল।

'দেখ এক নাম্বার প্যারাগ্রাফে বলা হয়েছে, ধর্মহীন ও ধর্মনিরপেক্ষ ছিল বলে, 'ওল্ড গুলাগ' ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু 'নিউ গুলাগে'র ভিত্তি হবে ঈশ্বরের মনোনীত ধর্ম এবং নিউ গুলাগ পরিচালনা করবে ঈশ্বরের সহস্র সহস্র বছরের পরীক্ষিত ও মনোনীত লোকেরা। দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে আছে, নিউ গুলাগ ঈশ্বরের বিশ্ব গড়ার একটা কারখানা এবং ল্যাবরেটরী। পৃথিবীর পথভ্রষ্ট মিলিট্যান্ট-মৌলবাদীদের এখানে এনে এক্সরে করা হবে এবং তার ফলাফলের ভিত্তিতে চিকিৎসা চলবে, গোটা পৃথিবীতে যাতে দ্রুত ইসরাইলের ঈশ্বরের রাজত্ব কায়েম হয়।'

থামল আহমদ মুসা। একটু থেমেই আবার বলল, কি বুঝলে যায়েদ, ফাতিমা।

'বুঝলাম, ধর্মহীন কম্যুনিষ্টদের গুলাগ ব্যর্থ হয়েছিল, কিন্তু ইহুদীদের ধর্মের নিউ গুলাগ সফল হবে। কিন্তু ঝুঝতে পারছিনা এক্সে-রে এবং তার ফলাফলের ভিত্তিতে বিশ্বব্যাপী চিকিৎসার ব্যাপারটা।' বলল, ফাতিমা।

'ব্যাপারটা আমার কাছেও খুব স্পষ্ট নয়। তবে যতটুকু বুঝতে পেরেছি তাতে বিষয়টা এই রকম হতে পারে, প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিউ গুলাগে ধরে নিয়ে যাবে।

সেখানে তাদের সব কথা বের করে নেয়া হবে বা জেনে নেয়া হবে যেমন এক্সরে'র মাধ্যমে করা হয়। এর ফলাফলের ভিত্তিতেই অতঃপর গোটা দুনিয়ায় তারা অপারেশন পরিচালনা করবে।'

আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ ভাইয়া। আমারও তাই মনে হয়।' বলল যায়েদ।

'সবটাই ভয়ংকর ব্যাপার ভাইয়া। ঐ এক্সরের পর নিশ্চয়ই ওখানে

কাউকে বাঁচিয়ে রাখা হবে না। আর বিশ্বব্যাপী ওদের অপারেশনটা ওল্ড গুলাগের ষ্ট্যালিনের মত।' বলল ফাতিমা। তার চোখে-মুখে আতংক।

'ঠিক বলেছ ফাতিমা। তবে ইহুদীবদীরা এটা করবে ধর্ম, মানবতা, মানবাধিকার ও সন্ত্রাস দমনের পোশাক পরে।' বলে একটা দম নিয়েই আহমদ মুসা আবার বলল, 'আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের স্পুটনিকের সাত গোয়েন্দাকে নিউ গুলাগ সাও তোরাহ দ্বীপেই রাখা হয়েছে।'

চমকে উঠল ফাতিমা ও যায়েদ দু'জনেই। তাদের দু'জনের চোখে-মুখেই নেমে এল অন্ধকার। দু'জনে এক সাথে বলে উঠল, 'কোথায় এই দ্বীপ?' কান্নার মত ভারী শোনাল তাদের কন্ঠস্বর।

আহমদ মুসা গা এলিয়ে দিল চেয়ারে। বলল, এটাই এখন প্রধান প্রশ্ন।'

সংগে সংগেই আবার সোজা হয়ে বসল আহমদ মুসা। বলল, 'যায়েদ সবগুলোর প্রিন্ট নাও। আর চল যাবার আগে পুলিশকে টেলিফোনে সব কিছু বলে যাই।'

উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা। বলল, 'যায়েদ তুমি প্রিন্টগুলো তাড়াতাড়ি সেরে ফেল। আমি এখনি আসছি।'

আহমদ মুসা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ফিরে এল পাঁচ মিনিট পরে দ্রুত। বলল, 'যায়েদ প্রিন্ট শেষ?'

'জি ভাইয়া।' বলল যায়েদ।

'তাহলে তোমরা দু'জন দ্রুত আমার পেছনে এস।' বলেই আহমদ মুসা ঘর থেকে বেরুবার জন্য হাঁটা শুরু করল।

ফাতিমা উঠে দাঁড়িয়েছিল সংগে সংগেই। যায়েদও কাজ গুছিয়ে নিয়ে আহমদ মুসার পেছনে হাঁটতে লাগল।

তারা দ্রুত নেমে এল নিচের তলায়।

এসে বাড়ির ভেতরে প্রবেশের গেট থেকে যে করিডোরটা ভেতরে এগিয়ে এসেছে তার মুখে দেয়ালের আড়ালে ওঁৎ পেতে দাঁড়াল তারা। আহমদ মুসা তার হাতে রিভলবার তুলে নিয়েছে।

ফাতিমা ও যায়েদ দু'জনেরই চোখে-মুখে উদ্বেগ। বলল, যায়েদ 'কি ব্যাপার ভাইয়া?' ফিস ফিস কন্ঠ যায়েদের।

'একটা প্রাইভেট কারকে আমি বাইরের গেটে দাঁড়াতে দেখেছি। দেখেছি দু'জন লোক নামতে। এরা নিশ্চয় WFA-এর লোক। ওদের রিল্যাক্স মুড দেখে মনে হয়েছে ওরা এখানকার ভেতরের খবর জানে না।' আহমদ মুসা বলল।

'তাহলে আমরা এখানে দাঁড়িয়ে কেন? আমরা এগুচ্ছিনা কেন?' ফাতিমা বলল।

'সামনে এগিয়ে ওদের মুখোমুখি হয়ে আমি আর লড়াই বাধাতে চাই না। আমি ওদের ধরতে চাই। এ পর্যন্ত ওদের কাউকে আমরা জীবন্ত হাতে পাইনি। ওদের কাউকে জীবন্ত হাতে পেলে 'নিউ গুলাগ সাও তোরাহ' দ্বীপ কোথায় জানার চেষ্টা করা যেত।

ফাতিমা ও যায়েদের মুখ উজ্জল হয়ে উঠল। ফাতিমা বলে উঠল, 'আপনার এ চিন্তা ঠিক ভাইয়া।'

'কিন্তু ওরা তো এতক্ষনে ভেতরে প্রবেশ করার কথা। আসছেনা কেন? ঠিক আছে, তোমরা এখানে দাঁড়াও। আমিএকটু ওদিকে.....।'

আহমদ মুসা কথা শেষ করতে পারলনা। পেছন থেকে একটা কর্কশ কন্ঠ ধ্বনিত হলো, 'ও দিকে নয়, এ দিকে তোমার যম আহম .......। তারও কথা শেষ হতে পারল না।

পেছনের দিকে কর্কশ কন্ঠ ধ্বনিত হবার সাথে সাথেই আহমদ মুসা অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সাথে নিজেকে ছুড়ে দিল মেঝেতে এবং সেই সাথেই তার হাতের রিভলবার গর্জন করে উঠল পরপর কয়েকবার।

ওদিকে পেছন থেকে যে কন্ঠ গর্জন করে উঠছিল তারা ছিল দু'জন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। দু'জনের হাতে উদ্যত রিভলবার। তাদের কন্ঠ থেমে যাবার সাথে সাথে তাদের রিভলবার ও গর্জন করে উঠেছিল।

আহমদ মুসা আগেই মেঝেয় ছিটকে পড়ার ফলে গুলি দু'টি তার উপর দিয়ে চলে যায়। তারা দ্বিতীয় গুলি করার আগেই আহমদ মুসার গুলি তাদের বিদ্ধ করল। বুকে গুলি খেল তারা দু'জনেই। তাদের রক্তাক্ত দেহ লুটোপুটি খাচ্ছিল মেঝেতে।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

ভয় ও আকস্মিকতায় কাঠ হয়ে ফাতিমা ও যায়েদ পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়েছিল। বাকরোধ হয়ে গেছে যেন তাদের। মৃত্যুকে যেন তারা একদম চোখের উপর নাচতে দেখল। জীবন ও মৃত্যু এত কাছাকাছি!

আহমদ মুসা যদি ঠিক সময়ে মেঝতে নিজেকে ছুঁড়ে দিতে না পারতো, তাহলে ওদের প্রথম গুলিই তার বক্ষ ভেদ করত। তারপর আহমদ মুসা যদি তার গুলিগুলো করতে কয়েক মুহূর্তও বিলম্ব করতো, তাহলে ওদের দ্বিতীয় গুলীর শিকার হতো আহমদ মুসা। তারপর ওদের তৃতীয় গুলি নিশ্চয় ছুটে আসতো যায়েদ ও ফাতিমার লক্ষ্যে। তাদের পকেটে একটি করে রিভলবার আছে, কিন্তু বের করার কথা মনে হয় নি, কখন বের করবে তাও বুঝতে পারেনি। আহমদ মুসা এত দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন!এত ক্ষিপ্র তিনি !যা ঘটে গেল তা অবিশ্বাস্য এক ঘটনা বলে মনে হচ্ছে তাদের কাছে। তাদের স্থির চোখের শূন্য দৃষ্টি আহমদ মুসার উপর নিবদ্ধ।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এস যায়েদ এদের একটু চেক করি।'

বলে আহমদ মুসা ওদের দিকে এগুলো।

আহমদ মুসার কথা শুনল যায়েদ। কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়া হলোনা তার মধ্যে। যেমন নিশ্চল দাঁড়িয়েছিল, তেমনি দাঁড়িয়ে রইল।

আহমদ মুসা প্রথমেই ওদের জামার কলার ব্যান্ড পরীক্ষা করল। তারপর তাদের পকেটগুলো সার্চ করল। দু'জনের পকেটে দু'টি মানিব্যাগ ছাড়া আর কিছুই পেলনা। মানিব্যাগে কোন কাগজপত্র পেলনা। এমনকি কোন নেমকার্ডও

নয়। শুধু কিছু ইউরো মুদ্রা রয়েছে মানিব্যাগে। মানিব্যাগ দু'টি আবার ওদের পকেটে রেখে দিয়ে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল এবং বলল, 'যায়েদ ফাতিমা এ দু'জনের কলার ব্যান্ডে ঐ একই ইনসিগনিয়া রয়েছে।'

কথা শেষ করে একটু থেমেই আবার বলল, চলো আমরা যাই।

আশে-পাশের কোন টেলিফোন বুথ থেকে পুলিশকে এখনি খবরটা জানাতে হবে। যাতে WFA -এর কেউ এখানে আসার আগেই পুলিশ আসতে পারে, সেটাও আমাদের দেখতে হবে।

আহমদ মুসা 'এসো' বলে হাঁটতে শুরু করল।

নিশ্চল মূর্তির আবস্থা থেকে ওরা নড়ে উঠল এবং আহমদ মুসার সাথে হাঁটতে শুরু করল। হাঁটতে হাঁটতে ফাতিমা বলল, 'এ ধরনের সংঘাতে জীবন-মৃত্যু যে কত কাছাকাছি, তা আজ প্রথম দেখলাম।

আপনার খারাপ লাগেনা ভাইয়া? একটুও চিন্তা হয়না আপনার? আমার বুক এখনোও কাঁপছে। যদি মেঝেয় ছিটকে পড়েগুলী করতে একমুহুর্তও দেরী করতেন তাহলেই তো আপনি আর থাকতেন না। আমি ভাবতেই পারছিনা এ সব কথা।' কন্ঠস্বর ভারী হয়ে উঠছিল ফাতিমার।

'জীবন-মৃত্যু কোন বুলেটের বা কোন অস্ত্রের হাতে নয়। এর ফায়সালা আসে আল্লাহর কাছ থেকে এবং তা আসে যখন তা আসার কথা। সুতরাং এ নিয়ে ভাবনার কিছু নেই।' তারা গেটে পৌছে গিয়েছিল।

'ভাইয়া সামনেই রাস্তার পূর্ব পাশে টেলিফোন আছে। আমি আসার আগে দেখেছি।' বলল, যায়েদ গেটে পৌছেই।

'যায়েদ চল, টেলিফোনটা করবে তুমি। টেলিফোন করে আমরা পাশেই কোথাও অপেক্ষা করব। এ বাড়িটা পাহাড়া দিতে হবে, যাতে পুলিশ আসার আগে ওরা কেউ আসতে না পারে।'

আহমদ মুসা 'এস' বলে আবার হাঁটা শুরু করল।

'টেলিফোনে কি বলব ভাইয়া?' বলল যায়েদ।

'বলবে, 'অমুক নাম্বার বাড়িতে গোলাগুলির আওয়াজ শুনেছি। বড় কিছু ঘটছে সেখানে। ব্যস আর কিছু নয়।' আহমদ মুসা বলল।

টেলিফোন করে আহমদ মুসারা পাশেই অপেক্ষা করল। দশ মিনিটও পার হলো না। পুলিশের দু'টি গাড়ি ছুটে এল তীব্রবেগে এবং তাদের অতিক্রম করে চলে গেল বাড়িটার দিকে।

এবার যায়েদ গাড়ি ষ্টার্ট দিল যাবার জন্যে। গভীর রাতের নিরবতা ভেঙে ছুটে চলছে গাড়ি। যায়েদের পাশে আহমদ মুসা।

পেছনের সিটে ফাতিমা।

চোখ বন্ধ করে গাড়ির সিটে গা এলিয়ে দিয়েছে আহমদ মুসা।

তিন জনেই নিরব।

নিরবতা ভাঙল যায়েদ। বলল, 'আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের স্বরণীয় রাত চির স্বরণীয়ভাবে কাটল ভাইয়া। আমরা খুব খুশি।'

'তোমাদের অভিনন্দন। কিন্তু মনে রেখ, তোমাদের দু'জনের নতুন জীবন যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে শুরু হয়েছে।' বলল আহমদ মুসা।

'এবং সে যুদ্ধটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়েকে প্রতিষ্ঠার জন্য। সুতরাং এটা আমাদের সৌভাগ্য।' যায়েদ বলল।

'ধন্যবাদ যায়েদ, তোমাদের মত করে সব মুসলমান যে দিন ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধের সংগ্রাম কে তাদের জন্য সৌভাগ্যের মনে করবে, সেদিন গোটা দুনিয়ার মুসলমানদের জীবন থেকে, অন্ধকারের অমানিশা কেটে যাবে।' বলল আহমদ মুসা।

'সেদিন কত দূরে ভাইয়া? ফাতিমা বলল।

'সেটা নির্ভর করছে তোমরা তরুন-তরুনীরা কত দ্রুত সামনে আগাতে পারছো তার ওপর।' বলল আহমদ মুসা।

ফাতিমা কোন কথার উত্তর দিল না। তার নিরব দৃষ্টি প্রসারিত হলো সামনে।

যায়েদের দৃষ্টিও সামনে প্রসারিত।

আবার আহমদ মুসা তার চোখ বন্ধ করেছে। ভাবছে সে।

এক সময় যায়েদ মুখ তুলল আহমদ মুসার দিকে। বলল, কি ভাবছেন ভাইয়া?

চোখ খুলল আহমদ মুসা। গম্ভীর হয়ে উঠল তার মুখ। বলল, ‘ভাবছি ওদের নিউ গুলাগ ‘সাও তোরাহ’ দ্বীপের কথা। কেথায় এই ভয়ংকর দ্বীপটা? কিন্তু এই মুহুর্তে তার চেয়েও বেশি ভাবছি আজকের রাতের ঘটনাকে পুলিশ কতটা, কিভাবে ব্যাবহার করবে? তারা প্রেসকে এ চাঞ্চল্যকর বিষয়টা জানতে দিবে কিনা?

বলেই আহমদ মুসা হঠৎ সোজা হয়ে বসল। তার চেখে- মুখে চাঞ্চল্যের চিহ্ন দেখা দিল। বলল দ্রুত কন্ঠে, যায়েদ ফাতিমা কোন সাংবাদিকের ঠিকানা তোমাদের কাছে আছে?

ফাতিমা, যায়েদ দু’জনেই সোজা হয়ে বসল। যায়েদ বলল, আমার কাছে কোন সাংবাদিকের টেলিফোন নাম্বার নেই। তবে আবদুল্লাহ ভাইয়ের বাসায় সাংবাদিক বুমেদিন বিল্লাহর টেলিফোন নাম্বার থাকতে পারে। কাল ঐ সাংবাদিক ভাইয়ার পরিবারের সাথে যোগাযোগ করে ছিলেন।’

‘বুমেদিন বিল্লাহ’ মানে লা-মন্ডের সাংবাদিক যিনি প্রথম নিউজটা করেছিলেন।’

‘হ্যাঁ ভাইয়া।’ বলল যায়েদ।

খুশি হলো আহমদ মুসা। বলল, তাকেই আজ বেশি দরকার। কিন্তু তিনি কি স্ট্রাসবার্গে আছেন?

‘শুনেছিলাম আছেন। তিনি নাকি এই কেসটার ব্যাপারে আগ্রহী।’ যায়েদ বলল।

‘আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে যায়েদ মোবাইলে তুমি তোমার ভাইয়ার বাসায় টেলিফোন কর। সাংবাদিক বুমেদীন বিল্লাহর টেলিফোন নাম্বার নাও।’ দ্রুত কন্ঠে বলল আহমদ মুসা।

গাড়ির ষ্টিয়ারিং এ এক হাত রেখে অন্য হাতে মোবাইলে টেলিফোন করল যায়েদ। প্রথমবার ও দ্বিতীয়বারের চেষ্টাতেও টেলিফোন কেউ ধরল না। তৃতীয় বারের চেষ্টায় টেলিফোন রিসিভ করল ওপার থেকে। খুশিতে মুখ উজ্জল হয়ে উঠল যায়েদের। বুমেদীন বিল্লাহর নাম্বার সে নিয়ে নিল।

টেলিফোন অফ করে দিয়ে বলল যায়েদ, 'আলহামদুলিল্লাহ, নাম্বারটা পেয়েছি ভাইয়া।'

'আলহামদুলিল্লাহ। এবার, মিঃ বুমেদীন বিল্লাহকে দেখ। পেলে তাকে বল, 'শার্লেম্যান রোডের ৫নং বাড়িটা স্পুটনিক ধ্বংসকারী ও সাত গোয়েন্দাকে অপহরনকারীদের একটা ঘাঁটি। আজ রাতে ওখানে ওদের বার চৌদ্দজন লোক মারা গেছে। ওখানে ওদের ঐ অফিসে কয়েকটা কম্পিউটার রয়েছে। কম্পিউটারে স্পুটনিক ধ্বংস ও সাত গোয়েন্দাকে অপহরনের ব্যাপারে চাঞ্চলকর তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

ব্যাস, এই টুকুই বললে হয়ে যাবে। এই মাত্র পুলিশ সেখানে গেছে।' বলল আহমদ মুসা।

'ধন্যবাদ ভাইয়া' বলে যায়েদ মোবাইল তুলে নিল। টেলিফোন করল। প্রথম বারেই ওপার থেকে সাড়া পেয়ে গেল যায়েদ। আহমদ মুসা যেভাবে বলেছিল সেই ভাবেই সব কথা যায়েদ সাংবাদিক বুমেদিন বিল্লাহকে জানাল। তারপর ওপারের কথা সে শুনল। চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল যায়েদের। ধন্যবাদ বলে সে মোবাইলটা অফ করে দিল।

আহমদ মুসা ও ফাতিমা উদগ্রীব হয়ে শুনছিল যায়েদের কথা।

যায়েদ কথা শেষ করতেই ফাতিমা দ্রুত কন্ঠে বলল, কি রেজাল্ট? কি বলল সাংবাদিক বুমেদীন বিল্লাহ?

'খুব খুশী হয়েছেন। এখনি যাচ্ছেন উনি ৫নং শার্লেম্যান রোডে। আমাকে অনেক করে ধন্যবাদ দিয়েছেন তিনি।' বলল যায়েদ।

'আলহামদুলিল্লাহ। ধন্যবাদ যায়েদ তোমার এ সফল মিশনের জন্য। যদি বিষয়টা পত্রিকায় আনা যায় তাহলে তো একটা বিরাট ব্যাপার হবে। ফরাসি পুলিশও তখন চাপে পড়বে।' থামল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা থামতেই যায়েদ বলে উঠল, 'মিশন আমার কোথায় ভাইয়া! আমি তো মাত্র আপনার প্রক্সি দিলাম।'

'রাখ এসব কথা। বল, আরও কিছু বলেছেন উনি? বলল আহমদমুসা।

‘একটা প্রশ্ন উনি করেছেন। সেটা হলো, কে তাদের হত্যা করল। প্রশ্ন করে তিনিই আবার তার উত্তর দিয়েছেন। বললেন সেদিন হোটেলে যে ভাবে যে কারনে মরেছে, সে ধরনের ঘটনাই বোধহয় ঘটেছে। দেখলেই বোঝা যাবে। বাড়তি একথা টুকুই তিনি বলেছেন।’ যায়েদ বলল।

‘এ কথাটুকুই অনেক কথা যায়েদ। সাংবাদিক বুমেদীন বিল্লাহ দেখছি খুব বুদ্ধিমান। আমার বিশ্বাস ওখানকার সব কিছুই তার কাছে ধরা পড়ে যাবে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘তাই যেন হয় ভাইয়া।’ বলে উঠল ফাতিমা ও যায়েদ দু’জনেই।

আহমদ মুসা আর কিছু বললনা। গাড়ির চেয়ারে গা এলিয়ে দিল ফাতিমা ও যায়েদ নিরব। আশায় উজ্জ্বল তাদের চারটি চোখ সামনে নিবদ্ধ।

ছুটে চলছে গাড়ি।

# ৫

আহমদ মুসা বসে আছে ড্রইংরুমে পুবের জানালার পাশে এক সোফায়।

আহমদ মুসাদের এ ফ্ল্যাটটি আট তলায়। বাড়িটা দাঁড়ানো একেবারে ঈল নদী তীর ঘেঁষে।

আহমদ মুসার দৃষ্টি জানালা দিয়ে বাইরে নিবদ্ধ। ঈল নদী পেরিয়ে সুন্দর রাইন উপত্যকার অনেকখানিই দেখা যায় এ জানালা দিয়ে। আহমদ মুসা চোখ বুলাচ্ছে রাইন উপত্যকার সবুজ বুকের উপর।

আহমদ মুসার চোখ দুটি রাইন উপত্যকার নরম সবুজের উপর নিবদ্ধ থাকলেও মন তার হারিয়ে গেছে ফেলে আসা এক অতীতের দিকে। তার দু'চোখে ভেসে উঠল রাইনের সবুজের অন্তরালে জমাট রক্তের এক সাগর। পৃথিবীর দুর্ভাগা যতগুলো ভুখন্ড আছে তার মধ্যে সুন্দর সবুজ এই রাইন উপত্যকাও একটি। ফ্রান্স-জার্মান আধিপত্যের লড়াই সবচেয়ে বেশি পীড়িত করেছে এই রাইন উপত্যকাকে। সপ্তম শতাব্দি শেষে এই উপত্যকা সম্রাট শার্লেম্যানের সম্রাজ্যের অংশে পরিণত হয়। শার্লেম্যানের উত্তরসুরীদের কাছ থেকে জার্মানি এই উপত্যকা কেড়ে নেয়। ১৫ শতক পর্যন্ত এখানে চলে জার্মানির আধিপত্য। পরে ফ্রান্স কেড়ে নেয় এই উপত্যকা জার্মানির কাছ থেকে এবং শুরু করে এখানে ফরাসীকরণ। বিশেষ করে ফরাসী বিপ্লবের পর এখানকার জনগণ এতটাই ফরাসী হয়ে যায় যে, অষ্টাদশ শতাব্দির শেষভাগে যখন এই উপত্যকা জার্মানি দখল করে নেয় এবং পাল্টা জার্মানিকরণ শুরু করে তখন এখানকার ৫০হাজার মানুষ ফ্রান্সে হিজরত করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ফ্রান্স রাইন উপত্যকার উপর তার অধিকার ফিরে পায়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতেই জার্মানি এটা আবার দখল করে নেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই উপত্যকার উপর ফ্রান্সের আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। তার পর অর্ধ শতাব্দির বেশি কাল ধরে এখানে চলে ফ্রান্সের শাসন। আবার জার্মানরা এখানে ফিরে আসবে না এ গ্যারান্টি ইতিহাস দিতে পারেনা।

দুই আধিপত্যবাদী শক্তির মাঝে রাইন উপত্যকার মানুষ তৃতীয় শক্তি। কিন্তু তারা দূর্বল। দূর্বল বলেই তাদের স্বাতন্ত্র, স্বাধিকার ও স্ব-মতের কোন মূল্য নেই। এই দূর্বলতার কারণে সুন্দর এই রাইন উপত্যকার মানুষ শুধু নয়, তাদের মত শত শত জাতি-গোষ্ঠি আজ শক্তিমানদের দ্বারা পদদলিত হচ্ছে একইভাবে। স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র, স্বাধীকার, মানবাধিকার সবই শক্তি নির্ভর। যাদের শক্তি আছে তাদের এসব নিশ্চিত থাকবে, আর যাদের তা নেই, এ অধিকার ভোগের অধিকার তাদের পদদলিত হচ্ছে। স্বাধীনতা, স্বাধীকার, মানবাধিকার, সন্ত্রাস এসব কিছুরই সংগা শক্তি নির্ভর হয়ে উঠেছে। শক্তিমানরা এসবের যে সংগা দেয় সেটাই হয়ে উঠে অনুসরণীয়। বার্মা'র সুচি'র আন্দোলন গনতন্ত্র, কিন্তু আলজিরিয়ার আব্বাস মাদানীর আন্দোলন তা নয়। সূচী পেল নোবেল পুরস্কার, আর আব্বাস মাদানী পেল জেল-দন্ড। পূর্ব তীমুরের আন্দোলন স্বাধীনতা সংগ্রাম, কিন্তু কাশ্মীর ও ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা সংগ্রাম অভিহিত হয়েছে সন্ত্রাস হিসেবে। এ সবের সংগায়নের ব্যাপারে জাতিসংঘের কিছু করনীয় নেই। জাতিসংঘ শক্তিমানরা গঠন করেছিল এবং তা শক্তিমানদের কথা শুনতেই বাধ্য। জাতিসংঘ আজ ভারবাহী গাধার মত। সে শুধু ভার বহনকারী, ভার নির্ধারণ, নিয়ন্ত্রণের কোন সুযোগ তার নেই। জাতিসংঘ ত্বরিত গিয়ে পূর্ব তীমুরের ভারটা গ্রহণ করেছিল, কিন্তু কাশ্মীর ও ফিলিস্তিন কিংবা চেচনিয়ার ভার সে গ্রহণ করতে পারেনি। এদিক থেক জাতিসংঘ কিছুটা সাম্প্রদায়িক হয়ে পড়তেও বাধ্য হয়েছে। যেমন ..........।

হঠাৎ আহমদ মুসার চিন্তায় ছেদ এসে পড়ল ফাতিমার কথায়। বলছিল ফাতিমা, 'রাইন উপত্যকা নিয়ে এত গভীর ভাবে কি ভাবছেন ভাইয়া ?

এর আগেই ফাতিমা ও যায়েদ আহমদ মুসার সামনে এক সোফায় এসে পাশাপাশি বসে পড়েছিল।

দু'জনকেই সুনদর পোশাকে খুব ফ্রেশ লাগছিল। ফাতিমাকে ঐতিহ্যবাহী মুসলিম পরিপারের একজন গৃহবধু বলে মনে হচ্ছে। তার পরনে পা পর্যন্ত নেমে যাওয়া ঐতিহ্যবাহী ঘাগরা। গায়ে ফুলহাতা ঢিলা কামিজ। মাথার রুমালটা গলা পেঁচিয়ে কাঁধ ও বুক পর্যন্ত নেমে এসেছে।

আহমদ মুসা ফাতিমার কথা শুনে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে সামনের দিকে তাকাল। দু'জনের দিকে পলকের জন্য দৃষ্টি দিয়ে সোফায় গা এলিয়ে উপরের দিকে শুন্য দৃষ্টি তুলে ধরে বলল, 'হ্যাঁ, ফাতিমা, আমি রাইন উপত্যকা নিয়েই ভাবছিলাম। তোমরা দু'আসামীই আমার সামনে হাজির। তোমরা জার্মান ও ফরাসীরা সুন্দর সবুজ অতি মনোহর এই রাইন উপত্যকাকে এবং তার মানুষদেরকে ফুটবল বানিয়েছ।

ফাতিমা ও যায়েদ দু'জনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। ফাতিমা যায়েদের দিকে ইশারা করল উত্তর দেবার জন্য। কিন্তু যায়েদ ইশারা করল ফাতিমাকে উত্তর দেবার জন্য। ফাতিমা বলল, ভাইয়া আপনি জার্মান-ফরাসীদের দুষছেন কেন! ভূমি নিয়ে এমন লড়াই তো দুনিয়ার সব চেয়ে প্রাচীন ইতিহাস। কোন দেশ, কোন জাতি কি এই দোষ থেকে মুক্ত আছে?'

'কিন্তু ছোট বিশেষ একটা ভুখন্ড নিয়ে এমন রক্তক্ষয়ী টাগ অব ওয়ার পৃথিবীর আর কোথাও নেই ফাতিমা।' আহমদমুসা বলল।

'কোন দুই দেশের সীমান্তে রাইন উপত্যকার মত এমন সুন্দর ও বিশেষ অবস্থানের ল্যান্ডও দুনিয়ার কোথাও নেই ভাইয়া। পাহাড়ের দেয়াল একে বিচ্ছিন্ন করেছে ফ্রান্স থেকে, আবার রাইনের মত

আন্তর্জাতিক নদী একে বিচ্ছিন্ন করেছে জার্মান থেকে। দুই দেশই এই ন্যাচারাল ব্যারিয়ারের অজুহাত তুলে এলাকাটা দখলে রাখতে চায়। নিশ্চয় এ বিষয়গুলো বিশেষ বিবেচনার বিষয় ভাইয়া।'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'তার মানে সংগত কারনেই আধিপত্ত্যের এ লড়াই চলতেই থাকবে?'

হাসল ফাতিমা। বলল, 'আমরা তা চাইনা। চাইনা বলেই তো জার্মান এবং ফ্রান্স এক হয়ে গেছি।'

আহমদ মুসা ও যায়েদ দু'জনেই এক সংগে হেসে উঠল।

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল।

বাধা দিয়ে ফাতিমা বলে উঠল, 'এ নিয়ে আর কথা নয়। বলুন, ওদের নতুন গুলাগ 'সাও তোরাহ' নিয়ে আর কি ভাবছেন।

আবার সোফায় হেলান দিয়ে বসল আহমদ মুসা। গম্ভীর হয়ে উঠল তার মুখ। সংগে সংগেই কোন উত্তর দিল না। পরে ধীরে ধীরে বলল, ‘ভেবেছি, কিন্তু ভেবে কোন কুল পাইনি। আমরা শুধু দ্বীপটার নামটাই জানতে পেরেছি, আর কিছু নয়। এবং আমি নিশ্চিত এই নামটা আসল নয়।’

‘সর্বনাশ নামটাও যদি নকল হয় তাহলে? বলল ফাতিমা। কন্ঠ তার আর্তনাদের মত শোনাল।

‘দ্বীপটাকে কিভাবে চেনা যাবে, এটাই এখন প্রধান সমস্যা আমাদের কাছে। সে জন্যই আমি চেয়েছিলাম ওদের কাউকে জীবন্ত ধরতে। কিন্তু পারলাম না।’ আহমদ মুসা বলল।

‘চেষ্টা তো সেদিন করেছিলেন। আচ্ছা আপনি যদি ও দু’জনকে গুলি না করতেন, তাহলে কি ঘটত? ওরা কি গুলি করত?

যায়েদ ‘কি ঘটত আমি জানিনা। তবে ওদের প্রথম গুলি করা থেকে বুঝা যায়, ওদের মারতে না পারলে ওদের হাতে আমাদের মরতে হতো।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আরেকটা বিকল্প হয়তো ছিল। সেটা হলো অস্ত্র ফেলে দিয়ে ওদের কাছে আত্মসমর্পন করা। যা হতো আমাদের জন্য মৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর।’ যায়েদ বলল।

হ্যাঁ, এটাও বিকল্প হতে পারতো।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আল্লাহ আমাদের বাঁচিয়েছেন। আমার বিস্ময় এখনো কাটেনি ভাইয়া, আপনি বুঝলেন কি করে যে, আপনাকে শুয়ে পড়ে গুলী করতে হবে?’ বলল ফাতিমা।

‘ওরা আগেই আমাদের দিকে রিভলবার তাক করেছিল। আমরা রিভলবার ওদের দিকে তুলতে গেলেই ওদের গুলী খেতে হতো। মাটিতে নিজেকে ছিটকে দিয়েছিলাম ওদের চোখের আড়ালে রিভলবার তাক করার সুযোগ নেয়া এবং যদি ওরা গুলী করে বসে তাও এড়াতে পারার জন্য।’

‘ধন্যবাদ ভাইয়া। আপনার দু’লক্ষ্যই অর্জিত হয়েছিল।’ বলল যায়েদ।

‘আল্লাহ সাহায্য করেছেন।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আলহামদুলিল্লাহ।’ বলে একটু দম নিয়েই ফাতিমা আবার বলে উঠল, ‘আগের কথায় ফিরে আসি ভাইয়া।’ সাও তোরাহে’র সন্ধান করার জন্য আপনি এখন কি চিন্তা করছেন।

‘চিন্তা করে কোন কিনারায় পৌঁছাতে পারিনি আমি। নানাভাবে বিষয়টা নিয়ে ভাবছি। দ্বীপটার নামের দু’টি শব্দআছে একটি ‘সাও’ অন্যটি ‘তোরাহ’। এর মধ্যে ‘সাও’ ল্যাটিনীয় স্প্যানেশ। আর ‘তোরাহ’ শব্দ ওল্ড টেস্টামেন্টের। শব্দ-প্রকৃতির বিচার থেকে আমি মনে করি, দ্বীপটা মিড-উত্তর আটলান্টিকের পূর্বাংশে অথবা মিড-দক্ষিণ আটলান্টিকের মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার ল্যাটিন এলাকার কোথাও হবে।’

ফাতিমা ও যায়েদ তাকিয়েছিল আহমদ মুসার মুখের দিকে।

তাদের চোখে-মুখে বিস্ময়। কিছু বলতে যচ্ছিল যায়েদ। এ সময় দরজায় নক হলো। ওঠে দিয়ে দরজা খুলল যায়েদ।

নিচ থেকে বেয়ারা আজকের কয়েকটি কাগজ নিয়ে এসেছে।

দরজা বন্ধ করতে করতে যায়েদ উপরে যে কাগজটা আছে তার দিকে নজর বুলাচ্ছিল।

নজর বুলিয়েই চিৎকার করে উঠল যায়েদ। বলল, ‘সেদিনের ঘটনাকে লা-মন্ডে লিড আইটেম করেছে ভাইয়া।’

বলে দরজা বন্ধ করে ছুটে এল যায়েদ। কাগজটা আহমদ মুসার হাতে দিল।

আহমদ মুসা কাগজ হাতে নিয়ে তাকাল হেডিংটার উপর। পড়ল হেডিংটাঃ

‘ঘটনার চাঞ্চল্যকর মোর, স্পুটনিক ধ্বংসের সাথে জড়িতদের আরও ১৪ জন নিহত ও কম্পিউটার থেকে পুলিশ কর্তৃক মূল্যবান দলিল উদ্ধার।’

হেডিংটা পড়েই চোখ দু’টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল আহমদ মুসার। চোখ বুলাল ক্রেডিট লাইনের উপর। দেখল লেখা আছে ‘ষ্ট্রাসবার্গ থেকে বুমেদিন বিল্লাহ।’ আরও খুশি হয়ে উঠল আহমদ মুসা বুমেদিন বিল্লাহর নাম দেখে। সে নাম গোপন করেনি। সাহস আছে তার।

যায়েদ ও ফাতিমা তখন আন্য পত্রিকায় নজর বুলাচ্ছিল। যায়েদ বলে উঠল, প্যারিসের আর মাত্র দু'টি পত্রিকা এবং ষ্ট্রাসবার্গের একটি পত্রিকা সিংগল কলামে নিউজটি দিয়েছে। বলছে, অজ্ঞাতনামা আততায়ীর গুলিতে ১৪ জন অজ্ঞাত নামা নিহত।'

'লা-মন্ডেই যথেষ্ট যায়েদ। আল্লাহর শুকরিয়া, লা-মন্ডে বিস্ময়কর ভাবে ইহুদী চাপ উপেক্ষা করেছে। আমি.........।'

আহমদ মুসার কথার মাঝখানেই যায়েদ বলে উঠল, 'এর কারণ আছে ভাইয়া। অতি-সম্প্রতি লা-মন্ডে দ্য গলপন্থীদের হাতে এসেছে।

এর সম্পাদকও নিযুক্ত হয়েছে একজন ন্যাশনালিষ্ট।'

'ও, কারণ তাহলে এটাই।' বলে আহমদ মুসা তার হাতের লা-মন্ডেটি যায়েদের দিকে তুলে ধরে বলল, 'যায়েদ পড় নিউজটা। কি লিখেছে দেখা যাক।'

যায়েদ হাতে নিল কাগজটা।

সে আবার কাগজটা ফাতিমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'পড় না, পড়ায় তুমি খুব ভাল।'

'তোমাদের ফরাসী তুমিই পড়।' বলল ফাতিমা।

'ভাইয়া দেখুন, অল্পক্ষণ আগেও বলছে আমরা জার্মান-ফরাসী এক হয়ে গেছি। আর এখন কি বলছে শুনুন।' যায়েদ বলল।

ফাতিমা হাসল। যায়েদের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠল, 'ভাইয় কথা সে অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিচ্ছে। আমি ভাষার কথা বলছি। আর প্রত্যেক জাতির জন্যে তার ভাষা আল্লাহর দান।'

'আচ্ছা, তোমাদের ঝগড়ার ফয়সালা পরে করব। এবার খবরটা পড়। লা-মন্ডে তোমাদের কাগজ যায়েদ, তুমই এটা পড়বে।' আহমদ মুসা বলল।

'আমিও ভাইয়াকে সমর্থন করছি।' বলল ফাতিমা মুখ টিপে হেসে।

'ভোট তুমি না দিলেও আমি পড়ছি।' বলে যায়েদ কাগজ গুছিয়ে নিয়ে সামনে ধরল এবং পড়তে শুরু করলঃ

'স্ট্রাসবার্গ থেকে বুমেদিন বিল্লাহ্। গত পরশু গভীর রাতে স্ট্রাসবার্গের শার্লেম্যান রোডের ৫নং বাড়ি থেকে পুলিশ স্পুটনিক ধ্বংসের সাথে জড়িত বলে

কথিত ১৪ জনের লাশ উদ্ধার করেছে। সেই বাড়িটির তৃতীয় তলায় তাদের অফিস কম্পিউটার থেকেমূল্যবান দলীল দস্তাবেজ ও উদ্ধার করেছে পুলিশ। এই উদ্ধারের কাজের সময় লা-মন্ডের এই রিপোর্টারও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ১৪ জনের মধ্যে ১২ জনের লাশ পাওয়া যায় ভূগর্ভস্থ একটি কক্ষ। আর বার জনের মধ্যে ১১ জনের কাছেই একটি করে ষ্টেনগান পাওয়াগেছে, অবশিষ্ট একজনের কাছে পাওয়া গেছে একটি রিভলবার।

কক্ষটিকে বন্দিখানা বলে সন্দেহ করা হয়েছে। ঘরে একটা সিংগেল খাট দেখা গেছে এবং খাটের উপর পাওয়া গেছে একটি হ্যান্ডকাফ। হ্যান্ডকাফের তালা ল্যাসার বীম দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা। পুলিশ মনে করছে একজন লোককে এখানে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। সেই বন্দী হ্যান্ডকাফের তালা গলিয়ে মুক্ত হয় এবং ঘরে প্রবেশকারী ১২ জনকে তাদেরই ষ্টেনগান দিয়ে হত্যা করে পালাতে সমর্থ হয়।

উল্লেখ্য, ক'দিন আগে হোটেল রাইন ইন্টারন্যাশনালের একটি কক্ষে দু'জনের লাশ পাওয়া যায়। তারাও কক্ষের বাসিন্দাকে হত্যা বা কিডন্যাপ করতে গিয়ে নিহত হয় বলে পুলিশ নিশ্চত হয়েছে। এরা দু'জন এবং উপরোক্ত চৌদ্দজন একই দলের বলে পুলিশ নিশ্চিত ভাবে মনে করছে। তাদের সকলেরই কলার ব্যান্ডে একই ধরনের ইনসিগনিয়া পাওয়া গেছে।

শার্লেম্যান রোডের ৫ নং বাড়িতে অবশিষ্ট ২ জনের লাশ পাওয়া যায় নীচের এক করিডোরে। পুলিশ মনে করছে বন্দী পালাবার সময় এ দু'জনকে হত্যা করে। এ দু'জনের হাতেও একটি করে রিভলবার পাওয়া গেছে।

নিহতদের সব অস্ত্রই লাইসেন্স বিহীন অবৈধ বলে পুলিশ উল্লেখ করেছে।

তিন তলার অফিস কক্ষ কম্পিউটারে যে দলিল দস্তাবেজ পাওয়া গেছে তার মধ্যে স্পুটনিক ধ্বংসের ব্লু- প্রিন্টও রয়েছে। পুলিশ তাদের তদন্তের স্বার্থে এ ব্লু-প্রিন্টের বিবরণ সম্পর্কিত কোন কিছু জানাতে রাজী হয়নি। তবে পুলিশ বলছে, নিছক ঐ ব্লু-প্রিন্ট দিয়ে সংশ্লিষ্ট দল বা ব্যাক্তিকে চিহ্নিত করা মুস্কিল।

নিহতদের সূত্র ধরে ক্রিমিনাল দলটির সন্ধান করা যায় কিনা এ সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে পুলিশ বলেছে তারা তা চেষ্টা শুরু করেছে।

ক্রিমিনাল দলটির পরিচয় সম্পর্কে পুলিশ বলতে না পারলেও ইনসিগনিয়ার বৈশিষ্টের প্রতি ইংগিত করে ওয়াকিফহাল মহল বলেনে, কোন ইহুদী সংগঠন স্পুটনিক ধ্বংসের ঘটনার সাথে জড়িত।

ক্রিমিনাল এই ইহুদী সংগঠনটির সাথে কাদের সংঘাত বেধেছে, যাকে সেদিন তারা হেটেলে মারতে বা ধরতে গিয়েছিল তার পরিচয় কি এবং কাকে তারা শার্লেম্যান রোডের ৫ নাম্বার বাড়িতে বন্দী করেছিল, সে সম্পর্কে পুলিশ এবং পর্যবেক্ষক মহল কিছুই বলতে পারছে না। তবে তাদের মতে পুলিশের তদন্ত আগাতে ব্যার্থ হওয়ার পটভুমিতে প্রতিকার ও সাত গোয়েন্দাকে উদ্ধারের জন্যে কোন তৃতীয় পক্ষ এগিয়ে এসেছে কিংবা স্পুটনিক পরিবাররা এই তৃতীয় পক্ষকে নিয়োগ করেছে। অবশ্য কয়েকটি স্পুটনিক পরিবারের সাথে এই প্রশ্ন নিয়ে যোগাযোগ করা হলে তারা এধরনের কোন পদক্ষেপের চিন্তাই করেনি বলে জানিয়েছে।

এই তৃতীয় পক্ষের পরিচয় সম্পর্কে হোটেল রাইনে আক্রান্ত ব্যাক্তিটি আসল কথা জানতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের জন্য লোকটিকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। লোকটি হোটিল থেকে চলে গেছেন এবং গা ঢাকা দিয়েছে। ক্রিমিনাল দলটির ভয়ে এবং তাদের আক্রমন থেকে আত্মরক্ষার জন্যই লোকটা এটা করেছে বলে পুলিশও মনে করেছে। তবে তাকে পুলিশের এখন খুব বেশি প্রয়োজন।

স্পুটনিক ধ্বংস থেকে শুরু করে গত পরশু রাত পর্যন্ত সংঘটিত ঘটনা দেশের সচেতন ও শান্তিকামী মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে। কোন ইহুদী সংগঠন যদি স্পুটনিক ধ্বংস ও সাত গোয়েন্দাকে অপহরনের সাথে জড়িত থাকে, তাহলে প্রশ্ন ওঠে এ ইইহুদী সংগঠন স্পুটনিকের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হওয়ার কারণ কি? উল্লেখ্য, সাত গেয়েন্দার স্পুটনিক সংস্থা নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ার ধ্বংস সম্পর্কে নতুন করে তদন্ত শুরু ও কিছু দলিল হাত করার পরেই তাদের উপর ধ্বংসও বিপর্যয় নেমে আসে।'

পড়া শেষ করেই কাগজটা টি টেবিলে রাখতে রাখতে বলল যায়েদ, 'ভাইয়া পুলিশ আপনার খোঁজ করছে বন্ধু হিসাবে না শত্রু হিসাবে?

‘আমি কে? ইহুদী সংগঠনটির সাথে যাদের সংঘাত বেঁধেছে, তাদের পরিচয় জানার জন্য আমাকে তাদের প্রয়োজন। শুরুটা ওদের বন্ধুত্বপূর্ন হলেও পরে বন্ধু থাকবে বলে আমি মনে করিনা।’

‘কেন থাকবে না? আপনার দেয়া তথ্য ও আপনার কাজ তো পুলিশের তদন্তে বাড়তি শক্তি যোগাবে।’ বলল, যায়েদ।

‘আমরা হোটেল থেকে কেন তাড়িঘড়ি চলে এলাম, এত তাড়াতাড়ি ভূলে গেছ? পুলিশের একটা গ্রুপ উর্ধ্বতন পুলিশের নির্দেশে আমাকে আন অফিসিয়ালী গ্রেপ্তার করে ঐ ইহুদী সংগঠনের হাতে তুলে দেবে, এটা জানতে পেরেই তো চলে এসেছি।’ বলল আহমদ মুসা।

‘বুঝেছি ভাইয়া।’ বলল যায়েদ।

‘পুলিশ যে আন্তরিক নয়, লা-মন্ডের এ রিপোর্ট থেকেও তা বুঝা যাচ্ছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কি থেকে বুঝা গেল ভাইয়া?’ বলল ফাতিমা।

‘কম্পিউটারে স্পুটনিক ধবংসের যে ব্লু প্রিন্ট ছিল তার কিছুই পুলিশ জানায় নি। উপরন্তু বলেছে, নিছক ঐ ব্লু প্রিন্ট থেকে সংশ্লিষ্ট দল বা ব্যাক্তিকে চিহ্নিত করা যাবে না। এর অর্থ ব্লু প্রিন্টটিকে অকেজ একটা দলিল হিসাবে কোল্ড স্টোরেজে ঠেলে দিতে পারে। সব চেয়ে বড় কথা হলো ক্রিমিনালরা নিজেরাই যাকে নতুন গুলাগ হিসাবে অভিহিত করেছে, সেই ‘সাও তোরাহ’ দ্বীপের মানচিত্রটি নিউজে নেই। পুলিশরা সাংবাদিকের কাছ থেকে বিষয়টা একদম গোপন করে ফেলেছে। কোন দিনেই হয়তো সাংবাদিকরা বা বাইরের দুনিয়া পুলিশের কাছ থেকে ‘সাও তোরাহে’র কথা আর জানতে পারবে না।’ আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসা থামল ও সংগে সংগে কোন কথা বলল না ফাতিমা ও যায়েদ। তাদের চোখ-মুখে ভাবনা ও হতাশার চিহ্ন।

একটু পরে ফাতিমা হতাশা জড়িত কন্ঠে বলল, ‘আমরা পুলিশের ভুমিকায় এ ব্যাখ্যা করতে পারি যে, ‘পুলিশ তদন্তের স্বার্থেই এটা প্রকাশ করে নি।

সাও তোরাহ দ্বীপের মানচিত্র পুলিশের হাতে পড়েছে জানলে ক্রিমিনালরা সাবধান হয়ে যাবে এবং দ্বীপ থেকে সব কিছু তারা অন্যত্র সরিয়ে ফেলবে।'

আহমদ মুসা হাসল।বলল, 'এ যুক্তি খাটেনা ফাতিমা। কম্পিউটার পুলিশের হাতে পড়ার পর ওরা নিশ্চিত হয়েছে, সাও তোরাহের মানচিত্রও পুলিশ পেয়ে গেছে। বিশেষ করে স্পুটনিক ধ্বংসের ব্লু প্রিন্টটা পুলিশ যখন পেয়েছে, এটা ক্রিমিনালরা বুঝতে মুহূর্তও দেরি হবার কথা নয়।'

'ধন্যবাদ ভাইয়া। আপনি ঠিক বলেছেন। তা হলে ব্যাপারটা এই দাঁড়াচ্ছে যে, পুলিশের কোন সহযোগিতা আমরা পাচ্ছি না।' বলল ফাতিমা হতাশ কন্ঠে।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, একটা সহযোগিতা আমরা পেলাম।

'কি সেটা? ত্বড়িত কন্ঠে প্রশ্ন করল যায়েদ।

'পুলিশ দলিলগুলো প্রকাশ না করায় এবং ক্রিমিনালদের সাথে আঁতাত করায় আমরা এখন নিশ্চিত হতে পারছি যে, ক্রিমিনালদের নতুন গুলাগ 'সাও তোরাহ' দ্বীপেই থাকছে। পুলিশ ক্রিমিনালদের সাথে যোগসাজোশে না গিয়ে মানচিত্রসহ দলিল প্রকাশ করলে, ফাতিমা যেটা বলেছে, ক্রিমিনালরা সাবধান হতো এবং সাও তোরাহ থেকে সব কিছু সরিয়ে নিত। তাতে আমরা যে টুকু এগিয়ে ছিলাম, সে টুকু পিছিয়ে পড়তাম।' আহমদ মুসা থামল।

আহমদ মুসা থামতেই ফাতিমা ও যায়েদ আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। ফাতিমা বলল, 'তাহলে আজকের নিউজের এটাই একমাত্র লাভ ভাইয়া।'

'না, আরও লাভ।' আহমদ মুসা বলল।

'আরও লাভটা কি?' জিজ্ঞাসা যায়েদের।

'এই নিউজটা প্রথম বারের মত এ কথা সামনে নিয়ে এল যে, স্পুটনিক ধ্বংস ও সাত গোয়েন্দাকে অপহরণের কাজ ইহুদী একটা ক্রিমিনাল সংগঠন করেছে। নিউজটি আরেকটি বড় বিষয় সামনে নিয়ে এসেছে সেটা হলো, নিউইয়র্কের টুইনটাওয়ার ধ্বংসের সাথে ক্রিমিনাল ইহুদী সংগঠনটি জড়িত থাকতে পারে। তা না হলে টুইন টাওয়ারের ঘটনার উপর নতুন ভাবে তদন্তকারী স্পটনিকের উপর ক্রিমিনাল ইহুদী সংগঠনটি খড়গহস্ত হলো কেন? নিউজটি

স্পুটনিকের তদন্ত কাজে পুলিশের ব্যার্থতাকেও তুলে ধরেছে এবং বলেছে যে, প্রতিকার ও সাত গোয়েন্দাকে উদ্ধারের জন্য অবশেষে তৃতীয় একটি পক্ষ কাজে নেমেছে। এই তৃতীয় পক্ষকে ধ্বংসের জন্যও ইহুদী ক্রিমিনাল সংগঠনটি উঠে পড়েলে গেছে এবং এর খেসারত হিসাবে সংগঠনটির এপর্যন্ত কম পক্ষে ষোল জনকে বলী হতে হয়েছে।' বলল আহমদ মুসা।

'কিন্তু নিউজটা সবচেয়ে বড় খবর তৃতীয় পক্ষ হিসাবে স্বয়ং আহমদ মুসা আবির্ভূত একথা বলতে পারেনি।' বলল ফাতিমা। তার মুখে আনন্দের হাসি।

'রিপোর্টারকে এ জন্য ধন্যবাদ ফাতিমা।' হেসে উঠে বলল যায়েদ।

ফাতিমা হাসিতে যোগ দিল না। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল সে। বলল, 'স্যরি ভাইয়া। হালকা চিন্তার সময় এটা নয়। পুলিশের সাহায্য আমরা পাচ্ছি না। আপনি কার্যতঃ একা। কি ভাবছেন ভাইয়া?

'সত্যি নিউজটা আমাদের উপকার করেছে। পুলিশের যোগসাজস অন্তত একটি ক্ষেত্রে আমাদের 'শাপেবর' হয়েছে। বলে আহমদ মুসা সোফায় গা এলিয়ে দিল। গম্ভীর হয়ে উঠল তার মুখ। মুহুর্ত কয়েক নিরব থাকার পর সে ধীরে ধীরে বলতে শুরু করল, কোন ভাবনার কথা বলব ফাতিমা। শেষ নেই। আমাদের সামনে দীর্ঘ পথ। স্পুটনিকের সাত নেতাকে উদ্ধার করতে হবে, তারপর আসবে

স্পুটনিক মিশন সফল করার কাজ করবে। এই পথের গোটাটাই আজ অন্ধকারে।'

ফাতিমার দুই চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'ভাইয়া স্পুটনিকের মিশন' মানে নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ার ধ্বংসের তদন্তের দায়িত্ব আপনি নেবে?

'দায়িত্ব তো স্পুটনিক নিয়েছে্ স্পুটনিককে সাহায্য করতে পারলে আমি খুশি হবো। আর এটা এমন একটা কাজ যার সাথে বিশ্বের প্রতিটি মুসলমানের স্বার্থ আজ জড়িত আছে। মুসলমানদের মাথা থেকে পুরানো একটা কলংকের বোঝা নামাতে হলে যে সত্য মিথ্যার স্তুপে ঢাকা পড়েছে তাকে উদ্ধার করতে হবে।' আহমদ মুসা বলল।

'এত দিন পর সত্যটা আসলেই উদ্ধার করা যাবে? আপনিও অনেক দিন আমেরিকা ছিলেন, তখন কিছু কি ভেবেছিলেন? জিজ্ঞেস করল যায়েদ।

'উদ্ধার করা যাবে না কেন? আমি শুনেছি, স্পুটনিক অনেক এগিয়েছিল। তাছাড়া এখন এ ব্যাপারে মার্কিন সরকারের সহযোগিতা পাওয়া যাবে। তোমরা জান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এখন দাবার ছক পাল্টে গেছে। 'ধরাকে সরা' জ্ঞান কারী জেনারেল শ্যারণ সেখানে আজ বন্দী এবং বিচারের সম্মুখিন।'

বলে একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর আবার বলা শুরু করল, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকার সময় ডেমোক্রাসি টাওয়ার' ও 'লিবার্টি টাওয়ার' বিষয় নিয়ে ভাবার আমার সুযোগ হয়নি। আমি আনন্দিত যে, স্পুটনিক গুরুত্বপূর্ণ কাজটা শুরু করেছে।'

বলতে বলতে আহমদ মুসা সোজা হয়ে বসল। বলল, 'স্পুটনিকের সাত নেতা উদ্ধার হলে এ বিষয়ে কাজ করার সময় আসবে, এখন নয়। এখন তাদের উদ্ধারই আমাদের সামনে একমাত্র বিষয়।'

'ঠিক ভাইয়া, 'সাও তোরাহ' দ্বীপ কোথায়, এ প্রশ্নটাই এখন সব চেয়ে বড়।' বলল যায়েদ।

'ভাইয়া আমরা আগামী কাল কামাল সুলাইমান ভাইয়ার বাসায় যাচ্ছি। লতিফা ভাবী কিন্তু একজন ভুগোলবিদ। তার সাথে 'সাও তোরাহ' নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।' ফাতিমা বলল।

'উনি কি কোথাও অধ্যাপনা করেন? জিজ্ঞেস করল আহসদ মুসা।

'হ্যাঁ উনি স্ট্রসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের একজন শিক্ষক।' বলল ফাতিমা।

খুশি হলো আহমদ মুসা। বলল, ভালই হলো, দেখা যাক তিনি কোন আলো দেখাতে পারেন কিনা।'

বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

'আপনি কোথাও যাবেন ভাইয়া?' জিজ্ঞাসা করল যায়েদ।

'হ্যাঁ, আমি একটু বেরুচ্ছি।' বলে ওদের সামনে দিয়ে আহমদ মুসা তার কক্ষের দিকে হাঁটা শুরু করল।

'ভাই সাহেব, আমাদের পরিবারে গত কয়েক জেনারেশনের মধ্যে মোস্তফা কামাল একজনই হয়েছেন। মোস্তফা কামালের জন্ম আর হয়নি। অতএব

ইসলাম সম্পর্কে মোস্তফা কামালের বিশেষ দৃষ্টিভংগি আমাদের পরিবারের আর কারও মধ্যেই আর দেখা যায় নি। বরং ইতিহাস হলো, আমাদের পরিবারের তৃতীয় জেনারেশনের যিনি তুরস্ক ছেড়ে জার্মানীতে এসে স্থায়ী বসতি গড়েন, তিনি চেয়ে ছিলেন মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের স্মৃতি ঘেরা পরিবেশ থেকে দূরে সরে আসতে। তিনি বলতেন, তার পূর্বপুরুষ মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক নিজের মত করে একটি জাতি গড়তে গিয়ে যা করেছেনসে স্মৃতি একটি সুন্দর ও সুস্থ , হ। এই দুঃসহ স্মৃতির হাত থেকে বাঁচার জন্যই তিনি পরিবারের জন্য দুঃস জার্মানীতে হিজরত করেন।'

আহমদ মুসার এক জিজ্ঞাসার জবাবে কথাগুলো বলছিলো লতিফা কামাল। স্পুটনিকের প্রধান গোয়েন্দা ও প্রধান পরিচালক কামাল সুলাইমানের স্ত্রী সে।

আহমদ মুসার সামনের এক সোফায় বসে কথা বলছিলো লতিফা কামাল। মোস্তফা কামাল তুর্কি মহিলাদের ইংরেজী পোশাক পড়িয়ে ছিলেন। মাথা থেকে খুলে ফেলেছিলেন রুমাল এবং নামিয়ে দিয়েছিলেন গা থেকে চাদর। কিন্তু মোস্তফা কামাল পরিবারের সদস্য লতিফা কামালের পরনে তুরস্কের ঐতিহ্যবাহী মুসলিম গৃহবধুর পোশাক।

লতিফা কামালের পাশে বসেছে ফাতিমা কামাল। আর আহমদ মুসার পাশের সোফায় বসেছে যায়েদ।

এটা লতিফা কামাল ও কামাল সুলাইমানের বাড়ি। স্বামী কামাল সুলাইমান কিডন্যাপ হবার পর লতিফা কামালের বাপ-মা এবং মাঝে মাঝে ভাইরা এসে থাকছে এখানে।

লতিফা থামতেই আহমদ মুসা বলল, বোন মিসেস কামাল, 'বড় আনন্দের খবর দিলেন আপনি। ধন্যবাদ আপনাকে। এ থেকে আবারও প্রমাণিত হলো, সব কিছু মূলের দিকেই ফেরে।'

'মোস্তফা কামালের পরিবার মূলের দিকে ফিরেছে। তবে মোস্তফা কামালের দেশ কিন্তু এখনও মূলের দিকে ফিরতে পারেনি।' আহমদ মুসা বলল।

'অধিকাংশ মানুষ মূলের দিকে ফিরছে, কিন্তু অধিকাংশ নেতা মূলের দিকে ফেরেননি ভাইয়া।' বলল ফাতিমা।

'ফাতিমা ঠিক বলেছে ভাই সাহেব।' লতিফা কামাল বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে। 'হ্যাঁ মিসেস কামাল, ফাতিমা ঠিকই বলেছে। তবে আমার মতে নেতারা বড় বাধা নয়, বাধা সেখানকার কামালীয় সংবিধান। গণতন্ত্রে জনতা জননেতাদের গড়ে নিতে পারে, কিন্তু সেখানকার সংবিধান জনতার ধরা-ছোঁয়ার উর্ধে বলল আহমদ মুসা।

হাসি ফুটে উঠল লতিফা কামালের মুখে। বলল, 'ভুলেই গিয়েছিলাম যে আপনি আহমদ মুসা। ফাতিমা ও আমাদের জানা এবং আপনার জানার মধ্যে যোজন পার্থক্য। আপনি যেটা বলেছেন, সেটাই ঠিক। সংবিধানই আসল বাধা।

বলে একটু থামল লতিফা কামাল। মুহূর্তের জন্যে মাথাটা নীচু করল। তার চোখে মুখে ফুটে উঠল গাম্ভীর্য। আহমদ মুসার দিকে চোখ তুলে সে বলল, 'কামাল সুলাইমান প্রায়ই বলত, , আমাদের দেশ ছাড়া হওয়াটা আমাদের পারিবারিক পাপের একটা প্রায়শ্চিত্ত। মোস্তফা কামাল যে ইউরোপীয় হতে চেয়ে ছিলেন, তার পরিবার আজ সে ইউরোপীয় হয়েছে। কিন্তু এতেই আমাদের প্রয়শ্চিত্ত হয়েছে বলে কামাল সুলাইমান মনে করতেন না। বলতেন, আমাদের পরিবারকে আরও মূল্য দিতে হবে। স্পুটনিকের ঘটনা, তিনি নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা তার কথিত সেই মূল্য কিনা কে জানে।'

থামল লতিফা কামাল। চাঁপা কান্নায় তার কন্ঠ প্রায় রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। হঠাৎই ড্রইংরুমের পরিবেশ ভারী হয়ে উঠল। বেদনার ছায়া নেমে এল উপস্থিত সবার মুখে।

নেমে এসেছিল এক নিরবতাও।

নিরবতা ভাঙল আহমদ মুসা। বলল, আমি কামাল সুলাইমানের সাথে একমত নই। আল্লাহ একের পাপে অন্যকে শাস্তি দেন না। আর কামাল পরিবারের জার্মানিতে হিজরত আল্লাহর শাস্তি নয় পুরুস্কার। আল্লাহ কামাল পরিবারের কাছ থেকে ইউরোপের মাটিতে ইসলামের পক্ষে খেদমত নিতে চান। সেই খেদমত কামাল পরিবার করছে।

স্পুটনিক তারই একটা অমর দৃষ্টান্ত। স্পুটনিকে যা ঘটেছে, কামাল সুলাইমানের যা ঘটেছে তা আদর্শের সৈনিকের জন্য একটা স্বাভাবিক ঘটনা। এ ঘটনা প্রমাণ করেছে অন্যান্যদের সাথে কামাল পরিবাকেও আল্লাহ কবুল করেছেন।’

লতিফা কামাল চোখ মুছে বলল, ‘ধন্যবাদ ভাই সাহেব। আপনার মত বুঝ আল্লাহ আমাদের দান করুন। কামালের দুর্ভাগ্য যে সে আপনার দেখা পেলনা।’

‘দোয়া করুন ভাবী, এ ভাইয়ার সাথে কামাল ভাইয়ার দেখা হবে।

ভাইয়া তো তাঁদের জন্যেই ফ্রান্সে এসেছেন ভাবী।’

‘আল্লাহ সাহায্য করুন। তোমাদের কাছে যেদিন আমি ভাই সাহেবের কথা শুনেছি, সেদিন গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে প্রথমবারের মত বুকটা আমি হাল্কা অনুভব করেছি, বুক ভরে আমি নিঃশ্বাস নিতে পেরেছি। মনে হয়েছে, আল্লাহ তাঁর বিশেষ দয়ার দৃষ্টি আমাদের উপর দিয়েছেন।’ বলল আবেগ–কম্পিত কন্ঠে লতিফা কামাল।

‘ভাবী আপনার একটা সাহায্য আমাদের প্রয়োজন।’ বলল ফাতিমা।

‘সাহায্যের কথা বলছ কেন? বল কি কাজ আমাকে করতে হবে?’

বলল লতিফা কামাল। তখনও ভারী তার কন্ঠস্বর।

লতিফা থামতেই কথা বলে উঠল আহমদ মুসা। ‘আমরা একটা দ্বীপের সন্ধান করছি, যে দ্বীপে কামাল সুলাইমানরা বন্দী থাকতে পারেন বলে সন্দেহ।’

‘দ্বীপের নাম কি? উদগ্রীব কন্ঠে বলল লতিফা কামাল।

‘সাও তোরাহ।’ আহমদ মুসা বলল।

‘সাও তোরাহ’ নামটি মুখে উচ্চারণ করে ভাবল কিছুক্ষণ লতিফা কামাল। তারপর বলল, ‘এই ধরনের কোন দ্বীপ আছে বলে আমি জানি না। এটা কোন ছদ্মনাম হবে।’

আহমদ মুসা পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে সেটা লতিফা কামালের দিকে মেলে ধরে বলল, ‘এটা দ্বীপটার আকার। আকার দেখে কোন আন্দাজ করতে পারেন কিনা দেখুন।’

লতিফা কামাল কাগজটি কিছুক্ষণ হাতে দেখে বলল, 'স্যরি, আমার এবিদ্যা নেই ভাই সাহেব। 'সমুদ্র পৃষ্ট ও দ্বীপতত্ত্ব বিষয়ে যারা পড়া শুনা করেছেন, তাদের পক্ষেই শুধু এব্যাপারে কিছু বলা সম্ভব।'

এই সময় কলিংবেল বেজে উঠল টেবিলে রাখা কলিং বক্স থেকে।

লতিফা কামাল 'এক্সকিউজ মি' বলে কলিং বক্সটা টেনে সামনে নিয়ে একটা সুইচ অন করে বলল, 'মিসেস কামাল বলছি, কে আপনি দয়া করে বলুন'

ওপারের কথা শুনল লতিফা কামাল। শুনেই প্রবল একটা বিব্রতভাব ফুটে উঠল তার চোখ মুখে। বলল সে ওপারের লোককে উদ্দেশ্য করে, 'হোল্ড অন প্লিজ।'

বলে কলিং বক্স নিরব করে দিয়ে বলল, 'স্যরি ভাই সাহব, একটা কান্ড ঘটে গেছে। আমি লা-মন্ডের রিপোর্টার বুমেদীন বিল্লাহকে সময় দিয়েছিলাম। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম এই এ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা। তিনি এসেছেন। কি করি এখন?

'বুমেদী বিল্লাহ?' কোন অসুবিধা নেই মিসেস কামাল। তাঁকে ডাকুন। তাঁর সাথে দেখা হলে আমরাও খুশি হবো। তিনি আপনার সাথে একান্তে কথা বলতে চাইলে আমরা পাশের ঘরে সরে যাবে' বলল আহমদ মুসা।

'ধন্যবাদ ভাই সাহেব।' বলে লতিফা কামাল কলিং বক্স অন করে বলল, 'স্যরি ফর ট্রাবল, প্লিজ আপনি আসুন।'

লতিফা কামাল কলিং বক্স অফ করতেই আহমদ মুসা বলে উঠল, মিসেস কামাল, বুমেদীন বিল্লাহর সাথে আমাদের এই দেখা হওয়াকে আমি আল্লাহর এক সাহায্য বলে মনে করছি। মনে মনে তাঁকে আমি চাইছিলাম।

যদি উনি রাজী হন আমরা কথা বললে আপনার আপত্তি নেই তো?

বিষণ্নতা ফুটে উঠল লতিফা কামালের মুখে। বলল, 'এভাবে অনাত্মীয়ের মত কথা বলছেন কেন? আমি এবং আপনারা কি আলাদা ভাই সাহেব?

'ধন্যবাদ বোন লতিফা কামাল।' বলল আহমদ মুসা।

'যাই উনি এসে পড়বেন' বলে লতিফা কামাল উঠে গেল দরজার দিকে মেহমানকে রিসিভ করার জন্য।

আধা মিনিটের মধ্যে মেহমানকে রিসিভ করে সাথে নিয়ে ড্রইংরুমে প্রবেশ করল লতিফা কামাল।

আহমদ মুসা, ফাতিমা ও যায়েদ উঠে দাঁড়িয়েছে মেহমানকে স্বাগত জানানোর জন্য।

বুমেদীন বিল্লাহকে দেখে বিস্মিত হলো আহমদ মুসা। একেবারে আলজেরিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা 'আহমদ বেন বেল্লা'র চেহারা।

বেন বেল্লাহর যে চেহারা আহমদ মুসার চোখে ভাসছে তার বয়স একটু বেশি, এর বয়স একটু কম।

আহমদ মুসা বুমেদীন বিল্লাহকে স্বাগত জানিয়ে হ্যান্ডশেকের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, আপনাকে 'বুমেদীন বিল্লাহ' না বলে 'বেন বেল্লাহ' বললেই মানাত ভাল।'

বুমেদীন বিল্লাহ হ্যান্ডশেকের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে হেসে বলল, 'আহমদ বেন বেল্লাহর' বেল্লাহ' তো আছেই, আমার মাতৃকূলের ঐতিহাসিক ব্যাক্তি 'হুয়ারী বুমেদিনে'র 'বুমেদীন' বাদ দেবেন কেন। আমার পিতা আমার পিতৃকুল মাতৃকুলকে এক সঙ্গে ধরে রাখার জন্যই দুই ইতিহাসকে যোগ করে আমার নাম রেখেছেন।'

আহমদ মুসা তাকে কাছে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরে বলল, 'দুই ইতিহাসের যোগ ফল হয়ে আপনি তাদের চেয়ে বড় ইতিহাস।'

বুমেদীন বিল্লাহ আহমদ মুসাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমি মৃত ইতিহাসের সাক্ষী বটে, কিন্তু আপনি ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। পুলিশ আপনাকে খুঁজছে, তার চেয়েও বেশি খুঁজছি আমি। আমি কিন্তু আপনাকে ছাড়ছিনা।'

আহমদ মুসা জড়িয়ে ধরা থেকে ছেড়ে দিয়ে তাকে নিয়ে এক সোফায় পাশাপাশি বসতে বসতে বলল, 'আমিও আপনাকে ছাড়ছি না মিঃ বুমেদীন বিল্লাহ। বিশেষ করে আপনার দ্বিতীয় নিউজ পড়ার পর আপনাকে দারুণভাবে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।'

'চমৎকার, দু'জনকে দু'জনার প্রয়োজন। আসুন তাহলে, আরেকবার হ্যান্ডশেক করি।' বলল বুমেদীন বিল্লাহ।

‘দু’জনে হ্যান্ডশেক করল আবার।

আহমদ মুসা হ্যান্ডশেক করে বুমেদীন বিল্লাহকে ধরে রেখেই বলল, ‘আপনি আমাকে চিনলেন কি করে?

‘সেদিন রাতে হোটেল কক্ষে দু’জন লোক নিহত হওয়ার ঘটনার পর পুলিশের সাথে আমিও গিয়েছিলাম। দেখেছি আপনাকে।

আপনার ভোলার কথা নয়। পুলিশ যাই ভাবুক, সেদিন রাতেই কিন্তু আমার মনে হয়েছে পুরো পরিচয় আপনার পাওয়া গেল না।

তারপর সেদিন রাইন পার্কের মোড়ে গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যওয়া যে গাড়ি পাওয়া গেছে তার আরোহী ছিলেন আপনি, সেটা অনুসন্ধানে আমি জানতে পেরেছি। এরপর শার্লেম্যানের ৫ নং বাড়ির ১৪ জনের হত্যার যে ঘটনা সেও আপনিই ঘটিয়েছেন বলে আমি নিশ্চিত।

আপনি সেখানে বন্দী ছিলেন। ওদের হত্যা করে আপনি মুক্ত হয়েছেন। এ সব থেকে আমার নিশ্চিত ধারনা হয়েছে, স্পুটনিকের ঘটনায় আপনি তৃতীয় পক্ষ। এই তৃতীয় পক্ষের কোন পরিচয় আমার জানা নেই। এটা না জানলে আমি ঘটনা নিয়ে আমি আগাতে পারছি না।’ বলল বুমেদীন বিল্লাহ।

‘রাইন পার্কের মোড়ে গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া গাড়ির আমি আরহী ছিলাম, এটা হোটেল রাইনের গাড়ি রেজিষ্টার থেকে জানা সম্ভব, কিন্তু শার্লেম্যানের ৫ নং বাড়িতে ১৪ জন নিহত হওয়ার ঘটনার সাথে আমাকে জড়িত করছেন কিসের ভিত্তিতে? জিজ্ঞেসা করলে আহমদ মুসা।

‘দুই কারণে আমি এটা মনে করছি। এক, হোটেলের নিহত দু’জন এবং শার্লেম্যান ৫ নং বাড়িতে নিহত ১৪ জন একই গ্রুপের। দ্বিতীয়তঃ স্পুটনিক ধ্বংসকারী এই গ্রুপের সাথে আপনি ছাড়া আর কারো সাথে সংঘাত বাধেনি। বলল বুমেদীন বিল্লাহ।

‘ঘটনার পেছনে মোটিভ একটা বড় জিনিস। আমাকে আপনি তৃতীয় পক্ষ ধরে নিয়েছেন। কিন্তু এই তৃতীয় পক্ষ আমি হবো কেন? আমার স্বার্থ কি এখানে? আহমদ মুসা বলল।

‘এটা আমারও প্রশ্ন। এই প্রশ্নের সমাধান আমি করতে পারিনি। এই কারণেই আমি আপনাকে খুঁজছি। আপনার পরিচয় জানতে পারলে মোটিভটা পরিস্কার হতে পারে’ বলল বুমেদীন বিল্লাহ।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, মিঃ বুমেদীন বিল্লাহ, আমরা কিন্তু মিসেস কামালের প্রতি অবিচার করছি। আপনার এপয়েন্টমেন্ট হয়েছে মিসেস কামালের সাথে। আর এসে কথা বলছেন আপনি আমার সাথে।

এটা ঠিক নয়। এবার আপনি.............।’

কথার মাঝখানে আহমদ মুসাকে থামিয়ে বুমেদীন বিল্লাহ লতিফা কামালের দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে বলে উঠল, ‘ম্যাডাম মিসেস কামাল আমাকে মাফ করুন। আসলে তৃতীয় পক্ষ সম্পর্কে আপনি কি জানেন, কিংবা জানার ব্যাপারে কি সাহায্য করতে পারেন, আপনার আত্মীয় এই ফাতিমা কামালকে কোথায় পাওয়া যাবে, এসব জিজ্ঞাসার জন্যেই আমি আপনার এপয়েন্টমেন্ট নিয়েছিলাম। এখন আপনার এখানে এসে দেখি শুধু ফাতিমা কামাল ও যায়েদ নয়, স্বয়ং তৃতীয় পক্ষ এখানে হাজির। সুতরাং তার সাথেই কথা বলছি। আমি আপনার সহযোগিতা চাই।’

হাসল লতিফা কামাল। বলল, আমি এখানে এখন তৃতীয় পক্ষ। আপনাদের দু’পক্ষকেই আমি সমান সহযোগিতা করব।’ দেখুন মিঃ বুমেদীন বিল্লাহ, আপনি আসার প্রায় পূর্ব মুহুর্তে মিসেস লতিফা কামাল আমাকে বলেছেন, তিনি এবং আমরা একপক্ষ। এখন তিনি আলাদা হতে চাচ্ছেন।’ আহমদ মুসা বলল মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য টেনে।

হাসল লতিফা কামাল। বলল, ঠিক আছে। আপনার কথা আমি অস্বীকার করছিনা। কিন্তু এক পক্ষের হয়েও অন্য পক্ষকে সহযোগীতা করা যায়, যদি স্বপক্ষের স্বার্থের বিরুদ্ধে না যায়। তাছাড়া হোষ্ট হিসাবে আমার মেহমানদারীরও একটা ভুমিকা আছে।

‘এরপর আর কোন কথা নেই। মেহমানদারীর প্রয়োজনটা আসন্ন হয়ে উঠেছে। সুতরাং মিসেস কামালের প্রস্তাবের প্রতি আমার পূর্ণ সম্মতি আছে।’ বলল আহমদ মুসা হাসতে হাসতে।

আহমদ মুসা কথা শেষ করতেই বুমেদীন বিল্লাহ বলে উঠল, 'নিঃস্পত্তি হয়ে গেল। আসুন তাহলে আমরা আমাদের কথায় ফিরে আসি।'

'অবশ্যই। তবে শুরুটা এবার আমি করব।' বলল আহমদ মুসা।

বুমেদীন বিল্লাহ থমকে গিয়ে একটু চিন্তা করে বলল, 'ঠিক আছে মি.আহমদ আবদুল্লাহ। শুরু করুন।'

'আচ্ছা মি. বুমেদীন বিল্লাহ, সেদিন শার্লেম্যান রোডে ওদের অফিস কম্পিউটারটা কি আপনি দেখে ছিলেন?'

'হ্যাঁ দেখেছি। পুলিশ পরীক্ষা ও ডিকোড করার জন্য কম্পিউটার তাদের অফিসে নিয়ে যায়।'

'কম্পিউটারে পাওয়া দলিল-দস্তাবেজ সম্পর্কে প্রেস ব্রিফিংকালে পুলিশ কি দলিলগুলো আপনাদের দেখিয়েছিল?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'তাদের নোট থেকে আমাদের বলেছিল।' বুমেদীন বিল্লাহ বলল।

'নতুন গুলাগ' সম্পর্কে কিছু বলেছিল? জিজ্ঞেসা করল আহমদ মুসা।

'নতুন গুলাগ?' কাদের নতুন গুলাগ? বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে বলল।
'বলছি। কিন্তু তার আগে আপনাকে একটা কথা দিতে হবে যে, 'আমাদের এখানকার গোটা আলোচনা 'অফ দ্যা রেকর্ড।' এর কোন কিছুই পত্রিকায় দিতে পারবেন না। মনে করুন আপনি আমার সাথে কথা বলছেন বেন বেল্লাহ ও হুয়ারী বুমেদীনদের একজন উত্তরসূরী হিসাবে, সাংবাদিক হিসাবে নয়। বলল আহমদ মুসা শান্ত এবং দৃঢ় কন্ঠে।

'আপনি মজার কথা বলছেন আহমদ আব্দুল্লাহ। আমার পরিচয়কে এভাবে কেউ কোন দিন তুলে ধরেনি।' বলেই আহমদ মুসার দিকে হাত বাড়িয়ে তার হাত ধরে বলল, হ্যাঁ আমি কথা দিচ্ছি আহমদ আবদুল্লাহ।'

'ধন্যবাদ মি. বুমেদীন বিল্লাহ।' বলে একটু থেমেই আহমদ মুসা আবার বলতে শুরু করল, ''আলেকজান্ডার সোলঝে-নিৎসীনের উপন্যাসে 'গুলাগ দ্বীপপুঞ্জে'র কথা আছে। মানবতার দোজখ অমন 'গুলাগ' সোভিয়েত দেশে অনেক ছিল। তবে সে অতীতের কথা। কিন্তু ইহুদী সন্ত্রাসবাদী সংগঠন 'ওয়ার্ল্ড ফ্রিডমআর্মি'(WFA) সোভিয়েত ও নাজী স্টাইলে 'নতুন গুলাগ' স্থাপন করেছে।'

বিস্ময় জেগে উঠল বুমেদীন বিল্লাহর চোখে-মুখে। বলল, কি উদ্দেশ্যে স্থাপন করেছে? নতুন গুলাগে কারা আছে?

'তাদের গুলাগ লোক চক্ষুর সামনে এখনো আসেনি। তবে আমি মনে করি, সক্রিয়বাদী মুসলিম ও কামাল সুলাইমানদের মত সত্যসন্ধানীরা আছেন।'

ভ্রু কুচকে গেল বুমেদীন বিল্লাহর। বলল, 'তার মানে কি আপনি মনে করেন কামাল সুলাইমান সহ স্পুটনিকের সবাইকে ঐ নতুন গুলাগে রাখা হয়েছে?

'আমি এ চিন্তা করতে চাইনা, কিন্তু এ চিন্তার কোন বিকল্প নেই।' আহমদ মুসার কন্ঠ শান্ত এবং দৃঢ়।

আহমদ মুসার এ কথা শোনার সাথে সাথে ভয় ও উদ্বেগ ফুটে উঠল লতিফা কামালের চোখে মুখে।

বুমেদীন বিল্লাহর চোখে-মুখেও ভাবান্তর। আহমদ মুসা থামলেও সে কথা বললনা। একটু পর সে বলে উঠল, 'এই গুলাগের কথা কি শার্লেম্যান রোডে সেদিন ধারা পড়া কম্পিউটারে আছে? 'ওয়ার্ল্ড ফ্রিডম আর্মি' নামটাও কি ঐ কম্পিউটারে আছে?

'হ্যাঁ আছে।' আহমদ মুসা বলল। 'কিন্তু আপনি জানলেন কি করে? জিজ্ঞাসা বুমেদীন বিল্লাহর।

'ওখান থেকে ফেরার আগে আমরা সেদিন তিন তলার অফিস-কম্পিউটারটা চেক করেছিলাম এবং সব দলিল-দস্তাবেজের প্রিন্ট নিয়ে এসেছি।' আহমদ মুসা বলল।

প্রবল বিস্ময়ে ছেয়ে গেল বুমেদীন বিল্লাহর মুখ। বলল সে, 'কোড ভেঙ্গেছিলেন আপনারা? কিন্তু পুলিশ তো পারেনি। অফিসে নিয়ে বিশেষজ্ঞ এনে তবেই কম্পিউটারের গোপন ফাইলগুলো ওপেন করা সম্ভব হয়।'

'হ্যাঁ কোড ভাঙা সম্ভব হয়েছিল।' আহমদ মুসা বলল।

'আমারা যাওয়ার কথা আপনি বললেন। 'আমরা'- এর মধ্যে আর কে ছিল।' জিজ্ঞাসা করল বুমেদিন বিল্লাহ।

'ফাতিমা ও যায়েদ।' আহমদ মুসা বলল।

বুমেদীন বিল্লাহ বিস্মিত চোখে তাকাল ফাতিমা ও যায়েদের দিকে। বলল, 'আপনারা এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ। বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনাদের পড়ার বিষয় কি ছিল?

হাসল যায়েদ। বলল, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের সাবজেক্ট কম্পিউটার বিজ্ঞান নয়। আমি সেদিন কম্পিউটার অপারেট করেছি বটে, কিন্তু ভাইয়া আমাকে কতগুলো কোড ট্রাই করতে বলেছিল এবং তারই দু'টি দিয়ে দুই কম্পিউটারের লক খুলে গিয়েছিল।'

বুমেদিন বিল্লাহ বিস্মিত চোখে তাকাল আহমদ মুসার দিকে।

বুমেদিন বিল্লাহর কিছু বলার আগে আহমদ মুসা বলে উঠল, নিশ্চয় আপনি এখন প্রশ্ন করবেন, কম্পিউটারের নতুন গুলাগে কি ছিল?

বুমেদিন বিল্লাহ গম্ভীর কন্ঠে বলল, 'না' আমার প্রশ্ন আপনি আসলে কে? শুনেছি, যার হাতে বন্দুক খুব বেশি চলে তার মাথা বেশি চলে না। কিন্তু আপনি দেখছি, বন্দুক চালনা ও মাথা চালনায় সমান দক্ষ। যাক এ প্রশ্ন। আপনি ঐ প্রশ্নের জবাব দিন, বলুন নিউ গুলাগে কি আছে?' নিউ গুলাগ ফাইলে আছে একটা দ্বীপের স্কেচ এবং নিউ গুলাগের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু কথা।' আহমদ মুসা বলল।

'দ্বীপের স্কেচ তার মানে ঐ দ্বীপটাই নিউ গুলাগ? দ্বীপটার নাম কি? দ্রুত ও এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলল বুমেদীন বিল্লাহ।

'দ্বীপের নাম 'সাও তোরাহ।' আহমদ মুসা বলল।

'সাও তোরাহ?' কোথায় এদ্বীপ? বলল বুমেদীন বিল্লাহ।

'এই প্রশ্নেরই জবাব আমি সন্ধান করছি বুমেদীন বিল্লাহ। মিসেস লতিফা কামালের কাছেও এসেছিলাম এই উদ্দেশ্যে। তিনি ভূগোলবিদ, দ্বীপটার সন্ধান নিশ্চয় তিনি দিতে পারবেন, এ আশা নিয়েই আমরা ছুটে এসেছিলাম।' আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসার কথা শুনে বুমেদীন বিল্লাহ একবার তাকাল মিসেস কামালের দিকে। তারপর আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, 'পেয়েছেন দ্বীপের সন্ধান?'

‘দ্বীপের সন্ধান পাইনি, তবে দ্বীপের সন্ধান কার কাছে পাওয়া যেতে পারে সেটা তিনি আমাদের জানিয়েছেন।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আমি কি জানতে পারি দ্বীপের সন্ধানটা কোথায় পাওয়া যাবে?’ বুমেদীন বিল্লাহ বলল।

‘উনি বলেছেন, সমুদ্রপৃষ্ঠ ও দ্বীপতত্ত্ব বিশেষজ্ঞের কাছে এর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।’ বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা থামতেই লতিফা কামাল বলে উঠল, হ্যাঁ, আমি এটাই বলছি। ‘সমুদ্রপৃষ্ঠ ও দ্বীপতত্ত্ব’ বিশারদরা দ্বীপের সাইজ দেখে সমুদ্র স্রোত নির্ণয় করতে পারেন এবং সমুদ্র স্রোত বিচার করে সমুদ্রের স্থানটাও চিহ্নিত করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়। এছাড়া আরও উপাদান ও উপলক্ষ তাঁদের বিচার্য আছে।

‘ধন্যবাদ মিসেস কামাল। আপনার একথায় আমার মনে আশা জাগছে যে, দ্বীপটার সন্ধান আমরা পাব। আমার মনে হয় তারা দ্বীপের নাম দেখ ও দ্বীপের এলাকা নির্ধারণ করতে পারবেন। যেমন আমি ভাবছি, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার ল্যাটিন অঞ্চলের কোথাও অথবা উত্তর আটালান্টিকের স্পেন ও পর্তুগাল বরাবর পশ্চিমে কোথাও এ দ্বীপটা থাকতে পারে।’

‘ভাই সাহেব, এই ভাবনার আপনার ভিত্তি কি? জিজ্ঞেস করল মিসেস কামাল।

‘দ্বীপের নামের দুটি অংশ আছে। তার এক অংশ হিব্রু, অন্য অংশ ল্যাটিন। আমি মনে করছি হিব্রু শব্দটা এসেছে ইহুদীদের ঐতিহ্য বোধ থেকে এবং ল্যাটিন অংশটা এসেছে আঞ্চলিক বিবেচনা বা প্রভাব থেকে। আমি যে অঞ্চল গুলোর উল্লেখ করছি সেগুলো ল্যাটিন ভাষা প্রভাবিত।’ আহমদ মুসা বলল।

চমৎকার। আপনার যুক্তি অকাট্য মিঃ আহমদ আবদুল্লাহ। আমার বিশ্বাস আপনার এ যুক্তি বিশেষজ্ঞদের এই দ্বীপ সন্ধানে সাহায্য করবে।’ বলল বুমেদীন বিল্লাহ।

‘আপনাকে ধন্যবাদ ভাই সাহেব। আপনি যে চিন্তা করছেন, আমার মাথায় এই চিন্তা কোন দিন আসত কিনা সন্দেহ’ লতিফা কামাল বলল।

‘মিসেস কামাল, দ্বায়িত্ব মানুষকে দ্বায়িত্বশীল বানায়। দ্বায়িত্ব এসে পড়লেই চিন্তা এমনিতেই মাথায় চাপত।’

বলে আহমদ মুসা একটু থামল, তারপর বলে উঠল, মিসেস কামাল, পরামর্শ দিন কার কাছে আমরা যেতে পারি। আমি তো কাউকে চিনি না।

‘আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ যিনি, তিনি এখন দেশের বাইরে। অন্য কাউকে তো আমি দেখছিনা।’ বলল মিসেস কামাল।

মিসেস কামাল থামতেই বুমেদীন বিল্লাহ বলল, মিঃ আবদুল্লাহ, একজন প্রবীণ আটলান্টিক বিশেষজ্ঞের সাথে আমার পরিচয় আছে। তিনি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এমিরিটাস। বাস করেন এই স্ট্রাসবার্গেই।

আটলান্টিক সমুদ্র স্রোত, ভূতত্ব, দ্বীপের গঠন ও প্রকৃতি ইত্যাদি আটলানিটক সংক্রান্ত বিষয়ের উপর তাঁর অনেক বই আছে। আমি মনে করি তার সাথে আপনি কনসাল্ট করতে পারেন। আমি সাথে করে নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু তার আগে একটা কথা বলুন, আপনি কেন এসব করবেন। আপনার লক্ষ্য কি?

‘আপনি তো আগেই আমাকে তৃতীয় পক্ষ বলে অভিহিত করেছেন। আসলেই আমি তৃতীয় পক্ষ। আমি স্পুটনিকের অপহৃত নেতাদের উদ্ধার করতে চাই। এবং সেটা করতে গিয়ে স্পুটনিক ধ্বংসের আসল লক্ষ্য সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়া এবং এ বিষয়ে কিছু করণীয় থাকলে করতে চাই।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কিন্তু যত দূর জানি আপনি একা। একাকি করতে পারবেন।’ বলল বুমেদীন বিল্লাহ।

‘না একা নই, সাথে আল্লাহ আছেন।’ আহমদ মুসা বলল।

বুমেদীন বিল্লাহর মুখ উজ্জল হয়ে উঠল। বলল, আরেকটা কথা, স্পুটনিক নিউইয়র্কের ডেমোক্রাসি ও লিবার্টি টাওয়ার ধ্বংসের উপর তদন্ত করছিল। এ ব্যাপারে আপনার মত কি?

‘আমি মনে করি স্পুটনিক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ হাতে দিয়েছে। এই তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। স্পুটনিক চাইলে আমিও তাদের সাথে থাকব।’ আহমদ মুসা বলল।

‘এবার আমি আমার পুরানা প্রশ্ন করতে চাই মিঃ আহমদ আবদুল্লাহ।

সেটা হলো, আপনি কে? কেন আপনি তৃতীয় পক্ষ হতে এলেন? বলল বুমেদীন বিল্লাহ।

'আমার প্রশ্নের জবাব দেবার আগে আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই, আপনি এই স্পুটনিক কেসে কেন বিশেষ আগ্রহ দেখাচ্ছেন?

কেন আপনি আমাদের সহযোগিতা করতে চাচ্ছেন? ফ্রান্সের সাংবাদিকদের মধ্যে আপনি ব্যাতিক্রম কেন ? জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

আহমদ মুসার কথা শেষ করার পর সংগে সংগে জবাব দিল না বুমেদীন বিল্লাহ। মুখটা সে একটু নীচু করছে। গম্ভীর হয়ে উঠেছে তার মুখমন্ডল।

কয়েক মুহুর্ত চুপ করে থাকার পর ধীরে ধীরে বলল, স্পুটনিক ধ্বংসযজ্ঞ আমাকে আহত করেছে। পুলিশের নিস্ক্রিয়তা আমি মেনে নিতে পারিনি, সাংবাদিকদের বৈষম্য দৃষ্টি আমাকে ভীষণ কষ্ট দিয়েছে। তাই স্পুটনিকের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি।'

'স্পুটনিকের ধ্বংসযজ্ঞ আপনাকে আহত করেছে কেন? সেটা কি শুধু স্পুটনিক একটা ভাল মানবতাবাদী সংস্থা বলেই? জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

আবার নিরবতা বুমেদীন বিল্লাহর। একটু পরে সে বলে উঠল, কি আপনি জানতে চাচ্ছেন, আমি বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, মিঃ আহমদ আবদুল্লাহ, কিন্তু ফরাসী পুলিশও কিছু ফরাসী সাংবাদিক খৃষ্টান ও ইহুদী হওয়ার কারণে যেমন মুসলিম প্রতিষ্ঠানের সাথে অসহযোগিতা করেছে, তেমনি আমি মুসলিম হিসাবে স্পুটনিককে সহযোগিতা করতে চাচ্ছি।'

বুমেদীন বিল্লাহ থামতেই আহমদ মুসা বলে উঠল, ধন্যবাদ মিঃ বিল্লাহ। আপনার মত ঐ একই কারণেই আমি স্ট্রসবার্গ ছুটে এসেছি। কারণ আমিও একজন মুসলিম। নিউইয়র্কের ডেমোক্রাসি ও লিবার্টি টাওয়ার ধ্বংসের পুরানো দায়টা আমরা মুসলমানরা এখনও বয়ে বেড়াচ্ছি। স্পুটনিক এ দায় থেকে আমাদের মুক্ত করতে চেয়েছিল। তাই স্পুটনিকের উপর ধ্বংসযজ্ঞ আপনার মত আমাকেও আহত করেছে। স্পুটনিকের সাত গোয়েন্দার মহান মিশনকে সহযোগিতা করার জন্য আমি এসেছি।'

‘মি. আহমদ আবদুল্লাহ আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার কাছে আমার দু’টি প্রশ্ন ছিল। দু’টির মধ্যে ‘আপনি কেন এসেছেন’ এ প্রশ্নের জবাব আপনি দিলেন। কিন্তু ‘আপনি কে’ এই প্রশ্নের জবাব কিন্তু এখনও হয়নি।’

আহমদ মুসা হাসল। বলল, আজই হলো প্রথম সাক্ষাত। প্রথম দিনেই জানা শোনা সব শেষ হয়ে যাওয়া ঠিক নয়। পরের জন্য কিছু রাখুন।’

বুমেদীন বিল্লাহও হাসল। বলল, আমার আপত্তি নেই। তবে আগ্রহটা আমার আরও বাড়ল।

বুমেদীন বিল্লাহ কথা শেষ করতেই লতিফা কামাল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ‘খাবার টেবিলে নাস্তা এসেছে। আমি সকলকে নাস্তা খাবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

‘খাবার সামনে রেখে নামাজও চলে না, কথা তো চলতেই পারে না। সুতরাং চলুন।’ বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

তার সাথে সাথে সবাই উঠে দাঁড়াল।

‘শুনলেন তো অধ্যাপক ডেভিড দানিয়েল, আমরা কত বড় শনির দশায় পড়েছি!’ বলল আজর ওয়াইজম্যান।

‘কিন্তু এত বড় বস্নানডার কিভাবে হলো? আমি বুঝলাম, আপনার লোকেরা প্রাণপণ লড়াই করেছে। সবাই মারা গেছে এটাই তার প্রমাণ। কিন্তু লড়াই-এর মত সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল কম্পিউটারের রেকর্ড নষ্ট করে দেয়া। কিন্তু তারা সেটা করেনি।’ অধ্যাপক ডেভিড দানিয়েল বলল।

‘আহমদ মুসা বন্দী হবার পর এত বড় বস্নান্ডার ঘটবে, এটা কারও কল্পনাতেও ছিল না। যাক, যখন বিপর্যয় ঘটেছে তখন আমাদের দূর্বলতাতেই ঘটেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এখন বলুন শেষ রক্ষার উপায়, স্পুটনিক ধবংসের পরিকল্পনা, ওদের সাত জনকে কিডন্যাপ করার ডকুমেন্ট, সাও তোরহ দ্বীপের মানচিত্র, সবই গিয়ে পড়েছে পুলিশের হাতে। স্ট্রসবার্গের পুলিশ কমিশনারকে অনুরোধ করে কোন রকমে মানচিত্র ও ডকুমেন্টের বিস্তারিত প্রেসে

দেয়া আটকাতে পেরেছি। কিন্তু ডকুমেন্টগুলো প্যারিস থেকে চেয়ে পাঠানো হয়েছে। ডকুমেন্টগুলো প্যারিসে গেলেই পত্রিকায় এসে যাবে। পুলিশ প্রধান যে ধরনের লোক, আমি কোন কথা-ই তাকে মানাতে পারবো না। যে টুকু পত্রিকায় এসেছে, তাতেই আমাদের বাইরে বেরুবার উপায় নেই। এর পর ডকুমেন্টের সব কথা যদি পত্রিকায় আসে তাহলে আমরা শেষ হয়ে যাব।'

'আমর মন কিছুতেই মানছে না মি.ওয়াইজম্যান, একজন লোক একাই এভাবে আপনাদের তুলা ধুনা করল।' বলল অধ্যাপক ডেভিড দানিয়েল।

'আমাদের কথা আর কি বলব। আপনি জানেন, বলতে গেলে আহমদ মুসার একার হাতেই ইহুদীবাদের গর্ব জেনারেল শ্যারণ তার দলবল সহ শেষ হয়ে গেল। গোটা ইহুদীবাদই আজ মহা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ছে অধ্যাপক ডেভিড। যে কোন ভাবে ডকুমেন্টগুলোর প্রেসে যাওয়া আটকাতে হবে।' আজর ওয়াইজম্যান বলল।

'আমাকে কি করতে হবে বলুন।' অধ্যাপক ডেভিড দানিয়েল বলল।

'জনাব প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে সম্মানিত প্রফেসর এমিরেটাস আপনি। তার উপর প্রেসিডেন্ট আপনার ব্যাক্তিগত বন্ধু। এই সুযোগ আপনাকে কাজে লাগাবার অনুরোধ করছি।' বলল আজর ওয়াইজম্যান।

'প্রেসিডেন্টকে আমি কি বলব? অধ্যাপক ডেভিড দানিয়েল বলল।

'ডকুমেন্টগুলো ভূয়া বলে গোটা বিষয়টাই ধামা চাপা দিতে হবে। বলতে হবে যে, মুসলিম মৌলবাদীরা ইহুদীদের ফাঁসাবার জন্য এই ভূয়া ডকুমেন্ট সাজিয়েছে।' বলল আজর ওয়াইজম্যান।

'কিন্তু মি.ওয়াইজম্যান, এটুকু করলেই আপনার বিপদ কেটে যাবে। মূল বিপদ তো বলছেন আহমদ মুসা। তার কি করবেন! এত কিছু পারছেন, ফরাসী পুলিশের সাহায্য নিয়ে তাকে পথ থেকে সরাতে পারছেন না? অধ্যাপক ডেভিড দানিয়েল বলল।

'সেখানেও এক বিপদ আছে। ফরাসী রাজকুমারীকে আহমদ মুসা বিয়ে করার পর ফরাসী পুলিশের কাছে সে অনেকটা আপন হয়ে গেছে। তার উপর আমেরিকার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে ফরাসী পুলিশের কাছে আহমদ মুসার ইমেজ

অনেক অনেক বেড়ে গেছে। এই অবস্থায় ফরাসী পুলিশের কাউকে কাউকে তার বিরুদ্ধে পাওয়া যাবে, সবাইকে পাওয়া যাবে না।' বলল আজর ওয়াইজম্যান।

'কিন্তু এই যে বললেন, পুলিশ স্ট্রাসবার্গে কোথাও আহমদ মুসাকে দেখতে পেলে ধরে তাকে আপনাদের হাতে তুলে দেবে। সেটা কিভাবে? অধ্যাপক ডেভিড দানিয়েল বলল।

'স্ট্রাসবার্গের পুলিশের কাছে আহমদ মুসার পরিচয় আহমদ আবদুল্লাহ হিসাবে। তারা আহমদ আবদুল্লাহকে আমাদের হাতে তুলে দেবে, আহমদ মুসাকে নয়।' বলল আজর ওয়াইজম্যান।

অধ্যাপক ডেভিড দানিয়েল কিছু বলতে যাচ্ছিল। আজর ওয়াইজম্যানের মোবাইলটি বেজে উঠল।

থেমে গেল অধ্যাপক ডেভিড দানিয়েল।

'মাফ করুন' বলল আজর ওয়াইজম্যান টেলিফোন ধরল।

ওপারের কথা শুনেই ভ্রু কুঁচকে উঠল আজর ওয়াইজম্যানের। বলল দ্রুত কন্ঠে, 'তোমার দু'জন বাড়ির সামনে পাহারায় থাক আমি লোকজন নিয়ে আসছি।

বলে মোবাইল অফ করে দিয়ে আজর ওয়াইজম্যান অধ্যাপক ডেভিডের উদ্দেশ্যে দ্রুত কন্ঠে বলল, 'অধ্যাপক ডেভিড আহমদ মুসার সন্ধান পাওয়া গেছে। একটা বাড়িতে সে আরও দু'জনকে সাথে নিয়ে থাকে। আমাদের দু'জন লোক বাড়িটার সামনে পাহারায় আছে।

লোকজন নিয়ে আমি ওখানেই যাচ্ছি। পরে আবার কথা বলব আপনার সংগে।' বলে অধ্যাপক ডেভিড দানিয়েলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল আজর ওয়াইজম্যান।

চারজন লোক নিয়ে ছুটল সে আহমদ মুসার বাড়ির উদ্দেশ্যে।

কিন্তু আজর ওয়াইজম্যান যখন তার লোকজন নিয়ে আহমদ মুসার আটতলায় গিয়ে পৌছল, তার বেশ কিছু আগে আহমদ মুসা বুমেদীন বিল্লাহকে নিয়ে আটলান্টিক বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক এমিরিটাস জ্যাক সাইমনের সাথে দেখা করার জন্য বেরিয়ে গেছে। আর তখন ফাতিমা এবং যায়েদ ও বাসা থেকে বেরিয়ে লিফটের দিকে এগুচ্ছিল। এই সময় তারা দেখল লিফঠ থেকে বেরিয়ে তাদের

ফলাটের দিকে এগুচ্ছে ক'জন লোক। এটা দেখে ফাতিমা এবং যায়েদ দুজনে একটা আড়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ব্যাপার কি তা দেখার জন্যে। ওরা পাঁচজন যখন ফাতিমাদের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, সে সময় ওদের একজনের মোবাইল বেজে উঠল। লোকটি মোবাইল তুলে নিয়ে চাপা কন্ঠে বলল, 'ইয়েস, আজর ওয়াইজম্যান।'

লোকটা ওপারের কথা শুনল। শুনেই গা ঝাড়া দিয়ে সটান হয়ে দাঁড়াল। উত্তেজনা ঠিকরে পড়তে লাগল তার চোখ মুখ থেকে। অনেকটা স্বাগতঃই বলে উঠল লোকটা, 'আমরা আহমদ মুসার তালাশে এসেছি তার বাড়িতে, আর আহমদ মুসা গিয়ে বসে আছে আমাদের হাতের মুঠোর মধ্য। চল সকলে।

তারা পাঁচজন আবার লিফটে গিয়ে উঠল।

চলে গেল তারা।

আড়াল থেকে বাইরে বেরিয়ে গেল ফাতিমা ও যায়েদ।

দু'জনেরই চোখ মুখ শুকনো।

চোখ-মুখে তাদের উদ্বেগ।

আজর ওয়াইজম্যান স্বাগতোক্তিতে যা বলেছে তা শুনতে পেয়েছে ফাতিমা ও যায়েদ দুজনেই।

দু'জন কারো মুখে কোন কথা নেই। অবশেষে নিরবতা ভাঙল ফাতিমা। বলল, 'আহমদ মুসা ভাইয়ারা আজর ওয়াইজম্যনদের হাতের মুঠোয় যাবেন কি করে? ওরা তো গেলেন অধ্যপক সাইমনের সাথে দেখা করতে। তাহলে কি বুমেদীন বিল্লাহ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে?

আহমদ মুসা ভাইকে অন্য কোথাও নিয়ে তুলছে? থামল ফাতিমা।

আতংক ফুটে উঠল যায়েদের চেখে-মুখে। বলল, 'আমারও এই রকমই সন্দেহ হচ্ছে।

ফাতিমা স্থির দাঁড়িয়েছিল। নড়ে উঠল। চলতে শুরু করল ফ্ল্যাটের দরজার দিকে। বলল, এস যায়েদ, নোট বুকে অধ্যাপক জ্যাক সাইমনের ঠিকানা লেখা আছে।'

যায়েদ ফতিমার সাথে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'অধ্যপক জ্যাক সাইমনের ঠিকানা দিয়ে কি করবে?

'কিছু একটা তো করতে হবে আগে জ্যাক সাইমনের ঠিকানা তো দেখি!

দরজা খুলে দু'জনেই ফ্ল্যাটে প্রবেশ করল।

# ৬

গাড়ি থামল বিশাল এক গাড়ি বারান্দায়।

গাড়ি থামতেই উর্দীপরা একজন যুবক বারান্দা থেকে দ্রুত নেমে এল। এসে গাড়ির দরজা খুলে সামনে বসা বুমেদীন বিল্লাহকে লক্ষ্য করে বলল, স্যার আপনি নিশ্চয় মিঃ বিল্লাহ। স্যার আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। ওয়েলকাম।'

বুমেদীন বিল্লাহ গাড়ি থেকে নেমে 'ধন্যবাদ' বলে আহমদ মুসার দিকে তাকাল।

আহমদ মুসাও গাড়ি থেকে নেমেছে।

আহমদ মুসা গাড়ি থেকে নেমে বুমেদীন বিল্লাহ ও এ্যাটেনড্যান্টের দিকে চাইতেই গাড়ির বারান্দার উপরে বারান্দায় উঠার সিঁড়ির পাশেই দেয়া সুন্দর একটি নেম প্লেট আহমদ মুসার নজরে পড়ল।

নেমপ্লেটটিতে সাদা পটভুমির উপর সুন্দর সাদাটে নীল কালিতে লেখা প্রফেসর (এমিরিটাস) জ্যাক সাইমন। নেমপ্লেটের সাদা পটভূমির উপর ও নীচের গোটা অংশ সাদাটে নীল।

আহমদ মুসা গাড়ি ঘুরে বুমেদীন বিল্লাহর পাশে এসে একসাথে সিঁড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল।

আগে চলছিল এ্যাটেনড্যান্ট।

হাঁটতে হাঁটতে আহমদ মুসা বুমেদীন বিল্লাহকে নেমপ্লেটটি দেখিয়ে বলল, 'নামটা তুলে নিয়ে যদি ওখানে নীল রংয়ের নামের বদলে যদি নীল ছয় কোণা তারকা বসানো যায়, তাহলে ওটা কি হয় বলুন তো?

মুহুর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে নেমপ্লেটের দিকে তাকিয়ে একটু চিন্তা করে বল, 'বলতে পারলাম না। এ রকম কোন জিনিসের কথা আমার মনে পড়ছে না।'

'ইসরাইল রাষ্ট্রের পতাকা। এখন মিলিয়ে দেখুন।'

মনে করার একটু চেষ্টা করে বুমেদীন বিল্লাহ বলল, 'পতাকা দেখেছি, কিন্তু এখন স্মৃতিতে আনতে পারছি না। কিন্তু আহমদ আবদুল্লাহ সুদুরের দুই বিষয়কে এভাবে মিলানোর কথা আপনার মনে পড়ল কি করে?

'কালার এবং তার সেট আপ ও আকার দেখে মনে হলো।' বলল আহমদ মুসা।

আবার চলতে শুরু করছে দু'জন।

ভেতরে ঢুকে একটা কক্ষ পেরিয়ে একটা দরজার সামনে এ্যাটেনন্ড্যান্ট থমকে দাঁড়াল। আহমদ মুসারাও তার পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

এ্যাটেনন্ড্যান্ট লোকটি বন্ধ দরজায় কয়েকবার নক করল। ভেতর থেকে একটা কন্ঠ ভেসে এ, 'ইয়েস'।

এ্যাটেনন্ড্যান্ট বলল, 'স্যার আপনারা যান।'

দরজা ঠেলে আহমদ মুসা ও বুমেদীন বিল্লাহ ঘরে প্রবেশ করল।

তারা দেখল, প্রৌঢ় দীর্ঘদেহী ভারী চশমাওয়ালা সোনালী সাদা রংয়ের একজন লোক দরজার দিকে তাকিয়ে বসে আছে।

আহমদ মুসারা ঢুকতেই লোকটি উঠে দাঁড়ল এবং কয়েক ধাপ এগিয়ে এল। 'ওয়েলকাম' বলে আহমদ মুসার সাথে হাত মেলাল।

বুমেদীন বিল্লাহ নিজের পরিচয় দিয়ে আহমদ মুসাকে দেখিয়ে বলল,

'আমার বন্ধু। নাম আলী আবদুল্লাহ। সমুদ্র ভ্রমনের নেশা। ইদানিং তিনি সমুদ্রের উপর কুইজ তৈরী করছেন।'

আহমদ মুসার এই নাম ও পরিচয় আগেই ঠিক করে রেখেছিল বুমেদীন বিল্লাহ। তার যুক্তি ছিল রাইন ইন্টারন্যাশনাল হোটেলে দু'জন লোক নিহত হওয়ার ঘটনার পর 'আহমদ আবদুল্লাহ' নামটি পত্র-পত্রিকায় এসেছে। এ নাম প্রফেসর জ্যাক সাইমন ও পত্র-পত্রিকায় দেখতে পারেন। সুতরাং নামটি কোন বিপত্তির সৃষ্টি করতে পারে। আহমদ মুসা ও বুমেদীন বিল্লাহর এ চিন্তাকে ওয়েলকাম করেছিল।

‘ওয়েলকাম টু বোথ’ বলে প্রফেসর জ্যাক সাইমন বাম পাশের দুটি সোফার দিকে ইংগিত করে বসতে বলল এবং নিজেও ফিরল সোফায় বসার জন্য।

আহমদ মুসা ও বুমেদীন বিল্লাহ সোফায় বসল।

ঘরটি বৃত্তাকার। ঘরের চারদিকে বৃত্তাকার করেই সোফা সাজানো।

বৃত্তের মাঝখানটা ফাঁকা।

বসার পর প্রফেসর জ্যাক সাইমন আহমদ মুসার দিকে চেয়ে বলল, ‘আপনি সমুদ্রকে ভালবাসেন জেনে খুশি হয়েছি। সমুদ্রকে আমিও ভালবাসি। তবে বেশি ভালবাসি আটলান্টিককে।’

‘ধন্যবাদ। বলুন কি করতে পারি আপনার জন্যে।’ প্রফেসর জ্যাক সাইমন বলল।

‘স্যার জার্মানীর এক কুইজ ফার্ম থেকে কিছু কুইজ পেয়েছি, সেগুলো আমি কাজে লাগাতে চাই। কিন্তু একটা আইল্যান্ডের কোন ট্রেস করতে পারছি না। বুমেদীন বিল্লাহ বলল, এর সমাধান শুধু আপনার কাছেই পাওয়া যেতে পারে। বলল আহমদ মুসা।

‘আইল্যান্ডের ছবি আছে। এর নাম, অবস্থান ও কোন রাষ্ট্রের অংশ, এটা বলে দিতে হবে তো? প্রফেসর জ্যাক সাইমন বলল।

‘জি স্যার।’ বলল বুমেদীন বিল্লাহ।

‘দাও ছবিটা। প্রফেসর জ্যাক সাইমন বলল।

‘ছবি নয় আকার বোঝা যায় এমন একটা স্কেচ আছে।’ বলে আহমদ মুসা স্কেচটা প্রফেসর সাইমনের হাতে তুলে দিল।

স্কেচটি হাতে নিল প্রফেসর জ্যাক সাইমন।

চোখের সামনে তুলে ধরল স্কেচটি।

দেখতে লাগল সে দ্বীপটাকে।

ধীরে ধীরে ভ্রুকুঞ্চিত হয়ে উঠল তার। বিস্ময়, সেই সাথে জিজ্ঞাসা ফুটে উঠল তার চোখ-মুখে। এক সময় এক চোরা দৃষ্টিতে তাকাল সে আহমদ মুসার

দিকে। তারপর হঠাৎ সহজ হয়ে উঠে প্রশ্ন করল, 'দিকের চিহ্নটা কি ঠিক আছে দ্বীপের ?

'জি হ্যাঁ।' বলল আহমদ মুসা।

'দ্বীপ সম্পর্কে আপনারা কিছু আন্দাজ করতে পেরেছেন? প্রফেসর জ্যাক সাইমন বলল।

'না, পারিনি।' বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা থামতেই প্রফেসর জ্যাক সাইমন বলে উঠল, 'দ্বীপটার সাইজ এ্যাভারেজ ক্যারেক্টরের। এক দৃষ্টিতে চিহ্নিত করা মুস্কিল।

আপনারা একটু বসুন। আমার কম্পিউটারের ইনডেক্স ও ক্যাটালগ একটু কনসাল্ট করে আসি। আপনারা গল্প করুন। চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

বলে উঠে ভেতরে চলে গেল প্রফেসর জ্যাক সাইমন।

প্রফেসর জ্যাক সাইমন চলে যাবার পর বুমেদীন বিল্লাহ আহমদ মুসাকে ফিস ফিস করে বলল, 'কি মনে করছেন , দ্বীপটাকে উনি কি চিহ্নিত করতে পারবেন?

'মি. বুমেদীন বিল্লাহ আমার চোখ যদি ভুল না দেখে থাকে তাহলে আমি বলব তিনি দ্বীপটাকে ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করেছেন।' বলল আহমদ মুসা।

'কি করে বুঝলেন? জিজ্ঞেস করল বুমেদীন বিল্লাহ।

'আমার দিকে চেয়ে যখন তিনি কথা বলছিলেন, তখন তার চোখ-মুখের ভাব দেখে আমি এটা বুঝেছি। না চিনতে পারলে যে অবস্থা, যে চেহারা মানুষের হয়, সেটা তাঁর মধ্যে আমি দেখলাম না। যখন তিনি ইনডেক্স ও ক্যাটালগ দেখার কথা বললেন, তখনও কথায় অন্তরের কোন স্পর্শ ছিল না।' বলল আহমদ মুসা।

'চিনতে পারলে তা গোপন করবেন কেন? কম্পিউটারে ইনডেক্স ও ক্যাটালগ কনসাল্ট করার কথাইবা বলবেন কেন? বুমেদীন বিল্লাহ বলল।

'আমার কথাটা চুড়ান্ত নয় মিঃ বিল্লাহ। ওটা আমার একটা ধারনা। হতে পারে প্রফেসর জ্যাক সাইমন এমন এক ধরনের মানুষ যার মনের ভাবটা চোখ-মুখে ফুটে উঠতে পারে না এবং চোখ-মুখের ভাব মনের কথা বলে না। এ ধরনের

শক্ত মনের ব্যতিক্রমী ব্যাক্তিত্ব দুনিয়াতে অনেক আছে। প্রফেসর জ্যাক সাইমন হতে পারেন তাদেরই একজন। বলল আহমদ মুসা।

চা এসে গিয়েছিল। চায়ে চুমুক দিয়ে বলল বুমেদীন বিল্লাহ, দ্বীপের সন্ধান পেলে কি করবেন মিঃ আহমদ আবদুল্লাহ?

'দ্বীপ সম্পর্কে খোজ খবর নিতে হবে। তার পর প্রয়োজনে দ্বীপে যেতে হবে, যদি স্পুটনিকের লোকেরা সেখানে আটক থাকে।' বলল আহমদ মুসা।

'আপনার সাথে দেখা হওয়ার পর থ্রিলের প্রতি আমার আকর্ষণ বেড়েছে। মনে হচ্ছে কি জানেন, এ ধরনের অভিযানে আমি আপনার সংগী হই।' বুমেদীন বিল্লাহ বলল।

'তাহলে সাংবাদিকতার কি হবে? জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'এ ধরনের অভিযানে সাংবাদিকতা বাধা হবে কেন? যুদ্ধে কি সাংবাদিকরা শরীক হয় না? বলল বুমেদীন বিল্লাহ। আহমদ মুসা হাসল। বলল 'আসলে কি জানেন, আপনি আপনাকে চিনতে পারেন নি, দুই ঐতিহাসিক রক্তের ধারা আপনার শরীরে। একটি ধারা এসেছে আলজেরিয়ার বিপ্লবী নেতা আহমদ বেন বেল্লাহর কাছ থেকে। এ সেই মহান বেন বেল্লাহ যিনি ১৯৫৪ সালে ফরাসী ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে আলজেরিয়ার জনগণের বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট হয়ে ছিলেন। আরেকটি রক্তের ধারা হুয়ারি বুমেদীনের দিক থেকে। তিনিও আলজেরিয়ার একজন স্বাধীন সংগ্রামী এবং আলজেরিয়ার দীর্ঘকালীন প্রেসিডেন্ট। এই দুই রক্ত আপনাকে একটা স্বভাব সংগ্রামী মানসিকতা দিয়েছে। আপনার সাংবাদিকতা আপনার এই স্বভাব সংগ্রামেরই অংশ। এখন আবার প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পরিবেশ দেখে আপনার মন তার সাথেও শামিল হতে চাচ্ছে।' থামল আহমদ মুসা।

বিস্ময় দৃষ্টিতে বুমেদীন বিল্লাহ অপলক তাকিয়ে আছে আহমদ মুসার দিকে। আহমদ মুসা থামলে আরও কয়েক মুহুর্ত সময় নিয়ে বুমেদীন বিল্লাহ ধীরে ধীরে বলল, 'আপনি কে জানি না। কিন্তু মনে হয় আপনি আর এক আহমদ বেন বেল্লাহ হবেন, যিনি মানুষকে জাগাতে, তাকে সংগ্রামী বানাতে পারেন। এখন সত্যিই আমার নিজেকে নতুন পরিচয়ের নতুন মানুষ মনে হচ্ছে। আমি কখনই

বেন বেল্লাহ কিংবা বুমেদীনকে আমার মডেল ভাবতে পারিনি, বরং ঘৃনা করেছি তাদের রাজনীতিকে। অথচ এই মুহুর্তে আমার মনে হচ্ছে, আহমদ বেন বেল্লাহ ও বুমেদীনের আরেকটা পরিচয় ছিল। সেটা বিপ্লবীর পরিচয়। এই পরিচয় আমার জন্য মডেল হতে পারে এবং এটা সময়েরও প্রয়োজন। আপনাকে............।

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল বুমেদীন বিল্লাহ। কিন্তু এ সময় ড্রয়িং রুমে ফিরে এলেন প্রফেসর জ্যাক সাইমন।

তার সোফায় বসতে বসতে প্রফেসর জ্যাক সাইমন বলল, 'স্যরি, অনেক্ষণ আপনাদের বসিয়ে রেখেছি। '

'স্যরি স্যার। আমাদেরই তো দুঃখ প্রকাশ করা দরকার। আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি আমরা।' বলল বুমেদীন বিল্লাহ।

আমাদের জন্যে কোন সুখবর আছে স্যার ?' আহমদ মুসা বলল।

'অবশ্যই ইয়ংম্যান।' বলে একটু থামল প্রফেসর জ্যাক সাইমন।

তারপর ধীরে ধীরে আবার শুরু করল, 'কুইজের উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ দিতে হয় মি. আলী আবদুল্লাহ। এ দ্বীপের সন্ধান তারা পেল কি করে ?

কোন মানচিত্র, এমনকি স্যাটালাইট চিত্রেও এ দ্বীপের কোন আকার স্পষ্ট নয়। কিন্তু আপনার স্কেচে দ্বীপটির নিখুঁত আকার এল কি করে?

কথা শেষ করতেই প্রফেসর জ্যাক সাইমনের মোবাইল বেজে উঠল।

মোবাইল তুলে নিয়ে প্রফেসর জ্যাক সাইমন বলল, 'ইয়েস সাইমন স্পিকিং।'

ওপারের কথা শুনে বলল, 'ইয়েস।' OK, বলে মোবাইল রেখে দিল।

মোবাইল রেখে দিয়েই প্রফেসর জ্যাক সাইমন তার পূর্ব কথার রেশ ধরে বলে উঠল , হ্যাঁ মি. আলী আবদুল্লাহ , কুইজ উদ্যোক্তারা এ দ্বীপের এই নিখুঁত মাপটা পেল কোথায়?'

ভ্রু কুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার। একটু ভাবল আহমদ মুসা। প্রফেসার জ্যাক সাইমনের এ জিজ্ঞাসার মধ্যে বিদ্রুপ ও অভিযুক্ত করার মানসিকতা রয়েছে। তার চোখে-মুখেও একটা অযৌক্তিক কাঠিন্য।

আহমদ মুসা ধীরে ধীরে বলল, ‘কোন অভিযাত্রি, কোন গ্রন্থ অথবা সরকারী কোন সূত্র থেকেও পেতে পারে।’

প্রফেসর জ্যাক সাইমন আহমদ মুসারা যে দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছিল সেই দরজার দিকে তাকিয়েছিল। তার ঠোটে ফুটে উঠেছে এক টুকরো শক্ত হাসি। আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই প্রফেসর বলে উঠল,

‘কেন কোন তিন তলার কম্পিউটার থেকে পেতে পারে না?

প্রফেসর জ্যাক সাইমনের কথা শেষ হবার আগেই আহমদ মুসা যেন এক ঝাঁকুনি দিয়ে জেগে উঠল। কখন তার ডান হাত কোটের পকেটে চলে গিয়েছিল। বের হয়ে এল রিভলবার। রিভলবারটি উঠল প্রফেসর জ্যাক সাইমনের মাথা লক্ষ্যে। সেই সাথে আহমদ মুসার কন্ঠ থেকে বেরিয়ে এল, ‘দেরী হয়ে গেছে, নেম প্লেটটা দেখেই আমার সব কিছু বুঝা উচিত ছিল।’

হঠাৎ হো হো হাসির শব্দ এল ড্রইংরুমের সামনের দরজার দিক থেকে।

তাকাল আহমদ মুসা সেদিকে। দেখল, চারটি ষ্টেনগান ও একটি রিভলবার তাদের দিকে তাক করা। হো হো করা কন্ঠটি আজর ওয়াইজম্যানের। হাসির সাথে সাথেই সে বলে উঠল, ‘সত্যিই দেরী হয়ে গেছে আহমদ মুসা। আর তোমার করার কিছুই নেই।’

বলে সে প্রফেসর জ্যাক সাইমনকে লক্ষ্য করে বলল, ‘প্রফেসর ডেভিড দানিয়েল, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার ঐতিহাসিক টেলিফোনের জন্য। আপনি দয়া করে আহমদ মুসার হাত থেকে রিভলবারটি নিয়ে নিন।’

প্রফেসর জ্যাক সাইমন উঠে এসে আহমদ মুসার পেছনে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে রিভলবার কেড়ে নিল।

‘প্রফেসর জ্যাক সাইমন আপনার ইহুদী নাম দেখছি ডেভিড দানিয়েল। নাম কবে পাল্টেছেন? জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘পাল্টাব কেন? ফ্যামিলী নাম হিসাবে এটা সব সময় চালু আছে। পাবলিকলী আমি জ্যাক সাইমন।’

‘মি. জ্যাক সাইমন আপনার মত লোক যে ছদ্মবেশী হবেন এটা বিশ্বাস করতে মন চায়নি। তাই রিভলবার বের করতে অনেক দেরী হয়েছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কেন আমাকে সন্দেহ করেছিলে নাকি? জিজ্ঞেস করল জ্যাক সাইমন।

‘অবশ্যই। আপনার নেমপ্লেটটা তো একটা ইসরাইলি পতাকা।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তাও তুমি ধরে ফেলেছ? তুমি সত্যিই অদ্বিতীয় আহমদ মুসা।’ বলল প্রফেসর জ্যাক সাইমন।

প্রফেসর জ্যাক সাইমন থামতেই আজর ওয়াইজম্যান বলে উঠল, ‘প্রফেসর ডেভিড দানিয়েল আহমদ মুসার এই কথা বলা কিন্তু একটা কৌশল। শৃগালের মত ধূর্ত, আর সাপের মত বিষাক্ত এই লোক মিঃ প্রফেসর। আপনি দূরে থাকুন।

বলেই আজর ওয়াইজম্যান চোখ ফেরাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘তোমরা দু’জন মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড় আহমদ মুসা। আমি কিন্তু দু’বার নির্দেশ দেব না এবং তোমাকে এক মূহুর্ত বাঁচিয়ে রাখার ইচ্ছাও আমার নেই।

আহমদ মুসা তাকাল বুমেদীন বিল্লাহর দিকে। দেখল বুমেদীন বিল্লাহর চোখ ভরা একরাশ বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে আহমদ মুসার দিকে। আহমদ মুসা তার দিকে চাইতে সে বলে উঠল, ‘ওরা যা বলেছে এটাকি ঠিক? আপনি সত্যিই আহমদ মুসা?

‘হ্যাঁ ভাই।’ বলে একটু থামল। তারপর হেসে বলল, ‘আসুন মিঃ ওয়াইজম্যানের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করি।’

আহমদ মুসা সোফা থেকে উঠল এবং এগুলো মেঝের মাঝখানটার দিকে।

বুমেদীন বিল্লাহও আহমদ মুসার পেছনে।

আহমদ মুসা পূর্ব দিকে মাথা দিয়ে উপুর হয়ে কার্পেটের উপর শুয়ে পড়ল। বুমেদীন বিল্লাহ আহমদ মুসার বাম পাশে একইভাবে শুয়ে পড়ল।

'বার বার ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান, এইবার ঘুঘু তোমার বধিব পরান' বুঝলে আহমদ মুসা। দু'বার তোমার ভাগ্য সহায় হয়েছে, খাঁচা কেটে পালাতে পেরেছ। এবার তোমাকে মরতে হবে, তবে তার আগে তোমাকে একটু নাচাতে চাই।' বলল আজর ওয়াইজম্যান আহমদ মুসাকে লক্ষ করে।

কথা শেষ করেই আজর ওয়াইজম্যান একজন ষ্টেনগানধারীর দিকে একটা প্যাকিং টেপের বান্ডিল ছুড়ে দিয়ে নির্দেশ দিল ওদের পিছ মোড়া করে বেঁধে ফেল।

নির্দেশ দিয়ে আজর ওয়াইজম্যান প্রফেসর ডেভিড দানিয়েলকে লক্ষ্য করে বলল, মিঃ ডেভিড দানিয়েল, আসুন পাশের ঘরে একটু কথা বলি।'

আজর ওয়াইজম্যান ও প্রফেসর ডেভিড দানিয়েল পাশের ঘরে চলে গেল।

একজন ষ্টেনগানধারী এক হাতে ষ্টেনগান অন্য হাতে টেপ নিয়ে এগুলো প্রথমে আহমদ মুসার দিকে।

সে আহমদ মুসার পেছন দিক দিয়ে গিয়ে তার উপর চেপে বসে তাকে পিছমোড়া করে বাঁধতে চাইল।

আহমদ মুসা দু'পা এবং দু'হাত ছড়িয়ে শুয়ে ছিল।

ষ্টেনগানধারী লোকটি আহমদ মুসার দু'পায়ের মাঝখান দিয়ে এগুলো তার পিঠের দিকে।

লোকটি যখন আহমদ মুসার নিতম্বের কাছাকাছি এসে পৌছেছে, তখন আহমদ মুসার দুই পা তীব্র বেগে উঠে এসে লোকটির দুই হাঁটুর উপর আঘাত করল। আকস্মিক এই আঘাতে লোকটি মুখ থুবড়ে পড়ে গেল আহমদ মুসার উপর। আর তার ষ্টেনগানটি গিয়ে পড়ল আহমদ মুসার পাশে একেবারে তার ডান হাতের উপর।

আহমদ মুসা এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করেনি। লোকটি আহমদ মুসার উপর পড়ে যাবার আগেই আহমদ মুসা পাশ ফিরে তার বাম হাত ঘুরিয়ে নিয়েছিল ডান হাতের কাছে। ষ্টেনগান ডান হাতের উপর পড়ার সাথে সাথেই আহমদ মুসার দুই

হাত ষ্টেনগান নিয়ে তাক করল তিন ষ্টেনগানধারীকে। শুয়ে থেকেই আহমদ মুসা ট্রিগার চাপল।

তিনজন ষ্টেনগানধারী ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। তার উপর তাদের সহযোগী লোকটি আহমদ মুসার উপর গিয়ে পড়ায় তারা দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিল।

ফলে অসহায়ভাবে তারা আহমদ মুসার গুলী বৃষ্টির শিকার হলো। মূহুর্তেই তিনজনের ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া দেহ ঝরে পড়ল মেঝের উপর।

এদিকে আহমদ মুসা উপর পড়ে যাওয়া লোকটি প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে ঘটনা বুঝে উঠেই সক্রিয় হয়ে উঠল। আহমদ মুসা যখন গুলী করছিল, তখন লোকটির দু'হাত সাঁড়াশীর মত আহমদ মুসার গলা লক্ষ্যে পৌঁছে গিয়েছিল।

আহমদ মুসা যখন তিনজন ষ্টেনগানধারীকে ভূপাতিত করে তার ষ্টেনগানের ব্যারেল নীচে নামাল, তখন লোকটির দুই হাত সাঁড়াশীর মত চেপে বসেছে আহমদ মুসার গলায়।

প্রতিরক্ষার জন্য আহমদ মুসা ষ্টেনগানকেই ব্যাবহার করল।

দু'হাতে ধরা ষ্টেনগানের বাট দিয়ে প্রচন্ড গুঁতা মারল আহমদ মুসা লোকটির মাথায় এবং সাথে সাথেই আহমদ মুসা মোচড় দিয়ে দেহটাকে ঘুরিয়ে নিল।

মাথায় আঘাত পেয়ে লোকটার দুই হাত আহমদ মুসার গলা থেকে আলগা হয়ে পড়েছিল এবং দেহটাও শিথিল হয়ে পড়েছিল।

আহমদ মুসার দেহের ধাক্কায় সে পাশে গড়িয়ে পড়ল। লোকটি তখন গলা ছেড়ে দিয়ে ষ্টেনগান ধরার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল। আহমদ মুসা ততক্ষণে তার ষ্টেনগান ঘুরিয়ে নিয়েছে। আহমদ মুসা ট্রিগার চেপে ধরল ষ্টেনগানের ব্যারেল তার পাঁজরে ঠেকিয়ে।

লোকটা ঝাঁপিয়ে পড়া এবং আহমদ মুসা ট্রিগার চাপা এক সাথেই হয়েছিল। এক ঝাঁক গুলীর তোড়ে লোকটার দেহ একটা রক্তাক্ত মাংসপিন্ডে পরিনত হলো।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াচ্ছিল। এই সময় চিৎকার করে উঠল বুমেদীন বিল্লাহ, মিঃ আহমদ মুসা গুলী..........।'

ভীত, আতংকিত বুমেদীন বিল্লাহ তখনও গুলী গোলার মধ্যে উঠে দাঁড়াতে সাহস পায়নি। শুয়ে থেকেই চারদিকটা সে দেখার চেষ্টা করছিল।

বুমেদীন বিল্লাহর চিৎকার করে উঠার সংগে সংগেই আহমদ মুসা নিজের দেহ পেছনের দিকে ছুঁড়ে দিল। তার উপর দিয়ে একটা বুলেট শাঁ করে চলে গিয়ে দেয়ালে বিদ্ধ হলো।

আহমদ মুসা মাটিতে আছড়ে পড়লেও ষ্টেনগান তার হাত থেকে পড়েনি এবং তার আঙুল ট্রিগার থেকে সরেনি।

যে দিক থেকে গুলী এসেছে, তার বিপরিত দিকে পড়েছে আহমদ মুসার মাথা। ফলে সে মেঝেতে শুয়ে পড়লে তার চোখ গিয়ে পড়েছে দরজাটির উপর যেখানে আজর ওয়াইজম্যান গুলী করেছে।

আহমদ মুসা শুয়ে পড়েই ট্রিগার টিপেছে তার ষ্টেনগানের। এক ঝাঁক গুলী ছুটে গেল দরজার উপর।

আজর ওয়াইজম্যান টার্গেট ঠিক করে দ্বিতীয় গুলী করার আর সুযোগ পেল না। আহমদ মুসা দেখতে পেল তার দেহটা একটা ঝাঁকি দিয়ে উঠে দরজার আড়ালে ছুটে গেল। আহমদ মুসার মনে হলো আহত হয়েছে আজর ওয়াইজম্যান।

শোয়া অবস্থা থেকে আহমদ মুসা তড়াক করে উঠে দাঁড়াল এবং ছুটল দরজার দিকে।

আহমদ মুসা দরজার ওপারে রক্তের ফোটা ফোটা দাগ দেখতে পেল। রক্তের দাগ অনুসরণ করে ছুটল।

বাইরের বারন্দায় বেরিয়ে দেখল একটা গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে গেট দিয়ে।

আহমদ মুসা ফিরতে যাচ্ছিল এ সময় একটা থামের আড়াল থেকে বেড়িয়ে এল ফাতিমা ও যায়েদ। বেরিয়েই রক্তে ভেজা আহমদ মুসার দিকে আতংকিত চোখে ফাতিমা বলল, 'আপনি ঠিক আছেন ভাইয়া? কাঁধ চেপে ধরে একজন এদিক দিয়ে পালাল।'

'ভাল আছি। তোমরা এস।' বলে আহমদ মুসা ছুটল ভেতরে। প্রফেসার জ্যাক সাইমনকে পেতে হবে, ধরতে হবে তাকে।

আহমদ মুসা চারটি লাশ পড়ে থাকা রক্তাক্ত হল রুমটিতে প্রবেশ করতেই সামনের দরজার দিক থেকে, যে দরজা দিয়ে প্রফেসার জ্যাক সাইমন ওরফে ডেভিড দানিয়েল দ্বীপের ইনডেক্স ও ক্যাটালগ দেখার জন্য ভেতরে গিয়েছিল, বুমেদীন বিল্লাহর চিৎকার ভেসে এল মিঃ আহমদ মুসা প্রফেসর জ্যাক সাইমন পালাচ্ছিল ধরে ফেলেছি।'

বলতে বলতে বুমেদীন বিল্লাহ প্রফেসর জ্যাক সাইমনকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে দরজা দিয়ে হল রুমে প্রবেশ করল এবং বলল, 'আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয়, তাহলে এই প্রফেসরই টেলিফোন করে এই কিলারদের ডেকে এনেছে।'

'আপনি ঠিক অনুমান করেছেন মি. বিল্লাহ। দ্বীপের ইনন্ডেক্স ও ক্যাটালগ দেখার ভান করে ইনি আজর ওয়াইজম্যানদের টেলিফোন করার জন্যই ভেতরে গিয়েছিলেন। আধা ঘন্টার ও বেশি ভেতরে দেরী করেছিলেন তাদের আসার সুযোগ দেয়ার জন্য। একে পাকড়াও করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ মিঃ বিল্লাহ।' বলল আহমদ মুসা।

বুমেদীন বিল্লাহ প্রফেসর জ্যাক সাইমনকে সোফার উপর ছুড়ে ফেলে দিয়ে আকস্মিকভাবে আহমদ মুসার সামনে ঝুঁকে পড়ে আহমদ মুসার দু'পায়ে দুই হাত দিয়ে বলল, আপনার পদধুলি গ্রহন করলাম দুই আনন্দে। একটি আ্নন্দ হলো কিংবদন্তী নায়ক আহমদ মুসাকে দেখলাম। অন্যটি হলো, তাঁর সাথে একটা অভিযানে শরিক হওয়ার আনন্দ।'

বলতে বলতে উঠে দঁড়িয়ে বিস্ময় বিমূঢ়তায় স্তব্ধ ফাতিমাদের লক্ষ্য করে বলল, মিঃ যায়েদ ও মিসেস ফাতিমা আসুন পদধুলি নিন, জানেন ইনি কে?

'আগেই পদধুলি নিয়েছি আমরা।' বলল যায়েদ।

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছি বুমেদীন বিল্লাহ। আহমদ মুসা তাকে বাধা দিয়ে বলল, মিঃ বিল্লাহ অনেক কাজ বাকি। প্রফেসর জ্যাক সাইমন আমাদের কতটা সময় নেবে কে জানে!'

বলেই আহমদ মুসা তাকাল ফাতিমার দিকে। বলল, 'তোমরা কি বাইরে থেকে গুলীর আওয়াজ পেয়েছ?

'গুলীর শব্দ বলে বুঝিনি। তবে এক ধরনের শব্দ পেয়েছি। আহত আজর ওয়াইজম্যানকে পালাতে দেখে বুঝলাম ওগুলো গুলীর শব্দ ছিল।' বলল যায়েদ।

'ঘরগুলো ভাল শব্দ প্রুফ। নিশ্চয় বাড়ির বাইরে কোন শব্দ যায়নি। 'আহমদ মুসা বলল। তার মুখে খুশি হওয়ার চিহ্ন।

কথাটা বলেই আহমদ মুসা ফিরল প্রফেসর জ্যাক সাইমনের দিকে।

প্রফেসর জ্যাক সাইমন জড়োসড়ো হয়ে সোফায় বসে ছিল।

আহমদ মুসা তার কাছাকাছি হয়ে বলল, 'প্রফেসর জ্যাক সাইমন আপনি নাম ভাঁড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরী করেছে?

'নাম ভাঁড়িয়ে নয়। আমার সার্টিফিকেট নামই জ্যাক সাইমন।' শুস্ক কন্ঠে বলল জ্যাক সাইমন।

'কিন্তু আপনার আসল নাম তো ডেভিড দানিয়েল।' আহমদ মুসা বলল।

কথা বলল না প্রফেসর জ্যাক সাইমন।

'খৃস্টান সেজে সারা জীবন গোপনে ইহুদীদের পক্ষে কাজ করে এসেছেন, এভাবে প্রতারণা করেছেন জনগনের সাথে।' বলল আহমদ মুসা।

মুখ খুলল না প্রফেসর জ্যাক সাইমন।

'স্পুটনিক ধ্বংস করা, স্পুটনিকের লোকদের কিডন্যাপ করার সাথে আপনি জড়িত।' বলল আহমদ মুসা। আহমদ মুসার কন্ঠ কঠোর।

মুখ নিচু করে ছিল প্রফেসর জ্যাক সাইমন। চমকে উঠে মুখ তুলল সে। আর্তকন্ঠে বলে উঠল, 'না আমি এর সাথে জড়িত নয়। আমি পরে জানতে পেরেছি।'

'আপনার একথা ঠিক নয়। আপনি জড়িত না থাকলে, পরে জানতে পারলে পুলিশকে আপনি এ বিষয় জানান নি কেন? বলল আহমদ মুসা।

কথা বলল না প্রফেসর জ্যাক সাইমন। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল আহমদ মুসার দিকে।

'আমি একজন সাংবাদিক নিয়ে স্পুটনিক ধবংস- ঘটনার অনুসন্ধানের ব্যাপারে একটা তথ্য নিতে আপনার কাছে এসেছিলাম, আপনি আমাদের খুন করার জন্যে টেলিফোন করে ক্রিমিনালদের এনেছেন।

'খুন করার জন্যে নয়, আমি তাদের খবর দিয়েছিলাম মাত্র।' আর্তকন্ঠে কম্পিত গলায় বলল প্রফেসর জ্যাক সাইমন।

'খুন করার জন্যে নয় তাহলে বন্দী করার জন্যে? বলল আহমদ মুসা।

'তাও নয়। এসব ঘটবে আমি ভাবতে পারিনি।' বলল প্রফেসর জ্যাক সাইমন। কান্নাজড়িত কন্ঠ তার।

'তাহলে ঘটাল কে? আহমদ মুসা বলল।

'ওরা এসব ঘটাবে বুঝিনি।' বলল প্রফেসর জ্যাক সাইমন। তাঁর কন্ঠে কান্না মিশ্রিত অনুনয়ের সুর।

'তাহলে এই কাজ আপনি সমর্থন করেন না? জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'না সমর্থন করি না। 'কন্ঠে শক্তি এনে বলার চেষ্টা করল প্রফেসার জ্যাক সাইমন।

'আপনি কি স্পুটনিক ধবংস সমর্থন করেন? স্পুটনিকের ৭ জনকে কিডন্যাপ করা সমর্থন করেন? আহমদ মুসা জিজ্ঞেস করল।

'না সমর্থন করি না।' দৃঢ় কন্ঠে বলল প্রফেসার জ্যাক সাইমন।

'তাহলে তাদের এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য করা আপনার কর্তব্য নয়? আহমদ মুসা বলল।

মাথা নিচু করল প্রফেসর জ্যাক সাইমন। কোন উত্তর দিল না।

'তাহলে ওদের অন্যায়কেই সহযোগিতা করবেন? বলল আহমদ মুসা কঠোর কন্ঠে।

'ওদের সাহায্য না করলে ওরা আমাকে মেরে ফেলবে। 'বলে কেঁদে উঠল প্রফেসর জ্যাক সাইমন। একটু থামল। থেমেই আবার বলা শুরু করল, 'জানেনা ওরা স্বজাতি হলেও শত্রুর চেয়েও বড় শত্রু। ওরা যে সহযোগিতা চাইবে, সে সহযোগিতা না দেয়ার অর্থ মৃত্যুকে আলিংগন করা। আমি একজন ধর্ম প্রান ইহুদী ছিলাম। ইহুদীবাদীদের সমর্থন করতাম না। কিন্তু প্রাণের ভয়ে বাধ্য হয়েছি

তাদের সহযোগিতা করতে এবং যখন যা চায় সেই পরিমাণ অর্থ সাহায্যও করতে হয়। আরও জানেন না, ইহুদীরা আজ ইহুদীবাদীদের কেনা গোলাম। ইসরাইল রাষ্ট্রের নাগরিক না হয়েও ইসরাইলের নাগরিকদের চেয়েও দ্বিগুন ট্যাক্স আমাদের দিতে হয় ইসরাইল রাষ্টকে। আমার সামনের যে নেমপ্লেট ওটা ওদের সরবরাহ করা। আমি টাঙাতে বাধ্য হয়েছি। এ রকম বাধ্য লোকের সংখ্যা ওদের লাখ লাখ।

'আপনার কথা আমি বিশ্বাস করলাম। আমাদেরকে আপনি সাহায্য করুন। আমরা আপনার নিরাপত্তার দায়িত্ব নেব।' বলল আহমদ মুসা।

উদ্বেগ ফুটে উঠল প্রফেসর জ্যাক সাইমনের চোখে- মুখে। বলল, 'কি সাহায্য ?

'আপাতত আমরা জানতে চাই, 'সাও তোরাহ দ্বীপটা কোথায়?

প্রফেসর জ্যাক সাইমন কম্পিত কন্ঠে বলল, 'আপনারা এ বিষয়টা জানলেই ওরা নিশ্চিত হয়ে যাবে যে, তথ্যটা আমিই আপনাদের দিয়েছি। তখন দুনিয়ার কোথাও গিয়ে আমি বাঁচতে পারবো না। যেখানে যাব সেখানে গিয়েই ওরা আমাকে হত্যা করবে। আর্তকন্ঠে বলল প্রফেসর জ্যাক সাইমন।

'এ ভয় আপনাকে করতে হবে না। এ বাড়িতে থাকা আপনার ঠিক হবে না। আপনি এখন আজর ওয়াইজম্যানকে টেলিফোন করুন। বলুন যে, বাড়ি থেকে আমি পালিয়ে এসেছি। ফ্রান্সের বাইরে চলে যাচ্ছিআহমদ মুসাদের হাত থেকে , বাঁচতে হলে আমাকে কিছু দিন আত্মগোপনে করতে হবে। এই কথা সে জানার পর আপনাকে দোষ দিতে পারবে না কোন মতেই।' বলল আহমদ মুসা।

প্রফেসর জ্যাক সাইমনের মুখ উজ্জল হয়ে উঠল আনন্দে। কৌশলটি তার খুব পছন্দ হয়েছে বলে মনে হলো। বলল, 'কিন্তু আমি থাকব কোথায়?

'প্যারিসেই থাকবেন। আমরা সব ব্যবস্থা করে দেব। আপনার নিরাপত্তার দিকটা আমাদের লোকেরাই দেখবে। 'আহমদ মুসা বলল। 'ধন্যবাদ মিঃ আহমদ মুসা। আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ যে, আপনি আমাকে বিশ্বাস করেছেন। 'বলে একটু থামল প্রফেসর জ্যাক সাইমন। তারপর বলল আবার, 'আমি আপনার অনেক কথা শুনেছি। সাম্প্রতিক আমেরিকার ঘটনাও আমি জানি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদীবাদকে নির্মূল করার ব্যাবস্থা আপনি করেছেন। যদি এভাবে গোটা

বিশ্বের ইহুদীদেরকে আপনি ইহুদীবাদের অক্টোপাশ থেকে মুক্ত করতে পারতেন, তাহলে তাদের দোয়া আপনি পেতেন।' আবেগে কন্ঠ ভারী হয়ে উঠেছিল। প্রফেসর জ্যাক সাইমনের।

'ধন্যবাদ প্রফেসর জ্যাক সাইমন। ইহুদীবাদের পাপই ইহুদীবাদকে ধবংস করবে। কিন্তু আমার একটা ধারনা ছিল, অধিকাংশ ইহুদী ইসরাইল রাষ্ট্রকে সমর্থন করে।' আহমদ মুসা বলল।

'এক সময় করত। যতদিন ইসরাইল শান্তি কামনা করেছে, আরবদের উপর হাত তোলেনি ততদিন সব ইহুদীই ইসরাইলকে সমর্থন করেছে। তারা কামনা করেছে আরবরা এবং অন্য সবাই ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিয়ে শান্তিতে থাকার ব্যাবস্থা করুক। কিন্তু পরে যখন ইসরাইল শক্তি নির্ভর হয়ে উঠল, অন্যের ভূখন্ড দখল করে নিতে শুরু করল এবং ফিলিস্তিনে ইহুদী বসতি বাড়ানোর অব্যাহত প্রচেষ্টা নিয়ে এগিয়ে চলল, তখন থেকেই বিশ্বের শান্তিকামী ইহুদীরা বুঝে নিয়েছে শান্তি ইসরাইল ও ইহুদীবাদীদের লক্ষ্য নয় তারা এক সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা করেছে যা জ্বালিয়ে রাখবে এক অশান্তির আগুন। ধর্মপ্রাণ ইহুদীরা ইসরাইলকে আজ তাদের জন্যে বিপজ্জনক মনে করছে।' বলল প্রফেসর জ্যাক সাইমন।

বলে একটা দম নিল। সোফায় একটু হেলান দিল। তারপর বলল, 'নতুন গুলাগ বা সাও তোরাহ দ্বীপের কথা আপনি জিজ্ঞেস করেছেন।' দ্বীপটা কোন মানচিত্রে নেই। পর্তুগাল থেকে ৮০০ মাইল পশ্চিমে ৩৮ ডিগ্রী নর্থ ল্যাটিচুডের উপর আটলান্টিকের 'আজোরস' দ্বীপপুঞ্জ। এ দ্বীপপুঞ্জ থেকে সোয়া'শ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ক্ষুদ্র ফ্লোরেস দ্বীপপুঞ্জ। ফ্লোরেস দ্বীপপুঞ্জের মাথার উপর 'করভো' নামে একাটা দ্বীপ। করভো দ্বীপের ৫ মাইল সোজা উত্তরে ৩০ ডিগ্রী পশ্চিম ল্যাটিচুডের ৫০ মাইল পশ্চিমে ছোট্ট বেনামা নির্জন একটা দ্বীপ। এটাই 'নিউ গুলাগ'। নাম রাখা হয়েছে 'সাও তোরাহ' দ্বীপ।' থামল প্রফেসর জ্যাক সাইমন।

খুশিতে মুখ উজ্জল হয়ে উঠছে আহমদ মুসার মুখ। বলল, ধন্যবাদ প্রফেসর জ্যাক সাইমন। সাও তোরাহ দ্বীপকে আপনি নির্জন বলছেন। ওখানে

কোন মানুষই বাস করে না। ‘না’ বলল প্রফেসর জ্যাক সাইমন। ‘তাহলে গোটা দ্বীপে বন্দীরা এবং তাদের পাহারাদাররাই শুধু বাসিন্দা। ‘আহমদ মুসা বলল।

‘হ্যাঁ তাই। আসলে গোটা দ্বীপ পাহাড়ের টিলায় ভর্তি। প্রায় সমগ্র উপুকুল জুড়ে কোথাও খাড়া পাহাড়ের দেয়াল, কিছু কিছু সমতল উপকূল ভূমিও রয়েছে। সব মিলিয়ে দ্বীপটা সাধারণ ভাবে বাসযোগ্য নয়।’ বলল প্রফেসর জ্যাক সাইমন।

‘সেখানে কি বন্দীখানা গড়া হয়েছে, না গোটা দ্বীপকেই বন্দীখানা বানানো হয়েছে? জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

‘স্যরি। এ সম্পর্কে তারা কোন সময়ই আমার সামনে কোন আলোচনা করেনি এবং আমিও জিজ্ঞাসা করিনি।’ বলল প্রফেসর সাইমন।

ধন্যবাদ প্রফেসর। চলুন আমরা এখন উঠি। এখনি আমাদের চলে যাওয়া উচিত, গাড়িতে শুইয়ে নিয়ে যাব আপনাকে, কেউ টের পাবে না, বাইরে গিয়ে আজর ওয়াইজম্যানকে টেলিফোন করবেন। আজকের মধ্যেই আমরা আপনাকে প্যারিস পৌছাবো।’

‘এ লাশগুলোর কি হবে এবং আমার বাড়ির? জিজ্ঞাসা করল প্রফেসর সাইমন।

‘লাশগুলো গুম করার ব্যাবস্থা আমরা করছি। আর আপনার বাড়িটা আপাতত তালাবদ্ধ থাকবে। আপনার পালিয়ে যাওয়া লোকজন নিশ্চয় ফিরবে না আপনি না ফিরা পর্যন্ত। আহমদ মুসা বলল।

‘ঠিক আছে।’ বলে সায় দিল প্রফেসর সাইমন। সবাই বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

প্রফেসর সাইমন, ফাতিমা ও যায়েদকে তাদের গাড়িতে তুলে নিল।

গাড়ি স্টার্ট নিয়ে চলতে শুরু করল।

আহমদ মুসা মোবাইল বের করল টেলিফোন করার জন্যে। সেদিন ফাতিমা-যায়েদের বিয়েতে গিয়ে মুসলিম সেচ্ছাসেবী একটা গ্রুপের সাথে পরিচিতি হয়েছিল, যাদের সাথে ‘সাইমুমে’র সম্পর্ক আছে বলে তারা জানিয়েছিল। তাদের নাম্বারেই টেলিফোন করতে লাগল আহমদ মুসা।

উত্তেজনায় মিসেস লতিফা কামালের মুখ লাল হয়ে উঠেছে। বলছিল সে, আমার গয়না আছে ব্যাংকের লকারে। সে জন্যই লকার খুলতে গিয়েছিলাম। গত ছয়মাসের মধ্যে লকার খুলিনি। শুধুমাত্র কামাল ও আমিই এই লকার খুলতে পারি। গত ছয়মাসে কামালেই কয়েকবার লকার খুলেছে। আমার যাওয়ার প্রয়োজন হয়নি।

বলে একটু দম নিয়ে আবার শুরু করল মিসেস লতিফা কামাল, আজ গিয়ে লকার খুলে গহনা অন্যান্য ফ্যামিলী ডকুমেনেটর সাথে ছোট ও সুদৃশ্য একটা প্লাস্টিক ব্যাগ দেখতে পেলাম। দেখে বিস্মিত হলাম এ ধরনের ব্যাগ আমাদের লকারে ছিল না। তাহলে কি কামাল পরে রেখেছে?

মনে প্রশ্ন জাগায় নতুন ব্যাগটাই প্রথমে খুললাম। খুলে দেখলাম ব্যাগে রয়েছে কতগুলো কাগজ পত্র এবং তার সাথে ডজন খানেকর মত ডিস্ক। আমি একটা কাগজ হাতে নিয়ে তাতে চোখ বুলালাম। দেখলাম, ওটা স্পুটনিকের একটা অনুসন্ধান রিপোর্ট। আরেকটা কাগজেও দেখলাম তাই। বুঝলাম কাগজপত্র ও ডিস্ক সবগুলোই স্পুটনিক সম্পর্কিত। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। মনে হলো, এই ডকুমেন্টগুলোই শয়তানরা খুঁজছে। এগুলোর সন্ধানেই তারা আমাদের বাড়ি এবং আত্মী-স্বজনের বাড়ি পর্যন্ত তছনছ করেছে। ভয়ে আমি কাঁপতে লাগলাম। তাড়াতাড়ি ব্যাগ বন্ধ করে লকার লক করে আমি চলে এসেছি।' থামল মিসেস লতিফা কামাল।

লতিফার পাশেই বসে ফাতিমা। তাদের সামনের সোফায় পাশা-পাশি বসে আহমদ মুসা ও যায়েদ।

আহমদ মুসার চোখ-মুখ আনন্দে উজ্জল হয়ে উঠেছে। বলল আহমদ মুসা দ্রুতকন্ঠে, 'ওটা কোন ব্যাংকে?

'আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক।' মিসেস লতিফা কামাল বলল। 'গুড। ম্যানেজার কে জানেন? জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

'জি। মিঃ কার্টার জুনিয়র।' বলল মিসেস কামাল।

‘মিঃ জন কার্টার জুনিয়র? জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘জি, পুরো নাম মি. জন র্কাটার জুনিয়র।’

‘আল হামদুলিল্লাহ। লোকটা ভাল। এর আগে তিনি একবার প্যারিসে ছিলেন।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ভাইয়া, লকারের খোঁজ কিন্তু ওরা পেয়ে যাবে। সরিয়ে নেয়াই কি নিরাপদ নয়? বলল ফাতিমা।

‘কিন্তু আমি মনে করি, লকারটাই এখন বেশি নিরাপদ। আমেরিকান ব্যাংকের সিস্টেম ভাল। তার উপর ম্যানেজার খুব ভাল লোক। তার উপর ইহুদীদের কোন চাপ পড়বে না। আমাদের কোন বাড়িই এখন নিরাপদ নেই।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ডুপ্লিকেট করে এক সেট অন্য কোথাও রাখলে ভালো হয় না।’ বলল যায়েদ।

‘তা করা যায়। কিন্তু ডকুমেন্ট নিয়ে আমাদের কেউ মুভ করা ঠিক হবে কিনা ভাব বার বিষয়। তবে সুযোগ পেলে ডুপ্লিকিট করা যায়। ঠিক আছে, দেখা যাক অবস্থা কি দাঁড়ায়।’ আহমদ মুসা বলল।

‘যাই হোক, ডকুমেন্টগুলো আপনার একবার পড়া প্রয়োজন।’ বলল ফাতিমা।

‘এখন এ দিক চিন্তা করছি না ফাতিমা। এখন প্রথম কাজ গুলাগ অভিযান, কামাল সুলাইমানদের উদ্ধার। এরপর শুরু হবে ইনশাআল্লাহ টুইন টাওয়ার ধ্বংসের রহস্য উদ্ধার।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তাহলে ডকুমেন্টগুলো লকারেই থাকছে? প্রশ্ন করল মিসেস কামাল।

‘হ্যাঁ। ডুপ্লিকেট যদি করা যায়, সেটা বাইরে রাখা যাবে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ঠিক আছে। তাই হবে মি. আহমদ মুসা।’ বলল মিসেস কামাল।

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল। এ সময়ে যায়েদ ফিরে এল। সে বারান্দায় উঠে গিয়েছিল। এসে আহমদ মুসাকে বলল, ‘ভাইয়া একটা ট্যাক্সি এদিকে মুখ করে সেই আপনি আসার সময় থেকে দাঁড়িয়ে আছে।

‘ঠিক আছে আমি উঠছি। দেখবো আমি। তোমরা পরে যাবে।

বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘আসি মিসেস কামাল।’

‘ভাইয়া প্রফেসর সাইমন কি প্যারিসে পৌছেছে?’ বলল ফাতিমা।

‘হ্যাঁ, বুমেদীন বিল্লাহ পৌছে টেলিফোন করেছিল।’

বলে আহমদ মুসা হাতের ব্যাগটা তুলে নিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেল।

কিছুক্ষন পরে বেরিয়ে এল কাঁচা-পাকা দাড়ি-চুলওয়ালা প্রৌঢ় সেজে।

পরনে ফুলপ্যান্ট জ্যাকেটের পরিবর্তে লুজ সার্ট ও ট্রাউজার।

যায়েদরা সবাই হেসে উঠল। মিসেস কামাল বলল, আমার আগে জানা না থাকলে আমারই চিৎকার করে ওঠার দশা হত।

‘ধন্যবাদ সকলকে। আসসালামু আলাইকুম।’ বলে আহমদ মুসা বেরিয়ে গেল।

আহমদ মুসা বাড়ি থেকে বেড়িয়ে ধীরে ধীরে এগুলো ট্যাক্সিটার দিকে।

নিকটবর্তী হলো সে ট্যাক্সিটার।

ট্যাক্সি ড্রাইভার লোকটি গাড়ির দরজা খুলে ড্রাইভিং সিটকে ইজি চেয়ারে পরিনত করে মিসেস কামালের বাড়ির দিকে তাকিয়ে বসেছিল। প্রৌঢ় বয়সী আহমদ মুসার দিকে তাকাবার প্রয়োজনই বোধ করেনি লোকটা।

আহমদ মুসা গাড়ির কাছে চলে এসেছে।

হঠাৎ একটা কুকুর লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে প্রচন্ড গর্জন করে ঝাঁপিয়ে পড়ল আহমদ মুসার উপর।

ঘটনাটি আহমদ মুসার জন্য অকল্পনীয় ছিল।

শেষ মূহূর্তে আহমদ মুসা তার মাথা লক্ষ্যে ছুটে আসা কুকুরকে মাথার কাপড় ধরা দেয়ার জন্যে বাম বাহুকে লাঠির মত শক্ত করে সামনে বাড়িয়ে দিল এবং ডান হাতটি প্রবেশ করল পকেটে রিভলবার বের করার জন্যে।

উড়ে আসা চলন্ত কুকুর হাতের সাথে ধাক্কা খেয়ে হাতটা কামড়ে মাটিতে পড়ে গেল। বাহুর যেটুকু অংশ কুকুরটি কামড়ে ধরেছিল তা ছিঁড়ে নিয়ে গেল।

আহমদ মুসার ডান হাত তখন বেরিয়ে এসেছে রিভলবার নিয়ে।

মাটিতে পড়ে যাওয়ার সংগে সংগেই আবার কুকুরটি উঠে দাঁড়িয়েছিল এবং নতুন করে আক্রমনের জন্য সামনের দু'পা উপরে তুলে পেছনের দু'পায়ের উপর ভর দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল।

আহমদ মুসার ডান হাতের তর্জনি ট্রিগার টিপতে একটুও দেরী করেনি। বুলেট ছুটে গিয়ে কুকুরটির বুক এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল।

কুকুরটির দেহটা উল্টে আছড়ে পড়ে গেল মাটিতে।

আহমদ মুসা গুলী করেই তাকাল গাড়ির সিটে বসা লোকটির দিকে। দেখল, লোকটির ডান হাত বেড়িয়ে আসছে কোটের পকেট থেকে। হাতে রিভলবার।

আহমদ মুসা চোখ লোকটির দিকে ঘুরে যাবার সাথে সাথেই আহমদ মুসার হাতের রিভলবারও ঘুরে গিয়েছিল লোকটির দিকে।

আহমদ মসার তর্জনি চেপে বসল রিভলবারের ট্রিগারে। একটা গুলী ছুটে গিয়ে কুকুরটির মতই এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল লোকটি বুক।

গাড়ির দরজা খোলাই ছিল।

আহমদ মুসা কয়েক ধাপ এগিয়ে গিয়ে লোকটিকে টেনে সিট থেকে মাটিতে নামিয়ে গাড়ির ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল আহমদ মুসা।

দ্রুত পকেট থেকে রুমাল বের করে বাম বাহুর রক্তক্ষরণরত আহত স্থানটা ডান হাত ও দাঁতের সাহায্যে বেঁধে গাড়ি স্টার্ট দিল।

চারিদিকে চেয়ে দেখল আশে-পাশে কেউ নেই। রাস্তার বাম পাশে দু'তলার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দু'জন লোক এদিকে তাকিয়ে আছে। আর সামনে রাস্তার ডান পাশে মিসেস লতিফা কামালের বাড়ির ব্যালকনিতে ওদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে।

আহমদ মুসা খুশি হলো। অল্পক্ষনের মধ্যেই এখানে পুলিশ আসবে এবং খোজ-খবর নিয়ে জানতে পারবে যে, একজন দাড়িওয়ালা প্রৌঢ় লোককে একটি কুকুর আক্রমন করে কামড়ে ধরেছিলো। লোকটি কুকুর ও কুকুরের মালিক গাড়িওয়ালাকে হত্যা করে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে গেছে।

আনন্দিত হবার সাথে সাথে চিন্তিতও হলো সে। আহমদ মুসার কোন সন্দেহ নেই যে, কুকুরটিকে শিখিয়ে পড়িয়ে আনা হয়েছিল আহমদ মুসাকে ধরার জন্যেই এবং কুকুর তাকে ঠিকেই চিনেছিল। আজর ওয়াইজম্যানরা যে সাংঘাতিক বেপরোয়া হয়ে উঠেছে আহমদ মুসাকে ধরার জন্যে কুকুরের ব্যাবহার এরই একটা প্রমাণ। এই ঘটনার তার গায়ে আরও আগুন ধরবে। মিসেস লতিফা কামালের এ বাড়িটা ছেড়ে দেয়া দরকার, ভাবল আহমদ মুসা। হিংসায় অন্ধ হয়ে আজর ওয়াইজম্যানরা কিছু ঘটিয়ে ফেলতে পারে।

এক সময় গাড়ির স্টিয়ারিং হুইললের নীচে তাকাতেই একটা মানিব্যাগ চোখে পড়ল আহমদ মুসার। ভাবল, গুলীতে যে মারা গেছে মানিব্যাগটা সে লোকের হতে পারে। মানিব্যাগটা তুলে নিলো আহমদ মুসা।

মানিব্যাগে দেখল কয়েকশ ডলারের নোট, ২টি নেম কার্ড এবং একটি চিঠি পর্তুগীজ ভাষায়। পর্তুগীজ ভাষা আহমদ মুসা জানে না বিধায় চিঠির সে কিছুই বুঝতে পারল না। কার্ডের দিকে মনোযোগ দিল। চমকে উঠল আহমদ মুসা। কার্ডটিতে ঠিকানার বটমে লেখা রয়েছে 'আজোরস দ্বীপপুঞ্জ'। আজোরস দ্বীপপুঞ্জের নাম পড়েই কার্ডের অবশিষ্টটুকু গোগ্রাসে পড়ল আহমদ মুসা। কার্ডের নামটি হলো, 'এ্যানটিনিও সোরেস।' পরিচয় হিসাবে লেখা 'ব্যাবসায়ী ও সমাজকর্মী'। আর ঠিকানা, '১১, গনজালো রোড, হরতা, সাও জর্জ, আজোরস। আকাশের চাঁদ হতে পাওয়ার মতই খুশি হলো আহমদ মুসা। ঠিকানা পেয়ে। চিঠি দিয়ে কার্ডটা মুড়িয়ে কার্ডটা পকেটে রেখে দিতে দিতে আহমদ মুসা ভাবল, প্রথম সুযোগেই চিঠিটা কারও কাছ থেকে পড়ে নিতে হবে। এই চিন্তার রেশ ধরেই আহমদ মুসা ভাবতে লাগল, কে এই এ্যনটিনিও? চিঠিটাও তার হবার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু এসব এই সন্ত্রাসীর কাছে কেন? এ্যনটিনিও কি এদের দলের? এমন হাজারো চিন্তা এসে ঘিরে ধরল আহমদ মুসাকে। গাড়ি চলছে আহমদ মুসার। ফোটা ফোটা রক্ত ঝরছে আহমদ মুসার আহত বাম বাহু থেকে।

# ৭

আন্তর্জাতিক পুলিশ ইন্টারপোলে'র ইউরোপীয় সদর দফতর প্যারিসে ইউরোপীয় 'ইন্টারপোল' বৈঠক। এ বৈঠকে ইন্টারপোলের ইউরোপীয় কমিটি ছাড়াও ফ্রান্স সহ কয়েকটি দেশের পুলশ প্রধানও হাজির।

বৈঠকে স্বাগতিক দেশের পুলিশ প্রধান মিঃ মিতেরাঁ তার স্বাগতিক বক্ত্যবে এজেন্ডার উপর ব্রিফিং দিচ্ছিলেন। বলছিলেন, 'ইন্টারপোলকে ধন্যবাদ যে, আমাদের আবেদনে বিশেষ এক এজেন্ডার উপর আলোচনা করতে রাজি হয়েছে।'

এজেন্ডার বিষয়ে আমার প্রথমিক বক্তব্য হলো, আপনারাও কিছুটা হলেও স্ট্রাসবার্গের দুটি ঘটনা সম্পর্কে জেনেছেন। এ দুই ঘটনার একটি ঘটনা ঘটে গেছে, আরেকটি ঘটতে চলছে। কিছুদিন আগে ইউরোপের বিখ্যাত একটা অনুসন্ধানী সংস্থা স্পুটনিককে সমূলে ধবংস করা হয়েছে এবং এর ৭ জন কর্মকর্তাকে অপহরণ করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এতই নিপুন ভাবে কাজটা করা হয়েছে যে, কোন ক্লুই পাওয়া যায়নি সামনে এগুবার। তার ফলেই গত কয়েক মাসে এর তদন্তে কোন অগ্রগতি হয়নি। কিন্তু গত এক পক্ষকালে ঐ স্ট্রাসবার্গেই কিছু ঘটনা ঘটেছে যার সাথে স্পুটনিক ধবংসের ঘটনা সম্পর্কিত হয়ে পড়েছে। স্ট্রাসবার্গের শার্লেম্যান রোডের ৫ নং বাড়ি থেকে ১৪টি লাশ ও দু'টি কম্পিউটার পাওয়া গেছে। এ সম্পকির্ত খবর পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, আপনারা দেখেছেন। তবে রিপোর্টে অনেক কিছুই ছাপা হয়নি।

ঐ রিপোর্ট ও আমাদের অনুসন্ধান থেকে জানা গেছে 'ওয়ার্ল্ড ফ্রিডম আর্মি' নামে একটা ইহুদী সংস্থা সুপরিকল্পিতভাবে স্পুটনিক ধ্বংসের ঘটনা ঘটিয়েছে এবং কম্পিউটার থেকে আরও তথ্য পাওয়া যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।' থামল ফ্রান্সের পুলিশ প্রধান।

পুলিশ প্রধান থামতেই ইন্টারপোলের প্রধান জর্জ জ্যাকব বিরক্তির স্বরে বলে উঠল, মিঃ মিতেরাঁ কম্পিউটার থেকে পাওয়া কোন তথ্য দলিল নয়। কম্পিউটারে যে কেউ যে কোন জিনিস ঢুকিয়ে দিতে পারে।

আপনি বলুন, স্ট্রাবার্গে এ পর্যন্ত দেড় ডজনের ও বেশি লোক খুন হয়েছে। এই খুনগুলো কে করলো? যারা এই খুনগুলো করতে পারে, তারা কম্পিউটারে কোন তথ্য ঢুকিয়ে দিতে পারে।'

'মি.জ্যাকব, যারা খুন হয়েছে তারা সকলেই এক দলের লোক এবং এরা আক্রমনকারী হিসাবে খুন হয়েছে।' বলল ফ্রান্সের পুলিশ প্রধান।

'কাকে এবং কেন তারা আক্রমন করতে গিয়েছিল? যাকে তারা আক্রমন করতে গিয়েছিল সেই কালপ্রিটকে আপনারা বের করার কি চেষ্টা করেছেন? সে কি করছে ফ্রান্সে, তা কি সন্ধান করেছেন? মাফ করবেন, আমার মনে হয় ফ্রান্সের পুলিশের মধ্যে নাজী পন্থী না হলেও এ্যান্টি সেমেটিক প্রবনতার বিস্তার ঘটেছে।' বলল ইনটারপোলের প্রধান স্পষ্ট ও দৃঢ় কন্ঠে।

ফ্রান্সের পুলিশ প্রধানের মিতেরাঁর মুখ লাল হয়ে উঠেছে। বলল, 'সব জাতির মধ্যেই ক্রিমিনাল আছে, ক্রিমিনাল গ্রুপ আছে। তেমনি ইহুদীবাদীদের মধ্যেও ক্রিমিনাল গ্রুপ থাকতে পারে। কিন্তু তারা কোন অপরাধে জড়িত হবার ঘটনা ঘটলেই একথা বলা অভ্যাসে পরিনত হয়েছে যে, এটা এ্যান্টি - সেমেটিকদের ষড়যন্ত্র। আপনাদের সবার কাছে ফাইল দেয়া হয়েছে। ফাইলই সুস্পষ্টভাবে প্রমান করছে, ওয়ার্ল্ড ফ্রিডম আর্মি বিরুদ্ধে অভিযোগ এ্যান্টি সেমেটিক কোন ষড়যন্ত্র নয়।' থামল মিতেরাঁ।

সংগে সংগেই বলে উঠল ইন্টারপোলের প্রধান জ্যাকব, 'ফাইল দেখেছি। প্রমাণগুলো সবই অবস্থাগত এবং কম্পিউটার রেকর্ড ভিত্তিক। যারা মারা গেছে, তারা সবাই একদলের বলা হচ্ছে এবং রেসিয়াল টেষ্টেও প্রমান করছে তারা সবাই ইহুদী। সবগুলো হত্যাকান্ড ঘটেছে আহমদ মুসার দ্বারা, সেটা যে পরিস্থিতিতেই হোক। প্রতিপক্ষ এখানে আহমদ মুসা। নিছক কম্পিউটারে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে স্ট্রাসবার্গের সাম্প্রতিক কয়েকটা ঘটনাকে স্পুটনিকের সাথে জুড়ে দেয়া ঠিক হবে না। বিষয়টাকে আহমদ মুসার সাথে সংঘাত হিসাবে দেখতে হবে।'

ইন্টারপোল প্রধান জ্যাকব থামতেই বৈঠকে উপস্থিত অনেকেই এক সাথে বলে উঠল, 'সন্দেহাতীত আরও প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত মাঝামাঝি এই সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত হবে।'

সংগে সংগেই ফরাসী পুলিশ প্রধান বলে উঠল, 'আমি দুঃখিত যে, আপনাদের এই মতের সাথে আমি একমত হতে পারলাম না। ফরাসী পুলিশ মনে করে, স্পুটনিকের ঘটনার সাথে স্ট্রাসবার্গের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো গভীর ভাবে সম্পর্কিত। স্পুটনিকের অপহৃতদের আত্মীয় স্বজনের পক্ষ থেকেই আহমদ মুসা স্পুটনিক ধবংসের ঘটনা নিয়ে কাজ করছে। সুতরাং আহমদ মুসার সাথে ওয়ার্ল্ড ফ্রিডম আর্মীর সংঘাতকে বিচ্ছিন্ন বলে চলাবার কোন যুক্তি নেই। তাছাড়া আহমদ মুসা কাজ শুরু করার পর স্পুটনিকের ঘটনায় অপহৃত ৭ জনের আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব সবার বাসা তছনছ হয়েছে। আহমদ মুসার উপর বার বার আক্রমনকারী ওয়ার্ল্ড ফ্রিডম আর্মীই যে এই তছনছের কাজ করেছে এতে আমাদের পুলিশের কোন সন্দেহ নেই। স্পুটনিকের সাথে সম্পর্কিত লোকদের বাসাবাড়ির উপর তারা চোখ রাখছে এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য। সর্বশেষ হত্যাকান্ডের ঘটনা ঘটে স্পুটনিকের প্রধান গোয়েন্দা কামাল সুলাইমানের বাড়ির সামনে। প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য অনুসারে কামাল সুলাইমানের বাড়ি থেকে একজন লোক বেরিয়ে এলে তার উপর আক্রমন চালানো হয়। কিন্তু সংঘর্ষে আক্রমনকারী লোকটি এবং তার কুকুর মারা যায়। যে লোকটি মারা যায় সে ওয়ার্ল্ড ফ্রিডম আর্মীর সদস্য। সুতরাং আহমদ মুসাকে এবং স্ট্রাবার্গের সাম্প্রতিক ঘটনাকে স্পুটনিকের ঘটনা থেকে বিচ্ছিন্ন করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। এই বাস্তবতাকেই যদি ইন্টারপোল অস্বীকার করে তাহলে তাদের সাহায্য আমরা পাব কি করে? আমরা ইন্টারপোলের সাহায্য এই জন্যই চেয়েছিলাম যে, স্পুটনিক যারা ধবংস করেছে এবং এর লোকদের যারা কিডন্যাপ করেছে, তারা ফ্রান্সে সীমাবদ্ধ নয়। আমদের নিশ্চিত বিশ্বাস স্পুটনিকের লোকদের আটকেও রেখেছে ফ্রান্সের বাইরে। এদিক থেকেই ইন্টারপোলের সাহায্য আমাদের প্রয়োজন ছিলো।' বলল ফ্রান্সের পুলিশ প্রধান মিঃ মিতেরাঁ।

ইন্টারপোলের বৃটিশ প্রতিনিধি মিঃ উইলসন বলল, 'আমি মিঃ মিতেরাঁর যুক্তিকে সমর্থন করছি। স্পুটনিক ও স্ট্রাবার্গের সাম্প্রতিক ঘটনা বিচ্ছিন্ন নয়। ফ্রান্সকে এই ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্যও করা উচিত। তবে একটা কথা। ফ্রান্সের জামাই আহমদ মুসার প্রতি ফ্রান্সের দুর্বলতার অর্থ আমরা বুঝতে পারছি। কিন্তু ইহুদীদের প্রতি মিতেরাঁ এত কঠোর হয়ে উঠলেন কেন?

আবার মিতেরাঁ বলে উঠল, 'স্পুটনিকের মত কোন কিছু ধবংসের ঘটনা যদি ওয়ার্ল্ড ফ্রিডম আর্মী বৃটেনে ঘটাত, তাহলে মিঃ উইলসন আমার চেয়েও কঠোর হতেন আমি হলফ করে বলতে পারি।'

এইভাবে আলোচনা চলল।

দীর্ঘ আলোচনার পর বৈঠক তিনটি সিদ্ধান্তে উপনীত হলোঃ এক, বিশ্ব মুক্তি সেনা বা ওয়ার্ল্ড ফ্রিডম আর্মীকে (WFA) স্ট্রাসবার্গের ঘটনাবলীর জন্য দায়ী বলে প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করা হলো, তবে এই সংস্থাকে ইহুদী সংগঠন হিসাবে প্রকাশ করা হবে না, দুই, ঘটনার সাথে

'ওয়ার্ল্ড ফ্রিডম আর্মী' (WFA) জড়িত থাকা সম্পর্কে ফ্রান্সকে আরও প্রত্যক্ষ প্রমান সংগ্রহ করতে হবে এবং তিন, ইন্টারপোল ফ্রান্সকে সব রকম সহযোগিতা করবে।

বৈঠক থেকে বেরিয়ে যাবার সময় মিতেরাঁ, উইলসান এবং জার্মান পুলিশ প্রধান ভন ক্রয়েগার এক সাথে হাঁটছিল। ফ্রান্সের পুলিশ প্রধান মিতেরাঁ বলল, 'ইহুদীবাদীদের এ ধরনের পাপকে আর কতদিন আমরা ঢেকে রাখব? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী বিশেষ করে বিজ্ঞানী জন জ্যাকব ও জেনারেলে শ্যারণদের অপকীর্তি থেকে কি আমরা শিক্ষা গ্রহন করবো না?

বৃটিশ পুলিশ প্রধান জর্জ উইলসনের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, 'মিটিং এ অনেক সময়েই পোষাকী কথা বলতে হয়। কিন্তু ফ্যক্ট হলো আমাদের প্রশ্রয় কিন্তু ইহুদীদের আরও ক্রিমিনাল বানাচ্ছে এবং এর মাধ্যমে তাদেরই ক্ষতি করছি আমরা।'

উইলসন থামতেই ভন ক্রয়েগার বলে উঠল, 'এর পরিনতি হতে পারে ভয়ংকর। 'নাজী'রা হয়তো কোনদিনই আর ফিরবে না। কিন্তু 'নাজী'দের ভাইয়েরা তো ফিরতে পারে।'

'সাংঘাতিক কথা বলছেন মিঃ ক্রয়েগার।' বলে উঠল জর্জ উইলসন।

কিছু বলতে যাচ্ছিল ভন ক্রয়েগার। কিন্তু বলা হলো না ইনটারপোল প্রধান মিঃ জন জ্যাকব তাদের মধ্যে এসে পড়ায়।

কথার প্রসংগ পাল্টাল ভন ক্রয়েগার।

হাঁটতে লাগল চারজন।

টেলিফোন ধরে ওপারের কথা শুনেই চমকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াল ফাতিমা। বলল, এক্সেলেন্সি, প্লিজ হোল্ড করুন। উনি আছেন, ওনাকে দিচ্ছি আমি।

বলে ফাতিমা মহাব্যস্ত হয়ে টেলিফোটা আহমদ মুসার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল, 'ভাইয়া ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্টের টেলিফোন।'

হাঁ ফাতিমা গলা শুনেই বুঝতে পেরেছি।' বলে আহমদ মুসা টেলিফোন সেট সামনে টেনে নিল। আহমদ মুসা সালাম দিয়ে কথা বলা শুরু করল। বলল, 'মাহমুদ কেমন আছ?'

'ভাল ভাইয়া। আপনি কেমন আছেন? কতদিন পর আপনার সাথে কথা বলছি।' ওপার থেকে বলল ফিলিস্তিন প্রেসিডেন্ট মাহমুদ।

'তুমি খুব ব্যাস্ত, তা আমি জানি।' বলল আহমদ মুসা।

'আমার প্রতি অবিচার করবেন না ভাইয়া। আমার কিছু ব্যাস্ততা আছে এ কথা ঠিক, কিন্তু আপনাকে খুঁজে পাওয়াই আমাদের জন্য কঠিন হয়ে যায়।' বলল মাহমুদ।

‘তুমি ঠিক বলেছ মাহমুদ। অবস্থার কারণে সব খবর তোমাদের আমি সব সময় জানাতে পারি না। যাক, এসব কথা। তোমার স্ত্রী এমিলিয়ার কাছে সব শুনেছি। এখন বল, হাসান তারিক কোথায়? বলল আহমদ মুসা।

‘আমার পাশে বসে আছে ভাইয়া। তাকে টেলিফোন দেব, তার আগে বলুন, আপনার ডাক পাবার এই সৌভাগ্য হাসান তারিকের কেন হলো? বলল মাহমুদ।

‘এটা সৌভাগ্য নয় মাহমুদ, দুর্ভাগ্য। কঠিন এক অভিজানে ওকে সাথী করতে চাচ্ছি। কিছু দিনের জন্য ওকে সকল সুখ কোরবানি দিতে হবে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কোরবানির সুযোগ তো মুসলমানদের জন্য সৌভাগ্যের ভাইয়া? বলল মাহমুদ।

‘এটা হাসান তারিকই বলুক।’ হেসে বলল আহমদ মুসা।

পরক্ষণেই টেলিফোনে হাসান তারিকের কন্ঠ শোনা গেল। বলল ‘আমার উপর আপনার এই রাগের কারন কি ভাইয়া?’

‘রাগ কোথায় দেখলে?’ আহমদ মুসা বলল।

‘এই যে আপনি বললেন কোরবানী আমি দিতে পারব কিনা তা আমাকেই বলতে হবে। এটা তো অনাস্থা অথবা রাগের কথা ভাইয়া।’ বলল হাসান তারিক।

আহমদ মুসা হাসল। তারপর গম্ভীর হয়ে উঠল তার মুখ।

বলল, ‘হাসান তারিক তোমার উপর খুব রাগ, খুব অবিশ্বাস তো, তাই কঠিন এক অভিযানে সাথি হবার জন্যে তোমাকেই স্মরণ করছি।’

‘আমার সৌভাগ্য ভাইয়া যে, আপনি আমাকে এত ভালবাসেন।’ বলতে বলতে কেঁদে ফেলল হাসান তারিক।

‘তোমার আবেগ দেখি আগের মতই আছে। মুছে ফেল চোখের পানি। বল, আয়েশা আলিয়েভা কেমন আছে?’ বলল আহমদ মুসা।

‘ভাল। আমি যাচ্ছি শুনলে সে কিন্তু পিছু নেবে। আপনার হুকুমই শুধু তাকে থামাতে পারে। ‘হাসান তারিক বলল।

‘সে আমি দেখব। তুমি তৈরী হও আসার জন্য।’ আহমদ মুসা বলল।

‘শোনা কি যাবে অভিযানটা কোথায়? বলল হাসান তারিক।

‘বলা গেলে শুরুতেই বলতাম।’ আহমদ মুসা বলল।

‘স্যরি ভাইয়া।’ বলল হাসান তারিক।

‘ধন্যবাদ হাসান তারিক। এখন রাখি।’ বলে, সালাম দিয়ে আহমদ মুসা টেলিফোটা রেখে দিল।

ড্রইংরুমে যায়েদ, ফতিমা ও লতিফা কামাল উদগ্রীব হয়ে শুনছিল আহমদ মুসাদের কথা-বার্তা।

আহমদ মুসা টেলিফোন রাখতেই ফাতিমা বলে উঠল, ‘আপনি কোন অভিযানে মানে কোথাও যাচ্ছেন ভাইয়া?

আহমদম মুসা তাকাল যায়েদ ও ফাতিমার দিকে। বলল, ‘হ্যাঁ বোন এবার যেতে হবে ‘সাও তোরাহ’ দ্বীপে।’

মলিন হয়ে উঠল যায়েদ, ফাতিমা ও লতিফা কামালের মুখ। ফাতিমাই আবার বলল, সেদিন প্রফেসর জ্যাক সাইমনের কাছে সাও তোরাহ দ্বীপের যে পরিচয় শুনেছি, তাতে আমার মনে হয়েছে ওটা রূপকথার এক দানবীয় দ্বীপ। ওখানে যেতে হলে সৈন্য-সেনাপতি দরকার। আপনি সত্যিই সেখানে যাবেন ভাইয়া? ভারি কন্ঠ ফাতিমার।

আহমদ মুসা ম্লান হাসল। বলল, ‘ওটা রূপকথার দ্বীপ নয় ফাতিমা, আটলান্টিকের বুকের এক বাস্তব সত্য। আর ওটা দানবীয় দ্বীপ নয়, আমার অনুমান সত্য হলে ওটা কিছু অমানুষের অক্টোপাশে বাঁধা একটা অশ্রুর দ্বীপ, এক ‘নিউ গুলাগ’। ওখানে যেতে সৈন্য-সেনাপতির দরকার নেই, দরকার শুধু মানুষের প্রতি মমতার অস্ত্র।’

‘আপনি কি নিশ্চিত ভাই সাহেব, ওখানেই কামাল সুলাইমানদের রাখা হয়েছে? বলল মিসেস লতিফা কামাল।

‘কম্পিউটারের ডকুমেন্টগুলো পাওয়ার পর আমি নিশ্চিত হয়েছি, সাও তোরাহ দ্বীপেই বন্দীদের রাখা হয়েছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তাই যদি হয়, তাহলে পুলিশ ও সরকারকে বলতে পারি এবং সরকার দ্রুত তাদের উদ্ধারের ব্যাবস্থা করতে পারে।’ বলল লতিফা কামাল।

'যে কম্পিউটার থেকে আমরা তথ্য পেয়েছি সে কম্পিউটার এখন পুলিশের হাতে। পুলিশ তাদের প্রেস ব্রিফিংকালে সাও তোরাহ দ্বীপের কথা গোপন করেছে। এটা দুই কারণে হতে পারে, এক, কৌশলগত কারণে পুলিশ এটা প্রকাশ করেনি। দুই, পুলিশ উদ্দেশ্যমূলকভাবেই এই তথ্যটা গায়েব করেছে। আমার যতদুর মনে হচ্ছে পুলিশকে দিয়ে এটা গায়েব করানো হয়েছে। কারণ পুলিশ সাও তোরাহ দ্বীপের ব্যাপারে কোন এ্যাকশনে যাবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এই অবস্থায় সাও তোরাহ দ্বীপের সন্ধান যদি পুলিশকে বা সরকারকে দেয়া হয়, তাহলে এ খবর সংগে সংগেই শত্রুদের কানে পৌছে যাবে এবং শত্রুরা যখনই জানবে, সাও তোরাহ দ্বীপের কথা ফাঁস হয়ে গেছে, সংগে সংগেই বন্দীদেরকে ওরা সাও তোরাহ দ্বীপ থেকে অন্য কোথাও সরিয়ে নিতে পারে, এমনকি হত্যাও করে ফেলতে পারে।'

আহমদ মুসার শেষ কথায় ভীষন কেঁপে উঠেছে মিসেস লতিফা কামাল, ফাতিমা ও যায়েদ। তাদের সবার মুখ পাংশু হয়ে গেছে। মিসেস কামাল আর্তকন্ঠে বলে উঠল, 'ভাই সাহেব আমি আমার কথা প্রত্যাহার করছি।

সরকার কিংবা পুলিশকে জানানোর দরকার নেই।'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'তাহলেই দেখুন, আমাদের সেখানে যাওয়ার কোন বিকল্প নেই।' আহমদ মুসা থামল।

তিনজনের কেউ কোন কথা বলল না।

কিছুক্ষণ পর যায়েদ ধীরে ধীরে বলল, 'ভাইয়া আমরা সেখানে যেতে পারি না? আমরা একসাথে যাতে আপনার সংগে কাজ করতে পারি, এ জন্যেই তো আপনি বিয়ে করিয়েছেন।'

'না যায়েদ, এই অভিযান ফাতিমার জন্য উপযুক্ত নয়।' বলল আহমদ মুসা।

'ঠিক আছে তাহলে আমাকে নিন। তাহলে এই অভিযানে স্পুটনিক পরিবারের অংশ গ্রহণও থাকল।

'না যায়েদ ফাতিমা ও স্পুটনিক পরিবারের সাথে তুমি থাক।'

'বুঝেছি আমি যোগ্য নই।'

‘অযোগ্যতার কোন প্রশ্ন নেই যায়েদ। হাসান তারিক ছাড়াও ডজন ডজন যোগ্য সহকর্মী আছে যারা ডাক পেলেই ছুটে আসবে। তাদের বাদ দিয়ে আমি হাসান তারিককে নিচ্ছি কেন? নিচ্ছি এই কারণে যে, সে ইহুদীবাদী বিশেষজ্ঞ হওয়া ছাড়াও একজন মেরিন ইঞ্জিয়ার। এই অভিজানে যারা যাবে তাদের এই জ্ঞানের দরকার হবে।’ আহমদ মুসা বলল।

মাথা নিচু করল। কোন কথা বলল না যায়েদ।

মুখ তুলল মিসেস লতিফা কামাল। বলল, ‘আমি গর্বিত ভাই সাহেব আল্লাহ আপনার মত একজনকে মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। আপনাকে আমাদের বুক ভরা কৃতজ্ঞতা ও দোয়া ছাড়া দেবার কিছু নেই।’ শেষে কান্নায় রুদ্ধ হয়ে গেল লতিফা কামালের কন্ঠস্বর।

ফাতিমা কিছু বলতে যাচ্ছিল তার আগেই আহমদ মুসা হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দ্রুত বলে উঠল, ‘আমার খুব ক্ষুধা লেগেছে। অনেক্ষণ ধরে নাস্তা টেবিলে অপেক্ষা করছে। চলো উঠি। আমাকে এখনি একটু বাইরে বেরুতে হবে।’

বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

তার সাথে সাথে ফাতিমা, যায়েদ ও লতিফা কামালও উঠল।

লিবসন শহরতলীতে অন্ধকার ঘেরা আলোকজ্জ্বল এক বাড়ি। বাড়িটার ড্রইংরুমে বসে আছে লালমুখ দীর্ঘদেহী একজন মানুষ। তার চোখে-মুখে দারুন উত্তেজনা। বেশিক্ষণ সে বসে থাকতে পারছে না। উঠে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে ঘরময়। মাঝে মাঝেই তাকাচ্ছে টেলিফোনের দিকে, আবার ঘড়ির দিকেও। বুঝা যাচ্ছে আকাঙিখত একটা টেলিফোন কল সে পাচ্ছে না, অন্যদিকে সময় বয়ে যাচ্ছে।

লোকটির নাম মারিও জোসেফ। সে WFA এর লিসবন ষ্টেশন চীফ। সে এই মাত্র ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থা সুত্রে খবর পেয়েছে, দু’জন মুসলমান নাম ভাড়িয়ে দুটি পর্তুগীজ পাসপোর্ট জোগার করেছে এবং আজ রাত ১২টার দিকে

পর্তুগীজ ইয়ারে আজরস দ্বীপপুঞ্জের 'লেজে' এয়ারপোর্ট যাত্রা করছে। কোন নামে পাসপোর্ট কোন নামে টিকিট তার কিছুই জানা যায়নি। এই নাম জানার জন্যেই মারিও জোসেফ পাগল হয়ে উঠেছে। নাম জানলে তবেই তাদের আজোরস দ্বীপপুঞ্জে যাওয়া আটকানো যাবে।

ওয়ার্ল্ড ফ্রিডম আর্মি সম্প্রতি সিদ্ধান্ত নিয়েছে কোন মুসলমানকেই আজোরস দ্বীপপুঞ্জে যেতে দেয়া হবে না। এই সিদ্ধান্তের পর অনেকের যাত্রা তারা ঠেকিয়েছে। এ বিষয়টা ইতিমধ্যে মুসলমানদের মধ্যে জানা জানি হয়ে গেছে। এরপর মুসলমানরা নাম ভাঁড়িয়ে আজোরসে যাবার চেষ্টা করছে। এ ধরনেরই একটা চেষ্টার খবর আজ মারিও জোসেফ পেয়েছে। যে কোন মুল্যে তাকে এদের এই যাত্রা বন্ধ করতে হবে। না পারলে আজর ওয়াইজম্যানের ক্রোধের আগুনে জ্বলে পুড়ে মরতে হবে।

টেলিফোন বেজে উঠল মারিও জোসেফের। পায়চারি করছিল মারিও জোসেফ। দাঁড়িয়ে পড়ে দ্রুত গিয়ে টেলিফোনের ভয়েস বোতামে চাপ দিল। সংগে সংগে ওপার থেকে কন্ঠ ভেসে এল, মিঃ মারিও জোসেফ দুঃখিত, বহু চেষ্টা করেও লোক দু'জনের নাম পাওয়া গেল না। তবে এই টুকু জানা গেছে, আজ রাত ১২ টার প্লেনের টিকেট যারা কিনেছে তারা সবাই শ্বেতাংগ তিনজন ছাড়া। একজন তুর্কি চেহারার এশীয় দু'টি টিকিট কিনেছে এবং একজন আফ্রিকান কিনেছে একটি। লিসবনের হোটেল চেক করে আরেকটা বিষয় জানা গেছে, গত সাত দিনে মাত্র তুর্কি চেহারার বা এশীয় দু'জন লিসবনের হোটেলে উঠছে এবং এরা দু'জনেই ভাস্কোডাগামা শেরাটন হোটেলের ৭১১ ও ৭১২ নাম্বার কক্ষে রয়েছেন।

এক নাগাড়ে কথাগুলো বলে থামলো ওপারের কন্ঠটি। কন্ঠটি লিসবনের একজন শীর্ষ গোয়েন্দা অফিসারের।

'ধন্যবাদ মি. এ্যানটোনিও। নাম দিতেনা পারলেও যে তথ্য দিয়েছেন, সেটা কম মূল্যবান নয়। আবারও 'ধন্যবাদ আপনাকে।'

বলে টেলিফোন অফ করে দিল মারিও জোসেফ। তারপর সোফায় সোজা হয়ে বসেই ডাকল, 'সিলভা।'

কোমরে রিভলবার ঝুলানো ষ্টেনগানধারী একজন ঘরে প্রবেশ করল।

লোকটি প্রবেশ করতেই মারিও জোসেফ বলল, ‘সবাই কে তৈরী হতে বল। দুটি গাড়ি রেডি কর। এখনি যাব ভাস্কোডাগামা শেরাটনে।’ কথা শেষ করেই উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘যাও, আমি তৈরী হয়ে আসছি।’

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বাড়িটা থেকে দুটি গাড়ি বেরিয়ে এল। একটি জীপ, অন্যটি মাইক্রো। গাড়ি দু’টি ছুটছে হোটেল ভাস্কোডাগামা শেরাটন লক্ষ্যে।

পরবর্তী বই

# গুলাগ অভিযান

**কৃতজ্ঞতায়ঃ**

1. S A Mahmud
2. Arif Rahman
3. Rabiul Islam
4. A.S.M Masudul Alam

# সাইমুম-৩৬

# গুলাগ অভিযান

আবুল আসাদ

# ১

লিসবনের হোটেল ভাস্কোদাগামা।

পাশাপাশি দুটি কক্ষ।

৭১১ নং কক্ষে থাকে রবীন সিং রাফায়েল ওরফে আহমদ মুসা এবং ৭১২ নং কক্ষে থাকে লছমন লিওনার্দো ওরফে হাসান তারিক।

দুজন দুকক্ষে থাকলেও দুজনেই এখন আহমদ মুসার কক্ষে দুচেয়ারে বসে।

তাদের সামনে টেবিলে উচ্ছিষ্ট খাবার, কয়েক মিনিট আগে তারা খাবার শেষ করেছে।

দশটায় তাদের এয়ারপোর্টে পৌছতে হবে বলে খাবার খাওয়া তারা আগেই সেরে নিয়েছে। বেয়ারা এসে এখনো উচ্ছিষ্টগুলো নিয়ে যায়নি।

বেয়ারা এসে গেল।

উচ্ছিষ্ট খাবার আর বাসনপত্র গোছাতে গোছাতে বলল, ‘স্যার, আপনাদের পরিচিত কে একজন এসেছিল। আপনারা কক্ষে আছেন কিনা জিজ্ঞেস করল। কিন্তু আমি ‘আছেন’ বলার পর তারা ঘরে প্রবেশ না করে তাড়াতাড়ি চলে গেল।’

‘এটা তুমি কখনকার ঘটনা বলছ?’ জিজ্ঞেস করল রবীন সিং রাফায়েল ওরফে আহমদ মুসা।

‘এই তো স্যার ৫ মিনিটও হয়নি।’ বলল বেয়ারা।

‘কি রকম চেহারা বলত?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘বলা যায় পর্তুগীজ চেহারাই। তবে মুখ অপেক্ষাকৃত লাল। মোটামুটি লম্বা-চওড়া।’ বলল বেয়ারা।

আহমদ মুসা বেয়ারাকে বখশিশ দিয়ে বলল, ‘একটু দেখবে, তাকে দেখা যায় কিনা। পেলে নিয়ে আসবে।’

বেয়ারা চলে গেল।

বেয়ারা চলে যেতেই হাসান তারিক বলে উঠল, ‘আমি নিশ্চিত ভাইয়া, শত্রুরা আমাদের খোঁজ পেয়ে গেছে।’

‘তাইতো মনে হচ্ছে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘তাহলে?’

ভাবছিল আহমদ মুসা। বলল, ‘আমার মনে হয় ওরা লবীতে অপেক্ষা করছে। এমনও হতে পারে ওরা হোটেলের চারদিকেই পাহারায় আছে।’

‘দুজন মুসলমান আমরা, একথা তারা নিশ্চিত জানেন। তাই আমার মনে হয় মাত্র দুজন মুসলমানকে ধরার জন্যে ওদের এতকিছু করা স্বাভাবিক নয়।’ বলল হাসান তারিক।

‘তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু আমাদের ভাবতে হবে খারাপটার কথা।’ আহমদ মুসা বলল।

‘এখন তাহলে আমাদের কি করণীয়?’ বলল হাসান তারিক।

‘আমাদের করণীয় হলো আজোরস দ্বীপপুঞ্জে পৌছে যাওয়া। তার আগে কোন সংঘাতে জড়িয়ে না পড়া, যা আমাদের আজোরস যাত্রায় কোন বিঘ্ন ঘটাতে পারে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কিন্তু সংঘাত আসন্ন মনে হচ্ছে ভাইয়া।’ বলল হাসান তারিক।

‘দেখা যাক। তুমি রেডি তো এয়ারপোর্ট যাত্রার জন্যে?’

‘হ্যাঁ ভাইয়া। ব্যাগটা রেডি করে রেখেছি।’

‘ধন্যবাদ, তবে শুধু এয়ারপোর্ট যাওয়ার জন্যে রেডি নয়, লড়াইয়ের জন্যেও রেডি হবে। যাও, ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে এস। হোটেলের বিল পরিশোধ করে এসেছি। চেক আউটও হয়ে গেছে। আমি বেরুচ্ছি।’

হাসান তারিক উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘আসুন, আমিও বের হচ্ছি।’

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক দুজনেই করিডোরে বেরিয়ে এল। দুজনের হাতে দুটি ব্যাগ।

‘আমরা কি সোজা লবি হয়ে বের হবো ভাইয়া?’ হাসান তারিক বলল।

‘হ্যাঁ অবশ্যই।’ বলে লিফট রুমের দিকে হাঁটা শুরু করল আহমদ মুসা।

হাসান তারিকও তার পেছনে হাঁটা শুরু করল।

তারা দুজন যখন লিফটের সামনে এসে দাঁড়াল, ঠিক তখনি লিফট থেকে বেরিয়ে এল বেয়ারা সেই দুজন লোককে সাথে নিয়ে।

আহমদ মুসা অপরিচিত দুজনের দিকে একবার তাকিয়েই বুঝতে পারল, বেয়ারা ওয়ার্ল্ড ফ্রিডম আর্মির দুজন লোককে তাদেরই ঘরে নিয়ে আসছে।

বেয়ারার সাথে ছফুটের মত লম্বা ও জিমন্যাষ্টের মত স্বাস্থ্যের অধিকারী যে লোকটি আহমদ মুসার সন্ধানে হোটেলে ছুটে এসেছে তার নাম মারিও জোসেফ। আর তার সাথের লোকটি হলো, তার দক্ষিণ হস্ত, সেই সিলভা।

যাদেরকে আহমদ মুসা এড়াতে চাচ্ছে, তাদের একদম মুখোমুখি হয়েও আহমদ মুসার চোখে-মুখে চাঞ্চল্যের সামান্য ছায়াও পড়ল না।

হাসিমুখে সে বলল, ‘বেয়ারা, আমাদের খোঁজ করছিলেন যারা তাদেরকে কি পেলে?’

‘স্যার, এরাই তো তাঁরা, আপনাদের কাছে নিয়ে যাচ্ছিলাম।’ বলল বেয়ারা খুশি হয়ে দ্রুত কণ্ঠে।

বেয়ারার কথা শেষ হতেই আহমদ মুসা হ্যান্ডশেকের জন্যে নেতা গোছের লম্বা-চওড়াজন অর্থাৎ মারিও জোসেফের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, ‘ওয়েলকাম, আমি রবীন সিং রাফায়েল এবং আমার সাথি লছমন লিওনার্দো। আপনারা নাকি আমাদের খোঁজ করছিলেন?’

'আপনারা কি আজ রাত ১২টার প্লেনে আজোরাস যাচ্ছেন?' জিজ্ঞেস করল মারিও জোসেফ।

আহমদ মুসা একটুও ভ্রু কুচকালো না, মুখে সামান্য ভাঁজও পড়ল না। প্রশ্নের সংগে সংগেই সহজ ও সরল কণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ যাচ্ছি তো?'

মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল মারিও জোসেফের। বলল, 'আপনাদের দুজনকে আমাদের সাথে একটু যেতে হবে।'

'কোথায়?' আহমদ মুসার কণ্ঠে কৃত্রিম বিস্ময়ের সুর।

'আমাদের অফিসে।' বলল মারিও জোসেফ।

'আপনাদের পরিচয় কিন্তু দেননি।' আহমদ মুসা বলল।

'আমি এ্যান্টেনিও। লিসবনের এই অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত অফিসার আমি।' বলল মারিও জোসেফ।

এক কৌতুকের হাসি ফুটে উঠল আহমদ মুসার মুখে। বলল, 'এমন ক্ষেত্রে আপনার আইডেনটিটি কার্ড দেখিয়ে এ ধরনের কথা বলা উচিত। তা আপনি দেখাননি।'

'মাফ করবেন। আপনি সে ধরনের কেউকেটা নন বলেই দেখানো হয়নি। চলুন আপনারা।' বলল মারিও জোসেফ।

'যদি বলি যাব না আমরা। এক ঘন্টার মধ্যে আমাদের এয়ারপোর্টে পৌছতে হবে। আপনারা চাচ্ছেন প্লেনটা আমাদের ফেল হোক।' আহমদ মুসা বলল।

খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মারিও জোসেফের মুখ। বলল, 'ধন্যবাদ। আমাদের সন্দেহকে আপনারা সত্য প্রমাণ করেছেন। আপনারা যাবেন না আমরা জানতাম। এজন্যে নিয়ে যাবার সব ব্যবস্থাই করে এসেছি। হোটেল কর্তৃপক্ষও আমাদের সহযোগিতা করবেন। সুতরাং না গিয়ে আপনাদের উপায় নেই।' বলল কঠোর কণ্ঠে মারিও জোসেফ।

'সব বুঝলাম। কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না আমাদের কেন যেতে হবে? আমরা কি কোন অপরাধ করেছি?' বলল আহমদ মুসা। তার কণ্ঠে কৃত্রিম ক্ষুদ্ধতার সুর।

‘এটা হোটেল। এখানে আমরা সব কথার আসর বসাতে পারি না। অফিসে চলুন, সবই জানতে পারবেন।’ বলল এ্যান্টেনিও ছদ্মনামের মারিও জোসেফ।

আহমদ মুসা ভাবছিল। লোকটি যা বলেছে সব সত্যি। ওরা আট-ঘাট বেঁধেই এসেছে। আর এই হোটেলে ওদের সাথে লড়াইয়ে নামার মধ্যে কোন মংগল নেই। তাতে পর্তুগাল হয়ে আজোরাস যাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। পর্তুগালের পাসপোর্টে পর্তুগাল হয়ে আজোরস দ্বীপপুঞ্জে যাওয়ার অনেক সুবিধা। এ সুবিধা আহমদ মুসা হাতছাড়া করতে চায় না। সুতরাং এই আজোরস যাওয়ার পথ যতটা নিরুপদ্রব হয় সে ধরনের ব্যবস্থাই করতে হবে। আহমদ মুসা এটাও ভাবল যে, আজোরস যাওয়ার পথে শুরুতেই ওদের হাতে বন্দী হবার মধ্যেও ঝুঁকি আছে। আজোরস দ্বীপপুঞ্জে যাওয়াই যদি বাধাগ্রস্ত হয়, তাহলে তো আসল কাজই পন্ড হয়ে যাবে। অবশেষে আহমদ মুসা ভাবল, ওদের হাতে বন্দীও হওয়া যাবে না, কিন্তু এই মুহূর্তে কোন ঘটনাও ঘটানো যাবে না, এই উভয় সংকটে আহমদ মুসা ধৈর্য্য ও অপেক্ষারই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

মারিও জোসেফ থামলে আহমদ মুসা তাকাল হাসান তারিকের দিকে। মুখে একটু হাসি টেনে বলল, ‘লছমন কি বল, এদের সাথে যাওয়ার জন্যে রেডি?’

হাসান তারিকের ঠোঁটেও হাসি ফুটে উঠল। বলল, ‘রেডি, তবে ঠিক সময়ে প্লেন আমাদের ধরতে হবে।’

‘শুনেছেন তো মি. এ্যান্টেনিও? আমাদের প্লেন ছাড়ার আর মাত্র ৪০ মিনিট বাকি। চলুন।’ বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক আগে আগে চলল। তাদের পেছনে মারিও জোসেফরা।

হোটেল থেকে বেরিয়ে এল তারা।

গাড়ি বারান্দায় একটা পাজেরো জীপ এবং একটা মাইক্রো দাঁড়িয়েছিল।

দুগাড়ি ঘিরে লোকরা দাঁড়িয়েছিল।

মারিও জোসেফ সেখানে পৌছেই লোকদের উদ্দেশ্য করে বলল, ‘দুজনকে দুগাড়িতে তুলে  তোমরা ওঠ গাড়িতে।’ বলে মারিও জোসেফ নিজে গিয়ে জীপের ড্রাইভিং সিটে উঠল।

লোকরা আহমদ মুসাকে জীপে এবং হাসান তারিককে মাইক্রোতে তুলতে গেল।

আহমদ মুসার হাতে ছিল একটা হ্যান্ড ব্যাগ, হাসান তারিকের হাতেও একটা।

আহমদ মুসা জীপে ওঠার আগে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। বলল হাসান তারিককে লক্ষ্য করে, 'লছমন, আমার ব্যাগটাও তোমার কাছে থাক।'

বলে আহমদ মুসা কয়েক ধাপ এগিয়ে তার হাতের ব্যাগ হাসান তারিকের হাতে তুলে দিল। তারপর পেছন ফিরে জীপের দিকে কয়েক ধাপ এগিয়ে আবার থমকে দাঁড়িয়ে মুখ পেছন দিকে ঘুরিয়ে হাসান তারিককে লক্ষ্য করে বলল, 'লছমন, ব্যাগটা বন্ধ করতে ভুলে গেছি। তুমি বন্ধ করো।'

'ঠিক আছে। বুঝেছি।' ওদিক থেকে বলল হাসান তারিক।

আহমদ মুসার ঠোঁটে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল।

গাড়িতে উঠে বসেছে আহমদ মুসা।

দুটি গাড়ি ছুটে চলেছে শহরতলীর দিকে।

গাড়ি ষ্টার্ট দিতেই ওরা সব সিগারেট ধরিয়েছে। দুদিকের দুটি জানালা খুলে দেয়ার পরও গাড়ি ভরে গেছে সিগারেটের ধোঁয়ায়।

আহমদ মুসা প্রতিবাদ করল। বলল, 'আপনারা গাড়িকে গ্যাস চেম্বার বানিয়ে ফেললেন, এটা কোন ভদ্রতা?'

আহমদ মুসার এ কথা নিয়ে ওদের মধ্যে হাসি-ঠাট্টা শুরু হলো। প্রথমেই মারিও জোসেফ বলল, 'তাহলে বুঝুন হিটলার কতটা ভদ্র ছিল এবং তার গ্যাস চেম্বারগুলো কেমন ছিল!'

'বস, সিগারেটের ধোঁয়াকে যে গ্যাস বলে তার পক্ষে হিটলারী গ্যাস সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব নয়।' একজন বলে উঠল।

সে থামতেই আরেকজন বলল, 'সিগারেটের ধোঁয়া যার কাছে গ্যাসের মত অসহ্য সে মুসলমান না হয়ে পারে না। আপনি ঠিকই সন্দেহ করেছেন বস।'

এই কণ্ঠ থামতেই আরেকজন বলে উঠল, 'বস, একে আসল গ্যাস চেম্বারের স্বাদ পাইয়ে দিতে হবে।'

‘মনে হচ্ছে ঈশ্বর তোমাদের আশা পূরণ করবেন।’ বলল মারিও জোসেফ।

এইভাবে তাদের আলোচনা চলতেই থাকল।

আহমদ মুসার ঠোঁটে ফুটে উঠল আগের সেই হাসি। হাসিটা ধীরে ধীরে কঠিন এক সিদ্ধান্তে পরিণত হলো।

ঘড়ি দেখল আহমদ মুসা। দশ মিনিট গাড়ি চলেছে। তার মানে বিমান বন্দরে রিপোর্ট করার আর মাত্র ৩০ মিনিট বাকি।

আহমদ মুসা পকেট থেকে ‘মাউথ-নোজ গ্যাস কভার’ বের করল। এটা ক্ষুদ্রাকারের এক ধরনের গ্যাসমাস্ক। এর কার্যকারিতা পাঁচ দশ মিনিটের বেশি থাকে না।

রাস্তা-ঘাট, কল-কারখানা এবং বিশেষ ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে আকস্মিক কোন গন্ধময় পরিবেশের সৃষ্টি হলে এটা ব্যবহার করা হয়।

আহমদ মুসা গ্যাসমাস্কটি পরে নিল।

হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল গাড়িতে।

মারিও জোসেফ বলে উঠল, ‘হেসো না, ফাঁসির আসামীও মুক্তির স্বপ্ন দেখে।’

গ্যাসমাস্কের সাথেই মার্বেলের মত কালো রংয়ের গ্যাসের ডিনামাইট বের করেছিল আহমদ মুসা। আহমদ মুসার গ্যাসমাস্ক নিয়ে হাসি ঠাট্টারত কেউই এটা খেয়াল করেনি।

গ্যাস-ডিনামাইটের কালো শরীরের এক জায়গায় জ্বল জ্বল করে জ্বলছিল একটা লাল বিন্দু। এটাই গ্যাস-ডিনামাইটের ট্রিগার পিন। পিনটি খুলে নিলেই গ্যাস-ডিনামাইটের বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণ ঘটে মানে গ্যাস-ডিনামাইটটি তার ভয়ংকর গ্যাস নিঃসরণ শুরু করে। এ গ্যাস-ডিনামাইট আলফ্রেড নোবেলের ডিনামাইটের মত সবকিছু ধ্বংস করে না, কিন্তু ছয় বর্গগজের মধ্যে কোন জীবনের অস্তিত্ব রাখে না। এ কারণেই জীবন ধ্বংসের এ নিরব-অস্ত্রকে ডিনামাইট নাম দেয়া হয়েছে।

হাতের মুঠোর মধ্যে লুকানো জীবন ধ্বংসী এ মারণাস্ত্রের ট্রিগার পিন খুলতে গিয়ে কেঁপে উঠল আহমদ মুসা। হৈ হুল্লোড়, হাসি ঠাট্টায় ব্যস্ত এ জীবন্ত

মানুষগুলোর জীবন কি এতই সস্তা যে, আগামী কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তারা ধ্বংস হয়ে যেতে পারবে! ওদের সুন্দর পৃথিবী, মমতায় গড়া ওদের পরিবার থেকে ওরা চিরতরে একেবারে বিনা নোটিশে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে কেন! পরক্ষণেই আহমদ মুসার মন থেকে কে যেন বলে উঠল, পৃথিবীর মানব বাগান যিনি সৃষ্টি করেছেন সেই 'মহা তিনি'ই সৃষ্টির সাথে ধ্বংসকে একই সাথে জুড়ে দিয়েছেন। ভূমিকম্প, বন্যা, জলোচ্ছাস, ঝড়-সাইক্লোন-হ্যারিকেন, মহামারি এই ধ্বংসেরই এক একটি মহা অস্ত্র। আগাম নোটিশ দিয়ে দিনক্ষণ ঠিক করে এরা আসে না। আবার মন থেকেই আরেকজন বলে উঠল, হত্যা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের ধ্বংস তো এক জিনিস নয়। মন থেকে এরও উত্তর এল সংগে সংগেই। বলা হলো, গাছকে রক্ষার জন্যে আগাছা তো মানুষই ধ্বংস করে। না করলে আগাছাই গাছকে শেষ করে দেয়। মানব সমাজেও রয়েছে এ ধরনের অসংখ্য আগাছা। যারা আহমদ মুসা ও হাসান তারিককে ধরে নিয়ে যাচ্ছে এরা ষড়যন্ত্রকারী এবং সন্ত্রাসী নামের আগাছা, এদের হত্যা করতে না পারলে এরাই হত্যা করবে আহমদ মুসা ও হাসান তারিককে। ওরা আহমদ মুসাকে আসল গ্যাস চেম্বারের স্বাদ পাইয়ে দিতে চায়। ওদের সুযোগ দিলে ওরা এটাই করবে। আর এ জালেমরা জুলুমের জিন্দানখানা সাও তোরাহ দ্বীপে যাবার পথে বাধা। এই আগাছাদের বিনাশ না হলে এক ইঞ্চিও আহমদ মুসা এগুতে পারবে না। শুধু তাই নয়, জীবন দিয়ে মাশুল দিতে হবে অন্যায় দুর্বলতার।

আহমদ মুসা জেগে উঠল মুহূর্তের ভাবাবেগ থেকে। কঠোর হয়ে উঠল আহমদ মুসার মুখ।

ঠিক এই সময়েই মারিও জোসেফ বলে উঠল, 'ডন সিলভাকে বলে দাও, আমরা অফিসে যাচ্ছি না। এসব ঝামেলা অফিসে নিয়ে লাভ নেই। সামনে পাইনের পার্কটায় যেতে বল। আর বলে দাও কথাবার্তায় সময় খরচ করার প্রয়োজন নেই। কাপড় খুলে দেখবে খাতনা আছে কিনা। যদি থাকে তাহলে সোজা বুকে কয়েকটা গুলী ঢুকিয়ে দেবে। ব্যস।' থামল মারিও জোসেফ।

তার থামার সাথে সাথেই জীপটা হঠাৎ বাঁক নিয়ে আরেকটা রাস্তায় প্রবেশ করল।

আহমদ মুসা বুঝল তাদেরকে পাইনের পার্কে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

কঠিন একটা হাসি ফুটে উঠল আহমদ মুসার ঠোঁটে। গ্যাস- ডিনামাইট দুহাতের মুঠোতে নিয়ে খুলে ফেলল লাল পিনটা। তারপর সামনের সিটের নিচ দিয়ে কাল বলটা গড়িয়ে দিল সামনে।

এক সেকেন্ড, দুসেকেন্ড করে গড়িয়ে চলল সময়, ঠিক দশ সেকেন্ডের মাথায় গাড়ির ষ্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল। ড্রাইভিং সিট থেকে মারিও জোসেফ দূর্বল তন্দ্রালূ কণ্ঠে বলল, 'ডন, তুমি ড্রাইভিং সিটে এস, হঠাৎ কেমন যেন হয়ে গেল শরীর।'

'হঠাৎ এ রকম হলো কেন? মনে হচ্ছে আমার শরীর তোমার চেয়েও খারাপ। উঠে দাঁড়াবার শক্তি আমার নেই।' টেনে টেনে দুর্বল কণ্ঠে বলল ডন।

'কি বললে?' তড়াক করে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে চিৎকার করে বলে উঠল মারিও জোসেফ, 'গুলী কর, খুন কর এই লোককে।'

বলে মারিও জোসেফ নিজেই পকেট থেকে রিভলবার বের করার চেষ্টা করল।

কিন্তু তার আগেই আহমদ মুসা পাশের ঝিমুনি আক্রান্ত লোকটির হাত থেকে ষ্টেনগান কেড়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'যে যেখানে যেভাবে আছ বসে থাক। একটু বেয়াদবী করলে মরবে গুলী খেয়ে।'

বলে আহমদ মুসা পিছু হটে গাড়ি থেকে নেমে এল। বন্ধ করে দিল গাড়ির দরজা।

পেছনের গাড়িটা প্রায় এসে পড়েছে। আহমদ মুসা তার ষ্টেনগান তুলল গাড়িটাকে লক্ষ্য করে।

সংগে সংগে গাড়ি থেকে চিৎকার শোনা গেল, 'ভাইয়া, গুলী করবেন না। আমি গাড়ি চালাচ্ছি।'

আহমদ মুসা ষ্টেনগানের ব্যারেল নিচে নামিয়ে ট্রিগার থেকে তর্জনি সরিয়ে নিল। বলল সেই সাথে চিৎকার করে, 'ভেতরের খবর কি?'

'সবাই ঘুমিয়েছে কিংবা...........।' হাসান তারিক কথা শেষ না করেই থেমে গেল।

গাড়ি থেকে তাড়াতাড়ি নেমে ছুটে এল হাসান তারিক। ফিসফিস করে বলল, 'ভাইয়া, খোলা ব্যাগের মাধ্যমে আপনি যে মেসেজ দিয়েছিলেন, তা সংগে সংগেই আমি বাস্তবায়ন করেছি।'

'ধন্যবাদ হাসান তারিক। আমি দুশ্চিন্তায় ছিলাম যে, তুমি বিষয়টা তাড়াতাড়ি ধরে ফেলতে পারবে কিনা। আলহামদুলিল্লাহ।'

বলে আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্রুত জীপের কাছে এল। নিজের মুখের গ্যাসমাস্ক ভালোভাবে মুখে-নাকে সেট হয়ে আছে কিনা দেখে জীপের দরজা খুলে ফেলল। এগুলো লাশের দিকে। পাশে এসে দাঁড়াল হাসান তারিক। দুজনে লাশগুলো রাস্তায় নামিয়ে ফেলল।

'হাসান তারিক, ব্যাগগুলো নিয়ে এস তোমার মাইক্রো থেকে।' বলে আহমদ মুসা এগুলো জীপের ড্রাইভিং সিটের দিকে।

হাসান তারিক মাইক্রো থেকে দুটি হ্যান্ড ব্যাগ নিয়ে এসে আহমদ মুসার পাশের সিটে উঠে বসল।

আহমদ মুসা গাড়ি ষ্টার্ট দিল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'এয়ারপোর্টে রিপোর্ট করার আর মাত্র ২৫ মিনিট বাকি হাসান তারিক।'

'ইনশাআল্লাহ আমরা ঠিক পৌছে যাব ভাইয়া।' বলল হাসান তারিক।

'কিন্তু সামনে গিয়ে এ গাড়িটা ছেড়ে দিয়ে কোন ট্যাক্সি-ম্যাক্সি নিতে হবে হাসান তারিক। এ গাড়িটা পুলিশের পরিচিত হবে নিশ্চয়। সুতরাং এ গাড়ি এয়ারপোর্টে নেয়া যাবে না।' আহমদ মুসা বলল।

'ঠিক বলেছেন ভাইয়া। এয়ারপোর্টে কি কোন ঝামেলা হতে পারে? কি ভাবছেন আপনি?' বলল হাসান তারিক।

'মুসলমানদের আজোরস দ্বীপপুঞ্জে যাওয়া বন্ধ। কোনভাবে ওরা সন্দেহ করেছে আমরা মুসলমান, ওরা নিশ্চিত হবার জন্যেই আমাদের ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। আমরা আহমদ মুসা ও হাসান তারিক এটা ওরা জানে না। সুতরাং এয়ারপোর্টে নতুন কোন ঝামেলা হবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া যে নাম আমরা এ্যান্টোনিওদের বলেছি, সে নামে আমাদের টিকেট নয়। টিকেটে আমাদের

পর্তুগীজ-স্পেনীয় নাম রয়েছে। আর পর্তুগীজ পড়তে না পারলেও পর্তুগীজ ভাল বলতে পারি আমরা।' আহমদ মুসা বলল।

'আপনার কথা সত্য হোক ভাইয়া। আমাদের যাত্রার অবশিষ্ট সময় আল্লাহ নিরুপদ্রব করুন।' বলল হাসান তারিক।

আহমদ মুসার গাড়ি সেই রোডে উঠে আসার পর কিছু দূর এগিয়ে একটি ট্যাক্সি ষ্ট্যান্ড দেখে জীপটি রাস্তার পাশে ছেড়ে দিয়ে আহমদ মুসারা নেমে পড়ল।

তারপর একটা ট্যাক্সি নিয়ে ছুটল লিসবন এয়ারপোর্টে।

আজোরস দ্বীপপুঞ্জের টেরসিয়েরা দ্বীপের 'লিজে' এয়ারপোর্টের ইমিগ্রেশন কাউন্টার।

কাউন্টারে আহমদ মুসা এবং তার পেছনে হাসান তারিক দাঁড়িয়ে।

ইমিগ্রেশন অফিসার আহমদ মুসা ও হাসান তারিকের পাসপোর্ট নাড়াচাড়া করে বলল, 'আপনাদের টিকেট দেখি।'

আহমদ মুসা তার হাতে দুটি টিকেট তুলে দিল।

লোকটি টিকেটের পাতা উল্টিয়ে দেখল। তারপর বলল, আপনাদের কার নাম রুইজর্জ এবং কার নাম পেড্রো পোর্টিট?

'আমি রুইজর্জ, আর ও পেড্রো পোর্টিট।' বলল আহমদ মুসা।

'আপনাদের নাম পর্তুগীজ, কিন্তু আপনারা তো এশিয়ান?' অফিসার লোকটি বলল।

'পর্তুগালে আফ্রিকান, রাশিয়ানসহ বিভিন্ন দেশের লোক বাস করে। তাদের সাথে অনেক এশিয়ানও।' হেসে বলল আহমদ মুসা।

'তা ঠিক।' অনেকটা বিব্রত কণ্ঠেই বলল অফিসার লোকটি।

একটা দম নেবার পরই সে আবার বলে উঠল, 'আচ্ছা আপনারা রবিন সিং রাফায়েল ও লছমন লিওনার্দো নামের দুএশিয়ানকে চেনেন?'

আহমদ মুসা মনে মনে আঁৎকে উঠল এই ভেবে যে, ‘লিসবনের তাদের সব খবরই তাহলে আজোরস-এ পৌছে গেছে।’

কিন্তু আহমদ মুসার এই আঁৎকে উঠা ভাব মুখের চেহারায় সামান্যও প্রকাশ পেল না। অফিসার লোকটি থামতেই আহমদ মুসা বলে উঠল, ‘না, এমন নামের কাউকে আমরা চিনি না। ওরা এই বিমানে যাবে কিনা সেটা যাত্রীদের তালিকা দেখলেই তো জানা যায়।’

‘ওরা খুব সাংঘাতিক লোক এবং মুসলমান। যাত্রী তালিকায় ঐ দুজনের নামে কোন যাত্রী নেই। নিশ্চয় ওরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাজে ছদ্মনাম ব্যবহার করছে। কোন ছদ্মনাম নিয়েই ওরা প্লেনে উঠেছে।’ বলল অফিসার লোকটি।

থেমেই আবার বলে উঠল লোকটি আহমদ মুসাদের পাসপোর্ট ও টিকিট ফেরত দিতে দিতে, ‘যাই হোক। সন্দেহ করে তো আমরা সব লোককে হেনস্তা করতে পারি না। আপনারা যান। ধন্যবাদ।’

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক পাসপোর্ট ও টিকিট নিয়ে ইমিগ্রেশন থেকে বেরিয়ে লাগেজ লাউঞ্জে প্রবেশ করল।

হাসান তারিক আহমদ মুসাকে ফিসফিস করে বলল, ‘ইমিগ্রেশন অফিসারটি নেহায়েত ভদ্রলোক। আমি তো ভাবছিলাম, উনি বলে বসবেন যে, আপনাদের নাম পরিচয় যে ঠিক তা প্রমাণের জন্যে আসুন আপনাদের ফিজিক্যাল টেষ্ট দিতে হবে। প্রমাণ করতে হবে আপনারা মুসলমান নন।’

‘দেখলে না লোকটার চেহারা? সে খাঁটি পর্তুগীজ নয়। ‘আজোরী’ সে। মানে আজোরসের মানুষ সে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আজোরী’রাও পর্তুগীজ?’ বলল হাসান তারিক।

‘পর্তুগীজ নয়, মিক্সড পর্তুগীজ। পর্তুগীজরা যখন এই বিজন দ্বীপপুঞ্জ দখল ও বসতি গড়ে, তখন তারা প্রচুর স্প্যানিশকে এখানে নিয়ে আসে। পরবর্তীকালে নর্থ আমেরিকান আদিবাসি এবং এস্কিমোরাও বেশ সংখ্যায় নানাভাবে এখানে এসে ছিটকে পড়ে। সব মিলিয়ে ‘আজোরী’রা একটি মিশ্র জাতি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তাই হবে। কিন্তু ভাইয়া, এই যে ফাঁড়াটা কাটল, এটাই শেষ ফাঁড়া নয় বলে মনে হচ্ছে।’ বলল হাসান তারিক।

‘কোন সন্দেহ নেই এ ব্যাপারে হাসান তারিক। ওয়ার্ল্ড ফ্রিডম আর্মি (WFA) নিশ্চিত যে, হোটেলে আমাদের ধরতে যাওয়া দুগাড়ির লোকদের হত্যা করে আমরা বিমানে উঠেছি লিসবন থেকে আজোরসের ‘লিজে’ আসার জন্যে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তাহলে তো প্রকৃত বিপদ আমাদের জন্যে বাইরে অপেক্ষা করছে!’ বলল হাসান তারিক।

‘ঠিক অনুমান করেছ হাসান তারিক!’ আহমদ মুসা বলল।

হাসান তারিক থমকে দাঁড়াল। বলল, ‘বেরুবার আগে তো কিছু তাহলে ভাবতে হয়। আসুন একটু দাঁড়ানো যাক।’

আহমদ মুসাও দাঁড়িয়ে পড়ল।

মুখোমুখি হলো দু’জন।

‘ঠিক বলেছ হাসান তারিক। একটু ভাবা প্রয়োজন। তবে বিকল্প কিছু করার সুযোগ খুব একটা আছে বলে মনে হয় না।’

‘কেন?’ বলল হাসান তারিক।

‘বিমান বন্দর থেকে বেরুবার একটাই পথ এবং সে পথটাই যদি ওরা আগলে থাকে!’ আহমদ মুসা বলল।

‘তাহলে শুরুতেই তো সংঘাতে জড়িয়ে পড়তে হবে!’ বলল হাসান তারিক।

‘কিন্তু আমরা সহজেই চিহ্নিত হয়ে যাব, এমন সংঘাতে জড়িয়ে পড়লে আমাদের মিশনের ক্ষতি হবে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমিও তাই ভাবছি ভাইয়া। কিন্তু বিকল্প নেই আপনিই তো বললেন।’ বলল হাসান তারিক।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘হয়তো আমরা বেশি বেশিই ভাবছি। হয়তো কেউ আমাদের পথ আগলে নেই।’

‘যদি থাকে তাহলে কি হবে, সেটাই তো আলোচনার বিষয়।’ হাসান তারিক বলল।

‘যে বিষয়ের উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ নেই, এসব বিষয় নিয়ে আর ভেবে কি হবে। রণাঙ্গনই বলে দিবে সৈনিকের ভূমিকা কি হবে। এস, অন্য বিষয়ে একটু ভাবি।’ বলে আহমদ মুসা লাউঞ্জের একটা চেয়ারে গিয়ে বসল।

হাসান তারিক গিয়ে বসল তার পাশে।

আহমদ মুসা ব্যাগের পকেট থেকে একটা কাগজ বের করল। কাগজটা একটা মানচিত্র। আজোরস দ্বীপপুঞ্জের একটা মানচিত্র।

মানচিত্রটি আহমদ মুসা সামনে মেলে ধরল। হাসান তারিকও তার উপর চোখ রাখল।

মানচিত্রের উপরের অংশে একটা দ্বীপের উপর আঙুল রেখে বলল, ফ্লোরেস দ্বীপের উত্তরে এটা করভো দ্বীপ। প্রফেসর জ্যাক সাইমনের বক্তব্য অনুসারে এই দ্বীপের কয়েক মাইল দূরে সাও তোরাহ দ্বীপ। করভোর উত্তরে যে সাদা বিন্দুটা দেখা যাচ্ছে, এটা সাও তোরাহ হতে পারে। এই দ্বীপের সবচেয়ে কাছের শহর হলো ফ্লোরেস দ্বীপের ‘সান্তাক্রুজ’। আমার মনে হয় সাও তোরাহ দ্বীপের সবচেয়ে কাছের শহর হিসেবে এর উপর WFA এর খুব বেশি দৃষ্টি থাকবে এখন। সুতরাং এখানে সাও তোরাহ দ্বীপ নিয়ে আলোচনা করা নিরাপদ হবে না। এই কারণে আমি মনে করি, সাও তোরাহ দ্বীপের পরবর্তী নিকটতম শহর হলো সান্তাক্রুজ। সান্তাক্রুজের সোয়াশ’ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে পিকো দ্বীপের ‘হারতা’ শহর। এই হারতা শহরকেই আমরা আপাতত বেজ করতে পারি। এখান থেকে সব খবরাখবর নিয়ে প্রস্তুত হয়ে পরবর্তী বেজ হিসাবে আমরা সান্তাক্রুজে যেতে পারি।’ থামল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা থামতেই হাসান তারিক বলে উঠল, ‘হারতা এবং সান্তাক্রুজ সম্পর্কেও তো আমাদের কিছু জানা প্রয়োজন।’

‘হ্যাঁ, হাসান তারিক। সেটা করতে হবে। পর্তুগীজ ইয়ারবুক থেকে কিছু জানা গেছে। ওটা তুমি একটু দেখে নিও। ‘লিজে’ থেকে আমরা কিছু ট্যুরিষ্ট লিটারেচার যোগাড় করতে পারব। সেখান থেকেও কিছু জানা যাবে।’ বলল আহমদ মুসা।

একটু থেমেই আবার সে বলে উঠল, ‘আমরা আপাতত একটা টাইম সিডিউল এ ধরনের করতে পারি যে, খোঁজ-খবরের জন্যে ‘লিজে’তে তিন দিন

কাটিয়ে ৪র্থ দিনে আমরা 'হারতা'তে পৌছব এবং হারতা গিয়ে পরবর্তী পরিকল্পনা করব।'

'হারতা গিয়ে কোথায় উঠব, এ সম্পর্কে আমরা কোন চিন্তা করব কিনা। ছোট শহরের হোটেলগুলো আমার মতে নিরাপদ নয়।' বলল হাসান তারিক।

'তুমি ঠিকই বলেছ হাসান তারিক। ফাইনালী কি হবে আমি জানি না। তবে আপাতত চিন্তা করেছি, হারতার ক্যাথলিক গীর্জার অতিথিশালায় উঠব। আমি ইয়ারবুকে দেখেছি, 'হারতা সেন্টপল' গীর্জার বিশাল অতিথিশালা সবার জন্যেই উন্মুক্ত।' আহমদ মুসা বলল।

খুশি হলো হাসান তারিক। বলল, 'ক্যামোফ্লেজটা ভালোই হবে ভাইয়া।'

'এস এবার উঠি।' বলে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

হাসান তারিকও উঠল।

চলল তারা ডিপারচার লাউঞ্জের দিকে।

লাউঞ্জ থেকে বের হবার দরজার পাশে একটা সুদৃশ্য কাউন্টার। কাউন্টারের এক প্রান্তে বিলবোর্ডে একটি বিজ্ঞপ্তি। বলা হয়েছে, এখান থেকে গাড়ি ভাড়া করতে পারেন। যৌক্তিক ভাড়া ও বিশ্বস্ততার প্রতীক আজোরস ন্যাশনাল কোম্পানী।'

বিলবোর্ডটি পড়ে আনন্দে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আহমদ মুসার। বর্তমান অবস্থায় বিশ্বস্ত গাড়ি পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

আহমদ মুসা হাসান তারিককে কানে কানে বলল, 'কাউন্টারে যাও। এদের থেকেই গাড়ি ভাড়া কর। বাইরে গিয়ে গাড়ি ভাড়া করার ঝুঁকি নেয়া যাবে না।'

হাসান তারিক কাউন্টারে গেল। গাড়ি ভাড়া হয়ে গেল। তাদের নিজস্ব কমিউনিকেশন নেট ওয়ার্কের মাধ্যমে বলে দেয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যে ইউনিফর্ম পরা ড্রাইভার লাউঞ্জে ঢুকল এবং আহমদ মুসাদের 'ওয়েলকাম' করে গাড়িতে নিয়ে গেল।

প্লেন থেকে নামার পর থেকেই আহমদ মুসার দুচোখ সতর্ক ছিল। চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেই গাড়িতে উঠে বসল।

'স্যার কোথায়?' ড্রাইভিং সিটে বসে ষ্টিয়ারিং-এ হাত রেখে বলল ড্রাইভার।

আহমদ মুসার চিন্তা করাই ছিল। বলল, ‘গঞ্জালেস ইন্টারন্যাশনাল হোটেলে চল।’

‘লিজে’ এয়ারপোর্টের বিপরীত দিকে শহরের সাগর প্রান্তে একটা ছোট পাহাড়ের উপর এই হোটেলটি। লিজে এয়ারপোর্ট থেকে দীর্ঘ সরল এক পথ পেরিয়ে ‘লিজে’ শহরে প্রবেশ করতে হয়। তারপর শহর পেরিয়ে ছোট একটা পাহাড়ী পথ পাড়ি দিয়ে পাহাড় শীর্ষের ‘গঞ্জালেস ইন্টারন্যাশনাল’ হোটেলে পৌছতে হয়। বেশ দীর্ঘ পথ। খুশিই হলো ড্রাইভার। তার মুখ দেখা গেল প্রসন্ন।

গাড়ি ষ্টার্ট নিয়েছে। চলছে গাড়ি।

গাড়ি তখন বিমান বন্দর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

হাসান তারিক আহমদ মুসার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, ‘যাত্রার শুরুটা বোধ হয় ভালোই হলো ভাইয়া।’

‘তোমার কথা সত্য হলে ভালো। কিন্তু আমার অন্য রকম মনে হচ্ছে। ডিপারচার লাউঞ্জে একজন ক্রিমিনাল চেহারার লোক সর্বক্ষণ আমাদের উপর চোখ রেখেছে। আমরা বের হয়ে এলে সেও বেরিয়ে একটা সাদা গাড়িতে চড়েছে। এছাড়া কার-পার্কেও আরেকটা সাদা গাড়ির আরেকজন লোকের দুচোখ আঠার মত গেঁথে ছিল আমাদের উপর। আমাদের গাড়ি ষ্টার্ট নিলে সেই গাড়িকেও ষ্টার্ট হতে দেখেছি।’ বলল আহমদ মুসা।

হাসান তারিকের মুখ ম্লান হয়ে গেল। তাকাল সে পেছন দিকে। বোধ হয় সেই দুটি সাদা গাড়ি পিছু নিয়েছে কিনা তা দেখার জন্যে। কিন্তু পেছনে গাড়ির সারি। অধিকাংশই সাদা গাড়ি। হতাশ হয়ে চোখ দুটি ফিরে এল হাসান তারিকের।

কিন্তু শহর পেরিয়ে পার্বত্য পথে প্রবেশের পর সন্দেহ আর থাকলো না। দুটো সাদা গাড়িকে দেখা গেল আহমদ মুসার গাড়ির সমান গতিতে ছুটে আসছে। আহমদ মুসা ড্রাইভারকে বলে গাড়ির গতি বাড়িয়ে কমিয়ে নিশ্চিত হলো যে, গাড়ি দুটো তাদেরকেই অনুসরণ করছে।

আহমদ মুসা পরিস্থিতিটা ড্রাইভারকে জানানো ও তার মনোভাব জেনে নেয়ার জন্যে বলল, ‘ড্রাইভার, দুটো গাড়ি দেখছি আমাদের ফলো করছে।’

‘স্যার, আপনাদের কোন শত্রু আছে?’ বলল ড্রাইভার। তার কণ্ঠে উদ্বেগ।

‘এদেশে আমরা বেড়াতে এসেছি। থাকতে পারে। কিন্তু ওরা সরকারের কেউ কিংবা ডাকাত-টাকাত নয়তো?’ আহমদ মুসা বলল।

‘স্যার, সরকারী নয়। সরকারের কোন ব্যাপার হলে সেটা বিমান বন্দরেই ঘটত। আর এ ধরনের ডাকাতও আমাদের আজোরসে নেই। স্যার, হতে পারে আপনাদের কোন শত্রু পর্তুগাল থেকেই আপনাদের অনুসরণ করছে।’ বলল ড্রাইভার।

‘তাহলে এখন কি করা যায় ড্রাইভার?’ আহমদ মুসা বলল।

‘চিন্তা নেই স্যার। গঞ্জালেস ইন্টারন্যাশনাল হোটেল। ওখানে শক্তিশালী পুলিশ ষ্টেশন আছে। আমরা ঠিক হোটেলে পৌছে যাব, ওরা আমাদের ধরতেই পারবে না।’ বলল ড্রাইভার।

পার্বত্য পথে আরও কিছুটা এগুলো আহমদ মুসাদের গাড়ি।

ঝোপে ঢাকা টিলার একটা বাঁক ঘুরতেই আহমদ মুসা দেখতে পেল দুশ গজের মত দূরে একটা মাইক্রো ও একটা জীপ তাদের পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। পেছনে তাকাল সে। দেখল পেছনে ছুটে আসা দুটি গাড়ির সাথে আরেকটি গাড়ি যোগ হয়েছে।

ড্রাইভার বিষয়টা খেয়াল করেছে। গাড়ি থামিয়ে দিয়েছে সে। তার চোখে ভয়ের ছাপ। বলল সে, ‘সর্বনাশ স্যার! ওরা দুদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে।’

আহমদ মুসাদের গাড়ির সামনেই রাস্তার একটা ত্রিমোহনী। হোটেলগামী রোড থেকে আরেকটা রাস্তা বেরিয়ে পার্বত্য এলাকার মধ্যে দিয়ে পশ্চিম দিকে চলে গেছে।

রাস্তাটির দিকে একবার তাকিয়ে আহমদ মুসা ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বলল, ‘পশ্চিম এ রাস্তাটা কোথায় গেছে ড্রাইভার?’

‘স্যার, পার্বত্য এলাকা ছাড়িয়ে রাস্তাটা আমাদের এ দ্বীপের একমাত্র বীচ পর্যন্ত গেছে। সেখানে মনোরম একটা ট্যুরিষ্ট স্পট আছে।’

‘ড্রাইভার গাড়িটা পশ্চিমের ঐ রাস্তায় নাও।’ নির্দেশের স্বরে বলল আহমদ মুসা।

‘ওদিকে তো কোন আশ্রয় নেই স্যার। মাত্র ট্যুরিষ্ট স্পটে একটা পুলিশ ষ্টেশন আছে। সে তো অনেক দূরে?’

‘ভয় করো না ড্রাইভার, তোমার এবং তোমার কোম্পানীর কোন ক্ষতি হবে না। তুমি গাড়ি ঘুরিয়ে নাও।’ এবার দৃঢ় কণ্ঠে নির্দেশ দিল আহমদ মুসা।

ড্রাইভার গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে পশ্চিমের রাস্তায় চলতে শুরু করল।

একটু হাসল আহমদ মুসা। বলল ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে, ‘শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করার চাইতে শত্রুর হাত থেকে বাঁচার চেষ্টা করাই উচিত নয় কি ড্রাইভার?’

‘অবশ্যই স্যার। কিন্তু শত্রুদেরকে খুব প্রবল দেখছি। স্যার, ওরা কারা আন্দাজ করতে পারেন?’ ড্রাইভার বলল।

‘বন্দী কিছু লোককে আমরা উদ্ধার করতে চাই। হতে পারে আটককারী দলের ওরা কেউ।’ আহমদ মুসা বলল।

‘বন্দীরা কে স্যার?’ বলল ড্রাইভার।

‘নিরপরাধ লোক। ওদের মুখ বন্ধ করার জন্যে ওদের অপহরণ করা হয়েছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘বন্দীরা কি আপনাদের আত্মীয়?’ ড্রাইভার বলল।

‘না। অন্যায়ের প্রতিবিধান করতেই আমরা ওদের সাহায্য করতে চাই।’ বলল আহমদ মুসা।

ড্রাইভারের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠেছে। কপাল তার কুঞ্চিত।

আর কোন কথা বলল না সে।

আহমদ মুসা তখন অন্য কাজে মনোযোগ দিয়েছে। হ্যান্ড ব্যাগ থেকে চাবি বের করে লাগেজে করে আনা ব্যাগটা টেনে নিয়ে খুলে ফেলল। বের করল প্লাষ্টিক কনটেইনার থেকে তার এম-১০ মেশিন রিভলবার।

প্লাষ্টিক কনটেইনারটি বিশেষভাবে তৈরি। ‘এক্সরে’ বা কোন ‘রে’ ফেললে এর ভেতরকার কিছু দেখা যায় না। ‘রে’ ফেললেই কনটেইনারটি আয়নার মত স্বচ্ছ একটা ছবি উপহার দেয়। এই কনটেইনারে করেই আহমদ মুসা ও হাসান তারিক তাদের অস্ত্র নিয়ে এসেছে।

হাসান তারিকও তার অস্ত্র বের করে নিয়েছে।

এক জায়গায় এসে হঠাৎ ড্রাইভার হার্ড ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করাল।

'কি হলো ড্রাইভার?' বলে উঠল আহমদ মুসা।

'স্যার, ইঞ্জিন ট্রাবল দিচ্ছে। দেখছি আমি।' বলে ড্রাইভার দ্রুত ষ্টার্টার থেকে চাবির রিং খুলে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজা বন্ধ করে ইঞ্জিনের দিকে এগুলো। তারপর ইঞ্জিনের টপটা খুলে ফেলে দাঁড় করিয়ে দিল।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক তখন ব্যস্ত পেছনটা দেখতে।
পেছনে ছুটে আসা গাড়ি ৫টি কত দূরে আছে সেটা আন্দাজ করতে চেষ্টা করছিল।

বেশ সময় পার হয়ে গেল।

ইঞ্জিনের দিক থেকে কোন শব্দ না পেয়ে আহমদ মুসা সামনে তাকাল। কিন্তু ইঞ্জিন নিয়ে কাজ করার কোন শব্দ সে শুনতে পেল না। তাছাড়া ড্রাইভারকেও দেখতে পেল না।

গাড়ির জানালা খুলে দেখার চেষ্টা করল আহমদ মুসা। কিন্তু গাড়ির জানালা খোলা গেল না। লক করা। দরজা খোলার চেষ্টা করল। কিন্তু দেখল দরজাও লক করা।

চমকে উঠল আহমদ মুসা।

দ্রুত সে এগিয়ে ড্রাইভারের দরজায় নব ঘুরাতে চেষ্টা করল। ঘুরল না।

'হাসান তারিক, ড্রাইভার পালিয়েছে এবং সেই সাথে সে আমাদেরকে বন্দী করে রেখে গেছে।' দ্রুত কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

বিদ্যুতস্পৃষ্টের মত ঘুরল হাসান তারিক। বলল, 'এ জন্যেই সে চাবি নিয়ে নেমে গেছে।'

আহমদ মুসা পেছনটা দেখে জানালার কোণা দিয়ে সামনের দিকটা দেখার চেষ্টা করে বলল, 'হাসান তারিক, সামনে থেকেও দুটি গাড়ি আসছে। দুতিনশ গজের বেশি দূরে নয় ওরা। পেছনের পাঁচটা গাড়িও দুএকমিনিটের মধ্যে এসে পড়বে।'

'তার মানে লক করা গাড়িতে আমরা বন্দী হয়ে পড়েছি।' বলেই হাসান তারিক তার মেশিন রিভলবারটা তাক করল জানালা গুড়ো করে দেবার জন্যে।

আহমদ মুসা তাকে বাধা দিয়ে দ্রুত বলল, 'গুলী নয়, বাট দিয়ে ভেঙে ফেল। গুলীর শব্দ করে আমাদের অবস্থা ওদের জানাতে চাই না।'

হাসান তারিক মেশিন রিভলবারের বাঁট দিয়ে ভেঙে ফেলল জানালা।

ভাঙা জানালা দিয়ে ব্যাগগুলো আগে বাইরে ফেলে দিয়ে হাসান তারিক ও আহমদ মুসা বাইরে বেরিয়ে এল।

বের হয়েই আহমদ মুসা বলল, 'যতদূর ধারণা করি উত্তর দিকে কিছু দূরেই সাগর আর দক্ষিণে পার্বত্য এলাকা পার হলে পাওয়া যাবে বনাঞ্চল, তারপর লোকালয়। কোন দিকটা আমরা বেছে নেব হাসান তারিক?'

'আমার মতে দক্ষিণ দিক ভাইয়া।' হাসান তারিক বলল।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক গাড়ি ঘুরে গাড়ির দক্ষিন পাশে এসে দ্রুত রাস্তা থেকে নেমে একটা টিলার আড়াল নিয়ে দক্ষিন দিকে এগুলো।

দুদিক থেকে গাড়িগুলো তখন এসে পড়েছে।

আহমদ মুসাদের গাড়ির সামনে ও পিছনে দাঁড়াল ৭টি গাড়ির একটি বহর।

৭টি গাড়ি থেকে নামল ৪০ জনের একটি বিরাট দল। তাদের সাথে দুটি শিকারী কুকুর।

জীপ থেকে নেমে আসা দীর্ঘদেহী ঋজু শরীরের এবং উত্তেজিত চেহারার একজন লোক আহমদ মুসাদের গাড়ির ভেতরটায় একবার চোখ বুলিয়ে ভাঙা জানালা দেখে সবার উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলল, 'কোন দিকে গেছে দেখ। শয়তানদের কিছুতেই পালাতে দেয়া যাবে না।'

দুটি কুকুর ধরে রাখা দুজন লোক তাদের হাতের ইনভেলাপ থেকে দুখন্ড কাপড় বের করে কুকুর দুটিকে দিয়ে তা শুকিয়ে নিল এবং কুকুর দুটিকে বেঁধে রাখা দড়ির শেষ প্রান্ত ধরে রেখে পুরো দড়ি ছেড়ে দিল।

সংগে সংগেই কুকুর দুটি গাড়ি ঘুরে উত্তর পাশ থেকে দক্ষিণ পাশে গিয়ে ছুটতে শুরু করল দক্ষিণ দিকে। কুকুরের দড়ি ধরে রাখা লোক দু'জনও ছুটল তার সাথে। অবশিষ্ট আটত্রিশজনও তাদের পিছনে চলতে লাগল।

সেই লম্বা লোকটির নেতৃত্বে ওরা চলছে অস্ত্র বাগিয়ে জংগল যুদ্ধের ফরমেশন নিয়ে।

পিঠে ব্যাগ ঝুলিয়ে পথহীন পার্বত্য ভূমির উপর দিয়ে আহমদ মুসারাও চলছিল।

পার্বত্য ভূমি চড়াই-উৎরাই, পাহাড়ের টিলা, খাড়া ও গভীর উপত্যকা এবং গাছ ও ঝোপ-জংগলে ভরা। পথ চলা খুব কঠিন। কিন্তু খুশি হলো আহমদ মুসা। এই পরিবেশে WFA-এর লোকরা তাদের খুঁজে পাবে না। আহমদ মুসা চিন্তা করল, তারা জংগলের দিকে না গিয়ে পুবে 'লিজে' শহরের দিকে হাঁটা শুরু করতে পারে। কিন্তু আবার ভাবল, শত্রুদের গতিবিধি সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে শহরমুখী হওয়া তাদের ঠিক হবে না।

প্রায় ১ ঘন্টা চলার পর একটা উচ্চভূমির উপর বসল আহমদ মুসা ও হাসান তারিক।

উচ্চ ভূমিটা সমতল। ঝোপ ও বড় বড় গাছ-গাছড়ায় ভরা। বিশাল উচ্চ ভূমিটা পুরাকীর্তির কোন গড়ের মত। এই গড়টারই উত্তর প্রান্তে এসে বসেছে আহমদ মুসা ও হাসান তারিক। এখানে বসে পেছনে ফেলে আসা পার্বত্য অঞ্চলটার উপর চোখ রাখা যাচ্ছে। ওরা ফলো করছে না ফিরে গেছে এটা খুব জানা দরকার।

আহমদ মুসার এ চিন্তায় ছেদ পড়ল হাসান তারিকের কথায়। সে বলছিল, 'ভাইয়া, আমরা কাক ডাকা ভোরে খালি পেটে বেরিয়েছি। খাবার বিষয়টাও আমাদের ভাবনায় রাখা যায়।'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'তুমি ঠিক বলেছ হাসান তারিক। আমিও পেটকে বুঝাতে পারছি না। কিন্তু কি খাবে? ব্যাগের পকেটে আছে বিমান থেকে পাওয়া মাত্র কয়েকটা চকলেট।'

বলে আহমদ মুসা চকলেটগুলো বের করে হাসান তারিককে দিল, নিজেও নিল।

চকলেট মুখে দিয়ে হাসান তারিক বলল, 'ভাইয়া বুঝতে পারছি না, সাত গাড়ি লোক গেল কোথায়! আমাদের ফলো না করে ওরা ফিরে যাবে এটা কি স্বাভাবিক?'

'না, স্বাভাবিক নয়।' আহমদ মুসা বলল।

কথা শেষ হতেই আহমদ মুসার কানে এল একটা অপ্রত্যাশিত শব্দ। একটা কুকুরের কণ্ঠ শব্দ তুলতে গিয়েও আকস্মিকভাবে রুদ্ধ হয়ে গেল।

চমকে উঠল আহমদ মুসা।

হঠাৎ একটা চিন্তা তার মাথায় ঝিলিক দিয়ে উঠল। ওরা কি কুকুর নিয়ে এগুচ্ছে? ওরা কি আহমদ মুসাদের দেখতে পেয়েছে? উৎসাহী কুকুরকে সামলাবার জন্যেই কি ঐভাবে তার মুখ চেপে ধরতে হয়েছে?

এই চিন্তা তার মাথায় আসার সাথে সাথেই আহমদ মুসা বলে উঠল, 'হাসান তারিক, তাড়াতাড়ি আড়াল নাও। সম্ভবত আমরা শত্রুর চোখে পড়ে গেছি।'

বলে আহমদ মুসা নিজেও দ্রুত গড়িয়ে উচ্চভূমির প্রান্ত থেকে একটু ভেতরে সরে এল।

হাসান তারিকও গড়িয়ে একটা ঝোপের আড়ালে চলে এসেছে।

আড়ালে এসেই হাসান তারিক ছুটে এল আহমদ মুসার কাছে। বলল, 'কি ব্যাপার ভাইয়া?'

'আমি একটা কুকুরের অসমাপ্ত চিৎকার কানে শুনেছি। কেউ কুকুরের চিৎকারকে মাঝ পথে থামিয়ে দিয়েছে। আমার বিশ্বাস, আমাদের শত্রুরা কুকুরের দিক-নির্দেশনায় নিঃশব্দে আমাদের খুব কাছে এসে পৌছেছে।' বলল আহমদ মুসা।

'দুঃখিত, কুকুরের চিৎকারটা আমি খেয়াল করিনি। শব্দ কোন দিক থেকে এসেছে ভাইয়া?' হাসান তারিক বলল।

'উত্তর দিক। একদম এই সামনে থেকে। আমার মনে হয়, এই উচ্চভূমি যেখান থেকে উঠে এসেছে সে পর্যন্ত ওরা পৌছে গেছে।' বলল আহমদ মুসা।

'তার মানে ওরা এখন এই হাইল্যান্ডে ওঠার প্রস্তুতি নিচ্ছে।' হাসান তারিক বলল।

'আমার মনে হয় কুকুরকে অনুসরণ করে আমাদের হাতের মুঠোয় পাওয়া পর্যন্ত ওরা নিরবে এগুবে এবং তারপর আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।' বলল আহমদ মুসা।

‘আমরা কি করব এখন? আমরা কি আরও সামনে সরে যাব?’ হাসান তারিক বলল।

‘ওরা চায় আমাদেরকে ওদের টার্গেটের মধ্যে নিতে। আর আমরা চাইব ওদেরকে আমাদের টার্গেটের মধ্যে আনতে। এদিক থেকে আমরা যেখানে রয়েছি, সেটা আমাদের জন্যে ভালো জায়গা। আমাদের এ উচ্চভূমি থেকে যে ঢাল ওদের দিকে নেমে গেছে তা খুব ফ্ল্যাট এবং উন্মুক্ত। ছোট দুচারটা গাছ-গাছড়া ও ঘাস ছাড়া আর কিছু নেই। এই ঢালে তারা আত্মগোপনের কোন সুযোগ পাবে না এবং এই ঢাল দিয়েই তাদের উঠে আসতে হবে। পূর্ব দিকে উচ্চভূমির সাথে পাহাড় যুক্ত হয়েছে। ওদিক দিয়ে আসতে পারছে না। ঢাল ঘুরে পশ্চিম দিক হয়ে তাদের আসার কোন যুক্তি নেই। কারণ আমরা তাদের সম্বন্ধে জানতে পেরেছি এটা তারা জানে না এবং স্বাভাবিকভাবে কুকুর তাদের এই পথেই নিয়ে আসবে।’ বলল আহমদ মুসা।

হাসান তারিক হাসল। বলল, ‘আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আমাদের উপযুক্ত জায়গায় এনে ওদের মুখোমুখি করেছেন।’

আহমদ মুসা ঢালের প্রান্ত বরাবর এলাকা পর্যবেক্ষণ করে মাঝামাঝি জায়গায় একটা উঁচু স্থান দেখতে পেল। উঁচু জায়গাটা ঢালের একদম প্রান্তে বেদীর মত দেখতে এবং ওটা পরিকল্পিতভাবে তৈরি মনে হলো তার কাছে।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক ক্রলিং করে গিয়ে উঠল সেই বেদিতে। আহমদ মুসারা বেদিতে উঠতেই বিরাট আকারের দুটি বড় সাপ বেদি থেকে নেমে গেল।

বিস্মিত হলো আহমদ মুসা, বেদির মেঝেটা পাথরের। পাথরের জোড়াগুলো দিয়ে গাছ-গাছড়া উঠে পাথরগুলো ঢেকে দিয়েছে। বেদির উপর দুটি পাথরের বাটি। বাটিগুলো ভেজা দেখে ভ্রু কুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার। চারদিকে চাইল।

বেদির উত্তর প্রান্তে অবস্থান নিল আহমদ মুসারা। তারা খুশি হলো যে, গোটা ঢালটাই তাদের নজরে আসছে। অবশ্য ঢালের পশ্চিম প্রান্ত দক্ষিণ দিকে বেঁকে গেছে বলে শেষটা দেখা যাচ্ছে না।

বেশিক্ষণ বসতে হলো না আহমদ মুসাদের। দেখা গেল, ঠিক তাদের সোজাসুজি জংগলের ভেতর থেকে ঢালের গোড়ায় উঠে এল দুজন লোক। তাদের সামনে দুটি কুকুর। কুকুর দুটির দড়ি তাদের হাতে। কুকুর দুটি ডবলমার্চের ভংগিতে দৌড়াচ্ছে।

কুকুর স্কোয়াডের পরই বেরিয়ে এল মূল বাহিনী। হাতে ষ্টেনগান, কোমরে পিস্তল সজ্জিত বিরাট একটা দল। সংখ্যা ৪০ থেকে ৫০এর মধ্যে হবে বলে অনুমান করল আহমদ মুসা। রীতিমত যুদ্ধের আয়োজন। বিস্মিত হলো আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিকের মেশিন রিভলবার প্রস্তুত।

আহমদ মুসা তাকাল হাসান তারিকের দিকে। বলল, ‘ওরা ঢালের মাঝ বরাবর আসার আগে আমরা গুলী করব না।’

ওরা ঢালের মাঝ বরাবর এসে গেছে।

আহমদ মুসা তার এম-১০ মেশিন রিভলবার ডান হাতে রেখে বাম হাত দিয়ে পকেট থেকে আরও একটা রিভলবার বের করে ওদের মাথার উপর দিয়ে গুলী করল। সংগে সংগেই ওদের কয়েক ডজন ষ্টেনগান ও রিভলবার এক সাথে গর্জন করে উঠল আহমদ মুসার রিভলবারের শব্দ লক্ষ্যে। কিন্তু তাদের গুলীগুলো প্রায় ৪০ ডিগ্রী কোণে মাথার উপর দিয়ে চলে গেল।

ওদের গুলীর প্রথম ধাপ আহমদ মুসাদের অতিক্রম করার সাথে সাথেই আহমদ মুসা ও হাসান তারিকের মেশিন রিভলবার গর্জন করে উঠল এবং ঘুরতে লাগল দলটির উপর দিয়ে।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড। দলটির সবাই ভূমি শয্যা নিল।

কয়েকটি দেহ ঢাল বেয়ে গড়িয়ে জংগলে ঢুকে গেল।

অন্যগুলো নির্জীব পড়ে থাকল ঢালের উপর।

ঢাল থেকে দেহগুলো জংগলে গড়িয়ে যাবার পর পরই ওদিক থেকে আহমদ মুসাদের উচ্চভূমি লক্ষ্যে অনিয়মিত ব্যবধানে গুলী আসতে লাগল।

আহমদ মুসারা গুলী খরচ না করে অপেক্ষা করার নীতি অনুসরণ করল। ওখানে বসে গুলী করে ওদের লাভ নেই। সামনে এগুতেই হবে ওদের। সেই সময়ের অপেক্ষা করতে লাগল ওরা।

পল পল করে সময় পার হয়ে যাচ্ছে। ওপার থেকে সেই অনিয়মিত গুলী একটানা চলছেই।

বিরক্তি ও বিস্ময় কিছুটা আচ্ছন্ন করেছে আহমদ মুসাকে। অর্থহীন ও অব্যাহত এই গুলীর অর্থ কি? এমন কি নিহত-আহতদের নিয়ে যাবারও ওরা চেষ্টা করছে না!

এ সময় আহমদ মুসাদের ঠিক পেছনে অনেকখানি উপরে শূন্য থেকে দুটি কারবাইন হ্যান্ড মেশিনগান গর্জন করে উঠল।

আকাশ থেকে পড়ার মত প্রবল শক খেয়ে আহমদ মুসা ও হাসান তারিক দুজনেই পেছন ফিরে তাকাল।

# ২

বেদিতে উঠতে উঠতে ভ্যানিসা গনজালো বলল, ‘ভাইয়া, গত মাসে আমরা আসতে পারিনি। তাতেই দেখো মনে হচ্ছে বেদিটা জংগলে ভরে গেছে। এ রকম তো হওয়ার কথা ছিল না।’

সার্গিও গনজালোও বেদিতে উঠছিল ভেনিসার সাথে। বলল, ‘ভিয়েনীরা এসেছিল তো। মনে হয় ওরা বেদিটা পরিষ্কার করে যায়নি।’

‘তাই হবে। আজ আমাদের সংগ্রামের শক্তিরা দুধ খেয়ে যাবার পর আমরা বেদিটা পরিষ্কার করব ভাইয়া’। বলল ভ্যানিসা গনজালো।

‘আমিও তাই ভাবছি।’ বলল সার্গিও গনজালো।

দুজনেই উঠল বেদিতে।

দুজনের হাতেই দুটা কারবাইন শ্রেণীর ক্ষুদ্র সাবমেশিনগান। দুজনেই হাতের সাবমেশিনগান কাঁধে ঝুলিয়ে কাঁধের থলে থেকে বের করল প্লাষ্টিকের একটা পট। পটের মুখ খুলতে খুলতে ওরা দুজনে গেল বেদির মাঝখানে রাখা দুটো পাথরের বড় বাটির দিকে। পটের মুখ খুলে ওরা দুজন পাথরের দুই বাটিতে পটের সবটুকু দুধ ঢেলে দিল।

পটের মুখ বন্ধ করে কাঁধের ঝুলানো ব্যাগে রেখে দুজনেই কাঁধ থেকে সাবমেশিনগান হাতে নিল এবং দুজনেই সাবমেশিনগানের ব্যারেল বাটির দুধে ডোবাল। তারপর আবার সাবমেশিনগান কাঁধে ঝুলিয়ে দ্রুত নেমে এল বেদি থেকে।

দুজনেরই পরনে ফুল সামরিক পোশাক। কাঁধের সাবমেশিনগান ছাড়াও ওদের কোমরে একদিকে ঝুলানো রিভলবার, অন্যদিকে খাপবদ্ধ ছুরি।

দুজনের মাথায় সামরিক টুপি।

দুজনে ওরা ভাই বোন। আজোরস দ্বীপপুঞ্জের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা। এ কারণেই পতুর্গীজ আইনে গনজালো বংশ বিদ্রোহী পরিবার। আজোরস

দ্বীপপুঞ্জের পর্তুগীজ আইন ও পুলিশ এই পরিবারের সন্ধানে সর্বক্ষণ পই পই করে ঘুরছে।

বেদি থেকে নেমে সার্গিও এগোচ্ছিল দক্ষিণ দিকে।

ভ্যানিসা গনজালো বলল, 'ভাইয়া, বেদিটা গাছ-গাছড়ায় ছেয়ে গেছে। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে বেদিতে আমাদের অতিথিদের আসা-যাওয়া দেখি, সেখান থেকে আজ বেদির কিছুই দেখা যাবে না।'

'তাহলে।' থমকে দাঁড়িয়ে বলল সার্গিও গনজালো।

'চল এই গাছটায় উঠে যাই। ওখান থেকে ভালো করে দেখতে পাব।' বলল ভ্যানিসা গনজালো।

'ঠিক, ভ্যানিসা গাছে ওঠা যায়। সব ভালো করে দেখা যাবে। কিন্তু তুমি গাছে উঠতে পারবে তো?' সার্গিও গনজালো বলল।

'কি বলছ ভাইয়া। তুমি কি নতুন হলে নাকি?' বলল ভ্যানিসা গনজালো।

'ঠিক আছে। চলো।' বলে সার্গিও গনজালো গাছের দিকে এগোলো।

বেদির পুবপাশে একটা উঁচু গাছে তারা উঠে বসল। ওখান থেকে উচ্চভূমির বিরাট এলাকাসহ উত্তর দিকে নেমে যাওয়া ঢালকেও পরিষ্কার দেখা যায়।

ওরা বেদিকে সামনে রেখে পশ্চিমমুখী হয়ে বসল।

তারা গাছে উঠে বসার পর দশ মিনিটও গেল না। পূব দিক থেকে এক জোড়া দীর্ঘ সাপ এক সাথে এসে বেদিতে উঠল। এগুলো তারা দুধ ভর্তি পাথরের বাটির দিকে। সাপ দুটি দুবাটি থেকে দুধ খাওয়া শুরু করল।

গাছে বসে দুভাইবোন সার্গিও ও ভ্যানিসা আনন্দের সাথে দেখছিল এই দৃশ্য। দৃশ্যটা দেখতে দেখতে সার্গিও গনজালো বলে উঠল, 'আমাদের চার পুরুষ সাপেরও চার পুরুষ ধরে এই দৃশ্য এভাবেই দেখে হয়ে আসছে। এই সাপরা আমাদের শক্তি ছাড়া, সংগ্রাম ও ঐতিহ্যের প্রতীক।'

'কিন্তু ভাইয়া, সাপের অব্যর্থ ছোবলের মত আমরা শত্রুর উপর অব্যর্থ আঘাত হানতে পারছি কই? আমরা এগুতে পারছি না কেন?' বলল ভ্যানিসা।

সার্গিও কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু ভ্যানিসার চোখ ঢালের উপর পড়তেই ভূত দেখার মত চমকে উঠে সার্গিওর মুখ চেপে ধরে বলল, 'ঢালের দিকে দেখ ভাইয়া।'

সংগে সংগেই সার্গিও চোখ ফেরালো ঢালের দিকে।

দেখলো দুজন লোক পাশাপাশি ঢাল বেয়ে দ্রুত উঠে আসছে।

ভ্রুকুঞ্চিত হলো সার্গিও গনজালোর। ফিস ফিস করে বলল ভ্যানিসাকে, 'দুজনের কেউ এদেশের নয়, ইউরোপেরও নয়।'

'তাহলে কোথাকার?'

'এশিয়ান মনে হচ্ছে ভ্যানিসা আমার কাছে।'

'তাহলে ওরা আমাদের শত্রু হওয়ার কথা নয়। কিন্তু ভাইয়া দুজনের হাতেই তো মেশিন রিভলবার?'

'আসলেই এশিয়ানরা আমাদের শত্রু হবার কথা নয়। কিন্তু ওরা যেহেতু অস্ত্রধারী সেহেতু শত্রু হতেও পারে। আর ওদের চলার ভংগি দেখে মনে হচ্ছে অস্ত্র তারা কারো না কারো বিরুদ্ধেই বহন করছে। তাদের সেই শত্রু কে? আমরাও হতে পারি। আর আমাদেরই রাজ্যের মধ্যে এখন ওরা।' বলল সার্গিও।

লোক দু'জন তখন উচ্চভূমির প্রান্তে উঠে এসেছে। বসল তারা। কিন্তু উন্মুক্ত জায়গায় না বসে ছোট গাছ-গাছড়ার মধ্যে বসল।

নিচু কণ্ঠে তারা কথা বলছিল। মাঝে মাঝেই উঁকি দিচ্ছিল ঢালের দিকে। হঠাৎ এক সময় তারা নিচের উপত্যকার দিকে তাকিয়ে দ্রুত গড়িয়ে উচ্চভূমির প্রান্ত থেকে কিছুটা ভেতরে গাছ-গাছড়ার আরও আড়ালে সরে এল।

উৎকর্ণ হয়ে উঠল সার্গিও। বলল ফিসফিস করে, 'নিচে উপত্যকায় মনে হয় কুকুরের চিৎকার শুনলাম। মনে হয় ওরা দুজনও শুনতে পেয়েছে কুকুরের চিৎকার। এ জন্যেই গড়িয়ে ওরা আরও আড়ালে সরে এল। নিশ্চয় ওরা কারো তাড়া খেয়ে পালিয়ে আসছে এবং তাড়াকারীরা নিচের উপত্যকায় পৌছে গেছে।'

'কিন্তু ভাইয়া এদের চোখে-মুখে তো পলাতকদের মত ভয় ও উদ্বেগ নেই!' বলল ভ্যানিসা।

'তা ঠিক। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে তারা পলাতক নয়।' সার্গিও বলল।

ওরা এ সময় দেখল, লোক দু'জন বেদির দিকে এগুচ্ছে।

আঁৎকে উঠল ভ্যানিসা। ফিসফিস করে বলল, 'ভাইয়া, আমাদের মেহমান সর্পরাজরা তো এখনও বেদিতে!'

'আমরা দর্শক, যা ঘটবে তা ঘটতে দাও। পাপ করলে পাপের সাজা ওদের পেতে হবে।' বলল সার্গিও।

লোক দুজন তখন বেদিতে উঠছিল।

সার্গিও ও ভ্যানিসা বিস্ময়ের সাথে দেখল, সাপ দুটি বেদির দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে সারি বেধে নেমে চলে গেল।

তাদের বিস্ময়ের বড় কারণ হলো, প্রতিদিন সাপ দুটো দুধ খাওয়ার জন্য যেমন বেদিতে উঠে আসে পূর্ব প্রান্ত দিয়ে দুধ খাওয়ার পর নেমেও যায় তেমনি পূর্ব প্রান্ত দিয়ে। কিন্তু আজ প্রথমবার ওরা নামল দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে।

তার মানে তাদের মেহমান সাপ দুটো আপোশ করল লোক দুজনের সাথে, ভাবল সার্গিও। লোক দুজন বেদিতে উঠার আগেই যেমন সাপ দুটো চলে গেল, তেমনি ভিন্ন রাস্তা দিয়ে গেল একই রাস্তা ব্যবহারের সংঘাত এড়িয়ে।

'ভাইয়া, কি বুঝলে?' বলল ভ্যানিসা।

'বুঝলাম, এ দুজন আমাদের শত্রু নয়, বা আমাদের জন্যে ক্ষতিকর নয়।' বলল সার্গিও।

'আমারও তাই মত। আর ওদের দুজনের চেহারা কোনও ভাবেই ক্রিমিনালের মত নয়। নিরীহ, নিষ্পাপ ভদ্রলোক বলেই ওদের মনে হয়।' বলল ভ্যানিসা।

কথা শেষ করেই ভ্যানিসা আবার চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'ভাইয়া দেখ, ওরা দুজন ওদের মেশিন রিভলবার বাগিয়ে যুদ্ধের পজিশন নিয়ে বসে আছে।'

সাপ দুটো ঠিক পথে গেল কিনা দেখছিল সার্গিও। ভ্যানিসার কথায় সে মুখ ফিরাল, দেখল, লোক দুজন বেদির উত্তর প্রান্তে গাছ-গাছড়ার আড়াল নিয়ে ঢালের দিকে তাদের রিভলবার তাক করে বসে আছে।

এক মিনিটও পার হলো না।

নিচের উপত্যকার জংগল থেকে দুটি কুকুর নিয়ে ষ্টেনগানধারী দুজন লোক বেরিয়ে এল। তারা উঠতে শুরু করল ঢাল বেয়ে।

তাদের পেছনে পেছনে বেরিয়ে এল চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ জনের বিশাল বাহিনী। প্রত্যেকের হাতেই উদ্যত ষ্টেনগান। মনে হচ্ছে একদল যোদ্ধা এগুচ্ছে যুদ্ধের জন্যে।

'তাহলে ওরাই তাড়া করে নিয়ে আসছে এ দুজনকে?' বলল ভ্যানিসা ফিসফিস করে সার্গিওর উদ্দেশ্যে।

'ভাবছি, এ দুজন বিদেশী। কিন্তু ওরা কারা? কি নিয়ে এই লড়াই?' ধীরে ধীরে চাপা কণ্ঠে বলল ভ্যানিসা।

'দূর থেকে দেখে যতটা বুঝা যাচ্ছে, তাতে সবাইকেই তো এদেশী বলে মনে হচ্ছে।' বলল সার্গিও।

লোক দুজন রিভলবার বাগিয়ে বসে আছে। আর ওরা ঢাল বেয়ে উঠে আসছে।

'দুই রিভলবার দিয়ে ওদের সাথে কিভাবে এরা লড়াই করবে, এরা এতদূর পালিয়ে এল, কিন্তু এখন আবার রুখে দাঁড়াল কেন?' ভ্যানিসা বলল।

'এদের ষ্ট্রাটেজিক জ্ঞান খুব টনটনে ভ্যানিসা। এরা খুবই সুবিধাজনক অবস্থান বেছে নিয়েছে। এ রকম জায়গা এদের সামনেও ছিল না, পেছনেও নেই।' বলল সার্গিও।

'কিন্তু এরা এভাবে বসে কেন? ওদের এগুতে দিচ্ছে কেন?' চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে বলল ভ্যানিসা।

ওরা তখন ঢালের মাঝামাঝি জায়গায় বসে আছে।

ওদের দিকে তাক করে বসা এদের একজন এ সময় ওদের দিকে একটা ফাঁকা গুলী করল সাধারণ রিভলবার থেকে। উত্তরে ওরা সংগে সংগে একসাথে গুলী বৃষ্টি শুরু করল বেদি লক্ষ্যে। এরাও বেদির উপর শুয়ে পড়ে তাদের দুই মেশিন রিভলবারের ট্রিগার টিপে ওদের উপর ঘুরিয়ে নিতে লাগল। মাত্র কয়েক সেকেন্ড। ওদিক থেকে গুলী ছোড়া বন্ধ হয়ে গেল। ঢালে আর কাউকেই দাঁড়ানো দেখা গেল না।

ওদিকের গুলী বন্ধ হলে এরাও গুলী ছোড়া বন্ধ করে দিল এবং উঠে বসল বেদির উপর।

'কি আশ্চর্য, ওরা কি সবাই মরে গেল?' প্রশ্ন তুলল ভ্যানিসা।

'বলেছিলাম না ভ্যানিসা। এরা খুব কুশলী। উপযুক্ত জায়গা বেছে নিয়েছে। আবার ওদের নিয়েও এসেছে ঢালের মাঝখানে, তারপর আক্রমণ করেছে। যাতে পালাতে না পারে।' সার্গিও বলল।

'না ভাইয়া, এরা প্রথম আক্রমণ করেনি। ঢাল থেকে ওরাই প্রথম আক্রমণ করেছিল। কিন্তু ভাইয়া, এরা ঐ একটা ফাঁকা গুলী কেন করেছিল?'

'ঠিক জানি না। হতে পারে ওদেরকে প্রথমে আক্রমণে আনা অথবা হটিয়ে দেয়ার জন্যে।'

'ওদেরকে এরা আক্রমণে আনতে চাইবে কেন?' আবার জিজ্ঞাসা ভ্যানিসার।

'আমিও ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না ভ্যানিসা।' বলল সার্গিও।

'কিন্তু এরা এখন কিসের অপেক্ষা করছে। ঢালে তো এখন নেমে যেতে পারে। যুদ্ধ জয় তো হয়েই গেছে।' বলল ভ্যানিসা।

'বোধ হয় এরা আশংকা করছে, উপত্যকায় ওদের শত্রু পক্ষের লোক আরও আছে।' সার্গিও বলল।

কিছু বলতে গিয়েও তার মুখ দিয়ে আর কথা বেরুল না। সে দেখল, পশ্চিম দিক থেকে দুজন ষ্টেনগানধারী বেদির পেছন পর্যন্ত এসে পৌছেছে।

ভ্যানিসা চাপা কণ্ঠে দ্রুত বলল, 'ভাইয়া, বেদির পেছনে।'

সার্গিও তাকিয়েছিল ঢালের দিকে। সে তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরাল বেদির পেছনে। দেখতে পেল দুজন ষ্টেনগানধারীকে। তাদের ষ্টেনগানের ব্যারেল তখন লোক দুটিকে লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে।

দেখেই চাপা কণ্ঠে 'ভ্যানিসা........' বলতে বলতেই সার্গিও তার কারবাইনের ট্রিগার চেপে ধরল ঐ দুজন ষ্টেনগাধারীর লক্ষ্যে।

ভ্যানিসাও আগেই তার কারবাইন ঘুরিয়ে নিয়েছিল। সার্গিওর সাথে তারও কারবাইন গর্জন করে উঠেছিল।

দুজন ষ্টেনগানধারীর ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া দেহ ঝরে পড়ল মাটিতে।

সার্গিও ও ভ্যানিসা দেখল সেই লোক দুজন প্রথমেই গাছে চড়ে থাকা তাদের দিকেই ফিরে তাকিয়েছে। তারপর ধীরে ধীরে তাদের দৃষ্টি ঘুরে গেল বেদির পেছনে পড়ে থাকা লাশ দুটির দিকে। তারা বেদির দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত এগিয়ে লাশ দুটিকে দেখল। আবার তাদের চোখ উঠে এসে নিবদ্ধ হলো সার্গিওদের উপর।

লোক দুজনের একজন আহমদ মুসা, সার্গিওদের উদ্দেশ্যে পর্তুগীজ ভাষায় বলল, 'ধন্যবাদ। আপনারা দুজনকে হত্যা করে আমাদের দুজনের প্রাণ বাঁচিয়েছেন। অথচ আপনারা ওদের কিংবা আমাদের কাউকেই চেনেন না।'

সার্গিওরা নেমে এল। সার্গিও বলল আহমদ মুসার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, 'আমরা ওদেরকে বা আপনাদেরকে চিনি না বটে। কিন্তু আক্রমণকারী কে আর আক্রান্ত কে তা আমরা দেখেছি। আমরা আক্রান্তকে সাহায্য করেছি।'

'অপরাধী আক্রমণকারীরা হয়, কিন্তু আক্রান্তরাও হতে পারে।' আহমদ মুসা বলল।

'তা হতে পারে। তবে আমাদের সে ভুল হয়নি, আপনার কথায় নিশ্চিত হলাম।' বলল সার্গিও।

'ধন্যবাদ। প্রথমে আমার মনে হয়েছিল আপনারা যেন স্বর্গের দূত। আমাদের রক্ষার জন্যে দয়া করে ঈশ্বর আপনাদের পাঠিয়েছেন। আমার বিস্ময় এখনও যায়নি। এখানে আপনারা এলেন কি করে? দয়া করে আপনাদের পরিচয় দেবেন?' আহমদ মুসা বলল।

'আমি সার্গিও গনজালো।' বলল সার্গিও। তারপর ভ্যানিসাকে দেখিয়ে বলল, 'এ আমার সহোদরা ছোট বোন ভ্যানিসা গনজালো। আমরা এ এলাকার। এর বেশি কিছু বলার আগে আপনারা কে তা আমাদের জানা প্রয়োজন।'

'আমরা বিদেশী। লিজে বিমান বন্দরে নামার পর যাচ্ছিলাম 'গঞ্জালেস ইন্টারন্যাশনাল হোটেলে' থাকার জন্যে।'

বলে একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর হোটেলের পথে তাদের কিডন্যাপ এবং হত্যা প্রচেষ্টাসহ গাড়ির জানালা ভেঙে তাদের পলায়নের সব কথা খুলে বলল।

‘আপনারা বিদেশী। আপনাদের সাথে ওদের শত্রুতা কেন? ওরা কারা?’ বলল ভ্যানিসা।

‘ওয়ার্ল্ড ফ্রিডম আর্মি’ (WFA) এর সাথে আপনাদের পরিচয় আছে?’ আহমদ মুসা সার্গিও ও ভ্যানিসা দুজনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল।

উত্তরে সার্গিও বলল, ‘পরিচয় নেই, তবে জানি আমরা ঐ সংগঠনকে। সংগঠনটা চরম ইহুদীবাদী। গোটা দুনিয়া দখলের দুঃস্বপ্ন ওদের। আজর ওয়াইজম্যান ওদের নেতা।’

‘ধন্যবাদ মি. সার্গিও। আপনারাতো দেখছি ওদের অনেক কিছুই জানেন। ওদের.......।’ আহমদ মুসার কথা সমাপ্ত হতে পারলো না।

আহমদ মুসাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে সার্গিও আবার বলে উঠল, ‘আজোরসের পর্তুগীজ গভর্নর ‘পেড্রো’র স্ত্রী ‘ক্রিষ্টিন করণিকা’ ইহুদী। এই সুবাদে WFA এখানে ব্যাপক সুবিধা নিচ্ছে। কিন্তু আপনাদের সাথে WFA এর শত্রুতা কিসের? আপনাদের পরিচয় কিন্তু বলেননি।’

আহমদ মুসা একটু ভাবল। তারপর মুখ তুলল সার্গিওর দিকে। গভীর দৃষ্টিতে একবার সে দেখল সার্গিওকে।

উত্তর দিতে কিছু দেরি হলো আহমদ মুসার।

হাসল সার্গিও। বলল, ‘বুঝেছি, বিশ্বাস করতে পারছেন না আমাদের।’

আহমদ মুসা সলজ্জ হাসল। বলল, ‘স্যরি, এটা অবিশ্বাস নয়, সতর্কতা। বিশেষ পরিস্থিতিতে এটা সবাইকেই করতে হয়। যেমন আপনারাও আপনাদের সবটা পরিচয় আমাদের কাছে দিতে পারেননি।’

আবার হাসল সার্গিও। বলল, ‘কিছু পরিচয় আমরা গোপন রেখেছি বলে কি আপনি মনে করেন?’

ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল আহমদ মুসার। বলল, ‘আপনারা ব্যক্তি পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু দলীয় বা সাংগঠনিক একটা পরিচয় আপনাদের আছে সেটা দেননি।’

‘কি করে বুঝলেন আমাদের একটা সাংগঠনিক পরিচয়ও আছে?’ গম্ভীর কণ্ঠস্বর সার্গিওর।

'আপনাদের ইউনিফরম ব্যক্তিগত নয়, নিশ্চয় কোন দল বা সংগঠনের। বিশেষ করে আপনাদের ইউনিফরমের বুকে উদীয়মান সূর্যের আলোকস্নাত আজোরস দ্বীপপুঞ্জের যে ইনসিগনিয়া সেটা ব্যক্তিগত নয় অবশ্যই। আপনাদের কারবাইনেও ঐ একই ইনসিগনিয়া আমি দেখতে পেয়েছি। এর অর্থ এই অস্ত্রগুলোও আপনাদের ব্যক্তিগত নয়।'

সার্গিও ও ভ্যানিসার চোখে-মুখে অপার বিস্ময়। তাদের দুজনেরই গভীর বিস্ময় দৃষ্টি আহমদ মুসার উপর নিবদ্ধ। বলে উঠল সার্গিও গম্ভীর কণ্ঠে, 'আপনাদের পরিচয়ের ব্যাপারে খুব আগ্রহী ছিলাম না। কিন্তু এখন আপনার পরিচয় জানার কৌতূহল দমন করা কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না। এ রকম সুক্ষ ও সার্বিক দৃষ্টিওয়ালা লোককে আমি শার্লক হোমস-এর বইতে দেখেছি, আর আজ আপনাকে জীবন্ত দেখলাম। অতএব এখন আপনার পরিচয় জানতেই হবে। তার আগে আমাদের ছোট্ট পরিচয়টা বলছি।'

বলে একটু থামল সার্গিও। একটু মাথা নিচু করল। মাথা তুলল পরক্ষণেই এবং বলা শুরু করল, 'ইনসিগনিয়ার উদীয়মান সূর্যটা স্বাধীনতার সূর্য। আমরা চাই আমাদের গোটা আজোরস স্বাধীনতা সূর্যের সোনালী আলোক ধারায় সণাত হোক। আমাদের সংগঠেনর নাম..........'

সার্গিও'র মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে আহমদ মুসা বলে উঠল, 'আজোরস ইনডিপেনডেন্ট পিপল' (AIP)।

হাসল সার্গিও। বলল, 'আমি বিস্মিত হলাম না। কারণ আপনি নতুন এক শার্লক হোমস। অতএব আজোরস দ্বীপপুঞ্জের স্বাধীনতা সংগ্রামের নাম জানা আপনার জন্যে বড় কথা নয়।'

বলে একটু থেমেই আবার শুরু করল, 'আজোরসের স্বাধীনতা সংগ্রামে 'আজোরস ইনডিপেনডেন্ট পিপল (AIP) -কে নেতৃত্ব দিচ্ছে আজোরস দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কারক এবং এখানে প্রথম বসতিস্থাপনকারী গনজালো পরিবার। আমরা সেই 'গনজালো' পরিবারের সদস্য। আমার বড়ভাই রিকার্ডো এখানকার পর্তুগীজ সরকারের হাতে বন্দী হবার পর আমি আন্দোলনকে দেখাশূনা করার দায়িত্ব পালন করছি।' থামল সার্গিও।

থেমেই আবার বলে উঠল, 'আমাদের সব কথা বলেছি। এবার আপনাদের কথা বলুন।'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'আমাদের কথা খুব বেশি নয়। WFA কিছু লোককে এই দ্বীপপুঞ্জের কোন এক দ্বীপে বন্দী করে রেখেছে। আমরা এসেছি তাদের উদ্ধার করতে।'

'বন্দী করেছে তারা কারা?' জিজ্ঞাসা ভ্যানিসার।

'ওরা কয়েকজন একটি গোয়েন্দা ফার্মের কর্মকর্তা। ওদের গোয়েন্দা ফার্ম WFA ধ্বংস করে দিয়েছে এবং তার ৭ জন কর্মকর্তাকে কিডন্যাপ করেছে।' আহমদ মুসা বলল।

'সেই ফার্ম কি ফ্রান্সের ষ্ট্রাসবার্গের স্পুটনিক?' বলল ত্বরিত কণ্ঠে ভ্যানিসা।

'হ্যাঁ, তুমি জানলে কেমন করে?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'আমি ঐ সময় ফ্রান্সে ছিলাম। লা-মন্ডেতে ঐ নিউজ আমি পড়েছি। স্পুটনিকের গোয়েন্দারা দেড় যুগ আগের নিউইয়র্কের টুইন-টাওয়ার ধ্বংসের কার্যকরণ অনুসন্ধান করছিল।' বলল ভ্যানিসা।

'কিন্তু WFA এই গোয়েন্দাদের প্রতিষ্ঠান ধ্বংস ও গোয়েন্দাদের কিডন্যাপ করল কেন?' ভ্যানিসা থামতেই বলে উঠল সার্গিও।

'আপনার প্রশ্নের উত্তর হিসেবে, 'ঠাকুর ঘরে কেরে, আমি কলা খাইনি' এই প্রবাদ প্রযোজ্য।'

বিস্ময় ফুটে উঠল সার্গিওর চোখে-মুখে। বলল, 'তার মানে WFA টুইন টাওয়ার ধ্বংসের তদন্ত বানচাল করার জন্যে স্পুটনিক ধ্বংস করেছে এবং তার ৭ গোয়েন্দাকে কিডন্যাপ করেছে?'

'ওদের ভূমিকা তো তাই প্রমাণ করছে।' আহমদ মুসা বলল।

'আরও একটা মজার খবর আছে, যেদিন স্পুটনিক ধ্বংস হয়, তার একদিন পর ইসরাইল রেডিওর দেশরক্ষা বিভাগের একটা সমীক্ষায় মন্তব্য করা হয় যে, 'স্পুটনিকের সব কাজের মধ্যে একটা সাম্প্রদায়িক লক্ষ্য আছে। দেড় যুগেরও বেশি পর তারা টুইন টাওয়ার ধ্বংস নিয়ে যে কাজ করছে, তাও সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুসলমানদের ভীষণ একগুয়েমি এবং

বর্তমান মার্কিন সরকারের প্রশ্রয়েই টুইন টাওয়ার ধ্বংসের মত ডেড ইস্যু নিয়ে স্পুটনিক কাজ করার সুযোগ পেয়েছে।' মার্কিন সরকারও স্পুটনিকের যোগসাজসে পরিচালিত এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিশ্ব বিবেককে রুখে দাঁড়াবার জন্যে আহবান জানায়।' বলল হাসান তারিক।

'হ্যাঁ, ইসরাইল সরকারের এই প্রতিক্রিয়াও প্রমাণ করছে, টুইন টাওয়ার ধ্বংসের বিষয়ে কোন কার্যকর তদন্ত হোক তা তারা চায় না। এই না চাওয়ার অর্থ এই ধরা যায় যে, টুইন টাওয়ার ধ্বংসের সাথে সংশিস্নষ্ট কোন সত্য তারা গোপন করতে চায়।' সার্গিও বলল।

'হ্যাঁ, স্পুটনিক ধ্বংস হওয়া এবং তার গোয়েন্দারা কিডন্যাপ হওয়ার এটাই কারণ।' বলল আহমদ মুসা।

'আপনারা কি স্পুটনিকের লোক?' জিজ্ঞাসা সার্গিওর।

'না, আমরা স্পুটনিকের লোক নই। আমরা স্পুটনিকের শুভাকাংখী। এতবড় অন্যায়ের প্রতিবিধান হওয়া উচিত বলেই আমরা কাজে নেমেছি।' আহমদ মুসা বলল।

'আপনার তাহলে কে?' জিজ্ঞেস করল ভ্যানিসা।

আহমদ মুসা একটু হাসল। হাসান তারিককে দেখিয়ে বলল, 'ইনি ফিলিস্তিন বিপ্লবের একজন নেতা। এখন ফিলিস্তিন সরকারের একজন উপদেষ্টা। নাম হাসান তারিক।'

বলে আহমদ মুসা একটু থামল। থেমেই আবার বলল, 'আর আমার নাম আহমদ মুসা। হাসান তারিকের মত আমার বিশেষ কোন পরিচয় নেই।'

'আহমদ মুসা' নাম শুনে সার্গিও ও ভ্যানিসা দুজনেরই কপাল কুঞ্চিত হয়ে উঠল। চোখে-মুখে ফুটে উঠল প্রবল জিজ্ঞাসা। ভ্যানিসাই প্রথম কথা বলে উঠল, 'কোন আহমদ মুসা? এই ক'দিন আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সুরিনামে যাকে নিয়ে মহা হৈ চৈ হয়ে গেল সেই আহমদ মুসা?' ভ্যানিসার কণ্ঠস্বর দ্রুত। যেন এক মুহূর্তেই সব কথা বলে ফেলতে চায়।

আহমদ মুসা কিছু বলার আগেই কথা বলে উঠল হাসান তারিক। বলল, 'হ্যাঁ, উনি সেই আহমদ মুসা। তবে হৈ চৈ শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও সুরিনামে নয়, চীন,

রাশিয়া, ককেশাস, ফ্রান্স, ফিলিস্তিন সব জায়গাতেই একটা করে ভূমিকম্প ঘটিয়েছেন তিনি।'

হাসান তারিক থামতেই সার্গিও ও ভ্যানিসা দুজনেই কোমর বাঁকিয়ে সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে আহমদ মুসাকে বাউ করে কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় একটা চালু ইঞ্জিনের শব্দ কানে এল।

থেমে গেল সার্গিও ও ভ্যানিসা। উৎকর্ণ হয়ে উঠল তারা।

আহমদ মুসাও উৎকর্ণ হয়ে উঠেছিল। মুহূর্ত কয়েক কান পেতেই সে বলে উঠল, 'দুটি হেলিকপ্টার আসছে এদিকে। আমার ধারণা মিথ্যা না হলে ওরা এখানেই ল্যান্ড করবে।'

বিস্ময় ফুটে উঠেছে সার্গিও ও ভ্যানিসার চোখে-মুখে। বলল সার্গিও, 'কেন আসবে হেলিকপ্টার, কার হেলিকপ্টার? আমি তো জানি WFA-এর কোন হেলিকপ্টার নেই।'

'ঠিক করে বলা মুষ্কিল। তবে আমি আন্দাজ করছি, WFA হেলিকপ্টার ভাড়া করেছে তার প্রেরিত বাহিনীর খোঁজ নেবার জন্যে।' আহমদ মুসা বলল।

'হেলিকপ্টারগুলো পুলিশের বলে মনে করছেন না কেন? WFA পুলিশকে বলে পুলিশের সাহায্য নিতে পারে। আমার মনে হয়, যে দু'জন লোক পেছন থেকে আক্রমণ করার জন্যে উপরে উঠে এসেছিল, তারাই মোবাইলে জানিয়ে দিয়েছিল তাদের বাহিনী ধ্বংস হয়ে যাবার কথা।' বলল সার্গিও।

'আমি WFA-কে যতটা জানি তাতে বলতে পারি, তারা এক্ষেত্রে পুলিশের সাহায্য নেবে না। এমনকি এতবড় ম্যাসাকারের কথা তারা পুলিশের কাছ থেকে গোপন করবে।' আহমদ মুসা বলল।

'কেন?' বলল সার্গিও।

'প্রথম কারণ, WFA তার এতবড় বিপর্যয় ও দুর্বলতার কথা পুলিশকে জানাতে চাইবে না। দ্বিতীয় কারণ, এ ধরনের বড় খুন-খারাবির কথা জানতে পারলে আইন-শৃঙ্খলার কারণেই পুলিশ WFA-এর কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারে বা তাদের উপর চোখ রাখতে পারে, এমন আশংকা করতে পারে WFA'রা।' আহমদ মুসা বলল।

সার্গিও ও ভ্যানিসা বিস্মিত চোখে তাকিয়ে আছে আহমদ মুসার দিকে। ধীরে ধীরে তাদের চোখে ফুটে উঠল মুগ্ধ দৃষ্টি। বলল সার্গিও, 'ধন্যবাদ মি. আহমদ মুসা। আপনার চিন্তাই ঠিক।'

বাক্যটা শেষ করেই মুহূর্তের জন্যে একটু থেমেই আবার বলে উঠল, 'এখন করণীয় কি, ঠিক করা দরকার। আমি মনে করি, হেলিকপ্টারগুলো যদি WFA-এরই হয়ে থাকে, তাহলে ওগুলো ল্যান্ড করার আগেই ধ্বংস করে দিতে পারি।'

'না মি. সার্গিও, আমরা যা বলছি সবই অনুমান। নিশ্চিত না হয়ে এতবড় পদক্ষেপে যাওয়া ঠিক হবে না। এমনও তো হতে পারে, পুলিশে ইনফরমেশন দিয়ে তাদের জ্ঞাতসারে এই হেলিকপ্টার দুটি পাঠাচ্ছে WFA, অথবা এই হেলিকপ্টারে দুএকজন পুলিশকেও তারা পাঠাচ্ছে। আমরা যদি হেলিকপ্টার ধ্বংস করি, আর যে দুটি বিকল্পের কথা আমি বললাম, তার যে কোন একটি যদি সত্য হয়, তাহলে পুলিশের সাথে সংঘাত আমাদের অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে। আমরা এই সংঘাত এখন এড়াতে চাই।' বলল আহমদ মুসা।

হাসল সার্গিও। বলল, 'ধন্যবাদ আপনাকে। আহমদ মুসার কথার পর আর কোন কথা চলে না। এখন বলুন আমাদের কি করণীয়। হেলিকপ্টারগুলো এসে পড়ল বলে।'

'এই উচ্চভূমির পাশে এমন কোথাও আমাদের আত্মগোপন করে অপেক্ষা করতে হবে, যেখান থেকে এই উচ্চ ভূমিটা দেখা যায়। ওদের এ ধারণা দিতে হবে যে, সংঘাতের পরেই এ স্থান ছেড়ে আমরা অন্য কোথাও চলে গেছি।'

'এর দ্বারা আমরা কি অর্জন করতে চাচ্ছি?' জিজ্ঞাসা সার্গিওর।

'নিরর্থক এই সংঘাত এড়ানোর চেষ্টা করা।' বলল আহমদ মুসা।

'নিরর্থক কেন?' ভ্যানিসা জিজ্ঞেস করল।

'এ সংঘাতে আমাদের জড়ানোর মধ্যে ওদের লক্ষ্য হলো আমাদের ক্ষতি করা, ধ্বংস করা। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য ওদের ধ্বংস করা নয়, আমাদের বন্দী লোকদের উদ্ধার করা। আমরা এই সংঘাতে জড়িয়ে পড়লে আমাদের লক্ষ্য অর্জন জটিলতর হবে। দ্বিতীয়ত, আমি চাই না এ সংঘাতে আপনারা আমাদের সাথে আছেন এটা কোনওভাবে তাদের জানার সুযোগ হোক।' বলল আহমদ মুসা।

'কেন চান না?' ভ্যানিসাই আবার জিজ্ঞেস করল।

'নতুন শত্রু সৃষ্টি করা আপনাদের ঠিক হবে না। আপনাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য WFA এখন কোন প্রত্যক্ষ শত্রু নয়, কিন্তু আমাদের হয়ে ওদের সাথে সংঘাতে নামলে আপনারাও শত্রু হয়ে যাবেন।' বলল আহমদ মুসা।

বিস্ময় ফুটে উঠেছে সার্গিও ও ভ্যানিসার চোখে-মুখে। বলল সার্গিও, 'আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে আপনি এর মধ্যেই এতটা ভাবছেন! যে লাভ-ক্ষতির কথা আমাদের মাথায় আসেনি, সেটাও আপনার ভাবনার বিষয়!'

বলে একটু হাসল সার্গিও। হাসিটার মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠল তার হৃদয়ের একরাশ বিমুগ্ধতা। সে কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই ভ্যানিসা বলে উঠল, 'পরকে আপনি এত আপন করে ভাবতে পারেন বলেই আপনি এত বড়, আপনার এত সাফল্য আহমদ মুসা। এমন মানুষের কাছেই মানুষ তার সবকিছু হারিয়ে বসতে পারে।' আবেগ-কম্পিত কণ্ঠ ভ্যানিসার।

ভ্যানিসা থামতেই আহমদ মুসা উৎকর্ণ হয়ে বলে উঠল, 'ওরা আরও কাছে এসে গেছে, আমাদের এখনি সরতে হবে।'

কিন্তু সার্গিও আহমদ মুসার কথায় ভ্রুক্ষেপ না করে ধীরে ধীরে বলে উঠল, 'এতদিন আমরা ভেবে এসেছি, যত পার শত্রুকে মার, তাতেই লাভ। কিন্তু আজ আপনার কাছে শিখলাম, লক্ষ্যকেই বড় করে দেখতে হবে। লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হয় না বা লক্ষ্য অর্জনকে জটিল করে তোলে এমন সংঘাত, হত্যাকান্ড অনর্থক, তাকে অবশ্যই এড়াতে হবে। এটা যে কত বড় শিক্ষা! ধন্যবাদ আপনাকে মি. আহমদ মুসা।'

'লক্ষ্যকে বড় করে দেখার অর্থ কিন্তু আবার এই নয় যে, লক্ষ্য অর্জনের জন্যে যা ইচ্ছা তাই করা যাবে। লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক নয় এমন অনর্থক কিংবা ক্ষতিকর সংঘাত সংঘর্ষ যেমন পরিত্যাজ্য, তেমনি নিছক লক্ষ্য অর্জনের স্বার্থে হলেও অযৌক্তিক ও অন্যায় হয় এমন কোন কাজ বা ঘটনাও ঘটানো যাবে না।' বলল আহমদ মুসা।

'কিন্তু আপনাদের WFA এবং আমাদের ক্ষেত্রে পর্তুগীজ সরকার কি এই নীতিবোধ মানছে?' জিজ্ঞেস করল সার্গিও।

‘তাদের লক্ষ্যই যেখানে অবৈধ, সেখানে তাদের পন্থার বৈধতা নিয়ে আলোচনা চলে না। কিন্তু আমার আপনার লক্ষ্য মহৎ, কোন অবৈধ পথ ও পন্থার ক্লেদ দিয়ে একে কলুষিত করা যাবে না।’ বলল আহমদ মুসা।

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা নড়ে উঠল। বলল, ‘চলুন মি. সার্গিও, কোন দিকে যেতে হবে।’

সম্বিত ফিরে পাওয়ার মত নড়ে উঠল সার্গিও। চলতে শুরু করে বলল, ‘আসুন, আপনি যেমন বলেছেন, তেমন ভালো শেল্টার আছে। ওখান থেকে সরে পড়ারও ভালো পথ আছে।’

সবার সাথে ভ্যানিসাও চলতে শুরু করেছে। হাঁটছে সে আহমদ মুসার পাশাপাশি। তার মুখ গম্ভীর। চলতে চলতে আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল সে, ‘লক্ষ্য অর্জনে যে পন্থার দিকে সবশেষে আপনি ইংগিত করেছেন, সেটা গ্রহণ করলে তো আমাদের সবাইকে ‘সেন্ট’ অন্য কথায় সাধু-সন্ত হতে হবে। অস্ত্র ধরা যাবে না। স্বাধীনতা সংগ্রামের তাহলে কি হবে?’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘তোমার লক্ষ্য স্বাধীনতা অর্জন, বন্দুক ধরা তোমার লক্ষ্য নয়। লক্ষ্যকে রক্ষার জন্যেই যখন বন্দুক ধরা প্রয়োজন তখন অবশ্যই বন্দুক ধরতে হবে। সাধু-সন্ত হলেও ধরতে হবে।’

হাসল ভ্যানিসা। বলল, ‘বুঝেছি। লক্ষ্য অর্জনে আপোশহীন হতে হবে, লক্ষ্য রক্ষার জন্যেই লড়াই করতে হবে।’

থামল ভ্যানিসা। থেমেই আবার বলে উঠল, ‘ইতিহাস সাক্ষী, আপনি মাঠের একজন বিপ্লবী। কিন্তু আবার মনে হচ্ছে আপনি নীতিবাগিশ দার্শনিক একজন সেইন্ট। এটা কি বৈপরিত্য নয়?’

‘আমরা মুসলমান। একজন মুসলিম একই সাথে গৃহী, পুলিশ এবং সৈনিক।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আপনি মুসলিম! ও, তাইতো আহমদ মুসা তো মুসলমানই।’ বলল ভ্যানিসা।

‘মন খারাপ হলো তোমার?’ বলল আহমদ মুসা ভ্যানিসাকে লক্ষ্য করে।

'মন খারাপ হবে কেন? বরং একটু ভালই লাগছে। আজোরস দ্বীপপুঞ্জের পর্তুগীজ সরকার আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিভেদ সৃষ্টি ও এই সংগ্রামে গনজালেস পরিবারের নেতৃত্ব নষ্ট করে একে দুর্বল করার জন্যে অপপ্রচার করে বেড়ায় যে, গনজালো পরিবার নাকি আদিতে মুসলিম ছিল। অপপ্রচার হলেও মুসলমানদের প্রতি কিছুটা আকর্ষণ তো আমাদের থাকবেই।' ভ্যানিসা বলল।

'অবাক খবর দিলে তুমি। আসল সত্যটা কি সার্গিও?' বলল আহমদ মুসা।

'আমরা এ ব্যাপারে কিছুই জানি না। অপপ্রচার নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন বোধ করিনি আমরা কোন সময়।' সার্গিও বলল।

হেলিকপ্টার দুটো এসে পড়েছে। দুএক মিনিটের মধ্যেই ওরা এই উচ্চভূমির আকাশে এসে পৌছবে।

উচ্চভূমির পূর্ব-দক্ষিণ পাশে পাহাড়ের গোড়ায় এসে গেছে আহমদ মুসারা।

একটা সংকীর্ণ গিরিপথে ঢুকতে ঢুকতে সার্গিও বলল, 'এসে গেছি আমরা। সাত আট ফিট উপরে উঠলেই একটা দীর্ঘ গিরিপথের মুখে শেল্টারটা। তার উপর পাহাড়ের ছাদ। সামনে উচ্চভূমির দিকটা উন্মুক্ত, কিন্তু গাছ-গাছড়ায় ঢাকা।'

সবাই সংকীর্ণ গিরিপথ বেয়ে উঠতে লাগল শেল্টারের দিকে।

হেলিকপ্টার দুটি ল্যান্ড করল আহমদ মুসাদের গুহা মুখের ঠিক নিচেই।

উচ্চভূমির গোটা এলাকা গাছ-পালায় ঢাকা। উচ্চভূমির উত্তর দিকে ঢালু স্লোপ, পশ্চিম দিকেও তাই। এই দুই ঢালে হেলিকপ্টার ল্যান্ড করা সম্ভব নয়।

উচ্চভূমির দক্ষিণ দিকটা দুর্গম। দিকটা অসংখ্য পাহাড় টিলা, সংকীর্ণ উপত্যকা ও গাছপালায় আচ্ছাদিত। ওদিকে হেলিকপ্টার ল্যান্ডের কোন সুযোগ নেই। উচ্চভূমির মাঝখানে সমতল পাথুরে একটা চত্বর আছে। এই চত্বরেই ল্যান্ড করেছে হেলিকপ্টার দুটি।

হেলিকপ্টার দুটি পূবমুখী হয়ে পাশাপাশি ল্যান্ড করেছে। এদের বিশাল পাখার ব্লেডগুলো আহমদ মুসাদের গুহামুখের মাত্র সাত আট ফুট দূর দিয়ে ঘুরছে।

হেলিকপ্টার ল্যান্ডিং এর জন্যে এই স্থানটি বেছে নেয়ায় আহমদ মুসা দারুন খুশি। ওদের ওঠানামা এবং কথাবার্তারও অনেক কিছুই তারা শুনতে পাবে।

ল্যান্ড করার মিনিট পাঁচেক পর হেলিকপ্টার দুটির দরজা একই সাথে খুলে গেল। দরজা খোলার সাথে সাথেই দুটি হেলিকপ্টার থেকে ৩জন করে ছয়জন লোক লাফ দিয়ে নামল। তাদের সকলের হাতেই উদ্যত ষ্টেনগান।

নেমেই তারা হেলিকপ্টারকে পেছনে রেখে সামনে ছুটে গিয়ে পজিশন নিল। পরক্ষণেই ছয়টি ষ্টেনগান থেকে গুলী শুরু হলো। উচ্চভূমির সব দিক লক্ষ্য করেই তারা গুলী ছুড়ছে।

মিনিট পাঁচেক একটানা গুলীর পর তাদের ছয়টি ষ্টেনগানই থেমে গেল।

আহমদ মুসা বুঝল, শত্রুকে আতংকিত করা কিংবা শত্রুর উপস্থিতি ও প্রতিক্রিয়া যাচাই করার জন্যে ফাঁকাগুলীর এ মহড়া চলছে।

আরও মিনিট পাঁচেক পার হলো।

হেলিকপ্টার থেকে আরও দুজন নেমে এল। তাদের কাঁধেও ষ্টেনগান ঝুলানো এবং দুজনের হাতেই একটি করে ফোল্ডিং চেয়ার।

হেলিকপ্টার দুটির মাঝখানে তারা চেয়ার দুটি সামনা সামনি করে পাতল।

কাঁচা পাকা চুলের দুজন রাশভারী লোক নেমে এল হেলিকপ্টার থেকে। বসল তারা চেয়ার দুটিতে।

দুজনের কাউকেই চিনতে পারল না আহমদ মুসা। দুজন নিশ্চয় বড় নেতা গোছের কেউ হবে। তবে সে নিশ্চিত যে এদের মধ্যে WFA-এর প্রধান আজর ওয়াইজম্যান নেই।

বসেই দুজনের একজন মুখ তুলে পজিশন নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে থাকা ছয়জনের একজনকে লক্ষ্য করে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল, 'রিকার্ডো' দুজনকে পাহারায় রেখে তোমরা চারজন ওদিকে যাও। কেউ বেঁচে আছে কিনা দেখ। চল্লিশটি লাশই গুণে আসবে। দেখলাম অস্ত্রগুলো পড়ে আছে। ওগুলো নিয়ে

আসবে। সবার কাছেই মোবাইল থাকার কথা। ভালো করে সার্চ করে দেখে ওগুলো অবশ্যই নিয়ে আসবে। মনে রেখ, মোবাইলগুলো অস্ত্রের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ।'

কথাগুলো আহমদ মুসারাও শুনতে পেল। শুনে মনটা খচখচ করে উঠল আহমদ মুসার। মোবাইল ওদের কাছে আছে, এ কথা মনেই করেনি আহমদ মুসারা। মোবাইলগুলো শুধু টেলিফোন ইনডেক্সই নয়, কার সাথে কখন যোগাযোগ হয়েছে তারও একটা বর্তমান নির্ঘণ্ট। আর আপসোস করে লাভ নেই, ওগুলো এখন ওদের হাতেই পড়ে গেল, ভাবল আহমদ মুসা।

ওদিকে রিকার্ডো নামক লোকটি তিনজনকে সাথে করে নিয়ে চলে গেল উচ্চভূমির উত্তর ঢালের দিকে।

ওরা চলে গেলে চেয়ারে বসা নেতা গোছের সেই রাশভারী লোকটি সামনের চেয়ারে বসা দ্বিতীয় লোকটিকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'মি. ডেভিড ডায়ার, খবর পাওয়ার পনের মিনিটের মধ্যে আমরা পৌছে গেছি। ওরা সরে পড়ার জন্যে খুব বেশি হলেও সাত আট মিনিট সময় পেয়েছে। এই সময় ওরা এক মাইল পথও যেতে পারেনি। সুতরাং ওদের আশে পাশেই পেয়ে যাব।'

'মি. এডাম এরিয়েল, আমারও তাই মত। কিন্তু ওদের আশে-পাশে পেতে হলে এখনই আমাদের কাজ শুরু করা দরকার।'

'হ্যাঁ সেটাই হবে মি. ডায়ার।' বলে এডাম এরিয়েল পকেট থেকে একটা কাগজ বের করল। মেলে ধরল কাগজটি সামনে।

কাগজটি টেরসিয়েরা দ্বীপের একটা মানচিত্র।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক দুজনের চোখেই দূরবীন। এডাম এরিয়েলরা আট নয় ফিট নিচে ৪০ ডিগ্রী কোণে আছে বলে দূরবীনের ফোকাস সহজেই মানচিত্রের উপরও ফেলা যাচ্ছে।

মানচিত্র দেখতে গিয়ে ওরা নিচু স্বরে কথা বলা শুরু করেছে।

আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি পিঠের ব্যাগ থেকে সাউন্ড সেন্সর রেডিও বের করে নিল।

যন্ত্রটি একটা পকেট রেডিওর মত। তাতে দুফিট লম্বা একটা এন্টেনা। এই এন্টেনাটা দুশ বর্গগজের মধ্যেকার সব শব্দ মনিটর করে আলাদা আলাদা করে ক্লাসিফাইড রেকর্ডের পর তা প্রচার করতে পারে।

আহমদ মুসা এন্টেনা তুলে 'হিউম্যান ভয়েস' 'কি'তে চাপ দিয়ে যন্ত্রটিকে সবার মধ্যখানে রেখে দিল।

আহমদ মুসা দূরবীন দিয়ে মানচিত্রের যতটা পারা যায় দেখতে লাগল এবং শুনতে লাগল ওদের কথা রেডিও রিলে থেকে।

যে কণ্ঠ তখন রিলে হচ্ছিল, সেটা এডাম এরিয়েলের কণ্ঠ। শুনেই তা বুঝতে পারল আহমদ মুসা।

বলছিল এডাম এরিয়েল, 'উচ্চভূমির চারদিকের অবস্থা বুঝলেন তো! এখন দেখুন, আহমদ মুসার যাবার এলাকা একমাত্র দক্ষিণ দিকটাই। উত্তর দিক থেকে সে পালিয়ে এসেছে, অতএব ওদিকে সে এই মুহূর্তে যাবে না। পশ্চিম দিকে ছোটভূমির পরেই বিশাল জলাভূমি। ওদিকে আহমদ মুসার কোন আশ্রয় নেই এবং সামনে এগুবার তার কোন পথ নেই। আর পূব দিকে পাহাড়। এই পাহাড়ের পথে কোন গন্তব্যে পৌছা তার পক্ষে সম্ভব নয়। অবশ্য আত্মগোপনের জায়গা এ পাহাড়ে থাকতে পারে। কিন্তু আহমদ মুসা আত্মগোপনের কথা ভাবছে না। তার লক্ষ্য কোন শহর বন্দরে পৌছা। সুতরাং দক্ষিণই তার যাবার একমাত্র পথ। দক্ষিণের পাহাড়-উপত্যকার পথ কষ্টকর হলেও এ পথে কিছুদূর সামনে এগুলে সে পাবে একটা ট্রাইবাল এরিয়া। এস্কিমো, রেড ইন্ডিয়ান বংশোদ্ভুত কিছু লোক এবং পলাতক এক শ্রেণীর অপরাধীদের উত্তর পুরুষ এই এলাকায় বাস করে। এখান থেকে দক্ষিণ ও পূর্ব উপকূলের কয়েকটি বন্দরে ও দক্ষিণের হেরোইমা শহরে যাবার পাহাড়ী পথ আছে। সুতরাং আহমদ মুসা এই আশ্রয়ের সন্ধানেই এগোবে।'

হাসল ডেভিড ডায়ার। বলল, 'আহমদ মুসা উচ্চভূমির চারদিকের এত কিছু জানলেই না আশ্রয়ের সন্ধানে দক্ষিণে অগ্রসর হবে। তার এতসব জানার কথা নয়। সে আজ রাতে দ্বীপের বিমান বন্দরে ল্যান্ড করেছে এবং সংগে সংগেই তাড়া খেয়ে সে পালিয়ে এসেছে। আমার ধারণা এত কিছু ভেবে সে এগুতে পারবে না।'

এডাম এরিয়েলও হাসল। বলল, ‘আসলে আপনি আহমদ মুসাকে চেনেন না। সে যে দেশে বা যেখানে পা দেয় তার সবকিছুই সে আগে জেনে নেয়। আমার বিশ্বাস এই দ্বীপের কোন কিছুই তার অজানা নয়।’

‘কিন্তু আপনি কি করে ধরে নিচ্ছেন যে, সে-ই আহমদ মুসা। আমি তো শুনলাম আজর ওয়াইজম্যানও এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারেননি।’ বলল ডেভিড ডায়ার।

‘আগে তিনি নিশ্চিত না হলেও এখন তিনি নিশ্চিত হয়েছেন। এখানকার বিপর্যয়ের খবর যে মোবাইলে দিয়েছিল, সে জানায়, তারা আগে আক্রান্ত হয়নি। একটা ফাঁকা গুলী তার মাথার উপর দিয়ে চলে যায়। এই ফাঁকা গুলীর পর তারা আক্রমণ করলে পাল্টা গুলী বর্ষণ শুরু হয় আহমদ মুসার দিক থেকে। এটাই আহমদ মুসার যুদ্ধের সাধারণ কৌশল। সে শত্রুকে কোনওভাবে এলার্ট না করে আক্রমণ সাধারণত করে না। এই ঘটনা যেহেতু এখানে ঘটেছে তাই এখন নিসন্দেহে বলা যায়, এই ম্যাসাকার আহমদ মুসার দ্বারাই হয়েছে।’

‘শত্রুকে আক্রমণের আগে এলার্ট করার আহমদ মুসার এই কৌশল কেন? কেন করে সে এটা?’ বলল ডেভিড ডায়ার।

‘সম্ভবত যুদ্ধ শুরুর দায় আহমদ মুসা তার ঘাড়ে নিতে চায় না, চাপাতে চায় শত্রুর কাঁধে। শত্রুকে এলার্ট করে সে শত্রুকে আক্রমণে নিয়ে আসে, তারপর সে তার জবাব দেয়।’ বলল এডাম এরিয়েল।

‘যুদ্ধে নেমে যুদ্ধের দায় সে নিতে চায় না কেন?’ ডেভিড ডায়ার বলল।

‘সে নিজেকে শান্তিবাদী হিসেবে দেখাতে চায়। সে দেখাতে চায় যে, সে জুলুমের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার লড়াই করে।’ বলল এডাম এরিয়েল।

হাসল ডেভিড ডায়ার। বলল, ‘ভূতের মুখে রাম-নাম।’

হাসল এডাম এরিয়েলও। বলল, ‘থাক, এখন যা করার দ্রুত করতে হবে। আমাদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত আহমদ মুসাকে আর বাঁচতে দেয়া যাবে না।’

‘বলুন, কি করতে চান? শেষ একটা অস্ত্র তো আমরা সাথে এনে..........।’

ডেভিড ডায়ারের কথা শেষ হলো না। হন্তদন্ত হয়ে একজন নেমে এল হেলিকপ্টার থেকে। উত্তেজিত কণ্ঠে বলল সে এডাম এরিয়েলকে লক্ষ্য করে,

‘স্যার, আমরা আমাদের সাউন্ড রেকর্ড থেকে রিলে গ্রহণ করতে গিয়ে দেখছি, আপনাদের কথা ডাবল রিলে হচ্ছে। তার মানে আপনাদের কথা আরও কোন জায়গা থেকে রেকর্ড ও রিলে হচ্ছে।’

শুনেই এডাম এরিয়েল ও ডেভিড ডায়ার বিদ্যুতপৃষ্টের মত চমকে উঠে সোজা হয়ে বসল। এডাম এরিয়েল চিৎকার করে উঠল, ‘ডাইরেকশন আইডেনটিফাই করেছ?’

হেলিকপ্টার থেকে নেমে আসা লোকটি বলল, ‘জি স্যার। পাহাড়ের দিক মানে পূব দিক থেকে আসছে।’

‘তার মানে আহমদ মুসা পাহাড়েরই কোথাও লুকিয়ে আছে।’ বলল আবার চিৎকার করে এডাম এরিয়েল।

‘স্যার, আপনার একথাগুলোও ওরা শুনতে পাচ্ছে।’ কিছুটা নিচু স্বরে বলল লোকটি।

কিছুটা বিব্রত কণ্ঠে এডাম এরিয়েল বলল, ‘স্যরি। ধন্যবাদ তোমাকে।’

কথাটা বলেই এডাম এরিয়েল উঠে দ্রুত ডেভিড ডায়ারের কাছে গেল। তাকে কানে কানে কি যেন বলল।

ডেভিড ডায়ার সায় দিল এডাম এরিয়েলের কথায় মাথা ঝাঁকিয়ে।

এরপর এডাম এরিয়েল কানে কানে কিছু বলল হেলিকপ্টার থেকে নেমে আসা লোকটিকে।

শুনেই মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিয়ে লোকটি দ্রুত হেলিকপ্টারে উঠল।

ওদিকে ডেভিড ডায়ারও হেলিকপ্টারে উঠে গেল।

এডাম এরিয়েল হাত ইশারা করে ডাকল পাহারায় দাঁড়ানো লোক দুজনকে।

ওরা এলে ওদের দুজনকেই কানে কানে কিছু বলল এডাম এরিয়েল। ওরাও সায় দিল এডাম এরিয়েলের কথায় মাথা নেড়ে।

ওদের সাথে কথা শেষ করেই এডাম এরিয়েল উঠে গেল হেলিকপ্টারে।

হেলিকপ্টারের পাখা ঘুরতে শুরু করল।

গর্জন শুরু করেছে হেলিকপ্টার দুটির ইঞ্জিন।

হেলিকপ্টার থেকে নামল আরও দুজন ষ্টেনগানধারী। তাদের দুজনেরই কাঁধে ঝুলানো ষ্টেনগান এবং কোমরে রিভলবার। শুধু একজনের হাতে বাড়তি বড় একটি ব্যাগ।

আগের দুজনসহ চারজন ষ্টেনগানধারী দৌড়ে হেলিকপ্টারের নিচ থেকে একটু দূরে সরে গেল।

হেলিকপ্টার উঠে গেল আকাশে।

রুদ্ধশ্বাসে দেখছিল আহমদ মুসারা এই দৃশ্য। আহমদ মুসারা জেনেছে, তাদের মনিটরিং ধরে ফেলার সাথে সাথে আহমদ মুসাদের অবস্থানের এলাকাও তারা চিহ্নিত করেছে। এখন কি ওরা আক্রমণে আসবে? কিন্তু ষ্টেনগানধারীদের রেখে হেলিকপ্টার দুটো আকাশে উড়ল কেন? ষ্টেনগানধারীদের পাহারায় রেখে ওরা বিশেষ কোন প্রস্তুতির জন্যে উপরে উঠেছে। তাহলে কি হেলিকপ্টার নিয়ে ওরা আহমদ মুসাদের অবস্থান চিহ্নিত করার জন্যে বেরুল?

এসব চিন্তা আহমদ মুসার মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল।

হেলিকপ্টার দুটো তখন আকাশে উঠে গেছে এবং পূবমুখী হয়ে উড়তে শুরু করেছে।

নিচের চারজন ষ্টেনগানধারীদের একজন হেলিকপ্টার থেকে নামানো বড় ব্যাগটা খুলে ফেলল। তার ভেতর থেকে এক এক করে বের করে আনল অনেকগুলো গ্যাসমাস্ক।

গ্যাসমাস্কগুলোর দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠল আহমদ মুসা। পাশের সাউন্ড সেন্সরটা গুটিয়ে ব্যাগের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'হাসান তারিক, ওরা হেলিকপ্টার থেকে গ্যাস ফেলবে এখনি। তোমরা আমার সাথে এস।'

বলে আহমদ মুসা যে পথ দিয়ে উঠেছিল সেই পথে নামা শুরু করল। বলল, 'ভয় নেই এস, ওদের গ্যাসমাস্ক আমাদের দখল করতে হবে।'

'ভাইয়া, আমাদের কাছে তো দু'টো গ্যাসমাস্ক আছে। ও দুটো মি. সার্গিও ও মিস ভ্যানিসাকে পরিয়ে দেই?' চলতে চলতেই বলল হাসান তারিক।

হাসান তারিক, সার্গিও ও ভ্যানিসা আহমদ মুসার পেছনে পেছনে তখন দৌড়াতে শুরু করেছে।

হাসান তারিকের কথার জবাবে আহমদ মুসা দৌড়রত অবস্থায় বলল, 'ও গ্যাসমাস্কগুলো কার্যকরী থাকে মাত্র দু'এক মিনিট মাত্র। তবুও দিতে পার।'

আহমদ মুসারা সবাই ছুটছে। কিন্তু এগুবার জন্যে যতটা কসরত হচ্ছে, ততটা এগুনো যাচ্ছে না। খাড়া পাহাড়ে ওঠা যতটা কঠিন, নামা তার চেয়েও কঠিন। তার উপর অনেকটা পথ ঘুরে তাদের আসতে হবে হেলিকপ্টার যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেই চত্বরটায়।

সার্গিও ও ভ্যানিসার মুখ উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় আচ্ছন্ন।

আহমদ মুসা এক ঝলক পেছনে তাকিয়ে ওদের লক্ষ্য করে বলল, 'ভয়ের কিছু নেই। হেলিকপ্টারগুলো পাহাড়ের পুব অঞ্চলে গ্যাস স্প্রে করতে করতে আসছে, যাতে এর মধ্যে তাদের সব লোকরা গ্যাসমাস্ক পরে নিতে পারে।'

'ওরা এতবড় অমানুষ! এ গ্যাস প্রয়োগে তো অন্যান্য নিরপরাধসহ পশু-পাখিও মারা পরবে।' বলে উঠল সার্গিও।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'মানুষ যখন অমানুষ হয়, তখন সে পশুর চেয়েও খারাপ হয়ে যায়।'

'ভাইয়া, আপনি এই সময়েও এমন নির্মল হাসতে পারলেন? আপনার মুখে তো কোন উদ্বেগ দেখছি না।' আহমদ মুসাক লক্ষ্য করে বলল ভ্যানিসা।

'আল্লাহ যা ঘটাবেন তাই ঘটবে, চিন্তা করে লাভ কি বোন?' বলল আহমদ মুসা।

'তাহলে তো আমাদের চেষ্টা করে কোন লাভ নেই।' ভ্যানিসা বলল।

'আমরা যে চেষ্টা করছি, সর্বশক্তি দিয়েই করছি, সেটাও আল্লাহই ঘটাচ্ছেন। কিন্তু উদ্বেগ-আতংক আল্লাহ ঘটান না, কারণ ওটা কোন কাজ নয়।'

হাসল ভ্যানিসা। বলল, 'অবিস্মরণীয় এক শিক্ষার কথা বলেছেন ভাইয়া।'

পূর্ব দিক থেকে হেলিকপ্টারের গর্জন ভেসে আসছে। দ্রুত ছুটে আসছে ওরা।

আহমদ মুসা কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। তার মনে পড়ল, তাদের একথাগুলো তো হেলিকপ্টার থেকে ওরা মনিটর করছে এবং এর মাধ্যমে সহজেই

ওরা আহমদ মুসাদের অবস্থান চিহ্নিত করতে পারবে। অলরেডি ওরা তা হয়তো করেছেও।

ভ্যানিসা কিছু বলতে যাচ্ছিল। আহমদ মুসা চাপা কণ্ঠে বলে উঠল, 'নো মোর টক। ওরা আমাদের অবস্থান ধরে ফেলবে।'

আরেক ঝলক উদ্বেগ নেমে এল সার্গিও এবং ভ্যানিসার চোখে-মুখে।

চত্বরের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে আহমদ মুসারা। চারদিকের বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। ওরা পূব দিক থেকে যে গ্যাস স্প্রে করতে করতে আসছে, তার প্রভাব এখানকার বাতাসেও ছড়িয়ে পড়েছে।

আরও দ্রুত পা চালালো আহমদ মুসা। সে আরও একটা বিষয় ভেবে উদ্বিগ্ন হলো। গ্যাসমাস্ক ওয়ালারা চারজনই যদি গ্যাসমাস্কগুলো উচ্চভূমির ঢালে তাদের সহকর্মীদের কাছে নিয়ে গিয়ে থাকে! সে ক্ষেত্রে মুস্কিলে পড়বে তারা। গ্যাসমাস্ক সংগ্রহ তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে যাবে।

আশা-নিরাশার দোলায় দুলে আহমদ মুসা ষ্টেনগান সামনের দিকে তাক করে গিরিপথের আড়াল থেকে মুখ বাড়াল। দেখল তিনজন ষ্টেনগানধারী রয়েছে। চতুর্থজন সঙ্গীদের গ্যাসমাস্ক সরবরাহ করতে গেছে ঢালে, বুঝল আহমদ মুসা। গ্যাসমাস্কের ব্যাগটাও পড়ে আছে চত্বরে।

'পশ্চিমমুখী হয়ে পজিশন নিয়ে বসে থাকা গ্যাসমাস্ক পরা ষ্টেনগানধারীদের অলক্ষ্যে তাদের পেছন থেকে গ্যাসমাস্কের ব্যাগ নিয়ে আসবে কিনা, ইত্যাদি নিয়ে আহমদ মুসা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছার আগেই পেছন থেকে প্রচন্ড হাঁচি দিয়ে উঠল ভ্যানিসা।

বাতাস কিছুটা দুষিত হয়ে পড়ার কারণেই এটার কোন এলার্জিক প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

হাঁচির সাথে সাথেই তিনজন ষ্টেনগানধারী চোখের পলকে ঘুরে দাঁড়াল। তাদের ষ্টেনগানও উঠে আসছিল।

আহমদ মুসা সংঘর্ষে যাওয়া ছাড়া গ্যাসমাস্ক দখলের আর কোন উপায় দেখল না।

আহমদ মুসার ষ্টেনগান তাক করাই ছিল। শুধু ট্রিগার চেপে ধরল সে।

ওরা আর গুলী করার সুযোগ পেল না। গুলী খেয়ে পড়ে গেল তিনটি দেহই।

আহমদ মুসা ষ্টেনগান বাগিয়ে ধরে ছুটল ব্যাগের দিকে। তার পেছনে পেছনে ছুটল হাসান তারিক ও ভ্যানিসারাও।

ব্যাগেই গ্যাসমাস্ক পাওয়া গেল।

দ্রুত গ্যাসমাস্ক পরে নিল সবাই।

হেলিকপ্টার এসে গেছে। নিশ্চয় হেলিকপ্টারে ওরা ষ্টেনগানের শব্দ শুনেছে। ওদের দূরবীনে আহমদ মুসারা ধরাও পড়ে যেতে পারে।

'সবাই এস, জংগলের আড়ালে যেতে হবে।' খুব নিচু স্বরে কথাগুলো বলে আহমদ মুসা ছুটল জংগলের দিকে। তার সাথে সবাই।

হেলিকপ্টার আসছিল গ্যাস স্প্রে করতে করতে। হেলিকপ্টার থেকে মেশিনগান দাগাও শুরু হলো।

'হেলিকপ্টার নিশ্চয় ষ্টেনগানের শব্দ শুনেছে, এখন দেখতে পেয়েছে তাদের লোকদের লাশও। আমরা উচ্চভূমির জংগলে আশ্রয় নিয়েছি, এটাও নিশ্চয় ওরা দেখতে পেয়েছে। এস, আমরা উত্তর দিকের ঢালের দিকে আগাই। ওদিকে তাদের লোক আছে। ওদিকে মেশিনগানের ফায়ার কম হতে পারে।'

নিচু চাপা কণ্ঠে কথাগুলো বলার সাথে সাথে আহমদ মুসা উত্তর দিকে দৌড়াতে শুরু করেছে। তার ষ্টেনগানের নল সামনে উদ্যত। আঙুল ষ্টেনগানের ট্রিগারে। তার পেছনে অন্য সবাই।

পথের মাঝামাঝি জায়গায় একটা ঘন ঝোপের পাশ কাটিয়ে সামনে এগুতেই আহমদ মুসা ৫জন ষ্টেনগানধারীর একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেল। ওরাও দৌড়ে আসছিল, সম্ভবত এদিকে ষ্টেনগানের আওয়াজ শুনেই।

ঘটনার আকস্মিকতা উভয় পক্ষকেই বিমূঢ় করে দিয়েছিল। কিন্তু আহমদ মুসা এ ধরণের অবস্থার জন্যে আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। তার ষ্টেনগানও হাতে বাগিয়ে ধরা ছিল, হাতের আঙুলও ছিল ট্রিগারে। সুতরাং জিতে গেল আহমদ মুসাই। সে দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে ট্রিগারে চেপে ধরল আঙুল।

ওরাও বিমূঢ়তার প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। নড়ে উঠেছিল তাদের ষ্টেনগানও।

কিন্তু তারা এ্যাকশনে যাবার আগেই সে সুযোগ তাদের শেষ হয়ে গেল। পাঁচজনই ষ্টেনগানের গুলীতে ঝাঁঝরা হয়ে ভূমি শয্যা নিল।

আহমদ মুসা একবার পেছনে তাকিয়ে 'এস তোমরা' বলে আবার দৌড়াতে শুরু করল।

সবাই এসে পৌছল উত্তর ঢালের মুখে। আহমদ মুসা সবাইকে বড় গাছের গোড়ায় আশ্রয় নিতে বলল।

কিন্তু হেলিকপ্টারের গুলী জংগলের মাঝামাঝি অতিক্রম করার পর বন্ধ হয়ে গেল।

হেলিকপ্টার চলে এল ঢালের ওপর।

'ওরা ঢালে পাঠানো ওদের লোকদের খুঁজছে।' বলে একটু হাসল আহমদ মুসা। বলল নিচু স্বরে আবার, 'ঢালে ওদের লোকদের পাচ্ছে না। সুতরাং এখন নিশ্চয় ওরা ভাবছে, তাদের লোকরা ঢালের কাজ সেরে উচ্চভূমির জংগলে উঠে এসেছে। এই ষ্টেনগানের ফায়ারও তাদের কানে গেছে। অতএব এখন তারা ভাবতে বাধ্য হবে, জংগলে তাদের লোকদের সাথে আমাদের লোকদের সংঘর্ষ চলছে। ফলে এখন তাদের মেশিনগান ও গ্যাস আক্রমণ দুটোই অকেজো।'

'কি করে?' বলল ভ্যানিসা খুব আসেত্ম। তার বিস্ময়-বিমুগ্ধ চোখে সপ্রশংস দৃষ্টি।

'গ্যাসমাস্ক আমরা দখল করেছি, এ বিষয়ে তারা নিশ্চিত। সুতরাং গ্যাস আক্রমণ কোন কাজ দেবে না। আর যেহেতু ওরা ধরে নিতে বাধ্য হয়েছে, ওদের লোকরাও এখন উচ্চভূমিতে, তাই হেলিকপ্টার থেকে মেশিনগান আক্রমণও তারা চালাতে পারছে না।' আহমদ মুসা বলল প্রায় ফিসফিস করে।

কথাটা বলেই আহমদ মুসা তাকাল হাসান তারিকের দিকে। দ্রুত চাপা কণ্ঠে নির্দেশ দিল, 'হাসান তারিক, তুমি যাও এখনি যে লাশগুলো পড়ল ওদের কাছে। ওরা ওদের সহকর্মীদের মোবাইলগুলো সংগ্রহের কথা বলেছিল। সবাইকে সার্চ করে মোবাইলগুলো নিয়ে এস।'

'আমি যেতে পারি মি. তারিকের সাথে। তাকে সহযোগিতা করব।' বলল সার্গিও যথাসাধ্য তার দরাজ কণ্ঠকে নিচু রেখে।

‘না মি. সার্গিও, আপনি ভ্যানিসার কাছে থাকুন।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আপনি তো আছেনই।’ বলল সার্গিও।

‘না আমি থাকছি না। এখনি গাছে উঠব।’ আহমদ মুসা বলল।

‘গাছে কেন?’

‘ওখান থেকে হেলিকপ্টারকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা যাবে। ওদের কিছু একটা ব্যবস্থা করা দরকার।’ বলেই আহমদ মুসা এগুলো সামনের সবচেয়ে বড় গাছটার দিকে।

গাছে উঠল আহমদ মুসা।

গাছের এমন এক জায়গায় উঠে সে বসল যাতে চারদিকের আকাশটাকে ভালোভাবে দেখা যায়। মাথার উপরটাতেই গাছের ডাল-পালার আড়াল। হেলিকপ্টার সরাসরি উপর থেকে তাকে দেখতে পাবে না। কিন্তু সে হেলিকপ্টারকে টার্গেট করতে পারবে। কিন্তু অসুবিধা যেটা হবে সেটা হলো, একমাত্র উপর ছাড়া চারপাশ থেকে হেলিকপ্টার তাকে দেখতে পাবে, যদি তারা বিশেষভাবে এদিকটার দিকে তাকায়।

উচ্চভূমির গোটা আকাশটাই চক্কর দিচ্ছে হেলিকপ্টার দুটি। তবে এক সাথে নয়, আলাদাভাবে এবং বেশ দূরত্ব রেখে।

আহমদ মুসা গাছের ডালে যুতসইভাবে বসে তখনও তৈরি হয়ে উঠতে পারেনি। এই সময় দেখতে পেল, একটি হেলিকপ্টার পূবদিকে কিছু দূরে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। আহমদ মুসার মনে হলো, হেলিকপ্টারটি তাকে দেখতে পেয়েছে। হেলিকপ্টারের খোলা দরজা এদিকে হা করে তাকিয়ে আছে। নিশ্চয় দূরবীনের দুটি চোখ এ দিকে স্থিরভাবে নিবদ্ধ, ভাবল আহমদ মুসা।

দক্ষিণ দিকের দ্বিতীয় হেলিকপ্টারটি উড়ে আসছিল পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে। সে হেলিকপ্টারটিও হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল, দেখল আহমদ মুসা। সেই সাথে দেখতে পেল, হেলিকপ্টারটির মাথা বোঁ করে উত্তরমুখী হয়ে ঘুরে গেল। দ্রুত আহমদ মুসা তাকাল পূবের হেলিকপ্টারটির দিকে। দেখল, পূবের হেলিকপ্টারটির মাথাও পশ্চিম দিকে ঘুরে গেছে। আহমদ মুসার বুঝতে বাকি

রইল না দক্ষিণ দিকের হেলিকপ্টারটি, পূবের হেলিকপ্টারকে সবকিছু জানিয়ে দিয়েছে। এখন দুটি হেলিকপ্টারই তাকে আক্রমণ করার জন্যে প্রস্তুত।

আহমদ মুসার এই চিন্তা শেষ হবার আগেই দেখল, হেলিকপ্টার দুটি তার দিকে দৌড় শুরু করেছে।

আহমদ মুসা দ্রুত ভাবল, সে ঝুলানো দড়ি বেয়ে নিচে নেমে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে। কিন্তু তার ফলে হেলিকপ্টার দুটি বেপরোয়া আক্রমণের সুযোগ পেয়ে যাবে উচ্চভূমির উপরে। কারণ তারা এখন নিশ্চিত মনে করবে, তাদের লোকেরা উচ্চভূমিতে জীবিত থাকলে তাদের শত্রুরা এভাবে গাছে উঠতে পারতো না। সুতরাং হেলিকপ্টার দুটোকে সে সুযোগ দেয়া যাবে না।

এ চিন্তার সাথে সাথে আহমদ মুসা চারদিকে তাকাল। তার চার দিকেই গাছ আছে তবে বেশ দূরে দূরে। কোন কোনটির দূরত্ব পনের-বিশফুট হবে।

দক্ষিণ পূর্ব কোণের দিকে একটা গাছকে টার্গেট করল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা দ্রুত উঠে এসে আশে-পাশের কয়েকটা ছোট ডাল ভেঙে তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুঁজে দিয়ে বাদুড়ের মত খুব সহজভাবে এগুলো দক্ষিণ পূবমুখী একটা মোটা ডাল বেয়ে।

ডালের প্রান্তের দিকে রশির মাথা শক্ত করে বেঁধে আহমদ মুসা ফিরে এল তার আগের জায়গায় রশির শেষ প্রান্তটা হাতে ধরে। তার পর দ্রুত কিছুটা নেমে এসে দুহাতে রশির দুপ্রান্ত জড়িয়ে দুপায়ে গাছটিকে প্রচন্ড শক্তিতে পেছনে ঠেলে ঝাঁপিয়ে পড়ল আহমদ মুসা। মুহূর্তেই লম্বা রশির ঝুলন্ত গতিবেগ ক্ষেপণাস্ত্রের মত আহমদ মুসাকে পৌছে দিল দক্ষিণ-পুবের সেই গাছটির একটা ডালের সান্নিধ্যে। আহমদ মুসা এক হাতে ডালটি ধরে ফেলে রশি ছেড়ে দিয়ে দুহাতে ডালটি আঁকড়ে উঠে গেল গাছে।

দুটি হেলিকপ্টারের শব্দও অনেক কাছে এসে গেছে।

আহমদ মুসা দ্রুত গাছের উপর দিকে উঠে যাচ্ছে। পাতায় জড়ানো অনেকগুলো ডালের এক গ্রন্থিতে আশ্রয় নিল আহমদ মুসা।

হেলিকপ্টার দুটি এসে গেছে। তাদের টার্গেট সবচেয়ে লম্বা ঐ গাছটি।

প্রবল এক পশলা গুলী বর্ষণ করল গাছটির উপর।

গাছের উপর আকাশে ইতস্তত ঘুরতে লাগল হেলিকপ্টার দুটি।

গাছটিতে কোন লোক নেই এবং সে যে নিচে নেমে গেছে তা তারা বুঝে ফেলেছে।

এ সময় একটা বোমা বিস্ফোরিত হলো গাছের নিচে।

ওরা বোমা ফেলেছে, বুঝল আহমদ মুসা। গ্যাস বোমা নয়, আগুনে বোমা। তবু আহমদ মুসা তার গ্যাস মুখোশটাকে ভালো করে টেনে-টুনে ঠিক করে নিল।

ধুঁয়া ধেয়ে আসছে নিচ থেকে উপর দিকে।

আহমদ মুসা খুশি হলো এই ভেবে যে, ধুঁয়া তাকে ঢেকে ফেলবে এবং হেলিকপ্টার থেকে কেউ তাকে দেখতে পাবে না। কিন্তু এই সাথে ভাবল ধুঁয়ায় আচ্ছন্ন হলে হেলিকপ্টার দুটোকে টার্গেট করা তার জন্যে কঠিন হয়ে পড়বে। তার উপর হেলিকপ্টার দুটি যদি এই অবস্থায় অন্যদিকে সরে যায়, তাহলে তার গাছে উঠাই বেকার যাবে।

এই চিন্তার সাথে সাথেই আহমদ মুসা দুহাতে তার দুটি ষ্টেনগানকে তৈরি করে নিয়েছে।

তখন ধোঁয়া উঠে আসেনি এবং তখনও হেলিকপ্টার দুটো গাছটির আকাশে চক্কর দিচ্ছে। গতি তাদের খুব স্লো।

ডালের গ্রন্থিতে পা রেখে আহমদ মুসা গাছের কান্ডে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছে। তার ষ্টেনগান দুটির ব্যারেল অধীরভাবে অপেক্ষা করছে হেলিকপ্টার দুটি তার নাগালের মধ্যে আসার।

আহমদ মুসা জানে, তার প্রথম আক্রমণই শেষ আক্রমণ হবে। প্রথম আক্রমণ থেকে যদি ওরা বেঁচে যায়, তাহলে ওদের পাল্টা আক্রমণের মুখে আহমদ মুসা দ্বিতীয় আক্রমণের সুযোগ পাবে না।

এজন্যেই আহমদ মুসার ষ্টেনগান দুটি খুব সতর্ক।

এক সময় উত্তর ও দক্ষিণ গামী হেলিকপ্টার দুটি আহমদ মুসার মাথার উপরে প্রায় ২০ ডিগ্রী কোণে পাশাপাশি চলে এল। দক্ষিণমুখি হেলিকপ্টারটি পুবপাশে, আর উত্তরমুখিটি পশ্চিম পাশে। দুটি ফুয়েল ট্যাংকার ষ্টেনগানের নাগালের মধ্যে এসেছে।

গর্জে উঠল আহমদ মুসার দুহাতের দুটি ষ্টেনগান। অবিরাম গুলীর ঝাঁক ছুটে চলল হেলিকপ্টার দুটিকে লক্ষ্য করে।

আক্রান্ত হয়েই হেলিকপ্টার দুটি দ্রুত সরে যেতে লাগল এবং অবিরাম গুলীবৃষ্টি তারাও শুরু করল ভূমির দিকে।

আহমদ মুসা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল। হেলিকপ্টার দুটি সরে গিয়ে গুলীবৃষ্টি শুরু না করলে আহমদ মুসা পূব পাশের হেলিকপ্টারের গুলীতে এতক্ষণ ঝাঁঝরা হয়ে গোশতের স্তুপে পরিণত হয়ে যেত।

হেলিকপ্টার দুটি দুদিকে চলে গেল, আর ফিরে এল না।

আহমদ মুসার এ গাছটা অপেক্ষাকৃত ছোট এবং সেও গাছের শীর্ষ থেকে অনেকখানি নিচে, তাই আকাশটা আর তার চোখে পড়ছে না।

আহমদ মুসা একটু অপেক্ষার সিদ্ধান্ত নিল।

একটু পরেই নিচ থেকে সার্গিও চিৎকার করে উঠল, 'মি. আহমদ মুসা, একটি হেলিকপ্টারে আগুন ধরে গেছে, অন্যটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। দ্রুত ফিরে যাচ্ছে।'

সার্গিও'র কথা শেষ না হতেই প্রচন্ড বিস্ফোরনের শব্দ শোনা গেল পুব দিক থেকে।

'হেলিকপ্টারটি ধ্বংস হয়ে গেছে মি. আহমদ মুসা।' নিচ থেকে আনন্দে চিৎকার করে উঠল সার্গিও'র কণ্ঠ।

'আলহামদুলিল্লাহ।' বলে আহমদ মুসা গাছ থেকে নামা শুরু করল।

গাছের নিচে দাঁড়িয়েছিল হাসান তারিক, সার্গিও এবং ভ্যানিসা।

আহমদ মুসা গাছ থেকে নামতেই সার্গিও হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'অভিনন্দন মি. আহমদ মুসা। আমাদের টেরসিয়েরা দ্বীপ অবিস্মরণীয় এক যুদ্ধ দেখল। সেই সাথে দেখল আহমদ .........।'

আহমদ মুসা তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'আর দেরি নয় মি. সার্গিও, এখনি এখান থেকে সরতে হবে। আমাদেরকে অহেতুক যুদ্ধ এড়াতে হবে।'

'অহেতুক কেন? এ যুদ্ধে শত্রুরা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং দূর্বল হয়েছে।'

‘এটুকুই লাভ মি. সার্গিও। কিন্তু এই লাভ করতে গিয়ে শত্রুদের যে পরিমাণ উস্কে দিয়েছি তাতে উদ্দেশ্য হাসিলের পথে এগুবার বদলে আত্মরক্ষার লড়াই-এ ব্যস্ত থাকতে হবে।’ বলল আহমদ মুসা।

সার্গিও ও ভ্যানিসা স্থির দৃষ্টি তুলে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের চোখে-মুখে বিস্ময়। আহমদ মুসা থামার একটু পরে সার্গিও বলে উঠল, ‘ধন্যবাদ মি. আহমদ মুসা। আপনি যেভাবে ভেবেছেন, ওটা আমাদের মাথাতেই আসেনি। আপনি ঠিকই বলেছেন।’

সার্গিও একটু থেমেই পরক্ষণে আবার বলল, ‘ওদের নতুন আক্রমণের আশংকা করছেন আপনি?’

‘এই পরিস্থিতিতে ওরা বড় ধরনের আক্রমণে না এসেই পারে না। আমি হলে তো সর্বশক্তি দিয়ে আক্রমণ করতাম।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তাহলে চলুন আমরা এখন থেকে তাড়াতাড়ি সরে পড়ি।’ বলল সার্গিও।

‘অস্ত্রগুলো কাজে লাগবে, কিন্তু এতগুলো অস্ত্র নেয়া হবে কি করে মি. সার্গিও?’

‘অসুবিধা হবে না, আমরা সবাই ভাগ করে নেব। একটু এগুলেই আমরা দুটি ঘোড়া পেয়ে যাব।’ বলল সার্গিও।

‘আপনারা ঘোড়ায় এসেছিলেন? সামনে তাহলে ঘোড়া চলার মত ভালো রাস্তা আছে?’ আহমদ মুসা বলল।

‘দক্ষিণের পাহাড়-উপত্যকার খাড়া চড়াই-উৎরাইটা খুব বেশি নয়। তারপরেই ঘোড়া চলতে পারে।’ বলল সার্গিও।

তৈরি হয়ে চলতে শুরু করল তারা।

যে গিরিপথ দিয়ে তারা পাহাড়ে উঠেছিল লুকাবার জন্যে, সে গিরিপথ দিয়েই তাদের চলা শুরু হলো।

‘আমাদের এ যাত্রা কোথায়? আপনাদের বাড়িতে? কোথায় আপনাদের বাড়ি?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা সার্গিওকে।

‘এই উচ্চ ভূমিটাই ছিল আমাদের আদি বাড়ি। ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে গেলে আরও দক্ষিণে সরে একটা বাড়ি তৈরি করা হয়েছিল। যখন নিরিবিলি সময় কাটাতে চাই, তখন এ বাড়িতেই আমরা আসি।’ বলল সার্গিও।

‘এই উচ্চভূমিটা কি করে বাড়ি হয়? না সমুদ্রের তীর, না নদীর ধার এটা।’ আহমদ মুসা বলল।

‘এটাই ছিল তখন সমুদ্র তীর। এই উচ্চভূমিটা একটা দূর্গ। দূর্গটা তৈরি হয়েছিল সমুদ্র তীরে। এর উত্তরের অঞ্চলটা ভূমিকম্পের ফলে জেগে উঠেছে।’

‘এই দুর্গটা আপনাদের পরিবারের বাড়ি হলে ধরে নিতে হবে যে আপনারাই এ দ্বীপের আদি শাসক পরিবার?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘এ দ্বীপের নয় এ দ্বীপপুঞ্জের। আমাদের গনজালো পরিবারই এ দ্বীপের আদি শাসক।’ বলল সার্গিও।

পূর্বমুখী গিরিপথ কিছুটা গিয়ে একেবারে এবাউট টার্ণ করে পশ্চিমমুখী হয়ে একটা সমতল উপত্যকায় প্রবেশ করল। চারদিকের পাহাড়ের দেয়াল ঘেরা উপত্যকাটা বেশ বড়। সারি সারি কবর সে উপত্যকায়। প্রতিটি কবরের শিয়রে ক্রুস শোভা পাচ্ছে।

‘এটা আমাদের আদি পারিবারিক কবরস্থান। ভূমিকম্প আমাদের দূর্গ ধ্বংস করেছে। কিন্তু এ কবরস্থানটা অক্ষত আছে।’ বলল সার্গিও।

উপত্যকার মাঝ বরাবর দিয়ে তারা পশ্চিমে এগিয়ে চলল। দুধারে কবরের সারি।

সামনে চলছিল হাসান তারিক। তারপর ভ্যানিসা। ভ্যানিসার পরে সার্গিও। সবশেষে আহমদ মুসা।

উপত্যকার পশ্চিম প্রান্তে তারা এসে গেছে।

হঠাৎ হাসান তারিক থমকে দাঁড়িয়েছে।

‘একি দেখছি আহমদ মুসা ভাই?’ বলল হাসান তারিক।

‘কি হল? কি দেখছেন?’ বলল সার্গিও ও ভ্যানিসা এক সাথে। তাদের কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা।

দ্রুত আহমদ মুসা সামনে চলতে চলতে বলল, ‘কি হয়েছে, কি দেখছ?’

হাসান তারিক মুখে কিছু না বলে আঙুল দিয়ে ইংগিত করল সামনের কবরের দিকে।

তাকাল আহমদ মুসা। কবরগুলো চোখে পড়ল তার। তাঁর ভ্রুও কুঞ্চিত হয়ে উঠল। উপত্যকার পশ্চিম প্রান্ত থেকে শুরু হয়ে বেশ কিছু দূর পর্যন্ত অনেকগুলো কবরের শিয়রে ক্রস রাখা নেই। এই কবরগুলোর সবগুলোর উপরের কাঠামো ভেঙে লন্ড-ভন্ড করা। কিন্তু তারপরও কবরের বুনিয়াদ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। এই কবরগুলো দক্ষিণ উত্তরমুখী করে তৈরী। অথচ এর পরের সবগুলো কবরই পূব-পশ্চিম মুখী এবং এদের প্রত্যেকটির শিয়রে ক্রস স্থাপিত আছে।

আহমদ মুসাও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল।

পেছন থেকে সার্গিও সামনে এসে আহমদ মুসা ও হাসান তারিকের মাঝখানে দাঁড়াল। সামনে তাকিয়ে মুখে হাসি টেনে বলে উঠল, 'ও এই কবরগুলো ভাঙা কেন! অবাক হয়েছেন আপনারা?' বলে একটু থামল সার্গিও।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক কিছু বলল না।

সার্গিওই আবার কথা বলে উঠল। বলল, 'সব কথা জানি না। তবে শুনেছি, প্রায় একশ বছর আগে আমাদের এক পূর্ব পুরুষ আমাদের আজোরস দ্বীপপুঞ্জের আজকের আধুনিক আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা গোমেজ গনজালো এই কবরগুলো ভেঙে ফেলেন। সেই সময় ইউরোপের এক সংবাদপত্রে আমাদের পরিবারের দুর্নাম রটাবার জন্যে কি যেন লেখা হয়, তারপরেই তিনি এই কবরগুলো ভেঙে ফেলেন। শুধু তাই নয়, ভেংগে প্রথম কবরটার পাশে পারিবারিক একটা বাক্সও সমাধিস্থ করেন এবং কবরস্থানকে বিদেশীদের জন্যে নিষিদ্ধ করে দেন। একশ বছরের মধ্যে আপনারাই প্রথম বিদেশী এই কবরস্থানে প্রবেশ করেছেন।'

'বাক্সটা কেন সমাধিস্থ হলো, কিছু জানেন?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'আমি জানি না। তবে অনুমান করি, কবরগুলো যে কারণে ভাঙা হয়েছে, সেই একই কারণে বাক্সটাকেও সমাধিস্থ করা হয়েছে।' বলল সার্গিও।

'কিন্তু ঐ কবরের কাছে কেন? যে কোন জায়গায় করলেই তো হতো!' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'আমারও সেই প্রশ্ন, কিন্তু উত্তর জানি না।' সার্গিও বলল।

সার্গিও থামতেই ভ্যানিসা বলে উঠল, ‘মনে হয় পরিত্যাজ্য গোপন কিছু সমাধিস্থ করা হয়েছে।’

‘ধন্যবাদ ভ্যানিসা। আমারও তাই মনে হয়।’ বলল আহমদ মুসা।

‘কবরগুলো ভাঙা হলো কেন, এই ব্যাপারে আপনার কি মনে হয় ভাইয়া?’

‘তোমার প্রশ্নের উত্তর আমি জানি। কিন্তু বলবো না। তোমাদের একশ বছর আগের পূর্ব পুরুষ যেমন তা সহ্য করতে পারেনি, তেমনি হয়তো তোমরাও পারবে না।’ আহমদ মুসা বলল।

‘পারবো ভাইয়া।’ বলল ভ্যানিসা।

‘ঠিক আছে বলব। আজ নয়। ঐ বাক্সটা যেদিন উদ্ধার করব, সেদিন বলব। এমনও হতে পারে আমাকে কিছুই বলতে হবে না। বাক্সটাই বলে দেবে সব।’ আহমদ মুসা বলল।

বিস্ময় ফুটে উঠল সার্গিও ও ভ্যানিসা দুজনেরই চোখে-মুখে। বলে উঠল সার্গিও, ‘বাক্সে কি আছে কেমন করে অনুমান করতে পারছেন? আর ঐ বাক্স আপনি পাবেনই বা কি করে?’

‘অনুমান কিভাবে তার উত্তর ভ্যানিসাই দিয়েছে। যে কারণে কবরগুলো ভাঙা সেই একই কারণে বাক্সটিকেও সমাধিস্থ করা হয়েছে। এদিক থেকে বাক্সে কি থাকতে পারে অনুমান করছি। আর বাক্স পাব কি করে? মাটি খুঁড়ে বের করতে হবে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘বাক্সটাকে আপনি এত জরুরী মনে করেন?’ সার্গিও বলল।

‘হ্যাঁ মি. সার্গিও। আপনারা রাজী হলে এখনি খুঁড়ে ওটা বের করতে চাই।’ বলল আহমদ মুসা।

‘না মি. আহমদ মুসা। আজ নয়। আর একদিন আসব আমরা এদিকে। আর এ ব্যাপারে আম্মাকেও আমার রাজি করতে হবে। কারণ ওটা ছিল পারিবারিক এক সিদ্ধান্তের ব্যাপার।’ সার্গিও বলল।

‘আমার আপত্তি নেই মি. সার্গিও।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তাহলে আবার যাত্রা শুরু হোক।’ সার্গিও বলল।

যাত্রা আবার শুরু হলো আগের মতই।

হাঁটা শুরু করে ভ্যানিসা আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, 'কবর ভাঙার রহস্য জানার ব্যাপারটা তো দেখছি অনির্দিষ্ট সময় চেপে রাখতে হবে, কিন্তু আমি তো এক মুহূর্তও তা পারছি না।'

'বেশি প্রত্যাশার জিনিস হলে বেশি ভালো লাগবে ভ্যানিসা।' বলল আহমদ মুসা একটু রসিকতার সুরে।

'কিন্তু মি. আহমদ মুসা, প্রত্যাশা ও না পাওয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে চলছে ভ্যানিসা। তার উপর আরও লোড চাপানো আরও দুঃখজনক হবে।' সার্গিও বলল।

'কি সে তিক্ত অভিজ্ঞতা?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

সার্গিও মুখ খুলতে যাচ্ছিল।

ভ্যানিসা চিৎকার করে তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'ভাইয়া, আমি কিন্তু এখানে বসে পড়ব।' লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠেছে তার মুখ।

'ঠিক আছে বলব না।' বলল সার্গিও।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'বলার দরকার নেই। আমার বুঝা হয়ে গেছে। আমার জিজ্ঞাসা মি. সার্গিও, উনি কি এখন রাজবন্দী, না বিদেশে?'

বিস্ময় ফুটে উঠল ভ্যানিসা ও সার্গিও দুজনের চোখে মুখে। পরক্ষণেই বিস্ময়ের স্থান দখল করে নিল বেদনা। বলল সার্গিও ধীরে ধীরে, 'রাজবন্দী নয়, তবে নজরবন্দী।'

'ঘটনা কি?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'ঘটনাটা বেদনার। ভ্যানিসা বিদ্রোহী গনজালো পরিবারের মেয়ে, আর সে আজোরসের পর্তুগীজ গভর্ণর পেড্রো পাওলেটা'র ছেলে। দুজনেই লিসবন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠি ছিল। পাশ করে এসেছে। এখন লুই জুগো রাজধানী পন্ট ডেলগাডারের বাইরে বেরুতে পারে না। আর ভ্যানিসার জন্যে রাজধানীতে ঢোকা কঠিন।' বলল সার্গিও।

আহমদ মুসার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'এসব কোন ব্যাপারই নয়। আমি আগের কথাই একটু ঘুরিয়ে বলব, ভালো লাগার বস্তু পাওয়া একটু কঠিন হওয়া বাজার অর্থনীতির জন্যেও স্বাভাবিক।'

সার্গিও মুখ টিপে হাসল।
আরও রক্তিম হয়ে উঠল ভ্যানিসার মুখ।
কিছু বলল না কেউ।

# ৩

'চিন্তার কিছু নেই স্যার। ভাল খবরই আমরা আশা করছি।' বলল জ্যাক শামির আজর ওয়াইজম্যানকে উদ্দেশ্য করে।

'জ্যাক শামির WFA-এর একজন নেতা এবং আজোরস দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী 'পন্ট ডেলগাডা'র ষ্টেশন চীফ হিসেবে কাজ করছে বর্তমানে।

'পাঁচ ঘন্টার জন্যে ওরা হেলিকপ্টার ভাড়া করেছিল। কিন্তু এখন পার হয়ে গেছে ৬ ঘন্টা। তারা অবশ্যই ফেরার কথা। কিন্তু তারা কিছু জানাচ্ছে না, আবার তাদের মোবাইলও বন্ধ। কারণটা তাহলে কি?' বলল আজর ওয়াইজম্যান সামনে বসা জ্যাক শামিরকে লক্ষ্য করে।

আজর ওয়াইজম্যান কথা বলছে জ্যাক শামিরকে লক্ষ্য করে, কিন্তু তার চোখ জানালা পেরিয়ে আজোরস সাগরের উপর নিবদ্ধ।

আজোরস সাগরকে তার যতটা সুন্দর লাগতো, আজ ততটা সুন্দর লাগছে না। সুন্দরের পাশে সেখানে ভয়ংকর একটা রূপও সে দেখছে। মাত্র দুজন লোকে তার চল্লিশজন লোক শেষ করে দিল, এই ভয়ংকর চিন্তা যেমন তার সমগ্র সত্তাকে আচ্ছন্ন করেছে, তেমনি গ্রাস করছে যেন সামনের সাগরটাকেও।

জ্যাক শামির বলছিল, 'এদিকটা ভাববার বিষয়ই বটে। তবে স্যার এটা ঘটতে পারে যেহেতু তারা পাঁচ ঘন্টার মধ্যে ফিরতে পারেনি।'

আজর ওয়াইজম্যান মুখ ফিরিয়ে নিল সাগরের দিক থেকে। তাকাল জ্যাক শামিরের দিকে। তার কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে বলল, 'কি যেন বললেন, পুলিশ প্রধান আসবেন, না আমাকে যেতে হবে?'

'পুলিশ প্রধান মি. বারবোসা পোর্টে কি এক মিটিং-এ যাচ্ছেন, এদিক দিয়ে ফিরবেন, সে সময় এখানে উঠবেন।'

আবার আজর ওয়াইজম্যান সাগরের দিকে ফিরে তাকাল। কিছু বলতে যাচ্ছিল। এ সময় বেজে উঠল তার টেলিফোন।

ঘুরল আজর ওয়াইজম্যান মোবাইলের দিকে। তুলে নিল টেলিফোনটা।

ওপার থেকে বলে উঠল, 'ডেভিড ডায়ার বলছি।'

'তোমাদের কি খবর? আমাদের ওখানকার চীফ এডাম এরিয়েল কোথায়? এত দেরিতে টেলিফোন করছ কেন?' এক সাথে প্রশ্নগুলো করে চুপ করল আজর ওয়াইজম্যান।

তারপর ওপারের কথা শুনতে লাগল আজর ওয়াইজম্যান। শুনতে গিয়ে মুখের ভাব পাল্টে যেতে লাগল তার। শেষে তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গিয়ে রাগে-দুঃখে যেন কাঁপতে লাগল তার ঠোঁট।

সব শুনে শেষে ছোট্ট করে সে বলল, 'ও দুজনকে ঐ তেরসিয়েরা দ্বীপ থেকে বের হতে দেয়া যাবে না। তোমরা অপেক্ষা কর। আমি ব্যবস্থা করছি।'

বলে টেলিফোন রেখে দিল আজর ওয়াইজম্যান।

শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় অপেক্ষা করছিল জ্যাক শামির। আজর ওয়াইজম্যান টেলিফোন রাখতেই বলল, 'ওখানকার কি খবর স্যার।'

টেলিফোন রাখার পর মুহূর্তকাল সোজা হয়ে মাথা নিচু করে বসে থাকল চেয়ারে। বলল, ধীরে ধীরে, 'আমাদের হেলিকপ্টার অভিযান ধ্বংস হয়েছে। গ্রাউন্ডে নামানো দশজন কমান্ডোই নিহত। একটি হেলিকপ্টার ধ্বংস হওয়ার ফলে একজন ক্রুসহ এডাম এরিয়েল নিহত হয়েছে। আরেকটা হেলিকপ্টারও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ডেভিড ডায়ার আহত। ঐ হেলিকপ্টারের একজন ক্রু মাত্র অক্ষত আছে।'

বিস্ময় ও বেদনার ধাক্কার সংগে সংগে কথা বলতে পারল না জ্যাক শামির। নিজেকে সামলে নিয়ে একটু পর বলল, 'এমন অবিশ্বাস্য ঘটনা আবারও ঘটতে পারল কি করে? ওদের সাথে আর কেউ কি যোগ দিয়েছে?'

'তার কোন প্রমান পাওয়া যায়নি। প্রথম অভিযানের প্রথম আক্রমণের পর যে দুজন বেঁচে গিয়েছিল, তারা স্বচক্ষে দুজনকেই মাত্র দেখেছে। মোবাইল করার পর ওরাও সম্ভবত নিহত হয়।' বলল আজর ওয়াইজম্যান।

জ্যাক শামির কিছু বলবে এমন সময় এটেনড্যান্ট ঘরে প্রবেশ করে জ্যাক শামিরকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'স্যার, পুলিশ প্রধান মি. বারবোসা এসেছে।'

সংগে সংগে উঠে দাঁড়াল জ্যাক শামির ও আজর ওয়াইজম্যান।

তারা ঘরের বাইরে গিয়ে স্বাগত জানাল আজোরস দ্বীপপুঞ্জের পুলিশ প্রধান বারবোসাকে।

তিনজনই ঘরে এসে তিন সোফায় মুখোমুখি বসল।

পুলিশ প্রধান বারবোসা বসতে বসতেই বলে উঠল, 'মি. ওয়াইজম্যান আপনাকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে। ব্যাপার কি?'

আজর ওয়াইজম্যান ম্লান হাসল। বলল, 'দুজন সন্ত্রাসী মুসলমান আমাদের সাংঘাতিক কষ্ট দিচ্ছে মি. বারবোসা।'

'কোথায় তারা? কোন কেস করেছেন?' জিজ্ঞেস করল পুলিশ প্রধান।

'সবে গত রাতে তারা 'লিজে' এয়ারপোর্টে নেমে তেরসিয়েরা দ্বীপে প্রবেশ করেছে।' আজর ওয়াইজম্যান বলল।

'আজোরস দ্বীপপুঞ্জে মুসলমানদের একটা সন্ত্রাসী দলের প্রবেশ করার পরিকল্পনা আছে, আপনাদের এই ইনফরমেশনের ভিত্তিতে সরকার তো আজোরস দ্বীপপুঞ্জে মুসলমানদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। তারা প্রবেশ করল কিভাবে?' বলল পুলিশ প্রধান।

'ওরা ছদ্মনাম নিয়ে প্রবেশ করেছে।' আজর ওয়াইজম্যান বলল।

'তাদের ছদ্মনাম জানেন কি না?'

'হ্যাঁ। একজনের নাম 'রুই জর্জ', অন্যজনের নাম 'পেড্রো পেট্রিট।'

'পুলিশকে আগে জানাননি কেন?' জিজ্ঞাসা পুলিশ প্রধানের।

'ওরা এয়ারপোর্টে নামার পর সন্দেহ হওয়ায় ওদের ফলো করতে গিয়ে আমরা এটা জানতে পেরেছি।' উত্তর দিল আজর ওয়াইজম্যান।

'কেন আপনারা সন্দেহ করলেন? আমাদের পুলিশ তো সন্দেহ করতে পারেনি।' বলল পুলিশ প্রধান।

'এয়ারপোর্টের বাইরে ওদের কথাবার্তা শুনে আমাদের লোকদের সন্দেহ হয়। পরে খোঁজ নিয়ে এই তথ্য জানা গেছে।' আজর ওয়াইজম্যান বলল।

'এখন বলুন ওরা কি কষ্ট দিচ্ছে, আমরা কি করতে পারি? আর একটা উপকার করুন, আপনারা যেহেতু প্রথম জেনেছেন তাই আপনারা ওদের দুজনের

বিরুদ্ধে একটা মামলা দায়ের করুন যে, তারা নাম ভাঁড়িয়ে অবৈধভাবে এখানে প্রবেশ করেছে।' বলল পুলিশ প্রধান।

'আমাদের লোকরা ওদের তাড়া করলে ওরা আশ্রয় নেয় গনজালো উচ্চভূমিতে। আমাদের দুটি হেলিকপ্টার ওদের তাড়া করেছিল। ওদের ধরতে চেষ্টা করতে গেলে ওরা আমাদের একটা হেলিকপ্টার ধ্বংস করে এবং দশজন লোককে হত্যা করে। অন্য হেলিকপ্টারও আমাদের ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।' বলল আজর ওয়াইজম্যান। কণ্ঠে সে অসহায় সুর ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করল।

ভ্রুকুঞ্চিত হয়ে উঠেছে পুলিশ প্রধানের। বলল, 'সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে। পুলিশকে না জানিয়ে আপনারা এভাবে গেলেন কেন? সন্ত্রাসীদের বাগে আনা কি আপনাদের কাজ?'

'পুলিশকে জানানোর আমরা সুযোগ পাইনি। ওরা পালিয়ে যাবে এই আশংকায় আমাদের লোকরা তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিয়ে ওদের অনুসরণ করে।' আজর ওয়াইজম্যান বলল।

'একটা কথা বলুন মি. ওয়াইজম্যান, যে কাজ পুলিশের সে কাজ আপনারা কাঁধে তুলে নিতে গিয়েছিলেন কেন? ওদের সাথে আপনাদের কি কোন বিশেষ শত্রুতা আছে?' বলল পুলিশ প্রধান।

একটু বিব্রত দেখাল আজর ওয়াইজম্যানকে। একটু চুপ করে থাকল, তারপর বলল ধীর কণ্ঠে, 'মুসলিম সন্ত্রাসীরা আমাদের ইসরাইল রাষ্ট্রের বিরোধী ছিল, আমাদের অস্তিত্বেরও ওরা বিরোধী। আমাদের অবস্থান যেখানে ওদের সন্ত্রাসও সেখানে। বিশ বছর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল, কিন্তু যুদ্ধটা তারা শেষ করেনি। বরং মার্কিনীরা এখন ক্রমান্বয়ে হয়ে উঠছে মুসলমানদের বন্ধু। এর ফলে ওদের সন্ত্রাসের প্রধান লক্ষ্য হয়ে পড়েছি আমরা। এই আজোরস দ্বীপপুঞ্জেও ওরা আমাদের শান্তিতে থাকতে দিতে চায় না।' থামল আজর ওয়াইজম্যান। শেষ দিকে তার কণ্ঠ হতাশ ও করুণ হয়ে পড়েছিল।

সহানুভূতি ফুটে উঠল পুলিশ প্রধান বারবোসার চোখে-মুখে। বলল, 'মি. ওয়াইজম্যান চিন্তা করবেন না। আমাদের এই দ্বীপপুঞ্জ শান্তির দেশ। এখানে কোন

সন্ত্রাসীর জায়গা হবে না। আপনি দয়া করে একটা অভিযোগ দায়ের করুন। আমরা দেখছি ব্যাপারটা?'

'কিন্তু স্যার ব্যাপারটা খুব জরুরী। এই মুহূর্তে ওদের যদি পাকড়াও করা না যায়, তাহলে আরও খুনোখুনি তারা করবে। আর একবার নাগালের বাইরে চলে গেলে ওদের খুঁজে পাওয়া যাবে না।' বলল আজর ওয়াইজম্যান।

'ওরা কোথায় এখন?' জিজ্ঞেস করল পুলিশ প্রধান।

'আমরা মনে করছি, গনজালো উচ্চভূমি থেকে দক্ষিণ দিকে সরে ট্রাইবাল এরিয়া সিলভার ভ্যালি'তে তারা প্রবেশ করেছে। এখান থেকে তাদের পরিকল্পনা মোতাবেক দ্বীপপুঞ্জের অন্য কোথাও যাওয়া তাদের জন্যে সহজ হবে।' আজর ওয়াইজম্যান বলল।

'ঠিক আছে মি. ওয়াইজম্যান, আমি তেরসিয়েরা দ্বীপের পুলিশ প্রধানকে নির্দেশ দিচ্ছি তিনি যেন সিলভার ভ্যালি' থেকে বেরুবার পথগুলোর উপর নজর রাখেন এবং এই ঘটনার তদন্ত যেন তিনি শুরু করেন।' বলল পুলিশ প্রধান।

একটু থেমেই আবার সে বলে উঠল, 'আমাকে এখন উঠতে হয় মি. ওয়াইজম্যান।'

আজর ওয়াইজম্যান উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমার অফিসে আপনার এই পদধুলির জন্যে আমি কৃতজ্ঞ মি. বারবোসা। আরও ধন্যবাদ সহযোগিতার আশ্বাস পেয়েছি তার জন্যে।'

বলে আজর ওয়াইজম্যান হাত বাড়ালো পুলিশ প্রধানের দিকে।

'ধন্যবাদ। বাই।' বলে হ্যান্ডশেক করে বেরিয়ে গেল পুলিশ প্রধান।

গাড়ি বারান্দা পর্যন্ত পুলিশ প্রধানকে পৌছে দিয়ে ফিরে এল আজর ওয়াইজম্যান ও জ্যাক শামির।

বসল তারা আবার মুখোমুখি সোফায়।

সোফায় গা এলিয়ে ক্রুব্ধ কণ্ঠে আজর ওয়াইজম্যান বলল, 'এই বেটা পুলিশ প্রধান জার্মান অরিজিন। নাজিদের রক্ত আছে এর শরীরে। ইহুদীরা যেন ওর কাছে কিছুই নয়। বলে তদন্ত করব। গোল্লায় যাক তোর তদন্ত। তেরসিয়েরার পুলিশ প্রধান তোর চেয়ে হাজার গুণ ভাল তার সাথে অলরেডি যোগাযোগ হয়েছে। ডলার

একটু বেশি চেয়েছে। তা হোক, আমাদের আজকের প্রয়োজনের চেয়ে এটা বড় কিছু নয়।'

'তাহলে তো মি. বারবোসাকে এসব বলে ভুল হলো। তিনি যদি এখন তেরসিয়েরা দ্বীপের পুলিশ প্রধানের কাজে হস্তক্ষেপ করেন।' বলল জ্যাক শামির।

'তুমি এসব নিয়ে ভেব না। এখন তুমি বল, আজোরস এর শীর্ষ সন্ত্রাসী নেতা 'ফিগো'কে খবর দিয়েছ?' আজর ওয়াইজম্যান বলল।

জ্যাক শামির ঘড়ির দিকে তাকাল। বলল, 'খবর দিয়েছি। এখনি এসে পড়বে।'

'ঠিকই বলেছ তুমি, পুলিশ প্রধান মি. বারবোসাকে এসব কথা না বললেই ভাল ছিল। এদিকটা ভেবেই কিন্তু আমি তোমাকে ফিগোকে খবর দিতে বলেছিলাম। মাঝখানে আবার বলে ফেললাম পুলিশ প্রধানকে। থাক, একদিক দিয়ে ভালই হলো। ওনাকে তো জানিয়েই দিলাম, ত্বরিৎ কিছু না করলে ওরা খুনোখুনির সুযোগ পেয়ে যাবে। এখন এই দ্বীপে বিশেষ করে সিলভার ভ্যালি অঞ্চলে যা কিছুই ঘটুক এর জন্যে দায়ী হবে আহমদ মুসা। এটা ভালই হলো আমাদের জন্যে।' বলল আজর ওয়াইজম্যান।

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল জ্যাক শামির। দরজায় নক করে ঘরে ঢুকল এ্যাটেনডেন্ট। বলল জ্যাক শামিরকে, 'স্যার মি. ফিগো নামে একজন লোক এসেছেন।'

শুনেই উঠে দাঁড়াল জ্যাক শামির। 'স্যার আপনি বসুন। আমি ওঁকে নিয়ে আসছি।' বলে বেরিয়ে গেল জ্যাক শামির।

মিনিট খানেক পরেই বিরাট বপু একজনকে নিয়ে ঘরে ঢুকল জ্যাক শামির।

সাদাকালো ষ্ট্রাইফের টিসার্ট গায়ে। পরনে সাদা প্যান্ট। মাথায় সাদা হ্যাট।

এরই নাম আলফ্রেড ফিগো।

একেবারে খাঁটি পর্তুগীজ চেহারা। দেখেই মনে হয় সিউর এক জলদস্যু। তবে ফিগো জলে দস্যুতা করে না। সে আজোরস দ্বীপপুঞ্জের আন্ডারওয়ার্ল্ডের নেতা। তার বাহিনী এই দ্বীপপুঞ্জে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

ফিগো ঘরে ঢুকতেই আজর ওয়াইজম্যান উঠে দাঁড়াল। কয়েক ধাপ এগিয়ে হ্যান্ডশেক করে বলল, 'ওয়েলকাম ওয়েলকাম, আমি আপনারই অপেক্ষা করছি।'

'গুড ইভনিং স্যার' বলে বসতে বসতে আবার বলে উঠল, 'মনে হলো পুলিশ প্রধান এখান থেকে বেরিয়ে গেল?'

'হ্যাঁ, এসেছিলেন। পোর্ট থেকে ফেরার পথে একটু ঢুঁ মেরে গেলেন। অনেক দিন থেকে জানাশোনা তো!' বলল আজর ওয়াইজম্যান।

'বলুন স্যার। আমাকে ডেকেছেন কেন? আমরা আপনার কোন কাজে লাগতে পারি?' বলল ফিগো। একদম নিরস কণ্ঠ তার।

'মি. ফিগো, আমরা আপনার সাহায্য চাই।' আজর ওয়াইজম্যান বলল।

'কি কাজ? কোন ধরনের কাজ?' বলল ফিগো।

'আমাদের বিদেশী দুজন শত্রু প্রবেশ করেছে তেরসিয়েরা দ্বীপে। গত রাতেই 'লিজে' এয়ারপোর্ট হয়ে এসেছে ওরা। আমাদের লোকরা তাদের তাড়া করেছিল। কিন্তু আমাদের লোকদের হত্যা করে ওরা পালিয়েছে। এ দুজনকে জীবন্ত অথবা মৃত আমরা চাই।' আজর ওয়াইজম্যান বলল।

'ওরা কোথায়, মানে কোন অঞ্চলে এখন?' জিজ্ঞেস করল ফিগো।

'দুপুরে পাওয়া তথ্য অনুসারে ওরা সিলভার ভ্যালিতে প্রবেশ করেছে। দুএকদিন সময় পেলে ওরা অন্য দ্বীপে পালাবে। আমরা চাই তেরসিয়েরা দ্বীপেই যাতে ওদের জীবনের ইতি ঘটে।' বলল আজর ওয়াইজম্যান।

'সিলভার ভ্যালি হলো গনজালোদের এলাকা। ওখানে তো কোন বিদেশী আশ্রয় পাবার কথা নয়।' ফিগো বলল।

'আশ্রয় হয়তো পাবে না। ওদিক দিয়ে হয়তো তারা পালাবার চেষ্টা করবে। আমরা চাই তারা পালাতে না পারুক। আমরা চাই তারা মরুক, অথবা ধরা পড়ুক।' বলল আজর ওয়াইজম্যান।

'বলুন আমাদের কি করতে হবে।' বলল ফিগো।

'ওরা ঐ অঞ্চল থেকে পালাবার আগেই ওদের ধরতে হবে, না হয় মারতে হবে।' আজর ওয়াইজম্যান বলল।

‘আমরা কি পাব?’ বলল ফিগো।

‘বলুন কি চান?’ আজর ওয়াইজম্যান বলল।

‘কম করে হলেও মিলিয়ন ডলারের নিচে আমরা এসব কাজে হাত দেই না।’ বলল ফিগো।

‘আমরা রাজী। কিন্তু অর্ধেকটা এখন পাবেন, বাকি অর্ধেকটা পাবেন কাজ শেষ হওয়ার পর।’

‘ঠিক আছে। তাই হবে। আর কোন কথা আছে?’ বলল ফিগো।

‘আমরা দ্রুত কাজ চাই। আগামী তিন দিনের মধ্যে সবকিছুর ইতি ঘটাতে হবে। প্রথম সুযোগেই তারা দ্বীপ ছেড়ে পালাবে। সেটা হোক আমরা তা চাই না।’ বলল আজর ওয়াইজম্যান।

‘সেই দুজন লোকের ফটো আমাদের দিন এবং টাকাও।’ বলে ফিগো উঠে দাঁড়াল।

আজর ওয়াইজম্যান ইশারা করল জ্যাক শামিরকে।

শামির চলে গেল। মিনিট খানেক পরেই প্রবেশ করল বড় একটা ব্রীফকেস নিয়ে।

আজর ওয়াইজম্যান ব্রীফকেস খুলে ফিগোর দিকে মেলে ধরে বলল, ‘আমরা টাকা নিয়ে দর কষাকষি করিনি। আশা করি, কাজের ক্ষেত্রেও আমাদের কোন ওজর শুনতে হবে না। গুণে নিন টাকাগুলো।’

ফিগো ব্রীফকেস হাতে নিয়ে তা বন্ধ করে দিয়ে বলল, ‘আমি কোন সময়ই টাকা গুণে নেই না। আমরা বিশ্বাসের উপর বিজনেস করি।’

‘গুডবাই’ বলে ঘর থেকে গট গট করে চলে গেল ফিগো।

স্বস্তির চিহ্ন ফুটে উঠল আজর ওয়াইজম্যানের চোখে-মুখে।

‘বিরাট একটা কাজ হলো স্যার।’ ফিগো চলে যাওয়ার পর বলল জ্যাক শামির।

‘কাজ হলো নয়, কাজ দেয়া হলো মাত্র। ঈশ্বর সাহায্য করুন।’ বলল আজর ওয়াইজম্যান।

‘ফিগোদের অসাধ্য কিছু নেই স্যার। পুলিশও তাদের হাতের মুঠোয়।’ জ্যাক শামির বলল।

‘তোমার কথা সত্য হোক শামির।’ বলল আজর ওয়াইজম্যান।

‘আমিন।’ বলে উঠল জ্যাক শামির।

আহমদ মুসা মাগরিবের নামাজ পড়ে হোটেলের কক্ষ থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে বসেছে।

হোটেলটি দোতলা। বারান্দাটা হোটেলের দক্ষিণের ব্যালকনি।

ব্যালকনির নিচেই রাস্তা। রাস্তাটা সিলভার ভ্যালির গভীর থেকে এসে পুবে কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে দক্ষিণ দিকে বাঁক নিয়ে দক্ষিণ উপকূলের সবচেয়ে বড় শহর আংগ্রা ডে হেরেমা বন্দর পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। এই রাস্তারই আরেকটা শাখা দ্বীপের পূব উপকূলের একটা অখ্যাত বন্দরে সাও সিভালায় গিয়ে শেষ হয়েছে।

রাস্তাটাকে ঠিক রাস্তা বলা যায় না। বলা যায় রাস্তার একটা চিহ্ন এটা। ঘোড়া ও মানুষের যাতায়াত এই পথ-চিহ্নের সৃষ্টি করেছে।

রাস্তার পরেই নিউ টাগুস নদী। রাস্তাটা নদীকে অনুসরণ করেই এগিয়ে গেছে আংগ্রা ডে হেরেমা পর্যন্ত। পাহাড় ও চড়াই-উৎরাই বাধার কারণে রাস্তাটা সব সময় নদীর তীর বেয়ে এগুতে পারেনি।

নদীটা খুবই খরস্রোতা। সিলভার ভ্যালিতেই শুধু এটা কিছুটা নাব্য, তারপর গোটাটাই অনাব্য।

হোটেলটা সিলভার ভ্যালির পূব মুখের উপর দারোয়ানের মত দাঁড়িয়ে।

হোটেলটা উত্তর থেকে এগিয়ে আসা একটা পাহাড়-শ্রেণীর দক্ষিণ প্রান্তের শেষ টিলার উপরে। হোটেলের পরেই রাস্তা, রাস্তার পর নদী এবং নদীর পরেই পাহাড়-শ্রেণীটা প্রথমে দক্ষিণে কিছু দূর এগিয়ে দুভাগ হয়ে একটা দক্ষিণে, অন্যটি পশ্চিমে এগিয়ে গেছে।

পুব দিক থেকে সিলভার ভ্যালিতে প্রবেশের পথ এই একটাই। এই প্রবেশ পথেরই দ্বাররক্ষী যেন হোটেলটা।

হোটেলটাও আবার ঠিক হোটেল নয়। অনেকটাই সরাইখানার মত। সিলভার ভ্যালিতে উৎপাদিত শস্য, ফল-মুল কেনার জন্যে যে ব্যাপারী, পাইকার ও যেসব ফড়িয়ারা উপত্যকায় আসেন, তারাই এই সরাইখানায় উঠে থাকেন। হোটেল বা সরাইখানায় নিয়মিত রান্নার কোন ব্যবস্থা নেই। অতিথি কেউ আসলে তার জন্যে রান্না হয়। এই হোটেলের মালিক ও তার পরিবার থাকেন পাশেই পাহাড়ের এক গুহাকে কেন্দ্র করে তৈরি বাড়িতে।

হোটেলের মালিক নব্বই বছর বয়সের এক বৃদ্ধ। নাম নুনো কাপুচো। আফ্রিকান, রেড ইন্ডিয়ান ও এস্কিমো সবারই কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে তার চেহারা। তার ভাষাও এই ধরনের মিশ্র। গত দেড় দিনে আহমদ মুসার সাথে তার বেশ ভাব হয়ে গেছে। কাপুচো ইতিমধ্যেই আহমদ মুসাকে গর্বের সাথে জানিয়েছে, তারাই দ্বীপপুঞ্জের আদি বাসিন্দা, তাদের ভাষাই দ্বীপপুঞ্জের নিজস্ব ভাষা। বিদেশীদের একদিন এই দ্বীপপুঞ্জ ত্যাগ করতেই হবে। তবে আহমদ মুসাকে সে বিদেশী বলে না, বলে মেহমান।

আহমদ মুসা ইজি চেয়ারে বসে ছিল। তার মুখ পশ্চিমে সিলভার ভ্যালির দিকে। জোৎস্না-স্নাত ভ্যালির বুকে তার চোখ দুটি নিবদ্ধ। গত দেড়টা দিন সে ভ্যালিতে ঘুরে বেড়িয়েছে। উপত্যকাটার নাম সিলভার ভ্যালি। নামটা স্বার্থক। সিলভার ভ্যালির চারদিকেই পাহাড়। পাহাড় থেকে ভ্যালিতে নেমে এসেছে অনেক সফেদ ঝর্ণা। এই ঝর্ণাগুলো সমৃদ্ধ ও বেগবান করেছে উপত্যকার একমাত্র নদী নিউ টাগুসকে। এই পাহাড়ী টাগুসের জন্ম আরও পশ্চিমের উঁচু পাহাড়ে। সফেদ ঝর্ণা, রূপালী নদী, সবুজ সোনালী শস্যক্ষিত এবং ফলের অজস্র বাগান ও সবুজে আচ্ছাদিত পাহাড়ের দেয়াল অপরূপ করে তুলেছে সিলভার ভ্যালিকে। সন্ধ্যার হালকা আঁধারের ওপর রূপালী জ্যোৎস্নার বিচ্ছুরণ এক মায়াময় দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে উপত্যকাটিকে ঘিরে। আহমদ মুসা এই দৃশ্যই উপভোগ করছে।

উপত্যকার গভীরে তারার মত একটা আলো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। আহমদ মুসা নিশ্চিত ওটা সার্গিও ভ্যানিসাদের বাড়ির আলো।

সার্গিও ভ্যানিসাদের বাড়ি সিলভার উপত্যকার মাঝখানে একটা পাহাড়ের উপর। পাহাড়ের গোড়া দিয়ে বয়ে যাচ্ছে নিউ টাগুস নদী।

চারদিকের সবুজের মাঝখানে ওদের সাদা পাথরের সফেদ বাড়িটা ছবির মত সুন্দর।

কিন্তু আহমদ মুসা তাদের বাড়িতে উঠতে রাজী হয়নি। আহমদ মুসা ওদের বাড়িতে উঠতে অস্বীকার করলে কেঁদে ফেলেছিল ভ্যানিসা। সার্গিও কাঁদেনি বটে, কিন্তু দুঃখ পেয়েছিল, কিছুটা অপমানিতও বোধ করেছিল। আহমদ মুসা ওদের বুঝাতে চেষ্টা করলে সার্গিও বলেছিল, 'আপনি সিলভার ভ্যালিতে এলেন, অথচ আমাদের বাড়িতে না উঠে গিয়ে থাকবেন চাল-চুলোহীন একটা সরাইখানায়, এটা আমাদের জন্যে চরম দুঃখের এবং অপমানেরও।' ভারী হয়ে উঠেছিল সার্গিওর কণ্ঠস্বর।

গম্ভীর হয়ে উঠেছিল আহমদ মুসা। ধীর কণ্ঠে বলেছিল, 'তোমাদের ওখানে উঠতে পারলে তোমাদের চেয়ে আমিই খুশি হতাম বেশি। কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থে আমি এই খুশিকে কুরবানী দিতে চাই।'

'সে স্বার্থটা কি?' ত্বরিত কণ্ঠে বলে উঠেছিল ভ্যানিসা।

'তোমরা কঠিন ও মহান এক দায়িত্ব পালন করছ তোমাদের জনগনের পক্ষে। আমি চাই, কোনভাবেই যেন আমার দ্বারা তোমাদের এ আন্দোলনের কোন ক্ষতি না হয়।' আহমদ মুসা বলেছিল।

'এ প্রশ্ন উঠছে কেন? আপনি যাচ্ছেন আমাদের বাড়িতে। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষতির প্রশ্ন এখানে ওঠে কি করে?' বলেছিল ভ্যানিসা।

'তোমাদের বাড়িতে যাওয়া বড় কথা নয়। এই যাওয়ার মাধ্যমে তোমাদের সাথে আমার পরিচয় ও সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা সবাই জানবে, এটা বড় কথা। এই বিষয়টাকে তোমাদের শত্রুরা, তোমাদের সরকার তোমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারে।' আহমদ মুসা বলেছিল।

'কিভাবে?' বলেছিল ভ্যানিসা।

'বলবে, এটা ওদের স্বাধীনতা আন্দোলন নয়, বরং দেশ বিক্রি করার একটা ষড়যন্ত্র। ওরা দেশকে বিদেশ, বিধর্মী ও মৌলবাদের চারণক্ষেত্র বানাতে চায়।

সম্প্রতি সন্ত্রাসী ও মৌলবাদী নেতা আহমদ মুসা নাম ভাড়িয়ে এদেশে প্রবেশ করে ওদের বাড়িতে গোপনে অবস্থান করেছে। সুতরাং গনজালো পরিবার বিদ্রোহী, ষড়যন্ত্রকারী ও বিদেশীদের এজেন্ট। ব্যস, কেল্লাফতে। তোমরা তো বলতে পারবে না আমি আসিনি, আমি তোমাদের সাথে থাকিনি।' আহমদ মুসা বলেছিল।

সংগে সংগে কথা বলেনি সার্গিও ও ভ্যানিসা। তাদের চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে ভাবনার চিহ্ন।

একটু পরে ম্লান হেসেছিল সার্গিও। বলেছিল, 'ঠিক বলেছেন ভাই, এই কথা তারা বলতে পারে।'

'বলতে পারে নয় মি. সার্গিও, তারা বলবে। আরও একটা কথা মি. সার্গিও। আমার আশংকা যদি সত্য হয়, তাহলে নিশ্চিত জানবেন ওরা আমাদের সন্ধানে আসছে। ওরা এসে পড়ার আগেই যদি আমি সিলভার ভ্যালি ত্যাগ করতে না পারি, তাহলে সংঘাত বাধতে পারে। সেই সংঘাতে গনজালো পরিবার জড়িয়ে পড়লে মহাক্ষতি হবে আপনাদের পরিবারের এবং আপনাদের মহান আন্দোলনের। আমি যদি এই ভ্যালিতেই আলাদা থাকি, তাহলে সংঘাত বাধলেও সেটা হবে আমার ও ওদের মধ্যে। মনে করা হবে, আমি ভ্যালিতে এসে লুকিয়েছিলাম। ভ্যালির কারো সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

ম্লান হাসি ফুটে উঠেছিল ভ্যানিসার মুখেও। বলেছিল আহমদ মুসা থামতেই, 'আপনার কথা সত্য ভাইয়া, কিন্তু এখন আপনার নিজের কথা ভাবার কথা, আমাদের কথা ভাবছেন কেন?'

'কৌশল নির্ধারণ করতে হলে সবটা বিষয়ই এক সাথে ভাবতে হবে ভ্যানিসা।' বলেছিল আহমদ মুসা।

গম্ভীর হয়ে উঠেছিল ভ্যানিসার মুখ। বলেছিল, 'জনাব আহমদ মুসার সাথে যুক্তি বুদ্ধি কোন দিক দিয়েই পারবো না। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি আমাদেরকে অমন তৃতীয় শ্রেণীর সরাইখানায় রাখতে পারতেন?'

আবেগে রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল ভ্যানিসার কণ্ঠ। ছলছলে হয়ে উঠেছিল তার চোখ।

ম্লান হাসি ফুটে উঠেছিল আহমদ মুসার ঠোঁটে। বলেছিল সান্তনা দেওয়ার সুরে, 'তুমি ঠিক বলেছ ভ্যানিসা। আমিও পারতাম না তোমাদেরকে তৃতীয় শ্রেণীর সরাইখানায় রাখতে। কিন্তু আমাদের তো এখন সেই শান্তির সময় নয়। আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে এখন। থাকা, খাওয়া, ঘুম ইত্যাদির যুদ্ধকালিন অবস্থা শান্তির সময় থেকে একদমই আলাদা। তুমি যদি এদিকটা ভাব ভ্যানিসা তাহলে আর খারাপ লাগবে না।'

চোখ ভরা অশ্রু নিয়ে হেসে উঠেছিল ভ্যানিসা। বলেছিল, 'আপনি কেন বন্দুক হাতে নিতে গেলেন ভাইয়া। এক শান্তির নীড়ে, এক স্নেহময় ভাইয়ের প্রতিচ্ছবি আপনি। মাত্র কয়েক ঘন্টার পরিচয় আপনার সাথে। তবু আমি ভাবছি, আপনার জাতীয় ও সামাজিক রূপের চাইতে আপনার পারিবারিক রূপটাই হবে মনোমুগ্ধকর বেশি।'

একটু থামল ভ্যানিসা। কিন্তু আহমদ মুসাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে মুহূর্তকালের মধ্যেই আবার বলে উঠেছিল, 'আপনার প্রস্তাবে এক শর্তে রাজী।'

'কি সেই শর্ত?' বলেছিল আহমদ মুসা।

'সরাইখানার বিছানা ব্যবহার করতে পারবেন না, খাবার খেতেও আপনি পারবেন না। বিছানা আমাদের বাসা থেকে ওখানে যাবে, খাবারও যাবে নিয়মিত সেখানে।' ভ্যানিসা বলেছিল।

'আমি তোমার প্রস্তাবে রাজী, তবে একটা শর্তে।' বলেছিল আহমদ মুসা।

'কি শর্ত?' জানতে চেয়েছিল ভ্যানিসা।

'বিছানা, খাবার তোমাদের বাসা থেকে আসতে পারবে, আমরা তাতে পরম আনন্দও বোধ করব, তবে শর্ত হলো এ বিষয়টা কাকপক্ষীরও জানা চলবে না।' বলেছিল আহমদ মুসা।

'আমি রাজী এ শর্তে।' ভ্যানিসা বলেছিল আনন্দিত কণ্ঠে।

'কিন্তু ভ্যানিসা, কাকপক্ষী না জানার শর্ত পূরণ করে কিভাবে তুমি নিয়মিত খাবার পাঠাবে?' বলেছিল সার্গিও।

হেসেছিল ভ্যানিসা। বলেছিল, ‘আমাদের ভেড়া-ছাগল-গরুর পালটা এখন উপত্যকার পুব-মুখ ঘেঁষেই অবস্থান করছে। পালের সাথে চার পাঁচজন রাখাল রয়েছে। তাদের যাতায়াত আছে সরাইখানায়। ওরাই খাবার পৌছাবে।’

খুশি হয়েছিল সার্গিও। ভ্যানিসাকে ধন্যবাদ দিয়ে সে বলেছিল, ‘এ চিন্তা তোমার মাথায় এল কি করে? যতই চিন্তা করি এ বিষয়টা আমার মাথায় আসতো না।’

আহমদ মুসাও ধন্যবাদ দিয়েছিল ভ্যানিসাকে।

সত্যি ভ্যানিসা তার কথা অক্ষরে অক্ষরে রক্ষা করেছে। রাখালরাই তিন বেলা তার খাবার নিয়ে আসে। হোটেল মালিক নুনো কাপুচোর কাছ থেকেও খাবার আসে। ওগুলো রাখালরা নিয়ে যায় নিজেরা ভোজ করার জন্যে।

আহমদ মুসা শুকরিয়া আদায় করল যে, এখন পর্যন্ত কোন দিক থেকে কিছু ঘটেনি। ভালই যাচ্ছে সময়। মনে মনে আহমদ মুসা কৃতজ্ঞতা জানাল সার্গিও ও ভ্যানিসাদের।

আহমদ মুসা তার চোখ ফিরিয়ে আনল ভ্যানিসাদের বাড়ির দিক থেকে।

পেছনে পায়ের শব্দ পেয়েছে আহমদ মুসা।

দৃষ্টিটা ফিরিয়ে তাকাল আহমদ মুসা পেছন দিকে। দেখল হাসান তারিক ও হোটেলের মালিক নুনো কাপুচো ব্যালকনিতে প্রবেশ করেছে।

এই অসময়ে হোটেল মালিক নুনো কাপুচোকে আসতে দেখে কিছুটা বিস্মিতই হলো আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়ে একটা চেয়ার টেনে সামনে এনে বসতে বলল নুনো কাপুচোকে।

আহমদ মুসার পাশের চেয়ারে বসল হাসান তারিক।

বসেই হাসান তারিক বলে উঠল, ‘ভাইয়া, মি. কাপুচো বলছেন কিছু লোক নাকি ভ্যালীতে বিদেশীদের খোঁজ করছে।’

ভ্রুকুচকালো আহমদ মুসা। চেয়ারে নড়ে-চড়ে বসল। বলল, ‘মি. কাপুচো, ঘটনা কি?’

‘হ্যাঁ, হঠাৎ যেন সবাই আজ বিদেশী খোঁজ করতে লেগে গেছে। আজ বাজারে আমাদের তিনজন কাবিলা প্রধান আমাকে জিজ্ঞেস করেছে আমাদের সিলভার ভ্যালিতে আমি দুজন বিদেশীকে দেখেছি কিনা। আজ দুপুরের পর দুজন বাইরের লোক এসেছিল হোটেলে। জিজ্ঞেস করেছিল, হোটেলে কোন বিদেশী এসেছে কিনা, এসেছিল কিনা। আমি বুঝতে পারছি না ঘটনা কি!’ বলল নুনো কাপুচো।

‘বাইরে থেকে এসেছিল ওরা কারা?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা। তার চোখে-মুখে ভাবনার ছাপ।

‘ওরা ফল ব্যবসায়ীর লোক। মাঝে মাঝেই ওরা আসে ফল মূলের পাইকারী মার্কেটে।’ বলল নুনো কাপুচো।

‘ওরা কাকে খুঁজছে, কেন খুঁজছে বলেছে কিছু?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘সে রকম সুনির্দিষ্টি করে কিছু বলেনি। বলেছে, দুজন বিদেশী হারিয়ে গেছে, তাদেরকেই ওরা খুঁজছে। ওরা নাকি গনজালো প্যালেসেও খোঁজ করেছে। সেখানেও কোন বিদেশী নেই।’ বলল নুনো কাপুচো।

‘দেখা যাচ্ছে, অনেক লোক লেগেছে খোঁজ করতে?’ আহমদ মুসা বলল।

‘হ্যাঁ অনেক লোক। ভ্যালিরও অনেক লোক লেগেছে। কয়েকজন কবিলা প্রধানও। যে কোন মূল্যে বিদেশীদের নাকি ওদের খুঁজে বের করা চাই।’ বলল নুনো কাপুচো।

‘আমরাও তো বিদেশী। কেউ তো আমাদের খোঁজ করেনি?’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমি তো বিদেশী বলিনি। আমি বলেছি আমার দুজন মেহমান আছে, আর কেউ নেই আমার হোটেলে।’ বলল নুনো কাপুচো।

‘আপনার কথা ওরা বিশ্বাস করেছে?’ আহমদ মুসা বলল।

‘তারা বিশ্বাস করা বা না করার সাথে আমার কিছু এসে যায় না। তারা নিজেরাও খোঁজ নিতে পারে। তাছাড়া তারা শুধু তো আমাকে নয়, আরও অনেককেই জিজ্ঞাসাবাদ করছে।’ বলল নুনো কাপুচো।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘ঠিকই বলেছেন আপনি।’

নুনো কাপুচো উঠে দাঁড়াল। বলল, 'উঠি আমি এখন, বাইরে কাজ আছে।'

'দুয়ে দুয়ে চার যেমন সত্য, এটাও তেমনি সত্য হাসান তারিক। ওরা আসবে এটা অবধারিত ছিল।' বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই ব্যালকনিতে প্রবেশ করল যুটো, সার্গিওদের হেড রাখাল।

'কি ব্যাপার যুটো? তুমি এ সময়?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'স্যার, কিছুটা সামনে ভ্যালির বাইরে দুটি ট্রাক ও একটি মাইক্রো বোঝাই লোক এসেছে। তার সাথে এসেছে একটা জীপ। আমি কথাবার্তায় শুনেছি, তারা এই হোটেল রেড করবে। দুজন বিদেশীকে তারা ধরবে। আমি খবরটা নিয়ে গিয়েছিলাম আমাদের স্যারের কাছে। তিনি আপনাকে এই চিঠি দিয়েছেন।'

বলে যুটো একটা চিঠি তুলে দিল আহমদ মুসার হাতে।

আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি চিঠিটা খুলল।

পড়লঃ

'ভাই সাহেব,

আপনাদের অবস্থান শত্রুদের কাছে ধরা পড়ে গেছে। যুটো আপনাকে বলবে। আমি ও ভ্যানিসা গোপন একটা গিরিপথে চারটা ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষা করছি। যুটোর সাথে আপনারা চলে আসুন। শত্রুকে কাঁচকলা দেখিয়ে আমরা উপত্যকা থেকে বেরিয়ে যাব। সংঘাত এড়ানোর আপনার কৌশল সামনে রেখেই আমি এই ব্যবস্থা করেছি।''

আপনার ভাই,<br>'সার্গিও'

চিঠিটা আহমদ মুসা পড়ে হাসান তারিকের হাতে তুলে দিল পড়ার জন্যে।

তারপর তাকাল যুটোর দিকে। বলল, 'উপত্যকার মুখে ওরা কখন এসেছে?'

'এক ঘন্টা আগে।' বলল যুটো।

'কিন্তু ওরা বাইরে অপেক্ষায় কেন? ঢুকছে না কেন ভেতরে?' বলল আহমদ মুসা।

আড়াল থেকে ওদের কথা যতটুকু শুনেছি তাতে ধারণা হয়েছে ওরা লোক পাঠিয়েছে ওদের পরিচিত কয়েকজন কাবিলা প্রধানের কাছে উপত্যকায় ঢোকার অনুমতির জন্যে। অনুমতি পেলে মনে হয় ওরা ঢুকবে।

'কাবিলা প্রধানরা অনুমতি দেবে?' আহমদ মুসা জিজ্ঞেস করল।

'সরাসরি দেবে না। আমাদের স্যার উপত্যকা কমিটির প্রধান। তাঁর কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে। সে অনুমতি ওরা পাচ্ছে না। কারণ আমাদের স্যার ইতিমধ্যেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছেন।' বলল যুটো।

'তাহলে অনুমতি ওরা পাচ্ছে না। অনুমতি না নিয়ে কি ওরা ঢুকবে?' বলল আহমদ মুসা।

'উপত্যকাবাসীদের সাথে লড়াই-এ ওরা নামতে চাইবে না। গাড়ি বোঝাই হয়ে না ঢুকে এমনি দু'চারজন ঢুকতে পারে।' চিঠি পড়া হয়ে গিয়েছিল হাসান তারিকের। বলল, 'ভাইয়া কি সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন?'

'সার্গিও ঠিকই বলেছে। চল আমরা বের হই।' আহমদ মুসা বলল।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ওরা তৈরী হয়ে দুতলার সিঁড়ির মুখে এসে মিলিত হলো।

তাকাল আহমদ মুসা হাসান তারিকের দিকে। বলল, 'তোমার মেশিন রিভলবারটা কোথায়?'

'আমার ব্যাগে।' বলল হাসান তারিক।

'না, ওটা শোল্ডার হোলষ্টারে নাও। কোটের বোতাম খুলে রাখ।' আহমদ মুসা বলল।

'ঠিক আছে ভাইয়া।' বলে হাসান তারিক ব্যাগ থেকে রিভলবার শোল্ডার হোলষ্টারে পুরল।

সিঁড়ি দিয়ে নামল আহমদ মুসারা।

হোটেলের কাউন্টারের সামনে আসতেই বিভিন্ন দিক থেকে বেরিয়ে এসে জনাছয়েক লোক আহমদ মুসাদের ঘিরে ধরল। কাপড়ের ভেতর থেকে তারা বের করল রিভলবার। এক সাথে ছয়টা রিভলবার তাক করা আহমদ মুসাদের দিকে।

ছয় দিক থেকে ছয়টা রিভলবারকে হা করে উঠতে দেখে আর্তনাদ করে উঠল যুটো।

আহমদ মুসা তাকাল হাসান তারিকের দিকে। বলল, 'তুমি যুটোর মত চিৎকার করো না। না জেনে-শুনে এরা নিশ্চয় গুলী করবে না। নিশ্চয় কোথাও ভুল হয়েছে এদের।'

বলে আহমদ মুসা রিভলবারধারী ছয়জনের দিকেই একবার করে তাকাল। তারপর এক জনের দিকে চোখ স্থির করে বলল, 'আপনিই নিশ্চয় এদের চীফ। এখন বলুন ঘটনা কি?'

'ঘটনা কিছুই নয়, আমাদের সাথে চলুন। একটু জিজ্ঞাসাবাদ আছে।' বলল লোকটি।

'কোথায় যেতে হবে?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'এই একটু সামনে।' বলল লোকটি।

'জিজ্ঞাসা কেন বলুন তো? কোন কেস-টেস আছে নাকি আমাদের বিরুদ্ধে।' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'সবই জানতে পারবেন।' বলল লোকটি।

'না জেনে যেতে যদি না চাই?' আহমদ মুসা বলল।

'আমার নাম ফিগো। আমি পাখির মত মানুষ মারতে পারি। দ্বিতীয়বার আমি আর আদেশ করব না। এই মুহূর্তে যাবার জন্যে পা না তুললে গুলী করবে আমার লোকরা।' বলল ফিগো লোকটা।

কৃত্রিম ভয় ফুটিয়ে তুলল আহমদ মুসা তার চোখে-মুখে। বলল, 'গুলীর দরকার নেই। আমরা যাব, এবং আপনাদের কি জিজ্ঞাসাবাদ আছে শুনব।'

একটু থামল। থেমেই আবার বলে উঠল, 'মি. ফিগো, হোটেলের বিল মিটিয়ে দিয়ে কি আমরা বেরোবো?'

বিস্ময় ফুটে উঠল ফিগোর চোখে-মুখে। বলল, 'বিল নিয়ে এখন আপনি ভাবছেন? ঠিক আছে বিল মিটিয়ে দিন।'

আহমদ মুসা হোটেলের কাউন্টারের দিকে এগুলো। কাউন্টারে একজন অল্প বয়সি বয় কাঠ হয়ে বসেছিল, যেন ফাঁসির আসামী। আহমদ মুসা তার

সামনে একটা পাঁচশ ডলারে নোট রেখে বলল, 'বিল কত হয়েছে তুমি তো বলতে পারবে না। মি. কাপুচোকে এই টাকাটা দিয়ে দিয়ো। যদি কিছু বাকি থাকে পরে শোধ করব।'

আহমদ মুসা কাউন্টার থেকে সরে এল। তাকাল হাসান তারিকের দিকে। বলল, 'চল, না গিয়ে তো বাঁচা যাচ্ছে না।'

বলে আগে আগে হাঁটতে লাগল আহমদ মুসা। তার পেছনে হাসান তারিক শুরু করল হাঁটা। তাদের পেছনে ঐ ছয়জন। তাদের রিভলবারগুলো এখন আগের মত আহমদ মুসাদের দিকে তাক করা নয় এবং ট্রিগার পয়েন্টেও নয়।

রাস্তায় নামার পরেই শুরু হলো অন্ধকারে পথ চলা।

হোটেল থেকে পুবে দুশ'গজ পরে পাহাড় ও নদীর মাঝের প্যাসেজটা সবচেয়ে সংকীর্ণ। কোন রকমে দুটি গাড়ি এই প্যাসেজ দিয়ে পাশাপাশি চলতে পারে। এটাই সিলভার উপত্যকায় প্রবেশের গেট।

কিন্তু গেটে কোন দরজা নেই।

গেট পার হয়ে ওপারে পৌছে গেল সবাই।

ওপারে পৌছতেই পেছন থেকে ফিগোর কণ্ঠ শোনা গেল। বলে উঠছে সে, 'যে যেভাবে আছ সেভাবে দাঁড়াও।'

ফিগোর কণ্ঠ চাপা বজ্রের মত শোনাল।

সবাই দাঁড়িয়ে গেল।

আবার ধ্বনিত হলো ফিগোর কণ্ঠ। বলল তার দুজন সাথীকে লক্ষ্য করে, 'জেভি ও কষ্টা, তোমরা শয়তান দুটোকে বেঁধে ফেল।'

আহমদ মুসা দাঁড়াবার আদেশ পেতেই হাসান তারিকও তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। হাসান তারিক পাশে দাঁড়াতেই আহমদ মুসা ফিসফিস কণ্ঠে বলে উঠল, 'ওরা দ্রুত কিছু ঘটাতে পারে। প্রস্তুত।'

ফিগোর নির্দেশ পাবার পর জেভি ও কষ্টা নামের দুই ব্যক্তি এগুলো আহমদ মুসাদের দিকে।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক পুবমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

জেভি ও কষ্টা পেছন থেকে এগুচ্ছে ওদের দিকে। চারদিকের নিশ্ছিদ্র নিরবতার মাঝে তাদের পায়ের কেডস পাথুরে রাস্তার বুকে শব্দ তুলছে। আহমদ মুসার কান দুটি উৎকর্ণ সেই শব্দের দিকে। প্রতিটি পদক্ষিপ যেন গুণছে।

পায়ের শব্দটি আহমদ মুসার পেছনে এসে দাঁড়াবার সাথে সাথে আহমদ মুসা একদিকে তার ডান হাতকে এগিয়ে দিল শোল্ডার হোলষ্টারে রাখা তার এম-১০ মেশিন রিভলবারের দিকে। অন্যদিকে বোঁ করে এবাউট টার্ণে তার বাঁ হাতকে ছুঁড়ে দিল পেছনে দাঁড়ানো লোকটির গলার দিকে। হাতটি অক্টোপাশের মত লোকটির গলা পেঁচিয়ে তাকে যখন টেনে নিয়ে আসছিল আহমদ মুসার দিকে, তখন আহমদ মুসার ডান হাতে উঠে আসা এম-১০ বুলেট বৃষ্টি শুরু করেছিল সামনে দাঁড়ানো লোকদের দিকে।

ভোজবাজীর মত এ ঘটনা বুঝে ওঠার আগে তাদের রিভলবারের ট্রিগার টেপার সময় পেছনের লোকরা পেল না। শুধু রিভলবারের ট্রিগার টেপার সময় পেয়েছিল ফিগো। দুটো গুলীও ছুঁড়েছিল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে। কিন্তু গুলী দুটো আহমদ মুসার বক্ষ ভেদ না করে তার বুকে চেপে ধরা ফিগোর সাথীরই পিঠ ফুটো করে দিল। তৃতীয় গুলী ছোঁড়ার সুযোগ ফিগো আর পায়নি। আহমদ মুসা ও হাসান তারিকের গুলীবৃষ্টি তাকেও ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল।

আহমদ মুসা গুলী বর্ষণ শুরু করার সাথে সাথে হাসান তারিক হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছিল। সেই সাথে তার হাতে আসা মেশিন রিভলবার প্রথমেই গুলী করেছিল তাকে বাঁধতে আসা লোকটিকে এবং তারপর সামনের দিকে ব্রাশ-ফায়ার করেছিল অনির্দিষ্ট লক্ষ্যে।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিকের রিভলবার যখন নিরব হলো, তখন অন্ধকারেই দেখা গেল সামনে কেউ দাড়িয়ে নেই। তবে অন্ধকারের কারণে বুঝার উপায় নেই কার কি অবস্থা।

'নিশ্চয় কেউ বেঁচে নেই।' প্রথম কথা বলল হাসান তারিক।

'হ্যাঁ তাই। বেঁচে থাকলে গুলী করার এই সুযোগ তারা নিত।' বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই তারা শুনতে পেল তাদের পেছনে ইঞ্জিনের গর্জন।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক দুজনেই পেছন ফিরে পুব দিকে তাকাল। দেখতে পেল অল্প সামনে তিনটি গাড়ির ছয়টি হেডলাইট জ্বলে উঠেছে। এগিয়ে আসছে গাড়িগুলো।

'গুলীর শব্দ শুনে কি ঘটেছে তা দেখার জন্যই নিশ্চয় ওরা আসছে।' বলল হাসান তারিক।

'এবং তারা মনে করছে, যে গুলীর শব্দ তারা শুনেছে তা তাদের লোকদেরই।' হাসান তারিক থামতেই বলে উঠল আহমদ মুসা।

'তাহলে এখন আমরা কি করব?' হাসান তারিক বলল।

'আমরা কিছু করব না, ওরা কি করে সেটা দেখতে চাই।'

কথাটা বলে একটু থেমেই আবার বলে উঠল, 'চল, আমরা সিলভার ভ্যালির দিকে হেঁটে গিয়ে ভ্যালির মুখের ওপাশে দাঁড়াই। ওরা এস সাথীদের লাশ দেখুক। তারপর কি করে দেখা যাক।'

বলে আহমদ মুসা সিলভার ভ্যালির দিকে হাঁটা শুরু করল।

হাঁটতে লাগল হাসান তারিক আহমদ মুসার পেছনে।

তিন গাড়ির বহরটি লাশগুলোর সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। সামনের গাড়ির হেডলাইটের আলো ছড়িয়ে পড়ল লাশগুলোর উপর।

তিনটি গাড়ির হেডলাইটই জ্বলছে।

হেডলাইটের আলোতে গাড়িগুলোও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সবার সামনে মাইক্রো। মাইক্রোর ছাদে বিশাল সাইজের একটা মেশিনগান ফিট করা।

গাড়ি তিনটি লাশের সামনে থামার সাথে সাথে মাইক্রোর পেছনের জীপ থেকে দুজন দ্রুত নেমে এল।

তারা মাইক্রোর আড়াল থেকে লাশগুলো দেখে আবার দ্রুত ফিরে গেল জীপে। তারা জীপে ফিরে যেতেই মাইক্রোর ছাদে ফিট করা মেশিনগান গর্জন করে উঠল। গুলীর বৃষ্টি প্রবেশ করল সংকীর্ণ পথ দিয়ে উপত্যকরা ভেতরে।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক পাহাড়ের আড়ালে না থাকলে তাদের দেহ ঝাঁঝরা হয়ে যেত।

গুলীবৃষ্টির মধ্যে মাইক্রো থেকে মানুষ নামল। তারা এক এক করে লাশগুলো নিয়ে গাড়িতে তুলতে লাগল।

আহমদ মুসা ফিসফিস করে বলল, 'তারিক, ওরা আক্রমণে আসছে না। ওদের মেশিনগানের গুলী ওদের লাশ সরিয়ে নেবার ঢাল মাত্র।'

'কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ওরা রণে ভংগ দেবে?' বলল হাসান তারিক। তার চোখে বিস্ময়।

'একটি কারণে হতে পারে। সেটা হলো যারা মারা গেছে তাদের মধ্যে তাদের সর্দার রয়েছে।' আহমদ মুসা বলল।

'হ্যাঁ ভাইয়া, ঠিক বলেছেন। ওদের লিডার যে ছিল সে কোন বড় নেতাই হবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, তাদের লাশ নিয়ে যাবার এই গরজ কেন?' বলল হাসান তারিক।

'লাশ পড়ে থাকলে লাশের মাধ্যমে তাদের পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়বে, হয়তো এটা ওরা চায় না।' আহমদ মুসা বলল।

অব্যাহত গুলীর আড়ালে তারা সবগুলো লাশ তুলে নিল গাড়িতে। গুলী তাদের বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু গাড়িগুলো নড়ল না। নিজেদের জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক পাহাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে উপত্যকার সংকীর্ণ মুখটায় এসে দাঁড়াল।

'ওরা দাঁড়িয়ে কেন। সামনেও এগুচ্ছে না, পেছনেও সরছে না। কারণ কি?'

ভ্রু-কুঞ্চিত হয়ে উঠল আহমদ মুসার।

বোঁ করে আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়াল। ঘুরা অবস্থায় আহমদ মুসা তার এম-১০ এর ব্যারেল তুলে নিচ্ছিল।

কিন্তু আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়িয়ে স্থির হবার আগেই একই সাথে দুটি গুলী এসে আঘাত করল তার এম-১০ মেশিন রিভলবারটিকে। আঘাতে তার তর্জনীও আহত হলো।

রিভলবার পড়ে গেল তার হাত থেকে।

আহমদ মুসার চেয়েও অবস্থা খারাপ হাসান তারিকের। তার দিকে গুলী এসেছিল সেকেন্ড খানেক পরে। হাসান তারিক রিভলবার তুলেছিল গুলী করার জন্যে। কিন্তু তার ট্রিগার টেপার আগেই গুলী এসে বিদ্ধ করেছে তার ডান বাহুকে। ছিটকে পড়ে গেছে তার হাত থেকে রিভলবার।

সামনে থেকে অট্টহাসি ভেসে এল।

আহমদ মুসা তাদের সামনে তিনজন লোককে দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু অন্ধকারে তাদের অবয়ব পরিষ্কার ছিল না। আহমদ মুসা বুঝতে পারছিল না ওরা কারা? উপত্যকার ভেতরের লোক ওরা, না ওদের সাথে আসা একটা অংশ। লাশ তুলে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ওদের সময় ক্ষেপণের কৌশল এবং লাশ তুলে নেয়ার পরও দাঁড়িয়ে থাকা দেখেই আহমদ মুসার শেষ মুহূর্তে মনে হয়েছিল, লাশ তোলা নাটকের দৃশ্যের দিকে তাদের মনোযোগ সরিয়ে নিয়ে আক্রমণের ভিন্ন কৌশল তারা গ্রহণ করেছে এবং সেটা তাদের পেছন দিক থেকেই হওয়া স্বাভাবিক। এ ভাবনার সাথে সাথেই আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে।

অট্টহাসিটা শুনেই কিন্তু আহমদ মুসা চিনতে পারল ওটা আজর ওয়াইজম্যানের গলা।

অট্টহাসি থামল এবং সেই সাথে ভেসে এলো আজর ওয়াইজম্যানের কন্ঠ। বলল আহমদ মুসা, এবার আমরা ভুল করিনি। অধ্যাপক দানিয়েলের বাড়িতে যে ভুল আমরা করেছিলাম, সেটা আর হবেনা। তোমাকে কাউন্টার আক্রমনের আর সুযোগ আমরা দেবনা।

আজর ওয়াইজম্যানের কথা শেষ হতেই তার পাশের ছায়ামূর্তিটির লম্বা ও মোটা ব্যারেলের বন্দুক চোখের পলকে উপরে উঠল। গর্জন করে উঠল ক্ষিপণাস্ত্রের মত। পর মুহূর্তেই দেখা গেল একটা জাল গিয়ে জড়িয়ে ফেলেছে আহমদ মুসা ও হাসান তারিককে।

জালটা অদ্ভুত ইলাষ্টিক ধরনের।

বেশ প্রশস্ত জালটি আহমদ মুসাদের জড়িয়ে ফেলার পর সংকুচিত হয়ে একেবারে লাগেজ ব্যাগে পরিণত হয়েছে। হাত-পা নড়ানো ও মুখ এদিক-ওদিক করার সামান্যতম সুযোগও নেই।

আজর ওয়াইজম্যান আবার হেসে উঠল হো হো করে। হাসির পর বলে উঠল আবার, 'আহমদ মুসা, আমি তোমাকে হত্যা করতে পারতাম। হত্যা করতে চেয়েছিলামও। কিন্তু হত্যা করিনি। তুমি মৌলবাদী ও মিলিট্যান্টদের ব্যাপারে যা জান, দুনিয়ার কেউ তা জানে না। আজকের মুসলিম রেনেসাপন্থীদের তুমি এক অনন্য অভিধান। তোমাকে হত্যা করলে এই অমূল্য অভিধান চিরতরে হারিয়ে যাবে। আমরা তোমাকে এক্সরে করে ধীরে ধীরে সব তথ্য বের করে নিতে চাই। তবে তুমি বেয়াড়া হলে হত্যা করতে এক সেকেন্ডও দেরি করা হবে না।'

কথা শেষ করেই পকেট থেকে মোবাইল বের করল। টেলিফোন করল কাউকে। মোবাইলটা কানে ধরে ওপার থেকে সাড়া পেয়েই বলে উঠল, 'সুসংবাদ নাও, দুজনকেই জালে আটকেছি। ওদিকের খবর কি?'

ওপারের কথা শুনে আবার বলে উঠল, 'আহ্ বেচারা আলফ্রেড ফিগো! আমি এটাইতো আশংকা করেছিলাম। বিরাট ক্ষতি হলো আমাদের। তোমরা চিন্তা করো না। ফিগোর কাছে কমিট করা পুরো অংকই তোমরা পেয়ে যাবে। আবার চাইলে তোমরা আমার সাথেও কাজ করতে পারবে। যাক, এখন জলদি গাড়ি নিয়ে এস।'

কথা শেষ করেই মোবাইল বন্ধ করল আজর ওয়াইজম্যান। সংগে সংগেই সে তার বাম পাশের দুই সাথীসহ অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে পেছনে ফিরছে। বিস্মিত হয়ে আজর ওয়াইজম্যান পেছন ফিরল। ফিরেই গুলীর মুখোমুখি হলো সে। তার চোখে পড়ল অল্প দূরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে দুটি ছায়ামূর্তি। তাদের হাতে উদ্যত রিভলবার। আরও চোখে পড়ল, তার পাশের দুই সাথী গুলী বিদ্ধ হয়ে ভূমিশয্যা নিল।

উরুতে গুলীবিদ্ধ হয়েছে আজর ওয়াইজম্যান।

সে দাড়িয়েছিল নদীর তীর ঘেষেই।

তার জামা-কাপড় দিয়ে তখনও পানি ঝরছে। পরিকল্পনা করে নদীর উজান বেয়ে সামনে এসেই তারা পেছন থেকে আক্রমণ করেছিল আহমদ মুসাদেরকে।

পাল্টা আক্রমণের সুযোগ দেখল না আজর ওয়াইজম্যান। ডান হাতের রিভলবার তুলতে গেলেই ওদের গুলীতে ঝাঁঝরা হতে হবে।

মুহূর্তেই তার সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছিল।

তার দেহটা ছিটকে দক্ষিণ দিকে পড়ে গেল। তারপর আরেকটা গড়া দিয়েই নদীতে গিয়ে পড়ল। ছায়ামূর্তি দুটি এবার দ্রুত এগিয়ে এল জালে জড়ানো লাগেজে পরিণত হওয়া আহমদ মুসাদের কাছে।

দুটি ছায়ামূর্তির একজন সার্গিও গনজালো, অন্যজন ভ্যানিসা।

সার্গিও গনজালো তাড়াতাড়ি তার মোজার মধ্যে গুজে রাখা একটা চাকু বের করে জালটা কেটে ফেলল।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক উঠে দাঁড়াল।

'ধন্যবাদ মি. সার্গিও, আপনি ঠিক সময়ে এসে পড়েছিলেন।'

'ভাই সাহেব, ধন্যবাদটা জুটোর প্রাপ্য। আপনি ও মি. হাসান তারিক আকস্মিকভাবে বন্দী হলে সে ওদের চোখ এড়িয়ে পালায় এবং ছুটে যায় আমাদের কাছে। তা না হলে ওখানে আমরা আপনাদের জন্যে কতক্ষণ দাঁড়াতাম কে জানে!' বলল সার্গিও।

'আল্লাহর শুকরিয়া যে, জুটোকে তারা আমাদের সাথে ধরেনি।' আহমদ মুসা বলল।

'ভাইয়া, আপনার কৌশল কাজে লেগেছে। উপত্যকার কেউ আপনার সাথে নেই, আপনারা পালিয়ে এসে উপত্যকার হোটেলে উঠেছেন, এটাই তারা সম্ভবত মনে করেছে।' বলল ভ্যানিসা।

'কিন্তু আপনারা ওদের মেরে আমাদের উদ্ধার করেছেন, এ থেকে ওরা কি ভাববে সেটা এখন চিন্তার বিষয়।' হাসান তারিক বলল।

হাসান তারিকের কথা শেষ হতেই আহমদ মুসা দ্রুত লাশ দুটির দিকে এগুলো।

ওদের একবার দেখে বলে উঠল আহমদ মুসা, 'হ্যাঁ মি. সার্গিও, তৃতীয়জন মানে আজর ওয়াইজম্যান কোথায়?'

‘আহত হবার পর যিনি নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। উনি কি আজর ওয়াইজম্যান ছিলেন? ও গড! উনিই তো প্রথম শিকার হওয়া উচিত ছিল।’ বলল সার্গিও গনজালো।

আপনি কি করবেন মি. সার্গিও, আল্লাহ ওকে আরেকটু সময় দিয়েছেন তার পাপের ভারটা পূর্ণ করার।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তাই হবে ভাই সাহেব।’ বলে একটু থামল সার্গিও। পরক্ষণেই আবার বলে উঠল, ‘আমরা আসার পথে প্রচন্ড গুলী-গোলার শব্দ শুনেছিলাম। আর আজর ওয়াইজম্যানের টেলিফোন টকে বুঝলাম, আলফ্রেড ফিগো নামে নেতা গোছের কেউ মারা গেছে। ঘটনা কি ভাই সাহেব?’

আহমদ মুসা সংক্ষেপে তাদের বন্দী করে নিয়ে আসা, ওদের ছয়জনকে হত্যা করে তাদের মুক্ত হওয়া, মেশিনগানের অব্যাহতগুলীর আড়ালে ওদের লাশ তুলে নিয়ে যাওয়া এবং পেছন থেকে আকস্মিক আক্রমণের মাধ্যমে তাদের বন্দী হওয়ার কাহিনী বলল।

‘তাহলে ঐ ছয়জনের একজনই ফিগো হবে। তাকেই আজর ওয়াইজম্যান ভাড়া করেছিল আপনাদের হত্যা অথবা বন্দী................।’

সার্গিও’র কথা শেষ হলো না।

পেছন থেকে তিনটি ইঞ্জিন প্রচন্ড গর্জন করে উঠলে আহমদ মুসা ও সার্গিওসহ সকলে পুব দিকে ফিরে তাকাল। দেখল, তিনটি গাড়ি উপত্যকার দিকে আসছে।

সার্গিও দ্রুতকণ্ঠে বলে উঠল, ‘ভাই সাহেব, বন্দী হিসেবে আপনাকে নিয়ে যেতে আসছে। আজর ওয়াইজম্যান ওদের আসার নির্দেশ দিয়েছিল।’

‘আজর ওয়াইজম্যানের এই ইচ্ছাও পূরণ হলো না। কিন্তু আমরা রক্তপাত এড়াতে চাই।’ বলল আহমদ মুসা।

সবাই ছুটে আসা গাড়ির দিকে মুখ করেই দাঁড়িয়েছিল।

কিছু বলতে যাচ্ছিল হাসান তারিক। কিন্তু থেমে গেল।

সবাই দেখল, উপত্যকার মুখে পৌছার আগেই থেমে গেল গাড়িগুলো।

‘থেমে গেল কেন গাড়িগুলো? আজর ওয়াইজম্যানের নির্দেশ মোতাবেক গাড়িগুলো দ্রুত এখানে চলে আসার কথা।’ বলল সার্গিও বিস্মিতকণ্ঠে।

ভাবছিল আহমদ মুসা।

হঠাৎ তার মুখে নেমে এল প্রসন্নতা। বলল, ‘যিনি ওদের আসার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তিনিই ওদের থামিয়ে দিয়েছেন মি. সার্গিও।’

‘তার মানে আহত আজর ওয়াইজম্যান নদী থেকে কাজ শুরু করে দিয়েছেন।’ হাসান তারিক বলল।

‘হ্যাঁ তাই হাসান তারিক। এ ছাড়া গাড়িগুলো থেমে যাবার আর কোন যুক্তি নেই।’ বলল আহমদ মুসা।

হঠাৎ ভ্যানিসা চাপাকণ্ঠে আর্তচিৎকার করে উঠল, ‘সার্গিও ভাইয়া, ওরা তো আহত। দেখ, আহমদ মুসা ভাইয়ার ডান হাতে এবং হাসান তারিক ভাইয়ার ডান বাহুতে রক্ত।’

আহমদ মুসা তৎক্ষণাৎ বলে উঠল, ‘চিন্তার কারণ নেই ভ্যানিসা, বুড়ো আঙুলের গোড়াটা গুলীর ধাক্কায় একটু ছিঁড়ে গেছে। আজর ওয়াইজম্যানের গুলী আমার পিস্তলকে আঘাত করেছিল।’

হাসান তারিকও বলে উঠল, ‘আমার বাহুটাও ছিঁড়ে গেছে। গুলী অল্প একটু জায়গা ছিঁড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেছে, এখন রক্ত খুব অল্পই বের হচ্ছে।’

ভ্যানিসা তাড়াতাড়ি তার ব্যাগের চেইনটা খুলে গলায় বাঁধা একটা স্কার্ফ বের করল। তাড়াতাড়ি তা ছিঁড়ে একটা অংশ দিয়ে হাসান তারিকের বাহু ও আহমদ মুসার আঙুল বেঁধে দিল। তার বাঁধার ষ্টাইল দেখে হাসান তারিক বলল, ‘আপনি ডাক্তার নাকি?’

‘ডাক্তার নয়, নার্স বলতে পারেন। আমাদের গনজালো পরিবার এবং আমাদের পাহাড়ী ও যাযাবর সব উপজাতির মহিলাদেরই এই ট্রেনিং আছে। আমরা দীর্ঘ এক যুদ্ধে জড়িত। আমাদের মহিলাদেরকেই ডাক্তার ও নার্সের কাজ বেশি করতে হয়।’ বলল ভ্যানিসা।

‘ধন্যবাদ বোন।’ আহমদ মুসা বলল।

ভ্যানিসা কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল। কিন্তু থেমে গেল। ইঞ্জিনের শব্দে তারা সামনে ফিরে তাকাল। দেখতে পেল সামনের গাড়িটা আবার এগিয়ে আসতে শুরু করেছে।

ওদিকে চোখ রেখে আহমদ মুসা ধীরে ধীরে বলল, 'আজর ওয়াইজম্যান কি আবার নতুন করে আক্রমণে আসতে চায়? কিন্তু এই রক্তপাত আমাদের জন্যে অপ্রয়োজনীয় এবং সিলভার ভ্যালির জন্যে ক্ষতিকর। এই অবস্থায় আমাদের কি করণীয়।'

আহমদ মুসা থামল।

আহমদ মুসা থামার সাথে সাথে গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দও থেমে গেল।

গাড়িটা উপত্যকার প্রবেশ পথের মুখে থেমে গেছ। দাঁড়িয়েছে পাহাড়ের দেয়ালের ঠিক গা ঘেঁষে। পর মুহূর্তে পেছনের গাড়িটাও এসে তার পাশে দাঁড়াল।

উপত্যকার প্রবেশ মুখে গাড়ি দুটি এমনভাবে দাঁড়াল যে, তৃতীয় কোন গাড়ি যাওয়া আসার পথ বন্ধ হয়ে গেল। এখন গাড়ি দুটির দুপাশ দিয়ে শুধু পায়ে হাঁটা লোকই চলাচল করতে পারবে।

গাড়ি দুটির হেডলাইট উপত্যকার মুখসহ অনেকখানি এলাকা আলোকজ্জ্বল করে তুলেছে। এখন উপত্যকার বাইরে যেই যেতে চাইবে, গাড়ির পড়ে যাবে।

দুটি গাড়ির ছাদের উপর মেশিনগান সাজানো। মেশিনগানের ব্যারেল হা করে আছে উপত্যকার দিকে।

আহমদ মুসার কপাল কুঞ্চিত।

ভাবছিল সে।

বলল একটু পর, 'মি. সার্গিও ওরা উপত্যকা অবরোধ করে বসল।'

'অবরোধ? অবরোধ করে কি করবে?' বলল সার্গিও।

'আমাকে ও হাসান তারিককে ধরবে।' আহমদ মুসা বলল।

'কিভাবে? অবরোধ করে বসে থাকলেই কি ধরা যাবে? কয়দিন ওভাবে বসে থাকবে তারা?' বলল সার্গিও।

'উপত্যকার মুখে ওরা এভাবে বেশি সময় বসে থাকবে না। আমার ধারণা তারা তাদের শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করবে এবং পুলিশেরও সাহায্য চাইবে

বিশ্বাসযোগ্য কোন কাহিনী ফেঁদে। উপত্যকার ভেতরের কারও সাথে যোগাযোগ করবে। সবশেষে প্রবেশ করবে উপত্যকায়।' আহমদ মুসা বলল।

'আর আমরা এ সময় উপত্যকায় বসে হাওয়া খাব তাই না? আপনারা যে পথে এসেছেন, সেই পথেই আবার বেরিয়ে যেতে পারেন, এটা কি তারা জানে না?' সার্গিও বলল।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'সে দিকের ব্যবস্থাও তারা নিশ্চয় করছে।'

'তার মানে তারা ঐ পথ অবরোধেরও ব্যবস্থা নেবে?' বলল সার্গিও।

'শুধু অবরোধ নয়, ঐ পথে এ উপত্যকায় তারা অভিযানেরও ব্যবস্থা করতে পারে। তাদের ক্ষতি কম হয়নি। তারা নিশ্চয় মনে করছে এ সব আহমদ মুসার কাজ। আহমদ মুসাকে ধরার এটুকু ব্যবস্থা তারা করবেই।' আহমদ মুসা বলল।

'তাহলে আমাদের এখন কি করণীয় ভাই সাহেব?' বলল সার্গিও।

'আমরা যেভাবে নিরবে উপত্যকায় এসেছিলাম, সেভাবেই বেরিয়ে যাব অর্থাৎ যে পথে এসেছিলাম সে পথেই।' আহমদ মুসা বলল।

'কিন্তু আপনি যে বললেন ঐ পথেও ওরা অবরোধ বসাচ্ছে বা অভিযানে আসছে?' বলল সার্গিও।

'পাহাড়ে ওদের চোখ এড়ানো সম্ভব হবে। সাউন্ড মনিটরিং আমাদের সাহায্য করতে পারে ওদের আগমন চিহ্নিত করার কাজে।' আহমদ মুসা বলল।

'কিন্তু এরপরও সংঘাত বাধতে পারে। কিন্তু আপনি চাচ্ছেন সংঘাত এড়াতে।' বলল সার্গিও।

'সংঘাত সব সময় এড়ানোর চেষ্টা করা উচিত। তবে কেউ ঘাড়ে এসে পড়লে জবাব দিতেই হয়। সে যাক। আমাদের এখন যাত্রা করা উচিত মি. সার্গিও।' আহমদ মুসা বলল।

'কিন্তু তার আগে আমাদের বাসায় যেতে হবে, এটা আপনার ওয়াদা ছিল।' বলল ভ্যানিসা।

একটু থামল আহমদ মুসা। বলল, 'এই উপত্যকার প্রতি একটা মমতার সৃষ্টি হয়েছে। এই মমতা আর বাড়াতে চাই না। আর সময়ও নেই তোমাদের বাড়িতে যাবার।'

‘আপনার কোন কথা শুনব না। যেতে হবে আমাদের বাড়িতে।’ বলে ভ্যানিসা তাকাল সার্গিও গনজালোর দিকে। বলল, ‘ভাইয়া’ এস ওদের নিয়ে।’

কথা শেষ করে হাঁটতে লাগল ভ্যানিসা।

সার্গিও আহমদ মুসার দিকে চেয়ে বলল, ‘চলুন, উপায় নেই।’

# ৪

আহমদ মুসা ডাইনিং থেকে ড্রইংরুমে প্রবেশ করে শোফায় বসতে বসতে বলল, 'হাসান তারিক, মি. সার্গিও, ভ্যানিসা এস আমরা একটু বসি। গন্তব্য নিয়ে একটা আলোচনা সেরে নেই।'

ড্রইং রুমের চারদিকে চোখ বুলাচ্ছিল হাসান তারিক। সে বসতে বসতে বলল, 'ভাইয়া, যাত্রা শুরুর আগে এ কাজটা অবশ্যই আমাদের সারতে হবে। কিন্তু তার আগে একটা কথা বলি ভাইয়া, মি. সার্গিওদের গোটা ড্রইং রুমটাই যেন একটা বিরাট এ্যানটিকস। বিশাল শোকেসটার এ্যানটিকসগুলোর মত সোফা, কার্পেট, ওয়ালম্যাট, ছবি সবকিছুই দেখার মত এ্যানটিক্স।'

'হাসান তারিক ভাইয়া ঠিকই বলেছেন। এগুলো সবই আমাদের পুরানো বাড়ি থেকে আনা সম্পদ; আমাদের জীবন্ত অতীত।'

'তার মানে এগুলোর কোন কোনটির বয়স পাঁচশ' ছ'শ বছরও হতে পারে?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার কণ্ঠে।

'অবশ্যই ভাইয়া। আপনি শোকেসের বড় যে তরবারিটা দেখছেন ওটা এই দ্বীপে আমাদের আদি পূর্ব পুরুষ মি. গনজালোর। প্রত্যেকটা এ্যানটিকসের সাথেই তার বয়স ও পরিচয় সম্পর্কে একটা নোট আছে।'

'বেশ মজার তো! দেখতে তো হয়।' বলল আহমদ মুসা।

'দেখবেন? আসুন, খুব খুশি হবো।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো ভ্যানিসা।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

সবাই উঠল।

সত্যিই দেখার মত অনেক জিনিস।

আহমদ মুসা এটা ওটা দেখে হাতে তুলে নিল একটা স্বর্ণমুদ্রা। মুদ্রার আরবী বর্ণমালা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। চোখের সামনে তুলে ধরল সে মুদ্রাটা। মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল আহমদ মুসার। ক্যালিগ্রাফিক আরবী বর্ণমালায় মুদ্রার উপর

অংশের প্রান্ত ঘেঁষে অর্ধচন্দ্রাকারে লেখা 'আব্দুর রহমান আল নাসির লি দ্বীনিল্লাহ'। আর নিচের অংশে '৩১১ হিজরী'। টাকাটা দ্রুত উল্টাল আহমদ মুসা। দেখল টাকার গোটা বুক জুড়ে কাবার ছবি। কাবার ছবি ঘিরে টাকার প্রান্ত ঘেঁষে বৃত্তাকারে লেখা, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।'

আহমদ মুসা বুঝল মুদ্রাটি স্পেনের। স্পেনের সুলতান তৃতীয় আবদুর রহমান এ মুদ্রা চালু করেছিলেন হিজরী ৩১১ সালে। তাঁর উপাধি ছিল 'আল নাসির লি দ্বীনিল্লাহ'। তিনি স্পেনের সিংহাসনে আরোহণ করেন ৩০০ হিজরীতে। তিনি দীর্ঘ ৬৬ বছর স্পেন শাসন করেন। ইংরেজী সাল হিসেবে ৯১২ খৃষ্টাব্দ থেকে ৯৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তার শাসনকাল বিস্তৃত ছিল। তিনি তার সিংহাসনে আরোহণের একাদশ বছরে এই স্বর্ণমুদ্রা চালু করেন। তার শাসকাল স্পেনে মুসলিম শাসনের স্বর্ণযুগ।

সেই সোনালী দৃশ্যটা স্বর্ণমুদ্রার মধ্যে দিয়ে যেন দেখতে পেল আহমদ মুসা। অপ্রতিরোধ্য এক আবেগে হৃদয়টা তার মোচড় দিয়ে উঠল। হাতের মুদ্রাটা যেন মুদ্রা নয়, একটা সোনালী ইতিহাস। হাতসহ মুদ্রাটা উঠে এল ঠোঁটে। আহমদ মুসা একটা চুম্বন এঁকে দিল মুদ্রার বুকে।

আহমদ মুসার দুচোখের কোণায় অশ্রু টলমল করে উঠেছে।

ভ্যানিসা লক্ষ্য করছিল আহমদ মুসাকে। বিস্ময় ও কৌতুহল ফুটে উঠেছে ভ্যানিসার চোখে-মুখে। বলল, 'ভাইয়া আপনার চোখে অশ্রু কেন? মুদ্রায় আপনি চুমু খেলেন। মুদ্রাটা কি ভাইয়া?'

সম্বিত ফিরে পেল আহমদ মুসা। ফিরে এল ইতিহাসের জগত থেকে বাস্তবে। তাড়াতাড়ি রুমাল দিয়ে চোখ মুছে ফেলে ম্লান হেসে বলল, 'স্যরি। মুদ্রাটা আমাকে এক সোনালী অতীতে নিয়ে গিয়েছিল। মুদ্রাকে আমি চুমু খাইনি, মুদ্রার মাধ্যমে আমি চুমু খেয়েছি সেই ইতিহাসকে।'

'মুদ্রাটা আমরা সব সময় দেখে আসছি। ওর দুর্বোধ্য লেখা আমরা পড়তে পারিনি। আমরা শুনেছি স্বর্ণমুদ্রাটা এই দ্বীপে আসা আমাদের আদি পুরুষ সাথে করে এনেছিলেন। মুদ্রাটা তিনি যত্নের সাথে সংরক্ষণ করে এসেছেন। আমরাও

তাই করি। না বুঝেই করি। কিন্তু আপনি কি বুঝলেন যে চুমু খেলেন? ভ্যানিসার মত আমারও এটা জিজ্ঞাসা।' বলল সার্গিও।

আহমদ মুসার ভ্রু-কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে। বলল, 'এই দ্বীপে আসা আপনাদের প্রথম পূর্ব পুরুষ এই মুদ্রাকে যত্ন করতেন? কিন্তু কেন?'

'আপনি যত্নের চেয়ে বেশি কিছু করেছেন। চুমু খেয়েছেন। কিন্তু কেন? এ 'কেন'র জবাব পেলে ঐ 'কেন'-রও জবাব হয়তো পাওয়া যাবে।' বলল ভ্যানিসা।

'পাওয়া যাবে কি?' বলে আহমদ মুসা একটু থামল। হাতের মুদ্রাটা হাসান তারিকের হাতে দিল। তারপর আবার কথা বলে উঠল, 'মুদ্রার উপর স্পেনের মুসলিম সুলতান তৃতীয় আবদুর রহমানের নাম 'আবদুর রহমান আল নাসির লি দ্বীনিল্লাহ' লেখা রয়েছে। তিনি ৩১১ হিজরী অব্দে এই মুদ্রা চালু করেন। মুদ্রার আরেক পাশে রয়েছে আমাদের পবিত্র তীর্থ কেন্দ্র 'কাবা শরীফে'র ছবি। সেই সাথে তার পাশে রয়েছে আমাদের কালেমা উৎকীর্ণ। এই মুদ্রার মধ্যে আকস্মিক আমাদের সোনালী ইতিহাসের মুখোমুখি হয়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম।'

'বুঝেছি ভাইয়া। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না আপনার মতো লোকের হৃদয় এত নরম, এত সংবেদনশীল কিভাবে?' বলল ভ্যানিসা।

'কেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যারা সংগ্রাম করবে, তাদের মন থাকতে নেই নাকি? তোমরাও তো অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ছ। তোমাদের মন নেই?' আহমদ মুসা বলল।

'আছে ভাইয়া। কিন্তু আমাদের অতীত আমাকে কাঁদায়নি, এভাবে আমাকে অভিভূত করেনি কোনদিনই।' বলল ভ্যানিসা।

কথাটা শেষ করে একটু থেমেই আবার বলে উঠল, 'মুদ্রাটা দেখছি আপনাদের ইতিহাস-আবেগের সাথে জড়িত। তাহলে আমাদের সেই মহান পূর্বপুরুষ এই মুদ্রাকে ওভাবে যত্ন করতেন কেন? যক্ষের ধনের মত অমন করে আগলে রেখে দিলেন কেন?'

'হতে পারে এই মুদ্রার সাথে তাঁর কোন কাহিনী বা স্মৃতি জড়িত।' বলল আহমদ মুসা।

'এটা হতে পারে।' বলল সার্গিও।

আহমদ মুসা কিছু বলল না। তার চোখে মুখে ভাবনার ছায়া। মনোযোগ দিল সে শোকেসের অন্যান্য এ্যানটিকসের দিকে। হাত বাড়িয়ে সে হাতে তুলে নিল খাপবদ্ধ একটা লম্বা তরবারি।

তরবারি হাতে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'তরবারির এই পুরু ও সুন্দর চামড়ার খাপটাও কি সেই সময়ের মি. সার্গিও।'

'না ভাইসাহেব, তরবারিটার সংরক্ষণের জন্যে খাপটা পরবর্তীকালে তৈরি।' সার্গিও বলল।

'খাপটা খুলতে পারি সার্গিও?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'অবশ্যই। ' বলল সার্গিও।

তরবারির খাপ খুলে ফেলল আহমদ মুসা।

দীর্ঘ ও মজবুত তরবারিটাও।

তরবারির সেই আগের রং নেই। কিছুটা ম্লান হয়ে গেছে ঔজ্জ্বল্য। কিন্তু মরিচা স্পর্শ করেনি তরবারিকে।

তরবারির মেটালটা ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করতে গিয়ে বাঁটের পরেই তরবারির গোড়ার উপর নজর পড়তেই আবার ভ্রু কুঁচকে গেল আহমদ মুসার। আবার সেই আরবী বর্ণমালা। তরবারির গোড়ায় খোদাই করে লেখা পড়ল আহমদ মুসাঃ 'গাজী আলী বিন জামাল।' নিশ্চয় মালিকের নাম, ভাবল আহমদ মুসা।

তরবারি থেকে মুখ তুলল আহমদ মুসা। তাকাল সার্গিওর দিকে। বলল, 'এ তরবারিটার মালিক কে সার্গিও?'

'কেন, এ দ্বীপে আমাদের পরিবারের প্রথম মানুষ 'গনজালো গাব্রালা।' সার্গিও বলল।

'কিন্তু তরবারিতে লেখা তো ভিন্ন নাম।' বলল আহমদ মুসা।

'কি নাম?' সার্গিও বলল।

'গাজী আলী বিন জামাল এবং এ নামটাও আরবীতে লেখা।' বলল আহমদ মুসা।

বিস্ময়ে মুখ হা হয়ে গেছে সার্গিও এবং ভ্যানিসা দুজনেরই।

কিছুক্ষণ তারা কথা বলতেই পারল না।

পরে ধীরে ধীরে বলল সার্গিও, 'কিন্তু ভাই সাহেব, এই তরবারি আমাদের পূর্ব পুরুষ গনজালোর, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। শত শত বছর ধরে আমাদের পরিবার এই কথা বলে আসছে এবং একে সংরক্ষণ করে আসছে। ভিন্ন লোকের একটা জিনিসকে, তা যতই মূল্যবান হোক, আমাদের পরিবার নিজের বলে দাবী করবে কেন?'

'আপনার কথা ঠিক মি. সার্গিও। ব্যাপারটা এ রকমও হতে পারে। আপনার পূর্বপুরুষ গনজালো গাব্রালা স্পেনের স্বর্ণমুদ্রাকে যে কারণে সংরক্ষণ করেছেন, তেমন কোন কারণেই হয়তো তিনি এই তরবারিকেও সংরক্ষণ করেছেন।' বলল আহমদ মুসা।

'টাকা বিনিময়ের মাধ্যম মাত্র। আর তরবারি ব্যবহারের জিনিস। দুটোর মালিকানা এক রকমের নয়। সুতরাং তরবারির সাথে টাকার বিষয়ের কোন তুলনা হয় না ভাই সাহেব।' সার্গিও বলল।

'তা ঠিক। কিন্তু তাহলে এর ব্যাখ্যা কি হতে পারে?' বলল আহমদ মুসা।

'হতে পারে তিনি তরবারিটা তার মালিকের কাছ থেকে কিনেছেন বা পেয়েছেন।' সার্গিও বলল।

আহমদ মুসা কোন উত্তর দিল না।

ভাবছিল সে।

একটু পরেই বলল, 'আরেকটা রহস্যেরও কিনারা করতে পারছি না সার্গিও। সিলভার ভ্যালির প্রধান নদী নিউ টাগুস। কিন্তু টাগুস নামে একটা নদী আছে স্পেনেও। স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদের দক্ষিণে স্পেনের ঐতিহাসিক শহর টলেডো। এই টলেডো শহরের মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ব-বিখ্যাত ছিল। টলেডো শহরটি টাগুস নদীর তীরে অবস্থিত। আমার মনে হচ্ছে এই 'নিউ টাগুস' নদীর নাম টলেডোর 'টাগুস' নদীর নাম অনুসারেই রাখা হয়েছে। এটাও একটা রহস্য।'

আহমদ মুসা থামতেই ভ্যানিসা বলে উঠল, 'আপনি বলতে পারেন ব্যাপারটা 'নিউইয়র্ক' 'নিউজার্সি' 'নিউ অরলিন্স' 'নিউ হ্যাম্পশায়ার' ইত্যাদির মত। 'ইংল্যান্ডের ইয়র্ক' 'অরলিন্স' 'হ্যাম্পশায়ারের' লোকরা আমেরিকায় গিয়ে

তাদের এসব নামের আগে ‘নিউ’, যোগ করে তাদের নতুন বসতি এলাকার নামকরণ করেছে।’

‘হ্যাঁ ভানিসা, এ রকমই মনে হয়।’ বলল আহমদ মুসা।

হেসে উঠল ভ্যানিসা। বলল, ‘ভাইয়া, আপনি আসার সাথে সাথে আমাদের একমাত্র স্বর্ণমুদ্রাটা মুসলমানদের হয়ে গেল, আমাদের পারিবারিক গর্বের বস্তু তরবারিটাও মুসলমানদের হয়ে গেল, আমাদের প্রধান নদীর নামটাও এক সময়ের মুসলিম দেশ স্পেনের হয়ে গেল, শুধু আমরাই এখন মুসলমান হওয়ার বাকি।’

বলে আবার হাসতে লাগল ভ্যানিসা।

‘কেন, আমাদের উপর এ ইলজাম পর্তুগীজ সরকার বহুদিন থেকেই করছে।’ বলল সার্গিও। তারও মুখে হাসি।

কিন্তু আহমদ মুসার মুখে হাসি নেই। সে ভাবছিল। এক সময় সে বলে উঠল, ‘মি. সার্গিও, তোমাদের কবরস্তানের উত্তর-দক্ষিণমুখী কবরগুলো ভাঙা কেন, প্রথম কবরটির পাশে তোমাদের কি সব জিনিস সমাধিস্থ করা হয়েছে তা কি অনুসন্ধান করে আমি দেখতে পারি?’

‘হ্যাঁ ভাইসাহেব। এ কথা আগেই আপনি আমাকে বলেছিলেন। আমি আম্মার সাথে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করেছি। তিনি অনুমতি দিয়েছেন একটা শর্তে। সেটা হলো, দেখার পর জিনিসগুলো আবার ওখানেই রেখে দিতে হবে।’ বলল সার্গিও।

‘আলহামদুলিল্লাহ। তোমার আম্মার কাছে আমি কৃতজ্ঞ মি. সার্গিও। তাঁকে নিশ্চয়তা দিবেন একটা জিনিসও নষ্ট করা হবে না।’ আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসা থামতেই সার্গিও বলে উঠল, ‘কাজ তাহলে আমাদের বাড়ল ভাইসাহেব। সমাধীক্ষিত্রের খোড়াখুড়িতে বেশ সময় যাবে। আসুন, ম্যাপটা পরীক্ষা করে আমাদের গন্তব্য ও রুট সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি।’

বলে সার্গিও সোফায় টেবিলের কাছে ফিরে এল।

আহমদ মুসারাও।

সার্গিও সোফায় ফিরে গিয়ে টেবিলে রাখা ‘তেরসিয়েরা’ দ্বীপের মানচিত্রটা কাছে টেনে নিল।

আহমদ মুসা গিয়ে সার্গিওর পাশে বসল।

সার্গিওর সাথে আহমদ মুসাও মানচিত্রের উপর ঝুঁকে পড়ল।

কিন্তু মানচিত্রটা পর্তুগীজ ভাষায়।

হোঁচট খেল আহমদ মুসার চোখ।

বলল আহমদ মুসা, ‘আমি পর্তুগীজ ভাষা বুঝতে পারি, পড়তে পারি না।’

বলেই হঠাৎ আহমদ মুসা সোজা হয়ে বসল। আনন্দ প্রকাশ পেল তার চোখে-মুখে। বলে উঠল, ‘মাফ চাচ্ছি মি. সার্গিও। ভুলে যাব, কথাটা বলে ফেলি। পর্তুগীজ ভাষার একটা চিঠি উদ্ধার করেছি WFA-এর একজন মৃতলোকের পকেট থেকে। চিঠিটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। কিন্তু কাউকে দিয়ে চিঠিটা পড়িয়ে নেবার সুযোগ করতে পারিনি এখন।’

‘চিঠিটা এখন আপনার কাছে আছে?’ বলল সার্গিও।

‘হ্যাঁ আছে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘তাহলে দিন চিঠিটা। এখনি পড়ে ফেলি। না হলে আবার ভুলে যেতে পারি আমরা।’

‘ধন্যবাদ মি. সার্গিও।’ বলে আহমদ মুসা মানিব্যাগের পকেট থেকে চিঠিটা বের করে সার্গিওর হাতে দিল।

সার্গিও চিঠিটা একবার উল্টেপাল্টে দেখল। বলল, ‘চিঠিটা লিখেছে একজন মা সাও জর্জ দ্বীপের ‘হারতা’ থেকে তার ছেলে ‘এ্যান্টেনিও সোরেস’কে। মা থাকেন ‘হারতা’র ১১নং গনজালো রোডে। কিন্তু ছেলের কোন ঠিকানা চিঠিতে নেই। নিশ্চয় ইনভেলাপে চিঠিটা এসেছে। ঠিকানাটা ইনভেলাপেই ছিল।

‘যাক, হারতার অন্তত একটা ঠিকানা পাওয়া গেল। এবার পড়ুন চিঠিটা মি. সার্গিও।’ সার্গিও পড়তে শুরু করলঃ

‘‘বেটা এ্যান্টেনিও সোরেস,

আশা করি ইশ্বরের কৃপায় তুমি ভাল আছ। এক মাস হলো তুমি চাকুরী নিয়ে পর্তুগাল গেছ। কিন্তু মনে হচ্ছে এক যুগ পার হয়ে গেছে। হয়তো এমন হতো না বেটা, কিন্তু অবস্থার কারণেই তোমাকে খুব বেশি মনে পড়ছে। যাদের সাথে তুমি পরিচয় করে দিয়ে গেছ, যারা তোমাকে চাকুরী দিয়েছে তারা লোক ভালো নয় সোরেস। তারা দুর্বিণীত, দুঃশ্চরিত্র এবং তাদের প্রতিটি আচরণই সন্দেহজনক। ওরা মনে হয় মানুষ পাচারকারী ধরনের কেউ হবে। কিংবা সন্ত্রাসী কোন দলও হতে পারে। ওরা ওদের সাংঘাতিক সব অস্ত্রশস্ত্র রেখে ঢেকে রাখারও প্রয়োজন বোধ করে না। কদিন আগে একজন লোককে আনল। এশিয়ান হবে। অসুস্থ। তার উপর খুব অত্যাচার হয়েছে মনে হলো। একদিন পরেই তাকে সাও তোরাহ দ্বীপে নিয়ে যায়। এই সাও তোরাহ দ্বীপের কথা ওদের মুখে প্রায় শুনি। দ্বীপটি কোথায়? ওদের কথা-বার্তা শুনে মনে হয় সাও তোরায় বড় কোন ব্যাপার আছে। আমার এসব ভাল লাগছে না বেটা। তুমি তাড়াতাড়ি এস। দরকার হলে চাকুরী ছেড়ে দিয়ে এস। ওদের হাত থেকে আমাদের বাঁচাও, তোমার বোনকে বাঁচাও। তোমার চিঠি নয়, তোমার আসার অপেক্ষায় রইলাম।''

তোমার 'মা'

চিঠি পড়া শেষ হলো।

মুখ ম্লান হয়ে উঠেছে আহমদ মুসার। বেদনার একটা চাদর যেন তার চোখ-মুখ ঢেকে দিয়েছে। বলল, 'স্যরি। মা ছেলের পথ চেয়ে বসে থাকবে, বিপদগ্রস্ত বোনের অস্থির দু'টি চোখ ভাইয়ের অপেক্ষা করবে। কিন্তু পরিবারের যিনি হাল ধরবেন, সেই ভাই আর কোন দিনই বাড়িতে পৌছবে না। বেচারা নিহত হয়েছে।'

থামল আহমদ মুসা।

তার কণ্ঠ কান্নার মত ভারী।

'দুঃখের এদিকটা বাদ দিলে চিঠিটা খুবই মূল্যবান ভাইয়া। জানা গেল, সাও তোরাহতে তাদের লোক পাচার অব্যাহত আছে। সাও তোরাহ থেকে ওরা সরে পড়বে, এ ভয় মনে হয় নেই। আমাদের অভিযান দ্রুত করতে হবে ভাইয়া।' বলল হাসান তারিক।

‘সত্যিই মনটা খারাপ হয়ে গেল ভাইসাহেব। থাক, আসুন ম্যাপটা দেখি।’ বলে সার্গিও আবার ম্যাপের উপর ঝুঁকে পড়ল।

আহমদ মুসাও।

কিন্তু মুখ তার আগের মতই বেদনার্ত।

হাতের পেন্সিলের ডগা দিয়ে মানচিত্রের স্থান বিশেষ স্পর্শ করে বলল সার্গিও, ‘আমরা উত্তরের পার্বত্য পথে উপত্যকা থেকে বের হচ্ছি। তারপর দ্বীপ থেকে বের হবার আমাদের সামনে দুটি পথ খোলা থাকবে। একটা হলো আমাদের পূর্বপুরুষের ভিটা পর্যন্ত যে পথ দিয়ে আপনারা এসেছিলেন সেই পথে। অন্যটি আমাদের পারিবারিক সমাধীক্ষিত্র থেকে সোজা পশ্চিম দিকে জলা ভূমিটাকে ডাইনে রেখে দ্বীপের উপকূল পর্যন্ত এগুনো। সে উপকূলে আমাদের একটা ঘাঁটি আছে, মোটর বোটেরও ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এই পথটা অপেক্ষাকৃত দুর্গম। এই ট্রাকটা আমরা ছাড়া আর কেউ ব্যবহার করে না এবং এর সন্ধানও কেউ জানে না। এখন...........।’

সার্গিওর কথার মাঝখানেই আহমদ মুসা বলে উঠল, ‘পশ্চিমের এই দূর্গম পথটাই আমাদের জন্যে নিরাপদ। চোখ বন্ধ করে আমরা এ পথ বাছাই করতে পারি।’

‘ধন্যবাদ ভাইসাহেব। এখন বলুন গন্তব্য কোথায় হবে। সেই অনুসারে আমাদের ঘাঁটিকে ইনষ্ট্রাকশন দিতে হবে আয়োজন করার।’ বলল সার্গিও।

আহমদ মুসা মানচিত্র থেকে মুখ তুলল। বলল, ‘সেটাও চোখ বন্ধ করে বলা যায়। আমরা সাও জর্জ দ্বীপের ‘হারতা’ যাচ্ছি।’

সার্গিও মুখ তুলল আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘ফ্লোরেস দ্বীপের সান্তক্রুজ কেন নয় ভাইসাহেব। ওখান থেকে সাও তোরাহ যাওয়া সহজ হবে।’

‘এমনিতেই আগে থেকে আমরা হারতাকে প্রথম বেজ ক্যাম্প হিসেবে বাছাই করেছিলাম সাও তোরাহ সম্পর্কে খবর সংগ্রহের জন্যে। এখন সেখানে যাওয়া ফরজ হয়ে গেছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ফরজ কি?’ জিজ্ঞাসা সার্গিওর।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘ফরজ অর্থ হলো, অবশ্য কর্তব্য।’

‘হারতা যাওয়া অবশ্য কর্তব্য হলো কেন?’ জিজ্ঞেস করল সার্গিও।

‘আমি এ্যান্টেনিও সোরেসের বাড়ি যেতে চাই।’ আহমদ মুসা বলল।

‘এ্যান্টেনিও সোরেসের বাড়ি কেন?’ সার্গিও বলল।

‘এ্যান্টেনিও সোরেসের মা-বোনদের অপেক্ষার অবসান ঘটাতে হবে।’ বলল আহমদ মুসা। তার মুখ গম্ভীর।

সবাই তাকাল আহমদ মুসার দিকে। কিন্তু কেউ কোন কথা বলল না।

সবাই নিরব।

একটু পর সার্গিও বলল, ‘সিদ্ধান্ত এটাই হলো। তাহলে ওঠা যাক। তৈরি হয়ে তো এখনই যাত্রা করতে হবে।

সবাই উঠল।

উঠতে উঠতে ভ্যানিসা আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, ‘আমার খুবই ইচ্ছা হচ্ছে হারতা যাবার।’

‘না বোন, তুমি এবং সার্গিও কাউকেই এখন এই কাজে জড়াব না। তোমরা যে পবিত্র সংগ্রাম করছ তাকে সব আনন্দিত উপসর্গ থেকে নিরাপদ রাখতে হবে। তোমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে যদি কোনওভাবে মুসলমান তথা মৌলবাদ তথা সন্ত্রাসীদের সাথে যুক্ত করতে পারে, তাহলে তোমাদের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। এই ক্ষতি তোমরা আমরা কেউই চাই না।’ আহমদ মুসা বলল।

‘যুক্তি আপনার ঠিক। কিন্তু মনকে মানাবার মত নয়।’ বলল সার্গিও।

‘তবু মনকে মানাতেই হবে ভাই।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আপনার নির্দেশ অবশ্যই শিরোধার্য।’ বলল সার্গিও।

‘কিন্তু একটা শর্তে।’ বলে উঠল ভ্যানিসা।

‘কি শর্ত?’ বলল আহমদ মুসা।

‘আপনারা ভালো থাকলে সেটা আমাদের জানার দরকার নেই। কিন্তু বিপদে পড়লে সেটা যেন আমরা জানতে পারি।’ ভ্যানিসা বলল। তার মুখ ম্লান, কণ্ঠ ভারী।

‘চেষ্টা করবো ভ্যানিসা তোমার শর্ত মানতে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ধন্যবাদ ভাইসাহেব। চলুন।’ সার্গিও বলল।

সবাই আবার হাঁটতে শুরু করল।

হঠাৎ ধাতব চিৎকার উঠল শাবলের আঘাতটা মাটির গভীরে গিয়ে আছড়ে পড়তেই।

ধাতব চিৎকার উঠার সাথে সাথেই আনন্দে হুররা দিয়ে উঠল সার্গিও।

শাবল চালাচ্ছিল আহমদ মুসা।

ঘেমে সে একাকার হয়ে গেছে।

প্রায় সাতফুট মাটির নিচে গিয়ে এই প্রথম ধাতব শব্দ পাওয়া গেল।

আহমদ মুসা, হাসান তারিক ও সার্গিও পর্যায়ক্রমে খননের কাজ করছিল।

অন্ধকারে চাঁদের আলোটুকুকে সম্বল করে মাটি খুঁড়তে হচ্ছিল।

বাইরের আলো জ্বালানো যাচ্ছে না।

তারা আসার পথে আজর ওয়াইজম্যানের বাহিনীর মুখে পড়ে গিয়েছিল। সমাধীক্ষিত্রের এক বাঁক দক্ষিণে একটা প্রশস্ত চড়াইয়ে যখন আহমদ মুসারা উঠছিল সেই সময় দুটি হেলিকপ্টার বোঝাই সশস্ত্র লোক ওখানে ল্যান্ড করতে আসে। পাথরের আড়ালে লুকিয়ে ওরা হেলিকপ্টারের ফ্লাশ ও ধরা পড়া থেকে নিজেদের রক্ষা করে। সশস্ত্র লোকরা চড়াই-এ নামার পর আহমদ মুসাদের পাশ দিয়েই দক্ষিণে চলে যায়। দুটি হেলিকপ্টারের একটি ওদের কাভার দিয়ে দক্ষিণে অগ্রসর হয়, অন্যটি গিরিপথের ট্রাক ধরে উত্তরে চলতে শুরু করে। দুটি হেলিকপ্টারই গোটা এই পথের উপর টহল দিয়ে ফিরছে। আলো দেখলেই ওরা এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাই খননের কাজটা তাদেরকে অন্ধকারের মধ্যেই করতে হচ্ছে।

কোথায় খুঁড়বে এ নিয়েও তারা বিপদে পড়েছিল। এ ব্যাপারে মা-দাদীও খুব বেশী সাহায্য করতে পারেনি। শুধু বলেছিল, জিনিসগুলো প্রথম কবরের পাশে পুঁতে রাখা হয়েছে। সমস্যায় পড়তে হয় প্রথম কবর কোথায় তা নিয়ে। উত্তর-দক্ষিণ কবর যখন, তখন তা মুসলমানের হওয়ার সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনা সামনে

রেখে আহমদ মুসা সিদ্ধান্ত নেয় পশ্চিম প্রান্তের সর্ব উত্তর থেকে কবর শুরু হয়েছে। সুতরাং সর্ব উত্তরেরটাই প্রথম কবর।

তারপর সমস্যা দেখা দেয় কবরের কোন পাশে জিনিসগুলো পুঁতে রাখা হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় কবরের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে আহমদ মুসা সিদ্ধান্ত নেয় এই দু কবরের মাঝখানে যে স্পেস তাতে তেমন কোন বড় জিনিস পুতে রাখার মত নয়। সুতরাং অবশেষে সে পশ্চিম ও উত্তর পাশেই অবস্থান বিচারে ধরে কবরের সিথানের দিকেই জিনিসগুলো পুঁতে রাখা হয়েছে।

সিথানের দিকে সাত ফিট খননের পর শাবলের আঘাত থেকে ধাতব শব্দ উঠায় পুঁতে রাখা ষ্টিলের বাক্স পাওয়া গেছে বলে সবাই খুশি হয়ে উঠল।

'কবরের লেভেল থেকেও অনেক নিচে পুঁতে রেখেছে বাক্সটা। অথচ মৃতদের সাথে সংশিস্নষ্ট কোন জিনিস কবরে বা কবরের লেভেলেই রাখা হয়।' বলল গর্তের ভেতর থেকে শাবল চালাতে চালাতেই।

'যারা এটা রেখেছেন তারা চাননি যে, এটা কেউ খুঁজে পাক।' হাসান তারিক বলল।

'আজ ভাইয়া না থাকলে আমাদের শত চেষ্টা ব্যর্থ হতো। আমরা এই বাক্সটা খুঁজে পেতাম না।' বলল ভ্যানিসা।

ভ্যানিসার কথা শেষ হতেই গর্ত থেকে আহমদ মুসা বলল, 'এবার এস হাসান তারিক। আলগা হয়েছে বাক্সটা। এখন তোলা যাবে।'

হাসান তারিক লাফ দিয়ে নামল নিচে।

সার্গিও এগিয়ে গেল।

বাক্সটা উপরে উঠে এল।

৬ বর্গফুটের বিশাল বাক্সটা।

বাক্সটা টেনে তার পাশেই পাহাড়ের এক গুহায় নিয়ে গেল।

পুরু পলিথিনে মোড়া বাক্সটা।

'মি. সার্গিও, যারা বাক্সটাকে কবর দিয়েছিল, তারা বাক্সটাকে কেউ খুঁজে পাক তা চাননি। কিন্তু বাক্সটাকেও তারা নষ্ট করতে চাননি। এয়ারটাইট পলিথিনের মোড়ক একেবারে অক্ষত রেখেছে বাক্সটাকে।' বলল আহমদ মুসা।

‘তার মানে আমাদের পূর্ব পুরুষরা পারিবারিক এই সম্পদকে লুকিয়ে রেখেছেন, চিরতরে কবরস্থ করেননি!’ সার্গিও বলল।

‘অর্থাৎ তারা চেয়েছিলেন কোন এক সময় পরিবারের কেউ এটা খুঁজে পাক?’ ভ্যানিসা বলল।

‘তাই মনে হয়।’ বলল সার্গিও।

‘কিন্তু আজকে কি সেই ‘কোন এক সময়’ বলা যায়?’ ভ্যানিসা বলল।

‘স্বয়ং আহমদ মুসা বাক্সটাকে মাটির নিচ থেকে তুলেছেন। আমি মনে করি এর চেয়ে বড় ঐতিহাসিক সময় ভবিষ্যতে আর আসবে না।’ বলল সার্গিও।

ভ্যানিসার মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বলল, ‘আমিও তাই মনে করছি। আমাদের পরিবারের জন্যে এটা সৌভাগ্য।’

বাক্স লক করা ছিল না।

ডালা খোলা হলো বাক্সের। আহমদ মুসাই খুলল।

তিনদিকে বন্ধ বৈদ্যুতিক লন্ঠন জ্বালানো হয়েছিল। যাতে বাইরে আলো দেখা না যায়।

বাক্সের ডালা খোলা হলো। আলোকসম্পাতে বাক্সের অভ্যন্তরে দেখা গেল, একটা কাল কাপড়ে বাক্সের ভেতরটা ঢাকা। কাল কাপড়ের উপরে পড়ে আছে একটা ইনভেলাপ।

‘ইনভেলাপটা তুলে নিয়ে আহমদ মুসা সার্গিওর হাতে দিয়ে বলল, ‘সবার উপর যখন এই ইনভেলাপটা, তখন এই বাক্স সম্পর্কেই এই ইনভেলাপে কিছু লেখা আছে। পরিবারে পক্ষ থেকে এটা পড়ার হক তোমার।’

ইনভেলাপটা হাতে নিল সার্গিও।

শত বছরের পুরানো ইনভেলাপ। শক্ত হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে ইনভেলাপটা খুলে তার ভেতর থেকে চিঠি বের করল সার্গিও।

ধীরে ধীরে চিঠির ভাঁজ খুলল।

সময়ের তুলনায় চিঠির কাগজের অবস্থা অনেক ভালো। এয়ারটাইট অবস্থায় থাকার কারণেই ক্ষতি হয়নি কাগজের। চিঠির ভাঁজ খুললেও কাগজের কোন ক্ষতি হলো না। চিঠি পড়তে লাগল সার্গিওঃ

''পরিবারের মহান সদস্যদের প্রতি,
আমার দৃঢ় বিশ্বাস মাটির তলা থেকে বাক্সবন্দী এই সম্পদ আমাদের বংশধরেরাই একদিন উত্তোলন করবে। এই বিশ্বাস থেকেই এই সম্বোধন করলাম।
পরিবারের একটি ইতিহাস, একটি পরিচয় আজ বাক্সবন্দী হয়ে আমার হাতে মাটি চাপা পড়ল। পরিবারের এক সময়ের পরিচয়ের চেয়ে পরিবারের অস্তিত্ব বড়। আবার একটি পরিবারের অস্তিত্বের চেয়ে দেশের অস্তিত্ব অনেক বড়। এই বিবেচনাতেই পরিবারের একটি পরিচয় সমাধিস্থ করলাম।
দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন আজ সংকটে। পর্তুগীজ সরকার সুস্পষ্ট অভিযোগ তুলেছে, স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্বদানকারী গনজালো পরিবার এবং স্বয়ং গনজালো মুসলমান ছিলেন। গনজালো পরিবারের খৃষ্টান পরিচয় একটা ছদ্মবেশ মাত্র। এই ছদ্মবেশ নিয়ে আজোরস দ্বীপপুঞ্জকে তারা কুক্ষিগত করতে চায়, মৌলবাদী একটি দেশে পরিণত করতে চায়। পর্তুগীজ সরকারের এই প্রচার আমাদের উপর বজ্রাঘাত হানে। এর উপযুক্ত উত্তর না দিলে প্রিয় মাতৃভূমি আজোরসের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। কিন্তু পর্তুগীজ সরকারের অভিযোগ সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। আমরা কি জবাব দেব? পরিবারের পুরানো কাগজপত্র ও এ্যানটিকসগুলো পরীক্ষা করতে লাগলাম। পুরানো পোশাকাদি ও দলিলপত্র এবং প্রাপ্ত একটা ডাইরী থেকে নিশ্চিত প্রমাণিত হলো সম্মানিত পুর্বপুরুষ গনজালোসহ আমাদের পুর্ব পুরুষরা মুসলমান ছিলেন। এটা জানার পর পরিবারের স্বার্থে দেশের স্বার্থে প্রথম প্রয়োজন হয়ে পড়ল পারিবারিক এই অতীত থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করা এবং তারপর পর্তুগীজ সরকারের জবাবে বলা যে, গনজালো পরিবার পর্তুগীজ সরকারের দুরভিসন্ধিমূলক অভিযোগকে প্রত্যাখ্যান করছে। গনজালোরা আজোরস দ্বীপপুঞ্জে সবচেয়ে পুরানো এবং ঐতিহ্যবাহী খৃষ্টান পরিবার। অজানা ও

অপ্রমাণিত কোন অতীত সম্পর্কে তারা কিছু জানতে চায় না, তার প্রয়োজনও নেই। মহান যিশুর রাজ্য হিসেবেই আজোরস তার স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করছে। পর্তুগীজ সরকার মিথ্যা কোন অভিযোগ এনে বা বিভ্রান্তি ছড়িয়ে এই আন্দোলন বানচাল করতে পারবে না।

এই বক্তব্য দেয়ার জন্যেই সিদ্ধান্ত নেয়া হলো পূর্বপুরুষ মুসলমান হওয়ার সব প্রমাণ নষ্ট করে ফেলা হবে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে এক এক করে বাছাই করে স্তুপিকৃত করা হলো পুড়িয়ে ফেলার জন্যে। কিন্তু পুড়ানো গেল না। আম্মা, দাদী কান্না শুরু করলেন। আমিও পারলাম না আগুন দিতে। মনে হচ্ছিল, পূর্ব পুরুষদের গায়েই যেন আগুন দিতে যাচ্ছি। অবশেষে ঠিক হলো আজোরসে আমাদের প্রথম পুরুষের কবরের পাশে এগুলো সমাধিস্থ করা হবে। সমাধিস্থ করতে গিয়ে দেখা গেল, প্রথম দিকের সব কবরই উত্তর-দক্ষিণ। অর্থাৎ তারা মুসলমান ছিলেন। অতীতে বহুবার এই সমাধীক্ষিত্রে গেছি, কিন্তু বিষয়টা কেউ আমরা খেয়াল করিনি। এই দৃশ্য আমাদের আতংকিত করে তুলল। এই দৃশ্যের ছবি যদি পর্তুগীজ সরকারের হাতে যায়, আর একবার যদি তা পত্র-পত্রিকায় আসে, তাহলে কথা বলারও আর মুখ থাকবে না। গনজালো পরিবার আকাশ থেকে একেবারে ধুলায় পড়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধান্ত নেয়া হলো প্রথম দিকের সব কবর নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার। সেই দিনই এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করা হলো।

এভাবেই গনজালো পরিবার তার অতীতকে মুছে ফেলল এক অপরিহার্য প্রয়োজনে।

আর এ কথাগুলো আমরা রেখে গেলাম ভবিষ্যতের এক প্রয়োজনকে সামনে রেখে।'

-গনজালোর ইতিহাস।''

পড়া শেষ করল সার্গিও।

সবাই মূর্তির মত স্থির বসে পড়া শুনছিল। পড়া শেষ হলেও তারা তেমনি স্থির বসে রইল। নড়তেও তারা যেন ভুলে গেছে।

কারো মুখেই কোন কথা নেই।

পড়ার পর সার্গিও নিজেও বাকহীন।

অনেকক্ষণ পর নিরবতা ভাঙল ভ্যানিসা। বলল, 'বলেছিলাম না, ভাইয়ার আগমনে স্বর্ণমুদ্রা, তরবারি, সিলভার উপত্যকার নদীও মুসলমান হয়ে গেছে, এখন আমরাই শুধু মুসলমান হতে বাকি। সেই বাকিটাও এখন জানা হয়ে গেল, আমরা মুসলমানদের বংশধর। মুসলমানদের রক্ত আমাদের ধমনীতে, মানে আমরাও মুসলমান।'

'এভাবে কথা বলো না ভ্যানিসা। এক সময় হয়তো আমাদের পরিবার মুসলমান ছিল, কিন্তু এখন খৃষ্টান। এটাই আজকের বাস্তবতা।' বলল সার্গিও।

'জানি ভাইয়া। এই বাস্তবতাই তো বাস্তব এক অতীতকে কবরস্থ করেছে।' ভ্যানিসা বলল।

'তোমাদের ভাইবোনের বিরোধ এখন থাক। আমরা একটা মৃতলাশের পোষ্টমর্টেম করছি মাত্র। এর শুধুই ঐতিহাসিক মূল্য আছে। অতীতের ঘাঁটাঘাঁটি যদি বিরোধের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে আর অগ্রসর না হওয়াই ভাল।' বলল আহমদ মুসা।

'স্যরি ভাইসাহেব। আমি ভ্যানিসার আবেগকে একটু থামিয়ে দিতে চেয়েছি। আর কিছু নয়। আমাদের পরিবারের এই ইতিহাস উদ্ধার আমার জন্যেই বরাদ্দ ছিল, এটা আমি মনে করি এবং এর জন্যে আমি গর্বিত। এই তো আমার এক পুর্বপুরুষের বক্তব্য পড়লাম, পারিবারিক অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে ইতিহাস বিসর্জন দিতে হবে। কিন্তু আমি মনে করি, ইতিহাস পরিত্যাগ করে পরিবার, জাতি কিছুই বাঁচতে পারে না। ইতিহাস বেঁচে থাকলে সে ইতিহাস নতুন করে জাতি, পরিবার গড়তে পারে। আমার জাতির সদ্য উদ্ধারকৃত ইতিহাস আমাকে নতুন শক্তি দিয়েছে ভাইসাহেব।' সার্গিও বলল। তার কণ্ঠ আবেগে ভারী।

সার্গিও থামতেই ভ্যানিসা বলল, 'ধন্যবাদ ভাইয়া। আমার কথাই বললেন আপনি। তবে যে আমাকে বকলেন!'

হাসল সার্গিও। বলল, 'সব কথা সব সময় বলার প্রয়োজন হয় না।'

'কিন্তু আপনি বললেন ভাইয়া।'

‘আমি প্রয়োজনে বলেছি ভ্যানিসা।’ হাসতে হাসতে বলল সার্গিও।

‘তাহলে মি. সার্গিও, একটু দেখুন বাক্সে কি আছে।’ আহমদ মুসা বলল।

সার্গিও অনুসন্ধান শুরু করল।

এক এক করে সার্গিও বাক্সের জিনিসগুলো বের করতে লাগল।

বেরুতে লাগল নানা ধরনের সাধারণ ও সামরিক পোশাক, যা স্পেনের সাধারণ মুসলিম মুর এবং সৈনিক ও শাসকরা পরত। আরবী টারবানও পাওয়া গেল। পাওয়া গেল নানা ধরনের মুসলিম শিরস্ত্রাণসহ একটা তুর্কি টুপি। কয়েকটা আরবী ক্যালিওগ্রাফি, কিছু ওয়াল হ্যাং, কিছু আরবী গ্রন্থসহ কোরআন শরীফ, মক্কা শরীফ ও মদিনা শরীফের বাঁধানো ফটো এবং আরও কিছু টুকিটাকিসহ একটি ডাইরীও পাওয়া গেল।

সব জিনিস বের করার পর সার্গিও বলল, ‘সব দেখলেন ভাইসাহেব। আমি যতটা বুঝেছি, সবটা জিনিসই মুসলিম কালচারের স্মারক। অবশ্য বইগুলো ও ডাইরীতে কি আছে আমি জানি না। এখন বলুন, আরও বেশি জানার কি সাহায্য আমাদের করতে পারেন।’

‘বইগুলোর মধ্যে একটি হলো কোরআন শরীফ। অন্যগুলো আরবীতে লেখা ইতিহাস ও হাদিসগ্রন্থ। আমার মতে আরও বেশি জানার ক্ষেত্রে ডাইরীটাই আমাদের সাহায্য করবে।’ আহমদ মুসা বলল।

সার্গিও ডাইরীটা হাতে নিয়ে তা খুলল। ভেতরটা একবার দেখেই বলে উঠল, ‘আমার অপরিচিত ভাষা ভাইসাহেব। আপনি দেখুন।’

আহমদ মুসা ডাইরীটা হাতে নিয়ে বলল, ‘ডাইরীটাও আরবী ভাষায় লেখা। তবে একটা ভূমিকা আছে, সেটা লেখক স্পেনীয় ভাষায় লিখেছেন।’

‘পড়ুন ভাইসাহেব।’ সার্গিও বলল।

‘ডাইরীটা পড়তে সময় লাগবে। অতটা সময় আমরা এখন দিতে পারবো না। ওদের হেলিকপ্টার এদিকে একটু ঘন ঘনই আসছে। মনে হয় ওরা জানতে পেরেছে আমরা সিলভার উপত্যকায় নেই। সুতরাং রাতের আঁধারেই যতটা সম্ভব পশ্চিমে সরে পড়া দরকার।’ বলে একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর ডাইরীটা লণ্ঠনের আলোর দিকে একটু সরিয়ে বলল, ‘আমি শুরু থেকে পড়ছি।’

বলে পড়তে শুরু করল আহমদ মুসাঃ

''আমি গাজী আলী জামাল। আমাদের বাড়ি স্পেনের টলেডো শহরে। আমাদের সুন্দর বাড়িটা ছিল টাগুস নদীর তীরে। শুরু থেকেই আমরা সামরিক পরিবার। স্পেনের সুলতান তৃতীয় আবদুর রহমানের সময়ে আমাদের পরিবারের একজন স্পেনের নৌবাহিনীতে চাকুরী নেয়। সুলতান হাজিব আল মনসুরের সময়ে আমাদের পরিবারের একজন একটি রণতরীর কমান্ডার পদে উন্নীত হন। পরিবারের ঐতিহ্য অনুসারে আমিও স্পেনের নৌবাহিনীতে যোগদান করি। কিন্তু স্পেনের নৌবাহিনী তখন কংকালে পরিণত হয়েছে। স্পেনের মুসলিম সাম্রাজ্য গ্রানাডার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়লে স্পেনের নৌবাহিনী ভেঙে পড়ে। ১৪২৩ সালে সুলতান তৃতীয় ইউসুফের মৃত্যু হলে স্পেনের নৌবাহিনীর কংকালটাও শেষ হয়ে যায়। ভারাক্রান্ত মনে আমি এর আগেই সৈনিক হিসেবে মাতৃভূমির সেবার আর কোন সুযোগ না দেখে তুরষ্কের সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের নৌবাহিনীতে যোগদান করি। তুরষ্কের সামরিক শক্তি তখন উদীয়মান। ইউরোপের সার্বিয়া, আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া, গ্রীস তখন তুর্কিবাহিনীর পদভারে কম্পিত। তুর্কি নৌবাহিনী ভূমধ্যসাগরে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে। ১৪২২ সালে তুর্কি বাহিনী কর্তৃক কনষ্ট্যান্টিনোপল অবরোধের ঐতিহাসিক ঘটনাতেও আমি অংশগ্রহণ করি। কিন্তু শীঘ্রই আমি তুর্কি নৌবাহিনীতে চাকুরীর ব্যাপারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ি। একটি ঘটনা থেকে এর সূত্রপাত ঘটে। সময়টা হবে ১৪২৩ সালের শেষের দিকে। তুরষ্কের, সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের সিংহাসন আরোহনের তৃতীয় বছর এবং সুলতান তৃতীয় ইউসুফের মৃত্যু-পরবর্তী স্পেনীয় গ্রানাডা রাজ্যের বিপর্যয়ের কাল। সেই সময় তুর্কি নৌবাহিনীর তিনটি জাহাজের একটা বহর আসছিল মরক্কোর ক্যাসাবস্নাংকা থেকে। আমরা ভূমধ্যসাগরের মেজরকা দ্বীপ থেকে ৫০ মাইল দূরে অবস্থান করছি। আমরা দেখলাম, স্পেনের মুসলিম রাজ্য গ্রানাডার পতাকাবাহী একটা বাণিজ্য জাহাজকে ঘিরে ফেললো ক্ষুদ্র দুটি রণতরী। একটি ফ্রান্সের মারসাই, অপরটিতে স্পেনের খৃষ্টান রাজা বারসেলোনার পতাকা। আমি

আমাদের নৌবহরের কমান্ডার ইশমত পাশাকে অনুরোধ করলাম গ্রানাডার জাহাজটিকে বাঁচাবার জন্যে। কমান্ডার বললেন, গ্রানাডাকে সাহায্য করার কোন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত আমাদের নেই। আমি বললাম, এটা গ্রানাডাকে সাহায্য করার ব্যাপার নয়, বিষয়টা রাজনৈতিক দস্যুদের হাত থেকে একটা বাণিজ্য জাহাজকে রক্ষা করার। কমান্ডার বলল, বাণিজ্য জাহাজটি গ্রানাডার উমাইয়াদের। উমাইয়াদের কোন সাহায্য করা হবে না। আমাদের তিনটি রণতরীর সামনেই গ্রানাডার বাণিজ্যতরীটি ফ্রান্সের মারসাই ও বারসেলোনার দুটি ক্ষুদ্র রণতরী লুণ্ঠন করল এবং বাণিজ্য জাহাজের সব লোকদের হত্যা করল। আমিও স্পেনের একজন আরব মুসলমান। আমার চোখের সামনেই আমার স্বজনদের হত্যা করল খৃষ্টান দুটি রণতরীর লোকরা। এই আক্রমণে স্পেনের বারসেলোনো ও ফ্রান্সের মারসাই-এর খৃষ্টান সৈন্য এক হতে পারল, কিন্তু তুর্কি সুলতানের অপ্রতিদ্বন্দ্বী তিনটি যুদ্ধজাহাজ গ্রানাডার অসহায় এক মুসলিম বাণিজ্য জাহাজকে সাহায্য করতে পারল না। অনেক কাঁদলাম আমি। মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। তুর্কি জাহাজে একদিন, এক মিনিট, এক সেকেন্ড অবস্থান করা অসম্ভব হয়ে উঠল। সবার অলক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লাম তুর্কি রণতরী থেকে ভূমধ্যসাগরে। এক ঘণ্টা সাঁতরে গিয়ে উঠলাম গ্রানাডার লুণ্ঠিত জাহাজে। লুণ্ঠিত জাহাজে লাশ ছাড়া আর কিছুই পেলাম না। তবু মনে সান্তনা পেলাম এই ভেবে যে, আমি মজলুমদের সাথে আছি। দীর্ঘ ৭ দিন একা জাহাজ চালিয়ে স্পেনের মালাগা বন্দরে এসে পৌছলাম। মালাগা বন্দরের শূন্য জেটিগুলো দেখে মনটা কেঁদে উঠল। একদিন নৌবাহিনীর জাহাজে ভর্তি থাকত মালাগা বন্দর। আজ একটিও নেই। অন্যদের সাথে নিয়ে লাশগুলো দাফন করার পর আমি পর্তুগালের এক জাহাজে চড়ে স্পেনও ছাড়লাম। চলে এলাম পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে। পর্তুগালের তখন সমুদ্র-অভিযানের প্রাথমিককাল। সমুদ্র সম্পর্কে অভিজ্ঞ নেভিগেটর যোদ্ধাদের সেখানে দারুণ কদর। চাকরী পেয়ে গেলাম লিসবনের বড় একটা কোম্পানীর নৌবহরে। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নেভিগেটর থেকে একটা কমান্ডিং জাহাজের

কমান্ডার পদে উন্নীত হলাম পরিশ্রম ও প্রতিভাগুণে এবং আল্লাহর সাহায্যে। ১৪৩১ সালের জুলাই মাস। আমার জাহাজটি উত্তর আটলান্টিকের দিক থেকে মধ্য আটলান্টিকের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল ধীর গতিতে। সে দিন জুলাই-এর এগার তারিখ। আমি জাহাজের ডেকে বসেছিলাম। চোখে দূরবীন। আমি জানি পশ্চিমে কানাডার উপকূল আর পূর্বে ইউরো আফ্রিকান উপকূলের মাঝখানে কোন দ্বীপের অস্তিত্ব নেই। তবু আমার অভ্যস্ত চোখের কোন ক্লান্তি নেই। দূরবীনের সাধ্যের শেষ পর্যন্ত চষে ফিরছিল আমার দুটি চোখ। হঠাৎ আমার চোখ দুটি আটকে গেল সবুজ পাহাড়ের চূড়ায়। চোখ দুটিকে আমার বিশ্বাস হলো না। চোখ থেকে দূরবীন সরিয়ে চোখ দুটি মুছে নিলাম। আবার দেখলাম। না, আমার চোখ ভুল দেখেনি। সত্যই ওটা একটা বড় সবুজ দ্বীপ। তার মানে আমি একটা নতুন ভূখন্ড আবিষ্কার করেছি। আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। চিৎকার করে নির্দেশ দিলাম জাহাজের গতি দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ঘুরিয়ে নেবার। চার ঘন্টা চলার পর দ্বীপটার নিকটবর্তী হলাম। ততক্ষণে দ্বীপটার পশ্চিমে আরো তিনটা দ্বীপের সবুজ দিগন্ত আমার চোখে ধরা পড়ে গেছে। আনন্দে আবারও চিৎকার করে উঠলাম, একটা দ্বীপপুঞ্জ আবিস্কার করেছি। এগারই জুলাই (১৪৩১) বেলা ১টার সময় আমাদের জাহাজ প্রথম দ্বীপে নোঙর ফেলল। এর আধঘন্টা পরে আমি জংগল আচ্ছাদিত তীরে পা রাখলাম। আনন্দে উদ্বেলিত জাহাজের সকলেই নেমেছিল দ্বীপে। তখন যোহর নামাজের সময়। সবাই যখন এদিক-ওদিক ঘুরতে ব্যস্ত তখন আমি যোহর নামাজটা পড়ে নিলাম। বেলা ২টায় আমরা সবাই খাওয়ার জন্যে একত্রিত হলাম। খাওয়ার পর দ্বীপপুঞ্জের নামকরণ ও পতাকা উত্তোলনের সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। ঠিক যোহর নামাজের সময় দ্বীপপুঞ্জে পা রেখেছি বলে আমি প্রস্তাব করলাম দ্বীপপুঞ্জের নাম হবে 'আয-যোহর।' সবাই হাততালি দিয়ে সমর্থন জানাল। পরে সবার পক্ষ থেকে আয-যোহর দ্বীপপুঞ্জে পর্তুগালের পতাকা উত্তোলণ করলাম। আমরা দ্বীপে পনের দিন অবস্থান করলাম। দ্বীপে কোন মানুষ ছিল না। উপকূলের কাছেই একটা উচ্চভূমিতে একটা বাড়ি তৈরি করলাম। এই বাড়িটাকেই পরে আমি দূর্গে

রূপ দিয়েছিলাম। নাম রেখেছিলাম ‘গাজী আলী জামাল’ দূর্গ। পরে পতুর্গাল থেকে পরিবার-পরিজন আনার পর এই দূর্গই আমার স্থায়ী নিবাসে পরিণত হয়। পতুর্গাল সরকার আমাকে দ্বীপপুঞ্জের গভর্ণরের দায়িত্ব দেন। দ্বীপপুঞ্জের গভর্ণর হিসেবে সবগুলো দ্বীপে বসতি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করি। এই সুযোগকে আমি আল্লাহর দেয়া বড় একটা রহমত হিসেবে গ্রহণ করি। স্পেনের ভাগ্যাহত মুসলমানদের এই দ্বীপপুঞ্জে নিয়ে আসার পরিকল্পনা নিয়ে আমি স্পেনের মুসলিম নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগের উদ্যোগ নিলাম। একবার পর্তুগাল সফরকালে এই উদ্দেশ্যে আমি গোপনে গ্রানাডা গেলাম।

আমি............।’

‘ভাইয়া খুব কাছেই হেলিকপ্টারের শব্দ। মনে হয় একটা হেলিকপ্টার নেমে আসছে।’ আহমদ মুসার পড়ার মাঝখানে চাপা-উত্তেজিত কণ্ঠে বলল হাসান তারিক। সে বসেছিল একদ গুহার মুখেই।

আহমদ মুসার ডাইরী পড়া বন্ধ হয়ে গেল।

সবাই উৎকর্ণ হয়ে উঠেছে।

আহমদ মুসা ডাইরীটা সার্গিও’র হাতে দিয়ে দ্রুত সরে এল গুহার মুখে হাসান তারিকের পাশে।

মুক্ত আকাশের দিকে কান পেতে একটু শোনার চেষ্টা করেই আহমদ মুসা বলে উঠল, ‘আমাদের মাথার উপরে হেলিকপ্টার। মনে হচ্ছে আলো না জ্বালিয়ে খুব নিচু দিয়ে ওরা এসেছে।’

বলেই আহমদ মুসা মুহূর্তের জন্যে থামল। পরমুহূর্তেই আহমদ মুসা ব্যাগ থেকে মুখোশ বের করে একটা নিজে নিয়ে অন্যগুলো সকলের সামনে ছুড়ে দিয়ে চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, ‘তোমরা সকলে তাড়াতাড়ি গ্যাস মুখোশ পড়ে নাও। নিশ্চয় শব্দ মনিটরিং করে আমাদের অবস্থান পিন পয়েন্ট করার পর তারা এসেছে। অন্ধকারে নিশ্চয় তারা নামতে সাহস পাবে না। গ্যাস বোমাই তাদের টার্গেট।’

আহমদ মুসার কথা শেষ হওয়ার আগেই চারদিক থেকে ছোট ছোট বেলুন ফাটলে যেমন শব্দ হয় সেরকম শব্দ উঠতে শুরু করেছিল।

সবাই গ্যাস মুখোশ পরে নিয়েছিল। আহমদ মুসাও তাড়াতাড়ি গ্যাস মুখোশ পরে নিল।

ভ্যানিসা ও সার্গিও'র মুখে আতংক। ভ্যানিসা বলল, 'ভাইয়া.......।'

ভ্যানিসা মুখ খুলতেই আহমদ মুসা ঠোঁটে আঙুল চেপে তাকে কথা বলতে নিষেধ করল।

'ভাইয়া' শব্দ বের হওয়ার পরই ভ্যানিসার মুখ বন্ধ হয়ে গেল।

আহমদ মুসা ফিসফিস কণ্ঠে বলল, 'হেলিকপ্টারে ওদের শক্তিশালী শব্দগ্রাহক যন্ত্র আছে। আর কোন কথা নয়। ওদের বুঝাতে হবে যে, ওদের প্রাণঘাতি গ্যাস বোমায় আমরা সবাই মারা গেছি। এ বিশ্বাস যদি ওদের হয় তাহলে ওরা নিশ্চিন্তে চলে যাবে, অথবা আরও নিশ্চিত হবার জন্যে নিশ্চংকচিত্তে এই গুহার সামনে ল্যান্ড করবে।'

কথা শেষ করে আহমদ মুসা গুহামুখের দিকে একটু সরে গিয়ে বসল।

তারপর অখন্ড নিরবতা। আকাশে হেলিকপ্টারের চাপা হালকা যান্ত্রিক গর্জন, নিচে আশে-পাশে মাঝে মাঝে গ্যাসবোমা ফাটার ফটফট শব্দ।

দীর্ঘ এক ঘন্টা নিরবতার পর সবাই অনুভব করল হেলিকপ্টারের শব্দ আরও নিকটতর হচ্ছে। বুঝল সবাই নামছে হেলিকপ্টার থেকে।

আহমদ মুসা হাসান তারিকের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস কণ্ঠে বলল, 'ওরা সম্ভবত দেখতে নামছে যে আমরা বেঁচে আছি কিনা। ওরা গুহামুখের দিকে আসবে, সাবধানে থেকো। আমি ওদের পেছন দিকে যাবার চেষ্টা করছি।'

বলে আহমদ মুসা গুহা থেকে বেরিয়ে গেল। তার মুখে গ্যাস মুখোশ এবং হাতে এম-১০ মেশিন রিভলবার।

হেলিকপ্টার ল্যান্ড করল গুহার একটু সামনে সমাধীক্ষেত্রের উপর।

আহমদ মুসা তখন ক্রলিং করে গুহামুখ থেকে অনেকখানি সরে গেছে।

আকাশটা মেঘে ঢেকে যাওয়ায় অন্ধকার এখন নিশ্ছিদ্র হয়ে উঠেছে। হেলিকপ্টারটিকে অন্ধকারের বুকে আরও অন্ধকার একটা পিন্ড বলে মনে হচ্ছে। চোখের সামনে আর সবকিছুই অন্ধকারে হারিয়ে গেছে।

হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে একটা ব্রাশ ফায়ারের শব্দ উঠল এবং তা অব্যাহতভাবে চলল।

আহমদ মুসা বুঝল, ব্রাশফায়ারের কেন্দ্রবিন্দু হলো গুহামুখ। আহমদ মুসা নিশ্চিত হলো, ওরা গুহার দিকে যাবে। এই ব্রাশফায়ার তারই পূর্ব প্রস্তুতি। তারা দেখতে চায় গুলীর কোন জবাব আসে কিনা। কেউ জীবিত থাকলে নিশ্চয় আত্মরক্ষার জন্যে জবাব দেবে।

হাসান তারিক ব্রাশফায়ারের কোন জবাব দিল না।

খুশি হলো আহমদ মুসা, হাসান তারিক ওদের পাতা ফাঁদে পা দেয়নি। শক্তিশালী শত্রুকে বাইরে গুহা বা ঘরের ভেতর থেকে সমর্থক গুলী চালিয়ে শত্রুর কাছে নিজের অস্তিত্বের জানান দেয়া ঠিক নয়। কারণ তাতে বোমা বা গ্রেনেড হামলার শিকার হয়ে বিপর্যয় ঘটার সম্ভাবনা থাকে। গুহা বা ঘর থেকে বাইরের প্রবল শক্তির প্রতি আক্রমণটা পিনপয়েন্টেড ও চূড়ান্ত হতে হয়।

আহমদ মুসা এসব ভাবছিল আর হেলিকপ্টারের পেছন দিকে অগ্রসর হচ্ছিল।

আহমদ মুসা পাঁচ মিনিটের মত ক্রলিং করে চলার পর হেলিকপ্টারের পেছনে গিয়ে পৌছল।

ধীরে ধীরে উঠে বসল আহমদ মুসা।

উঠে বসার পর মাথাটা স্থির হবার সাথে সাথেই একটা কঠিন বস্তু এসে মাথায় চেপে বসল। সংগে সংগেই ভারী একটা কণ্ঠ, 'আমার চোখে ইনফ্রারেড গগলস আছে। তোমার সবকিছুই আমি দেখতে পাচ্ছি। চালাকি করার চেষ্টা করলে মাথার খুলি উড়ে যাবে।' রুক্ষ ও কঠোর কণ্ঠ লোকটির।

আহমদ মুসার হাতে এম-১০, কিন্তু হাত যেমন ছিল তেমনি কোলের উপর রাখল। আক্রমণকারীর চোখে ইনফ্রারেড গগলস আছে তা আহমদ মুসা বিশ্বাস করেছে। এই গগলসটা থাকার কারণেই সে আহমদ মুসাকে দেখে ফলো করেছে।

আক্রমণকারী লোকটি একটু থেমেই আবার বলে উঠল, 'বেন্টো, ওর হাতের ভয়ংকর এম-১০টা নিয়ে নাও।'

সংগে সংগেই একজন লোক আহমদ মুসার পাশে এসে আহমদ মুসার হাত থেকে এম-১০টা নিয়ে নিল।

পরক্ষণেই পেছনের রিভলবারধারী লোকটি তার রিভলবারের নল দিয়ে আহমদ মুসার মাথাকে একটু সামনে ঠেলে দিয়ে বলে উঠল, 'উঠে দাঁড়াও।'

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়ালে সে বলল, 'সামনে আগাও হেলিকপ্টারের দরজার দিকে।'

হাঁটতে লাগল আহমদ মুসা।

পেছনে রিভলবারধারী লোকটির রিভলবার আহমদ মুসার মাথা থেকে তিল পরিমাণও নড়েনি।

হেলিকপ্টারের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

রিভলবারধারী পেছন থেকে বলল, 'বেন্টো, ওর দুহাতে পেছনে এনে বেঁধে ফেল।'

বেন্টো নামক লোকটিকে আহমদ মুসার পেছনে জায়গা করে দেবার জন্যে রিভলবারধারী আহমদ মুসার পাশে সরে আসছিল। তার রিভলবারের নলটিও আহমদ মুসার মাথা থেকে আলগা হয়ে গিয়েছিল।

মুহূর্তের এই ফাঁকেই ঘটে গেল ঘটনাটা।

হঠাৎ আহমদ মুসার মাথা তীর বেগে নিমণমুখী হলো, আর তার দুই পা ঈষৎ ফাঁক হয়ে ক্ষেপণাস্ত্রের মত উৎক্ষিপ্ত হলো উপর দিকে এবং ধনুকের মত তা বেঁকে একটা আঘাত করল রিভলবারধারীর চোখে-মুখে, অন্য পা টি হাতুড়ীর মত গিয়ে পড়ল আহমদ মুসাকে বাঁধার জন্যে এগিয়ে আসা দ্বিতীয় লোকটির বুকে।

দুজনেই পড়ে গিয়েছিল।

রিভলবারধারীর অবস্থাই বেশি খারাপ হয়েছিল। আহমদ মুসার পায়ের আঘাতে লোকটির ইনফ্রারেড গগলস ভেঙে চোখে ঢুকে গিয়েছিল। কিন্তু হাতের রিভলবার তার হাত থেকে ছুটে যায়নি। সে পড়ে গিয়ে চোখ বন্ধ রেখেই এলোপাথাড়ি গুলী করা শুরু করে দিয়েছিল।

আহমদ মুসাও পড়ে গিয়েছিল।

শুয়ে থেকেই রিভলবারধারীর রিভলবার ধরা হাত সে চিহ্নিত করতে পারল গুলী বর্ষণ দেখে।

আহমদ মুসা ঝাঁপিয়ে পড়ে দুহাত দিয়ে তার রিভলবার কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করল।

লোকটিও তার দুহাত দিয়ে রিভলবার আঁকড়ে ধরে গুলী করছিল।

রিভলবার নিয়ে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল দুজনের মধ্যে।

লোকটি তার সর্বশক্তি দিয়ে রিভলবারের নল আহমদ মুসার দিকে ঘুরাতে চেষ্টা করছিল এবং আহমদ মুসাও।

আহমদ মুসাই শেষে জিতে গেল। লোকটির রিভলবারের গুলী তার নিজেরই থুথনির নিচ দিয়ে ঢুকে মস্তক বিদ্ধ করল।

রিভলবারটি হাতে নিয়ে আহমদ মুসা পাশের লোকটির দিকে এগুলো। সে মাটিতে পড়েছিল। আহমদ মুসা ভাবল, লোকটি এলোপাথাড়ী গুলীর মধ্যে মাটিতে পড়ে থেকে আত্মরক্ষা করছে।

অন্ধকারেই আন্দাজ করে আহমদ মুসা তার রিভলবার লোকটির মাথায় চেপে ধরল এবং বলল, ‘দুহাত একটু নড়াতে চেষ্টা করলে মাথা ছাতু করে দেব।’

বলে আহমদ মুসা তার বাম হাত দিয়ে লোকটির ডান কব্জি চেপে ধরল। কিন্তু হাতটি নিসাড়। আহমদ মুসা তার বাম হাতটি আরও সামনে সরিয়ে নিতেই অনুভব করল লোকটির হাত খোলা, তার শিথিল হাতের পাশেই আহমদ মুসা পেয়ে গেল তার এম-১০ মেশিন রিভলবার।

লোকটি কি জ্ঞান হারিয়েছে? - এই চিন্তা করেই আহমদ মুসা তার ডান হাত লোকটির মুখের উপর নিয়ে এল।

গরম তরল কিছুতে আহমদ মুসার ডান হাতটা ডুবে গেল। ‘রক্ত নিশ্চয়’- ভাবল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা তার হাত লোকটির মাথায় নিয়ে এল।

মাথায় রক্তের বন্যা। আহমদ মুসা বুঝল লোকটি মাথায় গুলী খেয়ে মরেছে। এটা রিভলবারধারী লোকটির এলোপাথাড়ী গুলীরই ফল। মাথায় গুলী খাওয়ায় চিৎকারেরও অবসর পায়নি।

উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

এই সময় তার পেছনে গুহামুখ থেকে সাব-মেশিনগানের একটানা গর্জন ভেসে এল।

আহমদ মুসা গুলীর একটানা ষ্টাইল দেখেই বুঝল এ সাব মেশিনগান হাসান তারিকের।

খুশি হলো আহমদ মুসা যে, হাসান তারিক প্রথম গুলী ছুড়েছে এবং টার্গেট পিনপয়েন্ট করেই গুলী ছুড়ছে। এদের পাল্টা আক্রমণের আর অবসর হবে না।

তাই হলো।

হাসান তারিকের সাব মেশিনগান থেমে গেল। কিন্তু এ পক্ষের পাল্টা আক্রমণ আর হলো না। কিছুক্ষণ নিরবতা।

শত্রুপক্ষের কেউ আর অবশিষ্ট নেই, নিশ্চিত হলো আহমদ মুসা।

গুহা মুখের দিকে লক্ষ্য করে আহমদ মুসা বলল, 'হাসান তারিক, তোমরা বেরিয়ে এস, গেম ইজ ওভার।'

বৈদ্যুতিক লণ্ঠন সাথে করে বেরিয়ে এল হাসান তারিকরা।

চলে এল ওরা হেলিকপ্টারের কাছে।

'ওদিকের কি খবর হাসান তারিক?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'ওরা পাঁচজন গিয়েছিল। পাঁচজনই মারা পড়েছে ভাইয়া।' হাসান তারিক বলল।

'এদিকে ঐযে দুজনের লাশ দেখ, ওরাই শুধু ছিল।' বলে উঠল আহমদ মুসা।

'তার মানে হেলিকপ্টারটি এখন আমাদের।' আনন্দে বলে উঠল ভ্যানিসা।

'হ্যাঁ, যুদ্ধ-লব্ধ মাল। নিজের অবশ্যই বলতে পার।' আহমদ মুসা বলল।

'এখন হেলিকপ্টারে উঠে তো আলো জ্বালানো যায়।' বলল ভ্যানিসা।

'হ্যাঁ যায়।' বলেই আহমদ মুসা উৎকর্ণ হয়ে দক্ষিণ দিকে তাকাল।

হঠাৎ আহমদ মুসাকে এভাবে উৎকর্ণ হয়ে উঠতে দেখে সবাই তাকাল দক্ষিণ দিকে।

সবাই শুনতে পেয়েছে দক্ষিণ দিক থেকে একটা হেলিকপ্টারের শব্দ ভেসে আসছে।

সবাই তাকিয়ে থাকল ওদিকে।

শব্দটি কাছে চলে এসেছে।

খুব নিচু দিয়ে উড়ে আসছে হেলিকপ্টারটি আলো নিভিয়ে। তাই খুব কাছে এসে গেলেও হেলিকপ্টারটি দেখা যাচ্ছে না।

আহমদ মুসা দ্রুত হেলিকপ্টারে উঠে গেল। মিনিটখানেকের মধ্যেই নেমে এল এ্যান্টি-এয়ারক্রাপ্ট ধরনের হালকা গান নিয়ে। এ গানগুলো লোফ্লাইং বিমান, হেলিকপ্টার কিংবা মাটিতে থাকা যে কোন হালকা ধরনের স্থাপনা ধ্বংসে বংবহার করা যায়। এয়ার থেকে এয়ার, এয়ার থেকে গ্রাউন্ড সব রকমেই এগুলো ব্যবহার করা যায়।

চারটি গানের একটা নিজে রেখে অন্য তিনটি হাসান তারিক, সার্গিও ও ভ্যানিসাকে দিয়ে বলল, 'প্রথম হেলিকপ্টারটি আমাদের দখলে। দ্বিতীয় শত্রু হেলিকপ্টারটি আসছে হয় প্রথমটির খোঁজ নিতে, অথবা প্রথমটির আমন্ত্রণ পেয়ে। শত্রু হেলিকপ্টারটি নিকট আকাশে আসার পর আমাদের চারজনের একযোগে প্রথম আঘাতেই তাকে ধ্বংস করতে হবে। বোমা ফেলার সুযোগ তাকে দেয়া যাবে না।'

থামল আহমদ মুসা।

ওরা তিনজন একসাথেই বলে উঠল, 'আমরা বুঝেছি ভাইয়া।'

ল্যান্ড করা হেলিকপ্টারটির দক্ষিণপূর্ব কোণ বরাবর সমাধীক্ষেত্রের মাঝখানে পজিশন নিয়ে সবাই বসল আহমদ মুসার নির্দেশে।

লম্বালম্বি এক লাইনে প্রথমে আহমদ মুসা, তারপরে সার্গিও, পরে ভ্যানিসা এবং সবশেষে হাসান তারিক।

রাতের কালো আঁধার কেটে ততোধিক কালো হেলিকপ্টারটি যমদূতের মত আসছে খুব চাপা একটা গর্জন তুলে।

সমাধীক্ষেত্রের আকাশে ঢুকে পড়েছে হেলিকপ্টারটি।

গতি তার ধীর হয়েছে।

অনেকটা দ্বিধাগ্রস্ত গতি।

মনে হয় অয়্যারলেসের যোগাযোগে প্রথম হেলিকপ্টার থেকে সাড়া পাচ্ছে না। হঠাৎ সমাধীক্ষেত্রের মাঝখানের আকাশে এসে স্থির হয়ে থাকা হেলিকপ্টার থেকে সার্চ লাইটের একটা তীব্র আলো গিয়ে পড়ল মাটিতে ল্যান্ড করা হেলিকপ্টারটির উপর।

সেই আলোতে হেলিকপ্টারের দক্ষিণ পাশে পড়ে থাকা দুটি লাশের দৃশ্যও স্পষ্ট হয়ে উঠল।

'ফায়ার। ওটা এখন বিটালিয়েশনে আসবে।' চাপা কণ্ঠে গর্জন করে উঠল আহমদ মুসা।

সংগে সংগেই চারটি এ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফট গান গর্জন করে উঠল।

চারটি গান থেকে আটটি আগুনের বুলেট ছুটে গেল হেলিকপ্টারের দিকে।

আকাশে দাঁড়ানো হেলিকপ্টারকে তাক করে ধীরে সুস্থে ছোঁড়া আটটি বুলেটই গিয়ে আঘাত করল হেলিকপ্টারটিকে।

ভীষণভাবে কেঁপে উঠল হেলিকপ্টারটি। পরক্ষণেই মাথা নিচু করে একটা ড্রাইভ দিয়ে উত্তর দিক হয়ে পূর্ব দিকে ঘুরল। সেই সাথে একাধারে মেশিনগানের গুলী ও বোমা পড়তে শুরু করেছে হেলিকপ্টার থেকে।

হেলিকপ্টারটি একটু পূর্ব দিকে গিয়ে আবার পশ্চিম দিকে ফেরার চেষ্টা করে আবার পূর্বমুখী হয়ে ছুটতে শুরু করল। আগুনের ফুলকি বেরুচ্ছে হেলিকপ্টারের ইঞ্জিন থেকে।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই হেলিকপ্টারটি পাহাড়ের আড়ালে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল।

অল্পক্ষণ পরেই পূর্ব দিকে ভয়ানক বিস্ফোরণের শব্দ ভেসে এল।

'হেলিকপ্টারটি ধ্বংস হয়ে গেল, ভাইয়া।' বলল ভ্যানিসা আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে।

সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে বসা পজিশন থেকে। কিন্তু আহমদ মুসা ওঠেনি।

‘ভাইয়া আসুন। আমরা গুহামুখের দিকে একটু সরে যাই। বোমার আগুন এদিকে আসছে।’ বলল হাসান তারিক আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে।

হাসান তারিকের কথার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে আহমদ মুসা বলে উঠল, ‘হেলিকপ্টার বিস্ফোরণে যে বনি আদমরা মারা গেল, তার জন্য আমরা কতটুকু দায়ী হাসান তারিক?’ ধীর, ব্যথিত কণ্ঠ আহমদ মুসার।

‘আমরা দায়ী নই ভাইয়া। আমরা আত্মরক্ষার জন্যেই গুলী করেছি হেলিকপ্টারকে। ওরা বুঝতে পেরেছিল ওদের হেলিকপ্টারের সব লোক মারা গেছে। ওরা এর প্রতিশোধ নিতে বোমা ও গুলীর সয়লাব বইয়ে দিত এই সমাধীক্ষেত্রে। ওদের হেলিকপ্টারকে না মারলে আমাদেরকেই মরতে হতো।’ বলল হাসান তারিক।

হাসান তারিক থামতেই সার্গিও বলে উঠল, ‘এ প্রশ্ন আপনি তুলছেন কি করে ভাই? এটা যুদ্ধের ময়দান। মারার জন্যেই তারা এসেছিল, তারা না মরলে আমাদের মরতে হতো।’

ম্লান হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আপনাদের যুক্তিগুলো আমারও জানা। কিন্তু অনেক সময় অনেক ঘটনায় নিজের দিয়ে নিজেকে জানানো যায় না। নিঃসন্দেহে এই হত্যাগুলো প্রয়োজনের। আল্লাহর বিধান একে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু তবু মনে হয় তাঁর বান্দাহদের প্রতি আল্লাহ অপরিসীম মেহেরবান। আল্লাহ ব্যাথা পান তার বান্দাহদের এইসব মৃত্যুতে।’

‘না ভাইয়া, আল্লাহ ব্যাথা পান বান্দাহদের পথভ্রষ্টতায়। বান্দাহদের পথ ভ্রষ্টতাই তো এইসব করুণ পরিণতির জন্য দায়ী।’ বলল হাসান তারিক।

‘তুমি ঠিক বলেছ হাসান তারিক। বান্দাহদের পথভ্রষ্টতাই মূল কথা। এই পথভ্রষ্টতা সব হানাহানি, জুলুম-নির্যাতন এবং হতাহতের জন্য দায়ী। শান্তির জন্যই এই পথভ্রষ্টতার হাত থেকে মানুষকে বাঁচাতে হবে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘বাঁচাবার এই সংগ্রামই তো ইসলাম করছে। কিন্তু কল্যাণের এই সংগ্রামকেই উৎখাত করার জন্য এগিয়ে এসেছে পথভ্রষ্টরা। চলার পথ থেকে পথভ্রষ্টদের সরাতে না পারলে মানবতার শান্তির সংগ্রাম, মানবতার মুক্তির সংগ্রাম থেমে যাবে, শেষ হয়ে যাবে। সুতরাং মানুষের শান্তি ও মুক্তির জন্যই তো সংগ্রাম

প্রয়োজন পথভ্রষ্টদের বিরুদ্ধে। এই সংগ্রামে আজকের হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হওয়ার মত আরও অসংখ্য ঘটনা ঘটতেই পারে।' বলল হাসান তারিক।

'ধন্যবাদ মি. হাসান তারিক। আজ আপনাদের কথা খুব আপন বলে মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে মুসলিম ও ইসলাম গৌরবের বস্তু। কিন্তু এতদিন একে অপমানজনক মনে করে এসেছি।' সার্গিও বলল।

'শুধু অপমানজনক নয়, আমরা নিষ্ঠুরভাবে আমাদের পূর্ব পুরুষের কবর ভেঙে ফেলেছি এবং পরিবারের ইতিহাসকে সমাধিস্থ করেছি।' বলল ভ্যানিসা।

'যারা কবর ভেঙেছেন, যারা ইতিহাস কবরস্থ করেছেন তাদের সৌভাগ্য হয়নি ডাইরীটা পড়ার, যা আজ আহমদ মুসা ভাই আমাদের পড়ে শোনালেন।' সার্গিও বলল।

'ডাইরী পড়া তো শেষ হয়নি ভাইয়া।' বলল ভ্যানিসা।

ভ্যানিসা থামতেই আহমদ মুসা বলে উঠল, 'সব আলোচনা এখন বন্ধ। এখন কাজ। প্রথম কথা হলো, বাক্সটা গর্তে নামিয়ে আগের অবস্থায় রেখে দেয়া। আর.............।'

আহমদ মুসার কথার মাঝখানেই সার্গিও বলে উঠল, 'বাক্সটিকে আর মাটির তলায় পাঠানো হবে না ভাইয়া। দেখছেন তো, পরিবারের ইতিহাসকে সমাধিস্থ করা নিয়ে ভ্যানিসা কি রকম ক্রিটিক্যাল কথাবার্তা বলছে শুরু থেকেই।'

'না ভাইয়া, আমার মত আছে। বাক্সটাকে মাটির তলায় যেখানে ছিল সেখানে পাঠিয়ে দিন।' বলে হাসতে লাগল ভ্যানিসা। হাসতে হাসতেই আবার বলে উঠল, 'জানি ভাইয়া, আপনি পারবেন না আর বাক্সটাকে সমাধিস্থ করতে। দাদু গাজী আল জামাল এক মুহূর্তেই আমাদের মাথাকে আকাশস্পর্শী করেছেন। আমরা কি পারি এই মাথাকে আবার লুটিয়ে দিতে!' আবেগ কম্পিত কণ্ঠ ভ্যানিসার কান্নায় ভরে গেল। মুখের হাসি নিভে গেল চোখের পানিতে।

ম্লান হাসল সার্গিও। আবেগ উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে তার মুখও। বলল, 'ঠিক বলেছ বোন, ঐ বাক্সটা গনজালো পরিবারকে নতুন জীবন দান করল। ওকে কবর নয়, আমাদের মাথায় রাখতে হবে।'

‘কিন্তু আম্মার তো শর্ত ছিল, বাক্স আবার মাটির তলায় রাখতে হবে।’ দ্রুতকণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

‘আম্মা যা বলেছেন, আম্মাই তা আর মানবেন না। সুতরাং সে চিন্তা নেই।’ সার্গিও বলল।

‘তাছাড়া আমাদের পূর্ব পুরুষ যিনি এই ইতিহাসকে সমাধিস্থ করেছিলেন, তাঁর চিঠিওতো শুনলাম। তিনিও আশা করেছিলেন তারই উত্তর পুরুষের কেউ এই ইতিহাস উদ্ধার করবেন। আজ তাঁর আশাই পূর্ণ হলো। সুতরাং আগের অবস্থায় ফিরে যাবার কোন প্রশ্ন নেই।’ বলল ভ্যানিসা।

আহমদ মুসা হাসল। স্বস্তির হাসি। বলল সার্গিওকে উদ্দেশ্য করে, ‘তাহলে এখন করণীয় বলুন।’

‘এখন আমরা হেলিকপ্টার নিয়ে যাত্রা করব।’ বলল সার্গিও।

‘কোথায়?’ আহমদ মুসা বলল।

‘পশ্চিম উপকূলে আমাদের ঘাঁটিতে, যার কথা আমি আগেও বলেছিলাম।’ বলল সার্গিও।

‘হেলিকপ্টার নিলে অসুবিধা হবে না? কেউ দেখে ফেলবে না? জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘আমাদের ঘাঁটিটা হলো পশ্চিম উপকূলীয় শহর ‘সিরেটা ও দজ রিবেরা’র মাঝখানে এক পার্বত্য উপত্যকায়। ঐ ঘাঁটিতে কোন বাড়ি-ঘর নেই। পাহাড়ের বিভিন্ন গুহাকে বাড়িতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। সুতরাং ও ঘাঁটি কারও নজরে পড়ার মত নয়। হেলিকপ্টারটি জংগলের আড়াল করে চালিয়ে নিয়ে যাব। আর ওখানে নিয়ে গিয়েই হেলিকপ্টারে নতুন রং দিয়ে ওটা পাল্টে ফেলব আমরা। এ হেলিকপ্টারেই আমরা কেকো দ্বীপের হারতা পৌছতে পারি।’ বলল সার্গিও।

‘এখানে হেলিকপ্টারের রেজিষ্ট্রেশন নেই?’ আহমদ মুসা বলল।

‘আছে কমার্শিয়াল হেলিকপ্টারগুলোর। পার্সোনাল হেলিকপ্টারের নেই।’ বলল সার্গিও।

মুখটা প্রসন্ন হয়ে উঠল আহমদ মুসার। বলল, ‘চলুন বাক্সটা হেলিকপ্টারে তুলে যাত্রার জন্য তৈরি হই।’

বলে আহমদ মুসা গুহা লক্ষ্যে হাঁটতে শুরু করল।

ভ্যানিসা হাঁটতে শুরু করে বলল, 'হেলিকপ্টার জিন্দাবাদ।'

'হেলিকপ্টার জিন্দাবাদ কেন?' পেছন ফিরে জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'হেলিকপ্টারই আমাকে ও সার্গিও ভাইয়াকে ওদিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা বাদই পড়ে গিয়েছিলাম।' বলল ভ্যানিসা আদুরে শিশুর ভংগিতে।

সবাই হেসে উঠল।

হেলিকপ্টার উড়ে চলেছে তেরসিয়েরা দ্বীপের পশ্চিম উপকূলের দিকে।

হেলিকপ্টার চালাচ্ছে হাসান তারিক।

তার পেছনেই তিনটি সিটে বসে আছে আহমদ মুসা, সার্গিও ও ভ্যানিসা।

কথা বলছিল সার্গিও, 'আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি আহমদ মুসা ভাই, 'গাজী আলী জামাল' হয়ে গেল 'গনজালো'। আমাদের পরিবারও টের পেল না এই বিকৃতি।'

শুধু 'গাজী আলী জামাল' নাম কেন, দ্বীপপুঞ্জের নামও তো বিকৃত হয়েছে। কোথায় নামটা ছিল 'আয-যোহর' সেটা হয়ে গেল 'আজোরস'। এ রকমই হয়। সময়ের পরিবর্তনে যখন কোন ভাষার চর্চা কমে যায়, কিংবা আদৌ থাকে না, তখন সে ভাষার শব্দগুলো বিকৃত হয়ে যায়। অন্যভাষার লেখকরা এই বিকৃতিকে ত্বরান্বিত করে। যেমন স্পেনের 'জাবালুত তারিক' হয়েছে 'জিব্রালটার'। বলল আহমদ মুসা।

আমার মনে হয় দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন নামের মত মানুষের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি যেটা আগে ছিল, সেটারও ব্যাপক বিকৃতি ঘটেছে।' ভ্যানিসা বলল।

এ সময় আহমদ মুসা একটু নড়ে-চড়ে বসল। তার চোখে-মুখে হঠাৎ প্রশ্ন ভেসে উঠল। কোন কথা যেন হঠাৎ তার মনে পড়ে গেছে। সে দ্রুত কণ্ঠে বলে উঠল, 'একটা কথা মনে পড়েছে ভ্যানিসা। সেই উচ্চ ভূমিটায়, যেখানে তোমাদের আদি বাড়ি ছিল বলেছিলে, যে বেদিটা আছে সেখানে আমি পাথরের বাটি

দেখেছি। বেদিও পাথরের ছিল। সেখান থেকে দুটো বিশাল সাপকে নেমে যেতে দেখেছি। এখন আমার মনে পড়ছে সাপ দুটো বাটিতে কিছু খেয়েছে। আবার তোমরা দুজন বেদির পাশেই গাছের উপর ছিলে। তোমরা সব দেখার কথা। কি দেখেছ? তোমরা ওখানে গাছেই বা কেন ছিলে? এসব প্রশ্ন আমার রয়েছে। জবাব খুঁজে পাইনি।'

আহমদ মুসা থামতেই ভ্যানিসা সার্গিওর দিকে চেয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'ভাইয়া, তুমিই উত্তরটা দাও।'

গম্ভীর হয়ে উঠেছে সার্গিও। একটু ভাবল।

একটা ম্লান হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটে। বলল, 'সাপ দুটোকে আমাদের পরিবারের সদস্য মনে করা হয়। পনের দিন বা এক মাস পর পর বেদির ঐ পাথর বাটিটায় দুধ দেয়া হয়। সাপ দুটো তা খেয়ে যায়। এই নিয়ম চলে আসছে কত যুগযুগ ধরে তা আমরা জানি না। আমাদের পূর্ব পুরুষরা এটা করেছে, সাপ দুটোর পিতা-দাদারাও এভাবে একই নিয়মে দুধ খেয়ে এসেছে। বিস্ময়ের ব্যাপার এক সাথে দুটোর বেশি সাপ দুধ খেতে আসে না। আমাদের পারিবারিক বিশ্বাস হলো, সাপ দুটো আমাদের সৌভাগ্যের প্রতীক। আদি ভিটা আমরা ছেড়েছি, কিন্তু তারা ছাড়েনি। তারা আদি বাস্তুভিটাকে ধরে রেখেছে লড়াইয়ে জয়ী হয়ে। আমাদের পরিবারের বিশ্বাস হলো, আমরা অতীতের শক্তি, সম্পদ সব একদিন ফিরে পাব। দ্বীপপুঞ্জে একদিন আবার গনজালো পরিবারের পতাকা উড়বে। সাপ দুটো আমাদের ঐশ্বর্য ও ঐতিহ্যের পাদপিঠকে আঁকড়ে থাকা তারই একটা প্রমাণ।'

একটু থামল সার্গিও।

সার্গিও থামতেই আহমদ মুসা বলল, 'লড়াইয়ে জয়ী হয়ে' কথাটার অর্থ বুঝলাম না। আর আপনাদের সাপের ইতিহাস কার থেকে শুরু? নিশ্চয় শুরু থেকে নয়।'

'অবশ্যই শুরু থেকে নয়', বলতে শুরু করল সার্গিও, 'আমাদের পারিবারিক এক মহাবিপর্যয়ের সময় থেকে সাপের ইতিহাস শুরু বলে আমি শুনেছি। ইতিহাসটা হলোঃ গনজালো পরিবার তখনও দ্বীপের শাসক। সেই সময়ের কোন একদিন আমাদের পারিবারিক বাড়ি ও শাসনকেন্দ্র দুর্গটি আক্রান্ত হয় উত্তর

আটলান্টিকের সবচেয়ে বড় জলদস্যুর নৌবাহিনী দ্বারা। রাতের বেলা আক্রমণটা এতই আকস্মিক ছিল যে, আত্মরক্ষার কোন উদ্যোগ নেয়াই সম্ভব হয়নি। দূর্গের সৈন্য ও প্রহরীরা সবাই মর্মান্তিক গণহত্যার শিকার হয়। পরিবারের পুরুষ সদস্যরা বেশির ভাগই মারা যায়। কিন্তু আমাদের পরিবারের শীর্ষ ও দ্বীপপুঞ্জের শাসকপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিটি তার অবশিষ্ট পরিবার-পরিজন নিয়ে দক্ষিণে সিলভার উপত্যকায় পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

জলদস্যু রেডরিংগর বাহিনী আমাদের দূর্গ দখলের ঐ রাতেই ভোরে আমাদের দ্বীপে ভয়াবহ ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। ভূমিকম্পের কেন্দ্র যেন ছিল আমাদের দূর্গটি। দূর্গ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গেল। সেই সাথে ধ্বংস হয়ে গেল জলদস্যু রেডরিংগসহ তার বাহিনী। পরদিন দূর্গের শাসক আমাদের পূর্বপুরুষ দেখতে এসেছিলেন দুর্গের অবস্থা। আর দুর্গের আশে-পাশের লোকদের সাহায্যের জন্যে এনেছিলেন দুধ, রুটি, বিস্কুট ইত্যাদি। তিনি এসে দেখেন পাড়া-প্রতিবেশীদের তেমন ক্ষতি হয়নি। শুধু ধ্বংস হয়েছে দুর্গটাই। সবচেয়ে বিস্ময়কর যে ঘটনা দেখেন সেটা হলো, জলদস্যু সর্দার রেডরিংগ ও তার স্ত্রী দুর্গের গেটের বাইরে মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। জানা যায় সর্প দংশনে তাদের মৃত্যু হয়েছে। আর যে সাপ দুটো তাদের কামড়েছিল সে দুটো সাপ তাদের পাশেই বসেছিল। মানুষের ভীড় সে দৃশ্য অবলোকন করেছে। দ্বীপপুঞ্জের শাসক আমাদের পুর্বপুরুষ সেখানে পৌছতেই সাপ দুটো চলে যেতে থাকে। যেন সাপ দুটো লাশ দুটিকে পাহারা দিয়ে রেখেছিল দ্বীপের শাসকের আগমনের অপেক্ষায়। উপস্থিত প্রবীণদের কেউ কেউ আমাদের পূর্বপুরুষকে বলে, ‘ও দুটো আপনাদের বাস্তু সাপ। ওরা প্রতিশোধ নিয়েছে রিংগর উপরে, যেমন প্রতিশোধ নেয় ঈশ্বর ভূমিকম্পের মাধ্যমে। আপনাদের সাপের দুধ খেতে দিন। সংগে সংগেই আমাদের পূর্বপুরুষটি তার একজন লোকের হাত থেকে দুধের একটা বালতি নিয়ে কিছু দূরে রেখে দেন। সাপ দুটো ফিরে এসে দুধ খেয়ে চলে যায়। সেই থেকেই ওখানে নির্দিষ্ট সময় পরপর দুধ রাখার নিয়ম মেনে আসা হচ্ছে। দুটি সাপও সেই থেকে দুধ খেয়ে যাওয়ার নিয়ম মেনে চলছে।’

একটু থামল সার্গিও। থেমেই আবার বলে উঠল, ‘কাহিনী আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না, বিজ্ঞানও বিশ্বাস করবে না। কিন্তু আপনি তো দেখেছেন দুটো সাপকে দুধ খেয়ে যেতে।’

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘এক ধরনের সাপ কোথাও দুধের সন্ধান পেলে নির্দিষ্ট নিয়মেই সেখানে বার বার আসে। ভূমিকম্পের সন্ধান প্রাণীকূল আগেই পেয়ে থাকে। সেদিন ভূমিকম্পের আগে নিশ্চয় সেখানকার সাপগুলো মাটির তলা থেকে বেরিয়ে এসেছিল। ভূমিকম্প শুরু হলে মানুষ পালাচ্ছিল, সাপও পালাচ্ছিল। এই সময় রেডরিংগরা ভীত-সন্ত্রস্ত সাপের আক্রমণের শিকার হয়। এরপরও সাপের একটা নিজস্ব জগৎ আছে, সেই সাথে আল্লাহরও ইচ্ছা আছে। সুতরাং কিছু ঘটনা অলৌকিক পর্যায়ে পড়তেই পারে। আমি সাপকে দুধ খাওয়ানো বন্ধ করতে বলবো না। তবে সাপকে ভালোমন্দের নিয়ামক ভাবা চলবে না।’

ম্লান হাসল সার্গিও। বলল, ‘আপনার ব্যাখ্যাটি ঠিক। তবু যে বিশ্বাস আশা যোগায়, শক্তি যোগায় এবং তা যদি ক্ষতিকর না হয়, তাহলে সে বিশ্বাস রাখলে ক্ষতি কি!’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘গাজী আলী জামাল ওরফে গনজালো পরিবার আবার ঐশ্বর্য ঐতিহ্য ফিরে পাবে, এ বিশ্বাসের জন্যে সাপকে অবলম্বন করার দরকার নেই। আপনাদের সংগ্রামই তা প্রমাণ করে দেবে, সে শুভ দিন আপনাদের অবশ্যই আসবে।’

‘ধন্যবাদ আহমদ মুসা ভাই। কিন্তু এ ধরনের বিশ্বাস ধর্মনীতির পরিপন্থী?’ বলল সার্গিও।

‘হ্যাঁ, আমাদের ইসলাম ধর্মের পরিপন্থী। ইসলামের বক্তব্য হলো, আল্লাহই সবকিছুর স্রষ্টা, প্রতিপালক, প্রত্যাবর্তনস্থল। সব ভালো-মন্দ তারই হাতে। পৃথিবীর কোন পরাক্রমশালী শাসককেই ভালো-মন্দের মালিক বলা যাবে না। বেআইনীভাবে তার কাছে মাথাও নোয়ানো যাবে না।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ভাইয়া, স্রষ্টা মানে আল্লাহ যদি মন্দেরও মালিক হন, তাহলে মন্দের জন্যে তো তিনিই দায়ী হন। তাহলে মন্দের বিচার তিনি করবেন কেমন করে?’ বলল ভ্যানিসা।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘আমল বা আচরণ মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার জন্যে নির্ধারিত। কিন্তু এর ফলটা হয় খোদায়ী বিধান অনুসারে। ফলাফলের এ অংশটা আল্লাহর এখতিয়ারে। কিন্তু এই ফলাফল আসে আল্লাহর দেয়া প্রাকৃতিক বিধান অনুসারে, তবে মানুষের আমল ও আচরণের ভিত্তিতে। সুতরাং মন্দের জন্য আচরণকারী মানুষই দায়ী।’

‘ভাইয়া আসুন, আমরা উদ্ভুত অবস্থার আলোচনায় আসি।’ বলে একটু থেমেই আবার বলা শুরু করল, ‘পারিবারিক ইতিহাস ও পূর্ব পুরুষের পরিচয় পাওয়ার পর সবকিছুই উলট-পালট হয়ে গেল। আমাদের পরিচয় এখন কি হবে সেটাই ভাবছি।’ বলল সার্গিও।

‘তোমরা যে পরিচয় চাও, সেটাই হবে সার্গিও।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমি বুঝতে পারছি না আহমদ মুসা ভাই, একটি মুসলিম পরিবার কিভাবে খৃষ্টান পরিবারে রূপান্তরিত হলো?’ বলল সার্গিও।

‘অস্বাভাবিক নয় সার্গিও। শত শত বছর খৃষ্টান পরিবেশে যদি একটি বা কয়েকটি মুসলিম পরিবার থাকে এবং সেই সাথে যদি তাদের শিক্ষা-দীক্ষার কোন ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে ধীরে ধীরে জীবনাচরণ তাদের পরিবর্তিত হয়ে যায়, সেই সাথে হারিয়ে যায় তাদের বিশ্বাসও। এক সময় চারদিকের চলমান ধর্মই তাদের ধর্ম হয়ে যায়। এভাবেই গাজী আলী জামাল পরিবার আমূল বদলে গেছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘পূর্ব-পরিচয়ের এই আবিস্কার বিস্ময়কর। কিন্তু পরিচয়টা আমার জন্যে গৌরবের। আমার পূর্ব পুরুষরা স্পেনের নৌবাহিনীতে ছিল, অটোমান নৌবাহিনীতে ছিল। কিন্তু সবচেয়ে গৌরবের মনে হচ্ছে আধুনিক যুগ ও অনন্য সভ্যতার নির্মাতা আরব মুসলমানরা আমাদের পূর্ব পুরুষ। নিজেকে মুসলমান ভাবতে গৌরবই বোধ করছি।’ বলল ভ্যানিসা।

‘কিন্তু তোমাদের মুসলিম পরিচয় প্রকাশ হলে আজোরসের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দেয়া গনজালো পরিবারের জন্যে অসুবিধা হবে না?’ আহমদ মুসা বলল।

জবাব দিল সার্গিও। বলল, 'আমাদের পূর্ব পুরুষরা পতুর্গাল সরকারের প্রপাগান্ডাকে যতটা ভয় করেছিল, ততটা ভয়ের কোন কারণ নেই। পতুর্গালের প্রপাগান্ডায় কোন কাজ হয়নি। গনজালো পরিবারের ধর্ম আজোরসবাসীদের কাছে কোন বিবেচ্য বিষয় নয়। গনজালো পরিবারের নেতৃত্ব তাদের ইতিহাসের কারণে। গনজালো পরিবার মুসলিম হলে সে ইতিহাস মিথ্যা হয়ে যাবে না।'

'কিন্তু মুসলমানদের বিরুদ্ধে তো বিশ্বব্যাপী একটা খারাপ প্রপাগান্ডা চলছে। গনজালো পরিবারের মুসলিম পরিচয় আজোরসের স্বাধীনতা সংগ্রামে একটা সংকট সৃষ্টি করতে পারে।' আহমদ মুসা বলল।

'সে প্রপাগান্ডার ধার অনেকটা ভোঁতা হয়ে গেছে। এ প্রপাগান্ডার মূলে তো ছিল, ইহুদীরা। সে ইহুদীদের মেরুদন্ড ভেঙে গেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদীরা এখন প্রধান আসামীর কাঠগড়ায় দন্ডায়মান এবং একজন মুসলমান আপনিই এই ক্ষেত্রে সাহায্য করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে। সুতরাং মুসলমানদেরই সুদিন ফিরে আসছে। তারপরও যদি আমাদের পরিবারের মুসলিম পরিচয় আমাদের নেতৃত্বের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, আমরা নেতৃত্ব ছেড়ে দিয়ে কর্মীর কাতারে দাঁড়াতে একটুও দ্বিধা করবো না। নেতৃত্ব ছাড়ব, কিন্তু ইতিহাস আর ছাড়ব না, আদর্শ ছাড়ব না।' বলল সার্গিও।

'ধন্যবাদ ভাইয়া। আমারও মত এটাই।' আনন্দে চিৎকার করে উঠল ভ্যানিসা।

'কনগ্রাচুলেশন। তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি ভ্যানিসা, সার্গিও।' বলল আহমদ মুসা।

'ওয়েলকাম ভাইয়া। খুবই খুশি লাগছে আপনার সাথে এক হতে পেরে। আরও খুশি লাগতো যদি আপনার অভিযানে শরীক হতে পারতাম।' ভ্যানিসা বলল।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'এও হতে পারে, বাধ্য হয়েই তোমাদের অভিযানে যোগ দিতে হচ্ছে। আমরা হারতা যাচ্ছি মূল অভিযানের প্রস্তুতির জন্য। ভবিষ্যত সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। শত্রুর শক্তি এবং সেখানকার পরিস্থিতি

সম্পর্কেও নয়। হতে পারে যে, অভিযানে তোমাদের অংশগ্রহণ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। অতএব হতাশ হয়ো না। বরং প্রস্তুত থেকো।'

'অবশ্যই ভাইয়া। হারতা কবে যাত্রা করছেন?' ভ্যানিসা বলল।

'পশ্চিম উপকূলে তোমাদের ঘাঁটিতে যাবার পর তোমাদের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেব।' বলল আহমদ মুসা।

'হেলিকপ্টারেই যাবেন?' ভ্যানিসা বলল।

'সেটাও ঠিক হবে ওখানে যাবার পর। হেলিকপ্টার নিলে হেলিকপ্টারটি ফিরিয়ে আনার জন্য তোমাদের, মানে অন্তত সার্গিওর যেতে হবে।' বলল আহমদ মুসা।

'তাহলে হেলিকপ্টার নেন ভাইয়া।' ভ্যানিসা বলল।

আহমদ মুসা হাসল।

অন্য সকলেই হেসে উঠল ভ্যানিসার বাচ্চাসুলভ আবদারে।

হাসি থামলেও কেউ কোন কথা তৎক্ষণাৎ বলল না।

নেমে এল নিরবতা।

এই নিরবতার মধ্যে হেলিকপ্টারের চাপা গর্জনটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল।

সকলের দৃষ্টিই সামনে।

লক্ষক্ষ্যর পথে যেন প্রাণপণে উড়ে চলেছে হেলিকপ্টার।

# ৫

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক রেষ্টুরেন্ট থেকে এক পিস করে ডিমের ফ্রাই ও চা খেয়ে রাস্তায় নামল। হাঁটতে শুরু করল ফুটপাত ধরে।

আজ সকাল ছ'টায় তারা গনজালো রোডের মুখে এসে নেমেছে। আর হারতায় এসেছে তারা একদিন আগে। সার্গিও ও ভ্যানিসা তাদেরকে হেলিকপ্টারে করে পৌছে দিয়ে গেছে তারও একদিন আগে। হেলিকপ্টার নিয়ে তারা নামে হারতা থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে দক্ষিণ উপকূলের ছোট শহর 'ফেটেরা'র সমুদ্র তটে।

ফেটেরা আজোরস দ্বীপপুঞ্জের এ দ্বীপটির কোষ্টাল হাইওয়ে নেটওয়ার্কের উপর তৈরি একটা ব্যস্ত শহর। শহর থেকে উপকূলটা দুমাইল দূরে। আহমদ মুসাদের হেলিকপ্টার এখানেই অবতরণ করে।

দ্বীপের চারদিকে বৃত্তাকারে বেষ্টিত কোষ্টাল হাইওয়ের শহরগুলো নিয়মিত কমার্শিয়াল বাসলাইনের দ্বারা যুক্ত। একটা দিন আহমদ মুসারা ফেটেরা শহরে অবস্থান করে হারতা সম্পর্কে মোটামুটি জেনে নিয়ে ভোরের বাসে হারতা আসে। হোটেলে উঠে একটা দিন হারতা শহর ও এই দ্বীপ সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে তারা কাটায়। পরদিন সকালে এসে তারা প্রবেশ করেছে গনজালো রোডে।

সকাল ছ'টায় গনজালো রোডে নেমে পায়ে হেঁটে রোডের দুপাশটায় চোখ বুলিয়ে নিয়েছে। গনজালো ১১ নং বাড়িটাও তারা দেখেছে। খুবই সাধারণ দুতলা বাড়িটায় দারিদ্রের ছাপ স্পষ্ট।

রেষ্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে ফুটপাত ধরে আহমদ মুসারা পায়চারী করার মত হেঁটে ১১ নং বাড়িটার দিকেই এগুচ্ছিল।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক দুজনের মুখেই ছোট করে ছাঁটা মুখভরা দাড়ি। পরণে ট্যুরিষ্টের পোশাক। চুলে সোনালী রং করা। দাড়িও সোনালী। মুখেও

আছে হাল্কা মেকআপ। তাদেরকে এশীয় বলে চেনার কোন উপায় নেই। মনে হবে ইউরোপের কোন দেশ থেকে আজোরস সফরে এসেছে।

ফুটপাত ধরে তারা হাঁটছিল।

দুজন পাশাপাশি কথা বলতে বলতে হাঁটছিল। একজন প্রৌঢ়া তাদের সামনে পড়ে গেল। থমকে দাঁড়িয়েছিল প্রৌঢ়া।

আহমদ মুসারা গল্পের তালেই দুজন দুদিকে সরে গিয়ে প্রৌঢ়াকে পাশ কাটিয়ে সামনে এগুলো।

প্রৌঢ়া কিন্তু দাঁড়িয়েই রইল। ভাবছিল সে। সে হঠাৎ পেছন ফিরে আহমদ মুসাদের দিকে দৌড় দিল।

পেছন থেকে পর্তুগীজ ভাষায় 'হ্যাল্লো' আহবান করল। আহমদ মুসা ও হাসান তারিক দুজনেই এক সাথে পেছন ফিরল। দেখল যাকে পাশ কাটিয়ে এসেছে সেই প্রৌঢ়া।

এবার প্রৌঢ়া মহিলাটির দিকে ভালো করে তাকাল আহমদ মুসা। প্রৌঢ়া এ মহিলাকে কোথাও দেখেছে বলে মনে হলো আহমদ মুসার। দ্রুত মনে করার চেষ্টা করতে লাগল। প্রৌঢ়া মহিলাটি ততক্ষণে সামনে এসে পৌছেছে। বলল প্রৌঢ়া মহিলাট উচ্ছসিত কণ্ঠে, 'তোমরা বাছা তারা না? আমি ঠিক চিনতে পেরেছি। 'ফেটেরা' থেকে আসার পথে বাসে আমাকে ও আমার মেয়েকে বসতে দিয়ে সারাটা পথ তোমরা দাঁড়িয়েছিলে। তা তোমরা বাছা এখানে কোথায়?'

আহমদ মুসা ও হাসান তারিকও প্রৌঢ়া মহিলাকে চিনতে পেরেছে। ঠিক, ফেটেরা থেকে আসার পথে বাসে এই মহিলার সাথে তাদের দেখা হয়েছিল। এই মহিলা ও তার সাথের একটি মেয়েকে তাদের জায়গা ছেড়ে দিয়ে সারা পথ তারা দাঁড়িয়ে এসেছে।

সেদিন ভোরে যাত্রী ছিল প্রচুর। বাসের সব টিকিট আগেই বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। ওই প্রৌঢ়া মহিলা ও তার সাথের মেয়ে এসে টিকিট পায়নি কিন্তু তাদের আসতেই হবে হারতায় সকালে। নাছোড়বান্দা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবার শর্তে তারা বাসে ওঠে। আহমদ মুসা ও হাসান তারিক নিজেদের জায়গায় প্রৌঢ়া মহিলা ও তার সাথের মেয়েকে বসিয়ে নিজেরা দাঁড়িয়ে আসে। মহিলারা বসতে কিছুতেই

রাজী হয়নি। কিন্তু যখন আহমদ মুসারা বলে যে, মায়ের মত গুরুজনকে দাঁড় করিয়ে রেখে তারা বসে থাকতে পারবে না, তারাও তাদের সাথে দাঁড়িয়ে থাকবে, তখন প্রৌঢ়া ও তার মেয়ে সিটে বসে। বসতে বসতে মহিলাটি বলে, ঈশ্বর তোমাদের ভাল করুন বাছা, সত্যিই আমার ছেলের কাজ করেছ।'

প্রৌঢ়ার কথার উত্তরে আহমদ মুসা বলল, 'স্যরি বুড়িমা, প্রথমে চিনতে পারিনি। এখন ঠিক চিনতে পারছি। ভাল আছেন আপনি?'

'ভাল আছি বাছা। তবে আমাকে মা বলো না। মা ডাক শুনলে আমার ছেলের কথা মনে পড়বে। কান্না পাবে। তার চেয়ে 'আন্টি' বলো।'

প্রৌঢ়া একটু থামল। থেমেই আবার বলে উঠল, 'তোমরা কোথায় যাচ্ছ? কোথায় উঠেছ? ও বুঝতে পেরেছি মেইন ল্যান্ড থেকে তোমরা বেড়াতে এসেছ।'

আহমদ মুসা ভাবছিল। প্রৌঢ়া মহিলা থামতেই বলে উঠল, 'হ্যাঁ আন্টি, আমরা বেড়াতে এসেছি। আশে-পাশে একটা বাসা খুঁজছি ভাড়া নেবার জন্যে।'

শুনেই প্রৌঢ়া মহিলাটি আহমদ মুসাদের দিকে চোখ তুলে পরিপূর্ণভাবে একবার তাকাল। তার চোখে-মুখে আকস্মিক ভাবনার একটা ছায়া। মুহূর্তেই চোখ আবার নামিয়ে নিল সে। 'আমার বাসায় কি তোমরা উঠবে বাছা? পছন্দ হবে কি? আমরা দুতলায় থাকি। নিচ তলাটা খালিই থাকে। মাঝে মাঝে অবশ্য মেহমান আসে। কিন্তু নিচে চারটি শোবার ঘর আছে। তোমরা দুটোয় থাকলেও দুটো খালি থাকবে।'

'কোন অসুবিধা নেই। আপনার কাছে দুটো ঘর ভাড়া পেলে আমরা খুবই খুশি হবো আন্টি।' আহমদ মুসা বলল।

'সত্যিই তোমরা ভাড়া নেবে? অন্য আর কোন অসুবিধা নেই। ঐ একটু মেহমানের জ্বালাতন। তোমরা উঠলে সে জ্বালাতন কমাবারও একটা পথ হবে। আমি খুব খুশি হবো বাছা তোমরা এলে।' বলল প্রৌঢ়া মহিলা।

একটু থামল। আবার বলে উঠল প্রৌঢ়া, 'তাহলে বাছা কেনা-কাটায় এখন যাচ্ছি না। চল তোমরা বাড়িটা দেখবে। এস।'

বলে প্রৌঢ়া ফিরে দাঁড়িয়ে হাঁটা শুরু করল।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক পাশাপাশি হেঁটে মহিলাটির পেছনে চলছিল।

প্রৌঢ়া মহিলাটি এসে নক করল এগার নম্বর বাড়িতে।

'এটা আপনার বাড়ি আন্টি?' প্রবল আনন্দ ও বিস্ময় চেপে জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

হাসান তারিকের চোখে-মুখেও উপচে পড়া আনন্দ।

'হ্যাঁ, আমার বাড়ি। কেমন মনে হচ্ছে বাছা?' পেছন ফিরে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল প্রৌঢ়া মহিলা।

'আন্টির বাড়ি কি কখনও খারাপ হতে পারে?' মুখে হাসি টেনে বলল আহমদ মুসা। কিন্তু মনে মনে বলল, 'আল্লাহর অসীম রহমত যে, তিনি তাদেরকে এই বাড়িতে ঢোকার সুযোগ করে দিয়েছেন। এই বাড়িটার লক্ষ্যেই তো তারা তেরসিয়েরা দ্বীপ থেকে এখানে ছুটে এসেছে।

দরজা খুলে গেল।

দরজায় দেখা গেল প্যান্ট-সার্ট পরা একজন সুন্দরী তরুণীকে। তরুণীটি দরজা খুলে মাকে দেখেই কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু একটু পেছনে দাঁড়ানো আহমদ মুসাদের উপর নজর পড়তেই থেমে গেল তরুণীটি। দরজার সামনে থেকে সরে গিয়ে বলল, 'এস মা।'

প্রৌঢ়া পেছন ফিরে আহমদ মুসাদের দিকে তাকিয়ে 'এস বাছা' বলে ভেতরে প্রবেশ করল।

আহমদ মুসারাও প্রবেশ করল।

মেয়েটি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে 'গুড মর্নিং' বলে স্বাগত জানাল আহমদ মুসাদের।

ভেতরে ঢুকেই ঘুরে দাঁড়াল এবং মেয়েটিকে দেখিয়ে আহমদ মুসাদের লক্ষ্য করে বলল, 'চিনতে পারছ? আমার মেয়ে 'পলা জোনস।' তারপর মেয়েকে বলল, 'চিনতে পারছিস পলা? ফেটেরার বাসে দেখেছিলি। মনে পড়ছে?'

মেয়েটি হাসল। বলল, 'এখন পুরোপুরি মনে পড়ছে মা।' বলে মেয়েটি আহমদ মুসাদের লক্ষ্য করে সহাস্যে সপ্রতিভ কণ্ঠে বলল, 'ওয়েলকাম, আসুন।'

আহমদ মুসাদের নিয়ে একটু সামনে এগিয়ে সোফা দেখিয়ে দিল বসার জন্যে।

‘ধন্যবাদ’ বলে আহমদ মুসারা বসল।

প্রৌঢ়া আহমদ মুসাদের দিকে দুধাপ এগিয়ে এসে বলল, ‘বাছা তোমরা একটু বস। আমি পলাকে নিয়ে গিয়ে কয়েকটা কাজ বুঝিয়ে দিয়ে একটু বেরুব।’

বলে প্রৌঢ়া দুতলার ওঠার সিঁড়ির পাশ দিয়ে আরেকটা ঘরের দরজার দিকে এগুলো।

মেয়েটি আহমদ মুসাদের লক্ষ্য করে বলল, ‘আপনাদের নাস্তা হয়নি নিশ্চয়?’

‘ধন্যবাদ। নাস্তা করেছি।’ সৌজন্যমূলক একটু হেসে বলল আহমদ মুসা।

‘একটু বসুন’ বলে দুতলায় ওঠার সিঁড়ির দিকে এগুলো। তার মা যে ঘরে গেছে সেদিকে তাকিয়ে একটু কণ্ঠটা বাড়িয়ে বলল, ‘একটু বসুন। আমি এক্ষণি আসছি।’

বলে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে দুতলায় উঠে গেল।

মিনিট দুই পরেই দুহাতে ট্রে ধরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল।

ট্রেতে বিয়ারের দুটি ক্যান। দুটি গ্লাস। একটা পানির বোতল। একটা বাটিতে কিছু বরফ। চিপসের একটা ঠোঙা।

মেয়েটা ট্রে এনে আহমদ মুসাদের সামনে টেবিলে রেখে হেসে বলল, ‘শুধু শুধু বসে থাকার চেয়ে কিছু একটা নিয়ে ব্যস্ত থাকুন। আমি মার সাথে কথা বলে আসি।’

বলেই পলা জোনস ধন্যবাদ দেবার মত সময়টুকু না দিয়েই ছুটল তার মায়ের কাছে।

পলা জোনস চলে যাবার পর আহমদ মুসা বলল, ‘মেয়েটি খুব বুদ্ধিমতী, ভদ্র ও দিলখোলা। কিন্তু তার চোখে-মুখে একটা অস্বস্তির ছায়া আছে।’

কথাগুলো অনেকটা স্বগোতক্তির মত বলেই আহমদ মুসা তার ব্যাগটা টেনে নিয়ে হাসান তারিক ও তার মাঝে রাখল। দ্রুত হাতে খুলে ফেলল ব্যাগের চেন। বের করল রিমোট সাউন্ড মনিটরিং যন্ত্রটা। যন্ত্রটা অন করে দিয়ে স্পিকারের ভলিয়ম কমিয়ে দিল।

‘ওদের ব্যক্তিগত পারিবারিক কথা জানা আমাদের ঠিক হবে ভাইয়া?’ হাসান তারিক বলল।

'তা নিশ্চয় ঠিক নয়। কিন্তু হাসান তারিক, দশটা ব্যক্তিগত পারিবারিক কথার মধ্যে একটি কথাও WFA (ওয়ার্ল্ড ফ্রিডোম আর্মি) সম্পর্কে যদি থাকে সেটা আমাদের জন্যে মূল্যবান। এই মুহূর্তে আমাদের জানা দরকার চিঠিতে আমরা যেটা পড়েছি, সেটা ঠিক কিনা? WFA -এর লোকরা এখানে আছে কিনা, আসে কিনা?'

'ঠিক ভাইয়া।' হাসান তারিক বলল।

আহমদ মুসা আর কথা বাড়াল না। মনিটরের স্পিকার কথা বলতে শুরু করেছে ফিসফিস কণ্ঠে।

শোনা যাচ্ছিল প্রৌঢ়ার কণ্ঠ। বলছিল, 'বাছারা খুব ভালো। ওরা বাসা খুঁজছিল। আমি নিয়ে এলাম। নিচের তলাটা ওদের দিয়ে দেব।'

'বুঝেছি মা তুমি কি চাও। কিন্তু ওদের সাথে সংঘাতে যাওয়া কি ভালো হবে?' বলল মেয়েটি মানে পলা জোনস।

'সংঘাতে কেন? আমরা চলতে পারছি না। তোমার চাকরীর ব্যবস্থা এখনও হয়নি। বাসা আমাদের ভাড়া দেয়া প্রয়োজন।' বলল প্রৌঢ়া।

'কিন্তু ওরা এমনভাবে জেঁকে বসেছে। মনে করছে ওদেরই বাড়ি এটা।' বলল মেয়েটি।

'তুমি ওদের প্রশ্রয় দিচ্ছ পলা। তার ফলেই ওরা আরও জেঁকে বসেছে। ওরা লোক ভাল নয়।' বলল প্রৌঢ়া।

'আমি ওদের প্রশ্রয় দিচ্ছি না মা। ওদের সব কিছু সহ্য করে যাচ্ছি। না করে উপায় কি। আমাদের আত্মরক্ষার শক্তি নেই। ওরা যখন ইচ্ছা, যা ইচ্ছা করতে পারে। কৌশল করেই না এখনও বেঁচে আছি।' বলল পলা জোনস।

'এই জন্যেই তো নিচতলা ভাড়া দিতে চাচ্ছি। এতে আমাদের একটা নিরাপত্তারও ব্যবস্থা হবে।' প্রৌঢ়া মহিলা বলল।

'নিরাপত্তা নয় মা, বরং ঐ নিরীহ দুজন মানুষকে বিপদে ফেলা হবে। ওদের আমি যতটুকু জানি, তুমি ততটুকু জান না। ওরা দিন-দুপুরে আমাদের সকলকে খুন করে চলে যেতে পারে। আমরা সত্যিই সংকটে আছি মা। ভাইয়া নিখোঁজ।

ওদের সাথে ঝগড়া করে বাঁচবো না। ভাইয়াকে আমরা ফিরে পেতে পারি তাদের মাধ্যমেই।' বলল পলা জোনস।

সংগে সংগে প্রৌঢ়া মহিলা, পলার মা কথা বললো না। একটু পর ধীরে ধীরে বলল, 'ধন্যবাদ পলা। তুমি যতটা ভেবেছ, আমি ততটা ভাবিনি। তারপরও আমার মন বলছে, একটা অবলম্বন আমাদের খুঁজে নেয়া দরকার। আমার মনে হচ্ছে ওদের দুজনকে যখন হাতের কাছে পেয়েছি, তখন এ সুযোগ আমাদের হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। আমাদের হারতার লোকরা শান্তি শান্তি করতে গিয়ে মেরুদন্ডহীন হয়ে গেছে। এদের কারও উপর ভরসা করা যাবে না। মেইনল্যান্ড ইউরোপের লোকরা এমন নয়।'

'তোমার যুক্তি আমি মানছি মা। ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করুন। তবে এদের ভাড়া দিয়েছ, একথা ওদের জানিও না। বলতে হবে, 'ফেটেরা'তে এদের সাথে পরিচয়। হারতায় এসেছে, কদিন থাকবে।' পলা জোনস বলল।

'ধন্যবাদ পলা। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। খাসা বুদ্ধি বের করেছ। কদিন চলুক। দেখা যাক কি হয়।' বলল পলার মা।

পলার মার কণ্ঠ থেমে যাবার পর আবার তা কথা বলে উঠল, 'তাহলে পলা, আমি কেনাকাটা সেরে আসি। তুমি বাছাদেরকে এ দিকের দুটো ঘর ঠিক করে দাও।'

'ঠিক আছে মা।' বলল পলা।

'আমার মনে হয় ছেলে দুটো ভালই হবে, কি বলিস। আমাদের আজোরসের কেউ এভাবে জেদ করে জায়গা ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো না।' পলার মা বলল।

'একটা পার্থক্য ইতিমধ্যে আমার কাছে ধরা পড়েছে মা। কোন সুন্দরী মেয়ে সামনে পেলে সবাই দুচোখ দিয়ে গোগ্রাসে গেলে। কিন্তু এরা এখনও আমার দিকে একবারও পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়নি।' বলল পলা জোনস।

'ঈশ্বর বাছাদের ভালো করুন।' পলার মা বলল।

নিরব হয়ে গেল মনিটরিং যন্ত্র।

‘ওরা তাহলে আসছে’ স্বগতভাবে কথাটা বলার সাথে সাথে দ্রুত যন্ত্রটা আহমদ মুসা ব্যাগে পুরল।

ড্রইংরুমে ঢুকেই পলার মা আহমদ মুসাদের লক্ষ্য করে বলল, ‘বাছারা, তোমরা বস। পলা তোমাদের ঘর ঠিক-ঠাক করে দেবে। আমি একটু আসি।’

‘আন্টি, আপনাদের অসুবিধা করছি না তো? আমরা চেষ্টা করলে অন্যত্রও বাসা ঠিক করে নিতে পারব।’ বলল আহমদ মুসা।

‘না বাছা, আমাদের কোন অসুবিধা নেই। ভাবছি, তোমাদের অসুবিধা হবে কিনা। মাঝে মাঝেই নানারকম মেহমান আসে। থাকেও তারা দুচারদিন। অবশ্য নিচে ঘর আছে চারটা। দুটো ঘর মেহমানদের জন্য থাকবে। অসুবিধা হবার কথা নয়।’ বলল পলার মা।

‘এতে আমাদের কোন অসুবিধা নেই আন্টি। আপনাদের মেহমান মানে আমাদেরও মেহমান। আমাদের জন্যে তাদের কোন অসুবিধা হবে না।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ধন্যবাদ বাছা। আমি জানি তোমরা খুব ভালো ছেলে।’

বলে পলার মা বেরিয়ে গেল।

পলার মা বেরিয়ে যাবার পর পলা জোনস বলল, ‘আপনারা একটু বসুন। আমি ঘর দুটো ঠিক করে দিয়ে আসছি।’

বলে পলা দৌড়ে ঘরের দিকে চলে গেল।

দশ মিনিট পরে ফিরে এলো পলা। বলল, ‘আসুন, ঘর দুটো আপনাদের বুঝিয়ে দেই।’

আহমদ মুসারা চলল পলার সাথে। ড্রইং রুম থেকে দুতলায় ওঠার সিঁড়ির পাশ দিয়ে একটা করিডোর বাড়ির দক্ষিণের শেষ দেয়াল পর্যন্ত গেছে। এই করিডোরের দুপাশে দুটি ঘর। দরজা মুখোমুখি।

দুটোই সাধারণভাবে সুসজ্জিত ঘর। শোবার খাট, লেখার টেবিল, পোশাকের জন্যে ওয়াল ক্যাবিনেট, মিনি ফ্রিজার প্রভৃতি সাধারণভাবে প্রয়োজনীয় সবই রয়েছে। তবে একটি ঘরের দক্ষিণ ওয়ালে একটা বাড়তি দরজা রয়েছে। পলা জানাল ওটা একটা ইমারজেন্সী দরজা। নিচের তলা থেকে জরুরী অবস্থায় বের

হবার এটা একটা বিকল্প দরজা। দরজা দিয়ে বেরিয়ে একটা সংকীর্ণ পথ দিয়ে উত্তরের রাস্তায় বের হওয়া যায়।'

'মেহমানরা এলে কোথায় থাকে সাধারণত।' বলল আহমদ মুসা।

'ড্রইংরুমের পূর্ব পাশে দুটো ঘর আছে। ঘর দুটো আরও প্রশস্ত। রাস্তার দিকে জানালা আছে। মেহমানরা ও ঘর দুটোই ব্যবহার করে এ জন্যেই এ ঘর দুটো আপনাদের দেয়া হলো।'

আহমদ মুসা বিকল্প দরজাওয়ালা ঘরটাই বেছে নিল।

যাওয়ার আগে পলা বলল আহমদ মুসাদের লক্ষ্য করে, 'আম্মা বলেননি, কিন্তু একটা কথা আপনাদের বলি, যাদের আমরা মেহমান বলছি, তারা আমাদের আত্মীয় নন। আমার ভাইয়া সূত্রে ওরা আসেন। আমার ভাইয়াকে ওরা একটা ভালো চাকুরী দিয়েছেন।'

'আপনার ভাইয়া কোথায়?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা। সৌজন্যের খাতিরেই এটা জিজ্ঞাসা করা।

চোখ-মুখ ম্লান হয়ে উঠল পলা জোনসের। বলল, 'উনি চাকুরী নিয়ে ৪ মাস আগে লিসবনে গেছেন।'

'বেশি তো দূরে নয়, কাছেই।' বলল আহমদ মুসা।

'তবু মনে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি দূর।' পলা জোনস বলল।

'কেন?' বলল আহমদ মুসা।

'ভাইয়া নিয়মিত টেলিফোনে কথা বলত। ধীরে ধীরে তার টেলিফোনে কথা বলা কমে যাচ্ছে। তার কথাবার্তায় ভয় ও রাখ-ঢাকের ব্যাপার ক্রমেই স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। আম্মা একটা জরুরী চিঠি পাঠিয়েছেন। তার উত্তর পাওয়া যায়নি। আজ ৭ দিন কোন টেলিফোনও তার আসেনি।'

আহমদ মুসার দেহ-মনে যন্ত্রণার একটা স্রোত বয়ে গেল। তার ভাইয়াকে যে চাকুরী দেয়া হয়েছিল সেটা যে চাকুরী নয়, এক সন্ত্রাসী কাজ এবং সে কাজ করতে গিয়েই সে নিহত হয়েছে, একথা জানতে পারলে এ অসহায় পরিবারটির কি অবস্থা দাঁড়াবে! আর এ নিহত হওয়ার ঘটনা যে আহমদ মুসাদের হাতে হয়েছে এটাও আহমদ মুসাদের জন্যে খুবই বিব্রতকর ও বেদনাদায়ক। হঠাৎ আহমদ মুসার

মনে হলো, তারা যে এ পরিবারের সাথে এভাবে জড়িয়ে পড়ল, এর পেছনে নিশ্চয় আল্লাহর কোন ইচ্ছা আছে। এ পরিবারের একটা দায় কি আল্লাহ এভাবে তাদের উপর তুলে দিলেন? চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ায় উত্তর দিতে দেরি হয়ে গেল আহমদ মুসার।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস নামল পলা জোন্সের বুক থেকে। বলল, 'আমাদের দুঃখের কথা আপনাদের জানানোর প্রয়োজন ছিল না। তবু বললাম এ কারণে যে, অনেক কথাই হয়তো আপনারা জানতে পারবেন।'

'মিস পলা জোন্স, প্রয়োজনটা কার বেশি, সেটা না আমরা জানি আর না আপনি জানেন। আমি বলব প্রয়োজনেই আপনি বলেছেন।' বলল আহমদ মুসা।

ম্লান হাসল পলা জোন্স। বলল, 'দার্শনিকের মত কথা বললেন। তবু যা হোক সান্তনা পেলাম। ধন্যবাদ।'

'দর্শনই হলো অন্তর্নিহিত বাস্তবতা। আমরা আজ এখানে এসে উঠব, তা আপনারা বা আমরা কেউ ভাবিনি। এই অভাবনীয় বিষয়ের একটা দার্শনিক বাস্তবতা নিশ্চয় আছে।' আহমদ মুসা বলল।

পলা জোন্স মুখ তুলে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বলল, 'দর্শনের কথাটা আমি 'ফান' করে বলেছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি আপনি সত্যিই দার্শনিক।'

বলে একটু থামল পলা জোন্স। বলল আবার, 'আপনারা এখানে ওঠার অভাবনীয় ঘটনার মধ্যে কোন দার্শনিক তাৎপর্য আছে বলে মনে করেন?'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'জগতে দৃশ্যমান যা ঘটে, অদৃশ্যমানের সংখ্যা তার চেয়ে হাজারগুণ বেশি। সুতরাং দৃশ্যমান ঘটনার পেছনে অদৃশ্যমান কার্যকরণ থাকবে, এটা একটা বিশ্বাস।'

পলা জোন্সের চোখ-মুখের বিস্ময়টা আরও বাড়ল। তার বিস্ময় দৃষ্টি আবার নিবদ্ধ হলো আহমদ মুসার উপর। সেই সাথে তার চোখে জিজ্ঞাসাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ধীরে ধীরে সে বলল, 'আপনাদের পরিচয় কিন্তু জানা হয়নি। যারা ট্যুরে যান তারা ট্যুরিষ্ট। কিন্তু ট্যুরিষ্টদের একটা পেশা ও পরিচয় থাকে, আপনাদের সেই পরিচয় আমরা জানি না। তবে আমি নিশ্চিত, আমরা চারদিকে যাদের দেখি, যারা

এখানে আসেন, তাদের থেকে আপনারা আলাদা। দেখলাম, আপনারা বিয়ার খাননি।'

এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল আহমদ মুসার ঠোঁটে। বলল, 'আমরা দু'জনেই সুনির্দিষ্ট কোন পেশার সাথে জড়িত নই। সুতরাং সে ধরনের কোন পরিচয় আমাদের নেই। এদিক থেকে হয়তো কিছু আলাদা আমরা অন্যদের থেকে।'

'পেশা নয়, মন-মানসিকতায় পার্থক্যের কথা আমি বলেছি।' বলেই হেসে উঠল পলা জোন্স। বলল আবার, 'অনেক কথা বলেছি। যাই, প্রয়োজন হলে ডাকবেন। যে কোন সময় দু'তলায় আসতে পারেন। পলা বলবেন, মিস বলার প্রয়োজন নেই। অন্তত বয়সে ছোট হিসেবে এ দাবী আমি করতে পারি।'

একথা বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল পলা জোন্স।

রিডিং টেবিলের সাথে একটা মাত্র চেয়ার। আহমদ মুসা চেয়ারটাতে গিয়ে বসল।

হাসান তারিক গিয়ে বসল খাটে। বসেই বলল, 'এখন কি ভাবছেন ভাইয়া?'

'মেয়েটা খুব বুদ্ধিমতী, ভালই হলো।' আহমদ মুসা বলল।

'হ্যাঁ, এপর্যন্ত সবকিছু ভালই যাচ্ছে। কিন্তু আসল পক্ষ তো সিনে এখনও আসেনি।' বলল হাসান তারিক।

'দোয়া করো, সিনে তারা যত তাড়াতাড়ি আসে ততই মঙ্গল। আসল কাজে কিন্তু আমরা এখনও এক ইঞ্চিও এগুতে পারিনি।'

'আলহামদুলিল্লাহ। আমরা প্রথম বারের মত WFA-এর লোকদের সবচেয়ে নিকটে পৌছতে যাচ্ছি।'

'আলহামদুলিল্লাহ, প্রতিপদেই আল্লাহ আমাদের সাহায্য করছেন।'

'আমার ভয় হচ্ছে, আজর ওয়াইজম্যান সাও তোরাহ থেকে সবাইকে নিয়ে ভাগবে না তো?' বলল হাসান তারিক।

'হ্যাঁ, তোমার কথায় যুক্তি আছে। আজর ওয়াইজম্যান আহত এবং তেরসিয়েরা দ্বীপে তার সর্বাত্মক অভিযান চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু সাও তোরাহ দ্বীপ তেরসিয়েরা দ্বীপ থেকে অনেক দূরে। আরও একটা ব্যাপারে তারা আশ্বস্ত আছে যে, তেরসিয়েরা দ্বীপে তারা আমাদেরকে ধরতে না পারলেও এবং

তাদের অনেক ক্ষতি হলেও তারা আমাদেরকে আমাদের প্লানমত অগ্রসর হতে দেয়নি, আমাদের পরিকল্পিত অগ্রযাত্রাকে তারা ব্যর্থ করে দিয়েছে। এটা তাদের সাফল্য। অতএব সাও তোরাহ দ্বীপে আমরা আমাদের পরিকল্পনা মত পৌছে যেতে পারব, এটা নিশ্চয় আজর ওয়াইজম্যান মনে করছে না। সুতরাং সাও তোরাহ দ্বীপ থেকে তাদের সরার কোন প্রশ্ন নেই।' আহমদ মুসা বলল।

হঠাৎ খুশি হয়ে উঠল হাসান তারিক। বলল, 'আমাদের ভাগ্য যদি ভালো হয়, ওরা যদি এখানে আসে, তাহলে আজর ওয়াইজম্যানের গতিবিধি সম্পর্কে অবশ্যই কিছু জানা যাবে।'

'এখানে আমাদের আসার একটা বড় উদ্দেশ্য এটাই।' বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই বাইরের দরজায় নক হতে শুরু করল।

উচ্চ ও অসভ্য রকমের নক হচ্ছে দরজায়। কেউ যেন অস্থির হয়ে উঠেছে দরজা খোলার জন্যে।

পলা জোন্স দোতলা থেকে ছুটে নামছিল। সে দোতলার সিঁড়িমুখে পৌছতেই দেখল, আহমদ মুসা গিয়ে দরজা খুলে দিয়েছে। সে দোতলার সিঁড়ি মুখেই থমকে দাঁড়াল। দরজা তার নজরে পড়েছে। আহমদ মুসার পাশ দিয়ে তাকিয়ে দরজার ওপাশে দাঁড়ানো লোক দু'জনকে চিনতে পারল পলা। তাদের ঘাড়ে যারা চেপে বসে আছে সেই মেহমানরাই এসেছে। পলা জোন্স নিজেকে সিঁড়ির রেলিং-এর আড়ালে নেবার চেষ্টা করল।

আহমদ মুসা দরজা খুলতেই দরজার বাইরে দু'জনকে দাঁড়ানো দেখল। দু'জনেরই খালি হাত। লম্বা-চওড়া শক্ত-সামর্থ গায়ের গড়ন। চোখে সাপের মত ঠান্ডা দৃষ্টি এবং তাতে শেয়ালের মত ধূর্ততার ছাপ।

আহমদ মুসাকে দেখেই দু'জনের সামনের জন বিরক্তির সাথে বলে উঠল, 'কে হে তুমি? কোত্থেকে?'

বলে সে আহমদ মুসাকে পাশ কাটিয়ে ঢুকতে যাচ্ছিল।

আহমদ মুসা তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'কে আপনারা? কাকে চাই? কি প্রয়োজন বলুন?'

আহমদ মুসা ওদের নক করার ধরন এবং ওদের দেখেই বুঝতে পেরেছে ওরা কারা, তবু আহমদ মুসা যে প্রশ্নগুলো একান্তই না করলে নয় অপরিচিত লোকদের সে প্রশ্নগুলো করেছে।

লোকটি থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'তুমি কেন? বুড়ি অথবা পলাকে ডাক।'

'আপনি পলা জোন্স ও তার মাকে যেভাবে সম্বোধন করছেন, তাতে বুঝলাম যে, আপনারা এঁদের আত্মীয়। স্যরি। আপনারা আসুন। ওয়েলকাম।' হাসি মুখে বলল আহমদ মুসা।

'আত্মীয় নই, আত্মীয়ের চেয়ে বড়। কিন্তু তোমরা কে? এবার তোমাদের পরিচয় বল।' ভেতরে ঢুকে বলল লোকটি।

আহমদ মুসা ওদের দু'জনের সাথে ড্রইংরুমের দিকে এগুতে এগুতে বলল, 'মিস পলা জোন্সের মা মিসেস জোন্সের সাথে পূর্ব পরিচয় আছে। সেই পরিচয়েই এখানে উঠেছি।'

'বাড়ি কোথায়?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

মুহূর্তের জন্য দ্বিধা করল আহমদ মুসা। কিন্তু পরক্ষণেই বলে উঠল দ্বিধাহীন কণ্ঠে, 'ক্যাষ্টেলো ব্রাংকো।'

ক্যাষ্টেলো ব্রাংকো এই দ্বীপেরই দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের একটা শহর। আহমদ মুসা শহরটাকে চোখে দেখেনি।

'কিন্তু তোমরা তো ওখানকার বাসিন্দা নও। তোমাদের চেহারাতো তা বলেনা।' বলল লোকটি।

'চেহারা কি বলে?' হেসে বলল আহমদ মুসা।

'আজোরীদের সাথে মেলে না।' বলল লোকটি।

'সেটা আজোরসের দুর্ভাগ্য। আজ আজোরসে আসল আজোরীদের চেয়ে নকল আজোরীদের সংখ্যা বেশি। নকলের সাথে আসল মিলবে না, এটাই স্বাভাবিক এবং এটা অন্যায় নয়।'

'থাক, থাক। এধরনের জটিল আলোচনা আমার ভাল লাগে না। ঠিক আছে আপনার আসল-নকল সবাই আজোরী। এখন বলুন, আপনারা ক'দিন থাকছেন?' বলল লোকটি।

‘এ প্রশ্নও আপনি করছেন? প্রশ্নটা মিসেস জোন্সের জন্যে রেখে দিলেই ভালো হয়।’ হেসে বলল আহমদ মুসা।

লোকটি মুখ ঘুরিয়ে আহমদ মুসার দিকে তাকাল। বলল, ‘দেখুন এ বাড়িতে আমার কথা ও মিসেস জোন্সের কথা আলাদা নয়।’

‘স্যরি, জানতাম না একথা। এর পর মনে থাকবে।’ মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য টেনে বলল আহমদ মুসা।

সোফার কাছে তারা সবাই পৌঁছে গেছে।

আহমদ মুসা ওদের দু’জনকে বসার আহবান জানিয়ে বলল, ‘আপনারা বসুন। আমি মিস পলা জোন্সকে ডাকছি। মিসেস জোন্স বাসায় নেই।’

‘থাক থাক। আমাকে মেহমান সাজানোর প্রয়োজন নেই। মিস জোন্স এখনি আসবেন। আর আমাদের ঘর আমরা চিনি। কারও দেখিয়ে দেয়ারও প্রয়োজন নেই। এ বাড়িতে আমরা মেহমান নই। মিস জোন্সদের বাড়ি আমাদেরই বাড়ি।’

‘স্যার, তাহলে তো আর কোন কথা নেই। আমরা আসি। বাই।’ বলে আহমদ মুসা ও হাসান তারিক হাঁটতে লাগলো তাদের ঘরের উদ্দেশ্যে।

সিঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে হাসছিল পলা জোন্স উড়ে এসে জুড়ে বসা মেহমানদের সাথে আহমদ মুসার কথা শুনে।

# ৬

সন্ধ্যা তখন ৭টা।

বেন্টো ও সসাদের ট্যাক্সি আহমদ মুসাদের অতিক্রম করতেই আহমদ মুসা ও হাসান তারিক তাদের ভাড়া করা ট্যাক্সিতে উঠে বলল, 'ড্রাইভার ঐ ট্যাক্সিটার সাথে চলো। বেন্টো ও সসা মিস পলা জোন্সদের বাড়িতে আসা সেই দুজন লোক। পলা জোন্সের কাছ থেকে এ দুজনের নাম জেনে নিয়েছে আহমদ মুসারা। আলট্রা সেনসেটিভ সাউন্ড মনিটরিং দিয়ে আড়ি পেতে জেনেছে ওদের পরিকল্পনার কথা। তারা এখন যাচ্ছে জনৈক এমানুয়েলের কাছে। কোথায় কি যেন পরিবর্তন ঘটেছে, সেটা এমানুয়েল তাদের জানাবে এবং করণীয় সম্পর্কে নির্দেশ দেবে। এটা জানার পরই আহমদ মুসা ও হাসান তারিক তার পিছু নিয়েছে। পরিবর্তনের কথায় চিন্তিত হয়ে পড়েছে আহমদ মুসারা। বড় ধরনের কোন পরিবর্তন ঘটছে না তো? তারা সাও তোরাহ থেকে সরে যায়নি তো? এই উদ্বেগের কারণে বেন্টো ও সসাকে অনুসরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের অবশ্যই জানতে হবে পরিবর্তনের ব্যাপারটা।

এপথ ওপথ ঘুরে বেন্টোদের গাড়ি কোষ্টাল হাইওয়েতে উঠে ছুটতে লাগল উত্তর দিকে। শহরের প্রান্তে পৌছে গেল গাড়ি।

তবু বেন্টো ও সসাদের গাড়ি একই গতিতে এগিয়ে চলছে।

'ওরা কি টের পেয়েছে যে আমরা ওদের অনুসরণ করছি? না, এমানুয়েল লোকটা শহরের বাইরেই থাকে।' স্বগত কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

'ভাইয়া, রাস্তায় প্রচুর গাড়ি। আমার মনে হয় না তারা আমাদের সন্দেহ করতে পেরেছে।' হাসান তারিক বলল ধীর কণ্ঠে।

শহরের বাইরে চলে এসেছে গাড়ি। রাস্তার দুধারে ঘর-বাড়ি, দোকান-পাটের বদলে এখন ঝোপ-জংগল আর গাছ দেখা যাচ্ছে। ক্রমেই ঘন হয়ে উঠছে দুপাশের বনরেখা।

প্রায় ২শ গজ পেছন থেকে আহমদ মুসারা অনুসরণ করছে বেন্টোদের গাড়িটাকে। হঠাৎ বেন্টোদের গাড়িটা ডান দিকে বাঁক নিয়ে জংগলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নিশ্চয় ডানদিকে যাবার ওখানে রাস্তা আছে। কিন্তু সাগর তো পাশেই। রাস্তাটা কোথায় যাবে! আহমদ মুসার এ ভাবনা শেষ হবার আগেই গাড়িটা বাঁক নেবার জায়গায় আহমদ মুসারা পৌছে গেল।

আহমদ মুসার নির্দেশে গাড়ি থেমে গিয়েছিল। দেখা গেল কোষ্টাল হাইওয়ে থেকে পাথর বিছানো একটা কাঁচা রাস্তা পুব দিকে চলে গেছে। রাস্তার মুখেই একটা সাইনবোর্ড টাঙানো। তাতে লেখা, 'প্রাইভেট রোড। পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে প্রবেশ নিষিদ্ধ।'

'স্যার এখানে লাল সাহেবের বাড়ি এবং তার অফিস। এই প্রাইভেট রাস্তা দিয়ে শ'দুয়েক গজ এগুলেই তার বাড়ি। এখানে এক টুকরো ভূখন্ড সাগরের মধ্যে ঢুকে গিয়ে দ্বীপের আকার নিয়েছে। কোষ্টাল হাইওয়ে থেকে দ্বীপ পর্যন্ত জায়গাটা লাল সাহেবের ব্যক্তিগত।' বলল ড্রাইভার।

'লাল সাহেব কে, কি করেন?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা ড্রাইভারের কথা শেষ হবার সাথে সাথেই।

'স্যার, লাল সাহেব 'একবিশ্ব একদেশ একজাতি' নামক একটা এনজিও-র মালিক। তিনি হারতায় থাকেন না। মাঝে মাঝে আসেন। আসলে এ বাড়িতেই ওঠেন।' ড্রাইভার বলল।

'তিনি কোথায় থাকেন?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'তা জানি না।' বলল ড্রাইভার,

'আগের গাড়িটা তো তাহলে লাল সাহেবের বাড়িতেই গেছে। না এদিকে আর কোন বাড়ি আছে ড্রাইভার?' আহমদ মুসা বলল।

'স্যার এই প্রাইভেট রোড লাল সাহেবের। এই রোডে আর কোন বাড়ি নেই।' বলল ড্রাইভার।

'তাহলে গাড়ি ঘুরাও ড্রাইভার। চল লাল সাহেবের বাড়ি।' বলল আহমদ মুসা।

‘স্যরি স্যার। অনুমতি ছাড়া প্রাইভেট রোডে গাড়ি ঢুকানো ঠিক হবে না। তার উপর লাল সাহেবের লোকজন ভাল নয় স্যার।’ ড্রাইভার বলল।

‘ভাল নয় বলছ কেন?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘স্যার একবার ভাড়া নিয়ে ঐ বাড়িতে গিয়েছিলাম। এক ঘন্টা বসিয়ে রেখে ভাড়া দিয়েছিল অর্ধেক। প্রতিবাদ করলে বাড়ির অন্যান্য লোকজন এসে আমাকে গাল মন্দ কর এবং আমার গাড়ির পাম্প ছেড়ে দেয়।’ বলল ড্রাইভার।

‘লাল সাহেবের বাড়ি কেমন, কত বড়?’ আহমদ মুসা বলল।

‘তিন তলা বাড়ি। নিচের তলায় অফিস। বাড়ির তিন দিকে রোপন করা গাছের বাগান। বাড়ির সামনে ফুল গাছের বাগান। ফুল বাগানের মাঝখান দিয়ে রাস্তা উঠে গেছে গাড়ি বারান্দায়।’ বলল ড্রাইভার।

‘ধন্যবাদ। তাহলে তুমি এখন কি করবে ড্রাইভার?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘যা বলবেন স্যার। আপনারা এখানে অপেক্ষা করতে বললে অপেক্ষা করব। চলে যেতে বললে চলে যাব।’ বলল ড্রাইভার।

‘ঠিক আছে তুমি গাড়ি একটু আড়ালে নিয়ে অপেক্ষা কর।’ আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসা গাড়ি থেকে নামল।

হাসান তারিকও।

তারা হাঁটা শুরু করল পাথর বিছানো পথ দিয়ে।

ড্রাইভার দক্ষিণ দিকে সরে গেল তার গাড়ি নিয়ে।

মাত্র দুটি গাড়ি পাশাপাশি যাওয়ার সরু পথ। দুপাশে ঘন বন।

পাশাপাশি হাঁটছে আহমদ মুসা ও হাসান তারিক।

দুমিনিট চলার পর রাস্তার একটা বাঁক ঘুরতেই তারা দেখল সামনে চলার পথ বন্ধ। রাস্তার আড়াআড়ি ৩ ফুট উঁচুতে ষ্টিলের পাইপ দিয়ে রাস্তা বন্ধ করা।

আহমদ মুসারা পাইপের কাছে পৌছতেই পাইপের দক্ষিণ দিকের প্রান্ত থেকে দুজন লোক এগুতে লাগল আহমদ মুসাদের দিকে।

পায়ের শব্দ পেয়ে তাকাল আহমদ মুসা সেদিকে। দেখল লোক দুজনকে। তাদের দুজনের ঘাড়েই ষ্টেনগান ঝুলানো। একজনের হাতে মোবাইল। আরও দেখল, গার্ড রুম, জংগলের সাথে মিশে আছে।

লোক দুজন এসেই চ্যালেঞ্জ করল, 'কে তোমরা?'

নিরীহ কণ্ঠে আহমদ মুসা বলল, 'আমরা হারতার লোক। লাল সাহেবের কাছে এসেছি।'

লোক দুজন জোৎসণার বিপরীতে দাঁড়ানো ছিল। ওদের মুখের ভাব দেখা গেল না। কিছুক্ষণ কথা বলল না তারা। একটু পরেই কর্কশ কণ্ঠে একজন বলে উঠল, 'মতলববাজ, জোচ্চোর, এখনি পালাও এখান থেকে। না হলে গুলী করব।'

বলে লোকটি সত্যি সত্যিই তার কাঁধ থেকে ষ্টেনগান নামিয়ে নিতে যাচ্ছিল।

আহমদ মুসা বুঝে ফেলল, কথায় আর কাজ হবে না। সংগে সংগেই পকেট থেকে তার ডান হাত রিভলবার সমেত বেরিয়ে এল।

রিভলবারটি ওদের দুজনের দিকে তাক করে বলল, 'হাত তুলে দাঁড়াও, না হলে দুজনের মাথা এখনি গুঁড়ো হয়ে যাবে।'

লোক দুজন প্রথমে দ্বিধা করল। কিন্তু পরক্ষণেই দুজনের হাত উপরে উঠে গেল।

ওদের দুজনের হাত উপরে উঠতেই হাসান তারিক এগিয়ে গিয়ে মোবাইল ও দুটি ষ্টেনগান ওদের কাছ থেকে নিয়ে নিল। ওদের পকেট হাতড়িয়ে আর কোন অস্ত্র পেল না।

আহমদ মুসা হাসান তারিককে লক্ষ্য করে বলল, 'ধন্যবাদ। তুমি ওদের দুজনকে এবার ঘুম পাড়িয়ে দাও।'

সংগে সংগে হাসান তারিক ষ্টেনগান দুটো কাঁধে ফেলে এবং মোবাইলটি পকেটে রেখে পকেট থেকে ক্লোরোফরম স্প্রেয়ার বের করল। স্প্রেয়ারের মুখের ক্যাপ খুলে দুজনের নাকেই স্প্রে করল একে একে।

মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই লোক দুজন সংজ্ঞা হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক ওদেরকে টেনে গার্ডরুমে নিয়ে এল। তারা ওদের গার্ড-ইউনিফরম খুলে পরে নিল এবং নিজেদের কাপড়গুলো রাস্তার পাশে একটা ঝোপে লুকিয়ে রাখল।

তারপর দুজন দুটি ষ্টেনগান কাঁধে ফেলে পাশাপাশি হেঁটে এগুলো বাড়ির দিকে। ওখান থেকেই জোৎসণার আলোতে বাড়ির সামনের বাগানটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ফুলের বাগানে বেশ কিছু বড় বড় ফুলের গাছও আছে। তাই বাড়িটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না।

গাড়ি বারান্দার আলো ছাড়া বাড়ির আর কোন আলো দেখা যাচ্ছে না। জানালার ভারী পর্দার ফাঁক গলিয়ে কিছু আলোর রেশ চোখে পড়ছে মাত্র তবে বাড়ির তিনতলা ও নিচতলায় কোন আলো জ্বলছে না।

বাড়ির দুতলার দক্ষিণ দিকের জানালাগুলোতে আলো বেশি দেখা যাচ্ছে।

আহমদ মুসারা বাড়ির সামনের বাগানের পাশ কাটিয়ে বাড়ির দক্ষিণ দিকে গিয়ে পৌছল। বাড়ির নিচে দাঁড়িয়ে উপর দিকে তাকিয়ে দেখল, গাছ বেয়ে উঠে ডাল দিয়ে কষ্ট করে তিন তলার ছাদে পৌছা যায়। তারপর তিন তলা থেকে দুতলায় নেমে আসা যাবে।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক ডাল বেয়ে তিন তলার ছাদে নামল বটে, কিন্তু আহমদ মুসা নেমেই তিন তলার সিঁড়ির মুখে ঘরের ছায়ায় লুকিয়ে থাকা একজনের মুখ দেখতে পেল।

আহমদ মুসা নেমেছিল সিঁড়ি ঘরটির পুব পাশে, হাসান তারিক পশ্চিম পাশে। আর লোকটি বসেছিল সিঁড়ি ঘরের পুব পাশের অন্ধকারে।

আহমদ মুসা ডাল থেকে ছাদ লক্ষ্যে লাফ দিয়ে ছাদের প্রাচীর আঁকড়ে ধরেছিল। সেখান থেকে ছাদে নামার সময়ই লুকানো লোকটি ছুটে এসে পেছন থেকে আহমদ মুসার মাথায় পিস্তল চেপে ধরে।

আহমদ মুসার মাথায় পিস্তল ধরে রেখেই বলল, ‘নেমে এস। আচ্ছা তো তোমার সাহস! এই ভর সন্ধ্যায় তুমি চুরি করতে এসেছ।’

আহমদ মুসা আশ্বস্ত হলো যে, তাকে চোর ভাবা হয়েছে। অতএব হুট করে সে গুলী চালানোর প্রয়োজন বোধ করবে না।

আহমদ মুসা সুবোধ বালকের মত তার হুকুম তামিল করল। নেমে এল সে।

আহমদ মুসার মাথায় পিস্তল ধরে রেখেই বলল, ‘চল হাঁটতে থাক। নিচে নামতে হবে। কোন চালাকির চেষ্টা করো না। তুমি যদি অন্যকোন শত্রু না হও, তাহলে তোমার ভয় নেই। আমরা তোমাকে কিছুই করব না। শুধু পুলিশে দেব চুরির চেষ্টার দায়ে।’

আহমদ মুসা একটুও দেরি না করে হাঁটতে লাগল। তাদেরকে তো নিচে নামতেই হবে, তার সাথেই নামা যাক। যাওয়ার পথেই একটা পথ বেরিয়ে যাবে। তাছাড়া হাসান তারিক তো ওপাশে নেমেছে। এ ব্যাপারটা নিশ্চয় তারও চোখে পড়ে যাবে।

ছাদের দরজা দিয়ে আহমদ মুসা সিঁড়ি ঘরে প্রবেশ করেছে।

হঠাৎ ‘কক’ করে একটা শব্দ হলো এবং তার মাথা থেকে রিভলবারের নলটা সরে গেল।

আহমদ মুসা পেছন ফিরে তাকাল। দেখল, হাসান তারিকের বাম হাত লোকটার নাকে-মুখে একটা রুমাল চেপে ধরে তাকে পেঁচিয়ে ধরেছে এবং তার ডান হাত দিয়ে হাসান তারিক লোকটার রিভলবার কেড়ে নিয়েছে।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই লোকটি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক ধরাধরি করে লোকটাকে টেনে নিয়ে অন্ধকার সিঁড়ি ঘরের কোণায় রেখে দিল।

‘আলহামদুলিল্লাহ। হাসান তারিক, শুরুটা আমাদের ভালই হয়েছে। দুক্ষেত্রেই গোলাগুলী ছাড়াই আমরা কাজ সারতে পেরেছি। গোলাগুলী হলে ভেতরে ওরা সাবধান হয়ে যেতো। চল এবার আমরা তিন তলায় নামি।’ বলল আহমদ মুসা।

তিন তলায় নামল আহমদ মুসারা। তিন তলায় অনেকগুলো ঘর। সবগুলোই অন্ধকার এবং বন্ধ।

দুতলায় নামার সিঁড়ির মুখে গিয়ে দাঁড়াল তারা।

‘ভাইয়া আমরা সাউন্ড মনিটর ব্যবহার করতে পারি। বেন্টো ও সসা’দের অবস্থান এর দ্বারা চিহ্নিত করা যাবে। নিশ্চয় কোথাও তাদের কথা হচ্ছে।’ বলল হাসান তারিক।

‘ঠিক বলেছ, হাসান তারিক।’ বলে আহমদ মুসা কাঁধে ঝুলানো ছোট্ট ব্যাগ থেকে আলট্রা সেনসেটিভ সাউন্ড মনিটরিং যন্ত্র বের করল। লোভয়েসে যন্ত্রটি অন করে দিল আহমদ মুসা।

সংগে সংগেই কথা বলে উঠল যন্ত্রটি। প্রথম কণ্ঠটাই বেন্টোর। কিন্তু চারদিকে নানা শব্দ কথাকে অস্পষ্ট করে তুলছিল।

ডাইরেকশন ইন্ডিকেটর ঘুরিয়ে আহমদ মুসা ঠিক করল বেন্টোদের কথা কোন দিক থেকে আসছে। তারপর মনিটরিং যন্ত্রের অন্য সব দিক বন্ধ করে দিল। এবার বেন্টোদের কথা পরিষ্কার হয়েছে। কথা বলছিল তখন একটা অপরিচিত ভারী কণ্ঠ। বলছিল, ‘তেরসিয়েরা দ্বীপের ঘটনা সবকিছু ওলটপালট করে দিয়েছে। গতকাল আমাদের সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, সাও তোরাহ দ্বীপে শিকার নিয়ে যাওয়ার প্রোগ্রাম এখন বন্ধ থাকবে। শুধু তাই নয়, ওখানে যাতায়াতও একেবারে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।’

‘তাহলে আগামীকাল হারতায় যে চালান আসার কথা ছিল তা আসছে না?’ বলল বেন্টোর কণ্ঠ।

‘না আসছে না।’ বলল সেই অপরিচিত কণ্ঠ।

‘সাও তোরাহ যাবার জন্যে যে ‘মিনি সাব’ এসেছে, ওটা কি চলে যাবে?’ তৃতীয় কণ্ঠ বলল। কণ্ঠটি সসা’র।

‘ইতিমধ্যে ওটা চলে গেছে।’ বলল সেই অপরিচিত কণ্ঠ।

‘এতবড় পরিবর্তন, তেরসিয়েরাতে এমন কি ঘটেছে?’ বলল বেন্টো।

‘এমন কি ঘটেছে বলছো? আমাদের অর্ধশতের মত লোক সেখানে নিহত হয়েছে। দুটি ভাড়া করা হেলিকপ্টার ধ্বংস হয়েছে, একটা নিখোঁজ রয়েছে। স্বয়ং আমাদের চীফ আহত।’

‘কাদের সাথে এ সংঘর্ষ হয়েছে?’ সসা’র কণ্ঠ বলল।

‘সেটা আমাদের বলা হয়নি। তবে মনে হয়, একদিন নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ার যারা ধ্বংস করেছিল, তাদেরই উত্তরসূরী ওরা বোধ হয়।’ বলল অপরিচিত কণ্ঠ।

চতুর্থ একটি কণ্ঠ কথা বলে উঠল। বলল, ‘কিন্তু নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ার যারা ধ্বংস করেছিল, এটা নিয়ে তো এখন ভিন্ন কথা শোনা যাচ্ছে। বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট মি. হ্যারিসন খোদ নাকি মনে করেন যে, সেই সময়ের মার্কিন সরকার যে সিদ্ধান্তে পৌছেছিল সেটা ছিল পরিস্থিতি তাড়িত, উপযুক্ত প্রমাণ ভিত্তিক নয়।’

‘হ্যাঁ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ সেদেশের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি দুই-ই পাল্টে দিয়েছে। কিন্তু তুমি প্রেসিডেন্ট হ্যারিসনের এ কথাটা কার কাছে শুনলে?’ বলল অপরিচিত সেই প্রথম কণ্ঠ।

‘মার্কিন ষ্টেশন ডিপার্টমেন্টের একজন উর্ধ্বতন অফিসার ট্যুরিষ্ট হিসেবে হারতায় এসেছিলেন। তার সাথে পরিচয় হয়। তিনিই একথা আমাকে বলেছিলেন।’ চতুর্থ কণ্ঠটি উত্তরে বলল।

‘যাক এসব উদ্বেগজনক কথা আমাদের না শোনাই ভাল।’ বলে একটু থেমেই প্রথম কণ্ঠটি আবার কথা শুরু করল, ‘সাও তোরাহ শিকার নিয়ে যাবার কর্মসূচী বাতিল হলো, এ নিয়ে অন্যরকম কিছু ভাবার অবকাশ নেই। শিকার ধরা চলছে এবং সাও তোরাহ প্রজেক্ট চলছে এবং চলবে।’

‘তবে আমরা খুশি হতাম যদি সাও তোরাহয় আমরা কতটা কি করতে পারছি তা জানতে পারতাম।’ বলল চতুর্থ কণ্ঠ।

মুহূর্তকাল নিরবতা।

পরে কথা বলে উঠল সেই প্রথম লোকটি। বলল, ‘আমি এ বিষয়ে কিছু জানি না। সাও তোরাহ আমি দেখিওনি। তার প্রয়োজনও নেই। যা হবার তাই হচ্ছে সেখানে।’

কণ্ঠটি থামতেই নারী কণ্ঠের কান্না ভেসে এল সাউন্ড মনিটরিং যন্ত্রে।

কান্নারত নারী কণ্ঠ কথা বলে উঠল। বলল কান্নাজড়িত কণ্ঠে, ‘মি. বেন্টো, মি. সসা আপনারা আমাকে কোথায় নিয়ে এসেছেন, কেন নিয়ে এসেছেন?’

নারী কণ্ঠ শুনে আহমদ মুসা ও হাসান তারিক দুজনেই চমকে উঠল। এতো মিস পলা জোন্সের কণ্ঠ। বেন্টো ও সসা কি ঐ গাড়িতে করে পলা জোন্সকেও নিয়ে এসেছিল?

নারী কণ্ঠ থামতেই অপরিচিত সেই প্রথম কণ্ঠটি বলে উঠল, 'সুন্দরী তোমার গল্প বেন্টোদের মুখে অনেক শুনেছি। কিন্তু সময় হয়নি সাক্ষাত করার। আজ অনেক দিন পর আমরা অনেকেই এক সাথে বসতে পেরেছি। আমরা চাই তুমি আমাদের এ সম্মেলনকে স্মরণীয় করে রাখ। আমরা আজ সারারাত তোমাকে ঘিরে নাচব, গাইব। আমরা সকলেই খুশি হতে চাই তোমার সঙ্গলাভে।'

লোকটি একটু থেমেই আবার বলে উঠল, 'আমি সকলকে নাচে শরিক হবার জন্যে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আসুন মিস পলা।'

'না, আমি নাচব না। আমাকে বাড়িতে রেখে আসুন।' কান্নাজড়িত কণ্ঠে প্রতিবাদ করে উঠল পলা জোন্স।

'তোমার কান্না তোমার চিৎকার কেউ শুনতে পাবে না সুন্দরী। ইচ্ছায় না হলে, অনিচ্ছাতেই তোমাকে সবকিছুতে রাজী হতে হবে।'

একটু নিরবতা।

তারপরেই পলা জোন্সের কণ্ঠ আর্ত-চিৎকার করে উঠল, 'ছেড়ে দাও আমাকে, যেতে দাও। ইশ্বরের দোহাই।'

'হাসান তারিক এস, পলার সর্বনাশ হয়ে যাবে।' বলে আহমদ মুসা সাউন্ড রেকডিংটা পকেটে ফেলে ষ্টেনগানটা হাতে নিয়ে দ্রুত নামতে লাগল সিঁড়ি বেয়ে।

হাসান তারিকও পেছনে ছুটল আহমদ মুসার। তারও হাত ষ্টেনগান।

দৌড়ানো অবস্থায় আহমদ মুসা পকেট থেকে সাউন্ট মনিটরিং যন্ত্রটা বের করে ঘরটার লোকেশন আবার ঠিক করে নিল। তখনও সাউন্ড মনিটরিং-এ পলা জোন্সের চিৎকার ও প্রচন্ড ধস্তাধস্তির শব্দ ভেসে আসছে।

ঘরটির দরজায় গিয়ে দাঁড়াল আহমদ মুসা ও হাসান তারিক। দরজাটা ঠেলে দেখল দরজা লক করা।

'রেডি হাসান তারিক' বলে আহমদ মুসা গুলী করল লকারের কী হোলে।

গুলী করেই প্রচন্ড এক লাথি চালাল দরজায়। খুলে গেল দরজা।

ঘরে জনা সাতেক লোক। সবাই দাঁড়ানো।

ঘরের একদম দক্ষিণ প্রান্তে আহত ও অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় পলা জোন্সকে একজন লোক পাঁজাকোলা করে সম্ভবত পাশের ঘরে নিয়ে যাচ্ছিল। পাশেই একটা দরজা খোলা।

দরজা খুলে যেতেই ঘরেরর সবাই তাকিয়ে ছিল দরজার দিকে। সেই সাথে দুজনের হাতে উঠে এসেছিল রিভলবার। যে লোকটি পলা জোন্সকে পাজাকোলা করে নিয়ে যাচ্ছিল, চোখের পলকে সে পলা জোন্সকে ছেড়ে দিয়ে রিভলবার তুলে নিল পকেট থেকে।

আহমদ মুসারা চেয়েছিল পলা জোন্সকে উদ্ধার করতে। এ জন্যেই দরজা খোলার সাথে সাথে তারা গুলী করেনি। কিন্তু মুহূর্ত দেরি করলে তারা গুলীর শিকার হবে।

সে সুযোগ দিল না ওদের আহমদ মুসারা। ওদের হাতের রিভলবার টার্গেটে উঠে আসার আগেই আহমদ মুসা ও হাসান তারিকের ষ্টেনগান ঘরের তিন দিক ঘুরে অগ্নিবৃষ্টি করল।

সাতটি দেহই লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে। ঝাঁঝরা দেহগুলো ওদের কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই স্থির হয়ে গেল।

আহমদ মুসা ছুটল ঘরের দক্ষিণ প্রান্তের দিকে।

পলা জোন্সের প্রায় নগ্ন দেহ কুকড়ে পড়ে ছিল। ভয় ও আতংকে তার দুচোখ বিস্ফোরিত। মুখে মৃত্যুর পান্ডুরতা।

আহমদ মুসা পলার জ্যাকেটটি কুড়িয়ে নিয়ে তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, ‘পরে নাও।’

উঠে বসা পলা জোন্স গায়ের ছেঁড়া গেঞ্জি ও সার্টের উপর জ্যাকেট পরে নিল। তারপর স্কার্ট ঠিক করে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা হাসান তারিকের দিকে চেয়ে বলল, ‘তুমি পলাকে নিয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়াও। আমি এদের সার্চ করে বাইরে আসছি। দুতলা ও এক তলার ঘরগুলোও সার্চ করতে হবে।’

হাসান তারিক পলা জোন্সকে নিয়ে বাইরে গেল।

পলাকে দাঁড় করিয়ে রেখেই আহমদ মুসা ও হাসান তারিক দুতলার ঘরগুলো সার্চ করল। কাগজপত্র সন্দেহজনক যা পেল কুড়িয়ে নিল। দুতলায় পেল একটিমাত্র কম্পিউটার সেট। ডিস্কগুলো নিয়ে নিল আহমদ মুসা।

ভয় ও আতংক কিছুটা কমে গেলে পলা জোন্স আহমদ মুসা ও হাসান তারিককে নিয়ে বিস্ময়ের দোলায় দুলছিল। গার্ডের ইউনিফরম ও কপাল পর্যন্ত নামানো হ্যাট পরা ক্লিনসেভ আহমদ মুসা ও হাসান তারিককে চিনতে পারছিল না পলা জোন্স। কিন্তু ওদের কথা মাঝে মাঝে তার কাছে পরিচিত মনে হচ্ছিল। এই অপরিচিত দুজন লোক এই বিরাট হত্যাকান্ড ঘটিয়েও তাকে বাঁচাল কেন এটা সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না। এরা এখানে কি খুঁজছে সেটাও তার মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক পলা জোন্সকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল।

গাড়ি বারান্দায় এসে গাড়িতে ওঠার সময় পলা জোন্স বলল, 'মাফ করবেন আমরা কোথায় যাচ্ছি?' আমাদের বাড়িতে মা কান্না-কাটি করছেন।'

'হ্যাঁ, তুমি বাড়িতেই যাবে।' বলে আহমদ মুসা ড্রাইভিং সিটে উঠল। পাশে উঠল হাসান তারিক। পেছনের সিটে তুলল পলা জোন্সকে।

প্রাইভেট রোড থেকে কোষ্টাল হাইওয়েতে উঠে রেখে যাওয়া ট্যাক্সির কাছে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা ডাকল ট্যাক্সিওয়ালাকে। বলল, 'আরেকটা গাড়ি যোগাড় হয়ে গেছে। অপেক্ষা করার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।' বলে একমুঠো টাকা ট্যাক্সিওয়ালার হাতে তুলে দিল।

টাকার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল ট্যাক্সিওয়ালার। একটা লম্বা ধন্যবাদ দিয়ে ছুটল সে তার ট্যাক্সির দিকে।

গনজালো রোডের মুখে এসে আহমদ মুসা তার গাড়ি ডান পাশের পার্কটার কারপার্কে দাঁড় করাল।

গাড়ি থেকে নামল আহমদ মুসা ও হাসান তারিক। পলা জোন্সকে গাড়ি থেকে নামতে বলল।

পার্কের দিকে তাকিয়ে পলা জোন্স বলল, ‘আমার বাড়িতো এখানে নয়।’

‘এস। ১১নং গনজালো রোড খুব দূরে নয়। হেঁটেই যাওয়া যাবে।’ আহমদ মুসা বলল।

বিস্ময় ফুটে উঠল পলা জোন্সের মুখে। বলল, ‘আমার বাড়ি আপনারা চেনেন?’

‘ওটা তো এখন আমাদেরও বাড়ি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কে আপনারা?’ বলে উঠল পলা জোন্স। তার কণ্ঠে সংশয় সন্দেহ।

উত্তর না দিয়ে আহমদ মুসা ‘এস’ বলে পলা জোন্সের বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল।

‘গাড়ি না নেয়ার অর্থ বুঝলাম না।’ বলল পলা জোন্স।

আহমদ মুসা ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, ‘এই অপয়া গাড়িটা বাড়িতে নিলে ওটা সরিয়ে ফেলার জন্যে আবার পরিশ্রম করতে হবে।’

বলে হাঁটতে লাগল আহমদ মুসা।

তার পেছনে হাঁটতে লাগল হাসান তারিক ও পলা জোন্স।

পলা জোন্স হাঁটছে। কিন্তু তার মাথায় চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে ঝড়ের বেগে। আহমদ মুসার শেষ কথা শুনে তার নিশ্চিত মনে হচ্ছে তাদের নতুন মেহমান ভাইয়ার গলা ওটা। কিন্তু ভাইয়াদের সাথে এদের চেহারার মিল নেই। আর এরা অধিকাংশ সময়ই দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলেছে, যা ভাইয়াদের পক্ষে সম্ভব নয়।

পলা জোন্সের বাড়িতে পৌছল তারা।

দরজায় নক করে পলা জোন্সই প্রথমে প্রবেশ করল বাড়িতে।

পলার মা মিসেস জোন্স পলাকে জড়িয়ে ধরে কান্নার হাট বসিয়ে দিল।

পলাকে উদ্ধার করেছে এই পূন্যের সুবাদে মিসেস জোন্স আহমদ মুসাদেরকেও ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিল।

‘আপনারা বসুন দয়া করে। আমি কাপড় পাল্টে চা নিয়ে আসছি।

চলে গেল পলা উপরে দুতলায়।

‘পলার কি হয়েছিল? বেন্টো ও সসা কোথায় নিয়ে গিয়েছিল পলাকে? তোমরা কে?’ জিজ্ঞেস করল মিসেস জোন্স।

‘আন্টি, পরিচয় বলছি।’ বলে আহমদ মুসা মাথা থেকে হ্যাট খুলে ব্যাগ থেকে চুল ও দাড়ি পরে নিল। হাসান তারিকও।

মিসেস জোন্সের চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠল বিস্ময়ে। বলল, ‘বাছা তোমরা? তো......।’

বিস্ময় জড়িত কণ্ঠে কথা জড়িয়ে গেল মিসেস জোন্সের। একটু পর বলল, ‘আমি কিছু বুঝতে পারছি না বাছা!’

‘সব বলব আন্টি।’ বলল আহমদ মুসা।

এ সময় চা নিয়ে নেমে এল পলা জোন্স। আহমদ মুসাদের লক্ষ্য করে বলল, ‘ভাইয়া আপনারা? হঠাৎ কোত্থেকে?’

বলেই পলা জোন্সের চোখে পড়ল আহমদ মুসাদের পরনের পোশাকের উপরে। সেই গার্ডের ইউনিফরম। সংগে সংগে সব পরিষ্কার হয়ে গেল তার কাছে। শরীরের উপর নিয়ন্ত্রণ তার যে শিথিল হয়ে পড়ল। তার হাত থেকে খসে পড়ল চায়ের ট্রে। প্রচন্ড শব্দে তা আছড়ে পড়ল মাটিতে।

পলা জোন্সের মুখ থেকে একটা চিৎকার বেরিয়ে এল, ‘ভাইয়া আপনারা।’

চিৎকারের সাথে তার চোখ দুটি স্থির হলো আহমদ মুসাদের উপর।

অবাক বিস্ময় আর অনেক প্রশ্নের অপ্রতিরোধ্য চাপে বিস্ফোরিত তার দুচোখ।

চিৎকার তার থেমে গেল, কিন্তু চোখ দুটি তার যেন পাথর হয়ে গেছে। কথা সরছে না পলা জোন্সের মুখ থেকে।

আহমদ মুসা হাসল পলা জোন্সের দিকে চেয়ে। বলল, ‘তোমাদের এ বিস্ময় স্বাভাবিক। আমাদের সব কথা তোমাদের শুনতে হবে।’

পলা জোন্সের স্থির চোখ একটুও নড়ল না। তার ঠোঁট দুটি নড়ে উঠল। বলল, ‘সবকথা পরে শুনব। সবার আগে এক কথায় বলুন, ‘আপনারা কে? কি উদ্দেশ্যে আপনারা এসেছেন?’ শুষ্ক কণ্ঠ পলার।

আহমদ মুসা পরিপূর্ণভাবে তাকাল পলা জোন্সের দিকে। তার অনড় চোখের অতল দৃষ্টিতে আহমদ মুসা অন্য রকম এক পলা জোন্সকে দেখল। মনে হলো, এর কাছে মিথ্যা বলার প্রয়োজন নেই। আহমদ মুসা বলল, ‘আমরা দুজনেই

মুসলিম। আমরা ফ্রান্স থেকে লিসবন হয়ে এখানে এসেছি। একটা ভয়ংকর চক্র সাও তোরাহ দ্বীপে আমাদের কিছু ভাইকে বন্দী করে রেখেছে। আমরা তাদের উদ্ধার করতে চাই।'

আহমদ মুসা থামলেও পলা জোন্স কথা বলল না। তার অপলক, অনড় দৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে আহমদ মুসাদের উপর। যেন অনেক কিছু নিয়ে ভাবছে সে। কিছুক্ষণ পর পলা জোন্স ধীর কণ্ঠে বলল, 'আপনি আপনাদের পরিচয়ের সবটুকু বোধ হয় বলেননি। আর লিসবন হয়ে হারতা আপনারা আসেননি। লিসবন থেকে তেরসিয়েরা হয়ে হারতা এসেছেন।'

এবার বিস্ময় ফুটে উঠল আহমদ মুসার চোখে-মুখে। বলল, 'তুমি জান এটা? কি করে?'

'আপনিই তো বললেন।' বলল পলা জোন্স।

'কখন?' আহমদ মুসা বলল।

'এইতো বললেন যে, ফ্রান্স থেকে লিসবন হয়ে হারতা পৌছেছেন। যে দুজন মুসলমান লিসবন হয়ে আজোরস দ্বীপপুঞ্জে এসেছেন, তারা প্রথমে হারতায় নেমেছেন এবং অনেক ঘটনাও ঘটিয়েছেন।' বলল পলা জোন্স।

ভ্রু কুঁচকে উঠেছে আহমদ মুসার। বিস্ময় জড়িত চোখের দৃষ্টি তার আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। বলল, 'মিস পলা জোন্স আপনি কে?'

'আমি আজোরস এর 'সেন্ট্রাল কাউন্টার এসপায়োনেজ এজেন্সী' (CCEA) এর সদস্য।' দ্বিধাহীন যান্ত্রিক স্বরে বলল পলা জোন্স।

নতুন বিস্ময় নিয়ে তাকাল আহমদ মুসা ও হাসান তারিক পলা জোন্সের দিকে।

বিস্ময়-বিস্ফোরিত হয়ে উঠেছে মিসেস জোন্সের চোখও।

# ৭

আজর ওয়াইজম্যান সাও তোরাহ দ্বীপে ৪০ ফুট মাটির নিচে তার অফিস টেবিল বসে। জ্বলছে তার চোখ আগুনের মত। যেন তা পুড়িয়ে ফেলবে সামনে বসা তার দক্ষিণ হস্ত দানিয়েল ডেভিডকে।

আজর ওয়াইজম্যানের জ্বলন্ত চোখ নেচে উঠল। মুখ থেকে তার শব্দের শেল বর্ষিত হলো দানিয়েল ডেভিডকে লক্ষ্য করে, '২৪ ঘন্টার মধ্যে আমি হারতায় জর্জ এমানুয়েলের বাড়িতে কি ঘটেছে তার সঠিক রিপোর্ট চাই। আমার বিশ্বাস সেখানে আহমদ মুসা আসেনি। সমুদ্র পথের উপর আমাদের কড়া নজর আছে। গত ৭ দিনে তেরসিয়েরা থেকে কোন ছোট নৌকা বা বোট পশ্চিমের কোন দ্বীপে যায়নি। সবচেয়ে বড় কথা হলো, যে ঘরে হত্যা কান্ডটা ঘটেছে, সেখানে ছেড়া সার্ট ও গেঞ্জীর যে টুকরো পাওয়া গেছে তা কোন মেয়ের। লেডিজ ঘড়িও সেখানে পাওয়া গেছে। এ থেকে প্রমাণ হয় কোন মেয়েকে কেন্দ্র করে এই হত্যাকান্ড ঘটেছে। খোঁজ নাও ভাল করে।'

একটু থামল আজর ওয়াইজম্যান। বলল আবার একটু পরে, 'সবাইকে খবর পৌছাও সাও তোরাহমুখী জাহাজ, লঞ্চ, হেলিকপ্টার সবকিছুকে যেন বিনা জিজ্ঞাসায় ধ্বংস করে দেয়া হয়। আমাদের নিজস্ব যোগাযোগ 'মিনি-সাব' এর মাধ্যমে চলবে। আর মাটির উপরের বন্দীখানাকে ভূগর্ভে ঢুকিয়ে দাও। যেন মাটির উপরে জংগল ও পাহাড় ছাড়া আর কোন কিছুর চিহ্ন না থাকে।'

আবার একটু দম নিল আজর ওয়াইজম্যান। কয়েক মুহূর্ত পরে শুরু করল আবার, 'টুইন টাওয়ারের ধ্বংস সম্পর্কিত স্পুটনিক এর অনুসন্ধান রিপোর্টের বাড়তি কপি উদ্ধার করা এখনও সম্ভব হলো না। অথচ এর মধ্যেই রয়েছে আমাদের প্রাণ।'

অনেকটা স্বগত কণ্ঠে এ কথাগুলো বলেই আজর ওয়াইজম্যান পাগলের মত চিৎকার করে উঠল, 'নতুন বন্দী সাংবাদিক বুমেদীন বিল্লাহকে আমার কাছে নিয়ে

এস। সে কামাল সুলাইমানের স্ত্রী লতিফা কামাল, বোন ফাতিমা কামাল এবং যায়েদ বিন ফারুকের খোঁজ-খবর জানে। তার কাছ থেকে বের করে নিতে হবে ওদের ঠিকানা। আর স্পুটনিকের ৭ জনের কাছে শেষ চেষ্টা চালাও। বের কর রিপোর্টের কপি কোথায় রেখেছে। সময় আমাদের হাতে নেই। হয় ওরা বলবে না হয় ওদের সবাইকে মরতে হবে। যাও।'

বেরিয়ে গেল দানিয়েল ডেভিড।

পরবর্তী বই

# গুলাগ থেকে টুইনটাওয়ার

কৃতজ্ঞতায়ঃ Mahfuzur Rahman

সাইমুম-৩৭

# গুলাগ থেকে টুইনটাওয়ার

আবুল আসাদ

# ১

কাঁদছে মিসেস জোনস।

অঝোর ধারায় ঝরছে তার চোখ থেকে অশ্রু।

ঠোঁট কামড়ে কান্না চাপার চেষ্টা করছে পলা জোনস।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিকের বিব্রত চেহারায় বেদনার একটা মলিন আস্তরণ নেমে এল।

'স্যরি, এই মর্মান্তিক ঘটনা রোধ করার কোন উপায় আমাদের ছিল না।' বলল সে নরম ও বেদনা জড়িত কণ্ঠে।

ধীরে ধীরে চোখ খুলে মিসেস জোনস বলল, 'বাছা তোমাদের কোন দোষ নেই। তোমরা আত্মরক্ষার জন্যে যা করার তাই করেছ। তা না করলে হয়তো তোমাদেরই মরতে হতো। এরা যে কতবড় খুনি বর্বর, তা আবারও প্রমাণিত হয়েছে। আমার দু:খ................।'

কথা শেষ করতে পারলো না মিসেস জোনস। কান্নায় ভেঙে পড়ল সে আবার।

সান্তনার কোন ভাষা খুঁজে পেল না আহমদ মুসা। বুক ভাঙা কান্না যাকে বলে সেই কান্না শুনে যাওয়া ছাড়া তাদের কোন উপায় ছিল না।

অস্বস্তিকর একটা অবস্থা।

চরম বিব্রতকর অবস্থা আহমদ মুসাদের।

অসহনীয় নিরবতাটা এবার ভাঙল পলা জোনস। মুখ থেকে রুমাল সরিয়ে নিয়ে চোখ মুছে বলল, ‘আপনারা না বললে ভাইয়া খুন হয়েছে বা মরে গেছে সেটাও আমরা জানতে পারতাম না। ওরা আমাদের জানাত না। বেশি পীড়াপীড়ি করলে আমাদেরই ওরা খুন করতো।

আহমদ মুসা মুহূর্তের জন্যে পলা জোনসের দিকে তাকাল। বলল, ‘স্যরি, আমি বুঝতে পারছি না, আপনি আজোরস-এর মানে পর্তুগালের গোয়েন্দা বিভাগের কর্মী হয়েও ওদের ভয় করেন কেন? আপনি গোয়েন্দা বিভাগকে বলে তো এদের শায়েস্তা করতে পারেন।

ম্লান হাসর পলা জোনস। হাসিটা কান্নার চেয়েও করুণ। বলল, ‘বলে কোন লাভ হতো না। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, এরা WFA এর ভাড়া করা লোক। আর আমাদের দেশের গোয়েন্দা প্রধান WFA এর চীফ আজর ওয়াইজম্যানের অন্ধ বন্ধু। আর আমি মাত্র কয়েকদিন আগে কাজে যোগদান করা একজন সামান্য গোয়েন্দা অফিসার।’

‘অন্ধ বন্ধু বলছেন কেন?’ বলল আহমদ মুসা। তার কণ্ঠে বিস্ময়।

‘আমাদের গোয়েন্দা প্রধান সকল নীতি-নিয়ম ভংক করে আজোরস-এর পানি সীমায় WFA-এর মিনি সাব ও অন্যান্য জলযানের অবাধ বিচরণের অনুমতি পাইয়ে দিয়েছেন এবং দূরের বিচ্ছিন্ন একটা দ্বীপ ওদের নামে লীজ করিয়ে দিয়েছেন।’ বলল পলা জোনস।

‘নাম কি দ্বীপটার?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘দ্বীপের একটা নাম আছে, আমি শুনেছি। কিন্তু ভুলে গেছি নামটা।’ বলল পলা জোনস।

‘ম্যাপে নাম পাওয়া যাবে না?’ আহমদ মুসা বলল।

‘ফরমালি দ্বীপটার আলাদা নামকরণ হয়নি। মানচিত্রে পার্শ্ববর্তী দ্বীপের নামেই তাকে হয়তো ডাকা হয়। তবে লোক মুখে দ্বীপটার আলাদা একটা নাম আছে, তা আমি ভুলে গেছি।’ বলল পলা জোনস।

‘সাও তোরাহ কি?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

হাসল পলা জোনস। বলল, ‘এ নামটা কি করে জানলেন? বেন্টো সসাদের কাছে শুনেছেন?’

‘এ নাম আমরা আগে থেকেই জানি। এ দ্বীপেই আমাদের লোকেরা বন্দী আছে বলে মনে হয়।’ বলল আহমদ মুসা।

‘এ নাম আমি বেন্টো-সসাদের কথা থেকে জানি। কিন্তু দ্বীপটা চিনি না। এ নামের কোন দ্বীপ আজোরস দ্বীপপুঞ্জে নেই। হতে পারে এটা কোন দ্বীপের নতুন নাম।’ পলা জোনস বলল।

কথা শেষ করে একটা দম নিয়েই আবার বলে উঠল পলা জোনস, ‘ও দ্বীপে শুধু আপনাদের লোকরাই নেই। অন্য লোকরাও আছে আমাদের এ দ্বীপের রুটেও তো অনেক বন্দী সেখানে যায়।’

‘আপনাদের গোয়েন্দা বিভাগ এ বিষয়টা জানে না? কিছু করে না কেন?’ চট করে প্রশ্ন করল আহমদ মুসা।

‘আজোরস দ্বীপপুঞ্জ অনেকটা মুক্ত দেশ। পর্তুগাল কিংবা ইউরোপীয় কোন দেশের ভিসা থাকলে সে আজোরাসে প্রবেশ করতে পারে। তাছাড়া ওরা বন্দীদের নিয়ে আসে কোনও বিশেষ ব্যবস্থায় জলপথে। এ বিস্তীর্ণ জলপথ পাহারা দেবার কোন ব্যবস্থা আজোরস-এর নেই। এরপরও গোয়েন্দা বিভাগ এবং কোন পর্যায়ে পুলিশরাও এ বিষয়টা জানে বলে আমার মনে হয়েছে। আমি একদিন কথায় কথায় আমার উর্ধতন অফিসারকে এ বিষয়ে বললে তিনি মন্তব্য করছিলেন, WFA এর লোকরা এ দ্বীপপুঞ্জের ভিআইপি। এদের নিয়ে মাথা ঘামিও না। একদিন হারতার পুলিশ ইনচার্জের গাড়িতে আমি বেন্টো-সসাদের দেখেছি।’ বলল পলা জোনস।

‘যে দ্বীপ ওদের লীজ দেয়া হয়েছে, সে দ্বীপে তাহলে আজোরস সরকারের কোনই উপস্থিতি নেই?’ প্রশ্ন করল আহমদ মুসা।

‘সেটাই স্বাভাবিক।’ পলা জোনস বলল।

‘আপনি গোয়েন্দা বিভাগের লোক এ কথা কি বেন্টো-সসারা জানে?‘ প্রশ্ন আহমদ মুসা।

'জানে না। জানলে আমার উপর ওদের আরও অধিকার বর্তাবে বলে আমি ভয় করি।' বলল পলা জোনস।

'আজোরস-এর একজন গোয়েন্দা এতটা অসহায়? তার সামান্য আত্মরক্ষার অধিকারও সে আদায় করতে পারবে না ডিপার্টমেন্ট থেকে?' আহমদ মুসা হাসল। তার কণ্ঠে বিস্ময়।

ম্লান হাসল পলা জোনস। বলল, 'মেয়ে হওয়ার অনেক অসুবিধা আছে। আমার দূর্বলতা টের পেলে অফিসের যাদের কাছে আশ্রয় চাইব, তারাও এই সুযোগ ব্যবহার করতে পারে। তাছাড়া ভিআইপিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে চাকুরীর অসুবিধা হওয়ার ভয়তো আমার আছেই।'

আহমদ মুসা একটু হাসল। তার পরেই গম্ভীর হয়ে উঠল তার মুখ। বলল, 'মুক্ত সোসাইটিতে' মেয়েরা সমানাধিকার পাওয়ার পরেও মেয়েদের এই অসহায়ত্ব গেল না?'

'আরও বেড়েছে। আগে মেয়েরা পারিবারিক প্রটেকশনে থাকত। কিন্তু এখন পথে-ঘাটে, অফিসে-রেস্তোরায় পুরুষদের মত নিজেদের প্রটেকশন তাদের নিজেদেরই করতে হয়। কিন্তু সমানাধিকার পেলেও প্রাকৃতিকভাবে অসম নারীরা সে প্রটেকশন দেয়ার ক্ষমতা রাখে না। ফলে পথে-ঘাটে, অফিস-আদালতে অবাধ বিচরণের আজাদী তাদেরকে চারপাশের যথেচ্ছাচারের জিঞ্জীরে বেঁধে ফেলেছে। সমানাধিকারের ব্যাপারটা একটা গাঁজাখুরি, তা এখন আর বুঝার বাকি নেই। সমানাধিকার পেয়েও নারীরা লাঞ্ছিত হবার অভিযোগ অবিরাম তুলছে, কিন্তু একজন পুরুষ কখনও এই অভিযোগ তোলে না। উভয়ের মধ্যেকার প্রাকৃতিক অসমতাই এর কারণ।' বলল পলা জোনস।

সে থামতেই মিসেস জোনস বলল, 'তোমরা কথা বল বাছা। আমি একটু ওপর থেকে আসি।'

বলে মিসেস জোনস কাপড় দিয়ে ভালো করে চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল।

'ধন্যবাদ মিস পলা জোনস। আজকের ঘটনাকে আপনার অফিস কিভাবে দেখবে?' আহমদ মুসা বলল।

'আমি এতে ইনভলভ আছি, এ কথা আমি কিছুতেই প্রকাশ করব না। প্রমাণ হয়েছে বেন্টো, সসা, 'এক বিশ্ব-এক দেশে-এক জাতি' এনজিও এর এমানুয়েলরা সবাই WFA-এর লোক। এই ঘটনার জন্যে গোয়েন্দা বিভাগ উল্টো আমাকে দায়ী করতে পারে। তার চেয়ে বড় কথা হলো, একথা প্রকাশ হলে আমি WFA-এর টার্গেটে পরিণত হবো। ভাইয়াকে ওরা মেরেছে, আমাকেও মারবে।' বলল শুষ্ক কণ্ঠে পলা জোনস, তার চোখে-মুখে ভয়ের চিহ্ন।

'কিন্তু আমার বিশ্বাস, আপনাদের গোয়েন্দা বিভাগ এবং WFA সম্মিলিতভাবেই বের করতে চেষ্টা করবে কারা এ ঘটনার সাথে জড়িত। বেন্টো ও সসারা এ বাড়িতে থাকতো এ খবর তাদের জানা থাকতে পারে।' বলল আহমদ মুসা।

'তাহলে..........?' কথা শেষ না করেই থেমে গেল পলা জোনস। তার কণ্ঠে উদ্বেগ ঝরে পড়ল।

'উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই মিস পলা জোনস। ওদের কাজ ওরা শুরু করুক। আমাদেরও কিছু করতেহবে।' আহমদ মুসা বলল।

'WFA আপনাদের লোকদের কেন বন্দী করে রেখেছে, তা কিন্তু বলেননি।' বলল পলা জোনস।

'আপনি কিছু কি আন্দাজ করেন?' মুখে একটু হাসি টেনে জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'আপনাদের যারা বন্দী আছে, তারা কি মুসলমান?' প্রশ্ন পলা জোনসের।

'হ্যাঁ মুসলমান।' আহমদ মুসা বলল।

'তাহলে বন্দীটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রসূত। কারণ, আমি জানি WFA-এর চীফই শুধু ইহুদী তা নয়, গোটা WFA টাই ইহুদী। গত রাতের ঘটনায় 'এক বিশ্ব এক জাতি' এনজিওর যে ইমানুয়েল মারা গেল সেও ইহুদী। সুতরাং ইহুদীরা কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই আপনাদের লোকদের আটক করেছে। এটা আরও বেশি পরিষ্কার হবে, যদি জানা যায় ওরা কি করতেন।' বলল পলা জোনস।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'আপনি................।'

আহমদ মুসাকে থামিয়ে দিয়ে কথা বলে উঠল পলা জোনস, 'আমাকে 'আপনি' সম্বোধনের কি প্রয়োজন আছে? গত রাতে আমাকে উদ্ধারের কঠিন মুহূর্তে আপনি আমাকে 'তুমি' সম্বোধন করেছিলেন, আমার খুব ভালো লেগেছিল। আমি আপনাদের ছোট বোনের মত হতে পারি না!'

থামল পলা জোনস।

'ধন্যবাদ পলা। তুমি আমাদের ছোট বোনের মত নও, ছোট বোনই তুমি আমাদের।' বলে আহমদ মুসা তাকাল হাসান তারিকের দিকে। বলল, 'তাই কিনা হাসান তারিক?'

'অবশ্যই ভাইয়া।' বলল হাসান তারিক আনন্দে মুখ উজ্জ্বল করে।

বলেই হাসান তারিক পলা জোনসের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'আজোরস-এর হারতায় এসে আমরা আরেকটা বোন পেয়েছি, এ কথা শুনলে তোমার ভাবীরা খুব খুশি হবে।'

'আমার কি তাহলে এখন দুই ভাবী?' হেসে বলল পলা জোনস।

'অবশ্যই।' হাসান তারিক বলল।

'ও! গুড গড! যেখানে একটিও ছিল না, সেখানে দুই ভাবী পেলাম, ওরা থাকেন কোথায়?' বলল পলা জোনস।

'আমার স্ত্রী থাকেন ফিলিস্তিনে আর ভাইয়ার মোহতারামা থাকেন সৌদি আরবের মদিনা শরীফে।' হাসান তারিক বলল।

'আপনারা আরব? তাহলে তো WFA-এর সাথে লড়াই লাগার কথাই। যাঁরা আজর ওয়াইজম্যানের হাতে আটক আছেন, ওঁরা কোন দেশের?' জিজ্ঞেস করল পলা জোনস।

'ওরা ৭ জন ছয় দেশের। দুজন তুরস্কের, ইরান মিসর লিবিয়া ইন্দোনেশিয়া ও স্পেনের একজন করে।' বলল আহমদ মুসা।

'বোধ হয় একই সাথে ধরেছে, কিন্তু এক সাথে পেল কি করে?' পলা জোনস বলল। তার চোখে-মুখে বিস্ময়।

‘ওরা ৭ জন ফ্রান্সের ষ্টার্সবার্গে একটা গোয়েন্দা ফার্ম খুলেছিল। সে গোয়েন্দা ফার্মটিকেও ধ্বংস করেছে, তাদেরকেও কিডন্যাপ করেছে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ওরা কি ইহুদীদের বিরুদ্ধে কিংবা WFA-এর বিরুদ্ধে কোন কেস নিয়ে কাজ করছিল?‘ প্রশ্ন করল পলা জোনস।

‘তোমার এ কথা মনে হলো কি করে?’ আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

‘গোয়েন্দা ফার্মটাও যখন ধ্বংস করেছে, তখন বলতে হবে ফার্মটি খুব বড় ব্যাপার নিয়ে সামনে এগুচ্ছিল।’ বলল পলা জোনস।

‘ধন্যবাদ পলা। ঠিক বলেছ তুমি। গোয়েন্দা ফার্মটি ধ্বংস করার পর সেই কাজ সম্পর্কে তথ্য নেয়ার জন্যেই ওদের কিডন্যাপ করেছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ভাইয়া আপনারা কে?’ প্রশ্ন পলা জোনসের।

‘কেন এ প্রশ্ন?’ বলল আহমদ মুসা।

‘কারণ বন্দী গোয়েন্দাদের যারা উদ্ধার করতে আসেন, তারা আরও বড় কেউ। আর এর প্রমাণও গত রাতে আমি পেয়েছি। দেখে মনে হয়েছিল, পৃথিবীর বেষ্ট কমান্ডোদের আমি দেখছি। আবার মানুষ হিসাবেও আপনারা অসাধারণ। সুতরাং আপনারা অসাধারণ কেউ হবেন নিশ্চয়।’ পলা জোনস বলল।

আহমদ মুসা হেসে কিছু বলতে যাচ্ছিল, এ সময় বাইরের গেটে নক হলো।

আহমদ মুসা থেমে গেল।

পলা জোনস একবার দরজার দিকে তাকিয়ে বলল। ‘আপনারা বসুন, আমি দেখি কে?’

বলে পলা জোনস তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দরজার লুকিং হোল দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখেই দ্রুত ফিরে এসে বলল, ‘একজন গোয়েন্দা কর্মকর্তা এবং আরও একজন লোক।’ পলা জোনসের চোখে-মুখে একটা ভীত ভাব।

‘আমরা ভেতরে যাচ্ছি। ওদের এনে বসাও। আমরা পরে প্রয়োজনে আসব। তোমার কোন ভয় নেই।’ দ্রুত কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

বলেই আহমদ মুসা উঠে ছুটল তার ঘরের দিকে। হাসান তারিকও।

পলা জোনস ফিরে গিয়ে গেট খুলে দিল এবং গোয়েন্দা কর্মকর্তাকে স্বাগত জানিয়ে বলল, ‘গুড মর্নিং স্যার। আপনি কষ্ট করে আমাদের বাসাায়! আমাকে খবর দিলেই তো হতো।’

গোয়েন্দা কর্মকর্তার নাম ভিক্টর রাইয়া। হারতার গোয়েন্দা প্রধান সে।

কথা শেষ করে একটু থেমেই আবার বলে উঠল পলা জোনস, ‘স্যার, আসুন স্যার, ভেতরে আসুন।’

ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, ‘ব্যাপারটা খুব জরুরী তো। তাড়াতাড়ি তোমার এখানে আসতেই হতো। তাই চলে এলাম।

ভেতরে ঢুকে একটু থমকে দাঁড়াল। পেছন ফিরে তার পেছনে আসা সাথের লোকটির দিকে ইংগিত করে গোয়েন্দা প্রধান ভিক্টর রাইয়া বলল, ‘ইনি ‘এক বিশ্ব’ এনজিও‘র ভাইস চেয়ারম্যান। নাম কেলভিন কেনেইরো। এই সকালে তিনি হারতা এসে পৌছেছেন। ওঁদের একটা কাজ আমাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছে।’

বলে আবার হাঁটতে লাগল ভিক্টর সোফা লক্ষ্য করে।

পলা জোনস ও কেলভিন কেনেইরো সম্ভাষণ বিনিময়ের পর তারাও হাঁটতে লাগল সোফার দিকে।

পলা জোনসের মুখটা মলিন। ওদের দেখেই বুঝতে পেরেছে পলা জোনস যে, এরা গতকালের ঘটনা তদন্ত করার জন্যে এখানে এসেছে। সে যে জড়িত এই বিশাল হত্যাকান্ডের সাথে, এরা কি তা জানতে পেরেছে?’

আশংকা ও অস্বস্তিতে ভরে গেল তার মন।

ওদেরকে বসিয়ে তাদের সামনের এক সোফায় গিয়ে বসল পলা জোনস।

পলা জোনস বসতেই গোয়েন্দা কর্মকর্তা ভিক্টর রাইয়া বলে উঠল, ‘বেন্টো ও সসা নামের দুজন লোক এবারও তো তোমার এখানেই উঠেছে?’

ভেতরে ভেতরে আৎকে উঠল পলা জোনস। কিন্তু স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, ‘জি স্যার।’

’রাতে তো ওরা বাড়ি আসেনি। খোঁজ নিয়ে কিছু জেনেছ?’ বলল ভিক্টর রাইয়া।

‘হ্যাঁ, ওরা বাড়ি আসেনি। কিন্তু আপনি জানলেন কি করে স্যার?’ পলা জোনস বলল।

‘বলছি। আমার প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তর দাও।’ বলল ভিক্টর।

এক টুকরো বিব্রত হওয়ার মত হাসি। বলল, খোঁজ নেয়ার প্রয়োজন হয় না। ওরা এ রকম প্রায়ই করেন। এমন কি একবার বাড়ি থেকে কোন কাজে বেরুবার পর চলে গিয়েছিলেন। তিন মাস পর ফিরেছিলেন।’

‘ওরা খুন হয়েছে।’ ঠান্ডা গলায় বলল ভিক্টর।

‘খুন? কখন, কোথায়?’ চোখে মুখে উদ্বেগ ও বেদনার চিহ্ন মেখে বলল পলা জোনস।

‘শুধু তারা নয়, আরও কয়েকজন খুন হয়েছে তাদের সাথে।’ ভিক্টর বলল।

‘কোথায়?’ বলল পলা জোনস।

‘এক বিশ্ব এক দেশ‘ এনজিও‘র মি. এমানুয়েলের বাড়ি চেন?’ ভিক্টর বলল।

‘চিনি না, তবে লোকেশনটা জানি।’ বলল পলা জোনস।

‘ঐ বাড়িতেই তারাসহ এমানুয়েল ও অন্যান্যরা খুন হয়েছে।’ ভিক্টর বলল।

রাজ্যের উদ্বেগ আতংক টেনে আনল পলা জোনস তার চোখে-মুখে। তার মুখ হ্যাঁ হয়ে গেছে। কথা সরছেনা যেন মুখে।

‘মিস পলা জোনস গতকাল ওরা কখন বেরিয়েছিলেন?’ জিজ্ঞাসা কেলভিন কেনেইরার। তার চোখেও সন্ধানী দৃষ্টি।

‘গতকাল সন্ধ্যার পর ওঁরা বেরিয়ে যান।’ বলল পলা জোনস।

‘তাদের সাথে কি আর কেউ ছিল?’ কেলভিন কেনেইরা বলল।

বুকটা কেঁপে উঠল পলা জোনসের। ওরা কি জানতে পেরেছে যে, পলা ওদের সাথে ছিল! পলা স্মরণ করে খুশি হলো যে, সে যখন ওদের সাথে গাড়িতে

উঠেছিল, তখন আশে-পাশে কেউ ছিল না। সন্ধ্যার আলো-ছায়ায় দূর থেকে সব দেখা ও বুঝাও কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। জিজ্ঞাসার উত্তরে পলা জোনস বলল, 'স্যরি। ওদের যাওয়াটা আমি দেখিনি।'

'পাড়ার বা শহরের কোন মেয়ে বা মেয়েদের সাথে ওদের উঠাবসা ছিল?' বলল কেলভিন কেনেইরা।

'ওদের সাথে কোন মেয়ে কখনও আমাদের বাড়িতে আসেনি, বাইরে কিছু ঘটে থাকলে আমি কিছু বলতে পারবো না।' পলা জোনস বলল। তার কথা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে। কিন্তু উদ্বেগটাতার চোখে-মুখে ঠিকরে পড়ছে।

কেলভিন কেনেইরা কথা বলল, 'দেখুন গত রাতে এমানুয়েলের বাড়িতে যে গণহত্যার ঘটনা ঘটেছে, সেখানে একজন মেয়ের উপস্থিতি ছিল। সেখানকার পুরো ঘটনাটা অন্তত সেই মেয়েকে কেন্দ্র করেই সংঘটিত হয়েছে। তার সার্ট ও ব্লাউজের ছেড়া অংশ পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে চেন-ছেঁড়া একটি লেডিজ হাত ঘড়ি। হাত ঘড়ির ছেঁড়া চেনে রক্তের দাগ আছে। এর অর্থ একজন মেয়ে সেখানে নির্যাতিত হয়েছে। অবস্থা বলছে নির্যাতন করেছে এমানুয়েলরা। তারা সকলেই মরেছে। কিন্তু মেয়েটির লাশ কোথাও নেই। তার মানে মেয়েটাকে উদ্ধার কর হয়েছে। যারা উদ্ধার করেছে তারাই হত্যা করেছে এমানুয়েলদেরকে। মেয়েটাকে খুঁজে পেলে হত্যাকারীদেরকেও পাওয়া যাবে। আমাদের বিশ্বাস যাদের মাধ্যমে সেখানে মেয়ে নেয়া হতে পারে, তাদের মধ্যে বেন্টোদের কথাই প্রথম আসে। এজন্যেই প্রথমে এসেছি। বেন্টোদের কথা জানতে।'

ভেতরটা কাঁপছিল পলা জোনসের। কেলভিন কেনেইরার প্রত্যেকটা কথাই সত্য। ওরা কি আরও কিছু জানে? মনের দিক দিয়ে মুষড়ে পড়ল পলা জোনস। কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভাবল, পরিস্থিতির মোকাবিলা তাকে করতে হবে। কেলভিন কেনেইরার দিকে মুখ তুলল পলা জোনস। বলল, 'আর কি জানতে চান? ওরা মাঝে মাঝে এখানে এসে থাকতেন। এর বাইরে কোন প্রকার সম্পর্ক তাদের সাথে আমাদের ছিল না।'

কেলভিনের হঠাৎ নজর পড়ল পলা জোনসের ডান হাতের কব্জির উপর। কব্জির একটু উপরে চামড়া ছিড়ে যাওয়া। তাছাড়া হাতের ছোট্ট ব্যান্ডেজের

পাশেও আঁচড়ের চিহ্ন। ভ্রু কুঁচকে উঠল কেলভিনের। বলে উঠল, 'আপনার হাতে কি হয়েছে মিস জোনস? এ্যাকসিডেন্ট করেছিলেন বলে মনে হচ্ছে। কবে?'

'চমকে উঠেছিল পলা জোনস। নিজের ভেতরটাকে আড়াল করার জন্যে পলা জোনস তার মুখ নামিয়ে নিল এবং হাতটাকে নিজের কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, একটু ছিড়ে গেছে।'

'আপনি ঘড়ি নিশ্চয় ডান হাতে পরেন?' বলল কেলভিন কেনেইরা। তার চোখে-মুখে প্রবল চাঞ্চল্য ঠিকরে পড়ছে।

চকিতে মুখ তুলে একবার চেয়ে বলল, 'হ্যাঁ, কেন বলছেন এ কথা?' কণ্ঠের কম্পন পলা জোনস আড়াল করতে পারলো না।

'মাফ করবেন মিস জোনস।' বলে কেলভিন কেনেইরা ভিক্টর রাইয়ার সাথে একটুক্ষণ কানে কানে কথা বলল এবং পকেট থেকে একটা লেডিজ ঘড়ি বের করে ভিক্টর রাইয়া'র হাতে দিল।

ভিক্টর রাইয়া ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়েই বলে উঠল, 'মিস পলা, আমার যতটা মনে পড়ে তোমার ঘড়িটাও এই রকমই। নিয়ে এসতো তোমার ঘড়িটা।'

ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল পলা জোনসের মুখ। কেঁপে উঠল তার বুক। বুঝল সব ওরা জেনে ফেলেছে। তার মুখ থেকে কোন কথা বের হলো না।

ভ্রু কুঞ্চিত হলো গোয়েন্দা কর্মকর্তা ভিক্টর রাইয়ার। একরাশ প্রশ্ন জেগে উঠেছে তার চোখে। সে বলে উঠল, 'মিস পলা, তাহলে তোমাকেই ধরে নিয়ে গিয়েছিল ওরা?'

দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠল মিস পলা।

কেলভিন কেনেইরা আবার ভিক্টর রাইয়ার কানে কানে কথা বলল। ভিক্টর কেনেইরা বলল, 'মিস পলা আমরা দু:খিত, তোমার উপর জুলুম হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেছ। তোমাকে কে বা কারা উদ্ধঅর করল মিস পলা?'

'আমি জানি না। আমাকে উদ্ধার করে এনে পার্কের সামনে নামিয়ে দিয়েছে।' কান্না জড়িত কণ্ঠ পলা জোনসের।

'তারা কয়জন ছিল?' জিজ্ঞেস করল কেলভিন কেনেইরা।

‘তারা কয়েকজন ছিল। খেয়াল করে দেখিনি কয়জন।’ ভয় ও দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলল পলা জোনস।

কেলভিন তাকাল ভিক্টর রাইয়ার দিকে। কেলভিনের চোখে সন্দেহ। পরক্ষণেই সে মুখ ঘুরাল পলা জোন্সের দিকে। বলল, ‘উদ্ধারকারীদের তো আপনি দেখেছেন।’

‘হ্যাঁ।’ বলল পলা জোনস।

‘দেখলে তো নিশ্চয় চিনতে পারবেন।’ কেলভিন বলল।

‘আলো আঁধারীর মধ্যে দেখেছি তো!’ বলল পলা জোনস। আবার দ্বিধাজড়িত কণ্ঠ তার।

কেলভিন কেনেইরা তাকাল ভিক্টর রাইয়ার দিকে। তার চোখে বিরক্তির ভাব সুস্পষ্ট। বলল, ‘মি. রাইয়া চলুন একে আমাদের অফিসে নিয়ে যাই। ফাইলে আমাদের প্রচুর ফটো আছে। ক্রিমিনাল থেকে অস্ত্রবাজ কেউ বাদ নেই। ফাইল দেখে পলা জোনস আমাদের মূল্যবান সহযোগিতা করতে পারবেন।’

‘সেটাই ভাল। তাই চলুন।’ বলল ভিক্টর রাইয়া।

মুখ শুকিয়ে এতটুকুন হয়ে গেল পলা জোনসের। ভয় ও উদ্বেগে আচ্ছন্ন হয়ে গেল তার চোখ-মুখ। মুখ থেকে কোন কথা সরল না তার।

ভিক্টর রাইয়াই কথা বলে উঠল আবার, ‘তৈরী হয়ে নিন মিস পলা।’

ভিক্টর রাইয়ার কথা শেষ হবার আগেই ড্রইং রুমে প্রবেশ করল মিসেস জোনস।

‘পলা, কোথাও যাচ্ছিস নাকি?’ বলে মিসেস জোনস ভিক্টর রাইয়া ও কেলভিন কেনেইরার দিকে বিস্ময়ের চোখে তাকাল।

পলা জোনস কম্পিত গলায় ভিক্টর রাইয়াকে দেখিয়ে বলল, ‘ইনি হারতার গোয়েন্দা বিভাগের ডিজি।’ আর কেলভিন কেনেইরাকে দেখিয়ে বলল, ‘ইনি গত রাতে যিনি মারা গেছেন সেই এমানুয়েলের দলের একজন বড় কর্মকর্তা। এঁরা গতরাতের ঘটনার তদন্তে এসেছেন।’

‘ওয়েলকাম আপনাদেরকে। কিন্তু পলা কোথাও যাবে যেন বলছিলেন।’ বলল মিসেস জোনস ভিক্টর রাইয়াকে লক্ষ্য করে।

‘মি. কেলভিনের অফিসে। মিস পলাকে উদ্ধার করতে গিয়ে কারা হত্যাকান্ড ঘটায়, নানা কারণে এটা আমাদের জানা দরকার। তাদেরকে চিহ্নিত করার ব্যাপারে আমরা মিস পলার সাহায্য চাই। কিছু জানতে চাই তাঁর কাছ থেকে।’ ভিক্টর রাইয়া বলল।

শুনে উদ্বেগ ফুটে উঠল মিসেস জোনসের চোখে-মুখে। একটু ভেবে বলল, ‘পলার যাওয়ার দরকার কেন? এখানেই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করুন। আমার মনে হয় সে তেমন কিছু বলতে পারবে না। সে তো মহাআতংকগ্রস্ত হয়ে নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত ছিল। কোন দিকে নজর দেয়ার তার সুযোগ ছিল কোথায়?’

‘তবু একমাত্র উনিই সেই লোকদেরকে দেখেছেন। ওদের খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে একমাত্র উনিই সাহায্য করতে পারেন।’ বলল কেলভিন কেনেইরা দৃঢ় কণ্ঠে।

‘কিন্তু কালকের ঘটনার পর তাকে আমি এভাবে ছাড়তে পারি না। গতকালের বুকের কাঁপুনি আমার আজও শেষ হয়নি।’ মিসেস জোনস বলল।

‘কিন্তু ম্যাডাম জোনস, তাকে তো যেতেই হবে। গতকালকের ঘটনা ছোট কিছু নয়। বলতে গেলে গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে। যারা এটা ঘটিয়েছে তারা মিস পলাকে উদ্ধার করেছে বটে, কিন্তু উদ্ধার করতেই শুধু তারা গিয়েছিল বলে আমাদের মনে হয় না। মিস পলার উদ্ধার একটা আনুসঙ্গিক ঘটনা, আসল লক্ষ্য তাদের কি তা আমাদের জানা দরকার। সুতরাং মিস পলাকে আমাদের সাথে যেতেই হবে।’ বলল কেলভিন কেনেইরা। তার কণ্ঠ কঠোর শুনাল।

‘মিসেস জোনস, মি. কেলভিন যা.................।’ বলতে শুরু করেছিল ভিক্টর রাইয়া।

এ সময় আকস্মিক বাজ পড়ার মত প্রচন্ড শব্দে ড্রইংরুমের বাইরের দরজা খুলে গেল।

দরজা দিয়ে ঝড়ের বেগে প্রবেশ করল দুইজন মুখোশধারী। দুজনেরই শরীর ঢাকা বিশেষ এক ইউনিফরমে। দুজনের হাতেই উদ্যত রিভলবার।

‘কে আপনারা?’ বলে চিৎকার করে উঠে দাঁড়াচ্ছিল মিসেস জোনস। মুখোশধারীদের একজন অস্বাভাবিক ভারী কণ্ঠে পর্তুগীজ ভাষায় চিৎকার করে

উঠল, 'যে যেভাবে আছেন, সেভাবে থাকুন। এক ইঞ্চি নড়লেই মাথার খুলি উড়ে............।'

মুখোশধারীর কথা শেষ হওয়ার আগেই চোখের পলকে কেলভিন কেনেইরা পকেট থেকে রিভলবার বের করে মুখোশধারীদের লক্ষ্যে তুলছিল। কিন্তু তার আগেই মুখোশধারীর কথা থেমে গেল এবং সংগে সংগেই তার রিভলবার অগ্নিবৃষ্টি করল। গুলী গিয়ে কেলভিনের হাতের কব্জীতে লাগতেই রিভলবার পড়ে গেল তার হাত থেকে।

গুলী করেই মুখোশধারীটি পাশের সাথীর উদ্দেশ্যে বলল, 'কেলভিনকে ঘুম পাড়িয়ে গাড়িতে তুলে নাও।'

সংগে সংগেই দ্বিতীয় মুখোশধারীটি দ্রুত এগোল কেলভিনের দিকে এবং পকেট থেকে ক্ষুদ্র স্প্রেয়ার বের করে কেলভিনের নাকে স্প্রে করল। মুহূর্তেই তার দেহ সোফায় ঢলে পড়ল।

দ্বিতীয় মুখোশধারীটি কেলভিনের সংজ্ঞাহীন দেহ পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে পেছন ফিরে দরজার দিকে হাঁটতে লাগল। তার আগেই প্রথম মুখোশধারী দ্বিতীয় মুখোশধারীর হাত থেকে স্প্রেয়ার নিয়ে নিয়েছে।

কেলভিনকে নিয়ে দ্বিতীয় মুখোশধারী বেরিয়ে গেলে প্রথম মুখোশধারী বাম হাতে স্প্রেটা রেখে ডান হাতে রিভলবার তাক করল ভিক্টর রাইয়া, মিসেস জোনস ও পলা জোনসের দিকে।

বিমূঢ় ভিক্টর রাইয়া অনেকটা মরিয়া হয়েই বলল, 'আপনারা কে? এসব কিন্তু ভাল হচ্ছে না। আমরা সরকারী লোক।'

প্রথম মুখোশধারীর অস্বাভাবিক ভারী কণ্ঠটা সিংহের মত গর্জন করে উঠল, 'হ্যাঁ, আপনি ও পলা জোনস সরকারী লোক। কিন্তু নির্লজ্জের মত বিদেশী ষড়যন্ত্রকারী কেলভিনদের ভাড়া খাটছেন। তাদের হাতে আজোরস দ্বীপপুঞ্জকে ইজারা দিয়ে বসে আছেন। আজোরসবাসী আপনাদেরও বিচার করবে।' বলে মুখোশধারীটি তার হাতের স্প্রেটার বোতাম টিপে ভিক্টর রাইয়া, পলা জোনস ও মিসেস জোনসের উপর ঘুরিয়ে নিল।'

মুহূর্তের মধ্যে তারা সংজ্ঞাহীন হয়ে ঢলে পড়ল সোফার উপরে।

প্রথম মুখোশধারী গিয়ে গাড়িতে উঠতেই গাড়িটা ছেড়ে দিল।

দ্বিতীয় মুখোশধারী আগেই গিয়ে ড্রাইভিং সিটে বসেছিল। আর প্রথম মুখোশধারী পেছনের সিটে গিয়ে বসেছে। তার সামনে গাড়ির মেঝের উপর কেলভিনের সংজ্ঞাহীন দেহ।

গাড়িটা ছুটছে।

প্রথম মুখোশধারী দ্বিতীয় মুখোশধারীকে লক্ষ্য করে বলল, 'হাসান তারিক, গাড়ির নাম্বার প্লেট বদলেছ তো?'

'জি ভাইয়া।' বলল হাসান তারিক।

ওদিকে প্রথম ঘুম ভাঙল ভিক্টর রাইয়ার। সে লাফ দিয়ে উঠে বসেই ছুটল বাইরে। দেখল তার গাড়ি নেই। দ্রুত পকেট থেকে বের করল তার মোবাইল। প্রথমেই টেলিফোন করল হেড কোয়ার্টারে। তার গাড়ির নাম্বার জানিয়ে দিয়ে বলল, 'যেখানে পাও গাড়িটাকে আটকাও এবং গাড়ির সবাইকে গ্রেফতার করো। আহত কেলভিনকে তাড়াতাড়ি ক্লিনিকে নেবে।' এরপর ভিক্টর রাইয়া দ্বিতীয় টেলিফোনটি করল আজর ওয়াইজম্যানকে। তাকে জানাল সব কথা।

টেলিফোনের ওপ্রান্ত থেকে উত্তেজিত আজর ওয়াইজম্যান বলল, 'ওরা কি গনজালোদের লোক, না ভেতরের অন্যকোন জাতীয়তাবাদী গ্রুপ? কোন সন্দেহ নেই, এরাই গতরাতে এমানুয়েলের বাড়িতে গণহত্যা সংঘটিত করেছে। যাই হোক যে কোনভাবে ওদের পাকড়াও করা চাই। আমি দ্বিতীয় কলের অপেক্ষা করছি।'

ভিক্টর রাইয়া মোবাইল বন্ধ করে পলা জোনসদের ড্রইংরুমে প্রবেশ করল। তখনও পলা জোনস ও মিসেস জোনসের জ্ঞান ফেরেনি।

ভিক্টর রাইয়া ঠান্ডা পানি এনে ওদের চোখে-মুখে ছিটিয়ে ওদের জ্ঞান ফিরিয়ে আনল।

মিসেস জোনস উঠে বসেই পলা জোনসকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'এসব কি সর্বনেশে কান্ড ঘটছে।' বলেই মিসেস জোনস ভিক্টর রাইয়ার দিকে ফিরে বলল, 'দোহাই আমার মেয়ের কোন দোষ নেই। তাকে ওরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল। প্রাণে বেঁচে এসেছে। তাকে আর কোথাও নেবেন না দয়া করে।'

'না, মিসেস জোনস মিস পলাকে এখন কোথাও নিচ্ছি না। মি. কেলভিন ফিরে এলে দেখা যাবে কি করা যায়। আমার মনে হচ্ছে, মিস পলা ওদের নিশ্চয় চেনে না এবং তাদের সাথে কোনও সম্পর্কও নেই। এখন যারা হামলা করেছিল, তারাই সম্ভবত গতরাতে এমানুয়েলের বাড়িতে ঘটনা ঘটিয়েছিল। এরা আমাদের সবার জন্যেই বিপজ্জনক।' বলল ভিক্টর রাইয়া।

বিস্ময় ফুটে উঠল মিসেস জোনসের চোখে-মুখে। কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই ভিক্টর রাইয়া উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি চলি। মিস পলা, ম্যাডাম জোনস আপনারা একটু সাবধানে থাকবেন।'

বলে বাইরে বেরুবার জন্যে দরজার দিকে এগুলো ভিক্টর রাইয়া।

সংজ্ঞা ফেরার পর একটি কথাও বলেনি পলা জোনস। আগেই সেই উদ্বেগ, আতংক চোখে-মুখে নেই, বরং চোখে-মুখে স্বস্তি ও আনন্দ।

মিসেস জোনস উঠে দাঁড়াল। বলল, 'যাই বাছাদের ডাকি, ঝামেলা তো গেছে। ওদের দেখতে পেলে ঝামেলা আরও বাড়ত। বুদ্ধিমানের কাজ করেছে না বেরিয়ে।'

মিসেস জোনস হাঁটা শুরু করেছিল আহমদ মুসাদের ঘরের দিকে। পলা জোনস হাসল। বলল, 'আম্মা ওরা ঘরে নেই। আমরা সংজ্ঞাহীন থাকার সময় ওরা কোথাও গেছে।'

'কিন্তু তুমি দেখলে কি করে? আর তারা আমাদের ওভাবে ফেলে যেতে পারে না।' বলে মিসেস জোনস আবার হাঁটা শুরু করল।

'ওরা নেই আম্মা।' হেসে আবার বলল পলা জোনস।

কিন্তু মিসেস জোনস পলার কথা এবার গ্রাহ্য না করে গেল আহমদ মুসাদের ঘরে। পরক্ষণেই আবার ফিরে এল। তার চোখে-মুখে বিস্ময়। বলল, 'বাছারা এভাবে তো বাইরে যেতে পারে না। কিন্তু ঘটনা কি? কোথায় ওরা?'

'ভেব না আম্মা। ওরা ফিরে আসবেন।' বলল পলা এবার গম্ভীর কণ্ঠে।

'তুমি তাহলে জান, বলছ না কেন?' বলল মিসেস জোনস অধৈর্য্যরে সাথে।

‘দুজন মুখোশধারী ওরাই আম্মা। মহাবিপদ থেকে ওঁরা আবার আমাকে বাঁচিয়েছেন।’ বলল পলা জোনস। তার কণ্ঠ ভারী।

বিস্ময়ে ছানাবড়া হয়ে গেছে মিসেস জোনসের চোখ। তার স্বগত কণ্ঠে উচ্চারিত হলো, ‘ওরা বাছারা ছিল?কিন্তু এভাবে একাজ ওরা করল কেন? তাদের বিপদ তো আরও বাড়ল?’

বলে ধপ করে সোফায় বসে পড়ল মিসেস জোনস। তার চোখে রাজ্যের বিস্ময় আর দুর্ভাবনা।

ধীরে ধীরে চোখ খুলল কেলভিন কেনেইরা। তাকাল সে সোনালী দাড়ি চুলওয়ালা পর্যটকবেশী আহমদ মুসা ও হাসান তারিকের দিকে। তারপর চারদিকে তাকাল সে। তার চোখের ভয় ও উৎকণ্ঠাটা আরও গভীর হলো। বলল, ‘তোমরা আমাকে কোথায় এনেছ। কে তোমরা? কি চাও?’

কেলভিন ঘাসের উপর শোয়া অবস্থায় ছিল। আহমদ মুসা কোন কথা না বলে তাকে তুলে বসাল। উঠতে গিয়ে গুলীবিদ্ধ ডান হাতে একটু চাপ লাগায় কঁকিয়ে উঠল সে। তাকাল কেলভিন তার গুলীবিদ্ধ ডান হাতের দিকে।

‘চিন্তা নেই মি. কেলভিন। গুলী ভেতরে নেই। ভালো করে ব্যান্ডেজ করে দিয়েছি। আপনি বেঁচে থাকলে ঘা শুকাতে বেশি সময় নেবে না।’ বলল আহমদ মুসা।

আবার চারদিকে তাকাল কেলভিন।

জায়গাটা তিন দিক থেকে পাহাড় ঘেরা। সামনে শুধু সাগরের দিকটাই উন্মুখ। জায়গাটা একটা বিশাল সমতল উপত্যকা। পাথুরে ভুমির উপর ঘাসের আস্তরণ। দেখলে মনে হবে বিশাল এক ঘোড় দৌড়ের মাঠ। সবচেয়ে লক্ষণীয় দিক হলো, মাঠটার উত্তর প্রান্ত হঠাৎ খাড়াভাবে নিচে নেমে গেছে ২০ গজের মত। তারপর তা নেমে গেছে সাগরে। এর ফলে পাহাড়ের প্রাচীর ঘেরা মাঠটা যেন এক বিরাট মঞ্চে পরিণত হয়েছে। মঞ্চের পরের নিচের অঞ্চলটা গাছপালায় ঠাসা যেন

এক সবুজ কার্পেট। মাঠে দাঁড়িয়ে এই সবুজের উপর দিয়ে দেখা যায় প্রশান্ত এক নীল সাগর। সত্যিই অপরূপ এখানকার দৃশ্য।

কেলভিনকে আবার চারদিকে তাকাতে দেখে আহমদ মুসা বলল, 'কি দেখছেন মি. কেলভিন? চেনার চেষ্টা করছেন জায়গাটা, হারতা থেকে খুব বেশি দূরে নয় জায়গাটা। মাত্র...........।'

আহমদ মুসাকে বাধা দিয়ে বলে উঠল কেলভিন, 'আমাকে আর জায়গা চিনিও না। এটা পিকনিক স্পট 'সান্তাসিমা'। এটা আমাদেরই জায়গা। 'এক বিশ্ব এক দেশ এক জাতি' এনজিও এই 'সান্তাসিমা' লীজ নিয়েছে ৫০ বছরের জন্যে।'

থামল কেলভিন।

বিস্ময় ফুটে উঠল আহমদ মুসার চোখে-মুখে। 'এক বিশ্ব এক দেশ এক জাতি' এনজিও মানে তো WFA (ওয়ার্ল্ড ফ্রিডোম আর্মি)। আজর ওয়াইজম্যানের ওয়ার্ল্ড ফ্রিডোম আর্মি এটা লীজহ নিয়েছে! কেন? এই প্রশ্নটাই আহমদ মুসা করল কেলভিনকে। বলল, 'এই জায়গাটা আপনারা লীজ নিয়েছেন কেন?'

'এর সাথে তোমাদের কোন সম্পর্ক নেই। এখন বল তোমরা কে? কেন আমাকে ধরে এনেছ? তোমরাই কি গতরাতে পলা জোনসকে উদ্ধার করতে গিয়ে খুন করেছ অতগুলো লোককে? কিন্তু মনে রেখ.........।'

'থাক থাক, আপনার প্রশ্নের জবাব দেবার জন্যে আপনাকে নিয়ে আসিনি। আমাদের প্রশ্নের জবাব দেবেন আপনি।' বলল আহমদ মুসা।

'তোমরা কে জানি না। তবে তোমরা আমাদের চেন না বলেই মনে হচ্ছে। তুমি যে স্বরে কথা বলছ, সেই স্বরে ইউরোপের কোন সরকারও আমাদের সাথে কথা বলতে পারে না। যাক। আমি একটা সিগারেট খেতে পারি?' কেলভিন বলল।

'না, এখন নয়। জিজ্ঞাসাবাদের পর খাবেন।' বলল আহমদ মুসা।

'জিজ্ঞাসাবাদ! কি জিজ্ঞাসাবাদ?' কেলভিন বলল।

'আজোরস দ্বীপপুঞ্জ দখলের আপনাদের ষড়যন্ত্রে সাহায্য করছে কে বা কারা?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'আমরা আজোরস দখল করেছি! না, একথা ঠিক নয়।' বলল কেলভিন।

‘আপনারা ইতিমধ্যেই একটা দ্বীপ দখল করে নিয়েছেন। প্রত্যেক দ্বীপেই আপনারা ঘাঁটি গড়েছেন এবং আপনাদের লোক সংখ্যা বাড়াচ্ছেন। এই যে ৫০ বছরের জন্যে লীজ নিয়েছেন। এটাই ঔপনিবেশিকদের দেশ দখল করার প্রধান কৌশল।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কোন দ্বীপ আমরা দখল করেছি? সাও তোরাহ? ওটা তো আমরা লীজ নিয়েছি। এ ধরনের লীজ দেয়া-নেয়া হচ্ছে বিভিন্ন দেশ ও দ্বীপপুঞ্জে। কেউ একে দেশ দখল বলে না।’ বলল কেলভিন।

‘অন্যরা যাই করুক, আপনারা দেশ দখল করছেন? আপনারা সরকারের চোখকে ফাঁকি দিয়ে গোপন কম্যুনিকেশন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন। এমনকি তার মধ্যে ‘মিনি সাবমেরিন’ ব্যবস্থাও চালু করেছেন।’

বিস্ময়ে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল কেলভিনের। তীক্ষè দৃষ্টিতে তাকাল সে আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘কে তোমরা? বিদ্রোহী গনজালো গ্রুপের লোক? যদি তাই হয়ে থাক শোন, আজোরস দ্বীপপুঞ্জ স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ কারো সাথেই আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।’

থামলো কেলভিন।

‘কারণ আপনরা তৃতীয়পক্ষ। আপনারাই দ্বীপপুঞ্জকে গ্রাস করতে চান। আপনারা ‘সাও তোরাহ’ দ্বীপে কাউকে যেতে দেন না। কারণ ওখানে সামরিক ঘাঁটি গড়েছেন।’ বলল আহমদ মুসা।

‘এ অভিযোগ সত্য নয়। এমন অভিযোগ সরকারের কাছেও সম্ভবত গেছে। পরশু সরকারী একটা সার্ভে বিমান দ্বীপটার উপর দিয়ে ফ্লাই করেছে। আমরা শুনেছি পাহাড়, ঘাস ও জংগলের উপত্যকা ছাড়া আর কিছুই দেখেনি। ঘাঁটি বলছ, ওখানে একটা বাড়িরও সন্ধান পাবে না। আসল কথা হলো, আমরা দ্বীপটাকে পৃথিবীর সকল বৃক্ষ-প্রজাতির অভয়ারণ্য বানাচ্ছি।’

‘একটা বাড়িও যদি না থাকে, তাহলে যারা অভয়ারণ্য বানাচ্ছে তারা থাকে কোথায়?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

থতমত খেয়ে গেল কেলভিন কেনেইরা। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্যে। নিজেকে সামলে নিয়ে সে দ্রুত বলল, ‘কেন প্ল্যান্টেশন কর্মীদের জন্যে অস্থায়ী তাঁবুই কি যথেষ্ট নয়?’

আহমদ মুসা হাসল। ভাবছিল সে। সংগে সংগে কোন কথা বলল না। কিন্তু কথা বলে উঠল হাসান তারিক। বলল, ‘কিন্তু এই যে বললেন সরকারী বিমান সেখানে পাহাড়, ঘাস ও জংগলের উপত্যকা ছাড়া কিছুই দেখেনি!’

‘বিমান থেকে জংগলের মধ্যে ছোট ছোট তাঁবু দেখবে কি করে?’ বলল কেলভিন।

‘আজোরসের বিরুদ্ধে তোমার বদমতলব না থাকলে মিনি সাব দিয়ে তোমরা কি কর?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘মিনি সাব’ এর কথা শুনে কেলভিন চমকে উঠে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। চোর ধরা পড়ার মত মুখের চেহারা হলো তার। বলল, ‘মিনি সাব? মিনি সাব আমরা কি করব?’

আহমদ মুসার মুখ কঠোর হয়ে উঠল। হাতের রিভলবারটা কেলভিনের দিকে তাক করে বলল, ‘সত্য কথা বলতে যদি আর একটুও দেরী হয়, তাহলে এখনি তোমার ডান কানটা উড়ে যাবে।’

ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল কেলভিনের চোখে-মুখে। মরিয়া হয়ে বলার চেষ্টা করল, ‘না আমি .............।’

সংগে সংগেই আহমদ মুসার রিভলবারের নল সরে এসে স্থির হলো কেলভিনের ডান কান লক্ষ্যে। তার তর্জ্জনি চেপে বসতে যাচ্ছিল রিভলবারের ট্রিগারে।

ভয়ে বিস্ফোরিত হয়ে হয়ে উঠল কেলভিনের চোখ। কঁকিয়ে উঠল, ‘বলছি আমি।’

বলে একটু থেমেই শুরু করল, ‘নাম ‘মিনি সাব’ হলেও এটা সামরিক যান নয়। নিছক পরিবহন যান আমাদের মিনি সাব।’

‘মিথ্যা কথা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, রাশিয়ার মত দেশও পরিবহন যান হিসাবে সাবমেরিন বা মিনি সাবকে ব্যবহার করে না। আপনাদের

মত একটা এনজিও’র জন্যে এর কোনই প্রয়োজন হতে পারে না।’ বলল আহমদ মুসা।

দ্বিধায় পড়ল কেলভিন। মনে হয় জবাব খুঁজছিল। অবশেষে বলল, ‘এই পরিবহন সবচেয়ে নিরাপদ ও নিরিবিলি বলে আমরা ব্যবহার করছি।’

‘আজোরস দ্বীপপুঞ্জের নৌপথকে কোন দিক দিয়েই কি অনিরাপদ ও অনিরিবিলি মনে হয়?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

আবার দ্বিধায় পড়ে গেল কেলভিন। উত্তর ঠিক করে নিয়ে বলল, ‘নিরাপদ না হবার ও নিরিবিলি না হবার অবস্থা নেই।’

‘তাহলে মিনি সাব পরিবহনের বিলাসিতা কেন? আসল কথা হলো, মিনি সাব সামরিক-যান। এই মিনি সাব ও সাও তোরাহ দ্বীপকে আজোরসের বিরুদ্ধে কোন সামরিক ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং নিশ্চয় এই ষড়যন্ত্রের পিছনে বাইরের কোন শক্তি কাজ করছে।’

বলে আহমদ মুসা একটু থেমেই আবার তীব্র কণ্ঠে বলে উঠল, ‘বলুন আপনারা কার এজেন্ট হিসেবে কাজ করছেন?’

কথা শেষ হবার আগেই আহমদ মুসার রিভলবার কেলভিনের বুক বরাবরে এসে স্থির হলো।

ফ্যাকাশে হয়ে উঠল কেলভিনের মুখ। কম্পিত কণ্ঠে কেলভিন বলল, ‘না না আমরা আজোরসের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করছি না। এমন বিষয় আমাদের কল্পনাতেও নেই।’

‘তাহলে কি করছেন আপনারা আজোরস?‘ কণ্ঠের স্বর কঠোর হয়ে উঠেছে আহমদ মুসার।

কেলভিন কোন উত্তর দিল না। তার চোখ-মুখ ভয় ও উদ্বেগে আরও চুপসে গেল।

আহমদ মুসা ভাবল, আসল কথা কেলভিন বলবে না, মরলেও না। সুতরাং এ পথে না গিয়ে বরং প্রয়োজনীয় তথ্য যা পাওয়া যায় এর কাছ থেকে উদ্ধার করা উচিত। বলল আহমদ মুসা, ‘তোমাদের মিনি সাব দ্বীপপুঞ্জের কোথায় কোথায় ল্যান্ড করে? নিজস্ব জেটিতে, না কোন প্রাইভেট জেটিতে?’

‘কোন জেটিতেই ল্যান্ড করে না। কোন দ্বীপে এলে মিনি সাব উপরে ভেসে ওঠে এবং এরপর বোটের মাধ্যমে তীরে যাতায়াত চলে।’ বলল কেলভিন।

‘মিনি সাব দ্বীপপুঞ্জের নৌপথের সব রুটেই চলে, না এর নিজস্ব রুট আছে?’ আহমদ মুসা বলল।

‘নিজস্ব রুট আছে।’

‘এই রুটে কোন কোন দ্বীপ পড়ে?’

‘রাজধানী পঁতা দেলগা বন্দর ও হারতা পড়ে। একটা মিনি সাব পঁতা দেলগা থেকে হারতা আসে এবং আবার পঁতা দেলগাতে ফিরে যায়। আরেকটা মিনি সাব সাও তোরাহ ও হারতা পর্যন্ত যাতায়াত করে।’

‘সাও তোরার তো নিজস্ব জেটি আছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘না সাও তোরার কোন জেটি নেই কোন বন্দরও নেই।’ কেলভিন বলল।

‘তাহলে সাও তোরার বোট, জাহাজ ইত্যাদি কোথায় থাকে? মিনি সাবই বা কোথায় ভেড়ে?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা। তার ভ্রু কুঞ্চিত।

আহমদ মুসার কঠোর মুখভাবের দিকে একবার তাকিয়ে কেলভিন আমতা আমতা করে বলল, ‘সাও তোরাহ’র সাথে শুধু মিনি সাবের মাধ্যমেই যোগাযোগ হয়। বোট বা লঞ্চে সাও তোরাহ গেলেও উপকূলে গিয়ে মিনি সাবেই উঠতে হয়।

‘কেন?’ আহমদ মুসার চোখে-মুখে অপার বিস্ময়।

নতুন ভয় ও উদ্বেগসহ একটা অসহায়ভাব ফুটে উঠল কেলভিনের চোখে-মুখে। বলল, ‘একটা সিগারেট খেতে পারি।’

‘খান।’ আহমদ মুসা অনুমতি দিল।

কেলভিন কেনেইরা পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট নয় সিগারেট বের করল।

সে সিগারেট বের করার সময় হঠাৎ আহমদ মুসার চোখে পড়ল সিগারেটের গোড়ার দিকে সিগারেটের গায়ে ফিল্টার রং ঠিকই আছে, কিন্তু ফিল্টার নেই, ফাঁকা। তার উপর সিগারেটটা মনে হলো স্বাভাবিকের চেয়ে একটু লম্বা।

ভ্রুকুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার। আহমদ মুসার রিভলবার কেলভিনের দিকে তাক করাই ছিল। তর্জ্জনিটাও তার চলে এল আবার ট্রিগারে। ভাবনাও তার সম্পূর্ণ হয়েছে। বলল আহমদ মুসা, 'আপনার সিগারেটটাতো খুবই সুন্দর। দেখি কি ব্রান্ডের ওটা।'

কিন্তু ততক্ষণে কেলভিন সিগারেরটা তার ঠোঁটে তুলে নিয়েছে দ্রুত।

'হাসান তারিক শুয়ে পড়' বলেই আহমদ মুসার তর্জনি রিভলবারের ট্রিগারে চেপে ধরে নিজেকে মাটির উপর ছুড়ে দিয়েছে।

পরপর দুটি গুলী ছুড়েছে আহমদ মুসা। একটি গুলী বিদ্ধ করেছে কেলভিনের বুক, অন্য গুলীটি বিদ্ধ করেছে তার বাম পাঁজরকে।

বসে থাকা কেলভিনের দেহটা পেছন দিকে ছিটকে পড়ে গেছে। সিগারেটটা তার মুখ থেকে খসে পড়েছে মাটিতে ঘাসের উপর।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক দুজনেই উঠে বসেছে।

'কি ঘটেছে ভাইয়া ওকে যে গুলী করলেন? সিগারেটটাকে আপনি সন্দেহ করেছেন?' বলল হাসান তারিক।

'হ্যাঁ হাসান তারিক। আমার চোখ যদি ঠিক দেখে থাকে, তাহলে ওটা একটা ভয়ংকর বন্দুক।'

বলে আহমদ মুসা উঠে গিয়ে সিগারেটটা হাতে তুলে নিল। সিগারেট টিউবের দুপ্রান্তে চোখ বুলিয়ে বলল, 'সন্দেহটা ঠিক হাসান তারিক। রীতিমত এটা একটা মেশিনগান। এর ফিল্টার টপের উপর ঠোঁটের চাপ পড়লেই টিগ্রার সক্রিয় হয়ে উঠে এবং সুচের অগ্রভাগের মত সূক্ষè ও তীক্ষè এক ঝাঁক বুলেট বেরিয়ে গিয়ে চারদিক ছড়িয়ে পড়ে আঘাত করে। সামনে দশ বারজন লোক থাকলেও তাদের সকলকে কভার করার জন্যে একবার ট্রিগারে চাপ দেয়াই যথেষ্ট।'

'নিশ্চয় কোন ভয়ংকর বিষ মেশানো আছে ঐ বুলেটগুলোতে। না হলে সুচাগ্র বুলেট কতটুকু আর ক্ষতি করবে?' বলল হাসান তারিক।

আহমদ মুসা বলল, 'তুমি ঠিক বলেছ হাসান তারিক। চলত পরীক্ষা করি।'

বলে আহমদ মুসা একটু পিছিয়ে গিয়ে এক ধরনের গাছের বড় পুরু পাতায় একটা ফায়ার করল। কয়েকটা সুচাগ্র বুলেট গিয়ে বিদ্ধ করল পাতাটিকে।

মিনিটখানেক অপেক্ষা করতে হলো। এর মধ্যেই বড় পাতাটি নেতিয়ে গিয়ে তার কান্ডের উপর ঝুলে পড়ল।

বিস্ময় আহমদ মুসা ও হাসান তারিক দুজনের চোখে-মুখেই। হাসান তারিক বলল, 'আহমদ মুসা ভাই এটা ভয়ংকর ধরনের এক পয়জন যা জীবিত সবকিছুকেই মুহূর্তে ধ্বংস করতে পারে।'

'আল্লাহ আমাদের রক্ষা করেছেন হাসান তারিক।' বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে হাঁটা শুরু করে বলল, 'চল হাসান তারিক, এলাকাটা একটু ঘুরে দেখা যাক।'

তারা এদিক ওদিক ঘুরে পাহাড় ঘেরা উপত্যকা করিডোরটির একদম উত্তর প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালো। এখান থেকে উপত্যকা প্রায় খাড়াভাবে বিশ গজ নেমে গেছে। তারপর ঘন গাছ-পালায় ঢাকা উপত্যকাটি আধা মাইলের মত এগিয়ে সাগরে মিশেছে।

হঠাৎ হাসান তারিক ভ্রু কুঞ্চিত করে সামনের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'এখানে এক ধরনের তেলের গন্ধ পাচ্ছি আহমদ মুসা ভাই।'

শুনে আহমদ মুসাও সেটা অনুভবের চেষ্টা করল। মুহূর্ত কয়েক পরে আহমদ মুসাও বলে উঠল, 'সত্যি বলেছ, এক ধরনের তেলের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।'

'গন্ধটা বেশ ভারী আহমদ মুসা ভাই। এর উৎস খুব দূরে হবে না।' বলল হাসান তারিক।

'সাগরের পানিতে তেল পড়তে পারে। সাগর তো খুব দুরে নয়।' আহমদ মুসা বলল।

ভাবছিল হাসান তারিক। বলল, 'ভাইয়া সাগরের পানিতে তেল মেশার পর তার গন্ধ এতটা ভারী হবার কথা নয়।'

'তাহলে?' বলল আহমদ মুসা।

‘আমার মনে হয় ভিন্ন কোন উৎস থেকে তেলের এই গন্ধ আসছে।’ হাসান তারিক বলল।

‘সে ভিন্ন উৎসটা কি হতে পারে?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘আমি বুঝতে পারছি না আহমদ মুসা ভাই।’ বলল হাসান তারিক।

আহমদ মুসারা হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছিল। তারা এসে পড়েছে ঘাসে ঢাকা উন্মুক্ত উপত্যকাটার উত্তর-পূর্ব কোণের একদম প্রান্তে। সামনেই পাহাড়ের প্রাচীর।

হঠাৎ পাহাড়ের প্রাচীরের এক টুকরো নীল রংয়ের উপর চোখ আটকে গেল আহমদ মুসার।

এগিয়ে গেল আহমদ মুসা প্রাচীরের কাছে। দেখল, নীর রং দিয়ে একটা উর্ধমূখী তীর আঁকা। তীরের দন্ডটি জিগজ্যাগ। তীরের চারদিক ঘিরে বহুকৌণিক একটা সীমান্ত আঁকা সীমান্তের উপর চোখ বুলাতে গিয়ে চমকে উঠল আহমদ মুসা। বহুকৌণিক সীমান্তটিকে মনে হলো একটি হিব্রু অক্ষর যার উচ্চারণ ইংরেজী ‘প্রসিড’ এর সমার্থক।

আহমদ মুসার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই এক প্রশ্ন এসে এই ঔজ্জ্বল্যকে আচ্ছন্ন করে দিল।

আহমদ মুসা পাহাড়ের দেয়ালের অংকনটির দিকে ইংগিত করে বলল, ‘হাসান তারিক দেখ তো কিছু বুঝতে পারো।’

আহমদ মুসার সাথে হাসান তারিকও অংকনটিকে দেখছিল। বলল, ‘তীরটি উপরের দিকে অর্থাৎ সামনের দিকে একটা পথের ইংগিত করছে।’

‘আর চারদিকের কৌণিক বৃত্তটি?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘আমি বুঝতে পারছি না ভাইয়া।’

‘দেখ ওটা একটা হিব্রু অক্ষর।’

ভ্রু কুঞ্চিত হয়ে উঠল হাসান তারিকের। বলল, ‘ঠিক ভাইয়া।’

তারপরেই হাসান তারিক আবার উচ্ছসিত কণ্ঠে বলে উঠল, ‘কেউ যেন সামনে ‘প্রসিড’ মানে অগ্রসর হবার জন্যে নির্দেশ দিচ্ছে।’

‘নির্দেশ দাতা কে?’ প্রসন্ন মুখে জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘হিব্রু অক্ষরের উপস্থিতি প্রমাণ করছে সে নিদের্শদাতা ইহুদী কেউ।’ বলল হাসান তারিক।

‘ধন্যবাদ হাসান তারিক।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কিন্তু কোথায় অগ্রসর হতে নির্দেশ দিচ্ছে?’ জিজ্ঞাসা হাসান তারিকের।

‘সেটাই এখন প্রশ্ন।’ বলে একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর আবার বলে উঠল, ‘কেলভিনের কাছ থেকে আমরা জানলাম এই উপত্যকাটা ইহুদীরা মানে WFA (ওয়ার্ল্ড ফ্রিডোম আর্মি) লীজ নিয়েছে। লিজ নিয়েছে নিশ্চয় কোন কাজে লাগাবার জন্যে। সেই কাজটা কি? আমার মনে হয় এই ‘তীরটি’র সাথে এই জিজ্ঞাসার সম্পর্ক আছে।’

‘তার মানে তীরের নির্দেশ অনুসারে সামনে অগ্রসর হলে জিজ্ঞাসাটির জবাব পাওয়া যাবে।’ বলল হাসান তারিক।

‘তাই মনে হয়।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কিন্তু অগ্রসর হবো কিভাবে?’ চারদিকে চোখ বুলাবার সাথে সাথে জিজ্ঞেস করল হাসান তারিক।

‘চারদিকে নয় হাসান তারিক। তীরের দিক-নির্দেশনার দিকে তাকাও। দেখ আমরা পাহাড়ের প্রাচীর বেয়ে যদি উপরে উঠি, তাহলে কিছুটা উপরে গিয়েই আমরা একটা ‘ষ্টেপ’ পাচ্ছি। ষ্টেপটা দুই পাহাড়ের টিলার মধ্য দিয়ে সামনে এগিয়ে গেছে সামনের আরেক পাহাড়ের দেয়ালের দিকে। ঐ দেয়ালে পৌছে কি করতে হবে, তার নির্দেশ বোধ হয় ওখানে গেলেই পাওয়া যাবে।’ বলল আহমদ মুসা।

হাসান তারিকের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বলল, ‘চলুন ভাইয়া তাহলে অগ্রসর হই। জিজ্ঞাসাটির জবাব না নিয়ে আমরা ফিরছি না।’

‘আমারও তাই মত। চল হাসান তারিক।’ বলে আহমদ মুসা পাহাড়ের দেয়ালে ওঠার জন্যে সামনে অগ্রসর হলো।

দুজনেই পাহাড়ের ধাপে উঠে এল।

ধাপ বা ষ্টেপের মুখটা সরু। কিন্তু তারা দেখল, মুখের কয়েক গজ পরেই ধাপটা প্রশস্ত হয়েছে এবং তা এগিয়ে গেছে সামনের পাহাড়টার দেয়াল পর্যন্ত। তারপর তা সংকীর্ণ এক গিরিপথ আকারে এঁকে বেঁকে এগিয়ে গেছে উত্তর দিকে।

‘চল আমরা এগোই।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কোথা?’ জিজ্ঞাসা হাসান তারিকের।

‘জানি না। তবে পথে এগুলে এই উপত্যকা কেন WFA লীজ নিয়েছে তার রহস্য জানা যাবে। এই পথে গুরুত্বপূর্ণ পাহাড়ের গায়ে তীর চিহ্ন তা প্রমাণ করে।’ বলল আহমদ মুসা।

গিরিপথ ধরে এগুলো তারা।

হঠাৎ এক সময় মাটি থেকে একটা জিনিস তুলে নিয়ে চিৎকার করে বলল, ‘এই যে আহমদ মুসা ভাই একটা সিগারেটের গোড়া পাওয়া গেছে। তার মানে গিরিপথ দিয়ে লোকজন যাতায়াত করেছে।’

আহমদ মুসা থমকে দাঁড়িয়ে ফিরল। হাত বাড়িয়ে বলল, ‘দাও দেখি সিগারেটের গোড়াটা।’

সিগারেটের গোড়াটা হাতে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে বলল, ‘গোড়াটা টাটকা নয় দেখছি। দুএকদিনের মধ্যে নয়, তবে এই পথে লোক যাতায়াত করেছে।’

আবার হাঁটা শুরু করল তারা।

পথে সিগারেটের টুকরো, ভাঙা চারাগাছ, চকলেটের মোড়ক, প্রভৃতি মানুষ চলাচলের আরও কিছু চিহ্ন তারা পেল। কিন্তু সবই বেশ পুরানো। এক জায়গায় পেল একখন্ড দলা পাকানো কাগজ।

আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি তুলে নিল কাগজের দলাটি। কাগজের দলাটি তাড়াতাড়ি খুলল।

কাগজটা আয়তাকৃতির একটা স্লিপ পেপার। কাগজের এক পৃষ্ঠা সাদা। অন্য পৃষ্ঠায় একটা মোবাইল টেলিফোন নাম্বার লেখা। তার সাথে কয়েকটি তারিখ। এলোপাথাড়ী লেখা তারিখগুলো সবই সামনের।

মোবাইল নাম্বারটি চিনতে পারল আহমদ মুসা। কেলভিনের কাছ থেকে একটাই মোবাইল টেলিফোন নাম্বার পাওয়া গেছে। আর সেটা এই নাম্বার।

হাসান তারিকও কাগজটি দেখল। সেও টেলিফোন নাম্বারটি চিনতে পারল। কিন্তু তারিখ সম্পর্কে বলল, 'এগুলোর বোধ হয় কোন অর্থ নেই। কেউ এমনিই এলোপাথাড়ি লিখে থাকতে পারে।'

'হতে পারে, কিন্তু দেখ তারিখগুলোর একটা তারিখ কেটে দিয়ে সেটা আবার লেখা হয়েছে। অর্থহীন আঁচড় হলে একটা তারিখ কেটে দিয়ে তা আবার সংশোধন করার দরকার ছিল না।' বলে আহমদ মুসা কাগজের খন্ডটি পকেটে রেখে দিল।

গিরিপথ ধরে তারা একেবারে উপকূলে পৌছে গেল।

উপকূল দেখে তারা বিস্মিত হলো।

পাহাড় ঘেরা মাঠ থেকে যে উপত্যকা নেমে এসেছে তার শেষ প্রান্তটা, মানে উপকূল অংশটা পাহাড় ঘেরা ঘাসে ঢাকা মাঠটা যেমন খাড়া বিশ ফুট নেমে গিয়ে একটা সবুজ সমতল উপত্যকার সৃষ্টি করেছে, তেমনি নগ্ন পাথুরে উপকূলটি খাড়া সমুদ্রে নেমে গেছে। সবচেয়ে লক্ষণীয় হলো সাগর এখানে শান্ত।

বিস্মিত হাসান তারিক বলে উঠল, 'ভাইয়া এটা একটা ন্যাচারাল পোর্ট। পাথুরে উপকূলটা একটা ন্যাচারাল জেটিও এবং সাগর এখানে অত্যন্ত গভীর। সাবমেরিনসহ যে কোন জাহাজ এই পাথুরে জেটিতে ল্যান্ড করতে পারে। এমন ন্যাচারাল পোর্ট পৃথিবীতে আর আছে কি না সন্দেহ।'

আহমদ মুসা অপার বিস্ময় নিয়ে তাকাল হাসান তারিকের দিকে। বলল, 'সাগর এখানে অত্যন্ত গভীর কি করে বুঝলে?'

মেরিন ইঞ্জিনিয়ার হাসান তারিক জবাব দিল, উপকূল হওয়া সত্ত্বেও সাগর এখানে এতটা শান্ত হওয়াই তার প্রমাণ।'

'ও আল্লাহ! পাহাড় ঘেরা দুর্গম এই উপত্যকা ন্যাচারাল পোর্ট বলেই WFA এটা লীজ নিয়েছে।' বলেই আহমদ মুসা প্রবল উচ্ছাসে চিৎকার করে উঠল, 'এটাই তাহলে ওদের দুই মিনি-সাব লাইনের সংযোগ বন্দর। 'পঁতা

দেলগা’ থেকে আসা মিনি-সাব এখানে নোঙর করে, আবার এখান থেকেই মিনি-সাব সাও তোরাহ যায়।’

হাসান তারিকও উচ্ছসিত হয়ে উঠল। বলল, ‘ঠিক বলেছেন ভাইয়া, এটাই ওদের সংযোগ বন্দর।’

একটু থেমেই হাসান তারিক আবার বলে উঠল, ‘ভাইয়া তেলের যে গন্ধ পেয়েছিলাম সেটা এখান থেকেই। দেখুন এখানকার মাটি থেকেই এই গন্ধ আসছে। এটা সাবমেরিন ওয়েলের গন্ধ।’

আহমদ মুসার মুখে হাসি ফুটে উঠল। বলল, ‘হ্যাঁ তেলের গন্ধ এখান থেকেই উঠেছে। এ থেকে আরও নিশ্চিত প্রমাণ হচ্ছে যে, ওদের মিনি সাবমেরিন এখানে নোঙর করে।’

‘কিন্তু আশ্চর্য ভাইয়া, ওরা এখানে কোন স্থাপনা গড়ে তোলেনি।’ বলল হাসান তারিক।

‘চল একটু ঘুরে দেখা যাক।’ আহমদ মুসা বলল।

‘চলুন।’ বলল হাসান তারিক।

# ২

হারতা গোয়েন্দা সদর দফতরের আন্ডার গ্রাউন্ড একটা কক্ষে বড় ধরনের একটা চেয়ারে আছড়ে বসালো পলা জোনসকে আজর ওয়াইজম্যানের দুর্ধর্ষ দক্ষিণ হস্ত ডেভিড ইয়ামিন।

ডেভিড ইয়ামিন ইস্পাতের মত শক্ত ও ঋজু দীর্ঘকায় লোক। নাকের নিচে একখন্ড হিটলারী গোফ। তার চোখ-মুখ থেকে ঠিকরে পড়ছে নৃশংসতা। পলা জোনসকে চেয়ারে আছড়ে ফেলেই ডেভিড ইয়ামিন বলে উঠল, 'মি. ভিক্টর রাইয়া আমি দু:খিত যে পলা জোনস আপনার একজন ষ্টাফ। আপনাদের অজান্তেই ভয়ংকর এক শত্রুর এজেন্ট সে। সুতরাং তার প্রতি কোন দয়া-মায়া আপনাদের অবশ্যই নেই। মি. কেলভিনসহ আমাদের যতলোক খুন হয়েছে তার জন্যে প্রধানত এই মহিলা দায়ী। আমার উপর নির্দেশ হলো কেলভিনকে কিডন্যাপকারী দুজনের পরিচয় পলার কাছ থেকে আদায় করতে হবে যে কোনভাবেই। আপনার মূল্যবান সহযোগিতা আমরা পেয়েছি। আমাদের জেনারেল (আজর ওয়াইজম্যান) আশা করেন এক্ষেত্রেও আপনি আমাদের সহযোগিতা করবেন।'

বলে ডেভিড ইয়ামিন একটু থেমেই আবার বলে উঠল, 'মি. ভিক্টর রাইয়া আপনি একটু দাঁড়ান। আমি উপর থেকে আসছি।'

ডেভিড ইয়ামিন দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল উপরে।

ডেভিড ইয়ামিন উপরে উঠে যেতেই হারতার গোয়েন্দা প্রধান ভিক্টর রাইয়া পলা জোনসের কাছে ছুটে গেল। বলল, 'পলা আমি তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারবো না। এদের সম্পর্ক ডেপুটি গভর্নর, দেশের প্রধানমন্ত্রী, গোয়েন্দা প্রধান সকলের সাথে। আমি শুধু তাদের হুকুমই তামিল করতে পারি, আর কিছু নয়। তুমি যা জান বলে দাও এদের। তুমি কারও এজেন্ট নও আমি জানি।'

‘স্যার ঠিক বলেছেন, আমি কারও এজেন্ট নই। ওদের সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানি না। সেদিন রাতে WFA-এর লোকদের হাতে ধর্ষিত ও নিহত হওয়া থেকে ওরা আমাকে রক্ষা করে ও উদ্ধার করে। আমি ওদের সম্পর্কে যেটুকু জানি, সেটুকুও আমি বলব না।’ বলল পলা জোনস।

‘কিন্তু তুমি জান আমি তোমাকে এদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবো না। এদের অফুরন্ত টাকা আছে, অশেষ প্রতাপ আছে। এরা ডেপুটি গভর্নর, গভর্নরসহ অনেককেই কিনে ফেলেছে। আমার অফিসে তোমার উপর যা ইচ্ছে তাই হবে, সেটাও আমার পক্ষে সহ্য করা মুশকিল। সবচেয়ে ভাল, তুমি যা জান সব এদের বলে দাও।’ নরম কণ্ঠে বলল ভিক্টর রাইয়া।

পলা জোনসের দুচোখ দিয়ে অশ্রু গড়াল। বলল সে, ‘আপনার সহানুভূতির জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ স্যার। কিন্তু এই নির্দেশ আমি মানতে পারবো না। আমার জীবন গেলেও আমি এ শয়তানদের কোন সহযোগিতা করবো না।

ভিক্টর রাইয়া সংগে সংগে কথা বলল না। কিন্তু তার চোখে-মুখে একটা দৃঢ়তা ফিরে এসেছে। উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার চোখ দুটি। বলল, ‘তোমাকে ধন্যবাদ মা। আমরা প্রত্যেক আজোরসবাসী যদি তোমার মত হতাম ।’ তারও চোখের কোণ অশ্রুতে ভিজে উঠেছে।

একটু থেমেই আবার কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল। এ সময় ডেভিড ইয়ামিন ছুটে নেমে এল সিঁড়ি দিয়ে। তার চোখ-মুখ থেকে ক্রোধ ও উত্তেজনা ঠিকরে পড়ছে। ভিক্টর রাইয়ার কাছাকাছি এসেই সে বলল, ‘মি. ভিক্টর রাইয়া, এই হারামজাদি সবই জানে। এইমাত্র আমাদের লোকেরা খবর দিল, এর মা বুড়ি হারামজাদিকে আমাদের লোকেরা আচ্ছা করে পেটানোর পর স্বীকার করেছে সে পর্যটক দুজন লোককে তার বাড়ির দুটো কক্ষ ভাড়া দিয়েছিল। আমার সন্দেহ নেই, এ দুজন সব কাজের হোতা। আর তাদের সহযোগী ছিল এই হারামজাদী।’

বলেই ডেভিড ইয়ামিন ছুটে গেল পলা জোনসের চেয়ারের কাছে। তার হাত দুটো আটকানো ছিল চেয়ারের হাতলের হুকের সাথে। এবার পা দুটোকেও আটকে দিল পাটাতনের হুকের সাথে। আর চেয়ারের ব্যাকের সাথে বিশেষভাবে

তৈরী দুটো রাবারের হুক দুদিক থেকে এসে কপাল বেষ্টন করে পলা জোনসের মাথাটাকে চেয়ারের ব্যাকের সাথে সেঁটে দিল।

কথা বের করা ও শাস্তি দেয়ার এক মোক্ষম হাতিয়ার এই বৈদ্যুতিক চেয়ার।

পলা জোনসকে বেঁধে ফেলার পর ডেভিড ইয়ামিন চেয়ারের পেছনে হুকে ঝুলানো বৈদ্যুতিক সুইচ মিটার হাতে নিয়ে পলা জোনসকে লক্ষ্য করে বলল, 'শয়তানি, হাতের এই সুইচ টিপলেই তো বৈদ্যুতিক নাচন শুরু হয়ে যাবে। শেষ সুযোগ দিচ্ছি। বল, লোক দুটি কে, এখন কোথায় তারা? কেলভিনকে কোথায় নিয়ে গেছে।' চিৎকার করে কথাগুলো বলল ডেভিড ইয়ামিন।

পলা জোনস চোখ বন্ধ করে ছিল। চোখ খুলল না, কথাও বলল না।

আগুন জ্বলে উঠল ডেভিড ইয়ামিনের চোখে-মুখে। তার ডান হাতের অস্থির বুড়ো আঙুলটি চেপে বসল হাতের সুইচ মিটারের লাল বোতামটির উপর।

মুহূর্তেই চিৎকার করে উঠল পলা জোনস। বুক ফাটা সে চিৎকার। সেই সাথে অস্থির কম্পনের বাঁধন ছেঁড়া ঢেউ জেগে উঠল তার গোটা শরীরে। বেদনায় বিকৃত হয়ে গেল তার মুখ। ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছিল তার দুই চোখ।

মুহূর্তকাল বোতাম চেপে থেকেই সরে এল ডেভিড ইয়ামিনের বুড়ো আঙুল বোতামটি থেকে।

এরপর হাসি ফুটে উঠল ডেভিড ইয়ামিনের চোখে-মুখে। বলল, 'মিটারের কাঁটাতো কেবল সিকিতে উঠেছে, তাতেই এই অবস্থা। বুঝতেই পারছিসকাঁটাটা অর্ধেকে বা পুরোতে উঠলে কি হবে! বল, আমার প্রশ্নের জবাব দে? বল, ঐ দুজনের একজন আহমদ মুসা ছিল কিনা।'

পলা জোনসের মাথাটা ঝুলে গেছে দুদিক থেকে আসা হুকের সাথে। দেহটাও নেতিয়ে পড়েছে চেয়ারের উপর। তার চোখ দুটি বন্ধ। ডেভিড ইয়ামিনের হুংকার যেন কোন প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করল না।

ক্রোধে বিকৃত হয়ে গেল ডেভিড ইয়ামিনের মুখ। হাতের বিদ্যুত মিটারের লাল বোতামটা চেপে ধরল সে।

অবারিত বিদ্যুত গিয়ে ছোবল হানল পলা জোনসের দেহে। চিৎকারে চৌবির হয়ে গেল যেন পলা জোনসের বুক। চিৎকারের সাথে সাথে বাঁধন ছেড়া তীব্রতায় খিঁচুনি দিয়ে উঠল তার দেহ। কপালের দুপাশ এবং হাত ও পা-এর বাঁধনে থেথলে যাওয়া অংশ থেকে লাল রক্তের প্রবাহ নেমে এল।

আন্ডার গ্রাউন্ড ফ্লোরের সিঁড়ির মুখে দাঁড়ানো দুজন ষ্টেনগানধারী অপলক চোখে গ্রাউন্ড ফ্লোরের এই দৃশ্যটা দেখছে। তাদের পেছনে এসে দাঁড়াল শার্প চেহারার ঋজু দেহের একজন তরুণী। গ্রাউন্ড ফ্লোরের দিকে তাকিয়েই তার চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠল। পরমুহূর্তেই চিৎকার করে উঠল, 'আব্বা এসব কি হচ্ছে? পলা আমার ক্লাসমেট, বন্ধু। এরা কারা?'

বলেই তরুণীটি অপরিচিত প্রহরী দুজনকে ঠেলে সিড়ি দিয়ে নামছিল। প্রহরী দুজন তাকে বাধা দিতে যাচ্ছিল।

'সোফিয়া সুসান, তুমি দাঁড়াও আমি আসছি।'

কথা বলার সাথে সাথেই ভিক্টর সিঁড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করেছে।

সোফিয়া সুসান হারতার গোয়েন্দা প্রধান ভিক্টর রাইয়ার মেয়ে। সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন। অফিসে পিতার কাছে এসেছিল। অফিসে না পেয়ে এদিকে আছে শুনে চলে এসেছে।

প্রহরী দুজন সোফিয়া সুসানকে বাধা দিতে এসে মাঝ পথে থেমে গেছে। ডেভিড ইয়ামিন ইংগিতে তাদের থামিয়ে দিয়েছে।

পিতা সিঁড়িতে পৌছার আগেই সোফিয়া সুসান সিঁড়ি পেরিয়ে আন্ডার গ্রাউন্ড ফ্লোরে পৌছে গেল।

তার পিতা আসছিল।

সোফিয়া সুসান তার মুখোমুখি হলো। আগের প্রশ্নেরই পুনরাবৃত্তি করল সোফিয়া সুসান, 'এ সব কি হচ্ছে আব্বা? পলা আমার বন্ধু, তাকে আমি জানি। কি অপরাধ করেছে সে?'

মেয়ের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ভিক্টর রাইয়া বলল, 'সব বলব মা, তুমি এখান থেকে চলে যাও।'

‘এরা কারা আব্বা? এরা তোমার গোয়েন্দা বিভাগের লোক নয়?’ প্রশ্ন করল সোফিয়া সুসান।

‘সবই বলব। চল উপরে।’ বলল ভিক্টর রাইয়া।

‘না আব্বা সব শুনতে চাই। ওরা কেন পলাকে নির্যাতন করছে। কি দোষ পলার? ওরা নির্যাতন করবেন কেন?’

বিব্রত ভাব ফুটে উঠল ভিক্টর রাইয়ার চোখে-মুখে। মুখ ফিরিয়ে তাকাল সে ডেভিড ইয়ামিনের দিকে। তারপর বলল, ‘সে অনেক কথা মা, চল বলছি আমি।’

‘না আব্বা, পলা তোমার গোয়েন্দা কর্মী। বাইরের লোক তাকে নির্যাতন করছে। এর কারণ না বললে আমি পলাকে নিয়ে যাব।’ বলল সোফিয়া সুসান।

পলা জোনসের দেহটা নেতিয়ে পড়েছিল চেয়ারের উপর। তার চোখ বন্ধ।

ডেভিড ইয়ামিন তার হাতের বিদ্যুত মিটারটা মেঝের উপর ফেলে দিয়ে তাকাল সোফিয়া সুসানের দিকে। বলল, ‘মিস সুসান, মিস পলা জোনস মৌলবাদী সন্ত্রাসী আহমদ মুসাকে আশ্রয় দিয়েছে, সাহায্য করেছে এবং আমাদের কয়েকজন লোককে হত্যা করিয়েছে।’

বিস্ময় ফুটে উঠল সোফিয়া সুসানের চোখে-মুখে। গভীর দৃষ্টিতে তাকাল সে ডেভিড ইয়ামিনের দিকে। ভাবনার চিহ্ন ফুটে উঠল তার চোখে-মুখে। বলল, ‘ও! আপনি তাহলে আজর ওয়াইজম্যানের লোক!’

গম্ভীর কণ্ঠে এ কথাগুলো বলেই হেসে উঠল সোফিয়া সুসান। বলল ডেভিড ইয়ামিনকে হালকা কণ্ঠে, ‘মি. ডেভিড ইয়ামিন আপনার কথা ঠিক নয়। পলা জোনস আহমদ মুসাকে সাহায্য করতে পারে না, বরং আহমদ মুসা সাহায্য করতে পারে পলা জোনসকে। কারণ পলা জোনসের ভাইকে আপনারা হত্যা করেছেন। আর আপনাদের কয়েকজন লোককে পলা জোনস হত্যা করেনি, নিহত হয়ে থাকলে আহমদ মুসাই তাদের হত্যা করেছেন। আহমদ মুসার সাথে আপনাদের এটা পুরনো যুদ্ধ।’

বলে একটু থেমেই একটু হেসে সোফিয়া সুসান বলল, ‘আহমদ মুসাকে আপনি মৌলবাদী সন্ত্রাসী বলছেন, কিন্তু জানেন তো খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইহুদী সন্ত্রাস ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আমেরিকার এক মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তাকে আখ্যায়িত করেছে।’

কিছু বলতে যাচ্ছিল ডেভিড ইয়ামিন। এমন সময় উপর থেকে কয়েকটা গুলীর শব্দ ভেসে এল।

ডেভিড ইয়ামিন থেমে গেল।

সবাই উৎকর্ণ হয়ে উপর দিকে তাকাল।

পর মুহূর্তেই সিঁড়ির মুখে দাঁড়ানো প্রহরী দুজনাকে তাদের ষ্টেনগান তুলতে দেখা গেল। তাদের চোখে-মুখে উত্তেজনা।

কিন্তু তাদের ষ্টেনগান টার্গেটে স্থির হবার আগেই দুটি গুলীর শব্দ হলো এবং প্রহরী দুজন গুলীবিদ্ধ হয়ে ঢলে পড়ল।

পকেট থেকে রিভলবার বের করল ডেভিড ইয়ামিন।

সিঁড়ির মু্খে এসে দাঁড়িয়েছে আহমদ মুসা ও হাসান তারিক।

রিভলবার তুলে গুলী করল ডেভিড ইয়ামিন।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক সিঁড়ি মুখে এসেই তাকিয়েছিল নিচে। দেখতে পেয়েছিল তাদের দিকে উঠে আসা রিভলবার। ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তারা দুজনে সিঁড়ির উপর।

সিঁড়ি দিয়ে তারা গড়িয়ে আসতে লাগল। ডেভিড ইয়ামিন পর পর তিনটি গুলী ছুড়ল। কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়া দেহ দুটির একটিরও নাগাল পেল না।

আগে গড়িয়ে পড়েছিল আহমদ মুসা। রিভলবারের ট্রিগার থেকে তার তর্জনি মুহূর্তের জন্যে আলগা হয়নি। সিঁড়ি থেকে তার দেহ মেঝেয় ছিটকে পড়ে স্থির হবার আগেই আহমদ মুসার রিভলবারের গুলী ছুটে গেল ডেভিড ইয়ামিনের দিকে।

ডেভিড ইয়ামিনও তার রিভলবার তুলেছিল আহমদ মুসার লক্ষ্যে। সে অপেক্ষা করছিল আহমদ মুসার দেহ মেঝেয় পড়ে স্থির হবার জন্যে, যাতে তার শেষ দুটি গুলী লক্ষ্য ভ্রষ্ট না হয়।

কিন্তু গুলী করার আর সুযোগ হলো না ডেভিড ইয়ামিনের। তার আগেই গুলী বিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ল তার দেহ।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

হাসান তারিকও গড়িয়ে চলে এসেছিল। সেও উঠে দাঁড়াল।

দ্রুত এগোল আহমদ মুসা পলা জোনসের দিকে। হাসান তারিকও।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক দুজনেই পলা জোনসের বাঁধন খুলতে লাগল।

গোলাগুলীর শব্দে পলা জোনস চোখ খুলেছিল। তার নেতিয়ে পড়া দেহ টেনে সোজা করার চেষ্টা করেছিল তারা। আহমদ মুসা তার বাঁধন খোলা শুরু করলে সে 'ভাইয়া' বলে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

সোফিয়া সুসান দেখছিল আহমদ মুসাকে। মুহূর্তেই তার মনে হয়েছে, ইনিই আহমদ মুসা হবেন। তার চোখে-মুখে ফুটে উঠেছিল সপ্রশংস বিস্ময়। সে চোখ ফেরাতে পারেনি আহমদ মুসার দিক থেকে। অনেকটাই সে আনমনা হয়ে পড়েছিল। কিন্তু হঠাৎ তার পিতাকে আকস্মিক দ্রুততায় সিঁড়ি মুখের দিকে ফিরে তাকাতে দেখে সোফিয়া সুসানও সেদিকে চোখ তুলল।

সোফিয়া সুসানের আব্বা দাঁড়িয়েছিল সোফিয়া সুসানের পরেই। তার পরেই কিছু দূরে আহমদ মুসা ও হাসান তারিক দ্রুত পলা জোনসের বাঁধন খুলে দিচ্ছিল। সুতরাং সুসানের পিতার দৃষ্টি সিঁড়ি মুখের দিকে ঘুরে যেতেই সোফিয়া তাকে অনুসরণ করেছিল।

সোফিয়া সুসান দেখল, সিঁড়ি মুখে দুজন লোক এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের দুজনের চোখ নিহত ডেভিড ইয়ামিনের লাশের দিকে। বিস্ময় বিস্ফোরিত দৃষ্টি তাদের চোখে-মুখে।

পরমুহূর্তেই তাদের চোখ ঘুরে গেল আহমদ মুসা ও হাসান তারিকের দিকে। লোক দুজনের হাতে রিভলবার। আহমদ মুসাদের একবার দেখে নিয়েই লোক দুজন তাদের রিভলবার তুলছিল।

তাদের মতলব বুঝতে পেরেছিল সোফিয়া সুসান। আহমদ মুসা ও তার সাথীই তাদের টার্গেট। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল সোফিয়া সুসানের মন। বিপরীত

দিকে ঘুরে আহমদ মুসারা পলা জোনসের বাঁধন খুলছিল। নির্ঘাত মারা পড়বে তারা। এই কুচিন্তাটা সোফিয়া সুসানের মনকে আচ্ছন্ন করার সাথে সাথেই চোখের পলকে তার হাতের রিভলবারটা উঠে এল এবং তার দক্ষ হাত ফায়ার করল লোক দুজনকে।

আহমদ মুসাদের লক্ষ্য করে লোক দুজনের রিভলবার তোলার মধ্যে ছিল দ্বিধাগ্রস্তভাব। সম্ভবত তারা নিশ্চিত হতে পারছিল না, কে ডেভিড ইয়ামিনকে হত্যা করেছে, আহমদ মুসারা না ভিক্টর রাইয়ারা। সোফিয়া সুসানের হাতে রিভলবার দেখেই সম্ভবত এই জিজ্ঞাসা তাদের মনে জেগেছিল।

এর ফলেই সুযোগ পেয়ে গেল সোফিয়া সুসান। তার রিভলবারের পর পর দুটি গুলী গিয়ে বিদ্ধ করল লোক দুজনের বক্ষ।

গুলীর শব্দ শুনেই আহমদ মুসা ও হাসান তারিক তড়াক করে ফিরে তাকাল। দেখল ভিক্টর রাইয়ার পাশে দাঁড়ানো তরুণীর রিভলবার সিঁড়ি মুখের দিকে উদ্যত। ধোঁয়ার রেশ তখনও তার রিভলবারের নলে। আর সিঁড়ি মুখের দুজন লোক গুলী খেয়ে পড়ে যাচ্ছে। তরুণীটির বয়স বিশ-বাইশের বেশি হবে না। ডীপ ব্লু ট্রাউজারের উপর ডীপ ব্লু সার্ট। গাড় নীলের আবরণে যেন নিখুঁত একটি সাদ গোলাপ। যেমন ঋজু স্পোর্টি দেহ, তেমনি অসাধারণ বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা।

'থ্যাংকস মিস.....।'

সোফিয়া সুসানের দিকে তাকিয়ে বলল আহমদ মুসা।

'আমি সোফিয়া সুসান।' আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল সোফিয়া সুসান।

পলা জোনসের বাঁধন খোলা হয়ে গিয়েছিল। আহমদ মুসা ও হাসান তারিক তাকে তুলে দাঁড় করাচ্ছিল। সোফিয়া সুসানের কথার উত্তরে আহমদ মুসা বলল, 'আপনি ভিক্টর রাইয়ার মেয়ে নিশ্চয়?'

পলা জোনস উঠে দাঁড়িয়েছিল। দূর্বল কণ্ঠে টেনে টেনে বলল সে 'হ্যাঁ ভাইয়া। সে আমার বন্ধুও।'

'হ্যাঁ, তোমার বন্ধু বলেই আমাদের জীবনও উনি রক্ষা করেছেন। কিন্তু এরা দুজন এল কোত্থেকে? আমি আসার সময় এরা বাধা দেয়নি কেন?' বলল আহমদ মুসা।

'আমি দেখেছি। ওরা সমানে মদ গিলছিল। সম্ভবত গুলীর শব্দে ওদের নেশা কেটে যায়।' বলল সোফিয়া সুসান।

'তাই হবে।' বলে আহমদ মুসা তাকাল হাসান তারিকের দিকে। বলল, 'তুমি মৃত কয়েকজনকে সার্চ করে দেখ ওদের কোন ঠিকানা বা মিনি-সাব সম্পর্কে কোন তথ্য পাও কিনা।'

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়াল ভিক্টর রাইয়ার দিকে। বলল, 'মি. ভিক্টর রাইয়া আমি জানি আপনি পলা জোনসকে ¯েœহ করেন। কিন্তু আশ্চর্য হচ্ছি WFA এর আজর ওয়াইজম্যান আজোরস সরকারের উপর এতটাই প্রভাব রাখে যে, আপনাকে নিরবে তাদের জঘন্য আবদার মেনে নিতে হলো!'

বিব্রত দেখালো ভিক্টর রাইয়াকে। বলল সে, 'পলা জোনস তাদের শত্রু নয়। আপনার জন্যেই তার এই দূর্দশা।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু তাই বলে আপনার এক অধঃস্তন ষ্টাফকে আপনি ঠেলে দেবেন জানোয়ারের হাতে?' বলল আহমদ মুসা।

'পলার উচিত ছিল আপনার কথা ওদের বলে দেয়া। আপনাকে সে আড়াল করবে কেন?' ভিক্টর রাইয়া বলল।

'আপনার একথাও ঠিক। কিন্তু তাই বলে আপনার একজন ষ্টাফকে আজর ওয়াইজম্যানের লোকদের হাতে ছেড়ে দেবেন? আজর ওয়াইজম্যানদের কাছে মনে হচ্ছে আপনার সরকার অসহায়। কেন?'

কিছুটা বিরক্তি কিছুটা ক্রোধ প্রকাশ পেল ভিক্টর রাইয়ার চোখে-মুখে। কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তাকে বাধা দিয়ে সোফিয়া সুসান আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'মাফ করবেন। আপনি নিশ্চয় আহমদ মুসা। আমার পিতার জবাবটা আমিই দিচ্ছি। দেখুন, আজোরস কোন রাষ্ট্র নয়, একটা রাষ্ট্রের অংশ মাত্র। আমার আব্বা এই অংশের একজন অফিসার মাত্র। তাঁর পছন্দ অপছন্দের

সীমা খুবই সীমিত। আর এ বিষয়টা আপনার চেয়ে ভাল কেউ জানার কথা নয়। সুতরাং আপনার প্রশ্ন অবান্তর।'

'আপনার কথা ঠিক। কিন্তু কেন্দ্র কিংবা প্রাদেশিক WFA কে এ ধরনের সহযোগিতা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে আমার মনে হয় না।' বলল আহমদ মুসা।

'সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রয়োজন হয় না। যখন কেন্দ্রীয় কিংবা প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ অসম্ভব সব সুযোগ-সুবিধা WFA-কে দিচ্ছে, তখন অধস্তন কর্মকর্তাদের বুঝতে বাকি থাকে না তাদের কি করতে হবে। এর বাইরে লোভ-লালসার প্রশ্ন তো আছেই। একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। নৌবাহিনীর অনুসন্ধানী বিমান কল করল যে, সাও তোরাহ দ্বীপ থেকে তারা মাঝে মাঝেই দুর্বোধ্য ইলেক্ট্রনিক সিগন্যাল মনিটর করছে যার ডিকোড ও সন্ধান পাওয়া প্রয়োজন। কমান্ড অফিস থেকে আমিই রিপোর্ট সুপারিশসহ প্রদেশ ও কেন্দ্রে পাঠিয়েছিলাম। দুদিন পরেই উত্তর এসেছিল, 'দ্বীপটা বোটানিক্যাল গবেষণার জন্যে লীজ দেয়া হয়েছে। দ্বীপের ব্যাপারগুলো তোমরা ইগনোর কর।' অথচ জাতীয় নিরাপত্তার সুস্পষ্ট বিধান হলো, রাষ্ট্রীয় সীমানার ভেতর থেকে কেউই এ ধরনের রেডিও সিগন্যাল আদান-প্রদান করতে পারবে না।' বলল সোফিয়া সুসান।

'মিস সুসান, আপনি কি নৌবাহিনীতে চাকুরী করেন?' বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

'হ্যাঁ, নৌবাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন আমি।' সুসান বলল।

'সাও তোরাহ সম্পর্কে আর কোন তথ্য আপনার কাছে আছে?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'আর কিছু জানি না। কেন এ কথা জিজ্ঞেস করছেন?' সুসান বলল।

আহমদ মুসা একটু দ্বিধা করল, তারপর বলল, 'আমি মনে করি বিষয়টা আপনাকে অবশ্যই জানানো যায়।' কথা শেষ করল। একটা দম নিল আহমদ মুসা। তারপর বলল, 'আমি সাও তোরাহ দ্বীপে যেতে চাই। আমার নাম যখন জানেন তখন এটা নিশ্চয় জানেন যে, WFA আমার পুরনো শত্রু।'

'কিন্তু শত্রুতার জন্যে সাও তোরাহ দ্বীপে কেন?' জিজ্ঞাসা সুসানের।

'সাও তোরাহ্ দ্বীপে এখন আজর ওয়াইজম্যানকে পাওয়া যাবে। এছাড়া বিশেষ কারণও আছে।' বলল আহমদ মুসা।

'আপনার সম্পর্কে যতদূর আমাদের জানা আছে তাতে আজর ওয়াইজম্যানকে খোঁজার জন্যে বা হত্যার জন্যে আপনি সাও তোরাহ্ নিশ্চয় যাবেন না। তাহলে দেখা যাচ্ছে বিশেষ কারণটাই আসল কারণ এবং সেটা ছোট কারণ নয়। কৌতূহল হচ্ছে জানার। আর আপনি আপনার সাথীকে ওদের কোন ঠিকানা বা মিনি-সাব সম্পর্কে কিছু পাওয়া যায় কিনা দেখতে বললেন। সাও তোরায় ওদের ঠিকানা জানেন আপনি। আবার ঠিকানা দেখা কেন? মিনি-সাব মানে মিনি-সাবমেরিনের ব্যাপারটা কি?' সোফিয়া সুসান বলল।

'মিনি সাবমেরিন ওদের গোপন বাহন। এ বাহনে চড়ে তারা সাও তোরাহ্সহ বিভিন্ন গোপন মিশনে যাতায়াত করে। ওদের ঠিকান খুঁজছি কারণ সাও তোরাহ্ যাবার জন্যে ওদের গোপন বাহন মিনি সাব-এর সন্ধান লাভ।' বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা থামতেই সোফিয়া সুসান বলে উঠল, 'আর সাও তোরায় যাওয়ার কারণটা কি?'

'আমি বিদেশী। আমি সাও তোরাহ্ দ্বীপে কোন সময় যাইনি। সাও তোরাহ্ দ্বীপে কি হচ্ছে আমি যদি বলি বিশ্বাস হবে?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'আপনি বললে বিশ্বাস হবে। আমি আপনাকে জানি। আপনি চেগুয়েভারা, মাওসে তুং ও লেনিনের মত একজন বিপ্লবী। কিন্তু তাদের মত উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে আপনি ষড়যন্ত্র, মিথ্যাচার, প্রতারণা, খুন, ইত্যাদিকে বৈধ মনে করেন না। আপনার বিপ্লব আপনার স্বার্থে বা কোন জাতির স্বার্থে নয়, এক পরম সত্তার স্বার্থে যিনি সব মানুষের স্রষ্টা এবং যিনি সব মানুষকে ভালবাসেন ও প্রতিপালন করেন। আপনার বিপ্লব দেশ-ভাষা-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের মঙ্গলের জন্যে। সুতরাং এতে কোন জিঘাংসাবৃত্তি নেই, অহেতুক রক্তপাত নেই, তাড়াহুড়া নেই এবং সব জান্তা, সব বোদ্ধার রূপ নিয়ে, সবার অধিকর্তা হয়ে চেপে বসার অহমিকাও নেই।' কথা শেষ করল সোফিয়া সুসান। কণ্ঠে তার আবেগের আভাস, চোখ দুটি তার উজ্জ্বল।

বিস্ময় ফুটে উঠেছে আহমদ মুসার চোখে-মুখে। আজোরস সেনাবাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন একটি মেয়ে এই কথাগুলো কিভাবে বলতে পারল! দীর্ঘ ও গভীর পর্যবেক্ষণ ছাড়া যে মন্তব্য করা যায় না, সে মন্তব্য তরুণীর মুখে এল কি করে! বলল আহমদ মুসা মেয়েটিকে লক্ষ্য করে, 'এটা আপনার মূল্যায়ন?'

হাসল মেয়েটি। বলল, 'বিশ্বাস হচ্ছে না? আমারও বিশ্বাস হচ্ছে না যে, আহমদ মুসা এমন অল্প বয়সের, এমন ভদ্রলোক গোছের এবং সিনেমার নায়কসুলভ চেহারার এমন একজন মানুষ হবেন। তবে হ্যাঁ, আপনার মিশনের সাথে আপনাকেই মানায়।'

বলে একটু থামল সোফিয়া সুসান। আবার বলতে শুরু করল, 'আপনার অবিশ্বাস ঠিক। এ মূল্যায়ন আমার নয়। কয়েকদিন আগে আমাদের নেভাল হেড কোয়ার্টারে, কনটেমপোরারি চেনজেস ইন রেভ্লুশনারী থিংকিং এন্ড ফিউচার ষ্ট্রাটেজী ফর ন্যাশনাল ডিফেন্স' শীর্ষক বিষয়ের উপর আন্তঃ প্যাসেফিক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এই সেমিনারের সবচেয়ে মূল্যবান বক্তা ছিলেন মার্কিন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটন। তাঁর মূল্যায়নই আমি আমার মত করে আপনাকে বললাম।'

'আপনি যা বললেন, মানে আপনি যে মুল্যায়ন কোট করলেন তাকি আপনি বিশ্বাস করেন?' বলল আহমদ মুসা।

'বিশ্বাস না করলে মনে রাখতাম না, বলতামও না। জানেন, তাঁর বক্তৃতা শোনার পর আমি আপনার সম্পর্কে সব ইনফরমেশন নতুন করে পড়েছি। তাতে বিশ্বাস আমার আরও দৃঢ় হয়েছে এবং আপনাকে দেখার একটা প্রবল ইচ্ছা আমার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল। আমার সে ইচ্ছাও আজ পূর্ণ হলো। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।' সোফিয়া সুসান বলল।

'জেনারেল ওয়াশিংটন তাদের দেশের পলিসি সম্পর্কে কিছু বলেছিলেন?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'তিনি অনেক কথা বলেছিলেন। নোট দেখলে সব কথা বলতে পারব। তবে গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা আমার মনে আছে। সেটা হলো, বিশ বছর আগে নিউইয়র্কের টুইনটাওয়ার লিবার্টি ও ডেমোক্র্যাসি ধ্বংসের বিষয়। তিনি

বলেছিলেন, এই টুইন টাওয়ার ধ্বংসের জন্যে মুসলিম মৌলবাদী ও আল-কায়েদার সদস্যদের ওপর দোষ চাপিয়েছিলাম আমরা। এটা এখন আর প্রশ্নাতীত নয় বলে আমরাও মনে করি। আহমদ মুসাও এর অনুসন্ধান কাজে জড়িয়ে পড়েছে বলে জানতে পেরেছি। আমরাও এ ব্যাপারটাকে খতিয়ে দেখছি। মনে হচ্ছে বিশ বছর আগে আমরা যাকে সত্য বলে ধরে নিয়েছিলাম, সেটা পাল্টে যাবে। এমনও হতে পারে, আমাদের মেরিল্যান্ড অংগরাজ্যের 'নিউ হারমান'-এর সাম্প্রতিক গণহত্যার মতই আর এক কাহিনী হয়ে দাঁড়াবে নিউইয়র্কের টুইনটাওয়ার ধ্বংসের ঘটনা।' জেনারেল ওয়াশিংটনের এই উক্তি বলতে পারেন- আমার পিলে চমকে দিয়েছে।' বলল সোফিয়া সুসান।

'এমন সাংঘাতিক তথ্য, এত বড় একটা খবর কোন পত্রিকায় কিন্তু আসেনি!' আহমদ মুসা বলল।

'সেমিনারের গোটা বিষয়ই ছিল অফ দ্যা রেকর্ড। কোন সাংবাদিককে ডাকা হয়নি। কোন প্রেস রিলিজও করা হয়নি। বাছাই করা ডেলিগেটরাই শুধু শ্রোতা ছিলেন। আমি ষ্ট্রাটেজিক কমান্ডো ইউনিটের একজন কমান্ডার হিসাবে ডেলিগেট ছিলাম।' বলে একটু থেমেই আবার শুরু করল, 'দেখুন, আমি শুধু আপনার প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাচ্ছি। আমার প্রশ্নের জবাব দিন। আপনি কেন যেতে চান সাও তোরায়?'

'সাও তোরাহ একটা বন্দীশালা। ওখানকার নিরপরাধ বন্দীদের উদ্ধার করতে চাই এবং তার মাধ্যমে টুইন টাওয়ার ধ্বংসের হোতাদের সন্ধান ত্বরান্বিত করতে চাই।' বলল আহমদ মুসা।

'কি বলছেন আপনি? সাও তোরাহ দ্বীপ বন্দীশালা? কাদের বন্দীশালা? কিসের বন্দীশালা? আর সে বন্দী উদ্ধারের সাথে টুইনটাওয়ারের কি সম্পর্ক?' সোফিয়া সুসান বলল। উত্তেজিত কণ্ঠ তার।

'আপনি যত প্রশ্ন করেছেন, তার উত্তর দিতে হলে ইতিহাস বলতে হয়। আজর ওয়াইজম্যান..................।'

কথা শেষ করতে পারল না আহমদ মুসা। ভিক্টর রাইয়ার দুহাত ছিল তার কোটের দুই পকেটে। আকস্মিক তার দুহাত বেরিয়ে এসেছে দুই রিভলবার নিয়ে।

বিদ্যুতবেগে তার ডান হাত উঠে এসেছে আহমদ মুসার প্রতি। তার ডান হাত গুলী বর্ষণ করেছে আহমদ মুসার লক্ষ্যে। শুরুতেই ব্যাপারটা নজরে পড়েছিল সোফিয়া সুসানের। 'কি করছেন আব্বা আপনি' বলে সোফিয়া সুসান বাধা দেয়ার ভংগিতে দুহাত বাড়িয়ে তার পিতা ও আহমদ মুসার মাঝখানে ছুটে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু ততক্ষণে ভিক্টর রাইয়া তার রিভলবারের ট্রিগার টিপে ফেলেছে। গুলী গিয়ে আঘাত করল সোফিয়া সুসানের কাঁধে। তার কাঁধে বিদ্ধ না হলে গুলীটা আহমদ মুসার বাম বুকে গিয়ে আঘাত করতো।

সোফিয়া সুসান গুলী বিদ্ধ হওয়ায় ভিক্টর রাইয়া চমকে উঠে থমকে গিয়েছিল এবং রিভলবার ধরা তার ডান হাতটা নিচে নেমে গিয়েছিল। কিন্তু পরমুহূর্তেই তার চোখ দুটি জ্বলে উঠেছিল এবং তার বাম হাতের রিভলবার একটু নড়ে উঠে আহমদ মুসাকে তাক করেছিল। তার তর্জ্জনি ট্রিগারে চেপে বসছিল। কিন্তু ট্রিগারটি ফায়ার লেভেলে পৌছার আগেই সিঁড়ির দিক থেকে ছুটে আসা একটি গুলী তার রিভলবারকে বিদ্ধ করল। তার হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল রিভলবার।

মুহূর্তের জন্যে থমকে গিয়েছিল ভিক্টর রাইয়া। কিন্তু নিমিষেই তার হাতের রিভলবার উপরে উঠে এল। আবার লক্ষ্য আহমদ মুসা।

গুলীবিদ্ধ হয়ে বসে পড়া সোফিয়া সুসানকে তখন পরীক্ষা করছিল সে, গুলী তার কোথায় লেগেছে।

সোফিয়া সুসান দেখতে পেয়েছিল তার পিতার ডান হাতের রিভলবার উঠে আসা। চিৎকার করে উঠেছিল, 'মি. আহমদ মুসা গুলী।'

কিন্তু এবারও গুলী করতে পারল না ভিক্টর রাইয়া। এবার দ্বিতীয় আরেকটা গুলী সিঁড়ির দিক থেকে ছুটে এসে ভিক্টর রাইয়ার ডান হাতের রিভলবারকে আঘাত করল। আগের মতই তার হাত থেকে ছিটকে পড়ল রিভলবার।

সিঁড়ির দিক থেকে দুটি গুলীই করেছিল হাসান তারিক। সে সার্চ করছিল WFA এর লোকদের লাশ। সোফিয়া সুসানের চিৎকার ও গুলীর শব্দে ফিরে তাকিয়েছিল সোফিয়া সুসানের দিকে। আঁৎকে উঠেছিল অবিশ্বাস্য ঘটনা দেখে।

দ্রুত তার হাত পকেট থেকে বের করে এনেছিল তার রিভলবার। তার ছোঁড়া দুই গুলী ব্যর্থ করে দিয়েছিল আহমদ মুসাকে হত্যার ভিক্টর রাইয়ার শেষের দুই উদ্যোগকে। আর প্রথম উদ্যোগ ব্যর্থ করে দিয়েছিল সোফিয়া সুসান গুলীটাকে নিজের দেহে ধারণ করে।

ভিক্টর রাইয়া ডান হাতে গুলী খেয়েও বাম হাতে আবার তার হাত থেকে ছিটকে পড়া রিভলবারটা তুলতে যাচ্ছিল।

'পলা তুমি মিস সুসানকে দেখ' বলেই আহমদ মুসা সুসানকে ছেড়ে দিয়ে দ্রুত হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে ভিক্টর রাইয়ার আগেই মেঝেয় পড়ে থাকা রিভলবার দুটি তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল দ্রুত কণ্ঠে, 'হাসান তারিক তুমি দেখ, মিস সুসানকে দ্রুত কোন হাসপাতালে নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।'

পলা জোনসের গায়ে হেলান দিয়ে বসে মিস সুসান বলল, 'থ্যাংকস মি. আহমদ মুসা। আমি সামরিক হাসপাতালে যাব। পলা আমাকে সেখানে নেবে। বাইরেই গাড়ি আছে অসুবিধা হবে না। আমি সেখান থেকেই থানায় জিডি করব যে, আমার পিতার সাথে বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে ডেভিড ইয়ামিন গোয়েন্দা কর্মী পলা জোনসকে অসৎ উদ্দেশ্যে বেজমেন্ট কক্ষে নিয়ে এসেছিল। টের পেয়ে আমি ছুটে আসি। ডেভিড ইয়ামিনসহ ওদের পাঁচজনকে আমি হত্যা করি। ওদের একজন আমাকে আহত করে পালিয়ে যায়। ঘটনাটা এভাবে সহজেই মিটে যাবে।'

'থ্যাংকস মিস সুসান।' বলে আহমদ মুসা তাকাল ভিক্টর রাইয়ার দিকে। বলল, 'মি. ভিক্টর রাইয়া, আমি আপনার বা আপনার দেশ আজোরস-এর এমন কোন ক্ষতি করিনি যে, আমাকে খুন করার জন্যে আপনি এমন মরিয়া হয়ে উঠবেন।'

চোখে-মুখে একটা বিমূঢ় ভাব নিয়ে দাঁড়িয়েছিল ভিক্টর রাইয়া। আহমদ মুসার কথায় তার মুখে আবার কঠোরভাব ফিরে এল। শক্ত কণ্ঠে সে বলল, 'টেরসিয়েরা দ্বীপের সিলভার ভ্যালিসহ বিভিন্নস্থানে দুডজনেরও বেশি খুনের জন্যে তুমি দায়ী।'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'এ ব্যাপারে কোন মামলা হয়নি, তদন্তও হয়নি। তদন্ত হলে এ হত্যাকান্ডের জন্যে দায়ী হবে WFA এবং তাদের ভাড়া করা গুন্ডারা। সুতরাং এ কথা সত্য নয় যে, এ কারণেই আপনি আমাকে খুন করতে চান।'

'ছেড়ে দিন এ প্রসংগ মি. আহমদ মুসা। আমার আব্বা নরম ও সরল মনের মানুষ। WFA তার কান ভারী করে রেখেছে।' বলল মিস সুসান।

'আমি দুঃখিত সুসান। তুমি যাকে বাঁচাবার জন্যে এত ঘটনা ঘটালে, যার জন্যে হয়তো আমি আমার একমাত্র মেয়ের হত্যাকারীতে পরিণত হতাম, সেই আহমদ মুসাকে তুমি কতটা চিন!' ভিক্টর রাইয়া বলল।

'আব্বা, কাউকে সারা জীবন দেখেও চিনা যায় না, আবার কাউকে একবার দেখেই সারা জীবনের চেনা হয়ে যায়। আহমদ মুসা এই শেষ শ্রেণীর মানুষ।' বলল সুসান। আবেগে ভারী হয়ে উঠল তার কণ্ঠ।

কথা শেষ করেই থেমে তাকাল পলা জোনসের দিকে। বলল, 'চলো পলা।'

সুসানের কথা শেষ হতেই আহমদ মুসা তাকাল ভিক্টর রাইয়ার দিকে। বলল, 'ওর একা যাওয়া আমি ঠিক মনে করছি না। আমরা ওদের ফলো করতে চাই।'

'যেতে পারেন আপনারা। আমি যাচ্ছি ওদের সাথে।' বলল ভিক্টর রাইয়া।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিকের হাতে তখনও রিভলবার। আহমদ মুসা বলল, 'আমরা আমাদের রিভলবার পকেটে রাখতে পারি মি. ভিক্টর রাইয়া?'

'মি. আহমদ মুসা আপনার সাথে আমার কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই। কিন্তু রাষ্ট্রের একজন অফিসার হিসেবে উপরের ইচ্ছা অনুসারে আমাকে চলতে হয়।' গম্ভীর কণ্ঠে বলল ভিক্টর রাইয়া।

'আমাকে হত্যা করা কি উপরের নির্দেশ?' আহমদ মুসা বলল।

‘তা নয়। আজর ওয়াইজম্যান আমার বন্ধু। তাকে সাহায্য করা আমার একটা দায়িত্ব। আমার চোখের সামনে তাদের লোকদের হত্যা করে তাদের বন্দীদের ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছো তুমি। এর জবাব আমাকে দিতে হবে।’

‘বুঝেছি মি. ভিক্টর রাইয়া।’ বলে আহমদ মুসা তার রিভলবার ভিক্টর রাইয়ার দিকে তাক করে বলল হাসান তারিককে, ‘তুমি একে পিছমোড়া করে বেঁধে মুখে কাপড় গুঁজে দাও, যাতে চিৎকার করতে না পারে।’

সংগে সংগে হাসান তারিক এগিয়ে এসে একটানে ভিক্টর রাইয়ার গায়ের সার্ট ছিড়ে ফেলল। তার দুটা অংশ দিয়ে ভিক্টর রাইয়ার হাত-পা পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল। তারপর অবশিষ্ট অংশ ভিক্টর রাইয়ার মুখে গুঁজে দিল।

দুচোখ ছানাবড়া হয়ে গিয়েছিল ভিক্টর রাইয়ার। অভাবিত আকস্মিকতায় বিমূঢ় তার চেহারা, বিস্ময় সোফিয়া সুসানের চোখে-মুখেও।

আহমদ মুসা সোফিয়া সুসানের দিকে চেয়ে বলল, ‘এখন আপনার আব্বা আজর ওয়াইজম্যানের কাছে বলতে পারবেন এবং উপরে রিপোর্ট দিতে পারবেন যে, সন্ত্রাসীরা আগেই আমাকে বন্দী করে। কেউ যাতে জানতে না পারে এ জন্যে সাথে নিয়ে গিয়ে ঐ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটিয়ে পলা জোনসকে মুক্ত করে। হঠাৎ সামনে এসে পড়ায় সোফিয়া সুসানকেও গুলী করে। পলা জোনসই তার বন্ধু সোফিয়া সুসানকে হাসপাতালে পৌছায়।’

বিস্ময় ও অস্থিরতার একটা মেঘ কেটে গেল সোফিয়া সুসানের চোখ-মুখ থেকে। তার মুখে হাসি ফুটে উঠল। বলল, ‘ধন্যবাদ আহমদ মুসা। আমার পিতাকে আপনি বিপজ্জনক এক পরিস্থিতি থেকে বাঁচালেন। এত দ্রুত এত দূরের কথা আপনি ভেবেছেন!’

কথা শেষ করে একটু থেমেই আবার বলল, ‘তাতো হবেই। আপনি তো আহমদ মুসা।’ এবার বিমুগ্ধ গম্ভীর কণ্ঠ তার।

কোন কথা না বলে আহমদ মুসা হাসান তারিককে লক্ষ্য করে বলল, ‘আমি গিয়ে বাইরের অবস্থা দেখি। পলা জোনস মিস সুসানকে নিয়ে আসবে। তুমি ওদের সাহায্য কর।’

বলে আহমদ মুসা হাঁটতে উদ্যত হলো।

এ সময় পলা জোনস হঠাৎ দ্রুত কণ্ঠে বলে উঠল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, 'ভাইয়া একটা খবর। আমি ওদের কথোপকথনে শুনেছি, শেখুল ইসলাম ড. আহমদ মুহাম্মাদ নামের এক গুরুত্বপূর্ণ বন্দীকে আজ রাতে ওরা সাও তোরাহ নিয়ে যাচ্ছে।'

'কি নাম বললে শেখুল ইসলাম ড. আহমদ মুহাম্মাদ?' বলল আহমদ মুসা। তার কণ্ঠে অপার বিস্ময়। চোখে-মুখে বেদনার একটা ঝলক।

'কে উনি? চিনেন তাঁকে?' জিজ্ঞাসা পলা জোনসের।

'হ্যাঁ। তিনি মিসরীয়। তবে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছেন সউদী আরবে। কিন্তু কর্মক্ষেত্র তার গোটা দুনিয়া। গ্রেট মুসলিম মিশনারী তিনি। দুনিয়া মন্থন করা জ্ঞানসমৃদ্ধ একজন সুযোগ্য তার্কিক এবং যাদুকরী বক্তা। লাখো মানুষ মুসলমান হয়েছে তার কথা শুনে। সম্প্রতি মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করার কাজে মনোনিবেশ করেছিলেন।'

একটু থামল আহমদ মুসা। পরক্ষণেই আবার বলে উঠল, 'আর কি শুনেছ তার সম্বন্ধে?'

'হার্তা হয়ে আজ তাকে সাও তোরাহ নিয়ে যাওয়া হবে। তারা বলছিল এই একই সাথে যদি আপনাকেও তারা সাও তোরাহ নিয়ে যেতে পারত! এই আশাতেই আপনার ঠিকানা জানার জন্যে তারা আমার উপর চরম জুলুম শুরু করেছিল।' বলল পলা জোনস।

আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকাল। তারপর তাকাল হাসান তারিকের দিকে। বলল, 'হাসান তারিক ওদের হাসপাতালে পৌছে দিয়ে সেই উপত্যকায় আমাদের আবার যেতে হবে। আমাদের সন্দেহের পরীক্ষাটাও হয়ে যাবে। ঠিক আছে তুমি এঁদের বাইরে নিয়ে এস।'

বলে আহমদ মুসা দ্রুত পা চালাল সিঁড়ির দিকে।

সামরিক হাসপাতালের গেটে মিস সোফিয়া সুসান, তার পিতা ভিক্টর রাইয়া ও পলা জোনসকে পৌছে দিয়ে আহমদ মুসা বিদায় চাইল মিস সুসানদের কাছে।

মিস সুসান অনেকখানি যন্ত্রণাকাতর হয়ে পড়েছে। সে নিষ্পলক তাকিয়েছিল আহমদ মুসার দিকে। আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই মিস সুসান বলল, 'মি. আহমদ মুসা আপনারা আসুন। নিশ্চয় এই হাসপাতালেই আবার ফিরছেন। আমরা অপেক্ষা করব। আর একটা কথা, আমার অনুমান যদি ভুল না হয় তাহলে বুঝব, আপনারা ড. আহমদ মুহাম্মাদের সন্ধানে যাচ্ছেন। হার্তা হয়ে তাকে নেবার পথে যদি বাধা দেয়া যায় এই আশায়। গড ব্লেস ইউ। একটা কথা বলি, তাকে নিশ্চয় ওরা জলপথেই নেবে। তবে কোন দ্বীপের কোন বন্দর তাদের ব্যবহার করতে দেখা যায়নি। এই কিছুক্ষণ আগে মিনি-সাব এর কথা আপনার মুখ থেকে শুনলাম। আমিও জানি মিনি-সাব তারা ব্যবহার করে। এ পারমিশনও তারা নিয়ে রেখেছে। আমার মনে হয় তাদের গোপন কাজে তারা মিনি সাবই ব্যবহার করে। মিনি সাবেই নিশ্চয় তারা ড. আহমদ মুহাম্মাদকে পাচার করবে। কিন্তু কি করে আপনারা মিনি সাব-এর সন্ধান পাবেন?' দুর্ভাগ্য আমি আপনাদের সাহায্য করতে পারলাম না।' বড় ক্লান্ত শোনাল সোফিয়া সুসানের কণ্ঠস্বর।

'ধন্যবাদ মিস সুসান। আপনার কাছ থেকে জীবন বাঁচাবার মত অমূল্য সাহায্য আমরা পেয়েছি। আল্লাহ আপনাকে দ্রুত সুস্থ করুন। সকলকে ধন্যবাদ।' বলে আহমদ মুসা তার গাড়ির দিকে পা বাড়াল।

তার পেছনে হাসান তারিক।

মিস সুসানদের তিন জনের দৃষ্টিই আহমদ মুসাদের দিকে নিবদ্ধ।

ভিক্টর রাইয়ার চোখেও সপ্রশংস দৃষ্টি। গাড়ির খোলা দরজা দিয়ে মিস সুসান তাকিয়ে আছে। তার চোখে উদাস এক দৃষ্টি।

ষ্টার্ট নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে আহমদ মুসার গাড়ি।

পলা জোনস এক সময় তার চোখ ফিরিয়ে নিয়ে তাকাল সোফিয়া সুসানের দিকে। বলল, 'অদ্ভুত লোক আমার এই নতুন ভাইয়া। সাধারণ দৃষ্টিতে তিনি মুসলিম স্বার্থের একজন সেভিয়ার, কিন্তু কার্যত তিনি সব মানুষের স্বার্থের পক্ষে কাজ করেন।'

সংগে সংগে কথা বলল না সোফিয়া সুসান। তারও গাড়ি চলতে শুরু করেছে। চালাচ্ছে সোফিয়ার আব্বা ভিক্টর রাইয়া।

সোফিয়া সুসানের উদাস দৃষ্টি তখনও বাইরে নিবদ্ধ। ধীরে ধীরে বলল সে, ‘সুযোগ পেলে অনেকেই উপকার করতে পারে, শক্তি ও বুদ্ধি থাকলে যে কেউ লড়াইয়ে জিততেও পারে। কিন্তু তাঁর মত প্রশান্ত চোখ আমি কোথাও দেখিনি। সৌন্দর্যের হৃদয় সয়লাবী মাদকতা সেখানে কোন সামান্য চাঞ্চল্যেরও সৃষ্টি করে না। চোখ দুটি যেন অতলান্ত এক সাগর। কোন ঢেউ সেখানে কোনদিন উঠেছে বলে মনে হয় না। এরাই শত সাধনার সূর্যোদয়।’

হাসল পলা জোনস। বলল, ‘অবাক করলে, তোমার মত শক্ত মেয়েকে তো এমন আত্মহারা হতে কোনদিন দেখিনি! দেখছি, ভাইয়াকে আবার নতুন করে দেখতে হবে।’

সোফিয়া সুসানও হাসল। বলল, ‘বলেছি না, শত বছরের চেনা এক দন্ডেই হয়ে যায়, আবার শত বছর দেখেও চেনা হয় না।’ কথা হাসি দিয়ে শুরু করলেও শেষে কণ্ঠ ভারী হয়ে উঠল তার।

কিছু বলতে যাচ্ছিল পলা জোনস। তার আগেই কথা বলে উঠল সামনের ড্রাইভিং সিট থেকে ভিক্টর রাইয়া, ‘সামরিক হাসপাতালে যাওয়ার সোজা পথটা ভাল নয়, একটু ঘুরা পথেই যাচ্ছি। তুমি বেশি কথা বলো না মা সুসান। আরও দূর্বল হয়ে পড়বে।’

‘ঠিক বলেছেন স্যার।’ বলে পলা জোনস সুসানের রক্তক্ষরণ আরও কমিয়ে দেবার জন্যে সোফিয়া সুসানের আঘাতপ্রাপ্ত স্থানটা আর একটু চেপে ধরল।

সান্তাসিমা উপত্যকার পাথুরে জেটিতে পা রেখেই পেছন থেকে হাসান তারিক বলে উঠল, আপনি কি করে নিশ্চিত হলেন ভাইয়া যে, শেখুল ইসলামকে ওরা এ পথেই নিয়ে যাবে। আমরা এখানে বসেই নিশ্চিতভাবে তার সন্ধান পাব।’

আহমদ মুসা পেছনে না ফিরে তার হাঁটা অব্যাহত রেখে বলল, ‘গোটা হারতায় সান্তাসিমা উপত্যকার বাইরে সন্দেহ করার মত দ্বিতীয় জায়গা নেই বলেই এখানে এলাম।’

পাথুরে জেটির এক প্রান্তে একখন্ড পাথরের উপর দুজনে বসল।

বসেই আহমদ মুসা বলল, ‘আমাদের সর্বোৎকৃষ্ট যা করণীয় ছিল, তা আমরা করলাম। এখন ভবিষ্যত আল্লাহর হাতে।’

‘আল্লাহ আমাদের সফল করুন।’ বলল হাসান তারিক।

আহমদ মুসা কোন কথা বলল না। তার দুটি চোখ চাঁদের তরল আলো প্লাবিত সাগরের শান্ত বুকে নিবদ্ধ।

হাসান তারিকের চোখও গিয়ে পড়ল সেই সাগরের বুকে।

সময় বয়ে চলল পল পল করে।

জমাট নিরবতা চারদিকে।

এই নিরবতারও একটা ভাষা আছে।

এই ভাষায় কথা হয় বনানীর সাথে মাটির। মাটির সাথে সাগরের এবং সাগরের সাথে আকাশের।

নিঃশব্দ কথার এই মহোৎসবে আহমদ মুসা এক সময় শব্দ করে উঠল। বলল, ‘অন্ধকার ও নিঃশব্দতা এক অবিভাজ্য সত্তা। এই সত্তার রাজত্ব গোটা আকাশ জুড়ে। আকাশের মত শত কোটি তারার দ্বীপ সেখানে আলো জ্বালায় না। আলোকিত করে মানুষের পৃথিবীর মত পৃথিবীকে, প্রতিবিম্বিত হয় শুধুই মানুষের চোখে। পৃথিবীর আলো এবং মানুষ শব্দ ও সচলতারূপী জীবনের প্রতীক। পৃথিবীর দিন তাই আজকের জানা বিশ্ব-চরাচরের একমাত্র জীবন। এই পৃথিবীর প্রতিটি রাত আবার অন্ধকার ও নিঃশব্দ মহাকাশের সাথে হয় যায় একাকার, হয়ে দাঁড়ায় একখন্ড মৃত্যুর প্রতিবিম্ব। আমাদের এই পৃথিবীতে জীবন-মৃত্যুর এই খেলা চলছে প্রতিদিন। জীবন-মৃত্যুর দুই রূপ প্রতিদিনই মুর্তিমান হয়ে আভির্ভুত হচ্ছে আমাদের চোখের সামনে। কিন্তু আমরা মানে মানুষদের অনেককেই দিনের জীবন যতটা বিমুগ্ধ করে, রাতের মৃত্যু মহড়া ততটা ভীত করে না।’

'কিন্তু ভাইয়া, মানুষ মৃত্যুকে ভয় করে বলেই জীবনকে তারা বেশি ভালবাসে।' বলল হাসান তারিক।

'তোমার কথা দৃশ্যত ঠিক হাসান তারিক। কিন্তু এটা শেষ কথা নয়। মৃত্যুকে সত্যিই ভয় করলে জীবনকে ভালবাসা তাদের বেহিসাব হতে পারতো না। জীবনকে ভালবাসা ভাল, কিন্তু বেহিসাব হওয়া দোষের। জীবন সম্পর্কে বেহিসাব হওয়ার অর্থ মৃত্যু বা পরকাল সম্পর্কে বেহিসাব হওয়া এবং এই চরিত্র মানুষকে স্বৈরাচারী ফেরাউন করে তোলে।' আহমদ মুসা বলল।

'জীবনকে হিসেবী করার এবং বেহিসাবী না করার ভেদ রেখা সবার জন্যে সহজ নয় ভাইয়া।' বলল হাসান তারিক।

'হালাল উপার্জন কোনটা, কে না জানে বলত? মানুষকে ভালবাসা উচিত, নিজসহ কারো অধিকার হরণ না করা কর্তব্য, জীবন পরিচালনা সম্পর্কে মৌলিক বিধান দেয়ার অধিকার একমাত্র স্রষ্টার এবং তা মান্য করা সকলের জন্যে অপরিহার্য- এই কথাগুলো কে না জানে? ইসলাম তো এ কথাগুলোরই সমষ্টি। জীবন পরিচালনা সম্পর্কে এই সব বিধি-বিবেচনাই তো হিসাব-বেহিসাবের ভেদরেখা।'

তাদের অনুচ্চ কণ্ঠের এই ভারী আলোচনা চলতেই থাকল। এক সময় আপনাতেই তা বন্ধ হয়ে গেল। তাদের দুজনেরই চোখ গিয়ে নিবদ্ধ হলো সামনের জোৎ¯œা¯œাত জলরাশীর উপর।

চাঁদ তখন মাথার উপরে। মাথার উপরের চাঁদ যেন শান্ত সাগরের পানিতে নেমে আসা রূপালী স্বর্গ।

সাগরের বুক থেকে হাসান তারিকের চোখ এক সময় ফিরে তাকাল তার ঘড়ির দিকে। দেখল রাত তিনটা বাজে।

ঘড়ি থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে অনেকটা স্বগতোক্তির মতই বলল, 'শেখুল ইসলামকে সাও তোরায় নিয়ে যেতে ওরা এখানে আসবে কেন ভাইয়া?'

আহমদ মুসা কথা বলে উঠল, 'কেন জানি না। তবে তথ্য যেটা জানা গেছে সেটা হলো, ওদের রুট এখন হারতা হয়ে সাও তোরাহ। রুট হারতা হয়ে যাওয়ার অর্থ হারতা ওদের একটা ষ্টেশন। ষ্টেশনে কি হয়? নামা-উঠা হয়। এই

বিবেচনা থেকে আমরা বলতে পারি, হারতার কোথাও এসে ওরা নামবে, তারপর হারতা থেকে তাদের নতুন যাত্রা হবে সাও তোরাহ দ্বীপে।'

'কিন্তু হারতার সেই ষ্টেশনটা যে এই সান্তাসিমা উপত্যকা হবে, সেটা কি একেবারে নিশ্চিত?' আবার জিজ্ঞাসা হাসান তারিকের।

'কেলভিন ও অন্যান্য সূত্রে যা এ পর্যন্ত জানা গেছে তাতে সান্তাসিমাই হয় তাদের সে ষ্টেশন।' বলল আহমদ মুসা।

হাসান তারিক কিছু বলতে যাচ্ছিল।

হঠাৎ আহমদ মুসা তার মুখ চেপে ধরে কথা বন্ধ করে দিল।

হাসান তারিক বিস্ময়ে আহমদ মুসার দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখল তার উদগ্রীব দুচোখ চন্দ্রালোকিত সাগরের জলের উপর নিবদ্ধ। সে যেন কিছু দেখছে বিস্ময়ের সাথে।

'কি ভাইয়া?' জিজ্ঞেস করল হাসান তারিক ফিসফিসে কণ্ঠে।

'দেখ সাবমেরিনের পেরিস্কোপ এবং পানির আন্দোলন।' ফিসফিসে কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

হাসান তারিকও দেখতে পেয়েছে। বিস্ময় ও আনন্দ তার চোখে-মুখে। বলল, 'ভাইয়া একটা সাবমেরিন ভেসে উঠছে।'

'হ্যাঁ, বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এস আমরা একটু আড়ালে যাই।'

ওরা দুজনে পেছনের একটা বড় পাথরের আড়ালে চলে গেল।

সাব মেরিনটা ভেসে উঠল। মিনি সাবমেরিন।

পুরোটা ভেসে উঠল না। আধা আধি। মিনি সাবমেরিনের পেরিস্কোপ ও এ্যান্টেনাগুলোসহ সেইলটা মাত্র দেখা যেতে লাগল। গোটা দেহটা পানির তলায়ই রয়ে গেল। মিনি সাবমেরিনটা এগিয়ে এল পাথুরে জেটির দিকে। তার ডুবে থাকা নোজটা একেবারে যেন জেটির ডুবে থাকা গায়ে এসে ঠেকল।

আনন্দে চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আহমদ মুসা ও হাসান তারিক দুজনেরই। তারা ভাবতে লাগল, এই এখনি মিনি সাবমেরিন পুরোটা ভেসে

উঠবে। খুলে যাবে পিঠের হ্যাচটা। বেরিয়ে আসবে মানুষ। শেখুল ইসলামকে এই মিনি সাবমেরিনেই আনা হচ্ছে সাও তোরাহতে পৌছানোর জন্যে।

কিন্তু না মিনি সাবমেরিনটা ভেসে উঠল না।

পল পল করে বয়ে চলল সময়।

কেটে গেল আধা-ঘণ্টার মত সময়।

এক সময় হঠাৎ সাবমেরিনটা ডুবে গেল। প্রবলভাবে পানি আন্দোলিত হয়ে উঠল। চলে যাচ্ছে মিনি সাবমেরিনটা। পূর্ব দিক থেকে এসেছিল, সেই পূর্ব দিকেই আবার চলে গেল।

স্তম্বিত আহমদ মুসা ও হাসান তারিক। তাদের চোখে-মুখে হতাশার চিহ্ন। তারা খুবই আশা করেছিল শেখুল ইসলামের দেখা তারা পাবে এবং তাকে মুক্ত করার জন্যে কিছু করতে পারবে। ভাবতে লাগল তারা, মিনি সাবমেরিনটা ভেসে উঠল না কেন? তাদের উপস্থিতি কি টের পেয়েছে সাবমেরিনটা! তাদের উপস্থিতি টের পেয়েই কি মিনি সাবমেরিনটা ভেসে না উঠেই চলে গেল! কিন্তু শেখুল ইসলামকে সাও তোরাহ'তে পৌছাবার তাহলে কি হলো! মিশন কি বাতিল করতে পারে? না পরিস্থিতি দেখে ফিরে গেল মিনি সাবমেরিনটা কোন কাজে? ফিরে আসবে কি আবার?

অপেক্ষা করাই ঠিক মনে করল আহমদ মুসা।

অন্ধকারের মধ্যে পাথরে বসে আবার অপেক্ষা করার পালা।

ফিস ফিস করে গল্প চলল আবার।

হাসান তারিক বলল, 'ভাইয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনে ইহুদীদের ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত খৃষ্টান ও ইহুদীদের মধ্যে ছিল সাপে-নেউলে সম্পর্কে। তারই একটা প্রকাশ ছিল হিটলারের ইহুদী নিধন। তারা ইহুদীদের বোঝা মাথা থেকে নামাবার জন্যেই ফিলিস্তিনে ইসরাইল রাষ্ট্র চাপিয়ে দিয়ে ইহুদীদের ওখানে পাঠাল। তারপর ইহুদীবাদী ও মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ শুরু হলো, আর সখ্যতা গড়ে উঠল খৃষ্টান ও ইহুদীবাদীদের মধ্যে, বিষে করে আরব বিশ্বকে শায়েস্তা করার জন্য। আমার মনে হচ্ছে খৃষ্টান ও

ইহুদীদের মধ্যেকার হানিমুন শেষ হতে যাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদীদের বিপর্যয় তারই যাত্রা শুরু বলে মনে হয়।'

'তুমি বুঝলেও ইহুদীরা বুঝেনি। তারা মনে করছে, মুসলমানদের সাহায্য ও পরামর্শেই খৃষ্টানরা ইহুদীদের নানা দোষ ত্রুটি ধরছে ও অভিযুক্ত করছে। তাদের নিজেদের ষড়যন্ত্র ও অপকীর্তিই যে তাদের বিপর্যয় ঘটাচ্ছে, সে কথা তারা একেবারেই আড়ালে রাখছে। তারা ভাবছে, মুসলমানদের ঘাড় ভাঙতে পারলেই আবার তারা খৃষ্টানদের মাথায় উঠে বসতে পারবে।' বলল আহমদ মুসা।

'কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাথায় বসে টুইন টাওয়ার ধ্বংসের দায় মুসলমানদের ঘাড়ে চাপিয়েও মুসলমানদের মাথা ভাঙতে পারেনি ইহুদীরা। এখন কি পারবে? এখন তো ওরা আত্মরক্ষায় নেমেছে।' হাসান তারিক বলল।

'আত্মরক্ষায় নেমেছে বলছ কেন?' বলল আহমদ মুসা।

'ওরা এখন টুইন টাওয়ার ধ্বংসের কাহিনী ধামাচাপা দিতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে।' হাসান তারিক বলল।

'ঠিক। কিন্তু সেই সাথে ওরা মুসলমানদের ঘাড় ভাঙারও চেষ্টা করছে। মুসলমানদেরকে ওরা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে নেতৃত্বহীন করার চেষ্টা চালাচ্ছে। সাও তোরাহ দ্বীপে যাদের আটকে রাখা হয়েছে, তাদের মধ্যে জন সাতেককে টুইন টাওয়ার ঘটনার তদন্তের সাথে জড়িত থাকার কারণে আটক করা হয়েছে, অন্যেরা সবাই মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মুসলিম বুদ্ধিজীবি নেতা।' বলল আহমদ মুসা।

'কিন্তু ভাইয়া, এভাবে কি একটা জাতির ঘাড় ভাঙা যায়?' হাসান তারিক বলল।

'সেটা ভিন্ন প্রশ্ন। কিন্তু ইহুদীবাদীদের ষড়যন্ত্রের ঘর রক্ষা করতে হলে মুসলমানদের সচেতনতা ও সক্রিয়তা ধ্বংস করতে হবে, এটাই তাদের কাছে বড় কথা।' বলল আহমদ মুসা।

কথা শেষ করে আহমদ মুসা হঠাৎ মাথা খাড়া করে সোজা হলো। দৃষ্টি তার জ্যোৎ¯œা¯œাত সাগরের বুকে। ফিসফিসে কণ্ঠে বলে উঠল সে, 'হাসান

তারিক আবার সেই পেরিস্কোপ। পানির সেই আন্দোলন। উপকূলের দিকে আসছে একটি সাবমেরিন।'

'মিনি সাবমেরিনটা কি আবার ফিরে এল?' বলল হাসান তারিক।

'হতে পারে। কিন্তু এ আসছে পশ্চিম দিক থেকে।' আহমদ মুসা বলল।

আগের মতই মিনি সাবমেরিনটি ভেসে উঠল। তার 'সেইল' ও এন্টেনাগুলোই শুধু দেখা যেতে লাগল। আধা ভেসে উঠা মিনি সাবমেরিনটি আগের মতই উপকূলের পাথুরে জেটির মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। তার ডুবে থাকা নোজটা যেন পাথুরে জেটি স্পর্শ করেছে।

আবার আশান্বিত হলো আহমদ মুসা ও হাসান তারিক। এখনি মিনি সাবমেরিনটি পুরো ভেসে উঠবে এবং তার হ্যাচ খুলে বেরিয়ে আসবে মানুষ।

এই আশায় চলল তাদের অপেক্ষা। কিন্তু অর্ধ ভেসে উঠা মিনি সাবমেরিনটি নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকল। পুরো ভেসে উঠলো না।

উদগ্রীব অপেক্ষার মধ্যে সময় কতটা বয়ে গেল তারা খেয়াল করেনি।

হঠাৎ এক সময় মিনি সাবমেরিন ঝাকুনি দিয়ে উঠল। আন্দোলিত হলো পানি। সরে গেল মিনি সাবমেরিনটি পাথুরে জেটি থেকে। তারপর ঝুপ করে ডুবে গেল তা পানির তলায়। ভেসে থাকল মাত্র পেরিস্কোপটা। দ্রুত চলতে লাগল মিনি সাবমেরিনটা যে দিক থেকে এসেছিল সেই পশ্চিম দিকে।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক দুজনেরই চোখ সেদিকে নিবদ্ধ। চোখে তাদের শূন্য দৃষ্টি। মুখের চেহারায় বোকা বনে যাবার ভাব। মিনি সাবমেরিনটা দুবারই তার চেহারা দেখিয়ে চলে গেল। ভেসে উঠেও আবার উঠল না। উপকূলে ভিড়েও কেউ নামলো না। তাদের কাচকলা দেখানোই কি ওদের উদ্দেশ্য! ওরা কি তাহলে টের পেয়েছে আহমদ মুসারা এখানে! কিন্তু কিভাবে জানবে? ওখানে ওদের কেউ বাঁচেনি যে আমাদের ফলো করবে।

উঠে দাঁড়ালো আহমদ মুসা। হাসান তারিকও।

দুজনে এসে পায়চারী করল গোটা পাথুরে জেটিটায়। যেখানে দুটো সাবমেরিনই এসে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে তারা অনেকক্ষণ দাঁড়াল। কিন্তু কিছুই বুঝলো না।

ঘুরে দাঁড়াল আহমদ মুসা। বলল, ‘চল হাসান তারিক, এখানকার কেচ্ছা শেষ।’

বলে চলতে লাগল আহমদ মুসা।

হাসান তারিকও।

চলতে শুরু করে হাসান তারিক বলল, ‘কেচ্ছা তো বাকি রইল না ভাইয়া। কেলভিন মারা গেল। ওখানেও কেউ বাঁচলো না। এখানে এসেও কিছু মিলল না। সামনে এগোব আমরা কি করে? শেখুল ইসলামকে তো কোন সাহায্য আমরা করতে পারলাম না।’ হতাশার সুর হাসান তারিকের কণ্ঠে।

‘হতাশ হচ্ছো কেন হাসান তারিক। এখানে এসে বিরাট লাভ করেছি আমরা। প্রমাণ হলো, এটাই মিনি সাবমেরিনের ঘাঁটি। তার উপর আমরা দেখলাম ওদের মিনি সাবমেরিনকে। আজ দেখলাম, কাল ওতে নিশ্চয় আমরা উঠব। সামনে এগুবার পথ নিশ্চয় আল্লাহ করে দেবেন।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তাই যেন হয় ভাইয়া।’ বলল হাসান তারিক।

সান্তাসিমা উপত্যকা পেরিয়ে বেরিয়ে এল ওরা।

ঝোপের আড়ালে ওরা গাড়ি লুকিয়ে এসেছিল।

গাড়িতে গিয়ে উঠল আহমদ মুসারা।

তারা গাড়ি ষ্টার্ট দেবার আগেই হঠাৎ তাদের কানে এল আরেকটি গাড়ি ষ্টার্ট দেবার শব্দ।

আহমদ মুসা তাকাল হাসান তারিকের দিকে। হাসান তারিক গাড়ি থেকে দ্রুত বেরিয়ে ছুটল রাস্তার দিকে। রাস্তায় গিয়ে যখন সে পৌছল দেখল একটা গাড়ি রাস্তার এ পাশেরই কিছু পশ্চিমের একটা ঝোপ থেকে একটা গাড়ি বেরিয়ে পূর্ব দিকে ছুটল।

হাসান তারিক ছুটল তার গাড়ির দিকে। গাড়িতে উঠে বসতে বসতে বলল আমাদের পাশের ঝোপ থেকে একটা গাড়ি বেরিয়ে পূর্ব দিকে যাচ্ছে।

শুনতেই আহমদ মুসার দুচোখে বিস্ময়ের একটা ঝলক খেলে গেল। কুঞ্চিত হলো তার কপাল। গাড়ি ষ্টার্ট দিতে দিতে সে বলল, ‘আমাদের পাশের ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসেছে?’ আহমদ মুসার কণ্ঠেও বিস্ময়।

‘হ্যাঁ ভাইয়া, রাস্তার এ পাশে গজ তিরিশেক পশ্চিমের একটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল গাড়িটা।’ বলল হাসান তারিক।

আহমদ মুসার গাড়ি বেরিয়ে এসেছে রাস্তায়। তীর বরাবর সোজা রাস্তায় সে দেখতে পেল সামনের গাড়িটার পেছনের লাল দুটো আলো।

‘ধরতে হবে গাড়িটাকে হাসান তারিক। গাড়িটা আমাদের ফলো করে এখানে এসেছিল কিনা তা দেখতে হবে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘না ভাইয়া, গাড়িটা যদি আমাদের ফলো করে এখানে এসে থাকত তাহলে আমরা যাওয়ার আগে সে এভাবে পালাত না। তবে আমার মনে হয় কোন একটা রহস্য আছে, যা আমি বুঝতে পারছি না।’

আহমদ মুসার গাড়ির স্পিডোমিটারের কাঁটা দ্রুত উঠতে লাগল সত্তর থেকে আশি, আশি থেকে একশ। একশ ত্রিশে কাঁটা স্থির হলো।

কাঁপছে গাড়ি। ছুটে চলছে পাগলের মত।

কম্পনরত ষ্টেয়ারিং-হুইলে হাত রেখে সামনে স্থির দৃষ্টি ফেলে স্বগতকণ্ঠে আহমদ মুসা বলল, ‘তুমি ঠিক বলেছ হাসান তারিক। গাড়িটা আমাদের ফলো করে এলে পালাত না। কোন কারণে পালালেও পেছনের আলো জ্বালিয়ে রাখতো না।’

‘আমারও তাই মনে হয় ভাইয়া। কিন্তু ভাইয়া এই ঝোপের আড়ালে গাড়িটা এল কেন?’ বলল হাসান তারিক।

‘সেটাই তো প্রশ্ন। সামনে চল, উত্তর পাওয়া যায় কিনা দেখি।’ আহমদ মুসা বলল।

ঝড়ের বেগে চলছে আহমদ মুসার গাড়ি। সামনের গাড়িটি আগের সেই একই মধ্যম গতিতে চলছে। সামনের গাড়িটার অনেক কাছে চলে এসেছে আহমদ মুসার গাড়ি।

‘আল্লাহর শুকরিয়া। গাড়িটা আমাদের একটুও সন্দেহ করেনি হাসান তারিক।’ বলল আহমদ মুসা।

গাড়িটার একদম পেছনে চলে এসেছে আহমদ মুসার গাড়ি। হঠাৎ গাড়িটার নাম্বারের উপর নজর পড়তেই চমকে উঠল আহমদ মুসা। দ্রুতকণ্ঠে

আহমদ মুসা বলল, ‘হাসান তারিক গাড়ির নাম্বারটা দেখ। পলা জোনসকে উদ্ধারের জন্যে মি. ভিক্টর রাইয়ার অফিসে ঢোকার সময় এই গাড়িটা দেখেছিলাম, আবার বেরুবার সময়ও দেখেছিলাম গাড়িটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে। আর এটা ভিক্টর রাইয়ার গাড়ি নয় এবং সোফিয়া সুসানের গাড়িও নয়। যদি তাই হয়, তাহলে গাড়িটা অবশ্যই WFA এর হবে।’

থামল আহমদ মুসা। বলল হাসান তারিক, ‘ঠিক ভাইয়া, মি. ভিক্টর রাইয়ার হলে সেটা সরকারী গাড়ি হতো। আর মিস সুসানের গাড়িতো আমাদের সাথে হাসপাতালে গিয়েছিল। সুতরাং আপনার অনুমানই ঠিক ভাইয়া।’

আহমদ মুসা কোন কথা বলল না। গাড়ির গতি আকস্মিক আরও বেড়ে গেল। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই আহমদ মুসার গাড়ি সামনের গাড়িকে ক্রস করে কিছুটা সামনে এগিয়ে বাঁক নিয়ে গাড়িটাকে ব্লক করে দাঁড়াল।

গাড়িটা আহমদ মুসাদের গাড়িকে পাশ কাটাবার চেষ্টা করে না পেরে দ্রুত ঘুরে পেছন দিকে পালাবার চেষ্টা করল।

হাসান তারিকের পাশের জানালা খোলা ছিল। জ্যাকেটের পকেট থেকে রিভলবার তুলে নিয়েই হাসান তারিক গুলী করল।

পলায়নপর গাড়িটা তখনও সোজা হয়ে সারেনি। হাসান তারিকের গুলী গিয়ে বিদ্ধ করল গাড়িটার সামনের চাকার টায়ার। মুখ থুবড়ে পড়ল গাড়িটা।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক গাড়ি থেকে বেরিয়ে ছুটল ঐ গাড়িটার দিকে।

গাড়ির আরোহী বেরিয়ে এসেছিল গাড়ি থেকে। পালাবার জন্যে দৌড় দিয়েছিল। হাসান তারিক ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর।

মধ্য বয়সী লোকটি। কিন্তু লোকটির ষ্টিল রোবটের মত শক্ত এবং সেরকমেরই শক্তি। তাকে বাগে আনতে সময় লাগল হাসান তারিকের।

অবশেষে আহমদ মুসারা তাকে টেনে তুলল তাদের গাড়িতে।

সময় বেশি নিল না। অল্প দূরেই রাস্তা থেকে নেমে একটা ঝোপের আড়ালে একটা ফাঁকা জায়গায় গাড়ি দাঁড় করাল। গাড়ি থেকে নামাল লোকটিকে।

লোকটিকে দাঁড় করিয়ে গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

লোকটি রাগে ফুসছিল। দাঁড়িয়েই বলে উঠল, ‘কে তোমরা? আমাকে এভাবে আক্রমণ করার অর্থ কি? কি চাও তোমরা?’

বলে লোকটি তার চোখ আহমদ মুসা ও হাসান তারিকের দিকে তীক্ষè করল। চাঁদের আলোতেই সে আহমদ মুসা ও হাসান তারিককে ভালো করে দেখার চেষ্টা করল।

আহমদ মুসা বলল, ‘বেশি কিছু চাই না। সান্তাসিমা উপত্যকায় কি করছিলে, তাই জানতে চাই।’

‘সান্তাসিমা উপত্যকাই আমি চিনি না।’ বলল লোকটি।

‘কেলভিন চিনত, তুমি চিনবে না কেন?’ আহমদ মুসা বলল।

লোকটি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না। তার দুচোখ উঠে এল আহমদ মুসার দিকে। যেন দৃষ্টি আরও তীক্ষè করে আহমদ মুসাকে আরো গভীরভাবে দেখার চেষ্টা করছে। এক সময় বলে উঠল সে, ‘ও, তাহলে আহমদ মুসারাই তোমরা?’

‘আমার প্রশ্নের জবাব দাও।’ গর্জে উঠল আহমদ মুসা।

‘তোমরা আমাদের সর্বনাশের মূল। কোন জবাব তোমরা পাবে না।’ বলল লোকটি দৃঢ় কণ্ঠে।

‘কথা বলাতে আমরা জানি। কেলভিনকেও মুখ খুলতে হয়েছিল।’ আহমদ মুসা বলল।

লোকটি হো হো করে হেসে উঠল। বলল, ‘কেলভিন তোমাদের কিছুই বলেনি। বললে আমাকে প্রশ্ন করারই দরকার হতো না।’

আহমদ মুসা তার দিকে রিভলবার তুলে বলল, ‘নষ্ট করার মত সময় আমাদের নেই। বল, শেখুল ইসলাম আহমদ মুহাম্মাদ কোথায়?’

লোকটি আবার হো হো করে হেসে উঠল। বলল, ‘জানি তোমরা কথা বলাতে পার। কিন্তু লাশ তো কথা বলে না।’

বলেই লোকটি তার একটা আঙুল কামড়ে ধরল। কি ঘটছে বুঝতে পারল আহমদ মুসা।

সঙ্গে সঙ্গেই আহমদ মুসা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। লোকটির হাত ছিনিয়ে আনল তার মুখ থেকে। কিন্তু দেখল লোকটির আঙুল খালি। নিশ্চয় আংটিটা লোকটির মুখে।

আহমদ মুসা তার মুখে হাত দিতে গিয়ে দেখল মুখ শিথিল। বুঝল, সত্যিই লোকটি লাশ হয়ে গেছে।

উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা। বলল, 'হাসান তারিক, পটাসিয়াম সাইনাইডের আংটি ছির তার হাতে। লাশ তো এখন আর কথা বলতে পারবে না। দেখ সার্চ করে কিছু পাও কিনা।'

আহমদ মুসা আবার গিয়ে গাড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। মনটা খারাপ হয়ে গেছে আহমদ মুসার। মানুষের জীবন-মৃত্যু এত কাছাকাছি! আর একটা মিথ্যা বিশ্বাসের জন্যে মানুষ এমন অবলীলাক্রমে জীবন দিতে পারে! তাহলে তাদের তুলনায় মুসলমানরা কত পেছনে!

ভাবনায় ডুবে গিয়েছিল আহমদ মুসা। হাসান তারিকের কথায় তার সম্বিত ফিরে এল।

হাসান তারিক বলছে, 'ভাইয়া ঠিকানা লেখা একটা চিরকুট ছাড়া তার কাছ থেকে উল্লেখ করার মত কিছু পাওয়া যায়নি।'

'চিরকুটে কি আছে?' বলল আহমদ মুসা।

'কয়েক লাইন লেখা। এখনো পড়তে পারিনি।' হাসান তারিক বলল।

সোজা হয়ে দাঁড়াল আহমদ মুসা। বলল, 'দাও দেখি।'

আহমদ মুসা চিরকুটটি হাতে নিয়ে গাড়ির ভেতরে ঢুকে গিয়ে পড়তে লাগল ঃ

সুলিভান, আসছে সন্ধ্যায় ৭১ বে ষ্ট্রিটে এস। এভাবে চলতে পারে না। বস ভীষণ ক্ষুব্ধ। আমরা এখন ডু অর ডাই কন্ডিশনে।' -ডেভিড ডেনিম।

চিরকুটটা পড়ে আহমদ মুসা হাসান তারিকের দিকে তাকাল।

আহমদ মুসা তার দিকে চিরকুটটা তুলে ধরে বলল, 'পড়।'

হাসান তারিক চিরকুটটা পড়েই বলে উঠল, 'আমাদের পরবর্তী গন্তব্য তাহলে ৭১ বে ষ্ট্রিট।

‘হ্যাঁ তাই।’

বলে আহমদ মুসা গাড়ি ষ্টার্ট দিল।

# ৩

সাও তোরাহ দ্বীপের আন্ডার গ্রাউন্ড জেলখানা।

জেলখানা বলা ঠিক নয়। আসলে বিশাল এক কনসেনট্রেশন ক্যাম্প এটা। WFA-এর নেতা আজর ওয়াইজম্যান শত নির্যাতনে নিষ্পিষ্ট বন্দীদের বিদ্রুপ করে বলে, 'আল্লাহ নাকি তোমাদের জন্যে মহাসাড়ম্বরে মহাসুখের বেহেশ্ত সাজিয়ে রেখেছেন, সেখানে যাবার আগে দোজখের স্বাদটা নিয়ে যাও।'

আর বন্দীখানা বা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পটা আন্ডার গ্রাউন্ড এই অর্থে যে, মাঝে মাঝে এ বন্দীখানা মাটির উপর থেকে আন্ডার গ্রাউন্ডে নেমে আসে। বন্দীখানাটার ছাদ জুড়ে বাগান। উপর থেকে দেখলে মনে হবে সুন্দর সবুজ পরিচ্ছন্ন একটা ভূমিখ-। যখন বন্দীখানাটা আন্ডার গ্রাউন্ডে চলে যায়, তখন তো কথাই নেই। কেউ উপর থেকে দেখে হাজার চেষ্টা করেও বলতে পারবে না যে, বাগানটা কৃত্রিম কিছু এবং এর নিচে এক বিশাল বন্দীখানা আছে। কেন এটা দুনিয়ার অদ্বিতীয় দোজখখানা তার পক্ষে আজর ওয়াইজম্যান যুক্তি দেন যে, আমরা এই দোজখখানার জন্যে যে টেকনলজি ব্যবহার করেছি, হিটলার তার কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের জন্যে তা কল্পনাও করেননি। আরেকটা পার্থক্যের কথা আজর ওয়াইজম্যান বলে থাকে। সেটা হলো, হিটলার ছিলেন স্বৈরাচারী, আর আমরা দুনিয়ায় গণতন্ত্র প্রমোট করছি।

একদল বন্দী বন্দীখানার ময়লা পরিষ্কার ও মাজা-ঘসা করছিল।

সপ্তাহে একদিন বন্দীখানা মাজা ঘসা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়।

সাও তোরাহ-এর বন্দীদের জন্যে সপ্তাহের এ দিনটি বহুল আকাঙ্খিত দিন। কাজ করতে গিয়ে সবার এদিন একত্র হবার সুযোগ হয়। হাতে পায়ে পরানো হয় নতুন শেকল। শেকল দেড়ফুট লম্বা হওয়ায় চলা-ফেরায় কিছুটা সুবিধা হয়। সবচেয়ে  বড় কথা পায়ে পরানো কাঁটার জুতা খুলে নেয়া হয়ে থাকে, বন্দীদের জন্যে এই কাঁটার জুতা খুবই ভয়ংকর। জুতার সুখতলীতে বসানো থাকে

অতিসূক্ষè কাঁটার সারি। এই কাঁটা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। এ জুতা পায়ে দিয়ে হাঁটা তো দূরের কথা দাঁড়ানোও যায় না। জুতা পায়ের সাথে লক করা থাকে বলে খোলাও যায় না। এ জুতা বন্দীদের উপর নির্যাতনের ক্ষেত্রে নতুন সংযোজন।

সত্যি বন্দিখানাকে আজর ওয়াইজম্যান দোজখে পরিণত করেছে। বন্দীদের কম্বল ও কাপড় আরামদায়ক না হলেও কষ্টদায়ক ছিল না শুরুর দিকে। কিন্তু এখন কম্বল ও কাপড়-চোপড় হয়ে দাঁড়িয়েছে আরেক ভীতির কারণ। ওগুলোতে ছারপোকা জাতীয় এক ধরনের পোকার বাসা। গায়ে দিলেই ওগুলো গায়ে চরে বেড়াতে শুরু করে এবং কামড়াতে থাকে। তাছাড়াও কম্বল ও কাপড়ত-চোপড় গায়ে দিলেই সর্বাঙ্গ চুলকাতে শুরু করে। ভীষণ জ্বালা-যন্ত্রণায় কম্বল ও পোশাক গায়ে রাখা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আবার প্রচ- শীতের মধ্যে ওগুলো গা থেকে নামানোও যায় না। এক ভয়ংকর অবস্থার মধ্য দিয়ে বন্দীদের প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত হয়।

সুতরাং সাতদিনের এই একটা দিন তাদের জন্যে পরম আকাক্সক্ষার, যদিও এ দিন তাদের যে কাজটা করতে হয় তা ক্লিনার ও মেথরদের কাজ। ৬ দিনে বন্দীখানায় যে মল-মূত্র ও ময়লা জমে ৭ম দিনে তা পরিষ্কার করতে হয়। তবু পায়ে কাঁটার জুতা থাকে না এবং ভিন্ন ধরনের কাপড় পরা যায় বলে এই কাজটাই সবার কাছে পরম আরামদায়ক।

আজর ওয়াইজম্যানের মতে সপ্তাহের সপ্তম দিনকে কিছুটা আরামদায়ক করা হয়েছে ছয়দিনের কষ্টকে তীব্র করে তোলার জন্যে। কষ্ট অভ্যাসে পরিণত হলে কষ্ট কমে যায়। এটা যাতে না হয় এ জন্যেই আজর ওয়াইজম্যানের এই ব্যবস্থা।

একদল বন্দী একটু সুযোগ পেয়ে আলাপ করছিল। ইন্দোনেশিয়ার একজন বন্দী ভাঙা ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করল তুরস্কের একজন বন্দীকে, 'মি. বায়ার গত সপ্তাহে আপনার কাছ থেকে ব্যাপারটা জানার পর থেকেই আমি ভাবছি। আমার মনে হচ্ছে কি জানেন, দুনিয়ার এ দোজখখানাটা মুসলমানদের প্রায়শ্চিত্ত করার শেষ মনজিল। মুক্তির সূর্যোদয় খুব সামনেই।'

'কোন ব্যাপারটা মি. হাদি আমর?' বলল জালাল বায়ার।

জালাল বায়ার তুরস্কের একটা মুসলিম চ্যারিটি ফান্ডের প্রধান। তুরস্ক ভিত্তিক এ ফান্ডটি গোটা দুনিয়ায় বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করে। সেই সাথে অসহায় কিন্তু প্রতিভাবান এমন মুসলিম শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা দান করে। আজর ওয়াইজম্যানের WFA এই ফান্ড ধ্বংসের এক অংশ হিসেবে জালাল বায়ারকে কিডন্যাপ করেছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো শিক্ষা-সহায়তার নামে তার ফান্ড ইসলামী রেঁনেসা তথা মুসলমানদের মধ্যে হিংসা উদ্দীপ্ত করার কাজ করছে।

আর ইন্দোনেশিয়ার হাদি আমর 'লিভিং মস্ক মুভমেন্ট' বা 'মসজিদ আবাদ আন্দোলন'-এর নেতা। এ আন্দোলনের কাজ হলো, মসজিদ সংস্কার করা, মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ব্যবস্থা করা এবং মসজিদকে এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলার কেন্দ্রে পরিণত করা। আজর ওয়াইজম্যানের ওয়ার্ল্ড ফ্রিডম আর্মি (WFA)-এর কাছে এটা খুবই আপত্তিকর মনে হয়েছে। হাদী আমরকে কিডন্যাপ করা হয়েছে এই অভিযোগে যে, সে সাম্প্রদায়িকতাকে উদ্দীপ্ত করে সন্ত্রাসবাদকে সাহায্য করছে। তার কাছে এখন দাবী করা হচ্ছে তার জনশক্তির একটা পূর্ণ তালিকা।

'কেন মনে নেই, আপনি বলেছিলেন দুনিয়ার এই দোজখখানায় আমাদের ইন্দোনেশিয়ার পিতৃস্থানীয় আহমদ সুকর্নের বংশধর মোহাম্মদ সুকর্নের সাথে রয়েছেন আপনাদের পিতা কামাল আতাতুর্কের উত্তর সুরী কামাল সুলাইমান, মিসরের বাদশাহ ফারুকের প্রত্যক্ষ বংশধর আবদুল্লাহ ফারুক, লিবিয়ার বাদশাহ ইদরিসের উত্তরসূরী আহমদ আল সেনুসি, তুরস্কের শেষ খলিফা আবদুল হামিদের উত্তর-পুরুষ ওসমান আবদুল হামিদ, ইরানের রেজাশাহ পাহলবীর বংশধর মোহাম্মদ আলী রেজা এবং স্পেনের সোনালী ইতিহাসের নির্মাতা ওমাইয়া শাসকদের ধ্বংসাবশেষের সপ্তদশ পুরুষ আবদুল রহমান। দুনিয়ার এই দোজখখানায় এঁদের ঐতিহাসিক এই সম্মেলন কাকতালীয় বলা যাবে, কিন্তু আমার মনে হয়েছে এটা আল্লাহ তাআলারই এক পরিকল্পনা। এই সাত ব্যক্তি ঐতিহাসিক যে সাত ব্যক্তির উত্তরসূরী, সেই সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তাদের নিজ নিজ দেশে সব দ--মু-রে কর্তা বানিয়েছিলেন, কিন্তু তারা জাতি

গঠনের পরিবর্তে জাতিকে বিজাতীয়দের হাতে তুলে দিয়েছেন। এই ঐতিহাসিক সাতের পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছেন আপনারা, বলা যায় সেই সাতজনই এখন দুনিয়ার এই দোজখখানায়।' বলল হাদি আমর।

দুঃখের মধ্যেও হাসল জালাল বায়ার। বলল, 'আপনি চমৎকার একটা ইকুয়েশন করেছেন। কিন্তু মুক্তির সূর্যোদয় আপনি কোথায় দেখতে পেলেন?'

'ঠিক দেখতে পাইনি। কল্পনার দিগন্তে তৃতীয় নয়ন দিয়ে অবলোকন করছি। অনেক খবর এ জেলখানার বাতাসেও ভাসছে। তার একটি হলো, আহমদ মুসা আজোরস দ্বীপপুঞ্জে এসেছেন। আহমদ মুসা আল্লাহর এমন এক বান্দাহ যাকে সংগ্রাম এবং সাফল্য অনুসরণ করে থাকে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আহমদ মুসার কথা আমিও শুনলাম। কয়েক মিনিট আগে আমাদের কামাল সুলাইমান ও ওসমান আবদুল হামিদ বলল যে, আহমদ মুসা তেরসিয়েরা দ্বীপে WFA-কে বিধ্বস্ত করে 'হারতা' দ্বীপে এসেছেন।' বলল জালাল বায়ার।

'সত্যি? কার কাছ থেকে তারা জানলেন?' হাদি আমর আনন্দে চোখ উজ্জ্বল করে বলল।

'ফ্রান্স থেকে সাংবাদিক বুমেদীন বিল্লাহকে ওরা ধরে এনেছে। তাঁর কাছ থেকেই এরা শুনেছেন।' বলল জালাল বায়ার।

'বুমেদীন বিল্লাহ? আলজেরিয়ার পিতৃস্থানীয় বেন বেল্লাহর কি কেউ?' জিজ্ঞাসা হাদী আমর-এর।

'শুনলাম, শুধু বেন বেল্লাহ নয়, আলজেরিয়ার দীর্ঘ দিনের শাসক হুয়ারী বুমেদীনের বংশের সাথেও তিনি সম্পর্কিত। তিনি যেমন বেন বেল্লাহর 'গ্রেট গ্রেট গ্রান্ড সান', তেমনি তিনি হুয়ারী বুমেদীনেরও গ্রেট গ্রেট গ্রান্ড-ডটারের স্বামী।'

স্থান-কাল-পাত্র ভুলে গিয়ে হাদী আমর হাততালি দিয়ে উঠল। বলল উচ্চ স্বরে, 'তাহলে বংশীয় প্রায়শ্চিত্ত করার সংখ্যা আট-এ দাঁড়াল। আর বুমেদীন বিল্লাহ প্রায়শ্চিত্ত করবেন দুজনে.............'

কথা শেষ করতে পারল না হাদী আমর। পাশ থেকে উত্থিত বাঘের মত হিংস্র গর্জনে তার কন্ঠ থেমে গেল। মুখ ফিরিয়ে দেখল, দুজন তাদের দিকে

তেড়ে আসছে। কাঁধে তাদের ষ্টেনগান, হাতে পেরেক বিছানো ব্যাটন। এই ব্যাটন ষ্টেনগানের গুলীর চেয়ে ভয়াবহ। ষ্টেনগান নিমিষেই মানুষকে মেরে ফেলে, কিন্তু পেরেক বিছানো ব্যাটনের প্রহার মৃত্যুর চেয়েও ভীতিকর ও অসহনীয়। এই পেরেক বিছানো ব্যাটন WFA-এর নির্যাতন-অস্ত্রের তালিকায় আরেকটি নতুন সংযোজন।

হাদী আমররা চারজন দাঁড়িয়ে গল্প করছিল।

ব্যাটনধারী দুজন এসে চারজনকে এলোপাথাড়ী প্রহার শুরু করে দিল। জালাল বায়ার ও হাদী আমরকে সবচেয়ে নির্দয়ভাবে প্রহার করতে লাগল। শীঘ্রই রক্তের পিন্ডে পরিণত হলো দুটি দেহ। অন্য দুটি দেহও রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল।

অন্যান্য বন্দীরা চারদিক থেকে সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে আসছিল রক্তের পিন্ডে পরিণত হওয়া তাদের সাথীদের দিকে।

এমন ঘটনা বন্দীখানার সাধারণ ব্যাপার। সুযোগ পেলে একে অপরকে সেবা-শুশ্রুষা করে থাকে বন্দীরা।

ব্যাটনধারীরা তাদের রক্ত¯œাত ব্যাটন ফেলে দিয়ে হাতে নিয়েছিল ষ্টেনগান।

এ সময় চারদিকে একটা গম্ভীর কণ্ঠ ধ্বনিত হলো, ‘ধন্যবাদ ঈশ্বরের সন্তান প্রহরীরা। চারজন বন্দীকে কাজের সময় অকাজ করার শাস্তি হিসাবে যে রক্তের পোশাক পরিয়েছ সেজন্যে তোমাদের ধন্যবাদ। এখন বড় একটি সার্কেল দাও ওদের চারদিকে। কয়েকটা চেয়ার সাজিয়ে দাও রক্তের পোশাক পরা চারজনের সামনে।

বিখ্যাত নতুন মেহমান নিয়ে আমরা আসছি।

রক্তাপ্লুত হাদী আমরদের সামনে কয়েকটা চেয়ার উঠে এল।

তার সাথে উপর থেকে নেমে এল একটা সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল রাজপুরুষের সাজসজ্জা পরিহিত একজন দীর্ঘকায় মানুষ। সে এসে বসল সিংহাসনের মত একটা সুন্দর চেয়ারে।

তার পরেই নেমে এল সফেদ শ্মশ্রুওয়ালা স্বর্গীয় চেহারার একজন লোক। তাকে ধরে নামিয়ে নিয়ে এসেছিল আরেকজন। তাকে বসানো হলো সিংহাসনাকৃতি চেয়ারের সামনের একটা চেয়ারে। সে নেমে আসতেই বন্দীদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়ে গিয়েছিল। কেউ কেউ উঠে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু একজন প্রহরী চিৎকার করে উঠল, 'কেউ কথা বলবে না, কেউ নড়বে না। দ্বিতীয়বার আদেশ দেয়া হবে না।'

বন্দীরা সব চুপ করল। কিন্তু সকলের চোখে-মুখে বিস্ময় ও বেদনার ছাপ।

সফেদ শ্মশ্রুওয়ালা স্বর্গীয় চেহারার লোকটিই শেখুল ইসলাম আহমদ মুহাম্মাদ। ইনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক 'আন্তর্জাতিক হিউম্যান ডেভলপমেন্ট এন্ড এইডস ফর অপ্রেসড' (IHDAAFD)-এর প্রধান। তাকে কিডন্যাপ করে সাও তোরাহে আনা হয়েছে।

শেখুল ইসলাম বসার পর সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল মাঝবয়সী কঠিন চেহারার একজন লোক। সে বসল শেখুল ইসলামের ডান পাশে মুখোমুখি।

সিঁড়ি দিয়ে প্রথম নেমে আসা সিংহাসনাকৃতির চেয়ারে বসা রাজসিক পোশাকের লোকটি আজর ওয়াইজম্যান। আর সর্বশেষ নেমে আসা কঠোর চেহারার লোকটি বেন্টো বেগিন। আজর ওয়াইজম্যানের নতুন অপারেশন চীফ।

সবাই এসে বসলে আজর ওয়াইজম্যান তার সিংহাসনে নড়ে-চড়ে সোজা হয়ে বসল। তাকাল রক্ত পিন্ডের মত পড়ে থাকা চারজনের দিকে।

ওদের গা থেকে তখনও রক্ত ঝরছে। কাতরাচ্ছে ওরা যন্ত্রণায়। ওদের একজন 'পানি' 'পানি' বলে বিলাপ করছে।

আজর ওয়াইজম্যানের দৃষ্টি তার প্রতিই নিবদ্ধ হলো। বলল, 'ধৈর্য ধর হাদি আমর। দুনিয়ার পানি খেয়ে কি হবে, বেহেশতের শরাবন তহুরা তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।'

বলেই তাকাল একজন প্রহরীর দিকে। বলল, 'যাও হাদী আমরকে এক গ্লাস পানি দেখিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এস।'

থামল আজর ওয়াইজম্যান। হাসল একটু। তারপর চারদিকে বসা বন্দীদের দিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, 'তোমরা বিস্মিত হয়েছ শেখুল ইসলামের মত বিখ্যাত একজন জনসেবক ও সকলের শ্রদ্ধাভাজন লোককে কেন আমরা দুনিয়ার এই দোজখে নিয়ে এলাম। কারণ একটাই সেটা হলো, যারা আমাদের বন্ধু নয়, তারাই আমাদের শত্রু। শেখুল ইসলাম সব মানুষের বন্ধু, কিন্তু আমাদের বন্ধু হতে রাজী হননি। তাই তিনি এখানে।'

একটু থেমেই আজর ওয়াইজম্যান তার চোখ শেখুল ইসলামের দিকে ঘুরিয়ে নিল।

শেখুল ইসলাম দেখছিল চারদিকের বন্দীদের। বন্দীদের অধিকাংশই বিখ্যাত লোক এবং শেখুল ইসলামের পরিচিত। প্রথমে তার বিস্ময়ের পালা। তাহলে নিখোঁজ বলে প্রচারিত সবাইকে এখানে এনে বন্দী রাখা হয়েছে! এ সবই WFA -এর কাজ! তার মন কেঁদে উঠল সকলের অবস্থা দেখে। বিশেষ করে হাদী আমরদের অবস্থা তাকে দিশেহারা করে তুলল। বিশেষ করে জালাল বায়ার ও হাদী আমর দুজনেই তার খুব প্রিয় ব্যক্তি।

'জনাব শেখুল ইসলাম, আপনি সবই দেখলেন এবং দেখছেন, এখন বলুন আপনি আমাদের সহযোগিতা করতে রাজী কিনা।' বলল আজর ওয়াইজম্যান শেখুল ইসলামকে লক্ষ্য করে।

'নতুন কোন সহযোগিতার বিষয় হলে বলুন।' শেখুল ইসলাম বলল নির্লিপ্ত ও নিরুত্তাপ কণ্ঠে।

'আমাদের প্রয়োজনের কথা আবার বলছি। এক. আপনার 'হিউম্যান ডেভলেপমেন্ট' ও 'এইড ফর অপ্রেসড' প্রোগ্রামে যারা সাহায্য করে আসছে তাদের একটা পূর্ণ তালিকা আমরা চাই। দুই. স্পুটনিক তার ডকুমেন্টগুলো কোথায় লুকিয়ে রেখেছে, তারও সন্ধান আমাদের প্রয়োজন।' শক্ত কিন্তু শান্ত কণ্ঠে বলল আজর ওয়াইজম্যান।

শেখুল ইসলাম তার চেয়ারে সোজা হয়ে বসল। বলল ধীর কণ্ঠে, 'তালিকা আপনার প্রয়োজন নেই, সুতরাং তা আপনারা পাবেন না, এ কথা আগেই বলেছি। আর মি. কামাল সুলাইমানদের স্পুটনিক-এর ডকুমেন্ট সম্পর্কে আমি

কিছুই জানি না। তারা আমার পরিচিত, মাঝে মাঝেই তাদের সাথে আমার কথা হয়েছে, কিন্তু ডকুমেন্ট নিয়ে কোন কথা কোন দিন হয়নি, এ কথাও আমি আপনাদের বলেছি।'

'তালিকার প্রশ্নে পরে আসছি জনাব। ডকুমেন্টের ব্যাপারে আপনার কথা যদি শেষ হয়, তাহলে এ ডকুমেন্টের খবর কে জানবে জনাব। কামাল সুলাইমানরা নিশ্চয়?' বলল আজর ওয়াইজম্যান।

'তা অবশ্যই জানবে।' শেখুল ইসলাম বলল।

'তাহলে দয়া করে ওদের বলে দিন যেন ডকুমেন্টগুলো কোথায় তা আমাদের বলে দেয়।' বলল আজর ওয়াইজম্যান।

'স্পুটনিক ধ্বংস হবার সাথে সাথে ওদেরও অন্তর্ধান ঘটেছে। ওরাও কি তাহলে আপনার এখানে বন্দী?' শেখুল ইসলাম বলল।

'হ্যাঁ, ওরাও আমার এ দোজখখানার বিশেষ মেহমান। এখনি ওদের নিয়ে আসা হচ্ছে। তারা আপনাকে শ্রদ্ধা করে। আপনি ওদের রাজী করান।' বলল আজর ওয়াইজম্যান।

আজর ওয়াইজম্যানের কথা শেষ হতেই তাদের এবং হাদী আমরদের মাঝখানে ছয় সাত বর্গফুটের একটা সেল টিউব উঠে এল। তার মধ্যে কামাল সুলাইমানসহ স্পুটনিকের ওরা ছয়জন দাঁড়িয়ে।

সেল টিউবটি মেঝের সমান্তরালে এসে স্থির হতেই সেলের চারদিকের প্রাচীর আবার নিচে ফিরে গেল। উন্মুক্ত মেঝের উপর দাঁড়ানো কামাল সুলাইমানরা ছয়জন।

ওদের ছয়জনেরই বিধ্বস্ত অবয়ব। ভেঙে পড়া স্বাস্থ্য। দূর্বল দেহ। কিন্তু চোখ-মুখে তাদের সুস্থতার অদ্ভুত দ্যুতি ও আত্মবিশ্বাসের অপরূপ আলো।

শায়খুল ইসলাম এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল ওদের সাতজন অর্থাৎ কামাল সুলাইমান, আবদুল্লাহ আল ফারুক, আহমদ আল সেনুসি, ওসমান আবদুল হামিদ, মোহাম্মদ আলী রেজা, মোহাম্মদ সুকর্ণ, আবদুল রহমান উমাইয়া-এর দিকে। ওদের অবস্থা দেখে অন্তর কেঁদে উঠেছিল শেখুল ইসলামের। হতাশা ও দূর্বলতা এসে তাকে চেপে ধরেছিল চারদিক থেকে। কিন্তু ওদের চোখ-মুখের

দিকে তাকিয়ে দূর্বলতা ও হতাশা মুহূর্তে বিদায় নিল তার। কান্নার বদলে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল তার মন। যেন ওদের চোখ-মুখের দীপ্তিতে মূর্তিমান হয়ে উঠেছে দয়ালু আল্লাহর অশেষ দয়া।

আত্মবিশ্বাসের আলো ফিরে এল শেখুল ইসলামের চোখে-মুখেও।

আজর ওয়াইজম্যান শেখুল ইসলামকে বলল, 'আপনি ওদের বোঝান। টুইনটাওয়ার ধ্বংসের অন্তরালের ঘটনা সম্পর্কে যে দলিলপত্র ওরা সংগ্রহ করেছে, তা আমাদের দিয়ে দিক।'

বিস্ময় ফুটে উঠল শেখুল ইসলামের চোখে-মুখে। বলল, 'টুইনটাওয়ার ধ্বংসের অন্তরালের ঘটনা কি? সে ঘটনা সম্পর্কিত ডকুমেন্ট আপনি কেন চান?' বলল শেখুল ইসলাম আজর ওয়াইজম্যানকে লক্ষ্য করে।

আজর ওয়াইজমানের দুচোখ জ্বলে উঠল। বলল, 'আপনাকে এখানে আনা হয়েছে প্রশ্ন করার জন্যে নয়, প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে। আপনাকে যা বলেছি তাই করুন।'

আজর ওয়াইজম্যানের কথা শেষ না হতেই ওদের ৭ জনের একজন ওসমান আবদুল হামিদ বলে উঠল, 'মুহতারাম, উনি জবাব দেবেন কি করে? ঐ ষড়যন্ত্রকারীরাই নিউইয়র্কের লিবার্টি ও ডেমোক্রাসি টাওয়ার ধ্বংস করে মুসলমানদের ঘাড়ে চাপিয়েছিল, এ কথাই আমরা মানে স্পুটনিক প্রমাণ করতে যাচ্ছিলাম। দলিল কিছু আমরা উদ্ধারও করেছি। এটাই আমাদের অপরাধ।'

বিস্ময়ে বিস্ফোরিত হয়ে উঠেছে শেখুল ইসলামের দুই চোখ। এই তথ্য তার কাছে খুবই নতুন। পত্র-পত্রিকায় এ ধরনের কিছু খবর প্রকাশিত হয়েছিল স্পুটনিক ধ্বংসের ফলো-আপ হিসাবে। কিন্তু সে বিষয়টাকে কেউই তেমন গুরুত্ব দেয়নি, কারণ টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পরও এ ধরনের আশংকা ও সম্ভাবনার কথা নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। যা গুরুত্ব না পাওয়ায় আপনাতেই থেমে গিয়েছিল।

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল শেখুল ইসলাম। মুখের মধ্যেই কথা তার থেমে গেল। দেখল সে, আজর ওয়াইজম্যানের ইংগিতে একজন প্রহরী পেরেক বিছানো একটা ব্যাটন হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওসমান আবদুল হামিদের উপর। মুহূর্তেই তার দেহ রক্তাপ্লুত হয়ে উঠল। পড়ে গেছে সে। শোয়া অবস্থায়ই তাকে

পেটানো হচ্ছে। অবাক ব্যাপার। মুখে কোন অভিব্যক্তি নেই ওসমান আবদুল হামিদের। তার চোখ বন্ধ। জ্ঞান হারাল নাকি সে। আঁৎকে উঠল শেখুল ইসলাম। আজর ওয়াইজম্যানের দিকে তাকিয়ে অনেকটা অনুরোধের কণ্ঠে বলল, 'এই বর্বরতা থামান মি. ওয়াইজম্যান।'

'আপনি ওদের বলুন ডকুমেন্টগুলো কোথায় তা বলতে। সংগে সংগেই অপারেশন থেমে যাবে।' বলল আজর ওয়াইজম্যান নির্লিপ্ত কণ্ঠে।

শেখুল ইসলাম কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল, তার আগেই কামাল সুলাইমান বলে উঠল, 'মুহতারাম শেখুল ইসলাম, আপনি এই ষড়যন্ত্রকারী দুর্বৃত্তদের কোন সহযোগিতা করবেন না। আর আমরা মরে গেলেও ডকুমেন্টের কথা বলব না। আমরা যে কোন পরিণতির জন্যে প্রস্তুত। আল্লাহ ছাড়া এদের কোন কৃপা আমাদের কাম্য নয়। মুসলমানদের কৃপা করার কোন যোগ্যতাই এরা রাখে না।'

কামাল সুলাইমানের কথা শেষ না হতেই গর্জে উঠেছে আজর ওয়াইজম্যান। তার দুচোখে আগুন। গর্জে উঠেই সে ইংগিত করেছে আরেকজন প্রহরীকে। সংগে সংগেই সে প্রহরী পেরেক বিছানো সেই ব্যাটন হাতে ছুটল কামাল সুলাইমানের দিকে।

অন্ধের মতই এলোপাথাড়ী ব্যাটন চার্জ শুরু করল কামাল সুলাইমানের উপর। প্রতিটি আঘাতেই কামাল সুলাইমানের দেহ থেকে রক্ত ঝরণাধারার মত ফিনকি দিয়ে বেরুতে লাগল।

কয়েখ মুহূর্তের মধ্যেই কামাল সুলাইমানের দেহ মাটিতে আছড়ে পড়ল। রক্তের লাল রংয়ে ঢাকা পড়ে গেল কামাল সুলাইমানের দেহ।

ওসমান আবদুল হামিদের মতই কামাল সুলাইমানের মুখ থেকে একটি শব্দও বেরুলো না। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে চোখ বন্ধ করে মাটিতে পড়ে আছে সে।

অসহনীয় এই দৃশ্য থেকে বাঁচার জন্যে চোখ বন্ধ করেছে শেখুল ইসলাম। বেদনায় মুখ তার নীল হয়ে গেছে।

শেখুল ইসলামকে লক্ষ্য করে আজর ওয়াইজম্যান কঠোর কণ্ঠে বলল, ‘চোখ বন্ধ রাখলে বাইরের ঘটনা বন্ধ থাকবে না শেখুল ইসলাম। চোখ খুলুন। ওদের বোঝান।’

চোখ খুলল শেখুল ইসলাম। বলল, ‘আমি ভয়ে চোখ বন্ধ করিনি মি. ওয়াইজম্যান। মানুষের এই বর্বরতা সত্যিই অসহনীয়। আর ওদের বোঝাবার কথা বলছেন। কেন ওরা বুঝবে, যদি সে বুঝটা জাতির স্বার্থের বিরুদ্ধে হয়। যারা ভয়কে জয় করতে পারে, হুমকি, নির্যাতন ইত্যাদিতে তাদের কিছুই হয় না। নিজ চোখেই তো তা দেখছেন।’

হাসল আজর ওয়াইজম্যান। বলল, ‘যারা নিজের উপর নির্যাতনকে হাসি মুখে সহ্য করতে পারে, তারাই আবার অনেক ক্ষেত্রে অন্যের উপর নির্যাতন সহ্য করতে পারে না, ভেঙে পড়ে।’

কথা শেষ করেই একজন প্রহরীর দিকে চেয়ে বলল, ‘তুমি শেখুল ইসলামকে ওদের কাছে নিয়ে যাও। রঙীন সাজে একেও সাজাও। দেখি ব্যাটারা মুখ খোলে কিনা।’

সঙ্গে সঙ্গে প্রহরীটি ছুটে এল শেখুল ইসলামের কাছে। প্রহরী তাকে ধরতে যাবে এসময় শেখুল ইসলাম বলল, ‘ধরে নিতে হবে না, আমি নিজেই যাচ্ছি যেখানে নিতে চাও।’

‘অত বড়াই করো না শেখুল ইসলাম, তুমি কোন দিন আঙুলের আঘাতও খাওনি, এই দোজখী ব্যাটন-চার্জ খেয়ে তুমি হাতির মত চিৎকার করবে। সে চিৎকার ওদের মুখ খুলতে বাধ্য করবে।’ বলল আজর ওয়াইজম্যান ঠান্ডা স্বরে।

‘তোমার কথা ঠিক ছিল আজর ওয়াইজম্যান কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত। এখন আর সে অবস্থা নেই। আমি শিক্ষা নিয়েছি এই ছেলেদের কাছ থেকে। সারা জীবনের বিদ্যা আমাকে যা শেখায়নি, তা আমি শিখেছি ছেলেদের দীপ্ত চেহারা দেখে এবং যে কোন কষ্ট জয় করার ধৈর্য্য দেখে। তুমি একবার পরীক্ষা করে দেখ আজর ওয়াইজম্যান।’ পাথরের মত শক্ত আর ঠান্ডা স্বরে কথাগুলো বলে শেখুল ইসলাম হাঁটতে শুরু করল।

এ সময় বেন্টো বেগিন উঠে এল তার আসন থেকে। বন্দীদের সারিতে বসা নতুন বন্দী সাংবাদিক বুমেদীন বিল্লাহর দিকে ইংগিত করে আজর ওয়াইজম্যানের কানে ফিসফিস করে বলল, 'শেখুল ইসলাম আমাদের শেষ তুরুপের তাস। সবশেষের জন্যে তাকে রেখে সাংবাদিক বুমেদীন বিল্লাহকে টেষ্ট করতে পারি আমরা। সাংবাদিক বুমেদীন বিল্লাহ স্পুটনিক ধ্বংসের আগের ও পরের ঘটনার সাথে সব চেয়ে বেশি সংশ্লিষ্ট।'

কথা শুনে একটু ভাবল আজর ওয়াইজম্যান। তার চোখে-মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল। বলল, 'তুমি ঠিক বলেছ বেগিন। নিয়ে এস বুমেদীন বিল্লাহকে।'

বেন্টো বেগিন উঠে এগোল তার ডান পাশের বন্দীর সারির দিকে।

আজর ওয়াইজম্যান শেখুল ইসলামকে বলল, 'আপনি ওখানেই ওদের কাছে বসুন। আপনার টার্মটা একটু পরে। সাংবাদিক বুমেদীন বিল্লাহ আমাদের দোজখখানার বাসিন্দা হিসেবে আপনার সিনিয়ার। তার দাবীটাই আগে।'

বেন্টো বেগিন নিয়ে এল সাংবাদিক বুমেদীন বিল্লাহকে। বুমেদীন বিল্লাহর চেহারায় গাম্ভীর্য। কিন্তু মুখে ভয়ের চিহ্ন নেই।

বুমেদীন বিল্লাহ আসতেই আজর ওয়াইজম্যান তাকে শেখুল ইসলামের রেখে যাওয়া চেয়ারে বসতে বলল।

বেন্টো বেগিন তার চেয়ারে বসেছে।

বুমেদীন বিল্লাহ সেই নির্দেশিত চেয়ারে গিয়ে বসল।

বুমেদীন বিল্লাহ বসতেই আজর ওয়াইজম্যান হালকা কণ্ঠে বলল, 'তুমি তো সাংবাদিক, আমাদের কথা শুনলে। তোমার মতামত বলার মত কিছু আছে?'

'অমিত বলশালী বাঘ শিকার ধরেও তাকে বাগে আনতে পারছে না, এটাই বুঝলাম আমি।' বলল বুমেদীন বিল্লাহ।

'চমৎকার, চমৎকার। তোমার উপমা একশ'ভাগ ঠিক। মনে হচ্ছে তুমি খুব বুদ্ধিমান ছেলে। যে সাহায্য আমরা চাচ্ছি, সে সাহায্য তুমি করতে পারবে।'

তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল না বুমেদীন বিল্লাহ। মাথা নিচু করেছে সে। যেন সে গভীর ভাবনায় পড়েছে।

খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল আজর ওয়াইজম্যানের মুখ। সে নিশ্চিত বুঝল বুমেদীন বিল্লাহর কাছে মূল্যবান তথ্যটি আছে, না হলে সংগে সংগেই সে অস্বীকার করতো। বুমেদীন বিল্লাহর কথঅ বলতে দেরি দেখে উদগ্রীব কণ্ঠে আজর ওয়াইজম্যান বলে উঠল, 'বুমেদীন বিল্লাহ আমাদের সাহায্য কর। আমরা সাহায্য চাই যে কোন মূল্যে।'

মুখ তুললো বুমেদীন বিল্লাহ। বলল গম্ভীর কণ্ঠে, 'আমি আপনাদের সাহায্য করব। কিন্তু এই অমূল্য তথ্যের জন্যে আমি কি মূল্য পাব?'

শেখুল ইসলাম কথাগুলো শুনছিল। কামাল সুলাইমানসহ সবার কানেই কথাগুলো পৌছেছিল। বুমেদীন বিল্লাহর শেষ কথা কামাল সুলাইমানের কানে পৌছতেই নড়ে উঠল কামাল সুলাইমানের রক্তপিন্ড আকারের দেহ। অনেক কষ্টে মাথা তুলল সে। বলল সে বুমেদীন বিল্লাহকে লক্ষ্য করে, 'মি. বিল্লাহ টাকার জন্যে জাতির এতবড় সর্বনাশ করবেন না। এদের আপনি চেনেন না। ডকুমেন্টগুলোর খবর ওদের দিলেও ওরা আপনাকে বাঁচতে দেবে না। কোন মুসলমানের প্রতিই তাদের আস্থা নেই।'

ক্লান্ত কণ্ঠ থামল কামাল সুলাইমানের।

কামাল সুলাইমান থামতেই আজর ওয়াইজম্যান বলে উঠল, 'বিল্লাহ এ শয়তানদের কথা বিশ্বাস করবে না। এদের দুর্ভাগ্যের সাথে সব মুসলমানকে জড়াতে চাচ্ছে, তোমাকেও জড়াতে পারলে ওরা খুশি হয়। আমরা তোমার মত মানে কামাল আতাতুর্কের মত মুসলমানদের বন্ধু। এটা তুমি নিজেই দেখতে পাবে।'

আজর ওয়াইজম্যানের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বুমেদীন বিল্লাহ বলে উঠল কামাল সুলাইমানকে লক্ষ্য করে, 'মি. সুলাইমান আমি কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে নেই। আমাকে দোষ দেবেন না। আমি আপনা পূর্ব পুরুষ কামাল আতাতুর্কের অনুসারী। আমি মনে করি টুইনটাওয়ার ধ্বংসের বিশ বছর পর এ নিয়ে সাম্প্রদায়িক সংঘাত বাধাবার কোন যুক্তি নেই। সুতরাং ডকুমেন্টগুলো ওদের হাতে তুলে দিয়ে এ সংঘাত-সম্ভাবনার ইতি ঘটাতে চাই। এতে আপনাদেরও উপকার হবে, উপকার হবে আপনাদের পরিবারগুলোর।

জানেন, আপনাদের পরিবার সার্বক্ষণিক উদ্বেগ নিয়ে কিভাবে পালিয়ে বেড়াচ্ছে? আমি ওদেরকেও বাঁচাতে চাই।'

থামল বুমেদীন বিল্লাহ।

'আমাদের এবং আমাদের পরিবার নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না মি. বিল্লাহ। আজর ওয়াইজম্যান আপনার জন্যে কতটা করবেন জানি না, কিন্তু আমাদের জন্যে আল্লাহ আছেন। তাঁর উপর আমরা নিশ্চিত ভরসা করতে পারি। ইতিহাস বলে, অসাম্প্রদায়িক সেজে কেউই অতীতে লাভবান হয়নি, আপনিও হবেন না মি. বিল্লাহ।'

'আমিও বলছি ইতিহাসও বলবে। সেটা দেখার জন্যে আজর ওয়াইজম্যান আপনাদের জীবিত রাখুন, এটা আমি চাইব।' বলল বুমেদীন বিল্লাহ।

'হ্যাঁ, বিল্লাহ। অন্তত তোমার ইতিহাস তারা দেখেই মরবে। এখন বল তুমি কি বিনিময় চাও। আমরা দ্রুত আগাতে চাই।'

বুমেদীন বিল্লাহ একটু ভাবল। তারপর বলল, 'বিনিময় হিসাবে তিনটি শর্ত। এক. আমার মুক্তি, দুই. বৃটেন ও ফ্রান্সের দুটি কাগজে খবর ছাপতে হবে যে, আপনি আমাকে সাংবাদিক হিসেবে সাও তোরাহ দ্বীপের বোটানিক্যাল রিসার্চ পরিদর্শন ও রিপোর্ট করার জন্যে এই দ্বীপে নিয়ে এসেছেন, তিন. এক বিলিয়ন ডলার এক্সপ্রেস ব্যাংকে আমার একাউন্টে জমা দিতে হবে। শেষ দুটি কাজ আপনাদের তথ্য দেবার আগেই সম্পন্ন হতে হবে এবং ব্যাংকের ডিপোজিট শ্লীপ এবং নিউজসহ পত্রিকা আমাকে পেতে হবে।'

সংগে সংগেই উত্তর দিল না আজর ওয়াইজম্যান। ভাবল একটুক্ষণ। তারপর বলল, 'কোন শর্তেই আমার কোন আপত্তি নেই। তবে নিউজ প্রকাশ করতে হবে কেন?'

'ওটা আমার নিরাপত্তার গ্যারান্টি মি. আজর ওয়াইজম্যান। নিউজ প্রকাশিত হলে আমাকে হত্যা করা আপনার জন্যে কঠিন হবে। হত্যা করলেও আপনি শুধু নন, সাও তোরাহ দ্বীপও আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াবে। ওটুকু গ্যারান্টি

আমার জন্যে না থাকলে আমি নিঃশর্ত কোন ঝুঁকি নিতে পারি না।' বলল বুমেদীন বিল্লাহ।

'ঠিক আছে তোমার তিনটি শর্তই আমি মেনে নিলাম। কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে। সেটা হলো, 'ডকুমেন্ট আমাদের হাতে না আসা পর্যন্ত তোমাকে এখানেই থাকতে হবে।' আজর ওয়াইজম্যান বলল।

'এখানে এই জেলখানায় থাকব কি করে। প্রথম সুযোগেই তো ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।' বলল বুমেদীন বিল্লাহ চোখে-মুখে উদ্বেগ টেনে।

'হ্যাঁ সেটা চিন্তার বিষয়। তোমাকে ওদের সাথে রাখা যাবে না। ঠিক আছে তুমি আমাদের লোকদের সাথে এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন সেকশনে থাকবে।' আজর ওয়াইজম্যান বলল।

বলেই আজর ওয়াইজম্যান উঠে দাঁড়ালো।

উঠে দাঁড়ালো বেন্টো বেগিনও।

'বেগিন, বুমেদীন বিল্লাহকে তোমাদের সাথে নিয়ে এস। এখন থেকে সে তোমাদের সাথে থাকবে।'

বলে সিঁড়ির দিকে এগুলো আজর ওয়াইজম্যান।

আজর ওয়াইজম্যান উঠে যাবার পর বুমেদীন বিল্লাহকে নিয়ে সিঁড়িতে উঠতে উঠতে বলল একজন প্রহরীকে লক্ষ্য করে, বুমেদীন বিল্লাহর সেলে এখন থেকে থাকবে শেখুল ইসলাম।'

সিঁড়ি দিয়ে উঠার সময় বুমেদীন বিল্লাহ কামাল সুলায়মানদের দিকে চেয়ে বলল, 'মি. সুলায়মান, ইতিহাস আমার শুরু হলো।'

'আপনার ইতিহাস আপনি লিখবেন না, লিখবেন ঐতিহাসিকরা।' বলল কামাল সুলায়মান ক্ষীণ কণ্ঠে।

'যা ঘটে ঐতিহাসিকরা তাই লেখে। আমি ঘটাব, ইতিহাস তাই লিখবে।' বুমেদীন বিল্লাহ বলল।

'বিশ্বাসঘাতক বিশ্বাসঘাতক হিসাবে ঘটনা ঘটায় না। কিন্তু ইতিহাস তাকে বিশ্বাসঘাতক বলে।' বলল কামাল সুলাইমান দুর্বল ও কাঁপা কণ্ঠে।

হাসল বুমেদীন বিল্লাহ। বলল, ‘সে ইতিহাস দেখা পর্যন্ত আপনারা বেঁচে থাকুন, আমি চাই।’

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল কামাল সুলাইমান। কিন্তু বুমেদীন বিল্লাহ উপরে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেছে। সিঁড়িও উঠে যাচ্ছে।

আহমদ মুসা ধীরে ধীরে গাড়ি চালিয়ে ৭১ বে ষ্ট্রিট-এর সামনে দিয়ে একবার দক্ষিণে চলে গেল।

‘ভাইয়া, ৭১ বে ষ্ট্রিট তো একটা বদ্বীপ।’ বলল হাসান তারিক।

‘হ্যাঁ, নিশ্চয় বাড়িটা ব-দ্বীপের কেন্দ্রস্থলে হবে। গাড়ি চালিয়ে যাওয়া যাবে না। প্রধান সড়ক থেকে ৭১ বে ষ্ট্রিট-এর গেট পেরিয়ে অনেকটা হাঁটতে হবে মনে হচ্ছে।’ আহমদ মুসা বলল।

কিছুটা এগিয়ে গাড়ি আবার ফেরাল আহমদ মু। ৭১ বে ষ্ট্রিট-এর কাছাকাছি এসে গাড়িটা একটা ঝোপের আড়ালে রেখে দুজন হেঁটে হেঁটে ৭১ বে ষ্ট্রিট বাড়িটার দিকে এগুতে লাগল।

বে ষ্ট্রিটটা সাগরের ধার ঘেঁষে তৈরি। রাস্তার পরে সেফটি ফেঞ্চ বা নিরাপত্তা বেড়া। তার পরেই সাগর। তবে কোন কোন স্থানে ভূখন্ড মাথা বাড়িয়ে সাগরে ঢুকে গিয়ে বদ্বীপের আকার নিয়েছে। এসব স্থানে কিন্তু বাঁক না নিয়ে রাস্তা সোজা চলে গেছে। এই ধরনেরই স্থান হলো ৭১ বে ষ্ট্রিট।

তখন সন্ধ্যা পুরোপুরি নেমেছে। কিন্তু সাগর তীরের সন্ধ্যা আলো-আঁধারীর এক মিশ্রণ।

আলো-আঁধারীর বুক চিরে এগিয়ে যাচ্ছে আহমদ মুসা ও হাসান তারিক প্রশস্ত ফুটপাত ধরে।

চারদিকটা নিরব।

মাঝে মাঝে শিশ দিয়ে যাচ্ছে রাস্তার চলমান গাড়ি। কদাচিৎ দুএকজন লোক দেখা যাচ্ছে ফুটপাতে চলাচল করতে।

৭১ বে ষ্ট্রিট-এর দুপাশেই সাগর তীরের কিছু দূর পর্যন্ত ছোট-খাট গাছ-গাছড়া ও ঝোপ-ঝাড়। ঝোপ-ঝাড় মিশেছে গিয়ে ৭১ বে ষ্ট্রিট গেটের দুপ্রান্তে। নিশ্চয় এই ধরনের ঝোপ-ঝাড় কেটেই গেটটা তৈরি করা হয়েছে। গেট থেকে যে রাস্তা ব-দ্বীপের অভ্যন্তরে এগিয়ে গেছে তাও দুপাশের ঘন ঝোপ-ঝাড়ের মধ্য দিয়ে।

গোটা ব-দ্বীপটাই ঘন জঙ্গলের বর্মে ঢাকা।

৭১ বে ষ্ট্রিট এর গেট তখন দো যেতে শুরু করেছে।

ফুটপাতের প্রান্ত ঘেঁষে ঝোপ-ঝাড়ের ছায়া-ঘন অন্ধকারে নিজেদের আড়াল করে গেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আহমদ মুসা ও হাসান তারিক।

গেটের একেবারে পাশে এসে গেছে তারা।

গেটে দরজা আছে, কিন্তু খোলা।

হয়তো দরজা রাতে বন্ধ হয় কিছু সময়ের জন্য, কিংবা হয়ই না।

গেটের ভেতরের রাস্তাটা নির্জন।

রাস্তায় আলো আছে, কিন্তু যথেষ্ট নয়।

গেটের ভেতরের রাস্তাটা প্রাইভেট। আলোর ব্যবস্থা দূরে দূরে। সেই আলো রাস্তাকে যথেষ্ট আলোকিত করতে পারেনি।

আহমদ মুসা হাতঘড়ির দিকে তাকালো। রাত ৮টা বাজে। সূর্য অস্ত যাবার পর আধা ঘণ্টা পার হয়েছে। এই সময়টাকেই প্রকৃত সন্ধ্যা বলা হয় এই অঞ্চলে।

'গেট খোলা, তার উপর গেটে ওদের লোক নেই কেন হাসান তারিক বলতে পারো?' আহমদ মুসা বলল।

'ভাইয়া কদিন এখানে থেকে বুঝেছি, এখানকার প্রাইভেট বাড়ির প্রাইভেট রোডগুলোর সংস্কৃতি এক ধরনের নয়। কোথাও গেট আছে, কোথাও গেট নেই। কোথাও প্রহরী থাকে, কোথাও থাকে না।' বলল হাসান তারিক।

'কিন্তু হাসান তারিক, ভালো করে দেখ। ওপাশে গেটের পাশেই ছোট একটা গার্ডরুম। গার্ডরুমের দরজা খোলা। ভেতরে এই অন্ধকারেও একটা ছোট কিছুর অস্তিত্ব দেখা যাচ্ছে। ওটা চেয়ারই হবে। যদি তাই হয়, তাহলে চেয়ারে

মানুষ থাকে। কিন্তু এখন নেই। সে গেল কোথায়? বিশেষ করে আজ সন্ধ্যায় যখন ওদের বিশেষ অনুষ্ঠান।’

‘ঠিক, সার্বক্ষণিক লোকের তো গেট ফেলে কোথাও চলে যাওয়ার কথা নয়। তাই আমাদের কিছুটা অপেক্ষা করা উচিত। ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হবে।’

‘হ্যাঁ, হাসান তারিক, এটাই যুক্তিসংগত। তবে চল.........।’

কথা শেষ করতে পারলো না আহমদ মুসা। একটা হাত এসে সাঁড়াশির মত তর গলা চেপে ধরল। আরেকটা হাত এসে চেপে বসল তার নাকে।

সংগে সংগেই আহমদ মুসা বুঝল তাকে ক্লোরোফরম করা হচ্ছে।

আহমদ মুসা সে মুহূর্তেই শ্বাস বন্ধ করে গোটা দেহের ভার নিচের দিকে ছুঁড়ে দিয়েই দুহাত জোরে সামনের দিকে ছুড়ে দিল। ফলে দেহের ভারে বাড়তি গতির সৃষ্টি হলো এবং আকস্মিক এই গতির শক্তিই আক্রমণকারীর দেহকে সামনে উল্টে দিল। তার হাত খসে পড়লো আহমদ মুসার নাক ও গলা থেকে।

লোকটি উল্টে গিয়ে পড়েছিল আহমদ মুসার সামনে। তার মাথা আহমদ মুসার একদম দুহাতের মধ্যে।

লোকটি পড়ে গিয়েই পাশ ফিরে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিল। আহমদ মুসা তার ডান হাতের একটি তীব্র কারাত চালাল তার কানের নিচের জায়গায়। তার দেহটা আবার পড়ে গেল মাটির উপর।

আহমদ মুসা তাকে উপুড় করে ফেলে তার দুহাতদ পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল পকেট থেকে অ্যাডেসিভ টেপ বের করে।

তাকাল এবার আহমদ মুসা হাসান তারিকের দিকে। সে আক্রান্ত হবার আগেই বুঝতে পেরেছিল। দেখল, হাসান তারিক তার আক্রমণকারীকে ধরাশায়ী করে ফেলেছে। আহমদ মুসা তার দিকে তাকাতেই হাসান তারিক ফিস ফিস করে বলে উঠল, ‘এ একটু স্লো ছিল, আমার উপর এসে পড়ার আগেই টের পেয়ে যাই।’

‘হাসান তারিক, ওকে বেঁধে ফেল। চল একটু দূরে ওদের সরিয়ে নিয়ে যাই। এদের কাছ থেকে কিছু জানা যায় কিনা দেখতে হবে।’ বলল আহমদ মুসা।

ওদের টেনে নিয় গেল একদম সাগরের কিনারে। একটা পাথরের উপর ওদের আছড়ে ফেলে দিয়ে আহমদ মুসা বলল, 'বল তোরা আমাদের উপর আক্রমণ করেছিস কেন?' হাতের রিভলবারটা ওদের দিকে তাক করল আহমদ মুসা।

প্রবল ক্ষোভ ফুটে উঠেছে লোক দুটির চোখে-মুখে। কিন্তু কথা বলল না।

আহমদ মুসার রিভলবার নড়ে উঠল। প্রায় নিশব্দে একটা গুলী বেরিয়ে ওদের একজনের মাথার কিছু চুল ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেল। বলে উঠল তার সাথে সাথেই আহমদ মুসা, 'একটা সুযোগ দিলাম। দ্বিতীয় গুলীটায় এবার কিন্তু তোমার ডান কানটা উড়ে যাবে। মরার আগে তোমাকে অনেকবার মরতে হবে।'

আহমদ মুসার রিভলবারের নল নড়ে-চড়ে আবার স্থির হলো তার দিকে।

লোকটি মিট মিট করে চাইল। চোখ মুখ তার হঠাৎ শক্ত হয়ে উঠেছে। অকস্মাৎ তার মুখটি ডান দিকে নিচু হয়ে তার সার্টের একটা বোতাম কামড়ে ধরল।

আহমদ মুসা বুঝতে পেরেই হাত থেকের রিভলবারটি ফেলে দিয়ে লোকটির জামার কলার ধরে জোরে টান দিয়ে জামার বোতামটি লোকটির মুখ থেকে সরাতে চাইল কিন্তু পারল না। জামা তার মুখ থেকে সরে এল, কিন্তু বোতাম রয়ে গেল লোকটির মুখেই।

যখন আহমদ মুসা এদিকে ব্যস্ত, তখন হাসান তারিক দ্বিতীয় লোকটির জামা তার গা থেকে ছিঁড়ে খুলে ফেলেছে।

আহমদ মুসা তাকিয়েছিল প্রথম লোকটির লাশের দিকে। বিস্ময় তার চোখে-মুখে। এই হারতাতেই তার চোখের সামনে এ পর্যন্ত WFA-এর তিন জন লোক ধরা পড়ার চাইতে জীবন দেয়া বেশি পছন্দ করল! তার মানে নিজেদের আড়াল করাকে তারা তাদের জীবনের চেয়েও বেশি মূল্যবান মনে করে।

আহমদ মুসা লাশের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে তাকাল হাসান তারিকের দিকে। বলল, 'ধন্যবাদ হাসান তারিক। তুমি একজনকে জীবন্ত হাতে রাখতে পেরেছো।'

বলেই আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়াল দ্বিতীয় লোকটির দিকে, লোকটি বলা যায় একজন নব যুবক। চোখে-মুখে একটা দুর্বিনীত ভাব। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে যা হয়। আহমদ মুসা তাকে লক্ষ্য করে বলল, ‘তোমার সঙ্গী বিনা কারণেই নিজেকে শেষ করল।’

লোকটি কথা বলল না। শুধু একবার তাকাল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা আবার বলল, ‘তুমি কি ডেভিড ডেনিমের চাকুরী কর?’

লোকটি চমকে উঠে মুখ তুলল। বলল, ‘তুমি কি করে তাকে জান?’

‘আমরা তো তার কাছেই যাচ্ছিলাম।’ আহমদ মুসা বলল।

‘হ্যাঁ তোমাদেরই এ সময় আসার কথা।’ বলল লোকটি।

‘তুমি কি করে জান?’ আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

‘তোমরাই সুলিভান ও কেলভিনদের খুনী।’ বলল লোকটি।

‘কে বলেছে, ডেভিড ডেনিম? তাহলে তুমি তো সবই জান। তুমি আমাদের সাহায্য করতে পারবে।’ শীতল কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

‘আমি তোমাদের সাহায্য করব?’ বলল লোকটি। তার কণ্ঠে বিস্ময়।

আহমদ মুসা বলল, ‘হ্যাঁ, তুমি আমাদের সাহায্য করবে। সেটা হলো, আমরা ডেভিড ডেনিম-এর কাছ থেকে না ফেরা পর্যন্ত তুমি এখানে থাকবে এবং বেঁচে থাকবে। তোমাকে দিয়ে আমাদের অনেক কাজ আছে।’

হাসল লোকটিও। বলল, ‘তোমরা ডেভিড ডেনিম-এর কাছে যেতে পারার আশা করছ? আবার সেখান থেকে ফিরে আসার আশাও করছ?’

‘তিনি আসমানে থাকেন না। কোথায় থাকেন আমরা জানি।’ বলল আহমদ মুসা।

‘তোমরা আমাদের দুজনকে পরাভূত করে সব জয় করেছ মনে করো না। একবার চেষ্টা করে দেখ।’ লোকটি বলল।

আহমদ মুসা তাকাল হাসান তারিকের দিকে। বলল, ‘তুমি এর মুখটা ভালো করে টেপ দিয়ে আটকে দাও। তারপর পাটা বেঁধে ঐ গাছের কান্ডটার সাথে শক্ত করে বেঁধে রাখ।’

হাসান তারিক লোকটিকে নিয়ে একটু উত্তরে তীর ঘেঁষে দাঁড়ানো গাছটার দিকে এগুল।

লোকটি যাওয়ার জন্যে পা তুলে আবার ফিরে তাকিয়ে আহমদ মুসাকে বলল, 'আবার রেখে যাওয়া কেন। আমাকেও মেরে ফেল।'

'বললাম তো তুমি আমাদের অনেক কাজে লাগবে।' বলল আহমদ মুসা।

তারপর হাসান তারিককে লক্ষ্য করে বলল, 'তুমি ওকে বেঁধে সার্চ করে এস। ওকে সার্চ করে দেখা হয়নি। আমি ওকে দেখছি।'

বলেই আহমদ মুসা লাশটির পাশে বসে তাকে সার্চ করতে শুরু করল।

মাত্র কয়েক মুহূর্ত, এক মিনিটও পার হয়নি।

'দাঁড়াও, না হলে গুলী করব।' হাসান তারিকের এই চিৎকার শুনতে পেল আহমদ মুসা।

চমকে পেছন ফিরে দেখল, হাত বাঁধা লোকটি সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, আর হাসান তারিক গুলী ছুড়ছে তার রিভলবার থেকে।

আহমদ মুসা দ্রুত উঠে দাঁড়াল।

দেখল হাসান তারিকও সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে।

'হাসান তারিক দাঁড়াও।' বলে চিৎকার করে উঠল আহমদ মুসা।

হাসান তারিক আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা দৌড়ে গিয়ে পৌছল হাসান তারিকের কাছে।

'কেন নিষেধ করলেন ভাইয়া। তার তো হাত বাঁধা আছে। সাঁতরাতে পারবে না। ধরা যাবে তাকে।' দ্রুতকণ্ঠে বলল হাসান তারিক। তার চোখে-মুখে অনুমতি চাওয়ার ভাব।

আহমদ মুসা শান্ত কণ্ঠে বলল, 'হয়তো তাকে ধরা যেত। কিন্তু এতে তোমার বিপদ বাড়ত। তুমি খেয়াল করনি, যে টেপ দিয়ে ওকে বাঁধা হয়েছিল তা ওয়াটার সলিউল। পানিতে পড়ার সাথে সাথেই ওটা গলে গেছে। দ্বিতীয়ত, খাড়া তীর দেখেই বোঝা যাচ্ছে এখানে সাগর গভীর। তৃতীয়ত, জোৎ¯œার আলো থাকলেও গাছ-গাছড়ার কারণে উপকূলটা অন্ধকার। তার উপর এলাকাটা ওর চেনা। সুতরাং ধরার চেষ্টা বৃথাই হতো।'

‘একটা সুযোগ আমরা হারালাম।’ হতাশ কণ্ঠে বলল হাসান তারিক।

ভাবছিল আহমদ মুসা সাগর এবং ডেভিড ডেনিমের বাড়ির দিকে তাকিয়ে। সেই ৭১ বে ষ্ট্রিট-এর ডেভিড ডেনিমের বাড়িটা একটু উত্তরে সাগরের মধ্যে ঢুকে যাওয়া এই উপদ্বীপাকৃতি ভূখন্ডের মাথার দিকেই নিশ্চয় হবে। আহমদ মুসা নিশ্চিত, লোকটি সাঁতরে ডেভিড ডেনিমের বাড়িতে গিয়েই উঠতে পারে।

হঠাৎ আহমদ মুসার মুখটি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

আহমদ মুসা হাসান তারিকের কথার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে বলল, ‘হাসান তারিক আমাদেরকেও সাগরে নামতে হবে।’

ভ্রু কুঞ্চিত হলো হাসান তারিকের। একটু ভাবল। বিস্ময় ফুটে উঠল হাসান তারিকের চোখে-মুখে। বলল, ‘সাগরের পথে ডেভিড ডেনিমের ওখানে যেতে চাচ্ছেন ভাইয়া?’

‘হ্যাঁ হাসান তারিক। এই পথে সংঘাতের সম্ভাবনা কম। অন্তত বিনা সংঘাতে আমরা ডেভিড ডেনিমের বাড়ি পর্যন্ত পৌছতে পারব।’ বলল আহমদ মুসা।

‘একটা বিষয় ভাইয়া, ওদের সতর্কতা ও আমাদের উপর আক্রমণ দেখে মনে হচ্ছে, আমরা আসব ওরা জানত। তাই সব দিক থেকেই আট-ঘাট বেঁধে রেখেছে ওরা।’ হাসান তারিক বলল।

‘তোমার কথা ঠিক হাসান তারিক। কিন্তু জানবে কি করে ওরা?’ বলল আহমদ মুসা।

‘হতে পারে সুলিভানের অন্তর্ধানের বিষয় তারা যেভাবে জানতে পেরেছে, সেভাবেই জানতে পারে।’ হাসান তারিক বলল।

‘তাতে প্রমাণ হয় না আমরা এখানে আসব। ওদের অনেক লোকই তো এভাবে মারা গেছে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ঠিক ভাইয়া। কিন্তু এ কথায় কোন সন্দেহ নেই যে, ওরা বড় কোন সন্দেহ করেছে।’

আহমদ মুসা কোন উত্তর না দিয়ে একটু ভেবে বলল, ‘তোমার ব্যাগটা ওয়াটার প্রুফ নয়, আমারটাও নয়। কোন ধরনের বোমাই নেয় যাচ্ছে না। ওগুলো ফেলে দিয়ে চল যাই। আমার বিশ্বাস ওগুলোর প্রয়োজনও হবে না।’

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক দুজনেই ধীরে ধীরে পানির কিনারায় নেমে গিয়ে সাগরের পানিতে গা ভাসিয়ে দিল।

৭১ নং বে ষ্ট্রিট বাড়িটি সাগরে ঢুকে যাওয়া দ্বীপের একেবারে শেষ প্রান্তে গড়ে উঠেছে। দ্বীপের এই শেষ প্রান্তে হঠাৎ করেই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে ছোট ছোট পাহাড়ের টিলায় ভরা পাথরের দেয়াল। সেখান থেকে পাহাড় নেমে গেছে সাগরের পানিতে। উপকূল এখানে দুর্গম। পানির প্রান্ত রেখা থেকে পাথর ও টিলার ফাঁকে ফাঁকে গজিয়ে উঠেছে গাছ। ঢেকে দিয়েছে টিলাকে।

পাহাড়ের দেয়ালকে পেছনে রেখেই তৈরি হয়েছে ৭১ বে ষ্ট্রিট বাড়িটি।

সাগর থেকে সোজাসুজি তাকালে বড় বড় গাছ ও তার ফাঁকে পাথুরে টিলার দৃশ্য ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। দুপাশ থেকেও ঘন জংগল বাড়িটাকে ঢেকে রেখেছে।

আহমদ মুসারাও মিনি উপদ্বীপটার নাক বরাবর সামনে এসে উপকূলে উঠে বসল। তারা উপরের দিকে তাকিয়ে আলো-আঁধারে ঘেরা জংগল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না।

‘তাহলে দেখা যাচ্ছে ভাইয়া উপকূলের সাথে বাড়ির কোন সম্পর্ক নেই। আমার দক্ষিণ পাশেও দেখেছি ঘন জংগল। মনে হয় বাড়িটা উপকূল থেকে দূরে দ্বীপের মাঝ বরাবর হবে।’ বলল হাসান তারিক।

‘বাড়িটা উপকূল ঘেঁষে না হলেও পানি পর্যন্ত নামার কোন প্যাসেজ তারা রাখবে না, তা স্বাভাবিক নয়।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমরা কি খুঁজব সে প্যাসেজ?’ বলল হাসান তারিক।

‘তার প্রয়োজন নেই। সেটা খুঁজতে যে শ্রম এবং সময় যাবে, তা দিয়ে আমরা উপরে পৌছে যাব।’ আহমদ মুসা বলল।

প্রায় আধ ঘণ্টার প্রচেষ্টায় আহমদ মুসারা ৩০ ফুট উপরে পাহাড়ের এক গলি পথে উঠে এল। ঘুটঘুটে অন্ধকার। গাছ-পালার বাধা অতিক্রম করে চাঁদের

আলো নিচে পর্যন্ত পৌছতে পারেনি। এর মধ্যেই পশ্চিমমূখী লক্ষ্য ঠিক রেখে এঁকে বেঁকে, কোথাও কোথাও পাহাড় টিলার ছোট ছোট বাধা ডিঙিয়ে তারা এগুতে লাগল।

পনের মিনিট চলার পর একটা টিলার দেয়াল ডিঙিয়ে একটা সমতলে এসে নামতেই তারা একটা বিরাট বাড়ির মুখোমুখি হলো।

বাড়িটা তিনতলা।

বাড়ির ধবধবে সাদা রঙের উপর চাঁদের আলো বাড়িটাকে চারদিকের নিরব পরিবেশে এক স্বপ্নপুরীতে পরিণত করেছে। বিদ্যুতের ঝাঁঝালো আলো ও ইট-পাথরের নগ্ন চেহারা দেখায় অভ্যস্ত আহমদ মুসারা যেন অভিভূত হয়ে পড়ল বাড়িটার দিকে তাকিয়ে।

বাড়িটা এখনও চল্লিশ পঞ্চাশ গজ দূরে। মাঝখানে ছোট ছোট গাছ-গাছড়া ও ঘাসের সবুজ চত্বর।

বাড়ির দুতলা ও তিনতলার কোন কোন জানালা দিয়ে আলোর রেশ বাইরে ছড়িয়ে আছে। গ্রাউন্ড ফ্লোরের গোটাটাই অন্ধকার। বোধ হয় কোন জানালা খোলা নেই, অথবা হতে পারে সবগুলো আলো নিভানো।

আহমদ মুসা চারদিকটা একবার দেখল। পেছনে পাহাড়ের দেয়াল। সামনে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা, আর সামনের সবুজ চত্বরের উত্তর ও দক্ষিণ দুপাশেই ঘন গাছ-পালার সারি। গাছের সারির নিচটায় ঘুটঘুটে অন্ধকার।

‘চল আমাদেরকে চত্বরের পাশে গাছ-পালার অন্ধকারের কভার নিয়ে এগুতে হবে।’ হাসান তারিককে লক্ষ্য করে কথাগুলো বলে হাঁটতে লাগল আহমদ মুসা চত্বরের দক্ষিণ পাশ লক্ষ্যে।

হাসান তারিকও হাঁটতে লাগল পাশা-পাশি। দুজনেই শোল্ডার হোলষ্টার থেকে মেশিন রিভলবার বের করে হাতে নিয়েছে।

তারা দুজন হাঁটতে লাগল অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বাড়ির দিকে।

বাড়ির কাছাকাছি পৌছে গেছে তারা।

এক জায়গায় এসে ডান পা মাটিতে ফেলেই আহমদ মুসার মনে হলো, মাটিটা নরম ও পিচ্ছিল।

থমকে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

বাঁ হাত দিয়ে মাটি স্পর্শ করল। মাটি ভেজা। 'হঠাৎ এখানে মাটি ভিজল কি করে?' নিজেকেই প্রশ্ন করল আহমদ মুসা।

বসে পড়ল আহমদ মুসা। পরীক্ষা করে দেখল এক দেড় বর্গফুট জায়গা জুড়ে মাটি ভেজা।

'কি ভাইয়া।' হাসান তারিক ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসাকে।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল 'বেশ একটু জায়গা জুড়ে মাটি ভেজা। এটা হতে পারে যে, পালানো লোকটি এখানে এসে তার কাপড় চিপেছে। যদি তাই হয়, তাহলে এখানেই কোথাও সাগরে নামার তাদের প্যাসেজ আছে।

'খুঁজে দেখলে হয় না ভাইয়া?' বলল হাসান তারিক।

'বোধ হয় তার প্রয়োজন নেই। চল সামনে এগোই। সাবধান, ওরা কিন্তু সব জানতে পেরেছে।' আহমদ মুসা বলল।

বিড়ালের মত নিশব্দ পা ফেলে এগুচ্ছে আহমদ মুসারা।

বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণায় পৌছে গেছে তারা। গাছের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে একটু ডানে ঘুরে ছয় সাত গজ হাঁটলেই বাড়ির দেয়াল স্পর্শ করা যাবে।

এখান থেকে বাড়ির পুব ও দক্ষিণ পাশটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। দুপাশেরই দুতলা তিন তলার অনেকগুলো জানালা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে।

বাড়ির এ পাশটা পেছন দিক। রাস্তার মুখোমুখি পশ্চিম দিকটা বাড়ির সম্মুখভাব তা নিশ্চিত।

বাড়ির ভেতরটাতেও একদম পিনপতন নিরবতা।

দাঁড়িয়ে পড়েছে আহমদ মুসা।

বাড়িটা কি ফ্যামিলী রেসিডেন্স, না অফিস! ফ্যামিলি রেসিডেন্স হলে এমন ভর সন্ধ্যায় বাড়ি এমন নিরব থাকবে তা স্বাভাবিক নয়।

হঠাৎ তার মনে পড়ল পালিয়ে আসা লোকটির মাধ্যমে নিশ্চয় ইতিমধ্যে সবকিছু জানাজানি হয়ে গেছে। তাই কি এই নিরবতা? ঝড় ওঠার কি পূর্বাভাস এটা?

আহমদ মুসার এই চিন্তা শেষ হবার আগেই তীব্র আলোর একটা ঢেউ এসে তাদের চারদিকটা ভাসিয়ে দিল।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক দুজনেই পশ্চিমমুখো হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারা দেখল, তাদের সামনে চারগজের মধ্যে দাঁড়িয়ে উদ্যত ষ্টেনগান হাতে চারজন। তাদের একজনের হাতেই ফ্লাশ লাইট।

সেই চারজনের একজন কোন নির্দেশ দিতে যাচ্ছিল আহমদ মুসাদেরকে।

কিন্তু তার মুখ থেকে কথা বের হবার আগেই আহমদ মুসার দেহ ডান দিকে ছিটকে পড়ল। তার পা দুটি শূন্যে উঠল। আর শূন্য থেকে তার দেহ যখন মাটিতে পড়ছিল তখন তার হাতের এম-১০ গুলী করছিল সেই চারজন লক্ষ্যে।

চোখের পলকে ঘটে গেল ঘটনাটা। চারজন গুলী বৃষ্টির অসহায় শিকারে পরিণত হলো। চারজনেরই গুলীতে ঝাঁঝরা দেহ মাটিতে ঝরে পড়েছে। ফ্লাশ লাইটও পড়ে গেছে মাটিতে। এমনভাবে পড়েছে যাতে আলোর ফ্লাশ দক্ষিণ দিকে ঘুরে গেছে।

আহমদ মুসার সাথে সাথে হাসান তারিকও মাটিতে শুয়ে পড়েছিল শত্রু পক্ষের কোন আক্রমণ হলে তা থেকে বাঁচার জন্যে।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক মাটিতে শুয়ে একটুক্ষণ অপেক্ষা করল ওপক্ষের প্রতিক্রিয়া জানার জন্যে। ওদের চারজনের সবাই মারা গেছে কিনা, ওপক্ষের কোন আক্রমণ আসে কিনা! আহমদ মুসা ও হাসান তারিক দুজনেরই চোখ পশ্চিম দিকে অর্থাৎ ওরা যেখানে গুলী খেয়ে পড়ে গেছে সে দিকে নিবদ্ধ।

ওদিকে অনুসন্ধিৎসু চোখ রেখেই আহমদ মুসা ও হাসান তারিক উঠে বসল। দুজন পাশাপাশি।

আহমদ মুসা ফিস ফিস করে কিছু বলার সাথে সাথে উঠতে যাচ্ছিল। এ সময় আহমদ মুসা ও হাসান তারিক দুজনেই অনুভব করল তাদের পিঠে ভারী কিছু একটার স্পর্শ এবং শুনতে পেল পেছন থেকে শান্ত ও শক্ত একটি কণ্ঠ, ‘আমাদের সাথীদের যেভাবে হত্যা করলে আমরাও এখন তোমাদের সেভাবেই

হত্যা করতে পারি। কিন্তু তা করব না যদি অস্ত্র রেখে হাত ওপরে তোল এ মুহূর্তেই।'

ইতিমধ্যে পেছন থেকে আক্রমণকারীদের একজন ফ্লাশ লাইটটি তুলে নিয়ে তার ফ্লাশটা এদিকে ফিরিয়ে দিয়েছে।

আলোতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে চারদিক আবার।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক দুজনেই হাত তুলেছে। ভারী বস্তুর স্পর্শটা এখনও তাদের পিঠে লেগেই আছে।

ভারী বস্তুর স্পর্শটা ষ্টেনগানের নলের এ কথা শুরুতেই বুঝে নিয়েছে আহমদ মুসা।

আলো জ্বলে উঠতেই পেছন থেকে একজন লোক এসে আহমদ মুসা ও হাসান তারিকের দুহাত পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল।

পিঠে ঠেসে থাকা ষ্টেনগানের নল ধাক্কা মেরে আহমদ মুসাদের সামনের দিকে ঠেলে দিল। সেই সাথে পেছন থেকে আগের সেই কণ্ঠ বলে উঠল, 'সামনে আগাও। পালাবার চেষ্টা করলে কুকুরের মত গুলী করে মারব।'

যে লোকটি হাত বেঁধেছিল, সেই লোকটি আগে আগে চলল। তার পেছনে চলতে লাগল আহমদ মুসা ও হাসান তারিক।

দুতলায় উঠে একটা হলঘরে প্রবেশ করল তারা।

পুরো কার্পেট মোড়া সোফায় সাজানো ঘর। ঘরের মাঝখানে বড় সোফায় বসে আছে একজন। দীর্ঘ দেহ, রাজসিক পোষাক।

আহমদ মুসারা দরজায় পৌছতেই লোকটি বসে থেকেই বলে উঠল আহমদ মুসাদের লক্ষ্য করে, 'আমি ডেভিড ডেনিম। আপনাদের জন্যেই অপেক্ষা করছি। তবে আর একটু অপেক্ষা করতে হবে। ভিক্টর রাইয়া ও সোফিয়া সুসানকে আনার জন্যে লোক পাঠিয়েছি। ওদেরও সাহায্য চাই।'

কথাটা শেষ করে লোকটি চোখ ঘুরাল আহমদ মুসাদের পেছনের ষ্টেনগানধারীর দিকে। বলল, 'ধন্যবাজদ জীম। পেছন থেকে তোমার আক্রমণ খুবই কার্যকরী হয়েছে। যাও ওদের পাশের ঘরে বন্ধ করে রাখ। ওরা এলে এদের নিয়ে আসবে।'

ষ্টেনগানধারী জীম লোকটি আহমদ মুসাদের হলঘর থেকে বের করে নিয়ে পাশের একটি ছোট ঘরে ঢুকিয়ে ঘর বন্ধ করে দিল।

ঘরটার দরজা বন্ধ হতেই অন্ধকারে ডুবে গেল ঘর। ঘরটাতে কোন আলো নেই।

'এই ওয়েটিং রুমের ব্যবস্থা আল্লাহই আমাদের জন্য করেছেন হাসান তারিক।' বলল আহমদ মুসা।

'কেন একথা বলছেন ভাইয়া?' হাসান তারিক বলল।

'মুক্তির পথ বের করার জন্যে একটা এক্সক্লুসিভ সময় পাওয়া গেল।' বলল আহমদ মুসা।

'তা ঠিক। কিন্তু জানালাহীন এ বন্ধ ঘরে পথ কি আমরা পাব?' হাসান তারিক বলল।

'আমাদের কি দিয়ে বেঁধেছে দেখেছ?' বলল আহমদ মুসা।

'অটো প্লাষ্টিক কর্ড।' হাসান তারিক বলল।

'হ্যাঁ। এ কর্ডে গিরা দেয়া যায় না। বাঁধার পর দুই প্রান্ত মুড়ে দিলে প্লাষ্টিক কর্ডের গিরার চেয়ে শতগুণ শক্তিশালী হয়। কিন্তু মুড়ে দেয়া প্রান্ত খোলা খুব সহজ। শুধু উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দিলেই হলো।'

হেসে উঠল হাসান তারিক। বলল, 'বুঝেছি ভাইয়া। আপনারটা আমি, আর আমারটা আপনি।'

খুলে গেল দরজা।

খুলে যাওয়া দরজা দিয়ে প্রবেশ করল এক রাশ আলো।

পিছমোড়া করে বাঁধা অবস্থায় পাশাপাশি বসে ছিল আহমদ মুসা ও হাসান তারিক।

আলোর ফ্লাশ গিয়ে পড়েছে তাদের উপর।

জীম নামের লোকটা দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। তার হাতে আগের মতই ষ্টেনগান। তার পেছনে আরও দুজন ষ্টেনগানধারী।

'উঠে এস দুজন।' বলল জীম নামের লোকটা।

উঠল আহমদ মুসা ও হাসান তারিক দুজনেই।

জীম আগে আগে চলল। পেছনে আহমদ মুসারা দুজন। তাদের পেছনে দুজন ষ্টেনগানধারী।

ঘরে ঢুকে আহমদ মুসা দেখল, ডেভিড ডেনিম বসে আছে তার সেই সোফায়। তার সামনে পাশাপাশি সোফায় বসে আছে ভিক্টর রাইয়া ও সোফিয়া সুসান। তাদের পেছনটা আহমদ মুসার দিকে। কিন্তু পেছনটা দেখেই আহমদ মুসা চিনতে পারল ওদের।

দরজার ভেতরে দুপাশে আরও দুজন ষ্টেনগানধারী দাঁড়িয়েছিল।

আহমদ মুসা ঘরে ঢুকতেই ডেভিড ডেনিম বলে উঠল জীমকে লক্ষ্য করে, 'ওদের এদিকে নিয়ে এস।' বলেই ইংগিত করল তার ডান পাশে ও সোফিয়া সুসানদের বাম পাশ অর্থাৎ দরজার সোজাসুজি জায়গাটার দিকে।

জীম আহমদ মুসা ও হাসান তারিককে নিয়ে এল সে জায়গাতেই।

ডেভিড ডেনিম-এর কথা শুনে সোফিয়া সুসান ও ভিক্টর রাইয়া তাকিয়েছিল পেছন দিকে। আহমদ মুসাকে দেখে তারা দুজনেই চমকে উঠল।

বিশেষ করে ছানা-বড়া হয়ে গেছে সোফিয়া সুসানের চোখ। পর মুহূর্তেই ভয় ও উদ্বেগে ফ্যাঁকাসে হয়ে উঠল সোফিয়া সুসানের মুখ।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিককে এনে দাঁড় করানো হলো ডেভিড ডেনিমের ডানপাশ ও সোফিয়া সুসানদের বাম পাশের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গাটায়।

আহমদ মুসার মুখোমুখি হবার জন্যে ডেভিড ডেনিম একটু ডানদিকে ঘুরে বসল। ভিক্টর রাইয়া ও সোফিয়া সুসানকেও বামদিকে ঘুরে তাকাতে হলো আহমদ মুসাদের দেখার জন্যে।

ষ্টেনগান বাগিয়ে জীম দাঁড়াল আহমদ মুসাদের বাম পাশে ডেভিড ডেনিমের কাছাকাছি জায়গায় আহমদ মুসার দিকে ষ্টেনগান তাক করে।

ঘরে আসা অবশিষ্ট চারজন ষ্টেনগানধারী দাঁড়াল দরজায় আহমদ মুসাদের দিকে চোখ রেখে।

আহমদ মুসা স্থির হয়ে দাঁড়াবার আগেই ডেভিড ডেনিম হো হো করে হেসে উঠল। বলল, 'ভাবছ বোধ হয় তোমার জন্যে ফাঁদ পাতা হলো কি করে? আমরা জানলাম কি করে যে তুমি আসছ!'

থামল ডেভিড ডেনিম। হো হো করে হেসে উঠল আবার। বলল, 'সুলিভানকে খুন করে তার পকেটে চিরকুট পেয়ে ধেয়ে আসছিলে আমাকে পরবর্তী শিকার বানাতে। কিন্তু জানতে না সুলিভানের কাছে যেমন চিরকুট ছিল, তেমনি ছিল একটা ট্রান্সমিটার চীফ যা খুঁজে পাওয়া তোমার সাধ্য ছিল না।'

'আমরা সুলিভানকে জিন্দা চেয়েছিলাম। কিন্তু কেলভিনের মত সুলিভানও নিজেকে নিজেই হত্যা করেছে, এটা আপনি জানেন। সুলিভান হাতছাড়া হবার পরেই চিরকুট থেকে সন্ধান পাওয়ার পর আপনার সন্ধানে এসেছি।' আহমদ মুসা বলল।

'সুলিভানকে কেন জিন্দা চেয়েছিলে? আমার সন্ধানে কেন?' বলল ডেভিড ডেনিম।

'এ প্রশ্নের উত্তর প্রশ্নকর্তার নিজেরই জানা আছে।' আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসার উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে কথা বলল না ডেভিড ডেনিম। আগুন ঝরা তার দৃষ্টি তুলে ধরল সে আহমদ মুসার দিকে। বলল একটু সময় নিয়ে ধীরে ও শক্ত কণ্ঠে, 'তুমি কে জানি না। অনেকেই তোমাকে আহমদ মুসা বলে। কিন্তু আমি তোমাকে অতবড় ভাবতে চাই না। তোমার প্রসংগে পরে আসব। আজ ডেকেছি ভিক্টর রাইয়া ও সোফিয়া সুসানকে। ওদের কেসটা সেটে করার জন্যে সুলিভানকে ডেকেছিলাম। সে নেই। কিন্তু তাই বলে ক্ষতি হয়নি কিছু। তার বদলে পেয়েছি তোমাদেরকে, মানে প্রধান আসামীকে। প্রধান আসামীর সামনে বিচার হবে কলাবরেটর আসামীদের।'

বলে ডেভিড ডেনিম তাকাল ভিক্টর রাইয়ার দিকে। বলল, 'ভিক্টর রাইয়া আপনাদের কেন ডেকেছি জানেন?'

ভিক্টর রাইয়া কোন জবাব দিল না। প্রচন্ড বিরক্তি নিয়ে তাকাল শুধু।

'ডেকেছি আপনাকে উপলব্ধি করাবার জন্যে যে আজর ওয়াইজম্যানের 'ওয়ার্ল্ড ফ্রিডোম আর্মি'র বিরুদ্ধে যাওয়ার শাস্তি কত ভয়াবহ।' বলল ডেভিড ডেনিম।

'মি. ডেভিড আপনি আমার দেশে বসে এ দেশেরই একজন দায়িত্বশীল অফিসারকে হুমকি দিচ্ছেন।' ভিক্টর রাইয়া।

হাসল ডেভিড ডেনিম। বলল, 'দেশে জন্ম নিলেই দেশের মালিক হওয়া যায় না। দেশে যাদের শাসন চলে সেই হয় দেশের মালিক। তোমাদের সরকার পার্লামেন্ট ও প্রশাসন ইচ্ছা-অনিচ্ছায় আমাদের শাসনের অধীন। আমরা যা চাই, তাই এখানে হয়। গোলাম বেয়াদব ও বিদ্রোহী হলে তার কি পরিণাম হওয়া উচিত ভিক্টর রাইয়া?'

'মি. ডেভিড, ভালো লোকদের শুভেচ্ছাকে, করুণাকে গোলামী বলে ভুল করছেন। দেশ কেউ বিক্রি করেনি আপনাদের কাছে।' বলল ভিক্টর রাইয়া।

আবার হাসল ডেভিড ডেনিম। বলল, 'ভিক্টর রাইয়া, শুভেচ্ছার বিনিময়ে করুণার বিনিময়ে কেউ বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার হস্তগত করে না, আবার কেউ বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার দিয়ে শুভেচ্ছা, করুণা কেনে না। যখন এ ধরনের বিনিময় হয়, তখন সেটা হয়ে থাকে ক্রয়-বিক্রয়। সুতরাং আপনারা বিক্রি হয়েছেন, আমরা কিনে নিয়েছি। ক্রীতদাসরা নিছক গোলামের চেয়েও নিকৃষ্ট কিছু।'

চুপসে গেল ভিক্টর রাইয়ার মুখ। কোন উত্তর সে দিল না।

সেই হাসি হাসল আবার ডেভিড ডেনিম। বলল, 'ভিক্টর রাইয়া, পলা জোনসের বাড়ির হত্যাকান্ড, এ্যামানুয়েলের বাড়িতে সংঘটিত হত্যাকান্ড এবং গোয়েন্দা সদর দফতরের হত্যাকান্ড আপনার জ্ঞাতসারে হয়েছে। বিশেষ গোয়েন্দা সদর দফতরের হত্যাকান্ডে আপনি ও সোফিয়া সুসান শরীক ছিলেন। হত্যার বদলে হত্যার নির্দেশ এসেছে আমাদের কাছে।'

উদ্বেগ ফুটে উঠেছে ভিক্টর রাইয়ার চোখে-মুখে। এবারও কোন কথা বলল না ভিক্টর রাইয়া।

কথা বলল সোফিয়া সুসান। তার চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। প্রবল ক্রোধ ঠিকরে পড়েছিল তার চোখ-মুখ থেকে। বলল সে, 'টাকায় বিক্রি হওয়া

কয়েকজন লোক দেশের মালিক নয়। দেশের মালিক দেশের জনগণ। তারা কখনো আপনাদের গোলাম নয়, দেশও আপনাদের কেনা সম্পত্তি নয়। আর মি. ডেভিড, আপনাদের ক্রাইম আপনাদেরকে যে পরিণতির শিকার করেছে, তার দায় অন্যের ঘাড়ে চাপাবেন না।' ভীষণ উত্তেজিত কণ্ঠ সোফিয়া সুসানের।

কথাগুলো বলে একটু থামল সোফিয়া সুসান। একটু দম নিয়েই সোফিয়া সুসান আবার বলে উঠল, 'আব্বা উঠুন, আর এক মুহূর্ত নয় এখানে।'

উঠে দাঁড়াল সোফিয়া সুসান।

সোজা হয়ে বসল ডেভিড ডেনিম। বলল সোফিয়া সুসানকে লক্ষ্য করে, 'এটা তোমার কমান্ডো হেডকোয়ার্টার নয়, এটা তোমার প্রভুর হেডকোয়ার্টার।'

বলে একটু থেমেই আবার বলা শুরু করল, 'তোমার শরীর বোধ হয় একটু বেশি গরম। আমরা ঠান্ডা করতেও জানি। কথা শেষ করেই ডেভিড ডেনিম তাকাল দরজায় দাঁড়ানো একজন ষ্টেনগানধারীর দিকে। বলল, 'ডগ, তুমি তো মেয়েদের সঙ্গ একটু বেশি পছন্দ কর। এস সুসানকে একটু ঠান্ডা করে দিয়ে যাও। তার পূজনীয় পিতাসহ সবাই দেখুক, তার দেহের গরম কিভাবে ঠান্ডা হয়।'

বলে ডেভিড ডেনিম তাকাল আহমদ মুসা ও ভিক্টর রাইয়ার দিকে। বলল, 'ভাববেন না ওর একটুকুও লজ্জা আছে। ওকে আদর করে সবাই আমরা ডগ বলে ডাকি। এ ডগ কুস্তি লড়তো। এখন আমাদের বাহিনীতে।'

'ডগ' নামের লোকটা সোফিয়া সুসানের সামনে এসে দাঁড়াল। তার হাতের ষ্টেনগানটা সে কাঁধে ঝুলাল। তারপর দুহাত বাড়িয়ে সুসানকে ধরে দাঁড় করাতে গেল।

সঙ্গে সঙ্গেই স্প্রিং এর মত উঠে দাঁড়াল ভিক্টর রাইয়া। প্রচন্ড এক ঘুষি চালাল 'ডগ'কে লক্ষ্য করে। ঘুষিটা তার চোখের নিচটাকে আহত করল। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল সেখান থেকে।

ডগ এর নিচু হয়ে যাওয়া হাতটা ঘুরে এল ভিক্টর রাইয়ার দিকে। দুহাত তার জড়ো হলো। তারপর তা গিয়ে আঘাত করল ভিক্টর রাইয়ার কপালে। ভিক্টর রাইয়ার দেহটা টলে উঠে ঘুরপাক খেয়ে পড়ে গেল মেঝের উপর।

চোখের পলকে ঘুরে গেল ডগ এর দুহাত আবার সুসানের দিকে।

পড়ে গিয়ে টলতে টলতেই আবার উঠে দাঁড়াচ্ছিল ভিক্টর রাইয়া। বলছিল সে, 'আমি বেঁচে থাকতে আমার মেয়ের গায়ে হাত দিতে পারবে না কুকুর।'

ঠিক সে সময়েই চোখের পলকে বেরিয়ে এল ডেভিড ডেনিম-এর হাত পকেট থেকে রিভলবার সমেত। রিভলবার থেকে একটা গুলী বেরিয়ে এল। তা গিয়ে আঘাত করল ভিক্টর রাইয়ার ডান হাতের কব্জীকে। বলে উঠল ডেভিড ডেনিম সেই সাথে, 'এ কিছু নয় ভিক্টর রাইয়া, আমার ডগের গায়ে হাত তোলার ছোট্ট শাস্তি। একটু অপেক্ষা কর সুসানের পর তোমার পালা আসছে।'

ভিক্টর রাইয়া আর্তনাদ করে উঠে বাম হাত দিয়ে ডান হাতটা চেপে ধরে বসে পড়েছিল।

সোফিয়া সুসান ডগ-এর হাতকে পাশ কাটিয়ে চেষ্টা করল তার আহত পিতার দিকে ছুটে আসতে। কিন্তু ডগ তার বাঁ হাত দিয়ে খামচে ধরল সুসানের সার্টের কলার এবং একটা হ্যাচকা টান দিয়ে টেনে নিল নিজের দিকে। সার্টের বাম পাশটা ছিড়ে কাঁধের নিচে নেমে গেল।

সোফিয়া সুসানের বাঁম কাঁধটা আহত ছিল। ওখানে আঘাত পাওয়ায় ককিয়ে উঠল সে। কিন্তু কঁকিয়ে উঠলেও সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই তার ডান হাতের ঘুষি চালাল ডগ-এর বাম চোখের সেই আহত জায়গাতেই।

কমান্ডো সুসানের এ ঘুষিটা খুবই কার্যকর হয়েছিল। থমকে গিয়েছিল ডগ। সে দুহাতে চেপে ধরেছিল তার বাম চোখটা।

কিন্তু পরক্ষণেই দুহাত তার নেমে এল চোখ থেকে। তার রক্তাক্ত চেহারা ভয়ংকর হয়ে উঠল। কুস্তির প্রতিপক্ষের মতই সে ঝাঁপিয়ে পড়ল সুসানের উপর।

কমান্ডো সুসান চকিতে নিজেকে সরিয়ে নিল। ডগ উপুড় হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল গিয়ে সোফার উপর।

সঙ্গে সঙ্গে সুসান তার ডান হাতের কনুইটাকে তীব্র বেগে ছুড়ে দিল ডগ-এর পিঠের ডান পাশটা লক্ষ্যে।

আঘাত করেই ডগ-এর ষ্টেনগানটা কেড়ে নিল।

কিন্তু ষ্টেনগান নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবার আগেই ডেভিড ডেনিমের রিভলবারের গুলী গিয়ে বিদ্ধ করল সোফিয়া সুসানের ডান হাতকে।

তার হাত থেকে ষ্টেনগান পড়ে গেল।

'জীম, তুমি ষ্টেনগানটা সরিয়ে নাও। ডগটা এখনি উঠবে। তার কাজটা শেষ করা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব।' বলল ডেভিড ডেনিম জীমকে লক্ষ্য করে।

জীম তার ষ্টেনগান আহমদ মুসাদের দিকে তাক করে মূর্তির মত দাঁড়িয়েছিল। তার দৃষ্টি সে মুহূর্তের জন্যে আহমদ মুসাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করেনি। ডেভিড ডেনিম-এর নির্দেশ পেয়ে সে নড়ে উঠল। মাথা ঘুরিয়ে সে তাকাল সুসানের কাছে পড়ে থাকা ষ্টেনগানের দিকে।

আহমদ মুসা এই সুযোগেরই অপেক্ষা করছিল।

পিছমোড়া করে বাঁধা আহমদ মুসার দুহাত নড়ে উঠল। তার হাতের খোলা বাঁধনটি খসে পড়ল হাত থেকে। চোখের পলকে আহমদ মুসার দুহাত ছুটে গেল জীমের ষ্টেনগানের দিকে। কেড়ে নিল ষ্টেনগান।

কেড়ে নিয়েই আহমদ মুসা ব্রাশ ফায়ার করল দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা তিনজনকে লক্ষ্য করে।

জীম ঘুরে দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু ততক্ষণে আহমদ মুসার ষ্টেনগানের ব্যারেল ঘুরে এসেছে জীমকে লক্ষ্য করে।

ওদিকে হাসান তারিক ঝাঁপিয়ে পড়েছে ডেভিড ডেনিমের উপর। সে তার রিভলবার তুলছিল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে।

ডেভিড ডেনিম আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপতে যাচ্ছিল। হাসান তারিক তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ায় ডেভিড ডেনিমের হাতটি বেঁকে যায় এবং সেই সাথে ফায়ারও হয়ে যায়। বুলেটটি গিয়ে বিদ্ধ হয় ডেভিড ডেনিমের দুচোখের সন্ধিস্থলে। মাথাটা এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যায়।

ওদিকে ডগ উঠে দাঁড়িয়ে তার ষ্টেনগান হাতে তুলে নিয়েছিল। তার ষ্টেনগানের ব্যারেল ঘুরছিল আহমদ মুসার দিকে। কিন্তু তার আগেই সে আহমদ মুসার তৃতীয় ব্রাস ফায়ারের শিকার হলো।

হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে উঠল আহমদ মুসা। বাইরে অনেকগুলো পায়ের শব্দ। এদিকেই ছুটে আসছে।

আহমদ মুসা নিজের জ্যাকেটটি খুলে সোফিয়া সুসানের দিকে ছুড়ে দিয়ে ছুটল দরজার দিকে। বলল, 'হাসান তারিক তুমিও এস।'

আহমদ মুসা দরজায় পৌছার আগেই কয়েকজন দরজায় এসে গিয়েছিল। প্রত্যেকের হাতেই ষ্টেনগান।

দরজায় যারা এসে দাঁড়িয়েছিল তারা ভেতরের অবস্থা বুঝার জন্যে একটু সময় নিয়েছিল। এ সময়টুকুই ছিল আহমদ মুসার জন্যে বোনাস সময়। আহমদ মুসা দরজার দিকে এগুনো অবস্থাতেই তার ষ্টেনগানের ট্রিগার টিপে দরজার উপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিল।

পাঁচজন ওরা এসে দাঁড়িয়েছিল দরজায়। দরজার উপরই স্তুপ হয়ে পড়ে গেল ওদের লাশ।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক দুজনেই গিয়ে দরজায় দাঁড়াল। দুজন দুদিকে উকি দিল।

আহমদ মুসা উকি দিয়েছে বাঁ দিকে। এদিকেই নিচে নামার সিঁড়ি।

আহমদ মুসা দেখল সিঁড়িমুখ থেকে একটু এদিকে দুজন দাঁড়িয়ে। দ্বিধাগ্রস্তভাবে ওরা এগিয়ে আসছিল। ওদের ষ্টেনগানের ব্যারেল কিছুটা নিচু।

আহমদ মুসা ওদের দেখেই বলে উঠল, 'ষ্টেনগান হাত থেকে ফেলে দাও।'

ওরাও দেখে ফেলেছে আহমদ মুসাকে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে ওরা। ওদের ষ্টেনগান উঠে আসছে আহমদ মুসা লক্ষ্যে।

কিন্তু লক্ষ্য পর্যন্ত উঠে আসার সুযোগ পেল না ওদের ষ্টেনগান। তার আগেই আহমদ মুসার ষ্টেনগান থেকে ছুটে যাওয়া এক ঝাঁক গুলী দুই ষ্টেনগানধারীর দেহকে ঝাঁঝরা করে দিল।

হাসান তারিক আহমদ মুসার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল।

'হাসান তারিক, তুমি দুপাশের ঘরগুলো দেখ, কোন কাগজ-পত্র পাওয়া যায় কিনা। আমি এদের সার্চ করে দেখি।' বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা ঘরে প্রবেশ করল। দেখল, সোফিয়া নিজের ছেঁড়া জামাটা ছিড়ে ফেলে সেই টুকরো দিয়ে তার পিতা ভিক্টর রাইয়ার হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধার

চেষ্টা করছে। তার পিতা বাঁ হাত দিয়ে সহযোগিতা করছে। কিন্তু দুই বাম হাত মিলেও কাজটা ভালভাবে করতে পারছে না।

আহমদ মুসা দ্রুত গিয়ে বলল, 'সুসান দাও মি. রাইয়ার ব্যান্ডেজটা আমি বেঁধে দেই।'

বলে সুসানের হাত থেকে কাপড় নিয়ে ভিক্টর রাইয়ার হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে বলল, 'আল্লাহকে ধন্যবাদ মি. রাইয়া, বুলেটটা কব্জীর হাড়কে আঘাত করলেও তা পাশ কেটে গেছে। বড় রকমের ফ্রাকচার মনে হয় হয়নি।'

'ঈশ্বরের আগে ধন্যবাদ আপনার প্রাপ্য আহমদ মুসা। আমরা কৃতজ্ঞ।' বলল ভিক্টর রাইয়া আবেগ জড়িত কণ্ঠে।

আহমদ মুসা ভিক্টর রাইয়ার ব্যান্ডেজ শেষ করে সোফিয়া সুসানের দিকে এগুতে এগুতে বলল, 'আমি যেটা করেছি, সেটা ঈশ্বরই করিয়েছেন। সুতরাং সব প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য মি. রাইয়া।'

আহমদ মুসা মেঝে থেকে সুসানের ছেঁড়া জামা তুলে নিয়ে একটু ছিঁড়ে নিয়ে বলল, 'তোমার হাতটা দাও সুসান।'

আহমদ মুসার দেয়া জ্যাকেটটা পরতে পারেনি সুসান। বাঁম কাঁধটা আহত থাকায়  বাঁ হাত নাড়ানো তার জন্যে কষ্টকর ছিল। ডান হাতটা গুলী বিদ্ধ হওয়ায় সেটাও কাজ করছিল না। তবুও বাম হাত দিয়ে কষ্ট করে জ্যাকেটটা সে ধরে রেখেছিল গায়ের উপর। ধীরে ধীরে সে তার ডান হাতটা আহমদ মুসার দিকে এগিয়ে দিল এবং বলল, 'ঈশ্বর কিন্তু সবাইকে দিয়ে কাজ করান না।'

'হ্যাঁ, ঠিক। আপনাকে দিয়ে আল্লাহ আজ মূল কাজটি করিয়ে নিয়েছেন এজন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।' আহমদ মুসা বলল।

'কিভাবে?' বলল সোফিয়া সুসান।

'আপনি' ডগকে কাবু করে ও জীমকে আমাদের সার্বক্ষণিক পাহারা থেকে সরিয়ে এনে আমাদেরকে এ্যাকশনে আসার সুযোগ করে দিয়েছেন।'

হাসল সোফিয়া সুসান। বলল, 'লড়াই-এর পথ দেখানো আর লড়াই করা এক জিনিস নয়। যাক। আমি বিস্মিত হয়েছি, আপনাদের বাঁধা হাত কখন কিভাবে খুলে গেল?'

‘পিছমোড়া করে বেঁধে দুজনকে যদি একই জায়গায় নিরিবিলি রাখা হয়, তাহলে তাদের বাঁধন খোলা সমস্যা হয় না। আমাদেরকে বেঁধে ওরা পাশের ঘরে রেখেছিল।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আপনাদের বাঁধন খোলা না থাকলে, আপনারা সাহায্য করতে না পারলে সর্বনাশ রোধ করা যেত না। মরতেও হতো আমাদের দুজনকেই। আব্বা ঠিকই বলেছেন। সত্যিই আমরা কৃতজ্ঞ।’ বলল সোফিয়া সুসান।

আহমদ মুসা ততক্ষণে সোফিয়া সুসানের ব্যান্ডেজ বাঁধা শেষ করে ফেলেছে।

সুসানের কথার উত্তরে কোন কথা না বলে আহমদ মুসা লাশগুলোর পকেট সার্চ শুরু করে দিল। জীম থেকেই সে প্রথম কাজ শুরু করল।

হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধার পর সোফিয়া সুসান আহমদ মুসার জ্যাকেটটা কষ্ট করে হলেও পরতে পারল। জ্যাকেট পরে নিয়ে সোফিয়া সুসান বলল, ‘সার্চে আমিও আপনাদের সাহায্য করতে পারি।’

বলে সোফিয়া সুসান সার্চের জন্যে ডেভিড ডেনিমের দিকে এগুলো।

‘আসলে আপনি কি চাচ্ছেন আহমদ মুসা?’ প্রশ্ন করল ভিক্টর রাইয়া আহমদ মুসাকে।

‘সাও তোরাহ দ্বীপ সম্পর্কে জানতে চাই, জানতে চাই সাও তোরাহ দ্বীপে ওদের যাতায়াতের মাধ্যম মিনিসাব-এর গতিবিধি সম্পর্কে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘মিনি সাব এর গতিবিধি দিয়ে কি করবেন। সাও তোরাহ যাবার জন্যে কি মিনিসাব ব্যাবহার করতে চান?’ জিজ্ঞাসা ভিক্টর রাইয়ার।

‘ঠিক তাই।’ বলল আহমদ মুসা।

‘কেন, যে কোনভাবেই তো সাও তোরাহ যাওয়া যায়।’ সোফিয়া সুসান বলল।

‘যাওয়া যায়, কিন্তু তাতে মিশন সফল হওয়ার সম্ভাবনা কম। আকাশ পথ কিংবা সী-সারফেস দুপথের যে দিক দিয়েই যাওয়া হোক ওদের চোখে ধরা পড়তে হবে। তাতে তারা বন্দীদেরকে নিয়ে পালাবার সুযোগ পাবে মিনি-সাব এ

করে। অথবা বন্দীদের হত্যা করে তারা আমাদের মিশনটাকেই ব্যর্থ করে দিতে পারে।' বলল আহমদ মুসা।

'বুঝেছি।' বলল সোফিয়া সুসান। তারপর তাকাল তার পিতা ভিক্টর রাইয়ার দিকে। বলল, 'তাহলে আব্বা তুমিই একটা ব্যবস্থা কর না 'মিনি-সাবে'র। সেটাতে চড়ে ওঁরা যাবেন।'

'মিনি-সাব বা সাবমেরিন আমাদের গোয়েন্দা বিভাগের নেই। নৌবাহিনীর আছে। কিন্তু সেসব ডিফেন্স কমান্ডোর অধীন।' বলল ভিক্টর রাইয়া।

'হ্যাঁ, আমরা কমান্ডো ইউনিটও মিনি-সাব ব্যবহার করি। কিন্তু এ মিনি-সাবগুলোর যাতায়াত কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটর করা হয়। নিশ্চয় সাও তোরাহ দ্বীপে এ্যালাও করবে না। তবে সাও তোরাহের জন্যে বিশেষ প্রোগ্রাম তৈরী করা যায় আজ এদের যে ভয়াবহ রূপ দেখলাম তার ভিত্তিতে।' সোফিয়া সুসান বলল।

'না সুসান, এভাবে প্রোগ্রাম তৈরী করলেও তা কোন কাজ দেবে না। কারণ এ খবর ফাঁস হয়ে যাবে এবং সাও তোরাহ সাবধান হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত আমি শুনেছি, সাও তোরাহ দ্বীপের আকাশ থেকে তোলা গোয়েন্দা ফটোতে সাও তোরাহ দ্বীপে কোন ডেক বা কোন জেটি খুঁজে পাওয়া যায়নি। এমনকি মানুষের বসবাসযোগ্য কোন স্থাপনাও নয়। এই অবস্থায় তোমাদের মিনি সাব ওখানে পৌছলেও লাভ হবে না। ওদের ঘাঁটি খুঁজে পাওয়া যাবে না।' বলল আহমদ মুসা।

সার্চ করা ফেলে সোফিয়া সুসান সোজা হয়ে দাঁড়াল। তাকাল সে আহমদ মুসার দিকে। তার চোখে বিস্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টি।

কিছু বলার জন্যে সে মুখ হা করেছিল। কিন্তু তার আগেই তার পিতা ভিক্টর রাইয়া বলে উঠল, 'ঠিক বলেছেন। এমন গোয়েন্দা ছবি আমিও দেখেছি। আপনার কথা ঠিক।'

ভিক্টর রাইয়া থামতেই সোফিয়া সুসান বলে উঠল, 'আপনি এত কিছু চিন্তা করছেন? এত দুরদৃষ্টি আপনার? আপনি তথ্য ফাঁস হওয়ার কথা বললেন। কিন্তু সিদ্ধান্ত হবে কমান্ডো অপারেশন কমান্ড থেকে। সেখান থেকে তথ্য ফাঁস হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'তোমার কথাই হয়তো ঠিক। কিন্তু একটু আগে ডেভিড ডেনিমের কাছ থেকে জেনেছ ওরা টাকা দিয়ে সবকিছুই কিনে থাকে। এটা সত্য হলে এদের কেনার হাত কোন পর্যন্ত পৌছেছে কিনা কি করে জানবে? সুতরাং সন্দেহ থেকেই যায়।'

মুখ ম্লান হয়ে গেল সোফিয়া সুসানের। ছোট্ট করে বলল, 'স্যরি মি. আহমদ মুসা। আমাদের জাতির দুর্ভাগ্য যে, তাদের শ্রেষ্ঠ সন্তানরাও বিক্রি হয়।'

বলে আবার সার্চ করায় মনোযোগ দিল সোফিয়া সুসান।

'এটা আপনার জাতির একার দুর্ভাগ্য নয়। পৃথিবীর বহুদেশের বহুজাতির অসংখ্য শ্রেষ্ঠ সন্তান ইহুদীবাদীদের টাকার কাছে বিক্রি হয়েছে অথবা ওদের ষড়যন্ত্রের ফাঁদে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। শতাধিক বছর ধরে জর্জ ওয়াশিংটন আব্রাহাম লিংকন-টমাস জেফারসনের দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ওদের কুটবুদ্ধির দ্বারা ডোমিনেটেড হয়েছে, ওদের স্বার্থের বাহন সেজে শান্তির নামে অশান্তির ধ্বজা উড়িয়েছে দুনিয়ায়। সবে সে দেশটি মুক্তি লাভ করেছে ওদের অক্টোপাশ থেকে। অনেক দেশ এখনও মুক্তি পায়নি। তোমাদের আজোরস তারই একটু ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত।' বলল আহমদ মুসা।

আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে সোফিয়া সুসান। তাকাল আহমদ মুসার দিকে। আবেগে তার চোখ-মুখ ভারী হয়ে উঠেছে। বলল, 'মার্কিনীদের এই মুক্তির একটা নিমিত্ত আপনিও ছিলেন। আমরা এবং আমাদের জাতীয় মর্যাদা কোথায় পৌঁছেছে তার কিছুটা তো আজ জানলেন। আপনি কি আমাদের আজোরসকে সাহায্য করবেন।' আবেগে রুদ্ধ হয়ে গেল সোফিয়া সুসানের কণ্ঠ। দুচোখে তার টলটল করতে লাগল অশ্রু।

ম্লান হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'এ সুযোগ যদি আমার ভাগ্যে ঘটে, আমি আনন্দিত হবো সুসান।'

সোফিয়া সুসান সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে কোমর বাঁকিয়ে বাও করল আহমদ মুসাকে। তার দুচোখ থেকে নেমে এল দুফোটা অশ্রু।

চোখ মুছে আবার সার্চের কাজ শুরু করল সোফিয়া সুসান।

আহমদ মুসা ও সোফিয়া সুসান মোট ১৪টি মৃতদেহ সার্চ করল। কিন্তু আশ্চর্য কারও পকেটেই কিছু পেল না। একেবারে শূন্য পকেটগুলো। পকেটে তাদের মানিব্যাগ আছে, কিন্তু তাতে টাকা ছাড়া আর কিছুই নেই।

এ সময় ফিরে এল হাসান তারিকও। বলল, 'দুতলার সবগুলো কক্ষই বেড রুম। এই হলঘরের পাশে একটা অফিসরুম রয়েছে, সেখানে টেবিল, চেয়ার ও একটি কম্পিউটার। কম্পিউটারটিও শূন্য।'

'ঠিক ওদের পকেটের মত।' বলল আহমদ মুসা।

বলেই একটু ভাবল আহমদ মুসা। তারপর আবার বলে উঠল, 'আমার মনে হচ্ছে মি. ভিক্টর রাইয়া ও সোফিয়া সুসানের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার পর তারা তাদের সব ডকুমেন্ট সরিয়েছে, কম্পিউটারও খালি করেছে।'

'কেন?' বলল ভিক্টর রাইয়া।

'আপনাদের হত্যার পর প্রশাসনের অন্তত একটা অংশ থেকে রিটালিয়েশন হতে পারে, এ ভয়েই তারা তাদের পরিচয়ের সব রকম চিহ্ন গোপন করে ফেলেছে।'

'ঠিক বলেছেন মি. আহমদ মুসা। এটাই এর একমাত্র ব্যাখ্যা।' বলল ভিক্টর রাইয়া।

ভিক্টর রাইয়া দাঁড়িয়েছিল ডেভিড ডেনিমের লাশের পাশে।

তাকাল আহমদ মুসা ভিক্টর রাইয়ার দিকে কিছু বলার জন্যে।

ভিক্টর রাইয়ার দিকে তাকাতে গিয়েই আহমদ মুসার নজর পড়ল ডেভিড ডেনিমের গলায় থাকা একটা চকচকে জিনিসের উপর। পাশেই দাঁড়িয়েছিল সোফিয়া সুসান। আহমদ মুসা সোফিয়া সুসানকে জিজ্ঞেস করল, 'মি. ডেভিডের গলায় চকচকে ওটা কি?'

'সোনার একটা ক্রস।' বলল সোফিয়া সুসান।

'ইহুদী ডেভিডের গলায় খ্রীষ্টের ক্রস!'

বলে আহমদ মুসা দ্রুত এগিয়ে একটু ঝুঁকে পড়ে সোনার ক্রসটা সোনার চেন থেকে ছিঁড়ে নিল। ধরল চোখের সামনে। বলল স্বগত কণ্ঠে, মোটা-সোটা

এতবড় ক্রস তো কারও গলায় কখনও দেখিনি। আর একজন কট্টর ইহুদীবাদী ক্রস পরবে এটাও অবিশ্বাস্য ঘটনা।

বলে উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগল আহমদ মুসা ক্রসটিকে।

হঠাৎ ভ্রুকুচকে গেল আহমদ মুসার। সে দেখল ক্রসের দুপাশেই লম্বা-লম্বি জোড়া লাগানোর মত সোজা সরল রেখা।

আহমদ মুসা ক্রসটা দুহাতে ধরে জোড়ার মত লাইনের দুপাশে দুহাতের দুআঙুলের নখ সেট করে দুদিকে টান দিল।

সংগে সংগে দুভাগ হয়ে গেল ক্রসটি। ভেতর থেকে বেরিয়ে এল দুটি ফাইবার চীপ। চীপ দুটি হাতে তুলে নিল আহমদ মুসা। বিস্ময় তার চোখে-মুখে।

চোখ বুলাল চীপস দুটির উপর। দেখল দুটিতেই কয়েকটি ইংরেজী বর্ণ ও কয়েকটি করে ইংরেজী অংক খোদাই করা। পড়ল আহমদ মুসা। প্রথমটিতে লেখা 'FAMS 00654123' এবং দ্বিতীয়টিতে খোদাই করা হয়েছে 'FAST 00456321'

সবাই দেখছিল আহমদ মুসাকে। সবার চোখে-মুখে বিস্ময়। ক্রসও কোন কিছু লুকানোর আধার হতে পারে তাহলে!

'ওগুলো মনে হচ্ছে ফাইবার চীপস। ওগুলোতে কিছু লেখা আছে?' বলল সোফিয়া সুসান।

আহমদ মুসা কোন কথা না বলে চীপস দুটি তুলে দিল সুসানের হাতে।

ওরা একে একে সবাই দেখল চীপস দুটিকে। সর্বশেষে হাতে পেল ভিক্টর রাইয়া।

ভিক্টর চীপস দুটিতে চোখ বুলিয়েই বলে উঠল, 'চীপস দুটি গুরুত্বপূর্ণ কোড নাম্বার বহন করছে।'

'জি সেটা পরিষ্কার। কিন্তু কোড নাম্বার কিসের হতে পারে?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'চীপসের কোডে ৮টি ডিজিট থেকে ধরে নেয়া যেতে পারে ওগুলো কোন লককে আনলক করার কোড নাম্বার। সে লক কম্পিউটারেরও হতে পারে। কিন্তু

বর্ণমালাগুলো দ্বারা কি বুঝাচ্ছে তা জানতে পারলে রহস্যের সমাধান সহজ হতো।' বলল ভিক্টর রাইয়া।

গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়েছিল আহমদ মুসা।

সে চীপস দুটি ভিক্টর রাইয়ার হাত থেকে নিয়ে আবার নজর বুলাতে লাগল। উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগল ভালো করে। এক জায়গায় গিয়ে তার চোখ আটকে গেল। দেখল, প্রথম চীপসের শেষ ডান প্রান্তে সোনালী রংয়ের চীপসে সোনালী রংয়ের একটা এ্যারো আরও ডান দিককে মানে বাইরের দিককে ইংগিত করছে। এর বিপরীত দৃশ্য দ্বিতীয় চীপসটিতে। সেটার বাম প্রান্তে একটি এ্যারো। এ্যারোর মাথা ভেতর দিকে, মানে কোডকে ইংগিত করছে।

আহমদ মুসা দেখাল এ্যারোটি সকলকে। বলল, 'দুচীপসের দুকোডের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। যে চীপসের এ্যারো বাইরের দিককে ইংগিত করছে, সেটা প্রথম ব্যবহার করতে হবে এবং যে চীপসের এ্যারো ভেতরমুখি হয়ে কোডকে ইংগিত করছে সেটা দ্বিতীয়, একে প্রথমটার পরে ব্যবহার করতে হবে।'

হাসি ফুটে উঠল ভিক্টর রাইয়ার মুখে। বলল, 'আপনার রহস্যভেদী জ্ঞান অতুলনীয়। এখন বাকি থাকল বর্ণমালাগুলোর অর্থ উদ্ধার।'

হঠাৎ আহমদ মুসার চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে সে স্বাভাবিক হয়ে গেল। তারপর চীপসগুলো ক্রসে পুরে পকেটে রাখতে রাখতে বলল, 'রহস্য উদ্ধার যখন শুরু হয়েছে, তখন শেষও শীঘ্রই হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।'

কথা শেষকরে একটু থেমেই আবার বলে উঠল, 'না এখানে আর দেরি নয়। আপনারা আহত। চলুন আমরা যাই। যাবার সময় নিচের ফ্লোরটা একটু দেখে যেতে হবে।

বলেই তাকাল হাসান তারিকের দিকে। বলল, 'তুমি আগে চলবে সাবধানে, দেখে-শুনে। শত্রু লুকিয়ে থাকতে পারে সুযোগের অপেক্ষায়। আর পেছন দিকটা দেখার দায়িত্ব আমার।'

নির্দেশের সাথে সাথেই ষ্টেনগান হাতে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল হাসান তারিক।

ভিক্টর রাইয়া ও সোফিয়া সুসানও হাঁটতে শুরু করেছে।

আহমদ মুসা হাঁটতে শুরু করেই আবার থমকে দাঁড়াল। বলল, 'দাঁড়াও হাসান তারিক।'

দাঁড়িয়ে পড়ল সবাই।

'হাসান তারিক, ডেভিড ডেনিমের মৃতদেহ রেখে যাওয়া যাবে না। তুলে নিয়ে সাগরে ডুবিয়ে রাখতে হবে, অথবা অন্য কোথাও লুকাতে হবে যাতে তার মৃতদেহ কেউ না পায়।'

'কেন? এর কি প্রয়োজন? সবার মৃতদেহই তো থাকছে।' আহমদ মুসা কথা শেষ করতেই বলে উঠল সোফিয়া সুসান।

'তার লাশ এখানে থাকলে আজর ওয়াইজম্যান অবশ্যই জেনে যাবে যে, ডেভিড ডেনিমের গলায় ক্রসটা নেই, তখন সে অবশ্যই সন্দেহ করতে পারে যে, দুটি কোড নাম্বার শত্রুর হাতে পড়ে গেছে। তার ফলে এই কোড দিয়ে আর কোন লাভ হবে না।' বলল আহমদ মুসা।

সোফিয়া সুসানের বিমুগ্ধ দৃষ্টি আহমদ মুসার উপর। বলল, 'কিন্তু একথাও তো মনে করতে পারে টাকার লোভেই কেউ ক্রসটা নিয়ে গেছে।'

'টাকার লোভ থাকলে এতগুলো মানিব্যাগ তারা নেয়নি কেন? তাছাড়া আজর ওয়াইজম্যান জানে যারা এই লড়াই করেছে, তারা টাকার জন্যে লালায়িত নয়।' আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ।' বলল সোফিয়া সুসান। অসীম মুগ্ধতায় আলোকিত সোফিয়া সুসানের গোটা চেহারা।

'আমারও ধন্যবাদ গ্রহণ করুন আহমদ মুসা। আপনাকে যতই দেখছি, ততই অভিভূত হয়ে পড়ছি।' ভিক্টর রাইয়া বলল।

ভিক্টর রাইয়া যখন কথাগুলো বলছিল, তখন এদিকে কান না দিয়ে আহমদ মুসা এগিয়ে গিয়ে ডেভিড ডেনিমের লাশ কাঁধে তুলে নিচ্ছিল।

ছুটে এল হাসান তারিক।

'আপনি জানেন ভাইয়া, এ ধরনের ভার বইতে আমার খুব ভাল লাগে।' বলে আহমদ মুসার হাত থেকে ডেভিড ডেনিমের লাশ ছিনিয়ে নিয়ে তা নিজের কাঁধে তুলে নিল।

সোফিয়া সুসান তার আহত হাত দিয়েই একটা ষ্টেনগান তুলে নিল এবং গুলীর ম্যাগাজিনটা পরীক্ষা করল। তারপর বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, 'এবার মি. হাসান তারিকের দায়িত্ব আমি পালন করব।'

বলে সামনে এগিয়ে সবার সামনে সে হাঁটতে লাগল।

'ধন্যবাদ সুসান। তুমি সত্যিই একজন কমান্ডো।' বলল আহমদ মুসা।

'ভুলে যাচ্ছেন বোধ হয় যে, আপনি আহমদ মুসা। সাধারণ কারও জন্যে আপনার মুখ থেকে এতবড় প্রশংসা মানায় না।'

'এটা প্রশংসা নয়, সত্যের স্বীকৃতি।' আহমদ মুসা বলল।

'আপনার এই কথা এবং সবকিছু আমার কাছে স্বপ্ন মনে হচ্ছে। ভয় হচ্ছে স্বপ্ন না আবার ভেঙে যায়।' আবেগে গলাটা কাঁপল সুসানের।

বলেই দ্রুত চলতে শুরু করেছে সুসান।

সবাই চলতে শুরু করল।

আহমদ মুসাও।

# ৪

সান্তাসিমা উপত্যকার পাশে হাইওয়ে থেকে একটু নেমে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল।

গাড়ির ড্রাইভিং সিট থেকে প্রথমে নামল হাসান তারিক।

আহমদ মুসাও নামল তার পরে পাশের সিট থেকে।

'ঠিক এখান দিয়েই সুলিভানের গাড়িকে রাস্তায় উঠতে দেখেছিলাম।' বলল হাসান তারিক।

আহমদ মুসা চারদিকে তাকাল। দেখল, তারা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে বড় গাছ পালা মুক্ত একটা করিডোর এঁকে-বেঁকে সামনে এগিয়ে গেছে। তার দুপাশেই ঝোপ-ঝাড় ও গাছ-পালা। পাথরে-মাটিতে মেশানো ভূমি। ঘাসে ঢাকা।

'সুলিভান নিশ্চয় গাড়িটা সড়ক থেকে দেখা যাবে এমন জায়গায় পার্ক করেনি। মনে হয় যতটা পেরেছে ভেতরে নিয়েছে। এখন দেখ, গাড়ি যাওয়ার চিহ্নটা খুঁজে পাওয়া যায় কিনা। তাহলে কিছুটা অন্তত পরিষ্কার হবে যে, কেন সে এখানে এসেছিল? এদিকে তাদের নতুন কোন আস্তানা আছে কিনা।' আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক দুজনেই গাড়ির চাকার চিহ্ন খুঁজতে লাগল। যে গাড়ি সুলিভান ব্যবহার করেছিল তা বড় গাড়ি না হলেও আমেরিকান কারটির ওজন কম নয়। এ ওজনের চাপে কচি ঘাস যে থেতলে যাবে, পাতা ছিঁড়ে যাবে, কচি গাছগুলো ভেঙে যাবে, তা খুবই সাধারন দৃশ্য।

আহমদ মুসারা এই চিহ্নই সন্ধান করতে লাগল।

অবাক হলো তারা সন্ধান করতে গিয়ে। দেখল, ঘাসে ঢাকা করিডোরটার মাঝামাঝি লম্বা-লম্বি গোটা জায়গারই ঘাস অনেকটা থেতলানো, পাতা ছেঁড়া এবং কচি গাছও মাঝে মাঝে পিষ্ট হওয়া। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, থেতলানো ও ছেঁড়া

কোন ঘাস বা কচি গাছ মরে শুকিয়ে গেছে, কোনটা আবার থেতলানো ও ছেঁড়া হলেও ঐভাবে মরে যায়নি। বিস্মিত আহমদ মুসা বিষয়টার দিকে হাসান তারিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

ভ্রুকুঞ্চিত হলো হাসান তারিকের। বলল, 'ঠিক বলেছেন ভাইয়া। বিষয়টা এতক্ষণ আমি খেয়াল করিনি। এটা একটা বিরাট ব্যাপার। এর অর্থ হলো, শুধু সুলিভানের গাড়ি নয়, এ ধরনের গাড়ি এখানে আগেও এসেছে। হয়তো বার বারই এসেছে।'

ভাবছিল আহমদ মুসা। বলল, 'আর সুলিভানদের মত গাড়ি বার বার আসার অর্থ হলো, সামনে এমন কিছু আছে, যেখানে গাড়িগুলো এসেছে।'

'ঠিক বলেছেন ভাইয়া। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সান্তাসিমা উপত্যকার পাথুরে জেটি ছাড়াও তাদের আর কোন ঘাঁটি কি এদিকে আছে, কেলভিনের কথায় কিন্তু এটা বুঝা যায়নি।' বলল হাসান তারিক।

'সান্তাসিমার এ পাশটাকে সান্তাসিমা উপত্যকার বাইরে ধরছ কেন?' আহমদ মুসা বলল।

'তাও হতে পারে।'

'চল, গাড়ির এ ট্রাক ধরে আমরা এগিয়ে যাই।'

বলে হাঁটা শুরু করল আহমদ মুসা।

হাসান তারিকও চলল পাশাপাশি।

যতই সামনে, মানে উত্তরে এগুতে লাগল তারা, ততই এঁকে-বেঁকে অনেক ঝোপ-ঝাড় পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়া ঘাসের করিডোরটায় ছোট-খাট আগাছা ও গাছ-গাছড়ার সংখ্যা বাড়তে লাগল। এখানে গাড়ি যাতায়াতের ট্রাকটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বিস্ময় বাড়তে লাগল আহমদ মুসা ও হাসান তারিকের। জংগলের মধ্যে এভাবে গাড়ি নিয়ে আসার রহস্য কি! রহস্য কি না বুঝলেও কোন একটা বড় ব্যাপার আছে, সে বিষয়ে তারা নিশ্চিত হলো।

একটা পাহাড়ের বড় টিলার গোড়ায় এসে তাদের এই যাত্রা শেষ হয়ে গেল। দেখল, টিলাটার গোড়ায় এসে গাড়ি চলার সেই ট্রাকটা শেষ হয়ে গেছে।

আহমদ মুসারা থমকে দাঁড়াল সেখানে।

চারদিকে তাকাল আহমদ মুসা।

'ভাইয়া উপকূল কিন্তু খুব বেশি দূরে নয়।' বলল হাসান তারিক।

'কিন্তু সামনেটা আরও উঁচু হয়ে উঠেছে। সান্তাসিমা উপত্যকার মত ভূমি হঠাৎ নিচু হয়ে উপকূলের সমান্তরাল হয়ে যায়নি।' আহমদ মুসা বলল।

'হ্যাঁ ভাইয়া। আমার মনে হয় সামনের পাহাড়টা সাগর থেকে উঠে এসেছে। সেখানে হয়তো আমরা কোন নাব্য উপকূল পাব না।' বলল হাসান তারিক।

'আমরা উপকূলে যাচ্ছি না হাসান তারিক। গাড়ির লোকরা কোথায় এসেছিল সেটা খুঁজছি। আমার ধারণা এটা ওদের উপকূলে যাবার কোন রাস্তা নয়। মিনি-সাবের নোঙরের জন্যে তারা যে সান্তাসিমার পাথুরে জেটিটাকেই ব্যবহার করে, সেটা তো সেদিন আমরা নিজেদের চোখেই দেখিছি।' আহমদ মুসা বলল।

'এই জংগলে তাহলে তারা কেন আসবে?' বলল হাসান তারিক।

ভাবছিল আহমদ মুসা। বলল এক সময় সে উৎসাহিত কণ্ঠে, 'খেয়াল করেছ হাসান তারিক, সেদিন মিনি-সাব যখন সান্তাসিমা জেটিতে এসেছিল, সে সময়টাতেই সুলিভান এই জংগলে বা এই এলাকায় ছিল।'

'ভাইয়া তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন, মিনি-সাব নোঙর করা ও সুলিভান এখানে আসার মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে।' হাসান তারিক বলল।

'যোগসূত্র না থাকলে ঠিক এ সময় সুলিভান এখানে এসেছিল কেন?' স্বগত প্রশ্ন আহমদ মুসার।

'জেটিতেই তো আমরা লুকিয়ে ছিলাম। সুলিভান তো সেখানে যায়নি।' বলল হাসান তারিক।

'হতে পারে সুলিভান বা মিনি-সাব আমাদের অবস্থান টের পেয়েছিল। সুলিভানও সেখানে যায়নি এবং মিনি সাবও জেটিতে নোঙর করেনি।' বলে মুহূর্ত খানেক থামল আহমদ মুসা। তারপর আবার বলে উঠল, 'কিন্তু এমন কিছু ঘটার অর্থ হলো, সুলিভান আমাদের অবস্থান টের পেয়েছিল। যদি তা পেয়ে থাকে,

তাহলে সংগে সংগে তা ডেভিড ডেনিমদের জানাবার কথা। কিন্তু ডেভিড ডেনিমদের কথা বার্তায় এমন কিছু আঁচ করা যায়নি।'

'আমরা বিরাট ধাঁধায় পড়ে গেলাম ভাইয়া। কোনটাকে সত্য বলে গ্রহণ করব'। বলল হাসান তারিক।

'সুলিভানদের গাড়ি এখানে বার বার আসে এটাকেই সত্য বলে গ্রহণ করব। এস, কেন এসেছিল এ সত্যটা বের করি, তাহলে সবকিছুই পরিষ্কার হয়ে যাবে।' বলে আহমদ মুসা মনোযোগ নিবিষ্ট করল তার চারপাশে। বুঝার চেষ্টা করল, গাড়ি থেকে নেমে কোন দিকে গেছে।

এ সময় হাসান তারিক একটু পুব দিকে এগিয়ে ঝুঁকে পড়ে একটা কচি চারা হাতে তুলে নিয়ে আহমদ মুসাকে দেখিয়ে বলল, 'দেখুন এ চারা গাছটা গোড়া ভেঙে পড়েছিল, অনেকখানি শুকিয়ে গেছে।'

'আহমদ মুসার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'চল আমাদের ডান দিকেই এগুতে হবে।'

একটু এগিয়ে আহমদ মুসা দেখল, একটা পাথর তার জায়গা থেকে উপড়ে উল্টে আছে। আহমদ মুসা হাসান তারিককে পাথরটা দেখিয়ে বলল, 'আমরা ঠিক পথেই এগুচ্ছি হাসান তারিক।'

আহমদ মুসারা এইভাবে ছোট-খাট চিহ্ন অনুসরণ করে টিলাটার দক্ষিণ পাশ হয়ে পূব পাশ ঘুরে উত্তর পাশে গিয়ে পৌছল। টিলাটার উত্তর পাশে একটা অগভীর উপত্যকা। উপত্যকাটার পরেই একটা পাথুরে পাহাড়। পাহাড়টার নিচের দিকটা জংগলে ঢাকা হলেও উপরের অংশ অনেকটাই নাংগা, সলিড পাথরের। মাঝে মাঝে গাছ আছে।

আহমদ মুসারা চিহ্ন ধরে পাথুরে পাহাড়টারও উত্তর প্রান্তে গিয়ে পৌছল। সামনে তাকাতেই দেখতে পেল পাহাড়ের গোড়ায় একটা আগের মতই অগভীর, কিন্তু সংকীর্ণ উপত্যকা। উপত্যকার পরেই উঁচু হয়ে উঠেছে একটা উচ্চভূমি এবং ছাদের আকারে তা কিছুটা এগিয়ে গেছে। তার পরেই সাগর।

নিচের সংকীর্ণ উপত্যকাটা ঘন গাছ-পালায় ঢাকা। জংগলের উপর চোখ পড়তেই একটা বিষয়ের প্রতি তার দৃষ্টি দারুণভাবে আকৃষ্ট হলো। দেখল,

অনেকগুলো গাছের মধ্যে দাঁড়ানো একটা দেবদারুর মত সোজা লম্বা হয়ে ওঠা গাছের মাথাটা ভাঙা। ভাঙা মাথাটা ঝুলে আছে। ভাঙা অংশটা শুকিয়ে গেছে।

আহমদ মুসার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। গাছের ভাঙা মাথাটা হাসান তারিককে দেখিয়ে বলল, 'আমার মনে হয় ওটা একটা সংকেত হাসান তারিক।'

'আপনি মনে করেন, কেউ ডালটা ভেঙে রেখেছে?' হাসান তারিক বলল।

'আমার তাই মনে হয়।' বলল আহমদ মুসা।

'ঝড় বা অন্য কোন কারণেও তো ভাঙতে পারে?' হাসান তারিক বলল।

'দেখ, গাছটার পূব, পশ্চিম ও উত্তর সব দিকেই গাছের প্রাচীর। দক্ষিণ দিকটা ফাঁকা। কিন্তু এদিকে আবার পাহাড়ের প্রাচীর। সুতরাং এই অবস্থায় অপেক্ষাকৃত ছোট গাছটা এইভাবে ভাঙতে পারে না।' বলল আহমদ মুসা।

'যুক্তিটা ঠিক ভাইয়া।' হাসান তারিক বলল।

'চল ওদিকে দেখি ব্যাপারটা কি?' বলল আহমদ মুসা।

বলে আহমদ মুসা পাহাড় থেকে উপত্যকার দিকে নামতে শুরু করল।

সাথে হাসান তারিকও।

উপত্যকায় নেমে এল আহমদ মুসারা।

উপত্যকার তলাটা ঘন আগাছায় ভরা।

'ভাইয়া এখানেও লোক চলাচলের চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে।' হাসান তারিক বলল।

'কিন্তু হাসান তারিক একটা জিনিস দেখ, পেছনে আমরা যেমনটা দেখে এসেছি, এখানকার ঘাস ও আগাছা সে রকম দলিত-মথিত নয়। এখানে চলাফেরা হয়েছে খুব সাবধানে।' বলল আহমদ মুসা।

'কারণ বোধ হয় এই যে, এখানে ওদের আগমন ওরা লুকাতে চেয়েছে। কিন্তু কেন?'

'ব্যাপারটা মনে হয় ঠিকানা লুকাবার মত। আমরা হয়তো ওদের গুরুত্বপূর্ণ কোন কিছুর কাছাকাছি পৌছে গেছি।' আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক দুজনেই চারদিকে সতর্কভাবে চোখ বুলাতে লাগল। কিন্তু দৃষ্টি আকর্ষণের মত কোন কিছুই কোথাও দেখল না।

'চল আমরা মাথা ভাঙা গাছটার দিকে আগাই।' আহমদ মুসা বলল।

গাছের গোড়ায় পৌছার আগেই গাছের উত্তর পাশে গাছের নিচেই গাছ-আগাছার একটা বৃত্ত তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বৃত্তটার বহিঃসীমা অস্পষ্ট হলেও বৃত্তটা চারপাশের জংগল থেকে আলাদা হয়ে গেছে তা একটু সতর্ক দৃষ্টিতেই চোখে পড়ে। বৃত্তের ভেতরের ঘাস-আগাছার জংগল প্রাকৃতিকভাবে বিন্যস্ত নয়, পরিকল্পিতভাবে সাজানো। এই পার্থক্যই বৃত্তকে আলাদা করেছে।

আহমদ মুসা বৃত্তটা দেখাল হাসান তারিককে।

বিস্মিত কণ্ঠে হাসান তারিক বলল, 'উপরে গাছের ডাল ভেঙে রাখা, নিচে জংগলের একটা ম্যান-মেড বৃত্তের নিশ্চয় একটা অর্থ আছে ভাইয়া।'

আহমদ মুসা কোন জবাব দিল না। এগুলো গাছের গোড়ায় বৃত্তটার দিকে।

হাসান তারিকও।

বৃত্তটার পাশে পৌছতেই হাসান তারিক বলে উঠল, 'বৃত্তটাকে এখন কিন্তু ভাইয়া চারদিক থেকে জংগল এলাকা থেকে আলাদা করা যাচ্ছে না।'

'হ্যাঁ তাই হয়। শিল্পীদের এক শ্রেণীর ছবিকে কাছ থেকে দেখালে তার কোন আকার বুঝা যায় না। কিন্তু দূর থেকে দেখলে আকার পরিষ্কার হয়ে ওঠে। এ ব্যাপারটাও সে রকম। এ বৃত্তটাকে অন্য মানুষের চোখ থেকে লুকাবার জন্যে এটা একটা কৌশল।' বলেই আহমদ মুসা বৃত্তের চারদিকটা দেখতে লাগল।

মাটির উপর ঝুঁকে পড়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে আহমদ মুসা দেখল, 'বাইরের সাথে বৃত্তের প্রান্ত বরাবর ফাটল এবং তার সাথে কিছুটা আলগা মাটিও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা।

ব্যাপারটা হাসান তারিকেরও নজরে পড়েছিল। সে বিস্মিত। বলল সে আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, 'ভাইয়া মনে হচ্ছে যেন বৃত্ত একটা আলগা জিনিস।'

'তোমার চিন্তায় আরেকটা বিষয়ও যোগ কর। দেখ বৃত্তের প্রান্ত ধুলি ধূসরিত হলেও খুব শক্ত। যেন সিমেন্টে তৈরী । তার অর্থ প্রান্তটা প্রাকৃতিক নয় বিশেষভাবে তৈরী করা হয়েছে।' বলে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা। তার কপাল কুঞ্চিত। ভাবছে আহমদ মুসা।

হাসান তারিকও উঠে দাঁড়িয়েছে। তারও চোখে-মুখে বিস্ময়।

আহমদ মুসা আবার ঘুরে এল বৃত্তটার কাছে। বলল, ‘বৃত্তটাকে ম্যানহোলের ঢাকনার মত কিছু বললে কেমন হয়?’

চোখ কপালে তুলল হাসান তারিক। তার মানে জংগল-ঢাকা এই গোটা বৃত্তটা সরানো যাবে?’

‘প্রান্ত বরাবর আলগা মাটি দেখে মনে হচ্ছে এটা উঠেছে-নেমেছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কিন্তু কিভাবে সম্ভব? কেনইবা উঠবে? এই জংগলে এমন বিদঘুটে জায়গায় কি থাকতে পারে?’ হাসান তারিক বলল।

আহমদ মুসা ভাবছিল। তাকিয়েছিল পূব দিকে। বলল, ‘আমরা সান্তাসিমা পাথুরে জেটির প্রায় সমান্তরালে দাঁড়িয়ে আছি। এখান থেকে পাথুরে জেটিটা কতগজ হবে হাসান তারিক?’

হাসান তারিক পূব দিকটা একটু ভাল করে দেখে বলল, ‘ভাইয়া আমরা তো পাথুরে জেটিটার পাশেই দাঁড়িয়ে আছি। পাথুরে জেটির পশ্চিম পাশে যে পাথুরে দেয়াল দেখেছি, যাকে আমরা পাহাড় ভেবেছি, সেটা আমাদের সামনের উচ্চভূমির দেয়াল। আমাদের এখান থেকে সে দেয়ালের দূরত্ব বিশ-পঁচিশ গজের বেশি হবে না।’

আহমদ মুসার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, ‘এই বৃত্তটা যদি কোন ঢাকনা জাতীয় কিছু হয়, তাহলে আমার মনে হচ্ছে এই হাইল্যান্ডের নিচে কোন স্থাপনা তৈরী করা হয়েছে যার সাথে পাথুরে জেটির সম্পর্ক আছে।’

হাসান তারিক সংগে সংগে কথা বলল না। তার চোখে-মুখে আনন্দ ও বিস্ময়ের সমাহার। পরে ধীরে ধীরে বলল, ‘তাহলে ভাইয়া, সান্তাসিমা উপত্যকার এই আসল ঘাঁটি। এখানে ঢোকার পথও তাহলে এই বৃত্ত-মুখটাই।’

বলে একটু থেমেই আবার বলা শুরু করল হাসান তারিক, ‘বৃত্তটা একটা ঢাকনা হলে বাইরে খোলার একটা পথ অবশ্যই থাকবে। সেটাই এখন আমাদের দেখা দরকার ভাইয়া।’

'হ্যাঁ, এটা কোন ঢাকনা হলে তা খোলার উপায় তো অবশ্যই থাকবে।' বলে আহমদ মুসা বসে পড়ল। বৃত্তের উপর আবার চোখ বুলাতে লাগল। কিন্তু চারদিক ঘুরেও সন্দেহ করার মত কিছু পেল না। আহমদ মুসা নিশ্চিত যে, কোন ইলেক্ট্রনিক ব্যবস্থা ছাড়া এ ধরনের দৈত্যাকার ঢাকনা উঠানো নামানো সম্ভব নয়। ইলেক্ট্রনিক ব্যবস্থার সে ধরনের কৌশল খুঁজে পেল না আহমদ মুসা।

কিন্তু মাথা ভাঙা গাছটার বরাবরে এসে আহমদ মুসা বৃত্তের বাইরে আগাছার ভেতর আলগা মাটির একটা অস্পষ্ট লাইন দেখতে পেল। আগাছার মধ্যে এ ধরনের আলগা মাটি অস্বাভাবিক।

আহমদ মুসা দুহাতে আগাছা দুদিকে সরিয়ে ভালো করে দেখল আলগা মাটির লাইনটাকে।

আলগা মাটির এ লাইনটি শুরু হয়েছে বৃত্তের প্রান্তের সাথে লেগে থাকা বাইরের মাটির প্রায় কোনা থেকে। আর শেষ হয়েছে গাছের গোড়ায় গিয়ে। আহমদ মুসা মাটির ট্রাকটি অনুসরণ করে গাছের গোড়ায় গিয়ে পৌছল।

ঘাস ও আগাছার ভিড়ে গাছের গোড়াটা দেখাই যায় না।

আহমদ মুসা আলগা মাটির লাইন সোজা গাছের জায়গাটার আগাছার ফাঁক দিয়ে তাকাল গাছের গোড়ার দিকে। দেখতে পেল মাটি থেকে পাঁচ-ছয় ইঞ্চি উপরে গাছের গোড়ার একটা জায়গা চার বর্গ ইঞ্চি আকারে গোল করে কাটা এবং মাটি থেকে কাটা পর্যন্ত জায়গাটা গাছের পাতা দিয়ে ঢেকে দেয়া।

আহমদ মুসা ডান হাতে জংগল ফাঁক করে রেখে বাঁ হাত দিয়ে পাতাগুলো সরিয়ে ফেলল। সংগে সংগেই তার নজরে পড়ল গাছের গা বেয়ে মাটি থেকে উঠে আসা একটা বিদ্যুতের তার।

দুচোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আহমদ মুসার। কাটা অংশটা ধরে টান দিল। হাতের সাথে কাটা অংশটা উঠে এল।

কাটা অংশটা ছিল ঢাকনার মত লাগানো। ঢাকনা তুলতেই দেখা গেল প্লাষ্টিকের একটা ক্ষুদ্র সুইচ বক্স। সুইচ প্যানেলের একটা প্রান্ত নীল, অন্য প্রান্তটা লাল। সুইচটা নীল প্রান্তে টেনে দেয়া আছে।

আহমদ মুসা সোজা হয়ে দাঁড়াল।

পেছনেই দাঁড়িয়েছিল হাসান তারিক। হাসান তারিকও দেখতে পেয়েছিল সবকিছু।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াতেই হাসান তারিক বলে উঠল, 'ভাইয়া, সত্যিই আমরা ঠিক জায়গায় এসে গেছি। এখানে সুইচ টিপেই এই দৈত্যাকার ঢাকনাটা খোলা যাবে।'

'হ্যাঁ হাসান তারিক। সুইচটা নীল প্রান্ত থেকে লাল প্রান্তে আনলেই সিঁড়ি বা গুহা মুখের ঢাকনাটা খুলে যাবে। কিন্তু আমি ভাবছি হাসান তারিক, এটা দরজা খোলার সুইচ, না দরজা খোলার জন্যে সংকেত পৌছাবার সুইচ।' চিন্তা জড়িত কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

'যেটাই হোক ভাইয়া, সুইচ টিপলে দরজা খুলে যাবে।' বলল হাসান তারিক।

'তা ঠিক। কিন্তু এটা দরজা খোলার সংকেত হলে, দরজার মুখেই লোক থাকবে আমাদের স্বাগত জানানোর জন্যে।'

'এর পরেও তো আমাদের সামনে এগুতে হবে ভাইয়া।' হাসান তারিক বলল।

'হ্যাঁ হাসান তারিক তৈরী হও। রিভলবারটা হাতে নাও। ঢাকনাটার প্রান্তে গিয়ে দাঁড়াও। আমি সুইচ টিপছি।'

বলে আহমদ মুসা হাত বাড়াল সুইচের দিকে। আর বাম হাত দিয়ে পকেট থেকে তুলে নিল মেশিন রিভলবার। অন্যদিকে হাসান তারিক পকেট থেকে রিভলবার তুলে নিয়ে ছুটল ঢাকনার প্রান্তে।

আহমদ মুসা সুইচ বক্সের সাদা বোতামটাকে টেনে আনল নীল প্রান্ত থেকে লাল প্রান্তে।

সংগে সংগে শীষ দেয়ার মত একটা শব্দ হলো।

আহমদ মুসা তাকাল বৃত্তাকার ঢাকনার দিকে। দেখল বৃত্তাকার ঢাকনা নিচে নেমে যাচ্ছে। ফুট দুয়েক নামার পর ঢাকনাটা দ্রুত পাশে সরে গেল।

আহমদ মুসা দৌড়ে গিয়ে হাসান তারিকের পাশে দাঁড়াল। দেখল, তারা একটা সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে। সিঁড়ির গোড়াটা একটা আলোকিত ঘরে। পাথুরে মেঝের একটা ঘর ওটা।

আহমদ মুসা সিঁড়িতে পা রেখে বলল, 'আমি নামছি, তুমি এস।'

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক দুজনেই তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

আহমদ মুসারা পা রাখল ঘরে। চতুষ্কোণ একটা ঘর। পাথুরে মেঝে, পাথুরে ছাদ। পাশের দেয়াল ছোট-বড় পাথর গেঁথে তৈরী। ঘরে জানালা নেই, একটি দরজা। ঘরটা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। ঘরে কোন আসবাবপত্র নেই। তবে সিঁড়ির পেছনের দেয়ালে অনেকগুলো বাক্স সাজিয়ে রাখা।

'বাক্সগুলো একটু দেখা দরকার।' ফিসফিস করে বলল আহমদ মুসা ।

সংগে সংগেই হাসান তারিক ছুটল বাক্সগুলোর দিকে।

পকেট থেকে ছুরি বের করে একটা বাক্সের উপরের কভারটা কেটে ফেলল।

বাক্সে বই ভর্তি।

একটা বই হাতে তুলে নিল আহমদ মুসা। নজর বুলাল শিরোনামের উপর ঃ 'বাইফেইথ ইসলামিষ্টস আর টেররিষ্ট'। ইংরেজী ভাষার এ গ্রন্থ লিখেছেন ' এ গ্রুপ অব ইউরোপীয়ান পিপল।' প্রকাশকের জায়গায় লেখা 'ক্রিশ্চিয়ান চ্যারিটি প্রেস, বেলফার্ষ্ট, উত্তর আয়ারল্যান্ড।' প্রকাশকের বক্তব্য যিনি দিয়েছেন, তার নাম 'মেরি ক্রিশ্চিয়ানা'। তার ঠিকানা লেখা হয়েছে 'রোম, ইটালী।'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'বইটা লিখেছে, ছেপেছে ও ছড়াচ্ছে ইহুদীরা, কিন্তু দেখানো হচ্ছে বইটা খৃষ্টানরা লিখেছে, ছেপেছে এবং তাই তারাই প্রচার করছে।'

'নতুন কি ভাইয়া, ইহুদীবাদীরা খৃষ্টানবাদের ঘাড়ে বন্দুক রেখেই তো শিকার করে চলেছে।' হাসান তারিক বলল।

'এত বই এখানে কেন?' অনেকটা স্বগত প্রশ্ন আহমদ মুসার।

'আমার মনে হয় ভাইয়া, বইগুলো এখানে আনা হয়েছে উত্তর আজোরসের দ্বীপগুলোর জন্যে।'

'মনে হয় হারতাকেই ওরা উত্তর আজোরসের ঘাঁটি বানিয়েছে।' আহমদ মুসা বলল।

'তাহলে সাও তোরাহ কি?' জিজ্ঞাসা হাসান তারিকের।

'সাও তোরাহ ওদের ভয়াবহ এক জেলখানা, ঠিক আলেকজান্ডার সোলঝেনিৎসিনের 'গোলাগ' দ্বীপের মত।'

আহমদম মুসা কথা শেষ করেই এগুতে লাগল দরজার দিকে।

সাথে সাথে চলল হাসান তারিকও।

দরজাটা ষ্টিলের। দরজার এপারে হুক আছে, লক সিষ্টেমও রয়েছে। হুক খোলা। লক করা থাকতেও পারে, না থাকতেও পারে।

'লক করা না থাকুক' আহমদ মুসা কামনা করল।

ডান হাতে মেশিন রিভলবার ধরে বাম হাতে দরজার হাতলে চাপ দিল আহমদ মুসা। নিশব্দে ঘুরে গেল হাতল। সেই সাথে কিঞ্চিত সরে এল দরজা। লক করা নেই বুঝল আহমদ মুসা। পরক্ষণেই এক ঝটকায় খুলে ফেলল দরজা। মেশিন রিভলবার বাগিয়ে আহমদ মুসা ও হাসান তারিক দুজনেই দরজা থেকে মুখ বাড়িয়ে চারদিকে তাকাল।

দরজার বাইরে ওটা কোন ঘর নয়, একটা প্রশস্ত করিডোর। তার দুদিকেই ঘরের সারি।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক দুজনেই অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল দরজায়। কিন্তু কাউকে দেখল না। এমনকি কোন দিক থেকে কোন সাড়াশব্দও পেল না।

'আমার মনে হয়, এখন কেউ নেই। প্রয়োজনের সময়ই শুধু ওরা আসে হয়তো।' ফিসফিসে কণ্ঠে বলল হাসান তারিক।

'চল সার্চ করে দেখা যাক।' বলে আহমদ মুসা সাবধানে পা ফেলল করিডোরে।

হাসান তারিকও করিডোরে নেমে এল।

‘চল আগে করিডোর ঘুরে সবটা দেখে আসি। তারপর সব সার্চ করা যাবে। আগে আমাদের দেখা দরকার মিনি-সাবমেরিনের সংযোগটা কিভাবে। এখন আমার মনে হচ্ছে, সেই রাতে দুটি মিনি সাবমেরিনকে জেটিতে আধাডোবা অবস্থায় অপেক্ষা করে চলে যেতে দেখেছিলাম। ওরা কিন্তু অপেক্ষা করে ফিরে যায়নি। কাজ সম্পন্ন করেই তারা চলে যায়। শেখুল ইসলামকে এক মিনি সাবমেরিন এসে রেখে যায়, পরের মিনি সাব মেরিনটা এসে তাকে নিয়ে যায়। পানির ভেতরে হস্তান্তরটা কিভাবে করেছিল সেটা আমাদের জানা দরকার।’

ফিস ফিসিয়ে কথাগুলো বলল আহমদ মুসা হাসান তারিককে।

দরজা থেকে বের হবার পর হাতের ডান দিকে মানে দক্ষিণে করিডোরটা ছয়সাত গজের বেশি এগোয়নি। অতএব আহমদ মুসারা হাঁটছিল করিডোর ধরে উত্তর দিকে।

দু’পাশেই ঘর।

কয়েকটা ঘর পেরুতেই পূর্বমুখী আরেকটা করিডোরের সংযোস্থলে তারা গিয়ে পৌছল।

সেখান থেকে মূল করিডোরটা আরও উত্তরে এগিয়ে গেছে। আর পূবমুখী শাখা করিডোরটা পনের বিশ গজ পূবে গিয়েই শেষ হয়ে গেছে।

‘আমাদেরকে উত্তরেই এগুতে হবে।’ বলে আহমদ মুসা মূল করিডোর ধরে সামনে এগুল।

হাসান তারিকও তার পাশাপাশি হাঁটছিল।

আহমদ মুসারা ত্রিমুখী করিডোরের সংযোগস্থলের মাঝখানে এসে পৌছেছে, এ সময় চারদিক থেকে অনেকগুলো ফাঁস এসে তাদের জড়িয়ে ফেলল। ফাঁসগুলো তাদের গলা এবং হাতসহ বুক বরাবর দেহকে কঠিনভাবে বেঁধে ফেলল। আত্মরক্ষার কোন চেষ্টা করার আগেই মাটিতে আছড়ে পড়ে গেল তারা।

আহমদ মুসাদের উপর ফাঁস নিক্ষেপ করেছিল ছাদের চারদিকের ব্যালকনি থেকে। আহমদ মুসারা করিডোরে ঢোকার পর ঘর ও করিডোরের দিকেই শুধু নজর রেখেছে, উপরে তাকায়নি। উপরে ছাদের চারদিক ঘিরে ব্যালকনি। ব্যালকনির রেলিং-এ পর্দা টাঙানো। এরই আড়ালে লুকিয়ে ছিল ওরা

ছয়জন। প্রত্যেকের হাতেই ষ্টেনগান। কিন্তু ওরা গুলী করে চোখের পলকে শত্রু মারার চেয়ে ফাঁসিতে আটকে খেলিয়ে মারার মধ্যেই আনন্দ খুঁজে পেয়েছে।

ফাঁসিতে আটকে আহমদ মুসাদের মেঝেতে আছড়ে ফেলার পর ওরা ছয়জন লাফিয়ে নেমে এল মেঝেতে।

ওরা ফাঁস ধরে টেনে আহমদ মুসা ও হাসান তারিককে ত্রিমুখী করিডোরের সংযোগ স্থলের উত্তর পাশের বড় একটা ঘরে নিয়ে এল।

ঘরটা অনেকটা মিডিয়া রুমের মত। অনেকগুলো লাল-কাল টেলিফোন, ফ্যাক্স, টিভি ও কম্পিউটারে সজ্জিত ঘরটা। বসার জন্যে সোফা-চেয়ারও আছে অনেকগুলো।

ঘরে ঢুকিয়েই একজন মোবাইল নিয়ে কোথাও কল করল। সংযোগ হতেই টেলিফোনকারী লোকটি শরীরটা সামনে বেঁকিয়ে মাথা নিচু করে বিনীত কণ্ঠে বলল, 'এক্সিলেন্সি, আমাদের এই ঘাঁটিতে দুজন লোক প্রবেশ করেছিল। আমরা তাদের ধরে ফেলেছি। আমাদের নির্দেশ নিয়ম অনুসারে ওদের খুন করাই একমাত্র শাস্তি। তবু মনে হলো আপনাকে জানিয়ে তবেই কিছু করা দরকার। আপনি নির্দেশ করুন।'

ওপারের কথা শুনে লোকটি বলল, 'হ্যাঁ দুজনেই বিদেশী।'

কথঅ শেষ করে ওপারের কথঅ শুনল। শুনেই তার দুচোখ বিস্ময়ে ছানাবড়া হয়ে উঠল। বলল, 'সাংঘাতিক এক্সিলেন্সি, আমরা তো এতটা ভাবিনি। আমরা ভালোভাবে ওদের বেঁধে রেখেছি।'

ওপারের কথা শুনল আবার সে। তারপর বলল, 'ঠিক আছে এক্সিলেন্সি। বুঝতে পেরেছি। আপনি যেভাবে বলেছেন, সেভাবেই ওদের রাখব। আপনারা কখন আসছেন? এখনি যাত্রা করছেন? ঠিক আছে এক্সিলেন্সি। আমরা হুশিয়ার থাকব।'

কথা শেষ করে মোবাইল অফ করে রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা। তার চোখে হিং¯্রর দৃষ্টি। সে তার লোকদের উদ্দেশ্য করে বলল, 'জানো এই দুজন লোক আমাদের অসংখ্য লোককে খুন করেছে। আমাদের কর্তারা যাদের হন্যে হয়ে খুঁজছেন, সেই আহমদ মুসা এরা হতে পারে। মিনি-সাব নিয়ে কর্তারা

এখনি যাত্রা করছেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এসে যাবেন। এখন এদের ব্যাপারে আমাদের খুব সাবধান থাকতে হবে।'

লোকটি থেমেই আবার বলে উঠল, 'তোমরা ওদের সব অস্ত্র কেড়ে নিয়েছ তো?'

একজন উত্তরে বলল, 'হ্যাঁ, ওদের কাছে আর কিছুই নেই।'

'ঠিক আছে, এখনই ওদের দুপা বেঁধে ফেল, দুহাত যেভাবে দেহের ফাঁসে বাঁধা পড়েছে, সেটাকে আরও শক্ত করো। ওদের চোখ বেঁধে ফেল এবং মুখও আটকে দাও টেপ দিয়ে। বলে লোকটি আহমদ মুসার দিকে এগিয়ে এল। বলল, 'আমরা তোমাদের শিকার বানাতে পারলাম না। তোমরা যাদের শিকার তারা আসছে। তোমরা আমাদের ডেভিড ডেনিম, সুলিভান, কেলভিনসহ বহুলোককে হত্যা করেছ। তার ফল তোমাদেরকে তিল তিল করে ভোগ করতে হবে।'

কথা শেষ করেই হেসে উঠল লোকটি। বলল, 'তোমরা বোকার মত ঢুকেছিল এ ঘাঁটিতে। মনে করেছিলে বোধ হয় তোমাদের চেয়ে বুদ্ধিমান আর কেউ নেই। কিন্তু জানতে না তোমরা, গাছের সুইচে চাপ দেবার সংগে সংগে শুধু সিড়ির দরজাটাই খুলে যায়নি ভেতরে এলার্মও বেজে উঠেছিল। সংগে আমাদের এই টিভিতে তোমাদের ছবি ভেসে উঠেছিল। টিভি ক্যামেরা লুকানো ছিল বৃত্তাকার ঢাকনার কৃত্রিম গাছ-গাছড়ার মধ্যে। আমরা ভেতরে তোমাদের জন্যে ফাঁদ পেতে বসেছিলাম। ফাঁদে তোমরা পরিকল্পনা মোতাবেকই ধরা পড়েছ। এখানে কেউ ঢুকলে তার জন্যে মৃত্যু ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন পথ থাকে না। এতক্ষণ তোমরা লাশ হয়ে যেতে, কিন্তু তোমাদের মৃত্যুটা লেখা আছে আরও উপরের কর্তাদের হাতে। তার আগে তোমাদের নিয়ে নাকি অনেক কাজ আছে।'

কথা শেষ করে হঠাৎ সে চমকে উঠার মত সোজা হয়ে দাঁড়াল। বলল একজনকে লক্ষ্য করে, 'ভেতরের সুইচ টিপে সিঁড়ির দরজা কি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে?'

ওরা পাঁচজন আহমদ মুসা ও হাসান তারিককে বাধার কাজে ব্যস্ত ছিল। হাত-পা ওদের নতুন করে বাঁধা হয়ে গিয়েছিল। চোখ-মুখ বাঁধতে যাচ্ছিল ওদের। নেতা লোকটির কথা শুনে ওরা পাঁচজনই অপরাধীর মত উঠে দাঁড়াল। বলল

একজন, ‘আমরা এদের ধরে সোজা এখানে নিয়ে এসেছি। ভুলেই গেছি আমরা সিঁড়ির দরজার কথা।’

বলে এ লোকটিসহ আরও একজন ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটল সিঁড়ি ঘরের দিকে।

আহমদ মুসা লোকটির টেলিফোন আলাপ শুনে এবং আজর ওয়াইজম্যানদের কেউ তাদেরকে এখান থেকে নিয়ে যাবার জন্যে আসছে জানতে পেরে খুশি হয়ে উঠেছিল। সে মনে মনে প্রার্থনা করছিল তাদেরকে যেন সাও তোরাহ দ্বীপে নিয়ে যাওয়া হয়। বন্দী হয়ে যাওয়ার মধ্যে ঝুঁকি আছে, কিন্তু আরও মন্দের চেয়ে এটা তো ভালো। বলল আহমদ মুসা লোকটিকে লক্ষ্য করে, ‘তোমার কর্তারা আমাদের কোথায় নিয়ে যেতে চান? তোমাদের কর্তারা থাকেন কোথায়? তোমাদের কর্তারা আমাদের এত ভয় করেন? আর তোমাদের এত দূর্বল ভাবেন যে, আমাদের সাথে কথা বললেই তোমাদের আমরা পটিয়ে ফেলব?’

লোকটি কোন কথা বলল না। যে চেয়ার থেকে উঠে এসেছিল সেই চেয়ারে গিয়ে বসল।

আহমদ মুসাই আবার কথা বলল, ‘তোমাদের কর্তারা বলছেন, আমরা তোমাদের অনেক লোককে হত্যা করেছি। কিন্তু তোমরা নিশ্চয় জান, বাড়িতে ডাকাত পরলে ডাকাতকে হত্যা করা অপরাধ নয়, কিন্তু ডাকাতরা যদি হত্যা করে সেটা অপরাধ। তোমাদের কর্তারা কত লোককে খুন করেছে, কত লোককে সাও তোরাহতে এনে পশুর মত নির্যাতন করছে তা তোমাদের অবশ্যই জানার কথা।’

ক্রোধে জ্বলে উঠল চেয়ারে বসা লোকটা, কিছু বলতে যাচ্ছিল আহমদ মুসাদের পাশে দাঁড়ানো লোকদের উদ্দেশ্যে।

কিন্তু তার আগেই ওদের একজন বলে উঠল, ‘সিঁড়ির দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ তো এখনো আমরা পেলাম না। দেখে আসি ওরা কি করছে।’

‘তাই তো, এতক্ষণ ওদের ফেরার কথা।’ বলল একজন।

‘যাও তোমরা দুজন ওদিকে। হাওয়া খেতে দেখলে ঘাড় ধরে নিয়ে এস।’ উত্তরে বলল চেয়ারে বসা লোকটি।

নির্দেশ পেয়ে দুজন বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

চেয়ারে বসা লোকটি কাল টেলিফোনটা টেনে নিয়ে একটা টেলিফোন করা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

মিনিট তিনেক কেটে গেল তার টেলিফোন কলে।

টেলিফোন রেখেই ভ্রুকুঞ্চিত করে লোকটা আহমদ মুসার পাশে দাঁড়ানো অবশিষ্ট লোকটিকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'ওরা কি শুরু করল? আরও কিছু জরুরী কাজ আছে। ওরা দেরি করছে কেন? যাও ডাক ওদের।'

লোকটি বেরিয়ে গেল।

দুমিনিটেও যখন কেউ ফেরত এল না, তখন চেয়ারে বসা লোকটি অগ্নিমূর্তি হয়ে উঠে দাঁড়াল। চিৎকার করে উঠল, 'সব অপদার্থের দল। সবাইকে পিটিয়ে আজ লাশ করে দেব।' বলে সে ষ্টেনগানটা তুলে নিয়ে দরজার দিকে হাঁটা শুরু করল।

কিন্তু দরজার মুখোমুখি হতেই তার দুচোখ ছানা বড়া হয়ে গেল। কাল প্যান্ট, কাল সার্ট ও কাল হ্যাট পরা দুজন লোক দরজায় যমদূতের মত দাঁড়িয়ে।

কিন্তু প্রথম দেখার চমক কাটিয়ে উঠেই লোকটি তার ষ্টেনগান তুলছিল দরজার দাঁড়ানো আগন্তুকদের উদ্দেশ্যে।

কিন্তু আগন্তুক দুজনের দুহাত বিদ্যুত বেগে উঠে এল এবং এক সাথেই গুলী বর্ষিত হলো তাদের দুই রিভলবার থেকে।

লোকটির ষ্টেনগান মাঝপথেই থেমে গেল এবং বুকে একসাথে দুই গুলী খেয়ে ছিটকে পড়ল তার দেহটা দরজার এক পাশে।

দরজা থেকে কালো মূর্তি দুজন ঘরে ঢুকল। দুজনেই এসে দাঁড়াল আহমদ মুসাদের পাশে। তারপর দুজনেই একসাথে মাথার হ্যাট খুলে হেসে উঠল। বলল আহমদ মুসাদের লক্ষ্য করে, 'আপনাদের এভাবে দেখতে মজাই লাগছে।'

আহমদ মুসাও হাসল। বলল, 'পাঁচ কুমির ছানাকে দুই দুই এক করে তোমরা যে গ্রাস করলে তাও আমাদের মজা দিয়েছে। এখন বল সোফিয়া সুসান ও পলা জোনস, ওদের কাউকেই বাঁচিয়ে রাখনি কিছু জানার জন্যে?'

‘স্যরি মি. আহমদ মুসা, ওদের মুখ বন্ধ করতে হলে ওদের না মেরে উপায় ছিল না।’ বলল সোফিয়া সুসান।

‘তার মানে এখানেও কাউকে জীবিত পাওয়া গেল না।’ বলল আহমদ মুসা।

পলা জোনস আহমদ মুসাদের বাঁধন কাটা শুরু করে দিয়েছিল। সোফিয়া সুসানও তার সাথে যোগ দিল।

বাঁধন মুক্ত হয়ে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘সিঁড়ি মুখটা নিশ্চয় বন্ধ করে দেয়া হয়নি এখনও?’

‘জি না, হয়নি। আমরা সে চেষ্টা করিনি। তার সময়ও হয়নি।’ বলল সোফিয়া সুসান।

‘হাসান তারিক তুমি যাও দরজাটা বন্ধ করে এস। সিঁড়ির শেষ ধাপের উপরের ধাপে সুইচ দেখতে পাবে।’ নির্দেশ দিল আহমদ মুসা।

‘জি ভাইয়া।’ বলে হাসান তারিক উঠে গেল।

আহমদ মুসাও এগুল নিহত লোকটার সেই মোবাইলের দিকে। মোবাইলটি নিয়ে আহমদ মুসা ‘কল প্রেরণ’ উইনডোটা বের করল। আহমদ মুসার উদ্দেশ্য, কিছুক্ষণ আগে লোকটা তার যে কর্তাদের সাথে কথা বলল, তাদের অবস্থান কোথায়? সাও তোরাহ, না অন্য কোথাও। কিন্তু বের হলো একটা মোবাইল নাম্বার। আহমদ মুসা জিজ্ঞেস করল পলা জোনসদেরকে যে মোবাইল নাম্বার দেখে এলাকার পরিচয় জানা যাবে কিনা।

কথা বলে উঠল সোফিয়া সুসান। বলল, ‘না সম্ভব নয় জনাব। আজোরস দ্বীপপুঞ্জের মোবাইলগুলো সেন্ট্রালি এ্যালোট করা।’

মিনিট খানেক না যেতেই হাসান তারিক ফিরে এল। বলল, ‘হ্যাঁ ভাইয়া দরজা বন্ধ করেছি।’

বলেই তাকাল হাসান তারিক পলা জোনসের দিকে। বলল, ‘ছুরি দিয়ে আপনারা কাবু করেছেন পাঁচজনকে!’

‘এক সাথে তো নয় তিনবারে। গুলী করা সম্ভব ছিল না অন্যেরা সাবধান হবে এই ভয়ে। অসুবিধা হয়নি। সোফিয়া সুসান তো কমান্ডো। সেই কাজ করেছে আমি সাথে ছিলাম।’ পলা জোনস বলল।

‘আমরা ধরা পড়ার কথা কি আপনারা জেনেছিলেন?’ বলল হাসান তারিক।

‘জেনেছিলাম নয়, দেখেছিলাম।’ পলা জোনস বলল।

‘আপনারা কি আমাদের পেছনে পেছনেই ভেতরে ঢুকেন?’ বলল হাসান তারিক।

‘হ্যাঁ। তবে ততটা পেছনে, যতটা পেছনে থাকলে আপনাদের চোখে পড়া থেকে বাঁচা যায়। আপনারা করিডোরে ঢোকার পর আমরা সিঁড়ি ঘরে নেমে আসি।’ পলা জোনস বলল।

‘আমার বিস্ময় লাগছে, আহমদ মুসা ভাইকে না জানিয়ে এমন সিদ্ধান্ত আপনারা নিলেন কি করে!’ অনেকটা স্বগতকণ্ঠে বলল হাসান তারিক।

‘আমরা এসেছি ঈশ্বরের নির্দেশে। মি. আহমদ মুসা অবশ্যই আমাদের মাফ করবেন।’ বলল সোফিয়া সুসান। তার ঠোঁটে এক টুকরো হাসি।

আহমদ মুসা মোবাইলটা রেখে দিয়ে একটা চেয়ারে বসেছিল। তার মুখেও হাসি ফুটে উঠল। বলল, ‘ঈশ্বরের নির্দেশে আসলে আহমদ মুসার কাছে মাফ চাওয়ার প্রয়োজন কি?’

‘ঈশ্বরেরই তো নির্দেশ নেতার আনুগত্য করতে হবে।’ বলল সোফিয়া সুসান।

‘আমি আপনার নেতা হলাম কবে?’ আহমদ মুসা বলল। তার কণ্ঠে কৃত্রিম বিস্ময়ের সুর।

‘আপনি হননি, আপনাকে নেতা বানিয়েছি। আর এই আনুগত্য আমার একান্তই পারসোনাল ব্যাপার।’ বলল সোফিয়া সুসান। তার চোখে-মুখে একটা ঔজ্জ্বল্য।

‘ভাইয়া, সোফিয়া সুসান শুধু যে এক বাপের এক মেয়ে তা নয়। আপনি জানেন না হারতা ও পাশের নেসকুইন দ্বীপের সবচেয়ে দীর্ঘদিন রাজত্বকারী

আলতামোরা রাজবংশের একমাত্র মেয়ে। সে যা ইচ্ছা করে তাই করে থাকে। সুখের জীবন বাদ দিয়ে কমান্ডো বাহিনীতে সে যোগ দিয়েছে নিজের জেদেই। সে আমাকে জোর করে সাথে নিয়ে এসেছে ভাইয়া।'

'না, এবার জেদের বশে নয়, ঈশ্বরের নির্দেশ পেয়ে এসেছে ও।' হেসে বলল আহমদ মুসা।

একটু থেমেই আবার বলে উঠল, 'তোমাদের দুজনকেই ধন্যবাদ। এখন কাজের কথায় আসি।'

বলে একটু থামল আহমদ মুসা।

একটু ভাবল। তারপর শুরু করল, ওরা মিনি-সাব নিয়ে আমাকে ও হাসান তারিককে নিতে আসছে। কতক্ষণে ওরা পৌছবে জানি না। ওদের মধ্যে আজর ওয়াইজম্যান থাকবে বলে মনে হয় না। তবে তাদের লোকরাই আসছে। আমাদের জন্য এটা একটা মহা সুযোগ। আমরা যদি ওদের মিনি-সাব দখল করতে পারি, তাহলে সাও তোরাহ পৌছা অনেক সহজ হয়ে যাবে। কিন্তু এ জন্যে অনেকগুলো কাজ আমাদের করতে হবে। প্রথমত মিনি সাবের সাথে কিভাবে এই ঘাঁটির সংযোগ হবে, কোন পথে কিভাবে মিনি-সাব থেকে এখানে নামার ব্যবস্থা হবে তা আমরা জানি না, দ্বিতীয়ত ওদের সন্দেহমুক্ত ভাবে কিভাবে এই ঘাঁটিতে নিয়ে আসা হবে এবং তৃতীয় কাজটা হলো মিনি-সাবটা দখল করা। তৃতীয় কাজটা অবস্থার বিচারে করা হবে, কিন্তু প্রথম দুটো কাজ নিয়ে আমাদের অনেক ভাবতে হবে। এই ভাবনার জন্যে আমি তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছি।'

থামল আহমদ মুসা।

কথা বলে উঠল হাসান তারিক, 'ওদের কথা থেকে বুঝা গেছে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার মাধ্যমে বাইরের দৃশ্য মনিটর করা হয়। সুতরাং আমরা বন্দী অবস্থায় ওদের যে আলোচনা শুনেছি এবং টিভি মনিটরিং-এর মাধ্যমে যা আমরা দেখব তার ভিত্তিতে প্রাথমিক যোগাযোগের কাজ হয়তো করা যাবে। কিন্তু ওদের মনে যাতে সন্দেহের সৃষ্টি না হয় এ জন্যে ওদেরকে মিনি-সাব থেকে ঘাঁটির ভেতরে আনার কাজটা কিভাবে স্বাভাবিক করা যাবে সেটা নিয়ে আরও ভাবতে

হবে। কিন্তু প্রথমত ঘাঁটি অনুসন্ধান করে দেখা প্রয়োজন কোন ক্লু পাওয়া যায় কিনা, সাহায্য পাওয়া যেতে পারে এমন কিছু পাওয়া যায় কিনা।'

'ঠিক বলেছ, চল সার্চটা শুরু করা যাক।'

বলেই উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে সোফিয়া সুসান ও পলা জোনসকে বলল, 'তোমরা টিভি মনিটরিং এবং ফ্যাক্স ও টেলিফোনগুলোর উপর নজর রাখ।'

আহমদ মুসারা ঘাঁটির প্রতিটি ঘর সার্চ করল। প্রয়োজনীয় তথ্য গুলো সংগ্রহ করল। অবশেষে তারা উত্তর প্রান্তের প্রশস্ত করিডোরটি দিয়ে একটা তালাবদ্ধ ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। আহমদ মুসা পকেট থেকে ষ্টিলের একটা তার বের করে তালাটা খুলে ফেলল।

বেশ বড় ঘর।

ঘরের পূব দেয়ালের দিকে তাকিয়ে তারা বিস্মিত হলো। দেয়ালে পাঁচ ফুট উঁচু ও চার ফুঁট প্রস্তের একটা কাঠামো। ঠিক প্লেন বা স্পেসশীপের দরজার মত।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক দুজন দুজনের দিকে তাকাল। দুজনেরই চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আনন্দে।

প্রথম আহমদ মুসা কথা বলল, 'কি বুঝছ হাসান তারিক?'

'মিনি সাবমেরিন ও ঘাঁটির মধ্যেকার গ্যাংওয়েয়ের এটা এপাশের দরজা ভাইয়া।' আনন্দের সাথে বলল হাসান তারিক।

'আলহামদুলিল্লাহ, এক রহস্যের উন্মোচন হলো হাসান তারিক। দরজাটা যন্ত্র নিয়ন্ত্রিত তা বুঝাই যাচ্ছে। ঐ দেখো দরজার পাশে ডিজিটাল প্যানেল দেখা যাচ্ছে। এসো দেখি।' কথাগুলো বলে আহমদ মুসা দরজার দিকে হাঁটতে লাগল।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক দুজনে দরজার পাশের ডিজিটাল প্যানেলের মুখোমুখি দাঁড়াল। ডিজিটাল প্যানেলে অনেকগুলো পয়েন্ট। প্রথম পয়েন্টে লাল আলো দপদপ করে জ্বলছে। উপরে লেখা ডিসি (D.C)। দ্বিতীয়

পয়েন্টের উপর লেখা জি ডব্লিউ মিসফিটেড (G.W. missfitted) এবং চতুর্থটিতে ডিও (D.O)। ডিও পয়েন্টের সাথেই একটা ডিজিটাল কি বোর্ড।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক দুজনেই প্যানেলের উপর চোখ বুলাচ্ছিল। আহমদ মুসা বলে উঠল, 'প্রথম পয়েন্টটায় লাল আলো জ্বলছে। উপরের D.C-এর অর্থ নিশ্চয় 'ডোর ক্লোজড' মানে 'দরজা বন্ধ'। দরজা বন্ধ থাকারই লাল সংকেত দিচ্ছে পয়েন্টটা। কিন্তু অন্যগুলোর অর্থ বের কর হাসান তারিক।'

'পরবর্তী দুপয়েন্টের সমাধান করছি ভাইয়া। 'জি ডব্লিউ মিসফিডেট' অর্থ হলো গ্যাংওয়ে-মিসফিডেট'। এর অর্থ মিনি-সাব থেকে বেরিয়ে আসা গ্যাংওয়ে এই দরজার সাথে ঠিকভাবে ফিট হয়নি। তৃতীয় পয়েন্টের 'জি ডব্লিউ ফিটেড' অর্থ গ্যাংওয়েটি দরজার সাথে ঠিকভাবে ফিট হয়েছে। আর.............।' হাসান তারিক কথা শেষ করতে পারলো না।

কথার মাঝখানে আহমদ মুসা বলল, 'তার মানে মিনি-সাব থেকে বেরিয়ে আসা গ্যাংওয়ে ঠিকভাবে ফিট হলে তৃতীয় পয়েন্টে আলো জ্বলবে, আর ফিট না হলে দ্বিতীয় পয়েন্টে জ্বলবে।'

'ঠিক ভাইয়া। কিন্তু চতুর্থ পয়েন্ট D.O-এর অর্থ কি হতে পারে?'

'শুরুতে দেখছ দরজা বন্ধ। তারপর দেখলে গ্যাংওয়ে ঠিকভাবে লাগল, এখন কি করতে হবে?' বলল আহমদ মুসা সরাসরি উত্তর না দিয়ে।

হেসে উঠল হাসান তারিক। বলল, 'তার মানে D.O-ডোর ওপেন-দরজা খোলা।'

হাসান তারিক হাসলেও আহমদ মুসার মুখে ফুটে উঠেছে চিন্তার ছায়া। বলল, 'হাসান তারিক ডোর অপেন হবে ডিজিটাল লকে। ডোর ওপেনের জন্যে সঠিক ডিজিটাল কোড খুঁজে পাওয়াই হবে এখন আমাদের প্রধান সমস্যা।'

বলে ঘনিষ্ঠভাবে ডিজিটাল প্যানেল দেখার জন্যে আহমদ মুসা এগুলো প্যানেলের শেষ পয়েন্টটার দিকে।

হাসান তারিকও এগুলো পয়েন্টটার দিকে।

ডিজিটাল লকের উপর চোখ বুলাতেই কপাল কুঞ্চিত হয়ে উঠল আহমদ মুসার। ডিজিটাল লকে কতকগুলো জিরো অংকের সাথে শুরুতে কয়েকটা

বর্ণমালাও যুক্ত আছে। সব মিলিয়ে ডিজিটাল লকটা দাঁড়ায় 'FAMS 00654123'

ডিজিটাল লকটার উপর চোখ বুলাতেই আহমদ মুসার মনে হলো যে কোথাও এ ধরনের সংখ্যা সে পড়েছে।

হঠাৎ তার মনে পড়ল ডেভিড ডেনিমের লকেট থেকে পাওয়া দুটি চীপসের কথা। দ্রুত সে জ্যাকেটের ভেতরের এক গোপন পকেট থেকে বের করল চীপস দুটি। দুটি চীপসে চোখ বুলিয়ে একটি ডান হাতে তুলে ধরে বলল, 'হাসান তারিক সমাধান হয়ে গেছে। দেখ এই চীপসের বর্ণমালা 'FAMS'-এর সাথে ডিজিটাল লকের বর্ণমালা মিলে গেছে। তার মানে এই চীপসের ডিজিট কোড দিয়ে গ্যাংওয়ের এই দরজা খোলা যাবে। এখন শুধু জিরো চীপসের অংকগুলো টাইপ করলেই আমরা দরজা খুলতে পারব।'

হাসান তারিকও চীপসটা হাতে নিয়ে দেখল এবং বলে উঠল, 'আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে অভাবনীয়ভাবে সাহায্য করেছেন ভাইয়া।'

'ঠিক তাই হাসান তারিক। আমরা ভাবিনি এবং চাইওনি যে, সুসান ও পলা জোনসরা এখানে আসবে। ঠিক সময়ে দেখ তারা এসে গেছে। তার ফলে নাটকের দৃশ্যটা পাল্টে গেল। ঘটনার হুইল এখন আমাদের হাতে।'

হাসান দ্বিতীয় চীপসটার দিকে ইংগিত করে বলল, 'দ্বিতীয় চীপসে যে কোন নাম্বার সেটাও কি এখানেই লাগবে? আপনি বলেছিলেন একটা আগে, অন্যটা পরে ব্যবহার করতে হবে।'

'আগে ও পরের অর্থ এই নয় যে, দুটা কোড একই লকে ব্যবহার হবে। আমি জানি না। তবে কোডের প্রথম চারটি বর্ণমালা থেকে স্পষ্ট প্রথমটার মত দ্বিতীয়টাও আজর ওয়াইজম্যানের ওয়ার্ল্ড ফ্রিডম আর্মির সাও তোরাহ দ্বীপের কোন কিছুর কোড।' বলল আহমদ মুসা।

'সা তোরাহ দ্বীপ কি করে বুঝা গেল ভাইয়া?' জিজ্ঞাসা হাসান তারিকের।

আহমদ মুসা দুটো চীপস হাসান তারিকের সামনে তুলে ধরে বলল, ‘প্রথমটার অর্থ যেমন ‘Freedom Army Mini-Sub’ (FAMS), তেমনি দ্বিতীয়টার অর্থ হলো ‘Freedom Army Sao Torah’ (FAST)।’

‘ধন্যবাদ ভাইয়া, বুঝেছি। সাও তোরাহের কোড চীপসটা নিশ্চয় এই কোডের মতই গুরুত্বপূর্ণ হবে।’ বলল প্রসন্ন মুখে হাসান তারিক।

হাসান তারিক কথা শেষ করতেই তারা তাদের পেছনে পায়ের শব্দ শুনতে পেল।

বোঁ করে তারা দুজনেই ঘুরে দাঁড়াল।

দেখল পলা জোনস দৌড়ে আসছে। তার চোখে উত্তেজনা।

আহমদ মুসার সাথে চোখাচোখি হতেই সে বলে উঠল, ‘ভাইয়া, টিভি স্ক্রিনে মিনি-সাবের পেরিস্কোপ দেখা যাচ্ছে। এদিকেই আসছে।’

‘গুড নিউজ। চল দেখি।’ বলে আহমদ মুসা ছুটতে শুরু করল।

তার পেছনে হাসান তারিক ও পলা জোনসও দৌড়াতে শুরু করল।

টিভি মনিটরিং-এ বসেছিল সোফিয়া সুসান। আহমদ মুসারা পৌছতেই সোফিয়া সুসান একটু পাশে সরে গিয়ে টিভির ছবি ওদের সামনে নিয়ে এল। আহমদ মুসারা দেখল, তারা যেমন আগে দেখেছিল ঠিক সেভাবেই মিনি-সাব পাথুরে জেটির পশ্চিম প্রান্তে এসে ভিড়ছে।

ভিড়ল মিনি সাবমেরিনটা।

পেরিস্কোপ ধীরে ধীরে উপরে উঠতে লাগল।

মিনি সাবমেরিনটি ভেসে উঠছে।

আধা-ভাসা অবস্থায় মিনি-সাব স্থির হয়ে গেল।

এরপর কি ঘটবে, আহমদ মুসাদের কি করণীয় এসব নিয়ে রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা আহমদ মুসাদের।

অপেক্ষার জবাব পেয়ে গেল আহমদ মুসারা। তারা দেখল, মিনি-সাব থেকে গ্যাংওয়ে বেরিয়ে তাদের এ ঘাঁটির দিকে আসছে।

আহমদ মুসা দ্রুত হাসান তারিককে বলল, ‘হাসান তারিক তুমি গেটে যাও। আমি দেখি কয়জন ও কারা মিনি-সাব থেকে গ্যাংওয়েতে নামছে এখানে

আসার জন্যে। তাদের সাথে কি অস্ত্র থাকবে, থাকবে কিনা সেটাও দেখা যাবে। সেটা হিসাবে রেখেই আমাদের এগুতে হবে। আমি দরজা খোলার ঠিক আগের মুহূর্তে আসব।'

হাসান তারিক উঠে দাঁড়িয়ে ছুটল গ্যাংওয়ের গেটের দিকে।

পল পল করে সময় বয়ে চলল।

আহমদ মুসা দেখল, মিনি-সাবমেরিনের 'নোজ' এর পেছনে যেখানে সাধারণত ক্রুদের কেবিন থাকে। সেখান থেকে গ্যাংওয়ে বেরিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। গ্যাংওয়ে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু গ্যাংওয়ের বাইরেটা দেখা যাচ্ছে, ভেতরটা নয়। 'ভেতরে টিভি ক্যামেরা সেট করা নেই' বুঝতে পারল আহমদ মুসা। আশার গুড়ে বালি পড়ল তার। ভেবেছিল ভেতরটা যদি দেখা যায়, তাহলে কাজ সহজ হয়ে যাবে। তা হলো না।

এই সময় টেবিলের মোবাইলটা বেজে উঠল।

এ রকম একটা টেলিফোনের আশংকা করছিল আহমদ মুসা মিনি-সাব থেকে। তাহলে কি মিনি-সাব এরই টেলিফোন এটা? কথা বলতে গিয়ে যদি ধরা পড়ে যায়। টেলিফোন কি সে ধরবে, নাকি ধরবে না। না ধরলে সাবমেরিনের ওরা সন্দেহ করতে পারে। উভয় সংকট। করবে কি সে? ইতিমধ্যে টেলিফোনে তিন বার রিং হয়েছে। এখনি না ধরলে হয়তো লাইন কেটে দিতে পারে। শেষে কথা বলার ঝুকিই নিল আহমদ মুসা।

হঠাৎ আহমদ মুসা কাশতে শুরু করল। কাশতে কাশতে টেলিফোন ধরল আহমদ মুসা। টেলিফোন ধরে ওপার থেকে ভারী কণ্ঠের 'হ্যালো' সম্বোধন শুনেই আহমদ মুসা কাশি পীড়িত ভাঙা গলায় বলে উঠল, 'স্যরি, আমি বেগিন এক্সিলেন্সি। হঠাৎ কাশিতে................।'

ওপার থেকে কথায় বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'ও.কে। আমরা আসছি। সব ঠিক আছে তো?'

সেই কাশির মধ্যে গলা সামলাতে, সামলাতে বলে উঠল আহমদ মুসা, 'ইয়েস এক্সিলেন্সি।'

'থ্যাংকস। আসি।' বলল ওপার থেকে।

‘ওয়েলকাম এক্সিলেন্সি।’ বলেই ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল। বলল, ‘আমরা ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছি।’

সোফিয়া সুসান ও পলা জোনস টেলিফোনে আহমদ মুসার কথা শুনছিল। তার চোখে-মুখে উৎকণ্ঠা। আহমদ মুসা মোবাইল রাখতেই সোফিয়া সুসান বলল, ‘কথা কি মিনি সাবমেরিন থেকে কেউ বলল মি. আহমদ মুসা?’

‘হ্যাঁ সুসান।’ আহমদ মুসা বলল।

‘বুঝলেন কি করে যে বেঁচে গেলেন?’ বলল সোফিয়া সুসান।

‘কাশির ক্যামোফ্লেজ দিয়ে আমি আমার কণ্ঠকে আড়াল করতে পেরেছি বলে মনে হয়। আমাকে সে চিনতে পারেনি বলেই আমি মনে করছি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘খুশির খবর ভাইয়া। তবে ভাইয়া, ওদের চেয়ে ধড়িবাজ দুনিয়ায় কেউ নেই, এটা আপনি জানেন।’ বলল পলা জোনস।

‘ধন্যবাদ পলা। তোমরা দুজন মনিটরিংটা পাহারা দাও। আমি গ্যাংওয়ের গেটে যাচ্ছি।’

বলে আহমদ মুসা ছুটল গেটের দিকে।

সোফিয়া সুসান ও পলা জোনস দুজনে টিভি স্ক্রীণের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা টিভি স্ক্রীনে দেখল, গ্যাংওয়ে এসে ফিট হচ্ছে ঘাঁটির প্রবেশ দরজার চারদিকের এয়ারটাইট প্যানেলের সাথে। পরক্ষণেই তাদের নজরে পড়ল, গ্যাংওয়ের মুখ থেকে এয়ারটাইট ঢাকনা সরে যাচ্ছে। ঢাকনা সরে যাওয়ার সাথে সাথে তাদের নজরে পড়ল ৬ জন তিন তিন করে গ্যাংওয়ের দুপাশে ঘাঁটির দরজার দিকে ষ্টেনগান বাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর মাথায় হ্যাট পরা সুবেশধারী দীর্ঘকায় একজন লোক হাত নেড়ে তাদেরকে নির্দেশ দিয়ে এগোচ্ছে গ্যাংওয়ের মুখে ঘাঁটির দরজার দিকে। তারও হাতে রিভলবার। রিভলবার সমেত হাতটা সে কোটের পকেটে ঢুকাল।

সোফিয়া সুসানের মুখ কালো হয়ে উঠেছে। বলল সে পলা জোনসকে, রিভলবারধারী লোকটি হাত নেড়ে যে নির্দেশ দিল তার ছয়জন লোককে, তার অর্থ হলো দেখামাত্র গুলী করতে হবে।'

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে পলা জোনস। বলল, 'তাহলে এদিকের সব ব্যাপার ওরা জানতে পেরেছে। কিন্তু কিভাবে?'

'কিভাবে আমি জানি না। হতেও পারে আমরা যেমন ওদের দেখছি, ওরাও তেমন আমাদের দেখছে। বলল সুফিয়া সুসান।

'সর্বনাশ, ভাইয়াদের সাবধান করা দরকার।' বলল দ্রুতকণ্ঠে পলা জোনস।

দ্রুত উঠে দাঁড়াল সোফিয়া সুসান। বলল, 'পলা তুমি এদিকটা দেখ। আমি ওদের কাছে যাচ্ছি।' বলে সোফিয়া সুসান দৌড়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

ছুটল সে গ্যাংওয়ের গেটের দিকে।

সোফিয়া সুসান যখন গেট রুমের দরজায় পৌছেছে, তখন দেখল গ্যাংওয়ের মুখের গেট দেয়ালের ভেতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। গেটের এক পাশে দাঁড়ানো আহমদ মুসা ও হাসান তারিক উন্মুক্ত হয়ে উঠছে গ্যাংওয়ের মুখে দাঁড়ানো লোকদের উদ্যত ষ্টেনগানের সামনে। দেখামাত্র গুলীর মোকাবিলা করার মত প্রস্তুতি আহমদ মুসাদের নেই।

'সামনে গুলী মি. আহমদ মুসা।' বলে চিৎকার দিয়ে উঠে কমান্ডো সোফিয়া সুসান নিজের মাথাটাকে নিচে ঠেলে দিয়ে পা দুটোকে মেঝের সমান্তরালে তীরের মত ছুড়ে দিল গ্যাংওয়ের গেটের দিকে। গুলীর এক পশলা বৃষ্টি বয়ে গেল তার দেহের তিন ফিট উপর দিয়ে।

সোফিয়া সুসানের তীর বেগে ছুটা দেহ গিয়ে সুবেশধারী নেতা লোকটিসহ গ্যাংওয়ের মাঝখানে ক্লোজ হয়ে আসা দুজন ষ্টেনগানধারীকে আঘাত করল। তারা তিনজনই পড়ে গেল। তাদের দেহ সুসানের দেহের উপর দিয়ে সামনে ছিটকে পড়েছিল।

সোফিয়া সুসানের দেহ স্থির হয়েছিল পড়ে যাওয়া তিনজনের পায়ের দিকটায় এসে। ওদের হাত থেকে ছিটকে পড়া একটা ষ্টেনগান সে হাতের কাছে পেয়ে গিয়েছিল।

ওদিকে সোফিয়া সুসানকে নতুন করে টার্গেট করার জন্য গ্যাংওয়ের অন্য চারজন ষ্টেনগানধারী ফিরে দাঁড়াচ্ছিল। ঠিক সময় দরজার পাশে দাঁড়ানো আহমদ মুসারাও তাদের মেশিন রিভলবার থেকে গুলী বর্ষণ শুরু করেছে।

আর সোফিয়া সুসানও ষ্টেনগান পেয়ে শুয়ে থেকেই গুলী বর্ষণ শুরু করল।

দুআক্রমণের মাঝে পড়ে প্রতিআক্রমণের সময় মিনি-সাবের ষ্টেনগানধারীরা পেল না। ওদের সাতটি লাশই গ্যাংওয়ের মেঝেতে গড়াগড়ি দিতে লাগল।

সোফিয়া সুসান উঠতে যাচ্ছিল এসময় গ্যাংওয়ের মিনি-সাব প্রান্ত থেকে পায়ের শব্দ পেল সে।

ষ্টেনগানের ট্রিগারে হাত রেখে বোঁ করে দেহটা ঘুরিয়ে নিল সোফিয়া সুসান। দেখল, তিনজন বেরিয়ে এসেছে মিনি সাব থেকে গ্যাংওয়েতে। তাদের এক জনের হাত খালি অন্য দুজনের হাতে দুটি ষ্টেনগান। তারা মনে হয় পরিস্থিতি আঁচ করার চেষ্টা করছিল। তাদের ষ্টেনগানের ব্যারেলগুলোও নামানো ছিল। সোফিয়া সুসানকে ষ্টেনগান হাতে ঘুরে দাঁড়াতে দেখেই তারা তাদের ষ্টেনগান তুলল সোফিয়া সুসানকে লক্ষ্য করে। কিন্তু তাদের ষ্টেনগানের নল যখন উঠে আসছিল সোফিয়া সুসানকে লক্ষ্য করে, সে সময় সোফিয়া সুসানের ট্রিগার চাপা হয়ে গিয়েছিল। এক ঝাঁক গুলী বেরিয়ে গিয়ে গ্রাস করেছিল ওদের তিনজনকে।

উঠে বসল সোফিয়া সুসান।

তার পেছনে এসে দাঁড়াল আহমদ মুসা এবং হাসান তারিক।

'ধন্যবাদ সুসান। বুঝলাম, তোমাদের আজোরস দ্বীপের কমান্ডো ট্রেনিং খুবই উন্নতমানের।' গম্ভীর কণ্ঠে আহমদ মুসা বলল।

'কেন একথা বলছেন?' সোফিয়া সুসান বলল।

‘বলছি কমান্ডো সোফিয়া সুসানের কাজ দেখে। সত্যি সুসান, ওরা আমাদের সন্দেহ করেছে সেটা বুঝিনি। তাই ওদের তাৎক্ষণিক আক্রমণের জন্যে আমাদের প্রস্তুতি ছিল না। ওদের ঠেকাবার জন্যে সত্যি তুমি দুঃসাহসের কাজ করেছো। তোমাকে ধন্যবাদ সুসান।’

‘আজোরসের কমান্ডোদের প্রতি আপনার এ স্বীকৃতির জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। আসলে আমার কোন কৃতিত্ব নেই। টিভি স্ক্রীনে আমি ওদের দেখে বুঝেছিলাম যে ওরা ‘শুট এ্যাট সাইট’-এর প্রস্তুতি নিয়েছে। এ জন্যেই আমি ছুটে এসেছিলাম।’ বলল সোফিয়া সুসান।

এ সময় পলা জোনস এসে দাঁড়াল সোফিয়া সুসানের পাশে। তার চোখে-মুখে নতুন উত্তেজনা। বলল সে দ্রুতকণ্ঠে, ‘মিনি-সাব কন্ট্রোল রুমের আউটার প্যানেলে রেড লাইট ব্লিপ করছে। তার মানে মিনি-সাবের ভেতরে ইমারজেন্সি ঘোষণা করা হয়েছে। অন্যদিকে মোবাইলে অবিরাম কল আসছে প্রকৃত ঘটনা জানতে চেয়ে। কোন কলেরই জবাব দিচ্ছি না। আমার মনে হয় এই অবস্থায় মিনি-সাব সরে পড়ার চিন্তা করতে পারে।’

‘ঠিক বলেছ পলা। পরবর্তী কাজ আমাদের সাবমেরিন দখল করা। সময় নষ্ট করা যাবে না। এস তোমরা।’

বলে গ্যাংওয়ে ধরে হাঁটতে লাগল আহমদ মুসা। তার পাশে হাসান তারিক। পেছনে পাশাপাশি হাঁটছে পলা জোনস ও সোফিয়া সুসান।

মিনি সাবমেরিনের প্রবেশ দরজার কাছাকাছি এসে দাঁড়াল আহমদ মুসা। সবাই তার দুপাশে এসে দাঁড়াল। বলল আহমদ মুসা নিচু কণ্ঠে সবাইকে লক্ষ্য করে, ‘ভেতর থেকে আর আক্রমণ আসছে না। এর অর্থ দুটি হতে পারে। এক. ভেতরে কমব্যাটে আসার ফাইটিং লোক নেই, আছে নিছক কয়েকজন ক্রু। দুই. এ হতে পারে যে ফাইটিং লোক থাকলেও সংখ্যায় কম আছে। তারা ভেতরে অবস্থান নিয়েছে চোরাগোপ্তা আক্রমণের জন্যে। এ দুটি বিষয় সামনে রাখার পর তৃতীয় যে বিষয়টি আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে, সেটা হলো ওদের কনট্রোল রুমের টিভি মনিটরিং-এ আমাদের অবস্থান তারা দেখতে পাচ্ছে। তবে আশার কথা মনিটরিং রেজাল্ট প্রয়োজন অনুসারে পৌছাতে পারবে না তার লোকদের

কাছে। এই অবস্থায় আমাদের প্রথম কাজ হবে সাবমেরিন কনট্রোল হাতে নেয়ার জন্যে কনট্রোল রুম দখল করা। কনট্রোল রুম নিয়ন্ত্রণ দখল করার পর কনট্রোল রুম নিয়ন্ত্রণ করবে হাসান তারিক। সাবমেরিন সম্পর্কেও বিশেষজ্ঞ হাসান তারিক। আমি তার সাথে থাকব। আগের মতই রিয়ার গার্ড হিসাবে কাজ করবে সোফিয়া সুসান ও পলা জোনস।'

আহমদ মুসা কথা শেষ করল।

সোফিয়া সুসান বলল, 'ধন্যবাদ মি. আহমদ মুসা। তবে আমার মনে হয় তেমন কোন ফাইটিং ষ্ট্রেংথ ওদের এখন নেই।'

'আমারও তাই মনে হয়। WFA-এর লোকদের শক্তি থাকলে এতক্ষণ ভেতরে বসে থাকার মত ওরা নয়।' বলল পলা জোনস।

'ধন্যবাদ তোমাদের। এস আমরা এগোই, বলে আহমদ মুসা হাঁটতে শুরু করল।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করেছে।

আহমদ মুসারা মিনি-সাবের দরজায় পৌছে গেছে। সোফিয়া সুসানরা ধীরে ধীরে পা ফেলে এগুতে লাগল।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক মিনি-সাবের দরজায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। তাদের নাক বরাবর সামনে একটা সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে। তাদের সামনে দিয়ে মিনি-সাবের একটা করিডোর লম্বালম্বি প্রসারিত। আহমদ মুসার মেশিন রিভলবার বাম দিকে করিডোর বরাবর এবং হাসান তারিকের রিভলবার ডান দিকে করিডোর বরাবর উদ্যত।

হাসান তারিকের একটু ডানে সিঁড়িরও ডান পাশে ক্রুদের কক্ষ। তাদের কক্ষের পাশেই টর্পেডো রুম। তার পরেই ব্যাটারী সেলগুলোর জন্যে নির্ধারিত জায়গা। তার পরেই সোনার ডোম (ঝড়হধৎ ফড়সব)। আর সিঁড়ির বাম পাশে সাবমেরিনের গোটা মাঝ অংশ জুড়ে যুদ্ধ সাবমেরিনের যেখানে থাকে ব্যালষ্টিক মিসাইল বা ইলেক্ট্রনিক যুদ্ধাস্ত্র ও নিউক্লিয়ার চুল্লী, সেখানে দেখা যাচ্ছে প্যাসেঞ্জার কেবিনসমূহ। প্যাসেঞ্জার কেবিনগুলোর পরেই রয়েছে মেশিনারী রুম ও ইঞ্জিন রুম। সবশেষে রয়েছে প্রপেলার অংশ।

চারদিকে চোখ বুলাবার পর হাসান তারিকই প্রথম কথা বলল, 'ভাইয়া সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলেই কনট্রোল রুম।'

'ঠিক আছে, চল কনট্রোল রুমে।' আহমদ মুসা বলল।

'নিচের কক্ষগুলো একবার সার্চ করলে হয় না?' বলল হাসান তারিক।

'এটা সুসানদের জন্যে থাকল। কক্ষগুলোতে কেউ যদি থাকে, তাহলে ওদের আমাদের পিছু নিতে দাও, নিশ্চিন্তে।' আহমদ মুসা বলল।

আর কোন কথা না বলে হাসান তারিক এগুলো সিঁড়ির দিকে এবং দ্রুত ও বিড়ালের মত নিঃশব্দে উপরে উঠতে লাগল।

আহমদ মুসা একটু দূরত্ব রেখে হাসান তারিকের পেছনে উঠতে লাগল।

সিঁড়ি যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে প্রশস্ত একটি ল্যান্ডিং স্পেস। তাকে একটা মিনি করিডোরের অংশও বলা যায়। করিডোরটার বাম মাথায় একটা দরজা। দরজা খোলা। তাতে খাট পাতা দেখা যাচ্ছে। আর ডান প্রান্তটি 'সেইলে'র গায়ের একটা বন্ধ দরজায় গিয়ে শেষ হয়েছে।

কনট্রোল রুমের দরজা খোলা। হাসান তারিক ল্যান্ডিং-এ উঠে মুহূর্ত অপেক্ষা না করে কনট্রোল রুমে প্রবেশ করল।

প্রশস্ত কনট্রোল রুম।

ঘরে কাউকে দেখতে পেল না।

হাসান তারিক দ্রুত এগুলো তিন দিক জুড়ে থাকা কনট্রোল প্যানেলের মাঝখানের বড় স্ক্রীনটার দিকে যেখানে ফুটে উঠার কথা গোটা সাবমেরিনসহ সবগুলো ঘর ও স্থানের দৃশ্য। স্ক্রীনটা অফ করা।

হাসান তারিক স্ক্রীনের সুইচ বোর্ডটার উপর ঝুঁকে পড়তেই দরজার পাশের একটা ষ্টিল আলমারির আড়াল থেকে একজন লোক বিড়ালের মত নিঃশব্দে বেরিয়ে এল হাসান তারিকের দিকে রিভলবার তাক করে।

হাসান তারিকের সমস্ত মনোযোগ স্ক্রীন ও সু্ইচ প্যানেলের দিকে নিবদ্ধ থাকায় কিছুই আঁচ করতে পারল না।

রিভলবারধারী, একজন তরুণ, এগিয়ে গিয়ে তার রিভলবারের নলটা হাসান তারিকের মাথায় চেপে ধরে বলল, ‘হাত উপরে তুলুন, না হলে গুলী করব।’

হাসান তারিক হাত উপরে তুলল।

আহমদ মুসা ততক্ষণে কনট্রোল রুমের দরজায় পৌছে গেছে। তার নজরে পড়ল দৃশ্যটা।

কিন্তু সংগে সংগেই ঘরে না ঢুকে একটু সময় চারদিকে দেখার জন্যে যে আর কোন শত্রু আশে-পাশে লুকিয়ে আছে কিনা। সন্দেহজনকত কিছু দেখল না সে। তারপর আহমদ মুসাও নিশব্দে কনট্রোল রুমে প্রবেশ করল এবং সেও রিভলবারধারীর মাথায় তার মেশিন রিভলবারের ভারী নল চেপে ধরে বলল, রিভলবার ফেলে দিয়ে হাত তুলে দাঁড়াও।

কিন্তু আহমদ মুসাও খেয়াল করেনি যে তারা সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠা শুরু করলে টর্পেডো মেশিনারিজ রুম থেকে দুজন রিভলবারধারী দ্রুত বেরিয়ে এসে আহমদ মুসার পিছু নিয়েছিল নিশব্দে।

আহমদ মুসার কথা শেষ হবার সাথে সাথেই ওরা ল্যান্ডিং-এ গিয়ে পৌছেছিল। তাদের একজন দ্রুত রিভলবার তুলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে।

আহমদ মুসা শেষ মুহূর্তে টের পেয়েছিল, পেছনে পায়ের শব্দ টের পেয়েই বিদ্যুত গতিতে বসে পড়ল। ততক্ষণে ট্রিগার টিপে ফেলেছিল পেছনের রিভলবারধারী। বুলেটটি গিয়ে আঘাত করল হাসান তারিকের পেছনে দাঁড়ানো রিভলবারধারী যুবকটার ডান কাঁধে।

রিভলবার পড়ে গেল আহত যুবকটার হাত থেকে। আর্তনাদ করে উঠে সেও বসে পড়ল।

পেছনের দুরিভলবারধারী কিছুটা অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিল তাদের গুলী তাদের লোককে হিট করায়। কিন্তু পরক্ষণেই তাদের রিভলবার তাক করেছিল আহমদ মুসাকে। আহমদ মুসার মেশিন রিভলবারের ব্যারেল ঘুরে আসছিল তাদের দিকে।

কিন্তু তাদের রিভলবার থেকে গুলী বেরুবার আগেই তাদের পেছন থেকে দুটি রিভলবার এক সঙ্গে গর্জে উঠার শব্দ উঠল। তার সাথে সাথে ল্যান্ডিং-এ দাঁড়ানো দুজন রিভলবারধারী মাথায় গুলী খেয়ে পড়ে গেল।

সিঁড়ি থেকে গুলী দুটো করেছিল সোফিয়া সুসান ও পলা জোনস। তারা আহমদ মুসাকে অনুসরণকারী দুজনকে ফলো করে উপরে উঠে আসছিল।

গুলী করেই ল্যান্ডিং-এ উঠে এল সোফিয়া সুসান ও পলা জোনস।

হাসান তারিকের পেছনের যুবকটি গুলীবিদ্ধ হওয়ার পর আহমদ মুসা তার দিকে নজর রেখেছিল। ল্যান্ডিং-এ দাঁড়ানো দুজনকে মাথায় গুলী খেয়ে পড়ে যেতে দেখে লোকটি তার বাম হাত উপরে তুলে অনামিকার গোল্ড রিংটি কামড়ে ধরতে যাচ্ছিল। সংগে সংগে আহমদ মুসা তার বাম হাত টেনে নিয়ে আংটিটা খুলে নিয়ে বলল, 'তোমার বসরা তাদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে তোমাকে মারতে চায়, কিন্তু আমরা মানুষের কল্যাণের জন্যে তোমার বেঁচে থাকা এখন জরুরী মনে করি।'

যুবকটির উদ্দেশ্যে কথা কয়টি বলেই আহমদ মুসা তাকাল হাসান তারিকের দিকে। বলল, 'তুমি কনট্রোল রুমটা বুঝে নাও।'

তারপর সোফিয়া সুসানদের উদ্দেশ্য করে বলল, 'তোমাদের ধন্যবাদ। আগের মতই ঠিক সময়ে এসে পড়েছিলে। সুসান, এখন তোমরা দুজন গোটা সাবমেরিনটা চেক করে এস। আমি ততক্ষণে এর আহত জায়গাটা পরীক্ষা করি। রক্ত বন্ধের ব্যবস্থা করতে হবে।'

আহমদ মুসাকে ধন্যবাদ দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল সোফিয়া সুসান। 'চল পলা' বলে সিঁড়ি দিয়ে নামা শুরু করল সোফিয়া সুসান।

ওদিকে হাসান তারিক কনট্রোল রুমের রিডিং শুরু করেছে।

আহমদ মুসা মনোযোগ দিল লোকটির দিকে। তার গায়ের জামাটা ছিঁড়ে ফেলে তার ডান কাঁধটাকে উন্মুক্ত করল।

আহমদ মুসা জায়গাটা পরীক্ষা করে বলল, 'সুসংবাদ তোমার জন্যে ক্ষতটা খুব গভীর নয়। বুলেটটাও ভেতরে নেই। গোশত তোমার কিছু ছিঁড়ে নিয়ে গেলেও বড় কষ্ট থেকে তোমাকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে।' হাসিমুখে হাল্কা সুরে কথাগুলো বলল আহমদ মুসা।

যুবকটি আহমদ মুসার দিকে তাকাল। তার চেহারায় কিছু বিস্ময়। এমন নির্দোষ হাসি ও অন্তরঙ্গ কথা সে এমন শত্রুর কাছ থেকে বোধ হয় আশা করেনি। পরে সে চোখ নামিয়ে নিল এবং গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'আমি বাঁচতে চাই না মরতে চাই। আমার কাছে কিছু পাবেন না। বাঁচিয়ে লাভ নেই। বেঁচে গেলেও আমি নিজেকে এখন মৃত বলে মনে করছি।'

'বাঃ সুন্দর কথা বলতো! যাক, এখন বল তোমাদের ফাষ্ট এইডের সরঞ্জাম কোথায়?' আহমদ মুসা বলল।

যুবকটি মাথা ঘুরিয়ে দরজার পাশে একটা আলমিরার মাথার উপর দেয়ালের সাথে হুক দিয়ে আটকানো একটা বাক্স দেখিয়ে দিল।

আহমদ মুসা বাক্সটি নামিয়ে এনে খুলে দেখল ঔষধপত্রসহ ফাষ্ট এইডের সবরকম সরঞ্জাম প্রচুর পরিমাণে আছে।

কাজে লেগে গেল আহমদ মুসা।

যথাসম্ভব কম কষ্ট দিয়ে অত্যন্ত যতেœর সাথে আহত জায়গাটা পরিষ্কার করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল এবং ঔষধও খাইয়ে দিল। তারপর হাসান তারিককে দিয়ে লোকটির কামরা থেকে জামা আনিয়ে তাকে পরিয়ে দিল।

লোকটার চোখে-মুখে বিস্ময়। সুযোগ পেলেই চোরা চোখে আহমদ মুসাকে বুঝতে চেষ্টা করছে সে। জামাটা পরে নেবার পর সে বলে উঠল, 'আপনি কি ভুলে গেছেন আমি আপনার শত্রু?'

যুবকটি বয়সে একেবারে তরুণ।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'তোমার আরও একটা পরিচয় আছে। তুমি মানুষ। এই পরিচয়ে আমরা আদমের সন্তান হিসেবে পরস্পর ভাই।'

'গ্যাংওয়েতে যে দশজনকে হত্যা করেছেন এবং এই যে ল্যান্ডিং-এ দুজন নিহত হলো, তারা সবাই তো আদমের সন্তান, আপনাদের ভাই।' বলল তরুণটি।

'অবশ্যই। কিন্তু ওদের হত্যা না করলে ওরা আমাদের হত্যা করতো। আত্মরক্ষার্থেই এই হত্যা না করে উপায় ছিল না। ওরা আদমের সন্তান বটে, কিন্তু কুসন্তান।' আহমদ মুসা বলল।

‘কিন্তু ওরা আপনার ঘরে যায়নি। আপনারাই এখানে কয়েকজন লোককে হত্যা করে অনধিকার প্রবেশ করেছেন।’ লোকটি বলল।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘ক্রিমিনাল, কিডন্যাপারদের ঘরে প্রবেশের জন্যে অনুমতি নিতে হয় না এবং এটা অনধিকার চর্চা নয়।’

‘ক্রিমিনাল, কিডন্যাপার কারা?’ বলল যুবকটি।

‘সাও তোরাহ দ্বীপ একটা দোজখখানা তা তুমি জান না? জান না সেখানে শত শত নিরপরাধ লোককে বন্দীশালায় রেখে অকথ্য নির্যাতন চালানো হচ্ছে। আজর ওয়াইজম্যানদের এই নিপীড়নের রাজত্ব গোটা দুনিয়া ব্যাপী বিস্তৃত, তা তুমি জান না?’ আহমদ মুসা বলল। আবেগ এসে ভারী করেছিল তার কণ্ঠ।

বিস্ময়ে বিস্ফোরিত হয়ে গেল যুবকটির চোখ। বলল, ‘কিন্তু আমরা তো জানি যাদেরকে ওখানে রাখা হয়েছে তারা সবাই বড় বড় ক্রিমিনাল।’

‘কয়েক দিন আগে শাইখুল ইসলাম আহমদ মুহাম্মাদ নামে একজন প্রৌঢ় ব্যক্তিকে তোমরা সাও তোরাহ দ্বীপে নিয়ে গেছ, তাকে কি ক্রিমিনাল মনে হয়েছে তোমার কাছে?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

সংগে সংগে কথা বলল না যুবকটি। আত্মস্থ হওয়ার মত সে মাথা নত করল। একটু পরে বলল, ‘না তাঁকে ক্রিমিনাল মনে হয়নি। তিনি একজন ধর্মনেতা। অমন প্রশান্ত চেহারার লোক ক্রিমিনাল হয় না।’

‘সাও তোরাহ দ্বীপে যাদের আটকে রাখা হয়েছে, তাঁরা তাঁর মতই প্রশান্ত চিত্তের মানুষ। তুমি মনে করতে পার, সাও তোরাহ হিটলারের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের নতুন সংস্করণ।’ আহমদ মুসা বলল।

মুখটি চুপসে গেল যুবকটির। বলল, ‘কিন্তু ওদের সাথে আপনাদের সম্পর্ক কি? আপনারা কেন এই হত্যাকান্ড ঘটালেন এখানে প্রবেশ করে?’ বলল যুবকটি।

‘আমরা সাও তোরাহ দ্বীপের বন্দীদের মুক্ত করতে চাই। তাদের মধ্যে আমাদের কয়েকজন বন্ধু রয়েছেন। এই উদ্দেশ্যে সাও তোরাহ যাবার জন্যেই আমরা এই মিনি-সাব দখল করেছি।’ আহমদ মুসা বলল।

ভয় ও আতংকে পাংশু হয়ে উঠল যুবকটির মুখ। বলল, ‘সর্বনাশ তেরসিয়েরা দ্বীপের সেই লোকরাই কি আপনারা, যারা হারতায় আমাদের ইমানুয়েল, কেলভিন ও সুলিভানদের খুন করেছেন?’

একটা ঢোক গিলল যুবকটি। তারপর আবার শুরু করল, ‘আপনারা সাও তোরাহ থেকে বন্দীদের উদ্ধার করবেন কি করে, আপনাদেরই তো প্রাণে বাঁচা দায়। যে কোন মূল্যে আপনাদের শেষ করা হবে!’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘তোমাদের আজর ওয়াইজম্যান এই চেষ্টা করছেন। আর আমরা চেষ্টা করছি সাও তোরাহ থেকে বন্দীদের উদ্ধার করতে। জেনে রাখ, আমাদের ‘ন্যায়’-এর সংগ্রামই জয়ী হবে।’

‘আমরা ইহুদীরাও ন্যায়ের জন্যে লড়াই করছি। হিটলারের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে আমরাই গণহত্যা ও নির্যাতনের শিকার হয়েছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আবার আমাদের বিপদের মুখে ফেলা হয়েছে।’ বলল যুবকটি।

‘কিন্তু হিটলারের নির্যাতন ইহুদীদের সক্রিয় অংশকে আজ হিটলার বানিয়েছে, মানুষ বানায়নি। ফিলিস্তিনে ইসরাঈলের আচরণ এটাই প্রমাণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদীরা ‘রাম-রাজত্ব’ করার সুযোগে বিশ্বাসঘাতক বিভীষণের মত আচরণ করেছে। সাও তোরাহতে আজর ওয়াইজম্যান যা করছে, তার পেছনে কোন ন্যায়-নীতি কাজ করছে?’ বলল আহমদ মুসা। গম্ভীর কণ্ঠ তার।

যুবকটি সংগে সংগে কথা বলল না। একটু ভাবল। তারপর বলল, ‘আপনি যা বললেন তা একটা গ্রুপের জন্যে প্রযোজ্য হতে পারে, সব ইহুদীর ক্ষেত্রে নয়।’

‘কিন্তু এই ইহুদী গ্রুপই আজ ইহুদীদের পরিচালনা করছে। সব জেনেও ইহুদীরা কেউ তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়নি। যেমন সাও তোরাহতে যে অমানুষিকতা ও বর্বরতা চলছে তার প্রতিবাদ দূরে থাক সহযোগিতা করছ তোমরা অনেকে।’

যুবকটিকে খুব অপমানিত ও বিব্রত দেখাল। বলল, ‘সাও তোরাহ সম্পর্কে আপনি যা বললেন, তা সত্য বলে এখনও আমি জানি না।’ তার কণ্ঠে ক্ষোভ।

‘তোমার নাম কি?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘এ্যারন।’ বলল যুবকটি।

‘এ্যারন, অপরাধমূলক কাজ হয় গোপনে, কিন্তু বিচার হয় প্রকাশ্যে। আজর ওয়াইজম্যান যাদের বন্দী করে সাও তোরাহ নিয়ে গেছে, তারা যদি ক্রিমিনাল হয়, তাহলে তাদের নিয়ে এত রাখ ঢাক কেন? কেন তাদের দুনিয়ার সব চোখের আড়ালে জন-মানবহীন এক দ্বীপে এনে রাখা হয়েছে? কেন এমনকি তোমরাও তাদের সম্পর্কে জান না? আলেকজান্ডার সোলজেৎসিনের লেখা ষ্ট্যালিনের গোলাগ দ্বীপের কথা জান। সে গোলাগ দ্বীপের সাথে সাও তোরাহ দ্বীপের কোন পার্থক্য আছে?’ বলল আহমদ মুসা।

এ্যারন তৎক্ষণাত কিছু বলল না। চোখ বন্ধ করে ভাবছিল। একটু পর চোখ খুলে বলল, ‘আচ্ছা বলুন তো আপনার বন্ধুদেরকে কেন এখানে ধরে আনা হয়েছে?’

‘আমাদের সাত বন্ধুদের সকলেই সত্য-সন্ধানী গোয়েন্দা। ফ্রান্সে তাদের গোয়েন্দা ফার্ম আছে। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদের পাকড়াওয়ে তাদের সাফল্যের জন্যে দুবার তারা ইউরোপীয় গোল্ড মেডেল পেয়েছে। সবশেষে তারা কাজ করছিল নিউইয়র্কের ‘লিবার্টি’ ও ‘ডেমোক্র্যাসি’ টাওয়ার ধ্বংসের সত্য উদঘাটনে। মনে করা হয় তারা তাদের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ করে ফেলেছিল। অমূল্য সব দলিল-দস্তাবেজ সম্পর্কে দুনিয়াবাসী যাতে জানতে না পারে, সত্য যাতে প্রকাশ না পায় এজন্যেই আজর ওয়াইজম্যান সাত গোয়েন্দাকে গ্রেফতার করেছে এবং তাদের ফার্ম সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছে।’ আহমদ মুসা বলল।

রাজ্যের বিস্ময় এসে জমা হয়েছে এ্যারনের চোখে-মুখে। বলল, ‘আজর ওয়াইজম্যান কেন এটা করবেন? তার কি স্বার্থ এতে?’

‘তাদেরই তো স্বার্থ! টুইনটাওয়ার তো তারা মানে ইহুদীবাদীরাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি মাফিয়া চক্রের যোগসাজসে ধ্বংস করেছে।’

এ্যারনের চোখ বিস্ময়ে ছানাবড়া হয়ে উঠল। বলল, ‘আপনি কি বলছেন? গত বিশ বছরের প্রতিষ্ঠিত একটা সত্যকে আপনি পাল্টে দিতে চান?’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘না, ওরা বিশ বছর ধরে চালু ভুয়া ইতিহাস মুছে দিয়ে সত্যিকার ইতিহাস মানুষকে জানাতে চেয়েছিল।’

বিস্ময়ের ঘোর এ্যারনের মুখ থেকে এখনও কাটেনি। আহমদ মুসা থামলেও সে কথা বলল না। ভাবছে সে। অনেকক্ষণ পর সে বলল, 'বলতে চান, বিশ বছর ধরে এতবড় একটা মিথ্যা চালু আছে?'

'শুধু চালু আছে নয় এ্যারন, সে মিথ্যা ঢেকে রাখার জন্যে আজর ওয়াইজম্যানরা আবার জঘন্য অন্যায়ও করছে।' আহমদ মুসা বলল।

এ্যারন উত্তরে কিছু বলল না। নিরব হয়ে গেল।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। মনোযোগ দিল হাসান তারিকের দিকে। বলল, 'কনট্রোল প্যানেল ষ্টাডি তোমার হলো?'

'হ্যাঁ ভাইয়া। মোটামুটি দেখা হয়ে গেছে।' বলল হাসান তারিক।

'যুদ্ধ সাবমেরিন থেকে এই প্যাসেঞ্জার সাবমেরিনের খুব কি পার্থক্য আছে?' আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

'কিছু আছে। সেটা মাত্র কিছু যোগ কিছু বিয়োগের ব্যাপার। নতুন কোন টেকনলজি এখানে নেই।'

'কাজ শুরু করো হাসান তারিক। গ্যাংওয়ে গুটিয়ে নাও। আর..........।'

আহমদ মুসা কথা শেষ করতে পারলো না। কনট্রোল রুমে প্রবেশ করল সোফিয়া সুসান ও পলা জোনস। দরজায় পা দিয়েই সুসান বলে উঠেছিল, 'মি. আহমদ মুসা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। গোটা সাবমেরিন শত্রুমুক্ত। এখানে এখন শাসন শুরু হতে পারে।'

'আল-হামদুলিল্লাহ। তোমাদেরকে ধন্যবাদ সুসান এই বিজয়ে অগ্রগামী ভূমিকা পালনের জন্যে।' বলে আহমদ মুসা তাকাল পরিপূর্ণভাবে সোফিয়া সুসান ও পলা জোনসের দিকে। বলল, 'সুসান, পলা আমরা এখন সাও তোরাহ যাত্রা করব। তার আগে তোমাদের নামতে হবে সাবমেরিন থেকে।'

বিস্ময় ফুটে উঠল সোফিয়া সুসান ও পলা জোনসের চোখে-মুখে। কয়েক মুহূর্ত তারা যেন কথা বলতে পারলো না। একটু সময় নিয়ে প্রথম কথা বলে উঠল সোফিয়া সুসান, 'দেখুন আমি একজন মেয়ে হিসাবে এখানে আসিনি, এসেছি একজন কমান্ডো হিসাবে। আর পলা জোনস এসেছে একজন গোয়েন্দা অফিসার হিসাবে। আমরা সাও তোরাহ যাবার জন্যে প্রস্তুত। আপনি নামতে নির্দেশ দিলে

আমরা নির্দেশ অমান্য করব। এই আজোরসে আমরা মেজবান, আর আপনারা মেহমান। মেজবানকে ঘর থেকে বের করে দেবার অধিকার মেহমানের নেই।'

বলে একটু থামল সোফিয়া সুসান। তারপর আবার বলা শুরু করল, 'আমিও কিছু জানতাম। পলার কাছ থেকেও আপনাদের নৈতিকতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে আরও কিছু শুনেছি। আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি আপনাদের সংস্কৃতি আমরা মেনে চলব। আমরা সাবমেরিনকে দুভাগে ভাগ করে নিচ্ছি। নিচের জগতটা আমাদের আর উপরটা আপনাদের। কোন আদেশ দেয়ার দরকার হলে ইন্টারকম ব্যবহার করবেন। অথবা ডেকে নির্দেশ দেবেন। আমরা উপরে আসবো না।

গম্ভীর হয়ে উঠেছিল আহমদ মুসার মুখ। বলল, 'সংস্কৃতির প্রশ্ন তো আছে সুসান। তাছাড়াও একটা বিপদের মধ্যে তোমাদের জড়াতে চাইনি। তোমরা জড়িত হওয়া মানে আজোরস জড়িত হওয়া। আমি আজোরসকে জড়িত করতে চাচ্ছিলাম না।'

'আজর ওয়াইজম্যানদের ইতিমধ্যে জানা হয়ে গেছে আজোরস সরকারের সিদ্ধান্তের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আর থাকলেও ক্ষতি কি? আজোরস জড়িত হবে না কেন? মিথ্যা কথা বলে আজোরস সরকারের কাছ থেকে সাও তোরাহ লীজ নিয়ে সেখানে তারা জঘন্য অপরাধমূলক কাজ করে যাচ্ছে। এর শুধু প্রতিবাদ নয় প্রতিকার হওয়া দরকার। প্রতিকারের জন্যেই এই মিশনে আমরা অংশ নিতে চাই।' বলল সোফিয়া সুসান।

'হাসান তারিক, তুমি কি প্রস্তুত? তোমার সামনে কি সাও তোরার রুট ম্যাপ আছে?'

'আমি প্রস্তুত। তবে রুট ম্যাপ আমার সামনে নেই। কম্পিউটারে পাওয়া যেতে পারে। মি. এ্যারনের কাছে এ ব্যাপারে আমরা সাহায্য চাইতে পারি।' হাসান তারিক বলল।

আহমদ মুসা কিছু বলার আগেই এ্যারন বলে উঠল, 'সাও তোরাহ যাত্রা করে লাভ নেই। সেখানে আপনারা প্রবেশ করতে পারবেন না, এমনকি সাও তোরাহতে নোঙর করতেও পারবেন না।' তার চোখে উদ্বেগের প্রকাশ।

‘কেন প্রবেশ করা যাবে না? কেন নোঙর করা যাবে না?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘নোঙরের স্থান খুঁজে পাবেন না। তাদের কৌশল ও প্রতিরোধ ডিঙিয়ে প্রবেশ করাও অসম্ভব।’ বলল এ্যারন।

ভ্রুকুঞ্চিত হয়েছে আহমদ মুসার। একটু ভাবল। তারপর বলল, ‘নোঙরের কোন সারফেস জেটি নেই। এই সান্তাসিমা উপত্যকায় নোঙরের মত ওখানেও আন্ডার ওয়াটার নোঙরের ব্যবস্থা আছে এই তো? আন্ডার ওয়াটার এর সেই ব্যবস্থা খুঁজে পাওয়া যাবে না এই তো?’

বিস্ময় এ্যারনের চোখে-মুখে। বলল, ‘ও গড, আপনি সাংঘাতিক লোক। আপনি ঠিক ধরে ফেলেছেন। তবে সান্তাসিমা উপত্যকা থেকে ওখানকার প্রটেকশন ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা অনেক অনেক বেশি হবে, তা আপনি নিশ্চয় বুঝবেন।’

‘আমরা সাও তোরাহ যাবই। ন্যায়-অন্যায়ের তোয়াক্কা না করে যদি তুমি আগের অবস্থানেই থাক, তাহলে তোমাকে মেরে ফেলা যাবে, কিন্তু তথ্য আদায় করা যাবে না, সাহায্য পাওয়া যাবে না, এটা আমি জানি। এর ফলে আমাদের অসুবিধা হবে, কিন্তু পিছু হটবো না। জয় অবশেষে আমাদেরই হবে।’ বলল আহমদ মুসা।

বলে একটু থেমেই আবার নির্দেশ দিল, ‘হাসান তারিক, তুমি গ্যাংওয়ে গুটিয়ে নিয়ে সাবমেরিন ষ্টার্ট দাও। কনট্রোল-কম্পিউটারে দেখ ‘সাও তোরাহ’ শিরোনাম অথবা FAST শিরোনামে সাও তোরার ম্যাপ ও রুটম্যাপ আছে কিনা।’

কাজে লেগে গেল হাসান তারিক।

অল্পক্ষণ পরেই আনন্দে চিৎকার করে উঠল, ‘ধন্যবাদ ভাইয়া, সাও তোরার ম্যাপ ও রুট দুটই পেয়ে গেছি FAST কোডে।’

এ্যারনের চোখ ছানাবড়া। বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, ‘স্যার, আপনি কি সবজান্তা। এই ‘কোড নাম্বার’ আপনি জানলেন কি করে?’

‘সবজান্তা নই, সত্য-সন্ধানী। এ কোডসহ দুটি কোড আমি পেয়েছিলাম ডেভিড ডেনিমের গলায় ঝুলানো খৃষ্টের ক্রস থেকে।’ বলল আহমদ মুসা।

'খৃষ্টের ক্রসটাও আপনি ভেঙে দেখেছিলেন? সন্দেহ হয়েছিল কেমন করে স্যার?' এ্যারন বলল রাজ্যের বিস্ময় চোখে নিয়ে।

'ইহুদী ডেভিড ডেনিমের গলায় খৃষ্টের প্রতিকৃতি ঝোলানোটা অস্বাভাবিক হিসেবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।' আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ আপনাকে। আপনার সাত বন্ধুর মত আপনিও দেখছি গোয়েন্দা।' বলল এ্যারন।

এ্যারন থামতেই হাসান তারিক বলে উঠল, 'বিসমিল্লা, ষ্টার্ট অন করলাম ভাইয়া।'

চলতে শুরু করল মিনি-সাবমেরিন।

'মি. আহমদ মুসা, আমরা নিচে আমাদের জগতে চললাম। খাবার ডিপার্টমেন্ট নিচে আমাদের ওখানে। খাবার দেবার জন্যে উপরে আসার অনুমতি আছে তো?'

আহমদ মুসা একটু গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, 'সুসান, আমাদের ধর্মে পর্দার ভিত্তিটা হলো মানুষের মানসিকতা। তারপর চোখের নিয়ন্ত্রণ। সবশেষে ফিজিক্যাল সেপারেশন। মানসিকতার ব্যাপার হলো, অবৈধ সকল চিন্তা থেকে মনকে পবিত্র রাখা। মানসিকতা যদি পবিত্র হয়, তাহলে চোখ আপনাতেই পবিত্র ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়। আর ফিজিক্যাল সেপারেশনের বিষয়টা হলো, বৈধ সম্পর্কহীন নারী ও পুরুষ পরষ্পরকে নিরাপদ দূরত্বে রাখা। নিরাপদ দূরত্বে থাকলেও জীবন পরিচালনা ও সমাজ সম্পর্কের প্রয়োজনে তাদেরকে শালীনতা সহকারে কাছাকাছি আসতেই হয়। একে ইসলাম নিষিদ্ধ করেনি। নিষিদ্ধ করেনি বলেই তো মনকে পবিত্র ও চোখকে নিয়ন্ত্রিত রাখার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এখন চিন্তা করে দেখ সুসান খাবার নিয়ে আসা যাবে কিনা।'

সোফিয়া সুসানও গম্ভীর হলো। বলল, 'আমি ও পলা মুসলমান নই। ঐ পবিত্রতা তো আমাদের উপর বর্তায় না।'

'ইসলামের এ বিধানগুলো মানবিক, তাই সব মানুষের জন্যে। মুসলমান হওয়ার পরই শুধু ইসলামের বিধান মানতে হবে তা নয়। সব মানুষই ইসলামের

এ মানবিক ও কল্যাণকর বিধান মানতে পারে। অবশ্য ইসলামের এগুলো যারা মানে তাদেরকেই মুসলমান বলা হয়।'

সোফিয়া সুসান ও পলা জোনস এক সাথে হেসে উঠল। বলল, 'তার মানে ইসলামের বিধান মেনে নিয়ে আমরা মুসলমান হয়ে যাই।'

আহমদ মুসা একটু থামল। বলল, 'আমি তা বলছি না। কিন্তু একে অপরকে ভালোর দিকে কল্যাণের দিকে ডাকবার অধিকার অবশ্যই আছে।'

'কল্যাণের বিধান তো দুনিয়াতে একটা নেই মি. আহমদ মুসা।' বলল সোফিয়া সুসান।

'সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ, সবচেয়ে উৎকৃষ্ট এবং সবচেয়ে জীবন্তটাকেই তো মানুষ গ্রহণ করবে।' আহমদ মুসা বলল।

'তার মানে বলছেন যে ইসলামই সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ, সবচেয়ে উৎকৃষ্ট এবং সবচেয়ে জীবন্ত।' সুসানই আবার বলল।

'আমি বললেই তুমি গ্রহণ করবে, মানুষ বিশ্বাস করবে তা নয়। তোমাকেই অনুসন্ধান করতে হবে এবং তোমার রায়ই তোমার কাছে চূড়ান্ত হবে।'

হাসিতে মুখ ভরে উঠল সোফিয়া সুসানের। বলল, 'ধন্যবাদ। অনুসন্ধান করব। আশা করি আপনি সাহায্য করবেন। এখন আমরা চলি।'

বলে সোফিয়া সুসান ও পলা জোনস ঘুরে দাঁড়িয়ে নিচে নামতে শুরু করল।

বিস্ময়-বিমুগ্ধ চোখে এ্যারন আহমদ মুসাদের কথা শুনছিল। সোফিয়া সুসান ও পলা জোনস নিচে নেমে যেতেই এ্যারন আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, 'আপনাকে একটা কথা বলব?'

'অবশ্যই।' আহমদ মুসা বলল।

'আপনি খুব সংবেদনশীল মনের একজন ভালো লোক। খুনো-খুনীর জগতে আপনার আসা ঠিক হয়নি।'

'কি করব আজর ওয়াইজম্যানরাই তো আমাকে এ পথে নিয়ে এসেছে। দেখ, আমার বন্ধুদের বন্দী করে সাও তোরাহতে না আনলে, সাও তোরাহকে

মানুষের উপর বর্বর নির্যাতন চালানোর জেলখানায় পরিণত না করলে তো আমি এখানে আসতাম না।’ বলল আহমদ মুসা।

এ্যারন কোন উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, ‘আরেকটি কথা, আমাদের ইহুদী ধর্ম সম্পর্কে আপনার মত কি?’

একটু হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আমার মত না নেয়াই ভালো। তুমি খুশি হবে না আমার কথা শুনে।’

‘না তবু আপনি বলুন। আমি বুঝতে পারছি, আপনি অনেক জ্ঞান রাখেন ধর্ম সম্পর্কে এবং আপনি কোন অসত্য কথা বলবেন না।’ বলল এ্যারন একটু আবেগ জড়িত কণ্ঠে।

‘দেখ, এ ব্যাপারে অনেক কথা বলার আছে। কিন্তু তোমাকে আমি একটা কথাই বলব। ইহুদী দর্শন এখন আর কোন ধর্ম পদবাচ্য নেই। এটা উৎকট এক সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। ধর্ম তো মানুষের কল্যাণের জন্য খোদায়ী ব্যবস্থা। তাই ধর্মকে সব মানুষের জন্যে উন্মুক্ত থাকতে হয় যাতে সব মানুষ সে ধর্ম গ্রহণ করে উপকৃত হয়। কিন্তু ইহুদী ধর্ম তা নয়। অইহুদী কেউ ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করে ইহুদী হয়ে যেতে পারে না, ইহুদী হতে হয় জন্মগতভাবে। সুতরাং ইহুদী ধর্ম এখন মানুষের ধর্ম নয়। আজর ওয়াইজম্যানদের মত ইহুদীবাদীরা ইহুদী ধর্মকে আধিপত্যবাদী এক রাজনীতিতে পরিণত করেছেন।’ আহমদ মুসা বলল।

এ্যারন গভীর মনোযোগের সাথে আহমদ মুসার কথাগুলো শুনছিল। আহমদ মুসার কথা শেষ হলেও সে কোন কথা বলল না। তার চোখে শূন্য দৃষ্টি। একটা আত্মস্থভাব। যেন গভীর ভাবনায় ডুবে গেছে সে।

মিনি-সাব তখন অনেক পানির গভীরে।

চলছে মিনি-সাব।

হারতার উপকূল সমান্তরালে ছুটে চলছে মিনি-সাবটি।

আহমদ মুসা কথা শেষ করেই তাকাল হাসান তারিকের দিকে। বলল, ‘তোমার ট্রাভেল প্ল্যান কি হাসান তারিক?’

'সাও তোরাহ এখান থেকে তিনশ কিলোমিটার। মধ্যম গতিতে চলব। রাতে পৌঁছতে চাই সাও তোরাহ উপকূলে।' হাসান তারিক বলল।

'ঠিক আছে। আল্লাহ ভরসা।'

'আমিন।' বলল হাসান তারিক।

# ৫

সাও তোরাহ দ্বীপের রাত ১২টা।

দ্বীপ জুড়ে নিকষ অন্ধকার, নিশ্ছিদ্র নিরবতা।

দ্বীপের পশ্চিম উপকূল বরাবর পাহাড়ের কালো দেয়াল। এই দেয়ালের মাঝখানে সংকীর্ণ একটা ফাটল। সমুদ্র থেকে ১০ গজ প্রশস্ত একটা খাড়ি পাহাড়ের দেয়ালকে দুপাশে রেখে দ্বীপের ভেতরে সিকি মাইলের মত ঢুকে গেছে। দুপাশের পাহাড় থেকে নেমে আসা গাছ-পালা খাড়িটাকে প্রায় ঢেকে দিয়েছে।

খাড়িটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখান থেকে আধা বর্গমাইলের একটা সমতলভূমির শুরু। 'সমতলভূমিটা বড় বড় ঘাস ও গাছ-পালায় ঢাকা। তবে খাড়ি যেখানে, সেখান থেকে কয়েক একরের মত জায়গা একটু ভিন্নতর। এখানে বড় বড় ঘাস এবং ছোট ছোট গাছ-গাছড়া রয়েছে। ওভার ভিউ, এমনকি পাশে দাঁড়িয়ে দেখলেও কোন অস্বাভাবিকতাই নজরে পড়ে না। কিন্তু হাত দিয়ে স্পর্শ করলেই বোঝা যায় ঘাস ও গাছ-গাছড়া সবই কৃত্রিম। এটাই সাও তোরাহ দ্বীপে আজর ওয়াইজম্যানের জিন্দানখানা, যাকে দুনিয়ার দোজখ বানিয়ে রাখা হয়েছে কিছু মানুষের জন্যে। ত্রিতল এই জিন্দানখানাটিকে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মোভেবল করা হয়েছে। সুইচ টিপলে তৃতীয় তলাটি মাটির উপরে চলে আসে। কিন্তু তাদের ছাদের উপর তখনও থাকে কৃত্রিম ঘাস ও গাছ-গাছড়ার বাগান। উপর থেকে দেখলে কিছুতেই বোঝা যাবে না যে, এর নিচে একটা স্থাপনা আছে। জিন্দানখানাটির একতলা ও দোতলা সবসময় মাটির নিচে থাকে। সুইচ টিপে আবার তৃতীয় তলাসহ সবটাই মাটির তলায় নিয়ে যাওয়া যায়।

ঠিক রাত ১২টায় কৃত্রিম ঘাসে ঢাকা চত্বরটির পূর্ব প্রান্তের কাছাকাছি জায়গার দুই বর্গগজ গোলাকৃতি একটা অংশ কয়েকফুট নিচে নেমে গেল, তারপর একপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল। উন্মুক্ত হয়ে পড়ল একটা চলন্ত সিঁড়ি। সেই চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল আজর ওয়াইজম্যানের অপারেশন চীফ বেন্টো বেগিন এবং

এই জিন্দানখানার আজরাঈলরুপী দানিয়েল ডেভিড, হাইম হারজেল এবং আইজ্যাক জোসেফ।

ওরা চারজন সিঁড়ি থেকে মাটিতে উঠে এসেই পুব আকাশের দিকে তাকাতে লাগল।

প্রথমে কথা বলে উঠল বেন্টো বেগিন, 'করভো দ্বীপ অতিক্রমের পরই গোপনীয়তার জন্যে হেলিকপ্টারের আলো নিভিয়ে দেয়া হবে। সুতরাং আলো দেখা যাবে না। শব্দ শোনা যাবার মত কাছাকাছি হেলিকপ্টারটি এখনও আসেনি।'

'তাই হবে। কিন্তু এখনই আমাদের নীল আলো দেখানো উচিত। না হলে হেলিকপ্টার দিক ভুল করতে পারে।' বলল আইজ্যাক জোসেফ।

বেন্টো বেগিন আইজ্যাকের কথায় সায় দিল এবং তার হাতের প্লাষ্টিকের লম্বা দ-টির বটমটা উপরে তুলে পকেট থেকে একটা নীল বাল্ব বের করে তাতে সেট করে দিল। তারপর দ-টির গায়ের একটা সুইচ টিপে দিতেই নীল আলো জ্বলে উঠল। দ-ের মাথায় নীল আলোটি নির্দিষ্ট নিয়মে জ্বলা-নিভা করতে লাগল।

দ-টি উর্ধে তুলে ধরল হাইম হারজেল।

দুমিনিটও যায়নি দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে হেলিকপ্টারের শব্দ ভেসে এল।

খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠল চারজনই।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে হেলিকপ্টারটি এসে ল্যান্ড করল ঘাসের সে চত্বরের উপর।

হেলিকপ্টার থেকে নেমে এল হাস্যোজ্জ্বল মুখে আজর ওয়াইজম্যান। তার হাতে সুন্দর একটি ব্রীফকেস। এসে সে প্রথমেই জড়িয়ে ধরল বেন্টো বেগিনকে। তারপর একে একে অন্য তিনজনকে। বলল, 'এখানে কোন কথা নয়। চল নিচে নেমে যাই।' বলে আজর ওয়াইজম্যান হাঁটতে শুরু করল সুড়ঙ্গের চলন্ত সিঁড়ির দিকে।

সবাই তাকে অনুসরণ করল।

চলন্ত সিঁড়ি তিন তলা হয়ে নেমে এল দুতলায় আজর ওয়াইজম্যানের অফিস কক্ষে।

আজর ওয়াইজম্যান তার রিভলভিং চেয়ারে বসে গা এলিয়ে দিল। সামনে বিরাট ওয়ার্কিং টেবিল।

ওরা চারজন আজর ওয়াইজম্যানের সামনের চেয়ারে জড়োসড়ো হয়ে বসল।

আজর ওয়াইজম্যানের চোখ বন্ধ। চেয়ারে দুলছে তার দেহটা। আনন্দ উপছে পড়ছে তার চোখ-মুখ দিয়ে। এমন আনন্দিত তাকে বহুদিন দেখা যায়নি।

চোখ বন্ধ রেখেই সে এক সময় বলে উঠল, 'আজ বিজয়ের দিন নয় বেন্টো, মুক্তির দিন আমাদের আজ। স্পুটনিকের উদ্ধার করা দলিলের সর্বশেষ যে কপি আমি হাইজ্যাক করে নিয়ে এলাম তা যদি প্রকাশ হয়ে পড়ত, তাহলে পৃথিবী আমাদের কাছে অবাসযোগ্য হয়ে উঠত। টুইনটাওয়ার ধ্বংসের যাবতীয় দায় মাথায় নিয়ে শুধু বিশ্ববাসীর অপরিসীম ঘৃণা নয়, গণহত্যার জন্যে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হতো। পৃথিবীর সবার বিশ্বাস আমরা হারাতাম। কোথাও আমাদের স্থান হতো না। ফিরে যেতে হতো আমাদেরকে আবার অতীতের সেই অন্ধকার যুগে।'

থামল আজর ওয়াইজম্যান। আবেগের উত্তাপে তার চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। ভারী হয়ে উঠেছিল তার কণ্ঠ।

আজর ওয়াইজম্যানের সামনে বসা বেন্টো বেগিনদের চোখে-মুখেও ভয় ও উদ্বেগ। বেন্টো বেগিন বলল, 'টুইন টাওয়ার ধ্বংসের বিশ বছর পর এই দলিল তারা উদ্ধার করল কি করে?'

'ওরা সাতজন সত্যিই অসাধারণ প্রতিভাবান গোয়েন্দা।' বলল আজর ওয়াইজম্যান।

আজর ওয়াইজম্যান কথা শেষ করতেই তার টেলিকম কথা বলে উঠল। গলা সাংবাদিক বুমেদীন বিল্লাহর। বলল সে, 'শুনলাম এক্সিলেন্সি আপনি এসেছেন। আমি উদ্বেগের মধ্যে আছি। ইউরোপ থেকেই আপনার মিশন সম্পর্কে আমাদের জানানো উচিত ছিল আপনিই বলুন এক্সিলেন্সি।'

'আমি বলব না। তুমি এস বিল্লাহ এখনি।' বলল আজর ওয়াইজম্যান।

'এক মিনিটের মধ্যেই দরজায় নক হলো। আজর ওয়াইজম্যান বলল, 'এস বিল্লাহ।'

ঘরে ঢুকল বুমেদীন বিল্লাহ।

তাকে দেখেই আজর ওয়াইজম্যান চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল।

বেন্টো বেগিন এগিয়ে আসছে। আজর ওয়াইজম্যানও তার দিকে এগুলো। আজর ওয়াইজম্যান বুকে জড়িয়ে ধরল বুমেদীন বিল্লাহকে এবং তাকে টেনে নিয়ে চেয়ারে বসাল। বলল বুমেদীন বিল্লাহকে লক্ষ্য করে, 'তোমাকে অভিনন্দন বিল্লাহ। আমরা তোমার কাছে ঋণী। যেভাবে আছে বলেছিলে, সেভাবেই ব্যাংকের ভল্টে দলিলগুলো পেয়েছি। তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ বিল্লাহ।'

বুমেদীন বিল্লাহর চেহারায় শান্ত ভাব। আজর ওয়াইজম্যান যতটা উদ্দীপ্ত, ততটা বুমেদীন বিল্লাহ নয়। বলল সে, 'ওয়েলকাম এক্সিলেন্সি। কোন অসুবিধা তো হয়নি?'

'অসুবিধা আর কি? আমরা বিরাট প্রস্তুতি নিয়ে গিয়েছিলাম। সাহায্য নিয়েছিলাম ইউরোপের সেরা ব্যাংক ডাকাত গ্রুপের। ব্যাংকের নৈশ সব প্রহরীকেই আমরা হত্যা করি। পথ রোধকারী ব্যাংকের সব দরজাই আমরা 'ল্যাসার বীম' দিয়ে নিঃশব্দে ধ্বংস করে দিয়েছি। লকার খুঁজে পেতেও আমাদের অসুবিধা হয়নি। তোমার দিক-নির্দেশনা ছিল একেবারে নির্ভূল। তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

আজর ওয়াইজম্যানের মোবাইল বেজে উঠেছিল। কথা শেষ করেই মোবাইলটা হাতে নিল। বলল, 'গোল্ডা তুমি লাজেন থেকে বলছ? কি, খবর?'

লাজেন সাও তোরাহ থেকে ৭০ কিলোমিটার দক্ষিণের একটা দ্বীপের বন্দর নগরী। ওখানে WFA-এর একটা ষ্টেশন আছে। গোল্ডা মায়ার তার ষ্টেশন চীফ।

আজর ওয়াইজম্যান তার প্রশ্নের উত্তরে ওপারের কথা শুনছে। শুনতে শুনতে তার মুখ অন্ধকার হয়ে উঠল। শোনা শেষ করে আজর ওয়াইজম্যান শুধু বলল, 'না গোল্ডা, তোমার হারতা যেতে হবে। আমি বিষয়টা নিয়ে ভাবছি।'

মোবাইল অফ করে টেবিলে রেখে দিয়ে বেন্টো বেগিনের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘দেখছি, তেরসিয়েরা দ্বীপে আমাদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল তার চেয়েও বড় বিপর্যয় ঘটল হারতায়। ইমানুয়েল, কেলভিন, সুলিভান ও ডেভিড ডেনিমরাসহ প্রায় অর্ধশত আমাদের লোক নিহত হওয়া ও ঘাঁটিগুলো ধ্বংস হবার পর অবশিষ্ট ছিল শুধু সান্তাসিমা উপত্যকার সাবমেরিন ঘাঁটিটা। সেটারও ভবিষ্যত অনিশ্চিত বেন্টো।’ শুকনো কণ্ঠ আজর ওয়াইজম্যানের।

‘ঘটনা কি এক্সিলেন্সি?’ বলল বেন্টো বেগিন। তার কণ্ঠে উদ্বেগ।

‘গোল্ডা জানাল, সান্তাসিমা উপত্যকার সাবমেরিন ঘাঁটিতে আহমদ মুসা ও তার সহকারী প্রবেশ করে ও বন্দী হয়। সান্তাসিমা থেকে সাবমেরিনে টেলিফোন করা হয় বন্দীকে ওখানে থেকে নিয়ে আসার জন্যে। মিনি-সাবটি তখন ছিল লাজেনে। গোল্ডা তখনই সেখানকার অপারেশন কমান্ডারের নেতৃত্বে ১২ জন লোক দিয়ে মিনি-সাব সান্তাসিমায় পাঠিয়ে দেয়। মিনি-সাব সান্তাসিমা ঘাঁটিতে নোঙর করা পর্যন্ত খবর পেয়েছে গোল্ডা। তারপর ছয়ঘণ্টা পার হলো কোন খবর নেই। না রেসপনস করছে সাবমেরিন থেকে, না কথা বলছে ঘাঁটি থেকে কেউ।’ বলল আজর ওয়াইজম্যান।

বেন্টোও তার সাথী তিনজনের মুখও অন্ধকার হয়ে গেল উদ্বেগে। আর বুমেদীন বিল্লাহর চোখে-মুখে দপ করে এক ঝলক আলো জ্বলে উঠেই আবার নিভে গেল।

‘কি ঘটতে পারে এক্সিলেন্সি? আহমদ মুসা কি.......।’ কথা শেষ না করেই থেমে গেল বেন্টো বেগিন।

‘সব কিছুই ঘটতে পারে সেখানে? আমাদের সান্তাসিমা ঘাঁটির লোকরা আহমদ মুসাকে ধরে রাখার সাধ্য রাখে না। আমি ভাবছি, সাবমেরিনটাও বোধ হয় আমাদের শেষ হয়ে গেল।’ আজর ওয়াইজম্যান বলল।

‘আমরা চেষ্টার ত্রুটি করিনি এক্সিলেন্সি। কিন্তু আহমদ মুসা আপদটাকে বাগে আনা গেল না। কেউ তার সামনে দাঁড়াতে পারছে না।’ বেন্টো বেগিন বললল।

‘আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ও গোয়েন্দা প্রতিভা জেনারেল শ্যারন যার কাছে বার-বার পরাজিত হয়েছেন, যার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের হাত থেকে বেরিয়ে গেল, সেই আহমদ মুসাকে তোমরা আটকাবে কি করে! আমাদের চরম দুর্ভাগ্য যে, তার আজোরসে আসা আমরা আটকাতে পারিনি। এখন আমার মনে হচ্ছে, সাও তোরাহ নিয়েই এখন আমাদের ভাবতে হবে।’ বলেই আজর ওয়াইজম্যান তাকাল বুমেদীন বিল্লাহর দিকে। বলল, ‘বিল্লাহ, কিছু বলবে তুমি?’

‘এক্সিলেন্সি আমাকে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন। আমি অবিলম্বে চলে যেতে চাই’। বুমেদীন বিল্লাহ বলল।

আজর ওয়াইজম্যান মুখটা নিচু করল। পরক্ষণেই মুখ তুলে একটু হেসে বলল, ‘সব মনে আছে বিল্লাহ। কিন্তু মিনি-সাবটা হঠাৎ নিখোঁজ হলো। আমি দেখছি। প্রথম সুযোগেই তোমাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করব।’

‘আরেকটা কথা এক্সিলেন্সি, তাদের দলিলগুলো যে এখন আর তাদের হাতে নেই, আপনি উদ্ধার করেছেন, এ খবরটা আমি কামাল সুলাইমানদের একটু দিতে চাই। তাদের বুঝাতে চাই যে, তাদের কানাকাড়ি মূল্যও এখন নেই।’

হাসল আজর ওয়াইজম্যান। বলল, ‘হ্যাঁ এ মজাটা তুমি করতে পার। তার সাথে তাদের বলে দিও যে এক বিলিয়ন ডলারের চেক তোমার একাউন্টে জমা হয়ে গেছে।’

বুমেদীন বিল্লাহ হাসল। বলল, ‘বেচারাদের কাটা ঘায়ে একেবারে নুনের ছিটা পড়বে।’

‘ঠিক আছে বিল্লাহ। তুমি লাউঞ্জে গিয়ে বস। বেন্টো তোমাকে কামাল সুলাইমানদের কাছে নিয়ে যাবে।’ বলল আজর ওয়াইজম্যান।

‘ধন্যবাদ এক্সিলেন্সি।’ বলে উঠে দাঁড়াল বুমেদীন বিল্লাহ। বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

বাইরের ঘরটায় আজর ওয়াইজম্যানের পি.এ বসেন। বুমেদীন বিল্লাহ দেখল, পি.এ-এর ইন্টারকমটা খোলা। সে এই ইন্টারকম থেকেই আজর ওয়াইজম্যানের সাথে কথা বলেছিল। কিন্তু ইন্টারকম অফ করতে ভুলে গিয়েছিল। ইন্টারকমটা অফ করে দেবার জন্যে এগুলো টেবিলের দিকে। এই সময়

ইন্টারকম কথা বলে উঠল। গলা বেন্টো বেগিনের। সে বলল, 'এক্সিলেন্সি এখন আমাদের কি করণীয়?'

বুমেদীন বিল্লাহ নিজের মনেই হাসল। তাহলে আজর ওয়াইজম্যানও ইন্টারকম অফ করে দেয়নি।

বুমেদীন বিল্লাহ ইন্টারকম অফ করার জন্য হাত বাড়িয়েও হাতটা টেনে নিল। তার কৌতুহল হলো, আজর ওয়াইজম্যান কি উত্তর দেয় দেখা যাক।

গলা শোনা গেল আজর ওয়াইজম্যানের। তিনি বলছেন, 'সান্তাসিমার ঘটনা কোন দিকে গড়াচ্ছে আমি জানি না। মিনি-সাব যদি আহমদ মুসার হাতে যায়, তাহলে বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। স্পুটনিকের দলিলগুলো পাওয়ার পর আমাদের বর্তমান প্রধান লক্ষ্যটা অর্জন হয়েছে। আপাতত সাও তোরাহতে আমাদের কাজ নেই।'

'বন্দীদের স্থানান্তর?' বলল বেন্টো বেগিন।

'বন্দীরা যেখানে আছে, সেখানেই তাদের কবর হবে। আমরা যাবার সময় গ্যাস সিলিন্ডারের লকটা আনলক করে দিয়ে যাবো। আমরা দ্বীপটা ত্যাগ করার আগেই ওরা সবাই লাশ হয়ে যাবে।' আজর ওয়াইজম্যান বলল।

'এক্সিলেন্সি আমরা কি আজই দ্বীপ ছাড়ছি?' বলল বেন্টো বেগিন।

'হ্যাঁ, সূর্যোদয়ের আগেই।' আজর ওয়াইজম্যান বলল।

আজর ওয়াইজম্যানের পরিকল্পনা শুনে উদ্বেগ-আতংকে পাংশু হয়ে উঠেছিল বুমেদীন বিল্লাহর মুখ। এমন কিছু ঘটবে বুমেদীন বিল্লাহ জানত, কিন্তু সেটা এত তাড়াতাড়ি ঘটবে এটা ভাবতে পারেনি। কোন প্রস্তুতিরও সময় তার নেই। তাহলে কি আজর ওয়াইজম্যানের পরিকল্পনাই সফল হবে!

পরক্ষণেই বুমেদীন বিল্লাহর মুখ কঠোর হয়ে উঠল। কিছু করতে হবে। কিন্তু কি করবে? টুইন টাওয়ারের দলিল আজর ওয়াইজম্যানের হস্তগত হওয়ার খবর কামাল সুলাইমানদের দেয়ার অজুহাতে সে তাদের কাছে এই সংকেত পৌছাতে চেয়েছিল যে, মুক্তির একটা উপায়ের লক্ষ্যে সে কাজ করছে, তারা যেন প্রস্তুত থাকে। কিন্তু এই কাজ করার আর সময় কোথায়? কিন্তু তবু তাকে কিছু করতে হবে।

উঠে দাঁড়াল বুমেদীন বিল্লাহ। তার আগে সে ইন্টারকম বন্ধ করে দিয়েছে।

বুমেদীন বিল্লাহ বেরিয়ে এসে ড্রইং রুমে বসল। চিন্তা তখন রকেটের গতিতে ঘুরপাক খাচ্ছে তার মাথায়। এই সময় হঠাৎ তার মনে পড়ল সেদিন সে বেন্টো বেগিনের ষ্টোর থেকে সিগারেটের লাইটার সাইজের একটা ল্যাসার কাটার চুরি করেছে। সেটা তার এখুনি দরকার।

ভাবনার সাথে সাথেই বুমেদীন বিল্লাহ ছুটল তার ঘরের দিকে। ঘরে গিয়ে সে লুকিয়ে রাখা ল্যাসার কাটারটা পকেটে পুরল। টেবিলে বসে দ্রুত একটা চিরকুটে লিখল, 'আহমদ মুসা সম্ভবত হারতা দ্বীপ থেকে এখন সাও তোরাহের পথে। কিন্তু অপেক্ষার সময় নেই। সাও তোরাহতে আগামীকালের সূর্যোদয় ঘটবে না। দ্রুত প্রস্তুত হোন।' লেখা শেষে চিরকুটটি মুড়ে ল্যাসার কাটারের প্যাকেটে ঢুকাল।

তারপর দৌড়ে ফিরে এল আজর ওয়াইজম্যানের ড্রইং রুমে। সে সময় বেন্টো বেগিনও ড্রইংরুমে প্রবেশ করল।

বুমেদীন বিল্লাহকে দেখেই বেন্টো বেগিন বলে উঠল, 'চলুন কামাল সুলাইমানদের কাছে। হাতে সময় খুব কম।'

'সময় কম কেন?' কৃত্রিম বিস্ময়ের সুরে বলে উঠল বুমেদীন বিল্লাহ।

'জিনিসপত্র প্যাক করতে নামতে হবে এখনি। মূল্যবান ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি তো ফেলে যাওয়া যাবে না। অবশ্য ওদের বলে দিয়েছি, ওরা সবকিছু গুটিয়ে নেয়া ও প্যাক করা শুরু করে দিয়েছে। চলুন।' বলে হাঁটা শুরু করল তিন তলায় ওঠার সিঁড়ির দিকে বেন্টো বেগিন।

'বুঝলাম না মি. বেগিন। কোথাও যাচ্ছেন নাকি? হাঁটতে হাঁটতে বলল বুমেদীন বিল্লাহ ঠোঁটে কৃত্রিম হাসি টেনে।

'সবই দেখতে পাবেন। আপনিও যাচ্ছেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা দ্বীপ ছাড়ছি।' বলল বেন্টো বেগিন।

'দলিলগুলো হস্তগত হয়েছে। আসল কাজ হয়েছে। আপাতত দ্বীপে কোন কাজ নেই।' একটু থেমে পুনরায় বলে উঠল বেন্টো বেগিন।

কৃত্রিম আনন্দ প্রকাশ করে বুমেদীন বিল্লাহ বলল, 'তাহলে আজই যাত্রা করতে পারছি! অনেক ধন্যবাদ এ সিদ্ধান্তের জন্যে।'

তৃতীয় তলায় উঠে এল তারা।

তৃতীয় তলায় দুটি সিঁড়ি ঘর, একটা বিশাল ষ্টোর রুম বাদে গোটাটাই বন্দীদের ব্যারাক। দুটি সিঁড়ির একটি চলন্ত। চলন্ত সিঁড়িটি একতলার ল্যান্ডিং রুম, দুতলার আজর ওয়াইজম্যানের অফিস হয়ে তিন তলা দিয়ে ছাদে চলে গেছে। দ্বিতীয় সিঁড়িটি একতলার রক্ষী ব্যারাক থেকে দুতলার প্রশাসনিক অফিস হয়ে তিনতলায় চলে গেছে। তিনতলার এই সিঁড়ি ঘরেই বন্দী ব্যারাকে প্রবেশের বিশাল সিংহ দরজা। লোহার তৈরী।

বেন্টো বেগিন তালা খুলে বন্দীখানায় প্রবেশ করল।

বেন্টোর পেছনে পেছনে প্রবেশ করল বুমেদীন বিল্লাহ।

তিন তলার ছাদ প্রায় পনের ফিট উঁচু। কিন্তু বন্দীখানার ছাদ ৭ ফুটের বেশি নয়। এ ছাদের উপরে ৮ ফুট উঁচু বন্দীখানা আকারের বিশাল হলঘর নানা যন্ত্রপাতিতে ঠাসা। যন্ত্রপাতি অনেকগুলোর সাথেই বন্দীখানার সংযোগ আছে।

বন্দীখানার বন্দীদের সেল। সেল না বলে ওগুলোকে খাঁচা বলাই ভাল। তবে পাখির খাঁচার মত নয়। পাখির খাঁচা পাখির তুলনায় অনেকগুণ বড় হয়। কিন্তু বন্দীদের খাঁচা বন্দীদের চেয়ে ছোট।

বেন্টো বেগিন এগুলো কামাল সুলাইমানের খাঁচার দিকে।

কামাল সুলাইমানসহ সাত গোয়েন্দার খাঁচা একই সারিতে পরপর। কামাল সুলাইমানের পর ওসমান আব্দুল হামিদ। তারপর অন্যান্যরা।

বেন্টো বেগিন গিয়ে দাঁড়াল কামাল সুলাইমানের খাঁচার কাছাকাছি। বলল, 'মি. বিল্লাহ যা বলার, তাড়াতাড়ি তা সেরে ফেল।'

বুমেদীন বিল্লাহ বেন্টো বেগিনকে ছাড়িয়ে কামাল সুলাইমানের খাঁচার একদম পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

'মি. বুমেদীন বিল্লাহ ইতিহাস রচনার কতদূর এগুলেন?' খাঁচার ভেতরে জড়সড় হয়ে বসে থাকা কামাল সুলাইমান বলল বুমেদীন বিল্লাহকে। তার চোখে-মুখে তীব্র ঘৃণা ও বিদ্রুপ।

‘ইতিহাস সৃষ্টির শেষ অধ্যায়ে পৌছেছি। ব্যাংকের ভল্ট থেকে স্পুটনিকের টুইনটাওয়ার সংক্রান্ত সব দলিল-দস্তাবেজ আজর ওয়াইজম্যান আজ নিয়ে এসেছেন।’ বলল বুমেদীন বিল্লাহ।

‘জাতির পরাজয়ের মধ্য দিয়ে আপনার বিশ্বাসঘাতকতার জয় হলো, এই হলো আপনার ইতিহাসের শেষ অধ্যায়।’ কামাল সুলাইমান বলল।

‘হ্যাঁ মি. কামাল সুলাইমান, এটা আমার ইতিহাসের শেষ অধ্যায়, কিন্তু শেষ কথা নয়।’ বলে বুমেদীন বিল্লাহ বেন্টো বেগিনের দিকে ফিরে বলল, ‘চলুন, মি. ওসমান আব্দুল হামিদকে এবার সুখবরটা দেই।’

‘আসুন।’ বলে বেন্টো বেগিন ঘুরে দাঁড়িয়ে ওসমান আব্দুল হামিদের খাঁচার দিকে হাঁটতে লাগল।

এই সুযোগেরই অপেক্ষা করছিল বুমেদীন বিল্লাহ। সে দ্রুত পকেট থেকে ল্যাসার বীমের বক্সটি বের করে কামাল সুলাইমানের খাঁচায় ঢুকিয়ে দিয়ে হাঁটতে শুরু করল।

কয়েক ধাপ এগিয়েই বুমেদীন বিল্লাহ বেন্টো বেগিনকে লক্ষ্য করে বলল, ‘একে একে বলা আর নয়। দাঁড়ান। আমার গলায় যথেষ্ট জোর আছে। একসঙ্গে সবাইকে জানিয়ে দেই। ’

বলে বুমেদীন বিল্লাহ দৌড়ে গিয়ে খাঁচাগুলোর মাঝ বরাবর এক জায়গায় গিয়ে চিৎকার করে উঠল, ‘সাত গোয়েন্দা শুনুন। টুইনটাওয়ার সম্পর্কিত আপনাদের সব দলিল এখন আজর ওয়াইজম্যানের হাতে। ব্যাংকের ভল্ট থেকে আজ তিনি এগুলো নিয়ে এসেছেন। আপনারা এখন এক বিগ জিরো। আজ রাতেই এক ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটছে। নতুন ইতিহাস পর্যন্ত গুডবাই।’

বুমেদীন বিল্লাহ ও বেন্টো বেগিন বেরিয়ে এল বন্দীখানা থেকে।

ফিরে এল বুমেদীন বিল্লাহ তার ঘরে। দরজা লাগিয়ে দিয়ে সে আসন্ন পরিস্থিতির জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করার কাজ শুরু করে দিল। খাটের ফোম তুলে ফেলে তার তলা থেকে কয়দিন ধরে আর্মস ষ্টোর থেকে চুরি করা ডজন দুয়েক রিভলবার বের করল। হ্যান্ড ব্যাগে পুরল সে রিভলবারগুলো।

সব ঠিকঠাক করে বিছানায় বসল সে। হাতঘড়ির দিকে তাকাল। দেখল রাত পৌনে একটা। রাত একটার দিকে বেরুবে সে। প্রধান কাজ হবে অস্ত্রগুলো কামাল সুলাইমানদের হাতে পৌছানো।

দেহটা একটু বিছানায় রাখল বুমেদীন বিল্লাহ। তার দরজায় নক হলো এসময়। বুমেদীন বিল্লাহ তাড়াতাড়ি উঠে হ্যান্ড ব্যাগটা আড়ালে সরিয়ে রেখে দরজা খুলে দিল। দরজা খুলতেই দরজার ফাঁকে আটকানো একটা কাগজ নিচে পড়ে গেল। কিন্তু দরজার বাইরে কাউকেই দেখল না।

বুমেদীন বিল্লাহ তাড়াতাড়ি কাগজটা তুলে নিয়ে দরজা লাগিয়ে দিল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কাগজটার ভাঁজ খুলল। একটা চিঠি। কয়েক লাইন লেখা। পড়ল সে, 'প্রিয় সাংবাদিক, আপনি যথেষ্ট বুদ্ধিমান। সবই বুঝার কথা। তবু বলছি, WFA সম্পর্কে বা তার লোকদের পরিচয় সম্পর্কে সামান্য কিছু জানে এমন বাইরের কোন ব্যক্তিকেই বাঁচতে দেয়া হয় না। আপনার সাবধান হওয়ার সময় চলে যাচ্ছে।'

চিঠিটা পড়ে ঠোঁটে একটা হাসি ফুটে উঠল বুমেদীন বিল্লাহর। স্বগতকণ্ঠে অস্ফুট স্বরে বলল, 'তুমি কে জানি না বন্ধু। আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন। তুমি জেনে রাখ বন্ধু, যে মুহূর্তে আমি আজর ওয়াইজম্যানের প্রস্তাবে রাজী হয়েছি, সে মুহূর্ত থেকেই আমি জানি তার কাজ শেষ হবার পর আজর ওয়াইজম্যান আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে না। এমনিতেই তো তারা আমাকে মারতো, তাই আমি বাঁচার ও বাঁচাবার চেষ্টা করে মরতে চেয়েছি।'

আবার ঘড়ির দিকে তাকাল বুমেদীন বিল্লাহ। দেখল একটা বাজতে দশ মিনিট বাকি।

বিছানায় আবার গা এলিয়ে দিল বুমেদীন বিল্লাহ।

বুমেদীন বিল্লাহ ও বেন্টো বেগিন বন্দীখানা থেকে বেরিয়ে যেতেই কামাল সুলাইমান ছোট ল্যাসার বক্সটি খুলে ফেলল। খুলতেই বেরিয়ে পড়ল

চিঠিটা। সেই সাথে নজর পড়ল লাইটার সাইজের ল্যাসার কাটারের উপর। দেখেই বুঝতে পারল ওটা ল্যাসার কাটার। চোখ দুটি তার উজ্জ্বল হয়ে উঠল আনন্দে। তাড়াতাড়ি খুলল চিঠিটা। পড়ল। চিঠিটা পড়ে আনন্দে নেচে উঠল তার মন। আহমদ মুসা সাও তোরাহ আসছে জেনে। কিন্তু চিঠির পরবর্তী কয়েকটি লাইন তাকে উদ্বিগ্ন করে তুলল। আগামীকাল সাও তোরাহতে সূর্যোদয় ঘটবে না-এর অর্থ তার কাছে পরিষ্কার যে, আজকের রাতই তাদের শেষ রাত। সূর্যোদয়ের আগেই তাদের হত্যা করা হবে। বাঁচার জন্যে চেষ্টা করার সময় খুব কম। দ্রুত তাদের এজন্যে প্রস্তুত হতে হবে। বুমেদীন বিল্লাহ তাদেরকে প্রস্তুত হবার জন্যেই ল্যাসার কাটার সরবরাহ করেছে। বিস্মিত হলো সে, টুইনটাওয়ার সংক্রান্ত দলিল আজর ওয়াইজম্যানদের হাতে তুলে দেয়ার মত সর্বনাশ করে আবার আমাদের বাঁচাবার চেষ্টা কেন? দলিলগুলো তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। যাক। আল্লাহ যে সুযোগ দিয়েছেন তার সদ্ব্যবহার করা প্রয়োজন।

কামাল সুলাইমান তাকাল ওসমান আবদুল হামিদের দিকে। ওসমান আবদুল হামিদ কৌতুহলী চোখে তাকিয়েছিল কামাল সুলাইমানের দিকে। বুমেদীন বিল্লাহর ল্যাসার বক্সটি কামাল সুলাইমানের খাঁচায় দেবার সময় সে দেখেছিল।

কামাল সুলাইমান চিঠিটা ও ল্যাসার কাটার ওসমান আবদুল হামিদসহ সবাইকে দেখিয়ে ইংগিতে বলল, অবিলম্বে তাদের মুক্ত হতে হবে।

কামাল সুলাইমান কাজে লেগে গেল। হাত ও পায়ের চেইন ও বেড়ি কাটা কয়েক সেকেন্ডে হয়ে গেল। তারপর খাঁচার লক কেটে মুহূর্তেই খাঁচা থেকে বেরিয়ে এল।

খাঁচা থেকে বেরিয়ে কামাল সুলাইমান ল্যাসার কাটার ওসমান আবদুল হামিদকে দিয়ে এল। ওসমান আবদুল হামিদ মুক্ত হয়ে ল্যাসার কাটারটা দিয়ে এল তার পাশের আবদুল্লাহ আল ফারুককে।

এইভাবে দেড় ঘণ্টার মধ্যে ২০৭ জন বন্দীর সবাই মুক্ত হয়ে গেল।

সবাই মুক্ত হবার পর কামাল সুলাইমানরা সাতজন শেখুল ইসলাম আহমদ মুহাম্মাদকে সাথে নিয়ে পরামর্শ করল। কামাল সুলাইমান বলল,

‘আমাদের বন্দীখানার ভেতরের সব দৃশ্য নিশ্চয় টিভি ক্যামেরার মাধ্যমে মনিটর করা হচ্ছে, তাই যে কোন সময় আমাদের উপর আক্রমণ হতে পারে। ওদিকে আহমদ মুসা সাও তোরাহতে কখন পৌছবে আমরা জানি না। এই অবস্থায় আমাদের করণীয় কি?’

কামাল সুলাইমানের সাথের ছয়জন একই ধরনের মত প্রকাশ করল যে, ‘ওরা আক্রমণে আসার আগেই আমাদেরই আক্রমণে যাওয়া দরকার। যুদ্ধ করার মধ্যেই আমাদের বাঁচার সম্ভাবনা আছে। মরতে হলে যুদ্ধ করেই আমরা মরব।’ শেখুল ইসলামও অনুরূপ মত প্রকাশ করল।

কামাল সুলাইমান অবশিষ্ট সবাইকে ডাকল। পরিস্থিতি বুঝতেই সবাই বলে উঠল, ‘মরতে হলে যুদ্ধ করে আমরা মরব।’

অস্ত্র হিসেবে সবাই চেনগুলোকে কুড়িয়ে নিল।

কামাল সুলাইমানদের সাত জনের নেতৃত্বে ২০৭ জনকে ৭টি গ্রুপে ভাগ করা হলো।

ঠিক রাত দুটার সময় কামাল সুলাইমানের নেতৃত্বে প্রথম গ্রুপটি অগ্রসর হলো বন্দীখানার দরজার দিকে। তাদের পেছনে অন্য গ্রুপগুলো সারিবদ্ধভাবে অগ্রসর হলো দরজার দিকে।

কামাল সুলাইমান ল্যাসার বীম দিয়ে দরজার লক কেটে ফেলল।

কাটা শেষ ঠিক এই সময় দরজায় নক হলো। পরপর তিনবার নক করার শব্দ অন্যেরাও শুনতে পেয়েছে। কামাল সুলাইমানের ছয় বন্ধু এগিয়ে এল তার কাছে। ওসমান আবদুল হামিদ বলল ফিসফিসে কণ্ঠে, আমার মনে হয় আজর ওয়াইজম্যানের লোক হলে দরজায় নক না করে দরজা খুলে ফেলত। কারণ তাদের কাছে চাবি আছে। আমাদের কোন মিত্র মানে বুমেদীন বিল্লাহই নক করতে পারে। লেসার কাটার ব্যবহার করে আমরা মুক্ত হবো এবং আমরা দরজা খুলতে পারব, এটা শুধু সেই জানে। আর দেখ ঠিক সময়েই সে নক করেছে।’

ওসমান আবদুল হামিদের যুক্তি সবাই সমর্থন করল।

ঠিক এই সময় আবার সেই একই নিয়মে নক হলো দরজায়। পরপর তিনবার।

এবার কামাল সুলাইমানও সেই একই নিয়মে নক করল দরজায়। সংগে সংগে বাইরে থেকেও সে নিয়মে নক হলো।

কামাল সুলাইমান দরজা খুলে ফেলল।

দরজার বাইরে একটা ব্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে বুমেদীন বিল্লাহ।

দরজা খুলে যেতেই সালাম দিল বুমেদীন বিল্লাহ কামাল সুলাইমানদের লক্ষ্য করে।

সালাম দিয়েই উত্তরের অপেক্ষা না করে কামাল সুলাইমানদের দিকে দুধাপ এগিয়ে ব্যাগটা তার দিকে তুলে ধরে বলল, 'এতে ২৪টি রিভলবার আছে।'

কামাল সুলাইমান ব্যগটি নিয়ে তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে গেল। তাড়াতাড়ি রিভলবারগুলো বণ্টন করে ফেলল।

তারপর দরজার বাইরে এসে বলল, 'মি. বিল্লাহ আমরা প্রস্তুত।'

এ সময় প্রচ- গুলী-গোলার শব্দ ভেসে এল।

উৎকর্ণ হলো বুমেদীন বিল্লাহ। বলল, 'এই শব্দ নিচ তলা থেকে আসছে। কি ব্যাপার আমি একটু শুনে আসি। আপনারা এখানেই দাঁড়ান।' উদ্বিগ্ন কণ্ঠ বুমেদীন বিল্লাহর।

বুমেদীন বিল্লাহ বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ছুটল সে দোতলার দিকে।

দুতলার সিড়ির গোড়ায় সে দেখা পেল বেন্টো বেগিনের। বেগিনকে দেখেই বুমেদীন বিল্লাহ বলে উঠল, 'কি ঘটেছে নিচ তলায়? গোলাগুলী কেন?'

বুমেদীন বিল্লাহর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বেগিন বলে উঠল, 'আমি তোমাকে খুঁজছি। চল এক্সিলেন্সি তোমাকে ডেকেছেন।'

'কোথায় তিনি?' বলল বুমেদীন বিল্লাহ।

'তিন তলার ছাদে, হেলিকপ্টারে। তুমি তাড়াতাড়ি ফিরতে চাচ্ছ তাই তোমাকে নিয়ে যাবেন তিনি।'

বলেই সে তার পেছনে দাঁড়ানো হাইম হারজেলকে বলল, 'তুমি বুমেদীন বিল্লাহকে এক্সিলেন্সির কাছে নিয়ে যাও। আমি আসছি।'

'আপনি কোথায় যাচ্ছেন?' বুমেদীন বিল্লাহ জিজ্ঞাসা করল বেগিনকে।

'আমি তিন তলা থেকে আসছি। তুমি যাও।' বলে সে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে লাগল তিন তলার দিকে।

বুমেদীন বিল্লাহ হাইম হারজেলের পেছন পেছন চলন্ত সিঁড়ির দিকে চলল।

সিঁড়ির কাছাকাছি গিয়ে বুমেদীন বিল্লাহ থমকে দাঁড়াল। বলল হাইম হারজেলকে লক্ষ্য করে, 'শুনুন, আমার একটু কাজ আছে। আমি আসছি।'

বাঘের মত ঘুরে দাঁড়াল হাইম হারজেল। তার হাতে রিভলবার। বলল, 'মি. বিল্লাহ পেছন দিকে এক পা গেলে গুলী করব। নষ্ট করার মত এক সেকেন্ডও সময় নেই। আসুন।'

হাইম হারজেলের এই ব্যবহারে প্রথমে বিস্মিত হলেও বুমেদীন বিল্লাহ শীঘ্রই বুঝল যে সে কার্যত বন্দী এবং তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তাও সে বুঝল।

বুমেদীন বিল্লাহ সামনে পা বাড়াল। হাইম হারজেল ফিরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল।

শক্ত হয়ে উঠেছে বুমেদীন বিল্লাহর মুখ। পকেট থেকে রিভলবার বের করে গুলী করল হাইম হারজেলকে। মনে মনে বলল, এক তলায় কি ঘটছে তা এরা লুকাচ্ছে। ধরা পড়া থেকে রক্ষার জন্যে নিজেদেরকে নিজেরাই হত্যা করছে কি? বেন্টো বেগিন কেন তিন তলায় গেল তাও সে বুঝেছে। জীবনঘাতি গ্যাস ছেড়ে সে হত্যা করতে গেছে বন্দীদের। অন্যদিকে আজর ওয়াইজম্যান নিশ্চয় পালাচ্ছে। বুমেদীন বিল্লাহকে কেন হেলিকপ্টারে তুলতে চায় তাও তার অজানা নয়।

মাথায় গুলী খেয়ে হাইম হারজেল সিঁড়ির গোড়ায় আছড়ে পড়েছে।

বুমেদীন বিল্লাহ ছুটল তিন তলায় বন্দীখানায় উঠার সিঁড়ির দিকে।

বুমেদীন বিল্লাহ যখন তিন তলায় উঠার সিঁড়ির কাছাকাছি, তখন সে দেখল বেন্টো বেগিন তিন তলার সিঁড়ি থেকে বেড়ালের মত নিশব্দে নেমে এগুচ্ছে তার আর্মস রুমের দিকে। তার কানে মোবাইল ধরা, কথা বলছে সে। রিভলবার বাগিয়ে বুমেদীন বিল্লাহ এগুলো তার পেছনে। শুনতে লাগল সে বেগিনের কথা, 'এক্সিলেন্সি স্যরি, আমি তিন তলার গ্যাস ট্যাংকের কাছে যেতে না পেরে যাচ্ছি

আর্মস ষ্টোরে, সেখানেও পটাসিয়াম সাইনায়েড গ্যাসের একটা ট্যাংক আছে। স্যার ওটার মুখটা খুলে দিয়েই আমি আসছি।'

একটু থেমে ওপারের কথা শুনেই বেগিন আবার বলে উঠল, 'ওরা কিভাবে বন্দীদশা থেকে মুক্ত হলো, কিভাবে বন্দীখানা থেকে বেরিয়ে এল কিছুই বুঝে আসছে না এক্সিলেন্সি।'

আবার নিরবতা। ওপারের কথার উত্তরেই সে আবার বলে উঠল, 'বুমেদীন বিল্লাহকে হাইম হারজেলের সাথে আপনার কাছে পাঠিয়েছি। বুঝতে পারছি না কেন এতক্ষণ পৌছল না? অবশ্য একটা গুলীর আওয়ার ওদিক থেকে পেয়েছি এক্সিলেন্সি।'

পুনরায় মুহূর্তের জন্যে একটু নিরব হয়েই আবার বলে উঠল, 'আপনি ভাববেন না এক্সিলেন্সি, সাইনায়েড গ্যাসের প্রসারণ গতিটা প্রথম দুতিন মিনিট কম থাকলেও পরে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ে থাকে। গোটা বিল্ডিং কভার করতে ১ মিনিটও লাগবে না। এ বিল্ডিং এর কোন মানুষ কোন পোকামাকড়ও বাঁচবে না এক্সিলেন্সি। আপনি নিশ্চিত থাকেন।'

মোবাইল তার নেমে এল কান থেকে। মোবাইল পকেটে রেখে আর্মস রুমের দরজার দিকে সে হাত বাড়াল। দরজায় ডিজিটাল লক। লকের ডিজিটাল বোর্ডের অংকগুলোর উপর দ্রুত তার তর্জনীর টোকা পড়তে লাগল।

পরবর্তী মুহূর্তেই তার হাতটা নেমে এল দরজার হাতলে।

লক খুলে দরজা এখন সে খুলছে। আতংকিত কম্পিত বুমেদীন বিল্লাহ আর সময় দিল না তাকে। তার তর্জনী চেপে ধরল তার রিভলবারের ট্রিগারে।

সেই একইভাবে মাথায় গুলী খেল বেন্টো বেগিন। দরজার উপরেই পড়ে গেল তার লাশ।

পাশেই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে চোখের পলকে রিভলবার ঘুরিয়ে নিল। কিন্তু ট্রিগার টেপার আগেই দেখল কামাল সুলাইমানরা কয়েক জন রিভলবার হাতে নেমে আসছে।

বুমেদীন বিল্লাহ কিছু বলার আগেই কামাল সুলাইমান বলে উঠল, 'ধন্যবাদ মি. বিল্লাহ, এই বেগিন তিন তলায় গিয়েছিল। আমাদের টের পেয়েই

ফিরে এসেছে। আমরা ঠিক করলাম সে যখন আমাদের টের পেয়েছে এখন এর পিছু নেয়া দরকার।' কথাটুকু শেষ করেই আবার উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'নিচে কি ঘটেছে? কিছু জানতে পারলেন?'

'জানতে এসে প্রায় বন্দী হয়েছিলাম। আমাকে জোর করে একজন নিয়ে যাচ্ছিল তিন তলার ছাদে হেলিকপ্টারে তোলার জন্য আজর ওয়াইজম্যানের কাছে। আমি তাকে হত্যা করে এদিকে এসেই দেখতে পেলাম বেন্টো বেগিনকে। সে যাচ্ছিল আর্মস রুমে সাইনায়েড গ্যাসের ট্যাংক খুলে দিতে এ বিল্ডিং-এর সবাইকে সেকেন্ডের মধ্যে মেরে ফেলার জন্যে। আল্লাহ রক্ষা করেছেন'। বলল বুমেদীন বিল্লাহ।

কথা শেষ করে একটা দম নিয়েই আবার বলে উঠল বুমেদীন বিল্লাহ, 'আজর ওয়াইজম্যানের কমব্যাট বাহিনীর ব্যারাক নিচ তলায়। ওদের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশের মত। আমি বুঝতে পারছি না ওদের কি হলো? উপরেও কেউ আসছে না।'

'বুঝা যাচ্ছে দুপক্ষের মধ্যে গোলাগুলী হচ্ছে। আহমদ মুসারা এসে পৌছল কিনা! চলুন ওদিকে যাই।' বলল কামাল সুলাইমান।

সম্বিত ফিরে পেল যেন বুমেদীন বিল্লাহ। উৎসাহের সাথে বলল, 'ঠিক, হতে পারে। বোধ হয় এই কারণেই আজর ওয়াইজম্যান পালাচ্ছে। আর নিচে কি হচ্ছে এ ব্যাপারটা চেপে যাচ্ছে।' এক তলার সিঁড়ির দিকে ছুটতে ছুটতেই কথাগুলো বুমেদীন বিল্লাহ বলল।

বুমেদীন বিল্লাহর সাথে ছুটছিল কামাল সুলাইমানরা সবাই।

'সবাই শুয়ে পড়–ন, আজর ওয়াইজম্যানের সৈন্যরা ওরা..........।' সিঁিড়র ল্যান্ডিং-এর উপরে শুয়ে পড়তে পড়তে চিৎকার করে উঠল বুমেদীন বিল্লাহ।

কামাল সুলাইমানরাও শুয়ে পড়েছিল ল্যান্ডিং ও পেছনের করিডোরে।

সিঁড়ি থেকে এক ঝাঁক গুলী এল উপর দিকে। গুলীগুলো বুমেদীনদের মাথার উপর দিয়ে গিয়ে পেছনের দেয়ালে আঘাত করতে লাগল।

বুমেদীন বিল্লাহ ও কামাল সুলাইমানরাও হাত বাড়িয়ে সিঁড়ি লক্ষ্যে গুলী চালাতে শুরু করেছে।

দুপক্ষই আন্দাজে গুলী করছে।

গুলী চলতেই থাকল।

# ৬

আজর ওয়াইজম্যানের পলায়নরত লোকদের ধাওয়া করে দুতলায় উঠার সিঁড়ির গোড়ায় পৌছতেই শুনতে পেল সিঁড়িতে গোলাগুলীর শব্দ।

আহমদ মুসা থমকে দাঁড়াল। তার হাতে ষ্টেনগান। সে সোফিয়া সুসান ও পলা জোনসকে দাঁড় করাল হাতের ইশারায়। বলল, ‘সিঁড়িতে দুপক্ষের মধ্যে গুলী হচ্ছে। বুঝা যাচ্ছে একপক্ষ আজর ওয়াইজম্যানের লোকরা কিন্তু অন্যপক্ষে কারা গুলী গুলী ছুড়ছে?’

বিস্মিত হলো আহমদ মুসা।

এটা একটা নতুন পরিস্থিতি।

এ পর্যন্ত সময়টা তাদের ভালই গেছে।

আহমদ মুসাদের কোনই অসুবিধা হয়নি সাও তোরাহ দ্বীপের মিনি-সাবের ল্যান্ডিং পোর্ট খুঁজে পেতে।

সাও তোরাহর পশ্চিম প্রান্তের সেই জংগল ঢাকা খাড়ি দিয়ে যখন মিনি-সাব প্রবেশ করছিল, তখন আহমদ মুসা এ্যারনকে লক্ষ্য করে বলেছিল, ‘ধন্যবাদ এ্যারন, সত্যিই এই খাড়িটা খুঁজে পেতে কয়েক ঘণ্টা নয় কয়েক দিন হয়তো লেগে যেত। তোমাকে মোবারকবাদ।’

এ্যারন আহমদ মুসাদের একজন হয়ে গিয়েছিল। সাও তোরার সাগরে মিনি-সাব আসার পর এ্যারন বলেছিল আহমদ মুসাকে, শুধু আপনাদের সাহায্য নয় আহমদ মুসা, আপনার ধর্মও আমি গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আপনারা আমার চোখ খুলে দিয়েছেন। মনে হচ্ছে, এই প্রথম আমি প্রকৃত মানুষ দেখলাম, যারা মানুষকে ভালোবাসে এবং নীতিবোধকে সবার উর্ধে স্থান দেয়।

মিনি-সাব রাত দেড়টায় ল্যান্ড করেছিল পোর্টে। মিনি-সাবের কনট্রোল রুম অপারেট করছিল এ্যারন। তার পাশে হাসান তারিক ও আহমদ মুসা।

পোর্টে ল্যান্ড করার পর মিনি-সাবের গ্যাংওয়ে গিয়ে সেট হয়েছিল পোর্টেল প্রবেশ-দরজায়। বলে উঠেছিল এ্যারন, 'মি. আহমদ মুসা সান্তাসিমায় দরজা খুলেছিলেন ভেতর থেকে, কিন্তু এখানে খুলতে হবে বাইরে থেকে। মনে করুন আমি নেই, এখন কি করবেন দেখতে চাই।'

আহমদ মুসা বলেছিল, 'সেটা দরজার ডিজিট দেখে বলব। কিন্তু তার আগে বল, আমরা টিভি স্ক্রীনে ভেতরের মনিটরিং পাচ্ছি না, ওরা ভেতর থেকে আমাদের দেখছে কিনা?'

চিন্তার প্রকাশ ঘটেছিল এ্যারনের চোখে-মুখে। ভাবছিল সে। একটু পর আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'ব্যাপারটা রহস্যজনক। মনে হচ্ছে, ভেতরে মনিটরিং-এর কাজটাই বন্ধ আছে। এই কারণে আমরা ভেতরের কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আমরা ভেতরের কিছু দেখতে না পেলে তারাও আমাদের কিছু দেখতে পাবে না। কিন্তু এ রকম তো হবার কথা নয়। এখানকার সেন্ট্রাল কনট্রোল খুবই শক্তিশালী। চব্বিশ ঘণ্টা খোলা থাকে।'

'ব্যাপারটা অবশ্য চিন্তার। কিন্তু আপাতত আমাদের জন্যে ভাল হয়েছে। আমরা নিশ্চিন্তে মুভ করতে পারব।' বলেছিল আহমদ মুসা।

কথা শেষ করেই ইন্টারকমের বোতাম টিপে সোফিয়া সুসানকে লক্ষ্য করে বলেছিল, 'সুসান তুমি ও পলা প্রস্তুত হয়ে গ্যাংওয়ের মুখে যাও। হাসান তারিক মিনি-সাবের দায়িত্বে থাকবে। আমি ও এ্যারন আসছি।'

ইন্টারকম থেকে ঘুরে তাকিয়েছিল আহমদ মুসা এ্যারনের দিকে। বলেছিল, 'এ্যারন তুমি নিচে গিয়ে আর্মস ষ্টোর থেকে আমাদের চারজনের অস্ত্র বাছাই কর। আমি আসছি।'

সংগে সংগে এ্যারন বেরিয়ে গেল।

এ্যারন চলে গেলে হাসান তারিক বলেছিল, 'ভাইয়া আপনার সাথে আমি গেলে ভালো হতো না?'

'হতো, কিন্তু মিনি-সাব ও কনট্রোল রুমের দায়িত্ব কাকে দিয়ে যাব। এ্যারনকে এই পরিমাণ বিশ্বাসের সময় এখনও আসেনি, তাছাড়া যোগ্যতাও

পরীক্ষা করে দেখা হয়নি। এই দায়িত্বে সুসানদেরও রাখা যায় না। সবকিছুর পরেও তারা মেয়ে মানুষ।'

'ঠিক আছে ভাইয়া। আপনার সিদ্ধান্তই ঠিক।' বলেছিল হাসান তারিক।

'ধন্যবাদ হাসান তারিক। মিনিট দশেক দেখবে। এর মধ্যে যদি মনিটরিং কাজ শুরু না করে, তাহলে তুমি সশস্ত্র হয়ে গ্যাংওয়ের মুখে এসে দাঁড়াবে। ওরা পালাতে চাইলে মিনি-সাব দখল করা ওদের জন্যে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াবে। মিনি-সাব রক্ষা করা আমাদের জন্যে অপরিহার্য।'

বলেই আহমদ মুসা নিচে নামার জন্যে বেরিয়ে এসেছিল কনট্রোল রুম থেকে।

আহমদ মুসা এ্যারনকে সাথে নিয়ে গ্যাংওয়ের মুখে পৌছে দেখে সোফিয়া সুসান ও পলা জোনস গ্যাংওয়ের মুখে দুপাশে দুজন অবস্থান নিয়েছে।

'ধন্যবাদ সুসান ও পলা। তোমরা গোটা রাস্তা আমাদের কিচেন সামলিয়েছ, এখন বেরুতে হবে লড়াই-এর ময়দানে। তোমাদের একজন আমার বাম, অন্যজন ডান হাত।' সুসান ও পলা দুজনকে লক্ষ্য করে বলেছিল আহমদ মুসা।

সোফিয়া সুসান আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলেছিল, 'অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। আহমদ মুসা আমাদের দায়িত্ব দেয়ার যোগ্য মনে করেছেন, এটা আমাদের জন্যে গৌরবের, বিশেষ করে আহমদ  মুসার কিচেনের দায়িত্ব পাওয়া অপরিসীম আনন্দের। তবে সামনের কথা ভাবার আগে আমি জানতে চাচ্ছি টিভি মনিটরিং ভেতরের অবস্থা সম্পর্কে কি বলছে?'

'মনিটরিং ডেড সুসান।' বলেছিল আহমদ মুসা।

'তাহলে ভেতরটা আমাদের জন্যে অন্ধকার, তাই কি?' বলেছিল সোফিয়া সুসান।

'হ্যাঁ তাই।' আহমদ মুসা বলেছিল।

'তাহলে জনাব, আমাদের কমান্ডো তত্ত্ব মোতাবেক অগ্রসর হওয়ার ষ্ট্রাটেজী আমাদের পাল্টাতে হবে।' বলেছিল সোফিয়া সুসান।

'কি রকম?' বলেছিল আহমদ মুসা।

‘একটা হবে অগ্রবাহিনী, আরেকটা হবে মূল বাহিনী। যেমন আমি হবো অগ্রবাহিনী, আর আপনি অন্যদের সাথে হবেন মূলবাহিনী।’ সুসান বলেছিল।

‘তারপর?’ বলেছিল আহমদ মুসা।

‘অগ্রবাহিনী পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে, আপনি পরিস্থিতির মোকাবিলা করবেন।’ বলেছিল আহমদ মুসা।

‘কিন্তু অগ্রবাহিনী যদি আমি হই?’ বলেছিল আহমদ মুসা।

হেসে উঠেছিল সোফিয়া সুসান। বলেছিল, ‘মুলবাহিনী তাহলে কে হবে? আমি ও পলা মূল দায়িত্ব পালনের অযোগ্য। আমরা ঘটনা সৃষ্টি করতে পারি, ঘটনা সামাল দেয়ার সামর্থ আমাদের নেই। এটা আপনি পারেন।’

গম্ভীর হয়েছিল আহমদ মুসা। বলেছিল, ‘অন্ধকারের এক অনিশ্চয়তার মধ্যে তোমাকে সবার আগে ঠেলে দেব কেমন করে?’

‘একা এবং আগে তো যাচ্ছি না। আপনি তো পেছনে থাকছেনই। সৃষ্ট ঘটনার নিয়ন্ত্রণ তো আপনাকেই নিতে হবে।’ বলেছিল সুসান।

‘সেটা ঠিক আছে। কিন্তু গুলীর মুখে তো তোমাকেই প্রথম গিয়ে পড়তে হবে।’ আহমদ মুসা বলেছিল।

‘না জনাব, বরং আমিই প্রথম গুলীর সুযোগ পাব। কারণ আমি আগেই পরিকল্পনা করব, কিন্তু ওদের কোন পরিকল্পনা থাকবে না। আমাকে দেখার পর ওরা সিদ্ধান্ত নেবে। কিন্তু ততক্ষণে আমার এ্যাকশন শুরু হয়ে যাবে। এজন্যেই কমান্ডোরা ঝুঁকি নিলেও তারা সব সময় সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে।’ বলেছিল সোফিয়া সুসান।

হেসেছিল আহমদ মুসা। তারপর বলেছিল, ‘তুমি মনে-প্রাণে একজন রিয়েল কমান্ডো সুসান।’

‘ধন্যবাদ। আহমদ মুসার এই সার্টিফিকেট আমার জীবনের সবচেয়ে গৌরবজনক সঞ্চয়।’ বলেছিল সুসান। তার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়েছিল অভাবিত এক আনন্দে।

‘বুঝতে পারছি না, কমান্ডো হিসেবে তুমি শপথ নিয়েছ দেশ রক্ষার জন্যে। কিন্তু এখন তুমি ঝুঁকি নিচ্ছ কোন স্বার্থে?’

আবেগ জড়িত এক মিষ্টি হাসি ফুটে উঠেছিল সুসানের ঠোঁটে। বলেছিল, ‘সত্য ও ন্যায় দেশের চেয়ে বড়। কিন্তু তার চেয়েও বড় জীবনবাজী রাখা সত্য ও ন্যায়ের সংগ্রামীরা। তাদের পাশে থাকার যে গৌরব, তার চেয়ে বড় স্বার্থ আর কি আছে?’ আবেগে ভারী সুসানের কণ্ঠ।

‘সুসান, আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন।’ বলে আহমদ মুসা তাকায় এ্যারনের দিকে। বলেছিল, ‘দরজা এবার খুলতে হয় এ্যারন।’

‘লকটা ডিজিটাল, আপনি একটু দেখুন জনাব।’ বলেছিল এ্যারন।

একটু হেসেছিল আহমদ মুসা। বলেছিল, ‘বুঝেছি এ্যারন, তুমি আমার টেষ্ট নিতে চাও।’

‘না জনাব, এটা আমার একটা কৌতূহল।’ বলেছিল এ্যারন একটু হেসে।

আহমদ মুসা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। দেখেছিল, ডিজিটাল লকের প্রথমে চারটি ইংরেজী বর্ণ, তারপর আটটি জিরো অং ক। প্রথম চারটি বর্ণ হলো, ‘FAST’।

হাসল আহমদ মুসা। তার মনে পড়ে গেল তার পকেটের দ্বিতীয় কোড স্লিপটার কথা, যা ডেভিড ডেনিমের গলায় পাওয়া খৃষ্টের মূর্তির মধ্যে থেকে জানা গেছে। সে বুঝেছিল প্রথম কোড স্লিপের মত প্রথম চারটি বর্ণ ‘FAST’ এরপর কোড স্লিপে যে আটটা অংক বসান আছে তা দরজার ডিজিটাল জিরো অংকের জায়গাগুলোতে বসালেই দরজা খুলে যাবে, যেমন খুলেছিল সান্তাসিমার গ্যাংওয়ে মুখের দরজা।

আহমদ মুসা পকেট থেকে কোড স্লিপটি বের করে এ্যারনের হাতে দিয়ে বলে, ‘ডিজিটাল লকের জিরো অংকগুলোর স্থানে এই ক্রমিক নাম্বারগুলো বসালেই দিলেই দরজা খুলে যাবে।’

এ্যারন কোড স্লিপের উপর একবার নজর বুলিয়ে বলে ওঠে, ‘ঠিক। কোথায় পেলেন এই কোড নাম্বার? কি করে বুঝলেন এই কোড নাম্বারটি এই ডিজিটাল লকের?’

‘ডিজিটাল অংকগুলোর আগে চারটি ইংরেজী বর্ণ হলো FAST, যার অর্থ ‘Freedom Army Sao Torah’ এই অর্থ থেকেই বুঝেছি সাও তোরাহতে ঢুকতে বা সাও তোরাহর কোথাও এই কোড কাজে লাগবে।

এ্যারনের চোখ দুটি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠে। বরে, ‘ধন্যবাদ আপনাকে। আজর ওয়াইজম্যানদের সাথে লড়ার সামর্থ আপনাদেরই আছে।’

বলে এগিয়েছিল সে দরজার দিকে। লকের ডিজিটাল প্যানেলে নক করার আগে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেছিল, ‘আপনারা রেডি তো? দরজা কিন্তু পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকের দেয়ালে ঢুকে যাবে।’

আহমদ মুসা ও সুসান এ্যারনের দেয়া ঘাঁটির ড্রইং-এ আরো একবার চোখ বুলায়। তারপর সুসান গিয়ে দরজার পূব পাশে দরজা ঘেঁসে দাঁড়ায় এবং আহমদ মুসা দাঁড়ায় দরজার পশ্চিম পাশে। আহমদ মুসার পাশে এসে দাঁড়ায় পলা জোনস। তাদের সকলের হাতে খাটো ব্যারেলের মিনি ষ্টেনগান।

ডিজিটাল প্যানেলে নক সম্পূর্ণ করেই এ্যারন ছুটে একপাশে চলে যায়।

দরজা পূব দিক থেকে পশ্চিম দিকে সরে যেতে থাকে। দেহটা পার করার মত দরজায় একটা ফাঁক সৃষ্টি হতেই সুসান মাথাটা পায়ের কাছে মেঝেতে ছুড়ে দিয়ে দেহটাকে কুন্ডলি পাকিয়ে নিয়ে ফুটবলের মত গড়িয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে।

দরজা তখন পর্যন্ত অর্ধেকও উন্মুক্ত হয়নি। সুসানের দেহের কুন্ডলি যেখানে গিয়ে খুলে যায়, সেখান থেকে গোটা গেটরুম তার নজরে পড়ে। সে দেখতে পায় দরজার পূব পাশে চেয়ারে বসা দুজন প্রহরী দরজা খুলতে দেখেই উঠে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তাদের ষ্টেনগান তখনও কোন দিককেই লক্ষ্য করে ওঠেনি।

সুসান দেহটা সোজ করেই গুলী করেছিল প্রহরী দুজনকে লক্ষ্য করে। বৃষ্টির মত গুলীর মুখে পড়ে ওদের দেহ ঝাঁঝরা হয়ে চেয়ারের উপরই থেকে যায়।

গুলী করেই সুসান গড়িয়ে দ্রুত বিপরীত দিকের দরজায় চলে গিয়েছিল। দরজার পরেই ড্রইং রুম। ড্রইংরুমের ওপাশের দরজা দিয়ে একটা করিডোর দেখা যাচ্ছিল। এ্যারনের দেয়া নক্সা অনুসারে করিডোরটা উত্তর দিকে গিয়ে পূব দিকে ঘুরেছে। তারপর দক্ষিণ দিকে ঘুরে দক্ষিণের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌছেছে। এই

ঘুরানো করিডোরের দুপ্রান্তে সারিবদ্ধ ঘর। এখানেই রক্ষীদের এবং অতিথিদেরও থাকার জায়গা।

সুসান উঠে দাঁড়িয়ে ছুটেছিল করিডোরের দিকে। করিডোর ধরে দৌড়ে পশ্চিম-উত্তর কোণে যখন সে পৌছে, তখন দেখতে পায় পশ্চিমমুখী করিডোর দিয়ে বেশ কয়জন ছুটে আসছে।

ষ্টেনগান তোলার তখন সময় ছিল না। সুসান চোখের পলকে কোণের কক্ষটায় ঢুকে গেল এবং বন্ধ করে দিল দরজা। রক্ষীরা এসে দরজা ভাঙার চেষ্টা শুরু করে দিল।

আহমদ মুসা ও পলা জোনস ড্রইং রুমের দরজার কাছে এসে গিয়েছিল। দরজায় ধাক্কানো লোকগুলো তাদের ষ্টেনগানের মুখে পড়ে যায়। এক সাথেই গর্জে উঠেছিল দুজনের ষ্টেনগান। সুসানের কক্ষের সামনে লাশের স্তুপ পড়ে যায়।

ধীরে ধীরে সামান্য একটু দরজা খুলে সুসান সামনে পূব দিক থেকে আসা কিছু পায়ের শব্দ শুনেই পুরোটা দরজা খুলেছিল সে উদ্যত ষ্টেনগান হাতে।

দরজা খুলেই ট্রিগার চেপে ধরে সে। ওরা আট দশজন এগিয়ে আসছিল। গুলীর ঝাঁক গিয়ে ঘিরে ধরে ওদের। পূবমুখী উত্তর করিডোরের মাঝখানে ওরা লাশ হয়ে পড়ে যায়।

সুসান ঘর থেকে বের হয়।

ছোটে উত্তর করিডোর ধরে পূব দিকে। আবার অনেকগুলো পায়ের শব্দ কানে আসে তার। পূব-উত্তর কোণে পৌছে দেখে দক্ষিণ দিক থেকে পূব করিডোর ধরে ছুটে আসছে আরও দশ বারোজন রক্ষী।

তার বাম পাশে কোণের উপর দক্ষিণমুখী দরজার কক্ষটি খোলা দেখে সুসান। সুসান মাথা নিচে চালিয়ে এ্যাক্রোবেটিক কৌশলে দেহটা উল্টিয়ে ঘরের মধ্যে ছিটকে পড়ে। মাটিতে পড়েই সে পা দিয়ে লাথি মেরে দরজা বন্ধ করে দেয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এক ঝাঁক গুলী এসে লোহার দরজাটায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। অজ¯্রে লাথিও পড়তে শুরু করে দরজার উপর।

আহমদ মুসা, পলা জোনস ও এ্যারন পশ্চিম দিকের করিডোর ধরে ছুটে এসে করিডোরের পশ্চিম-উত্তর কোণে তারা থমকে দাঁড়ায় উত্তর-পূর্ব কোণে

সুসানের দরজার সামনে দাঁড়ানো রক্ষীদের দেখে এবং ষ্টেনগানের ব্যারেল লক্ষ্যে স্থির করে ট্রিগার চেপে ধরে আহমদ মুসা ও পলা জোনস।

শেষ মুহূর্তে রক্ষীরাও টের পেয়ে গিয়েছিল আহমদ মুসাদের। ওদের কয়েকজন তাদের ষ্টেনগান ঘুরিয়ে নিচ্ছিল। কিন্তু তাদের ষ্টেনগানের ঘুরে আসার আগেই গুলীর ঝাঁক গিয়ে ঘিরে ধরল ওদের সবাইকে। লাশের আরেকটা স্তুপের সৃষ্টি হলো উত্তর-পূব কোণে।

গুলী করেই আহমদ মুসারা ছুট দিয়েছিল পূব দিকে। যখন তারা উত্তর-পুব কোণে পৌছে তখন সুসানও বেরিয়ে আসে।

‘সুসান মনে হচ্ছে তুমি তোমার কমান্ডো ট্রেনিং-এর ডেমোনেষ্ট্রেশন দিচ্ছ। কিন্তু এটা তোমার কমান্ডো ট্রেনিং নয়। এভাবে ঝুঁকি নেয়া ঠিক নয়। এখন..........।’

আহমদ মুসার কথার মাঝখানেই হঠাৎ সুসানের ষ্টেনগান বিদ্যুত বেগে দক্ষিণ লক্ষ্যে উঠে আসে এবং শুরু করে গুলী বৃষ্টি।

কথা বন্ধ করে আহমদ মুসা তাকায় পুবের করিডোর দিয়ে দক্ষিণ দিকে। দেখে করিডোরের দক্ষিণ প্রান্তে দুজন রক্ষী মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে। আর অবশিষ্টরা দৌড়ে পশ্চিম দিকে আড়াল হয়ে গেল।

‘ওখানেই দুতলা তিন তলায় উঠার সিঁড়ি মি. আহমদ মুসা।’ বলছিল এ্যারন।

‘চল সবাই।’ বলে ছুটা শুরু করে দিয়েছিল আহমদ মুসা দক্ষিণে উপরে উঠার সিঁড়ির দিকে।

তারা পুব-দক্ষিণ কোণে পৌছে পশ্চিমে সিঁড়ির দিকে উঁকি দিয়েছিল। সংগে সংগে সিঁড়ির গোড়া থেকে ছুটে আসে গুলীর ঝাঁক।

সরে আসে আহমদ মুসারা।

তারপর তারা আড়ালে দাঁড়িয়ে তাদের চারটি ষ্টেনগানের ব্যারেল পশ্চিম দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সিঁড়ি লক্ষ্য করে গুলী বৃষ্টি শুরু করে।

গুলী করতে করতেই তারা বেরিয়ে আসে আড়াল থেকে সিঁড়ির মুখে।

ওদিক থেকে কোন পাল্টা গুলী আর আসে না।

আহমদ মুসারা গুলী অব্যাহত রেখেই সিঁড়ির গোড়ায় নিরাপদ অবস্থানে চলে যায়।

আহমদ মুসারা তখন গুলী বন্ধ করে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগুচ্ছিল সিঁড়ির দিকে ওদেরকে প্রত্যক্ষ টার্গেটে আনার জন্যে। এই সময়ই সিঁড়ি ও সিঁড়ির উপর এলাকায় দুপক্ষের মধ্যে গোলা-গুলী শুরু হয়ে যায়।

কিছু অপেক্ষার পর আহমদ মুসা যখন নিশ্চিত বুঝল ঐ দুপক্ষের এক পক্ষ আজর ওয়াইজম্যান বিপক্ষে, তখন ধরে নিল, ওদিকে আজর ওয়াইজম্যানের বিরোধী যারা, তারা আহমদ মুসাদের মিত্র। তাদের দুপক্ষের উদ্দেশ্য আজর ওয়াইজম্যানদের লোকদের পরাজিত করা। হতে পারে ঐ পক্ষ বন্দীদের পক্ষে এবং আজর ওয়াইজম্যানের লোকদের আক্রান্ত হতে দেখে তারা কাজ শুরু করেছে।

আহমদ মুসা নির্দেশ দিল সুসানদের আক্রমণ শুরু করার জন্যে।

সিঁড়ির গোড়ায় আড়াল থেকে আহমদ মুসারা গুলী বর্ষণ শুরু করে দিল।

সিঁড়িতে লুকাবার কোন জায়গা ছিল না। অল্পক্ষণ পরেই সিঁড়ি থেকে ষ্টেনগানের আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। উপর থেকে রিভলবারের আওয়াজও আর শোনা গেল না।

আহমদ মুসা গুলী বন্ধ করে সিঁড়ির গোড়ায় গিয়ে দাঁড়াল এবং চিৎকার করে বলে উঠল, 'সিঁড়িতে আজর ওয়াইজম্যানের কেউ বেঁচে নেই। উপরে কারা.........।'

আহমদ মুসার কথা শেষ হবার আগেই সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়াল বুমেদীন বিল্লাহ। চিৎকার করে উঠল, 'আহমদ মুসা ভাই, থ্যাংকস গড। তাড়াতাড়ি আসুন। আজর ওয়াইজম্যানের হেলিকপ্টার উড়ার কাজ শুরু করেছে। তাড়াতাড়ি আসুন।'

আহমদ মুসা বুমেদীন বিল্লাহকে সালাম দিয়ে বলল, 'আসছি বিল্লাহ।'

বলে দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে শুরু করল।

দুতলার ল্যান্ডিং-এ উঠে আসতেই বুমেদীন বিল্লাহ জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে।

আহমদ মুসার সাথে সুসানরাও উঠে এসেছিল।

'চল বিল্লাহ, আজর ওয়াইজম্যানরা কোথায়?'

'চলুন।' বলে দুতলার চলন্ত সিঁড়ির দিকে দৌড়াতে শুরু করল বুমেদীন বিল্লাহ। তার পেছনে ছুটল আহমদ মুসা এবং অন্যান্য সবাই।

যখন তারা ছাদে উঠল দেখল আজর ওয়াইজম্যানের হেলিকপ্টার অনেক খানি উপরে উঠে গেছে।

হেলিকপ্টার থেকে একটা আলোর ফ্লাশ ঘুরে গেল আহমদ মুসাদের উপর দিয়ে। একটা উচ্চহাসির আওয়াজ ভেসে এল উপর থেকে। তার সাথে একটা উচ্চ কণ্ঠ, 'আমার শূন্য ঘাঁটিতে জিরো কামাল সুলাইমানদের নিয়ে পরাজয়ের মহোৎসব করো। বিজয় আমার পকেটে। স্পুটনিকের দলিলগুলো নিয়ে গেলাম।'

কথা শেষ হলো।

কথা শেষ হবার সাথে সাথে আবার সেই উচ্চ হাসির শব্দ।

হেলিকপ্টার ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল আকাশের অন্ধকারে।

# ৭

সাও তোরাহ।

আজর ওয়াইজম্যানের অফিস কক্ষের পাশের বিশাল হল ঘর।

সত্যিই আনন্দের মহোৎসব চলছে।

চলছে মুক্ত আলোচনা। নানা কথা-বার্তা।

আহমদ মুসার ডান পাশে বসেছে হাসান তারিক। তারপর সুসানরা। আর বাঁ পাশে কামাল সুলাইমান ও তার ছয় সাথী। আহমদ মুসার সামনে মেঝেতে বসেছে বুমেদীন বিল্লাহ।

কথার এক পর্যায়ে কামাল সুলাইমান আহমদ মুসাকে বলল, 'জনাব, আমরা বিল্লাহর কাছে সব শুনেছি। পরের কাহিনী আপনার কাছে শুনলাম। আমরা আমাদের জাতি কৃতজ্ঞ আপনার কাছে।' আবেগে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল কামাল সুলাইমানের কণ্ঠ।

আহমদ মুসা কামাল সুলাইমানের কথার কোন জবাব না দিয়ে কামাল সুলাইমান, ওসমান আবদুল হামিদসহ ওদের সাতজনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনাদের সাতজনের সম্মেলন আমাকে খুব আনন্দ দিয়েছে। মনে হয়েছে ইতিহাসের কামাল আতাতুর্ক, খলিফা দ্বিতীয় আবদুল হামিদ, মিসরের বাদশাহ ফারুক, লিবিয়ার বাদশাহ ইদরিস, ইন্দোনেশিয়ার আহমদ সুকর্ণ, পারস্যের রেজা শাহ পাহলবী প্রমুখ যেন পুনরায় ফিরে এসে অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে মুসলমানদের বর্তমানকে রক্ষার জন্যে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন।'

'কিন্তু আমরা পারলাম না জনাব। আমরা চেয়েছিলাম মুসলমানদের সন্ত্রাসী সাজানোর যে ষড়যন্ত্র তার মুখোশ খুলে ফেলতে। কিন্তু পারলাম না। যে ডকুমেন্টগুলো সংগ্রহ করেছিলাম আজর ওয়াইজম্যানরা তা পুরিয়ে ফেলেছে। একটা অংশ আমরা ব্যাংকের ভল্টে সরিয়ে রেখেছিলাম, সেটাও আজর

ওয়াইজম্যান আজ নিয়ে গেল। বুমেদীন বিল্লাহ আমাদের বাঁচিয়েছে, কিন্তু মেরেছে জাতিকে।'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'না, মি. সুলাইমান। আজর ওয়াইজম্যান যে দলিলগুলো নিয়ে গেছে, সেটা একটা ডুপ্লিকেট অংশ। পূর্ণ কপিটা ম্যাডাম সুলাইমান অন্য একটি ব্যাংকে তার ভল্টে রেখেছেন।'

কামাল সুলাইমানসহ সাতজনই অপার বিস্ময় নিয়ে তাকাল আহমদ মুসার দিকে।

'আপনারা ধন্যবাদ দিন বিল্লাহকে। সে কিছু ডুপ্লিকেট কপি আজর ওয়াইজম্যানের হাতে তুলে দিয়ে সবাইকে বাঁচাবার একটা পথ বের করেছিল।' বলল আহমদ মুসা সাতজনকে লক্ষ্য করে।

'ধন্যবাদের পালা থাক। আজর ওয়াইজম্যান যে বিজয় পকেটে নিয়ে চ্যালেঞ্জ দিয়ে গেল, সে চ্যালেঞ্জের কি হবে?' বুমেদীন বিল্লাহ বলল।

বুমেদীন বিল্লাহর কথার উত্তরে কেউ কথা বলল না। সবাই চুপচাপ।

আহমদ মুসার ঠোঁটের কোণে এক টুকরো হাসি।

নিরবতা যখন খুবই বেসুরো হয়ে উঠল, তখন আহমদ মুসা মুখ খুলল। ধীরে ধীরে বলতে শুরু করল, 'আজর ওয়াইজম্যানের এই চ্যালেঞ্জ অনেক আগেই গ্রহণ করা হয়েছে। অপেক্ষা ছিল সাও তোরাহ থেকে কামাল সুলাইমানদের উদ্ধারের। এখন এদিকের কাজ শেষ। এখন আমি যাব রাজধানী পন্টে দিগায়। সেখান থেকে আমেরিকা।'

আহমদ মুসা একটু থামল। সোফায় সোজা হয়ে বসল। বলতে শুরু করল আবার, 'ম্যাডাম সুলাইমানকে ধন্যবাদ। তিনি স্পুটনিকের দলিলগুলোর ডুপ্লিকেট সেই সময়ই আমাকে দিয়েছিলেন। আমি পড়েছি দলিলগুলো। দলিলগুলো আসামীকে চিহ্নিত করেছে। কিন্তু বিচারের জন্যে প্রমাণ হাজির করেনি। এই কাজটাই এখন করতে হবে। বিশ বছর আগে টুইন টাওয়ার ধ্বংস হয়। কিন্তু এই ধ্বংসের ষড়যন্ত্র শুরু হয় বাইশ বছর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক শহরে। ষড়যন্ত্রের যাত্রা যেখান থেকে শুরু, সেখান থেকেই সেই ধ্বংস টাওয়ারের নতুন কাহিনী তৈরীর যাত্রা শুরু করতে হবে।'

থামল আহমদ মুসা।

পিন পতন নিরবতা  ঘরে। সবার দৃষ্টি আহমদ মুসার দিকে।

হাসান তারিক ও কামাল সুলাইমানদের মুখে আনন্দ। অন্যদের চোখে বিস্ময়।

পলা জোন্সের চোখে বেদনা।

সোফিয়া সুসানের চোখে উদ্বেগ।

নিরবতা ভাঙল কামাল সুলাইমান। বলল, 'নতুন কাহিনী তৈরীর যাত্রায় আমরাও সাথী।'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'অবশ্যই। কিন্তু তার আগে স্পুটনিকের যাত্রা আবার শুরু কর।'

'সন্ত্রাস বিরোধী সাংবাদিক হিসাবে আমি সফল। সুতরাং নতুন অভিযানে আমি আছি।'

'সাও তোরাহ ঘটনার রিপোর্ট কেমন লেখ, সেটা দেখার পরই তুমি ছাড়পত্র পাবে।' হেসে বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই এ্যারন বলে উঠল, 'পাশের ঘরে খাবার প্রস্তুত। আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।'

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

সবাই উঠল।

পাশের ঘরের দিকে হাঁটা শুরু করে আহমদ মুসা হাসান তারিককে বলল, 'গোটা ঘাঁটির সার্চ ঠিকমত হয়েছে তো? পুলিশ প্রধানের সাথে আলোচনা করেছি। পুলিশ আসছে। আমাদের সব কাজ তার আগেই শেষ করতে হবে।'

'হ্যাঁ ভাইয়া। কামাল সুলাইমানদের সাথে আমিও সর্বক্ষণ ছিলাম। এখানে পাওয়া তথ্যগুলো নিয়ে খাবার পরেই আলোচনায় বসব।' বলল হাসান তারিক।

আহমদ মুসা খাবার নিয়ে বসল এক কোণের এক টেবিলে।

সোফিয়া সুসান খাবার নিয়ে এসে আহমদ মুসার সামনে বসল।

আহমদ মুসা খাবার খাওয়া শুরু করেছে।

সোফিয়া সুসান মুখ নিচু করে বসে আছে। তার মুখ ভারী।

‘খাও সুসান।’ তাকিদ দিল আহমদ মুসা।

‘আমি কমান্ডো ট্রেনিং-এর ডেমোনেষ্ট্রেশন আর কখনও কোথাও দেব না। আমাকে আপনি সাথে নেবেন।’ কণ্ঠে তার কান্নার সুর।

দুচোখ থেকে তার দুফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

‘পাগল! তোমার চাকুরীও তো আছে।’ বলল আহমদ মুসা। মুখে তার এক টুকরো হাসি।

‘আহত হবার পর আমি ছয় মাসের ছুটি নিয়েছি। আমি..............।’ কথা শেষ করতে পারলো না সুসান। ধীরে ধীরে তাদের টেবিলে এল শেখুল ইসলাম আহমদ মুহাম্মাদ। সে অসুস্থ।

শেখুল ইসলামকে স্বাগত জানাল আহমদ মুসা।

চোখ মুছল সোফিয়া সুসান।

পরবর্তী বই

# ধ্বংস টাওয়ার

## কৃতজ্ঞতায়ঃ Mahfuzur Rahman

# সাইমুম-৩৮

# ধ্বংস টাওয়ার

আবুল আসাদ

# ১

রাব্বানিক্যাল ইউনিভার্সিটি নিউইয়র্ক-এর অভ্যর্থনা কক্ষ। ক্লান্ত দেহটা সোফায় এলিয়ে বসে আছে আহমদ মুসা। ড. হাইম হাইকেল এই ইউনিভার্সিটির ‘ফেইথ স্টাডিজ’ বিভাগের প্রধান রাব্বি। ড. হাইম হাইকেলের সাথে দেখা করতে চায় আহমদ মুসা। এই খবর সে পাঠিয়েছে মিনিট পাঁচেক আগে। ড. হাইম হাইকেল আসবেন, অথবা ভেতরে তার ডাক আসবে, এরই অপেক্ষা করছে আহমদ মুসা।

শান্ত, নিস্পৃহভাবে বসে থাকলেও বুকটা আহমদ মুসার আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে অনেকটাই অস্থির।

আহমদ মুসার এই নতুন আমেরিকান মিশনে রাব্বি ড. হাইম হাইকেলই তার প্রাইম টার্গেট, প্রধান অবলম্বন। নিউইয়র্কের লিবার্টি টাওয়ার ও ডেমোক্রোসি টাওয়ার ধ্বংসের রহস্য উদঘাটনে অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে কামাল সুলাইমানদের স্পুটনিক যে সত্যের সন্ধান পায় তার প্রধান সাক্ষী এই ধর্মনেতা ইহুদী জগতের বিশিষ্ট রাব্বি ড.হাইম হাইকেল।

আজ থেকে বিশ বছর আগে নিউইয়র্কের টুইনটাওয়ার, লিবার্টি টাওয়ার ও ডেমোক্রাসি টাওয়ার, ধ্বংস হয় বিস্ময়কর অভূতপূর্ব এক আক্রমণে। এর জন্যে

দায়ী করা হয় একটি মুসলিম গ্রুপকে। সন্দেহের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয় সব মুসলমানকেই। তারপর মুসলিম বিশ্বের এ প্রান্ত থেকে সে প্রান্ত পর্যন্ত ধ্বংস-বিপর্যয়ের ঝড় বয়ে যায়। মুসলমানদের অনেকেই একে তাদের অপরিণামদর্শী কিছু সদস্যের অপরাধ থেকে সৃষ্ট ভ্যগ্যলেখা হিসাবে মেনে নেয়। আবার অনেকেই একে গোপন ষড়যন্ত্রের পাতা ফাঁদে জড়িয়ে পড়া ভুল সিদ্ধান্ত বলে মনে করে। দীর্ঘ বিশ বছর পর এই শেষোক্ত ধারণা থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই কামাল সুলাইমানদের গোয়ান্দা সংস্থা 'স্পুটনিক' এই ব্যাপারে সত্য উদঘাটনের জন্যে অনুসন্ধান শুরু করে। সন্ধান পায় তারা এক গোপন ষড়যন্ত্রের। অনেক দলিল-দস্তাবেজ তারা যোগাড় করে এর সমর্থনে। তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল ছিল ইহুদী সিনাগগের কনফেশন টেবিলে 'সর্বশক্তিমান ও শেষ দিনের বিচারক' 'জিহোবা'র সামনে পেশ করা 'কনফেশন'-এর একটি অডিও টেপ। এই কনফেশনে তিনি নিউইয়র্কের টাওয়ার ধ্বংসে তার অপরাধ অংশের কথা স্বীকার করেছিলেন। এই কনফেশন ঘটনাক্রমেই রেকর্ড হয়ে গিয়েছিল এবং ঘটনাক্রমেই সে টেপের একটি কপি কামাল সুলাইমানরা পেয়ে যায়। কিন্তু টাওয়ার ধ্বংসে তাদের সামনে ইহুদীদের ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের বিষয়টি প্রমাণের জন্য এই কনেফেশন যথেষ্ট নয়। এজন্য যে তথ্য-প্রমাণ প্রয়োজন তা যোগাড়ে রাব্বি ড. হাইম হাইকেলের পক্ষেই সাহায্য করা সম্ভব। এই ষড়যন্ত্রের জগতে প্রবেশের পথে সেই একমাত্র প্রত্যক্ষ সোর্স। এ কারণেই আহমদ মুসা ছুটে এসেছে তার কাছে।

রাব্বি ড.হাইম হাইকেল লোকটি কেমন সে আহমদ মুসাকে কিভাবে গ্রহণ করবে, কনফেশনের টেপের কথা স্বীকার করতে রাজি হবে কিনা, ইত্যাদি ভাবনাপীড়িত দুরু দুরু মন নিয়ে অপেক্ষা করছে আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার পরণে কালো হ্যাট, কালো লম্বা কোট। এটাই হাসিডিক ইহুদীদের পোশাক। রাব্বি ড. হাইম হাইকেলও হাসিডিক পন্থী ইহুদী। অবশ্যই ড. হাইম হাইকেল পৈতৃক সূত্রেই ছিলেন 'হাসকলা' পন্থী ইহুদী। হাসকলারা বাইরের জীবনে ধর্মের ভূমিকাকে তেমন একটা আমল দেয় না। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের মাধ্যমে জীবনকে ও জাতিকে সমৃদ্ধ করাকেই এরা প্রধান কর্তব্য মনে করে।

অন্যদিকে হাসিডিকরা লেখাপড়া চর্চার চাইতে ‘দয়া’ ও ‘সানন্দ উপাসনাকে’ বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ড. হাইম হাইকেল টাওয়ার ধ্বংসের কিছুকাল পর এই হাসিডিক মত গ্রহণ করেন।

আহমদ মুসা একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল।

হঠাৎ তার নাম ধরে সম্বোধনের শব্দে সে সম্বিত ফিরে পেল। মুখ তুলে দেখল, তার সামনে একজন লোক দাঁড়িয়ে। পঞ্চাশোর্ধ। পরণে রাব্বির পোশাক। বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। বলছিল সে, ‘আপনি মি. আইজ্যাক দানিয়েল?’

আহমদ মুসা ‘আইজ্যাক দানিয়েল’ নাম নিয়েই এসেছে এই ইহুদী বিশ্ববিদ্যালয়ে ড. হাইম হাইকেলকে খোঁজ করার জন্যে। সে ফিলিস্তিন থেকে এই নামে পাসপোর্ট করে রেখেছিল। এবার এই পাসপোর্ট নিয়েই আহমদ মুসা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসেছে।

আহমদ মুসা লোকটির দিকে তাকিয়েই উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘গুড মর্নিং স্যার। হ্যাঁ, আমি আইজ্যাক দানিয়েল।’

‘ওয়েলকাম।’ বলে হাত বাড়িয়ে লোকটি বলল, ‘আমি জ্যাকব, হাইকেলের সহকর্মী।’

আহমদ মুসা তার সাথে হ্যান্ডশেক করে বলল, ‘পরিচিত হয়ে খুশি হলাম স্যার।’

‘আমিও।’ বলল রাব্বি জ্যাকব।

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল। জ্যাকব বাধা দিয়ে বলল, ‘স্যরি, আসুন আমার সাথে।’

জ্যাকব চলতে শুরু করল।

আহমদ মুসাও তার সাথে সাথে চলল।

পাশের একটি কক্ষে গিয়ে দুজনে বসল।

বসেই রাব্বি জ্যাকব বলল, ‘দয়া করে বলবেন কি রাব্বি ড. হাইকেলের সাথে আপনার কি সম্পর্ক? কেন দেখা করতে চান তার সাথে?’

‘তিনি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী ও বন্ধু। বাকি প্রশ্নের জবাব তিনিই তো চাইবেন।’ বলল আহমদ মুসা। তার শেষের বাক্যটা একটু শক্ত হয়েছিল।

রাব্বি জ্যাকবের চেহারায় পরিবর্তন দেখা গেল না। শান্ত কন্ঠে সে বলল, ‘রাব্বি ড. হাইকেল নেই। তার দেখা আপনি পাবেন না।’

‘কোথায় তিনি?’ বলল, আহমদ মুসা।

‘সেটাও আপনি জানবেন না। কারণ আমিও জানি না।’ রাব্বি জ্যাকব বলল।

ভ্রু কুঁচকে গেল আহমদ মুসার। বলল দ্রুতকন্ঠে, ‘আপনি জানবেন না কেন? অফিস তো নিশ্চয় জানে।’

‘অফিসও জানে না।’ রাব্বি জ্যাকব বলল।

‘এটা অসম্ভব। আমি অফিসকে জিজ্ঞাসা করতে চাই।’ বলল আহমদ মুসা।

‘সাক্ষাৎ প্রার্থী হওয়ার স্লিপ তো অফিসেই পাঠিয়েছিলেন। অফিস আমাকে পাঠিয়েছে। ভিন্নভাবে অফিস আর কথা বলবে না।’ রাব্বি জ্যাকব বলল।

স্তম্ভিত হলো আহমদ মুসা। ড. হাইকেল এখানে এক উচ্চপদে চাকুরী করেন। তিনি কোথায় আছেন বা কোথায় গেছেন কেউ জানবে না, এটা কি করে হতে পারে! বলল আহমদ মুসা, ‘তিনি কি এখানে চাকুরী করেন না? চাকুরী ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন? একমাস আগে প্রকাশিত নিউইয়র্কের এডুকেশন গাইড বইতেও দেখেছি, তিনি এখানকার ‘ফেইথ স্টাডিজ’ বিভাগের প্রধান।’ আহমদ মুসার কন্ঠে বিস্ময়।

‘এডুকেশন গাইডের তথ্য ঠিক। তিনি আমাদের ফেইথ স্টাডিজ বিভাগের প্রধান। কিন্তু তিনি নেই। দিন পনের আগে তিনি হঠাৎ উধাও হয়ে গেছেন। কাউকেই কিছু বলে যাননি।’ বলল রাব্বি জ্যাকব।

‘বাড়ির লোকেরা কি বলে?’ আহমদ মুসা বলল।

‘তারাও আমাদের মত অন্ধকারে। তার বাড়িতে মা ছাড়া তেমন কেউ নেই। একমাত্র ছেলে বাইরে লেখা-পড়া করছে।’ বলল রাব্বি জ্যাকব।

‘পুলিশ কি এ বিষয়ে কিছু জানে?’ আহমদ মুসা বলল।

‘পুলিশ চেষ্টা করছে, কিন্তু কোন সন্ধান পায়নি বলে জানি।’

‘স্যার, তার উধাও হওয়া সম্পর্কে আপনি কি মনে করেন?’

জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

আহমদ মুসার জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না রাব্বি জ্যাকব। তার চোখে-মুখে ফুটে উঠল ভয়ের চিহ্ন। কয়েক মুহূর্ত পর এদিক ওদিক তাকিয়ে ধীর কন্ঠে বলল,‘আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। সবাই বিষয়টাকে এড়িয়ে চলতে চাচ্ছে। আমাদের অধিকাংশ শিক্ষক বলছেন, তিনি হয়তো নিজেই কোথাও চলে গেছেন? আমরা কয়েকজন শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট রাব্বি ড.আইয়াজ ইয়াহুদের কাছে গিয়েছিলাম ড. হাইকেলের সন্ধানের ব্যাপারে আরও তৎপর হবার জন্য। বিষয়াটি পত্র-পত্রিকায় আনার জন্যে অনুরোধ করেছিলাম আমরা। তিনি আমাদেরকে আবেগপ্রবণ না হবার জন্যে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, ‘পুলিশকে বলা হয়েছে। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার দায়িত্ব তাদের। বহুদিন থেকে ড. হাইকেল ফ্রাস্ট্রেশনে ভুগছিলেন। এক সময় তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। সেখান থেকে নিজেই নেমে গিয়ে ‘ফেইথ স্টাডিজ’ বিভাগের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখলেন। সাম্প্রতিককালে তিনি চিন্তারও ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। তার ব্যাপারে সব চিন্তা আপনারা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিন।’

আহমদ মুসা স্তম্ভিত হলো ড. হাইকেলের মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার কথা শুনে। আহমদ মুসা বলল, ‘ড. হাইকেল মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার কথা কি সত্য?’

‘ড. হাইকেল আমার ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। আমি কখনও এমন কিছু লক্ষ্য করিনি।’

‘তাহলে ড. আয়াজ ইয়াহুদ এটা বললেন কেন? মানে তার কথা মন থেকে ঝেড়ে ফেলার কথা বললেন কেন? তিনি কি তাহলে আপনাদের চেয়ে বেশি জানেন ড. হাইকেল সম্পর্কে?’ প্রশ্ন তুলল আহমদ মুসা।

‘আমারও তাই মনে হয়। আমরা সবাই উদ্বিগ্ন, কিন্তু তার মধ্যে কোন উদ্বেগ দেখিনি।’ বলল রাব্বি জ্যাকব।

‘ড. আয়াজ ইয়াহুদ তাহলে কিছু সহযোগিতা করতে পারেন।’ বলল আহমদ মুসা।

‘কিন্তু আপনি তার সাক্ষ্যত পাবেন না। আর ড. হাইকেলের ব্যাপারে আপনার সাথে কোন আলোচনায় তিনি রাজি হবেন না।’ রাব্বি ড. জ্যাকব বলল ।

‘কেন বলছেন একথা?’ বলল আহমদ মুসা।

‘তিনি প্রশাসন বিভাগকে একটা নির্দেশ দিয়েছেন যে, ড. হাইকেল সম্পর্কে কোন কথা আর তার বলার নেই। যা জানার তা যেন মানুষ পুলিশের কাছ থেকে জেনে নেয়। এ বিষয়ে কোন সাক্ষাতকার কাউকে তিনি দেবেন না।’ রাব্বি জ্যাকব বলল।

‘দেখুন রাব্বি ড. হাইম হাইকেল আমার অকৃতিম শুভাকাঙ্ক্ষী ও বন্ধু। এসেছিলাম তার সাথে সৌজন্য সাক্ষাতকারের উদ্দেশ্য। তেমন কোন কাজ ছিল না। কিন্তু এখন দেখছি, তাকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা আমাকে করতে হবে। আমার এমন কিছু হলে তিনি অবশ্যই এটা করতেন।’

রাব্বি ড. জ্যাকব সঙ্গে সঙ্গে কোন কথা বলল না। ভাবছিল সে। কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে বলল, ‘তাতে কোন লাভ হবে না। আপনিই বিপদেই পড়বেন। দেখুন আমরা বিনা কারণে চুপ করে বসে নেই। ড. হাইকেলের ব্যাপারে আমাদের মুখ খুলতে নিষেধ করা হয়েছে। এরপর আমরা গিয়েছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টের কাছে। তিনিও আমাদের হতাশ করেছেন।’

‘কে নিষেধ করেছে? আর নিষেধ আপনারা মানবেন কেন?’ আহমদ মুসা বলল।

‘কে নিষেধ করেছে জানি না। হুমকি এসেছে টেলিফোনে। না মেনে আমরা কি করব? বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বয়ং প্রধান যখন বিষয়টাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না, পুলিশও যেখানে গতানুগতিক, সেখানে আমরা কার উপর নির্ভর করব?’ বলল রাব্বি জ্যাকব।

‘বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ড. আয়াজ ইয়াহুদের বাসায় তাঁর আর কে কে আছেন?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘তার এক মেয়ে ও স্ত্রী। এই দুজনসহ তিনজন নিয়ে তার সংসার।’ বলল রাব্বি জ্যাকব।

‘বিশ্ববিদ্যালয়ের তার অফিসের একটা এক্সটেনশন তো তাঁর বাসায় আছে, তাই না?’ বলল আহমদ মুসা।

হ্যাঁ। অফিসের নিরিবিলি কাজগুলো তিনি বাসায় বসে করাই পছন্দ করেন।’ রাব্বি জ্যাকব বলল।

‘তার অর্থ অফিসের কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সাথে তাঁর রেসিডেন্সিয়াল অফিসের কম্পিউটারগুলো যুক্ত কি বলেন।’ বলল আহমদ মুসা।

‘সেটাই স্বাভাবিক।’ রাব্বি জ্যাকব বলল। বলে সে তার হাত ঘড়ির দিকে তাকাল।

‘প্লিজ স্যার, আর একটি কথা। রাব্বি ড. হাইম হাইকেলের বাসা এখানে কোথায় ছিল?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘ফিফথ এভেনিউতেই সবকিছু। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও জুইস মিউজিয়ামের মাঝের জায়গাটুকুও বিশ্ববিদ্যালয়ের। এখানে বিশ্বাবদ্যালয়ের অনেক কয়টি রেসিডেন্সিয়াল ব্লক আছে। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ও তার পার্সোনাল স্টাফদের বাসা। আর পশ্চিমের সর্বশেষ লাইনে ‘ফিফথ’ এভিনিউ-এর লাগোয়া যে ব্লক সেটিই ‘আই’ ব্লক। এ ব্লকের দুতলায় সর্ব উত্তরের ফ্লাটে থাকতেন রাব্বি ড. হাইম হাইকেল।’

‘তিনি নিখোঁজ হবার পর তার বাড়িতে আপনারা গেছেন?’ আহমদ মুসা বলল।

‘গেছি। কেন এ কথা বলছেন।’ রাব্বি জ্যাকব বলল।

‘এখন কে আছেন তাঁর বাড়িতে?’ আহমদ মুসা বলল।

‘পুলিশ তার বাড়ি সীল করে রেখেছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ রকম থাকবে। তিনি বাসায় একাই থাকতেন।’ রাব্বি জ্যাকব বলল।

’ধন্যবাদ স্যার।’

‘ধন্যবাদ’ বলে উঠতে উঠতে রাব্বি জ্যাকব বলল, ‘আমার চোখ দেখতে যদি ভুল না করে থাকে, তাহলে আপনি আমাদের মত চুপ করে থাকার মত লোক নন বলেই মনে হচ্ছে। তবু আমি বলব, পাগলামী করবেন না। ওদের গায়ে হাত দিতেও পারবেন না।’

আহমদ মুসাও উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘ওদের তো আপনি জানেন না, তাহলে একথা বলছেন কেন?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা। তার চোখে বিস্ময়।

‘আমি ওদের জানি না। কিন্তু ড. হাইকেল মনে হয় ওদের জানতেন। কথাচ্ছলে একদিন তিনি আমাকে বলে............’

রাব্বি ড. জ্যাকবের কথা শেষ হলো না, অস্পষ্ট একটা শব্দ লক্ষ্যে দরজার দিকে আহমদ মুসা চাইতেই দেখল একটা রিভলবারের নল উঠে এসেছে রাব্বি জ্যাকবকে লক্ষ্য করে। রিভলবারে সাইলেন্সার লাগানো। সঙ্গে সঙ্গেই আহমদ মুসা এক হ্যাচকা টানে সরিয়ে নিল রাব্বি জ্যাকবকে। তারপরেই অ্যাক্রোব্যাটিক ঢংয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটির উপর। শীষ দেওয়ার মত শব্দ করে একটা গুলী তার আগে বেরিয়ে এসেছে। তার সাথে একটা আর্তনাদও উঠেছে জ্যাকবের মুখ থেকে।

আহমদ মুসার দেহ চরকির পুরো এক রাউন্ড ঘুরে দ্বিতীয় রাউন্ডের প্রথমেই তার জোড়া পা গিয়ে আঘাত করল লোকটার তলপেটে।

লোকটা পেছন দিকে ছিটকে দরজার বাইরে পড়ে গেল। হাত থেকে রিভলবারটাও পড়ে গেছে।

জোড়া পায়ে আঘাত করার পর আহমদ মুসা চিৎ হয়ে পড়ে গিয়েছিল মাটিতে। মুহূর্ত পরেই আহমদ মুসা উঠল। ছুটল লোকটির দিকে এবং চিৎকার করে উঠল, ‘খুনি, সন্ত্রাসী পালাচ্ছে। ধরুন তাকে।’

লোকটি আগেই উঠে দাঁড়িয়েছিল এবং ছুটে পালাচ্ছিল।

রাব্বি ড. জ্যাকবের আর্তনাদও সবাই শুনতে পেয়েছিল।

লোকটি অভ্যর্থনা কক্ষের মধ্যে দিয়েই দৌড় দিয়েছিল।

অভ্যর্থনা কক্ষ ও আশ পাশের সবাই লোকটির দিকে ছুটছিল। কিন্তু লোকটি দুটি বোমা ফাটিয়ে পালানোর নিরাপদ পথ করে নিল। আহমদ মুসা লোকটিকে পালাতে দেখেই দ্রুত আবার ফিরে এসেছিল রাব্বি ড. জ্যাকবের কক্ষে।

রাব্বি জ্যাকব তার ডান হাত দিয়ে বাম বাহু চেপে ধরে বসেছিল। গুলী লেগেছে তার বাম বাহুর উপরের অংশে।

আহমদ মুসা তার পাশে বসে ক্ষতস্থানটা একটু পরীক্ষা করে বলল, 'ঈশ্বর আপনাকে বাঁচিয়েছেন। বাহুর আঘাতও খুব মারাত্মক নয়।'

রাব্বি জ্যাকব মুখ তুলে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। । বলল, 'হ্যাঁ, ঈশ্বর আজ আপনার রূপ ধরে এসেছিল। আপনি চোখের পলকে ওভাবে টেনে না নিলে গুলীটা আমার বুক বিদ্ধ করতো।'

সবাই এসে দাঁড়িয়েছিল তাদের চারপাশে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ছুটে এসেছিল। এসেই বলল, 'তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিতে হবে। এ্যাম্বুলেন্স রেডি।'

কথা কয়টি বলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট আয়াজ ইয়াহুদ রাব্বি জ্যাকবকে লক্ষ্য করে বলল, 'কি করে, কেন এসব ঘটল ।' তারপর অপরিচিতি আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ইনি কে? এ সময়ে কেন এখানে?

রাব্বি জ্যাকব বলল, 'স্যার ইনিই আজ আমাকে বাঁচিয়েছেন। ইনি দেখা করতে এসেছিলেন। আমি তার সাথে এখানে বসে কথা বলছিলাম। একপর্যায়ে দরজায় এসে ঐ সন্ত্রাসী আমাকে গুলী করে। ইনি অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় আমাকে সরিয়ে না নিলে বাহুতে যে গুলী লেগেছে তা বুকে লাগত। তারপর ইনি আমাকে সরিয়ে দিয়েই আক্রমণকারীর উপর ঝাঁপিয়ে না পড়লে সন্ত্রাসী দ্বিতীয় গুলী করার সুয়োগ পেয়ে যেতো।'

রাব্বি জ্যাকব থামতেই বিশ্বাবদ্যালয়ের প্রেসিন্ডেট আয়াজ ইয়াহুদ আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, 'ধন্যবাদ ইয়ংম্যান। বুদ্ধি, শক্তি ও সাহসে যুবকরা এ রকমই হওয়া উচিত।'

এ্যাম্বুলেন্স থেকে স্ট্রেচার এসে পৌঁছল। রাব্বি ড. জ্যাকবকে আহমদ মুসাই স্ট্রেচারে শুইয়ে দিল।

স্ট্রেচার নিয়ে চলা শুরু হলে রাব্বি জ্যাকব আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল,'আপনি হাসপাতালে আসছেন তো।

'আবশ্যই আপনার সাথে দেখা করবো।' বলে আহমদ মুসা তাকাল ড. আয়াজ ইয়াহুদের দিকে। বলল, 'স্যার অনধিকার চর্চা হলেও আমি বলতে চাই.

ড. জ্যাকবের উপর শত্রু তার উদ্দেশ্য হাসিলে ব্যর্থ হয়েছে। সুতারাং সফল হবার জন্য আবারও তারা চেষ্টা করতে পারে।'

ভ্রুকুঞ্চিত হলো ড. আয়াজ ইয়াহুদের। বলল, 'ইয়ংম্যান, তুমি তো সাংঘাতিক বুদ্ধিমান। ঠিক বলেছ তুমি। আমি এখনি পুলিশকে বলছি। আর পুলিশকে তোমার তো একটা জবানবন্দী দিতে হবে। তুমি লিখে দাও তাতেই চলবে। ড. জ্যাকব তো সবকিছুরই সাক্ষী। সবাই বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

আহমদ মুসা ধীরে ধীরে নিকটবর্তী হল রাব্বিনিক্যাল ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্ক-এর প্রেসিডেন্ট ড. আয়াজ ইয়াহুদের বাসার।

এইমাত্র আহমদ মুসা বেরিয়ে এসেছে রাব্বি ড. হাইম হাইকেলের বাসা থেকে।

ড. হাইকেলের বাসা সীল করা। আহমদ মুসা প্রবেশ করে পেছনের এমারজেন্সী এক্সিট দিয়ে। আহমদ মুসা ল্যাসার বীম দিয়ে এক্সিটটির দরজা খুলতে গিয়ে দেখে জরুরি দরোজারটার তালা খোলা। বুঝে নেয় আহমদ মুসা তার আগে আরোও এক পক্ষ এ পথ দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেছিল। সে পক্ষ যে আজর ওয়াইজম্যান বা জেনারেল শ্যারনদেরই কেউ হবে সে ব্যাপারেও তার কোন সন্দেহ নেই। আহমদ মুসা আরও বুঝে নেয়, যে তথ্যের সন্ধানে আহমদ মুসা ড. হাইম হাইকেলের বাড়িতে প্রবেশ করেছে তা পাবার কোন সম্ভাবনা নেই।

সত্যি তাই। আহমদ মুসা ভেতরে ঢুকে দেখে সবগুলো ঘর লন্ড ভন্ড। কোন কাগজপত্রের চিহ্ন কোন ঘরে নেই। কম্পিউটারের মেমোরিতে কিছুই নেই। ডিস্ক থেকে সবকিছুই মুছে গেছে। ধ্বংসকারী কোন ওয়েভ পুড়িয়ে গেছে, মুছে দিয়ে গেছে সব। স্পুটনিকের ল্যাবও এই অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে ধ্বংস করা হয়েছিল।

তবে স্টিলের ফাইল ক্যাবিনেটের বটম ক্যাবিনেটের তলায় বুক সাইজের ইঞ্চি খানেক পুরু স্টিলের এয়ারটাইট একটা কেস পেয়েছে। সুইচ-লক খুলে সে দেখেছে ভেতরে একটা ইনভেলাপে ফিল্ম জাতীয় কিছু আছে। গুরুত্বপূর্ণ একটা ফ্যামিলি ডকুমেন্ট হতে পারে এবং উৎকৃষ্ট একটা সুভেনীর মনে করে আহমদ মুসা সেটা ব্যাগে তুলে নেয়।

সামনেই ড. আয়াজ ইয়াহুদের বাড়ি।

ড. আয়াজের কথাই ভাবছিল আহমদ মুসা। লোকটির সাথে প্রথম সাক্ষাৎ খারাপ হয়নি। তার সাথে প্রথম দেখা এখনকার আলোচনায় কাজ দেবে। কোন সন্দেহ নেই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে এবং হয়তো বাইরেও আজর ওয়াইজম্যানদের লোক মোতায়েন আছে। আহমদ মুসা যে ড. হাইম হাইকেলকে খুঁজতে এসেছে, এটা ওরা জানতে পারে এবং এসে তাদের আলোচনায় আড়িও পাততে পারে। এটা ড. জ্যাকবের ঘটনায় প্রমাণ হয়েছে। সে দেখেছে যখন রাব্বি ড. জ্যাকব ড. হাইম হাইকেল সম্পর্কে একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করতে যাচ্ছে, তখনই তাকে হত্যার জন্যে গুলী করা হয়েছে। লক্ষ্য ছিল ড. জ্যাকবের মুখ বন্ধ করা। যে কথা তখন তারা বলতে দেয়নি, সে কথা পরে আহমদ মুসা ড. জ্যাকবের কাছ থেকে শুনেছে। ড. জ্যাকবের বলা সে কথাটি হলো, ড. হাইকেল তাকে একদিন বলেছিল, 'ধর্মের নামে অর্ধমের হিংস্রতা আর বরদাশত হয় না। সত্যের উপর অসত্যের বলৎকার সত্যিই অসহনীয়। আমিও পাপ করেছি, অমার্জনীয় পাপ। প্রায়শ্চিত্য করার পথেও দুর্লংঘ দেয়াল।' ড. হাইকেলের এইকথা শুনে ড. জ্যাকব বিস্মিতকন্ঠে সঙ্গে সঙ্গে বলছিল, 'ধর্মের নামে অধর্মের হিংস্রতা কে করছে? কি পাপ করেছেন আপনি? প্রায়শ্চিত করার পথে কে আপনাকে বাধা দিচ্ছে?' ড. জ্যাকবের এই প্রশ্নে ভীত হয়ে পড়েছিল ড. হাইম হাইকেল। সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেকে সংকুচিত করে নেয়। চারদিকে সর্তক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছিল, 'থাক মি.জ্যাকব কথাগুলো আপনার মাঝেই রেখে দেবেন। আরো লাখো আমেরিকানের মত আমিও স্বাধীন মানুষ নই। দানবের অক্টোপাশে বন্দী । তারপর চুপ হয়ে গিয়েছিল ড. হাইকেল। কোন কথাই তার কাছ থেকে আর বের করা যায়নি।

আহমদ মুসার চিন্তা আবার ফিরে এল ড. আয়াজ ইয়াহুদের দিকে। ড. আয়াজ কি আজর ওয়াইজম্যানদের ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত? সেদিন ড. হাইকেলের উপর আক্রমণের সাথে জড়িতদের কি তিনি জানেন? ড. আয়াজ ইয়াহুদের সেদিনের আচরণ ও কথা-বার্তায় আহমদ মুসার এটা মনে হয়নি। আবার হতে পারে ড. আয়াজ গভীর পানির মাছ।

ড. আয়াজ ইয়াহুদের বাড়ির মখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে আহমদ মুসা। গেটের কলিং বেলের সুইচ হাতের নাগালের মধ্যে। কিন্তু কলিং বেলে চাপ দেবার আগেই গেটম্যানকে তার দিকে আসতে দেখল।

আহমদ মুসাও তার দিকে এগুলো।

'স্যার কাকে চাই?' গেটম্যান বলল বিনীতভাবে।

'এইমাত্র আয়াজ ইয়াহুদ স্যারের সাথে টেলিফোনে কথা হয়েছে। তিনি আমাকে তাড়াতাড়ি আসতে বলেছেন। দরজা খুলুন।' বলল আহমদ মুসা।

'ঠিক আছে স্যার আমি সিকিউরিটির লোকদের একটু জিজ্ঞাসা করে আসি।'

'না, দরকার নেই। দেরি হয়ে যাবে।' বলে দরজায় ঠেলা দিল।

গেটম্যান একটু চিন্তা করল, তারপর আহমদ মুসার দিকে একবার তাকাল। তারপর দরজা খুলে একপাশে সরে গেল।

আহমদ মুসা প্রবেশ করল ভেতরে।

'স্যার সোজা চলে যান। সামনের দরজা খোলা। ওটা অভ্যর্থনা কক্ষ। অভ্যর্থনা কক্ষের পরেই অফিসিয়াল ড্রইংরুম। আমি আসব সাথে?' বলল গেটম্যান।

'না সাথে আসার প্রয়োজন নেই। তার চেয়ে গেট রক্ষা করুন।' বলল আহমদ মুসা।

কথাগুলো বলতে বলতেই আহমদ মুসা হাঁটা দিয়েছিল দরজাটির লক্ষ্যে।

দরজাটি বাড়িতে ঢোকার একমাত্র প্রবেশ পথ। দরজার পশ্চিম পাশে একটা সিঁড়িঘর। এ সিঁড়িঘরের প্রবেশ পথ পশ্চিম দিকে। এ প্রবেশ পথে আসার

পথও ভিন্ন। এর ফলে ড. আয়াজ ইয়াহুদের ডুপ্লেক্স ফ্লাটের পথ সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেছে।

এই রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং-এর একতলা ও গ্রাউন্ড ফ্লোর নিয়ে এই ডুপ্লেক্স। এখানেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ড. ইয়াহুদ থাকে। তিন তলা থেকে উপরে থাকে তাঁর অন্যান্য স্টাফরা।

আহমদ মুসা দরজার সামনে গিয়ে মুহূর্তের জন্যে দাঁড়িয়েই টোকা দিল দরজায়। তারপর দরজা খোলার অপেক্ষা না করেই ঘরে ঢুকে গেল। চোখ ধাঁধানো সুন্দর ঘরটির একদম পুব প্রান্তে সুন্দর একটা টেবিলকে সামনে নিয়ে বসে আছে রিসেপশনিস্ট এক তরুণী।

আহমদ মুসা ঘরে ঢুকতেই সে উঠে দাঁড়াল। তার চোখে-মুখে চাঞ্চল্য। আহমদ মুসা অনুমতির অপেক্ষা না করে ঘরে প্রবেশ করার জন্যেই হয়তো এই চাঞ্চল্য। বলল রিসেপশননিস্ট তরুণীটি, 'স্যার হঠাৎ এভাবে........কি চাই আপনার?'

বলতে বলতেই তরুণীটি তার চেয়ার থেকে সরে আহমদ মুসার দিকে কিছুটা এগিয়ে এল।

'আমি স্যারের সাথে দেখা করতে এসেছি, জরুরি। নিয়ে চল।' বলল আহমদ মুসা।

'স্যার আপনি বসুন। আমি তাঁকে বলে আসি'। রিসেপশনিস্ট তরুণীটি বলল।

'না, অতটা সময় আমি দিতে পারবো না।' বলল আহমদ মুসা।

'তাহলে স্যার, টেলিফোনে তাঁকে বলি?' তরুণীটি বলল।

আহমদ মুসা ভাবল, তাও হতে দেয়া যাবে না। কাউকে কোন খবর দেয়ার কিংবা নিজস্ব প্রস্তুতির কোন সুযোগ দেয়া যাবে না। এ চিন্তা থেকেই আহমদ মুসা বলে উঠল, 'প্রয়োজন নেই। ভয় নেই। তিনি আমার পরিচিতি। নিয়ে চল আমাকে।'

মেয়েটির এরপরও দ্বিধা করছিল। কিন্তু আহমদ মুসার কঠোর হয়ে ওঠা মুখের দিকে চেয়ে তরুণীটি আর কিছু বলতে সাহস পেল না। 'আসুন স্যার' বলে

হাঁটতে শুরু করল তরুণীটি ড্রইংরুমের দরজার দিকে। কিন্তু কয়েক ধাপ এগিয়েই তরুণীটি তার টেবিলে ফিরে এল। টেবিলের ড্রয়ার খুলে ছোট একটা ভ্যানিটি কেস হাতে তুলে নিল। ভ্যানিটি কেসটাও খুলল ডান হাতের তর্জনি দিয়ে কি একটা পরখ করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আবার হাঁটা দিল।

আহমদ মুসাও দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সেও হাঁটা শুরু করল। নিচের ড্রইং লাউঞ্জ থেকেই দুতালায় উঠার সিঁড়ি। তরুণীটি আহমদ মুসার দিকে ফিরল। বলল,'স্যার উপরে আছেন। আপনি বসুন। আমি বলে আসি।'

'প্রয়োজন নেই। চলুন উপরে।' বলল আহমদ মুসা শান্ত, কিন্তু কঠোর নির্দেশের সুরে।

ভীত তরুণীটি অসহায় কন্ঠে বলল, 'স্যার আপনি যেতে পারেন। আমি এভাবে যেতে পারি না।'

'তোমার কোন ভয় নেই। তোমার কোন ক্ষতি হবে না। তোমাকে আমি সাথে নিচ্ছি পথ চেনার জন্যে নয়, তুমি যাতে এখনকার ঘটনা বাইরে কোথাও জানাতে না পার এজন্যই সাথে নেয়া। অতএব তোমাকে যেতেই হবে।' বলল আহমদ মুসা।

তরুণীটির চোখে-মুখে দেখা দিল আতংক। বিনা বাক্যব্যায়ে সে সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত উঠতে শুরু করল। আহমদ মুসা তার পিছু নিল।

দুতলার সিঁড়ির মুখ থেকেই থোকায় থোকায় সোফা সজ্জিত তারকাকৃতির বিরাট লাউঞ্জ। এটা ফ্যামিলি গ্যাদারিং-এর জায়গা।

সিঁড়িমুখে পৌঁছেই তরুণীটি পাথরের মত দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

আহমদ মুসা তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। দেখল, মাঝখানে দুটি সোফায় তিনজন বসে আছে। দেখেই আহমদ মুসা বুঝতে পেরেছিল একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ড. আয়াজ ইয়াহুদ। তার পাশে বসা তরুণীটি নিশ্চয় তার মেয়ে। তাদের সামনেই বসে মধ্যবয়সী এক ভদ্রমহিলা। মহিলা মিসেস আয়াজ ইয়াহুদ হবে তাতে কোন সন্দেহ নাই।

আহমদ মুসারা সিঁড়ি মুখে এসে দাঁড়াতেই দেখতে পেল সোফায় সোজা হয়ে বসে আছে ড. আয়াজ ইয়াহুদ। তার চোখে-মুখে কিছুটা বিস্ময় ও প্রশ্ন ফুটে

উঠেছিল। পরক্ষণেই সে প্রশ্ন করল তরুণীটিকে লক্ষ্য করে, ‘লিসা কি ব্যাপার?’ বলেই সে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘ইয়ংম্যান, তুমি তো সেই, যাকে সেদিন ড. জ্যাকবের উপর আক্রমণের সময় দেখেছিলাম? কিন্তু তুমি এখানে? এভাবে?’

‘হ্যাঁ স্যার, আমি সেই । আপনার কাছে কিছু জানার আছে। এজন্যে এসেছি।’ বলল আহমদ মুসা।

‘এ জানার কাজটা অফিসেও করা যেত। কিংবা সময় নিয়ে আসা যেত।’ তীব্র ক্ষোভ ও বিরক্তি ঝরে পড়ল ড. আয়াজ ইয়াহুদের কথায়।

‘স্যার আমি যা বলতে চাই, জানতে চাই তার জন্য এমন একটা পরিবেশ চাই। আপনি বিরক্ত হয়েছেন, কিন্তু আমার কথা আমাকে বলতে হবে।’ ঠান্ডা কিন্তু শক্ত কণ্ঠ আহমদ মুসার।

ড. আয়াজ ইয়াহুদ তাকাল তার স্ত্রী ও মেয়ের দিকে। ইংগিত করল উঠে যাবার জন্যে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আহমদ মুসা বলল, ‘স্যার ওঁরা এখানেই থাকবেন।’

ড. আয়াজ ইয়াহুদ বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল তাকাল আহমদ মুসার দিকে। তারপর ইংগিত করল তার রিসেপশনিস্ট লিসাকে চলে যাবার জন্যে। কিন্তু এবারও আহমদ মুসা বাধ সাধল। বলল, ‘ওকে নিচে রেখে আসতে চাইনি বলেই সাথে নিয়ে এসেছি। সেও এখানে থাকবে স্যার।’

ড. আয়াজ ইয়াহুদ চোখ ফেরাল আহমদ মুসার দিকে। তার চোখে-মুখে কিছুটা দিশেহারা ভাব, সেই সাথে একরাশ জিজ্ঞাসা। বলল, ‘আমি কিছু বুঝতে পারছি না মি. ......................।’

‘আইজ্যাক দানিয়েল।’ বলল আহমদ মুসা।

‘হ্যাঁ, আইজ্যাক দানিয়েল, তোমার কথা আমার সাথে, এদের কি প্রয়োজন?’ ড. আয়াজ ইয়াহুদ বলল।

‘পরে বুঝবেন স্যার।’ বলল আহমদ মুসা।

আবারও বিস্ময়ের দৃষ্টি নিয়ে তাকাল ড. আয়াজ ইয়াহুদ আহমদ মুসার দিকে। একটু ভাবল। তারপর আহমদ মুসাকে বামপাশের খালি সোফাটা দেখিয়ে বলল, 'বস।'

'মাফ করবেন স্যার, আমি দাঁড়িয়ে থেকে কথা বলব। যাতে আমি চারিদিকের উপর নজর রাখতে পারি।' আহমদ মুসা বলল।

'কেন, তুমি কি কোন প্রকার ভয় করছ? আমার এখানে তো ভয়ের কিছু নেই।' বলল ড. আয়াজ ইয়াহুদ।

'স্যার, এটা আমার সাবধনতা।' আহমদ মুসা বলল।

'কথা বলার আগে তোমার পরিচয় আমার জানা দরকার।' বলল ড. আয়াজ ইয়াহুদ।

'আমি রাব্বি ড. হাইকেলের শুভাকাঙ্ক্ষী ও বন্ধু।' আহমদ মুসা বলল।

ভ্রুকুঞ্চিত হলো ড. আয়াজ ইয়াহুদের। বলল, 'ভাল। কিন্তু আমার সাথে তোমার কি কথা?'

'স্যার, রাব্বি ড. হাইম হাইকেল কোথায়? তাঁর কি হয়েছে জানতে চাই।' বলল আহমদ মুসা খুব শান্ত কন্ঠে।

'এটা জানার জন্যে তোমার এত বড় আয়োজন? বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কারোও কাছে জিজ্ঞাসা করলে এটা জানতে পারতে?' ড. আয়াজ ইয়াহুদ বলল।

'আপনার কাছে জানতে চাই। আপনি যা জানেন, অন্যেরা তা জানে না।'

কিছুটা বিব্রতভাব ড. আয়াজ ইয়াহুদের চোখে-মুখে। বলল, 'তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন না। বাড়িতেও তিনি নেই। তার আত্নীয়-স্বজনের বাসাতেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। হঠাৎ তিনি নিরুদ্দেশ হয়েছেন। পুলিশে এটা জানানো হয়েছে। এইতো আমি জানি।'

'আপনি আরও জানেন যে, একটি শক্তিশালী মহল তাকে কিডন্যাপ করেছে এবং তারাই সেদিন ড. জ্যাকবকে খুন করার চেষ্টা করেছিল।'

আহমদ মুসা একথা বলার সাথে সাথে একটা চমকে উঠা ভাব ফুটে উঠল ড. আয়াজ ইয়াহুদের চোখে মুখে। কিন্তু নিজেকে সামলে ক্রুদ্ধ কন্ঠে বলে উঠল, 'তুমি অনধিকার চর্চার শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছ ইয়ংম্যান।'

'স্যার আপনি অপরাধী চক্রকে আড়াল করছেন। পুলিশ তাঁর অনুসন্ধানের ব্যাপারে আন্তরিক নয়, এটাও আপনি জানেন।' ঠান্ডা, কিন্তু শক্ত কন্ঠে বলল আহমদ মুসা।

ক্রুদ্ধভাবে উঠে দাঁড়াল ড. আয়াজ ইয়াহুদ। বলল তীব্র কন্ঠে, 'এসব বানোয়াট কথা বন্ধ কর। বেরিয়ে যাও তুমি।'

আহমদ মুসা একটু হাসল। বলল, 'আরও আছে স্যার, আপনারা ড. হাইম হাইকেল চিন্তার ভারসাম্যহীনতায় ভুগছে, একথা প্রচার করে তার নিরুদ্দেশ হওয়াটাকে স্বাভাবিক দেখাতে চাচ্ছেন।'

এই সময় ড. আয়াজ এর মেয়ে নুমা ইয়াহুদ টেবিলের উপর থেকে 'রিমোট কলার' টেনে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সাথে বোতাম টিপে দিল।

টের পেয়ে গিয়েছিল আহমদ মুসা। প্রথমটায় চোখ দুটি জ্বলে উঠেছিল আহমদ মুসার। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিল আহমদ মুসা। বলল আহমদ মুসা নুমা ইয়াহুদকে লক্ষ্যে করে, 'ধন্যবাদ ম্যাডাম, প্রশংসনীয় ক্ষিপ্রতার জন্যে। পিতার উপযুক্ত সন্তানের কাজ করেছেন।'

আহমদ মুসা তার কথা শেষ করার আগেই নিচতলায় দ্রুত পদশব্দ শুনতে পেল।

আহমদ মুসা সিঁড়ি মুখের সামনে থেকে একটু সরে রেলিং-এ ঠেস দিয়ে নিচে তাকিয়ে বলল, 'সিকিউরিটি উপরে এস। স্যার ডাকছেন। কুইক।'

দুজন সিকিউরিটির লোক এক দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আসতে লাগল। দুজনের হাতেই স্টেনগান। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিকিউরিটি ব্রিগেডের লোক এরা। পরণে কালো পোশাক, মাথায কালো হেলমেট।

ওরা সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে সিঁড়ির মুখে দাঁড়াল। তাকাল ড. আয়াজ ইযাহুদের দিকে নির্দেশ লাভের জন্যে।

ড. আয়াজ ইয়াহুদ আহমদ মুসাকে দেখিয়ে বলল, 'ওকে ধরে বাইরে নিয়ে যাও এবং পুলিশে দাও। অবৈধ প্রবেশ ছাড়াও ড. হাইকেলের নিরুদ্দেশের ঘটনার সাথে এই লোক সংশ্লিষ্ট হতে পারে, এটাই তার বিরুদ্ধে অভিযোগ।'

'আব্বা পুলিশে দেয়া কেন? উনি তো কিছু জানতে এসেছিল।' নুমা ইয়াহুদ তার পিতাকে লক্ষ্য করে বলল।

'চুপ কর নুমা। সেদিনের ঘটনা, আজকে এভাবে প্রবেশ এবং প্রশ্নগুলোর ধরণ প্রমাণ করে ড. হাইকেলের ঘটনার সাথে সে শুধু জড়িতই নয়, কোন উদ্দেশ্যে আমাদেরকে ব্ল্যাক মেইল করতে চাচ্ছে।' বলে ড. আয়াজ ইয়াহুদ সিকিউরিটিকে বলল, 'নিয়ে যাও একে।'

সিকিউরিটির লোক দুজন আহমদ মুসার দিকে এগুলো। আহমদ মুসার কাছাকাছি হয়ে তারা স্টেনগান এক হাতে নিয়ে আর এক হাত খালি করল। স্টেনগানের ব্যারেল তারা আহমদ মুসার সমান্তরালে তুলে রাখল।

আহমদ মুসা নির্লিপ্তভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সিকিউরিটির লোকেরা অগ্রসর হলে হেলান দেয়া অবস্থা থেকে শুধু সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু আহমদ মুসার মধ্যে প্রতিবাদ বা প্রতিক্রিয়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। সুতরাং সিকিউরিটির লোকেরা নিশ্চিন্তভাবে আহমদ মুসাকে ধরে নেবার জন্য অগ্রসর হচ্ছিল।

সিকিউরিটির দুজন লোক আহমদ মুসার নাগালের মধ্যে পৌঁছতেই আহমদ মুসার দুহাতের কারাত চোখের পলকে বজ্রপাতের মত গিয়ে আঘাত করল তাদের হেলমেটের ঠিক ধার ঘেঁষে কানের নিচের নরম জায়গাটায়।

দুজনের দেহই টলে উঠে পাক খেয়ে আছড়ে পড়ল মেঝের উপর।

ঘটনার আকস্মিকতায় বিস্ফারিত হয়ে হয়ে উঠেছিল ড. আয়াজ ইয়াহুদদের চোখ। তারা যেন অজান্তেই উঠে দাঁড়িয়েছিল।

আহমদ মুসা সিকিউরিটি দুজনের স্টেনগান কুড়িয়ে নিয়ে নিচে ছুঁড়ে দিয়ে বলল ড. আয়াজ ইয়াহুদদের লক্ষ্যে করে, 'আপনারা বসুন। আমার কথা শেষ হয়নি।'

আহমদ মুসার কথার রেশ মিলিয়ে যাবার আগেই ওরা পুতুলের মত বসে পড়ল।

আহমদ মুসা কথা শেষ করে মুহূর্তের জন্যে একটু থেমেছিল। তারপর বলল, 'ড. আয়াজ ইয়াহুদ আপনি আমাকে ড. হাইকেলের নিরুদ্দেশ হবার ঘটনার

সাথে জড়িত করতে চাচ্ছিলেন। হতভাগ্য ড. হাইকেল সম্পর্কে যে-ই অনুসন্ধান এগিয়ে আসবে, তাকে সরিয়ে দেবারই এটা একটা কৌশল। এর অর্থ ড. হাইকেলকে নিরুদ্দেশ বা হত্যা করার সাথে আপনি জড়িত আছেন।'

ড. আয়াজ ইয়াহুদের বিস্মিত-বিব্রত চেহারায় ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল। কঁকিয়ে উঠে বলল, 'না এটা মিথ্যা কথা, আমি ড. হাইকেল নিরুদ্দেশ বা হত্যার সাথে জড়িত নেই। আমি...................।' কথা শেষ করতে পারল না ড. আয়াজ ইয়াহুদ। তার কন্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

ড. আয়াজ ইয়াহুদ থেমে যেতেই তার মেয়ে নুমা ইয়াহুদ বলে উঠল, 'আমি এই বিশ্বাবদ্যালয়ের ছাত্রী এবং ফেইথ স্টাডিজ বিভাগেরই। আমি খুব ভালো করে জানি, ড. হাইকেল আংকলের সাথে আব্বার সম্পর্ক বরাবরই খুব ভালো। ড. হাইকেল আংকেল যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টের পদ ছাড়লেন, তখন তিনি চেষ্টা করেছিলেন আব্বা যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট হন। আর আব্বা প্রেসিডেন্ট হলেও ড. হাইকেল আংকেলকে সিনিয়ার হিসাবে সব সময় শ্রদ্ধা করেন। ড. হাইকেল আংকেলকে নিরুদ্দেশ করা বা হত্যা করার কোন মটিভ আব্বার তরফ থেকে থাকা বাস্তব নয়।'

'ধন্যবাদ ম্যাডাম নুমা। আপনি ভাল তথ্য দিয়েছেন। কিন্তু 'মটিভ' অনেক সময় ব্যাক্তিগত নাও হতে পারে, সামষ্টিক বা সম্প্রদায়গতও হতে পারে।' আহমদ মুসা শান্ত কন্ঠে বলল।

অন্ধকার নামল নুমা ইয়াহুদের মুখে। আহমদ মুসা যে কথা বলেছে তা এক তিলও মিথ্যা নয়।

ইহুদী তরুণী নুমা যেমন সুন্দরী, তেমনি বুদ্ধিদীপ্ত তার চেহারা। সে রাব্বানিক্যাল ইউনিভার্সিটির ফেইথ স্টাডিজ বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্রী।

আহমদ মুসার কথা নিয়ে সে একটু ভাবল। তারপর বলল, 'আব্বার ক্ষেত্রে সে ধরনের কোন সামষ্টিক ও সাম্প্রদায়িক মটিভ আছে কি?

আহমদ মুসা একটু পেছন সরে রেলিং-এ হেলান দিল। তারপর বলল, 'ড. হাইম হাইকেল এমন একটা ভয়াবহ বিষয় সম্পর্কে জানতেন যে বিষয়টি

প্রকাশ হয়ে পড়লে তাদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থে বিপর্যয় নামতে পারে। সেজন্য একটা গ্রুপ তাকে হত্যা বা লোক চক্ষুর আড়ালে নিতে চেয়েছে।'

বিস্ময়ে বিস্ফারিত হলো নুমা ইয়াহুদের চোখ। ড. আয়াজ ইয়াহুদও চমকে উঠে চোখ তুলেছে আহমদ মুসার দিকে। মিসেস আয়াজ ইয়াহুদের চোখে-মুখে নেমে এসেছে ভয়ের ছায়া।

বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিয়ে নুমা ইয়াহুদ জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসাকে, 'আপনি নিশ্চয় ইহুদী সাম্প্রদায়িক স্বার্থের দিকেই ইংগিত করেছেন। ইহুদী-কম্যুনিটির স্বার্থ তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিপর্যয়ের মুখেই। বিদেশ থেকেই আসা জেনারেল শ্যারনের বাড়াবাড়ি, বিজ্ঞানী জ্যাকবের মত ইহুদী নেতৃস্থানীয় লোকদের অগ্রহণযোগ্য ও চরম অপরাধমূলক অন্তর্ঘাত, আর বিস্ময়কর আহমদ মুসার সাথে মার্কিন সরকারের আঁতাত বিপর্যস্ত করেছে ইহুদী কম্যুনিটিকে। এর বাইরে আরও এমন কি ভয়ংকর তথ্য আছে, যা প্রকাশ করলে ইহুদী-কম্যুনিটির স্বার্থ আরও বিপর্যস্ত হবে? থাকলেও ড. হাইকেলের মত একজন নিষ্ঠাবান ইহুদী তা প্রকাশ করতে যাবেন কেন, 'যার কারণে তাকে লোকচক্ষুর আড়ালে ঠেলে দেবার দরকার হবে?'

'মিস নুমা এ প্রশ্ন আপনি আপনার পিতাকে করুন।' শান্ত কন্ঠে বলল আহমদ মুসা।

নুমা ইয়াহুদের চোখে-মুখে আরেক দফা অন্ধকার নামল। সে তাকাল তার পিতার দিকে।

ড. আয়াজ ইয়াহুদের চেহারা বিপর্যস্ত। নতুন এক ভয়ের দৃশ্য তার চোখে-মুখে। 'না নুমা এমন কোন তথ্য আমি জানি না। আমি............।'

আবারও কথা শেষ করতে পারল না ড. আয়াজ ইয়াহুদ।

'কথা শেষ করুন ড. আয়াজ ইয়াহুদ।' শক্ত কন্ঠে বলল আহমদ মুসা।

ড. আয়াজ ইয়াহুদ চোখ তুলে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে তার চোখ-মুখ। কিছু বলতে পারল না সে।

'আব্বা আপনাকে ভীত দেখছি কেন? কেন এই ভয়? ইনি তো আমাদের ভয় দেখাননি, বরং আমরাই সিকিউরিটি ডেকেছিলাম। সত্য কিছু থাকলে তা বলা

প্রয়োজন আব্বা। দেখা যাচ্ছে উনি অনেক কিছুই জানেন।' বলল নরম কন্ঠে নুমা ইয়াহুদ।

মাথা নিচু করল ড. আয়াজ ইয়াহুদ।

'ঠিক মিস নুমা। আমি ভয় দেখাইনি। আমি কিছু জানতেই এসেছি। আমি ড. হাইকেলকে সাহায্য করতে চাই। ড. আয়াজ যা জানেন তা দিয়ে যদি আমকে সাহায্য না করেন, তাহলে জানার জন্য আমি যে কোন উপায় অবলম্বন করব। ড. হাইকেলকে সাহায্য করার ব্যাপারে কোন বাধা আমি মানবো না।' বলে আহমদ মুসা পকেট থেকে রিভলবার বের করে হাতে নিল।

নুমা ইয়াহুদসহ সকলেই তার দিকে চোখ তুলল। ড. আয়াজ ইয়াহুদ ও মিসেস আয়াজ ইয়াদের চোখে-মুখে অপরিচিত ভয়। কিন্তু নুমা ইয়াহুদের চোখে-মুখে এবার ভয় নয়, বিমুগ্ধতা। তার মনে এখন আর কোন সন্দেহ নেই, আহমদ মুসা যা করছে তা ড. হাইকেলকে সাহায্যের জন্যেই করছে। আহমদ মুসা একজন বিপদগ্রস্তের পক্ষ নেয়া এবং তার কথায় ঋজুতা ও সাহস এবং সর্বোপরি বিপদ ও চরম উত্তেজনাকর অবস্থার মধ্যেও অদ্ভুত স্বাভাবিক ও সরল আচরণ তাকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ করেছে। অবিশ্বাস্য এক ফিল্মী চরিত্র জীবন্ত রূপ নিয়ে যেন তার সামনে।

কারও মুখে কোন কথা নেই।

আহমদ মুসাই নিরবতা ভাঙল। বলল, 'ড. আয়াজ ইয়াহুদ আমার সময় খুবই কম। আমি আর সময় দিতে পারছি না।' আহমদ মুসার কন্ঠ শান্ত, কিন্তু বুলেটের মতই বিদ্ধকারী।

'বলুন আব্বা। উনি তো ড. হাইকেল আংকেলকেই সাহায্য করতে চান।' নুমা ইয়াহুদ বলল।

মুখ তুলল ড. আয়াজ ইয়াহুদ। তাকাল আহমদ মুসার দিকে পরিপূর্ণভাবে। বলল, 'মি. আইজ্যাক দানিয়েল। আপনি অবশ্যই জানেন না আপনি এক ভয়ংকর পথে পা বাড়িয়েছেন। আমি ভয় করি, আপনি এগুতে পারবেন না। মাঝখানে আমাদের সকলের ড. হাইকেলের পরিণতি হবে।' ভয়জড়িত নরম কন্ঠ তার।

নুমা ইয়াহুদ ও মিসেস আয়াজ ইয়াহুদ শুনছিল ড. আয়াজ ইয়াহুদের কথা। ড. আয়াজ ইয়াহুদের এ স্বীকৃতিতে অপার বিস্ময় ফুটে উঠেছে তার চোখে-মুখে। তাহলে ড. আয়াজ ইয়াহুদও জানেন যে, ড. হাইম হাইকেলের কি পরিণিতি হয়েছে। অথচ তারা এতদিন ড. আয়াজ ইয়াহুদের কাছ থেকেও জেনেছে চিন্তার কোন প্রকার ভারসাম্যহীনতা থেকেই ড. হাইম হাইকেল কোথাও চলে গেছেন!

ড. আয়াজ ইয়াহুদ থামতেই আহমদ মুসা বলে উঠল, 'ড. আয়াজ ইয়াহুদ, এ পথে পা দেবার আগেই আমি জানি এটা ভয়ংকর পথ। এখন বলুন আপনি কি জানেন?'

'আমি আপনাকে বেশি সাহায্য করতে পারবো না। আমি এতটুকু জানি যে, ড. হাইকেলকে কিডন্যাপ করা হয়েছে এবং যারা কিডন্যাপ করেছে তাদের লোকজন আমাদের চারপাশে আছে পাহারা দেবার জন্য, যাতে আমরা কোন কিছু করতে না পারি। সেদিন ওদের একজন খুন করার চেষ্টা করেছিল ড. জ্যাকবকে।'

'আপনি কি করে জানলেন, তিনি কিডন্যাপ হয়েছেন। কিডন্যাপকারীদের আপনি চেনেন?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

ওদের লোক আমার সাথে দেখা করেছে এবং বলেছে, আমি যেন পুলিশকে এবং অন্য সবাইকে একথা বলি যে অনেক দিন থেকে তিনি কিছুটা চিন্তার ভারসাম্যহীনতায় ভুগছিলেন। সম্প্রতি হঠাৎ তা বেড়ে যায়।' তারা আমাকে একজন মানসিক ডাক্তারের নাম দিয়েছে এবং বলেছে, আমি যেন বলি,এই ডাক্তারের কাছে যেতেন ড. হাইম হাইকেল।' একটু থেমেই আবার বলা শুরু করল, আমি ওদের কাউকে চিনি না। ওরা রাতে আসতো এবং মুখোশ পরে কথা বলতো।'

'আপনি পুলিশকে কিছু বলেছেন?' আহমদ মুসা বলল।

'ওদের কিছু বলেনি।'

'যে ডাক্তারের কথা ওরা বলেছে, সে ডাক্তারকে আপনি চেনেন? ঠিকানা জানেন?'

'ঠিকানা জানি।'

'বলুন ঠিকানাটা।'

ড. আয়াজ ইয়াহুদ ঠিকানা বললে লিখে নিল আহমদ মুসা।

‘ড. হাইকেলকে কোথায় রেখেছে? তিনি কি বেঁচে আছেন? কিছু জানেন?’

‘মি. আইজ্যাক দানিয়েল ওরা শুধু শোনার জন্যে আসে, কিছু বলার জন্য নয়।’

সঙ্গে সঙ্গে কথা বলল না আহমদ মুসা। একটু ভাবল। বলল, ড. হাইম হাইকেলের বাড়ির ঠিকানা বলুন। কোন সাহায্য যদি সেখান থেকে পাই।’

ড. আয়াজ ইয়াহুদ ঠিকানাটা দিয়ে বলল, ‘আমার মনে হয় তাঁর বাড়ি আমাদের চেয়ে আরও বেশি অন্ধকারে আছে।’

‘তাতে একটু সুবিধা পাওয়া যাবে। তাঁর বাড়ি তার নিরুদ্দেশ হওয়া নিয়ে পুলিশ ও আরও উপর মহলে হৈচৈ করতে পারবে, যা আপনারা পারেননি ওদের ভয়ে। কিডন্যাপকারীদের চাপে ফেলার জন্য এই হৈচৈ-এর প্রয়োজন আছে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘সেই ভয়াবহ তথ্যের কথা কি বলবেন, যে তথ্য ড. হাইম হাইকেল আংকেলের কাছে রয়েছে, যার কারণে তিনি কিডন্যাপ হয়েছেন?’ নুমা ইয়াহুদ বলল।

আহমদ মুসা তাকাল রিসেশনিস্ট লিসার দিকে। তারপর নুমা ইয়াহুদের দিকে ফিরে বলল, এইভাবে বলা যাবে না মিস নুমা।’

নুমা ইয়াহুদ ব্যাপারটা বুঝল। সেও তাকাল একবার লিসার দিকে। আহমদ মুসাও তাকাল আবার লিসার দিকে। বলল, ‘মিস লিসা, তোমার ভ্যানিটি ব্যাগটা কি আমি দেখতে পারি?’

সঙ্গে সঙ্গেই লিসার মুখ ভয়ে এতটুকুন হয়ে গেল। ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার মুখের রং। পাথরের মত সে স্থির হয়ে গেছে। ভ্যানিটি কেস ধরা তার হাত কাঁপছিল। ভ্যানিটি কেস তুলে ধরার শক্তি যেন তার নেই।

‘মাফ করবেন লিসা’ বলে আহমদ মুসাই তার হাত থেকে ভ্যানিটি কেসটি নিয়ে নিল।

আহমদ মুসা ভ্যানিটি কেসটি খোলা দেখতে পেয়েছিল, এখনও খোলাই আছে।

আহমদ মুসা ভ্যানিটি কেসে দেখল দিয়াশলাই সাইজের একটি রেকর্ডার চালু রয়েছে।

আহমদ মুসার মুখে একটুরো হাসি ফুটে উঠল। বলল লিসাকে লক্ষ্য করে, 'তোমার কক্ষেই তুমি এটা অন করেছিলে, তারপর তো এটা অন করাই ছিল। তাহলে তো সব কথাই রেকর্ড হয়েছে, তাই না?'

কোন উত্তরের অপেক্ষা না করে রেকর্ডার অফ করে দিয়ে অন করল রেকর্ড প্লেয়ারের সুইচ।

ফিরল আহমদ মুসা ড. আয়াজ ইয়াহুদের দিকে ।

চলছে রেকর্ড প্লেয়ার।

তাদের এতক্ষণের সব কথাই আবার বলে যাচ্ছে রেকর্ডার।

স্তম্ভিত ড. আয়াজ ইয়াহুদরা সকলেই।

এক সময় ড. আয়াজ ইয়াহুদ তীব্র কন্ঠে বলে উঠল, 'এতো সাংঘাতিক গোয়েন্দাগিরী? লিসা, এটা কি তুমি সরকারের নির্দেশে করছ।'

ভীত, বিপর্যস্ত লিসা বলার আগেই আহমদ মুসা বলল, 'না সে সরকারের পক্ষে নয়, ড. হাইম হাইকেলের কিডন্যাপকারীদের পক্ষে কাজ করছে।'

'বুঝলেন কি করে?' জিজ্ঞাসা নুমা ইয়াহুদের।

'তার ভয়ের ধরন দেখে বুঝেছি।' বলল আহমদ মুসা।

'ও গড!' বলে আর্তনাদ করে উঠল ড.আয়াজ ইয়াহুদ।

'আমি কি ঠিক বলেছি লিসা?' আহমদ মুসা জিজ্ঞেস করল লিসাকে।

ভয় ও আতংকে পান্ডুর মুখটি নত করল লিসা।

'তুমি কত টাকার বিনিময়ে এই কাজ করছ লিসা?'

ফুপিয়ে কেঁদে উঠল লিসা। কান্নার মধ্যে সে বলল, 'এক পয়সা আমি নেইনি। পয়সা নিয়ে স্যারের বিরুদ্ধে এমন কাজ আমি করতে পারি না। আমি একাজ না করলে ওরা আমাকে ও আমার আব্বা-আম্মাকে মেরে ফেলবে। রাজী

না হওয়ায় আমার আব্বাকে ওরা কিডন্যাপ করেছিল। বাধ্য হয়ে আমি রাজী হয়েছি।' কান্নায় রুদ্ধ হয়ে গেল তার শেষ কথাগুলো।

দুহাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল লিসা।

আহমদ মুসা দুপা এগিয়ে তরুণীর মাথায় আলতোভাবে হাত বুলিয়ে বলল, 'তোমাকে ওরা কি ধরনের দায়িত্ব দিয়েছিল?'

মেয়েটি মুখ তুলল। বলল, 'স্যারের সাক্ষাত করতে আসা লোকদের সাথে কি আলাপ হয় এবং টেলিফোনে কি কথা উনি বলেন, এসব রেকর্ড করা ছিল আমার দায়িত্ব। স্যারের অফিসের কথা-বার্তা ও টেলিফোনের কথা-বার্তাও রেকর্ড করা হয়েছে।'

'অফিসে কে করছে এই কাজ?' দ্রুত কন্ঠে জিজ্ঞাসা করল ড. আয়াজ ইয়াহুদ।

'আপনার পার্সোনাল এ্যাসিস্টেন্ট 'জন'।'

আমার বিশ বছরের পুরানো কর্মচারী জন!' বিস্ময় ও উদ্বেগ ঝরে পড়ল ড. আয়াজের কন্ঠে।

কথা শেষ করেই ড. আয়াজ ইয়াহুদ আবার বলে উঠল, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের আর কেউ জড়িত আছে কি না তুমি জান?'

'শুধু এটুকু জানি প্রফেসর ও প্রসাশনের মধ্যে আরও দুতিনজন জড়িত আছে। কিন্তু তাদের নাম জানি না স্যার।' বলল লিসা।

'তুমি যে তথ্য যোগাড় কর, সেগুলো কি তারা এসে নিয়ে যায়?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'না ওরা কেউ আসে না। ওদের নির্দেশ মত ক্যাসেট বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় রাখতে হয়। ওরা এসে সেখান থেকে নিয়ে যায়।' লিসা বলল।

'তুমি ওদের কাউকে চেন না?' আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

'ওদের একজনই দুবার আমাদের সাথে দেখা করেছে। আর কারো সাথে দেখা হয়নি। ঐ একজন লোক ছাড়া আমি কাউকে চিনি না।' বলল লিসা।

'ওরা এসব কেন করছে, কেন ড. হাইম হাইকেলকে কিডন্যাপ করেছে, এ ব্যাপারে কিছুই জান না তুমি?'

'হ্যাঁ, আমাকে রাজি করার যুক্তি হিসাবে ওরা বলেছে, 'নবী মুসা যেভাবে বনি ইসরাইলকে ফেরাউনের হাত থেকে রক্ষা করেছিল, সেভাবে আমরাও ইহুদী জাতিকে বিশেষ করে মার্কিন ইহুদী সম্প্রদায়কে রক্ষার জন্য কাজ করছি। সব ইহুদীরই উচিত আমাদের সহযোগিতা করা।' লিসা বলল।

আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়াল। তাকাল ড. আয়াজ ইয়াহুদের দিকে। বলল, 'স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনার কাছ থেকে পেয়েছি। প্রয়োজনে আপনাদেরকে যে কষ্ট দিয়েছি সেজন্য আপনাদের সকলের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

আহমদ মুসা কথা শেষ করতেই লিসা কান্নাজাড়িত স্বরে বলল, 'স্যার আমার কি হবে? আমি যদি ওদের তথ্য সরবরাহ করতে না পারি, তাহলে ওরা আমাদের সবাইকে মেরে ফেলবে।'

'কেন, তুমি এই ক্যাসেটটা নিয়ে যাবে। তাদের দেবে, তবে একটা শর্তে। শর্তটা হলো, ক্যাসেটটা ওরা যেখানে রাখতে বলবে, সে স্থানের কথা আমাকে সঙ্গে সঙ্গেই জানাতে হবে। তুমি বিপদে পড় এমন কিছু করব না।' বলল আহমদ মুসা।

'সর্বনাশ এ ক্যাসেট ওরা পেলে তো আমরা বিপদে পড়ব।' বলে উঠল আয়াজ ইয়াহুদ।

'স্যার নিশ্চিত থাকুন, ওরা ক্যাসেট শোনার সুযোগ পাবে না।' আহমদ মুসা বলল।

'এতটা নিশ্চয়তা আপনি কিভাবে দিতে পারেন। ঝুঁকি থেকেই যাবে'। বলল নুমা ইয়াহুদ।

'ঝুঁকি আবশ্যই থাকবে এবং এ ধরনের ঝুঁকি নিতে হবে।' আহমদ মুসা বলল।

'ক্যাসেটে যা আছে তাতে আমাদের পরিবার মহাবিপদে পড়বে। লিসা তো ক্যাসেট না দিলেও পারে, ওরা তো এ ঘটনার কথা জানছে না।' বলল নুমা ইয়াহুদ ।

'এতেও ঝুঁকি আছে। কারণ এ বাড়িতে বাইরের কে কখন আসছে এটা জানবার জন্য ওদের লোক আরো থাকতে পারে। বলল আহমদ মুসা।

নুমা এবং ড. আয়াজদের সকলের মুখ ম্লান হয়ে গেল।

'স্যার আমি আপনাদের বিপদে ফেলার জন্য আসিনি, অন্তত এ ব্যাপারে নিশ্চত থাকুন।' সান্ত্বনার সুরে আহমদ মুসা বলল।

বলেই আহমদ মুসা তার মোবাইল নাম্বার ও ক্যাসেট সমেত ভ্যানিটি ব্যাগ তুলে দিল লিসার হাতে আর বলল, প্রতিশ্রুতির কথা মনে রেখো লিসা।'

'ফিরল আহমদ মুসা ড. আয়াজ ইয়াহুদের দিকে। বলল, এক্সকিউজ মি স্যার, এক্সকিউজ মি ম্যাডাম, আমি আসি।'

'না, জনাব, আপনার কথা শেষ হয়েছে, কিন্তু আমাদের কথা শেষ হয়নি।' অনেকটা প্রতিবাদের সুরে সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠল নুমা ইয়াহুদ। আহমদ মুসা সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আবার রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

'আংকেল ড. হাইম হাইকেল এমন কি ভয়ংকর তথ্য জানতেন যার জন্য তার এই পরিণতি এবং যা চাপা দেয়ার জন্য এতো কিছু ঘটছে?' বলল নুমা ইয়াহুদ।

'ইহুদীবাদীদের এক ভয়ংকর পাপ তিনি জানেন।' আহমদ মুসা বলল।

'কি সে পাপ কাহিনী?' বলল নুমা ইয়াহুদ।

'স্যরি, বলার আগে আমাকে ভাবতে হবে। আমি চলি। সিকিউরিটি দুজনের সংজ্ঞা এখনি ফিরে আসবে।' বলে আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়াতে গেল।

'শুনুন আমার প্রশ্ন শেষ হয়নি।' আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল নুমা ইয়াহুদ।

দ্রুত আবার ঘুরে দাঁড়াল আহমদ মুসা। মুখ ফেরাল নুমা ইয়াহুদের দিকে।

নুমা ইয়াহুদই আবার কথা বলল, 'এতক্ষণের ঘটনায় আমার মধ্যে যে প্রশ্নটি সবচেয়ে বড় হয়ে উঠেছে সেটা হলো, আপনি কে? আমি যতটা শুনেছি তাতে একজনের সাথে আপনার মিল আছে। তিনি আহমদ মুসা। বলুন আপনি কে? আপনি আমেরিকান নন, অথচ এত কথা জানেন এবং ড. হাইম হাইকেলকে বন্ধু বলছেন। ড. হাইম হাইকেল কোনদিন বিদেশে যাননি। তার মত ঘরকুনো মানুষের বিদেশী বন্ধু থাকার কথা নয়।'

‘স্যারি নিরাপত্তাজনিত কারণেই আমার পরিচয় এখন আমি বলব না। তবে আমার সাথে আহমদ মুসার মিল দেখার ব্যাপারটা মজার হয়েছে। আহমদ মুসার সাথে তুলনা করার মত অত তথ্য আপনি কার কাছ থেকে পেয়েছেন?’ বলল আহমদ মুসা।

‘আমি জেনেছি আমার এক বন্ধু সারাহ জেফারসনের কাছ থেকে। আজ সকালেও তার সাথে কথা বলেছি।’ বলল নুমা ইয়াহুদ।

‘উনি এত কথা জানেন কি করে?’ আহমদ মুসা বলল।

‘শুধু জানেন তা নয়, আমার মনে হয় তিনি.......

কথা বলার মাঝখানে হঠাৎ থেমে গেল নুমা ইয়াহুদ। বলে উঠল, না থাক। অনুমানে কোন কথা বলা ঠিক নয়।’

থেমে পরমুহূর্তেই আবার বলে উঠল, ‘ভেবে বলবেন বলেছেন। কিভাবে বলবেন? আবার কি দেখা হবে?’

‘পৃথিবী গোল। দেখা হওয়াই স্বাভাবিক।’ বলেই আহমদ মুসা ‘সকলকে ধন্যবাদ, বাই’ কথাটি উচ্চারণ করে দ্রুত নামল সিঁড়ি বেয়ে।

আহমদ মুসা চোখের আড়াল হতেই মিসেস ইয়াহুদ, নুমা ইয়াহুদের মা, নিজের দেহকে সশব্দে সোফায় এলিয়ে দিয়ে বুকে ক্রস এঁকে বলল, ‘কি দেখলাম, কি ঘটল! সিনেমার চেয়েও ভয়ংকর। ঈশ্বর রক্ষা করেছেন।’

হাসল নুমা ইয়াহুদ। বলল, ‘তুমি এত ভয় পেয়ে গেছ আম্মা!’

‘ভয় পাব না! তোর আব্বার কথা, তোর কথা যদি বিশ্বাস না করতো, আরো কথা যদি আদায় করতে চাইতো, তাহলে কি ঘটতো ভাবতেও.............। দেখলি তো, তার হাতের এক ঘায়ে সিকিউরিটির লোক কুপোকাত। দেখতে নেহায়েত ভদ্রলোক, কিন্তু কাজে একেবারে আগুন।’ বলল মিসেস ইয়াহুদ।

‘তুমি ঠিক বলেছ আম্মা। তবে মি.আইজ্যাক দানিয়েল ক্রিমিনাল নন।’ নুমা ইয়াহুদ বলল।

‘ক্রিমিনাল এভাবে এত কিছু ঝুঁকি একজন ভালো লোককে সাহায্য করতে আসে না।’ বলল ড. আয়াজ ইয়াহুদ। একটু থামল। তারপর সোজা হয়ে বসে বলল, ‘আমি ভাবছি লোকটির মিশন নিয়ে। আমরা ড. হাইম হাইকেলের

আশা ছেড়ে দিয়েছি ভয় ও চাপে পড়েই। কিন্তু এই লোকটি এই লস্ট কেস নিয়েই ছুটেই এসেছে এবং মনে হচ্ছে সে ছুটবেই। এটা খুব বড় একটা ঘটনা এবং লোকটাও একজন বড় কেউ হবে।'

'আব্বা উনি যে ভয়ংকর তথ্যের কথা বললেন, যা ড. হাইম হাইকেল আংকেল জানতেন বলেই তাঁর এই দুর্ভোগ, সে সম্বন্ধে তুমি কিছুই জান না আব্বা?' বলল নুমা ইয়াহুদ।

'আমি সত্যি জানি না। তবে সেটাও কোন বড় ঘটনা হবে। হাইকেল পরিবার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। তারাই এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করে আসছেন। ড. হাইম হাইকেল বিশ বছর বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার পর কি হল তিনি বিশ্বাবদ্যালয় পরিচালনা থেকেই সরে দাঁড়ালেন! সরে দাঁড়ালেন আগের বিশ্বাস থেকে! সরে দাঁড়ালেন সামাজিকতার সকল ক্ষেত্র থেকেও! আমার মনে হতো, কি এক অসহ্য যন্ত্রণা তিনি চেপে রাখতে সদাব্যস্ত। লোকটির কথিক 'ভয়ংকর তথ্য'-এর সাথে ড. হাইম হাইকেলের এই গোটা মানসিক অবস্থার কি কোন যোগ আছে! যদি থাকে তাহলে তা হবে ভয়ংকর বড় এক তথ্য।' ড. আয়াজ ইয়াহুদ থামল। শান্ত গম্ভীর কন্ঠ তার।

'আব্বা, মি আইজ্যাক দানিয়েলের কথা যদি সত্য হয়, তাহলে ড. হাইম হাইকেলের সে ভয়ংকর তথ্যটি সামষ্টিক ও সম্প্রদায়গত। যদি তাই হয়, তাহলে ভয়ংকর তথ্যের ভয়ংকরতা আরও ভয়ংকর হতে বাধ্য।' নুমা ইয়াহুদ বলল।

'আমিও তাই মনে করি।' বলল ড. আয়াজ ইয়াহুদ।

'তাহলে পুলিশকে ব্যাপারটা বলা উচিত নয় কি?' নুমা ইয়াহুদ বলল।

'কিন্তু তথ্যটা আমরা জানি না। বলব কি?' বলল ড. আয়াজ ইয়াহুদ।

'তাহলে আব্বা মি. আইজ্যাক দানিয়েলকে আমাদের প্রয়োজন। তিনি সাহায্য চাইতে এসেছিলেন। এখন দেখছি, আমাদেরই সাহায্য চাওয়া উচিত তাঁর কাছে।' নুমা ইয়াহুদ বলল।

কথা শেষ করেই নুমা ইযাহুদ উঠে দাঁড়াল। রেলিং-এর উপর ঝুঁকে পড়ে নিচের দিকে তাকিয়ে ডাকল রিসেপশনিষ্ট লিসাকে।

লিসা আহমদ মুসার পরপরই নিচে নেমে গিয়েছিল।

দৌড়ে উপরে উঠে এল লিসা।

নুমা ইয়াহুদ লিসার কাছ থেকে আহমদ মুসার মোবাইল নাম্বারটা নিয়ে নিল। তারপর ফিরে এসে নিজের জায়গায় বসতে বসতে বলল, ‘এখন আমার মনে হচ্ছে, আইজ্যাক দানিয়েল ঈশ্বর প্রেরিত। তাকে আমাদের সাহায্য করা প্রয়োজন।’

‘কোন আবেগকে প্রশ্রয় দিও না। ড. হাইম হাইকেল হারিয়ে গেছেন। ড. জ্যাকব খুন হতে বেঁচে গেছেন। শুধু নিজের জন্য নয়, প্রতিষ্টানের স্বার্থও আমাদের কাছে বড়। এই স্বার্থ নিশ্চিত করে কিছু করা গেলে সেটা দেখা যাবে।’ বলে উঠে দাঁড়াল ড. আয়াজ ইয়াহুদ।

তার সাথে সাথে মিসেস ইয়াহুদও।

একটা বড় শ্বাস ছেড়ে মাথাটাকে একটু হাল্কা করার চেষ্টা করে সোফায় গা এলিয়ে দিল নুমা ইয়াহুদ। হাতের মোবাইল নাম্বারটার দিকে অলসভাবেই একবার চোখ বুলাল।

নিউইয়র্ক ফিফথ এভিনিউ-এর ফুটপাত ধরে এগুচ্ছিল একজন যুবক ও একটি বালক। যুবকটি আগে, বালকটি পেছনে।

ফিফথ এভেনিউ-এর যেখানে ইহুদী মিউজিয়াম ও রাব্বানিক্যাল ইউনিভার্সিটির সীমা একসাথে মিশেছে, সেখানে পৌঁছে যুবকটি দাঁড়াল। ফিরে তাকাল বালকটির দিকে। পরক্ষণেই ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার হাঁটতে শুরু করল যুবকটি। আর বালকটি পেছন ফিরে উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করল।

যুবকটিকে দাঁড়াতে দেখে আহমদ মুসা সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারণ দুই সীমানার ঐ সংযোগস্থলেই লিসা তার ক্যাসেটটি রেখেছে বলে তাকে জানিয়েছে। আহমদ মুসা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকার সবচেয়ে কাছের গেটে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। আহমদ মুসা নিশ্চিত, ক্যাসেটটি রাখার পর তা

নিতে ওরা খুব দেরি করবে না। তাই আহমদ মুসা খবরটি লিসার কাছ থেকে পাওয়ার পরই এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

যুবকটিকে চলে যেতে দেখে এবং বালককে উল্টো যাত্রা শুরু করতে দেখে হতাশ হলো আহমদ মুসা। আহমদ মুসা বুঝল, কোন কথা হঠাৎ মনে হওয়ায় যুবকটি বালককে কোন কাজে কোথাও ফেরত পাঠিয়েছে। ওরা তার টার্গেট নয়।

দুতিন মিনিটও যায়নি। হঠাৎ আহমদ মুসা দেখল বালকটি তার সামনে দিয়ে আবার ফিরে আসছে। বিস্মিত হলো আহমদ মুসা। যে সময় গেছে তাতে বালকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাও পার হতে পারেনি। কি কাজে গিয়েছিল? এরই মধ্যে কি কাজ শেষ হলো?

আহমদ মুসার চোখ বালকটিকে অনুসরণ করলো।

বালকটি গিয়ে থমকে দাঁড়াল সে সংযোগ স্থলে।

অজান্তেই আহমদ মুসা সোজা হয়ে উঠল। সেই একই জায়গায় বালকটি আবার দাঁড়াল।

কি ব্যাপার? প্রশ্নটি মনে জেগে ওঠার সাথে সাথে আহমদ মুসার সব স্নায়ুতন্ত্রী খাড়া হয়ে উঠল।

বালকটি দাঁড়িয়ে পড়েই দুপা এগিয়ে সীমান্ত রেলিং-এর পাশে পৌঁছেই নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ল এবং রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে ডান হাত ভেতরে ঢুকিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই আবার বের করে নিল। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই হাঁটা শুরু করল সামনে যেদিকে যুবকটি গেছে সেদিকে।

আহমদ মুসার কাছে সব বিষয়ই পরিস্কার হয়ে গেল। বালকটিকে ক্যাসেট দেখিয়েই ফেরত পাঠানো হয়েছিল পরে একা এসে নিয়ে যাবে এ জন্য। খুব সাবধানী ওরা, ঝুঁকিটা বালকের উপর দিয়ে যাচ্ছে। বালক ভাড়া করাও হতে পারে।

আহমদ মুসা পিছু নিল বালকটির।

বালকটি একই গতিতে হাঁটছে। একবারও পেছনে ফিরে তাকায়নি।

ইহুদী মিউজিয়াম পার হবার পর বালকটি একটা গলিতে ঢুকে গেল।

আহমদ মুসা তাকে অনুসরণ করল। আহমদ মুসার লক্ষ্য হলো, তাকে অনুসরণ করে ওদের কোন ঠিকানার সন্ধান লাভ করা এবং সেই সাথে ক্যাসেটটি তাদের হাত থেকে উদ্ধার করা।

বালক দক্ষিণমুখী সে গলি থেকে পুর্বমুখী আরেক গলিতে প্রবেশ করল।

পুবের গলিতে বেশ কিছুটা এগুবার পর আহমদ মুসার হঠাৎ মনে হলো বালটিকে তার এ ফলো করা ওরা ধরে ফেলেছে। জেনে ফেলেছে বালকও। তারা সময় ক্ষেপণ করছে আহমদ মুসাকে ফাঁদে আটকাবার জন্যে।

এই চিন্তা মনে আসার সাথে সাথেই আহমদ মুসা মনে করল, ওদের ফাঁদ পাতা সম্পূর্ণ হবার আগেই বালককে ধরা প্রয়োজন এবং ক্যাসেটটাকে হাত করা দরকার। বালকের কাছ থেকেও ওদের কোন তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

নিঃশব্দে আহমদ মুসা দৌড় দিল বালকটিকে লক্ষ্য করে। কয়েক লাফে আহমদ মুসা পৌঁছে গেল বালকটির কাছে।

শেষ মুহূর্তে বালকটি টের পেয়ে গিয়েছিল। সেও দৌড় দিয়েছিল। কিছুটা এগুলোও। কিন্তু ধরা পড়ে গেল আহমদ মুসার হাতে।

আহমদ মুসা তার এক হাত চেপে ধরে বলল, 'আমি তোমার শত্রু নই। আমি ক্যাসেটটা খুজঁছিলাম। তুমি পেয়ে গেছ। আমাকে দিয়ে দাও।'

আহমদ মুসার হাসি এবং তার শান্ত কথা শুনে বালকটি তাকাল আহমদ মুসার দিকে। তার চোখে আস্থা স্থাপনের একটা জিজ্ঞাসা।

পাশেই গাড়ির শব্দ শুনতে পেল আহমদ মুসা। শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আহমদ মুসা বালকটির হাত ছেড়ে দিয়ে এক ধাপ পিছিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

তীব্র গতিতে একটা গাড়ি রাস্তার ওপাশ দিয়ে সামনের দিকে ছুটে আসছিল। গাড়িটি ছোট মাইক্রো। দরজা খোলা। স্টেনগানের একটা নগ্ন ব্যারেল ঝিলিক দিয়ে উঠল আহমদ মুসার চোখে।

স্টেনগানের ব্যারেল ঝিলিক দেয়ার সাথে সাথেই আহমদ মুসার কাছে বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে গেছে।

আহমদ মুসা হাত বাড়িয়ে বালকটির জামার কলার ঠেনে ধরে পেছনে দিকে ছিটকে পড়ল। তার আগেই স্টেনগান গর্জন করে উঠেছে।

আর্তনাদ করে উঠেছে বালকটি। আহমদ মুসার বাম হাত প্রচন্ড শক্তির একটা ছোবলে কেপেঁ উঠছে।

ছিটকে পড়েই তাড়াতাড়ি উঠে বসল আহমদ মুসা। তাকাল সে বালকটির দিকে। কাতরাচ্ছে সে। দেখল বালকের বামপাশটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। নিজের হাতের যন্ত্রণাও সে অনুভব করতে পারছে। মনে হচ্ছে তার কনুয়ের একটু উপরে কিছুটা জায়গায় যেন ধারালো কিছু দিয়ে কেউ কেটে তুলে নিয়ে গেছে।

দৃষ্টি ফেরাল আহমদ মুসা গুলি বর্ষণকারী গাড়ির দিকে। মুহূর্তের জন্য সে দেখতে পেল গাড়িটাকে। উত্তর দিকে বাঁক নিয়ে গড়িটা চোখের আড়ালে চলে গেল।

বুঝল আহমদ মুসা বালক এবং সে দুজনই ওদের টার্গেট ছিল। তবে বালকটি ছিল প্রধান টার্গেট। তারা চায়নি বালকটি আহমদ মুসার হাতে পড়ুক।

বালকটি জ্ঞান হারায়নি। আহমদ মুসা তাকে পাঁজকালো করে তুলে নিয়ে সাত্বনা দিয়ে বলল, 'আমি তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি। তুমি ঠিক হয়ে যাবে। ভয় নেই তোমার।'

বালকটি আহমদ মুসার দিকে তাকাল। যন্ত্রণাকাতর কন্ঠে বলল, 'আপনি কি পুলিশের লোক?'

'না, আমি পুলিশ নই।' বলল আহমদ মুসা।

'ওরা আমাকে মারল কেন? কান্নায় সুরে বলল বালকটি।

'ওরা কারা তুমি জান?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার। তার চোখে একটা আশার আলো।

'ঐ গাড়ি আমি চিনি। ওদের গাড়ি ওটা।' বালকটি বলল।

'ওরা কারা?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'পরিচয় জানি না। ওদের একজনকে আমি চিনি। বাসায় গেছি।' কথা বলতে বলতেই এগুচ্ছিল আহমদ মুসা। পেয়ে গেল একটা ট্যাক্সি।

বালককে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে বলল, 'ড্রাইভার প্লিজ কোন হাসপাতালে নিয়ে চলুন।'

ছুটতে লাগল ট্যাক্সি।

‘আমার তো ইনসিওরেন্স কার্ড নেই। হাসপাতালে দেখাবার টাকাও নেই।’ বালকটি দুর্বল কন্ঠে করুণ সুরে বলল।

আহমদ মুসা মিষ্টি হাসল। বলল, ‘বলেছি না তোমার ভয় নেই, চিন্তা নেই। টাকা আমার কাছে আছে।’

বালকটি কিছু বলল না।

পরে বালকটি তার ডান হাত দিয়ে তার জ্যাকেটের বুক পকেট থেকে একটা মিনি ক্যাসেট বের করে আহমদ মুসার হাতে দিল। বলল, ‘এতে কি আছে? এখানে পড়েছিল কেন?’

‘এসব তুমি পরে শুনো। বেশি কথা বলা তোমার ঠিক নয়।’ আহমদ মুসা বলল।

বালকটি চুপ করল। কিন্তু একটু পর আবার বলে উঠল,‘খাবার সময়ও বাড়ি না গেলে মা খুব ভাববে। আমার মাকে আপনি খবর দিতে পারবেন? মা ছাড়া আমার কেউ নেই।’

‘বাড়ির ঠিকানা আমাকে দিও। আমি আবশ্যই তোমার মাকে খবর জানাব। কি করেন তোমার মা?’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমার মা পঙ্গু। হুইল চেয়ারে চলাফেরা করেন।’ বলল বালকটি।

একটা বেদনার ছায়া নামল আহমদ মুসার চোখে-মুখে। বলল, তোমাদের চলে কিভাবে?’

‘মা একটা ভাতা পান। কিন্তু সেটাও কমে গেছে। সব খরচ তাতে চলে না। আমাকেও কিছু আয় করতে হয়।’বালকটি বলল।

‘কি আয় কর তুমি? জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

বালকটি আহমদ মুসার প্রশ্নের কোন জবাব দিল না। চোখ নামিয়ে চুপ করে থাকল।

আহমদ মুসা বুঝল এই বয়সে তাকে এমন কালো পথে নামতে হয়েছে, যা সে বলতে পারবে না।

হঠাৎ আহমদ মুসার মনে একটা কথা ঝিলিক দিয়ে উঠল। ঐ ক্যাসেটটা ওখানে থাকার খবর আহমদ মুসার জানার অর্থ কি ওরা এটাই ধরবে না যে,

লিসাই তাকে এ তথ্যটা জানিয়েছিল কিংবা লিসাই পেতেছিল এই ফাঁদটা! যদি এই অর্থ তারা ধরে তাহলে লিসা কি ওদের নতুন ক্রোধের শিকার................।

আহমদ মুসা চিন্তা শেষ করতে পারল না। ড্রাইভার বলে উঠল, স্যার হাসপপাতালে এসে গেছি।'

তার কথার সাথে সাথেই ট্যাক্সিটি দাঁড়িয়ে পড়ল।

আহমদ মুসা দ্রুত ভাড়া চুকিয়ে বালকটিকে পাঁজকোলা করে নিয়ে নেমে পড়ল।

আহমদ মুসা হুইল চেয়ার ঠেলে বালকটির মা মিসেস প্যাকারকে ড্রইংরুমে তুলে দিয়ে বলল, 'মিসেস প্যাকার আমি এখন বিদায় নিতে চাই।'

মিসেস প্যাকার আহমদ মুসার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি তুলে তাকাল। বলল, 'আপনি কে জানি না। আপনার নামও এখনও আমাকে বলেননি। যাই হোক আপনি একজন সৎ মানুষ। আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।'

আহমদ মুসা পকেট থেকে কিছু ডলার তুলে নিয়ে মিসেস প্যাকারের হাতে গুজে দিয়ে বলল, 'আপনার এক ভাইয়ের পক্ষ থেকে এই টাকা আপনি রাখুন। আপনার ছেলে প্যাকার জুনিয়রের সুস্থ হতে কয়েক সপ্তাহ লেগে যেতে পারে। আর ডাক্তারের সাথে আমি কথা বলেছি। আজই আপনার ছেলেকে বাড়িতে নিয়ে আসুন। এলাকার কম্যুনিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তার ও নার্সকে বললেই তারা প্রতিদিন দেখে যাবে। কিছু পয়সা তার জন্য লাগবে। হাসপাতালে তাকে রাখা নিরাপদ নয়।

মিসেস প্যাকারের চোখ অশ্রুতে ভরে গেল। বলল, 'আমি আমার ছেলের কাছ থেকেই সব শুনেছি। আজ দুবার তাকে আপনি মৃত্যুর অবস্থা থেকেই বাঁচিয়েছেন। হাসপাতালের বিল চুকিয়ে দিয়েছেন। আবার নিজেকে ভাই বলছেন এক অসহায় মহিলার। কোন আমেরিকানই এভাবে কারো ভাই হতে আসে না। বলবেন কি আপনি...............।'

মিসেস প্যাকারকে কথা শেষ করতে না দিয়েই বলে উঠল, ‘সুযোগ পেলে বলব একদিন সব। আমাকে এখনি যেতে হবে। তাড়া আছে।’

আহমদ মুসা কথা শেষ করতেই তার মোবাইল বেজে উঠল।

মোবাইল হাতে নিয়ে তাকাল মোবাইল স্ক্রিনে ভেসে উঠা টেলিফোন নাম্বারের দিকে। অপরিচিত নাম্বার দেখে ভ্রু-কুঁচকে উঠল তার।

টেলিফোন রিসিভ করল আহমদ মুসা। ‘হ্যালো’ বলে সাড়া দিতেই ওপ্রান্ত থেকে একটা মেয়ে কন্ঠ বলে উঠল, ‘আমি নুমা। লিসাকে ওরা গুলী করে মেরে ফেলেছে।’ কান্নায় তার কন্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

নুমা মানে নুমা ইয়াহুদের টেলিফোন।

কথাটা শোনার সাথে সাথে আকস্মিক শক খাওয়ার প্রচন্ড এক যন্ত্রণা আহমদ মুসার গোটা দেহে ছড়িয়ে পড়ল। মুহূর্তের জন্য বাকরুদ্ধ হয়ে গেল যেন তার।

নিজেকে সামলে নিয়ে আহমদ মুসা বলল, ‘স্যরি। এমন আশংকার কথা আমি ভেবেছিলাম। কিন্তু তাকে সাবধান করার সময় পেলাম না। মোবাইলে তাকে পাইনি। ওঁর কাছেই যাচ্ছিলাম আমি। স্যরি।’

‘ক্যাসেটের খবর কি? ওদের হাতে পড়েনি তো?’ বলল নুমা ইয়াহুদ। কাঁপা কন্ঠে ঝরে পড়ছে সীমাহীন উদ্বেগ।

‘ভয় নেই। ক্যাসেটটি এখন আমার কাছে। এতেই ওরা ক্ষেপেছে। ওরা মনে করেছে, লিসাই সব জানিয়ে দিয়েছে ওদের শত্রু পক্ষকে।’ বলে মুহূর্তের জন্য থেমেই আবার বলা শুরু করল, ‘আমি লিসাদের ওখানে যাচ্ছি নুমা। বেচারার পরিবার খুব সংকটে পড়ল।’

সঙ্গে সঙ্গেই দ্রুত কন্ঠে বলে উঠল নুমা, ‘আমি লিসাদের ওখান থেকেই কথা বলছি। আমরা সবাই এখন লিসাদের বাড়িতে।’

‘নুমা আমি আসছি। বাই।’ বলে আহমদ মুসা টেলিফোন শেষ করতেই মিসেস প্যাকার বলল, ‘কিছু ঘটেছে? কোন দুঃসংবাদ?’ উদ্বিগ্ন কন্ঠ মিসেস প্যাকারের।

একই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে দ্বিধায় পড়ে গেল আহমদ মুসা। শুনলে মিসেস প্যাকার ভয় পেয়ে যাবে। তার ছেলের ব্যাপারে আরও উদ্বিগ্ন হবে। কিন্তু পরে ভাবল, তাদের ভয় পাওয়ার দরকার। তাতেই বাস্তবতার ব্যাপারে তারা সাবধান হতে পারবে। এই চিন্তা করে আহমদ মুসা বলল, যারা আপনার ছেলেকে কাজে লাগিয়েছে, যারা আবার তাকে খুন করার চেষ্টা করেছে, তারা রাব্বানিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টের পি.এ মিস লিসাকে খুন করেছে।'

'কেন?' উদ্বিগ প্রশ্ন মিসেস প্যাকারের।

'লিসাকে ওরা জোর করে কাজে লাগিয়েছিল। লিসা তাদের তথ্য ফাঁস করে দিয়েছে বলে ওদের ধারণা।' আহমদ মুসা বলল।

প্রবল এক ভয়ের অন্ধকার নতুন করে নেমে এল মিসেস প্যাকারের মুখে। বলল, 'আসলে ঘটনা কি মি. আইজ্যাক দানিয়েল?' ওরা কি চাচ্ছে, কি করছে?'

'রাব্বানিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. হাইকেল নিরুদ্দেশ হয়েছেন। তাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। তার ব্যাপারে যাতে কেউ কিছু জানতেই না পারে এজন্যই অজ্ঞাত পরিচয় ঐ লোকেরা এসব করছে।' বলল আহমদ মুসা।

বিস্ময় ফুটে উঠল মিসেস প্যাকারের চোখে-মুখে। মুহূর্ত কয়েক চিন্তা করল। তারপর বলল, 'ড. হাইম হাইকেলকে নিরুদ্দেশ বলা হচ্ছে কেন? আমি যতদূর জানি, তিনি একজন মানসিক রোগী হিসাবে কোন এক মানসিক হাসপাতালে আছেন।'

বিস্ময় ফুটে উঠল আহমদ মুসার চোখেও। বলল, 'আপনি জানেন কিছু? কি করে জানেন?

'আমার স্নায়ু সংক্রান্ত অসুখের জন্যে আমি কিছুদিন সাইক্রিয়াটিস্ট ড. নিউম্যান-এর প্যাসেন্ট ছিলাম। আমি দুদিন তাকে টেলিফোনে ড. হাইম হাইকেলের বিষয় আলোচনা করতে শুনেছি। দুদিনই আমি তার কাছেই বসা অবস্থায় তিনি টেলিফোন ধরেন। ঘরের একপ্রান্তে সরে কথা বললেও তার সব কথাই আমার কানে এসেছিল। প্রথম দিন তিনি যা বলেছিলেন তার সার কথা হলো, 'আমি ভেবে দেখেছি, ড. হাইম হাইকেলকে মানসিক হাসপাতালে রাখাই

নিরাপদ। আজীবনও রাখা যাবে। আমি একটা সার্টিফিকেট দেব, তবে ঐভাবে।' দ্বিতীয় দিন তিনি যা বলেছিলেন তাহলো, হ্যাঁ ড. হাইম হাইকেলের পরিবার সবচেয়ে বড় সমস্যা। তবে অন্য সবদিক ঠিক থাকলে, হাইম হাইকেলের পরিবারও এক সময় বিষয়টাকে স্বাভাবিক হিসাবে মেনে নেবে। যে কোন মূল্যে তার পরিবারকে শান্ত রাখতে হবে।'

থামল একটু মিসেস প্যাকার। থেমেই আবার বলে উঠল, কথাগুলো থেকে তখন আমি যে অর্থ ধরেছিলাম, তাহলো 'ড. হাইম হাইকেল অসুস্থ। তাকে মানসিক হাসপাতালেই রাখা হচ্ছে। তিনি ড. নিউম্যানের প্যাসেন্ট। ড. হাইম হাইকেলের এই অবস্থায় তার পরিবার নিয়ে তারা সমস্যায় পড়েছেন।'

'ধন্যবাদ মিসেস প্যাকার। আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। দয়া করে কি ডা. নিউম্যানের ঠিকানা দিতে পারেন?' আহমদ মুসা বলল।

ডা. নিউম্যানের ঠিকানাটা আহমদ মুসাকে দিতে দিতে বলল, 'আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি বুঝতে পারছি আমার ছেলের সম্পর্কে আমাকে আরও সাবধান হতে হবে।'

'ধন্যবাদ ম্যাডাম, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আবার দেখা হবে। বাই।' বলে আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্রুত দরজার দিকে পা বাড়াল।

আহমদ মুসার ট্যাক্সি ছুটছে ডা. নিউম্যানের বাড়ির দিকে। ডা. নিউম্যানের সন্ধান পেয়ে আহমদ মুসা দারুন খুশি। প্রথমে সে ডা. নিউম্যানের কথা শুনেছিল ড. আয়াজ ইয়াহুদের কাছে। কিন্তু ডা. নিউম্যানের ঠিকানাসহ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছে মিসেস প্যাকার।

লিসার ওখানে গিয়ে আহমদ মুসা খুব বেশি দেরি করেনি। ওখানে তার যাওয়া ছিল লিসার বাবা-মাকে সমাবেদনা জানানো, তাদের আর্থিক অবস্থা সর্ম্পকে জানা এবং লিসার মোবাইল পরীক্ষা করা। কিন্তু গিয়ে শোনে যে, খুনিরা লিসাকে খুন করে তার মোবাইল নিয়ে গেছে। আহমদ মুসা দেখল, লিসার আব্বা-আম্মা সহজ সরল খুবই ভালো মানুষ। কিন্তু তাদের চোখে-মুখে মহাবিপর্যয়ের

ছাপ। আহমদ মুসা ড. আয়াজ ইয়াহুদকে জিজ্ঞাসা করেছিল, লিসার পরিবার তো তার উপর নির্ভরশীল ছিল। এখন চলবে কি করে ওদের।

আহমদ মুসার প্রশ্ন শুনে পিতার পাশে দাঁড়ানো বিস্মিত নুমা ইয়াহুদ প্রশ্ন করেছিল আহমদ মুসাকে, 'এ প্রশ্ন আপনার মাথায় এল কি করে? আপনি তো কোনভাবেই লিসার পরিবারের সাথে সংশ্লিষ্ট নন?' আহমদ মুসা বলেছিল, লিসা নিহত হয়েছে আমাকে সাহায্যে করতে গিয়েই। আমি আপরাধবোধ করছি এই অসহায় পরিবারের কাছে।'

'এখন কি করতে চান?' জিজ্ঞাসা করল নুমা ইয়াহুদ। তার ঠোঁটে মুখ টেপা হাসি।

'যতটা সম্ভব আমি পরিবারটির ক্ষতিপূরণ করতে চাই।' বলে আহমদ মুসা।

'সত্যি আপনি প্রয়োজনের চেয়েও ভালো মানুষ। লিসা তো আপনাকে সাহায্য করতে যেয়ে খুন হয়নি। খুন হয়েছে আমাদেরকে সাহায্য করতে গিয়ে।' বলেছিল নুমা ইয়াহুদ।

'কেমন করে?' আহমদ মুসা বলেছিল।

'প্রকৃতপক্ষে লিসা সাহায্য করেছিল ড. হাইম হাইকেল আংকেলকে, আপনাকে নয়। সুতরাং লিসার দায়িত্বটা আমাদের।' বলেছিল নুমা ইয়াহুদ।

নুমার কথা শেষ হতেই ড. আয়াজ ইয়াহুদ বলে উঠেছিল, 'হ্যাঁ মি. আইজ্যাক দানিয়েল, আমরাই ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েলফেয়ার ফান্ড থেকে লিসার নামে একটা পেনশন তার পরিবারকে দেব।'

ধন্যবাদ জানিয়েছিল আহমদ মুসা ড. আয়াজ ইয়াহুদকে। তারপর আহমদ মুসা ক্যাসেটকে কেন্দ্র করে বালক জুনিয়র প্যাকারের দুর্ঘটনার কথা তাদের জানিয়েছিল। কাহিনীটা শুনে নুমা ইয়াহুদ বলেছিল, 'আপনিও নিশ্চয় আহত। আপনার বাম বাহুটাকে আজ শুরু থেকেই একটু বাঁকা অবস্থায় দেখছি কোটের হাতার আড়াল সত্ত্বেও।'

'ও কিছু না, সামান্য।' বলেছিল আহমদ মুসা।

'গুলীর আঘাত?' উদ্বিগ কন্ঠে প্রশ্ন করেছিল মিসেস ইয়াহুদ।

‘জি, হ্যাঁ।’ বলেছিল আহমদ মুসা। তারপরই সে তার ডান হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল ড. আয়াজ ইয়াহুদের দিকে হ্যান্ডশেকের জন্য। বলেছিল, ‘স্যার বিদায় দিন, জরুরি একটা কাজ আছে।’

‘কি কাজ?’ হ্যান্ডশেক করতে করতে জিজ্ঞেস করে ড. আয়াজ ইয়াহুদ।

‘স্যার আপনার কাছে ডা. নিউম্যান এর নাম শুনেছিলাম। আর ঠিকানা পেয়েছি মিসেস প্যাকারের কাছে। তার দেয়া তথ্য অনুসারে ডা. নিউম্যান জানেন ড. হাইম হাইকেল কোথায় আছেন। আমি এখন তার সন্ধানে যাব।’ বলেছিল আহমদ মুসা।

‘এই আহত অবস্থায়?’ বিস্মিত কন্ঠে প্রশ্ন করেছিল নুমা ইয়াহুদ।

নুমার কথা শেষ হতেই ড. আয়াজ ইয়াহুদও বলেছিল, ‘তুমি জান ওরা কত বেপরোয়া, ভয়াবহ। লিসা, জুনিয়র প্যাকার এবং তার আগে ড. জ্যাকবের দৃষ্টান্ত তোমার সামনেই আছে। আহত অবস্থা নিয়ে তোমার ঐ ধরনের কাজে যাওয়া ঠিক নয়।’

‘আপনাদের এই শুভেচ্ছার জন্য ধন্যবাদ স্যার। কিন্তু ওরা যতটা বেপরোয়া, তার চেয়ে বেশি বেপরোয়া হতে না পারলে ওদের সাথে পারা যাবেনা। ওদের কোন সময় দেয়া যাবে না। ক্যাসেট উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গেই যদি আমি লিসার সাথে যোগাযোগ করতে পারতাম, তাহলে এই দুর্ঘটনা রোধ করা যেতেও পারতো।’ বলেছিল আহমদ মুসা।

‘কিন্তু তুমি একা ওদের সাথে লড়াই করবে কি করে? পুলিশের উপরের অবস্থা কি আমি জানি না। কিন্তু পুলিশের নিচের লোকেরা ওদের কেনা।’ বলেছিল আয়াজ ইয়াহুদ।

‘এই অবস্থার মধ্যেই কাউকে না কাউকে এগুতে হবে স্যার, পথ তো বের করতে হবে।’

কথা শেষ করেই ‘বাই টু অল’ বলে ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছিল আহমদ মুসা।

চোখ ভরা একরাশ বিস্ময় নিয়ে ভাবছিল নুমা ইয়াহুদ। আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়াতে গেলে সে বলে উঠল, ‘মি. আইজ্যাক দানিয়েল, আপনি কি শুধুই একজন আইজ্যাক দানিয়েল? শুধুই কি একজন শুভকাঙ্ক্ষী ড. হাইম হাইকেল

আংকেলের? আমরাও তো তার শুভাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু আমরা কেউইতো এই দায়িত্ব নিচ্ছি না। আসলে কে আপনি? কেন্দ্রীয় কোন গোয়েন্দা সংস্থার লোক আপনি নন, কারণ আপনি বিদেশী। তাহলে কে আপনি?'

ঘুরে দাঁড়িয়েছিল আহমদ মুসা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই কিছু বলল না সে। গম্ভীর হয়ে উঠেছিল তার মুখ। একটু ভেবে বলল, 'নুমা তুমি যা বলেছ তার সবই সত্য। আমি আইজ্যাক দানিয়েল নই। দুঃখিত আমি, এ মুহূর্তে আমি কে তা বলব না। আমি ভয় করি, পরিচয় কাজের পথে বাধা হতে পারে।'

নুমার বিস্মিত চোখে জেগে উঠে হাজারও প্রশ্ন।

বিস্ময়-বিমুগ্ধ চোখ ড. আয়াজ ইয়াহুদের। এক ধাপ এগিয়ে একেবারে মুখোমুখি দাঁড়াল আহমদ মুসার। বলল, 'আমরা আর তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করব না। আমি এরাবিয়ান ক্লাসিক্যাল স্টোরিতে হাতেম তাই-এর কাহিনী পড়েছি। তুমি আরেক হাতেম-তাই। তুমি ড. হাইম হাইকেলের শুভকাঙ্ক্ষী বলেছ, সেটা ঠিক নয়। তুমি তাকে চিনই না। ঠিক কিনা?'

'জি, হ্যাঁ।' বলেছিল আহমদ মুসা।

'তাহলে তুমি কার জন্য কাজ করছ? ড. হাইম হাইকেলের জন্য তো অবশ্যই নয়। হাতেম তাই একজন প্রেমিক শাহজাদার স্বার্থে একজন পরিজাদীকে শাপমুক্ত করার জন্য কাজ করেছিল। তোমার লক্ষ্য কি?' বলেছিল ড. আয়াজ ইয়াহুদ।

হেসেছিল আহমদ মুসা। বলেছিল, 'আমি কোন পরিজাদীকে নয়, এক পরম সত্যকে চরম মিথ্যার অবগুণ্ঠন থেকে মুক্ত করতে চাই।'

'সেই সত্যটা বা মিথ্যাটা কি তুমি অবশ্যই বলবে না, কিন্তু সেই সত্য বা মিথ্যার সাথে ড. হাইম হাইকেলের সর্ম্পক কি?' অপার বিস্ময় নিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল ড. আয়াজ ইয়াহুদ।

'সেই সত্যের জগতে প্রবেশের তিনিই আমার কাছে এখন একমাত্র সিংহদ্বার। বলেছিল আহমদ মুসা।

ভ্রুকুঁচকাল ড. আয়াজ ইয়াহুদ। অবাক বিস্ময়ে স্থির হয়ে গেছে নুমা ইয়াহুদের দুচোখ।

কথা যেন হারিয়ে গেছে ড. আয়াজ ইয়াহুদের মুখ থেকে। সে বুঝতে পারছে ড. হাইম হাইকেল তাহলে এমন তথ্য জানে যা মিথ্যার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে দেবে। যুবকটি এই তথ্যের জন্যেই তাহলে ড. হাইম হাইকেলকে খুঁজছে। কিন্তু কি এমন তথ্য ওটা। হঠাৎ তার মনে হল ড. হাইম হাইকেলের জীবনের যে পরিবর্তন তার সাথে এই সত্য বা মিথ্যার কি যোগ আছে? অবশেষে এই প্রশ্নই করল আহমদ মুসাকে, 'বৎস, তুমি আমার ছাত্রের মতো, ছেলের মতো। বলত, ড. হাইম হাইকেলের জীবনের অস্বাভাবিক পরিবর্তনের সাথে তোমার কথিত ঐ সত্য বা মিথ্যার কোন সর্ম্পক আছে কি?'

'এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ায় কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু দুঃখিত, আমি বিষয়টা সত্যই জানি না।'

আহমদ মুসা থামতেই নুমা ইয়াহুদ বলে উঠল, 'সেই সত্যটা আপনি না বলুন, কিন্তু সেই সত্যের সাথে আপনার সর্ম্পক কি? না হাতেম তাই-এর মত নিছকই জনসেবা এটা?'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'নুমা জনসেবা আসলে আত্নসেবাই। কারণ জনের উপকার নিজেরও উপকার আসে। উপকারের রূপ এক নয়, বহু।'

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা 'বাই' বলে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন।

চলতে শুরু করল।

পেছন থেকে নুমা বলেছিল,'মি. .................. সেই জনের মধ্যে কিন্তু 'নুমা'ও একজন, তার পিতা আছেন এবং মাতাও। সুতরাং .............।'

'সুতরা আমার কাজ আপনাদেরই কাজ।' মুখ না ঘুরিয়ে চলতে চলতেই বলেছিল আহমদ মুসা। নুমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে।

'ধন্যবাদ।' বলে নুমা অনেকটা স্বগতোক্তির মত।

আহমদ মুসার কানে কথাটা পৌঁছায় না।

হাঁটা দ্রুত করেছিল আহমদ মুসা। পেছন ফিরে আর তাকায়নি সে। ডা. নিউম্যানের চিন্তা তখন আহমদ মুসার মাথা জুড়ে।

ডা. নিউম্যানের বাসা 'ইস্ট রিভারে'র পশ্চিম তীরে বিখ্যাত রুজভেল্ট ড্রাইভ-এর একটু পশ্চিমে নিউইয়র্ক হসপিটাল ও কর্নেল মেডিকেল সেন্টারের

মাঝখানে। আহমদ মুসা কার্ল সুজ পার্কের মুখে রুজভেল্ট ড্রাইভে উঠে দক্ষিণে ছুটে চলল।

দুহাত আহমদ মুসার স্টিয়ারিং হুইলে। দৃষ্টি তীরের মত সোজা রাস্তার উপর প্রসারিত। ভাবছে আহমদ মুসা। নিউইয়র্ক এসে এ পর্যন্ত যা পেয়েছে তা কম নয়। কিন্তু ড. হাইম হাইকেলের সন্ধান এখনো পায়নি। কিন্তু তিনি কোথায় থাকতে পারেন তা জানা গেছে। প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হবারও সুযোগ হয়েছে। ড. হাইম হাইকেলের বাড়ির ঠিকানা পাওয়া গেছে। এখন ড. নিউম্যানের সহযোগিতায় আরও কিছুটা এগুনো যাবে।

আহমদ মুসার গাড়ি নিউইয়র্ক হাসপাতাল বরাবর এসে পশ্চিম দিকে মোড় নিয়ে নিউইয়র্ক হাসপাতাল ও কর্নেল মেডিকেল সেন্টারের মাঝের স্ট্রিট ধরে এগিয়ে চলল।

ডা. নিউম্যানের বাড়ি খুঁজে পেতে বেশি বেগ পেতে হলো না আহমদ মুসার। স্ট্রিট থেকে একটা ছোট বাইলেনের মাথা জুড়ে বাড়িটা।

গাড়ি বারান্দায় গাড়ি পার্ক করেই গাড়ি থেকে নামল আহমদ মুসা।

গাড়ি বারান্দা থেকে তিন ধাপের একটা সিঁড়ি পেরোলেই একটা বড় বারান্দা। বারান্দায় উঠলেই সিঁড়ির সোজা সামনে বড় দরজার একটা গেট। দরজার এক পাশে কলিং বক্স। সুইচ টিপল কলিং বক্সের।

# ২

'ধন্যবাদ মি.জন ফ্রাংক, লিসাকে ঠিক শাস্তি দিয়েছেন। কিন্তু বালকটির কি খবর?' বলল দানিয়েল ডেভিড।

দানিয়েল ডেভিড আজর ওয়াইজম্যানের অন্যতম দক্ষিণ হস্ত। আজর ওয়াইজম্যান ওয়াশিংটন যাবার পর নিউইয়র্কে 'ওয়ার্ল্ড ফ্রিডম আর্মি'র দায়িত্ব সে পালন করছে।

আর জন ফ্রাংক মার্কিন হাজতে বন্দী জেনারেল শ্যারনের লোক। আন্ডার গ্রাউন্ডে থেকে সেই এখন গোটা পূর্ব আমেরিকার ইহুদী গোয়েন্দা কার্যকম পরিচালনা করছে।

আজর ওয়াইজম্যানের ওয়ার্ল্ড ফ্রিডম আর্মি এবং জেনারেল শ্যারনের 'গোয়েন্দা আর্মী' এক লক্ষ্যে এক হয়ে গেছে। লক্ষ্য হলো আমেরিকায় তথা দুনিয়ায় ইহুদীবাদীদের দ্বিতীয় এবং চুড়ান্ত বিপর্যয় ঠেকানো। তারা এক হয়েছে, নিউইয়র্কের লিবার্টি টাওয়ার ও ডেমোক্রেসি টাওয়ার ধ্বংসের প্রকৃত রহস্য যদি দুনিয়াবাসী জানতে পারে, তাহলে শ্যারন ও আজর ওয়াইজম্যানদের পা রাখার জায়গা থাকবে না দুনিয়ার কোথাও।

'দুঃখিত, আমি নিশ্চিত ছিলাম বালক জুনিয়ার প্যাকার মরে গেছে। কিন্তু খবর পেলাম, সেই শয়তানের বাচ্চা আহত অবস্থায় তাকে কোন হাসপাতালে নিয়ে গেছে।' বলল জন ফ্রাংক।

'এই শয়তানের বাচ্চাটা কোত্থেকে উদয় হলো? ড. জ্যাকবকে সেই বাঁচিয়েছে। লিসাকে সন্ধান করে হাত করেছিল আমাদেরকে খুঁজে বের করার জন্য। আজ বালককেও সেই বাঁচাল। নিশ্চিত যে, সে বালকের মাধ্যমে আমাদের সন্ধান লাভের চেষ্টা করবে।' দানিয়েল ডেভিড বলল।

‘সে আশার গুড়ে বালি। বালকটি আমাদের কিছুই জানে না। একটা হোম সার্ভিসে সে কাজ করত। সেখান থেকেই তাকে রিক্রুট করেছি। তার কাজের ফাঁকে আমাদের কাজ করে দিত।’ বলল জন ফ্রাংক।

‘তার বাড়ি কোথায়? তাকে পাওয়া প্রয়োজন।’ দানিয়েল ডেভিড বলল।

‘দরকার হয়নি তার ঠিকানার আর তাই সেটা আমরা জোগাড়ও করিনি।’ বলল জন ফ্রাংক।

‘আজ কিন্তু ভীষণ দরকার হয়ে পড়েছে। আপাতত সেই হাসপাতাল খোঁজার নির্দেশ দিন। তারপর কান টানলে মাথা এসে যাবে। আমাদের কিছু কাজের সে সাক্ষী। লিসার মতই তাকে মরতে হবে।’ দানিয়েল ডেভিড বলল।

‘আমাদের লোকেরা ইতিমধ্য সে কাজে লেগে গেছে।’ বলল জন ফ্রাংক।

একটু থেমেই আবার বলে উঠল, ‘আমি মনে করি ঐ বালক এখন বিষয় নয়। আমাদেরকে ঐ লোকটিকে খুঁজে পাবে, এ ভয়ও আমাদের এখনকার বিষয় নয়। এখন তাকে আমাদের খোঁজা দরকার। কোত্থেকে কেন সে ড. হাইম হাইকেলের খোঁজে এসেছে। স্পুটনিকের লোকেরা মুক্ত হবার পর এই প্রশ্ন আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে উদ্বেগের ব্যাপার হলো এ বিষয়টির সাথে আহমদ মুসা জড়িত হয়ে পড়েছে।’

নড়ে-চড়ে সোজা হয়ে বসল দানিয়েল ডেভিড। বলল, ‘ঠিক বলেছেন মি. ফ্রাংক। টুইনটাওয়ার সংক্রান্ত দলিল স্পুটনিকের হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পর তারা ড. হাইম হাইকেলের সন্ধানে সবচেয়ে বেশি হন্য হয়ে উঠবে, সেটাই স্বাভাবিক। নতুন দলিলের জন্য ড. হাইম হাইকেলকে তাদের চাই-ই। আপনি ঠিকই বলেছেন এই লোকটিকে অবশ্যই আমাদের খুঁজে পেতে হবে। শুধু ড. হাইম হাইকেলকে আড়ালে রাখলে চলবে না, তাদেরকে ড. হাইম হাইকেল পর্যন্ত পৌঁছার সব পথই বন্ধ করতে হবে, সেদিকে যাবার সব উদ্যোগকেই বানচাল করে দিতে হবে।’

‘কিন্তু তাকে পাওয়া যাবে কোথায়। নিশ্চয় কোন হোটেলেই উঠেছে সে।’ বলল, জন ফ্রাংক।

কথা শেষ করেই হঠাৎ পরম কিছু পেয়ে যাবার মত আনন্দে ‘ইউরেকা, ইউরেকা’ বলে চিৎকার করে উঠল, ‘লিসার মোবাইলে নিশ্চয় লোকটার

টেলিফোন নাম্বার পাওয়া যাবে। লিসা অবশ্যই তার সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করত।’

তার কথা শেষ হবার আগেই সে পকেট থেকে লিসার মোবাইলটা বের আনল। মোবাইল থেকে লিসার কল সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। কিন্তু খুব তাড়াতাড়িই তার চোখে-মুখে হতাশার অন্ধকার নেমে এল। মোবাইলের কল লগের ‘ডায়ালড’ ও রিসিভড’ সেকশনে কোন নাম্বারই এন্ট্রি নেই। তার মানে কল আসা বা কল করার পরপরই ইরেজ করে ফেলা হতো। আর মোবাইলের ফোন বুকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দশ বারোজনের নাম্বার ছাড়া আর কোন নাম্বার নেই।

‘মেয়েটি সাংঘাতিক ধড়িবাজ ছিল।’ বিরক্তির সাথে বলল জন ফ্রাংক।

‘থাক মরা মানুষের পিন্ডিপাত করে কোন লাভ হবে না। এখন বলুন, আমরা এগুবো কোন পথে। লোকটিকে পেতেই হবে।’

মোবাইল বেজে উঠল দানিয়েল ডেভিডের।

মোবাইল হাতে নিয়ে স্ক্রীনে কল নাম্বারের দিকে চোখ পড়তেই তার চোখে-মুখে একটা আড়ষ্ঠতা ও সমীহের ভাব ফুটে উঠল। ত্বরিত সে জন ফ্রাংকের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘এক্সলেন্সি আজর ওয়াইজম্যানের টেলিফোন।’

কথা শেষ করেই কল ওপেন করে বলে উঠল, ‘ইয়েস এক্সিলেন্সি।’

‘শোন, নিউইয়র্কের গোটা বিষয় ভেবে দেখলাম। যা ঘটেছে খুব বড় ঘটনা। মনে হচ্ছে ঘটনা আরও বড় কিছুর দিকে এগুচ্ছে। ডবল এইচ (হাইম হাইকেল) আমাদের জন্যে দোজখের এক দরজার মত হয়ে উঠেছে। তাকে কেউ খোঁজ করা মানে আমাদের ভাগ্যে আগুন লাগাবার চেষ্টা। সুতারাং এই চেষ্টাকে যে কোন মূল্যে বানচাল করতে হবে।’ ওপার থেকে বলল আজর ওয়াজম্যান।

‘এক্সিলেন্সি আমরাও এখন এ বিষয়টা নিয়েই আলোচনা করছিলাম। লোকটাকে খুঁজে পাওয়ার বিষয়ে আমরা এখন সবচেয়ে গুরুত্ব দিচ্ছি।’ দানিয়েল ডেভিড বলল।

‘ধন্যবাদ। কিন্তু লোকটাকে তোমরা কেউ দেখেছ? ওপ্রান্ত থেকে বলল আজর ওয়াইজম্যান।

'আমি আজ এক ঝলক দেখেছি গাড়ি থেকে। আমেরিকান নয়।' বলল দানিয়েল ডেভিড।

'এই খবরটাই তো ভয়ের। বড় শয়তানটা মানে আহমদ মুসা সাও তোরাহ থেকে এত তাড়াতাড়ি নিউইয়র্কে চলে আসবে তা স্বাভাবিক নয়। কিন্তু এক বা একাধিক লোক এসেছে তাতো দেখাই যাচ্ছে এবং এ পর্যন্ত সে কার্যকরভাবেই সামনেই এগিয়েছে। এখনিই তাদের গতিরোধ করতেই হবে।

'এক্সিলেন্সি সে আমাদের জালের বাইরে কিছুই করতে পারেনি। সে প্রতিপদেই বাধা পেয়েছে। ডবল এইচ সম্পর্কে কোন তথ্যই সে কারো কাছ থেকে পায়নি। যে ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে তার ফলেই কারও কাছ থেকে সে সহযোগিতা পাচ্ছে না।' বলল দানিয়েল ডেভিড।

'আরেকটা কথা আমি ভাবছি, এই লোকটা ডবল এইচ সম্পর্কে তার প্রয়োজনীয় খবরাদি না পেলে তার বাড়ি পর্যন্ত ছুটতে পারে। লোকটা ডবল এইচের বাড়ি যাওয়া আমাদের জন্য বিপজ্জনক হবে। আমরা পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে তার নিরুদ্দেশ হওয়া, পুলিশ তার সন্ধানের চেষ্টা করছে, ইত্যাদি বলে তাদের থামিয়ে রেখেছি। তারাও এখানে-সেখানে কিছু দৌড়া-দৌড়ি করে এখন চুপ হয়ে গেছে। ডবল এইচ-এর ছেলে লেখাপড়ার জন্য বাইরে থাকায় কিছুটা সুবিধা হয়েছে। এই অবস্থায় লোকটা যদি ডবল এইচের বাড়ি যায়, তাহলে ব্যাপারটা ভিন্ন দিকে মোড় নিতে পারে। এজন্য লোকটা কিংবা বাইরের কেউই যাতে ডবল এইচের বাড়ি যেতে না পারে, সেটা নিশ্চিত করতে হবে।'

থামল আজর ওয়াইজম্যান।

সে থামতেই দানিয়েল ডেভিড বলে উঠল, 'এক্সিলেন্সি। আপনি জানেন, আমরা ফিলাডেলাফিয়ার আমাদের স্টেশনে এ ব্যাপারে আগেই বলেছি। ডবল এইচের বাড়িতে সার্বক্ষণিক পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ডবল এইচের ফ্যামিলির সাথে ঘনিষ্ট একটি মেয়ে, যে আমাদের লোক, বাড়ির ভেতরের সবকিছু উপর চোখ রাখছে। সুতরাং আমাদের চোখ এড়িয়ে বাইরের কেউ সেখানে গিয়ে কিছু করতে পারবে না।'

‘ধন্যবাদ। এ সম্পর্কে দ্বিতীয় বিষয় হলো, আমরা বাইরের লোককে আটকাতে সফল নাও হতে পারি। সেক্ষেত্রে পরিবারটি যাতে আমাদের মুঠোর বাইরে না যায় সেজন্য ডবল এইচের সাথে তার পরিবারের কৌশলগত একটা সাক্ষাতকারের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ব্যপারে কি করতে হবে, পরিবারকে কি বলতে হবে, এ ব্যপারে ডিটেল নোট আমি ‘ই-মেইল-এ’ পাঠাচ্ছি।’

‘ধন্যবাদ এক্সিলেন্সি। আমরা আপনার ‘ই-মেইল’-এর অপেক্ষা করছি।’

কথা শেষে মোবাইল অফ করে দিয়ে দানিয়েল ডেভিড তাকাল জন ফ্রাংকের দিকে। বলল, ‘মি. ফ্রাংক মনে হচ্ছে আমাদের কাউকে ফিলাডেলফিয়ায় যেতে হতে পারে। আমরা শিঘ্রই এক্সিলেন্সির কাছ থেকেই ই-মেইল পাব, তারপর এ ব্যপারে বিস্তারিত জানতে পারব। আর এ দিকে লোকটাকে পাকড়ও করার কাজকে নাম্বার ওয়ান গুরুত্ব দিতে হবে।’

কথা বলতে যাচ্ছিল দানিয়েল ডেভিড।

বেজে উঠল কলিং বেল।

থেমে গেল দানিয়েল ডেভিড।

জন ফ্রাংক এগুলো রিসিভিং বক্সের দিকে। বাইরের কলিং বেল ‘টিভি ক্যামেরা সজ্জিত ইন্টারকম সিস্টেম। এর মাধ্যমে ভেতর থেকে কলারের ছবিও দেখা যায়, জবাবও দেয়া যায়।

রিসিভারের সুইচ অন করতেই স্ক্রীনে একটা ছবি ভেসে উঠল। অপরিচিত। আমেরিকানও নয়। ভ্রুকুঁচকালো সে। হঠাৎ তার মনে হলো, ক’ঘন্টা আগে বালক জুনিয়ার প্যাকারের সাথে এই লোকটিকেই সে দেখেছিল কি! এক ঝলক দেখা চেহারা তার মনে নেই। কিন্তু এই নীল ব্লেজার ও কালো প্যান্টই সে দেখেছিল। এটা একটা ‘রিয়ার কম্বিনেশন’ বলে তার মনে আছে এই রংয়ের কথা। পরিচয়ের ব্যাপারে কিছুটা নিশ্চিত হতেই বিস্ময় ও আনন্দ দুই-ই তাকে ঘিরে ধরল। আনন্দ এই কারণে যে, আকাঙ্ক্ষিত লোকটা একদম নাকের ডগার সামনে। আর বিস্ময়ের কারণ হলো, লোকটা এখানে কেন? তাদের উপস্থিতির কথা জেনে কি এসেছে! কিন্তু কি করে হয়, এটা তো একটা বিখ্যাত ডাক্তারের বাড়ি। মাত্র আজই যে এই ডাক্তারকে এখান থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে

তারা এ বাড়িতে এসেছে, একথা অন্য কারো জানার কথা নয়। তাহলে কি সে ডাক্তারের কাছে এসেছে? এটা স্বাভাবিক।

এসব ভাবতে ভাবতেই জন ফ্রাংক সরে এল দানিয়েল ডেভিডের কাছে।

দানিয়েল ডেভিড বিস্মিত চোখে তাকিয়ে ছিল জন ফ্রাংকের দিকে। জন ফ্রাংকের ভাবনা ও বিস্ময় জড়িত চেহারা দানিয়েলের নজর এড়ায়নি।

জন ফ্রাংক ফিরে এসে সব কথা খুলে বলল দানিয়েলকে। দানিয়েলের মুখও বিস্ময় ও আনন্দে ছেয়ে গেল। সে আনন্দ-উৎসাহে বলে উঠল, ঈশ্বর আমাদের সহায় হয়েছেন। শিকারকে দোর গোড়ায় এনে দিয়েছেন।

বলেই সে ছুটল কল-রিসিভারের দিকে। এক ঝলক দেখেই সে এসে জড়িয়ে ধরল জন ফ্রাংককে। বলল, আমার চোখ যদি ভুল না দেখে তাহলে বলছি, ইনিই আহমদ মুসা।'

কথা শেষ করে একটা দম নিয়ে জন ফ্রাংকের কথা বলার চেষ্টাকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'একে এখানে আটকাতে হবে।'

বলে সে ত্বরিত গুছিয়ে নেয়া একটা প্লান সম্পর্কে জন ফ্রাংকে কানে কানে বলল।

প্ল্যান শুনে জন ফ্রাংকের মুখে হাসি ফুটে উঠল। বলল,'ধন্যবাদ আপনাকে। একেবারে ধন্বন্তরী প্লান। কিন্তু যা শুনেছি, তাতে আহমদ মুসার মত লোককে কি এভাবে আটকানো যাবে?'

কথা শেষ করেই জনফ্রাংক ছুটল কল রিসিভারের দিকে। এ সময় কলিং বেল আবার বেজে উঠল।

রিসিভার অন করাই ছিল। জনফ্রাংক বলে উঠল, 'স্যরি আমি টয়লেটে ছিলাম। ডাক্তার সাহেবও ওদিকের বারান্দায়। বলুন আপনি কে, কি চাই?'

জন ফ্রাংকের সন্দেহ ঠিক। ও প্রান্তের লোকটিকেই জন ফ্রাংক বালক জুনিয়র প্যাকারের সাথে দেখেছিল। কিছুটা ছদ্মবেশ থাকলেও আহমদ মুসা হিসাবে তাকে চেনা অসম্ভব ছিল না।

আহমদ মুসার ঠোঁটে রহস্যময় এক টুকরো হাসি ফুটে উঠেছিল। বলল সে জন ফ্রাংকের প্রশ্নের উত্তরে, 'আমি ডা. নিউম্যানের সাথে দেখা করতে এসেছি।'

জন ফ্রাংকের ঠোঁটেও ফুটে উঠল রহস্যময় হাসি। বলল, 'ওয়েলকাম। আমি ডা. নিউম্যানের একজন এ্যাসিটেন্ট। আমি গেটলক খুলে দিচ্ছি ঢুকেই ডান পাশের কক্ষটায় বসুন। স্যারকে বলে আসছি।

খট করে অফ হয়ে গেল কল বক্সের কানেকশান। আর সাথে সাথেই ক্লিক করে খুলে গেল দরজার লক।

দরজা খুলতেই একটা প্রশস্ত করিডোর। শুরুতেই বাম পাশে একটা দরজা এবং ডান পাশে একটা দরজা।

আহমদ মুসা ডান দিকের দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করল। ঘরটির ভেতরে নজর পড়তেই বুঝল, ডাক্তারের রোগী দেখার ঘর।

আহমদ মুসা ঘরে ঢুকে চারদিকটা দেখতে লাগল। আহমদ মুসা পশ্চিম দরজা দিয়ে ঢুকেছে। ঘরে আর একটি দরজা আছে উত্তর দিকে।

ডাক্তারের টেবিলটা উত্তর দরজা দিয়ে ঢুকেই পুব পাশে। ডাক্তারের বড় টেবিলটার সামনে তিনটা চেয়ার। ডাক্তার বসেন দক্ষিণমুখী, আর তার দর্শনার্থী বা রোগীরা তার সামনে উত্তরমুখী হয়ে বসেন।

আহমদ মুসা ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চারদিকটা দেখছিল।

উত্তর দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল একজন লোক।

ব্যায়াম-পুষ্ট সুঠাম দেহের লোক। সে ঘরে ঢুকে কয়েক ধাপ এগিয়ে এসে হাসিমুখে আহমদ মুসার দিকে হ্যান্ডশেকের জন্য হাত বাড়াল।

লোকটির মুখে হাসি ফুটে উঠল বটে, কিন্তু হাসির নিচে হিংসার কালো রেখাটা দেখা যাচ্ছিল।

আহমদ মুসা হ্যান্ডশেক করল।

'স্যার আমি জন ফ্রাংক। ডাক্তারের এ্যাটেনডেন্ট।' তারপর চেয়ার দেখিয়ে আহমদ মুসাকে বসতে বলল।

আহমদ মুসা বসতে যাচ্ছিল ডাক্তারের টেবিলের সামনের চেয়ারে।

আহমদ মুসা যখন চেয়ারে বসছিল, তখন জন ফ্রাংক ঘরের পশ্চিম প্রান্তের দিকে এগিয়ে পশ্চিমের দরজাটা, যে দরজা দিয়ে আহমদ মুসা প্রবেশ করেছিল, সেটা খুলে পাল্লার হুক লাগিয়ে দিল। দরজাটা উন্মুক্ত হয়ে পড়ল।

আহমদ মুসা মুখ ঘুরিয়ে দেখল।

আহমদ মুসাকে ফিরে তাকাতে দেখে জন ফ্রাংক বলল, 'ঘরটা অনেক্ষণ বন্ধ আছে, একটু ফ্রেস বাতাস আসুক স্যার।'

আহমদ মুসার চোখে নতুন সিদ্ধান্তের আলো জ্বল জ্বল করছিল। সেটা আরও উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল।

জন ফ্রাংক আহমদ মুসার বাম পাশের টেবিলের পশ্চিম পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল।

তার ডান হাতটা তার কোটের পকেটে।

জন ফ্রাংক দাঁড়িয়েই বলে উঠল, 'এখনি ডাক্তার স্যার এসে পড়বেন।'

আহমদ মুসা জন ফ্রাংককে ধন্যবাদ দিয়ে সামনের দিকে মনোযেগী হলো। টেবিল-জোড়া কাঁচটা বিশেষভাবে তৈরি সাদা কার্পেটের উপর রাখা।

হঠাৎ টেবিলের কাঁচের মধ্যে সরু পাতলা সাপের মত একটা ছায়াকে লাফিয়ে উঠতে দেখল আহমদ মুসা।

দৃশ্যটি আহমদ মুসার চোখে পড়ার সাথে সাথেই আহমদ মুসার মাথাটা নিচু হয়ে ডান দিকে তীব্র গতিতে ছুটে গেল। ডান পাশের চেয়ার এবং নিজের বসা থাকা চেয়ার নিয়ে সে পড়ে গেল মেঝেতে।

তার সাথে নাইলনের একটা ফাঁস টেবিলের উপর পড়ে গড়িয়ে গেল নিচে। নাইলনের ফাঁসের গোড়ার প্রান্তটি ধরে দাঁড়িয়েছে দানিয়েল ডেভিড পশ্চিম প্রান্তের খোলা দরজায়।

আহমদ মুসা পড়ে যাবার সাথে সাথেই উল্টে নিয়েছে শরীরটা। তার ফলে দেহের পায়ের দিকটা পড়ল দক্ষিণ দিকে এবং মাথা উত্তর দিকে। এবার ফাঁস হাতে নিয়ে পশ্চিম দরজায় দাঁড়ানো দানিয়েল ডেভিডকে দেখতে পেল আহমদ মুসা। দেখল দ্রুত সে পকেটের দিকে হাত নিচ্ছে।

আহমদ মুসা দেহটাকে ঘুরিয়ে নিয়েই পকেট থেকে রিভলবার বের করে এনেছিল। আহমদ মুসা কোন সুযোগ দিতে চাইল না ফাঁস ওয়ালাকে। শুয়ে থেকেই তার রিভলবার ঘুরিয়ে নিয়ে দ্রুত গুলী ছুড়ল এবং সেই সাথেই রিভলবার ঘুরিয়ে নিল জন ফ্রাংকের দিকে।

ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল জন ফ্রাংক। কিন্তু দানিয়েল ডেভিডকে গুলী করা দেখে সে সম্বিত ফিরে পেল এবং দ্রুত পকেট থেকে রিভলবার বের করল। কিন্তু ততক্ষণে রিভলবার ঘুরিয়ে নেয়া হয়ে গেছে আহমদ মুসার।

রিভলবার ঘুরিয়ে নিয়েই গুলী করেছে আহমদ মুসা। গুলী গিয়ে বিদ্ধ হলো জন ফ্রাংকের রিভলবার ধরে রাখা হাতের মুঠোয়।

রিভলবার ছিটকে পড়ে গেল জন ফ্রাংকের হাত থেকে। জন ফ্রাংক আর্তনাদ করে উঠে বাম হাত দিয়ে ডান হাতের মুঠোটা চেপে ধরল।

আর ওদিকে বুকে গুলী বিদ্ধ দানিয়েল ডেভিডের দেহটা আছড়ে পড়েছিল দক্ষিণের দেয়ালের উপর। তার দেহের পেছন দিকটা মেঝেয় আর মাথার দিকটা দরজার পাশে দুদেয়ালের কোণে ঠেস দেয়ার মত আটকে গেছে।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল এবং কুড়িয়ে নিল জন ফ্রাংকের রিভলবারটা। তারপর গিয়েই দাড়াল জন ফ্রাংকের মখের দিকে। বলল, 'ফাঁসে আটকে ফেলে বন্দী করতে চেয়েছিলে না? আজোরসের হারতা দ্বীপেও তোমাদেরকে ফাঁস ব্যবহার করতে দেখেছি। সাগর- মহাসাগর জুড়ে লুট-তরাজ ও দস্যুতার রেকর্ড সৃষ্টিকারী পূর্ব পুরুষদের সনাতন যুদ্ধ-মানসিকতায় ফিরে যাচ্ছ নাকি তোমরা?'

বলে আহমদ মুসা রিভলবারের নল দিয়ে জন ফ্রাংকের নিচু করে রাখা মুখটাকে উঁচু করে তুলল। বলল, অপরাধীরা অপরাধ করলে তার একটা চিহ্ন রেখেই যায়। তোমরা কলিং ইন্টারকমের রিসিভার অন করে রেখেই শলা-পরামর্শ করেছিলে। শুনতে একটু কষ্ট হয়েছে, কিন্তু শুনতে পেয়েছি সব।'

আহমদ মুসা একটু থামল।

কঠোর হয়ে উঠল তার চেহারা। বলল, 'ডা. নিউম্যান কোথায়?'

'এখান থেকে চলে গেছে।' বলল জন ফ্রাংক।

‘সেটা আগেই বুঝতে পেরেছি। আমি জিজ্ঞাসা করছি কোথায় গেছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আপাতত ওয়াশিংটন গেছে, তারপর কোথায় যাবেন জানি না।’ বলল জন ফ্রাংক।

‘তাহলে তোমাদের নেতা আজর ওয়াইজম্যান ওয়াশিংটনেই আছে?’

জন ফ্রাংক আহমদ মুসার এ প্রশ্নের কোন জবাব দিল না।

‘যাক। এ প্রশ্নের জবাব আমার প্রয়োজন নেই। এখন বল, ড. হাইম হাইকেলকে তোমরা কোথায় রেখেছ?’ ধীর শান্ত শীতল কন্ঠে জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

চমকে উঠে জন ফ্রাংক তাকাল আহমদ মুসার দিকে। চোখের দৃষ্টিতে টই-টুম্বর হিংস্রতা। কোন জবাব দিল না সে।

‘এই প্রশ্নের জবাব আমার প্রয়োজন মি. ফ্রাংক।’ বলে আহমদ মুসা তার রিভলবার তাক করল ফ্রাংকের চোখ বরাবর। বলল, ‘এখুনি জবাব না পেলে গুলী করব।’

কিন্তু লোকটি পাথরের মত নিরব রইল।

আহমদ মুসা তার রিভলবারের নল লোকটির বাম কানের বরাবর সরিয়ে আনল।

ঠিক এই সময়ই রিভলবারের সেফটি ক্যাচ তোলার শব্দ এল পেছন থেকে।

শব্দটি তার কান স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গেই আহমদ মুসা জন ফ্রাকের সামনে চোখের পলকে এক ধাপ সরে গেল।

সঙ্গে সঙ্গেই একটা গুলী এসে জন ফ্রাংকের বুক বিদ্ধ করল।

দানিয়েল ডেভিড বুকে গুলী খেয়ে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু গুলীটা তার হৃদপিন্ডকে মাঝামাঝি বিদ্ধ না করে একটু পাশ দিয়ে যাওয়ায় সে মরেনি তখনও। মরিয়া দানিয়েল ডেভিড একটা মহাসুযোগের সদ্ব্যব্যবহার করতে চেয়েছিল। কিন্তু সেফটি কাচের শব্দ ও আহমদ মুসার বিপদ আঁচের অদ্ভুত শক্তি ও ক্ষীপ্রতা তাকে সফল হতে দিল না।

কিন্তু যখন সে দেখল তার গুলী বুমেরাং হয়েছে, হত্যা করেছে জন ফ্রাংকেই, তখন সে শিথিল, কম্পিত দুহাতে তার রিভলবার আবার তুলছিল সর্বশক্তি ব্যয় করে।

এ যাত্রায়ও সে সফল হলো না। আহমদ মুসা তার আগেই ঘুরে দাঁড়িয়েছিল এবং তার রিভলবারও উঠে এসেছিল তাকে তাক করে। গুলী করতে আহমদ মুসার কষ্ট হচ্ছিল। ওদের অন্ততঃ একজনকে সে জীবন্ত চেয়েছিল কথা বের করার জন্য। কিন্তু গুলী না করে তার আর উপায় ছিল না। এক গুলী দিয়ে দুহাতকে নিস্ক্রিয় করার চেষ্টার মধ্যে ঝুঁকি আছে। সে ঝুঁকি আহমদ মুসা নিতে চায়নি।

আহমদ মুসার গুলী এবার দানিয়েল ডেভিডের মাথাকেই গুঁড়িয়ে দিল।

দুলাশের দিকে তাকিয়ে হতাশভাবে আহমদ মুসা পাশের চেয়ারটায় একটু বসল। ওদের কাউকে এখন পর্যন্ত জীবন্ত পাওয়া গেল না। আসল লক্ষ্য হল ড হাইম হাইকেলের সন্ধান লাভ, সেটারই কোন অগ্রগতি এখনও হলো না।

একটু রেস্ট নিয়ে উঠে আহমদ মুসা মৃত দুজনকেই সার্চ করল, তারপর সার্চ করল গোটা বাড়িটা। কিন্তু প্রয়োজনীয় এমন কিছু পেল না। একটা বিষয়ে আহমদ মুসার বিস্ময় লাগল, ওরা ডা. নিউম্যানকে সরিয়ে দিল কেন? এটা কি ওদের সতর্কতা না ওরা জানতে পেরেছে যে, ডা. নিউম্যানের ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে পড়েছে!

বাড়িটা থেকে শূন্য হাতে বের হতে হতে আহমদ মুসা ভাবল ড. হাইম হাইকেল সম্পর্কে জানার জন্যে সামনে একটা অবলম্বই দেখা যাচ্ছে। সেটা হলো ড. হাইম হাইকেলের পরিবার তার সাহায্য করতে পারে। আবার তাদের দিয়ে পথও বের করা যেতে পারে। কারণ তাদের সহযোগিতা করতে পুলিশ, সরকার, সবাই বাধ্য।

সুতারাং আহমদ মুসার নেক্সট ইনভেস্টিগেশন ফিলাডেলফিয়া, ড. হাইম হাইকেলের বাড়ি।

ফিলাডেলফিয়া এয়ারপোর্ট থেকে তীরবেগে ছুটে আসছে একটা কার। দিলাওয়ার এভেনিউতে প্রবেশ করে গাড়ি দিলাওয়ার নদী তীর ধরে ছুটে চলছে। দিলাওয়ার এভেনিউ থেকে গাড়িটি লম্বার্ড স্ট্রিটে প্রবেশ করে পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলল। সেন্ট পিটার্স চার্চ বরাবর এসে গাড়িটি প্রবেশ করল থার্ড স্ট্রিটে। চার্চ পেরিয়ে কিছুটা এগিয়ে গাড়িটা স্ট্রিট থেকে নেমে লাল পাথরে বাধা প্রাইভেট রাস্তা একশ গজের মত চলার পর গাড়িটা বিশাল এক বাড়ির গেটে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

পুরানো মডেলের নতুন বাড়ি। বাড়িটি ষোড়শ শতকের তৈরি। ফিলাডেলফিয়ার এই এলাকা একটি ইউরোপীয় বসতি। বৃটিশ সম্রাট দ্বিতীয় চার্লস কর্তৃক নিয়োজিত প্রথম বৃটিশ গভর্নর উইলিয়াম পেম এই দিলাওয়ার উপকূলে ল্যান্ড করার পরই এই বসতি স্থাপিত হয়। এই এলাকার শত শত বাড়ি এখনও সেই আগের মডেলেই বিদ্যামান। চারশ’ বছরের পুরানো বাড়িগুলো সংস্কার করা হয়েছে, কিন্তু আকার-আঙ্গিকে হাত দেয়া হয়নি। ঐতিহাসিক স্মৃতি রক্ষার জন্য মডেল, স্টাইল হুবহু রক্ষা করা হয়েছে।

যে বাড়িটার সামনে গাড়িটা গিয়ে দাঁড়াল, সে বাড়িটাও এই শত শত বাড়ির একটি। কিন্তু বাড়িটার আরেকটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, আমেরিকার বিখ্যাত ইহুদী ব্যক্তিত্ব হাইম সলমনের বাড়ি এটা। অতুল বিত্তের অধিকারী এই হাইম সলমন আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে তার সমুদয় অর্থ তুলে দিয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের তহবিলে। স্বাধীনতা উত্তর আমেরিকার সরকার গঠন ও পরিচালনা এবং শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে হাইম সলমন। সুতারাং এই বাড়িটা ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থান এবং পরিবারটাও পরম শ্রদ্ধাস্পদ।

গাড়িটা গেটের সামনে দাঁড়াতেই গেট বক্স থেকে সিকিউরিটি ছুটে এসে গেটের দরজা খুলে দিল।

গাড়ি লাল পাথরের রাস্তা ধরে সুন্দর ফুল-বাগানের মধ্য দিয়ে এগিয়ে প্রশস্ত গাড়ি বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

গাড়ি থেকে নামল সুদর্শন, বুদ্ধিদীপ্ত এক তরুন। হাতে ছোট্ট একটা হ্যান্ড ব্যাগ। এক দৌড়ে সে সিঁড়ি ভেঙে উঠে গেল বারান্দায়। বাড়িতে প্রবেশের দরজার মুখোমুখি হতে দরজা খুলে গেল। দরজায় দাঁড়িয়ে হাসি মুখে এক তরুণী। দরজা খুলেই তরুণীটি তরুণকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, 'হাই বেঞ্জামিন।'

'হাই ব্রাউন। তুমি! এখন, এখানে তোমাকে দেখব ভাবতেই পারছি না।' বলল বেঞ্জামিন।'

বেঞ্জামিনের পুরো নাম হাইম বেঞ্জামিন। হাইম হাইকেলের ছেলে এবং হাইম সলমনের উত্তম পুরুষ। পড়ে রোমের 'ইউনিভার্সিটি অব থিয়োলজী'তে। সে 'কম্পারেটিভ রিলিজিওন'-এর ছাত্র। তার পরীক্ষা ছিল বলে পিতার খবর তাকে জানানো হয়নি। পরীক্ষা শেষে জানতে পেরেই ছুটে এসেছে বাড়িতে।

আর ব্রাউনের পুরো নাম বারবারা ব্রাউন। বেঞ্জামিনদের প্রতিবেশী এক ইহুদী পরিবারের মেয়ে সে। পরিবারটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মাইগ্রেট করে আসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। হাইম বেঞ্জামিন ও বারবারা ব্রাউন ছোটবেলা থেকে সহপাঠি ও বন্ধু। বারবানা ব্রাউন এখন ফিলাডেলফিয়া বিশাববিদ্যালয়ের শেষ বর্ষের ছাত্রী।

বেঞ্জামিন কথা শেষ করতেই ব্রাউন বলে উঠল, 'আমি এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। দাদীর সাথে দেখা করতে এলাম। তুমি আসছ শুনলাম। তাই তোমাকে ওয়েলকাম করার জন্য দাঁড়িয়ে আছি।'

হাসিমুখে কথাগুলো বলল বারবানা ব্রাউন। কিন্তু হাসির মধ্যেও একটা অস্বস্তির প্রকাশ দেখা গেল তার মধ্যে। চোখের কোণায় যেন অপরাধের একটা কালো দাগ।

বারবানা ব্রাউন বেঞ্জামিনের হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে হাত ধরে টেনে ভেতরে নিয়ে যেতে যেতে বলল, দাদীর শরীর খুবই ভেঙে পড়েছে। তিনি উঠতে যাচ্ছিলেন তোমাকে রিসিভ করার জন্যে। আমি তাকে জোর করে শুইয়ে রেখেছি।'

বেঞ্জামিনের কথা শুনতে পেয়েছিল বেঞ্জামিনের দাদী গ্লোরিয়া হাইম।

বেঞ্জামিনের মা মারা গেছে। অনেক বছর হলো। দাদীই বেঞ্জামিনকে মানুষ করেছে। বেঞ্জামিনের পিতা হাইম হাইকেল চাকুরীর কারণে বেশির ভাগ

সময় নিউইয়র্কেই থাকত। আর বেঞ্জামিন পড়ত ফিলাডেলাফিয়াতেই। সুতারাং পিতা-মাতা দুজনেরই স্নেহ দাদী বেঞ্জামিনকে দিয়েছে।

বেঞ্জামিন ইটালীর রোমে পড়তে গেলে দাদী গ্লোরিয়া মানসিকভাবে খুবই ভেঙে পড়ে। হাইম হাইকেল মাকে সঙ্গ দেয়ার জন্য নিউইয়র্ক থেকে প্রতি সপ্তাহেই ফিলাডেলফিয়াতে আসত। একদিকে বেঞ্জামিন বিদেশে অন্যদিকে একমাত্র ছেলে হাইম হাইকেল নিরুদ্দেশ। শারীরিকভাবই দারুন ভেঙে পড়েছে গ্লোরিয়া।

বেঞ্জামিন গিয়ে জড়িয়ে ধরল দাদীকে।

বেঞ্জামিন দাদীকে সান্ত্বনা দিল। বলল, 'সব ঠিক হয়ে যাবে দাদী। আব্বার কোন শত্রু থাকতে পারে আমি বিশ্বাস করি না। তাঁর ক্ষতি কে করবে, কেন করবে দাদী?'

'আমিও তাই ভাবি। কিন্তু কোথায় গেল হাইকেল! তুই রোম যাবার পর কোন উইক এন্ডেই সে ফিলাডেলাফিয়ায় আসা বন্ধ করেনি।' বলল দাদী।

'এটা অবশ্যই চিন্তার বিষয় দাদী। কিন্তু এ থেকেই কোন খারাপ চিন্তা আমরা না করলেও পারি। সাধারণ ফর্মালিটির বাইরে তিনি কোথাও থাকতে পারেন। একথা সত্যি দাদী, আব্বার মধ্যে বিস্ময়কর মানসিক পরিবর্তন ঘটেছে। বিশ্বাসের দিক থেকে তিনি ইহুদী ধর্মের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে চলে এসেছেন। দুর্বোধ্য এই পরিবর্তন। পারিবারিক উত্তরাধিকার রাব্বানিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টের পদ পরিত্যাগ করে তিনি একাডেমিক একটা ডিপার্টমেন্টের দায়িত্বে নেমে এলেন। সবচেয়ে বড় কথা দাদী, সবকিছু থেকে নিজেকে বিছিন্ন করার একটা প্রবল আত্মমুখী প্রবণতা তার মধ্যে আমি দেখেছি। সুতারাং কোথাও গিয়ে কিছু সময়ের জন্য তিনি আত্মগোপন করতে পারেন।' বলল হাইম বেঞ্জামিন।

'বেঞ্জামিন, বয়সের পরিবর্তনের সাথে চিন্তাধারায় যে কোন পরিবর্তন আসতে পারে, তা বিস্ময়কর হতেও পারে। এটা স্বাভাবিক। কিন্তু এই কারণে হাইকেল তার মায়ের প্রতি, তার পরিবারের প্রতি এতটা অবিচার করবে, তা আমি মেনে নিতে পারছি না।' বলল দাদী গ্লোরিয়া।

‘এটা ঠিক বলেছ দাদী। আব্বার ইদানিংকালের মানবতাবাদী চিন্তার সাথেও এটা মিলে না। আচ্ছা পুলিশ কি বলছে দাদী?’ জিজ্ঞাসা বেঞ্জামিনের।

‘ফিলাডেলাফিয়ার পুলিশ প্রধান ঘটনার পর আমার কাছে এসেছিল। সমবেদনা প্রকাশ করেছিল। বলেছিল, ‘সকলের সম্মানিত হাইম হাইকেলকে উদ্ধারের সব রকম চেষ্টা তারা করবে। কিন্তু তদন্তের কাজটা চলবে নিউইয়র্ক ভিত্তিক। সব ব্যাপার জানে বিশ্বাবদ্যালয় এবং সেখানকার পুলিশ।’ বলল দাদী।

‘ঠিক আছে দাদী, আমি দুএকদিনের মধ্যেই নিউইয়র্ক যাব।’ হাইম বেঞ্জামিন বলল।

‘ঠিক আছে ভাই। এখন আর কথা নয়। যাও কাপড় ছাড়, ফ্রেশ হও।’ বলল গ্লোরিয়া হাইম।

‘আচ্ছা দাদী, একটু পরে আসছি। তোমার সাথে বসেই চা খাব।’ হাইম বেঞ্জামিন বলল।

উঠে দাঁড়াল সে।

উঠে দাঁড়াল বারবারা ব্রাউনও।

‘তুমি এখন চলে যাবে? একটু পরে যাও। এস কথা বলি।’ বারবানা ব্রাউনকে লক্ষ্য করে বলল হাইম বেঞ্জামিন।

‘তোমার এখন রেস্ট প্রয়োজন।’ বলল বারবারা ব্রাউন।

‘কথাকে রেস্টের বিকল্প বলছি না। চল।’ হাইম বেঞ্জামিন বলল।

হাইম বেঞ্জামিন কাপড় ছেড়ে ফ্রেস হয়ে এসে সোফায় বারবারা ব্রাউনের মুখোমুখি বসল। বলল, ‘আচ্ছা ব্রাউন বলত তুমি কি ভাবছ? আমি বিষয়টাকে সহজভাবে নিতে চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম,আব্বা নিভৃত জীবনের জন্য কিছু সময়ের জন্য কোথাও হয়তো গেছেন। ধর্ম চিন্তায় যারা গভীরভাবে ডুবে যান, তাদের ক্ষেত্রেই কখনও কখনও এমন ঘটে। কিন্তু এখন দাদীর কথায় মনে হচ্ছে, সত্যি আব্বা এমন দায়িত্বহীন হতে পারেন না। দাদী ও পরিবারের চিন্তাকে বাদ দিয়ে তিনি কোন চিন্তাই গ্রহণ করতে পারেন না।’

বেদনা মিশ্রিত একটা বিব্রতভাব ফুটে উঠেছিল বারবারা ব্রাউনের মুখেও। এই ভাবটা চাপতে চেষ্টা করে বলল বারবারা ব্রাউন, আমি দাদীর সাথে একমত। বড় কিছু ঘটেছে। ভেবে-চিন্তে তোমার সামনে এগুনো দরকার।

'বড় কিছু একটা কি হতে পারে?' জিজ্ঞেস করল হাইম বেঞ্জামিন।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না বারবারা ব্রাউন। কি উত্তর দেবে সে! সে নিজেও সবকিছু জানে না। কিন্তু এটুকু জানে যে, আংকেল ড. হাইম হাইকেল বিপদে আছেন। হাইম পরিবারকে তা জানতে দেয়া হবে না। ইহুদীদের স্বার্থেই নাকি এটা প্রয়োজন। আংকেল ড. হাইম হাইকেলের স্বার্থেই নাকি কোন বিদেশীকে, এমনকি অপরিচিত কোন স্বদেশীকেও হাইম পরিবারের সাথে দেখা করতে দেয়া যাবে না কিছুতেই। এই পাহারা দেবার দায়িত্ব তার উপরেও পড়েছে। পরিবারের অজান্তে এটা করতে তার খারাপ লাগছে। সে বুঝতে পারছে না এর মধ্যে ইহুদী স্বার্থের কি আছে, হাইম পরিবারের স্বার্থেরই বা কি আছে! তবু অর্পিত দায়িত্ব তাকে পালন করতে হচ্ছে। হাইম বেঞ্জামিন শুধু তার বন্ধু নয়, তার সব কিছুই সে। কিন্তু তার সাথেও লুকোচুরি খেলতে হচ্ছে তাকে। সত্য কথাটা বলা যাচ্ছে না। এই চিন্তা তাকে ভীষণ কষ্ট দিচ্ছে।

চিন্তার টানাপোড়নে বিব্রত বারবারা ব্রাউন উঠে হাইম বেঞ্জামিনের পাশে গিয়ে বসল। তুলে নিল হাইম বেঞ্জামিনের একটা হাত। বলল, 'বেঞ্জামিন 'বড় কিছু একটা' কি আমি জানি না। কিন্তু মনে হচ্ছে আংকেল বড় বিপদে পড়েছেন।'

থামল বারবানা ব্রাউন। একটা দম নিয়ে ভয়ার্ত ফিসফিসে কন্ঠে বলল, 'আমার মনে হয় তোমাদের পরিবারের উপরও চোখ রাখা হচ্ছে।'

ভ্রুকুঞ্চিত হলো বেঞ্জামিনের। সোজা হয়ে বসল। বারবারা ব্রাউনের দুহাতই সে তার হাতের মুঠোর মধ্যে নিল। বলল, 'ব্রাউন, সত্যি এটা? কি করে বুঝলে তুমি?'

কথা গুছিয়ে রেখেছিল বারবারা ব্রাউন। বলল, আমাদের কম্যুনিটির বিভিন্ন সূত্র থেকে এটা বলা হচ্ছে। আর গতকাল নিজেও আমি তোমাদের বাসায় একটা টেলিফোন ধরেছি দাদীর নির্দেশে। টেলিফোন যিনি করেছিলেন, কথার উচ্চারণ থেকে বুঝলাম তিনি একজন বিদেশী। তিনি বললেন, মি. হাইম বেঞ্জামিন

আগামীকাল ক'টায় পৌঁছাচ্ছেন?' আমি উত্তরে জিজ্ঞাসা করলাম, কে আপনি? তিনি বললেন, আমি ড. হাইম হাইকেলের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী। আমি মি. হাইম বেঞ্জামিন ও তার দাদীর সাথে দেখা করতে চাই।' আমার বিস্ময় লেগেছে তুমি আজ আসছ এ বিষয়টা একজন বিদেশী নিউইয়র্ক থেকে জানল কি করে? 'দাদী অসুস্থ, পরে যোগাযোগ করবেন' বলে আমি তাঁকে এড়িয়ে গেছি।'

ওদিকে হাইম বেঞ্জামিন কিছু বলার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। বারবারা ব্রাউন থামতেই বেঞ্জামিন বলে উঠল, 'আশ্চর্য, আমি এই দুমিনিট আগে টয়লেট থেকে বেরিয়ে একটা টেলিফোন ধরলাম। টেলিফোনটা তোমার সেই লোকের। ঠিক সেই বিদেশী উচ্চারণ। তোমাকে যা বলেছে আমাকেও তাই বলল। আব্বার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী সে, আমার সাথে দেখা করতে চায়।'

'অবাক ব্যাপার! তুমি এসেছ এক ঘন্টাও হয়নি, সে জানল কি করে?' বলল বারবারা ব্রাউন। বিস্ময়ভরা তার কন্ঠে।

হাইম বেঞ্জামিন চিন্তা করছিল। বলল,'আধুনিক ব্যবস্থায় বিমান বন্দরকে জিজ্ঞাসা করে বা ইন্টারনেট-ই-মেইলের মাধ্যমেও এটা জানা সম্ভব।'

'আবার বাড়ির উপর চোখ রেখেও জানা সম্ভব।' বারবারা ব্রাউন বলল।

'হ্যাঁ, তাও সম্ভব।' বলল, হাইম বেঞ্জামিন।

'তুমি কি বলেছ লোকটাকে?' জিজ্ঞাসা করল বারবারা ব্রাউন।

'আমি তাকে সময় দিয়েছি। আমি নিউইয়র্ক যাবার আগে তার সাথে আলোচনা করলে ভালোই হবে।' বলল বেঞ্জামিন।

'অপরিচিত একজন মানুষ। তার উপর বিদেশী। একজন অপরিচিত বিদেশী কি করে আংকেলের শুভাঙ্ক্ষী হতে পারেন?

হঠাৎ তার সাথে দেখা করা কি ঠিক হবে? তার কোন বদ মতলবও থাকতে পারে।' বারবারা ব্রাউন বলল।

'হঠাৎ করে তো দেখা করছি না। আসছেন আগামীকাল। আমাদের হাতে যথেষ্ট সময় থাকছে।' বলল বেঞ্জামিন।

কলিংবেল বেজে উঠল।

বারবারা ব্রাউন দৌড়ে গিয়ে কলটা রিসিভ করল। কথা বলল। তারপর ছুটে এল হাইম বেঞ্জামিনের কাছে। বলল, 'একজন পুলিশ অফিসার এবং নিউইয়র্ক রাব্বানিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইরেক্টর এসেছেন। তোমার সাথে দেখা করবেন।'

হাইম বেঞ্জামিনের মুখটা উজ্জল হয়ে উঠল। ওরা কি আব্বার সম্পর্কে কোন সুসংবাদ এনেছেন? মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকল হাইম বেঞ্জামিন যেন কোন সুখবর সে পায়।

উঠে দাঁড়াল হাইম বেঞ্জামিন। বলল,'চল ব্রাউন, ওদের নিয়ে আসি।'

মেহমান দুজনকে স্বাগত জানিয়ে নিয়ে এসে ওরা চারজন ড্রইংরুমে বসল। বেঞ্জামিন ও বারবারা পাশাপাশি এক সোফায় বসল। আর অন্য দুটি সোফায় বসল পুলিশ আফিসার এবং নিউইয়র্ক রাব্বানিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইরেক্টর মি. ফ্রান্সিস।'

হাইম বেঞ্জামিন বসেই মি. ফ্রান্সিসকে লক্ষ্য করে বলল, 'স্যার, আপনি আসায় খুব খুশি হয়েছি। আমি নিজেই নিউইয়র্ক যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম। আমরা খুব উদ্বিগ্ন।'

'আমরাও নিদারুন দুঃখিত ও উদ্বিগ্ন। আসলেই এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে কিছু বলার জন্যে আমরা এসেছি।' বলে একটু থামল ফ্রান্সিস। তারপর পুলিশ অফিসারের দিকে চেয়ে বলল, 'এসপি সাহবে আপনিই কথাটা শুরু করুন।'

পুলিশ অফিসারের চোখে-মুখে একটা বিব্রতভাব ফুটে উঠল। তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক হবার চেষ্টায় নড়ে-চড়ে বসল। বলল, 'আমি এ্যালেন শেফার। নিউইয়র্কের ইয়র্কভিল ডিস্ট্রিক্ট-এর একজন তদন্তকারী অফিসার। দুঃখের সাথে বলছি, আমরা ড. হাইম হাইকেলকে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় খুঁজে পেয়েছি। যা বুঝা গেছে তাতে মনে হয়েছে ভীষণ এক ভয়ে তিনি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। তাঁর জীবন প্রচন্ড ঝুঁকির মুখে। এর একটা সত্যতা পাওয়া গেছে, গত কয়েকদিনে রাব্বানিক বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় একজন খুন হয়েছে, দুজনকে খুন করার চেষ্টা করা হয়েছে। ড. হাইকেলের সন্ধানে তাদের হত্যা ও জখম করা হয়। এই আশংকাকে

সামনে রেখেই ড. হাইকেলকে খুঁজে পাওয়ার খবরটা প্রকাশ করা হয়নি। আর................।'

পুলিশ অফিসার এ্যালেন শেফারের কথার মাঝখানেই হাইম বেঞ্জামিন বলে উঠল, 'আব্বা এখন কোথায়?'

'একটা মানসিক হাসপাতালে রাখা হয়েছে।' বলল এ্যালেন শেফার।

'কোন হাসপাতালে?' জিজ্ঞাসা বারবারা ব্রাউনের।

'সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্তৃপক্ষ ছাড়া কাউকে বলার অনুমতি নেই। আমিও জানি না ম্যাডাম।' বলল পুলিশ অফিসার।

'পরিবারের সদস্যরাও তা জানতে পারবে না?' জিজ্ঞেস করল হাইম বেঞ্জামিন।

'পরিবারের সদস্যরা জানতে পারবে না?' কিন্তু যেতে পারবে। এ বিষয়ে আলোচনার জন্য আমরা এসেছি।' পুলিশ অফিসারটি বলল।

'বলুন ঘটনা কি?' বলল হাইম বেঞ্জামিন।

সঙ্গে সঙ্গে কথা বলল না পুলিশ অফিসারটি। একটু ভাবল। বোধ হয় কথা গুছিয়ে নিল। তারপর বলতে শুরু করল, 'ড. হাইম হাইকেল একদিকে অপ্রকৃতিস্থ, অন্যদিকে অদৃশ্য এক প্রবল শত্রু তাকে তাড়া করে ফিরছে। এই অবস্থায় তার যেমন চিকিৎসা দরকার, তেমনি দরকার নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার। এজন্য তাকে চিকিৎসার জন্য এমন এক জায়গায় রাখা হয়েছে, যা পুলিশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ছাড়া কেউ জানে না। আপনাদেরও জানানো যাবে না এই কারণে যে, আপনাদের যাতায়াত বা অন্য কোনভাবে বিষয়টা শত্রুরা জেনে ফেলতে পারে। শত্রুরা ড. হাইম হাইকেলের সন্ধানে আপনাদের উপরও চোখ রেখেছে। তবে সিদ্ধান্ত হয়েছে, সংশ্লিষ্ট পুলিশের তত্ত্ববধানে ড. হাইম হাইকেলকে দেখানো হবে তার পরিবারের লোকদের।'

একটা ঢোক গিলল পুলিশ অফিসার এ্যালেন শেফার। থামতে হলো তাকে।

পুলিশ অফিসার থামতেই হাইম বেঞ্জামিন বলে উঠল, আমার দুটি কথা। এক, আপনি বলেছেন হাসপাতালের নাম, ঠিকানা আমাদের জানাবেন না। কিন্তু

ওখানে যখন যাব, তখন তা তো জানা হয়েই যাবে। তাহলে নাম, ঠিকানা জানাতে আপত্তি কেন? দুই. আব্বাকে আমাদের দেখানো হবে বলেছেন। দেখানোর অর্থ সাক্ষাত ও কথা বলা নয়। 'দেখানো হবে' বলতে আপনি কি অর্থ করেছেন?'

পুলিশ অফিসারটির মুখে একটা অস্বস্তির ভাব ফুটে উঠল। বিব্রতও মনে হলো কিছুটা। কিন্তু এরপরও হাসার চেষ্টা করে সে বলল, 'ড. হাইম হাইকেলের পরিবারকে তার কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া হবে, দেখানো হবে, কিন্তু সাক্ষাত করানো হবে না। ডাক্তারের নিষেধ। যথেষ্ট সুস্থ না হওয়ায় আত্নীয়-স্বজনের সাথে তাকে সাক্ষাত করানো যাবে না। যে কোন আবেগ উত্তেজনা তার জন্য ক্ষতিকর। এই একই কারণে তাঁকে তাঁর কোন পরিচিতজনের সাথেও সাক্ষাত করানো হচ্ছে না। যেখানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেখানকার নাম- ঠিকানা না জানানোর অর্থ হলো, ড. হাইম হাইকেলের পরিবার সেখানে যাবেন বটে, কিন্তু যাওয়ার রাস্তা এবং যাওয়ার স্থান তাদের দেখতে দেয়া হবে না। শেডে ঢাকা বন্ধ গাড়িতে করে যে ঘরে বসে তারা হাইকেলকে দেখবেন, সেই ঘরে নিয়ে নামিয়ে দেয়া হবে। দেখার পর ঐ ঘর থেকে ঐভাবেই আবার ফিরিয়ে আনা হবে।'

বিরক্তি ফুটে উঠল হাইম বেঞ্জামিনের মুখে। বলল, এত কিছুর আমি কারণ বুঝছি না। ড. হাইম হাইকেলের পরিবারকেও বিশ্বাস করা হবে না কেন? আব্বার শত্রু কে বা কারা, কেন তা আমরা জানতে পারব না?'

পুলিশ অফিসারের মুখে সেই আগের অস্বস্তিভাব আবারও ফুটে উঠল। ম্রিয়মান কন্ঠে বলল, 'যা করা হচ্ছে সবই ড. হাইম হাইকেলের স্বার্থে।' বলে একটু থামল পুলিশ অফিসার। তারপর পুনরায় বলা শুরু করল, 'মুসলিম একটি মৌলবাদী চক্র বিরাট এক ষড়যন্ত্র এঁটেছে ড. হাইকেলকে ঘিরে। ড. হাইম হাইকেল একটি ঐতিহাসিক পরিবারের অত্যন্ত সুপরিচিত ও সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর কাছ থেকে ঐ চক্র একটা কনফেশন আদায় করতে চায় যে কোন মূল্যে। তারপর তাকে হত্যা করতে চায়, যাতে সে কনফেশনের কোন প্রতিবাদ জানানোর কোন সুযোগ না পান।'

পুলিশ অফিসার থামতেই বারবারা ব্রাউন বলে উঠল, 'কনফেশনটা এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? কিসের কনফেশন এটা?'

'এ প্রশ্নের উত্তর আমরা জানি না। তবে এইটুকু জানি যে, জাতীয় মহাগুরুত্বপূর্ণ এক ঘটনার সাথে এই কনফেশন জড়িত। এই কনফেশন শত্রুর হাতে এমন এক মহাঅস্ত্র তুলে দেবে যা ইতিহাসই পাল্টে দিতে পারে।' বলল পুলিশ অফিসারটি।

বিস্ময় ও ভীতির ছায়া নেমে এসেছে হাইম বেঞ্জামিন ও বারবারা ব্রাউনের চোখে-মুখে। পুলিশ অফিসারটি থামলেও তারা কোন কথা বলতে পারল না। ভাবছিল হাইম বেঞ্জামিন, তার আব্বা কি এমন জানেন বা চাপে পড়ে ভিত্তিহীন কি এমন কনফেশন করতে পারেন যা ইতিহাস পাল্টে দিতে পারে! তার পিতার মানসিক পরিবর্তনের সাথে এই কনফেশন ব্যাপারটার কি কোন সর্ম্পক আছে?

পুলিশ অফিসারই আবার কথা বলে উঠল। বলল, 'সব কথা আমরা জানি না। কিন্তু ষড়যন্ত্রটা অত্যন্ত ভয়াবহ। জাতির স্বার্থে, ড. হাইম হাইকেলের স্বার্থে আপনারা আমাদের সহযোগিতা করবেন বলে আমরা সবাই আশা করি।'

ভাবছিল হাইম বেঞ্জামিন। একটু পর বলল, 'ঠিক আছে মি. এ্যালেন শেফার। আমরা কবে দেখা করতে পারি?'

'সুবিধা অনুসারে আমাদের পক্ষ থেকেই তা আপনাদের জানানো হবে।' বলল পুলিশ অফিসার।

হাইম বেঞ্জামিন পাশের ডেস্ক থেকে স্লিপ প্যাডের একটা পাতা নিয়ে এসে পকেট থেকে কলম বের করে পুলিশ অফিসারকে বলল, 'আপনার অফিস ও বাসার টেলিফোন নাম্বার দিন, যাতে আমরাও যোগাযোগ করতে পারি আপনার সাথে।'

পুলিশ অফিসার কিছুটা সংকুচিত হয়ে পড়ে বাধো বাধো কন্ঠে বলল, 'আমি অফিসে কখন থাকি, বাসায় কখন থাকি তার কোন স্থিরতা নেই। সুতরাং আমাদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করে লাভ হবে না। আপনারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইরেক্টরের সাথে যোগাযোগ রাখবেন, তাহলেই হবে।'

কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে হাইম বেঞ্জামিন তার কাগজ ও কলম রেখে দিতে দিতে বলল, 'ধন্যবাদ ওঁদের সকলের টেলিফোন আমাদের কাছে আছে।'

হাইম বেঞ্জামিনের কথা শেষ হতেই পুলিশ অফিসার উঠে দাঁড়াল। তার সাথে উঠল নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইরেক্টর মি. ফ্রান্সিস। বলল পুলিশ অফিসার, 'আমরা দুঃখিত। একেবারে অসময়ে আপনাদের বিরক্ত করেছি। আপনি বাড়িতে ফিরে বোধ হয় একটু রেস্টও নিতে পারেননি।'

'আমাদের খুশি হবার কথা। আমরা খুশি হয়েছি। আমাদের জন্যেই কষ্ট করে আপনারা এসেছেন। কষ্ট করে আসার জন্য ধন্যবাদ।' বলল হাইম বেঞ্জামিন।

পুলিশ অফিসার এ্যালেন শেফার এবং নিউইয়র্ক রাব্বানিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইরেক্টর মি. ফ্রান্সিসকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসে হাইম বেঞ্জামিন ও বারবারা ব্রাউন আবার বসল।

কপাল কুঞ্চিত, চোখ আধ-বোজা। ভাবছিল হাইম বেঞ্জামিন।

তার চিন্তায় বাধ সেধে বারবারা ব্রাউন বলে উঠল, 'বলেছিলাম না বেঞ্জামিন আংকেল বড় কোন বিপদে পড়েছেন এবং বলেছিলাম যে, তোমাদের বাড়ি ও তোমাদের উপর চোখ রাখা হচ্ছে। দেখলে সবই সত্য প্রমাণ হলো। ওরাও বলে গেল এবং আমিও নিশ্চিত যে, শত্রু পক্ষ তোমাদের বাড়িতে আসবে, তোমাদের সাথে দেখা করারও চেষ্টা করবে।'

'কেন আসবে আমরা তো কিছুই জানি না।' বলল হাইম বেঞ্জামিন।

'এখন তো অনেক কিছুই জানলে'। বারবারা ব্রাউন বলল।

'আব্বা যখন বিপদগ্রস্থ, তখন সে বিপদ আমাদের স্পর্শ করবেই।' বলল হাইম বেঞ্জামিন।

'ভেব না বেঞ্জামিন। শত্রুরা তোমাদের পর্যন্ত পৌঁছতেই পারবে না।' বারবারা ব্রাউন বলল।

ভ্রুকুঞ্চিত হলো হাইম বেঞ্জামিনের। বলল, 'তুমি এতটা নিশ্চিত কেমন করে?'

একটু সংকুচিত ভাব দেখা দিল বারবারা ব্রাউনের চোখে-মুখে। একটু হেসে স্বাভাবিক হয়ে বলল, কেন যারা আংকেলের নিরাপত্তা দিচ্ছেন, তাদের কি দায়িত্ব নয় তোমাদেরকে নিরাপত্তা দেয়া?'

‘এটা যুক্তির কথা, কিন্তু বলেছ নিশ্চিত কথা। যাক। আব্বার অপ্রকৃতিস্থ হবার বিষয়টি আমার মন মেনে নিতে পারছে না। একমাস আগেও আব্বার যে চিঠি পেয়েছি, তাতে তাঁকে সুস্থ শুধু নয়, আরও গভীর ও স্বচ্ছ চিন্তার মনে হয়েছে।’ বলল বেঞ্জামিন।

‘তুমি বলছ এক মাস আগের কথা। কিন্তু বর্তমানকে তো মানতে হবে বেঞ্জামিন।’ বারবারা ব্রাউন বলল।

‘মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। কি করব বুঝতে পারছি না। আব্বার সাথে সাক্ষাত করতে পারবো না, এ কেমন কথা!’ বলল হাইম বেঞ্জামিন।

‘ডাক্তারের কথা তো মানতেই হবে। ডাক্তারের উপর ভরসা করা ছাড়া করার কি আছে!’ বারবারা ব্রাউন বলল।

সেই সাথে বারবারা ব্রাউন সরে বেঞ্জামিনের ঘনিষ্ট হলো। বেঞ্জামিনের কাঁধের উপর হাত রেখে বলল, ‘আবেগ নয়, তোমাকে বাস্তববাদী হতে হবে বেঞ্জামিন। আমার মনে হচ্ছে, বিপর্যয়টাকে যতটা আমরা দেখছি, তার চেয়ে বড়। তোমাকে সবদিক দেখে চলতে হবে।’

‘পরিবারের সবকিছু আব্বাই দেখেছেন, এখন তিনিই বিপদে। খুবই অসহায় বোধ করছি আমি।’ বলল বেঞ্জামিন।

বারবারা ব্রাউন হাত দিয়ে বেঞ্জামিনের গলা জড়িয়ে ধরে বলল, ‘আমি তোমার পাশে থাকব বেঞ্জামিন।’

বেঞ্জামিন কোন কথা বলল না।

মাথাটা সে এলিয়ে দিল বারবারা ব্রাউনের কাঁধে।

দিলাওয়ার নদীর তীরে দিলাওয়ার এভেনিউর ঠিক উপরেই একটা হোটেলে উঠেছে আহমদ মুসা। ইউরোপীয় ট্যুরিস্টের ছদ্মবেশে। সামান্য ছদ্মবেশেই সে একেবারে বদলে গেছে। সুবেশী একজন এ্যাংলো-এশিয়ান ট্যুরিস্ট মনে হচ্ছে তাকে।

দুপুরে সে হোটেলে উঠেছে। গোসল করে খাওয়ার পর একটু রেস্ট নিয়েই আহমদ মুসা বেরিয়েছিল এলাকাটা দেখার জন্যে। সেই সাথে সাথে হাইম বেঞ্জামিনের বাড়িটাও সে দেখে এসেছে।

হোটেলে উঠেই আহমদ মুসা যোগাযোগ করেছে হাইম বেঞ্জামিনের সাথে। বলেছে, 'আমি আপনার সাথে দেখা করতে এসেছি, আপনার আব্বার ব্যাপারে আপনার সাথে কিছু আলোচনার জন্যে।' সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর আসেনি বেঞ্জামিনের কাছ থেকে। একটু পর বলে, 'আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমি কিংবা আমাদের পরিবারের কেউ আমার আব্বার ব্যাপার নিয়ে কারও সাথে কথা বলব না।' আহমদ মুসা উত্তরে এই সিদ্ধান্তের কারণ জিজ্ঞাসা করেছিল। বেঞ্জামিন বলেছিল, 'এ ব্যাপারে আমাদের কিছু বলার নেই বলে। কারও কিছু জানার থাকলে পুলিশের কাছ থেকেই জানা উচিত।' আহমদ মুসা বলল, 'ধন্যবাদ আমি গত সাতদিনে নিউইয়র্কে সে রকম পুলিশ তালাশ করেছি, যিনি ড. হাইম হাইকেলের সর্ম্পকে কিছু জানেন। কিন্তু এ রকম পুলিশ পাইনি, যে অন্তত; এটুকু বলতে পারে, ড. হাইকেলের লা-পাত্তা হবার তদন্ত শুরু হয়েছে। এ ধরনের তদন্ত শুরু হয়, সংশ্লিষ্ট লোকের ঘর থেকে। কিন্তু আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে শুনেছি, ঘরটি পুলিশের কেউ এখনও দেখেইনি। তাঁকে যদি অসুস্থ বা অপ্রকৃতিস্থ বলা হয়, তাহলেও এর পটভূমির জন্যে তার ঘরের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসের তার ব্যাক্তিগত জিনিসপত্র ও কাগজপত্রের পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ দরকার হয়। পুলিশ তার কিছুই করেনি। তদন্তের জন্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন পুলিশ অফিসারই পাইনি। সুতরাং যা জানতে চাই, কাকে জিজ্ঞাসা করব?' আহমদ মুসার এ দীর্ঘ কথার পর সঙ্গে সঙ্গেই বেঞ্জামিন কিছু বলেনি। বোধ হয় ভাবছিল। একটু পরে বলে ওঠে, 'আপনি নিউইয়র্কের নিউইয়র্কভীল ডিস্ট্রিক্ট পুলিশ অফিসার এ্যালেন শেফারের কাছে গেছেন? তিনি আপনাকে সাহায্য করতে পারেন।' শুনেই আহমদ মুসা বলে উঠেছিল, 'কি নাম বললেন পুলিশ অফিসারের?' বেঞ্জামিন উত্তরে বলে, 'এ্যালেন শেফার।' আহমদ মুসা একটু ভেবে বলেছিল, 'আমি নিউইয়র্কের নিউইয়র্কভিল ডিস্টিক্টেই রয়েছি। ওখানকার পুলিশ অফিসে আমি খোঁজ-খবর নিয়েছি। ওখানে ১১ জন তদন্তকারী অফিসার

আছেন। তার মধ্যে এ্যালেন শেফার নামে কাউকে পাইনি!' উত্তরে বলেছিল বেঞ্জামিন 'পাননি! কয়েকদিন আগেই তো আমার সাথে কথা বলে গেল!' ভ্রুকুঞ্চিত হয়েছিল আহমদ মুসার। একটু ভেবে নিয়ে সে, বলেছিল, 'নিউইয়র্কের পুলিশ আপনার এখানে এসেছিল? তার নাম এ্যালেন শেফারই ছিল? ঠিক মনে আছে আপনার?' হাইম বেঞ্জামিন বলল, 'হ্যাঁ ঠিক আছে।' একটু ভেবে আহমদ মুসা বলেছিল, 'আমার অনুরোধ, আপনি সময় করে নিউইয়র্ক পুলিশের ওয়েব সাইটে নিউইয়র্কভিল ডিস্ট্রিক্টের পুলিশের লিস্টটা একটু পরীক্ষা করুন। ওখান থেকে টেলিফোন নাম্বার নিয়ে আপনি টেলিফোনও করতে পারেন।' আহমদ মুসা থামতেই বেঞ্জামিন বলে উঠল, 'আমি এখনি দেখছি। মিনিট দশেক পরে আপনার সাথে কথা বলব। স্যরি, এখন রাখছি।' বলেই সে টেলিফোন রেখে দিয়েছিল।

ঠিক দশ মিনিট পর আহমদ মুসা টেলিফোন করার আগে হাইম বেঞ্জামিনই আহমদ মুসাকে টেলিফোন করে। আহমদ মুসা টেলিফোন ধরে হ্যালো বলতেই হাইম বেঞ্জামিন বলতে শুরু করে, 'স্ট্রেঞ্জ মি. .............।'

'আইজ্যাক দানিয়েল।' বলল আহমদ মুসা।

'হ্যাঁ মি. দানিয়েল, আমি কম্পিউটারের ওয়েব সাইটে চেক করেছি। নিউইয়র্কভিল ডিস্ট্রিক্ট-এ এ্যালেন শেফার নামে কোন পুলিশ নেই। আমি টেলিফোনও করেছিলাম। ওখানকার পুলিশ অফিস জানাল, ঐ নামের কোন পুলিশ অফিসার এখানে নেই। গত তিন বছরের মধ্যে ছিল না। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম কোন পুলিশ অফিসার তারা আমাদের বাড়িতে পাঠিয়েছিল কিনা। তারা পাঠায়নি বলেছে। আপনার কথাই ঠিক। তারা আমার আব্বার অন্তর্দ্ধানের তদন্ত বিষয়ে কোন তদন্ত অফিসারই নিয়োগ করেনি এখনও।' হাইম বেঞ্জামিন থামলেই আহমদ মুসা বলেছিল, 'মি.হাইম বেঞ্জামিন আপনার সাথে আমার কথা আছে। আসতে পারি?' একটু চুপ করে থেকে হাইম বেঞ্জামিন বলেছিল, 'কি বলব মি. দানিয়েল, বুঝতে পারছি না।' আহমদ মুসা বলল, 'মি. হাইম বেঞ্জামিন আমাকে বিশ্বাস করার দরকার নেই। আমার কথা আপনি শুনবেন। আমি একাই এসেছি। একাই আপনার সাথে কথা বলব। আমাকে সার্চ করে ঢুকাবে আপনার

সিকিউরিটি। আপনি যে কোন কাউকে সঙ্গে রাখতে পারেন।' অবশেষে সাক্ষাতের সময় দেয় বেঞ্জামিন।

কাপড়-চোপড় পরেই আহমদ মুসা বসেছিল। বেঞ্জামিনের বাড়িতে যাবার জন্যে ঠিক সন্ধ্যা ৭ টায় উঠে দাঁড়াল।

দরজা খুলল।

দরজা খুলে বাইরে মুখ বাড়াতেই একজন লোকের মুখোমুখি হয়ে গেল। লোকটি যুবক বয়সের এবং লাল শ্বেতাংগ। আহমদ মুসার দরজার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আহমদ মুসার মুখোমুখি হতেই লোকটি চমকে উঠল এবং পেছনে ফিরে করিডোর বরাবর হনহন করে চলতে শুরু করল।

আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে লোকটির পেছনে হাঁটতে শুরু করল। আহমদ মুসা নিশ্চিত, লোকটি তার ঘরের সন্ধানেই এসেছিল।

সামনেই করিডোরের একটা বাঁক।

লোকটি বাঁক ঘুরে গেল।

আহমদ মুসা দরজা বন্ধ করতে যেয়ে একটু পিছিয়ে পড়েছিল।

আহমদ মুসাও বাঁক ঘুরল। কিন্তু বাঁক ঘুরে লোকটিকে আর দেখতে পেল না। লিফট রুম সামনে, কিন্তু বেশ একটু দূরে। এত তাড়াতাড়ি সে লিফটে নেমে যেতে অবশ্যই পারেনি। কিন্তু গেল কোথায়? লোকটি তার মতই কি হেটেলের বাসিন্দা? আহমদ মুসার দরজায় তার ঐভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটা কি একটা বোকামি? কিন্তু লোকটির চোখ-মুখ দেখে তা মনে হয়নি।

মাথায় এসব ভাবনা নিয়েই আহমদ মুসা লিফটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

এসে গেল লিফটটা।

আহমদ মুসা চিন্তাগুলো ঝেড়ে ফেলে লিফটে প্রবেশ করল। মনে মনে বলল, এখন ড. হাইম হাইকেলের পরিবারের সদস্যের সাথে কথা বলাই তার জন্য সবচেয়ে বড় কাজ। অন্যদিকে সে নজর দেবে না। সে নিশ্চিত যে, তার ফিলাডেলাফিয়ায় আসা শত্রুর কাছে ধরা পড়ে গেছে। লোকটি তাদের হওয়াটাই ঘটনার সবচেয়ে সংগত ব্যাখ্যা।

আহমদ মুসা হোটেলের সামনে কয়েক ঘন্টার চুক্তিতে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে যাত্রা করল।

আহমদ মুসার গাড়ি দেলোয়ার এভেনিউ থেকে ক্যাথেরিন স্ট্রিটে প্রবেশ করে পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলল। তারপর পশ্চিম দিকে বাঁক নিয়ে প্রবেশ করল থার্ড স্ট্রিটে।

আহমদ মুসার গাড়ি এগিয়ে চলল ঐতিহাসিক 'সাউথওয়াক' আবাসিক এলাকার মধ্যে দিয়ে। ষোড়শ শব্দাতীর এ আবাসিক এলাকা। এলাকার বাড়ি ঘরগুলো কাঠামো, ডিজাইন সবই ষোড়শ শতাব্দীর। আধুনিক সংস্কার বাড়িগুলোকে আধুনিক করে তুলেছে। এই আবাসিক এলাকারই একেবারে উত্তর-প্রান্তে ড. হাইম হাইকেলের বাড়ি।

আবাসিক এলাকার রাস্তাগুলো প্রশস্ত। বাড়িগুলো অনেক দূরে দূরে। সব বাড়িই চারদিক থেকে বাগানে সুসজ্জিত। এতে এলাকার শোভা বেড়েছে, কিন্তু চারদিকে একটা শুন-সান নির্জনতা নেমে এসেছে। সন্ধ্যা সাতটাতেই মধ্যরাতের নিরবতা-নির্জনতা এসে জুড়ে বসেছে। কচিৎ দুএকটা গাড়ির দেখা পাওয়া যাচ্ছে।

আহমদ মুসা একটু আনমনা হয়ে পড়েছিল, অতীতে ফিরে গিয়েছিল তার মন। ভাবছিল, ষোড়শ শতাব্দীর আগে এই ফিলাডেলফিয়ার কোন অস্তিত্ব ছিল না। অস্তিত্ব ছিল না ইউরোপীয় কোন মানুষের। আমেরিকার আদিবাসী ইন্ডিনয়ানদের 'দিলওয়ার' জাতি গোষ্ঠি বাস করত এই ফিলাডেলফিয়া অঞ্চলে। ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে শুরুর দিকে ইউরোপের ডাচরা প্রথমবারের মত এ অঞ্চলে এল। তারপর ১৬৪০ সালের দিকে ইউরোপের সুইডিশরা দিলওয়ার ইন্ডিয়ানদের এই অঞ্চলে এসে স্থায়ী বসতি গড়ে তুলল। ধীরে ধীরে এই অঞ্চলের উপর ইউরোপের সাম্রাজবাদী লোভাতুর দৃষ্টি তীব্র হয়ে উঠল। শুরু হলো এ এলাকার দখল নিয়ে ডাচ, সুইডিশ ও ইংরেজদের মধ্যে ঘোরতর লড়াই। এলাকার আসল মালিক সহজ, সরল দিলওয়ার ইন্ডিয়ানদের ঘরছাড়া করে আগেই হটিয়ে দেয়া হয়েছিল। দখলের লড়াই-এ অবশেষে জিতে যায় বৃটেন। আমেরিকা হয়ে দাঁড়ায় বৃটেনের উপনিবেশ। তারপর......।'

আহমদ মুসার চিন্তা আর এগুতে পারল না। ড্রাইভারের কথায় আহমদ মুসার চিন্তায় ছেদ নেমে এল। ড্রাইভার বলেছিল, 'স্যার আপনার সাথে আর কেউ আসছে?'

'না তো! কেন বলছ এ কথা?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'স্যার, ক্যাথেরিন স্ট্রিট থেকে একটা গাড়ি আমাদের পিছে পিছে আসছে। কিছুক্ষণ আগ পর্যন্ত আমাদের সমান স্পীডে এসেছে। এখন স্পিড বাড়িয়ে নিকটবর্তী হচ্ছে।' বলল ড্রাইভার।

আহমদ মুসা পেছনে তাকাল। দেখতে পেল একটা গাড়ির হেডলাইড। আহমদ মুসা খুশি হলো ড্রাইভারের উপরে। বলল, 'ধন্যবাদ ড্রাইভার তোমার সর্তক দৃষ্টির জন্যে। তুমি যে গতিতে গাড়ি চালাচ্ছ, সেই গতি অব্যাহত রাখ! সত্যিই অনুসরণ করে থাকলে দেখা যাক ওরা কারা! পুলিশ তো নয় দেখাই যাচ্ছে।'

'জি স্যার, পুলিশ নয়।' বলল ড্রাইভার।

আহমদ মুসা পেছন থেকে দৃষ্টিটা ফিরিয়ে আনল ড্রাইভারের দিকে। বলল, 'ড্রাইভার, তোমার ইংলিশ উচ্চারণ শুনে মনে হচ্ছে, 'আরবের কোন দেশে তোমার বাড়ি।

'জি স্যার আমি জর্দানী।' বলল ড্রাইভার।

'কতদিন তোমরা আছ?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'স্যার, বহুদিন। মাঝখানে টুইন টাওয়ারের ঘটনার পর আমার আব্বা আমাদের পরিবারের সবাইকে নিয়ে দেশে ফিরে গিয়েছিলন। দেশে গিয়ে আব্বা মারা যান। এখন অবস্থা আগের চেয়ে ভালো বলে এক বছর আগে আমি ফিলাডেলফিয়ায় ফেরত এসেছি।' বলল ড্রাইভার।

অবস্থা এখন ভালো মনে করছ?' আহমদ মুসা বলল।

'জি স্যার। এই সরকারের আগের সরকারের আমল থেকেই অবস্থা ভাল হযেছে। তবে গত এক বছর হলো পরিস্থিতি একেবারে পাল্টে গেছে। স্যার, এজন্য আমরা আমেরিকার মুসলমানসহ দুনিয়ার সব মুসলমান আহমদ মুসার প্রতি কৃতজ্ঞ। তিনি মার্কিন সরকার ও মার্কিন জনগণের চোখ খুলে দিয়েছেন।

মার্কিনীদের কাছে আমাদের সম্মান রাতারাতি একেবারে যেন আকাশচুম্বি হয়ে উঠেছে। তারা এখন মুসলমাদেরকেই প্রকৃত বন্ধু মনে করে।' উৎসাহের সাথে আবেগ-ঘন কন্ঠে বলল ড্রাইভার।

'ভাল খবর শুনালে ড্রাইভার। কিন্তু মার্কিনীরা শুধু তোমাদেরকেই ভালবাসে, না তোমাদের ধর্মকেও ভালবাসে, তোমাদের সংস্কার-সংস্কৃতিকেও ভালোবাসে?' আহমদ মুসা বলল।

'ভাল কথা মনে করে দিয়েছেন স্যার। এমন প্রশ্ন কেউ কখনও জিজ্ঞাসাই করে না। অথচ অকল্পনীয় সব ঘটনা ঘটেছে এ ক্ষেত্রেই। আপনি ফিলাডেলফিয়ার মুসলিম 'সানডে' স্কুলগুলিতে গিয়ে দেখুন স্কুলের দুই তৃতীয়াংশ ছেলেমেয়েই আমেরিকান খৃষ্টান পরিবারের। মুসলিম স্কুলগুলোতে নৈতিক শিক্ষা ভাল হয়, ভাল অভ্যাস গড়ে ওঠে বলে খৃষ্টান পরিবারও এখানে তাদের ছেলেমেয়ে পাঠায়।' ড্রাইভার বলল।

'কতগুলো 'সানডে স্কুল' আছে তোমাদের?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'শহরে দশটি মসজিদ আছে। দশটি মসজিদেই 'সানডে স্কুল' আছে। এছাড়া আরও দশ বারটা মুসলিম 'সানডে স্কুল' গড়ে উঠেছে শহরের বিভিন্ন জায়গায়।' বলল ড্রাইভার।

'আমেরিকানরা কি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে?' আহমদ মুসা বলল।

বহু স্যার। প্রতি সপ্তাহে ফিলাডেলফিয়ার প্রত্যেক মসজিদে জুমুআর নামাজের পর চার পাঁচজন করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ঘটনা ঘটেছে। স্যার, এই সপ্তাহে আমাদের মসজিদে ছয়জন ইসলাম গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে স্থানীয় খৃষ্টান চার্চের ফাদার ও একজন প্রফেসর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। খৃষ্টান চার্চটা ছয় মাস আগে বন্ধ হয়ে যায় কোন প্রার্থনাকারী যায় না বলে।'

থামল ড্রাইভার। একটা দম নিল। তারপর আবার বলে উঠল, 'স্যার কি মুসলমান? এশিয়ান তো বুঝতেই পেরেছি।'

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগে ড্রাইভার আঁৎকে উঠার মত শব্দ করে চাপা কন্ঠে বলে উঠল, ‘স্যার রং সাইড নিয়ে সামনে থেকে একটা গাড়ি আমাদের দিকে ছুটে আসছে।’

আহমদ মুসা পেছনে তাকিয়েছিল। সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে তাকাল সামনে। দেখল, ড্রাইভারের কথা ঠিক। আহমদ মুসাদের গাড়ির পথ রোধ করে গজ পাঁচেক সামনে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে।

আহমদ মুসাদের গাড়িকেও ড্রাইভার থামিয়ে দিয়েছিল। পেছনের গাড়িটাও পেছনে এসে দাঁড়িয়ে গেছে।

‘স্যার কি করব? আমরা পাশ কাটাতে চাইলে ওরা নির্ঘাত গুলী করবে।’ গাড়ি থামিয়েই বলে উঠল ড্রাইভার।

‘তুমি ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছ ড্রাইভার। দেখা যাক ওরা কে, কি চায়।’ বলল আহমদ মুসা।

থামার পরেই আগে পিছের দুগাড়ি থেকে চারজন দ্রুত নেমে এল। ছুটল তারা আহমদ মুসার গাড়ির দিকে।

‘ড্রাইভার গাড়ির জানালার কাঁচগুলো নামিয়ে ফেল। বন্ধ থাকলে ওরা ভেঙে ফেলতে পারে।’ বলল দ্রুতকন্ঠে আহমদ মুসা।

‘কিন্তু স্যার..................।’ কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল ড্রাইভার। বোধ হয় আহমদ মুসার নির্দেশের প্রতিবাদ করতে গিয়েছিল। কিন্তু কি মনে করে থেমে গিয়ে সুইচ টিপে সব জানালার কাঁচ খুলে দিল।

ছুটে আসা ওরা চারজন দুজন করে আহমদ মুসার দুপাশের জানালায় এসে দাঁড়াল। তাদের প্রত্যেকের হাতে রিভলবার।

দু’পাশের জানালা থেকে দুজন আহমদ মুসাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল, ‘বেরিয়ে আসুন। এক মুহূর্ত দেরি করলে গুলী করব’।

‘দুদিক থেকেই বলছ, তোমরাই বল কোন দরজা দিয়ে বের হবো।’ শান্ত স্বাভাবিক কন্ঠে বলল আহমদ মুসা।

গাড়ি দাঁড়িয়েছিল রাস্তার অনেকটা বাম প্রান্ত ঘেঁষে। ডানেই প্রশস্ত মূল রাস্তাটা।

ডান দিকের দুজনের মধ্যে একজন রিভলবার নাচিয়ে বলল, 'এদিক দিয়ে নাম।' বলেই সে দক্ষিণ দিকের দুজনকে লক্ষ্য করে বলল, 'তোমরা এদিক এস।'

সঙ্গে সঙ্গেই বাম পাশের দুজন দৌড় দিয়ে ডান পাশে চলে এল।

'ড্রাইভার দরজার কী আনলক করেছ?' ধীরে সুস্থে বলল আহমদ মুসা।

ওদের চারজনের মধ্যে দরজার সামনে দাঁড়িয়েছে দুজন এবং দরজার পিছন দিকে দাঁড়িয়েছে দুজন। দরজার পাল্লা খুলে সামনের দিকে যাবে বলে ওদিকে কেউ নেই।

আহমদ মুসা ড্রাইভারকে দরজা খোলার কথা বলার সাথে সাথে ক্লিক শব্দ করে দরজা খুলে গেল।

আহমদ মুসা দরজার দিকে ঘুরে বসে এগুলো দরজার দিকে।

হঠাৎ ওদের একজন চিৎকার করে উঠল, 'দাঁড়াও।'

আহমদ মুসা থেমে গেল।

রিভলবার বাগিয়ে রেখেই সামনে থেকে একজন ছুটে এসে বলল, 'তোমার কাছে রিভলবার আছে, ওটা দিয়ে দাও।'

'তোমাদের চারজনের কাছে চার রিভলবার, এরপরও আমার এক রিভলবারের ভয় করছ।' বিদ্রূপাত্মক হাসির সাথে একথাগুলো বলতে বলতে আহমদ মুসা পকেট থেকে রিভলবারটা বের করে ওদের দিয়ে দিল।

রিভলবার হাতে নিয়ে লোকটা একটু পেছনে হটে আগের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল।

সে যখন পেছনে হটছিল, তখন আহমদ মুসা দরজার দিকে এগুলো। দরজায় পৌঁছে পা দুটো দরজার প্রান্তে নিয়ে বাম হাত দিয়ে দরজা খুলে জোরে সামনের দিকে ঠেলে দিল। তার পরেই সে দুপায়ের উপর ভর দিয়ে দুহাত সামনে নিয়ে মাথাকে কিছুটা নিম্নমুখী করে বাইরে ড্রাইভ দিল। দুহাত তার মাটি স্পর্শ করার সাথে সাথে পা দুটি তার বিদ্যুত বেগে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ঘুরে গিয়ে সামনে পাশাপাশি দাঁড়ানো দুজনের বুকে আঘাত করল। ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল ওরা।

আহমদ মুসার পা দুটো ঘুরে গিয়ে মাটি স্পর্শ করতেই দুপায়ের দুমোজায় আটকানো রিভলবার বের করে নিয়ে ডান হাতের রিভলবার দিয়ে তাক করল গাড়ির দরজার পাশে দাঁড়ানো দুজনকে। তাদের একজনের কানের পাশ দিয়ে একটা ফাঁকা গুলী করে বলল, রিভলবার ফেলে দাও, না হলে পরের দুই গুলী দুজনের মাথায় ভরে দেব।'

আকস্মিক এই ঘটনায় তারা বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। রিভলবার সমেত হাত তাদের নিচে ঝুলে পড়েছিল। কানের পাশ দিয়ে ফাঁকা গুলীটাও ম্যাজিকের মত কাজ করল। তারা তাদের হাতের রিভলবার একটু সামনে ছুড়ে ফেলে দিল।

ওদিকে মাটিতে ছিটকে পড়া দুজন উঠে তাদের হাত থেকে ছিটকে পড়া রিভলবার হাত করার জন্য এগুচ্ছিল।

আহমদ মুসার বাম হাতের রিভলবার তাদের দিকে তাক করা ছিল। আহমদ মুসা ওদের নির্দেশ দিল, আর এক ইঞ্চি এগুবে না। দুজনকেই লাশ বানিয়ে দেব।

ওরা দুজনেই থমকে গেল।

আহমদ মুসা এবার দুদিকে রিভলবার তাক করে রেখে পা দিয়ে রিভলবার চারটিকে এক জায়গায় নিল। তারপর ওদের চারজনকেই নির্দেশ দিল ওদের পেছনের গাড়িটার পাশে এসে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে।

যন্ত্রের মতই ওরা নির্দেশ পালন করল।

আহমদ মুসা পকেট থেকে ক্ষুদ্র একটা ক্লোরোফরম স্প্রেয়ার বের করে ওদের নাকে স্প্রে করল। তারপর কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষার পর ওদের সংজ্ঞাহীন দেহ ওদের গাড়িতে তুলে স্টাটার থেকে চাবিটি খুলে নিয়ে গাড়ির সব জানালা-দরজা বন্ধ করে লক করে দিল। তারপর গাড়িটাকে একটা গাছের অন্ধকারে ঠেলে দিল।

আহমদ মুসার ড্রাইভার বেরিয়ে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে সবকিছু দেখছিল। তার চোখে বোবা বিস্ময়।

আহমদ মুসা তার দিকে চেয়ে বলল, 'ড্রাইভার ঐ গাড়িটাকেও রাস্তার বাইরে ঠেলে দাও। পারবে।'

‘ইয়েস স্যার। বলে ড্রাইভার তখনি গাড়িটা রাস্তার বাইরে ঠেলে দিল।’

আহমদ মুসা ওদের গাড়ি লক করার আগে ওদের চারটি রিভলবারও ওদের গাড়িতে রেখে দিয়েছিল। কিন্তু গুলী বের করে নিয়েছিল।

আহমদ মুসা এসে গাড়িতে উঠে বসল।

ড্রাইভার এসে তার সিটে বসতেই আহমদ মুসা বলল, ‘একটু দেরি হয়ে গেল ড্রাইভার, ওখানে ঠিক সময় পৌঁছাতে পারলাম না। দেখ জোরে চালিয়ে পুশিয়ে নিতে পার কিনা!’

ড্রাইভারের মুখ হা হয়ে গেছে বিস্ময়ে। বলল, ‘স্যার আপনি দেরি হওযার জন্যে চিন্তা করছেন, কিন্তু এদিকে তো আপনি প্রাণে বেঁচে গেলেন। এই অবস্থায় আপনি প্রোগ্রাম বাতিলও করতে পারেন।’

‘আমি যদি প্রোগ্রাম বাতিল করি, তাহলে যারা আমাকে বাধা দিতে এসেছিল তারা জিতে যায়, উদ্দেশ্য তাদের সফল হয়।’ আহমদ মুসা বলল।

‘বুঝেছি স্যার। কিন্তু গোয়েন্দারা আপনাকে বাধা দিতে এসেছিল কেন?’ বলল ড্রাইভার।

‘কাদের গোয়েন্দা বলছ? ওদের? কেমন করে বুঝলে ওরা গোয়েন্দা?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘আমাদের গোয়েন্দারা সাধারণত সাদা সার্টের সাথে কালো জুতা, কালো মোজা, কালো প্যান্ট এবং কালো হ্যাট পরে থাকে। আর কোন অফিসিয়াল অপারেশনে গেলে চার জনের টীম গিয়ে থাকে।’ বলল ড্রাইভার।

‘কিন্তু ড্রাইভার, ওরা গোয়েন্দা নয়। ওরা গোয়েন্দাদের ছদ্মবেশ পরেছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কেমন করে আপনি এতটা নিশ্চিত কথা বলছেন?’ ড্রাইভার বলল।

‘মার্কিন গোয়েন্দা ও পুলিশরা যে রিভলবার ও অস্ত্র ব্যবহার করে থাকে তাতে একটা বিশেষ মার্কিং থাকে, এদের চারজনের রিভলবারে তা ছিল না। তবে বুট কালো বটে, কিন্তু বুটের কন্ডিশন পুলিশের মত নয়।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আল-হামদুলিল্লাহ, আপনি মারামারির মধ্যে এত কিছু খেয়াল করেছেন। আমি এই বৈশিষ্টের বিষয়ে জানিই না।’ বলে ড্রাইভার তাকাল আহমদ

মুসার দিকে পেছনে ফিরে। বলল, ‘স্যার, সিনেমার আমি একজন আগ্রহী দর্শক। ফাইটিং যেভাবে শুরু হলো এবং শেষ হলো, তেমন দৃশ্য আমি কখনও দেখিনি।’ বলেই একটু থেমেই সে আবার শুরু করল, ‘স্যার আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসা করার অধিকার আমার নেই। আমার মাত্র একটি জিজ্ঞাসা। আমি বুঝতে পারছি, এশিয়া বা উত্তর আফ্রিকার কোন দেশে আপনার বাড়ি। আপনি মুসলিম কিনা?’

‘এটা জানার আগ্রহ কেন?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘আমার জীবনে এটা একটা অবিস্মরণীয় ঘটনাতো! ঘটনার নায়ক মুসলিম হলে গর্বের সাথে মানুষের কাছে গল্প করতে পারব। এ রকম সাহস ও বীরত্ব তো আমরা বহুদিন আগে হারিয়ে ফেলেছি!’ শেষ দিকে তার আবেগে কন্ঠ ভেঙে পড়ল।

ড্রাইভারের নিখাদ আবেগ আহমদ মুসাকেও স্পর্শ করল। আনমনা হয়ে পড়ল সেও। হঠাৎ করে তার সামনে যেন দুঃখ-বেদনা, লাঞ্ছনা-আপমানের কালো মেঘে ঢাকা এক দিগন্ত ভেসে উঠল। সে এক দীর্ঘ কালো রাত। রাজনৈতিক পরাধীনতা, সাংস্কৃতিক আধিপত্য, জ্ঞানের দেউলিয়াপানা মুসলমানদের চারদিক থেকে নিষ্পিষ্ট করেছে। তাদের অসহায় আর্তনাদ আকাশকে ভারী করেছে। সৃষ্টি হয়েছে কান্নার সমুদ্র। বহু বছরের দাসত্বে ভীরুতা-কাপুরুষতা হয়ে পড়েছিল তাদের চরিত্র-বৈশিষ্ঠ্য। ড্রাইভারের আবেগ রুদ্ধ কন্ঠ এই দুর্ভাগ্যের দিকেই ইংগিত করেছে। আহমদ মুসারও দুচোখের কোণ ভারী হয়ে উঠেছিল।

একটা নিরবতা নেমে এসেছিল। নিরবতা ভাঙল আহমদ মুসা। বলল, ‘ড্রাইভার, আহমদ মুসা এই আমেরিকাতেই ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, তুমিই তো বললে। তোমাদের অবস্থাও তিনি পাল্টে দিয়েছেন। তাকে নিয়ে তো গর্ব করতে পার।’

‘স্যার, তিনি তো জাতির গর্বের ধন। তার স্থান সবার মাথার উপরে, আকাশে। তাকে দেখার সৌভাগ্যও কোনদিন আমার হবে না। তাকে নিয়ে গর্ব করার মত কোন গল্প নেই। আজ যে গল্প সৃষ্টি হয়েছে, তা আমার জন্যে এক গর্বের কাহিনী।’ বলল ড্রাইভার।

‘হ্যাঁ ড্রাইভার, আমি তোমার এক ভাই।’

আল-হামদুলিল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ। তাহলে অনেক আহমদ মুসা তৈরি হয়েছে। তার সাথে এসেছে এক উর্বর পরিবেশও আমাদের আমেরিকায়। আল-হামদুলিল্লাহ।' আবেগ জড়িত কন্ঠে বলল ড্রাইভার।

গাড়ি হাইম হাইকেলের বাড়ি ক্রস করে চলে যাচ্ছিল।

'ড্রাইভার গাড়ি থামাও। আমরা এসে গেছি।' বলে আহমদ মুসা হাইম হাইকেলের বাড়ি দেখিয়ে দিল।

'স্যরি' বলে ড্রাইভার গাড়ি পিছিয়ে নিল। তারপর থার্ড স্ট্রিট থেকে নেমে প্রবেশ করল লাল পাথরে বাঁধানো প্রাইভেট রোডে।

এগিয়ে চলল গাড়ি হাইম হাইকেলের গেটের দিকে।

# ৩

আহমদ মুসা গাড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। গেটে দাঁড়িয়েছিল দুজন সিকিউরিটির লোক।

হাইম বেঞ্জামিন ও বারবারা ব্রাউন বেরিয়ে এল বাড়ির ভেতর থেকে।

হাইম বেঞ্জামিন ও বারবারা দুজনেই তাকাল আহমদ মুসার দিকে। দুজনেরই প্রথম প্রতিক্রিয়া হলো, গেটের ওপারে গাড়ির উপর ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো লোকটি অস্বাভাবিক চরিত্রের কোন মানুষ নয়। নিজের অজান্তেই তাদের মন যেন প্রসন্ন হয়ে উঠল। তবে অবাক হলো আহমদ মুসার সুন্দর কাটিং-এর স্যুটকে ধুলি ধুসরিত দেখে।

ভেতরে দাঁড়িয়েই হাইম বেঞ্জামিন সিকিউরিটির লোকদের উদ্দেশ্য করে বলল, 'ওঁকে আসতে দাও।'

হাইম বেঞ্জামিনের পাশে দাঁড়ানো বারবানা ব্রাউনের চোখে-মুখে একটা চাঞ্চল্য নেমে এল। সে বলল সিকিউরিটিদের উদ্দেশ্য, 'সার্চ করে দেখো কোন অস্ত্রপাতি আছে কিনা।'

আহমদ মুসা গেটে এসে দাঁড়ালে একজন সিকিউরিটি তাকে সার্চ করল। তার সার্ট কোর্ট-প্যান্টের পকেট, কোমর, শোল্ডার হোলস্টার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকল। সার্চ করে কোন অস্ত্র পেল না।

আহমদ মুসা ভেতরে প্রবেশ করল।

আহমদ মুসা কিছু বলার আগেই হাইম বেঞ্জামিন বলে উঠল, 'গুড ইভনিং, মি...........। ওয়েলকাম।'

'গুড ইভনিং। ধন্যবাদ। আমি আইজ্যাক দানিয়েল। নামটা বোধ হয় আগেও বলেছিলাম।' মুখ ভরা হাসি টেনে বলল আহমদ মুসা।

হাসল হাইম বেঞ্জামিনও। বলল, 'স্যরি। একটু পরীক্ষা করলাম যে, যাঁর সাথে কথা বলেছি তিনিই এসেছেন কিনা।

হাইম বেঞ্জামিন ও আহমদ মুসা হ্যান্ডশেক করল।

হ্যান্ডশেক করেই হাইম বেঞ্জামিন বারবারা ব্রাউনের দিকে ইংগিত করে আহমদ মুসাকে বলল, 'ইনি আমার বন্ধু ও আমাদের পরিবারের শুভাকাংখী।'

বারবারা ব্রাউন হাত বাড়াল আহমদ মুসার দিকে হ্যান্ডশেকের জন্য।

আহমদ মুসার হাত না বাড়িয়ে উপায় ছিল না। কারণ, বলা যাবে না বাধাটি কি।

আহমদ মুসা ও বারবারা ব্রাউন হ্যান্ডশেক করল। এই সাথে বারবারা ব্রাউন বলল, 'আমি বেঞ্জামিনের কাছে সব শুনেছি। ওয়েলকাম। আমি মনে করি, আপনার সাথে বেঞ্জামিন পরিবারের এই সাক্ষাত গুরুত্বপূর্ণ।'

'ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করুন।' বলল আহমদ মুসা।

'আসুন বলে ভেতরে যাবার জন্যে হাঁটা শুরু করল হাইম বেঞ্জামিন।

হাইম বেঞ্জামিন আগে আগে হাঁটছিল।

পেছনে পাশাপাশি আহমদ মুসা ও বারবারা ব্রাউন।

তিনজন এসে ড্রইংরুমে বসল।

পাশাপাশি এক সোফায় বসল হাইম বেঞ্জামিন ও বারবারা ব্রাউন। তাদের সামনে এক সোফায় বসল আহমদ মুসা।

বসে একটু সপ্রভিত হেসে হাইম বেঞ্জামিন বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, 'একটা অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি মি. দানিয়েল?'

'অবশ্যই।' আহমদ মুসা বলল।

'আপনার কোট-প্যান্ট ধুলি-ধুসরিত হবার চিহ্ন দেখছি। পরার সময় এমনটা থাকার কথা নয়।' বলল হাইম বেঞ্জামিন।

আহমদ মুসা হেসে উঠল। বলল, 'ঠিক ধরেছেন। পরার সময় এমনটা থাকার কথা নয়। ছিলও না।'

'তাহলে?' জিজ্ঞাসা করল হাইম বেঞ্জামিন।

'পথে আত্মরক্ষার জন্যে লড়াই করতে হয়েছে। সেজন্যে ধুলায় গড়াগড়িও খেতে হয়েছে।' আহমদ মুসা বলল।

'কি ব্যাপার?' প্রশ্ন করল দুজনেই বিস্ময়ে চোখ কলাপে তুলে।

আহমদ মুসা পথের সব ঘটনা বিস্তারিত তাদের জানাল।

'সর্বনাশ। সাংঘাতিক কিছু ঘটতে পারতো। অলৌকিকভাবে আপনি বেঁচে গেছেন। ঈশ্বর আপনাকে সাহায্য করেছে।' বলল হাইম বেঞ্জামিন। তার কন্ঠে রাজ্যের উদ্বেগ ঝরে পড়ল।

বারবানা ব্রাউন নিরব। তার মুখ মলিন হয়ে উঠেছে। বুঝতে পারল, ইহুদী গোয়েন্দা সংস্থাই এটা করেছে। কেন তারা করবে? ড. হাইম হাইকেলের পরিবার যদি কারও সাথে সাক্ষাত করতে চায়, তাহলে তাতে বাধা দেয়া হবে কেন? তাছাড়া তাদের গোয়েন্দা বিভাগ এ মিথ্যাচার কেন করল? বেঞ্জামিন নিশ্চিত হয়েছে এবং সেও নিউইয়র্ক পুলিশে অফিসে টেলিফোন করে জেনেছে ইয়র্কভিল ডিস্ট্রিক্ট-এ কিংবা নিউইয়র্কের কোন পুলিশ জোনেই এ্যালেন শেফার নামে কোন পুলিশ অফিসার নেই। তাহলে তাদের ইহুদী গোয়েন্দা সংস্থা মহামিথ্যাচার কেন করল? এসব ঘটনার পিছনে কি তাহলে আরও ঘটনা আছে যা বারবারারা জানে না? কিন্তু যাই থাক, ড. হাইম হাইকেলের পরিবারের সাথে মিথ্যাচার কেন? এ্যালেন শেফার যদি মিথ্যা হয়ে থাকে, তাহলে তার বলা সব কথাই মিথ্যা হয়ে যায়। মিথ্যা হয়ে যায় ড. হাইম হাইকেল সর্ম্পকে সে যা বলেছে তাও!

বারবারা ব্রাউনের চিন্তায় ছেদ নামল আহমদ মুসার কথার শব্দে। আহমদ মুসা বলছিল হাইম বেঞ্জামিনের কথার উত্তরে, 'হয়তো মেরে ফেলাই তাদের টার্গেট, কিন্তু আপাতত তারা আটক করতেই চেয়েছিল আমাকে।'

'তাদেরকে কি আপনি চেনেন? তারা কেন আপনাকে আটক করত চেয়েছিল? বেঞ্জামিন বলল।

'না তাদের কাউকে আমি চিনি না। আমি এখানে আসতে না পারি, আমি আপনাদের সাথে কথা বলতে না পারি, সেই ব্যবস্থাই তারা করতে চেয়েছিল।' বলল আহমদ মুসা।

হঠাৎ বিদ্যুত চমকের মত হাইম বেঞ্জামিনের মনে পড়ল তার সাথে দেখা করতে আসা নিউইয়র্কের সেই ভূয়া পুলিশ অফিসার বলে প্রমাণিত এ্যালেন শেফারের কথা। তিনি বলেছিলেন যে, ড. হাইম হাইকেলের শত্রুরা আমাদের বাসার উপর চোখ রেখেছে। তারা আমাদের সাথেও দেখা করতে চেষ্টা করবে।

তাহলে আইজ্যাক দানিয়েল কি সেই দেখা করার পক্ষ এবং তাকে কি এ্যালেন শেফারের লোকেরাই বাধা দিয়েছিল! এ্যালেন শেফার যে ভূয়া তা প্রমাণিত হয়েছে। তাহলে আইজ্যাক দানিয়েল কি ঠিক পক্ষ? এ প্রশ্নের জবাব তার কাছে নেই।

হাইম বেঞ্জামিন মনোযোগ দিল আহমদ মুসার দিকে। আহমদ মুসার কথার উত্তরে বলল, 'আপনি ওদের চেনেন না। কেন তাহলে ওরা আপনাকে বাধা দেবে এখানে আসতে?'

'লোক হিসাবে ওদের চিনি না বটে, কিন্তু ওরা কারা আমি জানি। আমি নিউইয়র্কে এসে যেদিন থেকে ড. হাইম হাইকেলের কেন কিভাবে অন্তর্ধান ঘটল, তাকে উদ্ধারের জন্যে কি করা হয়েছে, কিভাবে তার সন্ধান পাওয়া যাবে, ইত্যাদি ব্যাপারে সন্ধান শুরু করেছি, সেদিন থেকেই ওরা আমার প্রতি পদে বাধার সৃষ্টি করেছে। প্রথম দিনেই রাব্বানিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. হাইম হাইকেলের বন্ধু ড.জ্যাকব যখন ড. হাইকেলের অন্তর্ধানের ব্যাপারে আমাকে তথ্য দিচ্ছিলেন, সে সময় ড. জ্যাকবকে হত্যা করার জন্যে তার উপর হামলা হয়। অস্ত্র ও বোমা সজ্জিত ছিল বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকেরা তাকে ধরতে পারেনি।' এই কাহিনী দিয়ে কথা শুরু করে আহমদ মুসা কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টের বাড়িতে গিয়েছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট, তাঁর মেয়ে নুমা ইয়াহুদ ও পি,এ লিসা কিভাবে সহযোগিতা করতে এগিয়ে এসেছিলে, এই সহযোগিতা করতে গিয়ে লিসা কিভাবে ওদের হাতে নিহত হয় এবং সবশেষে বলল বালক জুনিয়ার প্যাকারের কাহিনী ও তার গুলীবিদ্ধ হবার কথা।

হাইম বেঞ্জামিন ও বারবারা ব্রাউনের মন্ত্রমুগ্ধের মত মুসার কথা শুনছিল। বিস্ময় ও উদ্বেগে তাদের চোখে-মুখে নেমে এসেছিল অন্ধকারের একটা ছায়া। আহমদ মুসা থামলেও ওরা কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না। ওদের চোখ আঠার মত লেগেছিল আহমদ মুসার উপর।

একটু সময় নিয়ে হাইম বেঞ্জামিন ধীর কন্ঠে বলল, 'এত কিছু ঘটে গেছে? আহত-নিহত হওয়ার ঘটনাও ঘটেছে? কিন্তু ...............।'

হাইম বেঞ্জামিন কথার মাঝখানে আহমদ মুসা বলে উঠল, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ড. আয়াজ ইয়াহুদ অথবা তাঁর মেয়ে নুমা ইয়াহুদের কাছে টেলিফোন করে বিষয়টা আরো একটু জানুন। আমার অনুরোধ।'

আহমদ মুসা থামতেই বারবারা ব্রাউন বলে উঠল, 'আমি নুমা ইয়াহুদকে চিনি। সে গত বছর ফিলাডেলফিয়া ক্যাম্পিং-এ এসেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রপস নিয়ে। পনের দিন আমরা একসাথে ছিলাম। আমি তাকে টেলিফোন করতে পারি। আমার মোবাইলে তার নাম্বার আছে।'

বলেই বারবারা ব্রাউন কথা বলার জন্যে একটু আড়ালে চলে গেল।

দশ মিনিট পর বারবারা ব্রাউন ফিরে এল হাসিমুখে। বসতে বসতে বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, 'মি. দানিয়েল, নুমা ইয়াহুদ আপনার যেভাবে প্রশংসা করল তাতে মনে হলো আপনি ওর হৃদয় সিংহাসনের অবিসংবাদিত হিরো।

'ওসব কথা পরে বলো। এখন কাজের কথায় এস।' বারবারা ব্রাউন থামতেই কথা বলে উঠল হাইম বেঞ্জামিন।

'বল কি! কাজের কথাই তো শুরু করেছি। বুঝতে পারছি না, নুমা ইয়াহুদ ও ড. আয়াজ ইয়াহুদের কাছে যিনি শার্লক হোমস ও আলেকজান্ডার শেয়ার্জনেগার এর যোগফল, তাঁর সম্পর্কে ওঁরা আর কি বলতে পারেন?' বলল বারবারা ব্রাউন।

'তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ড ড. আয়াজ ইয়াহুদ স্যারের সাথে কথা বলেছ?' হাইম বেঞ্জামিন জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ। তিনিও লিসা নিহত হওয়া, ড.জ্যাকব ও বালক আহত হওয়ার বিষয়টি কনফার্ম করলেন। বললেন যে, তাঁর কাছ থেকেই তোমাদের বাসার ঠিকানা নিয়েছেন। তিনি আরও বললেন, যতটা পারা যায় আইজ্যাক দানিয়েলকে সাহায্য করা উচিত। তিনি জানালেন, একটি চক্র, যাদেরকে তিনি চেনেন না, ড. হাইম হাইকেলের অনুসন্ধান, তার সম্পর্কে কাউকে কোন তথ্য দেয়া, এমনকি তার সম্পর্কে আলোচনাতেও বাধা দিচ্ছে। এদের ভয়েই ড. হাইম হাইকেলের সন্ধানে কোন কিছুই তারা করতে পারেনি। প্রথমবারের মত আইজ্যাক দানিয়েলই

নির্ভীকভাবে এপথে এগিয়েছেন। এখনও কোন বাধাই তার পথরোধ করতে পারেনি।' বলল বারবারা ব্রাউন।

'এই যদি হয় ব্যাপার, তাহলে আমরা পুলিশকে খবর দিতে পারি। আমরা তাদের সাহায্য নিতে পারি।' হাইম বেঞ্জামিন বলল।

'হ্যাঁ ও ব্যাপারেও ড. আয়াজ আংকেল বলেছেন। তিনি বললেন, পুলিশ তাদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করেনি। পুলিশকেও তারা নিস্ক্রিয় করে রেখেছে।' বলল বারবারা ব্রাউন।

'তাহলে উর্ধতন পুলিশ কর্তৃপক্ষকে বিষয়টা জানাতে পারি।' সোজা হয়ে বসে জোরের সাথে বলল হাইম বেঞ্জামিন।

'দেখুন মি.হাইম বেঞ্জামিন, ড. হাইকেলের সুস্থ ও জীবিত উদ্ধার করা আমাদের টার্গেট হওয়া উচিত। পুলিশের সর্বস্তরেই ওদের লোক আছে। পুলিশ যখন জোরে-শোরে এ্যাকশনে যাবে, পুলিশের মাধ্যমেই ওরা খবর পেয়ে যাবে। যদি দেখে ওরা ধরা পড়ে যাচ্ছে, তাহলে অভিযুক্ত হওয়া থেকে বাঁচার জন্য ওরা ড. হাইম হাইকেলকে চিরতরে গায়েব করে ফেলতে পারে।' আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসার শেষ কথায় কেঁপে উঠল হাইম বেঞ্জামিন ও বারবারা ব্রাউন দুজনেই। উদ্বেগ-আংতকে পান্ডুর হয়ে গেল তাদের মুখ। বলল হাইম বেঞ্জামিন, 'তাহলে কি করা যাবে?' তার কণ্ঠে অসহায় সুর।

আহমদ মুসা বলল, 'এগুতে হবে সন্তর্পনে। এমন কি পুলিশকেও না জানিয়ে। কৌশলে বা যে কোন মূল্যে ড. হাইম হাইকেলের অবস্থান জানতে হবে। তারপর তাঁকে উদ্ধার।'

'কিন্তু কঠিন দায়িত্ব কে নেবে? আমরা পারব?' বলল হাইম বেঞ্জামিন।

'সেজন্যে আমি আপনাদের কাছে এসেছি। আমি আপনাদের সাহায্য চাই।' আহমদ মুসা বলল।

'কি সাহায্য?' বলল হাইম বেঞ্জামিন।

'ড. হাইম হাইকেলকে ওরা কোথায় রেখেছে, এই তথ্য জানতে হবে। পুলিশ অফিসার ছদ্মবেশে ওরা আপনাদের কাছে এসেছিল। আমার বিশ্বাস ওরা আবারও আসবে। ওরা চেষ্টা করবে হাইম হাইকেলের পরিবারের সাথে সুসম্পর্ক

বজায় রাখতে। আর এই সুযোগ নিতে হবে হাইম হাইকেল পরিবারকে।' আহমদ মুসা বলল।

হাইম বেঞ্জামিন তাকাল বারবারা ব্রাউনের দিকে। তারপর আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করল, 'মি. আইজ্যাক দানিয়েল, আপনি এত বড় দায়িত্ব নেবেন কেন? আপনার কোন পরিচয় আমরা জানি না।'

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিল না আহমদ মুসা। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর ধীর কণ্ঠে বলল,'সংগত প্রশ্ন করেছেন। পরিচয় ছাড়া একসাথে চলা যায় না। কিন্তু পরিচয় দিতে সময় লাগবে। তার আগে আপনাদের আস্থা আমার উপর বাড়তে হবে, আমার আস্থাও বাড়তে হবে আপনাদের উপর। আমি ভয় করি আমার পরিচয় যদি ওরা পেয়ে যায়, তাহলে আমাদের ক্ষতি করতে পারে ওরা নানাভাবে। আপাতত পরিচয় ছাড়াও আমরা একসাথে এগুতে পারি। আপনি চান আপনার পিতা উদ্ধার হোক, আমিও চাই ড. হাইম হাইকেল উদ্ধার হোক।'

'মাফ করবেন। আগের প্রশ্নটাই আবার করছি। আমার পিতা উদ্ধার হলে আপনার কি লাভ? প্লিজ, কোন সন্দেহ করে আমি এ কথা বলছি না। আমার কৌতূহল।' বলল হাইম বেঞ্জামিন।

এবারও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না আহমদ মুসা। গম্ভীর হয়ে উঠেছে আহমদ মুসা। একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'আমি কেন ড. হাইম হাইকেল উদ্ধার হোক চাই, এটা জানতে হলে জানা প্রয়োজন ওরা কেন ড. হাইম হাইকেলকে আটক রাখতে চায়।'

হাইম বেঞ্জামিনের চোখ দুটি উজ্জল হয়ে উঠল। বলল, 'হ্যাঁ, সেটা তো অবশ্যই জানার বিষয়।'

'মি. হাইম বেঞ্জামিন আপনি জানেন, আপনার পিতা অতীতের বিশ্বাস ও আচরণ পরিত্যাগ করেছেন। তার............।'

হাইম বেঞ্জামিন আহমদ মুসার কথার মাঝখানে বলে উঠল, 'এ বিষয়টা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু কেন এই পরিবর্তন, সেটাই আমাদের সকলের প্রশ্ন।'

'আমি যতদূর জানি, ড. হাইম হাইকেল তার জাতির কোন বিশেষ কাজ এবং কাজের পন্থাকে মেনে নিতে পারেননি। শুধু মেনে নিতে পারেননি নয়,

জাতির ঐ পন্থারই তিনি বিরোধী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তার নিজ অতীতের তিনি বোধ হয় প্রতিবিধানও করতে চেয়েছিলেন। জাতির একটা বিশেষ গোষ্ঠী এটা মেনে নেয়নি এবং নিশ্চিত হয়েছে যে, ড.হাইকেলের এই পরিবর্তন এবং তার প্রতিবিধান করার মনোভাব তাদের ক্ষতি করবে। এরাই ড. হাইম হাইকেলকে আটক করে রেখেছে।' আহমদ মুসা বলল।

ভ্রুকুঞ্চিত হয়ে উঠল হাইম বেঞ্জামিনের। পুলিশ অফিসার এ্যালেন শেফারের কথা মনে পড়েছে তার। বলেছিল সে, শত্রুরা ড. হাইম হাইকেলকে দিয়ে কিছু তথ্যের ব্যাপারে কনফেশন করাতে চায়, যা ইতিহাস কে বদলে দেবে। এই কনফেশনই কি মি. আইজ্যাক দানিয়েলের ভাষায় আব্বার প্রতিবিধানমূলক কাজ? মি. আইজ্যাক দানিয়েল কি সেই কনফেশন বা প্রতিাবধানের সুবিধাভোগী পক্ষ? হাইম বেঞ্জামিন তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'ওদের ক্ষতির সুবিধাভোগী পক্ষ কি আপনি বা আপনারা? আপনারা কি কনফেশন করাতে চান আব্বাকে দিয়ে?'

'কনফেশন শব্দে বিস্মিত হলো আহমদ মুসা। মনে পড়ল 'স্পুটনিক'-এর নেয়া ড. হাইম হাইকেলের কনফেশন স্টেটমেন্টের কথা। হাইম বেঞ্জামিন নিশ্চিত এই 'কনফেশন'-এর দিকেই ইংগিত করেছেন। কিন্তু হাইম বেঞ্জামিনের তো এটা জানার কথা নয়। হতে পারে পুলিশ অফিসারের ছদ্মবেশে আসা এ্যালেন শেফার কোন ফর্মে এই কথা হাইম বেঞ্জামিনকে বলেছে। বলল আহমদ মুসা হাইম বেঞ্জামিনকে উদ্দেশ্য করে, 'মি. হাইম বেঞ্জামিন, কনফেশন করাবার প্রশ্ন নেই। আতীতের প্রতিবিধান হিসাবে নিজেই স্বতঃস্ফুর্তভাবে কোথাও কনফেশন করেছেন। এটাই ওদের কাছে তার সবচেয়ে বড় অপরাধ। আর সুবিধাভোগীর কথা বলছেন! ড. হাইম হাইকেল কারও সুবিধার্থে এই কনফেশন দেননি, সত্য প্রকাশের স্বার্থেই তিনি এটা করেছেন। আর সত্য প্রকাশ হলে এবং মিথ্যার ভার অপসৃত হলে কারও না কারো তো উপকার হবেই।'

'বুঝলাম। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আব্বা যদি কনফেশন করে ফেলেই থাকেন, তাহলে সবই তো শেষ। আটকে রেখেছে কেন আব্বাকে তাহলে তারা?' জিজ্ঞাসা বেঞ্জামিনের।

'আমার মতে এর দুটো কারণ। এক, কনফেশনে সত্যের একটা অংশের মাত্র প্রকাশ ঘটেছে, সত্যের সবটা নয়। অবশিষ্ট সিংহভাগ সত্যকে তারা ড. হাইম হাইকেলকে আটক রাখার মাধ্যমে চেপে রাখতে চায়। দুই. ওরা মনে করে ড. হাইম হাইকেলের সেই কনফেশন তারা উদ্ধার করে এনেছে। এর কোন কপিই আর বাইরে নেই। সুতারাং ড. হাইম হাইকেল এখন আটক থাকলে সত্য প্রকাশ হওয়ার আর ভয় নেই। কিন্তু তারা জানে না যে, কনফেশনের মূল কপিই বাইরে রয়ে গেছে। তারা যা উদ্ধার করেছে এবং আরও যেগুলো ধ্বংস করেছে সেগুলো মূলটার নকল কপি মাত্র।' আহমদ মুসা বলল।

বিস্ময় ভরা চোখে হাইম বেঞ্জামিন বলল, 'সত্যটা' কি মি. আইজ্যাক দানিয়েল? কনফেশনে কি আছে? সত্যটা প্রকাশ হলে এমন কি ঘটবে?'

'এ প্রশ্নগুলোর উত্তর আজ থাক।

আপনার আব্বাই এর উত্তর ভালো দিতে পারবেন। আপনার আব্বা উদ্ধার হওয়া পর্যন্ত এটুকু অবশিষ্ট থাক।' আহমদ মুসা বলল।

'আরও কিছু অবশিষ্ট থাকল। আপনার পরিচয় এখনও আমরা পাইনি।' বলল হাইম বেঞ্জামিন।

'পরিচয়ের ব্যাপারটা এমন কিছু নয় যে, সেজন্যে উন্মুখ হয়ে থাকতে হবে।' আহমদ মুসা বলল।

হাসল হাইম বেঞ্জামিন। বলল, পরিচয়ের মধ্যে 'এমন কিছু' না থাকলে পরিচয় প্রকাশে ভয় করতেন না মি. আইজ্যাক দানিয়েল।'

'আসুন, কাজের কথায় আসি। আমাকে আপনারা সাহায্য করবেন কিনা?' বলল আহমদ মুসা।

গম্ভীর হলো হাইম বেঞ্জামিন। বলল, 'এ জিজ্ঞাসা বরং আমাদের। আমরা আপনার সাহায্য চাই মি. আইজ্যাক দানিয়েল।'

'ধন্যবাদ। আমি সাহায্য নিতে এবং সাহায্য দিতেই এসেছি মি. হাইম বেঞ্জামিন।' বলল আহমদ মুসা।

'বলুন আমাদের কি করণীয়?' জিজ্ঞাসা হাইম বেঞ্জামিনের।

‘এ্যালেন শেফার মানে আপনার আব্বার আটককারীরা যে আপনাদের সাথে যোগাযোগ করেছে, এটা খুবই আনন্দের খবর। এখন ওদের সাথে আপনার সর্ম্পক বৃদ্ধি করতে হবে এবং জেনে নিতে হবে, আপনার আব্বাকে ওরা কোথায় রেখেছে।’ আহমদ মুসা বলল।

খুশি হয়ে উঠল হাইম বেঞ্জামিন। বলল, ঠিক পরামর্শ। আব্বার নিকটবর্তী হবার এটাই সবচেয়ে সহজ পথ। ইতিমধ্যেই ওরা প্রস্তাব করেছে যে, আমাদেরকে আব্বার কাছে নিয়ে যাবে। তবে দূর থেকে দেখাবে মাত্র, কথা বলতে দেবে না এবং তার সাথে সাক্ষাতও করাবে না।’

আহমদ মুসা দারুন খুশি হয়ে উঠল। বলল, ‘থ্যাংকস গড। ওটুকু যথেষ্ট। উনার থাকার লোকেশানটা জানতে পারলেই হলো।’

‘নাম, ঠিকানা না জানলেও আমরা এটুকু জানতে পেরেছি, আংকেল ড. হাইম হাইকেলকে একটা মানসিক চিকিৎসা কেন্দ্রে রাখা হয়েছে।’ বলল বারবারা ব্রাউন।

‘মানসিক হাসপাতালে? ওরা বলেছে?’ বলে উঠল আহমদ মুসা।

‘জি হ্যাঁ। তিনি নাকি অপ্রকৃতিস্থ।’ বলল বারবারা ব্রাউন।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘মানসিক হাসপাতালে রেখেছে, এটা সত্য। কিন্তু অপ্রকৃতিস্থ, এই কথা ডাহা মিথ্যা।’

‘আপনি এটা মনে করেন? আপনার কথাকে ঈশ্বর সত্য করুন।’ প্রার্থনার সুরে বলল হাইম বেঞ্জামিন।

‘সুস্থ ড. হাইম হাইকেল নিউইয়র্কের যে মানসিক ডাক্তার কৌশলগত কারণে মানসিক হাসপাতালে রাখার পরামর্শ দিয়েছিল, আমি সে ডাক্তারের বাড়িতে গিয়েছিলাম। কিন্তু পাইনি তাকে। যা বুঝেছি, নিউইয়র্ক থেকে তাকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে।’

এরপর আহমদ মুসা বলল ডাক্তারের বাড়িতে ওদের লোকেরা তাকে বন্দী বা হত্যা করার চেষ্টা করেছিল এবং সংঘর্ষে ওদের দুজন লোক মারা যায়।

বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে বারবারা ব্রাউন বলল, ‘ইতিমধ্যে ওদের দুজন লোক মারা গেছে আপনার হাতে?’

‘আমি দুঃখিত। না মারতে পারলে ওখানে আমাকেই লাশ হয়ে পড়ে থাকতে হতো।’ আহমদ মুসা বলল।

হাইম বেঞ্জামিন একথায় অংশ নিল না। সে আগের প্রশ্নই আবার করল, ‘আপনি নিশ্চিত মি.দানিয়েল যে, আব্বা অপ্রকৃতিস্থ হননি?’ হাইম বেঞ্জামিনের কণ্ঠ কান্নার মত ভারী।

‘আমি নিশ্চিত মি. হাইম বেঞ্জামিন। আমি যে বালক প্যাকারের কথা কিছুক্ষণ আগে বলেছি, সে বালকের মা মিসেস প্যাকার ঐ মানসিক ডাক্তারের একজন প্যাসেন্ট ছিলেন। তিনি নিজ কানে ডাক্তারকে এ বিষয়ে আলাপ করতে শুনেছেন। তাছাড়া আমি রাব্বানিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট আয়াজ ইয়াহুদসহ অনেকের সাথে আলোচনা করে বুঝেছি, ড. হাইম হাইকেল সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন। তাঁর মানসিক রোগের কথা ওরা ছড়িয়েছে তাঁর অন্তর্ধানকে যুক্তিসংগত করার জন্যে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘থ্যাংকস গড। আপনার প্রতিটি কথা ঈশ্বর সত্য করুন।’ বলল হাইম বেঞ্জামিন। তার দুচোখ খেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল।

‘বারবারা ব্রাউন বেঞ্জামিনের কাঁধে হাত রাখল তাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে।

সান্ত্বনার সুরে নরম কণ্ঠে আহমদ মুসা বলল, ‘ধৈর্য্য ধরুন। সব ঠিক হয়ে যাবে মি. হাইম বেঞ্জামিন। ড. হাইম হাইকেলের মত সৎ-সজ্জন ব্যাক্তির কেউ ক্ষতি করতে পারবে না। ঈশ্বরও তো আছেন।’

আহমদ মুসা একটু থামার পরেই আবার বলে উঠল, ‘মি. হাইম বেঞ্জামিন, আমি চলে যাবার পর থানায় একটা ডাইরী করাবেন এই বলে যে, ‘একজন অপরিচিতি লোক আমাদের বাসায় এসেছিল। মনে হয় সে ড. হাইম হাইকেলের অন্তর্ধান ঘটনার সাথে জড়িত। তার থেকে পরিবারের আরও ক্ষতির আশংকা করছি।’

‘আপনার বিরুদ্ধে এই ডাইরী?’ বলল হাইম বেঞ্জামিন ও বারবারা ব্রাউন একই সাথে।

‘হ্যাঁ। যাতে এ্যালেন শেফাররা বুঝে যে আপনারা তাদের সাথেই আছেন। আমি এলেও আমার সাথে ফলপ্রসু আলোচনা আপনাদের হয়নি।’ আহমদ মুসা বলল।

বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলেছে হাইম বেঞ্জামিন ও বারবারা ব্রাউন। বলল, ‘এই সুবিধার জন্যে আপনার মাথায় এতবড় বিপদ ডেকে আনবেন?’

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল, এ সময় বাইরে হৈচৈ-এর শব্দ শোনা গেল।

হৈচৈটা দ্রুত এগিয়ে আসছে। বলতে বলতে ভেতরে ঢুকে গেল।

আহমদ মুসারা তিনজনই উঠে দাঁড়াল।

হাইম বেঞ্জামিন কয়েক ধাপ এগিয়ে গেল ব্যাপার কি দেখার জন্যে। কিন্তু বেশি দূর যেতে হল না।

ঝড়ের বেগে ড্রইংরুমে প্রবেশ করল ৪ জন অপরিচিত লোক আর তাদের বাধা দিতে আসা দুজন সিকিউরিটির লোক।

ড্রইংরুমে প্রবেশ করেই ওরা চারজন সোজা হয়ে এসে দাঁড়াল আহমদ মুসার সামনে। তাদের হাতের চার রিভলবার তারা তাক করল আহমদ মুসার লক্ষ্যে। বলল তাদের একজন চিৎকার করে, ‘আমাদের সংজ্ঞাহীন করে গাড়িতে বন্ধ করে রেখে মনে করেছিলে এখানে কাজ সেরে চলে যাবে। কিন্তু তা আমরা হতে দিচ্ছি না। চল, এবার আমরা তোমাকে কি করি দেখবে।’

প্রথমে বেঞ্জামিন ও বারবারা ব্রাউন আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এখন বুঝতে পারল, এদেরকে আহমদ মুসা গাড়িতে বন্ধ করে এসেছিল। এরা এ্যালেন শেফারের লোক। পাহারা দিচ্ছে যাতে কেউ ড. হাইম হাইকেলের বাড়িতে তার পরিবারের সাথে মিশতে না পারে। এদের ক্রোধ আইজ্যাক দানিয়েলের উপর। আইজ্যাক দানিয়েলের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল তারা দুজনেই। এর বাইরেও বারবারা ব্রাউন যে বিষয়টা ভাবছিল তা হলো, এরা নিশ্চয় ইহুদী গোয়েন্দা সংস্থার লোক। কিন্তু তাদের সে চেনে না কেন? এদের কি অন্য জায়গায় থেকে আনা হয়েছে! কিন্তু তাকে বলা হয়নি কেন? হতে পারে, বারবারা

ব্রাউন ইহুদী গোয়েন্দা সংস্থার বিশ্বাসের পরীক্ষায় উর্ত্তীন হতে পারেনি। সেটাই ভাল। এসব অস্বচ্ছ 'হাইড এন্ড সীক' খেলার কাজ তার মোটেই পছন্দ নয়।

আর আহমদ মুসা ওদের চারজনকে চিনতে পেরেছিল। ওদের একজন চিৎকার করে আহমদ মুসাকে শাসানো শেষ হলে আহমদ মুসা হাসিমুখে বলল, 'তোমাদের তো আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত তোমরা এখনও বেঁচে আছ এবং এখানে আসার সুযোগ পেয়েছ এজন্যে।'

ওরা চারজন তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল আরও। ওদের তর্জন-গর্জনের মধ্যে একজন তার রিভলবারের ট্রিগারে তর্জনী চেপে বলল, 'আর একটু চাপলেই বুলেট তোমার কপাল ফুটো করে মগজ লন্ড ভন্ড করে দেবে।'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'তোমার রিভলবারের গুলী আছে কিনা পরীক্ষা করেছ?'

একথা বলতেই লোকটিই চমকে উঠে তার রিভলবার পরীক্ষা করল। গুলী নেই। তার চোখ ছানা-বড়া হয়ে উঠল গুলী নেই দেখে। সে তাকাল অন্য তিনজনের দিকে। ওরা তিনজনও একে একে রিভলবার পরীক্ষা করল। প্রত্যেকেরই চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠল বিস্ময়ে। কারও রিভলবারে গুলী নেই।

আহমদ মুসা ওদের বিপর্যস্ত চোখের সামনে ঝুঁকে পড়ে দুহাত দিয়ে দুপায়ের মোজায় আটকানো দুটি রিভলবার বের করে আনল। আহমদ মুসা সরে এল ড্রইংরুমের দরজার দিকে। ওরা চারজনসহ হাইম বেঞ্জামিন ও বারবারা ব্রাউনও এবার তার সামনে।

আহমদ মুসা তাক করেছে তার রিভলবার দুটো ওদের চারজনের দিকে। বলল, 'দেখলে তো নাটকের দৃশ্য কিভাবে পাল্টে গেল? তোমরা কি করে ধরে নিলে যে বুলেট ভরা রিভলবারগুলো আমি তোমাদের কাছে ফেলে এসেছি? মাত্র মৃত্যুই এ ধরনের ভুলকে ডেকে নিয়ে আসে।'

ওদের চারজনের বিমুঢ় মুখে এবার আতংক নেমে এল। বলল, দেখ আমরা সরকারী লোক। গায়ে হাত দিলে ভাল হবে না। আমরা নিজে করিনি। সরকারী হুকুম তামিল করার জন্যেই আমরা এসেছিলাম।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘ভয় করো না আমার রিভলবারের মূল্যবান বুলেট তোমাদের জন্যে নয়। সামান্য কয়টা পয়সার বিনিময়ে এসেছ আমাকে মারতে। এই ধরনের খারাপ কাজ আর করো না।’

বলেই আহমদ মুসা তাকাল রিভলবার দুটো পকেটে ফেলে তাকাল হাইম বেঞ্জামিনের দিকে। বলল, ‘জানি আমি বেরোনের পর আপনারা থানায় গিয়ে কেস করবেন যে, আমি আপনাদের হুমকি দিতে বা হত্যা করতে এসেছিলাম। তবে আমার অনুরোধ এই চারজন নকল গোয়েন্দা সম্পর্কেও থানায় অভিযোগ করবেন। ওরা সরকারী গোয়েন্দার পোশাকে এসেছিল নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন করতে। এটা অপরাধ।’

হাইম বেঞ্জামিন ভালভাবে তাকাল লোক চারজনের দিকে। ঠিক তো, ওদের চারজনেরই পরনে সরকারী গোয়েন্দা পোশাক।

আহমদ মুসা থামতেই ওদের চারজনের একজন বলে উঠল, ‘মিথ্যা কথা। সরকারী হুকুমেই আমরা এসেছি।’

‘সরকারী কোন লোকের হুকুম হতেই পারে। কিন্তু সেটা সরকারী হুকুম নয় এবং তোমরা সরকারী লোক নও। ফিলাডেলফিয়ার পুলিশ প্রধানকে জিজ্ঞাসা করলেই এটা জানা যাবে।’ বলল আহমদ মুসা।

তারপর আহমদ মুসা ‘সকলকে গুডবাই’ বলে ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে এল।

আহমদ মুসার পরপর বেরিয়ে গেল ওরা চারজনই। যাবার সময় বেঞ্জামিনকে বলল, ‘স্যরি স্যার আমরা শয়তানটাকে আটকাতে পারিনি। আপনাদের কোন ক্ষতি করেনি তো? ভীষণ চালাক আর ধড়িবাজ লোকটা। আমরা এসে পড়ে ভালই হয়েছে। চলে যেতে বাধ্য হলো।’

‘আপনাদেরকে এই দায়িত্ব দিয়েছিল কে? জিজ্ঞাসা বারবারা ব্রাউনের।

‘দুঃখিত, আমরা বলতে পারব না ম্যাডাম।’ বলে তারা চারজন বেরিয়ে গেল ড্রইংরুম থেকে।

ওরা চলে গেলে বারবারা ব্রাউন বলল, ‘বেঞ্জামিন তুমি একটু দাঁড়াও। আমি একটা টেলিফোন করে আসি।’ বলে মোবাইল নিয়ে টেলিফোন গাইডের খোঁজে হাইম বেঞ্জামিনের ঘরে গেল।

মিনিট তিনেক পর ফিরে এল বারবারা ব্রাউন। তারপর সে ও হাইম বেঞ্জামিন সোফায় ফিরে এসে পাশাপাশি বসল। বারবারা ব্রাউনই প্রথম কথায় বলল, ‘অনেক প্রশ্নেরই সমাধান আজ হলো বেঞ্জামিন। মি.আইজ্যাক দানিয়েল ঠিকই বলেছেন, এরা চারজনই ভূয়া গোয়েন্দা। আমি ফিলাডেলফিয়ার পুলিশ প্রধান মি. টেলারের কাছে টেলিফোন করেছিলাম। তিনি খোঁজ নিয়ে জানালেন, কোন ওয়াচার বা গোয়েন্দাকে ড. হাইকেলের বাসায় পাঠানো হয়নি আজ।’

‘তাহলে এই প্রতারণামূলক কাজ করল কে?’ জিজ্ঞাসা হাইম বেঞ্জামিনের।

‘যারা এ্যালেন শেফারকে পুলিশ অফিসার সাজিয়েছিল, তারাই সাজিয়েছে এদেরকেও।’ বলল বারবারা ব্রাউন।

‘কিন্তু আশ্চর্য হচ্ছি, আইজ্যাক দানিয়েল এদের ঠিক ঠিক চিনে ফেলল কি করে!’ হাইম বেঞ্জামিন বলল।

‘আইজ্যাক দানিয়েল সাধারণ কেউ নয় বলেই আমি মনে করি। দেখলে না, ওরা চারজন তাকে ঘিরে ফেলল, তখন তার চোখে-মুখে ভয়ের সামান্য কোন প্রকাশ ঘটেনি। আর দেখ ওদের রিভলবার আগেই খালি করে ওখানে রেখে এসেছিল। কি বিস্ময়কর দুরদৃষ্টি। আরেকটা ব্যাপার, তাঁকে সার্চ করে তার পকেটের রিভলবার গেটে রেখে দেয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা কি কল্পনা করতে পেরেছি যে, তার দুমোজার সাথে গোজা রয়েছে আরো দুটি রিভলবার! এখানেও অদ্ভুত দুরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। আমার ..................।’ শেষ করতে পারলো না বারবারা ব্রাউন তার কথা।

তার কথার মাঝখনেই হাইম বেঞ্জামিন বলে উঠল, ‘কিন্তু এখানে সে কি আমাদের সাথে প্রতারণা করেনি? সে আমাদের সার্চকে ফাঁকি দিয়েছে, অস্ত্র নিয়ে প্রবেশ করেছে।’

‘তোমার কথা একদিক দিয়ে ঠিক। কিন্তু প্রয়োজনেই এটা সে করেছে। আমরা তো ভেবেছি আমাদের কথা। কিন্তু তিনি ভেবেছেন আমাদের বিষয় ছাড়াও তার আরও শত্রুর কথা। সুতারাং তাকে প্রস্তুত থাকতে হয়েছে। তা যে ঠিক তা প্রমাণই হলো।’ বলল বারবারা ব্রাউন।

‘ঠিক বলেছ বারবারা। ওদের একটা করে রিভলবার খালী করে রেখেছিল। ওদের কাছে আরও রিভলবার যদি থাকতো।’ হাইম বেঞ্জামিন বলল।

হাইম বেঞ্জামিন একটু থেমেই আবার বলা শুরু করল, ‘দেখ আইজ্যাক দানিয়েল কেমন চালাক। তার সাথে আমাদের সম্পর্কের বিষয়টা ওদের চারজনকে জানতে দিল না, বরং বিপরীতটাই বুঝিয়ে দিল তার বিরুদ্ধে থানায় কেস করার প্রসঙ্গটি অন্যভাবে ঘুরিয়ে বলে।’

‘তার মানে তার দৃষ্টি দেখ সব দিকেই আছে। আবার দেখ যেমন তার বুদ্ধি, তেমনি এক্সপার্ট দেখ ফাইটিং-এও। আমার মনে হচ্ছে, নুমা ইয়াহুদ তাঁর সম্পর্কে যা বলেছে, তার চেয়েও তিনি বড়। দেখ এক সিটিং-এই তিনি আমাদের সামনের অন্ধকারকে একদম স্বচ্ছ, ঝরঝরে করে দিয়েছেন।’ বলল বারবারা ব্রাউন।

‘ঠিক বলেছ। আমার আনন্দ লাগছে, আব্বার উদ্ধারে তার মত লোকের সাহায্য পাব। এখন বল বারবারা, আমরা এগুবো কিভাবে। আমাদের উপর দায়িত্ব হলো, এ্যালেন শেফারদের মাধ্যমে আমাদের আব্বার অবস্থান জানার ব্যবস্থা করা। এখন কেমন করে ওদের সাথে যোগাযোগ করব।’ হাইম বেঞ্জামিন বলল।

‘বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইরেক্টর মি. ফ্রান্সিসের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। তিনি সব ব্যবস্থা করবেন বলে মনে হয়।’ বলল বারবারা ব্রাউন।

‘ঠিক আছে কালই মি. ফ্রান্সিসের সাথে যোগাযোগ করব। দরকার হলে নিউইয়র্ক যাব।’ বলল হাইম বেঞ্জামিন।

‘ঠিক আছে বেঞ্জামিন। আমি তাহলে এখন উঠি।’ বারবারা ব্রাউন বলল।

‘না চল, ডিনার খেয়ে যাবে। টেবিলে বোধ হয় রেডি।’ বলে উঠে দাঁড়াল হাইম বেঞ্জামিন।

বারবারা ব্রাউনও উঠে দাঁড়াল।

আজর ওয়াইজম্যানের সামনের টেবিলের ওপাশে বসেছিল বিল পুলম্যান।

বিল পুলম্যান ওয়ার্ল্ড ফ্রিডম আর্মি (WFA) ও ইহুদী গোয়েন্দা সংস্থার নিউইয়র্ক অফিসের প্রধান সমন্বয়কারী।

কথা বলছিল বিল পুলম্যান, 'স্যার আইজ্যাক দানিয়েলকে এ পর্যন্ত যে কয়জন দেখেছে, তাদের বর্ণনা থেকে নিশ্চিত প্রমানিত হয় না যে তিনিই আহমদ মুসা।'

'কিন্তু তার প্রতিটি কাজ প্রমাণ করে যে সে আহমদ মুসা না হয়ে পারে না।' বলল আজর ওয়াইজম্যান।

'তা ঠিক স্যার। অবশ্য আহমদ মুসা ছদ্মবেশ ধরতে উস্তাদ। সাধারণ ছদ্মবেশেও সে নিজেকে পাল্টে ফেলতে পারে। বিশেষ করে খুব অভ্যস্ত চোখ না হলে তার ছদ্মবেশ ধরা মুশকিল। অতএব আমি মনে করি, তাকে আহমদ মুসা হিসাবে ধরেই আমাদের অগ্রসর হওয়া দরকার।' বিল পুলম্যান বলল।

'যদি তা ধরে নিতে হয়, তাহলে সেটা এক বিপদের কথা। কারণ মার্কিন সরকার ও প্রসাশনের সকল পর্যায়ের সে সহযোগিতা পাবে। তবু কিন্তু এ লড়াইয়ে আমাদের জিততে হবে পুলম্যান।' বলল আজর ওয়াইজম্যান।

'অবশ্যই স্যার। নিউইয়র্কের লিবার্টি টাওয়ার ও ডেমোক্র্যাসি টাওয়ার ধ্বংসের সত্যটা যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাহলে স্যার ইহুদীবদীরা আবার রোমান যুগের মত অন্ধকার যুগে ফিরে যাবে। সুতরাং যে কোন মূল্যে সত্যের প্রকাশ রোধ করতে হবে।' বিল পুলম্যান বলল।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, স্পুটনিকের যোগাড় করা সব ডকুমেন্ট আমরা ধ্বংস করতে পেরেছি এবং অবশিষ্ট যেগুলো ওদের হাতে ছিল, সেগুলোর সবটাই আমাদের হাতে এসে গেছে। না হলে আমরা মহাবিপদে পড়ে যেতাম। সে

ডকুমেন্টগুলো ওরা হারিয়েছে বলেই খোদ আহমদ মুসাই পাগলের মত ছুটে এসেছে ড. হাইম হাইকেলের সন্ধানে। ড. হাইম হাইকেলকে পেলে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট তারা নতুন করে তৈরি করতে পারবে। সুতারাং যেভাবেই হোক ড. হাইম হাইকেলকে আড়ালে রাখতে হবে। তাকে না পেলে আহমদ মুসারা এক ইঞ্চিও সামনে এগুতে পারবে না।' বলল আজর ওয়াইজম্যান।

'মাফ করবেন স্যার। দেখা যাচ্ছে ড. হাইম হাইকেল প্রকৃত অর্থেই আমাদের জাতির জন্যে এক বিপজ্জনক বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের এখনকার সব শক্তিই তাকে আড়ালে রাখার চেষ্টায় ব্যায়িত হচ্ছে। এই অবস্থায় এই বোঝা আমাদের জাতিদেহ থেকে ঝেড়ে ফেলার মধ্যেই জাতির কল্যাণ।' বিল পুলম্যান বলল।

'কোন আমেরিকানের কাছে তুমি কখনই এ ধরনের কথা বলবে না। কোন আমেরিকান ইহুদীর কাছে তো নয়ই। যতদিন মার্কিন রাষ্ট্র থাকবে ততদিন হাইম সলমন মাকির্নীদের মধ্যে বেঁচে থাকবে এবং হাইম পরিবারও জাতীয় সম্মানের এক কেন্দ্রস্থল হিসাবে বর্তমান থাকবে। যদি ড. হাইম হাইকেলের কিছু হয়, তাহলে আজ না হয় কাল তা প্রকাশ পাবেই। তখন যে প্রতিক্রিয়া হবে সেটা আমরা ইহুদীবাদীরা বহন করতে পারবো না। অন্যভাবে তাকে ধীর প্রক্রিয়ায় মুছে ফেলতে হবে। অবশ্যই তাকে আড়াল করার শেষ রক্ষা যদি নাই হয়, তাহলে আশু জাতীয় স্বার্থকেই বড় করে দেখব। তাকে সরিয়ে দেয়ার দরকার হলে সরিয়েই দেব।' বলল আজর ওয়াইজম্যান।

'ধন্যবাদ স্যার। তাকে শুধু পাগল প্রমাণ করা নয়, সত্যিই পাগলে পরিণত করার কাজটাই সবচেয়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কেন এই কাজটা আমরা করতে পারছি না।' বিল পুলম্যান বলল।

'এই কাজ আমরা প্রথম থেকে শুরু করেছি। কিন্তু ডাক্তারদের বক্তব্য হলো ড. হাইকেল অত্যন্ত শক্ত মন ও নিখাদ চরিত্রের লোক। ঈশ্বরমুখিতা তার এতই দৃঢ় যে, তার মনকে, চিন্তাকে বিছিন্ন ও বহুমুখী করার কোন পন্থাই এখনও সফল হয়নি। এই চেষ্টা আমাদের জারি আছে। আমরা সম্প্রতি তার ব্রেনের উপর ইলেক্ট্রনিক ওয়েভকে কার্যকর করার চেষ্টা শুরু করেছি। এই চেষ্টা যদি যথেষ্ট

পরিমাণে সফল হয়, তাহলে তার চিন্তা-পদ্ধতিকে বিকৃত করা সম্ভব হবে।' বলল আজর ওয়াইজম্যান।

'ধন্যবাদ স্যার। স্যার আরেকটা কথা। আহমদ মুসাকে 'শুট এট সাইট' এর নির্দেশ দিন। এটা প্রমাণ হয়েছে, তাকে বন্দী করে আমরা এঁটে উঠতে পারছি না, অতীতেও পারিনি। সুতরাং তাকে বন্দী নয় দেখামাত্র হত্যার নির্দেশ দিন।' বিল পুলম্যান বলল।

'ঠিক বলেছ বিল। আমিও এ রকমই ভাবছি। আমরা যদি এতদিন এ সিদ্ধান্ত নিতাম, তাহলে অনেক আগেই আমরা আহমদ মুসার হাত থেকে মুক্তি পেতাম। আমাদের.....................।'

কক্ষের দরজায় এসে দাঁড়াল আজর ওয়াইজম্যানের পার্সোনাল সেক্রেটারী। বলল আজর ওয়াইজম্যানকে, 'স্যার পুলিশ অফিসার এ্যালেন শেফার ও রাব্বানিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিরেক্টর মি. ফ্রান্সিস এসেছেন।'

'ওঁদের নিয়ে এস।' নির্দেশ দিল আজর ওয়াইজম্যান।

'ফিলাডেলফিয়ার কোন খবর আছে স্যার।' জিজ্ঞাসা করল বিল পুলম্যান।

'ঐ ব্যাপারেই আসছেন এ্যালেন শেফার ও ফ্রান্সিস। বলল ওয়াইজম্যান।

কক্ষে প্রবেশ করল ফ্রান্সিস ও এ্যালেন শেফার।

তারা কক্ষে প্রবেশ করে আজর ওয়াইজম্যানকে রাজাসুলভ দীর্ঘ বাও করল।

আজর ওয়াইজম্যান তাদের ইংগিত করলে তারা বসল গিয়ে বিল পুলম্যানের বাম পাশে পাশাপাশি।

ওরা বসতেই আজর ওয়াইজম্যান চেয়ারে হেলান দিয়ে তাকাল এ্যালেন শেফারের দিকে। বলল,'মি. শেফার বলুন ফিলাডেলফিয়ার খবর কি?'

এ্যালেন শেফারের প্রকৃত নাম জোসেফ এরাম। তিনি ইয়র্কভিল ডিস্ট্রিক্টের ইনভেস্টিগেটিভ অফিসার। সেদিন এ্যালেন শেফার নাম নিয়ে

ফিলাডেলফিয়ায় ড. হাইম হাইকেলের বাসায় গিয়েছিলেন। সে একজন কট্টর ইহুদীবাদী।

'স্যার আজই আমি ফিলাডেলফিয়া থেকে জানতে পেরেছি, বারবারা ব্রাউন আমাদের সহযোগিতা করতে অস্বীকার করেছে।' আজর ওয়াইজম্যানের প্রশ্নের উত্তরে বলল 'এ্যালেন শেফার ওরফে জোসেফ এরাম।'

'তার মানে সেদিন আইজ্যাক দানিয়েল ড. হাইম হাইকেলের ছেলে হাইম বেঞ্জামিনের সাথে কি আলাপ করেছে তার কিছুই আমরা জানতে পারিনি!' আহত কন্ঠে জিজ্ঞাসা করল আজর ওয়াইজম্যান।

'জি হ্যাঁ, বারবারা ব্রাউন জানিয়ে দিয়েছে, হাইম পরিবারের বিরুদ্ধে যায় এমন কোন কাজ সে করতে পারবে না এবং সেদিনের আলোচনা সম্পর্কেও সে কোন কথা বলবে না। তবে এটুকু বলেছে যে, এ্যালেন শেফারের প্রস্তাবে হাইম বেঞ্জামিন রাজী আছে এবং হাইম বেঞ্জামিনের সাথে দেখা করতে আসা আইজ্যাক দানিয়েল লোকটিকে সে সন্দেহের চোখে দেখছে। সে কেস করেছে এ কারণেই।' বলল এ্যালেন শেফার।

'বারবারা ব্রাউনের এ পরিবর্তনের কারণ কি? সে তো একজন ভালো ইহুদী গোয়েন্দা কর্মী।' আজর ওয়াইজম্যান বলল।

'সে জানিয়েছে এটা তার নীতিগত সিদ্ধান্ত। হাইম পরিবারের সম্পর্কিত কোন কিছুই সে নিজেকে জড়িত করবে না।' এ্যালেন শেফার জানাল।

'দেখা যাচ্ছে হাইম বেঞ্জামিন আসার পরই তার এ পরিবর্তন। কারণ কি?' আবার প্রশ্ন করল আজর ওয়াইজম্যান।

'স্যার অনেকেই ভাবছেন প্রেম ঘটিত কোন ব্যাপার রয়েছে এর পেছনে। সে হয়তো মনে করছে বেঞ্জামিনের উপর কোন গোয়েন্দাগিরী করা তার ঠিক হবে না। এ রকম কিছু ঘটেছে বলে মনে করা হচ্ছে।' বলল এ্যালেন শেফার।

এ্যালেন শেফার থামতেই আজর ওয়াইজম্যান বলে উঠল, 'তার এই পরিবর্তন বা কোন প্রকার ঠুনকো সেন্টিমেন্ট গ্রহণযোগ্য নয়। তার ব্যাপারে আমরা পরে ভাবব।' বলে আজর ওয়াইজম্যান তাকাল ফ্রান্সিসের দিকে। বলল, 'মি. ফ্রান্সিস হাইম পরিবারের সাথে যোগাযোগের ব্যাপারটা সবাইকে বলুন।'

রাব্বানিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইরেক্টর নেইল ফ্রান্সিস নড়ে-চড়ে বসে বলল, 'হাইম বেঞ্জামিনের সাথে আমরা দেখা করে আসার পর হাইম বেঞ্জামিনই আমার সাথে প্রথম যোগাযোগ করেছে। প্রথম দিনেই সে বলেছে, এ্যালেন শেফারের দেয়া প্রস্তাব অনুসারে আমাদের দেখা করার ব্যবস্থা করুন। এরপর আরও তিনবার সে টেলিফোন করেছে। প্রতিবারেই সে ঐ ব্যাপারে জোর তাগিদ দিয়েছে। অধৈর্য হয়ে পড়েছে তারা। এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত না নিলে তাদের বুঝিয়ে রাখা যাচ্ছে না।'

নেইল ফ্রান্সিস থামলে আজর ওয়াইজম্যান বিল পুলম্যানকে বলল, 'তুমিও তো ব্যাপারটা জান। তুমি কি ভাবছ বল।'

'জি স্যার, আমি সব শুনেছি। আমি তাদের অধৈর্য হওয়াটাকে পছন্দ করছি না। এ্যালেন শেফার যে প্রস্তাব দিয়ে এসেছেন, আমরা তা আমাদের সুবিধা অনুযারী বাস্তবায়ন করব। দেখা করানোর ব্যাপারটাকে যতটা পারা যায় আমি 'ডি'লে' করানোর পক্ষপাতী।' বিল পুলম্যান বলল।

আজর ওয়াইজম্যান আবার তাকাল এ্যালেন শেফারের দিকে। বলল, 'জোসেফ এরাম তুমি এ ব্যাপারে কি বলতে চাও?'

জোসেফ এরাম ওরফে এ্যালেন শেফার তাকাল আজর ওয়াইজম্যানের দিকে। বলল, 'স্যার আমার হাইম পরিবারকে এই প্রস্তাব দেওয়ার আসল কারণ হলো তাদের শান্ত রাখা, আমাদের হাতে রাখা। যাতে এ নিয়ে তারা হৈচৈ না বাধায়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে স্যার আমি মনে করি, ড. হাইম হাইকেলকে দেখার ওদের সুযোগ দেয়া দরকার। দেখা হলে তারা নিশ্চিত হবে যে, ড. হাইম হাইকেল বেঁচে আছেন। তিনি অসুস্থ। তার চিকিৎসা হচ্ছে। তারা এ নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য করার প্রয়োজন অনুভব করবে না। এতে আমাদের কাজের সুবিধা হবে।' থামল পুলিশ অফিসার জোসেফ এরাম।

আজর ওয়াইজম্যান এবার সোজা হয়ে বসল। বলল, 'হাইম পরিবারকে দেয়া আমাদের প্রস্তাব নিয়ে আমরা কি করব, এ ব্যাপারে তোমাদের প্রত্যেকের কথার পেছনেই যুক্তি আছে। কিন্তু তোমরা কেউই বারবারা ব্রাউনের পরিবর্তনের বিষয়টাকে সামনে রেখে হাইম পরিবার সর্ম্পকে আমাদের করণীয় বিচার-

বিবেচনা করে দেখনি। বারবারা ব্রাউনের এই পরিবর্তন ছোট বিষয় নয়। তার চিন্তা-ধারার এই পরিবর্তনের মত হাইম পরিবারের চিন্তা ধারায় কোন পরিবর্তন এসেছে কিনা আমরা জানতে পারছি না। যতদিন এটা জানা না যাবে ততদিন হাইম হাইকেলের সাথে তার পরিবারকে দেখা করানো যাবে না।'

'কিন্তু স্যার বেশি দিন দেরি হলে করলে তারা বিরক্ত হবে, বিক্ষুব্ধ হবে এবং ধৈর্য্যহারা হলে এই বিষয়টা সরকার ও সংবাদপ্রত্রের কাছে চলে যেতে পারে।' বলল নেইল ফ্রান্সিস।

'কিন্তু মি. ফ্রান্সিস, এমন ধরনের কিছু যাতে তারা না করতে পারে তার ব্যবস্থা করা যাবে। কিন্তু দেখা করার পর কেউ যদি হোস্টাইল হয়, কিংবা হোস্টাইল কাউকে যদি দেখা করানো হয়, তাহলে যে ক্ষতি হবে তার প্রতিবিধানের কোন পথই থাকবে না। তার ফলে গোটা প্ল্যান আমাদের ভন্ডুল হয়ে যাবে। যে কোন মূল্যেই এটা হতে দেয়া যাবে না।' বলল আজর ওয়াইজম্যান।

'স্যার ঠিকই বলেছেন। কিন্তু স্যার এখন ওদের মুখ বন্ধ করা যাবে কিভাবে?' বলল নেইল ফ্রান্সিস।

'খুব সহজে। বিল পুলম্যান একদিন যাবে ফিলাডেলফিয়ায় ড. হাইম হাইকেলের বাড়িতে। বলবে বেঞ্জামিনকে শত্রুপক্ষের সাথে যেন পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ কোনভাবেই তারা যোগাযোগ না করে। অন্যথা যদি হয় তাহলে তারাও বিপদে পড়বে, ড. হাইম হাইকেলকেও মেরে ফেলবে। তাদের আচরণের উপরই নির্ভর করবে কবে কখন তারা ড.হাইম হাইকেলের সাথে দেখা করতে পারবে। অন্যথায় ড. হাইম হাইকেলের মতই বেঞ্জামিনও একদিন হারিয়ে যাবে।' আজর ওয়াইজম্যান বলল।

'বুঝলাম। তার আগ পর্যন্ত আমি কি বলব ওদের। ওরা আজ কিংবা যেকোন সময় যোগাযোগ করতে পারে।' বলল ফ্রান্সিস।

'জানাবেন, ক'দিনের মধ্যেই আমাদের লোক আপনাদের ওখানে যাবে আলোচনার জন্যে। এ বিষয়ে তারাই কথা বলবে।' আজর ওয়াইজম্যান বলল।

‘স্যার, আহমদ মুসা যদি সত্যিই এসে থাকে, তাহলে সে কি শুধু হাইম পরিবারের উপরই নির্ভর করবে? সরকার ও প্রশাসনের ক্ষমতাবান অনেকের সাথেই তার সখ্যতা রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে সে যোগাযোগ করছে কিনা আমরা কি তার খোঁজ রাখছি?’ বলল বিল পুলম্যান।

‘আহমদ মুসার এ সুবিধা আছে। জেনারেল শ্যারন জেলে থাকায় আমাদের বিরাট অসুবিধা হয়েছে এক্ষেত্রে। বিরাট ভীতি ও হতাশাও ছড়িয়ে পড়েছে আমাদের যারা অবশিষ্ট আছে তাদের মধ্যে। এরপরও তাদের যথাসাধ্য সাহায্য আমরা পাচ্ছি।’ আজর ওয়াইজম্যান বলল।

কথা শেষ করেই আজর ওয়াইজম্যান উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘তোমরা এস। আমার জরুরি এনগেজমেন্ট আছে। আমি চললাম।

আজর ওয়াইজম্যান বেরিয়ে গেলে অন্যরা সবাই উঠে দাঁড়াল।

# ৪

আহমদ মুসা অস্থিরভাবে পায়চারি করছিল তার হোটেল কক্ষে। হাইম বেঞ্জামিন আসছে, তারই জন্যে অধিরভাবে অপেক্ষা করছে আহমদ মুসা।

মাত্র আধা ঘন্টা আগে সে ফিলাডেলফিয়া পৌঁছেছে। ফিলাডেলফিয়া এসেছে বারবারা ব্রাউনের জরুরি টেলিফোন পেয়ে। বারবারা ব্রাউন টেলিফোন করেছিল হাইম বেঞ্জামিনের পক্ষ থেকে। টেলিফোনে বিস্তারিত কিছু বলেনি। শুধু বলেছিল, তাদের অনুরোধ আপনি অবিলম্বে ফিলাডেলফিয়া আসুন। হাইম পরিবার খুবই বিপদে।

টেলিফোন পেয়েই আহমদ মুসা ফিলাডেলফিয়া চলে এসেছে। হোটেল কক্ষে উঠেই আহমদ মুসা হাইম বেঞ্জামিনকে টেলিফোন করেছিল। টেলিফোন পেয়েই হাইম বেঞ্জামিন আহমদ মুসাকে কিছু বলতে না দিয়ে বলে, 'স্যার এখনি হোটেলে আসছি। আপনি অপেক্ষা করুন।' আহমদ মুসা আর কিছুই বলতে পারেনি তাকে। কথা বলার সময় বেঞ্জামিনের গলা কাঁপছিল। কণ্ঠস্বর ছিল ভীত, উদ্বিগ্ন। আহমদ মুসা তাকে তার হোটেল কক্ষে ওয়েলকাম করে টেলিফোন রেখে দিয়েছিল।

উদ্বেগ ঘিরে ধরেছিল আহমদ মুসাকে। নিশ্চয় বড় কিছু ঘটেছে। কি ঘটতে পারে? বারবারা ব্রাউনের যে টেলিফোন পেয়ে আহমদ মুসা নিউইয়র্ক থেকে এখানে এসেছে, সে টেলিফোনেও উদ্বেগ ছিল, কিন্তু সেটা এমন ভেঙ্গে পড়া ছিল না। আমাকে বাড়িতে না ডেকে আমার হোটেলে ছুটে আসছে কেন?

এমন অনেক চিন্তা আহমদ মুসাকে অস্থির করে তুলছে।

দরজায় নক হলো।

আহমদ মুসা দরজার দিকে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলল।

দরজায় দাঁড়িয়ে হাইম বেঞ্জামিন।

বেঞ্জামিনের উস্কো-খুস্কো চেহারা। টাই পরেনি। সার্টের উপর দিকের দুটি বোতাম খোলা। তার চোখ-মুখ থেকে উদ্বেগ ঠিকরে পড়ছে।

‘গুড ইভনিং মি. বেঞ্জামিন। ওয়েলকাম।’ দরজা খুলেই বেঞ্জামিনকে স্বাগত জানাল আহমদ মুসা।

‘স্যার, ওরা বারবারা ব্রাউনকে ধরে নিয়ে গেছে।’ আহমদ মুসার সম্ভাষণের কোন জবাব না দিয়ে কম্পিত কণ্ঠে, ভাঙা গলায় হাইম বেঞ্জামিন বলল।

‘আচ্ছা শুনছি তোমার কথা। এস, আগে বস।’ বলে আহমদ মুসা তাকে ধরে এনে সোফায় বসাল।

তার পাশে বসল আহমদ মুসা। বিস্ময় আহমদ মুসারও চোখে-মুখে। বলল, ‘কখন ধরে নিয়ে গেছে তাকে?’

‘এই ঘন্টা খানেক আগে।’ উত্তর দিল হাইম বেঞ্জামিন।

‘কেন নিয়ে গেছে, কি বলে নিয়ে গেল?’

‘বারবারা ব্রাউন যেতে অস্বীকার করেছিল। তার মাথায় রিভলবার ঠেকিয়ে ধরে নিয়ে গেছে।’

‘কেন নিয়ে যাচ্ছে কিছু জানায়নি?’

‘বাইরের কারো সাথে আব্বা সর্ম্পকে কথা বলতে কঠোর ভাবে নিষেধ করেছিল। বিশেষ করে নিষেধ করেছিল আপনার সাথে কোন প্রকার যোগাযোগ না করতে। কিন্তু বারবারা যে আমার পক্ষ থেকে আপনার কাছে টেলিফোন করেছে। সেটা গোটাটাই তারা মনিটর করেছে। এমনকি আজকের সকালের কথাও। তার প্রথম অপরাধ হলো, সেদিন আমাদের সাথে আপনার যে কথা হয়েছিল, সেটা বারবারা ব্রাউন ওদের জানাতে অস্বীকার করেছে। দ্বিতীয় অপরাধ হলো, সে আপনার সাথে যোগাযোগ রেখেছে।’ বলল হাইম বেঞ্জামিন।

‘কোত্থকে নিয়ে গেছে? বাড়ি থেকে?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘জি হ্যাঁ, বাড়ি থেকে।’

‘বাড়ির লোকেরা থানায় জানায়নি?’

‘না স্যার। নিয়ে যাবার সময় তারা বলেছে, বারবারা ব্রাউন আমাদের লোক আমরা নিয়ে যাচ্ছি। থানায় বলে লাভ হবে না। থানা জানে। এ বিষয় নিয়ে

বাড়াবাড়ি করলে, হৈচৈ করলে আরও বড় ঘটনা ঘটবে? পরিবারের লোকেরা সাংঘাতিক ভীত হয়ে পড়েছে।'

'তাহলে থানায় জানানো হয়নি?'

'জানিয়েছে স্যার। কিন্তু থানা সরেজমিনে খোঁজ নিতেও আসেনি। আনঅফিসিয়ালী বলেছে, বারবারা ব্রাউন একটি প্রাইভেট ডিটেকটিভ ফার্মে কাজ করতো। ফার্মই তাকে নিয়ে গেছে তাদের কাজে।' বলে একটা দম নিল হাইম বেঞ্জামিন। তারপর আবার বলা শুরু করল, 'স্যার পুলিশকে জানিয়ে, পুলিশকে হাত করেই এটা ওরা করেছে। সুতারাং পুলিশ কিছুই করবে না। আমার ভয়ই হচ্ছে, বারবারা ব্রাউনের কাছ থেকে কথা আদায়ের জন্যে ওরা তার উপর নির্যাতন চালাবে। আমরা এখন কি করব স্যার। এই বিপদে আপনার কথাই আমার মনে পড়েছে। বলুন আমরা কি করব? আমার আব্বারই বা কি হবে!' বলল হাইম বেঞ্জামিন।

'এসব কিছু না ঘটলে, আমাদের পরিকল্পনা মোতাবেক চলতে পারলে ভাল হতো। সে পথ এখন বন্ধ। কারণ তারা আপনাদেরও সন্দেহ করছে। এই অবস্থাটা বিপজ্জনক। তারা ধরা পড়ার ভয়ে ভীত হয়ে ড. হাইম হাইকেলকে কিছু করে বসলে সেটা মহা ক্ষতির কারণ হবে।' বলল আহমদ মুসা।

আংতকে-উৎকণ্ঠায় হাইম বেঞ্জামিনের মুখের চেহারা পান্ডুবর্ণ ধারণ করল। ঠোঁট কাঁপতে লাগল তার। বলল,'স্যরি, আমি ওদের কথা মত চলে চেষ্টা করেছি লক্ষ্যে পৌঁছতে। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় বারবারা ব্রাউনকে আমাদের সাক্ষাতের সব কথা ওদের জানাতে বললে। তাছাড়া টেলিফোনে ওরা মনিটর করবে, এটার চিন্তাও আমাদের মাথায় আসেনি স্যার। আমরা দুঃখিত।'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'বেঞ্জামিন এটা দুঃখের বিষয় নয়, পর্যালোচনার বিষয় এটা। যা হাতছাড়া হয়ে যায়, বুঝতে হবে তা হাতছাড়া হবার জন্যেই। এখানে দুঃখ নয়, শিক্ষার বিষয় থাকে।'

চোখের দুকোণ মুছে নিয়ে হাইম বেঞ্জামিন বলল, 'ধন্যবাদ স্যার। এখন আমরা কি করব বলুন। ওর মা শিলা ব্রাউন ভীষণ কাঁদছে। ওরা খুব নির্বিবাদী পরিবার। বংশানুক্রমে ওরা শিক্ষকতা পেশায়। ওর আব্বা ব্যাফেল ব্রাউন

ইউনিভার্সিটি অব দেলওয়ারের শিক্ষক এবং ফিলাডেলফিয়া জুইস এ্যাসোসিয়েশনের কালচারাল কমিটির সভাপতি। ভীষণ রেগে গেছেন তিনি। তাঁকে না জানিয়ে, অনুমতি না নিয়ে কেন বারবারা ব্রাউন জেনারেল শ্যারনের ইসরাঈল-কেন্দ্রিক গোয়েন্দা সংস্থায় যোগ দিল। তার............।'

বেঞ্জামিনের কথার মাঝখানে আহমদ মুসা বলে উঠল, 'তুমি কি জানতে?'

'জানতাম না। এবার আসার পর আমি ওর কাছ থেকেই শুনেছি। সে আমাকে জানায় যে, ইহুদী গোয়েন্দা সংস্থা তাকে নিয়োগ করেছে আমাদের বাসায় কে আসে, কে যায়, আমরা কখন কার সাথে যোগাযোগ করি, কি বলি, ইত্যাদি বিষয়ে রিপোর্ট করার জন্যে। চাপিয়ে দেয়া এই দায়িত্ব তার মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। ওদের কোন কথাই সে শুনতে রাজী নয়। এটা তার আরও বিপদ ডেকে আনবে।' বলল বেঞ্জামিন। শেষ বাক্যটা তার আবেগ-রুদ্ধ কণ্ঠ থেকে খুব কষ্টে বের হয়েছিল।

আহমদ মুসা বেঞ্জামিনের গায়ে সান্ত্বনার হাত বুলিয়ে বলল,'যারা বারবারাকে নিয়ে গেছে তাদের কাউকে চেন? ইহুদী গোয়েন্দা সংস্থার অফিস, যেখানে বারবারা মাঝে মাঝে যেত তার ঠিকানা তুমি জান?'

'জ্বি না। ওদের কাউকে চিনি না, ঠিকানাও ওদের জানি না স্যার।' বলল বেঞ্জামিন।

'ওদের বাসার কেউ জানে?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'এ ব্যাপারে কোন কথা ওদের আমি জিজ্ঞাসা করিনি।' বেঞ্জামিন বলল।

'আমরা বারবারার বাসায় এখন যেতে পারি না।?' বলল আহমদ মুসা।

'অবশ্যই স্যার।'

'আমার কি পরিচয় দেবে তাদের কাছে?' বলল আহমদ মুসা।

'বলব আমার বন্ধু এক প্রাইভেট গোয়েন্দা।' বলল হাইম বেঞ্জামিন।

'ধন্যবাদ। চল আর দেরি নয়।' বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

আহমদ মুসারা পৌঁছল বারবারা ব্রাউনদের বাড়িতে।

বাইরে সিকিউরিটির দুজন লোক ছাড়া আর কেউ ছিল না।

হাইম বেঞ্জামিন আহমদ মুসাকে লন চেয়ারে বসিয়ে এক দৌড়ে ভেতরে গেল। দুতিন মিনিট পরেই ফিরে এল সে।

হাইম বেঞ্জামিনের সাথে আহমদ মুসা প্রবেশ করল ভেতরে।

ভেতরে ড্রইংরুমে একটা সোফায় পাশাপাশি বসেছিল মি. ব্রাউন ও মিসেস ব্রাউন।

মি. ও মিসেস ব্রাউন ছাড়া বাসায় কেউ নেই।

মিসেস ব্রাউনের বিধ্বস্ত চেহারা। আর পানি ভরা মেঘের চেহারা মি. ব্রাউনের।

বেঞ্জামিন ওদের সাথে আহমদ মুসার পরিচয় করিয়ে দিল। বলল মি. ব্রাউনকে, 'আংকেল আমার বন্ধু প্রাউভেট ডিটেকটিভ মি. দানিয়েলকে নিয়ে এসেছি। পুলিশ কি করবে জানি না। কিন্তু আমাদের কিছু করা দরকার।

'ধন্যবাদ বেঞ্জামিন।' বলল মি. ব্রাউন, বারবারা পিতা।

তারপর মি. ব্রাউন তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'ওয়েলকাম মি. দানিয়েল। আমাদের বিপদে আপনার এগিয়ে আসার জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু পুলিশ যেখানে সক্রিয় হবার মত কিছু পাচ্ছে না, সেখানে আমরা কি করতে পারি!'

'বিপদের সময় যার যতটুকু সাধ্য চেষ্টা করা উচিত। সাফল্য ঈশ্বরের হাতে।' আহমদ মুসা বলল।

মি. ব্রাউন রুমাল দিয়ে চোখ ভাল করে মুছে নিয়ে সোজা হয়ে বসে বলল, 'ভাল বলেছ ইয়ংম্যান। নিশ্চয় তুমি গভীরভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাসী!'

'সৃষ্টি তার স্রষ্টার প্রতি তো বিশ্বাসী হবেই, তাঁর উপর নির্ভর করবেই।' আহমদ মুসা বলল।

'শেখ তোমরা এই বাছার থেকে। এই বিপদের সময় এখনও তোমরা একবারও ঈশ্বরের নাম করনি। বাছাই প্রথম আমার ঘরে আলো জ্বালল।' চোখ মুছতে মুছতে বলল মিসেস ব্রাউন। তারপর সোজা হয়ে বসে আহমদ মুসার দিকে ঘুরে বলল, 'বাছা তোমাকে ধন্যবাদ। তোমার মধ্যে ঈশ্বর আছেন। তুমিই পারবে আমার বাছাকে বাঁচাতে। পারবে না?'

‘চেষ্টা করতে অবশ্যই পারব মা। ঈশ্বর জানেন তিনি কি ফল দেবেন।’ আহমদ মুসা বলল।

মিসেস ব্রাউন অপলক চোখে তাকিয়ে আছে আহমদ মুসার দিকে। বলল একটু সময় নিয়ে, ‘বাছা তুমি আমাকে মা বলেছ? বারবারা নেই, আমার মন হাহাকার করছে এই ডাকের জন্যে বাছা। তুমি এই ডাক ফিরিয়ে এনেছ। তুমি বারবারাকে ফিরিয়ে আন বাছা।’

বলেই মুখ নিচু করল। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। মুখে রুমাল চাপা দিয়ে কান্না রোধের চেষ্টা করতে লাগল মিসেস ব্রাউন।

কেউই কোন কথা বলতে পারল না।

একটু নিরবতা।

অসহনীয় বেদনার এক পরিবেশ।

মিসেস ব্রাউন নিজেকে সামলে নিয়ে মুখ-চোখ মুছতে মুছতে বলল, ‘স্যরি। তোমরা কথা বল।’

আহমদ মুসাই কথা বলে উঠল, ‘যারা মিস ব্রাউনকে নিয়ে গেছে, তাদের বা তাদের ঠিকানা সম্পর্কে কিছু জানেন আপনারা?’

‘তারা কোন দিনই আমাদের বাড়িতে আসেনি। দেখিনি তাদের কোন দিন।’ বলল মি. ব্রাউন।

‘মিস ব্রাউন যে গোয়েন্দা সংস্থার সদস্য ছিল, তার পরিচয় ও ঠিকানা সম্পর্কেও নিশ্চয় আপনারা জানেন না!’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘না জানি না। এ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে যে নিজেকে জড়িয়েছে সে আমাদের কোন দিনই জানায়নি। দুর্ভাগ্য আমাদের!’ বলল মি. ব্রাউন।

‘মাফ করবেন, আমি কি তার ঘর, তার টেবিল,কাগজপত্র, হ্যান্ডব্যাগ, ইত্যাদি পরীক্ষা করতে পারি? আপনারা দয়া করে অনুমতি দেবেন?’ আহমদ মুসা বলল।

‘ওয়েলকাম বাছা। তুমি যে সহযোগিতা চাইবে, সবই আমরা করব।’ বলেই উঠে দাঁড়াল মিসেস ব্রাউন। বলল, ‘চল তার ঘরে নিয়ে যাচ্ছি।’

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

উঠে দাঁড়াল বেঞ্জামিন ও মি. ব্রাউনও।

প্রবেশ করল তারা মিস ব্রাউনের ঘরে। সুন্দর পরিপাটি করে সাজানো ঘর। শোবার বিছানা, পড়ার টেবিল, ওয়াল ক্যাবিনেট, কোথাও কোন অগোছালো অবস্থা নেই।

কিন্তু পরিপাটি অবস্থার মধ্যে পড়ার টেবিলে একটা মানিব্যাগ পড়ে আছে বেসুরোভাবে। মানিব্যাগটা দৃষ্টি আকর্ষণ করল আহমদ মুসার। আহমদ মুসা তাকাল মিসেস ব্রাউনের দিকে। বলল, মিস ব্রাউনের হ্যান্ড পারসটা কোথায়?

'ওর সাথেই ছিল নিয়ে গেছে।' বলল মিসেস ব্রাউন।

'কিন্তু তার এ মানিব্যাগটা তো তার হ্যান্ড পারসেই থাকার কথা। এখানে পড়ে কেন?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'এ মানিব্যাগটা তার কাছে মানে তার পারসেই ছিল। কিন্তু যাবার সময় সে ফেলে দিয়ে গেছে। গাড়ি করে যখন তাকে নিয়ে যায়, তখন বারবারা গাড়ির জানালা দিয়ে মানিব্যাগটা বাইরে ছুঁড়ে দেয়।' বলল মিসেস ব্রাউন।

আনন্দের একটা ঝিলিক ফুটে উঠল আহমদ মুসার চোখে-মুখে। তার কণ্ঠ থেকে একটা স্বগত উক্তি বেরিয়ে এল, 'ও গড! থ্যাংকস টু বারবারা। থ্যাংকস টু গড।'

ওরা তিনজনই আহমদ মুসার দিকে তাকাল। বেঞ্জামিন বলল, 'কি দেখলেন, কি পেলেন স্যার?'

'শত্রুদের ঠিকানা পেয়ে গেছি।' আহমদ মুসা বলল।

'কোথায়?' বিস্মিত প্রশ্ন বেঞ্জামিনের।

'ঐ মানিব্যাগে।' আহমদ মুসা বলল।

'কিন্তু বাছা, তুমি মানিব্যাগটা এখনও দেখই নি।' বলল মিসেস ব্রাউন।

'দেখার দরকার নেই মা। ওর মধ্যে যদি শত্রুর পরিচয় ও ঠিকানামূলক কিছু না থাকতো মিস ব্রাউন তাহলে তার মানিব্যাগ এভাবে গাড়ির জানালা দিয়ে ফেলে দিত না।' আহমদ মুসা বলল।

'ঠিক বলেছ দানিয়েল। আমারও বিস্ময় লেগেছে, শুধু ডলার রক্ষার জন্যে মানিব্যাগটা এভাবে ফেলল কেন সে!' বলল মি. ব্রাউন।

আহমদ মুসা হাত বাড়িয়ে মানিব্যাগটা তুলে নিল।

মানিব্যাগে যা ছিল সব বের করে আহমদ মুসা টেবিলে রাখল।

কিছু ডলার, কয়েকটা নেমকার্ড, দুটি ক্রেডিট কার্ড, কয়েকটা চিরকুট এবং কয়েক পাতার ছোট একটা টেলিফোন গাইড পেল মানিব্যাগ থেকে।

আহমদ মুসা টেলিফোন গাইডটা তুলে দিল মি. ব্রাউনের হাতে। বলল, 'দেখুন সন্দেহ করার মত কোন নাম, ঠিকানা, টেলিফোন আপনার চোখে পড়ে কিনা। আমি নেম কার্ড ও চিরকুটগুলো দেখছি।'

নেম কার্ডের সবগুলোই বিখ্যাত কিছু শপস ও বিজনেস হাউজের। চারটি চিরকুটে চার মোবাইল নম্বর লেখা। কিন্তু নম্বরের সবগুলোই ফিলাডেলফিয়ার বাইরের।

আহমদ মুসা নেম কার্ড ও চিরকুটগুলো বেঞ্জামিনের হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'দেখ তুমি কিছু বুঝতে পারো কিনা।'

মি. ব্রাউন বলল,'দানিয়েল, টেলিফোন গাইডে অপরিচিত কোন নম্বর দেখছি না। সবই আত্নীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, বিশববিদ্যালয় ও কমার্শিয়াল শপস-এর নম্বর এবং এদের সাথে মোটামুটি আমরা সকলেই পরিচিত।'

আহমদ মুসাও নজর বুলাল টেলিফোন গাইডটার উপর। টেলিফোন নম্বরগুলো সত্যিই 'আত্নীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, বিশ্ববিদ্যালয় ও মার্কেটিং' এই চ্যাপ্টারে বিভক্ত। অবাক হলো আহমদ মুসা যে, 'বিবিধ বলে বিভাগ নেই। বিস্মিত আহমদ মুসা বলল, 'বারবারা ব্রাউন দেখছি খুবই ঘরমুখো ছিল।। তার কনট্যাক্ট খুবই সীমিত ছিল।'

'হ্যাঁ বাছা। মেয়ে আমার খুবই ভাল। বিশ্ববিদ্যালয় ও বাড়ি ছাড়া সে কিছু বুঝত না। প্রয়োজনীয় শপিং-এ মাঝে মাঝে বাইরে যেত, কিন্তু আড্ডা দেয়া তার স্বভাব ছিল না। আমার এমন ভাল মেয়েই আজ বিপদে পড়ল।' বলল মিসেস ব্রাউন। বলতে বলতে কেঁদে ফেলল।

টেলিফোন গাইডের একদম শেষ পাতায় কিছুটা সংকেত ধরনের লেখা আহমদ মুসার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। লেখাটি এই রকমঃ L.F. `Sinai' ch. `Phila'. অক্ষর ও শব্দগুলোর মাত্র Sinai ও Phila শব্দ দুটি কোটেড।

ভ্রু-কুঁচকালো আহমদ মুসার। একটা রহস্যের গন্ধ পেল এর মধ্যে। লেখাটা আহমদ মুসা দেখাল মি. ব্রাউনকে।

মি. ব্রাউন বলল, 'এটা আমি দেখেছি দানিয়েল। কিছু বুঝতে পারিনি আমি। তার পড়াশুনার সাথে সম্পর্কিত কিছু হতে পারে মনে করেছি।

বেঞ্জামিন ও মিসেস ব্রাউনও লেখাটা দেখল। তারাও এর কোন অর্থ বের করতে পারলো না।

আহমদ মুসা আবার হাতে নিল টেলিফোন গাইডটা। আবার সে চোখ বুলাল লেখাটির উপর। হঠাৎ আহমদ মুসার চোখ-মুখ উজ্জল হয়ে উঠল। বলল, 'মিস ব্রাউনের নিশ্চয় পার্সোনাল কম্পিউটার আছে?'

'হ্যাঁ আছে।' বলল মি.ও মিসেস ব্রাউন একসাথেই।

'আমাকে দয়া করে সেখানে নিয়ে চলুন। আমি নিশ্চিত এই সংকেতগুলো তার কম্পিউটার এ্যাকাউন্টের সাথে জড়িত।' আহমদ মুসা বলল।

কম্পিউটারটা পরিবারের লাইব্রেরী রুমে।

লাইব্রেরী রুমে গিয়ে আহমদ মুসা কম্পিটারের চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

আহমদ মুসা কম্পিউটারের ফাইল তালিকা থেকে PSF (পার্সোনাল সিক্রেট ফাইল) বেছে নিয়ে ফাইলটি ওপেন করল। ফাইল আনলক করার জন্যে আহমদ মুসা `Sinai' টাইপ করল। অনন্দে মুখ উজ্জল হয়ে উঠল আহমদ মুসার। ফাইল আনলক হয়ে গেছে। স্ক্রীনে ভেসে উঠল আবার অনেকগুলো ফাইলের তালিকা। তালিকার উপর চোখ বুলাল আহমদ মুসা। সর্বশেষ ফাইলটা হলো `Phila'. সে ফাইলটিতে ক্লিক করতেই স্ক্রীনে ভেসে উঠল লাল অক্ষরে লেখা একটা ঠিকানা।

'ইউরেকা' বলে আনন্দে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

বেঞ্জামিন ও মি. ব্রাউনও দেখছিল আহমদ মুসার কাজ। তাদের চোখে মুখেও আনন্দ। বলল বেঞ্জামিন, 'এই ঠিকানায় ওরা বারবারাকে নিয়ে গেছে বলে আশা করছেন মি. দানিয়েল?'

'আশার চেয়ে বড় কথা হলো ওদের একটা ঠিকানা পেয়েছি। সামনে এগুবার একটা পথ হলো।' বলল আহমদ মুসা।

‘দানিয়েল, আমি বিস্মিত হচ্ছি, তুমি কি করে এত তাড়াতাড়ি বুঝলে যে ওটা কম্পিউটারের কোড? আমি দেখে তো কিছু বুঝিনি। আর ওভাবে মানিব্যাগ ফেলা দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি, কিন্তু এর অর্থ বুঝিনি। সত্যিই তুমি গুণী ছেলে। কিন্তু ঠিকানা পেয়ে কি করবে?’

‘আমি যাচ্ছি ওখানে। বারবারাকে তো আনতে হবে!’ আহমদ মুসা বলল।

‘ঈশ্বর তোমাকে সাহায্য করুন। কিন্তু কাকে নেবে সাথে? ঠিকানা যখন পাওয়া গেছে পুলিশকেও সাথে নেয়া যায়।’ বলল মি. ব্রাউন।

‘কিন্তু পুলিশ ওদেরকে আগেই জানিয়ে দেবে না, এ নিশ্চয়তা কি আছে?’ আহমদ মুসা বলল।

ম্লান ছায়া নামল মি. ব্রাউনের মুখে। কোন কথা বলতে পারল না।

কথা বলল বেঞ্জামিন। বলল, ‘পুলিশকে জানানোর প্রশ্নই ওঠে না। মি. দানিয়েল স্যার ঠিকই বলেছেন, পুলিশকে জানালে তারাও খবর পেয়ে যেতে পারে। কিন্তু তাহলে বারবারা উদ্ধার হবে কিভাবে? মি. দানিয়েল ও আমরা মিলে..............।’

কথা শেষ করতে পারল না বেঞ্জামিন। তাকে থামিয়ে দিয়ে মি. ব্রাউন বলে উঠল, ‘আমি তো সে কথাই বলছি। যারা সন্ত্রাসীর মত বাড়ি এসে সবার সামনে থেকে একজনকে ধরে নিয়ে যেতে পারে, তাদের বাড়িতে পুলিশের সাহায্য ছাড়া উদ্ধার অভিযানে যাওয়ার কল্পনাই করা যায় না।

‘লোকজন নিয়ে আয়োজন করে যাওয়া সম্ভব নয়। এ জন্যেই আমি একা ওখানে যাচ্ছি ওদের চোখকে ফাঁকি দেবার জন্যে। যাতে ওরা বারবারাকে সরিয়ে ফেলা কিংবা লড়াই এর আয়োজন করতে না পারে।’ আহমদ মুসা বলল।

বলেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘মি. বেঞ্জামিন আপনি কি গেটের ওদের বলে একটা ট্যাক্সি ডেকে দেবেন?’

‘ট্যাক্সি কেন, আমার গাড়ি নিয়ে যাবেন।’ ত্বরিত জবাব দিল হাইম বেঞ্জামিন।

‘না তোমার গাড়ি, এঁদের গাড়ি ওরা চেনে। তোমাদের উপর ওদের ক্রোধ আর বাড়াতে চাই না। ট্যাক্সিতেই আমার সুবিধা হবে।’ আহমদ মুসা বলল।

বিস্মিত ব্রাউন কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই আহমদ মুসা আবার বলে উঠল, ‘আর কোন কথা নয় জনাব, আমি চলি।’

তারপর হাইম বেঞ্জামিনের একটা হাত ধরে সামনে টেনে বলল, ‘চল বেঞ্জামিন। গেটে একটু দাঁড়ালেই ট্যাক্সি পেয়ে যাব।’

আহমদ মুসা ও বেঞ্জামিন হাঁটতে লাগল বাইরে বেরুবার জন্য।

গেটে গিয়েই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল আহমদ মুসা। ট্যাক্সিতে ওঠার সময় আহমদ মুসা বেঞ্জামিনের হাতে ভাঁজ করা একটা কাগজ তুলে দিয়ে বলল, ‘আমি যদি দুঘন্টার মধ্যে না ফিরি এবং কোন খবর না জানাই, তাহলে চিঠিতে যা বলা হয়েছে, সে অনুসারে কাজ করবে।’

আহমদ মুসার কথা শুনেই ভয় ও উদ্বেগে চুপসে গেল বেঞ্জামিনের মুখ। আহমদ মুসার একটা হাত চেপে ধরে কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলল, ‘আমাদের খাতিরে এমন বিপদের মুখে আপনি ঝাঁপিয়ে পড়ছেন.........’ কথা শেষ না হতেই ভারী কণ্ঠ আটকে গেল তার।

আহমদ মুসা হাইম বেঞ্জামিনের পিঠ চাপড়ে হেসে বলল, ‘কাঁটা হেরি ক্ষ্যান্ত কেন কমল তুলিতে! বারবারা ব্রাউনকে উদ্ধার না করলে তোমার চলবে বুঝি!

বলে আহমদ মুসা গাড়িতে উঠে গেল।

লজ্জায় মুখ লাল হয়ে উঠেছিল হাইম বেঞ্জামিনের।

আহমদ মুসার ট্যাক্সি চলে গেল।

হাইম বেঞ্জামিনের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল মি. ও মিসেস ব্রাউন।

বেঞ্জামিন তাকিয়েছিল আহমদ মুসার ট্যাক্সির দিকে।

‘আসলে যুবকটি কে বেঞ্জামিন? আমাদের বিপদে না জড়াবার জন্য আমাদের গাড়ি নিল না, অথচ আমাদেরই কাজে গেল। আমার কাছে অবাক লাগছে। তুমি কি প্রচুর টাকা দিয়েছ?’ বলল মি. ব্রাউন।

'না। আপনার মত আমিও বিস্মিত আংকেল। আমি তার মিথ্যা পরিচয় দিয়েছি। তিনি প্রাইভেট ডিটেকটিভ নন। আব্বাকে উদ্ধারে আমাদের সহযোগিতা চাওয়ার জন্যে তিনি এখানে এসেছিলেন।' বলল হাইম বেঞ্জামিন।

'তাহলে যুবকটি তোমার আব্বার পরিচিত?' জিজ্ঞাসা মি. ব্রাউনের।

'আব্বাকে তিনি দেখেননি এবং কোন প্রকার যোগাযোগও ছিল না। বলল হাইম বেঞ্জামিন।

'আরও বিস্মিত করলে । তাহলে.........।'

কথা শেষ করতে পারল না মি. ব্রাউন। মাঝখান থেকে হাইম বেঞ্জামিন বলে উঠল, 'সব বিস্ময়ের উত্তর তিনি দেবেন উপযুক্ত সময়ে।'

বলেই বেঞ্জামিন ফিরে দাঁড়াল। বলল, 'চলুন আমরা ভেতরে বসি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি। আমাকে কমপক্ষে দুঘন্টা তো বসতেই হচ্ছে।

সবাই পা বাড়াল বাড়ির দিকে ফিরে আসার জন্যে।

রক্সিকে হাসিমুখে ঘরে প্রবেশ করতে দেখেই স্টিভেন্স সোজা হয়ে বসল। তার চোখে-মুখে ঔজ্জ্বল্য। বলল সে,'রক্সি নিশ্চয় মিশন সাকসেসফুল?'

'অ্যালেক স্টিভেন্স আজর ওয়াইজম্যানের ওয়ার্ল্ড ফ্রিডম আর্মি (WFA) এবং মার্কিন জেলে আটক জেনারেল শ্যারন-এর ইহুদী গোয়েন্দা সংস্থা ইরগুন জাই লিউমি'র ফিলাডেলফিয়ার যৌথ প্রধান হিসাবে সদ্য নিয়োজিত হয়েছে। সে মার্কিন সেনাবাহিনীর একজন রিটায়ার্ড কর্ণেল। চাকুরীকালে বিদ্বেষ ও বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তার ফোর্সড রিটায়ারমেন্ট হয়। ইহুদীবাদের অক্লান্ত সৈনিক সে এখন। আর রক্সি, যারা বারবারা ব্রাউনকে ধরে আনতে গিয়েছিল তাদেরই একজন।

'জি স্যার।' অ্যালেক স্টিভেন্সের প্রশ্নের জবাব দিল রক্সি।

'ওরা কি বাধা দিয়েছিল?' জিজ্ঞাসা করল অ্যালেক স্টিভেন্স।

'বাধা দিয়েছে। কিন্তু বলপ্রয়োগে সাহস পায়নি।' রক্সি বলল।

'তোমাদের মিস ব্রাউনের প্রতিক্রিয়া কি?' অ্যালেক স্টিভেন্সের জিজ্ঞাসা।

'দুঃখজনক স্যার, সে কোন সাহায্য করতে রাজি নয়। আগের মতই ঐ ব্যাপারে কোন কথাই বলতে সে রাজি হচ্ছে না।' বলল রক্সি।

'সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না। তোমরা নিশ্চয় আঙুল বাঁকা করনি।'

'সে তো আমাদেরই লোক। তাছাড়া ফিলাডেলফিয়ার পুরানো ও পরিচিত পরিবার এটা। তার উপর হাইম পরিবারের সাথেও এরা সম্পর্কিত হয়ে পড়েছে। কিছু হলে হাইম বেঞ্জামিন প্রতিকারের জন্য চেষ্টা করতে পারে।' বলল রক্সি।

'কিন্তু সে ভয় এখন নেই। মিস ব্রাউনকে ধরে এনে সাপের লেজে পা দিয়েছ, এখন সাপের মাথা না ভাঙলে ছোবল খেতে হবে।' বলে উঠে দাঁড়াল স্টিভেন্স। বলল, 'চল দেখি হারামজাদিকে।'

তারা দুতলার একটা ছোট্ট বাংলো থেকে বেরিয়ে এল। এ বাড়িটি অ্যালেক স্টিভেন্সের অফিসিয়াল রেসিডেন্স।

তারা বেরিয়ে দু'শ গজের মত হেঁটে একটা বড় তিনতলা বাড়িতে প্রবেশ করল। এ বাড়িটাই আজর ওয়াইজম্যানদের ফিলাডেলফিয়ার হেড অফিস।

তাদের হেড অফিসের জন্যে একটা চমৎকার জায়গা বেছে নিয়েছে আজর ওয়াইজম্যানরা। উত্তর পূর্ব ফিলাডেলফিয়ার বিমান বন্দর থেকে উত্তর-পূর্বে অনেকখানি এগিয়ে পার্কসিন খাড়ির পুবে বাড়িটা। বাড়িটার কিছু উত্তর দিয়ে ফিলাডেলাফিয়ার নর্থ এক্সপ্রেস ওয়ে চলে গেছে। খাড়ি দিয়েও বোটের চলাচল আছে। সুতারাং বাড়িটা কোন রাস্তার উপর না হয়েও বহুমুখী যোগাযোগের সুযোগ ভোগ করছে।

বাড়িতে প্রবেশ করে তারা সোজা নেমে গেল বেজমেন্টে।

বেজমেন্টের প্রান্তে একটা ঘর। প্রশস্ত ঘরটি।

ঘরে কোন আসবাবপ্রত্র নেই।

ঘরের মাঝখানে মেঝেতে বসে আছে বারবারা ব্রাউন মুখ নিচু করে।

ঘরের বাইরে দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল দুজন প্রহরী। তাদের হাতে সাব মেশিনগান।

অ্যালেক স্টিভেন্স ঘরে ঢুকল।

তার পেছনে রক্সি।

ঘরে ঢুকেই চিৎকার করে বলল প্রহরীদের লক্ষ্য করে, 'ওঁকে এভাবে রাখা হয়েছে কেন? সে তো শত্রু নয়, আমাদের লোক।

অ্যালেক স্টিভেন্সের কথা শেষ হবার আগেই প্রহরীরা ছুটলো পাশের ঘরের দিকে। একটা হাতওয়ালা কুশন চেয়ার এনে বারবারা ব্রাউনের পাশে রাখল এবং বলল, 'সরি ম্যাডাম।'

'মিস ব্রাউন উঠে বসুন।' নরম কন্ঠে বলল মি. স্টিভেন্স।

বারবারা ব্রাউনের ঠোঁটে একটা ম্লান হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'বন্দীর জন্য ঘরের মেঝেই স্বাভাবিক স্থান।'

'স্যরি মিস ব্রাউন। আপনি বন্দি নন। কিছু জানার জন্য আপনাকে নিয়ে আসা হয়েছে মাত্র।' অ্যালেক স্টিভেন্স বলল।

'কতগুলো রিভলবারের মুখে যাকে তুলে আনা হয়, তাকে ডেকে আনা বলে?' বলল বারবারা ব্রাউন।

'স্যরি মিস ব্রাউন। আপনাকে যেভাবেই আনা হোক, আপনাকে বন্দী করে রাখার জন্য আনা হয়নি।'

বলে একটু থামল স্টিভেন্স।

তার চোখে-মুখে প্রবল অস্বস্তি ফুটে উঠল। হাতের ব্যাটনটাকে সে অস্থিরভাবে এ হাত থেকে সে হাত করছে। একটু পর সে আবার বলে উঠল, 'মিস ব্রাউন আপনি জাতির একজন সচেতন ব্যক্তি। ইহুদী জাতি তাদের ইতিহাসের অনেক সময়ের মত এক অতি কঠিন সময় আজ অতিক্রম করছে। আপনাদের নেতা জেনারেল শ্যারনসহ আমাদের হাজারো লোক গুরুতর অভিযোগে আজ জেলে। এই পরিস্থিতিতে জাতি আরও একটা ধ্বংসের গহবরে পড়ুক, তা আপনি আমি কেউই চাইব না। কিন্তু একটা চক্র আমাদেরকে সেই গহবরের দিকেই ঠেলে দিতে চাইছে। বাঁচার জন্যে আপনারও সাহায্য আমরা চাই।'

'কি সাহায্য?' বলল বারবারা ব্রাউন।

'সেদিন আইজ্যাক দানিয়েল আপনাদের কি কি বলেছিল?' জিজ্ঞাসা করল অ্যালেক স্টিভেন্স।

'এ প্রশ্নের উত্তর আমি দিয়েছি। তিনি এসেছিলেন হাইম হাইকেল আংকেলের খোঁজে। এ ব্যাপারেই তিনি কথা বলেছেন।' বলল বারবারা ব্রাউন।

'এটুকুর বাইরে আপনারা যা বলেছেন, উনি যা বলেছেন, সেটাই আমাদের প্রয়োজন।' অ্যালেক স্টিভেন্স বলল।

'হাইম পরিবার নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। কিন্তু তা থেকে আপনাদের বলার মত কিছু নেই।' বলল বারবারা ব্রাউন।

চোখ দুটি জ্বলে উঠল অ্যালেক স্টিভেন্সের। কিন্তু মুহূর্তেই সামলে নিয়ে বলে উঠল, 'কিন্তু আপনাদের টেলিফোন মনিটর বলে না যে, বলার কিছু নেই।'

'আমি জানি না। আপনাদের টেলিফোন মনিটরে কি আছে?' বলল বারবারা ব্রাউন।

'বলছি। হাইম বেঞ্জামিন টেলিফোনে আইজ্যাক দানিয়েল লোকটাকে বলেছেন, আমার ও মিস ব্রাউনের কথা ঠিক আছে। আর আমরা তো আপনাকে সাহায্য করছি না, সাহায্য করছি আমাদের নিজেদেরকে।' মি. বেঞ্জামিনের এই কথা থেকে পরিষ্কার যে, আমাদের কয়েকজন লোককে খুনকারী মি. দানিয়েলকে আপনারা 'কিছু কথা দিয়েছেন এবং তাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই 'কথা' ও 'সাহায্যের প্রতিশ্রুতি' কি আমরা জানতে চাই।' অ্যালেক স্টিভেন্স বলল।

বারবারা ব্রাউন মুখ তুলে সোজা হয়ে বসল। বলল, 'বিষয়টা হাইম পরিবারের পারিবারিক ব্যাপার। এটা অন্যদের জানার প্রয়োজন নেই। একথা আমি বার বার বলেছি।'

'মিস ব্রাউন, মি. হাইম হাইকেল এখন আমাদের তত্ত্বাবধানে। তার পরিবারের সবকিছুর সাথে আমাদের স্বার্থ জড়িত। তাই সব কিছুই আমাদের জানতে হবে।' বলল স্টিভেন্স তীব্র কণ্ঠে।

কণ্ঠের এই আকস্মিক বিস্ফোরণে চমকে উঠেছিল বারবারা ব্রাউন। নিজেকে সামলে সে ধীর কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু এই দাবী হাইম পরিবার কিংবা কেউ মেনে নেবে না।

স্টিভেন্স আগের মতই চিৎকার করে বলল, 'হাইম পরিবারকে বা অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করিনি, জিজ্ঞেস করেছি আমাদের কর্মীকে। যার উচিত ছিল সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু আমাদের জানিয়ে দেয়া।'

'কর্মী হবার বাইরেও আমার পরিবার আছে, আমার ভিন্ন জীবন আছে। গোয়েন্দা কর্মে আমার স্বতস্ফূর্ত কর্মকান্ড ছিল এসবের একটা বাড়তি বিষয়।' বলল বারবারা ব্রাউন।

হোঁ হোঁ করে হেসে উঠল অ্যালেক স্টিভেন্স। কিন্তু তার চোখ-মুখ দিয়ে আনন্দ নয় আগুন ঝরে পড়ল। তার ডান হাতটি তীব্র বেগে ছুটে গেল বারবারা ব্রাউনের বামগালের দিকে। 'ঠাশ' করে এক কর্কশ শব্দ উঠল।

'আ' করে এক শব্দ তুলে বারবারা ব্রাউন পড়ে গেল চেয়ার থেকে।

হিংস্র উন্মত্ততায় জ্বলে উঠল অ্যালেক স্টিভেন্সের দুচোখ।

দুধাপ এগিয়ে সে নির্বিচারে একটা লাথি চালাল বারবারা ব্রাউনের দিকে। তার পয়েন্টেড জুতার অগ্রভাগ গিয়ে আঘাত করল বারবারা ব্রাউনের পেটের বাম পাশে।

যন্ত্রণায় কুকড়ে গেল তার দেহ।

লাথি চালিয়েই অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিয়ে স্টিভেন্স বলে উঠল, 'কোন ইহুদীবাদীরই আলাদা কোন জীবন নেই, নিজস্ব কোন সত্তা নেই। তার গোটাটাই জাতির। তোকে বলতে হবে সেদিনের সব কথা।'

কথা শেষ করেই সে একজন প্রহরীকে বলল, 'ওকে তুলে বসাও।'

একজন প্রহরী ছুটে গিয়ে বারবারা ব্রাউনকে তুলে বসাল।

'বল হারামজাদি। সেদিন আইজ্যাক দানিয়েল কি কথা বলেছিল, তোরা কি বলেছিলি?' ক্রোধে গর গর করতে করতে বলল অ্যালেক স্টিভেন্স।

উঠে বসা বারবারা ব্রাউন মুখ তুলল। বিপর্যস্ত চেহারা। কিন্তু চোখ দুটি তার শান্ত এবং তাতে অনড় দৃঢ়তার ছবি। বলল বারবারা ব্রাউন, 'যে জাতি ব্যাক্তি

সত্তাকে বিলিন করতে চায়, সে জাতি-সত্তাও টেকে না। আমরা জুইস বা ইহুদীরা সেরকম কোন ধর্ম-জাতি নই। সুতরাং অন্যায় ও অনুল্লেখিত জাতীয় স্বার্থে আমার ব্যাক্তিস্বার্থ কোরবানী দেবার প্রশ্ন উঠে না।'

'তুই আমাকে নীতি-কথা শিখাচ্ছিস!' বলে সামনের দেয়ালের দিকে ছুটল সে। দেয়ালের হ্যাংগার থেকে নামিয়ে নিল একটা চাবুক। স্টিভেন্সের চোখ দুটি বাঘের মত জ্বলছে।

সে চাবুক বাগিয়ে ছুটে গেল বারবারা ব্রাউনের কাছে।

শপাং শপাং করে চাবুক পড়তে লাগল বারবারা ব্রাউনের গায়ে।

বারবারা ব্রাউনের পরনে ফুলপ্যান্ট ও গায়ে হাফসার্ট।

মুহর্তেই তার সাদা সার্ট রক্তে লাল হয়ে গেল। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে বারবারা ব্রাউন।

এক সময় চাবুক চালানোয় ক্ষান্ত দিল অ্যালেক স্টিভেন্স। বারবারা ব্রাউনকে বলল, 'প্রথম ডোজ কেমন দেখলি, দ্বিতীয় ডোজ শুরুর আগে জিজ্ঞেস করছি, মত বদলেছে কিনা, সেদিনের সব কথা বলছিস কিনা।'

বারবারা ব্রাউন উপুড় হয়ে পড়েছিল। মাথা ঘুরিয়ে মুখটা ফিরাল স্টিভেন্সের দিকে। বলল, 'জাতি আপনাদের একার নয়। আমরা জাতির অংশ। আপনারা কি করছেন তা জানার অধিকার আমাদের আছে। হাইম হাইকেলকে নিয়ে আপনারা কি করছেন তা জানার আগে কোন সহযোগিতাই আমি আপনাদের করব না।' হাঁপাতে হাঁপাতে দুর্বল কণ্ঠে বলল বারবারা ব্রাউন।

হুংকার দিয়ে উঠল অ্যালেক স্টিভেন্স। ক্রোধে মুখ বিকৃত হয়ে উঠল তার। বলল, 'ও তুই এখন আমাদের নয়, শত্রুর এজেন্ট। তাদেরই শেখানো কথা বলছিস। দেখাচ্ছি মজা। বলে দেয়াল থেকে টাঙানো 'ইলেকট্রিক শক-ব্যাটন' নামিয়ে হাতে নিল।

বিশেষ ব্যাটারি চালিত ব্যাটনটি সুইচ টেপার সাথে সাথে নির্দিষ্ট ভল্টের বিদ্যুত ওয়েভ সৃষ্টি করতে পারে। ব্যাটনের নিচের মাথায় রয়েছে কোয়ার্টার ইঞ্চি মাপের একটি আলপিনের অগ্রভাগ সেট করা। ব্যাটনের আলপিনটি কারও দেহে

বিঁধে যাওয়ার সাথে সাথেই নির্দিষ্ট ভল্টের বিদ্যুত তার দেহে সঞ্চালিত হয়। তাতে তার মৃত্যু ঘটে না, কিন্তু মৃত্যু যন্ত্রণা তাকে ভোগ করতে হয়।

এই মৃত্যুযন্ত্রণা নেমে এল বারবারা ব্রাউনের দেহে।

অ্যালেক স্টিভেন্স ব্যাটনটির আলপিন ঢুকিয়ে দিয়েছে বারবারা ব্রাউনের দেহে।

যন্ত্রণায় বুক ফাটা চিৎকার দিয়ে উঠল বারবারা ব্রাউন। গোটা দেহ তার কুকড়ে গেল।

মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে এই নির্যাতন অব্যহত রাখল স্টিভেন্স।

বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত বারবারা ব্রাউন এক সময় চিৎকার করে বলল, 'তোমাদের এই নির্যাতন আমার এই বিশ্বাস আরও বাড়িয়েছে যে, তোমরা জাতির শত্রু। জাতিকে ভালবাসে এমন কেউই তোমাদেরকে জীবন থাকতে সাহায্য করবে না। চালাও নির্যাতন। মৃত্যু দেবার চেয়ে বড় কোন কিছু তোমাদের হাতে নেই।

নির্যাতন চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে অ্যালেক স্টিভেন্স। একদিকে বারবারা ব্রাউনকে নতি স্বীকারে ব্যর্থতা, অন্যদিকে ব্রাউনের কথা তার গায়ে আগুন ধরিয়ে দিল। সে তার ব্যাটন বাগিয়ে আবার ছুটল বারবারা ব্রাউনের দিকে তার দেহে বিদ্যুতের আগুন জ্বালাবার জন্যে।

'স্যার থামুন। যে মৃত্যু চায় তার উপর নির্যাতন চালিয়ে জেতা যাবে না। অন্য পথ দেখতে হবে স্যার।' বলল রক্সি।

থমকে দাঁড়াল অ্যালেক স্টিভেন্স। বলল, 'মৃত্যুর বাইরে আর কোন পথ থাকতে পারে রক্সি?'

'আছে স্যার। মিস ব্রাউনরা আদর্শবাদী, পিউরিটান। ওদের কাছে স্যার জীবনের চেয়ে বড় ওদের ওদের পবিত্রতা। ওদের পবিত্রতায় হাত দিন, দেখবেন কেমন করে ভেজা বেড়াল হয়ে যায় ওরা।' বলল রক্সি।

আনন্দে উজ্জল হয়ে উঠল অ্যালেক স্টিভেন্সের মুখ। বলল সানন্দে চিৎকার করে, 'ধন্যবাদ তোমাকে রক্সি। যে উপহার সে সাজিয়ে রেখেছে তার

প্রেমিক হাইম বেঞ্জামিনের জন্য, তাকে লুট করাই হবে তার জন্য মৃত্যুর চাইতে বড় শাস্তি। এ মোক্ষম কথাটা আমার মনে ছিল না। তোমাকে ধন্যবাদ।'

একটু থামল স্টিভেন্স। তারপর একগাল হেসে বলল রক্সিকে, 'বিষয়টা যখন তোমার মাথায় প্রথম এসেছে, তখন সুযোগটা তোমাকেই প্রথম দিচ্ছি! যাও এগোও।'

'ধন্যবাদ স্যার। বলল রক্সি। লোভের আগুন তার চোখ দুটিতে চক চক করে উঠেছে।

তার সামনেই উপুড় হয়ে পড়ে আছে বারবারা ব্রাউন। তার গায়ের সার্ট ছেঁড়া। প্রায় অনাবৃত তার পৃষ্ঠদেশ।

শিকারী নেকড়ের মত এক পা' দু'পা করে এগুলো বারবারা ব্রাউনের কাছে। ঝুঁকে পড়ে বারবারা ব্রাউনের দেহ উল্টিয়ে তাকে চিৎ করল রক্সি।

বারবারা চিৎ হয়েই তার দু'পায়ের একটা প্রচন্ড লাথি মারল রক্সির ঝুকে পড়া দেহে।

আকস্মিক লাথি খেয়ে ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেল রক্সি।

হোঁ হোঁ করে হেসে উঠল স্টিভেন্স। বলল, 'লজ্জার কথা রক্সি।'

লাথি মেরেই উঠে দাঁড়িয়েছিল বারবারা ব্রাউন।

অপমানিত হয়ে দুচোখ ভরা আগুন নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল রক্সিও।

'লাথির মাশুল শয়তানির কাছ থেকে সুদে-আসলেই তুলব স্যার' বলেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ল বারবারা ব্রাউনের উপর।

ছিটকে পড়ে গেল বারবারার দেহ। তার উপর আছড়ে পড়ল রক্সিও।

ঠিক এই সময় এক সাথে দুটি রিভলবারের গর্জন করে উঠার শব্দ ভেসে এল।

ঘরের দরজায় দাঁড়ানো দুই প্রহরী গুলী খেয়ে পড়ে গেল দরজার উপরেই।

বারাবারা ব্রাউনকে ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে রক্সি।

অ্যালেক স্টিভেন্সও রিভলবার বাগিয়ে উঠেছে চেয়ার থেকে।

এক ধরনের ভাইব্রেশন থেকে তাদের দুজনেরই মনে হলো, কেউ যেন পুরু কার্পেটের উপর দিয়ে দ্রুত ছুটে আসছে।

গুলী করেছে সেই কি?

দুজনেরই রিভলবারের নল দরজার দিকে ঘুরল দ্রুত।

উত্তর-পূর্ব ফিলাডেলাফিয়ার পার্কসিন খাড়ির উত্তরে পার্ক হ্যাভেন রাস্তার উপর এসে পৌঁছতে আহমদ মুসার কোনই অসুবিধা হলে না। কিন্তু মুস্কিলে পড়ল তারপর। বারবারা ব্রাউনের কম্পিউটার থেকে পাওয়ার ঠিকানায় বলা আছে, '৩৯, গার্ডেন রীচ, নর্থ অব পার্কসিন খাড়ি এন্ড সাউথ অব পার্ক হ্যাভেন রোড।' এই নির্দেশিকা থেকে আহমদ মুসা বুঝেছে পার্কসিন খাড়ি থেকে উত্তরে এবং পার্ক হ্যাভেন রোড থেকে দক্ষিণে হবে গার্ডেন রীচ স্ট্রীটের ৩৯ নম্বর বাড়িটা। কিন্তু পার্ক হ্যাভেন রোড ও পার্কসিন খাড়ি দুটোই উত্তর-পুর্ব থেকে উত্তর-দক্ষিণে প্রলম্বিত। আহমদ মুসা বেছে বেছে পার্ক হ্যাভেন রোডের একটা বাঁক ঘুরে এমন জায়গায় এসে দাঁড়াল যেখান থেকে পার্কসিন খাড়ির অবস্থান সোজা দক্ষিণে।

এখন সোজা দক্ষিণে এগুবার একটা রাস্তা চাই।

সামনে তাকাল আহমদ মুসা। পার্ক হ্যাভেন রোড ও পার্কসিন খাড়ির মাঝের জায়গায় সবুজের সমুদ্র। গার্ডেন রীচ কি এলাকার নাম, না কোন রোডের নাম? এলাকা ও রোড দুয়েরই নাম হতে পারে,ভাবল আহমদ মুসা।

রাস্তার খোঁজ করতে গিয়ে সামনেই রাস্তা পেয়ে গেল আহমদ মুসা। দুপাশের সবুজ দেয়ালের মাঝখানে দিয়ে কংক্রিটের সাদা রাস্তাটা।

রাস্তাটার নাম দেখার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। রাস্তাটা দিয়ে তার গাড়ি চলতে শুরু করেছে। বাড়ির নাম্বার খুঁজতে হবে, তার সাথে রাস্তার নামও জানা যাবে, ভাবল আহমদ মুসা।

রাস্তার পাশে একটা বাড়ি থেকে পেয়ে গেল রাস্তার নাম। হ্যাঁ, এ রাস্তাই গার্ডেন রীচ।

নাম্বার ধরে এগিয়ে পেল ৩৭ নাম্বার বাড়ি। কিন্তু রাস্তা ধরে চারপাশ খুঁছে ৩৯ নম্বর বাড়ি পেল না, ৩৮ নম্বরও নয়। অনেক হয়রান হওয়ার পর ৩৭ নম্বর বাড়িতে নক করল আহমদ মুসা।

একটা কিশোরী এসে দরজা খুলে দিল। আহমদ মুসা সাদর সম্ভাষণ শেষে জিজ্ঞাসা করল ৩৯ নম্বর বাড়ি কোনটা।

কিশোরী হাসল। বলল, 'কেন খুঁজে পাচ্ছেন না? এই তো কাছেই।' বলে সে বর্ণনা দিতে যাচ্ছিল।

এই সময় ডুপ্লেক্স বাড়িটার দুতালা থেকে দুজন যুবক সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। তাদের দৃষ্টি আহমদ মুসার দিকে। চোখে তাদের তীক্ষ্ণ অনুসন্ধান। তাদের একজন বলল, 'জামি, কে উনি, কি চান?'

কিশোরীটি থেমে গেল। বলল, 'ইনি ৩৯ নম্বর বাড়ি খুঁজছেন। আমি বাড়িটা চিনিয়ে দিচ্ছিলাম।'

'চিনিয়ে দিয়েছ?' তাদের একজন পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলল।

'না। বলছিলাম।' বলেই কিশোরীটা আবার শুরু করল উৎসাহের সাথে।'

'থাম।' কিশোরীকে কড়া ধমক দিয়ে দুজনের দ্বিতীয় জন বলল, 'পাকামো আর করতে হবে না। যাও, তোমার আন্টিকে আনতে যাও। দেরি করে ফেলেছ। বস জানলে রক্ষা থাকবে না।'

কিশোরীটি মুখ কালো করে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে বাইরে।

দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই সেই লোকটি আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, '৩৯ নম্বরে কার কাছে যাবে?

'বিশেষ কারো কাছে নয়। যাকেই পাই চলবে। একটা খোঁজ জানতে এসেছি।' বলল আহমদ মুসা।

'কি খোঁজ নিতে? কার খোঁজ নিতে?' বলল দুজনের প্রথম জন।

প্রথম থেকেই ওদের মতলব আহমদ মুসা বুঝতে পেরেছে। ওরা ৩৯ নম্বর বাড়ির ঠিকানা কিশোরীকে বলতে দেয়নি। তাদের প্রশ্নের অর্থও হলো তারা আহমদ মুসাকে সন্দেহ করেছে। বাজিয়ে দেখতে চাচ্ছে তারা আহমদ মুসাকে।

এর আরও অর্থ হলো, তারা ৩৯ নম্বরের সবকিছু জানে। হতে পারে এই ৩৭ নম্বর ৩৯ নম্বরেরই অংশ। কিশোরীর সাথে ওদের কথা বলার সময় ‘বস’ শব্দের উচ্চারণ এই সন্দেহের সাথে মিলে যায়।

ওদের প্রশ্নে বিরক্ত হয়ে আহমদ মুসা বলল, ‘আমি ৩৯ নম্বর বাড়ির খোঁজ জানতে চেয়েছি। আপনারা উকিলের মত এসব কি জেরা শুরু করেছেন? জানলে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।

‘তুমি আমেরিকান নও। কোথায় বাড়ি তোমার?’ বলল ওদের দুজনের একজন।

আহমদ মুসা মনে মনে হাসল। ওদের আরেকটু এগুতে দেয়া দরকার, ভেবে নিল আহমদ মুসা।

‘ঠিক আছে, আমি একটা বাড়ির সন্ধানে এসেছিলাম, তোমাদের অহেতুক জেরার জবাব দেয়ার জন্যে নয়। আসি। বাই।’ বলে আহমদ মুসা বেরিয়ে আসার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়াবার সাথে সাথে একজন লাফ দিয়ে এসে পেছন থেকে আহমদ মুসার জ্যাকেটের কলার চেপে ধরল।

চিৎকার করে বলল, ‘কোথায় পালাচ্ছ! পরিচয় সন্তোষজনক হলে তবেই মুক্তি।’

আহমদ মুসা ঘুরল। ঘোরার সাথে সাথেই বাঁ হাতের এক প্রচন্ড কারাত চালাল লোকটির ঘাড়ে ঠিক কানের নিচে।

আহমদ মুসা যখন সম্পূর্ণ ঘুরে দাঁড়াল তখন লোকটি টলতে টলতে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল।

দ্বিতীয় লোকটি প্রথমটায় বিমুঢ় হয়ে পড়লেও মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়েছে। তারপর মুহূর্ত দেরি না করে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল আহমদ মুসার উপর।

চোখের পলকে আহমদ মুসা এক পাশে সরে দাঁড়াল। লোকটি আছড়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মেঝের উপর।

আঘাত সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিল লোকটি।

আহমদ মুসা তার দিকে রিভলবার তাক করে বলল, 'আর উঠে লাভ নেই। তখন অনুরোধে বলনি, এবার অস্ত্রের মুখে বল ৩৯ নম্বর বাড়ি কোনটা। আর তোমরা কে?'

'রিভলবার দেখিয়ো না। এখানে সবচেয়ে ছোট অস্ত্র যেটা সেটাই হলো সাব-মেশিন গান।' বলল লোকটি নির্ভিকভাবে।

আহমদ মুসা তার কথার উত্তরে ট্রিগার টিপল। রিভলবারের একটা গুলী লোকটির কানের এক পাশ ছিঁড়ে নিয়ে গেল।

লোকটি আর্তনাদ করে তার কান চেপে ধরল।

'দেখ আমার প্রশ্নের জবাব যদি এই মুহূর্তে না দাও, তাহলে দ্বিতীয় গুলী তোমার মাথা গুড়ো করে দেবে।' বলল আহমদ মুসা ঠান্ডা গলায়। যা চিৎকারের চেয়েও ভীতিকর শোনাল।

লোকটি মাথা ঘুরিয়ে ভীত চোখে আহমদ মুসার দিকে তাকাল। আহমদ মুসার কথা এবার সে পুরোপুরিই বিশ্বাস করছে। মুখ খুলল সে। বলল, 'স্যার এ বাড়ি থেকে দুশ গজ দক্ষিণে তিনতলা বাড়ি। ওটা ৩৯ নম্বর।

'বারবারা ব্রাউনকে তোমরা কোথায় বন্দী করে রেখেছ?' আবার সেই শান্ত, কিন্তু কঠোর কণ্ঠ আহমদ মুসার।

লোকটি দ্বিধা করছিল।

আহমদ মুসা তার তার দিকে রিভলবার তুলতেই বলল,'স্যার ঐ বাড়িতেই তাকে রাখা হয়েছে।'

'ঐ বাড়িতে এখন আর কে আছে?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

লোকটি উত্তর না দিয়ে ভয়ে ভয়ে তাকাল আহমদ মুসার দিকে।

'দেখ, তোমাকে আমি মারব না। কিন্তু যদি মিথ্যা বল, তাহলে ওখান থেকে ফিরে এসে মিথ্যা বলার শাস্তি তোমাকে দেব।' বলল আহমদ মুসা।

'স্যার ওখানে আমাদের বস আছেন। তাঁর সাথে রক্সি। আর গেটম্যানসহ তিনজন প্রহরী।' বলল লোকটি।

'বস কে? রক্সি লোকটা কে?' আহমদ মুসা বলল।

‘স্যার বস আমাদের অ্যালেক স্টিভেন্স। তিনি আমাদের ফিলাডেলাফিয়ার চীফ। আর রক্সি আমাদের অপারেশন টিম লিডার।’ বলল লোকটি।

‘এবার বল হাইম হাইকেলকে তোমরা কোথায় রেখেছ?’ বলেই আহমদ মুসা তার রিভলবার লোকটার মাথা তাক করল।

ভয়ে লোকটার মুখ পাংশু হয়ে গেল। বলল, ‘স্যার এটুকু জানি, কয়েকদিন আগে প্রাইভেট এক মানসিক হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে। এছাড়া আমরা আর কিছু জানি না স্যার। শুনেছি, টপ কয়েকজন বস ছাড়া আর কেউ জানে না সেই হাসপাতালের নাম ঠিকানা।’ লোকটি কাঁপতে কাঁপতে কাতর কণ্ঠে বলল।

আহমদ মুসা তার কথা বিশ্বাস করল। বলল, ‘তুমি উঠ, তোমার সংজ্ঞাহীন সাথীকে নিয়ে চল সিঁড়ির পাশে ছোট ঘরটায়।’

লোকটি সঙ্গে সঙ্গেই নির্দেশ পালন করল। আহমদ মুসা দেখল ঘরটিতে কোন টেলিফোন নেই। দেখল তাদের সাথেও কোন মোবাইল নেই।

আহমদ মুসা পিছমোড়া করে ওদের হাত-পা বাঁধল এবং নাকে ওদের ক্লোরোফরম স্প্রে করে ওদের সংজ্ঞাহীন করল। তারপর ঘরটির দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি লাগিয়ে এবং বাড়িটার মূল গেটও লক করে দিয়ে বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে।

ঠিক দুশ গজ দূরেই তিনতলা বাড়ি পেয়ে গেল আহমদ মুসা। বাড়িটিতে কোন নম্বর নেই।

বাড়িটার গেটে একজন প্রহরী গেট বক্সে বসে ছিল। আহমদ মুসাকে গেটের দিকে আসতে দেখে সে গেট বক্স থেকে বেরিয়ে এগিয়ে এল গেটে। আসার সময় সে তার সাব মেশিনগান হাতে করে নিয়ে এসেছে।

আহমদ মুসা কিছু বলার আগেই সে বলে উঠল, ‘কি চাই, কাকে চাই আপনার?’

‘অ্যালেক স্টিভেন্স আমার বন্ধু। তিনি আমাকে ডেকেছেন।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ওয়েলকাম স্যার। কিন্তু স্যার আপনাকে একটু বসতে হবে। আমি স্যারকে বলি।’ বলে সে আহমদ মুসাকে নিয়ে এল গেট বক্সের পাশের ওয়েটিং রুমে।

ওয়েটিং রুমে ঢুকে সে আহমদ মুসাকে বসাবার জন্যে একটা সোফা মুছে দিচ্ছিল।

আহমদ মুসা পকেট থেকে ক্লোরাফরম স্প্রে বের করে বলল, ‘স্যরি গেটম্যান, তোমাকে ঘন্টা দুই ঘুমিয়ে থাকতে হবে।’

আহমদ মুসার কথা শুনে চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল গেটম্যান।

কিন্তু সে কথার বলারও সুযোগ পেল না। আহমদ মুসা তার নাকে স্প্রে করল সে উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই।

সংজ্ঞা হারিয়ে ঢলে পড়ল গেটম্যান।

আহমদ মুসা তাকে তুলে সোফায় শুইয়ে দিল এবং দরজা লক করে বেরিয়ে এল।

বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করল আহমদ মুসা। শুরুতেই বিশাল ড্রইংরুম। ড্রইংরুম থেকে উপর তলায় সিঁড়ি উঠে গেছে।

নিঃশব্দ বাড়ি।

কোন দিক থেকেই মানুষের কোন সাড়া শব্দ নেই।

তিন তলাই কি শেষ। না নিচে আন্ডার গ্রাউন্ডে আরও ফ্লোর আছে? আহমদ মুসা ভাবনায় পড়ে গেল। কোত্থকে কাজ শুরু করবে? উপরে গেলে নিচটা অরক্ষিত থাকে, আবার নিচে গেলে ওরা ওপর থেকে চলে যেতে পারে।

হঠাৎ আহমদ মুসার মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠল। সে পিঠে ঝুলানো ব্যাগ থেকে সাউন্ড মনিটরের পার্টসগুলো বের করে সংযোজন করে নিল। যন্ত্রটি সাউন্ডের আল্ট্রা মনিটর। সিকি মাইল দূরত্ব পর্যন্ত এলাকার যে কোন শব্দ, যা দুগজ দূর থেকে মানুষ শুনতে পায়, এই যন্ত্র পরিষ্কারভাবে মনিটর করতে পারে। প্রয়োজন অনুসারে মনিটরিং এলাকা কমিয়ে আনা যায় এবং শব্দ মনিটরের ক্ষেত্রেও সিলেকটিভ হওয়া যায়।

আহমদ মুসা ৫০ ফিট রেঞ্জ দিয়ে মনিটরটি অন করতেই নারী কণ্ঠ ও পুরুষ কণ্ঠের বাদানুবাদ ভেসে আসতে লাগল এবং সে শব্দগুলো আন্ডার গ্রাউন্ড ফ্লোরের।

নারী কণ্ঠটি বারবারা ব্রাউনের তা শুনেই বুঝতে পারল।

আনন্দে মুখ উজ্জল হয়ে উঠল আহমদ মুসার।

মনিটরে শব্দের দিক নির্দেশক কাঁটা সিঁড়ির গোড়ার দিকে।

আহমদ মুসা এগুলো সিঁড়ির দিকে। ঠিক সিঁড়ির নিচে ৬ ফুটের মত একটা ল্যান্ডিং। ল্যান্ডিং থেকে একটা সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে। সিঁড়ি মুখটা উন্মুখক্ত কেন ভেবে পেল না আহমদ মুসা। হতে পারে অ্যালেক স্টিভেন্সের অতি আত্নবিশ্বাসই এর কারণ। খুশি হলো আহমদ মুসা বাড়তি এই সুবিধা পেয়ে।

দুহাতে রিভলবার নিয়ে অতি সন্তর্পনে সিঁড়ি দিয়ে নামা শুরু করল আহমদ মুসা।

সিঁড়ির মাঝামাঝি পৌঁছতেই আন্ডার গ্রাউন্ড ফ্লোরটির একটা দৃশ্য তার নজরে এল। সে দেখতে পেল দক্ষিণ প্রান্তের একটা ঘরের সামনে সাব-মেশিনগান নিয়ে দুজন প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে। ঘরটি দক্ষিণমুখী করিডোরটার মাথায়।

আহমদ মুসা যে সিড়িঁ দিয়ে নামছে, সেটার গোড়ায় লাউঞ্জ মত একটা বিরাট গোলাকার জায়গা। তার চারদিকে ঘিরে ঘর। লাউঞ্জ থেকে বিভিন্ন দিকে করিডোর চলে গেছে। সেরকম একটা পাশের এক ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সাব-মেশিনগানধারী প্রহরী দুজন।

আহমদ মুসা প্রহরীদের সর্ম্পকে কিছু ভেবে উঠার আগেই সে ওদের দুজনেরই নজরে পড়ে গেল। আর তখনই অসাধারণ ক্ষীপ্রতার সাথে তাদের সাব-মেশিনগানের ব্যারেল ঘুরে আসছিল তার দিকে।

আহমদ মুসা ওদের দেখার সাথে সাথে তার দুহাতের রিভলবারের নলও তাদের দিকে ঘুরে গিয়েছিল। সিদ্ধান্ত আহমদ মুসা এবার নিয়ে নিল। তার দুহাতের রিভলবার ওদের দুজনকে লক্ষ্য করে গর্জন করে উঠল।

গুলী খেয়ে ওরা দুজনই দরজার উপর পড়ে গেল।

গুলী করেই আহমদ মুসা কয়েক লাফে সিঁড়ির অবশিষ্টটা অতিক্রম করে মেঝেয় নেমে এল। সেই একই দৌড়ে সে ছুটল ঘরটির দিকে।

৩৭ নম্বর বাসার ওদের তথ্য অনুসারে এখন অ্যালেক্স ও রক্সিই মাত্র অবশিষ্ট আছে। আহমদ মুসা ওদের দুজনকে এক সাথেই পেতে চায়। দুজন ভিন্ন অবস্থানে যাবার সুযোগ পেলে সে অসুবিধায় পড়তে পারে।

আহমদ মুসা দরজার দিকে দৌড়ে যেতে যেতে ভাবল, তার মুখোমুখি হলে, বিপদে পড়লে ওরা মিস ব্রাউনকে ঢাল বানাতে পারে। সেই সুযোগ ওদের দেয়া যাবে না। আকস্মিকভাবে ওদের উপর চড়াও হতে হবে। ওরা অস্ত্র বাগিয়ে আছে নিশ্চয় এবং তারা দাঁড়িয়ে থাকাই স্বাভাবিক। সুতারাং দেখার সঙ্গে সঙ্গে ওরা গুলী করতে পারে। দেখতে হবে ওদের এই তাৎক্ষণিক গুলী যাতে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়। তাৎক্ষণিক গুলী না করে ওরা যদি টার্গেট ঠিক করতে যায়, তাহলে আহমদ মুসার দুই রিভলবারের গুলী তাদের সে সুযোগ দেবে না।

এইভাবে চিন্তা গুছিয়ে নিয়ে আহমদ মুসা শিকারী বাঘের মত নিঃশব্দে দৌড়ে গিয়ে দরজার পাশে একটু থমকে দাঁড়িয়ে দুহাতের রিভলবারকে দরজার দিকে উদ্যত রেখে দেহকে ছুঁড়ে দিল দরজায় পড়ে থাকা দুটি লাশের পেছনে। তার দেহের বাম পাঁজর গিয়ে মাটিতে পড়ল।

তার দেহ মাটি স্পর্শ করার আগেই এক ঝাঁক গুলী চলে গেল তার তিন ফিট উপর দিয়ে।

মাটি স্পর্শ করার সাথে সাথেই আহমদ মুসার দুই তর্জনী ট্রিগার টিপল দুই রিভরবারের।

পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল অ্যালেক স্টিভেন্স ও রক্সি। তাদের পেছনে বলতে গেলে মাটি কামড়ে শুয়েছিল বারবারা ব্রাউন।

আহমদ মুসা নিক্ষিপ্ত দুগুলীর একটি গিয়ে বিদ্ধ হয়েছিল অ্যালেক স্টিভেন্সের বুকে, অন্যটি মাথা গুড়িয়ে দিয়েছিল রক্সির।

নতুন টার্গেট লক্ষ্যে ওরা সাব-মেশিনগানের ব্যারেল নামিয়ে নিচ্ছিল। কিন্তু টার্গেটে গুলী করার সুযোগ তারা আর পেল না।

দুজনের লাশ গিয়ে বারবারা ব্রাউনের পাশেই পড়েছে।

আতংকিত বারবারা ব্রাউন উঠে দাঁড়িয়ে লাশের কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। কাঁপছে সে।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

বারবারা ব্রাউনের উপর চোখ পড়তেই চোখ নামিয়ে নিল সে। তাড়াতাড়ি সে নিজের জ্যাকেটটি খুলে না তাকিয়েই ছুড়ে দিল বারবারা ব্রাউনের দিকে। বলল, 'আপনি তো ঠিক আছেন মিস ব্রাউন?'

বারবারা ব্রাউন দুহাত দিয়ে তার দেহের প্রায় নগ্ন উর্ধদেশ ঢাকার ব্যার্থ চেষ্টা করছিল। সে আহমদ মুসার ছুঁড়ে দেয়া জ্যাকেটটি কুড়িয়ে নিল। পরে ফেলল দ্রুত। তারপর বলল, 'ভাল ছিলাম বলতে পারব না। তবে আপনি পৌঁছতে আর কয়েক মিনিট দেরি করলে আমার এক মৃত্যু ঘটত। আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন।' বলে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল বারবারা ব্রাউন। কাঁদতে কাঁদতেই সে বাধো বাধো গলায় বলল,'আপনি মানুষ নন, ফেরেশতা মি. দানিয়েল। আপনি ঠিক সময় এসেছেন।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও বোন। তিনি আমাদের সাহায্য করেছেন।' বলল আহমদ মুসা। দ্রুত ঘরে ঢুকে অ্যালেক স্টিভেন্স ও রক্সিকে সার্চ করল। মানিব্যাগ ছাড়া পকেটে আর কিছুই পেল না। মানিব্যাগে টাকা পয়সা ছাড়া আর কোন কাগজপ্রত্র নেই।

টাকা ভর্তি মানিব্যাগগুলো ওদের পকেটে আবার রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'এস মিস ব্রাউন, বাড়িটাকেও একবার সার্চ করে দেখি।

আহমদ মুসা ঘর থেকে বাইরে বেরুবার জন্যে পা বাড়াল।

পেছনে পেছনে হাঁটতে লাগল বারবারা ব্রাউন।

# ৫

নিউইয়র্ক রাব্বানিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট আয়াজ ইয়াহুদের বাসভবন। ভেতরের ফ্যামিলি ড্রইং রুমে বসে গল্প করছে আয়াজ ইয়াহুদ, মিসেস আয়াজ ইয়াহুদ, নুমা ইয়াহুদ ও বারবারা ব্রাউন।

বারবারা ব্রাউন কথা বলছিল। সে থামতেই হেসে মুখ খুলল নুমা ইয়াহুদ। কিন্তু তার আগেই আয়াজ ইয়াহুদ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'আটটা বাজছে। বুঝতে পারছি না মি. দানিয়েল এখনও পৌঁছল না কেন। এ বেঠকের সেই আয়োজক। সে দেরি করার ছেলে নয়।'

'স্যরি আব্বা তোমাকে জানানো হয়নি। বিকেল ৫টায় তিনি টেলিফোন করেছিলেন। কি এক কাজে তিনি আটকে পড়েছেন। তাঁর কিছু দেরি হবে আসতে। তিনি সকলের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন।' বলল নুমা ইয়াহুদ।

'কিন্তু তার বন্ধু দুজন শুনলাম সন্ধ্যায় আসবে।' আয়াজ ইয়াহুদ বলল আবার।

'হ্যাঁ ওদের সাথে আমার দেখা হয়েছে আব্বা। আমি ওদেরকে শহরের কয়েক জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলাম। ওদের সিডিউলে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। কিছুটা দেরি হচ্ছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বেন।' বলল নুমা ইয়াহুদ।

আয়াজ ইয়াহুদ সোফায় হেলান দিয়ে একটু রিল্যাক্স করে বসল। একটু চোখ বুঝল। তারপর ধীরে ধীরে অনেকটা স্বগত কন্ঠে বলল, দানিয়েল ছেলেটাকে যতই দেখছি বিস্ময় বাড়ছে। হাইম বেঞ্জামিনের কাছ থেকে বারবারা ব্রাউনের উদ্ধার কাহিণীসহ ওখানকার কাহিনীও শুনলাম। আমি ভেবে পাচ্ছি না, হাইম হাইকেলের সাহায্যে এমন একটা বিস্ময়কর চরিত্রের আর্বিভাব কি করে ঘটল। কেন ঘটল? গত কয়েক দিনে এই এক মানুষ বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছে। হাইম হাইকেলের গোটা ব্যাপার অন্ধকার থেকে আলোতে এসে গেছে।'

‘ঠিক বলেছেন আংকেল, কঠিন পরিস্থিতিতেও তিনি বিস্ময়কর ধরনের নির্ভীক ও নিশ্চিন্ত। পেশাদার শীর্ষ গোয়েন্দাও আমি অনেক দেখেছি, কিন্তু এমন মানুষ আমি দেখিনি। আপনাকে তো সব বলেছি। বারবারা ব্রাউনকে উদ্ধারের সাংঘাতিক কাজ তার ছেলে-খেলার মতই সহজ ছিল।’ হাইম বেঞ্জামিন বলল।

‘ছেলে-খেলা বলছ বেঞ্জামিন! উনি সেখানে জীবন নিয়ে খেলেছেন। সাব মেশিনগানসহ দুপ্রহরীকে হত্যা করার পর উনি দুহাতে রিভলবার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন দরজায়। তাঁর উপর দিয়ে দুই সাব মেশিনগানের এক ঝাঁক গুলী ছুটে গিয়েছিল। উনি তখন মাটিতে। মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়েই তিনি তার দুরিভলবারের গুলীতে হত্যা করেছিলেন অ্যালেক স্টিভেন্স ও রক্ষীকে। তিনি গুলী করতে দেরি করলে কিংবা তাঁর গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে তাঁর দেহ ঝাঁঝরা হয়ে যেত ওদের গুলীতে। অন্যদিকে ঠিকমত ঝাঁপিয়ে পড়তে না পারলেও তিনি ঝাঁঝরা হয়ে যেতেন। একটি মেয়ে যে তার কেউ নয় তাকে উদ্ধারের জন্যে এইভাবে তিনি মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তিনি মানুষ নন, ফেরেশতা!’ বলল বারবারা ব্রাউন। তার কণ্ঠ ভারী হয়ে উঠেছিল।

‘তুমি ঠিক বলেছ বারবারা ব্রাউন। আমি ছেলে-খেলা বলছি এই অর্থে যে, জীবন-মৃত্যুর এই লড়াই তার কাছে খেলার মত যেন।’ হাইম বেঞ্জামিন বলল।

সোজা হয়ে বসেছিল আয়াজ ইয়াহুদ। বলল,‘মা নুমা, দানিয়েল সম্পর্কে কি এক শ্বাসরুদ্ধকর খবর আছে তোমার কাছে বলেছিলে! সেটা তো বলনি!’

নুমা ইয়াহুদের দুই ঠোঁট ভরা হাসি। চোখ দুটি তার অস্বাভাবিক উজ্জল। বলল, ‘হ্যাঁ বাবা, খবরটা শ্বাসরুদ্ধকর। কিন্তু কিভাবে বলব, কোথা থেকে বলব তাই বলা হয়নি।’

‘তার কোন খারাপ দিক নয়তো নুমা? হলে না বলাই ভাল।’ বলল বারবারা ব্রাউন শান্ত কন্ঠে।

‘না সেরকম তো নয়ই।’ বলে একটু থামল নুমা ইয়াহুদ। তারপর বলল। ‘বলব কিন্তু মি. দানিয়েলকে কেউ কিছু জানাতে পারবে না।’ নুমা ইয়াহুদ বলল।

‘ঠিক আছে। অব্যশই আমরা বলব না।’ প্রায় সমস্বরেই বলে উঠল সকলে।

নুমা ইয়াহুদ একটু ভেবে নিল। তারপর বলতে শুরু করল, ‘বিখ্যাত জেফারসন পরিবারের সারা জেফারসন আমার বন্ধু। আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মিলিত যে স্টুডেন্ট ডেলিগেশন বছর দেড়েক আগে ইউরোপ সফর করেছিল, আমি ও সারা তার সদস্য ছিলাম। সেই থেকে আমাদের সবসময় যোগাযোগ আছে। সে আমার বাসায় এসেছে, আমিও তার বাসায় গেছি। গতকাল সে আমাকে টেলিফোন করে। বলে যে, সে আসছে উইক এন্ডে, সে নিউইয়র্ক আসবে এবং আমার এখানে উঠবে। আমি তাকে ওয়েলকাম করে আংকেল হাইম হাইকেলকে কেন্দ্র করে যা ঘটেছে, আইজ্যাক দানিয়েল নামের লোক যা করেছে, তা বিস্তারিত তাকে বলি। সে আগ্রহের সাথে সব শোনে। আর সে আইজ্যাক দানিয়েল সম্পর্কে খুঁটে খুঁটে অনেক প্রশ্ন করে। তারপর বলে, তুমি যে কাজের বর্ণনা দিলে এবং যে স্বভাব ও চেহারার বর্ণনা দিলে, তাতে আমি নিশ্চিত বলছি, উনি আইজ্যাক দানিয়েল নন।’ আমি জিজ্ঞাসা করি, ‘তাহলে উনি কে? তুমি কি আইজ্যাক দানিয়েলকে চেন।’ সারা বলে যে আইজ্যাক দানিয়েল নামের কোন লোককে সে চেনে না। আমি বলি, তাহলে কেমন করে বলছ, আইজ্যাক দানিয়েল নন তিনি? উত্তরে সারা বলে, তোমার সব বর্ণনা, বিবরণ আর একজনের সাথে সম্পূর্ণ মিলে যায়।’ আমি জিজ্ঞাসা করি যে, ‘সে কে?’ সারা বলে যে, যে কারণে তিনি ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন, সে কারণে তার নাম প্রকাশ ঠিক হবে না।’ আমি বলি যে, আমরা এবং হাইম পরিবার তার সাথে আছি এবং তাকে সাহায্য করছি। আমাদের কাছে তার পরিচয় বলা যাবে না কেন? তথ্যটা আমাদের ও হাইম পরিবারের বাইরে যাবে না এই শর্তে তিনি আইজ্যাক দানিয়েলের নাম ও পরিচয় বললেন। শেষে সারা কয়েকটা আইডেনটিফিকেশন মার্কের কথা বললেন। বললেন যে, তাঁর ঠোঁটের দুপ্রান্তে দুটি নীলাভ তিল আছে এবং ডান হাতের কনুই-এর নিচে প্রায় গোলাকার লালচে একটা ক্ষতচিহ্ন আছে। গতকাল মি. দানিয়েল আমাদের বাসায় আসেন, তখন তার হাত-মুখ ধোবার সময় আমি চেষ্টা করে তার ঠোঁটের তিল এবং কনুই-এর নিচের ক্ষতিচিহ্নটা দেখেছি। সুতারাং সারা আন্দাজে যা বলেছিলেন তা একশতভাগ সত্য প্রমাণিত হয়েছে। আর...........।’

‘মা নুমা, তুমি কি আমাদের ধৈর্য্যের টেস্ট নিচ্ছ? আমরা আর অপেক্ষা করতে পারছি না। তুমি তার নাম পরিচয় বল। তারপর অন্য কথা।’ নুমা ইয়াহুদকে থামিয়ে বলে উঠল তার পিতা আয়াজ ইয়াহুদ।

হাসল নুমা ইয়াহুদ। বলল, ‘পরিচয় বলতে হবে না আব্বা। নামেই তার পরিচয়।’

‘আবার কথা নুমা.........।’ অধৈর্য্য কণ্ঠে বলল আয়াজ ইয়াহুদ।

গম্ভীর হলো নুমা। বলল, ‘আব্বা, আমাদের আইজ্যাক দানিয়েল হলেন মুসলমানদের সৌভাগ্যের বরপুত্র এবং মেজরিটি মার্কিনীদের কাছে যিনি নতুন সেভিয়ার............।’

‘তার মানে ‘আহমদ মুসা’ তিনি!’ নুমা ইয়াহুদের কথার মাঝখানে তাকে থামিয়ে চিৎকার করে বলে উঠল বারবারা ব্রাউন।

‘হ্যাঁ বারবারা। আহমদ মুসাই তোমাকে উদ্ধার করেছে।’ বলল নুমা ইয়াহুদ।

সোফায় সোজা হয়ে বসে আছেন আয়াজ ইয়াহুদ। উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে গেছে হাইম বেঞ্জামিন ও বারবারা ব্রাউন। তাদের চোখে-মুখে রাজ্যের বিস্ময়।

তারা কেউই কথা বলল না। কথা বলতে পারল না।

ধীরে ধীরে সোফায় হেলান দিল আয়াজ ইয়াহুদ এবং এক সময় আস্তে আস্তে সোফায় বসে পড়ল হাইম বেঞ্জামিন ও বারবারা ব্রাউন।

তখনও কেউ কথা বলেনি।

কোন ভাবনার গভীরে তারা যেন হারিয়ে গেছে।

এক সময় ক্লান্ত সুরে স্বগত কণ্ঠে আয়াজ ইয়াহুদ বলল, ‘আমরা যাকে ইহুদীদের শত্রু ভাবছি, সেই আহমদ মুসা এসেছেন গোঁড়া ইহুদী হাইম হাইকেলকে উদ্ধার করতে তাদের হাত থেকে যারা ইহুদীদের পক্ষের শক্তি! সেই আহমদ মুসাই ইহুদীদের এক নিবেদিত কর্মী বারবারা ব্রাউনকে উদ্ধার করলেন ধর্ষিত ও নিহত হওয়ার চরম পরিণিতি থেকে সেই তাদেরই হাত থেকে যারা ইহুদীদের শক্তি! এবং আমরা নিষ্ঠাবান ইহুদীরা সাহায্য করছি আহমদ মুসাকেই!’

থামল আয়াজ ইয়াহুদের স্বগত কণ্ঠ।

পিতা থামতেই নুমা ইয়াহুদ বলল, ‘আব্বা, ধর্মভীরু ও নিষ্ঠাবান ইহুদীরা এর আগেও আহমদ মুসাকে সাহায্য করেছে। ডা. বেগিন বারাকের মত সৎ, সজ্জন ও বিখ্যাত ইহুদী ব্যক্তিত্ব সাহায্য করেছেন আহমদ মুসাকে ইহুদী পক্ষের জেনারেল শ্যারনদের বিরুদ্ধে। আবার ইয়াহুদীদের শীর্ষ গোয়েন্দা কর্মী নোয়ান নাবিলা সম্পূর্ণভাবে নিজ পক্ষের বিরুদ্ধে গিয়ে নিউ হারমান হত্যাকান্ডের মুখোশ উন্মোচন করে শুধু আহমদ মুসা ও আমেরিকান মুসলমানদেরই বাঁচিয়ে দেয়নি, জেলে পুরেছেন নিজ পক্ষের জেনারেল শ্যারনদেরকে এবং কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন আমেরিকান ইহুদীবাদীদের। আব্বা আমি মনে করি, আহমদ মুসা শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রী ও শান্তিবাদীদেরই সেভিয়ার নন, তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধর্মপ্রাণ ইহুদীদেরও রক্ষা করেছেন ইহুদীবাদীদের হাত থেকে। জেনারেল শ্যারন ও আজর ওয়াইজম্যানদের রাজনৈতিক ইহুদীবাদ এবং আমাদের তাওরাতভিত্তিক ইহুদী ধর্ম এক নয় আব্বা। বলতে পারি, মেজরিটি ইহুদীর সমর্থনও তাদের পেছনে নেই।’

থামল নুমা ইয়াহুদ।

সঙ্গে সঙ্গেই কথা বলে উঠল বারবারা ব্রাউন, ‘ঠিক বলেছ নুমা, লস আলামসের ইহুদীবাদী গোয়েন্দাবৃত্তি ধরা পড়া এবং নিউ হারমানের হত্যাকান্ডের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদী কম্যুনিটির প্রায় ৯০ ভাগ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংগঠন জেনারেল শ্যারনের ইহুদীবাদী সংগঠনের সাথে তাদের নিসম্পর্কতার ঘোষণা দেয় এবং ইহুদীবাদীদের নিন্দা করে। তখন দেশব্যাপী বহু চেষ্টা করেও সেসব সংগঠনকে আমরা নিরপেক্ষ ও নিরব রাখতেও সমর্থ হইনি।’

‘হাইম হাইকেলকে আটকে রাখাও তো ওদের একটা ক্রাইম।’ বলল আয়াজ ইয়াহুদ।

‘অবশ্যই আব্বা। ওদের যদি ক্রিমিনাল না বলি, তাহলে ক্রিমিনাল বলতে হবে হাইম হাইকেল আংকেলকেই। কিন্তু তা সম্ভব নয়। তাঁর মত নির্লোভ ও স্বার্থত্যাগী দেশ ও জাতির সাথে কোন ক্রাইম করতে পারেন না। জীবন থাকতে জাতির জন্যে ক্ষতিকর কিছু করতে পারেন না।’ নুমা ইয়াহুদ বলল।

‘তাহলে হাইম হাইকেলকে উদ্ধারের জন্যে আমরা যে আহমদ মুসাকে সাহায্য করছি এবং সাহায্য নিচ্ছি, এটা ঠিক আছে?’ বলল আয়াজ ইয়াহুদ।

‘অবশ্যই আব্বা। আমাদের মনে করা উচিত যে, ঈশ্বরই তাকে পাঠিয়েছেন আমাদের সাহায্যে। দেশের কারো কাছ থেকে আমরা সাহায্য পাব না বলেই ঈশ্বর এই ব্যবস্থা করেছেন।’ নুমা ইয়াহুদ বলল।

‘তোমার এ কথার মধ্যে দিয়ে কিন্তু দেশের মানুষের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ পাচ্ছে নুমা।’ বলল আয়াজ ইয়াহুদ।

‘না আব্বা, এর দ্বারা আমি দেশের মানুষের ইনাবিলিটি বা অসহায় অবস্থার দিকে অংগুলি সংকেত করছি। এই ইনাবিলিটি বা অসহায়ত্বের কারণেই যুগ যুগ ধরে চলা ইহুদীবাদী ষড়যন্ত্র ধরতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। অথচ কত তাড়াতাড়ি আহমদ মুসা তার মূলোচ্ছেদ করলেন।’ নুমা ইয়াহুদ বলল।

হাসল আয়াজ ইয়াহুদ। বলল, একটু দ্বিধায় পড়েছিলাম। তোমার কথায় সাহস পেলাম মা। সত্যিই আমরা কোন অন্যায় করছি না এবং যা করা উচিত তাই করছি। তোমকে ধন্যবাদ নুমা।’

‘আংকেল, শ্রদ্ধেয় হাইম হাইকেল ও তাঁর পরিবার এবং আমাদের সাথে ওরা যে আচরণ করেছে, সেটাই প্রমাণ করছে ওরা কোন ষড়যন্ত্রের মধ্যে যুক্ত আছে। ষড়যন্ত্রের সে লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য তারা কোন নীতি-নৈতিকতার ধার ধারছে না। ধর্ম, মানবতা সবকিছু বিসর্জন দিয়ে তারা তাদের লক্ষ্যের বাস্তবায়ন চায়। সুতরাং তারা ধর্ম ও জাতির কল্যাণে কিছু করছে না।’ বলল বারবারা ব্রাউন।

‘ঠিক মা। হাইম হাইকেলকে তারা কিডন্যাপ করার পর আমাদের সাথে তাদের আচরণও তুমি যা বলেছ তাই প্রমাণ করে। রীতিমত সন্ত্রাসী আচরণ করেছে ওরা আমাদের সাথে।’ আয়াজ ইয়াহুদ বলল।

‘নুমা, আহমদ মুসা সম্পর্কে মিস সারা জেফারসনের মনোভাব কেমন বুঝলে?’ জিজ্ঞাসা বারবারা ব্রাউনের।

হাসল নুমা ইয়াহুদ। বলল এক বাক্যে জবাবটা হলো, পূজ্যের প্রতি পূজারীর মনোভাব যেমন।’

‘উদাহারণটা বড় বেশি আকাশ-চারী হয়ে গেল না কি?’ বলল বারবারা ব্রাউন।

আবার হাসলো নুমা ইয়াহুদ। বলল,‘তুমি যদি শুনতে ‘আহমদ মুসা’ নামটি সারা জেফারসন কেমন সংকোচ, সম্মান, সংবেদনশীল কণ্ঠে উচ্চারণ করেছে, তাহলে আকাশ-চারী হওয়ার কথা তুমি বলতে না। তাছাড়া বিশ্বাসের ব্যাপারে প্রশ্ন করলে সারা জেফারসন বলেছে, নিজের উপর আমার যতটা বিশ্বাস আছে, তার চেয়ে বেশি বিশ্বাস আছে আমার ওর উপর। জেফারসন পরিবারের গৌরবদীপ্ত একটি মেয়ে এবং আমেরিকার শ্রেষ্ট ছাত্র প্রতিভা সারা জেফারসন কোন অবস্থায় এ ধরনের এ উক্তি করতে পারে বলত?’

নুমা ইয়াহুদ থামতেই কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল বারবারা ব্রাউন। এ সময় সিকিউরিটির দুজন লোক কামাল সুলাইমান ও বুমেদীন বিল্লাহকে নিয়ে প্রবেশ করল।

উঠে দাঁড়াল নুমা ইয়াহুদ। ওদের স্বাগত জানাল এবং তার পিতাকে লক্ষ্য করে বলল, ‘আব্বা এঁরাই আইজ্যাক দানিয়েলের বন্ধু।’

সবাই উঠে দাঁড়াল।

নুমা ইয়াহুদ কামাল সুলাইমানকে দেখিয়ে বলল, ‘আব্বা, ইনি আলফ্রেড স্মিথ।’ আর বুমেদীন বিল্লাহকে দেখিয়ে বলল, আর ইনি একজন বিখ্যাত সাংবাদিক আমর আব্রাহাম।’

‘ওয়েলকাম ইয়ংম্যান। তোমাদের বন্ধু আইজ্যাক দানিয়েল খুবই ভাল মানুষ, খুবই কাজের মানুষ। খুব খুশি হলাম তোমাদের পেয়ে।’ বলল আয়াজ ইয়াহুদ।

‘ধন্যবাদ স্যার। আমরা বন্ধুর কাছে আপনার কথা শুনেছি। আপনার মূল্যবান সহযোগিতার জন্যে কৃতজ্ঞ।’ কামাল সুলাইমান বলল।

একটু ভ্রু কুঁচকিয়ে মিষ্টি হাসল আয়াজ ইয়াহুদ। বলল, ‘ইয়ংম্যান, তোমার বন্ধুকে সহযোগিতা করছি, না তোমার বন্ধুই আমাদের সহযোগিতা দিচ্ছেন আমাদের লোককে উদ্ধারের জন্য?’

ধরা পড়ে যাবার মত একটু চমকে উঠেছিল কামাল সুলাইমান। তাড়াতাড়ি বলল, 'স্যার দুটোই ঠিক। তবে সহযোগিতার জন্য আমাদের বন্ধুই তো প্রথম আপনার সাথে দেখা করে।'

হাসল আয়াজ ইয়াহুদ। বলল, 'তার মানে তুমি তোমার কথার উপরই দাঁড়িয়ে থাকলে!

হাসল কামাল সুলাইমানও। বলল, 'আমি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছি মাত্র স্যার। মিথ্যা নিশ্চয়ই বলিনি।

উত্তর না দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল আয়াজ ইয়াহুদ। বলল এক সময়, 'মিথ্যা কথা তুমি নিশ্চয় বল না। বলত আইজ্যাক দানিয়েলের আসল নাম কি? 'আহমদ মুসা' কিনা?'

সন্দেহ ও কঠোরতায় ঢেকে গেল কামাল সুলাইমানের মুখ। তার ডান হাত তার অজ্ঞাতসারেই প্রবেশ করে চেপে ধরল রিভলবারের বাট। বুমেদীন বিল্লাহর চোখে-মুখেও সন্দেহ ও বিস্ময়।

হেসে উঠল নুমা ইয়াহুদ। বলল, 'মি. আলফ্রেড স্মিথ, রিভলবার বের করার দরকার নেই। আমরা আইজ্যাক দানিয়েলকে নয়, আহমদ মুসাকে চাই। হাইম হাইকেলকে উদ্ধারের জন্যে আহমদ মুসাকে প্রয়োজন। আর মি. আমর আব্রাহাম আপনার সন্দেহ-বিস্ময়ের কোন প্রয়োজন নেই।'

একরাশ নতুন বিস্ময় এবার কামাল সুলাইমান ও বুমেদীন বিল্লাহ দুজনের চোখে মুখে। বলল কামাল সুলাইমান, আপনাদের সাথে নাটকীয়তার যুক্তি আছে। কিন্তু আহমদ মুসা ভাই আমাদের অন্ধকারে রাখার কারণ বুঝতে পারছি না।'

'মি আহমদ মুসা নিজেই এখনও অন্ধকারে আছেন। তিনি আহমদ মুসা এটা আমরা জেনে ফেলেছি তা তিনি জানেন না।' বলল নুমা ইয়াহুদ।

'আপনারা জানলেন কি করে?' বলল বুমেদীন বিল্লাহ।

আমার বন্ধু সারা জেফারসনের কাছ থেকে।' নুমা ইয়াহুদ বলল।

কিছু বলতে যাচ্ছিল বুমেদীন বিল্লাহ। কিন্তু তার আগেই নুমা ইয়াহুদ আবার বলল, 'এবার মি. স্মিথ আপনার সম্পর্কে সত্য কথা বলুন। আর মি. আমর আব্রাহাম আপনার সুন্দর আরবীয় চেহারার পরিচয়টাও এবার দিন।'

'আইজ্যাক দানিয়েল 'আহমদ মুসা' হলে আলফ্রেড স্মিথকে 'কামাল সুলাইমান' হতে হবে।' আর সুন্দর আরবীয় চেহারা তার পরিচয় নিজে দেবে। হেসে বলল কামাল সুলাইমান।

'আমেরিকার আসার আগে আটলান্টিকের ওপারে যে নামটা রেখে এসেছি, তা মনে পড়ছে না এখন। কারণ কখনও ভাবিনি যে, পুরানো নামটা দরকার পড়বে।' বুমেদীন বিল্লাহ বলল গম্ভীর কণ্ঠে।

হাসল কামাল সুলাইমান। বলল, 'সাংবাদিকরা জবাব শুনতে অভ্যস্ত, জবাব দিতে নয়। আমিই বলছি। ওঁর নাম,'বুমেদীন বিল্লাহ।' জন্ম আলজিরিয়ায়। স্থায়ী নিবাস ফ্রান্সে। লা'মন্ডের সাংবাদিক।'

'তার মানে 'স্পুটনিক' ও 'সাও তোরাহ'-এর উপর যে চাঞ্চলকর রিপোর্ট করেছিলেন, ইনি সেই বুমেদীন বিল্লাহ?' বিস্ময়ের সাথে বলল নুমা ইয়াহুদ।

'আপনি রিপোর্টগুলো পড়েছেন?' জিজ্ঞাসা কামাল সুলাইমানের।

'হ্যা ইন্টারনেটে পড়েছি।' নুমা ইয়াহুদ বলল।

একটু থেমে নুমা ইয়াহুদ আবার বলে উঠল,'মি. বিল্লাহ, নামের মত সাংবাদিকতাকেও তো আটলান্টিকের ওপারে রেখে আসেননি?' মুখে হাসি নুমা ইয়াহুদের।

'সাংবাদিকতা করতে নাম লাগে না। নিউজে নাম না থাকলেও চলে। সুতারাং ওটা রেখে আসার দরকার হয়নি।' বুমেদীন বিল্লাহ বলল।

'যাক বাঁচা গেল।' বলল নুমা ইয়াহুদ।

কি বাঁচা গেল?' জিজ্ঞাসা কামাল সুলাইমানের।

'শিক্ষানবীস হয়ে ওঁর পেছনে ঘোরার একটা সুযোগ হয়ে গেল। সাংবাদিকতা করা ও লেখা আমার শখ। এখন...........।'

কথা শেষ করতে পারল না নুমা ইয়াহুদ। দরজায় নক করেই ড্রইং রুমে প্রবেশ করল আহমদ মুসা। তার হাতের মোবাইল কানে ধরে রাখা। কথা বলছে সে।

আহমদ মুসা রুমে প্রবেশ করে হাত তুলে ইংগিতে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে একটা সোফায় বসে পড়ল। চলছিল তার কথোপকথনঃ

'জি জনাব আমি উদগ্রীব আছি রেজাল্টটা জানার জন্যে।' বলল আহমদ মুসা।

তুমি বলার সঙ্গে সঙ্গেই কাজ শুরু করে দিয়েছিলাম। কিন্তু ওই পথে ভাল রেজাল্ট পাওয়া যায়নি। সরকারী বেসরকারী কোন হাসপাতাল-ক্লিনিকেই ঐ নামের লোক ভর্তি নেই। এমনকি দুচার বেডের ডিসপেন্সারীও আমরা চেক করেছি। ঐ নামের লোকের সন্ধান পাইনি। হাসপাতাল-ক্লিনিক-ডিসপেন্সারী থেকে মানসিক চিকিৎসা সেবা নিয়েছে এমন তালিকাও আমরা চেক করেছি। কিন্তু কোথাও ঐ নামের লোক পাওয়া যায়নি। পরে আমি মি. ডবল এইচের ফটো ইন্টারনেটে আমাদের গোটা নেটওয়ার্কে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। এতে ফল পাওয়া গেছে। তাঁর সন্ধান পাওয়া গেছে। ঠিকানাটা আমি তোমাকে টেলিফোনে এইভাবে বলব না। তোমার মোবাইলেই তুমি আজই একটা কোড-মেসেজ পেয়ে যাবে।' বলল ওপার থেকে।

'আপনাকে অসংখ্যা ধন্যবাদ জনাব। আমার জন্য আপনি অনেক পরিশ্রম করেছেন। আমি কৃতজ্ঞ জনাব।'

'এত ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা কেন? কাজটা আমাদের। আমাদের করা উচিত ছিল। তুমি আমাদের কাজ করে দিচ্ছ। ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা তো আমরা তোমাকে জানাব।'

'কিন্তু এই কাজটা আপনারা করলেন না, করছেন না কেন?' আহমদ মুসা বলল।

'আমি হেড কোয়ার্টার থেকে সুযোগমতই কাজ শুরু করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তুমি বিষয়টাকে টেক আপ করার পর আমরাও কাজটা তোমাকেই দিয়ে

দিয়েছি। আমরা যদি তাঁকে উদ্ধার করি তাহলে তুমি যা চাও তা তোমার পাওয়া কঠিন হতো।' টেলিফোনের ওপ্রান্ত থেকে বলল।

'বুঝেছি। ধন্যবাদ জনাব। বলল আহমদ মুসা।

'সারা জেফারসনের সাথে তো আপনার যোগাযোগ হয়নি।'

'জি না জনাব। সুযোগ হয়নি। আর আমি জানি না সে কোথায়। কিন্তু আপনি কি করে জানলেন?'

'তোমার আগে সে আমাকে কয়েকদিন আগে টেলিফোন করে। তার কাছে জানতে পারি তুমি কি করছ। সে আমাকে অনুরোধ করে আমি যেন এই বিপদজনক মিশনে তোমাকে ফলো করি।'

'কিন্তু সে কি করে জানল?'

'আমি জিজ্ঞাসা করিনি। কিন্তু তুমি আমেরিকায় এসেছ। তার খোঁজ নেয়া উচিত ছিল।'

'আমি ভীষণ ব্যস্ত ছিলাম জনাব।

'ওকে, ইয়ংম্যান। এখনকার মত এটুকুই। ঠিকানা পাওয়ার পর তুমি কি করছ, প্রয়োজন হলে আমাকে জানিও। সালাম।'

'সালাম, জনাব।' বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা তার মোবাইল বন্ধ করেই বলল, 'স্যরি টু অল। খুব জরুরি টেলিফোন ছিল। বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলাও সম্ভব ছিল না।'

'আমাদের লজ্জা দিবেন না আহমদ মুসা। আপনার দুঃখিত হবার কোন কারণ নেই। আমরাই দুঃখিত যে, আপনি কথা বলতেই নিশ্চয়ই অসুবিধা বোধ করেছেন।' বলল আয়াজ ইয়াহুদ।

আয়াজ ইয়াহুদের মুখে নিজের নাম শুনে বিস্ময়ে তার চোখ দুটি ছানাবড়া হয়ে উঠেছে। সে প্রথমেই চোখ ভরা প্রশ্ন নিয়ে তাকাল কামাল সুলাইমানদের দিকে।

সুলাইমান কিছু বলার জন্যে মুখ খুলছিল। কিন্তু তার আগেই নুমা ইয়াহুদ বলে উঠল, 'এক্সলিন্সি আহমদ মুসা, মি. কামাল সুলাইমানদের কাছ থেকে

আপনার পরিচয় আমরা পাইনি। আপনার পরিচয় আমরা জেনেছি অন্যসূত্রে।' হেসে বলল নুমা ইয়াহুদ।

'কার কাছ থেকে জেনেছেন?' জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা নুমা ইয়াহুদকে।

'জবাবটা কি এখনি প্রয়োজন এক্সেলেন্সি?' বলল নুমা ইয়াহুদ।

'এজন্যে প্রয়োজন যে, আমার পরিচয়টা কোন পর্যন্ত পৌঁছেছে তা জানার উপর আমার সামনে এগুনো নির্ভর করছে।' আহমদ মুসা বলল।

'সে ধরনের কোন চিন্তার প্রয়োজন নেই এক্সিলেন্সি আহমদ মুসা। বিষয়টা আমি জেনেছি জেফারসন পরিবারের সারা জেফারসনের কাছ থেকে। সে আমার বন্ধু। এক্সেলেন্সি আসার পর থেকে হাইম হাইকেলের ঘটনা নিয়ে যা ঘটেছে তা আমি জেফারসনকে বলেছিলাম। সব শোনার পর সে বোধ হয় নিশ্চিত হয়েছিল যে, আমরা এক্সিলেন্সির পক্ষের শক্তি। তখন সে এক্সিলেন্সির পরিচয় আমাদের দিয়েছিল।' নুমা ইয়াহুদ বলল।

'কিন্তু এসব ঘটনার সাথে আহমদ মুসা জড়িত, এটা সারা জেফারসন জানল কি করে?' আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

হাসল নুমা ইয়াহুদ। বলল, 'সারা সব শোনার পর বলেছিল, এই কাজ, এই ধরনের আচরণ এবং এই চেহারা দুনিয়াতে একজনেরই হতে পারে। পরে আলোচনা শেষে নামটাও বলেছিলেন। আজ সকালেও তার সাথে আমি কথা বলেছি। কথায় কথায় সে আজ বলল, ওঁর পরিচয় তোমাদের দিয়েছি এজন্যে যে, ওঁর দিকে তোমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। যিনি সবার জন্য ভাবেন, নিজের জন্যে ভাবার অবসর তার থাকে না। তাই তার জন্য সবাইকে ভাবতেই হবে। তবে আজ একটা খারাপ খবরও দিয়েছে। এ সপ্তাহেই তার নিউইয়র্ক আসার কথা তার অফিসের এক কাজ নিয়ে। কিন্তু আজ জানালেন, তোমরা এখন সাংঘাতিক ব্যস্ত। এখন আমি নিউইয়র্ক যাচ্ছি না।'

থামল নুমা ইয়াহুদ।

নুমা ইয়াহুদ থামতেই আয়াজ ইয়াহুদ বলে উঠল, 'মি. আহমদ মুসা, আপনার পরিচয় আমাদের সীমাহীন আনন্দ দিয়েছে শুধু নয়, বুকে আমরা সাহস

ফিরে পেয়েছি এবং অপার স্বস্তি লাভ করেছি। বিনা অষুধেই মনে হচ্ছে আমার ব্লাড প্রেসার এখন স্বাভাবিক। অন্য সবার অনুভূতিও আমার মতই। সুতারাং আপনার অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়।'

'আর আপনি নিশ্চিত থাকুন আহমদ মুসা। আপনার এই পরিচয় এখানে উপস্থিত চারজন ছাড়া বাইরে যাবে না।'

'ধন্যবাদ। কিন্তু আপনি আমাকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করছেন কেন হঠাৎ? আর নুমার কাছে হঠাৎ 'এক্সিলেন্সি' হয়ে গেলাম কেন?' বলল আহমদ মুসা।

'আমি আইজ্যাক দানিয়েলকে 'তুমি' বলেছি, আহমদ মুসাকে নয়। সুতরাং আহমদ মুসার ক্ষেত্রেই নতুন সম্বোধন হবে।' বলল আয়াজ ইয়াহুদ।

নুমা ইয়াহুদও বলল, 'আমারও এটাই জবাব। কিন্তু আমাকে আপনার আপনি সম্বোধন চলে না। আপনি বদলেছেন, আর আমি সে নুমাই আছি।'

'ঠিক আছে, আইজ্যাক দানিয়েল ইহুদী বলে তাকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন আপনারা। কিন্তু এখন আহমদ মুসা সেই ট্রিটমেন্ট পেতে পারে না! যাক, এখন আসুন আমরা কাজের আলোচনায় আসি।' বলে একটু থেমেই আহমদ মুসা কথা বলা শুরু করতে যাচ্ছিল।

ওদিকে আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই আয়াজ ইয়াহুদ তার আসন থেকে এক লাফে উঠে এসে জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে। বলল, 'দেখ, আমাদের বিস্মিত করেছ, মুগ্ধ করেছ, আমাদের চোখ খুলে দিয়েছ তুমি, আইজ্যাক দানিয়েল নামটা নয়। কিন্তু তোমার নতুন পরিচয় হঠাৎ তোমাকে সন্তানের আসন থেকে তুলে নিয়ে মাথায় বসাচ্ছিলাম। কিন্তু তুমি মাথা নয় বুক পছন্দ করেছ। তোমাকে ধন্যবাদ। তুমি মাথা থেকে নেমে কিন্তু আরও বেশি মাথায় উঠলে আমাদের।' আবেগে ভারী হয়ে উঠেছে আয়াজ ইয়াহুদের কণ্ঠ।

আয়াজ ইয়াহুদের আবেগাপ্লুত কণ্ঠ গোঠা পরিবেশকেই ভারী করে তুলেছে। নুমা ইয়াহুদের চোখের দুকোণায় অশ্রু চিক চিক করছে। বারবারা ব্রাউন ঠোঁট কামড়ে মাথা নিচু করেছে। একটা উচ্ছাস সে দমন করতে চেষ্টা করছে। আর

হাইম বেঞ্জামিনের উজ্জ্বল চোখ সম্মোহিতের মত তাকিয়ে আছে আহমদ মুসার দিকে।

আয়াজ ইয়াহুদ আহমদ মুসাকে তার সিটে বসিয়ে ফিরে গেল আসনে। বলল,'হ্যাঁ আহমদ মুসা তোমার কাজের কথা শুরু কর। কিন্তু তার আগে বল, ঐ জরুরি টেলিফোনটা কার ছিল? আলোচনা শুনে বুঝা গেল হাইম হাইকেলের বিষয় নিয়েই তোমরা কথা বলেছ।' 'জি, আমরা ড. হাইম হাইকেলের বিষয় নিয়েই আলোচনা করেছি। টেলিফোনটা করেছিলেন ওয়াশিংটন থেকে FBI-এর প্রধান জর্জ আব্রাহাম। তিনি...........।

আহমদ মুসার কথার মাঝখানেই বলে উঠল আয়াজ ইয়াহুদ, 'FBI-এর চীফকে তুমি চেন? তিনি চেনেন তোমাকে?

'জি হ্যাঁ, তিনি আমাকে তাঁর ছেলের মতই স্নেহ করেন।' আহমদ মুসা বলল।

'কেন আব্বা, 'লস আলামোস' ও নিউ হারম্যান' ঘটনার পর এ সংক্রান্ত রিপোর্টগুলো পড়নি? ওতেই তো আছে, গোয়েন্দা, সেনাবাহিনী, এমনকি রাষ্ট্রের শীর্ষ পর্যায়ে তার যোগাযোগ ও তাঁদের সাথে সহযোগিতা বিনিময়ের কথা।' বলল নুমা ইয়াহুদ।

'ঠিক ঠিক নুমা। পড়েছি আমি স্টোরিগুলো। কিন্তু আহমদ মুসা বুঝতে পারছি না, ওরা থাকতে ওদের সহযোগিতা না নিয়ে একা এইভাবে লড়তে এসেছ কেন?' বলল আয়াজ ইয়াহুদ।

'পুলিশ ও গোয়েন্দাদের সাহায্য নিতে গেলে বিষয়টা জানাজানি হয়ে যাবে। কারণ গোয়েন্দা ও পুলিশের মধ্যে ঐ শত্রু পক্ষের লোকও আছে। আর যদি ওরা জানতে পারে, তাহলে ওরা ধরা পড়ার আগে হাইম হাইকেলকে খুনও করতে পারে। এজন্যেই আমরা একা, নিরিবিলি কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। শত্রুদের যতদূর সম্ভব জানতে না দিয়ে আমরা তার উপর চড়াও হতে চাই।' আহমদ মুসা বলল।

‘ওরা ধরা পড়ার আগে হাইম হাইকেলকে খুন করতে পারে।’ এই কথা শুনে হাইম বেঞ্জামিন ও বারবারা ব্রাউন দুজনেরই মুখ উদ্বেগে চুপসে গিয়েছিল। কিন্তু আহমদ মুসার শেষ কথা শুনে তাদের মুখে স্বস্তি ফুটে উঠল।

‘ধন্যবাদ আহমদ মুসা। এক যুগ পরের কথা তুমি এক যুগ আগেই চিন্তা করতে পার। তুমি যা চিন্তা করেছ তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।’ বলল আয়াজ ইয়াহুদ আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই।

আহমদ মুসা সোফায় একটু গা এলিয়ে দিয়েছিল। সোজা হয়ে বসল আবার। আয়াজ ইয়াহুদ থামতেই আহমদ মুসা বলতে শুরু করল, ‘একটা সুখবর এবং অত্যন্ত গোপন খবর হলো, ‘হাইম হাইকেলের সন্ধান পাওয়া গেছে। আমি জর্জ আব্রাহামকে অনুরোধ করেছিলাম, তার বিশ্বস্ত গোয়েন্দা দিয়ে এবং কম্পিউটার রেকর্ড মনিটর করার মাধ্যমে দেশের সব মানসিক হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোতে হাইম হাইকেলের খোঁজ নিতে। কিন্তু ঐ নামের কাউকে হাসপাতালে পাওয়া যায়নি। শেষে তিনি ফটো সরবরাহের মাধ্যমে খোঁজ করেছেন। সফল হয়েছেন। আজই আমি পেয়ে যাচ্ছি ঠিকানা। তারপরেই বেরুতে হবে অভিযানে।’

সকলের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আনন্দ-উদ্বেগ ঠিকরে পড়েছে হাইম বেঞ্জামিন ও বারবারা ব্রাউনের মুখ থেকে। হাইম বেঞ্জামিন বলে উঠল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, ‘স্যার, পুলিশের সাহায্য নিয়ে তো আপনি আরও দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করতে পারেন!’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘কিন্তু বললাম তো, পুলিশ জানতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে শত্রুরা জানতে পারবে, এ ভয়ে আছে। জানতে পারলে হয় তাঁকে অন্যত্র সরিয়ে ফেলবে ওরা, নয়তো মেরেও ফেলতে পারে। এজন্যেই ওপথে যাওয়া যাবে না।’

‘স্যরি স্যার। আমার কথা প্রত্যাহার করছি। আপনি ঠিকই বলেছেন। নিউইয়র্ক, ফিলাডেলাফিয়ার অধিকাংশ পুলিশকেই আন্তরিক পাওয়া যায়নি। সবাই মিলে এই ঘটনাকে চাপা দিচ্ছিল। আপনি ঠিকই বলেছেন স্যার। আপনাকে ধন্যবাদ স্যার।’ বলল কম্পিত কণ্ঠে হাইম বেঞ্জামিন।

‘ধন্যবাদ বেঞ্জামিন।’ আহমদ মুসা বলল।

একটু নিরবতা।

পরক্ষণেই নিরবতা ভাঙল আয়াজ ইয়াহুদ। বলল, ‘একটা প্রশ্নের উত্তর আমরা পাইনি আহমদ মুসা। হাইম হাইকেলকে উদ্ধার করার জন্যে আহমদ মুসার আগমন কেন? এখানে দ্বন্দ্বটা ইহুদী ইহুদীতে!’

‘না এখানে দ্বন্দ্বটা ষড়যন্ত্রের সাথে সত্যের।’ আহমদ মুসা বলল।

‘দ্বন্দ্বের বিষয়টাকে তুমি ঠিকই ধরেছ। কিন্তু ষড়যন্ত্রের দুটি পক্ষই ইহুদী।’

‘কিন্তু তাতে কি? ইহুদীদের সাথে আমার কোন শত্রুতা নেই। আমার বিরোধ ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে। তারা ছাড়া সকলের সাথেই আমার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমরা বিরোধের ব্যাপারটাই জানতে চাচ্ছি। তারা হাইম হাইকেলকে অপহরণ করে আটকে রেখেছে শুধু এটা কি? আমি মনে করি এটা নয়। কারণ এমন কিডন্যাপ ও আটকের ঘটনা আমেরিকায় অসংখ্যা হয়েছে, হচ্ছে। সত্য ও ষড়যন্ত্রের লড়াইও হচ্ছে। কিন্তু তুমি ছুটে এসেছ শুধুমাত্র হাইম হাইকেলের সাহায্যার্থে। তোমার এই বিশেষ সিলেকশনই প্রমাণ করে এর পেছনে বিশেষ কারণ কাজ করছে। সে কারণটা কি?’

‘আপনি ঠিকই ধরেছেন। কিন্তু সে কারণ বলতে গেলে অনেক কিছু বলতে হবে। আমরা চাচ্ছি এই বলার কাজটা হাইম হাইকেল করবেন। তিনিই সবচেয়ে ভাল বলতে পারবেন। আমি কিছু কথা বেঞ্জামিনদের জানিয়েছি। আপনাদের প্রাথমিক অবগতির জন্য এটুকু বলতে পারি যে, জনাব হাইম হাইকেল যে ষড়যন্ত্রকে ঘৃণা করেছেন, সেই ষড়যন্ত্রকে আমরা দিনের আলোয় আনতে চাই। এখানেই তাঁর সাথে আমাদের উদ্দেশ্যের ঐক্য।’

থামল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা আর কোন কথা বলল না। ভাবনার চিহ্ন সবার চোখে-মুখে।

আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকাল। চোখ তুলল কামাল সুলাইমানের দিকে। আস্তে করে বলল, 'তোমাদের কি অজু আছে। আসরের নামাজ পড়ে নিতে হয়।'

'আমাদের অজু আছে মুসা ভাই।' বলল কামাল সুলাইমান।

এবার আহমদ আহমদ মুসা তাকাল আয়াজ ইয়াহুদের দিকে। বলল, 'মাফ করুন। আপনাদের ভাবনার মধ্যে ডিস্টার্ব করছি।' একটু থেমে আবার বলল, 'আমাদের আসর নামাজের সময় হয়েছে। আপনারা অসুবিধা মনে না করলে এখানেই পড়ে নিতে চাই।'

আয়াজ ইয়াহুদ একটু নড়ে চড়ে বসেই দ্রুত কণ্ঠে বলল, 'নো প্রোব্লেম। কোথায় পড়তে চাও?'

পাশেই ফাঁকা জায়গা দেখিয়ে আহমদ মুসা বলল, 'ওখানেই পড়ে নেয়া যায়।'

'কিছু লাগবে?' আয়াজ ইয়াহুদের জিজ্ঞাসা।

'অজু আমাদের আছে। একটা পরিষ্কার চাদর হলে চলে, না হলেও ক্ষতি নেই।' আহমদ মুসা বলল।

আয়াজ ইয়াহুদ নুমা ইয়াহুদের দিকে তাকাল। কিন্তু কিছু বলার আগেই নুমা ইয়াহুদ উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আমি চাদর আনছি।'

আসরের চার রাকাত নামাজ শেষে আহমদ মুসারা ফিরে এল তাদের আসনে।

নামাজের সময় এরা চারজন কেউ কথা বলেনি। তারা সবাই অপলক চোখে ওদের নামাজ পড়া দেখছিল।

আহমদ মুসা বসার পর আয়াজ ইয়াহুদ বলে উঠল, 'আহমদ মুসা মি. হাইম হাইকেলের সাথে তোমাদের উদ্দেশ্যের ঐক্যের কথায় আমাদের কৌতূহল কিছুটা নিবৃত্ত হলো। এখন আরেকটা কৌতূহলের উত্তর দাও। তোমাদের পরিচয় প্রকাশ না হলে আজ এই নামাজ তোমরা কি করে পড়তে? এতদিন তোমরা কি করে নামাজ পড়েছ?'

'বিশেষ বিশেষ অবস্থায় নামাজ কাজা রেখে পরে পড়ে নেয়া যায়। আর আমি চেষ্টা করি নামাজের সময় এড়িয়ে প্রোগ্রাম করতে। আজকের আসরের নামাজ আমরা ঠিক সময়ে পড়েছি। পরিচয়ের ব্যাপারটা না ঘটলে আলোচনা শেষে আস্তানায় ফিরে গিয়ে পড়ে নেবার চেষ্টা করতাম।' আহমদ মুসা বলল।

'আপনাদের নামাজ আমার খুব ভালো লেগেছে। এই নামাজ প্রমাণ করেছে আপনারা আধুনিকতা, শৃঙ্খলা ও সামরিকতার সাথে আধ্যাত্মিকতার অদ্ভূত সংযোগ ঘটিয়েছেন।' বলল নুমা ইয়াহুদ।

'আমরা ঘটাইনি, আল্লাহ ঘটিয়েছেন।' আহমদ মুসা বলল।

'স্যরি। তাহলে সংযোগটা আরও স্বাভাবিক, আরও মজবুত ও কার্যকরী হলো।' নুমা ইয়াহুদ বলল।

'ইসলামের অনেক বিউটির মধ্যে এটা একটা নুমা।' বলল আহমদ মুসা।

'একটা দেখলাম। অন্যগুলোও দেখতে হবে।' নুমা ইয়াহুদ বলল।

'হঠাৎ এতটা আগ্রহী হয়ে উঠলে কেন নুমা?' বলল নুমার মা মিসেস আয়াজ ইয়াহুদ।

'হঠাৎ নয় আম্মা। আমার মধ্যে এই আগ্রহ সৃষ্টি করেছে সারা জেফারসন। জেফারসন পরিবারের সারা জেফারসন যদি ইসলাম ধর্মকে আজকের যুগোপযোগিতার ক্ষেত্রে এক 'মিরাকল রিলিজিওন' বলতে পারেন, তাহলে আমি হব না কেন?'

এ সময় একজন সিকিউরিটির লোক সিঁড়ি ভেংগে দ্রুত উপরে উঠে এল।

আয়াজ ইয়াহুদ প্রশ্নবোধক দৃষ্টি তুলে তাকাল তার দিকে।

সিকিউরিটির লোকটি কম্পিত কণ্ঠে বলল, 'স্যার কিছু লোক আমাদের গেটের সামনে এবং পেছনে দরজার ওপাশে পজিশন নিয়েছে। গায়ে ওদের লম্বা কোট। নিশ্চয় অস্ত্র আছে কোটের আড়ালে। গেটের বাইরে ওদের দুটো গাড়ি দাঁড়ানো।'

'তোমরা ওদের বাধা দাওনি কেন? পুলিশে খবর দিয়েছ?' শুকনো কণ্ঠে বলল আয়াজ ইয়াহুদ। তাঁর চোখে-মুখে ভয়ের চিহ্ন।

'স্যার আপনার নির্দেশ হলেই জানাব।' বলল সিকিউরিটির লোক।

আয়াজ ইয়াহুদ তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'দেখ ওরা আমার বাড়ি আক্রমণ করতে এসেছে। পুলিশের দায়িত্ব একে ফেস করা। তোমরা কেউ এর সাথে জড়িয়ে না পড়া ভাল হবে। তোমার মত কি?'

'আপনার সাথে আমি একমত। কিন্তু পুলিশকে এখনও বলা হয়নি।' বলল আহমদ মুসা।

'বলছি' বলেই মোবাইলে টেলিফোন করল পুলিশকে।

পুলিশের সাথে কথা বলা শেষ করে বলল, পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই পুলিশ এসে পৌঁছে যাবে।' বলল দ্রুত কণ্ঠে আয়াজ ইয়াহুদ। তার চোখে-মুখে উদ্বেগ।

আহমদ মুসা খবর দিতে উপরে আসা সিকিউরিটির লোককে বলল, 'তুমি গেটে যাও আমি আসছি। ওদের গতিবিধির দিকে নজর রাখ, কিন্তু বুঝতে দিওনা যে তাদের তুমি দেখেছ।'

সঙ্গে সঙ্গেই সিকিউরিটির লোক নিচে নেমে গেল।

কয়েক মুহূর্ত পরে আহমদ মুসা নিচে নামার জন্য সিঁড়ির দিকে এগুচ্ছে, এই সময় সিকিউরিটির লোকটি চিৎকার করে ভেতরে ঢুকল। বলছিল সে চিৎকার করে, 'ওরা এসে গেছে। ওরা বাড়িতে ঢোকার জন্যে ছুটে আসছে। আমি যাচ্ছি ওদিকে।'

সঙ্গে সঙ্গে আহমদ মুসা থমকে দাঁড়াল। ফিরে তাকাল কামাল সুলাইমানদের দিকে। বলল, সুলাইমান তুমি বাড়িতে প্রবেশের দরজায় দাঁড়াও। আর বুমেদীন বিল্লাহ তুমি এদের নিয়ে উপরে থাক। দুতালার সামনে গিয়ে নিচেরটা দেখা যায় এমন নিরাপদ জায়গায় পজিশন নিতে পার। আর আমি বাইরে যাচ্ছি। সুলাইমান ও বিল্লাহ আমি এ্যাকশনে যাবার আগে তোমরা সুযোগ পেলেও গুলী করবে না।

'কিন্তু ভাইয়া, আপনার কি বাইরে যাবার প্রয়োজন আছে? ঢোকার পথে ওদের আক্রমণ করাই তো নিরাপদ বেশি।

‘সেটার জন্যে তোমরা থাকলে। আমি খালি হাতে বাইরে যাচ্ছি। দেখি পুলিশ আসা পর্যন্ত ওদের ঠেকানো যায় কিনা।’ বলে আহমদ মুসা তার জ্যাকেটের চেনটা খুলে দিতে দিতে ছুটল সিঁড়ি দিয়ে নিচের দিকে।

আহমদ মুসা কামাল সুলাইমানকে দরজার আড়ালে দাঁড় করিয়ে রেখে খালি হাতে বিস্ময়ের একটা চিহ্ন চোখে-মুখে এঁকে স্বাভাবিকভাবে হেঁটে বাইরে বেরিয়ে এল।

ওরা আট দশ জন গেটের ভেতর ঢুকে গেছে। সিকিউরিটির দুজন লোককে বেঁধে ফেলে রেখেছে।

আহমদ মুসাকে দেখে ওরা অস্ত্র বাগিয়ে আহমদ মুসার দিকে ছুটে এল।

আহমদ মুসা থমকে দাঁড়িয়ে বলল ওদের লক্ষ্য করে, ‘দাঁড়াও তোমরা। এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টের বাড়ি। ডাকাতির জায়গা এটা নয়। কি চাও তোমরা?’

আহমদ মুসা এই কথা গুলো এমন স্বাভাবিক কণ্ঠে এমন মাষ্টারি ঢং-এ বলল যে, ওদের চোখে-মুখে একটা বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠল। থমকে গেল ওরা।

কিন্তু অবিলম্বে তা সামলে নিয়েই ওদের মধ্যে লম্বা-চওড়ায় বড় একজন অস্ত্র উঁচিয়ে একধাপ সামনে এগিয়ে বলল, ‘তুমি কে? রাস্তা থেকে সরে দাঁড়াও। আমরা ডাকাতি করতে আসিনি। আমরা এসেছি কয়েকজন লোকের সন্ধানে। ওরা ভেতরে আছে। ওদেরই আমরা চাই।’

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘ভেতরে যাবার দরকার নেই। তোমরা কাকে চাচ্ছ? ড. নিউম্যানের বাড়িতে তোমাদের লোকদের যে হত্যা করেছিল, বারবারা ব্রাউনকে যে তোমাদের কবল থেকে উদ্ধার করেছিল তাকে?’

‘সামনে এগিয়ে এসেছিল যে লোকটি তার চোখ দুটি ছানাবড়া হয়ে গেল। বলল, ‘তুমি এত কথা জান কি করে? তুমি কে?’

আবার হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘তোমরা এবং তোমাদের নেতা আজর ওয়াইজম্যান যাকে খুঁজছে, আমি সেই।’

লোকটার মধ্যে ভুত দেখার মত একটা ভীতিকর বিস্ময় ফুটে উঠল। কিন্তু শিঘ্রই নিজেকে সামলে নিয়ে সহজ হয়ে গেল সে। বলল চিৎকার করে, ‘চালাকি

করো না। আসল লোককে বাঁচাবার এটা একটা ফন্দী। আমরা যেন কিছুই বুঝি না! ঐ শয়তান হলে কি তুমি এভাবে খালি হাতে আসতে ধরা দেবার জন্যে!'

কথাটা শেষ করেই পেছনের সাথীদের উদ্দেশ্য বলল, এই তোমরা একজন একে বেঁধে ফেলে গাড়িতে তোল, আর সবাই এস বাড়িতে ঢুকতে হবে।'

লোকটির পেছনে অস্ত্র উঁচিয়ে আট-দশ জন লোক দাঁড়িয়েছিল।

লোকটির নির্দেশ পেয়েই একজন তার পকেট থেকে সরু নাইনল কর্ড বের করে হাতে নিয়ে পা বাড়াল আহমদ মুসার কাছে আসার জন্যে।

কিন্তু লোকটির কথা শেষ হতেই উচ্চ হাসির সাথে আহমদ মুসা বলে উঠল, 'তা আর হলো না মি. ........................। ঐ দেখো, পুলিশ এসে গেছে।'

লোকটিসহ তার পেছনের সবাই যন্ত্রচালিতের মত পেছনে ফিরে তাকাল।

চোখের পলকে শোল্ডার হোলস্টার থেকে নতুন কেনা এম-১০ মেশিন রিভলবার আহমদ মুসার হাতে চলে এল।

পেছনে পুলিশকে না দেখে প্রতারিত হওয়ার ক্ষোভে ফেটে পড়ে যখন মুখ ফিরাচ্ছিল, তখন আহমদ মুসার মেশিন রিভলবার হাঁ করে ওদের লক্ষ্যে তাকিয়ে।

ওরা মুখ ফিরাতে আহমদ মুসা কঠোর কণ্ঠে বলল, 'সবাই অস্ত্র ফেলে দাও, তা না.........।'

আহমদ মুসার কথা শেষ হবার আগেই ওদের কয়েকজনের হাতের ভয়ংকর কারবাইন জাতের স্টেনগান আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে উঠে আসতে লাগল।

আহমদ মুসারও মুখের শেষ কথাগুলো হারিয়ে গেল। তার মেশিন রিভলবারের লক্ষ্য আগে থেকেই স্থির ছিল। এখন আহমদ মুসা ট্রিগার চেপে মেশিন রিভলবার ওদের ওপর দিয়ে দুবার ঘুরিয়ে নিয়ে এল।

চেখের পলকেই সামনে এগিয়ে আসা লোকটিসহ দশ-বারো জন সকলেরই দেহ ভূমি শয্যা নিল। কারো দেহ সঙ্গে সঙ্গেই স্থির হয়ে গেল। কারো দেহ গড়াগড়ি খেতে লাগল।

এ সময় চারদিক থেকে পুলিশের বাঁশি বেজে উঠল। একদল পুলিশ গেট দিয়ে ঢুকে দ্রুত ছুটে আসল হত্যাকান্ডের স্থানের দিকে।

এদিকে দরজার আড়াল থেকে কামাল সুলাইমান এবং দুতালা থেকে ওরা সবাই ছুটে আহমদ মুসার কাছে এল।

একজন পুলিশ অফিসার ছুটে এসে আয়াজ ইয়াহুদের সামনে দাঁড়াল। ছড়িয়ে পড়ল অন্যান্য পুলিশ চারদিকে।

পুলিশ অফিসারের হাতে ওয়াকিটকি। সে ওয়াকিটকিতে কথা বলতে বলতেই আসছিল।

পুলিশ তার কথা শেষ করে আয়াজ ইয়াহুদকে বাউ করে বলল, 'স্যার বাড়ির চারপাশে যে কয়জন ছিল তারা সবাই ধরা পড়ে গেছে। আর সামনের এদেরতো আপনারাই সামাল দিয়েছেন। ধন্যবাদ স্যার।'

'ধন্যবাদ পুলিশ অফিসার' বলে আয়াজ ইয়াহুদ সবাইকে পরিচয় করিয়ে দিল। হাইম বেঞ্জামিন ও বারবারা ব্রাউনকে পরিচয় করিয়ে কামাল সুলাইমান ও বুমেদীন বিল্লাহকে দেখিয়ে বলল, এঁরা একটা ইন্টারন্যাশনাল ডিটেকটিভ ফার্মের লোক। আর আহমদ মুসার পরিচয় দিতে গিয়ে বলল। ইনিও ঐ ফার্মের সাথে জড়িত এবং আমাদের পারিবারিক বন্ধু।

'ও বুঝেছি, আপনি হাইম পরিবারের লোকদের নিয়ে ডিটেকটিভ ফার্মের লোকদের সাথে পরামর্শ করছিলেন। এই খোঁজ পেয়ে বুঝি এরা ছুটে এসেছিল। তাহলে কি এদের কোন সর্ম্পক আছে হাইম হাইকেলকে নিখোঁজ করার পেছনে? ভাববেন না স্যার। আমি সব দেখছি। আমি একদিন আগে নায়াগ্রা থেকে এই অফিসে এসে জয়েন করেছি।' বলেই অফিসারটি তার লোকদের দিকে তাকিয়ে নির্দেশ দিল, লাশগুলো গাড়িতে তোল। আহতদের প্রতি লক্ষ্য রাখ যেন পালাতে না পারে। গাড়িতে ওদেরকে পাহারায় রাখ। আর বন্দীদের 'সেল' গাড়িতে তুলে নাও।'

তারপর আবার ফিরল ড. আয়াজ ইয়াহুদের দিকে। বলল, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ স্যার। ডিটেকটিভ ফার্মের লোকেরা আপনার সাথে থাকায় এই শয়তানদের বাধা দিতে পেরেছেন। বড় অঘটন থেকে আপনারা বেঁচে গেছেন।'

বলে পুলিশ অফিসার হ্যান্ডশ্যাক করল আহমদ মুসা, কামাল সুলাইমান, বুমেদীন বিল্লাহ, বারবারা ব্রাউন ও হাইম বেঞ্জামিনের সাথে। তারপর ড. আয়াজ ইয়াহুদকে লক্ষ্য করে বলল, 'স্যার আমরা চলি। রাত্রে একবার আমি খোঁজ নেব। দরকার হলে কষ্ট করে একটু টেলিফোন ঘুরাবেন।' গুড বাই স্যার।

চলে গেল পুলিশ অফিসার।

পুলিশের গাড়ি গেট থেকে বের হয়ে গেলে আয়াজ ইয়াহুদ গেটম্যান ও সিকিউরিটির লোকদের নির্দেশ দিল জায়গাগুলো পরিষ্কার করার এবং গেটের দিকে নজর রাখার জন্যে।

আয়াজ ইয়াহুদ সকলকে নিয়ে ভেতরে চলল। বলল, 'ডিনার না করিয়ে কাউকে ছাড়ছি না। এমন কি দরকার হলে রাতেও সকলকে থাকতে হতে পারে। আতংক কাটতে অনেক সময় লাগবে।'

'পুলিশের কাছে আমাদের পরিচয় দেয়াটা আপনার চমৎকার হয়েছে স্যার। আমাদের ডিটেকটিভ বলে পরিচয় দেয়ায় হত্যাকান্ডের ঘটনাটা তাদের কাছে স্বাভাবিক হয়ে গেছে।' বলল আহমদ মুসা।

'আর ডিটেকটিভদের সাথে হাইম পরিবারের লোকেরা এখানে উপস্থিত থাকায় ওদের আক্রমণটাও স্বাভাবিক হয়ে গেছে।' নুমা ইয়াহুদ বলল।

সবাই এসে আবার সোফায় বসল।

'এই নতুন পুলিশ অফিসারটা ভাল মনে হলো। মনে হচ্ছে ক্রিমিনালদের বিহিত উনি করবেন। কিছু কথাও আদায় করতে পারেন, যা প্রয়োজনে আসবে।' বলল আবার নুমাই।

'না নুমা। কাজের কিছু এদের কাছ থেকে পাওয়া যাবে না। এ লোকেরা পুতুল। নিছকই হুকুমের দাস। এরা ভেতরের কিছুই জানে না। সামনের লোকটা কিছুটা নেতা গোছের ছিল। সে বাঁচলে হয়তো কিছু জানার সম্ভাবনা ছিল।' আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসা থামতেই আয়াজ ইয়াহুদ বলল, 'ফ্লোর এখন আমার। সবার তরফ থেকে বিশেষ করে আমার ও হাইম পরিবারের তরফ থেকে আহমদ মুসাকে

শুকরিয়া ও অভিনন্দন জানাতে চাই। তিনি আমাদের গায়ে কোন আচঁড় পর্যন্ত লাগতে না দিয়ে যে ঝুঁকি নিয়ে ............।

আহমদ মুসা আয়াজ ইয়াহুদের কথার মাঝখানে বলে উঠল, 'যা ঘটে গেছে তা বাদ দিয়ে প্লিজ আসুন কাজের কথায় আসি।'

আয়াজ ইয়াহুদ থেমে গিয়েছিল। কিন্তু কথা বলে উঠল নুমা ইয়াহুদ আহমদ মুসা থামার সাথে সাথেই, 'ঐভাবে ওদের মুখোমুখি হওয়া কি আপনার ঠিক হয়েছে। ওরা যদি দেখা মাত্রই গুলী চালাত কিংবা পেছনে পুলিশের কথা বলে ওদের যদি আপনি বিভ্রান্ত করতে না পারতেন, তাহলে কি ঘটত?'

'যা ঘটেছে, সে রকমই কিছু ঘটত। আমার খালি হাত দেখার পর ওদের গুলী করার ইচ্ছা ৯০ ভাগই চলে গিয়েছিল। জেগে উঠেছিল আমাকে বাজিয়ে দেখার ইচ্ছা। ওরা যদি গুলী করারও সিদ্ধান্ত নিত, তাহলেও একজন নিরস্ত্রের বিরুদ্ধে ওদের বন্দুক উঠতে যে সময় নিত, সে সময়ে আমার মেশিন রিভলবার তার কাজ শেষ করে ফেলত। আর পেছনে পুলিশ দাঁড়াবার কথাটা মানে আমার প্রতারণার ফাঁদে ওদের পা না দিয়ে উপায় ছিল না। ফাঁদে পা না দেবার মত যোগ্য ওরা যদি হতোও, তবু গুলী করার আগে দুএকটা বাচালতা ওরা করতো, সেটুকু সময়ই যথেষ্ট ছিল আমার জন্যে ওদেরকে গুলীর শিকার বানাবার।' আহমদ মুসা বলল।

'অদ্ভূত! আপনার সময়ের এই হিসাব অংকের মতই নিখুঁত। ঐ টেনশনের মধ্যেও এই হিসাব আপনার মাথায় এল কি করে। অপশনসগুলোকে এইভাবে সাজালেন কি করে?' বলল বারবারা ব্রাউন।

'শুধু চোর পালালেই বুদ্ধি বাড়ে তা নয়, চোর দেখলেও বুদ্ধি বাড়তে পারে।' হেসে কথাটা বলেই আহমদ মুসা আবার বলা শুরু করল, 'আমি মনে করি আজকের ঘটনার পর সরকার এ বাড়িতে সার্বক্ষণিক পাহারার ব্যবস্থা করবে। পুলিশের প্রতি আপনাদের আস্থা যদি না থাকে তাহলে কয়েকদিন সরে থাকাই আমি ভাল মনে করি। মিস ব্রাউন ও হাইম বেঞ্জামিন সম্পর্কেও আমার এই কথা। কিছু সময় সরে থাকা ভাল।'

‘মনে হচ্ছে তুমি কোথাও যাবার আগে আমাদের বিদায়ী উপদেশ দিচ্ছ। ব্যাপার কি?’ বলল আয়াজ ইয়াহুদ।

‘জি স্যার। ঠিক ধরেছেন। FBI চীফ জর্জ আব্রাহামের কোডেড ম্যাসেজ আমি মোবাইলে পেয়ে গেছি। আজ রাত্রেই আমরা সেখানে যাত্রা করছি।’ বলল আহমদ মুসা।

‘তার মানে হাইম হাইকেলকে যেখানে আটকে রেখেছে, সে ঠিকানা তুমি পেয়ে গেছ?’ জিজ্ঞাসা আয়াজ ইয়াহুদের। আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার দুটি চোখ।

‘জি হ্যাঁ।’ বলল আহমদ মুসা।

খুশির বান ডেকে উঠল বেঞ্জামিন ও বারবারা ব্রাউনের চোখে-মুখেও।

‘ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। তোমার চেষ্টাকে ধন্যবাদ। কিন্তু যাত্রা এই রাতে কেন? রাতটা রেস্ট নিয়ে সকালে রওনা হয়ে যাও।’ আয়াজ ইয়াহুদ বলল।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘এটা আত্মীয়ের বাড়ি যাওয়া নয় স্যার। এই ধরণের কাজের সংস্কৃতি হলো, দেখা ও শোনার সাথেই কাজ চলবে। না হলে স্টেশনে পৌঁছে দেখা যাবে ট্রেন চলে গেছে।’

কথা শেষ করতেই আহমদ মুসার মোবাইলটা বেজে উঠল।

মোবাইল তুলে নিয়ে স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে দেখল FBI চীফ জর্জ আব্রাহামের টেলিফোন।

দ্রুত কানে লাগাল টেলিফোন।

ওপ্রান্ত থেকে আহমদ মুসাকে সালাম দিয়ে জর্জ আব্রাহাম বলল, ‘মাই সান, তোমার জন্যে দুটি খবর। একটা ভাল, অন্যটা মন্দ। ভালো খবরটা হলো, প্রেসিডেন্ট তোমাকে তার সাথে একদিন ডিনার খাওয়ার জন্যে দাওয়াত করেছেন। আর খারাপ খবরটা হলো চিড়িয়া উড়ে গেছে। ডবল এইচকে তোমাকে দেয়া ঠিকানা থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে।’

খবরটা শুনতেই বুকের কোথায় যেন একটা আঘাত লাগল আহমদ মুসার। নিঃশ্বাসের তার ছন্দপতন ঘটল। সামলে নিতে মুহূর্ত কেটে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিতে পারল না আহমদ মুসা।

জর্জ আব্রাহামই আবার কথা বলে উঠল, ‘স্যরি মাই সান, তোমার খারাপ লাগছে জানি। আমাদের লোকেরা নতুন লোকেশনের সন্ধানে লেগে গেছে।’

‘ধন্যবাদ জনাব। এই চিড়িয়া উড়ে যাওয়ার কারণ সর্ম্পকে কি ভাবছেন আপনি?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘একেবারে সোজা অর্থ। আমার FBI-এর কোন লোক নিশ্চয় ওদের কাছে খবর বিক্রি করেছে।’

‘তা আবারও তো করবে।’

‘তা হতে পারে। যথেষ্ট সাবধান ও সিলেকটিভ হওয়ার পরও এই ঝুঁকি থাকছে বেটা। কি করব? আমার FBI-তে বিশ্বাসের দুটি সমান্তরাল ধারা কাজ করছে। একটি হলো, ইহুদীবাদীদের স্পর্শ ও প্রভাব থেকে আমেরিকাকে চিরদিনের জন্যে মুক্ত করা। দ্বিতীয় ধারার বিশ্বাস হলো কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইহুদীবাদীরাও আমাদের মিত্র হতে পারে, তাদের সাথে সহযোগিতা চলতে পারে। এই দ্বিতীয় ধারাকে প্রমোট করেছে ইহুদীবাদীদের অর্থ ও লোভের অন্যান্য বস্তু। সুতারাং বিশ্বাস ভংগের সংকট থেকে FBI কে খুব শীঘ্র মুক্ত করা যাবে না।

‘ধন্যবাদ জনাব। একটা বাস্তবতাকে আপনি তুলে ধরেছেন। এই বাস্তবতা আমাকে আশা ভংগের কষ্টের মধ্যে ফেলল।’ একটু হাসির সাথে বলল আহমদ মুসা।

‘খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু হতাশ হয়ো না। আমি সামনে আরও সিলেকটিভ হবো। দেখা যাক । হ্যাঁ শোনো, খারাপ খবরের স্তুপে আমার সুখবরটা যে হারিয়ে গেল। কিছু বললে না যে!’

‘এক্সিলেন্সির এই দাওয়াতে আমি নিজেকে নতুন করে সম্মানিত বোধ করছি। মহামান্য প্রেসিডেন্টকে জানাবেন আমার এই মিশন শেষ করেই আমি ওয়াশিংটনে আসছি।’

‘ধন্যবাদ বেটা। তুমি যে সুখবরটা চাও, আশা করছি তাড়াতাড়িই তা তোমাকে দিতে পারবো। গুড বাই মাইসান।’

আহমদ মুসা টেলিফোন রাখতেই আয়াজ ইয়াহুদ বলে উঠল, 'প্রেসিডেন্টও তোমাকে দাওয়াত করেন! হিপ হুররে! তুমি সত্যিই ভাগ্যবান আহমদ মুসা।'

'তার সাথে খারাপ খবরও আছে স্যার।'

'কি সেটা?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল আয়াজ ইয়াহুদ।

'যে ঠিকানা পেয়েছিলাম, সে ঠিকানা থেকে জনাব হাইম হাইকেলকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে।'

'নিশ্চয় তাহলে শয়তানরা জানতে পারে?' শুকনো কণ্ঠে আয়াজ ইয়াহুদের।

হাইম বেঞ্জামিন, বারবারা ব্রাউন ও নুমা সকলের চোখে-মুখে হতাশা নেমে এসছে।

'নিশ্চয় স্যার। FBI-এর কেউ তথ্যটা ফাঁস করে দিয়েছে ওদের কাছে। FBI চীফ জর্জ আব্রহাম এ কথাই বললেন।' বলল আহমদ মুসা।

'সর্বনাশ! তাহলে এখন কি হবে?' নুমা ইয়াহুদ বলল।

'মি. জর্জ আব্রাহাম চেষ্টা করছেন। বাকি আল্লাহ ভরসা।'

আয়াজ ইয়াহুদের টেলিফোন বেজে উঠেছিল। আহমদ মুসা থামতেই আয়াজ ইয়াহুদ টেলিফোন ধরল।

ও প্রান্তের কথা শুনেই সে বলল, 'ঠিক আছে অফিসার। ওঁরা এখানে আছেন। পাঠিয়ে দিন। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।'

টেলিফোন রেখে দিয়ে আয়াজ ইয়াহুদ উদগ্রীব আহমদ মুসাকে বলল, 'পুলিশ অফিসারটার টেলিফোন ছিল। উনি জানালেন, এখানে নিহত নেতা গোছের লোকটার মানিব্যাগে একটা চিরকুট পেয়েছে। সেটা একটা ই-মেইল। ই-মেইল মেসেজটা তারা বুঝতে পারছে না। তার একটা কপি পাঠাচ্ছে আমাদের ডিটেকটিভদের কাছে।'

'আল্লাহকে ধন্যবাদ যে তিনি আমাদের কথা মনে করেছেন।' আহমদ মুসা বলল।

‘পুলিশ অফিসারটিকে একটু আলাদা মনে হচ্ছে।’ বলল আয়াজ ইয়াহুদ।

‘পুলিশ অফিসারটা আনকোরা। ষড়যন্ত্রকারীদের ছায়া এখনও ওঁর উপর পড়েনি। না হলে চিরকুটটা আমাদের এখানে আসতো না।’

আয়াজ ইয়াহুদ ও আহমদ মুসারা ডিনার শেষ করে ড্রইংরুমে ফিরে আসতেই পুলিশ অফিস থেকে পাঠানো পুলিশটি এল।

গেটের সিকিউরিটি তাকে নিয়ে এল আয়াজ ইয়াহুদের কাছে। পুলিশটা একটা স্যালুট দিয়ে একটি চিরকুট তুলে দিল। আয়াজ ইয়াহুদ ধন্যবাদ দিয়ে চিরকুটটি গ্রহণ করল।

পুলিশটিকে দেখে ভ্রু কুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার।

তার ইউনিফরম ও বেল্ট অতিমাত্রায় টাইট। আবার তার পায়ে কেটস, পুলিশের বুট নয়। তার মাথার চুলও পুলিশ কাট নয়। হ্যাটের পাশ দিয়ে চুল বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

পুলিশটি চিরকুট আয়াজ ইয়াহুদের হাতে দিয়েই আরেকটা স্যালুট শেষ করে পিছু হটছিল। তার দুহাত ছিল তার প্যান্টের দুপকেটে।

আহমদ মুসা হঠাৎ তার ভেতর থেকে এটা অশ্বস্তি অনুভব করল। পুলিশটির মুখে অস্বভাবিকতা দেখতে পেল সে। পকেটে হাত রাখাকেও সন্দেহজনক মনে হলো তার কাছে। সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এল তার রিভলবার। পুলিশটির দিকে রিভলবার তাক করে বলল, ‘দাঁড়াও, হাত উপরে তোল পুলিশ অফিসার।’

আহমদ মুসা তখন দাঁড়িয়ে গেছে।

পুলিশটি বোঁ করে ঘুরল আহমদ মুসার দিকে। কিন্তু পকেট থেকে তার হাত বের হওয়ার নাম মাত্র নেই। বরং তার দুচোখে হায়েনার দৃষ্টি।

আহমদ মুসা ব্যাপারটা বুঝল। মুহূর্তের বিলম্বে সর্বনাশ ঘটে যেতে পারে।

আহমদ মুসার রিভলবার গুলী বর্ষণ করল। গুলী পুলিশটির কপাল গুড়িয়ে মাথা ছাতু করে দিল।

টলে উঠে পড়ে যাচ্ছিল পুলিশটি।

আহমদ মুসা ছুটে গিয়ে তাকে ধরে ফেলে ধীরে ধীরে শুইয়ে দিল চিৎ করে যাতে তার প্যান্টের দুপাশের পকেটে কোন চাপ না লাগে।

বিস্ময় ও আতংকে চিৎকার করে উঠে আয়াজ ইয়াহুদ, নুমা ইয়াহুদ, বারবারা ব্রাউন ও বেঞ্জামিন উঠে দাঁড়িয়েছে।

চোখে-মুখে অপার কৌতূহল নিয়ে বসে আছে কামাল সুলাইমান ও বুমেদীন বিল্লাহ।

'আহমদ মুসা পুলিশকে হত্যা করলে কেন?' আতংকগ্রস্ত কণ্ঠে বলল আয়াজ ইয়াহুদ।

'এ পুলিশ নয়। পুলিশ অফিসে টেলিফোন করুন।' আহমদ মুসা বলল।

'কি বলছ! এ পুলিশ নয়?' আয়াজ ইয়াহুদ বলল।

'না পুলিশ নয়। আমার অনুমান মিথ্যা না হলে এর দুপকেটেই বিস্ফোরক আছে। পুলিশ অফিসারকে টেলিফোন করুন।' বলল আহমদ মুসা।

'কিন্তু যদি পুলিশ হয় তাহলে মহাবিপদ ঘটবে। ডাকব পুলিশকে?'

'হ্যাঁ ডাকুন।'

পুলিশে টেলিফোন করল আয়াজ ইয়াহুদ।

সেই পুলিশ অফিসার একটা পুলিশ টীমসহ এসে পৌঁছল অল্পক্ষণের মধ্যেই।

পুলিশ অফিসার পুলিশবেশী লোকটির দিকে একবার তাকিয়েই বলল, 'এ পুলিশ নয়। ব্যাপার কি স্যার? কি ঘটেছে? এ কোত্থেকে এল?'

আয়াজ ইয়াহুদ পুলিশবেশী লোকটির আসা থেকে সব কথা খুলে বলল।

শুনে বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে তাকাল আহমদ মুসার দিকে পুলিশ অফিসারটি। বলল, এ পুলিশ নয়, এটা ঠিকই ধরেছেন, কিন্তু একে গুলী করে মারলেন কেন?'

'একে মারতে মুহূর্তও দেরি হলে এ আমাদের সবাইকে মারত।' আহমদ মুসা বলল।

‘কি করে বুঝলেন? এর দুহাতই প্যান্টের পকেটে। আপনার রিভলবারের সামনে সেতো পকেট থেকে হাতই বের করতে পারতো না।’ বলল পুলিশ অফিসার।

‘উত্তরের জন্যে এর দুপকেট পরীক্ষা করুন।’ আহমদ মুসা বলল।

পুলিশ অফিসার পকেট দুটির উপর চোখ বুলিয়ে বুঝল, কোন গোলাকার বস্তু পকেটে আছে, রিভলবার নয়।

ভ্রু কুঁচকালো পুলিশ অফিসারটি। ডাকল তার বিস্ফোরক এক্সপার্টকে। বলল, ‘আমার সন্দেহ হচ্ছে এর পকেটে বোমা জাতীয় কিছু থাকতে পারে। দেখ ব্যাপারটি কি।’

বিস্ফোরক এক্সপার্ট পুলিশ অফিসারটি হাঁটু গেড়ে বসে কাঁচি দিয়ে আস্তে আস্তে, পকেট কেটে ফেলল। বেরিয়ে পড়ল ক্রিকেট বলের মত গোলাকার দুটি বস্তু।

বিস্ফারিত হয়ে গেল বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞের দুচোখ। চিৎকার করে উঠল, ‘আপনারা সবাই সরে যান’।

সবাই দ্রুত নিচে নেমে গেল।

বিস্ফোরণ বিশেষজ্ঞ পুলিশ অফিসার বোমা দুটির মুখ থেকে টেমপোরারি সেফটি কভার খুলে ডেটোনিটিং পিনটি খুলে নিল।

সবাই উপরে উঠে এল।

‘ঈশ্বর সকলকে রক্ষা করেছেন।’ বলে সে আস্তে করে একটি বিস্ফোরক তুলে তার লেবেলটা দেখাল তার ইনচার্জ অফিসারকে।

দেখেই আঁৎকে উঠল পুলিশ অফিসার। বলল, ‘সর্বনাশ, এর একটি বিস্ফোরণ ঘটলে তো এই বাড়ি ধূলা হয়ে যেত।’ বলেই সে ফিরল আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘ধন্যবাদ আপনাকে। বাহককে একমাত্র হত্যাই এই বোমার বিস্ফোরণ রোধ করার উপায় ছিল। আপনি তাই করেছেন। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। এখন আমি ভাবছি, আমার পাঠানো পুলিশের অবস্থা কি?’

‘আমার ধারণা এই সন্ত্রাসীদের এক বা একাধিক লোক পুলিশ অফিস কিংবা এই বাড়ির আশে-পাশে ওঁৎ পেতে ছিল। তারাই আপনার পুলিশকে ধরে

জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনেছে যে, সে আজ বিশ্বাবদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট আয়াজ ইয়াহুদের বাসায় আসছে। তাকে আটকে তার ইউনিফর্ম খুলে নিয়ে তাদের লোককে তা পরিয়ে এখানে পাঠিয়েছিল বোমা ফেলার জন্যে। লোকটি কোনভাবে ইউনিফর্ম পরেছিল, কিন্তু জুতা কিছুতেই পরতে পারেনি। আর আপনার পুলিশ ওদের হাতেই আটকে আছে। অথবা পুলিশকে ওরা ছেড়েও দিতে পারে।' আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ মি. ডিটেকটিভ। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, আপনারা আজ এখানে হাজির ছিলেন।' বলেই পুলিশ অফিসার ফর্মালিটি সারার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তারপর লাশ নিয়ে পুলিশরা বেরিয়ে গেল। যাবার সময় আয়াজ ইয়াহুদকে বলে গেল, আপনার বাড়িতে পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করে যাচ্ছি। তবে আপনাকে ও হাইম পরিবারকে বলছি, এই ডিটেকটিভদের ছাড়বেন না। এঁদের সাহায্য আমাদেরও দরকার।'

পুলিশরা বেরিয়ে যেতেই আয়াজ ইয়াহুদ ও বেঞ্জামিন একসাথে আহমদ মুসাকে জড়িয়ে ধরল। বলল আয়াজ ইয়াহুদ, 'তুমি মানুষ নও ফেরেশতা। বিকাল থেকে দুবার আমাদের সকলকে বাঁচিয়েছ।' আর বেঞ্জামিন বলল, 'আমার, আমার পরিবারের ও আমার পিতার অসীম সৌভাগ্য যে ঈশ্বর আপনাকে পাঠিয়েছেন আমাদের সাহায্যে। ইদানিং আমার পিতা মুসলমানদের ব্যাপারে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। মুসলমানদের জন্মগত বিদ্বেষের কারণে আমি একে ভালোচোখে দেখিনি। কিন্তু আজ দেখছি, মুসলমানরা সন্ত্রাস ও ষড়যন্ত্রের প্রতিপক্ষ হিসাবে আভির্ভুত হয়েছে। আর সন্ত্রাস-ষড়যন্ত্রের প্রতিভূ হয়ে দাঁড়িয়েছি আমি.......।'

আহমদ মুসা নিজেকে ওদের বাহুর পাশ থেকে খুলে নিল এবং বেঞ্জামিনের মুখে হাতচাপা দিয়ে তাকে থামিয়ে দিল। বলল আহমদ মুসা, 'আসুন আমরা বসি। ভূয়া পুলিশের দেয়া চিরকুট কি, ওটা ভূয়া না আসল, তা দেখা হয়নি। ভূয়া হলে আসলটা কি করে পাওয়া যায়, সে চেষ্টা করা যেতে পারে।'

সবার সাথে আহমদ মুসা তার তার আসনে ফিরে এল। নিজের সোফায় ফিরে যাবার সময় আয়াজ ইয়াহুদ ভূয়া পুলিশের কাছ থেকে পাওয়া চিরকুটটা

আহমদ মুসার হাতে দিল। দেবার সময় বলল,‘আমি তো এর আগাগোড়া কিছুই বুঝিনি। কিছু বুঝার থাকলে তুমি বুঝবে।’

আহমদ মুসা চিরকুটের উপর চোখ বুলাল। নিঃসন্দেহ এটা ই-মেইলের ফটোকপি। তবে প্রেরকের জায়গায় যেখান থেকে এসেছে তার নাম নেই। ডেট আছে, পাতার নম্বরও আছে। দুবাক্যের ই-মেইল। প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে ‘DH Shifted to 776 from 833 stop AW asked you to reach there by Eleven.’

আহমদ মুসা ই-মেইলের উপর চোখ বুলিয়ে সেটা তুলে দিল কামাল সুলাইমানের হাতে। কামাল সুলাইলমান ই-মেইল পড়ল। বলল, DH এবং AW এর ভেতরেই রহস্য লুকিয়ে আছে ভাইয়া কিন্তু সংকেত আমি ভাঙতে পারছি না।

‘যাদের কাছে ই-মেইলটা পাওয়া গেছে তাদের পরিচয় ও তাদের বর্তমান অবস্থার সাথে মেলালে ই-মেইলের একটা অর্থ পরিষ্কার হয়ে উঠে। আরও একটা মজার ব্যাপার হলো, আমরা FBI চীফের কাছ থেকে কিছুক্ষণ আগে যে খবর পেলাম, বিস্ময়করভাবে তারই ফলো আপ এটা। সে খবরে আমরা জেনেছিলাম হাইম হাইকেলকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। কোথায় সরিয়ে ফেলা হয়েছে এই খবর FBI চীফ দিতে পারেনি। কিন্তু এই ই-মেইল সেই খবরই আমাদের দিচ্ছে। দেখ..........।’ আহমদ মুসা বাধা পেয়ে গেল।

আহমদ মুসাকে থামিয়ে সোৎসাহে কথা বলে উঠল কামাল সুলাইমান, ‘তাহলে DH অর্থ ডবল এইচ মানে হাইম হাইকেল। আর AW এর অর্থ নিশ্চয় আমরা ধরে নিতে পারি ‘আজর ওয়াইজম্যান।’

‘ঠিক, কামাল সুলাইমান।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ই-মেইল অনুসারে তাহলে তো দেখা যাচ্ছে ভাইয়া, জনাব হাইকেলকে একই রাস্তার বা একই এলাকার এক জায়গায় থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।’

‘হ্যাঁ, কামাল সুলাইমান। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করেছেন। বলল আহমদ মুসা।

তারপর তাকাল আয়াজ ইয়াহুদের দিকে। বলল, 'স্যার শাপ অনেক সময় বর হয়ে দাঁড়ায়। আমরা বুঝতে পারি না। খারাপ ঘটনাও ভাল বার্তা বয়ে আনে।'

'তাইতো দেখছি আহমদ মুসা, ওরা আজ বাড়ি আক্রমণ করতে না এলে এই চিরকুট পাওয়া যেত না। চিরকুটটা পাওয়া না গেলে আমাদের হাইকেলেরও সন্ধান পাওয়া যেত না। সত্যিই আহমদ মুসা আল্লাহ আমাদের সাহায্য করেছেন, বিশেষ করে তোমাকে।' আয়াজ ইয়াহুদ বলল।

'আমি বিশেষ হলাম কিভাবে?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'বিশেষ এর কারণ হলো সাহায্যটা ঈশ্বর তোমার কাছেই পাঠিয়েছেন। তুমিই মেসেজটির সংকেত ভেঙেছ। আমরা যেখানে সংকেত বুঝিইনি, সাহায্য নিতাম কি করে?

'যাক, সব প্রশংসা আল্লাহর।' বলেই আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকাল। বলল, আমরা উঠছি জনাব। কামাল সুলাইমান চল। আর বুমেদীন বিল্লাহ তুমি এখানেই থাকবে।'

'আপনারা যাবেন, আমি থাকব কেন?' বুমেদীন বিল্লাহর কণ্ঠে কিছুটা বিদ্রোহের সুর।

'নিউইয়র্কে এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় আশ্রয়। এখানকার পাহারায় আমাদের কাউকে থাকতে হবে না? সান্ত্বনার সুরে বলল আহমদ মুসা।

'আপনার সিদ্ধান্ত ঠিক আছে ভাইয়া। এর আগে আপনারা দুজন যখন নিচে গিয়েছিলেন ঘোর বিপদের মুখে, তখনও তো ওঁকেই রেখে গিয়েছিলেন। আজ বিকালে মার্কেটে গিয়েছিলেন আপনি ও মি. কামাল সুলাইমান। যখন কোথাও গেলেন তখন তাঁকেই রেখে গেলেন। নিশ্চিতভাবেই উনি গুড কাস্টোডিয়ান।' বলল নুমা ইয়াহুদ।

ফুঁসে উঠল বুমেদীন বিল্লাহ। বলল, 'কাস্টোডিয়ান হওয়া সাংবাদিকের দায়িত্ব নয়। কাস্টোডিয়ান ঠিক কাজ করছে কিনা, সেটা দেখা সাংবাদিকের দায়িত্ব।'

‘তাহলে তো একজন সাংবাদিক কাস্টোডিয়ানের চেয়ে বড় কাস্টোডিয়ান।’

ত্বরিত জবাব হিসাবে কিছু বলতে যাচ্ছিল বুমেদীন বিল্লাহ। তাকে বাধা দিয়ে আহমদ মুসা হেসে বলল, ‘আমরা শান্তিপূর্ণভাবে নিষ্ক্রান্ত হই, তোমরা ঝগড়াটা পরে করো।’

বলেই উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা। বলল সকলকে লক্ষ্য করে, ‘আপনারা সকলে আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। আমাদের এ যাত্রা যেন শুভ হয়। আমরা যেন লক্ষ্য অর্জন করতে পারি। হাইম হাইকেল যেন মুক্ত হন।’

সকলেই উঠে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেকের চোখে-মুখেই একটা প্রবল ভাবাবেগ। কারও মুখে কথা নেই। নিরবতা ভাঙল আয়াজ ইয়াহুদ। বলল, ‘আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন। আর আমি জানি তোমার মত এক হাতেম তাই-এর সাথে আল্লাহর সাহায্য না থেকেই পারে না।’ আবেগে ভারী আয়াজ ইয়াহুদের গলা।

‘কিন্তু ভাইয়া, হাইম হাইকেল আংকেল মুক্ত হলেই কি আপনারা চলে যাবেন?’ নুমা ইয়াহুদের এ প্রশ্নটা অত্যন্ত বেসুরো শোনালেও এর মধ্যে একটা হৃদয়স্পর্শী কাতরতা ছিল।

আহমদ মুসা হাসল। একটু ভাবল তারপর বলল, ‘নুমা এত তাড়াতাড়ি আমরা আমেরিকা ছাড়তে পারবো না। তাকে উদ্ধারের পরই তো আমাদের আসল কাজ শুরু হবে, ধ্বংস টাওয়ারের নিচে যে সত্য চাপা পড়ে আছে সে সত্য উদ্ধারের কাজ।’

একটা নতুন কৌতূহল জাগল আয়াজ ইয়াহুদের, বেঞ্জামিন ও বারবারা ব্রাউনের মুখে। কিন্তু সরল আনন্দে মুখ ভরে গেল নুমা ইয়াহুদের। বলল ‘ধন্যবাদ’ ভাইয়া।

বুমেদীন বিল্লাহকে সালাম দিয়ে, অন্যদের গুডবাই জানিয়ে পেছনে ফিরে দ্রুত সিঁড়ির দিকে এগুলো নিচে নামার জন্যে আহমদ মুসা।

# ৬

আহমদ মুসা 'ডেট্রয়েট'-এর 'অলিভার এইচ পেরী' রোডটা দেখে বিস্মিতই হলো।

অলিভার এইচ পেরী রোডটা ডেট্রয়েট-এর অভিজাত উত্তর এলাকার মাঝখান দিয়ে পুবে এগিয়ে কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিভক্তকারী সেন্টক্লিয়ার কেনাল-এর তীর ঘেঁষে উত্তর-দক্ষিণে প্রলম্বিত কেনাল এভিনিউতে গিয়ে পড়েছে।

সংকীর্ণ সেন্টক্লিয়ার কেনাল-এর মাঝখান দিয়ে কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্ত। সেন্টক্লিয়ার কেনালটা দক্ষিণে গিয়ে 'লেক ইরী'তে, আর উত্তর প্রান্তটা মিশেছে গিয়ে 'লেক সেন্টক্লিয়ার'-এর সাথে।

অলিভার এইচ পেরী রোডের পুব প্রান্তে দাঁড়িয়ে চারদিকটাকে অদ্ভূত সুন্দর লাগল আহমদ মুসার। সেই সাথে তার মনটা ছুটে গেল কয়েকশ বছর আগের অতীতে। সে অতীতটা বড়ই রক্তরঞ্জিত। এই অঞ্চলেও বাস ছিল রেড ইন্ডিয়ানদের। ১৬৬৮ সালে প্রথম এই অঞ্চলে ফরাসি বসতি প্রতিষ্ঠিত হয়। আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ানদের সাথে বিদেশীদের সংঘাত শুরু সেই থেকেই। বৃটিশরা এই অঞ্চল দখল করে নেয় ১৭৬৩ সালে। রেড ইন্ডিয়ানদের সাথে তাদের শেষ ভয়ংকর যুদ্ধ হয় ১৭৯৪ সালে। এই মিচিগান এলাকা বৃটিশরা ১৮১৩ সালে শেষবারের মত দখলে আনে। এই দখলের 'লেক ইরী' যুদ্ধের বিজয়ী বৃটিশ সেনাপতি ছিলেন অলিভার এইচ পেরী। সেই বৃটিশ সেনাপতি অলিভারের নামেই ডেট্রয়েটের এই রাস্তা।

ডেট্রয়েটের এই রাস্তার সৌন্দর্য্য ও সিচুয়েশন আহমদ মুসাকে যতখানি অভিতূত করল, ঠিক ততখানি বিরক্ত হলো বাড়ির নম্বরটা খুঁজতে গিয়ে। আজর ওয়াইম্যানের ঐ লোকের কাছ থেকে পাওয়া ই-মেইল অনুসারে যে বাড়িতে এনে হাইম হাইকেলকে তোলা হয়েছে তার নম্বর হলো ৭৭৬, কিন্তু সাত শতের ঘরে

কোন নাম্বারই এই রাস্তায় নেই। আবার যেখান তাকে শিফট করা হয়েছে, সেই নম্বর হলো ৮৩৩ ই-মেইল অনুসারে। কিন্তু যেখানে ৭শ'র ঘরের নম্বরই নেই, সেখানে ৮ শতের ঘরের নম্বর আসবে কোত্থেকে?

দেখে-শুনে হতাশ কণ্ঠে কামাল সুলাইমান বলল, 'মনে হচ্ছে ভাইয়া ই-মেইলটাই ভূয়া।'

আহমদ মুসার চোখে-মুখে হতাশার কোন চিহ্ন নেই। কিন্তু ভাবছে সে। বলল, 'যেখান থেকে যেভাবে ই-মেইলটা পাওয়া গেছে, তাতে এটা ভূয়া হবার সম্ভবনা নেই কামাল সুলাইমান।'

'কিন্তু নম্বর দুটা যে ভূয়া তা দেখাই তো যাচ্ছে।' বলেই কামাল সুলাইমান হঠাৎ লাফ দিয়ে ঘুরে আহমদ মুসার মুখোমুখি দাঁড়াল। বলল দ্রুতকণ্ঠে ভাইয়া নম্বরের মধ্যে কোন ধাঁধা আছে কি না!'

'সেটাই ভাবছি কামাল সুলাইমান।' বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার কথা স্বগতোক্তির মত শোনাল। ভাবছিল আহমদ মুসা। এক সময় সে বলে উঠল, 'যেখান থেকে হাইম হাইকেলকে শিফট করা হয়েছে, সেই ঠিকানা জর্জ আব্রাহামের মেসেজে আছে। কিন্তু তাতে বাড়ি নাম্বার নেই, বাড়ির নাম আছে। আমরা যদি বাড়ির নাম ধরে খুঁজে বাড়িটা বের করতে পারি, তাহলে বাড়ির নম্বর পাওয়া যাবে এবং সে নম্বরের সাথে এই ই-মেইলের নম্বর মিলালেই নম্বরের ধাঁধাঁ পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

বলেই আহমদ মুসা তার মোবাইল বের করে মেসেজটা দেখে নিল। বাড়িটার নাম 'অলিভার হাউজ।'

'বাড়ির নাম 'অলিভার হাউজ' কামাল সুলাইমান। নামটা বিখ্যাত। নিশ্চয় বড় আকারেই লেখা থাকবে নামটা। চল খুঁজে বের করি।'

বলে আহমদ মুসা হাঁটা শুরু করল।

সন্দেহ সৃষ্টি না করে এমনভাবে দীর্ঘ কয়েক ঘন্টার কষ্টকর সন্ধান শেষে 'অলিভার হাউজ' তারা পেয়ে গেল। রাস্তার দক্ষিণ পাশের পুব প্রান্তের শেষ বাড়ি ওটা। বাড়িটার ছাদ থেকে সেন্টক্লিয়ার কেনালে প্রায় থু থু ফেলা যায়। আর ছাদ সোজা নিচে তাকালেই কেনাল এভেনিউ।

বাড়িটার সামনে গিয়ে মুহূর্তের জন্যে দাঁড়াল আহমদ মুসা। পুরাতন ধরনের বিশাল বাড়িটার শ্বেত পাথরের নেম প্লেটে বাড়িটার নামের নিচেই জ্বল জ্বল করছে বাড়িটার নম্বরঃ ৩৩৮ অলিভার এইচ পেরী রোড।

আহমদ মুসা কামাল সুলাইমান দুজনেই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেখল বাড়ির নাম ও নম্বর।

'ই-মেইল যে ভূয়া, এই বাড়ির নাম ও নম্বরই আবার তা প্রমান করল ভাইয়া।' বলল কামাল সুলাইমান।

'তুমি একজন গোয়েন্দা। চিন্তা না করে কমেন্ট করা তোমার সাজে না। তুমিই বলেছ ই-মেইলের নম্বরের মধ্যে ধাঁধাঁ থাকতে পারে। সে কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন?' আহমদ মুসা বলল।

'স্যরি ভাইয়া, আপনি পাশে থাকায় আমি গোয়েন্দা সে কথা ভুলে গেছি। কারণ সূর্য যখন আকাশে থাকে, তখন চাঁদের কোন দায়িত্ব থাকে না।'

আহমদ মুসা কামাল সুলাইমানের এই কথার কোন জবাব দিল না।

ভাবছিল সে।

এক সময় আহমদ মুসার মুখটা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'কামাল সুলাইমান ই-মেইলের বাড়িটার নম্বর কত আছে?'

'৮৩৩ ভাইয়া।'

'এ বাড়িটার নম্বরটা ডান দিকে পড়তো কত দাঁড়ায়?'

কামাল সুলাইমানের মুখও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'ইউরেকা', ইউরেকা', পাওয়া গেছে ভাইয়া। ই-মেইলে এ বাড়ির নম্বর ডান দিক থেকে লিখে ৩৩৮ কে ৮৩৩ বানিয়েছে।'

'নতুন বাড়ির যেখানে হাইম হাইকেলকে শিফট করা হয়েছে, তার নম্বর লেখার ক্ষেত্রেও তাহলে ওরা ঐ নীতির অনুসরণ করেছে।' আহমদ মুসা বলল।

'ঠিক ভাইয়া। তাহলে নতুন নম্বর দাড়াচ্ছে ৬৭৭ যাকে ডান দিক থেকে লিখলে দাঁড়ায় ৭৭৬ যা ই-মেইলে লিখা হয়েছে।' সাফল্যের আনন্দে মুখ উজ্জ্বল করে বলল কামাল সুলাইমান।

'এতক্ষণ ধরে রাস্তার বাড়িগুলোর নম্বর সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাতে রাস্তার উত্তর পাশের পুব প্রান্তের কোন বাড়ি হবে এটা। যতদূর মনে পড়ছে শেষ বাড়িটাই নম্বরই এই নম্বর ছিল। সে বাড়িটাও দেখেছি এ বাড়িটার মতই বিশাল ও পুরানো ধাঁচের।' আহমদ মুসা বলল।

'চলুন ভাইয়া, যাওয়া যাক।'

'চল, নম্বরটা দেখা যাক। তবে বাড়িতে এখন ঢুকব না।'

রাস্তা ক্রস করে আহমদ মুসা ও কামাল সুলাইমান চলল অলিভার এইচ পেরী রোডের উত্তর পাশে পুব প্রান্তের দিকে।

দুজনে গিয়ে দাঁড়াল বাড়ির সামনে।

দুজনেরই পরণে ট্যুরিস্ট পোশাক। কাঁধে ট্যুরিস্ট ব্যাগ। দুজনের মাথার চুল কালো-লালে মেশানো, কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে। মুখ ভরা দাড়ি। লাল। মুখে রয়েছে লাল মেক আপ। সব মিলিয়ে তারা দুজন নিখুঁত ইউরোপীয় ট্যুরিস্ট পরিণত হয়েছে।

বাড়িটা প্রাচীর ঘেরা।

রাস্তার পাশে কারুকাজ করা বড় গেট।

গেটের পরে বাগান। বাগানের পর বিশাল এলাকা নিয়ে তিনতলা বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। বাড়িটার অন্য তিন পাশেও দক্ষিণ পাশের মত বাগান হবে মনে করল আহমদ মুসা। এ ধরনের বাড়িতে কোন অভিযানে যাওয়া সুবিধাজনক, ভাবলো আহমদ মুসা।

আহমদ মুসারা গেটের সামনে দাঁড়িয়ে বাড়িটার নম্বর আনন্দের সাথে দেখছে আর এসব ভাবছে। আর পথচারীরা ভাবছে দু'বিদেশী ট্যুরিস্ট বাড়িটার ঐতিহ্য, বিশাল ও সুন্দর গেটটার কারুকাজ দেখছে হাঁ করে।

হঠাৎ এক সময় আহমদ মুসা ও কাসাল সুলাইমান দুজনেই অনুভব করল, তাদের পেছনে কয়েকজন লোক এসে দাঁড়াবার পরমুহূর্তেই শক্ত দুটি বস্তু এসে তাদের পিঠে ঠেকল। স্পর্শের ধরন থেকে তারা নিশ্চিতই বুঝল তা বাঘা সাইজের রিভলবারের নল হবে।

সঙ্গে সঙ্গে তারা দুজনই একসাথে ফিরে তাকাচ্ছিল। কিন্তু পেছন থেকে কে একজন শক্ত কণ্ঠে বলল, 'রিভলবারের সাইলেন্সার আছে। মাথা ঘোরাবার চেষ্টা করলেই গুলী করে দেব। চল সামনে চল।'

তার কথার সাথে সাথেই রিভলবারের নলের গুতো খেল তারা পিঠে।

ঘাড় আর ফেরানো হলো না আহমদ মুসাদের। লোকদের দেখতেও পেল না, জানাও হলো না কয়জন তারা। রিভলবারের গুতো খেয়ে তারা সুবোধ বালকের মত হাঁটতে লাগল সামনের দিকে। পেছনের লোকেরাও ছায়ার মত আসতে লাগল তাদের পেছনে।

তারা গেটের মুখোমুখি হতেই গেট খুলে গেল।

আহমদ মুসারা ও পেছনের লোকেরা ভেতরে প্রবেশ করতেই পেছনে দরজা বন্ধ হয়ে গেল স্বয়ংক্রিয়ভাবেই।

আহমদ মুসারা চারদিকটা দেখার জন্যে চোখ তুলে মাথা ঘুরাচ্ছিল। এমন সময় ঘাড়ে কানের নিচটায় প্রচন্ড হাতুড়ির মত একটা আঘাত এসে পড়ল।

গোটা দেহ তার ঝিম ঝিম করে উঠল। ঘুরে গেল মাথা। দুই চোখ তার বন্ধ হয়ে গেল। বোধশক্তি হারিয়ে গেল এক নিকশ অন্ধকারে।

আহমদ মুসা ও কামাল সুলাইমানের দেহ এক সাথেই সংজ্ঞা হারিয়ে খসে পড়ল মাটিতে।

# ৭

ভর্তি মদের গ্লাসটা গলায় উপুড় করে মুখ বিকৃত করে শেরিল শ্যারন বলল, 'এই শালা নিশ্চয় আহমদ মুসা। মনে একটু ভয়-ভীতি নেই। কথা বলছে যেন এটা শ্বশুর বাড়ি। এরকম পাথরের মত নার্ভ তো আহমদ মুসা ছাড়া আর কারো নেই। শালাকে এইবার ফাইনাল ফাঁদে ফেলেছি। মৃত্যুর বাইরে তার মুক্তি নেই।'

থামল শেরিল শ্যারন।

মার্কিন সেনাবাহিনীর একজন সাবেক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শেরিল শ্যারন বর্তমানে ইহুদী গোয়েন্দা সংস্থা ইরগুন জাই লিউমি ও ওয়াল্ড ফ্রিডম আর্মি (WFA) দুয়েরই প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করছে, ডেট্রয়েটে। চরম সাম্প্রদায়িক হিসাবে তার বদনাম ছিল মার্কিন সেনাবাহিনীতে। বৈষম্যমূলক কিছু কাজের অপরাধেই তার চাকুরী যায় সেনাবাহিনী থেকে। চাকুরী যাবার পরেই সে জেনারেল শ্যারনের গোয়েন্দা দলে যোগ দেয়। এখন সে আজর ওয়াইজম্যানের WFA এর সাথে কাজ করছে।

শেরিল শ্যারন থামতেই তার টেবিলের ওপাশে বসা বডি বিল্ডার গোছের জো বিশপ বলল, 'তার ধরা পড়ার পেছনে বেশি কৃতিত্ব কিন্তু আমাদের নিউইয়র্ক অফিসের জেমস-এর। সেই তো খবর দিয়েছে বিদেশী চেহারার দুজন লোক আজ রাতেই ডেট্রয়েটে রওয়ানা দিয়েছে।'

জেমস হলো আয়াজ ইয়াহুদের বাড়িতে হামলাকারীদের একজন। হামলাকারীদের মধ্যে সে একমাত্র পালাতে পেরেছিল। নিউইয়র্ক অফিসসহ সব জায়গায় সেই তাদের অভিযানের মর্মান্তিক বিপর্যয়ের খবর পৌঁছায়। সে আয়াজ ইয়াহুদের বাড়ির পাশে শেষ পর্যন্ত ওঁৎপেতে ছিল। আহমদ মুসা ও কামাল সুলাইমান আয়াজ ইয়াহুদের বাড়ি থেকে বের হলে সে তাদের পেছনে পেছনে

যায়। আহমদ মুসারা ডেট্রয়েটে যাবার জন্যে যে প্লেনের টিকিট কেটেছে সেটাও সে জেনে নেয় এবং জানিয়ে দেয় ডেট্রয়েট অফিসকে।

'জেমস নিজের থেকে যে বুদ্ধিমানের কাজ করেছে তার তুলনা হয় না। তাকেই নিউইয়র্কের চীফ বানিয়ে দেবার সুপারিশ আমি করব।' বলল শেরিল শ্যারন।

'কিন্তু স্যার, এখনও তো আমাদের চীফ আজর ওয়াইজম্যানের কাছ থেকে কোন মেসেজ এল না। এই কথিত আহমদ মুসাদের আমরা কি করব, কোথায় রাখব, সেটা তো আমাদের জানা দরকার।' জো বিশপ বলল।

'এখনও হয়তো উনি আকাশে আছেন। ফ্লোরিডা পৌঁছার পরেই আমাদের বার্তা পাবেন। তারপরই আসবে তার জবাব।

জো বিশপ হাত ঘড়িটা দেখল। বলল, 'স্যার বিমানটা যদি ঠিক সময়ে ফ্লাই করে থাকে, তাহলে সিডিউল মোতাবেক এখন থেকে ২০ মিনিট আগে তিনি ফ্লোরিডায় পৌঁছে গেছেন।'

জো বিশপের কথা শেষ হবার সাথে সাথেই শেরিল শ্যারনের মোবাইল সেটটা বেজে উঠল।

সেটটা উঠাল শেরিল শ্যারন।

'হ্যালো। গুড মর্নি। আমি এস. শ্যারন বলছি।' বলল শেরিল শ্যারন।

'গুডমনিং, আমি আজর ওয়াজম্যান। তোমার জরুরি মেসেজটা কি, তাড়াতাড়ি বল।

শেরিল শ্যারন আহমদ মুসাদের পাকড়াও করার ঘটনাটা জানিয়ে বলল, 'আমাদের মনে হচ্ছে স্যার সে আহমদ মুসাই হবে।'

গলা ছড়িয়ে সোৎসাহে বলে উঠল আজর ওয়াইজম্যান, তার চেহারা ও শরীরের বর্ণনা দাও তো।

বর্ণনা দিল শেরিল শ্যারন।

বর্ণনা শুনে আজর ওয়াইজম্যান বলে উঠল, 'মিলে যাচ্ছে শ্যারন। তুমি ঠিকই ধরেছ। হাইম হাইকেলকে উদ্ধারে আহমদ মুসা আসতেই পারে।'

তারপর একটু নিরব থেকেই উচ্ছাসিত গলায় আজর ওয়াইজম্যান বলল, ‘তুমি ইতিহাস সৃষ্টি করেছ শ্যারন। তুমি শিয়াল ধরতে গিয়ে সিংহ ধরার মত কাজ করেছ। তোমাকে ধন্যবাদ। কোথায় রেখেছ তাকে?’

‘ভূগর্ভস্থ কয়েদ খানায়। পিছ মোড়া করে হাত পা বাঁধা হয়েছে। তার উপর ক্লোরাফরম করে সংজ্ঞাহীন করে রাখা হয়েছে। ঘরের দরজায় দুজন পাহারাদার রাখা হয়েছে।’

‘গুড। কিন্তু আহমদ মুসার জন্যে এটুকু যথেষ্ট নয়। তুমি নিজেই ঘরটার উপর চোখ রাখ। মনে রেখ অস্যধ্য সাধন করার ক্ষমতা আহমদ মুসার আছে। আমি জরুরি কাজ সেরে আজ রাতেই রওয়ানা হব। ততক্ষণে তাকে যে কোন মূল্যে ধরে রাখ। মনে রেখ তাকে ধরে রাখা হাইম হাইকেলের চেয়েও লক্ষগুনে জরুরি। শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নয়, গোটা দুনিয়ায় আমাদের অস্তিত্ব নির্ভর করছে তাকে নিশ্চিহ্ন করার উপর। সে কাজ আমি করব, আসছি। গুড বাই।’

শেরিল শ্যারন টেলিফোন রেখে বলল, ‘দেখেছ বিশপ, বসের গলা কাঁপছে। যার সম্পর্কে কথা বলতে এতদূর থেকে বসের গলা কাঁপছে, তাকে আমরা পাকা ফল ছিঁড়ে নেয়ার মত কেমন সহজে ধরে ফেললাম।’

‘যতটা ভয়ংকর শুনেছি, তেমন মনে হয়নি স্যার। ভয়ংকররা স্বভাবগতভাবেই গোঁয়ার হয়, কিন্তু একে দেখলাম নিরেট ভদ্রসন্তান।’

‘ভদ্র ভয়ংকররাই বেশি ভয়ংকর হয়। আহমদ মুসা সে রকমই একজন।’ বলেই হাত ঘড়ির দিকে তাকাল শেরিল শ্যারন। বলল দ্রুত কণ্ঠে জো বিশপকে, ‘এখন হাইম হাইকেল জেগে উঠার কথা। যাও বল, ওকে লাঞ্চ খাইয়ে আবার ঘুমিয়ে দিতে হবে। ঘুমের ঔষধ আগের ডোজ অনুসারেই।

শুনেই জো বিশপ উঠতে যাচ্ছিল। এ সময় ইন্টারকম প্যানেলের ইমার্জেন্সী লাল বাতি জ্বলে উঠল। সেই সাথে বেজে উঠল টেবিল সাইরেন। তারপর শ্যারনের পি.এ-এর টেলিফোন, ‘স্যার কোথাও থেকে গুলীর আওয়াজ আসছে। সিকিউরিটি ব্রাঞ্চ থেকে ইমার্জেন্সি ঘোষনা করা হয়েছে।’

লাফ দিয়ে উঠল শেরিল শ্যারন।

শেরিল শ্যারন ও জো বিশপ দুজনেই ছুটে বাইরে বেরিয়ে এল।

লক্ষ্যবিহীনভাবে ছুটতে গিয়ে শেরিল শ্যারন বলল, ‘অসাধ্য সাধন যে করতে পারে, সেই আহমদ মুসার বন্দীখানার দিকে আগে চল।’

পরবর্তী বই

# ধ্বংস টাওয়ারের নিচে

**কৃতজ্ঞতায়ঃ**

1. Abu Bakkar Siddique
2. Omar Faruk
3. Muhammad Shahjahan

সাইমুম-৩৯

# ধ্বংস টাওয়ারের নিচে

আবুল আসাদ

# ১

ছুটছিল আহমদ মুসা পূর্বমুখী প্রশস্ত করিডোর ধরে। তার পেছনে বুমেদীন বিল্লাহ।

দুজনের হাতেই দুটি ডেডলি কারবাইন। উদ্যত অবস্থায়। ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যেত দুটো কারবাইনের নল দিয়েই ধুঁয়া বেরুচ্ছে। তাদের পেছনে করিডোরের এক চৌমাথা। চৌমাথার উপর পড়ে আছে ছয় সাতটি লাশ। ওরা ছুটে এসেছিল উত্তর ও দক্ষিণের করিডোরটার দিক থেকে আহমদ মুসাকে বাধা দেয়ার জন্যে। বন্দীখানার ভেতরে প্রহরীদের সাথে যে সংঘর্ষ হয়, তার গুলীর শব্দ তারা পেয়েছিল।

আহমদ মুসার বন্দীখানা থেকে বেরুতে চেয়েছিল নিশব্দেই। কিন্তু তা পারেনি। আবার গেটেও যে গোপন এ্যালার্ম ব্যবস্থা ছিল তা আহমদ মুসারা একবারও ভাবেনি। এ এলার্ম পেয়েই দুপাশ থেকে বাড়তি প্রহরীরা ছুটে এসেছিল গেটের দিকে। এ সবের ফলেই হাইম হাইকেলকে খোঁজার জন্যে আহমদ মুসারা বন্দীখানায় যে কাজটা নি:শব্দে সারতে চেয়েছিল তা আর হয়নি।

তাদেরকে বন্দীখানা থেকে ছয়টি লাশ মাড়িয়ে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। সব আট-ঘাট বেঁধে তাদের বন্দী করে রাখলেও তাতে একটা বড়

ফসকা গিরা ছিল। তাদেরকে ক্লোরোফরম করেছিল তারা ঠিকই, কিন্তু আহমদ মুসা ও বুমেদীন বিল্লাহ তাদের নিশ্বাস বন্ধ করে রাখায় ক্লোরোফরম তাদের উপর কাজ করেনি। তারা সংজ্ঞা হারাবার ভান করে ওদের বোকা বানাতে পেরেছিল।

ওরা আহমদ মুসাদের পিছমোড়া করে বেঁধে মেঝেয় ফেলে রেখে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে যেতেই আহমদ মুসা চোখ খুলেছিল। বুমেদীন বিল্লাহও। গেট আগলাবার ও বন্দীদের উপর নজর রাখার জন্য দুজন প্রহরী রাখা ও তাদের কড়া নির্দেশ দেয়ার বিষয়টাও তারা শুনে নেয়।

চোখ খুলেই মেঝের উপর উঠে বসে আহমদ মুসা। পিছমোড়া করে বাঁধা হাতের বাঁধন পরখ করার চেষ্টা করে বলে, ‘বিল্লাহ ওরা বিশেষ ধরনের রাবার রোপ দিয়ে বেঁধেছে। সম্ভবত এটা কোনভাবেই কাটা যাবে না।’

বুমেদীন বিল্লাহও উঠে বসেছিল। বলেছিল, ‘রাবারের বাঁধন খোলাও কঠিন ভাইয়া।’

আহমদ মুসা চোখ বন্ধ করে একটু ভেবেছিল। বলেছিল, ‘তবে বিল্লাহ রাবার দড়িতে যদি ইলাষ্টিসিটি থাকে, তাহলে কিন্তু একটা পথ বের করা যায়। বাঁধনটা যেভাবে হাতকে কামড়ে ধরেছে, তাতে রাবার দড়িতে ইলাষ্টিসিটি আছে বলেই মনে হচ্ছে। তোমারটা কেমন বিল্লাহ?’

‘ঠিক ভাইয়া, বাঁধনটা হাতে যেন ক্রমশই চেপে বসেছে।’ বলেছিল বুমেদীন বিল্লাহ।

খুশি হয় আহমদ মুসা। ঘরে ছিল ঘুট ঘুটে অন্ধকার। আহমদ মুসা বুমেদীন বিল্লাহর দিকে ঘুরে বসে বলেছিল, ‘আমি একটু চেষ্টা করি। দেখি তোমার বাঁধন কি বলে?’

‘কাজটা খুবই কঠিন ভাইয়া। পিছমোড়া করে বাঁধা হাত খুব একটা শক্তি খাটাতে পারবে না। কিন্তু বাঁধন দারুণ শক্ত বোঝাই যাচ্ছে।’ বলেছিল বুমেদীন বিল্লাহ।

‘তা ঠিক, বাঁধনটা খুবই শক্ত। কিন্তু বাঁধনের একটা সিংগল তারকে তুমি যদি আলগা করতে পার, তাহলে কিন্তু কাজ খুবই সহজ হয়ে যাবে।’ আহমদ মুসা বলেছিল।

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা বুমেদীন বিল্লাহকে আবার বলে, ‘তোমার হাত এদিকে দাও।’

আহমদ মুসা তার দিকে পেছন ফিরেছিল।

আহমদ মুসা হাতের আঙুল দিয়ে বুমেদীন বিল্লাহর হাতের বাঁধন পরীক্ষা করে। অত্যন্ত শক্ত বাঁধন, রাবার ইলাষ্টিক হওয়ার কারণেই বাঁধন আরও কামড়ে ধরেছে হাতকে।

আহমদ মুসা অনেক চেষ্টার পর চিমটি দিয়ে ধরে একটা তারকে আলগা করে তাতে আঙুল ঢোকাতে পারল।

এ সময় বাইরে থেকে একজনের কণ্ঠ শোনা যায়। বলেছিল সে, ‘শালারা সংজ্ঞা হারায়নি। সাবধান। ঘর খোল। ওদের ঘুমিয়ে রাখতে হবে।’

কথাটা কানে যেতেই আহমদ মুসা বুঝে ফেলে সব। নিশ্চয় এঘরে সাউন্ড মনিটর যন্ত্র আছে, এমনকি টিভি ক্যামেরাও থাকতে পারে। তারা ঐভাবে কথা বলে ভুল করেছে।

ব্যাপারটা বুঝার সংগে সংগেই আহমদ মুসা বুমেদীন বিল্লাহর হাতের বাঁধনে ঢুকানো আঙুলটা বড়শির মত বাকা করে হাত দিয়ে জোরে টান দেবার উপায় না খুঁজে পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সামনের দিকে।

আছড়ে পড়ে আহমদ মুসা মেঝের উপর। মুখ খুলে যায় বিল্লাহর হাতের বাঁধনের। বুমেদীন বিল্লাহ দ্রুত বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে এগিয়ে যায় আহমদ মুসার দিকে।

‘তাড়াতাড়ি বিল্লাহ। ওরা দরজা খুলছে।’

বুমেদীন বিল্লাহ অন্ধকারে আহমদ মুসার হাত খুঁজে নিয়েছিল। পরীক্ষা করে দেখে হাতে কামড়ে বসে আছে শক্ত বাঁধন। অন্ধকারে হাতের বাঁধন হাতড়ে একটা তার খুঁজে নিয়ে তা বিচ্ছিন্ন করার মত অত সময় তখন নেই। কিন্তু হঠাৎ পেয়ে গেল গিরার মুখটা। গিরার বাইরে দুই তারের বাড়তি অংশে গিয়েই তার হাত পড়েছিল। সংগে সংগেই বিল্লাহ সেই বাড়তি অংশটুকু ডান হাতে ধরে জোরে টান দেয় এবং আলগা হয়ে উঠে আসা তারের ভেতর বাম হাতের চার আঙুল ঢুকিয়ে তারকে টেনে ধরে। সঙ্গে সঙ্গেই ডান হাতের চার আঙুলও বাম হাতেদের

আঙুলের সাথে গিয়ে যোগ হয়। তারপর 'রেডি ভাইয়া' বলে তীব্র একটা হ্যাচকা টানে ছিড়ে ফেলল রাবারের দড়ি।

হাতের বাঁধন খুলে গিয়েছিল আহমদ মুসার। কিন্তু পায়ের বাঁধন তখনও বাকি। খুলে যায় এই সময় দরজা। উজ্জ্বল আলোয় ভরে যায় ঘর।

হুড়মুড় করে পাশাপাশি দ্রুত হেঁটে দুজন কারবাইন বাগিয়ে ঘরে ঢোকে। তাদের পেছনে আরও দুজন এসেছিল। তারা কারবাইন বাগিয়ে পূর্ব থেকে পাহারায় থাকা দুজনের সাথে দরজা আগলে দাঁড়ায়।

দরজা খোলার আগেই আহমদ মুসা শুয়ে পড়েছিল হাত দুটি পিঠের তলায় নিয়ে, যেন বুঝা যায় তার হাত বাঁধাই আছে। আর পা বাঁধা তা দেখাই যাচ্ছিল।

কিন্তু বিমূঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিল বুমেদীন বিল্লাহ। তার হাত-পা খোলা।

ঘরে ঢুকেই একজন চিৎকার করে ওঠে, 'একশালা বাঁধন খুলে ফেলেছে।'

ঘরে ঢুকে দুজনই বুমেদীন বিল্লাহর দিকে এগোয়। তারা যাচ্ছিল আহমদ মুসার পাঁচ ছয় ফুট দূর দিয়ে।

আহমদ মুসার দেহটা কাত হয়ে নড়ে ওঠে, যেন সে ওদের ভালো করে দেখতে চাচ্ছে।

হঠাৎ আহমদ মুসার দুহাত পিঠের তলা থেকে বেরিয়ে আসে এবং তার দুপা তীরের মত ছুটে গিয়ে আঘাত করে বিল্লাহর দিকে অগ্রসর হওয়া লোক দুজনের হাঁটুর নিচটায়।

ওরা আকস্মিক এই আঘাতে চিৎ হয়ে উল্টে পড়ে যায়। ওরা আহমদ মুসার পাশেই পড়েছিল। আর ওদের একজনের কারবাইন ছিটকে এসে আহমদ মুসার উপর পড়ে।

আহমদ মুসা লুফে নিয়েছিল কারবাইনটা। চোখের পলকে ব্যারেল ঘুরিয়ে নেয় সে দরজায় দাঁড়ানো চারজনের দিকে। ওরাও কি ঘটছে দেখতে পেয়েছিল। প্রথমটায় একটা বিমূঢ় ভাব তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু আহমদ মুসাকে কারবাইন তাক করতে দেখে তারা সম্বিত ফিরে পায়। তারাও ঘুরাতে যায়

তাদের ষ্টেনগানের নল। কিন্তু তখন দেরি হয়ে গিয়েছিল। তাদের ষ্টেনগানের ব্যারেল ঘুরে আসার আগেই আহমদ মুসার গুলীবৃষ্টির শিকার হয় তারা। দেহগুলো ঢলে পড়ে দরজার উপর।

ওদিকে মেঝেয় পড়ে যাওয়া দুজনের একজন গড়িয়ে দ্বিতীয় ষ্টেনগানটার দিকে এগুচ্ছিল। অন্যজন এগুচ্ছিল আহমদ মুসার দিকে।

বুমেদীন বিল্লাহ ছুটে গিয়ে ষ্টেনগানটা আগেই হাত করে নেয় এবং ষ্টেনগানের ব্যারেল ঘুরিয়েই গুলী করে ওদের দুজনকে। আহমদ মুসাও তার ষ্টেনগানের ব্যারেল ঘুরিয়ে নিয়েছিল। বিল্লাহ গুলী করে ওদের দুজনকে লক্ষ্য করে।

'ধন্যবাদ বিল্লাহ, ওয়েলডান।' বলে আহমদ মুসা উঠে বসে এবং পায়ের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে।

আহমদ মুসা ও বিল্লাহ দুজনে দুটি রিভলবার এবং আরও দুটি কারবাইন কুড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল ঘর থেকে।

ছুটছিল আহমদ মুসারা করিডোর ধরে। এখন তাদের কাছে এখান থেকে বের হওয়াটাই একমত্র লক্ষ্য। আহমদ মুসা সিদ্ধান্ত নিয়েই নিয়েছে, এই পরিস্থিতিতে বিজ্ঞানী হাইম হাইকেলকে খোঁজা যাবে না। বের হবার জন্যে আহমদ মুসারা 'এক্সিট' সাইন দেখে সামনে দৌড়াচ্ছে।

ছুটতে ছুটতে হঠাৎ এক সময় আহমদ মুসার মনে হলো কেউ আর বাধা দিতে আসছে না কেন! বন্দীখানা থেকে বের হবার পর করিডোরের প্রথম মোড়টাতেই শুধু দুপাশ থেকে আসা প্রহরীদের বাধার সম্মুখীন হয়েছে তারা। তারপর থেকে তারা সামনে এগুচ্ছেই। কিন্তু কোন দিন থেকেই বাধা আসছে না, প্রতিরোধ আসছে না।

করিডোরটা একটা ঘরে এসে প্রবেশ করল।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল আহমদ মুসা। দ্রুত কণ্ঠে বলে উঠল, 'বিল্লাহ, আমরা নিশ্চিতই ট্রাপে পড়ে গেছি। এক্সিট আসলে............।'

আহমদ মুসা কথা শেষ করতে পারলো না। মেঝেটা তাদের পায়ের তলা থেকে সরে গেল। পাকা ফলের মত তারা পতিত হলো। গিয়ে আছড়ে পড়ল একটা শক্ত মেঝেতে। শব্দটা ফাঁপা ধরনের।

মেঝে শক্ত হলেও আহমদ মুসাদের তেমন একটা লাগেনি। যে উচ্চতা থেকে পড়েছে তা চৌদ্দ পনের ফুটের বেশি হবে না।

শক্ত মেঝেটাতে পড়ার সংগে সংগেই একটা ঝাঁকুনি খেল তারা। তার সাথে উঠল শব্দ। ইঞ্জিন ষ্টার্টের শব্দ।

আহমদ মুসা বুঝল এবং চারদিকে তাকিয়েও দেখল তারা একটা গাড়ির মেঝেতে এসে পড়েছে। তারা পড়ার সময় গাড়িতে ছাদ ছিল না। কিন্তু তারা পড়ার সাথে সাথেই দুপাশ ও পেছন থেকে ষ্টিলের দেয়াল উঠে এসে উপরটা ঢেকে দিয়েছে।

'আমরা একটা গাড়িতে পড়েছি বিল্লাহ। এ গাড়িটাও একটা ফাঁদ।' আহমদ মুসা বলল।

গাড়িটা তখন তীব্র গতিতে চলতে শুরু করেছে।

'ঠিক ভাইয়া। গাড়িটাও একটা ট্রাপ। আমাদের কোথাও নিয়ে যাচ্ছে।'

'আরেক বন্দীখানায় নিশ্চয়।' গাড়িটার চারদিক পর্যবেক্ষণ করতে করতে বলল আহমদ মুসা।

দেখল আহমদ মুসা, তারা যে ফ্লোরের উপর বসে আছে সেটা অল্প দুলছে। পরিষ্কারই বোঝা যাচ্ছে, এটা স্প্রিং-এর উপর রয়েছে। অবাকই হলো আহমদ মুসা। গাড়ি স্প্রিং-এর উপর থাকাটা স্বাভাবিক। কিন্তু ফ্লোর আলাদাভাবে স্প্রিং-এর উপর থাকাটা তার কাছে একেবারেই নতুন। কেন? এর কোন ফাংশন আছে?

উপরে যে ঢাকনাটা গাড়ির ছাদে পরিণত হয়েছে, তার দুপাশে দুটি হাতল। মাথার উপর হাত বাড়ালেই মাথার উপরের ঢাকনাটা পাওয়া যায়। ভাবল খোলার এটা একটা ম্যানুয়াল ব্যবস্থা হতে পারে।

মেঝের উপর আরেক দফা চোখ বুলাতে গিয়ে আহমদ মুসা আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করল। মেঝেটা লম্বালম্বি দুভাবে বিভক্ত। মাঝ বরাবর দুঅংশের

জোড়। জোড়টা আলগা মনে হলো আহমদ মুসার কাছে। জোড়টা লম্বালম্বির দুপ্রান্তে অস্পষ্ট হলেও ঘর্ষণের দাগ দেখতে পেল আহমদ মুসা। ভ্রুকুঞ্চিত হলো তার। স্প্রিং-এর কারণে উঁচু-নিচুঁ হবার ফলে এ দাগ হয়নি। আরও বড় ধরনের কোন আঘাতের ফলেই এ দাগ সৃষ্টি হতে পারে। কি সে আঘাত? ভাবছিল আহমদ মুসা।

'কি দেখছেন ভাইয়া? গুরুত্বপূর্ণ কিছু?' বুমেদীন বিল্লাহ বলল।

'বিল্লাহ আমার মনে হচ্ছে, গাড়ির উপরের ঢাকনার মত গাড়ির এ ফ্লোরটাও স্থানান্তরযোগ্য।' বলল আহমদ মুসা।

'তার মানে? ঢাকনা যেমন সরে গিয়ে আমাদের গ্রহণ করেছে, তেমনি এ ফ্লোরও কি সরে গিয়ে আমাদের ফেলে দেবে?' বুমেদীন বিল্লাহ বলল।

বিস্ময়-বিস্ফোরিত দৃষ্টিতে তাকাল আহমদ মুসা বিল্লাহর দিকে। পরক্ষণেই তার চোখে বিস্ময়ের বদলে দেখা দিল এক ঝলক আনন্দ। বলল, 'তুমি ঠিক বলেছ বিল্লাহ। তোমাকে ধন্যবাদ। আমি তাৎপর্য খুঁজে পাচ্ছিলাম না। সত্যিই তুমি যা বলেছ, তার বাইরে আর কোন অর্থ দেখা যাচ্ছে না।'

একটু থেমেই আহমদ মুসা আবার বলে উঠল, 'ঢাকনা খোলা ছিল আমাদের গ্রহণ করে নিয়ে আসার জন্যে, তাহলে ফ্লোর খুলবে কি আমাদের নামিয়ে দিয়ে চলে যাবার জনে?'

'সেটা কি হবে নতুন বন্দীখানা?'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'বিল্লাহ, তুমি সাংবাদিক থেকে একেবারে গোয়েন্দা বনে যাচ্ছ।' আহমদ মুসা বলল।

বুমেদীন বিল্লাহ কিছু বলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ গাড়িটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল।

ঝাঁকুনির সাথে সাথেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়েছে।

উঠে দাঁড়াবার সাথে সাথেই সে অনুভব করল পায়ের তলার মেঝে নড়ে উঠেছে।

সংগে সংগে আহমদ মুসা চিৎকার করে উঠল, 'বিল্লাহ ফ্লোর নেমে যাচ্ছে। সাবধান গাড়ি ছেড় না।'

বলেই আহমদ মুসা এদিক ওদিক তাকিয়ে ডান হাত বাড়িয়ে গাড়ির ছাদের ডান দিকের হাতলটি ধরে ফেলল।

বুমেদীন বিল্লাহ বসেছিল। সাবধান হবার সুযোগ নিতে পারেনি। শেষ মুহূর্তে পড়ে যাবার সময় কোন অবলম্বন না পেয়ে আহমদ মুসার একটি পা দুহাতে জড়িয়ে ধরল।

আহমদ মুসা ডান হাত দিয়ে হাতলের উপর ঝুলে পড়েছিল। বিল্লাহ ঝুলে পড়ল আহমদ মুসাকে ধরে।

ছোট দুটি স্ক্রুতে আটকানো হাতলের পক্ষে দুজনের ভার বহনের শক্তি ছিল না। আহমদ মুসার হাত অনুভব করল হাতল ঢিলা হয়ে যাচ্ছে। আহমদ মুসা চিৎকার করে বিল্লাহর উদ্দেশ্যে বলল, 'তাড়াতাড়ি আমার গা বেয়ে উঠে এসে বাঁ দিকের হাতলটি ধর। এ হাতলটি খসে যাচ্ছে। আহমদ মুসাও বাম হাত দিয়ে বাঁ দিকের হাতল ধরার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না।

বিল্লাহ একবার তাকাল উপর দিকে। তারপর আহমদ মুসাকে ছেড়ে দিল। পড়তে লাগল সে নিচের দিকে।

আহমদ মুসা নিচের দিকে তাকিয়ে 'বিল্লাহ' বলে চিৎকার করে উঠল। তারপর নিজেও তার হাত ছেড়ে দিল হাতল থেকে।

কিন্তু বিল্লাহ পড়ে যাওয়ার পরক্ষণেই গাড়ির ফ্লোর আবার উঠে আসতে শুরু করেছে। উঠে আসা ফ্লোরে আহমদ মুসার দেহ আটকে গেল।

আহমদ মুসার মুখ বেদনায় নীল হয়ে উঠেছে। গাড়ির ষ্টিলের ফ্লোরে একটা মুষ্ঠাঘাত করে বলল, 'ও আল্লাহ, বিল্লাহ একা কোথায় গেল!'

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল কিন্তু গাড়িটা আবার ভীষণ বেগে পেছন দিকে যাত্রা শুরু করল।

আহমদ মুসা বুঝল গাড়িটা যেখান থেকে এসেছে সেখানেই ফিরে যাচ্ছে। আরও বুঝল, গাড়িটা নিশ্চয় স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলছে। তা না হলে সে পড়ে যায়নি এটা জানার পর গাড়ি এভাবে ফেরত যেত না এবং আবার ফ্লোর নামিয়ে দিয়ে তাকেও ফেলার চেষ্টা করত।

উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

গাড়িকে থামানো কিংবা গাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়া যায় কিনা তার উপায় সন্ধান করতে লাগল।

আহমদ মুসা ভাবল, গাড়িটা স্বয়ংক্রিয় হলে অবশ্যই তা কতকগুলো অবস্থা বা সময়-সীমা দ্বারা পরিচালিত হয়। সেগুলো কি?

তারা যখন গাড়ির মেঝেতে আছড়ে পড়ে, তখন দুপাশ থেকে ঢাকনা এসে গাড়িকে ঢেকে দেয় এবং গাড়িও ষ্টার্ট নেয়। তাদের আছড়ে পড়া, গাড়ি ঢাকনায় ঢেকে যাওয়া এবং ষ্টার্ট নেয়া কি একে-অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত? আবার গাড়ি তার লক্ষ্যে পৌছে যাওয়ার পর গাড়ির ফ্লোর খুলে যাওয়া, আবার বন্ধ হওয়া এবং গাড়ি ষ্টার্ট নেয়ার বিষয়টা নিশ্চয় নির্ধারিত প্রোগ্রাম ও সময়-সীমার সাথে সম্পর্কিত।

আহমদ মুসা গাড়ির ঢাকনার দুটি হাতলের কথা ভাবল। হাতল রাখার মধ্যে নিশ্চয় বড় কোন তাৎপর্য আছে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভাবল, হাতলের উপর ঝুলেই তো সে একবার বেঁচেছিল। কিন্তু ঢাকনা তো খুলে যায়নি। আবার ভাবল, দুহাতল একসাথে ধরে সে একটা চেষ্টা করতে পারে।

চিন্তার সাথে সাথেই আহমদ মুসা দুহাত বাড়িয়ে দুপাশের দুটি হাতল ধরে ঢাকনার উপর চাপ সৃষ্টির জন্যে ঝুলে পড়ল।

সংগে সংগেই ঢাকনাটি গুটিয়ে গিয়ে ইঞ্জিন ও ক্যারিয়ারের মাঝখানে ঢুকে গেল।

আহমদ মুসা আছড়ে পড়ল ক্যারিয়ারের সামনের প্রাচীরের উপর। তার দুটি হাত ঢাকনার ফাঁকে পড়ে থেঁথলে গেল।

কিন্তু সে দেখল গাড়িটা থেমে গেছে।

গাড়ি থেমে গেলেও আহমদ মুসা কিছুক্ষণ নড়তে পারলো না আছড়ে পড়ার ধাক্কা এবং বেদনার নি:সাড় হয়ে যাওয়া দুটি হাত নিয়ে।

শীঘ্রই আহমদ মুসা শরীরটাকে টেনে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। প্রথমেই চোখ পড়ল ড্রাইভিং বক্সের দিকে। যেখানে ড্রাইভিং সিট বা ড্রাইভার কিছুই দেখল না। আহমদ মুসা নিশ্চিত হলো গাড়িটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলে কম্পিউটারাইজড প্রোগ্রাম অনুসারে।

দ্রুত তাকাল দুপাশের দিকে। দেখল একটা সুড়ঙ্গের দক্ষিণ পাশ ঘেঁষে রেল। তার উপরে দাঁড়ানো গাড়িটা। আর উত্তর দিকে দিয়ে মসৃণ একটা পথ, ফুটপাথ বলা যায়, রাস্তাও বলা যায়। দুটো গাড়ি পাশাপাশি চলতে পারে।

আহমদ মুসা দিকটা ঠিক করলো অনুমানের উপর। আহমদ মুসার ধারণা সুড়ঙ্গটা ডেট্রোয়েট ডেট্রোয়েট নদীর দিকে চলে গেছে। আর ডেট্রোয়েট নদীটা নগরীর পূর্ব প্রান্ত ঘেঁষে।

আহমদ মুসা লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নামল। সে মাটিতে পড়ার আগেই গাড়ি ছুটতে শুরু করেছে। গাড়ির ফোল্ড হওয়া ঢাকনাটাও উঠে এসে ঢেকে দিয়েছে গাড়িটাকে।

বুঝল আহমদ মুসা, নামার জন্যে যখন সে ডান পা উপরে তোলে তখন বাম পায়ের একটা বাড়তি চাপ পড়েছিল গাড়ির মেঝের উপর। সেই চাপেই গাড়িটা ষ্টার্ট নিয়ে থাকতে পারে। আর গাড়ি চলার সাথে নিশ্চয় সম্পর্ক আছে ঢাকনা গাড়িটাকে ঢেকে দেয়ার।

আহমদ মুসা লাফ দিয়ে নেমেই ছুটল যে দিক থেকে এসেছিল সেই দিকে। বিল্লাহর কি অবস্থা হয়েছে কে জানে! তাকে উদ্ধারই এখন প্রথম কাজ।

দশ মিনিট দৌড়াবার পর এক জায়গায় এসে তাকে থমকে দাঁড়াতে হলো। সামনে সুড়ঙ্গ জুড়ে ষ্টিলের দেয়াল। বাম দিকে তাকিয়ে দেখল, গাড়ি চলার রেলটি ষ্টিলের দেয়ালের ভেতরে ঢুকে গেছে। আহমদ মুসা বুঝল, ষ্টিলের দেয়াল খোলা যায়। নিশ্চয় এ জন্যে কোন স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা আছে।

আহমদ মুসা একটু এগিয়ে টোকা দিল দেয়ালের গায়ে। একদম নিরেট ষ্টিলের দেয়াল। দেয়ালের গা সহ উপর নিচে অনেক খোঁজাখুঁজি করল দেয়াল সরিয়ে দেয়া বা দেয়ালে দরজা খোলার কোন ক্লু পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু কিছু পাওয়া গেল না। ভাবল আহমদ মুসা, হতে পারে রেলের উপর, গাড়ির চাপের সাথে সম্পর্কিত কোন স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা আছে।

উদ্বিগ্ন হলো আহমদ মুসা। ভেতরে ঢুকতে না পারলে খুঁজবে কি করে বুমেদীন বিল্লাহকে। সে বিপদে পড়েনি তো! যেখানে সে পড়েছে, সেটা নিশ্চয় আন্ডার গ্রাউন্ড বন্দীখানা। বন্দীখানা হওয়ার অর্থ লোকজন সেখানে আছে।

তাদের হাতেই সে এখন পড়েছে। তারা বিল্লাহর উপর চরম কিছু কি করবে? শংকিত হলো আহমদ মুসা। কিন্তু ভাবল আবার, আহমদ মুসাকে না পাওয়া পর্যন্ত বিল্লাহকে তারা কিছু করতে নাও পারে।

গাড়ির রেল ট্রাক থেকে উত্তর পাশের রাস্তায় উঠে আসার জন্যে আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়াল। ঠিক এ সময়ই আহমদ মুসা অনুভব করল তার পায়ের তলার মাটি কাঁপছে।

কি কারণে মাটি কাঁপছে? জেনারেটর চলা, গাড়ি চলা ইত্যাদি নানা কারণে মাটি কাঁপতে পারে। তাহলে আবার সেই গাড়ি ফেরত আসছে না তো?

চিন্তার সাথে সাথেই আহমদ মুসা রাস্তার উপর শুয়ে পড়ে রেল-এর উপর কান পাতল। রেলের উপর গাড়ির চাকার ঘর্ষনের স্পষ্ট শব্দ শুনতে পেল আহমদ মুসা।

গাড়ি ফিরে আসছে নিশ্চিত হলো আহমদ মুসা। কিন্তু কেন ফিরে আসছে? ধরা পড়া বন্দীদের কাছে আসছে? সে ধরা পড়েনি এটা নিশ্চয় ওরা জেনে ফেলেছে এবং তাকে খোঁজার জন্যেই ওরা আসছে?

যা হোক, এখন তাকে লুকাতে হবে। কিন্তু কোথায়?

চারদিকে চোখ বুলাল আহমদ মুসা। লুকানোর মত আশ্রয় কোথাও নেই। অথচ কিছুতেই ওদের চোখে পড়া যাবে না।

অবশেষে রেল লাইনটার পাশে মরার মত পড়ে থাকার কথা চিন্তা করল। তাতে সহজে ওদের চোখে পড়লেও আকস্মিক আক্রমণ করার একটা সুযোগ থেকে যাবে।

চিন্তার সাথে সাথেই আহমদ মুসা রেল লাইনটার পাশে সটান শুয়ে পড়ল। ছুটে আসছে গাড়ি।

কান খাড়া করে চোখ বন্ধ করে নিঃসাড়ে পড়ে আছে আহমদ মুসা। শব্দ শুনে যখন মনে হলো গাড়ি দৃষ্টি সীমার মধ্যে পৌছেছে, তখন আস্তে মাথাটা একটু কাত করে সামনে তাকাল।

গাড়ি দেখতে পেল সে। গাড়িটা খোলা নয়, ঢাকা।

খুশিতে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা। গাড়িতে যারা আসছে, তারা তাকে দেখতে পাবে না। বরং সে এখন ভেতরে ঢোকার জন্যে এই গাড়ির সাহায্য নিতে পারে।

গাড়ির রেল লাইন থেকে ফুট তিনেক সরে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

পরিকল্পনা ঠিক করে নিয়েছে সে।

গাড়ি এই দেয়ালের কাছে এসে যে থামবে না সেটা সেটা জানে। তারা আসার সময় এখানে গাড়ি থামেনি। বন্দীদের নামিয়ে দেবার জন্যে বন্দীখানার উপরে গিয়েই প্রথম থেমেছিল।

গাড়ি এসে গেছে। আহমদ মুসা রেল লাইনটার পাশ বরাবর সামনে এগিয়ে দেয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। গাড়ি তখনও দশ বারো ফুট দূরে।

আহমদ মুসার পাশ থেকেই দেয়ালের একটা অংশ নিঃশব্দে উপরে উঠে গেল। যে দরজাটা উন্মুক্ত হলো তা গাড়িটা সহজভাবে ঢোকার জন্য যথেষ্ট। দরজা খোলার সেকেন্ডের মধ্যেই গাড়িটা ঢুকে গেল ভেতরে।

দরজার পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল আহমদ মুসা। গাড়িটা ঢুকে যাওয়ার পর মুহূর্তেই আহমদ মুসা চোখের পলকে দেয়ালের এপার থেকে ওপারে ঢুকে গেল। ঢুকেই ভেতরের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। তার সাথে সাথেই বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

বাহির থেকে ভেতরটা একেবারেই আলাদা। বর্গাকৃতির বিশাল ঘর। মেঝেতে দামী পাথর বিছানো। অবশিষ্ট তিনটি দেয়ালেই দরজা।

ঘরের উত্তর দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়েছে গাড়িটা। উত্তর দেয়ালেও একটা দরজা। সবগুলো দরজাই বন্ধ। ঘরে লুকানোর কোন আড়াল নেই।

গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়তে দেখেই আহমদ মুসা ছুটে গিয়ে গাড়ির ওপাশের দেয়াল ও গাড়ির চাকার মাঝখানে আশ্রয় নিল।

আহমদ মুসা হাঁটু গেড়ে বসে সবে উপর দিকে তাকাল। দেখল, একটা অস্পষ্ট শীষ দেয়ার শব্দ করে গাড়ির উপরের কভার সরে গেল। গাড়ির মেঝেতে বসা একজনের মাথার হ্যাট নজরে পড়ল আহমদ মুসার। তাড়াতাড়ি আহমদ মুসা গাড়ির তলে সরে গেল।

'জন, চল নেমে পড়ি।' গাড়ির মেঝে থেকে একজনের কণ্ঠ শোনা গেল।

‘চল, মিখাইল। কিন্তু জ্যাকের তো এতক্ষণে এখানে পৌছার কথা। এদিকটা একবার দেখে আমরা ওদিকে যেতে পারি। হারামজাদাটা লুকালো কোথায়, তাকে তো পেতে হবে!’ বলল জন নামের লোকটি।

‘চিন্তা নেই, ছোটটাকে তো পাওয়া গেছে। তার মুখ থেকেই সব কথা বেরুবে। চল।’ মিখাইল নামের লোকটি বলল।

বলে মিখাইল নামের লোকটি নিচে লাফিয়ে পড়ল।

‘হ্যাঁ তা তো দেবেই।’ নিচ থেকে বলল মিখাইল।

আহমদ মুসা গাড়ির নিচে মেঝে দিয়ে সাপের মত এগুচ্ছে মিখাইলের দিকে। এগুবার সময় ভাবল, গাড়ির নিচের এই মেঝেটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা আছে। এদিক দিয়েই কিছুক্ষণ আগে বুমেদীন বিল্লাহ পড়ে গেছে। এ পর্যন্ত ভাবতেই তার বুকটা ধক করে কেঁপে উঠল মিখাইলের কথায়। বুমেদীন বিল্লাহ তাহলে এখন ওদের হাতে! বিল্লাহকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যেই এরা তাহলে এসেছে!

এটা চিন্তা করে নতুন করে সে ভাবল, বিল্লাহর কাছে পৌছা পর্যন্ত এদের ফলো করা উচিত হবে। এর আগে সে ভেবেছিল এদের দুজনকে কাবু করে গাড়ির কাছে রেখে দিয়ে সে বিল্লাহর সন্ধানে যাবে। এ সিদ্ধান্ত নিয়েই সে মিখাইলের দিকে এগুচ্ছিল। গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নামল জনও।

দুজনে এগুলো পুবের দরজার দিকে। আহমদ মুসার দুচোখ তাদের অনুসরণ করল। ওরা দুজন গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়াল।

ওদের একজন গিয়ে দরজার বাম পাশের দেয়ালে লম্বালম্বি আয়তাকার একটা প্যানেলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কালো বোর্ডের উপর সাদা ‘কী’ ডিজিটগুলো জ্বল জ্বল করছে। প্যানেলের সাইজ দেখে আহমদ মুসা ধরে নিল ওটা আলফাবেটিক্যাল প্যানেল হবে।

লোকটি তার তর্জনি দিয়ে প্যানেলের ‘কি’ গুলোতে টোকা দিতে লাগল। টোকা শেষ হতেই দরজা খুলে গেল।

ওরা দরজা দিয়ে ওপারে ঢুকে গেল। আর সাথে সাথেই বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

আহমদ মুসা ছুটে গিয়ে যখন দরজার কাছে দাঁড়াল, তার আগেই দরজা বন্ধ হওয়ার ক্লিক শব্দ বাতাসে মিলিয়ে গেছে।

আহমদ মুসা দ্রুত গিয়ে প্যানেলের কাছে দাঁড়াল।

লোকটির নক করা দেখেই আহমদ মুসা জেনে ফেলেছে যে, সে কিবোর্ডে 'DAVID' টাইপ করেছে। অর্থাৎ 'DAVID' দরজার খোলার 'পাস ওয়ার্ড'।

আহমদ মুসা দ্রুত 'DAVID' টাইপ করল কি বোর্ডে। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল।

আহমদ মুসা উঁকি দিল দরজা দিয়ে। দেখল, ওরা ডান দিকে করিডোর ধরে এগুচ্ছে। দুদিকে চকিতে একবার চেয়েই আহমদ মুসা বুঝল, করিডোরটি এ ঘরকে তিন দিক থেকে বেষ্টন করে আছে। করিডোরের ওপাশ দিয়ে ঘরের সারি।

আহমদ মুসা কাঁধ থেকে কারবাইনটা হাতে নিয়ে বিড়ালের মত ওদের পেছনে ছুটল।

ওরা দুজন প্রথমে পশ্চিম দিকে বাঁক নিয়ে কিছুটা এগিয়ে উত্তরমূখী আরেকটা করিডোর ধরে এগিয়ে চলল।

ওদের পিছে পিছে এগুচ্ছে আহমদ মুসা।

একটা ছোট করিডোরের বাঁকে বসে পড়ল আহমদ মুসা। বাঁক ঘোরার অপেক্ষা করছে সে। অকস্মাৎ বিনামেঘে বজ্রপাতের মত গলার দুপাশ দিয়ে দুটো হাত এসে তাকে চেপে ধরল।

সবটুকু মনোযোগ সামনে দিতে গিয়ে পেছনের ব্যাপারে সাবধান হয়নি আহমদ মুসা। এখন কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পারল সে। বুঝল, এই অবস্থায় সামনে-পিছনে দুদিক সামলানো তার পক্ষে সম্ভব হবে না। আক্রান্ত হয়েও আহমদ মুসা তাই আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ না করে তার কারবাইন তুলে গুলী বৃষ্টি করল সামনের দুজনকে লক্ষ্য করে।

আক্রমণকারীর দুটি হাত তখন আহমদ মুসার গলায় চেপে বসেছে। কারবাইনটা তখনও আহমদ মুসার হাতে। কিন্তু আক্রমণকারীকে তার কারবাইনের নলের আওতায় আনার অবস্থা তখন আহমদ মুসার নেই। গলা থেকে মাথা পর্যন্ত অংশ প্রায় অকেজো হয়ে পড়ছে। শ্বাস নালীর উপর চাপ পড়ায়

শরীরের সক্রিয়তাও কমে যাচ্ছে। বুক, চোখ ও মাথার উপর চাপ কষ্টকর হয়ে উঠছে। বাঁচার জন্যে কিছু করার সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে।

শেষ সময়টুকুর সদ্ব্যবহার করতে চাইল আহমদ মুসা। সে সবটুকু দম একত্রিত করে দুহাতে আক্রমণকারীর জ্যাকেটের কলার জাপ্টে ধরে পা থেকে কোমর পর্যন্ত ঠিক খাড়া রেখে কোমর বাঁকিয়ে মাথা নিচে ছুড়ে দিয়ে ধনুকের মত বাঁকিয়ে নিয়ে এল।

আহমদ মুসার এ কাজটা ছিল তীব্র গতির এবং আকস্মিক। লোকটার পেছনটা আহমদ মুসার উপর দিয়ে ঘুরে এসে মাটিতে পড়ল।

লোকটির দুহাত আহমদ মুসার গলা থেকে আলগা হলো বটে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার সে আহমদ মুসার গলা জড়িয়ে ধরল।

ততক্ষণে আহমদ মুসার বুক ভরে নিঃশ্বাস নেয়া হয়ে গেছে।

লোকটি আধা শোয়া অবস্থায় তার দুহাত আহমদ মুসার ঘাড়ে লক করে আহমদ মুসাকে মাটিতে ফেলার চেষ্টা করতে লাগল।

আহমদ মুসা উবু অবস্থায় ছিল। সে দুপা প্রসারিত করে লোকটির ঘাড়ে লাগিয়ে একদিকে সে লোকটির দেহ পেছন দিকে পুশ করল, অন্যদিকে নিজের কাঁধ নিজের পেছন দিকে সজোরে ঠেলে দিল।

লোকটির দুহাত খসে গেল আহমদ মুসার কাঁধ থেকে।

হাত থেকে পড়ে যাওয়া কারবাইনটা পাশেই পড়ে ছিল। আহমদ মুসা দ্রুত তা কুড়িয়ে নিল এবং কারবাইনের নল ঘুরিয়ে নিল লোকটির দিকে।

লোকটিও তার হাত ছুটে যাবার সাথে সাথে উঠে দাঁড়াচ্ছিল। আহমদ মুসাকে কারবাইন হাতে নিতে দেখে সেও পকেট থেকে বের করে নিয়েছিল রিভলবার। তার রিভলবার ধরা হাত উঠে আসছিল।

কিন্তু গুলী করার সময় সে পেল না। তার আগেই আহমদ মুসার কারবাইনের গুলীতে তার বুক ঝাঁঝরা হয়ে গেল।

গুলী করেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল এবং কারবাইনটা বাগিয়ে ধরে ছুটল জন-মিখাইলরা যে দিকে যাচ্ছিল সেদিকে। জন ও মিখাইলের লাশ ডিঙাবার সময় দেখল তাদের কেউই বেঁচে নেই।

ওদের লাশ ডিঙাবার পরই করিডোরের একটি বাঁকে গিয়ে পৌছল। তার সামনে মানে উত্তরে এগোবার পথ বন্ধ। সে পূর্ব-পশ্চিম লম্বা সরল রেখার মত একটা করিডোরের মুখোমুখি।

কোনদিকে যাবে? বুমেদীন বিল্লাহকে কোথায় তারা রেখেছে? ঠিক এই সময়ে আহমদ মুসার নজরে পড়ল করিডোরের পশ্চিম দিক থেকে পাঁচ ছয়জন ছুটে আসছে করিডোর ধরে। ওদের প্রত্যেকের হাতেই কারবাইন।

আহমদ মুসা এক ধাপ পেছনে হটে দেয়ালের আড়ালে দাঁড়াল। ওদের পায়ের শব্দের দিকে উৎকর্ণ হয়ে থাকল কিছুক্ষণ।

ধীরে ধীরে ওদের পায়ের শব্দ নিকটতর হচ্ছে, ক্রমেই বাড়ছে ওদের পায়ের শব্দ। একেবারে কাছে এসে গেছে ওরা। হঠাৎ ওদের পায়ের শব্দ থেমে গেল। ভ্রুকুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার। ওরা দাঁড়াল কেন?

ব্যাপার কি দেখার জন্যে অতি সন্তর্পণে মুখটা সামনে এগিয়ে উঁকি দিল।

উঁকি দেবার সাথে সাথেই এক ঝাঁক গুলী ছুটে এল তার দিকে।

মাথা সরিয়ে নিয়েছে আহমদ মুসা। এক ঝাঁক গুলী তার মাথার কয়েক ইঞ্চি সামনে দিয়ে ছুটে গেল। মাথা সরিয়ে নিতে মুহূর্ত দেরি হলে তার মাথা ছাতু হয়ে যেত।

উঁকি দিয়ে প্রথম দৃষ্টিতেই আহমদ মুসা দেখতে পেয়েছে ওরা দাঁড়িয়ে নেই, শিকারী বাঘের মত এক ধাপ এক ধাপ করে নিঃশব্দে তার দিকে এগুচ্ছে।

এর অর্থ ওরাও আহমদ মুসাকে দেখতে পেয়েছে, এ বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে গেল আহমদ মুসার কাছে। তার মানে যুদ্ধ সামনে।

আহমদ মুসা কারবাইনের ট্রিগারে হাত রেখে দেয়ালে পাজর ঠেস দিয়ে কৌশল নিয়ে ভাবছে।

এ সময় ওদিক থেকে গুলী শুরু হয়ে গেল। গুলী আসছে অবিরাম ধারায়। গুলীর এক অংশ দেয়ালের কোনায় এসে বিদ্ধ হচ্ছে। বেশীর ভাগই দেয়ালের পাশ দিয়ে গিয়ে করিডোরের বিপরীত দিকের দেয়ালকে বিদ্ধ করছে।

এভাবে অনর্থক পাগলের মত গুলী বর্ষণ করে চলার অর্থ কি? নিজেকেই এ প্রশ্ন করল আহমদ মুসা। পরক্ষণেই উত্তর তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

আসলে ওদের মতলব হলো, আহমদ মুসা যাতে আক্রমণের সুযোগই না পায় এজন্যেই ওদের অব্যাহত আক্রমণ। তাদের এখনকার অনর্থক আক্রমণই এক সময় অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে। এখন যে গুলী কৌণিকভাবে আসছে, তা সমান্তরালে আসতে শুরু করলেই আহমদ মুসা গুলী বৃষ্টির মুখে অনাবৃত হয়ে পড়বে।

এই সুযোগ আহমদ মুসা তাদের দিতে পারে না। কিন্তু কোন পথে এগুবে সে।

এই আক্রমণের মধ্যেও তাকে পাল্টা আক্রমণের জন্যে একটা ফাঁক বের করতে হবে।

আহমদ মুসা লক্ষ্য করে দেখল ছুটে আসা গুলীর ¯্রােত সীমাবদ্ধ আছে এক ফুট থেকে চার ফুট উচ্চতার মধ্যে। নিচের এক ফুট মাত্র তার জন্যে নিরাপদ জোন। এটাই তার পাল্টা আক্রমণের জন্য সুড়ঙ্গ পথ।

আহমদ মুসা শুয়ে পড়ে সাপের মত এগুতে লাগল সামনে। করিডোরটির মুখে দেয়ালের শেষ প্রান্তে গিয়ে থামল আহমদ মুসা। ভাবল, সুযোগের এই সুড়ঙ্গটা মাত্র একবারই ব্যবহার করা যাবে। ওদেরকে বন্দুকের আওতায় আনার দরজা করে দেবে মাত্র একবারের জন্যে। সুতরাং তার প্রথম আক্রমণটা হবে শেষ আক্রমণ।

আহমদ মুসা তার কারবাইনের লোডটা পরীক্ষা করে নিল। তারপর কারবাইনের ব্যারেল ঘুরিয়ে ট্রিগারে হাত রাখল।

প্রস্তুত হয়ে মুখটা দেয়ালের বাইরে বাড়িয়ে দিতে যাবে এই সময় একটা কঠোর নির্দেশ শুনতে পেল পেছন দিক থেকে 'তোমার খেলা সাঙ্গ শয়তানের বাচ্চা। আগে-পিছনে সবদিক থেকে ঘেরাও। অস্ত্র রেখে উঠে দাঁড়াও, দুহাত উপরে তোল, না হলে কারবাইনের ম্যাগাজিনের সবগুলো গুলী তোমার মাথায় ঢুকিয়ে দেব।'

আহমদ মুসা পেছন দিকে একবার তাকিয়ে অস্ত্র যেখান থেকে তাক করছিল সেখানে রেখেই সে ত্বরিত উঠে দাঁড়ালো দুহাত উপরে তুলে। আহমদ মুসার দুহাত তার মাথার পেছনটাকে আলতোভাবে ছুঁয়ে আছে। তার ডান হাতের মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে আহমদ মুসার রিভলবারের বাট তার ঘাড়ে জ্যাকেটের

একটা পকেটে ঝুলছে। আহমদ মুসার দুচোখ বাজের মত ষ্টাডি করছে সামনের শত্রুকে।

লোকটি হোঁ হোঁ করে হেসে উঠল। তার হাতে কারবাইনের নলটি নাচছিল। লোকটি হাসির সাথে বলল, 'তুমি খুব ঘড়েল আহমদ মুসা। কিন্তু আজ তুমি ব্রিগেডিয়ার শেরিল শ্যারনের হাতে পড়েছ। তোমার সব খেলা খত..........।' কথা শেষ করতে পারলো না ব্রিগেডিয়ার শ্যারন।

আহমদ মুসার ডান হাত মাথার পেছন থেকে কয়েক ইঞ্চি নেমে গিয়ে লুকানো রিভলবার নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। চোখের পলকে ছুটে এসেছিল ব্রিগেডিয়ার শ্যারনকে লক্ষ্য করে।

ব্রিগেডিয়ার শ্যারন দেখতে পেয়েছিল ব্যাপারটা। কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তার মুখের। সে দ্রুত ট্রিগারে তর্জনি ফিরিয়ে নিয়ে টার্গেট থেকে নড়ে যাওয়া কারবাইনের ব্যারেল তুলে আনছিল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে। কিন্তু তার আগেই আহমদ মুসার রিভলবারের গুলী তার কপালটাকে গুড়ো করে দিল।

মেঝের উপর ছিটকে পড়ে গেল সে লাশ হয়ে।

গুলী করেই আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার রেখে যাওয়া কারবাইনের কাছে।

ওরা অনেক কাছে চলে এসেছে। ওদের গুলীর এ্যাংগল বদলে গেছে। সমকোণে পৌছতে দেরি নেই। কারবাইনের ট্রিগারে তর্জনি রেখে আহমদ মুসা মুখ বাড়াতে যাচ্ছিল দেয়ালের ওপারে। কিন্তু পারল না। গুলী আসছে এবার মাটি কামড়ে। নিচের যে এক ফুট জায়গা গুলীর বাইরে ছিল, তাও পূরণ হয়ে গেছে।

আহমদ মুসা পেছনে সরে এল। ভাবল, ওদের কেউ কেউ এখন তাদের গান-ব্যারেল আরও নামিয়ে নিয়েছে।

সামনে এগুনো সম্ভব নয়। আবার চারদিকে তাকালো আহমদ মুসা।

গুলীর এই আয়ত্ত্বের বাইরে কোন উইনডো তাকে পেতে হবে। তা না হলে আক্রমণে যাওয়া যাবে না।

পাশের জানালার দিকে তাকালো আহমদ মুসা। উপরে গেল তার দৃষ্টি।

জানালার কিছু উপরে একই সমান্তরালে করিডোরের দুদেয়ালের মধ্যে কয়েকটি সংযোগ বার।

আহমদ মুসার মাথায় বুদ্ধি এসে গেল। কারবাইনটা কাঁধে ফেলে চোখের পলকে সে জানালায় উঠে লাফ দিয়ে বার ধরল। এক বার থেকে আরেক বার- এই ভাবে শেষ বারে উঠে বসল আহমদ মুসা। নিচ দিয়ে গুলীর ঢেউ বয়ে যাচ্ছে।

আহমদ মুসা এ ঢেউ ডিঙিয়ে করিডোরের মুখের ওপাশে পৌছতে চাইল নিরাপদ উইন্ডোর সুযোগ নেবার জন্যে।

ওরা এগিয়ে আসছে। সমকৌণিক অবস্থান থেকে তার মাত্র পনের বিশ ডিগ্রি দূরে অবস্থান করছে। তাদের কারবাইনের ব্যারেল আরও ডান দিকে, করিডোরের মুখের দিকে বেঁকে গেছে। করিডোর মুখের বামপাশটা নিরাপদ হয়েছে। কিছু গুলী ওদিকেও যাচ্ছিল সেটা বন্ধ হয়েছে। আহমদ মুসা ওখানেই পৌছতে চায়।

আহমদ মুসা প্রস্তুত হয়ে কারবাইনের ট্রিগারে ডান তর্জনি রেখে বাম হাতে কারবাইনটা আঁকড়ে ধরে বার থেকে লাফিয়ে পড়ল করিডোর মুখের বামপাশের কোণায়।

প্রস্তুত ছিল আহমদ মুসা। মাটিতে পড়েই সে গুলীবৃষ্টি শুরু করল ওদের দিকে।

ওরা বুঝে উঠে তাদের কারবাইনের নল ফিরাবার আগেই ওরা সব লাশ হয়ে গেল।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়ে ছুটল করিডোর ধরে পশ্চিম দিকে। লাশগুলোর পাশ দিয়ে যাবার সময় তাদের একজনের পকেট থেকে মোবাইলের শব্দ শুনল। থমকে দাঁড়াল আহমদ মুসা। সে লাশের পকেট থেকে মোবাইলটি বের করে নিল। অন করে মোবাইলটি সে কানে ধরল।

‘এতক্ষণ দেরি কেন রাস্কেল। শোন, ব্রিগেডিয়ারের মোবাইল কোন সাড়া দিচ্ছে না। অবস্থা সুবিধার মনে হচ্ছে না। আমরা ছোট শয়তানকে নিয়ে ০০৩৩ নাম্বারে ডক্টরের কক্ষে যাচ্ছি। সেখান থেকে ইমারজেন্সী এক্সিট নেব। তোমরা

ওদিকটা দেখ।' আদেশের সুরে ওপ্রান্ত থেকে কথাগুলো এল। তারপর উত্তরের অপেক্ষা না করেই ওপার থেকে লাইন কেটে দিল।

'আলহামদুলিল্লাহ!' বলে আহমদ মুসা মোবাইলটি পকেটে পুরে মনে মনে বলল, অন্ধকারে হাতড়ানোর হাত থেকে আল্লাহ বাঁচিয়ে দিয়েছেন। বিল্লাহ এবং ডক্টর হাইকেলকে ঐ ০০৩৩ নাম্বার কক্ষে পাওয়া যাবে নিশ্চয়। দৌড় দিল আহমদ মুসা।

দৌড়ে যাবার সময় ডান পাশের একটা কক্ষের নাম্বার দেখল ০০১৬, আর বাম পাশের ঘরটার নাম্বার দেখল ০০৪৯। মনে মনে হাসল আহমদ মুসা। ডান পাশে ৩৩-এর আগের ১৬ এবং বাম পাশে তেত্রিশের পরের ১৬ টি ঘর রয়েছে। তার মানে করিডোর যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানেই ৩৩ নাম্বার ঘরটি হয় ডান সারিতে হবে, নয় তো বাম সারিতে। এখন সে চোখ বন্ধ করে দৌড়াতে পারে।

দৌড়াতে দৌড়াতেই আহমদ মুসা আবার ভাবল, বন্দী হবার পর গ্রাউন্ড ফ্লোরের একটা ঘরের নাম্বার ১১১ দেখেছিল। আর বন্দীখানা থেকে বেরিয়ে সামনের একটা ঘরের নাম্বার পড়েছিল ০৭৩। এর অর্থ আহমদ মুসা এখন আন্ডার গ্রাউন্ড ফ্লোরের দ্বিতীয় বা বটম ফ্লোরে রয়েছে। এখান থেকে এক্সিট মানে গ্রাউন্ডে উঠার পথ। সে পথ কি ০০৩৩-এর সাথে বা কাছাকাছি রয়েছে? করিডোরের শেষ প্রান্তে হবার একটা অর্থ এও হতে পারে।

০০৩৩ নাম্বারটি পেল আহমদ মুসা। কিন্তু ঘরটির কোন দরজা নেই। বাম সারির শেষ ঘর এটি। ০০৩২-এর পর করিডোরের শেষ পর্যন্ত শুধু দেয়াল, দরজা নেই। কিন্তু দেয়ালেল মাঝামাঝি এক জায়গায় ঘরের নাম্বার ০০৩৩ ঠিকই লিখা রয়েছে।

দরজায় এসে আছাড় খাওয়ার মত বিপদে পড়ে গেল আহমদ মুসা। দেয়ালে কোন গোপন দরজা আছে কিনা দেখার চেষ্টা করল আহমদ মুসা। কিন্তু কোন হদিস পেল না।

সময় হাতে নেই। অস্থির হয়ে উঠল আহমদ মুসা।

ফিরে এল ০০৩২ নাম্বার কক্ষের দরজায়। আস্তে নব ঘুরাল দরজার। দরজা খুলে গেল।

খুশি হলো আহমদ মুসা ডুবন্ড লেকের খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মতই।

ঘরে প্রবেশ করল সে। বিশাল ঘর। আসবাবপত্র শোবার ঘরের মতই।

ঘরের দক্ষিণ দেয়ালে একটা দরজা দেখতে পেল আহমদ মুসা। বাইরের দরজার মতই এর দরজার লক সিষ্টেম।

বিসমিল্লাহ বলে দরজার নব ঘুরাল। খুলে গেল দরজা।

পরের ঘরটাও একই রকম বড়। তবে এ ঘরটি শোবার নয়। অফিস টেবিল ও সারি সারি কম্পিউটার সাজানো ঘরটি।

'না আমি ইনজেকশান নেব না'- চিৎকার করে এই কথা বলার শব্দে চমকে উঠে আহমদ মুসা শব্দের উৎস লক্ষ্যে পশ্চিম দিকে তাকাল। দেখল, ঘরের পশ্চিম দেয়ালে একটা দরজা। দরজাটা আধ-খোলা। দরজার ওপার থেকেই শব্দটা ভেসে এসেছে।

আনন্দে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আহমদ মুসার। নিশ্চিত সে, ঐ ঘরটাই ০০৩৩ নাম্বার ঘর এবং সে ঘরে ঢোকার তাহলে এটাই দরজা।

চিৎকারটা থেমে যেতেই আরেকটা কণ্ঠ বলে উঠল, 'ডক্টর তুমি সব সময় বল আমি ইনজেকশন নেব না, আর সব সময় ইনজেকশন দিয়েই আমরা তোমাকে ঘুমিয়ে রাখি। এই ঘুম তোমার মৃত্যুর বিকল্প।'

'আমি বাঁচতে চাই না। মরতে চাই আমি। তোমরা মেরে ফেল আমাকে।' অসহায় কণ্ঠে বলল সেই চিৎকার করে কথা বলা লোকটি।

'তুমি একা মরলে আমাদের বিপদ আছে। আহমদ মুসা এবং তোমার পরিবারের সকলের সাথে তোমাকে একত্রে মরতে হবে। এই মৃত্যুর সাথেই তলিয়ে যাবে নাইন ইলেভেন নিউইয়র্কের লিবার্টি টাওয়ার ও ডেমোক্রাসি টাওয়ার ধ্বংসের সকল ইতিহাস।' বলল দ্বিতীয় লোকটি আবার।

আহমদ মুসা বুঝল, ইনজেকশন নিতে না চাওয়া লোকটিই ডক্টর হাইকেল। আর দ্বিতীয় কণ্ঠটি আজর ওয়াইজম্যানেরই কোন লোক।

দ্বিতীয় কণ্ঠ থামতেই ডক্টর হাইম হাইকেল বলে উঠল, 'আহমদ মুসা কে? তার সাথে আমার মৃত্যুর সম্পর্ক কি?'

'তুমি জান না? সে তো সাত সাগর তের নদী পাড়ি দিয়ে এসেছে তোমার কাছে। তোমাকে উদ্ধার করতে। তোমাকে তোমার কনফেশনের পুরষ্কার দিতে।'

বলে একটু থামল লোকটি। তারপর আবার বলে উঠল, 'এই যে হাত বাঁধা পায়ে বেড়ি লোকটিকে দেখল, সে আহমদ মুসার সাথী। এ ধরা পড়েছে। আহমদ মুসাও ধরা পড়তে যাচ্ছে।'

একটু নিরবতা। আবার ডক্টর হাইকেল চিৎকার করে উঠল, 'আমি ইনজেকশন নেব না। আমাকে ইনজেকশন দিও না।'

পরক্ষণেই ক্রুব্ধ কথা শোনা গেল সেই দ্বিতীয় কণ্ঠটির, 'এই তোমরা এস। তোমরা হাত, পা মাথা ভালো করে ধর।'

তারপর চিৎকার ও ধস্তাধস্তির কিছু শব্দ উঠল।

আহমদ মুসা ভেবে নিয়েছে, ডক্টর হাইকেলকে ইনজেকশন দেবার আগেই তাকে উদ্ধার করতে হবে।

আহমদ মুসা তার কারবাইন কাঁধে ফেলে দুহাতে দু'রিভলবার তুলে নিয়েছে।

আস্তে করে দরজা দিয়ে উঁকি দিল আহমদ মুসা। দেখল, একটা খাটে শুয়ে আছে ড. হাইম হাইকেল। দুজনে তার দুহাত খাটের সাথে সেঁটে ধরে আছে। একজন ধরে আছে পায়ের দিকটা। আর একজনের হাতে ইনজেকশন। সে যাচ্ছে ইনজেকশন করতে।

বুমেদীন বিল্লাহ বসে আছে ঘরের মেঝেতে। সে পিছ মোড়া করে বাঁধা। তার পায়েও চেন লাগানো।

আহমদ মুসা ডান হাতের রিভলবার থেকে প্রথম গুলীটা করল ইনজেকশন ধরা হাতটিতে।

তার হাত থেকে ইনজেকশন পড়ে গেল। লোকটির ডান হাতের কব্জিতে গুলী লেগেছে। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার লোকটি সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করে বোঁ করে ঘুরে দাঁড়াল। সেই সাথে তার বাঁ হাত বের করে এনেছে রিভলবার।

বেপরোয়া লোকটির রিভলবার ধরা হাত বিদ্যুত বেগে উঠে আসছিল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসার ডান হাত তৈরিই ছিল। আরেকবার ট্রিগার টিপল আহমদ মুসা। লোকটি এবার গুলী খেল মাথায়। উল্টে পড়ে গেল সে খাটে, ড.হাইকেলের উপর।

লোকটির লক্ষ্যে ট্রিগার টিপেই আহমদ মুসা দেখল বাকি দুজনই রিভলবার বের করে তাকে তাক করেছে।

শুধু একটা গুলী করারই সময় পেল আহমদ মুসা। ডক্টর হাইকেলের মাথার দিকের লোকটি বুকে গুলী খেয়ে পড়ে গেল।

গুলী করেই আহমদ মুসা নিজের দেহটাকে সরিয়ে নেবার জন্যে বাম দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। ড. হাইকেলের পায়ের দিকে দাঁড়ানো লোকটির নিক্ষিপ্ত গুলী আহমদ মুসার ডান হাতের তর্জনি সমেত হাতের রিভলবারকে আঘাত করল। তার রিভলবার হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল এবং তর্জনির বামপাশটা কিছুটা ছিঁড়ে গেল।

আহমদ মুসা বেপরোয়া লোকটিকে আর দ্বিতীয় গুলীর সুযোগ দিল না। মাটিতে পড়ে গিয়েই বাম হাতের রিভলবার থেকে গুলী করল লোকটিকে। লোকটিও তার গুলী ব্যর্থ হয়েছে দেখে তার রিভলবার ঘুরিয়ে নিচ্ছিল আহমদ মুসার দিকে। কিন্তু তার আগেই বুকে আহমদ মুসার গুলী খেয়ে পড়ে গেল লোকটি।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়ে সালাম দিল বুমেদীন বিল্লাহকে।

'ওয়া আলাইকুম সালাম। আলহামদুলিল্লাহ, ঠিক সময়ে এসে পড়েছেন ভাইয়া। ওরা ডক্টর ও আমাকে নিয়ে এখনি চলে যেত। ডক্টর ইনজেকশন নিতে অস্বীকার করায় দেরি হচ্ছিল।' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল বুমেদীন বিল্লাহ।

'আলহামদুলিল্লাহ। তিনি তাদের এ সুযোগ দেন নি।' বলে আহমদ মুসা তার বাম হাতের রিভলবার দিয়ে গুলী করে বিল্লাহর হাতের হ্যান্ডকাফ এবং পায়ের চেনের লক উড়িয়ে দিল। তারপর এগুলো ডক্টর হাইকেলের দিকে বলল, 'স্যার আপনি ভাল তো?'

ড. হাইকেলের মাথা ভর্তি উস্কো-খুস্কো চুল। মুখভর্তি দাড়ি ও গোঁফ। গায়ের লম্বা কালো কোট ও প্যান্ট বহু ব্যবহারে মলিন। মুখের দুধে-আলতা রংয়ের উপর যেন কুয়াশার ছাপ। কিন্তু চোখ দু'টি উজ্জ্বল। তাতে অনমনীয় দৃঢ়তার ছাপ।

ড. হাইকেল উঠে বসল। তার বিস্ময় দৃষ্টি আহমদ মুসার দিকে। তার দুটি চোখ যেন আঠার মত আটকে গেছে আহমদ মুসার উপর। আহমদ মুসার প্রশ্ন যেন সে শুনতেই পায়নি। বলল, 'আপনিই কি আহমদ মুসা? আপনি আমার কাছে, আমাকে উদ্ধার করার জন্যে এসেছেন সাত-সাগর তের নদী পাড়ি দিয়ে?'

'ঠিক উদ্ধার করার জন্যে নয়। আমি এসেছিলাম আপনার কাছে। এসে শুনলাম আপনি নিখোঁজ। অনেক খোঁজ খবর নেয়ার পর বুঝলাম আপনি বন্দী। তারপর শুরু উদ্ধার করার চেষ্টা। আপনার বাড়িতেও গেছি। ওরা সবাই ভাল আছে। আমি ডেট্রয়েটে আসর আগে নিউইয়র্কে আপনার ছেলে বেঞ্জামিন আমার সাথেই ছিল।' বলল আহমদ মুসা।

আনন্দের একটা ঢেউ খেলে গেল ডক্টর হাইকেলের মুখে। তারপর একটু গম্ভীর হলো। বলল, 'বেঞ্জামিন এখন নিউইয়র্কে কেন?'

'ছুটিতে এসেছে। এসে সে সব জানতে পারে।' আহমদ মুসা বলল।

'আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। অনেক কৃতজ্ঞতা। কিন্তু আপনি আমার কাছে কেন এসেছেন? জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কেন আমাকে উদ্ধারের চেষ্টা করছেন? ওদের কথা-বার্তায় বুঝেছি, ওদের অনেক লোক মারা গেছে। অনেক আস্তানা ওদের ধ্বংস হয়েছে। আজ বুঝলাম এসব আপনিই করেছেন। কেন করছেন আমি বুঝতে পারছি না।' ডক্টর হাইম হাইকেল বলল।

'সবই জানবেন। সবই বলব। তবে আজ নয়, এ অবস্থায় নয়।' আহমদ মুসা বলল।

'ঠিক আছে। আপনি মুসলমান বুঝতে পারছি। কোন দেশের লোক আপনি?'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'কোন দেশের নাম করব! একটা দেশে আমি জন্মেছি, যে দেশকে এখন আমার দেশ বললে ভুল হবে। এই হিসেবে কোন

দেশকেই আমি আমার দেশ বলতে পারি না। বলতে পারে, আমি সব দেশের বিশেষ করে সব মুসলিম দেশের আমি নাগরিক।'

ভ্রুকুঞ্চিত হলো ডক্টর হাইম হাইকেলের। ভাবনার চিহ্ন তার চোখে-মুখে। বলল আমি এক আহমদ মুসার কথা পড়েছি পত্র-পত্রিকায়। তিনি বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়ান। মানুষের সমস্যা ও বিপদ তিনি মাথায় তুলে নেন। তাঁর অনেক সাকসেস ষ্টোরি আমি পড়েছি। তিনি একজন বিপ্লবী নেতাও। আপনি কি সেই আহমদ মুসা?' জিজ্ঞাসা ড. হাইম হাইকেলের।

'হ্যাঁ স্যার। ইনিই তিনি।' বলল দ্রুত বুমেদীন বিল্লাহ আহমদ মুসা মুখ খোলার আগেই।

'আমিও এটাই ভেবেছি। কিন্তু আমি বিস্মিত হচ্ছি, পরম প্রভু ঈশ্বর আমার প্রতি এত দয়া করেছেন! আহমদ মুসাকে পাঠিয়েছেন আমার সাহায্যার্থে! বলে একটু থামল ডক্টর হাইকেল। তারপর আবার মুখ খুলেছিল আহমদ মুসাকে কিছু বলার জন্যে।

তার আগেই আহমদ মুসা বলে উঠল, 'স্যার, পরে আমরা কথা বলব। এখন আমাদের বের হতে হবে এখান থেকে। আমার অনুমান ঠিক হলে আমরা এখন ভূমিতল থেকে দুতলা নিচে অবস্থান করছি।'

'অনুমান কেন? আপনি তো উপর থেকে নিচে নেমেছেন!' বলল ডক্টর হাইম হাইকেল।

একটু হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'আমরা স্বেচ্ছায় আসিনি। ওরা আমাদের বন্দী করে এনেছিল।'

একটু বিস্ময়, একটু মলিনতা দেখা গেল ডক্টর হাইম হাইকেলের চোখে-মুখে। তারপরই হাস্যোজ্জ্বল মুখে বলল, 'চমৎকার। বন্দী থেকে বিজয়।'

'বিজয় এখনো আসেনি স্যার। আমাদের বাইরে বেরুনো এখনও বাকি।' আহমদ মুসা বলল।

'এই ঘরেই বাইরে বেরুবার কোন ব্যবস্থা আছে। আমি ওদের কথায় এটা শুনেছি।' দ্রুত কণ্ঠে বলল ড. হাইম হাইকেল।

'ধন্যবাদ। আমারও এটাই বিশ্বাস।' আহমদ মুসা বলল।

ঘরের চারদিকে তাকাচ্ছিল আহমদ মুসা।

ঘরটা পরিষ্কার। শোবার খাট ছাড়া ঘরে আছে একটি মাত্র ষ্টিলের টেবিল। এর বাইরে রয়েছে ঘরে প্রবেশের একটা দরজা। ঘরে আর কিছু নেই। টেবিলটি ঘরের পশ্চিম দেয়ালের দক্ষিণ কোণায় একেবারে সেঁটে রাখা কোণের সাথে।

টেবিলের গাঁ ঘেঁষে পশ্চিম দেয়াল বরাবর রাখা খাটটি। টেবিল ও খাট দুটোই ষ্টিলের। ঘরের অবশিষ্টটা নগ্নভাবে ফাঁকা।

'বলতো বিল্লাহ, টেবিল ও খাটটাকে এমন বেসুরোভাবে রাখা হয়েছে কেন? কেন ঘরের মাঝখানে রাখা হয়নি। গোটা মেঝো কোন কাজে ফাঁকা রাখা হয়েছে?' বলল আহমদ মুসা অনেকটা স্বগত কণ্ঠে।

'ঠিক বলেছেন ভাইয়া। ঘর সাজানোর দৃষ্টিতে এটা একেবারেই বিদঘুটে। কিন্তু কেন?' বলল বুমেদীন বিল্লাহ।

'আচ্ছা দেখ তো', টেবিলের উচ্চতা স্বাভাবিকের তুলনায় কম, তাই না?' আহমদ মুসা বলল।

'ঠিক। কিন্তু এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? আমাদের বের হওয়ার পথ বের করতে হবে।' বলল বুমেদীন বিল্লাহ অস্থির কণ্ঠে।

'বুমেদীন বিল্লাহ লক্ষ্য কর, খাট ও টেবিলের মধ্যকার উচ্চতা একটা সিঁড়ির সাধারণ ধাপের সমান।' আহমদ মুসা বলল বিল্লাহর কথার দিকে কর্ণপাত না করে।

'মি. আহমদ মুসা, ঘর থেকে এক্সিট নেয়ার ক্ষেত্রে এই খাট ও টেবিলের মধ্যে কোন রহস্য লুকিয়ে আছে বলে আপনি মনে করছেন?' আহমদ মুসার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে বলল হাইম হাইকেল।

একটু হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'এ ছাড়া আর কোন অবলম্বন দেখছি না।'

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা বিল্লাহকে লক্ষ্য করে বলল, 'বিল্লাহ, দেখ, টেবিল ও খাট নিশ্চয় মেঝের সাথে ফিক্সড করা।'

বিল্লাহ ছুটে গিয়ে দেখে বলল, 'ঠিক ভাইয়া, ফিক্সড করা।'

আহমদ মুসার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এগিয়ে গিয়ে খাট ও টেবিলের তলা এবং পায়াগুলো ভালো করে পরীক্ষা করল, কিন্তু গোপন সুইচ জাতীয় কোন কিছুই পেল না।

এই প্রথম চেষ্টার ব্যর্থতার পর আহমদ মুসা এসে টেবিলের পাশ ঘেঁষে খাটের উপরে বসল।

আহমদ মুসার হাতে একটা টিস্যু পেপার ছিল। সে হাতের দলা পাকানো টিস্যু পেপার ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটের উদ্দেশ্যে ছুড়ে মারল।

ছোট আয়তাকার ওয়েস্টপেপারের বাস্কেট ছিল টেবিল ও খাটের মাঝখানে। আহমদ মুসার ছুড়ে দেয়া টিস্যু পেপার বাস্কেটে পড়ার বদলে গিয়ে পড়ল বাস্কেটের ওপারে, বাস্কেটের আড়ালে।

আহমদ মুসা বাস্কেটটি একপাশে সরিয়ে ওপাশ থেকে টিস্যু পেপারটি নেবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারলো না। বাস্কেটটি মেজের সাথে ফিক্সড।

বিস্মিত হয়ে আহমদ মুসা তাকাল বাস্কেটের দিকে। ফাঁকা কালো রংয়ের বাস্কেটের তলায় দেখল সাদা বড় আকারের স্ক্রুর মাথা। কিন্তু স্ক্রুর মাথায় যেমন খাঁজ থাকে, তেমন কোন খাঁজ এ স্ক্রুতে নেই।

ভ্রু কুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার।

মুখ না তুলেই আহমদ মুসা ডাকল, 'বিল্লাহ এদিকে এস।'

সাংবাদিক বিল্লাহ নব্য গোয়েন্দার ভাব নিয়ে ক্লুর সন্ধানে দেয়াল-খাট-টেবিলের আশে-পাশে ঘুর ঘুর করছিল। আহমদ মুসার ডাক পেয়ে ছুটে এল।

ঠিক এ সময় ০৩২ নম্বর ঘরের দরজায় ধাক্কার শব্দ হল। কয়েকটা ধাক্কার পরই ব্রাশ ফায়ারের শব্দ এল।

উদ্বিগ্ন চোখে বিল্লাহ তাকাল আহমদ মুসার দিকে। আর ভীত ড. হাইম হাইকেল খাটের ওপ্রান্ত থেকে আহমদ মুসার দিকে সরে এসে কম্পিত কণ্ঠে বলল, 'ওরা এসে গেছে মি. আহমদ মুসা।'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'ভয় নেই। না হয় আরেক দফা লড়াই করতে হবে। আর সম্ভবত ওরা এসে আমাদের পাবে না।'

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা বিল্লাহকে বাস্কেটের স্ক্রুর মাথা দেখিয়ে বলল, 'ওতে চাপ দাও।'

বিল্লাহ এক হাত টেবিলে ঠেস দিয়ে ঝুঁকে পড়ে অন্য হাতে স্ক্রুর মাথায় জোরে চাপ দিল।

সঙ্গে সঙ্গে শিষ দেয়ার মত একটা লম্বা শব্দ উঠল। পশ্চিমের দেয়ালের একাংশ উপরে উঠে গেল এবং তার সাথে সাথে টেবিল ও খাটসহ মেঝের সংশ্লিষ্ট অংশ দেয়ালের ওপাশে ঢুকে যেতে লাগল।

এ সময়ই শোনা গেল ০০৩৩ ঘরের দরজায় ধাক্কা ও তারপর ব্রাশ ফায়ারের শব্দ।

টেবিল ও খাট ওপাশে পৌছে একটা সিঁড়ির সাথে সেট হয়ে গেল। দেখা গেল খাট থেকে টেবিল এবং টেবিল থেকে সিঁড়ির ধাপে উঠার সুন্দর পথ তৈরি হয়ে গেছে।

'চলুন সবাই সিঁড়িতে উঠে যাই।' বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

প্রথমে ড. হাইম হাইকেল, তারপর বুমেদীন বিল্লাহ, সবশেষে সিঁড়িতে গিয়ে উঠল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা সিঁড়িতে উঠতেই টেবিল ও খাট আবার ফিরে গেল সেই ঘরে। নেমে এল দেয়ালও উপর থেকে।

'এর আসাটা স্বয়ংক্রিয় নয়, কিন্তু যাওয়াটা স্বয়ংক্রিয়। মনে হয় ওজনের সাথে এর ফিরে যাওয়ার সক্রিয় হবার কোন সম্পর্ক আছে। আমরা ওতে অবস্থান করলে ওটা সম্ভবত ফেরত যেত না। আমরা নেমে আসায় ওর ওজন মূল অবস্থানে চলে আসায় তার ফিরে যাবার ব্যবস্থা সক্রিয় হয়েছে।' কথাগুলো বলেই আহমদ মুসা ড. হাইম হাইকেলকে লক্ষ্য করে বলল, 'চলুন স্যার। ওরা আমাদের পিছু ছাড়বে না। দেয়াল সরিয়ে এ পথে আসার পন্থা ওরা নিশ্চয় জানে। ওরা এখনি এসে পড়বে।'

আহমদ মুসার কথা শেষ হবার আগেই ড. হাইম হাইকেল ও বুমেদীন বিল্লাহ দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করেছে।

আহমদ মুসাও ছুটল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সিঁড়িতে ব্রাশ ফায়ারের শব্দ পেল আহমদ মুসারা। কিন্তু সিঁড়িটা এঁকে বেঁকে উপরে উঠায় আহমদ মুসাদের কোন অসুবিধা হলো না।

সিঁড়ি পথে আহমদ মুসারা একটা বাড়িতে গিয়ে উঠল। বাড়িটার পুব পাশ দিয়ে নদী এবং পশ্চিম পাশ ঘেঁষে সড়ক পথ।

ডেট্রয়েট শহরের এই এলাকাটা বলা যায় অফসাইড। অপেক্ষাকৃত নিচু এলাকা এটা। সবজির ক্ষেত ও প্রচুর ঝোপ-জংগল রয়েছে।

আহমদ মুসা দ্রুত ড. হাইম হাইকেল ও বুমেদীন বিল্লাহকে নিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়াল। কোন গাড়ি-ঘোড়া পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম।

আহমদ মুসারা দাঁড়ানোর মিনিট খানেকের মধ্যেই একটা গাড়িকে আসতে দেখল। কাছাকাছি এলে দেখা গেল, গাড়িতে আরোহী মাত্র একজন মহিলা, সেই ড্রাইভ করছে।

আহমদ মুসা হাত তুললে গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল। আহমদ মুসা দ্রুত তাকে বলল, 'আমরা বিপদে পড়েছি। বিশেষ করে এই বৃদ্ধ। আমরা আপনার সাহায্য চাই।'

মেয়েটি তার চোখের সব শক্তি উজাড় করে আহমদ মুসাকে দেখল। তারপর মেয়েটি মাত্র একটি শব্দ উচ্চারণ করল। বলল, 'উঠুন।'

পেছনের সিটে বিল্লাহ ও ড. হাইম হাইকেলকে বসিয়ে আহমদ মুসা নিজে সামনের ড্রাইভিং সিটের পাশের সিটে উঠে বসল।

এ সময় তিনজন ষ্টেনগানধারী বেরিয়ে এল আহমদ মুসারা যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল সেই বাড়ি থেকে।

আহমদ মুসাদের গাড়িতে ওঠা তারা দেখতে পেয়েছে। গাড়ি লক্ষ্যে এক পশলা গুলি ছুটে এল তাদের ষ্টেনগান থেকে।

মেয়েটি বিস্মিত হয়েছে। গাড়ি ষ্টার্ট দিতে দিতে বলল মেয়েটি, 'ঘটনা কি মি...........।'

'আহমদ আমি।' বলল আহমদ মুসা।

'আহমদ?' আপনি কি মুসলমান?' মেয়েটির চোখে বিস্ময় দৃষ্টি।

'জি হ্যাঁ।' সংক্ষিপ্ত জবাব দিল আহমদ মুসা।

মেয়েটি মুহূর্তকাল চুপ করে থাকল। তারপর বলল, 'আপনারা মূলত বাদী, না আসামী?'

'বাদী।' ত্বরিত জবাব দিল আহমদ মুসা।

'আপনি বিশেষ করে বৃদ্ধের বিপদের কথা বললেন। বৃদ্ধটি কে, তার নাম কি?' জিজ্ঞাসা করল মেয়েটি।

আহমদ মুসা একটু দ্বিধা করল। তারপর বলল, 'ইনি ডক্টর হাইম হাইকেল।'

ব্রাশ ফায়ারের শব্দ পাওয়া গেল এ সময় পেছন থেকে।

আহমদ মুসা পেছনে তাকাল। দেখল, পেছনে একটা কার ছুটে আসছে। আহমদ মুসা বুঝল, ওরাই পিছু নিয়েছে। নিশ্চয় গাড়িটা ওদের ওই বাড়িতে ছিল।

আহমদ মুসা চারদিকে তাকাল। ডানে সবজির বাগান। বামে নদী পর্যন্ত ঝোপঝাড়।

সামনেই রাস্তাটা বাম দিকে একটা বাঁক নিয়েছে। বাঁক শেষে জংগল। খুশি হলো আহমদ মুসা।

তাকাল সে মেয়েটির দিকে। বলল, সামনের বাঁকে আমাকে নামিয়ে দিন। বাঁকটা ঘুরেই আমাকে নামিয়ে দেবেন। যাতে পেছনের গাড়ি দেখতে না পায়।'

মেয়েটির চোখে-মুখে উদ্বেগ। বলল, 'নেমে কি করবেন? ওরা তো মেরে ফেলবে আপনাদের। তার চেয়ে সামনে কোন পুলিশের সাহায্য পাওয়া যায় কিনা দেখা যাক।'

'না সবাই নামবে না। শুধু আমি নামব। ওদের এখানেই আটকাতে চাই। সামনে পুলিশের সাহায্য পাওয়া যাবে, তার নিশ্চয়তা নেই।' বলল আহমদ মুসা।

মেয়েটির চোখে-মুখে বিস্ময়। বলল, 'আপনি কিভাবে ওদের ঠেকাবেন? ওরা তো সংখ্যায় বেশ কয়েকজন। তাছাড়া ষ্টেনগানের মত বড় অস্ত্র ওদের আছে।'

'কিন্তু এভাবে আপনি এবং আমরা সবাই বিপদগ্রস্ত হবো। ওরা গাড়ির টায়ারে গুলী করতে পারলে এখনি গাড়ি থেমে যাবে এবং আমরা সবাই ওদের গুলীর মুখে পড়বো। আর আমি নেমে গিয়ে ওদের গাড়ি আটকে দিতে পারব। এ

পাশের দুটি টায়ারের যে কোন একটি ফাটাতে পারলেই ওরা থেমে যেতে বাধ্য হবে। তখন আপনারা নিরাপদে চলে যেতে পারবেন।' আহমদ মুসা বলল।

'কিন্তু আপনার কি হবে? ওদের গাড়ি আটকাতে পারলেও ওদের সবাইকে একা এঁটে উঠবেন কি করে?' বলল মেয়েটি প্রতিবাদের সুরে।

'আমি হবো আক্রমণকারী, ওরা আক্রান্ত। আমার জয়ী হবার সম্ভাবনা বেশি।' আহমদ মুসা বলল।

'সম্ভাবনা যদি সত্য না হয়?' বলল মেয়েটি।

'এতটা ভাবলে কোন কাজ করা যাবে না। করণীয় যা তা করতে এগিয়ে যেতে হবে। ব্যস।' বলে আহমদ মুসা একটু থেমেই আবার বলে উঠল, 'এখানেই নামিয়ে দিন।'

গাড়ি থামাল মেয়েটি। আহমদ মুসা গাড়ির দরজা খুলতে খুলতে বলল, 'আপনার নাম কি জুলিয়া রবার্টস?'

'হ্যাঁ।' বলল মেয়েটি।

'থ্যাংকস।' আহমদ মুসা বলল।

'ওয়েলকাম।' মেয়েটির চোখে বিস্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টি।

গাড়ির খোলা জানালা দিয়ে বিল্লাহ চিৎকার করে বলে উঠল, 'ভাইয়া আমার জন্যে কোন নির্দেশ?'

'মিস জুলিয়ার ঠিকানায় তোমাদের খোঁজ করব।' চিৎকার করে বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসাকে নামিয়ে দিয়েই মেয়েটি গাড়ি ষ্টার্ট দিয়েছে। বিল্লাহ কথা শুরু করলেও সে গাড়ি স্লো করেনি। গাড়িটা যে থেমেছিল সেটা পেছনের গাড়িটাকে সে জানতে দিতে চায় না। আহমদ মুসা এটাই চেয়েছিল।

বাঁকটা একেবারেই এল প্যাটানের ছিল। তাছাড়া বাঁক এলাকায় ঝোপ ও গাছপালা ছিল বেশ বড় বড়। পেছনের গাড়িটা টের পেল না সামনের গাড়ির থামাটা।

পেছনের গাড়িটা বাঁকে আসার আগেই সড়কের পাশে ঝোপের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে একটা মোটা গাছের আড়ালে পজিশন নিয়ে নিয়েছে আহমদ মুসা।

দুহাতে দু’রিভলবার রেডি।

পেছনের গাড়িটা ঝড়ের গতিতে বাঁকে এসে পৌছল। সামনের গাড়িটা বাঁকের কারণে আড়াল হওয়ার জন্যেই হয়তো তাদের বাড়তি এই তৎপরতা।

গাড়িটা আহমদ মুসার সোজাসোজি পজিশনে আসার আগেই গাড়ির সামনের চাকা লক্ষ্য করে দুহাত দিয়ে দু’টি গুলী ছুড়ল আহমদ মুসা। গুলী ব্যর্থ হওয়া এবং দ্বিতীয় গুলীর ঝুঁকি নিতে চায় না সে।

দুটি গুলীই অব্যর্থভাবে আঘাত করল গাড়ির সামনের টায়ারকে। মুহূর্তেই প্রচন্ড গতির গাড়িটা ছিটকে শূন্যে উঠে বেশ অনেকটা দূরে গিয়ে আছড়ে পড়ল। তারপর আরও কয়েকটা গড়াগড়ি খেল। পরে প্রচন্ড শব্দে বিস্ফোরিত হলো গাড়িটা। আগুন ধরে গেল গাড়িতে।

আহমদ মুসা রিভলবার পকেটে পুরে বেরিয়ে এল ঝোপ থেকে।

সড়কের ধার ঘেঁষে হাঁটা শুরু করল সামনের দিকে। জ্বলন্ত গাড়ি পেরিয়ে যাবার সময় দেখল, কেউ বাঁচেনি। মনে হয় কেউ গাড়ি থেকে বের হবার চেষ্টা করারও সুযোগ পায়নি।

সড়কের প্রান্ত ঘেঁষে হেঁটে চলেছে আহমদ মুসা। এ সড়কের ওদিকে সমান্তরালে, ফেরার সড়ক। দুসড়কের মাঝখানে ঘাসে ঢাকা প্রশস্ত আইল্যান্ড।

প্রায় দশ মিনিট পার হয়ে গেছে। পথ চলছেই আহমদ মুসা। লিফট নেয়ার মত কোন গাড়ি পায়নি। কার্গো ভ্যান কয়েকটা গেছে, যাত্রী ভর্তি হায়ার্ড ট্যাক্সিও কয়েকটা গেছে। কিন্তু আহমদ মুসা ওদের কোন অনুরোধ করেনি।

হঠাৎ আহমদ মুসা তার নাম ধরে ডাক শুনে ডান দিকে রাস্তার ওপাশে ফিরে তাকাল। দেখল, আইল্যান্ডের ওপারে ফেরার সড়কের বেড়া বরাবর দাঁড়িয়ে গাড়ির সেই মেয়েটা ও বিল্লাহ তাকে ডাকছে। তাদের পাশে তাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

বুঝল আহমদ মুসা। ওরা নিশ্চয় পেছনের গাড়িটা ধ্বংস হওয়া দেখতে পেয়েছে। তাই কোথাও এক্সিট নিয়ে ফিরতি পথ ধরে তাকে নেবার জন্যে তারা ফিরে এসেছে।

আহমদ মুসা সড়ক ক্রস করে চলল ওদের দিকে।

# ২

জুলিয়া রবার্টসের বাড়ি। দুতলার ভিআইপি গেষ্ট রুম।

আহমদ মুসা একটি সোফায় বসে।

ঘরের ওপাশে সুসজ্জিত বেড। ক্লান্ত শরীরটা চাচ্ছে শুয়ে একটা লম্বা ঘুম দিতে। কিন্তু আহমদ মুসার কাছে এই লোভের চেয়ে একটা চিন্তা বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আহমদ মুসার চোখ ঘুরে ফিরে বার বার জানালা দিয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে। জানালা দিয়ে বাড়ির এ্যাপ্রোচ রোডটা দেখা যায়।

ঘরে প্রবেশ করল বুমেদীন বিল্লাহ। আহমদ মুসাকে দেখে বলল, 'কি ব্যাপার, ভাইয়া এখনও কাপড়-চোপড় ছাড়েননি?'

আহমদ মুসা বিল্লাহর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল, 'ড. হাইম হাইকেলের খবর নিয়েছ?'

ড. হাইম হাইকেলকে বাড়ির ওপাশের আরেকটি ঘরে রাখা হয়েছে।

আহমদ মুসার প্রশ্নের ধরণ দেখে বিল্লাহ বলল, 'কেন কিছু ঘটেছে? আপনি কি ভাবছেন?' বিল্লাহর চোখে-মুখে ভাবনার প্রকাশ।

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু অস্পষ্টভাবে ভেসে আসা একটা শব্দের অনুসরণে জানালা দিয়ে ছুটে গেল তার দুচোখ। একটি কার এবং ছোট একটি মাইক্রো প্রবেশ করল জুলিয়া রবার্টসের বাড়িতে। চোখ ফিরিয়ে ঘড়ির দিকে তাকাল আহমদ মুসা, রাত ৯টা।

'ভাইয়া, কারো কি অপেক্ষা করছিলেন? তারা কি এসে গেছে?' বলল বিল্লাহ।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'কারও অপেক্ষা করছি না। তবে কিছু একটা পাহারা দিচ্ছি।'

বসল বিল্লাহ। ভ্রুকুঞ্চিত হয়েছে তার। বলল, 'এখানে আবার কি পাহারা দিচ্ছেন ভাইয়া। কিছু ঘটেছে?'

'হয় তো ঘটতে পারে।' আহমদ মুসা বলল।

উদ্বেগ ফুটে উঠল বিল্লাহর চোখে মুখে। ছোট কোন ঘটনা নিয়ে আহমদ মুসা এভাবে মাথা ঘামায় না। কিন্তু কি ঘটেছে? জুলিয়া রবার্টসকে তো তার ভালই মনে হয়েছে। নি:সন্দেহে সে সহানভুতিশীল ও আন্তরিক। বলল বিল্লাহ, 'ভাইয়া আপনি কি ম্যাডাম জুলিয়া রবার্টসকে সন্দেহ করছেন?'

'সন্দেহ নয়, তিনি তার দায়িত্ব পালন করতে পারেন।' আহমদ মুসা বলল।

বিল্লাহ কিছু বলতে যাচ্ছিল। এ সময় দরজা নক করে ঘরে প্রবেশ করল জুলিয়া রবার্টস।

ঘরে ঢুকেই বলল, 'আমি বসব না মি. আহমদ মুসা। চলুন ড্রইং রুমে একটু বসি। আরও কয়েকজন এসেছে। জরুরি কথা আছে।'

'ওঁরা তো এফ.বি.আই-এর লোক। ওঁদের মধ্যে কি ডেট্রয়েটের এফ.বি.আই চীফ হেনরী শ্যারন রয়েছেন।' বলল আহমদ মুসা সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে।

জুলিয়া রবার্টসের দুচোখ ছানাবড়া। বলল, 'আপনি কি করে জানলেন ওঁরা এফ.বি.আই-এর লোক?'

'আপনি যেভাবে আমার পুরো নাম জেনেছেন, বলা যায় সে ভাবেই। আমার প্রশ্নের জবাব দেননি মিস জুলিয়া রবার্টস।'

'আরও কি জেনেছেন?' প্রশ্ন জুলিয়া রবার্টসের।

'আপনিও এফ.বি.আই-এর লোক।' বলল আহমদ মুসা।

'ওঁরা আসবেন তাও কি জানতেন? ওঁদের অপেক্ষাতেই কি কাপড়ও ছাড়েননি?' জুলিয়া রবার্টস বলল।

'জি হ্যাঁ, জানতাম।' বলল আহমদ মুসা।

তৎক্ষণাত আর কোন কথা বলল না জুলিয়া রবার্টস। বিস্ময়ের চিহ্ন তার চোখ-মুখ থেকে চলে গেছে। ঠোঁটে এক টুকরো মুগ্ধ হাসি। বলল অল্পক্ষণ চুপ

থাকার পর, 'আহমদ মুসর জন্যে কোন কিছুই বিস্ময়কর নয়, এ কথা ভুলে গিয়েছিলাম।'

বলে একটু থেমেই আবার বলে উঠল, 'হ্যাঁ মি. আহমদ মুসা, যাঁরা এসেছেন, তাঁদের মধ্যে ডেট্রয়েটের এফ.বি.আই. কর্মকর্তা হেনরী শ্যারনও রয়েছেন। চেনেন তাঁকে?'

আহমদ মুসা একটু হাসল। বলল, 'নাম জানি।'

'ওকে, তাহলে আপনারা আসুন। আমি চলি।' বলে জুলিয়া রবার্টস ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

জুলিয়া রবার্টস বের হয়ে যেতেই বিল্লাহ বলে উঠল, 'আপনি কি করে জানলেন ভাইয়া যে, ওরা এফ.বি.আই.-এর লোক এবং ওরা আসবে এখানে। জুলিয়া রবার্টসের পরিচয়ই বা কি করে পেলেন?'

'এফ.বি.আই. এর লোকরা বিশেষ কোডে হর্ণ বাজায়। জুলিয়া রবার্টসের হর্ণ বাজানো দেখে চিনেছি। তার টেলিফোনের আলোচনা শুনে জানতে পেরেছি ডেট্রয়েটের এফ.বি.আই কর্মকর্তারা রাত ৯টায় এখানে আসছেন।' আহমদ মুসা বলল।

'জুলিয়া রবার্টসের নাম কিভাবে জেনেছিলেন? তাঁর ঠিকানায় আমাদের খোঁজ করবেন বলেছিলেন। ঠিকানা জানলেন কিভাবে?'

হাসল আহম মুসা। বলল, 'আমার সামনে গাড়ির ড্যাশবোর্ডের উপর একটা নেম কার্ড পড়েছিল। তাতেই ওঁর নাম-ঠিকানা লেখা ছিল। কার্ড ওঁর কিনা এজন্যেই গাড়ি থেকে নামার সময় ওঁর নাম জিজ্ঞাসা করেছিলাম।'

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা দুপকেট থেকে দুরিভলবার বের করে লোড পরীক্ষা করল। তারপর বলল, 'চল।'

বিল্লাহর চোখে-মুখে বিস্ময়। এ সময় আহমদ মুসা রিভলবার পরীক্ষা করল কেন? বলল, 'ভাইয়া, এ সময় রিভলবার চেক করছেন কেন?'

'রুটিন চেক।' হেসে বলল আহমদ মুসা।

'আমিও রুটিন চেক করি তাহলে।' বলল বিল্লাহ এবং নিজের রিভলবার বের করল।

আহমদ মুসা তখন চলতে শুরু করেছে। বিল্লাহও আহমদ মুসার পেছন পেছন চলল। ড্রইংরুমে প্রবেশ করল আহমদ মুসা। ড্রইংরুমটা বিশাল ঘর। গোটা ঘরটাই সোফায় সাজানো। ড্রইংরুমের তিনটি দরজা।

পুব দিকের দরজা বাইরে থেকে প্রবেশের। উত্তরের দরজা গেষ্ট ও সাধারণ আবাসিক উইং-এর দিকে। আর দক্ষিণের দরজা ষ্টোর ও কিচেন উইং-এর সাথে যুক্ত।

আহমদ মুসা দুতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে ঘরের পশ্চিম দিয়ে ঘরে প্রবেশ করল।

আহমদ মুসা দেখল, জুলিয়া রবার্টস ও মি. হাইম হাইকেলসহ ছয়জন ড্রইংরুমে বসে আছে। ওরা চারজন কেন? ওরা তো কারের চারজন। মাইক্রোর লোকজন কোথায়?

নিজেকে প্রশ্ন করে নিজের মনেই হাসল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়েছে জুলিয়া রবার্টস। সে স্বাগত জানাল আহমদ মুসাকে।

ওরা চারজন যেমন বসেছিল, তেমনি বসে থাকল। শুধু ওদের ৮টি চোখ একসাথে গিয়ে স্থির হলো আহমদ মুসার উপর।

ওরা চারজন বসেছিল পুবমুখী ও উত্তরমুখী হয়ে দু'সোফায়। আর জুলিয়া রবার্টস ও ড. হাইম হাইকেল পশ্চিমমুখী এক সোফায়। ড্রইংরুমের সেন্ট্রাল সার্কেলেল দক্ষিণমুখী একটা সোফাই শুধু খালি আছে। সোফাটা বাইরের দরজার সোজাসুজি। খুশি হলো আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা ও বুমেদীন বিল্লাহ গিয়ে সেই খালি সোফাটায় বসল।

আহমদ মুসারা বসার আগেই জুলিয়া সবাইকে সবার সাথে পরিচয় করে দিয়েছে।

আহমদ মুসা বসতেই ডেট্রোয়েটের এফ.বি.আই. চীফ হেনরী শ্যারন বলে উঠল, 'আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আহমদ মুসা। অনেক বিপদ পাড়ি দিয়ে, অনেক কষ্ট করে আপনি মি. হাইম হাইকেলকে উদ্ধার করেছেন।'

‘ওয়েলকাম। তবে আমি আমার কাজ করেছি। এ জন্যে ধন্যবাদের প্রয়োজন হয় না।’ একটু হেসে বলল আহমদ মুসা।

‘এটা আপনার বদান্যতা।’ বলে একটু থেমেই হেনরী শ্যারন আবার কথা বলে উঠল, ‘মি. আহমদ মুসা, আমরা ড. হাইম হাইকেলকে নিয়ে যাচ্ছি। আপনাকেও আমাদের সাথে যেতে হবে।’

বিস্মিত হলো না আহমদ মুসা। এ ধরনের কথা আসবে, আগেই তা ভেবেছে সে। কিন্তু শুরুতেই এমন নগ্নভাবে আসবে ভাবেনি আহমদ মুসা।

ঠোঁটে এক টুকরো হাসি টেনে আহমদ মুসা বলল, ‘কিন্তু ড. হাইম হাইকেলের সাথে আমার জরুরি কিছু কথা আছে, সেটা এখনও হয়নি।’ খুব স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

সংগে সংগে উত্তর দিল না হেনরী শ্যারন। দেখা গেল আহমদ মুসার কথায় তার চোখ-মুখ শক্ত হয়ে গেছে। একটু সময় নিয়ে বলল, ‘আপনি তো তার সাথে পরিচিতও নন, সম্পর্কিত নন। সুতরাং তেমন কি আর কথা থাকবে। ঠিক আছে, আপনিও যাচ্ছেন। আপনাদের কথা বলার সুযোগ করে দেব।’

আহমদ মুসার ভেতরটা শক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু মুখে তার কিছুই প্রকাশ পেল না। সে পাশে বসা বিল্লাহকে কানে কানে কিছু বলল। সংগে সংগে বিল্লাহ উঠে দাঁড়াল।

বিল্লাহ যখন দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছিল, আহমদ মুসা তাকে লক্ষ্য করে বলল, ‘তাড়াতাড়ি ফিরে এস।’

বলেই জুলিয়া রবার্টসের দিকে ফিরে তাকিয়ে আহমদ মুসা বলল, ‘ওকে একটু বাইরে পাঠাচ্ছি মিস জুলিয়া রবার্টস।’

‘ধন্যবাদ সৌজন্যের জন্যে।’ বলল জুলিয়া রবার্টস।

জুলিয়া রবার্টস যখন আহমদ মুসার কথার জবাব দিচ্ছিল, তখন হেনরী শ্যারন তার মোবাইলে কথা বলছিল।

হেনরী শ্যারনের কথা শেষ হতেই আহমদ মুসার তার কথার উত্তরে বলল, ‘আমি আপনাদের সাথে যাচ্ছিই এটা কিভাবে নিশ্চিত হলেন?’

সংগে সংগে উত্তর দিল না হেনরী শ্যারন। তার চোখে-মুখে ক্রোধের প্রকাশ। বলল শক্ত কণ্ঠে, ‘এফ.বি.আই. কারো মর্জি মাফিক নয়, নিজের মর্জি মাফিক কাজ করে।’

জুলিয়া রবার্টসের চোখে-মুখে চরম বিব্রতভাব ফুটে উঠেছে। তাকাল হেনরী শ্যারনের দিকে। বলল, ‘মি. শ্যারন, এমন তো কথা ছিল না? ড. হাইম হাইকেলকে তার পরিবারে ফিরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে, এটাই তো বলেছিলেন।’

‘মিস জুলিয়া রবার্টস, সে সময়ের পর অনেক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। অনেক পরিবর্তনের জন্যে এই সময় যথেষ্ট।’ বলেই হেনরী শ্যারন তাকাল ড. হাইম হাইকেলের দিকে। বলল, ‘চলুন স্যার। আপনি ক্লান্ত। আপনার বিশ্রাম দরকার।’

‘মি. শ্যারন, আমি তো যাবই। আপনারা আমাকে বাড়ি পৌছাবেন, এটাই আমার জন্যে নিরাপদ। কিন্তু তার আগে আহমদ মুসার সাথে আমার প্রয়োজন শেষ করতে চাই।’ বলল ড. হাইম হাইকেল।

‘স্যার সেটা হবে। আমরাই তার ব্যবস্থা করব। আহমদ মুসা আমাদের সাথে যাচ্ছেন।’ হেনরী শ্যারন বলল।

‘আমি যাচ্ছি না মি. শ্যারন। আমি আপনার মর্জির অধীন নই।’ বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার কথা শেষ হবার সাথে সাথেই স্প্রিং-এর মত উঠে দাঁড়াল হেনরী শ্যারন। উঠে দাঁড়াবার সাথেই তার হাতে উঠে এসেছে রিভলবার।

রিভলবার আহমদ মুসার দিকে তাক করে ক্রুব্ধ হেনরী শ্যারন কিছু বলতে যাচ্ছিল।

এরই সুযোগে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতার সাথে আহমদ মুসার হাত রিভলবার সমেত বেরিয়ে এল এবং আগুন উদগীরন করল।

গুলী গিয়ে আঘাত করল শ্যারনের রিভলবারের নলকে। তার হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল রিভলবার।

আহমদ মুসার বাম হাতও তুলে নিল আর একটি রিভলবার।

অবশিষ্ট তিনজন ইতিমধ্যে পকেটে হাত দিয়েছিল তাদের রিভলবার বের করার জন্যে। কিন্তু ততক্ষণে তারা আহমদ মুসার টার্গেটে এসে গেছে। বলল আহমদ মুসা শ্যারনকে লক্ষ্য করে, ‘মি. হেনরী শ্যারন, মানুষের সব ইচ্ছা পূরণ হয় না। আপনার ইচ্ছাও পূরণ হবার কোন উপায় নেই।’

ক্রোধে ফুসছিল হেনরী শ্যারন। আগুনে তেল পড়ার মত জ্বলে উঠল সে। চিৎকার করে উঠল, ‘জন তোমরা এদিকে এস।’

কোন সাড়া এল না ওদিক থেকে।

আরও জোরে চিৎকার করল মি. শ্যারন।

‘মি. শ্যারন এক সময় ঘুম থেকে তারা জাগতেও পারে।’ মুখ টিপে হেসে বলল আহমদ মুসা।

চোখ দুটি ছানাবড়া হয়ে উঠেছে হেনরী শ্যারনের।

এ সময় ঘরে প্রবেশ করল বিল্লাহ।

আহমদ মুসা বলল, ‘বিল্লাহ, তুমি মি. শ্যারনকে একটু বল কিভাবে তুমি জনদের ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছো।’

‘তুমি এতটা এগুবে, সেটা বুঝিনি আহমদ মুসা। কিন্তু এটাই শেষ নয়। তোমার ঔদ্ধত্য সহ্য করা হবে না।’ ক্রোধের চোটে কাঁপতে কাঁপতে বলল হেনরী শ্যারন।

‘অপেক্ষা করুন মি. শ্যারন।’ বলেই আহমদ মুসা বিল্লাহকে লক্ষ্য করে বলল, ‘এদেরকেও ঘুম পাড়িয়ে দাও বিল্লাহ। শান্তিতে থাকবেন ওঁরা। তবে বিল্লাহ, মিস জুলিয়া রবার্টসের ডোজটা যেন একটু কম হয়। কারণ ওঁকে জেগে উঠে এদেরকে হাসপাতালে নিতে হবে। একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর হেনরী শ্যারনকে লক্ষ্য করে বলল, ‘হ্যাঁ মি. শ্যারন, বিশেষ ধরনের এবং সিগারেট সাইজের এই ক্লোরোফরম আমরা পেয়েছি আপনার বন্ধু ব্রিগেডিয়ার শেরিল শ্যারনের বন্দীখানা থেকে। আমাদের সংজ্ঞাহীন করার জন্যে এনেছিলেন। আমাদের বাঁধতে গিয়ে একটা প্যাকেট পড়ে যায় ওদের পকেট থেকে। এ্যান্টিডোজ ব্যবহার না করলে এই ক্লোরোফরম ঘুম ভাঙে না।’

বিল্লাহ এক হাতে রিভলবার, অন্য হাতে ক্লোরোফরম স্প্রে নিয়ে ওদের কাছে পৌছে গিয়েছিল।

বিল্লাহ প্রথমে গেল হেনরী শ্যারনের দিকে। তার নাকের কাছে স্প্রে নিয়ে মাথায় রিভলবারের নল ঠেকিয়ে বলল, 'নিশ্বাস টানতে থাকুন, এক সেকেন্ড দেরী করলেই গুলী করব। নিশ্বাস টানুন।'

হেনরী শ্যারনের দুচোখ থেকে আগুন বেরুচ্ছে। কিন্তু সুবোধ বালকের মত নির্দেশ পালন করল সে। নি:শ্বাস টানল। আর তার সাথে সাথেই ঢলে পড়ল সংজ্ঞা হারিয়ে। ওদের চারজনেরই একই পরিণতি হলো।

বিল্লাহ ফিরে গিয়ে আহমদ মুসার পাশে বসল।

উঠে দাঁড়িয়েছে জুলিয়া রবার্টস। তার বিব্রত বেদনার্ত মুখ। বলল, 'মি. আহমদ মুসা, বিল্লাহ বসলেন কেন? আমি বাকি রয়ে গেছি।'

'আপনি বাকিই থাকবেন। আপনাকে ক্লোরোফরম করার প্রয়োজন নেই।' আহমদ মুসা বলল।

'কিন্তু আপনি তো বলেছেন।' বলল জুলিয়া রবার্টস।

'সেটা মি. হেনরী শ্যারনকে শুধু জানাবার জন্যেই।' আহমদ মুসা বলল।

'শুধু জানাবার জন্যে? বুঝলাম না।' জুলিয়া রবার্টস বলল।

'আপনাকে ক্লোরোফরম না করলে, তার অর্থ তারা বুঝত আপনি আমাদের সহযোগিতা করছেন। সেটা আপনার জন্যে বিপজ্জনক হতো। এজন্যেই তাদের জানিয়েছি যে আপনাকেও সংজ্ঞাহীন করা হবে।' বুঝিয়ে দিল আহমদ মুসা।

'কিন্তু সংজ্ঞাহীন করার প্রয়োজন নেই বলছেন যে!' জুলিয়া রবার্টস বলল।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'ওরা জেনেছেন আপনিও সংজ্ঞাহীন হয়েছেন। কিন্তু ওরা জানবে না যে আপনি সংজ্ঞা হারাননি, আপনাকে ক্লোরোফরম করা হয়নি।'

বিস্ময়ে হা হয়ে উঠল জুলিয়া রবার্টসের মুখ। বলল, 'এতটা আট-ঘাট বেঁধে আপনি কথা বলতে পারেন?'

আহমদ মুসা উত্তর দিল না। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, ‘যা ঘটে গেল তার জন্যে আমি দু:খিত মিস জুলিয়া রবার্টস। আপনি.....।’

আহমদ মুসার কথায় বাধা দিয়ে বলে উঠল জুলিয়া রবার্টস, ‘আপনার ব্যাপারে ওঁরা বাড়াবাড়ি করেছেন বলে আমি মনে করি। কিন্তু আপনি বাইরের লোকদের নিস্ক্রিয় করার আগাম ব্যবস্থা নিয়েছিলেন কি করে? ওঁদের মনোভাব আঁচ করতে পেরেছিলেন কিভাবে?’

‘আমি নিউইয়র্ক থাকতেই খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম ডেট্রোয়েটের এফ.বি.আই. চীফ হেনরী শ্যারন ইহুদী এবং শ্যারন-আজর ওয়াইজম্যান নেটওয়ার্কের তিনি সদস্য। তারপর আপনার সাথে গাড়িতে আসার সময় যখন দেখলাম আপনি অধ্যাপক হাইম হাইকেলসহ আমার খবর তাকে জানালেন এবং ৯টায় ওঁরা আসছেন জানলাম, তখনই আমি নিশ্চিত হয়েছিলাম ওরা যে কোন মূল্যে এই মহাসুযোগের সদ্ব্যবহার করবে। আর যখন দেখলাম ওরা একটা কার ছাড়াও একটা মাইক্রো সাথে করে নিয়ে এসেছে, তখন এটা বুঝা গেল, তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় জনশক্তি তারা নিয়ে এসেছে।’ আহমদ মুসা বলল।

জুলিয়া রবার্টসের চোখে-মুখে বিস্ময়। বলল, ‘আমিও যেহেতু ব্যাপারটার সাথে জড়িত, তাই বোধ হয় আপনি আমাকে কিছুই জানাননি।’ কণ্ঠে কিছুটা অনুযোগের সুর।

‘না, আপনাকে জড়িত মনে করিনি। আপনি যেটা করেছেন, সেটা আপনার রুটিন ডিউটি। আপনাকে না জানাবার কারণ হলো, আপনাকে বিব্রত না করা এবং আপনাকে অসুবিধায় না ফেলা।’

হাসল জুলিয়া রবার্টস। বলল, ‘এতদিন আপনার কথা শুনেছি, আজ দেখলাম। নিজের লাভের চাইতে, অন্যের যাতে ক্ষতি না হয় সেটাকে আপনি বড় করে দেখেন। কিন্তু এই নীতি সমাজ সেবক, সমাজ সংস্কারকের হতে পারে, কিন্তু আপনার মত একজন যোদ্ধার এই নীতি কিভাবে?’

‘এটা নির্ভর করে যুদ্ধ ও যোদ্ধার লক্ষ্যের উপর। যুদ্ধ যদি হয় মানব সেবা ও মানব সমাজের সংস্কারের জন্যে, তাহলে যুদ্ধ ও যোদ্ধার নিজের লাভের চেয়ে

মানুষের ক্ষতিকে বড় করে দেখা হয়। ইসলামে এই যুদ্ধকেই বলে 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ' বা 'আল্লাহর জন্যে যুদ্ধ করা'। আল্লাহর জন্যে যুদ্ধ হলে সেটা কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, দেশ বা জাতির স্বার্থে হয় না, হয় মানুষের জন্যে।' বলল আহমদ মুসা।

'তাহলে ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জাতি বা দেশ যুদ্ধ করবে কেন, ক্ষতি স্বীকার করবে কেন, জীবন দেবে কেন?' জুলিয়া রবার্টস বলল।

'এই ধরনের যুদ্ধ তারা করতে পারে যারা স্রষ্টাকে পালনকর্তা, বিচারকর্তা এবং পুরষ্কার দাতা বা শাস্তিদাতা মানে।' বলল আহমদ মুসা।

'কিন্তু এই বিশ্বাসের সাথে মানুষের জন্যে কাজ করার সম্পর্ক কি?' জুলিয়া রবার্টস বলল।

'সম্পর্ক স্রষ্টা, পালনকর্তা, বিচারকর্তা ও পুরষ্কার বা শাস্তিদাতার উদ্দেশ্যে সাথে। স্রষ্টা চান তাঁর চাওয়া অনুসারে মানুষ মানুষের শান্তি ও কল্যাণের জন্যে কাজ করুক।' বলল আহমদ মুসা।

'এটা তো সমাজ সেবা, খুব বেশি হলে সমাজ সংস্কারের কাজ। যুদ্ধের কোন প্রশ্নই তো এখানে ওঠে না। কিন্তু আপনি বলেছেন যুদ্ধের লক্ষ্য এটা হতে পারে।' জুলিয়া রবার্টস বলল।

'এই লক্ষ্যে যুদ্ধ নয়, কিন্তু যুদ্ধ হলে তার লক্ষ্য এটাই হওয়া উচিত।' বলে একটু থামল আহমদ মুসা। বলল আবার, 'মানুষের শান্তি ও মংগলের জন্যে কাজ করার দুটো দিক আছে। একটা হলো ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্যে কাজ করা, অন্যটা হলো অন্যায়ের প্রতিরোধ করা। এই দুটি দিকের প্রথমটি দ্বিতীয়টির উপর নির্ভরশীল। ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্যেই অন্যায়ের প্রতিরোধ প্রয়োজন। তার মানে.......।'

'তার মানে মানুষের শান্তি ও মংগলের লক্ষ্যে অশান্তি ও অমংগলের প্রতিরোধের জন্যে যুদ্ধ প্রয়োজন। এর অর্থ আপনাদের ইসলামে যুদ্ধ একটা একান্ত আবশ্যকীয় অস্ত্র।' আহমদ মুসার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলল জুলিয়া রবার্টস।

'হ্যাঁ, যতদিন অশান্তি ও অমংগলের শক্তির হাতে এই অস্ত্র থাকবে।' বলল আহমদ মুসা।

মুখ টিপে হাসল জুলিয়া রবার্টস। বলল, 'এই দৃষ্টি কোণ থেকে সন্ত্রাস যুদ্ধকে আপনি বৈধ বলবেন? কারণ সবল পক্ষ যেটাকে যুদ্ধ বলে, সবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের সেই যুদ্ধই সন্ত্রাস নামে অভিহিত হয়। দুর্বলের এই যুদ্ধ সংগত কারণেই কৌশলের দিক দিয়ে ভিন্নতর হয়ে থাকে। দুর্বল এক্ষেত্রে সবলের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে না গিয়ে গেরিলা পন্থা অনুসরণ করে।'

'আপনার কথিত দুর্বল পক্ষ যদি বৈধ কোন ষ্টেট (যদি তা বিদ্রোহের মাধ্যমেও) হয় এবং ষ্টেট-অথরিটি যদি যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে সবল শত্রুর যতটা পারা যায় ক্ষতি করার জন্যে গেরিলা ধরনের আক্রমণ শুরু করে, তাহলে এটা সন্ত্রাস হবে না। কিন্তু ষ্টেট অথরিটি ছাড়াই যদি কোন গ্রুপ বা পক্ষ তার শত্রুর বিরুদ্ধে এই ধরনের আক্রমণ শুরু করে, তাহলে সেটা সন্ত্রাসের পর্যায়ে পড়বে। আমাদের নবী (স.) মক্কায় ১৩ বছর ষ্টেটলেস অবস্থায় মানুষের জন্যে শান্তি ও মংগলের বাণী, অর্থাৎ ইসলাম প্রচার করেছেন। এই তের বছর তিনি সবল শত্রুর দ্বারা অকথ্য নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। কিন্তু পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ কোনভাবেই তিনি শত্রুর উপর পাল্টা আঘাত হানেননি। অথচ মদিনায় গিয়ে ষ্টেট-অথরিট অর্জন করার পর প্রতিটি আঘাত-আক্রমণের তিনি মোকাবিলা করেছেন। শত্রুর প্রস্তুতিকে দুর্বল বা নস্যাত করার জন্যে অভিযান পরিচালনা করেছেন। সুতরাং আপনার প্রশ্নের জবাব হলো, ন্যায়সংগত হলেও আপনার কথিত সবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের অথরিটি বিহীন সন্ত্রাস যুদ্ধকে বৈধ বলে মনে করে না ইসলাম। 'ক'এর অপরাধে 'খ'কে শাস্তি দেবার অনুমতি ইসলামে নেই। অথচ সন্ত্রাসের অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটাই ঘটে।' আহমদ মুসা বলল।

'কেন এটা আপনাদের 'ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ' তত্ত্বের মধ্যে পড়ে তো।' জুলিয়া রবার্টস বলল।

'ব্যক্তি পর্যায়ে অন্যায় প্রতিরোধে গিয়ে কোন সময় শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হতে পারে। সে শক্তি প্রয়োগ যদি সামনাসামনি কোন অন্যায় থেকে কাউকে বিরত রাখার জন্যে হয়, তাহলে এটা সন্ত্রাস হবে না, কেউ একে সন্ত্রাস

বলবে না। কিন্তু কেউ যদি অন্যায়কারীকে এভাবে সামনাসামনি প্রতিরোধ করার প্রকাশ্য ও বাঞ্জনীয় দায়িত্ব পালন না করে এক সময় গোপনে গিয়ে তার বাড়িতে আগুন লাগায়, তাহলে এটা সন্ত্রাস হবে। কারণ এর দ্বারা নির্দিষ্ট অন্যায়টির প্রতিরোধ হয় না এবং এই কাজে অন্যায়কারী ছাড়াও আরও অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় খোদ এই কাজটিই অন্যায়ে পরিণত হয়।' বলল আহমদ মুসা।

'কিন্তু এর আগে আপনি বলেছেন, আপনাদের নবী ষ্টেট-অথরিটি বিহীন অবস্থায় মক্কা জীবনের তের বছরে কোন পর্যায়েই অন্যায় ও জুলুম নির্যাতনের প্রতিরোধ করেননি শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে। এখন বললেন ব্যক্তিপর্যায়ে অন্যায়ের প্রতিরোধে শক্তি প্রয়োগ করা যাবে। এটা ইসলাম সম্মত হলে আপনাদের নবী মক্কার জীবনে তা করেননি কেন?' জুলিয়া রবার্টস বলল।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'আমি এখানে বলেছি ব্যক্তি বা বিচ্ছিন্ন গ্রুপ পর্যায়ের অন্যায়ের কথা এবং ব্যক্তি বা বিচ্ছিন্ন গ্রুপ পর্যায়ের প্রতিরোধের কথা। এটা মানুষের অপরিহার্য দায়িত্বশীলতার অংশ বলেই মানব সমাজে এই কাজ চলে আসছে এবং চলা উচিত। ইসলাম একে উৎসাহিত শুধু নয় অবশ্য পালনীয় করেছে। কিন্তু অন্যায় ও জুলুম নির্যাতনকারী যদি ষ্টেট-অথরিটি হয়, জুলুম-নির্যাতন-অন্যায় যদি ষ্টেট অথরিটির অধীনে চলে তাহলে এর বিরুদ্ধে ব্যক্তি বা বিচ্ছিন্ন গ্রুপ পর্যায়ের শক্তি প্রয়োগ বা সন্ত্রাসী কর্মকান্ডকে ইসলাম অনুমোদন করেনি। আমাদের নবী (স.) মক্কা জীবনে এটা করেননি।'

'এর অর্থ হলো, ষ্টেট অথরিটির সব অন্যায় ও জুলুম অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করে যেতে হবে। এই কি?' জুলিয়া রবার্টস বলল।

'না, রাষ্ট্রের নাগরিকরা তা অবশ্যই মুখ বুজে সহ্য করবে না। প্রতিবাদ ও আন্দোলনের মাধ্যমে তাদেরকে অবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে। এটাও ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ, যাকে আপনার পাশ্চাত্যের সবাই ভুল বুঝে থাকে।' বলল আহমদ মুসা।

জুলিয়া রবার্টস হাসল একটু মুখ টিপে। বলল, 'অস্ত্রের যুদ্ধও তো জিহাদ?'

'হ্যাঁ, কিন্তু দুয়ের ক্ষেত্র আলাদা।' বলল আহমদ মুসা।

'বুঝেছি। কিন্তু বিদ্রোহ বা স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে আপনার মত কি? ষ্টেট অথরিটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও আন্দোলন কোন সময় বিদ্রোহ বা মুক্তি সংগ্রামের পর্যায়ে পৌছতে পারে।' জুলিয়া রবার্টস বলল।

'বিদ্রোহ বা মুক্তি সংগ্রাম ষ্টেট অথরিটির প্রতিপক্ষ আরেক ষ্টেট অথরিটি হয়ে দাঁড়াতে পারে। সেক্ষেত্রে যে যুদ্ধ বা সংঘাতটা হয়, তা যেমন প্রকাশ্য ও ঘোষিত, তেমনি তা শুধু ষ্টেট অথরিটির নিয়ন্ত্রণে সংঘটিত হয়। এই ধরনের বিদ্রোহ বা মুক্তি সংগ্রামমুলক কাজ সন্ত্রাসের পর্যায়ে পড়ে না। এই বিদ্রোহ, মুক্তি সংগ্রাম যদি 'আল্লাহর জন্যে', মানে মানুষের শান্তি ও কল্যাণের জন্যে হয়, তাহলে ইসলাম একে অনুমোদন করে।'

'ধন্যবাদ।' বলল জুলিয়া রবার্টস।

থামল সে। হেসে উঠল। বলল আবার, 'আপনি আমেরিকায়, সুরিনামে, ক্যারিবিয়ানে, আফ্রিকায়, ইউরোপে যা করেছেন এবং করছেন, তা কোন পর্যায়ে পড়ে? আপনি অস্ত্র ব্যবহার করছেন, মানুষও মারছেন।'

হাসল আহমদ মুসাও। উত্তরের জন্যে মুখ খুলেছিল। এ সময় ড. হাইম হাইকেল আহমদ মুসাকে বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'এই উত্তরটা আমি দিতে চাই।'

বলে একটু থামল। তারপর বলা শুরু করল, 'মি. আহমদ মুসা জিহাদকে চার ভাগে ভাগ করেছেন। ব্যক্তি বা বিচ্ছিন্ন গ্রুপ পর্যায়ে অন্যায়ের প্রতিরোধ, ব্যক্তি বা সামষ্টিক নাগরিক পর্যায়ে প্রতিবাদ ও আন্দোলন, বিদ্রোহ বা মুক্তি সংগ্রাম পর্যায়ে সংঘাত ও যুদ্ধ এবং আন্তঃ ষ্টেট পর্যায়ের যুদ্ধ সংঘাত। আহমদ মুসা প্রথম ধরনের জিহাদ করছেন। অস্ত্রের ব্যবহার ও মানুষ মারা নিয়ে মিস জুলিয়া প্রশ্ন তুলেছেন। আপনাদের আলোচনায় পরিষ্কার হয়েছে, দ্বিতীয় প্রকারের জিহাদে ইসলামী নীতি অনুসারে অস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ, কিন্তু প্রথম প্রকারের জিহাদে অস্ত্রের ব্যবহার প্রয়োজনীয় হতে পারে। কারণ অন্যায়কারীর হাতে যা থাকবে, তা নিয়েই তো তাকে প্রতিরোধ করতে হবে। আহমদ মুসা এটাই করছেন। মি. বুমেদীন বিল্লাহ এবং আমাকে উদ্ধার করতে এসে বন্দী খানাতেই আহমদ মুসার হাতে দু'ডজনের মত লোক মরেছে। এই লোকদের না মারলে তিনি আমাকে মুক্ত করতে পারতেন না। এটাই শুধু নয়, তাঁকেও নিহত হতে

হতো। তার এই যুদ্ধ বা জিহাদকে শুধু ইসলাম নয়, দুনিয়ার অন্য ধর্ম ও শাসন ব্যবস্থাও অনুমোদন করে।’ থামল ড. হাইম হাইকেল।

‘ধন্যবাদ স্যার। আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু সন্ত্রাস সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?’ বলল জুলিয়া রবার্টস।

‘মি. আহমদ মুসার সব কথা আমি ভালোভাবে শুনেছি। সন্ত্রাস সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন তার সাথে আমি একমত। তিনি তার ধর্মের জিহাদের যে দৃষ্টিকোন তুলে ধরেছেন তার সাথে আমি কয়েকটা কথা যোগ করব। জিহাদ বা যুদ্ধের ব্যাপারে ইসলামের নীতি খুবই স্বচ্ছ, বিস্তারিত ও বাস্তবমুখী। এদিক থেকে ইসলাম অন্যান্য ধর্ম থেকে একেবারেই আলাদা। ইসলাম সর্বকনিষ্ঠ এবং নবুওতের ধারায় সর্বশেষ ধর্ম হওয়ার দাবীদার বলেই হয়তো। ইসলাম মানুষের মতামতের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। কারো উপর ধর্মমত চাপিয়ে দেবার বিরোধী। ইসলামের নবী তার জীবদ্দশায় মদিনার মুনাফিকদের বিকৃত বিশ্বাসকে সহ্য করে গেছেন, কিন্তু তাদের বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীকে সহ্য করেননি। যেমন তাদের ভিন্ন ‘মসজিদ’ তৈরির উদ্যোগ নস্যাত করে দিয়েছিলেন। মদিনার ইহুদীদের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তির ভিত্তিতে মৈত্রী গড়েছিলেন। কিন্তু ইসলামের নবী নিজে যেমন চুক্তি লংঘন করেননি, তেমনি তিনি ইহুদীদের ষড়যন্ত্রমূলক চুক্তি লংঘনকে বরদাশত করেননি। বিচার ও বিচার কার্যকরী করার ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ইসলামের নবী মানুষের চিন্তা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু বিভ্রান্তি, অনর্থ, অশান্তি সৃষ্টিকারী উদ্যোগের প্রতিরোধকে একান্ত আবশ্যকীয় বলেছেন। ইসলাম অশান্তি বিশৃঙ্খলা ও সন্ত্রাসকে ‘হত্যা’র চেয়ে মারাত্মক অপরাধ বলে অভিহিত করেছে। এমনকি একজন লোকের হত্যাকেও গোটা মানবজাতিকে হত্যা বলে আখ্যায়িত করেছে। এ কারণেই ইসলাম অপরাধের প্রতিরোধ ও প্রতিবিধানে অত্যন্ত কঠোর। ইসলামের মানবিক রূপ আমাদের পশ্চিমী দেশসমুহে যুদ্ধবাদী, সহ অবস্থান বিরোধী, অশান্তি সৃষ্টিকারী বলে চিত্রিত হয়েছে। মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী হিসেবে চিত্রিত করার কসরত চলছে এই দৃষ্টিকোন থেকেই। পশ্চিমের এই চিন্তা বুঝার ভুল অথবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রসূত। নিরপেক্ষ ও নীতিনিষ্ঠ হয়ে একটু চিন্তা করলেই দেখা

যাবে ইসলামের মৌলবাদিতা অর্থাৎ মানবতা ও মানব সমাজ বিরোধী অপরাধের প্রতিরোধ, প্রতিবিধান ও বিচার প্রশ্নে ইসলামের অনড়তা, আপোষহীনতা মানব সমাজের শান্তি ও কল্যাণের জন্যেই প্রয়োজন। খোদ জাতিসংঘও এ বিষয়টা এখন উপলব্ধি করতে শুরু করেছে। এক সময় জাতিসংঘ শুধু শান্তি রক্ষা করে চলাকেই তার কাজ মনে করতো, কিন্তু এখন শান্তি প্রতিষ্ঠাকেও তার কাজ হিসাবে গ্রহণ করছে। জাতিসংঘ তার এই লক্ষ্য বাস্তবায়িত করতে গেলে অন্যদের অমঙ্গলের শক্তির বিরুদ্ধে তাকে যুদ্ধ করতে হবে। জাতিসংঘ ইতিমধ্যেই যুদ্ধ শুরু করেছে। জাতিসংঘ তার কুয়েত যুদ্ধ ও আফগান যুদ্ধকে এই দৃষ্টিকোণ থেকেই অপরিহার্য করেছে। এমনকি আমাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার অনেক আগ্রাসনকে অনুরূপ যুক্তিতে বৈধ মনে করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার মিত্রসহ গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক দেশসমূহের নিরাপত্তার জন্যে প্রয়োজন হলে অশান্তি ও অমংগলের শক্তির বিরুদ্ধে আগাম আক্রমণকেও বৈধ করে নিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক আক্রমণ ও দখন তার এই নীতিরই একটা নগ্ন দৃষ্টান্ত। সুতরাং ইসলাম..........।'

ড. হাইম হাইকেলের কথায় বাধা দিল জুলিয়া রবার্টস। ড. হাইম হাইকেলের কথার মাঝখানেই সে বলে উঠল, 'স্যার, তাহলে তো দেখা যাচ্ছে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামের যুদ্ধ নীতিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাতিসংঘ গ্রহণ করেছে।'

হো হো করে হেসে উঠল ড. হাইম হাইকেল। বলল, 'হ্যাঁ, গ্রহণ করেছে। ইসলামের বন্দুকটা নিয়েছে ঠিকই, কিন্তু টার্গেট উল্টো দিকে স্থির করেছে। ইসলামের 'যুদ্ধ'কে নিলেও যুদ্ধের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে নেয়নি। মি. আহমদ মুসা বলেছেন, ইসলামের জিহাদ বা যুদ্ধ 'আল্লাহর জনে', মানে মানুষের মুক্তি, শান্তি ও কল্যাণের জন্যে, কিন্তু আমাদের আমেরিকার যুদ্ধ আমেরিকার জন্যে, তার নিজ সম্পদ ও সমৃদ্ধির জন্যে। মুসলমানদের 'আল্লাহর জন্যে' যুদ্ধকে মৌলবাদ বলে গালি দিলেও তা মানুষের জন্যে শান্তি আনে, কল্যাণ আনে, আর আমরা স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের শ্লোগানের আড়ালে যুদ্ধ করি নিজের জন্যে। তাই অশান্তি ও অমংগলের সৃষ্টি করে এবং সংশ্লিষ্ট জনগণের কাছে আমরা দখলদার ও খুনি হিসেবে চিত্রিত হই। অথচ ইসলামের সোনালী যুগের মুসলিম বিজেতাদের

বিজিত দেশের মানুষ স্বাগত জানিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরেছে, আর বিজয়ীরাও বিজিতদের বিজিত হিসেবে নয় ভাই হিসেবে বুকে টেনে নিয়েছে। সুতরাং দুযুদ্ধই যুদ্ধ, তবে দুয়ের মধ্যে স্বর্গ ও নরকের মত ............।'

ড. হাইম হাইকেলের কথার মাঝে আবার বাধা দিয়ে জুলিয়া রবার্টস বলে উঠল, 'স্যার, আপনি কিন্তু দেশের বিরুদ্ধে কথা বলছেন।'

'না, দেশের বিরুদ্ধে নয়, আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফাউন্ডার ফাদারসদের স্বাধীনতা ও গনতন্ত্র নীতির পক্ষে কথা বলছি।' বলল ড. হাইম হাইকেল।

'আপনি তো ধর্মপ্রাণ ইহুদী, ইসলামকে আসলেই আপনি কেমন মনে করেন?' জিজ্ঞাসা জুলিয়া রবার্টসের।

'ইসলাম আধুনিক মানুষের জীবন-দর্শন।' জবাব দিলেন ড. হাইম হাইকেল।

'স্যার আমি জানি, আপনি আপনার আগের ইহুদী বিশ্বাস থেকে সরে এসে এখন এমন একটি ইহুদী বিশ্বাস অনুসরণ করেন যেখানে দয়া ও ভালোবাসাই মাত্র ধর্মের হাতিয়ার, যেখানে যুদ্ধ ও রক্তপাতের কোন স্থান নেই। কিভাবে আপনি তাহলে ইসলামকে আধুনিক মানুষের অনুসরণীয় ধর্ম বলেছেন যেখানে প্রতিরোধ-প্রতিবিধানের জন্যে যুদ্ধ অপরিহার্য?'

সংগে সংগে জুলিয়া রবার্টসের প্রশ্নের জবাব দিল না ড. হাইম হাইকেল। যেন দম নিচ্ছিল সে। একটু পর বলল, 'আমি আমার জীবনের এক বিশেষ অবস্থায় যে বিশ্বাস বেছে নিয়েছি, তা আমার মনের শান্তির জন্যে প্রয়োজনীয় হলেও সে বিশ্বাস দুনিয়ায় শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। কারণ দুনিয়ায় সবল ও ষড়যন্ত্র পটু অমংগলের শক্তি দুর্বল ও নীরিহ মংগল কামনাকে গলা টিপে মারছে ও মারতেই থাকবে। পথহারা দূর্বল ও নিরীহ মানুষের মুক্তির জন্যে আজ খোদায়ী বিধানের অধীন একমাত্র জীবন্ত ধর্ম ইসলামের প্রয়োজন। ইসলামের প্রতিরোধ ও প্রতিকারের যুদ্ধই পারে মানুষের জন্যে শান্তি ও মংগল আনতে।' থামল ড. হাইম হাইকেল।

ড. হাইম হাইকেল থামতেই জুলিয়া রবার্টস বলে উঠল, 'স্যার, আপনি খুব বেশি হতাশ। কেন জাতিসংঘের মাধ্যমে তো আমরা মানুষের জন্যে এ শান্তি ও কল্যাণ আনতে পারি।'

হাসল ড. হাইম হাইকেল। বলল, 'মিস জুলিয়া রবার্টস, দুনিয়ায় সকল মানুষের জন্যে পক্ষপাতহীন শান্তি, সুবিচার ও মংগল প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রয়োজন ব্যক্তি-নিরপেক্ষ, দেশ-নিরপেক্ষ অনড় নীতিবোধ। এই নীতিবোধ জাতিসংঘ নয়, একমাত্র স্রষ্টাই দিতে পারেন। কারণ স্রষ্টা সব মানুষের এবং মানুষও স্রষ্টার। আর একটা মৌলিক কথা হলো, যিনি নীতি প্রণয়নকারী, তিনিই যদি আবার তার বাস্তবায়নকারী হন, তাহলে তিনি সময় ও অবস্থার পরিবর্তনে নীতি পাল্টাতে পারেন। সুতরাং মানুষ কিংবা মানুষের দ্বারা পরিচালিত জাতিসংঘ একই সাথে বিধান দাতা ও বিধানের অনুসরণকারী দুই-ই হতে পারে না। এ জন্যেই মানুষের জন্যে খোদায়ী বিধান প্রয়োজন যা সকলের উপর সমভাবে প্রযোজ্য এবং এই বিধানই মানুষের শান্তি ও কল্যাণের পাহারাদার হবে। আমার মত ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের কাছে এটা দুর্ভাগ্যজনক হলেও স্বীকার করতে হবে যে, এই খোদায়ী বিধান আজ শুধু ইসলামের কাছেই আছে।'

বিস্মিত, বিব্রত, মুগ্ধ জুলিয়া রবার্টস বলল, 'কেন, তাহলে স্যার আপনি ইসলাম গ্রহণ করেননি, করছেন না?'

হাসল ড. হাইম হাইকেল। বলল, 'আমি দুনিয়ার মানুষের কথা বলছি, নিজের কথা নয়। ব্যক্তিগত প্রসংগ থাক।' থামল ড. হাইম হাইকেল।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে আহমদ মুসা 'কম্পারেটিভ ফেইথ ষ্টাডিজ'-এর প্রবীণ প্রফেসর ড. হাইম হাইকেলের কথা গোগ্রাসে গিলছিল। ড. হাইম হাইকেল থামতেই সে বলে উঠল, 'ধন্যবাদ স্যার। আমার বিশ্বাসকে আপনি আরও মজবুত করছেন যে, ইসলাম একদিন অবশ্যই বিশ্বের সব মানুষের একমাত্র জীবন-দর্শন হয়ে উঠবে।'

বলে একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর ড. হাইম হাইকেলকে 'মাফ করবেন স্যার' বলে জুলিয়া রবার্টসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মিস জুলিয়া রবার্টস,

এদেরকে হাসপাতালে নিতে হবে। কিন্তু তার আগে আপনি এফ.বি.আই.-এর চীফ জর্জ আব্রাহাম জনসনের সাথে একটু কথা বলুন।'

'সুপ্রীম বস জর্জ আব্রাহাম জনসনের সাথে? আমি? কেন?' দুচোখ ছানা-বড়া করে বলল জুলিয়া রবার্টস।

'আমার কথা তাকে বলুন। সব ব্যাপার তাকে জানান?' বলল আহমদ মুসা।

'উনি তো সবই জানতে পারবেন। সবই তাকে জানানো হবে অফিসিয়ালি।' জুলিয়া রবার্টস বলল।

'সেটা তো পরে। আমি এখান থেকে যাওয়ার আগেই তাঁকে জানানো দরকার। যাতে অন্তত আপনার কাছে পরিষ্কার হয় যে, সুযোগ নিয়ে আমি আইনের হাত থেকে পালাচ্ছি না। এফ.বি.আই. চীফ যখন ইচ্ছা ডাকলেই আমাকে পেতে পারেন।' বলল আহমদ মুসা।

'তাহলে আপনি কথা বলুন। আমি সরাসরি তাঁর সাথে কথা বলার এক্তিয়ার রাখি না।' জুলিয়া রবার্টস অনুরোধের সুরে বলল।

'ঠিক আছে, সংযোগ লাগিয়ে দিন, আমি কথা বলব।' বলল আহমদ মুসা।

ঠিক আছে। আমার পার্সোনাল ও অফিসিয়াল মোবাইল ছাড়াও নাম্বারহীন একটা মোবাইল আছে। সেটা নিয়ে আসি। আমি চাই, আমার সহযোগিতার কোন রেকর্ড স্যারের কাছে না থাক।' বলে উঠে এক দৌড়ে উঠে গেল দুতলায়। এক মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল সে মোবাইল নিয়ে।

আহমদ মুসা এফ.বি.আই.-চীফ জর্জ আব্রাহাম জনসনের পার্সোনাল মোবাইল নাম্বার জুলিয়া রবার্টসকে বলল।

জুলিয়া রবার্টস নাম্বারগুলো টিপে সংযোগ দিয়েই দ্রুত তুলে দিল আহমদ মুসার হাতে।

টেলিফোন ধরে ওপারের কণ্ঠ শুনেই চিনতে পারল। বলল, 'গুড ইভিনিং। জনাব আমি আহমদ মুসা।'

ওপার থেকে কণ্ঠ ভেসে এল, 'আসসালামু আলাইকুম। তুমি তো ডেট্রয়েটে। কেমন আছ? নিশ্চয় কোন বিশেষ খবর?'

'ড. হাইম হাইকেলকে ওদের হাত থেকে মুক্ত করেছি জনাব।' আহমদ মুসা বলল।

ভেসে এল ওপার থেকে কণ্ঠ, 'থ্যাংকস গড। অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে। কখন, কিভাবে কোত্থেকে তাকে উদ্ধার করা গেল?'

আহমদ মুসা সংক্ষেপে কাহিনীটি বলল। সেই সাথে বলল জুলিয়া রবার্টস কিভাবে তাদেরকে নিরাপদ স্থানে সরে আসতে সাহায্য করেন।

'থ্যাংকস গড। রীতিমত থ্রিলিং ব্যাপার? তুমি এখন কোথায়?' বলল ওপার থেকে জর্জ আব্রাহাম জনসন।

'এখন মিস জুলিয়ার ড্রইংরুমে। আমার সামনে ডেট্রয়েটের এফ.বি.আই.-চীফ হেনরী শ্যারনসহ তার ৮জন লোক সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে আছে। আমি আপনাকে টেলিফোন করেছি একথা জানাবার জন্যে যে, আমি ডক্টর হাইম হাইকেলকে আমার সাথে নিয়ে যাচ্ছি। তিনি এ বাড়িতে মুহূর্তের জন্যেও নিরাপদ নন। আপনি তার নিরাপত্তা ও অবস্থানের জন্যে ব্যবস্থা করলে তাকে আপনাদের কাছে হাজির করব।' এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলল আহমদ মুসা।

'থ্যাংকস। হেনরী শ্যারন কি তোমাদের আক্রমণ করেছিল? তোমাকে ও ড. হাইম হাইকেলকে ধরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল?' ওপার থেকে বলল জর্জ আব্রাহাম জনসন।

আহমদ মুসা জুলিয়া রবার্টসের গাড়ি করে আসার সময় থেকে যা ঘটেছে তার সব কথা বলল জর্জ আব্রাহাম জনসনকে।

'থ্যাংকস গড। তুমি ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলে। হেনরী শ্যারনদের হাতে পড়া মানে আজর ওয়াইজম্যানদের হাতে পড়া। এবার ওদের হাতে পড়লে তোমার ও ড. হাইম হাইকেলের নিহত হওয়ার শতভাগ সম্ভাবনা ছিল। আর নিশ্চয় এই কারণেই হেনরী শ্যারন বিষয়টা আমাদের কাছ থেকে গোপন রেখেছে। সে আজ রাত পৌনে ৯টায়, মানে সে তোমার ওখানে পৌছার মাত্র পনের মিনিট আগে আমার অফিসের সাথে কথা বলেছে। কিন্তু সে তোমাদের সম্পর্কে, তার

অভিযান সম্পর্কে কিছুই জানায়নি। ভাল হয়েছে, তুমি ওদের সংজ্ঞাহীন করে আত্মরক্ষা করেছ, কাউকে হত্যা করতে হয়নি। থ্যাংকস গড।' বলল জর্জ আব্রাহাম জনসন।

'জনাব, আমিও আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি যে, আমি আপনাকে ও জুলিয়া রবার্টসকে বিব্রত অবস্থার মধ্যে ফেলিনি।' আহমদ মুসা বলল।

'ঠিক, আমাদেরকে বিব্রত অবস্থা থেকে বাঁচিয়েছ। মিস জুলিয়া রবার্টস কি তোমার পাশে আছে? ওকে টেলিফোনটা দাও।'

'দিচ্ছি স্যার। এইসাথে আমি আপাতত বিদায় নিচ্ছি। আমি কি করছি আপনাকে জানাব। থ্যাংকস। বাই।'

আহমদ মুসা মোবাইলটি তুলে জুলিয়া রবার্টসের হাতে নিল।

জুলিয়া রবার্টস মোবাইল হাতে নিয়ে মুখের সামনে ধরে 'গুড ইভিনিং স্যার' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল। কথা বলল তার চীফ বস জর্জ আব্রাহাম জনসনের সাথে।

কথা শেষ করে ধপ করে সোফার উপর বসে পড়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'আজ দ্বিতীয়বার কথা বললাম তার সাথে। একবার বলেছিলাম চাকুরিতে যোগ দেবার সময়। আর আজ।'

এই স্বগোতোক্তির পর তাকাল সে আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'স্যার বলেছেন, আপনারা আমার সাথে বেরুবেন। আমি হেনরী শ্যারনদেরকে হাসপাতালে রেখে আপনাদের নিয়ে যাব এয়ারপোর্টে। এয়ারপোর্টে আপনাদের জন্যে তিনটা টিকিট থাকবে ফিলাডেলফিয়ার জন্যে। আপনাদের বিমানে তুলে দিয়ে তারপর আমার ছুটি। তবে এখান থেকে বেরুবার আগে আপনাদের ছদ্মবেশ নিতে হবে, স্যার বলেছেন।'

'ফিলাডেলফিয়া কেন? আমি তো তাকে বলেছি, ড. হাইম হাইকেল তার বাড়িতে একদিনের জন্যেও নিরাপদ নন।' বলল আহমদ মুসা।

হাসল জুলিয়া রবার্টস। বলল, 'আমার কথা এখনও শেষ হয়নি। আপনারা ড. স্যারের বাড়ি যাচ্ছেন না। আপনারা ফিলাডেলফিয়া এয়ারপোর্টে যাওয়ার পর পার্কিং নাম্বার ওয়ানে একটা নীল রংয়ের গাড়ি পাবেন। নাম্বার 'FA

1876' এবং সে গাড়ির ড্রাইভার থাকবেন একজন তরুণী। তরুণীটি একটি বিশেষ কোডে হর্ণ দিয়ে আপনাদের স্বাগত জানাবেন। সে কোড আপনি জানেন। গাড়ি যেখানে আপনাকে নিয়ে যাবে সেটা হবে, স্যার বলেছেন, আমেরিকায় আপনার জন্যে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। ব্যস। এবার চলুন ছদ্মবেশ নেবেন।'

জুলিয়া রবার্টসসহ আহমদ মুসারা তিনজন উপরে উঠে গেল। একটু পর চারজন নিচে নেমে এল। সবাই ধরাধরি করে সংজ্ঞাহীন দেহগুলো বাইরে মাইক্রোতে নিয়ে তুলল। তারপর বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে।

গাড়ির কাছে গিয়ে জুলিয়া রবার্টস বলল, 'মি. আহমদ মুসা, আপনি ড. স্যার ও বিল্লাহকে নিয়ে আমার গাড়িতে উঠুন। আর আমি হেনরী শ্যারনদের মাইক্রোতে ওঁদেরকে নিয়ে ওটা আমি চালিয়ে নেব।'

জুলিয়া রবার্টস নিজের গাড়ির চাবি আহমদ মুসার হাতে দিয়ে মাইক্রোতে গিয়ে উঠল।

আহমদ মুসারাও গিয়ে জুলিয়া রবার্টসের কারে উঠল।

গাড়ি ষ্টার্ট দিতে দিতে জুলিয়া রবার্টস গাড়ির জানালা দিয়ে আহমদ মুসাকে বলল, 'আপনি আমাকে ফলো করবেন। হাসপাতাল থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত পার্কিং-এ আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন। গুড লাক। বাই।'

জুলিয়া রবার্টসের গাড়ি চলতে শুরু করল। তার পেছনে আহমদ মুসার গাড়িও।

গাড়িটা যেমন যান্ত্রিক। ড্রাইভার তরুণীটাও তেমনি যন্ত্রের মত। সামনে তাকিয়ে স্থির বসে আছে ড্রাইভিং সিটে। হাত দুটি তার ড্রাইভিং হুইলে। হুইলটার মাঝে মাঝে নড়া-চড়া ছাড়া আর সবকিছুই স্থির। গাড়িতে তোলার সময় যান্ত্রিক কণ্ঠে স্বাগত জানানো ছাড়া মেয়েটি আর একটা কথাও বলেনি। আহমদ মুসা ভাবল, মেয়েটি বোধ হয় এফ.বি.আই.-এর কেন্দ্রীয় স্পেশাল ফোর্সের সদস্য। বলা হয়, এরা বলেও না, শুনেও না, শুধুই হুকুম তামিল করে।

গাড়ির ম্যাপ স্ক্রীনে গাড়ির চলার পথ সুন্দরভাবে ফুটে উঠছে। গাড়িটা ফিলাডেলফিয়া ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে উত্তর-পূর্বমুখী পেনরস এ্যাভেনিওতে প্রবেশ করেছিল। পেনরস এ্যাভেনিউ থেকে প্রবেশ করেছে বিখ্যাত ব্রডষ্ট্রিটে। ব্রডষ্ট্রিট থেকে গাড়ি এখন ওয়ালমাট ষ্ট্রিটে প্রবেশ করে পুব দিকে এগিয়ে চলেছে।

ড. হাইম হাইকেল আহমদ মুসার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'আমরা দেলোয়ার নদীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আমার মনে হয়, দেলোয়ার নদী ও সিটিহলের মাঝখানের পুরানো অফিসিয়াল এলাকার কোথাও আমাদের নিয়ে যাচ্ছে।'

ড. হাইম হাইকেলের কথা শেষ হতেই গাড়িটা উত্তর দিকে টার্ণ নিয়ে ষষ্ঠ ষ্ট্রিট ধরে এগিয়ে চলল। কিন্তু মাত্র ১০০ মিটার গিয়েই গাড়ি পুবদিকে বাঁক নিয়ে ষ্ট্রিট থেকে নেমে সামনে এগুলো। তারপর আরও পঞ্চাশ মিটার গিয়ে পাঁচিল ঘেরা একটা বাড়ির গেটে গিয়ে দাঁড়াল।

দাঁড়িয়েই ড্রাইভার তরুণী আহমদ মুসাদের দিকে তাকিয়ে 'এক্সকিউজ মি স্যার' বলে গাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

তরুণী এগুলো গেটের দিকে।

গেটের সিকিউরিটিকে কি যেন সে বলল। সংগে সংগে সিকিউরিটি লোকটি মোবাইল তুলে কথা বলল।

মিনিটখানেকের মধ্যেই ভেতর থেকে একজন লোক বেরিয়ে এল। সে সিকিউরিটির সাথে কথা বলেই ছুটে এল গাড়ির কাছে। গাড়ির দরজা খুলে বলল, 'ওয়েলকাম স্যার, আসুন।'

লোকটি চল্লিশোর্ধ। সুন্দর সাদাসিধা পোশাক। সরল, হাসিমাখা মুখ।

গাড়ি থেকে বেরুল প্রথম আহমদ মুসা। তারপর ড. হাইম হাইকেল এবং শেষে বুমেদীন বিল্লাহ।

লোকটি সবার সাথে হ্যান্ডশেক করে বলল, 'আমি হেনরিক হফম্যান। ম্যাডামের কর্মচারী। এই বাড়ির কেয়ারটেকার। আপনাদের ব্যাপারে সবকিছু আমাকে বলা হয়েছে।'

একটু দম নিয়ে ড. হাইম হাইকেলে দিকে ইংগিত করে বলল, ‘ইনি নিশ্চয় ড. মুর হ্যামিল্টন। ম্যাডামের শিক্ষক। অসুস্থ। আর..............।’

তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে আহমদ মুসা বলল, ‘আর আমি জোসেফ জন।’ তারপর বুমেদীন বিল্লাহকে দেখিয়ে বলল, ‘ইনি ক্রিশ্চিয়ান কার্টার।’

‘জানি স্যার। আসুন। ওয়েলকাম।’ বলে গেটের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

ড্রাইভার তরুণী এগিয়ে এল আহমদ মুসাদের দিকে। স্যালুট দিয়ে বলল, ‘হ্যাভ অ্যা নাইস টাইম। বাই স্যার।’

‘থ্যাংক ইউ ম্যাডাম।’ বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসারা হফম্যানের সাথে গেটের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

গেটের ডানপাশে বাড়ির একটা নেম প্লেট। কাঠের ব্রাউন প্লেটের উপর সাদা অক্ষরে বড় করে লেখা ‘জেফারসন হাউজ।’ তার নিচে ব্র্যাকেটের মধ্যে ছোট অক্ষরে ‘ব্যক্তিগত মালিকানা’ শব্দ দ্বয় লেখা।

বাড়িটার নাম পড়ে ভ্রু কুঁচকালো আহমদ মুসা। কোন জেফারসন? টমাস জেফারসন নিশ্চয়। না হলে আর কোন জেফারসনের নামে এমন হাউজ হবে এবং এই খানে? ভাবনা বাড়ল আহমদ মুসার। এটা জেফারসন হাউজ হলে ম্যাডাম কে? বিরাট পরিবার, অনেক শাখা। ম্যাডাম অনেকেই হতে পারে। ফিলাডেলফিয়ার ‘জেফারসন হাউজ’-এর কথা আহমদ মুসা সারাহ জেফারসনের কাছে কোনদিনই শোনেনি।

আহমদ মুসারা গেট পার হয়ে প্রবেশ করল ভেতরে।

গেট থেকে লাল পাথরের একটা সুন্দর রাস্তা এগিয়ে গেছে বাড়ির দিকে। দুধারে ফুলের বাগান। বাগানটা বাড়ির চারদিক ঘিরেই। চারদিকের ফুল বাগানের মাঝখানে লাল পাথরের সুন্দর তিনতলা বাড়িটি।

লাল পাথরের রাস্তাটি বাড়ি থেকে একটু সামনে বেরিয়ে আসা গম্বুজাকৃতির ছাদে ঢাকা সুন্দর সাদা পাথরের চত্বরে গিয়ে শেষ হয়েছে। এটা গাড়ি বারান্দা হিসেবেই ব্যবহার হয়। তিনটা ধাপ পেরিয়েই সে বারান্দায় উঠা

যায়। ছোট্ট অর্ধ চন্দ্রাকৃতি বারান্দার পরেই বাড়িতে প্রবেশের বিরাট দরজা। হেনরিক হফম্যানকে অনুসরণ করে ঐ দরজা পথে আহমদ মুসা বাড়িতে প্রবেশ করল।

দরজার পরে ছোট্ট একটা করিডোর পথ। তার পরেই বিশাল একটা লাউঞ্জ। তাঁরা লাউঞ্জে পৌঁছল।

হেনরিক হফম্যান বলল, 'স্যার এটা বাড়ির পার্টি কর্ণার। এই নিচের তলাতেও আগে অফিস রুম ছিল, এখন তার কিছু অংশে কিচেন ও ষ্টোর করা হয়েছে। আমরা যারা আছি তাদেরও থাকার ব্যবস্থা এই ফ্লোরে। একতলা ও দুতলা রিমডেলিং হয়ে গেছে। তিনতলার কাজ বাকি। আপনাদের থাকার জায়গা দুতলায়। চলুন স্যার।'

দাঁড়িয়ে এক নাগাড়ে কথাগুলো বলে দুতলায় উঠার সিঁড়ির দিকে আবার হাঁটা শুরু করল হেনরিক হফম্যান।

আহমদ মুসারা চলল তার পেছনে পেছনে।

দুতলায় উঠে হেনরিক হফম্যান আহমদ মুসাদের প্রত্যেককে তার ঘরে নিয়ে গেল। সবাইকে বলল, 'ফ্রেশ হয়ে দুতলার লাউঞ্জে আসুন স্যার। ওখানেই চা-নাস্তা দিতে বলেছি। নাস্তার সাথে কথাও বলা যাবে। আর কাপড় ছাড়ার দরকার হলে আলমারিতেই সব পাবেন স্যার। প্রয়োজনীয় সব জামাকাপড় সেখানে রাখা আছে। কোন কিছুর দরকার হলে বলবেন।'

হেনরিক হফম্যান দুতলার লাউঞ্জে ফিরে এল। লাউঞ্জটা দুতলার সিঁড়ির মুখেই।

মিনিট পনেরোর মধ্যে আহমদ মুসা, ড. হাইম হাইকেল ও বুমেদীন বিল্লাহ লাউঞ্জে চলে এল।

গরম নাস্তা ও গরম চায়ের জন্যে ধন্যবাদ দিয়ে ড. হাইম হাইকেল বলল, 'নাইস লোকেশান বাড়িটার। বাড়ির পুব পাশে ফিলোসফিক্যাল হল, উত্তর পাশে ইনডিপেনডেন্স হল এবং তার পাশেই কংগ্রেস হল। বলা যায় ফিলাডেলফিয়ার প্রাণকেন্দ্র এটা।'

বলে একটু থেমেই ড. হাইম হাইকেল তাকাল হেনরিক হফম্যানের দিকে। বলল, 'মি. হফম্যান, এ বাড়িটার নাম 'লিবার্টি হাউজ' এবং এ বাড়িটা 'ন্যাশনাল চাইল্ড ফাউন্ডেশন'এর অফিস ছিল। এ পরিবর্তনটা কি করে হলো?'

'আপনি ঠিকই বলেছেন স্যার। দুমাস আগে এই পরিচয়ই ছিল। দুমাস হলো এই পরিবর্তন ঘটেছে। বাড়ির মালিকই এ পরিবর্তন ঘটিয়েছেন।' বলে একটু থেমেই হফম্যান আবার বলা শুরু করল, 'স্যার, এই বাড়িটা তৈরি করেন দুবার নির্বাচিত সাবেক প্রেসিডেন্ট টমাস জেফারসন। ফিলাডেলফিয়ায় থাকাকালিন সময়ে এ বাড়িতে তিনি বাসও করেন। তিনিই বাড়িটির নাম দেন 'লিবার্টি হাউজ'। এই বাড়িতে বসেই তিনি মার্কিন সংবিধান 'বিল অব রাইটস'এর খসড়া তৈরি করেন। বোধ হয় এ কারণেই তিনি বাড়িটার নাম 'লিবার্টি হাউজ' রাখেন। তিনি ওয়াশিংটনে চলে গেলে বাড়িটা ভাড়ায় চলে যায়। সর্বশেষ ভাড়ায় ছিলেন ন্যাশনাল চাইল্ড ফাউন্ডেশন। দুমাস আগে তারা চলে যান। তারা চলে যাওয়ার পর বর্তমান মালিক ম্যাডাম মানে টমাস জেফারসনের গ্রান্ড গ্রান্ড ডটার মিস সারা জেফারসন সিদ্ধান্ত নেন বাড়িটা আর ভাড়া দেবেন না। বাড়িটাকে তিনি তার গ্রান্ড গ্রান্ড ফাদার টমাস জেফারসনের 'ফ্যামিলি মেমোরিয়াল' বানাবেন। ভার্জিনিয়ায় টমাস জেফারসনের বাড়ি এখন প্রকৃত অর্থে পাবলিক প্লেসে পরিণত হয়েছে। ওখানে কোন ফ্যামিলি প্রাইভ্যাসি আর সম্ভব নয়। এ কারণেই তিনি জেফারসনের 'ফ্যামিলি মেমোরিয়াল, হিসেবে এই বাড়ি বেছে নিয়েছেন। নামও পরিবর্তন করেছেন উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে।'

সবাই যখন হফম্যানের কথা শোনায় বুঁদ হয়ে গিয়েছিল, তখন আহমদ মুসার একটা ভিন্ন অস্বস্তি। মনের একটা চিন্তা থেকেই এই অস্বস্তি। সারাহ জেফারসনের মায়ের মন্তব্য তার মনে আছে। অতীতের সব কিছু মুছে ফেলার জন্যে সারা জেফারসনের সময় ও সুযোগ প্রয়োজন। আহমদ মুসা কোনভাবেই আর তার বিব্রত হওয়ার কারণ হতে চায় না। যে কারণে আহমদ মুসা এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসে সারার সাথে কোন যোগাযোগ করেনি। সারা জেফারসন তার খবর রাখছে জানতে পেরেও তার সাথে সৌজন্যমূলক কথা বলা থেকেও আহমদ মুসা বিরত থেকেছে। কিন্তু এত কিছুর পরেও সে আজ সারা জেফারসনের

বাড়িতে এসে উঠেছে। এফ.বি.আই. চীফ জর্জ আব্রাহাম জনসন বিষয়টা জেনেও কেন এটা করলেন? এটা তিনি ঠিক করেননি। মনে কিছু ক্ষোভেরই সৃষ্টি হলো তার।

ওদিকে গল্প চলছিল। কিন্তু আহমদ মুসার কানে ওদের গল্প ঢুকছে না। অস্বস্তিকর বিষয়  তার মনকে অসুস্থ করে তুলেছে।

ওদের কথা বলার মাঝখানেই আহমদ মুসা অনেকটা বেসুরোভাবে বলে উঠল, 'সকলে মাফ করবেন, আমি একটু রেষ্টে যেতে চাই।'

'অবশ্যই, অবশ্যই। আপনারা ক্লান্ত। আমি উঠি। আমি নিচে আছি। ডাকলেই পাবেন।' বলে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল হেনরিক হফম্যান।

সবাই উঠে দাঁড়াল।

ড. হাইম হাইকেলের রুমটা আহমদ মুসার রুমের সামনেই। আর বুমেদীন বিল্লাহর রুম ড. হাইম হাইকেলের রুমের পাশে।

আহমদ মুসা ড. হাইম হাইকেলকে তার কক্ষে পৌছে দিয়ে বলল, 'স্যার, ঘরটা সব সময় লক করে রাখবেন। আপনি একা দয়া করে বেরুবেন না। রুম টেলিফোনে আমাকে ডাকবেন।'

'ধন্যবাদ আহমদ মুসা। আমাদের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি।' বলে একটু থামল ড. হাইম হাইকেল। তারপর বলল, 'আপনার কাছে আমার অনেক জিজ্ঞাসা আছে। আপনি তো আমার বাড়িতে গেছেন।'

'স্যার, আমি আপনার ছেলের মত। আমাকে সেইভাবে কথা বললে বাধিত হবো।' আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ। কিন্তু তুমি তো মাথায় থাকার মত।' ড. হাইম হাইকেল বলল।

'না স্যার, মাথা থেকে বুকটা মনে হয় আরও কাছে।' বলে আহমদ মুসা একটা দম নিয়েই ড. হাইম হাইকেলকে তার বাড়ির কিছু খবর দিয়ে বলল, 'যা ঘটেছে তা বিস্তারিত বলার জন্যে আজই সুযোগ নেব।'

আহমদ মুসা থামতেই ড. হাইম হাইকেল বলল, 'তুমি বলেছিলে, আমার কাছে তোমার কিছু কাজ আছে, সেটা কি?'

‘খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ স্যার। আপনার সাহায্য আমি চাই। সব বলব আপনাকে। এখন যাই স্যার। আপনি রেষ্ট নিন।’

আহমদ মুসা বেরুবার জন্যে পা বাড়াল।

‘আহমদ মুসা, তোমাকে সাহায্য করতে পারা আমার জন্যে গৌরবের ব্যাপার হবে।’ বলল ড. হাইম হাইকেল।

‘অনেক ধন্যবাদ স্যার।’ বলে আহমদ মুসা ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

আহমদ মুসা রুম থেকে বেরুতেই তার দিকে ছুটে আসতে দেখল হেনরিক হফম্যানকে। তার হাতে একটা মোবাইল। তার কাছে কোন টেলিফোন এসেছে কি, ভাবল আহমদ মুসা।

হেনরিক হফম্যান তার কাছে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, ‘স্যার, আপনি আপনার মোবাইল ফেলে এসেছিলেন। ড্রাইভার মেয়েটা দিয়ে গেল।’

বলে সে তার হাতের মোবাইল আহমদ মুসার হাতে তুলে দিল।

আহমদ মুসা মোবাইলটি হাতে নিয়ে বলল, ‘কোন ড্রাইভার?’

‘স্যার, আপনাদের ড্রাইভার। আপনি যে গাড়িতে আসলেন সেই গাড়ির ড্রাইভার। ’ বলল হেনরিক হফম্যান।

ভ্রুকুঞ্চিত হল আহমদ মুসার। মুখে বলল, ‘ঠিক আছে, ধন্যবাদ মি. হফম্যান।’

হেনরিক হফম্যান চলে গেল।

আহমদ মুসা তাকাল মোবাইলটার দিকে। দেখল, মোবাইলের স্ক্রীনে জলজল করছে তার নতুন নাম ‘জোসেফ জন’। ভাবল সে, এটাও এফ.বি.আই. চীফ জর্জ আব্রাহামেরই কীর্তি। তিনি নিশ্চয় চান না আমি সাধারণ টেলিফোনে তার সাথে বা কারো সাথে কথা বলি। তবু একবার টেলিফোন করে বিষয়টা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।

খুশি হলো আহমদ মুসা। ঘরে প্রবেশ করল।

আহমদ মুসা হ্যাংগারে কোটটি খুলে রেখে প্রথমেই দুরাকাত নামাজ পড়ল। শোকরানার নামাজ। আল্লাহ কঠিন কাজকে অনেক সহজ করে দিয়েছেন। ড. হাইম হাইকেলকেও দিয়েছেন সহযোগিতাকারী হিসাবে। ধ্বংস টাওয়ারের

তলায় লুকানো ষড়যন্ত্রের রূপ কেমন, তার উদ্ধারকেও আল্লাহ সহজ করে দিন। এই প্রার্থনা আহমদ মুসা জানাল আল্লাহর কাছে।

আহমদ মুসা বিছানায় গা এলিয়ে দিল। বিরাট ধকল গেছে শরীরের উপর দিয়ে গত দুদিনে। শয্যাকে মনে হচ্ছে ভীষণ মধুর। মনটাকে বাইরের জগত থেকে ফিরিয়ে এনে আত্মস্থ হতে চেষ্টা করল নিশ্চিন্ত রেষ্টের জন্যে। কিন্তু আত্মস্থ হতেই মন চারপাশের জগত থেকে অন্য এক জগতে চলে গেল। মনের আকাশ জুড়ে ভেসে উঠল ডোনা জোসেফাইনের মুখ, হাসি মাখা প্রাণবন্ত একটি মুখ। মুখে এক চির বসন্তের রূপ। ওতে শীতের বিশীর্ণতা কিংবা বর্ষার কালো মেঘের ঘনঘটা কোনদিন সে দেখিনি। শত বেদনাতেও কোন অনুযোগ, অভিযোগ তার নেই। হঠাৎ বাঁধ ভাঙা এক আবেগ এসে আছড়ে পড়ল তার হৃদয়ে। আবেগটা অশ্রু হয়ে বেরিয়ে এল তার দুচোখ দিয়ে।

চোখ মুছল না আহমদ মুসা। গড়াতে লাগল অশ্রু তার দুগন্ড বেয়ে। এ অশ্রু তাকে যন্ত্রণা নয়, দিল প্রশান্তি।

আহমদ মুসা হিসেব করে দেখল নিউইয়র্ক থেকে ডোনা জোসেফাইনের সাথে কথা বলার পর আজ ৯ম দিন পার হয়ে যাচ্ছে। তার সাথে ওয়াদা আছে টেলিফোন করার ক্ষেত্রে কোনক্রমেই সাতদিন অতিক্রম করবে না। গত কিছুদিনের মধ্যে প্রথম ব্যতিক্রম এবার ঘটল। সাতদিনের পর আরও দুদিন চলে গেছে। নিশ্চয় সে অস্থির হয়ে উঠেছে। তাকে তো এখন এমন অস্থির হওয়া চলবে না। বাচ্চা হওয়ার সময়টা ঘনিয়ে আসছে। ঘড়ির দিকে তাকাল আহমদ মুসা। এখন হয় তো সে ঘুমিয়ে পড়েছে। থাক। সন্ধ্যার দিকে মানে সউদি আরবের সকাল বেলায় ভাল হবে টেলিফোন করা।

পাশ ফিরল আহমদ মুসা। কিন্তু ঘুমানোর চেষ্টা সফল হলো না। মোবাইল বেজে উঠল।

উঠে বসে টেনে নিল মোবাইল টেবিল থেকে। মোবাইলের স্ক্রীনের উপর চোখ রাখতেই দেল নাম্বারটি এফ.বি.আই. চীফ জর্জ আব্রাহাম জনসনের।

মোবাইলটি কানের কাছে তুলে ধরতেই ওপার থেকে জর্জ আব্রাহাম জনসন বলে উফল, ‘আসসালাম জোসেফ জন, সব ঠিকঠাক? কোন অসুবিধা হয়নি তো?’

‘জি জনাব, সব ঠিক-ঠাক। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু...........।’ কথা শেষ না করেই আহমদ মুসা থেমে গেল কিভাবে বলবে সেটা ভেবে নেবার জন্যে।

‘কিন্তু কি, জোসেফ জন?’

‘আপনি যে স্থানকে আমাদের জন্যে আমেরিকার মধ্যে সবচেয়ে নিরাপদ স্থান বলে আমাদের এখানে এনেছেন। কিন্তু সে স্থানের মালিক এ বিষয়টা জানেন বলে আমার মনে হচ্ছে না।’

হো হো করে হেসে উঠল জর্জ আব্রাহাম জনসন। বলল, ‘ঠিকই বলেছ জোসেফ জন। তার অনুমতি ছাড়াই আমি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তবে ঠিক অনুমতি ছাড়াও নয়। ক’দিন আগে আমাকে সারাহ জেফারসন বলেছিল যে, তোমার মিশনের জন্যে তোমাকে অনেক দূর যেতে হতে পারে। তার জন্যে তোমাকে লম্বা একটা সময় আমেরিকায় থাকতে হবে। তোমার জন্যে নিরাপদ একটা ঠিকানা দরকার। এই কথা বলার সাথে সাথে সে বলেছিল তার ঐ ফিলাডেলফিয়ার বাড়ির কথা। ‘ফ্যামিলি মেমোরিয়াল’ গড়ে তোলার কাজ শুরু করতে বেশ সময় লাগবে। তার আগে বাড়িটা খালিই পড়ে থাকবে। গতকাল তোমার সাথে আলোচনা করার পর আমি চিন্তা করলাম ড. মুর হ্যামিল্টনকে নিয়ে তুমি কোথায় যেতে পার! কোন জায়গাটা তোমাদের জন্যে নিরাপদ হতে পারে! এটা চিন্তা করতে গিয়েই সারা জেফারসনের সেদিনের কথা মনে পড়েছিল। সংগে সংগেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে জুলিয়া রবার্টসকে এ ব্যবস্থার করথা জানিয়ে দিয়েছিলাম। পরে আমি সারা জেফারসনকে আমার গৃহিত ব্যবস্থার কথা বলি। সে খুশি হয়ে বলে, আংকেল, আমি যা করতাম, আপনি তাই করেছেন।’ সুতরাং জোসেফ জন, মালিকের অনুমতি নেই তা বলতে পার না।’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আমন্ত্রণ আর বাধ্য হয়ে আতিথ্য দান বোধ হয় এক জিনিস নয় জনাব।’

'জোসেফ জন, তুমি জান তুমি ঠিক বলছ না।' বলে একটু থেমেই সে আবার বলে উঠল, 'আমি বুঝতে পারছি না তোমাদেরকে। তুমি যেমন সত্যকে পাশ কাটাতে চাচ্ছ, হাসির ছলে হলেও, তেমনি তার ব্যাপারটাও আমাকে বিস্মিত করেছে। আজ সাত সকালে সারা আমাকে টেলিফোন করে বলল, 'সে ইউরোপ চলে যাচ্ছে তিন মাসের সফরে। তুরস্কের বসফরাস, মর্মরা ও কৃষ্ণ সাগর আর ইস্তাম্বুলের অলিতে-গলিতে প্রাণ খুলে ঘুরে বেড়াবে তিন মাস ধরে। তার একটা স্বপ্ন এটা। অথচ গত রাতে ১৫ মিনিট ধরে কথা হলো তার সাথে, কিছুই সে বলেনি। এত বড় একটা স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রোগ্রাম রাতের অবশিষ্ট কয়েক ঘণ্টায় কেন, কিভাবে সম্ভব হলো! যাক, এসব কথা জোসেফ জন। কাজের কথায় আসি। তোমাকে অবশিষ্ট কাজের ব্যাপারে দ্রুত হতে হবে। ড. মুর হ্যামিল্টনকে এভাবে বেশি দিন রাখা যাবে না। আর ওখানে তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না। হেনরিক হফম্যান লোকটা সবদিক দিয়েই ভাল এবং যোগ্য। মনে কর বাড়িটার এখন আমিই মালিক। আইনিসহ এর সবরকম তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তিন মাসের জন্যে সারা আমাকেই দিয়ে গেছে।' থামল জর্জ আব্রাহাম জনসন।

আহমদ মুসা একটু আনমনা হয়ে পড়েছিল। জর্জ আব্রাহামের শেষ কথায় সে সম্বিত ফিরে পেল। তাড়াতাড়ি কথা গুছিয়ে হাসার চেষ্টা করে বলল, 'সুখবর জনাব, এখন ভাড়া দাবী না করলেই আমরা বাঁচি।'

'জোসেফ জন, তোমরা আমেরিকার বাইরেটাই দেখ, অন্তর দেখ না।' বলল আব্রাহাম জনসন।

'অস্ত্রের কোন অন্তর থাকে না। আর 'আমেরিকা' আজ হৃদয়হীন সে অস্ত্রই হয়ে দাঁড়িয়েছে জনাব।' আহমদ মুসা বলল।

'ঠিক বললে না জোসেফ জন। আমেরিকার শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সাহায্য-সহযোগিতার বিশ্বব্যাপী ভূমিকা তুমি অস্বীকার করতে পারো না।'

'ঠিক জনাব। তবে দেখা যাচ্ছে, আমেরিকার শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সাহায্য-সহযোগিতা আমেরিকার শক্তির কাঁধে সোয়ার, অথবা আমেরিকার শক্তি তার শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সাহায্য-সহযোগিতার কাঁধে সওয়ার। সুতরাং শক্তি মানে অস্ত্রই আজ সবদিক থেকে আমেরিকার ইমেজ, অবয়ব হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

‘কিন্তু জোসেফ, আমেরিকা এটা নয়। এই অবয়ব আমেরিকার নেই। এক রাহুর গ্রাস থেকে বেরিয়ে আসছে জর্জ ওয়াশিংটন, জেফারসন ও আব্রাহাম লিংকনের আমেরিকা। তোমার সাহায্য নতুন সূর্যের উদয় ঘটিয়েছে আমেরিকায়। তোমার বর্তমান অনুসন্ধান যদি সফল হয়, তাহলে আলোর পথে আমেরিকার আরেকটা উল্লম্ফন ঘটবে।’ জর্জ আব্রাহাম জনসন বলল।

‘আমিন।’ আহমদ মুসা উচ্চারণ করল। তারপর বলল, ‘আমি কৃতজ্ঞ আপনার অমূল্য সহযোগিতার জন্যে।’

‘না জোসেফ জন। আমি তোমাকে সাহায্য করছি না, সাহায্য করছি আমাকে, আমার প্রিয় আমেরিকাকে।’

‘ঠিক বলেছেন জনাব। কিন্তু আমি কাজ করছি সত্যের জন্যে, আমার জাতির জন্যে। ধ্বংস টাওয়ারের তলদেশে যে সত্য লুক্কায়িত আছে তা যদি উদ্ধার হয়, তাহলে বিজয় হবে সত্যের। কিন্তু তার চেয়ে বড় বিষয় হলো বাঁচবো আমরা সন্ত্রাসী হওয়ার দায় থেকে। এ দায়-মুক্তিই আমার কাছে আজ সবচেয়ে বড়। এই বড় কাজে আপনার সাহায্য চাওয়ার চেয়েও অনেক বেশি। ধন্যবাদ আপনাকে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ওয়েলকাম, জোসেফ জন। এখন বিদায় নেই জোসেফ।’ জর্জ আব্রাহাম বলল।

‘অশেষ ধন্যবাদ জনাব। বাই।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আসসালাম। গুড বাই।’ বলে ওপার থেকে লাইনটা কাট করল জর্জ আব্রাহাম।

আহমদ মুসা মোবাইলটি রেখে দিয়ে আবার বিছানায় গা এলিয়ে দিল।

সব চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে চোখ বন্ধ করতে চেষ্টা করল।

আবার রুম টেলিফোন বেজে উঠল।

তুলল টেলিফোন আহমদ মুসা।

‘স্যরি জোসেফ, একটা জরুরি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। এখান থেকে আমার বাড়ি তো খুব কাছে। আমি মুর হ্যামিল্টন নাম নিয়ে অপরিচিতের মতই

কথা বলতে চাই। আমার বাড়ির সাথে কথা বলতে পারি?' বলল ওপ্রান্ত থেকে ড. হাইম হাইকেল।

'আমি বুঝতে পারছি আপনার মনের অবস্থা। কিন্তু না পারেন আপনি নিজ নাম নিয়ে টেলিফোন করতে, না পারেন মুর হ্যামিল্টন নাম নিয়ে, কারণ আপনার বাসার টেলিফোন মনিটর করা হয়। এখন আরও বেশি হচ্ছে। তারা ধরে ফেলবে।' আহমদ মুসা বলল।

'কিন্তু আমি মুর হ্যামিল্টন নাম নিয়ে করলে তারা চিনবে কি করে?' বলল ড. হাইম হাইকেল।

'জনাব, গত রাতে আপনি ডেট্রোয়েট থেকে উধাও হওয়ার পর একজন ড. মুর হ্যামিল্টন বিমানে ফিলাডেলফিয়া এসেছেন। সেই ড. মুর হ্যামিল্টন ড. হাইম হাইকেলের বাসায় টেলিফোন করেছেন, এর অর্থ ওদের কাছে কি দাঁড়াবে? তারা নিশ্চিত ধরে নিতে পারে ডেট্রোয়েট থেকে আসা মুর হ্যামিল্টনই আসলে ড. হাইম হাইকেল।' আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ, তুমি ঠিক বলেছ। এদিকটা আমার মাথায় আসেনি। সত্যিই তুমি অসাধারণ। গড ব্লেস ইউ।' বলল ড. হাইম হাইকেল।

'ধন্যবাদ। চিন্তা করবেন না। আমিই ওদের সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দেব।' আহমদ মুসা বলল।

'ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। রাখছি টেলিফোন। ডিষ্টার্ব করার জন্যে দুঃখিত। বাই।'

বলে ওপার থেকে টেলিফোন রেখে দিল ড. হাইম হাইকেল।

আহমদ মুসা টেলিফোন রেখে আবার শুয়ে পড়ল।

শরীরটাকে নিঃশেষে ছেড়ে দিল বিছানার উপর নিরংকুশ এক বিশ্রামের সন্ধানে।

# ৩

ড. হাইম হাইকেলের বেডরুম।

আহমদ মুসা একটা সোফায় বসে। তার মুখোমুখি সোফায় বসে ড. হাইম হাইকেল। আহমদ মুসা কথা বলছিল।

বলছিল পেছনের বিশাল কাহিনীটা। বলছিল ইউরোপের গোয়েন্দা সংস্থা 'স্পুটনিক'-এর ধ্বংস থেকে শুরু করে আজোরস দ্বীপের কথা, আজর ওয়াইজম্যানের সাথে সংঘাত সংঘর্ষের কথা, স্পুটনিকের গোয়েন্দাদের উদ্ধারের কথা এবং আজর ওয়াইজম্যান ড. হাইম হাইকেলের কনফেশন টেপ নিয়ে আসার কথা। বলছিল ড. হাইম হাইকেলের সন্ধানে আহমদ মুসার নিউইয়র্কে আসার কথা এবং তাকে সন্ধান করতে গিয়ে বিপদ ও ষড়যন্ত্রের চক্রজালে জড়িয়ে পড়ার কথা। বলছিল তার ফিলাডেলফিয়া যাওয়া এবং সেখানকার ঘটনা-দূর্ঘটনার কথা। সবশেষে বলেছিল তার ডেট্রোয়েটে আসা, বিপদে পড়া ও ড. হাইম হাইকেলকে উদ্ধারের কথা। সুদীর্ঘ কাহিনী সংক্ষেপে বলার পর ইতি টানতে গিয়ে বলল, 'স্যার, কাহিনীর এসব ভূমিকা, আসল কাহিনী শুরুই হয়নি।'

আহমদ মুসার কাহিনীর মধ্যে ডুবে গিয়েছিল ডক্টর হাইম হাইকেল। তার চোখে-মুখে আনন্দ, বেদনা ও বিস্ময় যেন একসাথে এসে আছড়ে পড়েছে।

আহমদ মুসা থামলেও ড. হাইম হাইকেল কোন কথা বলল না। তার চোখ দুটো যেন আঠার মত লেগে আছে আহমদ মুসার উপর। তার বোবা দৃষ্টিতে বিস্ময়-বিমুগ্ধতা।

এক সময় মুখটা নত হয়ে গেল ড. হাইম হাইকেলের। মুহূর্ত কয় পরে মুখ তুলে বলল, 'তুমি আরেক আরব্য রজনী শোনালে আহমদ মুসা! আনন্দের বিষয় হলো, এ আরব্য রজনী কল্পনার নয়।'

বলে থামল ড. হাইম হাইকেল। মুখটি আবার নিচু হলো তার। একটু পরেই মুখ তুলল। চোখ দু্ুটি তার ছলছল করছে। বলল, 'বাস্তব এই আরব্য

রজনীর তুমি সিন্দাবাদ। আমার জন্যে, আমার পরিবারের জন্যে যা করেছ তার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ দেব না। শুধু প্রার্থনা করব, সিন্দাবাদের কিস্তি যেন কূলে ভিড়ে।'

একটু থামল আবার ড. হাইম হাইকেল। রুমাল দিয়ে চোখ দুটি মুছে বলল, 'আমি বুঝতে পারছি আহমদ মুসা তোমার মিশন কি। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, আমার কনফেশন টেপ স্পুটনিকের গোয়েন্দাদের হাতে গেল কি করে?'

আহমদ মুসা বলল, 'ঐ মহলের সাধারণ একটা ধারণা সেটা স্পুটনিক আপনার কাছ থেকে পেয়েছে। প্রথমে আমিও এটাই মনে করতাম। পরে আমি কামাল সুলাইমানের কাছে ঘটনা শুনেছি। কামাল..........।'

ড. হাইম হাইকেল কথা বলে ওঠায় আহমদ মুসা থেমে গেল। ড. হাইম হাইকেল বলছিল, 'মাফ করবেন, কে এই কামাল সুলাইমান?'

'তিনি স্পুটনিকের প্রধান গোয়েন্দা। আজর ওয়াইজম্যানের হাতে বন্দী সাত গোয়েন্দার তিনিও একজন।' আহমদ মুসা বলল।

'স্যরি, বলুন।' বলল ড. হাইম হাইকেল।

আহমদ মুসা শুরু করল, 'কামাল সুলাইমান বিশ বছর আগের টুইনটাওয়ার ধ্বংসের সেই কাশুন্দি ঘেঁটে সত্যটা বের করার জন্যে ওয়াশিংটন এসেছিলেন। এখানেই তিনি দেখা পেয়েছিলেন বৃদ্ধ এক ইহুদী পরিবারের। আর সেই ইহুদী পরিবারের এক বৃদ্ধের কাছ থেকেই তিনি পেয়েছিলেন কনফেশন টেপ।'

'তার নাম কি? রাব্বী উইলিয়াম কোলম্যান কোহেন?' জিজ্ঞাসা ড. হাইম হাইকেলের।

'জি।' বলল আহমদ মুসা।

কিছুটা বিস্ময় ফুটে উঠল ড. হাইম হাইকেলের চোখে-মুখে। বলল, 'অবিশ্বাস্য ঘটনা! এ ধরনের কনফেশন সিনাগগের বাইরে যাওয়ার বিধান নেই। তার উপর রাব্বী উইলিয়াম কোহেনের মত লোক এমন কিছু করতে পারেন না। তিনি কোন নীতি-বিরুদ্ধ কাজ করবেন বলে তা বিশ্বাস করা মুস্কিল।'

'বিশ্বাস করা মুস্কিল হলেও এটাই ঘটেছে এবং ঘটাটাই ছিল স্বাভাবিক।' আহমদ মুসা বলল।

'কি রকম?' বলল ড. হাইম হাইকেল।

'সে ছিল এক মজার ঘটনা। কামাল সুলাইমান একটু অসুস্থতা নিয়ে ওয়াশিংটনের একটা ক্লিনিকে ভর্তি হয়েছিলেন। তার কক্ষের মুখোমুখি কক্ষটিতে ভর্তি হলেন একজন বৃদ্ধ রাব্বি। বয়সের ভারে অত্যন্ত দূর্বল, তার উপর অসুস্থ। একা হাঁটা তার জন্যে কষ্টকর ছিল। তার কোন এ্যাটেনডেন্ট ছিল না। ক্লিনিকের নার্স তাকে দেখাশুনা করতো, কিন্তু সবসময়ের জন্য তা যথেষ্ট ছিল না। মুখোমুখি দুঘরের দরজা ও জানালা একটু খোলা রাখলে দুঘর প্রায় এক হয়ে যেত। বৃদ্ধ রাব্বি ভর্তি হওয়ার প্রথম দিনেই যখন নার্স তাকে হুইল চেয়ার থেকে তুলে শুইয়ে দিতে হিমশিম খাচ্ছিল, তখন কামাল সুলাইমান তাকে সাহায্য করে। তারপর থেকে কামাল সুলাইমান বৃদ্ধের খোঁজ খবর রাখত এবং প্রয়োজনে তাকে সাহায্য সহযোগিতা করতো। ব্যাপারটা অবশেষে তার রুটিন কাজে পরিণত হয়ে যায়। প্রথম দিকে এভাবে সহযোগিতা নিতে বৃদ্ধ সংকোচ বোধ করত, কিন্তু পরে কামাল সুলাইমানের আন্তরিকতায় তা দূর হয়ে যায়। বৃদ্ধ তাকে একদিন জিজ্ঞেস করে, তোমাদের সমাজে, দেশে ছেলে-সন্তান ও আত্মীয়-স্বজনরা কি এভাবেই পিতা-মাতার সেবা করে? কামাল সুলাইমান বলেছিল, জ্বি হ্যাঁ। আর এটা ছেলে-সন্তানদের শুধু দায়িত্ব হিসেবে করা হয় না, এটা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি তাদের ভালোবাসার অংশ। এইভাবে দুজনের মধ্যে পিতা-পুত্রের মত একটা হৃদ্যতা সৃষ্টি হয়। এরই মধ্যে বৃদ্ধ রাব্বীর রোগের অবস্থা খারাপের দিকে যায়। তার সাথে দুজনের সম্পর্কও আরও গভীর হয়। বৃদ্ধ রাব্বীর আত্মীয় বলতে তেমন কেউ ছিল না। রুটিন খবরাখবর সিনাগগের লোকরাই নিত। স্বজন না থাকায় বিরাট শূন্যতার কিছুটা যেন বৃদ্ধের পূরণ হয় কামাল সুলাইমানকে দিয়ে। কামাল সুলাইমান মুসলমান এ কথা বৃদ্ধ শুরুতেই জেনে ফেলে। পরে বৃদ্ধের কক্ষেও কামাল সুলাইমান মাঝে মাঝে নামাজ পড়ত। কামাল সুলাইমান ধার্মিক বলে তার প্রতি বৃদ্ধের ভালোবাসা যেন আরও বেড়ে যায়। ধর্ম নিয়েও তাদের মধ্যে অনেক আলোচনা হয়। একদিন বৃদ্ধ তাকে বলে, 'এখনকার অবস্থা যাই হোক, ইহুদী ধর্ম

বা জুদাইজমের সবচেয়ে কাছের ধর্ম ইসলাম। ধর্ম অনুশীলনের দিক দিয়েও ইহুদী ও মুসলমানরা পরস্পরের খুব কাছাকাছি। বিশ্বাস কর, আমি ইহুদী না হলে মুসলমান হতাম।' এধরনের কথায় কথায় একদিন বৃদ্ধ রাব্বী উইলিয়াম কোহেন কামাল সুলাইমানকে জিজ্ঞাসা করল, 'চাকুরি, ব্যবসা কোন উদ্দেশ্যই তোমার নেই, তাহলে কেন তুমি আমেরিকা এসেছ? তোমার মত কাজের ছেলে শুধু ঘুরে বেড়িয়ে দিনের পর দিন সময় নষ্ট করবে, এটা স্বাভাবিক নয়।' এইভাবে কথার প্যাঁচে পড়ে কামাল সুলাইমান তার উদ্দেশ্যের কথা বৃদ্ধকে বলে ফেলে এবং জানায় যে, সে নিশ্চিত নিউইয়র্কের টুইনটাওয়ার মুসলমানরা ধ্বংস করেনি। কে করেছে, সেটা উদ্ধার করতে তার সারা জীবনও যদি ব্যয় করতে হয় তবু সে করবে।' কামাল সুলাইমানের কথা বৃদ্ধ শুধু শোনে, কিছুই বলে না। ধীরে ধীরে প্রসংগটি সে এড়িয়ে যায় অন্য কথার ছলে। বৃদ্ধের অবস্থা আরও খারাপের দিকে যায়। মুমূর্ষু অবস্থায় পৌছে যায় বৃদ্ধ রাব্বী উইলিয়াম কোহেন। মাঝে মাঝেই সে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলতে শুরু করে। জ্ঞান ফিরে পেলেই সে দেখত কামাল সুলাইমান শিয়রের কাছে বসে। এমনি একটা মুহূর্তে একদিন বৃদ্ধ কামাল সুলাইমানের একটা হাত তুলে নিল হাতে। বৃদ্ধের চোখ দুটি অশ্রু সজল হয়ে উঠেছে। বৃদ্ধ বলে, 'প্রভুর কাছে যাওয়ার সময় আসন্ন। জানি না, প্রভুর সন্তুষ্টি আমি পাব কিনা। তাঁর জন্যেই আমি শেষ একটি কাজ করে যেতে চাই।' থামে বৃদ্ধ। কামাল সুলাইমান বলে, 'কি কাজ?' বৃদ্ধ বলে, 'তোমাকে সাহায্য করতে চাই।' 'কি সাহায্য?' বিস্মিত কণ্ঠে বলে কামাল সুলাইমান। বৃদ্ধ কোন উত্তর না দিয়ে বলে, 'ঐ আলমারিতে গতকাল সিনাগগ থেকে আনা যে ছোট্ট বাক্সটি আছে, সেটা আমার কাছে নিয়ে এস।' বাক্সটি কামাল সুলাইমান নিয়ে এলে বৃদ্ধ বাক্স থেকে ভেলভেটের একটা ছোট্ট থলে বের করে কামাল সুলাইমানের হাতে তুলে দেয়। ক্লান্ত কণ্ঠে ধুঁকতে ধুঁকতে বলে বৃদ্ধ, 'বেটা, তোমার জীবন তোমার কাছে যতটা গুরুত্বপূর্ণ, এই থলেটাও তোমার কাছে ততটাই গুরুত্বপূর্ণ।' বৃদ্ধ দম নেবার জন্যে থেমে যায়। কামাল সুলাইমান বিস্মিত কণ্ঠে বলে, 'জনাব এতে কি আছে?' বৃদ্ধ কষ্ট করে টেনে টেনে বলে, 'তোমরা যা খুঁজছ বেটা......।' কথাগুলো উচ্চারণ করেই বৃদ্ধের ক্লান্ত কণ্ঠ থেমে যায়, বুজে যায় চোখ দুটি। কয়েক মুহূর্ত পরে বৃদ্ধ

আবার চোখ খুলে বলে ক্ষীণ কণ্ঠে, ‘বেটা, কোরআনের সুরা ইয়াসিন কি তোমার মুখস্থ আছে?’ ‘আছে।’ বলে কামাল সুলাইমান। বৃদ্ধ উজ্জ্বল চোখে অস্ফুট কণ্ঠে বলে, ‘তুমি ওটা পড়তে থাক, আর সাক্ষী থাক.....। আমি ঘুমাব।’ বলে বৃদ্ধ চোখ বুজে। কামাল সুলাইমান তাড়াতাড়ি উঠে ডাক্তার, নার্সদের ডাকে। তারা ছুটে আসে। যখন ডাক্তার, নার্সরা বৃদ্ধকে নিয়ে ব্যস্ত, তখন কামাল সুলাইমান বৃদ্ধের শিয়রে দাঁড়িয়ে মনে মনে সুরা ইয়াসিন পাঠ করছিল। বৃদ্ধ আর চোখ খোলেনি। কামাল সুলাইমান ভেলভেটের সেই থলেতে পেয়েছিল আপনার কনফেশন টেপ।’ থামল আহমদ মুসা।

নিরব রইল ড. হাইম হাইকেল। তার সমগ্র চেহারা বেদনায় পাংশু। আর অশ্রুর প্রস্রবণ বইছে তার চোখ থেকে। নত মুখে অনেকক্ষণ অশ্রু মোচনের পর মুখ তুলল। বলল, ‘এখন আর আমার কোন বিস্ময় নেই আহমদ মুসা। মহান রাব্বী ঠিকই করেছেন। আর ইসলাম গ্রহণ করে তিনি তার বিজ্ঞতারই প্রমাণ রেখে গেছেন।’

‘স্যার, সুরা ইয়াসিন পাঠ করতে বলা এবং সাক্ষী থাকতে বলার অর্থ আপনিও এটাই করেন?’ বলল উৎসাহিত কণ্ঠে আহমদ মুসা।

‘এর আর কোন অর্থ নেই বৎস।’ বলল ড. হাইম হাইকেল।

‘আল হামদুলিল্লাহ।’ আহমদ মুসা বলল।

ড. হাইম হাইকেল মুখ তুলল। তাকাল আহমদ মুসার আনন্দিত মুখের দিকে। তারও মুখে একটু স্বস্তির হাসি ফুটে উঠল। সোফায় হেলান দিয়ে বসল সে। বলল, ‘এবার আহমদ মুসা, তোমার কথা বল।’

আহমদ মুসা একটু ভাবল। তারপর বলল, ‘স্যার, রাব্বী উইলিয়াম কোহেন যে অমূল্য সাহায্য করেছেন, তার পরের সাহায্য আপনার কাছ থেকে চাই।’

‘তার মানে আমার কনফেশনে প্রয়োজনীয় যে কথা নেই, তা জানতে চাও, তাতে যে ফাঁকগুলো আছে তা পূরণ করতে চাও। এক কথায় কনফেশনে যা বলা হয়েছে তাকে প্রমাণ করার উপকরণ চাও। এই তো?’ বলল ড. হাইম হাইকেল।

আহমদ মুসার মুখে হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'ঠিক স্যার।'

'কেন চাও? প্রতিশোধ নেবার জন্যে?' জিজ্ঞাসা ড. হাইম হাইকেলের।

'প্রতিশোধ নয় স্যার। সত্য উদ্ধার করতে চাই। বিশ্ববাসীকে সত্যটা জানাতে চাই। জাতির কপাল থেকে সন্ত্রাসী হওয়ার কলংক মুছে ফেলতে চাই।' আহমদ মুসা বলল।

'তোমার চাওয়া যুক্তিসংগত। আমার পাপ সাংঘাতিক কেউ জানুক। সত্যটা বাইরে যাক, এটাও আমার মনের একটা চাওয়া ছিল, যদিও মূলত আমার মানসিক শান্তির জন্যেই আমি কনফেশন করেছিলাম। আমি আনন্দিত যে, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমি করছি, অন্যদিকে সত্যটা প্রকাশেরও একটা পথ হয়েছে। আমি অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করব।'

বলে একটু থেমেই ড. হাইম হাইকেল আবার বলে উঠল, 'তবে আমি বলার আগে তোমার কাছে কিছু শুনতে চাই। বিশ বছর আগের ঘটনা তো! তোমরা কতটুকু জান, জানার ক্ষেত্রে কতটা এগিয়েছ, ঘটনা সম্পর্কে কি ধরনের সিদ্ধান্তে পৌছার পরে তোমরা সত্য-সন্ধানের ফাইনাল ষ্টেজে নেমেছ, তা আমি জানতে চাই। প্রথমে বল, ঘটনার পেছনে কারা আছে বলে তোমরা মনে কর?'

'এ ব্যাপারে গত বিশ বছরে অনেকে অনেক কথা বলেছেন। তার মধ্যে আমার মতে সত্যের সবচেয়ে কাছাকাছি হলো রুশ গবেষক ড. তাতিয়া কোরাজিনার কথা। তিনি এক সাক্ষাতকারে বলেছেন, 'ঘটনা ঘটাবার জন্যে যে ১৪ জনকে দায়ী করা হয়েছিল, তারা এ ঘটনা ঘটায়নি। বরং ঘটনার সাথে জড়িত আছে বড় একটা গ্রুপ যারা পৃথিবীর রূপ পাল্টে দিতে চায়। এরা সাংঘাতিক শক্তিশালী। এদের আয়ত্বে আছে ৩০০ ট্রিলিয়ন ডলারের সম্পদ। গ্লোবাল গভর্নমেন্টের মাধ্যমে এরা এদের ক্ষমতাকে বৈধতা দিতে চায়।' আহমদ মুসা বলল।

'তিনি তো সেই ক্ষমতাধরের নাম করেননি। কে সেই ক্ষমতাধর?' বলল ড. হাইম হাইকেল।

'সেই শক্তিকে চিহ্নিত করার জন্যে দুটি বিষয়ের আলোচনা দরকার। এক. এই ঘটনার দ্বারা কে বা কারা লাভবান হয়েছে? দুই. ঘটনা সম্পর্কে কারা আগাম জানত?'

'লাভবান হওয়ার বিষয়ে বলা যায়, এই ঘটনার দ্বারা দুনিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে লাভবান হয়েছে ইসরাইল। টুইনটাওয়ার ধ্বংসের আগে পশ্চিমী জনমতের মধ্যে ইসরাইলের প্রতি বিরক্তি এবং ফিলিস্তিনিদের প্রতি সহানুভুতি বাড়ছিল। নাইন-ইলেভেনের দায় মুসলমানদের বিশেষ করে আরবদের ঘাড়ে চাপানোতে রাতারাতি অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। আরবদের প্রতি সন্দেহ-সংশয় যতটা বেড়েছে, ততটাই সহানুভুতি বেড়েছে ইসরাইলের জন্যে। অন্যদিকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আড়ালে ইসরাইল ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতা সংগ্রামের কণ্ঠরোধ করার সুযোগ পেয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ফলে আফগানিস্তান ও ইরাক ধ্বংস হওয়া, সিরিয়া, লেবানন, মিসর, সউদি আরবের মত দেশের স্বাধীন গতি শৃঙ্খলিত হওয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যে বিপুল পরিমাণ মার্কিন সৈন্য অনির্দিষ্টকালের জন্যে আসন গেড়ে বসায় ইসরাইলের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে এবং মার্কিনীদের কাছে ইসরাইলের মূল্য আরও বেড়েছে। অনুরূপভাবে টুইনটাওয়ার ধ্বংসের ফলে সীমাহীনভাবে লাভবান হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা যুদ্ধবাদী গোষ্ঠীর রাজনীতি। সবাই বলেছে টাওয়ার ধ্বংসের আগের পৃথিবী এবং পরের পৃথিবী এক পৃথিবী নয়। পৃথিবীর এই পরিবর্তন আমেরিকার ঐ যুদ্ধবাদী গ্রুপের পক্ষে গেছে। টাওয়ার ধ্বংসের জন্যে এমন এক শক্তিকে আমেরিকার তদানিন্তন সরকার দায়ী করে, যারা নির্দিষ্ট কিছু মানুষ কিংবা নির্দিষ্ট কোন দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মার্কিনীরা যখন যেখানে চাইবে, তাদের হাজির করবে এবং সেখানে হামলা তাদের জন্যে বৈধ হয়ে যাবে। আমেরিকা আফগানিস্তান ধ্বংস করেছে, কিন্তু অদৃশ্য শত্রু অদৃশ্যই রয়ে গেছে। যাদেরকে সন্দেহাতীতভাবে দোষী সাব্যস্ত করে সকল আইনের নাগালের বাইরে এক দ্বীপে বন্দী করে নির্যাতন চালিয়ে গেছে, তাদের টাওয়ার ধ্বংসের ব্যাপারে কোন দোষ পাওয়া যায়নি। সেই শক্তিকে অন্য এক রূপে ইরাকে আনা হয়েছে। তারপর ইরাক ধ্বংস হয়েছে, কিন্তু সেই শক্তিকে পাওয়া গেল না ইরাকে, অদৃশ্য হয়ে

গেল। এইভাবে অদৃশ্য শত্রুকে আমেরিকার ক্ষমতাসীনরা যেখানে ইচ্ছা আবিষ্কার করেন এবং সেখানে আগাম আক্রমণ করা তার জন্যে বৈধ হয়ে যায়। এই সর্বব্যাপী শত্রুর ভয় আমেরিকান জনগণের মধ্যে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছিল যে, আমেরিকান জনগণেরও মৌলিক অধিকার খর্ব করা হয় আভ্যন্তরীন নিরাপত্তার নামে। একটি একক গ্লোবাল পাওয়ার লাভেল জন্যে যে সুযোগ তার প্রয়োজন ছিল, সেই সুযোগ নিউইয়র্কের লিবার্টি ও ডেমোক্রাসি টাওয়ার ধ্বংসের পর আমেরিকার যুদ্ধবাদী গোষ্ঠীর হাতে এসে যায়। সুতরাং টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনায় প্রত্যক্ষভাবে ইসরাইল এবং আমেরিকার একটি গোষ্ঠী লাভবান হয়। ঠিক এই ভাবেই ঘটনা থেকে লাভবান হওয়া এই দুপক্ষেরই জানা ছিল ঘটনা সম্পর্কে আগাম খবর। টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনার আগের দুএকদিন শেয়ার মার্কেটে অস্বাভাবিক লেন-দেন হয়। যে ক্ষমতাধররা এর মাধ্যমে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার কামাই করে, তারা টাওয়ার ধ্বংস সম্পর্কে জানত। আমেরিকার সি.আই.এ, এফ.বি.আই-এর কাছে টাওয়ার ধ্বংস সম্পর্কে ইতিবাচক তথ্য ছিল, কিন্তু তারা প্রতিকারের পদক্ষেপ বা প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিতে সাহস করেনি। এ নিয়ে পরে লোক দেখানো তদন্ত কমিটিও গঠিত হয়। তদন্ত কমিটিও ফলপ্রসূ কিছু করেনি। সম্ভবত যে সাহস সি.আই.এ, এফ.বি.আই-এর ছিল না, সে সাহস তদন্ত কমিটিরও থাকার কথা নয়। অন্যদিকে টাওয়ার ধ্বংসের ব্যাপারে ইসরাইলের পুরোপুরি জানা ছিল। টুইনটাওয়ারে চার হাজার ইসরাইলী কাজ করত, কিন্তু কেউ ঘটনার দিন কাজে যায়নি। কোন দেশের কত লোক মারা গেছে তার একটা তালিকা প্রকাশ পায় ঘটনার পরপরই, তাতে কোন ইসরাইলীর নাম ছিল না। পরে অবশ্য এ তথ্য গোপন করার চেষ্টা করা হয়। ঘটনার একদিন পর জেরুসালেম পোষ্ট লিখে, চার হাজার ইসরাইলী নিখোঁজ। অন্যদিকে ঘটনার ৮ দিন পর ওয়াশিংটন পোষ্ট লিখে ১১৩ জন ইসরাইলী মারা গেছে। ওয়াশিংটন পোষ্ট এই কথা বলার একদিন পর সে সময়ের মার্কিন প্রেসিডেন্ট তার বক্তব্যে বলেন ১৩০ জন ইসরাইলী নিহত হয়েছে। কিন্তু সবশেষে টুইনটাওয়ার ধ্বংসের ১১ দিন পর নিউইয়র্ক টাইমস মাত্র তিনজন ইসরাইলী নিহত হবার খবর লিখে। তারাও আবার ছিল ভ্রমণকারী, টুইনটাওয়ারের চাকুরে নয়। দ্বিতীয়ত ঃ টুইন টাওয়ার এলাকায়

ঐ দিন ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রীর একটা প্রোগ্রাম ছিল। সব ঠিকঠাক ছিল, শেষ মুহূর্তে ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থার নিষেধের কারণে প্রধানমন্ত্রী সেই প্রোগ্রাম বাতিল করেন। এফ.বি.আই. নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়া সত্ত্বেও তিনি যাননি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ইহুদীরা, ইসরাইলী গোয়েন্দা বিভাগ পুরোপুরি এবং আমেরিকার সি.আই.এ ও এফ.বি.আই-এর একটা অংশ টাওয়ার ধ্বংস সম্পর্কে জানত। এফ.বি.আই, সি.আই.এ শুধু জানত নয়, তারা ঘটনা ঘটার সময় প্রতিরোধ প্রতিকারের কোন ব্যবস্থাই করেনি। মাঠ পর্যায়ের এফ.বি.আই কর্মীরা যে তথ্য উপরে পাঠিয়েছিল, তা চাপা দেয়া হয়। শুধু তাই নয়, দুনিয়ার সবাই জানে টাওয়ার ধ্বংসের আক্রমণকেও প্রতিরোধ করা হয়নি। প্রথম টাওয়ারে আক্রমণের পর দ্বিতীয় টাওয়ারে আক্রমণ করার মাঝে সময়ের যে ব্যবধান ছিল তাতে আমেরিকার সব জংগি বিমান, সব ক্ষেপণাস্ত্র সেখানে হাজির হতে পারতো। কিন্তু একটিও আসেনি। অথচ খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রথম টাওয়ারে আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে টিভিতে তার ছবি দেখেন, কিন্তু নিস্ক্রিয় থাকেন। আক্রমণ যেন হতে দেয়া হয়েছে। কেন তা করা হয়েছে? উত্তর একই রকম। কোন শক্তিমানের প্রতি ভয়ই সম্ভবত এই নিস্ক্রিয়তার কারণ।' থামল আহমদ মুসা।

থামতেই ড. হাইম হাইকেল বলে উঠল, 'কিন্তু বল, সেই শক্তিমান পক্ষ কে বলে তোমরা মনে কর?'

'কোন ব্যক্তি নয়, কোন বড় গ্রুপের কাজ এটা। এ গ্রুপের কোন বিশেষ নাম আছে কিনা, জানি না। এ গ্রুপের পরিচয়মূলক আরও কিছু তথ্য সামনে আনলে তাদের চিহ্নিত করা সহজ হতে পারে।' বলে একটু থামল আহমদ মুসা। সোজা হয়ে বসে আবার বলা শুরু করল, 'বলা হয় এই যুদ্ধবাজ গ্রুপের বিদেশ নীতি Neo-colonialism এর সমার্থক। এরা আমেরিকার সামরিক শক্তি বা গোয়েন্দা শক্তি ব্যাবহার করে ডিক্টেটর শাসক, ধনী রাজনৈতিক পরিবার, দুর্নীতি সৃষ্ট গণতান্ত্রিক দলকে কাজে লাগিয়ে বা তাদের ক্ষমতায় বসিয়ে পৃথিবীর জাতিসমূহকে দমন ও নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। পেছনে তাকিয়ে আমেরিকার আগ্রাসন ও হস্তক্ষেপমূলক রেকর্ডের ও তৎপরতার দিকে নজর দিলে এর ডজন ডজন প্রমাণ পাওয়া যাবে, নাম উল্লেখ করে সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নেই স্যার। কিন্তু

এর চেয়েও এই গ্রুপের ভয়ংকর কাজটা হলো অন্তর্ঘাত। এই গ্রুপের একটা পলিসি হলো, ধ্বংসাত্মক সন্ত্রাসী ঘটনা নিজেরা ঘটিয়ে তার দায় অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েতার বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের বৈধতা দাঁড় করানো। ঠিক হিটলারের জার্মানীর পার্লামেন্ট পোড়ানোর ঘটনার মত। হিটলার তার পার্লামেন্টে আগুন দেয়ার জন্যে কম্যুনিষ্টদের দোষারোপ করেছিল। কম্যুনিষ্ট কার্ডধারী একজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছিল। সে লোক আগুন দেয়ার অপরাধ স্বীকারও করেছিল। কিন্তু পরে দুনিয়া জেনেছে এই পার্লামেন্ট পোড়ানোর কাজ খোদ হিটলার করিয়েছিল। প্রমাণ হয়েছিল হিটলারের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সহযোগী হারমান গোয়েরিং-এর অফিস থেকে পার্লামেন্ট ভবন পর্যন্ত একটা সুড়ঙ্গ সৃষ্টি করা হয়েছিল। এই সুড়ঙ্গ পথে গিয়ে হিটলারের লোকরাই পার্লামেন্টে আগুন দিয়েছিল। মনে করা হচ্ছে হিটলারের এই কৌশলটাকেই আমেরিকার একটি গ্রুপ এবং ইসরাইল তার রাষ্ট্রীয় পলিসি হিসাবে গ্রহণ করেছে। আমেরিকার এই যুদ্ধবাজ গ্রুপটির 'নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রাভঙ্গ' করার মত এক জঘন্য ষড়যন্ত্র প্রেসিডেন্ট কেনেডি ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। সম্প্রতি এই গোপন কর্মকান্ডের বিবরণ তুলে ধরেছে আমেরিকার 'ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি'র উপর লেখা জেমস বামফোর্ড-এর বই 'Body of secrets : Anatomy of the Ultra-Secret National Security Agency'-এর লেখক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন গোপন দলিলের ভিত্তিতে লিখেন যে, পৃথিবী কাঁপানো 'ইধু ড়ভ চরমং' ঘটনার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা শক্তিমান গ্রুপ কিউবার বিরুদ্ধে মার্কিন জনমতকে খেপানো এবং কিউবার বিরুদ্ধে যুদ্ধে মার্কিন জনগণের সমর্থন আদায়ের জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ধ্বংসাত্মক কিছু সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটানো ও তার দায় কিউবার উপর চাপানোর একটা পরিকল্পনা তৈরি করে। এই পরিকল্পিত সন্ত্রাসী ঘটনার মধ্যে ছিল আকস্মিক এক দাঙ্গা ও রায়ট সৃষ্টির মাধ্যমে কিউবা সন্নিহিত মার্কিন ঘাঁটি গুয়ানতানামোর জংগি বিমান, যুদ্ধ জাহাজ ও অস্ত্র-গুদাম উড়িয়ে দেয়া, ফ্লোরিডার মিয়ামী এরিয়া, এমন কি খোদ ওয়াশিংটন এলাকায় কম্যুনিষ্ট কিউবার নাম জড়িত করে সন্ত্রাসী অভিযান, ফ্লোরিডা উপকূলে কিউবান রিফুজী ভর্তি একটা বোট ডুবিয়ে দেয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাছাইকৃত

কিছু এলাকায় বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো এবং এর সাথে কিউবার সম্পর্ক থাকার দলিল তৈরি করে জনসমক্ষে প্রকাশ করা, 'মেকি রাশিয়ান বিমান' দ্বারা মার্কিন বেসামরিক বিমানকে হেনস্থা করা, মার্কিন বেসামরিক বিমান ও জলজাহাজ হাইজ্যাক, এমন কি বেসামরিক বিমান গুলী করে ভূপাতিত করা। এই সন্ত্রাস-পরিকল্পনা প্রেসিডেন্ট কেনেডির কাছে পেশ করা হলে তা এক কথায় তিনি বাতিল করে দেন। কেনেডি নিহত হবার পর 'Assassination Record Review Board' এই দলিল আবিষ্কার করে এবং 'ন্যাশনাল আরকাইভস' এই দলিল প্রকাশ করেছে।'

এ পর্যন্ত বলে আহমদ মুসা একটু থামল।

গম্ভীর ড. হাইম হাইকেল আহমদ মুসার দিকে পানির একটা গ্লাস ঠেলে দিয়ে বলল, 'গলা একটু ভিজিয়ে নাও।'

'ধন্যবাদ' বলে আহমদ মুসা একটু পানি খেয়ে আবার বলা শুরু করল, 'প্রেসিডেন্ট কেনেডির আমলে শক্তিমান এই গ্রুপ যতটা শক্তিশালী ছিল, মনে হয় তারা পরে অনেক বেশি শক্তিশালী হয়। টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনার জলজ্যান্ত অনেক তথ্যকে তারা বেমালুম হজম করে ফেলেছে এবং ছয়কে নয়, আর নয়কে ছয় করতে সমর্থ হয়েছে। দুটাওয়ারের সাথে তৃতীয় একটা টাওয়ার সমূলে ধ্বংস হয়, অথচ বিমান তাকে আঘাত করেনি। এই টাওয়ার নিয়ে হৈ চৈ উঠেনি, কোন গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যাও দেয়া হয়নি এবং তদন্তও করা হয়নি। কোন সিভিলিয়ান এয়ার লাইনারের পক্ষে অত নিচুতে অমন গতিতে এগিয়ে গিয়ে ঐ রকম নিখুঁতভাবে আঘাত করা সম্ভব নয়। মার্কিন সামরিক বাহিনীর 'গ্লোবাল হক' (যা দেখতে বোয়িং ৭৩৭-এর মত) হাই আলটিচুড বিমান তার ভয়ানক শক্তিশালী 'দূর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা'র মাধ্যমেই মাত্র সিভিল এয়ারলাইনার দিয়ে এ ধরনের ঘটনা ঘটাতে পারে। এই প্রবল সন্দেহ সম্পর্কেও তাদের কোন বক্তব্য নেই। তাছাড়া টাওয়ার বালি দিয়ে তৈরি ঘরের মত মাটির সাথে মিশে যায় প্লেনের আঘাতে নয়, বরং গোড়ায় সংঘটিত বিশেষ ধরনের বিস্ফোরণের মাধ্যমে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিল্ডিং এক্সপার্টরা এই ধরনের বক্তব্য দিয়েছে। কিন্তু অন্য সব গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের মত এ তথ্যও মানুষের কাছে পৌছতে পারেনি। অনুরূপভাবে সংশ্লিষ্ট

এয়ারলাইনগুলো প্রথমে যে যাত্রী-তালিকা প্রচার করে, তার মধ্যে কোন মুসলিম নাম ছিল না। পরে ১৪টি মুসলিম নাম তালিকায় আসে। কেন আসে, কিভাবে আসে, তার কোন গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা আজও পাওয়া যায়নি। এমনি হাজারো তথ্যকে ঐ শক্তিমান গ্রুপটি দিনের আলোর মুখ দেখতে দেয়নি। এই গ্রুপটি এতই শক্তিশালী যে, দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর থেকে, নিউইয়র্ক টাইমস-এর ভাষায়, আমেরিকান পলিসি কার্যত এদেরই হাতে রয়েছে।' থামল আবার আহমদ মুসা।

সোফায় হেলান দিয়ে বসা ড. হাইম হাইকেল সোজা হয়ে বসল। বলল, 'শক্তিমান পক্ষটির কাজ বললে, পরিচয় কিন্তু চিহ্নিত হলো না।'

ম্লান হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'কি নামে তাদের আমি ডাকব। পরোলোকগত মার্কিন লেখিকা গ্রেস হারসেলের কথা মনে পড়ছে। তিনি ছিলেন একজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও গ্রন্থকার। তিনি ইসরাইল সফর করেন। তার ভিত্তিতে একটা বই লেখেন। বইয়ের নাম হলো, 'জেরুসালেম সফর'। তিনি এ বইতে ইসরাইলী একজন সাংবাদিকের একটি গর্বিত উক্তি উদ্ধৃত করেন এবং সে উক্তি হলো, 'আমরা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি যে, বর্তমানে হোয়াইট হাউজ আমাদের হাতে, সিনেট আমাদের হাতে, নিউইয়র্ক টাইমস আমাদের হাতে, এমতাবস্থায় আমাদের প্রাণের সাথে আর কারও প্রাণের তুলনা হয় না।' লেখিকা গ্রেস হারসেল তার উক্ত বই সম্পর্কে একটা অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন তার অন্য একটি লিখায়। বলেছেন, 'আমার এ বই অনেক বাধা-বিপত্তি, চক্রান্তের বেড়াজাল পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হলো ১৯৮০ সালে। এরপর বেশ কয়েকটি গীর্জায় বক্তৃতা দেয়ার আমন্ত্রণ পেলাম। সাধারণ খৃষ্টানরা বিশ্বাস করতে চাইল না আমার পরিবেশিত তথ্যসমূহ। কারণ, তৎকালে ফিলিস্তিনীদের উপর ইসরাইলের বিভিন্ন অত্যাচার, ভূমি দখল, বাড়িঘর বিধ্বস্ত করা, যখন-তখন গ্রেফতার ও অন্যান্য নির্যাতন সম্পর্কে আমেরিকান প্রচার মাধ্যমে কোন খবরই থাকত না। বিভিন্ন গীর্জায় বক্তৃতাকালে আমি যখন শ্রোতাদের আমার নিজের দেখা ঘটনাবলীর বর্ণনা দিতাম, আমাকে প্রশ্ন করা হত 'আমরা তো সংবাদপত্রে এসব খবর পাই না?' অথচ ইসরাইলের মত ছোট দেশে যত আমেরিকান সাংবাদিক কাজ করে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ দেশেও এই পরিমাণ আমেরিকান সাংবাদিক নেই। এসব বিষয়

আমাকে মনে করিয়ে দিল, নিউইয়র্ক টাইমস, দি ওয়াল ষ্ট্রিট জার্নাল, দি ওয়াশিংটন পোষ্ট, আর আমাদের দেশের অন্যান্য প্রায় সব সংবাদপত্র হয় ইহুদী মালিকানাধীন অথবা ইহুদী নিয়ন্ত্রিত। আর এসব সংবাদপত্র ইসরাইলের সমর্থক। এতসব সাংবাদিক ইসরাইলে কাজ করে শুধু ইসরাইলীদের দৃষ্টিকোন থেকে সংবাদ প্রচারের জন্য।' লেখিকা গ্রেস হারসেলের এই মন্তব্য তার What Christians dorit know about Israil শীর্ষক প্রবন্ধে ছাপা হয়। গ্রেস হারসেলের এই বক্তব্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ফোর্থ ষ্টেট' অর্থাৎ মিডিয়া জগতকে যে অক্টোপাশের হাতে বন্দী দেখা গেছে, সেই অক্টোপাশই সেদিন হোয়াইট হাউজ ও পার্লামেন্টকে পুতুলে পরিণত করেছিল। এই অক্টোপাশ ইহুদী লবী এবং সরকার, সিনেট ও প্রশাসনে কর্মরত তাদের অনুগতরা এবং নব্যঔপনিবেশিক যুদ্ধবাজ এক গ্রুপ নিয়ে গঠিত ছিল বলে আমি মনে করি। এই অক্টোপাশই সেদিন টুইনটাওয়ার ধ্বংস করে তার দায় মুসলিম মৌলবাদী পরিচয়ের অদৃশ্য এক গ্রুপের ঘাড়ে চাপিয়ে পৃথিবীর সম্পদ, শক্তিকেন্দ্র দখল করার জন্যে যেখানে ইচ্ছা সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ার অবারিত সুযোগ করে নিয়েছিল। আমার কথা এ পর্যন্তই। এই কাজ সেদিন তারা কিভাবে করেছিল, সেটা আপনি বলবেন।' থামল আহমদ মুসা।

ড. হাইম হাইকেল চোখ বুজে সোফায় হেলান দিয়ে বসেছিল। সোজা হয়ে বসে বলল, 'ধন্যবাদ তোমাকে। দেখছি, কোন দিক দিয়েই তুমি কারও পেছনে নও। সব দিকেই তোমার চোখ আছে। জটিল একটা বিষয়কে সরল অবয়বে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছ। এখন তুমি একটা মডেল দাঁড় করাও যে ধরনের ছবি তুমি আঁকলে, তারা কিভাবে ঘটনা ঘটিয়ে থাকতে পারে।'

'এ ব্যাপারে নতুন কথা নেই। যে সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে, তাই আমি বলতে পারি।'

বলে একটু থামল। তারপর আবার বলা শুরু করল, 'আমার বিশ্বাস সিভিল এয়ার লাইনার বিমান টুইন টাওয়ারে আঘাত করেনি, আঘাত করানো হয়েছে। হয় মার্কিনী বিমান গ্লোব হক'-এর বিমান হাইজ্যাক-এর অপ্রতিরোধ্য টেকনলজি কিংবা টুইনটাওয়ারে রিমোর্ট কনট্রোল ব্যবস্থা সিভিল এয়ার লাইনের

বিমানকে টুইনটাওয়ারে টেনে নিয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত ঃ বিমান হামলায় টুইনটাওয়ার ধ্বংস হয়নি। বিল্ডিং এক্সপার্টদের যেমন, তেমনি আমারও বিশ্বাস, টুইনটাওয়ারের বটমে বিশেষ বিস্ফোরক পাতা হয়েছিল। তৃতীয়ত ঃ টুইনটাওয়ার আক্রমণকারী কোন বিমানই হাইজ্যাক হয়নি। বিমানের যাত্রী ও ক্লুরা বুঝতেই পারেনি বিমানের কি হয়েছে, কোথায় যাচ্ছে। বিমানের কম্যুনিকেশন নেটওয়ার্ক নষ্ট করার কারণে বিমান বন্দরের সাথে কোন যোগাযোগ করতে পারেনি। বিমানের ব্ল্যাকবক্স থেকে এর সাক্ষী পাওয়া যাবে বলে ব্ল্যাক বক্স গায়েব করা হয়। চতুর্থত ঃ বিমান হাইজ্যাক ও টুইনটাওয়ার ধ্বংসের জন্যে যে ১৫ জন মুসলমানকে দায়ী করা হয়েছে, তারা বিমানে থাকলেও তারা নির্দোষ যাত্রী ছিল মাত্র। এরা ছিল এফ.বি.আই অথবা ষড়যন্ত্রকারী গ্রুপের রিক্রুট। মিডিলইষ্ট, আফগানিস্তানসহ মুসলিম বিশ্বকে প্রাথমিকভাবে ঘটনার সাথে জড়াবার জন্যে এদেরকে ব্যবহার করা হয়েছে। মুসলিম নামের অনেক মানুষকে তারা এ ধরনের কাজের জন্যে তৈরি করা রেখেছে।' থামল আহমদ মুসা।

গ্লাস থেকে একটু পানি খেল ড. হাইম হাইকেল। বলল, 'ধন্যবাদ আহমদ মুসা। তুমি অনেক ব্যাপারে অনেক কথা বলেছো। কিন্তু সব ব্যাপারে আমি বলতে পারবো না। কারণ ষড়যন্ত্রটা ছিল বেশ কয়েকভাগে বিভক্ত। একটার সাথে আরেকটার কোন প্রকার সম্পর্ক ছিল না। যারা বিমানের দায়িত্বে ছিল, তাদের কাজ ছিল টাওয়ার আঘাতকারী বিমান এবং এই বিমানকে টাওয়ারের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে টেনে নেবার জন্যে 'গ্লোব হক' বিমানের ব্যবস্থা করা। অন্যদিকে টুইনটাওয়ারের দায়িত্ব যাদের ছিল, তাদের কাজ ছিল তিনটি। এক. টুইনটাওয়ারের আন্ডার গ্রাউন্ড ফ্লোরে ঠিক সময়ে 'সেফ ডেমোলিশন ডেভাইস' (SDD)-এর বিস্ফোরণ ঘটানো, দুই. টাওয়ারে আঘাতকারী বিমান যখন এক মাইলের মধ্যে আসবে তখন টুইনটাওয়ারে বসানো বাড়তি চুম্বকীয় রিমোট কনট্রোল ব্যবস্থাকে সক্রিয় করা যাতে টুইনটাওয়ারে আঘাত নিশ্চিত হয় এবং তিন. টুইনটাওয়ারে আঘাত-পরবর্তী সময়ে বিমানের ব্ল্যাকবক্সসহ নেগেটিভ ডকুমেন্ট গায়েব করা, জাল ডকুমেন্ট ছড়িয়ে রাখা। আর যারা 'গিনিপিগ' -এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিল, তাদের কাজ ছিল 'গিনিপিগ'দের নাম নির্দিষ্ট দিনে

নির্দিষ্ট সময়ের নির্দিষ্ট এয়ার লাইনসের যাত্রী তালিকায় সন্নিবেশিত করা এবং টুইনটাওয়ারের ঘটনায় তাদের মৃত্যুর ব্যাপারটা প্রকাশ পাবার পর এদের হত্যা করা ও গায়েব করে ফেলা। এই তিনটি বিভাগ ছাড়াও...............।'

আহমদ মুসা ড. হাইম হাইকেলের কথার মাঝখানে বলে উঠল, 'গিনিপিগ' বলতে কাদের বুঝিয়েছেন? কথিত বিমান হাইজ্যাককারী মুসলমানদের?'

'হ্যাঁ, আহমদ মুসা।' বলল ড. হাইম হাইকেল।

'ধন্যবাদ স্যার। গত ২০ বছরে তাদের ক্ষেত্রে কেউ এই 'গিনিপিগ' শব্দ ব্যবহার করেনি। আপনিই মাত্র হতভাগ্যদের সঠিক অবস্থা তুলে ধরেছেন এই 'গিনিপিগ' শব্দ দ্বারা। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। স্যরি, কথার মাঝখানে কথা বলার জন্যে। বলুন স্যার।'

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম। ষড়যন্ত্রের যে তিনটি গ্রুপের কথা বলেছি, তা ছাড়াও ছিল আরেকটা গ্রুপ। এর নাম 'মিডিয়া গ্রুপ'। যার কাজ ছিল আমেরিকান এবং আমেরিকায় কার্যরত বিদেশী, বিশেষ করে ইউরোপীয় ও অষ্ট্রেলিয়ান মিডিয়াম্যানদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করা এবং টাওয়ার ধ্বংসের পরপরই তাদের মাধ্যমে পরিকল্পিত নিউজ প্রচারের ব্যবস্থা করা। এই গ্রুপেরই আরেকটা বড় কাজ ছিল প্রশাসন, সরকার ও পার্লামেন্টের যে সব দায়িত্বশীল লোক অবাঞ্ছিত, বেফাঁস বা বৈরি কথা বলতে পারে তাদের কাছে ভুয়া তথ্য সরবরাহসহ সবরকম পন্থা প্রয়োগ করে তাদের মুখ বন্ধ রাখা বা বাঞ্ছিত কথা আদায় করা।' থামল ড. হাইম হাইকেল।

'কিন্তু স্যার, এই সব ভাগ বা গ্রুপ মিলে যে দল তার নাম তো বলেননি।' আহমদ মুসা বলল।

'দলের কোন নাম ছিল না। ইসরাইল সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ, আমেরিকার ইহুদীবাদী লবীর কেন্দ্রীয় একটা গ্রুপ এবং আমেরিকার সরকার, সেনাবাহিনী, প্রশাসন ও পার্লামেন্টে তাদের অনুগতদের সমন্বয়ে গড়া ছিল এই দল। তবে তাদের ষড়যন্ত্র-কর্মসূচীর একটা নাম ছিল। নামটা হলো, 'অপারেশন মেগা ফরচুন' সংক্ষেপে OMF । তাদের অপারেশন সংক্রান্ত সব দলিলে সংক্ষিপ্ত

‘OMF’ নাম ব্যবহার করা হয়েছে। তাদের এই অপারেশনের নাম অনুসারে তাদের আমরা ‘অপারেশন মেগা ফরচুন গ্রুপ’ ‘OMF Group’ নামকরণ করতে পারি।’ থামল ড. হাইম হাইকেল।

‘তারপর স্যার।’ তাকিদ আহমদ মুসার।

‘তারপর তোমার জানার বিষয়টা কি?’ ড. হাইম হাইকেলের জিজ্ঞাসা।

‘অপারেশনের বিবরণ এবং তাদের অপরাধ প্রমাণ করার উপায়।’ আহমদ মুসা বলল।

‘বলেছি আহমদ মুসা, অপারেশন কয়েক ভাগে বিভক্ত ছিল। আমার ভাগের বিবরণই আমার জানা।’ বলে একটু থামল ড. হাইম হাইকেল। মাথা নিচু করে একটু ভাবল বোধ হয়। তারপর মুখ তুলে কথা শুরু করল, ‘আমি যাদের ‘গিনিপিগ’ বলেছি, তাদের দায়িত্বে আমি ছিলাম। তুমি ঠিকই বলেছ, শতশত মুসলিম নামের মানুষ ওদের হাতে রয়েছে, তাদেরকে সুবিধামত ব্যবহার করে ওরা মুসলমানদের ফাঁসাবার জন্যে। তুমি যেটা জান না সেটা হলো, বিশেষ করে আরব বিশ্ব ও আফ্রিকা থেকে সংগৃহীত হতাশ ও ভোগ-পাগল মুসলিম যুবকদের রিক্রুট করে এদের ব্রেনওয়াশ করা হয়েছে। এদেরকে পুতুলের মত কাজে লাগানো হয়েছে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের এরা উপকরণ হয়েছে। সন্ত্রাসের বিরদ্ধে যুদ্ধ জিইয়ে রাখার জন্যে সন্ত্রাস সৃষ্টির প্রয়োজনে এদেরকেও ব্যবহার করা হয়েছে। আমার হাতে যাদের অর্পণ করা হয়েছিল, তারাই এদের কয়েকজন। এদের সংখ্যা ছিল উনিশ। পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের প্রয়োজন চৌদ্দ জনের। সতর্কতার জন্যে ছয়জন বাড়তি লোক আনা হয়েছিল। ১৯ জনের প্রত্যেককেই আলাদাভাবে রাখা হয়েছিল স্বাধীনভাবে একটা সেট প্রোগ্রাম দিয়ে। কিন্তু তারা ছিল অদৃশ্য পাহারার অধীনে। এদের সবার জন্যে টিকিট করা হয় এবং বোর্ডিং কার্ড নেয়া হয়। কিন্তু এরা কেউ বিমানে ওঠেনি। বিশেষ ব্যবস্থায় এদের ডিপারচার লাউঞ্জ থেকে ফিরিয়ে আনা হয়। টাওয়ার ধ্বংসের পর এয়ারলাইন্স প্রথমে যে যাত্রী তালিকা দেয় তা বিমানে উঠা যাত্রীদের কাছ থেকে সংগৃহীত বোর্ডিং কার্ডের কাউন্টার পার্টের ভিত্তিতে। পরে আমাদের ‘মিডিয়া টিম’-এর হস্তক্ষেপে

এয়ারলাইন্স তাদের তালিকা সংশোধন করে বোর্ডিং কার্ড ইস্যুর ভিত্তিতে নতুন তালিকা প্রকাশ করে। যাতে আমাদের 'গিনিপিগ'দেরও নাম এসে যায়।'

থামল ড. হাইম হাইকেল। সোজা হয়ে বসে কয়েক ঢোক পানি খেল। বলতে শুরু করল আবার, 'ওদেরকে এয়ারপোর্ট থেকে বের করে এনে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী একটা কনটেইনারে তোলা হয়। তারপর শুরু হয় সোয়া তিনশ মাইলের দীর্ঘ পথ যাত্রা। যাত্রার লক্ষ্য বোষ্টনের উত্তর-পূর্বে মাউন্ট মার্সি এলাকার দুর্গম রেডইন্ডিয়ান বসতি। মাউন্ট মার্সি পর্বতটি অ্যাপালাচিয়ান পর্বতমালার উত্তর অংশের পশ্চিম ঢালে অবস্থিত। মাউন্ট মার্সির দক্ষিণ দিক অ্যাডিরমডাক পর্বতমালায় ঘেরা। আর পশ্চিমে মাত্র চল্লিশ পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে লেক অনটারিও এবং কানাডা সীমান্ত। লেক অনটারিও ও কানাডা সীমান্ত পশ্চিম দিক হয়ে উত্তর দিক ঘুরে অ্যাপালাচিয়ান পর্বতমালায় গিয়ে মিশেছে। এই বিচ্ছিন্ন, দূর্গম অঞ্চলে মাউন্ট মার্সির পশ্চিম পাদদেশে ঘনবনাকীর্ণ এক সবুজ উপত্যকা। এই উপত্যকা রেডইন্ডিয়ানদের জন্যে নির্দিষ্ট একটা স্থান। ঔপনিবেশিক বৃটিশদের সাথে ১৬৭৫-৭৬ সালে সংঘটিত বিখ্যাত 'কিলফিলিপ যুদ্ধে' পরাজিত ও বিতাড়িত রেডইন্ডিয়ানদের একটা ক্ষুদ্র অংশ চিড়িয়াখানার মত এই উপত্যকায় বাস করে। আমাদের টার্গেট ছিল এই রেডইন্ডিয়ানদের গোরস্থানের লাগোয়া পূর্ব নির্দিষ্ট একটা জায়গা। ভূ-তাত্বিক কর্মীর ছদ্মবেশে আমাদের লোকরা এখানে আগে থেকেই একটা গর্ত করে রেখেছিল। রাতের অন্ধকারে এখানেই পৌছা আমাদের লক্ষ্য। অ্যাপালাচিয়ান পর্বতমালার উত্তরাংশের মাউন্ট মার্সি বরাবর পৌছে সড়ক থেকে আমাদের গাড়ি রাস্তার চিহ্নহীন পাথুরে ভূমিতে নেমে যায়। তারপর পাহাড়ের উপত্যকা, সুড়ঙ্গ ধরে ২০ কিলোমিটার যাওয়ার পর আমাদের গাড়ি পৌছল রেডইন্ডিয়ানদের সেই গোরস্থানের কাছে। দিনটা ছিল ইন্ডিয়ানদের বাৎসরিক সম্মিলিত প্রার্থনা দিবস। রেডইন্ডিয়ান বসতির ওয়ান টু অল গিয়ে জড়ো হয়েছে তাদের সর্দারের বাড়িতে। এই সুযোগ নেয়অর জন্যেই দিনটা আমরা ঠিক করেছিলাম। গোরস্থান থেকে নিরাপদ দূরত্বে আমাদের গাড়ি দাঁড়াবার পর রাতের জন্যে অপেক্ষা করা হয়। অপেক্ষাকালীন এই সময়েই কনটেইনারে বিশেষ এক ধরনের গ্যাস প্রয়োগ করে

তাদের হত্যা করা হয়। তারপর রাতের অন্ধকারে রেডইন্ডিয়ানদের কবর লাগোয়া গর্তে ওদের গণকবর দিয়ে আমাদের গাড়ি ফিরে আসে বোষ্টনে। আমার দায়িত্বাধীন ভাগের কাজের এভাবেই ইতি হয়।'

থামল ড. হাইম হাইকেল। তার মুখ গম্ভীর। অপরাধ ও যন্ত্রণার কালো ছায়া তাতে।

'আপনার মধ্যে এই অন্যায়ের প্রতিক্রিয়া কবে শুরু হয়?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'তখন আমি ছিলাম কঠোর মনোভাবের এক ইহুদীবাদী কর্মী। আমি তখন মনে করতাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদী স্বার্থ রক্ষা ও গোটা দুনিয়ায় ইহুদী ইমেজ রক্ষা এবং ইহুদীদের উপর উদ্যত কৃপাণ সরিয়ে মুসলমানদের উপর ঘুরিয়ে দেবার জন্যে এই কাজের কোন বিকল্প নেই। নিরপরাধ লোকদের কন্টেইনারে তুলে নৃশংসভাবে হত্যা করা থেকেই আমার মনে প্রতিবাদ দানা বাঁধতে থাকে। এর সাথে যোগ হলো নিরপরাধ বিমানযাত্রীদের মর্মান্তিক মৃত্যু। কিন্তু এ সবের চেয়েও আমার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল সর্বব্যাপী সীমাহীন বীভৎস মিথ্যাচার এবং মিথ্যার উপর ভর করে মুসলিম নামের নিরপরাধ লাখো বনি আদমের উপর হত্যা, ধ্বংস ও দখল চাপিয়ে দেবার বিষয়টি। 'অপারেশন মেগা ফরচুন'কে আমি আমার ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবেই গ্রহণ করেছিলাম। পরে সব দেখে আমার মনে হলো আমরা আমাদের ধর্মকেই হত্যা করছি। আমার আরও মনে হলো, ইহুদীদের 'হাসকালা' ধর্মমত বৈষয়িক উন্নতি ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে আমাদেরকে ধর্মহীন করে দিয়েছে। এই চিন্তা থেকেই ইহুদী বিশ্বাসের 'হাসিডিক' ধর্মমত আমি গ্রহণ করি। 'হাসিডিক' ধর্মমত 'দয়া' ও সানন্দ উপাসনার দিকেই মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে বেশি। এই ধর্মমত গ্রহণের পরেই আমি মনের পাপ-যন্ত্রণা লাঘবের জন্যে সিনাগগে গিয়ে ঈশ্বরের কাছে কনফেশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। আমি মনে করছি, ঈশ্বর আমার কনফেশন গ্রহণ করেছেন। কনফেশনকে কেন্দ্র করে আমার যে দুঃখ-কষ্ট তা আমি মনে করছি ঈশ্বরেরই দেয়া আমার পাপ মোচনের জন্যে। সবশেষে তোমার আগমন,

আমাকে উদ্ধার, আমার কাছে সাহায্য চাওয়া সবই ঈশ্বরই করাচ্ছেন। সুতরাং আমি তোমাকে সাহায্য করব, এটা ঈশ্বরেরই ইচ্ছা।'

দীর্ঘ বক্তব্যের পর থামল ড. হাইম হাইকেল।

'ধন্যবাদ স্যার', বলে শুরু করল আহমদ মুসা, 'কিন্তু একটা জিনিস আমি বুঝতে পারছি না, গিনিপিগ হিসাবে ব্যবহৃত কজনকে কবর দেবার জন্যে অত দূরের স্থান বেছে নিলেন কেন?'

'দুটি বিবেচনায় আমরা এটা করেছি। এক. রেডইন্ডিয়ানদের এই এলাকাটা দূর্গম ও নিরাপদ। কারও পক্ষে ওখানে যাওয়া এবং খোঁজ করা দুই-ই কঠিন। দুই. কোন কারণে সন্দেহ হলেও গণকবর খোড়াখুড়ি করা সম্ভব হবে না। রেডইন্ডিয়ানরা এটা করার কাউকে সুযোগ দেবে না। কারণ তারা সংগতভাবেই ভয় করবে গণকবর ও গণহত্যার সাথে ওদের সম্পর্কিত করার চেষ্টা করা হবে। দ্বিতীয়ত. এই খননকে তাদের গোরস্থানের শান্তি ও সম্মানের খেলাফ মনে করবে রেডইন্ডিয়ানরা।' বলল ড. হাইম হাইকেল।

ড. হাইম হাইকেল থামতেই আহমদ মুসা বলল, 'ষড়যন্ত্রের আরও বিভাগ আছে বলেছেন আপনি। কিন্তু তাদের কাউকেই আপনি চেনেন না?'

'হ্যাঁ অনেককেই চিনি। ইহুদী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কট্টর ইহুদীবাদী অধ্যাপক এবং একটি ঐতিহাসিক ইহুদী পরিবারের সন্তান হিসেবে 'ও.এম.এফ গ্রুপ' (OMF Group)-এর কাছে আমার বিশেষ একটা মর্যাদা ছিল। এ কারণে অনেক ক্ষেত্রে অনেকের কাছে আমার অবাধ যাতায়াত ছিল। বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত হলেও অনেক কিছুই আমি শুনতাম ও জানার সুযোগ হতো।' ড. হাইম হাইকেল বলল।

'তাহলে অন্যান্য গ্রুপের ব্যাপারেও আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারেন।' বলল আহমদ মুসা।

'তোমার কি প্রয়োজন, কি জানতে চাও সেটা বললে বুঝা যাবে আমি ঐ বিষয় জানি কিনা।' ড. হাইম হাইকেল বলল।

'ধন্যবাদ স্যার। আমার অনুসন্ধানের বিষয় হলো টাওয়ার ধ্বংসের কাজ কারা করেছে, তা বের করা এবং তার পক্ষে প্রমাণ যোগাড় করা। এখন দেখা

যাচ্ছে 'ও.এম.এফ গ্রুপ' এটা করেছে। এই সত্যের পক্ষে আমি প্রমাণ যোগাড় করতে চাই।' বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার কথার তৎক্ষণাৎ জবাব দিল না ড. হাইম হাইকেল। সে সোফায় গা এলিয়ে দিল। তার চোখে-মুখে ভাবনার প্রকাশ ঘটল। অল্পক্ষণ পর সোফা থেকে গা না তুলেই বলল, 'আহমদ মুসা, এই বিষয়টা আমি কোনদিন চিন্তা করেই দেখিনি। ঘটনার বিবরণ বর্ণনা করা যায়, কিন্তু তা প্রমাণ করা কঠিন। 'ও.এম.এফ গ্রুপ' টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনা ঘটিয়েছে, এই সত্য তোমার কথায় এসেছে, ঘটকদের একজন হিসাবে আমিও বলেছি, কিন্তু প্রমাণ করাটা বলার মত সহজ নয়।' থামল ড. হাইম হাইকেল।

আহমদ মুসা গম্ভীর। সোজা হয়ে সোফায় বসল। বলল, 'কিন্তু প্রমাণ করার মিশন নিয়েই আমি আমেরিকায় এসেছি। এ মিশন সম্পূর্ণ করেই আমি ফিরব ইনশাআল্লাহ।'

সোফায় সোজা হয়ে বসল ড. হাইম হাইকেল। তার ভ্রুকুঞ্চিত। ভাবছে সে মুখ নিচু করে। এক সময় মুখ তুলে বলল, 'তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি আহমদ মুসা। তোমার কথা আমার মধ্যে সাহসের সৃষ্টি করেছে। মনে হচ্ছে, অসম্ভব বলে কিছুই নেই। কিন্তু আমার সামনে অথৈ অন্ধকার সমুদ্র, বাতিঘরের আলো কোথাও দেখি না।'

ভাবছিল আহমদ মুসাও। বলল, 'স্যার, প্রমাণের বহু বিষয় আছে। কিন্তু অত কিছুর প্রয়োজন নেই। মৌলিক ধরনের কয়েকটা বড় বিষয় প্রমাণ করতে পারলেই আমাদের হয়ে যায়।'

'সে বিষয়গুলো কি?' জিজ্ঞাসা ড. হাইম হাইকেলের।

'প্রথম বিষয় হলো, ষড়যন্ত্রের যে অংশটা আপনি সম্পাদন করেছেন, তা থেকে প্রমাণ করা যে, হাইজ্যাকাররা বিমান হাইজ্যাক করে তা দিয়ে টাওয়ার ধ্বংস করেছে, এ কথা মিথ্যা এবং কথিত হাইজ্যাকারদেরকে টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনার ১২ ঘণ্টা পর হত্যা করে গণকবর দেয়া হয়। দ্বিতীয়ত. প্রমাণ করা যে, হাইজ্যাকাররা নয়, 'গ্লোব হক' ও টুইনটাওয়ারে পাতা চুম্বকীয় রিমোট কনট্রোল ব্যবস্থার সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে যাত্রী বিমান টুইনটাওয়ারে আঘাত করতে সমর্থ

হয়। তৃতীয়ত. টুইনটাওয়ার যাত্রী বিমান দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয় ঠিকই, তবে টুইনটাওয়ার গুড়িয়ে ধ্বসে পড়ে টুইনটাওয়ারের গোড়ায় পাতা 'সেফ ডেমোলিশ ডেভাইস'-এর বিস্ফোরণ ঘটানোর ফলে। এটা প্রমাণ করতে হবে। এই তিনটি বিষয়ের প্রমাণই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।'

ড. হাইম হাইকেল হা করে তাকিয়ে ছিল আহমদ মুসার দিকে। তার চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বলল, 'ধন্যবাদ তোমাকে আহমদ মুসা। ঠিকই বলেছ তুমি। এখন আমার মনে হচ্ছে এই সহজ বিষয়টি আমার মাথায় আসেনি কেন?'

বলে ড. হাইম হাইকেল মুহূর্তের জন্যে একটু থামল। পরক্ষণেই আবার শুরু করল, 'কিন্তু প্রমাণ হওয়া এবং গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার কাজ কিভাবে হবে? ধর প্রথমটার কথাই। গণকবরে যাদের হাড়গোড় আছে, তারাই ও.এম.এফ গ্রুপ কথিত বিমান হাইজ্যাককারী তা প্রমাণ করতে হবে। কিভাবে করবে? গোপনে ওখানে গিয়ে কবর থেকে হাড়গোড় তুলে আনা খুবই কঠিন। তার পরেও না হয় গেলে, হাড়গোড় তুললে, নিয়ে এলে, কার্বন টেষ্ট, ফরেনসিক টেষ্টসহ বিভিন্ন আইডেনটিফিকেশন টেষ্ট দ্বারা না হয় প্রমাণ করলে ওগুলোই সেই বহুল কথিত হাইজ্যাকারদের দেহ এবং ওদেরকে হত্যা করা হয়েছে গ্যাস প্রয়োগে (যে গ্যাস বিমানে থাকে না) আর হত্যার সেই ঘটনা ঘটেছে টুইনটাওয়ার ধ্বংসের ১২ ঘণ্টার পর। কিন্তু তোমার দাবীগুলো অথেনটিসিটি পাবে কিভাবে, দুনিয়ার মানুষ গ্রহণ করবে কেন?'

চিন্তা করছিল আহমদ মুসা। এক সময় তার মুখে হাসি ফুটে উঠল। ড. হাইম হাইকেল থামতেই আহমদ মুসা বলে উঠল, 'স্যার আমি যা ভাবছি তা যদি আমি করতে পারি, তাহলে গণকবর আবিষ্কারের কথা গোটা দুনিয়া জানবে এবং তাদের ফরেনসিক টেষ্ট, দাঁত টেষ্ট, ইত্যাদি সব কিছুই গোটা দুনিয়াকে জানিয়েই করা হবে। অতএব বিশ্বাসযোগ্যতা না পাবার প্রশ্ন নেই।'

'এই অসাধ্য সাধন কিভাবে সম্ভব?' জিজ্ঞাসা ড. হাইম হাইকেলের।

'আল্লাহর সাহায্য থাকলে সবই সম্ভব। আপনাকে সব বলব স্যার।' বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা কথা শেষ করেই ড. হাইম হাইকেলের কিছু বলার আগেই আবার মুখ খুলল। বলল, ‘স্যার, প্রমাণের দ্বিতীয় বিষয়টা নিয়ে আমি চিন্তায় আছি। এ ব্যাপারে আপনার সাহায্যের প্রয়োজন আছে কিনা ভেবে দেখতে আমি আপনাকে অনুরোধ করছি।’

আহমদ মুসার কথা ড. হাইম হাইকেল মনোযোগ দিয়ে শুনল। কিন্তু কোন উত্তর দিল না। তার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠেছে। ভাবছে সে। অনেকক্ষণ পর মুখ তুলল। বলল, ‘প্রমাণের জন্য অন্তত প্রয়োজন ঐ দিন ঐ কাজে ‘গ্লোব হক’-এর ‘অফিসিয়াল লগ’ ও ‘অর্ডার শীট’ উদ্ধার করা। আর............।’

ড. হাইম হাইকেলের কথা মাঝখানেই আহমদ মুসা বলে উঠল, ‘এ ‘লগ’ ও ‘অর্ডার শীট’ কোথায় পাওয়া যাবে?’

‘দৃশ্যত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ‘এয়ার সেফটি সার্ভিস’ (ASS) ডিভিশনে এটা থাকার কথা। কিন্তু আমি বিষয়টা সম্পর্কে নিশ্চিত নই।’ বলল ড. হাইম হাইকেল।

একটা দম নিয়েই আবার বলে উঠল, ‘টাওয়ার ধ্বংসে ‘সেফ ডেমোলিশন ডেভাইস’ যে ব্যবহার হয়েছিল, সেটা প্রমাণ করার জন্যে ধ্বংস টাওয়ারের ডাষ্ট-এর বিশেষ ধরনের পরীক্ষা প্রয়োজন।’

‘কিন্তু ধ্বংস টাওয়ারের ডাষ্ট এখন এত বছর পর কোথায় পাওয়া যাবে? টুইনটাওয়ারের জায়গায় তো নতুন টাওয়ার গড়ে তুলে ঐ এলাকা ঢেকে ফেলা হয়েছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘নিউইয়র্কের তিনটি প্রতিষ্ঠানে এই ডাষ্ট পাওয়া যাবে। ইন্টারন্যাশনাল টেরর মিউজিয়াম (ITM), ‘বিল্ডিং হিষ্টরী মিউজিয়াম’ (BHM) এবং ধ্বংস টাওয়ারের স্থানে নির্মিত নতুন টাওয়ার কমপ্লেক্সের ‘লিভিং মেমরি ল্যাবরেটরী’তে পাওয়া যাবে।’ কিন্তু এই ডাষ্ট পাউডারটাই বড় কথা নয়, এর প্রামাণ্য টেষ্ট রেজাল্ট প্রয়োজন।’ বলল ড. হাইম হাইকেল।

‘ধন্যবাদ স্যার আপনার দেয়া তথ্যগুলো অমূল্য।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কি অমূল্য বলছ। তুমি চেষ্টা করলেও এ তথ্যগুলো যোগাড় করতে পারতে। আসলেই তোমাকে সাহায্য করার মত তেমন কিছু আমার কাছে নেই।’ বলল ড. হাইম হাইকেল।

‘বলেন কি স্যার! আপনার প্রধান যে তথ্যের জন্য এসেছিলাম তা পেয়ে গেছি। তথাকথিত বিমান হাইজ্যাকারদের সম্পর্কে যে তথ্য দিয়েছেন, এই একটা তথ্যই আমাদের জন্যে যথেষ্ট। শুধু একেই যদি আমরা সত্য প্রমাণ করতে পারি, তাহলে মুসলমানদের কপাল থেকে সন্ত্রাসী হওয়ার কলংক তিলক মুছে ফেলা যায়।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কিন্তু ‘ও.এম.এফ গ্রুপ’-এর সর্বব্যাপী ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচন করতে হলে গোটা ষড়যন্ত্রকেই দিনের আলোতে আনতে হবে এবং এটা তুমিই পারবে আহমদ মুসা। আমেরিকান জনগণও তোমার কাছে আরও বেশি কৃতজ্ঞ হবে। তুমি আগেও তাদের অমূল্য উপকার করেছ। এই উপকার যদি তুমি করতে পার, তাহলে আমেরিকান জনগণ পুরোপুরিই মুক্ত হবে কুগ্রহের কবল থেকে।’ বলল ড. হাইম হাইকেল।

এ কথাগুলোর খুব অল্পই আহমদ মুসার কানে প্রবেশ করেছে। আহমদ মুসা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে তার মোবাইল নিয়ে।

ড. হাইম হাইকেল থামতেই আহমদ মুসা বলল, ‘এক্সকিউজ মি স্যার, আমি কয়েকটি টেলিফোন করে নিতে চাই।’

বলে আহমদ মুসা প্রথমে টেলিফোন করল কামাল সুলাইমানকে জার্মানীতে। বলল, ‘কামাল জার্মানীর ‘মিউজিয়াম অব ওয়ার্ল্ড ইভেন্টস’-এর প্রেসিডেন্ট মি. ব্রেম্যান তোমার বন্ধু, তাই না?’

‘হ্যাঁ।’ ওপার থেকে বলল কামাল সুলাইমান।

‘তুমি মিউজিয়ামের তরফ থেকে মি. ব্রেম্যানের একটি করে চিঠি নিয়ে এস নিউইয়র্কের ‘ইন্টারন্যাশনাল টেরর মিউজিয়াম’-এর প্রেসিডেন্ট, ‘বিল্ডিং হিষ্ট্রি মিউজিয়াম’-এর প্রেসিডেন্ট এবং গ্রাউন্ড ফরচুন’-এর নতুন টাওয়ার কমপ্লেক্সের ‘লিভিং মেমরী ল্যাবরেটরী’-এর ডিরেক্টরের নামে। এই পৃথক পৃথক চিঠিতে মিউজিয়ামের তরফ থেকে লিখতে হবে মিউজিয়ামের রেকর্ড ও প্রদর্শনী

বস্তু হিসাবে পৃথক দু'প্যাকেটে ৫ গ্রাম করে টুইনটাওয়ার ধ্বংসের ডাষ্ট ডোনেট করার জন্যে। তিনটি চিঠি নিয়ে মিউজিয়ামের প্রতিনিধি হিসাবে তোমাকে এক সপ্তাহের মধ্যে নিউইয়র্ক আসতে হবে।' বলল আহমদ মুসা।

'বুঝেছি ভাইয়া। আপনার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হবে। ড. মুর হ্যামিল্টনের সাথে আসল কথাটা হয়েছে?' ওপার থেকে বলল কামাল সুলাইমান।

'হ্যাঁ। তার প্রেক্ষিতেই তো এ জিনিসগুলোর প্রয়োজন। কথা শেষ। এস। আস্সালামু আলাইকুম।'

আহমদ মুসা কল অফ করে দিয়ে নতুন আরেকটা নাম্বারে ডায়াল করল।

ডায়াল করল ইলিনয় ষ্টেটের রেডইন্ডিয়ান রিজার্ভ কাহোকিয়ার অধ্যাপক আরাপাহোর কাছে।

ওপার থেকে প্রফেসর আরাপাহোর কণ্ঠ শুনেই আহমদ মুসা সালাম দিয়ে বলল, 'স্যার আমাকে চিনতে পেরেছেন?'

প্রফেসর আরাপাহো আহমদ মুসাকে সালাম দিয়ে বলল, 'তোমাকে চিনব না? তোমার কণ্ঠের একটা শব্দ কানে আসাই যথেষ্ট তোমাকে চেনার জন্যে। কেমন আছ তুমি? কেমন আছে বউমা? তুমি কি আমেরিকায়? না আমেরিকার বাইরে? তুমি আজোরাস আইল্যান্ডে এসেছ তা জানিয়েছ। তারপর আর কোন খবর জানি না।'

'আমরা সবাই ভাল আছি জনাব। আমি নিউইয়র্ক থেকে বলছি। ওগলালা বোধ হয় কাহোকিয়ায়। কেমন আছে সে?' আহমদ মুসা বলল।

'ওগলালা আমার পাশে বসে। টেলিফোনটা নেবার জন্যে হাত বাড়িয়ে আছে। তাকে দেব টেলিফোন। তবে তার আগে তোমার কথা শুনি। নিউইয়র্কে কোন কাজে এসেছ নিশ্চয়?' বলল প্রফেসর আরাপাহো।

'জি, কাজ নিয়ে এসেছি এবং আপনার সাহায্য চাই।' আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ তোমাকে এজন্যে যে, আমার কথা তুমি চিন্তা করেছ। বল তোমার কি প্রয়োজন, আমার সব কিছু তোমার জন্যে।' বলল প্রফেসর আরাপাহো।

'ধন্যবাদ স্যার।' বলে একটু থামল। তারপর বলল, 'আপনার কাছে মাউন্ট মার্সি'র ইন্ডিয়ান রিজার্ভ-এর কথা শুনেছিলাম।'

'হ্যাঁ শুনেছিলে। কি হয়েছে? হঠাৎ একথা তুলছ কেন?'

'মাউন্ট মার্সি'র ইন্ডিয়ান রিজার্ভ-এর সাথে আপনার পরিচয় কেমন স্যার?'

'ভাল। ওখানে এক অনুসন্ধান কাজে আমি তিনমাস ছিলাম। তাছাড়াও বেশ কয়েকবার গেছি আমি সেখানে।'

'স্যার আপনাকে আবার এক অনুসন্ধানে যেতে হবে।' বলল আহমদ মুসা সোৎসাহে।

'আমাকে যেতে হবে এক অনুসন্ধানে? অনুসন্ধানটা তোমার এবং সেটা খুব বড় বিষয় হবে নিশ্চয়? কারণ তোমার হাতযশ বড় বিষয়কেই সব সময় টানে।' বলল প্রফেসর আরাপাহো। তার কণ্ঠে আনন্দের সুর।

'ঠিক ধরেছেন স্যঅর, সেটা হবে আমার অনুসন্ধান এবং তা বড় বিষয়ও।' বলল আহমদ মুসা।

'তোমার যদি বিষয় হয়,তাহলে আমি একবার নয় একশ'বার যেতে রাজি আছি। কারণ তোমার বিষয় মানেই হলো মানুষের কোন কল্যানের কাজ, এখন বল কবে যেতে হবে?' প্রফেসর আরাপাহো বলল।

'এক সপ্তাহ পর যে কোন দিন আপনার সুবিধা অনুসারে। আমিও আপনার সাথী হতে চাই।'

'তুমিও যাবে? চমৎকার। দিনগুলো তাহলে তো উৎসবের হবে। তাহলে সপ্তাহ পর দিন ঠিক করে তোমাকে জানাব। কিন্তু কাজটা কি বললে না তো?'

'সাক্ষাতে ছাড়া বলা যাবে না। তবে আপনাকে মাউন্ট মার্সি'র রেডইন্ডিয়ান রিজার্ভে যেতে হবে প্রতœতাত্বিক অনুসন্ধানের এক মিশন নিয়ে, যাতে স্বাভাবিকভাবে খোঁড়া-খুঁড়িরও প্রোগ্রাম থাকবে। সেখানকার সবার এটা জানা উচিত।' বলল আহমদ মুসা।

'ঠিক আছে। আমি বুঝেছি। তোমার কাজ যাই হোক, কাজের প্রকৃতি বুঝেছি। আমি আজই মাউন্ট মার্সি'র কমিউনিটি সরদারকে লিখে জানাচ্ছি যে,

আমার গবেষণার প্রয়োজনে কিছু প্রতœতাত্বিক অনুসন্ধানের জন্যে আমি আমার কয়েকজন লোককে নিয়ে মাউন্ট মার্সিতে আসছি।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার।'

'ওয়েলকাম। রাখলাম। ওয়াস্সালাম।'

আহমদ মুসা 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম' বলতেই ওপার থেকে লাইনটা কট করে কেটে গেল।

আহমদ মুসা কল অফ করে দিয়ে ওয়াশিংটনে ডায়াল করল ঈগল সান ওয়াকারের কাছে।

ওপার থেকে সান ওয়াকারের কণ্ঠ পেতেই আহমদ মুসা বলে উঠল, 'আসসালামু আলাইকুম, সান ওয়াকার। চিনতে পেরেছ?'

ওপার থেকে সান ওয়াকার আনন্দে চিৎকার করে উঠল, 'চিনব না মানে? আপনি......।'

সান ওয়াকারকে কথা সমাপ্ত করতে না দিয়ে আহমদ মুসা বলল, 'থাক, নাম শুনতে চাই না তোমার কাছ থেকে। বল কেমন আছ? মেরি রোজ কেমন আছে?'

'ভাল আমরা আহ.......।' কথা শেষ করতে পারলো না সান ওয়াকার।

আহমদ মুসা আবার তাকে থামিয়ে দিল। বলল, 'থাক বড়দের নাম নিতে নেই। শোন, মাউন্ট মার্সি'র রেডইন্ডিয়ান রিজার্ভে তোমার একটা ফ্রেন্ড ছিল না?'

'ছিল নয়, আছে। সান ইয়াজুনো।' বলল সান ওয়াকার ওপাশ থেকে।

'সে এখন কোথায়?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'মাউন্ট মার্সিতে। সে মাউন্ট মার্সির রেডইন্ডিয়ান রিজার্ভের ফেডারেল কমিশনারের অফিসে চাকুরি করে। সেখানকার সিভিল এ্যাফেয়ার্স অফিসার সে। কিন্তু ভাইয়া হঠাৎ তাকে মনে পড়ল কেন?' সান ওয়াকারের কণ্ঠ শেষ দিকে গম্ভীর হয়ে উঠেছে।

'সান ওয়াকার, তুমি কি তোমার বন্ধুর সাথে দেখা করবে?' বলল আহমদ মুসা।

সংগে সংগে উত্তর এল না সান ওয়াকারের কাছ থেকে। একটু পর ওপ্রান্ত থেকে সে বলে উঠল, 'ব্যাপার কি বলুন তো ভাইয়া। অন্য কেউ এমন কথা বললে রসিকতা মনে করতাম। কিন্তু আপনার প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি উচ্চারণের মূল্য আছে। আমার ভয় হচ্ছে বড় কিছু ঘটেছে কিনা!'

'ঘটনা বড় সান ওয়াকার, কিন্তু তোমার উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। তোমাকে আগামী সপ্তাহে সান ইয়াজুনোর ওখানে যেতে হবে। আমিও সে সময় ওখানে থাকব। ভয় করো না সান ইয়াজুনোর সাথে এ ঘটনার কোন সম্পর্ক নেই। তুমি ওখানে যাবে মাত্র। বলবে প্রতœতাত্বিক অনুসন্ধান প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে তুমি ওখানে যাচ্ছ। ওখানে গিয়েই সব তোমাকে বলব।' আহমদ মুসা বলল।

'বুঝেছি ভাইয়া। ঠিক আছে। কবে যাচ্ছি আপনাকে জানাব। মাফ করবেন ভাইয়া, আমি কিন্তু ইচ্ছা করেই আপনার সাথে যোগাযোগ করিনি।' বলল সান ওয়াকার।

'জানি। কিন্তু তুমি কি জান আমার টেলিফোন নাম্বার?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'ঘটনাক্রমে জেনে গেছি ভাইয়া। সেদিন এয়ারপোর্টে গিয়েছিলাম এক আত্মীয়কে বিদায় জানাতে। লাউঞ্জে দেখা হলো সারা জেফারসন আপার সাথে। তিনি ইউরোপ যাচ্ছিলেন। ক'মিনিট কথা হয়েছিল লাউঞ্জে বসে তার সাথে। তিনিই জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তোমরা তাঁর খবর রাখ?' আমি বলেছিলাম, তিনি এসেছেন, কিন্তু ওয়াশিংটনে আসেননি। আমি যোগাযোগের সুযোগ পাইনি।' আমার কথার পর তিনি আমাকে একটা নাম্বার দিয়ে বলেছিলেন, তাঁর সাথে যোগাযোগ রেখ। তার নিজের প্রয়োজন তিনি জানান না, জানতে হয়।' টেলিফোন নাম্বার পেলেও আমি যোগাযোগ করতে সাহস পাইনি ভাইয়া।' বলল সান ওয়াকার।

'সারা তোমাকে নাম্বার দিয়েছে? কিভাবে পেল? যেদিন সকালে সে ইউরোপ গেছে, তার আগের রাতে মাত্র আমি টেলিফোনের নতুন সেট পেয়েছি! এ নাম্বার তো তার জানার কথা নয়। বলত নাম্বারটা?' আহমদ মুসা বলল।

নাম্বারটা নিয়ে দেখল তার টেলিফোনেরই নাম্বার। ভাবল আহমদ মুসা, নাম্বারটা নিশ্চয়ই এফ.বি.আই চীফ জর্জ আব্রাহাম জনসন সারাকে দিয়েছে। বলল আহমদ মুসা সান ওয়াকারকে, 'ঠিক আছে সান ওয়াকার। তাহলে এই কথা থাকল, তুমি যাওয়ার আগে টেলিফোন করছ। আসি। আস্সালামু আলাইকুম।'

আহমদ মুসা কল অফ করে দিয়েই ফিরল ড. হাইম হাইকেলের দিকে। বলল, 'মাফ করবেন স্যার, আর একটা কল করব।'

'আহমদ মুসা তুমি যা করছ, তাতে শত কল করলেও শোনার প্রতি আগ্রহ আমার উত্তরোত্তর বাড়বে। আমি বুঝতে পারছি না এত পরিকল্পনা তুমি কখন করলে? এইমাত্র তো আমার কাছে ঘটনা শুনলে!' ড. হাইম হাইকেল বলল।

'পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়নি। আপনার দেয়া সুনির্দিষ্ট তথ্যগুলোই এ কাজগুলোকে টেনে নিয়ে এসেছে। ধন্যবাদ স্যার।' বলেই আহমদ মুসা তার মোবাইলের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

মোবাইলের ডিজিটাল প্যানেলে কয়েকটা অংকে নক করল। সংগে সংগেই ওপার থেকে একটা ভারি কণ্ঠ ভেসে এল, 'বল, জোসেফ জন, নিশ্চয় ড. হ্যামিল্টনের সাথে তোমার কথা হয়ে গেছে?'

'জি জনাব। কথা হয়েছে, কিন্তু ইতি হয়নি।' বলল আহমদ মুসা।

'কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে না পৌঁছে তো তুমি আমাকে টেলিফোন করনি!' জর্জ আব্রাহাম জনসন বলল ওপার থেকে।

'তা ঠিক। কিন্তু আমরা দুজন বসে এখনও কথা বলছি। কথার মাঝখানেই কয়েকটা টেলিফোন করলাম। শেষ টেলিফোনটা আপনাকে করেছি।' বলল আহমদ মুসা।

'ধন্যবাদ। তুমি দ্রুত আগাচ্ছ। এটাই দরকার। আমার কেমন সহযোগিতা দরকার বল।' এফ.বি.আই প্রধান জর্জ আব্রাহাম জনসন বলল।

'কয়েকটা জিজ্ঞাসা।' আহমদ মুসা বলল।

'বল।' বলল জর্জ আব্রাহাম।

‘সেফ এয়ার সার্ভিসেস (SAS) কোন মন্ত্রণালয়ের অধীন। এর সদর দফতর কোথায়? ‘সেফ এয়ার সার্ভিসেস’-লগ রাখার দায়িত্ব কার?’ প্রশ্ন কয়েকটা করে থামল আহমদ মুসা।

ওপার থেকে জর্জ আব্রাহামের উত্তর আসতে কয়েক মুহূর্ত দেরি হলো। একটু সময় পর ওপার থেকে ভেসে এল জর্জ আব্রাহামের কণ্ঠ, ‘আরেকটা প্রশ্ন তোমার বাদ পড়েছে। সেটা হলো, ওল্ড লগগুলো রক্ষার রীতি-বিধান কি? তাই কিনা জোসেফ জন?’

‘ধন্যবাদ জনাব।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ওয়েলকাম, জোসেফ জন। উত্তরের জন্যে আমাকে ভাবতে হবে। এক ঘণ্টার মধ্যে উত্তরগুলো তোমার হাতে পৌছে যাবে। আর কোন বিষয়?’ বলল জর্জ আব্রাহাম।

‘ধন্যবাদ জনাব, আপাতত এ পর্যন্তই।’ আহমদ মুসা বলল।

‘শোন জোসেফ জন, তুমি তোমার প্রজেক্টের চুড়ান্ত পর্যায়ে পৌছেছ। তোমাকে প্রয়োজনের অগ্রাধিকার সিলেকশন আগে করতে হবে। তারপর প্রথম কাজ প্রথমে।’ বলল জর্জ আব্রাহাম।

‘ধন্যবাদ জনাব। বুঝেছি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ওকে। রাখলাম। বাই।’ ওপার থেকে বলল জর্জ আব্রাহাম জনসন।

আহমদ মুসা তার মোবাইলের কল অফ করে দিল এবং ফিরে বসল ড. হাইম হাইকেলের দিকে।

আহমদ মুসা তার দিকে ফিরতেই ড. হাইম হাইকেল বলল, ‘তাহলে আগামী সপ্তাহেই মাউন্ট মার্সিতে যাচ্ছ? যাদের সাথে নিচ্ছ তারা বিশ্বস্ত? প্রফেসর আরাপাহো ও সান ওয়াকার দুজনেরই নাম আমি শুনেছি। তোমার বাছাই ঠিক। রেডইন্ডিয়ানরা সাথে থাকলে ওদের সোসাইটিতে মেশবার সুবিধা পাবে তুমি। ঈশ্বর তোমাকে সফর করুন। তবে ধ্বংস টাওয়ারের ডাষ্ট সংগ্রহের কৌশল তোমার চমৎকার হয়েছে। আমার মনে হচ্ছে SAS এর লগ পাওয়াটাই তোমার জন্যে কঠিন হবে। তবে ঈশ্বর তোমার প্রতি খুব সদয়। তোমার কয়েকটা

টেলিফোনই প্রমাণ করে ঈশ্বর যেন তোমাকে হাত ধরে সামনে এগিয়ে নিচ্ছে। গড ব্লেস ইউ মাই বয়।'

ড. হাইম হাইকেল থামতেই আহমদ মুসা বলল, 'অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার। আমি এখন উঠতে চাই।'

'অবশ্যই। কিন্তু আরেকটা কথা শোন। তুমি খুবই হুশিয়ার, তবু বলি। যাকে আমরা 'অপারেশন মেগা ফরচুন গ্রুপ' (OMF-Group) বলছি, তারা কিন্তু ছড়িয়ে আছে সবখানে। আমাদের পুলিশ, এফ.বি.আই এবং সি.আই.এ'র মধ্যে মনে করা হয় প্রতি দুজনের একজন লোক ওদের। কথাটার মধ্যে খুব অতিরঞ্জন আছে বলে আমি মনে করি না।'

ভ্রুকুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার। বলল, 'ব্যাপারটা আমিও জানি স্যার, কিন্তু আপনার দেয়া অংকটা উদ্বেগজনক।'

বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল। তার মোবাইলটা আবার বেজে উঠল। মোবাইলের স্ক্রীনে চোখ বুলাতেই দেখল জর্জ আব্রাহাম জনসনের নাম্বার। কি ব্যাপার তাঁর টেলিফোন কেন? এক ঘণ্টার মধ্যে উত্তর আমার হাতে পৌছে দিয়ে তারপর টেলিফোন করার কথা। আহমদ মুসা মোবাইল তুলে নিয়ে 'গুড ইভিনিং স্যার' বলে সাড়া দিতেই ওপার থেকে জর্জ আব্রাহাম জনসন 'গুড ইভিনিং' জানিয়ে বলল, 'তোমার ঘড়িতে এখন সময় কত?'

'ঠিক সাড়ে তিনটা।' বলল আহমদ মুসা।

'ঠিক আছে তোমার ঘড়ি। শোন, এখন থেকে ঠিক আধা ঘণ্টার মাথায় তুমি গাড়ি নিয়ে ফিলোসফিক্যাল হলের উত্তর পার্শ্বের রোড সাইড কার পার্কিং-এর ১৫০০ নাম্বার পার্কিং ষ্ট্যান্ডে তোমার গাড়ি দাঁড় করাবে এবং গাড়িতেই বসে থাকবে। ঠিক পাঁচ মিনিট পর, একটা লাল গাড়ি এসে তোমার গাড়ির বাম পাশে দাঁড়াবে। গাড়ি দাঁড় করিয়েই গাড়ির ড্রাইভার থেকে বেরিয়ে আসবে এবং তোমাকে 'হ্যাল্লো মি. জে জে' বলে সম্বোধন করে ছুটে এসে একান্ত বন্ধুর মত তোমার গাড়িতে উঠবে। তোমাকে প্রায় অদৃশ্য JAJ জলছাপ ওয়ালা নাম ঠিকানাবিহীন একটা সাদা বন্ধ ইনভেলাপ দেবে। তারপর কিছু কথা বলে সে বেরিয়ে যাবে। তুমি চলে আসবে। আর শোন তোমার গাড়ির নাম্বার প্লেট চেঞ্জ

করে ওখানে যাবে। নাম্বার প্লেট তোমার রুমের খাটের নিচে পাবে। ওকে। কথা শেষ। রেখে দিলাম। বাই।'

ওপ্রান্ত থেকে লাইন কেটে দিল আহমদ মুসাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই।

আহমদ মুসা কল অফ করে দিয়ে ড. হাইকেলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আসি স্যার। আমাকে এখনই একটু বাইরে বেরুতে হবে।'

'উইশ ইউ গুডলাক।' বলল ড. হাইম হাইকেল।

'ধন্যবাদ' বলে আহমদ মুসা বেরিয়ে এল ড. হাইম হাইকেলের কক্ষ থেকে।

আহমদ মুসা ১৫০০ নাম্বার কার পার্কিং ষ্টান্ডে গাড়ি দাঁড় করিয়ে অপেক্ষা করছে।

এ রোড সাইড কার পার্কিংটা ফিলোসফিক্যাল হল থেকে পঞ্চাশ গজের মত দূরে হবে। সোজা মাথার সামনে একটা ছোট বাগান। প্রাচীর ঘেরা। প্রাচীরটা ফিলোসফিক্যাল হলকেও বেষ্টন করেছে। বাগানটা হলেরই অংশ বুঝল আহমদ মুসা।

পার্কিং-এর পার্ক ষ্টান্ড আছে ৭টা। সবগুলোই শূন্য। একটি মাত্র গাড়ি দাঁড়িয়ে, সেটা আহমদ মুসার।

ঠিক পাঁচ মিনিটের মাথায় একটা লাল গাড়ি এসে পার্ক করল আহমদ মুসার গাড়ির বাম পাশে।

গাড়ির জানালা পথে আহমদ মুসা দেখতে পেল শক্ত ও লম্বা গড়নের এক বুদ্ধিদীপ্ত যুবককে।

গাড়ি দাঁড়াতেই যুবকটি তাকাল আহমদ মুসার গাড়ির দিকে। চোখা-চোখি হয়ে গেল আহমদ মুসার সাথে। যুবকটির চোখে ছিল অনুসন্ধানী দৃষ্টি এবং সেই সাথে প্রথম দৃষ্টিতেই ছিল একটা চমকে ওঠা ভাব। কিন্তু পরক্ষণেই যুবকটির

মুখ উজ্জ্বল হাসিতে ভরে গেল। হাসতে হাসতেই গাড়ি খুলে বেরিয়ে এল। বলে উঠল চিৎকার করে, 'হ্যাল্লো মি. জে জে।'

ছুটে এল যুবকটি আহমদ মুসার গাড়ির দিকে।

গাড়ির কাছে আসতেই আহমদ মুসা গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে তাকে স্বাগত জানাল।

যুবকটি গাড়িতে ঢুকে সিটে বসে দরজা টেনে বন্ধ করে দিল। তারপর কোটের পকেট থেকে একটা ইনভেলাপ বের করে আহমদ মুসার হাতে দিয়ে বলল, 'বোধ হয় খুব গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি। পাওয়ার পর মুহূর্ত নষ্ট না করে ছুটতে হয়েছে।'

ভ্রুকুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার। কথাগুলোকে অপ্রয়োজনীয় ও কৈফিয়ত ধরনের বলে মনে হলো তার কাছে।

'ধন্যবাদ' বলে আহমদ মুসা ইনভেলাপটিকে উল্টে-পাল্টে দেখল। আবারও ভ্রুকুঞ্চিত হলো তার। ইনভেলাপের কোথাও JAJ -এর জলছাপ নেই।

আহমদ মুসা তাকাল যুবকটির দিকে। বলল, 'ইনভেলাপ বদল হয়েছে। আমার ইনভেলাপ কোথায়?' শান্ত কিন্তু শক্ত কণ্ঠস্বর আহমদ মুসার।

যুবকটি হেসে উঠে আহমদ মুসার কথা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে বলল, 'আপনি কি জ্যোতিষী নাকি যে, ইনভেলাপ খোলার আগেই এমন কথা বলছেন। ইনভেলাপ খুলে দেখুন।'

'ইনভেলাপের ভেতরটা পরে দেখব। আগে বলুন ইনভেলাপটা কোথায়?' আগের মতই স্থির কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

'আপনি কি বলছেন আমি বুঝতে পারছি না। ইনভেলাপ তো দিয়েছি। কি আছে দেখুন। তারপর তো বলবেন!' বলল যুবকটি অনেকটা কৈফিয়তের সুরে।

আহমদ মুসা তার দুচোখের সবটুকু দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল যুবকটির মুখের উপর। ভাবনা তার মনে, যুবকটি বারবার ভেতরটা দেখতে বলছে কেন? এ ইনভেলাপ আসল ইনভেলাপ সে দাবী কিন্তু করছে না সে। তার মানে ভেতরটা

ঠিক থাকা সম্পর্কে সে নিশ্চিত। আর এর অর্থ হলো ভেতরটা সে দেখেছে। আর তার দেখার অর্থটা কি?'

কঠোর হয়ে উঠল আহমদ মুসার মুখ। বলল যুবকটিকে, 'মেসেজের ফটোকপি যেটা আপনি করেছেন, সেটা দি.........।'

আহমদ মুসা কথা শেষ করতে পারলো না। যুবকের ডান হাতটা যেটা ওপাশে ছিল, ছুটে এল রিভলবার নিয়ে। আহমদ মুসার মাথা লক্ষ্যে তাক করল সে রিভলবার। বলল, 'যা আমি কল্পনা করেছিলাম, তার চেয়েও তুমি চালাক। কিন্তু বেশি চালাকের......।

যুবকটিও কথা শেষ করতে পারলো না। আহমদ মুসার বাম হাত চোখের পলকে উঠে এসে যুবকটির রিভলবার ধরা হাতের কব্জী ধরে উপর দিকে পুশ করল, অন্যদিকে আহমদ মুসার মাথা তীরের মত নেমে গিয়ে আঘাত করেছে যুবকটিকে।

আকস্মিক আঘাতে যুবকটি ছিটকে গিয়ে গাড়ির দরজার সাথে ধাক্কা খেল। অন্যদিকে তার রিভলবার ধরা হাতকে উপর দিকে পুশ করার সময়ই যুবকটি গুলী করল। গুলীটা গিয়ে আঘাত করল গাড়ির ছাদকে।

যুবকটি সিট ও দরজার মাঝখানে কোনঠাসা হয়ে পড়েছিল। তাকে শামলাতে গিয়ে আহমদ মুসার ডান হাত ওদিকে এনগেজ হয়ে পড়েছিল। আর বাম হাত যুবকটির রিভলবার ধরা ডান হাতের সাথে লড়াই করছিল। যুবকটি তার ডান হাতকে আহমদ মুসার দিকে এনে তাকে রিভলবারের টার্গেটে আনবার চেষ্টা করছিল। দুহাতের লড়াই-এ সুবিধা পাচ্ছিল যুবকটিই বেশি। কারণ আহমদ মুসার শক্তি ও মনোযোগের বিরাট অংশ ব্যয় হচ্ছিল যুবকটিকে চেপে রাখতে গিয়ে। অন্যদিকে কোনঠাসা অবস্থা থেকে মুক্তির চেষ্টা না করে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল আহমদ মুসাকে কোনোভাবে গুলীর আওতায় আনার জন্যে।

এক সময় আহমদ মুসা যুবকটিকে ডান হাতে চেপে রেখে নিজের দেহটাকে আলগা করে নিল। তারপর চোখের পলকে ডান হাতটা তুলে নিয়ে দুহাত দিয়ে যুবকের রিভলবার ধরা ডান হাত চেপে ধরে জোরে ঠেলে দিল যুবকের দিকেই। রিভলবারের নলও ঘুরে গেল যুবকের দিকেই। যুবকটি তার

হাতের চাপ বাড়িয়ে দিল হাত ঘুরিয়ে নেবার জন্যে। এটা করতে গিয়ে রিভলবারের ট্রিগারের উপর তার তর্জনি আকস্মিকভাবে চেপে বসল ট্রিগারের উপর। সংগে সংগে একটা গুলী বেরিয়ে তার বুককে এফাড়-ওফোড় করে দিল।

আহমদ মুসা চারদিকে চেয়ে দেখল আশেপাশে কেউ নেই।

আহমদ মুসা যুবকটির রিভলবার ধরা হাত বাম হাত দিয়ে ধরে রেখে ডান হাত দিয়ে গাড়ির দরজা খুলে ফেলল। ওদিকে যুবকটির গাড়ির দরজা খোলাই ছিল।

আহমদ মুসা দ্রুত যুবকটিকে গাড়িতে নিয়ে যুবকটির পকেটগুলো সার্চ করল। তার কোটের ভেতরের পকেটেই পেয়ে গেল চার ভাজ করা একটা বড় কাগজের শিট। একটু খুলেই বুঝল জর্জ আব্রাহাম জনসনের পাঠানো মেসেজের একটা কপি। কাগজটি পকেটে পুরল আহমদ মুসা। মানিব্যাগ ছাড়া কোন পকেটেই আর কোন কাগজ ছিল না।

আহমদ মুসা যুবকটির গাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিল। যুবকটির ডান হাতের কাছেই পড়ে থাকল তার রিভলবার। তদন্তকারীরা দেখবে রিভলবারটির একটা গুলী যুবকের বুকে এবং দেখবে রিভলবারের বাঁটে যুবকেরই হাতের ছাপ।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে আহমদ মুসা ফিরে এল তার গাড়িতে। যুবকের দেয়া ইনভেলাপ পড়েছিল গাড়ির সিটে। দ্রুত ইনভেলাপটি খুলে ভেতর থেকে কাগজ বের করল। খুলল। দেখল, যুবকের কাছ থেকে যে মেসেজটি পেয়েছে তারই মূল কপি এটা।

আহমদ মুসা ইনভেলাপসহ মেসেজের দুটো শিট পকেটে পুরল। দুহাত থেকে গ্লাভস খুলে পাশের সিটে রেখে গাড়ি ষ্টার্ট দিল। আর একবার চারদিকে চেয়ে দেখল রোড-সাইড বা এ পার্কে আর কোন গাড়ি নেই, মানুষও নেই।

আহমদ মুসার গাড়ি উল্টো পথে যাওয়া শুরু করল। ঘোরা পথ দিয়ে সে জেফারসন হাউজে ফিরে আসবে। চলছে গাড়ি।

হঠাৎ আহমদ মুসার মনে পড়ল ড. হাইম হাইকেলের কথা। আসার সময় তিনি বলেছিলেন সি.আই.এ, পুলিশ ও এফ.বি.আই-এর প্রতি দুজনের একজন

‘অপারেশন মেগা ফরচুন গ্রুপ’ মানে ইহুদী লবির সাথে সংশ্লিষ্ট অথবা সহানুভুতিশীল। কিন্তু তাই বলে এফ.বি.আই- প্রধানের বিশেষ গ্রুপের মধ্যেও ওরা ঢুকে পড়েছে! আহমদ মুসার ধারণা এফ.বি.আই-এর যে মেয়েটি সেদিন তাদেরকে এয়ারপোর্ট থেকে জেফারসন হাউজে রেখে গিয়েছিল, সে মেয়েটির মত এ যুবকটিও এফ.বি.আই-এর বিশেষ কেন্দ্রীয় গ্রুপের সাথে সংশ্লিষ্ট।

আহমদ মুসা জেফারসন হাউজে ফিরে নিজ ঘরে এসে কাপড় ছাড়তে ছাড়তে ভাবল, দুর্ঘটনার কথা এফ.বি.আই. প্রধান জর্জ আব্রাহাম জনসনকে জানাতে হবে। তাঁর কিছু করণীয় থাকতেও পারে। কিন্তু তার আগে তাঁর পাঠানো মেসেজটা দেখা দরকার।

আহমদ মুসা মোবাইলটি বিছানায় বালিশের পাশে রেখে মেসেজ শিট নিয়ে শুয়ে পড়ল।

শুয়ে পড়ে আহমদ মুসা মেসেজ শিটটি চোখের সামনে তুলে ধরল। পড়া শুরু করল সে ঃ

‘বিশ বছরের পুরানো মিলিটারী ডকুমেন্টগুলোকে আনক্লাসিফায়েড করে ন্যাশনাল আরকাইভস ও মিলিটারী আরকাইভসে পাঠানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টটি ক্লাসিফায়েড ডকুমেন্ট ছিল না। তাই আন-ক্লাসিফায়েডও হয়নি এবং সে কারণে ন্যাশনাল আরকাইভস-এ রাখার উপযুক্তও বিবেচনা করা হয়নি। অপ্রয়োজনীয় ও সময়োত্তীর্ণ বিধায় বিভাগ থেকেই একে নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। শুধু একটা কপি সংরক্ষণ করা হয় ‘মিউজিয়াম অব মিলিটারী হিষ্ট্রি’-এর মহাফেজখানায়। কিন্তু সেখানকার রেকর্ডে একে ‘মিষ্ট্রিয়াস মিসিং লিষ্টে’ রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে কোন তদন্ত না হওয়ায় ডকুমেন্টটার ব্যাপারে আর কিছুই বলা যাচ্ছে না।’

মেসেজ পড়ে হতাশ হলো আহমদ মুসা। আরও দুঃখ হলো এই কারণে যে, অকাজের এ বিষয়টা নিয়ে একজন লোকের জীবনও গেল।

এ সম্পর্কিত সাত-পাঁচ অনেক চিন্তা এসে চেপে ধরল আহমদ মুসাকে। গ্লোব হকের লগ ও অর্ডার শিট উদ্ধার না হলে প্রমাণ করা যাবে না গ্লোব হকের রিমোট কনট্রোল সেদিন দুটি সিভিল এয়ার লাইন্সের প্লেনকে টুইনটাওয়ারে টেনে

এনেছিল। কিন্তু গ্লোব হকের ঐ লগ ক্লাসিফায়েড হলো না কেন? কেউ এর সাথে কোন গোপন, কৌশলগত বা অস্বাভাবিক কোন কিছু জড়িত দেখেনি বলেই বোধ হয়। রুটিন কোন কিছু তো ক্লাসিফায়েড হয় না। ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের ঐ মিশনকেও রুটিন বলে চালিয়ে দেয়া হয়েছে! শীর্ষ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সবাই কি তাহলে ঘটনার সাথে জড়িত ছিল!

পাশ ফিরল আহমদ মুসা। আবার মনোযোগ দিল মেসেজটির দিকে। আবার পড়ল আহমদ মুসা হতাশা পীড়িত মন নিয়ে।

এবার হঠাৎ মেসেজের শেষ লাইনে চোখ আটকে গেল আহমদ মুসার। একটা জিনিসের হারিয়ে যাওয়াকে 'মিষ্ট্রিয়াস মিসিং লিষ্টে' আনা হলো, কিন্তু সে ব্যাপারে তদন্ত হলো না কেন? তদন্তের উপযুক্ত না হলে কোন বিষয়কে মিষ্ট্রিয়াস মিসিং লিষ্ট-এ আনা হবে কেন? আনা হলে রহস্য উদ্ধারের জন্যে তদন্ত হবে না কেন? বিষয়টাকে কি চাপা দেয়া হয়েছে? কেন চাপা দেয়া হলো? কোন চাপের কারণে কি? কে চাপ দিল? এ সব প্রশ্নের জবাব পেলে মিসিং ডকুমেন্টেরও খোঁজ পাওয়া যাবে নিশ্চয়। হতাশার মধ্যে একটা আশার আলো জ্বলে উঠল আহমদ মুসার সামনে। এই আলোর উৎস মিলিটারী হিষ্ট্রির মিউজিয়ামে তাকে যেতে হবে, ভাবল আহমদ মুসা।

আবার পাশ ফিরল আহমদ মুসা। হাতের কাছে পড়ল মোবাইলটা। মোবাইলটা হাতে তুলে নিল আহমদ মুসা।

হাতের চার আঙুলের উপর মোবাইলটা রেখে বৃদ্ধাঙ্গুলি কয়েকটা ডিজিটাল নাম্বারে চাপ দিল। মোবাইলের স্ক্রীনে ভেসে উঠল এফ.বি.আই প্রধান জর্জ আব্রাহাম জনসনের নাম্বার।

সংযোগ হয়ে গেল।

ওপার থেকে জর্জ আব্রাহাম জনসনের কণ্ঠ শুনতে পাওয়ার সাথে সাথেই আহমদ মুসা বলল, 'আমি জোসেফ জন বলছি স্যার। গুড ইভিনিং।'

'ইভিনিংটা গুড রাখলে কোথায়?' বলল জর্জ আব্রাহাম জনসন হাল্কা কণ্ঠে।

'সব শুনেছেন জনাব?'

‘ঘটনার রেজাল্ট শুনলাম। ঘটনা তো তুমি বলবে। আমি নিশ্চিত যে সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। কি করেছিল সে?’

‘ইনভেলাপ পাল্টেছিল।’

‘ইনভেলাপ পাল্টেছিল? তার মানে ভেতরের মেসেজ পাল্টেছিল, অথবা কপি নিয়েছিল?’

‘কপি নিয়েছিল।’

‘ইনভেলাপ পাল্টানো বুঝলে কি করে?’

‘প্রথমেই আমি ইনভেলাপটা চেক করি। তাতে যে গোপন JAJ জলছাপ থাকার কথা তা পাইনি। তখনই বিষয়টা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় যে সে ডাবল এজেন্ট। সে ইনভেলাপ খুলে মেসেজ পাল্টেছে, অথবা কপি নিয়েছে। আমি যখন তার কাছে আসল ইনভেলাপ চাইলাম এবং অবশেষে চিঠির ফটোকপি তার কাছে চাইতে গেলাম, তখন সে রিভলবার বের করে।’

‘তারপর সে সম্ভবত নিজের রিভলবারে নিজের গুলীতেই প্রাণ হারায়।’ বলল জর্জ আব্রাহাম জনসন।

‘জনাব রিভলবারেও তারই ফিংগার প্রিন্ট পাওয়া যাবে। তবে আমি তার এ পরিনতি চাইনি। আমি চেয়েছিলাম তাকে আটক করে মেসেজের কপি নিয়ে নিতে।’ আহমদ মুসা বলল। কণ্ঠ তার ভারী হয়ে উঠেছিল।

‘দুঃখ করো না জোসেফ জন। বিশ্বাসঘাতকের এই পরিণতিই কাম্য। তোমার জন্যে না হলেও আমার জন্যে এটা অপরিহার্যভাবে কাম্য ছিল। তোমাকে ধন্যবাদ জন। এখন বল, কি করবে তুমি? ‘লগ’ তো পাচ্ছ না।’

‘আমি হতাশ নই। আশার আলো দেখতে পাচ্ছি আমি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কিভাবে, কোথায় তুমি আশার আলো দেখতে পাচ্ছ?’ জিজ্ঞাসা জর্জ আব্রাহাম জনসনের।

‘আপনার মেসেজের শেষ বাক্যে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘সংগে সংগে ওপার থেকে জবাব এল না জর্জ আব্রাহাম জনসনের। একটু পর বলল, ‘বুঝেছি, তুমিই তদন্তে নামতে চাও। সত্যি আহমদ মুসা তুমি

অনন্য। স্রষ্টা সব নেয়ামত তোমার উপর ঢেলে দিয়েছেন। আমি নিজেও কিন্তু এ পথটার কথা ভাবিনি।'

কথা শেষ করে একটু থেমেই আবার বলল, 'ঠিক আছে, এখন এ পর্যন্তই। আমার কিছু করার থাকলে তা জানাতে দেরি করবে না। ধন্যবাদ। বাই।'

'অবশ্যই জনাব। বাই।' আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই ওপার থেকে লাইন কেটে গেল।

আহমদ মুসাও কল অফ করে মোবাইল রেখে দিয়ে আবার একটা পাশ ফিরল। কিন্তু চোখ বন্ধ করতে পারলো না। হাতঘড়ির এ্যালার্ম বেজে উঠল।

আসরের নামাজের এলার্ম। উঠে বসল আহমদ মুসা।

# ৪

মাউন্ট মার্সি রেডইন্ডিয়ান রিজার্ভ-এর ফেডারেল কমিশনার ওয়ারেন ওয়েলেসলি মনোযোগ দিয়ে শুনছিল কাহোকিয়ার ইনষ্টিটিউট অব আমেরিকান রেডইন্ডিয়ান ষ্টাডিজ-এর প্রধান আরাপাহোর কথা।

প্রফেসর আরাপাহোর পাশে বসে আছে জোসেফ জন ওরফে আহমদ মুসা। তার পরিচয় সে প্রফেসর আরাপাহোর একজন সহকারী রেডইন্ডিয়ান বিশেষজ্ঞ।

আর কমিশনার ওয়ারেন ওয়েলসলির আমন্ত্রণে উপস্থিত আছেন ঈগল সান ওয়াকার। কমিশনার অফিসের সিভিল অফিসার সান ইয়াজুনো'র বন্ধু সে। তার মাধ্যমেই সান ওয়াকারের সাথে কমিশনারের পরিচয়। কমিশনার দেশবরেণ্য প্রতিভা সান ওয়াকারের প্রতি দুদিনেই আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। রেডইন্ডিয়ান বিষয়ক আলোচনা বলেই কমিশনার সান ওয়াকারকেও ডেকেছে। অফিসের আরও দুজন বৈঠকে হাজির। তাদের একজন ফেডারেল কমিশনার অফিসের প্রধান প্রশাসনিক অফিসার টমাস ওয়াল্টন এবং সিভিল এ্যাফেয়ার্স অফিসার সান ইয়াজুনো।

আলোচনা বসেছে ফেডারেল কমিশনারের অফিসে।

কথা শেষ করে থামল প্রফেসর আরাপাহো।

প্রফেসর আরাপাহো থামতেই কমিশনার ওয়ারেন ওয়েলসলি বলে উঠল, 'আমাদের সম্মানিত অতিথি প্রফেসর আরাপাহোর কাছে এ বিষয়ে আমি আগেই শুনেছি। এখন আরও বিস্তারিত উনি বললেন। আমি এ ব্যাপারে প্রথমে মি. টমাস ওয়ালটনের বক্তব্য শুনতে চাই।'

'ধন্যবাদ স্যার', বলতে শুরু করল টমাস ওয়ালটন, 'বিষয়টির সাথে আমাদের অফিসের তেমন কোন যোগসূত্র দেখছি না। আমাদের একটা ইনফরমেশন দেয়াই যথেষ্ট মনে করি। এ বিষয়টির সাথে কিছুটা যোগ আছে

অপরাধ-আইনের। স্যার তো বললেনই থানার আপত্তি নেই। তবে কবর খননের সময় তারা হাজির থাকতে চায়। প্রফেসর স্যারও এটাই চান। এই অবস্থায় আমরা কোন সমস্যা দেখি না। থানার মত ঘটনার সময় আমরাও হাজির থাকতে চাই, এটুকু দাবি বোধ হয় আমরা করতে পারি।'

টমাস ওয়ালটন থামতেই কমিশনার ওয়ারেন ওয়েলসলি বলল, 'ধন্যবাদ মি. ওয়ালটন। এবার সান ইয়াজুনো তোমার মত বল।'

'স্যার আমি মি. ওয়ালটনের সাথে একমত। শুধু একটা কথাই যোগ করব। এ বিষয়ে এখানকার রেডইন্ডিয়ান কমিউনিটি কর্তৃপক্ষের অনুমতি দরকার। আমি প্রফেসর স্যারের কাছে শুনেছি তিনি এ বিষয়ে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করেছেন। তারা এতে আপত্তি করেননি। আজ কমিউনিটি নেতারা আনুষ্ঠানিকভাবে বসছেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবেই তারা এর অনুমতি দেবেন। আমি মনে করি প্রফেসর স্যারকে যতটা পারা যায় আমাদের সহযোগিতা করা দরকার।' বলল সান ইয়াজুনো।

কমিশনার তাকালো সান ওয়াকারের দিকে। বলল, 'তুমি এখানে অতিথি হলেও তোমার এ ব্যাপারে মতামত আমাদেরকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করবে। কিছু তুমি বল।'

'প্রফেসর স্যার যে কাজ নিয়ে এসেছেন, সেটা আমাদের সকলের কাজ। আমি মনে করি, সকল প্রশ্ন, সকল জিজ্ঞাসা, সকল সন্দেহ, ইত্যাদির তাৎক্ষণিক সমাধান হয়ে যাওয়া প্রয়োজন। এতে সমাজ, দেশ সুস্থ থাকবে।' সান ওয়াকার বলল।

সান ওয়াকার থামলে কমিশনার ওয়ারেন ওয়েলেসলি বলল প্রফেসর আরাপাহোকে লক্ষ্য করে, 'হয়ে গেল মি. প্রফেসর। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আমি যা ভাবছিলাম, সকলের কাছ থেকে সেটাই শুনলাম। তাহলে আপনি কমিউনিটি নেতাদের সাথে আলোচনা করে কাজ শুরু করে দিন। কবে শুরু করছেন, আমাদের দয়া করে জানাবেন। আমরাও থাকব সাথে।'

‘ধন্যবাদ। খুব খুশি হলাম সহযোগিতার জন্যে। থানাও সাথে থাকবে। তাদের কাছ থেকে তারিখ কনফার্ম করে আপনাদের জানাব।’ প্রফেসর আরাপাহো বলল।

‘আরও কিছু কথা হলো। তারপর বিদায় নিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এল প্রফেসর আরাপাহো এবং আহমদ মুসা।

আহমদ মুসারা গাড়িতে উঠতে যাচ্ছে এ সময় সান ওয়াকারও ছুটে এসে তাদের সাথে যোগ দিল। বলল, ‘কমিউনিটি নেতাদের বৈঠকে চলুন আমিও যাব।’

আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, ‘ওদের মিটিং বেশ আগে শুরু হয়ে যাবার কথা। এখানে আমাদের একটু বেশি সময় লাগল।’

‘মিটিং শুরু হতেই বেশ দেরি হয়েছে। থাক, শেষটা ভালই হয়েছে। চিন্তা নেই, কমিউনিটি নেতাদের মিটিং-এ আমাদের কোন ভূমিকা নেই। আমাদের কথা সবাইকে বলেছি। সবাই জানে। সবাই সানন্দে সহযোগিতা করতেও রাজি হয়েছে। অতএব কোন সমস্যা হবার কথা নয়। গড ব্লেস আস।’

কথা শেষ করেই বলল, ‘আর দেরি নয়, চল। মিটিং-এর শেষটা আমরা ধরতে চাই।’ বলে গাড়িতে উঠল প্রফেসর আরাপাহো।

আহমদ মুসা ও সান ওয়াকারও গাড়িতে উঠল। আহমদ মুসা বসেছে ড্রাইভিং সিটে। গাড়ি চলতে শুরু করল।

আহমদ মুসারা যখন মিটিং-এ উপস্থিত হলো,তখন মিটিং শেষ পর্যায়।

মিটিং বসেছে মাউন্ট মার্সি রেডইন্ডিয়ান কমিউনিটির প্রধান সিনর সোপাহারোর বিশাল দরবার খানায়। দরবার খানার বিশাল হলের চারদিক জুড়ে সোফা ষ্টাইলের ঐতিহ্যবাহী গদি বসানো। কমিউনিটির বিভিন্ন অংশের সরদাররা বসেছেন সুদৃশ্য গদিগুলোতে। ঘরের মাঝ বরাবর দেয়াল ঘেঁষে স্থাপিত সিংহাসনাকৃতির বিশাল গদিতে বসেছে সিনর সোপাহারো। তার দুপাশে কয়েকটা গদি খালি।

আহমদ মুসারা দরবার হলে প্রবেশ করতেই মাউন্ট মার্সি’র রেডইন্ডিয়ান প্রধান সিনর সোপারাহো আনন্দ উচ্ছাসের সাথে বলল, ‘সম্মানিত

প্রফেসর আসুন। আপনাদের সবাইকে এ দরবারে স্বাগত। আপনাদেরই এখন আশা করছিলাম। ঠিক সময়েই এসেছেন।

‘ধন্যবাদ সরদার।’ বলে প্রফেসর আরাপাহো দুহাত তুলে কমিউনিটির সব নেতাদের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘সকলকে গুড ইভিনিং।’

তারপর প্রফেসর আরাপাহো আহমদ মুসা ও সান ওয়াকারকে নিয়ে এগুলো সিনর সোপাহারোর দিকে।

সিনর সোপাহারো উঠে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানাল প্রফেসর আরাপাহোকে এবং নিজের ডান পাশের আসনটার দিকে ইংগিত করে প্রফেসর আরাপাহোকে বসতে বলল। বাম পাশের দুআসনে বসাল আহমদ মুসা ও সান ওয়াকারকে।

তারপর নিজে তার আসনে ফিরে গিয়ে সিনর সোপাহারো প্রফেসর আরাপাহোকে লক্ষ্য করে বলল, ‘প্রফেসর স্যার, আপনার বিষয় নিয়ে আমি আমার সরদারদের সাথে আলোচনা করেছি। তারা সকলেই আপনার চিন্তার সাথে একমত। কিন্তু তারা কতগুলো কৌতূহল প্রকাশ করেছেন, যার জবাব আপনার কাছে আছে।’

‘ওয়েলকাম সরদার। আমি তাঁদের কৌতুহল মিটানোর সুযোগ পেলে খুবই খুশি হবো।’ বলল প্রফেসর আরাপাহো।

‘প্রফেসর স্যার, অনেকের কৌতুহল, এখানে গণকবর থাকার কথা কেউ জানে না, এমনকি শোনেওনি কেউ, এ বিষয়টা অবহিত হলেন কিভাবে?’ বলল সিনর সুপাহারো।

‘ধন্যবাদ সরদার সিনর সুপাহারো। রেডইন্ডিয়ানদের বিষয়ে, রেডইন্ডিয়ানদের এলাকা বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য, ইনফরমেশন ইত্যাদি বরাবরই বিভিন্নভাবে আমাদের ইনষ্টিটিউটে আসে। কেউ চিঠিপত্রের মাধ্যমে জানান। কেউ রেকডকৃত অডিও ভিডিও ক্যাসেট পাঠান। পত্র-পত্রিকা ম্যাগাজিনও অনেকে পাঠান। মাউন্ট মার্সির গণকবরের সংবাদ এইভাবে কয়েকটি সূত্র থেকে আমার কাছে আসে। তারা জানান, রেডইন্ডিয়ানদের স্বার্থেই এর অনুসন্ধান প্রয়োজন। আমি এ বিষয়টার প্রতি তেমন গুরুত্ব দেইনি। কিন্তু একটা সূত্র যখন আমাকে স্থান

নির্দিষ্ট করে বলল, তখন আমি বিষয়টাকে সিরিয়াসলি গ্রহণ করেছি এবং আপনাদের কাছে এসেছি।' বলল প্রফেসর আরাপাহো।

প্রফেসর আরাপাহো থামতেই এক পাশ থেকে সরদারদের একজন বলে উঠল, 'স্যার তাদের স্বার্থ কি? তারা কেন চায় এটা খনন হোক?'

প্রফেসর আরাপাহো মিষ্টি হাসল। বলল, 'পৃথিবীতে অনেক মানুষ আছে যারা নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা না করে বা নিজের স্বার্থ কোরবানী দিয়েও সত্য সন্ধানে, রহস্য সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। এখানে আমি মনে করি সত্য সন্ধানটাই মূখ্য।'

'স্যার এটা করতে গিয়ে আমরা কোন সমস্যার জড়িয়ে পড়ব না তো?' অন্য প্রান্ত থেকে আরেকজন সরদারের জিজ্ঞাসা।

'বিষয়টা অতীতের সাথে সম্পর্কিত। বর্তমানের সাথে নয়। এই ইন্ডিয়ান রিজার্ভের কেউ-ই যেহেতু এ বিষয়টা সম্পর্কে কিছুই জানে না, তাই এখানকার কেউ এর সাথে সম্পর্কিত হবার প্রশ্নই ওঠে না।'

'স্যার, খনন করে গণকবর যদি পাওয়া যায়, তাহলে পরবর্তী পদক্ষেপ আপনার কি হবে?' আরেকজন সরদারের জিজ্ঞাসা।

'সত্যটা জানতে চাই। গণকবরে ওরা কারা? রেডইন্ডিয়ান কিনা? কত দিন আগে ওদের এই পরিণতি ঘটে? এ বিষয়গুলো যদি জানা যায়, তাহলে আমাদের ইতিহাসের এক অংশ হবে এটা।' বলল প্রফেসর আরাপাহো।

প্রফেসর আরাপাহো থামল। কোন দিক দিয়ে কোন প্রশ্ন আর এল না। মুখ খুলল এবার সিনর সুপাহারো। বলল, 'ধন্যবাদ প্রফেসর স্যার। আমি মনে করি সবাই আশ্বস্ত হয়েছে। আমার একটা পরামর্শ, আপনার এ উদ্যোগের সাথে আমরা তো আছিই, পুলিশ এবং ফেডারেল কমিশনার অফিসকে জড়িত করা দরকার।'

'জি সরদার। ওদের সাথে কথা বলেছি। ওরা থাকবেন আমাদের সাথে।' বলল প্রফেসর আরাপাহো।

'তাহলে আর কোন কথা নয়। আমাদের পূর্ণ সম্মতি আছে। আপনি অগ্রসর হোন।' সিনর সুপাহারা বলল হাসি ভরা মুখে।

প্রফেসর আরাপাহো উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘ধন্যবাদ সরদার, ধন্যবাদ সকলকে।’

আরও দুচারটি কথার পর কফি পান পর্ব শেষে মিটিং-এর সমাপ্তি ঘোষণা হলো।

আহমদ মুসারা ফিরে এল সিনর সুপাহারোর অতিথি হিসেবে রয়েছে মাউন্ট মার্সিতে আসার পর থেকেই। আহমদ মুসারা এখানকার ট্যুরিষ্ট রেষ্ট হাউজে উঠেছিল। কিন্তু মাউন্ট মার্সি’র রেডইন্ডিয়ান কম্যুনিটির প্রধান তাদেরকে রেষ্ট হাউজে থাকতে দেয়নি। বলতে গেলে জোর করেই নিয়ে এসেছে তার আলিশান মেহমান খানায়।

আহমদ মুসা তার কক্ষে এসে ধপ করে বসে পড়ল, গাটা এলিয়ে দিল সোফায়। মনটা তার খুব হাল্কা লাগছে আজ। কয়েকদিন বেশ টেনশনে কেটেছে। প্রথম দিকে কমিউনিটি সরদাররা এ ব্যাপারটা বুঝতেই চায়নি। তাছাড়া এখানকার পুলিশও ব্যাপারটাকে সন্দেহের চোখে দেখেছে। ফেডারেল কমিশনারের অফিসও এর সাথেজড়িত হতে দ্বিধা করেছে। প্রফেসর আরাপাহোর ইমেজ ও অব্যাহত চেষ্টা এবং পেছনে থেকে সান ওয়াকারের বন্ধু সান ইয়াজুনোর চেষ্টা গোটা বিষয়কে অবশেষে সহজ করে দিয়েছে। পুলিশ আগেই রাজি হয়েছিল। ফেডারেল কমিশনারের অফিস ও কমিউনিটি সরদারদের গুরুত্বপূর্ণ সম্মতিও আজ পাওয়া গেল। এখন যে কোন মুহূর্তে কাজ শুরু করা যায়।

এসব ভাবনায় আহমদ মুসা যখন ডুবে আছে, তখন প্রফেসর আরাপাহো এবং সান ওয়াকার প্রবেশ করল আহমদ মুসার ঘরে।

ওদের দেখে আহমদ মুসা সোজা হয়ে বসল।

সান ওয়াকার গিয়ে আহমদ মুসার পাশে বসল। আর প্রফেসর আরাপাহো আহমদ মুসার মুখোমুখি সোফায় বসতে বসতে বলল, ‘জোসেফ জন ওরফে...... থাক নাম ধরব না। এখন বল, তোমার পরিকল্পনা কি? যে কোন সময়ে কাজ শুরু করতে পার। আমার প্রতœতাত্বিক খননকারী গ্রুপও আজ বিকেলের মধ্যে পৌছে যাবে।’

‘অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনাকে। আপনি একটা অসাধ্য সাধনের মত কাজ করেছেন। আমি.........’ আহমদ মুসা কথা শেষ করতে পারলো না।

আহমদ মুসাকে বাধা দিয়ে প্রফেসর আরাপাহো বলল, ‘দেখ সাগর যদি নদীর গভীরতা নিয়ে প্রশংসা করে, সেটা খুবই লজ্জার। আমি তোমার প্রশংসা শুনতে আসিনি। আমি জানতে এসেছি তোমার পরিকল্পনা।’

স্যার আমি এখন টেলিফোন করব আমাদের ‘ক্রিশ্চিয়ান কার্টার’ ওরফে ‘বুবি’কে (বুমেদীন বিল্লাহকে)। আজই তাকে আসতে বলব। সে এলেই খনন কাজ শুরু করা যাবে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘তার জন্যে অপেক্ষা কেন?’ জিজ্ঞাসা প্রফেসর আরাপাহোর।

‘সে মূলত ফ্রান্সের লা’মন্ডে পত্রিকার সাংবাদিক। তাছাড়া সে ফ্রি ওয়ার্ল্ড (FWTV) এবং ওয়ার্ল্ড নিউজ এজেন্সি (WNA)-এর আন্ডার গ্রাউন্ড রিপোর্টার। বিশ্বব্যাপি উপযুক্ত প্রচার এখন হবে আমাদের প্রধান অবলম্বন। এক্ষেত্রে সেই হবে আমাদের এখন প্রধান অস্ত্র।’ আহমদ মুসা বলল।

‘বুঝেছি জোসেফ জন। মিডিয়া যুদ্ধের মাধ্যমেই জয় নিশ্চিত করতে চাও। গড ব্লেস আস অল।’ বলল প্রফেসর আরাপাহো।

‘ধন্যবাদ স্যার।’ বলেই আহমদ মুসা মোবাইলটা হাতে তুলে নিল। মোবাইলের ডিজিটাল নাম্বারে নক করতে করতে প্রফেসর আরাপাহোকে লক্ষ্য করে বলল, ‘মাফ করুন স্যার, টেলিফোনটা সেরে নিই।’

কথা শেষ করতেই টেলিফোনের ও প্রান্ত থেকে ড. হাইকেলের কণ্ঠ শোনা গেল।

‘গুড ইভিনিং ড. হ্যামিল্টন। আপনি কেমন আছেন? ওখানে কি মি. কার্টার ওরফে ‘বুবি’ আছে?’ এ প্রান্ত থেকে বলল আহমদ মুসা।

‘ওয়েলকাম। গুড ইভিনিং। হ্যাঁ বুবি আছেন। ইউরোপ থেকে যার আসার কথা তিনিও আছেন। কেমন আছ তুমি? ওদিকের খবর কি?’ ড. হাইম হাইকেল বলল।

‘এ দিকের খবর খুবই ভাল। ব্যবস্থা সব সম্পূর্ণ। দুএকদিনের মধ্যেই কাজ শুরু করব। ‘বুবি’কে পরে কিন্তু তার আগে ইউরোপ থেকে আসা মেহমানকে দিন।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ওকে। গড ব্লেস আস অল।’ ওপার থেকে বলল ড. হাইম হাইকেল।

পরক্ষণেই টেলিফোনের ওপ্রান্ত থেকে কামাল সুলাইমানের কণ্ঠ শুনতে পেল আহমদ মুসা। বলল, ‘কাসু কেমন আছ? ওদিকে কতদূর এগুলে?’

‘সুখবর তিন ক্ষেত্রেই। যেমন আপনি চেয়েছিলেন সেভাবে তিন প্রতিষ্ঠান থেকে ছয় প্যাকেট ম্যাটেরিয়াল যোগাড় করা হয়েছে। প্রত্যেক প্যাকেটেই প্রত্যয়নমূলক সিল সিগনেচার রয়েছে। কিন্তু সমস্যা হয়েছে, আমি হোটেল ছেড়ে দিয়েছি।’ বলল কামাল সুলাইমান।

ভ্রুকুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার। সমস্যা বলতে কামাল সুলাইমান কি বলতে চেয়েছে বুঝেছে আহমদ মুসা। বলল, ‘ভাল করেছ। পরবর্তী কাজগুলো?’

‘যেদিন পেয়েছিলাম নমুনা, আপনার নির্দেশ অনুযায়ী সেদিনই একটি করে প্যাকেটের ম্যাটেরিয়াল দিয়েছিলাম সেই নির্দিষ্ট তিনটি প্রতিষ্ঠানে। কিন্তু রেজাল্ট নিতে যাওয়াই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওরা হন্যে হয়ে উঠেছে। পাহারা বসিয়েছে সবখানে।’ বলল কামাল সুলাইমান। বিষণœ কণ্ঠ তার।

‘ঠিক আছে। ধীরে চল। আজই ‘বুবি’কে এখানে পাঠিয়ে দাও। তাকে এখানে দরকার। শোনাও যাবে তার কাছ থেকে সব।’ বলল আহমদ মুসা গম্ভীর কণ্ঠে।

‘ঠিক আছে। ‘বুবি’র সাথে কথা বলবেন?’

‘আর প্রয়োজন নেই। তুমি তাকে বলে দাও। আজই যেন সে আসে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ঠিক আছে। পাঠাচ্ছি ওকে। আর কোন নির্দেশ?’ জিজ্ঞাসা কামাল সুলাইমানের।

‘সাবধানে যতটুকু এগুনো যায় এগোও আর খোঁজ নাও। পারলে ডেলিভারি নাও। সম্ভব না হলে সাধ্যমত খোঁজ খবর রাখ। মনে রেখ দুনিয়াতে

একমাত্র শিশাই নিশ্চিদ্র। আর সবকিছুর মধ্যে ছিদ্র আছে, ফাঁক আছে। এই ফাঁকের সন্ধান কর।' বলল আহমদ মুসা।

'ধন্যবাদ। আপনার নির্দেশ বুঝেছি।' বলল ওপার থেকে কামাল সুলাইমান।

'ধন্যবাদ, কাসু। আজকের মত এখানেই শেষ। গড ইজ উইথ আস। বাই।' বলল আহমদ মুসা।

'বাই।' কামাল সুলাইমান বলল।

আহমদ মুসা কল অফ করে দিয়ে সোফায় গা এলিয়ে দিল। কিছু বলার জন্যে আহমদ মুসা মুখ খুলেছিল। কিন্তু তার আগেই প্রফেসর আরাপাহো বলে উঠল, 'কি ব্যাপার আহমদ মুসা, কোন খারাপ খবর?'

'ভালোমন্দে মেশানো স্যার।'

'কেমন?'

'থ্যাংকস, কামাল সুলাইমান নিউইয়র্কের তিনটি প্রতিষ্ঠান থেকে পরিকল্পনা অনুযায়ী টুইনটাওয়ার ধ্বংসের ডাষ্ট যোগাড় করেছে। কামাল সুলাইমানের সাথে খোলামেলা কথা বলা গেল না। কিন্তু যতটুকু কথা হলো, তাতে বুঝলাম এই ডাষ্ট সংগ্রহ করার বিষয়টা 'ওপারেশন মেগা ফরচুন' গ্রুপ (ও.এম.এফ গ্রুপ) জেনে ফেলেছে এবং তারা কামাল সুলাইমানের হোটেলের ঠিকানাও পেয়ে যায়। কামাল সুলাইমানও এটা আঁচ করতে পারে। সে হোটেল ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র সরে গেছে। ডাষ্টগুলো নিউইয়র্কের তিনটি প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা করতে দেয়া হয়েছে ডাষ্টগুলোর পরিচয় প্রকাশ না করে। কামাল সুলাইমান আশংকা করছে, ও.এম.এফ গ্রুপ সবগুলো ল্যাবরেটরীর দিকে নজর রাখছে। সে কারণে রেজাল্ট সংগ্রহ করতে এখনও সে যায়নি। ফলে ওদিকে কাজটা থেমে গেছে।' আহমদ মুসা বলল।

'মি. কামাল সুলাইমানের পক্ষ থেকে ডাষ্ট পরীক্ষা করতে দেয়া হয়েছে, সুনির্দিষ্টভাবে এটা কি তারা জানতে পেরেছে?' সান ওয়াকার বলল।

'বিষয়টা এত খোলামেলা ওর সাথে আলোচনা হয়নি। তবে আমার মনে হয় ওরা সন্দেহের উপর পাহারা বসিয়েছে, যাতে আমরা ডাষ্ট পরীক্ষা করতে না

পারি। তিনটি ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার জন্যে ডাষ্ট জমা দেয়া হয়েছে, ডাষ্ট সংগ্রহ করার এক ঘণ্টার মধ্যে ডাষ্টের তিনটি ভিন্ন পরিচয়ে এবং তিনজন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির পক্ষ থেকে। কামাল সুলাইমানই তিন নাতে তিন ব্যক্তি সেজেছিল।' বলল আহমদ মুসা।

'থ্যাংকস গড। সব আট-ঘাট বেঁধেই কাজটা করা হয়েছে বলে আমি মনে করি। সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা নিশ্চয় ওদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কারণ আমি জানি, নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনের এসব ল্যাবরেটরিতে প্রতিদিন টেষ্টের জন্যে শত শত কেস জমা হচ্ছে। এই অবস্থায় ডাষ্টের পরিচয় ও জমাদানকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নাম না জানলে বাঞ্ছিত জিনিস বের করা মুস্কিল।' সান ওয়াকার বলল।

'তোমার কথাই যেন সত্য হয় সান ওয়াকার। সমস্যা হলো, ভিন্ন নামে জমা হলেও একই ব্যক্তি তিন জায়গায় গেছে, প্রতিষ্ঠানগুলোর টিভি ক্যামেরায় এ ছবি উঠেছে।' বলে আহমদ মুসা সোফায় সোজা হয়ে বসল। বলল, 'নিউইয়র্কের এই অভিজ্ঞতা থেকে আমি মনে করছি, কাল সকালেই গণকবরের খনন কাজ শুরু হওয়া দরকার। আমার বিশ্বাস কাল সকালের মধ্যে আমাদের বিল্লাহ এখানে পৌছে যাবে।' বলল আহমদ মুসা।

'তাহলে আজই পুলিশ, ফেডারেল অফিসসহ সবাইকে জানিয়ে দিতে হয়।' প্রফেসর আরাপাহো বলল।

'জি স্যার।' বলল আহমদ মুসা।

'অল রাইট। তাহলে এখনই কাজে নামতে হয়।' প্রফেসর আরাপাহো বলল।

'খননের পরের বিষয়গুলো কি চিন্তা করেছেন ভাইয়া?' জিজ্ঞাসা সান ওয়াকারের।

'পরের কাজও তোমার এবং স্যারেরই বেশি। যে কয়টা দেহাবশেষ পাওয়া যাবে তার প্রত্যেকটি থেকে ৪টি করে দাঁত, প্রত্যেকটির থেকে দুপ্যাকেট করে দেহাবশেষ নিয়ে যেতে হবে শিকাগোতে পরীক্ষার জন্যে। আমার পরীক্ষার বিষয় তিনটি। এক. লোকগুলো কোন জাতি গোষ্ঠীর, দুই. লোকগুলো কয় তারিখে কতটার সময় নিহত হয়েছে, এবং তিন. তারা কিভাবে নিহত হয়েছে। স্যারের

সাথে শিকাগোর সংশ্লিষ্ট দুটি ল্যাবরেটরীর কথা হয়েছে। তারা বলেছে দাঁত ও দেহাবশেষ পেলে তিন বিষয়েই তারা নিখুঁত তথ্য দিতে পারবে। সুতরাং স্যার এবং তোমাকেই এ মিশন নিয়ে শিকাগো যেতে হবে।' বলল আহমদ মুসা।

'কিন্তু এই ডকুমেন্টগুলার প্রামাণ্যতা নিরুপিত হবে কিভাবে?' সান ওয়াকার বলল।

'এ ব্যাপারে আমি প্রফেসর স্যারের সাথে আলোচনা করেছি। আমার চিন্তা হলো, 'গণকবর থেকে পাওয়া প্রত্যেকটা দেহাবশেষ বিষয়ে চারটা প্যাকেট হবে। দুটি দাঁতের প্যাকেট, আর দুটি দেহাবশেষের প্যাকেট। দাঁতের দুপ্যাকেটের প্রত্যেকটিতে দুটি করে দাঁত থাকবে। দেহাবশেষের দুটিতে একই জিনিস থাকবে। প্রত্যেকটা প্যাকেট সকলের উপস্থিতিতে সিল করা হবে এবং প্রত্যেকটি প্যাকেটে প্রত্যয়নমূলখ স্বাক্ষর থাকবে পুলিশের থানা কর্তৃপক্ষের, ফেডারেল কমিশনার অফিসের এবং রেডইন্ডিয়ান কমিউনিটি প্রধানের। অর্থাৎ প্রত্যেকটি দেহাবশেষের প্রত্যেক বিষয়ে দুটি করে সীল প্যাকেট হবে। দুটি প্যাকেটের একটি ল্যাবরেটরিতে দেয়া হবে পরীক্ষার জন্যে, আর একটি আমাদের হাতে থাকবে রেকর্ড হিসাবে।' আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ ভাইয়া। নিñিদ্রে ব্যবস্থা হয়েছে। প্রমাণের বিষয়টা নিয়েই আমার উদ্বেগ ছিল।' বলল সান ওয়াকার।

'কিন্তু একটা বিষয়, 'অবশিষ্ট দেহাবশেষ থাকবে কোথায়?' বলল প্রফেসর আরাপাহো আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে।

'কোন গণকবর আবিষ্কৃত হবার পর এর দায়িত্ব বর্তায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষক কর্তৃপক্ষের উপর। সেই হিসেবে পুলিশ গণকবরের দেখা-শোনা করবে, যতদিন না উর্ধতন কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে তাদের বিধি-ব্যবস্থা শেষ না করেন।' আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ। ঠিক, এটাই আইন।' বলে উঠে দাঁড়াল প্রফেসর আরাপাহো। বলল, 'আমি যাই। ওদিকে গিয়ে দেখি, সকালেই কাজ আমরা শুরু করব। তুমি রেষ্ট নাও। বাই।'

প্রফেসর আরাপাহো চলে গেলে সান ওয়াকার বলল, 'আমিও উঠি। সন্ধ্যার পর আসব।'

সান ওয়াকার যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল।

'ঠিক আছে। এস। কিন্তু শোন, তুমি সান ইয়াজুনোকে বলো সে যেন ফেডারেল কমিশনার অফিস এবং পুলিশ ষ্টেশনের কথা-বার্তা, চিন্তা-ভাবনার দিকে নজর রাখে। তারা যত বেশি আমাদের সহযোগী হয়, ততই ভাল।' বলল আহমদ মুসা।

'আপনি কিছু আশংকা করেননি তো?' সান ওয়াকার বলল নিচু কণ্ঠে।

'সে রকম কিছু কারও মধ্যেই আমি দেখিনি। আমি বলছি যেটা এ কারণে যে আমাদের সাবধান হতে দোষ নেই।'

'তাহলে আমি সন্ধ্যায় এদিকে আসছি না। সান ইয়াজুনোর সাথে আমি পুলিশ ষ্টেশনের দিকেই যাব।'

'ঠিক আছে। কিন্তু তোমরা কালকে সকালের ব্যাপারে ওদের কিছু বলবে না। ওটা বলবেন প্রফেসর স্যার ফরমালি ওদেরকে।'

'ঠিক আছে, চলি। আচ্ছা.........।' কথার মাঝখানে থেমে গিয়ে সান ওয়াকার বলল, 'মনেই থাকে না যে, আমাদের সালাম-কালাম সব শিকেয় তুলে রাখা হয়েছে।'

'তা রাখা হয়েছে, কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ শিকায় তোলা নেই।' আহমদ মুসা বলল হেসে উঠে।

'সে ভুল হবে না অবশ্যই। আচ্ছা ভাইয়া, আজ সকালে কিন্তু ভাবীর কাছে আপনার টেলিফোন করার কথা ছিল, রাতে বলেছিলেন।'

'ধন্যবাদ বিষয়টা মনে করিয়ে দেবার জন্যে। সকালে করেছিলাম, সন্ধ্যার পর আবার টেলিফোন করতে হবে।'

'বিশেষ কোন খবর আছে?'

'না, সকালে পাইনি। হাসপাতালে গিয়েছিলেন। মোবাইল বন্ধ ছিল।' বলল আহমদ মুসা।

'হাসপাতালে কেন?' প্রশ্ন করল সান ওয়াকার। তার চোখে-উদ্বেগ।

‘উদ্বেগের কিছু নেই রুটিন চেকিং। মেয়াদের শেষ দিকে তো! ওকে সব ব্যাপারে এখন সাবধান থাকতে হচ্ছে। ছোট-খাট ব্যাপারেও ডাক্তারের পরামর্শ প্রয়োজন হয়।’

‘ওখানকার সংশ্লিষ্ট ডাক্তারের সাথেও আপনার কথা বলা উচিত।’

‘মদিনাতুন্নবী স্পেশালাইজড ষ্টেট হাসপাতালের চীফ ড. ফাতেমার কেয়ারে উনি আছেন। আমি তার সাথে কথা বলেছি। আগে থেকেই তিনি আমার পরিচিত।’

‘থ্যাংকস গড। আসি। বাই।’ বলল সান ওয়াকার।

‘এস। বাই।’ বিদায় জানাল আহমদ মুসা সান ওয়াকারকে।

‘নিউইয়র্ক অ্যাটোমিক ল্যাবরেটরী’র ডকুমেন্ট ডেলিভারি কাউন্টার।

সময় সকাল ৮টা। সবেমাত্র অফিস খুলেছে। দিনের কাজ গোছ-গাছ করে নিচ্ছে সবাই। ডেলিভারি কাউন্টার ল্যাবরেটরির সম্মুখভাগের একটি কক্ষ। কক্ষটির দরজা ঠেলে প্রবেশ করলেই ডেলিভারী কাউন্টার। কাউন্টারে বসে আছে একজন যুবক এবং একজন তরুণী।

কাউন্টারের ফাইল-পত্র গোছ-গাছ করে সেলফের ফাইল, প্যাকেট চেক করে ঠিক-ঠাক করে রেখে দুজনে চেয়ারে এসে বসল।

ঘরে এসে প্রবেশ করল একজন লোক। মাথায় হ্যাট। দুপাশের কানের নিচ পর্যন্ত নামানো জুলফি।

গোঁফ অর্ধ চন্দ্রের আকারে মুখের উপরটা ঘিরে রেখেছে। পরনে কাউবয় প্যান্ট ও শার্ট। পায়ে ফিল্ড বুট।

লোকটার গোটাটাই একজন কাউবয়-এর প্রতিকৃতি।

লোকটা সোজা এসে যুবকটির সামনে দাঁড়াল। একটা ইনভেলাপ থেকে একটা রিসিট বের করে তুলে দিল যুবকটির হাতে।

যুবকটি রিসিটের উপর চোখ বুলাতেই ভ্রুকুঞ্চিত হয়ে উঠল তার। দ্রুত চোখ তুলে তাকাল সে লোকটির দিকে।

লোকটিরও দুচোখ বাজের মত আটকে ছিল যুবকটির উপর। যুবকটির চোখ-মুখের পরিবর্তন তার দৃষ্টি এড়ায়নি, হ্যাটের ছায়ায় তার চোখ-দুটি শক্ত হয়ে উঠেছে।

যুবকটি লোকটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্যার একটু বসুন।'

'ডকুমেন্ট আগেই কাউন্টারে আসার কথা। নির্দিষ্ট সময়ের চারদিন পরে আসছি।' বলল লোকটি।

'এসেছে স্যার। এবার ফাইনাল চেকটা করে আসি।' বলে উঠে দাঁড়াল যুবকটি।

'ঠিক আছে ডকুমেন্টটা দিন। আমি দেখতে থাকি। আপনি চেক করে আসুন।' বলল লোকটি স্থির কণ্ঠে।

যুবকটি উঠে শেলফ থেকে একটা ফোল্ডার বের করে কাউন্টারে এল। বলল, 'এই তো আপনার ডকুমেন্ট। একটু বসুন। আমি স্যারকে দিয়ে চেক করিয়েই নিয়ে আসছি।'

লোকটি কাউন্টারের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। বাজের মতই ছোঁ মেরে লোকটি যুবকটির হাত থেকে ফোল্ডারটি নিয়ে নিল।

যুবকটি চিৎকার করতে যাচ্ছিল।

কিন্তু লোকটি এক হাতে ফোল্ডার কেড়ে নিয়েছে, অন্য হাত দিয়ে বের করেছে রিভলবার এবং সে রিভলবার তাক করেছে যুবককে। সেই সাথে একবার রিভলবার ঘুরিয়ে এনেছে তরুণীর দিক থেকেও।

যুবকটি হা করেছিল, কিন্তু তার কণ্ঠ থেকে চিৎকার বেরুল না। নিজেকে সামলে নিয়েই সে বলে উঠল, 'স্যার আমাদের বিপদে ফেলবেন না। আমরা চাকুরি হারাব। ওটা আমাকে দিন।'

যুবকটি কোন কথা বলল না। রিভলবারের ট্রিগার টিপল পরপর দুবার যুবক ও তরুণীকে লক্ষ্য করে। রিভলবার থেকে দুজনের দিকে দুগুচ্ছ ধোয়া বেরিয়ে গেল। সংগে সংগেই দুজন সংজ্ঞা হারিয়ে ঢলে পড়ল।

লোকটি ফোল্ডারটা একবার দেখে নিয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে লোকটি পার্কিং-এ রাখা একটি ট্যাক্সি ক্যাবে উঠে বসল। বলল, 'চলুন থার্ড এভেনিউ-এর স্প্রিং টাওয়ারে।'

গাড়ি চলতে শুরু করল।

কাউবয় বেশে কামাল সুলাইমান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল। আরও শুকরিয়া আদয় করল হাতে পাওয়া রিপোর্টের জন্যে। ডাষ্টের কমপোনেন্ট এ্যানালিসিসে পরিষ্কার বলা হয়েছে, ডাষ্টে ডেমোলিশন পাউডারের উপস্থিতি ধ্বংসকারী মাত্রায় রয়েছে।

থার্ড ষ্ট্রিটের স্প্রিং টাওয়ারে যখন কামাল সুলাইমানের গাড়ি পৌছল, তখন সকাল ৯টা।

স্প্রিং টাওয়ারের প্রথম তিনটি ফ্লোর নিয়ে 'ল্যাবরেটরি অব ফিজিক্যাল এক্সপ্লেনেশন' কাজ করছে। এক তলায় কাষ্টমারস সার্ভিস ডিপার্টমেন্টের দুটি উইং। একটা ডিপোজিটস, আরেকটা ডিজবারসমেন্ট।

কামাল সুলাইমান প্রবেশ করল ডিজবারসমেন্ট ডিপার্টমেন্টে। এর অনেকগুলো বিভাগ। কামাল সুলাইমান রিসিট বের করে দেখল তাকে বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালস সেকশনে যেতে হবে। কামাল সুলাইমান এদিক-ওদিক খুঁজে এক প্রান্তে গিয়ে পেল সেকশনটি। প্রবেশ করল কক্ষে। কাউন্টারে দুজন যুবক বসে। কাউন্টারের সামনে একপ্রান্তে সোফায় বসে আছে আরও দুজন।

কামাল সুলাইমান কাউন্টারে গিয়ে এক টুকরো কাগজে লেখা একটা নাম্বার একজন যুবকের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এই নাম্বারের ডকুমেন্ট ডেলিভারির জন্যে রেডি কিনা।'

যুবকটি নাম্বার দেখেই তার রেজিষ্টারের দিকে তাকাল।

তাকানোর সংগে সংগেই তার চোখে-মুখে একটা উত্তেজনা ফুটে উঠল। তাকাল সে পাশের যুবকের দিকে এবং এগিয়ে দিল তার দিকে চিরকুটটি। দ্বিতীয় যুবকটি চিরকুটের নাম্বারটি দেখেই তাকাল সামনের সোফায় বসা যুবক দুজনের দিকে। বলল, এই যে শুনুন, ইনি ঐ ডকুমেন্টের খোঁজে এসেছেন।

সংগে সংগেই সোফায় বসা দুজন যুবক স্প্রিং-এর মত লাফিয়ে উঠল। একযোগে দৌড় দিল কামাল সুলাইমানের দিকে। তাদের দুজনেরই একটি করে হাত কোটের পকেটে।

চোখের পলকে কামাল সুলাইমানের ডান হাত পকেট থেকে ক্লোরোফরম রিভলবার নিয়ে বেরিয়ে এল। ওরাও তখন রিভলবার বের করছে। কামাল সুলাইমানের রিভলবার 'দুপ' 'দুপ' শব্দ করে উঠল দুবার। দুবার ট্রিগার টিপেই কামাল সুলাইমান তার রিভলবার ঘুরিয়ে নিল কাউন্টারের দুজন যুবকের দিকে। দেখল, যুবকদের একজন ইন্টারকমের বোতাম টিপে কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছে। কিন্তু কামাল সুলাইমানের রিভলবার তাদের দিকে ঘুরতে দেখে থেমে গেছে।

কামাল সুলাইমান বাম হাত বাড়িয়ে ইন্টারকমের সুইচ অফ করে দিয়ে বলল, 'ওদের দুজনকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি, কিন্তু তোমাদের দুজনের মাথা গুড়িয়ে দেব যদি ডকুমেন্টটা দিতে এক মুহূর্ত দেরি কর।'

বলে কামাল সুলাইমান বাম হাত দিয়ে দ্বিতীয় রিভলবার বের করে তাদের দিকে তাক করল। আর ডান হাতের ক্লোরোফরম রিভলবার পকেটে রেখে দিল।

যুবক দুজন কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল। একজন বলল, 'আমাদের আপত্তি নেই স্যার। কিন্তু আমাদের উপর নিষেধ আছে। দিচ্ছি স্যার।'

বলে যুবকটি একটু এগিয়ে তাদের পেছনের সেলফ থেকে একটা ফাইল বের করে কামাল সুলাইমানের হাতে দিল।

কামাল সুলাইমান ফাইলের ভেতর ত্বরিত একবার চোখ বুলিয়ে বন্ধ করে দিল। বলল, 'নিষেধ করেছে কেন? ওরা কারা?'

'জানি না, ওরা খুব পাওয়ারফুল স্যার। আমাদের কোম্পানীর প্রেসিডেন্টকেই ওরা বাধ্য করে ফেলেছে। আমাদের চাকরি থাকবে না স্যার। উপরন্তু আমাদের বিপদ হবে এ ফাইল আমরা দিয়েছি বলে। আপনি কিছুক্ষণ পরে এলে ফাইল পেতেন না। ওরা নিয়ে যেত। ওরা ফাইলও চায়, আপনাদেরকেও ধরতে চায়।'

'ধন্যবাদ সহযোগিতার জন্যে। ভয় নেই তোমাদের চাকরি থাকবে। ওদের মত তোমরাও সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে থাকবে। তাহলে তোমাদের দোষ দেবার সুযোগ থাকবে না।' বলে কামাল সুলাইমান প্যাকেট থেকে আবার ক্লোরোফরম রিভলবার বের করে ক্লোরোফরম বুলেট ফাটিয়ে ওদের সংজ্ঞাহীন করে দিল।

দ্রুত বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বেরুবার সময় ঘরটাকে লক করল যাতে করে এ বিল্ডিং থেকে তার বেরুনো পর্যন্ত এ ঘরে কেউ না ঢুকতে পারে।

বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এল কামাল সুলাইমান। ট্যাক্সি ক্যাবে ফিরে এল।

সিটে বসে রুমাল দিয়ে কপালের ঘামটা মুছতে মুছতে ট্যাক্সি ক্যাবের ড্রাইভারকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'আরও একটা অফিসে যাব। এবার চলুন কুইন্স-এর মার্টিন লুথার কিং এভেনিউতে। এভেনিউ-এর উত্তর প্রান্তে পশ্চিম পাশ ঘেঁষে পার্ক আছে। পার্কের দক্ষিণ পাশ ঘেঁষে আরেকটা ষ্ট্রিট। পার্কের অপজিটে ষ্ট্রিটের মুখে একটা চারতলা বাড়ি। ওটা 'ল্যাবরেটরি অব সাইন্সেস'। ওখানে যাব।

'ওকে স্যার। কিন্তু জায়গাটাতো অনেক দূর।' বলল ড্রাইভার।

'আপনি কি অসুবিধা মনে করছেন?' কামাল সুলাইমান বলল।

'না স্যার। আমার কোন অসুবিধা নেই। এখন ব্রীজ, ট্যানেল সবটাতেই প্রচন্ড জ্যাম। বেশ দেরি হবে। বোর হবেন। এজন্যেই বললাম।' বলে ড্রাইভার ষ্টার্ট দিল। সেই সাথে অন করে দিল তার ক্যাসেট প্লেয়ার।

চলতে লাগল গাড়ি।

আর ক্যাসেট প্লেয়ারে নরম, মিষ্টি সুরের আরবী বাজনা বেজে উঠল।

একটু শুনল কামাল সুলাইমান। না, খাঁটি আরবী বাজনা, একটা বিখ্যাত আরবী যন্ত্র সংগীত।

ভ্রুকুঞ্চিত হলো কামাল সুলাইমানের। বলল, 'ড্রাইভার এমন ক্যাসেট আপনি কোথায় পেলেন? জানেন আপনি এ গান কোন ভাষার?'

'জানি স্যার। আরবী ভাষার। আপনি পছন্দ করবেন বলে লাগালাম।' ড্রাইভার বলল।

'আমি পছন্দ করব কি করে বুঝলেন?' কামাল সুলাইমানের কণ্ঠে বিস্ময়।

'আপনি তো মুসলমান। তাই।'

'আমি মুসলমান কি করে বুঝলেন?' এবার কামাল সুলাইমানের কণ্ঠে বিস্ময়ের সাথে উদ্বেগও।

'স্যার এ পর্যন্ত আপনি দুবার গাড়ি থেকে নেমেছেন। নামার সময় দুবারই আপনি বিসমিল্লাহ বলেছেন। আস্তে বললেও আমি শুনতে পেয়েছি। আবার প্রথমবার গাড়িতে উঠার সময়ও আপনি এইভাবে বিসমিল্লাহ বলেছেন।' ড্রাইভার বলল।

'বিসমিল্লাহ শব্দটা আপনি কি করে বুঝলেন? আর মুসলমানরা এটা বলে কি করে জানলেন?'

'স্যার জানব না কেন? আমি তো মুসলমান।'

'মুসলমান? কিন্তু আপনি তো পুরাপুরি আমেরিকান শ্বেতাংগ।'

'জি স্যার। আমি তখন ছোট। সে সময় আমার আব্বা-আম্মাসহ গোটা পরিবার ইসলামে কনভার্ট হয়। আমি গত বছর আমার স্ত্রীসহ হজও করেছি স্যার।'

'মোবারকবাদ। মোবারকবাদ। খুব খুশি হলাম। আপনার নাম কি?'

'আগে আমার নাম ছিল 'অ্যান্টনীয় আব্রাহাম'। ইসলামে আসার পর আমার নাম হয়েছে 'আহমদ ইব্রাহিম'। নামটা রাখেন আমাদের এলাকা ব্রুকলিনের এক মসজিদের ইমাম।'

'তুমি তোমার ধর্ম ইসলামকে খুব ভালবাস, তাই না?'

'অবশ্যই স্যার। টাওয়ার ধ্বংসের পর দুঃসময়কালে আমার আব্বা ও আমরা আমাদের সবকিছু দিয়ে মুসলিম ভাইদের সাহায্য করেছি, বাড়িতে তাদের অনেককে আশ্রয় দিয়েছি। খৃষ্টান ও ইহুদী শ্বেতাংগদের অন্যায়ের মোকাবিলা করেছি।' বলল ড্রাইভার।

'টুইনটাওয়ার কারা ধ্বংস করেছে মনে করেন?'

'যারাই করুক স্যার, মুসলমানরা করেনি। কারণ টুইনটাওয়ার, টুইনটাওয়ারের মালিক, কিংবা সেখানে যারা মরেছে, তাদের সাথে মুসলমানদের

কোন শত্রুতা ছিল না। মুসলমানরা কারণ ছাড়া এ ঘটনা ঘটাবে তা যুক্তিসংগত নয়।’

‘সুন্দর যুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু দায়টা মুসলমানদের ঘাড়ে চাপল কেন?’ জিজ্ঞাসা কামাল সুলাইমানের।

‘দায় তো কারও না কারও ঘাড়ে চাপাতেই হয়। মুসলমানদের ঘাড়ে চাপানো তখনকার সরকারের জন্যে লাভজনক ছিল।’

‘লাভজনক কোন দিক দিয়ে?’ বলল কামাল সুলাইমান। তার মুখে হাসি।

‘আমাদের তদানিন্তন সরকারের আফগান ও ইরাক পলিসির ক্ষেত্রে এটা লাভজনক হয়েছে। কিন্তু স্যার মুসলমানদের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতির বোঝা এখনও তাদের বইতে হচ্ছে।’

‘খুব সুন্দর বলেছেন।’

‘মাফ করবেন স্যার। আপনাকে আমেরিকান মনে হয়, কিন্তু উচ্চারণ আমেরিকান নয়।’

‘আমি আমেরিকান নই। কিন্তু আমেরিকান সেজেছি।’

‘স্যারের নাম কি জানতে পারি?’ বলল ড্রাইভার।

‘অবশ্যই। আমার নাম কামাল সুলাইমান। তবে এ নামে আমাকে এখন ডাকবেন না এবং আপনার নামটাও মুখে নেবেন না বাইরে। আমি এখন পুরোপুরি আমেরিকান। নাম কুনার্ড সুলিভান।’

‘বুঝেছি স্যার। মুসলমানদের বহু ক্ষেত্রেই নাম ভাঁড়িয়ে কাজ করতে হয়।’

কামাল সুলাইমান ও ড্রাইভার আহমদ ইব্রাহিমের মধ্যে এমন আলাপ চলল ‘ল্যাবরেটরি অব সাইন্সেস’ পৌছা পর্যন্ত।

বিশাল মার্টিন লুথার কিং এভেনিউ-এর ধার ঘেঁষে ‘ল্যাবরেটরি অব সাইন্সেস’ এর বিল্ডিংটা।

রাস্তার বিশালত্বের তুলনায় গাড়ি কম। মানুষ তো চোখেই পড়ে না।

ল্যাবরেটরির সামনে পার্কিং-এর জায়গা আছে।

কামাল সুলাইমান ড্রাইভারকে বলল, ‘এমন জায়গায় গাড়ি পার্ক করুন যাতে বেরুতে কোন অসুবিধায় পড়তে না হয়।’

‘ঠিক আছে স্যার।’ বলল ড্রাইভার।

‘আর স্যার নয়, ভাই বলবেন। সব সম্পর্কের চাইতে এই ভাই সম্পর্ক সবচেয়ে বড় মুসলমানদের জন্যে।’

‘ধন্যবাদ স্যা...... ভাই।’ বলল আহমদ ইব্রাহিম হাসি মুখে।

গাড়ি পার্ক হলে নামার সময় কামাল সুলাইমান কাঁধে ঝুলানো সাইড ব্যাগ থেকে দুটি ফোল্ডার ফাইল ড্রাইভারের হাতে দিয়ে বলল, ‘এ দুটি জিনিস আপনার কাছে কিছুক্ষণের জন্যে আমানত থাকল। আমি অফিস থেকে আসছি।’

বলে কামাল সুলাইমান বিসমিল্লাহ্ বলে গাড়ি থেকে নামল।

কামাল সুলাইমান প্রবেশ করল অফিসে।

প্রথমেই রিসিপশন।

রিসিপশনে দুজন লোক বসে।

কামাল সুলাইমানকে দেখেই তার দিকে এমনভাবে তাকাল যেন তারই জন্যে তারা উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছে।

চিন্তার একটা কালো মেঘ উঁকি দিল কামাল সুলাইমানের মনে। কিভাবে এটা সম্ভব? তাহলে এখানে খবর পৌছেছে। তার চেহারা ও পোশাকের বিবরণও কি এসেছে। মনে মনে নিজেরই একটু সমালোচনা করল কামাল সুলাইমান, তার পোশাক পাল্টানো উচিত ছিল।

কিন্তু এখন তার পিছানোর পথ নেই। তাকে তৃতীয় ডকুমেন্টটি যোগাড় করতেই হবে। এটাই আমেরিকার সবচেয়ে সম্মানিত প্রামাণ্য ল্যাবরেটিরি। মনে পড়ল আহমদ মুসার উপদেশ, দুনিয়াতে একমাত্র শিশা ছাড়া সবকিছুর মধ্যে ফাঁক আছে। সেই ফাঁক বা দুর্বলতা তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে।

দ্বিধা দূর হয়ে গেল কামাল সুলাইমানের মন থেকে।

সে মুখোমুখি হলো রিসিপশেনর। সে রিসিট দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল সেকশনটা কোন দিকে?

রিসিপশনের দুজনের মধ্যেই কেমন একটা চাঞ্চল্যের ভাব। তাদের একজন রিসিপশনের পাশেই টাঙানো বোর্ডের দিকে কামাল সুলাইমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, ‘এই চার্টে সব দেখিয়ে দেয়া আছে স্যার।’

কামাল সুলাইমান দ্রুত চোখ বুলাল চার্টটায়। গ্রাউন্ড ফ্লোরেই পেয়ে গেল সেকশনটা। পথটাও খুব ঘোরানো নয়। রিসেপশনের পরেই কাষ্টমার লাউঞ্জ। লাউঞ্জ থেকে তিনটি করিডোর তিনদিকে বেরিয়ে গেছে। যে করিডোরটা উত্তরে এগিয়ে গেছে সেটা শেষ প্রান্তে পৌছার আগে এ থেকে একটা শাখা পশ্চিম দিকে এগিয়েছে। বাঁক নেয়ার পর উত্তর পাশের প্রথম কক্ষটাই ডাষ্ট এবং সোয়েল সেকশন।

কামাল সুলাইমান রিসেপশনিষ্টদের উদ্দেশ্যে ‘ধন্যবাদ’ বলে ভেতরে এগুলো।

লাউঞ্জে মুখোমুখি সোফায় তিনজন লোক বসেছিল। কামাল সুলাইমান লাউঞ্জে ঢুকলে তিনজনই বিভিন্ন ঢং-এ হলেও তাকে দেখে নিল। তাদের চেহারা ও দৃষ্টিকে ল্যাবরেটরির কাষ্টমারের বলে মনে হলো না কামাল সুলাইমানের কাছে।

কামাল সুলাইমান তাদের এড়িয়ে উত্তরের করিডোরে ঢুকে গেল। তার একটি হাত প্যান্টের পকেটে ভয়ংকর স্প্রেগানটার উপর, আরেকটি হাত জ্যাকেটের ডান পকেটে ক্লোরোফরম গানটার গায়ে।

করিডোরের বাঁকে পৌছে কামাল সুলাইমান দেখল সোজা করিডোরটার শেষ প্রান্তে একটা দরজা। দরজা খোলা। দরজার পরে একটা প্রশস্ত ল্যান্ডিং। সেখানেও তিনজন লোক বসে। কামাল সুলাইমান নিশ্চিত ওরাও তারই জন্যে অপেক্ষা করছে। কিন্তু বিস্মিত হলো কামাল সুলাইমান। তাকে চেনার পরেও কেন আক্রমণ করতে এগিয়ে আসছে না। তাহলে কি কামাল সুলাইমান ডকুমেন্ট হাতে নেয়ার পর শতভাগ নিশ্চিত হয়ে তাকে হাতে-নাতে ধরবে! খুশি হলো কামাল সুলাইমান। সেও এটাই চায়।

কামাল সুলাইমান বাঁক ঘুরে দ্রুত এগিয়ে ঘরটির দরজায় গিয়ে দাঁড়াল।

নব ঘুরিয়ে দরজা ঠেলে ঘরে প্রবেশ করল এবং সেই সাথে দরজার লক টিপে বন্ধ করে দিল দরজা।

কাউন্টারে একজন যুবক বসেছিল। আর কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়েছিল আরও তিনজন যুবক।

চারজনই টের পেয়েছিল দরজা লক করার দৃশ্য। ওরা দরজার দিকেই তাকিয়েছিল। যেন ওরা অপেক্ষা করছিল।

তিনজন দাঁড়ানো যুবকের একজনের হাতে ছিল মোবাইল। কামাল সুলাইমানকে প্রবেশ করতে দেখেই সে পকেটে রাখল মোবাইলটা। ওদের মুখে কিছুটা কৌতুকের হাসি।

কামাল সুলাইমানের দুহাত পকেটের দু'রিভলবার। সে আশা করেছিল ওরা আক্রমণে আসবে। তার খবরটা আগেই এরা পেয়ে গেছে মোবাইলে। কিন্তু না তারা আক্রমণে এল না। তারা তিনজনই কাউন্টার থেকে পাশে একটু দক্ষিণে সরে গেল। ব্যাপার তাহলে এটাই যে, ওরা শতভাগ নিশ্চিত হবার জন্যে ডকুমেন্টটা নেয়া অথবা অন্তত চাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চায়। মনে মনে হাসল কামাল সুলাইমান।

কামাল সুলাইমান কাউন্টারে বসে থাকা যুবকটির সামনে দাঁড়িয়েরিসিট ও ক্লোরোফরম রিভলবারসহ ডানহাত বের করল।

কামাল সুলাইমানের রিভলবার ধরা হাতটি দ্রুত তিনজন যুবকের লক্ষ্যে উপরে উঠে এল।

শেষ মুহূর্তে ওরাও টের পেয়ে গিয়েছিল। একজন যুবকের পকেটে রাখা হাত দ্রুত বের হয়ে এল। তার হাতে রিভলবার।

অন্য দুজন বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল আকস্মিক রিভলবারের মুখোমুখি।

কামাল সুলাইমান পরপর তিনবার ট্রিগার টিপল তার ক্লোরোফরম রিভলবারের। প্রথম ক্লোরোফরম বুলেট ছুটে গেল যে রিভলবার তাক করছিল সে যুবকের দিকে।

কিন্তু বেপরোয়া ক্ষিপ্র যুবকটি তার দিকে ক্লোরোফরম বুলেট বিস্ফোরিত হওয়ার মুখেই ট্রিগার টিপেছিল।

কামাল সুলাইমান রিভলবারের ট্রিগার টেপার অবস্থায়ই কাত হয়ে কাউন্টারের দিকে শরীরটাকে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বুকটা তার রক্ষা পেলেও বাম বাহু রক্ষা পেল না। যুবকটির ছোঁড়া বুলেট বাম বাহুর একটা অংশ বিধ্বস্ত করে বেরিয়ে গেল।

এদিকে কামাল সুলাইমানের ছোড়া ক্লোরোফরম চোখের পলকে ওদের তিনজনকেই ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল।

গলগলিয়ে রক্ত নামছিল কামাল সুলাইমানের বাম বাহু দিয়ে।

কিন্তু সেদিকে নজর দেবার সময় ছিল না কামাল সুলাইমানের। রিভলবারের শব্দ নিশ্চয় বাইরে ওরা শুনেছে। ওরা এখনই ছুটে আসবে।

কামাল সুলাইমান ফিরে দাঁড়িয়েছে কাউন্টারের যুবকটির দিকে।

কামাল সুলাইমান ইতিমধ্যে ক্লোরোফরম রিভলবার পকেটে রেখে ডান হাত দিয়ে বাঁ পকেট থেকে তার ভয়ংকর স্প্রেগান বের করে নিয়েছে।

টর্চ আকারের গানটি যুবকের দিকে তাক করে বলল, 'রিসিটের ফাইলটি দিয়ে দাও, না হলে তোমার মাথা ভর্তা হয়ে যাবে।'

যুবকটি কাঁপছিল। বলল, 'দিচ্ছি স্যার।'

বলেই যুবকটি ছুটল সেলফের দিকে।

যুবকটি ওদিকে গেলে কামাল সুলাইমান গানটি কাউন্টারে রেখে ডান হাত দিয়ে ব্যাগ থেকে একটা গ্যাসমাস্ক ও মার্বেলের মত দুটি বল বের করে নিল।

ঘরের দরজায় এ সময় ধাক্কা শুরু হলো।

বুঝলো কামাল সুলাইমান ওরা এসে গেছে।

কামাল সুলাইমান-এর বাম হাত দুর্বল হয়ে পড়েছে। উপরে তুলতে কষ্ট হচ্ছে। একহাত দিয়েই কামাল সুলাইমান গ্যাস-মাস্কটি পরে নিল মুখে।

অনেক কষ্টে গানটি বাম হাত দিয়ে ধরল। তার ডান হাতে থাকল দুটি গ্যাস বোম।

যুবকটি ফাইলটা নিয়ে কাউন্টারে এল।

'খোল ফাইলটা, দেখি ঠিক আছে কিনা।' কামাল সুলাইমান যুবককে নির্দেশ দিল।

যুবক মেলে ধরল ফোল্ডারটা।

ঠিক বিষয়ের রিপোর্ট ফাইলে আছে দেখল কামাল সুলাইমান।

বাইরে থেকে তখন দরজা ভাঙার চেষ্টা হচ্ছে।

যুবককে ফাইলটি বন্ধ করতে নির্দেশ দিয়ে বলল, 'ফোল্ডারটা আমার ব্যাগে ঢুকিয়ে দাও।'

কম্পমান যুবকটি ফোল্ডারটা কামাল সুলাইমানের কাঁধে ঝুলানো ব্যাগে তুলে দিল।

'থ্যাংকস' বলে কামাল সুলাইমান পেছনে হটে দরজায় এল। দাঁড়াল দেয়াল ঘেঁষে। তারপর আস্তে ডান হাতটা নবের কাছে এগিয়ে নিয়ে দ্রুত নব ঘুরিয়ে দরজা আনলক করেই ডান হাত টেনে নিল।

দরজায় প্রচন্ড ধাক্কা চলছিল। আর মাঝে মাঝে নব ঘুরানো হচ্ছিল প্রাণপনে।

কামাল সুলাইমান দরজা আনলক করে হাত টেনে নিতেই বাইরের চাপে প্রচন্ড গতিতে দরজা খুলে গেল।

সংগে সংগেই কামাল সুলাইমান ডান হাতের একটা বল ছুড়ে মারল দরজার বাইরে। পটকা ফাটার মত শব্দ হলো। কোন ধোয়া বেরুল না। কিন্তু সংজ্ঞাহরনকারী মারাত্মক গ্যাস বাতাসের চেয়ে শতগুণ দ্রুত গতিতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

কামাল সুলাইমান দেখল, কাউন্টারের যুবকটি জ্ঞান হারিয়ে টেবিলের উপর লুটিয়ে পড়েছে।

এবার কামাল সুলাইমান মুখ বাড়ালো বাইলে। দেখল, দশ বারোটি সংজ্ঞাহীন দেহ করিডোর ভরে তুলেছে। তাদের মধ্যে আগের দেখা তিন তিন ছয়জনও আছে। অবশিষ্টরা অফিসের সিকিউরিটি বা কৌতুহলী লোক হবে।

কামাল সুলাইমান ছুটল।

কামাল সুলাইমান কাউন্টারে এসে দেখল, কাউন্টারের একজন ছুটে এসে টেলিফোন হাতে তুলে নিয়েছে।

রক্তাক্ত কামাল সুলাইমানকে দেখে তার হাত থেকে টেলিফোন পড়ে গেল। ভয়ে তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। এ সময় উপর তলা থেকে কজনকে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসতে দেখা গেল।

কামাল সুলাইমান হাতের অবশিষ্ট গ্যাস বোম মেঝেতে ছুড়ে মেরেই দৌড় দিল ল্যাবরেটরির কার পার্কিং-এর দিকে।

ড্রাইভার আহমদ ইব্রাহিম, ল্যাবরেটরির দিকে তাকিয়ে গাড়ির কাছে দাঁড়িয়েছিল।

কামাল সুলাইমানকে দৌড়াতে দেখে এগুলো সে সামনে। কামাল সুলাইমানকে রক্তাক্ত দেখে বিস্ময় ও উদ্বেগে তার মুখ পাংশু হয়ে গেল।

'কি ঘটেছে? আপনি ঠিক আছেন স্যা........ ভাই?'

'ঠিক আছি। বাম বাহুটা মাত্র আহত। গাড়ির দরজা খুলে দিন।' বলল দ্রুত কণ্ঠে কামাল সুলাইমান।

আহমদ ইব্রাহিম তাড়াতাড়ি গাড়ির দরজা খুলে ধরল।

গাড়িতে ঢুকে গেল কামাল সুলাইমান। বলল, 'তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠুন। গাড়ি ছাড়–ন। পরে বলছি সব।'

উদ্বিগ্ন ড্রাইভার আহমদ ইব্রাহিম বুঝল কোন বড় বিপদ ঘটেছে কামাল সুলাইমানের এবং বিপদ তার এখনও কাটেনি।

আহমদ ইব্রাহিম তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে গাড়ি ষ্টার্ট দিল। বলল, 'কোন দিকে যাব?'

'গাড়িটা আগে দূরে সরিয়ে নিন, তারপর বলছি।' কামাল সুলাইমান বলল।

'ভাই সাহেব আপনর বিষয় কিছুই জানি না আমি। শুধু জেনেছি আপনি আমার এক ভাই এবং এটা আপনিই আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আপনি যদি ভাইকে বিশ্বাস করেন, তাহলে অনুরোধ করছি আমার বাসায় চলুন। আমার মনে হয় ওটা বুলেট ইনজুরি। আরও এক দেড় ঘণ্টা দেরি করা ক্ষতিকর হবে।' বলল গম্ভীর কণ্ঠে আহমদ ইব্রাহিম।

হাসল কামাল সুলাইমান। বলল, 'আপনি না করার পথ একেবারে বন্ধ করে দিয়েছেন। চলুন, আপনার বাসায় যাব।'

'ধন্যবাদ, ভাই সাহেব।' বলল আহমদ ইব্রাহিম হাসি মুখে।

সে নড়ে চড়ে বসল ড্রাইভিং সিটে। ছুটে চলল গাড়ি।

# ৫

কামাল সুলাইমানের গুলীবিদ্ধ হাতের ক্ষত পরিষ্কার করছিল আহমদ ইব্রাহিম। তাকে সহাযোগিতা করছিল আহমদ ইব্রাহিমের স্ত্রী ডা. আয়েশা আহমদ।

কামাল সুলাইমানের মোবাইলটা বেজে উঠল।

‘আপনি টেলিফোন রিসিভ করবেন মি. কামাল সুলাইমান?’ জিজ্ঞাসা করল ডা. আয়েশা আহমদ কামাল সুলাইমানকে।

‘একটাই টেলিফোন আসবে পারে এবং সেটা খুবই জরুরি। দিন দয়া করে মোবাইলটা।’ বলল কামাল সুলাইমান।

ডা. আয়েশা আহমদ মোবাইলটা কামাল সুলাইমানের হাতে দিল।

মোবাইল স্ক্রীণে একবার নজর বুলিয়ে মুখের কাছে তুলে নিয়ে বলল, ‘জি ভাইয়া, আমি কোমার্ড সুলিভান।’

‘কেমন আছ? খবর কি? তোমার গলা ভারী কেন? গলায় কম্পন কেন?’ ওপার থেকে বিস্মিত কণ্ঠ আহমদ মুসার।

‘সব খবর ভাল। কিন্তু আমি সামান্য আহত ভাইয়া।’

‘আহত? কি হয়েছে?’ উদ্বেগ আহমদ মুসার কণ্ঠে।

‘বাম বাহুতে গুলী লেগেছে। তেমন সিরিয়াস নয়। গুলীটা বেরিয়ে গেছে।’

‘গুলী? তাঁর মানে তুমি শত্রুর ‘দূর্বলতা’ ও ‘ফাঁক’-এর সন্ধানে বেরিয়েছিলে? কিন্তু তোমাকে এমন ঝুঁকি নিতে বলিনি। শেষে তো বলেছিলাম, ওদের খবর রাখ।’

‘ভাইয়া আমি খুশি। আজ মরে গেলেও আমার আত্মা তৃপ্তি পেতো। তিনটি ডকুমেন্টই আমি হাত করতে পেরেছি।’ বলল কামাল সুলাইমান।

‘থ্যাংকস গড। তুমি এখন কোথায়?’

‘ফেরার পথে এক শুভাকাক্সিক্ষর বাড়িতে। ওঁরা আমার চিকিৎসা করছেন। আমাদের এক ভাই-বোন। বলা যায় আল্লাহ ওদের জুটিয়ে দিয়েছেন।’

‘থ্যাংকস গড। আমার শুভেচ্ছা দিও।’

‘ভাইয়া ওদিকের খবর কি?’

‘বলছি। কিন্তু আগে বল রিপোর্টে কি দেখলে? দেখেছো তো?’

‘দেখেছি। দারুণভাবে পজিটিভ।’

‘থ্যাংকস গড। অনেক ধন্যবাদ তাঁকে। এ দিকের খবর খুব ভাল। গণকবর খোঁড়া হয়েছে। ঠিক ১৪টি কংকালই সেখানে পাওয়া গেছে। দাঁত ও দেহাবশেষ পরীক্ষার জন্যে শিকাগো পাঠানো হয়েছে। এছাড়া গণকবর থেকে আংটি, ঘড়ি ও কয়েনের এমন কিছু জিনিস পাওয়া গেছে, যা থেকে গণকবরের লোকদের জাতীয় পরিচিত নির্ধারণ করা যাচ্ছে।’

‘ভাইয়া, অস্বীকার করার কোন ফাঁক পাবে না তো তারা?’

‘তেমন কোন সুযোগ তাদের জন্যে রাখা হয়নি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘থ্যাংকস গড। মাত্র রিমোর্ট কনট্রোলের বিষয়টাই এখন বাকি থাকল।’

‘হ্যাঁ। রিপোর্টটা পেলেই আমি ওদিকে মনোযোগ দেব।’ কথা শেষ করেই আহমদ মুসা বলল, ‘এখনকার মতো রাখছি। তুমি রেষ্ট নাও। পরে কথা বলব। বাই।’

‘বাই ভাইয়া।’

কামাল সুলাইমান অফ করে রেখে দিল মোবাইলটা। বলল আহমদ ইব্রাহিমের দিকে চেয়ে, ‘স্যরি।’

‘স্যরি’র প্রশ্ন নেই ভাইয়া। বরং আপনারই কষ্ট হলো। কিন্তু আপনাকে দারুণ খুশি দেখাচ্ছে।’ বলল আহমদ ইব্রাহিম।

‘সত্যিই আমরা আজ খুশি মি. আহমদ ইব্রাহিম। বললাম না, গুলীবিদ্ধ কেন আমি আজ গুলীতে মরে গেলেও আমার আত্মা তৃপ্তি পেত।’

ভ্রু কুঞ্চিত হলো আহমদ ইব্রাহিম ও তার স্ত্রী আয়েশা আহমদের। বিস্ময় তাদের চোখে-মুখে। বলল, ‘আপনি যেভাবে বললেন, তাতে আনন্দের ব্যাপারটা না শুনে তো থাকতে পারছি না। আরও জানতে ইচ্ছা করছে, গুলীবিদ্ধ হওয়ার মত

ঘটনা কেন ঘটল। আপনি ক্রাইম করতে পারেন, একথা আমি বিশ্বাস করি না। তাছাড়া ভাইয়া, আপনি আমাকে তিন জায়গায় নিয়ে গেছেন, তিনটাই বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞান-ল্যাবরেটরি। শেষ ল্যাবরেটরি থেকে গুলীবিদ্ধ হয়ে এলেন, কিন্তু অন্য দুল্যাবরেটরি থেকেও ফেরার পর আপনার মধ্যে বেশ উত্তেজনা বা অস্থিরতা দেখেছি।'

কামাল সুলাইমান হাসল। বলল, 'মি. আহমদ ইব্রাহিম, আপনি বলেছেন নিউইয়র্কের টুইনটাওয়ার কোন মুসলমান ধ্বংস করেনি। তাহলে কে করেছে বলে আপনি মনে করেন?'

'যেই করুক, তারা মুসলমানদের উপর এই দায় চাপাবার জন্যেই করেছে। এই ঘটনায় কোন দিক দিয়েই মুসলমানদের কোন লাভ হয়নি। এতে আমাদের আমেরিকার কিছু ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু লাভ হয়েছে লাখোগুণ বেশি আমেরিকার এক ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর এবং তাদের মিত্র ইসরাইলের। অন্যদিকে মুসলমানদের কোনই লাভ হয়নি, কিন্তু ক্ষতি হয়েছে অবর্ণনীয়, অপূরণীয়। সুতরাং ক্রাইমের মটিভ-তত্ব অনুসারে মুসলমানরা এ কাজ করেনি। এ পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোন মুসলমানের বিরুদ্ধেই কোন 'হার্ড-এভিডেন্স' দাঁড় করানো যায়নি। আর যে সংগঠনকে দায়ি করা হচ্ছে, সে নামে আদৌ কোন সংগঠন মুসলিম দুনিয়ায় মুসলমানদের পক্ষে কাজ করছে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তাদের কোন নেতাই টাওয়ার ধ্বংসের আগে বা পরে মুসলিম জনতার সামনে আসেনি, মুসলমানদের নেতা হিসাবে পরিচিতিও হয়নি। এমন কোন নেতাকে আমাদের আমেরিকা বা বাইরের কোন কোর্টে হাজিরও করা হয়নি, যাকে মুসলমানরা স্বীকৃতি দেয়। এই সংগঠনের কাজ দেখানো হচ্ছে ই-মেইল এবং অডিও-ভিডিও টেপে। এগুলো কোন দলিল নয়। যে কেউ এগুলো তৈরি করতে পারে। সুতরাং আমি মনে করি টাওয়ার ধ্বংসের দায় একটা অস্তিত্বহীন ইসলামী সংগঠনের উপর চাপিয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের আসামী করা হয়েছিল।' কথাগুলো বলল ডা. আয়েশা আহমদ তার স্বামী আহমদ ইব্রাহিমের কথা বলে ওঠার আগেই।

কামাল সুলাইমান বিস্ময়ের সাথে কথাগুলো শুনছিল। কথা শেষ হতেই বলল, 'ধন্যবাদ বোন, কোন আমেরিকানের মুখে এত সত্য কথা এভাবে আমি

শুনিনি। বুঝতে পারছি, এ কথাগুলো বহুদিন তোমার মনে জমে আছে। আজ এক সুযোগে তা বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু বোন, কারা করেছে এটাও ছিল আমার প্রশ্ন।'

'স্যরি, ভাই সাহেব। এ ব্যাপারে অনেক কথা শুনেছি। কিন্তু তার পক্ষেও কোন প্রমাণ হাজির করা হয়নি। তাই প্রমাণ ছাড়া কারও দিকে অংগুলি সংকেত করা মুস্কিল।' বলল ডা. আয়েশা আহমদ।

'আমারও এই কথা ভাই সাহেব।' ড. আয়েশা আহমদ থামতেই বলে উঠল আহমদ ইব্রাহিম।

'একটু সুখবর দিতে পারি, প্রমাণ নিয়ে কেউ হাজির হচ্ছে।' বলল কামাল সুলাইমান একটু হেসে।

থমকে গেল আহমদ ইব্রাহিমরা দুজনই। তারা বিস্ময়ভরা চোখে তাকাল কামাল সুলাইমানের দিকে। কথা বলে উঠল ডা. আয়েশা আহমদ, 'ভাই সাহেব ফান করছেন না নিশ্চয়! কিন্তু বাস্তবতা হলো, বিশ বছর পার হয়ে গেল, কেউ আসেনি প্রমাণ করার জন্যে। কে আর আসবে? মনে পড়ে আব্বার কথা। তিনি 'আররাহমা' নামক এক এনজিও'র কর্মকর্তা ছিলেন। এই এনজিও ইয়াতিম, বিধবা ও ছিন্নমূলদের সাহায্য করতো। ফিলিস্তিনের মত ভাগ্যবিড়ম্বিত এলাকা ছিল তাদের টার্গেট। টেররিষ্টদের কাছে অর্থ পাচার করা হয় এই অভিযোগে এনজিওটি বন্ধ করা হয়। আব্বাকে জেলে পুরা হয়, তা চ্যালেঞ্জ করতে কেউ এগিয়ে আসেনি। বিশ বছর ধরে মিথ্যার এক জগদ্দল চেপে আছে আমেরিকার উপর। কে আসবে এই জগদ্দল পাথর সরাতে?'

হাসল কামাল সুলাইমান। বলল, 'যিনি এই জগদ্দল সরাবেন, তিনি এতদিন আসেননি বোন। এখন তিনি এসেছেন।'

আহমদ ইব্রাহিম ও ডা. আয়েশা আহমদ দুজনেরই চোখে-মুখে বিস্ময় ও আনন্দের স্ফুরণ। বলল আহমদ ইব্রাহিম, 'কে তিনি? আমরা কি জানতে পারি?'

'আপনারা কি আহমদ মুসাকে চেনেন?' বলল কামাল সুলাইমান।

'চিনব না কেন? তার জন্যে আমরা গর্বিত। তিনি আমেরিকার অশেষ উপকার করেছেন এবং মুসলমানদের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। তাঁর কথা বলছেন কেন? শুনেছি, তিনি এখন আজরস আইল্যান্ডে। তাঁকে কেউ এ যুগের সিন্দাবাদ

বলেন, কারো কাছে তিনি আধুনিক হাতেম তাই। কিন্তু আমার কাছে তিনি আধুনিক দুনিয়ার মুসলমানদের এক জিয়নকাঠি।' বলল ডা. আয়েশা আহমদ।

'সত্য উদ্ধারের দায়িত্ব তিনিই কাঁধে তুলে নিয়েছেন।' বলল কামাল সুলাইমান।

'আহমদ মুসা? তিনি এখন আমেরিকায়?' এক সাথে বলে উঠল তারা দুজন।

'হ্যাঁ, তিনি আমেরিকায়।'

দুজনের কেউ সংগে সংগে কথা বলল না।

তাদের চোখে-মুখে বিস্ময় ও আনন্দের ছাপ। একটু সময় নিয়ে বলল আহমদ ইব্রাহিম, 'সত্যি আমেরিকানদের জন্যে এটা সুখবর। আশারও খবর এই যে, তার উপর চোখ বন্ধ করে আস্থা রাখা যায়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, ২০ বছর আগের জটিল ঘটনার প্রমাণ কি করে সম্ভব?'

হাসল কামাল সুলাইমান। বলল, 'মি. আহমদ ইব্রাহিম আমার ব্যাগে তিনটি ফাইল আছে, ওগুলো দেখ। বিজ্ঞানও তোমাদের পড়তে হয়েছে। অনেক কিছু বুঝবে তোমার।'

আহমদ ইব্রাহিম ও ডা. আয়েশা আহমদ ফাইলগুলো বের করল এবং দেখল।

একটু পর আহমদ ইব্রাহিম বলল, 'ভাই সাহেব, তিনটি ফাইলে তিনটি ল্যাবরেটরির বিল্ডিং-ডাষ্টের ফিজিক্যাল কম্পোজিশন দেখছি। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ডাষ্টের কম্পোজিট কেমিক্যালের মধ্যে অটো ডেমোলিশন অর্গানিজম রয়েছে, যা দিয়ে বহুতল বিল্ডিংকেও ধুলায় পরিণত করে বসিয়ে দেয়া যায়।'

'মি. আহমদ ইব্রাহিম, ধ্বংস টাওয়ারের ডাষ্ট পরীক্ষা করে ল্যাবরেটরিগুলো এই রিপোর্ট দিয়েছে।' বলল কামাল সুলাইমান।

বিস্ময়ে হা হয়ে উঠেছে আহমদ ইব্রাহিমের মুখ। বলল, 'তার মানে ডেমোলিশন ডিভাইস দিয়ে টুইনটাওয়ার ধ্বংস করা হয়েছে!'

'হ্যাঁ এটাই সত্য।' বলল কামাল সুলাইমান।

'তাহলে অনেকে যে সন্দেহ করেছিল, সেটাই সত্য? কিন্তু এ রিপোর্ট আপনার কাছে কি করে? মানে কিভাবে এই ডাষ্ট পরীক্ষা হলো? এ রিপোর্ট সংগ্রহের জন্যে রক্তাক্ত অভিযান আপনাকে করতে হলো কেন?' বিস্ময়-জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল ডা. আয়েশা আহমদ।

কামাল সুলাইমান এ পর্যন্ত প্রমাণ সংগ্রহের জন্যে যা করা হয়েছে, তার বিবরণ দিয়ে বলল, 'গণকবরটিতে ঠিক ১৪ জনেরই কংকাল পাওয়া গেছে। ডাষ্ট যেমন প্রমাণ করল টাওয়ার ধ্বংস হয়েছে বিমানের আঘাতে নয়, ধ্বংস হয়েছে ডেমোলিশ ডিভাইসের মাধ্যমে তেমনি কংকালগুলোও প্রমাণ করবে কথিত বিমান হাইজ্যাকাররা বিমানে ছিল না। তাদের হত্যা করে তাদের নাম ব্যবহার করা হয়েছে।'

বিস্ময়-বিমূঢ় ডা. আয়েশা আহমদ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনিই কি তাহলে আহমদ মুসা?'

হাসল কামাল সুলাইমান। বলল, 'আমি কামাল সুলাইমান। আমি তাঁর একজন নগণ্য সহকর্মী। আমি এইমাত্র যার সাথে টেলিফোনে কথা বললাম তিনি ছিলেন আহমদ মুসা।'

'আপনাকে স্বাগত। আমরা সৌভাগ্যবান যে, আপনার দেখা এইভাবে আমরা পেলাম এবং পেলাম বিশ বছরের সেরা খবর। আজ নিশ্চিতই মনে হচ্ছে, বিশ বছর ধরে ঘুনে ধরা জগদ্দল পাথর আমাদের বুক থেকে নামবে। আল্লাহর অশেষ শোকরিয়া।' বলল আহমদ ইব্রাহিম।

আহমদ ইব্রাহিম থামতেই ডা. আয়েশা আহমদ কামাল সুলাইমানকে লক্ষ্য করে বলল, 'ভাই সাহেব ধ্বংস টাওয়ারের নিচে লুকানো সত্য-সন্ধানের আপনার কাহিনী শুনে অনেক দিন আগে শুনা একটা কথা মনে পড়ছে। বিষয়টা টাওয়ার ধ্বংসের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে। আমার মামা মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের 'সেফ এয়ার সার্ভিস' (SAS)-এর একজন কর্মকর্তা ছিলেন। অনেক আগে তিনি রিটায়ার করেছেন এবং তিনি অমুসলিম। অমুসলিম হলেও আমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক সব সময় ঠিক ছিল, ঠিক আছে। কয়েক বছর আগে ঘরোয়া পরিবেশে আমি মামি ও মামা গল্প করছিলাম। প্রসংগক্রমে টাওয়ার ধ্বংসের কথা

ওঠে। আমাকে রাগিয়ে দেবার জন্যে মামি বলেছিলেন, 'ধ্বংস টাওয়ার সাক্ষী হয়ে আছে যে, মুসলমানরা সন্ত্রাসী। তাদের কেউ সন্ত্রাস করে, কেউ একে সমর্থন করে। দেখ, আয়েশা আজও সন্ত্রাসীদের সন্ত্রাসী বলে না।'

সেদিন মামা আমার পক্ষ নিয়েছিলেন। পাল্টা আক্রমণ করেন তিনি মামিকে এই বলে, 'যদি জানতে পার মুসলিম হাইজ্যাকাররা বিমান দুটো টুইনটাওয়ারে নিয়ে যায়নি, অন্যকিছু বিমান দুটিকে টুইনটাওয়ারে টেনে নিয়ে গেছে, তাহলে সন্ত্রাসের অভিযোগ কার বিরুদ্ধে করবে?'

মামি বলেছিলেন, 'যদি' যদি 'যদি' না হতো, তাহলে উত্তর দেয়ার প্রয়োজন হতো।'

মামা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে পড়েছিলেন। বলেছিলেন, 'যদি প্রত্যাহার করে নিলাম। এখন বল।'

মামির ভ্রুকুঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। বলেছিল, 'যা বলেছ, সত্যি বলেছ?'

'হ্যাঁ।' মামা বলেছিলেন।

'কিন্তু যা বলছ, তা না তুমি বিশ্বাস করতে পার, না দুনিয়া বিশ্বাস করতে পারে?' বলেছিলেন মামি।

মামা বলেছিলেন, 'আমি বিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু দুনিয়া বিশ্বাস করতে পারে না। দুনিয়াকে বলাও যায় না। তাই তো বলিনি।'

'কিন্তু এমন বিশ্বাসের জন্যে নিঃসন্দেহে ভিত্তি প্রয়োজন।' মামি বলেছিলেন।

'সূর্য উঠতে দেখে যদি বলি সূর্য উঠছে, তা যে ধরনের সত্য, আমার কথাও সে ধরনের সত্য।'

মামি একেবারে চুপ হয়ে গিয়েছিলেন। একটু পর বলেছিলেন, 'তোমার সত্যের স্বরূপটা কি ধরনের তা আমি আঁচ করতে পারি, কিন্তু স্বরূপটা কি বলতে পারি না। আমি জিজ্ঞাসাও করব না। আর এ নিয়ে তুমি কোন আলোচনাও করো না। এমনিতেই তোমার পরিবারের একটা অংশ মুসলিশ হয়ে গেছে।'

'বলতে চাইনি। কথাচ্ছলে এসেছে।' বলে মামা চুপ হয়ে গিয়েছিলেন।

মামি ও মামার না জানা ও না জানানোর বিষয়ে আপোশ হয়ে গেলেও আমার ভেতর একটা জিজ্ঞাসা কিন্তু বেড়েই চলছিল। একদিন সুযোগ বুঝে মামাকে বলেছিলাম, 'মামা একটা সত্য আপনার কাছে জানতে চাই। বলবেন?'

'সত্য বলারই বিষয়। কিন্তু তোমার ও আমাদের জন্যে ক্ষতিকর নয় তো?'

'না।'

'তাহলে বলব। সত্যটা কি বল?'

আমি তাকে সেই দিনের সে আলোচনার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললাম, 'সূর্যের মত দেখা সেই সত্যটা কি মামা।'

'কিন্তু এ সত্যের প্রকাশ তোমার ও আমাদের পরিবারের জন্যে ক্ষতিকর।'

'ক্ষতিকর অবশ্যই যদি ক্ষতিকারীরা এটা জানতে পারে। কিন্তু ক্ষতিকারীরা জানার কোনই সুযোগ নেই মামা।'

মামা অনেকক্ষণ চুপ করে ছিলেন। পরে ধীরে ধীরে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ মা, তোমাকে বলতে পারি। আমার তো বয়স হচ্ছে। আমার পরে কেউ একজন সত্যটার স্বাক্ষী থাকা প্রয়োজন।'

মামা একটু থামার পর একটা দম নিয়ে বলেছিলেন, 'টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনার দিন 'সেফ এয়ার সার্ভিস' সেন্টারের অবজারভেটরিতে রাডার স্ক্রীন মনিটরের দায়িত্ব আমার ছিল। প্রতি মুহূর্তের ছবি ও বিবরণ আমি রেকর্ড করছিলাম। এটা করতে গিয়ে আমি দেখেছিলাম আমাদের 'গ্লোবাল হক' নামের বিশেষ বিমান দুটি সিভিল বিমানকে রিমোর্ট কনট্রোলের মাধ্যমে পরপর টেনে নিয়ে গিয়ে টাওয়ারে আঘাত করায়।'

বলতে বলতে মামার দুচোখ ভয়ে বিস্ফোরিত হয়ে উঠেছিল। আমারও অবস্থা হয়েছিল সামনে ভূত দেখার মত।

বলেই মামা উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'মনে রেখ, শুধু জেনে রাখার জন্যেই বললাম।'

সংগে সংগেই আমি বলেছিলাম, 'তোমার কথা তুমি সত্য প্রমাণ করবে কি করে মামা?'

'আমি সত্য প্রমাণ করতে চাই না। সত্য প্রমাণ করার প্রয়োজনও নেই।' বলেছিলেন মামা।

আমি নাছোড়বান্দার মত বলেছিলাম, 'যদি কেউ সত্য প্রমাণ করতে চায়?'

'পারবে না। সে টাওয়ারের মত ধ্বংস হয়ে যাবে। ষড়যন্ত্রের যোগ্যতায় তারা আমেরিকার দেশপ্রেমিকদের চেয়ে অনেক শক্তিশালী।' কথা শেষ করেই মামা চলে গিয়েছিলেন। কোন কথা তাঁকে আর বলানো যায়নি।'

দীর্ঘ এই বিবরণ শেষ করার পর বলল ডা. আয়েশা আহমদ কামাল সুলাইমানকে লক্ষ্য করে, 'আমার মনে হয় মামা যা দেখেছেন তা এক সাংঘাতিক প্রমাণ হতে পারে টাওয়ার ধ্বংসের অপরাধী নির্ধারণে।'

কামাল সুলাইমান গোগ্রাসে গিলছিল ডা. আয়েশা আহমদের কথা। আনন্দ ও বিস্ময়ের ঢেউ তার চোখে-মুখে।

ডা. আয়েশা আহমদ থামতেই কামাল সুলাইমান বলল, 'বোন, আহমদ মুসা ভাই এটুকু সংগ্রহ করেছেন যে, 'সিভিল প্লেন টুইনটাওয়ারে চালনা করার জন্যে 'গ্লোবাল হক' ব্যবহার করা হয়। তিনি এটা প্রমাণের জন্য 'গ্লোবাল হক'-এর 'উড্ডয়েরন লগ' খুঁজছেন। কিন্তু আপনার মামার কথায় মনে হয় সূর্যের ন্যায় দেখা অর্থে তিনি 'গ্লোবাল হক'-এর গতিপথ এবং উড্ডয়নের ফটোগ্রাফের কথা বলেছেন। আমার মতে এটা হবে সবচেয়ে প্রত্যক্ষ ও অকাট্য এক প্রমাণ। কিন্তু এটা পাওয়া যাবে কি করে? আপনার মামা কোথায় থাকেন?'

'তিনি নিউইয়র্কের উপকণ্ঠে এক কাউন্ট্রিতে নিরিবিলি বাস করেন। আপনি দেখা করতে চান তার সাথে?' বলল ডা. আয়েশা আহমদ।

'না, এখন নয়। আহমদ মুসা ভাইকে বলতে হবে। তিনিই সিদ্ধান্ত নেবেন।' কামাল সুলাইমান বলল।

খুশি হলো ডা. আয়েশা আহমদ। বলল, 'মামা আহমদ মুসার একজন ভক্ত। খুব ভালো হয় তিনি যদি দেখা করেন। মামা তার কাছে না করতে পারবেন না।'

ডা. আয়েশার কথা শেষ হতেই উঠে দাঁড়াল আহমদ ইব্রাহিম। বলল, 'থ্যাকস গড। সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য পাওয়া গেল। আল্লাহ সাহায্য করুন একে যাতে কাজে লাগানো যায়।'

স্বগত কণ্ঠে এ কথাগুলো বলে ডা. আয়েশাকে লক্ষ্য করে বলল, 'লাঞ্চের সময় কিন্তু পার হয়ে যাচ্ছে। তুমি ওদিকে লাঞ্চের ব্যবস্থা করো। আমি ভাই সাহেবকে নিয়ে আসছি।'

'আমার কিন্তু এখনই ফেরা দরকার। অনেক কাজ পড়ে আছে।' কামাল সুলাইমান বলল।

'আপনাকে আটকে রাখা যাবে না ভাই সাহেব। চলুন, খেয়ে আসি।' বলল আহমদ ইব্রাহিম।

কামাল সুলাইমান উঠল।

দুজনে এগুলো ডাইনিং-এর দিকে।

চারসিটের একটা হেলিকপ্টার দ্রুত ছুটে চলেছে 'মাউন্ট মার্সি'র দিকে। সামনে একটাই সিট, ড্রাইভারের।

পেছনে সিট তিনটা। মাঝখানে সিটে বসেছে আজর ওয়াইজম্যান। তার ডান পাশে নিউইয়র্ক ষ্টেট পুলিশের প্রধান মি. ওয়াটসন। আর আজর ওয়াইজম্যানের বাম পাশে বসেছে ইলিয়া ওবেরয়।

ইলিয়া ওবেরয় বর্তমানে হাজতে বন্দী জেনারেল শ্যারনের পক্ষে কাজ করছে। সে আন্তর্জাতিক ইহুদী গোয়েন্দা সংস্থা ইরগুন জাই লিউমি এবং ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের দুয়েরই একজন শীর্ষ অফিসার।

কথা বলছিল আজর ওয়াইজম্যান নিউইয়র্কের পুলিশ প্রধান ওয়াটসনের সাথে।

আজর ওয়াইজম্যান বক্তব্য শেষ করল এই কথা বলে যে, 'এত বড় ঘটনা, মাউন্ট মার্সির পুলিশ হেড অফিসের অনুমতি নেবে না?'

'এ ধরনের সন্দেহ নিরসনের কাজ পুলিশ উপরে না জানিয়েও করতে পারে। তবে পরে অবশ্যই জানাতে হয়, সেটা তারা জানিয়েছে?' বলল ওয়াটসন।

'এটা কোন সাধারণ সন্দেহের বিষয় নয়, গণকবরের ব্যাপার।' বলল আজর ওয়াইজম্যান।

হাসল ওয়াটসন। বলল, 'কিন্তু গণকবর প্রমাণিত হয়েছে খননের পর। আগে ছিল নিছক একটা সন্দেহ।'

পুলিশ প্রধান থেমেই আবার বলে উঠল, 'কিন্তু আপনি এত অস্থির হচ্ছেন কেন মি. ওয়াইজম্যান।

'অস্থির হওয়ার কারণ হলো আমি সন্দেহ করছি এর সাথে আহমদ মুসা জড়িত আছে। এটা তার কোন এক ষড়যন্ত্র এবং সেটা আমাদের বিরুদ্ধে।' বলল আজর ওয়াইজম্যান।

'আহমদ মুসা এটা করেছে এর কোন প্রমাণ আমরা পাইনি। ওখানকার থানা জানিয়েছে প্রখ্যাত রেডইন্ডিয়ান প্রতœতাত্বিক বিশেষজ্ঞ প্রফেসর আরাপাহো প্রতœতাত্বিক খোঁড়াখুঁড়ি করতে গিয়ে এই গণকবর আবিষ্কৃত হয়েছে।'

'এই প্রফেসর আরাপাহোর সাথে আহমদ মুসার পরিচয় আছে, সম্পর্ক আছে।' দ্রুত কণ্ঠে জবাব দিল আজর ওয়াইজম্যান।

'আহমদ মুসার সাথে ঐ ধরনের পরিচয় ও সম্পর্ক আমাদের পুলিশ, এফ.বি.আই. এবং সরকারের অনেকেরই আছে। তিনি তো আমেরিকার অনেক উপকার করেছেন।' বলল পুলিশ প্রধান মি. ওয়াটসন।

আজর ওয়াইজম্যানের মুখে অসন্তুষ্টির ছায়া নামল। বলল, 'দুঃখিত, আমি বুঝাতে পারছি না যে আহমদ মুসা গোড়া কেটে আগায় পানি ঢালার মত বিপজ্জনক শয়তান। জানেন, ড. হাইম হাইকেলকে সেই বন্দী করে রেখেছে?'

‘আপনার এ তথ্য ঠিক নয় মি. আজর ওয়াইজম্যান। ড. হাইম হাইকেল এখন পারিবারিক তত্ত্বাবধানে এক জায়গায় লুকিয়ে আছেন এবং এফ.বি.আই সেটা জানে। তার কিডন্যাপ হওয়ার ব্যাপারটা সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত তার লুকিয়ে থাকাকে তার নিরাপত্তার জন্যে ঠিক মনে করা হচ্ছে।’

আজর ওয়াইজম্যানের চোখে-মুখে অন্ধকার নেমে এল। চুপ করে থাকল। কোন কথা যেন তার মুখে জোগাল না।

কথা বলে উঠল ইলিরা ওবেরয়। বলল পুলিশ প্রধান ওয়াটসনকে লক্ষ্য করে, ‘স্যার আমরা মনে হয় এসে গেছি। কোথায় আমরা ল্যান্ড করব, কোথায় আমরা প্রথমে যাব সেটা বোধ হয় ঠিক করা হয়নি। পাইলটকেও নির্দেশ দেয়া দরকার।’

‘ধন্যবাদ মি. ওবেরয়। আমরা থানায় নামব। আমি থানাকে জানিয়ে দিয়েছি।’ বলে নিচে গ্রাউন্ডের দিকে তাকাল ওয়াটসন। কিছু নির্দেশ দিল পাইলটকে। তারপর ফিরে তাকাল আজর ওয়াইজম্যানের দিকে। বলল, ‘আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না মি. ওয়াইজম্যান। ফেডারেল পুলিশের সাবেক প্রধান শ্যারন আলেকজান্ডার আপনার ব্যাপারে আমাকে বলেছেন। যতটা পারা যায়, সহযোগিতা করার জন্যেই আমি আসছি।’

‘ধন্যবাদ স্যার।’ বলল আজর ওয়াইজম্যান মুখে হাসি টানার চেষ্টা করে।

ল্যান্ড করল হেলিকপ্টার থানার সামনে একটা সুন্দর সবুজ চত্বরে।

থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারসহ পুলিশরা দাঁড়িয়ে আছে তাদের বসকে স্বাগত জানানোর জন্যে।

পরিচয় পর্ব শেষ করে তারা এগিয়ে চলল থানার কনফারেন্স রুমের দিকে।

পুলিশ প্রধান ওয়াটসন আজর ওয়াইজম্যান ও ইলিরা ওবেরয়ের পরিচয় দিয়েছেন দুজন সমাজসেবী ও তাঁর মেহমান বলে।

তারা গিয়ে বসল কনফারেন্স রুমে।

চায়ে চুমুক দিয়ে সামনে বসা থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারকে লক্ষ্য করে বলল, ‘মি. ক্যানিং আপনাদের সেই ১৪টি কংকাল কোথায়?’

‘স্যার ওগুলো রেডইন্ডিয়ানদের কমিউনিটি অফিসের গোডাউনে রাখা হয়েছে।’ বলল থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার ক্যানিং।

‘তোমার এখানে নয় কেন?’ বলল পুলিশ প্রধান ওয়াটসন। তার কণ্ঠে অসন্তুষ্টির সুর।

‘স্যার কংকালগুলো রেডইন্ডিয়ান রিজার্ভ এরিয়ার মধ্যে পাওয়া গেছে, অতএব তারা দাবি করেছে কংকালগুলো তাদের হেফাজতে থাকবে। কংকালগুলো যদি রেডইন্ডিয়ানদের না হয় এবং কংকালগুলো যদি কোন অপরাধমূলক ঘটনার অংশ হয় তাহলে তারা পুলিশকে ফেরত দেবে?’ বলল পুলিশ অফিসার ক্যানিং।

‘কিন্তু কংকালগুলো রেডইন্ডিয়ান রিজার্ভ এরিয়ার মধ্যে পাওয়া গেছে, অতএব তারা দাবি করেছে কংকালগুলো তাদের হেফাজতে থাকবে। কংকালগুলো যদি রেডইন্ডিয়ানদের না হয় এবং কংকালগুলো যদি কোন অপরাধমূলক ঘটনার অংশ হয় তাহলে তারা পুলিশকে ফেরত দেবে?’ বলল পুলিশ অফিসার ক্যানিং।

‘কিন্তু কংকালগুলো যদি ইতিমধ্যে পাল্টে ফেলা হয় কোনো উদ্দেশ্যে?’ আজর ওয়াইজম্যান বলল।

‘না স্যার, সে সুযোগ রাখা হয়নি। রেডইন্ডিয়ানরা নিজেরাও কংকালগুলো একক দায়িত্বে রাখতে রাজি হয়নি। ছোট ছোট ঘুলঘুলি বিশিষ্ট এক দরজা ওয়ালা যে কক্ষে কংকালগুলো রাখা হয়েছে, তার দরজায় তিনটি তালা লাগিয়ে তিনটি সিল-গালা করা হয়েছে। একটা চাবি রেডইন্ডিয়ানদের একটা পুলিশের এবং অন্যটা ফেডারেল কমিশনার অফিসের হাতে দেয়া হয়েছে।’ বলল পুলিশ অফিসার ক্যানিং।

হতাশা ও উদ্বেগ নেমে এল আজর ওয়াইজম্যান ও ইলিয়া ওবেরয়ের চোখে-মুখে। গণকবর খননোত্তর ঘটনাকে ষড়যন্ত্র প্রমাণ করার জন্যে কংকাল

সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করা দরকার। কিন্তু যেভাবে রাখা হয়েছে তাতে সন্দেহ সৃষ্টির কোন সুযোগ রাখা হয়নি। নিশ্চয় এটা আহমদ মুসারই বুদ্ধি।

'ধন্যবাদ ক্যানিং, তোমরা বুদ্ধিমানের কাজ করেছ। এখন বলতো অফিসার, ওটা কি সত্যিই গণকবর ছিল?' জিজ্ঞাসা ওয়াটসনের।

'জি স্যার। কংকালগুলো স্তুপ আকারে পাওয়া গেছে।'

'কতদিনের পুরানো হবে বলে তোমরা মনে করছ?'

'প্রতœতত্ত্ববিদরাসহ আমরা মনে করেছি বিশ পঁচিশ বছরের পুরনো হবে।'

'গণকবর থেকে কংকাল ছাড়া আরও কিছু কি পাওয়া গেছে?'

'ঘড়ি, আংটি, চশমা, বোতাম, কয়েন ইত্যাদি কিছু জিনিস পাওয়া গেছে।'

'সেগুলো কোথায়?'

'সেগুলোর ফটোসহ একটা তালিকা তৈরি করা হয়েছে। তালিকায় তিন পক্ষই সই-সীল দিয়েছে। ওগুলোও কংকালের সাথে রাখা হয়েছে। এইভাবে ফটোসহ কংকালেরও তালিকা তৈরি করা হয়েছে। প্রত্যেকটি তালিকা ফটোসহ চার কপি করা হয়েছে। আমরা তিনপক্ষ তিনটি তালিকা নিয়েছি। আর চতুর্থ তালিকাটি নিয়েছেন প্রফেসর আরাপাহো।'

পুলিশ অফিসার ক্যানিং-এর শেষ হতেই আজর ওয়াইজম্যান দ্রুত কণ্ঠে বলে উঠল, 'প্রফেসর আরাপাহো নিয়েছেন কেন? তিনি কি আরো কিছু নিয়েছেন? তিনি ও তার সাথীরা কোথায়?'

পুলিশ অফিসার ক্যানিং তাকাল আজর ওয়াইজম্যানের দিকে। আজর ওয়াইজম্যানের রূঢ় ও কৈফিয়ত চাওয়ার মত কথা তার ভালো লাগেনি। তার চোখে-মুখে একটা বিরক্তির ভাব। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল সে ধীর কণ্ঠে, 'হ্যাঁ, প্রফেসর আরাপাহো তার প্রতœতাত্ত্বিক ও অন্যান্য পরীক্ষঅর জন্যে প্রত্যেকটি কংকাল থেকে চারটি করে দাঁত, পাঁচ গ্রামের দুপ্যাকেট করে দেহাবশেষ এবং অন্যান্য জিনিসের ফরেনসিক ফটোগ্রাফ নিয়েছেন।'

‘তিনি এখন কোথায়?’ দ্রুত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল আজর ওয়াইজম্যান। তার চোখে-মুখে অস্থিরতার ভাব।

‘তিনি, একজন রেডইন্ডিয়ান ছাত্র এবং তার টিমের কয়েকজন চলে গেছেন জিনিসগুলো নিয়ে পরীক্ষার জন্যে।’ বলল পুলিশ অফিসার।

‘কোথায়?’ সংগে সংগেই প্রশ্ন করল আজর ওয়াইজম্যান। তার গলা কাঁপছে স্পষ্ট।

‘এটা আমরা জানি না। তিনিও বলেননি। আমরা জিজ্ঞাসার প্রয়োজন দেখিনি।’

‘কেন?’ প্রশ্ন ওয়াইজম্যানের।

‘কারণ, তাঁকে ফলো করার সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করিনি।’ বলল পুলিশ অফিসার শক্ত কণ্ঠে।

পুলিশ প্রধান ওয়াটসন আজর ওয়াইজম্যানের কথার বাড়াবাড়ি এবং পুলিশ অফিসার ক্যানিং-এর বিরক্তি লক্ষ্য করল। তাদের দুজনের কথা বন্ধ করার জন্যে বলে উঠল, ‘মি. ক্যানিং, যখন প্রমাণিত হলো ওটা গণকবর, তখন সরকার ও পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত না নেয়া পর্যন্ত কোন কিছু হস্তান্তর না করলেই ভালো হতো।’

‘স্যার গোটা বিষয় রেডইন্ডিয়ান রিজার্ভ এলাকার ভেতরের। প্রফেসর আরাপাহো তার প্রতœতাত্বিক গবেষণার জন্যে রেডইন্ডিয়ান প্রশাসনের কাছ থেকে খননের অনুমতি নিয়েছেন। ফেডারেল কমিশনার অফিসও তাদের সাথে একমত এটা জানিয়ে দিয়েছে। আমাদের ডেকেছে সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত থাকার জন্যে। গোটা উদ্যোগ প্রফেসর আরাপাহোর। তার পরীক্ষা ও গবেষণার জন্যে কিছু করে স্যাম্পল নিয়ে যাবেন, এটা তাঁর অধিকার। এতে বাধা দেয়া যাবে কেমন করে, বিশেষ করে রেডইন্ডিয়ান প্রশাসন যদি বাধা না দেন। তারা বাধা দিলে, আমাদের সাহায্য চাইলে আমরা অবশ্যই প্রফেসর আরাপাহোকে আটকাতাম। তাছাড়া স্যার, অতীতেও এই রেডইন্ডিয়ান এলাকায় খোঁড়াখুঁড়ি হয়েছে। যারা এটা করেছেন, তারা প্রাপ্ত জিনিসপত্র নিয়ে গেছেন, পরীক্ষা-নীরিক্ষা করেছেন। কোন সময়ই এ নিয়ে প্রশ্ন ওঠেনি। কোথাও এ প্রশ্ন তোলা হয়নি স্যার।’

পুলিশ অফিসার থামতেই আজর ওয়াইজম্যান বলল, 'ঠিক আছে। ধন্যবাদ। কিন্তু একটা কথা দয়া করে বলুন, প্রফেসর আরাপাহো পরীক্ষার জন্যে যা নিয়ে গেছেন, সে গুলোই যে তিনি পরীক্ষা করবেন, অন্য কিছু পরীক্ষা করে তাকে এই গণকবর খননের ফল বলে চালিয়ে দেবেন না, তার নিশ্চয়তা বিধান কিভাবে হবে?' আজর ওয়াইজম্যানের মুখটা কিছুটা উজ্জ্বল দেখাল।

হাসল পুলিশ অফিসার ক্যানিং। বলল, 'প্রফেসর আরাপাহো তার কাজে কারও প্রশ্ন তোলার কোন অবকাশ রাখেননি স্যার। তিনি প্রতিটি জিনিসের দুটি করে প্যাকেট করেছেন। যেমন প্রতিটি কংকালের দাঁতের দুটি প্যাকেট এবং প্রতিটি দেহাবশেষের দুটি প্যাকেট। প্রতিটি জিনিসের দুপ্যাকেটেই রেডইন্ডিয়ান প্রধান, ফেডারেল কমিশনার অফিস ও থানার সই-সীলসহ প্রত্যায়ন নিয়েছেন। প্রতি দুপ্যাকেটের একটিকে তিনি পরীক্ষার কাজে ব্যবহার করবেন এবং অন্য প্যাকেটটি তার কাছে সাক্ষী হয়ে থাকবে।'

আনন্দের সাথে এই কথাগুলো বলল পুলিশ অফিসার ক্যানিং, কিন্তু এই কথা শুনে আজর ওয়াইজম্যান ও ইলিয়া ওবেরয়ের মুখ হতাশার অন্ধকারে ঢেকে গেল। ভয়ংকর এক ভাবনা এসে তাদের ঘিরে ধরেছে, ফরেনসিক ও অন্যান্য টেষ্টে প্রমাণ হয়ে যাবে যে, গণকবরের এই চৌদ্দজন কারা এবং কোন জাতির। তার ফলে মিথ্যা হয়ে যাবে টাওয়ার ধ্বংসের জন্যে ঐ চৌদ্দ জনের দ্বারা বিমান হাইজ্যাকের সাজানো কাহিনী। নিশ্চয় ড. হাইম হাইকেল ফাঁস করে দিয়েছে এই গোপন গণকবরের কথা। এখন কোথায় পাওয়া যাবে প্রফেসর আরাপাহোদের। সে তো আসল নয়। তার পেছনে আছে আহমদ মুসা। আহমদ মুসাকে এ পরীক্ষা ও পরীক্ষার ফল লাভে বিরত রাখতে হলে তাকে পাওয়া দরকার। আর তাকে পেতে হলে প্রফেসর আরাপাহোকে পাওয়া দরকার।'

এসব আকাশ-পাতাল চিন্তায় বুঁদ হয়েছিল আজর ওয়াইজম্যান।

ওয়াটসন তাকে লক্ষ্য করে বলল, 'কি ভাবছেন মি. ওয়াইজম্যান?'

'ভাবছি প্রফেসর আরাপাহোদের কথা। তিনি আমাদের শত্রুর পক্ষ হয়ে কাজ করছেন। ভেবে পাচ্ছি না, এই স্যাম্পলগুলোকে তিনি গবেষণা-পরীক্ষার নামে কোন কাজে লাগাবেন। তাঁকে আমাদের পাওয়া দরকার। সেটাই ভাবছি।'

‘ভেবে কি ঠিক করলেন? এদিকে তো যা ঘটেছে, তার মধ্যে পুলিশের কোন ভুল-ত্রুটি দেখতে পাচ্ছি না।’ বলল ওয়াটসন।

‘দোষ আমাদের ভাগ্যের। তা না হলে প্রফেসর আরাপাহোর মত লোক শত্রুর ক্রীড়নক হয়ে এখানে আসেন!’ বলল আজর ওয়াইজম্যান।

পুলিশ অফিসার কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল। কিন্তু পুলিশ প্রধান ওয়াটসন তাকে বাধা দিয়ে বলল, ‘এখন আর কোন কথা নয়। চল একটু ঘুরে ফিরে দেখি। গণকবরটিও একবার দেখা যেতে পারে।’

‘কিন্তু এরচেয়েও জরুরি হলো প্রফেসর আরাপাহোকে খুঁজে বের করা। পরীক্ষা-নীরিক্ষা অবস্থার মধ্যেই তাকে যে কোন মূল্যে খুঁজে পেতে হবে।’ বলল আজর ওয়াইজম্যান।

‘তাহলে?’ ওয়াটসন বলল।

‘চলুন তাহলে। একটু ঘুরে-ফিরে এসে আমরা আবার যাত্রা করব।’

‘ঠিক আছে।’ বলে ওয়াটসন উঠে দাঁড়াল। সবাই উঠল।

# ৬

নিউইয়র্ক হাইওয়ে ধরে একটা গাড়ি এগিয়ে চলেছে ওয়াশিংটনের দিকে। গাড়ির আরোহী দুজন। ড্রাইভিং সিটে আহমদ মুসা এবং তার পাশে কামাল সুলাইমান।

'আমরা অর্ধেক পথ এগিয়েছি ভাইয়া। গণকবরের ১৪টি কংকালের সবরকম টেষ্ট সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে, ঐ ১৪ জনই আরব বংশোদ্ভুত এবং তাদেরকে টুইনটাওয়ার ধ্বংসের দিনগত রাতে একই সময়ে বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে। এর অর্থ আরবদের কর্তৃক বিমান হাইজ্যাক করে টুইনটাওয়ারে আঘাত করার প্রচারিত কাহিনী মিথ্যা এবং সাজানো। অন্যদিকে ধ্বংস হয়ে যাওয়া টুইনটাওয়ারের ডাষ্টের তিনটি পরীক্ষাই প্রমাণ করেছে বিশেষ ধরনের ডেমোলিশন বিস্ফোরক দিয়ে টাওয়ার ধ্বংস করা হয়েছে, বিমানের আঘাতে টাওয়ার ধ্বংস হয়নি।' বলল কামাল সুলাইমান।

'আমরা অর্ধেক পথ এগিয়েছি, এ কথা বলছ কেন? টুইনটাওয়ার ধ্বংসের জন্যে যাদেরকে অভিযুক্ত করা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণের ডকুমেন্ট আমাদের হাতে। অন্যদিকে টাওয়ার ধ্বংসের যে কারণ দেখানো হয়েছে তা মিথ্যা প্রমাণেরও ডকুমেন্ট আমাদের হাতে এসেছে। সুতরাং বলতে পারো পুরো পথই আমরা অতিক্রম করেছি। এখন আমরা উদ্ধার করতে যাচ্ছি সিভিল প্লেন কিভাবে টাওয়ারে আঘাত হানল, সেই রহস্য।' বলল আহমদ মুসা।

'আমরা ডা. আয়েশা আহমদের মামার কাছ থেকে 'গ্লোবাল হক'-এর উড্ডয়ন রুট এর লগ ও ফটোগ্রাফ যোগাড়ের চেষ্টা করতে পারি। আমার বিশ্বাস তিনি আমাদের সাহায্য করবেন।' কামাল সুলাইমান বলল।

'আমরা 'মিউজিয়াম অব মিলিটারী হিষ্ট্রি'র ওখানে কাজ সেরে নিউইয়র্কে ফিরেই ওখানে যাব ইনশাআল্লাহ।' আহমদ মুসা বলল।

'গ্লোবাল হক'-এর মিসিং বলে কথিত লগ সম্পর্কে নতুন কিছু জানা গেছে ভাইয়া?'

'আমি একটা টেলিফোনের অপেক্ষা করছি কামাল সুলাইমান।'

'কে টেলিফোন করবেন।' জিজ্ঞাসা কামাল সুলাইমানের।

'এফ.বি.আই প্রধান জর্জ আব্রাহাম জনসন টেলিফোন করবেন। তিনি গত রাতে আমাকে টেলিফোন করে বলেছিলেন যে, মিলিটারী মিউজিয়ামের লগ সম্পর্কে স্পেসেফিক কিছু জানতে পারলে আমি সেখানে পৌছার আগেই তিনি আমাকে জানাবেন।'

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই তার মোবাইলটা বেজে উঠল।

মোবাইলটি তুলে সামনে ধরল আহমদ মুসা।

'নিশ্চয় মি. আব্রাহাম জনসনের টেলিফোন।' বলল কামাল সুলাইমান।

'না বুমেদীন বিল্লাহর টেলিফোন।' বলে আহমদ মুসা বুমেদীন বিল্লাহর কলের উত্তর দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, আমি জোসেফ জন। তুমি কখন ফিরলে?'

'এই মাত্র। পৌছেই আপনাকে টেলিফোন করেছি।'

'শোন, আমি যা খবর পেয়েছি, তাতে প্রফেসরকে কিছুদিন বাইরে থাকতে হবে, বাড়িতে তাঁর যাওয়া হবে না। আর তুমি তোমার আসল কাজ শুরু করে দাও। মূল রিপোর্টের আগে প্রারম্ভিক কয়েকটা রিপোর্ট করতে হবে। যেমন গণকবর আবিষ্কারের খবর, ধ্বংস টাওয়ারের ডাষ্ট পরীক্ষার উদ্যোগের খবর এবং এসবকে সামনে রেখে বলবে টাওয়ার ধ্বংস বিষয়ে সত্যানুসন্ধানের সামগ্রিক উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এই রিপোর্টের পরদিনই মূল রিপোর্ট পত্রিকায় যেতে হবে। এরপর 'লা-মন্ডে' পত্রিকায় যা উঠবে না, সেসব বিষয়েও ফলোআপ পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তোমাকে পাঠাতে হবে FWTV এবং WNA সংবাদ মাধ্যমে। মূল তথ্য তো পাওয়া গেছে। তার ভিত্তিতে রিপোর্ট তৈরি কর। পরে একটা বিষয় সংযোজন করলেই চলবে।' আহমদ মুসা বলল।

'আমি কাজ শুরু করে দিয়েছি। তবে আপনি যে প্রারম্ভিক রিপোর্টের কথা বলেছেন তা আমার মাথায় ছিল না। আপনি ঠিকই বলেছেন। বিনা মেঘে বজ্রপাতের চেয়ে এটাই স্বাভাবিক হবে।' বলল বুমেদীন বিল্লাহ।

‘ধন্যবাদ বিল্লাহ। রাখলাম টেলিফোন। সব কথা মনে রেখ। বাই।’ বলে আহমদ মুসা কল অফ করে দিল।

কল অফ করে মোবাইল ড্যাশ বোর্ডে রাখতেই মোবাইল বেজে উঠল আবার।

‘এবার নিশ্চয় জর্জ আব্রাহাম জনসন হবেন ভাইয়া।’ বলল কামাল সুলাইমান।

মোবাইল তুলে নিল আহমদ মুসা।

ঠিক জর্জ আব্রাহাম জনসনই টেলিফোন করেছে।

‘গুড মর্নিং জনাব। কেমন আছেন?’ বলল আহমদ মুসা।

‘গুড মর্নিং। ভাল আছি। তুমি নিশ্চয় পথে ড্রাইভ করছ?’

‘জি হ্যাঁ।’

‘তাহলে তাড়াতাড়ি বলছি শোন। লগটা মিসিং বলে যে মন্তব্য ডকুমেন্ট আছে তা ঠিক নয়। একটা বিশেষ পক্ষ অফিসকে দিয়ে এটা করিয়েছে। লগটা ঠিক জায়গায় ঠিকই আছে। বলছি সেকশন ও ডেস্ক নাম্বার। মুখস্থ করে নাও। MM-111/197, আরও শোন, ওখানে কিন্তু কড়া সিকিউরিটি। তাদের উপর ‘দেখা মাত্র গুলী’র স্থায়ী নির্দেশ দেয়া আছে। তার উপর তোমরা রিভলবার নিতে পারছো না। সুতরাং সাবধান। উইশ ইউ গুডলাক। বাই।’ বলে এপার থেকে কিছু শোনার অপেক্ষা না করে টেলিফোন রেখে দিল জর্জ আব্রাহাম জনসন।

‘আল্লাহ লোকটির উপর রহম করুন। তাঁর সরকারের কোন লাভ নেই, বরং একদিক দিয়ে ক্ষতি আছে, তা সত্ত্বেও অমূল্য সাহায্য তিনি করছেন।’ স্বগত কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

‘জর্জ আব্রাহাম জনসন সত্যিই আপনাকে ছেলের মত ভালোবাসেন ভাইয়া।’ কামাল সুলাইমান বলল।

‘তোমার কথা ঠিক কামাল সুলাইমান। তিনি আমাকে তার দ্বিতীয় ছেলে মনে করেন। কিন্তু তিনি ছেলেকেও এ ধরনের সাহায্য করবেন না। আসলে কামাল সুলাইমান, তিনি আমাদের উদ্দেশ্য-আদর্শকেও ভালোবাসেন।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ভাইয়া আরেকটা বিষয়, বর্তমান মার্কিন সরকার সম্ভবত চান টুইনটাওয়ার ধ্বংসের সত্য ঘটনা দিনের আলোতে আসুক। যে গ্রুপটা তখন মার্কিন প্রশাসন ও সরকারের একটা অংশকে কাজে লাগিয়ে ভয়াবহ কাজটা করেছিল, বিশ্বকে ও আমেরিকাকে বদলে দিতে চেয়েছিল তাদের মত করে, সেই গ্রুপটা ও তাদের হীন উদ্দেশ্য ধরা পড়ে যাক বিশ্ববাসীর চোখে, এটা আমেরিকার বর্তমান সরকার আন্তরিক ভাবেই কামনা করেন। তবে এ কাজটা অন্যের হাতে হোক, এটা তারা চাচ্ছেন।’ কামাল সুলাইমান বলল।

‘হ্যাঁ কামাল সুলাইমান, তোমার কথা ঠিক, আজকের আমেরিকা বিশ বছর আগের সেই আমেরিকা নয়। জর্জ ওয়াশিংটন, আব্রাহাম লিংকন, টমাস জেফারসনের আমেরিকা আবার ফিরে এসেছে। এই আমেরিকা নিজের যেমন শান্তি, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত রাখতে চায়, তেমনি চায় অন্যেরও শান্তি, স্বাধীনতা, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত থাক। এই আমেরিকা বিশ্বের জাতি ও দেশসমূহের মাথায় বসতে চাচ্ছে না, চাচ্ছে তাদের হৃদয়ে স্থান পেতে। সুতরাং আমেরিকা অবশ্যই চাইবে অতীতের একটি কালো দাগ তার গা থেকে মুছে ফেলতে।’ বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই কামাল সুলাইমান চিৎকার করে উঠল, ‘ভাইয়া ডান দিকে এক্সিট নিন। এ দিক দিয়ে ‘ইন্ডিপেনডেন্স’ এভেনিউতে না ঢুকলে অনেক ঘুরতে হবে।’

‘ধন্যবাদ কামাল সুলাইমান। কথায় মনোযোগ দিতে গিয়ে রাস্তার দিকে মনোযোগ ছিল না।’ এক্সিট নেবার জন্যে গাড়িটাকে সাইড লেনে নিতে নিতে বলল আহমদ মুসা।

ইন্ডিপেনডেন্স এভেনিউ ও কনষ্টিটিউশন এভেনিউ রাজধানী ওয়াশিংটনের প্রাণকেন্দ্রে। হোয়াইট হাউজ, পার্লামেন্ট ভবনসহ গুরুত্বপূর্ণ সরকারি প্রতিষ্ঠান এই এলাকায়।

ইন্ডিপেনডেন্ট এভেনিউ-এর দক্ষিণ প্রান্তে এভেনিউ থেকে একটু ভেতরে এক বিরাট এলাকা জুড়ে ‘মিউজিয়াম অব মিলিটারী হিষ্ট্রি’।

মিউজিয়ামের চারদিক ঘিরে বড় বড় গাছ স্থানটাকে বাগানের রূপ দিয়েছে। মিউজিয়ামের দুপাশে পার্কিং প্লেস।

উত্তর পাশের পার্কিং প্লেসটা ছায়া ঘেরা ও অপেক্ষাকৃত নির্জন। তাছাড়া মিউজিয়ামের প্রাইভেট ও ইমারজেন্সি দরজা আছে, সেটাও এদিকেই।

আহমদ মুসা এই কারপার্কিং-এ তার গাড়ি পার্ক করলো।

আহমদ মুসা পকেট থেকে মিউজিয়ামের ইন্টারন্যাল মানচিত্রটা বের করে চোখের সামনে তুলে ধরল। চারতলা বিল্ডিং। প্রতিটি ফ্লোরের রুম ও প্যাসেজের এ্যারেঞ্জমেন্ট প্রায় এই রকমের। পূর্ব দিকে মিউজিয়ামের এনট্রান্স। মিউজিয়ামে ঢোকার পর একটা বড় লাউঞ্জ। লাউঞ্জের দুপ্রান্ত থেকে দুটি প্রশস্ত সিঁড়ি উঠে গেছে চারতলা পর্যন্ত। একটা সিঁড়ি উপরে ওঠার জন্যে, অন্যটা নিচে নেমে আসার জন্যে।

মিলিটারী মিউজিয়ামটি সার্বক্ষণিকভাবে সর্বসাধারণের জন্যে খোলা নয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনুমতি প্রাপ্তরাই শুধু মিউজিয়ামে ঢুকতে পারে।

মিউজিয়ামের সকল বিভাগ সকলের জন্যে অবারিত নয়। কিছু কিছু বিভাগ আছে যা দর্শনার্থীদের জন্যে উন্মুক্ত নয়। এ ধরনের সেকশনগুলো চারতলায়। অর্থাৎ চারতলায় কোন দর্শনার্থী যায় না। জর্জ আব্রাহাম জনসন জানিয়েছেন, MM-111/117 সেকশনটা নিষিদ্ধের তালিকায় নয়।

সুতরাং তাদের গন্তব্য 'সেফ এয়ার সার্ভিস'-এ গিয়ে রেকর্ড লগ দেখায় কোন বাধা নেই। কিন্তু সমস্যা চারটি, যে ডকুমেন্টকে মিষ্ট্রিয়াস মিসিং তালিকায় তোলা হয়েছে তা, এক. দেখায় কোন বাধা আসবে কিনা, দুই. ক্যামেরা নিয়ে যেতে দিবে কিনা, তিন. ছবি তোলার সুযোগ পাওয়া যাবে কিনা, এবং চার. সেকশনটি কোন তলায় তা জানাতে ভুলে গেছেন জর্জ আব্রাহাম।

আহমদ মুসা মিউজিয়ামের মানচিত্র থেকে মুখ তুলল। বলল কামাল সুলাইমানকে সব সমস্যার কথা।

কামাল সুলাইমান বলল, 'সেকশন চেনার সমস্যাটা ভাইয়া আমরা 'ইনফরমেশন' থেকে জেনে নেব। আমার মনে হয় প্রথম সমস্যাটা কোন সমস্যা হবে না। কারণ সেকশনটা দর্শনার্থীদের জন্যে নিষিদ্ধ নয় বলেই একে চারতলায়

নেয়া হয়নি। মিসিং তথ্যটা দর্শনার্থীদের জন্যে এজন্যেই রাখা হয়েছে যাতে কোন দর্শনার্থী সেকশনটাতেই না যায়। গেলে বাধা দেয়ার কিছু নেই। সমস্যা দাঁড়াচ্ছে ক্যামেরা নেয়া ও ছবি তোলা নিয়ে।'

থামল কামাল সুলাইমান সমস্যা দুটির কোন সমাধান না দিয়েই। ভাবছিল সে।

'কলম ক্যামেরাতো! একটা কাজ আমরা করতে পারি। আমরা ক্যামেরা থেকে ব্যাটারী এবং ফটোডিস্কটা আলাদা করতে পারি। তাতে ওদের স্ক্যানিং এড়ানো যাবে।' বলল আহমদ মুসা।

গাড়ি থেকে নামার জন্যে তৈরি হলো আহমদ মুসা।

বেরিয়ে এল গাড়ি থেকে।

মিউজিয়ামের লাউঞ্জে প্রবেশ করল আহমদ মুসারা। সোজা গিয়ে দাঁড়াল রিসিপশনের সামনে।

রিসিপশন ডেস্কে দুজন। একজন মেয়ে, একজন ছেলে।

আহমদ মুসাকে ডেস্কের সামনে দাঁড়াতে দেখে মেয়েটি তার দিকে এগিয়ে এল।

'গুড মর্ণিং ম্যাডাম। আমি জোসেফ জন আর আমার সাথে ইনি কুনার্ড সুলিভান। এই দুনামে রিসিপশনে দুটি প্রবেশ পত্র থাকার কথা।'

'প্লিজ স্যার.........' বলে মেয়েটি রেজিষ্টারটি টেনে নিল। রেজিষ্টারে নজর বুলিয়েই মেয়েটি বলে উঠল, 'ইয়েস স্যার, আপনাদের পাশ আছে। মেয়েটি দুটি পাশ আহমদ মুসার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'স্যার রেজিষ্ট্রারে দয়া করে সই করুন।'

আহমদ মুসারা প্রবেশপত্র নিয়ে রেজিষ্টারে সই করল।

সই করে আহমদ মুসা বলল, 'ম্যাডাম MM-111/117 সেকশনটা কোন তলায় কোনদিকে হবে?'

মেয়েটির পাশে দাঁড়ানো অন্য রিসিপশনিষ্ট আগ্রহ ভরে একধাপ এগিয়ে এল এবং বলল মেয়েটি কিছু বলার আগেই, 'স্যার ও সেকশনটা তিন তলার ১৯৭ নাম্বার কক্ষে।'

রিসিপশনিষ্টের মুখের আকস্মিক এক পরিবর্তন এবং তার অতি উৎসাহ আহমদ মুসার দৃষ্টি এড়াল না। কিন্তু এ নিয়ে চিন্তা করার সময় তার ছিল না। প্রবেশ পত্র হাতে পেয়েছে। এখন তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে।

সিঁড়িতে ওঠার মুখে স্ক্যানিং মেশিন।

স্ক্যানিং পেরল আহমদ মুসারা। স্ক্যানিং-এর সময় ব্যাটারী ও ফটো ডিস্ককে আলাদাভাবে দেখে তারা কোন সন্দেহ করেনি।

স্ক্যানিং আছে বলেই আহমদ মুসারা আজ রিভলবার নিয়ে আসেনি। কামাল সুলাইমানের কাছে একটা ক্লোরোফরম রিভলবার রয়েছে। প্লাষ্টিকের বলে তা স্ক্যানিং-এ ধরা পড়েনি। এটাই তাদের একমাত্র অস্ত্র। জর্জ আব্রাহাম জনসন তাদেরকে কৌশলে কাজ সারতে বলেছে। এখানে বড় কোন খুনোখুনি হোক তা তিনি চান না।

চারতলা এই মিউজিয়ামে লিফট ব্যবস্থা আছে, কিন্তু তা দর্শকদের জন্যে নয়।

আহমদ মুসা সিঁড়ি ভেঙে সোজা উঠে গেল তিন তলায়।

কক্ষগুলো সুন্দর গুচ্ছাকারে সজ্জিত। এ রকম অনেকগুলো কক্ষ নিয়ে তিন তলা।

আহমদ মুসারা খুঁজতে লাগল একশ' সাতানব্বই নাম্বার কক্ষ।

আহমদ মুসারা আগেই শুনেছিল, মিউজিয়ামে কোন ইউনিফরম পরা পুলিশ নেই। সিকিউরিটি পুলিশরা সাধারণ পোশাকে বিভিন্ন রুম ও করিডোরে ছড়িয়ে আছে। দর্শকদের সাথে মিশে দর্শক হয়ে তারা সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই ব্যবস্থাটা আহমদ মুসাদের জন্যে বিপদজনক।

পেয়ে গেল তারা ১৯৭ নাম্বার কক্ষ। কক্ষটি উত্তর দিকের শেষ প্রান্তে। কক্ষের দরজা ওয়ালা সম্মুখ দেয়াল মিউজিয়ামের উত্তরের বহিঃদেয়ালের মুখোমুখি। মাঝখান দিয়ে প্রশস্ত করিডোর।

আহমদ মুসা রুম খোঁজাখুঁজির এক ফাঁকে কলম ক্যামেরাটিকে সেট করে নিয়েছে।

মাল্টি ডাইমেনশনাল এই মুভি ক্যামেরা অত্যন্ত শক্তিশালী।

যে কোন বড় গ্রন্থ বা রেজিষ্টারের উন্মুক্ত দুপাতার উপর শট নিলে এক সেকেন্ডের শত ভাগের এক ভাগের মধ্যে দুদিকের দুপাতার নিচের দশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত নিখুঁত ফটো তুলতে পারে।

আহমদ মুসারা ১৯৭ নাম্বার কক্ষে প্রবেশ করল।

বিশাল কক্ষটিতে তখন পাঁচজন লোক। তাদের মধ্যে চারজন যুবক, একজন তরুণী। তারা বিভিন্ন জিনিস দেখায় ব্যস্ত।

গোটা কক্ষে 'সেফ এয়ার সার্ভিস'-এর বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, প্লেনের মডেল, বিভিন্ন দেয়াল চার্ট, রেজিষ্টার ও বইপত্র সুন্দরভাবে সাজানো।

আহমদ মুসা ও কামাল সুলাইমান আলাদাভাবে খুঁজছে লগ রেজিষ্টার।

তাদের পরিকল্পনা হলো, তারা দুজনে এক সঙ্গে থাকবে না। আহমদ মুসা লগ রেজিষ্টার থেকে ফটো নেবে। আর কামাল সুলাইমান চারদিকটা পাহার দেবে তাকে আক্রমণ থেকে বাঁচানোর জন্যে।

ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় দরজা থেকে নাক বরাবর সামনে একটা ডেস্কে আহমদ মুসা পেয়ে গেল লগ রেজিষ্টার।

লগ রেজিষ্টারটি খোলা। খোলা পাতার দিকে তাকিয়ে আহমদ মুসা বিস্ময়ে হতবাক। লগের যে অংশটি সে চায় সেই পাতাটিই খোলা আকারে জ্বল জ্বল করছে।

এটা কি কাকতালিয় ঘটনা, না শত্রুপক্ষের এটা একটা নোটিশ?

যেটাই হোক এ নিয়ে সময় নষ্ট করা যাবে না। তাকাল আহমদ মুসা কামাল সুলাইমানের দিকে। দেখল, আহমদ মুসার বামে কিছু দূরে একটা যন্ত্র পরীক্ষা করছে দুজন। তাদের অল্প দূরে কামাল সুলাইমান। অবশিষ্ট দুজন কামাল সুলাইমানের কিছু দূরে দরজার কাছাকাছি জায়গায়। আর তরুণীটি ঘরের পশ্চিম প্রান্তে পশ্চিমমূখী হয়ে একটা বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছে।

আহমদ মুসার সাথে কামাল সুলাইমানের চোখাচোখি হল।

কামাল সুলাইমান পকেটে হাত দিল। এটা তার প্রস্তুত থাকার সংকেত।

আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়াল। কলম ক্যামেরাটি হাতেই ছিল। কলম-ক্যামেরাটি সে রেজিষ্টারের নির্দিষ্ট পাতার উপরে ধরে ক্যামেরাটি অন করল। অফও করে দিল সেকেন্ড খানেকের মধ্যেই।

আহমদ মুসা কলমটি পকেটে রাখতে যাবে। এই সময় তার বাম পাশ থেকে একটা শক্ত কণ্ঠ ভেসে এল, 'হাত তুলে দাঁড়াও আহমদ মুসা।'

আহমদ মুসা হাত না তুলেই ফিরল তাদের দিকে। দেখল, যারা একটা যন্ত্র পরীক্ষা করছিল সেই যুবক দুজন ঘুরে দাঁড়িয়েছে। তাদের দুজনের হাতেই উদ্যত রিভলবার।

আহমদ মুসা ওদের দিকে তাকাতেই ওদের একজন বলল, 'চালাকির চেষ্টা করো না। হাত তোল। গুলী করতে আমাদের বাধ্য করো না।'

তার কথা শেষ হবার আগেই কামাল সুলাইমানের হাত পকেট থেকে বেরিয়ে এসেছিল। দুপ দুপ করে শব্দ হলো দুবার।

ক্লোরোফরম বুলেট গিয়ে বিস্ফোরিত হলো যুবক দুজনের সামনে।

মুহূর্তেই ওরা জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে।

ক্লোরোফরম বুলেট ছোড়ার পর কামাল সুলাইমান রিভলবার নামিয়ে এগুচ্ছিল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা চিৎকার করে উঠল, 'কামাল পেছনে..........।'

দরজার পাশে যে দুজন যুবক ছিল তারা দুজনেই পকেট থেকে রিভলবার বের করে তাক করছে আহমদ মুসা ও কামাল সুলাইমানকে।

তাদের একজন চিৎকার করে উঠেছে, 'তোরা বহু জ্বালিয়েছিল আমাদের। তোদের আজ বাঁচিয়ে রাখব না। কুকুরের মত মারব তোদের।'

কামাল সুলাইমানও তাদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু আহমদ মুসা ও কামাল সুলাইমান কারও কিছু করার ছিল না। যুবক দুজন এতটা দূরে যে, তাদের উপর পাল্টা আক্রমণের সুযোগ নেই। কামাল সুলাইমানের ক্লোরোফরম রিভলবারও বিদঘুটে পজিশনে।

আহমদ মুসা ও কামাল সুলাইমান দুজনেরই স্থির দৃষ্টি যুবক দুজনের দিকে।

সময়ের এ রকম সন্ধিক্ষণে সাইলেন্সার লাগানো রিভলবারের গুলীর শব্দ হলো পরপর দুবার।

যুবক দুজনের হাত থেকে রিভলবার ছিটকে পড়ে গেল। দুজনেরই দুহাত রক্তাক্ত।

আহমদ মুসারা তাকাল ঘরের পশ্চিম দিকে। দেখল, সেই তরুণীর হাতে রিভলবার।

আহমদ মুসা তার দিকে তাকাতেই মেয়েটি বলল, 'আসুন স্যার আপনারা আমার সাথে।'

বলে তরুণীটি দরজার দিকে হাঁটা দিল।

কামাল সুলাইমান তার ক্লোরোফরম রিভলবার তুলে ফায়ার করল আহত যুবক দুজনের দিকে। বলল, 'ওরা চিৎকার করার আর সুযোগ পাবে না।'

হাঁটতে হাঁটতে মুখ ঘুরিয়ে তরুণীটি কামাল সুলাইমানকে বলল, 'ধন্যবাদ।'

তরুণীটির সাথে আহমদ মুসারা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তরুণীটি হাঁটতে লাগল করিডোর ধরে প্রথমে পশ্চিমে, তারপর উত্তরে।

'আমরা কি বের হবো উত্তরে প্রাইভেট এক্সিট দিয়ে?' বলল আহমদ মুসা তরুণীটিকে লক্ষ্য করে।

'জি স্যার। সামনের গেট দিয়ে অনেক ঝামেলা হতে পারে। ওদের আরো লোক আছে। আপনারা দুজন ঢুকেছেন, এ খবর সব জায়গায় হয়ে গেছে।'

'কিভাবে, আমাদের তো ওরা চিনে না।' বলল কামাল সুলাইমান।

'রিসিপশনে আপনারা সেকশনের কোড নাম্বার বলেছিলেন। এ থেকেই বিষয়টা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। শুধু ঘরের চারজন বোধ হয় জানত না যে, আপনারা দু'জন।'

তারা প্রাইভেট সিঁড়ি দিয়ে উত্তরের প্রাইভেট এক্সিটে নেমে এল।

প্রাইভেট এক্সিটে একজন তরুণী দাঁড়িয়েছিল। আহমদ মুসাদেরকে নিয়ে আসা তরুণী তাকে লক্ষ্য করে বলল, 'এদিক সব ঠিক-ঠাক?'

'জি।'

‘ঠিক আছে তোমার কাজ শেষ। তুমি এখন চলে যাও।’

বলে সে এগুলো দরজার দিকে। দরজায় ডিজিটাল লক। তরুণীটি আনলক করল। দরজা খুলে গেল।

তরুণীসহ আহমদ মুসারা বেরিয়ে এল।

গাড়ির পাশে গিয়ে পৌছল তারা।

মেয়েটি বলল, ‘স্যার আমাকে ওয়াশিংটনের সীমা পর্যন্ত আপনাদের পৌছে দিতে বলেছেন।’

‘ওয়েলকাম।’ আহমদ মুসা বলল।

মেয়েটি পেছন দিকের দুটি দরজা খুলে আহমদ মুসাদের বসিয়ে নিজে গিয়ে ড্রাইভিং সিটে বসল।

গাড়ি ষ্টার্ট নিল।

আহমদ মুসা বলল, ‘গাড়িতে বসার প্রোটোকল তো ঠিক হলো না।’

‘আপনারা মেহমান। আর আমি হোষ্টের পক্ষে আপনাদের সার্ভিস দিচ্ছি। প্রোটোকল ঠিক আছে।’ বলল তরুণীটি।

‘হোষ্ট কে?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘অফিসিয়ালি বলা যাবে না। আর আন-অফিসিয়ালি শুনে কি লাভ।’ বলল তরুণীটি।

গাড়িটি নিউইয়র্ক হাইওয়েতে উঠলে তরুণী একটা ইমারজেন্সি পার্কিং-এ গাড়ি দাঁড় করিয়ে নেমে পড়ল। আহমদ মুসা ও কামাল সুলাইমানও নামল।

কামাল সুলাইমান ড্রাইভিং সিটের পাশের সিটে উঠে বসল।

আহমদ মুসা বলল, ‘আপনি কিভাবে ফিরবেন সে জিজ্ঞাসা জানি অবান্তর। আপনি আপনার ‘স্যার’কে আমার কৃতজ্ঞতা জানাবেন। আর বোনকে কৃতজ্ঞতা জানাব না। কারণ, বোন উত্তরে বলবেন বোন হিসাবে সে দায়িত্ব পালন করেছেন।’

‘আপনি আমাকে বোন বলেছেন? আমি আপনাদের বোন?’ মেয়েটির গলা হঠাৎ ভারী হয়ে গেল। ছলছলিয়ে উঠল তার চোখ। বলল, ‘আমি যে সত্যিই আপনাদের বোন। আমি আয়েশা বেগ মোহাম্মদ।’

‘আপনি মুসলিম?’ আহমদ মুসা বলল বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে।

‘আপনি নয়, ‘তুমি’ বলুন ভাই। হ্যাঁ আমি মুসলিম। তবে মুসলিম নামে আমি চাকুরিতে ঢুকিনি। অনেক চেষ্টা করেও মুসলিম নাম নিয়ে এ ধরনের চাকুরি পাইনি। শেষে আমি ‘আলিশা বার্গম্যান’- এই ইহুদী নাম নিয়েছিলাম। এই নামেই চাকুরি পাই। অবশ্য বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমি আমার মুসলিম নাম ফিরে পেয়েছি। স্যার আমাকে এই সুযোগ করে দিয়েছেন।’

‘আলহামদুলিল্লাহ। কত খুশি হয়েছি বলতে পারবো না। তুমি জান কি কাজে তুমি আমাদের সহযোগিতা করলে?’ আহমদ মুসা বলল।

‘হ্যাঁ। স্যার আমাকে বলেছেন। আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি যে, শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ একটি মহৎ কাজের সামান্য অংশে নিজেকে জড়িত করতে পেরেছি। তবে স্যার আমার মনে একটা প্রশ্ন। সেটা হলো, প্রমাণ যোগাড় যথেষ্ট নয়। প্রমাণগুলোকে আমেরিকার মানুষ এবং গোটা দুনিয়া গ্রহণ করতে হবে। এটা কি করে সম্ভব হবে?’ বলল আয়েশা বেগ মুহাম্মাদ।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘মিথ্যাকে যেভাবে গ্রহণ করানো হয়েছিল, সত্যকে সেভাবেই গ্রহণ করানো হবে।’

‘সেটা কি? বুঝছি না আমি।’ বলল আয়েশা বেগ।

‘দুদিন অপেক্ষা কর। জবাবটা তুমিই বলবে, তোমার কাছ থেকেই শুনব।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আলহামদুলিল্লাহ। আপনার কথা সত্য হোক ভাই সাহেব।’

‘আমিন। আসি বোন। আবার দেখা হবে। আস্সালামু আলাইকুম।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ওয়াআলাইকুমুস সালাম। উইশ ইউ গুড ডেজ ভাইয়া।’

আহমদ মুসা গাড়িতে উঠল। ষ্টার্ট নিল গাড়ি।

‘ভাইয়া আমরা কি যাচ্ছি ডা. আয়েশা আহমদের মামার ওখানে?’ বলল কামাল সুলাইমান।

‘যাব বলেছি। কিন্তু ওরা প্রস্তুত থাকবেন কিনা?’ আহমদ মুসা বলল।

'আমি ডা. আয়েশাকে জানিয়েছিলাম। উনি কনফারম করেছেন আজ বিকেলে অথবা সন্ধ্যার পর যে কোন সময়।' বলল কামাল সুলাইমান।

'ধন্যবাদ, কামাল সুলাইমান। আমরা যদি অফিসিয়াল 'লগ'-এর সাথে সাথে 'গ্লোবাল হক'-এর 'এরিয়াল রুট' ও এই রুটে উড্ডয়নের ছবি পেয়ে যাই, তাহলে আমাদের চেষ্টা ষোলকলায় পূর্ণ হবে।' আহমদ মুসা বলল।

'আল্লাহই করুন তাই যেন হয়। এটা হবে আমাদের জন্যে 'সোবহে সাদেক'।' বলল কামাল সুলাইমান।

'আমিন।' আহমদ মুসা বলল।

কেউ কথা বলল না এর পর। দুজনেই নিরব। দুজনের চোখে-মুখে আশা আনন্দ ও ভাবনার ছাপ। চোখের দৃষ্টি তাদের সামনে। ছুটছে গাড়ি।

কফির পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে পেয়ালা রেখে বলল বৃদ্ধ মরিস মরগ্যান, 'দেখ আহমদ মুসা তুমি একটা জীবন্ত কিংবদন্তী। আমার এ বাড়িটা ধন্য হয়েছে তোমাকে পেয়ে। কিন্তু তোমরা আমাদের আয়েশার বন্ধু। তোমাদের তুমি বলব, কিছু মনে করো না।'

বলে বৃদ্ধ একটা দম নিল। একটু ভাবল। তারপর বলল, 'তোমার কথা শুনলাম আহমদ মুসা। আনন্দিত হলাম যে, একটা মিথ্যার মুখোশ তোমরা উন্মোচন করতে যাচ্ছ। কিন্তু বিশ বছর পর সত্য উদ্ধার করে কি করতে চাও? প্রতিশোধ নিতে চাও, না কালোদাগের বিমোচন চাও? কোনটা বড় তোমাদের কাছে?'

মরিস মরগ্যান ডা. আয়েশা আহমদ এর মামা। 'সেফ এয়ার সার্ভিস'-এর একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সে।

মরিস মরগ্যানের হিলটপস্থ বাড়ির সুন্দর বৈঠকখানায় বসে আহমদ মুসারা তার সাথে গল্প করছে। পূবদিকে চোখ ফেরালেই হাডসন নদীর নীল পানি

চোখে পড়ে। নদীর গা ছুঁয়ে আসা সরস বাতাসের স্পর্শ অনুভব করতে পারছে তারা।

নিউইয়র্ক থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার উত্তরে হাডসন নদীর তীরে সুন্দর পাহাড়ী গ্রাম এই গ্রীন ফিল্ড। চাকুরি থেকে অবসর পাওয়ার পর মরিস মরগ্যান কাউন্ট্রির নিরব পরিবেশে প্রায় বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করছে।

'আমরা একটা অসত্যের অবসান ঘটাতে চাই। মানুষকে জানাতে চাই প্রকৃত সত্য। কোন প্রতিশোধের চিন্তা আমাদের নেই। অপরাধীদের শাস্তির প্রশ্ন আছে। কিন্তু সে দায়িত্ব আমেরিকান সরকারের। এদিকটা আমরা ভাবছি না।' বলল আহমদ মুসা।

'এটাই ভাল। ধন্যবাদ। বিচার চাওয়া ভাল। বিদ্বেষ ভাল নয়। যারা টাওয়ার ধ্বংসের কাজ করেছে, যারা এ নিয়ে মিথ্যাচারের মাধ্যমে উদোরপিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়েছে, তাদেরকে আমি আমার সমগ্র সত্তা দিয়ে ঘৃণা করি। ঘটনার একমাস পর আমি রিটায়ার নিয়েছি। অফার ছিল আরও দুবছর চাকুরি করার। কিন্তু অফার আমি গ্রহণ করিনি। যদিও জানতাম আমার আমেরিকা এজন্যে দায়ি নয়, এমন কি আমাদের সরকারও এর সাথে নেই। একটি স্বার্থের সিন্ডিকেট এই কাজ করেছে। এটা জেনেও করার কিছু ছিল না। আয়োজনটা এমন আট-ঘাট বেঁধে করা হয়েছিল যে, কাউকে কিছু বিশ্বাস করানো সম্ভব ছিল না। তাই নিরবে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলাম।'

'জনাব একটা প্রশ্ন, আপনি ষড়যন্ত্রের কথা কিভাবে বুঝেছিলেন?'

'সেদিন আমার শিফট শুরু হলে 'সেফ এয়ার সার্ভিস'-অবজারভেটরীতে গিয়ে বসেছি। চোখ গেল স্কাই-স্ক্রীনে। হঠাৎ দেখলাম, নিউইয়র্কের আকাশে খালি চোখে দেখা যায় না এমন উঁচুতে আমাদের 'গ্লোবাল হক' দাঁড়িয়ে। তার অনেক নিচে বিপজ্জনক ফ্লাইং লেবেল দিয়ে সিভিল এয়ারলাইনার ছুটে আসছে। 'গ্লোবাল হক' ও 'সিভিল এয়ার লাইনার' এর গতি একই দিকে। ভ্রুকুচকে গেল আমার। 'গ্লোবাল হক'-এর অপ্রতিরোধ্য ম্যাগনেটিক রিমোট কনট্রোল কি কোন হাইজ্যাক করা বিমানকে আটক করেছে? আমি তাড়াতাড়ি অ্যাডিশনাল রেকর্ডার এবং 'রেয়ার ভিউ কলার' চালু করে নিয়ে চোখে তুলে নিলাম ম্যাগনেটিক

গগলস। এই গগলস অদৃশ্য ম্যাগনেটিক ওয়েভ ্রা েতকে রঙীন আলোর আকারে সামনে নিয়ে আসে। আমি গগলস চোখে লাগাতেই দেখতে পেলাম আমার ধারণা সত্য। 'গ্লোবাল হক' থেকে সবুজ আলোর একটা ধারা তীরের মত সোজা নেমে গিয়ে স্পর্শ করেছে সিভিল এয়ার লাইনারকে। প্লেনটি পরিণত হয়েছে একটি আলোকপিন্ডে। সবুজ আলোর ধারাটি প্লেনকে টেনে নিয়ে চলেছে। বুঝলাম, 'গ্লোবাল হক' হাইজ্যাক হওয়া একটা প্লেনের নিজস্ব পরিচালনা ব্যবস্থা এবং হাইজ্যাকারদের মেটালিক ও এক্সপ্লোসিভ সব অস্ত্রকে বিকল করে দিয়ে প্লেনটিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সেফ ল্যান্ডিং এর দিকে। কিন্তু পরক্ষণেই আমি অবাক বিস্ময়ে দেখলাম, প্লেন গিয়ে আঘাত করেছে পাশাপাশি দাঁড়ানো ডেমোক্রাসি ও লিবার্টিং টাওয়ারের মধ্যে ডেমোক্রাসি টাওয়ারকে। আপনা আপনিই আমার কণ্ঠ থেকে একটা চিৎকার বেরিয়ে এল। আমি তাড়াতাড়ি টেলিফোন করলাম আমাদের এয়ার ডিফেন্স হেড অফিসে। এক অপরিচিত কণ্ঠ আমার টেলিফোন ধরল। আমি কম্পিত কণ্ঠে তাকে ঘটনা জানালাম। 'ওকে' বলে সে টেলিফোন রেখে দিল। তার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া না দেখে আমি বিস্মিত হলাম। কে টেলিফোন ধরেছিল, এ যখন ভাবছি এবং দৃষ্টি ফেরাচ্ছি স্কাই স্ক্রীণের দিকে। ঠিক তখনই আমার সামনের স্কাই স্ক্রীনটা অন্ধকার হয়ে গেল। তার সাথে বিদ্যুতও চলে গেল। অবজারভেটরির এ কক্ষের বিকল্প বিদ্যুত ব্যবস্থা সক্রিয় হলো। আলো জ্বলে উঠল কক্ষে আবার। কিন্তু 'স্কাই স্ক্রীন' অন্ধকারই থাকল। আমি টেলিফোন করলাম মেইনটেন্যাস বিভাগে। তারা বলল, আমরা কিছু বুঝতে পারছি না স্যার। সব কিছুই আমাদের ঠিক আছে। কিন্তু কাজ করছে না কোন কিছুই। এটা কি কোন ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক জ্যামিং? আমি আতংকিত হয়ে পড়লাম। আমি এবার টেলিফোন করলাম, আমাদের 'সেফ এয়ার সার্ভিস' বিভাগের চীফ জেনারেল আব্রাহামকে। তিনি বললেন, নিউইয়র্কে একটা বড় ঘটনা ঘটেছে। ইমারজেন্সী চলছে। শীঘ্রই সব জানতে পারবে। তোমার ডিউটি রুমে তুমি অপেক্ষা করবে।' তাঁর কথা আমাকে আরও আতংকে ঠেলে দিল। আমি বুঝতে পারলাম না, ইমারজেন্সী চললে আমাদের স্কাই স্ক্রীন আমাদের কাছে অন্ধকার হয়ে যাবে কেন? এইভাবে আতংক-উত্তেজনার মধ্যে আমার সময়

কাটতে লাগল। এমনি এক সময়ে আমাকে আরও আতংকিত করে দিয়ে আমার অবজারভেটরী কক্ষের দরজা ঠেলে প্রবেশ করল এক মুখোশধারী। গায়ে কালো ওভারকোট, মাথায় কালো হ্যাট। গ্লাভস পরা হাতে তার রিভলবার। সোজা এসে সে আমার পকেট থেকে রিভলবার তুলে নিল। তারপর দ্রুত এগুলো স্কাই বোর্ডের দিকে। স্কাইবোর্ডের কম্পিউটারে তখন ছিল গত কয়েক ঘণ্টার স্কাইমনিটরিং ভিডিও রিপোর্ট। মুখোশধারী লোকটি সবজান্তার মত স্কাই বোর্ড থেকে কম্পিউটার ডিস্ক বের করে নিল। যাবার সময় সে বলল অস্বাভাবিক ভরাট কণ্ঠে, গত এক ঘণ্টার কথা একদম ভুলে যাবে। না হলে স্কাইবোর্ড থেকে ডিস্ক বের করার মত করে তোমার মাথা থেকে মেমরি-মগজ বের করে নেয়া হবে।' বলে বের হয়ে গেল লোকটি। আমার সামনের গোটা পৃথিবী ওলট পালট হয়ে গেল। আতংকিত নয়, ঘটনাটা আমাকে বাকহীন পাথর করে দিল। সম্বিত ফিরে পেলাম টেলিফোন বেজে উঠার শব্দে। ধরলাম টেলিফোন। আমার চীফ বস জেনারেল আব্রাহামের টেলিফোন। তিনি বললেন, 'মি. মরগ্যান, শত্রুরা নিউইয়র্কে আমাদের গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার প্রতীকে আঘাত হেনেছে। ইমারজেন্সী ঘোষণা করা হয়েছে। ডিউটিরুম ত্যাগ করবে না।' আমি তাঁকে এইমাত্র ঘটে যাওয়া ঘটনার পুরো বিবরণ দিলাম। তিনি বিস্ময়ে প্রায় চিৎকার করে উঠলেন। বললেন, 'এত দূরে আমাদের অফিসেও হামলা! তুমি তাড়াতাড়ি সব লিখে আমাকে ফ্যাক্স করো। আমি ওটা আমাদের সিকিউরিটি, গোয়েন্দা ও পুলিশকে দিয়ে তারপর তোমার অফিসে আসছি। আমি লিখিত দিয়েছিলাম। সব বিভাগকে জানানোও হয়েছিল। কিন্তু ফল হয়নি। আমি জানতাম ফল হবে না। জেনারেল আব্রাহাম আমার আগেই রিটায়ার নেন। 'গ্লোবাল হক'-এর সেদিনের ভুমির সাথে 'শত্রুর আক্রমণ তত্ব' আমি মিলাতে পারিনি। সেখান থেকেই আমার সন্দেহ শুরু।' দীর্ঘ বক্তব্য দিয়ে থামল মরিস মরগ্যান।

'অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে ঘটনার অবিশ্বাস্য এক কাহিনী জানার সৌভাগ্য হলো। আর একটা বিষয়, স্কাইবোর্ড থেকে এরিয়াল দৃশ্যের মনিটর রেকর্ড তো ওরা নিয়ে যায় সেদিনই। কিন্তু পরে

‘গ্লোবাল হক’-এর ‘এরিয়্যাল রুট’ ও ‘তৎপরতার’ ছবি কি করে পেলেন?’ আহমদ মুসা বলল।

‘স্কাই বোর্ডের এ রেকর্ড ছাড়াও আমি অ্যাডিশনাল রেকর্ডও শুরু করি। শুরু থেকে ঘটনার দৃশ্য নেবার জন্যে ‘রিভিউ রেকর্ডার’ও চালু রেখেছিলাম। ওরা এটা টের পায়নি। ঘটনা সম্পর্কে আমার মনে সন্দেহ সৃষ্টি হবার পর ঐ দুটি রেকর্ড-ডিস্কের একটা কপি আমি দিয়েছিলাম জেনারেল আব্রাহামকে, আরেকটা কপি আমি রেখে দিয়েছিলাম আমার কাছে। অফিসে ছিল এক কপি। কিন্তু অফিস ও জেনারেল আব্রাহামের কপি হারিয়ে যায়।’ বলল মরিস মরগ্যান।

‘তাহলে আপনার কপির কথা ওরা জানতো না?’ আহমদ মুসা বলল।

‘তাই হবে। আমাকে ওরা সন্দেহও করেনি। কারণ আমি একেবারেই নিরব হয়ে গিয়েছিলাম।

কথা শেষ করেই মরিস মরগ্যান তার পকেট থেকে একটা ইনভেলাপ বের করল এবং তা এগিয়ে দিল আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘মি. আহমদ মুসা এই ইনভেলাপে ‘গ্লোবাল হক’ এর উড্ডয়ন থেকে টাওয়ার ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত অনেকগুলো ছবি আছে এবং একটি ডিস্ক আছে এতে।’

‘ধন্যবাদ জনাব’ বলে ছবির ইনভেলাপ গ্রহণ করার সময় আহমদ মুসা বলল, ‘একটা জিজ্ঞাসা জনাব। এই ঘটনায় গোপন ও কৌশলগত ‘গ্লোবাল হক’ বিমান ব্যবহৃত হবার ব্যাখ্যা কি?’

‘ওটা অনেক উপরের সিদ্ধান্তের ব্যাপার। আমি ঐ ব্যাপারে কিছুই জানি না। তবে যেটা আমি উপলব্ধি করেছি, সেটা হলো, ঐ দিন ‘গ্লোবাল হক’-এর সাপ্তাহিক রুটিন মহড়ার দিন ছিল। প্রতি সপ্তাহে একদিন ‘গ্লোবাল হক’-এর জন্যে রুটিন মহড়া নির্ধারিত। একে সামনে রেখেই ষড়যন্ত্রকারীরা তাদের অপারেশনের দিন ঠিক করে। ‘গ্লোবাল হক’-এর মহড়ার উড্ডয়নকেই বিশেষ অপারেশনের কাজে ব্যবহার করা হয়। আমি নিশ্চিত মনুষ্যবিহীন ‘গ্লোবাল হক’কে ঘাঁটি থেকে যিনি কম্পিউটার কমান্ড দিয়েছেন, তিনি ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত ছিলেন। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো, ঘটনার এক ঘণ্টা পর তিনি রহস্যজনকভাবে নিহত হন। সন্দেহ নেই, কাজে লাগানোর পর তাকে হত্যা করা হয় যাতে অতিগোপনীয়

বিষয়টা বাইরে না যায়। তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্তের সাথে সাথে গ্লোবাল হককে অপারেশনের কাজে ব্যবহারের সকল চিহ্ন তারা মুছে ফেলার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই লক্ষ্যেই সেফ এয়ার সার্ভিস অফিস থেকে 'গ্লোবাল হক' সেদিন কি কাজে ব্যবহার হয়, তার সাক্ষী ফিল্ম ডাকাতি করে তারা নিয়ে যায়।' বলল মরিস মরগ্যান।

'কিন্তু তারা 'সেফ এয়ার অফিস'-এর রুটিন লগ তখন সরায়নি! কেন?' আহমদ মুসা বলল।

'কারণ, দিনটি রুটিন মহড়ার ছিল বিধায় লগে অস্বাভাবিকত্ব কিছু ছিল না তবে সন্দেহ উদ্রেককারী একটা বিষয় ছিল। লগের সাথে ছিল রুটের মনিটরিং রিপোর্টও। এই রিপোর্ট থেকে প্রমাণ হতে পারে টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনার সময় 'গ্লোবাল হক' নিউইয়র্ক ষ্টেটের আকাশে ছিল।' বলল মরিস মরগ্যান।

'ও এ কারণেই তাহলে পরে এই লগকে মিসিং দেখানো হয়।' আহমদ মুসা বলল।

'অবশ্যই, এটাই কারণ।'

কথা শেষ করে একটু থেমেই মরিস মরগ্যান আবার বলে উঠল, 'তোমরা অনেক কথাই জান দেখছি। নিশ্চয় অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছ। একটা দুটো প্রমাণ দিয়ে ওদের কাবু করা যাবে না। ষড়যন্ত্রকারীরা শক্তিমান, বুদ্ধিমান, অর্থবান ও অতুল প্রভাবশালী। তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের সবচেয়ে বড় প্রমাণ কি?'

'বেশি নয় শুধু তিনটি বড় প্রমাণের উপর আমরা ভরসা করছি।' বলে আহমদ মুসা হাইজ্যাকার বলে কথিত ১৪ জনের লাশ উদ্ধার মাউন্ট মার্সি থেকে এবং ধ্বংস টাওয়ারে ডাষ্ট পরীক্ষার রিপোর্ট সম্পর্কে সংক্ষেপে সব কথা মরিস মরগ্যানকে জানাল।

'ও গড! তোমরা অসাধ্য সাধন করেছ। কিন্তু বৎস, তোমরা যা যোগাড় করেছ, সেগুলো তুখোড় যন্ত্র, কিন্তু চালনা করবে কে?' বলল মরিস মরগ্যান।

'সেজন্যে ক্ষেপণাস্ত্রেরও ব্যবস্থা করেছি জনাব। আগামী দুতিন দিনের মধ্যে ক্ষেপণাস্ত্রের কাজ দেখবেন আপনি। প্রার্থনা করুন যেন-আমরা সফল হই।' আহমদ মুসা বলল।

‘ঈশ্বর তোমাদের সাহায্য করুন।’ বলল মরিস মরগ্যান।

‘আমরা উঠতে চাই জনাব।’ আহমদ মুসা বলল।

‘অবশ্যই উঠবে। স্মরণীয় সময় খুব সংক্ষিপ্তই হয়ে থাকে। খুব খুশি হয়েছি তোমাদের দেখা পেয়ে। তাছাড়া জান, আমাদের ভাগ্নীদের সিদ্ধান্তেও আমি খুব খুশি। ধর্ম বিশ্বাসকে নবায়ন করতে চাইলে, তার জন্যে বিশ্বে ইসলামই একমাত্র বিকল্প। তারা তাই করেছে।’ বলল মরিস মরগ্যান।

আহমদ মুসা একটু হাসল। বলল, ‘আমাদের ধর্মে একটা কথা আছে, নিজের জন্যে যা পছন্দ করবে, অন্যের জন্যেও তা পছন্দ করা উচিত। এই কথাকে বোধ হয় এভাবেও বলা যায়, অন্যের জন্যে যা পছন্দ করবে, নিজের জন্যেও তা পছন্দ হওয়া উচিত।’

হাসল বৃদ্ধ মরিস মরগ্যানও। বলল, ‘তুমি অসাধারণ আহমদ মুসা। অত্যন্ত শক্ত কথা তুমি শুধু সহজ করে নয় সুন্দর করেও বলতে পার। কিন্তু এই সুন্দর কথা শোনার সুন্দর বয়স আমার নেই। অস্তাচলের সময়টা শুধু বিয়োগের, সংযোজনের নয়। প্রাকৃতিক বিধানও এটাই।’

আহমদ মুসার চোখে-মুখে নামল গাম্ভীর্যের একটা পাতলা ছায়া। বলল, ‘গতির জগৎ এই পৃথিবীর জন্যে একথা সত্য, কিন্তু মানব জীবনের অস্তাচল চিরন্তন স্থিতির জগতের সোবহে সাদেক মাত্র। মৃত্যুর সিংহদ্বার দিয়ে মানুষ এই স্থিতির জগতে প্রবেশ করে। শেষ নিঃশ্বাসের পূর্ব পর্যন্ত মানুষকে চিরন্তর স্থিতির জগতের জন্যে পাথেয় যোগাড় করতে হয়। এই পাথেয়র প্রকৃতি ও পরিমাণই নিরুপণ করে স্থিতির জগতে তার পাওয়া ও পজিশন কেমন হবে। সুতরাং অস্তাচলের শেষ পর্যন্তও পাথেয়র সংযোজন চলতে হবে।’

‘আহমদ মুসা তুমি পরম দর্শন-তত্ত্বের কথা বলছ। আমি বলেছি মাটির মানুষের অনিত্য জীবনের কথা।’ বলল মরিস মরগ্যান।

‘গতির জগতে দুনিয়ার সবকিছুই অনিত্য। কিন্তু এই জগতের অনিত্য জীবনই অনন্তের পাথেয়। সুতরাং মাটির মানুষের জীবন অনন্তের সাথে সম্পর্কিত, বিচ্ছিন্ন নয়।’ আহমদ মুসা বলল।

বৃদ্ধ মরিস মরগ্যানের চোখে-মুখে আনন্দ ও বিস্ময়ের ছাপ। বলল সে চেয়ারে সোজা হয়ে বসে, 'আমাদের অনিত্য জীবনটা অনন্তের পাথেয় সংগ্রহের জন্যেই, জীবনের অস্তাচল ক্ষয়মান হলেও পাথেয়র সংযোজন এ সময় বাড়িয়ে চলতে হবে, এই তো?'

'ঠিক তাই।' আহমদ মুসা বলল।

হাসল বৃদ্ধ মরিস মরগ্যান। বলল, 'জীবনের উদ্দেশ্য ও পরিণতির দিক দিয়ে তোমার কথা পরম এক সত্য। কিন্তু আমি কথাটা বলেছিলাম জীবনের জৈবিক দিক সামনে রেখে। এখন বল, আমার ভাগ্নীদের জন্যে যেটা ভাল মনে করেছি, সেটা নিজের জন্যে ভাল মনে করলেই কি পাথেয়র ব্যবস্থা আমার হয়ে যাবে?'

'এ প্রশ্নের জবাব তো আপনি দিয়েছেন এই কথা বলে যে, ধর্ম বিশ্বাস নবায়ন করতে চাইলে তার জন্যে ইসলামই একমাত্র বিকল্প।' বলল আহমদ মুসা।

'কিন্তু আমি ধর্ম বিশ্বাসকে নবায়ন বা পুনরুজ্জীবন করতে যদি না চাই?' বলল মরিস মরগ্যান। গম্ভীর কণ্ঠ তার।

মুখ টিপে হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'এইমাত্র আপনি বললেন জীবনের উদ্দেশ্য ও পরিণতির দিক থেকে দুনিয়ার অনিত্য জীবনে আখেরাতের অনন্ত জীবনের জন্যে পাথেয় সংগ্রহের বিষয়টা একটা পরম সত্য। এই পরম সত্যটা মুলত ধর্মের সত্য। একমাত্র ধর্ম অবলম্বন বা অনুসরণ করেই এই পরম সত্য লাভ করা সম্ভব। সুতরাং ধর্ম বিশ্বাসের নবায়ন বা পুনরুজ্জীবন আপনাকে করতেই হচ্ছে।'

সংগে সংগে উত্তর দিল না মরিস মরগ্যান। তার মুখ অসম্ভব গম্ভীর হয়ে উঠেছে। ভারী কোন চিন্তার গভীরে নিমজ্জিত সে। এক সময় সে ধীর কণ্ঠে বলে উঠল, 'আমার প্রায় ৮০ বছরের অচল নিস্ক্রিয় জীবনকালে তুমি আমাকে একি শোনালে আহমদ মুসা! আমার সামনে নতুন এক জীবন বোধের দরজা যে খুলে দিলে তুমি! আমি তো জীবনকে এভাবে কোন দিন দেখিনি! কেউ বলেনি আমাকে এভাবে! এখন মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে নয় ভয় হচ্ছে আমি আমার দুনিয়ার অনিত্য

জীবনকে ব্যর্থ করে দিয়েছি, তার মানে অনন্ত জীবনেও আমি কিছু পাব না, মর্মান্তিকভাবে ব্যর্থ ও বিড়ম্বিত হব আমি সেখানে!' ভারী ও কম্পিত কণ্ঠে সে কথা শেষ করল। তার দুচোখের কোণায় অশ্রু চিক চিক করছে।

শান্ত কণ্ঠে ও সান্ত্বনার সুরে আহমদ মুসা বলল, 'জনাব, সর্বশেষ যে বাক্য দিয়ে আপনি কথা শেষ করলেন, সে ধরনের কথা বলার সময় এখনও আসেনি। আপনার দুনিয়ার জীবন শেষ হয়নি, আখেরাতের অনন্ত জীবন এখনও অজানা দূরত্বে।'

'অজানা দূরত্বে হলেও একথা তো আমি জানি, সে অনন্ত জীবনের জন্যে উপযুক্ত পাথেয় সংগ্রহের অনেক সময় আমার নেই।' বলল মরিস মরগ্যান নরম কণ্ঠে। চোখের কোণায় জমে ওঠা দুফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল তার গন্ড দিয়ে।

'আল্লাহর কাছে 'উপযুক্ত পাথেয়' বিবেচ্য বিষয় সব সময় নয়। যদি তিনি দেখেন তাঁর বান্দা উপযুক্ত পাথেয় সংগ্রহের জন্যে উপযুক্ত যাত্রা শুরু করেছে, কিন্তু যাত্রা শেষ করার সময় তার হয়নি, তাহলে করুণাময় আল্লাহ ফুল মার্ক অর্থাৎ উপযুক্ত পাথেয় তাকে দিয়ে দেন।' এই কথাগুলো বলতে গিয়ে আবেগে ভারী হয়ে উঠল আহমদ মুসার কণ্ঠও।

ওদিকে মরিস মরগ্যান-এর দুচোখ দিয়ে দর দর করে নেমে এল অশ্রু। আকুল কণ্ঠে বলে উঠল, 'সত্যি বলছ আহমদ মুসা! অনন্ত সে জীবন আমি সুন্দর করে পাব? এখনও সফল হবার সময় তাহলে আমার আছে? তাহলে আমার হাত ধর আহমদ মুসা। আমাকে নিয়ে চল 'উপযুক্ত যাত্রা' শুরুর পথে।'

বলে বৃদ্ধ মরিস মরগ্যান জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসার হাত।

মিসেস মরগ্যান অনেকক্ষণ এসে দাঁড়িয়েছে একটু দূরে, মরিস মরগ্যানের পেছনে। সেও শুনছিল উভয়ের কথা অবাক বিস্ময়ে।

সে এবার ধীরে ধীরে এসে স্বামীর পাশে বসল। সে তার হাত ন্যস্ত করল স্বামীর বাহুর উপর।

মরিস মরগ্যান আহমদ মুসার একটা হাত জড়িয়ে ধরলে আহমদ মুসাও দুহাত দিয়ে তার হাত জড়িয়ে ধরেছে।

# ৭

মার্কিন প্রেসিডেন্টের ওভাল অফিস। প্রেসিডেন্ট এ্যাডামস হ্যারিসন তার আসনে বসে। সামনে খোলা একটা ফাইলের উপর তার মনোযোগ নিবিষ্ট। আনন্দ-উৎকণ্ঠার মিশ্র খেলা তার চোখে-মুখে।

এক সময় সে ফাইল ধীরে ধীরে বন্ধ করল। সোজা হয়ে বসল চেয়ারে। তারপর বাম হাত বাড়িয়ে বাম দিকের ডেস্কের এক প্রান্তে রাখা ইন্টারকমের নীল বোতাম চেপে বলল, 'ওঁদের এখন পাঠিয়ে দাও।'

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ঘরে এসে ঢুকল সেক্রেটারী অব ষ্টেট বব.এইচ ব্রুস, সেক্রেটারী অব ডিফেন্স সান্ড্রা ষ্টোন, প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা উপদেষ্টা এলিজা উড, মার্কিন সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান রোনাল্ড ওয়ার্শিটন। সি.আই.এ প্রধান এডমিরাল ম্যাক আর্থার, এফ.বি.আই প্রধান জর্জ আব্রাহাম জনসন এবং সিনেট গোয়েন্দা কমিটির প্রধান আনা প্যাট্রেসিয়া।

সবাইকে স্বাগত জানাল প্রেসিডেন্ট হ্যারিসন। বলল, এই মিটিংটা ২৪ ঘণ্টা আগে হবার কথা ছিল, কিন্তু কাকতারীয়ভাবে মিস এলিজা উড, মিস সান্ড্রা ষ্টোন ও বব. এইচ. ব্রুস তিনজনই ওয়াশিংটনের বাইরে থাকায় মিটিং পিছিয়ে দেয়া হয়। আর আমরা এই সাত সকালে বসেছি তার কারণ হলো, আমার মনে হচ্ছে সকাল দশটার মধ্যেই প্রেসের সাথে আমাদের কথা বলতে হবে।' থামল প্রেসিডেন্ট।

সবাই নিরব। প্রেসিডেন্ট আবার কথা বলল। এফ.বি.আই প্রধান জর্জ আব্রাহাম জনসনকে লক্ষ্য করে বলল, 'মি. জর্জ, লা-মন্ডের কালকের নিউজ আইটেমটা পড়ুন।'

পড়া শুরু করল জর্জ আব্রাহাম জনসন,

'প্যারিস, ১১ই সেপ্টেম্বর। নিউইয়র্ক ষ্টেটের মাউন্ট মার্সি'র রেডইন্ডিয়ান গ্রেভইয়ার্ডের পাশে গোপন একটি গণকবর আবিষ্কৃত হয়েছে।

একজন পুরাতত্ত্ববিদ অধ্যাপকের কৌতূহলমূলক এক খননকালে এই গণকবর আবিষ্কৃত হয়।

গণকবরে ১৪টি কংকাল ছাড়াও হাতের আংগুটি, প্লাষ্টিক মানিব্যাগ, প্লাষ্টিক নেমকার্ড, কয়েন, ইত্যাদিসহ বেশ কিছু এমন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে যা ইতিমধ্যেই সবার মধ্যে প্রবল চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে।

প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে একটা নেমকার্ডে এমন একজনের নাম পাওয়া গেছে যিনি নিউইয়র্কের টুইনটাওয়ার ধ্বংসের হাইজ্যাকার হিসাবে বিমান ধ্বংসের সাথে সাথে নিহত হয়েছে বলে প্রচারিত হয়েছে। প্রাপ্ত একটা আংটিতে এমন একটা আরবী অক্ষর পাওয়া গেছে যা টাওয়ার ধ্বংসকারী বলে কথিত একজন সন্ত্রাসীর নামের আদ্যাক্ষরের সাথে মিলে যায়। এছাড়া খননকারী ও উপস্থিত পুরাতত্ত্ববিদ ও প্রতœতত্ত্ববিদদের প্রাথমিক ধারণায় গণকবরটি বিশ বছরের মত পুরানো হবে।

কংকালগুলো উত্তোলনের পরপরই দাঁত ও দেহাবশেষ এর নমুনা ফরেনসিক পরীক্ষার জন্যে অধ্যাপক নিয়ে গেছেন। অধ্যাপকের ধারণা গণকবরটি রেডইন্ডিয়ান ভিকটিমদেরও হতে পারে। এ প্রেক্ষাপটে মনে করা হচ্ছে ফরেনসিক পরীক্ষার মাধ্যমেই সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে।

তবে এলাকার প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট অধিকাংশের অভিমত হলো, আবিষ্কৃত গণকবরের সাথে নিউইয়র্কের টুইনটাওয়ার ধ্বংসের সম্পর্ক আছে। প্রাপ্ত আরবী নাম, আরবী বর্ণমালা, টাওয়ার ধ্বংসে নিহত ১৪ সন্ত্রাসীর সাথে গণকবরের কংকাল সংখ্যা মিলে যাওয়াই শুধু নয়, গণকবর আবিষ্কারের পর একটি অপরিচিত মহল হঠাৎ তৎপর হয়ে ওঠাকেও পর্যবেক্ষক মহল তাৎপর্যপূর্ণ বলে অভিহিত করছে।

এ বিষয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা গেছে, গণকবর আবিষ্কারের পরদিন নিউইয়র্কের পুলিশ প্রধানকে সাথে নিয়ে দুজন অজ্ঞাতনামা লোক হেলিকপ্টার নিয়ে মাউন্ট মার্সিতে গিয়েছিলেন। ওয়াকিফহাল সূত্রে জানা গেছে, তারা টাকা-পয়সা দিয়ে কংকাল ও প্রাপ্ত জিনিসপত্র গায়েব করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঘটনার সাথে রেডইন্ডিয়ানদের স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় ফেডারেল কমিশন

অফিস ও পুলিশ লিখিত-পড়িতভাবে জড়িত হয়ে পড়ায় এবং কংকালগুলোর অংশবিশেষ পরীক্ষার জন্যে চলে যাওয়ায় তাদের ষড়যন্ত্র সফল হয়নি। মনে করা হচ্ছে, বিশেষ কোন মহলের চাপের ফলে কিংবা প্রভাবিত হয়ে নিউইয়র্কের পুলিশ প্রধান অজ্ঞাতনামা দুজনের সাথে তাদের বা তাদেরই সংগৃহিত হেলিকপ্টারে মাউন্ট মার্সিতে গিয়েছিলেন। পুলিশ প্রধান মি. ওয়াটসন বলতে পারবেন ঐ লোক দুজন কে? পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন, মাউন্ট মার্সি'র গণকবরটি যদি নিউইয়র্কের টাওয়ার ধ্বংসের সাথে সম্পর্কিত হয়ে পড়ে, তাহলে নিউইয়র্কের পুলিশ প্রধানকে যারা মাউন্ট মার্সিতে নিয়ে গিয়েছিল তাদেরও সম্পর্ক আছে টাওয়ার ধ্বংসের সাথে।'

পড়া শেষ করে থামল এফ.বি.আই প্রধান জর্জ আব্রাহাম জনসন। পড়া শেষ হতেই প্রেসিডেন্ট হ্যারিসন ডিফেন্স সেক্রেটারী সান্ড্রা ষ্টোনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি রিপোর্ট নিশ্চয় পড়েছেন?'

'পড়েছি মি. প্রেসিডেন্ট। কিন্তু এটা তো পত্রিকার রিপোর্ট। আমাদের নিজস্ব রিপোর্টও আমাদের সামনে আসা দরকার।' বলল সান্ড্রা ষ্টোন।

প্রেসিডেন্ট হ্যারিসন তার সামনের ফাইল সান্ড্রা ষ্টোনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এফ.বি.আই. এর রিপোর্টটা আপনি সবাইকে পড়ে শুনান।

'ধন্যবাদ মি. প্রেসিডেন্ট' বলে সান্ড্রা ষ্টোন ফাইলটি হাতে নিল। পড়তে শুরু করল সে ঃ

''ক'দিন আগে ড. হাইম হাইকেল উদ্ধার হবার পর তার কাছ থেকেই প্রথম জানা গেল টাওয়ার ধ্বংসের পিছনে তৃতীয় পক্ষের ষড়যন্ত্রের কথা। ড. হাইম হাইকেলকে এই ষড়যন্ত্রকারীরাই কিডন্যাপ করেছিল তার মুখ বন্ধ রাখার জন্যে। বিশ বছর আগে যুবক ড. হাইম হাইকেলও এই ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু পরে তিনি অনুতপ্ত হন এবং সিনাগগে গিয়ে তিনি ঈশ্বরের কাছে তার পাপের কনফেশন করেন। এই কনফেশন রেকর্ড ঘটনাক্রমে ফ্রান্স-জার্মানির প্রাইভেট গোয়েন্দা সংস্থা 'স্পুটনিক' পেয়ে যায়। এই গোয়েন্দা সংস্থা আপনা থেকেই টাওয়ার ধ্বংসের পেছনে প্রকৃত সত্য কি তা উদ্ধারের জন্যে তদন্ত কাজ হাতে নিয়েছিল। ষড়যন্ত্রকারী সেই তৃতীয় পক্ষ সমস্ত রেকর্ড ও দলিল-পত্রসহ স্পুটনিক

অফিস ধ্বংস করে এবং এর সাত গোয়েন্দাকে কিডন্যাপ করে। সম্প্রতি আজোরস দ্বীপপুঞ্জ থেকে তারা উদ্ধার হয়। তারা উদ্ধার হবার পর টাওয়র ধ্বংসের ব্যাপারে আবার তদন্ত শুরু হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতেই ড. হাইম হাইকেল যাতে ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেবার সুযোগ না পায় এজন্যেই ড. হাইম হাইকেলকে কিডন্যাপ করা হয়।

ড. হাইম হাইকেলকে স্পুটনিকের লোকেরাই উদ্ধার করে এবং ড. হাইম হাইকেল টাওয়ার ধ্বংসের ষড়যন্ত্রের সাথে যতটুকু জড়িত ছিলেন, ততটুকু তারা জেনে নেয়। তার ভিত্তিতে তদন্তে এগিয়ে তারা আজ গোটা ষড়যন্ত্রই উদঘাটন করেছে। ভয়ংকর ও উদ্বেগজনক সব তথ্য বেরিয়ে এসেছে। ফরেনসিক পরীক্ষায় প্রমাণ হয়েছে, গণকবর থেকে উদ্ধারকৃত ১৪টি কংকালের সবাই আরব এবং তারা নিহত হয়েছে টাওয়ার ধ্বংসের দিনগত রাতে এক সাথে। টাওয়ার ধ্বংসের ডাষ্ট তারা নিউইয়র্কের তিনটি বিশ্ববিখ্যাত ল্যাবে পরীক্ষা করেছে। তাতে প্রমাণ হয়েছে, বিশেষ ধরনের অতি ক্ষমতাশালী 'সেফ ডেমোলিশ এক্সপ্লোসিভ' দিয়ে দুটি টাওয়ার গুড়িয়ে দেয়া হয়েছে, বিমানের আঘাতটা ছিল লোক দেখানো। সবচেয়ে ভয়ংকর হলো, আমাদের অতি গোপনীয় ও অত্যাধুনিক 'গ্লোবাল হক' বিমান সিভিল এয়ার লাইনস-এর দুটি বিমানকে টেনে নিয়ে টাওয়ারে আঘাত করানোর কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। এই বিমানের সেদিনের অফিসিয়াল লগ-এর ফটোকপিসহ গ্লোবাল হকের সেদিনের 'এরিয়েল রুট' ও 'উড্ডয়ন তৎপরতার' ছবি স্পুটনিকের হাতে পড়েছে। উপরে উল্লেখিত ডকুমেন্টগুলোর কপি আমাদেরও হাতে এসেছে। শুধু 'গ্লোবাল হক' এরিয়েল ফটোগ্রাফ নেই। তবে দুএক দিনের মধ্যে পেয়ে যাব।

ষড়যন্ত্রকারী তৃতীয় পক্ষ সম্পর্কে আমরাও খোঁজ খবর নিচ্ছি। আমরা নিউইয়র্কের পুলিশ প্রধানের সাথে আলোচনা করেছি। যে দুজন মাউন্ট মার্সিতে তাকে সাথে নিয়েছিলেন, তাদের নাম পাওয়া গেছে। একজন আজর ওয়াইজম্যান। তিনি গোপন ইহুদী সংগঠন 'ওয়ার্ল্ড আর্মি'-এর নেতা এবং এখন আমাদের হাজতে বন্দী ইহুদী গোয়েন্দা প্রধান জেনারেল শ্যারনের সে বন্ধু।"

পড়া থামাল সান্ড্রা ষ্টোন। বলল প্রেসিডেন্ট হ্যারিসনকে লক্ষ্য করে, 'মি. প্রেসিডেন্ট রিপোর্ট-এর 'সার সংক্ষেপ' পড়লাম। এরপর বিস্তারিত। পড়ব কি?'

'এখনকার মত সার-সংক্ষেপই যথেষ্ট। ধন্যবাদ আপনাকে।' বলল প্রেসিডেন্ট।

প্রেসিডেন্ট থামতেই সিনেট গোয়েন্দা কমিটির প্রধান আনা প্যাট্রেসিয়া বলে উঠল, 'মি. প্রেসিডেন্ট, গোটা ব্যাপারটা বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত মনে হচ্ছে আমার কাছে। তৃতীয় পক্ষের ষড়যন্ত্রের সাথে মার্কিন সরকারের সম্পর্ক কতটুকু ছিল, এ ব্যাপারে রিপোর্টের সার-সংক্ষেপে কিছু বলা নেই। এ ব্যাপারটাই আমাদের কাছে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যদি এখন প্রেসের সাথে কথা বলতে যাই, তাহলে আমাদের প্রধান কথা হবে এ ব্যাপারেই।'

'ধন্যবাদ মিসেস প্যাট্রেসিয়া। এ বিষয়টা আলোচনার জন্যেই আমরা বসেছি।' বলে প্রেসিডেন্ট এফ.বি.আই প্রধান জর্জ আব্রাহাম জনসনের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল। এ সময় তাঁর ইন্টারকমে লাল একটা সিগন্যাল জ্বলে উঠল। প্রেসিডেন্ট টেলিফোনের রিসিভার হাতে তুলে নিল। ওপারের কথা শুনল। গম্ভীর হয়ে উঠল তার মুখ। উত্তরে শুধু বলল, 'পাঠিয়ে দাও।'

প্রেসিডেন্ট টেলিফোনের রিসিভার রেখে সোজা হয়ে বসে বলল, 'আজকের 'লা-মন্ডে' আসছে। ওতে নাকি বিশাল রিপোর্ট আছে টাওয়ার ধ্বংসের উপর।'

কথা শেষ করেই প্রেসিডেন্ট ঘড়ির স্ক্রীনের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে বলে উঠল, 'এস।'

সেকেন্ডের মধ্যেই একটা ফাইল নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করল প্রেসিডেন্টের একজন পি.এস।

ফাইলটি সে প্রেসিডেন্টের সামনে রেখে বেরিয়ে গেল।

প্রেসিডেন্ট ফাইল থেকে লা-মন্ডে বের করে নিল। দেখল লীড হেডিংটা। শোল্ডারে বলা হয়েছে ঃ 'বৃহত্তম ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচন।' আর আট কলামব্যাপী মূল হেডিং হলো ঃ 'টাওয়ার ধ্বংস করে ডেমোলিশন এক্সপ্লোসিভ ॥ বিমান হাইজ্যাক হয় গ্লোবাল হকের দ্বারা।'

প্রেসিডেন্টের মুখ বিষণœ হয়ে উঠেছে। তাতে কিছু উদ্বেগও ছায়া ফেলেছে। লা-মন্ডে কাগজটা জর্জ আব্রাহামের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, ‘আপনার রিপোর্টে নেই, এমন কি আছে এখানে, সে ব্যাপারে ব্রিফ করুন।’

কাগজটি হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল জর্জ আব্রাহাম জনসন। বলল, ‘মি. প্রেসিডেন্ট আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি।’

জর্জ আব্রাহাম জনসন বেরিয়ে গেল। ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আবার ফিরে এল। বসল। বলল, ‘মি. প্রেসিডেন্ট গোটা রিপোর্টের উপর আমি চোখ বুলিয়েছি। আমাদের রিপোর্টের চেয়ে আলাদা যে দিক তাহলো, লা-মন্ডের রিপোর্টটি বেশি প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ। তাছাড়া তারা ১৪টি কংকালের ফরেনসিক রিপোর্ট আলাদা আলাদা দিয়েছে, আমরা ১৪টা কংকাল মিলিয়ে একটা রিপোর্ট করেছি। অনুরূপভাবে ধ্বংস টাওয়ারের ডাষ্ট তিনটি ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা হয়েছে। পত্রিকা তিনটি ল্যাবরেটরির রিপোর্টই আলাদা আলাদা করে দিয়েছে, আমরা দিয়েছি তিন ল্যাবের একটা সামারি। সিভিল এয়ারলাইন্স-এর দুটি বিমানকে টাওয়ারে হাইজ্যাক করে নিয়ে যাবার জন্যে ‘গ্লোবাল হক’কে কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ পত্রিকা ‘সেফ এয়ার সার্ভিস’এর কর্মকর্তা মরিস মরগ্যান-এর ষ্টেটমেন্ট আকারে বিস্তারিত তুলে ধরেছে। আমরা অতটা পারিনি। তবে একটা জিনিস লা-মন্ডে এক্সক্লুসিভ করেছে, যা আমাদের রিপোর্টে নেই। সেটা হলো ষড়যন্ত্রকারীরা সরকারের চোখে ধুলা দিয়ে কিভাবে ‘গ্লোবাল হক’কে তাদের কাজে ব্যবহার করতে সমর্থ হয়। পত্রিকার বিবরণটা এই রকম ঃ ‘গ্লোবাল হক’ সপ্তাহে একদিন রুটিন মহড়ায় আকাশে উড়ে থাকে। ষড়যন্ত্রকারীরা গ্লোবাল হক’কে ব্যবহারের জন্যে এই দিনটাকেই বেছে নেয় এবং ঐদিন গ্রাউন্ড কমান্ডে ‘গ্লোবাল হক’-এর দায়িত্বে যে ছিল তাকে কৌশলে ঐদিন ছুটি নেয়ানো হয় এবং তাঁর স্থানে ঘুষ খেয়ে আত্মবিক্রি করা একজনকে বসানো হয়। তারই কমান্ডে ‘গ্লোবাল হক’ বিমান হাইজ্যাক করে টাওয়ারে নিয়ে যায়। পরে ঘটনার এক ঘণ্টার মধ্যে তাকে খুন করে চিরতরে তার মুখ বন্ধ করা হয়।’ থামল জর্জ আব্রাহাম।

জর্জ আব্রাহাম থামলে আনা প্যাট্রেসিয়াই প্রথম কথা বলে উঠল। বলল, ‘লা-মন্ডের রিপোর্ট কোথাও কোনোভাবে সরকারকে জড়িয়েছে কিনা?’

‘না জড়ানো হয়নি। বরং সেফ এয়ার সার্ভিস-এর কর্মকর্তা মরিস মরগ্যানের ষ্টেটমেন্ট এবং সর্বশেষ ‘গ্লোবাল হক’-এর গ্রাউন্ড কনট্রোলের যে কথা লা-মন্ডে থেকে বললাম তা মার্কিন সরকারকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।’ জর্জ আব্রাহাম জনসন বলল।

‘কিন্তু মরিস মরগ্যান তার বিবরণ এবং ‘গ্লোবাল হক’ টাওয়ার ধ্বংসে যে ভুমিকা পালন করেছে তার ফটো অফিসিয়ালি উপরে দিয়েও কোন বিচার পাননি, বরং তার বিভাগীয় চীফ প্রতিকার চাইতে গিয়ে ফোর্স রিটায়ারমেন্টের শিকার হয়েছেন তার ব্যাখ্যা কি?’ বলল আনা প্যাট্রেসিয়া।

‘সরকার জড়িত নেই মানে এই কাজ সরকারের সিদ্ধান্তক্রমে হয়েছে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু সরকারের শীর্ষ থেকে নি¤œ পর্যায় পর্যন্ত এক বা একাধিক লোক এই ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত থাকতে পারে। তাদের মাধ্যমে ভূয়া তথ্য, ভূয়া খবর দিয়ে তখন সরকারের কথা ও কাজকে বিপথগামী করা হয়েছে। এবং এই ভাবেই বিনা তদন্তে এবং উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়াই টাওয়ার ধ্বংসের দায় একটা পক্ষের উপর চাপান হয়েছে, তাদের শাস্তিও দেয়া হয়েছে। ষড়যন্ত্রকারীরা এটা পরিকল্পিতভাবে করিয়েছে। লা-মন্ডের রিপোর্টে এ কথা পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে। ড. হাইম হাইকেলের মতে তাদের ষড়যন্ত্রের কয়েকটা দিক ছিল। প্রধান একটা দিক ছিল সরকার ও মিডিয়ায় অবস্থানকারী তাদের লোক দিয়ে এমন কথা বলানো, এমন তথ্য ছড়ানো যাতে করে তাদের পরিকল্পনা অনুসারে সরকারের পদক্ষেপ গ্রহণ অবধারিত হয়ে পড়ে এবং এর পক্ষে জনমতও সৃষ্টি হয়। এটাই ঘটেছে। সরকার ষড়যন্ত্রের বাহন হিসাবে কাজ করেছে, ষড়যন্ত্রকারী হিসাবে নয়।’ জর্জ আব্রাহাম জনসন বলল। জর্জ আব্রাহাম জনসন থামলেও সংগে সংগে কেউ কথা বলে উঠল না।

সোজা হয়ে বসল প্রেসিডেন্ট হ্যারিসন।

বলল, ‘ধন্যবাদ মি. জর্জ। আপনি যেটা বলেছেন, সেটাই সম্ভবত সত্য। কিন্তু ..........।’

প্রেসিডেন্ট কথা শেষ করল না। লাল আলো জ্বলছে তার ইন্টারকম প্যানেলে। কথা বন্ধ করে সবার উদ্দেশ্যে 'মাফ করবেন' বলে টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিল। টেলিফোনে ওপারের কথা শুনে 'ওকে' বলে টেলিফোন রেখে দিল। সবার দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রথমেই জর্জ আব্রাহাম জনসনকে লক্ষ্য করে বলল, আপনার জন্যে মেসেজ আজর ওয়াইজম্যান এবং ইলিয়া ওবেরয় ধরা পড়েছে। আপনার জন্যে আরেকটা সুখবর হলো, তাদের ধরে এফ.বি.আই-এর হাতে তুলে দিয়েছে মি. আহমদ মুসা।' শেষ কথাটা বলার সময় প্রেসিডেন্টের ঠোঁটে এক টুকরো মিষ্টি হাসি ফুটে উঠেছিল।

প্রেসিডেন্ট একটু থামতেই জর্জ আব্রাহাম জনসন কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল। কিন্তু প্রেসিডেন্ট তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'আমার কথা শেষ হয়নি মি. জর্জ।'

'স্যরি স্যার।' বলল জর্জ আব্রাহাম।

'ওয়েলকাম জর্জ।' বলে প্রেসিডেন্ট সবার দিকে মুখ ফিরাল। বলল, 'খবরের আরেকটা সংযোজন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ দুনিয়ার সব টিভি ও রেডিও লা-মন্ডের খবরের ফলাও প্রচার শুরু হয়েছে। আজ ভোর রাত থেকে ফ্রি ওয়ার্ল্ড টিভি টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনার উপর বিস্তারিত রিপোর্ট শুরু করেছে। সকাল থেকে দুনিয়ার সব টিভি চ্যানেলও এর সাথে যোগ দিয়েছে। পার্লামেন্ট সদস্যসহ সব জায়গা থেকে টেলিফোন আসা শুরু হয়েছে। আমি মিটিং-এ আছি বলে সব কল ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে। আমাদেরকে অবশ্যই অবিলম্বে প্রেসের সাথে কথা বলতে হবে। কি বলব এটাই এখনকার বড় প্রশ্ন।'

থামল প্রেসিডেন্ট। তাকাল জর্জ আব্রাহাম জনসনের দিকে। বলল, 'বলুন মি. জর্জ কি যেন বলতে চেয়েছিলেন।'

'মি. প্রেসিডেন্ট, আহমদ মুসা শুধু আজর ওয়াইজম্যান ও ইলিয়া ওবেরয়কেই শুধু ধরলেন না, ড. হাইম হাইকেলকে উদ্ধারসহ গোটা অপারেশনটাই তিনি করেছেন।' জর্জ আব্রাহাম জনসন বলল।

'স্পুটনিক-এর কথা শুনেই এ চিন্তা আমার মাথায় এসেছে। কয়েকজন মুসলিম যুবকের তৈরি স্পুটনিক ইতিহাস সৃষ্টি করবে, আর তার সাথে আহমদ

মুসা থাকবে না, এটা অবিশ্বাস্য। তারপর যখন আজর ওয়াইজম্যানের পাকড়াও করার কথা শুনলাম, তখনি আমার কাছে বিষয়টা দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে গেছে। ধন্যবাদ জর্জ বিষয়টা ফরমালি জানানোর জন্যে।' বলল প্রেসিডেন্ট হ্যারিসন।

কথা বলার জন্যে হাত তুলল সশস্ত্র বাহিনী প্রধান রোনাল্ড ওয়াশিংটন। বলল, 'আহমদ মুসা আমারও ¯েœহের পাত্র। কিন্তু স্যার, আহমদ মুসা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এবার বিপদে ফেলল।'

হাসল প্রেসিডেন্ট। 'মি. রোনাল্ড ওয়াশিংটন আপনি ঠিক বলেছেন। তবে তা ঠিক এই অর্থে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এখন একটা কৈফিয়ত বা ব্যাখ্যা দিতে হবে। কিন্তু আরেক দিক থেকে এই আবিষ্কার মুসলমানদের রাহুমুক্তি ঘটাবার সাথে সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও কলংক মোচন করল। আমেরিকা ও ইউরোপের কিছু লোক ছাড়া দুনিয়ার অবশিষ্ট মানুষ বিশ্বাস করতো টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনা খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘটিয়েছে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্যে। আর এটাও ঠিক যে মার্কিন সরকার তখন এই ঘটনার সুযোগ গ্রহণও করেছিল। তার বড় কয়েকটি একতরফা সামরিক অভিযান-এর সাক্ষী হয়ে আছে। এইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে সন্ত্রাসকে ইস্যু বানিয়েছিল, সে সন্ত্রাসের দায়েই সেও অভিযুক্ত হয়েছিল। বিশ বছর ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই কলংকের বোঝা বহন করে চলেছে। আজ টাওয়ার ধ্বংসের রহস্য উন্মোচিত হওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং মার্কিন জাতি অন্যের যাত্রা ভংগের সেদিনের দায় থেকে মুক্ত না হলেও 'নিজের নাক কেটে' অন্যের 'যাত্রা ভংগ' করতে গিয়েছিল, এই জঘন্য ধরনের দ্বৈত অপরাধের দায় থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু থাক এসব কথা। আমরা আসল কথায় ফিরে আসি। বলছিলাম প্রেস ব্রিফিং-এর কথা। কি বলব সেটা ঠিক হওয়া দরকার।'

'মি. প্রেসিডেন্ট, আমরা প্রেস ব্রিফিং করব, না প্রেস ষ্টেটমেন্ট করব? ষ্টেটমেন্ট রিলিজ করলে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হতে হয় না।' বলল সেক্রেটারী অব ষ্টেট বব.এইচ ব্রুস।

‘সাংবাদিকদের এড়িয়ে লাভ নেই মি. বব। সত্য যেটা সেটাই আমরা বলব। জনগণের কাছে অবশ্যই আমাদের স্বচ্ছ থাকতে হবে। তাছাড়া দেশ, সরকার কোনটার জন্যেই আমি কোন সমস্যা দেখছি না।’ বলল প্রেসিডেন্ট।

‘আমিও তাই মনে করছি মি. প্রেসিডেন্ট।’ বলল সেক্রেটারী অব ডিফেন্স সান্ড্রা ষ্টোন।

প্রেসিডেন্ট নিরাপত্তা প্রধান এলিজা উড, সি.আই.এ প্রধান এডমিরাল ম্যাক আর্থার এবং সশস্ত্র বাহিনী প্রধান রোনাল্ড ওয়াশিংটনের দিকে তাকাল।

তারা একে একে বলল, ‘প্রেসিডেন্টের কথাই ঠিক। সত্যের মুখোমুখি আমাদের দাঁড়ানো উচিত। যতটুকু ভুল ততটুকুকে ভুলই বলতে হবে। এতে আমাদের জাতিগত মর্যাদা আরও সমুন্নতই হবে। গোটা পৃথিবী এই মুহূর্তে উন্মুখ হয়ে আছে আমরা কি বলি তা শোনার জন্যে। আমরা এখন যা বলব, তা শুধু আমাদের নয় গোটা আমেরিকার কথা হয়ে দাঁড়াবে। ব্যক্তিগতভাবে আমরা মিথ্যা বলতেও পারি, সত্য গোপন করতে পারি, কিন্তু জাতির পক্ষে কথা বলতে গিয়ে আমরা তা পারি না। প্রমাণ হচ্ছে আমরা নিজেদের নাক-কেটে অন্যদের যাত্রা ভংগ করিনি। সুযোগ গ্রহণের উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা নিজেরা টুইন টাওয়ার ধ্বংস করিনি। কিন্তু এভাবে আমরা নিজেরা নিজেদের নাক না কেটেও পৃথিবীর অনেক দেশ, অনেক মানুষদের আমরা যাত্রা ভংগ করেছি। সেটা আজ উন্মুখ বিশ্ববাসীর কাছে অকপটে আমাদের স্বীকার করা উচিত। এতে দু’চার জন অখুশি হলেও আমাদের ফাউন্ডার ফাদারসরা খুশি হবেন।’

‘সবাইকে ধন্যবাদ। আমি মানে প্রেসিডেন্ট নিজেই আজ প্রেসিডেন্ট নিজেই আজ প্রেস ব্রিফিং করবেন। মিস এলিজা উড আপনি সবার সাথে পরামর্শ করে একটা ব্রিফিং দাঁড় করান। ঠিক দশটায় হোয়াইট হাউজে সাংবাদিকদের ডাকা হোক।’ একটু থামল প্রেসিডেন্ট হ্যারিসন। তাকাল জর্জ আব্রাহাম জনসনের দিকে। বলল, ‘মি. জর্জ আপনি নিশ্চয় জানেন আহমদ মুসা এখন কোথায়। আপনি নিজে তার কাছে যাবেন। তাঁকে আমার দাওয়াত দেবেন। আজ তাঁর পছন্দমত যে কোন সময় আমি তাঁর সাথে কথা বলতে চাই।’ আবার একটু থামল প্রেসিডেন্ট। কথা বলল আবার জর্জ আব্রাহামকে লক্ষ্য করেই, ‘প্রেসিডেন্টের প্রেস

ব্রিফিং-এর পর ড. হাইম হাইকেল ও মি. মরিস মরগ্যান-এর সাংবাদিক সম্মেলন হবে। সে ব্যবস্থাও করতে হবে।' বলল প্রেসিডেন্ট হ্যারিসন।

'ইয়েস মি. প্রেসিডেন্ট। আপনার নির্দেশ অনুসারে কাজ হবে।' বলল জর্জ আব্রাহাম জনসন।

'ধন্যবাদ জর্জ। সবাইকে ধন্যবাদ।' বলে প্রেসিডেন্ট উঠে দাঁড়াল।

উঠে দাঁড়াল সবাই।

জেফারসন হাউজ।

দুতলার বিশাল লাউঞ্জে কামাল সুলাইমান, ড. হাইম হাইকেল বসে। তাদের সামনের টি টেবিলে ফ্রান্সের দৈনিক লা-মন্ডে পড়ে আছে। আর তাদের সামনে কয়েকটি টেলিভিশন সেট। বিভিন্ন টিভি স্ক্রীনে বিভিন্ন চ্যানেল। কিন্তু তাদের সামনে তাদের বিষয়টাই ঃ ধ্বংস টাওয়ারের অন্তরাল থেকে সত্য উদ্ধার, ষড়যন্ত্রে মুখোশ উন্মোচন।

সবারই দৃষ্টি টিভি স্ক্রীনের দিকে।

'কামাল সুলাইমান, এখনও আমার স্বপ্ন মনে হচ্ছে ব্যাপারটা। এমন কিছু ঘটেছে! ঘটতে পারে! খবরের এমন ভয়াবহ বোমা কোথাও কোন দিন ফাটেনি।' বলল ড. হাইম হাইকেল।

'মিথ্যার প্রাসাদ যত বড় ছিল, যত দৃঢ় ছিল, বোমাটি ততখানিই শক্তিশালী হয়েছে। যাতে মিথ্যার প্রাসাদ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।' কামাল সুলাইমান বলল।

বুমেদীন বিল্লাহ লাউঞ্জে প্রবেশ করল। তার মুখ বিষণœ। একটা সোফায় বসতে বসতে বলল, 'গত রাতে আহমদ মুসা ভাই যে কোথায় গেলেন, এখনও কিছুই জানালেন না তিনি। এদিকে তার নামে তিনটা ই-মেইল এসেছে।' থামল বুমেদীন বিল্লাহ।

কামাল সুলাইমান ও ড. হাইম হাইকেল দুজনেরই মুখে নেমে এল দুশ্চিন্তার ছাপ। কামাল সুলাইমান বলল, 'গত রাতে উনি আজর ওয়াইজম্যানের পিছু নেবার জন্যে বেরিয়েছেন। ব্যাপারটা উদ্বেগেরই বটে। কিন্তু আল্লাহ ভরসা। বর্তমান মিশনের শেষ কাজটি করার জন্যে তিনি বেরিয়েছেন। আল্লাহ তাকে সফল করবেন।'

'আমিন।' বলল ড. হাইম হাইকেল এবং বুমেদীন বিল্লাহ দুজনেই।

'কোত্থেকে ই-মেইল এসেছে? কি ই-মেইল?' জিজ্ঞাসা ড. হাইম হাইকেলের।

'তিনটা ই-মেইল এসেছে। একটা মক্কার রাবেতা আলম আল-ইসলামী থেকে। আর অবশিষ্ট দুটি ই-মেইল এসেছে জোসেফাইন ভাবীর কাছ থেকে। এ দুটি ই-মেইলই জরুরি।' কামাল সুলাইমান বলল।

'জরুরি বিষয়টা কি? আপনারা পড়েছেন তো?' বলল ড. হাইম হাইকেল।

'জি না। ভাইয়ার পার্সোনাল ই-মেইল আমরা দেখি না।' বলল বুমেদীন বিল্লাহ।

কথা শেষ করেই চিৎকার করে উঠল বুমেদীন বিল্লাহ, 'ভাইয়া আসছেন।'

সবাই তাকাল। দেখল, আহমদ মুসা সিঁড়ি দিয়ে দুতলায় উঠে আসছে। সিঁড়ি মুখেই কামাল সুলাইমান ও বুমেদীন বিল্লাহ তাকে জড়িয়ে ধরল।

ড. হাইম হাইকেলও উঠে দাঁড়িয়েছিল। বলল, 'মোবারকবাদ আহমদ মুসা। মানুষ স্বপ্নেও যা ভাবেনি, তা আজ বাস্তব হলো।'

'আজকের হিরো তো বিল্লাহ। তার সাংবাদিকতার 'গোল্ডেন ডে' আজ।' বলল আহমদ মুসা।

'আর এই গোল্ডেন ডে'র মেকার তো আপনি।' বলল বিল্লাহ প্রতিবাদের সুরে।

'না। আজকের গোল্ডেন ডে'র মেকার আমাদের স্যার ড. হাইম হাইকেল। তাঁর দেখানো পথে আমরা হেঁটেছি মাত্র।' আহমদ মুসা বলল।

‘শক্তি, বুদ্ধি কোন কিছুতেই আপনাদের সাথে পারব না। বিনয়েও পারব কি করে? যাক, আজকের দিনের মেকার আমরা কেউ নই, আল্লাহ।’ বলল ড. হাইম হাইকেল।

‘আলহামদুলিল্লাহ।’ সবাই এক সাথে বলে উঠল।

আহমদ মুসা বসতে যাচ্ছিল সোফায়। কামাল সুলাইমান বাধা দিয়ে বলল, ‘ভাইয়া বসবেন না, ভাবীর জরুরি ই-মেইল এসেছে। আগে সেটা দেখুন।’

আহমদ মুসা কোন কথা না বলে ছুটল তার ঘরের দিকে।

আহমদ মুসার মনে তখন নানা কথার ভীড়। কি খবর দিয়েছে ডোনা? সে ভাল আছে তো? গত কদিন ধরে সে একটা খবরের জন্যে উদগ্রীব, সে খবর এল কি?

দ্রুত আহমদ মুসা কম্পিউটার খুলল। ওপেন করল মেইল বক্স।

পরপর দুটি ই-মেইল। পড়ল।

প্রথমটি পড়েই ‘আল-হামদুলিল্লাহ’ বলে সিজদায় গেল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার পেছনে কামাল সুলাইমানরাও আহমদ মুসার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল।

তারা আহমদ মুসাকে সিজদায় যেতে দেখল। সিজদা থেকে উঠলে কামাল সুলাইমান বলল, ‘কি খবর ভাইয়া?’

ঘুরে দাঁড়াল আহমদ মুসা। তার মুখে হাসি, চোখে পানি। বলল, ‘আলহামদুলিল্লাহ। সুখবর। তোমাদের ভাতিজা হয়েছে।’

কামাল সুলাইমান ও বুমেদীন বিল্লাহ ছুটে গিয়ে আনন্দে জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে। কামাল সুলাইমান বলল, ‘আজ খুশির উপর মহাখুশির সংবাদ। ভাতিজার একটা ভাল নাম চাই ভাইয়া। নিশ্চয় ঠিক করেছেন?’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘এ প্রসংগ একটু পরে। তোমার ভাবী দ্বিতীয় ই-মেইলটায় কি লিখেছে পড়ে নেই।’ বলে আহমদ মুসা আবার কম্পিউটারে বসল।

কামাল সুলাইমানরা ঘরের সোফায় গিয়ে বসল।

একটুপর আহমদ মুসা কামাল সুলাইমানদের দিকে ফিরে তাকাল। হেসে বলল, 'নাম করণে একটু জটিলতা আছে।' বলে ঘড়ির দিকে তাকাল। বলল, 'এখন ১২টা বাজতে যাচ্ছে। ঠিক ১২ টা ১ মিনিটে তোমাদের ভাবী ই-মেইলে একটা নাম সাজেষ্ট করবে। আর ঠিক ১২ টা ১ মিনিটে আমিও একটা নাম সাজেষ্ট করব। দুটো নামের মধ্যে লটারি করে একটা নাম ঠিক করা হবে।'

'ই-মেইল কেন ভাইয়া। টেলিফোনে কথা বলুন।' বুমেদীন বিল্লাহ বলল।

'না তা হবে না। কেউ তার নাম আগে বলতে রাজি নয়। কারণ আশংকা হলো, পরে যে বলবে, সে তার নাম আর নাও বলতে পারে।'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আহমদ মুসা আবার বসল কম্পিউটারে।

রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে কামাল সুলাইমানরা। একটু পরপর ঘড়ি দেখছে।

তাদের অপেক্ষার ইতি ঘটিয়ে আহমদ মুসা ঘুরে বসল তাদের দিকে। তার মুখ ভরা হাসি। বলল, 'মিরাকল।'

'মিরাকল! কি ঘটেছে ভাইয়া।' বলল বুমেদীন বিল্লাহ।

'মিরাকল মানে, দুপ্রান্ত থেকে দুজনের চয়েস এক। একই সময়ে দুজনের ই-মেইলে একই নাম সাজেষ্ট করা হয়েছে। দুপক্ষের সাজেষ্ট করা সে নাম 'আহমদ আবদুল্লাহ।' বলল আহমদ মুসা। 'আহমদ আবদুল্লাহ?' বলে দুজনে এক সাথে চিৎকার করে উঠল।

এ সময় ঘরে ঢুকল ড. হাইম হাইকেল। তার হাতে দুটি প্যাকেট।

'কি ব্যাপার এত চিৎকার কেন? 'আহমদ আবদুল্লাহ' কে?' বলল ড. হাইম হাইকেল।

দুজনে এক সাথে বলে উঠল, 'আমাদের নবজাত ভাতিজা।'

'ও! নামকরণ হয়ে গেছে? তাহলে মিষ্টিমুখে তো দেরি করা যায় না?' বলে ড. হাইম হাইকেল কাগজের প্লেটে একটা খেজুর ও একটা করে মিষ্টি সবাইকে বিতরণ করল। বলল, 'হতাশ হবার কারণ নেই, এটা উপস্থিত পরে আরও হবে।'

‘নিউইয়র্কে খেজুর কোথায় পাওয়া গেল এ সময়?’ বলল কামাল সুলাইমান।

‘শুধু খেজুর কেন, নিউইয়র্কে গোটা দুনিয়া পাওয়া যায়।’ ড. হাইম হাইকেল বলল।

তারপর পকেট থেকে দুপিস ক্যান্ডি বের করে কামাল সুলাইমান ও বুমেদীন বিল্লাহকে দিয়ে বলল, ‘ভাতিজার জিনিস চাচারা খেতে পারে, বাপকে দেয়া যাবে না।’

হেসে উঠল সবাই।

‘ভাইয়া, রাবেতা থেকে একটা ই-মেইল এসেছিল, ওটা কি দেখেছেন?’ বলল বুমেদীন বিল্লাহ।

‘দেখেছি, কিন্তু পড়িনি। প্রিন্ট নিয়েছি। এদিকের সব কাজ শেষ হলে পড়ব।’ আহমদ মুসা বলল মুখে একটু হাসি টেনে।

‘তার মানে ভাইয়া, নতুন কোন মিশন.........।’ কামাল সুলাইমান বাক্য শেষ না করেই থেমে গেল।

‘থাক এ কথা এখন। বললাম তো ও প্রসংগটা পরে। আমি এখন একটা জরুরি টেলিফোন করব।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ঠিক আছে ভাইয়া। আমরা পরে আসছি। ভাবীকে আমাদের সালাম ও মোবারকবাদ, আর আহমদ আবদুল্লাহর জন্যে দোয়া দেবেন।’

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কামাল সুলাইমানরা সকলে।

আহমদ মুসা দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে মোবাইলটা হাতে নিতেই রিং হতে লাগল মোবাইলে।

আহমদ মুসা দেখল ডোনা জোসেফাইনের টেলিফোন।

‘আস্সালামু আলাইকুম। মোবারকবাদ জোসেফাইন। কেমন আছ তুমি? কেমন আছ আবদুল্লাহ।’

‘ওয়া আলাইকুমুস সালাম। আমি ও বাচ্চা ভাল, আলহামদুলিল্লাহ। তোমাকে কনগ্রাচুলেশন।’ ওপ্রান্ত থেকে বলল ডোনা জোসেফাইন।

‘আমাকে মোবারকবাদ কেন? অসীম খুশির এক ভান্ডার তুমি উপহার দিয়েছ, তাই হাজারো মোবারকবাদ তোমার প্রাপ্য।’

‘আমাদের এই খুশি তোমার আমার এবং আমাদের আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিতজনদের জন্যেই শুধু, কিন্তু তুমি যে আনন্দ সংবাদ সৃষ্টি করেছ, যে আনন্দ সংবাদ আজ ভোর থেকে হাজারো সংবাদপত্র ও হাজারো টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে পৃথিবীর পৃথিবীর ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে। সে আনন্দ শুধু পৃথিবীর দেড়শ কোটি মুসলমানের নয়, পৃথিবীর সব শান্তি ও সুবিচারকামী মানুষের। তোমাকে লাখো মোবারকবাদ দিলেও তা কম হবে।’

‘জোসেফাইন, আমরা এখন আমাদের কথা বলছি। বাইরের কথা থাক না।’

‘ঠিক বলেছ। কিন্তু ঘর বাহির নিয়েই তো আমাদের জীবন এবং আমাদের আনন্দও। জান, আজ রাতে হাসপাতালের বেডে শুয়ে বারবার তোমাকে মোবাইল করেছি, সকালেও। কিন্তু তোমাকে পাইনি। এক সময় অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। বুক ভরে গিয়েছিল ক্ষোভে। পরক্ষণেই যখন মনে হলো, শান্তির শয্যা ছেড়ে তুমি কাঁটা বিছানো পথে ঘুরে বেড়াচ্ছ, অবিরাম ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছ তোমার জন্যে নয়, আল্লাহর জন্যে, আল্লাহর বান্দাদের জন্যে, তখন হৃদয়ের সকল ক্ষোভ আনন্দের অশ্রু হয়ে বের হয়ে এল দুচোখ দিয়ে। জান, দুনিয়ার কোন কষ্টই এ আনন্দের চেয়ে বড় নয়। আমাদের ঘর বাহির আলাদা নয় কোনো ভাবেই।’

‘ধন্যবাদ জোসেফাইন। তোমার কাছ থেকে এ শক্তি না পেলে আমি এত কাজ করতে পারতাম না।’

‘গতরাত এবং সকালে তুমি কোথায় ছিলে। মোবাইল সাথে নাওনি কেন?’

‘আমি আজর ওয়াইজম্যানের পিছু নিয়েছিলাম। মোবাইল বন্ধ রেখেছিলাম। সকালে তাকে ধরা গেছে। তাকে ধরার পর আমাদের সাফল্য পূর্ণ হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ।’

‘আলহামদুলিল্লাহ। তুমি এখন কোথায়? বাইরে কোথাও, না জেফারসন হাউজে?’

‘জেফারসন হাউজে।’

‘আমাদের সোনামনির খবর সারাকে দিয়েছি। ও এখন ইস্তাম্বুলে।’

‘সারাকে কেমন করে পেলে?’

‘তুমি যখন তার টেলিফোন নাম্বার দিতে পারলে না, তখন ভার্জিনিয়াতে ওঁর আম্মার কাছ থেকে টেলিফোন নাম্বার নিয়েছিলাম।’

‘জোসেফাইন, আবদুল্লাহর কথা যে কিছু বলছ না! বল সে কেমন হয়েছে। আজই ই-মেইলে ওর একটা ছবি পাঠাও!’

‘কেমন আছে বলব না, ছবিও পাঠাব না।’ বলে হেসে উঠল ডোনা জোসেফাইন।

‘আমি তো আসছি। অতএব এই কষ্ট না দিয়ে কিছু বল এবং ছবি পাঠাও।’

‘আমি বলব না। কারণ তার বর্ণনা দেবার মত ভাষা আমার জানা নেই। ছবি পাঠাব না, কারণ ছবি কখনই আসল হয় না।’

‘ধন্যবাদ। তোমার যুক্তি মোক্ষম। দুধের সাধ ঘোলে মিটানো ঠিক নয়। জান্নাত থেকে আসা সোনার টুকরাকে প্রথম সরেজমিনেই স্বাগত জানানো উচিত। আমি আসছি।’

‘তুমি কষ্ট পাচ্ছ। শোন, দুধের সাথে যদি সুন্দর অনুপাতে তরল সোনা মেশাও, তাহলে কেমন রং হবে সেটা সামনে রেখে কল্পনা কর আবদুল্লাহর রং-এর কথা। আর তোমার শিশু চেহারাকে তো তুমি দেখনি, দেখলে বলতাম সে এক শিশু আহমদ মুসা। তবে আব্বা-আম্মা বলেন, ‘ওঁর মুখ আমার মতো, আর চোখ-চুল কপাল তোমার........।’

ডোনা জোসেফাইন কথা শেষ করতে পারল না। তাকে বাধা দিয়ে আহমদ মুসা বলে উঠল, ‘আর বলতে হবে না, আবদুল্লাহর একটি চবি আমি এঁকে ফেলেছি জোসেফাইন।’

‘তোমার মধ্যে এ পরিবর্তন কেন?’ হঠাৎ জিজ্ঞাসা জোসেফাইনের।

‘কি পরিবর্তন?’

‘আমাকে কখনও ‘জোসেফাইন’ ডাকতে না, ‘ডোনা’ বলতে।

‘ডোনার আসন থেকে তুমি এখন অনেক উঁচুতে উঠেছ। পূর্ণ মানুষের এক মহিয়ান-গরিয়ান আসনে এখন তুমি। ছোটবেলার ছোট্ট ডাক নাম ‘ডোনা’র মধ্যে আমার মনে হচ্ছে তোমার এই পরিচয় সার্থক হয়ে উঠছে না। খুব ইচ্ছে করছে তোমাকে ‘জোসেফাইন’ নামে ডাকতে। এই নামেই যেন তুমি আমার কাছে পূর্ণ হয়ে উঠেছো।’ বলল আহমদ মুসা। আবেগে ভারী হয়ে উঠেছে তার কণ্ঠ।

‘ধন্যবাদ।’ বলে একটু থামল জোসেফাইন। তারপর ধীর কণ্ঠে বলল, ‘তুমি অনেক ভাবছ আমাকে নিয়ে। অতদূর থেকে এমন ঘনিষ্ঠভাবে ভাবতে নেই। কষ্ট তাতে বাড়ে। এখন বল ওদিকের কাজ শেষ কিনা? কবে আসছ?’ আবেগ-জড়িত ভারী কণ্ঠ জোসেফাইনেরও।

‘এখানে আমার কাজ শেষ। এখন যা করণীয় তা করবে মার্কিন সরকার। তবে যাওয়ার দিন ঠিক করিনি। সবার সাথে আলোচনা করে দেখি। জানাব তোমাকে। আব্বা আম্মাসহ ওদিকে সবাই কেমন?’

‘ভাল আছেন। জান, মসজিদে নববীর ইমাম সাহেব এসেছিরেন আহমদ আবদুল্লাহকে দেখতে। তিনি কি উপহার দিয়েছেন জান? রূপার ফ্রেমে কাঁচের আধারে রাখা রূপোর প্লেটে খোদিত সোনা বিছানো ইসলামী বিশ্বের একটা মানচিত্র। আহমদ আবদুল্লাহর পাওয়া এটাই প্রথম গিফট।’

‘আলহামদুলিল্লাহ। আব্বার মাধ্যমে ইমাম সাহেবের কাছে আমার সালাম পৌছাবে।’ আহমদ মুসা বলল।

এ সময় দরজায় এসে দাঁড়াল কামাল সুলাইমান। তার হাতে মোবাইল। ইশারায় সে আহমদ মুসাকে জানাল তার টেলিফোন এসেছে। কামাল সুলাইমানের মোবাইলে।

‘জোসেফাইন একটু হোল্ড কর। সম্ভবত আমার টেলিফোন এসেছে। কার টেলিফোন জেনে নেই।’ বলে মোবাইলটা মুখ থেকে নামিয়ে বলল, ‘কার টেলিফোন কামাল সুলাইমান?’

‘এফ.বি.আই প্রধান জর্জ আব্রাহাম জনসন। কয়েকবার আপনার টেলিফোনে চেষ্টা করেছে। না পেয়ে আমাকে টেলিফোন করেছে। কি একটা জরুরি বিষয়।’ বলল কামাল সুলাইমান।

আহমদ মুসা তার মোবাইল তুলে নিল। কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল। কিন্তু তার আগেই ওপার থেকে ডোনা জোসেফাইন বলল, ‘শুনেছি আমি, মি. জর্জ আব্রাহাম জনসন তোমার জন্যে টেলিফোনে অপেক্ষা করছে! এখন রাখছি। পরে টেলিফোন করব। আস্সালামু আলাইকুম।’

‘ওয়া আলাইকুমুস সালাম। ধন্যবাদ জোসেফাইন।’

আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি মোবাইলটা রেখে কামাল সুলাইমানের মোবাইল হাতে নিল।

আহমদ মুসার কণ্ঠ ওপার থেকে শুনতে পেয়েই জর্জ আব্রাহাম জনসন আহমদ মুসাকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল, ‘আসসালামু আলাইকুম। আহমদ মুসা তোমাকে প্রেসিডেন্টের তরফ থেকে এবং আমার তরফ থেকে মোবারকবাদ। তুমি অসাধ্য সাধন করেছো। তোমার জন্যে আমার গর্ব হচ্ছে আহমদ মুসা।’

‘ধন্যবাদ জনাব।’ বলল আহমদ মুসা।

‘অল্পক্ষণের মধ্যে প্রেসিডেন্ট নিজে সাংবাদিক সম্মেলন করছেন টাওয়ার ধ্বংসের প্রসঙ্গ নিয়ে। আর ড. হাইম হাইকেল ও মি. মরিস মরগ্যানের সাথে আমি কথা বলেছি। তারা নিউইয়র্কে আজ একটি সাংবাদিক সম্মেলনে কথা বলতে রাজি হয়েছেন। আমাদের লোকেরা সব ব্যবস্থা করবে। আমরা চাই, তুমি তাদের একটু গাইড করো।’ জর্জ আব্রাহাম জনসন বলল।

‘ধন্যবাদ। খুব ভালো সিদ্ধান্ত হয়েছে। ড. হাইকেল এবং মরিস মরগ্যানের সাংবাদিকদের সাথে কথা বলা খুব জরুরি। আমি ওঁদের সাথে অবশ্যই কথা বলব।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ধন্যবাদ আহমদ মুসা। প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে তোমার জন্যে একটা মেসেজ আছে।’ জর্জ আব্রাহাম জনসন বলল।

‘কি মেসেজ?’

‘তিনি আজ তোমার সাথে কথা বলতে চান। তাঁর সাংবাদিক সম্মেলনের পর যে কোন সময়ে। বিমান বাহিনীর একটা হেলিকপ্টার তোমাকে নিয়ে আসবে। কখন আসতে পারছ, সময়টা আমাকে দাও।’

‘প্রেসিডেন্ট আমাকে ডেকেছেন, আমি কৃতজ্ঞ। তবে আমার গাড়িতে যাব, সামরিক হেলিকপ্টারে নয়। বাদ মাগরিব সাক্ষাতের সময় নির্দিষ্ট করলে ভাল হয়ে জনাব।’

‘হেলিকপ্টারে আপত্তি কেন? দ্রুত আসার জন্যেই এই ব্যবস্থা।’

‘আমি সরকারের কোন মেহমান নই, কিংবা ‘আসামী’ও নই। সরকারি বা সামরিক হেলিকপ্টার আমাকে দেয়া হবে কেন?’ আহমদ মুসা বলল।

‘বুঝেছি তুমি সরকারকে সম্মানিত হবার সুযোগ দিতে চাচ্ছ না। ঠিক আছে, তোমার জন্যে প্রাইভেট হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করছি।’

‘আপনি আপনার বক্তব্যের প্রথম অংশকে যদি সত্যিই ‘মিন’ করে থাকেন, তাহলে সামরিক হেলিকপ্টারেই আমাকে যেতে হবে।’ বলল আহমদ মুসা।

হেসে উঠল জর্জ আব্রাহাম জনসন। বলল, ‘আমি তা ‘মিন’ করিনি আহমদ মুসা। একটু রসিকতা করলাম। তোমার বেসরকারি হেলিকপ্টারে আসাই সব দিক থেকে ভাল হবে।’

‘ধন্যবাদ। তাহলে সময়টা বাদ মাগরিব মানে সাড়ে ছটার দিকে হলেই ভাল হয়।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ধন্যবাদ আহমদ মুসা।’ তখনই তোমার সাথে দেখা হচ্ছে ইনশাআল্লাহ। এখনকার মত শেষ করছি। বাই।’

‘ধন্যবাদ জনাব। বাই।’ বলে মোবাইল রেখে দিল আহমদ মুসা।

ড. হাইম হাইকেল এসে দাঁড়িয়েছিল সেখানে।

আহমদ মুসা তাকে বলল, ‘স্যার আপনি ও মরিস মরগ্যানের সাথে আমার কিছু কথা বলা দরকার। আসুন আমরা বসি।’

‘আমিও সেটাই আশা করছি। কিন্তু তুমি উপস্থিত না থাকলে আমাকে দিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন হবে না।’

আমি নিউইয়র্কে থাকলেও আপনার সাথে সাংবাদিক সম্মেলনে থাকতে পারবো না। তার দরকারও হবে না। যা প্রয়োজন আমরা এখনি আলোচনা করে নিতে পারি।’

বলে আহমদ মুসা এগুলো সোফার দিকে বসার জন্যে। তার সাথে এগুলো সকলেই।

পরবর্তী বই

# কালাপানির আন্দামানে

## কৃতজ্ঞতায়ঃ Mahfuzur Rahman

সাইমুম-৪০

# কালাপানির আন্দামানে

আবুল আসাদ

# ১

আহমদ মুসাকে স্বাগত জানাল হোয়াইট হাউজের চীফ অব প্রোটোকল এ্যালান শেফার্ড।

আহমদ মুসাকে নিয়ে বসাল হোয়াইট হাউজের বৈদেশিক উইং-এর ভিভিআইপি কক্ষে। এ কক্ষেই প্রেসিডেন্ট বিদেশী প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীদের সাক্ষাত দেন।

আহমদ মুসা বসলে এ্যালান শেফার্ড বলল, 'মাফ করবেন স্যার, এক মিনিট, আমি আসছি।'

কিন্তু তার কথা শেষ না হতেই তার হাতের অয়্যারলেস টেলিফোন বেজে উঠল।

ধরল টেলিফোন এ্যালান শেফার্ড। টেলিফোন ধরে শুধু 'ইয়েস স্যার', 'ইয়েস স্যার', বলতে থাকল। সব শেষে বলল, 'আমি ওঁকে নিয়ে যাচ্ছি স্যার।'

কথা শেষ করে কল অফ করে দিল এ্যালান শেফার্ড। তাকাল সে আহমদ মুসার দিকে। তার মুখে কিছু বিব্রত ভাব। বলল সে আহমদ মুসাকে, 'স্যরি স্যার। আপনাকে আর একটু কষ্ট করতে হবে। আসুন আমার সাথে।'

বলে সে ঘুরে দাঁড়াল ঘর থেকে বের হবার জন্যে।

আহমদ মুসাও উঠে দাঁড়াল। চলল এ্যালান শেফার্ডের সাথে।

এ্যালান শেফার্ড আহমদ মুসাকে নিয়ে এল হোয়াইট হাউজের ডোমেষ্টিক উইং-এ। বসাল তাকে ভিভিআইপি কক্ষে। এ কক্ষেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট মার্কিন ভিভিআইপি'দের সাক্ষাত দেন।

আহমদ মুসা বসল। বলল হাসতে হাসতে, 'কোন তৃতীয় স্থানে তো আর যেতে হবে না?'

এ্যালান শেফার্ডের বিব্রত অবস্থা বাড়ল। বলল, 'স্যরি স্যঅর। ভুলটা আমারই হয়েছিল।'

'কিন্তু বুঝতে পারলাম না। 'বিদেশ' থেকে 'স্বদেশ'-এ আসলাম কেন?' আহমদ মুসা বলল।

'স্যার, এটাই তো হবে। আমার মত আপনিও ভুল করছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তো আপনার স্বদেশ। আপনি তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও নাগরিক। আপনি তো ডোমেষ্টিক উইংয়েই আসবেন।' বলল এ্যালান শেফার্ড।

'ও এই কথা। এমন নাগরিক আমি তো প্রতিটি মুসলিম দেশের।' হেসে বলল আহমদ মুসা।

'স্যার, অন্য অনেক দেশের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনা হয় না। মার্কিন নাগরিকরা যে অধিকার ভোগ করে, তা দুনিয়ার অধিকাংশ দেশেই নেই।' এ্যালান শেফার্ড বলল।

আবার অয়্যারলেস বিপ বিপ করা শুরু করল এ্যালান শেফার্ডের।

কথা বলল সে অয়্যারলেসে। কথা শেষ করেই সে ঘুরে তার পেছনের দেয়ালের দিকে এগুলো। দেয়ালের একটা ছবির সামনে দাঁড়াল। ছবিটি দেয়ালে সেঁটে আছে। ছবির বটমে সাপোর্টিং একটা কাঠের প্যানেল। প্যানেলে প্রায় অদৃশ্য কয়েকটা বোতাম। একটা বোতাম টিপল। সংগে সংগে আহমদ মুসার সামনের দেয়ালের একটা অংশ টেলিভিশন স্ক্রীনে রূপান্তরিত হলো। টিভি স্ক্রীনে ফুটে উঠেছে একটা বিশাল ঘরের দৃশ্য। ঘর ভর্তি মানুষ। একটি চেয়ারও খালি নেই। প্রতিটি চেয়ারের সামনে ডেস্ক। ডেস্কে প্রত্যেকের নোটশীট, কলম, রেকর্ডার রেডি। ঘরে ষ্টিল ও টিভি ক্যামেরার বন্যা।

এ্যালান শেফার্ড বলল, ‘স্যার আপনার একটু কষ্ট হবে। প্রেসিডেন্টের ‘meet the press’ অনুষ্ঠান শেষ মুহূর্তে এক ঘণ্টা পিছিয়ে যায়। আর দু’এক মিনিটের মধ্যেই প্রেসিডেন্ট প্রেসের সামনে আসছেন। দুঃখিত স্যার, আপনাকে এক ঘণ্টা বসতে হবে।’

‘দুঃখ নয় মি. শেফার্ড, এটা খুশির বিষয় হলো। প্রোগ্রামটা এক ঘণ্টা পিছিয়ে যাওয়ায় প্রেসিডেন্টের প্রেস ব্রিফিং এখন সরাসরি দেখার আমার সৌভাগ্য হলো।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ধন্যবাদ স্যার। প্রেসিডেন্টের ‘meet the press’ অনুষ্ঠান আপনাকে আনন্দ দিলে আমরা খুব খুশি হবো।’

কথা শেষ করেই ‘এক মিনিট স্যার’ বলে সে বেরিয়ে গেল।

ঠিক এক মিনিটের মধ্যেই সে একটা ট্রেতে দুই মগ কফি এবং দুই হাফপ্লেট ভর্তি ক্র্যাকার নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল।

এ্যালান শেফার্ড আহমদ মুসাকে কফি ও ক্র্যাকার এগিয়ে দিতে দিতে বলল, ‘জর্জ জনসন স্যার বলেছিলেন, এই সময় আপনি কফি পছন্দ করেন।’

‘কারণ বেশির ভাগ ক্ষেতে এই সময় আমি তার মেহমান হয়েছি।’ আহমদ মুসা বলল হাসতে হাসতে।

‘স্যার প্রেসিডেন্ট আসছেন। শুরু হচ্ছে প্রেস ব্রিফিং।’ আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই বলে উঠল এ্যালান শেফার্ড।

আহমদ মুসা টিভি স্ক্রীনের দিকে চোখ ফেরাল। দেখল, প্রেসিডেন্ট হ্যারিসন মঞ্চে তার নির্ধারিত আসনে এসে বসেছেন। মঞ্চে তিনি একাই। মঞ্চের নিচে ডান পাশে তাঁর ক্যাবিনেটের কয়েকজন সদস্য ও তাঁর কয়েকজন পার্সোনাল ষ্টাফ বসেছে।

প্রেসিডেন্ট বসে সকলকে গুড ইভিনিং জানিয়ে কিছুক্ষণ সিনিয়র কয়েকজন সাংবাদিকদের সাথে হালকা মুডে ইনফরমাল কিছু আলাপ করল। এই আলাপেরই এক পর্যায়ে তিনি হঠাৎ সোজা হয়ে বসে বলে উঠল, ‘মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস ইন মিডিয়া, এখন কাজ আমরা শুরু করতে পারি।’

বলে থামল একটু প্রেসিডেন্ট। সামনের ফাইলটার উপর একবার নজর বুলাল। তারপর মাথা তুলল। গম্ভীর মুখ। কিন্তু কোন বিষণ্নতা তাতে নেই। আছে স্থির আস্থা ও অনড় দায়িত্বশীলতার স্ফুরণ। বলতে শুরু করল প্রেসিডেন্টঃ

"মাইডিয়ার ফ্রেন্ডস, বিশ বছর আগে টুইনটাওয়ারের ধ্বংস যেমন নিমিষেই বদলে দিয়েছিল পৃথিবী, তেমনি আজ সকাল হতে শুরু হওয়া সংবাদ-ভূমিকম্প পাল্টে দিয়েছে গতকাল থেকে আজকের অবস্থাকে। কিন্তু মার্কিন সরকারের কাছে এটা কোন অভাবিত বিষয় আকারে আসেনি। বিষয়টি সম্পর্কে আমরা জ্ঞাত হয়েছি। মিডিয়ায় বিষয়টি না এলে আমরা অচিরেই আমাদের জনগণ ও বিশ্ববাসীর কাছে এ নিয়ে কথা বলার জন্যে হাজির হতাম। এই অতিগুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি মিডিয়ায় আসার ফলে আমাদের দেশসহ সবদেশে সবখানে প্রবল জিজ্ঞাসার জন্ম হয়েছে। জিজ্ঞাসাগুলো আমরা অনুধাবন করতে পারছি। এই জিজ্ঞাসার দাবী পূরণ করতেই আপনাদের কাছে ত্বরিত হাজির হওয়ার প্রয়োজন হবে তা আমরা অনুভব করেছি। আমাদের বক্তব্য হবে আপাতত খুবই সংক্ষিপ্ত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত একটি গণতান্ত্রিক দেশের সরকার জনগণের পক্ষে সব দায়িত্ব পালন করা এবং জনস্বার্থে সব দিকে নজর রাখার জন্যে দায়িত্বশীল। কিন্তু এই সরকার সবজান্তা নয় এবং তা হওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া এই সরকার জনগণের হলেও বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যক্তিপ্রবণতা অনেক সময়ই সিদ্ধান্তকারী হয়ে উঠতে পারে। এই ব্যক্তিপ্রবণতা যখন আইন-বিধান লংঘন করে, জাতির স্বার্থ বিঘিœত করে এবং জনগণের ইচ্ছা-আকাক্সক্ষাকে পদদলিত করে, তখন তা হয়ে দাঁড়ায় বিপর্যয় সৃষ্টিকারী অপরাধ। সুতরাং সরকার গণতান্ত্রিক হলেও সে সরকারের কাজ ও সিদ্ধান্তে ব্যত্যয় ও বিপর্যয় ঘটতে পারে, সবজান্তা না হওয়া এবং ব্যক্তির স্বার্থদুষ্ট প্রবণতা- এ দুয়ের যে কোন কারণে। বিশ বছর আগের মর্মান্তিক ঘটনার ক্ষেত্রে আমাদের তদানিন্তন সরকারের এদুটো কারণের কোনটি ক্রিয়াশীল ছিল মার্কিন-জীবনের স্বচ্ছতার জন্যেই তা দিনের আলোতে আসা প্রয়োজন। এ কারণেই আমার সরকার আমাদের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে একটা বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আমরা আশা করছি, এই তদন্তের মাধ্যমে সব প্রশ্নেরই জবাব পাওয়া যাবে, সবকিছুই পরিষ্কার হয়ে যাবে। এই তদন্ত সাপেক্ষে আমাদের ইতিমধ্যেকার অনুসন্ধান থেকে কিছু কথা আমরা বলতে পারি। টুইনটাওয়ার ধ্বংসের পেছনে যে ষড়যন্ত্র ছিল, তার সাথে মার্কিন সরকার কোন ভাবেই যুক্ত ছিল না। ড. হাইম হাইকেল-এর কনফেশন ও তাঁর কনফেশনের ভিত্তিতে ১৪ জন আরবের কংকাল আবিষ্কারসহ যে তথ্য প্রকাশ পেয়েছে এবং তার মাধ্যমেই 'ডিমোলিশন বিস্ফোরক' দিয়ে টুইনটাওয়ার ধ্বংসের যে তথ্য জানা গেছে, তার সাথে মার্কিন সরকারকে কোনও ভাবেই যুক্ত দেখা যাচ্ছে না। অনুরূপভাবে 'সেফ এয়ার সার্ভিস'-এর সাবেক কর্মকর্তা মি. মরিস মরগ্যান-এর সাক্ষ্য থেকেও প্রমাণ হচ্ছে দুটি সিভিল প্লেন হাইজ্যাক ও টুইনটাওয়ারে আঘাত করার জন্যে আমাদের 'এ্যান্টি-হাইজ্যাক' প্লেন 'গ্লোবাল হক' ব্যবহারের ক্ষেত্রেও আমাদের সরকারের কোন ভূমিকা নেই। এই প্লেনকে একটা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে একটা চক্র ব্যবহার করেছিল।

তবে এই ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের বিভিন্ন পর্যায়ে আমাদের তদানিন্তন সরকারের কেউ বা অনেকেই জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে যুক্ত থাকতে পারেন। এটা অনুসন্ধান সাপেক্ষ বিষয়। এটা অনুসন্ধানের জন্যেই আমরা উপচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করেছি।

টুইন টাওয়ার ধ্বংসের ষড়যন্ত্র আমাদের আরেকটি বড় বিবেচ্য বিষয়। যেহেতু এই ষড়যন্ত্র আমাদের মাটিতে হয়েছে এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত টুইনটাওয়ার আমাদের সম্পদ ছিল তাই অপরাধীদের শাস্তি বিধানও আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। ইতিমধ্যেই ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত দুজন শীর্ষ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমরা এ ব্যাপারে তদন্ত কাজ শুরু করেছি। এফবিআই প্রধান জর্জ আব্রাহাম জনসন এই তদন্তে নেতৃত্ব দেবেন। অপরাধীদের মধ্যে যারা জীবিত আছে তাদের অবশ্যই আমরা পাকড়াও করব। উপযুক্ত শাস্তি থেকে কেউই রেহাই পাবে না।

সবশেষে আমি টুইনটাওয়ার ধ্বংসের ষড়যন্ত্র উদঘাটনকারী ইউরোপ-বেজড 'স্পুটনিক' গোয়েন্দা সংস্থাকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। সবচেয়ে

বেশি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ‘স্পুটনিক’-এর হয়ে কাজ করে যিনি গোটা ষড়যন্ত্রকে দিনের আলোতে নিয়ে এসেছেন, সেই আহমদ মুসাকে। তিনি বিশ বছর ধরে জেঁকে বসে থাকা মিথ্যার দূর্গকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন। প্রতিষ্ঠিত করেছেন সত্যকে। এতে ব্যক্তি হিসাবে তাঁর কোন উপকার হয়নি। কিন্তু দেশ হিসাবে, জাতি হিসাবে উপকৃত হয়েছি আমরা মার্কিনীরা। আমাদের জাতির পক্ষ থেকে আমি তাকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

শেষ করার আগে বলতে চাই, আমরা মার্কিনীরা আমাদের ফাউন্ডার ফাদারসদের প্রতিষ্ঠিত আদর্শের প্রতি অনড়ভাবে আস্থাশীল। আমরা ভুল করতে পারি, কিন্তু ভুল শোধরানোর সাহস আমাদের আছে। এই সাহসই আমাদের মার্কিনী জাতির শক্তি। সকলকে ধন্যবাদ।”

প্রেসিডেন্ট কথা শেষ করতেই কয়েকজন দাঁড়িয়ে গিয়েছিল প্রশ্ন করার জন্য। প্রেসিডেন্ট তাদের বসতে বলে গ্লাস থেকে এক ঢোক পানি খেয়ে বলল সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে, ‘আমার বক্তব্যে আমি কোন প্রশ্ন করার অবকাশ রাখিনি। তবু সাংবাদিকরা থাকবেন, কিন্তু কোন প্রশ্ন থাকবে না, এটা স্বাভাবিক নয়। তাই ঠিক করেছি আমি তিনটি প্রশ্নের জবাব দেব। এখন আপনারা ঠিক করুন প্রশ্ন তিনটি কি হবে। পাঁচ মিনিট পরে আমি আসছি।’

বলে প্রেসিডেন্ট উঠে দাঁড়াল। বেরিয়ে গেল কক্ষ থেকে।

তার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল উপস্থিত মন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের পার্সোনাল ষ্টাফরা।

ঠিক পাঁচ মিনিট-এর মধ্যেই প্রেসিডেন্ট সংবাদ কক্ষে প্রবেশ করল এবং তাঁর আসনে ফিরে এল।

প্রেসিডেন্ট তাঁর আসনে বসতেই সাংবাদিকদের প্রথম সারি থেকে ওয়াশিংটন পোষ্টের হোম এ্যাফেয়ার্স এডিটর প্রবীণ সাংবাদিক জ্যাকব জোনস উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ‘মি. প্রেসিডেন্ট, আমরা তিনটি প্রশ্ন আপনার সামনে রেখেছি।’

‘ধন্যবাদ মি. জোনস।’ মুখে হাসি টেনে বলল প্রেসিডেন্ট।

টেবিল থেকে নিয়ে প্রশ্নগুলোর উপর নজর বুলাল প্রেসিডেন্ট।

হাসি ফুটে উঠল প্রেসিডেন্টের মুখে। মুখ তুলে তাকাল প্রেসিডেন্ট সকলের দিকে। বলল, 'উপস্থিত বন্ধুরা, আপনাদের প্রথম প্রশ্ন হলো, 'টুইনটাওয়ার ধ্বংসের রহস্য উদঘাটন সম্পর্কিত মূল রিপোর্ট করেছে ফ্রান্সের দৈনিক 'লা-মন্ডে' এবং 'ফ্রি ওয়ার্ল্ড টেলিভিশন'। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার কি এই রিপোর্ট কনফার্ম করছে?'

'বন্ধুগণ, আমার উত্তর হলো, টুইনটাওয়ার ধ্বংসের ষড়যন্ত্র বিষয়ে মার্কিন সরকারের হাতে যে তথ্য রয়েছে তার ভিত্তিতে লা-মন্ডে ও FWTV -এর রিপোর্টের মূল বিষয়কে আমরা কনফার্ম করেছি। মাউন্ট মার্সি'র গণকবর থেকে উঠানো ১৪টি কংকালের পরিচয়মূলক ফরেনসিক রিপোর্ট এবং ধ্বংস টুইনটাওয়ারের ডাষ্ট পরিক্ষার রিপোর্ট আমাদের কাছে রয়েছে। গ্লোবাল হক-এর সেদিনের লগ এবং উড্ডয়ন রুট ও এর তৎপরতার এরিয়েল ফটোগ্রাফও আমরা পেয়েছি। এসব প্রমাণের সবগুলোই মিডিয়া রিপোর্টের মূল বিষয়কে কনফার্ম করছে।

আপনাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন: টুইনটাওয়ার ষড়যন্ত্র উদঘাটন করতে পারল ইউরোপ থেকে একটা প্রাইভেট গোয়েন্দা সংস্থা। বিশ বছরেও আমাদের এসব গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এই কাজটা করতে পারল না কেন?

আমি আমার উত্তরে এই প্রশ্নটিকে খুবই সংগত বলে অভিহিত করতে চাই। কিন্তু প্রশ্ন সংগত হলেও টুইনটাওয়ার ধ্বংসের ষড়যন্ত্র উদঘাটনের তদন্ত আমাদের গোয়েন্দা বিভাগগুলোর জন্যে স্বাভাবিক ছিল না। তদন্ত অনুষ্ঠানের প্রথম শর্ত হলো, সন্দেহ করা। টুইনটাওয়ার ধ্বংসের পেছনে যে ষড়যন্ত্র আছে, এই সন্দেহ বিশ বছর আগে আমাদের কারও মনেই জাগেনি। রাজনীতিকদের মধ্যেও নয়। সাংবাদিকরা কিছু লিখলে সেটা আমাদের জন্যে চোখ খোলার একটা অবলম্বন হতো। তাও হয়নি। অন্যদিকে স্পুটনিক হলো কিছু মুসলিম ব্যক্তির পরিচালিত একটা গোয়েন্দা সংস্থা। আর মুসলমানরা ছিল টুইনটাওয়ার ধ্বংসের প্রতিপক্ষ। সুতরাং টুইনটাওয়ার ধ্বংসের পেছনে ষড়যন্ত্র আছে এটা তারা শুরু থেকেই মনে করেছে। এই সন্দেহ থেকেই স্পুটনিক সংস্থাটি সত্য উদ্ধারের জন্যে তদন্ত শুরু করে। বলা যায় ঘটনাক্রমেই তারা ড. হাইম হাইকেলের সন্ধান পেয়ে

যায় এবং অবশেষে তারা ষড়যন্ত্র উদঘাটন করতে সমর্থ হয়। এই সুযোগগুলো আমাদের গোয়েন্দা বিভাগ পায়নি এবং সন্দেহ করেনি বলে সত্য সন্ধানের চেষ্টাও তারা করেনি। এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে প্রশাসন ও সরকারের কেউ কেউ ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত ছিল। এ ব্যাপারটা আমাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো ধরতে পারেনি কেন? সরকার ও প্রশাসনের কোন পর্যায় এই ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত ছিল, তা জানতে পারলেই এই জটিল প্রশ্নের জবাব দেয়া যাবে। হতে পারে বিষয়টি চাপা দেবার মত শক্তি তাদের ছিল। এই কারণেই হয়তো টুইনটাওয়ার ধ্বংসের আগাম কিছু তথ্য-প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও সরকার ও প্রশাসন প্রতিরোধ করার জন্যে সামনে এগুতে পারেনি। এই বিষয়গুলো দেখার জন্যেই প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। অপেক্ষা করুন, সব প্রশ্নেরই জবাব মিলবে।'

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর শেষ করে একটু থামল প্রেসিডেন্ট হ্যারিসন। তাকাল হাতের কাগজের দিকে তৃতীয় প্রশ্নের জন্যে।

হাসি ফুটে উঠল প্রেসিডেন্টের মুখে। বলল, 'আপনাদের তৃতীয় প্রশ্ন হলো, অবস্থা ও পরিস্থিতি যাই হোক এটা কি সত্য নয় যে, মার্কিন সরকার ইহুদী বিদ্বেষী আহমদ মুসার সাথে যুক্ত হয়ে ইহুদী বিদ্বেষী অবস্থান নিতে যাচ্ছে?'

বন্ধুগণ আমার উত্তর হলো, 'প্রশ্নটিতে পক্ষ-বিপক্ষের নির্বিচার মেরুকরণ করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্নকর্তার ইতিমধ্যেই জেনে ফেলার কথা টুইনটাওয়ার ধ্বংসের ষড়যন্ত্র উদঘাটনে আহমদ মুসার প্রধান সাহায্যকারী একজন ইহুদী, এবং তিনি ড. হাইম হাইকেল। ড. হাইকেল শুধুই একজন ইহুদী নন, তিনি আমেরিকার শীর্ষ ও সম্মানিত ইহুদী পরিবারের একজন শীর্ষ ও সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। শুধু তিনি নন অনেক সম্মানিত ইহুদী ব্যক্তিত্ব এবার অপূরণীয় ক্ষতি স্বীকার করেও আহমদ মুসাকে সাহায্য করেছে। ইতিপূর্বে বর্তমানে আটক ইহুদী নেতা জেনারেল শ্যারনের ষড়যন্ত্র বানচাল করার ক্ষেত্রেও আহমদ মুসা অনেক সম্মানিত ইহুদী ব্যক্তিত্বের সাহায্য পেয়েছেন। সুতরাং বলা যায় আহমদ মুসা ইহুদী বিদ্বেষী নয় এবং ইহুদীরাও আহমদ মুসা বিদ্বেষী নন। ঘটনাক্রমে কিছু ইহুদীর ষড়যন্ত্রের মোকাবিল আহমদ মুসাকে করতে হয়েছে। বর্তমান ক্ষেত্রেও সেটাই হয়েছে।

এজন্যেই আহমদ মুসা ইহুদীদের সহযোগিতা পেয়েছেন এবং পাচ্ছেন। আর আমাদের ইহুদী বিরোধী অবস্থান নেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিছু ক্রিমিনাল ছাড়া দেশের ইহুদী নাগরিকরা আমাদের সাথে আছেন। জেনারেল শ্যারনের বিরুদ্ধে আমাদের খৃষ্টান নাগরিকদের চেয়ে ইহুদী নাগরিকদেরই বেশি সোচ্চার দেখা গেছে। বর্তমান ক্ষেত্রেও এটাই ঘটবে।'

প্রেসিডেন্ট একটু থামল। সকলের দিকে চাইল। বলল আবার, 'বন্ধুগণ, মার্কিন সরকার মার্কিন জনগণের সরকার। তারা ইহুদীদেরও সরকার, মুসলমানদেরও সরকার। আইন মান্যকারী নাগরিকদের যেমন সরকার ভালবাসবে, তেমনি আইন ভংগকারীদের দেবে শাস্তি। অন্যদিকে সরকারও ভুলের উর্ধ্বে নয়। বিশ বছর আগে টুইনটাওয়ার ধ্বংসের ঘটনার পরে একটা ভুল বা অন্যায় করা হয়েছিল। তার ফলে মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। আমরা দ্বিধাহীন ভাবেই এই ভুল বা অন্যায়ের দায়িত্ব স্বীকার করছি। ধন্যবাদ সকলকে। ধন্যবাদ আমাদের ডাকে হাজির হয়ে আমাদের সহযোগিতা করার জন্যে।'

কথা শেষ করেই প্রেসিডেন্ট উঠে দাঁড়াল।

সংগে সংগেই আহমদ মুসাদের সামনে দেয়ালের টিভি স্ক্রিনটি অফ হয়ে গেল।

আহমদ মুসা স্ক্রিনের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে এ্যালান শেফার্ডকে কিছু বলতে যাচ্ছিল, এ সময় এ্যালান শেফার্ডের অয়্যারলেস বেজে উঠল।

আহমদ মুসা থেমে গেল।

এ্যালান শেফার্ড মুখের কাছে তুলে নিল অয়্যারলেস।

ওপারের কথা সে শুনল। শুধু 'স্যার' 'স্যার' বলা ছাড়া কোন কথা সে বলল না। কথা বলা শেষ হলো।

অয়্যারলেস কল অফ করে দিয়ে সে দ্রুত কণ্ঠে বলল, 'স্যার, মি. প্রেসিডেন্ট সরাসরি এখানে আসছেন। মাফ করবেন স্যার, আমি একটু বাইরেটা দেখি সব ঠিক আছে কিনা।'

বলে এ্যালান শেফার্ড দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

দুমিনিটের মধ্যেই এ্যালান শেফার্ড ঘরে ফিরে এল। বলল, ‘মি. প্রেসিডেন্ট এসে পড়েছেন।’

তার কথা শেষ হওয়ার সংগে সংগেই প্রেসিডেন্টের পারসোনাল সিকিউরিটি এবং পারসোনাল সেক্রেটারী ঘরে প্রবেশ করল।

তারা আহমদ মুসাকে শুভেচ্ছা জানাল।

পি,এস প্রেসিডেন্টের বসার চেয়ার ঠিকঠাক করে টেবিলের উপর নোটশীট ও কয়েকটি ইনভেলাপ এবং একটি কলম রাখল।

আর সিকিউরিটি অফিসার হাতে একটা ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র নিয়ে গোটা ঘরটা একবার চেক করে প্রেসিডেন্টের চেয়ারের অনেকখানি পেছনে গিয়ে দাঁড়াল।

প্রেসিডেন্ট হ্যারিসন প্রবেশ করল ঘরে।

প্রবেশ করে নিজের চেয়ারের দিকে না গিয়ে ‘হ্যালো ইয়ংম্যান, হিরো অফ দি টাইম’ বলে আহমদ মুসার দিকে এগিয়ে এল।

আহমদ মুসা আগেই উঠে দাঁড়িয়েছিল এবং কয়েক ধাপ এগিয়ে ছিল।

প্রেসিডেন্ট সামনে চলে এলে আহমদ মুসা হাত বাড়াল হ্যান্ড শেকের জন্যে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট দু’হাত বাড়িয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল এবং ডান হাত দিয়ে পিঠ চাপড়ে বলল, ‘কনগ্রাচুলেশন আহমদ মুসা। ঈশ্বর নিশ্চয় তোমাকে বিশেষ বিশেষ কিছু কাজের জন্যে বেছে নিয়েছেন। আমার আমেরিকার পক্ষ থেকে তোমাকে ধন্যবাদ।’

‘আমাকে আপনার সাথে সাক্ষাতের এই সুযোগ দেয়া এবং আমাকে সাহায্য সহযোগিতা করার জন্যে আপনাকে এবং আমেরিকাকে ধন্যবাদ মি. প্রেসিডেন্ট।’ বলল আহমদ মুসা।

প্রেসিডেন্ট আহমদ মুসাকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে পরে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল।

প্রেসিডেন্ট চেয়ারে বসার পর প্রেসিডেন্টের পার্সোনাল সেক্রেটারী ও সিকিউরিটি অফিসার ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

প্রেসিডেন্ট চেয়ারে বসেই বলল, ‘আমেরিকা তোমাকে সাহায্য করল কখন?’

‘মি. প্রেসিডেন্ট, ড. হাইম হাইকেল আমেরিকান, মরিস মরগ্যান আমেরিকান, প্রফেসর আরাপাহো আমেরিকান, সান ওয়াকার আমেরিকান, মাউন্ট মার্সিতে যারা আমাদের সাহায্য করেছেন, মিলিটারি হিষ্ট্রি মিউজিয়ামে যিনি আমাদের জীবন বাঁচিয়েছেন, তারা সবাই আমেরিকান। সর্বোপরি যার আশ্রয়, প্রশ্রয় ও সাহায্য না পেলে এগুনোই সম্ভব হতো না সেই সম্মানিত ব্যক্তি জর্জ আব্রাহাম জনসনও আমেরিকান। সুতরাং আল্লাহর সাহায্য বাদ রাখলে আমার যে সাফল্য তা এই মহান আমেরিকানরাই এনে দিয়েছেন।’

গাম্ভীর্য নামল প্রেসিডেন্টের মুখে। বলল, ‘এই আমেরিকানদের জন্যে আমিও গর্বিত আহমদ মুসা।’

তারপর ঠোঁটে এক টুকরো মুচকি হাসি টেনে বলল, ‘তবে জর্জ জনসন তোমাকে আমেরিকান হিসাবে সাহায্য করেননি, তিনি সাহায্য করেছেন তাঁর এক পুত্রকে।’

‘সত্যি মি. প্রেসিডেন্ট, তিনি আমাকে তার পুত্রের মত ভালবাসেন। আমি ভাগ্যবান যে, আমি তার এ ভালবাসা পেয়েছি।’ বলল আহমদ মুসা আবেগ জড়িত গম্ভীর কণ্ঠে।

‘শুধু তিনি নন আহমদ মুসা। মিসেস জনসন যে বিশেষ খাবার তৈরি করে, কেক তৈরি করে নিউইয়র্কে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন, এটা আমি জানি।’ বলল প্রেসিডেন্ট।

‘অবশ্য তিনি তা পাঠাবেন। তিনি তো আমার মা।’ মিষ্টি হেসে আহমদ মুসা বলল।

হাসল প্রেসিডেন্ট। বলল, ‘শুধু মা হিসাবে তাঁকে দখল করনি। মা ও তার পরিবারের বিশ্বাসও তো তুমি পাল্টে দিয়েছ।’

‘ধর্ম বিশ্বাস?’

‘হ্যাঁ।’

‘কিভাবে?’

‘কেন তুমি জান না, তারা গোটা পরিবার ইসলাম গ্রহণ করেছে?’

'না মি. প্রেসিডেন্ট, এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। তারা তো কিছুই বলেননি আমাকে?'

'আশ্চর্য! তুমি জান না এত বড় ঘটনা? তুমি ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে তাদেরকে কোন সময় কিছু বলনি?' বলল প্রেসিডেন্ট। তার কণ্ঠে বিস্ময়।

'ইসলামের বিভিন্ন দিক নিয়ে দু'চারটা কথা কখনও কখনও বলেছি। এর বেশি কিছু নয়। আমি তাঁদের ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে কোন সময়ই কিছু বলিনি।'

প্রেসিডেন্ট হাসল। বলল, 'আহমদ মুসা, কোন আদর্শের দিকে আহ্বান দুভাবে হতে পারে। একটা হলো, মুখে বা লিখিতভাবে বলা, আরেকটার মাধ্যম দৃষ্টান্ত উপস্থাপন। তুমি মুখে তাদেরকে ইসলামের পরিচয় বলনি, কিন্তু তোমার মধ্যে তারা জীবন্ত ইসলামকে দেখেছে। সেই ইসলামই তাদের আকৃষ্ট করেছে, যেমন আকৃষ্ট করেছে ড. আয়াজ ইয়াহুদ, ড. হাইম হাইকেল, মরিস মরগ্যান, প্রফেসর আরাপাহোদের পরিবারসহ সান ওয়াকারদের মত তোমার সান্নিধ্যে আসা বহু পরিবারকে।'

বিস্ময় ফুটে উঠেছে আহমদ মুসার চোখে-মুখে। বলল, 'মি. প্রেসিডেন্ট, আমি শুধুমাত্র সান ওয়াকাররা ছাড়া আর কারো বিষয়ে কিছুই জানি না। তাদের সবার ব্যাপারে নতুন কিছু জানেন?'

হাসল আবার প্রেসিডেন্ট। বলল, 'আহমদ মুসা, তোমার দৃষ্টি সামনে। তুমি যে পথ মাড়িয়ে যাও, সেদিকে আর ফিরে তাকাও না তুমি। কিন্তু আমি দেশের প্রেসিডেন্ট। সব জানতে হয় আমাকে।'

'ধন্যবাদ মি. প্রেসিডেন্ট। আমার একটা কৌতুহল, জানার একটা ফল আছে, ইতিবাচক বা নেতিবাচক যেটাই হোক। আপনার মধ্যে এই জানার ফলটা কি ধরনের?'

হো হো করে হেসে উঠল প্রেসিডেন্ট। বলল, 'তুমি আমাকে ফাঁদে ফেলতে চাও আহমদ মুসা। ওটা বলব না। প্রেসিডেন্সিয়াল সিক্রেট ওটা। তবে এটুকু বলতে পারি, তুমি সত্যিই একটা বিস্ময়। ধর্ম-নিরপেক্ষ-মানবতা ও ধর্মনিরপেক্ষ-গণতান্ত্রিকতার এই জয়-জয়কারের যুগে তুমি একটা ধর্মকে সংগ্রাম,

সুবিচার ও মানবিকতার অচ্ছেদ্য এক দ্রবণ হিসাবে তুলে ধরেছ। আমি বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করছি আহমদ মুসা।’

কথা শেষ করেই প্রেসিডেন্ট আবার বলে উঠল, ‘এই বিষয়টা এখন থাক আহমদ মুসা। এস, আমরা অন্য কথায় যাই।’

একটু থামল প্রেসিডেন্ট। তারপর বলল, ‘আমার প্রেস ব্রিফিং-এ বলা দরকার ছিল, এমন কিছু বাদ পড়েছে কিনা?’

‘না জনাব। তেমন কিছুই বাদ পড়েনি। সব দিকের সব কথা সুন্দরভাবে এসেছে। প্রেস ষ্টেটমেন্টের সাথে তিনটি প্রশ্নের উত্তর কোন প্রশ্নেরই অবকাশ রাখেনি। মুসলমান ও আমার অবস্থানটা সুন্দরভাবে তুলে ধরায় আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ মি. প্রেসিডেন্ট।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আমি তোমাদের কোন ফেভার করিনি যে, ধন্যবাদ দিতে হবে। আমি একটা সত্যকে সত্য হিসাবে তুলে ধরেছি মাত্র।’

‘ধন্যবাদটা আপনাকে এই জন্যেই মি. প্রেসিডেন্ট।’

‘এশিয়া, আফ্রিকায় আমার প্রেস ব্রিফিং-এর প্রতিক্রিয়া কি হবে বলে মনে কর?’

‘আমেরিকাকে তারা আসল রূপে ফিরে পাবে মি. প্রেসিডেন্ট। এতে আমেরিকা তাদের মাথা থেকে পড়ে গেলেও তাদের হৃদয়ে স্থান পাবে। ভুল বা অন্যায়ের দায়িত্ব স্বীকারমূলক যে উক্তি আপনি করেছেন, তা আমেরিকাকে দুর্বল নয়, আরও শক্তিশালী করেছে।’

‘ধন্যবাদ আহমদ মুসা। তোমার কথা সত্য হোক। আমরা আমাদের ফাউন্ডার ফাদারসদের দেখানো পথেই চলতে চাই।’

বলে প্রেসিডেন্ট একটু থামল। তারপর আহমদ মুসার উপর সরাসরি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলল, ‘তোমার সাথে সাক্ষাত করার ইচ্ছা ছাড়াও আরও দুটি প্রয়োজনে তোমাকে কষ্ট দিয়েছি।’

‘বলুন মি. প্রেসিডেন্ট।’ আহমদ মুসা বলল।

প্রেসিডেন্ট টেবিল থেকে একটা ইনভেলাপ তুলে নিয়ে আহমদ মুসার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, ‘এতে জুনিয়র আহমদ মুসা মানে আহমদ আবদুল্লাহর

মার্কিন পাসপোর্ট আছে। আমাদের সরকার তাকে অভিনন্দন জানাবার সাথে সাথে তাকে মার্কিন নাগরিকত্ব দিয়ে ধন্য হতে চায়।'

আহমদ মুসা ইনভেলাপ থেকে পাসপোর্ট বের করে পাসপোর্ট খুলে তাতে আহমদ আবদুল্লাহর ছবি দেখে ছবিতে একটা চুমু খেয়ে বলল, 'এই সময়ের মধ্যে আপনারা কি করে এঁর ছবি পেলেন মি. প্রেসিডেন্ট?'

'আমরা সৌদি সরকারকে অনুরোধ করেছিলাম। আমাদের অনুরোধের এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা ছবি পেয়ে গেছি।'

'ধন্যবাদ মি. প্রেসিডেন্ট, পৃথিবীর এক সদ্যজাত অতিথিকে এই মর্যাদা দেয়ার জন্যে। আল্লাহ তার জন্যে এটা কল্যাণকর করুন।' আবেগে ভারী আহমদ মুসার কণ্ঠ।

'ওয়েলকাম আহমদ মুসা' বলে প্রেসিডেন্ট দ্বিতীয় একটি ইনভেলাপ তুলে ধরল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'এটা তোমাকে ও তোমার পরিবারকে আমাদের মেহমান হিসাবে আমেরিকা সফরের আমন্ত্রণ। তোমরা মার্কিন নাগরিক হিসাবে যে কোন সময় আমেরিকা সফর করতে পার। কিন্তু এটা বিশেষ আমন্ত্রণ। আগামী মাসে ওয়াশিংটনে 'এডাম এন্ড ইভ' সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সম্মেলনের শ্লোগান হবে 'এক পরিবারের সন্তান আমরা ভালবাসি সবাই সবাইকে।' এই সম্মেলনে তোমাদের দাওয়াত। শুধু আহমদ মুসার স্ত্রী হিসাবে নয়, ফরাসী রাজকুমারী হিসাবে ম্যাডাম আহমদ মুসা একটা নারী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন। এই দাওয়াত তোমরা গ্রহণ করলে বাধিত হবো।'

আহমদ মুসা একটু ম্লান হাসল। বলল, 'আমেরিকা সফরের দাওয়াত আমরা গ্রহণ করলাম। কিন্তু দুঃখিত যে, আগামী মাসে আমরা আসতে পারবো না। আমি তখন থাকব আন্দামানে। এখান থেকে আমি সৌদিআরব যাচ্ছি। তারপর সেখান থেকে যাবো আন্দামানে।'

'আন্দামানে কেন? আরও পরে সেখানে যাও।' বলল প্রেসিডেন্ট।

'না জনাব। বিষয়টা জরুরী। ওখানকার কাজ সেরে আমেরিকা আসবো, এটা হতে পারে।'

'তুমি যে বিষয়টাকে জরুরী ভাবছো, তা অবশ্যই জরুরী এবং এই প্রোগ্রাম তোমার বাতিল করা ঠিক হবে না এটাও আমি জানি। কিন্তু আহমদ মুসা, তোমার তো নিশ্চিত একটা রেষ্ট দরকার।'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'কাজ ও রেষ্টের ব্যবস্থা আল্লাহ এক সাথেই করেছেন। দিনে কাজ, রাতে রেষ্ট-এটা আল্লাহর দেয়া অবকাশ যাপনের একটা স্থায়ী ব্যবস্থা। এর বাইরে মানুষের রেষ্টের আসলেই কোন প্রয়োজন নেই।'

হাসল প্রেসিডেন্ট। বলল, 'ঠিক আহমদ মুসা, তোমার এই কথা ভেবে দেখার মত?'

'একটা অনুরোধ করতে পারি প্রেসিডেন্ট?'

'বল। এই প্রথম তোমার কাছ থেকে একটা অনুরোধ পেলাম।'

'মার্কিন নাগরিক হিসাবে আন্দামান-এর জন্যে আমার একটা পাসপোর্ট প্রয়োজন।'

'জানি, আন্দামান ভারতের নানা বিধি-নিষেধের আওতাধীন একটা এলাকা। এ জন্যেই হয়তো তুমি এই অনুরোধটা করেছ। আমি আনন্দিত যে তোমার একটা অনুরোধ পেয়েছি। মনে কর ভিসা তুমি পেয়ে গেছ। আজ পাসপোর্ট দিয়ে যাও। কালকে ভিসা করে পাসপোর্ট তোমাকে পৌছে দেব।'

'ধন্যবাদ মি. প্রেসিডেন্ট।' বলল আহমদ মুসা।

'আমার একটা কৌতুহল হচ্ছে আহমদ মুসা।'

'বলুন মি. প্রেসিডেন্ট।'

'আন্দামানে নিশ্চয় বড় কোন কাজ। কাজটা কি জানতে কৌতুহল হচ্ছে, যদি তাতে তোমার কোন ক্ষতি না হয়।' বলল প্রেসিডেন্ট।

'ক্ষতির কোন প্রশ্ন নেই মি. প্রেসিডেন্ট। আমি মক্কার রাবেতায়ে আলম আল-ইসলামী থেকে ই-মেইল পেয়েছি। ই-মেইলে আন্দামান নিকোবর দ্বীপে উদ্বেগজনক পরিস্থিতির বিবরণ দেয়া হয়েছে। কিছুদিন আগে আন্দামানের একটা দ্বীপ থেকে রাবেতার অফিস রাতারাতি ভৌতিকভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। পোর্ট ব্লেয়ার থেকে অল্প দূরে একটা ছোট সবুজ দ্বীপ রাবেতা ভাড়া নিয়েছিল। সেখানে গড়ে তুলেছিল কাঠের তৈরি একটা অফিস কমপ্লেক্স। তার সাথে একটা মসজিদ

এবং আবাসিক ইসলামী স্কুল। এমন ভাবেই উচ্ছেদ করা হয়েছে রাবেতার অফিস যে সেখানে কোনদিন কিছু ছিল তার প্রমাণ নেই। গাছগাছালি লাগিয়ে ও অনেক চারাগাছের সমাবেশ ঘটিয়ে জায়গাটাকে নার্সারিতে পরিণত করা হয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, সরকারী ফাইল ও রেকর্ড থেকে রাবেতা যে দ্বীপটা ভাড়া নিয়েছিল তার কাগজপত্র ও প্রমাণ সব উধাও হয়ে গেছে। রাবেতার লোকদের কিছু সংখ্যক মুখোশধারী সেই রাতেই একটা জাহাজে তুলে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছে। এই ঘটনায় আন্দামানের গভর্নর জেনারেলের অফিস ও পুলিশ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে। পুলিশ তদন্ত হাতে নিয়েছিল। কিন্তু তদন্ত আগায়নি। পুলিশ ভয় পাচ্ছে এগুতে। ঘটনা এটুকুতেই থেমে নেই। সবুজ দ্বীপের ঐ ঘটনার আগে ও পরে মিলে কয়েক ডজন মুসলিম ব্যক্তিত্ব আন্দামানে মারা গেছে। আন্দামানের এ ঘটনাগুলোকে আগে তেমন গুরুত্ব দেয়া হয়নি। স্বাভাবিক ও কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মনে করা হয়েছে। কিন্তু সবুজ দ্বীপের ঘটনার পর পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটেছে এবং মুসলিম ব্যক্তিত্বদের বিচিত্রভাবে মারা যাবার ঘটনা ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ছে। অধিকাংশই ডুবে মারা যাচ্ছে। প্রচার করা হচ্ছে, এরা সবাই 'আরাম চৌগলা' ও 'জরুডান্ডা' নামক অপদেবতার রোষে পড়ে মারা যাচ্ছে। আন্দামানের প্রাচীন বিশ্বাস অনুসারে যারা হঠাৎ মাটিতে মারা যায় তারা ডাঙার অপদেবতা 'জরুডান্ডা' এবং যারা হঠাৎ পানিতে মারা যায় তারা পানির অপদেবতা 'আরাম চৌগলা' কর্তৃক নিহত হয়। সবচেয়ে বড় উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে 'শাহজাদা আহমদ শাহ আলমগীর' নামের অত্যন্ত জনপ্রিয় এক মুসলিম তরুণের নিখোঁজ হওয়া নিয়ে। এই শাহজাদা আহমদ শাহ আলমগীরের দাদা মোগল শাহজাদা ফিরোজ শাহ ছিলেন ১৮৫৭ সালের প্রথম আজাদী সংগ্রামের একজন সংগঠক। দেশীয় রাজা ও জমিদারদেরকে বৃটিশের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করার জন্যে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। এরপর বিচারে তাকে যাবজ্জীবন কারাদ- দিয়ে আন্দামানে নির্বাসন করা হয়। সংগ্রামী এই মোঘল শাহজাদার নাতি হিসাবে শুধু নয়, শাহজাদা আলমগীরের যোগ্যতা ও ব্যবহারের জন্যেই সে ধর্ম মত নির্বিশেষে সকল আন্দামানবাসীর প্রিয় হয়ে উঠেছিল। দ্বীপের গভর্নর বালাজী বাজী রাও মাধবের মেয়ে সুষমা রাও-এর সাথে তার খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল। উভয়ে ভারতের

মেইন ল্যান্ডের দুটো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তো। শাহজাদা আলমগীর নিখোঁজ হবার পর সুষমা রাওকেও জনসমক্ষে দেখা যাচ্ছে না। ভারত থেকে CBI এর লোকরা গোটা বিষয়ের তদন্তের জন্যে আন্দামানে এসে দুদিন থেকেই অজ্ঞাত কারণে ফেরত চলে গেছে। এই অবস্থায় দ্বীপের মুসলমানদের জীবনে উদ্বেগ ও আতংকের অন্ধকার নেমে এসেছে। তাদের পাশে দাঁড়াবার আজ কেউ নেই।'

দীর্ঘ এই বক্তব্য দেয়ার পর একটু থামল আহমদ মুসা। শেষ কথাগুলো বলার সময় আবেগে তার কণ্ঠ ভারী হয়ে উঠেছিল। একটু থামার পর আহমদ মুসা আবার বলে উঠল, 'আমি কি করতে পারব তা আমি জানি না। কিন্তু সব দেখার জন্যে, বোঝার জন্যে এবং সম্ভব হলে কিছু করার জন্যে আমি সেখানে যেতে চাই।'

'সত্যি আহমদ মুসা সেখানে তোমার যাওয়া উচিত। ভারতের গণতান্ত্রিক সরকার অনেক দিক দিয়েই দক্ষ, কিন্তু সংখ্যালঘু বিশেষ করে মুসলিম সংখ্যালঘুদের প্রশ্ন আসলে সরকারের আইন সেখানে অকার্যকর হয়ে পড়ে। আমার মনে হয় ভারতের শিবাজী সেনার মত রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ভয়ংকর কোন গ্রুপ সেখানে তৎপর রয়েছে। বাইরে বা ভেতর থেকে প্রতিবাদ বা প্রতিকার দাবী করে কোন লাভ হবে না। তোমার মত কেউ সেখানে যাওয়া দরকার।'

থামল প্রেসিডেন্ট। একটু ভাবল। তারপর আবার বলল, 'একটা জিনিস আমি বুঝতে পারছি না। আমি জানতাম ভারতের মধ্যে সবচেয়ে সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতির এলাকা হলো আন্দামান। হঠাৎ সেখানে এই উৎপাত শুরু হলো কেন? আহমদ মুসা, তুমি সেখানে যাচ্ছ। দেখ, কোন প্রকার সাহায্যের দরকার হলে আমাকে বলবে। কোন মুসলিম দেশের পক্ষে সেখানে সাহায্য করা কঠিন। কিন্তু আমেরিকা পারবে। তার উপর তুমি যাচ্ছ আমাদের নাগরিক পরিচয়ে।'

'ধন্যবাদ মি. প্রেসিডেন্ট।'

'ওয়েলকাম আহমদ মুসা। তাহলে এখনকার মত আমি উঠছি।' বলে প্রেসিডেন্ট উঠে দাঁড়াল।

আহমদ মুসাও উঠে দাঁড়াল।

প্রেসিডেন্ট হ্যান্ডশেকের জন্য হাত বাড়াল আহমদ মুসার দিকে। বলল সেই সাথে, 'তুমি পাসপোর্টটা এখনি জর্জ জনসনকে দিয়ে দেবে। আর মনে থাকে যেন, আন্দামান থেকে ফিরে সপরিবারে আসছ আমেরিকায়।'

'ইনশাআল্লাহ।' বলল আহমদ মুসা।

প্রেসিডেন্ট আহমদ মুসার হাত ছাড়ল না। হাত ধরে রেখেই কথা বলতে বলতে এগুলো ঘরের দরজার দিকে।

তার আগেই প্রেসিডেন্টের পার্সোনাল ও সিকিউরিটি ষ্টাফরা ঘরে প্রবেশ করেছে।

জেফারসন হাউজ।

আহমদ মুসা তার ঘরে ব্যাগ গুছিয়ে নিচ্ছিল।

ঘরে ঢুকল একসাথে হাইম বেঞ্জামিন ও বারবারা ব্রাউন। দুজনেই সালাম দিল আহমদ মুসাকে। বারবারা ব্রাউনের পরনে প্যান্ট, কোর্ট কিন্তু মাথা ও গলায় রুমাল জড়ানো।

আহমদ মুসা সালাম নিয়ে ব্যাগ রেখে গিয়ে জড়িয়ে ধরল বেঞ্জামিনকে। স্বাগত জানাল বারবারা ব্রাউনকে।

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল বারবারা ব্রাউনকে। কথা আটকে গেল। ঘরে প্রবেশ করল বেঞ্জামিনের আব্বা ড. হাইম হাইকেল এবং বেঞ্জামিনের দাদী ম্যাডাম হাইম। তাদের পেছনে পেছনে কামাল সুলাইমান।

আহমদ মুসা বেঞ্জামিনকে ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে গেল ম্যাডাম হাইমের দিকে। তার আগেই ড. হাইম হাইকেল ও ম্যাডাম হাইম সালাম দিয়েছে আহমদ মুসাকে।

আহমদ মুসা সালাম দিয়ে অভিনন্দন জানাল ম্যাডাম হাইমকে। বলল, 'দাদী, আপনি কষ্ট করে এসেছেন কেন? আমি তো যাবার পথে আপনার সাথে দেখা করে যাব ঠিক করেছি।'

‘তুমি তো আমার কাছে গেছ ভাই। আমি তো আসিনি। তাই সুযোগ নিলাম। আমার এটা সৌভাগ্য।’ বলল ম্যাডাম হাইম। ভারী কণ্ঠ তার।

‘দাদী এভাবে বলে না। আমি আপনার নাতীর মত।’

‘সেটা বয়সে। কিন্তু ওজনে তুমি তো হিমালয়ের মত। তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছি ভাই।’

‘কেন কৃতজ্ঞতা, কিসের কৃতজ্ঞতা দাদী?’

‘তুমি আমার পরিবারকে বাঁচিয়েছ শুধু নয়, আমাদেরকে অবিশ্বাসের অন্ধকার থেকে বিশ্বাসের আলোতে নিয়ে এসেছ।’

আহমদ মুসা ম্যাডাম হাইমের দুহাত চেপে ধরে বলল, ‘দাদী কথাটা ঠিক হলো না, আলোর পথে নিয়ে আসার মালিক আল্লাহ। তার একটা দয়ার প্রকাশ এটা।’

‘ঠিক ভাই। কিন্তু তুমি না হলে তাঁকে তো আমরা পেতাম না। তুমি সোনার ছেলে ভাই।’ বলে চুমু খেল আহমদ মুসার কপালে।

আহমদ মুসাকে ছেড়ে ম্যাডাম হাইম তাকাল বারবারা ব্রাউনের দিকে। বলল, ‘ব্রাউন বোন, ওটা ভাইকে দাও।’

বারবারা ব্রাউন তাড়াতাড়ি ব্যাগ থেকে ছোট একটা মোড়ক বের করে আহমদ মুসার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, ‘ভাই সাহেব, এটা নতুন অতিথি আমাদের ভাতিজার জন্যে আমাদের দাদীর পক্ষ থেকে।’

‘ধন্যবাদ’ বলে মোড়কটি নিয়ে বলল, ‘আমি খুলে দেখতে পারি তো।’

সবাই হেসে উঠল।

খুলল আহমদ মুসা মোড়কটি। মোড়ক থেকে বেরিয়ে এল একটা ক্রেষ্ট। সোনার তৈরি মিনার সিম্বলের উপর একটি সোনার অর্ধচন্দ্র। অর্ধচন্দ্রের ভেতরে তারকার আদলে সোনার তার দিয়ে লেখা ‘আহমদ আব্দুল্লাহ’ নাম।

‘চমৎকার’ উচ্ছসিত কণ্ঠে বলে উঠল আহমদ মুসা। বিস্ময়-বিমুগ্ধ আহমদ মুসা। বলল ডক্টর হাইম হাইকেলের দিকে তাকিয়ে, ‘জনাব, চমৎকার এ আইডিয়া। ইসলামের ইতিহাসের অনেক কথাকে এর মধ্যে বেঁধে ফেলা হয়েছে। ধন্যবাদ দাদী, ধন্যবাদ সকলকে।’ বলল আহমদ মুসা।

হাইম পরিবারের সকলের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

কিছু বলতে যাচ্ছিল ড. হাইম হাইকেল।

এ সময় কুরআন শরীফের একটা আয়াত আবৃত্তি করতে করতে ঘরে প্রবেশ করল বুমেদীন বিল্লাহ।

থেমে গেল হঠাৎ হাইম হাইকেল।

ঘরে প্রবেশ করে ড. হাইম পরিবারকে দেখে হোঁচট খাওয়ার মত থেমে গেল সে। সালাম দিল সকলের উদ্দেশ্যে। বলল, ড. হাইম হাইকেলকে লক্ষ্য করে, 'স্যার কেমন আছেন। খুব খুশি হলাম আপনাদের সবাইকে দেখে।'

'ধন্যবাদ। আমরা ভাল। কিন্তু বিল্লাহ তোমার মুখে আগে থেকে উপচে পড়া খুশি দেখছিলাম। তার কারণ কি? আহমদ মুসার সাথে মক্কা-মদিনায় যাওয়ার সৌভাগ্য হচ্ছে সেই জন্যে?' বলল ড. হাইম হাইকেল হাসতে হাসতে।

'না স্যার। তার চেয়ে বড় একটা আনন্দ সংবাদ পেয়েছি।' বুমেদীন বিল্লাহ।

'এর চেয়েও বড় আনন্দ? কি সেটা?' জিজ্ঞাসা ড. হাইম হাইকেলের।

ড. হাইকেলের কথা শেষ হতেই আহমদ মুসা বলল, 'তুমি তো সৌদি রাষ্ট্রদূতের সাথে দেখা করে আসছ না? ঐ ব্যাপারেই বোধ হয় তিনি কিছু জানিয়েছেন?'

হাসল বুমেদীন বিল্লাহ। বলল, 'হ্যাঁ ভাইয়া, আমি কনসোলার অফিস থেকে আসছি। সৌদি রাষ্ট্রদূত আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। আপনার চিঠি তাকে দিতেই হয়নি। তার আগেই তিনি বললেন, আহমদ মুসার জন্যে সুখবর আছে। তিনি যে প্রস্তাব করেছিলেন, সৌদি সরকার আনন্দের সাথে সবটাই গ্রহণ করেছেন।'

বলে হাসল বুমেদীন বিল্লাহ। তারপর পকেট থেকে একটা চিঠি বের করল। বলল, 'এ দাওয়াতপত্র ড. হাইম হাইকেলের পরিবারের জন্যে। অন্যদের দাওয়াত পৌছে যাচ্ছে বা পৌছে গেছে।'

'বলতো অন্যদের মধ্যে কারা আছেন? দেখি সবাই তার মধ্যে আছেন কিনা?' বলল আহমদ মুসা।

'ইউরোপ থেকে স্পুটনিকের ছয় গোয়েন্দা এবং তাদের সব পরিবারকেই দাওয়াত করা হয়েছে। আজোরস দ্বীপপুঞ্জের গনজালো, পলা জোনস ও সোফিয়া সুসান পরিবার, টার্কস দ্বীপের লায়লা জেনিফারের পরিবার, বাহামা'র শিলা সুসানের পরিবার, সান ওয়াকার-মেরী রোজদের পরিবার, নিউইয়র্কের ড. আয়াজ ইয়াহুদের পরিবার, প্রফেসর আরাপাহোর পরিবার, মরিস মরগ্যানের পরিবার, ড. হাইম হাইকেলের পরিবার, ভার্জিনিয়ার জেফারসন পরিবার এবং জর্জ আব্রাহাম জনসনসহ প্রস্তাবিত সব লোক সৌদি আরব সফর ও ওমরার দাওয়াত পেয়েছেন। আর আমি ও জনাব সুলাইমান ও তার পরিবার তো আপনার সাথে আজ মদিনায় যাচ্ছি। বুমেদীন বিল্লাহ কথা শেষ করল।

'এবং এদের সফর ও ওমরার দাওয়াত তো এ মাসেই? এটাই আমি বলেছিলাম।' বলল আহমদ মুসা।

'হ্যাঁ ভাইয়া।' বুমেদীন বিল্লাহ বলল।

'আল-হামদুলিল্লাহ। আমি ওদিকে ফিলিস্তিন, মধ্যএশিয়া, সিংকিয়াং, মিন্দানাও, ইত্যাদি থেকেও বন্ধুদের দাওয়াত করেছি এ সময় সৌদি আরব সফর ও ওমরায় আসার জন্যে। বিরাট একটা সম্মেলন হবে। এটাই হবে নতুন অতিথি আহমদ আবদুল্লাহর আকিকা উৎসব।'

চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ঘরে উপস্থিত ড. হাইম হাইকেল, সুলাইমান ও বুমেদীন বিল্লাহ সকলের। বলল ড. হাইম হাইকেল বুমেদীন বিল্লাহকে লক্ষ্য করে, 'আমার তর সইছে না। আমার সৌভাগ্যের দাওয়াতপত্রটা দাও দেখি।'

বুমেদীন বিল্লাহ হেসে তার হাতে দিল চিঠিটা।

পড়ল সে চিঠিটা।

পড়তে পড়তে তার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। তার চোখের দু'কোণায় অশ্রু এসে জমল। চিঠিতে একটা চুমু খেয়ে চিঠি বন্ধ করে স্বগত কণ্ঠে বলে উঠল, 'আল্লাহর রসূলের কবর জিয়ারত করার এবং কাবা তাওয়াফের সুযোগ হবে এত তাড়াতাড়ি, আল্লাহ এর ব্যবস্থা এত তাড়াতাড়ি করে দেবেন, স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি! ধন্যবাদ সৌদি সরকারকে। ধন্যবাদ আহমদ মুসা তোমাকে।' কান্না ও আবেগে রুদ্ধ হয়ে গেল ড. হাইম হাইকেলের কথা।

টেলিফোন বেজে উঠল আহমদ মুসার।

ড. হাইম হাইকেল চোখ মুছে বিল্লাহ ও সুলাইমানকে লক্ষ্য করে বলল, ‘চল আমরা বাইরে গিয়ে বসি। উনি টেলিফোন সেরে নিন।’

বলে ড. হাইম হাইকেল বাইরে বেরুবার জন্যে হাঁটা শুরু করল।

তার সাথে সুলাইমান, বুমেদীন বিল্লাহ, হাইম বেঞ্জামিন, ম্যাডাম হাইম ও বারবারা ব্রাউন সকলে।

মোবাইলটা মুখের সামনে তুলতেই দেখল কলটা এসেছে মিসেস জর্জ জনসনের কাছ থেকে। খুশি হয়ে আহমদ মুসা মোবাইল মুখের কাছে নিয়ে সালাম দিল। বলল, ‘আম্মা, কেমন আছেন?’

‘ওয়া আলাইকুম সালাম, বেটা। আমরা সকলে ভাল আছি। তোমার আংকেল এবং আমাদের পরিবারের সকলের তরফ থেকে শুকরিয়া জানানোর জন্যে এই টেলিফোন করছি। আমরা সৌদি সরকারের কাছ থেকে সৌদি আবর সফর ও ওমরার দাওয়াত পেয়ে ভীষণ খুশি হয়েছি। কিন্তু বেটা, সেদিন তোমার সাথে কত কথা হলো, কিন্তু তুমি এত বড় খবর সম্পর্কে তো কোন ইংগিত দাওনি!’

‘আম্মা, দাওয়াত সৌদি সরকারের তরফ থেকে। সেজন্যে আমি আগাম কিছু বলতে চাইনি। আম্মা, এখন জানিয়ে দিচ্ছি আরো একটা খবর, আমি মদিনায় ফেরার পর আমাদের তরফ থেকেও একটা দাওয়াত আপনাদের কাছে আসবে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কিসের দাওয়াত বেটা?’

‘আপনার নাতি আহমদ আবদুল্লাহর আকিকা অনুষ্ঠান হবে। সেখানে আমি গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আমার বন্ধু-বান্ধব ও গুরুজনদের আমন্ত্রণ জানাব। সেখানে আপনারা অবশ্যই থাকবেন।’

‘ও বেটা! ধন্যবাদ। সেটা তো হবে এক মহাব্যাপার! আর সেটা আমাদের জন্যে সৌভাগ্যের। তোমার দাওয়াত আসার আগেই গ্রহণ করলাম।’

বলে একটু থামল মিসেস জনসন। তারপর বলল, ‘বেটা, তোমার আংকেল ওমরার প্রস্তুতির ব্যাপারে জানতে চেয়েছেন। কোন অভিজ্ঞতা তো এ ব্যাপারে আমাদের কারো নেই।’

‘কোন চিন্তা নেই আম্মা। আপনারা প্রথমে মদিনা যাচ্ছেন। সুতরাং এ ব্যাপারে আগাম কোন চিন্তার প্রয়োজন নেই। আমি সব ব্যবস্থা মদিনায় করে রাখব। মদিনা থেকে মক্কায় যাবেন ওমরা করতে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ধন্যবাদ বেটা। তুমি বেরুচ্ছ কখন?’

‘এই তো কাপড় গোছ-গাছ করছি। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরুবো।’

‘তোমাকে তাহলে আর আটকাব না। তোমার সফরকে আল্লাহ সুন্দর ও নিরাপদ করুন। আমি রাখছি। আস্সালাম। বাই।’

‘ওয়াস্সালাম। দেখা হবে মদিনায়। বাই আম্মা।’

আহমদ মুসা কলটি অফ করে দিয়েই টেলিফোন করলো কামাল সুলাইমানকে। বলল, ‘শোন সুলাইমান, আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান ও আজোরস-এর যারা সৌদি আরব সফর ও ওমরার দাওয়াত পেয়েছে, তাদের সকলকে টেলিফোন করে আমার সালাম দাও। দাওয়াতের চিঠি পেয়েছে কিনা দেখ। তারপর ওদের জানাও, তাদের প্রথমে মদিনায় নেয়া হবে। সেখান থেকে তাঁরা ওমরা করতে মক্কায় যাবেন। তাদের কোন চিন্তা করতে হবে না। ওমরার সব প্রস্তুতি মদিনায় থাকবে। ঠিক আছে, বলে দাও এখনি। বিল্লাহর কাছে টেলিফোন নাম্বার আছে। তাকেও বল কিছু টেলিফোন করতে।’

আহমদ মুসা কথা শেষ করে মোবাইল রাখতে যাচ্ছিল। আবার বেজে উঠল টেলিফোন। মোবাইলটি সামনে এনে দেখল সারা জেফারসনের মা জিনা জেফারসনের টেলিফোন। বিস্মিত হলো আহমদ মুসা, মিসেস জিনা জেফারসন তার এই গোপন টেলিফোন নাম্বার পেলেন কিভাবে!’

দ্রুত টেলিফোনটা মুখের কাছে তুলল আহমদ মুসা। বলল, ‘আস্সালামু আলাইকুম। খালাম্মা, কেমন আছেন আপনি? সব ভাল তো?’

‘ওয়া আলাইকুম সালাম। আমি ভাল আছি, মাই সান। কতদিন পর তোমার ডাক শুনলাম বলত? খালাম্মার উপর রাগ করেছ বুঝি! মায়েরা সব সময় সন্তানদের ভাল চায় বেটা।’

‘জানি খালাম্মা। আমি দুঃখিত, এবার এসে খুব ব্যস্ত অবস্থায় আছি। কিন্তু সব সময় আপনাকে মনে করি খালাম্মা।’

‘জানি বাছা। তোমাকে অনেক দিন দেখি না। কিন্তু মনে হয় তুমি আমার চোখের সামনেই আছ। অন্তরে তোমার স্পর্শ পাই। তোমার মত ছেলে চোখের আড়াল হলেও মনের আড়াল হবার মত নয়।’

‘এমন ¯েœeহ পাওয়া সৌভাগ্যের খালাম্মা।’

বলে আহমদ মুসা একটু থেমে আবার বলে উঠল, ‘খালাম্মা, আপনি কি সৌদি সরকারের একটা দাওয়াত পেয়েছেন সৌদি আরব সফর ও ওমরা করার জন্যে?’

‘হ্যাঁ বেটা। এ জন্যেই তো তোমাকে টেলিফোন করেছি। সারা আমাকে তোমার সাথে আলোচনা করতে বলেছে। আমি দাওয়াত পত্রটা পাওয়ার পরেই সারাকে টেলিফোন করেছিলাম। সারা কি একটা সর্ট কোর্স করছে ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ে। সে যেতে পারবে না।’

‘সে ভাল আছে খালাম্মা?’

‘সে সব অবস্থায় বলে, ভাল আছি। নিজের অসুবিধার কথা সে কোন সময়ই জানায় না। এই অভ্যেস তার এখন আরও বেড়েছে। তাই তাকে নিয়ে আমার খুব ভয় বেটা।’

‘ভাববেন না খালাম্মা। আল্লাহ সাহায্য করবেন।’ বলে একটু থামল তারপর আবার বলল, ‘আপনি আসুন খালাম্মা। শুধু সৌদি সরকার নয় আমরা খুশি হবো আপনাকে পেলে। আমি মদিনায় ফিরে আপনাকে চিঠি লিখব। তাতে আমি আপনার সফরের সব ব্যবস্থার কথা জানাব।’

‘ধন্যবাদ বেটা। আমি কি ওখান থেকে পরে সারার কাছে যেতে পারব? আরও তো প্রায় আড়াই মাস সে তুরস্কে থাকছে। আমি ওদিক হয়ে তাকে দেখে আসতে চাই।’ বলল জিনা জেফারসন, সারা জেফারসনের মা।

‘কোন অসুবিধা হবে না। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। তাছাড়া মদিনায় আমাদের অনুষ্ঠানে তুরস্ক থেকেও আমার বন্ধু-মুরুব্বীরা আসবেন।’

‘তাহলে খুবই ভাল হবে বাছা। ঠিক আছে, রাখি। তুমি ভাল থাক বেটা। আসসালামু আলাইকুম। বাই।’

সালাম নিয়ে আহমদ মুসা ফোন রেখে দিল।

আহমদ মুসা মোবাইল রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই দৌড়ে কামাল সুলাইমান প্রবেশ করল আহমদ মুসার ঘরে। তার হাতে মোবাইল। বলল সে দ্রুত কণ্ঠে, 'ভাইয়া টেলিফোন নিন, ভাবী লাইনে আছে।'

বলে আহমদ মুসার হাতে তার মোবাইলটি তুলে দিয়ে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল দরজাটা বন্ধ করে।

টেলিফোন মুখের কাছে তুলে নিয়েই আহমদ মুসা বলে উঠল, 'আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছ জোসেফাইন?'

'ওয়া আলাইকুম সালাম। ভাল আছি। তুমি?'

'খুব ভাল।'

'ভাল'র আগে 'খুব' লাগালে কেন?'

'দেখ, এশিয়ানরা সাধারণত ঘরমুখো। সুতরাং ঘরে ফেরার সময় তারা বাড়তি আনন্দে থাকে।'

'তুমি বলতে চাচ্ছ নন-এশিয়ানরা বাহির-মুখো। না?'

'স্যরি, কথা তুলে নিচ্ছি। তুমি যে ইউরোপীয়ান ভুলে গিয়েছিলাম। তবে...............।'

'আর কথা নয়। বল, টেলিফোন কি এতক্ষণ কেউ এনগেজ রাখে? আমি কখন থেকে চেষ্টা করছি।'

'স্যরি। আমি কাপড়-চোপড় গুছিয়ে ব্যাগে ভরছিলাম। এই সময় কয়েকটা টেলিফোন এল। কথাটা একটু দীর্ঘ হয়ে গেছে।'

'সবে ব্যাগেজ গোছাতে শুরু করেছ? ও! না! তুমি তো ওখানে নয় ঘণ্টা পেছনে। আর কতক্ষণে তুমি যাত্রা করছ?'

'এই ধরো দশ মিনিট। ওরা সবাই লাগেজ নিয়ে নিচে নেমে গেছে। আমি হাত ব্যাগটা গুছাচ্ছি। আমিও এখনি বেরুব।'

'জান, তুমি আসার এখন আয়োজন করছ এটা ভেবেই আমার পালস বীট আজ সকাল থেকে বেড়ে গেছে। তুমি আসলে কি হবে তাই ভাবছি।'

'দেখ, তোমার শরীর দূর্বল। তুমি বেশি টেনশন করো না। ক্ষতি হবে।'

‘তুমি বোকা। এটা টেনশন নয়। এ অস্থিরতা আনন্দের, আনন্দের হৃদ-কম্পন এটা। এতে ক্ষতি হয় না, শক্তি ও সুস্থতা আরও বাড়ে।’

‘তাহলে ঠিক আছে। ধন্যবাদ। তোমার পালস বীট আরও বাড়............’ কথা শেষ করতে পারল না আহমদ মুসা।

তাকে বাধা দিয়ে ডোনা জোসেফাইন বলে উঠল, ‘বাজে কথা আর বাড়িয়ো না। তোমার সময় কম। শোন, তোমাকে দুটো অনুরোধ করব বলে এ টেলিফোন করেছি।’

‘বল।’

‘বলছি। তার আগে শোন, আজ সকালে আমি আহমদ আবদুল্লাহকে নিয়ে মেইলিগুলো আপার কবরে গিয়েছিলাম। আহমদের কচি হাতে একটা ফুল ধরিয়ে ওঁর কবরে রেখে এসেছি। আমি আহমদকে বলেছি, এ তোমার বড় মায়ের কবর। যে মা তোমার জন্মের আগেই তোমাকে ভালবেসেছেন, অজ¯্র টাকার একটা গিফট তোমার জন্যে ব্যাংকে রেখে গেছেন। মনে হয় আমার কথা সে বুঝেছে। হেসে হাত-পা নেড়ে আনন্দ প্রকাশ করেছে সে।’ বলল ডোনা জোসেফাইন।

‘ভাল করেছো জোসেফাইন। ধন্যবাদ। ওঁর আত্মা খুশি হবে। একটি স্বপ্ন পূরণ করেছ তুমি তাঁর।’

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা আবার বলে উঠল, ‘নির্দেশটা এবার বল।’

‘নির্দেশ নয়, অনুরোধ।’

‘ঠিক আছে বল।’

দুটি অনুরোধ। একটি হলো, ‘তুমি আন্দামান যাওয়ার আগে আমরা দু’জনে সুইজারল্যান্ডে তাতিয়ানার কবর জেয়ারতে যাব। খুব ইচ্ছা হচ্ছে, তাতিয়ানার বোন রুশ সম্রাজ্ঞী ক্যাথেরীনকে আমাদের অনুষ্ঠানে দাওয়াত করার। কিন্তু সেটা তো সম্ভব নয়। আমার দ্বিতীয় অনুরোধ হলো, ‘তুমি সারা জেফারসনকে অনুরোধ করবে আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্যে। আমি তাকে টেলিফোন করেছিলাম। সে বলেছে, তার একটা শর্ট কোর্স চলছে। কিছুতেই তার

পক্ষে সময় বের করা সম্ভব হবে না। তুমি যদি তাকে অনুরোধ কর, তাহলে আমাদের দুজনের অনুরোধ সে ফেলতে পারবে না।'

'তোমাকে আবারও ধন্যবাদ জোসেফাইন। তাতিয়ানার কবর জেয়ারতে এ সময় আমাদের যাওয়া উচিত। তুমি স্মরণ করিয়ে ভাল করেছ। আমরা যাব। আর রুশ সম্রাজ্ঞী ক্যাথেরীনকে আমরা দাওয়াত করতেই পারি। তিনি আসতে পারবেন না সেটা ভিন্ন কথা। অন্তত এ অনুষ্ঠান সম্পর্কে তাঁর জানার অধিকারটা তো পূরণ হবে! তোমার দ্বিতীয় অনুরোধ আমি রাখতে পারছি না জোসেফাইন। সারাকে তার মত করে চলতে দেয়ার মধ্যেই তার কল্যাণ আছে। কোন কিছুতেই আমাদের তাকে বাধ্য করা ঠিক নয়। সে অত্যন্ত সচেতন ও বুদ্ধিমান। সে নিজের জন্যে যেটাকে ঠিক মনে করেছে, তার বাইরে তাকে টানাকে আমি উচিত মনে করছি না।'

'তোমার কথার মধ্যে যুক্তি আছে। হয় তো এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তোমার এ কথা ঠিক নয় যে, সারা জেফারসন যা করছে এটাই তার জন্যে ঠিক। আমি এটা মেনে নেব না।'

'জোসেফাইন, তুমি যেটা বলছ, সেটাও একটা দিক। কিন্তু অলটারনেটিভগুলোর মধ্যে যেটা স্বাভাবিক সেটাই গ্রহণ করতে হবে।'

'আমি আগেই বলেছি যে, হয়তো এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এ ব্যাপারে আমার দ্বিমত আছে। তবে এ নিয়ে আমি কথা বাড়াতে চাই না। তোমাকে কি এটুকু অনুরোধ করতে পারি যে, তুমি শুধু একবার তাকে বল, তুমি ও আমি তাকে ওয়েলকাম করছি আমাদের এ অনুষ্ঠানে। তাহলেও আমি মনে একটু শান্তি পাব। তা না হলে সবাই আসবে, আর একা সারাই বাইরে থাকবে, এটা আমি সহ্য করতে পারবো না।' বলতে গিয়ে জোসেফাইনের শেষ কথাগুলো আবেগে রুদ্ধ হয়ে গেল।

আহমদ মুসা সংগে সংগেই জবাব দিল না। একটু ভাবল। তারপর বলল, 'জোসেফাইন, তোমার কষ্ট তো আমাকেও কষ্ট দেবে। ঠিক আছে তুমি যেভাবে যা বলতে বলেছ আমি তা সারাকে বলব। খুশি?'

'খুশি। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। এস তুমি। রাখি এখন?'

‘ঠিক আছে জোসেফাইন। ভাল থেক। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।’

‘ওয়া আলাইকুম সালাম’ বলে ওপার থেকে জোসফোইন টেলিফোন রেখে দিল।

আহমদ মুসা কল অফ করে দিয়ে মোবাইল রেখে আবার ব্যাগ গুছিয়ে নেয়ায় মনোযোগ দিল।

আহমদ মুসারা গ্যাংওয়ের দিকে এগুচ্ছিল।

তার সাথে হাঁটছে কামাল সুলাইমান, মিসেস সুলাইমান, বুমেদীন বিল্লাহ ছাড়াও তাদেরকে ‘সি অফ’ করতে আসা ড. ইয়াহুদ, ম্যাডাম ইয়াহুদ, নুমা ইয়াহুদ, নিউইয়র্কের মুসলিম কম্যুনিটির নেতৃবৃন্দ এবং নিউইয়র্কের এফ.বি.আই চীফ ও নিউইয়র্ক ষ্টেটের প্রধান প্রটোকল অফিসার।

গ্যাংওয়েতে ঢোকার আগে আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়িয়ে সবার সাথে বিদায়ী হ্যান্ডশেক করল।

একপাশে দাঁড়িয়ে নুমা ইয়াহুদ ও বুমেদীন বিল্লাহ একান্তে আলাপ করছিল। আহমদ মুসার হ্যান্ডশেক শেষ হতেই নুমা ইয়াহুদ ও বুমেদীন বিল্লাহ একসাথে এগিয়ে এল আহমদ মুসার কাছে।

আহমদ মুসা একটু হেসে বলল, ‘কি দুজনের তরফ থেকে কোন সুখবর আছে?’

নুমা ইয়াহুদের মুখ লাল হয়ে উঠল লজ্জায়। আহমদ মুসাকে সালাম দিয়ে আহমদ মুসার হাতে একটা ছোট্ট ইনভেলাপ তুলে দিয়ে ছুটে পালাল।

আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার হাঁটা শুরু করল। তার সাথে কামাল সুলাইমানরা।

এফ.বি.আই অফিসার আহমদ মুসার পিছনে হাঁটতে হাঁটতে বলল, ‘স্যার, আমার উপর হুকুম প্লেনে উঠা পর্যন্ত আপনার সাথে থাকার এবং প্লেন ‘টেক অফ’ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করার।

‘ধন্যবাদ জনাব।’ বলল আহমদ মুসা।

প্লেনে উঠল আহমদ মুসা। সৌদি আরবের আল-মদিনা এয়ার লাইন্সের বিশেষ ফ্লাইট এটা। বিমানটি নন-ষ্টপ উড়ে একেবারে গিয়ে ল্যান্ড করবে মদিনা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে।

প্লেনের দরজায় আহমদ মুসাকে স্বাগত জানিয়ে জড়িয়ে ধরল ফ্লাইটের ক্যাপ্টেন। তার ক্রুরা সহাস্যে পরমাত্মীয়ের মত স্বাগত জানাল আহমদ মুসাকে। ক্যাপ্টেন বলল, ‘আমাদের সৌভাগ্য, এই ফ্লাইটের সৌভাগ্য যে, আপনার মত এক মহান ভাইকে আতিথ্য দেবার ভাগ্য আমাদের হয়েছে।’

সবাইকে মোবারকবাদ দিয়ে আহমদ মুসা বসল গিয়ে তার সিটে।

প্লেন উড়তে শুরু করলে আহমদ মুসা নুমা ইয়াহুদের দেয়া চিঠি বের করল। ইনভেলাপ থেকে একটা ছোট্ট ই-মেইল বের হলো। দেখল, ই-মেইলটি সারা জেফারসনের। পড়ল:

‘আসসালামু আলাইকুম। টেলিফোনে তাৎক্ষণিকভাবে উত্তরটা দিতে পারিনি বলে দুঃখিত। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে খোঁজ নিয়ে দেখলাম, শর্ট কোর্সটিতে কয়েক দিনের ব্রেক হলে কোর্সটাই অর্থহীন হয়ে যাবে। তাই আপনাদের আমন্ত্রণে ‘না’ বলারই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। দূরে থাকলেও আমাদের নতুন ‘সোনামণি’র জন্যে থাকবে আমার এক বুক ভালবাসা ও দোয়া। ওয়াস্সালাম। -সারা।’

ই-মেইল পড়া শেষ করে আহমদ মুসা তা আবার ইনভেলাপে পুরে ইনভেলাপটি পকেটে রাখল। মনে মনে বলল, ‘ই-মেইলটি জোসেফাইনের পড়া দরকার। কারণ তার অনুরোধেই সে সারাকে টেলিফোন করেছিল।’

আরও কিছু চিন্তা ও আরও কিছু কথা চারদিক থেকে ছুটে আসছিল মাথায়। আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি মাথাটা সিটে এলিয়ে দিয়ে মাথাটাকে শূন্য করার উদ্যোগ নিল। বুজল সে তার চোখ।

অন্য সবাইও নীরব।

নীরবতা নেমেছে প্লেনের প্রথম শ্রেণীর এ কক্ষটিতে।

প্লেনের বাতাস কেটে সাঁতরে চলার শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ কোথাও নেই।

ছুটে চলছে প্লেন মদিনার উদ্দেশ্যে।

# ২

অন্ধকুপের মত ঘরটি।

ডিম লাইটের মত একটা আলো জ্বলছে ঘরের মাঝখানে। সে আলো ঘরের সামান্য অংশেরই অন্ধকার তাড়াতে পেরেছে। আলোকিত অংশটিও ধোঁয়াটে। এর বাইরে ঘন অন্ধকারের দেয়াল।

ভীতিকর পরিবেশ।

মেঝেতে পড়ে আছে একটা তরুণের দেহ। বয়স বাইশ-তেইশের মত। একহারা বলিষ্ঠ দেহ। সুন্দর চেহারা। চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ।

তার দেহ রক্তাক্ত। চাবুকের ঘায়ে ফেটে যাওয়া ক্ষত-বিক্ষত শরীর।

সংজ্ঞাহীন তরুণটি।

তার পড়ে থাকা দেহের ঠিক উপরে ছয় সাত ফিট উঁচুতে একটু দূরত্বের দুটি শিকল ঝুলছে। দুই শিকলেরই প্রান্তে হ্যান্ডকাফ লাগানো। হ্যান্ডকাফ দুটিও রক্তাক্ত। বুঝাই যাচ্ছে হ্যান্ডকাফ দুটি তরুণের দুহাতে লাগানো ছিল। দুই শিকলে তার দুহাত বেঁধে টাঙিয়ে রেখে তাকে নির্যাতন করা হয়েছে।

এক সময় ধীরে ধীরে চোখ খুলল যুবকটি। চোখ খুলে কোন দিকে চাইল না সে। উর্ধমুখী অবস্থায় তার চোখ খুলেছিল, দৃষ্টি তার উর্ধমুখী হয়েই থাকল।

তরুণটির মুখ থেকে কাতর কণ্ঠে ধ্বনিত হতে লাগল, ‘পানি’, ‘পানি’, ‘পানি’।

অন্ধকারের দেয়াল ভেদ করে তিনজন লোক এগিয়ে এল তরুণটির কাছে।

তাদের পরনে কালো প্যান্ট, কালো শার্ট এবং মাথায় তাদের ভারতের ব্ল্যাক ক্যাট কমান্ডোদের মত কালো কাপড় বাঁধা।

কাছে এসে তাদের একজন বলল, ‘শাহজাদার জ্ঞান ফিরল তাহলে। জয় হোক শাহজাদা আহমদ শাহ আলমগীরের।’ তার মুখভরা বিদ্রুপের হাসি।

সে থামতেই আরেকজন বলে উঠল, ‘সম্রাজ্য কবে অক্কা পেয়েছে, আগ্রা দূর্গে কবে উড়েছে বৃটিশ পতাকা, এখন সেখানে উড়ছে ভারতের ত্রিরঙ্গা। কিন্তু এদের নামের বাদশাহী যায়নি! নাম রেখেছে আহমদ শাহ আলমগীর!’ বলে লোকটি হো-হো করে হেসে উঠল।

তরুণটির ক্লান্ত, কাতর কণ্ঠে ধ্বনিত হলো, ‘তোমরা আমাকে মেরে ফেলতে চাও, মেরে ফেল। অনেককেই তো মেরেছ। দেরি করছ কেন?’

‘মরতে তোমাকেই হবেই। তুমি আমাদের মারাঠী কন্যা, পবিত্র নামে যার নাম সেই জিজা’র উপর তোমার অপবিত্র নজর ফেলেছ। মরতে তোমাকে হবেই। কিন্তু তার আগে আমাদের মহাবাপুজী ‘শিবাজী’র তৈরি ভবিষ্যত সম্পর্কিত ‘নীল নক্সা’র আধার ক্ষুদ্র চন্দন বাক্সটি আমাদের হাতে তুলে দিতে হবে। যতক্ষণ বা যতদিন তা না দেবে, ততদিন শতবার মৃত্যু চাইলেও তোমার মৃত্যু আমরা দেব না। কিন্তু দেব মৃত্যুর চেয়ে বড় যে কষ্ট, সেই কষ্টের পাহাড়।’

‘বার বার তোমাদের আমি বলেছি, বাক্সটা কি আমি জানি না। বাক্সটি আমি দেখিনি। এমন কোন বাক্স আমাদের কাছে নেই। তোমরা আমার বাড়ি সার্চ করে দেখতে পার।’ বলল আহমদ শাহ আলমগীর।

‘তোমাদের বাড়িতে খোঁজা আমরা অবশ্য বাকি রাখিনি। গত এক বছরে তোমাদের বাড়িতে কয়েকবার ঢুকেছি। সব জায়গা সার্চ করেছি। সন্দেহজনক সবকিছু নিয়ে এসেছি। কিন্তু বাক্সটা পাইনি। তোমরা ওটা মাটির তলায় কিংবা অন্য কোথাও লুকিয়ে রেখেছ।’ বলল সেই তিনজনের একজন।

‘আমি এ সম্বন্ধে কিছুই জানি না। আমি আমার আব্বা, দাদার কাছেও এমন বাক্স সম্পর্কে কোন গল্প শুনিনি। তোমাদের মহাবাপুজী’র এই বাক্স আমাদের কাছে আসবে কেন?’ আহমদ শাহ আলমগীর বলল।

‘আসবে কেন আমরাও জানতাম না। কিন্তু এক বছর আগে আমরা নিশ্চিত জেনেছি। আগেই আমরা শিবাজী পৌত্র ‘শাহুজী’র এক দলিল থেকে জানতাম, শাহুজীকে বন্দী করার সময় সম্রাট আওরঙ্গজেব এই বাক্সটিও শাহুজীর কাছ থেকে কেড়ে নেন। তারপর এ বাক্সটি অজানার অন্ধকারে চলে যায়। শেষ মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ রেংগুনে নির্বাসিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে ঘটনাক্রমে

তার ডাইরীটি একজন ভারতীয় পুরোহিতের হাতে পড়ে যায়। এই পুরোহিত ছিলেন বোম্বাই-এর একশ দশ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত শিবাজীর জন্মস্থান শিবন গিরি-দুর্গস্থ মন্দিরের সেবায়েত। সেবায়েত ডাইরীটিকে অতি-যতœ করে মন্দিরের এ্যান্টিক্স বিভাগের আলমারিতে রেখে দেন। গত বছর এই ডাইরীটি আমাদের ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু এক সদস্যের চোখ পড়ে যায়। তিনি ডাইরীটির ফটো নিয়ে আসেন। এই ডাইরীর এক স্থানে সম্রাট বাহাদুর শাহ লিখেছেন, ‘আল্লাহর শোকর যে, বাক্সটি আমি শাহজাদা ফিরোজ শাহ-এর হাতে তুলে দিতে পেরেছি। আমাদের শাহজাদাদের মধ্যে ফিরোজ শাহ-ই সবচেয়ে ধর্মভীরু, দেশপ্রেমিক, সাহসী ও সংগ্রামী চরিত্রের। বাবরের সাহস, আকবরের দেশপ্রেম এবং আওরঙ্গজেবের ধর্মভীরুতা ও দৃঢ়তার অপূর্ব সমাবেশ তার মধ্যে আমি দেখেছি। আমাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে ওরা মোঘল রাজত্বের ইতি ঘটাতে চায়। মোঘল সাম্রাজ্য হয়তো এরপর থাকবে না। তবু আমার দায়িত্ব হিসাবে ভারতের মুসলমানদের পক্ষে মোঘল সম্রাজ্যের রক্ষক হিসাবে ফিরোজ শাহকেই আমি নির্বাচন করতে চাই। মোঘলদের গোপন অর্থভান্ডারের নক্সা ও চাবি, তুরস্কের খলিফার পক্ষ থেকে মোঘল শাসন কর্তৃত্বের সনদ এবং শিবাজীর বাক্স তারই প্রাপ্য। প্রশ্ন উঠতে পারে, শিবাজীর বাক্সটি আমাদের কাছে এমন সম্পদ হয়ে উঠল কেন? কারণটা বলি। শিবাজীর বাক্সে রয়েছে কতগুলো বিচ্ছিন্ন তা¤্রলিপি। তা¤্র লিপিগুলো দুর্বোধ্য সংকেতের অনুসরণে একত্রিত করলে পাওয়া যায় শিবাজীর এক স্বপ্ন কাহিনী। সে কাহিনী বিভেদ, বিদ্বেষ এবং হিংসার। ভারতে শত শত বছরের মুসলিম শাসন হিন্দু-মুসলমানদের সহযোগিতা ও সহাবস্থানের যে অপূর্ব সমাজ সৃষ্টি করেছে, শিবাজীর স্বপ্ন তা ভেঙে দিয়ে মুসলমানদের সাথে তারা বৌদ্ধদের মত আচরণ করতে চায়। এই ধ্বংসাত্মক দলিলটি সম্রাট আওরঙ্গজেব ‘শাহুজী’র হাত থেকে উদ্ধার করার পর একে বংশীয়ভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এভাবেই শিবাজীর বাক্সটি মোঘলদের একটি পারিবারিক সম্পদে পরিণত হয়েছে। যাক এ দিকের কথা। আমি শিবাজীর বাক্সের মধ্যেই পুরলাম মোঘল ধন-ভান্ডারের নক্সা ও চাবি এবং মোঘল রাজত্বের সনদপত্র। শাহজাদা ফিরোজ শাহ তখন দিল্লীর বাইরে বৃটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তৎপরতায় ব্যস্ত। বৃটিশদের

তখনও পর্যন্ত অজানা গোপন পথ দিয়ে তাকে আগ্রা দুর্গে নিয়ে এলাম। সব জানিয়ে তার হাতে তুলে দিলাম বাক্সটি। তার সাথে সাথে তাকে দিলাম আমার মাথার মুকুট। তাকে বললাম পারলে ওটা তুমি পরো। না পারলে ওটা তুমি এই সম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের সমাধিতে রেখে দিয়ে তাঁকে জানিয়ো, আমরা তার অযোগ্য উত্তরসূরীরা পারছি না তার দেয়া দায়িত্বভার বহন করতে।' এখানে শেষ বাহাদুর শাহের বাক্স সংক্রান্ত উক্তি। অনেক অনুসন্ধানের পর জেনেছি, শাহজাদা ফিরোজ শাহ ভারতের দেশীয় রাজা জমিদারদের উস্কিয়ে বিরোধী যুদ্ধ সংগঠিত করতে গিয়ে এক পর্যায়ে ধরা পড়েন এবং আন্দামানে নির্বাসিত হন। আমরা খোঁজ নিয়ে জেনেছি, পোর্ট ব্লেয়ারে নামার সময় তার লাগেজের যে লিষ্ট করা হয়, তার মধ্যে চন্দন কাঠের সেই বাক্সটি ছিল। জেল কর্তৃপক্ষ শাহজাদার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে ঐ বাক্সসহ সব কিছুই তাকে ফেরত দেন। সুতরাং বাক্সটি তোমার আব্বার কাছে আছে। এখন বাক্সটি তোমার কাছে।

দীর্ঘ বক্তব্য শেষ করল লোকটি।

'চন্দন কাঠের কেন, কোন ধরনের বাক্সই আমার কাছে নেই।' বলল আহমদ শাহ আলমগীর জোরের সাথে।

চিৎকার করে উঠল সেই লোকটিই। বলল, 'খবরদার মিথ্যা কথা বলবে না। মুখ একেবারে গুড়ো করে দেব।' বলে সে প্রচ- এক ঘুসি চালাল আহমদ শাহ আলমগীরের মুখে।

ঠোঁটের কোণ কেটে গেল এবং নাক ফেটে বেরিয়ে এল রক্ত।

দুহাত মুখে চাপা দিয়ে যন্ত্রণা হজম করার চেষ্টা করল আহমদ শাহ আলমগীর।

তিনজনের অন্য আরেকজন বলল, 'তোমার মা মোপলা বংশের তাই না?'

'হ্যাঁ।' বলল আহমদ শাহ আলমগীর।

'তাহলে তোমার মা তো তোমার চেয়ে শক্ত হবে, তাই না?'

কথা বলল না আহমদ শাহ আলমগীর।

'তোমার বোনের নাম কি?'

‘আর্জুমান্দ শাহ বানু।’

‘বয়স কত?’

এ প্রশ্নের জবাব দিল না আহমদ শাহ আলমগীর।

‘সে তো সুষমা রাও এর সাথে চেন্নাই-এর ষ্টেট ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, তাই না?’

‘হ্যাঁ।’ বলল আহমদ শাহ আলমগীর।

‘তোমার বোনই বোধ হয় তোমার ও ‘সুষমা রাও’-এর মধ্যে দুতিয়ালী করেছে?’

‘না।’ পরিষ্কার জবাব দিল আহমদ শাহ আলমগীর।

‘তাহলে তুমিই সুষমা রাও এর ঘাড়ে চেপেছ? হায়দরাবাদের ইউনিভার্সিটি অব টেকনলজিতে তুমি পড়। এই ঘাড়ে চাপার জন্যেই বোধ হয় তুমি ঘন ঘন চেন্নাই আস?’

‘না। আমি আন্দামানে ফেরার সময় ওদিক দিয়ে বোনকে নিয়ে আসি এবং যাবার সময় তাকে ওখানে রেখে যাই।’

‘মোপলাদের রয়েছে আরবীয় সৌন্দর্য আর মোঘলদের তুর্কি সৌন্দর্য। এই দ্ইুয়ের সমাহার আর্জুমান্দ শাহ বানু তাই না?’

এই প্রশ্ন করে লোকটি থামতেই ওদের তিনজনের তৃতীয়জন বলে উঠল। এত ভনিতা না করে আসল কথাটাই বলে ফেল না। আগামী কালের মধ্যে বাক্সের সন্ধান আমরা যদি না পাই, তাহলে বেগম আর্জুমান্দ শাহ বানুকে আমরা এখানে নিয়ে আসবো। তারপর জান তোমার সামনে কি ঘটবে!’

‘তোমরা আমাকে নির্যাতন করো, মেরে ফেল আমাকে। কিন্তু আমার বোনের গায়ে তোমরা হাত দিতে পারবে না।’ উঠে বসার চেষ্টা করতে করতে বলল আহমদ শাহ আলমগীর।

‘তোমাকে মেরে ফেলে আমাদের লাভ নেই। আমরা চাই বাক্স। ওটা এখন আমাদের প্রাণ। ওতে শুধু আমাদের ‘মহাবাপুজী’র পবিত্র দলিলই নেই, আছে মোঘল ধন-ভা-ারের চাবী। ঐ ধন-ভান্ডারের মালিক এখন আমরা। আজ কয়েক সপ্তাহ ধরে চেষ্টা করছি, তুমি মুখ খোলনি। গ-ারের চামড়া তোমার গায়,

আর গাধার মত তোমার সহ্য শক্তি। এবার আমরা দেখব, বোনকে শেষ হয়ে যেতে দেখলে তোমার এই সহ্যশক্তি কতক্ষণ থাকে।'

'তোমরা বিশ্বাস কর, আসলেই আমার কাছে বাক্সটি নেই।' কাতর কণ্ঠে বলল আহমদ শাহ আলমগীর।

তার কথা শেষ না হতেই চিৎকার করে উঠল ওদের তিনজনের একজন, 'বলেছি না যে, নেই, জানি না- এই ধরনের কথা আর উচ্চারণ করবে না।' বলে সে সর্বশক্তি দিয়ে এক লাথি মারল আহমদ শাহ আলমগীরের পাঁজরে।

অন্য একজন বলে উঠল, 'চল আমরা এখন যাই। কাল সকালে এসে শেষ কথা শুনে যাব। যদি মুখ না খোলে তাহলে যা ঘটার তাই ঘটবে।'

আরেকজন বলল, 'ঠিক আছে আমরা এখন যাচ্ছি। মনে রেখ, তোমার মৃত্যু নেই। তোমার বোন যাবে, তারপর তোমার মা যাবে, কিন্তু তুমি থাকবে।'

বলেই সে অন্ধকারের দিকে তাকাল। বলল, 'শোন তোমরা, একে পানি খাইয়ে যাও। আর এর হাত-পা বেঁধে রাখ। আর সর্বক্ষণ এর উপর চোখ রাখবে।'

ওরা তিনজন যেভাবে এসেছিল, সেভাবেই আবার অন্ধকারের দেয়ালের আড়ালে হারিয়ে গেল।

উদ্বেগ-আতংকে তখন আহমদ শাহ আলমগীরের চোখ-মুখ বিস্ফোরিত। তার মনে একটুও সন্দেহ নেই, ওরা যা বলেছে তাই করবে। কিন্তু কি করবে সে! কি করে রক্ষা করবে তার বোনকে, তার মাকে আর নিজেকে! আহমদ শাহ আলমগীর এখন বুঝতে পারছে, এরা বিরাট-বিশাল এক চক্র। শুধু আন্দামান নয়, গোটা ভারতে এরা ছড়িয়ে আছে। আত্মসমালোচনার আদলে সে ভাবলো, সুষমা রাওকে ভালবেসে কি সে নিজের পরিবারকে, নিজের জাতিকে বিপদে ফেলল! কিন্তু তার এতে দোষ কি! ওরা যা বলল সেভাবে আমি ওর ঘাড়ে চাপিনি। একটি হৃদয়ের পবিত্র আবেগকে, পবিত্র আকাঙ্ক্ষাকে সে স্বীকৃতি দিয়েছে মাত্র। জানি মারাঠী কন্যা, ব্রাহ্মণ কন্যা, জানি সে চির মোঘল বৈরী ও হিন্দু-রাষ্ট্র-চিন্তার আধুনিক জনক শিবাজীর বিখ্যাত পেশোয়া পরিবারের সন্তান, কিন্তু এসব পায়ে দলেই তো সে এসেছে। সে আমার দরজায় নক করেছে, আমি দরজা খুলে দিয়েছি মাত্র। এমনই ঘটে, ঘটেছে। আমাদের আন্দামানে এটা স্বাভাবিক ঘটনা। এ নিয়ে

কেউ কোনদিন কথা তোলেনি, কারও কাছেই এ বিষয়টা কোন ইস্যু ছিল না। এখন এ বিষয়টা বড় হয়ে উঠল কেন? কারা এরা? আন্দামানে কি তাহলে শান্তির দিন, স্বস্তির দিন শেষ হয়ে গেল?

উদ্বেগ-আর্তক আরও শতগুণ বেড়ে ঘিরে ধরল আহমদ শাহ আলমগীরকে। অসহায় মন তার ডেকে উঠল আল্লাহকে। আল্লাহর সাহায্যই শুধু তাদেরকে বাঁচাতে পারে, অটুট রাখতে পারে আন্দামানের শান্তি ও স্বস্তির জীবনকে। ভারতের সিকি শতক রাজ্য ও ৭টি ইউনিয়ন এলাকার মাত্র এক আন্দামান-নিকোবরই ছিল সব দিক দিয়ে অখ- এক শান্তির টুকরো, শান্তির দ্বীপ। একেও কি এখন অশান্তি এসে গ্রাস করবে!

আহমদ শাহ আলমগীরের চিন্তা আর এগুতে পারলো না। দুজন ষ্টেনগানধারীর পাহারায় একজন লোক পানি নিয়ে এসে তার সামনে দাঁড়াল।

তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছিল আহমদ শাহ আলমগীরের। পানি দেখার পর যেন সে পাগল হয়ে উঠল। প্রায় কেড়ে নিল পানির বোতল। ঢক ঢক করে গিলতে লাগল পানি বোতল থেকে। এক নিঃশ্বাসেই বোতল সে শেষ করে ফেলল।

আহমদ শাহ আলমগীর বোতল হাতে ধরা থাকতেই ওরা তার হাতে হ্যা-কাফ ও পায়ে শিকল পরিয়ে লক করে দিল।

ওরা ওদের কাজ শেষ করে যেমন যন্ত্রের মত এসেছিল, তেমনি যন্ত্রের মত চলে গেল।

আহমদ শাহ আলমগীর গা এলিয়ে দিল মাটিতে।

জিজা সুষমা রাও এর দুচোখ থেকে অঝোর ধারায় নামছে অশ্রু।

সুষমা রাও ভারতীয় একটি ইউনিয়ন টেরিটোরী আন্দামান-নিকোবর-এর গভর্নর বালাজী বাজী রাও মাধব-এর একমাত্র মেয়ে। বয়স বিশ-একুশ বছর হবে। দুধে-আলতা রংয়ের নিরেট আর্য-ব্রাহ্মণ কন্যা সে। তার সৌন্দর্যের অপরূপ

সুষমার পাশে তার বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্বে রয়েছে এক সম্মোহনী শক্তি। কিন্তু অবিরল অশ্রুর বন্যায় সব কিছুই তার ঢেকে গেছে।

মুখ নিচু করে কাঁদছে সুষমা রাও।

তার পাশেই বসে তার মা ভারতী রাও। প্রবল অস্বস্তিতে ভরা বেদনা জর্জরিত তার মুখ।

তাদের সাথে সামনে সোফায় বসা বালাজী বাজী রাও মাধব। সবাই তাকে বিবি মাধব বলেই জানে। ক্রোধ-অসন্তুষ্টির প্রবল ছায়া তার চোখে মুখে। সে কথা বলছিল সুষমা রাওকে উদ্দেশ্য করে।

সুষমা রাও কান্নায় ভেঙে পড়লে সে থেমে গিয়েছিল। আবার শুরু করল সে। বলল, 'মা, তুমি কি জান, তোমার নামের প্রথম অংশ 'জিজা' কার নাম?'

'জি বাবা। শিবাজীর মার নাম।' অশ্রুরোধের চেষ্টা করে বলল সুষমা রাও।

'শুধু শিবাজী বললে তার অসম্মান হয় মা। তিনি আমাদের জাতির নতুন রাজনৈতিক জাগরণ ও সামরিক উত্থানের মহান জনক। তিনি আমাদের মহাবাপুজী। যাক। শোন, তোমার 'জিজা' নাম তোমার দাদু রাখেন। এর পেছনে এক স্বপ্ন তাঁর মধ্যে কাজ করেছে। মহান শিবাজী আধুনিক হিন্দু জাতির স্রষ্টা হলে, তার মা জিজা মহাশিবাজীর ¯্রষ্টা। তোমার নাম জিজা রাখার মাধ্যমে তোমার দাদু চেয়েছেন, জিজার মতই তুমি জাতিস্বার্থ দেখবে, জাতিকে ভালবাসবে। কিন্তু তুমি একি করলে মা, আমাদের আবহমান এক শত্রু পরিবারের প্রত্যক্ষ এক উত্তরাধিকারীকে তুমি ভালবেসেছ! ওদের বিরুদ্ধে মহান শিবাজী, তার পুত্র 'শম্ভুজী' এবং শম্ভুজীর পুত্র 'শাহুজী' আজীবন লড়াই করে গেছেন। সব কিছুই করা হয়তো আমাদের পক্ষে সম্ভব কিন্তু এই মোঘল পরিবারকে বন্ধু বানানো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কি করে সম্ভব? তৃতীয় পানিপথ যুদ্ধের দগদগে স্মৃতি একজন মারাঠী কিংবা একজন হিন্দুও তার মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না। সেই সর্বগ্রাসী পানিপথ যুদ্ধে আমরা ৪০ হাজার বললেও প্রকৃতপক্ষে ২ লাখ মারাঠী মারা গিয়েছিল। মারা গিয়েছিল আমাদের ৪০ জন সেনাপতি। তোমার প্র-পিতামহ পেশোয়া বালাজী বাজী রাও এর বড় ছেলে বিশ্বাস রাও ছিলেন পানিপথ

যুদ্ধের নেতা। তিনি নিহত হন। নিহত হন প্রধান সেনাপতি সদাশিব রাও। এই আঘাত সহ্য করতে পারেননি বালাজী বাজী রাও। অসুস্থ হয়ে তিনিও মারা গেলেন। পানিপথ যুদ্ধের পর মারাঠীদের এমন কোন বাড়ি ছিল না, যেখানে ক্রন্দনের রোল ওঠেনি। আর এই পানিপথই ধ্বংস করে দিয়ে যায় হিন্দু রাষ্ট্রের স্বপ্ন।'

'কিন্তু বাবা, মাফ করবেন আমাকে। এই যুদ্ধের জন্যে মোঘলারা কতটুকু দায়ী? কেন সেদিন আমরা গিয়েছিলাম দিল্লী দখল করতে? এই অভিযানই তো এই সর্বগ্রাসী যুদ্ধ ডেকে আনে।' বলল সুষমা রাও কান্নাজড়িত কণ্ঠে।

'আমরা দিল্লী দখল করতে না গেলে, তারা আসত মারাঠা দখল করতে। থাক এ কথা। আমার নামটাও তোমার দাদু 'বালাজী বাজী রাও মাধব' রেখেছিলেন কোন উদ্দেশ্যে জান? আমার নামের প্রথম অংশ তৃতীয় পানিপথ যুদ্ধে আমাদের হৃদয়বিদারক পরিণতির প্রতীক এবং শেষ অংশ 'মাধব' আমাদের জাতির বিপর্যর কাটিয়ে উত্থানের স্মারক। কারণ বালাজী বাজী রাও-এর এক পুত্র মাধব রাও পরাজিত শক্তিকে সাময়িকভাবে হলেও সংহত করেছিলেন এবং অল্প সময়ের জন্যে হলেও মোঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমকে অনেকটা আশ্রিত করে তার মাধ্যমে দিল্লীর উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সুতরাং দেখ, তোমার দাদুর মধ্যে কতবড় জাতীয় ও পারিবারিক আবেগ ছিল। এই আবেগ আমাদের প্রত্যেক মারাঠীর মধ্যে থাকা উচিত। তুমি এর এক ইঞ্চিও বাইরে যেতে পার না।'

গভর্নর বিবি মাধব থামলে সুষমা রাও কান্নারুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'বাবা এনিয়ে আমি এখন আপনার সাথে কোন তর্ক করব না। সে সময় এখন নয়। বাবা, আহমদ শাহ আলমগীরকে আপনার বাঁচাতে হবে। আমার যদি সত্যিই অপরাধ হয়ে থাকে, আমাকে যে শাস্তি দেবেন আমি গ্রহণ করব। আমি মরতেও রাজী আছি। বাবা, আপনি ওঁকে বাঁচান। আপনাদের রাষ্ট্রীয় শক্তি ছাড়া সন্ত্রাসীদের হাত থেকে কেউ তাকে উদ্ধার করতে পারবে না। আপনি দয়া করে তাকে উদ্ধারের উদ্যোগ নিন।'

বলতে বলতে সুষমা রাও ছুটে গিয়ে তার বাবার পায়ের কাছে বসে তার বাবার কোলে মুখ গুঁজল। নিঃশব্দ কান্নায় সে ভেঙে পড়ল।

এক ধরনের বিক্ষোভ ও বেদনায় ভারী হয়ে উঠেছে বিবি মাধবের মুখ। সে কান্নারত মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে তুলে পাশে বসাল। বলল, ‘মা, ওকে শুধু ‘আলমগীর’ বলবে। আহমদ শাহ নয়। ঐ নাম শুনলে আমার বুক ফেটে যায়। মোঘলরা আমাদের প্রতিপক্ষ, কিন্তু আহমদ শাহ আবদালী সবচেয়ে বড় খুনি। তৃতীয় পানিপথে আমাদের বিপর্যয়ের কারণ এই আহমদ শাহ আবদালী। সেই খুন করেছে আমাদের বিশ্বাস রাও, সদাশীব রাওকে, ৪০ জন সেনাপতিকে এবং দুলাখ আমাদের ভাইকে।’

বলতে বলতে আবেগ-প্রবণ হয়ে উঠেছিল বিবি মাধব।

বোধ হয় নিজেকে শামলে নেবার জন্যেই একটু থামল সে। একটু পর শান্ত কণ্ঠে বলল, ‘স্যরি মা, প্রসঙ্গান্তরে চলে গিয়েছিলাম। শোন মা, আলমগীরের শত্রুর সংখ্যা বিশাল, তাদের শক্তিও অসীম। সে নিখোঁজ হবার পরই পুলিশ তার উদ্ধারের জন্য কাজ শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু তারা কিছুই করতে পারছে না।’

‘কিন্তু বাবা, এ পর্যন্ত অনেকগুলো রহস্যজনক খুন হয়েছে আন্দামান নিকোবরে। আমি চেন্নাই-এ থাকতেও কাগজে এসব পড়েছি। কিন্তু পুলিশ কোন সুরাহা করতে পারেনি। সুতরাং সাধারণ পুলিশ তৎপরতার দ্বারা আলমগীর উদ্ধার হবে বলে আমি মনে করি না।’

‘কিন্তু মা, এই কাজের জন্যে আমার হাতে পুলিশ ছাড়া আর কি আছে?’

‘সিবিআই-এর লোকরা এসে আবার চলে গেল কেন?’

‘তারা বলেছে, খুনগুলো সবই বিচ্ছিন্ন ঘটনা এবং স্থানীয় শত্রুতা জনিত। কোন ষড়যন্ত্র বা বিশেষ কোন উদ্দেশ্য এর পেছনে নেই। এসবের তদন্তের জন্যে স্থানীয় পুলিশই যথেষ্ট।’

‘কিন্তু আলমগীর কোন শত্রুতাজনিত কারণে কিডন্যাপ হয়েছে, এটা কেউ মনে করছে না। আমিও মনে করি না। আশ-পাশের দ্বীপসহ পোর্ট ব্লেয়ারে আলমগীর এমন এক এবং একমাত্র ছেলে যার কোন শত্রু নেই। তার কিডন্যাপ অবশ্যই ষড়যন্ত্রমূলক। নানা কার্য কারণ থেকে এই কথা আমি নিশ্চিত করেই বলছি বাবা।’

'সে ষড়যন্ত্রটা কি হতে পারে বলে তুমি মনে কর?' বলল সুষমা রাও এর পিতা গভর্নর বিবি মাধব সোজা হয়ে বসে।

'আমি তা জানি না বাবা। কিন্তু সাম্প্রতিক রহস্যজনক যে খুনগুলো হয়েছে তারা সবাই মুসলমান। ব্যাপারটাকে আমি কাকতালীয় বলে মনে করি না। আবার একটা কিডন্যাপের ঘটনা ঘটল সেও মুসলমান। আমার মনে হয়, খুনগুলো ও কিডন্যাপের উৎস একই হতে পারে।'

'তোমার কথা তোমার কল্পনাও হতে পারে। পুলিশ তো তোমার মত করে ভাবছে না।'

'সুতরাং বাবা, পুলিশ দিয়ে এই সমস্যার সমাধান হবে না। আপনাকে কেন্দ্রের সাহায্য চাইতে হবে। আপনি তাড়াতাড়ি এই ব্যবস্থা করুন বাবা।'

'তোমার বাবার ক্ষমতা সীমাহীন নয় বেটা। বিশেষ করে সিবিআই যে মন্তব্য করে চলে গেছে। তারপর দিল্লীর সাহায্য পাওয়া খুবই কঠিন হয়ে গেছে। চাপ দিলেই বলবে পুলিশকে কেন কাজে লাগাচ্ছি না।'

'তাহলে?' সুষমা রাও-এর গলা কান্নায় জড়িয়ে গেল।

সুষমার বাবা বিবি মাধব পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, 'আমি দেখছি মা। আমাদের গোয়েন্দা দফতরের সাথে তোমার চিন্তা নিয়ে আলোচনা করে দেখি তারা কি বলে? কিন্তু তোমাকে আবার একটা কথা বলছি মা, তুমি সব কথা বলেছ। আন্দামান সরকার চেষ্টা করবে তাকে উদ্ধারের জন্যে। তোমার কাছ থেকে কিন্তু তার সম্পর্কে আর কোন কথা আমি শুনব না। মারাঠী রাও পরিবারের কেউ কোন মোঘল সন্তান সম্পর্কে দুর্বলতা দেখাবে এটা অপমানজনক। এই অপমানকর কিছু যেন আর কানে না আসে।'

বলেই ওঠে দাঁড়াল বিবি মাধব। বেরিয়ে গের পারিবারিক ড্রইং রুম থেকে।

পিতা বেরিয়ে গেলেও পাথরের মত স্থির বসে থাকল সুষমা রাও। তার চোখে-মুখে বিস্ময়-বেদনা, আতংক-উৎকণ্ঠা ও অপমানের একটা সয়লাব এসে যেন আছড়ে পড়ল। তার মনে হলো, তীরে নামার সিঁড়ি এক সাথে ভেঙে পড়ল।

উত্থাল সাগরে সব সহায় যেন তার কাছ থেকে সরে গেল। দুহাতে মুখ ঢেকে ফুপিয়ে কেঁদে উঠল সে।

তার মা ভারতী রাও এসে তার পাশে বসল। মেয়েকে বুকে টেনে নিল। বলল, 'ধৈর্য ধর মা। তোমার বাবার কথা নিয়ে মন খারাপ করার প্রয়োজন নেই। এখনকার প্রশ্ন হলো, আলমগীর উদ্ধার হওয়া, অন্যকিছু নয়।'

'তাহলে তার উদ্ধার সম্পর্কে তো আম্মা কোন কথা বলতে পারবো না বাবাকে। তার মানে সে উদ্ধার হবে না, এটাই বাবা বোঝাতে চেয়েছেন।' কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বলল সুষমা রাও।

'এভাবে বলো না মা। সব চেষ্টার পরও তো উদ্ধার নাও হতে পারে। এমনও তো হতে পারে, উদ্ধার চেষ্টা শুরুর আগেই সে নি......।' কথা শেষ করতে পারল না সুষমার মা ভারতী রাও। সুষমা রাও মায়ের মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, 'তুমি কি বলতে চাচ্ছ বুঝেছি, সর্বনাশা কথাটা উচ্চারণ করো না, মা। তোমরা সবাই বোধ হয় এটাই চাচ্ছ।'

বলে উঠে দাঁড়িয়ে সুষমা রাও ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ভারতী রাও উঠে সুষমার পেছনে পেছনে ছুটল।

চেন্নাই থেকে আন্দামানগামী জাহাজে উঠতে গিয়ে বিস্মিত হলো আহমদ মুসা। একটা দেশ থেকে বের হবার সময় যে ধরনের চেকিং হয় তার সবই এখানে করা হচ্ছে। পাসপোর্ট চেকিং, ভিসা চেকিং, লাগেজ চেকিং থেকে শুরু করে আন্দামান-নিকোবরে প্রবেশের জন্যে কি ধরনের অনুমতি দেয়া হয়েছে তাও তারা দেখছে।

আহমদ মুসা ইতিমধ্যেই জেনেছে আন্দামানে প্রবেশের জন্যে চার ধরনের অনুমতি আছে। ট্যুরিষ্টরা শুধুমাত্র তালিকা অনুযায়ী ট্যুরিষ্ট স্পটগুলো ভিজিটের অনুমতি পায়। ব্যবসায়ীরা পোর্ট ব্লেয়ারের বাইরে কোথাও যাবার অনুমতি পায় না। আন্দামান-নিকোবর-এর বাসিন্দাদের জন্যেও অনুমতিপত্র

আছে। কিছু কিছু এলাকায় বিনা অনুমতিতে তাদেরও প্রবেশ নিষিদ্ধ। এছাড়া এক ধরনের বিশেষ অনুমতিপত্র আছে। এই অনুমতি প্রাপ্তরা আন্দামান-নিকোবরের সব জায়গায় যেতে পারে। তবে ট্রাইবাল এরিয়া ও রস দ্বীপে যাবার আগে পুলিশকে শুধু জানাতে হয়।

আহমদ মুসা শুধুমাত্র আমেরিকান সরকারের কল্যাণে ভারতের ওয়াশিংটন দূতাবাসের মাধ্যমে এই বিশেষ অনুমতিপত্র পেয়েছে। আর এটা বিশেষভাবে সম্ভব হয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সৌজন্যে।

আর এটা পাওয়ার ক্ষেত্রে তার আরেকটা সুবিধা হয়েছে আহমদ মুসা মুসলিম নামের পাসপোর্ট ব্যবহার করেনি। আসার আগে মুসলিম নামের পাসপোর্ট বাদ দিয়ে যুডীয়-খৃষ্টান নামের একটা নতুন পাসপোর্ট দিয়েছে এফ.বি.আই প্রধান জর্জ আব্রাহাম জনসন। এই পাসপোর্টে তার নাম হয়েছে 'বেভান বার্গম্যান'। পাসপোর্টে তার পরিচয় দেয়া হয়েছে 'পরিবেশবাদী' ও 'পুরাতত্ত্ববিদ' হিসাবে। ভিআইপি ভিসা পেয়েছে সে।

এই পাসপোর্ট ও ভিসার কারণেই সে যথেষ্ট খাতির পেল কাউন্টারে গিয়ে। পাসপোর্ট দেখেই বডিচেকিং ও লাগেজ চেকিং না করেই তাকে ছেড়ে দিয়েছে।

আহমদ মুসা জাহাজে উঠল। বিরাট জাহাজ।

জাহাজের টপ ফ্লোরে ভিআইপি কক্ষ নিয়েছে আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা জাহাজে ঢুকে উপরে ওঠার জন্যে এগুচ্ছিল। কথা কাটাকাটির শব্দ কানে এল তার। তাকিয়ে দেখল, জাহাজের লবীতে দুজন লোক একজন লোককে জাহাজ থেকে নামিয়ে নেবার জন্যে টানাটানি করছে। যাকে টানাটানি করছে তার পরনে পাজামা-শেরোয়ানী। মাথায় রামপুরী টুপী। মুখে ছোট করে ছাটা দাড়ী।

লোকটি প্রতিবাদ করছে, যুক্তি দেখাচ্ছে। কিন্তু কে শোনে প্রতিবাদ, যুক্তি। লোক দুজন তাকে আগে জাহাজ থেকে নামিয়ে নিতে চেষ্টা করছে। বলছে, চল নিচে নেমে সব কথা শুনব। চারিদিকে সব লোক দাঁড়িয়ে থেকে তামাশা দেখছে। কেউ কিছু বলছে না, প্রতিবাদ করছে না।

লোক দুজন লোকটিকে টেনে-হেঁচড়ে নামিয়ে নিতে শুরু করেছে।

আহমদ মুসা ওপরে না উঠে এগুলো লোকদের দিকে।

তাদের সামনে গিয়ে আহমদ মুসা যারা টেনে-হিঁচড়ে নিচ্ছে লোকটিকে তাদের উদ্দেশ্যে বলল ইংরেজীতে 'আপনারা কি পুলিশের লোক?' আহমদ মুসা শান্ত কিন্তু শক্ত কণ্ঠে বলল।

লোক দুজন লোকটিকে ছেড়ে আহমদ মুসার দিকে তাকাল।

আহমদ মুসা নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, 'আমি একজন আমেরিকান ট্যুরিষ্ট। নাম 'বেভান বার্গম্যান।' ইংরেজীতেই কথা বলছে আহমদ মুসা।

আহমদ মুসর ঋজু কণ্ঠ ও প্রশ্নের ধরন এবং অযাচিত পরিচয় দেয়ার নির্ভীক ষ্টাইল দেখে ও পরিচয় পেয়ে ওরা বোধ হয় দ্বিধাগ্রস্ততার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল।

তাদের দু'জনের একজন বলল, 'না, আমরা পুলিশের লোক নই। আমরা..........।'

লোকটিকে কথা সম্পূর্ণ করতে না দিয়ে আহমদ মুসা বলে উঠল, 'তাহলে কি আপনরা গোয়েন্দা?'

লোক দুজনের চোখে-মুখে বিব্রত ভাব ফুটে উঠল। সেই লোকটিই আবার দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে জবাব দিল, 'না, আমরা গোয়েন্দা নই।'

আহমদ মুসা এবার তাকাল যাকে জাহাজ থেকে নামিয়ে নিচ্ছিল তার দিকে। তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি এদের চেনেন? কোন লেন-দেন আছে এদের সাথে?'

'না, এদের আমি চিনি না। কোন দিন এদের সাথে দেখাও হয়নি। লেন-দেনের তো প্রশ্নই ওঠে না।' বলল লোকটি দ্রুত ও স্পষ্ট কণ্ঠে।

আহমদ মুসা ফিরে তাকাল লোক দুজনের দিকে। বলল, 'আপনারা ওঁকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন কেন? আপনারা কি এ জাহাজের যাত্রী?'

ওদের একজন বলল, 'না, আমরা যাত্রী নই।'

যাত্রী না হলে জাহাজে আপনারা প্রবেশ করলেন কেমন করে?' জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

লোক দুজন তৎক্ষণাৎ কোন জবাব দিল না।

চারদিকে দাঁড়ানো লোকদের মধ্যে গুঞ্জন আগেই শুরু হয়েছিল তা এ সময় সরব হয়ে উঠল। কয়েকজন বলল, 'এরা নিশ্চয় হাইজ্যকার।'

কয়েকজনের এই কথার রেশ ধরে এবার সবাই বলে উঠল, 'নিশ্চয় হাইজ্যাকার এরা। পুলিশ ডাক। পুলিশে দাও এদেরকে।'

হৈ চৈ শুনে জাহাজের কয়েকজন এগিয়ে এল। সব শুনে তারা দুঃখ প্রকাশ করে বলল, 'ঠিক আছে, এদেরকে পুলিশে দিচ্ছি। কি করে জাহাজে ঢুকল সেটাও দেখছি।'

বলে লোক দুজনকে ধরে তারা জাহাজ থেকে নামিয়ে নিয়ে গেল।

শেরোয়ানী পরা লোকটি দুহাত জোড় করে চারদিাকের সবার শুকরিয়া আদায় করে আহমদ মুসার কাছে এসে দুহাত জড়িয়ে ধরে বলল, 'স্যার, আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন। ওরা নিশ্চয় আমাকে হাইজ্যাক করত। আরও কি করতে জানি না।' বলতে গিয়ে লোকটি কেঁদে ফেলল।

সবাই তাকে সান্তনা দিল।

আহমদ মুসাকেও সবাই ধন্যবাদ দিল। বলল, 'কি হচ্ছে, কি করতে হবে আমরা বুঝতেই পারছিলাম না।'

আহমদ মুসা লোকটির পিঠ চাপড়ে, সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে উপরে ওঠার জন্যে সিঁড়ির দিকে এগুলো।

আহমদ মুসা কেবিনে গিয়ে ব্যাগ, ইত্যাদি গোছগাছ করে রেখে ঘণ্টাখানেকের মত গড়িয়ে নিল। তারপর ডেকলাউঞ্জে চলে এল। উদ্দেশ্য সমুদ্রের উন্মুক্ত সান্নিধ্য উপভোগ করা। কাছে থেকে সমুদ্রের লোনা স্বাদ গ্রহণ অনেক দিন ভাগ্যে জোটেনি।

রেলিং-এর ধার ঘেঁষে একেবারে প্রান্তের সারিতে এক ডেক চেয়ারে বসল আহমদ মুসা।

সামনে আদিগন্ত সমুদ্র। সীমাহীনতার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে ভাল লাগে আহমদ মুসার।

সেই ভাল লাগার মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল আহমদ মুসা।

‘হ্যাল্লো মি. বার্গম্যান’-বাম দিক থেকে বাম কানের উপর আছড়ে পড়া শব্দে আহমদ মুসার আনমনা অবস্থা ভেঙে পড়ল।

তাকাল আহমদ মুসা বাম দিকে। দেখল, বয়স্ক এবং ভদ্র চেহারার একজন লোক তার দিকে এগিয়ে আসছে। বয়স পঞ্চাশের কম হবে না। স্বাস্থ্য ভাল। বয়সের চিহ্ন তার চেহারার উপর নেই।

আহমদ মুসার মনে বিস্ময়, লোকটি তার নাম জানল কি করে। দুএকদিনের মধ্যে কোথাও তার সাথে দেখা হয়েছে কিনা মনে করার চেষ্টা করল। কিন্তু স্মৃতি হাতড়ে লোকটির দেখা মিলল না।

লোকটিও বুঝতে পেরেছে আহমদ মুসার অবস্থা। বলল, ‘আপনি আমাকে চিনবেন না, এই ঘণ্টাখানেক আগে আমি আপনাকে চিনেছি।’

বলতে বলতে লোকটি আহমদ মুসার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। কথা শেষ করেই সে বলল, ‘আপনার পাশে বসতে পারি মি. বার্গম্যান?’

আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে বসে সলজ্জ হেসে বলল, ‘অবশ্যই। বসুন। ওয়েলকাম।’

লোকটি বসল।

লোকটি হ্যান্ডশেকের জন্যে আহমদ মুসার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, ‘আমি শ্রী গংগাধর তিলক। আমি পোর্ট ব্লেয়ারের ‘ব্লেয়ার মেমোরিয়াল গভর্নমেন্ট হাইস্কুল এন্ড কলেজ’-এর প্রিন্সিপাল।’

পোর্ট ব্লেয়ারের সরকারী হাইস্কুল এন্ড কলেজ-এর প্রিন্সিপাল জেনে খুব খুশি হয়ে উঠল আহমদ মুসা। কিছু বলতে যাচ্ছিল সে।

কিন্তু আহমদ মুসার আগেই শ্রী গংগাধর তিলকই আবার বলে উঠল, ‘এক নিমিষেই কখনো কখনো এক যুগের পরিচয় হয়ে যায়। সে রকমই হয়েছে। আপনি আমার ছেলের বয়সী হলেও এক নিমিষেই আমি আপনার ভক্ত হয়ে গেছি। দুঃখ যে, আপনার মত মানুষ লক্ষ নয়, কোটিতেও একজন পাওয়া যাবে না। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সব দেখেছি। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।’

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে থামল গংগাধর তিলক।

‘স্যার, প্রতিবাদ করার মত লোক অনেক আছে, কিন্তু পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে তারা সামনে এগোয় না। যদি তারা মনে করতো যে কোন অবস্থায় আইনকে পাশে পাওয়া যাবে, তাহলে প্রতিরোধ-প্রতিবাদে এগিয়ে আসতে কেউ দ্বিধা করতো না।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ধন্যবাদ। ঠিক রোগ ধরেছেন আপনি। আইনের সহায়তা তো দূরে থাক, বাদী হতে গিয়ে আসামীও হতে হয়।’

বলে একটু থামল। আবার বলে উঠল, ‘আপনি আমেরিকান আপনার কাছেই শুনলাম। আন্দামান যাচ্ছেন সরকারী কোন কাজে, না ব্যবসায়-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে?’

‘বেড়ানের উদ্দেশ্যে।’

‘কম্যুনিকেশন কিন্তু খুব ভাল নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পায়ে হাঁটা ও নৌকায় বেড়ানোর প্রধান মাধ্যম।’

‘এ দুটো মাধ্যমই আমার পছন্দনীয়।’

‘তাহলে আর কথা নেই।’

আহমদ মুসা শুরু থেকেই ভাবছিল। আন্দামানের বর্তমান সম্পর্কে কিছু জানার ইনি ভাল মাধ্যম হতে পারেন। আহমদ মুসা আলোচনার বিষয়টাকে ঐ দিকেই ঘুরিয়ে নিতে চাইল। বলল, ‘আমি জানতাম আন্দামান-নিকোবর শান্তি ও সম্প্রীতির একটা দ্বীপ। ভারতের যে কোন এলাকার চাইতে এখানকার সামাজিক পরিবেশটা ভাল। কিন্তু আসার আগে আমি ইন্টারনেটে পড়লাম, আন্দামানে সম্প্রতি বেশ কিছু রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে এবং জনপ্রিয় একজন ছেলে সম্প্রতি নিখোঁজ হয়েছে। বিষয়টা জেনে আমার মনটা খারাপ হয়ে গেছে। ব্যাপার কি বলুন তো?’

শ্রী গংগাধর তিলক তৎক্ষণাৎ জবাব দিল না। তার চোখে-মুখে একটা অস্বস্তির ভাব ফুটে উঠল। বলল, ‘আপনি ঠিকই শুনেছেন। তবে একটু কম শুনেছেন। সৌদি আরবের একটা এনজিও একটা ছোট্ট দ্বীপ ভাড়া নিয়ে সেখানে একটা কমপ্লেক্স গড়ে তুলেছিল। কমপ্লেক্সটা সমূলে ধ্বংস করা হয়েছে। এই সব ঘটনা আন্দামানের ইতিহাসকেই কলংকিত করেছে। বিশেষ করে আহমদ শাহ

আলমগীর-এর নিখোঁজ হওয়া আন্দামানের সকলের মনকেই নাড়া দিয়েছে। ছেলেটি আমার প্রতিষ্ঠান থেকেই পাশ করেছে। সে অত্যন্ত ভাল ছাত্র এবং আমার প্রিয় ছাত্র ছিল। সে এক অবিশ্বাস্য চৌকশ ছেলে। সে কোন পরীক্ষায় মেযন দ্বিতীয় হয়নি, তেমনি কোন খেলাধুলা ও প্রতিযোগিতায় সে কখনও দ্বিতীয় হতো না। মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার পর সে খেলাধুলা ছেড়ে দেয়। না হলে খেলাধুলার বহু আইটেমে সে জাতীয় দলে স্থান পেয়ে যেত। সবাই মনে করত, ছেলেটি আন্দামান নিকোবরের মুখ উজ্জ্বল করবে। আহমদ শাহ আলমগীরের হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যাওয়াটা আন্দামানবাসীদের জন্যে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত।'

'তার নিখোঁজ হওয়া সম্পর্কে আপনি কি মনে করছেন? মানুষ কি মনে করছে?' আহমদ মুসা বলল।

'মনে করা হচ্ছে এই ভাল করাটাই তার জন্যে কাল হয়েছে। হিংসা পরবশ হয়ে কেউ এই কাজ করতে পারে।'

'ছেলেটির কে আছে, তাদের বাড়ি কোথায়?'

'ছেলেটির মা আছে, এক বোন আছে। অন্যান্য আত্মীয় স্বজনও আছে। পোর্ট ব্লেয়ারের পশ্চিমে কাছেই হারবারতাবাদে তার পৈত্রিক নিবাস।'

'আপনি এই যে রহস্যজনক মৃত্যুর কথা বললেন এবং এই যে ছেলেটি নিখোঁজ হলো, এসবের জন্যে পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করেনি? তদন্তের খবর কি?' আহমদ মুসা বলল।

'না, গ্রেফতার হয়নি।'

'সাংঘাতিক ব্যাপার। তাহলে চক্রটি বেশ বড় নিশ্চয়। আন্দামান তো নিরাপদ নয়। আগে জানলে............।' কৃত্রিম একটা ভয় চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে আহমদ মুসার।

কিন্তু আহমদ মুসা কথা শেষ করার আগেই তাকে থামিয়ে দিয়ে শ্রী গংগাধর তিলক বলল, 'না, না, ভয় করার কোন কারণ নেই। ঘটনাগুলো খুব দুঃখজনক হলেও আপনার জন্যে সান্তনার যে, আহমদ শাহ আলমগীরের নিখোঁজ

হওয়াসহ রহস্যজন মৃত্যুর যত ঘটনা ঘটেছে, তার সবগুলোর শিকার মুসলমানরা। অন্য কোন ধর্মের লোকের কোন ক্ষতি হয়নি।'

'শুধু মুসলমানরা শিকার হয়েছে? কেন?' বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে বলল আহমদ মুসা নিপুণ এক অভিনেতার মত।

'কেন আমি জানি না। কিন্তু এটাই ঘটতে দেখা যাচ্ছে।' বলল গংগাধর তিলক।

'ভারতের অন্যান্য এলাকার মত এখানে শিবসেনা, আর.এস.এস ইত্যাদির মত সংগঠন গোপনে তৈরি হয়েছে নিশ্চয়?'

'এ ধরনের কোন প্রকাশ্য সংগঠন নেই। গোপনে থাকার যে কথা বলছেন, সেটা আমি জানি না।' বলল গংগাধর তিলক।

'আন্দামান-নিকোবর তো কেন্দ্র শাসিত। কেন্দ্রের নিয়োগ করা গভর্নর এখানকার শাসন পরিচালনা করেন। বিষয়টি কি গভর্নরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল না গংগাধর তিলকের কাছ থেকে। কি যেন ভাবছিল। তার ঠোঁটে অস্পষ্ট এক টুকরো হাসি। বলল, 'কি বলব বলুন। বেশির ভাগ লোকের ধারণা গভর্নরের ইংগিতেই কিডন্যাপ-এর ঘটনা ঘটেছে। কারণ গভর্নরের মেয়ের সাথে তার প্রেম আছে। গভর্নর বিবি মাধব ছেলেটাকে পথ থেকে সরিয়ে দেবার জন্যেই এটা করেছেন। কিন্তু আমার মতে ঘটনা তা নয়।'

'কেন নয় বলছেন জনাব?' আবার আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

'যেদিন সে কিডন্যাপ হয় সেদিন আমাদের কলেজে হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান ছিল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গভর্নর বিবি মাধব। কৃতিছাত্র হিসাবে আহমদ শাহ আলমগীরের শতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ছাত্রের পুরস্কার নেবার কথা ছিল। এ অনুষ্ঠানে আসার পথেই আলমগীর নিখোঁজ হয়ে যায়। সেদিনের গোটা সময়ের গভর্নর সাহেবের কথা-বার্তা, আচার-আচরণের আমি সাক্ষী। শিক্ষকতার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় মানুষ সম্পর্কে আমার যতটুকু জানা হয়েছে, তার ভিত্তিতেই আমি বলছি আলমগীরের সেদিনের কোন ঘটনার সাথে তিনি

জড়িত ছিলেন না। এরপরও যদি জড়িত থাকেন, তাহলে বলতে চাই, তার চেয়ে বড় অভিনেতা আর নেই।’ বলল গংগাধর তিলক।

কথা শেষ করেই গংগাধর তিলক উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘আমি একটু যাই, কাজ আছে। আপনার সাথে কথা বলে খুব খুশি হলাম। আপনি শুধু সাহসী ও প্রতিবাদী নন, খুব সজ্জন ব্যক্তি বলেও আমি মনে করি আপনাকে। আমার প্রতিষ্ঠানে একদিন আসুন। আরো কথা হবে।’

আহমদ মুসাও উঠে দাঁড়াল। তার সাথে হ্যান্ডশেক করে বলল, ‘আপনার ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার সুযোগ পেলে খুবই খুশি হবো।’

গংগাধর তিলক চলে গেল।

আহমদ মুসা দুধাপ এগিয়ে রেলিং-এ ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। চারদিকে চাইতে গিয়ে তার চোখে পড়ল, সেই শেরওয়ানীধারী যুবক কিছুটা দূরে রেলিং-এ দুহাতের কনুই ঠেস দিয়ে সাগরের দিকে চেয়ে আছে।

শেরওয়ানীধারী যুবকও এদিকে তাকিয়েছে। সেও দেখতে পেল আহমদ মুসাকে।

দেখতে পেয়েই সে দ্রুত এগিয়ে এল আহমদ মুসার দিকে।

কাছাকাছি হয়ে বলল, ‘স্যার বোধ হয় ভিআইপি কেবিনে আছেন?’

আহম মুসা খুব খুশি হয়েছে যুবককে এভাবে এখানে পেয়ে। আন্দামানের মুসলমানদের ব্যাপারে গংগাধর তিলকের চেয়ে অনেক বেশি জানা যাবে এই যুবকের কাছ থেকে। তাছাড়া তার আক্রান্ত হওয়ার কারণ কি, এটাও রহস্য হয়ে আছে আহমদ মুসার কাছে।

আহমদ মুসা যুবকটির প্রশ্নের হ্যাঁ সুচক জবাব দিয়ে বলল, ‘আসুন, বসে কথা বলা যাক।’

‘ধন্যবাদ স্যঅর, আমেরিকাকে জানার আমার খুব আগ্রহ। এক স্বপ্নের দেশ বলতে পারেন ওটা আমার।’

বলতে বলতে দুজনে এক সাথে এগিয়ে এসে পাশাপাশি বসল।

বসেই যুবকটি বলে উঠল, ‘স্যার নিশ্চয় এশিয়ান- আমেরিকান? কোন দেশের?’

‘আপনিই বলুন কোন দেশের।’

‘তুরস্ক থেকে মিসর পর্যন্ত কোন দেশের বংশোদ্ভুত হবেন।’

‘যথেষ্ট বুদ্ধি করে কথা বলেছেন। বুঝা যাচ্ছে, বিভিন্ন দেশের মানুষ সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান রাখেন। এখন বলুন ঐ লোকদের সম্পর্কে। তারা কোথাকার এবং আপনার উপর চড়াও হয়েছিল কেন?’

‘লোকগুলো অবশ্যই ভারতের।’ বলে যুবকটি চুপ করল।

‘প্রশ্নের এক অংশের জবাব হলো, অন্য অংশের?’

‘আমি তো আগেই বলেছি তাদের চিনি না, তাদের সম্পর্কে কিছুই জানি না আমি স্যার।’ বলল যুবকটি।

‘আপনার নামটাই কিন্তু এখনও জানা হয়নি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘স্যরি। জি, আমার নাম, ‘ইয়াহিয়া আহমাদুল্লাহ।’

‘সুন্দর নাম। আপনার বাড়ি কি আন্দামানে?’

‘জি হ্যাঁ।’

‘কি করেন?’

‘কিছু করতাম, এখন করি না।’

‘কি করতেন?’

‘গ্রীন আইল্যান্ডের রাবেতা কমপ্লেক্স মসজিদের একজন ইমাম এবং সেখানকার ইসলামিক স্কুলের একজন শিক্ষক ছিলাম।’

ইয়াহিয়া আহমাদুল্লাহর পরিচয় পেয়ে আহমদ মুসা ‘মেঘ না চাইতে জল পাওয়া’র মত আনন্দিত হলো। মনে মনে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল। বলল কিছু না জানার ভান করে, ‘ছিলেন মানে? এখন সেখানে ইমাম ও শিক্ষক হিসাবে নেই? চাকুরী ছেড়ে দিয়েছেন?’

যুবকটি গম্ভীর হলো। গভীর বেদনার ছায়া পড়ল তার চোখে-মুখে। বলল, ‘রাবেতার সে কমপ্লেক্স ধ্বংস হয়ে গেছে। মসজিদ নেই, স্কুল নেই এবং আমার চাকুরীও নেই।’

‘ধ্বংস হয়েছে মানে? কিভাবে ধ্বংস হলো?’ বলল আহমদ মুসা মুখে কৃত্রিম বিস্ময় ফুটিয়ে।

‘কে বা কারা একরাতে গোটা কমপ্লেক্সের মূলোচ্ছেদ করে সেখনে গাছ-পালা লাগিয়ে দিয়েছে। বুঝাই যায় না সেখানে কোন স্থাপনা ছিল। শুধু ধ্বংসই নয়, রাবেতার কর্মকর্তা-কর্মচারী যারা আন্দামান ও ভারতের নয়, তাদের রাতারাতিই এক জাহাজে তুলে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে।’ ইয়াহিয়া আহমাদুল্লাহ বলল।

‘কোন প্রতিবাদ-প্রতিকার হয়নি এই অবিচারের?’

‘কে প্রতিবাদ-প্রতিকার করবে? যারা করতে পারতো, তাদের তো দ্বীপ থেকে বাইরে চালান করে দেয়া হয়েছে। পরে অবশ্য রাবেতা দিল্লী সরকারের কাছে প্রতিবাদ করে প্রতিকার দাবী করেছে। দিল্লী প্রতিকার কিছু করেনি, বরং বলেছে, এ রকম কোন সংস্থা আন্দামানে আছে বা ছিল তা দিল্লী সরকারের জানা নেই, আন্দামান কর্তৃপক্ষও জানাতে পারেনি।’ যুবকটি বলল বেদনাপীড়িত কণ্ঠে।

‘সাংঘাতিক ব্যাপার? এই ধ্বংসের পিছনে সরকারের যোগ-সাজস আছে? না খোদ সরকারই এটা করেছে?’

‘কিছ জানি না। জানার চেষ্টা করতেও পারিনি। যদিও আমার বাড়ি আন্দামানে, তবু সেই রাতে আমাকে অন্য সবার সাথে আন্দামানের বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এতদিন নানা কারণে ফিরতে পারিনি। আজ ফিরছি।’

আহমদ মুসার চোখে-মুখে ভাবনার ছাপ। বলল, ‘আন্দামানে কোথায় বাড়ি আপনার? কে আছে সেখানে?’

‘পোর্ট ব্লেয়ারের দক্ষিণে ছোট শহর কালিকটে আমার বাড়ি। সেখানে আমার আব্বা-আম্মা ছাড়া আর কেউ নেই।’

ভাবনা দূর হয়নি আহমদ মুসার চেহারা থেকে। ইয়াহিয়া আহমাদুল্লাহ থামতেই সে বলে উঠল, ‘যারা আপনাদের রাবেতা কমপ্লেক্স ধ্বংস করেছে, তারাই কি চেন্নাই বন্দরে আপনাকে কিডন্যাপ করার চেষ্টা করেছিল?’

বিস্ময় ফুটে উঠল ইয়াহিয়া আহমাদুল্লাহর চোখে-মুখে। বলল, ‘আমি তো এইভাবে জিনিসটাকে দেখিনি। হতে পারে তারাই ঘটনা ঘটিয়েছে। আমি আন্দামানে যাই তারা তা নাও চাইতে পারে। তবে অন্যেরাও এ ঘটনা ঘটাতে

পারে। বিশেষ করে মুসলমানরা এখানে দুষ্কৃতিকারীদের হাতে এমন হ্যারাসমেন্টের শিকার হয়।’

‘আপনি আন্দামানে কেন ফিরছেন? পরিবারের কাছে, না আরও কিছু করণীয় আছে আপনার?’

‘রাবেতা কমপ্লেক্স ধ্বংসের ব্যাপারে একটা কেস দায়ের করব। পুলিশ কিছু করলে তাদের সহযোগিতা করব। আর কিছু নয়। রাবেতা বলেছে পোর্ট ব্লেয়ারের কোন মসজিদকে কেন্দ্র করে ছোট-খাট অফিসের মাধ্যমে রাবেতার কিছু কাজ চালু রাখতে।’

‘আন্দামানে রাবেতার অফিস ধ্বংসের মত কাজ কে বা করা করতে পারে, এ ব্যাপারে আপনার কোন ধারণা আছে কি?’

‘ধারণার জন্যে কিছু তৎপরতা চোখে পড়া দরকার। কিন্তু এমন কোন বৈরী বা সন্দেহ করার মত তৎপরতা কখনই চোখে পড়েনি। আন্দামান-নিকোবর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। মানব হিতৈষী এনজিও হিসাবে রাবেতা এখানে শান্তিপূর্ণভাবে কাজ করছিল। এ সংস্থার দিকে কাউকে কখনও বৈরিতা তো দূরে থাক প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাতেও দেখিনি।’

‘কিন্তু আকস্মিকভাবে এমন ঘটনা ঘটা কি সম্ভব?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘সম্ভব নয়, কিন্তু ঘটেছে?’

‘আপনি বলছেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা, কিন্তু এরই মধ্যে কয়েকজন মুসলিম যুবক খুন হয়েছে, আহমদ শাহ আলমগীর কিডন্যাপ হয়েছে, এর ব্যাখ্যা তাহলে কি?’

‘এ সবই অতি সাম্প্রতিক ঘটনা। তবে হ্যাঁ, এগুলো সাম্প্রদায়িক ঘটনাও হতে পারে, তবে তা এখনও প্রমাণ হয়নি। রাবেতা অফিস ধ্বংস হবার মতই এগুলো রহস্যপূর্ণ। বিশেষ করে আহমদ শাহ আলমগীরের নিখোঁজ হওয়া সকলের মনকেই নাড়া দিয়েছে।’

‘আহমদ শাহ আলমগীর সম্পর্কে আপনি কি জানেন?’ বলল আহমদ মুসা।

‘খুব ভাল ছেলে। মাথা যেমন ভাল, তেমনি ভাল তার লিডারশীপ কোয়ালিটি। দেশ ও মানুষের উপকার হয়, এমন সব ক্ষেত্রেই তার অগ্রণী ভূমিকা। মনে হয় কয়েক জেনারেশন পর তার মধ্যে প্রকৃত মোগল রক্ত নতুন করে জেগে উঠেছে।’

‘এবড় জনপ্রিয় ছেলের শত্রু কে হতে পারে? কারও সাথে তার এমন কোন ঘটনা ছিল যারা এটা করতে পারে?’

‘সে পড়তো অন্ধ্র প্রদেশের হায়দরাবাদে। বাড়িতে ছুটি-ছাটার সময় আসতো। তার এমন শত্রু আন্দামানে ছিল বলে মনে হয় না।’

‘ধন্যবাদ।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ধন্যবাদ স্যার। আমি এখন উঠতে চাই। আপনাকে আবার আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।’ বলে উঠে দাঁড়াল ইয়াহিয়া আহমাদুল্লাহ।

চলতে শুরু করেই সে আবার ঘুরে দাঁড়াল। বলল, ‘স্যার, সময় যদি পান, আমার বাসায় এলে খুব খুশি হবো।’ বলে সে তার একটি নেমকার্ড আহমদ মুসার হাতে তুলে দিয়ে আবার চলতে শুরু করল।

মনে মনে আহমদ মুসা বলল, সময় না পেলেও আপনার বাড়িতে যেতে হবে। আপনার সাথে দেখা করতে হবে বন্ধু।

এ বিষয়ে ভাবতে গিয়ে খুশি হলো আহমদ মুসা। আন্দামান গোটাটাই তার কাছে অন্ধকার ছিল। হোটেল ছাড়া কোন ঠিকানা তার জানা ছিল না। এখন তিনটি ঠিকানা তার হাতে। একটি গংগাধর তিলকের হাইস্কুল এন্ড কলেজ, দ্বিতীয়টি ইমাম ইয়াহিয়া আহমাদুল্লাহর বাড়ি এবং তৃতীয়টি নিখোঁজ আহমদ শাহ আলমগীরদের বাসার ঠিকানা। তাছাড়া সুষমা রাও সম্পর্কেও কিছু জানা গেছে। আহমদ শাহ আলমগীর সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সুষমা জানতে পারে।

মন প্রসন্ন হয়ে উঠল আহমদ মুসার। অনেক হালকা লাগল মনটাকে।

আবার সে দৃষ্টি ফেরাল সামনের আদিগন্ত সমুদ্রের দিকে।

আদিগন্ত সমুদ্র যেখানে আকাশের সাথে এক হয়ে গেছে, সেখানে গিয়ে তাদের সাথে একাকার হয়ে গেল আহমদ মুসার মনও।

# ৩

পোর্ট ব্লেয়ারের লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে বাইরের লবীতে এসে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

লাউঞ্জের এক পাশের দেয়ালে একটা বিশাল বোর্ডে আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মানচিত্র।

আহমদ মুসা একটু এগিয়ে মানচিত্রটির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দেখল, শুধু আন্দামান-নিকোবরের মানচিত্র নয়, ইনসেটে পোর্ট ব্লেয়ার শহরেরও একটা মানচিত্র আছে। আন্দামান নিকোবরের মানচিত্রে শহর, গ্রাম, পাকা রাস্তা, কাঁচা রাস্তা, পায়ে চলার রাস্তা, ফেরী যোগাযোগ, পাহাড়, বন, ঝরনা, হ্রদ, দ্বীপসমূহের অবস্থান ইত্যাদি সুন্দরভাবে চিহ্নিত। আর পোর্ট ব্লেয়ারের মানচিত্র রাস্তা, এলাকার নাম, হোটেল, সরকারী অফিস ও দর্শনীয় স্থানগুলোর অবস্থান ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সবকিছুই রয়েছে। আহমদ মুসা খুব খুশি হলো। সে ইন্টারনেট থেকে যে মানচিত্র যোগাড় করেছে তা এত বিস্তারিত নয়।

আহমদ মুসা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছিল মানচিত্র। আপাতত পোর্ট ও এর আশে-পাশের অঞ্চল সম্পর্কে একটা ধারণা সে মাথায় গেঁথে ফেলতে চায়।

আহমদ মুসা অনুভব করল তার দুপাশে কিছু লোক এসে দাঁড়াল।

তাকাল আহমদ মুসা। দেখল, তরুণ ও যুবক বয়সের কয়েকজন। তাদের পরনে ইউনিফর্ম। বুঝল, তারা ট্যাক্সি চালক। আহমদ মুসাকে বিদেশী ট্যুরিষ্ট ভেবে ছুটে এসেছে।

আহমদ মুসা তাদের দিকে চাইতেই হাস্যোজ্জ্বল একজন তরুণ তড়িঘড়ি করে ভাঙা ইংরেজীতে বলে উঠল, ‘স্যার, আমার গাড়ি একেবারে নতুন। এসি আছে। ভাড়ার মিটার একদম নিখুঁত।’

তার কথার মধ্যেই অন্যেরাও একসাথে কথা বলা শুরু করল।

আহমদ মুসা হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'ও আগে কথা বলেছে, ওর সাথে কথাটা শেষ করি, কেমন?'

সবাই চুপ করল।

আহমদ মুসা তাকাল তরুণটির দিকে। বলল, 'তোমার গাড়ির বিবরণ পছন্দ হয়েছে, কিন্তু তুমি কেমন তার বিবরণ দাওনি।'

তরুণটি সলজ্জ হাসল। বলল, 'স্যার, আমাকে তো দেখতেই পাচ্ছেন?'

'কিন্তু তুমি কেমন তাতো দেখতে পাচ্ছি না।' আহমদ মুসা বলল।

তরুণটির মুখে সলজ্জ বিব্রতভাব আরও গভীর হলো। বলল, 'স্যার, ওটা মুখে বলার নয়, কাজে প্রমাণ হয়।'

তরুণটির উত্তরে খুশি হলো আহমদ মুসা। বলল, 'বা! তুমি তো খুব বুদ্ধিমান ছেলে!'

আহমদ মুসা কথা শেষ করতেই কার পার্কিং এলাকা থেকে একটা চিৎকার ভেসে এল, 'হাইজ্যাকার, হাইজ্যাকার, বাঁচাও, বাঁচাও।'

আহমদ মুসা দ্রুত তাকাল ওদিকে। দেখল, তিনজন লোক একজনকে জোর করে একটা মাইক্রোতে তুলছে। লোকটির গায়ে শেরওয়ানি।

চমকে উঠল আহমদ মুসা। সে নিশ্চিত, লোকটি ইয়াহিয়া আহমাদুল্লাহ।

আহমদ মুসা দেখতে পেল, কার পার্কিং এর বিপরীত প্রান্তে দুজন পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তাদের দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরানো। একজন মানুষের আর্ত চিৎকারকে তারা ভ্রুক্ষেপই করছে না।

আহমদ মুসা দ্রুত তাকাল তরুণটির দিকে। বলল, 'যাবে তুমি? চল। দৌড়।'

বলে আহমদ মুসা দ্রুত হাঁটতে লাগল কার পার্কিং-এর দিকে।

তরুণটিও দৌড় দিল। বলল, 'স্যার আপনি আসুন। আমাদের ভাড়া গড়িগুলো বাইরের পার্কিং-এ আছে। আমি নিয়ে আসছি গাড়ি।'

আহমদ মুসা যখন তরুণটির গাড়িতে উঠল, 'তখন ইয়াহিয়া আহমাদুল্লাহকে হাইজ্যাক করা কারটা অনেকটা পথ এগিয়ে গেছে। পোর্ট থেকে

বেরিয়ে যাওয়া রাস্তাটা তীরের মত সোজা বলে গাড়িটা চোখের আড়ালে যেতে পারেনি।

আহমদ মুসা ড্রাইভার তরুণটির পাশের সিটে বসেছিল। তরুণটিকে লক্ষ্য করে সে দ্রুত কণ্ঠে বলল, 'ঐ মাইক্রোটার পিছু নাও। গাড়িটাকে হারানো চলবে না।'

'সাংঘাতিক ঘটনা স্যার। আমি এ ধরনের ঘটনা আন্দামানে আর দেখিনি। একজন লোককে হাইজ্যাক করল, আর পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল- আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। স্যার, লোকটা কি আপনার পরিচিত?' বলল ড্রাইভার তরুণটি।

'পরিচিত নয়, আসাবর সময় জাহাজে দেখা হয়েছিল।' বলল আহমদ মুসা।

'আপনি কি করতে চান স্যার। তাকে উদ্ধার করবেন? তাহলে তো মারামারি হবে?'

'মারামারিকে ভয় কর নাকি?'

'ভয় করি না। কিন্তু আমার চিন্তা গাড়ি নিয়ে। অনেক কষ্টে গাড়িটা করেছি স্যার।' তরুণটি উদ্বেগ মিশ্রিত কণ্ঠে বলল।

কথা শেষ করেই ছেলেটি চিৎকার করে উঠল, 'স্যার, মাইক্রোটি শহর ছেড়ে সাউথ আন্দামান হাইওয়ের দিকে যাচ্ছে।'

সাউথ আন্দামান হাইওয়েটি পোর্ট ব্লেয়ার থেকে বেরিয়ে দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্ত হয়ে লেক ব্লেয়ার ঘুরে সাউথ আন্দামান দ্বীপের উত্তরাংশে বহুদুর পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। এই হাইওয়ে ধরে সাউথ আন্দামানের কালিকট, ওলিগঞ্জ, হায়বারতাবাদ, উইমবারলিগঞ্জ শহরগুলোতে কিংবা তার কাছাকাছি যাওয়া যায়।

'শোন, গাড়িটার সামনে গিয়ে আটকাবার চেষ্টা করার দরকার নেই। গাড়িটাকে অনুসরণ করে, গাড়িটা যে পর্যন্ত যেতে চায়, আমরা সে পর্যন্ত যাব।'

'ঠিক আছে স্যার।'

'তোমার নাম কি?'

'কোন নাম বলব স্যার, ফ্যামিলী, না অফিসিয়াল?'

‘তোমার নাম বল। দুটো মিলেই তো একটা পূর্ণ নাম হয়।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কিন্তু আমার দুটো নামই আলাদা ও পূর্ণ নাম।’

‘দুই নামই বল।’

‘দুই নাম বলা যাবে না স্যার। ফ্যামিলী নাম শুধু ফ্যামিলীর জন্যে। আমার অফিসিয়াল নাম হলো গোপী কিষাণ গংগারাম।’

‘ঠিক আছে গংগারাম। একটু স্পিড বাড়াও। সামনে রাস্তা মনে হচ্ছে আঁকা বাঁকা। কাছাকাছি না থাকলে হারিয়ে যাবে গাড়িটা।’

‘ঠিক স্যার। সামনে রাস্তা খুবই জিগজ্যাগ।’ বলে সে গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিল।

ঠিক এ সময়ে এক বাঁকে গাড়িটা আহমদ মুসাদের চোখের আড়ালে চলে গেল।

গংগারাম বলল, ‘স্যার, সামনের ঐ বাঁক না পেরুলে গাড়িটা চোখে পড়বে না। কিন্তু আমরা যখন ঐ বাঁক পার হবো, তখন ঐ গাড়িটা আরেকটা বাঁকের আড়ালে চলে যাবে।’

‘গাড়ির স্পিড বাড়াও গংগারাম। গাড়িটাকে ধরতে হবে।’

গংগারামের গাড়ির স্পিডোমিটারের কাঁটা লাফ দিয়ে ৬০ থেকে ৯০ তে গিয়ে উঠল। এরপর কাঁপতে কাঁপতে তা উঠল একশ’তে।

ঠিক আছে গাড়ির স্পিড এখানে রাখ গংগারাম। নিশ্চয় ওই গাড়ি আমাদের দেখতে পায়নি। সুতরাং ওরা এই ঝুঁকিপূর্ণ স্পিডে যাবে না।

দুতিনটা বাঁক পার হবার পর গংগারামের গাড়িটা একটা সোজা রাস্তার মুখে এসে দাঁড়াল। কিন্তু সামনে কোন গাড়ি তারা দেখতে পেল না।

সঙ্গে সঙ্গে গংগারাম বলে উঠল, ‘স্যঅর, গাড়ি নিশ্চয়ই সামনে যায়নি। আমার ছোট নূতন গাড়ি যে স্পিডে এসেছে এই আঁকা-বাঁকা রাস্তায়, বড় মাইক্রোটা ঐ স্পিডে যাওয়া অসম্ভব। সুতরাং সামনের লম্বা পথটায় তাকে দেখা পাবারই কথা। দেখা যখন যাচ্ছে না, তখন আমার মনে হয় পেছনে কোথাও ওরা লুকিয়েছে।’

‘ঠিক বলেছ গংগারাম। গাড়ি ঘুরাও।’

গংগারাম গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে চলতে শুরু করল।

‘গংগারাম, মাইক্রোটা চোখের আড়ালে যাবার পর পাহাড়ের আঁকা-বাঁকা পথে আমরা যতটা এগিয়েছি তার মধ্যে দুপাশে সরে পড়ার কোন রাস্তা আছে?’ বলল আহমদ মুসা।

‘না স্যার, এরকম রাস্তা নেই। তবে পাহাড়ের গলি আছে কয়েকটা যা দিয়ে গাড়িও চলতে পারে।’

‘দ্রুত আগাও গংগারাম। গলিগুলো চেক করতে হবে।’ আহমদ মুসা বলল।

গাড়ির স্পীড বাড়ল। ছুটে চলল গাড়ি সামনের দিকে।

এক স্থানে এসে গাড়ির গতি স্লো হয়ে গেল।

গংগারাম বলল, ‘স্যার ডান দিকে একটা প্রশস্ত করিডোর আঁকা বাঁকা হয়ে পূর্বদিকে চলে গেছে।’

গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল।

‘স্যার, এখানেই গিরি করিডোরটা। ওদিকে গাড়ি ঘুরিয়ে নেব?’ বলল গংগারাম।

সামনের রাস্তাটার উপর আহমদ মুসার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। এক টুকরো কাদামাটি তার নজরে পড়ল।

ভ্রুকুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার।

দ্রুত নামল গাড়ি থেকে।

গাড়ির সামনে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখল কাদামাটির ছোট্ট খ-টির উপর। দেখেই বুঝল মাটিটি কোন গাড়ির চাকা থেকে খসে পড়া।

কাদামাটিটা একদম তাজা।

আশে-পাশে নজর বুলাল। চোখে পড়ল কংক্রিটের রাস্তার উপর গাড়ির ভেজা চাকার শুকিয়ে ওঠা অস্পষ্ট দাগ। কংক্রিটের রাস্তার পাশেই মাটির উপরের ঘাস দুমড়ানো মুচড়ানো।

ঘাসের উপরের এই দাগ অনুসরণ করে আহমদ মুসা তাকাল পূর্ব দিকে। দেখল সামনে একটা প্রশস্ত গিরিপথ।

গংগারাম এসে দাঁড়িয়েছে আহমদ মুসার পাশে।

‘কি দেখছেন স্যার?’ জিজ্ঞাসা গংগারামের।

‘সামনে কোন জলাভূমি আছে গংগারাম?’ গংগারামের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

‘স্যার, এখান থেকে সাগর খুব কাছে। এই গিরিপথটা এঁকে বেঁকে সাগর পর্যন্ত নেমে গেছে। সামনে কোন জলাভূমি নেই। তবে পাথে ঝরনা ধরনের পানির ধারা আছে।’ বলল গংগারাম।

‘সেটা কতদূর?’

‘কাছে। সামনের টিলার পরেই। কি হয়েছে স্যার?’ কেন জিজ্ঞাসা করছেন?’

আহমদ মুসা গংগারামকে কাদা খ-, রাস্তায় গাড়ির চাকার ভিজা দাগ এবং দলিত-মথিত ঘাস দেখিয়ে বলল, ‘হাইজ্যাকার গাড়িটা নিয়ে এদিকে লুকিয়ে ছিল, এইমাত্র চলে গেছে মনে হয়।’

গংগারামও ঝুঁকে পড়ে চাকার দাগ পরীক্ষা করল। বলল, ‘মনে হয় স্যার, আপনি ঠিকই বলেছেন, এটা ঐ মাইক্রো গাড়িরই চাকার দাগ।’

‘তাহলে আর দেরি নয়, গঙ্গারাম এস। গাড়িটাকে ফলো করতে হবে।’

বলে আহমদ মুসা ছুটল গাড়ির দিকে।

গংগারামও দৌড় দিয়ে গাড়িতে ফিরে এল। গাড়ি ষ্টার্ট দিতে দিতে বলল, ‘আমরা দশ মিনিটের পথ সামনে চলে গিয়েছিলাম, ফিরতে লেগেছে দশ মিনিট। মাইক্রো এতক্ষণ লুকিয়ে থাকার কথা নয়। সুতরাং স্যার আমি আশাবাদী নই যে, মাইক্রোটির দেখা আমরা পাব।’

গংগারামের কথাই সত্য হলো। আহমদ মুসারা গাড়ি নিয়ে আবার পোর্ট পর্যন্ত এল। এ ছাড়াও আরও এদিক-সেদিক ঘুরল। কিন্তু মাইক্রোটির দেখা তারা পেল না।

আহমদ মুসা হতাশভাবে হোটেলে এল।

হোটেলটা গংগারামই চয়েস করে দিয়েছে। বলেছিল, 'খাওয়া থাকায় দামের দিক দিয়ে সেরা না হলেও পোর্ট ব্লেয়ারে এটাই সেরা হোটেল স্যার। মালিক খুব ভাল লোক, পোর্ট ব্লেয়ারের আদি মানুষ। বসবাসের জন্যে ভারতের অন্য এলাকা থেকে আসা নয়। পোর্ট ব্লেয়ারে আসা মানুষকে তিনি মেহমান মনে করেন। ব্যবসায় করেন, মানুষের পকেট কাটেন না।'

'তুমি ট্যাক্সি ক্যাব চালাও। তাঁকে এমন ঘনিষ্ঠভাবে জান কি করে? তিনি বুঝি খুব জনপ্রিয় লোক?' জিজ্ঞাসা করেছিল আহমদ মুসা।

'ভাল লোককে সবাই ভাল বলে জানে, কিন্তু অনেকে না মানতেও পারে।' বলেছিল গংগারাম।

হোটেলের দুতলার সুন্দর অবস্থানে একটা ঘর পেয়েছিল আহমদ মুসা। পূবের জানালা খুললে বিল্ডিং-এর দেয়ালে আছড়ে পড়া পানির ছলাৎ ছলাৎ শব্দ শোনা আর দেখা যায় আন্দামান সাগরের অথৈ নীল জল। আর উত্তরের জানালা খুললে নিচেই সুন্দর বাগান নজরে পড়ে।

আহমদ মুসা ফজরের নামাজের পর গিয়ে দাঁড়িয়েছিল পূবের জানালায়। আন্দামান সাগরের শান্ত নীল পানির দিকে তাকিয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল। এই গোটা আন্দামান ছিল একদিন জেলখানা। এই সাগর পথেই অসহায় বন্দীদের আনা হতো এই জেলখানায়। এই বন্দীদের মধ্যে ছিল সুলতান-শাহজাদা, রাজা-রাজপুত্র, বিচারক-ক্রিমিনাল, মওলানা-মুর্খ, রাজবন্দী-ডাকাত সবাই।

আহমদ মুসার এই আপন-ভোলা অবস্থা কতক্ষণ থাকতো কে জানে! কিন্তু চোখের উপর রোদের সরাসরি ছোবল তার সম্বিত ফিরিয়ে আনল।

আহমদ মুসা জানালা থেকে সরে এল। জায়নামাজ হিসাবে ব্যবহৃত সফেদ কাপড় খ-টি মেঝে থেকে তুলে গুছিয়ে টেবিলের একপাশে রাখল এবং টেবিল থেকে ক্ষুদ্র কুরআনটি তুলে নিয়ে ব্যাগে পুরল। ব্যাগটি লাগেজ কেবিনে রাখতে গিয়ে জানালা দিয়ে বাগানটি দেখতে পেল আহমদ মুসা।

পর্দা পুরোটা গুটিয়ে জানালায় গিয়ে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

সুন্দর, পরিচ্ছন্ন বাগান। ফুলের গাছ মাঝে মাঝে থাকলেও পরিকল্পিত ফলের গাছই বেশি। আন্দামানে সমভূমির পরিমাণ কম বলে সমভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহারে আন্দামানীরা যতœবান।

বাগানের উত্তর প্রান্তের একটা ছোট্ট স্থাপনা আহমদ মুসার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। উত্তর-দক্ষিণ লম্বা দশ ফুট আয়তাকার ক্ষেত্রটি দু'ফুটের মত উচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। চারটি খুঁটির উপর দাঁড়ানো একটা টিনের চালা ক্ষেত্রটির উপর দাঁড়িয়ে আছে।

'ওটা কি কবর?' স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রশ্নটি বেরিয়ে এল আহমদ মুসার মুখ থেকে।

প্রশ্নটার রেশ আহমদ মুসার মন থেকে মিলিয়ে না যেতেই সে দেখতে পেল এক দীর্ঘাঙ্গ সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ একটা গাছের ওপাশ দিয়ে কবরের পাশে এসে দাঁড়াল। কবরটা ঘুরে সে পূর্ব পাশে চলে গেল। কবরকে পাশে রেখে সে পশ্চিমমুখী হয়ে দাঁড়াল। মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর তার দুটি হাত উপরে উঠল। দোয়া করছে বৃদ্ধ। সন্দেহ নেই কবরবাসীর জন্যে সে দোয়া করছে।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছিল আহমদ মুসা দৃশ্যটা।

বিস্ময়ও এসে তার মনকে আচ্ছন্ন করেছে। বুঝাই যাচ্ছে বাগানটা হোটেলের অংশ। হোটেলের বাগানে কবরটাকে এমন পরিপাটি করে রাখা কেন? হোটেলের মালিক কি কোন মুসলিম কেউ? সৌম্যদর্শন ঐ বৃদ্ধটি কে? হোটেলের কেউ?

দরজায় নক হলো।

ভাবনায় ছেদ পড়ল আহমদ মুসার।

দরজার দিকে এগুলো আহমদ মুসা। দরজায় পৌছে বাইরে কে তা দেখার জন্যে ডোর ভিউ-এ চোখ রাখল। বাইরে কাউকে দেখতে পেল না। কে তাহলে নক করল? দ্রুত দরজা খুলল আহমদ মুসা।

দরজার গোড়ায় খবরের কাগজ পড়ে থাকতে দেখে মনে মনে হেসে উঠল। হকার নিশ্চয় কাগজ দেয়ার পর নক করে তা জানিয়ে দিয়েছিল।

কাগজ নিয়ে আহমদ মুসা ঘরে প্রবেশ করল।

বসল গিয়ে সোফায়।

আন্দামানের একমাত্র ইংরেজী দৈনিক 'দি আন্দামান'-এর প্রথম পাতাটা চোখের সামনে তুলে ধরল আহমদ মুসা।

কাগজের প্রথম পাতায় চোখ বুলাতে গিয়ে পত্রিকার ডান কোনার একটা টপ ছবির উপর আহমদ মুসর চোখ আটকে গেল। ছবিটা ইয়াহিয়া আহমাদুল্লাহর।

আহমদ মুসা কৌতুহল নিয়ে তাকিয়েছিল ছবির ইয়াহিয়া আহমাদুল্লাহর দিকে। কিন্তু ছবির নিচের ক্যাপশনে চোখ পড়তেই আঁৎকে উঠল আহমদ মুসা। নিউজের শিরোনাম পড়ল, 'সেই সাগর তীরেই আরেকটি রহস্যজনক মৃত্যু।'

নিউজটি রুদ্ধশ্বাসে পড়ল আহমদ মুসা। পোর্ট ব্লেয়ার থেকে ৪০ মাইল দূরে হাইওয়ের অদূরে সমুদ্র উপকূলে অর্ধডোবা অবস্থায় তার লাশ পাওয়া গেছে। পোষ্ট মর্টেম রিপোর্ট অনুসারে জলে ডোবার কারণে শাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেছে সে। তার শরীরে অন্য কোন আঘাত পাওয়া যায়নি।

একটা দুঃখ গুমরে উঠল আহমদ মুসার হৃদয়ে। সরল, সহজ ও অনড় আদর্শ-নিষ্ঠ লোকটাকে চেন্নাইতে কিছু সাহায্য করতে পারলেও এখানে তার জন্যে কিছুই করতে পারল না সে। ভাবল আহমদ মুসা, কাল হাইওয়ের উপর কাদাওয়ালা গাড়ির যে দাগ তারা দেখেছিল, সেটা ছিল লোকটাকে হত্যা করে ওদের ফিরে যাওয়ার চিহ্ন। ওদের অনুসন্ধান করার জন্যে তাড়াহুড়া করে ফিরে না এসে যদি তারা সাগর কূলে যেত, তাহলে কালকেই তারা ইয়াহিয়া আহমাদুল্লাহর লাশ পেয়ে যেত।

একটা বিষয় আহমদ মুসর কাছে খুবই স্পষ্ট হয়ে গেল, মাদ্রাজে যারা ইয়াহিয়ার উপর আক্রমণ করেছিল এবং যারা আন্দামানে তাকে হত্যা করল তারা একই গ্রুপ। এর অর্থ যারা আন্দামানে হত্যাকা- চালাচ্ছে, যারা আহমদ শাহ আলমগীরকে কিডন্যাপ করেছে এবং যারা রাবেতার স্থাপনা ধ্বংস করে দিয়েছে, তারা আন্দামানের কোন বিচ্ছিন্ন গ্রুপ নয়, ভারতের মূল ভূখ- কার্যরত কোন ষড়যন্ত্রেরই একটা অংশ। এবং এটাই যুক্তিযুক্ত হতে পারে যে, ভারত-উদ্ভুত কোন ষড়যন্ত্রেরই নতুন বিস্তার ঘটেছে আন্দামানে। এটাই যদি ঘটনা হয়, তাহলে এটা

আন্দামানবাসী, বিশেষ করে আন্দামানের মুসলমানদের জন্যে খুবই দুর্ভাগ্যজনক। এই দুর্ভাগ্যের মোকাবিলা হবে কঠিন।

দরজায় নক হলো এ সময়।

আহমদ মুসা হাত ঘড়ির দিকে তাকাল। দেখল সকাল ৭টা পার হয়ে গেছে। সাতটার সময় গংগারাম তার গাড়ি নিয়ে আসার কথা। নিশ্চয় নকটা সেই করেছে।

আহমদ মুসা টেবিলের উপর থেকে লকারটা টেনে নিয়ে দরজা আনলক করার সুইচ টিপে দিয়ে বলল, 'এস গংগারাম।'

কিন্তু গংগারাম নয় দরজায় দেখতে পেল সেই সৌম্যদর্শন বৃদ্ধকে, যাকে কিছুক্ষণ আগে আহমদ মুসা বাগানে দেখেছিল।

'আসতে পারি মি. বেভান বার্গম্যান?' দরজা থেকে বলল সৌম্যদর্শন বৃদ্ধটি।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'ওয়েলকাম স্যার।'

বৃদ্ধ এল। আহমদ মুসা তাকে সোফায় বসিয়ে নিজে বসল।

বৃদ্ধ বসেই বলে উঠল, 'আমি হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহ। আমার এই হোটেল 'সাহারা' আপনাকে স্বাগত। কাল বিকালে এসেছেন, কিন্তু খোঁজ নেবার সময় করতে পারিনি। কোন অসুবিধা নেই তো?'

গংগারাম কথিত হোটেল মালিকের হঠাৎ মুখোমুখি হয়ে এবং তার মুসলিম পরিচয় পেয়ে একটু আনমনা হয়ে পড়েছিল আহমদ মুসা।

উত্তর দিতে একটু দেরি হলো। যখন উত্তর দিতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় আবার দরজায় নক হলো। আহমদ মুসা দরজার দিকে একবার তাকিয়ে হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহকে 'মাফ করবেন স্যার' বলে উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত দরজার দিকে এগুলো।

দরজা খুলে দেখল গংগারাম দাঁড়িয়ে।

আহমদ মুসা ফিরে তাকাল হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহর দিকে। বলল, 'জনাব ট্যাক্সি ক্যাব-এর গংগারাম এসেছে। তাকে একটু পরে আসতে বলি?'

‘না তা কেন? আমার তেমন কোন কথা নেই। আসতে বলুন গংগারামকে। আমাদের গংগারাম খুব ভাল ছেলে।’ বলল হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহ।

‘ধন্যবাদ স্যার’ বলে গংগারামকে নিয়ে আহমদ মুসা চলে এল।

আহমদ মুসা বসল তার সোফায়।

গংগারাম বসল একটা সোফার পাশে কার্পেটের উপর।

‘কি করছ গংগারাম! সোফায় বস।’ বলল দ্রুত কণ্ঠে আহমদ মুসা।

‘থাক মি. বার্গম্যান, কার্পেটেই থাক। খুব লাজুক ছেলে আমাদের গংগা। গুরুজনদের সামনে সে চেয়ারে বসে না।’ আবদুল আলী আবদুল্লাহ বলল।

হাসল আহমদ মুসা। বলল গংগারামকে লক্ষ্য করে, ‘তুমি তো ঠিক সময়ে আসনি গংগারাম।’

‘ম্লান হাসল গংগারাম। বলল, ‘স্যার আমি একটু ওদিকে গিয়েছিলাম। এই লোকই তো কাল কিডন্যাপ হয়েছিল স্যার।’

গম্ভীর হলো আহমদ মুসর মুখ। আহমদ মুসা টেবিলের খবরের কাগজটি টেনে নিয়ে ইয়াহিয়া আহমাদুল্লাহর ছবি গংগারামকে দেখিয়ে বলল, ‘হ্যাঁ গংগারাম, এ লোকটি সেই লোক।’

‘ও, তোমরা আজকের রহস্যজনক মৃত্যুর খবরের কথা বলছ? ও তো ইয়াহিয়া আহমাদুল্লাহ। আহা, সে নীরব, শান্তিপ্রিয় একজন ধর্মপ্রচারক, শিক্ষাবিদ।’ বলল হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহ।

‘আপনি তাকে চিনতেন, জানতেন?’ জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা হাজী আবদুল্লাহকে লক্ষ্য করে।

‘সে বহুবার এখানে আমার কাছে এসেছে। যে রাবেতা কমপ্লেক্সে সে চাকুরি করতো, সে ট্রাস্টের আমি একজন ট্রাষ্টি ছিলাম। আমি সাধ্যমত নিয়মিত কিছু সহযোগিতা করতাম। সেটাই সংগ্রহ করতে সে মাঝে মাঝে আসত। সে আন্দামানেরই ছেলে, আমাদেরই ছেলে। তাছাড়া সে ভারতের অন্যতম স্বাধীনতা সংগ্রামী আন্দামানে দ্বীপান্তরিত ও মৃত আহমাদুল্লাহ ইবনে ইয়াহিয়ার বংশধর।’ আবদুল আলী আবদুল্লাহ বলল।

'ধন্যবাদ জনাব। আমি নিউজটা পড়েছি। আমি উদ্বেগ বোধ করছি। আমি নিশ্চিত এটা মেরে ফেলার ঘটনা। ভাল লোকটির এমন পরিণতি হলো কেন?' বলল আহমদ মুসা।

'তুমি বিদেশী এ কথা বলছ, কিন্তু আমাদের পুলিশ এ কথা বলে না। এ ধরনের মৃত্যু আরও ৩৫টি ঘটেছে। কিন্তু পুলিশ পরিষ্কারভাবে এসব মৃত্যুকে নিহত বলছে না। মৃত্যুর ঘটনার উপর শুধু প্রশ্ন তুলে রাখছে, প্রশ্নের সমাধান করছে না।' বলল হাজী আব্দুল্লাহ। তার কণ্ঠে হতাশা ও উদ্বেগ।

'এ ধরনের আরও ৩৫টি মৃত্যু ঘটেছে?' চোখে-মুখে কৃত্রিম আতংক টেনে বলল আহমদ মুসা।

'আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই। এই মৃত্যুগুলো বিশেষ শ্রেণী থেকে হয়েছে ও হচ্ছে।' বলল হাজী আবদুল্লাহ।

'কেমন?' আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

'মৃত্যুর শিকার যুবকরা সবাই মুসলমান। এর মধ্যে মোপলা বংশোদ্ভুত যুবকের সংখ্যাই বেশি। অবশিষ্টের মধ্যে কিছু ভারতীয়, কিছু মালয়ী বংশোদ্ভুত। সবচেয়ে বড় ঘটনা এক জনপ্রিয় যুবকের কিডন্যাপ হওয়া। সেও মোঘল বাদশাহদের বংশোদ্ভুত একজন মুসলিম যুবক।'

'আহমদ মুসার চোখে-মুখে কৃত্রিম ভয় ও বিস্ময়ের চিহ্ন। বলল, 'সাংঘাতিক ব্যাপার? মুসলিম যুবকদের এই অব্যাহত হত্যার ঘটনার কারণ কি? কারা জড়িত?'

'আপনার মত আমাদেরও প্রশ্ন এটাই। এ প্রশ্নের জবাব পুলিশ কিংবা সরকার কেউ দিচ্ছে না।' হাজী আবদুল্লাহ বলল।

'আপনি মুসলিম কম্যুনিটির একজন নেতৃস্থানীয় লোক। আপনার অভিমত কি? আপনি কাদের সন্দেহ করেন?' বলল আহমদ মুসা।

'আমরা আশংকা করছি একটা বড় ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। এ ষড়যন্ত্রের কি উদ্দেশ্য, এর পেছনে কে বা কারা আছে আমরা জানি না। আমরা চরম আতংক ও অনিশ্চয়তার মধ্যে আছি। আমি যুবক নই, বোধ হয় এ কারণেই এখনও ইয়াহিয়া আহমাদুল্লাহর পরিণতি থেকে আমি বেঁচে আছি।' বলল হাজী আবদুল্লাহ।

হাজী আবদুল্লাহ থামতেই গংগারাম বলে উঠল, 'যারাই এর পেছনে থাক, তারা আন্দামানের বাইরে থেকে এসেছে। আমি খোঁজ নিয়ে জানলাম, কাল যারা ইয়াহিয়া আহমাদুল্লাহকে কিডন্যাপ করেছে, তাদেরকে সেখানে উপস্থিত অনেকেই দেখেছে। তাদের পোশাক, কথা-বার্তা, আচার-আচরণ আন্দামানীদের মত নয়।'

'একথা তুমি পুলিশকে বলেছ গংগারাম।' দ্রুত কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

'বলে কিছু হবে না স্যার। কালকে দুজন পুলিশের সামনে কিডন্যাপের ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ দুজন অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে রেখে কিডন্যাপের সুযোগ করে দিয়েছে।' গংগারাম বলল। তার কণ্ঠে ক্ষোভ।

'গংগারাম ঠিকই বলেছে। হঠাৎ করেই পুলিশের মধ্যে এই পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। এই যে তিন ডজন রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনা ঘটল, পুলিশ তার কিছুই বলতে পারছে না। আহমদ শাহ আলমগীর নিখোঁজ হবার ব্যাপার নিয়ে কয়েকদিন একটু নড়াচড়া করে এখন একেবারে চুপ হয়ে গেছে।' বলল হাজী আবদুল্লাহ।

বলতে বলতে হাজী আবদুল্লাহ উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আপনার অনেকখানি সময় আমি নিয়েছি। খুব ভাল লাগল আপনার সাথে কথা বলে। আপনাকে আমেরিকান মনেই হচ্ছে না- চেহারায় নয় কথাতেও নয়। কোন বিদেশীকেই দেখিনি আমাদের ব্যাপারে আমাদের সাথে এমন আন্তরিক হতে। ধন্যবাদ।'

আহমদ মুসাও উঠে দাঁড়াল।

হাজী আবদুল্লাহকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরে এসে বসতে বসতে বলল, 'তুমি ঠিকই বলেছিলে গংগারাম। হোটেল মালিক হাজী সাহেব সত্যি ভাল লোক।'

'ধন্যবাদ স্যার।'

বলে একটু থামল গংগারাম। একটু ভাবল। তারপর বলে উঠল আবার, 'স্যার, আপনার কক্ষে কি আর কেউ এসেছিল?'

'না তো। কেন বলছ?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘আমি আসার সময় করিডোরের ওপ্রান্ত থেকে দেখলাম হোটেলেরই একজন বাসিন্দা সোমনাথ শম্ভুজী আপনার দরজার দিক থেকে করিডোরে উঠল। মনে হলো আপনার রুম থেকে বেরিয়ে গেল।’ গংগারাম বলল।

আহমদ মুসা একটু ভ্রুকুচকালো। তারপর বলল, ‘সব ফ্লোরের ডিজাইন ও দরজাগুলো তো একই রকম। ভুল হতে পারে। কেমন বয়স ভদ্রলোকের?’

‘পঞ্চাশ বছরের মত হবে।’

‘যাক। নাস্তা করেছ তুমি?’

‘না স্যার। আপনি তৈরি হোন। আমি নিচে গিয়ে নাস্তা করে নেব।’

‘আমি নাস্তা করিনি। চল নাস্তা করে নেই।’

‘স্যার, প্রোগ্রাম ঠিক আছে তো?’

‘হ্যাঁ গংগারাম। তবে প্রোগ্রামে আরও একটা আইটেম যোগ হয়েছে। আমি আহমদ শাহ আলমগীরের বাড়ি থেকে ইয়াহিয়া আহমাদুল্লাহর বাড়িতেও একটু যাব। অসুবিধা নেই তো?’ উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল আহমদ মুসা।

‘স্যার কি সাংবাদিকও?’

‘কেন বলছ?’

‘এই যে এত খোঁজ খবর নেন। আবার খোঁজ নিতে বা জানতে যাবেন। ট্যুরিষ্টরা তো দেখি, চারদিকে কি হচ্ছে, সে দিকে কোন ভ্রুক্ষেপই করে না।’ বলল গংগারাম।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘সাংবাদিকতার চাকুরী করি না। কিন্তু সাংবাদিকের চরিত্র আমার আছে।’

‘তার সাথে নিশ্চয় সমাজ সেবকের চরিত্রও।’

‘কেমন করে?’ হেসে বলল আহমদ মুসা।

‘কোন ট্যুরিষ্ট বা সাংবাদিক কোন অপহৃতকে উদ্ধারের জন্যে ছোটে না, আপনি সেটাও করেন।’ বলল গংগারাম।

‘তুমি খুব বুদ্ধিমান ছেলে গংগারাম। তোমার আরও বড় কিছু করা উচিত ছিল।’

বলে হাঁটতে শুরু করল দরজার দিকে। নাস্তার ও খাওয়ার ব্যবস্থা এই দ্বিতীয় তলাতেই। গংগারামও হাঁটতে শুরু করল আহমদ মুসার সাথে।

# ৪

হারবারতাবাদ ছোট্ট উপকূলীয় শহর। পোর্ট ব্লেয়ার থেকে সোজা পশ্চিমে আন্দামানের একেবারে পশ্চিম উপকূলে ওয়েষ্ট বে'র পানি ঘেঁষে দাঁড়ানো শহরটি।

আন্দামানের একমাত্র হাইওয়ে পোর্ট ব্লেয়ার থেকে শুরু হয়ে সাউথ আন্দামান দ্বীপটির দক্ষিণ প্রান্ত ঘুরে দ্বীপের উত্তর প্রান্তে এগুবার সময় একটা হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করেছে হারবারতাবাদ শহরকে।

হারবারতাবাদের প্রতিষ্ঠা পোর্ট ব্লেয়ার এর অল্প পরে। হারবারতাবাদের তিরিশ মাইল দক্ষিণে একটি শহর নাম ডেলিগঞ্জ। আর চল্লিশ মাইল উত্তর পূর্বে আরেকটি শহর আছে। নাম উইমবারলীগঞ্জ। এই দুশহরে বাংলাসহ পূর্ব ভারতীয় লোকের আধিক্য বেশি। কিন্তু হারবারতাবাদে উত্তর ভারতীয় লোক বেশি দেখা যায়। এই শহরটির প্রতিষ্ঠা করেন আন্দামানে কয়েদী হয়ে আসা মোঘল শাহজাদা ফিরোজ শাহ।

ফিরোজ শাহ বৃটিশ বিরোধীয় যুদ্ধ সংগঠক শীর্ষ ব্যক্তিদের একজন ছিল। বৃটিশ রাজের বিরুদ্ধে দেশীয় রাজা ও আঞ্চলিক জমিদারদের সংগঠিত করার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সে পালন করে। দিল্লীর পতনের পর মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর বার্মার রেংগুনে নির্বাসনে যাবার আগে পলাতক ও একমাত্র জীবিত মোঘল শাহজাদা হিসেবে ফিরোজ শাহকে গোপনে ডেকে উত্তরাধিকারের দায়িত্ব তার কাঁধে অর্পণ করাসহ কিছু গোপন দলিল ও বংশীয় গোপন কিছু তথ্য তার হাতে দিয়ে যায়। এর অনেক পর ফিরোজ শাহ ধরা পড়ে। দিল্লীতে অপ্রকাশ্য এক বিশেষ বিচারে তাকে দ্বীপান্তর দেয়া হয় আন্দামানে।

আন্দামানের বৃটিশ কর্তৃপক্ষ শাহজাদা ফিরোজ শাহকে ভয়ংকর কয়েদীদের স্থান 'ভাইপার জেলখানা' কিংবা সাধারণ কয়েদীদের রাখার জায়গা 'আবরডীন জেলখানা' কোনটাতেই রাখতে ভরসা পায়নি। কয়েদী বিদ্রোহের

আশংকায়। বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে পোর্ট ব্লেয়ার থেকে ৬০ মাইল পশ্চিমে পাহাড় ঘেরা পশ্চিম উপকূলীয় এক উপত্যকার ছোট্ট একটা স্থাপনা গড়ে সেখানে ফিরোজ শাহকে বিচ্ছিন্নভাবে রাখার ব্যবস্থা করে। অনেক পরে আন্দামানের কয়েদী জীবনের নিয়ম অনুসারে কাশ্মীরে এক হিন্দুরাজাকে হত্যাকারিনী সদ্য কয়েদী হয়ে আসা এক কাশ্মীরী শিক্ষিকা মহিলাকে সে বিয়ে করে। যুবক ফিরোজ শাহ একদিন বৃদ্ধে পরিণত হয়। তাকে বন্দী করে রাখার স্থানটিতেই একদিন সে স্বাধীনভাবে বসতি গড়ে তোলে। সে যখন প্রথম এই উপত্যকায় আসে, তখন সে এর নাম দেয় 'হায়রতাবাদ' বা আশ্চর্য আবাস। তখন এখানে তার বাড়ি ছাড়া আর কোন বাড়ি ছিল না। তার চারপাশের পাতার ঘরে বাস করা কিছু আদিবাসী ছাড়া আর কোন মানুষ ছিল না। বৃটিশদের অর্থ দিয়ে কেনা এই আদিবাসীরা ছিল তার পাহারাদার। কথা বলার কোন লোক ছিল না। জায়গাটা দিনের বেলাতেও ছিল একটা নিঝুম পুরী। রাতের বেলা তা হয়ে দাঁড়াত ঘুটঘুটে অন্ধকারে ছাওয়া নিঃশব্দ মৃত এক জাহান্নাম। তাই 'হায়রতাবাদ' নামটা খুই যথার্থ ছিল। কিন্তু ফিরোজ শাহ যখন স্বাধীনভাবে এখানে বাস করতে লাগল, আদিবাসীরা যখন তার ভক্ত হয়ে গেল এবং তার চারপাশে বসতি গড়ে তুলল, তার সাথে ধীরে ধীরে ভারতীয় স্বাধীন কয়েদীরাও যখন সেখানে আবাস গড়ে তুলল, তখনও আগের সেই 'হায়রতাবাদ' নামটাই রয়ে গেল। সেই নামটাই ইংরেজদের কল্যাণে বিকৃত হয়ে 'হারবারতাবাদ' হয়ে গেছে।

হারবারতাবাদ শহরে এখন সাত হাজার লোকের বাস। সোনা ফলা সুন্দর উপত্যকার কয়েকটি প্রশস্ত অনুচ্চ টিলায় বাড়িগুলি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে।

আহমদ মুসার গাড়ি হারবারতাবাদ উপত্যকায় প্রবেশ করল।

বাড়ি শোভিত উপত্যকার টিলার দিকে তাকিয়ে চমৎকৃত হলো আহমদ মুসা। সবুজের ফাঁকে ফাঁকে সাদা লাল বাড়িগুলো অপরূপ মনে হচ্ছে।

রাস্তার দুপাশের সবুজের দেয়াল পেছনে ফেলে এগুলো আহমদ মুসার গাড়ি।

টিলায় উঠছে তারা।

টিলায় উঠার আগে আহমদ মুসা ঘোড়ার পরিচর্যারত এক বৃদ্ধের কাছ থেকে আহমদ শাহ আলমগীরের বাড়ি কোথায় তা জেনে নিয়েছে। বাড়িটার নামও জেনে নিয়েছিল 'শাহ বুরুজ'।

সর্ব পশ্চিমে অপেক্ষাকৃত বড় ও প্রশস্ত টিলাটার শীর্ষে নীলের বুক ফেঁড়ে একটা মিনার মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ওটা মসজিদ। মসজিদের পাশেই আহমদ শাহ আলমগীরের বাড়ি।

মসজিদের মিনার লক্ষ্যে গাড়ি চালিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই 'শাহ বুরুজ' বাড়িটার গেটে গাড়ি দাঁড় করাল গংগারাম।

বাড়িটা প্রাচীর ঘেরা। বাড়িতে প্রবেশের দৃশ্যত এই একটাই গেট।

গেটের সামনে আগে থেকেই একটা মাইক্রো দাঁড়িয়ে ছিল।

আহমদ মুসাদের গাড়ি পাশে একটু দূরত্ব রেখে দাঁড়াল।

আগে থেকে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িটিতে কোন লোক নেই।

বাড়িতে ঢোকার দরজা বন্ধ। দরজায় কোন কলিং বেল নেই।

দরজার লকের সাথে কোন ব্যবস্থা থাকতে পারে।

দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই ভেতর থেকে নারী কণ্ঠের চিৎকার ও কান্নার আওয়াজ শুনতে পেল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার দুহাত দ্রুত গিয়ে দরজায় চাপ দিল।

দরজা খুলে গেল।

লক করা ছিল না দরজা।

দরজা পুরোটা খুলে ফেলল আহমদ মুসা।

খোলা দরজা পথে আহমদ মুসা দেখতে পেল ছয়জন লোক একজন তরুণী ও একজন চল্লিশোর্ধ মহিলাকে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে আসছে। অসহায় মহিলা দুজন চিৎকার করছে, কাঁদছে।

আহমদ মুসার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল গংগারাম। বলল সে দ্রুত কণ্ঠে, 'স্যার, ঐ তরুণী আহমদ শাহ আলমগীরের বোন, আর উনি তাঁর মা। ওদেরকেও ধরে নিয়ে যাচ্ছে।'

আহমদ মুসা গংগারামের সবটা কথা শোনার জন্যে অপেক্ষা করেনি। দৌড় দিয়েছিল ওদের লক্ষ্যে।

আহমদ মুসা লোকগুলোর সামনা-সামনি হয়ে প্রচ- ধমকের সুরে বলল, ‘কে তোমরা? ওদের ছেড়ে দাও।’

ওরা থমকে দাঁড়াল।

ওরা ছয়জন।

তরুণীকে দুজনে হাত ও পা ধরে চ্যাংদোলা করে নিয়ে আসছিল। অন্য দুজনে মহিলার দুহাত ধরে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে আসছিল। অন্য দুজন তাদের পাশে পাশে আসছিল।

আহমদ মুসার কথা শুনে ওরা থমকে দাঁড়ালেও তরুণী ও মহিলাকে ওরা ছেড়ে দেয়নি। দুজন যাদের হাত খালি, তারা তেড়ে এল আহমদ মুসার দিকে। তাদের দুজনের হাতেই দুটি রিভলবার উঠে এসেছে।

ওরা দুজন আহমদ মুসার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আহমদ মুসার দিকে রিভলবার তাক করে বলল, ‘এই মুহূর্তে পালাও, নইলে.............।’

তাদের কথা শেষ হলো না, আহমদ মুসার মাথাটা অকস্মাৎ নিচে নেমে গেল। আর তার দুই পা তীর বেগে ছুটে গিয়ে লোক দুজনের দুপায়ের টাখনুর উপরে প্রচ- আঘাত হানল।

লোক দুজন গোড়াকাটা গাছের মত সবেগে পড়ে গেল।

আহমদ মুসা পড়েছিল চিৎ হয়ে। আর ওরা আহমদ মুসার দুপাশে পড়েছিল উপুড় হয়ে।

আহমদ মুসা পড়েই উঠে বসেছিল।

ওরা দুজন পড়ে যাবার পর সামলে উঠার আগেই আহমদ মুসা ওদের দুজনের হাত থেকে রিভলবার কেড়ে নিল।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

ওদিকে ওরা চারজন তরুণী ও মহিলাকে ছেড়ে দিয়ে পকেট থেকে রিভলবার বের করতে যাচ্ছিল।

আহমদ মুসা সুযোগ দিল না ওদের। তার দুহাতের দুই রিভলবার নিখুঁত লক্ষ্যে চারটি গুলি করল। ওদের চার জনের গুলী বিদ্ধ হাত থেকে রিভলবার খসে পড়ল। ওরা নিজেদের হাত চেপে ধরে কঁকিয়ে উঠল।

এদিকে এরা দুজন ভূমিশয্যা থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছিল।

আহমদ মুসা দুজনের দিকে দুহাতের রিভলবার তাক করে বলল, 'কোন চালাকির চেষ্টা করলে ওদের মত আর হাতে নয় মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।'

আহমদ মুসা যখন এ দুজনের দিকে মনোযোগ দিয়েছিল, তখন ওরা চারজন আহত হাত চেপে ধরে মাথা নিচু করে ভোঁ দৌড় দিয়েছে গাড়ির লক্ষ্যে গেটের দিকে।

গংগারাম চিৎকার করে উঠল, 'স্যার, ওরা পালাচ্ছে। আহমদ মুসা তাকাল ওদের দিকে। এই সুযোগে এরা দুজন আহমদ মুসার হাত থেকে রিভলবার কেড়ে নেবার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল আহমদ মুসার উপর।

কিন্তু আহমদ মুসার চোখ ভিন্ন দিকে সরে গেলেও দুরিভলবারের ট্রিগার থেকে দুতর্জনি একটু সরেনি। সুতরাং ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ার সাথে সাথে তর্জনি ঠিক সময়েই ট্রিগার টিপে দিয়েছিল। দুজনেই বুকে গুলীবিদ্ধ হয়ে পড়ে গেল।

আহমদ মুসা ছুটে গেল মহিলার দিকে। মাটিতে লুটানো দুটি ওড়নার একটি তরুণীর দিকে ছুড়ে দিয়ে অন্যটি মহিলাটির মাথা ও গায়ে জড়িয়ে দিয়ে বলল, 'মা, আপনি ভাল আছেন তো? কিছু হয়নি তো?'

মহিলার চোখে-মুখে বিস্ময়, আনন্দ ও বেদনার প্রকাশ। 'মা' ডাক শুনেই বোধ হয় পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল আহমদ মুসার দিকে মহিলাটি। তারপর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

তরুণীটি এগিয়ে এসে মহিলার পাশে দাঁড়াল।

মহিলাটি এক হাত দিয়ে তরুণীকে কাছে নিয়ে বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, 'আল্লাহর ফেরেস্তা হয়ে এসে আমাদের রক্ষা করেছ। কে তুমি বাবা?'

'আল্লাহ আপনাদের রক্ষা করেছেন। মানুষ মানুষকে বাঁচাতে পারে না মা।' আহমদ মুসা বলল।

'তুমি একজন বড় ঈমানদারের মত কথা বললে। কে তুমি বাবা?' মহিলাটি বলল।

'বলছি মা। আগে বলুন এ লাশগুলোকে লুকানোর কোন জায়গা আছে কি না? ঝামেলা এড়াবার জন্যে এ লাশগুলোকে লুকানো দরকার।'

মহিলা কিছু বলার আগেই তরুণীটি বলে উঠল, 'আছে জনাব। আমাদের বাড়ির পেছনের প্রাচীরে একটা দরজা আছে। এরপর জংগল। নিচে পাহাড়ের গোড়া দিয়েই সাগর। জংগলের মধ্যে দিয়ে পায়ে চলার রাস্তা আছে।

আহমদ মুসার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

তরুণীটির উদ্দেশ্যে 'ধন্যবাদ' বলে আহমদ মুসা গংগারামের দিকে তাকিয়ে বলল, 'গংগারাম, তোমার গাড়ি লক করেছ?'

'জি স্যার।'

'তাহলে তুমি গেটটা লক করে দিয়ে তাড়াতাড়ি এস।'

'আচ্ছা স্যার' বলে ছুটল গংগারাম গেটের দিকে। গেটটা লক করে দিয়ে আবার ছুটে এল সে আহমদ মুসার কাছে। এসেই বলল, 'স্যার, সাহসী বলে আমার সুনাম আছে। কিন্তু আমার গা এখনও কাঁপছে স্যার। আপনি খালি হাতে কি করে ওদের মোকাবিলা করে চারজনকে আহত এবং দুজনকে হত্যা করে যুদ্ধজয় করলেন। কোন সিনেমাতেও স্যার আমি এখনও এমন কোন দৃশ্য দেখিনি।'

'বাস্তব সব সময় কল্পনার চেয়ে বড় হয়। রাখ এসব কথা। লাশ সাগর পর্যন্ত নিতে সাহায্য কর। তুমি একজনকে নাও। আরেকজনকে আমি নিচ্ছি।' বলে আহমদ মুসা তাকাল মহিলার দিকে, তারপর তরুণীর দিকে। বলল তরুণীকে লক্ষ্য করে, 'শোন, আমরা না ফেরা পর্যন্ত বাইরের দরজা কারও কথাতেই খুলবে না। যদি দরজা ভেঙে ফেলছে দেখল, তাহলে মাকে নিয়ে পেছন দরজা দিয়ে জংগলে প্রবেশ করবে।'

মেয়েটি এমনিতেই এখনও স্বাভাবিক হতে পারেনি। আহমদ মুসার কথা শুনে মেয়েটি ভয়ে চুপসে গেল। কাঁপতে শুরু করল আবার।

এটা দেখে আহমদ মুসা মেয়েটি ও মহিলা উভয়কে লক্ষ্য করে বলল, ‘কেউ আসবে না আমি মনে করি। আমি বলছি সাবধান থাকার কথা। আর ভয় নেই আপনাদের।’

‘বরং আমরাও তোমাদের সাথে যাই বাবা।’ বলল মহিলাটি।

‘প্রয়োজন নেই মা। আমাদের ফিরতে দেরি হবে না।’

বলে আহমদ মুসা একটি লাশ কাঁধে তুলে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল।

গংগারামও তার পেছনে পেছনে চলল, ‘মিনিট বিশেক পরেই আহমদ মুসারা ফিরে এল।

ফিরে এসে দেখল উঠানে রক্তের কোন চিহ্ন নেই। ওরা মা ও মেয়ে দুজনে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে।

আহমদ মুসারা পেছন দরজা দিয়ে এসে উঠানে প্রবেশ করতেই মহিলারা উঠানে নেমে এল। বলল, ‘বাবা, তোমরা এস। বসবে চল।’

‘চলুন’ বলেই আহমদ মুসা জিজ্ঞেস করল, ‘রক্ত আপনারা মুছে ফেলেছেন মা?’

‘হ্যাঁ বাবা। শাহ বানু ওগুলো মুছে ফেলেছে। লাশ যেমন গেছে, লাশের চিহ্নও মুছে ফেলা দরকার।’ বলল মহিলাটি।

আহম মুসা মুখ ফিরাল তরুণীর দিকে। বলল, ‘ধন্যবাদ।’

‘চল বাবা, বসবে।’ বলে মহিলাটি আবার তাড়া দিল আহমদ মুসাকে।

‘চলুন মা।’

‘এস’ বলে হাঁটতে লাগল মহিলাটি।

ঘরটিতে প্রবেশ করেই আহমদ মুসা দেখল মোঘল সম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবর-এর ছবি। তার পাশের ছবিটিকে চিনতে পারলো না আহমদ মুসা। ছবির মানুষটি একজন সুদর্শন যুবক। তার পরনে কয়েদীর পোশাক। যুবকের

চোখে কয়েদীর অপরাধবোধ নেই, বরং আছে উন্নত শির এক আভিজাত্য। ইনিই কি ‘ফিরোজ শাহ’, ভাবল আহমদ মুসা।

মহিলা ঘরে ঢুকে সবাইকে বসার জন্যে আহ্বান জানাল।

আহমদ মুসা বসতে বসতে দেয়ালের ছবির দিকে ইংগিত করে বলল, ‘তৈলচিত্রের ছবি সম্রাট বাবরের, ফটোর ছবি কি বন্দী মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহের মনোনীত মোঘল সম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী ফিরোজ শাহের?’

মহিলার চোখে-মুখে কিছুটা বিস্ময় ফুটে উঠল। বলল, ‘তুমি এদের সবাইকে চেন দেখছি বাবা!’

‘তা নয়। সম্রাট বাবরকে তো সকলেই চিনবে। ফটোর নামটা বলেছি আমি অনুমান করে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তোমার অনুমান ঠিক বাবা। উনিই মোঘল সম্রাজ্যের শেষ উত্তরাধিকারী যাবত-জীবনের জন্যে দন্ডপ্রাপ্ত, আন্দামানে নির্বাসিত এবং আন্দামানে আমাদের প্রথম পূর্ব পুরুষ ফিরোজ শাহ।’ বলল মহিলাটি।

‘টাঙানোর জন্যে ছবির চমৎকার সিলেকশন মা। বাবর ভারতে মোঘল বংশের প্রতিষ্ঠাতা আর ফিরোজ শাহ আন্দামানে মোঘল বংশের প্রতিষ্ঠাতা। চমৎকার মিল দুইয়ের মধ্যে।’

‘কিন্তু অমিলই বেশি জনাব। সম্রাট বাবর ভারতে এসেছিলেন বিজয়ীর বেশে। আর জনাব ফিরোজ শাহ আন্দামানে আসেন বন্দী বেশে। অন্যদিকে বাবর ভারতে একটা সম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন, আর ফিরোজ শাহ যাপন করেছেন বন্দী প্রজার জীবন।’ মহিলাটি কিছু বলার আগেই বলে উঠল মেয়েটি।

আহমদ মুসা তাকাল তরুণীর দিকে। এই প্রথম তার মুখের উপর চোখ পড়ল আহমদ মুসার। অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। তার সাথে সেখানে আভিজাত্যের যোগ। বয়স উনিশ-বিশের বেশি হবে না। রংয়ের দিক দিয়ে জীবন্ত একটা ইরানী ফুল।

আহমদ মুসা বলল, ‘সুন্দর পার্থক্য দেখিয়েছ তুমি। কিন্তু যে দিকটা ভাল নয়, তা সামনে না আনার মধ্যেই কল্যাণ বেশি।’

কিছু বলতে যাচ্ছিল তরুণীটি। কিন্তু তার মা বাধা দিয়ে বলল, ‘চুপ, কথার পিঠে কথা সব সময় বলতে নেই।’

কথা শেষ করেই মহিলাটি তাকাল আহমদ মুসার দিকে। তারপর সোফায় সোজা হয়ে বসল। বলল, ‘বেটা, তুমি বলেছ আল্লাহ মানুষকে রক্ষা করে। কিন্তু সেটা করেন তিনি কোন উপলক্ষের মাধ্যমে। সেই উপলক্ষ তুমি বাবা। আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি, ঠিক সময়ে তিনি তোমাকে পৌছিয়েছেন। তুমি নিজের জীবনের পরোয়া না করে আমাদের বাঁচিয়েছো।’

কণ্ঠ ভারী, চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে মহিলার। একটু থামল সে।

মুখ নিচু করে নিজেকে সম্বরণ করে নিল। বলল আবার, ‘আমাদের তুমি জান কিনা, কতটুকু জান আমি জানি না। বেটা, আমি এক হতভাগ্য মা। আমার ছেলে কিছু দিন আগে হারিয়ে গেছে। তার জন্যে কিছুই করতে পারছি না আমরা। এ আমার একমাত্র মেয়ে শাহ বানু। এই মেয়ে এবং আমি কত বিপদে আছি তা তুমি দেখলে।’

‘আমি এত কিছু জানতাম না মা। শুধু জানি আহমদ শাহ আলমগীরের বিষয়টা।’ বলল আহমদ মুসা।

‘তুমি কে বাবা? নিশ্চয় আন্দামানে তোমার বাড়ি নয়, হয় তো ভারতেও নয়।’

‘ভারতেও নয় এ কথা কেমন করে বললেন মা?’

‘তোমার ইংরেজী বলাটা ভারতের মত নয়। তাছাড়া তোমার চেহারাও সাধারণ ভারতীয়ের মত নয়।’

‘ধন্যবাদ মা, ঠিকই ধরেছেন আপনি।’

বলে একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর আবার বলা শুরু করল। গংগারামকে দেখিয়ে বলল, ‘ইতিমধ্যে নাম জেনেছেন। এ হলো গংগারাম। আমি আন্দামানে আসার পর তার ক্যাবেই ঘুরছি। সে আমার সাথী এবং গাইড দুটোই।’

মহিলা মানে শাহ বানুর মার মুখে এবার একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল। বলল, ‘এ আবার গংগারাম হলো কবে থেকে? একে তো আমরা চিনি। এতো আন্দামান ষ্টেট কলেজের ছাত্র গাজী গোলাম কাদের।’

বিস্ময় ফুটে উঠল আহমদ মুসার চোখে-মুখে। তাকাল সে গংগারামের দিকে। বলল, 'কথা বল গংগারাম, মিথ্যা পরিচয় কেন দিয়েছ?'

'স্যরি স্যার। আমি আপনাকে মিথ্যা পরিচয় দেয়নি। এ পরিচয়টা আমি অনেক আগেই নিয়েছি। ডিগ্রী পাশ করার পর আন্দামানে চেষ্টা করেছি ভাল চাকুরি হয়নি। তারপর কোলকাতা ও মাদ্রাজেও গেছি, কিন্তু চাকুরি মেলেনি। পরে হোটেল সাহারার মালিক হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহ নিজে জামানত দিয়ে কিস্তিতে আমাকে একটা ট্যাক্সি ক্যাব পাইয়ে দেন এবং পরামর্শ দেন যে, মুসলিম না নিয়ে আমি যেন ট্যাক্সি ক্যাব না চালাই। কারণ তাতে ব্যবসা কম হবে, যে কোন সময় বিপদও হতে পারে। তিনি আমাকে নতুন নাম দেন গোপী কিষণ গংগারাম। সেই থেকে আমি গোপী কিষণ গংগারাম। আমার নতুন বাড়ির প্রতিবেশীরাও আমাকে আজ গংগারাম বলেই জানে। এতে আমি দেখেছি আমার বিরাট উপকার হয়েছে। আমি মুসলিম নামে থাকলে আমার লাশ হয় তো এতনি সাগরকূলে পাওয়া যেত। আমরা মোপলা মুসলিম ছেলে যারা এক সঙ্গে কলেজে পড়তাম, তাদের কেউই বেঁচে নেই। আমার মনে হচ্ছে মোপলা যুবকরাই আজ প্রধান টার্গেট হয়ে দাঁড়িয়েছে। মনে হয়, আমার মোপলা পরিচয় নেই বলেই আমি এখনও বেঁচে আছি আল্লাহর ইচ্ছায়।'

থামল গংগারাম।

আহমদ মুসার ভ্রুকুঞ্চিত হয়ে উঠেছে গংগারামের কথা শুনে। গংগারাম থামতেই আহমদ মুসা বলে উঠল, 'গংগারাম, না না গাজী গোলাম কাদের, কেন তুমি বললে, মোপলা মুসলিম যুবকরাই চলমান রহস্যজনক মৃত্যুর প্রধান টার্গেট?'

'স্যার, নিহত ৩৬ জন যুবকের মধ্যে ২৫ জনই মোপলা বংশোদ্ভুত মুসলিম যুবক, ৬ জন ভারতীয় ওয়াহাবী বংশোদ্ভুত তরুণ এবং অবশিষ্ট ৫ জন মালয়ী, কারেন এবং অন্যান্য। সর্বশেষ আপনি যাকে বাঁচাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু সম্ভব হয়নি, সেই ইয়াহিয়া আবদুল্লাহও মোপলা বংশোদ্ভুত।' বলল গংগারাম।

অবাক বিস্ময়ে আহমদ মুসার দুচোখ স্থির হয়ে গেছে। গংগারাম থামলেও আহমদ মুসা মুহূর্ত কয়েক কথা বলতে পারলো না।

একটু পর অনেকটা স্বগত কণ্ঠে আহমদ মুসা বলল, 'মোপলারা একটু সাহসী, প্রতিবাদী এই কারণেই হয় তো।' তারপর বলল, 'তোমার কথা ঠিক। কিন্তু আরও কথা আছে গংগারাম।'

'সেটা কি স্যার?'

'মোপলাদের অতীত।'

'কি অতীত?'

'কেন মোপলাদের ইতিহাস জান না?'

'গত শতাব্দীর শুরুতে ভারতের মালাবারে (আজকের কেরালায়) মোপলারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়েছিল, বহু খুনোখুনি তাতে হয়েছিল এই কথা জানি।'

'তুমি ভুল জেনেছ গংগারাম। তুমি যেটা পড়েছ, জেনেছ ওটা রূপকথা, ইতিহাস নয়। মোপলারা কোন দিন কোথাও এ ধরনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধায়নি।'

'কিন্তু আমরা ইতিহাসে পড়েছি এটা।' বলল গংগারাম জোর দিয়ে।

'ইতিহাস ওখানে মিথ্যা কথা বলেছে। সত্য গোপন করেছে।'

'সেই সত্যটা কি?' জিজ্ঞেস করল গংগারাম।

'সেটা অনেক কথা। সংক্ষেপে কথা হলো, মোপলারা ভারতের সংগ্রামী জনগোষ্ঠী। অষ্টম শতাব্দীতেই আরব বণিক ও মুসলিম মিশনারীদের মাধ্যমে ইসলাম ভারতের মালাবার উপকূলে প্রবেশ করে। স্থানীয় মানুষ ব্যাপকহারে ইসলাম গ্রহণ করে। পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তে যেমন হয়েছে, তেমনি আরব বণিক ও মিশনারীদের অনেকেই বসতি গড়ে এখানে থেকে যায়। তারা স্থানীয়দের সাথে বৈবাহিত সম্পর্কের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের সাথে একাকার হয়ে যায়। এভাবে ভারতের দক্ষিণ উপকূলের মালাবার অঞ্চলে একটা মুসলিম জনগোষ্ঠী গড়ে উঠে। এরাই মোপলা নামে পরিচিত হয়। এরা বিশ্বাসে যেমন ছিল অবিচল, তেমনি সাহসেও অপ্রতিরোধ্য ছিল এরা। এদের আরেকটা বৈশিষ্ট্য ছিল- এরা স্বাধীনচেতা ও সংগ্রামী। ভারতের মুসলিম শাসনের পতনের পর পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হবার জন্যে এরা বার বার সংগ্রাম ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বিশেষ করে ১৮৪৯,

১৮৫১, ১৮৫২ ও ১৮৫৫ সালে এদের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ গোটা ভারতবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অমানবিক হত্যা-নির্যাতনের মাধ্যমে এদের দমিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু বৃটিশরা এতে সফল হয়নি। প্রতিটি সুযোগেই এরা বিদ্রোহ করেছে ও স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সর্বশেষ এদের বড় ধরনের স্বাধীনতা যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৯২১ সালে। হাজার হাজার সৈন্য লেলিয়ে দিয়ে এই বিদ্রোহ দমন করে বৃটিশরা। এই যুদ্ধে ২২২৬ জন মোপলা শহীদ হয়, এছাড়া ১৬১৫ জন আহত হয় এবং বন্দী ৫৬৮৮ জন এবং বিচারের প্রহসন চলে মামলা নিয়ে। ১৯২২ সালে হাজার হাজার মোপলা মুসলিমকে আন্দামানে নির্বাসিত করা হয়। গংগারাম, তুমি যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা বললে ওটা কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছিল না। সেটা ছিল বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে মোপলাদের ১৯২১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম। এই স্বাধীনতা সংগ্রামকেই তোমরা পড়েছ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হিসাবে।'

থামল আহমদ মুসা।

বিস্ময়ে হা হয়ে গিয়েছিল গংগারামের মুখ।

অবাক-বিস্ময় শাহ বানু এবং শাহ বানুর মা'র চোখে-মুখেও।

কথা বলল প্রথমে গংগারাম। বলল, 'স্যার, একজন ট্যুরিষ্ট বেভান বার্গম্যান এসব কথা বলতে পারেন না। বহু ট্যুরিষ্ট আমি পেয়েছি স্যার, কিন্তু কাল থেকে আপনাকে যতটা জেনেছি, তাতে কোন ট্যুরিষ্টের সাথেই আপনার মিল খুঁজে পাইনি। সন্ত্রাস দেখে ট্যুরিষ্টরা পালায়, কিন্তু আপনি কালকে বন্দরে নেমেই একজনকে বাঁচাবার জন্যে সন্ত্রাসীদের পিছু নিয়েছেন। একজন ট্যুরিষ্টের এমন আচরণ হতেই পারে না।'

গংগারাম থামল।

গংগারাম থামতেই শাহ বানু বলে উঠল, 'কিছুক্ষণ আগে এখানে যে অবিশ্বাস্য ও অভূতপূর্ব ঘটনায় আমরা মুক্তি পেলাম, সেটা নিছক কোন ট্যুরিষ্টের কাজ নয়। অত্যন্ত প্রতিভাবান প্রফেশনাল হলেই শুধু কেউ এই পরিস্থিতিতে লড়াই করতে পারে, জেতার আশা তো আরও বড় যোগ্যতার ব্যাপার! তিনি লড়াই করেছেন এবং জিতেছেনও। বিভিন্ন পেশার লোক ট্যুরিষ্ট হন। সুতরাং দুনিয়ার

ট্যুরিষ্টদের মধ্যে এমন যোগ্যতার ট্যুরিষ্ট থাকতেও পারেন, কিন্তু জনাবের মধ্যে যে অবগতি ও আবেগ দেখেছি তাকে কাকতালীয় ঘটনা বলা যায় না। সুতরাং জনাবের পরিচয় সম্পর্কে প্রশ্ন থেকেই যায়।'

'তুমি বুদ্ধিজীবর মত কথা বলেছ শাহ বানু। তা হবে। জান তুমি, ঐতিহাসিক কোন মহিলার নামের সাথে শাহ বানু নাম জড়িত?' শাহ বানুর দিকে মুখটা একটু ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

'জানি। সম্রাট শাহজাহানের পত্নী সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহলের বাল্যনাম শাহ বানু।' শাহ বানু বলল।

'ধন্যবাদ।' উত্তরে বলল আহমদ মুসা।

'তোমার নাম কি বাবা? তোমার পরিচয় তো এখনও তুমি দাওনি।' জিজ্ঞাসা করল শাহ বানুর মা।

গম্ভীর হলো আহমদ মুসা।

ধীরে ধীরে বলল, 'মা, পাসপোর্টে আমার নাম লিখা আছে বেভান বার্গম্যান। হোটেলেও এ নাম লিখা হয়েছে। গংগারামরাও আমার এ নামই জানে। কিন্তু আপনার কাছে এ নামটা আমি বলতে পারবো না মা। কারণ আমার নাম এটা নয়। কিন্তু আমার আসল নামটাও আপনাকে এখন আমি বলতে পারবো না। আরও পরে হয়তো বলা যাবে।'

শাহ বানু, শাহ বানুর মা সবারই বিস্ময়দৃষ্টি আহমদ মুসার মুখের উপর আছড়ে পড়েছে। আর সত্যিই বিস্ময়ে হা হয়ে গেছে গংগারামের মুখ।

কারও মুখেই কোন কথা নেই।

এবার শাহ বানুর মা বলল, 'তুমি আমাদের বিশ্বাস করতে পারছ না বাবা?'

'অবিশ্বাস নয় মা, এটা আমার সাবধানতা।' আহমদ মুসা বলল।

'কেন সাবধানতা?' বলল শাহ বানুর মা।

'এই 'কেন'-র উত্তর দিতে হলে সব কথা বলতে হয়। বলব আমি। কিন্তু এই মুহূর্তে বলতে পারছি না।'

'স্যার, আমি বাইরে যাচ্ছি। তবু বলুন।' বলল গংগারাম।

‘তোমাকে আমি অবিশ্বাস করি না গংগারাম। তুমি মুসলমান না হলেও তোমার প্রতি আমার আস্থা থাকতো।’

বলে একটু থামল আহমদ মুসা।

ভাবল একটু। তারপর তাকাল শাহ বানুর মায়ের দিকে। বলল, ‘মা, আমি আন্দামানে এসেছি আহমদ শাহ আলমগীরের সন্ধান করার জন্যে। আর এসেছি এ পর্যন্ত যে তিন ডজন মুসলিম যুবকের রহস্যজন মৃত্যু হয়েছে তার কারণ সন্ধানের জন্যে। আমার নাম যেমন ছদ্ম, তেমনি আমার ট্যুরিষ্ট পরিচয়ও ছদ্মবেশ।’ থামল আহমদ মুসা।

আনন্দ-বিস্ময় ঠিকরে পড়ছে শাহ বানু ও শাহ বানুর মায়ের চোখ-মুখ থেকে। বোবা বিস্ময় গংগারামের চোখে-মুখেও।

আনন্দ-বিস্ময়ে আচ্ছন্ন শাহ বানুর মা এক সময় দুহাত উপরে তুলে কেঁদে উঠল, ‘হে আমার রব, আমার দুকান এইমাত্র যা শুনল তা যেন স্বপ্ন না হয়, এই যুবক যেন স্বপ্ন না হয়। আন্দামানে আজ কেউ নেই তোমার অসহায় বান্দাদের সাহায্য করার। তোমার সাহায্যই আমাদের সম্বল। এই যুবকের কথা যেন সত্য হয়। এই যুবক যেন সত্য হয়।’

মায়ের সাথে সাথে শাহ বানুর দুগ- বেয়েও গড়িয়ে পড়ছিল নীরব অশ্রুর দুটি ধারা।

শাহ বানুর মা ওড়না দিয়ে চোখ মুছে বলল, ‘তোমাকে আল্লাহ সাহায্য করুন বেটা। কিন্তু তুমি এ সব জানতে পারলে কি করে? কোন আন্তর্জাতিক, এমনকি এখানকার মিডিয়াতেও তো এ খবর যায়নি!’

‘মা, আমি এ সংবাদ কোন কাগজ থেকে জানিনি। দুমাস আগে আমি তখন আমেরিকায়। মক্কা থেকে একটা ইসলামী সংগঠন ই-মেইল করে আমাকে সব ঘটনা জানায়। আমি তখনই সিদ্ধান্ত নেই এখানে চলে আসার।’

‘তুমি কি আমেরিকায় থাক? আমেরিকার নাগরিক?’ বলল শাহ বানুর মা।

‘হ্যাঁ মা, আমি আমেরিকারও নাগরিক। কিন্তু আমেরিকা আমার দেশ নয়। ওখানে আমি থাকিও না।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তাহলে দেশ কোনটা?’ জিজ্ঞাসা শাহ বানুর মার।

আহমদ মুসা একটু ম্লান হাসল। বলল, ‘কি বলব মা। আমি সব মুসলিম দেশকেই আমার দেশ বলে মনে করি। সব মুসলিম দেশই আমাকে নাগরিকত্ব দিয়েছে। সব দেশেই আমি যেতে পারি, ও থাকতে পারি। কিন্তু বিশেষ কোন দেশকে আমি আমার দেশ বলে এখনো ভাবিনি।’

অবাক বিস্ময়ে ছেয়ে গেছে শাহ বানুর মা এবং গংগারামের মুখ। আর ভ্রু-কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে শাহ বানুর। তার তীক্ষè সন্ধানী দৃষ্টি আহমদ মুসার মুখের উপর।

একটু নীরবতা ভেঙে শাহ বানুর মা বলে উঠল, ‘বেটা, তুমি অবাক করলে। এমন দেশহীন এবং সর্বদেশীয় নাগরিক কেউ হতে পারে?’

হঠাৎ মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল শাহ বানুর। দ্রুত কণ্ঠে সে বলল, ‘পারেন মা, শুধু একজন পারেন।’

কথা শেষ করেই ‘আসছি মা’ বলে শাহ বানু ছুটে গিয়ে বেরিয়ে গেল বৈঠকখানা থেকে।

সিঁড়ি দিয়ে দুতালায় উঠে গেল। ঢুকল তার ভাই আহমদ শাহ আলমগীর-এর ঘরে। খুলল আহমদ শাহ আলমগীরের ফাইল ক্যাবিনেট।

ফাইল ক্যাবিনেটের একটা ড্রয়ার থেকে একটা ফাইল বের করে আনল। ফাইলে নাম লেখা ‘আহমদ মুসা’। ফাইলে অনেকগুলো নিউজ ক্লিপিং এবং কয়েকটা ম্যাগাজিন।

সবগুলো নিউজ ক্লিপিং আহমদ মুসা সম্বন্ধীয় এবং সবগুলো ম্যাগাজিনেই আহমদ মুসা সম্পর্কে ষ্টোরি আছে। তার মধ্যে একটা ম্যাগাজিনে রয়েছে কভার পেজে বিরাট ফটোসহ বিশাল কভার- ষ্টোরি।

ম্যাগাজিনটি শাহ বানু সামনে নিয়ে এল। অপার বিস্ময়-আনন্দ-আকুলতার সাথে চেয়ে আছে কভার ষ্টোরির আহমদ মুসার দিকে। ছবির এই আহমদ মুসা এবং যিনি এসেছেন একই লোক, এক চেহারা। সামান্য পার্থক্য কোথাও নেই। তবে ছবির চেয়ে বাস্তবের আহমদ মুসা আরও মধুর।

অনেকক্ষণ ছবি থেকে চোখ তুলতে পারলো না শাহ বানু। স্বপ্নের মানুষ এই মানুষ তার কাছে। আর তার ভাই আহমদ শাহ আলমগীরের কাছে আহমদ মুসা একজন মুকুটহীন শাহানশাহ। আহমদ মুসা সম্পর্কে কোথাও কোন তথ্য বা লেখা উঠলে, যে ভাবেই হোক সে তা সংগ্রহ করবেই। এই ভাবেই আহমদ শাহ আলমগীর ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছে এই ফাইল। এই কাজে শাহ বানু ছিল তার সাথী। ভাইয়ের কাছে গল্প শুনে শুনেই শাহ বানু আকৃষ্ট হয় আহমদ মুসার প্রতি। তারপর আহমদ মুসা সম্পর্কে পড়ে পড়ে সে তার স্বপ্নের মানুষে পরিণত হয়।

সেই স্বপ্নের মানুষ আজ তাদের বাড়িতে! শুধু কি আসা? একেবারে রূপকথার রাজকুমারের মত পংখীরাজ ঘোড়ায় চড়ে এসে দৈত্যের গ্রাস থেকে তাদের উদ্ধার করেছে! আকুল করা এক অপার্থিব শিহরণ জাগল তার গোটা দেহে।

ম্যাগাজিনটা হাতে নিয়ে ফাইল বন্ধ করে এক হাতে ম্যাগাজিন, অন্য হাতে ফাইল নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ফিরে আসার জন্যে। কিন্তু সামনে পা বাড়াতে গিয়ে যে উচ্ছাস নিয়ে ছুটে এসেছিল, সেই উচ্ছাসের শক্তিকে সে আর খুঁজে পেল না। রাজ্যের জড়তা এসে তার দুপা যেন জড়িয়ে ধরল। এক মহাসাগরের সামনে ঝর্নার এক ছোট ধারা কি করে গিয়ে দাঁড়াতে পারে! তবু যেতেই হবে।

এক পা দুপা করে গিয়ে শাহ বানু প্রবেশ করল বৈঠকখানায়।

সবাই তাকাল শাহ বানুর দিকে।

সংকোচের প্রাচীর ডিঙিয়ে শাহ বানুর চোখও ছুটে গিয়েছিল আহমদ মুসার দিকে। আহমদ মুসা চোখ নামিয়ে নির। শাহ বানুও চোখ রাখতে পারল না আহমদ মুসার উপর। সে চোখ নামিয়ে নিয়ে তাকাল মায়ের দিকে। মায়ের পাশে বসে ম্যাগাজিন ও ফাইলটা তার হাতে তুলে দিতে দিতে বলল, 'কোন দেশের না হয়েও যিনি সব দেশের নাগরিক হতে পারেন, তাঁকে দেখ মা।'

ম্যাগাজিন ও ফাইল হাতে নিয়ে ম্যাগাজিনের কভারে আহমদ মুসার নাম ও বিরাট ছবিটার দিকে তাকিয়ে ভূত দেখার মত চমকে উঠল তার মা। তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বিস্ময় বিস্ফোরিত তার দৃষ্টি। বাকহীনভাবে তাকিয়ে থাকল

আহমদ মুসার দিকে। এক সময় তার মুখ ফুঁড়ে বেরিয়ে এল, ‘সত্যিই কি তুমি আহমদ মুসা বেটা?’

তারপর মুখ উপরে তুলে বলল, ‘হে আল্লাহ, তুমি সবই করতে পারো। যে জিজ্ঞাসা আমি করলাম, তার উত্তর তুমি ‘হ্যাঁ’ কর। এক অসম্ভবকে তুমি সম্ভব কর প্রভূ।’ শাহ বানুর মার কণ্ঠে আকুল কান্নার সুর। বিস্ময়ের এক আকস্মিক ধাক্কায় দেহ শিথিল ও কম্পমান হয়ে পড়ল আর শিথিল হাত থেকে ফাইল ও ম্যাগাজিনটা পড়ে গেল।

আহমদ মুসাও বিস্মিত হয়ে পড়েছিল শাহ বানুর কথা এবং শাহ বানুর মার মুখে নিজের নাম শুনে।

ফাইল ও ম্যাগাজিনটা পড়ে গেলে আহমদ মুসা বলল, ‘শাহ বানু ও দুটো আমাকে দাও দেখি।’

শাহ বানু যন্ত্র চালিতের মত উঠে ফাইল ও ম্যাগাজিন নিয়ে তুলে দিল আহমদ মুসার হাতে। কাঁপছিল শাহ বানুর হাত।

‘ধন্যবাদ’ বলে আহমদ মুসা শাহ বানুর হাত থেকে ম্যাগাজিন ও ফাইলটা গ্রহণ করল।

ম্যাগাজিনটা দেখেই আহমদ মুসা চিনতে পারল। বেশ পুরানো। আহমদ মুসা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সুরিনামে যায়, সে সময় ম্যাগাজিনটি তাকে নিয়ে এই কভার ষ্টোরি করে।

শাহ বানু ও তার মার ব্যাপারটা বুঝল আহমদ মুসা। ফাইল খুলে আহমদ মুসা ক্লিপিংগুলোর দিকে চোখ বুলাল। নিউজ আইটেমগুলোর দুএকটা ছাড়া সবই তার অদেখা। বিস্মিত হলো তার সম্পর্কিত নিউজের কালেকশান দেখে। মনে হয় সংগ্রহ শুরুর পর কোন একটি নিউজও বাদ দেয়নি। নিউজের মধ্যে ইন্টারনেট রিপোর্টও রয়েছে। কার ফাইল এটা? কে সংগ্রহ করল এগুলো? শাহ বানু? ফাইল কভারের উপর নজর বুলাল আহমদ মুসা। সেখানে কারও নাম নেই। আহমদ মুসা তাকাল শাহ বানুর দিকে। বলল, ‘ধন্যবাদ শাহ বানু! আমার মত একজনকে নিয়ে এত বড় ফাইল করতে এ পর্যন্ত কাউকে আমি দেখিনি। অকাজের এই কাজ কে করল শাহ বানু?’

'ভাইয়া করেছেন। কিন্তু তিনি কোন অকাজ করেননি? ভাল কাজের রেকর্ড সংগ্রহ অবশ্যই একটা ভাল কাজ। কিন্তু পানির মধ্যে যিনি ডুবে আছেন, তিনি পানির আলাদা মূল্য অনুভব নাও ...........।'

শাহ বানুর কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে তার মা বলে উঠল, 'শাহ বানু, কথা না বলে তুমি থাকতেই পার না। কথার পিঠে কথা তোমার না বললেই যেন নয়। এখন থাম তুমি।' বলে শাহ বানুর মা তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি বেটা। ছোট্ট এবং একেবারেই অনুল্লেখযোগ্য আন্দামানে এবং তার চেয়েও অজ্ঞাত ও অসহায় এই পর্ণ কুটিরে আল্লাহ তোমাকে নিয়ে এসেছেন। এ যেন অখ্যাত এক দেশের, অজ্ঞাত এক গ্রামের নামহীন এক হতভাগ্যের অন্ধকার কুটিরে স্বয়ং চাঁদের নেমে আসা। আমরা আমাদের হৃদয়ের সবটুকু আবেগ ও আকুতিসহ তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি বেটা। 'যাদের কেউ নেই, তাদের আল্লাহ আছেন', এই মহাসত্যের জীবন্ত এক রূপ হিসাবে তুমি এসেছ বাবা। এখন বল বেটা, আমরা তোমার জন্যে কি করব, আর তুমি আমাদের জন্যে কি করবে?' আবেগ জড়িত কান্নারুদ্ধ কণ্ঠে বলল শাহ বানুর মা।

'আমি এই ব্যাপারে আপনাদের সাথে কথা বলার জন্যেই এসেছি মা। আমি আহমদ শাহ আলমগীর সম্পর্কে জানতে চাই।'

'কি জানতে চাও বাবা? বল?'

'আহমদ আলমগীরের নিখোঁজ হওয়ার সাথে দুটি পক্ষ জড়িত হতে পারে। এক. ছত্রিশ জন যুবকের মৃত্যুর জন্য যারা দায়ী তারা, দুই. গভর্নর বালাজী বাজী রাও এর লোকরা। কারা জড়িত থাকতে পারে আপনারা কিছু বলতে পারেন কিনা?' বলল আহমদ মুসা।

শাহ বানু ও তার মা পরস্পরের দিকে চাইল। তাদের চোখে কিছুটা বিস্ময়! এরপর শাহ বানুর মা বলল, 'গভর্নরের লোকরা হবে কেন বেটা?'

'গভর্নরের মেয়ে সুষমা রাওয়ের সাথে আহমদ আলমগীরের একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এটার চিরতরে ইতি ঘটানোর জন্যে গর্ভনরের লোকরা এটা করতে পারে।'

শাহ বানুর মা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। বলল, 'এই সর্বনাশের পথ থেকে আমি আমার ছেলেকে সরাতে চেষ্টা করেছি, পারিনি। মেয়েটা খুব বেশি এগিয়ে এসেছিল। আর ওরা আন্দামানের বাইরে চলে যাবার পর আমাদের চেষ্টা আর কার্যকরী হয়নি।'

'ও বিষয়টা থাক মা। গভর্নরের লোকরা তাকে কিডন্যাপ করতে পারে কিনা এটা জানা দরকার।' আহমদ মুসা বলল।

'এটা বলা মুস্কিল। ওদের কোন প্রতিক্রিয়া আমরা কখনই জানতে পারিনি।' বলল শাহ বানুর মা।

'সুষমা রাও কি কখনও এখানে এসেছে?'

'এসেছে। দুবার। সে খুব ভাল মেয়ে। কিন্তু তার বাবা-মা সম্পর্কে আলোচনা আমরা কখনও করিনি, সেও কখনও তোলেনি।'

'তার কাছ থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যাবে?'

'তাকে পাবে কোথায়। ঘটনার পর কয়েকদিন টেলিফোন করেছে। তবে প্রায় সাতদিন যাচ্ছে তার কোন টেলিফোন পাওয়া যায়নি। আমরা কখনও তার সাথে যোগাযোগ করিনি।' শাহ বানুর মা বলল।

'সুষমা রাওয়ের নাম্বার কি আমি পেতে পারি?' বলল আহমদ মুসা।

'অবশ্যই বেটা' বলে শাহ বানুর মা শাহ বানুকে বলল, 'তুমি নাম্বার লিখে দাও।'

সংগে সংগে শাহ বানু উঠে গেল।

'স্যার, আমি একটা কথা বলি?'

'অবশ্যই গংগারাম।'

'ছয়জন, যারা ম্যাডামদের কিডন্যাপ করতে এসেছিল, তারা কেউ আন্দামানের লোক নয় স্যার।' গংগারাম বলল।

'কি করে বুঝলে?'

'চেহারা দেখে স্যার।'

'আন্দামানী ও ভারতীয় চেহারার মধ্যে খুব কি পার্থক্য আছে?'

‘সেটা হয়তো নেই। কিন্তু আন্দামানের বাসিন্দা ও আন্দামানে বহিরাগত এদের মধ্যে একটা পার্থক্য অবশ্যই আছে। যেমন স্যার, ওরা চারজন যেভাবে চোরের মত পালাল, আন্দামানীরা হলে পালাত না। আন্দামানীরা সাহসী। ডান হাত আহত হওয়ার পর ওরা বাম হাত দিয়ে গুলী করতো। তাছাড়া সেদিনের ওরা হাফপ্যান্ট ও হাফশার্ট পরা ছিল, এরাও তাই। আর এভাবে দল বেঁধে হাফপ্যান্ট, হাফশার্ট পরার কালচার আন্দামানে নেই।’ থামল গংগারাম।

‘ধন্যবাদ গংগারাম। আমি মনে করি তোমার কথা সত্য। তাহলে এর অর্থ কি এই যে আন্দামানের কোন পক্ষ বা ভারতের কোন পক্ষ বিশেষ মিশনে ভাড়া করা লোক ব্যবহার করছে? সেই পক্ষ কি গভর্নর বালাজী বাজী রাও মাধব হতে পারেন?’ অনেকটা স্বগতকণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

‘গভর্নর হলে আহমদ আলমগীরকে কিডন্যাপের একটা অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু ঐসব হত্যাকান্ডের কি অর্থ? গভর্নরই কি সব কিছু করাচ্ছেন? কেন?’ বলল গংগারাম।

‘এটাও একটা দিক গংগারাম।’ আহমদ মুসা বলল।

ঘরে প্রবেশ করল শাহ বানু। মায়ের হাতে একখ- কাগজ তুলে দিয়ে বসল মায়ের পাশে।

শাহ বানুর মা কাগজখ-ের উপর চোখ বুলিয়ে শাহ বানুর হাতে দিয়ে বলল, ‘ওদের দিয়ে এস।’

মুখটা শাহ বানুর আরক্ত হয়ে উঠল। কাগজখ- সে মায়ের হাতে না দিয়ে আহমদ মুসার হাতে দিয়ে আসতে পারতো। কিন্তু অজানা এক সংকোচে তার পা ওঠেনি। ফাইল দিতে গিয়ে তার হাত একবার কেঁপেছে। এই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি করতে সে আর সাহস পায়নি।

কিন্তু মায়ের নির্দেশে তাকে উঠতে হলো।

নিয়ে গেল কাগজখ- সে আহমদ মুসার কাছে। কাগজের খ-টি ছোট্ট।

কাগজ নেবার জন্যে হাত বাড়াল আহমদ মুসা। শাহ বানু হাত বাড়িয়ে কাগজখ- দিতে গিয়ে আহমদ মুসার হাতের কাছাকাছি হতেই শাহ বানুর হাতের আঙুলগুলো অকস্মাৎ নিঃসাড় হয়ে গেল। হাত থেকে খসে পড়ল কাগজখ-টি।

‘স্যরি’ বলল শাহ বানু কম্পিত কণ্ঠে।

আহমদ মুসা কাগজখ-টি মাটিতে পড়ার আগেই ধরে ফেলেছিল। বলল, ‘ওকে’ শাহ বানু।’

থামল আহমদ মুসা। হাসল। আবার বলে উঠল শাহ বানুকে লক্ষ্য করে, ‘শাহ বানু, কথায় যেমন তুমি বুদ্ধিমান, তেমনি সাহসেও তোমাকে শক্তিমান হতে হবে। কমপক্ষে তোমার ফুফু নুরজাহান ও দক্ষিণ ভারতের চাঁদ সুলতানার ইতিহাস তুমি পড়েছ নিশ্চয়?’

শাহ বানু কোন উত্তর না দিয়ে ছুটে এসে বসল তার আসনে। লজ্জা, সংকোচ ও আনন্দ সব মিলে তার মুখ আরও রাঙা হয়ে উঠেছে।

‘বাছা, সে রাজ্যও নেই, সেই রাজাও নেই, সেই শিক্ষাও নেই।’ শাহ বানুর মা বলল।

‘রাজ্য, রাজা সবই আছে মা। কিন্তু নাম পাল্টেছে, কাজও পাল্টে গেছে। দুনিয়ার অধিকাংশ স্বৈরতন্ত্রী আজ রাজা-বাদশাদের চেয়েও বড়। এমনিভাবে গণতন্ত্রী যারা ৫ বছরের জন্যে ক্ষমতায় বসেন, তারা অনেকেই মিনি রাজা হয়ে বসতে চান।’ বলল আহমদ মুসা।

উত্তরে কোন কথা বলল না শাহ বানুর মা।

তার মধ্যে ভাবান্তর দেখা গেল। গম্ভীর হয়ে উঠল শাহ বানুর মা। বলল ধীরে ধীরে, ‘বেটা, ওরা আহত বাঘের মত পাগল হয়ে উঠবে নিশ্চয়। আল্লাহর সাহায্য হিসেবে এসে একবার তোমরা আমাদের বাঁচিয়েছ। এরপর আমরা কি করব?’

‘আল্লাহ তো সব জায়গায় সব সময়ের জন্যে আছেন মা।’ বলল আহমদ মুসা।

‘তা আছেন। কিন্তু মানুষকে পথ খোঁজার জন্যে উঠে দাঁড়াতে হয়, তারপরই আল্লাহ তার সামনে পথ খুলে দেন।’ শাহ বানুর মা বলল।

গম্ভীর হয়ে উঠেছিল আহমদ মুসার মুখ। বলল, ‘আন্দামানে কি আপনাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন আছে?’

‘নেই বেটা।’ বলল শাহ বানুর মা।

‘আপনি ঠিকই বলেছেন মা, ওরা এখন আহত বাঘের মত। আমার ধারণা আজই তারা যে কোন সময় আক্রমণ করতে পারে। সুতরাং এ বাড়ি ছাড়তে হবে আপনাদের এখনই।’

বলেই আহমদ মুসা তাকাল গংগারামের দিকে। বলল, ‘গংগারাম, আরেকটা গাড়ি যোগাড় করতে পারবে এখন?’

‘অবশ্যই পারতে হবে স্যার। আমি দেখছি।’ কথা বলতে বলতেই উঠে দাঁড়িয়েছে। গংগারাম। মোবাইলটা পকেট থেকে হাতে তুলে নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে।

‘গাড়ি কি করবে বেটা?’ গংগারাম বেরিয়ে যেতেই বলল শাহ বানুর মা।

‘আপনাদের অন্য কোথাও নিতে হবে। সব গুছিয়ে নিন মা।’

‘কোথায়?’ বলল শাহ বানুর মা। কণ্ঠে তার উদ্বেগ।

‘আপনি আমাকে বিশ্বাস করছেন তো?’

‘এটা জিজ্ঞাসা করার কোন বিষয় হলো? আমার ছেলে আমার কাছে এমন প্রস্তাব আনলে আমার মধ্যে দ্বিধার সৃষ্টি হতো। তোমার কথায় তাও হয়নি।’

‘ধন্যবাদ মা।’

কথা শেষ করেই পকেট থেকে মোবাইল বের করল। টেলিফোন করল হোটেল সাহারার মালিক হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহকে।

ওপার থেকে হাজী আবদুল আলীর কণ্ঠ পেয়েই আহমদ মুসা বলল, ‘জনাব আমি বেভান বার্গম্যান। আমি আপনার হোটেলের একজন............।’

‘বাসিন্দা। সকালে আমার সাথে কথা হয়েছিল- এই বলবেন তো। বলুন, নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ কিছু হবে।’

‘জি জনাব। আমি জানতে চাচ্ছিলাম। কোন ‘ফ্যামিলি সুট’ আপনার হোটেলে খালি আছে? নিরাপদ হয় এমন একটা লোকেশান?’

আহমদ মুসা থামার সাথে সাথেই ওপার থেকে হাজী আবদুল আলীর কণ্ঠ ভেসে এল, ‘আমার হোটেলের প্রত্যেক ফ্লোরে দুটি করে ফ্যামিলি সুট আছে। কয়েকটি খালি। আপনার ফ্লোরেরটাও খালি আছে। কিন্ত কেন জানতে চাচ্ছেন? ফ্যামিলি সুটে ট্রান্সফার হবেন?’

'না জনাব। আমার এক আত্মীয়ের জন্যে একটা ফ্যামিলি সুট দরকার। আমার ফ্লোরেরটা হলেই ভাল হয়।'

'আপনার দরজার ঠিক মুখোমুখি দরজা, ওটা একটা ফ্যামিলি সুট, আর আপনার সারির সর্ব দক্ষিণে আরেকটা। কোনটা চাই? কাছের টা নিশ্চয়?'

'জি।' বলল আহমদ মুসা।

'ঠিক আছে। ওরা কি আজই আসবেন?'

'আজ নয়, এখনি জনাব।'

'আসুন। ওয়েলকাম।'

'ধন্যবাদ জনাব।'

মোবাইল অফ করেই আহমদ মুসা তাকাল শাহ বানুর মার দিকে।

বলল, 'সব তো শুনলেন মা। আমি মনে করি হোটেলই বেশি নিরাপদ হবে।'

'তুমি যা ভাল মনে কর বেটা। কিন্তু হোটেলের ফ্যামিলি সুট তো খুব ব্যয়বহুল।'

'মা, আপনার ছেলে না ফেরা পর্যন্ত মনে করুন আপনি আপনার আরেক ছেলের মেহমান।' বলল আহমদ মুসা।

হঠাৎ শাহ বানুর মার দুচোখ অশ্রুতে ভরে গেল। বলল, 'আমার ছেলে ফিরবে বেটা?' বলে কান্না চাপার চেষ্টা করতে লাগল।

'আমার মন বলছে আসবে মা। ওরা যে আপনার বাড়ি আক্রমণ করেছে আপনাদের কিডন্যাপ করার জন্যে। এটাও একটা প্রমাণ যে আপনার ছেলে বেঁচে আছে।'

'আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তোমার কথা সত্য করুন।'

'হোটেল আপনার নাম কি বেভান বার্গম্যান?' জিজ্ঞাসা করল শাহ বানু।

'হ্যাঁ, শাহ বানু। হোটেলের বোর্ডার হিসাবে তোমাদের নাম পাল্টাতে হবে।'

'কেন?' জিজ্ঞাসা করল শাহ বানুর মা।

‘আপনারা বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোন অজ্ঞাত কোথাও চলে গেছেন, হারিয়ে গেছেন, এটাই সকলকে জানাতে হবে। তা না হলে শত্রুরা আপনাদের পিছু ছাড়বে না।’ আহমদ মুসা বলল।

শাহ বানু ও শাহ বানুর মার মুখে ভয়ের ছায়া নামল। বলল শাহ বানু, ‘আমরা বাড়ি থেকে চলে গেলেও ওরা খুঁজবে আমাদের?’

‘আমি মনে করি খুঁজবে।’

‘কেন?’ বলল শাহ বানু।

‘এই ‘কেন’র সঠিক উত্তর জানি না। এটা আহমদ আলমগীরকে পেলে জানা যাবে, অথবা শত্রুদের কারো কাছে জানা যেতে পারে।’

আহমদ মুসার কথার উত্তরে শাহ বানুর মা কিছু বলতে যাচ্ছিল। এ সময় ড্রইংরুমে প্রবেশ করল গংগারাম। থেমে গেল শাহ বানুর মা।

‘স্যার, এ অঞ্চলে গাড়ি পাওয়া যায় না। একটি ক্যারিয়ার পেয়েছি। এতে চলবে স্যার। ওদের লাগেজ নিয়ে আমি ক্যারিয়ারের সাথে যাব। আপনি ওদের নিয়ে আমার গাড়িতে ড্রাইভ করবেন।’

‘ধন্যবাদ গংগারাম।’ বলে আহমদ মুসা তাকাল শাহ বানুর মার দিকে।

আহমদ মুসা কিছু বলার আগেই শাহ বানুর মা উঠে দাঁড়িয়েছে। বলল, ‘আমরা তৈরি হয়ে নিচ্ছি বেটা। কিন্তু বাড়ি আমরা কিভাবে রেখে যাব! কি নেব, কি নেব না বুঝতে পারছি না।’ কান্নায় রুদ্ধ হয়ে এল শাহ বানুর মার শেষের কথাগুলো।

‘ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্যে আশু অপরিহার্য এমন জিনিসই নেবেন মা। আর কোন পারিবারিক ডকুমেন্ট থাকলে সেগুলো অবশ্যই নেবেন।

শাহ বানু ও শাহ বানুর মা দুতলায় উঠে গেল।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই শাহ বানু ও তার মা দুজনে কাঁধে একটি করে ব্যাগ ও হাতে একটি স্যুটকেস নিয়ে বেরিয়ে এল।

গংগারাম তাদের হাত থেকে ব্যাগ ও সুটকেস নিয়ে কাঁধে ও হাতে ঝুলিয়ে ছুটল গেটের দিকে।

‘মা, উপরের ঘরগুলো লক করেছেন?’ বলল শাহ্ বানুর মাকে লক্ষ্য করে আহমদ মুসা।

‘হ্যাঁ, বেটা।’ কান্না চাপতে চাপতে বলল শাহ্ বানুর মা।

তারা সবাই বেরিয়ে এল। নিচের ঘরগুলো চেক করে লক করে দিল আহমদ মুসা। বাড়ির বাইরে চলে এল সকলে।

ব্যাগ ও সুটকেসগুলো ক্যারিয়ারে নিয়ে গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে ছিল গংগারাম।

আহমদ মুসা বাইরের গেট লক করে দিয়ে গাড়ির কাছে এল। শাহ্ বানু ও শাহ্ বানুর মাকে গংগারামের ক্যাবের পেছনের সিটে বসিয়ে গংগারামের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘এদিকে এস।’

গংগারাম এলে আহমদ মুসা বলল, ‘তুমি রিভলবার চালাতে জান?’

‘না স্যার। কেন স্যার?’ বলল গংগারাম।

‘আজ ওদের কাছ থেকে ছয়টি রিভলবার কুড়িয়ে পেয়েছি। তার একটা তোমাকে দিতাম।’

‘কেন স্যার?’

‘থাক। যাও, গিয়ে ক্যারিয়ারে ওঠ। তোমাদের গাড়িটা আগে যাবে, আমারটা পেছনে।’

‘আচ্ছা স্যার।’ বলে গংগারাম ছুটে গেল তার গাড়ির দিকে।

আহমদ মুসা গিয়ে ড্রাইভিং সিটে বসল।

গংগারামের পিক ক্যারিয়ারটা চলতে শুরু করলে আহমদ মুসাও তার ক্যাবটি ষ্টার্ট দিল।

আহমদ মুসা ষ্টিয়ারিং এ হাত রেখে মুখটা পেছনে ফিরে বলল, ‘মা, আপনারা এমনভাবে থাকলে ভাল হয় যাতে বাইরে থেকে কারো চোখে না পড়েন।’

‘ঠিক আছে বেটা।’

‘ধন্যবাদ মা।’

ফুল স্পিডে তখন চলতে শুরু করেছে গাড়ি।

শাহ বানুর বাড়ি চার'শ গজের মত দূরে যেখানে শাহ বানুর বাড়ির দিক থেকে আসা একমাত্র রাস্তাটি 'এল' টার্ন নিয়ে দক্ষিণে চলে গেছে, সেখানে রাস্তার পাশে জংগলের ধার ঘেঁষে পাঁচজন লোক উদগ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সকলের দৃষ্টি উপর থেকে নেমে আসা মাইক্রোর দিকে।

এলাকাটা এবড়ো-থেবড়ো জংগলাকীর্ণ। একেবারে নির্জন। অনেক দূর পর্যন্ত কোন বাড়িঘর নেই। আন্দামানের অন্যান্য এলাকার মত হারবারতাবাদের বাড়িগুলোও গুচ্ছাকৃতির। এই এলাকাটা এবড়ো-থেবড়ো ও কিছুটা খাড়া হওয়ার কারণে এই এলাকায় কোন বাড়িঘর নেই।

লোকগুলো যেখানে দাঁড়িয়ে মাইক্রোটির অপেক্ষা করছে, তার পেছনেই জংগল। জংগলের ফাঁক দিয়ে একটা ছোট্ট হেলিকপ্টার দেখা যাচ্ছে। জংগলটার পরেই একটা বড় পাথুরে চত্বর। ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে হেলিকপ্টারটা।

মাইক্রোটা লোকগুলোর সামনে এসে দাঁড়াল। লোকদের মধ্য থেকে নেতা গোছের একজন ছুটে গেল মাইক্রোর সামনের জানালায়। দ্রুত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'মিশন সাকসেসফুল? মা, বেটি দুজনকেই পেয়েছ?'

কিছু না বলে ড্রাইভিং করা লোকটি নিচে নেমে এল। তার সাথে সাথে পেছন থেকেও নেমে এল তিন জন। তাদের সকলেরই দুহাত ছিল রক্তাক্ত।

যে উৎসাহ নিয়ে লোকেরা মাইক্রোর দিকে ছুটে এসেছিল, সে উৎসাহ তাদের উবে গেল।

মাইক্রো ড্রাইভ করছিল যে লোক, সে গাড়ির জানালার সামনে আসা নেতা গোছের লোকটিকে লক্ষ্য করে আর্তকণ্ঠে বলল, 'শংকরজী, আমাদের শিবরাম ও বলবন্ত দুজনেই নিহত হয়েছে। আমরা.........।'

'দেখতেই পাচ্ছি, আহত হয়ে পালিয়ে এসেছ। কি করে এতবড় ঘটনা ঘটল লক্ষ? আমাদের ইনফরমেশন কি ভুল ছিল। গোপনে ওখানে পাহারা

রেখেছিল? কিন্তু ওরা তো কিছু জানার কথা নয়? কেন পাহারা রাখবে?’ বলল শংকর নামের লোকটি।

‘না সেখানে কোন পাহারা ছিল না। আমরা মা বেটি দুজনকেই ধরে নিয়ে আসতে শুরু করেছিলাম। বাড়ি থেকে বেরুবার আগেই হঠাৎ দুজন লোক এসে হাজির হলো বাইরে থেকে।’ বলে লক্ষণ পরের সব ঘটনা জানাল।

ঘটনা শুনে বিস্মিতকণ্ঠে শংকর চিৎকার করে বলে উঠল, ‘দুজন নিরস্ত্র লোক তোমাদের ছয় জনকে নিহত-আহত করল? এটা বিশ্বাস করতে বল?’

‘ঘটনা বিশ্বাস করার মত নয় শংকরজী। কিন্তু আমরা কিছু করার আগেই সবকিছু শেষ হয়ে গেছে।’ বলল লক্ষণ।

শংকর পকেট থেকে মোবাইল বের করল। কোথাও যোগাযোগ করে বলল, ‘মহাগুরু স্বামীজী, সর্বনাশ হয়ে গেছে। ওরা শয়তানটার মা-বোনকে ধরে আনতে পারেনি। শিবরাম ও বলবন্ত নিহত হয়েছে। লক্ষণরা গুলীবিদ্ধ আহত অবস্থায় ফিরে এসেছে।’

কথা শেষ করল শংকর। ওপারের জবাব বোধ হয় সুখকর ছিল না। ভীত ও মলিন হয়ে উঠেছে শংকরের মুখ।

সে টেলিফোন লক্ষণের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, ‘ওখানে কি হয়েছে, কি ঘটেছে, কি দেখেছ সব স্বামীজীকে জানাও।’

লক্ষণ টেলিফোন নিয়ে কম্পিতকণ্ঠে কিভাবে তারা গেল,ত কিভাবে মা-বেটিকে ধরে নিয়ে আসতে শুরু করেছিল, তারপর বাইরে থেকে আসা দুজন লোক কি ঘটাল, কিভাবে তারা চারজন সরে পড়েছে সব বিবরণ দিল। কথা শেষ হবার পর ওপারের এক প্রশ্নের জবাবে বলল, ‘ওরা মনে হয় অন্য কোন শহর থেকে সেখানে যায়। গেটে একটা ট্যাক্সি ক্যাবকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। তাতে ড্রাইভার অবশ্য ছিল না। মনে হয় ড্রাইভারও ভেতরে ঢুকেছিল। কারণ ভেতরে ঢোকা দুজনের একজনকে আমার ড্রাইভার বলে মনে হয়েছে।’

কথা শেষ করে ওপারের কথা শুনেই বলল, ‘ঠিক আছে স্বামীজী, শংকরকে টেলিফোন দিচ্ছি।’

শংকর টেলিফোন হাতে নিল। ওপারের কথা শুনে কম্পিতকণ্ঠে শংকর বলল, 'জি গুরুজী, আপনার কথা বুঝেছি। অক্ষরে অক্ষরে তা আমরা পালন করব।'

'জয় গুরুজী' বলে মোবাইল অফ করেই সকলের দিকে ঘুরে দাঁড়াল শংকর। বলল, 'শোন নির্দেশ, ঐ মা-বেটিকে ধরে নিয়ে যেতেই হবে। আর যে দুজন আমাদের দুজনকে খুন করেছে এবং চারজনকে আহত করেছে, তাদেরকেও ধরতে হবে। না হলে খুন করতে হবে।'

একটু থামল শংকর। সংগে সংগেই আবার বলে উঠল, 'কিন্তু তার আগে তোমরা কেউ যাও হেলিকপ্টার থেকে ফাষ্ট এইড নিয়ে এসে ওদের ব্যান্ডেজ করে দাও। যা দেখছি কারো হাতেই গুলী ঢোকেনি বলে আমার বিশ্বাস।'

শংকরের কথা শেষ না হতেই একজন দৌড় দিয়েছে হেলিকপ্টারের উদ্দেশ্যে।

কথা শেষ করেই শংকর ফিরল লক্ষণ নামের লোকটির দিকে। বলল, 'লক্ষণ, প্রথমে দুটি ব্যাপার আমাদের নিশ্চিত হওয়া দরকার। এক. শয়তান লোক দুজন ঐ বাড়িতে আছে কিনা, দুই. ঐ দুই হারামজাদি বাড়িতেই অবস্থান করছে, না অন্যত্র সরে পড়েছে।'

'বাইরে চলে যাবার এই একটি মাত্র রাস্তা। আমরা তো রাস্তার উপরই আছি। সুতরাং বাইরে কোথাও যায়নি এটা নিশ্চিত। আশে-পাশে প্রতিবেশী কারও বাড়িতে আশ্রয় নেবার সম্ভাবনা আছে। প্রতিবেশীদের কারো বাড়িতে সরে না পড়লে তারা বাড়িতেই আছে। শয়তান দুজনের ব্যাপারে এই একই কথা। তারা ট্যাক্সি ক্যাবত নিয়ে ওখানে গেছে। তারা বাইরে থেকে গেছে এটা নিশ্চিত। সুতরাং ফিরতে হলে এ পথ দিয়েই ফিরতে হবে। আমার মনে হয় খোঁজ নেবার জন্য লোক পাঠানো দরকার। সেটা দেখার জন্য আমরা ওদিকে যাব।' বলল লক্ষণ।

'ঠিক বলেছ লক্ষণ' বলেই শংকর একজনকে সব কথা বুঝিয়ে দিয়ে, বলল, 'তুমি মোবাইলে বললেই আমরা আসব।'

লোকটি দৌড় দিল।

অন্য কয়েকজন ওদের চারজনের হাতে ফাষ্ট এইড ও ব্যান্ডেজ দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

আর শংকর একজনকে নিয়ে হেলিকপ্টারে গেল অস্ত্র নিয়ে আসতে যাতে মোবাইল পেলেই তৎক্ষণাৎ যাত্রা শুরু করতে পারে।

প্রায় চল্লিশ মিনিট পর টেলিফোন এল লক্ষণের।

বিরক্ত, ক্রুদ্ধ শংকর মোবাইল ধরেই ধমক দিল। ধমক খেয়ে ওপার থেকে লক্ষণ বলল, 'পথেই একটা বিপদে পড়েছিলাম। পরে বলব। শোন, এইমাত্র এসেই দেখলাম, সেই ট্যাক্সি ক্যাবে দুই মা-বেটি যাচ্ছে। ড্রাইভ করছে ক্যাব চালক। ঐ দুজনকে দেখছি না।'

'যাচ্ছে মানে কি এদিকে আসছে?' জিজ্ঞাসা করল শংকর।

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে। আপাতত এ দুজনকে পেলেও চলবে। দুই শয়তানকে আমরা পরে দেখব।'

কথা শেষে মোবাইল অফ করেই ফিরল সকলের দিকে। বলল, 'একটা ট্যাক্সি ক্যাব আসছে। আটকাতে হবে। ওতেই দুই মা-বেটি আছে।'

সবাই রাস্তার পাশে জংগলের মধ্যে পজিশন নিল। শংকর সবাইকে ব্রিফিং দিয়ে রাস্তার পাশে একটা গাছে হেলান দিয়ে সিগারেট ফুঁকতে লাগল।

পিক আপ ভ্যানটি তার চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল। আধা মিনিটের মধ্যেই ক্যাবটি চলে এল।

শংকর দুহাতে দুই রিভলবার নিয়ে রাস্তার মাঝখানে গিয়ে দুটি ফাঁকা ফায়ার করে ক্যাবকে দাঁড়াতে নির্দেশ দিল।

আহমদ মুসা চারদিকে তাকাল। আর কাউকে দেখল না। লোকটি একা? পুলিশ নয় দেখেই আহমদ মুসা নিশ্চিত হয়েছে, এ খুনি দলেরই কেউ হবে। ক্যাব দাঁড়াতে বলছে কেন? আহতরা কি তাহলে সব খবর দিয়েছে ওদের? দিয়েছে নিশ্চয়ই। কিন্তু এভাবে গাড়ি আটকাচ্ছে কেন? ওরা কি তাহলে জানে গাড়িতে আহমদ আলমগীরের মা বোনরা আছে?'

বাম পাশে সিটের উপর ও ড্যাশবোর্ডের রিভলবার দুটির দিকে একবার তাকিয়ে আহমদ মুসা গাড়িতে ব্রেক কষল এবং পেছন দিকে না তাকিয়েই বলল, 'শাহ বানু, তোমরা সিটের নিচে লুকিয়ে পড়।'

গাড়ি দাঁড়াতেই শংকর ছুটে এল। 'ড্রাইভার, তোমার দুজন যাত্রী কোথায়? দেখছি না যে?'

শংকরের জিজ্ঞাসায় আহমদ মুসা নিশ্চিত হলো যে, কিডন্যাপকারীরাই এরা?

আহমদ মুসা আগেই গাড়ির জানালা খুলে ফেলেছিল।

শংকর গাড়ির তিন চার গজের মধ্যে এসে গেছে।

আহমদ মুসার ডান হাতটা তখনো ষ্টিয়ারিং হুইলে। তার বাম হাত সিটের উপরের রিভলবার নিয়ে চোখের পলকে উঠে এল গাড়ির জানালায়।

দুবার ট্রিগার টিপল আহমদ মুসা।

দুহাত লক্ষ্যে দুটি গুলী করেছে সে।

প্রথম গুলীটি ডান হাতকে বিদ্ধ করল। দ্বিতীয় গুলীটি ছুটে যাচ্ছিল। কিন্তু প্রথম গুলীটি খাওয়ার পরেই শংকর তার দেহকে বাঁ দিকে সরিয়ে নিয়েছিল। ফলে গুলী তার বাঁ হাতের বদলে তার তলপেটকে বিদ্ধ করল।

আহমদ মুসা রিভলবার ধরা বাম হাতটা সরিয়ে নিল গাড়ির জানালা থেকে। মনটা খারাপ হয়ে গেছে তার। লোকটাকে মারতে চায়নি আহমদ মুসা। লোকটির হাত দুটিকে নিস্ক্রিয় করে নিরাপদে গাড়ি নিয়ে সরে পড়তে চেয়েছিল সে।

আহমদ মুসা গাড়ি ষ্টার্ট দিতে যাচ্ছিল।

এ সময় রাস্তার পাশে জংগলের দিক থেকে বৃষ্টির মত গুলী ছুটে আসতে লাগল গাড়ি লক্ষ্যে।

মুহূর্তেই গাড়ির কাঁচ চূর্ণ-বিচুর্ন হয়ে গেল। টায়ারও ঝাঁঝরা হয়ে গের। সামনের দিকটা বসে পড়ল গাড়ির।

আহমদ মুসা বসে পড়ে গাড়ির বিপরীত দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে অর্থাৎ দক্ষিণ পাশেল দরজার দিকে ক্রলিং করে এগুতে এগুতে বলল, 'শাহ বানু, তোমরা গাড়ির ফ্লোর থেকে মাথা তুলো না।'

গুলীবৃষ্টির আধিক্য গাড়ির সামনের দিকেই বেশি এবং গাড়ির সামনের দিকের চাকাটাই নষ্ট হয়ে গেছে। আহমদ মুসা বুঝল, যারা গুলী করছে তারা গাড়ির সামনের সোজাসুজি রাস্তার পাশে অবস্থান নিয়েছে অথবা তাদের লক্ষ্য গাড়ির সামনের দিকটা। আহমদ মুসা গাড়ির পেছন দিকটা ঘুরে পেছনের উত্তর দিকের চাকার পাশ দিয়ে তাকাল রাস্তার ওপাশের দিকে। গুলী আসছে এখনও ওদিক থেকে। তবে গুলীর পরিমাণ কমে গেছে।

আহমদ মুসার দুহাতে রিভলবার। রাস্তার ওপাশের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে। আহমদ মুসা নিশ্চিত, এদিক থেকে গুলীর জবাব না পেলে এক সময় ওরা জংগলের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসবে প্রতিপক্ষের কি অবস্থা হয়েছে তা দেখার জন্যে। সেই সুযোগ আহমদ মুসা গ্রহণ করবে।

ওরা জংগর থেকে বেরিয়ে এসেছে। তাদের দুজনের হাতে ষ্টেনগান। অন্য পাঁচজনের হাতে রিভলবার।

গাড়ি লক্ষ্যে বিস্মিত দুচারটা গুলী ছুড়তে ছুড়তে ওরা এগিয়ে আসছে।

আহমদ মুসা তার দুরিভলবার ওদের দিকে তাক করল। ওরা গাড়ি পর্যন্ত পৌছার আগেই তাকে এ্যাকশনে যেতে হবে।

আহমদ মুসার সমস্ত মনোযোগ যখন গাড়ির দিকে এগিয়ে আসা লোকদের দিকে। তখন পেছন থেকে দ্রুত ছুটে আসা পায়ের শব্দে চমকে উঠে আহমদ মুসা মুখ ঘুরিয়ে পেছনে তাকাল। দেখল, একজন লোক ছুটে আসছে। লোকটিও আহমদ মুসাকে দেখতে পেয়েছে। আহমদ মুসাকে দেখতে পেয়েই সে দৌড়ানো অবস্থাতেই পকেটে হাত ঢুকিয়েছে।

কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝল আহমদ মুসা এবং বুঝতে পারল যে, লোকটি এই গ্রুপেরই সদস্য।

লোকটি পকেট থেকে হাত বের করার আগেই আহমদ মুসার বাম হাতের রিভলবারের নল ঘুরে গেছে লোকটির দিকে এবং ট্রিগার টেপা হয়েছে তার সাথে সাথেই। লোকটি মাথায় গুলী খেয়ে উল্টে পড়ে গেল।

গুলী করেই আহমদ মুসা তার মুখ ও বাম হাত ঘুরিয়ে নিল গাড়ির লক্ষ্যে এগিয়ে আসা লোকদের দিকে। দেখল, ওদের সকলেরই নজরে এসেছে ঘটনাটা। আহমদ মুসার অবস্থানও ওদের নজরে পড়েছে।

আহমদ মুসার একাংশ গাড়ির চাকার আড়ালে। অন্য অংশ ওদের অধিকাংশের নজরে এসেছে।

কিন্তু আহমদ মুসা সিদ্ধান্ত নিয়েই তার মাথা ও হাত ঘুরিয়ে নিয়েছিল এবং তার দুরিভলবার এক সাথেই গুলী বর্ষণ করেছিল।

আহমদ মুসার প্রথম টার্গেট ছিল এদিকের লোকরা। ছয় রাউন্ডের বেশি গুলী ছোড়া তার পক্ষে সম্ভব হলো না। ওপাশ থেকে গুলী বর্ষণ শুরু হয়ে গেছে। একটি গুলী এসে তার বাম হাতকে আঘাত করল, অন্য আর একটি গুলী কাঁধের নিচে বাহুর মাসলের একটা অংশ উড়িয়ে নিয়ে গেল। অধিকাংশ গুলীই আঘাত করছিল গাড়ি এবং গাড়ির চাকাকে। এতেই রক্ষা পেল আহমদ মুসা।

গুলীর আঘাতে আহমদ মুসার বাম হাতের রিভলবার ছিটকে চলে গিয়েছিল।

এদিক দিয়ে আক্রমণে যাওয়া কঠিন দেখে আহমদ মুসা দ্রুত পেছনে ব্যাক করল।

গাড়ির এপাশে চলে এসে আহত হাতটাকেও যথাসম্ভব কাজে লাগিয়ে দ্রুত ক্রলিং করে গাড়ির সামনের দিকে চলে এল।

গাড়ির সামনের দিকটা ঘুরে গাড়ির উত্তরপূর্ব প্রান্তের কোনায় আশ্রয় নিয়ে তাকাল গাড়ির এপাশটার দিকে। দেখল, চারজন ওরা গুলী করতে করতে এগুচ্ছে গাড়ির পশ্চিম প্রান্তের দিকে।

তাদের পাশে তিনজনের লাশ পড়ে আছে। বুঝল আহমদ মুসা, তার ছয় রাউন্ড গুলীতে ওরা তিনজন শেষ হয়েছে। তড়িঘড়ি টার্গেট নেয়া হলে রেজাল্ট খারাপ হয়।

আহমদ মুসার বাম হাত এই মুহূর্তে রিভলবার ধরার মত নয়।

তার ডান হাতের রিভলবার পাল্টে পকেট থেকে একটা ফুল লোডেড রিভলবার নিল।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। ওদের দিকে রিভলবার তাক করে বলল, 'তোমরা হাতের রিভলবার ও ষ্টেনগান ফেলে দিয়ে হাত তুলে দাঁড়াও। মনে রেখ এক কথা আমি দুবার বলি না।'

ওরা চারজনই একসাথে ঘুরে দাঁড়াল চোখের পলকে। কেউ ওরা অস্ত্র ফেলে দেয়নি, হাত তোলেনি।

আহমদ মুসার রিভলবার পরপর চারবার গুলী বর্ষণ করল। ওদের ষ্টেনগান ও রিভলবার উঠে আসছিল। কিন্তু মাঝপথেই গতি থেমে গেল। ওরা চারজন বুকে গুলী খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

আহমদ মুসা চারদিকে দেখল কেউ নেই।

সে দ্রুত এগুলো গাড়ির দিকে। টান দিয়ে দরজা খুলে দেখল ওপাশের দরজার পাশে দুই মা-মেয়ে কুকড়ে শুয়ে আছে।

'শাহ বানু, তোমরা ভাল আছ, ঠিক আছ?' দ্রুত কণ্ঠে আহমদ মুসা জিজ্ঞেস করল।

ভয়ে-আতংকে ওরা নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। আহমদ মুসাকে দেখে আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মত চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তারা আশা করতে পারছিল না যে তারা আবার আহমদ মুসাকে দেখতে পাবে।

কথা বলে উঠল শাহ বানুর মা। বলল, 'বেটা, আমরা মরে গেলে ক্ষতি নেই। আমরা চিন্তিত ছিলাম তোমাকে নিয়ে। আল্লাহর হাজার শোকর তোমাকে পেয়েছি আমরা।'

শাহ বানুর নজর পড়েছিল আহমদ মুসার রক্তাক্ত হাত ও বাহুর দিকে। ভয়ে আঁৎকে উঠেছিল সে। মুখ খুলেছিল কিছু বলার জন্যে।

তার আগেই আহমদ মুসা বলে উঠল, 'মা, আসুন আপনারা। এ গাড়ি শেষ হয়ে গেছে। অন্য গাড়ি দেখতে হবে।'

বলেই আহমদ মুসা সোজা হয়ে দাঁড়াল। তাকাল রাস্তার পাশে দাঁড়ানো মাইক্রোর দিকে।

শাহ বানুরা বেরিয়ে এল গাড়ি থেকে। আটটা রক্তাক্ত লাশ পড়ে থাকতে দেখে আরেক দফা আঁৎকে উঠল তারা। কিছু বলতে যাচ্ছিল শাহ বানুর মা।

আহমদ মুসা তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'আসুন মা, ঐ মাইক্রোতে উঠতে হবে। তাড়াতাড়ি সরে পড়তে হবে এখান থেকে।'

বলে আহমদ মুসা ছুটল মাইক্রের দিকে।

যাবার সময় দুটো ষ্টেনগান ও কয়েকটা রিভলবার কুড়িয়ে নিল।

সুন্দর নতুন মাইক্রো। কীহোলে চাবি ঝুলছে।

মাইক্রোর দরজা খুলে দিল শাহ বানুদের উঠার জন্যে।

গাড়িতে উঠতে গিয়ে আহমদ মুসার রক্তাক্ত বাম বাহুর দিকে নজর পড়তেই শাহ বানুর মা আর্তনাদ করে বলে উঠল, 'একি হয়েছে বেটা, তুমি তো সাংঘাতিক আহত!'

'আমি আগেই দেখতে পেয়েছি। ওঁর হাতে দুটা গুলী লেগেছে মা। আহত জায়গা এখনই বেঁধে ফেলা দরকার। তাতে অন্তত রক্ত বন্ধ হবে।' বলল শাহ বানু কম্পিত কণ্ঠে।

'এখন সময় নেই শাহ বানু। তোমরা গাড়িতে উঠ। ঝামেলায় পড়ার আগে আমরা সরে পড়তে চাই।' শান্ত, কিন্তু শক্ত কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

আর দ্বিরুক্তি না করে শাহ বানুরা গাড়িতে উঠে গেল।

গাড়িতে দরজা বন্ধ করতে গিয়ে মাইক্রোর পেছন দিকে হঠাৎ নজর গেল আহমদ মুসার। তিনটি ছোট বাক্স দেখতে পেল। ভাল করে দেখল। তিনটিই গুলীর বাক্স। দুটি ষ্টেনগানের এবং একটি রিভলবারের।

আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল আহমদ মুসার মুখ। বলল, 'মা, দেখুন আল্লাহর সাহায্য কিভাবে আসে। আমি খালি হাতে আন্দামানে এসেছি। আজই বেশ অনেকগুলো রিভলবার হাতে এসে গেল। দুটি ষ্টেনগানও এখন যোগাড় হলো। কিন্তু গুলী ছিল না হাতে। ভাবছিলাম গুলীর সন্ধান এ অজানা জায়গায়

কিভাবে করব! দেখুন আপনাদের পিছনে তিনটাই গুলীর বাক্স। আলহামদুলিল্লাহ।’

‘আল্লাহ তো তোমাকেই সাহায্য করবে বেটা! যে আমাদের মত অসহায়দের সাহায্যের জন্যে নিজের জীবনের পরোয়া করে না। আল্লাহর সাহায্য তো তোমার মত লোকদের জন্যেই।’ বলল গভীর আবেগ জড়ি কণ্ঠে শাহ বানুর মা।

‘ওকে মা’ বলে আহমদ মুসা আর কোন কথা না বলে দরজা বন্ধ করে দিয়ে ড্রাইভিং সিটে এসে বসল। গাড়ি চলতে শুরু করল।

শাহ বানু আস্তে আস্তে তার মাকে বলল, ‘আমার ওড়নাটা অনেক লম্বা এবং অনেক চওড়া। লম্বালম্বি ছিড়লে ওঁর দুটো ব্যান্ডেজ ভাল মত হয়ে যাবে। এভাবে রক্ত পড়তে থাকলে তো ক্ষত ছাড়াও মানুষেরও তা নজরে পড়ে যাবে।’

‘ঠিক বলেছ মা’ বলে শাহ বানুর মা আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, ‘বেটা, তোমার বাঁ হাতটা এদিকে দাও। শাহ বানু ব্যান্ডেজ করে দেবে। ওর ভাল ফাষ্ট এইড ট্রেনিং আছে।’

‘দরকার নেই মা। কিছুক্ষণের মধ্যেই তো আমরা হোটেলে পৌছে যাচ্ছি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কিছুক্ষণ কোথায়? যে রাস্তার অবস্থা, দুঘণ্টার আগে যাওয়া যাবে না। তাছাড়া রক্ত পড়া চলতে থাকলে, তা হোটেলের অনেকেরই চোখে পড়ে যেতে পারে।’ বলল শাহ বানুর মা।

সঙ্গে সঙ্গে আহমদ মুসা কিছু বলল না। শাহ বানুর মা’র শেষ যুক্তিটা অবশ্যই বিবেচনার বিষয়। রক্তাক্ত দৃশ্যটা হোটেলের লোকদের চোখ থেকে আড়াল করা দরকার। এই চিন্তা করে আহমদ মুসা বলল, ‘কিন্তু ব্যান্ডেজ বাঁধার জন্যে কাপড় পাবেন কোথায়?’

‘সে চিন্তা তোমার নয় বেটা।’ বলল শাহ বানুর মা।

সঙ্গে সঙ্গেই শাহ বানু লম্বালম্বি তার ওড়না ছিঁড়ে ফেলল।

ছয়ফুট লম্বা চার ইঞ্চি চওড়া একটা খ- বেরিয়ে এল। দীর্ঘ খ-টিকে মাঝামাঝি ছিঁড়ে দুই খ- পরিণত করল।

তারপর শাহ বানু উঠে গেল ড্রাইভিং সিটের পাশের সিটে।

হ্যান্ড ব্যাগ থেকে কিছু টিস্যু পেপার বের করে নিল।

আহমদ মুসা ষ্টিয়ারিং এ ডান হাত রেখে সামনে তাকিয়ে ছিল। শাহ বানুর দিকে না তাকিয়েই বাম হাতটা শাহ বানুর দিকে একটু এগিয়ে দিয়ে বলল, 'ফাষ্ট এইড ট্রেনিং দেয়ার পর ট্রেনিং কাজে লাগাবার বাস্তব সুযোগ কখনও পেয়েছ শাহ বানু?'

'শাহ বানু আহমদ মুসার হাত হাতে তুলে নিয়েছিল। সে দেখে খুশি হলো যে পাঁচটি আঙুলই অক্ষত আছে। কিন্তু বুড়ো আঙুলের সন্ধিস্থল হাতের তালুর উচ্চভূমিটা উড়ে গেছে গুলীতে। অন্যদিকে কাঁধের নিচের সুগঠিত শক্ত পেশীটারও বড় অংশ উঠে গেছে।

শাহ বানু টিস্যু পেপার দিয়ে হাত পরিষ্কার করতে করতে আহমদ মুসার জিজ্ঞাসার উত্তরে বলল, 'আমি ভাগ্যবান। জীবনের ঐতিহাসিক দিনে ঐতিহাসিক একজনকে ফাষ্ট এইড দেয়ার মাধ্যমে আমার বাস্তব অভিজ্ঞতার যাত্রা শুরু হলো।'

আহমদ মুসা কোন কথা বলল না। তার স্থির দৃষ্টি সামনে নিবদ্ধ।

শাহ বানু আহমদ মুসার আহত দুটি জায়গা পরিষ্কার করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল।

আহত দুটি জায়গা পরিষ্কার করতে গিয়ে শাহ বানু বিস্মিত হয়েছে এবং দেখেছে, অসহনীয় বেদনাকে আহমদ মুসা কত অবলীলায় হজম করেছে। তার চোখের পাতা সামান্য নড়েনি। মুখে বেদনার সামান্য একটা ভাঁজও পড়েনি। মনে হয়েছে আহত স্থান দুটো দেহের অংশই নয়।

আহমদ মুসা তার হাত ফেরত পাওয়ার পরে বলল, 'বাঃ, হাত আমার খুব হালকা হয়ে গেছে। দুহাতেই এখন আমি ড্রাইভ করতে পারবো। ধন্যবাদ শাহ বানু।'

'একটা কথা জিজ্ঞেস করি?' বলল শাহ বানু।

'অবশ্যই।' আহমদ মুসা বলল।

'আপনার নার্ভ কি পাথরের?'

'কেন?'

‘আহত স্থান দুটো পরিষ্কার করা ও ব্যান্ডেজ বাঁধার সময় আপনার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া দেখিনি। মনে হয়েছে হাত যেন আপনার দেহের অংশই নয়।’ বলল শাহ বানু।

গম্ভীর হলো আহমদ মুসা। বলল, ‘হযরত আলী (রা) এর ঘটনা নিশ্চয় তোমার জানা। এক যুদ্ধে তার পায়ের গোড়ালিতে তীর বিদ্ধ হয়। তীর খুলতে গেলে কষ্ট হবে ভেবে তার তীর খোলা হলো না। তিনি যখন নামাজে দাঁড়ালেন, তখন তীর সহজেই খুলে নেয়া হলো। তিনি টেরই পেলেন না। এটা কেন জান? নামাজের সময় তিনি তার সমস্ত মনোযোগ আল্লাহমুখী করেন এবং ভুলে যান তিনি চারপাশের জগতকে। তার পায়ে তীর বিদ্ধ থাকা এবং তীর খোলার যন্ত্রণার যে শক্তি তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তি ছিল নামাজে আল্লাহর সাথে তার সম্পর্কের শক্তি।’

‘ধন্যবাদ জনাব। এ ঘটনা আমার জানা ছিল না। কিন্তু সেই ঘটনা থেকে আপনার ঘটনার মধ্যে পার্থক্য আছে। হযরত আলী (রা) নামাজে ছিলেন, আপনি নামাজে ছিলেন না।’

‘নামাজে ছিলাম না, কিন্তু আল্লাহমুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে বাইরের সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার চেষ্টা করেছিলাম।’

‘হযরত আলী (রা) তা করেননি কেন? তাহলে নামাজের আগেই তার তীর খুলে নেয়া যেত।’

গাম্ভীর্য নামল আহমদ মুসার মুখে আবার। বলল, ‘হযরত আলী (রা)-এর মত মহান সাহাবায়ে কেরামগণ তাদের উপর আপতিত দুঃখ-মুসিবত ও বিপদ-আপদকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতেন এবং মনে করতেন আল্লাহই এসব দূর করে দেবেন। তাঁরা দুঃখ-মুসিবত নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠতেন না। সুতরাং তীর বিদ্ধ হওয়াও তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেনি, উদ্বিগ্ন-উৎকণ্ঠিত এতে হননি তিনি। এ কারণে আহতের বেদনা থেকে বাঁচার জন্যে আমি যা করেছিলাম, তিনি তা করেননি। এটা তাঁদের আকাশচুম্বী ঈমানী শক্তিমত্তার প্রমাণ। এই শক্তি আমাদের নেই শাহ বানু।’ আবেগ জড়িত কণ্ঠস্বর আহমদ মুসার।

আহমদ মুসার দৃষ্টি সেই একইভাবে সামনে নিবদ্ধ।

শাহ বানুর দৃষ্টি আহমদ মুসার মুখে। তার স্বপ্নের আহমদ মুসার সব রূপই সে তার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে। শত্রুর বিরুদ্ধে তার অংগার রূপ সে দেখল। দু'ডজনের মত লাশ ফেলেছে সে এ পর্যন্ত। পরার্থে তার যে জীবন তারও রূপ সে দেখছে। সুন্দর আন্দামানে এই যে জীবন-মৃত্যুর লড়াই এতে তাঁর কোন জাগতিক স্বার্থ জড়িত নেই। আবার এই কঠোর সংগ্রামীর মধ্যেই সংবেদনশীল ও আবেগপ্রবণ এক অপরূপ মনও রয়েছে। তার চোখে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আগুন জ্বলে উঠতেও সময় লাগছে না, আবার আবেগে অশ্রু সজল হতেও দেরি হচ্ছে না। এই স্বপ্নের মানুষরা যারা একদিন দুনিয়া জয় করেছিল ইসলামের জন্যে, তারা হারিয়ে গিয়েছিল। অন্তত মুঘল সম্রাট বাবরের মত মানুষ যারা মদের পাত্র ভেঙে তওবা করে যুদ্ধ যাত্রা করতে পারেন, তারাও এক সময় নিখোঁজ হয়েছিলেন। এসেছিল সম্রাট আকবরের মত আত্মপরিচয়হারা এবং সম্রাট শাহজাহানের মত বিলাসী মানুষ। তারা যে ক্ষতি করেছিল মুসলিম জাতির সে ক্ষতি থেকে পতনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা আলমগীর আওরঙ্গজেবের মত দরবেশ সম্রাটের বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা পারেনি জাতিকে রক্ষা করতে। আবার সেই স্বপ্নের মানুষকে চোখের সামনে দেখছে, যে শুধুই আদর্শবাদ, নীতিবোধ ও জাতিবোধের টানে ছুটে এসেছে আমেরিকা থেকে এবং জীবন-ভোগের অপ্রতিরোধ্য বাসনার গলায় ছুরি চালিয়ে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে জীবন-মৃত্যুর ভয়াবহ সংগ্রামে!

আবেগের এক সয়লাব এসে ভাসিয়ে নিল শাহ বানুর হৃদয়কে। অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল তার দুচোখের কোণ। বলল সে ধীরে ধীরে আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, 'জনাব, সেই ঈমানী শক্তি নেই, আপনিও যদি একথা বলেন, তাহলে হতাশা যে কাটবে না! কার দিকে তাকাব আমরা আশা নিয়ে?'

'কোন মানুষের দিকে নয়, আশা নিয়ে তাকাতে হবে আল্লাহর দিকে। সাহায্য করার শক্তি ও অধিকার এককভাবে আল্লাহর। আদর্শের বদলে ব্যক্তিনির্ভর সিষ্টেম ও ব্যক্তিনির্ভর ব্যবস্থা একের পর এক মুসলিম সম্রাজ্যকে ধ্বংস করেছে।' বলল আহমদ মুসা।

'আপনার কথা ঠিক জনাব। কিন্তু আদর্শ তো ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে উঠে দাঁড়ায় এবং পথও চলে।'

‘ঠিক শাহ বানু। কিন্তু এখানে ব্যক্তি মুখ্য নয়। আদর্শ ব্যক্তিকে দাঁড় করায় এবং তাকে পথ চলায়, এটাই সত্য। এটাই যদি আমাদের কাছে সত্য হয়, তাহলে ব্যক্তির ব্যর্থতা বা তিরোধান আমাদের ক্ষতি করবে না, হতাশ করবে না। বরং আদর্শের শক্তি আমাদের ‘গণতন্ত্র’কে কাজে লাগিয়ে নতুন নেতা, নতুন ব্যক্তিকে দাঁড় করাবে, পথ চালাবে।’

শাহ বানুর অপলক চোখ আহমদ মুসার মুখে। কিছু বলতে যাচ্ছিল সে।

কিন্তু তার আগেই আহমদ মুসা বলে উঠল, ‘ঐতো দেখছি গংগারামের পিকআপটা দাঁড়িয়ে।’

আহমদ মুসা পিকআপটার পাশে তার মাইক্রো দাঁড় করাল এমনভাবে, যেন পিকআপের ড্রাইভার তাদের দেখতে না পায়।

গলার স্বরটাকে কিঞ্চিত আলাদা করে ডাকল গংগারামকে।

সঙ্গে সঙ্গেই গংগারাম গাড়ি থেকে নেমে ছুটে এল। মাইক্রোতে আহমদ মুসাদের দেখে তার চোখে-মুখে বিস্ময়। কিছু বলার জন্যে সে মুখ খুলেছিল।

আহমদ মুসা ঠোঁটে আঙুল চাপা দিয়ে নিষেধ করল কথা বলতে। আহমদ মুসাই দ্রুত বলে উঠল, ‘সব ঘটনা পরে জানবে। আমরা চলে যাবার পাঁচ মিনিট পর ড্রাইভারকে বলবে যে, পেছনের গাড়ির জন্যে আর অপেক্ষা করা যায় না। তারপর গাড়ি নিয়ে চলে এস।’

গংগারামের চোখভরা বিস্ময় আর প্রশ্ন। বিশেষ করে আহমদ মুসার ব্যান্ডেজ বাঁধা হাত দেখে অস্থির হয়েছে বেশি। কিন্তু কোন প্রশ্ন না করে ‘ঠিক আছে স্যার’ বলে পিকআপের দিকে ফিরতে শুরু করল সে।

আহমদ মুসা তাকে লক্ষ্য করে উচ্চস্বরে বলল, ‘ঠিক আছে গংগারাম, তোমরা অপেক্ষা করা আমি যাই।’

বলে আহমদ মুসা গাড়ি ষ্টার্ট দিল।

গাড়ি চলতে শুরু করলে শাহ বানু বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, ‘দুঃখিত জনাব, গংগারাম গাড়ি নিয়ে পরে আসবে কেন বুঝতে পারলাম না। ড্রাইভার তো আমাদের দেখেছে, আমরা এখানে নিজেদের গোপন করলাম কেন?’

‘পেছনে যা ঘটেছে তা ড্রাইভারের জানা ঠিক হবে না। আমাদের দেখলে তার মনে প্রশ্ন জাগত ক্যাব ছেড়ে আমরা মাইক্রোতে কেন? তারপর কাল যখন সে গুলীতে ক্যাব ঝাঁঝরা হওয়া এবং জন দশেক লোক নিহত হওয়ার কথা জানবে, তখন সে আমাদের বিষয়টা পুলিশকে বলেও দিতে পারে। গংগারামকে পরে আসতে বললামও এই কারণে যেন ক্যাব, আমরা ও গংগারামের মধ্যে কোন যোগসূত্র গড়ার সুযোগ ড্রাইভার না পায়।’

‘বুঝলাম। অনেক দূরের কথা আপনি চিন্তা করেছেন। কিন্তু ক্যাব এর সাথে গংগারামের সম্পর্কের কথা প্রকাশ হয়েই পড়বে।’ বলল শাহ বানু।

‘তাতে ক্ষতি নেই। গংগারাম পোর্ট ব্লেয়ারে পৌছেই থানায় মামলা দায়ের করবে যে, তার গাড়ি চুরি গেছে।’ আহমদ মুসা বলল।

হেসে ফেলল শাহ বানু। বলল, ‘চমৎকার পরিকল্পনা। কিন্তু এত কথা আপনি ভাবলেন কখন?’

একইভাবে সামনে তাকিয়ে ছিল আহমদ মুসা।

মুখ না ফিরিয়েই আহমদ মুসা বলল, ‘দায়িত্ব নিয়ে ভাবলে তুমি এমন কি গংগারামও এটাই করতো।’

‘ধন্যবাদ’ শাহ বানু সামনের সিট থেকে উঠে পেছনের সিটে মায়ের পাশে গিয়ে বসল।

‘অনেক ধন্যবাদ।’ আহমদ মুসাও বলল।

তারপর নামল একটা নীরবতা।

ছুটে চলছে গাড়ি।

# ৫

একটা পাহাড় শীর্ষ ঘিরে একটা পুরানো বাড়ি।

বাড়ির অধিকাংশই ভেঙে চুরে গেছে। মাঝে মাঝে কিছু অংশ জোড়াতালি দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে।

বাড়ির সামনে কংক্রিটের একটা স্তম্ভে সেট করা একটা মার্বেল পাথরে লেখা 'হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের সম্পত্তি'। বাড়িটা ইন্ডিয়ান হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের একটা সম্পত্তি।

নিচ থেকে একটা পাথুরে রাস্তা এঁকে বেঁকে উপরে উঠে গেছে। তারপর রাস্তাটা বাড়ির বাইরের প্রান্ত দিয়ে বাড়িটাকে চারদিক থেকে সার্কুলার রাস্তা তৈরি করেছে। এই সার্কুলার রাস্তা থেকে অনেক শাখারাস্তা ঢুকে গেছে সার্কুলার বাড়িটার ভেতরে।

বাড়ির মতই রাস্তাগুলোও প্রায় নিশ্চিহ্ন।

সেই নিশ্চিহ্ন রাস্তা দিয়ে গংগারামকে চারজন লোক চ্যাংদোলা করে উপরে তুলছে।

গংগারামকে নিয়ে তারা ভাঙা বাড়িটার ভেতরে প্রবেশ করল। গলিপথ ঘুরে তারা গিয়ে পৌছল সুসজ্জিত একটা ঘরে। ঘরের দরজার পাশে একটা ছোট্ট সাইন-বোর্ড। তাতে লেখা 'মোবাইল অফিস, হেরিটেজ ফাউন্ডেশন।'

গংগারামকে নিয়ে সে ঘরে প্রবেশ করে আরও কয়েকটি ঘর পেরিয়ে এক অন্ধকার করিডোর দিয়ে এগিয়ে একটা অনুজ্জ্বল সিঁড়ি পথে নিচে নামল।

আন্ডারগ্রাউন্ডেও অনেক কক্ষ।

একটা বড় ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল ওরা চারজন গংগারামকে নিয়ে। দরজায় দাঁড়িয়ে ওরা গংগারামকে ছুড়ে দিল ঘরের মাঝখানে।

আলোকজ্জ্বল ঘর।

ঘরের মেঝে পাথরের, দেয়ালও পাথরের। ছাদটা চুন-শুরকিরই হবে।

ঘরে মাত্র তিনটি চেয়ার। দুটি হাতাছাড়া কুশন চেয়ার, আর একটা হাতাওয়ালা বিরাট কুশন চেয়ার।

হাতলহীন দুচেয়ারের উপর বসে আছে মুষ্টিযোদ্ধার মত মেদহীন পেশীবহুল দুযুবক। তাদের সামনেই গিয়ে পড়ল গংগারামের দেহ।

সংগে সংগেই যুবক দুজনের একজন চিৎকার করে উঠল, 'ব্রাভো, ব্রহ্মশ্রী শালাকে নিয়ে এসেছিস!'

'জয়রাম স্যার। শয়তানকে বাড়িতেই পেয়েছি।'

'স্বামীজী এতক্ষণ পৌছার কথা!' বলল চেয়ারে বসা অন্যজন।

'এর চেয়ে সোজাসুজি 'রশ দ্বীপে' নিলেই বোধ হয় ভাল হতো।' বলল চেয়ারে বসা প্রথম জন।

'না দেবানন্দ, ওখানে তো এক শয়তানকে রাখা হয়েছে। সবাইকে ওখানে জড়ো করা ঠিক হবে না। বরং আমি মনে করি, শয়তানদের জন্যে এটাই আসল জায়গা। এখানে বৃটিশরা রক্তপান করেছে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের, আর আমরা রক্তের স্বাদ নেব শয়তান নেড়েদের।' চেয়ারের দ্বিতীয়জন বলল।

'ঠিক বলেছ নটবর, ইংরেজ বেনিয়াদের এই জল্লাদখানা হবে আমাদের শুদ্ধি অভিযানের জল্লাদখানা। কিন্তু সরকারের কি করবে? তাদের কারণে তো আমরা নিরাপদে অগ্রসর হতে পারছি না।' বলল দেবানন্দ নামের লোকটি।

নটবরের চোখ পড়েছে গংগারামের উপর। দেখল,গংগারাম গোগ্রাসে গিলছে তাদের কথা। নটবর গংগারামের মুখে জোরে এক লাথি বসিয়ে বলল, 'হারামজাদা কি শুনছিস। কোন লাভ হবে না। এটা যমালয়, এখান থেকে কেউ ফেরত যায় না।'

লাথিটা লেগেছিল গংগারামের ঠোঁটে। ঠোঁট ফেটে গল গল করে রক্ত বেরিয়ে এল।

গংগারাম কোন কথা বলল না। বলেও লাভ নেই জানে। মনে মনে শুধু প্রার্থনা করল, আহমদ মুসা যেন এদের হাতে ধরা না পড়ে। সে নিশ্চিত যে, আন্দামানে এ পর্যন্তকার সকল অপঘাত মৃত্যু বা খুনের জন্যে এরাই দায়ী।

একজন ছুটে এসে ঘরে প্রবেশ করল। মহাগুরু স্বামীজী আসছেন।

দুজন তড়াক করে উঠে দাঁড়াল।

মাথা উঁচিয়ে বুক টান করে ৬ ফুট লম্বা, ফর্সা কিন্তু অসুর চেহারার গৈরিক বসনপরা কপালে তিলকআঁকা একজন লোক লম্বা পদক্ষেপে ঘরে প্রবেশ করল। তার হাতে সাতফুট লম্বা লাঠি। আগাগোড়া পিতল বাঁধানো।

উঠে দাঁড়ানো দেবানন্দ ও নটবর জোড় করে আভূমি নত হয়ে কুর্নিশ করল লোকটিকে। লোকটি এসে বসল বড় আর্ম চেয়ারটায়।

এই লোকটিই গোপন 'শিবাজী ব্রিগেড' এর দ্বিতীয় শক্তিধর নেতা মহাগুরু স্বামী শংকরাচার্য শিরোমনি। 'শিবাজী ব্রিগেড' নামক গোপন দলটি গোটা উপমহাদেশে কাজ করার লক্ষ্যে তৈরি। তবে প্রথম কাজ শুরু করেছে তারা আন্দামান থেকে। আন্দামানের বিচ্ছিন্নতা, নির্জনতা তাদের জন্যে খুবই উপযোগী।

মহাগুরু স্বামীজী বসেই নটবর ও দেবানন্দকে লক্ষ্য করে বলল, 'সোমনাথ শম্ভুজী আসবেন না। তাকে বারণ করেছি আসতে। তাকেও দুই মা-বেটি ও সেই খুনি শয়তানের খোঁজে লাগতে বলেছি। পুলিশও সাহায্য করবে। যে কোন মূল্যে তাদের চাই। খুনিটা সম্পর্কে তোমরা কিছু জানতে পেরেছ? এ কিছু বলেছে?'

গংগারামকে দেখিয়ে শেষ প্রশ্নটা করে কথা শেষ করল মহাগুরু স্বামীজী।

'স্বামীজী, একে এইমাত্র আনা হলো। আমরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি। কোন জিজ্ঞাসাবাদ করিনি।' বলল দেবানন্দ মাথা ঝুঁকিয়ে।

'এইমাত্র মানে? নিচে এসেছে আধাঘণ্টা আগে, আর এখানে এসেছে পনের মিনিট আগে।' বলল মহাগুরু স্বামীজী।

দেবানন্দ ও নটবর দুজনেরই মুখ চুপসে গেল। তারা কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু মহাগুরু স্বামীজী ঘুরে দাঁড়িয়েছে গংগারামের দিকে। বলল, 'তোর নাম কি?' জল্লাদের নিরস ও ধারাল কণ্ঠস্বর।

'গংগারাম।' গংগারাম বলল।

চোখ দুটি জ্বলে উঠল স্বামীজীর। বলল, 'ব্যাটা ম্লেচ্ছ, যবন, আমাদের গংগা ও রাম দুপবিত্র নামকেই অপবিত্র করেছিস।'

বলে স্বামীজী তার হাতের লাঠির শেষ মাথাটা গায়ে চেপে ধরে বলল, 'হারামজাদা, আমরা সব জেনে ফেলেছি। তুই তোর মুখেই নামটা বল।'

লাঠির শেষ মাথাটা গংগারামের গায়ে চেপে ধরার সাথে লাঠির মাথার একটা অংশ স্প্রিং-এর মত সংকুচিত হয়েছিল আর তার ফলে বেরিয়ে এসেছিল একটা পিন। পিনটা গংগারামের দেহ স্পর্শ করার সাথে সাথে গংগারাম বুক ফাটা চিৎকার দিয়ে উঠেছিল।

পিনটি ছিল বিদ্যুততাড়িত। পিন গংগারামের দেহ স্পর্শ করার সাথে সাথে বিদ্যুত গিয়ে তাকে ছোবল হেনেছিল। অসহ্য যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গিয়েছিল গংগারাম। বিস্ফোরিত হয়ে উঠেছিল তার দুচোখ।

লাঠি সরিয়ে নিয়ে মহাগুরু স্বামীজী বলল, 'মিথ্যা বলার কি শাস্তি তা সামান্য টের পেলি। অতএব সব প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দিবি। বল এবার তোর নামটা।'

'গাজী গোলাম কাদের।' বলল গংগারাম।

'নাম পাল্টেছিলি কেন?'

'কাজ ও চাকুরী-বাকরীর সুবিধার জন্যে।'

'তুই মোপলা গোষ্ঠীর?'

'হ্যাঁ।'

'মোপলা যুবকরা মেন মরছে জানিস?'

'না।'

'তারা সব কাজে খুব সাহস দেখায়। তারা ভাবে, তাদের মত সাহসী ও শক্তিমান জাতি ভারতে নেই। সাহসী হওয়ার শাস্তি তারা পাচ্ছে। সুতরাং তুই সাহস দেখাবি না। এবার বল, গতকাল তুই আহমদ আলমগীরের বাড়ি গিয়েছিলি দুজন যাত্রী নিয়ে?'

'হ্যাঁ।'

'ঐ যাত্রী এবং আহমদ আলমগীরের মা-বোনকে গাড়িটা তুই পাঠিয়ে দিয়েছিলি, তাই না?'

‘না। আমার গাড়ি রেখে আমি নাস্তা করতে গেলে আমার গাড়ি হারিয়ে যায়। আমি থানায় মামলা করেছি।’

‘মিথ্যা কথা বলবি না। তুই তোর গাড়িতে ওদের পাঠিয়ে অন্য গাড়িতে করে হোটেল সাহারা পর্যন্ত ফিরেছিলি। আর ওরা তোর গাড়ি ধ্বংস হবার পর আমাদের যে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে আসে, সেই গাড়ি তুই হোটেল থেকে নিয়ে পোর্ট ব্লেয়ার বাসষ্ট্যান্ডে রেখে আসিস। তার অর্থ তুই ঐ যাত্রীকে চিনিস এবং আহমদ আলমগীরের মা-বোনকে এনে কোথায় রাখা হয়েছে তাও তুই জানিস।’ বলল চিৎকার করে মহাগুরু স্বামীজী।

ভয়ে চুপসে গেল গংগারাম। সে ভেবে পেল না এরা এত কথা এত তাড়াতাড়ি জানতে পারল কি করে! সে ভয়জড়িত কম্পিত কণ্ঠে বলল, ‘আমি ওদের জানি না। আমি ওদের ভাড়ায় নিয়ে গিয়েছিলাম। পরে গাড়ি ওদের ভাড়া দিয়েছিলাম। পরে ‘মামলা করলে আমি বাঁচতে পারব’-ওদের এই কথায় আমি মামলা করি। আমি ঐ সময় ওদের সাথে থাকাকালে ওদের নামও শুনিনি।’

মাহগুরু স্বামীজীর লাঠি আবার স্পর্শ করল গংগারামের দেহ। তড়াক করে লাফিয়ে উঠল দেহ, সেই সাথে গলা ফাটানো চিৎকার। দেহটা ধনুকের মত বেঁকে গিয়ে কুঁকড়ে গেল অসহ্য যন্ত্রণায়। যন্ত্রণাটা মূর্তিমান হয়ে উঠেছে তার বিকৃত হয়ে যাওয়া চোখে-মুখে।

লাঠি সরিয়ে নিল স্বামীজী।

যন্ত্রণার নাচন থেমে গেল গংগারামের দেহের। নেতিয়ে পড়ল তার দেহ। হাঁপাচ্ছে গংগারাম।

‘বল, ঐ যাত্রী দুজন কে? কোথায় রাখা হয়েছে আহমদ আলমগীরের মা-বোনকে।’ হুংকার দিয়ে বলল স্বামীজী গংগারামকে।

গংগারাম ভাবল, কথা না বললে এখনই নেমে আসবে আগের সেই নির্যাতন। কথা বলে তা হয়তো কিঞ্চিত ঠেকিয়ে রাখা যাবে। এই চিন্তা করেই সে ধীরে ধীরে বলল, ‘তাহলে আহমদ আলমগীরকে তোমরাই কি কিডন্যাপ করেছ কিংবা হত্যা করেছ?’

‘হত্যা করিনি, হত্যা করব। সে একটি সোনার হাঁস। তার ভেতরে সোনার ডিম আছে। সে ডিম পাওয়া হয়ে গেলেই তার দিন শেষ হয়ে যাবে।’

‘স্বামীজী, মানুষের ভেতর সোনার ডিম থাকে না।’

‘কিন্তু তার কাছে কোটি কোটি সোনার ডিমের চেয়েও মূল্যবান জিনিস রয়েছে। সেটা আমরা পেতে চাই। মারাঠী কন্যারা আমাদের কাছে স্বর্গের দেবী। সেই দেবীর উপর চোখ দেয়ার পরও আহমদ আলমগীর এখনও বেঁচে আছে ঐ সোনার ডিমের কারণেই।’

কথা শেষ করেই স্বামীজী তার লাঠি গংগারামের দিকে তাক করে বলল, ‘আমার জিজ্ঞাসার জবাব দাও গংগারাম।’ তার কণ্ঠে নিষ্ঠুর এক গর্জন।

ভীত কণ্ঠে গংগারাম বলল, ‘তারা এখন কোথায় জানি না। এ সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নেই স্যার।’

চোখ দুটি আবার জ্বলে উঠল স্বামীজীর। সে লাঠির বাঁট টেনে একটা লম্বা তরবারি বের করল। তরবারির শীর্ষ সুচাগ্রের মত তীক্ষè।

উঠে দাঁড়াল স্বামীজী।

একটানে ছিঁড়ে ফেলল গংগারামের জামা। তারপর তরবারির আগা গংগারামের বুকে ঠেকিয়ে বলল, ‘তরবারির মাথা তোর বুকে কিছু কাজ করবে। নড়া-চড়া করলে কিন্তু বুকে ঢুকে যাবে বেমালুম।’

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই তরবারির আগা কাজ শুরু করে দিয়েছে। তার সাথে আর্তনাদ করতে শুরু করেছে গংগারামের কণ্ঠ। নড়ে-চড়ে ব্যথা লাঘব করার তার কোন উপায় নেই। সত্যি দেহটা একটু উপরে উঠলে, বুকটা এদিক-ওদিক নড়লেই তরবারির তীক্ষè ফলা ঢুকে যাবে বুকে। জোরে শ্বাস নিতেও ভয় করছে গংগারামের। জোরে আর্তনাদ করতে গিয়ে কয়েকবার ঘা খেয়েছে তরবারির তীক্ষè ফলার।

আর চিৎকার করছে না গংগারাম। সে দাঁতে দাঁত চেপে চোখ বন্ধ করে শুধুই আল্লাহকে ডাকছে।

বেদনায় বুক ফেটে যাচ্ছে তার।

লাঙ্গল যেমন জমির বুক চিরে এগিয়ে যায়, তরবারির ফলা তেমনি গঙ্গারামের বুকের চামড়া চিরে সামনে অগ্রসর হচ্ছে অবিরাম গতিতে।

অসহ্য বেদনায় গংগারামের একেকবার মনে হচ্ছে তরবারিটাকে বুকের ভেতরে টেনে নিয়ে সব যন্ত্রণার ইতি ঘটায়। কিন্তু একদিকে আল্লাহর ভয়, অন্যদিকে আহমদ মুসার চেহারা চোখের সামনে ভেসে উঠে বাঁচার প্রেরণা যোগাচ্ছে।

রক্তে বুক ভেসে যাচ্ছে গংগারামের।

মহাগুরু স্বামীজী মহাউল্লাসে বলল, 'গাজী মিঞা, পরাজিত হয়ে যমালয়ে গেলেও একটা উপকার তোমার হবে। তোমার বুকে শিবের যে ত্রিশুল উৎকীর্ণ করে দিচ্ছি, তা তোমাকে অনেকখানি রক্ষা করবে।'

গংগারামের বুকের উপর তখনও চলছে স্বামীজীর তরবারির অগ্রভাগ লাঙ্গলের মত।

অসহ্য যন্ত্রণায় সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছে গংগারাম।

ত্রিশুল আঁকা বন্ধ করে গংগারামের সংজ্ঞাহীন দেহে একটা লাথি মেরে বলল, 'দেবানন্দ, এর সংজ্ঞা ফিরিয়ে আন। হারামজাদা সবই জানে, কথা আদায় করতেই হবে তার কাছ থেকে।'

দেবানন্দ এক গ্লাস ঠা-া পানি নিয়ে ছুটে এল। আর নটবর গংগারামের পায়ের কাছে বসে কলমের বল পয়েন্ট-এর অগ্রভাগ দিয়ে পায়ে খোঁচা দিতে লাগল।

'সামান্য এক ড্রাইভারের বুক দেখি হাতির চেয়েও শক্ত। কথা বলানো গেল না।' বলল স্বামীজী।

'তাহলে কি গংগারামের কথাই সত্য যে, সে দুজন যাত্রীকে লিফট দিয়েছিল এবং গাড়ি দিয়েছিল মাত্র, সে তাদেরকে চেনে না?' বলল নটবর।

'কখনও না। অবশ্যই চেনে। গংগারাম শুধু গাড়িই ঐ যাত্রীদের দিয়েছিল তা নয়। এই কিছুক্ষণ আগে পুলিশ সূত্রে জেনেছি, গংগারামের ক্যাবে করে একজন যাত্রী আহমদ আলমগীরের মা-বোনকে নিয়ে পোর্ট ব্লেয়ারে আসছিল। অন্যদিকে গংগারাম একটা পিকআপে করে আহমদ আলমগীরের মা-বোনদের

লাগেজ নিয়ে হোটেল সাহারায় পৌছে দেয়। একথা পিকআপটির ড্রাইভার পুলিশকে জানিয়েছে। পিকআপটির ভাড়া গংগারামই পরিশোধ করে। সুতরাং গংগারাম কোন কথাই সত্য বলছে না। সে সবই জানে।'

তিন চার মিনিটের মধ্যেই চোখ খুলল গংগারাম।

মহাগুরু স্বামীজী তার লাঠির আগা দিয়ে একটা জোরে খোঁচা দিল গংগারামকে।

বিদ্যুত একটা প্রচ- ছোবল দিল গংগারামের দেহে। লাফিয়ে উঠল গংগারামের দেহ। চিৎকার বেরিয়ে এল গংগারামের মুখ থেকে।

খোঁচা দিয়েই লাঠি সরিয়ে নিয়েছে স্বামীজী।

মুহূর্ত পরেই গংগারামের দেহ আবার স্থির হয়ে গেল।

ক্লান্তিতে হাঁপাচ্ছে গংগারাম।

হেসে উঠল স্বামীজী। বলল, 'তোমাদের কোরানে একটা কথা আছে যে, দোজখীদের উপর শাস্তি এমন ভয়ংকর হবে যে, তাদের বাঁচার কোন অবস্থা থাকবে না, আবার তাদের মরতেও দেয়া হবে না।' মনে কর গংগারাম, এটাও এক দোজখখানা। তুমি যতক্ষণ মুখ না খুলছ, সব না বলছ, ততক্ষণ ঐ দোজখীদের মতই তোমার হাল করা হবে।'

বলে স্বামীজী তাকাল দেবানন্দের দিকে। বলল, 'ত্রিশুলটা পরে আকব। রক্ত শুকিয়ে নিক। যাও আগুন থেকে একটা শিক নিয়ে এসো। বিদ্যুত-চর্চা কিছু সময় হয়েছে। এবার ওর দেহের উপর কিছুক্ষণ আগুন চর্চা করে নেই।'

ছুটল দেবানন্দ। আধা মিনিটের মধ্যেই জ্বলন্ত একটা লোহার শিক নিয়ে এল। শিকের মাথাটায় গনগনে লাল আগুন।

স্বামীজী শিকটাকে গংগারামের দিকে তাক করে এগুলো তার দিকে। গংগারাম চিৎকার করে চোখ বন্ধ করল।

আন্দামানের গভর্নল বালাজী বাজী রাও মাধব এর সরকারী বাসভবনের প্রাইভেট উইং-এর ড্রইংরুম।

আহমদ মুসা দেখা করতে এসেছে সুষমা রাও এর সাথে।

একজন পুলিশ তাকে এ ড্রইংরুমে পৌছে দিয়ে গেছে।

আহমদ মুসার অনুরোধে সুষমা রাও-এর সাথে তার এই সাক্ষাতকারের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন পোর্ট ব্লেয়ারের 'ব্লেয়ার মেমোরিয়াল হাইস্কুল এন্ড কলেজ' এর প্রধান বলি গংগাধর তিলক। আন্দামানে আসার পথে জাহাজে আহমদ মুসার সাথে তার পরিচয় হয়েছিল। সেই পরিচয়ের সূত্রে আহমদ মুসাকে সে এই সাহায্য করেছে।

সুষমা রাও পোর্ট ব্লেয়ার কলেজ থেকে ডিগ্রী পাশ করেছে। তাছাড়া সে হায়দরাবাদে ভর্তির আগে বলি গংগাধর তিলক তাকে কোচিং দিয়েছে। সুষমা রাওকে বলি গংগাধর তিলক বলেছিল বেভান বার্গম্যান নামে একজনকে আমার পক্ষ থেকে তোমার কাছে পাঠাতে চাই একটা বিষয়ে আলোচনার জন্যে। সুষমা ওয়েলকাম করেছিল তার স্যারের এই অনুরোধকে।

ভেতরের দরজা সামনে রেখে উত্তরমূখী একটা সোফায় বসে অপেক্ষা করছিল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার অপেক্ষার ইতি ঘটিয়ে দরজা দিয়ে প্রবেশ করল সুষমা রাও। প্রতিভাদীপ্ত এক সুন্দর তরুণী। হলুদ বরণ কন্যার গায়ে হলুদাভ সাদা সালোয়ার ও ফুলহাতা কামিজ। গলার দুপাশ দিয়ে সামনে একই রংয়ের ওড়না ঝুলানো। শালীন পোশাক। খুশি হলো আহমদ মুসা।

ঘরে ঢুকেই মেয়েটি হাসল। স্বচ্ছ হাসি। কিন্তু হাসির মধ্যেও কোথাও যেন এক টুকরো বেদনা জড়ানো। মুখ ভরা অপরূপ লাবণ্যের অন্তরালে বিষণ্নতার একটা মেঘও যেন লুকিয়ে আছে।

'আমি সুষমা রাও। স্যরি স্যার। আমার একটু দেরি হয়ে গেছে আসতে। আমি দুঃখিত।' ঘরে ঢুকেই মেয়েটি বলল। দুহাত জোড় করে উপরে তুলে 'নমষ্কার' করল এবং তার সাথে বলল এ কথাগুলো।

বাঁ দিকে সোফায় আহমদ মুসার মুখোমুখি সে বসল।

সাথে সাথেই প্রায় নাস্তা প্রবেশ করল।

মেয়েটি নিজ হাতে আহমদ মুসাকে নাস্তা ও চা এগিয়ে দিল।

মেয়েটিও নাস্তা নিল। খেতে খেতে বলল, 'স্যার নিশ্চয় আমাদের প্রিন্সিপাল স্যারের কলিগ। কতদিন আপনি এখানে? আপনাকে দেখে কিন্তু মনে হয় একজন সৈনিক, শিক্ষক নয়।'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'সৈনিক! শিক্ষক নয় কেন?'

'আমার মতে শিক্ষকরা প্রতিদিনই শিক্ষাদানের দায়িত্ব পালন করে। তার ফলে তাদের মনে 'মিশন অ্যাকমপ্লিশড (mission accomplished) মানে 'লক্ষ্যে পৌছে গেছি' ধরনের তৃপ্তির প্রতিচ্ছবি সাধারণ ভাবে তাদের মধ্যে প্রকাশ পায়। কিন্তু একজন সৈনিক সব সময় মনে করে তার কাজ সামনে। দেশের জন্যে, জাতির জন্যে দায়িত্ব পালনের তার মহাসন্ধিক্ষণটি এখনও আসেনি। সুতরাং একজন সত্যিকার সৈনিকের মধ্যে একটা ভিশনকে সব সময় জীবন্ত দেখা যায়।' বলল সুষমা রাও।

'আপনি তো সাইকোলজির ছাত্রী নন, আর্টের ছাত্রী। কিন্তু কথা বলছেন সাইকোলজির ছাত্রীর মত।' আহমদ মুসা বলল।

'আপনি যে শিক্ষক নন তার আর একটা প্রমাণ আমাকে 'আপনি' সম্বোধন করেছেন। প্লিজ আমাকে 'তুমি' বলুন।'

'কেন শিক্ষকরা 'আপনি' বলে না?'

'বলেন স্যার। কিন্তু ছাত্রী না হলেও ছাত্রী পর্যায়ের সবাইকেই তারা সাধারণভাবে 'তুমি' বলে থাকে। যেমন আমি ব্লেয়ার কলেজ এর ছাত্রী। ঐ স্কুল কলেজের কোন শিক্ষকই আমাকে 'আপনি' বলবেন না।' বলল সুষমা রাও।

একটু থেমে পরক্ষণেই আবার বলে উঠল, 'স্যার, আপনার কথা এখনও বলেননি। আমার প্রশ্নের জবাব দেননি।'

নাস্তা হয়ে গিয়েছিল।

সুষমা রাও চা তৈরি করে আহমদ মুসার হাতে তুলে দিল।

বেয়ারা নাস্তার ট্রে সরিয়ে নিয়ে গেল।

আহমদ মুসার চায়ের কাপটি টি-টেবিলে রেখে সোজা হয়ে বসল। গাম্ভীর্য নেমে এসেছে তার মুখে। বলল আহমদ মুসা, 'ধন্য সুষমা, 'তুমি' সম্বোধনের অনুমতি দিয়ে শিক্ষকের মত ঘনিষ্ঠ হবর সুযোগ দেয়ার জন্যে। আসলে আমি ব্লেয়ার স্কুল কিংবা কলেজের শিক্ষক নই। সম্মানিত অধ্যক্ষ গংগাধর তিলকের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাত হয় তিন চারদিন আগে মাদ্রাজ থেকে আন্দামান আসার পথে জাহাজে। তিনি আমার অনুরোধে তোমার সাথে এই সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আমি দুঃখিত, এই কৌশলের আশ্রয় না নিয়ে উপায় ছিল না।'

থামল আহমদ মুসা।

ভ্রুকুঞ্চিত হয়ে উঠেছে সুষমার। তার চোখে বিস্ময় ও কৌতুহল দুইই। তার পরিপূর্ণ দৃষ্টি আহমদ মুসার মুখের উপর। বলল সে ধীরে ধীরে, 'আমি বিস্মিত হয়েছি বটে, কিন্তু আপনার দুঃখিত হবার মত অন্যায় কিছু ঘটেনি বলে আমি মনে করি। প্রিন্সিপাল স্যর কোন কল্যাণ কামনা ছাড়া এই কৌশলের আশ্রয় নেননি। আর আমার বড় ভাই নেই, থাকলে তাঁর দৃষ্টি আমার মনে হয় আপনার মতই হতো।'

'ধন্যবাদ সুষমা, অনেক বড় আসন আমাকে দিয়েছ। ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করুন।' আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসা একটু থামল। গাম্ভীর্য আর একটু গাঢ় হলো তার চোখে-মুখে। কথা বলে উঠল আবার, 'আমি আসলে বেভান বার্গম্যান নই। আমি আহমদ শাহ আলমগীরের শুভাকাক্সক্ষী। তাঁর খোজ নেবার জন্যেই আমি এসেছি আমেরিকা থেকে। আমি আহমদ মুসা।'

আহমদ মুসার কথা শেষ হবার সাথে সাথেই সুষমা রাও যন্ত্রচালিতের মত উঠে দাঁড়াল। তার চোখে-মুখে সীমাহীন বিস্ময়, তার সাথে আনন্দও।

পরক্ষণেই যে যন্ত্রচালিতের মত ধীরে ধীরে বসে পড়ল। চোখ বন্ধ করল। কয়েক মুহূর্তের জন্যে। তারপর চোখ খুলে বলল, 'দেখুন, আমার সবই স্বপ্ন মনে হচ্ছে। আহমদ শাহ আলমগীরের শুভাকাক্সক্ষী কেউ আমার এখানে আসবেন,

কিন্তু তিনি আহমদ মুসা হবেন কি করে? আমি যে আমার চোখ-কানকে বিশ্বাস করতে পারছি না!'

'তুমি কি আহমদ মুসাকে জান?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'খবরের কাগজে কিছু পড়েছি। আর মাঝে মাঝে আহমদ শাহ আলমগীরের কাছে গল্প শুনেছি। তার কাছে আহমদ মুসা বিশ্ব থিয়েটারের মহানায়ক। আর আমি মনে করে বসে আছি তিনি রবিনহুড ও জেমসবন্ডের এক সমন্বয়।' বলল সুষমা রাও।

'কল্পনা কল্পনাই। এস বাস্তবে আসি। অনেক কথা আছে।'

'কিন্তু তার আগে বলুন, আমেরিকা থেকে আহমদ শাহ আলমগীরের কথা জানলেন কি করে? আর তার শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে আমার কাছে কেন?'

'একটা আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা গোটা বিষয় আমাকে ই-মেইল করে জানিয়েছে। তার মধ্যে তোমার কথাও ছিল।'

'আমার কথাও ছিল? কি ছিল?'

'আহমদ শাহ আলমগীরের নিখোঁজ হওয়ার সাথে গভর্নর বালাজী বাজী রাও মাধবের মেয়ে সুষমার সাথে তার সম্পর্কও একটা কারণ হতে পারে।'

মলিন হয়ে গেল সুষমা রাও এর মুখ। দুহাতে মুখ ঢেকে হাঁটুতে মুখ গুঁজল সে।

'স্যরি সুষমা।'

সুষমা মুখ তুলল। অশ্রুতে ধুয়ে গেছে তার দুগ-।

'স্যরি ভাইয়া। ঠিকই বলেছে ওরা, কিন্তু সরকার মানে আমার বাবা এর সাথে জড়িত আছে বলে আমার মনে হয় না। আমি বাবার সাথে এ ব্যাপারে কথা বলেছি।'

'আমারও তাই মনে হয় সুষমা। আন্দামানে গত অল্প কিছুদিনের মধ্যে প্রায় তিন ডজন মানুষের রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। মৃত প্রায় সবাই মোপালা মুসলিম যুবক। আমার মনে হয় যারা এই মৃত্যুর জন্যে দায়ী তারাই আহমদ শাহ আলমগীরের নিখোঁজ হওয়ার সাথে জড়িত থাকতে পারে।'

মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল সুষমার। বলল, ‘আমার আব্বাও মনে করেন বিপজ্জনক বড় একটা চক্র এই ঘটনার সাথে জড়িত থাকতে পারে।’

‘কারা এই চক্র?’ অনেকটা স্বগতোক্তির মত এই কথা বলে আহমদ মুসা গত তিন দিনের সব ঘটনা একে একে সুষমাকে বলল।

ভয়-আতংকে চুপসে গেছে সুষমা রাওয়ের মুখ। আর্তকণ্ঠে বলল, ‘আহমদ শাহ আলমগীরের পরিবারের উপরও আজ এত বিপদ! তাই তো কাল বিকেল থেকে টেলিফোনে পাচ্ছি না।’

একটু থামল সুষমা রুদ্ধ হয়ে আসা কণ্ঠ সামলে নেবার জন্যে। বলে উঠল সে আবার, ‘আপনি আন্দামানে পা দেবার আগে থেকেই ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে এবং তিন দিনে এতসব সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে আপনাকে কেন্দ্র করে? তার মানে সেই চক্র আপনার সন্ধান পেয়েছে। এবং এর অর্থ আপনিও তাদের সন্ধান পেয়েছেন। অথচ এ পর্যন্ত এক ইঞ্চিও এগুতে পারেননি।’ বিস্ময়, আনন্দ ও কান্নার সমন্বয়ে কথাগুলো বলল সুষমা রাও।

‘ওরা আমাকে চিনতে পেরেছে বলে মনে হয় না। তবে আমাকে টার্গেট করেছে আমি ওদের মুখোমুখি হয়েছি, কিন্তু ওদের কোন পরিচয় সন্ধান এখনো পাইনি। ওদের কাউকেই আমি জীবিত হাতে পাইনি। তাই আমি সামনে এগুতে পারছি না।’

আহমদ মুসার কথা শেষ হবার আগেই তার মোবাইল বেজে উঠল। মোবাইল তুলে নিল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা ‘হ্যালো’ বলতেই ওপার থেকে হোটেল সাহারার মালিক হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহর কণ্ঠ শুনতে পেল। বলল ওপার থেকে, ‘বেভান, গংগারাম কিডন্যাপ হয়েছে।’

চমকে উঠল আহমদ মুসা। দ্রুত কণ্ঠে বলল, ‘কখন কোত্থেকে কিডন্যাপ হয়েছে?’

‘গত রাতে। বাসা থেকে। শোন, তুমি সুষমার সাক্ষাত পেয়েছ?’

‘পেয়েছি। তার সাথে কথা বলছি।’

‘ঠিক আছে কথা শেষ করে তাড়াতাড়ি এস। পরিস্থিতি মনে হয় জটিল হয়ে উঠছে। শোন, তোমার সব কথাই আমি গংগারামের মাধ্যমে জানি।’

‘ঠিক আছে জনাব। আমি সব বুঝেছি। আমি এমনটাই অনুমান করেছিলাম। এত দুঃসংবাদের মধ্যেও এদিকটা আমার কাছে আনন্দের যে, আমি একজন অভিভাবক পেলাম।’

‘উল্টো কথা বলো না যুবক। তোমাকে তো আমাদের সবার অভিভাবক করেই আল্লাহ আন্দামানে পাঠিয়েছেন। ছেলের মত তাই ‘তুমি’ বলেছি তোমাকে। আমাকে মাফ করো। আর কথা নয়। তুমি তাড়াতাড়ি এস।’

‘জি জনাব।’ বলে আহমদ মুসা কল অফ করে দিল।

এক রাজ্যের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকিয়ে ছিল সুষমা আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা কথা শেষ করতেই সুষমা বলে উঠল, ‘কে কিডন্যাপ হয়েছে ভাইয়া?’

‘গংগারাম নামের একজন ক্যাব ড্রাইভার। আন্দামানে সেই ছিল আমার গাইড, সাথী, সাহায্যকারী সব। তার আসল নাম গাজী গোলাম কাদের। সেও একজন মোপালা যুবক। মনে হয় আমার সন্ধান পাবার জন্যেই তাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। এর অর্থ সে ভয়ংকর এক বিপদের মধ্যে পড়েছে।’ আহমদ মুসার কণ্ঠে বেদনার ছাপ।

‘কারা এই শয়তান? কেন তারা এসব করছে? আমিই কি এর জন্যে দায়ী? আলমগীরকে ভালবাসা যদি আমার অপরাধ হয়, তাহলে এজন্যে মাত্র আমিই অপরাধী। আমাকে শাস্তি তারা দিতে পারে। আলমগীর কিংবা সবাইকে এর সাথে জড়ানো হচ্ছে কেন?’ অশ্রুরুদ্ধ কন্ঠে বলল সুষমা।

‘না সুষমা, তুমি এসব ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু নও। আহমদ শাহ আলমগীর কিডন্যঅপ হওয়ার অনেক আগে ঘটনার সূত্রপাত ঘটেছে। আলমগীর যখন কিডন্যাপ হয়, তার আগেই আড়াই ডজন মানুষের রহস্যজনক মৃত্যু ঘটেছে। সুতরাং তোমার বিষয়টা এখানে গৌণ।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তাহলে মুখ্য এখানে কোন বিষয়টা। আসলে কারা ওরা?’

'সেটাই এখনকার প্রশ্ন সুষমা। এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার ক্ষেত্রে তুমি কোন সহযোগিতা করতে পার কিনা, এ জন্যেই আমি তোমার কাছে এসেছি।'

সংগে সংগে কোন উত্তর দিল না সুষমা রাও। ভাবছিল সে।

আহমদ মুসাই আবার কথা বলল। সে বলল, 'আহমদ আলমগীর সম্পর্কে তোমাকে কোন দিন কিছু বলেছে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে থেকে অথবা অন্য কেউ?'

'সেটাই ভাবছি। আমার ও আহমদ আলমগীরের ব্যাপারটা ঠিক কেউ জানতো না। সুতরাং কেউ কিছু বলার কথা নয়। একটা ঘটনার কথাই মনে পড়ে। তিন চার মাস আগের ঘটনা। প্লেনে আসছিলাম হায়দরাবাদ থেকে আন্দামানে। আমি ও আলমগীর পাশা-পাশি বসেছিলাম। পোর্ট ব্লেয়ার পৌছার পর লাগেজ কর্নারে আমি অপেক্ষা করছিলাম। আলমগীর তার লাগেজ নিয়ে এগুচ্ছিল চেকিং কাউন্টারের দিকে।

একজন লোক আমার পাশে এসে দাঁড়াল। মাঝ বয়সী। বলল, 'মা, আমি সোমনাথ শম্ভুজী, মারাঠী। তোমাদের পরিবার ও আমাদের পরিবার একই এলাকার। তোমাদের 'পেশোয়া' পরিবার আমাদের সকলের গৌরবের বস্তু। সেই জন্যেই একটা কথা বলছি, আলমগীর ছেলেটির সাথে মেশা তোমার উচিত নয়। একদিকে সে শত্রু ধর্মের, অন্যদিকে সে শত্রু পরিবারের। সে সাপের বাচ্চা সাপই হবে। বলেই সে পিঠ চাপড়ে চলে যায়। আমি.............।'

সুষমা রাওকে বাধা দিয়ে আহমদ মুসা বলল, 'কি নাম বললে? সোমনাথ শম্ভুজী?'

'হ্যাঁ। কেন এই নামের কাউকে চেনেন?'

'চিনি না। তবে এই নামের একজন লোক আমাদের হোটেলে থাকে। আমার কক্ষের দরজায় সে একদিন এসেছিল। একথা আমাকে গংগারাম বলেছে।'

'আপনার কক্ষের দরজায়? কেন?'

'জানি না। বিষয়টাকে আমি তখন গুরুত্ব দেইনি।'

'শুনুন। যেহেতু সোমনাথ শম্ভুজী বলেছিল সে আমাদের এলাকার লোক, আমাদের পরিবারকে ভালবাসে, তাই আব্বাকে তার ব্যাপারে আমি জিজ্ঞাসা

করেছিলাম। তিনি সোমনাথ শম্ভুজীকে চেনেন। আব্বা বলেছেন, শম্ভুজী একটা চরমপন্থী সংগঠনের সদস্য। ওদের উদ্দেশ্য সফল হলে ভারতে শুধু গণতন্ত্র নয়, সত্যিকার মানুষ ও মানবতাও থাকবে না। যেমন............।'

'থাক সুষমা, আর প্রয়োজন নেই। আমার বুঝা যদি ভুল না হয়ে থাকে তাহলে এই সোমনাথ শম্ভূজীরাই আলমগীরের কিডন্যাপ এবং সব হত্যাকা-ের পেছনে রয়েছে।' সুষমা রাওকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল আহমদ মুসা।

বিস্ময় ফুটে উঠল সুষমা রাওয়ের চোখে-মুখে। বলল, 'তিনি কোন চরমপন্থী দলের সদস্য বলেই কি এ কথা বলছেন?'

'এর সাথে আমার দরজায় আড়ি পাতার ব্যাপারটাকে যোগ কর।'

'বুঝতে পারছি না আপনার ওখানে আড়ি পাতবে কেন? আপনি তো বেভান বার্গম্যান, একজন আমেরিকান।'

'কিন্তু আমার চেহারা তো আমেরিকান নয়। সেজন্যে সন্দেহ সে করতেই পারে। তাছাড়া হতে পারে সে হোটেলের প্রত্যেক নতুন বাসিন্দা সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে নিশ্চিত হয়ে থাকে। যেটাই হোক, এ থেকে প্রমাণ হয় এরা একটা মিশন নিয়ে কাজ করছে। একটা চরমপন্থী সংগঠনের মিশন কি হতে পারে, তা তোমার আব্বাই কিছুটা বলে দিয়েছেন যে' ওরা সফল হলে ভারতে শুধু গণতন্ত্র নয়, সত্যিকার মানুষ ও মানবতাও থাকবে না। সোমনাথ শম্ভুজীরা আন্দামানে গণতন্ত্র, সত্যিকার মানুষ ও মানবতা নিধনেরই কাজ করছে।'

সুষমা রাও বিস্ময় বিমুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'ধন্যবাদ ভাইয়া, আপনি ঠিক ধরেছেন। কিন্তু ভাইয়া, এই রক্ত পিয়াসুরাই যদি আহমদ আলমগীরকে..........।'

কথা শেষ করতে পারলো না সুষমা। কান্নায় আটকে গেল তার কথা।

মুখে হাত চাপা দিয়ে মুখ নিচু করল সে।

আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি বলল, 'ধৈর্য্য ধর সুষমা। আমি নিশ্চিত যে, আহমদ আলমগীর বেঁচে আছে।'

মুখ তুলল সুষমা। অশ্রু ধোয়া মুখ। চোখ দুটিও পানিতে ভরা। তার ঠোঁট দুটি কাঁপছে। কথা বলার চেষ্টা করেও পারল না। কান্না এসে কথাকে তলিয়ে দিল। আবার মুখ নিচু করল সে।

‘আমি ঠিক বলছি সুষমা, আহমদ আলমগীর বেঁচে আছে। তার বোন ও মাকে তারা কিডন্যাপের চেষ্টা করছে এটাই তার বেঁচে থাকার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।’ শান্ত ও দৃঢ় কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

সুষমা রাও মুখ তুলল। মুখ মুছে বলল, ‘ঈশ্বর আপনার কথা সত্য করুন ভাইয়া। কিন্তু ওঁর মা-বোনকে কিডন্যাপ করার সাথে ওঁর বেঁচে থাকার কি সম্পর্ক?’

‘আমার মনে হচ্ছে আহমদ আলমগীরের মা-বোনকে তারা আহমদ আলমগীরের কাছে নিতে চায়। কেন নিতে চায় এর উত্তর একাধিক হতে পারে। আর একটি কথা হলো তারা আহমদ আলমগীরের কাছ থেকে এমন কিছু আদায় করতে চায় যা তারা পাচ্ছে না। তার উপর বাড়তি চাপ সৃষ্টির জন্যে তারা এখন আহমদ আলমগীরের মা-বোনকে হাতের মুঠোয় নিতে চাচ্ছে।’

নতুন উৎকণ্ঠা-উদ্বেগ সুষমার চোখে-মুখে। সে বলল, ‘কি পেতে চায় ওঁর কাছে। আমার কাছ থেকে সরে যাবার ওয়াদা?’

‘আমার তা মনে হয় না সুষমা। কারণ এমন ওয়াদার কোন মূল্য নেই। সুতরাং এমন অকার্যকর বিষয়ের জন্যে তারা এতবড় আয়োজন করতে পারে না।’

‘তাহলে?’ বলল সুষমা। তার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আরও গভীর হয়েছে।

‘এটাই এখনকার সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। আচ্ছা সুষমা, আহমদ শাহ আলমগীর গোপন বা প্রকাশ্য কোন দল বা সংগঠনের সাথে জড়িত ছিল?’

‘না, সে কোন কিছুর সাথেই জড়িত ছিল না। যাকে বলে বই পোকা সে সে ধরনেরই। তবে আহমদ শাহ আলমগীর সব ধরনের খেলা-ধুলা ও সমাজ-সেবার মত অনেক কিছুতে জড়িত ছিল। এ সবই করতো সে ব্যক্তি হিসাবে, কোন সংগঠনের সদস্য হিসাবে নয়। এমন কি কোন স্পোর্টস সংগঠনেরও সদস্য ছিল না।’ বলল সুষমা রাও।

'তোমার অজান্তে কোন গোপন সংগঠনের সাথে তার জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে তোমার মত কি?'

একটু ভাবল সুষমা রাও। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'আমরা দুজন দুজনের কাছে স্বচ্ছ আয়নার মত। দুজনের কাছে দুজনের কোন কিছুই গোপন নেই। এই অবস্থায় সে কোন কিছুর গোপন সদস্য থাকবে, এটা একেবারেই অসম্ভব।'

'ধন্যবাদ সুষমা, আর পারিবারিক গোপন কিছু সম্পর্কে তোমার কি জানা আছে?'

আবার ভাবনায় ডুব দিল সুষমা রাও। কিছুক্ষণ স্মৃতি হাতড়ে ফেরার পর সে বলল, 'তেমন কিছু আমার মনে পড়ছে না। তবে শিবাজী ডাইনেষ্টি সম্পর্কে তার একটা কথা আমার মনে আছে। একদিন ভারতের ইতিহাস নিয়ে আলোচনার সময় সে বলেছিল, 'জান, তোমাদের শিবাজী প্রণীত তার ও পেশোয়া ডাইনেষ্টির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও গোপন দলিল তোমাদের হাতে নেই, সেটা আছে মোগল ডাইনেষ্টির হাতে।' আমাদের এই ডাইনেষ্টি সংক্রান্ত কোন ব্যাপারেই আমার কোন আগ্রহ নেই। তাই বিষয়টা আমি এড়িয়ে গেছি। কিছু জিজ্ঞাসা করিনি তাঁকে এ ব্যাপারে।'

ভ্রু-কুঞ্চিত হয়েছে আহমদ মুসার। প্রবল একটা চিন্তার সয়লাব এসে তাকে আচ্ছন্ন করল। আহমদ আলমগীর শিবাজী-পেশোয়া ডাইনেষ্টির যে গোপন দলিলের কথা বলেছে সেটা কি? সে দলিলটা কি আহমদ শাহ আলমগীরের হাতে আছে? অন্যেরাও কি সেটা জানে? সুষমা কথা শেষ করতেই আহমদ মুসা বলল, 'তুমি কি এই দলিল বিষয়ে কারো সাথে কখনও আলাপ করেছ সুষমা?'

'না ভাইয়া, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। আপনি জিজ্ঞাসা করায় ভাবতে গিয়ে মনে পড়ে গেছে। আজ আপনাকেই প্রথম বললাম।'

কথা শেষ করে একটু থেমেই সুষমা আবার বলে উঠল, 'আপনি এ দলিল নিয়ে কিছু ভাবছেন ভাইয়া? এর এখন কি গুরুত্ব আছে?'

'সে গোপন দলিল কি আমরা জানি না। তবে শিবাজী প্রণীত তার ডাইনেষ্টির দলিল শত রাজভা-রের চেয়ে মূল্যবান হতে পারে। আর ওরা যদি

জেনে থাকে সে দলিলের সন্ধান আলমগীর জানে, তাহলে সে তথ্য বের করার জন্যে তারা সবকিছুই করতে পারে।'

'কিন্তু ওরা তা জানবে কি করে? আর ঐ দলিল আহমদ আলমগীরের কাছে থাকবে কেন?' ভয় ও উদ্বেগ জড়িত কম্পিত কণ্ঠে বলল সুষমা রাও।

'এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের কাছে বড় নয় সুষমা, আর উত্তর আমাদের জানারও উপায় নেই। আমাদের ভাববার বিষয় হলো, দলিলের বিষয়টাও আহমদ আলমগীরের কিডন্যাপ হওয়ার একটা কারণ হতে পারে। যদি তাই হয়, তাহলে খুব বড় ঘটনা হবে এটা। কারণ গোটা ভারতের গোটা চরমপন্থী সেন্টিমেন্টকে আমরা এর সাথে জড়িত দেখতে পাব।'

মুখ শুকিয়ে চুপসে গেল সুষমা রাওয়ের। কোন কথা সে বলতে পারল না।

আহমদ মুসাই আবার কথা বলে উঠল, 'সুষমা, আমাকে এখন উঠতে হবে। আমাকে তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরতে বলা হয়েছে। মনে হচ্ছে, ওরা মরিয়া হয়ে উঠেছে। গংগারামকে কিডন্যাপ করার অর্থ হলো, ওরা আহমদ আলমগীরের মা-বোনকে হাতে পাওয়ার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে।'

সুষমা তার আসন থেকে উঠে দাঁড়াল। ছুটে এসে বসল আহমদ মুসার পায়ের কাছে কার্পেটের উপর। আহমদ মুসার দিকে মুখ তুলে সজল কণ্ঠে বলল, 'ভাইয়া, আল্লাহ এবং আপনি ছাড়া আহমদ আলমগীরে সাহায্যকারী আর কেউ নেই। আমার ভয়, পুলিশও তাকে পেলে মেরে ফেলবে। আব্বা মুখে কিছু না বললেও তিনি এভাবেই সমস্যার সমাধান করতে চাচ্ছেন। সুতরাং আপনি পুলিশ ও প্রশাসন কারও সাহায্য পাবেন না।'

বলে একটা ঢোক গিলল সুষমা রাও। তারপর বলল, 'ভাইয়া, আমি কি আপনার কোন কাজে লাগতে পারি? আর কিছু না পারলেও ওর জন্যে জীবনটা আমি দিতে পারব।'

কান্নার দুরন্ত বেগ চাপতে চাপতে বলল সুষমা রাও।

আহমদ মুসা তার মাথায় হাত দিয়ে সান্তনার সুরে বলল, 'আল্লাহর উপর ভরসা রাখ। আর তুমি দোয়া করলেই চলবে সুষমা।'

‘ভাইয়অ, আমি শাহ বানু ও আলমগীরের মা সাহারা বানুকে এনে রাখতে পারি না?’

আহমদ মুসার মুখ উজ্জল হয়ে উঠল, ‘কোথায় রাখবে তুমি?’

‘আমাদের ফ্যামিলী উইং-এ আমার গেষ্টরুমে থাকবে। আব্বা জানতে পারবেন না। মা কিছু বলবেন না। গ্রাম থেকে আসা আত্মীয় হিসাবে থাকবেন।’

‘তোমার প্রস্তাবের জন্যে ধন্যবাদ। প্রয়োজন হলে ওদের তোমার কাছে পাঠাব, কথা দিচ্ছি সুষমা।’

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই ‘ধন্যবাদ ভাইয়া’ বলে হাতব্যাগটা খুলে একটা মোবাইল এবং একটা কার্ড আহমদ মুসার হাতে তুলে দিয়ে বলল, ‘ভাইয়া, এ মোবাইলে আমার সব নাম্বার আছে। আমাকে যে কোন সময় পাবেন। আর এই কার্ডটা আমাদের ফ্যামিলী পাশ। আপনি এ পাশ নিয়ে যে কোন সময় ফ্যামিলী উইং-এর গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারবেন। ওঁদের স্বাগত জানানোর জন্য আমার সব কিছু প্রস্তুত থাকবে ভাইয়া।’

মোবাইল ও কার্ড পকেটে রেখে ‘ধন্যবাদ সুষমা’ বলে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসাকে বিদায় দেওয়ার সময় সুষমা তার কম্পিত হাত তুলে কাতর কণ্ঠে বলল, ‘ভাইয়া, আমার মন প্রতিটা মুহূর্ত আপনার কলের জন্যে উন্মুখ থাকবে।’

‘সব ঠিক হয়ে যাবে সুষমা। আল্লাহ ভরসা।’ বলে আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়িয়ে গাড়িতে উঠে বসল।

আহমদ মুসার গাড়ি তখন পোর্ট ব্লেয়ার শহরের মধ্যাঞ্চল অতিক্রম করছে।

মোবাইল বেজে উঠল।

মোবাইল হাতে নিয়ে স্ক্রিনে দেখল হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহর নাম্বার। তাড়াতাড়ি কথা বলল। আহমদ মুসার কণ্ঠ পেতেই হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহ বলল, 'তুমি কোথায়?'

'হোটেল থেকে দুকিলোমিটার দূরে।'

'শোন হোটেলের বাইরে ওরা অবস্থান নিয়েছে। লাউঞ্জেও ওরা আছে। পুলিশের দুজন বড় অফিসার এসেছিল। আমার মনে হয় তারাই ওদের এনেছে। পুলিশ অফিসাররা বোর্ডার সবার ফটো দেখছে এবং একজন পিকআপ-এর ড্রাইভারকে দেখিয়েছে। দুজন পুলিশ তোমার সাথে এবং শাহ বানু ও তার মায়ের সাথে দেখা করতে চায়। আমি বলেছি, এখন ওঁরা ঘরে নেই। পুলিশ অফিসার দুজন আবার আসবে বলে চলে গেছে। কিন্তু বুঝতে পারছি ওরা সবাই বসে আছে। আমার পিকআপ-এর ড্রাইভার তোমাদের চিনিয়ে দিয়েছে।' বলল হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহ।

'জনাব, সোমনাথ শম্ভুজী কোথায়?'

জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'এখনি তোমার জানা দরকার?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে, টেলিফোন ধরে রাখ।'

আধা মিনিট পরেই টেলিফোন এল আবার হাজী আবদুল আলী আব্দুল্লাহর। বলল, 'উনি ঘরে নেই।'

'শাহ বানু ও তার মা সাহারা বানুর খবর কি?'

'ওঁরা ঘরে আছে। নিষেধ করেছি কোন প্রকার টেলিফোন ধরতে এবং দরজায় নক করলে সাড়া দিতে। এছাড়াও দরকার হলে পাশের ঘরে সরে যাবার ব্যবস্থা করে রেখেছি। পাশের ঘর খলি আছে।'

'অনেক ধন্যবাদ জনাব।'

'উল্টো কথা বলো না। ধন্যবাদ শুধুই তোমার প্রাপ্য। আল্লাহ দয়া করে তোমাকে আমাদের মধ্যে এনেছেন। শোন, এই হোটেল এবং আমার যা কিছু আছে সব তুমি তোমার মত করে ব্যবহার করতে পার।'

‘ধন্যবাদ।’

‘ধন্যবাদ নয়, এখন বল তুমি কি চিন্তা করছ।’

‘জনাব, আপনি শাহ বানুদের পাশের কক্ষে থাকুন। আমি মিনিট পনেরোর মধ্যে আসছি।’

‘কোথায়? হোটেলে?’

‘জি।’

‘কিভাবে? খবরদার তুমি এ কাজ করো না।’ আর্তনাদ করে উঠল হাজী আবদুল আলীর কণ্ঠ।

‘আল্লাহ ভরসা জনাব। ঠিক আমি পৌছে যাব। আপনি শাহ বানুদের রেডি রাখবেন। ওদের হোটেল ছাড়তে হবে।’

‘কিভাবে?’ আবার আর্তনাদ হাজী আবদুল আলীর কণ্ঠে।

‘আমি আসছি। সব বলব জনাব। আসি। আসসালামু আলাইকুম।’

ওপার থেকেও সালামের জবাব এল।

মোবাইলের কল অফ করে মনোযোগ দিল সামনের দিকে।

হোটেল সাহারা পোর্ট ব্লেয়ারের পূর্ব প্রান্তে সাগরের ধার ঘেঁষে বিরাট জায়গা জুড়ে অবস্থিত। হোটেলের সমগ্র এলাকা প্রাচীর ঘেরা। হোটেলের পূর্ব দিকে সাগর। পশ্চিম দিকে প্রাচীরের বিশাল গেট পর্যন্ত বাগান। বাগানের মধ্য দিয়ে প্রায় ৫০ ফুট চওড়া রাস্তা হোটেলের গাড়ি বারান্দা পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে। বাগানটা হোটেলের দক্ষিণ ও উত্তর প্রান্তে বিস্তৃত। বাগানের বাইরে দিয়ে বিভিন্ন ফলফলারীর গাছ এবং ছোট ছোট আগাছায় ভরা জংগল।

আহমদ মুসা হোটেলের প্রাচীরের কাছে যাবার আগেই একটা কাঁচা গলিপথ দিয়ে গাড়ি উত্তর দিকে ঘুরিয়ে নিল। দুটি দোকানের মাঝখান দিয়ে কয়েকটা বাড়ি পেরিয়ে প্রাচীরের ধার ঘেঁষে একটা বড় গাছের ছায়ায় ঝোপের

আড়ালে গাড়ি দাঁড় করাল। সূর্য ডুবে গেছে। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। এদিকে কেউ আসবে না, নিশ্চিত আহমদ মুসা।

গাড়ির সিটে বসেই মাগরিবের নামাজ পড়ে নিল সে। তারপর তৈরি হয়ে নেমে এল। গাড়ি লক করে চাবিটা গাড়ির চাকার তলায় রেখে দিল।

প্রাচীর ধরে প্রথমে উত্তরে তারপর পূর্ব দিকে এগুলেঅ আহমদ মুসা। তারপর একটা জায়গায় এসে দাঁড়াল।

আজ সকালেই সে হোটেলের তিনদিকের গোটা বাগান ঘুরে বেড়িয়েছে। সব কিছুই দেখেছে সে। তার এই ঘুরে বেড়াবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তার কক্ষের জানালা থেকে দেখতে পাওয়া সুন্দর পরিপাটি করে সাজানো কবরখানাটা দেখা। দেখেছে সে কবরখানা। কবরটা মওলানা লিয়াকত আলীর। তিনি আন্দামানে দ্বীপান্তরিত ভারতের একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী। আহমদ মুাস শ্রদ্ধাভরে সালাম দিয়েছে করববাসীকে। আহমদ মুসা তাঁকে চেনেনি, কিন্তু বুঝেছে দেশ ও জাতির জন্যে বৃটিশের বিরুদ্ধে জীবন-পণ সংগ্রাম করেছে যে হাজার হাজার মুসলমান, এই মওলানা লিয়াকত আলী তাদেরই একজন। পরে হাজী আবদুল আলীকে জিজ্ঞাসা করে আহমদ মুসা জেনেছিল, আন্দামানে জেলের বাইরে বাড়িঘর করে স্বাধীনভাবে জীবন যাপনের অনুমতি পেয়েছিল অনেক কয়েদি। মওলানা লিয়াকত আলী তাদেরই একজন। তিনি এই মুক্ত কয়েদিদের একটা জুমআ মসজিদের ইমাম ছিলেন। এই কবরের পাশেই তার বাড়ি ছিল। হাজী আবদুল আলীর পূর্ব পুরুষ বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অপরাধে ১৯২২ সালে দক্ষিণ ভারতের মালাবার অঞ্চল থেকে দ্বীপান্তরিত হয়ে এখানে আসে। তারপর তাদেরই এক উত্তর পুরুষ এই জায়গাটা কিনে নেয়। হাজী আবদুল আলী তাদেরই এক উত্তর পুরুষ। বংশানুক্রমে মওলানা লিয়াকত আলীর পরিচয় তাঁর কাছেও পৌছে। তার স্মৃতি নয়, একটা ইতিহাস রক্ষার জন্যেই তিনি কবরটাকে ধরে রেখেছেন।

আহমদ মুসা প্রাচীরের গোড়ায় দাঁড়িয়ে কোমরে জড়ানো সিল্কের কর্ড বের করে হুকটা ছুঁড়ে মারল প্রাচীরের মাথায়। হুকটা প্রাচীরের মাথায় ভালভাবে আটকেছে দেখে নিয়ে তরতর করে সে উঠে গেল প্রাচীরের মাথায়।

সিল্কের কর্ডটা খুলে নিয়ে লাফিয়ে পড়ল সে ভেতরে। গুড়ি মেরে ছুটল সে হোটেলের দিকে। গিয়ে দাঁড়াল তার ঘরের জানালা বরাবর নিচটায়। একটা ইমারজেন্সী এক্সিটের ব্যবস্থা হিসাবে গত রাতেই সে তার জানালার স্ক্রুগুলো খুলে রেখেছে।

মাটি থেকে জানালার পাশ দিয়ে উপরে উঠে যাওয়া পানির পাইপ বেয়ে তরতর করে উঠে গেল দুতলার জানালায়। তারপর কার্নিসে দাঁড়িয়ে গোটা জানালাটা খুলে ভেতরে রেখে দিল এবং বেড়ালের মত নিঃশব্দে লাফিয়ে ঘরে গেল।

সোফায় বসে মুখ ও কপালের ঘাম মুছে একটু জুড়িয়ে নিল শরীরটাকে।

আহমদ মুসা হিসাব করল, তার এখন দ্বিতীয় কাজ হলো হাজী আবদুল আলী ও শাহ্ বানুদের কাছে পৌছা।

কিন্তু তার আগে আহমদ মুসা আলমারি থেকে ব্যাগ এনে দড়ির মই বের করে যথাস্থানে রাখল। ইমারজেন্সী এক্সিট সামনে রেখেই গত রাতে সে এই দড়ির মইটাও জোগাড় করেছে।

আহমদ মুসা গভর্নর হাইজে যাওয়া জামার উপর বহু পকেট ওয়ালা জ্যাকেট পরে নিল। সব ঠিক আছে দেখে নিয়ে আহমদ মুসা এগুলো দরজার দিকে।

আস্তে করে নব ঘুরিয়ে দরজাটি খুলল আহমদ মুসা।

সামনে দরজা সরাতেই ভূত দেখার মত চমকে উঠল আহমদ মুসা। চার-পাঁচ গজ দূরেই দাঁড়ানো সোমনাথ শম্ভুজী। তার হাতের রিভলবার উঠে এসে স্থির হলো আহমদ মুসার বুক বরাবর।

হেসে উঠল সোমনাথ শম্ভুজী। বলল, ‘প্রথমে শব্দ শুনে আমি মনে করেছিলাম ঘরে ইঁদুর-টিদুর হবে। চলেই যাচ্ছিলাম। সারাদিন দরজা পাহারা দিয়ে বসে আছি। কখন তুমি ঢুকেছিলে ঘরে ছদ্মবেশী আমেরিকান?’

গম্ভীর হয়ে উঠল সোমনাথ শম্ভুজী।

কঠোর হয়ে উঠল তার মুখ। বলল, ‘হাত উপরে তোল বেভান বার্গম্যান। একটু চালাকির চেষ্টা করলে বুক তোমার এফোড় ওফোড় হয়ে যাবে।’

হাত উপরে তুলল আহমদ মুসা। তার মুখটা অকস্মাৎ যেন একটু বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বলল, 'কে আপনি? কি করছেন এসব? দিন-দুপুরে হোটেলে এভাবে...........।'

সোমনাথ শম্ভুজী একটা ধমক দিয়ে আহমদ মুসার কথা বন্ধ করে দিয়ে বলল, 'কে আমি, কি করছি সবই টের পাবে।'

কথা বলতে বলতে সোমনাথ শম্ভুজী যখন বাম হাতের রিভলবার ধরে ডান হাতে আহমদ মুসাকে সার্চ করতে আসছিল, ঠিক তখন উপরে উঠানো আহমদ মুসার ডান হাত জ্যাকেটের কলারের নিচ থেকে তীক্ষe ফলার ছুরি বের করে হাতে নিচ্ছিল।

ছুরিটা হাতে নিয়েই আহমদ মুসা সোমনাথ শম্ভুজীর পেছন দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলে উঠল, 'গংগারাম' ডোন্ট ফায়ার।'

সোমনাথ শম্ভুজী চমকে উঠে মুহূর্তের জন্যে পেছনে তাকাল।

আহমদ মুসা মুহূর্তের এই সুযোগটাই চাচ্ছিল। ছুরির বাট ধরা আহমদ মুসার ডান হাত তীব্র বেগে নেমে এল। গিয়ে আঘাত করল সোমনাথ শম্ভুজীর পিঠের বাম পাশে ঠিক হৃদপিন্ডের উপর।

ছুরিটা আমূল বিদ্ধ হয়েছিল।

একটামাত্র চিৎকার সোমনাথ শম্ভুজীর মুখ থেকে বেরুল। তারপর সে ঢলে পড়ল আহমদ মুসার উপর।

আহমদ মুসা শম্ভুজীকে ধরে ঘরের ভেতরে টেনে নিল।

দ্রুত ছুটে আসা দুজনের পায়ের শব্দ পেল আহমদ মুসা। সম্ভবত সোমনাথ শম্ভুজীর চিৎকার তারা শুনতে পেয়েছে।

আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি সোমনাথ শম্ভুজীকে রেখে দরজার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল।

সোমনাথ শম্ভুজী পড়ে আছে দরজার পরেই ঘরের মেঝেতে।

দুজন লোক ছুটে এসে দরজায় মুহূর্তের জন্যে দাঁড়াল। তাদের হাতে রিভলবার। তারপর তারা দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগল সোমনাথ শম্ভুজীর দিকে। দুজন পাশাপাশি।

আহমদ মুসা গুড়ি মেরে একটু এগিয়ে অকস্মাৎ তার দুপাকে ছুঁড়ে দিল তাদের সামনে।

তারা দেখতে পেল আহমদ মুসাকে। কিন্তু তারা কিছু ভাববার আগেই আহমদ মুসার বাড়িয়ে দেয়া পায়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল মুখ থুবড়ে সোমনাথ শম্ভুজীর উপর।

আহমদ মুসা দ্রুত উঠে গিয়ে তার দুহাতের দুরিভলবার দুজনের দিকে তাক করে বলল, 'তোমরা তোমাদের হাতের রিভলবার ফেলে দাও।'

কিন্তু আহমদ মুসার কথা শেষ হবার আগেই তারা বিদ্যুত বেগে তাদের শরীর উল্টিয়ে নেয়ার সাথে সাথে তাদের রিভলবার ঘুরিয়ে নিচ্ছিল।

গুলী না করে আহমদ মুসা কোন উপায় থাকল না। আহমদ মুসা তার রিভলবারের নল দুজনের পাঁজরে চেপে ধরে এক সাথেই ট্রিগার চাপল।

শব্দ এড়াবার জন্যে গুলী করতে চায়নি আহমদ মুসা। দুজনের গায়ে রিভলবারের নল চেপে তার গুলী করা শব্দ এড়াবার লক্ষ্যেই।

আহমদ মুসা একটু অপেক্ষা করল। না আর কেউ এল না।

ঘর থেকে বেরিয়ে সে দরজা লক করে ছুটল শাহ বানুদের ঘরের দিকে।

শাহ বানুদের ঘরের পাশের ঘরে হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহর থাকার কথা।

আহমদ মুসা সেই দরজায় নক করল।

দরজায় ডোর ভিউ আছে।

ডের ভিউতে আলোর নড়াচড়া লক্ষ্য করল আহমদ মুসা।

পরক্ষণেই দরজা খুলে গেল।

দরজায় দাঁড়িয়ে হাজী আবদুল্লাহ।

তার পেছনে ঘরের মাঝখানে মুখ শুকনো করে দাঁড়িয়ে আছে শাহ বানু ও তার মা সাহারা বানু।

হাজী আবদুল্লাহ জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে। বলল, 'তুমি কি পনের মিনিটেই এসে গেছ। এই পনের মিনিট আমার কাছে পনের বছরের মত ভারী হয়েছে। কি করে এলে তুমি?'

‘জনাব যে পথে এসেছি, সে পথেই ফিরব। দেখবেন আপনি।’

বলে আহমদ মুসা তাকাল সাহারা বানুর দিকে। বলল, ‘মা আপনারা রেডি?’

‘হ্যাঁ বাবা, কিন্তু কি নিতে হবে বুঝতে পারছি না।’ সাহারা বানু বলল।

‘প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড় ছাড়া আর কিছুর প্রয়োজন নেই মা।’

‘আমরা কোথায় যাব বেটা?’

‘চিন্তা করে দেখলাম মা হোটেলে যেমন আপনারা নিরাপদ নন, তেমনি পরিচিত কোন মুসলিম ঘরও নিরাপদ নয়। সব ভেবে সুষমা রাও-এর প্রস্তাব আমি গ্রহণ করেছি মা। সুষমা রাওয়ের সাথে আপনাদের পরিচয় আছে তো!’ আহমদ মুসা বলল।

‘জি, ভাল পরিচয় আছে।’ বলল শাহ বানু।

‘সুষমা রাও তার কাছে তোমাদের রাখতে চায়। পরিচয় হবে আপনারা তাদের গ্রাম থেকে আসা আত্মীয়।’

‘ভাল-মন্দ কিছুই আমরা বুঝব না বেটা, তুমি যেটা ভাল মনে কর, সেটাই করবে।’ সাহারা বানু বলল।

‘সুষমা রাও যদি এ দায়িত্ব নেয়, তাহলে এটা হবে সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ।

‘সুষমা আন্তরিকভাবে এ অনুরোধ করেছে। এ কারণে আমিও ভাল মনে করেছি এটা।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ভাইয়া নিখোঁজ হওয়ার পর সুষমা আমাদের বাড়ি এসেছে এবং প্রতিদিনই টেলিফোনে আমাদের খোঁজ-খবর নিয়েছে। আমিও মনে করি এটা ভাল ব্যবস্থা হবে।’ বলল শাহ বানু।

‘কিন্তু এদের নিয়ে কিভাবে যাওয়া যাবে আহমদ মুসা?’ হাজী আবদুল্লাহ বলল।

‘আহমদ মুসা নয়, বলুন বেভান বার্গম্যান।’ আহমদ মুসা বলল।

হাসল হাজী আবদুল্লাহ। বলল, ‘ভুল আর হবে না মি. বার্গম্যান।’

‘চলুন যাওয়া যাক।’ বলে আহমদ মুসা দরজা খুলে প্রথম বের হলো করিডোরে। চারদিকে দেখে বলল, ‘আপনারা আসুন।’

সবাই চলল আহমদ মুসার ঘরের দিকে।

ঘরের লক খুলে প্রথমে তাদের ঘরে ঢুকিয়ে আহমদ মুসা ঢুকল।

ঘরে ঢুকে আঁৎকে উঠোছে হাজী আবদুল্লাহ, সাহারা বানু এবং শাহ বানু তিনজনেই।

‘একি আহমদ মুসা? কিভাবে হলো?’ আর্তকণ্ঠে বলল হাজী আবদুল্লাহ।

‘আপনি বলেছিলেন সোমনাথ শম্ভুজী তার কক্ষে নেই। তাই বলে হোটেলে ছিল না তা নয়। সে আমার কক্ষের সামনে কোথাও ওঁৎ পেতে আমার ঘরের উপর সার্বক্ষণিক চোখ রেখেছিল। আমি বাগান দিয়ে এসে পানির পাইপ বেয়ে জানাল দিয়ে ঘুরে ঢুকি। আপনার কাছে যাবার জন্যে যখন দরজা খুলেছিলাম, তখন রিভলবার বাগিয়ে আমার উপর সে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। শেষে এই পরিণতি তার হয়েছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কিন্তু অন্য দুজন?’

‘ওরাও সোমনাথ শম্ভুজীর লোক। শম্ভুজীর চিৎকার শুনে ওরা ছুটে এসেছিল। দেখুন তাদের হাতে এখনও রিভলবার ধরা আছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ধন্যবাদ আহমদ মুসা। ওরা আক্রমণ করল, আবার ওরাই মারা পড়ল। তোমার হতে যাদু আছে আহমদ মুসা। এতদিন শুনেছি, এবার চোখে দেখার সৌভাগ্য হলো।’

‘যাদু নয় জনাব, আল্লাহর সাহায্য আছে।’

বলেই আহমদ মুসা জানালার নিচে রাখা দড়ির মই নিয়ে জানালার দুপাশের দুহুকের সাথে ভাল করে বাঁধতে লাগল, আর শাহ বানুকে লক্ষ্য করে বলল, ‘তুমি মৃত ওদের সবার পকেট সার্চ কর। নেমকার্ড, যে কোন ধরনের কাগজ ও মোবাইল পেলে আমাকে দাও।’

আহমদ মুসা দড়ির মই সেট করে বলল হাজী আবদুল্লাহকে, ‘জনাব, আমি সোমনাথ শম্ভুজীর ঘরটা একটু সার্চ করে আসি।’

‘তার কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট কোন কিছু কি পেতে চাচ্ছ?’ বলল আবদুল্লাহ।

‘আহমদ আলমগীর ও গংগারামকে তারা কোথায় রেখেছে, ওদের আস্তানা কোথায়, এদের উদ্দেশ্য ও পরিচয় কি, ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য আমার দরকার।’

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই শাহ বানু সোমনাথ শম্ভুজীসহ মৃত তিনজনের পকেট থেকে পাওয়া কিছু টুকরো কাগজ এনে আহমদ মুসার হাতে তুলে দিল।

আহমদ মুসা দ্রুত চোখ বুলাতে লাগল কাগজের টুকরোগুলোর উপর। বিভিন্ন ধরনের স্লিপ। কোনটাতে ঔষধের নাম লেখা, কোনটাতে মানুষের নাম লেখা, কসমেটিকস-এর নামও দুটো স্লিপে পাওয়া গেল। কয়েকটা ব্যবসায় কোম্পানীর কার্ডও পাওয়া গেল। একটা স্লিপের উপর এসে চোখ আটকে গেল আহমদ মুসার। তাতে লেখা:

‘এই চিরকুটের বাহক দুজন পিকআপের ড্রাইভারকে তোমার কাছে নিয়ে যাচ্ছে। পুলিশকে বলেছি। তারা সাহায্য করবে। এই হোটেলেই ওরা আছে। ওদের ধরতেই হবে। ‘ভাইপার’ এ তোমার আসার দরকার নেই। ক্যাব শয়তানটাকে আমরাই দেখব। ওর কাছ থেকে কথা পেলে সংগে সংগেই তোমাকে জানাব।’ -স্বামীজী

রুদ্ধশ্বাসে চিরকুটটি পড়ল আহমদ মুসা। তার কোন সন্দেহ নেই। ‘ক্যাব-শয়তান’ বলতে গংগারামকেই বুঝানো হয়েছে। কিন্তু ‘ভাইপার’ কি বাড়ি, না জায়গা? আহমদ মুসা জিজ্ঞাসা করল হাজী আবদুল্লাহকে, ‘জনাব, ভাইপার কি? এ নামের কোন বাড়ি বা স্থান আছে?’

‘ভাইপার ছোট্ট দ্বীপের নাম, পোর্ট ব্লেয়ারের অংশ। কেন জিজ্ঞাসা করছ?’

‘সন্ধ্যার পর ওরা গংগারামকে ভাইপার-এ নিচ্ছে।’ গম্ভীর কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

‘ঠিক আহমদ মুসা। নিতে পারে। ভাইপার-এ পোর্ট ব্লেয়ারের পুরানো জেলখানা। ওটা পোড়ো বাড়ি। পুরাতত্ব বিভাগ কিছু কিছু সংস্কার করে স্মৃতি

হিসাবে ধরে রেখেছে। ক্রিমিনালরা জনমানবহীন ঐ জায়গায় আড্ডা গারতে পারে।' হাজী আবদুল্লাহ বলল।

আনন্দের প্রকাশ ঘটল আহমদ মুসার চোখে-মুখে। দ্রুত কণ্ঠে বলল, 'ধন্যবাদ জনাব। আমি শাহ বানুদেরকে সুষমার ওখানে দিয়েই তাহলে ছুটব ভাইপার দ্বীপে।'

'ভাইপার দ্বীপের কোন কিছুই তুমি চিনবে না। আমি চিনি। আমি তোমার সাথে থাকব। ভেব না। আমিও বন্দুক চালাতে জানি, দেখবে।'

'কিন্তু জনাব, আমি তো ওদিক দিয়ে চলে যাব।' আহমদ মুসা বলল।

'ঠিক আছে। আমি এ লাশগুলো সামলাবার ও তোমার ঘরটা পরিষ্কার করার কাজ সেরে এখন থেকে ঠিক এক ঘণ্টার মাথায় পুরানো ভিক্টোরিয়া ব্রীজে পৌছব। ও ব্রীজ দিয়েই ভাইপার দ্বীপে যেতে হয়। ব্রীজের গোড়ায় বসে তোমার অপেক্ষা করব। তুমি ওখানে পৌছে সমান মাপের তিনটা হর্ন দেবে। আমি আড়াল থেকে বেরিয়ে আসব।'

'ঠিক আছে জনাব। তাহলে আমি এখন আর সোমনাথ শম্ভুজীর কক্ষে যাচ্ছি না। ইনশাআল্লাহ ফিরে এসে দেখব। ওর ঘরে যেন অন্য কেউ না ঢোকে আপনার লোকদের সেটা দেখতে বলবেন।'

'তথাস্তু বেভান।' বলল হাজী আবদুল্লাহ। তার মুখে আনন্দের হাসি।

আহমদ মুসা ঘুরল সাহারা বানুর দিকে। বলল, 'মা, দড়ির মই দিয়ে নামতে পারবেন তো? এক তলার দূরত্ব অসুবিধা হবে না।'

'নামতে তো হবেই বেটা।'

'ধন্যবাদ মা! আশা করি অসুবিধা হবে না। আমি আগে নিচে যাব। নিচ থেকে মই ধরে রাখব।'

বলে আহমদ মুসা ছুটে গিয়ে ঘরের রাইটিং টেবিলটা নিয়ে এল জানালার নিচে। চেয়ারও আনল টেবিলের ধারে। বলল আহমদ মুসা শাহ বানুকে, 'চেয়ার থেকে টেবিলে, টেবিল থেকে জানালায় এবং জানালা থেকে দড়ির মই বেয়ে নিচে নামবে, ঠিক আছে?'

'উত্তরটা দিতে পারব নিচে নামার পর।' বলল শাহ বানু। চিন্তান্বিত তার মুখ।

আহমদ মুসা লক্ষ্য করল শাহ বানুর চিন্তাক্লিষ্টতা। বলল, 'ভাবছ কেন শাহ বানু। তুমি মোঘল কন্যা না? মধ্য এশিয়ার 'পারগানা' থেকে ভারতের 'দিল্লী' পর্যন্ত মোঘল ইতিহাস জান না? মোঘল দুহিতারা কি হাতির পিঠে, ঘোড়ার পিঠে বসেনি এবং পায়দলে যুদ্ধ করেনি?'

'ভুলে গিয়েছিলাম। আপনি আসার পর সবই মনে পড়তে শুরু করেছে। সাহস, বাঁচার আশা সবই ফিরে আসছে। আপনি সামনে আছেন, সব কিছুই আমরা পারব।' বলল শাহ বানু। ভারী ও গম্ভীর কণ্ঠ শাহ বানুর।

'ধন্যবাদ শাহ বানু' বলে আহমদ মুসা ঘরের চারদিকে একবার নজর বুলিয়ে হাজী আবদুল্লাহকে বলল, 'জনাব, ঘর সাফ করার সময় লোকরা যেন চেয়ার টেবিল ঠিক জায়গায় রাখে এবং জানালাটাও তুলে জানালার স্পেসে সেট করে রাখে, একটু দেখবেন। যে কোন সময় পুলিশ ওদের নিয়ে আমাদের ঘরগুলো সার্চ করতে পারে।'

কথা শেষ করেই 'আমি নিচে যাচ্ছি' বলে আহমদ মুসা জানালায় উঠে গেল।

'বেভান, তুমি জানালা খোলার পর জানালার হুক কি যথেষ্ট শক্তিশালী আছে?'

'একজন মানুষ বহন করার মত শক্তিশালী অবশ্যই। ভয় হুকের তীক্ষè প্রান্ত নিয়ে। আল্লাহ ভরসা, মাত্র পনের ষোল ফুট উচ্চতার ব্যাপার তো। এই মুহূর্তে বিকল্প চিন্তার সময় নেই।' বলল আহমদ মুসা।

কথা শেষ করেই তর তর করে নেমে গেল আহমদ মুসা দড়ির মই বেয়ে।

নিচে নেমে দড়ির মই টেনে ধরলে শাহ বানুর মা দড়ির মই বেয়ে ভালভাবেই নেমে এল।

কিন্তু শাহ বানু মাঝপথ পর্যন্ত আসতেই দড়ির মই ছিঁড়ে পড়ে গেল।

মই টেনে ধরে নিচে দাঁড়িয়ে ছিল আহমদ মুসা, তাই নিচে পাথরের উপর পড়া থেকে রক্ষা পেল শাহ বানু। হাত বাড়িয়ে যথাসময়েই তাকে ধরে ফেলেছিল আহমদ মুসা।

উপর থেকে চাপা কণ্ঠে হাজী আবদুল্লাহ বলল, 'বেভান, তোমরা সবাই ঠিক আছ তো?'

আহমদ মুসা শাহ বানুকে দাঁড় করিয়ে উপরে তাকিয়ে চাপা কণ্ঠে বলল, 'ধন্যবাদ, ঠিক আছি আমরা।'

বলে আহমদ মুসা বলল শাহ বানুকে, 'বললাম বটে, কিন্তু তুমি আসলেই ঠিক আছ তো?'

'আলহামদুলিল্লাহ। আমি তো বেঁচে গেছি। আঘাত আপনার পাবার কথা।' বলল শাহ বানু কম্পিত ও বিব্রত কণ্ঠে। তখনও শাহ বানু নিজেকে সামলে নিতে পারেনি।

'কিভাবে কি ঘটে গেল, আমার কিছুই মনে পড়ছে না।' বলে আহমদ মুসা হাঁটা শুরু করে বলল, 'আসুন আম্মা, শাহ বানু এস।'

সমস্যা দেখা দিল প্রাচীর টপকাতে গিয়ে। আহমদ মুসা সহজেই প্রাচীর পার হয়েছিল হুকওয়ালা সিল্কের কর্ডের সাহায্যে। সে কর্ড তো শাহ বানু ও সাহারা বানুর ক্ষেত্রে অচল।

সমস্যাটা শাহ বানুরাও উপলব্ধি করেছে। শাহ বানুর মা সাহারা বানু বলল, 'দড়ির মই তো ছিঁড়ে গেছে। প্রাচীর টপকাব কি করে বেটা?'

'আমি পার হয়েছিলাম সিল্কের কর্ডে হুক প্রাচীরে আটকিয়ে। এখনকার কথা তখন মনেই পড়েনি। অসুবিধা নেই আম্মা। আসুন।'

বলে আহমদ মুসা প্রাচীরের গোড়ায় গিয়ে কোমর থেকে হুকওয়ালা কর্ড খুলে প্রাচীরের মাথায় ছুড়ে মেরে হুক আটকিয়ে নিল। তারপর বসে পড়ল আহমদ মুসা প্রাচীরের গোড়ায়। বলল, আম্মা আমার দুকাঁধে পা রেখে কর্ড ধরে দাঁড়ান। আমি দাঁড়াবার পর তিন ফিট উপরে থাকবে প্রাচীরের মাথা। হাত দিয়ে ভাল করে প্রাচীরের মাথা ধরে প্রাচীরের উপরে গিয়ে আপনি বসুন। পরের ব্যবস্থা আমি প্রাচীরে উঠে করব।'

'কি বলছ বেটা, তোমার কাঁধে পা রাখব?' বলল সাহারা বানু প্রতিবাদের সুরে।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বলল, 'আম্মা আমাকে মাফ করুন, এখন কথা বলার সময় নয়। আমরা এখন যুদ্ধক্ষেত্রে আছি। জীবনের স্বাভাবিক আইন এখানে চলবে না, প্লিজ।'

বলে আবার বসে পড়ল আহমদ মুসা।

আর কোন কথা না বলে শাহ বানুর মা জুতা খুলে দুহাতে সিল্কের কর্ড ধরে আহমদ মুসার দুকাঁধে পা রেখে উঠে দাঁড়াল।

তাকে নিয়ে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা। বলল, 'আম্মা, এবার আপনি কর্ড ছেড়ে দিয়ে প্রাচীরের মাথা শক্ত করে ধরুন।'

'ধরেছি বেটা।' বলল সাহারা বানু।

'এবার আপনি প্রাচীরের মাথায় উঠার চেষ্টা করুন, আমি পা ধরে ঠেলে দিচ্ছি।'

বলে আহমদ মুসা সাহারা বানুর দুপা ধরে তাকে উপরের দিকে ঠেলে দিল।

সাহারা বানু সহজেই উঠে বসল প্রাচীরের মাথায়।

আবার বসে পড়ল আহমদ মুসা। বলল, 'এস শাহ বানু।'

বিব্রত, সংকুচিত শাহ বানু কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারল না।

দ্রুত গিয়ে দাঁড়াল আহমদ মুসার পেছনে।

'আম্মা যা করেছেন দেখেছ সেভাবেই তোমাকে প্রাচীরের মাথায় উঠতে হবে।'

শাহ বানু জুতা খুলে 'আই এ্যাম স্যরি' বলে সিল্কের কর্ড ধরে সে আহমদ মুসার কাঁধে উঠে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়ে শাহ বানুর দুপা ধরে উপরে ঠেলে দিলে সে মায়ের মতই প্রাচীরের মাথায় উঠে বসল।

আহমদ মুসা সিল্কের কর্ডের সাথে শাহ বানু ও সাহারা বানুর জুতা ও ব্যাগ বেঁধে কর্ড ধরে উঠে গেল প্রাচীরের মাথায়।

উঠেই বলল সাহারা বানুকে, ‘আম্মা, আপনি দুহাতে প্রাচীরের মাথা ধরে বাইরের পাশে ঝুলে পড়ূন। ভয় নেই আমিও আপনার হাত ধরে থাকছি।’

‘ভেব না, আমি পারব বেটা।’ বলে সাহারা বানু প্রাচীরে ঝুলে পড়ল।

আহমদ মুসাও একইভাবে ঝুলে পড়ল প্রাচীরে। তারপর বাঁ হাত দিয়ে প্রাচীর ধরে রেখে ডান হাত সরিয়ে নিয়ে ধরল সাহারা বানুর এক হাত। বলল, ‘আম্মা, এখন আমি আপনার যে হাত ধরেছি সেটা প্রথমে ছেড়ে দিন, পরে দ্বিতীয় হাতটাও ছেড়ে দিয়ে আমার হাতের উপর ঝুলে পড়ূন।’

‘কিন্তু তুমি দুজনের ভার এক হাতে............।’ কিছু বলতে যাচ্ছিল সাহারা বানু। আহমদ মুসা তাকে বাধা দিয়ে বলল, ‘আল্লাহর উপর ভরসা করার পর কোন প্রশ্ন তোলা ঠিক নয় আম্মা।’

‘আল্লাহ সাহায্য করুন’ বলে সাহরা বানু চোখ বন্ধ করে দ্বিতীয় হাতটা প্রাচীর থেকে সরিয়ে ঝুলে পড়ল আহমদ মুসার হাতে।

প্রবল এক ঝাঁকুনি খেল আহমদ মুসার দেহ। কিন্তু তার অনড় বাঁ হাত লোহার হুকের মতই প্রাচীরের মাথায় চেপে বসেছিল। প্রাচীরের অসমান মাথা লোহার হুকের তেমন ক্ষতি করতে পারে না, কিন্তু আহমদ মুসার হাতকে সুঁচের মত বিদ্ধ করল।

সাহারা বানু যখন ঝুলে পড়ছিল, শাহ বানুও তখন চোখ বন্ধ করেছিল ভয়ে, তার মা পড়ে যাবার কোন শব্দ না পেয়ে সব ঠিক আছে বুঝে চোখ খুলল শাহ বানু। দেখল তার মা ঝুলছে আহমদ মুসার হাতে।

‘থ্যাংকস গড।’ অস্ফুট কণ্ঠে বলল শাহ বানু।

সাহারা বানু হাতের উপর ঝুলে পড়লে আহমদ মুসা বলল, ‘আম্মা, এখন আপনি মাটি থেকে ফুট খানেকেরও কম উপরে। লাফিয়ে পড়ুন মাটিতে। জায়গাটা ভাল, ঘাসে ঢাকা নরম মাটি।’

বলার পরেই ‘রেডি’ বলে সাহারা বানুর হাত ছেড়ে দিল আহমদ মুসা।

ছোট একটা শব্দ হলো।

‘আলহামদুলিল্লাহ, আমি ঠিক আছি বেটা।’ নিচ থেকে চাপা কণ্ঠে বলল সাহারা বানু।

শাহ বানুকে আর বলতে হলো না। আহমদ মুসা তার দিকে তাকাতেই সে ঝুলে পড়ল প্রাচীরে। তারপর একহাত বাড়িয়ে দিল আহমদ মুসার দিকে। তারপর দ্বিতীয় হাত প্রাচীর থেকে টেনে নিয়ে ঝুলে পড়ল আহমদ মুসার হাতের উপর।

শাহ বানুর সুবিধা হলো নিচ থেকে তার মা ধরে ফেলায়।

আহমদ মুসা নিচে নেমে এল।

ব্যাগ ও জুতা কর্ড থেকে খুলে তাদের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল, 'স্যরি, আপনাদের খুব কষ্ট হয়েছে আম্মা। কিন্তু এ ছাড়া তো আর কোন পথ ছিল না।'

শাহ বানু ঝুঁকে পড়ে আহমদ মুসার দুপায়ে হাত দিয়ে সালাম করতে করতে বলল, 'সব কষ্ট করলেন আপনি আর বলছেন কষ্ট করলাম আমরা। মহামানুষদেরকে কি এতটাই বিনয়ী হতে হয়?'

আহমদ মুসা পা সরিয়ে নেবার চেষ্টা করে বলল, 'একি হচ্ছে শাহ বানু?'

'বড়দের গায়ে পা লাগলে এখানে সালাম করা হয় বেটা।' বলল শাহ বানুর মা সাহারা বানু।

'হিন্দুয়ানী রীতি শাহ বানু দেখছি ভালই রপ্ত করেছে।' হেসে বলল আহমদ মুসা।

শাহ বানু কিছু বলতে যাচ্ছিল। আহমদ মুসা বাধা দিয়ে বলল, 'আর কোন কথা নয়, এখান থেকে বেশ একটু দূরে গাড়ি। চল।'

শাহ বানুরা জুতা পরে নিয়েছিল। সবাই চলতে শুরু করল।

গাড়ির আলো নিভিয়ে রেখেই আহমদ মুসা গাড়ি নিয়ে মেইন রোডে উঠে এল। ছুটল গাড়ি।

আহমদ মুসাদের গাড়ির পাশ ঘেঁষে দুটি পুলিশের গাড়িকে হোটেল সাহারার দিকে যেতে দেখল।

আহমদ মুসা মনে মনে বলল হাজী সাহেব ইতিমধ্যে ঘরটা পরিষ্কার ও ঠিক-ঠাক করতে পাল কিনা?

মোবাইল তুলে নিয়ে আহমদ মুসা হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহকে দুগাড়ি পুলিশ হোটেলে যাচ্ছে তা জানাল।

হাজী আবদুল্লাহ আহমদ মুসাকে ধন্যবাদ দিয়ে বলল, 'তোমার ঘরটা ধুয়ে ফেলার পর এখন মুছে ফেলা হচ্ছে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ঘরটা স্বাভাবিক হয়ে যাবে।'

শহরের মাঝখানে একটা নিরিবিলি জায়গায় এসে আহমদ মুসা গাড়িটা একটা গাছের নিচে দাঁড় করিয়ে গাড়ির আলো জ্বেলে পোর্ট ব্লেয়ারের রোডম্যাপ বের করল গভর্নর হাউজে সোজা যাবার পধটা আর একবার দেখে নেয়ার জন্যে। রাতে পোর্ট ব্লেয়ারে গাড়ি চালাবার অভিজ্ঞতা এই প্রথম।

আলো জ্বলতেই আহমদ মুসার হাতের দিকে তাকিয়ে আঁৎকে উঠল শাহ বানু, তার বাম হাতটা রক্তে ভেসে গেছে।

সাহারা বানুও দেখতে পেয়েছে। বলল আর্তকণ্ঠে, 'বেটা, আহত হাতটাকে আবার আহত করেছ? দেখি, কিভাবে হলো?'

'আম্মা, প্রাচীরের মাথা অমসৃণ। সিমেন্ট ও পাথরের তীক্ষè কণা রয়েছে প্রাচীরের মাথা জুড়ে। প্রাচীর থেকে সকলকে নামিয়ে দেবার সময় সব ভার তো বাঁ হাতের উপর পড়েছিল। সিমেন্ট ও পাথরের ঐ সব তীক্ষè কণায় হাত ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে।'

'বেটা, আল্লাহ তোমাকে এত ধৈর্য্য দিয়েছেন? নিজের এতবড় অসহনীয় কষ্টটাও কাউকে বুঝতে দাওনি। তার উপর আমাদের কষ্টের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করছ! শুনলাম তুমি আমাদের রেখে ভাইপার দ্বীপে যাবে গংগারামকে উদ্ধারের জন্যে। সেখানে কি ঘটবে তুমি ভাল করেই জান। এ অবস্থায় তুমি কি করে যাবে সেখানে?' বলতে বলতে কান্নায় রুদ্ধ হয়ে গেল সাহারা বানুর কণ্ঠ।

শাহ বানুরও চোখ থেকে দুফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল তার দুগ- বেয়ে। এক সময় আহমদ মুসা ছিল তার স্বপ্নের মানুষ। কিন্তু বাস্তবের মানুষটি সব স্বপ্ন, সব কল্পনাকে ছাড়িয়ে গেছেন। দড়ির মই ছিড়ে তাঁর কোলে পড়ে গিয়েছিল শাহ বানু। দুহাতে বুকের সাথে আঁকড়ে ধরে শাহ বানুকে রক্ষা করেছে সে। কিন্তু তিনি বললেন, কিভাবে কভন কি ঘটেছে তার কিছুই মনে নেই। পাথরে যেমন স্পন্দন

ওঠে না, ইনি ঠিক তেমনি হবেন। ভাবতে গা শিউরে উঠছে তার। মানুষের ওজনের প্রবল চাপে একটি মাত্র হাতে পাথর ও সিমেন্ট কণা প্রবেশ করে হাতকে যখন ক্ষত-বিক্ষত করছিল, তখন কি অদ্ভুত স্বাভাবিকতার সাথে তিনি কাজ করে যাচ্ছিলেন এবং তার অসুবিধা একটু তিনি জানতে দেননি। গাড়িতে আলো না থাকলে হয়তো জানাই যেত না। ইসলামের সোনালী যুগের মানুষ সে দেখেনি। নিশ্চয় এমন মানুষই ছিল তারা। তা না হলে জগত জয়ের সাথে জগতের মানুষকে কেমন করে জয় করল তারা!

চিন্তায় ছেদ নামল শাহ বানুর। আহমদ মুসা কথা বলে উঠেছিল তার মায়ের কথার জবাবে, 'হাতের আঘাতটা খুব বেশি কিছু নয় মা। ভাইপার দ্বীপে যাওয়ার প্রোগ্রাম এক ঘণ্টাও পিছিয়ে দেয়া যাবে না।'

'শাহ বানু, গাড়িতে দেখ 'ফাষ্ট এইড বক্স' আছে। হাতে ভাল করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দাও।' বলল সাহারা বানু।

আহমদ মুসা রোড ম্যাপ গুটিয়ে রেখে গাড়ি ষ্টার্ট দিয়ে বলল, 'এখন সময় হবে না। আপনাদের ওখানে পৌছে দিয়ে হাজী আবদুল্লাহ সাহেবের আগেই আমাকে ভিক্টোরিয়া ব্রীজ-এর গোড়ায় পৌছা দরকার। সেখানে গিয়ে আমি ব্যান্ডেজটাকে বেঁধে নেব, কথা দিচ্ছি মা। হাজী সাহেব নিশ্চয় ভাল ব্যান্ডেজ বাঁধতে পারেন।'

'কিন্তু গভর্নর হাউজের লোকরা এ সব রক্তারক্তি দেখে কি বলবে?' বলল সাহারা বানু পাল্টা যুক্তি হিসেবে।

'আমি সেখানে গাড়ি থেকে নামবো না।' বলে আহমদ মুসা সুষমার দেয়া মোবাইলে সুষমার 'ওয়ানটাচ' ডায়ালে মোবাইল করল।

ওপারে টেলিফোন ধরেই সুষমা বলে উঠল, 'আমার কি সৌভাগ্য। আস্সালামু আলাইকুম।'

'ওয়াচ্ছালাম। শাহ বানুদের নিয়ে আসছি সুষমা।' আহমদ মুসা বলল।

'ও! নাইস। ধন্যবাদ ভাইয়া। কতক্ষণের মধ্যে পৌছবেন? আমি গেটে যাচ্ছি।' সুষমা ওপার থেকে বলল।

‘ধরো আধা ঘণ্টা। অন্তত তোমার মাকে এ ব্যাপারে সঙ্গে সঙ্গেই জানানো উচিত।’

‘অলরেডি আমি জানিয়েছি ভাইয়া। মাও তাঁদের ওয়েলকাম করবেন। তবে গ্রামের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হিসাবে, মোঘল পরিবারের সদস্য হিসাবে নয়।’

‘তুমি কিন্তু ঝুঁকি নিচ্ছ সুষমা। তুমি একটি মোঘল পরিবারকে আশ্রয় দিচ্ছ।’ বলল আহমদ মুসা।

‘অবশ্যই। কিন্তু এটা কি ইতিহাসে নতুন? মারাঠী নেতা শিবাজী ও তাঁর পুত্র শম্ভুজী আওরঙ্গজেবের হাতে মোঘল কারাগারে বন্দী থাকলেও তারা মেহমান হিসাবে ব্যবহার পেয়েছেন। শত্রুতা সত্ত্বেও মারাঠীরা আবার প্রয়োজনের মুহূর্তে মোঘলদের সহযোগিতায় গেছে। আমাদের চতুর্থ পেশোয়া প্রথম মাধব রাও মোঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমকে ইংরেজের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছিলেন এবং বন্দীদশা থেকে তাকে মুক্ত করে মোঘল সাম্রাজ্য পুন:প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৭৭২ সালে।’ সুষমা রাও বলল।

‘তাহলে বলা যায় সুষমা এখন দ্বিতীয় মাধব রাও।’

হেসে উঠল সুষমা। একটু থেমে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, ‘আমি মাধব রাও এই অর্থে যে, আমি আমার যে কোন মূল্যে আহমদ আলমগীরকে মুক্ত দেখতে চাই। একটি মোঘল পরিবারের সাথে সম্পর্কের আমি সেতুবন্ধ হতে চাই। কিন্তু তাঁর মুক্তির জন্যে তো কিছুই করতে পারবো না, কোন সহযোগিতা আপনি নিলে আমি বাধিত হবো।’

‘শাহ বানুদের কাছে রাখছ, এখন এটাই সবচেয়ে বড় সহযোগিতা। ওদের একটা নিরাদ হোটেলে রেখেছিলাম। কিন্তু শয়তানরা সন্ধান পেয়ে যায়। অল্পের জন্যে আজ এঁরা শয়তানদের হাতে পড়া থেকে বেঁচে গেছেন।’ বলল আহমদ মুসা।

‘অশেষ ধন্যবাদ ভাইয়া যে, আপনি আমার কথা মনে করেছেন।’ বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলল সুষমা।

একটু থেমে কান্নাজড়িত কণ্ঠে আবার বলে উঠল, ‘ওঁর মুক্তির ব্যাপারে কি ভাবছেন ভাইয়া?’

'আমি নিশ্চিত সুষমা, আহমদ আলমগীর মুক্ত হবে। আমি অনেকটা পথ এগিয়েছি। রহস্যের অন্ধকারটা ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হয়ে উঠছে।' আহমদ মুসা বলল।

'আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করুন।' বলল সুষমা।

'এখনকার মত কথা শেষ, রাখছি সুষমা।'

মোবাইলের কল অফ করে দিল আহমদ মুসা। মুখ ফিরাল সাহারা বানুর দিকে। বলল, 'সুষমার সাথে কথা হলেঅ আম্মা। ওর মাকে সে আগেই বলে রেখেছে। তার মা তাদের আত্মীয় হিসাবে স্বাগত জানাবে। তাদের আত্মীয় পরিচয়েই ওখানে থাকবেন। আর এখন সুষমা গেটে এসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে। কোন ঝামেলা হবে না।'

'ধন্যবাদ বেটা, তোমার কাজে কোন ফাঁক নেই। আল্লাহ তোমাকে আরও সাহায্য করুন।' বলল সাহারা বানু।

সাহারা বানু থামতেই শাহ বানু আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, 'আপনি তো সুষমাকে চিনতেন না। মাত্র একবার দেখা হয়েছে। কিন্তু আপনাদের কথা শুনে মনে হলো এক যুগ থেকে আপনাদের পরিচয়। কি করে এটা সম্ভব?'

'তোমাদের সাথেও আমার পরিচয় ছিল না। কিন্তু তোমরা কি আমাকে তোমাদের পরিবারের একজন করে নাওনি?'

'আমার প্রশ্ন এখানেই। কেন, কেমন করে এটা হতে পারে?' বলল শাহ বানু।

'শোন, তোমার কাজ যদি 'ফি সাবিলিল্লাহ' অর্থাৎ 'আল্লাহর ওয়াস্তে' হয়, তাহলে তাতে এমন একটা শক্তি সৃষ্টি হয়, এমন একটা বরকত আল্লাহ তাতে দেন যে, তোমার সততা, স্বার্থহীনতা ও উদ্দেশ্যের পবিত্রতার কথঅ আর বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন হয় না, প্রমাণ করার প্রয়োজন পড়ে না। এ কারণে ফলের জন্যে সময়ের প্রয়োজন হয় না। এক যুগের রেজাল্ট এক দিনেও পেয়ে যেতে পার।' আহমদ মুসা বলল।

'ফি সাবিলিল্লাহর অর্থ তো আল্লাহর জন্যে কাজ করা।' বলল শাহ বানু।

'হ্যাঁ, শুধু আল্লাহরই সন্তুষ্টির জন্যে, আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করা। আল্লাহ খুশি হন সেই কাজে যে কাজ নিরপরাধ কাউকে আঘাত করে না, যে

কাজে কোন অন্যায় অবিচার নেই, যে কাজে কোন অন্যায় পক্ষপাতিত্ব করা হয় না, যে কাজ মানুষের কল্যাণের জন্যে হয় এবং যে কাজ কারও ক্ষতির বিনিময়ে কারও কল্যাণ করে না।' আহমদ মুসা বলল।

'অনেকে ভাল কাজ বা কল্যাণের কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে সম্পর্কিত করতে চায় না। আল্লাহকে মানে না, এমন লোকও ভাল কাজ, কল্যাণেল কাজ করে বা করতে পারে।' বলল শাহ বানু।

'হ্যাঁ। করে, করতে পারে। এ ধরনের ভাল কাজের লোকদের উদাহরণ পচা ফলের মত। পচা ফলের কিন্তু সবটাই পচা হয় না। হয়তো ফলের বৃহত্তর অংশ, এমন কি ৯০ ভাগ অংশও ভাল থাকতে পারে। কিন্তু এর পরও মানুষ একে পচা ফলই বলে এবং মানুষ কিনতে চায় না সেটা পচা ফল সেজন্য। যাদের কাজের লক্ষ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ নয়, যারা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ও পছন্দ-অপছন্দের অনুসরণে কাজ করে না, তারা পচা ফলের সাথে তুলনীয় এই কারণে যে, তাদের সব কাজ মানুষের কল্যাণে হয় না, তারা সব ক্ষেত্রে অন্যায়-অবিচার থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। যেমন, একজন সহৃদয় ধনী লোক মানুষের কল্যাণে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করল। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, যে ধন তিনি অর্জন করেছেন, তার মধ্যে কালো টাকা আছে, তার সাথে জড়িয়ে আছে বহু বঞ্চিতের দীর্ঘশ্বাস, আর নির্যাতিতের কান্না। দেখা যাচ্ছে, এই ধনীর খরচটা প্রশংসার, কিন্তু উপার্জনটা নিন্দার। আল্লাহর প্রতি ঈমান নেই, বা ভয়-ভালবাসা নেই, এমন লোকদের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে তাদের শতকরা নব্বই জনই এই ধরনের মানুষ। দুচারজন এর ব্যতিক্রম হতে পারেন, যেমন আইয়ামে জাহেলিয়াতের ঘোর অন্ধকারেও হযরত আবু বকর (রা) ভাল লোক ছিলেন, নবী হওয়ার আগে আল্লাহর রসূল (স) সব দিক দিয়ে ভাল ছিলেন এবং হযরত খাদিজা (রা) সবদিক দিয়ে ভাল মহিলা ছিলেন।' থামল আহমদ মুসা।

'চমৎকার। ধন্যবাদ আপনাকে। কিন্তু 'ফি সাবিলিল্লাহর অনুসারী, মানে ভালো মানুষ হওয়া খুব কঠিন।' বলল শাহ বানু।

'না, খুবই সহজ। তুমি যদি আল্লাহকে ভালবাস এবং তার সৃষ্টিকে ভালবাস, তাহলে তোমার অলক্ষ্যেই তুমি ভাল মানুষ হয়ে যাবে। আল্লাহর প্রতি

ভালবাসাটা গাড়ির ষ্টিয়ারিং হুইল-এর মত। ষ্টিয়ারিং হুইল যেমন গাড়ির গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া ও ক্ষতিগ্রস্থ করা থেকে গাড়িকে রক্ষা করে, তেমনি আল্লাহর প্রতি ভালবাসা ও আল্লাহর সৃষ্টির জন্যে ভালবাসা মানুষের জীবনকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করে যাতে তার দ্বারা মানুষ শুধু কল্যাণই পায়, ক্ষতিগ্রস্থ না হয় এবং এই ভালবাসাই তাকে অন্যায়ের প্রতিবিধান ও প্রতিরোধে এমন কি জীবন-উৎসর্গেও উদ্বুদ্ধ করে।' থামল আহমদ মুসা।

থেমেই আহমদ মুসা বলে উঠল, 'সামনেই গভর্নর হাউজ আম্মা। আমরা এসে গেছি।'

নড়ে-চড়ে বসল শাহ বানু ও সাহারা বানু। কাপড় ও চুল ঠিক-ঠাক করার দিকে মনোযোগ দিল তারা।

আহমদ মুসা নীরব। তার দৃষ্টি সামনে।

গাড়ির গতি কমে এসেছে আগের চেয়ে।

# ৬

আহমদ মুসা ও হাজী আবদুল্লাহ ভাইপার দ্বীপের জনমানবহীন এলাকায় এসেছে।

আন্দামানের অন্যান্য দ্বীপের মত ভাইপার দ্বীপের জনবসতি ও বন্দর এবং উপকূলের উর্বর উপত্যকা কেন্দ্রীক এক সময় পাহাড়-জঙ্গল এলাকায় উপজাতিরা বাস করতো। বহিরাগত বসতির পর তারা আরও দুর্গম দ্বীপাঞ্চলে চলে গেছে।

দুপাশে ঝোপ-ঝাপ, আর মধ্য দিয়ে পুরানো পাথুরে রাস্তা। এই রাস্তা ধরেই এগুচ্ছে আহমদ মুসারা।

আহমদ মুসারা তখন একটা পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে শুরু করেছে।

হাঁটার সাথে কথা চলছিল।

বক্তা হাজী আবদুল্লাহ এবং শ্রোতা আহমদ মুসা। হাজী আবদুল্লাহ বলছিল দ্বীপের কথা, দ্বীপের মানুষের কথা। আর আহমদ মুসা কথাগুলেঅ গিলে যাচ্ছিল গো-গ্রাসে।

সামনে একটু উপরে একটা ভাঙা প্রাচীরের দিকে আঙুল তুলে হাজী আবদুল্লাহ বলল, 'ওটাই ভাইপার দ্বীপের জেলখানার প্রাচীর। জেলখানার মতই প্রাচীরটা পাহাড়ের তিনদিকে ঘেরা। পূর্ব দিকটায় পাহাড় খাড়া সাগরে নেমে গেছে বলে ওদিকে কোন প্রাচীর নেই।'

হাজী আবদুল্লাহ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'আর একটু উত্তরে সাগরে দাঁড়ানো 'রশ' দ্বীপ যেমন বৃটিশ ও এলিটদের বাসস্থান ও প্রশাসন কেন্দ্র হিসাবে বিখ্যাত ছিল, তেমনি এই 'ভাইপার' অপরাধীদের দ্বীপ হিসাবে বিখ্যাত ছিল। বৃটিশ ভারত থেকে যেসব দ্বীপান্তরিত কয়েদীদের জাহাজ বোঝাই করে আনা হতো, তাদের এ দ্বীপে নামানো হতো। আর তাদের ঢুকানো হতো ঐ প্রাচীর পার

করে জেলখানায়। জেলখানার ডান্ডাধারী দারোগারা ছাড়া তথাকথিত 'ভদ্রজন'রা ভুল করেও এ দ্বীপে পা রাখত না।'

প্রাচীরের গেটে এসে গেছে আহমদ মুসারা।

গেট নেই, গেটের কংকাল এখনও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

কংকালে লেগেছে সংস্কারের প্রলেপ। এ প্রলেপ দিয়েছে পুরাতত্ব বিভাগ।

প্রাচীন কংকালের উপর আধুনিক প্রলেপ বীভৎস এক শিল্পে পরিণত হয়েছে।

দমকা একটা বাতাসের সাথে সিগারেটের গন্ধ নাকে প্রবেশ করায় চমকে উঠল আহমদ মুসা। হাজী আবদুল্লাহর কাঁধে চাপ দিয়ে রাস্তার উপরেই বসে পড়ল আহমদ মুসা।

'কি ব্যাপার বেভান? কি হল? কোন কিছু দেখেছ? সন্দেহ করছ কিছু?' বিস্মিত কণ্ঠে একরাশ প্রশ্ন করল হাজী আবদুল্লাহ।

'কোন গন্ধ পাচ্ছেন না?' বলল আহমদ মুসা।

হাজী আবদুল্লাহ কিছু একটা বোঝার চেষ্টা করে বলল, 'হ্যাঁ। মনে হচ্ছে তামাকের গন্ধ। তাই না?'

'হ্যাঁ।'

এতক্ষণে সচেতন হয়ে উঠল হাজী আবদুল্লাহ। স্বর আরও নিচু করে বলল, 'তাহলে নিশ্চয় আশে-পাশে কেউ আছে। ধন্যবাদ বেভান যে, তুমি আগেই সাবধান হয়েছ।'

'গন্ধ হালকা। বাতাস পূর্ব দিকের। অতএব যিনি সিগারেট খেয়েছেন, তিনি প্রাচীরের ভেতরে ছিলেন।'

'পাহারা বসিয়েছে তাহলে?' বলল হাজী আবদুল্লাহ।

'অবশ্যই।' বলেই আহমদ মুসা হাতের রিভলবারটা পকেটে রেখে শোল্ডার হোলষ্টার থেকে উজি টাইপের ছোট্ট সাবমেশিনগান বের করে নিল।

আহমদ মুসার দেখাদেখি হাজী আবদুল্লাহও রিভলবার বের করে হাতে নিল।

‘আমাদের রাস্তা এড়িয়ে অন্য পথে সামনে এগুতে হবে’ বলে আহমদ মুসা হামাগুড়ি দিয়ে রাস্তার পশ্চিম পাশে নেমে পড়ল।

আহমদ মুসারা এগুতে লাগল গেটের পশ্চিম পাশে প্রাচীরে একটা ভাঙা জায়গার দিকে। আহমদ মুসা ভাবল, আমাদের আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। আমরা ওদের সিগারেটের গন্ধ পেলে ওরা আমাদের কথার শব্দ পেয়েও থাকতে পারে। তাহলে ওরাও নিশ্চয় সতর্ক হয়েছে।

পেছন থেকে একটা শুকনো ডাল ভেঙে পড়ার শব্দ আহমদ মুসার কানে এসে প্রবেশ করল। রুদ্ধশ্বাসে আরও কিছু শুনতে চেষ্টা করল আহমদ মুসা। হ্যাঁ, অখ- নিঃশব্দতার মধ্যে বাতাসে শব্দের অস্পষ্ট গুঞ্জন সম্বলিন ভারী একটা ঢেউ আসছে।

আহমদ মুসা নিশ্চিত যে কয়েক জোড়া পা এগিয়ে আসছে। আহমদ মুসা তার দুহাত মাটি ঘেঁষে সামনে বাড়িয়ে উজি সাবমেশিনগানের ট্রিগারে তর্জনি রেখে বুকে হেঁটে সামনে অগ্রসর হওয়া অব্যাহত রাখল।

ক্রলিং করে সামনে এগুচ্ছিল হাজী আবদুল্লাহ।

আহমদম মুসা ভাবছিল তারা আক্রমণে আসার আগে সে আক্রমণে যাবে কিনা। কিন্তু ওরা আক্রমণে আসছে না কেন? তারা কি কারও জন্য অপেক্ষা করছে? না তাদেরকে কোন ফাঁদে নিয়ে ওরা আটকাতে চায়।

চরম বিপদের সময় চুড়ান্ত সিদ্ধান্তের মুহূর্তে তার চিন্তা কখনও তাকে প্রতারিত করেনি।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে আহমদ মুসা।

ট্রিগারে ডান হাতের তর্জনি চেপে বাঁ হাতের বজ্র মুঠিতে উজিগানটা আঁকড়ে ধরে দেহটাকে উল্টে নিয়েছে পেছনের অদেখা শত্রুর উদ্দেশ্যে ট্রিগার টেপার জন্যে।

কিন্তু তার আগেই একটা কণ্ঠ হো হো করে হেসে উঠল। বলল, ‘বন্দুক ফে...........।’

আহমদ মুসা প্রস্তুত হয়েই নিজেকে উল্টে নিয়েছিল। আর ওরা হেসে উঠেছিল শত্রুকে পেছন থেকে আক্রমণ করার সুযোগ নিয়ে। ওদের লক্ষ্য ছিল

শত্রু দুজনকে নিরস্ত্র করা। পেছন ফিরে থাকা শত্রু আকস্মিক আক্রমণে আসবে এমনটা ভাবতে পারেনি বলে প্রথমে ট্রিগার টেপার সুযোগ তারা পেল না। এই সুযোগ পেল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা নিজেকে উল্টিয়ে নিয়ে ট্রিগার টিপতে একটু দেরি করেনি। শত্রুর হেসে উঠাকে সে আল্লাহর রহমত হিসাবে গ্রহন করেছিল। একটা সাধারন মানসিকতা হলো, আক্রমণে আসা যে শত্রু প্রথমে কথা বলে, সে কথার সাথে সাথে গুলী করে না। কারণ সে শত্রুকে কথা শোনাতে চায়। এ কারণেই ও পক্ষের রিভলবারও ষ্টেনগান টার্গেট লক্ষ্যে গুলী করার জন্যে প্রস্তুত ছিল না। তাই তারা আহমদ মুসাকে গুলী করতে উদ্যত দেখতে পেয়েও আগে গুলী করার সুযোগ নিতে পারেনি। এর ফলেই ওরা ব্রাস ফায়ারের মুখে পড়ে যায় এবং মুহূর্তে ওরা তিনজন লাশে পরিণত হয়ে যায়।

ব্রাস ফায়ার সম্পূর্ণ করেই আহমদ মুসা বলল, 'আসুন জনাব, আমরা পশ্চিম দিকের ঢিবি'র আড়ালে চলে যাই।'

ঢিবিটার দিকে ক্রলিং করে যাওয়া শুরু করেই বলেছে কথাগুলো আহমদ মুসা।

হাজী আবদুল্লাহও ক্রলিং করে চলতে শুরু করেছে আহমদ মুসার সাথে।

ঢিবি'র আড়ালে পৌছেই হাজী আবদুল্লাহ বলল, 'ধন্যবাদ বেভান। কিন্তু তুমি তার আগে গুলী করলে কেমন করে? আগেই ওদের টের পেয়েছিলে?'

'হ্যাঁ জনাব।'

'আমি তো তোমার সাথেই ছিলাম, কিন্তু কিছুই তো টের পেলাম না।'

'আপনার সব নজর সামনে ছিল। পেছনে কোন নজর ছিল না আপনার।' আহমদ মুসা বলল।

'চোখ সামনে দেখার জন্যে, পেছনে নজর রাখা যাবে কি করে?'

'পেছনের চোখ হলো কান।'

'বুঝেছি। ধন্যবাদ।' বলল হাজী আবদুল্লাহ।

'এবার সামনে নজর দিন।' আহমদ মুসা বলল।

‘কিন্তু এতটা সরে এসে এখানে লুকালাম কেন? পেছনে তো শত্রু নেই। সামনেও কাউকে দেখা যাচ্ছে না। আমরা সামনে এগুতে পারি।’

‘যাদের সিগারেটের গন্ধ পেয়েছি, তারা সামনে কোথাও লুকিয়ে আছে। এই গুলীর শব্দ শোনার পর তারা যাই মনে করুক যে কোন এ্যাকশনে তারা যাবে। হতে পারে সাথীদের সন্ধানে তারা প্রকাশ্যেই এগিয়ে আসবে। এই এগিয়ে আসার জায়গা করে দেবার জন্যেই আমরা তাদের পথ থেকে সরে এসেছি। আবার হতে পারে তারা এগুবে না। আমরা যেমন তাদের অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে আছি। তারাও তেমনি আমাদের জন্যে ওঁৎ পেতে থাকবে।’

‘বুঝলাম। এসব শিখতেই আমার জীবন শেষ হয়ে যাবে। আমি তো মনে করেছিলাম, গোপনে আসব, গোপনে হানা দেব ওদের আস্তানায়। ফলে আমরা জিতে যাব। কিন্তু এখন দেখছি, সাপে-নেউলের মত লড়াই।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ।

‘তাহলে আপনি এখানে অপেক্ষা করুন, আমি যাই।’

‘না বেভান, তুমি পাশে থাকলে আমার কোন ভয় নেই। আমি এ সুযোগ হাতছাড়া করব না।’

আহমদ মুসা কোন জবাব দিল না। তার অখ- মনোযোগ তখন সামনের দিকে।

ঢিবি’র আড়ালে বসে তারা দশ মিনিট পার করে দিল, কিন্তু ঐ পক্ষের সাড়া-শব্দ নেই। হাজী আবদুল্লাহ অধৈর্য্য কণ্ঠে বলল, ‘ওরা থাকলেও নিশ্চয় পিছু হটে গেছে।’

‘জনাব, এটা ওদের এলাকা। কি ঘটেছে তা না দেখে না জেনে ওরা পিছু হটতে পারে না। আর ওদের এ ঘাঁটির নিকটবর্তী একটা অবস্থান থেকে এতটুকুতেই ওদের পিছু হঁটা স্বাভাবিক নয়।’

‘কিন্তু ওদের চুপ-চাপ বসে থাকা কি স্বাভাবিক?’ বলল হাজী আবদুল্লাহ।

আহমদ মুসার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে চোখ থেকে নাইট ভিশন গগলসটি খুলে হাজী আবদুল্লাহর চোখে পরিয়ে দিয়ে তারা যেখান থেকে সরে এসেছে সে দিকে অঙ্গুলি সংকেত করে ফিসফিসিয়ে বলল, ‘দেখুন।’

হাজী আবদুল্লাহ সেদিকে তাকিয়ে সোৎসাহে কিছু বলার জন্যে মুখ হা করেছিল।

আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি তার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, 'একটু শব্দ নয়।'

'স্যরি। তোমার কথাই ঠিক বেভান। তুমি দেখছি পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে সামনের অবস্থাকে অংকের রেজাল্ট-এর মত নিখুঁত বলে দিতে পারে। ধন্যবাদ তোমাকে।' বলল হাজী আবদুল্লাহ ফিসফিসে কণ্ঠে।

আহমদ মুসার মনোযোগ তখন অন্যদিকে। ওরা চারজন এগিয়ে আসছে। ওরা নিশ্চয় তাদের সাথীদের লাশ পর্যন্ত এগুবে। এর মধ্যে তাদের কাবু করতে হবে।

'আসুন জনাব।' হাজী আবদুল্লাহকে লক্ষ্য করে কথাটা বলে ক্রলিং করে এগুতে লাগল আহমদ মুসা।

হাজী আবদুল্লাহ তাকে অনুসরণ করল।

আহমদ মুসা ডান হাতের তর্জনী ষ্টেনগানের ট্রিগারে রেখে ষ্টেনগানটা বাগিয়ে ধরে একহাতে ক্রলিং করে আগাছার মধ্যে জিনেকে যথাসম্ভব গোপন রেখে বিড়ালের মত নিঃশব্দে এগুতে লাগল।

এক সময় হাজী আবদুল্লাহ ফিসফিস করে বলে উঠল, 'বেভান, ওরা কিন্তু গুলীর রেঞ্জে আছে। তাহলে আর এগুনো কেন?'

কোন জবাব না দিয়ে 'আসুন' বলে আহমদ মুসা এগিয়ে যাওয়া অব্যাহত রাখল।

আহমদ মুসা তার নাইট ভিশন গগলস-এর মাধ্যমে দেখল সামনে এগুনো চারজনের একজন হঠাৎ থমকে গেল। পকেট থেকে মোবাইল বের করে কথা বলেই চমকে উঠে তাকাল পশ্চিমে মানে আহমদ মুসাদের দিকে। পেছন দিকে তাকিয়ে কি বলার পর সকলেই থমকে দাঁড়াল।

চমকে উঠল আহমদ মুসাও। টেলিফোন পেয়েই এদিকে তাকানো এবং সকলকে থামিয়ে দেয়ার অর্থ একটাই যে তারা নতুন কোন ইনফরমেশন পেয়েছে। সেই ইনফরমেশন নিশ্চিত এই হতে পারে যে, আহমদ মুসাদের অবস্থান

ও এগুনো সম্পর্কে ওদের জানানো হয়েছে। কে জানাতে পারে, কে তাদের অবস্থান জানতে পারে? দূর থেকে তাদের দেখা সম্ভব নয়, তাহলে কি কাছে থেকে কেউ তাদের ফলো করছে? তা হয়ে থাকলে সে বা তারা আক্রমণে আসছে না কেন? সে কি আক্রমণের অবস্থানে নেই, দূরে কোন জায়গায় অবস্থান করছে? কোন উঁচু স্থান বা পাহাড়ের উপরের উপযুক্ত কোন স্থান থেকে তাদের আলোতে দূরবীনের মাধ্যমে তাদের দেখা যেতেও পারে।

চারদিকে তাকাল আহমদ মুসা।

তার চোখ ভাঙা গেটের উপর দিয়ে যাবার সময় ভাঙা গেটের উঁচু একাংশের মাথায় তারকার মত একটা আলো নিভে যেতে দেখল। আলোটা ছোট টর্চের অথবা মোবাইলের লাইভ স্ক্রীনেরও হতে পারে।

উঁচু গেটের দুপাশে এক সময় পর্যবেক্ষণ টাওয়ার ছিল। তারই একটা এখনও টিকে আছে, যা এখন সংস্কার করা হয়েছে। হতে পারে ওপাশে টাওয়ারে উঠার সিঁড়িও রয়েছে। পর্যবেক্ষণ টাওয়ারে কেউ অবস্থান করছে না, এখন কেউ উঠেছে চারিদিক দেখার জন্যে যদি এটাই হয়ে থাকে, তাহলে তার ব্যবস্থাই আগে করতে হবে। তা না হলে সেই তো সব দিকে খবর দিয়ে দেবে, ভাবল আহমদ মুসা।

'জনাব, আপনি এখানে বসে সামনের দিকে চোখ রাখুন। ওরা যদি এদিকে আগায়, তাহলে আপনি পিছু হটবেন। এর মধ্যে আমি এসে যাব ইনশাআল্লাহ।' আহমদ মুসা বলল হাজী আবদুল্লাহকে।

'তুমি কোথায় যাচ্ছ?' বলল হাজী আবদুল্লাহ। তার কণ্ঠে উদ্বেগ।

'বেশি দূরে নয়। গেটের ঐ টাওয়ারে যাব। সম্ভবত টাওয়ার থেকে কেউ আমাদের দেখতে পেয়েছে এবং সে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছে। ওর ব্যবস্থাটা এখনই করতে হবে।'

বলে আহমদ মুসা ক্রলিং করেই পিছু হটতে লাগল। চলে গেল একদম ঢিবিটার আড়ালে। ঢিবির আড়ালে গিয়ে সে বাঁক নিল উত্তর দিকে। ফাঁকা জায়গা এড়িয়ে ঝোপ-ঝাড়, আগাছা, ইত্যাদির আড়াল নিয়ে দ্রুত এগুলো সে। ভাঙা

প্রাচীর পেরিয়ে আরও উত্তরে এগিয়ে একদম টাওয়ারের পেছনে চলে গেল। তারপর মাটি কামড়ে ক্রলিং করে টাওয়ারের দিকে এগুলো আহমদ মুসা।

টাওয়ারের গোড়ায় গিয়ে পৌছল সে।

টাওয়ারের পশ্চিম পাশে প্রাচীরের গায়ের সাথে লাগানো সিঁড়ি উঠে গেছে টাওয়ার বক্সে। সিঁড়িটা বেশ খাড়া।

খুশি হলো আহমদ মুসা। সিঁড়ি যত ফ্ল্যাট হবে, টাওয়ার বক্স থেকে সিঁড়িটা ততো বেশি দেখা যাবে। আর এই খাড়া সিঁড়ি দিয়ে কেউ উঠলে তার মাথা বক্সের ফ্লোর লেভেলে না ওঠা পর্যন্ত বক্সের ভেতর থেকে দেখা যাবে না।

ডান হাতে রিভলবার বাগিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিঃশব্দে উঠতে লাগল আহমদ মুসা।

আর চার ধাপ বাকি। মাথাটা ইতিমধ্যেই ফ্লোর লেবেলে চলে গেছে।

আহমদ মুসা রিভলবারের ট্রিগারে হাত চেপে টাওয়ার বক্সের উপর অনড় দৃষ্টি রেখে আর এক ধাপ উপরে উঠল।

উঠার সঙ্গে সঙ্গেই আহমদ মুসা মুখোমুখি হলো এক যুবকের। সে সিঁড়ি মুখের দিকেই আসছিল। তারও হাতে রিভলবার, তবে হাতে ঝুলানো। তার মানে সে আহমদ মুসাকে আগে দেখতে পায়নি তাই দেখতে পেয়েই বিস্ময়ের এক ধাক্কা তাকে মুহূর্তের জন্যে বিমূঢ় করে তুলেছিল। পরমুহূর্তেই যুবকটির মধ্যে একটা বেপরোয়া ভাব ফুটে উঠল এবং রিভলবার ধরা তার ডান হাতটি বিদ্যুত বেগে উপরে উঠে এল।

আর আহমদ মুসা এই সাক্ষাতের জন্যে প্রস্তুত ছিল। তার তর্জনি রিভলবারের ট্রিগারে ছিল প্রস্তুত হয়ে। সুতরাং বেপরোয়া যুবকটি যখন তার রিভলবার আহমদ মুসার দিকে তুলে আনছিল, তখন আহমদ মুসার তর্জনি ট্রিগারে চেপে বসল। গুলী গিয়ে বিদ্ধ করল যুবকটির বুক।

গুলী খেয়েও যুবকটি তার রিভলবারের ট্রিগার টিপেছিল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে। কিন্তু শিথিল হয়ে পড়া কম্পিত হাতের গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। আহমদ মুসা দ্রুত তার পকেট সার্চ করে কাগজপত্র ধরনের কিছুই পেলো না। মানি ব্যাগে

টাকা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আহমদ মুসা মানিব্যাগ যুবকের পকেটে রেখে মোবাইল ও তার রিভলবার নিয়ে দ্রুত নিচে নেমে এল।

আহমদ মুসা যথাসম্ভব নিঃশব্দে দ্রুত চলল সেই চারজনের দিকে।

ওরা চারজন তাদের পেছনে টাওয়ারে গুলীর শব্দ শুনে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। তারা তাদের খবর নেবার জন্যে সামনে এগুবে, না ওঁৎ পেতে শত্রুর দিকে এগুবে, না টাওয়ারের খোঁজ নেবে বুঝতে পারছিল না।

চারদিকেই তারা সতর্ক দৃষ্টি রাখছিল।

আহমদ মুসার এগিয়ে আসাটা তাদের নজরে পড়ে গেল। তাদের একজন চিৎকার করে উঠল, 'কে, জিম?'

কোন উত্তর এল না।

টাওয়ারে অবস্থান নেয়া লোকটিরই নাম সম্ভবত ছিল জিম।

উত্তর না পেয়েই তারা ঐ দিক লক্ষ্য করে গুলীবর্ষণ শুরু করে দিল।

ওরা চারজন আহমদ মুসার নজরে সব সময়ই ছিল। তার নাইট ভিশন গগলস থাকায় তাদের প্রতিটি কার্যকলাপ সে লক্ষ্য করছিল।

ওরা 'কে, জিম?' বলে ডাকার সাথে সাথেই আহমদ মুসা বুঝতে পেরেছিল যে, সে তাদের নজরে পড়ে গেছে। সংগে সংগেই আহমদ মুসা দ্রুত বাঁ দিকে গড়াতে লাগল। সুতরাং ওদের গুলীবর্ষণ বৃথাই গেল। তার উপর গুলীবর্ষণের শব্দ এবং ওদের মনোযোগ একদিকে স্থির হবার সুযোগে আহমদ মুসা গড়িয়ে ওদের বাম পাশে চলে এল।

আহমদ মুসা আরও গড়িয়ে ওদের চারজনের পেছনে চলে গেল। এখন হাজী আবদুল্লাহকেও ভাল দেখা যাচ্ছে। সে রিভলবার বাগিয়ে স্থির বসে আছে। মনে মনে তার সাহসের প্রশংসা করল আহমদ মুসা। মনে মনে ভাবল, নিশ্চয় হাজী সাহেবের উজ্জ্বলতর একটা অতীত আছে।

ওরা চারজন এখন বিমূঢ়। কোন দিকে যাবে স্থির করতে পারছে না। আসলে টাওয়ারে গুলী এবং ওদিক থেকে কারো এদিকে আসার আলামত তাদের ধাঁধায় ফেলেছে।

এবার আহমদ মুসা পেছন থেকে ওদের ক্লোজ হবার জন্যে বিড়ালের মত নিঃশব্দে সামনে এগুতে লাগল।

আহমদ মুসা ওদের একেবারে কাছাকাছি পৌছতে চায়।

সে ধীরে সন্তর্পনে এগিয়ে একেবারে ওদের পেছনে গিয়ে পৌছল।

ষ্টেনগানের ট্রিগারে তর্জনি রেখে ওদের দিকে তাক করে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা। আহমদ মুসা সবে ওদের অস্ত্র ফেলে হাত তুলে দাঁড়াবার নির্দেশ দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই এদিকে হঠাৎ ফিরে দাঁড়ানো ওদের একজনের নজরে পড়ে গেল আহমদ মুসা।

অদ্ভুত ক্ষীপ্র গতির লোকটি। আহমদ মুাস তার নজরে পড়ার সাথে সাথেই বিদ্যুত গতিতে সে রিভলবার তুলল আহমদ মুসার দিকে।

বিস্মিত আহমদ মুসার কোন উপায় ছিল না তার ষ্টেনগানের ট্রিগার টেপা ছাড়া। যুবকটির রিভলবার তোলা দেখে অন্যেরাও চোখের পলকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

তর্জনি দিয়ে ট্রিগার চেপে ধরল আহমদ মুসা। ঘুরিয়ে নিল ষ্টেনগান ওদের উপর দিয়ে।

মুহূর্তেই ওরা লাশ হয়ে পড়ে গেল।

মন খারাপ হয়ে গেল আহমদ মুসার। আহমদ মুসা চেয়েছিল ওদের বন্দী করে কিছু কথা আদায় করার।

হাজী আবদুল্লাহ এসে দাঁড়াল আহমদ মুসার পাশে। বলল, ‘এখানে বেভান নয়, শোন আহমদ মুসা, আমার অবস্থা দাঁড়িয়েছে খোয়াজ-খিজিরের সাথে সফরে বের হওয়া মুসা (আ)-এর মত। তবে পার্থক্য এই যে, প্রশ্ন করলেই সফর শেষ করার শর্ত করেছিলেন খোয়াজ-খিজির, কিন্তু তুমি সে রকম কোন শর্ত দাওনি। অতএব প্রশ্ন আমি করতে পারি।’

‘প্রশ্ন করার সময় আপনি পাবেন জনাব, তবে এখন নয়। এত গোলাগুলীর পর ভেতরে যারা আছে, খোঁজ নিতে অবশ্যই আসবে। অতএব চলুন আমরা আড়াল নিয়ে একটু একটু করে সামনে আগাই। তার আগে আসুন মৃত সকলের পকেট সার্চ করে দেখি কোন দরকারী কাগজপত্র পাওয়া যায় কিনা।’

সব পকেট খালি। কাগজপত্র কিছুই পেল না।

রাস্তার পাশ দিয়ে ঝোপ-জংগলের আড়াল নিয়ে আবার সামনে এগুতে লাগল আহমদ মুসারা।

আহমদ মুসার বাম পকেটের মোবাইলটি বেজে উঠল।

মোবাইলটি সেই টাওয়ারে নিহত যুবকের কাছ থেকে নিয়ে এসেছিল।

আহমদ মুসা মোবাইলটি বের করে তাকাল স্ক্রীনের দিকে। স্ক্রীনে 'ঝঝঝ' এই তিন বর্ণ ভেসে উঠেছে।

নিশ্চয় এটা কোন নামের সংকেত।

কিছুই বুঝল না আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা 'কল অন' করে মোবাইলটিকে কানের কাছে নিল।

ওপার থেকে কোন ভারী কণ্ঠ 'জিম' 'জিম' বলে চিৎকার করছে। কয়েকবার ডেকে সেই কণ্ঠ চিৎকার করে বলল, 'তুমি কোথায় জিম? কি হয়েছে ওদিকে? এত গোলা-গুলী কেন?'

আহমদ মুসা শুধু শুনছিল, জবাব দিচ্ছিল না।

জবাব না পেয়ে সম্ভবত পাশের একজনকে বলল, 'কিছু বুঝতে পারছি না। এ দিকে হোটেলের ভেতর থেকে সোমনাথ শম্ভুজী তার বডিগার্ডসহ নিখোঁজ এবং আহমদ আলমগীরের মা-বোনকে হোটেলে পাওয়া যায়নি। এদিকে আবার সেই একই সন্ধ্যায় আমাদের দোর গোড়ায় গোলাগুলীর ঘটনা ঘটল। আমি নিশ্চিত, জিমসহ আমাদের লোকরা অসুবিধায় না পড়লে মোবাইল নিরব হতো না এবং কি ঘটেছে তার খবর আমাদের কাছে পৌছে যেত। এটাই ভাববার বিষয় কি ঘটেছে।'

ভারী কণ্ঠটি থামতেই আরেকটি কণ্ঠ বলল,'ওখানে আমাদের নয়জন লোক পাহারায় আছে। সকলের একসাথে কিছু হবে এটা স্বাভাবিক নয়। ঠিক আছে, আমি ও নটবর ওদিকটা দেখে আসছি।'

কণ্ঠটি থামতেই সে ভারীকণ্ঠ আবার কথা বলে উঠল, 'না দেবানন্দ আমিও যাব। কি ঘটেছে আমি দেখতে চাই। তোমরা ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবো না।'

থামল ভারীকণ্ঠটি। কণ্ঠটি থামতেই সেই দেবানন্দের কণ্ঠ আবার বলল, 'কিন্তু গংগারাম একা থাকবে এখানে?'

মোবাইল মুহূর্তের জন্যে থামল। তারপর সেই ভারীকণ্ঠ আবার বলল, 'তাহলে.............।'

হঠাৎ তার কণ্ঠ থামিয়ে দিয়ে আর একটি নতুন কণ্ঠ, হয়তো নটবরের, বলল, 'স্বামীজী, আপনার মোবাইল খোলা আছে। বন্ধ করে দিন।'

'ও, তাইতো'- স্বামীজীর এই কণ্ঠের সাথে সাথেই মোবাইল সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

তবু খুশি হলো আহমদ মুসা। জানা গেল, ওরা এদিকে আসছে খোঁজ-খবর নেবার জন্যে এবং গংগারাম ওখানে বন্দী অবস্থায় আছে। কিন্তু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল, 'তাহলে'-র পর স্বামীজী কি বলেছেন তা নিয়ে? সেটা নিশ্চয় গংগারাম সম্পর্কে কথা। কি কথা? খুব খারাপ সিদ্ধান্ত নয় তো! মনের উদ্বিগ্নতা আহমদ মুসার আরও বাড়ল।

হাজী আবদুল্লাহ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছিল। আহমদ মুসা মোবাইলে যা শুনেছিল তা তাকে জানিয়ে বলল, 'চলুন, ওদের আসা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব না।'

কথা শেষ করেই চলতে শুরু করল। হাজী আবদুল্লাহও।

রাস্তা থেকে কিছু দূরে এগিয়ে ঝোপ ঝাড় আগাছার মধ্যে দিয়ে নিজেদের যতটা সম্ভব আড়াল করে সামনে এগুতে লাগল।

বাউন্ডারী প্রাচীরের মতই কারাগারটিও পাহাড়ের তিন দিক ঘিরে। কিন্তু কারাগারটি এখন সে অবস্থায় না থাকলেও কংকালটাকে বলা যায় যতেœর সাথেই দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। কিছু কিছু অংশ ব্যবহারযোগ্যও হয়েছে।

আহমদ মুসারা যেদিকে এগুচ্ছিল, তার সামনে কারাগারের যে অংশ দেখা যাচ্ছে তা কয়েদীদের জেনারেল ব্যারাকের মত নয়। এ অংশটি যেমন ব্যারাকের লেভেল থেকে বেশ উঁচু, তেমনি দরজা জানালার সাইজও ভিন্ন রকমের এবং বড়। আহমদ মুসা দেখেই বুঝল, এটা কারাগারের অফিস-অংশ। প্রধান রাস্তাটা তাই ওদিকেই গেছে।'

আহমদ মুসারা কারাগারের অনেকটা কাছে পৌছে গেছে। কিন্তু ওরা দুজন স্বামীজীসহ এখনও তো বের হলো না। ওরা কি মত পাল্টেছে? মোবাইল খোলা দেখার পর ওরা কি কোন কিছু সন্দেহ করেছে? ওরা কি ভিন্ন কৌশল নিয়েছে? ইত্যাদি প্রশ্ন আহমদ মুসাদের কি করণীয় এ ব্যাপারে আহমদ মুসাকে চিন্তায় ফেলে দিল।

একটা ঘর আগাছার মধ্যে দিয়ে আহমদ মুসারা তখন যাচ্ছে। গাছগুলো একফুট দেড়ফুটের বড় নয়, কিন্তু ঘন হওয়া এবং ক্রলিং করা অবস্থার কারণে চারদিকের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ওরা রাস্তা বাদ দিয়ে অন্যভাবেও তো আসতে পারে।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

সোজা উত্তরে কারাগারের সম্মুখ ও সামনের রাস্তার দিকেই তার দৃষ্টি গেল প্রথম।

আহমদ মুসা দাঁড়াবার পর মুহূর্তেই বাঁ দিক থেকে একটা কণ্ঠের চিৎকার ভেসে এল, 'হাতের ষ্টেনগান ফেলে দিয়ে হাত তুলে দাঁড়াও, না হলে তোমার মাথার খুলি উড়ে যাবে এখনি।'

কিছুটা অসতর্ক ভাবেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়েছিল। তার ষ্টেনগানটা তার ডান হাতে ঝুলছে। আর আক্রমণটা এসেছে সামনে থেকে নয়, একদম পাশ থেকে। ওদের উদ্যত রিভলবার বা ষ্টেনগানের মুখে তার অপ্রস্তুত ষ্টেনগানকে টার্গেট পর্যন্ত তুলে নিয়ে সফল হওয়া অস্বাভাবিক। আহমদ মুসা দ্রুত ভাবছিল বিকল্প নিয়ে।

ঠিক এ সময় আহমদ মুসার তার পেছন থেকে প্রায় একই সাথে দুটি গুলীর শব্দ শুনল। বুঝল এ গুলী হাজী আবদুল্লাহর।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াবার সময় একটু সামনে এগিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। তার ফলেই হাজী আবদুল্লাহ পেছনে পড়েছিল।

আহমদ মুসা ষ্টেনগান উঁচিয়ে ধরে তাকাল বাঁ দিকে। দেখল, বাঁ দিকে রাস্তার ওপারে পাশাপাশি দাঁড়ানো দুজন যুবক টলতে টলতে পড়ে যাচ্ছে।

আহমদ মুসা বসে পড়ল।

হাজী আবদুল্লাহ উঠে দাঁড়াচ্ছিল তখনই। আহমদ মুসা বলল, 'বসুন জনাব, ওদের আর একজন আছে।'

বসে পড়ল হাজী আবদুল্লাহ।

'ধন্যবাদ। কনগ্রাচুলেশন জনাব। আপনি ঠিক সময়ে গুলী করেছেন।' বলল আহমদ মুসা হাজী আবদুল্লাহকে।

'ধন্যবাদের কিছু নেই আহমদ মুসা। আমি টেনশনমুক্ত অবস্থায় ধীরে-সুস্থে, মেপে-জুকে গুলী করার সুযোগ পেয়েছি। এমনভাবে সফল হতে যে কেউ পারে।' হাজী আবদুল্লাহ বলল।

'আপনি লুকোচ্ছেন জনাব। কে বলল টেনশন ছিল না। আপনার গুলী ব্যর্থ হলে ওদের পরমুহূর্তের পাল্টা গুলী আমাকে, আপনাকে কাউকে রেহাই দিত না। আপনার হাত অভ্যস্ত ও নিখুঁত। আপনি লুকোলেও আপনার এক অতীত আছে। আমাকে সাহায্য করা এবং এই অভিযানে আপনার শামিল হওয়া থেকেই আমি এটা বুঝেছি।' আহমদ মুসা কথাগুলো বলছিল রাস্তার ওপারে তার অপলক চোখ নিবদ্ধ রেখে।

হাজী আবদুল্লাহ আহমদ মুসার কথার কোন জবাব না দিয়ে আহমদ মুসার দৃষ্টি আনুসরণ করে রাস্তার ওপারে তাকিয়ে বলল, 'ওদের সাথে আরো কেউ থাকলে সে সংগে সংগেই জবাব দেবার কথা।'

'সে এদের সাথে নাও থাকতে পারে, কিন্তু কোথাও থাকার কথা।' বলে আহমদ মুসা আবার মাথা উপরে তুলল।

হাজী আবদুল্লাহও।

উত্তরে রাস্তা বরাবর কারাগারের সামনে চোখ পড়তেই আহমদ মুসা দেখতে পেল, একজন বিশাল বপু লোক লাঠি হাতে দৌড়ে কারাগারের ভেতরে ঢুকে গেল।

হাজী আবদুল্লাহও দেখতে পেয়েছে ব্যাপারটা এবং সেই প্রথম কথা বলে উঠল, 'ঐ তো সে পালাচ্ছে।'

'হ্যাঁ জনাব, ইনিই সম্ভবত এদের এক নেতা স্বামীজী।'

বলেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আসুন দৌড় দিতে হবে।' সে গংগারামের ক্ষতি করতে পারে, যদি গংগারাম এখনও বেঁচে থাকে।'

ছুটল আহমদ মুসা কারাগার লক্ষ্যে।

দুজনেই ছুটছে।

কারাগারের সামনে পৌছেই তার ষ্টেনগান থেকে গুলীবর্ষণ শুরু করল আহমদ মুসা।

গুলী করতে করতেই ঢুকল কারাগারে।

আহমদ মুসার পেছনে পেছনে ছুটছে হাজী আবদুল্লাহ।

'আমরা এভাবে গুলীর দেয়াল সৃষ্টি করে তাকে জানান দিলে তাতে তার পালানোর সুবিধা হয়ে যাবে না?' বলল হাজী আবদুল্লাহ আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে।

'ও এমনিতেই পালাবার চেষ্টা করবে। তার মধ্যে আতংক সৃষ্টি করতে চাই যাতে করে সে গংগারামের ক্ষতি করার সুযোগ না পায়।' আহমদ মুসা বলল।

পুরাতত্ব বিভাগের ঝুলানো আলোকোজ্জ্বল কয়েকটি সাইনবোর্ড দেখে সামনে এগুলো আহমদ মুসারা।

সামনে পেল অন্ধকার করিডোর। সামনে এগুবে, না কোন দিকে যাবে ভাবছিল আহমদ মুসা।

তার পাশে এসে দাঁড়াল হাজী আবদুল্লাহ। সে বলে উঠল,'বেভান, তুমি তাকিয়ে দেখ, করিডোরের শেষ প্রান্তের অন্ধকার কিন্তু ফিকে। মনে হচ্ছে ডান দিক থেকে একটা হালকা আলোর রেশ অন্ধকারের উপর এসে পড়েছে।'

'ঠিক বলেছেন জনাব।' বলে সেদিকে ছুটল আহমদ মুসা।

ঐ প্রান্তে আহমদ মুসারা দেখল, করিডোরটি ওখানে ডানদিকে বাঁক নেবার পর কিছুটা এগিয়ে আবার ডান দিকে বাঁক নিয়েছে। বাঁকের ওদিক থেকেই উজ্জ্বল আলো বেরিয়ে এসেছে। সেই আলোই দেয়ালে প্রতিবিম্বিত হয়ে পেছনের অন্ধকার করিডোরের উপরে পড়েছে।

করিডোর ধরে আলোর দিকে চলল আহমদ মুসারা।

আলোর উৎস করিডোরটা দীর্ঘ। মাঝ বরাবার জায়গায় আলো জ্বলছে।

আলোর নিচে পৌছতেই আহমদ মুসার চোখে পড়ে গেল একটা সিঁড়ি হাতের বাঁয়ে মানে পূর্ব দিকে নেমে গেছে। আহমদ মুসা আন্দাজ করল, তারা ঘুরে ঘুরে আবার কারাগারের প্রশাসনিক অংশের মাঝামাঝি জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে।

আহমদ মুসা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামার সিদ্ধান্ত নিল। ভাবল সিঁড়ি নিশ্চয় আন্ডার ফ্লোরে গেছে। স্বামীজী পালিয়ে সেখানে আশ্রয় নিতে পারে। অথবা আরো কোন রহস্য বা পথের সন্ধান সেখানে পাওয়া যেতে পারে।

আহমদ মুসা তখন পা বাড়িয়েছে সিঁড়িতে নামার জন্যে।

হঠাৎ ক্ষীণ চিৎকারের আওয়াজ এল সামনের করিডোরের খুব নিকটের কোথাও থেকে।

সে থমকে দাঁড়াল।

ছুটল আবার শব্দ লক্ষ্যে।

হাজী আবদুল্লাহও।

সামনে কিছুটা এগিয়ে হাতের ডান পাশে পেল আবছা অন্ধকার একটা করিডোর। নিচে আলো দেখা যাচ্ছে। সেই আলোরই কিছুটা এসে পড়েছে সিঁড়িতে।

চিৎকার আসছে নিচের কোন এক স্থান থেকে।

আহমদ মুসারা নিচে নেমে গিয়ে শব্দ লক্ষ্যে এগুলো।

একটা ঘরে বাঁধা অবস্থায় পেল গংগারামকে।

আহমদ মুসা তার হাত-পায়ের বাঁধন কেটে তাকে তুলে জড়িয়ে ধরল। বলল, 'তুমি ঠিক আছ তো গংগারাম?'

'ঠিক আছি স্যার। কিন্তু ওরা মানুষ নয়।' বলে কেঁদে উঠল গংগারাম।

'গংগারাম, ওরা শাস্তি পেয়েছে। বাইরে ওরা দশজন মরেছে। শুধু খুঁজে পাচ্ছি না স্বামীজীকে। সে তো এদিকেই পালিয়ে এসেছে।'

'ঐ স্বামীজীই তো সব স্যর। সে আমাকে ইলেক্ট্রিক শক দিয়েছে। তরবারির আগা দিয়ে আমার বুকে ত্রিশূল এঁকেছে। খুনি কাপালিক সে।' বলল গংগারাম আর্তকণ্ঠে।

'কিন্তু সে গেল কোথায়?' আহমদ মুসা বলল।

‘স্যার ওদের আলাপে শুনেছি, কাছেই কোথাও সিঁড়িপথ আছে এই পাহাড় থেকে বের হবার।’ বলল গংগারাম।

‘তাহলে আমরা আসার পথে যে সিঁড়ি দেখে এলাম, সেটা কি? ঐ সিঁড়িটা পূর্ব দিকে নেমে গেছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ওটাই হবে আহমদ মুসা। আমি তো পেছনে ছিলাম। আমি আসার সময় সিঁড়ি পথ বন্ধ হতে দেখে এসেছি।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ।

‘ওদিকটা তাহলে দেখতে হয়।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কোন লাভ হবে না আহমদ মুসা। যে জোরে সে দৌড় দিয়েছে তাতে এতক্ষণে পগার পার। আমি সুড়ঙ্গটা দেখেছি। সেটা পাহাড়ের পূর্বমুখী খাড়িতে গিয়ে শেষ হয়েছে। ওখান থেকে মটর বোটে চড়ে এক মিনিটের মধ্যেই দ্বীপ থেকে বের হওয়া যায়। সুতরাং প-শ্রম না করে এস তোমাকে একটা ভাল কাহিনী শোনাব।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ।

‘কাহিনী? এই সময়?’ একটা কৌতুকমিশ্রিত হাসি ফুটে উঠল আহমদ মুসার মুখে।

‘কাহিনী মানে রূপকথা নয়, জীবন্ত এক ইতিহাস।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ।

আহমদ মুসা প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল হাজী আবদুল্লাহর দিকে।

হাজী আবদুল্লাহ আহমদ মুসাকে হাত ধরে নিয়ে গেল ঘরের একমাত্র দরজাটির সামনে।

ঘরের দরজা লোহার মোটা শিকের তৈরি, কিন্তু চৌকাঠ শাল কাঠের।

পাশের চৌকাঠের একটা জায়গা হাজী আবদুল্লাহ হাত দিয়ে পরিষ্কার করল। তারপর ছুরি বের করে তার ফলা দিয়ে খুঁচিয়ে পরিষ্কার করে একটা কিছু বের করল। সামান্য একটু দূরে দাঁড়িয়ে বলল, ‘এস আহমদ মুসা, পড়।’

আহমদ মুসা চৌকাঠটির মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াল। তাকাল হাজী আবদুল্লাহর দেখানো স্থানটার দিকে।

আরবী বর্ণমালা নজরে পড়ল তার। পড়ল, ‘শেরখান।’ একজন লোকের নাম।

‘দেখলাম। সম্ভবত কোন বন্দী ছিলেন শেরখান।’ হাজী আবদুল্লাহকে লক্ষ্য করে বলল আহমদ মুসা।

‘হ্যাঁ বন্দী। শুধু বন্দী নয়, একজন বীর বন্দী। শুধু একজন বীর বন্দী নয়, একজন শহীদ বীর বন্দী। তাঁর ফাঁসির পূর্ব পর্যন্ত এই ঘরেই বন্দী ছিলেন তিনি। শুনেছি তিনি বহু কষ্টে এক টুকরো কাঁচ যোগাড় করে সেই কাঁচ দিয়ে খোদাই করে তার নামটাকে এ কাঠের গায়ে লিখে রাখার চেষ্টা করেছে। সে হয়তো জানতো তার নামে ভারতে কোন মনুমেন্ট হবে না, কেউ স্মরণও করবে না তার কথা। আমার আনন্দ যে, তার নামটা তোমাকে আমি দেখাতে পারলাম।’ থেমে গেল হাজী আবদুল্লাহ। কান্নায় বন্ধ হয়ে গেল তার কথা। তার দু’গ- বেয়ে নেমে এল অশ্রুর ধারা।

গম্ভীর হয়ে উঠেছে আহমদ মুসা। সে তার এক হাত হাজী আবদুল্লাহর কাঁধে আস্তে আস্তে রেখে বলল, ‘স্যরি জনাব, আমিও তাকে চিনি না, তার নাম জানি না।’

চোখ মুছে হাজী আবদুল্লাহ বলল, ‘তোমার জানার কথা নয়। বৃটিশ ঐতিহাসিকরা ভারতের বৃটিশ শাসনকর্তা লর্ড মেয়োকে হত্যাকারী এতবড় ক্রিমিনাল শেরখানের নাম ঘৃণাভরেই লেখেনি। পরে ভারতের ইতিহাস তাকে স্মরণ করেনি, কারণ সে মুসলিম ছিল। আর পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ঐতিহাসিকদের চোখে এমনকি কাছের অনেক বড় জিনিসও পড়ে না, আন্দামানের শেরখান তাদের চোখে পড়বে কেমন করে?’

‘ভারতের বৃটিশ শাসক লর্ড মেয়ো কি আন্দামানে নিহত হন?’ জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

‘হ্যাঁ। আন্দামানে মাউন্ড হেরিয়েট দ্বীপে তিনি নিহত হন। ওখানে ‘ইয়াবু’ পর্বত থেকে সূর্যাস্তের অপরূপ দৃশ্য চোখে পড়ে। আন্দামান সফরে আসা লর্ড মেয়ো সূর্যাস্ত দেখার জন্যে ইয়াবু পর্বতে গিয়েছিলেন। তার ফেরার পথে হেরিয়েট দ্বীপেরই উপকূলে তিনি নিহত হন।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ।

‘শেরখান কে ছিলেন?’ প্রশ্ন আহমদ মুসার।

'তিনি ছিলেন পেশোয়ারের বাসিন্দা। বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামের এক সৈনিক ছিলেন তিনি। বিচারে এই আন্দামানে তার দ্বীপান্তর হয়।' বলল হাজী আবদুল্লাহ।

'এত বড় শাস্তির পরও তিনি এই কাজ করেন? তাঁর সাথে আর কতজনের শাস্তি হয়?'

'তাঁর সাথে আর কেউ ছিল না। লর্ড মেয়োকে হত্যার কাজ তিনি একাই করেন।'

'একা? একা কেন?'

'তোমার এই 'কেন'-এর উত্তর তুমি শেরখানের মুখ থেকেই শোন। শেরখান বীরদর্পে বিচারককে জানান, "১৮৬৭ থেকে আমার সংকল্প ছিল যে, কোন ইংরেজী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে আমি হত্যা করব। সেই উদ্দেশ্যেই কয়েক বছর এই ছুরিখানা আমি তৈরি করে রেখেছিলাম। ৮ই ফেব্রুয়ারী (১৮৭২ খৃষ্টাব্দ) যখন লর্ড মেয়ো আন্দামানে এলেন, আমি ছুরি ধার দিয়ে নিলাম। সারা দিন রশ দ্বীপে (যেখানে লর্ড মেয়ো অবস্থান করছিলেন) যাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু অনুমতি পাইনি। সন্ধ্যা পর্যন্ত হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু তকদির লর্ড মেয়োকে আমার বাড়িতেই নিয়ে এল। আমি তার সঙ্গে পাহাড়ের উপরে গিয়েছিলাম, তার সঙ্গেই ফিরে এসেছিলাম। কিন্তু সুযোগ পাইনি। তীরে ফিরে গাড়ির আড়ালে লুকিয়ে ছিলাম। এখানেই আমার মনের সাধ পূর্ণ হয়............।" শেরখান তার এই বক্তব্যে কোন মিথ্যা বলার চেষ্টা করেননি। একটা কথাও লুকোননি।'

'বৃটিশদের কোন কষ্ট হয়নি তাকে ফাঁসির আদেশ শোনাতে?' বলল আহমদ মুসা।

'বৃটিশদের ফাঁসি শেরখানকে সামান্যও ভীত করতে পারেনি। ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি চিৎকার করে বলেছিলেন, 'ভাই সকল, আমি তোমাদের শত্রুকে শেষ করেছি। তোমরা সাক্ষি থাক যে আমি মুসলমান।' তারপর তিনি কালেমা তাইয়েবা পড়েছিলেন। কালেমা পড়া অবস্থায় তাঁর ফাঁসি কার্যকর হয়।' অশ্রুভেজা কণ্ঠে বলল হাজী আবদুল্লাহ।

আহমদ মুসাও অভিভূত হয়ে পড়েছিল। বলল, 'কোথায় তাঁর ফাঁসি হয়?'

‘এই জেলখানা থেকে আরও উপরে পাহাড়ের মাথায়। সেখানে তার জন্যে একটা ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল। আজ তো সময় নেই আর একদিন তোমাকে দেখাব ঐতিহাসিক জায়গাটা। আরও ঐতিহাসিক জায়গা এখানে আছে আহমদ মুসা।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ।

‘ধন্যবাদ জনাব।’ বলেই আহমদ মুসা তাকাল গংগারামের দিকে। বলল, তোমার এখন কোন অসুবিধা নেই তো?’

‘কোন অসুবিধা নেই।’

‘তাহলে বল, তুমি তো অনেকটা সময় ওদের হাতে ছিলে, গুরুত্বপূর্ণ কিছু তুমি জানতে পেরেছ কিনা?’

‘স্যার, ওরা ধরে নিয়েছিল আমি এখান থেকে জীবিত বেরিয়ে যেতে পারব না। তাই সব আলোচনাই তারা আমার সামনে করতো। স্যার, প্রথম দিকে আমার মনে হয়েছিল যাকে ওরা স্বামীজী বলে সেই স্বামী শংকরাচার্য শিরোমণিই বোধ হয় সব। তাঁর আদেশেই সব কিছু হয়। তিনিই ওদের নেতা। কিন্তু পরে বুঝতে পারি, আসল নেতা তিনি নন। তিনি সামান্য আদেশ পালনকারী মাত্র। এদের দলের শীর্ষ নেতা আন্দামান সরকারের কেউ। আর সবকিছুর এ্যাডভাইজার একজন আছেন, তিনি ভারতের লোক নয়। কোথাকার জানতে পারিনি। তবে নাম শুনেছি ‘ক্রিষ্টোফার কোলম্যান কোহেন’। ওঁকে ওরা ‘টিসি’ (ট্রিপল সি) বলে ডাকে।

নাম শুনে চমকে উঠল আহমদ মুসা। বলল, ‘কি বললে নাম ‘টিসি’? ‘ক্রিষ্টোফার কোলম্যান কোহেন? ঠিক শুনেছ নাম?’

‘জি স্যার। তাকে চেনেন নাকি স্যার? নাম শুনতে ভুল হবার কথা নয় স্যার। তিনি এখানে এসেছিলেন।’

‘এখানে? এই জেলখানায়?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার। তার চোখে-মুখে বিস্ময়।

‘তুমি তাঁকে চেন নাকি আহমদ মুসা?’ বলল হাজী আবদুল্লাহ।

'হ্যাঁ চিনি। তিনি ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা 'মোসাদ'-এর সবচেয়ে সফল একজন মিশন কনট্রোলার। 'মোসাদ' এর সবচেয়ে বেশি সংখ্যক গোয়েন্দা অভিযান বা গোয়েন্দা প্রকল্পের তিনি পরিচালক ছিলেন।'

'তাই হবে স্যার। তিনি অত্যন্ত চালাক। তিনি আমার সামনে কোন আলাপেই রাজি হননি। কথা বলার জন্যে স্বামীজীকে তিনি ঘরের বাইরে নিয়ে যান।'

হাজী আবদুল্লাহর চোখ-মুখও বিস্ময়ে ভরে উঠেছিল। গংগারাম থামতেই হাজী আবদুল্লাহ বলে উঠল, 'ভারতের গোয়েন্দা বিভাগের সাথে 'মোসাদ' এর যোগ-সাজস আমার কাছে বিস্ময়ের নয়, আন্দামানে ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থা 'মোসাদ- এর লোক আসা আমার কাছে নতুন ঘটনা নয়, কিন্তু আমি বিস্মিত হচ্ছি, স্বামী শংকরাচার্য শিরোমণি ও সোমনাথ শম্ভুজীদের সংযোগ কি করে হলো মোসাদের সাথে!'

আহমদ মুসা বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল হাজী আবদুল্লাহর দিকে। বলল, 'আপনার এ প্রশ্নের জবাব আমার কাছে আছে, কিন্তু তার আগে বলুন, ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগের সাথে 'মোসাদ'-এর যোগ-সাজশের কথা এবং আন্দামানে 'মোসাদ' এর আসার কথা আপনি জানলেন কি করে?'

হাসল হাজী আবদুল্লাহ। বলল, 'কথাটা বলেই কিন্তু আমার মনে হয়েছে, আমার এ কথা তোমার নজর এড়াবে না।'

বলেই একটু গম্ভীর হলো হাজী আবদুল্লাহ। বলল, 'ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগে আমি দীর্ঘদিন চাকুরী করেছি। আন্দামানের গোয়েন্দা প্রধানের দায়িত্বও আমি পাই। এই পদ থেকে আমাকে আগাম রিটায়ার করে দেয়া হয়। এবং সেটা হয় ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থা 'মোসাদ' এর পরামর্শে। 'মোসাদ'-এর একটা টীম এসেছিল আন্দামানে। ডেমোগ্রাফিক একটা গোপন রিপোর্ট তৈরি করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা আমার অধীনে কাজ করতে অস্বীকৃতি জানায়। এর কিছুদিন পরেই আমাকে রিটায়ার করে দেয়া হয়। আমার রিটায়ারের পরে 'মোসাদ'-এর মিশনটি এখানে আসে। এটা বিশ বছর আগের কথা।'

'ধন্যবাদ জনাব। আপনার অতীতে এমন ধরনের কিছু কথা থাকবে, তা আমি ধারণা করেছিলাম। তবে আপনার 'অভিনয়' খুব সুন্দর হয়েছে। একই সাথে দুহাতে দুজনকে টার্গেট করে সফল হওয়ার ঘটনায় কিন্তু আপনি নিজেকে লুকাতে পারেননি।'

একটু থামল আহমদ মুসা। থেমেই আবার বলে উঠল, 'জনাব, আপনার জিজ্ঞাসার জবাব আপনি নিজেই দিয়েছেন। 'মোসাদ' আন্দামানে ডেমোগ্রাফিক অনুসন্ধান চালিয়ে যে সিদ্ধান্তে পৌছেছিল, সম্ভবত সেই সিদ্ধান্তই বাস্তবায়ন করছে স্বামী শংকরাচার্য শিরোমণিরা। অতএব 'মোসাদ'-এর লোকেরা তাদের কাছে আসবে না কেন? হতে পারে, 'মোসাদ' এর সুপারিশ বা সিদ্ধান্ত ভারত সরকার বাস্তবায়নে রাজী হয়নি এবং অন্য কোন সংস্থা-সংগঠন এর বাস্তবায়নে এগিয়ে এসেছে। 'মোসাদ' হয়তো এদেরই সাহায্যে এগিয়ে এসেছে।'

'ধন্যবাদ আহমদ মুসা। তুমি ঠিক বলেছ। কিন্তু স্বামী শংকরাচার্যদের কাজটি একেবারেই বেসরকারী? গংগারাম কিন্তু বলেছে যে, আন্দামানে শংকরাচার্যদের সংস্থার নেতৃত্বে আছে আন্দামান সরকারেরই কেউ।' বলল হাজী আবদুল্লাহ।

'আন্দামান সরকারের কোন লোক শংকরাচার্যদের সংস্থার নেতৃত্ব দেয়ার পরও এটা বেসরকারী কোন গোপন সংস্থা হতে পারে। কারণ আন্দামান সরকারের উক্ত লোকটি সরকারের অজান্তে ব্যক্তিগতভাবে শংকরাচার্যদের সংস্থার সাথে জড়িত থাকতে পারে।' আহমদ মুসা বলল।

'হ্যাঁ এটাও হতে পারে আহমদ মুসা।' বলল হাজী আবদুল্লাহ।

আহমদ মুসা মুখ ফিরাল গংগারামের দিকে। বলল, 'তুমি কি করে বুঝলে যে, স্বামী শংকরাচার্যের দলের নেতা আন্দামান সরকারের কেউ?'

'স্বামীজীর কিছু টেলিফোন টক থেকে আমার এটা মনে হয়েছে।' বলল গংগারাম।

'কি কথা শুনেছিলে?'

'নির্যাতনের ফলে একবার আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। যখন জ্ঞান ফেরে, তখন দেখলাম স্বামীজী ঘরে প্রবেশ করছেন। দেবানন্দ ও নটবর আগে

থেকেই ঘরে হাজির ছিল। স্বামীজী প্রবেশ করার পরেই তার মোবাইল বেজে উঠল। টেলিফোন ধরেই তিনি একেবারে জড়সড় হয়ে গেলেন। গলার স্বর নিচে নেমে গেল। টেলিফোনে স্বামীজী কিছুই বলেননি। শুধু জি স্যার, ইয়েস স্যার, ইত্যাদি করে গেছেন। একবার শুধু বলেছিলেন, 'আপনি নিশ্চিত থাকুন স্যার, কথা আমরা বের করেই ছাড়ব।' মোবাইলে কথা শেষ করেই দেবানন্দকে লক্ষ্য করে তীব্র কণ্ঠে বলল, 'গভর্নর অফিস থেকে টেলিফোন এসেছিল। তুমি উত্তরে টেলিফোন করনি কেন? এখন আবার তাঁকে টেলিফোন করতে হলো! উত্তরে দেবানন্দ বলেছিল, 'আমি মিসকল পেয়েছিলাম। তারপর আধাঘণ্টা চেষ্টা করেও আমি লাইন পাইনি। ব্যস্ত ছিল তাঁর টেলিফোন।' দেবানন্দ থামলে স্বামীজী বললেন, 'শোন, বস বলেছেন, আগামী দুদিনের মধ্যে সেই লোক এবং আহমদ আলমগীরের মা-বোনকে পাকড়াও করতে হবে। কোন অজুহাত তিনি শুনবেন না।' এই কথাবার্তা থেকে আমার নিশ্চিত মনে হয়েছে এদের নেতা গভর্নর অফিসের সরকারী কেউ।' থামল গংগারাম।

'গভর্নর অফিসে অনেক জাঁদরেল লোক রয়েছেন। তাদের মধ্যে কেউ একজন হতেই পারেন।' বলল হাজী আবদুল্লাহ।

'গভর্নর হাউজের সেই বস সম্পর্কে বোধ হয় আর কিছুই শোননি।' বলল আহমদ মুসা।

'না স্যার, প্রসঙ্গটা এই একবারই উঠেছিল।' গংগারাম বলল।

'এবার বল, আহমদ আলমগীর সম্পর্কে তারা কি আলোচনা করেছে?' বলল আহমদ মুসা।

'আহমদ আলমগীরের নাম ওদের মুখ থেকে শুনিনি। তাদের কথা থেকে শুনেছি, একজন বড় শয়তানকে 'রশ' দ্বীপে ওরা আটকে রেখেছে।'

'বড় শয়তান যে আহমদ আলমগীর কি করে তা বুঝলে?' বলল হাজী আবদুল্লাহ।

'শুনেই আমার মনে হয়েছে, তার উপর আহমদ আলমগীরের মা-বোনের কথাও তাদের আলোচনায় আসে। আমার সন্দেহ নেই, আহমদ আলমগীরকেই ওরা ওখানে বন্দী করে রেখেছে।' গংগারাম বলল।

‘ধন্যবাদ গংগারাম। তোমার দেয়া দুটি তথ্যই আমাদের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ।’ বলল আহমদ মুসা।

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা তাকাল হাজী আবদুল্লাহর দিকে। বলল, ‘রশ দ্বীপ তো সংরক্ষিত এলাকা। ওখানে কি করে আহমদ আলমগীরকে রাখল?’

‘গংগারামের এই তথ্য তার আগের দেয়া তথ্যকে সত্য প্রমাণিত করছে। সরকারের শক্তিধর কেউ যদি সন্ত্রাসী দলের সাথে থাকে, তাহলে এই সন্ত্রাসীরা ‘রশ’ দ্বীপ অবশ্যই ব্যবহার করতে পারে। সুতরাং দু’তথ্যের একটি অপরটির সত্যায়ন করছে বলে আমি মনে করি।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ।

‘ঠিক জনাব। সন্ত্রাসী দলটির সাথে আন্দামান সরকারের উচ্চপদস্থদের সংশ্লিষ্টতা থাকলে আত্মগোপন করা কিংবা কাউকে গোপনে রাখার জন্যে ‘রশ’ দ্বীপই সবচেয়ে উপযুক্ত। কারণ কেউ এ দ্বীপে আসলে সরকারের অনুমতি নিয়ে আসবে। আহমদ আলমগীরকে কিডন্যাপ করে রাখার জন্যে এমন জায়গা বেছে নেবে, সেটাই স্বাভাবিক।’

‘তাহলে আহমদ মুসা, আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, আহমদ আলমগীরকে ‘রশ’ দ্বীপেই বন্দী করে রাখা হয়েছে।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ।

‘আমরা ‘রশ’ দ্বীপ অভিযানের আয়োজন করতে পারি। দ্বীপটি সম্পর্কে সব কিছুই আপনার জানার কথা।’ আহমদ মুসা হাজী আবদুল্লাহকে লক্ষ্য করে বলল।

‘তবু দ্বীপের সরকারী ও গুরুত্বপূর্ণ বিল্ডিং-এর বৃটিশযুগীয় লে-আউট আরেকবার দেখতে হবে।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ।

‘কোথায় ওটা পাওয়া যাবে?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘আন্দামান মিউজিয়ামের পুরাতত্ব বিভাগে এবং গভর্নর অফিসে পাওয়া যাবে।’

‘জনাব, এটা আপনাকেই সংগ্রহ করতে হবে।’

‘অবশ্যই তা করব। কিন্তু কে সরকারের এই সন্ত্রাসীদের নেতা, তা বের করতে পারলে এবং আন্দামানের গভর্নর ও দিল্লী সরকারকে বেনামীতে হলেও জানিয়ে দিতে পারলে বিরাট কাজ হতো।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ।

‘জি জনাব। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আহমদ আলমগীরকে উদ্ধার করা এবং সন্ত্রাসী দলটির গোড়ায় সরকারের কে আছে তা বের করা- এ দুটিই আমাদের প্রধান কাজ এখন। তারপর সমস্যাটি কোন দিকে গড়ায় দেখতে হবে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ধন্যবাদ আহমদ মুসা। আমরা মনে হয় কিছুটা এগুতে পেরেছি।’

‘অবশ্যই! তাহলে এখন চলতে পারি। গংগারাম ক্লান্ত, ওর রেষ্ট দরকার।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ঠিক। গংগারাম ওঠ। চলি আমরা।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ।

আহমদ মুসা গংগারামকে ধরে দাঁড় করাতে করাতে বলল হাজী আবদুল্লাহকে লক্ষ্য করে, ‘আরেকটি কাজ করতে হবে। ভাইপার দ্বীপের এই জেলখানা পুরাতত্ব বিভাগের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। একটা নিউজ করতে হবে যে, পুরাতত্ব বিভাগ একদল সন্ত্রাসী গ্রুপকে এ জেলখানায় ঘাঁটি গাড়ার সুযোগ করে দিয়েছে। তাদের মধ্যেকারই সংঘর্ষে অমুক রাতে প্রায় ডজন খানেক মানুষ নিহত হয়েছে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রের বরাত দিয়ে এ নিউজ পত্রিকায় আনতে হবে।’

‘ধন্যবাদ আহমদ মুসা। ভাল বুদ্ধি বের করেছ। এটা করলে পুরাতত্ব বিভাগ ও সন্ত্রাসী দল- উভয় পক্ষকেই চাপের মধ্যে ফেলা যাবে।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ।

গংগারামকে ধরে নিয়ে আহমদ মুসা চলতে শুরু করেছে। বলল, ‘সরকারের যে ব্যক্তিটি সন্ত্রাসীদের সাথে জড়িত রয়েছে, সেও বিব্রতবোধ করবে এবং পুরাতত্ব বিভাগের পক্ষে সে কিছুটা সক্রিয়ও হয়ে উঠতে পারে। তাকে আইডেনটিফাই করার ক্ষেত্রে এটা কাজেও আসতে পারে।’

‘সাংবাদিকদের মধ্যে কয়েকজন আমার খুব ঘনিষ্ঠ। তাদের দিয়ে আমি নিউজটা করাতে পারব।’ আহমদ মুসাদের পেছনে চলা শুরু করে বলল হাজী আবদুল্লাহ।

আহমদ মুসারা বেরিয়ে এল ভাইপার কারাগার থেকে।

# ৭

টেলিফোন করে মোবাইলটা কানে ধরে উদগ্রীবভাবে অপেক্ষা করছে সুষমা রাও।

সুষমা রাওয়ের পাশে শাহ বানুও বসে আছে। টেলিফোনের ওপার থেকে আহমদ মুসার কণ্ঠ শুনতে পেয়েই সুষমা চিৎকার করে উঠল আনন্দে, ‘ও ভাইয়া! ছত্রিশ ঘণ্টা হলো তোমার কোন খোঁজ নেই। আমি কতবার টেলিফোন করেছি জান?’

‘আমি খুব ব্যস্ত ছিলাম সুষমা। মোবাইল বন্ধ রাখতে হয়েছে। স্যরি। বল, কোন খবর আছে? শাহ বানুরা কেমন?’

‘আমার পাশেই আছে শাহ বানু। তুমি তাকেই জিজ্ঞেস করো কেমন আছে। খালাম্মা খুব ভাল আছেন। আমার আর কোন খবর নেই ভাইয়া। আমি প্রতিটি সেকেন্ড, মিনিট, গুনছি আপনার কাছ থেকে ওঁর খবরের প্রতিক্ষায়।’

‘আমরা এগুচ্ছি সুষমা। আমার সাথী উদ্ধার হয়েছে। আমরা খবর পেয়েছি, যার প্রতিক্ষা তুমি করছ তাকে ‘রশ’ দ্বীপে রাখা হয়েছে। কিন্তু বিশাল দ্বীপটির কোথায় রাখা হয়েছে আমরা তা জানতে পারিনি।’

‘এটা তো বড় খবর ভাইয়া। ও জীবিত আছে, এটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় খবর.......।’ আবেগের উচ্ছাসে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল তার। থেমে গেল সুষমা রাও।

পাশে বসা শাহ বানুর চোখও ছল ছল করে উঠেছে। সে সান্তনার হাত রাখল সুষমার কাঁধে।

সুষমা নিজেকে সামলে নিয়ে আবার কথা বলল, ‘স্যরি ভাইয়া। কি বললে তুমি, কোন দ্বীপে?’

‘রশ দ্বীপে।’

সংগে সংগে কোন উত্তর দিল না সুষমা রাও। ভাবছিল। কপাল কুঞ্চিত তার।

ওপার থেকে আহমদ মুসাই কথা বলে উঠল, 'কি হলো সুষমা, কথা বলছ না কেন?'

আহমদ মুসার এই কথাগুলো সুষমার কানে গেছে বলে মনে হয় না। একটা চিন্তার মধ্যে ডুবে থাকা অবস্থায় সে ধীর কণ্ঠে বলল, 'ভাইয়া আজ আব্বার বেড রুমের পাশ দিয়ে আসছিলাম। তাঁর মুখে 'রশ' দ্বীপের নাম শুনলাম। তিনি কাউকে বলছিলেন, 'রশ দ্বীপের ডিফেন্স গোডাউনে আছে? ওখানেই থাকবে?' একথা তিনি কাকে, কি ব্যাপারে বলেছেন, আমি কিছুই জানি না। যেহেতু তার কথায় রশ দ্বীপের নাম আছে, একটা জায়গারও নাম আছে। তাই তোমাকে জানালাম ভাইয়া।'

'ধন্যবাদ সুষমা। তোমার আব্বা শীর্ষ দায়িত্বে। তিনি এখনকার সব কিছু না হলেও অনেক কিছুই জানেন। তার সব কথাই গুরুত্বপূর্ণ। এই তথ্য আমাদের কাজে আসবে।' বলল আহমদ মুসা।

'ওর সন্ধানে তো কাজে আসবে না!' বলল সুষমা হতাশ সুরে।

'সেটাও বলা যায় না সুষমা। ছোট্ট একটা আলামত পর্বত সমান অপরাধ প্রমাণের মূল উৎস হয়ে দাঁড়ায়।'

'কিন্তু এই তথ্যের কি সেই ভাগ্য হবে?'

'হবে কিনা জানি না। তবে এই তথ্য থেকে একটা মহাগুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানলাম। সেটা হলো রশ দ্বীপের গোডাউনগুলো এখনও ব্যবহার করা হচ্ছে। অথচ আমরা সবাই জানি, দুনিয়া জানে ওগুলো পরিত্যক্ত, ধ্বংসপ্রাপ্ত। ঐতিহাসিক কীর্তি হিসাবে ওগুলো সংরক্ষণ করা হচ্ছে মাত্র। তোমার দেয়া তথ্যই এখন আমাদের বলছে ওর সন্ধান করার জন্যে সবগুলো গোডাউন চেক করতে হবে।' বলল আহমদ মুসা।

'ধন্যবাদ ভাইয়া।' সুষমা রাও বলল।

হঠাৎ সুষমা রাও এর মুখ শুকিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি সে আহমদ মুসা কিছু বলার আগেই বলে উঠল, 'একটা কথা ভাইয়া।' বলে চুপ করল সুষমা রাও।

‘কি কথা, বল?’ ওপার থেকে আহমদ মুসা বলল।

ভাবছিল সুষমা রাও। বলল, ‘থাক ভাইয়া। পরে বলব।’

‘ঠিক আছে।’

‘তুমি কেমন আছ ভাইয়া? খুব শুনতে ইচ্ছা করছে তোমাদের উদ্ধার অভিযানের কাহিনী।’

‘অবশ্যই শুনবে একদিন।’ আহমদ মুসা বলল।

থেমেই আবার সে বলে উঠল, ‘মেহমানদের সম্পর্কে তোমার আব্বা তো কিছু জানতে পারেননি, না?’

‘এদিকে উনি আসেন না। আর উনি এটা জানেন যে, কেউ না কেউ সব সময় এখানে থাকেই।’ সুতরাং অস্বাভাবিকতা কিছু নেই।’ বলল সুষমা রাও।

‘আল্লাহ ভরসা।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমার কথা এখনকার মত শেষ। তুমি শাহ বানুর সাথে কথা বল ভাইয়া।’

‘সব কথা তো হয়েই গেল। আর কি কথা বলব?’

‘ওর কথা আছে ভাইয়া। টেলিফোন ওকে দিলাম। বাই।’ বলে সুষমা মোবাইল গুঁজে দিল শাহ বানুর হাতে।

‘বল শাহ বানু।’ বলল আহমদ মুসা।

‘জি।’ শাহ বানু আটকে গেল এটুকু বলেই।

‘তুমি সুষমার সাথে ভালই আছ, আম্মা কেমন আছেন?’

‘জি, ভাল আছেন।’ উত্তর দিল শাহ বানু।

‘উনি খুব চিন্তা করেন নাতো? তোমাদের কোন অসুবিধা নেই তো?’ আহমদ মুসা বলল।

‘সুষমা আম্মাকে চিন্তা করার সুযোগই দেয় না। আমরা খুব ভাল আছি।’

‘সুষমা তো অন্য কেউ নয়। প্রয়োজনের কথা তাকে বলবে।’

‘আমাদের প্রয়োজন আমরা বুঝার আগে সুষমাই টের পেয়ে যায়। তাই চিন্তা করার আগেই জিনিস এসে যায়, অনেকটা বেহেশতের মতই।’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘সুন্দর এক মেছাল দিয়েছো শাহ বানু। খুশি হলাম তোমাদের খবর শুনে। আর কোন কথা আছে?’

‘জি, না।’ বলল শাহ বানু।

‘সুষমা যে বলল তোমার কথা আছে?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘সুষমার কল্পনা বেশি। অনেক কথা, অনেক চিন্তা তার যেন কোত্থেকে উড়ে মাথায় আসে।’

‘বুঝেছি। দুজনার মধ্যে কথার ঠেলাঠেলি চলছে। ওটা ভাল। ঠিক আছে। রাখছি। বাই।’

‘বাই।’ শাহ বানু বলল।

শাহ বানু মোবাইল অফ করতেই সুষমা জড়িয়ে ধরল শাহ বানুকে। বলল, ‘কোন কথাই তো বললে না, মাঝখানে কল্পনাপ্রবণ বলে দোষ দিলে আমাকে।’

‘কি কথা বলব? আসলেই কিছু কথা নেই।’ বলে শাহ বানু সুষমার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে পালাল।

সুষমাও উঠে ছুটল তার পেছনে পেছনে।

পরবর্তী বই

# ‘আন্দামান ষড়যন্ত্র’

## কৃতজ্ঞতায়ঃ Mahfuzur Rahman

# সাইমুম-৪১

# আন্দামান ষড়যন্ত্র

আবুল আসাদ

# ১

‘বুঝলাম, হোটেল সাহারা থেকে তোমাদের উদ্ধারের কাহিনী এ জন্যেই তাহলে চেপে গেছ এতদিন। দারুণ রোমান্টিক কাহিনী’ বলল সুষমা রাও। সোফায় শাহ্ বানুর গলা জড়িয়ে ধরে বসে সুষমা।

শাহ্ বানু গলা থেকে সুষমার হাত সরিয়ে দিয়ে বলল, বাঁচা-মরার লড়াইয়ের মধ্যে রোমান্টিকতা কোথায় পেলে?’

বল কি তুমি রোমান্টিকতা নয়? দোতলা থেকে স্বপ্ন-নায়কের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়া, তা কাঁধে চলে প্রাচীরে ওঠা, তার হাতে ঝুলে নিচে নামা, ইত্যাদি রোজান্টিক নয় বলে মনে কর?’

আমি ঝাঁপিয়ে পড়িনি। দড়ির মই ছিঁড়ে পড়ে গিয়েছিলাম। এভাবে পাথরের উপর পড়লে বড় রকমেম কিছু ঘটতে পারতো। তিনি আমাকে বাঁচিয়েছেন। আর প্রাচীর পাও হওয়ার ময় যা ঘটেছে, ওরকম বিপদে এর চেয়েও বেশি কিছু ঘটতে পারে। আপতকালীন এসব বিষয় কেউ মনে রাখে না, মনে রাখার মত নয়। এখানে রোমান্টিকতা খোঁজা পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়।’ বলল শাহ্ বানু।

মনে রাখে না বলল, আচ্ছা বলত, ঐ ঘটনা তুমি আমৃত্য ভুলতে পারবে?’

'মনে রাখা মানে আমি স্মরণ রাখা অর্থে বলিনি। বলেছি, মানুষ এমন ঘটনা রঙিন অর্থাৎ রোমান্টিক চোখে দেখে না। সে রকম দেখা একবারেই অস্বাভাবিক।' শাহ্ বানু বলল।

'তোমার সাথে এ নিয়ে তর্ক করবো না শাহ্ বানু। তবে বলব, চোখের পানিতে সুখের স্বপ্ন প্রতিবিম্বিত হতে পারে, হতাশার ঘনঘটার মধ্যে জীবনের প্রদীপ দীপ জলে উঠল বা দু'জীবনের মিলনের বীজ অংকুরিত হতে পারে। তুমি মানতে না চাইলেও এর লাখো দৃষ্টান্ত আছে পৃথিবীর ইতিহাসে।' বলল সুষমা রাও।

'দেখ সুষমা, পৃথিবীতে আহমদ মুসা আজ একজনই আছেন। তিনি তোমার ঐ 'লাখোর মধ্যেকার একজন নন। তাই তোমার দৃষ্টান্ত অচল এখানে।'

'আমি জানি শাহ্ বানু। আহমদ মুসা ভাইকে এই কথার বলার সাহস আমার নেই। আমি বলছি তোমার কথা। তোমার হৃদয়ের কথা।'

শাহ্ বানুর মুখ রাঙা হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পরণেই যন্ত্রণার এক কালো ছায়া এসে তা গ্রাস করে নিল। বলল শাহ্ বানু গম্ভীর কণ্ঠে, 'কিন্তু আমাকে বলছ কেন?'

'কারণ তোমার মুখে অমূল্য অনুরাগের এক রাঙা রূপ আমি বার বার দেখেছি। কিছুণ আগে ভাইয়ার সাথে কথা বলার সময় দেখেছি এবং এইমাত্রও দেখলাম।'

হাসল শাহ্ বানু। হেসে উঠলেও তার মুখের রাজকীয় লাবণ্য কিন্তু হেসে উঠল না। তাতে জড়ানো বেদনার প্রলেপ। বলল সে ধীর শান্তকণ্ঠে, 'তুমি যেটা দেখেছ সেটা অন্যায় এবং এক অবাধ্যতা। আমি দুঃখিত তার জন্যে।'

অকস্মাৎ ভারী হয়ে উঠেছে শাহ্ বানুর কণ্ঠ। তার শুকনো ঠোঁটে হাসি ফুটে আছে ঠিকই, কিন্তু তার দু'চোখ ফেটে গড়িয়ে পড়ল দু'ফোটা অশ্রু"।

মুহূর্তেই সুষমা রাওয়ের মুখ থেকে হাসি রসিকতার চিহ্ন উঠে গেল। বিস্ময়-বেদতনার ছায়া নামল তার চোখে-মুখে। বলল সে,'কি ব্যাপার শাহ্ বানু?' উৎকণ্ঠা সুষমার রাওয়ের কণ্ঠে।

শাহ্ বানু চোখ মুছে হেসে উঠে জড়িয়ে ধরল সুষমা রাওকে। বলল, এস সুষমা এসব আমরা ভুলে যাই। আহমদ মুসা দেড় মাসের বাচ্চা রেখে এখানে এসেছেন এই জীবন-মৃত্যুর অভিযানে। এস আমরা তাঁর জন্যে এবং সেই মিষ্টি বাচ্চার জন্য দোয়া করি।

শাহ্ বানু জড়িয়ে ধরারয় সুষমা রাও নিশ্চল স্থির হয়ে গেছে। গোটা দেহ জুড়ে বয়ে গেল বেদনার এক স্রোত। বলল সুষমা রাও কাঁপা কণ্ঠে, 'তুমি যা বলছ তা সত্য শাহ্ বানু? কার কাছে শুনেছ?'

'আম্মার কাছে।' বলল শাহ্ বানু।

শাহ্ বানু সুষমাকে ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে বসল। আগের মতই স্থির, নিশ্চল বসেছিল সুষমা রাও। দু'জনই নিরব।

কয়েক মুহূর্ত পর সুষমা রাও তাকাল শাহ্ বানুর দিকে। বলল নরম ভারী কণ্ঠে, 'এ ভুল তাহলে তুমি কেন করলে শাহ্ বানু।'

শাহ্ বানু নরম ভেজা কণ্ঠে বলল, 'প্রথমে আমি নিজেকেই বুঝতে পারিনি সুষমা। আর সবকিছু শুনলাম আমি আম্মার কাছে যে রাতে তোমার এখানে এসেছি সেই রাতে।'

বলে শাহ্ বানু জাড়িয়ে ধরল সুষমার দু'হাত। বলল, 'আমি সবকিছু ভুলে যাব সুষমা। তুমি কিছু শুনেছ, জেনেছ সেটা তুমিও ভুলে যাও। রসিকতা করেও আমার সম্পর্কে তুমি ওঁর কাছে কোন কথা বলো না।' কান্নায় ভেজা কণ্ঠস্বর শাহ্ বানুর।

চোখের কোণ ভিজে উঠেছে সুষমা রাওয়ের। বলল সে, 'আমার খুব কষ্ঠ হচ্ছে শাহ্ বানু। আমিও তো একজনকে ভালবাসি। তুমি যা বলছ, আমি কি তা পারতাম? পারতাম না।'

চোখের অশ্রু দু'গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ল সুষমা রাওয়ের।

সুষমার হাত ছেড়ে দিয়ে সোফায় হেলান দিয়ে বসল শাহ্ বানু। বলল ধীর কণ্ঠে, 'তোমার ব্যাপারটার সাথে আমার তুলনা হয় না সুষমা। তুমি অন্যায়, অস্বাভাবিক কিছু করনি। কিন্তু আমার দ্বারা অন্যায় হয়েছে। অন্যায় তো মানুষেরই

হয়। আমি শুধরে নে....।' কান্নায় আটকে গেল শাহ্ বানুর কথা। দু'হাতে মুখ ঢাকল সে।

সুষমা রাও শাহ্ বানুর দিকে মুখ তুলে বলল, 'যদি অন্যায়ই মনে কর, যদি শুধরে নিতেই চাও, তাহলে কাঁদছ কেন।' ভারী কণ্ঠ সুষমার।

'এটা আমার দুর্বলতা। আমি শক্ত হতে পারব সুষমা।' কান্না জড়িত কণ্ঠে বলল শাহ্ বানু।

কিছু বলতে যাচ্ছিল সুষমা। এ সময় বাইরে তার পিতার গলা শুনতে পেল।

সে তাড়িতাড়ি বলল, 'শাহ্ বানু বাবা এসেছেন। নিশ্চয় এখানে আসবেন। তোমার নাম মনে আছে তো?'

দু'জনেই তাড়াতাড়ি চোখ-মুখ মুছে স্বাবাবিক হওয়ার চেষ্টা করল।

সুষমা রাও তাড়াতাড়ি এগুলো দরজার দিকে। দরজাতেই দেখা হয়ে গেল তার আব্বা আন্দামানের গভর্নর বালাজী রাজীরাও মাধবের সাথে।

'কেমন আছ মা? সুষমা তার আব্বার পায়ে প্রণামের উত্তরে মাথায় হাত রেখে বলল বিবি মাধব।

'ভাল আছি বাবা। তুমি অফিসে যাওনি?' সুষমা রাও বলল।

'কয়দিন খুব পরিশ্রম গেছে মা। আজ একটু রেষ্ট নিব।'

সুষমা রাও তার পিতার হাত ধরে বলল, 'এস বাবা, বসবে।'

পিতাকে নিয়ে সুষমা রাও ঘরে ঢুকল। ঘরের মাঝ বরাবর আসতেই শাহ্ বানু গিয়ে নিরবে কদমবুছি করল সুষমার আব্বার পায়ে।

সুষমার আব্বা বিভি দাধব অবাক হলো শাহ্ বানুকে ধেকে। তার মাথায় হাত রেখে 'বেঁচে থাক মা' বলেই জিজ্ঞাসা কলল, 'কে তুমি মা?'

শাহ্ বানু মুখ খুলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই সুষমা রাও বলল, 'বাবা আমার বান্ধবী, সঙ্গীতা সাইগর। আমার সাথে পড়ে। বেড়াতে এসেছে আন্দমানে।'

'বাঃ খুব ভাল । কিন্তু আমাকে তো বলনি? কবে এসেছে?'

‘গত সন্ধ্যায় এসেছে বাবা। তোমাকে বলব কি বাবা, তোমাকে পেলে তো! মা জানেন।’

‘বেশ ভাল। তা এদের বাড়ি কোথায়?’

‘ওরা মাদ্রাজের বাবা।’

‘আমাদের গেষ্ট উইং-এ একজন মহিলাকে দেখলাম। উনি কে জান?’

সুষমা রাও একটু চমকে উঠেছিল। মুহূর্তের জন্য উৎকণ্ঠার একটা ছায়াও নেমেছিল তার মুখে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে নিজেকে সামলে নিযে দ্রুতকণ্ঠে বলে উঠল, ‘উনি সঙ্গীতার মা। বাবা তোমার সাথে তার দেখা হয়েছিল। কাজে যাচ্ছিলাম, ব্যস্ত ছিলাম। তাই কথা হয়নি।’ বলে একটু থেমেই আবার বলে উঠল, ‘কিন্তু মা সঙ্গীতার মা’র মাথায় কাপড় দেখলাম। সাইগলরা তো খুবই আধুনিক। ওদের মেয়েরাও সার্ট-প্যান্টে অভ্যস্ত। ওরা তো মাথা ঢাকে না।’

সুষমার বুকটা কেঁপে উঠল। ঠিক বলেছে তার আব্বা। সাইগলরা খুবই আধুনিক। তার ঠিক হয়নি ‘সঙ্গিতা’ নামের সাথে সাইগল লাগানো। যা হোক বিষয়টাকে কভার করার জন্যে সুষমা তাড়াতাড়ি বলল, ‘বাবা’ সবাই কিন্তু একরকম হয় না। বিষেশ করে মেয়েরা। দেখ না কউ সকাল-সন্ধ্যা মন্দিরে যায়। আবার কউ দেখ মাসেও একবার ঠাকুর-মুখো হয় না।’

কথাটা শেষ করেই তার পিতাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গান্তরে নিয়ে যাবার জন্যে বলে উঠল, ‘বাগানে কি জরুরি কাজ ছিল বাবা?’

‘বাগানটার রিমডেলিং হচ্ছে। বড় করা হচ্ছে বাগানটা। সমস্যা দেখা দিয়েছে একটা কবর নিয়ে। কবরটা না সরালে বাগান বড় করা যাবে না। কিন্তু এ ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছে পুরাতত্ব বিভাগ। তারা বলছে কবরসহ জায়গাটা বৃটিশরা স্থায়ী ওয়াকফ করে গেছে। ও জমিতে হাত দেয়া যাবে না।’ বলল গভর্ণর বিবি মাধব।

‘হ্যাঁ বাবা, বাগানের লাগোয়া কবরটা আমি দেখেছি। মার্বেল পাথরে বাঁধানো। কবরটা এখানে এল কি করে?’

‘সত্যি, কবরটা এখানে আসার কথা ছিল না। এসেছে যে তার পেছনে ইন্টারেষ্টিং একটা কাহিনী আছে। আন্দামান জেলখানার জেলার হিসাবে এসেছিলেন একজন দার্শনিক পণ্ডিত লোক। তিনি দর্শন শাস্ত্রে উপর একটি জটিল বই পড়ছিলেন। অনেক শব্দের অর্থ দএবং কিছু বিষয় তার বোধগম্য হচ্ছিল না। তিনি জেল অফিসের সাবাইকে জানালেন, আন্দামানে এমন কেউ কি আছে যে তাকে শব্দগুলো বুজার ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে। জেলের এক অফিসার জেলারকে জানায়, আমাদের জেলে একজন কয়েদী আছে, সেই পারে এর ব্যাখ্যাদান করতে।

এই কথা শুনে জেলার অস্থির হয়ে ওঠেন। বলে, এখনি আমার এই গ্রন্থটি তার কাছে নিয়ে দাও। গ্রন্থটি সেই কয়েদিকে নিয়ে দেয় জেলের কয়েদীকে............. শব্দ ও বিষয়সমূহের শুধু অর্থ-ব্যাখ্যাই করা হয়নি, অস্পষ্ট অনেক বিষয়কে ফুটনোট দিয়ে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। ব্যাখ্যা ও ফুটনোট পড়ে তিনি বিষ্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন যে, এতবড় দার্শনিক তার জেলখানায় কিভাবে কোত্থেকে এল! তাঁর থাকার কথা শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের আসনে! জেলার সঙ্গে সঙ্গেই বললেন, তাঁর কাছে আমাকে নিয়ে চল। আমি দেখতে চাই এই মহান দার্শনিককে। অফিসাররা তাকে নিয়ে গেলেন তাঁর কাছে। মাঠে একজন কয়েদীর কাছে তাঁকে নিয়ে দাঁড় করানো হলো। তিনি দেখলেন, খালি পা, ঘর্মাক্ত গা, কাঁচা-পাকা চুলের জ্যোতিস্মান চোখের এক বয়স্ক ব্যক্তি টুকরি ভরা মাটি মাথায় করে বয়ে নিয় আসছে। বিস্ময় ও বেদনায় বাকহীন হয়ে গেলেন জেলার। এতবড় একজন পণ্ডিত তার জেলখানায় মাটি কাটছে, মাথায় মাটি বইছে! জেলার সাহেব এই পণ্ডিত ব্যক্তির ভক্ত হয়ে পড়েন। তাঁরই উদ্যোগে সেই পণ্ডিত কয়েদীর এখানে কবর হয়।’

‘এখান কেন?’ জিজ্ঞাসা সুষমার রাওয়ের।

‘সাগর তীরের এই সুন্দর উচ্চভূমিতে জেলার সাহেব কয়েদীদের জন্য পাঠাগার ও খেলা-ধুলার ব্যবস্থা সম্বলিত ক্লাব ও পার্ক গড়ে তোলেন। এখানেই তিনি কবর দেন পণ্ডিত কয়েদীর। সময়ের পরিবর্তনে সেই ক্লাব কমপ্লেক্সেই আজ গভর্নর হাউজ।’

'কে ছিলেন এই পণ্ডিত কয়েদী বাবা?'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না গভর্নর বিবি মাধব। একটু ভাবল, বলল, 'কি বলব মা। তার নাম মাওলানা ফজলে হক খয়রাবাদী। তিনি একজন অতি বড় পণ্ডিত ব্যক্তি, সেই সাথে একজন আপোষহীন যোদ্ধা। দর্শন শাস্ত্র, বিজ্ঞান, ইসলামী ধর্মতত্ব, সাহিত্য, প্রভৃতি বিষয়ে তিনি ছিলেন অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী। জটিল দর্শন বিষয়ে গ্রন্থ রচনাসহ বহু গ্রন্থ প্রণেতা তিনি। লাখনৌর নবাব সরকারে তিনি আট বছর প্রধান বিচারপতি ছিলেন। বৃটিশরা লাখনৌ দখল করলে তিনি বৃটিশের অধীনে চাকরি করতে অস্বীকার করার পর পদত্যাগ করে রাজপথে নেমে আসেন। স্থানীয় শাসক, জমিদার ও কৃষকদের মধ্যে বিদ্রোহের বাণী প্রচারের জন্যে চারদিকে ঘোরা শুরু করেন। ১৮৫৭ সালে তিনি বৃটিশের বিরুদ্ধে জিহাদের ডাক দিয়ে ফতোয়া প্রচার করেন। ফতোয়াটি ভারতে তখনকার বিখ্যাত পত্রিকা 'সাদিকুল আখবার'-এ প্রকাশিত হয়। ১৮৫৭ সালের বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামে দিল্লীর সম্রাট বাহাদুর শাহের পাশে তিনি ছিলেন। মোঘল শাসন কিভাবে চলবে ভবিষ্যতে তার দিক নির্দেশনার জন্যে তিনি একটি 'গণতান্ত্রিক সংবিধান' রচনা করেন এবং দিল্লী সম্রাটকে উদ্বদ্ধ করেন নতুন পদ্ধতির শাসনের জন্যে। বৃটিশদের হাতে দিল্লীর পতন ঘটলে তিনি বিদ্রোহ সংগঠনের লক্ষ্যে দিল্লী ত্যাগ করেন। এর পর তিনি বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামের নায়িকা 'হযরত মহল'- এর পাশে গিয়ে দাঁড়ান এবং চেষ্টা চালাতে থাকেন দেশীয় শক্তিতে ঐক্রবদ্ধ করতে। এই সময় তিনি বৃটিশদের হাতে গ্রেফতার হন। অফিযোগ আনা হয় যে, তিনি দেশীয় রাজা-জমিদারদের বিদ্রোহ-রক্তপাতে উস্কানি দিয়েছেন, যুদ্ধ করেছেন এবং হত্যা-খুনের মত অপরাধ করেছেন। ১৮৫৯ সালের ৪ঠা মার্চ এক রায়ে বৃটিশ কোর্ট তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দান করেন এবং ১৮৬০ সালে ৬৩ বছর বয়সে তিনি আন্দামানে দ্বীপান্তর লাভ করেন। ২ বছর পর ১৮৬২ সালে তিনি এই দ্বীপেই ইন্তেকাল করেন।'

'তাহলে তো বাবা তিনি ভারতের বিরাট একজন স্বাধীনাতা সংগ্রামী।' বলল সষমা রাও।

'না তিনি ভারতের নন, তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী তার জাতির। তিনি ভারতে মুসলমানদের শাষন রক্ষার জন্যে চেষ্টা করেছিলেন। চেয়েছিলেন দিল্লীর মোঘল সাম্রাজ্য টিকে থাক।'

'একই তো কথা বাবা, দিল্লীর মোগল সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখা মানে ভারতের স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখা।'

'তুমি জানো না, তখন শিবাজী পরিবারের নেতৃত্বে, মারাঠাদের কর্তৃত্বে হিন্দুদের আরেকটা স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। দিল্লী সাম্রাজ্য টিকে গেলে তো এই স্বাধনতা সংগ্রাম শেষ হয়ে যেত মা।'

'কিন্তু বাবা, দিল্লী সাম্রাজ্য টেকেনি, তাকে কি মারাঠীদের নেতৃত্বাধীন স্বাধীনতা সংগ্রাম টিকেছিল? বৃটিশরা কি সাবাইকে ধ্বংস করে দেয়নি?'

'দিয়েছে, কিন্তু পরিণাম ভাল হয়েছে মুসলমানরা ভারতের সাম্রাজ্র চিরতরে হারিয়েছে। কিন্তু শিবাজী-মারাঠার উত্তরসূরীরা আজ ভারতের কর্তৃত্বে আসীন হয়েছে।' বলল সুষমার পিতা বালাজী বাজীরাও মাধব।

'থাক বাবা এ প্রসঙ্গ। আমি বুঝতে পারছি না বাবা, জেলার সাহেব তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার পরেও জেল থেকে তার মুক্তির ব্যবস্থা করতে পারিননি কেন?' সুষমা রাও বলল।

'তিনি তাঁর সাধ্যের অধীন সব চেষ্টা করেছিলেন মা। শেষ পর্যন্ত তিনি সফল হয়েছিলেন। কিন্তু জেল থেকে মুক্তি জনাব খয়রাবাদীর কপালে ছিল না। বিলাতের প্রিভি কাউন্সিল থেকে মুক্তির আদেশ শত ঘাট পেরিয়ে পৌঁছে খয়রাবাদী সাহেবের ছেলের হাতে। সেই আদেশ নিয়ে তাঁর সন্তান যখন আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ারের নামেন, তখন খয়রাবাদীকে এই কবরে নামানো হচ্ছিল। জেল থেকে মুক্তির আগেই তিনি দুনিয়া থেকে মুক্তি লাভ করেন।'

মুখ ভারী হয়ে উঠেছে সুষমার। ছল ছল করে উঠেছে তার দু'চোখ। তার পিতা থামলেও সঙ্গে সঙ্গে কথা বলল না সে নিজেকে সামলে নিয়ে একটু পর বলল, 'যে কবর এত বড় একজন মানুষের, যে কবরের সাথে জড়িয়ে আছে এতবড় ট্রাজেডি, সেই কবরে কেন হাত দেবেন বাবা? থাক না স্মৃতিটা।'

হাসল সুষমার পিতা বিবি মাধব। বলল, ‘ব্যক্তি, ব্যক্তির স্মৃতি এবং কবর এক জিনিস নয় মা? আর মুসলিম বিধানে কবর স্থায়ী করার ব্যবস্থা নেই।’

‘কিন্তু এরপরও বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজননে কবর স্থায়ী করা হচ্ছে। এটাও বিশেষ ধরণের একটা ক্ষেত্র বাবা।’

‘ঠিক আছে, ক্ষেত্রটাকে বিশেষ মনে করতে পার, কিন্তু এটা কবরের জন্যে বিশেষ স্থান নয় মা।’ বলল সুষমার পিতা।

‘বিশেষ কবরের জন্যে বিশেষ স্থান এখন এটা নয় বাবা। কিন্তু বাস্তবতা হলো বিশেষ কবরটি এ স্থানে হয়ে গেছে। তাই কবরটা বিশেষ বলে স্থানটাও বিশেষ হয়ে গেছে বাবা।’ বরল সুষমা রাও।

হেসে উঠল সুষমার পিতা গভর্নর বালাজী বাজীরাও মাধব। বলল, ‘সুষমা মা, তোমাকে আর্ট না পড়িয়ে আইন পড়ানো উচিত ছিল। কিন্তু শোন আমার কন্যা, জাতীয় থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রকারের ‘প্রয়োজন’ আছে যার জন্যে অন্য সবকিছু জলাঞ্জলী দিতে হয়। আমাদেরকে এমন ধরনেরই সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে।’

বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল সুষমার আব্বা গভর্নর বিবি রাও। শাহ্ বানুর দিকে তাকিয়ে বলল, ‘খুব খুশি হলাম মা, তোমরা এসেছ। কি যেন নাম তোমার?

‘সঙ্গিতা সাইগল।’ শশব্যাস্ত কাঁপা গলায় বলল শাহ্ বানু। মুহূর্তের জন্য তার মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল। মিথ্যা কথাটা বলতে তার কষ্ট হচ্ছিল।

‘আসি মা’ বলে দু’জনকে বাই জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল সুষমার পিতা বালাজী বাজীরাও মাধব।

সুষমা রাও ও শাহ্ বানু তাকে ঘরের বাইরে পর্যন্ত এসে বিদায় জানাল।

সুষমার পিতা বালাজী বাজীরাও মাধব তার পার্সোনাল ষ্টাডিরুমে এসে দরজা বন্ধ করে বসল।

পকেট থেকে বের করল মোবাইল। একটা কল করল সে।

ওপান্তে থেকে একটা কণ্ঠ ভেসে এল, ‘স্যার, গুডমর্নিং স্যার, আমি রঙ্গলাল। নির্দেশ করুন স্যার।’

রঙ্গলাল গভর্নন হাউজের গোয়েন্দা ইনচার্জ।

‘শোন রঙ্গলাল। আমার মেয়ের সাথে মাদ্রাজের সঙ্গীতা সাইগল নামে একটি মেয়ে পড়ে। তুমি গোপনে খোঁজ নাও সেই সঙ্গীতা সাইগল ও তার মা এখন কোথায়?’ এ প্রান্ত থেকে বলল গভর্নর বিবি মাধব।

‘ওকে স্যার। আর কিছু নির্দেশ, স্যার।’ গোয়েন্দা অফিসার ওপ্রান্ত থেকে বলল।

‘ভাইপার দ্বীপে যে লাশগুলো পাওয়া গেছে, তার কোন হদিস মিলল?’

‘না স্যার। মনে করা হচ্ছে, কোন আন্তগ্যাং-এর মধ্যে কোন সংঘাত ওটা।’

‘এ ধরনের দায়সারা গোছের কথা ছেড়ে দাও। যাদের লাশ ওখানে পাওয়া গেছে, তাদের সাবার কপালে চন্দনের বিশেষ ধরনের তিলক আঁকা। এ ধরনের লোকরা জগৎমাতার সেবক হয়ে থাকে। এখন যেটা দেখার সেটা হলো, জগৎমাতার এই সেবকদের কারা হত্যা করল?’ বলল গভর্নর।

‘স্যরি স্যার। ওদের কাছে রিভলবার পাওয়া যায়নি, কিন্তু প্রত্যেকের পকেটে রিভলবারে বুলেট পাওয়া গেছে। ওদের রিভলবারগুলো প্রতিপক্ষরা নিয়ে গেছে মনে করা হচ্ছে। এই দিকটার কারণেই সম্ভবত ঐ কথা বলা হয়েছে। স্যরি স্যার।’ গোয়েন্দা অফিসার বলল।

‘ধন্যবাদ। হোটেল থেকে সোমনাথ শম্ভুজী এবং তার দু’রক্ষীকে যারা গায়েব করেছে, তারাই ভাইপার দ্বীপে জগৎমাতার সেবকদের হত্যা করেছে। সাহারা হোটেলের ভেতরেই কোন রহস্য আছে। গোয়েন্দা বিভাগ ও পুলিশ কি হোটেলের সব বাসিন্দাদের সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছে?’ বলল গভর্নর।

‘নিয়েছে স্যার। শুধু পাওয়া যায়নি ‘বেভান বার্গম্যান’ নামের একজন আমেরিকান ট্যুরিষ্টকে। আর পাওয়া যায়নি আহমাদ শাহ্ আলমগীরের মা ও বোনকে। তারা সোমনাথ শম্ভুজীদের মতই যেন হাওয়অ হয়ে গেছে।’ গোয়েন্দা অফিসার বলল।

‘কিছুক্ষণ আগে পুলিশ প্রধান আমাকে জানিয়েছেন, সব তথ্য একত্র করার পর তাঁরা মনে করছেন যারা আহমদ আলমগীরকে গায়েব করেছে তারাই আবার আলমগীরের মা-বোনকে মিথ্যা ব্লাফ দিয়ে ভিন্ন নামে হোটেলে এসে

তুলেছিল কোন উদ্দেশ্যে। পরে ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে পড়েছে এই আশঙ্কা থেকে তাদের আবার হোটেল থেকে সরিয়ে নিয়েছে তারা। কিন্তু কোন পথে সরিয়ে নিল, শম্ভুজীদের পাওয়া যাচ্ছে না কেন, এর জবাব পুলিশ প্রধানের কাছে নেই। আচ্ছা হাজি আব্দুল্লাহ আলীর খবর কি? উনি কি বলেন?' জিজ্ঞেস করল গভর্নর।

'সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত তিনি হোটেলে থাকেন, তারপর তিনি বাসায় চলে যান। সেদিনও তাই গেছেন।'

'আপনারা বাড়িতে তার খোঁজ করেছেন? কথা বলেছেন তার সাথে হোটেলের সব ব্যাপার নিয়ে?' গভর্নর বলল।

'স্যার আমি এটুকু শুনেছি যে, পুলিশের উপস্থিতিতে হোটেলের লোকরাই তার বাসায় টেলিফোন করেছিল। হাজী সাহেব বাসায় ছিলেন না। বাসা থেকে বলা হয়েছিল, আটটার দিকে কোথাও তাঁর একটা এ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল, সেখানেই তিনি গেছেন।' বলল গোয়েন্দা অফিসারটি।

'ঠিক আছে। আমি মনে করি, তাঁর উপর নজর রাখা.............। না থাক, ওটা আমি দেখব।'

বলে একটু থেমেই গভর্নর আবার বলে উঠল, 'হ্যাঁ, তোমাকে যেটা বলেছি, সেআ তাড়াতাড়ি জানা দরকার। এখনি কাজ শুরু কর।'

'ইয়েস স্যার।' বরল গোয়েন্দ অফিসারটি।

'ওকে।' বরৈ গভর্নর মোবাইল অফ করে দিল।

অস্বস্তি ও উদ্বেগের একটা ছায়া তার চোখে-মুখে উদ্বেগের কারণ হলো, তরুণী ও মহিলার যে পরিচয় তার মেয়ে সুষমা তাকে দিয়েছে, সেটা সে গ্রহণ করতে পারছে না। তরুণীর চোখে-মুখে সে শংকা-ভয়ের ছায়া দেখেছে। বেড়াতে আসা সাইগল পরিবারের কারও মুখে এই শংকা, ভয় থাকবে কেন? আর তরুণীটির চেহারা যেন তার কাছে চেনা মনে হচ্ছে এই চেহারা যেন সে কোথাও দেখেছে তাহলে কি ওদের কোন মিথ্যা পরিচয় দিয়েছে? কেন দেবে? এখানেই তার অস্বস্তি লাগছে।

উদ্বেগ-অস্বস্তির ব্যাপারটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইল গভর্নর বিবি মাধব। ভাবল, মাদ্রাজ থেকে সাইগল পরিবারের খবরটা এলেই সব পরিস্কার হয়ে যাবে।

মোবাইলটা পকেটে রাখল বিবি মাধব।

# ২

আন্দামান সাগরের বুক চিরে একটা বোট এগিয়ে চলেছে রস দ্বীপের দিকে।

বোটে একমাত্র আরোহী আহমদ মুসা। সেই বোট চালাচ্ছে।

এভাবে একটা বোট চালিয়ে 'রস' দ্বীপে আসা নিয়ম নয়। সরকারি ট্যুরিষ্ট কোম্পানী আছে, তাদের বোটে আসাতে হয়। সরকারি বোট চালকারই নিয়ে আসে। কিন্তু আহমদ মুসার বিশেষ মার্কিন পাসপোর্ট এবং বিশেষ ভিসার কারণে আহমদ মুসাকে একটা বোট নিয়ে 'রস' দ্বীপে যাবার অনুমতি দিয়েছে। তবে শর্ত দিয়েছে, 'রস' দ্বীপের নৌ-পোর্টে গিয়ে নৌবাহিনীর কাছে তাকে রিপোর্ট করতে হবে।

হাজী আব্দুল্লাহও তাকে একা ছাড়তে চায়নি। বলেছে, রস দ্বীপ একন যেমন নিরাপদ, তেমনি বিজ্জনকও। দ্বীপটি ভারতীয় নৌবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে বলে নিরাপদ, কারণ কোন ধরনের কোন সিভিল লোক এখানে বাস করে না। কিন্তু বিপদের কারণ নৌবাহিনী নিজেই। কারণ, তারা কাউকে সন্দেহ করলে দ্বীপেই তাদের কবর হয়। তারা মনে করে, কোন বিদেশী গোয়েন্দা ছাড়া কেউ ছাড়া সন্দেহজনক কেউ ঐ দ্বীপে যায় না। কিন্তু আহমদ মুসা হাজী আব্দুল্লাহর অকাট্য যুক্তি ও জেদ সত্ত্বেও তাকে সাথে নেয়নি। বলেছে, হাজী আব্দুল্লাহ দ্বীপে যাওয়ার বিশেষ অনুমতি পেলেও তার 'রস' দ্বীপে যাওয়াকে পুলিশ ও গোয়েন্দারা সন্দেহজনক দৃষ্টিতে দেখতে পারে। সন্দেহ করার কারণে গোয়েন্দারা যদি আহমদ মুসাদের অনুসরণ করে, তাহলে দ্বীপে যাওয়ার তাদের আসল লক্ষ্যই বানচাল হয়ে যেতে পারে। হাজী আব্দুল্লাহ অবশেষে আহমদ মুসার যুক্তির কাছে হার মেনেছে।

আহমদ মুসা দু'হাতে বোটের ষ্টিয়ারিং ধরে সামনে স্থির দৃষ্টি রেখে 'রস' দ্বীপের কথাই ভাবছে। এক সময় 'রস' দ্বীপ ছিল আন্দামানের সবচেয়ে জমকালো

দ্বীপ। কয়েদী জনসাধারণের জন্যে ভীতিকর প্রশাসনিক বিল্ডিং-এর সারি ছিল এই দ্বীপে। ছিল গুচ্ছ গুচ্ছ আবাসিক বাড়ির মনোরম দৃশ্য। শাসনকারী শ্বেতাংগদের বেড়ানোর জন্য ছিল সুদৃশ্য পার্ক ও বীচ, ছির তাদের খেলার জন্য গল্ফ কোর্ট, পোলো গ্রাউন্ড। সাঁতার কাটার জন্যে অনেক স্যুইমিং পুল। ভু-পৃষ্ঠ ও ভূগর্ভে ছিল সারি সারি সামরিক ও পণ্য-গোডাউন। ১৯৪১ সালে এক ভুমিকম্প সব কিছু ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। এই ধ্বংস দ্বীপকে ফিরেয়ে দিয়েছে আগের অবস্থায়। দ্বীপ এখন বড় একটি জংগল। ভারতীয় নৌবাহিনীর লোক ছাড়া দ্বীপে কোন মানুষ নেই। এই প্রচার সত্য হলে, দ্বীপে শাহ্ আলমগীর বন্দী থাকার প্রশ্ন আসে কি করে। কে তাকে বন্দী করে নিয়ে যাবে যদি সেখানে কারো যাতাযাত না থাকে? তাছাড়াও মনে করতে হবে, সবকিছু সেখানে ধ্বংস হয়ে যায়নি। কিছু বাড়ি কিংবা গোডাউন অক্ষত আছে যেখানে আহমদ শাহ্ আলমগীরকে বন্দী করে রাখতে পারে। সত্যিই কি আহমদ শাহ্ আলমগীর সেখানে বন্দী আছে? গভর্নর বালাজী বাজীরাও মাধবের একটা উক্তিকে সামনে রেখে আহমদ মুসা 'রস' দ্বীপে যাচ্ছে। সুষমা রাও তার পিতা গভর্নর বালাজী বাজীরাওকে বলতে শুনেছিল রস দ্বীপের কোন গোডাউনে কাউকে রাখা হয়েছে। তাছাড়া ভাইপার দ্বীপে গঙ্গাধরকে যারা বন্দী রেখেছিল, তাদের নেতা স্বামী শংকরাচার্য শিরোমনিও এ ধরনের কথা বলেছিল বলে গঙ্গারাম জানিয়েছিল। এ দু'টি অস্পষ্ট তথ্য প্রমাণ করে না যে, আহমদ শাহ্ আলমগীর ঐ দ্বীপেই আছে, আবার এ সন্দেহও সৃষ্টি করে যে ঐ দ্বীপে তাকে রাখা হতে পারে। আন্দামান সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের লোকরা এই ঘটনার সাথে জড়িত থাকলে, আহমদ শাহ্ আলমগীরকে 'রস' দ্বীপে রাখা যুক্তিযুক্ত হয়ে ওঠে। আর এটা সত্য হলে স্বয়ং বালাজী বাজীরাও মাধব ঘটনার সাথে জড়িয়ে পড়েন। হাজি আব্দুল্লাহর অতীত কাহিনী এবং ইসরাইলী সহযোগিতার তথ্য বালাজী বাজীরাও এর সাথে জড়িত থাকার সন্দেহকে আরো ঘনিভূত করে। কিন্তু এ সন্দেহে একটা অনুমান মাত্র।

সামনে প্রসারিত আহমদ মুসার চোখে 'রস' দ্বীপটি দিগন্তে কাল রেখার মত ফুটে উঠল। আহমদ মুসার মাথায় ভাবনা এল, তার বোটটিকে সে দ্বীপের কোথায় দাঁড় করাবে? 'রস' উপকূলে দু'ধরের ঘাট আছে। ট্যুরিষ্ট বোটগুলোর

জন্যে একটা ঘাট, আর কিছু আছে নৌবাহিনীর ঘাট। বেসরকারী কোন নৌযান নৌবাহিনীর ঘাটে ভেড়ার অনুমতি নেই। নৌবাহিনীর ঘাঁটি দ্বীপের দক্ষিণ, পূর্ব ও উত্তর উপকূলে একটি করে। আর ট্যুরিষ্ট বন্দরটি দ্বীপের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে। দ্বীপের পশ্চিম উপকূলের অধিকাংশ বেসরকারি নোঙরের জন্য জন্য নিষিদ্ধ এলাকা। এই উপকূল জুড়েই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে এক সময়ের প্রাচ্যের প্যারিসের ধ্বংসাবশেষ। আন্দামানের প্রশাসনিক কেন্দ্র সাজানো-গোছানো মনোরম 'রস' দ্বীপকে বলা হতো প্রাচ্যের প্যারিস। সেই প্রাচ্যের প্যারিস এখন জংগলাকীর্ণ ধ্বংসের স্তুপ ছাড়া আর কিছু নয়। অনেকেই মনে করেন, দ্বীপ-কারাগার আন্দামানের হাজারো কয়েদীর জীবনব্যাপী কান্নার অভীশাপে ধ্বংস হয়েছে প্রাচ্যের প্যারিস নামের আন্দামানের এই রাজধানী। আহমদ মুসার ইচ্ছা মূল ধ্বংসপুরিতেই ল্যান্ড করা। আহমদ মুসা চিন্তা করেছে উপকূলের কাছাকাছি গিয়ে ডানদিকে বাঁক নিয়ে দক্ষিণ, পূর্ব ও উত্তর হয়ে দ্বীপটাকে একটা রাউন্ড দেবে সে। শেষ পর্যায়ে আসবে সে পশ্চিম উপকূলের মাঝামাঝি জায়গায়। তারপর টপ করে কোন খাড়ি দিয়ে ঢুকে যাবে দ্বীপের মানচিত্র সে দেখেছে পশ্চিম উফকূলে বেশ কয়েকটি সুন্দর খাড়ি আছে। আহমদ মুসারি বিশ্বাস রস দ্বীপের এক সময়ের পণ্য গোডাউন ও সামরিক গোডাউনগুলো কোন খাড়ির তীরেই হবে।

আহমদ মুসা মনে মনে খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল। গভর্নর বালাজী বাজীরাও-এর কথা যদি তারা ঠিত ধরে থাকে এবং স্বামী শংকরাচার্য শিরোমনি যদি ঠিক বলে থাকে তাহলে ধ্বংস এলাকার কোন গোডাউনে আহমদ শাহ্ আলমগীরকে পাওয়া যাবে।

আহমদ মুসার চিন্তায় ছেদ পড়ল।

একটা হেলিকপ্টারের শব্দে মুখ তুলল সে। দেখল, তার বাম দিক অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে একটা হেলিকপ্টার ছুটে আসছে। ছোট হেলিকপ্টার। এ্যাকোমোডেশনের দিক থেকে ৬সিটের মাইক্রোর চেয়ে সুবিধাজনক হবে না।

হেলিকপ্টার কাছে চলে এসেছে। আবার মুখ তুলল আহমদ মুসা। এবার তার কারেছ স্পষ্ট হলো, হেলিকপ্টারটি কোন ট্যুরিষ্ট কোম্পানীর। কিন্তু হেলিকপ্টারটি সোজা 'রস' দ্বীপের দিকে যাচ্ছে না। তার মাথার উপর দিয়ে

দক্ষিণমুখী তার গতি। আহমদ মুসা ভাবল, আরও দক্ষিণের, হয়তো নিকোবরের কোন দ্বীপ লক্ষ্য হতে পারে হেলিকপ্টারটির।

আহমদ মুসা হেলিকপ্টারটির চিন্তা বাদ দিয়ে চোখ নামিয়ে সামনে দৃষ্টি প্রসারিত করল। হঠাৎ তার মনে হলো হেলিকপ্টারটি যেন তার মাথার উপর স্থির হয়ে আছে।

দেখার জন্য মুখ উপরে তুলল আহমদ মুসা। কিন্তু তাকিয়েই তার দু'চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। দেখল, হেলিকপ্টার থেকে সাদা এক গুচ্ছ সিল্কের কর্ড ধরনের কিছু নেমে এসেছে তার মাথার উপর। চিন্তা করার আগেই কর্ডের গুচ্ছটি তাকে এসে জড়িয়ে ধরল। সে যে ফাঁদে আটকা পড়েছে তা এবার বুঝতে বাকি রইল না আহমদ মুসার।

সিল্কের কর্ডটি একটা ম্যাগনেটিক ফাঁস। রিমোট কনট্রোরে মাধ্যমে ফোল্ড-আনফোল্ড করা যায়। সিল্কের কর্ডের গুচ্ছটি আহমদ মুসার দেহের উপর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে নিশ্চয় হেলিকপ্টার থেকে রিমোট কনট্রোল অন করা হয়েছিল। চোখের মিনিষেই সিল্কের কর্ডগুলো গুটিয়ে গিয়ে আহমদ মুসাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল। কোমর থেকে উপর দিকে দু'হাতসহ সবটাই অনড় বাঁধনের মধ্যে পড়ে গেল। হাত দু'টি তিলমাত্র নড়াবারও কোন উপায় ছিল না।

এরপর কি ঘটবে সেটার পরিস্কার আহমদ মুসার কাছে। ফাঁসটি এবার গুটিয়ে নেবে ওরা উপর থেকে। তুলে নেবে তারা তাকে হেলিকপ্টারে।

আহমদ মুসা নিশ্চিত, স্বামী শংকরাচার্য শিরোমনিরাই তাকে এই ফাঁদে আটকেছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, তারা তাকে চিনল কি করে? জানল কি করে যে সে 'রস' দ্বীপে এইভাবে যাত্রা করেছে? একবারে নিশ্চিত না হয়ে তারা এইভাবে হেলিকপ্টার নিয়ে আসেনি। 'রস' দ্বীপে আসার বোটও সে নিজে ঠিক করতে যায়নি। বোট ঠিক করেছে হাজী আবদুল্লাহ নিজে এবং সেই একমাত্র বিদায়কালে তাকে দেখেছে। বোট কোম্পানীর লোকরা হাজী আবদুল্লাকে সন্দেহ করেছিল? তারাই কি খবর দিয়েছে কাউকে? ইত্যাদি নানা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল আহমদ মুসার মাথায়।

তাকে টেনে তোলা হলো হেলিকপ্টারে। আছড়ে ফেলা হলো তার দেহকে হেলিকপ্টারের মেঝের উপর।

আহমদ মুসা দেখল পাইলটসহ সাত সিটের হেলিকপ্টার। ভর্তি সবগুলো সিটই। তার মানে হেলিকপ্টারে লোকের সংখ্যাও সাতজন।

আহমদ মুসা সবার মুখের উপর দিয়ে চোখ ঘুরিয়ে নিল। একজনের পরনে গেরুয়া বসনম, তার মাথায় পাগড়িও রংও গেরুয়া, সে মধ্যবয়ষী। পাইলটসহ অন্য সবাই যুবক এবং তাদের পরনে প্যান্ট-টিসার্ট, পায়ে কেড্‌স। মুখে সকলের তৃপ্তির হাসি।

আহমদ মুসার দিকেও ওরা কটমট করে তাকিয়েছিল। যুবকদের একজন বলে উঠল, ‘এই আমেরিকান, আমেরিকার তো নয়।’

বলে উঠল আরেকজন, ‘আজগুবি কথা বলিস না আমেরিকান হলেই আমেরিকার হয়ে যায়।’

‘সত্যি আমেরিকান তো?’ অন্য একজন বলল।

‘না আমেরিকান। খোঁজ নেয়া হয়েছে।’ বলল প্রথম যুবকটি।

একজন যুবক হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠল, স্বামীজী, ভাল করে দেখুন, আমরা হারবারতাবাদের ‘শাহ্ বুরুজে’র সামনে সেদিন গঙ্গারামরে সাথে থাকা একজন লোকের যে বিবরণ যোগাড় করেছি তার সাথে এর চেহারা সম্পূর্ণ মিলে যায়।’

যুবকটি গেরুয়া বসনধারী কপালে তিলক আঁকা মাঝবয়সী লোকটাকে লক্ষ্য করেই কথাগুলো বলল। গেরুয়া বসনধারী লোকটিও আহমদ মুসার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে ছিল।

স্বামীজীর পুরো নাম স্বামী স্বরূপানন্দ মহামুনি। ইনি দৃশ্যত আন্দামানের ‘হরে কৃষ্ণ হরে রাম’ নামক এনজিও’র প্রধান, কিন্তু কাজ করেন তিনি গোপন সন্ত্রাসী আন্দোলনের সাথে।

আগের যুবকটির কথা শেষ হতেই আরেকজন যুবক কথা বলার জন্য মুখ খুলেছিল। কিন্তু স্বামীজী তার কথায় বাধা দিয়ে বলল, ‘এবার তোমরা থাম।’

বলে সে একটু থামল। তাকাল আহমদ মুসার দিকে। তার চোখ দু'টি লাল আর বাজপাখির মত তীকশ্ন। বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, 'তুমি কে? তুমি আমেরিকান নিশ্চয়, কিন্তু তুমি শুধু বিভেন বার্গম্যান নও।'

স্বামী স্বরূপানন্দ মহামুনীর গলা ঠান্ড, শান্ত। কথা শুনেই আহমদ মুসা বুঝল, এ লোকটি ওদের থেকে আলাদা। প্রফেসনাল অ্যাকটিভিষ্টে সে। হতে পারে নেতা গোছেরও কেউ। তাকে ধরার মিশনে একজন নেতা আসাই তো স্বাভাবিক।

'আপনারা কি পরিচয় সন্ধান করছেন?' বলল আহমদ মুসা শান্ত কণ্ঠে।

আহমদ মুসার কথায় লোকটি ভ্রু-কুঞ্চিত করল। বিরক্তির প্রকাশ ঘটেছে তার চোখে-মুখে। বলল, 'আমরা কোন পরিচয় সন্ধান করছি না, আমরা জানতে চাচ্ছি তুমি কে?'

'কি পরিচয় জানতে চাচ্ছেন? নাম-ধামের বাইরের আরও কিছু পরিচয় আপনাদের ইমিগ্রেশন বিভাগ জানে । আপনাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও জানতে পারে।' বলল আহমদ মুসা।

'শাহবুরুজে আমাদের লোককে খুর করেছ, ভাইপার দ্বীপে আমাদের লোককে খুন করেছ, সেটাও কি আমাদের ইমিগ্রেশন ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানে?' স্বামীজীর কণ্ঠ এবার ধারাল।

'এ অভিযোগগুলো পুলিশের উত্থাপন করার কথা। পুলিশকে আপনাদের জানানোর কথা।

'পুলিশ তো তোমাকে পাচ্ছে না। সাহারা হোটেল থেকে তুমি পালিয়ে এসেছ।'

'পালিয়ে নয় সরে এসেছি দু'জন বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করার জন্য।'

'বিপদগ্রস্ত কারা? সাহারা বানু, শাহ্ বানু?'

'অবশ্যই।'

'ওদের সাথে বিভেন বার্গম্যানের কি সম্পর্ক?'

'মানুষ মানুষকে সাহায্য করবে, এজন্যে সম্পর্কের প্রয়োজন হয় না।'

'তারা কোথায়?'

‘নিশ্চয় তারা অন্য কারো আশ্রয়ে আছে। আমি এখানে বিদেশী। আমার বাড়ি-ঘর নেই এখানে। কাউকে আশ্রয় দেবার প্রশ্ন ওঠে না।’

‘শাহবুরুজে ও হারবারতাবাদ-পোর্ট ব্লেয়ার রাস্তায় আমাদের লোকদের খুব করেছ সেটাও কি মানুষকে সাহায্য করার জন্য।’

‘অবশ্যই।’

‘শাহবুরুজে কেন গিয়েছিলে?’

‘একজন পর্যটক অনেক কিছুই দেখে। একজন প্রাচীন কয়েদীর বাসস্থান শাহবুরজে দেখতে গিয়েছিলাম। ঠিক তখনই কিডন্যাপ হচ্ছিল সাহারা বানু ও শাহ্ বানু।’

‘কোন পর্যটক এখানে রিভলবার-বন্দুক নিয়ে আসতে পারে না। তুমি রিভলবার সাথে এসেছিলে কেন পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে?’

‘আমি বন্দুক রিভলবার কিছুই আনিনি।’

‘কিন্তু আমাদের লোকদের তুমি রিভলবারে গুলীতে হত্যা করেছ।’

‘সেটা আমার রিভলবার নয়। ওদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া রিভলবার।’

‘একজন পর্যটক কি অমন পেশাদার বন্দুকবাজ হতে পারে?’

‘মার্কিন পুরুষ নাগরিকদের প্রত্যেকেরই একটি সৈনিক জীবন আছে। সৈনিকরা পেশাদার ক্রিমিনালদের চেয়ে অনেক দক্ষ বন্দুকবাজ।’

‘তুমি ভাইপার দ্বীপে আমাদের লোকদের খুন করেছ। গঙ্গারামকে উদ্ধার করতে যাওয়া কি একজন মার্কিন পর্যটকের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে?’

’গঙ্গারাম আমার গাইড ছিল, বন্ধু ছিল।তার বিপদে এগিয়ে যাওয়া পর্যটক হিসাবে নয়, মানুষ হিসাবে আমারদ দায়িত্ব ছিল।’

‘দুনিয়াতে এমন পর্যটক কিংবা মানুষ কি কোথাও আছে, যে বিদেশে গিয়ে স্বল্প পরিচিত এক মাত্র গাইডের উদ্ধারের জন্যে ডজনেরও বেশি লোক হত্যা করত পারে?’

‘অবশ্যই যেতে পারে। কারণ হত্যা এখানে বিষয় নয়, বিষয় ছিল গঙ্গারামকে উদ্ধার করা। উদ্ধার কাজ করতে গিয়ে আপতিত ঘটনায় ডজন

খানেকের মত লেঅক নিহত হয়েছে। পর্যটকও হতে পারতো। নিজেকে বাঁচানোর জন্যেই আক্রমণকারীদের হত্যা করতে হয়েছে। পর্যটক ওদের হত্যা করতে যায়নি, গঙ্গারামকে উদ্ধার করতে.........।' আহমদ মুসা কথা শেষ করতে পারলো না।

স্বামী স্বরূপানন্দ মহামুনি বিদ্যুৎ বেগে তার আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল। তার চোখ দু'টি আরও লাল টকটকে হয়ে উঠেছে। সে উঠে দাঁড়াবার সাথে সাথেই তার ডান পায়ের প্রচণ্ড এক লাথি গিয়ে পড়েছে আহমদ মুসার মুখে।

মুখটা সরিয়ে নেয়ায় লাথিটা গিয়ে আঘাত করেছে চোখের ঠিক পাশটায়। থেতলে গেল জায়গাটা। গড়িয়ে পড়তে লাগল রক্ত।

রক্তের দিকে তাকিয়ে মুখ বাঁকিয়ে কথার রাজ্যের শ্লেষ ছড়িয়ে বলল, 'উকিলের মত আরগুমেন্ট পেশ করছো। তোমাকে ওকালতির জন্য আনা হয়নি, আনা হয়েছে হিসাব-নিকাশ শেষ করার জন্যে।'

স্বামী স্বরূপানন্দ ফিরে এল তার আসনে। একটু সামনে ঝুঁকে বসে বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, 'এবাল বল 'রস' দ্বীপে কেন যাচ্ছিলে?'

রক্ত গড়িয়ে পড়েছে চোখের কোণ থেকে। হাত দু'টি আহমদ মুসার ফাঁসের মধ্যে বাঁধা থাকায় রক্ত মুছে ফেলার আর সুযোগ নেই।

উঠে বসল আহমদ মুসা। হাসল। বলল, 'সবাই বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে 'রস' দ্বীপে যায় না।' শান্তকণ্ঠ আহমদ মুসার।

'আবার ওকালতির ভাষা শুরু করেছো।' চিৎকার করে বলল স্বামী স্বরূপানন্দ।একটু থামল সে। থেমেই আবার বলে উঠল, 'কথা না বললেই বেঁচে যাবে তা নয়। এটা থানা পুলিশ নয়, কথা বের করে ছাড়ব। আর হাজী আবদুল্লাকেও ছাড়া হবে না। হাতে নাতে তাকে আমরা ধরব, তারপর সব বেরিয়ে আসেবে।'

স্বামীজী থামতেই আহমদ মুসা বলে উঠল, 'তোমরা থানা-পুলিশ নও, তাহলে কে তোমরা? আমাকে এভাবে ধরার, এভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করার তোমাদের কি অধিকার আছে।'

‘আমরা কে? আমরা তোমাদের বাপ, তোমাদের দাদার বাপ, পরদাদার বাপ।’

‘আন্দামানে আমেরিকানদের বাপ এল কি করে?’

‘আহমদ শাহ্ আলমগীর, সাহারা বানুরা আমেরিকান নয়।’

‘তাদের বাপ হলে কি করে? তারা তো মুসলমান। তাদের দাদা-পরদাদারা হিন্দু ছিল বলেই কি বলছেন?’

‘তোমার এসব ওয়াজ রাখ। বল তুমি ‘রস’ দ্বীপে কেন যাচ্ছিলে? কি জানতে পেরেছ সেখানকার?’

‘তাহলে ওখানে জানার মত বড় কিছু আছে?’ ঠাণ্ডা গলায় বলল।

চোখ দু’টি জ্বলে উঠল স্বামীজীর। সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। এগুতে গেল আহমদ মুসার দিকে।

ঠিক এস সময় হেলিকপ্টার একটা ড্রাইভ দিল। পাইলট বলে উঠল, গুরুজী আমরা এসে গেছি। আমি চত্বরে ল্যান্ড করব? ওদিকে কিছু পুলিশ দেখা যাচ্ছে।’

স্বামী স্বরূপানন্দ এক ধাপ পিছিয়ে এসে বসে পড়ল সিটে। বলল, ‘পুলিশ তো কি হয়েছে। ওদরে বাবার লোক আমরা। নেমে যাও। এখানকার থানা-পুলিশের সবাই আমাদের চেনে। চিন্তা নেই। এই শয়তান আমেরিকানকে ষ্ট্রেচারে করে নিয়ে যাওয়া যাবে।’

স্বামী স্বরূপানন্দ থামতেই আহমদ মুসা বলে উঠল, ‘তোমাদের পুলিশের এই বাবা পুলিশ না তোমাদের মত কোন ক্রিমিনাল।’

আগুনের মত জ্বলে ওঠা চোখ নিয়ে তাকাল স্বামী স্বরূপানন্দ আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘শয়তান আমরা ক্রিমিনাল নই, আমরা মুক্তিযোদ্ধা। আমরা দেশকে অপবিত্রদের স্পর্শ থেকে মুক্ত করতে চাই। আর তাকে ক্রিমিনাল বলছ? তিনি শুধু পুলিশের মালিক নন, আন্দামানেরও মালিক।’

আহমদ মুসার বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। বলল, আন্দামানের মালিক তো গভর্নরকে বলা যাযা এক হিসেবে।’

হুংকার দিয়ে আবার উঠে দাঁড়াল স্বামী স্বরূপানন্দ। বলল, ‘আমি গভর্নরের নাম বলেছি? হারামজাদার মুখ ভেঙ্গে দেব। তুই কি কাঠের তৈরী? এতবড় লঅথি খাওয়ার পরও বকবক করছিস। ভয় নেই তোর শরীরে?’

বন্যার বেগের মত কথাগুলো উদগীররণ করেই স্বামী স্বরূপানন্দ বসে পড়ল। বসে বসতে বলল, ‘চল দেখাচ্ছি মজা।’

স্বরূপানন্দের কথাগুলো আহমদমুসার কানে খুব কমই প্রবেশ করেছে। সে ভাবছিল অন্য কথা। স্বয়ং গভর্নর বালাজী বাজীরাও মাধব এই সন্ত্রাসী দলের নেতা, এটাই কি তাহলে সত্য?

একটা ঝাঁকুনি দিয়ে হেলিকপ্টার থেমে গেল।

ল্যান্ড করেছে হেলিকপ্টার।

আহমদ মুসা মুখ ঘুরাল চারদিকটা দেখার জন্যে।

‘শয়তানকে এখন ক্লোরোফরম করনি। তাড়াতাগি করে।’ চিৎকার করে উঠল স্বামী স্বারূপানন্দ।

পর মুহূর্তেই একজন ছুটে এল। একটা টিউবের ছিপি খুলে সে আহমদ মুসার নাকের ফুটোয় গুঁজে দিল।

আহমদ মুসা বুঝল ওটা ক্লোরোফরম। একটু হাসি ফুটে উঠল আহমদ মুসার ঠোঁটে। সে চোখ বুঝল। পরমহূর্তেই তার দেহ টলে উঠে পড়ে গেল হেলিকপ্টারের মেঝের উপর।

পনের বিশ সেকেন্ডের বেশি ধরে থাকতে হলো না আহমদ মুসার নাকে।

‘বড় বড় কথা বলে, কিন্তু এত অল্প সময়ে কাবু? যাও, তোমরা শয়তানটার সংঙ্গাহীন দেহ ষ্ট্রেচারে নাও।’ বলল স্বামী স্বরূপানন্দ।

দু’জন ছুটে এসে আহমদ মুসার দেহ দরজার পাশে রাখা ষ্ট্রেচারের দিকে টেনে নিতে লাগল।

ষ্ট্রেচার থেকে আহমদ মুসাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল ওরা মেঝের উপর।

মেঝের উপর আছড়ে পড়েছিল আহমদ মুসার দেহটা। মেঝের সাথে ঠুকে গিয়েছিল চোখের কোণের আহত জায়গাটা আবার। আহত জায়গা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এসেছিল। হাত বাঁধা থাকার জন্যে আগে যেমন আহম জায়গায় হাত বুলাতে পারেনি, এখনও তেমনি সংজ্ঞাহীন থাকার ভান করার কারণে আহত জায়গায় হাত বুলাতে পারেনি, কিংবা আহত স্থানটাকে আরাম দেয়ার জন্যে দেহটাকে পাশ ফেরানোও সম্ভব হয়নি।

ওরা বেরিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করতেই মুখ থুবড়ো পড়া অবস্থা থেকে সোজা হয়ে শয়ন করলে আহমদ মুসা। চোখ বুজে কয়েকটা বড় শ্বাস নিয়ে আহমদ মুসা ধীরে ধীরে চোখ খুলল।

মাথা ঘুরিয়ে নিল চারদিকটায়। বড় একটা ঘর।

দু'দিকে আড়াআড়ি দু'টি দরজা। কোন জানালা নেই। অনেক উপরে ভেন্টিলেশনের জন্যে ঘুলঘুলি রয়েছে।

কক্ষটি ষ্টোর রূম হিসাবে ব্যবহৃত হয় আহমদ মুসা অনুমান করল।

আহমদ মুসা উঠে বসার কথা চিন্তা করল। কিন্তু পরক্ষণেই বাবল, ঘরে যদি টিভি ক্যামেরা থাকে? তাহলে তো এখনি ওদের কাছে খবর হয়ে যাবে যে, আমি উঠে বসেছি, আমার জ্ঞান ফিরেছে। এত তাড়াতাড়ি কোনভাবেই সংজ্ঞা ফেরার কথা নয়। তখন তারা ভাবতে পারে আমি সংজ্ঞাহীনের ভান করেছিলাম। সেক্ষেত্রে তারা আমার ব্যাপারে আরও সাবধান হয়ে যাবে। কিন্তু তার মনে পড়ল, তাকে এই বাড়িতে প্রবেশ করানোর সময় স্বামী স্বরূপানন্দ বলেছিল, 'এ পর্যন্ত বুঝা গেছে এ লোকটা সাংঘাতিক ধড়িবাজ। এক আপাতত ষ্টোরেই আটকে রাখা হোক। জানালা নেই, সুবিধা হবে। দরজায় পাহারা বসিয়ে রাখলেই চলতে।' তার কথা শেষ হতেই আরেকজন বলে উঠেছিল সঙ্গে সঙ্গেই, 'কিন্তু জানালা থাকলে নজর রাখা যেত। সেটা ভালো হতো না?' উত্তরে স্বরূপানন্দ বলেছিল, 'কেন উত্তরের দরজায় তো 'আই-হোল' আছে। আর সংজ্ঞাহীনদের উপর আবার কি দৃষ্টি রাখবে। আর বেশি সময় তো থাকছে না। মিঃ কোলম্যান এলেই তো আমরা এর একটা বিহিত করবো।' একথাগুলো থেকেই পরিস্কার বুঝল আহমদ মুসা যে, এই ঘরে পর্যবেক্ষণের জন্যে কোনো টিভি ক্যামেরা নেই।

খুশি হলো আহমদ মুসা। উঠে বসল সে।

কোনও দিক থেকে কথার রেশ ছুটে আসতে শুরু করল এই সময়। কান খাড়া করল আহমদ মুসা।

খুবই ক্ষীণ, জড়ানো আওয়াজ। কিছুই বুঝতে পারল না আহমদ মুসা। উঠে দাঁড়াল সে।

আরেকটু কান পেতে শুনল। তারপর ধীরে ধীরে এগুলো আহমদ মুসা উত্তর দিকের দরজাটার দিকে। ঐ দিক থেকেই শব্দটা আসছে। আহমদ মুসাকে এই দরজা দিয়েই প্রবেশ করানো হয়েছিল, দেখেছে আহমদ মুসা। আর এ দরজাতেই 'আই হোল' আছে।

দরজার সামনে দাঁড়াল আহম মুসা। শব্দ বড় হয়েছে, খুব স্পষ্ট এখনও নয়।

মুখ এগিয়ে নিয়ে সে সন্তর্পণে চোখ নিল আইহোলের কাছে।

আইহোলের মুখের সাটারটি খোলা ছিল। চমকে উঠেছিল আহমদ মুসা। ওপার থেকে কেউ চোখ রাখেনি তো ঘরে?

কিন্তু চোখ দু'টি আইহোলের সোজাসুজি এগিয়ে এসে দেখল ওপারে ফাঁকা, আলো দেখা যাচ্ছে।

আরেকটা ভুল ভাঙল আহমদ মুসার। ওটা আইহোল নয়। নিছকই একটা গোলাকার ফুটো। দু'পার থেকেই দেখা যায়। এ কারণেই বোধ হয় সাটার লাগানানোর ব্যবস্থা।

বাইরে থেবে বেসে আসা কথা এবার অনেক স্পষ্ট। কথার মধ্যে একটা পরিচিত কণ্ঠ পেল আহমদ মুসা। কোলম্যান কোহেন তাহলে এসে গেছে। ইসরাইলের গোয়েন্দাসংস্থা 'মোসাদ'-এর সবচেয়ে সফল গোয়েন্দা হলো ক্রিষ্টোফার কোলম্যান কোহেন। আন্দামানে সে এসেছে ভারতে একটা বড় সন্ত্রাসী গ্রুপকে সাহায্য করার জন্যে। হাজী আব্দুল্লাহ আলীর কাছে আহমদ মুসা এই কথা শুনেছিল। এরাও বলেছিল কোলম্যান কোহেনের এখানে আসার কথা। না হলে এত তাড়াতাড়ি তার কণ্ঠ হয়তো সে ধরে ফেলতো পারতো না।

উৎকর্ণ হয়েছে আহমদ মুসা। দরজার ফুটো দিয়ে তার চোখ দু'টোও ওদের সন্ধান করছে। দৃষ্টিসীমার মধ্যে পড়ল ওরা।

ওরা ডান পাশে ওদিকের একটা দরজারর সামনে করিডোরে দাঁড়িয়ে কথা বলছে।

স্বামী স্বরূপানন্দ ও ক্রিষ্টেফার কোলম্যান কোহেন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। এপাশ থেকে দু'জনকেই মুখোমুখি দেখা যাচ্ছে।

কথা বলছিল কোলম্যান কোহেনই। সে বলছিল, '........ ওসব কথা সবই শুনেছি, কিন্তু কি বললেন লোকটি দেখতে এশিয়ান? এশিয়ান মানে কোন দেশের মত?'

'তুর্কি বা আরব অঞ্চলের মত।' বলল স্বামী স্বরূপানন্দ।

ভ্রুকুঞ্চিত হলো কোলম্যান কোহেনের। অনেকটা স্বগতঃকণ্ঠে বলল, 'তুর্কিদের চেহারা , তার সাথে আমেরিকান পাসপোর্ট।' দৃষ্টিটা একটু নিচু, কিচুটা আত্বস্থভাব কোলম্যান কোহেনের।

'ঠিক আছে, চলুন দেখবেন। অবশ্য সে এখনও সংজ্ঞাহীন।' স্বামী স্বরূপানন্দ বলল।

'চলুন যাওয়া যাক। আমি যার কথা ভাবছি সে নিশ্চয় নয়। তাকে এভাবে আপনারা পাকড়াও করতে পারতেন না। সে শৃগালের মত ধড়িবাজ, আর সিংহের মত হিংস্র।'

'কিন্তু এও কম যায় না মিঃ কোলম্যান। আমরা যখন ক্রোধে ফেটে যাচ্ছি, ওকে আঘাত করছি, তখনও তার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া নেই, একদম পাথরের মত ঠাণ্ডা সে।' বলল স্বামী স্বরূপানন্দ স্বামীজী।

'এমন ক্রিমিনাল বহু আছে স্বামীজী। বলে মুহূর্তকাল থামল কোলম্যান কোহেন। পরে বলে উঠল, 'তবে সে যদি হয়, তাহলে দেখা মাত্র গুলী করব। অতীতে ভুল করেছি, আর করব না।' কোলম্যান কোহেন বলল।

'কেন, কেন, গুলী কেন? তাকে তো এইমাত্র ধরা হল। কিছুই জানাই হয়নি তার কাছ থেকে।' বলল স্বামীজী দ্রুত কণ্ঠে।

'আমি যার কথা ভাবছি সে যদি হয়, তাহলে তার কাছ থেকে একটা কথাও আদায় করা যাবে না। সে ভাঙবে, কিন্তু মচকাবে না, এটা শত-সহস্রবার প্রমাণ হয়ে গেছে। তাকে বাঁচিয়ে রেখে কোন লাভ নেই।'

'কিন্তু মারলেই বা লাভ কি?'

'সে পালাতে পারবে না, আমাদের ক্ষতি করার আর তা সুযোগ থাকবে না।'

'পালাবে কেন? আমরা পালাতে দেব কেন? আমাদের হাত থেকে কেউ এখনো পালাতে পারেনি।'

'সে পারবে। সে মানুষ নয়, একেবারে অতিমানুষ। আমরা বহুবার ঠকেছি। আর ঠকার সিদ্ধান্ত নিতে চাই না। টুইন টাওয়ারের ব্যাপার নিয়ে আমেরিকায় যা ঘটল, এরপর আমাদের সিদ্ধান্ত হয়েছেম তাকে দেখা মাত্র গুলী করার। তাকে দেখার পর একটা শব্দ উচ্চারণের মতও সময় নষ্ট করা যাবে না। চোখে পড়ার সাথে সাথেই তাকে গুলী করতে হবে। তাকে হত্যা করার মধ্যেই আমাদের সব সমস্যার সমাধান।'

বলে একটু থেকে একটা দম নিয়েই আবার বলে উঠলম 'ও যে একাই একটা বোট নিয়ে 'রস' দ্বীপে যাচ্ছে, এটা টের পেলেন কি করে আপনারা? আর সে সন্দেহজনক মনে হলো কি করে?'

'আমাদের চোখ ছিল হাজী আব্দুল্লাহ আলীর উপর। সেই -ই বিভেন বার্গম্যানকে ট্যুরিষ্ট অফিসে নিয়ে গেছে এবং 'রস' দ্বীপে যাবার সব ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এইভাবে হাজী আব্দুল্লাহর উপর চোখ রাখতে গিয়ে হোটেল সাহারা থেকে নিখোঁজ হওয়অ সন্দেহের একটা বড় লক্ষ্য বিভেন বার্গম্যানকে আমরা পেয়ে যাই। তার 'রস' দ্বীপে যাওয়ার উদ্যোগে তার প্রতি আমাদের সন্দেহ আরও ঘনীভুত হয়। একদিকে আহমদ শাহ্ আলমগীরের পরিবারে সাথে তার সম্পর্ক থাকা, অন্যদিকে আহমদ শাহ্ আলমগীরকে বন্দী করে রাখা 'রস' দ্বীপে তার যাওয়ার সিদ্ধান্তে পরিস্কার হয়ে যায়, 'রস' দ্বীপে তার মিশন কি। তার উপর ট্যুরিষ্ট অফিস থেকে সে 'রস' দ্বীপের পুরানো মাত্রচিত্র যোগাড় করেছে সে যাবে দ্বীপের বাড়িঘর, গোডাউন, অফিস-আদালত, ইত্যাদিরর সুস্পষ্ট অবস্থান নির্দেশ করা

আভে। এই ম্যাপ এখন নিষিদ্ধ ট্যুরিষ্ট বা সর্বসাধারণের জন্য। কিন্তু তার কাছে আমিরিকান বিশেষ পাসপোর্ট থাকায় সে এর প্রভাব খাটিয়ে উপরের অফিসারের কাছ থেকে মানচিত্রটা যোগাড় করেছে। এ খবর পাওয়ার পরই আমরা সিদ্ধান্ত নেই যে, তাকে যে কোন মূল্যে ধরতে হবে।'

'বস কি সব জানেন?' বলল কোলম্যান কোহেন।

'বিবি মাধব?'

'হ্যাঁ।'

'তার গোয়েন্দারাইতো প্রথম জানতে পারেন এবং আমাদের জানান। তাঁর নির্দেশেই তো দ্রুত হেলিকপ্টারটার যোগাড় হয়েছে।'

'চলুন যাওয়া যাক।' বলে আহমদ মুসার বন্দীখানার দরজার দিখে মুখ ফিরাল কোলম্যান কোহেন।

'চলুন, কিন্তু বন্দী সম্পর্কে যে কথা বললেন, তার কি হবে? বসকে এ ব্যাপারে জানানো হয়নি।'

'কোন ব্যাপারে?'

'বন্দী যদি আপনাদের সেই লোক হন, তাহলে তাকে দেখা মাত্র হত্যা করবেন।'

'হ্যাঁ। কিন্তু কেন এটা তাঁকে জানানো দরকার? সে লোক আমাদের শিকার। আমরা তাকে শিকার করব।'

'এমন সাংঘাতিক শিকার লোকটি কে, যাকে হত্যাই আপনাদের নিরাপত্তার একমাত্র পথ?'

'আপনারাও চেনেন, সে আহমদ মুসা।'

নামটা শুনে চমকে উঠে স্বামীজী মুখ তুল কোলম্যান কোহেনের দিকে। কিছুক্ষণ নির্বাক তাকিয়ে থাকল কোহেনের দিকে। বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে তার মুখ।

তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে স্বামী স্বরূপানন্দ বলে উঠল, 'সর্বনাশ! আহমদমুসা আমাদের দ্বীপের ঘটনায় জড়িয়ে পড়তে পারে। যদি সত্যি হয় আমাদেরও দ্বিমত নেই আপনার সাথে। আমরা চাই না আমাদের দ্বীপপুঞ্জে

আহমদ মুসাপর অস্তিত্ব এক মুহূর্তেও থাকুক। সে শুধুই বিপজ্জনক নয়, সে মুসলিম কমিউনিটির বিজয়ের এবং উত্থানের 'পরশ পাথর।'

'ধন্যবাদ মিঃ স্বরূপনান্দ।'

উভয়ে পাশাপাশি এগিয়ে বলল আহমদ মুসার বন্দীখানার দরজার দিকে।

দরজার ফুটোয় চোখ লাগিয়ে শ্বাসরুদ্ধভাবে আহমদ মুসা শুনছিল তাদের কথা।

ওদের দরজার দিকে আসতে দেখে দ্রুত পেছনে সরে এল।

ইহুদী গোয়েন্দা ক্রিষ্টোফার কোলম্যান কোহেনের কথা শোনার পর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে আহমদ মুস। আক্রমণে না গিয়ে উপায় নেই। আক্রমণে না গেলে তাকে আক্রান্ত হতে হবে এবং সেক্ষেত্রে সুবিধাটা তাদের হাতেই তুলে দেয়া হবে।

পেছনে সরে এসেই ভাবল আহমদ মুসা, দরজার একপাশে লুকোলেই সুবিধা বেশি হয়।

সেদিকে যাবার জন্য পা তুলতে গিয়ে আহমদ মুসার মনে হলো, ওরা দরজা খোলার আগে নিশ্চয় দরজার ফুটো দিয়ে ঘরের ভেতরটা একবার দখেকে নেবে। যদি তারা আহমদ মুসাকে মেঝেতে আগের মত না দেখে তাহলে সাবধান হবে যাবে। ওদেরকে অসাবধান রেখে আক্রমণে যাওয়া বেশি যুক্তিসঙ্গত হবে, যদিও এতে ঝুঁকি আছে।

আহমদ মুসা এ দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটিই গ্রহণ করল। আহমদ মুসা আগের সেই সংজ্ঞাহীন অবস্থার মত শুয়ে পড়ল গিযে মেঝেতে।

আহমদ মুসা ঠিকই চিন্তা করেছিল। স্বামী স্বরূপানন্দ দরজার সামনে এসেই প্রথমে গিয়ে চোখ রাখল দরজার ফুটোয়। ঘরের ভেতরটা দেখে নিয়ে সে মুখ ঘুরিয়ে ক্রিষ্টোফার কোলম্যান কোহেনকে লক্ষ্য করে বলল, 'না মিঃ কোহেন ওর সংজ্ঞা এখনও ফেরেনি। দেখবেন?' বলে দরজা থেকে সারে এল স্বামী স্বরূপানন্দ।

কোলম্যান কোহেন গিয়ে ফুটোয় চোখ লাগাল।

কয়েক সেকেন্ড পরেই দরজার ফুটো থেকে মুখ সরিয়ে স্বামী স্বরূপানন্দের দিকে চেয়ে বলল, ‘সে ওপাশ ফিরে আছে। চেনা যাচ্ছে না। চলুন ভেতরে।’

স্বামী স্বরূপানন্দ দরজায় পাহারত ষ্টেনগানধারী চারজনের একজনকে বলল, ‘গনেজ দরজা খুলে দাও।’

দরজা খুলে গেল।

ঘরে প্রবেশ করল আগে স্বামী স্বরূপানন্দ। তারপর ক্রিষ্টোফর কোলম্যান কোহেন। তাদের পেছনে পেছনে প্রবেশ করল ষ্টেনগানধারী সেই চারজন প্রহরী।

দরজা থেকে একটু সামনে এগিয়ে স্বামী স্বরূপানন্দ দাঁড়াল। তার পাশে দাঁড়াল কোলম্যান কোহেন।

দাঁড়িয়েই স্বামী স্বরূপানন্দ বলে উঠল, ‘গনেশ যাও শয়তানটার মুখ এগিয়ে ঘুরিয়ে দাও।’

গনেশ নামক লোকটা ছুটল আহমদ মুসার দিকে।

সে গিয়ে দাঁড়াল আহমদ মুসার ওপাশে, তার মুখোমুখি। সে হাতের ষ্টেনগানটা মেঝেতে রেখে দু’হাত বাড়িয়ে আহমদ মুসাকে ঠেলে পাশ ফেরাতে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে ভেলকিবাজির’র মতই ঘটে গেল ঘটনাটা।

মেঝেয় রাখা ষ্টেনগানটা আহমদ মুসার মুখের কাছ থেকে মাত্র ফুট দেড়েক দূরে ছিল।

আহমদ মুসার দু’হাত ছুটে গেল সেদিকে। ষ্টেনগানটি দু’হাতে ধরেই চোখের পলকে পাশ ফিরল কোহেনদের দিকে। সেই সাথে ষ্টেনগান থেকে গুলীর স্রোত ছুটে গেল সেদিকে।

আহমদ মুসার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা আকস্মিকতার ধাক্কায় কয়েক মুহূর্তের জন্যে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। কিন্তু দ্রুত সামলে উঠেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ল আহমদ মুসার উপর। তার লক্ষ্য আহমদ মুসার হাতের ষ্টেনগান।

লোকটার গোটা দেহই আড়াআড়িভাবে আহমদ মুসার উপর। আর তার দু’টি হাত গিয়ে চেপে ধরেছে আহমদ মুসার হাতের ষ্টেনগান।

লোকটি ষ্টেনগান ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টায় নিজের দেহটাকে সামনে সরিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াতে গেল।

লোকটি তখনও দু'পায়ের উপর শক্তভাবে দাঁড়াতে পারেনি। হ্যাঁচকা টানে তার দেহত কুণ্ডলি পাকিয়ে পড়ে গলে। তার হাত থেকেও ষ্টেনগান ফশকে বেরিয়ে গেল। ষ্টেনগান টেনে নিয়েই উঠে দাঁড়িয়েছে আহমদ মুসা। লোকটিও উঠে দাঁড়িয়েছিল।

আহমদ মুসা ষ্টেনগান দিয়ে আঘাত করল লোকটির কানের পাশটায়।

পাক খেয়ে তার দেহ ঝরে পড়ল মেঝের উপর। আহমদ মুসা তাকাল দরজার দিকে। ওদের পাঁচটি দেহই মেঝেতে লুটিপুটি খচ্ছে। কেউ সঙ্গে সঙ্গে মরে গেছে, আবার কেউ আহত।

আহমদ মুসা এগিয়ে গেল কোলম্যান কোহেনের দিকে। বুকে, পেটে সে গুলীবিদ্ধ। কিন্তু তখনও বেঁচে আছে। তার হাত থেকে ছিটকে পড়া রিভলভার তুলে নিয়ে পকেটে রাখতে রাখতে বলল, স্যরি মিষ্টার কোহেন, তোমরা দেখামাত্র গুলীর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলে বলে আমাকেও নিতে হয়েছে। তা না হলে তোমাকে কয়েকটা কথা বলতাম, বলার ছিল।

চোখ খুলেই ছিল কোলম্যান কোহেন। বলল বাধো বাধো গলায়, 'তুমি আন্দামানে জানলে আমি আরও সাবধান হতাম। গতকালই মাত্র আমরা জানতে পেরেছি, তুমি মার্কিন প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত সুপারিশে বিশেষ মার্কিন পাসপোর্ট ও বিশেষ ইন্ডিয়ান ভিসা পেছেছ।'

'বুঝলে মিঃ কোহেন, সিআইএ-মোসাদ আতাতের পতন শুরু হয়েছে। দুঃখ যে, শেষটা হয়তো তুমি দেখে যেতে পারবে না।'

'দিন কারো সমান যায় না আহমদ মুসা। কিন্তু দিন আবার ফেরেও।'

'দিন আমাদের ফিরছে।' বলে একটু থেমেই আহমদ মুসা আবার বলল, 'তুমি আমাকে টকেটা সাহায্য করতে পর, আহমদ শাহ্ আলমগীরকে তোমরা কোথায় রেখেছ বল?'

'মনে করেছ যে, মৃত্যু আসন্ন জেনে উদার হয়ে তোমার শেষ একটা প্রার্থনা আমি পুরণ করব। না, আমি মরার আগে মরতে চাই না।'

ঠিক এ সময় বাইরে অনেকগুলো পায়ের শব্দ ও হৈ চৈ শোনা গেল।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। হাতের ষ্টেনগানটা কাঁধে ফেলে আরেকটা ষ্টেনগান কুড়িয়ে নিল।

'আমাকে মেরে গেলে না আহমদ মুসা? মেরে ফেলে যাও।' আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল কোলম্যান কোহেন।

'তোমাকে মারা আমার মিশন নয়। তোমাকে প্রতিরোধ করতে চেয়েছি। তা করেছি। আল্লাহ চাইলে তোমাকে মৃত্যু দিবেন।' বলে আহমদ মুসা ছুটল দরজার দিকে।

দরজার পরেই একটা প্রশস্ত করিডোর। করিডোরটি পূর্বদিকে এগিয়ে উত্তর দিকে বাঁক নিয়ে একটা বড় দরজায় গিয়ে শেষ হয়েছে। এটাই বাইরে বেরুবার দরজা। ওরা এদিক দিয়েই আহমদ মুসাকে বন্দীখানায় নিয়ে এসেছিল।

করিডোরে বেরিয়ে দেখল, চার-পাঁচজন লোক এদিকে আসছে। ওদের হাতের ষ্টেনগানগুলোর ব্যারেল নিচ দিকে নামানো। তাদের চোখে-মুখে কৌতুহলের চিহ্ন। আহমদ মুসা বুঝল এখানে কি ঘটেছে ওরা জান না।

কিন্তু আহমদ মুসাকে দেখে মুহূর্তেই মুখের ভাব পাল্টে গেল। ফুটে উঠল ক্রোধ ও লড়াকু ভাব। ওরা ষ্টেনগান তুলতে যাচ্ছিল। আহমদ মুসা ওদের লক্ষ্যে ছোট এক পশলা গুলী করে বলল, 'শোন ষ্টেনগান তুলতে পারবে না। তার আগে সবাই মারা পড়বে। আমি খুনোখুনি চাই না। বাঁচতে চাইলে ষ্টেনগান ফেলে দিয়ে হাত উপরে তুলে সবাই বাইরে চল।'

মাটি ছুয়ে যাওয়া ছোট্ট এক পশলা গুলীতেই কয়েকজন আহমদ হয়েছিল। ভয় ওদের চোখে-মুখে। ওরা আহমদ মুসার নির্দেশ পালন করল। ষ্টেনগান ফেলে দিয়ে গেটের দিকে হাঁটতে লাগল।

গেটের বাইরে চত্বরে কয়েকটি জীপ ও একটি মাইক্রো দাঁড়িয়েছিল। একটা জীব ছিল দরজার সামনেই।

আহমদ মুসা চারদিকে তাকাল। তার চোখ ঘুরে বামপ্রান্তে পৌছার আগেই কটা রিভলবার গর্জন করে উঠল এবং একটা গুলী এসে বিদ্ধ করল তার বাম বাহুকে।

আহমদ মুসার চোখ তখন পৌছে গেছে সেদিকে। সে জীপটার বাম পাশ দিয়ে দেখল একটা গাছের ছায়ায় চারজন লোক। তাদের পেছনে চারটা চেয়ার। তাদেরই একজনের হাকে রিভলবার। তখনও উদ্ধত। অন্য তিনজনও রিভলবার হাতে তুলে নিয়েছে।

আহমদ মুসার ষ্টেনগানও ছিল উদ্ধত। ট্রিগারে ছিল আঙুল। ওরা ও ওদের উদ্ধত রিভলার চোখে পড়ার সাথে সাথেই আহমদ মুসার তর্জনি ট্রিগার চেপে ধরছে।

বাহুর উপর আছড়ে পড়া গুলী নিঃসাড় করে দিয়েছে হাঁতটা। ঠেলে দিতে চাচ্ছিল দেহটাকে পেছনের দিকে।

কিন্তু আহমদ মুসা মুহূর্তেই হজম করে নিয়েছে আঘাতকে। বাম হাতটা দারুণ কেঁপে উঠেছিল, কিন্তু ষ্টেনগান ছাড়েনি। আর ডান হাতের তর্জুনি আঘাতের এক শক-ওয়েভে কেঁপে উঠলেও আরও শক্তা করে ট্রিগার চেপে ধরেছিল।

ষ্টেনগান থেকে ছুটে যাওয়া গুলীর বৃদ্ধি গাছের ছায়ায় দাঁড়ানো চারজনকেই গিয়ে গ্রাস করল। ওদের কারো রিভলবার থেকেই আর গুলী আসার সুযোগ হয়নি। ঝরে পড়ল মাটিতে ওদের চারটি দেহই।

আহমদ মুসা ওদের পেছনে আর সময় ব্যয় না করে দ্রুত গিয়ে জীপে উঠল। আনকোরা নতুন জীপ। কী হোলে চাবি ঝুলছিল।

খুশি হলো আহমদ মুসা।

ষ্টেনগান পাশে রেখে, বাম হাতটাকে টেনে ষ্টিয়ারিং হুইলে নিয়ে ডান হাতে ষ্টার্ট দিল গাড়ি।

গাড়ি ছুটে বেরিয়ে রাস্তায় এসে উঠল। রাস্তা ধরে ছুটে চলল তার গাড়ি। কোনদিকে কোথায় সে যাচ্ছে জানে না। জায়গার নাম কি তার জানা নেই। হেলিকপ্টারটি তাকে নিয়ে উত্তরদিকে এসেছে, এটুকু সে বুঝেছে। কিন্তু হেলিকপ্টারটি কোথায় ল্যান্ড করল, তা সে বুঝেনি। তবে হেলিকপ্টার যে গতিতে চলেছে, যতটা সময় নিয়েছে, তাতে অন্তত একশ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েছে বলা যায়। তাতে আহমদ মুসার উত্তর আন্দামানের মায়া বন্দর, পাহলাগাঁও-এর মত কোন স্থানে রয়েছে।

ছুটে চলেছে আহমদ মুসার গাড়ি।

অন্ধের মত চলছে আহমদ মুসা। এই চলার ক্ষেত্রে তার এখন একটাই নীতিঃ অপেক্ষাকৃত ছোট রাস্তা থেকে বড় রাস্তায়।

প্রশস্ত রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছে গাড়ি। সূর্যের দিকে তাকিয়ে আহমদ মুসা বুঝল সে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যাচ্ছে।

তীরর মত সোজা রাস্তা।

আহমদ মুসা গাড়ির রিয়ার ভিউ মিররে কয়েকটি গাড়ির ছবি ভেসে উঠতে দেখল।

এ পর্যন্ত রাস্তায় কোন গাড়ির সাক্ষাত পায়নি আহমদ মুসা। প্রথমবার দেখা মিলল, তাও একসাথে তিনটি।

রিয়ারভিউ-এ চোখ রাখল আহমদ মুসা। তিনটি গাড়িই তীব্র গতিতে এগিয়ে আসছে এবং তিনটি গাড়ির একই গতি। তার মানে এক জোট হয়ে চলছে।

এই শেষ চিন্তাটা তার মাথায় আসার সাথে সাথে আহমদ মুসার কাছে পরিস্কার হয়ে গেল যে গাড়িগুলো তার পেছনেই ছুটে আসবে।

আহমদ মুসা গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিল। কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিল, কোথায় যাবে সে? মায়া বন্দর থেকে সে যদি বেরিয়ে থাকে, তাহলে সামনে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে পাহলাগাঁও। সেখানে পৌছা পর্যন্ত ডানে-বামে বেরুবার কোন পথ নেই। রাস্তার বামে সবুজ বনে আচ্ছাদিত পাহাড়, টিলার পর টিলা এগিয়ে গেছে দক্ষিণে। আর রাস্তার ডানে উত্তর দক্ষিণে বিলম্বিত উপত্যকাটা পশ্চিমে আরও কিছুটা প্রশস্ত। ঘন বনে ঠাসা এই উপত্যকায় কোন পথ ঘাটের কথা কল্পনাই করা যায় না, তবে এই উপপত্যকা দিয়ে একটা ছোট নদী বয়ে গেছে দক্ষিণে। মানচিত্রে পাওয়া এটুকু তথ্যই তার মুখস্ত আছে, আর কিছু নয়।

কিন্তু পেছনের ওদের এড়িয়ে পাহলাগাঁও পৌছা কি সম্ভব হবে?

গাড়ির দিকে মনোযোগ দিল আহমদ মুসা। স্পিডমিটাররে কাঁটা আরও এক ধাপ উপরে উঠল, সোজা ও মসুণ হলেও রাস্তায় চড়াই-উৎরায় থাকায় এর বেশি স্পিড নিরাপদ নয়। আর তার গুলীবিদ্ধ বাম হাতটা খুব সক্রিয় হতে পারছে না। এখনও রক্ত ঝরছে আহত স্থান থেকে। যন্ত্রণা বাড়ার সাথে সাথে হাতটা

ভারীও হয়ে উঠেছে। গুলীটা বেরিয়ে গেছে না ভেতরে আছে বুঝতে পারছে না আহমদ মুসা। এটা দেখারও তো এখন সুযোগ নেই।

আহমদ মুসা শুনতে পেল তার পেছনে হেলিকপ্টারের শব্দ। চমকে উঠে পেছন ফিরে তাকাল আহমদ মুসা। দেখল, পেছন থেকে একটা হেলিকপ্টার ছুটে আসছে। স্বামী স্বরূপানন্দদের সেই হেলিকপ্টারই হবে, নিশ্চিত ধরে নিল আহমদ মুসা।

একেবারে নিচ দিয়ে উড়ে আসছে হেলিকপ্টারটা।

তাদের পরিকল্পনা পরিস্কার হলো আহমদ মুসার কাছে। হেলিকপ্টারটা সামনে গিয়ে রাস্তা ব্লক করবে, আর পেছন তেখে ছুটে আসবে গাড়ি। এভাবে ফাঁদে ফেলবে তারা আহমদ মুসাকে। অথবা হেলিকপ্টার থেকে তার গাড়ি লক্ষ্যে ওরা গোলা ছুড়তে পারে, আবার বোমা ফেলতেও পারে যদি কোলম্যান কোহেন জীবিত থাকে। আহমদ মুসার মৃত্যুই তো কোলম্যান কোহেনের একমাত্র চাওয়া।

ধেয়ে আসছে হেলিকপ্টারটা। পেছনের দিনটি গাড়ির সমান্তরালে গেছে। আর দু'চার মিনিটের মধ্যেই তার মাথার উপরে এসে যাবে হেলিকপ্টার।

আহমদ মুসার ডানে উপত্যকার দিকে ঘন জংগল। গাড়ি ত্যাগ না করে উপায় নেই আহমদ মুসার। আপাতত উপত্যকার ঘন জংগলে তাকে আশ্রয় নিতে হবে।

আহমদ মুসা গাড়িটাকে রাস্তার ডান ধারে নিল।

রাস্তার ধারটা ঢালু হয়ে উপত্যকার দিকে নেমে গেছে। ঢালটা ঘাশ ও আগাছায় ভরা, বড় বড় গাছ, ঝোপঝাড়ও আছে। ঢাল কতটা গভীর আন্দাজ করতে পারছে না আহমদ মুসা।

রাস্তার ধার ঘেঁষে এগিয়ে চলেছে তার গাড়ি।

আহমদ মুসা ষ্টেয়ারিং হুইল লক করল যাচে চালকবিহীন অবস্থাতেও গাড়িটা কিছুপথ সামনে এগুতে পারে। রাস্তা সোজা হওয়ায় এ ব্যবস্থা চলবে কিছুটা পথ পর্যন্ত। আহমদ মুসা চায় সে কোথায় নেমেছে, এ ব্যাপারে ওদের বিভ্রান্ত করতে।

আহমদ মুসা পেছনের গাড়ি ও হেলিকপ্টারের অবস্থানটা আর একবার দেখে নিয়ে উপর থেকে বড় গাছ গাছড়ার আড়াল আছে এমন একটা স্থান পছন্দ করে দু'টি ষ্টেনগান ও গাড়িতে পাওয়া গুলীর বাক্সটা জংগলে ছুঁড়ে দিযে আহদ বামবাহুকে যতটা সম্ভব নিরাপদ রেখে ডানে কাত হয়ে নিজেকে ছুঁড়ে দিল রাস্তার ঢালে একটা ঝোপের মধ্যে।

আহমদ মুসার দেহ যেখান ঝোপে পড়ল, ঢাল সেখানে খাড়া হওয়ায় দেহটা উল্টে পাল্টে একটা গাছের গোড়ায় লেগে গেল।

প্রচণ্ড ব্যাথা পেল আহমদ মুসা তার আহত বাম হাতটায়।

বাম বাহু চেপে ধরে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে পড়ে থাকল।

ঐ পড়ে থাকা অবস্থাতেই শব্দ শুনে আহমদ মুসা বুঝল, প্রথমে হেলিকপ্টার, তারপর গাড়ি তিনটি তাকে অতিক্রম করে গেল।

আহমদ মুসা ধীরে ধীরে উঠল। সাপের মত নিঃশব্দে ক্রলিং করে ছঁড়ে ফেলা অস্ত্রগুলো কুড়িয়ে নিল।

আহমদ মুসা জংগলের ভেতর থেকে উজি দেবার জন্যে উঠে দাঁড়াল। তাকাল হেলিকপ্টার ও গাড়রি দিকে।

এই সময় ব্রাশ ফায়ারের শব্দ হলো।

আহমদ মুসা দেখতে পেল, হেলিকপ্টার থেকে তার গাড়ি লক্ষ্যে গুলী করা হয়েছে।

হেলিকপ্টারটি আহমদ মুসার চালকহীন গাড়ি অতিক্রম করে সামনে গিয়ে রাস্তার কয়েক ফুট উপর পর্যন্ত নেমে গড়ির মুখোমুখি অবস্থানে স্থির দাঁড়িয়ে গেল।

গুলীতে আহমদ মুসার গাড়ির সামনের দু'টি টায়ারই ফেটে গেছে। গাড়িটি রাস্তার উপর হুমড়ি খেযে পড়ে উল্টে গেছে।

পেছনের তিনটি গাড়ি সেখানে পৌঁছে গেল। হেলিকপ্টারও রাস্তায় ল্যান্ড করল।

গাড়িগুলো ও হেলিকপ্টার থেকে কয়েকজন ছুটে গেল আহমদ মুসার উল্টে যাওয়া গাড়ির দিকে।

সবাই দাঁড়াল গাড়ির পাশে। সবারই হাতে উদ্যত ষ্টেনগান।

ওদের মধ্যে থেকে দু'জন ছুটে গিয়ে গাড়ির ভেতরটা দেখতে লাগল। কাত হয়ে থাকা গাড়িটা সব দিকে থেকে পরীক্ষা করে তারা সোজা হয়ে দাঁড়াল। একজন চিৎকার করে কিছু বলল সবার উদ্দেশ্যে।

আহমদ মুসা বুঝল, গাড়িতে তাকে না পাবার কথাই বলা হচ্ছে। নিশ্চয় বলেছে, আহমদ মুসা গাড়িতে নেই, তার লাশও নেই।

অবশিষ্টরাও ছুটে গেল গাড়ির কাছে। গাড়িটাকে ঠেলে সোজা করে হলো।

গাড়ি পরীক্ষা করার পর সবাই গাড়ি থেকে সরে এল এবং তাদের দৃষ্টি ইতস্তত বাইরে ঘুরতে শুরু করল।

হেলিকপ্টার থেকে নেমে আসা গলায় গেরুয়া চাদর ঝুলানো দীর্ঘকায় একজন লোক সবাইকে ডেকে কিছু কথা বলল এবং হাত নেড়ে রাস্তার পশ্চিম পাশের উপত্যকা এলাকার দিকে ইংগিত করল।

সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকজন ছুটল হেলিকপ্টারের দিকে। তারা হেলিকপ্টার থেকে নামিয়ে আনল একটা বাক্স। বাক্স থেকে এক এক করে সবাই হাতে নিল টিয়ার গ্যাস গান ধরনের বন্দুক। তার সাথে সবাই একটা করে হাতে নিল লাল রং-এর ঝোলানো থলে ওয়ালা বেল্ট।

ভ্রুকঞ্চিত হলো আহমদ মুসার।

ওরা কি টিয়ার গ্যাস ছুঁড়বে? কিন্তু টিয়ার গ্যাস ছুঁড়ে কি হবে? টিয়ার গ্যাস তো মানুষকে ছত্রভঙ্গ করা, পালিয়ে দেরার জন্যে, কাউকে ধরার জন্যে নয়। কিন্তু ওরা তো তাকে ধরতে চায়।

লোকগুলো বেল্ট কোমরে বেঁধে হাতে বন্দুক নিয়ে ছুটে আসবে। ওরা রাস্তার পশ্চিম ধার বরাবর বেশ দূরে দূরে অবস্থান নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

আহমদ মুসা বুঝল ওরা জংগলে ঢুকবে না। রাস্তা থেকে টিয়ার গ্যাস শেল ছুড়বে।

ব্যাপর কি বুঝতে না পেরে অতিসন্তর্পণে পিছু হটতে লাগল। আহমদ মুসা। তার বরাবর রাস্তায় দাঁড়ালো লোকটিকে তখনও সে দেখতে পাচ্ছে। হঠাৎ

আহমদ মুসা লক্ষ্য করল বেল্টে ঝুলানো লাল থলের পাশে একটি গ্যাস মাস্ক ঝুলছে। পরক্ষেণেই দেখল লোকটি বেল্ট থেকে ঝুলানো গ্যাস মাস্ক খুলে নিয়ে মুখে পরছে।

আঁৎকে উঠল আহমদ মুসা। আহমদ মুসা বুঝল, ওরা কাঁদানো গ্যাস ছুঁড়বে না। বন্দুকগুলো কাঁদানো গ্যাস ছোঁড়ার জন্যও নয়। কাঁদানো গ্যাসের সেলের মতই এক ধরণের গ্যাস বোমা তৈরী হয়েছে। ওগুলোকে কাঁদানো গ্যাসরে মতই বন্দুকে ফিট ককে শত্রুর ওপর ছোঁড়া যায়। চেতনা লোপকারী গ্যাস বোমা এগুলো।

ছোঁড়ার পর কাঁদানো সেলের মত ওগুলো ফাটে, তবে শব্দ করে নয়। শব্দ হয় না বলে শত্রুপক্ষ বুঝতেও পারে না যে, তাদের উপর গ্যাস বোমার আক্রমণ হয়েছে। কিছু বোঝার আগেই ওরা চেতনা হারিয়ে ফেলে শত্রুর হাতে পড়ে যায়। স্থান বিশেষে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আজ এটা ব্যবহার হচ্ছে। এই জংগলে যুদ্ধ ওদরে জন্যে মুস্কিল বলেই আহমদ মুসাকে ধরার সহজ পথ হিসেবে এই ব্যবস্থা তারা গ্রহণ করেছে।

আহমদ মুসা ঘন ঝোপ থেকে বেরিয়ে দ্রুত চলার জন্যে একটা ফাঁকা মত জায়গা ধরে ছুটতে শুরু করল। যতটা সম্ভব এদের আওতা থেকে দূরে যাওয়ার চেষ্টা করেছে সে। কোন কাজ হবে না তবু নাকে রুমাল চেপেছে সে।

শব্দ না হওয়ার জন্য বুঝা যাবে না ভয়ংকর অদৃশ্য গন্ধহীন গ্যাস তাকে কখন আক্রমণ করছে। এখন ভাবছি, পরবর্তীতে ভাবার হয়তো সুযোগ হবে না, এমন নানা চিন্তা কিলবিল করছে আহমদ মুসার মাথায়।

তবু আহমদ মুসা ছুটছে। তার সাধ্য যা, ততটুকু করাই তো তার দায়িত্ব। পরবর্তী দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহর। এই অটল বিশ্বাস আহমদ মুসার আছে বলেই সে ভাবছে বটে, কিন্তু ভয় পায়নি।

বেশি এগুতে পারল না আহমদ মুসা।

তার সামনে পাথরের একটা নাঙ্গা টিলা পড়ল। তার দু'পাশেই ঘন জংগলের প্রাচীর। সেই টিলা টপকাতে গিয়ে তার মাথায় উটার পর কিছু বুঝে উঠার আগেই সংজ্ঞা হারিয়ে আছড়ে পড়ল টিলার উপর।

জায়গাটা ফাঁকা হওয়ায় এবং উঁচু ঠিলাটি নাঙ্গা হওয়ায় আহমদ মুসা নজরে পড়ল রাস্তায় দাঁড়ালো বন্দুকধারী লোকটির।

সে দু'হাত তুলে চিৎকার করে উঠল তার সাথীদের উদ্দেশ্যে। ডাকল সবাইকে।

সবাই ছুটে এল তার দিকে। গাড়ি নিয়ে ছুটে এল গলায় গেরুয়া চাদর জড়ানো দীর্ঘকায় লোকটিও।

গলায় গেরুয়া চাদর জড়ানো লোকটির হাতে একটি দূরবীন ছিল। সে চোখে দূরবীন লাগিয়ে টিলার দিকে তাকিয়ে দেখেই চিৎকার করে উঠল, 'ঠিক পাওয়া গেছে শয়তানের বাচ্চাকে। শয়তান খুন করেছে স্বামী স্বরূপানন্দকে, কোলম্যান কোহেনকে এবং আমাদরে বহু লোককে। একে জীবন্ত হাতে পাওয়া আমাদের দরকার। যাও তোমরা কয়েকজন গিয়ে তাকে নিয়ে এস।

নির্দেশের সাথে সাথে চারজন ছুটে গেল।

কায়েক মিনিটের মধ্যেই তাকে ধরা-ধরি করে নিয়ে এল। ছুঁড়ে ফেলল রাস্তায়।

বলল একজন, 'এর সাথে এই দু'টি ষ্টেনগানও ছিল। এগুলো সে আমাদের লোকদের কাছে থেকে কেড়ে নিয়ে এসেছিল।'

'শয়তান গুলীও খেয়েছে।' বলেই গুলী খাওয়া আহম বাহুতেই জোরে একটা লাথি মারল গলায় গেরুয়া চাদর জড়ানো সেই লোক।

এই গোটা ঘটনা যখন থেকে ঘটতে শুরু করেছিল, তখন থেকেই রাস্তার ওপাশের পাহাড় শীর্ষে দাঁড়ানো এক ঘোড়সওয়ার সবকিছু অবলোকন করছিল। তার চোখে দূরবীন। তার কাঁধে ঝুলানো বাধা ধরনের টিলিস্কোপিক মিনি মেশিন গান। মাথার টুটি থেকে আপাদ-মস্তক জলইপাই রংয়ের ইউনিফর্ম। বন আচ্ছাদিত পাহাড়ের সাথে সে একদম একাকার। তাকে আলাদা করে চিহ্নিত করার কোন উপায় নেই। তার পাশে দাঁড়ানো চকলেট রংয়ের ঘোড়াকেই শুধু বেসুরো লাগছে। কালো গগলস পরা লোকটির মুখের খুব অল্পই দেখা যাচ্ছে।

লোকটি এক হাতে ঘোড়ার লাগাম অন্য হাতে কাঁধে ঝুলানো মিনি মেশিনগানটির ফিতা ধরে ঘোড়াকে টেনে নিয়ে নামছিল।

কিন্তু নিচে রাস্তায় আহমদ মুসাকে ওরা যখন হেলিকপ্টারে তুলতে যাচ্ছিল, তখন সে থমকে দাঁড়াল। ডান হতে থেকে ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিয়ে দ্রুত বাম কাঁধ থেকে মিনি মেশিনগানটা হাতে নিয়ে তাক করল রাস্তার ওদেরকে। মিনি মেশিন গানের টেলিস্কোপিক লেন্সটায় চোখ রেখে ট্রিগারে তর্জনি রাখর। চেপে ধরল ট্রিগার। ধরেই থাকল।

সিংগল বুলেট ফাংশন একটিভেট করা ছিল মেশিনগাটির। তার ফলে বুলেট ঝাঁক আকারে না বেরিয়ে এক এক করে বেরিয়ে যেতে লাগল।

প্রতিটি গুলী বেরুবার পর লোকটি মিনি মেশিনগানের টেলিস্কোপিক ব্যারেলকে নতুন টার্গেটের সাথে এডজাষ্ট করে নিচ্ছিল অদ্ভুত দ্রুততার সাথে।

মাত্র দশ সেকেন্ড। মিনি মেশিনগানের গর্জন থেমে গেল। নিচে রাস্তায় ১৫টি লাশ।'

বুঝে ওঠা ও প্রতিরোধের কথা বাবতে গিয়ে বোধ হয় পালাবারও চেষ্টা তাদের করা হয়নি।

নিহতদের রক্তস্রোত আহমদ মুসার সংজ্ঞাহীন দেহেও আসছিল।

মিনি মেশিন গানের ব্যারেল থেকে তর্জনি সরিয়ে নিয়েই লোকটি দ্রুত মেশিন গানটাকে বাম কাঁধে চালান করে লাফ দিয়ে ঘোড়ায় উঠল এবং দ্রুত নামতে শুরু করল পাহাড় থেকে রাস্তায়।

# ৩

সংজ্ঞা ফিরে পেয়েছে আহমদ মুসা। কিন্তু চোখ খুলল না সে।

মনে পড়েছে তার সব কথা। সংজ্ঞালোপকারী গ্যাস আক্রমণের হাত থেকে বাঁচার জন্যে সে পালাচ্ছিল। কিন্তু পারেনি সে পালাতে। হঠাৎ চিন্তা রুদ্ধ হয় গিয়েছিল, চারদিকটা অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, এটুকুই শুধু তার মনে আছে। তার অর্থ সে সংজ্ঞা হারিয়েছিল। তার মানে সে এখন শত্রুর হাতে বন্দী। কিন্তু তার পিঠের নিচের শয্যাটাকে খুব নরম, আরামদায়ক মনে হচ্ছে কেন? এই গেরুয়া বসনা কাপালিকদের বন্দীখানা শুখু নগ্ন মেঝে নয়, তার জন্যে সেটা কাঁটা বিছানো হবার কথা। সন্তর্পণে হাত-পা নাড়ল আহমদ মুসা। না, হাত-পায়ে বাঁধন নেই। এই সাথে সে অনুভব করছে, স্নিগ্ধ বাতাসে তার গা জুড়িয়ে যাচ্ছে। সে বুঝল খোলা জানালা পথে আসা স্বাভাবিক বাতাস এটা। তাছাড়া সে বাতাসের প্রবাহ দেখে বুঝতে পারছে একাধিক জানালা খোলা রয়েছে। তাহলে একটা বন্দীখানা কিভাবে হতে পারে? নরম আরামদায়ক বিছানা, হাত-পা মুক্ত, জানালা খোলা-এ অবস্থায় তাকে কোন বন্দীখানায় রাখা হতে পারে না।

ধীরে ধীরে চোখ খুলল আহমদ মুসা।

দ্রুত চারদিকটা দেখতে চাইল সে।

কিন্তু তার চোখ দু'টি আটকে গেল বাম পাশে পাশাপাশি দু'চেয়ারে বসা একজন পুরুষ ও একজন মহিলার উপর।

লোকটির রং পিতাভ। বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ। উচ্চতা মাঝারি। দেহে শক্ত কাঠামোতে সুন্দর স্বাস্থ্য। চেহারায় হাসির প্রলেপ। পরনে বাদামী রংয়ের প্যান্ট ও টিসার্ট। মহিলার সাদা-স্বর্ণাভ রং। একহারা, দির্ঘাঙ্গী। বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। পরণে জিনসের প্যান্ট ও জ্যাকেট। তারও বয়স লোকটির কাছাকাছি।

আহমদ মুসা ওদের দিকে চাইতেই লোকটি 'গুড় ইভনিং' বলে স্বাগত জানাল আহমদ মুসাকে।

‘গুড ইভনিং টু বোথ’ বলে আহমদ মুসা নিজের দিকে তাকাল। দেখল তার বাম বাহুতে সুন্দর ব্যান্ডেজ। গায়ের জামা পাল্টানো, নতুন সার্ট গায়ে। প্যান্ট ঠিক আছে, কিন্তু পায়ের জুতা খোলা।

চোখ ঘুরিয়ে আবার আহমদ মুসা তাকাল লোকটির দিকে।

লোকটির মুখে এক টুকরো হাসি ফুঠে উঠল। বলল, ‘আপনার অনুমতি না নিয়েই আমরা আপনাকে অপারেট করেছি।’

কথাটা শেষ করেই হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে একটা বুলেট হাতে নিয়ে বলল, ‘থ্যাংকস গড় যে, বুলেটটি সারফেস সমান্তরালে ঢুকায় পেশির অনেক ক্ষতি হলেও হাড় বেঁচে গেছে।’

‘ধন্যবাদ আপনাদের। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় অপারেশন করায় নতুন কষ্ট থেকে বেঁচে গেছি। কিন্তু এত সুন্দর ব্যান্ডেজ! এ তো নিখুঁত ডাক্তারী কাজ!’ বলল আহমদ মুসা।

লোকটি মুখে হাসি নিয়ে তাকাল পাশের মহিলার দিকে। তারপর মুখ ফিরিয়ে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘যিনি করেছেন তিনি ডাক্তার। এ কৃতিত্ব ওঁর।’

আহমদ মুসা ডাক্তার মহিলার দিকে চেয়ে বলল, ‘ধন্যবাদ ম্যাডাম।’

‘ওয়েলকাম। আহপনার চোখের কোণায় আরও একটি নতুন আঘাতের চিহ্ন দেখলাম। দেখলাম আরও কয়েকটি বড় আঘাতের চিহ্ন যেগুলো কয়েকনিদ আগের হবে। এ কারণেই আমি প্রতিষেধক ধরনের কোন ইনশেকশন দিইনি। আমি মনে করি ওগুলো দেয়া আভে।’ বলল মেয়েটি খুব শান্ত ও ধীর কণ্ঠে।

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই লোকটি বলে উঠল, ‘আমি বুঝতে পারছি না, আপনি কখন গুলীবিদ্ধ হলেন? আপনি গাড়ি চালিয়ে ঐ রাস্তার ঐ স্থানে আসা থেকে আপনাকে দেখেছি আমি। দুরবীনে খুঁটি-নাটি সবকিছুই আমার কাছে ধরা পড়েছে। আপিনি একটু কায়দা করে গাড়ির সামনে এগুনো অব্যাহত রেখে আত্মগোপন করার জন্যে লাফিয়ে পড়েছিলেন গাড়ি থেকে। তারপর থেকে আপনাকে কেউ গুলী করার ঘটনা তো আমার মনে পড়ছে না।’

আহমদ মুসা উত্তর দেবার আগেই ডাক্তার মেয়েটি কথা বলে উঠল। বলল, 'তুমি যে সময়ে তাঁকে দেখেছ বলেছিলে, আহত স্থান দেখে আহত হওয়াটা তার আগে বলে আমার মনে হয়েছে।'

'ডাক্তার ম্যাডাম ঠিক বলেছেন। আগেই আমি আহত হয়েছিলাম। আজ সকালের দিকে ওরা আমাকে বন্দী করে নিয়ে আসে। ওদের বন্দীখানা থেকে পালাবার সময় আমি আহম হই। ওরা আমাকে ধরার জন্যেই ফলো করছিল।' বলল আহমদ মুসা ডাক্তার মেয়েটির কথা শেষ হতেই।

'ওহ তো! আপনার সম্পর্কে কিছুই জানা হয়নি। আপনাকে কেন ওরা বন্দী করে এনেছিল? পালাবার পর কেনই বা অমন মরিয়া হয়ে উঠেছিল ওর আপনাকে ধরার জন্যে? ওরা কারা?' বলল লোকটি।

আহম মুসা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না। কি বলা উচিত তা নিয়ে দ্বিধায় পড়ে গেল। এই দ্বিধাগ্রস্ততা নিয়েই তাকাল আহমদ মুসা ওদের দিকে।

আহমদ মুসার দ্বিধাগ্রস্ততা লক্ষ্য করল লোকটি। গম্ভীর হলো সে। বলল, 'আপনার সমস্যা বুঝেছি। কি বলবেন, কতুটুকু বলবেন তা নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন। আপনাকে আশ্বস্ত করতে পারি যে, অন্য কারও পক্ষে আমাদের কাজ করার কোন সম্ভাবনা নেই। আমরা আপনার বন্ধু হতে পারবো কিনা জানি না, তবে একজন অতিথির শত্রু আমরা কিছুতেই হবো না।'

লজ্জা মিশ্রিত হাসি ফুটে উঠল আহমদ মুসার মুখে। বলল, 'ধন্যবাদ আপনাদের। মানুষের কতকগুলো স্বাভাবিক দুর্বলতা আছে, আমি তার উর্ধে নই।'

বলে একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর বলতে শুরু করল, 'আমি পোর্ট ব্লেয়ার থেকে এককভাবে ভাড়া করা বোট নিজেই চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিছিলাম 'রস' দ্বীপে। 'রস' দ্বীপে পৌঁছার আগেই একটা হেলিকপ্টার থেকে ফাঁদ ফেলে আমাকে বন্দী করে হেলিকপ্টারে তুলে নেয়।' এরপর বন্দীখানা থেকে পালানো পর্যন্ত সব কথা ওদের বলল আহমদ মুসা।

ওরা গভীর মনোযোগ দিয়ে আহমদ মুসার কথা শুনছিল। আহমদ মুসা থামতেই লোকটি বলে উঠল, 'বুঝতে পারছি, আপনি ওদের আট-দশজন লোক মেরেছেন। সুতরাং ওরা মরিয়া হয়ে উঠার কথাই। কিন্তু এটা তো পরের কথা।

আমার বিস্ময় লাগছে হেলিকপ্টার নিয়ে গিয়ে ফাঁদে ফেলে অভিনব অবস্থায় বন্দী করল ওরা কারা? এবং এভাবে আপনাকে বন্দী করতে হলো আপনার কোন অপরাধে বা তাদের কোন স্বার্থে?'

'আমার অপরাধ বোধ হয় এই যে, ওরা 'রস' দ্বীপে একজন যুবককে বন্দী করে রেখেছে, আমি তাকে উদ্ধার করতে চাই। আরও অপরাধ হলো, ওরা এ পর্যন্ত আন্দামান-নিকোবরের অর্ধশতকের মত যুবককে হত্যা করেছে, আরও হত্যা করতে চায়। কিন্তু ওরা মনে করেছে যে, ওদের পরিকল্পনায় আমি বাধ সাধছি।'

'পঞ্চাশ জন খুন করেছে? এত সংখ্যাক খুনের খবর তো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি!' বলল ডাক্তার মহিলাটি।

'সবগুলো খবরই দুর্ঘটনা বা অপঘাতে মৃত্যু হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে। অধিকাংশই পানিতে ডুবে মরার খবর হিসেবে পত্রিকায় এসেছ।'

'হ্যাঁ, এমন খবর পত্রিকায় বেশ পড়েছি। এগুলো কি সবই খুন তাহলে?' ডাক্তার মহিলাটি বলল।

'কোন সন্দেহ নেই।' আহমদ মুসা বলল।

'পুলিশ জানে?' জিজ্ঞাসা মহিলাটির।

'সবাই হয়তো জানে না, কিন্তু পুলিশের একটা বড় অংশ এ ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত আছে।'

'ষড়যন্ত্রটা কি?'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর না দিয়ে মুখ নিচু করল। একটু ভাবতে চাইল। একটু চিন্তা করে বলল, 'ওটা একটা নির্মুল করার প্রোগ্রাম। একটা বিশেষ জনগোষ্ঠীকে শেষ করার প্রোগ্রাম।'

ডাক্তার মহিলা ও লোকটি দু'জনেই কপাল কুঞ্চিত হলো। একটা জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা ওদের চোখে-মুখে আছড়ে পড়ল।

'কোন জনগোষ্ঠীকে?' এবার প্রশ্ন ছেলেটির।

আহমদ মুসা উঠে বসেছিল।

কিন্তু মহিলাটি চেয়ার থেকে উঠে ছুটে এল। বসতে বাধা দিয়ে আবার শুইয়ে দিল আস্তে আস্তে। বলল, 'আপাতত কিছুটা সময় স্থির শুয়ে থাকতে হবে। উঠতে গেলে আহত জায়গায় প্রেসার পড়বে। আবার ব্লিডিং হবে। অনেক ব্লিডিং হয়েছে। আর ব্লিডিং হতে দেয়া যাবে না। জানেন তো এটা জংগল, রক্ত দেয়ার কোন ব্যবস্থা নেই।'

'স্যরি ম্যাডাম।' বলল আহমদ মুসা।

'সহযোগিতার জন্যে ধন্যবাদ।' বলে মহিলা তার চেয়ারে ফিরে এল।

'উঠে বসে বোধহয় কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, বলুন।' বলল লোকটি।

'আমাদের পারস্পরিক পরিচয়টা হয়ে গেলে ভাল হয়।' আহমদ মুসা বলল।

'আলোচনা ফ্রি হবার জন্যে?' ডাক্তার মহিলাটি বলল।

'ঠিক তাই।' বলল আহমদ মুসা।

'কিন্তু পরিচয় হবার পর যদি আবার কিছু কথা লুকোবার প্রয়োজন হয় উভয় পক্ষেই? পরিচয় হলেও মুক্ত আলোচনায় সমস্যা আছে।' মেয়েটি বলল।

'লুকানোটাই যদি কল্যাণকর মনে হয়, তাহেল সেটাও মনে করি ঠিক আছে।' বলল আহমদ মুসা।

'চমৎকার বলেছেন আপনি। সব কথা বলা সময় কল্যাণকর হয় না।' লোকটি বলল।

কথা শেষ করেই চেয়ার ঠেস দিল লোকটি। চোখে-মুখে একটা গাম্ভীর্য নেমে এল হঠাৎ। বলল, 'আমাদের কথাই প্রথম বলি। আমার পিতা ভারতীয়, মা থাইল্যান্ডের মেয়ে। আমার পিতৃদত্ত নাম ড্যানিশ দেবানন্দ। আমার মা আমার নাম দেন মংকুত চোলালংকন, প্রথম থাই রাজার নাম অনুসারে। আমার মা'র গর্ব ছিল তিনি চীন থেকে আসা থাইল্যান্ডের প্রথম রাজা মংকুত পরিবারের মেয়ে। আমি পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সময় বিয়ে করি আমার পাশে উপবিষ্ট তখন ডাক্তারী পড়ুয়া মহারাষ্টের মেয়ে এই সুস্মিতা বালাজীকে। এটা হলো আমাদের পরিচয়ের প্রথম পর্ব। দ্বিতীয় পর্বটা হলো, আমরা দু'জন

ইঞ্জিনিয়ার-ডাক্তার এই জংগলে এলাম কি করে? আমরা দু'জন পিতৃ-মাতৃহত্যার দায় মাথায় নিয়ে পালিয়ে বাস করছি এই জংগলে।' থামল ড্যানিশ দেবানন্দ।

আহমদ মুসার কপাল কুঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। সে ভাবছিল।

ড্যানিশ দেবানন্দ থামতেই আহমদ মুসা বলল, আপনি কোথায় চারকি করতেন?'

'পোর্ট ব্লেয়ারের ইন্ডিয়ান রোডস্ এন্ড কম্যুনিকেশন ডিপার্টমেন্টে।' বলল ড্যানিশ দেবানন্দ।

'আপনার পুরো নাম কি ড্যানিশ দিব্য দেবানন্দ?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

চমকে উঠল ড্যানিশ দেবানন্দ। বলল, 'হ্যাঁ, আপনি জানলেন কি করে?'

'আপনার পিতার নাম কি ড্যানিশ দিনা প্রেমানন্দ এবং মার নাম সাবিতা থানাবাতান?'

'হ্যাঁ।' বলল ড্যানিশ দেবানন্দ চেয়ারে সোজা হয়ে বসে। বিস্ময়ে বিস্ফোরিত তার দু'চোখ। একবার তাকাল সে স্ত্রী সুস্মিতা বালাজীর দিকে। তারপর মুখ ঘুরিয়ে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'আপনি এত কিছু জানলেন কি করে? আপনি গোয়েন্দা বিভাগের লোক নন তো?'

একটু হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'আমি গোয়েন্দা নই। তবে একজন সাবেক গোয়েন্দা কর্মকর্তা আমার বন্ধু লোক। তাঁর কাছেই অন্য একটি বিষয়ে শুনতে গিয়ে আপনাদের প্রসঙ্গ ঘটনাক্রমে আসে। আপনি আপনার পিতা-মাতাকে খুন করেননি, এটাই ঠিত তাই না?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি এতোসব বলেছেন কি করে? তিনিই বা কি করে বলেছেন?'

'হ্যাঁ। আপনারা ভিন্ন বাড়িতে থাকতেন। আপনার পিতা-মাতা খুন হওয়ার পরপরই আপনার টেলিফোন পেয়ে আপনার পিতা-মাতার বাড়িতে পৌঁছান। গিয়ে আপনারা দেখতে পান তাঁরা দু'জনেই ছুরিবিদ্ধ। তারা তখন মুমুর্ষূ। আপনারা দু'জনে তাদের দু'জনের দেহ থেকে ছুরি খুলে ফেলেন। এই সময় সেখানে আপনাদের পরিচিত কেউ পৌঁছেন। তারা খুনের দায়ে আপনাদের

অভিযুক্ত করেন এবং বাইরে দাঁড়ানো নকল পুলিশকে দেখিয়ে আপনাদের ধরিয়ে দেয়ার ভয় দেখান। মুক্তির বিনিময়ে তারা একটি বিলে সই ও আপনার পিতার ফার্মের মালিকানা দাবি করেন। একদিকে পিতা-মাতার মৃত্যু, অন্যদিকে তাদের হত্যার দায় ঘাড়ে এসে পড়ায় বিপর্যস্ত আপনারা তাদের সব দাবি মেনে নিয়ে পালিয়ে আসেন।' থামল আহমদ মুসা।

শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা তখন ড্যানিশ দেবানন্দ এবং ডাক্তার সস্মিতা বালাজীর।

আহমদ মুসা থামতেই ড্যানিশ দেবানন্দ উঠে দাঁড়িয়ে বিহ্বল কণ্ঠে বলল, 'আপনার কথার প্রতিটি বর্ণ সত্য। কিনতু সেই গোয়েন্দ কর্মকর্তা এসব জানলেন কি করে? এ তো কারও জানার কথা নয়। এসব তিনি আপনাকে বললেনই বা কেন?'

'আমার সেই সাবেক গোয়ান্দো বন্ধু সে সময় আন্দামন-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জির প্রধান গোয়েন্দা কর্মকতা ছিলেন। তিনি ঐ ঘনটার তদন্দ করেছিলেন। তিনি মহাগুরু শংকারাচার্য শিরোমনিকে গ্রেপ্তার করেছিলেন। শংকরাচার্য সব বিষয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি সব কথা নাকি খুলে বলেছিলেন। কিন্তু চার্জ শিটের আগেই মামলার কার্যক্রম অজ্ঞাত কারণে বন্ধ হয়ে যায়।'

আবেগ-উত্তেজনায় ধপ করে আবার চেয়ারে বসে- পড়ল ড্যানিশ দেবানন্দ। বলল, 'মহাগুরু শংকরাচার্য শিরোমনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন? আমার এ দুর্দশা ও আমার পারিবারিক বিপর্যয়ের কারণ এই মহাগুরু শংকরাচার্য শিরোমনি। কিন্তু তিনি কি আমার পিতামাতাও খুনি?

'সব আলোচনা তিনি করেননি। তবে এটুকু বলেছিলেন, আপনার আব্বার ড্রইংরুম, করিডোর এবং বাইরের গেট সব জায়গায় টিভি ক্যামেরা ছিল। শংকরাচার্য এটা জানতেন না। তদন্তে গিয়ে সব ফিল্ম তিনি পেয়ে যান। যার ফলে শংকরাচার্য কোন অপরাধই গোপন করতে পারেননি।'

'থ্যাংকস গড়। আমি ঈম্বরের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলাম। ঈশ্বর অবশ্যই আছেন, তা না হলে দৃশ্যপট এভাবে উল্টে গেল কেমন করে?'

আহমদ মুসা ভাবছিল মহাগুরু শংকরাচার্য শিরোমনির ব্যাপার। ড্যানিশ দেবানন্দ তাকে চেনে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কতটুকু চেনে, কতটা জানে তাকে। তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সে কি জানে? ড্যানিশ দেবানন্দ থামতেই আহমদ মুসা তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'শংকরাচার্য শিরোমনির সাথে আপনার বিরোধরে কারণ কি? তার সাথে আপনাদের জানা-শোনা কিভাবে, কেমন করে, কতটুকু জানেন তাকে আপনি?'

একটু ভাবল ড্যানিশ দেবানন্দ। বলল, 'যতদুর মনে পড়ছে শুরুর দিকে শংকরাচার্য ও তার লোকোরা আসতেন মহারাষ্ট থেকে। 'শিবাজি সন্তান সেনা' নামে তাদের কি এক সংগঠন আছে। সংক্ষেপে বলত, 'সেসশি' বা সূর্য। এই সংগঠনের জন্যে মোটা চাঁদা নিত প্রতিবছর। তারা বলত, জাতির প্রতিরক্ষা ও প্রতিষ্ঠার জন্য তারা কাজ করছে। আমি বাঙ্গালোর থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে আন্দামানে ফিরে এলাম। বাবার বিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং ও কনষ্ট্রাকশন ফার্ম ফিল এখানে। কিন্তু আমি তাতে যোগ না দিয়ে সরকারি চাকরিতে যোগ দিলাম। এর বড় কারণ ছিল বাবার টাকা কামাবার কৌশল আমার পছন্দ হতো না। সরকারি কনষ্ট্রাকশন ফার্মে যোগ দিলে শংকরাচার্য ও তার লোকরা আমার কাছে যাওয়া আশা শুরু করল। তাদের আবেগ-উত্তেজনাকর কথা আমার খুব পছন্দ হতো। আমি............।'

'তাদের আবেগ উত্তেজনাকর কথাগুলো কেমন ছিল?' ড্যানিশ দেবানন্দের কথার মাঝখানে বলে উঠল আহমদ মুসা।

'শমাংক, শংকরাচার্য, শিবাজী, গান্ধীর জীবন তারা সমানে নিয়ে আসত। বলত যে, তাদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার জন্যেই আমাদের সংগঠন। তারা ভারতবর্ষকে আর্য-মুনি-ঋষিদের শাস্তিত সাম-গান ধ্বনিত এক স্বর্গ বানাতে চেয়েছিলেন। সকল অপবিত্রতা থেকে মুক্ত করে ভারতবর্ষকে সেই রূপ দেয়অর জন্যেই আমরা কাজ করছি। তাদের এই কথা আমার খুব ভালো লাগত। এই ভালোলাগার কারণেই আমি ওদের

অনেক প্রোগ্রামে গেছি, ওদের অফিসগুলোতে গেছি। কিন্তু..............।

আবার ড্যানিশ দেবানন্দের কথায় বাধা দিয়ে আহমদ মুসা বলল, 'আন্দামানেও কি তাদের অফিস ছিল? কোথায় ছিল?'

'অফিস ছিল, গোপনে পরিচালিত তাদের প্রধান অফিষ ছিল 'রস' দ্বীপের ফাষ্ট সার্কেলে, যেখানে আন্দামানের গভর্নরের অফিস, বাসভবন ও ডিফেন্স ষ্টোরেজ ছিল। ডিফেন্স ষ্টোরের পাশেই গভর্নর ও তার পরিবারের আন্ডার গ্রাউন্ড শেল্টার ছিল তাদের প্রধান অফিস। সে আন্ডা গ্রাউন্ড শেল্টারের মাটির উপর ছিল গভরর্নর ভবনের ব্যাকওয়ার্ড এক্সিট বা পেছনের দরজা। সেটা ছিল কয়েকটি ঘরের সমষ্টি পাথরের তৈরি দু'তলা একটি স্থাপনা। এখান দিয়ে যেমন বাইরে বের হওয়া যায়, তেমনি আন্ডার শেল্টারে যাওয়া যায়। অন্যদিকে আন্ডারগ্রাউন্ড শেল্টার থেকে ডিফেন্স গোডাউনে যাওয়ারও পথ আছে। ১৯৪১ সালে জুনের ভুমিকম্পে গভর্নর ভবনসহ রস দ্বীপের সব সরকারি স্থাপনা মাটির সাথে মিশে গেছে। কিন্তু আন্ডার শেল্টার, এর মাথার উপরের দু'তলা অংশ এবং ডিফেন্স গোডাউন সম্পুর্ণ অক্ষত রয়ে গেছে। এটাই শংকরাচার্যদের 'সেসশি' বা 'সূর্য' সংগঠনের আন্দামান হেড কোয়ার্টার। কিন্তু এখানে সাইনিবোর্ড আছে পুরাতত্ত্ব পবিভাগের আঞ্চলিক অফিসের। অফিসে পুরাতত্ত্ব বিভাগের কয়েকটা চেয়ার-টেবিল, ফাইল ছাড়া কোন কাজ নেই। পরিচালকসহ দু'তিন জন কর্মচারী আছে তারা কার্যত 'শিবাজী সন্তান সেনা' 'সেসশি'র বেতনবুকে পরিণত হয়েছে। আন্দামান নিকোবরের সবগুলো পুরাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অফিসই তাদের দখলে। এসব অফিসের কয়েকটিতে আমি গিয়েছি।' থামল ড্যানিশ দেবানন্দ।

সে থামতেই আহমদ মুসা বলল, 'আপনি ওদরে কথা পছন্দ করতেন। বলুন তার পরে কথা।'

'হ্যাঁ, ওদের কথা-বার্তা ও কাজ আমার খুবই পছন্দ হতো। কিন্তু পরে এই পছন্দ আমি ধরে রাখতে পারিনি। প্রথমেই মন আমার বিষিয়ে ওঠে তাদের একটা দাবি শুনে। এক কোটি টাকা বাজেটের একটা রোড কনষ্ট্রাকশন তখন আমার হাতে নিয়েছিলাম। স্বয়ং মহাগুরু শংকরাচার্য শিরোমনি আমাকে এসে বললেন, প্রকল্পের অর্ধেক টাকা তাদের ফান্ডে দিতে হবে। তার মানে প্রকল্পের ১ কোটি টাকা মধ্যে ৫০ লাখ টাকাই তাদের দিতে হবে। বিস্ময়ে আমার চোখ ছাড়াবড়া।

বললাম, ‘কেন দিতে হবে?’ ‘জাতির জন্যে জাতির কাজে।’ বললেন তিনি। ‘কিভাবে দেব? এ টাকা তো জাতির কাজের জন্যেই।’ বললাম আমি। ‘তোমাদের প্রকল্প দেশের কাজের জন্যে, জাতির কাজের জন্য নয়। দেশ ও জাতি এক নয়। দেশ এখন হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সকলের। এই দেশ পবিত্র না করতে পারা পর্যন্ত দেশের স্বার্থের প্রতি আমাদের কোন আগ্রহন নেই।’

তার এই কথা সেদিন আমাদের বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়েছিল। তাদের ভেতরের জঘন্য রূপ আমাকে আতংকিত করে তুলেছিল। আমি সেদিন তাদের দাবী প্রত্যাখ্যান করেছিলাম এই বলে যে, আমার এই চাকরিটা দেশের স্বার্থ দেখার জন্যে। আমি দেশের এক পয়সাও প্রকল্পের বাইরে খরচ করতে পারবো না। আমার প্রত্যাখ্যানকে শংকরাচার্য তাদের চূড়ান্ত অপমান ও আমার জাতিদ্রোহিতার হিসেবে দেখেছিল। আমি না বুঝলেও সেই থেকে আমার ও আমার পরিবারের প্রতি তাদের শত্রুতার শুরু। আরেকটা ঘটনা ঘটতে দেখেছি পোর্ট ব্লেয়ারের সেলুলার জেলে আমার চোখের সামনে। সেদিন সেলুলার জেল প্রতিষ্ঠার দিনকে ‘কালো দিবস’ হিসাবে পালনের অনুষ্ঠান ছিল। সরকারি প্রয়োজেন অনুষ্ঠান হচ্ছেল। সেলুলারে যেসব বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন, যারা জেলে মারা গেছেন এবং সেলুলার জেলে যারা ফাঁসিতে জীবন দিয়েছিলেন, তাদের সচিত্র বিবরণ অনুষ্ঠানের মঞ্চ ও দেয়ালে উপস্থাপন করা হয়েছিল। তার মধ্যে আন্দামানের লর্ড মেয়োকে হ্যত্যাকারী সেলুলার জেলের কয়েদী সেলুরার জেলেই ফাঁসিতে জীবন দানকারী শের আলী, সেলুলার জেলের সুপরিচিত কয়েদি দামোদর সাভারকার এবং সেলুলার জেলে মৃত্যুবরণকারী একজন দাশীনক মওলানা ফজলে হক খয়রাবাদী-এই তিনজনের সচিত্র বিরণ মঞ্চের দেয়ালে টাঙানো হয়েছিল। অনুষ্ঠান শুরু হলে স্বাগত বক্তব্য দেয়ার সময় মহাগুরু শংকরাচার্য এবং স্বামী স্বরূপানন্দ সামনের কাতার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে স্বাগত ভাষণ থামিয়ে দিয়ে বললেন, ‘মঞ্চের দেয়াল থেকে শের আলী ও মওলানা ফজলে হক খয়রাবাদীর সচিত্র বিবরণসহ অনুষ্ঠান কক্ষের দেয়ালে মুসলিম নামের যাদের পরিচিতি টাঙানো আছে, সব সরিয়ে ফেলা হোক।’ অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দিচ্ছেলেন ভারতীয় ইতিহাসের প্রবীণ প্রফেসর এবং আন্দামান-নিকোবর

স্মৃতিরক্ষা প্রকল্পের নির্বাহী পরিচালক রমানন্দ রাধাকৃষ্ণাণ। তিনি হাত জোড় করে তাদের বসতে অনুরোধ করে বললেন, শের আলী ও মাওলানা খয়রাবাদীসহ তাদের বিবরণ সরিয়ে নিলে, তাদের প্রতি যেমন অসম্মান হবে, তেমনি আমাদের অনুষ্ঠানেরও অঙ্গহানি হবে।'

তার এই কথার সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠান হলে চল্লিশ পঞ্চাশ জুন গেরুয়াধারী দাঁড়িয়ে গেল এবং একযোগে চিৎকার করে বলল, 'ওদের সরিয়ে দিন। ওরা কেউ নয়, ওরা কেউ নয়?' বুঝলাম শংকরাচার্য আট-ঘাট বেঁধে এসেছে।

রমানন্দ রাধাকৃষ্ণাণ আবার হাত জোড় করে বললেন, 'সম্মানিত উপস্থিতি, ্কষদিরাম যেমন ভারতীয় ইতিহাসের জাতীয় বীর, তেমনি শের আলীও। সাভারকার যেমন আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র, তেমনি ফজলে হক খয়রাবাদীর আত্নদানও আমাদের গর্বের বস্তু। আমি আপ........।'

কথা শেষ করতে পারলো না রাধাকৃষ্ণাণ। দর্শকের আসন থেকে শ্করাচার্য এবং স্বরূপানন্দ ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল রাধাকৃষ্ণাণের উপর। তাদের হারেদ ত্রিশুল দিয়ে তার উপর প্রহার শুরু করল। ওদের হাত থেকে রাধাকৃষ্ণাণকে যখন উদ্ধার করা হলো, তখন তিনি রক্তাক্ত। অনুষ্ঠান পণ্ড হয়ে গেল। এই ঘটনার পর আন্দামানের সেলুলার জেল ও অন্যান্য দর্শনীয় স্থান ও রেকর্ড থেকে ভোজবাজীর মত মুসলিম নাম উবে গেল।

এই ঘটনার পর আমি শংকরাচর্যদের ঘৃণা করতে শুরু করি। এরপর আমি কোন কাজেই ওদের সহযোগিতা করিনি।'

দীর্ঘ বক্তব্য দিয়ে থামল ড্যানিশ দেবানন্দ। থেমেই আবার বলে উঠল, 'আমি অনেক কথা বলেছি, এবার আপনি বলুন।'

বলে চেয়ারে হেলান দিল ড্যানিশ দেবানন্দ।

'ঠিক বলেছ, আমরা তো ওঁর নাম পর্যন্ত এখনও জানি না।'

বলে তাকাল ডাক্তার সুস্মিতা বালাজী আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'আমার বিস্ময় লাগছে শংকরাচার্যদের ব্যাপারে আপনার আগ্রহ দেখে। আপনি আপনার বন্ধু সাবেক গোয়েন্দার কাছে প্রসংগক্রমে শংকরাচার্যের সম্পর্কে

শুনেছেন। কিন্তু শুধু এটুকু শোনা থেকে কোন ব্যক্তি সম্পর্কে এত আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।’

‘ঠিক বলেছেন। শংকরাচার্যদের সম্পর্কে আমিও কিচু জান, তাই আরও কিছু জানার চেষ্টা করছি।’ বলল আহমদ মুসা।

‘কেন?’ ডাক্তার সুস্মিতা বালাজী বলল।

‘আমি শুধু শংকরাচার্য নয়, তাদরে ‘সেসশি’ অর্থাৎ ‘শিবাজী সন্তান সেনা’দের সম্পর্কে সবকিছু জানতে চাই। স্বামী স্বরূপানন্দ এখন নেই এবং মহাগুরু স্বামী শংকরাচার্য শিরোমনিও এখন পালিয়ে বেড়াতে বাধ্য হচ্ছেন বটে, কিন্তু তাদের শিবাজী সন্তান সেনা এখনও তাদের মতই ভয়ংকর।’

ড্যানিশ দেবানন্দ ও সুস্মিতা বালাজীর চোখে-মুখে বিষ্ময় ফুটে উঠেছে। বলল ড্যানিশ দেবানন্দ, ‘শংকরাচার্য পালিয়ে বেড়াচ্ছে এবং স্বরূপানন্দ নেই মানে?’

‘স্বামী স্বরূপানন্দ নিহত হয়েছে আজ কিছুক্ষণ আগে এবং শংকরাচার্য দু’দিন আগে ভাইপার দ্বীপের পুরানো জেলখানায় শের আলীর বসবাস ও ফাঁসির স্থানেই মৃত্যুর মুখ থেকে পালাতে সক্ষম হয়েছে।’ বলল আহমদ মুসা গম্ভীর কণ্ঠে।

ড্যানিশ দেবানন্দ ও সুস্মিতা বালাজীর বিষ্ময় ভরা দুই জোড়া চোখ তাকিয়ে আছে আহমদ মুসার দিকে। দু’জনেই উন্মুখ হয়ে উঠেছে কিছু বলার জন্যে। সুস্মিতা বালাজীই আগে বলে উঠল, ‘এতটা বিস্তারিত খবর ও নিখুঁত তথ্য আপনি জানেন কি করে? আপনি কি সবকিছু.....।’ কথা শেষ না করেই থেমে গেল সুস্মিতা বালাজী।

আহমদ মুসার মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠল। বলল, ‘যার নেতৃত্বে আমাকের আজ বন্দী করা হয়েছিল তিনি স্বামী স্বরূপানন্দ। আমি বন্দীখানা থেকে পালাবার সময় যারা মারা গেছে, তাদের মধ্যে স্বামী স্বরূপানন্দও আছে। আর শংকরাচার্যরা আন্দামানে আমার গাইড ও সাথী গোপী কিষাণ গঙ্গারাম ওরফে গাজী গোলাম কাদেরকে বন্দী করে রেখেছিল ভাইপার দ্বীপের ঐ জেলে। আমি তাকে উদ্ধার করতে গিয়েছিলাম। সংঘর্ষে যারা নিহত হয়েছে তাদের মধ্যে শংকরাচার্যও

থাকার কথা ছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে ভাঙ্গ জেলখানার আন্ডার গ্রাউন্ড গোপন পথ দিয়ে সে পালাতে সক্ষম হয়।'

ড্যানিশ দেবানন্দ ও সুস্মিতা বালাজীর চোখে-মুখে বিস্ময়-কৌতুহল আরও বেড়েছে। তারা দেখছে আহমদ মুসাকে। হঠাৎ তাদের মনে হচ্ছে, যে সহজ সরল যুবককে তারা দেখছে, সে যেন আসলে অন্য কেউ, অন্য কিছু। তার বয়সের চেয়ে, তার আকারের চেয়ে অনেক উঁচুতে উঠল যেন সে। কথা বলে উঠল ডাক্তার সুষ্মিতা বালাজী। বলল, 'এবার আপনার সম্পর্কে দয়া করে কিছু বলুন।'

আহমদ মুসা তাকাল ডাক্তার সুষ্মিতা বালাজীর দিকে। বলল, 'এভাবে কথা বললে আমার কথা আমি বলতে পারবো না। কোন বড় বোন কি এভাবে কথা বলে?'

চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ডাক্তা সুষ্মিতা বালাজীর। বলল, 'বড় বোন? বড় বোন বলছেন আমাকে?'

'কেন বড় বোন হতে পারেন না? আমার জীবনে অনেক ছোট বোন পেয়েছি, কিন্তু বড় বোন একটিও পাইনি। বড় বোনের মধুর অভিভাবকত্ব আমার কাছে এক স্বপ্ন।' বলল আহমদ মুসা। হাসি দিয়ে কথা শুরু করলেও শেষে আহমদ মুসার কণ্ঠ ভারী হয়ে উঠেছিল।

আগেবে ভারী হয়ে উঠেছে ডাক্তার সুষ্মিতা বালাজীর চোখ-মুখ। বলল, 'থ্যাংকস গড়। কেন পারবো না বড় বোন হতে। আমার কোন ছোট ভাই নেই। ঈশ্বর যদি একটি ছোট ভাই দেন, সেটাকে আমি অসীম দয়া বলেই গ্রহণ করব।' আবেগ-ঘন কণ্ঠে বলল ডাক্তার সুষ্মিতা।

'এবার বড় ভাইটি তোমার নাম?' ড্যানিশ দেবানন্দ বলে উঠল।

আহমদ মুসা একটু ভাবল। তারপর বলল, 'কোন নাম বলব, পাসপোর্টের নাম, না পিতা-মাতার দেয়া নাম? আমার...............।'

'দুই নাম তো হয় না। পিতা-মাতার দেয়া নামই তো পাসপোর্টের নাম হয়। নাম বদলালেও নাম একটাই হয়ে থাকে।'

'আমি আন্দামানে আসার সময় মার্কিন পাসপোর্ট নিয়ে এসেছি। এ পাসপোর্টে আমার নাম দেয়া হয়েছে বেভান বার্গম্যান। এটাই এখন আমার নাম।' বলল আহমদ মুসা।

'মার্কিন পাসপোর্ট নেয়ার আগে কোন দেশের পাসপোর্ট ছিল? কি নাম ছিল?' জিজ্ঞাসা করল ডাক্তা সুষ্মিতা বালাজী।

'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেমন পাসপোর্ট দিয়েছে, তেমনি অনেক দেশই দিয়েছে আমাকে পাপোর্ট। নামও বিভিন্ন হয়েছে।'

ড্যানিশ দেবানন্দ ও সুষ্মিতা বালাজী দুজনের চোখই বিস্ময়ে বিস্ফোরিত। বলল সুষ্মিতা বালাজীই আবার, 'আন্তর্জাতিক ক্রিমিনালদের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন নামের পাসপোর্ট থাকে। কিন্তু তোমাকে তো ক্রিমিনাল বলে মনে হচ্ছে না।'

'ক্রিমিনালদের যারা ধরে তাদের কিন্তু এ রকম পাসপোর্টের দরকার হয়ে।' আহমদ মুসা বলল।

'তাহলে কি তুমি গোয়েন্দা? ইন্টারপোলের কেউ?' ড্যানিশ দেবানন্দ বলল।

'না গোয়েন্দা নই, পুলিশও নই।'

'কিন্তু ছদ্মনামে তাহলে আন্দামানে এলে কেন?'

তৎক্ষণাৎ জবাব না দিয়ে একটু ভাবল আহমদ মুসা। তারপর বলল, 'আসল নামে এলে প্রতিপক্ষ সাবধান হয়ে যেত। আমি চাইনি 'মিশন' সফল করার আগেই ঝামেলায় পড়ি।'

'এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে, তোমার নাম তোমার প্রতিপক্ষ এবং অনেকেই আগে থেকেই জানে। তোমার প্রতিপক্ষ এখানে কে? তোমার মিশন এখানে কি?' বলল ড্যানিশ দেবানন্দ।

প্রতিপক্ষের কাউকেই চিনতাম না। এখানে এসে তাদের মধ্যে যাদের চিনেছি তারা হলেন মহাগুরু শংকরাচার্য শিরোমনি, স্বামী স্বরূপানন্দ এবং দেখেছি নাম না জানা কিছু লোককে।'

'অবাক ব্যাপার, মিশন নিয়ে এসেছ, অথচ তাদের কাউকে চেন না, নামও জান না! মিশনটা কি ছিল?' জিজ্ঞাসা ডাক্তার সুষ্মিতা বালাজীর।

‘ধরুন একটা খুন হলো। খুনিকে ধরার মিশন নিয়ে এলেন। খুনিকে চেনা মিশনের শর্ত নয়।’

হাসল সুষ্মিতা বালাজী। বলল, ‘ঠিক। কিনতু তুমি কি সেরকম কোন মিশন নিয়ে এসেছ?’

‘হ্যাঁ।’

‘কি সেটা?’

‘যে কথা কিছুক্ষণ আগে বলেছিলাম। গত কিছুদিনের মধ্যে প্রায় অর্ধ শতের মত লোক খুন হয়েছে আন্দামান নিকোবরে। খুন বলে প্রচার হয়নি। প্রচার হয়েছে তারা অপঘাতে মারা গেছে। কিন্তু আসলেই সবগুলো কোল্ড ব্লাডেড মার্ডার। সবচেয়ে লক্ষনীয় হলো হত্যার শিকার সবাই একই কম্যুনিটির লোক। দ্বিতীয়.........।’

আহমদ মুসার কথার মাঝখানে কথা বলে উঠল সুষ্মিতা বালাজী। বলল, ‘কোন কম্যুনিটির লোক তারা?’

‘মুসলিম।’

ভ্রুকুঞ্চিত হলো ড্যানিশ দেবানন্দ এবং সুষ্মিতা বালাজীর। গম্ভীর হয়ে উঠল তাদের মুখ।

‘দ্বিতীয় যে বিষয়’, আবার কথা শুরু কলল আহমদ মুসা, ‘ভয় হলো, ‘রাবেতায়ে আলম আল ইসলামী’ নামের আন্তর্জাতিক একটি মুসলিম সংগঠন পোর্ট ব্লেয়ার উপসাগরের ‘সবুজ দ্বীপটি’ ভাড়া নিয়ে সেখানে শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ক একটা কমপ্লেক্স গড়ে তুলেছিল। সে কমপ্লেক্সটি রাতারাতি দ্বীপ থেকে উধাও হয়েছে। কোন স্থাপনা সেখানে ছিল, এ চিহ্নও নেই। তৃতীয়ত, ভারতের মোঘল রাজবংশের ধ্বংসাবশেষের একটা টুকরো আন্দামানে ছিল। যুবক আহমদ শাহ্ আলমগীর এখানকার মোগল পরিবারটির একমাত্র পুরুষ সন্তান। সে নিখোঁজ এবং তার মা এবং একমাত্র বোনের জীবন হয়ে উঠেছিল বিপন্ন। এই রহস্যপূর্ণ ও উদ্বেগজনক বিষয়গুলো সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাবার মিশন নিয়েই আমি আন্দামানে এসেছি। এই মিশন ছাড়া আন্দামানের আর সবটাই ছিল আমার কাছে অন্ধকার।’

‘অন্ধকারে আলো জ্বলল কি করে? শংকরাচার্যদের সন্ধান পেলে কি করে?’ বলল সুষ্মিতা বালাজী।

আহমদ মুসা আন্দামানে আসার পথের ঘটনা, পোর্ট ব্লেয়ারের একজন শিক্ষক গঙ্গারাম তিলকের সাথে সাক্ষাত এবং পোর্ট ব্লেয়ারে আবার পর গোপী কিষণ গঙ্গারামের সাথে পরিচয় হওয়া এবং প্রাথমিক ঘটনাগুলোর সব বিবরণ দিয়ে বলল, আহমদ শাহ্ আলমগীরের বাসায় পৌঁছতে সেদিন একটু দেরি হলে তার মা বোনকে পাওয়া যেত না। কিডন্যাপ থেকে তাদরে রক্ষা করতে দিয়ে দশ বারো জনের জীবনহানী ঘটেছে। তারপর ওদেরকে হোটেলে রাখা, গোপী কিষণ গঙ্গারাম কিডন্যাপ হওয়া থেকে পরবর্তী সব ঘটনা বলল আহমদ মুসা।

ড্যানিশ দেবানন্দ ও সুষ্মিমা বালাজী দু’জনেরই চোখে-মুখে অপার বিষ্ময়। ড্যানিশ দেবানন্দ বলল, ‘তুমি দেখছি রীতিমত লড়াইয়ের মধ্যে আছ।’

ড্যানিশ দেবানন্দের কথা শেষ হতেই সুষ্মিতা বালাজী বলল উঠল, ‘কি বলছ, শাহ্ বানু ও তার মাকে একদম গভর্নরের বাড়িতে নিয়ে রেখেছ!

‘গভর্নর বিবি মাধবের মেয়ে সুষমা রাও আহমদ শাহ্ আলমগীরকে ভালবাসে এবং তার খাতিরেই সে এতবড় ঝুঁকি নিয়েছে।’ আহমদ মুসা বলল।

হাসল সুষ্মিমা বালাজী। বলল, ‘মহারাষ্ট্রের বিশেষ করে বালাজী রাও বংশের মেয়েরা রাজপুত মেয়েদের মতই। এরা কথা দিয়ে জীবন দিয়েও রাখে।’

হাসল ড্যানিশ দেবানন্দও। বলল, ‘আমি ভাগ্যবান স্বীকার করতেই হবে।’

বুঝার চেষ্টা করে আহমদ মুসাও হেসে উঠল। বলল, ‘আমিও ভাগ্যবান যে আমার আপা বালাজী রাও পরিবারের।’

মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য টেনে সুষ্মিতা বালাজী বলল, ‘ভাগ্যবান হতেই হবে। বালাজীরা শুধু ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাক্ষ্মণ পরিবারই নয়, তারা মারাঠা শক্তির স্রষ্টা।’

‘ধন্যবাদ আপা। কিন্তু বলুন তো গভর্নর বালাজী বাজীরাও মাধন পরিবারের সাথে আপনার যোগাযোগ এখন কেমন?’ বলল আহমদ মুসা।

গম্ভীর হলো সুস্মিতা বালাজী। বলল, 'তিনি আমার মামা। কিন্তু যোগাযোগ নেই গত বিশ বছর।' সুষমা' আমারই দেয়া নাম। আমি দেখেছিও তাকে সেই বিশ বছর আগে।'

'আপনাদের বিপদে কোন সাহায্য তাদের নেননি?' আহমদ মুসা বলল।

'সে অনেক কথা। আমার অসমবর্ণ বিয়েকে আমাদের পরিবার গ্রহণ করেনি বলে আমি কাছে সাহায্য ভিক্ষা করতে যাইনি। তাছাড়া আমাদের কাছে পুলিশের চেয়ে বড় বিপদ ছিলেন শংকরাচার্যরা।' বলল সুস্মিতা বালাজী।

আহমদ মুসা কিছু বলার জন্য মুখ খুলেছিল। কিন্তু তার আগেই ড্যানিশ দেবানন্দ মুখ খুলল। বলল, 'দেখ সুস্মিতা, বত্রিশ সিংহাসনের কেচ্ছার মত আমাদের কথায় কিন্তু নানা শাখা গজাচ্ছে। আসল কথাই এখনও আমরা জানিনি। এতক্ষণ তোমার ভাইয়ের যে কাহিনী আমরা শুনলাম, তাতে মনে হচ্ছে আমরা আরেক রবিনহুডের পাশেই বসে আছি। কিন্তু রবিহুডের নাম পর্যন্ত আমরা জানি না।'

সুস্মিতা অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল আহমদ মুসার দিকে। তারও মনে এই একই কথা। মাত্র একজন লোক বাইরে থেকে আন্দামানে এসে নিজের কোন স্বার্থে জীবন-মৃত্যুর লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়লো, অসম সাহসের সাথে বিরাট এক পক্ষকে মোকাবিলা করলো, পথে দাঁড়ানো সব শক্তিই এ পর্যন্ত যার কাছে পরাভূত হলো, বিষ্ময়কর এই ব্যক্তিটি কে? ড্যানিশ দেবানন্দের কথা কানে যাওয়ার পর সুস্মিতা বালাজির ভাবান্তর ঘটল। বলল, 'দেবানন্দ ঠিক বলেছে। তোমার সত্যিকার নামই তো আমাদরে এখন ও জানা হয়নি, তোমার পরিচয়ও বলনি।'

'আপনাদের কম্পিউটার আছে?'

'আছে। কিন্তু তুমি অন্য কথায় যাচ্ছ কেন?'

'যাইনি। কম্পিউটারে ইন্টারনেট কানেকশন আছে?'

'অবশ্যই। আমাদের সংবাদপত্রের তৃষ্ণা মেটেতো ইন্টারনেট দিয়েই। কিন্তু অপ্রাসঙ্গিকভাবে এ প্রসঙ্গ আনছ কেন?' বলল সুস্মিতা বালাজী।

'প্রাসঙ্গিকভাবেই বলছি। কোথায় আপনাদের কম্পিউটার?'

উঠে দাঁড়াল ড্যানিশ দেবানন্দ। বলল, ‘সুষ্মিতা, কম্পিউটার এখানেই নিয়ে আসি।’

বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মিনিট খানেকের মধ্যে সে কম্পিউটার ঠেনে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল। কম্পিউটার দাঁড় করাল আহমদ মুসার মাথার কাছে।

ড্যানিশ দেবানন্দ তার চেয়ারে ফিরে এল।

আহমদ মুসা উঠে বসতে গেলে সুষ্মিতা বালাজী তাকে ধরে বসাল।

‘আপা, আপনি দেখছি আমাকে পরনির্ভরশীল করে ছাড়বেন। এর চেয়ে অনেক অনেক খারাপ অবস্থাতেও কেউ আমাকে এভাবে সাহায্য করে না।’

‘বউ এখানে হাজির নেই। তার বিরুদ্ধে বদনাম ছড়িও না।’

‘বদনাম নয় আপা। এমন অবস্থায় দূরে দাঁড়িয়ে সে সাহস দেয় আর বলে, উঠে উঠে যাচ্ছ, কোন কষ্ট হচ্ছে না তোমার ইত্যাদি।’ বলল আহমদ মুসা।

‘তার মানে স্ত্রীকে ‘স্ত্রী’ না বানিয়ে এক অপারত ‘তুমি’ বানিয়েছ। কিন্তু...।’

সুষ্মিতা বালাজীর কথার মাঝখানে ড্যানিশ দেবানন্দ বলে উঠল, ‘সুসি, ওকে তুমি আবার ভিন্ন দিকে নিয়ে যাচ্ছ। কম্পিউটার এনে দিয়েছি, এখন আমাদের প্রশ্নের জবাব চাই।’

‘ধন্যবাদ ড্যানি।’

বলে আহমদ মুসার দিকে তাকাল সুষ্মিতা বালাজী। বলল, ‘কম্পিউটার তো এসেছ। আগে প্রশ্নের জবাব দাও। তারপর কম্পিউটার হাত দিও।’

‘দু’টোই হবে।’

বলে আহমদ মুসা কম্পিউটাররের কি বোর্ডে হাত চালাতে লাগল।

ড্যানিশ দেবানন্দ ও সুষ্মিতা বালাজীর দৃষ্টি কম্পিউটার স্ক্রিনের উপর। তাদের চোখে-মুখে বিস্ময়, তাদের প্রশ্নের জবাবের সাথে কম্পিউটারের কি সম্পর্ক।

ইন্টারনেটে প্রবেশ করেছে আহমদ মুসা। সার্চ করা নয়, সবই যেন মুখস্ত তার। আহমদ মুসার আঙুল নড়ছে, সেই সাথে অবিরাম পাল্টে যাচ্ছে কম্পিউটার স্ক্রিনের দৃশ্যে।

অপলক চোখে তাকিয়ে আছে ড্যানিশ দেবানন্দ ও সুষ্মিমা বালাজী কম্পিউটারে স্ক্রীনের দিকে।

তারা দেখল, অস্থির কারসারটি এক সময় শিরোনামে একটি পয়েন্টে গিয়ে স্থির হলো। তারপর আহমদ মুসার তর্জনি একটা কীতে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে স্ক্রিনে ভেষে উঠল একটা ফটো। ফটোটাকে ধীরে ধীরে স্ক্রীন জোড়া করে তুলল আহমদ মুসা।

ফটো দখে চমকে উঠল ড্যানিশ দেবানন্দ ও সুষ্মিতা বালাজী। মুখ ফেঁড়েই যেন কথা বেরিয়ে এল সুষ্মিতা বালাজীর, 'এতো তোমার ফটো? ইন্টারনেটে কেন?'

প্রশ্ন করে থামল সুষ্মিতা বালাজী।

'ইন্টারনেটে তোমার 'ওয়েব সাইট' আছে নাকি?' সুষ্মিতার কথার রেশ মিলিয়ে যাবার আগেই ড্যানিশ দেবানন্দের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো প্রশ্ন।

'আমার কোন ওয়েব সাইট নেই। এটা মার্কিন 'সিআইএ'র একটি ওয়েব সাইট। শিরোনামঃ 'পরিবর্তনের নিয়াময় যারা' (Potentials of Change)।'

'সাংঘাতিক ব্যাপার। সিআইএ'র 'পটেনশিয়ালস অব চেইঞ্জ'-এ তোমার পরিচিতি দিয়েছে? দেখি।'

বলে সুষ্মিতা বালাজী চেয়ার টেনে এগিয়ে এলো কম্পিউটারের কাছে।

ড্যানিশ দেবানন্দও চেয়ার টেনে সুষ্মিতার পাশে বসল।

প্রথম ওয়েব পেশ খোলাই ছিল।

ছবির নিচেই জ্বল জ্বল করছে একটি নামঃ 'আহমদ মুসা।'

ড্যানিশ দেবানন্দ ও সুষ্মিতা বালাজীর চোখ আটকে গেল নামটার উপর।

বিষ্ময়ের এক ধাক্কা তাদের দু'জনের মুখেই আছড়ে পড়ল। কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে তাদের কপাল। নীরব দৃষ্টিতে দু'জন দু'জনের দিকে তাকাল। নামটা দু'জনেরই চেনা। বিগত বছরগুলোতে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে তার সম্পর্কে

জেনেছে। সবশেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীন সংকটে তার ঐতিহাসিক অবদা এবং টুইনটাওয়ার ধ্বংসের রহস্য উদঘাটনের শ্বসরুদ্ধকর কাহিনী তাদের সামনে রয়েছে। অনেক ঘটনার বিষ্ময়কর সেই নায়ক আমাদের সামেনের এই লোকটি? তাকেই কি আমরা শত্রুর হাত থেকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় উদ্ধার করে এনেছি। গর্ব ও তৃপ্তির শিহরণ খেলে গেল তাদের দেহে। তারা তাকাল আহমদ মুসার দিকে। আহমদ মুসার দৃষ্টি তখন জানালা দিয়ে বাইরে নিবদ্ধ। বাইরে দেখা যাচ্ছিল নিচে উপত্যাকার সবুজ বনানীর উপর দিয়ে আন্দামান উপসাগরের নীল পানি। এই নৈসর্গিক দৃশ্যের কোন অন্তহীনের মধ্যে যেন ডুবে গেছে তার মন। একটা ধ্যানমগ্নতা ফুটে উঠেছে তার চোখে-মুখে। এ মানুষ তো পৃথিবীকে এবং এই পৃথিবীর সব মানুষকে শুধু ভালই বাসতে পারে। এই মানুষেরই হাতে প্রাণসংহারকারী বন্দুক গর্জন করে ওঠে কি করে!

ড্যানিশ দেবানন্দ এবং সুষ্মিতা বালাজীর চোখে-মুখে এবার বিষ্ময়ের স্থানে ফুটে উঠল শ্রদ্ধার ভাব আর অনেক প্রশ্ন।

কিন্তু আহমদ মুসার ঐ ধ্যানমগ্নতা তারা ভাঙতে চাইল না। সুষ্মিতা বালাজী আবার চোখ ফেরাল কম্পিউটার স্ক্রীনের দিকে। ফটোর নিচেই আহমদ মুসার নাম। তারপরই শুরু আহমদ মুসার ডসিয়ার-তার জীবন ও কাজের বিবরণ।

ড্যানিশ দেবানন্দের চোখও ফিরে এসেছে কম্পিউটার স্ক্রীনে। তারও চোখ আহমদ মুসার ডসিয়ারের উপর।

‘এস ডসিয়ার দেখে নেই। সিআইএ’র ডসিয়ার দেখছি অনেক বিস্তারিত ও তথ্যবহুল।

‘হ্যাঁ, ঠিক।’ বলল ড্যানিশ দেবানন্দ।

সুষ্মিতা বালাজী ডসিয়ারের এক এক পেজ ওপেন করতে লাগল এবং পড়ে চলল। ড্যানিশ দেবানন্দও।

ওয়েব পেজ পড়া শেষ হলো। বিষ্ময়ে বিমুগ্ধ দু’জনেরই মুখ।

দু’জনেই মুখ ঘুরিয়ে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। আহমদ মুসাও মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়েছে তাদের দিকে।

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিনতু তার আগেই ড্যানিশ দেবানন্দ বলে উঠল, 'মিঃ আহমদ মুসা, শ্রীকৃষ্ণ যদি এখন আমাদের সামনে এসে দাঁড়াত, তাহলেও আমরা এত বিষ্মিত হতাম না, যতটা বিষ্মিত হয়েছি আপনাকে এইভাবে পেয়ে। কারণ, ভগবান ভক্তদের দর্শন দিতেই পারেন, কিন্তু আপনার দেখা পাওয়া ছিল অসম্ভব, অকল্পনীয়। ওয়েলকাম আপনাকে।'

মুখটা একটু গম্ভীর হয়ে উঠেছে আহমদ মুসার। বলল, 'ওয়েলকাম জানাবার জন্যে 'আপনি' সম্বোধনের কি প্রয়োজন?'

'আহমদ মুসাকে 'তুমি' বলব আমরা কি করে?' বলল সুষ্মিতা বালাজী।

'বলুন আপনি আহমদ মুসার পিতা-মাতা, বড় ভাই, বড় বোননা কি তাকে 'আপনি' বলবে?'

'তা বলবে না।'

'তাহলে আপনি কি বড় বোন হতে অস্বীকার করছেন?'

একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল সুষ্মিতা বালাজী। তার মুখে নেমে এল বেদনার ছায়া। তাকাল পূর্ণ দৃষ্টিতে আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'না, অস্বীকার করতে পারি না, এ ডাক কেউ প্রত্যাখান করতে পারে না।' আবেগের উচ্ছাছে আটকে গেল সুষ্মিতার বালাজীর শেষ কথাগুলো।

একটু থেকে নিজেকে সামলে, চোখে টলটলে অশ্রু নিয়ে মুখে হাসি টানার চেষ্টা করে বলল, 'যাই বলুন, আপাতত 'তুমি' সম্বোধন মখে আসছে না এবং নাম ধরে ডাকতে পারবো না। ঠিক আছে?'

'না, এ আপোষ প্রস্তাবে না করা কিছু নেই।' বলে ড্যানিশ দেবানন্দ মুখ ঘুরিয়ে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'আপনাকে এভাবে পেয়ে বিষ্ময়ে যে শক খেয়েছি আমরা, তার চেয়ে কিন্তু বেশি বিষ্ময়কর মনে হচ্ছে আপনার আন্দামানে আসা। আপনি যখন এসেছেন, তখন ধরতেই হবে এখানে খুব বড় একটা ঘটনা ঘটছে। কিন্তু সেটা কি? মাত্র কয়েক ডজন লোক খুন হওয়া দু'একজন কিডন্যাপড হওয়া খুব বড় ঘটনা নয়, এমন ঘটনা বহুদেশেই এখন ঘটছে।'

গাম্ভীর্যের একটা ছায়া নামল আহমদ মুসার চোখে। বলল, 'ঠিকই বলেছেন। কিন্তু ধরুন, ঐ নিহত লোকরা যদি একটা ধর্ম বিশ্বাসের হয়, কিডন্যাপপ লোকটিও যদি ঐ একই কম্যুনিটির হয়, তাহলে এর একটা ভিন্ন অর্থ হয় না?

বিস্ময় নামল ড্যানিশ দেবানন্দ ও সুষ্মিতা বালাজীর চোখে-মুখে। কথা বলে উঠল সুষ্মিতা বালাজীই প্রথম। বলল, 'তাম মানে নিহতরা সবাই মুসলামান।

'হ্যাঁ।' বলল আহমদ মুসা।

'তাহল দাঁড়াচ্ছে বিষয়টা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষজাত।' সুষ্মিমা বালাজী বলল।

'শংকরাচার্য শিরোমনির মত লোকরা যখন এর সাথে জড়িত, তখন বিষয়টা যে উৎকট সাম্প্রদায়িক হবে সেটা অবধারিত।' আহমদ মুসা উত্তর দেবার আগেই বলল ড্যানিশ দেবানন্দ।

'আপনি ঠিক বলেছে ভাই সাহেব। বিষয়টা শুধু উৎকট সাম্প্রদায়িক নয়, সাংঘাতিকভাবে পরিকল্পিতিও। আপনি যেটা বললেন, ওরা আন্দামানের সেলুলার জেলের ইতহাস থেকে মুসলমানদের নাম মুছে ফেলতে চায়। ঠিক এভাবেই ওরা আন্দামান থেকেও মুসলমানদের বিশেষ করে সক্রিয়-সচেতন মুসলমানদের অস্তিত্ব মুছে দিতে চায়। এটাই মুল বিষয়, কিন্তু এর সাথে কিছু অনুসঙ্গ আছে।' বলল আহমদ মুসা।

'সে অনুসঙ্গটা কি?' প্রশ্ন সুষ্মিতা বালাজীর।

'আমি জানি না। তবে আমাদের গঙ্গারাম ওদের হাতে বন্দী থাকার সময় শুনেছিল, একটা মহামুল্যবান বাক্স নাকি তারা উদ্ধারের চেষ্টা করছে বড় শয়তান মানে আহমদ শাহ্ আলমগীরের কাছে থেকে। এই বাক্স উদ্ধারের জন্যে তারা যা করার তাই করবে।' আহমদ মুসা বলল।

'একটা বাক্স কি করে এই ধরনের একটা ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে? নিশ্চয় তাহলে বাক্সটা বড় কিছুর একটা অংশ।' বলল সুষ্মিতা বালাজী।

'হবে হয়তো। আমি এ ব্যাপারে কিছুই শুনিনি।' আহমদ মুসা বলল।

সুষ্মিতা বালাজী কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঘরে প্রবেশ করল রান্নার এ্যাপ্রন পরা একটি মেয়ে। তাকে দেখে থেকে গেল সুষ্মিতা বালাজী। বলে উঠল মেয়েটিকে লক্ষ্য করে, 'জারওয়া, সব রেডি?'

জারওয়া আদিবাসি মেয়ে। বলল ভাঙা হিন্দিতে, 'সব তৈরি মাতাজী।'

'যাও নিয়ে এস।' নির্দেশ দিল সুষ্মিতা বালাজী।

মেয়েটি চলে গেল।

'বুঝতে পারলাম না মেয়েটি কোন আদিবাসি গ্রুপের?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'মিশ্র গ্রুপের। আমাদের এই উপত্যকা ও পাহাড়ে সেন্টেনেরিল ও জারওয়া গ্রুপের উপজাতিরা একসাথে এক সমজে বাস করে। বহুদিরে পারস্পরিক বৈবাহিতক সম্বন্ধের ফলে দু'গ্রুপের মিশ্রণে তৃতীয় একটি গ্রুপের সৃষ্টি হয়েছে।' বলল সুষ্মিতা বালাজী।

'কিন্তু এমন তো শুনিনি। আন্দামান-নিকোবরের চারটি প্রধান উপজাতি গ্রুপই আলাদাভাবে আলাদা অঞ্চলে বাস কের। এদের মধ্যে কোনই সামাজিক সম্পর্ক নেই।' আহমদ মুসা বলল।

'এটাই ঠিক ছোট ভাই। কিন্তু এখানকার ব্যাপারটা একটা ব্যতিক্রম। প্রাকৃতিক এক বিপর্যয় এভাবে এক করে দিয়েছে। অনেক বছর আগে ভয়াবহ এই সাইক্লোন উলট-পাঠল করে দিয়েছিল এই দ্বীপকে। পর্বতপ্রমাণ ঢেউ মানুষকে ভাসিয়ে নিয়েছিল এখান থেকে সেখানে। সেই ঢেউ ৫০ জন নারী, পুরুষ ও শিশুকে রেখে গিয়েছিল এই পাহাড়ে। এই পঞ্চশ জনের একটা অংশ সেন্টেনেলিস ও অপর অংশটা ছিল জারওয়া গ্রুপের। একসাথে মিলে-মিশেই এরা ঘর বাঁধে। এখন ওরা এক হয়ে গিয়েছে।' বলল সুষ্মিতা বালাজী।

সুষ্মিতা বালাজীর কথা শেষ হতেই ট্রলি ঠেলে নাস্তা নিয়ে প্রবেশ করল জারওয়া।

ট্রলিটা এসে দাঁড়াল আহমদ মুসার খাট ঘেঁসে। ট্রলিতে একটা বড় ট্রে। ট্রেতে একদম শহরে নাস্তা-ব্রেড রোল, বাটার কিউব, গরম সুপ ওফরের জুস। তার সাথে কফি-চিনি-দুধের পট এবং তিনটি কাপ।

‘ছোট ভাই, আপনার সংজ্ঞা ফেরার আগে আমাদের নাস্তা হয়ে গেছে। আপনি নাস্তা করে নিন, আমরা কফি খাচ্ছি।’ বলল ড্যানিশ দেবানন্দ আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে।’

‘ধন্যবাদ। সত্যি ক্ষুধার্ত আমি।’

বলে আহমদ মুসা ট্রলির কাছে সরে এল। নাস্তার উপর একবার চোখ বুলিয়ে বলল, ‘সুপটা কিসের? ভেজিটেবল?’

‘না, চিকেন সুপ।’ বলল সুস্মিতা বালাজী।

আহমদ মুসা সুপের বাটি সামে থেকে একটু পাশে সরিয়ে রেখে ব্রেড-বাটার খেতে শুরু করল।

ড্যানিশ দেবানন্দ ও সুস্মিতা বালাজী কাপে কফি ঢেলে নিয়ে খেতে শুরু করল।

‘এই গহীন জংগলে এমন টাটকা নাস্তা কি করে এল?’ আহমদ মুসা বলল।

‘গহীন জংগল হলেও এখান থেকে উত্তরে মায়াবন্দর এবং দক্ষিণে পাহলাগাঁও সমান দূরত্বে। আমাদের আদিবাসি লোকদের ঐ দুই শহরেই প্রতিনিদ যাতায়াত আছে। প্রতিদিনই সরবরাহ আনা হয় সেখান থেকে।’ বলল সুস্মিতা বালাজঅ।

‘তাহলে মায়াবন্দর কিংবা পাহলাগাঁওয়ে না থেকে এখানে কেন? শংকরাচার্য ও পুলিশের ভয়েই কি?’ আহমদ মুসা বলল।

‘এটাই প্রথম কারণ। আমরা চেয়েছি, ঐ কশাই-কাপালিক ও পুলিশের ছায়া থেকে দূরে থাকতে। দ্বিতীয় কারণ হলো, এই উপপত্যকা, পাহাড় এবং পাহাড়ীদের আমরা ভালবেসে ফেলে।ছ। এদের নিয়েই আমাদের জীবন। এটাই আমাদের পৃথিবী।’ বলল সুস্মিমা বালাজী।

আহমদ মুসা ব্রেড-বাটার-জুস খেয়ে কফির কাপ টেনে নিল।

‘সুপ যে থাকল ছোট ভাই। অনে রক্ত গেছে, আপনার জন্যে ওটা খুবই দরকার।’ সুস্মিতা বালাজী বলল।

এক টুকরো সলজ্জ হাসি ফুটে উঠল আহমদ মুসার ঠোঁটে। বলল, ‘স্যরি, মুরগির সুপ বলে খেতে পারছি না।’

‘মুরগি খান না?’ সুস্মিতা বালাজী বলল।

‘খাই। কিন্তু আমাদের ধর্মীয় বিধান অনুসারে আল্লাহর নাম নিয়ে যদি জবাই করা না হয়, তাহলে মরগি, খাসি, গরু ইত্যাদি কোন প্রাণীরই গোসত আমরা খেতে পারি না।’ বলল আহমদ মুসা।

বিস্ময় ফুটে উঠল সুস্মিতা বালাজী এবং ড্যানিশ দেবানন্দ দু’জনের চোখে-মুখেই। কয়েক মুহূর্ত তারা কিছু বলতে পারল না। পরে সুস্মিতা বালাজী বলল, ‘আল্লাহর নাম নেয়া নয় বলেই এসব কোন কিছুই আপনি খাবেন না? কিন্তু এই নাম নেয়া না নেয়ার মধ্যে কি এমন এসে যায়?’

‘আল্লাহর নাম না নেয়ার মধ্যে গোশতের গন্ধ, স্বাদ কিংবা ফিজিক্যাল কোন পার্থক্য হয়তো দৃশ্যমান নয়, কিন্তু সৃষ্টিগত দদি থেকে জীবনের সাথে এর সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর।’ আহমদ মুসা বলল।

‘সেটা কেমন?’ বলল ড্যানিশ দেবানন্দ।

‘এই বিশ্বজগতে যা আছে সকলেই আমরা আল্লাহর সৃষ্ট। সৃষ্টি হিসাবে গরু, ছাগল, ভেড়া, মানুষ, মুরগি সকলেই আমরা সমান। তাহলে আমরা গরু, ছাগল, মুরগি ইত্যাদিকে দেদার জবাই করে খাচ্ছি কেন, কোন অধিকারে? খাচ্ছি এই অধিকারে যে স্রষ্টা স্বয়ং এই অধিকার আমাদের দিয়েছেন। স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টি বলয়কে চলমান, অব্যাহত রাখার জন্যেই এক সৃষ্টিকে আরেক সৃষ্টির ভোগ্য বানিয়েছেন। মানুষ খাবে মুরগি, মরগি খাবে পোকাড়মাকল, পোকাড়মাকল বাচঁবে আবার অন্যকিছু খেয়ে। এইভাবে সৃষ্টির সবাই বাঁচবে, সষ্টি-জগৎ থাকবে চলমান। সুতরাং আমরা যে গরু খাচ্ছি, মরগি খাচ্ছি, খাসি খাচ্ছি, তা আমাদের শক্তির জোরে খাচ্ছি না, আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসারে খাচ্ছি। এই বিধানকে স্বীকৃতি দেয়া, স্মরণ করার জন্যেই ভোগ্য প্রাণীকে জবাই করতে আল্লাহত নাম নিতে হবে।’ বলল আহমদ মুসা।

সুস্মিতা বালাজী ও ড্যানিশ দেবানন্দ যে গোগ্রাসে গিলছিল আহমদ মুসার কথা। তাদের স্থির দৃষ্টি আহমদ মুসার মুখের উপর। আর বিস্ময়ে হা হয়ে

গেছে তাদের মুখ। আহমদ মুসা থামলেও তারা কথা বললো না। তাদের দৃষ্টি একইভাবে নিবদ্ধ থাকল আহমদ মুসার দিকে। তাদের শোনা যেন শেষ হয়নি। অথবা যেন হজম করছে আহমদ মুসার কথাগুলো।

আহমদ মুসা কফির কাপ তুলে নিয়ে একটু একটু চুমুক দিচ্ছিল গরম কফিতে।

নীরবতা ভাঙল সুস্মিতা বালাজী। বলল, 'ধন্যবাদ ছোট ভাই, আপনি অপরূপ এক সৃষ্টি-দর্শন সামনে নিয়ে এসেছেন। জীবন ধারণের জন্যে একে-অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত বা নির্ভরশীল সৃষ্টি বলয়ের কথা আমরাও জানি, কিন্তু এর সাথে স্রষ্টার ইচ্ছা বা বিধানকে যুক্ত করে একে যে অপরূপ করে তুললেন, সেটা বিস্ময়কর শুধু নয়, তা জীবনের এক নতুন অর্থ সামনে নিয়ে আসে।'

বলে একটা দম নিল সুস্মিতা বালাজী। একটু ভাবল। তাপর বলল, 'কিন্তু বলুন স্রষ্টার নাম নিয়ে তার বিধানকে স্বীকৃতি না দেয়া, বা স্বরণ না করার মধ্যে ক্ষতি বৃদ্ধি কি আছে? আইন বা সিষ্টেম হিসাবে কেন এ বিষয়টাকে অপরিহার্য করে নিতে হবে।'

'আল্লাহর এই ইচ্ছা ও বিধানকে স্বরণ করা বা স্বীকৃতি দেয়ার মধ্যে বড় লাভ হলো,পৃথিবীতে আমরা ভোগ দখলের ক্ষেত্রে আমার শক্তিকে আমি আমার ক্ষমতাকে বড় করে দেখছি না, নিয়ামক ভাবছি না বরং আল্লাহর দেয়া অধিকার হিসেবেই ভোগ দখল করছি। এই দৃষ্টিভঙ্গি মানুষ গ্রহণ করলে, জীবনের সবক্ষেত্রেই সে এই দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণ করবে। সবক্ষেত্রেই সে আল্লাহর ইচ্ছা ও বিধান তালাশ করবে। এই জীবন-দর্শন যখন কোন মানুষের অনুসরণীয় হয়ে যায়, তখন মানুষ কেন কোন পশু-পাখিও তার দ্বারা অহেতুক ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। আল্লাহর কোন ইচ্ছা বা আইনকে সে লংঘন করে না, কোন অন্যায়কে সে প্রশ্রয় দেয় না, কোন জুলুম অত্যাচারেও সে শামিল হয় না।' থামল আহমদ মুসা।

সুস্মিতা বালাজী ও ড্যানিশ দেবানন্দের চোখে-মুখে নতুন বিস্ময়-বিমুগ্ধতা। আহমদ মুসা থামতেই কথা বলে উঠল ড্যানিশ দেবানন্দ, 'ছোট ভাই সাহেব, তিল তো দেখি একেবারে তাল হয়ে গেল। শুরু হয়েছিল মুরগির গোশত খাওয়া না খাওয়া নিয়ে, কিন্তু আপনি পরিণত করলেন একটা জীবন-দর্শনে। আর

আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, কোন ধর্মীয় মঞ্চ থেকে ধর্মবেত্তা কোন দার্শনিক বক্তৃতা দিচ্ছে। যাক, এখন বলুন ঈশ্বরের ইচ্ছা ও বিধানকে স্মরণ করা বা স্বীকৃতি দিলে কোন আইন কেউ লংঘন করবে না, অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবে না, জুলুম-অত্যাচারে শামিল হবে না এমন লোক তৈরি হবে, এটা কি বাস্তব?'

'খুবই বাস্তব। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-তারা, গাছ-পালা, জীব-জন্তু সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছা ও বিধানকে নিখুঁতভাবে মেনে চলছে তাদের গোটা জীবনে। সকল অংগ-প্রত্যাংগসহ। মানুষের দেহও একইভাবে আল্লাহর বিধান মেনে চলে। মানুষ কিভাবে জীবন যাপন করবে, কি বলবে কি বলবে না, কি করবে কি করবে না, কি খাবে কি খাবে না, ইত্যাদি কর্মমূলক সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রেই শুধু মানুষকে স্বাধীনাতা দিয়েছেন আল্লাহ তায়ালা। এই স্বাধীনতা দেয়ার সাথে সাথে আল্লাহ মানুষকে বলে দিয়েছেন যে, তিনি জীবন-মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন এটা দেখার জন্যে যে মানুষ সৎকর্মশীল হয় কিনা।' সৎকর্মশীল হওয়ার অর্থ হলো, আল্লাহর ইচ্ছা ও বিধান অনুসারে কিংবা বিবেকের নির্দেশ অনুসারে চলা। এভাবে চলা সম্ভব, অবাস্তব নয়। শুধু প্রয়োজন জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন।

সুস্মিতা বালাজী মুখ খুলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই ড্যানিশ দেবানন্দ বলে উঠল, 'এই দৃষ্টিভংগির পরিবর্তনটা কি? ঈশ্বরের ইচ্ছা বিধানকে মেনে চলা?'

'এই মেনে চলাটা কাজ, দৃষ্টিভঙ্গির ফল। জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি হলো, জীবন জীবনের পরিণতি সম্পর্কে ধারণা।' এই ধারণা আজ বিভিন্ন রকম।' আহমদ মুসা বলল।

'যেমন, মানুষ কর্মফল অনুযায়ী পুনর্জন্ম হওয়া, দুনিয়ার জীবনই সব-এর আগেও কিছু না পরেও কিছু নেই, যিশু সকল পাপের দায় নিয়ে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন এবং সে কারণে যিশুর অনুসারীর স্বর্গ নিশ্চিত, ইত্যাদি দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলছেন তো ছোট ভাই?' ড্যানিশ দেবানন্দ বলল।

'হ্যাঁ। এই দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতেই জীবনের কাজ-কর্ম নির্ধারিত ও পরিচালিত হয়। দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক হলে জীবনের কাজ-কর্ম সঠিক হবে ও কল্যাণকর হবে সকলের জন্যেই।' বলল আহমদ মুসা।

‘ছোট ভাই, আপনি বলছেন দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক হলে জীবনের কাজকর্ম সঠিক হবে। তার মানে সব দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক নয়। তাহলে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি কিভাবে বাছাই হবে, কে বাছাই করবে?’ ড্যানিশ দেবানন্দ বলল ।

‘একটা প্রবাদ আছে, নিজের ভাল পাগলেও বুঝে। স্রষ্টার দেয়া মানুষের এটা একটা বিশেষ গুণ। আল্লাহর দেয়া এই বিশেষ গুণ বা শক্তির নাম বিবেক। মানুষের এই বিবেকই বলে দেয় কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ, কোনটা কল্যাণকর, আর কোনটা অকল্যাণের। মানুষের বিবেকের এই শক্তিই বলে দিতে পারে, জীবনের কোন দৃষ্টিভঙ্গিটি তার জন্যে ভাল, কল্যাণকর।’ বলল আহমদ মুসা।

‘বুঝলাম ছোট ভাই, কিন্তু কল্যাণকর বা করণীয় হিসাবে আপনি ‘স্রষ্টার ইচ্ছা বা বিধান’ এবং ‘বিবেকের বাছাই’ দুই দিকেরই উল্লেখ করেছেন। অথচ সত্য ও কল্যাণ একটাই হবে, একদিকেই থাকবে, এর দুই রূপ হতে পারে না।’ ড্যানিশ দেবানন্দ বলল।

‘ঠিক বলেছেন। কিন্তু স্রষ্টার ইচ্ছা ও বিধান’ এবং ‘বিবেক’ দুই জিনিস নয়। বিবেক স্রষ্টার দেয়া। এর বাছাই আল্লাহর ‘ইচ্ছা ও বিধানের’ পরিপন্থী হয় না। শুধু মাধ্যম হিসাবে আলাদা। আল্লাহর সৃষ্ট ভাল-মন্দ বাছাইয়ের একটা স্থায়ী ব্যবস্থা।’ বলল আহমদ মুসা।

‘নবী-রসূল মানে ডিভাইন মেসেঞ্জারদের কথা বলছেন, ধর্মের কথা বলছেন। ডিভাইন মেসেঞ্জারদের মাধ্যমে ধর্মের আকারে স্রষ্টার ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আইন-বিধান আসছে, বিবেকের আবার প্রয়োজন কি?’ ড্যানিশ দেবানন্দ বলল।

‘দু’য়ের উদাহরণ অনেকটা অর্জিত শিক্ষা ও কমনসেন্সের মত। শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জিত হয়, কিন্তু অশিক্ষিতের একটা কমনসেন্স থাকে, যা দিয়ে সে ভালো-মন্দের বাছ-বিছার করে জীবন পরিচালনা করতে পারে। নবী-রসুলরা আল্লাহর তরফ থেকে মানুষের জন্যে জীবন-যাপন প্রাণালী বা জীবন পদ্ধতি নিয়ে আসেন। মানুষ তাদের কাছে থেকে শিক্ষা লাভ করে সৎ, সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারে। কিন্তু যারা নবী-রসূলদের সাক্ষাত পায়নি কিংবা তাদের শিক্ষা লঅভের সুযোগ হয়নি, তাদের ভাল থাকার, ভাল করার উপায় হিসাবেই ভালকে ভাল, মন্দকে মন্দ মনে করার কমনসেন্স বিবেককে বিধিবদ্ধভাবেই নেয়া হয়েছে,

যাতে করে আল্লাহ ‘জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন এটা দেখার জন্যে যে মানুষ সত্যিই কর্মশীল হয় কি না’- এই পরীক্ষা সবার ক্ষেত্রে হয়ে যায়।’ থামল আহমদ মুসা।

গভীর ভাবনার ছায়া ড্যানিশ দেবানন্দ ও সুষ্মিতা বালাজীর চোখে-মুখে। সঙ্গে সঙ্গে ওরা কথা বলল না।

ওরা তাকিয়ে আছে আহমদ মুসার দিকে।

নীবরতা ভাঙল ড্যানিশ দেবানন্দই। বলল, ‘ছোট ভাই, এই কয়েক মিনেটে আপনার কাছ থেকে যা শিখলাম, কয়েক দিন, কয়েক মান আপনার সাথে পেলে জীবন সম্পর্কে সত্যিই পণ্ডিত হয়ে যাব। কিন্তু বলুন ভাই, জানতাম আপনি জগৎ কাঁপানো একজন বিপ্লবী, বন্দুক-গোলা-বারুদ আপনার সাথী, সংঘাত-সংঘর্ষ আপনার প্রতিদিনের রুটিন কাজম সেই আপনাকে দেখছি ধর্মবেত্তা এক পরম ভাববাদী রূপে। আল্লাহর নাম না নিয়ে জবাই করলে আপনি সে মুরগি খান না। মানে আপনার ধর্মের প্রতিটি আদেশ নিষেধ আপনি সিরিয়াসলি মেনে চলেন। তা মানে আপনি একটা ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেচেন নিজেকে, আর আপনার বৃহত্তর মানুষ পরিচয়কে পরিত্যাগ করেছেন। আপনার মত বিপ্লবী এটা কিভাবে পারলেন?’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘মানুষ একটা প্রজাতির নাম, বলা যায় পশু প্রজাতির অংশ। নিছক এই প্রজাতি হিসাবে মানুষের রূপ-রস-গন্ধ কিছুই নেই, মানুষ প্রকৃত পক্ষে এই অবস্থায় মানুষ হয় না। মানুষকে মানুষ হবার জন্যে তার পশু-প্রবৃত্তির উপর তার মানবিক যুক্তিবাদিতাকে প্রভাবশীল করে জীবনকে তার পরিচালনায় একে নিয়ন্ত্রকের আসতে বসাতে হবে। এই মানবিক যুক্তিবাদিতা কতকগুলো নিয়ত-নীতি-মূল্যবোধের নাম, কতকগুলো আদেশ-নিষেধ ও বিধি-ব্যবস্থার নাম। এইগুলো মানুষ লাভ করে নবী-রসুলদের মাধ্যমে আসা বিশ্ব-চরাচরের স্রষ্টা আল্লাহর ইচ্ছা ও বিধান থেকে। মানুষ যখন মানুষ হবার জন্যে এই মানবিক যুক্তিবাদিতা বা মানবিক জীবন বিধান গ্রহণ করে তখন তার আরও একটি নাম হয়ে যায়। আমি এ ধরনের একটা নাম গ্রহণ করছি। এর দ্বারা আমি

মানুষ পরিচয়কে পরিত্যাগ করিনি, বরং আমার পশু প্রবৃত্তিকে হটিয়ে সেখানে মানবিক যুক্তিবাদিতাকে বসিয়ে আমার মানুষ পরিচয়কে পূর্ণ করেছি।'

ড্যানিশ দেবানন্দ ও সুস্মিতা বালাজীর দু'জনের চেহারাতেই বিস্ময়-বিমুগ্ধতা। আহমদ মুসা থামলে এবার কথা বলে উঠল সুস্মিতা বালাজী। বলল, 'চমৎকার ছোট ভাই, চমৎকার উত্তর দিয়েছেন। ভেবেছিলাম এবার আপনি আটকা পড়বেন। এই মোক্ষম প্রশ্নটার কোন জবাব নেই বলেই জানতাম। এমন অকাট্য পশ্নের কোন যৌক্তিক জবাবই হতে পারে না। কিন্তু এখন আপনার উত্তর শুনে মনে হচ্ছে প্রশ্নের চেয়ে লক্ষ গুণ বেশি যৌক্তিক ও সংগত আপনার জবাব। আপনার কথা শতভাগ সত্য। শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কার-সামাজিকতার স্পর্শহীন আবহমান বনচারী একজন মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্কথ্য খুবই কম। কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষা-মূল্যবোধ তাকে সত্যিকার মানুষ করে তোলে এবং তখন তার মানুণ নাম ছাপিয়ে তার নতুন পরিচয় জ্ঞাপক নাম মূখ্য হয়ে ওঠে। যেনম ভারতীয়, আমেরিকান।'

'না, হলো না আপা।' আহমদ মুসা বলল।

'কি হলো না বলছেন?'

'উদাহরণটা ঠিক হয়নি। ভারতীয়, ইন্ডিয়ান এসব রাজনৈতেক পরিচয় জ্ঞাপক নাম। রাজনৈতিক পরিচয়ের পার্থক্যে কিন্তু মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের পার্থক্য ঘটে না। যেমন একজন জার্মান ও একজন ফরাসির মধ্যে মূল্যবোধ ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিগত কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু একজন জার্মান ও একজন তুর্কির মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিরাজমান। একজন জার্মান ও একজন ফরসীর মধ্যে পার্থক্য না থাকার কারণ তারা উভয়েই ক্যাথলিক খৃষ্টান, আর একজন তুর্কি ও একজন জার্মানের মধ্যেমার পার্থক্যের কারণ জার্মানীরা ক্যাথলিক তুর্কিরা ইসলামী ধর্মমতে বিশ্বাসী। আর একটা কথা, দু'জার্মানের মধ্যে বিরাট পার্থক্য হতে পারে যদি দু'জার্মান দু'ধর্মমতে বিশ্বাসী হয়।' আহমদ মুসা বলল।

'তার মানে দৃষ্টিভঙ্গি বা মূল্যবোধগত পার্থক্যের নিয়াকম হলো 'ধর্ম?' বলল সুস্মিতা বালাজী।

‘ঠিক ধরেছেন আপা।’

‘তাহলে কথা দাঁড়াচ্ছে, ধর্মবোধই ‘পশু-মানুষ’কে মানবিক ‘মানুষে পরিণত করে, তাই কি? নিশ্চয় আপনার উত্তর ‘হ্যাঁ’ হবে। কিন্তু একটা ছোট্ট প্রশ্ন থেকে যায়, মানুষের সহজান ‘বিবেক’ বা কমনসেন্স কি মানুষকে মানুষ বানাতে পারে না? আপনিই তো বিবেককে ঈশ্বরের দেয়া ভাল-মন্দ বাছাইয়ের একটা শক্তি বলেছেন।’ ড্যানিশ দেবানন্দ বলল।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘হ্যাঁ নিছক বিবেক বা কমনসেন্স যদি পশু মানুষকে ‘মানবিক মানুষ’ বানাতে পারত, তাহলে ঈশ্বর বা আল্লাহ এবং তার নবী-রসূলেদের আর দরকার হতো না, সহজেই দর্মনিরপেক্ষা হওয়া যেতো। কিন্তু তা সম্ভব নয় ভাই সাহেব। বিবেক বা কমনসেন্সের কাজ বিরাট, কিন্তু তার কাজের ক্ষেত্র খুবই সীমিত। বিবেক তার স্বভাব-প্রকৃতির মাধ্যমে ভালকে ভাল বলে, খারাপকে খারাপ বলে, এমনকি আল্লাহর প্রয়োজন অনুভব করে কোন কিছুকে ঈশ্বর বানিয়ে নিতে পারে, কিন্তু মানব জীবনের জন্যে মানিবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধভিত্তিক একটা সিস্টেম বা সংবিধান দাঁড় কারাতে পারে না। নবী-রসূলদের অভাবে জংগলবাসী মানুষের বিবেক যেমন একটা পারেনি, নবী-রসূলদের অস্বীকার করে নগরবাসী সভ্য মানুষ কার্লমার্কস, এঞ্জেলস ও মাওসেতুং-এর বিবেকও তেমনি তা পারেনি। এ সিষ্টেম বা ধর্ম আসে শুধুমাত্র আল্লাহর কাছ থেকে নবী-রসূলদের মাধ্যমে।

সুষ্মিতা বালাজীদের চোখে মুগ্ধ দৃষ্টি এবং মুখে ফুটে উঠেছে উজ্জ্বল হাসি।

‘সমস্যার সাংঘাতকি একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন ছোট ভাই। আপনার দৃষ্টান্তও চমৎকার। আপনার যুক্তি মেনে নিচ্ছি। কিন্তু বলুন তো, আপনার ব্যস্ত জীবনে এসব জটিল বিষয়ে চিন্তা করেন কেন, সময়ই বা কখন পান?’

‘যে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি বা মূল্যবোধকে আমার জীবন-পথের সিস্টেম বা ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছি, আমার কাজ সে ধর্মেরই অংশ। সুতরাং আমার এই চিন্তা আমার কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ধন্যবাদ ছোট ভাই। এই জবাব আপনি দেবেন তা আগেই বুঝেছি। বুঝতে পারছি আপনি খুবই মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তিবাদী মানুষ। আপনি আপনার ‘ধর্ম’ ইসলামকে আপনার জন্যে বাছাই করেচেন, না উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন বলে গ্রহণ করেছেন?’ জিজ্ঞাসা সুষ্মিতা বালাজীল।

‘আমি জন্মসূত্রে ইসলাম পেয়েছি। আমার আজকের বাছাইতেও ইসলাম একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আপনার এই বাছাই পক্ষপাতদৃষ্ট হওয়াই তো স্বাভাবিক।’ বলল সুষ্মিতা বালাজী। তার মুখে হাসি।

‘বাছাই সম্পর্কে এ প্রশ্ন তোলা স্বাভাবিক। কিন্তু আমার বাছাইটা ‘সত্য’ সন্ধানের জন্যে হলে, তাতে তখন পক্ষপাতের প্রশ্ন আসে না। এমনিভাবে প্রত্যেককেই সত্যকে যাচাই-বাছাই করে বের করে আনতে হবে। সত্য সব সময় একটাই হয়। সুতরাং সত্য সন্ধান যদি লক্ষ্য হয়, তাহলে সবাই আমরা এক সময় এক জায়গায় এসে দাঁড়াব।

সুষ্মিতা বালাজী মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য টেনে চোখ দু’টি বড় করে তাকাল ড্যানিশ দেবানন্দের দিকে। বলল, ‘শুনেছ ছোট ভাই কি ইঙ্গিত দিয়েছেন, বুঝেছ?’

‘বুঝব না কেন? সত্য যেহেতু একটাই, এখন তার ধর্ম যদি সত্য হয় তাহলে এক জায়গায় গিয়ে না দাঁড়িয়ে উপায় কি!’ বলল ড্যানিশ দেবানন্দ। তার মুখেও কৃত্রিম গাম্ভীর্য।

সুষ্মিতা বালাজী মুখ ঘুরাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘আপনার ধর্মকেই একমাত্র সত্য ধর্ম মনে করেন?’

‘না করলে আমি গ্রহণ করেছি কেন?’

‘তাতো ঠিক।’ বলল সুষ্মিতা বালাজী। একটু থামল। থেমেই আবার বলে উঠল, ‘সত্য বললেই তো হলো না। সবাই তার ধর্ম সত্য বলবে। সত্য যাচাইয়ের একটা মাপকাঠি তো থাকতে হবে। সেটা কি?’ সুষ্মিতা প্রশ্ন করল আহমদ মুসাকে।

'মানব জীবনের প্রকৃতি ও প্রয়োজনের বিচারে মানুষের জন্যে এমন একটি ধর্ম বা জীবন পদ্ধতি দরকার। যা হবেঃ

ক. মানুষের সমগ্র জীবন পরিচালনার একটা সামগ্রিক ব্যবস্থা।

খ. মানুসের প্রকৃতি ও প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যশীল সার্বিক শান্তি ও কল্যাণের ব্যবস্থা।

এখন এক এক ধর্মকে সামনে নিয়ে দেখুন, কোন ধর্ম উপরের দুটি শর্ত পুরণ করতে পারে।' আহমদ মুসা বলল্

'ছোট ভাই, খুঁজে এ শর্ত দুটি কোত্থেকে বের করলেন? আপনার দ্বিতীয় জটিল শর্ত পূরণ তো পূরের কথা, প্রথম শর্তই আমার জানা কোন ধর্ম পূরণ করতে পারে না। যেমন আমাদের হিন্দু ধর্ম। আমাদের ধর্মে পূজা-পার্বনের কিছু নীতি-নিয়ম, ব্রাক্ষ্মণ-দেবতার কিছু ফাংশন ছাড়া মানুষের জন্যে মান্য বা করণীয় কিছুই সেখানে নেই। খৃষ্ট ধর্মে ৭দিনে ১দিন গীর্জায় যাওয়া ছাড়া মানব জীবন পরিচালনায় কোন নীতি ও বিধান নেই। বৌদ্ধ ধর্মতো জীবন বিমুখ ও নির্বাণে বিশ্বাসী। ইহুদী ধর্ম তো বণী ইসরাইল ছাড়া আর কারও পালনীয় নয়, আর এখানেও জীবন পরিচালনার সার্বিক বিধান অনুপস্থিত। শুধু ইসলামকেই সক্রিয় ও কর্মের ধর্ম বলে মনে হয়। আমি বিস্তারিত জানি না। আপনিই বলতে পারেন আপনার এই ধর্ম ঐ শর্ত দু'টি পালন করে কিনা।' বলল ড্যানিশ দেবানন্দ।

আহমদ মুসা মুখ খোলার আগেই সুষ্মিতা বালাজী দ্রুতকণ্ঠে বলে উঠল, 'ড্যানি, তুমি তো ছোট ভাইয়ের ধর্মকে 'ওয়াক ওভার' দিয়ে দিলে। আর বাকি থাকল কি?'

আহমদ মুসা কফির কাপ ট্রেতে রেখে হাসি মুখে বলল, 'তাহলে আমি আর নিজের ঢোল নিজে বাজাব না। আপনারাই বরং আরও অনুসন্ধান করুন, জানুন।'

'আপনাকে আর ঢোল পেটাতে হবে না। ড্যানি যেটুকু পিটিয়েছে তাই যথেষ্ট। বাকির জন্য ওয়েব সাইট আছে। অনেক বলেছেন, আর কথা নয়। রেষ্ট নিন।'

বলে সুস্মিতা বালাজী ট্রেতে সব কাপ, বাটি সাজাল। তারপর বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, 'আপনার মুরগি ও অন্যান্য গোশত খাওয়া দরকার। এখন কি করলে খেতে পারবেন তাই বলুন।'

'আপনারা আল্লাহর নাম নিয়ে জবাই করুন। গরু-খাসি যারা জবাই করে, তাদের আল্লাহর নাম নিয়ে জবাই করতে বলুন।'

'কি বলতে হবে লিখে দিন। মুরগি আমরাই জবাই করব। গরু-খাসির ব্যবস্থাও করব।'

বলে কাগজ-কলম এগিয়ে দিল আহমদ মুসাকে সুস্মিতা বালাজী।

'একটা কাগজে আহমদ মুসা লিখল, 'বিসমিল্লাহে আল্লাহু আকবর'। বলল, 'এই বাক্যটি বাই-এর সময় তিনবার বলতে হবে।

'বাক্যটির অর্থ বলুন।' বলল সুস্মিতা বালাজী।

'অর্থ হলো, 'আল্লাহর নামে মুরু করছি। আল্লাহ সর্ব শ্রেষ্ঠ।'

হাসল সুস্মিতা বালাজী। বলল, 'তাহেল আল্লাহকে তো স্বীকৃতি দিয়েই দিলাম। মুসলমান হয়ে যাবো না তো আবার এই কথা বললে?'

'অবশ্যই। কিন্তু ক্ষতি নেই। তুমিও ওয়াকওয়ার দিয়ে যাও।' টিপ্পনি কাটল ড্যানিশ দেবানন্দ।

'না, অতটুকুতে কেউ মুসলমান হয় না। অতএব ভয় নেই।' আহমদ মুসা বলল।

'ড্যানি, তুমি না জেনে ওয়াকওভার দিয়েছ। আমি তা করব না। দেখি ওয়েব সাইটে আজ থেকেই পড়াশুনা শুরু করব।'

বলে 'ট্রে' নিয় উঠে দাঁড়াল সুস্মিতা বালাজী। বলল আহমদ মুসাকে, 'ভাই এখন শুয়ে পড়ুন। কাল সকল থেকে একটু করে হাঁটতে পারেন, আজ নয়।'

চলা শুরু করে ড্যানিশ দেবানন্দকে লক্ষ্য করে বলল, 'ড্যনি তুমি বাড়িতে থাক। আমি রোগীটাকে দেখে আসি।'

'তাহলে তুমি খোঁজ নিয়ে এস ঐ এলাকার কোন নতুন লোক দেখা গেছে কিনা। নিশ্চয় ওরা আসবে। লোকেরা যেন চোখ রাখে।

'ঠিক আছে।'

বলে নাস্তার ট্রে নিয়ে ভেতরে চলে গেল সুস্মিতা বালাজী।

'ঠিক বলেছেন ভাই সাহেব, ওরা না এসে পারে না।'

'চিন্তা নেই। ঐ এলাকায় আমাদের লোকেরা চোখ রাখছে?'

বলে উঠে দাঁড়াল ড্যানিশ দেবানন্দ। বলল, 'ছোট ভাই আপনি শুয়ে পড়ুন। দেখি সুস্মি বেরুল কিনা। আর একটা কথা বলতে হবে তাকে।'

ড্যানিশ দেবানন্দ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আহমদ মুসা না শুয়ে কম্পিউটারের দিকে ঘুরে বসল। তার ডান হাতটা এগুলো কম্পিউটারের 'কী' বোর্ডের দিকে।

# ৪

সুস্মিতা বালাজীদের বাড়ির বাইরে সুন্দর বাগান।

বাগানে বসার জন্য বাঁশের তৈরি ছোট ছোট মাচা অনেক গুলো।

তারই একটি মাচায় বসে আহমদ মুসা।

তার সামনে একটা মাচায় পাশা-পাশি বসে সুস্মিতা বালাজী ও ড্যানিশ দেবানন্দ।

তাদের চারদিকে উপত্যকা, পাহাড় ও সাগরের অপরুপ দৃশ্য।

বিশাল উপত্যকাটা উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ দিক থেকে পাহাড় ঘেরা। আর পশ্চিমে দেখা যাচ্ছে সুনীল সাগর। মাঝখানের গঠন অদ্ভুত সুন্দর। পাহাড়ের প্রান্ত ঘেঁসে পাহাড় ও উপত্যকার মাঝ দিয়ে তিন দিক জুড়ে প্রলম্বিত খাল আকারে গভীর খাদ। মাঝখানে উচ্ছ সমভূমি। সমভূমির তিন দিক ঘেরা গভীর খাল। বছরের অধিকাংশ সময়ই এটি পানিতে ভর্তি থাকে। পাহাড় ও উঁচু সমভূতি থেকে বৃষ্টির গড়ানো পানি খালের পানির উৎস। মাঝখানের উঁচু সমভূমি কয়েক বর্গমাইল আয়তনের হবে। সমভূমিটির প্রতিটি ইঞ্চি জমি জুড়ে উঠেছে বাগান ও শস্যক্ষেত। যখন বৃষ্টি কম থাকে, তখন তিন দিকের খাল থেকে সমভূমির ক্ষেতে পানি সেচ চলে। সুখী এই উপত্যকার মানুষ।

এই উচ্চভূমি উপত্যকার মাঝখানে এক টিলার উপর ড্যানিশ দেবানন্দের বাড়ি।

বাড়িটি উপত্যকাটির মধ্যমণি। আদিবাসীরা ড্যানিশ দেবানন্দ ও সুস্মিতা বালাজীকে যেন মূর্তিমান ভগবান হিসেবে গ্রহণ করেছে। তাদের গোটা জীবন পাল্টে গেছে। তারা মাছ আর পশু শিকার করে জীবন যাপন করতো। তারা এখন আধুনিক চাষাবাদ শিখেছে, অনেক ধরনের কুটির শিল্পের মালিক। তাদের কেউ বিনা চিকিৎসায় মারা যায় না। আন্দামানের আদিবাসীদের সংক্যা অব্যাহতভাবে কমে যাওয়া তাদের ভাগ্যে লিখা। কিন্তু গত বিশ বছরে এই উপত্যকার

আদিবাসীদের সংখ্যা অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষার জন্যে তাদের স্কুল হয়েছে।

ড্যানিশ দেবানন্দদের বাড়ি থেকে গোটা উপত্যকা নজরে আসে। নীল আকাশের নিচে নীল সাগরের সফেদ ঢেউয়ের মিষ্টি শব্দে শিহরিত সবুজ পাহাড় ঘেরা সবুজ উপত্যকার শান্ত-সুন্দর দৃশ্য কয়েকদিনে আহমদ মুসার সব ক্লান্তি, ব্যাথা, বেদনা মুছে দিয়েছে। সম্পূর্ণ সুস্থতা অনুভব করছে আহমদ মুসা।

মাচায় বসা আহমদ মুসা, ড্যানিশ দেবানন্দ ও সুস্মিতা বালাজীর মধ্যে কথা চলছিল।

কয়েকদিন থেকেই আহমদ মুসা ওদের কাছ থেকে জংগল জীবনের কাহিনী শুনছে।

আজ কথা শুরু হলেই সুস্মিতা বালাজী বলে ওঠে, 'আমাদের কথা শেষ, এবার আপনার কথা শুরু।'

'আমার কাহিনী তো ইন্টারনেটে দেখেছেন আপনারা। আমি যা বলব সবই তো ওখানে আছে।' উত্তরে বলল আহমদ মুসা।

'না ওখানে কিছু ঘটনার কথা আছে, আপনার জীবনের কথা নেই। আমরা আপনাকে জানতে চাই।' বলল সুস্মিতা বালাজী । বলে সুস্মিতা বালাজী ও ড্যানিশ দেবানন্দ প্রশ্নের পর প্রশ্ন শুরু করেছিল।

দীর্ঘক্ষণ ধরে চলেছিল এই আলোচনা। মুখে হাসি নিয়ে সুস্মিতা বালাজী তার প্রশ্ন শুরু করেছিল। কিন্তু উত্তর শুনতে শুনতে বেদনা-ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল সুস্মিতা বালাজী এবং ড্যানিশ দেবানন্দ দু'জনেই। এক সময় সুস্মিতা বালাজী আহমদ মুসাকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'ছোট ভাই, আপনি স্মৃতির এত দুর্বহ ভার বয়ে বেড়ান।' কণ্ঠ ভারী হয়ে উঠেছিল সুস্মিতা বালাজীর।

প্রশ্ন শুনে ম্লান হেসেছিল আহমদ মুসা। বলেছিল, 'সামনে তাকিয়ে আমি পথ চলি, পেছন ফিরে তাকাই না। তাই মনেও পড়ে না কিছু, তার ফলে কোন ভারও বইতে হয় না।'

সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠল সুস্মিতা বালাজী, 'দেখুন, আমি ডাক্তার। আমাকে সাইকোলজীও পড়তে হয়েছে। মানুষের পথ চলা এবং তার জীবন এক জিনিস

নয়। স্মৃতিকে সামনে আনার জন্যে পেছন ফিরে তাকাতে হয় না। এমনকি এ ব্যাপারে কোন ইচ্ছা বা সিদ্ধান্তেরও প্রয়োজন পড়ে না। অজান্তেই স্মৃতি সামনে এসে যায়। আর আজ আপনি যত কথা বলেছেন, তা আপনি সিদ্ধান্ত নিয়ে বলেননি কিংবা নিছক আমাদের প্রশ্নের উপলক্ষে আসেনি। আপনি নিশ্চয় উপলব্ধি করেছেন, আপনি যেন কথা বলছেন না, স্মৃতিগুলো যেন নিজেই কথা বলে যাচ্ছে অনর্গল।

আহমদ মুসার মুখ নিচু হয়ে গিয়েছিল। একটু দেরিতেই মুখ তুলল। গম্ভীর তার মুখ। বলল, 'সত্যিই আপা, আপনাদের এই অপরূপ উপত্যাকার এই সুন্দর মুহূর্ত আমাকে তাজিক সীমান্তে দুর্গম পাহাড়ের এমনি আর এক উপত্যকায় নিয়ে গিয়েছিল। সেটা ফাতেমা ফারহানাদের গ্রাম। আমি হঠাৎ বর্তমানকে হারিয়ে ফেলেছিলাম, অততে হয়ে উঠেছিল বর্তমান। স্মৃতিটাই যেন আমার জীবন হয়ে উঠেছিল।' ভারী কণ্ঠ আহমদ মুসার।

'অতীত হঠাৎ বর্তমান হয়ে উঠেছিল তা আসলে নয়, বর্তমানের সাথে অতীত সব সময় আপনার স্মৃতিতে হাজির আছে। স্মৃতি বর্তমানেরই একটা অংশ। আপনি এবার যখন ভাবি জোসেফাইন ও আহমদ আব্দুল্লাহকে নিয়ে তাতিয়ানার কবর জিয়ারতে গিয়েছিলেন, কিংবা মেইলিগুলির কবরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে দোয়া করেছিলেন, তখন আপনার সামনে ফাতিমা ফারহানাদের কবর ভেসে ওঠেনি? উঠেছিল। এভাবেই অতীত বর্তমানের সাথে জড়াজড়ি করে বাস করে। আপনি পেছনে ফিরে তাকাতে চান না- আপনি স্মৃতিকে ভয় করেন বলে নয়, স্মৃতি আপনার অতি প্রিয় বলেই। কিন্তু আপনি এই বিষয়টাই চেপে রাখতে চান। আসলে প্রকৃতিগতভাবেই আপনি অত্যন্ত কোমল মানের মানুষ।' থামল সুস্মিতা বালাজী।

আহমদ মুসা আনমনা হয়ে পড়েছিল। চেয়ারে এলিয়ে পড়েছিল তার দেহ।

সুস্মিতা বালাজী বুঝতে পেরেছিল আহমদ মুসা অতীত থেকে ফিরে আসতে পারেনি। সুস্মিতা বালাজী এখানে এসে তাদের দীর্ঘ আলোচনার ইতি টানতে চাইল। প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্যে বলে উঠল, 'বলেছিলেন না মোবাইল কাথাও টেলিফোন করবেন?'

‘হ্যাঁ, ঠিক আমাকেও তো বলেছিলেন। খুব জরুরি নাকি টেলিফোন!’ বলল ড্যানিশ দেবানন্দ।

সম্বিত ফিরে পাওয়ার মত চকিতে মুখ তুলল আহমদ মুসা। বলল, ‘ঠিক ভাই সাহেব, জরুরি টেলিফোন। গত কয়েকদিনে কয়েকবার টেলিফোন করেছি, পাইনি।’

সুষ্মিতা বালাজী পকেট থেকে মোবাইল বের করে এগিয়ে দিল আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘সেটটা আপনি রেখে দিন। আমি আরেকটা যোগাড় করেছি।’

‘ধন্যবাদ’ বলে আহমদ মুসা মোবাইলটি হাতে নিল।

সঙ্গে সঙ্গেই টিপল নির্দিষ্ট নাম্বারগুলো।

কানে তুলে ধরল মোবাইল।

নাম্বারটিতে রিং হচ্ছে।

ওপারের উত্তরের অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে উঠেছে আহমদ মুসা।

ওপার থকে ‘হ্যালো’ শব্দ ভেসে এল। নারী কণ্ঠের।

আনন্দে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আহমদ সমুসার। বলল দ্রুত কণ্ঠে, ‘সুষমা রাও বলছ?’

‘ভাইয়া? আপনি? আপনার কোন খবর নেই কেন? কোথায় আপনি? এদিকে সর্বনাশ হয়ে গেছে।’ কান্নায় জড়িয়ে গেল সুষমা রাওয়ের কণ্ঠ।

‘কি হয়েছে সুষমা?’ কাঁদছ কেন? বল কি হয়েছে?’ উদ্বিগ্ন কণ্ঠ আহমদ মুসার।

‘সর্বনাশ হয়ে গেছে ভাইয়া। গত রাতে শাহ্ বানুদের কে বা কারা কিডন্যাপ করেছে।’ কাঁদতে কাঁদতে বলল সুষমা রাও।

‘কি বলছ সুষমা, কিডন্যাপ করেছে? কিভাবে? সংরক্ষিত গভর্নর ভবনে বাইরেরে কেউ ঢুকবে কি করে?’

‘ভাইয়া, চারজন প্রহরীকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পাওয়া গেছে।’ কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল সুষমা রাও।

‘কিন্তু রাতের বেলা তো তোমাদের বাড়ি থেকে মেইন রোড পর্যন্ত সড়কটায় গভর্নর হাউজের ষ্টিকার বিহীন ও পুলিশের গাড়ি ছাড়া অন্যসব গাড়ির চলাচল বন্ধ থাকে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমি কিছু জানি না ভাইয়া। আপনি আসুন।’ বলল সুষমা রাও।

‘তোমার আব্বা কি বলছেন? পুলিশ কি করছে?’ আহমদ মুসা বলল। কুঞ্চিত আহমদ মুসার কপাল। চোখে-মুখে উদ্বেগের ছায়া।

‘বাবা বলেছেন, পুলিশ খুঁজে বের করবে। পুলিশ চারদিকে খোঁজ করছে। কিন্তু পুলিশ কিচুই করতে পারবে না, করবেও না, এসব আপনি জানেন ভাইয়া। আপনি আসুন। আপনি কেন ক’দিন খোঁজ খবর নেননি? কেন আপনার মোবাইল বন্ধ?’

‘আমি পোর্ট ব্লেয়ার থেকে অনেক দূরে। মোবাইল আমার কাছে নেই। আমি আসছি সুষমা। তুমি ভেব না। সব ঠিক হয়ে যাবে। বাই।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আপনি আসুন ভাইয়া। বাই। সালাম।’

ওপার থেকে মোবাইল বন্ধ হয়ে গেল।

আহমদ মুসা মোবাইল বন্ধ করতেই সুষ্মিতা বালাজী ও ড্যানিশ দেবানন্দ একসাথে বলে উঠল, কি ঘটেছে, কে কিডন্যাপ হয়েছে?’

‘আমি আপনাদের বলেছিলাম, আহমদ শাহ্ আলমগীরের বোন শাহ্ বানু এবং তাদের মা সাহারা বানুকে এক নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে এসেছিলাম। সেখান থেকে ওরা কিডন্যাপ হয়েছে।’

‘সুষ্মিতা বালাজী ও ড্যানিশ দেবানন্দের চোখ-মুখ উদ্বেগের অন্ধকারে ছেয়ে গেল। কোন কথা তাদের মুখে যোগাল না।

আহমদ মুসা ভাবছিল। একটু পর মুখ তুলল। বলল সুষ্মিতা বালাজীকে লক্ষ্য করে, ‘আপা আপনার মামা বিবিমাধন সুষমার প্রেমিক আহমদ আলমগীরকে বন্দী করে রাখতে পারলে তা মা বোনকে কি কেউ মেয়ের আশ্রয় থেকে অপহরণ করতে পারে না।?’

সুস্মিতা বালাজী বিষণ্নতায় ডুবে গেল। সাথে সাথে উবে গেল তা মুখ থেকে সেউ উচ্ছ্বল আনন্দ। সে ধীরে ধীরে বলতে শুরু কলল, 'আপনার এ প্রশ্নের জবাব আমার জীবনেই আছে। কিছুই অসাধ্য তাদের নেই।'

'আমি শুনতে পারি সে কাহিনী।' বলল আহমদ মুসা।

ম্লান হাসল সুস্মিতা বালাজী। বলল, 'আমি মহারাষ্ট্রের বালাজী পরিবারের ব্রাক্ষ্মণ কন্যা। বিয়ে করি পার্সি ছেলেকে। যদিও সে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে, তাতে কোন ফল হয় না। আমার গোটা পরিবার আমাদের পরিত্যাগ করে। মামারাই ক্ষুব্ধ হন বেশি। বোম্বাই-এ মামা থাকতেন। তাঁর বাড়িতে থেকেই লেখা-পড়া করতাম। সুষমার এক বছর বয়স পর্যন্ত একসাথে ছিলাম। তারপেরেই আমি বিয়ে করি। বিয়ের পর একবছর ছিলাম আমরা পোর্ট ব্লেয়ারে। তারপরেই শুরু হয় পলাতক জীবন। আমরা বিপদে পড়লে শুনেছিলাম মামি নাকি মামাকে আমাদের ব্যাপারে অনুরোধ করেছিলেন। উত্তরে মামা বলেছিলেন, পেলে দু'জনকেই ফাঁসিতে ঝুলাব। মামি আমাকে মেয়ের মত ভালবাসতেন।'

থামল সুস্মিতা বালাজী। শেষের কথাগুলো বলতে গিয়ে কাঁপছিল সুস্মিতা বালাজীর কণ্ঠ।

তার পাশেই বসেছিল ড্যাসিন দেবানন্দ। সে ধীরে ধীরে হাত রাখল সুস্মিতা বালাজীর কাঁধে। সান্ত্বনা দিতে চাইল সে।

কিন্তু ফল আরও বিপরীত হলো।

সান্ত্বনা তাকে বোধ হয় আরও দুর্বল করে দিল। তার দু'চোখ থেমে নেমে এল অশ্রুর বন্যা। দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুপিয়ে কেঁদে উঠল সে।

সেই সাথে উঠে দাঁড়াল। 'স্যরি' বলে বাড়ির দিকে ছুটল।

অপ্রস্তুত আহমদ মুসা। বেদনা তার চোখে মুখে। ড্যানিশ দেবানন্দ গম্ভীর।

দু'জনের কেউ কথা বলল না।

অস্বস্তিকর এক নীরবতা।

এক সময় নীরবতা ভেঙে ড্যানিশ দেবানন্দ স্বগতউক্তির মত বলল, ‘বিশ বছরের মধ্যে প্রথম কাঁদল সুস্মিতা। পিতার মৃত্যু সংবাদে একবার কেঁদেছিল। কিন্তু সে কান্নার ছিল ভিন্ন অর্থ।’

‘আপার মা’ বেঁচে আছেন?’ বলল আহমদ মুসা।

‘ওঁর মা মারা গেছেন ছোট বেলায়।’

‘ও! স্যরি! আত্নীয়-স্বজন কারও সাথে যোগাযোগ নেই?’

‘সুস্মিতার এক ফুফাতো বোন থাকে পোর্ট ব্লেয়ারে। সেও ডাক্তার। সুস্মিতা এবং সে একসাথেই ডাক্তার হয়েছিল। তার সাথেই মাত্র যোগাযোগ আছে। সে এসছে এখানে।’

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু থেকে গেল সুস্মিতা বালাজীকে ফিরে আসতে দেখে।

সুস্মিতা বালাজী এসেই বলল, ‘স্যরি ছোট ভাই, আপনার কথার মধ্যেই অযথাই ছেদ নামল। কারা ওদের কিডন্যাপ করতে পারে, ভেবেছিন কিছু? আমার বুক কাঁপছে, এর চেয়ে খারাপ খবর আর হয় না।’

বলল সুস্মিতা বালাজী মাচায় ড্যানিশ দেবানন্দের পাশে বসতে বসতে।

মুখ চোখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে এসেছে সুস্মিতা বালাজী। মুখ চোখ থেকে বেদনার সেই কালেঅ মেধ একবারেই উধাও।

‘কিডন্যাপ করেছে শংকরাচার্যের ‘সেসশি’র লোকরাই। কিন্তু আমি ভাবছি অন্যকথা। গভর্নরের অন্দর মহল থেকে শংকরাচার্যের লোকদের পক্ষে শাহ্ বানুদের কিডন্যাপ করা কি করে সম্ভব? আমি গভর্নর হাউজ দেখেছি, সেই অন্দর মহলে গেছি। এই কিডন্যাপ সম্ভব নয় শংকরাচার্যদের পক্ষে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আপনি তাহলে পুলিশের যোগ-সাজস সন্দেহ করছেন?’ বলল সুস্মিতা বালাজী।

‘শুধু পুলিশের যোগ-সাজসেই কি এতবড় কিপন্যাপ সম্ভব? গোয়েন্দাদের চোখ রয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, সেটা গভর্নরের বাসগৃহ।’

‘তাহলে খোদ গভর্নরকেই আপনি সন্দেহ করছেন। তাই তো?’ সুস্মিতা বালাজী বলল।

‘ঠিক সন্দেহ নয়, তাঁর সম্পর্কে ভাবছি। করণ তাঁর মুখ থেকেই সুষমা রাও শুনেছিল যে, ‘রস’ দ্বীপের গোডাউনে এক বন্দীকে রাখা হয়েছে। গভর্নর কাউকে টেলিফোনে একথা বলেছিলন। সুষমার কাছেও কথাটা অস্বাভাবিক লেগেছিল। তার কাছ থেকে একথা শুনেই আমি সন্দেহ নিরসনের জন্য ‘রস’ দ্বীপে যাচ্ছিলাম। রস দ্বীপেই শংকরাচার্যদের ‘সেসশি’র হেড অফিস’ একথা শোনার পর গভর্নরের কথা সত্য মনে হচ্ছে। সুতরাং তাঁর জড়িত থাকার কথা ভাবনায় আসতেই পারে।’

‘কিন্তু আপনি তো বলেছেন শাহ্ বানুদের পরিচয় গভর্নর জানেন না। তাহলে?’

‘সেটা ঠিক। কিন্তু তার সন্দেহ হতে পারে। তিনি খোঁজ নিতে পারেন। তাঁর তো এ সুযোগ আছে।’

সুস্মিতা বালাজী কিছু বলতে গিয়েও থেকে গেল। মাঝবয়সী এক আদিবাসী তাদের দিকে আসছিল।

তাকে দেখেই ড্যানিশ দেবানন্দ বলল, ‘এস, দিওবা কি খবর?’

স্যার, গতকাল বলেছিলমা, দু........।’

কথা শেষ না করেই থেকে যেগে হলো দিওবাকে। তার কথার মাঝখানে ড্যানিশ দেবানন্দ বলল, ‘মাচাটায় আগে বস, কথা তোমার শুনছি।’ দিওবা মাচায় হেলান দিয়ে বলল, ‘বসেছি স্যার।’

হাসল ড্যানিশ দেবানন্দ। বলল, ‘ঠিক আছে, বল তোমার কথা।’

‘স্যার গতকাল আপনাকে বলেছিলাম দু’জন ট্যুরিষ্ট পাহাড়ের উপরে আমাকে এসে বলেছিল, ‘আমরা আমাদের এক সাথীকে হারিয়ে ফেলেছি। সে আহত। তাকে কেউ কোথাও দেখেছ কিনা? পরে শুনলাম ঐ দু’জনই আমাদের আরেকজনকে বলেছে, আমাদের গাড়ি একসিডেন্ট করেছে। সিরিয়াস আহত আমাদের একজন। গাড়ি অচল হয়ে পড়েছে। এদিকে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে কিনা? আজ সকালে আমাদের আর একজন বলেছে, একদল ট্যুরিষ্ট এসেছে। ওরা

কয়েকদিন এ অঞ্চলে বেড়াবে। ওদের থাকার মত ব্যবস্থা কোথায় হতে পারে? তাদের আমাদের ভাল লাগেনি। তাই স্যার আপনাকে বলতে এলাম।'

'ধন্যবাদ দিওবা। ট্যুরিষ্টরা কোথায় উঠেছে, জান?' জিজ্ঞাসা ড্যানিশ দেবানন্দের।

'না স্যার, জানি না।'

'কোন দিন ট্যুরিস্ট তো এখানে আসেনি।' অনেকটা স্বগত কণ্ঠে বলল ড্যানিশ দেবানন্দ।

ড্যানিশ দেবানন্দের স্বগতোক্তির বেশ বাতাসে মেলাবার আগেই দেখা গেল আরেকজন আদিবাসি এদিকে আসছে।

লোকটি কাছাকাছি আসতেই ড্যানিশ দেবানন্দ বলল, 'অংগি, কি খবর? কারও অসুখ-বিসুখ করেনি তো?'

অংগি হলো স্কুলের কেরানী কাম গার্ড। স্কুলের সাথে লাগানো একটি বাড়িতে সে স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে নিয়ে থাকে, মাঝ বয়সী লোকটি লেখা-পড়া জানতো না, কিন্তু খুবই বুদ্ধিমান, খুবই বিশ্বস্ত। এখন অক্ষর জ্ঞান লাভ করার পর সে হিন্দী ও ইংরেজী ভাষায় খাতা, রেজিষ্ট্রার লেখার কাজ চালাতে পারে।

'না, স্যার। এক সমস্যা হয়েছে।' বলল অংগি।

'কোথায়, কি সমস্যা?' প্রশ্ন ড্যানিশ দেবানন্দের।

'একদল ট্যুরিষ্ট এসে আমাদের স্কুল মাঠে তাঁবু গেড়েছে। কয়দিন থাকবে, বেড়াবে।'

ভ্রুকঞ্চিত হলো আহমদ মুসার।

'কতজন ওরা?' বলল ড্যানিশ দেবানন্দ।

'দশ বারো জন।'

'আদিবাসি কেউ নয়। সবাইকেই আমাদের ভারতীয় মনে হলো।'

'ঠিক আছে। ক্ষতি নেই। ট্যুরিষ্টরা তো কোনদিন আসে না এব অঞ্চলে। কয়েক দিন থেকে ওরা কি দেখবে?' নিস্পৃহ কণ্ঠ ড্যানিশ দেবানন্দের।

কথা শেষ করেই তাকাল সে আহমদ মুসার দিকে। আহমদ মুসাকে গম্ভীর দেখে বলল, 'এ সময় ওরা না এলেই ভাল হতো, কিন্তু এসে তো গেছে। আপিন কি ভাবছেন ছোট ভাই?'

'দিওবার খবরের সাথে অংগির খবর যোগ করলে ব্যাপারটি অস্বাভাবিক হয়ে দাঁড়াচ্ছে।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে।' বলল সুষ্মিতা বালাজী।

'আমারও মনে অস্বস্তি লাগছে এ খবর শোনার পর থেকেই।' ড্যানিশ দেবানন্দ বলল।

আহমদ মুসা অংগিকে লক্ষ্য করে বলল, 'তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করেছে ওরা?'

'জি স্যার।'

'কি জিজ্ঞাসা করেছে?'

'এখানে কোন দোকান, ডাক্তার খানা আছে কিনা? আর কোন ট্যুরিষ্ট আছে কিনা কিংবা ইংরেজি জানা শিক্ষিত লোক আছে কিনা, স্কুলে শিক্ষক কোত্থেকে আসে, এসব।'

'তুমি কি জবাব দিয়েছ?'

'আমরা আমাদের ভেতরের কোন ইনফরমেশন বাইরে দেই না। শুধু বলেছি, বাইরে কোন শিক্ষক নেই, বাইরে থেকে স্থাপিত কোন ডাক্তার খানা নেই, বাইরের কোন ডাক্তারও নেই। 'সাবাস! ধন্যবাদ তোমাকে। খুব বুদ্ধিদীপ্ত জবাব দিয়েছ।'

'আরেকটা খবর স্যার, ওদের সাথে দু'জন পুলিম এসেছে।' বলল অংগি ড্যানিশ দেবানন্দের দিকে চোখ তুলে।

'দু'জন পুলিশ এসেছে?' কথাটা লুফে নিয়ে বলল আহমদ মুসা।

পুলিশের কথা শুনে অস্বস্তি ফুটে উঠেছে ড্যানিশ দেবানন্দ ও সুষ্মিতা বালাজীর চোখে-মুখে। গত বিশ বছর ধরে পুলিশকে এড়িয়ে চলা তাদের অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'জি স্যার।'

সঙ্গে সঙ্গে আহমদ মুসা কথা বলল না, একটা ভাবল। তারপর বলল, ‘কি করে বুঝলে পুলিশ?’

‘গায়ে ইউনিফর্ম আছে।’

‘মাথায় পুলিশের টুপি আছে?’

‘জি আছে।’

‘পায়ে জুতা আছে?’

‘আছে।’

‘কি রং।’

‘কালো।’

‘টুপি খোলা অবস্থায় ওদের দেখেছ?’

‘দেখেছি।’

‘চুল তাদের কেমন?’

‘বড়, ঘাড় পর্যন্ত নেমে যাওয়া।’

‘ওদের হাতে কি, লাঠি?’

‘না, স্যার। বন্দুক, মাসে ষ্টেনগান।’

‘কি রং? সিলভার কালার, না অন্য রং?

‘কালো।’

‘আচ্ছা পুলিশরা কি করছে? পাহারায় বসে আছে।?’

‘না স্যার। ওদের সকলের সাথে কাজ করছে।’

‘কি কাজ করছে?’

‘তাঁবু খাটানো থেকে ব্যাগ-ব্যাগেজ টানা সব কাজই করছে।’

‘বড় বড় লাগেজ আছে ওরেদ সাথে?’

‘খুব হালকা ব্যাগ।’

‘তবে মনে হয় রা গায়ক দল। সবার হাতে একটা করে সেতার জাতীয় বাদ্যযন্ত্র আছে।’

ভ্রুকুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার।

তবে সঙ্গে সঙ্গেই কিছু বলল না।

একটু ভাবল। বলল, 'অংগি ওরা এখন কি করছে?'

'ওরা শুকনো খাবার নিয়ে এসেছিল। খেয়ে নিয়েছে। শুনলাম, ওঁরা দল বেঁধে বেরুবে।'

'এলাকায় কি দেখার আছে, পাহাড়ে যাবে?' বলল আহমদ মুসা।

'স্যার, ওরা বলল, এলাকা সম্পর্কে কার সাথে কথা বলা যায়? তোমাদের সর্দার কোথায়? তার সাথে কথা বলে সব জেনে নেবে। তারপর এলাকায় বেরুনো যাবে। আমরা বলেছি, আমরাদের কোন সর্দার নেই। আমাদের স্যার আছেন। তিনিই আমাদের সব। তারা বলেছে, তাহলে তাঁর সাথেই দেখা করব। দেখা করা যাবে তো, বাধা নেই তো? আমরা বলেছি, তাঁর দরকার সবার জন্য খোলা।'

'তার মানে ওরা এখানে আসছে?' বলল আহমদ মুসা।

'তাই ওরা বলেছে, স্যার।' বলল অংগি।

'বাইরের লোকদের কোন সময়ই এখানে আনিনি। তার উপর ওদের সাথে আছে পুলিশ।' ড্যানিশ দেবানন্দ বলল। তার কণ্ঠে কিছুটা উদ্বেগ।

ড্যানিশ দেবানন্দের কথা শেষ হতেই আহমদ মুসা বলল, 'সামনে দেখুন ভাই সাহেব।'

সাবই তাকাল সামনে।

তাকিয়েই অংগি বলে উঠল, 'স্যার ঐ তো ট্যুরিষ্টরা আসছে। আমাদের লোকরাও ওরদের সাথে আছে স্যার। পুলি দু'জনও আছে স্যার।'

'ছোট ভাই এখন কি করা?' ড্যানিশ দেবানন্দ বলল আহমদ মুসাকে।

ড্যানিশ দেবানন্দদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে আহমদ মুসা একটা চাপা কণ্ঠে ইংরেজিতে বলল, 'ভয় নেই ভাই সাহেব, ওরা ভুয়া পুলিশ।'

'বলেন কি, জানলেন কি করে ছোট ভাই।' বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে বলল ড্যানিশ দেবানন্দ। সুস্মিতা বালাজীরও চোখ নাচছে বিস্ময়ে।

'খবর বোধ হয় আরও আছে ভাই সাহেব। পরে দেখবেন হয়তো।' বলল আহমদ মুসা অনেকটা স্বগতকণ্ঠে।

পর্যটকদের দল অনেকটা কাছে এগিয়ে এসেছ। দু'জন পুলিশসহ ওরা বারোজন। ওদের দুপশ দিয়ে একটু দুরত্ব রেখে এগিয়ে আসছে জনা দশেক আদিবাসি। পর্যটকদের সবার হাতে সেই বাদ্যযন্ত্র সেতার।

'ভাই সাহেব, সামনের তিন নম্বর মাচায় পর্যটকদের বসতে বলুন। ওরা একসাথে এক সারিতে বসতে পারবে। আর আপনার লোকরা.....।'

আহমদ মুসার কথার মাঝখানে ড্যানিশ দেবানন্দ বলে উঠল, 'হ্যাঁ ওরা এক পাশ দাঁড়িয়ে থাকবে। এইভাবে ওরা বসতে চাইবে না।'

পর্যটকরা একদম কাছে এসে গেছে।

ওরা একসাথে হাঁটছে।

ওদের মধ্যমণি হিসাবে মাঝখানে দাঁড়ানো একজনের উপর আহমদ মুসার চোখ আটকে গেল। তাকে দেখেছে সে এর আগে। কোথায়? বিদ্যুৎ চমকের মতই মনে পড়ে গেল। সেদিন স্বামী স্বরূপানন্দের বন্দীখানা থেকে পালাবার সময় এসেও সে হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল। আহমদ মুসাও তার চোখে পড়ে গেছে। তার চোখ প্রথমে বিস্ময়-বিস্ফোরিত, তারপর আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কিন্তু আহমদ মুসার চোখে কোন ভাবান্তর নেই। আহমদ মুসা তাকে চিনতে পেরেছে একথা প্রকাশ পেল না।

ওরা এগিয়ে এলে ড্যানিশ দেবানন্দ উঠে দাঁড়াল। অংগি দাঁড়িয়েই ছিল। সে ড্যানিশ দেবানন্দকে ওদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল।

সবাই বসল।

আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করল তার দেখা দেই লোকটি। দ্রুত চাপা স্বরে বলছে তার স্বাথীদের। তার চোখে-মুখে উত্তেজনা এবং তা ছড়িয়ে পড়ছে তার সাথীদের মধ্যেও। এর মধ্যে একদম এপ্রান্তে বসা ওদের একজন বলে উঠল, 'আমরা বেড়াতে এসেছি। আপনারা আদিবাসী নন, এটা বুঝিনি। আমরা আপনাদের মত লোকই খুজছিলাম। আমরা খুব খুশি হলাম।'

তার কথা শেষ হতেই আহমদ মুসা বলে উঠল, 'দেখছি আপনারা সকলেই সেতার প্রিয়। আর আমি বলতে পারেন সেতার বলতে অন্ধ।'

বলে উঠে দাঁড়িয়ে আহমদ মুসা এপ্রান্তের যে লোকটি কথা বলেছিল তার সামনে গিয়ে বলল, 'আপনার সেতারটা একটু দেখতে পারি। একটু বাজিয়ে দেখব।'

লোকটার চেহারায় বিব্রত ভাব প্রকাশ পেল। তার পাশের সাথীর দিকে একবার তাকাল। তারপর সেতারটি আহমদ মুসার হাতে তুলে দিল।

আহমদ মুসা সেতারটি হাতে নিয়ে বুঝল তার অনুমান ঠিক। খুশি হলো আহমদমুসা।

সেতারটি নেড়ে-চেড়ে দেখতে দেখতে দু'ধাপ পেছনে সরে এল। বলল, 'চমৎকার সেতার।'

সেতার বাজাতে শুরু করল আহমদ মুসা। আহমদ মুসা সত্যি সেতার ভাল বাজায়।

প্রশংসায় উচ্ছসিত হয়ে উঠেছিল ড্যানিশ দেবানন্দ ও সুষ্মিতা বালাজী।

আহমদ মুসা তখন ভাবছিল অন্য কথা। এদের পরিকল্পনা কি। এ সময় কিংবা দিনের বেলা সবার সামনে কিছু না করে রাতের সুযোগ তারা নেবে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু আহমদ মুসাকে হাতের মুঠোয় পাওয়ার পর সুযোগটা ছেড়ে দিয়ে তারা রাত পর্যন্ত অপেক্ষার ঝুঁকি নেবে, এটাও অস্বাভাবিক। আহমদ মুসা ওদের মধ্যেই উত্তেজনা লক্ষ্য করল।

আহমদ মুসা সেতার বাজানো থামিয়ে মুখ ফিরাল ড্যানিশ দেবানন্দের দিকে। বলল, 'স্যরি, সুর দিয়ে একটা সেকুরো কাজ করে ফেললাম। মেহমানদের সাথে কথা বলু.....।'

পেছনে একটা কর্কশকণ্ঠ আহমদ মুসাকে থামিয়ে দিল। কর্কশ কণ্ঠটির নির্দেশ, 'বার্গম্যান, দেবানন্দ বাবু সবাই হাত তুলে দাঁড়ান।'

আহমদ মুসার মুখের কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দেখল, বিস্মিত ড্যানিশ দেবানন্দ ও সুষ্মিতা বালাজী হাত তুলে দাঁড়াচ্ছে। আহমদ মুসাও সেতার দু'হাতে ধরে রেখেই হাত দু'টি উপরে তুলতে তুলতে ঘুরে দাঁড়াল। আহমদ মুসা দেখল, বন্দীখানায় দেখা সেই লোকটিই ষ্টেনগান তাক করেছে তাদের দিকে। তার ষ্টেনগানটি সেতারের খোলস থেকে বের করে নিয়েছে। অন্যেরা ষ্টেনগান বের

করেনি কিংবা তাক করে উপরে তোলেনি, কিন্তু সবাই সেতারকে পজিশনে নিয়েছে এবং সবারই হাত ষ্টেনগানের ট্রিগারে, বুঝল আহমদ মুসা।

ওদিকে পাশে দাঁড়ানো আদিবাসীদের মধ্যে ভয় ও গুঞ্জন দুই'ই সৃষ্টি হয়েছে।

সেই লোকটির কর্কশ কণ্ঠ আবার ধ্বনিত হলো, 'নরেন, বিরেন তোমরা আদিবাসীদের গুঞ্জন থামিয়ে দাও।'

কথা বলার সময় তার চোখ ও ষ্টেনগানের নল আহমদ মুসার দিক থেকে একটুকুও সরায়নি।

'তাহলে ঐ পরিচিত লোকটি এখন ওদের নেতাও।' ভাবল আহমদ মুসা।

লোকটির নির্দেশ নরেন-বিরেনরা পাওয়ার সাথে সাথেই ওদের সারি থেকে দু'জন লোক তাদের সেতার ঘুরিয়ে নিল এবং আদিবসীদের দিকে লক্ষ্য করে একপশলা ফায়ার করল। তিনজন আদিবাসী গুলীবিদ্ধ হয়ে পড়ে গেল।

গুলী করেই নরেন অথবা বিরেন লোকটি চিৎকার করে বলল, 'আমরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত সবাই হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকবে। না হলে সবাইকে লাশ করে দেব।'

এদিকে আহমদ মুসারেদ টার্গেট করা লোকটি আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে তীব্র কণ্ঠে বলল, 'তোমাকে দেখামাত্রই হত্যা করতমা। কিন্তু তোমাকে আমাদের জীবন্ত প্রয়োজন। আহমদ শাহ্ আলমগীরের মা-বোনকে ধরেছি। আহমদ শাহ্ আলমগীরের মুখ খোলার জন্যে সবাইকে দরকার। কিন্তু মনে রেখ, কোন চালাকির আশ্রয় নিলে কুকুরের মতো গুলী করে মারব।'

বলেই সে যার হাত থেকে আহমদ মুসা সেতার নিয়েছিল তাকে নির্দেশ দিল, 'যাও শয়তানটার কাছ থেকে সেতারটা নিয়ে নাও।'

লোকটি নির্দেশ পেয়েই উঠে গিয়ে আহমদ মুসার সামনে দাঁড়াল। দু'হাত বাড়িয়ে বলল, 'দাও সেতার।'

আহমদ মুসা হাত তুলে দাঁড়ানো অবস্থায় দু'হাতে ধরে রেখেছিল সেতারটি। এমনভাবে ধরেছিল যাতে ডানহাতের তর্জনি সেতাররে ট্রিগার হোলে ঢুকিয়ে রাখা যায়।

আহমদ মুসা সেতারটি বুক বরাবর নামিয়েই সেতারটি লোকটির হাতে তুলে দেবার ভঙ্গিতে বাম পাটা একধাপ এগিয়ে নিল, তারপর ডান পা বিদ্যুৎ গতিতে ছুড়ল লোকটির দিকে। আঘাত করল লোকটির তলপেটের নিচে। লোকটি দেহ মুহূর্তে ধনুকের মত বেঁকে গেল।

ততক্ষণে আহমদ মুসার সেতার গুলীবর্ষণ শুরু করেছে। প্রথম গুলীটি বিদ্ধ করল আহমদ মুসার পায়ের আঘাতে মাটিতে পড়ে থাকা লোকটিকে।

তারপর আহমদ মুসার হাতের সেতারটি মাচানে সবা ওদের দিকে তাক করে ট্রিগার চেপে ধরেছিল।

সেতার থেকে ছুটে যাওয়া গুলীর বৃষ্টি ওদের উপর দিয়ে দু'বার ঘুরে এল।

ওদের বাকী ১১জনই দু'টি মাচানে সারিবদ্ধ হয়ে বসেছিল।

গুলী বৃষ্টি দু'বার ঘুরে আসার পর ওরা সবাই লাশ হয়ে পড়ে গেল, কোউ মাচার উপর, কেউ মাচার নিচে।

গুলী শেষ করেই আহমদ মুসা সেতারটি হাত থেকে ফেলে দিয়ে ছুটল আদিবাসীদের দিকে। দ্রুত গেল তিনজন আহতের কাছে। দেখল, তিনজনেরই দেহে একাধিক গুলরি আঘাত। তবে দেহের উপরের দিকটা নিরাপদ।

আহমদ মুসাকে আদিবাসীদের দিকে ছুটতে দেখে ড্যানিশ দেবানন্দ সুষ্মিতা বালাজীকে টেনে নিয়ে সেদিকে ছুটে এসেছিল।

ওরাও এসে আহতদের পাশে বসল।

'আপা, ওরা সবে থেকে সুনির্দিষ্ট টার্গেট ছাড়াই গুলী করেছে, অন্যদিকে এদের দাঁড়ানোর জায়গা তো উঁচু। তাই দেহের উপরের অংশটা বেঁচে গেছে।' বলল আহমদ মসা সুষ্মিতা বালাজীকে লক্ষ্য করে।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। তোমরা এদেরকে মাচায় তোল, আমি মেডিকেল কীট নিয়ে আসি।' বলে ছুটল সুষ্মিতা বালাজী ঘরের দিকে।

আহমদ মুসা ও ড্যানিশ দেবানন্দ দু'জন আহতকে তুলতে যাচ্ছিল।

ছুটে এল পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে পড়া আদিবাসীরা। সমস্বরে বলে উঠল, 'স্যার আপনারা সরুন, আমরা তুলছি।'

সরে এল আমহদ মুসারা।

আহমদ মুসা বলল, ‘ঠিক আছে ওরা ওদের তুলি নিক, ততক্ষণে আমি দেখি ওদের কেউ জীবতি আছে কিনা।’

বলে আহমদ মুসা ওদিকের মাচার দিকে চলল।

তিনজন আহতকেই মাচার উপর তোলা হয়েছে।

সুষ্মিতা বালাজী তার মেডিক্যল কীট নিয়ে এসে গেছে।

এদিকে মানুষের ঢল নেমেছে।

গুলীর শব্দ শুনে ছুটে আসছে আদিবাসীরা।

‘ছোট ভাই, আপনি এদিকে আসুন। আপনার সাহায্য দরকার। কি করছেন আপনি ওখানে?’ বলল সুষ্মিতা বালাজী আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে।

‘দেখছিলাম, এদের কেউ বেঁচে আছে কিনা। কিন্তু কেউ বেঁচে নেই।’ আহমদ মুসা বলল।

‘বেঁচে থাকলে কি করতেন?’ ঠোঁটে হাসি টেনে প্রশ্ন করল সুষ্মিতা বালাজী।

‘অসুস্থ, আহত ও আত্নসমর্পণকারীরা আর শত্রু থাকে না। তাছাড়া তাদের কেউ আহত থাকলে, তাকে বাঁচানোর মধ্যে লাভ ছিল। কিছু তথ্য আদায় করা যেত। তাদের সম্পর্কে তথ্য এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।’ আহমদ মুসা বলল।

কথা শেষ করে সুষ্মতা বালাজী ও ড্যানিশ দেবানন্দের সাথে আহতদের সেবার কাজে যোগ দিয়ে বলল, ‘তবু কিছু জানার একটা সুযোগ আছে। এদের মোবাইলগুলো যোগাড় করেছি, আর স্কুল মাঠে আছে এদের ব্যাগ-ব্যাগেজ। ওসব থেকে কিছু তো পাওয়া যাবেই।’

‘ঈশ্বর সহায় হোন।’ বলল সুষ্মিতা বালাজী।

তিনজনই কাজে লেগে গেল। চারদিকে মানুষের দেয়াল।

ঘটনার খবর আগুনের মত ছড়িয় পড়েছে। সবাই এসে হাজির হয়েছে তাদের স্যারের বাড়িতে। তোদের চোখে-মুখে বিষ্মিয় বেদনা ও পর্বত প্রমাণ উৎসুক্য। কিন্তু তাদরে স্যাররা ব্যস্ত।

তাদের উৎসুক্য মেটাচ্ছে, তাদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে অংগি, দিওবা এবং অন্য যারা আঘে থেকেই উপস্থিত ছিল এখানে। আদিবাসীরা একে একে জেনে ফেলল তাদের মেহমানের বিস্ময়কর বাহাদুরীতে বেঁচে গেছে তাদরে স্যাররা, বেচে গেছে আদিবাসীরা। ওরা পর্যটকের ছদ্ধবেশে, ষ্টেনগানগুলোকে সেতারের খোলসে ঢেকে এনেছিল ডাকাতি করতে, লুটতরাজ করতে। বাঁচিয়েছে তাদের মেহমানের বাহাদুরী।

আদিবাসীদের শত শত চোখের কৃতজ্ঞ ও প্রশংসার দৃষ্টি আহমদ মুসার প্রতি নিবদ্ধ। মুহূর্তেই আহমদ মুসা তাদের 'হিরো'তে পরিণত হয়ে গেল।

এদিকে আহতদের আহত স্থান ওষধ  দিয়ে পরিস্কার করা, প্রয়োজনে অপারেশন করে গুলী বের করা, আহত জায়গা সেলাই করা, ব্যান্ডেজ করা এবং সেই যন্ত্রণাকাতর লোকদের সান্তনা দেয়ার কষ্টকর ও সময় সাপেক্ষ কাজ এগিয়ে চলেছে।

'ছোট ভাই, এ স্পেশালাইজড কাজেও দেখছি আপনি দক্ষ।' কাজ করতে করতেই এক সয় বলে উঠল সুষ্মিতা বালাজী আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে।

কাজ থেকে চোখ না সরিয়েই আহমদ মুসা উত্তরে বলল, 'আমার ক্ষেত্রে এমত ঘটনা এত বেশি ঘটেছে যে, দেখতে দেখতে সব মুখস্থ হয়ে গেছে।'

'ছোট ভাই, এতদিন আপনার কথা পড়েছি, শুনেছি। কিন্তু আজ চোখে দেখলাম, আপনি কি! আপনি কি করে জানলে যে সেতারের খোলসে ষ্টেনগান আছে, কি করেই বা বুঝলেন সে ষ্টেনগানটির ট্রিগার কোথায়, কিভাবে ব্যবহার করতে হবে! পাল্টা আঘাত করার সময়টাই বা কিভাবে বেছে নিলেন! চোখের পলকেই এমন ঘটনা ঘটলোই বা কিভাবে!' একটা আহত স্থান সেলাইরত অবস্থায় বলল সুষ্মিতা বালাজী।

'সবই আল্লাহর সাহায্য, আপা।' বলল আহমদ মুসা।

'আমি বুঝতে পারছি না ছোট ভাই, আপনি সেতারটা ওদের একজনের হাত থিকে নিয়েছিলেন সত্যি বাজনোর জন্যে, না আপনি অস্ত্র জেনেই ওটা হাত করেছিলেন?' একজনের সেলাইকরা আহত স্থানে ব্যান্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে বলল ড্যানিশ দেবানন্দ।

‘আমার নিশ্চিত বিশ্বাস হয়েছিল যে, সেতারের খোলসে ওগুলো আসলে অস্ত্র। অস্ত্র হিসেবেই সেতারটা আমি হাত করেছিলাম।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আপনার এ নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মাবার কারণ?’ প্রশ্ন করল সুস্মিতা বালাজী। হাতের কাজটার উপর চোখ রেখেই।

‘সে অনেক কথা। দেওবার কাজ থেকে খবরগুলেঅ জানার পর পর্যটকদের আগমনকেই আমি সন্দেহ করেছিলাম। দু’জন পুলিশের আকার-আকৃতি ও আচার-আচরণের কথা শুনে আমি বুঝেছিলাম। ওরা আসলে পুলিশ নয়। পুলিশ সাজিয়ে আনা হয়েছে মানুষকে ভয় দেখাবার জন্যে এবং বাড়তি সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে। তারপর ওরা এলে ওদের একজনকে আমি চিনতে পারি। স্বামী স্বরূপানন্দের বন্দীখানা থেকে বেরুবার সময় ওকে আমি দেখেছিলাম। সে আমাকে চিনতে পেরেছিল এবং তার সাথী সবাইকে ইংগিতে জানিয়ে দিয়েছিল। ঐ লোকটিই আমাদের প্রতি ষ্টেনগান তাক করেছিল। আহমদ মুসা বলল।

‘যদি সেতারটি আপনি না নিতে পারতেন কিংবা আপনি যদি গুলী করার সুযোগ না পেতেন, তাহলে কি ঘটত তা ভাবতেও ভয় লাগছে। বলল সুস্মিতা বালাজী।

‘আপনা, কখনও কোন সংকটই নিশ্ছিদ্র হয় না। প্রত্যেক সংকটের সাথে সংকট উত্তরণের সুযোগও থাকে। প্রয়েজন হলো সে সুযোগ বের করে নেয়া এবং সদ্ব্যবহার করা।’

‘কিন্তু সুযোগ সব সময় বের করা নাও যেতে পারে, বা সে সুযোগের সদ্ব্যবহার সম্ভব নাও হবে পারে।’ বলল সুস্মিতা বালাজী।

‘হ্যাঁ আপা। আল্লাহর ইচ্ছা হলে সেটাও হতে পারে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘জীবন-মৃত্যুকে এমন পাশাপাশি দেখেও আপনার ্কটুকুও ভায় করে না?’ সুস্মিতা বালাজী বলল।

‘আমাদের ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআনে রয়েছে, ‘আমার জীবন, মরণ, সাধনা, কুরবানী সব বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহর জন্যে।’ এটা যদি বিশ্বাস হয় তাহলে ভয় কোত্থেকে আসবে?’ বলল আহমদ মুসা।

'কিন্তু আপনার স্ত্রী আছে যাকে আপনি অত্যন্ত ভালবাসেন, আপনার সোনার টুকরো সন্তান আছে, যে আপনার কাছে আপনার চেয়ে প্রিয়। জীবন-মৃত্যুর এই ধরনের চরম সন্ধিক্ষণে তাদের স্মরণ আপনাকে দুর্বল করে না?' শেষ বান্ডেজটি সম্পন্ন হওয়ার পর আহমদ মুসার দিকে মুখ তুলে বলল সুষ্মিতা বালাজী।

'আপা, আমাদের কুরআন শরীফের আর একটি আয়াতে বলা হয়েছে যে, নিজের পিতা, নিজের সন্তান, নিজের ভাই, নিজের পত্নী, নিজের জাতি-গোষ্ঠী, নিজের অর্জিত সম্পদ, নিজের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং নিজের বাড়ি-বাসস্থান থেকে আল্লাহকে, তার রসূলকে এবং আল্লাহর পথে সংগ্রামকে বেশি ভালবাসতে হবে।' এটা যেহেতু আমার ঈমান, তাই সন্তান ও স্ত্রীকে আমি বড় করে দেখব কি করে?'

সঙ্গে সঙ্গেই সুষ্মিতা বালাজী বলে উঠল, 'কিন্তু আপনার এই সংগ্রাম তো আল্লার জন্যে, তার রসূল স.-এর জন্য নয় কিংবা তার পথের জন্যে সংগ্রাম নয়।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'আমি যা করছি তা আল্লার পথের সংগ্রাম হিসেবেই করছি। মজলুম, অত্যাচারিতদের সাহায্যে এগিয়ে যাবার জন্যে আল্লাহ শুধু নির্দেশই দেননি বরং যারা আর্ত মানবতার সাহায্যে এগিয়ে যায় না, তারা কেন যায় না এ নিয়ে আল্লাহ তাদরে অভিযুক্তও করেছেন। আমাদের ধর্মগ্রন্থ আল কুরআনে বলা হয়েছে, 'তোমাদের কি হলো যে, তোমরা যুদ্ধ করছ না আল্লাহর জন্যে এবং অসহায় নর-নারী ও শিশুদের জন্যে যারা-ফরিয়াদ করছে, হে আল্লাহ এই যালেমের জনপদ হতে আমাদে অন্যত্র নিয়ে যাও..........।' আল্লাহর এই আদেশ অনুসারে প্রত্যেক অত্যাচারিত, মজলুম মানুষের জন্য সংগ্রাম করা আল্লাহর পথে কাজ করা একই কথা। আমি তো এই কাজের জন্যে আন্দামানে এসেছি এবং এই কাজ করছি।'

সুষ্মিতা বালাজীর চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সে রক্তভেজা তুলা, ব্যান্ডেজের বর্জ সবকিছু একসাথে একটা প্লাস্টিকের প্যাকেটে তুলতে তুলতে বলল, 'বিষ্মিত হচ্ছি ছোট ভাই, আপনাদের ধর্মে দেখছি সব বিষয়ে কথা আছে, নির্দেশ আছে, নিয়ম আছে। আপনার শেষ উদ্ধৃতি যদি কুরআনের কথা হয়,

তাহলে তো বলতে হবে, কুরআন মুসলমানদের জন্যে নয়, কুরআন মানুষের জন্যে। আর আপনার ধর্ম শুধু নয়, জীবন-ধর্ম, জীবন্ত ধর্ম।'

সুস্মিতা বালাজীর কথা শেষ হতেই ড্যানিশ দেবানন্দ বলল, 'থাম থাম সুসি, এই কিছুক্ষণ আগে তুমি বললে আমি নাকি ছোট ভায়ের ধর্মকে ওয়াকওবার দিয়েছি। কিন্তু এখন তো তুমি ডাবল ওয়াকওভার দিলে।

সুস্মিতা বালাজী দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল। আহমদ মুসা আগেই বলে উঠল, এ প্রসঙ্গ এখন থাক আপনা। ওদিকে আমাদের মনোযোগ দেয়া দরকার। গ্রামবাসীদের কিছু বলুন। আহতদের কোথায় পাঠাবেন বা রাখবেন সে ব্যবস্থা করুন।

'ধন্যবাদ ছোট ভাই।' বলে সুস্মিতা বালাজী তাকাল ড্যানিশ দেবানন্দের দিকে। বলল, 'দিওবা, অংগি গ্রামবাসীদের কিছু বলেছে। তুমিও ওদের কিছু বল। লাশগুলো কি করবে, ওদের লাগেছর কি হবে, সব ব্যাপারে ওদের নির্দেশ দিতে হবে।' বলল সুস্মিতা বালাজী।

ড্যানিশ দেবান্দ তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'লাশগুলো ও লাগেজের কি হবে এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কি?'

'লাশগুলো বয়ে নিয়ে পাহাড়ের ওপারে রাস্তার পাশে রাখা ওদের গাড়িতে তুলে রাস্তার পাশেই গভীর খাদে ঠেলে ফেলে দিতে হবে। আর এদের পকেটের টাকা-পয়সা, লাগরজর জিনিসপত্র সবকিছু গ্রামবাসীদের কল্যাণ-ফান্ডে জমা দি। অস্ত্রগুলো আপনার অস্ত্রগারে রাখুন। আর গ্রামবাসীদের বলুন ১২জন পর্যটকের এই উপত্যকায় আসাসহ যা কিছু ঘটেছে যেন তারা ভুলে যায়। কেউ অনুসন্ধানে এলে তারা কিছুই জানে না বলবে।'

'চমৎকার ছোট ভাই। এমন সমাধান দিয়েছেন যার কোন বিকল্প নেই। ধন্যবাদ।' বলল ড্যানিশ দেবানন্দ।

সুস্মিতা বালাজীরও চোখ দু'টি বিমুগ্ধতায় উজ্জ্বল। বলল, 'আমারও ধন্যবাদ নিন ছোট ভাই। কিন্তু একটা কথা, সবশেষে আপনি যে গ্রামবাসীদের মিথ্যা কথা বলার পরামর্শ দিলেন?'

'না, ওটা মিথ্যা বলা নয় আপা। যুদ্ধের একটা কৌশল ওটা। যুদ্ধক্ষেত্রে শুত্রুকে বিভ্রান্ত করা যুদ্ধেরই একটা অস্ত্র। সে অস্ত্রই আমরা প্রয়োগ করেছ।'

হাসল সুষ্মিতা বালাজী। ড্যানিশ দেবানন্দও হাসল।

বলল সুষ্মিতা, 'বুঝেছি ছোট ভাই। ধন্যবাদ আপনাকে। কথাটা আমরাও অন্যভাবে জানতাম। কিন্তু আপনি একে যে 'তাত্বিক রূপ' দিয়ে প্রকাশ করলেন তা অবিস্মরণীয়। আপনাদের আবারো ধন্যবাদ।'

'আমার পক্ষ থেকেও ধন্যবাদ।' বলে উঠে দাঁড়াল ড্যানিশ দেবানন্দ।

'দেখি আমাদের লোকদের সাথে কথা বলি।' বলে ড্যানিশ দেবানন্দ গ্রামবাসীদর দিকে এগুলো।

আর আহমদ মুসা ও সুষ্মিতা বালাজী পানি ভর্তি বালতির দিকে এগুলো। জারওয়া ইতিমধ্যেই বালতিতে করে পানি, সাবান, তোয়ালে এনেছিল।

রাত কখন ১০টা।

আষাঢ়ে মেঘের মত মুখ ড্যানিশ ও সুষ্মিতা বালাজী দু'জনেরই। তারা বসে আছে এক সোফায় পাশাপাশি।

তাদের সামনে আর এক সোফায় বসে আছে আহমদ মুসা। গম্ভীর তার মুখ।

'আজ রাতে এখনই চলে যাবেন, এটা সত্যি ফাইনাল?' বলল ড্যানিশ দেবানন্দ। তার গলায় ক্ষোভের সুর।

'হ্যাঁ, যেতে হবে ভাই সাহেব।' বলল আহমদ মুসা।

'হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত কেন?' সুষ্মিতা বালাজী বলল। তার কণ্ঠ ভারী।

'সে কথা বলঅর জন্যেই তো ডেকেছি আপা আপনাদের।' বিকেল থেকে এ পর্যন্ত যা জানতে পেরেছি তাতেই এ সিদ্ধান্ত আমাকে নিতে হয়েছে।'

'আজ এতবড় ঘটনা এখানে ঘটল। রাতেই আপনি চলে গেলে কেমন হবে। আমার জীবনে এমন ঘটনা ঘটেনি। এ গ্রামেও নয়। কোন কিছুতেই ভয়

আমার নেই। এই অঞ্চলকে অপরাধ মুক্ত করতে সব রকম ক্রিমিনালদের সাথে লড়তে হয়েছে আমাদের। কিন্তু আজ যা ঘটল তা নতুন। আর এর সাথে আমার পুরানো শ্রত্রুর যোগ রয়েছে। তাই বলছিলাম, 'দু'একদিন থাকলে ভাল হতো।' বলল ড্যানিশ দেবানন্দ।

'আমি এ দিকটা চিন্তা করেছি ভাই সাহেব। নিহত বারজনের কাছ থেকে যে মোবাইলগুলো পেয়েছি, সেসব চেক করতে গিয়ে শংকরাচার্যের মোবাইল নাম্বার পেয়ে যাই। আমি তাকে বলেছি, তার পাঠানো বারজন খুনিকেই আমি শেষ করেছি। আমি আসছি পোর্ট ব্লেয়ারে।'

'সে কি পোর্ট ব্লেয়ারে আছে?' ড্যানিশ দেবানন্দ বলল।

'সেও বলেনি। আমিও জানি না। জিজ্ঞাসাও করিনি। আমি চেয়েছি তার দৃষ্টি এই উপত্যকা থেকে পোর্ট ব্লেয়ারের দিকে সরিয়ে দিতে।'

'ধন্যবাদ ছোট ভাই। আপনি সত্যিই গ্রেট। আপনি কত বড় আপনিই জানেন না। আপনি উপত্যকার অসহায় লোকদের বাঁচিয়েছেন। আমার বুকের উপর থেকে একটা পাথর নেমে গেল। জানি এই আদিবাসী লোকরা ভাই-বোনের চেয়েও আমার কাছে বড়। শংকরাচার্যের মত যে শয়তান আমার পরিবার ধ্বংস করেছে, আমাদের বনবাসী করেছে, সেই শয়তান শকুন দৃষ্টি আমার উপত্যকায় সরল সহজ, দরিদ্রলোকদের উপর না পড়ুক, এটা চাচ্ছিলাম। মনে হয় আমার ভাবার আগেই আপনি আমার চাওয়া পুরণ করেছেন। কেউ সব মানুষকে ভাল না বাসলে এমনভাবে আগাম ভাবতে পারে না। ছোট ভাই আপনার সবচেয়ে বড় পরিচয় আপনি মানুষকে ভালবাসেন।'

আহমদ মুসা মুখ খুলেছিল কিছু বলর জন্যে। কিন্তু তার আগেই সুস্মিতা বালাজী বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, 'এত করার মধ্যেও' কিন্তু বুঝা গেল না কেন আপনাকে এই রাতে যেতে হবে।'

'বলছি সে কথা। আমি শংকরাচার্যকে টেলিফেন করেছিলাম তাকে জানাবার জন্যে যে, সে যে বারজনকে পাঠিয়েছিল আমাকে ধরে নিয়ে যাবার জন্যে, তারা সবাই খতম হয়ে গেছে। আমি আসছি পোর্ট ব্লেয়ারে। সঙ্গে সঙ্গেই সে আমাকে বলেছে, শাহ্ বানু ও সাহারা বানু এখন তার হাতের মুঠোয়। আমি যদি

আগামীকাল সকাল ৮টার মধ্যে তাদের হাতে নিজেকে সোপর্দ না করি, তাহলে শাহ্ বানু সাহারা বানু আগামীকালই ধর্ষিতা হবে এবং লাঞ্ছিত জীবন যাপনে তাদের বাধ্য করা হবে। আমি জানি সে যা বলছে, তা করবে। এই অবস্থায় তাদের হাতে নিজেকে সোপর্দ করা ছাড়া আমার উপায় নেই। তাই সকালের মধ্যেই আমাকে পোর্ট ব্লেয়ারে পৌঁছতে হবে।'

আহমদ মুসার কথা শেষ  হবার আগেই আর্তনাথ করে উঠেছে ড্যানিশ দেবানন্দ ও সুস্মিতা বালাজী দু'জনেই। বিস্ময়-বেদনায় ছানাবড়া হয়ে গেছে দু'জনের চোখ।

আহমদ মুসা থামলে কথা বলতে চেষ্টা করল সুস্মিতা বালাজী। কিন্তু পারল না। প্রবল এক উচ্ছ্বাস তার জিহ্বা ও কণ্ঠকে যেন আড়ষ্ট করে দিল।

কথা বলে উঠল ড্যানিশ দেবানন্দ। বলল, 'ছোট ভাই আপনি একথাগুলো স্বপ্নে বলছেন না বাস্তবে বলছেন? আপনাকে ওরা হাত পেলে কি করবে জানেন?'

'আমি সে কথা ভাবছি না। আমি ভাবছি, আমার নিজেকে বাঁচাবার যেটুকু ক্ষমতা আছে, সেটুকু ক্ষমতা শাহ্ বানু সাহারা বানুর নেই। আর আমি ওদের হাতে হয়তো কষ্ট পাব, কিন্তু তাতে আমার অসম্মান হবে না, আমার জীবনও নষ্ট হবে না, কিন্তু শাহ্ বানুরা হারাবে সবকিছু। আমার সজ্ঞানে আমাদের মা-বোনকে এইভাবে ওদের হাতে ছেড়ে দিতে পারি না। বলল আহমদ মুসা।

'আপনার কথা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু এরপরেও বলল আপনার জীবন কি ওঁদের নিরাপত্তার বিনিময় হতে পারে? আপনাকে এভাব অবমূল্যায়ণ করার অধিকারি কি আপনার আছে।' আবেগকম্পিত কণ্ঠে সুস্মিতা বালাজী।

'আপা, এমনি বা আমার অজ্ঞাতে তাদের একটা কিছু যদি হয়ে যেত, তাহলে সান্তনার একটা সুযোগ ছিল। কিন্তু তারা এ বিষয়ে ঘোষনা দেয়ার পর এবং আমি তা জানার পর, তাদের সম্মান শুধু জাতির সম্মান নয় গোটা মানব জাতির সম্মানের মত বিশাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে তাদের রক্ষা পাওয়ার একটা উপায় আমার সাথে যুক্ত হবার পর, আমার দায়িত্ব সবচেয়ে বেড়ে গেছে। এ

দায়িত্বের আহবানে আমাকে সাড়া দিতেই হবে।’ বলল আহমদ মুসা। আগেব উত্তেজনাহীন শান্ত কণ্ঠ আহমদ মুসার।

হাতাশা ও অসহায়তার অন্ধকার নেমেছে সুস্মিতা বালাজী ও ড্যানিশ দেবানন্দের চোখে-মুখে।

মুষড়ে পড়েছে সুস্মিতা বালাজীই বেশি। তার শুকনো ঠোঁট দু’টি উত্তেজনায় কাঁপছে। সে কম্পি কণ্ঠে বলল, ‘কিন্তু ওদরে হাতে ধরা দিলেই যে ওঁরা ছাড়া পাবেন বা রক্ষা পাবেন, এর কোন গ্যারান্টি আছে? আমার বিশ্বাস ওরদর সাথে আপনাকেও হাতে পাবার ওদের একটা ফাঁদ এটা। যদি তাই হয়, তাহলে সবাই শেষ হবে। অতএব অনিশ্চয়তা মাঝ এ ঝঁকি নিতে পারেন না।’ কান্না রুদ্ধ কণ্ঠে বলল সুস্মিতা বালাজী।

‘আপনার কথায় যুক্তি আছে। হয়তো এটাই ঘটবে। কিন্তু এই যুক্তির আড়াল নিয়ে আমি বসে থাকতে পারি না। বিপদগ্রস্তকে বাঁচানোর চেষ্টা করা দায়িত্ব, চেষ্টার ফল হিসাব করে নয়। আপনি যেটা বলেছেন, হতে পারে এটা তাদের ফাঁদ। কিন্তু ফাঁদ পেতে তারা জয়ী হবে একথাও তো নিশ্চিত করে বলা যাবে না।’ বলল আহমদ মুসা।

‘এছাড়া সামনে এগুবার আর কোন রাস্তা নেই?’ বলল ড্যানিশ

‘ভেবে দেখেছি। আর কোন পথ নেই।’ আহমদ মুসা বলল।

‘এখন দেখছি এই উপত্যকার নিরপত্তার কথা ভেবে টেলিফোন করতে গিয়ে এই বিপিদে পড়েছেন। আপনাকে না পেলে এই আলটিমেটাম দিতে পারতো না। শাহ বানুদের উপরও তাহলে এই বিপদ চাপতো না।’ শুকনো কণ্ঠে বলল ড্যানিশ দেবানন্দ।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘ভাই সাহেব, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আপনি আরও দৃঢ় করুন। যা ঘটবে তাই কিন্তু ঘটে যায়, কার্যকারণের দিক থেকে ভাল-মন্দ যাই হোক। আমার টেলিফোন করা, এই সংকট সৃষ্টি হওয়া সবই অদৃশ্য এক পরিকল্পনার অংশও হতে পারে। সুতরাং ধৈর্য ধারণ করে করণীয় কাজ করে যাওয়াই মানুষের কাজ।’

‘আপনার সব কথাই সত্য ছোট ভাই। কিন্তু বিষয়টাকে আপনি যত হালকা করে দেখছেনম, ততো সহজ নয় ব্যাপারটা। একজন বা দু’জনকে মৃত্যুদণ্ড থেকে বাঁচাবার জন্যে আপনি মৃত্যুদণ্ড নিজে গ্রহণ করছেন। কোন বোন তার ভাইকে এ অনুমতি দিতে পারে না। কিন্তু আমি সত্যিই তো বোন নই।’ আবেগ-কম্পিত গলায় বলল সুষ্মিতা বালাজী।

‘ছোট ভাই, উত্তর দিন এবার।’ বলল ড্যানিশ দেবানন্দ।

‘যার বড় বোন কোন দিন ছিলই না, সে কাউকে বড় বোন হিসাবে পেলে তার সাথে ‘বড় বোন’-এর মতই ব্যবহার করবে । কারও আপন বোন থাকলেই শুধু সে ‘পাতানো বোন’-কে ‘পাতানো’ বলে বুঝতে পারে। আমার সে সুযোগ নেই।’

বলে একটু থামর আহমদ মুসা। তারপর মুখ তুলে তাকাল ড্যানিশ দেবানন্দ ও সুষ্মিতা বালাজীর দিকে। ঠোকে হাসি আহমদ মুসার। বলল, ‘ভাই সাহেব, আপপ, আমি কার দণ্ড নিজের মাথায় তুলে নিচ্ছি না। অন্যের প্রতি আমার দায়িত্বের কথা যখন ভাবি, নিজের প্রতি দায়িত্বের কথাও আমি মনে রাখি। আজ আমি যখন শাহ্ বানুদের সাহায্য করতে যাচ্ছি, তখন আমার নিজের প্রতি দায়িত্বের কথাও আমি অবশ্যেই ভাবছি। কিন্তু আমি আমাকে কতটুকু সাহায্য করতে পারবো, সেটা আল্লাহই ভাল জানেন।’

‘ধন্যবাদ ছোট ভাই, আপনার কথা বুঝেছি। কিন্তু শত্রুদের হাতে তুলে দেয়া কি আপনার নিজের প্রতি অবিচার নয়? এর পর দায়িত্ব পালন করবেন কিভাবে?’ বলল সুষ্মিতা বালাজী।

‘আমি জানি না কিভাবে, কিন্তু করব এটা আমি জানি। কঠিন বিপদের মধ্যে পদে পদে আমি আল্লাহত সাহায্য পেয়েছি, একনও আমি তাঁরই সাহায্য প্রার্থী।’

সুষ্মিতা বালাজী রুমাল দিয়ে চোখ মুছে বলল, ‘জানি আপনি আহমদ মুসা। মজলুম মানুষের জন্যেই আপনি আজ যাযাবর। ঈশ্বরের অফুরন্ত ভালোবাসা আপনার সাথে আছে। আমরা যা বলেছি সেটা আমাদের চাওয়া। কিন্তু আমাদের চাওয়া আহমদ মুসাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তবে খুশি হয়েছি যে, নিজের

প্রতি দায়িত্বের কথা আপনি ভুলে থাকেন না। আমাদের উদ্বেগের জবাব এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছেন। আপনাকে ধন্যবাদ।' থামল সুষ্মিতা বালাজী। শুকনো কণ্ঠ তার।

'যাবার ছাড়পত্র পেয়ে গেলে ছোট ভাই। আপনি এমন এক পাখি, যে গাছ তেকে একবার ওড়েন, সে গাছে আর ফিরো আসার সুযোগ হয় না, এটাই দুঃখ। এখন মনে হচ্ছে এই কয়টা দিন জীবনে না এলেই ভাল হতো। বিদ্যুৎ চমকের পর যে অন্ধকার নামে, সেটা আরও কষ্টকর।' ড্যানিশ দেবানন্দ তার কথা হাসি দিয়ে শুরু করলেও তার কণ্ঠ শেষে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'মনে রাখবেন ভাই সাহেব, আপনাদের আলোর জীবনে না নিয়ে এসে আমি আন্দামান থেকে উড়ব না।'

'এই উপত্যকাকে অন্ধকার করে নয় কিন্তু।' বলল ড্যানিশ দেবানন্দ।

'এনই উপত্যকা আজ নিজের আলোতেই আলোকিত। গোটা আন্দামান যদি এই উপত্যকা হতো তাহলে কতই না ভাল হতো!' আহমদ মুসা বলল।

'আপনাকে ধন্যবাদ ছোট ভাই উপত্যকাবাসীর পক্ষ থেকে। একটা কথা ছোট ভাই, এভাবে চলে গিয়ে কিন্তু দু'জন নতুন মুসলিম সদস্য হারালেন।' বলে হেসে উঠল ড্যানিশ দেবানন্দ।

'হারালাম কোথায়? তাঁরা তো মুসলিম সদস্য হয়ে গেছেন। এই উপত্যকায় তাদের রেখে গেলাম নতুন বিশ্বাসের আলো জ্বালাবার জন্যে।'

'কিন্তু তারা দু'জন তো এ ঘোষণা দেয়নি।' বলল ড্যানিশ দেবানন্দ।

'এটা ঘোষণার ব্যাপার নয়, বিশ্বাস ও মননের পরিবর্তনের বিষয় এটা। এই পরিবর্তন সংঘটিত হলে ঘোষণার ব্যাপার স্বতঃস্ফুর্তভাবেই ঘটে যায়। আমি জানি এ পরিবর্তন দু'জনের মধ্যে এসেছে। এরখন আপনাদের সাক্ষী মানছি, বলুন পরিবর্তন এসেছে কিনা।' আহমদ মুসা বলল।

'সুসি, অস্ত্র তো বুমেরাং হলো। এখন সাক্ষী দাও। কি বলবে, বল।' বলল ড্যানিশ দেবানন্দ।

হাসল সুষ্মিতা বালাজী। বলল, 'ভাই সাক্ষী দেবার পর বোনের সাক্ষী দেবার প্রয়োজন আছে? এখন আপনিই বলুন ছোট ভাইয়ের সাক্ষী আপনি গ্রহণ করছেন কিনা।'

'তোমরা ভাই-বোন দেখছি আমাকে ট্রাপে ফেলার চেষ্টা করছ।' বলল ড্যানিশ দেবানন্দ।

'আমরা ট্রাপে ফেললাম কোথায়।'

'আপনি না আগেই কনফেস করেছেন।' আহমদ মুসা বলল।

'কিভাবে?' ড্যানিনশ দেবানন্দ বলল।

'আপনি দু'জন নতুন মুসলিম সদস্য' হারাবার কথা বলেছেন। তার অর্থ এই যে, আপনারা দু'জন মুসিলিম সদস্য হয়ে গেছেন।' আহমদ মুসা বলল।

হেসে উঠল ড্যানিশ দেবানন্দ।

হাসি থামিয়ে মুহূর্তেই সে আবার গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, 'বিশ্বাসের পরিবর্তন জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সময়-সাপেক্ষ সিদ্ধান্তের ব্যাপারও। কিন্তু এ তত্বকতা কোনই কাজে লাগল না। আপনি এলেন এবং জয় করে নিলেন। আপনাকে ধন্যবাদ ছোট ভাই।'

'না ধন্যবাদ, মোবারকবাদ আপনাদের জন্যেই। সত্যকে এত দ্রুত চিনতে পারা, বুঝতে পারা এবং গ্রহণ করতে পারার শক্তিই আসলে ধন্যবাদযোগ্য।' আহমদ মুসা বলল।

'না ছোট ভাই, বিশ্বাস অশরীরী বস্তু।  ওকে দেখা যায় না, চেনা যায় না। এই অশরীরী গুণাত্বক বস্তুটি শরীরী রূপ নিয়ে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে মানুষের মধ্যে। আপনার মধ্যে আপনার ধর্মকে এমন জীবন্ত ও পরিপূর্ণরূপে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। শতদিন শত মাসের গড়া, দেখা ও অনুভব শত ঘন্টায় আমাদের হয়ে গেছে। ছাত্রজীবনে ও কর্মজীবনে ঢুকে অনেক মুসলমানকে আমরা দেখেছি, কিন্তু বিশ্বাসের এই রূপ আমরা দেখিনি। তাই তাদের দিখে চোখ ফিরানোরও সুযোগ হয়নি। শিক্ষার চেয়ে দৃষ্টান্ত বড়় শিক্ষার মধ্যে দৃষ্টান্ত থাকে না, কিন্তু দৃষ্টান্তের মধ্যে শিক্ষাও থাকে। সুতরাং আমাদের সৌভাগ্যমুখী পরিবর্তনের জন্যে ধন্যবাদ আপনারই প্রাপ্য।

'ওয়েলকাম ভাই সাহেব। এখন...।' কথা এগুতে পারল না। আমহদ মুসা। থেমে যেতে হলো।

সুস্মিতা বালাজী উঠে দাঁড়িয়ে কথার মাঝখানে বলে উঠেছে, ‘আসুন আমরা একসাথে প্রার্থনা করি। আপনার নামাজে দেখে নামাজের ট্রেনিং আমাদের হয়ে গেছে। ইন্টারনে থেকে ওজু ও নামাজের নিয়ম কানুন শিখছি, আরবীও শিখছি। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে নামাজ আমরা পড়তে শুরু করিনি। আনুষ্ঠানিক শুরুটা আপনিই উদ্বোধন করে দিয়ে যান।’

বলে সুস্মিতা বালাজী ছুটে গিয় পরিস্কার সাদা চাদর বিছানোর কাজে লেগে গেল।

আহমদ মুসা ও ড্যানিশ দেবানন্দও উঠে দাঁড়াল।

দু’জন ওজুর জন্যে এগুচ্ছিল। ড্যানিশ দেবানন্দ বলল, ‘ছোট ভাই আপনি হয়তো কতকটা রসিকতা করেই এই উপত্যকায় আলো জ্বালাদার দায়িত্ব আমাদের দিয়েছেন। কিন্তু আপনার কার্যক্রম আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। আমি একটা মহান কাজ পেয়ে গেছি ছোট ভাই। আমি খুশি হয়েছি।’

‘আল্লাহ আপনার সহায় হোন। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।’

তারা ওজুর জন্যে দু’জন দু’বেসিনে চলে গেল।

# ৫

পোর্ট ব্লেয়ারের বন্দর এলাকার কয়েক মাইল দক্ষিণে এবং কালিকট শহর এলাকার কয়েক মাইল উত্তরে এক নির্জন উপকূলে বোট নোঙর করল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা বোটটি টেনে উপরে তুলে একটা আড়ালে ঠেলে দিল। মনে মনে বলল, বোটটি শুধু অত্যন্ত সুন্দরই নয়, এর ইঞ্জিন অত্যান্ত পাওয়ারফুলও।

বোটটি ড্যানিশ দেবানন্দদের। ওদের মোট তিনটি বোটের মধ্যে সবচেয়ে ভালটাই আহমদ মুসাকে ওরা দিয়ে দিয়েছে। ওদের সাথে শলাপরামর্শ ও চিন্তা-ভাবনা করে সে নৌ পথে আসার সিদ্ধান্ত নেই। হেলিকপ্টার যোগাগের সুযোগ ঐ সময় তাদের ছিল না। সেখান থেকে গাড়ি নিয়ে পোর্ট ব্লেয়ারে আসার মতো রোড-কম্যুনিকেশণ নেই। আর ঐ রাতে ভাড়া গাড়িও মিলত না। এ প্রশ্ন তুলে সুষ্মিতা বালাজীই প্রস্তাব করে মটর বোটে নৌ পথে আসার।

এসব ভাবতে গিয়ে মনে ভেসে উঠল সুষ্মিতা বালাজীর ছবি। বিদায়ের সময় বোটটির জন্য কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়েছিল সুষ্মিতা বালাজীদের। সুষ্মিতা বালাজী কান্নাচাপা কণ্ঠে বলেছিল, 'বোটটার দামটাই যদি এভাবে চুকাতে চান তাহলে সম্পর্কটা ছিন্ন করে যান।'

আহমদ মুসা আর কোন কথা বলতে পারেনি। 'স্যরি আপা' বলে সালাম দিয়ে বিদায় নিয়েছে।

স্পীড বোটটি উভচর। আহমদ মুসা বোট চালিয়ে তীরে উঠে একটা ঝোপের আড়ালে রেখে বাইরে বের হয়ে আসার আগে অভ্যাসবশতই একটু স্পর্শ করে নিল পকেটে রিভলবারটা ঠিকঠাক আছে কিনা। আরেকটা ছোট্ট বিললবার আছে মোজার ভেতরে গুঁজে রাখা।

আহমদ মুসা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে চারদিকে তাকাল। শংকরাচার্যের নির্দেশনা অনুসারে উপকূল থেকে সামনে তাকালে দেখা যাবে

বিশাল মরা একটা মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। সে গাছটি ডানে রাখলে পাহাড়ে যে আঁকা-বাঁকা গলিপথ পাওয়া যাবে সেটা ধরে এগুতে হবে দু'আড়াই মাইল। গলিপথের একবারে নাক বরাবর মাথায় পাওয়া যাবে একটা ছোট পাহাড়, পাহাড়ের উপর মন্দির এবং মন্দিরের মাথায় একটি গৈরিক পতাকা। সে মন্দিরের উত্তর পাশে একটা 'সাদা মাইক্রো' দাঁড়ানো থাকবে। সেই মাইক্রোর খোলা দরজার সামনে হাত তুলে দাঁড়াতে হবে। দু'জন লোক বড়ি সার্চ করবে। তারপর উঠে বসতে হবে গাড়িতে কাঁটায় কাঁটায় সকাল ৮টায়।

আহমদ মুসা সামনে তাকিয়েই দেখতে পেল সেই মরা গাছ।

এগুতে লাগল আহমদ মুসা সেই গাছ লক্ষ্যে।

কয়েক গজ এগুতেই একটা গাড়ির শব্দ পেল আহমদ মুসা। শব্দটা আসছে সেই মরা গাছটির বাম দিক থেকে।

আহমদ মুসা একটা ঝোপের আড়ালে চলে গেল। আড়াল থেকে দেখতে পেল একটা নীল রঙের প্রাইভেট কার আসছে।

প্রাইভেট কারটি তার সামনে দিয়েই চলে গেল উপকূলের দিকে। ড্রাইভিং সীটের একজনকেই সে দেখতে পেল। লোকটির মাথায় ঝাঁকড়া চুল, গায়ে টি সার্ট। তাকে দেখে ভদ্রলোক মনে হলো না।

এই নির্জন উপকূলে লোকটি গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে কোথায়?

কৌতুহল দমন করতে পারলো না আহমদ মুসা। ঝোপের আড়াল ধরে গাড়ির পিছু পিছু ছুটল সে। উপকূল পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়াল গাড়িটি।

গাড়ি থেকে নামল ড্রাইভিং সীটের লোকটি। পেছনের সীটের দরজা খুলল। ভেতর থেকে পেনে বের করে আনল একজন লোককে। তারপর তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে চলল পানির দিকে।

আহমদ মুসা দেখল, লোকটি একজন স্বাস্থ্যবান যুবক। যুবকটি মৃত না সংজ্ঞাহীন বুঝতে পারলো না আহমদ মুসা। তাকে পাঁজাকোলা করে সাগরের দিকে নিয়ে যেতে দেখে ভাবল, লাশ সাগরে ফেলে দিতে এসেছে নিশ্চয়। কিন্তু আবার প্রশ্ন জাগল, লাশ শুধু সাগরে ফেলার জন্যে এতদূরে আনার দরকার কি!

হঠাৎ আহমদ মুসার মনে পড়ল আন্দামানে ডজন ডজন লোককে সাগরে ডুবিয়ে মারার কথা।

চমকে উঠল আহমদ মুসা। তাহলে লোকটি কি সংজ্ঞাহীন? তাকে মেরে ফেলতে নিয়ে যাচ্ছে?

আহমদ মুসা পকেট থেকে রিভলবার বের করে নিল। বের হয়ে এল ঝোপের আড়াল থেকে।

লোকটি তখন পানির ধারে চলে গেছে। ফেলে দিয়েছে সংজ্ঞাহীন লোকটিকে পানিতে। তারপর এগিয়ে যাচ্ছে পানিতে পড়া লোকটির দিকে।

আহমদ মুসার বুঝতে বাকি রইল না লোকটি এখন কি করতে চায়। সংজ্ঞাহীন লোকটিকে ডুবিয়ে রাখলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে তার মুত্যু ঘটবে। প্রমান হবে সে পানিতে ডুবে মারা গেছে।

গুলী করল আহমদ মুসা লোকটির হাঁটু লক্ষ্যে।

সাইলেন্সার লাগানো রিভলবার থেকে নিঃশব্দে বের হওয়া গুলী গিয়ে আঘাত করল লোকটির হাঁটুতে। লোকটি পেছনে ছিটকে এসে পড়ল উপকূলের মাটিতে।

গুলী করেই দৌড় দিয়েছে আহমদ মুসা উপকূলের পানির দিকে।

গুলী খেয়ে আহত লোকটি বাঘের মত চোখে সমস্ত বিষ ঢেলে তাকিয়ে আছে আহমদ মুসার দিকে।

'যেমন আছ ঠিক পড়ে থাক' বলে তার কোমরের বেল্টের রিভলবার খুলে নিয়ে সংজ্ঞাহীন লোকটিকে পানি থেকে তুলে আনল। তুলে আনতে গিয়ে আহমদ মুসা উপকূলটির অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করল। উপকূল ঢালু হয়ে পানি স্পর্শ করেছে, তারপর দু'তিন গজ পরেই হঠাৎ খাড়া হয়ে নিচে নেমে গেছে। পানির রং ঢেউয়ের প্রকৃতি দেখে বুঝা যায়, সাগর অত্যন্ত গভীর। আরও লক্ষ্য করল, পানি বরাবর উপকূলের মাটিগেরুয়া রঙ্গে রাঙা। এখানে পূজাও হয় নাকি?' ভাবল আহমদ মুসা।

হঠাৎ আহমদ মুসার খেয়াল হলো, 'ইমাম ও শিক্ষক ইয়াহিয়া আহমদুল্লার লাশও তো এখানেই পাওয়া গিয়েছিল। পানিতে ডোবা আগের

লাশগুলোও এখানে বা এ ধরনের স্থানেরই কি পাওয়া গিয়েছিল। তার মানে লাশগুলোকে কি সাগর দেবতাকে অর্ঘ হিসাবে পেশ করা হয়।

আহমদ মুসা লোকটিকে এসে তীরে শুইয়ে দিল। লোকটার গোটা শরীর ভিজে গিয়োছিল। এই ভিয়ে যাওয়াটা তার সংজ্ঞা ফিরে পাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে, ভাবল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা এগিয়ে গেল খুন করতে আসা লোকটির দিকে।

লোকটি আহত হাঁটু ধরে বসেছিল।

আহমদ মুসা কাছে যেতেই বলে উঠল, 'তুই কে জানি না। কিন্তু যা করছিস তাতে তোকে মরতে হবে।'

আহমদ মুসা কোন কথা না বলে তার দু'হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে পানির কিনারা থেকে অনেকটা উপরে নিয়ে এল। তার কপালে রিভলবার চেপে বলল, 'কিভাবে কেন মরতে হবে বল, তারপর ভাবব তোকে মারব কিনা।

'শুধু তোকে নয়, যাকে মারতে নিয়ে এসেছিলাম তাকেও মরতে হবে। আমাদের হাত থেকে কেউ ছাড়া পায়নি। বাঁচার উপায় তারও নেই।' বলল নির্ভিক কণ্ঠে।

আহমদ মুসা তার কপাল থেকে রিভলবারের নল একটু সরিয়ে গুলী করল লোকটির কানের বাইরের প্রান্ত লক্ষ্যে।

কানের একটা অংশ ছিঁড়ে গুলী চলে গেল।

লোকটি আর্তচিৎকার করে কান চেপে ধরল। এবার তার চোখে-মুখে ভীতির চিহ্ন ফুটে উঠল। বিস্ফোরিত চোখ তুলি তাকাল সে আহমদ মুসার দিকে।

গুলী করেই আহমদ মুসা রিভলবার নল ফিরিয়ে এনে তার কপালে চেপে ধরল। বলল, 'ঠিকতম উত্তর না দিলে এবার মাথা গুড়ো হয়ে যাবে। বল, তোরা কারা? কে তোদের নেতা? কি দোষ ঐ লোকটির?'

লোকটির চোখে-মুখে মৃত্যু ভয় উৎকটভাবে ফুটে উঠেছে। বলল,'নেতা কে আমি জানি না। আমাকে নির্দেশ দিয়েছে মহাগুরু শংকরাচার্য।'

আহমদ মুসাও এই উত্তরই আশা করছিল। বলল, 'এখন বল এই লোকটির দোষ কি? কে তাকে হত্যা করতে নিয়ে এসেছিলি?'

'আমি সেটা জানি না স্যার। সত্যি বলছি। আমি শুধু একটা নির্দেশ পালনের জন্যেই এসেছিলাম।'

'শংকরাচার্য কোথায়?'

'আমি জানি না স্যার। লর্ড মেয়ো রোডের প্রত্নতত্ব অফিসের সামনে দাঁড়ানো গাড়ি নিয়ে আমি এখানে চলে এসেছি। এই ছেলেটি ঐ গাড়িতে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ছিল।'

পুরাতত্ব অফিসের নাম শুনেই আহমদ মুসার মনে পড়ে গেল ড্যানিশ দেবানন্দের কথা। পুরাতত্বের সব অফিসকেই 'শিবাজী সন্তান সেনা'র তাদের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করছে। সুতরাং 'লর্ড মেয়ো রোড'-এর ঐ আস্তানা শংকরাচার্যের একটা ঘাঁটি  হতে পারে। সংজ্ঞাহীন ছেলেটির ওখান থেকে নেয়ার অর্থ হলেঅ, সংজ্ঞাহীন ছেলেটির জ্ঞান ফিরলে তার কাছ থেকেও কিছু জানা যেতে পারে। এ চিন্তার সাথে সাথেই আহমদ মুসা এ লোকটির পকেটে খোঁজ করে মোবাইল নিয়ে ফিরে এল সংজ্ঞাহীন ছেলেটির কাছে।

সংজ্ঞা এখনও ফেরেনি ছেলেটির।

ছেলেটির বয়স তেইশ-চব্বিশ বছর। আরবীয় আরয চেহারা। ফর্সা রং, কাল চুল, টানা চোখ, উন্নত নাক। গায়ে হালকা নীল সার্ট, পরণে নীল প্যান্ট। সব মিলিয়ে একটা অভিজাত চেহারা। বুঝাই যাচ্ছে মুসলমান।

তাড়াতাড়ি জ্ঞান ফেরানো দরকার। কি করা যায় এখন।

হঠাৎ মনে পড়ল আহম মুসার, ঐ লোকটার পকেটে মোবাইল এবং আরও অস্ত্র আছে কিনা খঁজে দেখার সময় একটা ছোট শিশিতে মদ দেখেছে।

কথাটা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আহমদ মুসা ছুটে গেল এবং লোকটির পকেটে থেকে মদের শিশি এসে ছিপি খুলে ছেলেটির নাকের সামনে ধরল।

নিঃশ্বাসের সাথে স্পিরিটের তীব্র গন্ধ প্রবেশ করল ছেলেটির নাক দিয়ে ভেতরে। নড়ে উঠল তার দেএঃ। মুহূর্ত কয়েক পর ছেলেটি চোখ খুলল। বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে তাকাল সে আহমদ মুসার দিকে। চারদিকে তাকাল সঙ্গে সঙ্গেই।

চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে এল আহমদ মুসার দিকে আবার। বলল দ্রুত কণ্ঠে, 'আমি এখানে কেন? আপনি কেন? ওরা গেল কোথায়?'

‘ওরা মানে যারা তোমাকে ধরেছিল তারা?

‘জি, হ্যাঁ।’

‘ওরা তোমাকে সংজ্ঞাহীন করে একজনকে দিয়ে পাঠিয়েছিল সাগরে তোমাকে ডুবিয়ে মারা জন্যে। আমি এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। তোমাকে বাঁচিয়েছি। বাঁ দিকে যে লোকটি পড়ে থাকতে দেখলে, সেই এনেছিলো তোমাকে পানিতে ডোবানোর জন্য। ওর হাঁটুতে আমি গুলী করেছি।’

‘আপনি কে? দেখে তো এশিয়ারই বলে মনে হচ্ছে।’ ছেলেটি উঠে বসতে বসতে বলল।

‘বলব সব, এখনি ওদিকে একটু চল। ওর সামনে সব কথা বলা যাবে না।’

বলে আহম মুসা উঠে দাঁড়াল এবং ছেলেটিকেও উঠতে সাহয্য করল। তারপর আহত লোকটির দিকে একটু ঘুরে বলল, ‘তুমি যেভাবে পড়ে আছ, সেভাবে থাকবে। পালাতে পারবে না, কিন্তু মরবে তার ফলে।’

আহমদ মুসা গাড়ির সিটে উঠল। পাশের সীটে উঠতে বলল ছেলেটিকে।

ছেলেটি উঠে বসলে আহমদ মুসা বলল, ‘এই গাড়িতে করেই তোমাকে নিয়ে এসেছিল।’

আহমদ মুসা গভীর দৃষ্টিতে তাকাল ছেলেটির দিকে। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে দ্রুত বলল, ‘দেখ আমার হাতে সময় খুব কম। দ্রুত উত্তর দেবে। প্রথম প্রশ্ন, তুমি মুসলিম নিশ্চয়। তুমি কি জান কারা তোমাকে ধরেছিল, কারা খুন করতে চায় এবং কেন?’

‘দুঃখিত, এই প্রশ্নগুলোর কোনটিরই উত্তর আমার জানা নেই।’

ছেলেটি একটা থেকে একটা ঢোক গিলেই আবার বলে উঠল, ‘কিন্তু আপনি জানলেন কি করে আমি মুসলামান?’

‘পরে বলব। আগে প্রশ্নের উত্তর দাও। তুমি কালকে বিদেশ থেকে এসেছ। তুমি ঐ পুরতত্ব অফিসে কেন গিয়েছিলে? কেন তোমাকে ওরা ধরল?’

‘আপনি কি করে জানলেন আমি কালকে বিদেশ থেকে এসেছি। আপনাকে কখনই দেখিনি আমি।’ বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে বলল ছেলটি।

‘পরে বলব, তুমি প্রশ্নের উত্তর দাও।’ গম্ভীর কণ্ঠ আহমদ মুসার।

ছেলেটি তাকাল আহমদ মুসার দিকে। আহমদ মুসার ব্যক্তিত্বের কাছে মুষড়ে পড়ল সে। বুঝল বাড়তি প্রশ্ন করা তার ভুল হয়ে গেছে। বলল সে ‘স্যরি স্যার। পুরাতত্ব বিভাগে আমার বন্ধু চাকরি করে। থাকেও সে অফিস সংলগ্ন বাড়িতে। আমি তারই খোঁজে গিয়েছিলাম।’

‘তারপর।’ বলল আহমদ মুসা।

‘তখন অফিস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অফিসের উত্তর পাশের অংশের বাড়িটাতেই আমার বন্ধু থাকতো। আমি দরজায় নক করে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছি। কেউ দরজা খুলল না। বুঝলাম বাসায় কেউ নেই। হতাশ হয়ে কি কি করব ভাবছি। এমন সময় একটা মাইক্রো এসে বাড়ির সামনে থামল। গাড়ি থেকে পাঁচ-ছয় জন নামল। তারা দু’জন মহিলাকে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যেতে লাগল। মহিলা দু’জনের মুখ টেপ লাগিয়ে বন্ধ করা। আমি দু’জন মহিলাকে চিনতে পারলাম। ছুটে গেলাম তাদের দিকে। বললাম, ‘কি দোষ এদের? আমি এদের চিনি। ওদের ছাড়ুন। শুনুন আমার কথা।’

ওদের মধ্যে লম্বা-চওড়া সর্দার গোছের একজন ওদের আগে আগে যাচ্ছিল। আমার কথা শুনেই সে দু’জনকে নির্দেশ দিল আমাকে ধরার জন্যে। সঙ্গে সঙ্গেই দু’জন এসে আমার উপর ঝাপিয়ে পড়ল। এসব ব্যাপার এত দ্রুত ঘটে গেল যে, আমার প্রতিরোধ করার সুযোগ হল না।’

‘ঐ দু’জন মহিলা কি একজন শাহ্ বানু, আরেকজন সাহারা বানু?’’

‘হ্যা। আপনি জানলেন কি করে?’ ছেলেটির চোখ বিস্ময়ে-বিস্ফারিত।

‘পরে বলব। উত্তর দাও প্রশ্নের।’

‘স্যরি স্যার। হ্যাঁ মহিলা দু’জন ওরাই ছিলেন।’

আহমদ মুসা দ্রুত ঘড়ির দিকে তাকাল। দেখল, ৮টা বাজতে এখনও এক ঘন্টা বাকি। মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল আহমদ মুসার। ভাবল সে, আমরা এখন সরাসরি সেই পুরাতত্ব অফিসে অভিযান চালাতে পারি। শংকরাচার্য ৮টার সময় জানবে যে আমি তাদের ফাঁদে পা দেইনি। এ খবর যে জানার আগেই আমরা তার কাছে পৌছে যাব। সুতরাং শাহ্ বানুদের উপর চড়াও হবার তাদের কোন সুযোগ

হবে না। অন্য কোনভাবে এ খবর সে আগে-ভাগে জানবে তারও সম্ভাবনা নেই। এই উপকূলে তাদের যে পাহারা নেই, তা বুঝাই যাচ্ছে। তাবে একটা প্রশ্ন আহমদ মুসার কাছে বড় হয়ে দেখা দিল, আমাকে এই উপকূলে মেরে ফেলার জন্যে। কেন?

চিন্তা করেই আহমদ মুসা চোখের পলকে গাড়ি ঘুরিয়ে সেই আহত লাকটির পাশে গিয়ে দাঁড়াল। গাড়ির জানালা দিয়ে লোকটির দিকে রিভলবার তাক করল।

লোকটি আর্তকণ্ঠে বলল, 'আমাকে মারতে পারে। কিন্তু তাতে কোন লাভ হবে না। আমি একজন হুকুম তামিলকারী মাত্র।'

'ঠিকআছে, গুলী করব না। কিন্তু একটা কথা বল, এই ছেলেটিকে হত্যা করার জন্যে শংকরাচার্য কি তোমাকে এই ঘাটেই আসতে বলেছিল, না অন্য কোথাও।' বলল আহমদ মুসা শান্ত কিন্তু শক্ত কণ্ঠে।

'আমার উপর নির্দেশ ছিল ঘাটে নিয়ে একে ডুবিয়ে মারার। অনেকগুলো ঘাট আছে। আমি এই ঘাটে এসেছি কারণ ঘাটটিতে আসার রাস্তা আরও দু'টি কাছের ঘাটের চেয়ে অনেক ভাল।'

'আরেকটা প্রশ্নের উত্তর দাও, যেখান থেকে গাড়ি নিয় এসেছ, সেই পুরাতত্ব অফিসে কখনও ঢুকেছ?'

'অনেক বার ঢুকেছি স্যার।'

'অফিসে কি আন্ডার গ্রাউন্ড কক্ষ আছে?'

'আছে স্যার। বাড়িটার অফিস অংশের উত্তর ও দক্ষিণ দু'পাশে দু'টি আবাসিক অংশ আছে। ঐ দু'অংশে দু'টি আন্ডার গ্রাউণ্ড কক্ষ আছে।'

'ধন্যবাদ।' বলে আহমদ মুসা গাড়ি আবার ঘুরিয়ে নিল। তার পর গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে লোকটিকে বলল, 'গাড়ি আমি নিয়ে গেলাম, সাড়ে ৭টা পর্যন্ত অপেক্ষা কর, গাড়ি পেয়ে যাবে।'

গাড়ি ষ্টার্ট দেয়ার আগে আহমদ মুসা ব্যাগ থেকে একটা ছোট ব্যান্ডেজ প্যাকেট লেকটির দিকে ছুড়ে দিল।

গাড়ি ছুটতে শুরু করল।

‘স্যার, এখানে আসবে কি ওকে গাড়ি ফেরত দেবার জন্যেই?’ বলল ছেলেটি।

‘সবই জানতে পারবে। আমার আরও প্রশ্ন আছে।’

ছেলেটি একবার আহমদ মুসারি দিকে তাকিয়ে চুপ করল। মনে মনে বলল, কি বিষ্মকর মানুষরে বাবা! সবজান্তার মত সবকিছুই জানে। চেহারা, চোখ-মুখ থেকে বুঝা যাচ্ছে খুব ভাল একজন মানুষ। কিন্তু রিভলবার হাতে নিলে মনে হচ্ছেতার কোন দয়া-মায়া নেই। আবার ব্যান্ডেজ দিয়ে আসা থেকে বুঝা যায় তার দয়া-মায়া আছে। আর তার সাথে একজন রাশভারী বড় ভাইয়ের মত অথবা একজন সেনা কমান্ডারের মত ব্যবহার করছে, তার শুধু হুকুমই পালন করতে হবে, প্রশ্ন করা যাবে না। তবে হুমুকের মধ্যে হৃদয়ের স্পর্শ আছে। ভাল লাগছে হুকুম তামিল করতে। বাঁচিয়েছে বলেইয়, তাকে দেখে এবং কথা শুনেই মনে হচ্ছে সে একজন হৃদয়বান অভিভাবক।

ছেলেটির ভাবসা ভেঙে দিয়ে উচ্চারিত হল আহমদ মুসার কণ্ঠস্বর। আমার তার প্রশ্ন ছেলেটিকে, ‘তুমি শাহ্ বানুদের চেন কিভাবে?’

‘শাহ্ বানুদের সাথে আমার ছোটবেলা থেকে পরিচয়। ওরা ভাই আহমদ শাহ্ আলমগীর আমার ছোটবেলার বন্ধু। আমাদের উভয় পরিবারের মধ্যে যাতায়াত ছিল। আমাদের বাড়ি পোর্ট ব্লেয়ারে। সেকেন্ডারী পাস করার পর আমি পড়ার জন্য লন্ডন চলে যাই। পরে আমার আব্ব-আম্মাও লন্ডন চলে গেছেন। ওখানেই সেটেলড। প্রতিবছর ছুটিতে আমি এখানে আসি। আমাদের পোর্ট ব্লেয়ারের বাড়ি ভাড়া দেয়া আছে। আমি শাহ্ বানুদের বাড়িতেই উঠতাম। আহমদ শাহ্ আলমগীর নিখোঁজ হওয়ার খবর আমি সাত আটদিন আগে পেয়েছি। খবর পেয়েই আমি চলে এসেছি। প্লেন থেকে নেমে সোজা শাহ্ বানুদের বাসায় চলে যাই। শাহ্ বানুদের পায়নি। কেউ সঠিক কিছু বলতে পারল না। পুরাতত্ব অফিসের আমার সেই বন্ধু আহমদ শাহ্ আলমগীরের ভাল বন্ধু। এ জন্যেই তার কাছে গিয়েছিলাম সে কিছু বলতে পারে কিনা জানার জন্যে।’

‘শুধু তাদের খোঁজ নেবার জন্যেই লন্ডন থেকে এসেছ?’’

‘জি হ্যাঁ। একদিকে আহমদ শাহ্ আলমগীরের চিন্তা অন্যদিকে তার পরিবারের চিন্তা আমাকে উদ্বগ্ন করে তুলেছিল।’

‘এখন তুমি মুক্ত, কি করবে চিন্তা করেছ?’

‘আমি গতকাল যা দেখেছি সে ব্যাপারে পুলিশকে খবর দেব। পুলিশকে নিয়ে ঐ বাড়িতে যাব।’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘জান সবচেয়ে সংরক্ষিত আন্দামানের গভর্নরের বাড়িতে তাদেরকে রেখেছিলাম। সেখান থেকে তাদের কিডন্যাপ করা হয়েছে। পুলিশের সহযোগতা ছাড়া এটা হয়নি।’

‘ছেলেটির চোখে-মুখে অনেক কৌতুহল ও অনেক প্রশ্ন ফুটে উঠতে দেখা গেল। সে প্রশ্নের জন্যে মুখও খুলেছিল। কিন্তু চেপে গেল। ধীরে ধীরে তার চেহারায় ফুঠে উঠল হতাশার চিহ্ন। বলল, ‘তাহলে কি হবে?’

‘কেন, উদ্ধারে আমরা যেতে পারি না?’ বলল আহমদ মুসা।

‘আমি, আপনি দু’জনে?’ বলল ছেলেটি বিস্ময়ে চোখ কপাল তুলে।

‘কেন তুমি গুলী চালাতে জান না?’

‘রিভলবার, বন্দুক হাতে নিলেও কোন মানুষকে লক্ষ্য করে কোন দিন গুলী করিনি।’

‘তাহলে শাহজাদী উদ্ধার হবে কিভাবে? আর কিছুটা অন্তত যুদ্ধ করতে না জেনে তুমি মোগল পরিবারের জামাই হবে কি করে।’ আহমদ মুসার ঠোঁটে মিষ্টি হাসি।

ছেলেটি চমকে উঠে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। তার চোখে-মুখে প্রথমে বিব্রতভাব, তারপর লজ্জায় ঢেকে গেল তার চেহারা। পরে লজ্জা সরে গিয়ে সেখানে ফুটে উঠল যন্ত্রণার একটা ম্লানিমা। বলল, ‘স্যার আপনি বিস্মকর এক মানুষ। আপনি অবশ্যই সব জানবেন। আপনি ঠিকই বলেছেন। যে যুদ্ধ জানে না, সে একজন শাহজাদীকে জয় করবে কি করে? এই কথাটা এতদিন আমি বুঝিনি বলেই মনে কষ্ট পেয়েছি স্যার।’

ছেলেটির মনে যন্ত্রণা আহমদ মুসাকেও স্পর্শ করল। বেদনার একটা ছায়া নামল আহমদ মুসার চোখে-মুখে। বলল সে, 'আমি ওটা রসিকতা করে বলেছি। তুমি শাহ্ বানু......।' কথা শেষ করতে পারলনা আহমদ মুসা।

ছেলেটি বলল, 'ঠিক স্যার।'

'আসলে সে কি জানে তুমি তাকে কামনা কর?'

'অবশ্যই সে বুঝে স্যার। কিন্তু সব সময়ই সে পাথরের মত ঠাণ্ডা। তার সাথে কথা-বার্তা সবই হয়। কিন্তু তার চোখে কোনদিন বিশেষ দৃষ্টি দেখিনি। খুব সাধারণ চোখে সে আমকে দেখে থাকে।' বলল ছেলেটি ম্লান কণ্ঠে।

'আচ্ছা থাক এ প্রসঙ্গ। তুমি ভেব না, আমি দেখব ব্যাপারটা। এখন বল তোমর নাম কি?' তোমর পরিচয়ই তো জানা হয়নি।'

'আমার নাম তারিক মুসা মোপলা। বলল ছেলেটি।

'বাঃ সুন্দর নাম। আমার নামের সাথে মিল আছে। আবার তোমার নামের সাথে ইসলামের দু'মহান সেনাপতি 'তারিক' ও 'মুসা'র নাম যুক্ত হয়েছে। কিন্তু বল 'মোপলা' শব্দটা যোগ হল কেন? তোমরা দক্ষিণ ভারতের মালাবার (কেরালা) অঞ্চলের মোপলা জনগোষ্ঠীর বলেই কি?'

'তা তো বটেই স্যার। তাছাড়া আরও একটা দিক আছে। আব্বা বলেন, গৌরবময় একটা স্মারক হিসেবে মোপলা নামটা আমরা ধারণ করে আসছি। মোপলা শব্দটি মূলত 'মক্কা পিল্ল'। যার অর্থ মক্কাবাসী। আমাদের পূর্ব পুরুষরা মক্কা থেকে ব্যাবসায় ও ধর্ম প্রচারের মিশন নিয়ে এসে মালাবার অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। তারা 'মক্কা পিল্ল' বা 'মক্কাবাসী' হিসেবে পরিচিত ও সম্মানিত হতেন। মক্কা পিল্লাই আজকের 'মোপলা'। মোপলা নাম ধারণের মাধ্যমে মহান এক অতীতকে জীবিত রাখতে চাই আমরা।'

'তোমরা আন্দামানে কেন? তোমাদের পূর্ব পুরুষরা বৃটিশ বিরোধী যুদ্ধে যুক্ত ছিল সেজন্যে?

'আমার দাদা এবং তাঁর আরও এক চাচা বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অপরাধে দীপান্তর দণ্ড লাভ করে ১৯২২ সালে আন্দামানে আসেন। আমার দাদার আব্বা আবদুল্লাহ আলী মোপলা ছিলেন মালাবারের এক প্রভাবশালী সর্দার।

আমাদের বাড়ি ছিল মালাবারের তখনকার এক বন্দর 'মুজিরিস' (কেন্নানুর) শহরে। আমার দাদার আব্বা উক্ত আবদুল্লাহ আলী মোপলা মালাবারের ওয়ালুভানদক অঞ্চল থেকে বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংগঠিত করার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এভাবে একেকটা অঞ্চল একেকজন সরদারের হাতে দেয়া হয়েছিল। শুরুতেই বৃটিশরা ওয়ালুভানদক থেকে আমার দাদার আব্বা এবং এরনাদ অঞ্চলের সর্দারকে গ্রেফতার করে। তার ফলে যুদ্ধ দ্রুত শুরু হয়ে যায়। এরনাদ ও ওয়ালুভানদক তথা গোটা মালাবার স্বাধীনতা ঘোষণা করে। যুদ্ধ শেষে যে এক হাজার জনের ফাঁসি হয় তাদের মধ্যে আমার দাদার আব্বা আবদুল্লাহ আলী মোপলা ছিলেন। হাজার হাজার নিহতের মধ্যে আমার দাদার আব্বার তিন ভাই ছিলেন। গোটা পরিবারের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল আমার দাদার আব্বা এবং তার এক চাচা। তারা আন্দামানে দ্বীপান্তর দণ্ড লাভ করেন। মালাবারের দুই হাজার মোপলা মুসলমান দ্বীপান্তর দণ্ড লাভ করে আন্দামানে আসেন।'

'শাহ বানুর মা সাহারা বানুও তো মোপলা মেয়ে।'

'জ্বি স্যার। ১৯২১ সালে মালাবারে বৃটিশ বিরোধী যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে যুদ্ধ সংগঠিত করার অভিযোগে মালাবারের এরনাদ এলাকার যে সরদারকে গ্রেপ্তার করা হয় তার নাম আবু বকর আবদুল্লাহ। তারও ফাঁসি হয়। তার ছেলে ওমর ফারুক আবদুল্লাহ আন্দামানে দ্বীপান্তর দণ্ড লাভ করেন। এই ওমর ফারুক আবদুল্লাহরই নাতনি মুহতারামা সাহারা বানু।'

'সাহারা বানু তো ইরানী নাম। অবশ্য জানি না মোগল বা মোপলাদের মধ্যে এ ধরণের নাম আছে কিনা।' আহমদ মুসা বলল।

'মোগলদের মধ্যে আছে স্যার। মোপলাদের মধ্যে নেই। আসল ব্যাপার হলো মুহতারামা সাহারা বানুর আব্বা হায়দরবাদে পড়ার সময় একজন ইরানী সহপাঠিনীকে বিয়ে করেন। সেখোন থেকেই মোপলাদের মধ্যে এ নাম এসেছে।'

'ধন্যবাদ তারিক। তোমার কাছে অনেক কিছু জানলাম। শাহ বানুদের এত কিছু জিজ্ঞাসার সুযোগ হয়নি।'

বলে আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকাল। বলল, 'বিরাট একটা ঝুঁকি নিয়েছি তারিক। তোমার বন্ধুর সেই পুরাতত্ব অফিসে শংকরাচার্য ও শাহ বানুদের

পেতেই হবে। তা না হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। আমি দু'কুলই হারাবো।' গম্ভীর কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

উদ্বেগ দেখা দিল তারিকের চেহারায়। বলল, 'আমি জানতে পারি কি ঘটনা?'

'হ্যাঁ জানতে পার' বলে আহমদ মুসা সংক্ষেপে তার আন্দামানে আসার উদ্দেশ্য এবং এ পর্যন্ত কি ঘটেছে তার বিবরণ দিয়ে বলল, গতকাল রাতে শংকরাচার্য আমাকে হুমকি দিতয়েছে আমি যদি আজ সকাল ৮টায় তাদের কাছে আত্মসমর্পণ না করি, তাহলে শাহ বানু ও সাহারা বানুদের লাঞ্চিত করা হবে, তাদের পবিত্রতা নষ্ট করা হবে। আমি আত্মসমর্পণের জন্য তাদের নির্দেশিত জায়গা ঐ উপকূলে সকালেই এসে নেমেছি। ওখান থেকে দু'আড়াই মাইল পশ্চিমে একটা নির্দিষ্ট স্থানে একটা গাড়ি আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমাতে ঠিক ৮টায় গাড়িতে গিয়ে শংকরাচার্যের লোকদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। ঐ গাড়ি আমাকে বন্দী করে নিয়ে যাবে শংকরাচার্যের কাছে। আমি উপকূলে নেমে ঐ গাড়ির দিকেই যাত্রা করেছিলাম। এমন সময় তোমার ঘটনা ঘটল। তোমাকে যে পদ্ধতিতে ওরা হত্যা করতে চেয়েছিল, সেটা দেখে আমার সন্দেহ হয়েছিল শংকরাচার্য এ ঘটনার সাথে জড়িত। তারপর যখন আহত ঐ লোকটির কাছ থেকে শুনলাম পুরাতত্ব অফিস থেকে তোমাকে গাড়িতে করে নিয়ে এসেছে, তখন আমার সন্দেহ দৃঢ় হলো। পরে তোমার কাছ থেকে নিশ্চিত জানলাম যে শাহ বানু ও সাহারা বানুকে ঐ পুরাতত্ব অফিসেই তোলা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি আত্মসমপর্ণের সিদ্ধান্ত বাতিল করে আত্মসমপর্ণের সময়ের আগেই শাহ বানুদের উদ্ধারের সিদ্ধান্ত নিলাম। এখন আত্মসমপর্ণের সময়ের মধ্যে আত্মসমর্পণ করিনি, এ খবর শংকরাচার্যের কাছে পৌঁছার আগে আমাদের শাহ বানুদের কাছে পৌঁছতে হবে। ওদের না পাওয়ার কথা ভাবতেই পারছিনা আমি।'

তারিক অপলক চোখে তাকিয়ে ছিল আহমদ মুসার মুখের দিকে। সব আতংক, বিসস্ময় ও বিমুদ্ধতা এসে ঘিরে ধরেছিল তারিক মুসা মোপলাকে। সে আতংকিত হয়ে পড়েছিল শাহ বানুদের সম্ভাব্য পরিণতির কথা শুনে। বিস্মিত

হয়েছিল আন্দামানে আহমদ মুসার রোমঞ্চকর কাহিনী শুনে। বিমুগ্ধ হয়েছিল শাহ বানুদের স্বার্থে নিজেকে শত্রুর হাতে তুলে দেবার আহমসদ মুসার ত্যাগ দেখে।

আহমসদ মুসার থামার পরেও অনেকক্ষণ কথা যোগালনা তারিকরে মুখে। একটু পর বলল, 'স্যার, রাতে ওরা অবশ্যই ওখানে ছিল। এত সকালে কোথাও স্থানান্তর করার কথা নয়, বিশেষ করে যখন আপনার সকাল ৮টায় আসার কথা। এখন মনে পড়ছে স্যার, ক্লোরোফরম করে আমাকে সংজ্ঞাহীন করা হয় সকালে। তার আগে একজন লোক আমাকে বলেছিল, তুই মরতে এসেছিলি কেন? যাদের বাঁচাতে এসেছিলি, তারা কিন্তু বেঁচে আছে, মরতে হবে তোকে। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ওদের কোন ক্ষতি হবে না তো? লোকটি বলেছিল, ওদের বাঁচিয়ে রাখা হবে অবশ্যই। ধরা হয়েছে বড় টোপ হিসেবে। টার্গেট শিকার না হওয়া পর্যন্ত তারা থাকবে। সুতরাং আমি মনে করি স্যার, ওঁদের পাওয়া যাবে।'

'তোমার কথা সত্য হোক।' বলল আহমদ মুসা।

গাড়ি প্রবেশ করেছে পোর্ট ব্লেয়ার শহরে।

প্রবেশ করল লর্ড মেয়ো রোডে।

কিছুক্ষণ চলার পর তারিক বলল, 'আমরা এসে গেছি স্যার। সামনে বাঁ দিকের পুরনো বাড়িটাই পুরাতত্ব অফিস। বৃটিশ আমলে এই বাড়িটা ছিল আঞ্চলিক গোয়েন্দা অফিস।'

আহমদ মুসা বাড়িটা থেকে ২শ গজ দক্ষিণে একটা বাড়ির সামনে রাস্তা ঘেঁষে দাঁড়ানো কাঁঠাল জাতীয় একটা গাছের নিচে গাড়ি দাঁড় করাল। সেখান থেকে পুরাতত্ব অফিস বাড়িটার পেছনে দিকেরও অনেকখানি দেখা যায়। আহমদ মুসা একটু ভেবে নিয়ে বলল, অফিস বিল্ডিংসহ দু'টি আবাস গৃহের কোনটিতে কি পেছনে ইমারজেন্সী এক্সিটের মত কোন দরজা আছে?'

তারিক মনে করার চেষ্টা করে বলল, 'স্যরি। আমি জানিনা। বাড়িগুলোর পেছনের দিকে কোন সময় যাওয়া হয়নি।'

'অল রাইট। আমি খুঁজে নেব। থাকলে পাওয়া যাবে।'

একটা বাক্যে কথাটার ইতি টেনে আহমদ মুসা পায়ের মোজায় গুঁজে রাখা এবং পকেটে রাখা দু'টি রিভলবার বের করে দেখল সম্পূর্ণ গুলি ভর্তি আছে

কিনা। তারপর উপকূলে আহত লোকটার কাছ থেকে নেয়া রিভলভারটিতেও পাঁচটা গুলি ঠিকঠাক রয়েছে দেখল। এই রিভলবারটি আহমদ মুসা মাথার নিচে ঘাড়ে জ্যাকেটের কলারের বিশেষ পকেটে রাখল। কাজটা শেষ করে ঘুরল তারিকের দিকে।

তারিক অপলক চোখে আহমদ মুসার যুদ্ধসাজ দেখছে। তার মুখ বিস্ময় ও উদ্বেগে ভরা।

আহমদ মুসা নিজের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, 'শোন তারিক, এখন ৭টা বেজে ৩৫ মিনিট। তুমি ঠিক আটটার সময় পুরাতত্ব অফিস-বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করবে। এর মধ্যেই ইনশাআল্লাহ ফিরে আসব। আর যদি না..............।'

কথা শেষ করতে পারলনা আহমদ মুসা। তারিকের ডান হাত ছুটে এসে আহমদ মুসার মুখ চেপে ধরেছে। বলল তারিক, 'স্যার, অবশিষ্ট কথাটা বলবেন না। আল্লাহ এ রকম করবেন না।' অশ্রুতে ছল ছল করছিল তারিকের দু'চোখ। তার কথার সাথে দু'ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল তার দু'গণ্ড বেয়ে।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'ঠিক আছে বললাম না।'

আহমদ মুসা তারিকের পিঠ চাপড়ে সান্তনার সুরে বলল, 'অশ্রু মুছে ফেল তারিক। এটা যুদ্ধক্ষেত্র। ইসলামের মহান সেনাপতি তারিক বিন যিয়াদ নিজেদের সব জাহাজ পুড়িয়ে ফেলে পিছু হটার পথ বন্ধ করে স্পেনের রণাঙ্গনে প্রবেশ করেছিলেন। সেই সেনাপতির নামে তোমার নাম। তোমাকে ভাবতে হবে, ন্যায়ের স্বার্থে অন্যায়ের প্রতিবাদে গোটা পৃথিবীর বিরুদ্ধে আমি শির উঁচু করে দাঁড়াব। মনে রেখ অশ্রু মানুষকে দুর্বল করে।'

'কিন্তু গোটা দুনিয়ার বিরুদ্ধে বা পরাশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই তো চলেনা।'

'লড়াই করার দরকার নেই। তুমি তাদের সাথে একমত নও, এটা জানিয়ে দিতে হবে। এটা্ই শির উঁচু করে দাঁড়ানো।'

'এতে কিন্তু বিজয় আসবেনা এবং অন্যায়ের প্রতিবিধান হবে না।'

'বিজয় আসবেনা, কিন্তু আখেরাতে তোমার মুক্তি নিশ্চিত হবে। বিজয়ের ভাবনা তোমার নয়, আল্লাহর। বিজয় দেয়ার সময় হয়েছে কি হয়নি, এটা ঠিক

করা একমাত্র তারই এখতিয়ার। এটা যদি তোমার ঈমান হয়, তাহলে দেখবে হতাশা কোন সময়ই স্পর্শ করবেনা তোমাকে এবং কাজ করার শক্তি ও উৎ'সাহ বহুগুণ বাড়বে। বিজয়ের চিন্তাই যে মানুষকে, বিজয় না আসা এ ধরণের মানুষদের দুর্বল ও হতাশাগ্রস্থ করে এবং এই হতাশাগ্রস্থততাই তাকে পথভ্রষ্ট করে চরমপন্থার দিকে নিয়ে যায়। সুতরাং তোমার দায়িত্ব শতভাগ পালন করেছ কিনা সেটা দেখবে। সবাই তার দায়িত্ব শতভাগ পালন যদি করে, তাহলে এক সময় আল্লাহর দেয়া বিজয় আপনাতেই এসে দ্বারে করাঘাত করবে।'

বলে আহমসদ মুসা সালাম দিয়ে গাড়ি থেকে নামল।

সোজা ফুটপাতে উঠে গেল।

চলতে লাগল গাছতলা দিয়ে সোজা পশ্চিম দিকে।

পলকহীন চোখে তারিক তাকিয়ে আছে আহমদ মুসার দিকে। বুঝল সে, তার স্যার একটা দূরত্ব পর্যন্ত পশ্চিমে এগিয়ে তারপর পুরাতত্ব বাড়ির পেছনে যাবার পথ ধরবে।

তারিক ঘড়ির দিকে তাকাল। ৭টা ৩৭ মিনিট। আর ২২ মিনিট হাতে আছে। সামনে থেকে হর্নের শব্দ কানে এল তারিকের। ঘড়ির দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে সে তাকাল সামনের দিকে। দেখতে পেল, পুরাতত্ব বাড়ির সামনে একটা মাইক্রো এসে দাঁড়িয়েছে। তার দেখা গতকালকেরেই সেই মাইক্রোই।

হঠাৎ বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল তারিকের। সতর্ক হয়ে উঠল সে।

পরক্ষণেই মাইক্রো থেকে পাঁচ ছয় জন লোক নেমে মাইক্রোর গেট খোলা রেখে গেটের সামনে দু'ভাগ হয়ে দাঁড়াল।

তারিক বুঝল মাইক্রোতে কাউকে এনে উঠানোর জন্য তারা অপেক্ষা করছে।

'তাহলে কি শাহ বানুদের আবার..................।' এতটুকু চিন্তা আসতেই আঁৎকে উঠল সে।

সে তৎক্ষণাৎ গাড়ির দরজা খুলে নেমে প্রাণপণে ছুটল আহমদ মুসার দিকে। ছুটার সাথে সাথে সে 'স্যার', 'স্যার' বলে চিৎকার করছে।

আহমদ মুসার কানে পৌঁছেছে তারিকের ডাক। দ্রুত সে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ডান শোনার সাধে সাথে তার মনে শংকা জেগেছে।

আহমদ মুসা দেখল তাকে ঘুরতে দেখে তারিক হাত দিয়ে ইঙ্গিত করছে পুরাতত্ব অফিসের সামনের দিকে।

ইঙ্গিত দেখেই ভ্রুকুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার। তাহলে কি শাহ বানুদের কোথাও সরিয়ে নিচ্ছে! তারিকের পাগলের মত ছুটা ও চিৎকারের এটাই তো অর্থ হতে পারে।

এবার ছুটল আহমদ মুসা তাদের গাড়ির কাছে ফিরে আসার জন্যে।

তারিক থমকে দাঁড়িয়েছে।

আহমদ মুসা তার কাছাকাছি আসতেই সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'স্যার, পুরাতত্ব অফিসের সামনে মাইক্রো। কাউকে গাড়িতে তোলার আয়োজন করছে।'

আহমদ মুসা কিছু না বলে তার ছুটা অব্যাহত রাখল।

গাছের তলা পর্যন্ত আসতেই আহমদ মুসা দেখতে পেলো, কয়েকজন কাউকে টেনে-হেঁচড়ে গাড়িতে তুলছে। পাশে ওদেরই আরও লোক দাঁড়িয়ে থাকায় পরিষ্কার দেখা গেলনা, কিন্তু কাপড়-চোপড়ের যে অংশ বিশেষভাবে দেখা গেল তাতে একাধিক মহিলাকে গাড়িতে উঠানো হচ্ছে তা নিশ্চিত।

আহমদ মুসা ছুটে এসে গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসল। তারিক এসে বসল পাশে। মাইক্রো তখন স্টার্ট নিয়ে ফেলেছে।

এদিকেই মাইক্রোটি গড়াতে শুরু করেছে। তার মানে মাইক্রোটি দক্ষিণে কোথাও যাবে।

খুশি হলো আহমদ মুসা মাইক্রোটিকে এদিকে আসতে দেখে। সিদ্ধান্ত সে নিয়ে নিয়েছে, এখানেই সে আটকাবে মাইক্রোটিকে।

মাইক্রোটি আসছে।

রাস্তাটি বেশ প্রশস্ত।

আহমদ মুসা রাস্তার পশ্চিম পাশে ফুটপাত ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। আর মাইক্রোটি আসছে রাস্তার পূর্ব পাশ দিয়ে। মাইক্রোটি আহমদ মুসার গাড়ির সমান্তরালে এলে দু'গাড়ির মধ্যকার দূরত্ব দাঁড়াবে বিশ গজের মত।

পরিকল্পনা করে ফেলল আহমদ মুসা।

দু'হাতে দুটি রিভলবার তুলে নিল আহমদ মুসা। দু'তর্জনি দু'ট্রিগারে রেখে অপেক্ষা করতে লাগল সে।

মাইক্রোটি এসে পড়েছে। মাইক্রোর ভেতরের অবয়বগুলো এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ড্রাইভারের পাশের জানালায় কাঁচ নামানো। সামনের সীটে আছে দু'জন, মাঝের সিটে তিনজন এবং পেছনের সিটে শাহ বানু ও সাহারা বানুকে নিয়ে ৪ জন।

মাইক্রোর দু'টি দরজাই পূব দিকে।

আহমদ মুসা গাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে এল। রিভলবার ধরা দু'হাত তার পেছনে।

মাইক্রোটি আহমদ মুসার গাড়ির সমান্তরালে এসে যাচ্ছে।

'তারিক তুমি গাড়িটা রাস্তার ওপাশে মাইক্রোর পেছনে নিয়ে আসবে।'

মুখের কথা শেষ হবার সাথে সাথেই রিভলবার ধরা তার দু'হাত উপরে উঠেছে। দু'রিভলবারের গুলি তার একসাথেই বেরিয়ে গেল। তার ডান হাতের রিভলবার গুলি করেছে মাইক্রোর সামনের ডান দিকের চাকায় আর বাম হাতের রিভলবারের গুলী গিয়ে বিদ্ধ করেছে ড্রাইভারকে।

গুলীর রেজাল্ট না দেখেই আহমদ মুসা বাঘের মত দীর্ঘ এক লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ে চরকির মত নিজের দেহটা মাটির উপর গড়িয়ে রাস্তার ওপাশে চলে গেল।

মাইক্রোতে ফুল স্পীড ছিলনা। গুলী খাওয়ার পর মাইক্রোটি প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে কাত হয়ে গিয়ে আবার এঁকে-বেঁকে একটু সামনে এগিয়ে ফুটপাতের সাথে ধাক্কা খেয়ে মুখ থুবড়ে থেমে গেল।

মাইক্রো থামলেও মাইক্রোর ভেতরের লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল না। গাড়ির ঝাঁকুনিতে ধাক্কায় নাকাল হওয়া, আকস্মিক আক্রমণে বিমূঢ় হয়ে পড়া

এবং শত্রুর অবস্থান সম্পর্কে বিভ্রান্তি এসব কারণে তাদের বের হতে বিলম্ব হলো। অন্যদিকে আহমদ মুসা মাইক্রো দাঁড়াবার সাথে সাথেই গড়িয়ে গিয়ে মাইক্রোর পেছনে অবস্থান নিল।

মাইক্রো থেকে বের হতে ওরা দেরি করলেও হুড়মুড় করে ওরা অবার একসাথেই ৬ জন বেরিয়ে এল।

ওরা বেরিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবার আগেই আহমদ মুসা গাড়ির পেছনে বসা অবস্থা থেকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, যাতে ওদের সবাইকে চোখের সামনে আনা যায়।

আহমদ মুসাকেও ওরা দেখতে পেল।

আহমদ মুসার দু'হাতের রিভলবার তাক করা ছিল ওদের দিকে।

কিন্তু বেপরোয়া ওরা ওদের হাতের রিভলবার তুলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে। দু'রিভলবার দিয়ে ছয়জনকে তাক করা যায়না, এ ধারণাই কাজ করেছিল তাদের মধ্যে। কিন্তু হাতের রিভলবার টার্গেট পর্যন্ত তোলা ও গুলী করার জন্যে যে সময়ের প্রয়োজন তাতে দু'রিভলবার কেউ কেউ ছয়জন কেন তারও বেশি লক্ষ্যভেদ যে করতে পারে, সেটা তাদের বিবেচনায় আসেনি।

এর ফল তাদের ভোগ করতে হলো। আহমদ মুসার দু'রিভলবার পাখির মসতো শিকার করল ওদের ছয়জনকে।

ছয় গুলী শেষ করেই আ্হমদ মুসা তাকাল গাড়ির ভেতরে শাহ বানুদের অবস্থা দেখার জন্যে। দেখতে পেল শাহ বানু ও তার মা দু' জনেই আহমদ মুসার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে আছে। সাহারা বানুকে আহত দেখল আহমদ মুসা। তার কপাল সম্ভবত থেঁতলে গেছে। সেখান থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়তে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এর পরেও দু'জনেরই মুখ ভরা আনন্দ এবং চোখ উপচানো খুশির ঔজ্জ্বল্য।

আহমদ মুসা দ্রুত খোলা দরজার সামনে গিয়ে একটু নিচু হয়ে বলল, 'খালাম্মা তাড়াতাড়ি নেমে পড়ুন, শাহ বানু এস।'

আহমদ মুসা ধরে ওদের নামিয়ে আনল।

এ সময় তারিকও গাড়ি এনে মাইক্রোর পেছনে দাঁড় করাল।

গাড়ি দাঁড় করিয়েই গাঁড়ি থেকে নামল তারিক। খুলে দিল পেছনের দরজা।

আহমদ মুসা শা বানু ও সাহারা বানুকে ধরে গাড়ির দিকে আনছিল।

শাহ বানু ও সাহারা বানুর চোখে-মুখে আনন্দের ঔজ্জ্বল্য ফিরে এলও তাদের শরীরের আতংকজনিত ভেঙে পড়া অবস্থা যায়নি। তারা দাঁড়াতে গিয়েও কাঁপছিল।

আহমদ মুসা ওদেরকে গাড়িতে বসিয়ে দিতে দিতে বলল, ‘তারিক তুমি রিভলবারগুলো কুড়িয়ে আন, কুইক।’

আহমদ মুসা দ্রুত গিয়ে ড্রাইভিং সিটে বসল।

তারিকও রিভলবার কুড়িয়ে এনে আহমদ মুসার পাশের সিটে বসল।

এলাকাটি অফিস এলাকা হলেও এবং অফিসের সময়ের দেড় ঘণ্টা বাকি থাকলেও বেশ দূরত্বে দু’চারজন জমা হয়ে গেছে।

আহমদ মুসা তাকাল পুরাতত্ব অফিসের দিকে। ওরা জানতে পেরেছে কিনা, দেখতে পেয়েছে কিনা- এটা একটা বড় বিষয়।

আহমদ মুসা দেখতে পেল অফিসের সামনে দু’জন লোক দাঁড়িয়ে আছে। আরও দু’জন ভেতর থেকে ছুটে এল। তারপর চারজনেই ছুটল অফিসের গাড়ি বারান্দায় দাঁড়ানো জীপরে দিকে।

আহমদ মুসার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল। ওরা চারজন তাহলে জীপ নিয়ে তাকে ফলো করবে। ওদের মধ্যে শংকরাচার্য নেই। এখানে মৃত ছয়জনের মধ্যেও শংকরাচার্য নেই। সে তাহলে গেল কোথায়?

আহমদ মুসা আপাতত এ ভাবনা রেখে পায়ের পাশ থেকে একটা ব্যাগ তুলে পেছন দিকে এগিয়ে ধরে শাহ বানুদের উদ্দেশ্যে বলল, ‘শাহ বানু ব্যাগে দেখ ফাস্ট এইডের জিনিস রয়েছে। খালাম্মার আহত জায়গাটায় ফাস্ট এইড লাগাও।’

‘আমরা ভাল আছি বেটা। আমাদের কথা ভেবনা। নতুন জীবন পেয়েছি। কোন কষ্টই কষ্ট নয়।’ বলল সাহারা বানু।

আহমদ মুসার গাড়ি লর্ড মেয়ো রোর্ড থেকে কালিকট রোডে পড়ল। পোর্ট ব্লেয়ার থেকে দক্ষিণে কালিকটের দিকে যাবার এটাই সবচেয়ে সোজা পথ। পোর্ট ব্লেয়ার ও কালিকটের মধ্যবর্তী সেই উপকূলই আহমদ মুসার টার্গেট।

কালিকট রোডে পড়ার পর আহমদ মুসা রিয়ারভিউতে দেখল, জীপটি ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসছে। আহমদ মুসা গাড়ির গতি বাড়াল না।

শহর ছেড়ে পাহাড় এলাকায় প্রবেশ করেছে আহমদ মুসার গাড়ি।

আহমদ মুসার গাড়িকে ফলো করে আসার জীপটাকে শাহ বানুরাও দেখতে পেয়েছে। তারা ঘন ঘন তাকাচ্ছে পেছন দিকে। তাদের মুখে-চোখে আবার ফুটে উঠেছে সেই আতংকের ভাব।

আহমদ মুসার গাড়ির স্পীড কমমে কমতে এক সময় 'ডেড স্টপ' হয়ে থেমে গেল।

আহমদ মুসা দু'টি রিভলবার হাতে নিয়ে বলল, 'শাহ বানু গোলাগুলী শুরু হয়ে গেলে তুমি খালা আম্মাকে নিয়ে সীটে শুয়ে পড়বে। তারিক তুমিও।'

আহমদ মুসা দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির সামনে চলে গেল। খুলল ইন্জিনের ঢাকনা।

'গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে?' আর্তকণ্ঠে বলল সাহারা বানু।

কে উত্তর দেবে এই প্রশ্নের। শাহ বানুর চোখে-মুখেও নেমেছে মৃত্যুর পাণ্ডুরতা। তারিকও উদ্বেগ-আতংকে মুষড়ে পড়েছে। এই ভয়ানক সময়ে তাদের গাড়ি খারাপ হল, এই চিন্তা তার মনকে দারুণ পীড়া দিচ্ছে।

পেছনের জীপ দেখতে পেয়েছে সামনের গাড়ির এই দুর্দশার চিত্র। জীপের ড্রাইভিং সীটের লোকটি অন্যদের লক্ষ্য করে বলল, 'আমি ঐ গাড়ির পেছনে জীপ দাঁড় করাচ্ছি। আসল লোক গেছে সামনে গাড়ি ঠিক করতে। গাড়িতে মেয়ে দু'টি আর একটি ছেলে। আমরা চারজন একসাথে নামব দু'জন দু'পাশ থেকে পাহারা দেব গাড়ি ঠিককরারত লোকটাকে। সে যেন আক্রমণে আসতে না পারে। আর দু'জন গিয়ে ছেলেটিকে কাবু করে বা হত্যা করে মেয়ে দু'জনকে বের করে আনবে।

ওদিকে আহমদ মুসা গাড়ির সামনের ঢাকনাটা তুলে রেখে গাড়ির নিচে ঢুকে গেল। মাটি আঁকড়ে শুয়ে সাপের মতো গড়িয়ে গাড়ির পেছন দিকে এগুচ্ছিল।

গাড়িটা আহমদ মুসা এমন মজার জায়গায় দাঁড় করিয়েছে যেখানে গাড়ির তলার জায়গাটা নিচু, দু'ধার আবার উঁচু। কিছুটা নালা গোছের। গাড়ির দু'ধারের চাকা পড়েছে নালার দু'ধারের উঁচু প্রান্তে। গাড়ির তলার নালা দিয়ে এগুতে আহমদ মুসার তাই কোন কষ্ট হলোনা। তবে নালা মত জায়গাটায় কাদা-পানি থাকায় মুখসহ সামনের দিকটা কাদার প্লাস্টারে ঢেকে গেল আহমদ মুসার।

আহমদ মুসা যখন গাড়ির পেছনে পৌঁছে গেছে, তখনই জীপটি এসে দাঁড়াল আহমসদ মুসাদের গাড়ির চার পাঁচ গজ পেছনে। আহমদ মুসা জীপের উপরের অংশ ছাড়া দু'পাশ ও নিচের অংশ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। আহমদ মুসা তার মুখ লম্বাভাবে মাটির উপর রেখে দু'হাতের দু'রিভলবার দিয়ে জীপের দু'পাশটাকে টার্গেট করল।

জীফ থামার সঙ্গে সঙ্গেই জীপের পাশ দিয়ে প্রায় একই সঙ্গে ৮টি পা নেমে এল। আহমদ মুসা ওদের নিচের অংশ দেখতে পাচ্ছিল, দেহের উপরের অংশ নয়।

আটটি পা দ্রুত এগিয়ে আসছে। ওরা জীপ পার হয়ে মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গায় সহজ টার্গেটে আসার পর আহমদ মুসা স্থির লক্ষ্যে গুলী করা শুরু করল। দু'রিভলবার হতে চারটি ফায়ার হতেই চারজন মাটিতে পড়ে গেল।

এবার ওদের চারজনকেই আহমদ মুসা দেখতে পেল। চারজনই পায়ে গুলী খেয়েছে। ওরা বসে পড়ে উদভ্রান্তের মত চারদিকে খুঁজতে লাগল গুলী কোন দিক থেকে এল। ওদের হাতে তখনও রিভলবার, চোখে হিংসার আগুণ।

আহমদ মুসা তার রিভলবারের নল দিয়ে গাড়ির গার্ডারে দুটি আঘাত করল। একটা ধাতব শব্দ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

ওদের চারজনের চোখই ছুটে এল এদিকে।

ওরা দেখতে পেল আহমদ মুসার মুখ এবং দু'হাতের রিভলবার।

প্রথমটায় ওরা ভূত দেখার মত চমকে উঠেছিল। তার পরক্ষণেই ওদের চারজনেরই রিভলবার উঠতে লাগল আহমদ মুসার লক্ষ্যে।

কিন্তু আহমদ মুসার তর্জনি রিভলবারের ট্রিগার স্পর্শ করে তৈরি হয়েছিল। আহমদ মুসার দু'তর্জনি আবার দু'বার করে চাপল রিভলবারের ট্রিগার। বেরিয়ে গেল চারটি গুলী। নিঁখুতভাবে তা লক্ষ্যভেদ করল। চারটি দেহই এবার গড়িয়ে পড়ল মাটিতে।

গাড়ির পেছনে নালার মাথাটা ছিল তুলনামূলকভাবে সংকীর্ণ। বের হতে কষ্ট হলো। কর্দমাক্ত ও ধুলি ধুসরিত দেহ নিয়ে আহমদ মুসা বেরিয়ে এল।

শাহ বানু, সাহারা বানু ও তারিক সবাই গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে ওদের চারজনকে গুলি খেয়ে পড়ে যেতে দেখে এবং আহমদ মুসাকে আশে-পাশে না দেখে আতংকিত হয়ে পড়েছে তারা। আহমদ মুসাতে দু'হাতে রিভলবার নিয়ে গাড়ির তলা থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে ওরা যেন প্রাণ ফিরে পেল। সাহারা বানু আহমদ মুসাকে দু'হাতে জড়িয়ে নিয়ে কপালে চুমু খেয়ে বলল, 'বেটা তোমাকে না দেখে মনে হচ্ছিল গোটা জগৎ যেন মুছে গেল চোখের সামনে থেকে। আল্লাহ তোমাকে দীর্ঘজীবি করুন, শত মায়ের শত বোনের অশ্রু মোছাতে তোমাকে সামর্থ দান করুন। তোমার এত কষ্টের শতগুণ জাযা আল্লাহ তোমাকে দান করুন।'

'ধন্যবাদ খালাম্মা।' বলল আহমদ মুসা

তারপর দ্রুতকন্ঠে বলল, 'আসুন এখান থেকে তাড়াতাড়ি সরে পড়তে হবে। আল্লাহর বিশেষ দয়া যে এতক্ষণ কোন গাড়ি এদিকে আসেনি।'

ইতোমধ্যে তারিক মৃত চারজনের রিভলবার ও মোবাইল সংগ্রহ করেছে।

আহমদ মুসা তারিকের পিঠ চাপড়ে বলল, 'এই তো যুদ্ধের ট্রেনিং শুরু করে দিয়েছে। সাবাস!'

আহমদ মুসা গাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করল।

'ভাইয়া, সামনের দিকের কাপড় শুধু ভিজা নয় একদম কাদায় লেপটে গেছে। আপনার ব্যোগে বাড়তি কাপড় দেখেছি....।' আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল শাহ বানু। কথা শেষ না করেই থেমে গেছে শাহ বানু।

‘কিছু ভেব না শাহ বানু, আমার এ সবে অভ্যেস আছে।’ হাঁটতে হাঁটতে বলল আহমদ মুসা।

সবাই গাড়িতে উঠল

আবার গাড়ি ছুটে চলল।

‘স্যার, মাফ করবেন। একটা কথা। আপনি গাড়ির নিচে ঢুকবেন তো গাড়ির ঢাকনা তুললেন কেন? আমি তো ভয় পেয়েছিলাম, গাড়ি বোধহয় খারাপ হয়ে গেছে।’

‘ঢাকনা না তুললে তো ওরা গাড়ির সামনেটাও দেখতে পেতো। যদি দেখতে পেতো আমি নেই তাহলে ওরা সাবধান হয়ে যেত এবং আমাকে খোঁজার কাজটাই তারা প্রথমে করত। আমাকে গাড়ির তলায় ওরা খুঁজে পেতেও পারতো।’

‘ঠিক স্যার।’ বলল তারিক।

‘তারিক তুমি আহমদ মুসাকে ‘স্যার’ বল? ভাই বল না?’

চমকে উঠল তারিক ‘আহমদ মুসা’র নাম শুনে। দ্রুত পেছন দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, ‘খালাম্মা ইনি আহমদ মুসা?’ কন্ঠে তার রাজ্যের বিস্ময়।

‘কেন তুমি ‘আহমদ মুসা’কে চেননা? তোমার ‘স্যার’ আহমদ মুসা জাননা?’ বলল সাহারা বানু।

তারিক ভূত দেখার মত শ্বাসরুদ্ধকর এক অনুভূতি নিয়ে তাকাল আহমদ মুসার দিকে।

নির্বাক বিস্ময়ে সে তাকিয়েই রইল। মনের ভেতরে তোলপাড়। এই আহমদ মুসা! সকাল থেকেই আহমদ মুসার পাশেই সে আছে! আহমদ মুসা হুকুম দিচ্ছে, ঐ হুকুম তামিল করার সৌভাগ্য সে লাভ করেছে! সেই বিরাট আহমদ মুসা এত সহজ, এত সরল, এত আপন! গর্বে বুক ভরে উঠল তারিকের। আহমদ মুসার জীবন-মৃত্যুর অপরূপ খেলার সে চাক্ষুস সাক্ষী হতে পেরেছে, তার সাথী হতে পেরেছে।

আনন্দ বিস্ময় আবেগ অশ্রু হয়ে বেরিয়ে এল তার চোখ দিয়ে।

আহমদ মুসা ড্যাশবোর্ড থেকে একটা টিস্যু পেপার তুলে নিয়ে তারিকের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, ‘চোখের পানি মুছে ফেল তারিক। বলেছিনা যে, অশ্রু মানুষকে দুর্বল করে।’

‘এটা ভয়ের নয়, আনন্দের অশ্রু স্যার। বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বজনের আকস্মিক সাক্ষাতে যে অশ্রু ঝরে, তা মানুষকে দুর্বল নয় প্রাণবন্ত করে।’ তারিক বলল।

‘ধন্যবাদ তারিক। স্বজন পাওয়ার প্রতি আমার খুব লোভ।’

‘কিন্তু আমাদের মত আপনার কোটি কোটি স্বজন প্রতিটি সকাল সন্ধ্যায় আপনাকে স্বাগত জানাবার জন্যে অপেক্ষা করছে স্যার।’

তারিকের কথা শেষ হতেই সাহারা বানু বলল, ‘বৃটেন থেকে ‘স্যার’ সম্বোধনে দেখছি একেবারেই অভ্যস্ত হয়ে গেছ তারিক।’

‘খালাম্মা, তারিক আমার ছাত্র হতে চায়। এটা ভাল। আমি ওর ট্রেনিং শুরু করেছি। একজন বিরাট যোদ্ধা ওকে বানিয়ে ছাড়ব।’

‘ভাইয়া, যোদ্ধা কাউকে বানানো যায়? যোদ্ধা হওয়া তো মননের ব্যাপার।’ বলল শাহ বানু গম্ভীর কন্ঠে।

‘তোমার কথা ঠিক শাহ বানু। এক শক্তিশালী মনন ওর মধ্যে আছে বলেই আমি ওকে ট্রেনিং দিচ্ছি।’

একটা বিব্রতভাব ফুটে উঠল তারিকের চোখে-মুখে। সেই সাথে লজ্জাও। লজ্জাকর একটা ভাবনা এসে ঘিরে ধরেছে। শাহ বানুর প্রতি তার দুর্বলতার কথা, শাহ বানুর নেতিবাচক মনোভাবের কথা, ইত্যাদি বিষয় আহমদ মুসাকে বলা তার ঠিক হয়নি। এখন সে কি করবে! আহমদ মুসা ও শাহ বানুর উপস্হিতিতে পরিস্থিতি তার জন্যে যে মহাবিব্রতকর হয়ে উঠেছে।

কথাটা বলেই আহমদ মুসা তাকাল তারিকের দিকে। তার বিব্রত অবস্থা দেখতে পেল আহমদ মুসা। আহমদ মুসার মুখে একটা মিষ্টি হাসি ফুটে উঠল।

‘আমরা গন্তব্যে প্রায় এসে গেছি খালাম্মা। সামনেই উপকূল।’

বলে একটু থামল আহমদ মুসা। একটু ভাবল। সেই সাথে তার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, ‘খালাম্মা, পোর্ট ব্লেয়ার থেকে বেশ দূরে ভিন্ন একটা জায়গায় আপনাদের নিয়ে যেতে চাই।’

‘কোথায় বেটা।’ বলল সাহারা বানু, শাহ বানুর মা।

‘মায়া বন্দর ও পাহলগাঁও-এর মাঝখানে গভীর জংগলে সবুজ উপত্যকার এক আদিবাসীদের জনপদে।’

‘ওখানে কে আছে?’

‘আমার বড়বোন এবং আমার দুলাভাই।’

‘তোমার ভাই-বোন কেউ নেই, বড় বোন কোথেকে এল?’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘পাতানো বড় বোন, তাঁকে বড় বোন ডেকেছি।’

‘হঠাৎ কোথায় কিভাবে তাঁদের পেলে? মাত্র কয়েক দিন তো তুমি পোর্ট ব্লেয়ারের বাইরে ছিলে?’

‘এই কয়েকদিনে অনেক ঘটনা ঘটেছে খালাম্মা।’

আহমদ মুসা কথা শেষ হবার সাথে সাথে গাড়ি- একটা ঝোপের পাশে দাঁড় করাল। বলল, খালাম্মা, এ ঝোপটা পার হলেই আমরা উপকূলের সামনে পড়ে যাব। এই উপকূলের ধারে তারিককে মেরে ফেলতে নিয়ে আসা লোকটি এখনও পড়ে থাকার কথা। সে আপনাদের দেখতে পাক, সেটা ঠিক হবেনা। আমি দেখে আসি। আপনার ঝোপের আড়ালে একটু দাঁড়ান।’

আহমদ মুসা গাড়ি নিতে গিয়েও নিলনা। ভাবল সে, আগে দেখা দরকার আহত লোকটি আছে। তারপর গাড়ি নেয়া যাবে।

এই ভাবনাকে আহমদ মুসা খুবই গুরুত্ব দিল। সরাসরি বাইরে না বেরিয়ে জংগলের আড়াল নিয়ে সে এগুলো সামনে।

এক সময় গোটা উপকূলইটাই তার নজরে এল। দেখল, ‘সেই আহত লোকটি নেই।’ বিস্মিত হলো আহমদ মুসা। ঘড়ির দিকে তাকাল। দেখল সকাল ৮টা চল্লিশ মিনিট বাজে।

নানা চিন্তা, নানা আশংকার বিষয় ঘুরপাক খেতে লাগল আহমদ মুসার মাথায়। যে গাড়িতে সকাল ৮টায় আমার কথা আত্মসমর্পণ করার জন্য, আমি না পৌঁছানোয় কি সে গাড়িটি উপকূলে এসেছিল খোঁজ নিতে? যদি তারা এসে থাকে, তারা পেয়ে গেছে আহত লোকটিকে। তার কাছে সব কথাই তারা শুনেছে এবং শুনেছে যে আমি সাড়ে ৮টায় ফিরে আসব।

এই চিন্তা তার যদি সত্য হয়, তাহলে এই উপকূলে কোথাও তারা ওঁৎপেতে অপক্ষো করছে আহমদ মুসার জন্যে। কোথায় তারা লুকাতে পারে? দু'পাশের কোন জংগলে নিশ্চয়।

যে কোন জংগলে তারা অপেক্ষা করতে পারে? নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করল আহমদ মুসা। উত্তরেরও সন্ধান করতে লাগল।

আহমদ মুসা দক্ষিণ পাশের জংগল ধরে এগুচ্ছিল। পেছনে এই জংগলেরই একপাশে শাহ বানুদের সে লুকিয়ে রেখে এসেছে এবং এপাশের জংগলেই উপকূলে এক প্রান্তে এক ঝোপের ভেতরে বোটও লুকানো রয়েছে। আহমদ মুসা বোট থেকে নেমেছিল এ পাশের জংগলেরই কাছাকাছি জায়গায়। আবার তারিককে ডুবিয়ে মারার জন্যে তাকে পানিতে ফেলার জায়গাটাও দক্ষিণ পাশের জংগলেরই নিকটে। আর আহত লোকটিকে আহমদ মুসা যেখানে রেখে গিয়েছিল, সেটাও এই জংগলেরই কাছে। সুতরাং শত্রুরা যদি তার জন্যে ওঁৎপেতে থাকে, সেটাও তাহলে এ দক্ষিণ পাশের জংগলেই হবে।

এই চিন্তা করার সাথে আহমদ মুসা ক্রলিং করে সন্তর্পণে নিঃশব্দে এগুতে লাগল।

কিছুটা এগুবার পর আহমদ মুসা নাকে সিগারেটের গন্ধ পেল।

থেমে গেলে আহমদ মুসা।

সে উপরে গাছের দিকে তাকিয়ে পাতার নড়া-চড়া থেকে বুঝল বাতাস সামনে থেকে মানে পূর্ব দিক থেকে বইছে তাহলে ঠিকই যাচ্ছে আহমদ মুসা। সামনেই শত্রুদের সে পেয়ে যাবে।

ক্রলিং করে আরও মিনিট দুই এগুবার পর আহমদ মুসা চাপা কথার আওয়াজ পেল।

আরও এগুলো আহমদ মুসা।

চোখে পড়ে গেল ওরা আহমদ মুসার। জংগলের মধ্যে একটা গোলমত জায়গায় একটা তোয়ালে বিছিয়ে ৪ জন তাস খেলছে। আর দু'জন একটা গাছের আট দশ ফিট উঁচু ডালে উত্তরমুখী হয়ে বসে ফাঁকা উপকূলের দিকে নজর রেখেছে। গাছে বসা দু'জনেই সিগারেট খাচ্ছে।

হঠাৎ একটা কুকুরের আকাশ-ফাটা চিৎকারে চমকে উঠল আহমদ মুসা। দেখল সে, ওদের পাশে কুকুরটা শুয়ে ছিল, লাফ দিয়ে উঠল। উঠার আগেই সে চিৎকার দিতে শুরু করেছে। বোধ হয় কুকুরটি ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। উঠেই সে পরিচিত গন্ধ পেয়েছে, যদি আহমদ মুসার কোন জিনিস কুকুরটিকে শুকিয়ে রাখা হয়ে থাকে। অথবা অপরিচিত গন্ধ পেয়েও কুকুরটি ক্ষেপে উঠতে পারে। এসব ভাল আহমদ মুসা।

কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠার সাথে সাথে চারজনের তাস খেলা বন্ধ হয়ে গেছে। তারা পকেট থেকে রিভলবার বের করে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। জংগলের আড়ালে থাকার কারণে তারা আহমদ মুসাকে দেখতে পায়নি। কিন্তু ডালে বসা দু'জন লোক ঠিকই দেখতে পেয়েছে আহমদ মুসাকে। তাদের হাতেও উঠে এসেছে রিভলবার।

আহমদ মুসার দু'হাতে দু'রিভলবারের দুটি গুলি সে একই সাথে করেছে ডালে বসা দু'জনকে লক্ষ্য করে।

বুকে গুলি খেয়ে দু'জনেই ডাল থেকে খসে পড়ল মাটিতে।

ওদিকে ওরা কুকুরের চেন খুলে দিয়েছে।

ছুটতে শুরু করেছে কুকুর। ওরা চারজন কুকুরের পেছনে। তাদের হাতের রিভলবার বাগিয়ে ধরা। হিংস্র দৃষ্টি তাদের চোখে।

আহমদ মুসার রিভলবার ডালের দু'জনকে গুলি করেই লক্ষ্য নামিয়ে নিয়ে এসেছিল নিচে কুকুর এবং সেই চারজনের দিকে।

আহমদ মুসার বাম হাতের রিভলবার টার্গেট করেছে ছুটে আসা কুকুরটিকে। গোলাকৃতি সেই ফাঁকা জায়গা থেকে জংগলে ঢোকার বেশ আগেই মাথায় গুলী খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল কুকুরটি। আর ডান হাতের রিভলবার টার্গেট

করল চারজন লোককে। অধীকতর ক্ষীপ্র আহমদ মুসার ডান হাত তার সাথে বাম হাত যোগ দেবার আগেই অব্যর্থ গুলীতে তিনজনকে শিকার করা সমাপ্ত করল। বাম হাত এসে চতুর্থ জনকে গুলী করে ওদের আক্রমণে আসার চেষ্টার ইতি ঘটাল।

ঘটনার এ জায়গা থেকে উপকূলের ফাঁকা এলাকা দশ গজের বেশি দূরে নয়।

আহমদ মুসা জংগল থেকে বেরিয়ে এল। সে তাকাল শাহ বানুরা যে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে আছে সে ঝোপের দিকে। দেখল, ঝোপের আড়াল থেকে তারিক উঁকি দিচ্ছে। আহমদ মুসাকে দেখে সে ঝোপের আড়াল থেকে বাইরে এল। আহমদ মুসা তাকে গাড়িসহ সবাইকে নিয়ে আসার জন্য ইঙ্গিত করল।

দু'মিনিটের মধ্যেই তারিক সবাইকে নিয়ে হাজির হলো।

গাড়ি থামতেই শাহ বানু প্রথম নামল। বলল, ভাইয়া, আপনি ভাল আছেন তো। গুলীর আওয়াজ শুনলাম, কুকুরের আওয়াজ শুনলাম। ওদের.......।'

'ভাল আছি। গুলীর আওয়াজ ছিল আমার, কুকুরের আওয়াজ ছিল ওদের।' আহমদ মুসা বলল।

'ওরা কারা?' বলল সাহারা বানু।

অন্যেরা সবাই গাড়ি থেকে নেমে এসেছিল।

'আসুন' বলে আহমদ মুসা সবাইকে জংগলের ভেতরে নিয়ে গেল। দেখাল ৬ জনের লাশ। বলল, 'এরা এখানে ওঁৎ পেতে বসে ছিল আমাদের অপেক্ষায়।'

'কিন্তু আমরা এখানে আসব তা ভাবল কি করে? প্রশ্ন করল শাহ বানু।

'যে আহত লোকটিকে রেখে গিয়েছিলাম, তাকে আমি বলে গিয়েছিলাম সাড়ে ৮টা পর্যন্ত অপেক্ষা করার জন্যে। আমি ঠিক করেছিলাম, আমি ফিরে এলে সেই গাড়িতে সে যেতে পারবে। কারণ আমার গাড়ির আর দরকার হবে না।'

'তাকে যখন বাঁচাতে চাও, তখন যাবার সময় লিফট দিলে পারতে। গাড়ি পাওয়া যায় এমন কোথাও নামিয়ে দিতে।' বলল সাহারা বানু।

‘কিন্তু তাকে উদ্ধারের জন্যে আপনাদের ওখানে পৌঁছার আগেই সেখানে আমাদের খবর পৌঁছে দিত।

‘বুঝেছি। ধন্যবাদ বেটা।’

‘আহত লোকটি এই ছয়জনের মধ্যে আছে?’ বলল তারিক।

‘নেই। আমরা এখানে পৌঁছার আগেই শংকরাচার্যের কোন গ্রুপ মনে হয় এখানে এসেছিল। হতে পারে এখান থেকে দু’মাইল পশ্চিমে গিয়ে যাদের কাছে আমার আত্মসমপর্ণের কথা ছিল, তারাই এখানে এসেছিল। আহত লোকের কাছে সব শুনে গাড়িতে করে আহতকে পাঠিয়ে দিয়ে অন্যেরা আমাদের ধরার জন্যে এখানে অপেক্ষা করছিল এবং আমার মনে হয়, এরাই শংকরাচার্যকে জানিয়েছিল যে, আত্মসমপর্ণের বদলে আমি শাহ বানুদের উদ্ধার করতে গেছি। এই খবর পেয়েই শংকরাচার্য শাহ বানুদেরকে লর্ড মেয়ো রোডের ঐ বাড়ি থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিচ্ছিল।

‘তাই হবে ভাইয়া, আমাদের ঘরের বাইরে একজন আরেকজনকে বলছিল, ‘শয়তান ধরা দেয়নি। আর এ কুকুরকেও উদ্ধার করে নিয়ে গেছে। এখানে আর বন্দীদের রাখা যাবে না। মহগুরুচী বলেছেন, ‘ওখানে গিয়েই বাঘের শিকার ধরার মহোৎসব হবে। মহাগুরু গাড়ি ঘুরিয়ে ওখানেই যাচ্ছেন।’

‘তোমরা কি জান বাঘের শিকার ধরার মহোৎসবটা কি?’

মুখটা ম্লান হয়ে উঠল শাহ বানুর। আতংক দেখা দিল তা চোখে-মুখে। মাথা নিচু করল সে। বলল, ‘জানি ভাইয়া, গত রাতেই শংকরাচার্য স্বয়ং এই হুমকি দিয়ে গেছে। আমার সারারাত আল্লাহকে ডেকেছি। আমাদের ছিল উভয় সংকট। আমাদের পরিণতির বিষয়টা যেমন ছিল অকল্পনীয়, আপনি আত্মসমর্পণ করলে আমরা, আপনি একসাথে বিপদগ্রস্থ হতাম।’

‘আমিও এটা জানতাম শাহ বানু।’

‘তাহলে আত্মসমপর্ণে রাজি হলেন কেন?’ জিজ্ঞাসা শাহ বানুর।

‘দু’কারণে রাজি হয়েছি। এক, অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতিকে বিলম্বিত করা, দুই, তোমাদের উদ্ধারের একটা সুযোগ তৈরি করা। আল্লাহ সে সুযোগ তৈরি করে দিয়েছেন।’

'আল হামদুলিল্লাহ।' একসাথে বলে উঠল শাহ বানু, সাহারা বানু দু'জনেই।

একটা নিরবতা।

নিরবতা ভাঙল তারিক। বলল, 'আমার একটা কৌতুহল স্যার, জংগলে এদের আপনি পেলেন কি করে? আমাদের পাহারায় থেকেও এরা গুলী ছুড়তে পারলোনা কেন?'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'তুমি যখন আমার ছাত্র, তখন তো শেখাতেই হবে। শোন, যখন দেখলাম আহত লোকটি উপকূলে নেই, তখন বুঝলাম কেউ বা কারা এসেছিল। যখন শত্রুপক্ষের লোক এসেছিল, তখণ তারা অবশ্যই জেনেছে আমি এখানে ফিরে আসব। যখন তারা জেনেছে আমি ফিরে আসব, তখন অবশ্যই আমার জন্যে তারা ফাঁদ পাতবে। তারপর চিন্তা করেছি, দু'পাশের জংগলের কোন পাশে তারা অপেক্ষা করবে। সকল বিচারে আমি দেখলাম, দক্ষিণ পাশের জংগলে তাদের লুকিয়ে থাকা স্বাভাবিক। আমি দক্ষিণের জংগল ধরে অগ্রসর হলাম। এক জায়গায় পৌঁছে সিগারেটের গন্ধ পেলাম। বাতাসের গতি দেখে বুঝলাম, পূর্ব দিক থেকে সিগারেটের গন্ধ আসছে। আমি ওদের সন্ধানে অগ্রসর হলাম এবং ওদের পেয়েও গেলাম। ওদের কুকুর আমাকে টের পেয়ে গিয়েছিল। ওদের দু'জন গাছের ডালে বসেছিল পাহারার জন্যে। তারা আমাকে দেখতে পেল এবং গুলী করতে যাচ্ছিল। তার আগেই আমি গুলী করলাম। এভাবেই ঘটনার ইতি হলো।'

'ধন্যবাদ স্যার, এই কয়েক ঘন্টায় স্যার আমি অনেক কিছু শিখে ফেলেছি।' বলল তারিক।

'এই তো উপযুক্ত ছাত্রের কাজ। এবার তুমি ছয়জনের মোবাইল ও রিভলবারগুলো এবং শা বানুদের নিয়ে বাইরে যাও। সামনের এক ঝোপে স্পীড বোট লুকিয়ে রেখেছি। ওটা নিয়ে আমি আসছি।'

বলে আহমদ মুসা দ্রুত হাঁটা শুরু করল পূর্বদিকে। ঝোপের আড়াল থেকে স্পীড বোট চালিয়ে পানিতে নেমে গেল।

শাহ বানুরাও তীরে এসে পড়েছে। বোটে উঠল সবাই।

‘স্যার, আমি বোট ভাল ড্রাইভ করতে পারি।’ বলল তারিক মুসা মোপলা।

‘কিন্তু রুট তো নতুন তোমার জন্যে।’ আহমদ মুসা বল।

‘অসুবিধা হবে না স্যার, আপনি তো পাশে থাকছেন।’

‘বেশ এস। তোমার উপর শিক্ষকতা করার আরও একটা সুযোগ পাওয়া গেল।’

বলে আহমদ মুসা সরে এল ড্রাইভিং সিট থেকে।

‘ধন্যবাদ স্যার’ বলে তারিক গিয়ে বসল ড্রাইভিং সিটে। বসে বলল, ‘স্যার আপনার কাছ থেকে প্রতি মুহূর্তেই শেখার আছে। আমার একটা গর্ব ছিল আমি গাড়ি ভাল ড্রাইভ করি, কিন্তু স্যার আপনার গাড়ি ড্রাইভ দেখে আমার মনে হয়েছে আমার বহু কিছু শেখার আছে।’

‘ধন্যবাদ তারিক। কি শিখতে হবে জানাটা কিন্তু একটা বড় শিক্ষা।’ বলে আহমদ মুসা বোটের ড্যাশবোর্ড থেকে একটা মানচিত্র বের করে আনল। সেটা তারিকের সামনে মেলে ধরে বলল, ‘দেখ রুটটাকে রেড মার্ক করে রেখেছি। এখন তুমি আন্দামানের পূর্ব উপকূল ধরে উত্তরে ১২ ডিগ্রী পর্যন্ত চোখ বন্ধ করে এগিয়ে যাবে। সেখানে পৌঁছার পর ডানে থাকবে হ্যাভলক আইল্যান্ড আর বামে দেখবে মেইণল্যান্ডের সাথে কীড দ্বীপপুন্জ। এ দ্বীপপুঞ্জের উত্তর মাথা দিয়ে একটা চ্যানেল ঢুকে গেছে মেইন্যোন্ড। এ চ্যানেলটি পশ্চিম উপকূলে স্পাইক বে’তে গিয়ে পড়েছে। স্পাইক বে’ থেকে বের হয়ে তোমাকে আন্দামানের পশ্চিম উপকূল ধরে এগোতে হবে। উত্তরে অ্যান্ডারসন দ্বীপ পর্যন্ত গিয়ে অ্যান্ডারসন চ্যানেল দিয়ে এর মাথা পর্যন্ত পৌঁছে পূর্ব দিকে মোড় নিয়ে কয়েক মাইল গেলেই গ্রীণ ভ্যালির উপকূল পাওয়া যাবে।’

থামল আহমদ মুসা।

তারিক মানচিত্রটি হাতে নিয়ে তার সামনে ড্যাশবোর্ডের উপর আবার রাখল।

চলতে শুরু করল বোট।

সাত সীটের বোটটি খুব সুন্দর।

ড্রাইভিং সীটের পেছনে ৬টি সীট বৃত্তাকারে সাজানো। মাঝখানে একটা নীচু গোলাকার টেবিল। চেয়ার ও টেবিল সবই ক্লোজ করে মেঝেতে ফেলে রাখা যায়। তখন বোটটি কার্গো বোট হয়ে দাঁড়ায়। আবার চেয়ার-টেবিল আনফোল্ড করলেই সুন্দর ট্যুরিস্ট বোট হয়ে দাঁড়ায়।

বোটের ইঞ্জিনে ডবল সাইলেন্সার লাগানো। কোন শব্দই হয়না। নিঃশব্দে তীরের মত এগিয়ে চলে বোটটি।

আহমদ মুসার কথা শেষ করার পর একটা নিরবতা নেমেছিল।

নিরবতা ভাঙল সাহারা বানু, শাহ বানুর মা। বলল আহমদ মুসাকে উদ্দেশ্য করে, 'বেটা আমাদের দূর্ভাগ্যের খবর তুমি কিভাবে পেয়েছিলে? কখন পেয়েছিলে?'

'গতকাল বিকেলে আমি সুষমা রাও- এর কাছে টেলিফোন করেছিলাম। আমার টেলিফোন পেয়েই সে কাঁদতে শুরু করে এবং বলে আপনারা কিডন্যাপড হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গেই আমি বুঝতে পারি যে কারা এই কাজ করেছে। গতকাল বিকেলেই আরেকটা বড় ঘটনা ঘটে গ্রীনভ্যালিতে। আপনাদের যারা কিডন্যাপ করেছিল, তাদেরই বার জন লোক পর্যটকের ছদ্মবেশে গিয়েছিল গ্রীনভালিতে আমার খোঁজে আমাকে ধরে আনার জন্যে। তাদের সাথে সংঘর্ষ হয়। তারা সবাই মারা যায়। তাদেরই একজনের মোবাইল থেকে শংকরাচার্যের টেলিফোন নাম্বার পাই। সন্ধ্যার পরে এই তাকে টেলিফোন করে আপনাদের বিষয়ে জানার জন্যে। সেই কথা বলার সময় হুমকি দেয় আজ সকাল ৮টার মধ্যে আমি তাদের হাতে আত্মসমর্পল না করলে সে আপনাদের ক্ষতি করবে। তাই রাতেই চলে এলাম, যাতে সকাল আটটার মধ্যে তাদের কাছে পৌঁছা সম্ভব হয়।'

'কিভাবে এলে? এই বোট নিয়ে?' বলল সাহারা বানু।

'ওঁরা খুব ভালো লোক। আমি শংকরাচার্যের হাতে আটকা পড়লে বোট ওরা কোনদিনই আর ফিরে পাবেনা জেনেও অত্যন্ত মূল্যবান বোটটি আমাকে দিয়েছে যাতে ঠিক সময়ে আমি পৌঁছতে পারি এখানে।' আহমদ মুসা বলল।

'ওঁদের কথা কিছুই শোনা হয়নি। কিন্তু তার আগে বল আমাদের রেখে চলে যাবার পর হঠাৎ তুমি নিরব হয়ে গেলে কেন? না এলে, না টেলিফোনেও

কোন যোগাযোগ করলে। মাত্র গতকাল সুষমার সাথে তোমার যোগেোযগ হলো কেন?' বলল সাহারা বানু।

'মাঝখানে শংকরাচার্যদের হাতে বন্দী হয়েছিলাম, তারপর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। যখন........।'

আহমদ মুসা কথা শেষ করতে পারল না। আহমদ মুসার কথার মাঝখানেই শাহ বানু বলে উঠল, 'বন্দী হয়েছিলেন? শংকরাচার্যদের হাতে?' শাহ বানুর কণ্ঠে উদ্বেগ।

আহমদ মুসার উত্তর দেয়ার আগেই কথা বলল সাহারা বানু। বলল, 'কি অসুখ হয়েছিল তোমার? নিশ্চয়ই কিছু অঘটন ঘটেছিল!' সাহারা বানুর কণ্ঠেও উদ্বেগ।

'হ্যাঁ, খালাম্মা আহত হয়েছিলাম। আমি যাচ্ছিলাম 'রস' দ্বীপে আহমদ শাহ আলমগীরের খোঁজে। সাগর থেকেই ওরা আমাকে বন্দী করে হেলিকপ্টার নিয়ে গিয়ে। ওদের বন্দীশালা থেকে পালাতে গিয়ে কাঁধে গুলী খেয়েছিলাম। ওরা আমার পিছু লেগেছিল গাড়ি ও হেলিকপ্টার নিয়ে। অনেকদূর পাহাড়ী এলাকায় যাবার পর ওরা আমাকে আগে ও পেছনে গাড়ি ও উপর থেকে হেলিকপ্টার দিয়ে ঘিরে ফেলে। এই অবস্থায় গাড়ি ছেড়ে দিয়ে জংগলে নামা ছাড়া উপায়ই ছিলনা। ঘন জংগলে অবিরাম খোঁজার কষ্ট এড়াবার জন্যে ওরা সংজ্ঞালোপকারী গ্যান বোমা ছোড়ে জংগলে। তখন আমি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিলাম।' আহমদ মুসা থামল একটু।

কিন্তু থামতেই উদ্বিগ্ন কন্ঠে বলল শা বানু, 'আপনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিলেন? আবার ধরা পড়লেন আপনি?'

'না। আমাকে ওরা সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ধরে এনেছিল বটে, কিন্তু ধরে নিয়ে যেতে পারেনি। তোমাদের তার নাম বলেছি। আমি যাকে বড় বোন বলেছি সেই ডাক্তার সুস্মিতা বালাজীর স্বামী ড্যানিশ দেবানন্দ রাও আমাকে সেখান থেকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় উদ্ধার করেছিলেন। পরে আমি তাদের কাছে শুনেছিলাম, ড্যানিশ দেবানন্দ কোন কাজে ঐ এলাকার পাহাড়ে গিয়েছিলেন। তিনি এক জায়গায় বসে- ওদের আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে আসা, আমার জংগলে পালানো,

ওদের সংজ্ঞালোপকারী গ্যাসবোমা ছোড়া, আমার সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়া, ওদের আমাকে গিয়ে ধরে নিয়ে আসা সবই চোখে দুরবীন লাগিয়ে দেখেছিলেন। তারপর তিনি পাহাড় থেকে নেমে আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। আমার সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ডাক্তার সুস্মিতা বালাজী আমার গুলীবিদ্ধ স্থানে অপারেশন করেন। আমাকে কয়েকদিন ওরা নড়া-চড়া করতে দেননি। সুষমা রাওয়ের মোবাইলে তার কোন সাড়া পাচ্ছিলাম না। শেষে দ্বিতীয় আরেকটি মোবাইলের নাম্বার মনে পড়ে যায়। সেটায় গতকাল বিকেলে তাকে ফোন করে পেয়ে যাই। তার পরের ঘটনা সবকিছু বলেছি।'

'তোমার এত বিপদ গেছে? আল হামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তোমাকে দ্রুত সুস্থ করে তুলেছেন। তোমার বোন মেয়েটা সত্যিই ডাক্তার?' বলল শাহ বানুর মা সাহারা বানু।

'জি, তিনি এমবিবিএস ডাক্তার।'

'গ্রীন ভ্যালি কি আসলেই জংগল?' শাহ বানু বলল।

'হ্যাঁ, একেবারে পুরোপুরি জংগল।'

'কিন্তু জংগলে থাকেন কেন ওরা?' শাহ বানুই প্রশ্ন করল।

'সে অনেক কাহিনী। দু'জনেই খুব বড় ঘরের ছেলে মেয়ে। বোন সুস্মিতা বালাজী ডাক্তার এবং তার স্বামী ড্যানিশ দেবানন্দ একজন ইঞ্জিনিয়ার। তিনি একজন বিপুল বিত্তশালী ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানের মালিকের ছেলে। নিজেও চাকরি করতেন পোর্ট ব্লেয়ার সরকারের অধীনে। সৎ অফিসার ছিলেন। তার সততাই কাল হয়ে দাঁড়ায়। ঐ শংকরাচার্যরা তার চরম বৈরী হয়ে দাঁড়ায়। একদিন একসাথে তারা ড্যানিশ দেবানন্দের পিতা-মাতাকে খুন করে। কৌশলে খুনের দায় চাপিয়ে দেয় ড্যানিশ দেবানন্দ ও সুস্মিতা বালাজীর উপর। প্রাণ বাঁচাবার জন্যে দেবানন্দ তার পিতার সহায়-সম্পদ শংকরাচার্যদের হাতে তুলে দিয়ে জংগলে আশ্রয় নেয়। সেই থেকে আজ বিশ বছর ওঁরা জংগলে। আরেকটা বড় সুখবর তোমাদের জন্যে সেটা হলো সুস্মিতা বালাজী, মানে আমার পাতানো বড় বোন, তোমাদের সুষমা রাওয়ের ফুফাতো বোন। তারা মহারাষ্ট্রের একই গোষ্ঠীর মেয়ে।' আহমদ মুসা বলল।

‘কি বলছেন ভাইয়া, এটা সত্যি?’ বলল শাহ্ বানু। তার চোখে আনন্দ ও বিস্ময়।

‘সত্যি, তবে সুস্মিতা বালাজীর কথা সুষমা রাওয়ের মনে আছে কিনা জানি না। কিন্তু তার মা সুস্মিতা বালাজীকে খুব ভালবাসতেন, এখনও ভালবাসেন নিশ্চয়ই।’ আহমদ মুসা বলল।

‘বুঝতে পারলাম না। মামাতো-ফুফাতো অচেনা হবে কিভাবে?’ বলল সাহারা বানু।

‘এর পেছনে কাহিনী আছে। সুস্মিতা বালাজী সুষমা রাওদের বোম্বের বাসায় থেকে মেডিকেল কলেজে পড়তো। সুষমা রাও বয়স যখন এক বছর, তখন সুস্মিতা বালাজী মেডিকেল কলেঝে শেষ বর্ষে পড়াকালে ইন্জিনিয়ারিং শেষ বর্ষের ছাত্র ড্যানিশ দেবানন্দকে পরিবারের বাধা সত্বেও বিয়ে করে। বনিয়াদী ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে ভিন্ন জাতের ছেলেকে বিয়ে করায় পরিবার তা সাথে সম্পর্ক ছেদ করে। আজ বিশ বছর হলো তার পরিবারের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ কিংবা সম্পর্ক নেই সুস্মিতা বালাজীর। সুষমা রাও তাকে চিনবে কি করে!’

‘ড্যানিশ দেবানন্দ কেমন ভিন্ন জাতের ছেলে? তারও তো হিন্দু নাম দেখছি!’ বলল শাহ বানুর মা সাহারা বানু।

‘সুস্মিতা বালাজীকে বিয়ে করার সময় ড্যানিশ দেবানন্দ হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু পিতার দিক থেকে সে পার্সি এবং মায়ের দিক থেকে থাই বৌদ্ধ। দেবানন্দের মা থাইল্যান্ডের প্রথম রাজবংশের মেয়ে এবং তারা মূলত চীনা।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তোমার কাছ থেকে এই কাহিনীটা না শুনলেই ভাল ছিল। এখন খুব খারাপ লাগছে। তারা পরিবার হারিয়ে, স্বাধীন জীবন হারিয়ে জংগলে বাস করছে। কি দূর্ভাগ্য!’ বলল শাহ্ বানুর মা।

‘না খালাম্মা। ভাববেনা না। ওরা খুব ভাল আছে। আদিবাসীদের নিয়ে তারা এক নতুন জীবন শুধু নয়, এক সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে। এই সাম্রাজ্যে তারা সম্রাট। পরিবার-পরিজনদের হারিয়ে পরিবারের চেয়ে অনেক বড় আদিবাসী এক সমাজকে তারা পেয়েছে।’ আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসার মোবাইল বেজে উঠেছে। কথা শেষ করেই আহমদ মুসা পকেট থেকে মোবাইল তুলে নিল।

সুষমা রাওয়ের টেলিফোন।

'হ্যালো। ওয়ালাইকুম ছালাম। বল সুষমা।' বলল আহমদ মুসা।

ওপারের কথা শুনে আবার বলল, 'না সুখবর আছে সুষমা। ওদের উদ্ধার করেছি। আমি এখন ওদের নিয়ে যাচ্ছি গ্রীণভ্যালিতে, যেখানে আমি, গত কয়েকদিন ছিলাম।'

'না সুষমা। ওরা ওখানে ভাল ও নিরাপদ থাকবে।'

না, ওরা অজানা-অচেনা কেউ নয়। তোমার খুব আপনজন ওরা।'

'না সত্যি বলছি।'

'ঠিক আছে বলছি। আগে তুমি খালাম্মা ও শাহ্ বানুর সাথে কথা বলে নাও।'

আহমদ মুসা মোবাইল দিল সাহারা বানুকে। সাহারা বানু কথা বলল। তার কাছ থেকে মোবাইল গেল শাহ্ বানুর কাছে। ওদের কথা আর শেষ হয়না।

শাহ বানুই অবশেষে বলে ফেলল সুস্মিতা বালাজীর পরিচয়। বোধ হয় শাহ বানুর কাছে শুনে সুষমার যেন সব শোনা হলো না। আহমদ মুসার সাথে কথা বলতে চাইল সুষমা রাও।

শাহ বানু আহমদ মুসাকে মোবাইল দিয়ে বলল, ভাইয়া, ওদের ব্যাপারে সুষমা আপনার সাথে কথা বলতে চায়।

আহমদ মুসা মোবাইল নিয়ে 'হ্যালো' বলতেই ওপার থেকে সুষমা রাও বলল, 'কি ভাইয়া, শাহ বানু যা বলল তা সত্যি? সে সত্যিই আমার হারানো বোন?' গম্ভীর ও আবেগ জড়িত কন্ঠ সুষমার।

'তার কথা তোমার মনে আছে?'

'তাকে আমার মনে নেই। কিন্তু আম্মার কাছ থেকে তার কথা এত বেশি শুনি যে, তিনি আমার কাছে শত বছরের চেনার চেয়েও বেশি। আমার জন্মের পর তিনি এক বছর আমাদের বাড়িতে ছিলেন। আম্মা বলেন, তিনি এই এক বছরে আমাকে শত বছরের আদর দিয়ে গেছেন। এক বছর আমি ওর কোলেই মানুষ

হয়েছি। আমার অসুখ-বিসুখ কিংবা কোন অসুবিধা হলে তিনি মেডিকেল কলেজেরে ক্লাসে যেতেন না।' বল্ল সুষমা রাও। কান্নাজড়িত কন্ঠ সুষমার।

'হ্যাঁ, সুস্মিতা। তিনি তোমাদের কথা খুব ফিল করেন। সেদিন তোমাদের কথা বলতে গিয়ে তিনি অনেক কেঁদেছেন।' আহমদ মুসা বলল।

'তার কথা আমার আম্মা শুনলে পাগল হয়ে যাবেন ভাইয়া। আত্মীয় স্বজনের মাধ্যমে, বিভিন্ন মাধ্যমে কত যে সন্ধান করেন তিনি আপার। ভাইয়া, শাহ বানুদের নিয়ে যাচ্ছেন, আমাকেও আপার কাছে নিয়ে চলুন।' বলল সুষমা রাও।

'তোমার আব্বার চোখ এড়িয়ে তোমার যাওয়া কঠিন। আমি কথা দিচ্ছি সুষমা, আপাকেই তোমাদের কাছে আনব।' আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ ভাইয়। আমি, আমার মা সীমাহীন খুশী হবো। আপনি আপার টেলিফোন নাম্বার দিন। এখনি টেলিফোন করব।'

আহমদ মুসা সুস্মিতা বালাজীর টেলিফোন নাম্বার দিল সুষমা রাওকে।

'ধন্যবাদ ভাইয়া, আমার সব ধন্যবাদ, সব কৃতজ্ঞতা আপনার জন্যে ভাইয়া। আবেগ রুদ্ধ কন্ঠে বলল সুষমা রাও।

'কথা ফেরত নাও সুষমা। মানুষের সব ধন্যবাদ, সব কৃতজ্ঞতা একমাত্র আল্লাহর জন্যে।'

'স্যরি। একজন নব্য মুসলমানের ভুল হতেই পারে। আমি আমার উক্তিটি প্রত্যাহার করলাম। কিন্তু ভাইয়া, আল্লাহ তো আল্লাহই। তিনি সর্বোপরি এবং সর্বশক্তিমান। সবকিছুর নিয়ামক ও নিয়ন্ত্রক তিনি। আমি যে কথাটা বললাম তা বললে কি তার এই অধিকারে হস্তক্ষেপ হয়, না আরও কিছু কারণ আছে?'

'হস্তক্ষেপ অবশ্যই হয়। সব প্রশংসা, সব ধন্যবাদ-কৃতজ্ঞতা পাওয়ার যোগ্য মানুষ নয়, কারণ সব ক্ষমতা মানুষের নেই। যে কাজগুলোর জন্যে তুমি আমাকে ধন্যবাদ দিলে বা কৃতজ্ঞতা জানালে, সে কাজগুলো আমি করেছি বটে, কিন্তু এর কৃতজ্ঞতা কি আমার? একটা পুতুল ভাল নাচে, একটা কলম ভাল লিখে, এই 'ভাল নাচ' ও 'ভাল লেখা'র কুতিত্ব কি পুতুল ও কলমের? তা নয়। সবাই চোখ বন্ধ করে এই কৃতিত্ব দেবে পুতুল কলমের নির্মাতাকে। কারণ নির্মাতাই পুতুল ও কলমকে এই ভাল কাজের জন্যে তৈরি করেছে। সুতরাং আমি যে ভাল

কাজগুলো করেছি, তার যোগ্যতা, তার মানসিকতা, তার সুযোগ, সামর্থ্য সবই আল্লাহর কাছ থেকে পেয়েছি বিধায় প্রশংসা, ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা আল্লাহর জন্যে।

'আপনি ঠিক বলেছেন ভাইয়া। কিন্তু একটা সমস্যা। মানুষের ভাল কাজের প্রশংসা আল্লাহকে দিতে হয়, তাহলে মানুষের মন্দ কাজের দায় আল্লাহর উপরই বর্তায়।'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'পুতুল ও কলমের সাথে মানুষের পার্থক্য আছে। পুতুল ও কলমের স্রষ্টা পুতুল ও কলমকে নির্দিষ্ট একটা কাজের জন্যে সৃষ্টি করেছে, অন্য কোন কাজ করার ক্ষমতা, স্বাধীনতা পুতুল ও কলমকে দেওয়া হয়নি। কিন্তু মানুষকে আল্লাহ চিন্তা ও কাজ করার স্বাধীনতা দিয়ে পাঠিয়েছেন। এই সাথে মানুষের মঙ্গলের জন্যে, মানুষের এই বিশ্বের শান্তি ও স্বস্তির জন্যে ভাল ও ভাল পথকে আল্লাহ চিহ্নিত করে দিয়েছেন যুগে যুগে পাঠানো তাঁর নবী-রাসুলদের মাধ্যমে এবং বিধান দিয়েছেন মানুষকে ভাল কাজ হরতে হবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। এই বিধান মানুষ মান্যও করতে পারে, লংঘনও করতে পারে। ভাল কাজ করতে পারলে আল্লাহর প্রশংসা এই জন্যেই করতে হয় যে, ভাল কাজ করার শক্তি-সামর্থ্য যেমন আল্লাহ দিয়েছেন, তেমনি ভাল পথ ও কাজ চেনার সুযোগও আল্লাহই করে দিয়েছেন। অন্যদিকে মানুষ মন্দ কাজ করে, মন্দ পথে চলে তখন আল্লাহর বিধান সে লংঘন করেই করে এবং কাজ করার যে শক্তি-সামর্থ্য আল্লাহ দিয়েছেন তার অপব্যবহার করে। সুতরাং কেউ মন্দ কাজ করলে ও মন্দ পথে চললে তার দায় দাকেই বহন করতে হবে, আল্লাহকে নয়।'

আহমদ মুসা থামল। থেমেই আবার বলল সুষমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে, 'এসব ভারী কথা এখন থাক, সাক্ষাতে হবে। এখন বল, তেমন কোন খবর আছে কিনা। তোমার আব্বা কি ভাবছেন শাহ বানুদের ও আহমদ শাহ আলমগীরের উদ্ধারের ব্যাপার নিয়ে?'

'কিছুই ভাবছেন না ভাইয়া, এসব ব্যাপারে নিজের থেকে কিছুই বলেননি তিনি। মিনিট পাঁচেক আগে তার রুমের পাশ দিয়ে আসার সময় টেলিফোনে খুব উত্তেজিতভাবে কথা বলতে শুনলাম। তিনি কাউকে গালিগালাজ করে বলছেন,

'সব অপদার্থের দল। একা একজন সব ওলট-পালট করে দিল। আর সকলে মিলে তোমরা ঘোড়ার ঘাস কাটলে।' তারপর তিনি কাউকে নির্দেশ দিলেন, 'ওদের নিয়ে অবশ্যই কোথাও তাকে উঠতে হবে, পোর্ট ব্লেয়ার বা অন্য কোথাও। বোটে তারা অন্য কোন দ্বীপেও যেতে পারে। সন্দেহজনক সকল স্থানে তোমরা অভিযান চালাও। আমি বলে দিয়েছি পুলিশ তোমাদের সাহায্য করবে।'

থামল সুষমা রাও।

'খুব মূল্যবান খবর দিলে তুমি সুষমা। আমার অনুমান মিথ্যা না হলে, আমাদের ব্যাপারেই ঐ নির্দেশ তিনি কাউকে দিয়েছেন।

'আমার মনও এরকম কিছু বলছে ভাইয়া। তার মানে আব্বা কি.........।'

কথা শেষ না করেই থেমে গলে সুষমা রাও।

'সুষমা প্রমাণহীন কোন সন্দেহ নিয়ে অযথা মন খারাপ করোনা।'

'কিন্তু ভাইয়া, আমার মনে সন্দেহ ক্রমে দৃঢ় হচ্ছে যে, আমার কাছ থেকে আহমদ শাহ আলমগীরকে আলাদা করার জন্যেই তাকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে।' শেষের কথাগুলো তার কান্নায় রুদ্ধ হয়ে গেল।

'ধৈর্য্য ধর সুষমা। আহমদ শাহ আলমগীর সম্পর্কে সুখবর আমি শীঘ্রই তোমাকে দিতে পারব।'

'ধন্যবাদ ভাইয়া। আল্লাহ আপনাকে সাহয্য করুন। আপনার সাথে সাক্ষাৎ না হলে অবস্থা আমাকে পাগল করে ফেলতো। আল্লাহর পরেই আপনার উপর আমার ভরসা।'

'ধন্যবাদ বোন। এখন কথা শেষ করি।'

'আব্বার ঐ নির্দেশ নিয়ে আপনি কি ভাবছেন? আপনাদের অনেক সাবধান হতে হবে। আমি খুব দুশ্চিন্তায় আছি। আপনি সময় না পেলে শাহ বানু যেন আমার সাথে যোগাযোগ রাখে।'

'আমি ঐ বিষয়ে সিরিয়াসলি ভাবা শুরু করে দিয়েছি। তুমি চিন্তা করোনা। তোমার কথা আমি শাহ বানুকে বলব। রাখছি। আসসালামু আলাইকুম।'

'ওয়াআলাইকুম আস সালাম।' ওপার থেকে বলল সুষমা রাও।

আহমদ মুসা মোবাইল রাখতেই উদ্বিগ্ন কন্ঠে বলল সাহারা বানু, 'সুষমা রাও কি খবর দিল বেটা?'

'আমাকে কি বলার জন্যে বলল সুষমা?' মা সাহারা বানু থামতেই বলল শাহ বানু।

'সুষমা তোমাকে ঘন ঘন টেলিফোন করতে বলেছে। আর খালাম্মা, সুষমার খবরটা হলো, ওরা আমাদের খোঁজার জন্যে চারদিকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।' বলল আহমদ মুসা।

'আমাদের দূর্ভাগ্য। কিন্তু সুষমা এ বিষয়টা এত তাড়াতাড়ি জানল কি করে?' বলল সাহারা বানু।

'ক'মিনিট আগে তার আব্বা কারও সাথে টেলিফোনে যে কথাগুলো বলেছিল, তার থেকেই সুষমা এটা বলেছে।' বলল আহমদ মুসা।

'এত তাড়াতাড়ি বিষয়টা তার আব্বাই বা জানল কি করে? এমন কথা তিনি বলবেনই বা কেন? বলল সাহারা বানু। তার কপাল কুঞ্চিত।

আহমদ মুসা ম্লান হাসল। বলল, 'খালাম্মা আপনি যে প্রশ্ন তুলেছেন, তা খুব বড় খালাম্মা।'

'আমার ধারণা সত্য না হোক। কিন্তু মনে হচ্ছে কি জান, আহমদ শাহ আলমগীরের হারিয়ে যাওয়ার পেছনে সুষমার আব্বার হাত থাকতে পারে। যে অন্যবর্ণে বিয়ে করায় ভাগ্নীকে ত্যাগ করতে পারে, সে লোক নিজের মেয়েকে ভিন্ন ধর্মের ছেলের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে ভিন্ন ধর্মের ছেলের ব্যাপারে যে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যদি এই ঘটনা সত্যিই হয়, তাহলে আমাদের কিডন্যাপের সাথে তিনি জড়িত থাকতে পারেন।' বলল সাহারা বানু।

'খালাম্মা, আপনি যেটা বলেছেন সেটা ঘটতে পারা যুক্তির মধ্যেও আসে। কিন্তু আমি ভাবছি, তিনি আরও বড় কিছুর সাথে জড়িত।'

'সেটা কি?' সাহারা বানুর প্রশ্ন।

'একটা হিংস্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর সাথে তিনি জড়িত। এই গোষ্ঠীর হাতেই এই পর্যন্ত আন্দামানের কয়েক ডজন মুসলিম যুবক প্রাণ দিয়েছে।'

আহমদ মুসার মুখের কথা শেষ না হতেই তার মোবাইল আবার বেজে উঠল।

মোবাইল আবার তুলে নিল আহমদ মুসা। সুস্মিতা বালাজীর টেলিফোন।

খুশী হলো আহমদ মুসা। তাকে টেলিফোন করা দরকার মনে করেছিল আহমদ মুসা।

'হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম আপা।' বলল আহমদ মুসা।

'ওয়ালাইকুম সালাম, ছোট ভাই। আপনাদের ওয়েলকাম। শাহ বানুরা আসছে জেনে খুব খুব খুশী হয়েছি আমরা।'

'আমি আপনাকে টেলিফোন করব মনে করছি। আপনি জানলেন কি করে যে আমরা আসছি?'

'সুষমা টেলিফোন করেছিল। এটা ছিল আমার জন্যে এক ঐতিহাসিক আনন্দের ঘটনা। সেই এক বছরের দেখেছিলাম তাকে। দেখলাম সে সব জানে, সব শুনেছে। আপনার কাছ থেকে টেলিফোন নাম্বার পেয়েও আমি আমি তাকে টেলিফোন করিনি সে আমাকে চিনতে পারে কিনা এই চিন্তায়। কিন্তু তার সাথে কথা বলে মনে হলো আমরা যেন একদিনের জন্যেও আলাদা হইনি। আপনাকে ধন্যবাদ, আপনার জন্যে এই আনন্দ, এই মিলন সম্ভব হলো।'

'ওয়েলকাম আপা। আপনারা কেমন আছেন?'

'ভালো'

'গতকালের ঘটনার আর কোন প্রতিক্রিয়া আছে?'

'খারাপ নেই। ভাল প্রতিক্রিয়া হলো, আপনাকে আদিবাসীরা দেবতা ভাবতে শুরু করেছে।'

'ভাই সাহেব কি আশে-পাশে আছেন?'

'আছেন। দিচ্ছি।' সুস্মিতা বালাজী বলল।

'হ্যালো ভাই সাহেব, কেমন আছেন?'

'ভালো। আপনাকে কনগ্রাচুলেশন সাকসেসফুল মিশনের জন্যে। সত্যি আল্লাহ আপনাকে খাসভাবে সাহায্য করেন।' বলল ড্যানিশ দেবানন্দ।

'আলহামদুলিল্লাহ। আপনাকে একটা অনুরোধ করব।'

‘অনুরোধের প্রশ্ন কেন? বলুন কি’

‘হাইওয়ে থেকে ভ্যালিতে ঢোকার পথে, ভ্যালি মাঠটায় এবং ভ্যালি উপকূলে ল্যান্ডিং ডকটায় আপনি পাহারা বসান। তাদের বলুন অপরিচিত লোকদের দেখলে যেন আপনাদের খবর দেয়।’

‘কেন আপনি কি কোন আশংকা করছেন?’

‘সে রকম কিছু নয়, তবে আমার মন বলছে, আমাদের সাবধান হওয়া দরকার।’

‘যদি সে রকম হয়, তাহলে আমরা কি করব?’

‘লোকতেদর একত্রিত করবেন। যারা আসবে, তাদেরকে সার্চ করতে দেবেন। আমাদের না পেলেই তারা চলে যাবে। আরেকটা বিকল্প হলো, লোকদের একত্রিত করবেন সশস্রভাবে এবং যারা আসবে তাদের প্রতিহত করবেন।’

‘আপনার বিকল্পটাই গ্রহনযোগ্য। শংকরাচার্যের লোকেরা যদি ভ্যালিতে আসেই, তাহলে গতকালের ঘটনার তারা প্রতিশোধ নেবে। তাছাড়া আমাদের যদি চিনতে পারে, তাহতে তো অবস্থা আরও খারাপ হবে। সুতরাং বাধা দেওয়াই ভাল।’

‘ঠিক আছে। আমিও আপনার সাথে একমত। তবে ভাই সাহেব, ভ্যালিতে যদি কেউ যায়ই, তাহলে চূড়ান্ত পর্যায়ে ঘটনাকে ডিলে করার চেষ্টা করবেন। অথবা যারা যাবে তার আপনার প্রস্তুতির বিষয় জানার আগেই তাদের শেষ করতে পারলে সেটাই ভাল হবে।’

‘এখানেও আপনার দ্বিতীয় প্রস্তাব বেশি গ্রহণযোগ্য। তবে অবস্থা অনুসারেই আমাদের ব্যবস্থা নিতে হবে।’

‘ভাই সাহেব, এখন সাড়ে ৯টা। আমার খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাব ইনশাআল্লাহ।’

‘ইনশাআল্লাহ। ছোট ভাই, দোয়া করুন, আমার শান্তির ভ্যালিটাকে আল্লাহ যেন রক্ষা করেন।’

‘আমিন।’ বলল আহমদ মুসা।

‘তাহলে রাখি। আপনারা আসুন। খোদা হাফেজ।’

আহমদ মুসা মোবাইল রাখল।

শাহ বানু, সাহারা বানু ও তারিক সবারই মুখ উদ্বেগাকুল। আহমদ মুসার কথায় তারা বুঝেছে যে ভ্যালিতে তারা যাচ্ছে, সেখানেও বিপদ।

আহমদ মুসা মোবাইল রাখতেই সাহারা বানু বলে উঠল, ‘বেটা সেখানে কিছু হয়েছে, কোন বিপদ ঘটেছে?’

‘খালাম্মা এ নিয়ে চিন্তা করবেন না। আমরা বিপদের মধ্যেই আছি।যে কোন জায়গায় যে কোন ঘটনা ঘটে যেতে পারে। আবার কিছু নাও ঘটতে পারে। আমি ওদের একটা আশংকার কথা বলেছি। যাতে ওরা সতর্ক থাকে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আল্লাহ সহায় হোন, কিছু না ঘটুক বেটা।’ বলল সাহারা বানু।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘খালাম্মা কিছু ঘটা দরকার, ওদের আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়ানো দরকার। তাহলেই না বুঝব আমরা ঠিক পথে চলছি এবং আরও সামনে এগুনো আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে। যদি তারা আমাকে ওদের হাতে আত্মসমর্পণের জন্যে এখানে আসতে বাধ্য না করতো, তাহলে এত সহজে ও এত তাড়াতাড়ি আপনাদের উদ্ধার করা সম্ভব হতো না।’

‘তাই বলে বিপদেকে ওয়েলকাম করছেন স্যার?’

আলোচনায় শরিক হলো তারিকও।

‘বিপদকে নয় তারিক। শত্রুপক্ষ অন্ধকার থেকে সামনে এসে দাঁড়াক, সেটাই কামনা করছি। তাতে নতুন কিছু জানাও যেতে পারে। আহমদ শাহ আলমগীর এখনো উদ্ধার হয়নি। আমি অনুমান করি কোথায় তাকে রাখা হয়েছে। কিন্তু সেটা নিশ্চিত নয়। আরও নিশ্চিত হওয়া যায় কিনা এবং ঐ জায়গা সম্পর্কে আরও খবর জানা যায় কিনা দেখতে হবে। তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে ব্যর্থ হলে তাকে বাঁচানো কঠিন হতে পারে। আমি বুছতে পারছিনা, আহমদ শাহ আলমগীরের ব্যাপারে তারা এত সিরিয়াস কেন? শুধু সুষমা রাও এর কারণ হতে পারেনা। রহস্যের কেন্দ্রে পৌঁছতে..........।’

আহমদ মুসার কথার মাঝখানে কথা বলে উঠল সাহারা বানু। বলল সে, 'স্যরি বেটা, একটা সাংঘাতিক কথা মনে পড়ে গেছে। আগে এটা শোন। তোমার জিজ্ঞাসার জবাব এতে পেতে পার।'

মুহূর্তখানেক থেমেই সাহারা বানু বলা শুরু করল, 'শংকরাচার্যের লোকেরা আমাদের অনেক জিজ্ঞসাবাদ করেছে। এর মধ্যে একটা বাক্সের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে সবচেয়ে বেশি। বলেছে, এই বাক্স না পেলে আহমদ শাহ আলমগীর কিংবা তোমাদের কাউকে আমরা ছাড়ব না। তোমাদের ধরাই হয়েছে এই বাক্স আদায়ের জন্যে। আহমদ শাহ আলমগীর তার চোখের সামনে তার মা ও বোনের মর্মান্তিক পরিণতি দেখবে, যাতে মুখ খুলতে বাধ্য হবে। আবার তোমরা তোমাদের চোখের সামনে আহমদ শাহ আলমগীরের মর্মান্তিক পরিণতি দেখবে এবং তোমাদেরও মুখ খুলতে হবে। এসবের আগেই তোমরা যদি বাক্সের সন্ধান দাও, তাহলে তোমরা সকলেই বেঁচে যাবে। বাক্সের কথা শুনে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। কোন বাক্সের কথা বলছে, আমরা বুঝতেই পারিনি। আমি বললাম, কোন বাক্সের কথা বলছেন আপনার? কি আছে তাতে? জবাবে ওদের সর্দার লোকটি ইংরেজিতে বলল, চন্দন কাঠের একটি বাক্স। ওতে আছে আমাদের ঋষি রাজা শিবাজীর তৈরি মহামূল্যবান একটি দলিল, মোগল ধনভান্ডারের একটা নক্সা এবং আরও কিছু। আমে বলেছিলাম, এ বাক্স আমি দেখিনি। বাক্সটি আমাদের কাছে আসবে কেন? তিনি ক্রুদ্ধ কন্ঠে বলেছিলেন, ভনিতা রাখুন, বাক্সটি আপনাদের কাছেই আছে। আন্দামানে আপনাদের প্রথম পুরুষ মোগল শাহজাদা ফিরোজশাহ যখন কয়েদী হিসাবে আন্দামানে আসেন, তখন তার সাখে চন্দন কাঠের এই বাক্সটি ছিল। শত বিপদে সবকিছু ছাড়তে হলেও তিনি বাক্সটি ছাড়েন নি, তিনি কি বাক্সটিকে পারিবারিকভাবে হেফাজত না করে পারেন? পারেন না। অতএব বাক্সটি আপনাদের কাছে আছে, এ ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই। আমি তখন বলি, কিন্তু আমরা কেউ জানি না। সে বলে, জানেন কিনা দেখা যাবে। কাল সকালে এক ভয়ংকর শয়তান আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করছে। তারপর সবাইকে প্যাক করে আহমদ শাহ আলমগীরের কাছে নিয়ে যাব। তারপর দেখব আহমদ শাহ আলমগীর মা-বোনের অপমান কতটা সহ্য করতে পারে, আর

তোমার চোখের সামনে সন্তানের আকাশ-ফাটানো আর্তচিৎকার কতটা সহ্য করতে পার দেখব। সে যেতে উদ্যত হয়েও আবার বলে, হ্যাঁ আরেকটা সুখবর শোন। এ হারামজাদা যদি কালকে আত্মসমর্পণ না করে তাহলে এক মহাঘটনার জন্যে তৈরি থেকো? তারপর চলে যায় সে।'

আহমদ মুসা চোখ নিচু করে গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছিল সাহারা বানুর কথা। বাক্সের কথা ও বাক্সের ভিতরের জিনিসের কথা ভ্রুকুঞ্চিত হয়ে উঠেছিল আহমদ মুসার। তাহলে শংকরাচার্যের এই রকাক্ত মিশনের সাথে শুধু আন্দামানের ব্যাপার নয় ইতিহাসের একটি বিষয় এবং অর্থযোগও রয়েছে। তার বিস্ময় জাগল, মোগল অর্থভান্ডার কি এখনো গোপনই রয়ে গেছে, তার মনে পড়ল রাশিয়ার জারদের গুপ্তধনের কথা। তাহলে সব রাজবংশই কি তাদের জন্য গোপন অর্থভান্ডার গড়ে তোলে? হতে পারে, এটাই সে সময়ের চলমান বাস্তবতা। তার মনে আরও প্রশ্ন জাগল, শিবাজীর মহামূল্যবান দলিল মোগলদের বাক্সে কেন? কি আছে ওতে? আর ফিরোজ শাহ এত বিপদের মধ্যেও বাক্সটি ছাড়লেন না কেন? সাথে করে তা নিয়ে এলেন আন্দামানে?

এসব চিন্তায় নিজেকে প্রায় হারিয়ে ফেলেছিল আহমদ মুসা। সাহারা বানু থামলেও তাই কথা বলতে দেরি হলো আহমদ মুসার।

চিন্তায় ছেদ টেনে কথা বলল আহমদ মুসা। বলল, 'খালাম্মা, আমার মনে হচ্ছে বাক্সের কথাটা ওরা ঠিকই বলেছে। আহমদ শাহ আলমগীরকে বন্দী করে রাখার একটা বড় কারণ এটাই।'

'কিন্তু বেটা, কোন চন্দন কাঠের বাক্সতো আমরা দেখিনি।' সাহারা বানু বলল।

'কিছু মনে করবেন না খালাম্মা, এটা একটা বংশীয় গোপনীয়তার ব্যাপার, এমন কি হতে পারে যে, আপনি জানেন না কিন্তু আহমদ শাহ আলমগীর জানে?' বলল আহমদ মুসা।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না সাহারা বানু। ভাবছিল সে। একটু পর বলল, 'তুমি একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছ। রাজা-বাদশাদের এটা শুধু ট্রেডিশন নয় আইনও। উত্তারধিকার সূত্রে আহমদ শাহ আলমগীর এমন কিছু পেতেও পারে।

কিন্তু একটা বিষয়, আহমদ শাহ্ আলমগীরের পিতার এমন কোন বিশেষ বা গোপন স্থান ছিল না যেখানে সে একটা জলজ্যান্ত বাক্স সংরক্ষণ করবে, অথচ আমি জানেত পারবো না।'

এমনও তো হতে পারে, বাক্সটি দৃশ্যমান কোন স্থানে নেই। বাড়ির ভেতরে বা বাইরে কোন অদৃশ্য জায়গায় ওটা রেখেছিলেন ফিরোজ শাহ। ফিরোজ শাহ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে বিষয়টা সবাই জেনে আসছে এবং এই নিয়মেই আহমদ শাহ্ আলমগীর জেনেছে তার পিতার কাছ থেকে।' আহমদ মুসা বলল।

'ঠিক বলেছ বেটা। বাক্সের বিষয়টা যদি সত্য হয়, তাহলে এটাই ঘটেছে।'

বলে একটু থামল সাহারা বানু। একটা ঢোক গিলে আবার বলল, 'আল্লাহর হাজার শোকর তারা আমাদের বন্দী করে আহমদ শাহ'র কাছে নিয়ে যেতে পারেনি। আমাদের ক্ষতি দেখলে সে ওদেরকে বাক্সের কথা বলেও দিতে পারতো।'

'ঠিক খালাম্মা, এটা একটা বড় বাঁচা।' বলল আহমদ মুসা।

'আমরা বাঁচলাম, কিন্তু ভাইয়ার কি হবে, তার উপর তারা প্রতিশোধ নিতে পারে। কিছু ঘটে যায় যদি।' কম্পিত কন্ঠে বলল শাহ্ বানু।

'কোন ভয় নেই শাহ্ বানু। আমি নিশ্চত, ঐ বাক্স পাওয়া পর্যন্ত আহমদ শাহ্ আলমগীরকে তারা অবশ্যই বাঁচিয়ে রাখবে।' আহমদ মুসা বলল।

'বাক্সের ব্যাপারটা কি সত্যি ভাইয়া?' শাহ্ বানু বলল।

'বিশ্বাস করা, বিশ্বাস না করা কোন দিকেই সুনির্দিষ্ট কোন প্রমাণ আমার কাছে নেই। তবে এরকম কিছু থাকা আমি অস্বাভাবিক মনে করি না।'

'কোথায় খোঁজা যেতে পারে সে বাক্স' বলল শাহ্ বানু।

বাক্স খোঁজা তাদের কাজ, আমাদের কাজ হলো আহমদ শাহ্ আলমগীরকে পাওয়া। তবে এই বাক্সটার সন্ধান করতে চাই। বাক্সটার সাথে দু'টি ইতিহাস জড়িত। এক, মোগলদের, দুই শিবাজীর। আমার মতে বাক্সের মোগল ধনভান্ডারের চাবি ও নক্সার চেয়ে শিবাজীর দলিলটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শোনার পর থেকে ঐ দলিলটার প্রতি আমার লোভ বাড়ছে।' আহমদ মুসা বলল।

‘আপনার ভেতের কি কোন প্রকার লোভ আছে ভাইয়া?’ শাহ বানুর প্রশ্ন। তার ঠোঁটে ম্লান হাসি।

‘কেন আমি মানুষ নই? মানুষ বলেই অন্য মানুষের যা আছে, আমারও তা থাকবে।’

‘কিন্তু মানুষ বলেই সবকিছু সবার মধ্যে সবার মধ্যে থাকবে, তা কি স্বাভাবিক ভাইয়া?’

মৌলিক মানবীয় বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে অবশ্যই এটা স্বাভাবিক। কিন্তু পার্থক্য যেটা দেখা যায় সেটা মেধা ও অনুশীলণগত কারণের ফল। অনুশীলন এমনকি মেধার ঘাটতি পূরণ করে। সুতরাং শিক্ষা বা চর্চা মানুষে মানুষে বিরাট পার্থক্য তৈরি করে, আবার তেমনি পার্থক্য দূরও করে।

‘আপনার ছাত্র অনুশীলন শুরু করেছে, দেখা যাক পার্থক্য কতটা দূর করে।’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘দেখা তো শেষ হয়ে গেছে শাহ বানু। তার বন্দী হওয়া থেকে উদ্ধার পর্যন্ত সে সাহসের পরিচয় দিয়েছে। পুনরায় তোমাকে উদ্ধার করার সময় এক কঠিন মুহূর্তে ঠিক সময়ে সে গাড়ি নিয়ে হাজির হয়েছিল। তারপর এই বোট চালানোর দায়িত্ব সে নেয়া পর্যন্ত সংঘাতকালীন সব পর্যায়ে সে তার দায়িত্বের অংশ ঠিকঠাক পালন করেছে। আমি তার হাতে রিভলবার তুলে দেইনি। সবার হাতে রিভলবার উঠুক আমি চাই না, তোমাদেরও চাওয়া উচিত নয়।’

‘কিন্তু ভাইয়া, রিভলবারের ব্যবহারই কিন্তু আমাদের উদ্ধার করতে এবং এ পর্যন্ত নিরাপদে পৌঁছতে সাহায্য করেছে।’ বলল শাহ বানু।

‘ঠিক। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্যে রিভলবারের যেটুকু ব্যবহারের প্রয়োজন ছিল, তার ব্যবস্থা আল্লাহ করেছিলেন।’

‘প্রয়োজনকালে সময়ের জন্যে প্রস্তুতি তো তাহলে অপরিহার্য।’ শাহ বানু বলল।

‘তার মানে তুমি তারিকের হাতে রিভলবার তুলে দেবেই। এটাই স্বাভাবিক। মোগল রক্তের সাথে তাদের সামরিক বৈশিষ্ট্য অবিচ্ছেদ্য।

‘কিন্তু ভাইয়া, রিভলবার হাতে দেওয়ার চেয়ে তুলে নেওয়াই বেশি স্বাভাবিক।’

হাসল আহমদ মুসা। বলল তারিকেকে উদ্দেশ্য করে, ‘এবার তুমি জবাব দাও তারিক। নিজের বোঝা নিজেই বহন করা উচিত। আহমদ মুসা বলল।

‘ধন্যবাদ স্যার।’

বলে একটু থামল। শুরু করল পরক্ষণেই, ‘অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়া মোগল ট্রেডিশনে আছে। মোগল সম্রাজ্ঞীরা মোগল সম্রাটের হাতে তলোয়ার তুলে দিতেন যুদ্ধ যাত্রার সময়।’

বিব্রতকার একটা ভাব দেখা দিল শাহ বানুর চোখে-মুখে। লাল হয়ে উঠেছে তার মুখ। বলল, ওটা একটা আনুষ্ঠানিকতার ব্যাপার। যুদ্ধ যাত্রার সময়ে ওটা একটা বাড়তি উৎসাহের বিষয়। সম্রাটরা কিন্তু যোদ্ধা হিসাবেই সম্রাজ্ঞীর কাছ থেকে অস্ত্র পেয়েছেন।’

‘অস্ত্র হাতে পাওয়া যোদ্ধা হওয়ার ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই কোন বাধার সৃষ্টি করে না।’ বোটের সামনের দিকেই চোখ নিবদ্ধ রেখেই বলল তারিক।

‘যোদ্ধা হওয়া যায়না কিংবা বাধা সৃষ্টি হওয়ার কথা আমি বলিনি। আমার বলার বিষয় হলো মানসিকতা। যুদ্ধ বা সংগ্রামের জন্যে নিজেই প্রস্তুত হওয়া এবং অন্যের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হওয়ার মধ্যে মানসিকতার বিরাট পার্থক্য রয়েছে’ বলল শাহ বানু।

‘যুদ্ধ বা সংগ্রামের যে মুখোমুখি হয়নি, যুদ্ধ-সংগ্রামের যে সুযোগই পায়নি, তার ক্ষেত্রে প্রস্তুতির প্রশ্ন ওঠে না।’ বলল তারিক।

শাহ বানু হাসল একটু। বলল, ‘স্যরি আমার কথা টার্গেটেড নয়, আমি নীতি কথা বলেছি। আমি সব সময় মনে করি, আজ মুসলমানদের তো বটেই, প্রতিটি নাগরিকেরই তিনটি দায়িত্ব পালন করা দরকার। এক. সে যোদ্ধা হবে, দেশ ও জাতির জন্যে ডাক পড়লে যেন যুদ্ধে যেতে পারে। দুই. সে পুলিশ হবে যেন সে সমাজে আইন-শৃংখলা রক্ষা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে পারে এবং তিন. সে সংসার-ধর্ম পালনকারী একজন পরিপূর্ণ গৃহস্থ হবে। এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবার প্রস্তুতি তাকে সব সময় সম্পূর্ণ করে রাখতে হবে।’

‘ধন্যবাদ শাহ বানু।’ বলল আহমদ মুসা উচ্ছসিত কন্ঠে। আহমদ মুসার সাথে ধন্যবাদ দিল তারিকও।

‘তুমি চমৎকার একটা তত্ব সামনে এনেছ শাহ বানু।’ আহমদ মুসা বলল।

‘এটা আপনার কথা। আমি নতুন করে বললাম মাত্র। কোন এক ঘটনায় আপনিই একথা বলেছিলেন। ইন্টারনেট থেকেই আমি ও ভাইয়া এটা মুখস্থ করেছিলাম।’ বলল শাহ বানু।

‘ইন্টারনেঠে এটা আমি পড়িনি। কেউ বলেওনি। আমি জানতামও না। জানলে যোদ্ধা হওয়ার প্রস্তুতি অবশ্যই নিতাম।’ তারিক বলল।

‘আমাদেরকে কেউ বলেনি। আমরা ব্রাউজিং করে বের করেছি।’ বলল শাহ বানু।

‘তোমাদের ধন্যবাদ শাহ বানু। আমার নিজের জন্য স্যরি।’ তারিক বলল।

তারিকের কথা শেষ হতেই আহমদ মুসা বলে উঠল, ‘স্যরি নয় তারিক। জানার জন্যে ওটা কোন অপরিহার্য বিষয় নয় যে দুঃখ করতে হবে। যা হোক, তোমাদের সংক্ষিপ্ত বিতর্ক ভালো হয়েছে। তোমরা দু’প্রান্তে থাকলে কোন বিতর্ক জমবে ভালো। তবে কথা পরোক্ষ হয়েছে, সরাসরি হলে আরও ভাল হতো।’

‘তুমি নতুন শুনছ তো বেটা! ওরা ওভাবেই কথা বলে। তারিক খুব শান্ত ছেলে, ভালো ছেলে। শুধু আত্মরক্ষা করে চলাই ওর অভ্যাস।’ সাহারা বানু বলল।

‘তার মানে আমি ভালো নই বলছ আম্মা?’

সাহারা বানু কথা বলার জন্যে মুখ খুলেছিল।

আহমদ মুসা তার আগেই বলে উঠল, ‘আমার বোন এমন হতেই পারে না। মা যখন নিজের সন্তানের সামনে অন্য ছেলে-মেয়ের প্রশংসা করেন, তখন স্বতঃসিদ্ধ হয়ে যায় যে, সেই মা নিজের ছেলের গুণগুলোকেই অন্যের মধ্যে দেখতে চান।’

‘সবাইকে যিনি ভালবাসেন, তাকে এভাবেই ভাবতে হয় ভাইয়া।’

বলল শাহ বানু। তার কন্ঠ গম্ভীর।

শাহ বানু থামতেই তারিক বলল, ‘দুর্লভ এই গুণ শাহ বানু।’

শাহ বানু তাকাল তারিকের দিকে। তার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠেছে। কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল। তার আগেই আহমদ মুসা বলল, ‘এসব কথা এখন থাক। এস অন্যদিকে মনোযোগ দেই।’

বলে তারিকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তারিক বোটের মাথার উপরের কভারটা আনফোল্ড করে দাও। উপর এবং আশ-পাশ কোথাও থেকে আমাদের কেউ দেখতে পাক তা চাই না।

‘আমরা তো সাগর দিয়ে চলেছি স্যার। আমাদের দেখবে কে?’ বলল তারিক।

‘টেলিস্কোপিক বাইনোকুলারের শক্তির কথা তোমার জানার কথা। পোর্ট ব্লেয়ারের উপকূলে বসে তোমার জামার রং পর্যন্ত কেউ বলে দিতে পারে।’

‘স্যরি স্যার।’ বলে তারিক বোটের কভার আনফোল্ড করার বোতাম টিপে দিল।

ঢেকে গেল বোটের উপরটা। তার সাথে চারদিক থেকে ঝালর নেমে এসে পাশের অনেকটা ঢেকে দিল।

আহমদ মুসা চেয়ারে গা এলিয়ে দিল।

‘বেটা, বাক্সের ব্যাপারটা আমার মাথা থেকে যাচ্ছে না। তুমি কি এ নিয়ে আর কিছু ভেবেছ?’

‘আমার কিছু ভাবার দেখছি না। আপনি এ ব্যাপারে কিছু ভাবতে পারেন। আমি নিশ্চত বাক্সটি আপনাদের বাড়িতেই আছে। হতে পারে সেটা বাইরের কোন লকারে অথবা ভেতরের কোন লকারে।’

‘ভেতরের লকার কি?’ সাহারা বানু বলল।

‘ভেতরের লকার অর্থ বাড়ির দেয়াল অথবা ফ্লোরে কোন লকার রয়েছে। হতে পারে বাড়ি নির্মাণের সময় সেটা তৈরি করা হয়। আমি কিছু জিজ্ঞাসা করছি দয়া করে উত্তর দিন।’ আহমদ মুসা বলল।

‘বল বেটা।’ সাহারা বানু বলল।

আহমদ মুসা প্রশ্ন শুরু কলল। শুরু হলো আলোচনা।

নিঃশব্দে এগিয়ে চলল মটর বোট।

# ৬

এন্ডারসন দ্বীপ ও ইন্টারভূ দ্বীপের মাঝখান দিয়ে গ্রীন পয়েন্ট প্রণালী হয়ে এন্ডারসন দ্বীপের উত্তর প্রান্তে পৌঁছার পর আহমদ মুসার নির্দেশে বোটের উত্তরমুখী মাথা সোজা পূর্ব দিকে টার্ন নিল। এখান থেকে নাক বরাবর পূর্ব দিকে এগুলে গ্রীনভ্যালির মুখে পৌঁছা যাবে।

বোট এগিয়ে চলল গ্রীনভ্যালির ঐ মুখের দিকে।

আহমদ মুসা উঠে বোটের ফ্ল্যাগ-স্ট্যান্ডে ফিশিং বোটের একটা পতাকা গুঁজে দিল।

ফিরে এসে আহমদ মুসা বসতে বসতে বলল, সবাই মনে করুক যে এটা একটা ফিশিং বোট।'

বোট গিয়ে পৌঁছল গ্রীনভ্যালির মুখে।

মুখটা তিরিশ ফুটের বেশি প্রশস্ত হবে না। দু'পাশ থেকে সাঁড়াশির মত সবুজ বাহু মুখ পর্যন্ত পৌঁছেছে। মুখ পেরোলেই বিশাল হ্রদের মত এক বিশাল সরোবর। এ সরোবরের তিন প্রান্ত ঘিরেই গ্রীনভ্যালি। আবার কয়েক বর্গমাইলের গ্রীনভ্যালি ঘিরে সবুজ পাহাড়ের দেয়াল। অপূর্ব দৃশ্য।

মুখটা পেরিয়ে বোট ভেতরে প্রবেশ করতেই সামনে তাকিয়ে চিৎকার করে বলে উঠল সবাই, 'ওয়ান্ডারফুল', অবিশ্বাস্য!'

তাদের সামনে শান্ত সরোবরের অগাধ কাল জলরাশি। এর ওপারে উপত্যকার সবুজ সমুদ্র এবং তাতে সবুজ চাদরে ঢাকা পাহাড়ের দেয়াল।

শাহ বানুরা যখন গ্রীনভ্যালির সৌন্দর্যের মধ্যে নিজেদের হারিয়ে ফেলেছে, তখন আহমদ মুসার চোখের দূরবীণ গ্রীনভ্যালির ছোট ও একমাত্র ল্যান্ডিং প্ল্যাটফরমের উপর নিবদ্ধ।

আহমদ মুসার চোখে-মুখে কৌতূহল। ল্যান্ডিং প্ল্যাটফরমে অপরিচিত দু'টি মাঝারি আকারের বোট দাঁড়িয়ে আছে।

আহমদ মুসা বোট দু'টি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা শুরু করল।

বোটে কোন পতাকা নেই। কোন বিশেষ মার্কসও দেখা যাচ্ছে না বোটের গায়ে।

বোটে কোন মানুষ আছে কিনা খুঁজতে লাগল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার ভাগ্য ভাল, একজন লোক বোটের চাঁদোয়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে বোটের মাথায় গিয়ে দাঁড়াল। তার পোশাক সাধারণ, বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য নেই। আরও ভালভাবে দেখতে লাগল লোকটাকে আহমদ মুসা। কিন্তু দেখা হলো না। লোকটি বোটের চাঁদোয়ার তলে আবার এল।

আহমদ মুসা দূরবীন রেখে উঠে গিয়ে ফিশিং বোটের পতাকা নামিয়ে ফেলল বোটের ফ্ল্যাগ স্ট্যান্ড থেকে।

ফিরে এস চেয়ারে বসতে বসতে বলল, 'ঘাটে আরও দু'টি অপরিচিত বোট নোঙর করা।'

'তাতে কি স্যার? ঘাটে তো অনেকেরই বোট থাকতে পারে।' বলল তারিক।

'ওটা প্রাইভেট ঘাট। ওখানে তাদের নিজেদের বোট ছাড়া কোন বোট থাকে না, রাখার লোকও নেই গ্রীনভ্যালির ত্রিসীমানায়।'

'তাহলে?' বলল সাহারা বানু।

'বোটে একজন লোককেও দেখতে পেয়েছি। সে আদিবাসী নয়। অথচ এই গ্রীনভ্যালি ও এর আশে-পাশের এলাকায় আমার আপা সুস্মিতা বালাজী ও তার স্বামী ড্যানিশ দেবানন্দ ছাড়া অআদিবাসী কোন লোক নেই।'

'বোট তাহলে এল কোত্থেকে? তাও একটি নয় দু'টি।'

ভাবছিল আহমদ মুসা

একটু পর বলল, 'এর একটাই ব্যাখ্যা যে, শংকরাচার্যের লোকেরা এখানে এসেছে।'

উদ্বেগের ছায়া নামল শাহ বানুদের চোখে-মুখে।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'তারিক, তুমি পেছনে এস।'

তারিক ড্রাইভিং সীট ছেড়ে দিয়ে পেছনে সরে এল।

আহমদ মুসা ড্রাইভিং সীটে বসল। বোটের গতি বেড়ে গেল।

‘ওদের কোন বিপদ হয়নি তো বেটা? আমরা আবার ওখানে যাচ্ছি।

‘কিছু ভাববেন না খালাম্মা। সবকিছুই আল্লাহর ফায়সালার অধীন। আমাদের দায়িত্ব হলো, আমাদের কাছে যেটা কল্যাণকর মনে হবে, সেটাই করা।

‘আল্লাহ আমাদের সহায় হোন বেটা।’

‘আমিন’ বলল সকলে।

আহমদ মুসা দ্বিধা-সংকোচহীন গতিতে বোট নিয়ে নোঙর করল অপরিচিত একটি বোটের পাশে।

একটি বোট আসতে দেখে অপরিচিত বোটের একজন লোক উঠে দাঁড়িয়ে ছিল। সন্দেহ-সংশয়পূর্ণ তার দু’টি চোখ তাকিয়েছিল আহমদ মুসাদের দিকে। তার একটি হাত পকেটে।

লোকটির পকেটের হাতে যে রিভলবার তা বুঝতে বাকি রইল না আহমদ মুসার। এই লোকটিকেই আহমদ মুসা দূরবীনে দেখেছিল।

বোট নোঙর করেই আহমদ মুসা পাশের বোটের সেই লোকটিকে উদ্দেশ্য করে বলল, ‘তুমি একাই আছ? মহাগুরুজীরও তো থাকার কথা ছিল। তিনিও গেছেন ওদের সাথে?’

‘তুমি কে’ আহমদ মুসার কোন প্রশ্নেরই জবাব না দিয়ে বলল লোকটি।

‘তুমি চিনবে না। মহুগুরুজীর সাথে আমার কথা হয়েছে। আমি পোর্ট ব্লেয়ার থেকে আসছি। ভেতরে যাদের দেখছ, ওদেরই নিয়ে আসার কথা।’ বলল আহমদ মুসা।

লোকটি বোটের ভেতরে বসা শাহ বানুদের দিকে একবার তাকিয়ে একটু চিন্তা করল। বলল, ‘এঁদেরকেই মহাগুরুজী মানে আমরা সন্ধান করছি?’

‘হ্যাঁ।’ বলল আহমদ মুসা

এতক্ষণে লোকটি স্বাচ্ছন্দ ফিরে পেল। বলল, ‘হ্যাঁ, মহাগুরুজী সকলকে নিয়ে উপরে গেছেন। আমি বোট ও গোলাগুলী পাহারা দিচ্ছি। আ.........।’

আহমদ মুসা তার কথার মাঝখানে বলে উঠল, ‘কেন সবাই গোলাবারুদ সাথে নিয়ে যাবার কথা। নিয়ে যায়নি?’

‘না, বাড়তি গোলাবারুদ নিয়ে যায়নি। ওঁরা গিয়ে অবস্থা দেখে প্রয়োজন হলে দু’জন লোক পাঠাবেন গোলাগুলী নিয়ে যাবার জন্যে।’ বলল লোকটি।

‘একটু কথা বলার দরকার মহুগুরুজীর সাথে। ওরা কখন গেছেন, কয়জন গেছেন?’ আহমদ মুসা বলল।

‘পনের জন, পনের-বিশ মিনিনট হলো।’ বলতে বলতে লোকটি পকেট থেকে মোবাইল বের করল।

আহমদ মুসা ঐ বোটে গিয়ে উঠল। বলল, ‘মোবাইল আমাকে দাও। ওর নাম্বার আমি জানি।’

লোকটি মেবাইল তুলে ধরল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা ডান হাতে মোবাইলটি নিল তার কাছ থেকে। সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে বাম হাত দিয়ে রিভলবার বের করে তার মাথায় চেপে ধরল।

লোকটি ভূত দেখার মত চমকে উঠে পকেটে হাত দিতে যাচ্ছিল।

আহমদ মুসা শান্ত গলায় শান্তকন্ঠে বলল, ‘রিভলবার বের করার চেষ্টা করো না। তার আগেই মাথা ছাতু করে দেবে।’

আহমদ মুসা লোকটির কাছ থেকে নেয়া মোবাইলটি পকেটে রেখে হাত দিয়ে লোকটির পকেট থেকে রিভলবার তুলে নিল। তারপর এক ধাক্কা দিয়ে লোকটিকে বোটের উপর ফেলে দিল। বলল তারিককে উদ্দেশ্য করে, ‘ব্যাগে দেখ ক্লোরোফরম আছে। দু’টুকরো তুলা ভিজিয়ে ওর নাকের দু’ছিদ্রে গুঁজে দাও।’

তারিক এল। সে লোকটির মুখ বাম হাতে চেপে ধরে ডান হাত দিয়ে দু’টুকরো ক্লোরোফরম ভেজা তুলা লোকটির নাকের দু’ছিদ্রে গুঁজে দিল। তারপর ডান হাত দিয়ে লোকটির বুক চেপে দিল কয়েকবার।

লোকটি নিশ্বাস বন্ধ করেছিল, সেটা খুলে গেল।

লোকটি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল।

‘তারিক তুমি ওই বোটে দেখ গোলাগুলী কোথায় আছে বের করে নিয়ে এস। আমি এ বোটে দেখছি।’ আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসা এ বোটে অস্ত্র-শস্ত্র কিছু পেল না, একটা ব্যাগ পেল। ব্যাগে ডাইরী এবং কাগজ পত্র দেখতে পেল একটা ফাইলে। আহমদ মুসা ব্যাগটি কাঁধে তুলে নিল।

ওদিকে তারিক একটি গ্রেনেড লাঞ্চার ও একটা লাইট মেশিণগান সহ দু'বাক্স এ্যামুনিশন নিয়ে ঐ বোট থেকে নেমে এল।

আহমদ মুসা শাহ বানুদেরও নামিয়ে নিল বোট থেকে।

আহমদ মুসা একটা ব্যাগ পিঠে, আরেকটা কাঁধে ঝুলাল। রকেট লাঞ্চার ও মেশিনগান নিল কাঁধে। কিন্তু গোলাগুলীর বাক্স দু'টি তারিক নিতে পারছিল না।

শাহ বানু এগিয়ে এসে একটা বাক্স নিতে চাইল।

'বেশ ভারী, তোমার কষ্ট হবে।' বলে তারিক বাক্সটি শাহ বানুকে দিতে চাইল না।

'মেয়েরা বোধ হয় কষ্ট করতে জানে না? মেয়েরা কোন দিন বোধ হয় যুদ্ধ করেনি?' বলল শাহ বানু ক্ষোভের সাথে।

'একটা বাক্স শাহ বানুকে দিয়ে দাও তারিক। একটা লোডেড রিভলবারসহ কিছু গুলীও তুমি দিয়ে দাও শাহ বানুকে। শাহ বানু ভাল গুলী চালাতে পারে।' বলল আহমদ মুসা।

গুলীর বাক্সটা কাঁধে নিয়ে রিভলবারটা ওড়নার নিচে কামিজের কোন গোপন পকেটে রেখে দিল। তারপর আহমদ মুসার উদ্দেশ্যে বলল, 'ধন্যবাদ ভাইয়া আমার প্রতি আস্থার জন্য।'

চারজনের যাত্রা শুরু হলো। প্রথমে আহমদ মুসা, তারপর শাহ বানু, শাহ বানুর পরে সাহারা বানু ও সবশেষে তারিক।

উপকূলের পর কয়েকটা চড়াই-উৎরাই বেয়ে উপত্যকার সমভূমিতে উঠতে হয়। চড়াই-উৎরাই সবটাই ঘন-জংগলে আচ্ছাদিত। তার মধ্য দিয়ে অস্পষ্ট একটা পায়ে চলার পথ।

দু'টি চড়াই পার হয়ে এসেছে আহমদ মুসারা। তৃতীয় চড়াইয়ের মাথায় পৌঁছে গেছে তারা। আরেকটা চড়াই-উৎরাই এর পরেই উপত্যকা। তৃতীয় চড়াই

এর মাথায় উঠেছে আহমদ মুসা। তার পেছনে শাহ বানুও চড়াইয়ের মাথায় এসে গেছে। সাহারা বানু এবং তারিকও উঠছে চড়াইয়ের মাথায়।

আহমদ মুসা উৎরাই বেয়ে নামার যাত্রা শুরু করেছে। দু'ধাপ এগিয়েছে। এ সময় দু'পাশের ঝোপ থেকে দু'জন যবক স্টেনগান বাগিয়ে বেরিয়ে এল। আহমদ মুসার পথ রোথ করে দু'জন পাশাপাশি দাঁড়াল। তাদের স্টেগানের নল আহমদ মুসা, শাহ বানু সকলকেই কভার করেছে।

আহমদ মুসা দাঁড়িয়ে গেছে। তার বাম হাত কাঁধের মেশিনগান ও গ্রেনেড লাঞ্চার ধরে রেখেছে। আর ডান হাত জ্যাকেটের পকেটে এবং পকেটে রিভলবারের বাট ধরে আছে।

আহমদ মুসা হাত বের করতে গিয়েছিল। ওদের একজন চিৎকার করে বলল, 'হাত বের করার চেষ্টা করে না। হাত বের করার আগেই ডজন খানেক গুলী তোমার শরীরে ঢুকে যাবে। এতক্ষণ গুলী ঢুকে যেত, কিন্তু মৃত্যুর আগে তোমাকে একটা কথা শোনাতে চাই। তুমি এ পর্যন্ত আমাদের যত লোক মেরেছ, তার দ্বিগুণ লোককে আমরা এই উপত্যকায় আজ হত্যা করব।'

বলে সে স্টেনগানের ট্রিগার টানা শুরু করেছিল।

শাহ বানুর বাম হাতে তার কাঁধের গুলীর বাক্স ধরা ছিল। আর তার ডান হাত ছিল স্বাভাবিকভাবেই ওড়নার নিচে। ওড়না কোমর পর্যন্ত নেমে যাওয়া।

শাহ বানু তাদের সামনে যমদূতের মত দু'স্টেনগানধারীকে উদয় হতে দেখ প্রথমটায় ঘাবড়ে যায় পরে সাহস ফিরে পায় এবং কামিজের পকেট থেকে রিভলভবার বের করে নেয়।

শাহ বানু আহমদ মুসার কয়েক গজ পেছনে ছিল এবং দু'স্টেনগানধারী ও তার মাঝে কোন আড়াল ছিল।

ষ্টেনগানধারী যখন কথা শেষ করল, শাহ বানু বুঝল কি ঘটতে যাচ্ছে। সমস্ত সত্তা যেন তার কেঁপে উঠল। সে সমস্ত মনোযোগ একত্রিত করে ওড়নার তলে তার রিভলবার সেট করল প্রথম ষ্টেনগানধারীকে লক্ষ্য করে। ওরা উৎরায়ের কিছুটা নিচে দাঁড়ানো থাকায় সুবিধা হলো টার্গেট করায়।

ষ্টেনগানধারী যখন তার ষ্টেনগানের ট্রিগার টানছিল, তখন শাহ বানু তার রিভলবারের ট্রিগার টিপে দিয়েছে। একটি গুলী বেরিয়ে গেল রিভলবার থেকে। সে গুলীর ফলাফলের অপেক্ষা না করে ট্রিগারে দ্বিতীয় আরেকটি চাপ দিল সে।

দু'টি গুলীর একটি গিয়ে বিদ্ধ করেছে প্রথম ষ্টেনগানধারীর বুকে এবং দ্বিতীয়টি মাথায়।

প্রথম গুলী গিয়ে ষ্টেনগানধারীকে বিদ্ধ করতেই আহমদ মুসা রিভলবার ধরা তার হাত পকেট থেকে বের করে নিয়েছে। সে টার্গেট করল দ্বিতীয় ষ্টেনগানধারীকে। শাহ বানুর দ্বিতীয় গুলী এবং আহমদ মুসার গুলী প্রায় এক সাথেই হলো।

দু'ষ্টেনগানধারীর গুলীবিদ্ধ দেহ মাটিতে আছড়ে পড়ে অল্প একটু গড়িয়ে স্থির হয়ে গেল।

শাহ বানু নির্বাক চোখে তাকিয়ে আছে তার গুলীতে নিহত প্রথম ষ্টেনগানধারীর দিকে। সে গুলী করেছে এবং লোকটি মরেছে- সবই যে তার কাছে স্বপ্ন মনে হচ্ছে। কি করে এসব ঘটে গেল বুঝতে পারছে না সে। তার কাঁধ থেকে গুলীর বাক্স পড়ে গেছে। তার হাত যেন শিথিল হয়ে পড়েছে।

সাহারা বানু পেছন থেকে এসে জড়িয়ে ধরল শাহ বানুকে। বলল, 'ঠিক করেছ মা। আল্লাহর হাজার শোকর। আল্লাহ তোমাকে আরও সাহস দিক'।

আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। বলল, 'খালাম্মা শুধু ঠিক কাজ করেছে তাই নয়, ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি করেছে। একটু দেরি হলে ওর ষ্টেনগানের গুলী আমাকে 'এফোড়-ওফোড়................'।

আহমদ মুসা কথা শেষ করতে পারলো না। শাহ বানুর একটা হাত এসে আহমদ মুসার মুখের উপর চেপে বসল। বলল সে আর্তকণ্ঠে, এমন শব্দ উচ্চারণ করবেন না ভাইয়া। আমি কিছু করতে না পারলে আল্লাহ আপনাকে দিয়ে কিছু করাতেন আত্মরক্ষার জন্যে।'

'ঠিক শাহ বানু। আল্লাহ এটাই করেন'। গম্ভীর কন্ঠ আহমদ মুসার।

তারিক এগিয়ে এসেছে। সে বলল, 'ধন্যবাদ শাহ বানু। তোমার প্রথম রিভলবার চালনা ঐতিহাসিক হয়েছে এবং সফল হয়েছে। ঐতিহাসিক এই কারণে

যে, প্রথম গুলী আমার মত সকলের স্যার এবং মহানায়ক আহমদ মুসার প্রতিরক্ষায় বর্ষিত হয়েছে। পুরুষানুক্রমে এটা গল্প করা যাবে'।

শাহ বানু ফিরে তাকাল তারিকের দিকে। চোখে তার ভ্রুকুটি। বলল, 'তোমাকে ধন্যবাদ দিতে পারছি না। তুমি প্রয়োজনের চেয়ে বেশি বলেছ। ভাইয়া এ ধরনের প্রশংসা পছন্দ করেন না। তবে তোমাকে ধন্যবাদ দিতে পারি এ কারণে যে, আত্মরক্ষার উপযুক্ত প্রস্তুতি কত প্রয়োজন তা তুমি বুঝেছ'।

মুখ লাল হয়ে উঠেছে তারিকের। ফুটে উঠেছে বিব্রতভাব। বলল, দুঃখিত বেশি বলে থাকলে। তবে বানানো কিছু বলিনি। আর আত্মরক্ষার প্রয়োজন ও প্রস্তুতির ব্যাপার একটি সার্বজনীন বাস্তবতা। এ উপলব্ধি কারও নেই, একথা ভাবা ঠিক নয়। প্রস্তুতি ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে পার্থক্য অবশ্যই থাকতে পারে'। তারিকের কণ্ঠ অনেকটাই অভিমান ক্ষুব্ধ।

মিষ্টি হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'তোমাদের বাকযুদ্ধ খুবই ভাল লাগে। তবে শাহ বানু, আমার ছাত্রের প্রতি তোমার শেষ কথাটা খুব কঠোর হয়েছে'।

'আমি দুঃখিত ভাইয়া। কিন্তু আপনার ছাত্রও শেষে নরম কথা বলেনি'। বলল শাহ বানু নরম কণ্ঠে।

'তারিক, শাহ বানু ঠিকই বলেছে'। সেই মিষ্টি হাসি আহমদ মুসার মুখে তখনও।

'আমি দুঃখিত স্যার'। তারও নরম কণ্ঠ।

'অতীতেও ওরা এমন বাক যুদ্ধ করে এসেছে। কিন্তু তোমার মত মধ্যস্থতাকারী ছিল না বেটা। আশা করি মতপার্থক্যের দূরত্বটা এবার দূর হবে'। বলল সাহারা বানু প্রসন্ন কন্ঠে।

আহমদ মুসা হাসি মুখে 'আমিন' উচ্চারণ করে তারিককে লক্ষ্য করে বলল, 'তুমি গুলীর বাক্সটা শাহ বানুকে তুলে দাও'।

সঙ্গে সঙ্গে তারিক নিজের বাক্সটা কাঁধ থেকে নামিয়ে রেখে শাহ বানুর বাক্সটা তুলতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। বলল, 'স্যার আমি দু'বাক্স দু'কাঁধে সহজেই নিতে পারব। শাহ বানু ফ্রি থাক। এতে আমাদের উপকারই হবে'।

আহমদ মুসা কথা বলার আগেই শাহ বানু বলে উঠল 'মেয়েরাও ভার বহন করতে পারে। ঠিক আছে বাক্সটি আমিই তুলে নিচ্ছি'।

কথার সাথে সাথে শাহ বানু নিচু হয়ে বাক্সটি তুলে নিল কাঁধে।

আহমদ মুসা সেই মিষ্টি হেসেই বলল, 'খুবই আনন্দের কথা, মেয়েরা খুব আত্মসচেতন হয়ে উঠছে। তারা বাড়তি 'আনুকূল্য' নিয়ে নিজেদের ছোট করতে চায় না। ভেব না তারিক, শাহ বানুর ডান হাত ফ্রি থাকছে।

'স্যার, শাহ বানু কিন্তু সব সময়ই আত্মসচেতন। তার পরিচয়ের কারণেই হয়তো'। বলল তারিক।

শাহ বানু কথা বলার জন্য মুখ খুলেছিল। তার চোখে ভ্রুকুটি। কিন্তু তার আগেই দ্রুত আহমদ মুসা বলে উঠল, 'আবার তারিক, তুমি বেশি বলে ফেলেছ। আমার ছোট বোনটি অহেতুক প্রশংসা পছন্দ করে না'।

'স্যরি স্যার'। সঙ্গে সঙ্গেই বলল তারিক।

আহমদ মুসার কথার ঢংয়ে ঠোঁটে হাসি ফোটে উঠল শাহ বানুর। সে মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে নিল, বোধ হয় হাসি আড়াল করার জন্যেই।

'ঠিক আছে তারিক, স্যরি গ্রহণ করা হল। এবার তুমি পেছনে লাইনে দাঁড়াও। আমাদের যাত্রা শুরু করতে হবে'।

বলে আহমদ মুসা থামল। তার চোখে-মুখে ভাবনার চিহ্ন ফুটে উঠল।

তারিক হটে গিয়ে সাহারা বানুর পেছনে তার জায়গায় ফেরত গেছে।

আহমদ মুসা রকেট লাঞ্চার পিঠে ঝুলিয়ে লাইট মেশিন গানটি হাতে নিল। ম্যাগজিন লোডেড কিনা পরীক্ষা করল। পকেট থেকে বের করে এক্সট্রা ম্যাগজিনও পরীক্ষা করে দেখল। তারপর লাইট মেশিনগানটি (এলএমজি) হাতে রেখেই তাকাল শাহ বানু তারিকদের দিকে। বলল, 'এরা দু'জন যাচ্ছিল বোটে অ্যামুনিশনের বাক্স আনার জন্যে। তার মানে সংঘর্ষ হবে, শংকরাচার্যরা এই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে। কিন্তু অ্যামুনিশন না যাওয়া পর্যন্ত কোন সংঘাত হচ্ছে না, এটা বলা যায়। যদি এরা দু'জন অ্যামুনিশন নিয়ে ওদের কাছে না ফিরে যায়, তাহলে নিশ্চয় ওদের কেউ এদের খোঁজ খবর নিতে আসবে। যদি এটাই ঘটবে বলে আমরা মনে করি, তাহলে আমাদের ওদের জন্যে অপেক্ষা করা দরকার। এই

ধরনের গেরিলা আক্রমণে ওদের জান ও শক্তিক্ষয় আমাদের বিজয়কে সহজ করবে।

'তথাস্তু ভাইয়া'। বলল শাহ বানু।

তারা সকলে গিয়ে ঝোপের আড়ালে বসে পড়ল। সেখান থেকে উৎরাই বেয়ে নেমে যাওয়া অনেকখানি দেখা যায়। পল পল করে এক ঘন্টা কেটে গেল। একটা অপরিচিত গন্ধ এসে প্রবেশ করল আহমদ মুসার নাকে। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল আহমদ মুসার কথা। আহমদ মুসারা গল্প করছিল ফিসফিসে কন্ঠে।

গন্ধ পাওয়ার সাথে সাথেই আহমদ মুসার চোখ নেমে গেল পায়ে হাঁটা রাস্তা ধরে নিচের দিকে। দেখল দু'জন লোক আসছে বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে। তাদের দু'জনের কাঁধেই ষ্টেনগান ঝুলানো।

রাস্তার দিকে ইঙ্গিত করে আহমদ মুসা সবাইকে চুপ করতে বলল।

শাহ বানুরাও রাস্তার দিকে চোখ ফিরাল। উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করল। শাহ বানু বলল, 'আগের মতই দু'জন'।

ওরা দু'জন আহমদ মুসাদের অতিক্রম করে সামনে এগুলো। ষ্টেনগান কাঁধে ঝুলিয়ে দু'হাত পকেটে ঢুকিয়ে ওরা দ্রুত হাঁটছিল।

আহমদ মুসা এলএমজি ও গ্রেনেড লাঞ্চার মাটিতে নামিয়ে রেখে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। বিড়ালের মত পা টিপে টিপে দ্রুত ওদের পেছনে চলে গেল।

আহমদ মুসা তার দু'হাতের দু'রিভলবার ওদের দু'জনের বাম পিঠে চেপে ধরে বলল, হাত তুলে উপুড় হয়ে শুয়ে............'।

আহমদ মুসার কথা শেষ হলো না। ওদের দু'জনের দু'হাত রিভলার সমেত বের হয়ে উপরে উঠল বিদ্যুত গতিতে।

আহমদ মুসা সঙ্গে সঙ্গেই বুঝল এই বেপরোয়া লোক দু'জন হাত উপরে তুলেই উপর থেকে তাকে লক্ষ্য করে গুলী করতে যাচ্ছে। আহমদ মুসার কাছে এটা বেনজীর ষ্টাইলের এক বেপরোয়া উদ্যোগ। এই দু'গুলির আওতায় যে আহমদ মুসা পড়তে পারে, এটাও আহমদ মুসা জানে।

আহমদ মুসার ভাবনার চেয়েও দ্রুত যেন মাথা থেকে নির্দেশ পৌঁছে গেল আহমদ মুসার দু'হাতের তর্জনিতে। দু'তর্জনি সঙ্গে সঙ্গেই চেপে ধরল দু'রিভলবারের ট্রিগার। আহমদ মুসা গুলী করেই ওদের গায়ের সাথে লেপ্টে গিয়ে ওদের দেহকে পুশ করল সামনের দিকে।

আহমদ মুসা গুলী করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওদের রিভলবার থেকেই দু'টি গুলীর আওয়াজ হলো। কিন্তু ততক্ষণে ওদের দেহে গুলী লাগার ফলে ওদের দেহ ও হাতে কম্পনের ধাক্কা গিয়ে লেগেছে। রিভলবারের ব্যারেল ওদের নড়ে গিয়ে উপরে উঠেছে অনেক খানি। ফলে গুলী দু'টি আহমদ মুসার অনেক উপর দিয়ে উড়ে গেল।

আহমদ মুসা ওদের দেহ নিয়ে উপুড় হয়ে পড়েছে। ওদের উপরে গিয়ে পড়েছে আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। তার দেহের সামনেটা রক্তে ভিজে গেছে।

গুলীবিদ্ধ দু'জনকে আহমদ মুসা চিৎ করল, দেখল, ওরা এখনও জীবিত থাকলেও কথা বলার পর্যায়ে নেই।

ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়া এসে সবাই আহমদ মুসার পাশে দাঁড়িয়েছে।

আহমদ মুসা অনেকটা স্বগত কণ্ঠে বলল, 'আমি এদের দু'জনকে মারতে চাইনি। আমি চেয়েছিলাম এদের কাছে জানতে ওদিকের অবস্থা সম্পর্কে। কিন্তু বেপরোয়া এই লোকদের না মারতে পারলে, এরাই আমাকে মারত'।

বলে আহমদ মুসা তারিকের দিকে চেয়ে লোক দু'জনকে সার্চ করার নির্দেশ দিয়ে পকেট থেকে মোবাইল বের করল। নির্দিষ্ট কয়েকটি নাম্বারে চাপ দিল দ্রুত।

'হ্যালো'। ওপার থেকে সুস্মিতা বালাজী বলল।

'আসসালামু আলাইকুম। আপা, ওদিকের খবর কি?'

'ওয়া আলাইকুম আসসালাম। ছোট ভাই, আপনি কোথায়? ভাল আছেন?' সুস্মিতা বালাজী বলল।

'আমরা উপত্যকার মুখে। তৃতীয় উৎরাই হয়ে নামছি আমরা'।

‘আলহামদুলিল্লাহ। ওদিকে অনেক গুলীর শব্দ শুনলাম। কি ঘটনা?’

‘অনেকগুলো নয়, ছয়টি গুলীর আওয়াজ শুনেছেন। তার দু’টি আওয়াজ ওদের রিভলবার থেকে। অবশিষ্ট চারটি গুলী আমাদের। চারটি গুলীতে ওদের লোক কমেছে চার জন। ওদিকের অবস্থা বলুন আপা’।

‘অবস্থা এখনও খারাপ হয়নি ছোট ভাই। ওরা নৌপথ ও স্থলপথ দু’দিক থেকে দু’গ্রুপ এসেছে। আমাদের স্কুলের মাঠে ওরা ক্যাম্প করেছে। ওরা পঁচিশ জন। আগের মতই ওদের সবার কাছে ষ্টেনগান। আরও ভারী অস্ত্র নাকি ওদের আসবে। আমাদের লোকদের চার ভাগ করে চার জায়গায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে। এক গ্রুপ আমাদের বাড়ির সামনে, দ্বিতীয় গ্রুপ স্কুলের সামনে হইওয়ের দিক থেকে আসা রাস্তার পাশে, তৃতীয় ও চতুর্থ গ্রুপ স্কুলের উত্তরে আমাদের গোটা বসতিকে সার্কেল করা রাস্তায় উঠার মুখে গোপনে মোতায়েন করে রাখা হয়েছে। ছোট ভাই, আমরা আপনার অপেক্ষা করছি’।

‘ঠিক আছে আপা। লোকদের গোপনে মোতায়েন ঠিক হয়েছে। ক্ষতি এড়াবার জন্যে সম্মুখ সংঘর্ষ এড়াতে হবে। আপা, ভাই সাহেবের সাথে একটু কথা বলব’।

‘দিচ্ছি। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। সালাম ছোট ভাই’।

বলে সুস্মিতা বালাজী টেলিফোন দিয়ে দিল ড্যানিশ দেবানন্দকে।

ড্যানিশ দেবানন্দের সাথে সালাম বিনিময়ের পর আহমদ মুসা বলল, ‘আপার কাছে সব শুনলাম। আমি তাঁকেও বলেছি আমাদের সম্মুখ সংঘর্ষ এড়িয়ে বিচ্ছিন্নভাবে এ্যাকশনে এনে ওদের ক্ষতি করতে হবে। দুর্বল হয়ে পড়লে চূড়ান্ত আঘাতের সময় আসবে’।

‘সুবিধা হয়েছে ছোট ভাই, আমাদের স্কুলের গার্ডকে ওরা কাজে লাগিয়েছে। গার্ড খুব শক্ত, চালাক ও বিশ্বস্ত। তার কাছে মোবাইল আছে। মাঝে মাঝে সে খবর পাঠাচ্ছে। তার কাছেই শুনলাম, দু’জন লোক পাঠিয়েছে তারা বোটে কি কাজের জন্যে। কিন্তু ফিরে আসেনি। তার উপর গুলির শব্দ শুনে তারা উদ্বিগ্ন। খোঁজ নেবার জন্যে আরও দু’জন লোক পাঠিয়েছে। ওর টেলিফোন পাওয়ার পর আবার গুলীর শব্দ শুনলাম। কি ব্যাপার?’ বলল ড্যানিশ দেবানন্দ।

'ঐ দু'জনও মারা গেছে ভাই সাহেব'। আহমদ মুসা বলল।

'থ্যাংকস আল্লাহ। ছোট ভাই, আপনার এখন পরিকল্পনা কি। আমরা তো আপনার অপেক্ষা করছি'।

'আমি তৃতীয় উৎরাইয়ে ওদের জন্যে আরও অপেক্ষা করব। ওদের দু'টি গ্রুপ শেষ হয়েছে। এদের খোঁজ নিতে আরও লোক পাঠাবে। না এসে ওদের উপায়ও নেই। ভারী অস্ত্র তারা বোটে রেখে এসেছে। এই অস্ত্র তারা চায়, তাদের দরকার। সুতরাং লোকদের খোঁজে, অস্ত্রের খোঁজে তারা আসবে। আর তাদের এই পেছনটা ঝুঁকিপূর্ণ রেখে তারা সামনে আপনাদের দিকে এগুবে না। তাই আমি মনে করছি, তারা পেছনটাকে নিরাপদ করার জন্য এমনকি সর্বশক্তিও নিয়োগ করতে পারে'। বলল আহমদ মুসা।

'ওদের মহাগুরু শংকরাচার্য কি এই অভিযানে আছে ছোট ভাই?' জিজ্ঞাসা ড্যানিশ দেবানন্দের।

'নৌপথে বোটে করে যে দলটি এখানে এসেছে, তার সাথে শংকরাচার্য এসেছেন। উনি এখন আপনাদের স্কুলে নিশ্চয়'।

'সে শয়তানের মত ষড়যন্ত্রকারী। সে কখন কোন দিকে কি করবে বলা মুস্কিল। তাকেই আমার ভয়, ছোট ভাই'।

'গত কয়েক সপ্তাহ তার সব পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। ভয় করবেন না ভাই সাহেব'।

'থ্যাংকস আল্লাহ। ছোট ভাই আপনি আসার পরই শুধু এই পরিবর্তন ঘটেছে'।

'আল্লাহকে ধন্যবাদ দিয়ে কৃতিত্বটা আমাকে দিচ্ছেন কেন ভাই সাহেব। বলুন, আল্লাহ আন্দামানের উপর নজর দেয়ার পর অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে'।

'স্যরি। আমাদের অভ্যাস পাল্টাতে সময় লাগবে'।

'ধন্যবাদ ভাই সাহেব। আল্লাহ সাহায্য করুন'।

বলে একটু থামল আহমদ মুসা। শুরু করল আবার, 'শুনুন ভাই সাহেব, ওরা যদি এদিকে না এগোয়, তাহলে আমিই এগুব এবং ওদের পেছন থেকে উদের উপর চড়াও হবো। আর আপনাদের লোক যেভাবে আছে, সেভাবেই

থাকবে। যদি শংকরাচার্যের লোকরা আমার এদিকে ছাড়া অন্য কোন দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করে, তাহলে সব গোপন স্থান থেকে একসাথে ব্ল্যাংক ফায়ার করতে হবে। যাতে ওরা কোন এক দিকে অগ্রসর হতে না পারে এং অগ্রসর হতে চাইলে যেন বিভক্ত হয়ে সব দিকে অগ্রসর হয়। এতে ওদের বিভক্ত করে মার দেয়া সহজ হবে'।

'ধন্যবাদ ছোট ভাই। আর কোন পরামর্শ?'

'আপাতত নয়'।

'সাহারা বানু, শাহ বানুরা কেমন আছে ছোট ভাই?'

'ভাল আছে ভাই সাহেব'।

'থ্যাংকস আল্লাহ'।

'এখন টেলিফোন রাখছি। আসসালামু আলাইকুম'।

সালাম দিয়ে ওপার থেকে ড্যানিশ দেবানন্দ টেলিফোন অফ করল।

আহমদ মুসা মোবাইল অফ করে পকেটে রেখে বলল, এস তারিক লাশ দু'টো জংগলে লুকিয়ে ফেলি'।

এগিয়ে এল তারিক। বলল, 'আমরা কি এখানে অপেক্ষা করব?'

'এখানে নয়, আরও সামনে গিয়ে ঐ দু'টিলার পেছনে গিয়ে অপেক্ষা করব। টিলার উপর থেকে নিচে অনেক দূর দেখা যাবে। আর দু'টিলার মাঝখান দিয়ে যে পথ তা সংকীর্ণ। শত্রুদের এখানে ট্রাপে ফেলা আমাদের জন্য অনুকূল হবে'।

'ওরা আসবে নিশ্চিত?'

'কোন কিছুই নিশ্চিত নয়। আমাদের এটা আশা মাত্র। ওদের এই ভাবে বিচ্ছিন্ন করে মোকাবিলা করার আশা আমাদের সফল নাও হতে পারে'।

'বুঝেছি স্যার'।

বলে লাশ্ম টেনে নেয়ার জন্যে হাত লাগাল তারিক। আহমদ মুসাও। লাশ দু'টো ঝোপের আড়ালে রেকে সামনে এগিয়ে টিলার কাছে চলে এল আহমদ মুসারা'।

টিলাটা অদ্ভুত ধরনের। দু'পাশের জংগলে কতকটা দেয়ালের আকারে টিলাটা বিস্তৃত। কিন্তু দু'পাশ থেকে রাস্তায় এসে টিলাটা গেটের আকার নিয়েছে। রাস্তার দু'পাশের দু'টিলা যেন গেটের স্তম্ভ।

গেটের এ পাশটায় বড় একটা গাছ। গাছটার ডাল-পালা প্রায় ঢেকে দিয়েছে টিলাটাকে।

গাছের তলাটা প্রায় পরিষ্কার এবং সমতল। আহমদ মুসা তার পিঠের ব্যাগের পকেট থেকে শক্ত নাইলনের ওয়াটার ওয়্যার বের করে নিল। উভচর কোট বৃষ্টিতেও কাজে লাগে, আবার সাগরে নামার জন্যে খুবই নিরাপদ। হাঙ্গর-কুমিরের দাঁত তো দুরের কথা বুলেটও এই বিশেষ নাইলন ফুটো করতে পারে না।

প্যাক করলে ওয়াটার ওয়্যারটি হাতের মুঠিতে নেয়া যায়, খুললে বিরাট আকার নেয়।

আহমদ মুসা ওটা খুলে মাটিতে বিছিয়ে সাহারা বানুকে বলল, খালাম্মা এখানে বসে পড়ুন। কতক্ষণ আমরা এখানে অপেক্ষা করব তা বলা মুষ্কিল। শাহ বানু ও আপনি বসুন। একটু কষ্ট কম হবে'।

'আমাদের কষ্টের কথা বলছ? নিজের দিকে একটু তাকাও তো বেটা। তোমার গা রক্তে ভেজা। প্রতি মুহূর্ত কি টেনশনে কাটছে তোমার! দু'বাহুর মত জীবন-মৃত্যু তোমার দু'পাশে। সে তুলনায় আমরা পরম সুখে। অথচ তোমার সব কষ্ট আমাদের জন্যেই'। বলল সাহারা বানু।

'মায়ের জন্যে সন্তানরা, বোনের জন্যে ভাইয়েরা তো কষ্ট করবেই। এ কষ্ট তাদের জন্যে কষ্ট নয়। কষ্টই যদি হবে, সন্তান, ভাই- এ সম্পর্ক তাহলে কেন?' বলে টিলার দিকে এগুলো আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার চলার পথের দিকে অশ্রু সজল চোখে তাকিয়ে ছিল সাহারা বানু।

শাহ বানু তার মাকে টেনে নিয়ে ওয়াটার ওয়্যারে বসতে বসতে বলল, 'বিষ্মিত হয়ো না আম্মা, আহমদ মুসার কাছে আল্লাহর এই গোটা দুনিয়া তাঁর একটা ঘর। এই ঘরের বাসিন্দা তুমি, আমি পর হবো কি করে?'

চোখ মুছতে মুছতে বলল সাহারা বানু, 'আমি ভাবছি, ওর স্ত্রী আছে, সোনার টুকরো একটা সন্তান আছে, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে দুনিয়ার কোন বাঁধনে সে বাধা নয়। পরের জন্যে নিজকে এভাবে ভূলে যাওয়া অসম্ভব'। ভারী ও ভাঙা গলা সাহারা বানুর।

আল্লাহর সৈনিকরা নাকি এমনই হয়। আহমদ মুসা ভাইয়াই একথা বলেছিলেন। নিজের পিতা, মাতা, ভাইবোন, স্বামী-সন্তান, স্ত্রী-পুত্র, বাড়ি-ঘর, ব্যবসায়-বানিজ্য সবকিছুর চেয়ে নাকি আল্লাহ, তার রসূল স. এবং তাঁদের কাজকে বেশি ভালবাসতে হয়'। শাহ বানু বলল।

'এরাই সোনার মানুষ শাহ বানু। আল্লাহর সাহায্য এদের জন্যেই সাহারা বানু বলল।

আহমদ মুসা চোখ থেকে দূরবীন নামিয়ে তাকাল তারিকের দিকে। টিলার আগাছা আর ঘাসের উপর বসে ঘুমে ঢুলছিল তারিক।

আহমদ মুসা তার পিঠে একটা থাপ্পড় দিয়ে বলল, 'উঠে দাঁড়াও। যাও নিচে গিয়ে এই টিলায় বিশবার উঠা-নামা কর। ঘুম চলে যাবে'।

'ধন্যবাদ স্যার। বলে তারিক টিলা থেকে নামা শুরু করল।

'ভাইয়া ওর মাথায় বরফ আছে, সেখানে টেনশন প্রবেশ করলেও তা বরফ হয়ে যায়'। বলল শাহ বানু টিলার গোড়া থেকে। টিলার গোড়ায় সে মায়ের সাথে বসেছিল।

'ঘুমের জন্যে মাথায় বরফ থাকতে হয় না। টেনশনের মধ্যেও ঘুম এসে যেতে পারে'। কৈফিয়তের সুরে বলল তারিক।

শাহ বানু মুখ খুলতে যাচ্ছিল। আহমদ মুসা তার আগেই বলে উঠল, 'কোন কথা নয় শাহ বানু। বিতর্ক 'ড্র' থাকুক কোন সুসময়ের জন্যে'।

'ঝগড়ার জন্যে আমি বলিনি ভাইয়া'। বলল শাহ বানু। কণ্ঠে কিছুটা ক্ষোভ।

‘ঝগড়া নয়, আমি কথাটা ক্লিয়ার করার জন্যে বলেছি’। বলল তারিক।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘তোমাদের দু’জনকে ধন্যবাদ’।

দূরবীনে আবার চোখ রাখল আহমদ মুসা। দূরবীনের দৃষ্টি উৎরাইয়ের পথ পেরিয়ে ওদিকের চড়াই পর্যন্ত বিস্তৃত।

হঠাৎ দূরবীনের দৃষ্টি এক জায়গায় স্থির হয়ে গেল। চারজন তাদের ষ্টেনগান বাগিয়ে পথ ধরে উঠে আসছে।

আহমদ মুসা এদেরই অপেক্ষা করছিল। কিন্তু বিস্মত হলৌ ওদের সংখ্যা চারজন দেখে। সুস্মিতা বালাজী জানিয়েছে, ওরা দশজন এসেছে এদিকে। অবশিষ্ট ছয়জন কোথায় তাহলে? ওদের পেছনে আসছে?

হঠাৎ আহমদ মুসার মনে হলো, ওরা ভিন্ন পথ দিয়ে আসতে পারে। ওদের কৌশল এই হতে পারে যে, এরা চারজন আমাদের সংঘর্ষে নিয়ে আসবে, আর ওরা ছয়জন পেছন থেকে আমাদের উপর চড়াও হবে। এ পরিকল্পনা নিয়ে ওরা ছয়জন এ চারজনের আগেই নিশ্চয় যাত্রা করেছে। তাহলে তো ওরা অনেকখানি কাছে এসে গেছে।

সতর্ক হলো আহমদ মুসা। উঠে দাঁড়াল টিলার উপর। ছয় জন এদিকে আসার জন্যে রাস্তার কোন পাশটা বেছে নেবে ওরা?

তীক্ষন দৃষ্টি মেলে আহমদ মুসা গোটা পথটায় একবার নজর বুলাল। তার কাছে ধরা পড়ল, রাস্তার দক্ষিণ পাশ গোটাটাই কিছু খাড়া পাহাড় এবং গভীর খাদে ভরা। এ পাশ দিয়ে আসা অনেক সময়সাপেক্ষই শুধু নয়, ভীষন কষ্টকরও। সুতরাং এ পথ তারা অবশ্যই বিবেচনা থেকে বাদ দেবে। অতএব নিশ্চিত যে, ওরা উত্তরের জংগল পথেই আসছে।

আহমদ মুসাকে গভীর ভাবনায় নিমজ্জিত দেখে সাহারা বানু ও শাহ বানু দু’জনেই উঠে এসেছে। বলল সাহারা বানু, ‘তুমি খুব ভাবছ, কিছু ঘটেছে বেটা?

‘ওরা আসছে খালাম্মা। চারজনকে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ওরা তো দশ জন। আর ছয় জন নিশ্চয় অন্য পথে আসছে। মনে হচ্ছে আমাদেরকে এই চারজনের সাথে ব্যস্ত রেখে ঐ ছয় জন অন্যপথে এসে পাশ বা পেছন থেকে আমাদের উপর চড়াও হবার পরিকল্পনা করছে’।

উদ্বেগ ফুটে উঠল সাহারা বানুদের মুখে। কিছু বলতে যাচ্ছিল সাহারা বানু।

এই সময় দু'টি শুকর ছানা পূর্ব থেকে এসে তাদের পাশ দিয়ে ভীত সন্ত্রস্তভাবে ছুটে পালাল পশ্চিম দিকে।

এদিকে নজর পড়তেই এক হাত তুলে আহমদ মুসা কথা বলতে নিষেধ করল সাহারা বানুদের।

ভ্রুকুঞ্চিত হয়েছিল আহমদ মুসার। তার মনে হলো শুকর ছানার ভয়ের উৎস ঐ ছয়জন হতে পারে। তার মানে ওরা জংগলের এই প্রান্ত বরাবরই আসছে।

'খালাম্মা ঐ ছয়জন জংগলের এ প্রান্ত দিয়েই আসছে'।

বলেই চোখ ফিরাল আহমদ মুসা শাহ বানুর দিকে। বলল দ্রুত, 'শাহ বানু তুমি খালাম্মাকে নিয়ে রাস্তার ওপাশে টিলার আড়ালে চলে যাও। তারিকও যাও সাথে'।

নির্দেশ পেয়েই শাহ বানু ওয়াটার ওয়্যার তাড়াতাড়ি গুটিয়ে নিয়ে বলল, 'চল আম্মা'। শাহ বানু তারিকের দিকেও একবার তাকাল।

'চল শাহ বানু'। তারিকও বলল।

'কোন নির্দেশ ভাইয়া?' চলতে শুরু করে শাহ বানু বলল।

উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় শুকিয়ে গেছে ওদের মুখ। কথা বলার সময় শাহ বানুর কণ্ঠ কাঁপছিল।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'নির্দেশ হলো, ভয় পেয়ো না। ওরা আমাদের দেখতে পায়নি, আমরা ওদের দেখেছি। আমরা বেটার অবস্থানে। আমাদের জন্যে এটা আল্লাহর সাহায্য। আর নির্দেশ হলো, তোমাদের সকলের কাছে লোডেড রিভলবার আছে। যদি কিছু করণীয় হয়, মন তোমাদের বলে দেবে যাও'।

আহমদ মুসার নিশ্চন্ত হাসি এবং আশার কথা শাহ বানুদের চলা অনেক সহজ করে দিল। সাহসও যেন ওরা ফিরে পেল। 'ধন্যবাদ ভাইয়া' বলে উঠল শাহ বানু ও তারিক একই সঙ্গে এবং ওরা চলে গেল।

আহমদ মুসা আবার টিলার শীর্ষে উঠে গেল।

ডাল পালা ও আগাছার আড়ালে ওটা সুন্দর জায়গা। ওখান থেকে একই সাথে রাস্তা ধরে আসা চারজন এবং জংগলের প্রান্ত দিয়ে আসা ছয় জন সকলকেই চোখে রাখা যাবে।

আহমদ মুসা দেখল রাস্তার চারজন চাশ গজের মধ্যে এসে গেছে।

আহমদ মুসা অনুমান করল ছয় জনের অগ্রবাহিনী নিশ্চয় তিনশ গজের মধ্যে চলে এসেছে।

আহমদ মুসা পকেট থেকে ফুল লোডেড দু'টি রিভলবার হাতে তুলে নিল। আহমদ মুসার প্রধান মনোযোগ জংগলের দিকে। জংগল বড় বড় গাছে ভরা। তবে শাল জাতীয় গাছগুলোর দীর্ঘ কাণ্ড শাখা-পাতা শূন্য। তার ফলে জংগলের আকাশটা যতটা নিবিড়-ঘন, নিচটা ততটাই ফাঁকা। তবে মাটিতে প্রচুর আগাছা রয়েছে, আগাছার অনেকগুলো বেশ বড়ও। তাই জংগলের তলাটা সহজে দৃষ্টিগোচর নয়। বিশেষ করে রাস্তার প্রান্ত বরাবর প্রচুর ঝোপ জংগল রয়েছে। এ সবের মধ্যে দিয়ে কেউ যদি লুকিয়ে আসতে চায়, তাহলে তারা সহজে চোখে পড়ার কথা নয়।

কিন্তু আহমদ মুসার চোখে দূরবীন থাকায় ঝোপ-ঝাড়ের গলি-খুঁজা তার কাছে অনেক স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। আগাছা, শাখা-প্রশাখার সামান্য নড়া-চড়াও তার নজর এড়াচ্ছে না।

অবশেষে ওরা ছয় জন আহমদ মুসার দূরবীনে ধরা পড়ল।

ওরা ছয় জন ষ্টেনগান বাগিয়ে বৃত্তাকারে বিড়ালের মত নিঃশব্দ পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে। বৃত্তের সামনের দু'জনের চোখ সামনে, মানে পশ্চিমে, বৃত্তের দু'পাশের দু'জনের দৃষ্টি দু'দিকে, দক্ষিণ ও উত্তরে। আর বৃত্তের পেছনের দু'জন পেছনে চোখ রেখে কতকটা উল্টো হেঁটে এগিয়ে আসছে।

আহমদ মুসা মনে মনে প্রশংসা করল ওদের পরাকল্পনার।

আহমদ মুসা ভাবল, ওরা টিলার দেয়ালে এসে বাধা পাবে। তারপর তারা টিলা পেরিয়ে সোজা সামনে এগুবে টিলার উপরের এদিকটা সার্চ করতে আসবে কিনা এটা একটা বড় প্রশ্ন।

ওরা টিলার দেয়ালের কাছে এসে গেছে। সকলেই ওরা চারদিকে তাকাচ্ছে টিলায় ওঠার আগে।

আহমদ মুসা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে রিভলবার বাগিয়ে।

ওদের বৃত্তের সামনের দু'জন অতিসন্তর্পণে হামাগুড়ি দিয়ে টিলার দেয়ালে উঠে দেয়ালের ওপাশ মানে পশ্চিম পাশটায় নজর বুলাল। ঠিক তাদের মতই বৃত্তের দক্ষিন পাশে যে ছিল সে টিলার দেয়ালে উঠে ক্রলিং করে টিলার দেয়াল বেয়ে অনেক খানি উপরে উঠে এল এবং চারদিকটা দেখল। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে আবার নেমে গিয়ে বৃত্তে যোগ দিল।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল আহমদ মুসা। লোকটি যদি আর দু'গজ এগুতো কিংবা আহমদ মুসা যদি টিলার একদম শীর্ষে আশ্রয় না নিত, তাহলে লোকটির চোখে পড়ে যেত।

আহমদ মুসা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল। আহমদ মুসা এই মুহূর্তে ওদের আক্রমণ করতে চায় না। আহমদ মুসা চাইল পেছনের চারজনও আরও কাছে আসুক। যাতে একসাথে সবাইকে আক্রমণের আওতায় আনা যায়। আহমদ মুসার ইচ্ছা, ছয় জনের দলকে তাদের পেছন থেকে এবং চার জনের দলকে সামনে থেকে সে আক্রমণ করতে চায়। তার আরও লক্ষ্য হল, কেউ যেন লুকবার সময় না পায়।

ছয় জনের বৃত্তটি টিলার দেয়াল পেরিয়ে সামনে এগুলো।

গজ চারেক এগুবার পর হঠাৎ বৃত্তের সামনের দু'জন থমকে দাঁড়াল। তাদের একজন নিচু হয়ে মাটি থেকে একখণ্ড কাগজ হাতে তুলে নিল।

আহমদ মুসার দূরবীনে ধরা পড়ল চকলেটের একটি মোড়ক। হয় শাহ বানু, নয়তো তারিক চকলেট খেয়ে ওটা মাটিতে ফেলে দিয়েছিল। আহমদ মুসাই দিয়েছিল ওদের চকলেট।

চকলেটের কাগজটি পেয়ে মুহূর্তেই ছয় জনের বৃত্তটির সবাই মাটিতে শুয়ে পজিশন নিল। ওরা চারদিকে তাকাচ্ছিল। ওদের সন্দিগ্ধ ও সতর্ক দৃষ্টি

ওরা চারদিকটা ভালোভাবে দেখে নেবার পর তাদের সবার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো টিলার দিকে। সেই আগের মত বৃত্তাকারে চারদিকে চোখ রেখে তারা এগুলো টিলার দিকে। তাদের হাতের অস্ত্রগুলো উদ্যত এবং ট্রিগারে আঙ্গুল।

আহমদ মুসা নিশ্চিত, এবার ওরা টিলা সার্চ না করে ফিরবে না।

আহমদ মুসা অত্যন্ত সন্তর্পণে টিলার মাথাটা ডিঙ্গিয়ে ওপারের ঢালটায় চলে গেল। রিভলবার দু'টো মাটিতে রেখে লাইট মেশিনগানটার ব্যারেল ওদিকে ঘুরিয়ে নিল আহমদ মুসা।

কিন্তু ব্যারেল ঘুরাতে গিয়ে বিপত্তি ঘটল। একটা বড় পাথর স্থানচ্যুত হয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল ওপাশে নিচের দিকে।

ওটা ওদের নজরে পড়তে দেরি হলো না।

সংগে সংগেই ওদিক থেকে শুরু হলো ব্রাশ ফায়ার।

মেশিনগানের ট্রিগারে আঙ্গুল রেখে আহমদ মুসা অপেক্ষা করছিল।

প্রায় পঞ্চাশ রাউন্ডের মত গুলীর পর গুলী কমে এল।

সম্ভবত! ওরা রেজাল্ট দেখার জন্যেই গুলী কমিয়ে দিয়েছিল।

আহমদ মুসার হাত মেশিনগানের ট্রিগারেই ছিল। ওদের গুলী কমার সঙ্গে সঙ্গে আহমদ মুসা মাথাটা তুলে মেশিনগানের ব্যারেল টার্গেটের বরাবর নিয়ে গুলী বৃষ্টি শুরু করল।

মেশিনগানের ব্যারেল কয়েকবার ঘুরিয়ে প্রায় পনের সেকেন্ড ট্রিগার চেপে রাখল। দশ সেকেন্ড গুলীর পর ওদিক থেকে গুলীর শব্দ একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে।

আহমদ মুসা চকিতে একবার পেছন ফিরে তাকাল পেছনের চারজনের অবস্থান দেখার জন্যে। দেখল, ওরা কাছে চলে এসেছে। ষ্টেনগান বাগিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ছুটে আসছে ওরা। ওদের লক্ষ্য টিলা্

আহমদ মুসা ঘুরিয়ে নিল তার লাইট মেশিনগান। ট্রিগার টানল মেশিনগানের। শুরু হলো গুলী বৃষ্টি।

ওরা ছিল বৃত্তাকারে। আর এরা চার জন ছিল রাস্তার আড়াআড়ি একটা লাইনে।

গুলীবৃষ্টি হবার সঙ্গে সঙ্গে দু'জন ছুটে রাস্তার ওপাশের জংগলে ঢুকে গেল। দু'জনের লাশ পড়ে গেল রাস্তায়।

গুলী বন্ধ করে আহমদ মুসা টিলার পশ্চিম পাশে ছয় জনের অবস্থা দেখার জন্যে হামাগুড়ি দিয়ে টিলার পশ্চিম পাশে চলে এল। ওপারে গিয়েই দেখতে পেল টিলার গোড়ার কয়েকগজ দূরে ওরা ছয়জন বৃত্তাকারেই মরে পড়ে আছে।

আহমদ মুসা দ্রুত নিচে গেল। ভাবল দু'জন ওরা ওপারের জংগলে ঢুকেছে, এখনি যেতে হবে ওপারের টিলার দিকে।

কিন্তু এ ভাবনা শেষ হবার আগেই আহমদ মুসার কানে প্রায় একসাথে দু'টি গুলীর শব্দ এসে প্রবেশ করল। সোজা হয়ে দাঁড়াল আহমদ মুসা। আর কোন গুলীর শব্দ হলো না। স্বস্তি ফুটে উঠল আহমদ মুসার মুখে। সে নিশ্চিত, গুলী দু'টি শাহ বানু ও তারিকের রিভলবারের এবং গুলী দু'টি ছোঁড়া হয়েছে ওপাশের জংগলে পালানো দু'জনকে লক্ষ্য করেই। আর তারা দু'জনই মারা গেছে। ওদের ষ্টেনগানের কোন গুলী শোনা যায়নি। তার মানে ওরা গুলী করার সুযোগই পায়নি।

তাকাল আহমদ মুসা টিলার দিকে। দেখল, শাহ বানু, সাহারা বানু ও তারিক টিলার নিচে রাস্তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

আহমদ মুসা ওদিকে তাকাতেই শাহ বানু বলল 'ভাইয়া আমরা আসতে পারি?'

'এস'। আহমদ মুসা বলল।

শাহ বানুরা এপারে এলে আহমদ মুসা বলল, দু'জনের দু'সফল গুলীর জন্যে ধন্যবাদ'।

বিস্ময় নামল শাহ বানু ও তারিকের চোখে-মুখে। বলল শাহ বানু, 'ভাইয়া জানলেন কি করে যে, আমরা দু'জনে গুলী করেছি এবং তা সফল হয়েছে?'

'ওদের দু'জনের হাতে ষ্টেনগান ছিল, আর তোমাদের হাতে ছিল রিভলবার। দু'গুলী একসাথেই হয়েছে। তোমাদের গুলীর পরে ষ্টেনগান থেকে কোন গুলী হয়নি। এ সবই আমার কথার প্রমাণ'। বলল আহমদ মুসা। 'আল্লাহকে ধন্যবাদ ভাইয়া। আপনি এতদ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন ভাইয়া?' শাহ বানু বলল।

‘বেটা, তুমি ওদের ধন্যবাদ দিচ্ছ তোমার প্রাপ্য ধন্যবাদ আড়াল করার জন্য বুঝি!’ বলল সাহারা বানু।

‘পানিতেই যার বাস, তার কাছে পানি নতুন নয়, কিন্তু পানিতে যারা নতুন পা দিল, ধন্যবাদ তো তাদেরই প্রাপ্য খালাম্মা’। আহমদ মুসা বলল।

‘আমাদের এত বড় স্বীকৃতি দিচ্ছেন ভাইয়া? বেশি হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে আমি, মেয়েরা, এই মহান কাজে অচল’। বলল শাহ বানু। তার কণ্ঠ গম্ভীর।

‘শাহ বানু, মেয়েদের এমন ছোট করে দেখলে, মানুষের অর্ধেকটাই ছোট হয়ে যায়। অথচ মোগলদের নূরজাহান, মুসলিম শাসক চাঁদ সুলতানা, বীর নারী হামিদা বানু প্রমুখের ইতিহাস তোমরা জান’। আহমদ মুসা বলল।

‘ধন্যবাদ ভাইয়া! আপনি..................।

আহমদ মুসার মোবাইল বেজে উঠায় শাহ বানু কথা শেষ না করেই থেমে গেল।

আহমদ মুসা মুখের কাছে তুলে নিল মোবাইল। বলল, ‘জি আপা, ওয়া আলাইকুম সালাম’।

‘ছোট ভাই ভাল আছেন আপনারা? গুলী-গোলার শব্দে আমরা এখানে উদ্বিগ্ন’। বলল সুস্মিতা বালাজী।

‘হ্যাঁ ভাল আছি। ওদের দশজনই মারা গেছে, আলহামদুলিল্লাহ’।

‘আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা তাহলে এখন আসছেন?’

হ্যাঁ আসছি। ওদিকের খবর কি?’

‘এই মাত্র আমাদের স্কুলের গার্ড টেলিফোন করেছিল। গোলা-গুলীর শব্দ শুনে ওরা খুব খুশি। এ খবর শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে আমি টেলিফোন করলাম’।

‘হতে পারে, গোলা-গুলী শুনেই ওরা ধরে নিয়েছিল তারা শত্রুদের খতম করেছে। যাক ওখানে এখন ওরা কয়জন আছে?’

‘ওরা দশ এগার জন আছে’।

‘ঠিক আছে আপা। আপনার যেভাবে আছেন, সেভাবেই থাকুন। আমরা আসছি।

‘ঠিক আছে ছোট ভাই। সালাম’।

‘আসসালামু আলাইকুম’।

আহমদ মুসা মোবাইল পকেটে রেখে বলল, ‘চল আমরা যাত্রা করি। তার আগে শাহ বানু ও তারিক তোমরা অ্যামুনিশনের বাক্সের সাথে সাথে ওদের ষ্টেনগানগুলো কাঁধে তুলে নাও। আমাকেও কিছু দাও’।

‘না, ষ্টেনগানগুলো আমি নেব’। বলে সাহারা বানু ষ্টেনগানগুলো কুড়িয়ে নেবার জন্যে এগুলো।

‘না খালাম্মা, আপনি নন। ওরাই পারবে’। আহমদ মুসা বলল।

‘বেটা, তুমি না এইমাত্র নূরজাহান, সুলতানা রাজিয়াদের উদাহরণ দিলে। আরও উদাহরণ আছে। ভারতের বেগম হযরত মহল, ইসলামের প্রাথমিক যুগের বীর নারী খাওলার মত যুদ্বের ময়দানে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন অসংখ্য মুসলিম নারী। তাহলে আমি এই কয়টা ষ্টেনগান বহনের অধিকার পাব না কেন? সন্তানদের যুদ্ধে মা কি অংশ নিতে পারে না?’

‘ধন্যবাদ খালাম্মা। আমাদের মায়েরা এইভাবে জেগে উঠলে আমাদের জাতি নতুন এক সোনালী দিনের মুখ অবশ্যই দেখবে’। বলে আহমদ মুসা নিজে ষ্টেনগানগুলো কুড়িয়ে সাহারা বানুর কাঁধে ঝুলিয়ে দিল।

তারা গ্রীনভ্যালির উদ্দেশ্যে আবার যাত্রা শুরু করল।

রাস্তায় উঠে আসতেই আহমদ মুসার মোবাইল আবার বেজে উঠল।

মোবাইল নিয়ে মুখের কাছে তুলে ধরে বলল, ‘জি আপা, আসসালামু আলাইকুম। কোন নতুন খবর?’

‘ওয়া আলাইকুম আসসালাম। ছোট ভাই এইমাত্র আমদের স্কুলের গার্ড জানাল, এইমাত্র ওদের সর্দার ওদের সবাইকে গ্রীনভ্যালি ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছে। যে দশ জন উপকূলের দিকে গিয়েছিল সবাই মারা গেছে। ওরা বলেছে, আবার তৈরি হয়ে হেলিকপ্টার নিয়ে খুব শীঘ্রই নাকি ওরা আবার আসবে’। গার্ড আরও জানাল জোর প্যাকিং চলছে দু’এক মিনিটের মধ্যেই ওরা যাত্রা শুরু করবে। ছোট ভাই, আমাদের এখন কি করণীয়?’ বলল সুস্মিতা বালাজী উত্তেজিত তার কণ্ঠস্বর।

‘বুঝেছি আপা। ভাই সাহেব কোথায়?’

‘বাইরে লোকদের কাছে গেছে। আমাকে বল তোমার পরামর্শ’।

‘আপা প্রথম কথা হলো, ওদের কাউকেই গ্রীনভ্যালি থেকে যেতে দেয়া যাবে না। গ্রীনভ্যালির ভবিষ্যত নিরাপত্তার জন্যেই গ্রীনভ্যালির এসব কাহিনী বাইরে প্রকাশ হতে দেয়া উচিত হবে না। দ্বিতীয় কথা, ওরা প্রস্তুত হয়ে যাত্র শুরুর আগে ওদের আক্রমণ করা যাবে না। পালাবার সময় মানুষের মন দুর্বল হয়, ঐক্য বিনষ্ট হয় এবং পাল্টা আক্রমণের উদ্যোগ প্রায়ই থাকে না। তৃতীয় কথা, ওরা যখন পালিয়ে যাবার জন্যে রাস্তায় উঠবে, তখন উত্তর দিকে রিংরোডের সংযোগস্থলে যারা আছে, তারা আক্রমনে আসবে। এই আক্রমণে তারা পেছনে গুলী ছুঁড়তে ছুঁড়তে সামনে দৌড়াবে, তখন পূর্ব দিকে হাইওয়ে গামী রাস্তার পাশে যারা আছে, তারা পাশ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়বে’।

‘ধন্যবাদ ছোট ভাই, সুন্দর পরিকল্পনা’। বলল সুস্মিতা বালাজী।

‘শুনুন আপা, আমাদের এখানে যারা এসেছিল, তাদের মধ্যে শংকরাচার্য নেই। তাহলে তিনি ওখানেই আছেন। তাকে জীবন্ত ধরতে পারলে ভাল। একটু দেখবেন’।

‘কঠিন কথা বলেছেন ছোট ভাই, এটা কে দেখাবে? আপনার মত মাথা ঠাণ্ডা করে, পরিকল্পনা করে গুলী করার লোক আমাদের নেই’।

‘ঠিক আছে আপা, আল্লাহ ভরসা। যেটা হবার সেটাই হওয়া উচিত। আর কোন কথা আপা?’

‘না, আপাতত নেই। আপনারা যতটা সম্ভব দ্রুত আসুন। কি হবে আমার ভয় করছে। রাখলাম। আসসালামু আলাইকুম’।

‘ওয়া আলাইকুম আসসালাম’ বলে মোবাইল বন্ধ করল আহমদ মুসা।

শাহ বানুরা সবাই তাকিয়ে ছিল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা সংক্ষেপে সুখবরটা ওদের দিল।

যাত্রা শুরু হল আবার।

# ৭

সামনে একটু নিচেই গ্রীনভ্যালি।

পাহাড়টা ছোট হলেও উপত্যকার প্রায় গোটাই দৃষ্টিতে আসছে।

আহমদ মুসারা শেষ উৎরাই হয়ে নামছে।

নিচে গ্রীনভ্যালি উপত্যকা।

এই সময়ই শুরু হলো প্রচণ্ড গুলীগোলা। চলল দু'আড়াই মিনিট ধরে।

এক সময় থেমে গেল গুলীর আওয়াজ।

শাহ বানুরা সবাই তাকাল আহমদ মুসার দিকে। মুখ তাদের শুকনো উদ্বিগ্ন তারা। বলল শাহ বানু, কিছু বুঝছেন ভাইয়া?

'কিছু বুঝা তো যাচ্ছে। দু'আড়াই মিনিটে যেগুলী হয়েছে, তাকে তিনটি ওয়েভে বিভক্ত করা যায়। তিন ওয়েভের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়টি আমি মনে করি আমাদের লোকদের। আমাদের লোকরা পেছন থেকে শংকরাচার্যের পলায়নরত লোকদের উপর গুলীবর্ষণ করে। পলায়নরতরা এর জবাব দিতে শুরু করে। গোলা-গুলীর প্রাবল্য এই সময় বেশি ছিল। এর পর গুলীবর্ষণ শুরু হয় হাইওয়েগামী রাস্তার পাশে ওঁৎ পেতে থাকা আমাদের লোকদের পক্ষ থেকে। এই ওয়েভ-গুলীর পাল্টাগুলীর শব্দ তেমন পাওয়া যায়নি। এ থেকে বুঝা যায়, এমন অবস্থায় এমন আকস্মিকভাবে এই আক্রমণ আসে পাল্টা গুলী চালানোর সময় ও সুযোগ তাদের ছিল না। আর এর অর্থ হলো, শত্রুরা সম্পূর্ণ পরাভূত। হয়তো সবাই মরে গেছে'।

'তাহলে আমরা মুক্ত। আমাদের আর কোন ভয় নেই'। আনন্দ-উচ্ছ্বাস কম্পিত কণ্ঠে বলল শাহ বানু।

'আলহামদুলিল্লাহ'। বলল সাহারা বানু।

পাহাড়ের গোড়ায় নেমে এসেছে আহমদ মুসারা।

এই সময় আহমদ মুসারা দেখতে পেল, উপত্যকার পথ ধরে পাহাড়ের দিকে ছুটে আসছে একদল আদিবাসী নারী-পুরুষ। তাদের সামনে ড্যানিশ দেবানন্দ এবং সুস্মিতা বালাজী। আনন্দে হৈচৈ করছে সবাই।

ওরা এসে গেছে। আহমদ মুসারা দাঁড়িয়ে পড়েছে।

ড্যানিশ দেবানন্দ নিজে ছুটে গিয়ে আহমদ মুসার কাঁধ থেকে লাইট মেশিন গান ও গ্রেনেড লাঞ্চার নামিয়ে নিয়ে ওগুলো দু'জন আদিবাসীর হাতে দিয়ে দিল। আহমদ মুসা জড়িয়ে ধরল ড্যানিশ দেবানন্দকে।

ওদিকে সুস্মিতা বালাজী নিজে এগিয়ে প্রথমে সাহারা বানুর কাঁধ থেকে ষ্টেনগানগুলো এবং পরে শাহ বানুর মাথা থেকে গুলীর বাক্সটি নামিয়ে নিয়ে কয়েকজন আদিবাসী মেয়ের হাতে তুলে দিল। তারপর সে একসাথে জড়িয়ে ধরল সাহারা বানু ও শাহ বানু দু'জনকে। বলল সে, 'ওয়েলকাম, ওয়েলকাম ওয়েলকাম'। গভীর আবেগ তার কণ্ঠে।

বাহুর বন্ধন থেকে দু'জনকে ছেড়ে দিয়ে সুস্মিতা বালাজী সাহারা বানুর হাত নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে বলল, 'খুশি হয়েছি খুব। উম্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছি আপনাদের'। তারপর মুখ ঘুরাল সুস্মিতা বালাজী শাহ বানুর দিকে। এক হাতে নত মুখটি তুলে ধরে বলল, 'আর মোগল শাহজাদী! তোমাকে যেমন ভেবেছি, তার চেয়েও তুমি মিষ্টি। তুমি সুষমার বন্ধু না? তোমার কাছে তার অনেক গল্প শুনব'। বলে শাহ বানুকে কাছে টেনে তার কপালে একটা চুমু দিয়ে বলল, 'আমার সৌভাগ্য তোমাদের পেয়েছি। গত বিশ বছরে এই প্রথম এমন আনন্দ'।

বলেই সুস্মিতা বালাজী আবার ঘুরল সাহারা বানুর দিকে। বলল, 'জানেন আপনারা আমার কত ঘনিষ্ঠ অত্মীয়?'

'জানি মা, আমার হবু বউমা সুষমার তুমি বোন। সেই সূত্রে আমি তোমারও 'মা' হবার দাবী করতে পারি'। বলল সাহারা বানু।

সুস্মিতা বালাজী আবার জড়িয়ে ধরল সাহারা বানুকে।

'সুষি, ওরা কিন্তু খুব ক্লান্ত। চল আমরা ওদের নিয়ে ফিরি'। বলল ড্যানিশ দেবানন্দ সুস্মিতা বালাজীকে লক্ষ্য করে।

সুস্মিতা বালাজী সাহারা বানুর বুক থেকে মুখ তুলে ড্যানিশ দেবানন্দকে সাহারা বানু ও শাহ্‌ বানুর সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। তারিকেরও পরিচয় দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু ড্যানিশ বলল, 'এই ইয়ংম্যানকে আমি ইতিমধ্যেই জেনে ফেলেছি। ছোট ভাই আহমদ মুসা আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। তারপর শাহ বানুর দিকে স্নেহময় হাসিতে চেয়ে বলল, এও জেনেছি খালাম্মা যে, শাহ বানুর রিভলবার ইতিমধ্যেই দু'টি শিকার এবং তারিকের রিভলবার একটি সফল শিকারের কৃতিত্ব অর্জন করেছে'।

ড্যানিশ দেবানন্দের কথা শেষ হতেই সেখানে হাজির হলো আহমদ মুসা। বলল দ্রুত কণ্ঠে, 'ভাই সাহেব, আহত শংকরাচার্যের ওখানে এখনই পৌঁছা দরকার'।

সুস্মিতা বালাজী এগিয়ে এল আহমদ মুসার দিকে। বলল, ছোট ভাই শংকরাচার্যকে আপনি জীবিত চেয়েছিলেন, জীবিতই পাবেন'।

'ধন্যবাদ আপা। চলুন সকলে আমরা যাই'। বলল আহমদ মুসা।

সবাই চলতে শুরু করল উপত্যকার অভ্যন্তরে।

সবার আগে হাঁটছে সুস্মিতা বালাজী দু'পাশে সাহারা বানু ও শাহ বানুকে নিয়ে। তার পেছনে আহমদ মুসা ও ড্যানিশ দেবানন্দ পাশা পাশি। পরে অন্য সকলে হাঁটছে।

আহমদ মুসারা পৌঁছল স্কুলের পূর্বে হাইওয়েগামী রাস্তাটায়। এখানেই একটা উঁচু জায়গায় ঘাসের উপর রাখা হয়েছে মহাগুরু শংকরাচার্যকে। তার দু'পায়েই গুলী লেগেছে। একটা গুলী বেরিয়ে গেছে। আর একটা পায়ে আটকে আছে।

সেখানে পৌঁছেই আহমদ মুসা বলল, 'গুলীটা এখনই বের করার ব্যবস্থা করতে হয় ভাই সাহেব'।

পাশেই ছিল সুস্মিতা বালাজী। সে বলে উঠল, 'অপারেশনের ব্যবস্থা আগেই এনে রেখেছি। কিন্তু অপারেশন করতে রাজি নন তিনি।

আহমদ মুসা তাকাল মহাগুরু শংকরাচার্যের দিকে। বলল, 'আপনার আপত্তি কেন?'

মহাগুরু শংকারাচার্যের চোখে-মুখে মহাক্রুব্ধ ভাব। বলল, 'আমাদের হয় ছেড়ে দেবে, নয় মেরে ফেলবে। আমি তোমাদের কোন চিকিৎসা চাই না, মরে গেলেও না'।

'কি মনে করেন? আপনাকে ছাড়া হবে?' বলল আহমদ মুসা।

'তুমি সেই বিভেন বার্গম্যান মার্কিন নাগরিক। কিন্তু আসলে তুমি তো বিভেন বার্গম্যান নও। কে তুমি?' বলল শংকরাচার্য।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'আমার পরিচয় এখন ইস্যু নয়। আপনাকেই নিয়েই কথা। এখন কথা বলুন তো, আন্দামানের এত লোককে আপনারা খুন করলেন কেন? কেন আপনারা আটকে রেখেছেন আহমদ শাহ আলমগীরকে?'

'তুমি জানতে চাইলে না যে, তোমরা আমাকে ছাড়বে কিনা, এ সম্পর্কে আমি কি মনে করি? দেখ তোমরা আমাকে ছাড়বে, এমন ভাবার মত বোকা আমি নই। তবে তোমরা আমাকে মেরে ফেলতে পার, কিন্তু আটকে রাখতে পারো না, যেমন আমরা আটকে রেখেছি আহমদ শাহ আলমগীরকে। ড্যানিশ দেবানন্দও আমাকে হত্যা করতে পারে। কারণ আমি তার পিতা-মাতাকে হত্যা করেছি এবং তার সম্পত্তি গ্রাস করে তাদের বনবাসী করেছি'।

'কিন্তু আপনি এসব অপরাধ স্বীকার করছেন কেন?' আহমদ মুসা বলল।

'এজন্যে যে আমার বাড়তি কোন ক্ষতি করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। বরং আমি এসব কথা বলে আনন্দ পাচ্ছি এ কারণে যে, তোমাদের মনে যাতনা কিছু বাড়াতে পারছি'। বলল শংকরাচার্য।

'আপনার আন্দামানের এত লোককে হত্যা করেছেন, আহমদ শাহ আলমগীরকে আটকে রেখেছেন, এ অপরাধও কি স্বীকার করবেন?' আহমদ মুসা বলল।

'স্বীকার করবো না কেন? এটা করতে পারাটা আমাদের জন্যে গর্বের'।

'আহমদ শাহ আলমগীরসহ ওদের অপরাধ কি তা বলার মত সাহস কি আপনার আছে?'

'আহমদ শাহ আলমগীরের ব্যাপারটা একটু ভিন্ন। তার প্রথম অপরাধ হলো, পবিত্র বংশ পেশোয়া পরিবারের এক কন্যাকে সে ভাগাতে চেয়েছিল। তার

দ্বিতীয় অপরাধ হলো, তার কাছে মূল্যবান কিছু জিনিস আছে যা আমাদেরকে উদ্ধার করতেই হবে। কিন্তু সে রাজি হচ্ছে না। কিন্তু তাকে আমরা ছাড়ছি না'।

'ছাড়া, না ছাড়ার সবটা আপনাদের হাতে নয়, আপনার আজকের এই অবস্থা তার একটা প্রমাণ। সে যাক, এখন বলুন, ডজন ডজন যুবককে আপনার হত্যা করেছেন, তাদের কি দোষ ছিল?'

'আন্দামানের ইতিহাস থেকে মুসলমানদের নাম মুছি ফেলেছি। এখানকার মাটি থেকেও মুসরমানদের দর্শনীয় অস্তিত্ব আমরা মুছে ফেলব।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'ইতিহাস থেকে কি মুছে ফেলতে পেরেছেন?

'আন্দামানের জেলখানা কিংবা কোথাও, মুসলমানদের উপস্থিতি এবং অবদানের কথা নেই। আন্দামানের সেলুলার জেলখানা উৎসর্গ করা হয়েছে দামোদর সাভারকারের নামে। অথচ ইতিহাস মানলে এ জেলখানা 'শের আলী'র নাম উৎসর্গ হওয়া উচিত ছিল। শের আলীর মত সফল স্বাধীনতা সংগ্রামী ভারতে আর দ্বিতীয় জন্মেনি। আন্দামানে নিজ হাতে সে ভারতের বৃটিশ শাসক লর্ড মেয়োকে খুন করে এবং এই কৃতিত্বের জন্যে গর্ব ভরে সেই এই সেলুলার জেলখানায় ফাঁসিতে জীবন উৎসর্গ করে। শের আলীর পর যার নামে সেলুলার উৎসর্গ হওয়া উচিত ছিল তিনি মওলানা ফজলে হক খয়রাবাদী। ভারতে প্রথম আজাদী সংগ্রামের একজন নায়ক ছিলেন তিনি এবং জেলেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। এমন আরও বহু নাম আছে যাদের প্রায় সবাই মুসলিম। তাদের নামে জেল উৎসর্গ হতে পারতো। কিন্তু আমরা শের আলী ও মাওলানা ফজল হকসহ সবার নাম আন্দামানের ইতিহাস থেকে মুছে ফেলতে পেরেছি। তাদের নাম জ্বেলের কোন দর্শনীয় অস্তিত্ব মুছে ফেলতে পারব'।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'আন্দামানের কয়েকটা ডকুমেন্ট ইতিহাসের সব নয়। আন্দামানের কয়েকটা লিষ্ট থেকে এদের নাম মুছে ফেললেও ইতিহাসে এদের নাম ঠিকই থাকবে। আর দামোদর সাভারকারকে গায়ের জোরে হিরো বানানো হয়েছে। এর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই প্রতিবাদ হয়েছে ভারতের পত্র-পত্রিকার তরফ থেকেই। ভারতের প্রভাবশালী পত্রিকা 'ফ্রন্টলাইন' দামোদর সাভারকারকে স্বপক্ষত্যাগী ও বৃটিশের অনুগ্রহভোজী হিসাবে চিত্রিত করেছে।

দামোদর সাভারকার জেলে থেকে বৃটিশ সরকারের কাছে যে চিঠি লিখে ছিলেন তার পুরোটা ছেপে দিয়েছে পত্রিকাটি। ঐ চিঠিতে সাভারকার বৃটিশের বিরোধিতা করা ভুল হয়েছিল স্বীকার করে বৃটিশ সরকারের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছিলেন এবং বলেছিলেন, কারগার থেকে ছেড়ে দিলে তিনি এবং তার ভাই যতদিন সরকার চায় ততদিন কোন প্রকার রাজনীতিতে জড়িত হবেন না (I and my brother are perfectly willing to give a pledge of not participating in politics………..I am sincere in expressing my earnest intention of treading the constitutional path and trying my humble best to render the hands of the British dominion a bond of love and respect and respect and a mutual help." 'Front line', April 8, 2005) বৃটিশের কাছে আনুগত্যের শপথগ্রহণকারী এই দামোদর সাভারকারকেই স্বাধীনতা সংগ্রামী বানিয়ে তার নামে সেলুলার উৎসর্গ করেছেন। এই মিথ্যাচার টিকবে না। ইতিহাসের এই প্রতিবাদ শুরু হওয়াই তার প্রমাণ। সুতরাং আন্দামানের মাটি থেকে আলমগীরদের মুছে ফেলা যাবে না'।

'তোমার বক্তৃতা শুনলাম। বৃক্তৃতা বা দু'কলম লিখে ইতিহাস লেখা যায় না। ইতিহাস লিখতে শক্তিরও দরকার হয়। শক্তিমানরাই ইতিহাস গড়ে। আমাদের এই শক্তি আছে'।

'আপনি এই কথা বলছেন?' আহমদ মুসা বলল।

'কেন বলব না। মনে করেছ, আমি ধরা পড়ে গেছি, আর সব শেষ হয়ে গেল। তা নয়। আমি ডুবো পাহাড়ের এক আইসবার্গ মাত্র।নিজেকে যতই টাইটানিক মনে কর, ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে।'

'এই ডুবো পাহাড় কে?'

'তা আমি বলব না'।

'না বলে তুমি যে মরতেও পারবে না, মরণও যে আসবে না'।

'আমি জানি। কিন্তু তুমি জীবন্ত কাউকে আমাদের ধরতে পেরেছ এখনও? কিংবা কাউকে ধরে রাখতে পেরেছ? পারনি। আমাকেও পাবে না'।

‘পারিনি বলে পারা যাবে না, একথা ঠিক নয়’। বলল আহমদ মুসা।

এ কথা বললেও আহমদ মুসা সতর্ক হয়েছিল শংকরাচার্যের মতলব সম্পর্কে। চঞ্চল হয়ে উঠেছিল তার চোখ। শংকরাচার্যের না বলা কথাও পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল আহমদ মুসা কাছে।

আহমদ মুসার বঞ্চল চোখ ঘুরছিল শংকরাচার্যের দু’হাত ও তার জামার বোতামের উপর। শংকরাচার্যের বাম হাতটা ডান হাতের উপর রাখা ছিল বলে ডান হাতের পুরোটা দেখতে পাচ্ছিল না আহমদ মুসা।

‘আপনার ডান হাতটা দেখি’ বলে আহমদ মুসা নিচু হচ্ছিল শংকরাচার্যের ডান হাত ধরার জন্যে।

কিন্তু শংকরাচার্য চোখের পলকে তার ডান হাত টেনে নিয়ে তর্জনিটা মুখে পুরল।

আহমদ মুসা ঝাঁপিয়ে পড়র শংকরাচার্যের উপর। চেষ্টা করর তার ডান হাতের তর্জনিটা মুখ থেকে টেনে নেবার জন্যে। কিন্তু পারল না আহমদ মুসা। শংকরাচার্য তার সর্বশক্তি দিয়ে তার দেহটাকে উপুড় করে ফেলল।

আহমদ মুসা যখন তাকে আবার চিৎ করল এবং তার হাত মুখ থেকে বের করল, তখন শংকরাচার্যের দেহটা নীল হয়ে গেছে।

তার হাতটা দেহের উপর ছুঁড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা। হতাশ কণ্ঠে বলল, ‘পারলাম না তাকে বাঁচাতে’।

‘আংটিতে তাহলে পটাসিয়াম সাইনাইড ছিল’। বলল সুস্মিতা বালাজী।

‘শয়তানকে শাস্তি তাহলে শয়তান নিজেই দিল। ড্যানিস দেবানন্দ বলল।

‘হ্যাঁ, ভাই সাহেব। ব্যক্তি শয়তান নিজেকে শাস্তি দিয়ে শয়তানের ‘ডুবো পাহাড়’কে বাঁচিয়ে গেল’।

‘ছোট ভাই আপনার উদ্যোগ আর একটু আগে হলে কি হতো জানি না’। বলল সুস্মিতা বালাজী।

‘তার ডান হাতেই যে পটাসিয়াম সাইনাইড আংটি আছে, এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে একটু দেরি হয়েছে আমার’।

‘দুঃখ করবেন না ছোট ভাই। শয়তানের এইভাবে চলে যাওয়াই আল্লাহর ইচ্ছা ছিল। আমি খুশি হয়েছি। একটা কুগ্রহ আমাদের জীবন থেকে সরে গেল। আমাদের স্বেচ্ছা-নির্বাসন জীবনের ইতি ঘটল। আমি ও সুস্মি আজ থেকে মুক্ত’।

‘কনগ্রাচুলেশন আপা, ভাই সাহেব’। বলল আহমদ মুসা।

‘ধন্যবাদ ছোট ভাই। কিন্তু আপনি তো শয়তানের ‘ডুবো পাহড়ে’র সন্ধান পেলেন না। তার কি হবে?’ সুস্মিতা বালাজী বলল।

গম্ভীর হলো আহমদ মুসা। বলল, ‘আইসবার্গ হারিয়ে যাওয়ায়, শয়তানের, ‘ডুবো পাহাড়’ পানির তলায় অদৃশ্য হয়ে গেল বটে, কিন্তু শয়তানের জিন্দানখানা নামক আইসবার্গ, যেখানে এক মোগল শাহজাদা বন্দী আছেন, তা আমার সামনে রয়েছে। সেখানে গেলে আমি বন্দী শাহজাদাকে উদ্ধার করতে পারব এবং শয়তানের ‘ডুবো পাহাড়ে’র সন্ধানও আরেকবার পেয়ে যাব’।

আহমদ মুসা থামল।

সঙ্গে সঙ্গে ‘আমিন’ বলে উঠল সাহারা বানু, শাহ বানু এবং তারিক একই সঙ্গে। তারপর সুস্মিতা বালাজি এবং ড্যানিস দেবানন্দও।

‘ইনশাআল্লাহ’। বলল আহমদ মুসাও।

পরবর্তী বই

# ডুবো পাহাড়

কৃতজ্ঞতায়ঃ

1. Anisur Rahman
2. Abdullah Al Mahmud
3. Mohammed Sohrab Uddin

সাইমুম-৪২

# ডুবো পাহাড়

আবুল আসাদ

# ১

সুস্মিতা বালাজীদের তিন তলার হাওয়াখানা।

একে অভজারভেটরিও বলে সুস্মিতারা।

এখানে বসে হ্রদের মত বিশাল সরোবরের উপর দিয়ে আন্দামানের শান্ত নীল সমুদ্র দেখা যায়।

আহমদ মুসার শূন্য দৃষ্টি নীল সাগর পেরিয়ে ছুটছে আরও দূরে, অনেক দূরে- আরব সাগরও পার হয়ে। চোখের সামনে ভেসে উঠেছে জোসেফাইনের মিষ্টি হাসির শান্ত সুন্দর মুখ।

এইমাত্র টেলিফোন করেছিল ডোনা জোসেফাইন। তার রুটিন টেলিফোন। আগে সাত দিন পর পর টেলিফোন করতো। সন্তান আহমদ আব্দুল্লাহ জন্ম নেয়ার পর সাত দিন থেকে নেমে এসেছে এখন তিন দিনে। প্রতি তিন দিন পর সে এখন টেলিফোন করে। ডোনার যুক্তি হল আহমদ আব্দুল্লহ আসার পর তার দায়িত্ব বেড়েছে এবং তার সাথে দুশ্চিন্তাও বেড়েছে। এখন সাত দিন অপেক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

তিন দিন পরের ডোনার এই টেলিফোন আহমদ মুসার কাছে অমৃতের মত, যেন প্রানসঞ্জীবনী সুধা। তিন দিনের ক্লান্তি নিমিষেই দূর হয়ে যায় একটি পরিচিত কন্ঠের মিষ্টি সম্বোধনে।

কিন্তূ ডোনা আজ টেলিফোন করেছে দু'দিনের মাথায়।

আজ ডোনা ছিল দারুন খুশি।

ফ্রান্স থেকে তার আব্বা এসেছে এবং রাশিয়া থেকে এসেছে তার মা (ওলগার মা)। কিন্তূ এই খুশির কথা বলতে গিয়ে কান্নায় বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে জোসেফাইন। বলেছে, 'এই মুহূর্তে খুব ফিল করছি আমি তোমাকে। মনটা অস্থির লাগছে। চারদিকে আমার সবই আছে, কিন্তূ মনে হচ্ছে কিছুই নেই। হঠাৎ করে শূন্যতার একটা যন্ত্রণা আমাকে ঘিরে ধরেছে। তাই একদিন আগেই তোমাকে টেলিফোন করলাম।' কথা শেষ করেই সে তাড়াতাড়ি বলে উঠেছে, 'স্যারি, আমার কথা গুলোকে শাব্দিক অর্থে নিও না। আব্বা, আম্মা এসেছেন তো। তাই মনটা হঠাৎ আনন্দে বাঁধন হারা হয়ে উঠেছে। আহমদ মুসা উত্তরে বলেছে, কিন্তূ জোসেফান, আমি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছি এ কথা তো ঠিক।' উত্তরে জোসেফাইনের জবাবটা দীর্ঘ ছিল। বলেছে, কষ্ট পাচ্ছি এ কথা যদি বলি তা ঠিক হবে না। কিন্তূ এ কষ্টে যে সুখ আছে, তা কষ্টের চেয়ে অনেক বড়, এ কথা তুমি অন্তত বুঝবে। কারণ এমন কষ্ট তোমার মাঝেও আছে এবং কষ্টের মধ্যে যে বড় সুখ তা আমার মত তোমাকেও সান্তনা দেয়। আর তুমি আমাকে কোন কষ্ট দাও না। এ কষ্ট যদি কেউ দিয়ে থাকেন তিনি আমার আল্লাহ, বিশ্ব জাহানের প্রভূ। আনন্দের সাথে বুক পেতে এই কষ্ট আমি গ্রহন করেছি। কারণ এর যে পরম জাযাহ তিনি পুরস্কার হিসাবে প্রস্তূত রেখেছেন তা তোমার আমার কল্পনার বাইরে। বল, এরপর তুমি কষ্টের কথা বলতে পার?' আহমদ মুসা বলেছে, 'বলতে পার জোসেফাইন। পুরস্কারের অস্তিত্ব যেমন বাস্তব, কষ্টেরও অস্তিত্ব তেমনি বাস্তব। কষ্ট আছে বলেই তো পুরস্কার। তবে আমার খুব ভাল লাগছে জোসেফাইন, আল্লাহর ইচ্ছাকে তুমি এমনভাবে গ্রহন করতে পেরেছ দেখে। তোমার এই ধৈর্য আমাকে আরও শক্তি যোগাবে।' জোসেফাইন উত্তরে আবেগরুদ্ধ কন্ঠে বলেছে, 'সকল প্রসংসা আল্লাহর। আর আল্লাহকে তুমিই আমাকে চিনিয়েছ। আল্লাহর প্রতি এই নির্ভরতা

আমি তোমার কাছে থেকেই শিখেছি। আজকের এই যে আমি, তাকে তুমিই গড়েছ। সুতরাং.........।' জোসেফাইনকে কথা শেষ করতে না দিয়ে তার কথার মাঝখানেই আহমদ মুসা বলে উঠেছে, 'মানুষ একমাত্র আল্লাহই গড়ে জোসেফাইন। আল্লাহরই দেয়া যে আলো আমি তোমার কাছে তুলে ধরেছি, তাঁকে গ্রহন করার শক্তি আল্লাহই তোমাকে দিয়েছেন। এ আলোয় যে আলোর জীবন তুমি পেয়েছ, আল্লাহই দয়া করে তা গড়ে দিয়েছেন। সর্বাবস্থায় সব প্রশংসা আল্লাহর।' সঙ্গে সঙ্গেই জোসেফাইন বলেছে, 'ধন্যবাদ তোমাকে। তুমি আমার ভূল শুধরে দিয়েছ। তুমি আমার স্বামী, আমার শিক্ষক। এটা আমার গর্ব।' আহমদ মুসা সঙ্গে সঙ্গেই বলেছে, 'ব্যাপারটা একতরফা নয় জোসেফাইন। আমাদের কুরআন শরীফে স্বামী-স্ত্রীকে পরস্পরের অভিভাবক হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। অভিভাবক শিক্ষকও। সুতরাং শুধু ছাত্রী নয়, শিক্ষকও তুমি।' হেসে উঠেছিল জোসেফাইন। বলেছে, 'স্যার যদি ছাত্রীকে স্যারে উন্নতি করেন, তাহলে কোন বোকা ছাত্রী আনন্দে আত্মহারা হবে না।' আহমদ মুসা বলেছেন, 'কথাটা ওভাবে নয় এভাবে বল, স্বামী-স্ত্রী দুজনকে সমান আসন দেয়ার জন্য আল্লাহকে ধন্যবাদ।' একটু সময় নিয়ে গম্ভীর কন্ঠে বলেছে জোসেফাইন, তোমার সমান কথাটার সাথে আমি একমত নই। আল্লাহরব্বুল আলামিন স্ত্রীদের তাদের উপযুক্ত স্থান দিয়েছেন এ জন্য তার শুকরিয়া আদায় করছি। উত্তরে আহমদ মুসা বলেছে, 'কথাটার মধ্যে প্রতিযোগিতা দরকষাকষি আছে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক দরকষাকষির নয়, সম্প্রীতি ও সহযোগিতার। সম্প্রীতি ও সহযোগিতা না থাকলে দরকষাকষির রেজাল্ট খুব ফল দেয়না। আল্লাহ উভয়ের মধ্যে এই সম্প্রীতি ও সহযোগিতার কথাই বলেছেন।'

কথা শেষ জোসেফাইন আবার বলে উঠেছে, 'তোমার অনেক সময় নিয়েছি, প্রসঙ্গ থেকেও অনেক দূরে সরে এসেছি। শোন, আপাকে বলো আমি টেলিফোন করব। রাখলাম টেলিফোন।' বাধা দিয়ে আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিল, রেখো না প্লিজ। একটা দম নিয়ে জোসেফাইন বলেছে, তমার মনটা আজ খুব ফ্রি দেখছি। এমন ফ্রি দেখলে আমার ভয় করে।' 'কেন' বলেছে আহমদ মুসা। 'তোমার এমন ফ্রি হওয়া তোমার বড় কিছুতে জড়িয়ে পড়ার ইঙ্গিত দেয়,

বলেছে ডোনা জোসেফাইন। তার কন্ঠ ভারী শোনা যাচ্ছিল। বলেছে আহমদ মুসা, ‘কিন্তু তুমি তো অনেক শক্ত জোসেফাইন। তোমার দৃঢ়তা আমাকে শক্তি জোগায়।’ জোসেফাইন বলেছে, স্যরি এভাবে বলা আমার ঠিক হয়নি। কিন্তু সত্যি কি জান? আহমদ আবদুল্লাহর দিকে চাইলে আমি যেন দুর্বল হয়ে পড়ি। তুমি পাশে থাকলে এ দুর্বলতা আমি অনুভব করি না। বুঝতে পারি, এটা আমার জন্যে শোভনীয় নয়। কিন্তু......। কথা শেষ করতে পারে না ডোনা জোসেফাইন। গলায় আটকে যায় তার কথা। বেদনার একটা তীক্ষ্ণ ছুরি এসে আঘাত করে আহমদ মুসাকে। বলে সে, তোমার এ চিন্তা শোভনীয় নয় কেন জোসেফাইন, এ চিন্তাই স্বাভাবিক। একজন স্ত্রীর চেয়ে একজন ‘মা-স্ত্রীর’ দায়িত্ব তো বেশি হবেই। দায়িত্ব থেকে আসে চিন্তা, চিন্তার একটা পর্যায় ভয়ও।’ সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠেছে জোসেফাইন, ‘আমার দুর্বলতার কথা তোমাকে বলেছি সাহস পাওয়ার জন্যে, শক্তি পাব বলে। কিন্তু এখন দেখছি, দুর্বলতাকে তুমি প্ররোচণা দিচ্ছ, আরও বাড়িয়ে দিচ্ছি। তোমার কাছ থেকে এটা আশা করিনি।’ আহমদ মসা বলেছে, আমি এখন শুধু আহমদ মুসা নই, একজনের স্বামী এবং একজনের পিতাও। বলেছে জোসেফাইন, ‘স্যরি, আমি যে কথা বলছি, সে কথা তুমিও বললে। কথা সত্য এবং খুবই বাস্তব। কিন্তু এই দুর্বলতা আমার জন্যে হয়তো কিছুটা সাজে কিন্তু তোমার সাজে না। তুমি একজন জোসেফাইনের স্বামী তুমি একজন আহমদ আবদুল্লাহর পিতা, কিন্তু কোটি কোটি মানুষের তুমি ‘আহনদ মুসা’। আল্লাহর কাছে তুমি আহমদ মুসাই। এই আহমদ মুসা দুর্বল হতে পারে না।’ এক ধরনের আবেগ ঢেউ খেলে উঠেছিল আহমদ মুসার চেহারায়। ডোনা জোসেফাইনের কথাগুলোকে মনে হচ্ছিল অবিস্মরণীয় শিলালিপির এক মূর্তিমান সত্তার মত দেদীপ্যমান। বলে উঠেছিল আহমদ মুসা, ‘জোসেফাইন আমার কৃতজ্ঞতা নাও। তোমার মত স্ত্রী থাকলে কারো পথ হারাবার ভয় নেই। আল্লাহ তোমাকে জাযাহ দান করুন। তুমি শান্তির মরুদ্যান শুধু নাও জোসেফাইন, অব্যাহত প্রেরণার এক মানস সরোবরও।’ আহমদ মুসার কথার পিঠেই ডোনা জোসেফাইন বলে উঠেছিল, হ্যা, মহানজন সূর্য যখন ঘাতক চাঁদের প্রসংসা করে তখন শুনতে ভালোই লাগে।’

ডোনা জোসেফাইনকে নিয়ে আহমদ মুসার এই সুখ চিন্তা আর কতক্ষণ চলতো কে জানে। কিন্তু চলতে পারলো না। হাওয়াখানায় উঠার সিঁড়ি-মুখের দড়জায় নক হল। ভেঙে গেল আহমদ মুসার সুখ সপ্ন। সাগরের নীল বুক থেকে ফিরে এল তার চোখ।

দরজার পেছনে বসেছিল আহমদ মুসা।

পেছনে একবার তাকাল আহমদ মুসা।

মুখ ফিরিয়ে আনল আবার। বলল, 'এস শাহ বানু।'

অনুমতি পেয়ে শাহ বানু প্রবেশ করল হাওয়াখানায়।

পরনে তার ঢোলা সালোয়ার-কামিজ। মাথায় ওড়না, শরীরেও জড়িয়ে আছে।

মাথার ওড়নাটা কপালের উপর আরও টেনে দিয়ে চঞ্চল পদক্ষেপে আহমদ মুসার সামনে এল। বলল, 'ভাইয়া আমি মাত্র একবার নক করেছি। কি করে বুঝলেন আমি।'

'তুমি তর্জনী ভাঁজ করে ভাঁজ হওয়া আঙুল দিয়ে প্রথমে একবার নক করে থাক।' আহমদ মুসা বলল।

'ভাইয়া আপনি এত হিসাব-নিকেশ করেন কখন?'

'হিসেব-নিকেশ নয়, এটা ভালো করে শোনার ব্যাপার।'

'আমরাও তো শুনি, কিন্তূ এই ফল তো হয় না।' শাহ বানু বলল।

'শোন বটে, কিন্তূ আন্তরিকভাবে মনোযোগ দাও না।'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব না দিয়ে শাহ বানু একটু ভাবল। তারপর বলল, 'হতে পারে।'

শাহ বানু থামতেই আহমদ মুসা বলল, 'কিছু বলবে, না হাওয়া খেতে এসেছ?'

'ভাইয়া, সুষমা টেলিফোন করেছিল। আপনি ছিলেন না। সে সুস্মিতা বালাজী আপার সাথে দেখা করার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে। আপনাকে অনুরোধ করেছে, যে কোন উপায়ে সুস্মিতা আপার সাথে তার দেখা করিয়ে দেয়ার জন্য।'

হ্যাঁ, সুস্মিতা আপারা পোর্ট ব্লেয়ারে থাকে। সেখানে গেলে সহজেই দেখা হতে পারে। ঠিক আছে, ওদের সাথে আলোচনা করে দেখব।'

'ধন্যবাদ ভাইয়া। এটুকুই বলার ছিল।' বলল শাহ বানু।

'তোমার কথা শেষ হয়ে থাকলে আমার কিছু বলার আছে তোমাকে।আহমদ মুসা বলল।

সোফায় হেলান দিয়ে আহমদ মুসার শূন্য দৃষ্টি আবার ফিরে গেল সাগরের দিকে।

আহমদ মুসার কথায় চমকে উঠে তাকায় শাহ বানু আহমদ মুসার দিকে। কিছুটা উৎসুক, কিছুটা ভয় মিশ্রিত ভাব ফুটে উঠেছে তার চোখে-মুখে। বলল, 'আমি কিছু অন্যায় করে ফেলিনি তো।'

সঙ্গে সঙ্গে কথা বলল না আহমদ মুসা। ভাবছিল সে। গতকাল সাহারা বানু আহমদ মুসাকে বলেছে শাহ বানু ও তারিকের ব্যাপারে। তার এবং আহমদ শাহ আলমগীরের ইচ্ছা তারিকের সাথে শাহ বানুর বিয়ে দেয়া। তারিক ও তারিকের পরিবারও এটা চায়। কিন্তূ দুর্বোধ্য হল শাহ বানু। এ সংক্রান্ত সব কথা সব প্রশ্নকেই সে এরিয়ে যায়। এই প্রস্তাবে তাকে আনন্দিত বলে মনে হয় না। আবার তারিককে সে খারাপ চোখে দেখে এটাও নয়। যদিও শাহ বানু কিছুটা সমালোচক, কিন্তূ সেটা আন্তরিক, বিদ্বেষমূলক নয়। সব মিলিয়ে এই ব্যাপারে সাহারা বানু কিছুই ঠিক করতে পারছে না, কি করবে বুঝতে পারছে না। তাই সে আহমদ মুসাকে অনুরোধ করেছে এই বিষয়ে দায়িত্ব নেয়ার জন্যে। সাহারা বানুর কথা, আহমদ মুসার কোন কথায় না করার সাধ্য শাহ বানুর নেই। সাহারা বানুর দেয়া এই দায়িত্ব নিয়েই শাহ বানুর সাথে কথা বলার উদ্যোগ নিয়েছে আহমদ মুসা।

কি বলবে একটু গুছিয়ে নিল আহমদ মুসা। বলল, 'কোন অন্যায় কোন দিন করেছ যে অন্যায় করবে? সেসব কিছু না শাহ বানু।' আহমদ মুসার দৃষ্টি সাগরের দিক থেকে ফিরে এসেছে।

'অজান্তে, অজ্ঞাতেও অন্যায় হয়ে যায় ভাইয়া। কেউ না জানলেও আল্লাহ তা জানেন।'

‘আল্লাহ তার বান্দার অজান্তে অজ্ঞাতের ভুল, অন্যায় গোপন রাখতেই চান এবং এসব তিনি মাফ করে দেন।’

ম্লান হাসল শাহ বানু। তার চোখের কোণটা ভারী হয়ে উঠেছিল। কেঁপে উঠেছিল তার মন। আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ। অন্যায়কে আমি অন্যায় বলি বটে, কিন্তু অন্যায়ের স্মৃতিকেও যে আমার ভালো লাগে। আল্লাহ তো এটাও জানেন। এ অন্যায়কেও তিনি মাফ করবেন?

একটু ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে আবার সামনে এল সে আহমদ মুসার। বলল, ‘বলুন ভাইয়া।’

শাহ বানুর ভারী চেহারা আহমদ মুসার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। শাহ বানুকে সহজ করার জন্যেই আহমদ মুসা বলল, ‘কারও সাথে ঝগড়া করেছ নাকি।’ মুখে হাসি আহমদ মুসার।

‘না ভাইয়া ঝগড়া করিনি। ঝগড়া তো একজনের সাথে হয়, আর হবে না।’ ম্লান হেসে বলল শাহ বানু।

‘কেন হবে না?’

‘সে আপনার ছাত্র।’ গম্ভীর কণ্ঠ শাহ বানুর।

‘তাতে কি?’

শাহ বানু আহমদ মুসার সামনের সোফায় বসল। বলল, ‘আপনার কথা বলুন ভাইয়া।’ জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল শাহ বানু।

একটা গাম্ভীর্য নেমে এল আহমদ মুসার মুখে। বলল, ‘কথাটা তোমার আম্মার পক্ষ থেকে হলে ভালো হতো। কিন্তু তিনি আমাকে এ দায়িত্ব দিয়েছেন। কথাটা তুমি ও তারিক মুসা মোপলাকে নিয়ে।’ থামল আহমদ মুসা।

শাহ বানুর মুখ নিচু হয়ে গিয়েছিল।

আহমদ মুসা থামলে একটুক্ষণ নিরবতা।

‘বলুন ভাইয়া।’ নিরবতা ভেঙে বলল শাহ বানু। তার কণ্ঠ একটু কাঁপা ও গম্ভীর।

‘সবাই মনে করেন, তোমাদের সম্পর্কটা খুবই ভালো হবে।’

‘আমিও সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি ভাইয়া।’ মুখ নিচু শাহ বানুর। কণ্ঠটা ভেঙে পড়ার মত ভারী।

আহমদ মুসা মুখ তুলল শাহ বানুর দিকে। বলল, ‘আলহামদুলিল্লাহ।’ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল আহমদ মুসার মুখ।

‘আলহামদুলিল্লাহ।’ বলল শাহ বানুও। বলতে গিয়ে তার কণ্ঠ কান্নায় ভেঙে পড়ল।

দু’হাতে মুখ ঢেকে কান্না চেপে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে পালাল শাহ বানু।

মিষ্টি হাসি ফুটে উঠল আহমদ মুসার ঠোঁটে। মনে মনে বলল, আমাদের মেয়েরা আনন্দের সিদ্ধান্তেও কাঁদে। এটাই স্বাভাবিক। জীবনে এর চেয়ে বড় সিদ্ধান্ত কিছু নেই।

নিজের কথা মনে পড়ল আহমদ মুসার।

‘আমাদের কাঁদার হাসার কোনটারই সুযোগ হয়নি’, স্মৃতিচারণ করল আহমদ মুসা, ‘আমাদের বিয়েটা ছিল রণাঙ্গনের বিয়ের মত। বিয়ের আসন থেকে সোজা এয়ারপোর্ট গিয়েছি। যাবার পথে গাড়িতে কয়েকটা কথা হয়েছিল মেইলিগুলি মানে আমিনার সাথে। কি অসীম ধৈর্যের প্রতিমূর্তি ছিল সে। সে সময় সে ভেঙে পড়লে আমি এগোতে পারতাম না। সব চাওয়া, সব আবেগ, সব কান্নাকে আড়াল করে সে বিদায় দিয়েছিল আমাকে। আড়ালের সে কান্নার সমুদ্র আমি পেছনে তাকালেই দেখতে পাই।’ ভারী হয়ে উঠল আহমদ মুসার দু’চোখের কোণ।

ভেবে চলে আহমদ মুসা, ডোনা জোসেফাইনের সাথে তার বিয়েও পরিকল্পনা করে হয়নি। কতকটা পথ-বিয়ের মতই ছিল ব্যাপার। এক সাথে রাশিয়া যাওয়া উপলক্ষ করে প্রয়োজনই দু’জনের চাওয়ার আকস্মিক মিলন ঘটায়। অভিভাবকদের পারিবারিক বিয়ের যে আনন্দ-আবেগ তার সাক্ষাত আহমদ মুসারা পায়নি। শাহ বানুর আবেগ-অনুভুতির মধ্যে তারই একটা প্রকাশ দেখল আহমদ মুসা।

অতীতের স্মৃতির মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল আহমদ মুসা। তার দু’চোখের শূন্য দৃষ্টি আঠার মত সেঁটে গিয়েছিল দূর সাগরের বুকে।

হাওয়াখানায় প্রবেশ করেছে সাহারা বানু, ড্যানিশ দেবানন্দ ও সুস্মিতা বালাজী। সুস্মিতা বালাজী বগলদাবা করে ধরে নিয়ে আসছিল শাহ বানুকে। শাহ বানু তার চোখের অশ্রু মোছারও সুযোগ পায়নি।

হাওয়াখানায় তাদের সশব্দে প্রবেশ আহমদ মুসার তন্ময়তা ভাঙাতে পারেনি।

সুস্মিতা বালাজী শাহ বানুকে ধরে নিয়ে সবার আগে আহমদ মুসার কাছাকাছি পৌছে গিয়েছিল। সে আহমদ মুসার আপনাহারা তন্ময়তা দেখে থেমে যায় এবং আঙুলের ইশারায় সবাইকে চুপ করতে বলে।

সবারই চোখ পড়ল আহমদ মুসার তন্ময় ভাবের উপর।

তারা বুঝল, কোন চিন্তার গভীরে তলিয়ে গেছে আহমদ মুসা।

সবাই চুপ। পল পল করে কেটে গেল কয়েক মুহূর্ত।

এতগুলো লোকের উপস্থিতি টের পেল না আহমদ মুসা। তার চোখ দু'টির শূন্য দৃষ্টি ফিরে আসেনি সাগরের বুক থেকে। তার মুখে পাতলা একটা বেদনার প্রলেপ।

সুস্মিতা বালাজী একটু দ্বিধা করল। এগোল কয়েক ধাপ আহমদ মুসার দিকে।

শাহ বানু দ্রুত ফিস ফিস করে বলে উঠল, 'আপা, ওনাকে এখন ডিষ্টার্ব না করলে হয় না?'

'উনি এখন কোন কিছুতে ব্যস্ত নন। অতীতের কোন এক স্মৃতির গহ্বরে তিনি আটকা পড়েছেন মাত্র।'

'ছোট ভাই।' উঁচু, কিন্তু নরম কণ্ঠে ডাকল সুস্মিতা বালাজী।

আহমদ মুসা হঠাৎ ঘুম ভাঙার মত চমকে উঠে সোজা হয়ে বসল। বলল, 'স্যরি আপা, আপনারা কখন এসেছেন। বসুন। আমি একটু আনমনা হয়ে পড়েছিলাম।'

সুস্মিতা বালাজী সাহারা বানুকে বসিয়ে শাহ বানুকে পাশে নিয়ে সোফায় বসতে বসতে বলল, 'না না ছোট ভাই, আপনি আনমনা নয়, অতীতের কোন স্মৃতির বাঁধনে আটকা পড়েছিলেন।'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'ঠিক তাই।'

'একান্ত পার্সোনাল না হলে কি সে স্মৃতি জানতে ইচ্ছা করছে।' বলল সুস্মিতা বালাজী।

'পার্সোনাল নয়, পাবলিকই। তবে তেমন কিছু নয়।' বিষয়টাকে এড়ানোর চেষ্টায় বলল আহমদ মুসা।

'অতীতের যে ঘটনা আহমদ মুসাকে বর্তমানেও এসে আপনহারা করতে পারে, সে ঘটনা যে বড় কিছু অবশ্যই এতে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।' সুস্মিতা বালাজী বলল।

'আসলেই ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়। আমি ভাবছিলাম বিয়ের রকম নিয়ে। কতক বিয়ে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা, বাহাস-বিতর্ক, অনুষ্ঠান-আয়োজন, মান-অভিমানের দীর্ঘ পটভূমিতে হয়ে থাকে। তার জন্যে আলোক সজ্জা হয়, গৃহ সজ্জা হয়, ঢাক-ঢোল পিটানো, গাড়ির মিছিল নামে, মানুষের মেলা বসে। আবার কতক বিয়ে এমন হয় যে, পাত্র-পাত্রীলও মনে হয় না যে তাদের বিয়ে হল।' থামল আহমদ মুসা।

'বিয়ের রকম নিয়ে হঠাৎ এত বড় ভাবনা এল কেন?' বলল সুস্মিতা বালাজী।

হাসল আহমদ মুসা। তাকাল শাহ বানুর দিকে। বলল, 'একটা বিয়ের ঘটকালি করতে গিয়ে আপা নিজের বিয়ের কথা মনে পড়ে গেছে।'

ভ্রুকুঞ্চিত হল সুস্মিতা বালাজীর। মুহূর্তকাল চিন্তা করেই তাকাল শাহ বানুর দিকে। সে শাহ বানুর মুখটা একটু তুলে ধরে বলল, 'চোখের পানিতে মুখ ভাসানো হচ্ছিল এই কারণে? তা খুশির অশ্রুতো এতবেশি হওয়া উচিত নয়।'

মাথানত করে মুখটা আড়ালে নিল শাহ বানু। মুখটা তার আবার বেদনায় নীল হয়ে গিয়েছিল। বিবেকের সব শাসানি উপেক্ষা করে মনটা ডুকরে উঠল। সত্যিই খুশির নয়, এ এক নিষিদ্ধ, অবাধ্য অশ্রু।

শাহ বানুকে কথা কয়টি বলেই সুস্মিতা বালাজী আহমদ মুসার দিকে ফিরল। বলল, 'ছোট ভাই, আপনার বিয়ের কথা মনে পড়ল কেন?'

'এসব কথা থাক।'

‘বলার মত না হলে থাক। কিন্তু আপনার অসাধারন তন্ময়তা দেখে লোভ হচ্ছিল জানার যে, বিয়ের কথাটা ঐভাবে মনে পড়েছিল কেন?’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘বিয়ের ব্যাপারটা সবসময় পাবলিক। বলা যাবে না কেন?’

বলে একটু থেমেই আবার বলা শুরু করল, ‘প্রথমে আমার মনে পড়ে সিংকিয়াং এ মেইলিগুলির সাথে আমার বিয়ের কথা। আমি প্রস্তুত হয়েছি সিংকিয়াং থেকে ককেশাসে যাবার জন্যে। প্লেন অপেক্ষা করছে বিমান বন্দরে। আমার বন্ধু-বান্ধব ও শুভাকাক্সিক্ষরা চাইল আমাকে এক ঠিকানায় বেঁধে ফেলতে। সঙ্গে সঙ্গেই মেইলিগুলির সাথে আমার বিয়ের ব্যবস্থা হয়ে গেল। বিয়ে হয়ে গেল। বিমান বন্দরে যাবার গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। বিয়ের আসন থেকে উঠে আমি গাড়িতে গিয়ে বসলাম। মেইলিগুলি আমার পাশে এসে বসল বিমান বন্দরে পৌছে দেবার জন্যে। ড্রাইভার গাড়ি ষ্টার্ট দিল। আমার গাড়ির আগে পেছনে বন্ধু-বান্ধবদের গাড়ির মিছিল। বিমান বন্দরে বন্ধু-বান্ধবদের সারিতে দাঁড়িয়ে অশ্রুভেজা চোখ আর মুখে হাসি নিয়ে বিদায় দিল আমাকে মেইলিগুলি।’ থামল আহমদ মুসা।

সবাই হা করে শুনছে আহমদ মুসার কথা। তাদের চোখে অবিশ্বাসের বিস্ময়।

আহমদ মুসা থামতেই সুস্মিতা বালাজী বলল, ‘এটা কি রূপকথার রসিকতা ছোট ভাই, না আসলে ঘটেছিল?’

‘ইতিহাস এটা আপা।’

শাহ বানু সোজা হয়ে বসেছিল। তার চোখে অপার বিস্ময় এবং অনেক প্রশ্ন। তার মুখ চিরেই যেন কথা বেরিয়ে এল, ‘তারপর আপনি কবে ফিরলেন আবার?’

প্রশ্ন শুনে চোখ বুজল আহমদ মুসা। মুখ নিচু হল তার। ধীরে ধীরে মুখটি উঁচু হল আবার। বেদনায় ভারী মুখ। বলল, ‘তারপর ঘটনার ¯্রাতে আমাকে ভাসিয়ে নিল ককেশাসে, সেখান থেকে বলকানে, বলকান থেকে স্পেনে। স্পেনের পর দক্ষিণ ফ্রান্সে, দক্ষিণ ফ্রান্স থেকে দুঃসংবাদ পেলাম মেইলিগুলির আব্বা-আম্মা নিহত, মেইলিগুলি নিখোঁজ। ছুটে গেলাম সিংকিয়াংএ। আমি বন্দী হলাম।

হাত-পা বাঁধার পরেও খাটের সাথে আমাকে বেঁধে রাখা হয়েছিল। আহত ও বন্দী মেইলিগুলিকে সেখানে আনা হল। সেই বিয়ের পর এই আমাদের প্রথম দেখা। আমার শত্রুর ইচ্ছা আমাদের দু'জনকে একত্রিত করা এবং আমার চোখের সামনে আমার স্ত্রীকে লাঞ্চিত করা। আমার শত্রুটি এগিয়ে আসছিল মেইলিগুলির দিকে। আমার শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা। মেইলিগুলি পাথরের মত ভাবলেশহীন। শেষ মুহূর্তে মেইলিগুলির হাত ওড়নার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ক্ষুদ্র এক রিভলবার নিয়ে। ক্ষুদ্র, কিন্তু অত্যন্ত পাওয়ারফুল এই রিভলবার। মেইলিগুলি সব সময় এটা সাথে রাখত শেষ মুহূর্তের মত ঘটনায় ব্যবহার করার জন্যে। গুলী করল সে। গুলী খেয়ে পড়ে গেল শত্রুটি। গুলী করেই আহত মেইলিগুলি উঠল আমার দিকে আসার জন্যে। ওদিকে শত্রুটি গুলী খেয়ে পড়ে গেলেও পরমুহূর্তেই সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তার হাতেও উঠে এসেছে রিভলবার। তার রিভলবার টার্গেট করেছে আমাকে। মেইলিগুলি শেষ মুহূর্তে টের পেল। তখন রিভলবারের ট্রিগারে আঙুল চাপছে শত্রু। মেইলিগুলি ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে আড়াল করে দাঁড়াল। যে গুলীটা আমার বুক বিদ্ধ করতো, তা এসে বিদ্ধ করলো মেইলিগুলিকে। গুলী খেয়ে মেইলিগুলি পড়ে গেল খাটের উপর আমার গায়ে ঠেস দেয়া অবস্থায়। কিন্তু পড়ে গিয়েও রিভলবার ছাড়েনি মেইলিগুলি। সে সর্বশক্তি দিয়ে ডান হাত তুলে গুলী করল শত্রুকে। তার রিভলবারের সবগুলো গুলীই সে শেষ করল শত্রুর উপর। তার পরেই শরীর এলিয়ে পড়ল আমার উপর। গোলাগুলীর শব্দ শুনে উদ্ধার করতে আসা আমাদের সাথীরা এসে গেল। তারা বাঁধন খুলে দিল আমার। আমি মেইলিগুরীকে হাসপাতালে নিতে চাইলাম। কিন্তু আমাদের জন্য হাসপাতালের খোঁজ কেউ দিতে পারল না। মেইলিগুলির মাথা ছিল আমার কোলে।

হাসপাতালে যাবার মত তার অবস্থাও ছিল না। সে কষ্ট করে বলল, 'আব্বা-আম্মা নিহত হবার সময়ই আমি মরে যেতে পারতাম। সেখান থেকে পালাবার পর প্রতি মুহূর্তেই মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছি। তোমার সাথে সাক্ষাত পর্যন্ত আমি আল্লাহর কাছে জীবন ভিক্ষা চেয়েছিলাম। তা আমি পেয়েছি। আমার আর কিছু চাওয়ার নেই। শুধু কয়েকটি কথা বলার আছে তোমাকে।' সবটুকু শক্তি দিয়ে

সে বলল শেষ কথা কয়টি। কথা কয়টি শেষ হবার সাথে সাথে সেও হারিয়ে গেল।' থামল আহমদ মুসা।

কারও মুখে কোন কথা নেই। সবারই মাথা নিচু।

কারও চোখই শুকনা নেই।

এক সময় নিরবতা ভাঙল সুস্মিতা বালাজী। বলল, 'স্যরি ছোট ভাই, এমন কাহিনী শোনার জন্যে আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। কতকটা মজা করেই শুনতে চাচ্ছিলাম আপনার বিয়ের কাহিনী। সত্যি ছোট ভাই, বিয়েটা যেমন ছিল অসম্ভব এক রূপ কথা, তেমনি এর অকাল সমাপ্তিটাও অবিস্মরণীয় এক বিষাদগাথা। এই স্মৃতির মধ্যে কেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলেন বুঝলাম।' থামল সুস্মিতা বালাজী।

শাহ বানু মুখ তুলতেই পারেনি। বোবা এক বেদনায় সে নির্বাক হয়ে গেছে।

সুস্মিতা বালাজী থামতেই সাহারা বানু বলল, 'বৌমা শেষ কথাটা কি বলেছিল বেটা?'

'ধন্যবাদ খালাম্মা। আমারও মন চাচ্ছে শুনতে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে সাহস হচ্ছিল না।' বলল সুস্মিতা বালাজী।

আহমদ মুসা গম্ভীর। তার মুখ বেদনায় নীল তখনও।

সুস্মিতা বালাজীর কথায় আহমদ মুসার মুখে লজ্জাবিজড়িত ম্লান হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'তিনটি কথা বলেছিল মেইলিগুলি। এক. তার এবং তার পিতার বিশাল সম্পত্তি যেন আমি গ্রহণ করি এবং আমার ইচ্ছামত কাজে লাগাই। দ্বিতীয় বিষয়ে সে বলেছিল, 'বছরে অন্তত একদিন তোমার সান্নিধ্য পাই, এমন এক জায়গায় তুমি আমার কবর দেবে। আর তৃতীয় বিষয় হলো, জেদ্দা ইসলামী ব্যাংকের একাউন্টে তার যে টাকা আছে, সে টাকা আমার ছেলে পাবে। তার মালার লকেটে 'একাউন্ট কোড আছে।'

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই সাহারা বানু দ্রুত কণ্ঠে বলে উঠল, 'তখন তোমার ছেলে কোত্থেকে এল। এই সেদিন না তোমার ছেলে হল?'

'ঠিক খালাম্মা।'

‘ও তাহলে তুমি বিয়ে করবে, বাচ্চা হবে এটা ভেবেছিল সে।’ বলল সাহারা বানু।

‘না খালাম্মা, ভাবেনি। আমাদের ছোট ভাই যাতে বিয়ে করে, ঘর-সংসার করে পরোক্ষভাবে সে এই অনুরোধ করে গেছে, এই চাপই দিয়ে গেছে সে। আমাদের ভাবী মেইলিগুলির জীবনের এ আর এক মহত্তর দিক। মুমূর্ষূ অবস্থায়ও কত সুদূরপ্রসারী, কত বাস্তববাদী চিন্তা সে করেছে। তার ত্যাগ ও শুভ চিন্তার জাযাহ আল্লাহ তাঁকে দিন।’ সুস্মিতা বালাজী বলল।

মুগ্ধতায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠল শাহ বানুর মুখ। মনের ভেতরে তার নানা কথার আলোড়ন, সত্যিই আহমদ মুসার যোগ্য সাথী মেইলিগুলি। সে শুধু নিজের জীবন দিয়ে আহমদ মুসার জীবনই বাঁচিয়ে যায়নি, আহমদ মুসাকে নতুন জীবন শুরু করতে বাধ্য করে গেছেন। জোসেফাইনও কি এরকম? সে তো ফরাসি রাজকন্যা। ওঁরা যখন ভালো হন, তখন আকাশ স্পর্শী হয়ে ওঠেন। শাহ বানু তার এই ভালো চিন্তার মধ্যেও তার মুগ্ধ মনের কোথাও যেন স্বস্তি অথবা অস্বস্তির একটা অস্তিত্ব অনুভব করছে। সেটা আকাশের চাঁদ ছুতে চাওয়ার ব্যর্থতা, না চাঁদ ছুঁতে চাওয়ার গর্ব থেকে উদ্ভুত তার হিসেব শাহ বানু মেলাতে চাইল না। অতীত যেমন তেমনই থাক না। তার যা তা তো এখন সামনের দিকে। কিছুক্ষণ আগের দু’চোখের সেই অঢেল অশ্রু ছিল তার নতুন জীবন জন্ম নেয়ার বেদনা সঙ্গীত। মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠল শাহ বানুর।

সুস্মিতা বালাজীর কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই সাহারা বানু ‘আমিন’ বলে উঠল।

তারপর মুহূর্ত কয়েকের নিরবতা।

নিরবতা ভেঙে সাহারা বানু বলে উঠল, ‘জোসেফাইন বৌমার কাহিনী নিশ্চয় এমন দুঃখের হবে না। আমরা সেটা শুনে মনটা ভালো করতে পারি বেটা।’

ম্লান হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘ঠিক খালাম্মা ওখানে এ ধরনের কোন কাহিনী নেই। তবে এ বিয়েটাও ছিল আকস্মিক। তাতিয়ানার দেয়া একটা দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তার আত্মীয়া ও রুশ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী জার রাজকন্যা ক্যাথারিনের স্বার্থে রাশিয়া যাওয়া অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। ওদিকে

ডোনা জোসেফাইনের পিতাকেও কিডন্যাপ করে রাশিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। সবমিলিয়ে রাশিয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। ডোনা জোসেফাইন গোঁ ধরল, সেও রাশিয়ায় যাবে আমার সাথে। আমি বললাম, ইসলামী বিধান মতে সম্পর্ক নেই এমন একটা মেয়েকে একা আমার সাথী করে নিতে পারি না। শুনে অনেকক্ষণ মুখ নিচু করে থাকে। তারপর ধীর ও ভারী কণ্ঠে বলে, আমি আগেই আব্বার মত নিয়েছি, আমার ইসলাম গ্রহণ করায় তাঁর আপত্তি নেই এবং আমি আপনাকে বিয়ে করলে তিনি আনন্দিত হবেন। দুঃখিত আপনার মত সুস্পষ্টভাবে আমি জেনে নিইনি। আপনার সম্মতি ছাড়াই আমি এতটা এগিয়ে আছি। এখন আপনি চাইলে আমাদের বিয়ে..........।' কথা শেষ করতে পারে না ডোনা জোসেফাইন। কান্নায় তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়। এরপর একটা মসজিদে গিয়ে আমাদের বিয়ে হয়। কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব ও শুভাকাক্সক্ষী হাজির ছিলেন অনুষ্ঠানে।'

মোবাইল বেজে উঠল আহমদ মুসার।

কথা শেষ করেই মোবাইল তুলে নিল হাতে।

আহমদ মুসা টেলিফোন তুলে 'হ্যালো' বলতেই ওপার থেকে বলল, 'আমি বেগম হাজী আহমদ আলী আবদুল্লাহ বলছি। আপনি?'

আহমদ মুসা সালাম দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ আমি আহমদ মুসা। চাচাজানের খবর কি?'

'সেই খবর এবং আরও কিছু খবর দেবার জন্যেই তো গতকাল থেকে তোমাকে পাবার চেষ্টা করছি বাছা। তোমাকে পাচ্ছিলামই না।'

'সব খবর ভালো তো?'

'ভালো নয় বেটা। গতকাল বিকেলে আকস্মিকভাবে তাকে জেল থেকে ছেড়ে দেয়া হয়। বাড়ি আসার পথে তিনি নিখোঁজ হয়ে গেছেন। গত রাতে টেলিফোনে পুলিশ এ কথা আমাকে জানায়। আজ পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে।' বলল বেগম হাজী আবদুল্লাহ কান্নাচাপা কণ্ঠে।

'পত্রিকার খবরে কি লিখেছে খালাম্মা?'

'লিখেছে যে, 'আন্দামানে এক সময়ের গোয়েন্দা প্রধান হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহ ডিটেনশন থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফেরার পথে সন্ধ্যার দিকে

কিডন্যাপড হয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শীর সূত্রে এটা জানা গেছে। পুলিশ এটা কনফারম করেছে। তার বাড়িতে যোগাযোগ করে জানা গেছে তিনি বাড়িতে পৌছাননি গভীর রাত পর্যন্ত। কে বা কারা কিডন্যাপ করতে পারে এ ব্যাপারে পুলিশ এবং হাজী সাহেবের বাড়ির লোকেরা কিছুই বলতে পারছেন না।' সংক্ষেপে নিউজটা এই। কিন্তু সবচেয়ে উদ্বেগজন খবর হল, আজ সকালে একজন টেলিফোনে আমাকে বলেছে, আহমদ মুসাকে আমাদের হাতে তুলে দিলে আপনার স্বামীকে ছাড়া হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আহমদ মুসাকে না পেলে হাজী সাহেবকে হত্যা করা হবে।'

'আপনি কি বলেছেন?'

'আহমদ মুসা কে? আমরা তাকে কোথায় পাব? উত্তরে লোকটি বলেছে, কোথায় পাবেন তা জানেন, বলে টেলিফোন রেখে দিয়েছে লোকটি।'

'নির্দিষ্ট সময়ের কথা বলেছে। নির্দিষ্ট সময়টা কখন সেটা কি বলেছে?'

'না বলেনি।'

'ভাববেন না খালাম্মা। তারা আমাকে ঐ নির্দিষ্ট সময়টা জানানোর পর সে সময় পার হওয়ার আগে পর্যন্ত হাজী সাহেব নিরাপদ। এদিকে আমি দেখছি কি করা যায়।'

'ধন্যবাদ বেটা। আরেকটা জরুরি খবর। মার্কিন রাষ্ট্রদূত আন্দামানে এসেছিলেন। গোপনে আমার সাথে দেখা করেছিলেন। তোমাকে খোঁজ করছেন তিনি। তিনি গভর্নর বালাজী বাজীরাও মাধবকেও তোমার কথা বলেছেন। তোমার টেলিফোন নাম্বার তখন আমার কাছে ছিল না বলে জানাতে পারিনি।'

'তার কোন টেলিফোন নাম্বার দিয়ে গেছেন?'

'একটা নেম কার্ড দিয়েছিলেন। দুঃখিত, আমি সেটা হারিয়ে ফেলেছি। তিনি বলেছিলেন, তুমি গভর্নর কিংবা গভর্নর অফিসে যোগাযোগ করলেই তারা যোগাযোগ করিয়ে দেবেন।'

মনে মনে হাসল আহমদ মুসা। সরিষায় যে ভূত, তাতো রাষ্ট্রদূত মহোদয় জানেন না। বলল আহমদ মুসা, 'ঠিক আছে খালাম্মা। আমি জেনে নেব। দিল্লীর মার্কিন দূতাবাসের টেলিফোন নাম্বার যোগাড় করা কঠিন হবে না।'

‘ঠিক আছে বেটা। শাহ বানুরা কেমন আছে?’

‘ভালে আছে খালাম্মা। শাহ বানুরা আপাতত নিরাপদ। আপনাকে সাক্ষাতে সব কথা বলব। আমি আসব আপনার ওখানে।’

‘আলহামদুলিল্লা। আল্লাহ ভরসা। শোন বেটা, পারলে প্রতিদিন খবর নিও, তোমার খবর জানিও। আর তুমি এস। এখন রাখছি টেলিফোন।’

আহম মুসা সালাম দিয়ে মোবাইল রেখে দিল।

সবাই উদগ্রীবভাবে আহমদ মুসার কথা শুনছিল। সুস্মিতা বালাজী বলল, ‘কে টেলিফোন করেছিল? কোন দুঃসংবাদ মনে হচ্ছে!’

‘হ্যাঁ আপা’, বলে আহমদ মুসা সব কথা তাদের জানিয়ে বলল, ‘হাজী সাহেবের পরিবার ও হাজী সাহেব সব রকম ঝুঁকি নিয়ে আমাকে ও শাহ বানুদের সাহায্য করেছে।’

মুহূর্তেই উদ্বেগ ও বেদনার একটা ঢেউ খেলে গেল গোটা ঘরে।

কারো মুখে কোন কথা নেই। নিরবতা বেশ কিছুক্ষণ।

আহমদ মুসা তখন তার মোবাইলের ফোন বুকে টেলিফোন নাম্বারগুলো চেক করছিল।

এবারও কথা বলল, সুস্মিতা বালাজীই। বলল, ‘তার মানে আবার আপনি ফিরে যাচ্ছেন পোর্ট ব্লেয়ারে। কণ্ঠে হতাশার সুর।’

‘হ্যাঁ আপা যেতে হবে।’

‘এতবড় ঘটনা ঘটিয়ে আপনি এলেন। দু’একদিনও স্থির হয়ে বসবেন না?’ বলল সুস্মিতা বালাজী।

‘পৃথিবী স্থির নয় আপা। আমি আপনারা স্থির হবো কি করে? আমাদের এ পৃথিবীটা গতির উপর টিকে আছে। সবকিছুই এখানে গতিময়। গতিহীনতা মানেই এখানে মৃত্যু। সুতরাং স্থিরতা নয় গতি চাই আপা।’

‘কথায় আমরা জিততে পারবো না। দেখি ভাবিকেই সব জানাতে হবে।’

বলে একটু থামল সুস্মিতা বালাজী। একটু আত্মস্থ হল। তারপর আবার বলা শুরু করল, ‘আমরা যে কথাটা বলতে এসেছিলাম, তা এখনও বলাই হয়নি।’

আবার একটু থামল সুস্মিতা বালাজী। বলতে শুরু করল আবার, 'ছোট ভাই আমাদের সুষমা রাও একদম পাগল হয়ে উঠেছে। বার বার টেলিফোন করছে। বলছে, হয় আমাকে নিয়ে যান, না হয় আপনাকে আসতে হবে। তার এই জেদের কিভাবে মোকাবিলা করি বলুন।'

'আমি এ ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছি। আপনারা অনেকদিন বাইরে যাননি। আমার মনে হয় আপনারা পোর্ট ব্লেয়ার থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন। সেখানে আপনারা বোনের বাড়িতে উঠবেন। হোটেলেও উঠতে পারেন।' বলল আহমদ মুসা।

'আমিও ভেবেছি। এটা হতে পারে, কিন্তু গ-গোলটা একটু না থামলে নয়।' সুস্মিতা বালাজী বলল।

'আমারও বাইরে যাবার জন্যে মন আকুলি-বিকুলি করছে। বিশেষ করে শংকরাচার্য মরে যাবার পর আমাদের সামনে সে রকম কোন আশংকাই আর বর্তমান নেই। কিন্তু সুস্মিতা ঠিকই বলেছে, এখন বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়। আদিবাসীদের এভাবে রেখে যাওয়া ঠিক হবে না।' বলল ড্যানিশ দেবানন্দ।

আহমদ মুসাও ভাবছিল। বলল, 'ঠিকই বলেছেন, আদিবাসীদের এভাবে রেখে যাওয়া ঠিক হবে না। তাছাড়া শাহ বানুদেরকেও কোথাও মুভ করানো ঠিক হবে না।'

'তাহলে?'

'যেহেতু সুষমাকে আনাও অসম্ভব। তাই বুঝিয়েই সুষমাকে শান্ত করতে হবে। তারও এটা বুঝা দরকার যে, আহমদ শাহ আলমগীর ছাড়া না পাওয়া পর্যন্ত তার বাইরে মুভ না করাটা বেটার। আমরা যে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করছি তারা পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট। তারা এমনকি সুষমাকে বিপদে ফেলে তার দায় আহমদ শাহ আলমগীরের পক্ষের লোকদের উপর চাপাতে পারে।'

চোখ ছানা-বড়া হয়ে উঠল সুস্মিতা বালাজীর। বলল, 'শুনতে এটা অসম্ভব মনে হচ্ছে। কিন্তু সুষমাকে খেপিয়ে তুলে তাকে পক্ষে পাওয়া এবং মানুষের মধ্যে শাহ পরিবারের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছাড়াবার জন্যে অবশেষে তারা এটা করতে পারে। ধন্যবাদ ছোট ভাই। আমি সুষমাকে সব ব্যাপার বুঝিয়ে বলব।'

‘ধন্যবাদ আপা।’

থামল একটু আহমদ মুসা। চারদিকে চেয়ে বলল, ‘তারিক কোথায়, তাকে তো দেখছি না?’

‘সে আর্মস ষ্টোরে। অস্ত্র অস্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করছে। তার খোঁজ করছেন কেন? তাকেও সঙ্গে নেবেন নাকি?’ বলল সুস্মিতা বালাজী।

‘না পোর্ট ব্লেয়ারে এখন তার প্রয়োজন নেই। সে এখানেই থাক। তবে অস্ত্র জ্ঞানের দিকে মনোযোগ দিয়েছে এটাকে আমি ভালো মনে করছি না। অস্ত্র জ্ঞান নয়, আজ বেশি প্রয়োজন জ্ঞানের অস্ত্রকে শাণিত করা।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কিন্তু আপনি! উল্টোটাই যে সত্য তা প্রমাণ করছেন।’ বলল শাহ বানু।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘তুমি তো মোগল রক্ত! সামরিক বিবেচনা তোমাদের মজ্জাগত। তুমি তারিককে সৈনিক বানাতে চাও। কিন্তু শাহ বানু! আজ মোগলরা থাকলে, আমি যা বলছি তারা তাই বলত। জেনে রেখ শাহ বানু, অস্ত্রশক্তি কিংবা সৈন্য শক্তির অভাবে মোগলদের পতন হয়নি। পতন হয়েছে রাষ্ট্রজ্ঞানের অভাবে, অস্ত্র ও সৈন্য শক্তি ব্যবহারের জন্যে যে জ্ঞান দরকার তার অভাবে। আজ আন্দামানে আমাদের যে সংকট তার সমাধান অস্ত্র নয়, বুদ্ধির মাধ্যমেই আনতে হবে।’

‘কিভাবে? অস্ত্রই তো এখানে মুখ্য দেখছি।’ শাহ বানু বলল।

‘কিভাবে আমি জানি না, কিন্তু এটা বিশ্বাস করি। অস্ত্রের যে উপস্থিতি তুমি দেখছ, সেটা সাময়িক অবস্থার একটা প্রয়োজন মাত্র।’

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘মাফ করবেন, আমি উঠছি। কয়েকটা কাজ সারতে হবে।’

‘ছোট ভাই, আপনি যাত্রা করছেন কখন?’ জিজ্ঞাসা সুস্মিতা বালাজীর।

আহম মুসা যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। আবার ফিরল। বলল সুস্মিতা বালাজী ও ড্যানিশ দেবানন্দকে উদ্দেশ্য করে, ‘আপা, ভাই সাহেব, অপরিচয়ের প্রাথমিক অবস্থা তো চলে গেছে। এখনো ছোট ভাইকে কি ‘আপনি’ বলতেই হবে?’

একটা গাম্ভীর্য নামল সুস্মিতা বালাজী ও ড্যানিশ দেবানন্দের মুখে। মুহূর্তের জন্যে দু'চোখ বন্ধ হয়েছিল সুস্মিতা বালাজীর। বোধ হয় সেটা নিজের ভেতরটাকে দেখার জন্যেই। বলল, 'ধন্যবাদ, না আর বলব না ছোট ভাই। সত্যিই আহমদ মুসা এখন আমাদের ছোট ভাই হয়ে গেছে। তোমাকে ওয়েলকাম।'

'তোমাকে আমার পক্ষ থেকেও ওয়েলকাম।' বলল ড্যানিশ দেবানন্দ।

'ধন্যবাদ আপা, ভাই সাহেব।' বলেই আহমদ মুসা আবার ঘুরে দাঁড়াল ঘর থেকে বের হবার জন্যে।

হাতের রক্তাক্ত চাবুকটা ঘরে ঢোকার পরেই একপাশে ছুড়ে দিয়ে লোকটি এসে টেবিলের সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়াল।

লোকটি দীর্ঘদেহী। দেখেই মনে হয় পেশী দিয়ে পেঁচানো লোকটির দেহে তিলমাত্র মেদ নেই।

লোকটি ঘর্মাক্ত।

মুখভরা তার বিরক্তি ও হতাশা।

টেবিলের ওপাশে ফুলসাইজ রিভলভিং চেয়ারে বসে আরেকজন লোক। লম্বা গেরুয়া দাড়ি ও মোচ এবং লম্বা গেরুয়া চুলে তার মুখ ও মাথা ঢেকে আছে। পরনেও তার গেরুয়া বসন।

পাশেই দাঁড় করানো বিশাল ত্রিশুল।

দেহ তার বিশাল না হলেও গড় সাইজের চেয়ে দর্শনীয়ভাবে বড়।

চোখ দু'টি তার লাল। তার দাড়ির রং এবং তার গেরুয়া বসনের সাথে খুবই সংগতিশীল।

ইনিই মহামুনি শিবদাস সংঘমিত্র। ইনি শিবাজী সন্তান সেনা ও শিবাজীবাদী আরও পাঁচটি সংগঠন নিয়ে গঠিত 'মহাসংঘ'-এর আন্দামান এলাকার শীর্ষ সংঘপতি।'

বিশেষ সময় সন্ধিক্ষণ ছাড়া তিনি লোকচক্ষুর সামনে আসেন না। কিন্তু লোকরা সবাই তার চোখের সামনে থাকে সবসময়, মহাসংঘের সকলেই এটা ভালোভাবে জানে।

আজকের বিশেষ সময় সন্ধিক্ষণে তিনি উদয় হয়েছেন রাস দ্বীপে শিবাজী সন্তান সেনা (সেসশি) এর হেড অফিসে।

মহামুনি সংঘমিত্র তার মেরুদ- তীরের মত খাড়া রেখে সোজা হয়ে বসে দরজার দিকেই তাকিয়ে ছিল।

ঘরে ঢোকা লোকটির চেহারার দিকে চোখ পড়তেই মহামুনি সংঘমিত্রের লাল চোখ দু'টি জ্বলে উঠল। কণ্ঠেও ধ্বনিত হল বজ্র নির্ঘোষ শব্দ, 'কথা আদায় করতে পারনি?'

'প্রভু, মানুষকে যত রকমের নির্যাতন করা যায়, তার কোনটাই বাকি রাখা হয়নি। সে বার বার সংজ্ঞা হারাচ্ছে, কথাটি আদায় করা যাচ্ছে না। অবিরাম তার একটাই কথা, 'বাক্স আমার কাছে নেই। এ সম্পর্কে আমি কিছু জানি না। প্রভু ব্যাপারটা কি এমন হতে পারে যে, 'বিষয়টি শুধু তার মায়েরই জানা আছে।' বলল লোকটি।

লোকটির নাম কৃষ্ণ দাস তিলক। গুজরাটের ব্রাক্ষণ। ভারতীয় পুলিশ সার্ভিসের একজন ডাক সাইটে অফিসার ছিল। সে অত্যন্ত সাহসের সাথে ও গর্বের সাথে প্রকাশ্য ও অব্যাহতভাবে সাম্প্রদায়িক ভূমিকা পালন করতো। সর্বশেষ বোম্বাই-এর এক মুসলিম বিরোধী দাঙ্গাকালে কৃষ্ণদাসকে তার নিজের রিভলবার দিয়ে একটি ঘরে লুকানো কয়েকজন মুসলিম বালককে গুলী করে মারার ছবি পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর হিন্দুস্তান সরকার কৃষ্ণদাসকে বরখাস্ত করে এবং তার বিরুদ্ধে সরকারের পক্ষ থেকে মামলা দায়ের করা হয়। কিন্তু আইনের ফাঁক গলিয়ে যথারীতি নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে সে বেরিয়ে আসে। তবে চারদিকের সমালোচনার মুখে সে আর চাকরিতে যোগ দেয় না। যোগদান করে সে 'মহাসংঘ' এর শিবাজী সন্তান সেনা দলে। যাকে হিন্দুস্তানের পুলিশের খাতায় 'ব্ল্যাক আর্মি' বলে ডাকা হয়। কৃষ্ণদাস তিলক সম্প্রতি আন্দামানে এসেছে এখানকার 'ব্ল্যাক আর্মি'র দায়িত্ব নিয়ে।

কৃষ্ণ দাস তিলকের কথা শেষ হলে মহামুনি সংঘমিত্র চেয়ারে হেলান দিল। তার চোখে-মুখে এখন ক্রোধের চেয়ে বিরক্তির চিহ্নই বেশি। বলল, 'কৃষ্ণ দাস তুমিও পুঁচকে ছেলে আহমদ শাহ আলমগীরের কাছে পরাজিত হলে। বাক্সের সন্ধান তার কাছে নেই, এ কথা ঠিক নয়। মোগলসহ প্রত্যেক রাজবংশই তাদের বংশীয় কোন দায়িত্ব হস্তান্তর করে উত্তরাধিকারীর হাতে, অন্য কারও কাছে নয়। সুতরাং বাক্সটা আহমদ শাহ আলমগীরের কাছেই পাওয়া যাবে।'

'প্রভু, হাতিও এমন নির্যাতন সহ্য করতে পারবে না, কিন্তু তবু তো মুখ খুলছে না সে।'

'যারা মৃত্যুকে জয় করে। তারা যে কোন কষ্টকে জয় করতে পারে। এজন্যেই আহমদ শাহ আলমগীরের মা-বোনকে প্রয়োজন ছিল। এদের কাবু করতে হলে মানিসক আঘাত প্রয়োজন। তার সামনে যদি তার মা-বোনের গায়ে হাত পড়ত, তাহলে সে বাপ বাপ করে এসে পায়ে পড়ত।'

'প্রভু, তার মা-বোন সম্পর্কে নতুন কোন খবর পাওয়া গেছে?'

'এখনও নয়। তবে বিভেন বার্গম্যান ওরফে আহমদ মুসা পোর্ট ব্লেয়ারে আসছে। মনে করি আহমদ শাহ আলমগীরের মা-বোনরা পোর্ট ব্লেয়ারেই রয়েছে। তাদের খুঁজে বের করতেই হবে।'

'বিভেন বার্গম্যান কি আহমদ মুসা? কি করে জানা গেল?' বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে বলল কৃষ্ণদাস।

'হাজী আবদুল্লাহ আলীর বাসা ও হোটেলের টেলিফোন মনিটর করে। সে মনিটর থেকেই প্রথম জানতে পারি বিভেন বার্গম্যান আসলে আহমদ মুসা। পরে হাজী আবদুল্লাহকে কিডন্যাপকারী মোসাদ গোয়েন্দারাও জানায় এ কথা। এ খবর জানার পর আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে, কেন তার সাথে আমরা পেরে উঠছি না। ইসরাইলী ও পশ্চিমী গোয়েন্দারা যার কাছে অব্যাহতভাবে নাকানি চোবানী খাচ্ছে, তাকে আমরা এঁটে উঠব কি করে!' বলল মহামুনি সংঘমিত্র।

তখন কৃষ্ণদাসের চোখের ছানাবড়া ভাব কাটেনি। বলল উদ্বিগ্ন কণ্ঠে, 'প্রভু, দুশ্চিন্তা বেড়ে গেল।'

‘হ্যাঁ। কিন্তু আমরা তার সাথে লড়াইয়ে নামব না। আমরা তাকে পেলেই খুন করব। আর আমাদের টার্গেট বাক্স। বাক্স পেলেই হয়ে গেল। আর আমি নির্দেশ দিয়েছি, নিপাত প্রোগ্রাম বন্ধ রাখতে। এখন প্রথম কাজ আহমদ মুসাকে খুন করা, দ্বিতীয় বাক্স উদ্ধার করা। এদিকে সমস্যা দেখা দিয়েছে বিভেন বার্গম্যান ওরফে আহমদ মুসাকে নিয়েই।’

‘কি সমস্যা প্রভু।’ কৃষ্ণদাসের চোখে বিস্ময়।

‘হাজী আবদুল্লাহ আলীর বাসার টেলিফোন মনিটর থেকে জানতে পেরেছি, মার্কিন রাষ্ট্রদূত আন্দামানে বেড়াতে এসে বিভেন বার্গম্যানের খোঁজ করেছিরেন। তিনি একথা হাজী আবদুল্লাহ আলীর স্ত্রী সাথেও বলেছেন। আমাকেও তিনি বলেছেন বার্গম্যানের কথা। আবার নয়াদিল্লীতে ফিরেও টেলিফোন করে আন্দামান সরকারকে বিভেন বার্গম্যানের নিরাপত্তার প্রতি নজর রাখতে বলেন। সুতরাং খুব কৌশলে তাকে ড্রিল করতে হবে, যাতে সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে।’

‘তাহলে সিআইএ’র লোক নয় তো সে?’ বলল কৃষ্ণদাস।

‘না তা নয়। সিআইএ’র লোক হলে ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থা ‘মোসাদ’ এর নাম্বার ওয়ান গোয়েন্দা ক্রিষ্টোফার কোলম্যান কোহেনকে সে মারতো না।’

‘তা ঠিক। তাহলে?’

‘সে কে আমাদের জানার দরকার নেই। তাকে কৌশলে সরাতে হবে যাতে কোনওভাবে সরকার কিংবা ‘মহাসংঘ’ -এর সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ না থাকে।’

‘ধন্যবাদ প্রভু, ঠিক বলেছেন।’

বলে একটু থেমেই আবার মুখ খুলল, ‘এখন আমরা কি করব। শয়তানটি তো মুখ খুলছে না।’

‘বললাম তো, তার মা-বোনকে খুঁজে বের করতে হবে। এটা সম্ভব না হলে বিকল্প পথ খুঁজতে হবে। দেখতে হবে আন্দামানে তার আর কোন প্রিয়জন আছে কিনা।’

‘এমন কেউ কি তার আছে আন্দামানে?’

হঠাৎ করেই মহামুনি শিবদাস সংঘ মিত্রের মুখটা মলিন হয়ে উঠল। বলল, ‘এ প্রসঙ্গ এখন থাক। আমি এখন উঠব। তুমি যাও। হাজী আবদুল্লাহ আলীর বাসার উপর নজর রাখার ক্ষেত্রে যেন শৈথিল্য না আসে। বিভেন বার্গম্যান পোর্ট ব্লেয়ারে থাকলে অবশ্যই হাজী আবদুল্লাহর স্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করবেই, বাড়িতে কিংবা অন্য কোথাও। ওদের টেলিফোনও মনিটর করা হচ্ছে।’

বলে উঠে দাঁড়াল মহামুনি সংঘমিত্র।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল কৃষ্ণদাস তিলকও।

# ২

পোর্ট ব্লেয়র জুড়ে নিñিদ্র নজরদারী চলছে, নগরে যারা প্রবেশ করছে এবং যারা বের হচ্ছে তাদের প্রত্যেককেই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তাছাড়া নগরীর প্রতিটি বাড়ির বাসিন্দাদের পরিচয় যাচাই করা হচ্ছে। নগরীর উপকূল, সবগুলোর সব এন্ট্রি পয়েন্ট, বিমান বন্দরকে সার্বক্ষণিক নজরদারীর আওতায় আনা হয়েছে।

এই ব্যবস্থা প্রশাসনিক নির্দেশে করা হয়েছে। জনগণের অবগতির জন্যে বলা হয়েছে, এটা রুটিন সতর্কতা ও চেকআপের মহড়া। জনগণের উদ্বেগের কোন কারণ নেই। তারা সব সময়ের স্বাভাবিক চলাফেরা, কাজ-কর্ম করে যাবেন।

নজরদারী ও চেকআপের কাজে পুলিশের পাশাপাশি রয়েছে ব্যাজ পরা রাষ্ট্রীয় স্বেচ্ছাসেবক। আসলে এরা স্বেচ্ছাসেবক নয়, এরা সকলে ‘মহাসংঘ’ ও শিবাজী সন্তান সেনা (সেসশি) এর সদস্য। নজরদারী ও চেকআপে এরাই আসল, পুলিশ সাইনবোর্ড মাত্র।

মহাসংঘ ও ‘সেসশি’ আহমদ মুসা আন্দামানে এসেছে এটা জেনে ফেরার পর মহাআলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে পর্দার অন্তরালে। মূল ভূখ-ের মুম্বাই ও উত্তর প্রদেশে যথাক্রমে ‘সেসশি’ ও মহাসংঘ-এর হেডকোয়ার্টার এক পায়ে দাঁড়িয়ে গেছে আন্দামানে আহমদ মুসার আসার কথা শুনে। ভারতে বাবরী মসজিদ ভাঙা, আসামের নেলী, বোম্বাই; গুজরাটে সংখ্যালঘু নিধনের মত সংখ্যালঘু নির্মূলের রাজনীতি যারা করে, তারা ক্রোধে ফেটে পড়েছে। সেই সাথে মজলুম উদ্ধারে, অন্যায়ের প্রতিকারে আহমদ মুসার অনন্য রেকর্ডের কথা তারা জানে বলে তারা আতংকও বোধ করছে। মনে করছে, আইসবার্গের নিচে জাতিগত হিংসা, বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতার যে ডুবো পাহাড় তারা লুকিয়ে রেখেছে, সেটাকে আহমদ মুসা দিনের আলোতে এনে ফেলতে পারে। এই ভয়, আতংক, ক্রোধ থেকে এবং মহাগুরু শংকরাচার্য ও স্বামী স্বরূপানন্দের মত লোকদের মহাজ্বালা সামনে রেখে তারা আন্দামানের গোপন সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের নেতা মহামুনি শিবদাস

সংঘমিত্রের উদ্দেশ্যে নির্দেশ জারি করেছে, আহমদ মুসা আর একদিনও যাতে জীবিত থাকতে না পারে। আন্দামানে এটাই তাদের এখন একমাত্র কাজ।

পোর্ট ব্লেয়ার ছাড়াও উত্তরে 'নর্থ প্যাসেজ আইল্যান্ড' থেকে পোর্ট ব্লেয়ারের দক্ষিণে ডান কান প্যাসেজ পর্যন্ত মধ্য ও দক্ষিণ আন্দামানের দুই উপকূলকেও সার্বক্ষণিক সতর্ক পাহারার মধ্যে রাখা হয়েছে।

ভাইপার দ্বীপের সামরিক অবজারভেটরি।

একটা নাইট ভিশন দূরবিনে চোখ রেখে বসেছিল জয়রাম রাঠোর। তার দুরবিনের চোখ ঘুরছে নর্থ প্যাসেজ দ্বীপের দক্ষিণে 'কী' আইল্যান্ড ও রিসেজ দ্বীপপুঞ্জের মধ্যবর্তী গোটা উপকূল রেখায়।

জয়রাম রাঠোর 'মহাসংঘ'-এর একজন অপারেশন প্রধান। গভর্নরের বিশেষ নির্দেশে বিশেষ জুরী অবস্থায় সামরিক অবজারভেটরিতে সামরিক লোকদের সাথে সেও কাজ করছে। সামরিক লোকরা ধরে নিয়েছে জয়রাম রাঠোর কেন্দ্রীয় বিভাগের কেউ হবেন।

তার সহযোগী হিসেবে তার পাশেই বসেছিল এখানকার সেনা ইউনিটের একজন ক্যাপ্টেন। সে এক সময় জয়রাম রাঠোরকে লক্ষ্য করে বলল, 'স্যার, আমরা যান সন্ধান করছি, সে অনুপ্রবেশকারী লোকটি কে?'

'একজন ইন্টারন্যাশনাল টেররিষ্ট।' বলল জয়রাম রাঠোর।

'নাম জানা গেছে?'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না জয়রাম রাঠোর। দ্বিধাগ্রস্ত ভাব ফুটে উঠেছে তার চোখে-মুখে। অবশেষে নাম সে বলল না। বলল, 'টেররিষ্টদের নামের ঠিক নেই। যেখানে যেমন ইচ্ছা তেমন নাম নেয়। যেই হোক, সে একজন মুসলিম টেররিষ্ট।'

'একটা কথা স্যার, মুসলমানরা হঠাৎ এমন টেররিষ্ট হয়ে উঠল কেন?'

'তার মানে মুসলমানরা আগে টেররিষ্ট ছিল না বলতে চাও?'

'আমি বলতে চাই না স্যার। ইতিহাস বলে। সে কথাই আমি বলছি।'

‘ইতিহাস কি বলে, শুনি।’

‘স্যার গত বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের পর দু’টি আন্দোলনকে আমরা খুব বেগবান হতে দেখি। একটা হল কম্যুনিজমের বিস্তার, অন্যটি মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রাম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অর্থাৎ ১৯৪৫ সালের পর মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রাম যেমন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে, তেমনি কম্যুনিজমের বিস্তারও এ সময় সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হয়। ১৯৭০ সালের মধ্যে প্রায় সবগুলো মুসলিম দেশ স্বাধীন হয়ে পড়ে। এই দুই সমান্তরাল আন্দোলনের মধ্যে কম্যুনিজমের রাজ্য গঠন ও রাজ্য বিস্তার ছিল হিংসা, সন্ত্রাস ও ষড়যন্ত্র নির্ভর। আর মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল জনগণের শক্তি, সুবিচার ও যুক্তিনির্ভর। স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানরা সীমাহীন নির্যাতনের শিকার হয়েছে, কিন্তু এরপরও তারা কম্যুনিষ্টদের মত ষড়যন্ত্র ও সন্ত্রাসের পথ বেছে নেয়নি। ভারতের কথাই ধরুন স্যার। এখানে মুসলমানদের আযাদী আন্দোলনের নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এতটাই নিয়মতান্ত্রিক ছিলেন যে, জীবনে একবারও তাঁকে জেলে যেতে হয়নি। তারপর দেখুন স্যার, বঙ্গভঙ্গ রহিত করার জন্য আমরা হিন্দুরা বিক্ষুব্ধ হয়ে আবেগের বশে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন করেছি, বোমা মেরেছি, কিন্তু মুসলমানরা বঙ্গভঙ্গের পক্ষে এবং বঙ্গভঙ্গ রহিত করার বিপক্ষে কোন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন করেনি, বোমাও হাতে তুলে নেয়নি।’

দীর্ঘ বক্তব্য দিয়ে থামল ক্যাপ্টেন শশাংক সিংঘাল।

জয়রাম রাঠোরের মুখে-চোখে একটা বিরক্তি ভাব ফুটে উঠেছিল। ক্যাপ্টেন শশাংক সিংঘাল থামতেই জয়রাম রাঠোর বলল, ‘তুমি বোধ হয় ইতিহাসের ছাত্র ছিলে?’

‘জি স্যার।’

‘কোথায় তুমি লেখাপড়া করেছ, আলীগড়ে?’

‘না স্যার। অনার্স, মাষ্টার্স দু’টোই আমি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে করেছি।’

'ভালো করেছ। তবে তুমি সামরিক বাহিনীতে না এসে বিনোদাভাবে কিংবা রামমোহনের মত কোন সর্বোদয় নেতা হওয়া উচিত ছিল তোমার। থাক, তুমি তোমার প্রশ্নের উত্তর চাও?'

'জি স্যার।'

'তত্ত্ব কথা শুনতে নাকি নগ্ন সত্যটা জানতে চাও?'

'সত্য জানতে চাই স্যার।'

'মুসলমানরা সীমাহীন সম্পদের মালিক এক বদ্ধ বোকার মত। ওদের কাছে এমন এক পরশ পাথর আছে যা গোটা দুনিয়াকে ওদের জন্যে সোনায় পরিণত করে দিতে পারে। কিন্তু এ কথাটা ঐ বোকারা জানে না। ওরা এটা জানা এবং ব্যবহার করার আগেই ওদের হাত-পা ভেঙে ওদের চলৎশক্তি রহিত করা প্রয়োজন। এই কাজই এখন চলছে।' বলল জয়রাম রাঠোর।

'বুঝলাম না স্যার। মুসলমানদের টেররিষ্ট হওয়া এবং তাদের হাত-পা ভেঙে চলৎশক্তিহীন করা- এ দুয়ের মধ্যে কি সম্পর্ক?'

'কল্পনা করো ভোটের কোন এক প্রার্থীর কথা। ভীষণ জনপ্রিয়। মানুষ তাকে দারুণ ভালোবাসে। সে সকলের ভোট পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই সময় যদি প্রমাণ হয়ে যায় যে, সে কোটি টাকা আত্মসাতকারী, কোটি টাকার কালোবাজারী। তখন তার অবস্থা কি দাঁড়ায়? হাত-পা ভাঙ্গা চলৎশক্তিহীন মানুষের মত হয়ে যায় না? প্রকৃত অর্থে মানুষের কাছে তার মৃত্যু ঘটে যায় কি না? মুসলমানরা টেররিষ্ট বলে চিহ্নিত হবার পর তাদের এই অবস্থাই হয়ে গেছে।'

'কিন্তু আমার প্রশ্ন ছিল, মুসলমানরা হঠাৎ এভাবে টেররিষ্ট হল কি করে?'

'কারণটা তো বলেছি। উদাহরণও দিয়েছি। এ থেকেই বুঝে নেয়া উচিত ছিল। আরও খোলাসা শুনতে চাও?'

'জি স্যার।'

'মুসলমানদের টেররিষ্ট বানানো হয়েছে। পুঁজি করা হয়েছে তাদের অসন্তোষকে। এ লক্ষ্যেই তাদের অসন্তোষকে বাড়ানো হয়েছে, কমানোর বা তাদের সমস্যা সমাধানের কোন চেষ্টা করা হয়নি। মুসলমানদের দু'টি সমস্যা ছিল খুব বড়। একটা ফিলিস্তিন, অন্যটা কাশ্মীর। জাতিসংঘের মাধ্যমে বহু আগেই

এ সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। কিন্তু তা করতে দেয়া হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট ও রাশিয়া দুই পরাশক্তি দুই পক্ষ নিয়ে সমস্যা দুটিকে ঝুলিয়ে রাখে প্রায় ৪০ বছর। ফিলিস্তিন সমস্যা নিয়ে ইসরাইল ও আরবদের মধ্যে এবং কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে তিনটি করে বড় বড় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। জীবন ও সম্পদের সীমাহীন ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়নি। এই অবস্থায় জাতিসংঘের ব্যর্থতার পটভুমিতেই নব্বই দশকের আগে ও এর শুরু থেকে ফিলিস্তিন ও কাশ্মীরের বাসিন্দারা স্বাধীনতার জন্যে গেরিলা লড়াই শুরু করে। গোটা নব্বই এর দশক ধরে এ লড়াই চলে। পরাশক্তি হিসেবে রাশিয়ার পতন ঘটার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র পশ্চিমী শক্তির একক নেতৃত্বে এই সমস্যার সমাধান হলো না। এই অব্যাহত অবিচার, মুসলিম দেশসমূহে নিজেদের আদর্শ ও অধিকারের চেতনা অবলম্বন করে মুসলিম যুব শক্তির উত্থান, ইসলামের নামে ইরানে বিপ্লব এবং আফগানিস্তানে মুসলিম সমর শক্তির বিজয় শুধু মুসলিম বিশ্বে নয়, গোটা দুনিয়ায় মুসলমানদের মধ্যে নতুন জাগরণের জোয়ার সৃষ্টি করে। এই জাগরণের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট ও তার মিত্ররা এক নতুন শক্তির উত্থান প্রত্যক্ষ করল। নতুন শক্তির এই উত্থানকে অংকুরেই শেষ করে দেবার জন্যে একটা বড় অজুহাত বা উপলক্ষের প্রয়োজন ছিল। ‘সন্ত্রাস’কে তারা এই উপলক্ষ হিসেবে বাছাই করল। আফগানিস্তানে গেরিলা যুদ্ধে বিজয়ী, কাশ্মীর ও ফিলিস্তিনে গেরিলাযুদ্ধরত এবং যুগ-যুগান্তের অবিচার পীড়িত মারমুখী হয়ে ওঠা মুসলমানদের উপর ‘সন্ত্রাসী’ হওয়ার দোষ চাপানো খুব সহজ ছিল। মুসলমানদের উপর সন্ত্রাসের দায় চাপানোর জন্যেই নিউইয়র্কে টুইন টাওয়ার ধ্বংসের সন্ত্রাসী কর্মকা- অভিনীত হল। যেহেতু তাকফিরুল হিজরা, আল-জিহাদ ও হিজবুল্লাহর মত ক্ষুদ্র কয়েকটা গোষ্ঠী ছাড়া মুসলিম বিশ্বের সব ইসলামী দলই গণতান্ত্রিক। তারা সন্ত্রাস-ষড়যন্ত্র পছন্দ করে না। তাই আল-কায়েদা নামে একটা ইসলামী দল ও লাদেন নামে একটা ইসলামী ব্যক্তিত্বকে খাড়া করা হয় এবং টুইন টাওয়ার ধ্বংসের দায় এদের ঘাড়ে চাপানো হল। তাদের আশ্রয় দেয়ার অপরাধে আফগানিস্তান ধ্বংস করা হল। শুরু হয়ে গেল সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। মুসলমানদের বানানো হল এই যুদ্ধের প্রতিপক্ষ, অন্য কথায় সন্ত্রাসী।

দীর্ঘ বক্তব্য দিয়ে থামল জয়রাম রাঠোর।

'ধন্যবাদ স্যার। বুঝতে পেরেছি সব। কিন্তু স্যার আমরা যার সন্ধান করছি, সে কি সত্যিই টেররিষ্ট, না বানিয়ে বলা হচ্ছে?' বলল ক্যাপ্টেন শশাংক সিংঘাল।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না জয়রাম রাঠোর। তার মুখে একটা অস্পষ্ট হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'তুমি সত্য জানতে চাও, না যা বলা উচিত তা জানতে চাও?'

'সত্য জানতে চাই স্যার।'

'সত্য জানতে চাইলে এখন উত্তর পাবে না। এখন আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে আছি। যাকে আমরা বধ করব, তার সম্পর্কে ভালো চিন্তা বা ভালো কথার এখন সময় নয়।'

'তাহলে অর্থ দাঁড়ায় স্যার, সে ভালো কেউ?'

জয়রাম রাঠোর চোখ পাকিয়ে ক্যাপ্টেন শশাংকের কথার উত্তর দিতে যাচ্ছিল, সে সময় তার মোবাইল বেজে উঠল।

মোবাইল তুলে নিয়ে স্ক্রীনের দিকে চেয়েই এ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে সোজা হয়ে চেয়ারে বসল। বলল, 'স্যার, স্যার........।'

ওপারের কথা শুনল। শুনে শশব্যস্তে বলল, 'স্যার, নিশ্চিন্ত থাকুন স্যার। আমাদের চোখ এড়িয়ে সে পোর্ট ব্লেয়ারে প্রবেশ করতে পারবে না। পশ্চিম উপকূলের স্পাইক আইল্যান্ড থেকে আমাদের লোক চোখ রেখেছে নর্থ প্যাসেজ সাউথ প্যাসেজসহ পশ্চিম উপকূলের দিকে। স্যার, পশ্চিম উপকূলে বাড়তি ব্যবস্থা হিসেবে আছে হারতাবাদের পশ্চিম উপকূলে আমাদের আরেকজন লোক। নেইল আইল্যান্ডে আমরা আরেকজনকে রেখেছি পূর্ব উপকূলে বাড়তি সতর্কতার জন্য। সাউথ আন্দামানের দু'পাশের গোটা উপকূলই আমাদের নজরে স্যার।'

থামল জয়রাম রাঠোর। ওপারের কথা শুনল। উত্তরে বলল, 'না স্যার ভুল হবে না। তার চেহারা আমাদের মুখস্থ। চিনতে পারলেই গুলী, কোন কথা নয় স্যার।'

কথা শেষ করে ওপারের কথা শুনে ধন্যবাদ দিয়ে মোবাইল রেখে দিল জয়রাম রাঠোর।

‘কার টেলিফোন ছিল স্যার?’ উৎফুল্ল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ক্যাপ্টেন শশাংক সিংঘাল।

‘কার আবার...।’ কথা শেষ না করেই থেমে গেল জয়রাম রাঠোর। নিজেকে সামলে নিয়েই বলে উঠল, ‘উনি ছিলেন গভর্নর বিবি মাধব।’

বলেই দূরবিনের দিকে আবার মনোযোগ দিল। বলল ক্যাপ্টেন শশাংককে লক্ষ্য করে, ‘দেখ দুরবিনে ভালোভাবে চোখ রাখ।’

তার কথা শেষ হবার আগেই তার মোবাইল বেজে উঠল।

মোবাইল তুলে নিয়ে তাকাল স্ক্রীনের দিকে। দেখল স্ক্রীনে বিপিন বাজওয়ার নাম ভেসে উঠেছে।

বিপিন বাজওয়া নেইল আইল্যান্ডের পর্যবেক্ষণ টাওয়ার থেকে নজর রাখছে উপকূলসহ পোর্ট ব্লেয়ারের সামনের আন্দামান সাগরের উপর।

জয়রাম খুশি হল মোবাইল স্ক্রীনে বাজওয়ার নাম দেখে। বলল, ‘কি খবর বাজওয়া?’

‘বড় ঘটনা ঘটে গেছে।’ বলল বাজওয়া। উত্তেজিত তার কণ্ঠস্বর।

‘কি ঘটনা?’

‘এক বিস্ফোরণে আহমদ মুসার বোট ধ্বংস হয়েছে। আহমদ মুসাও।’

‘কোথায়? কি ঘটনা?’

‘আমাদের নেইল আইল্যান্ড থেকে প্রায় ৬০ কিলোমিটার দক্ষিণে। বলা যায় ৯৩ ডিগ্রী অক্ষাংশের উপর আমাদের বোট দ্বারা ঘেরাও অবস্থায় আহমদ মুসার বোটে বিস্ফোরণ ঘটেছে।’

‘ঘটনাটা কি?’

‘আহমদ মুসার বোটটি যখন পশ্চিম উপকূলের স্পাইক আইল্যান্ডের উত্তর দিয়ে ‘নর্থ প্যাসেজে’ প্রবেশ করেছিল পূর্ব উপকূলে আসার জন্যে তখন স্পাইক আইল্যান্ডের আমাদের পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র তা দেখতে পায। বোটের আলো নিভানো ছিল, ইঞ্জিন ছিল সাইলেন্সার যুক্ত। বোটের চালক ছিল একমাত্র আরোহী। একটা কৌণিক অবস্থানের কারণে ‘নাইট ভিশন’ দুরবিনেও তাকে চেনা সম্ভব হয়নি। সন্দেহ হওয়ায় স্পাকি দ্বীপ থেকে একটা বোট তার পিছু নেয়।

সন্দেহযুক্ত বোটটি 'নর্থ প্যাসেজ' পার হয়ে রিসেজ দ্বীপপুঞ্জ ঘুরে বারেন দ্বীপকে বাঁয়ে রেখে দক্ষিণ দিকে চলতে শুরু করে। দক্ষিণগামী কোন বোট পাগলের মত এতটা পথ কখনও ঘোরে না। এতে সন্দেহ আরও বাড়ে। রিসেজ দ্বীপপুঞ্জের 'আউট রাম' দ্বীপের পর্যবেক্ষণ নৌকেন্দ্র থেকে আরও দুটি বোট তার পিছু নেয়। পোর্ট ব্লেয়ার বরাবর এসে রহস্যজনক বোটটি তার গতি পরিবর্তন করে সোজা পশ্চিম দিকে চলতে শুরু করে। সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়। নিশ্চিত বোঝা যায় বোটটির লক্ষ্য পোর্ট ব্লেয়ার। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা ওরা আমাদেরও জানায়। আমরা 'নেইল আইল্যান্ড' থেকে আরও তিনটি বোট নিয়ে সামনে থেকে এগোলাম। আমাদের তিনটি এবং পেছন থেকে তিনটি মোট ৬টি বোট রহস্যজনক বোটটিকে ঘেরাও করে ফেললাম। তখনও বোটের চালক লোকটিকে সরাসরি দেখা যায়নি। আমাদের লক্ষ্য ছিল রহস্যজনক বোটটিকে আটকানো। আমরা বোটের আলো নিভিয়ে তার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম। আমাদের নাইট ভিশন দূরবিনেই সে প্রথম ধরা পড়ল। আমরা চিনতে পারলাম সে আহমদ মুসা। সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের বোট থেকে সব বোটকে এলার্ট করা হল। ঘিরে ফেলা হল বোটটিকে। সেও আমাদের দেখে ফেলেছে। তার বোটের স্পীড সাংঘাতিক বেড়ে গেল। তীর বেগে সে এগোল পোর্ট ব্লেয়ারের দিকে। একদম বেপরোয়া। মনে হল সামনে অন্য বোট পড়ে গেলে তার উপর দিয়েই সে সামনে এগোবে। উপায় না দেখে তাকে থামাবার জন্য চারদিক থেকে মেশিনগানের গোলা বর্ষণ শুরু করলাম। আমাদের ব্যারিকেড ভাঙতে পারলেও শেষ রক্ষা করতে সে পারল না। সম্ভবত ফুয়েল ট্যাংকারে বিস্ফোরণ ঘটে টুকরো টুকরো হয়ে গেল বোটটি। তার সাথে সাথে ছাই হয়ে গেছে আহমদ মুসাও।'

বিপিন বাজওয়ার দীর্ঘ বিবৃতি শেষ হল।

আনন্দ-বিস্ময়ে জয়রাম কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না। তারপর বলল চিৎকার করে, 'ধন্যবাদ বাজওয়া তোমাদের সকলকে। আমাদের মহামুনি মানে স্যার কি জেনেছেন?'

'এইমাত্র তো ঘটনা ঘটেছে। তাঁর সবগুলো ফোন ব্যস্ত পেয়ে আপনাকেই প্রথম টেলিফোন করলাম।'

‘ঠিক আছে, আমি জানিয়ে দিচ্ছি। তোমরা এখন কোথায়?’

‘আমরা এখন বিস্ফোরণ ক্ষেত্রেই। আপনাদের হুকুমের অপেক্ষা করছি।’

‘ঠিক আছে। আমি তাহলে মহামুনি স্যারের সাথে কথা বলে নেই। তারপর জানাচ্ছি।’

কথা শেষ করেই ‘বাই’ বলে দ্রুত লাইনটা কেটে দিল।

জয়রাম রাঠোর দ্রুত টেলিফোন করল মহামুনি শিবদাস সংঘমিত্র ওরফে গভর্নর বিবি মাধবকে।

গভর্নর বিবি মাধব টেলিফোন ধরেই বলল, ‘তোমাদের ধন্যবাদ জয়রাম। খবর আমরা পেয়েছি। খবর শুধু এটা নয় জয়রাম, এটা মহাখবর। পৃথিবীর অধিশ্বররা যা পারেনি, তোমরা তাই করে দেখালে। সুতরাং আমরাই পৃথিবীর অধিশ্বর হব, এটা প্রমাণ হল।’

‘অবশ্যই মহামুনি গুরুদেব। আমাদের ‘মহাসংঘ’ অবশ্যই দুনিয়াতে মহাকীর্তি রেখে যাবে।’

‘আগে বিশ্বের কথা নয় জয়রাম। নর-দেবতা শিবাজী মহাপ্রভুর আমৃত্যু সংগ্রামের যে স্বপ্ন, যা মহাকবি রবীন্দ্রনাথ তার ‘এক ধর্মরাজ্য পাশে খ- ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি’ কবিতাংশে অপরূপভাবে প্রকাশ করেছেন, তার আশু বাস্তবায়ন আমাদের কাজ।

‘তথাস্তু মহামুনি মহাগুরু। আমার জন্যে আর কিছু নির্দেশ?’

‘কাল সকালে পুলিশ যাওয়া পর্যন্ত ওদের সেখানে অপেক্ষা করতে বল। কিছু আলামত পেলে তা ওরা সংগ্রহ করতে পারবে।’

‘তথাস্তু মহামুনি মহাগুরু!’

ওপার থেকে লাইন কেটে দেয়া হয়েছে।

জয়রাম রাঠোর মোবাইল রেখে দিল।

ক্যাপ্টেন শশাংক বোবা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েছিল জয়রাম রাঠোরের দিকে।

জয়রাম টেলিফোন রাখতেই ক্যাপ্টেন শশাংক বলল, 'কার সাথে কথা বললেন স্যার? আমরা যার সন্ধান করছি, বোটসহ তার ধ্বংস হওয়ার খবর দেয়ার কথা বলে টেলিফোন করলেন। কিন্তু খবর তো দিলেন না।'

হাসল জয়রাম রাঠোর। বলল, 'উনি আগেই খবর পেয়েছেন। তার খবর পাওয়ার লাইন বহু।'

'কে তিনি স্যার? 'মহাসংঘ', 'মহাকীর্তি', 'মহামুনি', 'মহাগুরু' এসব কথার কিছুই বুঝলাম না স্যার।

'এসব শব্দ থেকেই বুঝেছ, যার সাথে আমি কথা বলেছি, তিনি একজন অসাধারণ ব্যক্তি। সাধারণ্যে তার কথা বলা যায় না।'

'স্যার দেশ আমাদের গণতন্ত্রের। এখানে আইনের দৃষ্টিতে সাধারণ-অসাধারণ নেই, এখানে অস্বচ্ছতার কোন দেয়াল নেই।'

'কেতাবের কথা রাখ। কেতাবের কথা দিয়ে শাসন চলে, দেশ চলে, কিন্তু জাতি বাঁচে না।'

'দেশ ও জাতিকে আপনি আলাদা করে দেখছেন?'

'দেশের নাম, সীমার পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু জাতির জীবন পথ অপরিবর্তনশীল। সুতরাং একটু পার্থক্য তো হতেই পারে।'

'একটি গনতান্ত্রিক দেশে 'জাতীয় জীবন পথ' বা 'জাতীয় স্বার্থ', যদি মেজরিটির স্বার্থ হয়, তাহলে সেটাও গণতন্ত্রের অধীন। গণতন্ত্রের অধীন হলে সেটা আইনানুগ হবে এবং তাতে স্বচ্ছতা থাকবে। সুতরাং 'জাতীয় জীবন পথ' বা 'জাতীয় স্বার্থ' তো আলাদা হচ্ছে না।'

'আলাদা হলেই তা আইনানুগ হবে না, তাতে স্বচ্ছতা থাকবে না সেটা নয়। কিন্তু জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার অন্তবর্তীকালীন একটা সময়ে প্রতিষ্ঠিত আইন ভাঙতে হয়, স্বচ্ছতাও রাখা যায় না। যেমন স্বাধীনতা সংগ্রাম। জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজও জাতির স্বাধীনতা সংগ্রাম। সেই সংগ্রাম চলছে। সে সংগ্রামে নেই বলে তুমি অনেক কিছু বুঝতে পারছো না।'

‘কিন্তু দেশ তো আমাদের স্বাধীন। আইন ও সংবিধানের বাইরে তো কোন সংগ্রাম চলতে পারে না। এ সংগ্রাম আসলে কি চায় স্যার।’ ক্যাপ্টেন শশাংকের চোখে সন্দেহ ও গভীর অনুসন্ধিৎসা।

‘ঐ তো বললাম শিবাজী যে জন্যে সংগ্রাম করেছেন, রবীন্দ্রনাথ যে কথা কবিতায় প্রকাশ করেছেন খ- ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে এক সাথে বেঁধে ‘এক ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা’।

‘কিন্তু এই ধরনের সংগ্রাম তো ভারত রাষ্ট্রের স্বাধীনতা চেতনা ও সংবিধান দু’য়েরই বিরোধী। তাছাড়া আমাদের হিন্দু ধর্ম তো কিছু পুরা কাহিনীর সমষ্টি মাত্র। এ দিয়ে আজ কোন ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। হলে সেটা হবে ধর্মের নামে স্বৈরতন্ত্র, ঠিক যেমন ছিল মধ্যযুগে ইউরোপের যাজক-রাষ্ট্র-তন্ত্র।’

চরম বিরক্তিভাব ফুটে উঠেছিল জয়রাম রাঠোরের চোখে-মুখে। বলল, ‘এই কিছুক্ষণ আগে তুমি মুসলিম রাষ্ট্রের কথা বলেছ, তাহলে ‘হিন্দু রাষ্ট্র’ হবে না কেন?’

‘আমি মুসলিম রাষ্ট্রের কথা বলিনি। মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা বলেছি। তবে যদি ধরে নেই মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রাম মুসলিম রাষ্ট্রের জন্যে, যেমন ভারত ভাগ হয়েছে পৃথক ‘মুসলিম রাষ্ট্রের’ দাবীতে। তবু এখানে কথা আছে, মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থে তাদের রাষ্ট্রনীতি আছে যা সাংঘাতিকভাবে আধুনিক। সুতরাং মুসলিম রাষ্ট্র হতে পারে। কিন্তু আমাদের সে সুযোগ নেই। মাফ করবেন রাজা দশরথ (রামচন্দ্রের পিতা) ও রামচন্দ্র যে রাজ্য পরিচালনা করেছেন তা নিজস্ব ধর্মচিন্তার ভিত্তিতে, ধর্মগ্রন্থের সুনির্দিষ্ট বিধানবলীর ভিত্তিতে নয়। সুতরাং মানব রচিত নয় এমন ‘সোর্স অব ল’ আমাদের নেই, যা মুসলমানদের আছে বলে তারা দাবী করে।’

‘তোমার এসব তত্ত্ব কথা রাখ ক্যাপ্টেন। তত্ত্বের চেয়ে বাস্তবতা বড়। বাস্তবতা বহুদূর এগিয়ে গেছে। তোমার চোখ নেই তাই দেখতে পাচ্ছ না। ডুবো পাহাড় দেখেছ? নিশ্চয় দেখার কথা। ‘মহাসংঘ’ আজ ডুবো পাহাড়ের রুপ নিয়েছে। কিছুই দেখছো না তুমি। কিন্তু দেশ নামক সমুদ্রের সবটা জুড়ে রয়েছে ডুবো পাহাড়।’

‘কিছুই বুঝতে পারছি না স্যার। যা বলছেন তা কি ঠিক?’

‘অবশ্যই।’

‘কিন্তু স্যার আমার মনে হচ্ছে আমাদের পুরা কাহিনীর মতই এ এক কল্প কথা।’

‘অল্প বুদ্ধি ভয়ংকর ক্যাপ্টেন। জেনারেল হও তারপর বুঝবে আমি যা বলছি তার অর্থ।’ বলল জয়রাম রাঠোর অনেকটা বিদ্রুপের কণ্ঠে।

কথা শেষ করেই মুহূর্তকাল থেমে আবার বলা শুরু করল, ‘থাক এসব কথা। এস এখনকার করণীয় বিষয়ে আলাপ করি।’

‘করণীয় আর কি স্যার। মিশন আমাদের সফল। এখন ব্যারাক এবাউট টার্ন।’

‘না। কাল পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছা পর্যন্ত যার যে জায়গা সেখানে থাকতে হবে।’

‘তথাস্তু স্যার।’

‘শব্দটি শেখার জন্যে ধন্যবাদ।’

গভর্নর হাউজের খাস বৈঠকখানা।

গভর্নর বিবি মাধব একটা সোফায় বসে। তার সামনে আরেক সোফায় আরও দু’জন লোক বসে।

কথা বলছিল বিবি মাধব, ‘হ্যাঁ, আমাদের সামনে থেকে প্রধান বাধা, প্রধান শত্রু আহমদ মুসা শেষ হয়েছে। কিন্তু আমাদের আসল কাজ একটুকুও এগোয়নি। আহমদ শাহ আলমগীর মুখ খোলেনি। সে মুখ না খুললে বাক্স পাওয়া যাবে না। বাক্স না পাওয়া গেলে আমাদের জন্য শিবাজী মহাপ্রভুর রেখে যাওয়া মহাভারত গঠনের নীলনকশা আমরা পাব না এবং মোগলদের গোপন ধনভা-রও আমরা হাত করতে পারবো না। দুটোই আমরা চাই, একটা জাতির জীবন হিসেবে, আরেকটা জাতির সমৃদ্ধির জন্যে।’ থামল বিবি মাধব।

তার সামনের সোফায় বসে থাকা দুজনের একজনের চেহারা ভারতীয়, অন্যজন বিদেশী, সেমেটিক চেহারা।

বিবি মাধব থামতেই ভারতীয় চেহারার লোকটি বলে উঠল, 'এটা খুবই আশ্চর্যের যে, এতদিনে সবকিছু করেও একজন লোকের কাছ থেকে কথা আদায় করা গেল না। অবিশ্বাস্য ঘটনা।'

'অবিশ্বাসের কিছু নয় জেনারেল স্বামীজী। যে মৃত্যু চায়, কোন নির্যাতন, কোন ভয় তাকে বাধ্য করতে পারে না।'

জেনারেল স্বামীজীর পুরোনাম জেনারেল জগজিৎ জয়রাম। দু'বছর আগে তিনি ভারতীয় সেনা প্রধানের দায়িত্ব থেকে অবসর নিয়েছেন। অবসর নেয়ার পরেই তিনি 'শিবাজী সন্তান সেনার সদস্য হয়েছেন। আজ তিনি 'মহাসংঘ' এর একজন মহাগুরুত্বপূর্ণ নেতা। তার নাম আজ জেনারেল স্বামী জগজিৎ জয়রাম মহাগুরু। মহাগুরু স্বামী শংকরাচার্য শিরোমনি গ্রীনভ্যালি অপারেশনে নিহত হলে তার দায়িত্ব নিতে মহারাষ্ট্র থেকে এসেছেন। তিনি আন্দামানে 'মহাসংঘ' এর দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে কাজ করছেন।

বিবি মাধব থামলে জেনারেল স্বামীজি বলে উঠল, 'তাহলে উপায় কি?'

'উপায় তার মানসিক প্রতিরোধ ভেঙ্গে দেয়া। এ ধরনের আদর্শবাদীদের দৈহিক কষ্ট দিয়ে তাদের মানসিক প্রতিরোধ ভাঙ্গা যায় না। আহমদ শাহ আলমগীরের মা-বোনের ইজ্জত আহমদ শাহ আলমগীরের মত লোকদের কাছে নিজ জীবনের চেয়ে লক্ষগুণ বেশি মূল্যবান।' জেনারেল স্বামীজির কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কথা বলল বিদেশী চেহারার লোকটি।

বিদেশী চেহারার লোকটির নাম দানিয়েল ডেভিড। ইসরাইলী গোয়েন্দা কর্মকর্তা সে। ইসরাইলের সেরা চৌকষ গোয়েন্দা কোলম্যান কোহেন আহমদ মুসার হাতে নিহত হবার পর তার স্থানে কাজকরতে এসেছে দানিয়েল ডেভিড।

দানিয়েল ডেভিড থামতেই বিবি মাধব বলল, 'ওদের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। আহমদ মুসা ওদের উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছিল উত্তর আন্দামানের গ্রীনভ্যালিতে। আহমদ মুসা সেখান থেকে চলে আসার পর এবং বিস্ফোরণে বোটসহ আহমদ মুসা ধ্বংস হবার পর কয়েকবার আমরা গ্রীনভ্যালিতে গোপনে

খবর নিয়েছি সেখানে আহমদ শাহ্ আলমগীরের মা-বোনরা নেই। আহমদ মুসাই তাদেরকে সরায় অথবা পরে তারা সরে যায়। তাদেরকে চারদিকে খোঁজা হচ্ছে। কিন্তু তারা কোথায় এ সম্পর্কে কোন ক্লু আমরা এখনও পাইনি।'

থামল বিবি মাধব।

'তাহলে উপায় কি? তাদের খোঁজ পাওয়ার উপরই নির্ভর করছে আমাদের লক্ষ অর্জন।' বলল জেনারেল স্বামীজি।

সোফায় হেলান দিয়ে ছিল বিবি মাধব।

জেনারেল স্বামীজি থামলেও বিবি মাধব সঙ্গে সঙ্গে কথা বলল না। তার চোখে-মুখে গভীর চিন্তার ছাপ।

দানিয়েল ডেভিডের মুখেও কোন কথা ছিল না।

এক সময় বিবি মাধব সোজা হয়ে সোফায় বসল। বলল, 'হ্যাঁ, আর কোন উপায় না দেখে আমি একটা উপায় বের করেছি। নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রা ভঙ্গ করার মত।'

'সেটা কি?' উদগ্রীব জেনারেল স্বামিজী জিজ্ঞাসা করল।

'সেটা বলার জন্যে আমি আজ আপনাদের ডেকেছি।'

এটুকু বলে মুহূর্তের জন্যে থামল বিবি মাধব। পরক্ষণেই শুরু করল আবার, 'আজ সকালে আমার মেয়ে আমার স্ত্রীর সাথে মন্দির থেকে আসার পথে কিডন্যাপ হয়েছে। কিডন্যাপ হয়েছে মানে আমি কিডন্যাপ করিয়েছি।' থামল বিবি মাধব।

জেনারেল স্বামিজী ও দানিয়েল ডেভিড দু'জনেরই মুখ হা হয়ে গেছে বিস্ময়ে। তাদের মুখে কোন কথা নেই। তাদের বিস্ফোরিত চোখ গভর্নর বিবি মাধবের উপর নিবদ্ধ।

শুরু করল বিবি মাধব আবার, 'আহমদ শাহ্ আলমগীরের কাছ থেকে কথা আদায়ের শেষ, নিরাপদ ও অব্যর্থ ব্যবস্থা হিসেবে আমরা এটা করেছি।'

গলাটা পরিষ্কার করার জন্যে একটু থেমেছিল। সেই সুযোগে দানিয়েল ডেভিড বলে উঠল, 'আপনার মেয়ের কিডন্যাপ হওয়ার সাথে আহমদ শাহ

আলমগীরের কাছ থেকে কথা আদায়ের কি সম্পর্ক রয়েছে! আমরা তো কিছুই বুঝতে পারছি না।’

‘আছে। আপনারা একটা বিষয় জানেন যে, আমার মেয়ে ও আহমদ শাহ আলমগীর এক সাথে পড়তো। আহমদ শাহ আলমগীর ভালোবাসে আমার মেয়ে সুষমাকে। আমরা সুষমাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে চাই, আহমদ শাহ আলমগীরের কাছ থেকে কথা আদায়ের জন্যে।’

‘কিভাবে?’ বলল দানিয়েল ডেভিড।

‘আহমদ শাহ আলমগীরের সামনে একটা নাটক করা হবে। তার কাছ থেকে যা জানতে চাওয়া হচ্ছে তা না বললে তার প্রেমিকা ধর্ষিতা হচ্ছে, এই হবে সে নাটক। আমার বিশ্বাস আহমদ শাহ আলমগীরের মা-বোনকে ব্যবহার করে যে ফল পাওয়া যেত, এক্ষেত্রেও সে ফল পাওয়া যাবে।’ বিবি মাধব বলল।

‘কিন্তু আপনার মেয়ে এবং আহমদ শাহ আলমগীর দুজনেই এটা ধরে ফেলতে পারবে। তাদের এত দিনে জেনে ফেলা স্বাভাবিক যে, আপনি বা আপনার সরকার আহমদ শাহ আলমগীরের আটক করার পেছনে রয়েছে।’ বলল জেনারেল স্বামিজী।

‘আহমদ শাহ আলমগীর এ ব্যাপারে কিছুই জানে না। আমার মেয়েও নয়। সে কোনওভাবে সন্দেহ করলেও কিডন্যাপ হওয়ার পর নিশ্চিত হবে যে, তার পিতা কিংবা পিতার সরকার আহমদ শাহের কিডন্যাপের সাথে নেই।’

‘কিন্তু কিডন্যাপ, মানে কিডন্যাপ নাটকের যে কোন পর্যায়ে তার কাছে প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে যে, তার পিতা বা পিতার সরকার তাকে একটা রক্তাক্ত নাটকের উপকরণে পরিণত করেছে। তখন সব পরিকল্পনা প- হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া আপনার মেয়ে সব কথা প্রকাশ করে সমস্যা বাড়াতে পারে, আমি ভয় করছি।’ বলল দানিয়েল ডেভিড।

‘সেটা আমি চিন্তা করেছি মি. ডেভিড। চারজন চৌকশ মহিলা গোয়েন্দা সুষমাকে পাহারা দিয়ে রাখবে। অধিকাংশ সময় তাকে রাখবে ঘুম পাড়িয়ে। প্রয়োজনীয় কয়েকটা কথার বাইরে কেউ একটা কথাও তার সাথে বলবে না।

মহাসংঘের সুরক্ষিত অফিসগুলোতেই তাকে রাখা হবে। সুতরাং আপনি যে আশঙ্কা করছেন তার কোনই সম্ভাবনা নেই।' বিবি মাধব বলল।

'কিন্তু মহামুনি স্যার, আহমদ শাহ আলমগীর যদি মুখ না খোলে। মুখ খোলার জন্যে ধর্ষনের নাটকও শুরু করতে হতে পারে। তারপরও যদি মুখ না খোলে। নাটককে যদি শেষ পর্যায় পর্যন্ত নিতে হয়?' বলল জেনারেল স্বামীজি।

হঠাৎ মলিন হয়ে উঠল বিবি মাধবের মুখ। কিন্তু মুহূর্তেই তা মিলিয়ে গেল। শক্ত হয়ে উঠল তার মুখ। তার মুখের পেশীগুলো যেন শক্ত পাথরের রূপ নিল। বলল, 'আহমদ শাহ আলমগীরের কাছ থেকে বাঞ্ছিত তথ্য আদায়ের জন্যে যে কোন পর্যায় পর্যন্ত আমি যাব। মেয়েকেও আমি কুরবানী দেব।'

একটু থামল বিবি মাধব। তার মুখটি সহজ হয়ে এল। বলল, 'তবে আমি মনে করি, সে পর্যন্ত যেতে হবে না। তার আগেই কথা তার কাছ থেকে পাওয়া যাবে।'

'ধন্যবাদ 'মহামুনি স্যার' আপনাকে। আপনার এই ত্যাগের মনোভাব জাতির জন্যে একটা মহান দৃষ্টান্ত এবং আমাদের জন্য একটি অফুরন্ত প্রেরণা। কিন্তু স্যার, আহমদ শাহ আলমগীর যদি বিষয়টা আসলেই না জানে, তাহলে বলবে কি করে? সে ক্ষেত্রে আমাদের তো দু'কুলই যাবে।' বলল জেনারেল স্বামীজী।

'এমন ভাবার কোন অবকাশ নেই। আহমদ শাহ আলমগীরের বাপ বেঁচে নেই। সুতরাং তাকে এটা জানতেই হবে। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে তার কাছে তথ্যটা থাকবেই। সেসব কথা বললেই আমরা সেটা বুঝতে পারব।'

'ধন্যবাদ। ঠিক বলেছেন, মহামুনি স্যার।' জেনারেল স্বামীজী বলল।

'বাই দি বাই। দি গ্রেট শিবাজীর সেই দলিলে কি আছে, আপনারা সেটা কি জানেন?' বলল দানিয়েল ডেভিড।

'মহাপ্রভু শিবাজী দলিলটি প্রনয়ের পর দ্বিতীয় যে ব্যক্তি এটা দেখেছেন, তিনি তার পুত্র শম্ভুজী। শিবাজী মহাপ্রভু ও শম্ভুজীর ডাইরি থেকে দলিল সম্পর্কে কিছু জানা গেছে। শিবাজী মহাপ্রভু তার ডাইরীর এক জায়গায় লিখেছেন, 'বাইশ বছর বয়সকালে ১৫৭১ সালের বৈশাখ শুক্লা নবমী বৃহস্পতিবার মহারাষ্ট্রের এক

পাহাড়ে স্বর্গীয় পুরুষ গুরু রামদাস স্বামীর কাছে পরমার্থতত্ত্ব সম্পর্কে দীক্ষা লাভের পর দিব্যজ্ঞান লাভ হল। তাতে দেখলাম, আমি যে রাজ্য ফেলে পাহাড়ে এসেছিলাম, সে রাজ্য আসমুদ্র হিমাচল এবং সমগ্র দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াব্যাপী বিস্তৃত হয়ে মায়ের পবিত্র রূপ নিয়ে শুধু আমাকে নয় আমার পেছনে দাঁড়ানো আর্য সন্তানদের ডাকছে। সে দিব্যজ্ঞানের নির্দেশেই সেই পাহাড়ে বসে মা-রূপী সে সা¤্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও প্রশাসনের জন্যে একটা দলিল রচনা করলাম। তারপর রাজ্যে ফিরে এসে রাজপাটে বসে 'মহাভারত' এর সংগ্রাম শুরু করলাম।' তাঁর ডাইরীর সর্বশেষ বাক্য হিসেবে লিখেছেন, 'মহাপবিত্র' দলিলটির মহাগুরুভার আমি পুত্র শম্ভুজীকে অর্পণ করে গেলাম।' আর শম্ভুজী তার ডাইরীর এক জায়গায় লিখেছেন, 'বাপুজীর মহাপবিত্র দলিলটি আমি সবচেয়ে নিরাপদ জায়গায় রেখেও রক্ষা করতে পারলাম না। মোগল স¤্রাট আলমগীর আওরঙ্গজেব আমার মত দলিলটিকেও বন্দী করে দিল্লী নিয়ে যাচ্ছে।' দলিলটি সম্বন্ধে শম্ভুজীর ডাইরীতে আর কিছু পাওয়া যায়নি। আর শিবাজী মহাপ্রভু দলিলের বিষয় সম্পর্কে যেটুকু বলেছেন, তার চেয়ে বেশি জানা যায়নি।' থামল বিবি মাধব।

আবেগে ভারী হয়ে উঠেছিল তার কণ্ঠ।

গম্ভীর হয়ে উঠেছিল দানিয়েল ডেভিডের মুখও বলল, 'বুঝলাম, দলিলটা আমাদের 'টেন কমান্ডমেন্ট' এর মতই আপনাদের কাছে মূল্যবান। অবশ্য আমাদের 'টেন কমান্ডমেন্টটা ডিভাইন।'

একটু থামল দানিয়েল ডেভিড। একটা ঢোক গিলে সঙ্গে সঙ্গেই সে আবার বলে উঠল, 'একটা সা¤্রাজ্যের সীমা সেন্ট শিবাজী এঁকেছেন তার ডাইরীর ঐ বক্তব্যে। তাঁর দলিলেও নিশ্চয় এটা আরও তিনি সুনির্দিষ্ট করেছেন। ষোড়শ শতকের এই চিন্তাকে আপনারা এখন বাস্তব মনে করেন?'

'শুধু বাস্তব নয়, আমরা একে 'ধ্রুব' মনে করি। আমরা সর্বশক্তি দিয়ে এর জন্যেই কাজ করছি। আমাদের মহাসংঘের এই একটাই লক্ষ্য। এর জন্যে যা করা দরকার, তা আমরা করব। আমার জীবন তুল্য সন্তান আমার মেয়েকে এই লক্ষ্যেই

বলি দিতে রাজি হয়েছি।’ বলল বিবি মাধব। আবেগে প্রায় রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল তার কণ্ঠ।

‘স্যার, আপনাদের উদ্দেশ্যের প্রতি আমার আন্তরিক সম্মান। কিন্তু এতবড় উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন আপনাদের সংবিধান ও সরকার ব্যবস্থার সহায়তা ছাড়া কিভাবে হতে পারে, আমি বুঝতে পারছি না। আপনাদের সংবিধান ধর্মনিরপেক্ষ এবং আপনাদের সরকারকে সে সংবিধানকেই মান্য করতে হবে। আপনারা তাহলে কিভাবে শিবাজীর মানে আর্য সন্তানদের ‘মহাভারত’ গঠন করবেন?’ দানিয়েল ডেভিড বলল।

‘সংবিধান, সরকার সবই জনতার জন্যে এবং জনতার দ্বারা। সুতরাং জনতা সবকিছু পরিবর্তন করে যা চায়।’ বলল বিবি মাধব।

‘কিন্তু আপনাদের সমর্থিত দল তো জনতার সমর্থনে ক্ষমতায় গিয়েছিল, তারা তো কোন পরিবর্তনই আনতে পারেনি।’ দানিয়েল ডেভিড বলল।

‘কমপক্ষে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় যেতে হবে। সে সুযোগ আমাদের এখনও হয়নি। তাছাড়া প্রস্তুত হওয়ার কাজ আমাদের শেষ হয়নি।’ বলল বিবি মাধব।

‘কি প্রস্তুতি?’ দানিয়েল ডেভিড বলল।

‘মহাসংঘের কাজ এখনও সব জায়গায় পৌছেনি। শিবাজী মহাপ্রভুর ‘দলিল’ এখনও আমাদের হাতে আসেনি। ওটাই তো আমাদের মূল পাথেয় এবং ওটা আমাদের বাস্তবায়নের বিষয়ও।’ বলল বিবি মাধব।

‘তাহলে তো দেখা যাচ্ছে আপনারা যা চান, যা করবেন, তা এখনও নির্দিষ্ট নয় আপনাদের কাছে।’ দানিয়েল ডেভিড বলল।

‘এ কথা ঠিক নয়। রামচন্দ্রের মহাভারত আমাদের সামনে আছে। আমরা যা করব, আমরা তা জানি। শিবাজী মহাপ্রভুর নির্দেশনা সেটাকে আরও সুনির্দিষ্ট ও পূর্নাঙ্গ করবে মাত্র।’ বলল বিবি মাধব।

‘বুঝেছি। ধন্যবাদ।’

‘ওয়েল কাম মি. দানিয়েল ডেভিড।’

কথা শেষ করেই উঠে দাঁড়াল বিবি মাধব। বলল, ‘আপনারা বসুন। আরও কিছু কথা আছে। আমি ছোট্ট একটা কাজ সেরে আসছি।’

ড্রইংরুম থেকে দ্রুত বেরিয়ে বিবি মাধব তার রেসিডেন্ট অফিসের দিকে ছুটল।

জ্ঞান ফিরে আসার সাথে সাথে সুষমা রাও চোখ খুলেই এক ঝটকায় উঠে বসল। দেখতে পেল একটু দূরে ঘরের ঠিক মাঝখানে চারজন মুখোশধারী মহিলা মেঝেতে বসে চাদর পেতে তাস খেলছে। তাদের প্রত্যেকের পাশে একটি করে রিভলবার।

মনে পড়ল সুষমা রাওয়ের, সে মন্দির থেকে মায়ের সাথে তাদের বাড়ির দিকে আসছিল। মন্দিরটা তাদের বাড়ির পাশেই এবং তা তাদের গভর্নর হাউজের নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যেই। বাড়ি ও মন্দিরের মাঝামাঝি জায়গায় তারা আসতেই একটা মাইক্রো তীর বেগে এসে তাদের পাশে দাঁড়ায়। মাইক্রো থেকে মুখোশধারী কয়েকজন নেমে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। একজন তার মুখে একটি রুমাল চেপে ধরে, অন্যেরা তাকে চ্যাংদোলা করে তুলে নেয় মাইক্রোতে। রুমাল থেকে একটা মিষ্টি গন্ধ তার নাকে প্রবেশ করে। তারপর আর কিছু মনে নেই।

আতংকের এক প্রবল চাপ নামে তার মনের উপর। শাহ বানুরা যেভাবে কিডন্যাপ হয়েছিল, তাহলে সেও ঐভাবে কিডন্যাপ হয়েছে। শরীল ও মন তার থর থর করে কেঁপে ওঠে। চারজন মুখোশধারী মেয়ের দিকে তাকিয়ে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল, ‘কে আপনারা? আমাকে কেন ধরে এনেছেন?’

তারপর হাত-পায়ের বাঁধনের দিকে চেয়ে কান্না জড়িতকণ্ঠে বলল, ‘আমি কি অপরাধ করেছি?’

চারজন মুখোশধারীর কেউ কোন কথা বলল না। ফিরেও তাকাল না তার দিকে।

‘কেন কি করেছি আমি, ছেড়ে দাও আমাকে?’ কান্নার সাথে বলল সে।

এবার মুখোশধারীদের একজন পাশে রাখা রিভলবার তুলে নিয়ে তার দিকে ঘুরল। হাত উঠাল উপরে। তর্জনি তার রিভলবারের ট্রিগারে। চাপল সে ট্রিগার। একটা গুলী বেরিয়ে সুষমা রাওয়ের চুল ছুঁয়ে গিয়ে বিদ্ধ করল পেছনের দেয়ালকে।

বুক ফাটা আতংকে সুষমা রাওয়ের চোখ দু'টি বিস্ফোরিত হয়েছিল। মাথার উপর দিয়ে গুলী চলে গেলেও বেঁচে যাওয়ার কোন স্বস্তি তার চোখে মুখে ফুটে উঠল না। বুঝল সে, এরা পাখির মত মানুষও মারতে পারে। এবার গুলী তার চুল ছুঁয়ে গেছে পরের গুলী হয়তো মাথা ভেদ করে যাবে। কারা এই নিষ্ঠুররা? যারা শাহ বানুদের কিডন্যাপ করেছিল, যারা আহমদ শাহ আলমগীরকে কিডন্যাপ করেছে, যারা ডজন ডজন মানুষকে আন্দামানে খুন করেছে, তারাই কি এরা? কিন্তু তারা আমার জন্যে মেয়ে প্রহরী দিয়েছে কেন? মেয়ের জন্যে মেয়ে প্রহরী এমন নীতিবোধ তো তাদের থাকার কথা নয়? আসলে এরা কারা?

এই সময় ঘরের একটা মাত্র দরজা নিঃশব্দে খুলে গেল। ঘরে প্রবেশ করল বিশাল বপু একজন মহিলা। তার পেছনে সৈনিকের পোশাকধারী একজন পুরুষ। দুজনেরই মুখে মুখোশ। মহিলার হাতে রিভলবার, আর সৈনিকের হাতে ষ্টেনগান।

সুষমা বুঝল সৈনিক লোকটি পদস্থ মহিলাটির গার্ড।

'কি ঘটনা, গুলী কেন?' ঘরে ঢুকেই বলল মহিলাটি।

ভেতরের চারজন মহিলা বিশাল বপু মহিলাটি ঘরে ঢুকতেই তাকে দু'হাত তুলে নমষ্কার করেছিল। তার প্রশ্নের উত্তরে একজন বলল, 'মহা মাতাজী, মেয়েটি কান্না জুড়ে দিয়েছিল। থামিয়ে দেবার জন্যে ওই ব্যবস্থা করেছি আমরা।'

'গুড।' বলল বিশাল বপু মহিলাটিই।

'ধন্যবাদ, মহামাতাজী।' সেই মেয়েটিই বলল।

'তবে দেখ, এখনই গুলীটা যেন মাথায় ঢুকে না যায়। তার ডার্লিং এর কাছ থেকে যদি কথা আদায় করে দিতে পারে, তাহলে দুজনেরই মুক্তি। আর কথা আদায় করে দিতে না পারলে তাকে মরার আগেই মরতে হবে। তারপর এক সময় আসল মরণ।' বলল বিশাল বপু মহিলাটি।

বিশাল বপু মেয়েটির কথা শুনে কৌতুহল ও আশা জাগল সুষমা রাওয়ের মনে। বলল, 'আমার ডার্লিং, কে সে ম্যাডাম?' বিশাল বপু মেয়েটিকে লক্ষ্য করে বলল সুষমা রাও।

'কেন আহমদ শাহ আলমগীর? সে তোমার প্রেমিক নয়?'

সুষমা রাও মহিলাটির প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল, 'তার কাছ থেকে কি কথা আদায় করতে হবে?'

'একটি বাক্সের কথা। বাক্সটি তার বাসায় কোথাও লুকানো আছে। আমরা বাক্সটি চাই।' বলল বিশাল বপু লোকটি।

'বাক্সের জন্যেই কি তাকে ধরেছেন?' সুষমা রাও বলল।

'হ্যাঁ, তাই।'

'ওঁদের বাড়িতে তো এখন কেউ নেই। বাক্সটি আপনারা খুঁজে নিতে পারেন।'

'আমরা আগেই খুঁজেছি। না পেয়েই তো তাকে ধরা হয়েছে।'

'বাক্সের কথা উনি তোমাদের বলছেন না?'

'বলছে না। সে মানুষ নয়, একটা পাথর। এত আঘাতে পাথরও ভেঙে যেত, কিন্তু তাকে মুখ খোলানো যায়নি।'

মুহূর্তেই মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল সুষমা রাওয়ের। বেদনার এক প্লাবন নামল তার চোখে-মুখে। ছল ছলিয়ে উঠল তার দুচোখ। এক অসহনীয় যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ল বুক থেকে সর্বত্র।

একটু সময় নিয়ে বলল, 'বাক্সটি কি এমন গুরুত্বপূর্ণ যে এজন্যে তাকে কিডন্যাপ করেছেন, নির্যাতন করছেন?'

'ওর মধ্যে আমাদের প্রাণ আছে। ও বাক্সটা আমাদের।'

'বাক্সটা আপনাদের হলে উনি দেবেন না কেন?'

'সেটাই তো আমাদের কথা। দেবে না কেন?' সে মরতে রাজি, কিন্তু বাক্সের ব্যাপারে মুখ খুলতে রাজি নয়।'

মুখ মলিন হয়ে গেল সুষমা রাওয়ের। মরতে রাজি, কিন্তু বাক্স দিতে রাজি নয়। তাহলে কি বাক্সটি তাদের জন্যেও মূল্যবান? বাক্সটি কি.........।'

সুষমা রাওয়ের ভাবনায় ছেদ পড়ল মহিলাটির কথায়। সে বলছে, ‘বাক্সটি তুমি আমাদের আদায় করে দাও। এজন্যে আমরা তোমাকে এনেছি।’

‘যদি এমনই হয় যে, তিনি মরতে রাজি বাক্স দিতে রাজি নয়, তাহলে আমার কথায় তা তিনি অবশ্যই দেবেন না।’

‘সে তোমাকে ভালোবাসে।’

‘যদি তাই হয়, তিনি যা চান না, আমি সেটার জন্যে চাপ দেব কেন? আর অন্যায় কথা তিনি শুনবেন কেন? আর ভালোবাসলেই যে সব কথা শুনতে হবে, মানতে হবে, তা স্বাভাবিক নয়।’

‘হ্যাঁ, ওটা স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা অস্বাভাবিকটা চাচ্ছি। তুমি অবশ্যই তাকে বলবে, তাকে শুনতেও হবে এবং সে শুনবেই।’

বিস্ময় নামল সুষমা রাওয়ের চোখে-মুখে। বলল, ‘শুনবেই, এ কথা কেমন করে বলছেন ম্যাডাম?’

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না মহিলাটি। সে হো হো করে হেসে উঠল। কিন্তু সেটা যেন হাসি নয়, একটা বিকৃত চিৎকার। তার চোখে-মুখে লালসার বন্যা।

তার চিৎকার ও চেহারা দেখে আঁৎকে উঠল সুষমা রাও।

বিশাল বপু মহিলাটি একটু সময় নিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, ‘সে চোখের সামনে তার সুন্দরী প্রেমিকা ধর্ষিতা হচ্ছে এটা দেখতে চাইবে না। সুতরাং কোন অসুর পুরুষ তোমার দেহের কাপড় টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে নেকড়ে যেমন শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সেভাবে তোমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, তখন তার মুখ থেকে বাক্সের কথা সুড় সুড় করে বেরিয়ে আসবে।’

মহিলাটির কথা শেষ না হতেই থর থর করে কেঁপে উঠেছে সুষমা রাওয়ের দেহ। সে বুঝতে পারল ওরা কি ষড়যন্ত্র করেছে! ভয় ও আতংকে কুঁকড়ে গেল সুষমা রাওয়ের দেহ।

আবার হেসে উঠল মহিলাটি। কুৎসিত হাসি। বলল, ‘এখনই কুঁকড়ে অর্ধেক হয়ে গেছ! তখন কেমন হবে অবস্থা! আর তোমার সে অবস্থা দেখে কি অবস্থা হবে তোমার প্রেমিকের!’

কোন কথা বলল না সুষমা রাও। চোখ বন্ধ করেছে সে। তার মনে হচ্ছে সে এক গহীন জঙ্গলে। চারদিক থেকে তাকে ছিঁড়ে খাবার জন্যে নেকড়েরা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় মনে পড়ল তার আহমদ মুসার কথা। তিনি কি জানতে পারবেন তার কিডন্যাপ হওয়ার কথা! আর.......।

সুষমা রাওয়ের ভাবনা ছিড়ে গেল আবার বিশাল বপু মহিলাটির অট্টহাসিতে।

হাসতে হাসতে বিজয়ীর ভঙ্গিতে সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। সুষমার দেহটা লুটিয়ে পড়ল খাটিয়ার উপর।

# ৩

উপকূলের শক্ত পাথরটাতে মাথা রেখে অবসন্ন দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে মরার মত পড়ে থাকল আহমদ মুসা।

শরীরে তার একফোটা শক্তিও যেন অবশিষ্ট নেই।

কিন্তু মাথা তার সক্রিয়।

উপকূলের স্পর্শ পেয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল আহমদ মুসা।

তার বোট ঘেরাও হয়ে পড়েছে, শেষ মুহূর্তে টের পায় আহমদ মুসা। শেষ রাতের নিরব সমুদ্র দিয়ে নিশ্চিন্তে বোট চালিয়ে আসছিল সে। তার চোখে নাইট ভিশন গগলস ছিল, কিন্তু তা ছিল খুবই স্বল্প পাল্লার। টের পেয়েই ওদের ঘেরাও থেকে বের হবার জন্যে আহমদ মুসা বোটের সবটুকু স্পীড ব্যবহার করেছিল। বোটটি লাফিয়ে উঠে তীরের মত চলতে শুরু করেছিল। ঠিক তখনি চারদিক থেকে গুলী এসে তাকে ঘিরে ধরে। পরিণতি বুঝতে পারে আহমদ মুসা। 'টিউব মেরিন আর্মার' সে পরেই ছিল।

'টিউব মেরিন আর্মার' সর্বাধুনিক একটি আবিষ্কার। এটা ওয়াটার প্রুফ, এয়ার প্রুফ একটা টিউব। এর সাথে একটা ইঞ্জিন যুক্ত আছে এবং আছে একটা মিনি অক্সিজেন ট্যাংক। ইঞ্জিন চালু করলে টর্পেডো টিউবের মতই টিউবটি প্রচ-গতিশীল হয়ে যায়। মিনি ট্যাংকের অক্সিজেনে একজনের পাঁচ ঘণ্টা পর্যন্ত চলতে পারে। অতএব এই টিউবে আশ্রয় নিয়ে একজন মানুষ সাগরের তলদেশ দিয়ে পাঁচ ঘণ্টা পর্যন্ত চলতে পারে।

গুলী বৃষ্টির মধ্যে মাথা নিচু করে দুপা এগিয়ে ঝুপ করে নেমে পড়ে পানিতে।

কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না। একটা গুলী এসে তার বাহুকে বিদ্ধ করে। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ওঠে গোটা শরীর আহমদ মুসার। এরপরও সে এদিকে তার

মনোযোগ দেবার সময় পায় না। দ্রুত ভার্টিকাল ডাউন বোতাম টিপে পানির গভীরে নেমে যায়।

এ সময় আহমদ মুসা খেয়াল করে বুলেটের আঘাতে তৈরি ফুটো দিয়ে চিকন ধারায় হলেও তীর বেগে পানি প্রবেশ করছে টিউবে।

আঁৎকে ওঠে আহমদ মুসা। পানি যতই প্রবেশ করবে, অক্সিজেনের ক্ষেত্র ততই সংকুচিত হয়ে পড়বে। এক সময় পানি ভর্তি হয়ে যাবে টিউব, তার সাথে সাথেই টিউবটা অক্সিজেন শূন্য হয়ে পড়বে। তার মানে তখন আর পানির তলায় থাকতে পারবে না টিউবটা।

আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি প্যারালাল ফরোয়ার্ড বোতাম টিপে কম্পাসের নির্দেশ মত সোজা পশ্চিমে সেট করে টিউব সাব-মেরিনের মাথা। তীর বেগে ছুটতে শুরু করে টিউবটি। অক্সিজেন শেষ হবার আগেই আহমদ মুসাকে অবরোধ জোন ও গুলীর রেঞ্জ থেকে দূরে সরে যেতে হবে।

টিউবটি পানিতে প্রায় পূর্ণ। আহমদ মুসা বোতাম টিপে টিউবের মাথা ৪০ ডিগ্রী আপওয়ার্ড ঘুরিয়ে নেয়, তারপর কয়েক মুহূর্ত। আহমদ মুসা উঠে আসে পানির সারফেসে।

টিউব থেকে বেরিয়ে আসে আহমদ মুসা। বাম হাতটা নড়াতে গিয়ে যন্ত্রণায় কঁকিয়ে ওঠে আহমদ মুসা।

গুলীটা বাহুর পেশি ছিঁড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেছে, না পেশির মধ্যে ঢুকে আছে তা বোঝার উপায় নেই। সাগরের লোনা পানির জন্যেই বোধ হয় যন্ত্রণাটা অনেক বেশি।

টিউব থেকে বেরিয়েই আহমদ মুসা পেছনের ঘটনাস্থলের দিকে তাকিয়েছিল। দেখল সবগুলো বোটে আলো জ্বলে উঠেছে। আলোগুলো ছুটোছুটি করছে এবং আলোর ফ্লাশ চষে ফিরছে ঐ এলাকার সাগরের বুক। তাকেই খুঁজছে বুঝল আহমদ মুসা।

দৃষ্টি ফেরায় আহমদ মুসা সামনের দিকে।

পশ্চিম দিগন্তে ক্ষীণ আলোর একটা রেখা দেখা যায়। কতদূরে হবে উপকূল? বিশ থেকে তিরিশ মাইলের মত দূরে হবে, ভাবে আহমদ মুসা।

লাইফ-জ্যাকেটে ভেসেছিল আহমদ মুসা। সাঁতরাতে শুরু করে বাঁ হাত তুলতে গিয়ে আবারও অন্তর্ভেদী খোঁচা খায় সে। যন্ত্রণায় ঝিমঝিম করে উঠল তার গোটা শরীর।

বাঁ হাত ব্যবহার করা গেল না।

চিৎ হয়ে দুপা ও ডান হাত দিয়ে সাঁতরে ধীরে ধীরে এগোতে থাকে আহমদ মুসা।

গুলীর ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে তখনও।

শরীরটাকে টেনে নিয়ে এগোনো কঠিন হয়ে পড়ছিল। ফাঁপা জ্যাকেট বাধার সৃষ্টি করছিল বেশি।

দু'পায়ে পানি ঠেলে এবং অবশিষ্ট এক হাত দিয়ে পানি টেনে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোয় আহমদ মুসা উপকূলের দিকে।

অব্যাহতভাবে এই চলা।

থামার কোন অবকাশ নেই। যে কোন মূল্যে রাতের অন্ধকার শেষ হবার আগেই তাকে উপকূলে পৌছাতে হবে।

দুর্বল হয়ে পড়েছিল আহমদ মুসা। তবু সর্বশক্তি দিয়ে দু'পা ও এক হাতকে আরও সক্রিয় করতে হয় তাকে।

দুঃসাধ্য এই প্রচেষ্টা।

যখন উপকূলে পৌছে, তখন দূর্বলতা ও ক্লান্তিতে সংজ্ঞা হারাবার মত অবস্থা আহমদ মুসার। লাইফ-জ্যাকেট না থাকলে অনেক আগেই ডুবে যেত সে। দেহকে ভাসিয়ে রাখার শক্তি তার ছিল না।

পাথরে মাথা রেখে অনেকক্ষণ অসাড় হয়ে পড়ে থাকার পর শক্তি যেন কিছুটা ফিরে পেল আহমদ মুসা। মাথার চিন্তাও ফিরে আসে পেছন থেকে বর্তমানে। ভাবনা এল মাথায়, অন্ধকার আরও ফিকে হবার আগেই তাকে সরে পড়তে হবে। পুব আকাশ সাদা হয়ে উঠেছে। ধীরে ধীরে সুবহে সাদেকের স্বচ্ছতা নেমে আসছে।

আহমদ মুসা আস্তে আস্তে উঠে বসল। চারদিকে তাকাল।

দেখল, এখানকার উপকূলটা পাথর বাঁধানো। কিছুটা উপর থেকে সাজানো বাগানের মত। আর আহমদ মুসা বসে আছে একটা পাথুরে সিঁড়ির ধাপে। মাথা রাখার যে স্থানটাকে সে পাথর ভেবেছিল, সেটা পাথর বটে, কিন্তু সিঁড়ির একটা ধাপ।

সিঁড়ি বরাবর উপরে তাকাল আহমদ মুসা। সিঁড়ির শেষটা সে দেখতে পেল না। সিঁড়িটা খাড়া উঠে গিয়ে কিছুটা বেঁকে গেছে। সিঁড়ির শেষটা দেখা না গেলেও একটা মন্দিরের বিশাল চুড়া দেখতে পেল আহমদ মুসা। বুঝল, এটা একটা মন্দির এলাকা। সিঁড়িটা মন্দিরে উঠে গেছে। আহমদ মুসা চেষ্টা করেও ঠিক করতে পারলো না এটা পোর্ট ব্লেয়ারের কোন এলাকা। উত্তর অংশ অবশ্যই নয়, দক্ষিণ দিকের কোন স্থানে এটা হতে পারে। আবার ভাবল, সে লক্ষ্যচ্যুত হয়ে পোর্ট ব্লেয়ারের বিপরীত দিকে 'ব্লেয়ার চ্যানেল' এর উত্তর দিকের কোন জায়গায় এসে উঠেনিতো? ব্লেয়ার চ্যানেলের দক্ষিণ তীরে পোর্ট ব্লেয়ার। কিন্তু পরক্ষণেই আবার চিন্তা হলো, ব্লেয়ার চ্যানেলের উত্তর তীর খুবই খাড়া। সাগরের দিকটাও একই রকম খাড়া। সেখানে এমন সুন্দর জায়গা থাকতে পারে না। এটা যে পোর্ট ব্লেয়ার নিশ্চিত হল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল।

বিপর্যস্ত শরীরে কোমরের ভারী বেল্ট এবং পিঠের ট্যুরিষ্ট ব্যাগটাকে আরো ভারী বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু ও দুটি ফেলা যাবে না। ওয়াটার প্রুফ বেল্ট ও ব্যাগে অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস আছে। পদে পদেই দরকার হবে। শোল্ডার হোলষ্টারে তার প্রিয় রিভলবারটার স্পর্শও অনুভব করতে পারছে।

বাম হাত চেপে ধরে সে হাঁটতে শুরু করল।

গুলীতে সৃষ্ট ক্ষত থেকে রক্ত এখন বেরুচ্ছে না। কিন্তু ভিজা ক্ষত স্থানের জমাট রক্ত গলছে।

পানিতে ধুয়ে গেলেও বাম বাহু ও বাঁদিকের কাপড়-চোপড় অনেকটা রক্তাক্তই দেখাচ্ছে।

আহমদ মুসা কয়েক ধাপ উঠেছে।

হঠাৎ সিঁড়ির বাঁকের ওপার থেকে দুটি মেয়ের মাথা সে দেখতে পেল। ধীরে ধীরে তাদের গোটা দেহ তার নজরে এল।

দুটি মেয়ে নামছে সিঁড়ি দিয়ে। একজন তিরোশার্ধ, অন্যজন তরুণী।

দু'জনেরই কপালে ফোঁটা, কিন্তু একজনের সিঁথিতে সিঁদুর। তরুণীটির সিঁথিতে সিঁদুর নেই। তার হাতে পিতল রংয়ের একটা গোলাকার ট্রে মনে হচ্ছে।

নিশ্চয় ট্রেটিতে ফুল ও পুজার উপকরণ আছে, অনুমান করল আহমদ মুসা। সেই সাথে বাবল, মেয়ে দুটি নামছে সাগরে পূজার অর্ঘ দিতে।

মেয়ে দুটিও তাকে দেখে ফেলেছে।

আহমদ মুসা ক্ষণিকের জন্যে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু আবার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করল।

কিন্তু মেয়ে দুটি দাঁড়িয়ে গেছে।

প্রথমে তাদের চোখে ছিল সাধারণ কৌতুহল দৃষ্টি। এই রকম চিন্তা যে, এই সাত সকালে সিঁড়ি দিয়ে কে উঠে আসছে! এ কৌতুহল শীঘ্রই বিস্ময়ে পরিণত হল, যখন দেখল লোকটি পানি থেকে উঠে আসছে।

আরও কাছে এসে পড়েছে আহমদ মুসা।

এবার পরিপূর্ণভাবে ওদের নজরে পড়েছে আহমদ মুসা। আহমদ মুসার বাম বাহু আহত, রক্তাক্ত, তা দেখতে পেয়েছে ওরা। আহমদ মুসার পিঠের ব্যাগ দেখতে পেয়েছে তারা। আহমদ মুসার চেহারার বিদেশী ভাবও তাদের নজর এড়ায়নি।

তাদের বিস্ময় এবার উদ্বেগে রূপ নিয়েছে।

আহমদ মুসা খুবই স্বাভাবিকভাবে উপরে উঠেছিল। মেয়েরা কিছু না বললে আহমদ মুসা ওদের এড়িয়ে উঠে যাবে, এটাই ভেবে রেখেছে আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা আরও এগিয়ে এলে তরুণীটি বড় মেয়েটিকে লক্ষ্য করে বলল, 'আপা লোকটি আহত, মনে হয় কোন ট্যুরিষ্ট। কারো দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল কিংবা দুর্ঘটনায় পড়েছিল বোধ হয়।'

'তা হতে পারে। কিন্তু রেডিও ঘোষণা শুনেছিস? একজন বিদেশী সন্ত্রাসীকে সরকার খুঁজছে। সে এমনি......।'

পেছনে খড়মের দ্রুত ঠক ঠক শব্দ শুনে বড় মেয়েটি কথা বন্ধ করে পেছনে তাকাল। দেখল প্রধান পুরোহিত দ্রুত নামছে সিঁড়ি বেয়ে।

পুরোহিত যোগানন্দ যোগী কোন কারণে মন্দিরের এ দিকটায় এসে দেখতে পেয়েছে আহমদ মুসাকে। একটু ভালো করে দেখেই ছুটে আসছে।

যোগানন্দ যোগী 'মহাসংঘ' এর সদস্য।

আন্দামান সাগরে বোট সমেত আহমদ মুসা ধ্বংস হবার খবর সে শুনেছে। খুশিতে আপ্লুত হয়ে ইতিমধ্যেই সে এক প্রস্থ পূজা দিয়েছে। শক্তিরূপিনী, অশুর নাশিনী মা দূর্গাকে। কিন্তু এখন ভিজা, আহত আহমদ মুসাকে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসতে দেখেই তার কোন সন্দেহ রইল না যে, এই লোক সাগর থেকে উঠে আসছে। সেই সাথে তার দ্বিতীয় যে কথা মনে হল, তা হল সোজাসুজিই সাগরে বোট ধ্বংসের ঘটনা ঘটেছে, সুতরাং সাগর থেকে উঠে আসা লোক আহমদ মুসা হওয়াই স্বাভাবিক। সে সিঁড়ি ভেঙে দৌড়ে যতই আহমদ মুসার নিকটবর্তী হল, এই বিশ্বাস তার আরও দৃঢ় হল। মেয়ে দুটির পেছনে এসে আহমদ মুসার গুলীবিদ্ধ বাম বাহু দেখে তার আর কোন সন্দেহই রইল না।

সঙ্গে সঙ্গেই দুপায়ের খড়ম ফেলে দিয়ে সে হুংকার দিয়ে সামনে এগোল। কোমরে গুঁজে রাখা রিভলবার তার উঠে এসেছে হাতে।

আঁৎকে উঠে মেয়ে দুটি সিঁড়ির দু'পাশে সরে গেল।

যোগানন্দ যোগীর মনে পড়ছে তার উপর হুকুমের কথা, 'দেখামাত্র আহমদ মুসাকে হত্যা করতে হবে।'

রিভলবার তুলে নিয়েই যোগানন্দ যোগী চিৎকার করে উঠেছে, 'বিভেন বার্গম্যান ওরফে আহমদ মুসা তোমার আর রক্ষা নেই। সাগরে থেকে তুমি বেঁচে উঠেছ, কারণ ডাঙ্গায় তোমার মরণ লিখা ছিল।'

বলেই যোগানন্দ যোগী আহমদ মুসার দিকে তাক করা রিভলবারের ট্রিগার টিপে দিয়েছে।

যোগানন্দ যোগীকে হাতে রিভলবার তুলে নিতে দেখেই আহমদ মুসার হাত শোল্ডার হোলষ্টারে চলে গিয়েছিল। আহমদ মুসাকে দেখামাত্র গুলী করার 'মহাসংঘের' সিদ্ধান্ত সে জানে। যোগানন্দ যোগীর বেপরোয়া চেহারা দেখে এবং

কথার ধরনে এ কথাই তার আবার মনে পড়ল। শোল্ডার হোলষ্টার থেকে রিভলবার বের করলেও গুলী করার সময় ছিল না। আত্মরক্ষার জন্যে আহমদ মুসাকে বাঁ দিকে ছিটকে পড়তে হল। গুলী করার জন্যে ডান হাত উন্মুক্ত রাখার জন্যেই আহত বাম পাশটার উপরই আবার জুলুম করতে হল। গুলীটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল যোগানন্দ যোগীর। আহমদ মুসা তার দেহ সরিয়ে নিতে চার পাঁচ সেকেন্ড দেরী করলেই যোগানন্দ যোগীর বুলেট তার কপাল ফুটো করে দিত।

বাঁ দিকে মাটিতে ছিটকে পড়েই আহমদ মুসা তার রিভলবারের ট্রিগার টিপেছিল যোগানন্দ যোগীকে লক্ষ্য করে।

পাল্টা এই আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত ছিল না যোগানন্দ যোগী। কিছু বুঝে উঠার আগেই কপালের ঠিক মাঝখানটায় গুলী খেয়ে আছড়ে পড়ল সে সিঁড়ির উপর। তারপর গড়িয়ে অনেক দূর পর্যন্ত নেমে গেল তার দেহটা।

গুলী করেই আহমদ মুসা তার বাম বাহুর যন্ত্রণায় নেতিয়ে পড়ল মাটির উপর। বামদিকে দেহকে ছিটকে দেয়ায় আহত বাম বাহুটা গিয়ে পড়েছিল একটা পাথরের উপর। দেহের গোটা চাপটাও গিয়ে পড়েছিল সেই আহত বাহুটার উপরই।

যন্ত্রণায় বাহুটা প্রায় অবশ হয়ে পড়েছিল। সেই সাথে দেহটাও তার ব্যথায় জরজর হয়ে পড়েছে।

ভয়-আতংকে পাথর হয়ে যাওয়া মেয়ে দুটি তাদের চোখের সামনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো নিরবে দেখছিল।

প্রথমে সাধু যোগানন্দ যোগী গুরুজীর ঐভাবে তেড়ে আসা ও রিভলবার বের করা দেখে তারা অবাক হয়েছিল। যে গুরুজী একটা মাছি মারাকেও ¯্রষ্টার অনভিপ্রেত বলেন, সেই গুরুজীর হাতে রিভলবার! তারপর গুরুজী সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসা লোককে 'আহমদ মুসা' বলে সম্বোধন করা দেখে ভীষণ চমকে উঠেছিল বড় মেয়েটি। ভেতর থেকে শতকণ্ঠে তার জিজ্ঞাসা ধ্বনিত হয়েছিল এই লোকটি তাহলে সেই আহমদ মুসা!

আতংকের ঘোর কাটলে আহমদ মুসা নামটা ধাক্কা দিল বড় মেয়েটিকে। গুরুজীর কপালে যে গুলী লেগেছে, এটা তো দেখাই গেল। এতক্ষণে গুরুজী বোধ

হয় শেষ হয়ে গেছেন। কিন্তু আহমদ মুসা যাকে বলা হল, তিনিও কি গুলী খেয়েছেন। ওভাবে নির্জীব পড়ে আছেন কেন? গুরুজীর মতই কি তার অবস্থা? বুকের কোন গভীরে যেন একটা প্রবল অস্বস্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। সে তরুণীটির হাত ধরে টান দিয়ে বলল, 'এস।'

বড় মেয়েটি দ্রুত এগোল আহমদ মুসার দিকে। গিয়ে দাঁড়াল আহমদ মুসার পাশে। সঙ্গে সঙ্গে আহমদ মুসাও মাটি থেকে মাথা উঠিয়ে চাইল মেয়েটির দিকে।

'আপনি ভালো আছেন? আপনার গুলী লাগেনি?' উদগ্রীব কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল মেয়েটি।

বিস্মিত হল আহমদ মুসা। এই অচেনা হিন্দু মেয়েটির কণ্ঠে আন্তরিকতার সুর কেন? চোখে তার দরদ ভরা দৃষ্টি কেন?

জবাব দিতে আহমদ মুসার একটু দেরী হয়েছিল। মেয়েটিই আবার বলে উঠল, 'আপনি কি সত্যিই আহমদ মুসা? ভয় নেই। আমি সুস্মিতা বালাজীর বোন। আমি পোর্ট ব্লেয়ারে থাকি, সুস্মিতা আপা আপনার কথা আমাকে বলেছেন।'

আহমদ মুসা তার ডান হাত দিয়ে বাম হাত চেপে ধরে উঠে বসল। বলল, 'আল্লাহর অশেষ প্রশংসা। আমার চরম দুঃসময়ে আল্লাহ আপনাকে মিলিয়ে দিলেন। আপনার বোন সুস্মিতা বালাজীকেও এক কঠিন বিপদে আমি আল্লাহর সাহায্য হিসেবে পেয়েছিলাম।'

একটু থেমে একটা দম নিয়ে আবার আহমদ মুসা বলল, 'হ্যাঁ আমি আহমদ মুসা।'

শুনে খুশি হল বড় মেয়েটি। কিন্তু পরক্ষণেই এক রাশ উদ্বেগের অন্ধকার নামল তার চোখে-মুখে। বলল সে দ্রুতকণ্ঠে, 'সরকার ও গোটা প্রশাসন পাগল হয়ে উঠেছে আপনাকে শেষ করার জন্যে। পোর্ট ব্লেয়ারের কোন রাস্তা, হোটেল, বাড়ি আপনার জন্যে নিরাপদ নয়। আপনি উঠুন, এখনি এখান থেকে সরে পড়তে হবে।'

কথা শেষ করেই আবার বলে উঠল মেয়েটি, 'আপনি হাঁটতে পারবেন?'

আহমদ মুসা উঠতে উঠতে বলল, ‘পারব। কিন্তু কোন জায়গাই নিরাপদ না হলে আমি কোথায় যাব, কোথায় নেবেন আপনারা আমাকে?’

‘সুস্মিতা বালাজীর বোনের বাড়িকে আপনি নিরাপদ ভাবতে পারেন।’ বলল বড় মেয়েটি।

আহমদ মুসা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে।

‘আমরা মন্দিরের দিক দিয়ে বেরুতে পারবো না। বাইরের রাস্তাও আমাদের জন্যে নিরাপদ নয়। সাগর তীর দিয়েই আমাদের যেতে হবে। মন্দির এলাকা পেরোবার পরও সাগর তীর হয়েই যাওয়া যাবে। একটু এগোলেই আমাদের বাড়ি।’

বলেই হাঁটতে শুরু করল বড় মেয়েটি। তার সাথে আহমদ মুসা ও তরুণীটিও।

পাশাপাশি তিনজন হাঁটছে। প্রথমে কিছুক্ষণ নিরবতা।

নিরবতা ভেঙে বড় মেয়েটিই প্রথমে কথা বলল, ‘আমার নাম সুরূপা সিংহাল। সুস্মিতা আপার ছোট খালার বড় মেয়ে আমি। আর এই মেয়েটি আমার চাচাতো বোন এবং সুষমা রাওয়ের খালাতো বোন। আন্দামান এলে আমাদের বাসাতেই থাকে, গভর্নর ভবনে সে যায় না। ওর নাম সাজনা সিংহাল।’

যতটা সম্ভব দ্রুত হাঁটছিল তারা।

আহমদ মুসা ডান হাত দিয়ে বাম হাতটা চেপে ধরে হাঁটছিল।

‘স্যার, আপনার কষ্ট হচ্ছে আপনার পিঠের ব্যাগটা আমাকে দিন।’ বলল সাজনা সিংহাল।

‘ভাই, ও ঠিকই বলেছে। ওটা আমাদের দিন।’ বলল সুরূপা সিংহাল।

‘না বোনরা, আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না। বরং পিঠের চাপ আহত বাহুর যন্ত্রণাকে কিছুটা লাঘব করছে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘কষ্ট বেশি হবার কথা, লাঘব হচ্ছে কিভাবে স্যার?’ বলল বিস্মিত কণ্ঠে সাজনা সিংহাল।

‘পিঠে ভারের বোধ থাকায় কষ্টের অনুভূতিটা দু’ভাবে ভাগ হচ্ছে। এ ভার না থাকলে কষ্ট বোধটা আহত বাহুতে গিয়ে কেন্দ্রীভূত হবে।’ আহমদ মুসা বলল।

সুরূপা ও সাজনা দু'জনেই এক সাথে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। দুজনের চোখেই বিস্ময়।

সুরূপা চোখ ফিরিয়ে স্বগত কণ্ঠে বলল, 'কোন বিষয়কে এমন নিখুঁতভাবে দেখা ঈশ্বরের দেয়া বিশেষ গুণ।'

সাজনা কিছু বলতে যাচ্ছিল। সুরূপা বাধা দিয়ে বলল, 'আমরা এসে গেছি সাজনা। সামনেই কাঁটাতারের বেড়া। এস আমরা নিচে নেমে যাই, নিচু করিডোরটা দিয়ে আমরা ওপারে চলে যাব, কাঁটাতারের বেড়া ডিঙাতে যাওয়া ঠিক হবে না।

ওরা তিনজন নিচে সাগরের কূলে নেমে গের। বড় বড় পাথর-টিলার কিছু চড়াই-উৎরাই ওদের পার হতে হল। ওপারে পৌছে গেল ওরা। এখন অনেকটা নিরাপদ। একটা বড়, মসৃণ পাথর দেখে সুরূপা আহমদ মুসাকে বলল, 'ভাই, আপনি বসুন। আপনার অনেক কষ্ট হয়েছে।'

বসল তিনজনই।

সুরূপা আহমদ মুসার বাহুর ক্ষতটা দেখছিল। বলল, 'আমার মনে হয় গুলীটা বেরিয়ে গেছে।'

'আমারও তাই মনে হয়। তা না হলে ক্ষতের দুটি মুখ থাকতো না।' বলল আহমদ মুসা।

'স্যার, আপনি কোথায় গুলীবিদ্ধ হলেন? সাগরে পড়লেন কি করে? লঞ্চ ডুবি হয়েছিল? 'সাগর থেকে বেঁচেছ, ডাঙ্গায় তোমার মরণ লিখা হয়েছে' -গুরুজী এই কথা বলল কেন? গুরুজী আপনাকে মারতে চেয়েছিল কেন?' -এক নিশ্বাসে প্রশ্নগুলো করল সাজনা সিংহাল।

'গুরুজী কেন মারতে চায়, সে কথা তুমি সুরূপার কাছে শুনে নিও। সে নিশ্চয় সব কথা শুনেছে সুস্মিতা আপার কাছ থেকে। সাগরে কি করে পড়লাম, সেই কথা বলছি শোন। আমি.........।'

'এখন কোন কথা নয় ভাই। বাসায় চলুন, আপনি সুস্থ হোন তারপর সব কথা।' বলে সুরূপা পকেট থেকে মোবাইল বের করল। কোথাও মোবাইলে কথা

বলল। কোন এক ডাক্তার সোহনীকে বলল, ‘প্লিজ আপনি সার্জারী, ব্যান্ডেজ ও চিকিৎসার সরঞ্জাম নিয়ে আমার বাসায় চলে আসুন। এখনি প্লিজ।’

মোবাইল রেখে সুরূপা বলল, ‘ডাক্তার সোহনী পোর্ট ব্লেয়ার হাসপাতালের একজন সার্জন এবং সুস্মিতা আপার ক্লাসমেট ও বন্ধু। আমাদের সমস্যায় তিনি আসেন। আপনার ক্ষেত্রে যেমনটা প্রয়োজন, তিনি ততটাই বিশ্বস্ত।’

‘সোহনী নাম, তিনি কি মুসলিম?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘জি হ্যাঁ মুসলিম, কেরালার মেয়ে। পুরো নাম সোহনী শবনম। খুব ধর্মভীরু। নিয়মিত নামায পড়ে, মাথায় রুমাল বাঁধে। আপনাকে নিশ্চয় চিনবে।’ সুরূপা বলল।

কেরালার নাম শুনতেই আহমদ মুসার মনে পড়ল শাহ বানুর মায়ের কথা, হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহর কথা। মোপলা বিদ্রোহের নায়ক তাদের পূর্ব পুরুষের কথা। বলল আহমদ মুসা, ‘ডাক্তার সোহনী শবনম কি কেরালা থেকে আসা, না আন্দামানের কেরালিয়ান?’

‘কেরালা থেকে আসা। কেরালার সরকারি হাসপাতাল থেকে ট্রান্সফার হয়ে আন্দামানে এসেছেন।’ বলল সুরূপা সিংহাল।

কথা শেষ করেই সুরূপা আবার বলে উঠল, ‘চলুন উঠি। সোহনীদি আবার এসে পড়বেন।’

সবাই উঠল। চলতে শুরু করল সাগর তীরের পাথুরে চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে।

ডাক্তার সোহনী ব্যান্ডেজ খুলেই বলে উঠল, ‘তাই বলে আপনার দেহ এত আঘাতের ধকল মোকাবিলার পরেও কেমন করে এত স্বাভাবিক! আপনার দেহে নিশ্চয় মেডিসিনের ষ্টোর আছে, অথবা আপনার দেহে আল্লাহ এমন কিছু বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন, যা আঘাতের ক্ষতিকে দ্রুত পূরণ করে আপনাকে স্বাভাবিক করে দেয়। তা না হলে মেশিন গানের বুলেট পেশির গভীরে প্রবেশ করে বিপরীত

দিক দিয়ে বের হয়ে যে ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল, তা ঠিক হতে কমপক্ষে ১৫ দিন লাগার কথা, কিন্তু তার সিকি সময়ও তো আপনার লাগেনি!'

'তাড়াতাড়ি আমার সুস্থ হওয়া প্রয়োজন। সে কারণেই আল্লাহর এই সাহায্য।' আহমদ মুসা বলল।

'আপনার ক্ষেত্রে এটা খুব বেশি ঠিক।' বলল ডাক্তার সোহনী।

একটু থেমেই আবার বলল, 'একটা কথা জিজ্ঞাসা করি?'

'নিশ্চয় করবেন? তবে 'আপনি' সম্বোধন না করলে খুশি হতাম। সুস্মিতা আপাও শেষে ছোট ভাই হিসেবে 'তুমি' বলেই সম্বোধন করেছেন।' আহমদ মুসা বলল।

'শুধু বয়স মর্যাদার প্রতীক নয়। আপনাকে ছোট ভাই বলে আপন করার চাইতে আপনি যে মর্যাদার অধিকারী, সেটাকে বড় করে দেখাই বেশি প্রয়োজনীয়।' বলল ডাক্তার সোহনী।

'আপনার প্রশ্ন বলুন।' আহমদ মুসা বলল।

একটুক্ষন চুপ করে থেকে বলল, 'মনে রাখবেন প্রশ্নটা আমার মত একজন দুর্বল নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে। আপনার এই অস্থির জীবনের শেষ কোথায়? আমি যতটুকু জেনেছি, ততটুকুতেই আমি দিশেহারা হয়ে পড়েছি। জোসেফাইন ভাবী কি ভাবেন আমি জানি না।'

'এটা 'অস্থির জীবন' নয় ডাক্তার সোহনী, এরই নাম জীবন। জীবন মানেই কাজ, কাজ মানেই অস্থিরতা। কাজের এই অস্থিরতা গৃহাঙ্গন থেকে বিশ্ব পর্যায়ে হতে পারে। এরই একপর্যায়ে আমার জীবন। সুতরাং এই অস্থিরতা শেষ হওয়ার কথা নয়।' বলল আহমদ মুসা।

হাসল ডাক্তার সোহনী। বলল, 'আপনাদের মত লোকদের সাধারণ কথাও দর্শন হয়ে যায়। সহজ কথার একটা কঠিন দর্শন আপনি তুলে ধরেছেন। আমিও একমত আপনার সাথে। কিন্তু এই অস্থিরতার মাঝেও স্থিরতা থাকে। আমি সেটার কথাই বলেছি।'

'আপনার কথা ঠিক। কিন্তু সব জীবন একরকম নয়। আপনাদের মোপলা বিদ্রোহের কথাই স্মরণ করুন।' আহমদ মুসা বলল।

গম্ভীর হয়ে ওঠল ডাক্তার সোহনীর মুখ। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়নি। একটু পর ধীরে ধীরে বলল, 'ঠিক বলেছেন।'

ডাক্তার সোহনী তার ডাক্তারী ব্যাগ গুছিয়ে নিতে শুরু করেছে।

ব্যাগটি গুছিয়ে নিয়ে পাশের সোফায় বসল।

হাতের টিস্যুটা দিয়ে মুখ মুছে নিয়ে একটু হাসল। বলল, 'ওসব ভারী কথা থাক। এখন, বলুন গত রাতে চারদিক থেকে ঘেরাও হয়ে প্রচ- গোলা-গুলীর মধ্যে বোট থেকে সাগরে নামলেন, গুলীবিদ্ধ হলেন, সাবমেরিন টিউবও যখন গুলীতে ফুটো দেখলেন, তখন আপনার কি মনে হয়েছিল?'

'প্রত্যেক বিপদের মধ্যে বাঁচার একটা পথ থাকেই, সেই বাঁচার পথ ব্যবহার করার জন্যে তখনকার অবস্থা মোকাবিলা করা ছাড়া আর কিছুই আমি ভাবিনি।' আহমদ মুসা বলল।

'ভাবীর কথা? বাচ্চার কথা?' বলল ডাক্তার সোহনী।

'ওদের ছবি, সব সময় আমার চোখের সামনে থাকে। তবে ঐ মুহূর্তে ওদেরকে নিয়ে দূর্বল করার মত ভাবনা আমার মধ্যে সৃষ্টি হয়নি।'

'সে জন্যেই তো আপনি আহমদ মুসা। ধন্যবাদ। কিন্তু বলুন তো অতীতের এমন কোন ঘটনা বা স্মৃতি যা আপনাকে দূর্বল করে, দুঃখিত করে, ব্যথিত করে?' বলল ডাক্তার সোহনী।

'এমন কোন মানুষ দুনিয়ায় নেই যার জীবনে এই ধরনের কোন ঘটনা বা স্মৃতি নেই। আমার জীবনেও এমন অনেক ঘটনা আছে। এতই বেশি.....।'

এই সময় ছুটে ঘরে প্রবেশ করল সুরূপা সিংহাল। তার পেছনে পেছনে সাজনা সিংহালও।

আহমদ মুসার কথা আগেই থেমে গিয়েছিল।

আহমদ মুসা তার দিকে তাকিয়ে সোজা হয়ে বসল।

'ভাই, একটা দুঃসংবাদ।' সুষমা রাও নিখোঁজ।'

'সুষমা রাও নিখোঁজ?' অনেকটা স্বগত কণ্ঠে উচ্চারণ করল আহমদ মুসা। তার চোখে মুখে বিস্ময়।

ধীরে ধীরে মাথাটা নিচু হল। চোখটাও তার বন্ধ হয়ে গেল। ভাবছে সে। কথা বলল না।

কথা বলল ডাক্তার সোহনী। বলল, ‘কবে থেকে নিখোঁজ?’

‘গতকাল বিকেল থেকে।’ বলল সুরূপা সিংহাল।

‘কই পত্রিকায় তো আসেনি? গভর্নরের মেয়ে নিখোঁজ, ছোট ঘটনা নয়।’ বলল ডাক্তার সোহনী।

‘সম্ভবত মর্যাদার ব্যাপারকে তারা বড় করে দেখছে।’ সুরূপা বলল।

‘কোত্থেকে নিখোঁজ হয়েছে?’ প্রশ্ন ডাক্তার সোহনীর।

‘গভর্নর হাউজের সামনে কালী মন্দিরে মায়ের সাথে পূজো দিতে গিয়েছিল। ফেরার পথে নিখোঁজ হয়েছে।’ বলল সুরূপা।

‘তাহলে তো এটা নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা নয়। নিখোঁজ এভাবে হয় না। বলতে হবে অপহৃত হয়েছে।’ ডাক্তার সোহনী বলল।

‘খালাম্মার সাথে কথা হল। তিনি নিখোঁজ শব্দই বললেন। অবশ্যই তার অবস্থা খুবই খারাপ। কান্নায় কথা বলতে পারছেন না। অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।’ বলল সুরূপা সিংহাল।

‘মন্দির পর্যন্ত এরিয়া গভর্নর হাউজের সিক্যুরিটি এলাকার মধ্যে। ওখান থেকে গভর্নরের মেয়ে অপহৃত হলে সাংঘাতিক দুঃসাহসিক কাজ!’ ডাক্তার সোহনী বলল।

‘পুলিশের থেকে তারা যদি বড় হয়, তাহলে দুঃসাহসের দরকার হয় না।’ সুষমা রাওয়ের অপহরণের ব্যাপারে প্রথম মুখ খুলল আহমদ মুসা।

‘পুলিশের থেকে তারা বড় হবে কেন? সন্ত্রাসী যত বড়ই হোক, পুলিশকে তারা ভয় করে।’ বলল ডাক্তার সোহনী।

‘ব্যাপারটা নিয়ে আরও ভাবতে হবে। তবে আমার মনে হয় সন্ত্রাসীরা সুষমা রাওকে অপহরণ করেনি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তাহলে কে অপহরণ করেছে?’ বলল সুরূপা সিংহাল।

‘আমার কথা ঠিক নাও হতে পারে। তবে আমি সুষমা রাওয়ের অপহরণের যতগুলো বিকল্পের কথা ভাবলাম, তার মধ্যে সবচেয়ে সম্ভাবনার

কথা হল, একটা জঘন্য উদ্দেশ্যে অপহরণের নাটক সাজানো হয়েছে।' আহমদ মুসা বলল।

'বলেন কি ভাই? এ নাটক সাজাবে কে? তার বাবা?' বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে বলল সুরূপা সিংহাল।

'আমি তাই অনুমান করেছি।' আহমদ মুসা বলল।

'কি কারণে, সেই জঘন্য উদ্দেশ্যটি কি?' প্রশ্ন সুরূপারই।

'অনেকগুলো কারণের কথা চিন্তা করা যায়। সুষমা রাওয়ের সাথে সুস্মিতা বালাজী আপার যোগাযোগ হয়েছে, এটা তার পিতা জানতে পেরে এই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্যে এই কাজ করেছেন। কিন্তু এই কারণ আমার কাছে খুব যৌক্তিক নয়। দ্বিতীয় কারণ হতে পারে, সুষমা রাওকে অপহরণের নাটক সাজিয়ে তাকে সরিয়ে রেখে এর দায় আহমদ শাহ আলমগীর তথা মুসলমানদের উপর চাপিয়ে তাদের বিরুদ্ধে কোন দমনমূলক পদক্ষেপ নেয়ার সুযোগ সৃষ্টি করতে চান। এ কারণকেও আমার কাছে খুব শক্তিশালী মনে হয় না। তৃতীয় কারণ হতে পারে এই যে, বন্দী আহমদ শাহ আলমগীরের কাছ থেকে তথ্য আদায়ের জন্য একটা গিনিপিগ হিসেবে ব্যবহার করতে চায় সুষমা রাওকে।'

'গিনিপিগ কিভাবে? কি তথ্য আদায়?' বলল সুরূপা সিংহাল বিস্মিত কণ্ঠে।

আহমদ শাহ আলমগীর ও সুষমা পরস্পরকে ভালোবাসে। সুষমাকে বন্দী আহমদ শাহ আলমগীরের কাছে হাজির করে আহমদ শাহ আলমগীরকে এ কথা বলা হবে যে, তথ্য যদি সে প্রকাশ না করে, তাহলে তার সামনেই সব রকম নির্যাতন, এমনকি শ্লীলতাহানীর কাজ করা হবে। সুষমা রাওকে রক্ষার জন্যেই তখন আহমদ শাহ আলমগীর মুখ খুলবে। আর......'।

আহমদ মুসার কথায় বাধা দিয়ে ডাক্তার সোহনী বলে উঠল, 'আপনি এটাও কি নিছক অনুমান করেছেন?'

'না। এভাবে গিনিপিগ বানাবার জন্যে বিবি মাধবের লোকরা আহমদ শাহ আলমগীরের মা ও বোনকে অপহরণ করেছিল। কিন্তু তারা তাদের হাত ছাড়া হয়ে যাওয়ায় তাদের গিনিপিগ বানানো সম্ভব হয়নি এবং আহমদ শাহ

আলমগীরের কাছ থেকে তথ্যও তারা আদায় করতে পারেনি। শেষ ব্যবস্থা হিসেবেই আমি মনে করি সুষমা রাওকে তারা অপহরণ করেছে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আপনার কথায় শক্তিশালী যুক্তি আছে। কিন্তু একজন পিতা কি তার মেয়ে নিয়ে এমন কিছু করতে পারেন?’

‘এটা হতে পারে যদি গরজটা মেয়ের চেয়েও বড় হয়। আর পিতা মনে করতে পারেন, আসলেই তার মেয়ের কোন ক্ষতি হবে না। মাঝখান থেকে আহমদ শাহ আলমগীরের কাছ থেকে তথ্য আদায় হয়ে যাবে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কিন্তু মেয়ের কাছে তো পিতা চিরদিনের মত ছোট হয়ে যাবেন।’ বলল সুরূপা সিংহাল।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘সুষমা রাও পিতাকে সন্দেহ করেছে, কিন্তু পিতা মেয়েকে জানতে দেয়নি তারাই যে আহমদ শাহ আলমগীরকে অপহরণ করেছে। তাঁর নিজের লোকরা ছদ্মবেশে সুষমাকে অপহরণ করেছে এবং জানতেও দেবে না তার পিতা এর সাথে জড়িত। সে বুঝবে আহমদ শাহ আলমগীরকে যারা আটক করেছে, তারাই আহমদ শাহ আলমগীরকে কথা বলাবার জন্যে সুষমাকে অপহরণ করেছে। সুষমা আরও বুঝবে, তার পিতা তাহলে আহমদ শাহ আলমগীরের অপহরণের সাথে জড়িত নয়। এতে গভর্নর মাধব মেয়ের সন্দেহের দায় থেকেও মুক্ত হবেন এবং কার্যোদ্ধারও হয়ে যাবে।’

ডাক্তার সোহনী, সুরূপা ও সাজনা সিংহাল সকলের মুখেই আনন্দ ও স্বস্তির ভাব ফুটে উঠেছে। তাদেরও এখন স্থির বিশ্বাস সুষমার অপহরনের কাজ তার পিতাই করেছে এবং সুষমার আসলেই কোন ক্ষতি হবে না।

আনন্দ ও স্বস্তির মধ্যেও প্রশ্নের এক প্রবল স্ফুরণ ঘটেছে সাজনা সিংহালের চোখে মুখে। বলল সে, ‘খালুজান মানে সুষমা আপার আব্বা এতবড় একটা কাজ করেছেন কোন তথ্যের জন্যে? সে তথ্যের সাথে তার সম্পর্ক কি?’

‘এটাই আসল বিষয়। এই তথ্যের জন্যেই আহমদ শাহ আলমগীরকে অপহরণ করা হয়েছে এবং পরবর্তী ঘটনাগুলো এই তথ্যকে কেন্দ্র করেই ঘটছে। কিন্তু এই ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু জানি না। আমি এ পর্যন্ত যেটা জানতে পেরেছি

তা হল, শিবাজীর কি দলিল ও মোগল সম্রাটদের কি একটা নক্সা আহমদ শাহ আলমগীরের কাছে আছে। এই জিনিসগুলো তারা চায়। এটা পেলে নাকি তাদের পথ ও পাথেও দুই-ই পাওয়া হয়ে যাবে। আবার ভারতে প্রতিষ্ঠিত হবে শিবাজীর স্বপ্নের ধর্মরাজ্য। কবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় একত্রিত হবে আবার, 'এক ধর্মরাজ্য পাশে খ- ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত।' আহমদ মুসা বলল।

'রবীন্দ্রনাথের এ কবিতাংশ জানলেন কি করে? আপনি তো বাংলা জানেন না, ভারতীয়ও নন।' বলল সাজনা সিংহাল।

'তোমার আপা সুস্মিতা বালাজীই আমাকে শিখিয়েছেন।' আহমদ মুসা বলল।

ডাক্তার সোহনী ও সুরূপার মুখ গম্ভীর। তারা ভাবছিল। সাজনার এবং আহমদ মুসার উত্তর তাদের কানে বোধ হয় পৌছায়নি।

আহমদ মুসার কথার শেষ শব্দ বাতাসে মেলাবার আগেই সুরূপা প্রশ্ন করল, 'যারা ঐসব অপহরণের সাথে জড়িত, যারা ভারতে শিবাজীর ধর্মরাজ্য চায় তাদের সাথে গভর্নর বিবি মাধবের সম্পর্ক কি? তিনি তো ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের গভর্নর।'

গম্ভীর হল আহমদ মুসা। ভাবনার একটা ছায়া নামল তার চোখে-মুখে। বলল সে ধীরে ধীরে, 'এটা তাঁর উপরি কাঠামো। ভেতরের রূপ ভিন্ন। ভারতের 'শিবাজী সন্তান সেনা', 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম', প্রভৃতি অত্যন্ত পরিচিত ও নির্দোষ জাতীয়তাবাদী সংগঠন। কিন্তু এগুলো আসলে পানির উপরে মাথা তোলা শৈল চূড়া। পানির নিচে লুকানো রয়েছে 'ডুবো পাহাড়'-এর মত 'মহাসংঘ'। মহাসাম্প্রদায়িক এই 'মহাসংঘে'রই একজন নেতা বিবি মাধব। তিনি আন্দামান 'মহাসংঘ'কে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বলেই আমার বিশ্বাস।' থামল আহমদ মুসা।

সুরূপা সিংহালরা কোন কথা বলল না। তাদের সকলের চোখে-মুখে অপার বিস্ময়। বিস্ময়ে তাদের যেন বাকরোধ হয়ে গেছে।

আহমদ মুসাই আবার মুখ খুলল। বলল, 'ডুবো পাহাড় এই মহাসংঘই ভারতের সকল সাম্প্রদায়িক বিভেদ, বিত-া এবং দাঙ্গার জন্য দায়ী। ধর্মের কারণে ভারত ভাগও হলেও ভাগ হওয়া অন্য দুই অংশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-ফাসাদ নেই।

সেখানেও ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের আন্দোলন আছে। কিন্তু সেটা গোপন নয়, গণতান্ত্রিক। সেখানে অবশ্য সন্ত্রাস আশ্রয়ী অগণতান্ত্রিক একটা ধর্ম আন্দোলন মাথা তুলেছিল, কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ না হলেও সেখানকার সরকারের কঠোর অবস্থান ও জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান করায় ঐ আন্দোলন পানার মত ভেসে গেছে। কিন্তু ভারতে তা হতে পারছে না।’

‘কেন? ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ সরকার নিশ্চয় মহাসংঘটির কর্মকা-কে সমর্থন করে না। সেজন্যেই ওটা প্রকাশ্য পাহাড় নয়, গোপন ডুবো পাহাড়।’ বলল ডাক্তার সোহনী।

‘প্রকাশ্যে সমর্থন করে না এটা ঠিক। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারের মত কঠোর অবস্থানও নেয় না। বরং গোপন সায় আছে এটাই প্রমাণ হয়। যেমন, বাবরী মসজিদ ধ্বংস করল ‘শিবাজী সন্তান সেনা’রা নানা নামের ব্যানারে। তদানিন্তন নরসীমা রাওয়ের কংগ্রেস এতে প্রকাশ্যে অংশ নেয়নি বটে, কিন্তু বাধা দেয়নি, প্রতিরোধ করেনি। বাবরী মসজিদ রক্ষায় এগিয়ে যায়নি সরকারের পুলিশ ও সৈন্যরা। নিরবে দাঁড়িয়ে সবকিছু যেন উপভোগ করেছে।’ থামল আহমদ মুসা।

সুরূপা সিংহালদের মুখ ম্লান হয়ে গেছে। কথা বলল না সঙ্গে সঙ্গেই। একটু সময় নিয়ে ডাক্তার সোহনী বলল, ‘হতাশার কথা আপনি শোনালেন।’

‘হতাশ হবার কিছু নেই। ভারতে গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত। ডুবো পাহাড় রূপী মহাসংঘের বিরুদ্ধে এই গণতন্ত্রই ভারতবাসীদের জন্যে রক্ষাকবচ, যদি গণতন্ত্রকে সত্যিকার গণতন্ত্র হিসেবে তারা বাঁচিয়ে রাখতে পারে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ধন্যবাদ ভাই, আপনার কথা সত্য হোক। কিন্তু আন্দামান মহাসংঘের তৈরি সংকট থেকে উদ্ধার হবে কিভাবে, যেখানে গভর্নর নিজে জড়িত হয়ে পড়েছেন?’ বলল ডাক্তার সোহনী।

‘এই সংকট উত্তরণের চেষ্টাই আমরা করছি। দোয়া করুন।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ফি আমানিল্লাহ’ বলে উঠে দাঁড়াল ডাক্তার সোহনী। বলল, ‘আপনার শরীরের দূর্বলতা কাটতে কিন্তু আরও একটু সময় লাগবে। এখনও আপনার বাইরে বেরোনো নিষেধ।’

‘ও, আপনাকে বলা হয়নি, আজ সকালেই তো উনি বাইরে বেরুবার জন্যে তৈরি হয়েছিলেন। একটা টেলিফোনের অপেক্ষা করতে গিয়েই শেষ পর্যন্ত তিনি বেরুতে পারেননি।’ বলল সুরূপা সিংহাল।

সুরূপার কথা শেষ হতেই আহমদ মুসা বলে উঠল, ‘আমার এক পুরানো বন্ধু আটক আছেন। তার খোঁজেই একটু বেরোনো দরকার। সম্ভবত তার বাসার টেলিফোন খারাপ। খবর দিয়েও কোন সাড়া পাইনি।’

‘কিন্তু আপনি জানেন, আপনার চলাচল নিরাপদ নয়।’ বলল সুরূপা সিংহাল।

‘আমি জানি বোন। ওদের চেষ্টা হল, কারফিউ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে আমার চলাফেরা অসম্ভব করে তুলে ওদের লক্ষ্য অর্জন করা। অন্যদিকে আমার কাজ হল ওদের সতর্কতার সব আয়োজন ব্যর্থ করে দিয়ে আমার লক্ষ্যে উপনীত হওয়া। আমার চুপ করে বসে থাকার অর্থ হল, লক্ষ্য অর্জনে তাদের সাহায্য করা। আমার কি করা উচিত বলুন আপনারা।’

‘আমরা জানি আহমদ মুসা বসে থাকবার পাত্র নন। বিপদের ঘনঘটা তার খুব পরিচিত সাথী। কিন্তু আমার কৌতুহল আপনি এই মুহূর্তে বাইরে গিয়ে কি করবেন?’ বলল সুরূপা সিংহাল।

‘কিছুই করার না থাকলে, কোন পথই খুঁজে না পেলে কাজ হবে ওদের হাতে ধরা দেয়া। ধরা দিয়ে ওদের কাছে পৌছে পথ বের করে নেয়া। কিন্তু .....।

আহমদ মুসার কথা সামনে এগোতে পারলো না। বাধা দিয়ে কথা বলে উঠল সুরূপা সিংহাল। বলল, ‘এমন আত্মঘাতী কাজ করার চিন্তাও করেন?’ বিস্ময় ও উদ্বেগ তার কণ্ঠে। সাজনা ও ডাক্তার সোহনীরও মুখ হা হয়ে গেছে বিস্ময়ে।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘নিরুপায় অবস্থায় এমন কাজ করতে হয়েছে। তবে এখন এমন কিছু করার প্রয়োজন নেই। চলার জন্যে আমার সামনে

পথ খোলা। আপনারা কেউ সাহায্য করলে, বিশেষ করে তিনি যদি একজন ডাক্তার হন, তাহলে একটা অভিযান এখনি শুরু হতে পারে।’

ডাক্তার সোহনীসহ ওদের তিনজনের চোখেই বিস্ময় ও কৌতুহল। আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই সুরূপা সিংহাল বলে উঠল, ‘আমাদের মধ্যে ডাক্তার তো একজনই আছে। কি বলবেন সোহনী আপা?’

‘হ্যাঁ, প্রস্তাবটা বিস্ময়ের এবং রোমাঞ্চকর। আমি বুঝতে পারছি না আহমদ মুসা, একজন ডাক্তার আপনাকে কি বিশেষ সহায়তা করতে পারেন?’ বলল ডাক্তার সোহনী।

‘কথা আমি সিরিয়াসলি বলেছি ডাক্তার সোহনী। হাজী আবদুল আলী আব্দুল্লাহ জেলে, তার স্ত্রীর সাথে আমার দেখা হওয়া দরকার। কিছু বিষয় তার কাছ থেকে জানা দরকার। কিন্তু তার বাড়ি ও টেলিফোন দুয়ের উপরই নজরদারী চলছে। তাঁর মোবাইলও মনিটর করা হচ্ছে। গোয়েন্দা ও পুলিশের নজর এড়িয়ে তাঁর বাড়িতে কারও যাওয়া সম্ভব নয়, এমনকি আত্মীয়-স্বজনদেরও যেতে দেয়া হচ্ছে না খবর পাচার হতে পারে এই আশংকায়। এই অবস্থায় একজন ডাক্তারই তাঁর বাড়িতে যেতে পারেন। তার সাথে থাকবে শিখ ড্রাইভার.........।’

কথা বলতে বলতেই আহমদ মুসা সামনের ‘টি’ টেবিল থেকে পানির গ্লাস তুলে নিল এবং ‘স্যরি’ বলে খেতে শুরু করল।

গ্লাস টেবিলে রাখতেই সাজনা সিংহাল বলল, ‘ঠিক আছে ম্যাডাম ডাক্তার সোহনী না হয় হলেন ডাক্তার, আপনি কি তাহলে ড্রাইভার? ড্রাইভিং লাইসেন্স পাবেন কোথায়? তারপর পোশাক?’

আহমদ মুসা সাথে করে আনা ওয়াটার প্রুফ ব্যাগ থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স বের করে সবার সামনে রাখল। শিখ সাজার মত পাগড়ী, পোশাক, দাড়ী, এমনকি গোঁফও বেরিয়ে এল তার ব্যাগ থেকে।

সাজনা সিংহাল ছোঁ মেরে ড্রাইভিং লাইসেন্স তুলে নিল। একটু নজর বুলিয়েই বলল, ‘তাহলে স্যার, আপনি ড্রাইভার শরন সিং।’

‘তাহলে দেখছি, আপনি পরিকল্পনা তৈরি করেই এসেছেন। কিন্তু ডাক্তার এভাবে পেয়ে যাবেন, এটা ঠিক করেছিলেন কিভাবে?’ বলল সুরূপা সিংহাল।

‘আমার পরিকল্পনায় ডাক্তার ছিল না। এই মাত্র এ বিষয়টা আমার মাথায় এসেছে ডাক্তার সোহনীকে দেখে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ডাক্তার সোহনীকে না পেলে পোর্ট ব্লেয়ারে এসে ট্যাক্সির ব্যবস্থা কিভাবে করতেন?’

‘একজন ট্যাক্সিওয়ালাকে আটকে রেখে তার ট্যাক্সি ব্যবহার করতাম। নিরাপত্তার জন্যে ট্যাক্সির নাম্বার পাল্টে অকেজো, পরিত্যক্ত একটা ট্যাক্সির নাম্বার ব্যবহার করতাম। সে নাম্বারও আগে থেকেই জোগাড় করা আছে।’ আহমদ মুসা থামল।

কিন্তু ওদের কারও মুখে কোন কথা নেই।

সবার বিস্ময় দৃষ্টি আহমদ মুসার দিকে। এতদিনের শোনা আহমদ মুসাকে তারা চোখের সামনে দেখছে। তার কাজ করার ধরন, তার কৌশল সব তারা নিজের চোখে দেখছে, খোদ আহমদ মুসার কাছেই শুনছে। এই বাস্তবতা স্বপ্নের চেয়েও বড় স্বপ্ন মনে হচ্ছে তাদের কাছে।

নিরবতা ভাঙল ডাক্তার সোহনী। বলল, ‘আমি রাজি জনাব। আমি আপনার কোন কাজে লাগলে, নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করব।’

‘ওয়েলকাম ডাক্তার সোহনী। আমার কাজ দ্রুত ও সহজ করে দিলেন। আমি মনে করি চিন্তার কিছু নেই।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আমি তো বিনা কলেই যাচ্ছি। এটা যদি পুলিশ-গোয়েন্দারা জানে এবং বলে যে কল নেই যাচ্ছি কেন?’ ডাক্তার সোহনী বলল।

‘বলবেন, রুটিন চেকিং, প্রতিমাসেই হয়।’ বলল আহমদ মুসা।

‘চমৎকার জবাব। রুটিন চেকিং বলাটাই সবচেয়ে নিরাপদ। ধন্যবাদ আপনাকে।’ ডাক্তার সোহনী বলল।

আরও তিন ঘণ্টা পর। পড়ন্ত বেলা।

আহমদ মুসা শিখ ড্রাইভারের পোশাক পরে ড্রইংরুমে বসে ডাক্তার সোহনীর অপেক্ষা করছে, আর গল্প করছে সুরূপাদের সাথে।

ঠিক সময়েই গাড়ি বারান্দায় প্রবেশ করল ডাক্তার সোহনীর গাড়ি।

ডাক্তার সোহনী গাড়ির ড্রাইভিং সিট থেকে নেমে এল। তার হাতে ষ্টেথিসকোপ, গায়ে ডাক্তারের এপ্রন। এপ্রনে একটা বড় আকারের রেডক্রস ছাড়াও তার নিচে সবুজ কালিতে জ্বল জ্বল করছে আন্দামান সরকারি হাসপাতালের মনোগ্রাম। ড্রাইভিং সিটের পাশের সিটে রাখা একটা বড় ডাক্তারী ব্যাগও দেখ যাচ্ছে। গাড়ির সামনের ও পেছনের স্ক্রিণেও লাল রেডক্রসের মনোগ্রাম।

গাড়ির শব্দে শিখ ড্রাইভারবেশী আহমদ মুসাসহ সুরূপা ও সাজনা বেরিয়ে এসেছিল।

আহমদ মুসাকে দেখে ডাক্তার সোহনী সানন্দে বলে উঠল, 'চমৎকার, একদম নিখুঁত ছদ্মবেশ। আগে না জানলে আমি চিনতেই পারতাম না আপনাকে।'

'ধন্যবাদ' বলে আহমদ মুসা এগিয়ে গিয়ে গাড়ির পেছনের দরজা খুলে পাঞ্জাবী মেশানো হিন্দীতে ডাক্তার সোহনীকে গাড়িতে বসার জন্যে আহ্বান জানাল।

'ধন্যবাদ' বলে ডাক্তার সোহনী গাড়িতে গিয়ে বসল।

গাড়ির দরজা বন্ধ করে আহমদ মুসা গিয়ে বসল ড্রাইভিং সিটে। পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল সুরূপা ও সাজনা। সাজনা বলল ডাক্তার সোহনীকে লক্ষ্য করে, 'আমার হিংসা হচ্ছে আপনাকে একটা ইতিহাসের অংশ হতে দেখে।'

'কিন্তু ইতিহাসের শুরু তোমাদের বাড়ি থেকে তোমাদের সহযোগিতায়। সুতরাং তোমরাও ইতিহাসের অংশ। আসি, আসসালাম।' বলে আহমদ মুসা গাড়িতে ষ্টার্ট দিল।

সুরূপা দুই হাত জোড় করে উপরের দিকে তাকিয়ে মাথা নোয়াল। বোধ হয় মা দূর্গা'র কাছে কোন প্রার্থনা করল। গাড়ি তখন বাড়ি থেকে রাস্তায় গিয়ে উঠেছে।

হঠাৎ আহমদ মুসা ব্রেক কষে গাড়ি থামিয়ে দিল। তারপর গাড়ি ব্যাক করে গেটের ভেতর চলে এল। গেট থেকে একটু আড়ালে গাড়ি নিয়ে আবার ব্রেক কশল।

ডাক্তার সোহনী বিস্মিত হয়ে বলল, 'কি ব্যাপার জনাব?'

'একটা ভুল হয়েছে। দু'মিনিট দেরি হবে।' বলে আহমদ মুসা তার ব্যাগ থেকে গাড়ির দুটি নাম্বার নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে গেল। ডাক্তার সোহনীর গাড়ির দুদিকে নাম্বার প্লেট খুলে গাড়ির ভেতরে ছুড়ে দিয়ে তার জায়গায় নতুন নাম্বার প্লেট লাগিয়ে দিল।

কাজ শেষ করে ড্রাইভিং সিটে ফিরে এল। সিটে বসে গাড়ির দরজা বন্ধ করতে করতে বলল, 'ডাক্তার সোহনী সম্প্রতি কোন ডাক্তার কি বিদেশে বা ছুটি নিয়ে মূল ভুখ- গেছে?'

'গেছে। কেন?'

'বলছি। তাদের কারও একজনের নাম বলুন।'

'ডাক্তার আশা স্যাম্যাল আমেরিকা গেছেন এবং ডাক্তার নন্দিতা পাঞ্জাবে তার বাড়ি ছুটিতে গেছেন।'

'তাহলে ডাক্তার সোহী এখন থেকে আমাদের ফিরে আসা পর্যন্ত আপনার নাম ডাক্তার নন্দিতা। আপনি এই অভিযানে ছিলেন এ কথা যাতে কোনভাবে প্রমাণ না হয় এজন্যে।'

'কিন্তু এতে আমি বাঁচব, কিন্তু ডাক্তার নন্দিতার তো বিপদ হবে।'

'ডাক্তার নন্দিতার বিপদ হবে কেন? তিনি তো ছুটিতে আছেন। প্রমাণ হবে যে, 'কেউ নকল নন্দিতা সেজেছিলেন।'

হাসল ডাক্তার সোহনী। বলল, 'গাড়ির নাম্বার প্লেট বদলাবার কারণ কি?'

'গাড়িটা যে আপনার এটা যাতে কেউ খুঁজে বের করতে না পারে, এজন্যেই এই ব্যবস্থা।'

‘আল্লাহকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। তিনি নিশ্চয় আপনাকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করেছেন। আপনি এতটা আগাম চিন্তা করেন?’

‘এটা আমার কৃতিত্ব নয় মোটেই।’ গাড়ি ষ্টার্ট দিতে দিতে বলল আহমদ মুসা। গাড়ি রাস্তায় বেরিয়ে ছুটে চলল।

এক সময় ডাক্তার সোহনী পেছন থেকে প্রশ্ন করল, ‘আচ্ছা জনাব, সংস্কারক ও যোদ্ধা এ দুজনের মধ্যে কে বড়?’

‘দুজনেই বড়। সংস্কার জাতির পুনর্গঠনের কাজ করেন এবং যোদ্ধা জাতিকে রক্ষার জন্যে লড়াই করে। দুকাজই তাদের স্ব স্ব জায়গায় এক নাম্বার।’

‘আপনি একজন যোদ্ধা হিসেবে বলুন............।’

আহমদ মুসা ডাক্তার সোহনীর কথায় বাধা দিয়ে বলল, ‘না আমি যোদ্ধা নই, যোদ্ধার দায়িত্ব অনেক বড়। আমি ছোট একজন সেবক, জাতির বিপদকালে সাহায্য করার চেষ্টা করি।’

‘এটা আপনার বিনয়। মিন্দানাও, মধ্য এশিয়া, বলকান, স্পেন, প্রভৃতি জায়গায় যা করেছেন, সেটা যুদ্ধের চেয়েও বড়।’

‘না, ওগুলো যুদ্ধ নয়। যুদ্ধের জন্যে আনুষ্ঠানিক একটা সেন্ট্রাল অথরিটি থাকতে হয়, জনগণের কোন প্রকার আনুষ্ঠানিক সমর্থন ও গ্রহণ থেকে এই অথরিটির সৃষ্টি হয়। এসব কিছুই সেখানে ছিল না, এসবের প্রয়োজনও হযনি। কারণ আমি যেটা করেছি, সেটা অন্যায় ও অন্তর্ঘাতের মোকাবিলা এবং জাতিতে তার বিপদ উত্তরণে সহযোগিতা করা। বিপদ মুক্ত হয়ে জাতি অনেক জায়গায়ই স্বাধীনভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াবার সুযোগ পেয়েছে। আর দেখুন, আমি আমার এ তৎপরতায় কোন আইন ভঙ্গ করিনি, আইনের পক্ষে কাজ করেছি এবং আইনের শাসন ও গণতন্ত্রকেই সামনে এগিয়ে নেবার চেষ্টা করেছি। আমি বিশ্বাস করি ডাক্তার সোহনী, আজ বিশ্বে মুসলমানরা যদি তাদের স্ব স্ব স্থানে আইনের শাসন রক্ষা ও গণতন্ত্র চর্চার উপর অটল থাকে এবং আল্লাহ যেমন চান তেমন ‘ভালো’ মানুষ হতে পারে, তাহলে তাদের সেই সোনালী দিনের পুনরাগমন নিশ্চিত হতে পারে।’

‘চমৎকার বলেছেন। ধন্যবাদ। কিন্তু বলুন আমাদের এই যাত্রা, আমরা যা করতে চাচ্ছি তা কি এই দেশের আইনের বিরুদ্ধে হচ্ছে না?’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘না তা হচ্ছে না। এই দেশে একটা খুনি সন্ত্রাসী চক্র সরকারের অভ্যন্তরে একটা সরকার সৃষ্টি করে বেআইনিভাবে আইনকে হাতে নিয়ে নির্দোষদের উপরে যে নির্যাতন নিপীড়ন চালাচ্ছে, তারই বিরুদ্ধে আমাদের এই অভিযান। আমরা কেন, চক্রটির ষড়যন্ত্রের কথা যদি এদেশের দেশপ্রেমিক পুলিশ, গোয়েন্দারা জানত, তাহলে তাদেরও দায়িত্ব হতো এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়া। আমরা বলতে গেলে তাদেরই কাজ....।’

কথা শেষ না করেই আহমদ মুসা গাড়ির ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করাল।

সামনেই একজন পুলিশ হাত তুলে আছে, আহমদ মুসার গাড়িকে দাঁড়াবার নির্দেশ দিচ্ছে।

হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহর বাড়ি এসে গেছে। সামনের মোড়টা ঘুরেই রাস্তাটা সোজা হাজী আবদুল আলী আবদুল্লার বাড়ি গিয়ে উঠেছে। এখানে এই একটিই রাস্তা। এদিক-সেদিক যাবার কোন রাস্তা নেই এবং এই রাস্তাটা হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহর বাড়ি গিয়েই শেষ হয়েছে।

পুলিশ অফিসারটি কয়েক ধাপ হেঁটে আহমদ মুসা রূপী ড্রাইভার শরন সিংয়ের কাছে এসে দাঁড়াল। তার সাথে ছিল আরও দুজন পুলিশ। তারাও এসে দাঁড়াল পুলিশ অফিসারের পেছনে।

পুলিশ অফিসারটি কয়েক ধাপ হেঁটে আহমদ মুসারূপী ড্রাইভার শরন সিংয়ের কাছে এসে দাঁড়াল। তার সাথে ছিল আরও দুজন পুলিশ। তারাও এসে দাঁড়াল পুলিশ অফিসারের পেছনে।

পুলিশ অফিসারটি গাড়ির জানালার দিকে একটু ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করল, ‘সিংজী আপনারা কোথায় যাচ্ছেন।’

‘হাজী আবদুল্লাহজীর বাড়িতে।’

পুলিশ অফিসার আহমদ মুসার কাছ থেকে সরে ডাক্তার সোহনীর জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

ডাক্তার সোহনী একটা খবরের কাগজ পড়ছিল।

আহমদ মুসা পুলিশ অফিসারের সাথে কথা বলার সময় ডাক্তার সোহনী মুখের সামনে থেকে কাগজটা একটু সরিয়ে নিয়েছিল। বাম দিকের চুলের কিছু অংশ ও বাম চোখের উপর দিয়ে গালের উপর পড়েছিল। মুখের ঠোঁট বরাবর ছিল খবরের কাগজের উপরের প্রান্ত। ফলে মুখের পুরোটা দেখা যাচ্ছিল না।

পুলিশ অফিসারকে তার জানালার দিকে আসতে দেখে ডাক্তার সোহনী নিজেই বলে উঠল, 'কিছু ঘটেছে অফিসার?'

'না, ম্যাডাম। ইমারজেন্সী চলছে তো। তাই রুটিন চেকিং হচ্ছে। হাজী সাহেবের বাড়িতে সাধারণের যাওয়াটা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। হাজী সাহেবের বাড়ি থেকে আপনাকে 'কল' করা হয়েছে বুঝি?' বলল পুলিশ অফিসার।

'প্রতি মাসের রুটিন চেকিং বেগম সাহেবার।'

'বুঝেছি।' বলে একটু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে নোট বুক ও কলম বের করে বলল, 'মাফ করবেন, শুধু নিয়ম রক্ষার জন্যে। ম্যাডামের নাম কি?'

'ডাক্তার নন্দিতা। পোর্ট ব্লেয়ার গভর্নমেন্ট হাসপাতাল।'

'ধন্যবাদ। এই যথেষ্ট।' বলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'যাও সিংজী।'

আহমদ মুসা গাড়ি ষ্টার্ট দিল। সে রিয়ার ভিউতে দেখল, গাড়ির নাম্বারও টুকে নিচ্ছে পুলিশ অফিসারটি।

'অফিসার গাড়ির নাম্বারও লিখে নিচ্ছে ডাক্তার সোহনী।' আহমদ মুসা বলল।

ডাক্তার সোহনী এক পলক পেছনে তাকিয়ে বলল, 'ধন্যবাদ সিংজী। এখন বুঝতে পারছি গাড়ির নাম্বার ও আমার নাম বদলানো কত গুরুত্বপূর্ণ। যাক ফাঁড়াটা কেটে গেছে।'

'কাটলেই ভালো'। বলল আহমদ মুসা।

কিন্তু কাটলো না।

হাজী সাহেবের বাড়ির বাউন্ডারি প্রাচীরের গেটে গাড়ি পৌছাতেই সাদা পোশাকের একজন লোক ভূতের মত উদয় হয়ে গাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল।

গেটের সামনে এসে গাড়ি আগেই দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

লোকটি সোজা গিয়ে ডাক্তার সোহনীর জানালায় গিয়ে দাঁড়াল।

ডাক্তার সোহনী আগের মতই খবরের কাগজ পড়ছিলেন। খবরের কাগজে তার মুখ ঢাকা।

সাদা পোশাকধারী লোকটি দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে মুখের সামনে থেকে কাগজটা একটু সরিয়ে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল লোকটির দিকে।

আগের মতই ডাক্তার সোহনী বাম পাশের বাম দিকের চোখ ও গাল প্রায় ঢেকে দিয়েছে।

ডাক্তার সোহনীকে তার দিকে চাইতে দেখেই সাদা পোশাকের লোকটি পকেট থেকে একটা আইডি কার্ড বের করে ডাক্তার সোহনীর সামনে তুলে ধরে বলল, 'আমি গোয়েন্দা বিভাগের লোক। আমার উপর নির্দেশ আছে যে বা যারাই ভেতরে হাজী পরিবারের সাথে দেখা করতে বা কোন কাজ নিয়ে যান, তাদের সাথে থাকতে। আশা করি, আপনারা আমাকে সাহায্য করবেন।'

তার কথার উত্তর না দিয়ে ডাক্তার সোহনী ডাকল আহমদ মুসাকে, 'সিংজী।'

সঙ্গে সঙ্গেই আহমদ মুসা বলল, 'ইয়েস ম্যাডাম।'

তারপর পেছন দিকে না ফিরেই আহমদ মুসা গোয়েন্দার উদ্দেশ্যে বলল, 'ওয়েলকাম। আসুন স্যার। সামনে এসে বসুন।'

কথাগুলো বলছিল আহমদ মুসা আর পকেট থেকে ছোট একটা সেন্টের শিশি বের করে তার পাশের সিটের সামনে ড্যাশ বোর্ডের উপর রাখছিল।

আহমদ মুসা গোয়েন্দাকে তার পাশে এসে বসার আমন্ত্রণ জানালে ডাক্তার সোহনীর মুখ ম্লান হয়ে গেল। আহমদ মুসা যে জন্যে যাচ্ছে, সেই কাজ সে গোয়েন্দার সামনে কিভাবে করবে? তাদের মিশনটাই ব্যর্থ হয়ে গেল বোধ হয়। মনটা খারাপ হয়ে গেল ডাক্তার সোহনীর।

আহমদ মুসার আহ্বান পেয়ে গোয়েন্দা এসে গাড়ির দরজা খুলে আহমদ মুসার পাশের সিটে বসে বলল, 'ধন্যবাদ সিংজী।'

'ওয়েলকাম স্যার।' বলল আহমদ মুসা।

প্রবেশের গেটটা বন্ধ ছিল। কিন্তু গেটম্যান গেট বক্সে বসে জানালা দিয়ে সব ব্যাপারই দেখছিল ও শুনছিল।

গোয়েন্দা লোকটি গাড়িতে উঠে বসলে গেটম্যান আর কোন কথা না বলে ভেতর থেকে দরজাটা খুলে দিল।

গেটের পরেই একটা পাথুরে মসৃণ রাস্তা সোজা এগিয়ে গাড়ি বারান্দায় গিয়ে শেষ হয়েছে। রাস্তার দু'পাশ বরাবর ফুল গাছের সারি। আর রাস্তার দুদিক থেকে শুরু হয়ে বাড়িটার চারদিকের বিশাল এলাকা জুড়ে বিশাল ফলের বাগান। চারদিকের সবুজ সমুদ্রের মাথায় টিলার সাদা বাড়িটাকে অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে।

গেট থেকে গাড়ি বারান্দার দূরত্ব ২০০ গজের কম হবে না।

গাড়ি চলছে গাড়ি বারান্দার দিকে।

পথের মাঝখানে এসে আহমদ মুসা গোয়েন্দাকে লক্ষ্য করে বলল, 'মাফ করবেন স্যার, ড্যাশ বোর্ডের উপরের সেন্টের শিশিটি কি আমাকে দেবেন?'

কোন কথা না বলে গোয়েন্দা লোকটি তার সামনের ড্যাশ বোর্ড থেকে সেন্টের শিশি তুলে নিল। চোখের সামনে ধরে বলল, 'প্রিন্সেস।' তারপর নিচের টাইটেল লাইনে দেখল, 'অ্যা প্রডাক্ট অব প্যারিস'। পড়েই হাঁ করে বলে উঠল, 'প্রিন্সেস ব্রান্ড। তাও আবার প্যারিসের। একবার না শুঁকে দিচ্ছি না সিংজী।'

বলেই গোয়েন্দা লোকটি শিশির ছিপি খুলে মহানন্দে নাকে ধরল। সঙ্গে সঙ্গেই তার মাথাটি সিটের উপর ঢলে পড়ল। তার হাত থেকে শিশিটি পড়ে যাচ্ছিল। আহমদ মুসা বাঁ হাত দিয়ে শিশিটা ধরে ফেলল এবং চাপ দিয়ে ছিপি লাগিয়ে দিল।

গোয়েন্দাটির দেহ গাড়ির সিটে ঢলে পড়ল।

'কি হল? গোয়েন্দা লোকটির কি হল জনাব?' পেছনের সটি থেকে উদ্বিগ্ন কণ্ঠ ডাক্তার সোহনীর।

'সে জ্ঞান হারিয়েছে।' বলল আহমদ মুসা।

'কেন? কিভাবে? শিশিতে তাহলে কি কোন হার্ড ক্লোরোফরম ছিল?'

'জি, হ্যাঁ। ফাঁদ পেতেছিলাম। সে ফাঁদে ধরা পড়েছে সে।'

‘ও গড! এমন ঘটনার জন্যেও আপনি প্রস্তুত ছিলেন? কি করে জানলেন এই ঘটনা ঘটবে?’

‘কিছুই জানতাম না। আমার কাছে যেমন রিভলবার আছে, তেমনি এই ক্লোরোফরমও রয়েছে। প্রয়োজনে ব্যবহার করেছি মাত্র।’

‘আলহামদুলিল্লাহ। আপনার ক্ষেত্রে ‘অবিশ্বাস্য’ শব্দ প্রযোজ্য নয়। কিন্তু গোয়েন্দা লোকটিকে এখন কি করবেন?’

‘যাবার সময় কোথাও রেখে যাবো। এখন সিটেই বসে থাকবে।’

গাড়ি বারান্দায় পৌছে আহমদ মুসা ও ডাক্তার সোহনী গাড়ি থেকে নামল। গাড়ি লক করে আহমদ মুসা দৌড় দিয়ে বারান্দায় উঠল। পেছনে পেছনে ডাক্তার সোহনী।

বাড়ির ভেতরে প্রবেশের দরজাটার সামনে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

‘বলে তো আসা হয়নি। বেগম হাজী সাহেব দরজা খুলবেন তো?’ বলল ডাক্তার সোহনী।

‘বেগম সাহেবার জন্যে সংকেত আছে। তিনি বুঝবেন, অসুবিধা হবে না।’

বলে আহমদ মুসা কলিং বেলে তিন বারে এক, দুই ও তিন সংখ্যায় মোট ৬ বার চাপ দিল।

তারপর পাঁচ সেকেন্ডের মত অপেক্ষা।

কলিংবেল কথা বলে উঠল, ‘আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম, বাছা। এস।’

সঙ্গে সঙ্গেই দরজার অটোলক শব্দ করে খুলে গেল।

প্রবেশ করল আহমদ মুসা এবং ডাক্তার সোহনী।

সবই চেনা আহমদ মুসার।

ভেতরে ঢুকে গেল আহমদ মুসা।

ভেতরের ফ্যামিলী ড্রইংরুমে বসেছিল বেগম হাজী হাসনা আবদুল্লাহ।

আহমদ মুসাদের দেখেই উঠে দাঁড়াল হাজী হাসনা বেগম আবদুল্লাহ এবং এগিয়ে এল।

আহমদ মুসাকে কাছে টেনে নিয়ে মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, 'আল্লাহর পর তোমাকেই আমি স্মরণ করছিলাম। আল্লাহর শোকর যে তোমাকে পেয়ে গেছি। তুমি এলে কেমন করে। বুঝতে পারছি তোমাকে আটকাবার জন্যেই ওরা পোর্ট ব্লেয়ারে কারফিউ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে।'

একটা দম নিয়ে বেগম হাজী হাসনা ডাক্তার সোহনীকে দেখিয়ে বলল, 'কে এ বাছা?'

'ইনি ডাক্তার সোহনী। এর ড্রাইভার সেজে সহজেই আসা সম্ভব হয়েছে। উনি আপনাকে চেকও করবেন। তাহলে ওর আসাটাও সার্থক হবে।'

'ধন্যবাদ মা। অবশ্যই মা আমাকে দেখবে।'

বলে বেগম হাজী হাসনা আবদুল্লাহ দুজনকে টেনে নিয়ে সোফায় বসল।

বসেই আহমদ মুসা বলল, 'প্রথমে কাজের কথা সেরে নেই আম্মা। আপনার কোন নির্দেশ-উপদেশ আছে কিনা আগে বলুন।'

'তোমাকে বলার সবচেয়ে জরুরি বিষয় হল, হাজী সাহেবকে আটকে রাখার কথা সরকার অস্বীকার করছে। প্রথম দিকে নিচের অফিসাররা স্বীকার করলেও তারা এখন বলছে, খবরটা ভুল বুঝাবুঝির ফল ছিল। এই অস্বীকার করার কারণ খারাপ কিছু ঘটে থাকতে পারে বলে আমার ভয় হচ্ছে।'

থেমে গেল বেগম হাজী হাসনা আবদুল্লাহ। কান্নায় রুদ্ধ হয়ে গেছে তার কণ্ঠ।

'ধৈর্য ধরুন আম্মা। খারাপ কিছু ঘটার পেছনে যুক্তি নেই। এমন কিছু ঘটতে পারে না।' নরম কণ্ঠে সান্তনার সুরে বলল আহমদ মুসা।

চোখ মুছে বেগম হাজী হাসনা আবদুল্লাহ বলল, 'তাহলে আটক রাখার কথা অস্বীকার করছে কেন?'

'অন্য কোন কারণ থাকতে পারে। আমি এ ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছি আম্মা। আপনি চিন্তা করবেন না। বলুন, আর কি কথা আছে।'

'আমি তাঁর ফাইল ঘাঁটতে গিয়ে পোর্ট ব্লেয়ারের গোয়েন্দা আটক কেন্দ্রগুলোর একটা তালিকা পেয়েছি। ওটা তোমার কাজে লাগবে বলে আমার মনে হয়েছে। আমার তৃতীয় কথা হল, মার্কিন রাষ্ট্রদূতের দেয়া তার অয়্যারলেস

মোবাইল নাম্বারটা হারিয়ে গিয়েছিল। ওটা পেয়েছি। উনি তোমার সাথে কথা বলার জন্যে উদগ্রীব।'

থামল বেগম হাজী হাসনা আবদুল্লাহ এবং হাতের ছোট্ট ব্যাগ থেকে একটা ছোট্ট কার্ড বের করে আহমদ মুসার হাতে দিয়ে বলল, 'মার্কিন রাষ্ট্রদূতের নাম্বার এতে রয়েছে।'

'পোর্ট ব্লেয়ারে গোয়েন্দাদের আটক কেন্দ্রগুলোর তালিকা?' আহমদ মুসা বলল।

'তোমার হাতের কার্ড দেখনি। দেখ। ওটা আমাদের হোটেলের একটা অ্যাড্রেস কার্ড। কার্ডটা একটু পুরু। একটু চেষ্টা করলেই কার্ডের দুটি লেয়ার আলাদা হয়ে যাবে। বেরিয়ে পড়বে সুপার ফাইল ফোল্ড করা একখ- কাগজ। ঐ কাগজে টেলিফোন নাম্বারটাও পাবে এবং ঐ তালিকাও পাবে।' বলল বেগম হাজী হাসনা আবদুল্লাহ।

আহমদ মুসা কার্ডের দিকে একবার তাকিয়ে বলল, 'ধন্যবাদ আম্মা।'

'এখন বল তোমার কথা।' বলল বেগম হাজী আবদুল্লাহ।

'আমার জানার বিষয়ও আপনার কথায় পেয়ে গেছি। আমি ভেবেছিলাম হাজী সাহেব কোথায় কোন জেলে আপনি জানেন। এখন দেখছি, সরকার তাকে আটক রাখার কথাই অস্বীকার করছে। আরেকটা বিষয় ছিল মার্কিন রাষ্ট্রদূতের অয়্যারলেস টেলিফোন নাম্বার খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করা। সেটা তো পেয়েই গেলাম। এখন আপনার স্বাস্থ্য চেক করা বাকি।' আহমদ মুসা বলল।

পরিচারিকা এ সময় ট্রলি ঠেলে নাস্তা নিয়ে প্রবেশ করল।

বেগম হাজী আবদুল্লাহ ট্রলিটি টেনে নিয়ে বলল, 'এস বাছা, এস মা। আমি দশ মিনিট আগে নাস্তা করেছি। এখন তোমাদের একাই নাস্তা করতে হবে।'

নাস্তা সেরে ডাক্তার সোহনী বলল বেগম হাজী আবদুল্লাহকে, 'সত্যি মা আমি আপনার ব্লাডপ্রেসার, ডায়াবেটিস এবং হার্ট পরীক্ষা করব। ব্লাডপ্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষা এখানেই করছি। হার্টের ইসিজি করব আপনাকে আপনার বেডে নিয়ে।'

পরীক্ষা-নীরিক্ষা শেষ হলে আহমদ মুসা বলল, বেগম হাজী আবদুল্লাহকে, ‘আম্মা এবার আমাদের উঠতে হবে। বেশি সময় থাকলে পুলিশের সন্দেহ হতে পারে।’

‘অবশ্যই যাবে বাছা। মাকে তুমি কি সান্তনা দিয়ে যাবে বল।’

‘আমার বিশ্বাস আম্মা, হাজী সাহেবকে ওরা কোন জেলে রাখেনি। গোয়েন্দাদের আটক কেন্দ্রেই তিনি বন্দী আছেন। আমি সব জায়গাতেই খুঁজবো। সুষমা রাও-ও কিডন্যাপড হয়েছে। আমার অনুমান তাকেও হাজী সাহেবের মত কোন গোয়েন্দা আটক কেন্দ্রে আটকে রাখা হয়েছে। লিষ্টটা পাওয়ায় তাকে খোঁজাও সহজ হয়ে গেল। অপেক্ষা করুন। আল্লাহর সাহায্য আমাদের বিজয়ী করবে।’

‘আমিন। আল্লাহ তোমার কথাকে সত্য করুন।’ বলল বেগম হাজী আবদুল্লাহ।

‘আম্মা, এখন বাড়িতে আপনার পরিচারিকা ছাড়া আর কেউ আছে?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘নেই।’ বেগম হাজী আবদুল্লাহ বলল।

‘এখন আমাকে একটা নাটক করতে হবে মা।’ বলল আহমদ মুসা।

‘নাটক? কেন? কিসের নাটক?’ বলল বেগম হাজী আবদুল্লাহ।

‘আপনাকে ও পরিচারিকাকে ক্লোরোফরমে সংজ্ঞাহীন করে এই ড্রইং রুমে ফেলে রাখতে চাই। আর আপনার সিন্দুকের কাগজ-পত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ফেলে রাখতে চাই এবং টাকা পয়সা গায়েব করতে চাই। সিন্দুকের..........।’

আহমদ মুসাকে বাধা দিয়ে বেগম হাজী আবদুল্লাহ বলে উঠল, ‘কি কারণে, কেন এসব করবে?’ তার চোখে-মুখে বিস্ময়।

‘আপনাকে সন্দেহ থেকে বাঁচাবার জন্যে। আমরা আসার সময় একজন গোয়েন্দাকে সংজ্ঞাহীন করে এখানে এসেছি। তা না হলে সেও আমাদের সাথে আসত এবং তার সামনেই আমাদের কথা-বার্তা বলতে হতো।’ থামল একটু আহমদ মুসা।

সেই ফাঁকেই বেগম হাজী আবদুল্লাহ বলল, ‘বুঝলাম। কিন্তু আমাদের উপর সন্দেহ করবে কেন?’

‘শুধু সন্দেহ প্রথম সুযোগেই তারা আপনাকে গ্রেফতার করবে।’

‘কেন? কি কারণে?’ উদ্বেগভরা কণ্ঠে বলল বেগম হাজী আবদুল্লাহ।

‘যখন একজন গোয়েন্দাকে সংজ্ঞাহীন করে আমরা এখানে এসেছি, তখন স্বাভাবিকভাবেই ওরা বুঝবে আমরা ডাক্তার হওয়ার যে পরিচয় দিয়েছি এবং আপনাকে চেক করতে আসার যে কথ বলেছি তা ঠিক নয় এবং আপনার সাথে দেখা করার জন্যেই এই কৌশল নিয়েছিলাম। তারা সন্দেহ করবে এই যোগসাজশে আপনিও জড়িত আছেন। সুতরাং আপনার কাছ থেকে তারা জানার চেষ্টা করবে, আমরা করা। এমনকি তারা আপনাকে এই অজুহাতে গ্রেফতারও করতে পারে। এখন আমরা যদি আপনাকে বেঁধে ও সংজ্ঞাহীন করে যাই এবঙ আপনার সিন্দুক লুট করি, তাহলে আপনাকে সন্দেহ করার তাদের কোন অবকাশ থাকবে না।’

মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল বেগম হাজী আবদুল্লাহর। বলল, ‘ঠিক বলেছ বাছা। তোমার এত বুদ্ধি! আল্লাহ তোমাকে আরও উন্নতি দিন।’

একটু থামল। থেমেই আবার বলে উঠল, ‘তোমরা বস আমি একটু আসি। শরিফাকে সব বুঝিয়ে বলি। পুলিশকে কি বলতে হবে সেটা তার ভালোভাবে বুঝা দরকার। নাস্তার এসব আয়োজনও তাকে সরিয়ে ফেলতে হবে।’

বলে ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে গেল বেগম হাজী আবদুল্লাহ।

কয়েক মিনিট পরে ফিরে এল। বলল, ‘হ্যাঁ আমরা রেডি। ভল্ট মানে সিন্দুক চল খুলে দেই।’

‘না আম্মা, সিন্দুক আপনি খুলবেন না। আমি লেসার কাটার দিয়ে সিন্দুক খুলে সিন্দুক লুট করব।’

‘ঠিক আছে। লকটা নষ্ট হবে অবশ্য। সিন্দুকে কিছুই নেই। আছে মাত্র কিছু চেক বই, ব্যাংক সার্টিফিকেট, শেয়ার সার্টিফিকেট এবং জমি ও ব্যবসায়ের কিছু দলিল দস্তাবেজ। ওগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকলে বা নষ্ট হলে কোন ক্ষতি নেই।’

‘ঠিক আছে।’ বলে আহমদ মুসা এ্যাকশন শুরু করল। বেগম হাজী আবদুল্লাহকে তার বেডরুমে চেয়ারের সাথে বাঁধল। পরিচারিকা শরিফাকে সংজ্ঞাহীন করে বাইরের প্রবেশ দরজার কাছে ফেলে রাখল। বেগম হাজী আবদুল্লাহকে সংজ্ঞাহীন না করে বড় স্কচ টেপ তার মুখে সেঁটে মুখ বন্ধ করে দিল। তারপর তার চোখের সামনে লেসার কাটার দিয়ে সিন্দুকের লক কেটে ভেতরের সব কাগজপত্র টেনে বের করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলল। তারপর ‘আম্মাজী আমরা চললাম, দোয়া করবেন’ বলে ডাক্তার সোহনীকে ডেকে নিয়ে ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। যেন সত্যিই সে এক দস্যুতার কাজ সম্পন্ন করল।

বাইরে বেরিয়ে এসে বাড়িতে প্রবেশের দরজাটিরও লক লেসার কাটার দিয়ে ওপেন করে রাখল।

আহমদ মুসা ও ডাক্তার সোহনী নেমে এল গাড়ি বারান্দায়। একটু দূরে বাইরের গেটের দিকে নজর পড়তেই বিস্মিত হল আহমদ মুসা। গেটটি একেবারে খোলা। তাড়াতাড়ি গাড়ির ভেতরে তাকাল আহমদ মুসা। সংজ্ঞাহীন গোয়েন্দা তার সিটে নেই। গাড়ির দরজা টান দিয়েই আহমদ মুসা বুঝল কি ঘটেছে।

ভ্রুকুঞ্চিত হল আহমদ মুসার। বলল, ‘ডাক্তার সোহনী আমরা ধরা পড়ে গেছি।’

ডাক্তার সোহনী আহমদ মুসার চেহারার পরিবর্তন লক্ষ্য করছিল। সেও খারাপ কিছু আশংকা করছিল। আহমদ মুসার কথা শুনে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ডাক্তার সোহনী বলল, ‘সংজ্ঞাহারা গোয়েন্দাটি গাড়িতে নেই দেখছি। ধরা পড়ে গেছি মানে ওরা কি আমাদের চিনে ফেলেছে?’

‘চিনে ফেলেনি। তবে জেনে ফেলেছে যে আমাদের পরিচয় ভুয়া।’

‘তাহলে?’

‘আমার মনে হয় সংজ্ঞাহীন গোয়েন্দাকে ওরা চিকিৎসার জন্যে নিয়ে গেছে। সম্ভবত সংখ্যায় দুই একজনের মত ছিল বলে তারা ভেতরে প্রবেশ করেনি। কিন্তু হয় তারা এখন বাইরে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে, নয়তো ওরা প্রস্তুত হয়ে আসার পথে।’

উদ্বেগ-আতংকে মুখ পাংশু হয়ে গেল ডাক্তার সোহনীর। কথা বলতে পারল না।

'স্যরি ডাক্তার সোহনী, আপনাকে আমি বিপদে ফেলেছি। কিন্তু আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন।'

বলে আহমদ মুসা গাড়ি থেকে তার ব্যাগটি বের করে নিল। বলল ডাক্তার সোহনীকে লক্ষ্য করে, 'আপনি গাড়িতে উঠে বসুন। ভয় করবেন না, ওদের চোখে ধুলা নয় ধুঁয়া নিক্ষেপ করে ঠিকই আমরা চলে যেতে পারব।'

'আল্লাহ সাহায্য করুন।' বলে ডাক্তার সোহনী গাড়িতে উঠে বসল।

আহমদ মুসা ছোট মার্বেলাকৃতির ছয়টি স্মোক বোম ভরল মোটা নলের পেট মোটা এক রিভলবারে।

এটা পাওয়ারফুল উৎক্ষেপক যন্ত্র। রিভলবারের মতই একাধিক্রমে ছয়বার ট্রিগার টেপা যায়। ছয় বারে ছয়টি স্মোক বোম ৫০ গজ পর্যন্ত দূরে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গেই দশ বর্গগজ এলাকা জুড়ে ধুঁয়ার দেয়াল সৃষ্টি করতে পারে।

স্মোক বোম রিভলবার নিজের সিটের উপর রেখে আহমদ মুসা গাড়ির খুলে রাখা নাম্বার প্লেট বের করে নিল এবং গাড়িতে লাগানো নাম্বার প্লেট খুলে সামনে পিছনে দু'দিকেই আগের নাম্বার প্লেট লাগিয়ে নিল।

আহমদ মুসা ড্রাইভিং সিটে এসে বসল।

'এখনই যে আগের নাম্বার লাগিয়ে ফেললেন? ওরা তো দেখে ফেলবে।' ডাক্তার সোহনী বলল।

'এখন আর ওরা গাড়ির নাম্বার দেখবে না। গাড়ি সমেত আমাদের ধ্বংস করার চেষ্টা করবে। আগের নাম্বারটা এখন লাগালাম, কারণ ওরা ইতিপূর্বে গাড়িতে যে নাম্বার লাগানো ছিল তা সবাইকে জানিয়ে দিয়েছে, অথবা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই জানিয়ে দিতে পারে। সুতরাং পুলিশের চোখ থাকবে গাড়ির পূর্বের নাম্বারের দিকে, এই নাম্বার লাগানোর ফলে আমরা নিরাপদে চলে যেতে পারব।'

'সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি আপনাকে এমন দুরদৃষ্টি দিয়েছেন।'

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা মাথার পাগড়ি ও দাড়ি খুলে ফেলল। শুধু গোঁফটাই থেকে গেল।

পাশের জানালা পুরোটাই খুলে ফেলল।

বাম হাত ষ্টিয়ারিং-এ রেখে ডান হাতে তুলে নিল স্মোক বোমের রিভলবারটি।

ষ্টার্টার অন করার আগে আহমদ মুসা বলল, 'ডাক্তার সোহনী আপনি সিটে শুয়ে পড়ুন এবং সিটের প্রান্ত ভালোভাবে ধরে রাখুন।'

আহমদ মুসা সামনে তাকিয়ে হিসেব করে নিল। বাগানের মাঝ বরাবর গিয়ে গেটের ওপাশে প্রথম স্মোক বোমার বিস্ফোরণ ঘটাবে। তারপর রাস্তার প্রথম বাঁকে আরও দুটি। পরে দরকার মনে করলে সিদ্ধান্ত নেবে।

গাড়ি ষ্টার্ট দিল আহমদ মুসা। যতটা সম্ভব গতি বাড়াতে লাগল।

গাড়ি ষ্টার্টের শব্দ গেটের ওপাশে পৌছে গেছে। গাড়ি বাগানের মাঝ বরাবর আসতেই চার জন পুলিশ তাদের সাবমেশিনগান বাগিয়ে গেটে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের মধ্যে একজন সেই পুলিশ অফিসার যার সাথে, আহমদ মুসারা কথা বলেছিল।

দেখার পর পলকমাত্র দেরি করেনি আহমদ মুসা। ট্রিগার টিপেছে স্মোক বোম রিভলবারের। ওরাও দেখতে পেয়েছে আহমদ মুসার ট্রিগার টেপা। ওরাও তাদের হাতের সাবমেশিনগান তুলছিল। কিন্তু সেই সময়েই তাদের মাঝখানে গিয়ে বিস্ফোরিত হল স্মোক বোম।

স্মোক বোমা বিস্ফোরণের পর পরই আহমদ মুসার গাড়ি তীব্র বেগে এগিয়ে গেল গেটের দিকে।

গেটে পৌছেই আহমদ মুসা তিরিশ চল্লিশ গজের ব্যবধানে আরও একটি স্মোক বোমার বিস্ফোরণ ঘটাল।

আহমদ মুসার গাড়ি গেট থেকে তিরিশ চল্লিশ গজ দূরে দ্বিতীয় বিস্ফোরণের জায়গায় পৌছাতেই পেছন থেকে বৃষ্টির মত গুলী ছুটে এল তার গাড়ির দিকে।

প্রথম স্মোক বোমা বিস্ফোরণের পর পুলিশ চারজন নিশ্চয় আতংকিত হয়ে পড়েছিল। বোমাটি যে নির্দোষ স্মোক বোমা এটা বুঝতে তাদের একটু সময় লেগেছিল। তারা বুঝে উঠে আক্রমণের জন্যে তৈরি হওয়া পর্যন্ত আহমদ মুসা গেট থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ গজ দূরে চলে এসেছিল।

ধুয়ার মধ্যে থেকে লক্ষ্যহীনভাবে ছোড়া পুলিশের গুলীর দু'একটি পেছনের গার্ডারে আঘাত করলেও গাড়ির কোন ক্ষতি হয়নি।

সামনে আর কোন পুলিশ দেখতে পেল না আহমদ মুসা। তাই স্মোক বোমার ব্যবহার আর করল না।

'আলহামদুলিল্লাহ। মাত্র চারজন পুলিশ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল ডাক্তার সোহনী। মনে হয় আরও দু'একজন পুলিশ ছিল তারা সংজ্ঞাহীন গোয়েন্দাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। এখনো নতুন পুলিশ এসে পৌছায়নি। মনে হয় সংজ্ঞাহীন গোয়েন্দাকে তারা বেশি আগে খুঁজে পায়নি।' বলল আহমদ মুসা।

'সামনে আরও পুলিশ থাকতে পারে।' বলল ডাক্তার সোহনী।

'থাকলে ক্ষতি নেই। সেই নাম্বারের গাড়ি, সেই শিখ ড্রাইভার এবং সেই ডাক্তার কাউকেই তারা পাবে না। আপনি এখনও ডাক্তারের এপ্রন খোলেননি। খুলে ফেলুন।' আহমদ মুসা বলল।

সত্যিই কোথাও আর পুলিশ তাদের আটকালো না।

ডাক্তার সোহনীর মুখে স্বস্তি ও হাসি ফিরে এসেছে। সহজ হয়ে বসে বলল, 'আমি কৌতুহল বশতই আপনার অভিযানে অংশ নিয়েছিলাম। কিন্তু জীবনের সবচেয়ে বড় অভিজ্ঞতা লাভ আজ আমার হল। আপনার সম্পর্কে শত কথা শুনেছিলাম। কিন্তু আজ আপনার সঙ্গী হয়ে দেখলাম, কোন বর্ণনাই আপনাকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়।'

প্রসঙ্গটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল আহমদ মুসা। বলল, 'ওল্ড সেন্ট্রাল মেডিকেল ষ্টোর', 'ওল্ড পুলিশ হেডকোয়ার্টার', 'শয়তানের সীমান্ত', 'পূর্বানী', 'আসু আশ্রম' এবং 'কালী বাড়ি'-এসব কি কোথায় আপনি জানেন?'

নামগুলো শুনেই হাসতে লাগল ডাক্তার সোহনী। বলল, 'নামগুলো আপনি কোথায় পেলেন? এক জায়গায় কিভাবে নামগুলোকে একত্র করলেন?'

‘জায়গাগুলো আমার জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাকে সাহায্য করুন প্লিজ।’ বলল আহমদ মুসা।

‘স্থানগুলোর সবই একদিক দিয়ে ঐতিহাসিক। স্থানগুলোর স্থাপনাসমূহ পরিত্যক্ত ঘোষিত। সরকারের পূর্ত বিভাগ এ স্থানগুলোর দায়িত্বে রয়েছে।’ বলল ডাক্তার সোহনী।

‘স্থানগুলো সম্পর্কে আমি আরও বিস্তারিত জানতে চাই।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমি আপনাকে কিছু সাহায্য করতে পারব। বেশি সাহায্য পাবেন পোর্ট ব্লেয়ার মিউজিয়াম থেকে।’ বলল ডাক্তার সোহনী।

‘ধন্যবাদ।’ বলল আহমদ মুসা।

‘কি ব্যাপার, আপনি চিনতে পারেননি। বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন তো!’ বলল দ্রুত কণ্ঠে ডাক্তার সোহনী।

‘স্যরি। মনটা অন্যদিকে ছিল। আশে পাশে তাকানো হয়নি।’

বলে আহমদ মুসা গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরে এল। গেট দিয়ে প্রবেশ করল ভেতরে।

# ৪

পোশাক পরে কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল আহমদ মুসা।

পায়ে কেডস পরনে ফুলপ্যান্ট এবং গায়ে জ্যাকেট। মুখে গোঁফ।

বেরিয়েই ‘স্যরি’ বলে আবার তার কক্ষের দিকে চলে গেল।

ড্রইং রুমে বসেছিল সাজনা সিংহাল।

বাইরের দিক থেকে ড্রইংরুমে ঢুকলো সুরূপা সিংহাল। তার স্বামীকে বিদায় দেবার জন্যে সে বাইরে গিয়েছিল। তার স্বামী আনন্দ সিংহাল সরকারের কম্যুনিকেশন ব্যুরোতে কাজ করে। আজ তার নাইট ডিউটি।

সুরূপা সাজনার পাশে বসতে বসতে বলল, ‘ভাই সাহেব বের হননি?’

‘বের হয়েই ‘স্যরি’ বলে আবার ভেতরে গিয়েছেন।’ বলল সাজনা।

‘সত্যিই আমি ভেবে অবাক হই, এ ধরনের একটি বিপজ্জনক অভিযানে বের হচ্ছেন, কিন্তু সাহায্য করার কেউ নেই, এমনকি কিছু হলে পেছনে খোঁজ নেবারও কেউ নেই। অথচ এই কাজে তার নিজের কোন স্বার্থ নেই। হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহ, সুষমা রাও কেউই তাঁর সাথে কোন সম্পর্কিত নয়। সুষমার সাথে আমাদেরই রক্তের সম্পর্ক। কিন্তু আমরা তো তার জন্যে বিন্দুমাত্রও ভাবছি না।’ সুরূপা বলল।

‘আপা, সব সময় কিছু মানুষকে নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে হয়। তারা সমাজ, সভ্যতাকে শুধু দিয়েই যায়, নেয় না কিছু। এই হাতেম তাই, রবিনহুডদের জন্যেই আমাদের সমাজ সভ্যতা টিকে আছে, আপা।’ বলল সাজনা।

‘কিন্তু এজন্যে তো বাঁচা প্রয়োজন, সুস্থ থাকা প্রয়োজন। কিন্তু এ বিষয়ে তার কোন ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। বল, এই রাতে তিনি একা যে কাজে যে জায়গায় যাচ্ছেন, তার কোন যুক্তি আছে? রাতের বেলা জায়গাগুলোই দেখতে

ভয়ংকর, ঐ জায়গাগুলোতে যারা যায় বা থাকে, তারা হবে আরও ভয়ংকর।' সুরূপা বলল।

সাজনা কিছু বলতে যাচ্ছিল।

আহমদ মুসা এসে ড্রইংরুমে প্রবেশ করল।

সুরূপা ও সাজনা উঠে দাঁড়াল। কথা বলল সাজনা, 'আসুন স্যার, বসুন।'

আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বসতে বসতে বলল, 'আমাকে এখনই বেরুতে হবে। সাজনা তুমি আমাকে এক গ্লাস পানি খাওয়াতে পার।'

শুনেই সাজনা এক দৌড়ে গিয়ে এক গ্লাস পানি নিয়ে এল।

'ধন্যবাদ সাজনা।' বলে আহমদ মুসা গ্লাসটি হাতে নিয়ে পানি খেল।

পানি খেয়েই উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা। বলল, 'আসি সুরুপাজী, আসি সাজনা।'

সুরূপা উঠে দাঁড়িয়েছিল। বলল, 'কখন ফিরছেন?' ম্লান কণ্ঠ সুরূপার।

আহমদ মুসা হাঁটতে শুরু করেছিল। ঘুরে দাঁড়াল। হাসল বলল, 'ব্যাংকের চাকরিতে যেমন যাওয়ার সময় আছে, আসার সময় নেই। আমার এ ধরনের কাজের ক্ষেত্রেও তাই। সময় মেপে যাই, কিন্তু ফেরার কোন সময় নেই।'

'হাসতে পারছেন! ভাবনা হচ্ছে না?' বলল সাজনা।

আবার হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'শিকারীর দৃষ্টি শিকারের দিকে থাকতে হয়, নিজের দিকে এলেই সব শেষ।'

'স্যরি, ভাবনার দরকার নেই তাহলে।' বলল সাজনা ম্লান কণ্ঠে।

সাজনার মাথায় একটা টোকা দিয়ে বলল, 'ঠিক, ছোট বোনটি আমার।'

বলেই 'আসি সুরূপা বোন' বলে আবার ঘুরে দাঁড়াল। হাঁটতে শুরু করল।

বেরিয়ে গেল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা বেরিয়ে গেলেও সুরুপা ও সাজনা স্থির দাঁড়িয়েছিল।

সাজনার দু'চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুরূপা সাজনার দিকে তাকাল। দেখলো সাজনার চোখে অশ্রু। সুরূপা ধীরে ধীরে সাজনার কাঁধে একটি হাত রাখল।

মমতার এই স্পর্শে সাজনার চোখের অশ্রু আরও বাড়ল। সে মুখ গুঁজল সুরূপার কাঁধে। বলল, 'আহমদ মুসা আমাকে ছোট বোন বলেছে আপা।' সাজনার চোখে পানি, আর মুখে হাসি। তার কথাগুলো অশ্রু ও আনন্দ মিশ্রিত।

'ওল্ড পুলিশ হেডকোয়ার্টার' থেকে প্রায় আড়াইশ' গজ দূরে ট্যাক্সি থেকে নামল আহমদ মুসা।

এই ওল্ড পুলিশ হেডকোয়ার্টার পোর্ট ব্লেয়ার গোয়েন্দাদের একটি গোপন কারাগার। আহমদ মুসা গত কয়েকদিনের বেগম হাজী হাসনা আবদুল্লাহর কাছ থেকে পাওয়া পোর্ট ব্লেয়ার গোয়েন্দাদের গোপন কারাগারের তালিকায় উল্লেখিত সবগুলো বাড়ি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছে এবং বাড়িগুলোর উপর চোখও রেখেছে। একজন শিল্পপতির ছদ্মবেশে বাড়ি ও জমি কেনার জন্যে ঘুরে বেড়িয়েছে। গোপন কারাগারগুলোর আশে-পাশের পুলিশকে বকশিশ দিয়ে বাড়ির অবস্থা ও পরিচয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছে। তাতে দেখেছে ঐ বাড়িগুলো কোন পারিবারিক বাসভন কিংবা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান নয়। এগুলো পরিত্যক্ত। কিন্তু এগুলোতে লোক থাকে, লোকদের যাতায়াতও দেখা যায়। সুতরাং সরকার বা গোয়েন্দা বিভাগ যে এগুলোকে গোপন কাজে ব্যবহার করছে তা এইসব খবর থেকেও পরিষ্কার হয়ে যায়। পরিত্যক্ত ওল্ড পুলিশ হেডকোয়ার্টারকে বিশেষভাবে সন্দেহের কেন্দ্রে পরিণত করেছে। এখানে লোকজন এমনকি কিছু মহিলারও ব্যস্ত গতিবিধি লক্ষ্য করা গেছে। এ কারণেই আহমদ মুসা এখান থেকেই গোপন কারাগারগুলোতে অনুসন্ধান শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আহমদ মুসা গাড়ি থেকে নামার পর রাস্তা বাদ দিয়ে জঙ্গলাকীর্ণ উঁচু-নিচু টিলা-গর্তপূর্ণ কষ্টকর পথেই বাড়িটিতে পৌছার সিদ্ধান্ত নিল। আহমদ মুসা গোপনে বাড়িটিতে প্রবেশ করতে চায় এবং গোপনে অনুসন্ধান করে দেখতে চায়। তাতে করে প্রতিপক্ষকে অন্ধকারে রাখা সম্ভব হবে। সংঘাত-সংঘর্ষ হলে প্রতিপক্ষ

মনে করবে তাদের গোপন কারাগারগুলো ধরা পড়ে গেছে। সেক্ষেত্রে তারা হাজী সাহেবকে অন্যত্র সরিয়ে নিতে পারে।

আহমদ মুসা রাস্তা থেকে নেমে এল।

তার পরনে কালো প্যান্ট, গায়ে কালো জ্যাকেট এবং মাথায়ও কালো হ্যাট। রাতের অন্ধকারের সাথে সে একদম মিশে গেছে।

চোখে নাইট ভিশন গগলস থাকার পরেও অনেকবার হোঁচট খেয়ে নানা রকম আগাছা ও গাছ-গাছড়ার কষ্টকর বাধা পেরিয়ে বাড়িটির পশ্চিম দিকে অর্থাৎ বাড়ির পেছনে গিয়ে পৌছল। বাড়িটা তিন তলা। বেশ বড়। উপরে নিচে সব মিলিয়ে তিরিশ-চল্লিশটি রুম হবে। বাড়িটার পেছনে কিচেন বা ষ্টোর রুম হতে পারে। এদিকের কিছু অংশ মূল বিল্ডিং থেকে বাড়তি আকারে বেরিয়ে এসেছে। এই অংশটি একতলা।

আহমদ মুসা নিরাপদে বাড়ির গোড়া পর্যন্ত পৌছাতে পেরে খুশি হল।

একতলার এদিকের দেয়ালে একটা জানালা দেখতে পাচ্ছে। এ জানালা পথে কিংবা একতলায় উঠে বাড়িতে প্রবেশের সে চেষ্টা করতে পারে।

আহমদ মুসা নিশ্চিন্ত মনে এই পরিকল্পনা করছিল, ঠিক তখন বাড়িটির তিন তলা থেকে একটা দড়ির মই বেয়ে একতলার অংশের ছাদে নেমে এল একজন লোক। তার গলায় ঝুলানো নাইট ভিশন দূরবিন এবং দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে রাখা রিভলবার।

একতলার ছাদে নেমেই সে বাম হাতে নাইট ভিশন দূরবিন চোখে লাগিয়ে ডান হাতে রিভলবার নিয়ে বিড়ালের মত নিশব্দে হামাগুড়ি দিয়ে ছাদের প্রান্তের দিকে এগোল। এ সময় তার পকেটের মোবাইল বেজে উঠল। সে তাড়াতাড়ি রিভলবার মাটিতে রেখে মোবাইল বের করে কলটি অফ করে দিল। কিন্তু ইতিমধ্যেই মোবাইলে দু'বার রিং হয়েছে।

নিচে জানালায় উঠার জন্যে প্রস্তুতিরত আহমদ মুসা মোবাইলে প্রথম রিং শুনেই চমকে গিয়ে উৎকর্ণ হয়ে উঠল। দ্বিতীয় রিং শুনেই সে নিশ্চিত হয়ে গেল, রিং টোন জানালা দিয়ে অর্থাৎ ঘরের ভেতর থেকে নয় একতলার ছাদের উপর থেকে আসছে। তাহলে ছাদের উপর লোক আছে নিশ্চয়। সে কি আগে থেকেই

ছিল, না কেউ দেখতে পেয়ে তাকে টার্গেট করেছে। কিন্তু ছাদেকেন। পরক্ষণেই তার মনে হল, ছাদে বসে নিশ্চয় তারা নাইট ভিশন দূরবিন চোখে লাগিয়ে চারদিকে চোখ রাখছিল। নিশ্চয় সে দেখতে পেয়েছে যে আহমদ মুসা বাড়ির পশ্চিম দিক দিয়ে একতলার নিচে এসে দাঁড়িয়েছে। এটা দেখেই সে তার দিকে এগিয়ে আসছে। এই চিন্তা করেই আহমদ মুসা দ্রুত একতলার দেয়ালের সাথে সেঁটে গিয়ে দেয়াল ঘেঁষে বাড়ির উত্তর পাশের দিকে এগোল। আহমদ মুসা ভাবল, লোকটি নিশ্চয় এক তলার নিচে বা পেছন এলাকায় তাকে খুঁজবে অথবা ছাদে ওঁৎ পেতে তার অপেক্ষা করবে।

আহমদ মুসা এক তলার বর্ধিত অংশ পার হয়ে ফাঁকা জায়গায় দাঁড়াল। যেন এখান থেকে এক তলার ছাদটা পরিষ্কার দেখা যায়। আহমদ মুসা দেখল একজন লোক ছাদের পশ্চিম প্রান্তে বসে চোখে দূরবিন লাগিয়ে পশ্চিম পাশটাকে তন্ন তন্ন করে দেখছে। আহমদ মুসা বুঝল তাকেই খুঁজছে। আহমদ মুসার চোখেও নাইট ভিশন গগলস।

আহমদ মুসা একতলা অংশের উত্তরের দেয়ালে পাইপ দেখতে পেল।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল আহমদ মুসা।

শিকারীর মত সতর্ক পায়ে ছুটল সে পানির পাইপের দিকে।

পানির পাইপ বেয়ে ছাদের কাছ বরাবর উঠে দেয়ালের বাইরে এগিয়ে আসা কার্নিস ধরে ঝুলে পড়ল এবং এক ঝটকায় দুহাতে ভর দিয়ে লাফিয়ে উঠে দেহের উপরের অর্ধেকটাকে ছাদে শুইয়ে দিয়ে পেছনটাকে ছাদে তুলে নিল। দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে রাখা রিভলবার হাতে নিয়ে দ্রুত গড়িয়ে এগোতে লাগল লোকটির দিকে।

আহমদ মুসা লোকটির দুগজের মধ্যে আসার পর সে টের পেয়েছে।

পেছনে শব্দ পাওয়ায় লোকটি বোঁ করে ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

আহমদ মুসাও লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে রিভলবার তার দিকে উদ্যত করে।

লোকটির এক হাতে দূরবিন, অন্য হাতে রিভলবার। কিন্তু রিভলবার ধরা হাতটি নিচে ঝুলে আছে, আর দূরবিন ধরা হাতটা চোখ বরাবর উঁচুতে ধরে নেয়া।

লোকটি আকস্মিক এই আক্রমণের মুখে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। তার কপাল বরাবর ধরে রাখা আহমদ মুসার রিভলবারের সামনে সে রিভলবার তুলতে পারছিল না।

আহমদ মুসা লোকটির দিকে রিভলবার ধরে রেখে কয়েক ধাপ এগিয়ে লোকটির হাত থেকে রিভলবার কেড়ে নিল এবং তার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। লোকটির মাথায় রিভলবার ঠেকিয়ে বলল, 'আমি এক প্রশ্ন দুবার করবো না। প্রশ্ন করে আমি তিন পর্যন্ত গুনব। এর মধ্যে উত্তর না পেলে তোমার মাথায় গুলী ভরে দেব।'

লোকটি ভয়ে একদম চুপসে গেছে। তার মুখ-চোখ থেকে মৃত্যু ভয় ঠিকরে পড়ছে।

'তোমাদের এ গোপন কারাগারে কাকে বা কাদেরকে বন্দী করে রাখা হয়েছে?'

প্রশ্ন করেই আহমদ মুসা গুণতে শুরু করেছে। এক........, দুই........, তিন...। 'তিন' সংখ্যা উচ্চারণ শুরু করতেই সে বলল, 'কাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে, নাম জানি না। একটি মেয়ে বন্দী আছেন।'

'একটি মেয়ে?' আপনাতেই প্রশ্নটি বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে। ভাবছিল সে, মেয়েটি কি সুষমা রাও?'

'হ্যাঁ, একটি মেয়ে। ভেতরে মেয়েরাই তার পাহারায় আছে।'

'ভেতরে কজন পাহারাদার আছে? হাজী আবদুল্লাহকে কোথায় আটকে রেখেছে?'

'পাঁচজন মেয়ে গোয়েন্দা ও দুজন ছেলে পুলিশ। হাজী আবদুল্লাহকে কোথায় রেখেছে জানি না। এখানে নেই।' বলল লোকটি।

'বল, মেয়েটিকে এই বাড়ির কোথায় রেখেছে?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'দোতলার সব উত্তরের রুমে।' বলল পুলিশ লোকটি।

'পাহারাদার মহিলা গোয়েন্দারা কোথায়?'

'মেয়েটির সাথে ঐ ঘরেই তারা থাকে।'

আহমদ মুসার তার কথা শেষ করার আগেই পকেট থেকে শিশি বের করেছিল বাম হাত দিয়ে। বাম হাত দিয়েই প্লাষ্টিক ছিপিটি খুলে তার মুখে চেপে ধরল।

পুলিশ লোকটির প্রতিরোধের কোন চেষ্টা ছিল না। সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে গেল ছাদের উপর।

আহমদ মুসা তাকে টেনে ছাদের প্রান্তে নিয়ে যাচ্ছিল। পুলিশ লোকটির পকেটে মোবাইল বেজে উঠল। আহমদ মুসা থমকে দাঁড়াল। তার পকেট থেকে মোবাইল ধরবে কিনা, লাইন কেটে দেবে কিনা, পুলিশের মোবাইলটি তার দরকার পড়বে কিনা, এ নিয়ে একটু ভাবল আহমদ মুসা। শেষে সিদ্ধান্ত নিল পুলিশের মোবাইল তার কোন কাজে আসবে না। আর লাইন কেটে দেয়ার বা ধরার দরকার নেই। মোবাইল আরও একবার বেজেছিল, তখনও কথা বলতে শোনা যায়নি। সম্ভবত কেটে দিয়েছিল লাইন। এবারও মোবাইল না ধরায় ভেতরে অবস্থানকারী পুলিশের কেউ নিশ্চয় আসবে তার কি হল খোঁজ নিতে।

আহমদ মুসা পুলিশের সংজ্ঞাহীন দেহ ছাদের পশ্চিম প্রান্তে নিয়ে হাত ধরে তার দেহকে নিচে ঝুলিয়ে দিল। তারপর ছেড়ে দিল। নিচে ঐ জায়গায় অল্প বালির একটা স্তুপ রয়েছে। তার উপর গিয়েই তার দেহটি পড়ল। লোকটির তেমন আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলো না।

আহমদ মুসা এক তলার ছাদ ধরে দৌড়ে চলে এল তিন তলার ছাদে উঠার দড়ির মইয়ের কাছে। তার সিদ্ধান্ত তিন তলার ছাদে উঠে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করবে সে। আহমদ মুসা খুশি হয়েছে এজন্য যে, সুষমা রাওকে এখানে পাওয়া গেলে বড় একটা কাজ হবে। বিবি মাধবরা তাকে টোপ বানিয়ে আহমদ শাহ আলমগীরের কাছ থেকে তথ্য আদায়ের যে ষড়যন্ত্র করেছিল তা ব্যর্থ হবে।

আহমদ মুসা দড়ির মইয়ে পা রাখতে যাবে, এমন সময় উপর থেকে একটা কণ্ঠ ভেসে এল, 'সন্তোষ, সন্তোষ তুই কোথায়?'

আহমদ মুসা বুঝতে পারল, সংজ্ঞাহীন সেই পুলিশের নাম সন্তোষ। তার মোবাইল নিরব দেখে তাকেই খুঁজতে এসেছে তার সহকর্মী পুলিশ বা পুলিশ অফিসার। খোঁজ করার জন্যে সে নিশ্চয় নিচ তলার ছাদে আসবে।

আহমদ মুসা দ্রুত দড়ির মইয়ের কাছ থেকে সরে এসে কাছেই দেয়াল ঘেঁষে পড়ে থাকা একটা বড় ভাঙা বাক্সের আড়ালে আশ্রয় নিল।

আহমদ মুসার ধারণাই সত্য হল। দড়ির মইয়ের নড়াচড়া দেখে বুঝল, লোকটি মানে দ্বিতীয় পুলিশ দড়ির মই বেয়ে নামছে।

প্রায় নেমে গেছে লোকটি।

লোকটি দুহাতে দড়ি আঁকড়ে ধরে দড়ির বারে পা ফেলে ফেলে নামছে। সে রিভলবারটি দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে আছে।

আহমদ মুসার লুকিয়ে থাকা বাক্স থেকে দড়ির মইয়ের দূরত্ব দুগজও হবে না।

পুলিশ লোকটির পা মাটিতে পড়ার আগেই তাকে অকেজো করার জন্যে প্রস্তুত হল আহমদ মুসা।

দড়ির মইয়ের বটমে ছাদের একেবারে কাছে এসে স্বাভাবিকভাবেই তার চোখ নিচের পা ও ছাদের দিকে নিবদ্ধ হয়েছিল। আহমদ মুসা এরই সুযোগ গ্রহণ করল।

আহমদ মুসা বাক্সের আড়াল থেকে বেরিয়ে পুলিশ লোকটির পেছন দিক দিয়ে গিয়ে তার একদম পেছনে দাঁড়াল। লোকটি তখন ছাদ থেকে মাত্র দড়ির মইয়ের দুই ষ্টেপ উপরে।

আহমদ মুসা তার রিভলবারের নল দিয়ে তার গায়ে একটা টোকা দিল।

লোকটি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার মত চমকে ওঠে পেছন দিকে তাকাল। একদম মুখের উপর আহমদ মুসাকে রিভলবার হাতে দেখে ভুত দেখার মত বিমূঢ় হয়ে পড়ল। কামড়ে ধরে রাখা রিভলবার তার মুখ থেকে পড়ে গেল।

'নেমে পড়। তোমার আর কিছুই করার নেই। কথা না শুনলে মারা পড়বে।' বলল আহমদ মুসা। তার রিভলবার লোকটির দিকে তাক করা।

পুলিশ লোকটি লাফ দিয়ে নেমে পড়ল। সামনা সামনি হলে আহমদ মুসা দেখল সে পুলিশের সাধারণ সিপাই নয়, মাঝারি পর্যায়ের অফিসার।

নেমে দাঁড়িয়েই সে বলল, 'আমার লোক কোথায়? তুমি কে?'

'তোমার লোক ঘুমিয়ে আছে। ঘণ্টা তিনেক পর ঘুম ভাঙবে। আমি একজন জনসেবক। পরিত্যক্ত বাড়িতে তোমরা কি করছ, কোন অপরাধমূলক কাজ করছ কিনা তা দেখতে এসেছি।' বলল আহমদ মুসা।

পুলিশ অফিসারকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে আহমদ মুসা আবার বলে উঠল, 'যেভাবে দাঁড়িয়ে আছ, হাত দুটি উপরে তুলে সেভাবেই দাঁড়িয়ে থাক। কথার সামান্য অন্যথা হলে রিভলবারের গুলী তোমার বক্ষ ভেদ করবে।'

বলে আহমদ মুসা এক ধাপ এগিয়ে তার বুকে রিভলবারের নল ঠেকিয়ে বাম হাত দিয়ে পকেট থেকে ক্লোরোফরমের শিশি বের করে তার নাকে চেপে ধরল।

পুলিশ অফিসার নিশ্বাস বন্ধ করেছে, বুঝতে পারল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা রিভলবারের নল দিয়ে পুলিশ অফিসারের বুকে খোঁচা দিয়ে বলল, 'জোরে নিশ্বাস নাও অফিসার।'

পুলিশ অফিসার আহমদ মুসার দিকে একবার তাকিয়ে হুকুম তামিল করল। জোরে নিশ্বাস নিল। পরবর্তী কয়েক সেকেন্ডেই তার সংজ্ঞাহীন দেহ ছাদের উপর লুটিয়ে পড়ল।

আহমদ মুসা সংজ্ঞাহারা পুলিশ অফিসারের পকেট থেকে মোবাইলটি নিয়ে নিল। মনে করল, মোবাইলটিতে সুষমা সম্পর্কে পুলিশ অফিসারের সাথে বিবি মাধবের যোগাযোগের প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে।

মোবাইলটি পকেটে ফেলে রিভলবারের দাঁতে কামড়ে ধরে দ্রুত দড়ির মই বেয়ে তিন তলার ছাদে উঠল আহমদ মুসা। দেখতে পেল সিঁড়িঘর। সিঁড়িঘরের দরজা খোলা।

আহমদ মুসা সিঁড়ি ঘর দিয়ে পা রাখল সিঁড়িতে। তার ডান হাতে রিভলবার।

নিঃশব্দে নামতে লাগল সিঁড়ি বেয়ে। সে ভাবল, মহিলা পুলিশ গোয়েন্দারা যদি মেয়েটির সাথে ঘরের ভেতরে থাকে, তাহলে একজন মাত্র পুলিশ বাইরে আছে।

সাবধান হল সে, এই একজন পুলিশকে সরাতে পারলেই সে নিরাপদে ঘরটির দরজা পর্যন্ত পৌছাতে পারে।

এটা ভাবতে গিয়ে আহমদ মুসা বিস্মিত হল নিজের মেয়েকে বিবি মাধব এমন একটা অরক্ষিত জায়গায় রেখেছে? আবার ভাবল পুলিশেরই সাথে হেডকোয়ার্টারের তিনজন পুলিশ ও পাঁচজন মহিলা গোয়েন্দা পুলিশের হেফাজতে রাখা খুব অযৌক্তিকও নয়। আরেকটা প্রশ্নও জাগল আহমদ মুসার মনে। সুষমা রাও কি বুঝতে পেরেছে কিংবা জানতে পেরেছে যে, তার কিডন্যাপ হওয়ার কাজটি তার পিতার কা-! একজন পিতা কতটা নিষ্ঠুর হলে তার মেয়ের ক্ষেত্রে এ সিদ্ধান্ত নিতে পারে! ভাবতে গিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হল আহমদ মুসা। আসলে তার গভর্নরের চেয়ারে বসা একটা ছদ্মবেশ মাত্র। গভর্নরের বিশাল ছদ্মবে নিয়ে সে শিবাজীর ‘ধর্মরাজ্য’ গোপন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে জড়িয়ে রয়েছে। এ থেকেই আঁচ করা যায়, ষড়যন্ত্রটি ‘ডুবো পাহাড়’-এর মত কতটা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে।

আহমদ মুসা তিন তলার সিঁড়ির মিডল ল্যান্ডিং-এ নেমেই দেখতে পেল দুতলার ল্যান্ডিং-এ সিঁড়ির মুখেই তৃতীয় পুলিশটি চেয়ারে বসে আছে। তার দৃষ্টি নিচে দোতলার সিঁড়ির দিকে।

আহমদ মুসা শিকারী বাঘের মত সিঁড়ি বেয়ে এক পা দুপা করে এগোল পুলিশটির দিকে। আহমদ মুসা রক্তারক্তি এড়াতে চাচ্ছে। নিরবে কাজ সারতে চায় সে।

কিন্তু সিঁড়ির একদম গোড়ায় এসে পুলিশের দৃষ্টিতে পড়ে গেল।

আহমদ মুসাকে দেখে চমকে উঠেই পুলিশটি তার ষ্টেনগান ঘুরিয়ে নিতে যাচ্ছিল। আহমদ মুসা ধীর, কিন্তু কঠোর কণ্ঠে বলল, ‘হাতটা যেখানে আছে সেখানে রাখ, না হলে মাথার খুলি উড়ে যাবে।’

পুলিশটি আহমদ মুসার দিকে একবার তাকাল। তারপরই তার দুটি হাত শিথিল হয়ে গেল এবং হাতের ষ্টেনগান ঝুলে পড়ল।

আহমদ মুসা পুলিশের কাছে গেল। তার মাথায় রিভলবারের নল ঠেকিয়ে বলল, 'অন্য দুজনের মত সংজ্ঞাহীন হওয়াই তোমার জন্য মঙ্গলজনক হবে।'

এ কথা বলে তার দিকে বোকার মত তাকিয়ে থাকা পুলিশের নাকে ক্লোরোফরমের শিশি চেপে ধরল আহমদ মুসা।

পুলিশ সংজ্ঞাহীন হয়ে সিঁড়িতে পড়ে গেলে আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়িয়ে করিডোর সোজা উত্তর প্রান্তের শেষ ঘরটির দিকে চাইতেই দেখল প্লেন সাফারী পরা, কোমরে বেল্ট বাঁধা এবং মাথায় কালো কাপড় বাঁধা একজন মহিলার হাতের ষ্টেনগান তার দিকে উদ্যত হয়ে উঠেছে।

সঙ্গে সঙ্গেই আহমদ মুসা রিভলবার ধরা ডান হাত সামনে নিয়ে করিডোরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং ভুমি স্পর্শ করেই গুলী ছুড়ল মেয়েটিকে লক্ষ্য করে।

আহমদ মুসার দেহ ভুমি স্পর্শ করার আগেই এক ঝাঁক গুলী উড়ে গেল তার দেহের উপর দিয়ে। কিন্তু আহমদ মুসার টার্গেটেড গুলী গিয়ে তার বক্ষ ভেদ করল। সে এত দ্রুত এই পাল্টা আক্রমণের আশা করেনি এবং ষ্টেনগানের লক্ষ্য পরিবর্তনের সময়ও পায়নি।

গুলী খেয়ে পড়ে গেল মেয়েটি।

আহমদ মুসা উঠে দৌড় দিল ঘরটির দিকে।

কয়েক ধাপ এগিয়েছে মাত্র। ঘর থেকে একযোগে বেরিয়ে এল চারজন মহিলা। তাদের সবার হাতে ষ্টেনগান। বেরিয়েই তারা দেখতে পেল আহমদ মুসাকে। ষ্টেনগান বাগিয়েই তারা বেরিয়ে এসেছিল। আহমদ মুসাকে দেখতে পেয়েই তারা গুলী ছুড়তে শুরু করল।

ওদের বেরুতে দেখেই আহমদ মুসা বুঝতে পেরেছিল কি ঘটতে যাচ্ছে। ওদের ষ্টেনগান থেকে গুলী বেরিয়ে আসার আগেই আহমদ মুসা করিডোরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ঝাঁপিয়ে পড়েই তার পায়ের দিকটা সামনে ছিটকে দিল। চিৎ অবস্থান হল তার দেহের এবং তার দেহটা সামনে এগিয়েও গেল অনেকখানি। মেয়ে চারজনই তার একেবারে সামনে এবং তার রিভলবারের মুখে পড়ল। অন্যদিকে মেয়ে চারজনের ষ্টেনগানের টার্গেট থেকে সে অনেকখানি সরে

এসেছে। মেয়েরা তাদের টার্গেট আহমদ মুসার দিকে সরিয়ে আনার আগেই তার রিভলবার থেকে পরপর চারবার গুলী বেরিয়ে এলো। মেয়েগুলো খুব কাছে হওয়ায় সব গুলীই অব্যর্থ হল।

চার মেয়ে গোয়েন্দার দেহই দরজার সামনে স্তুপাকারে পড়ে গেল।

আহমদ মুসা উঠেই দৌড় দিল ঘরের দিকে।

লাফ দিয়ে লাশগুলো পেরিয়ে ঘরে ঢুকে গেল।

হাত-পা বাঁধা অবস্থায় সুষমা রাও পড়েছিল খাটের উপর। ভয়ে তার দেহটা কুঁকড়ে গিয়েছিল। দুহাত দিয়ে সে তার মুখ ঢেকে ছিল।

ঘরে পায়ের শব্দ শুনে আঙুলের ফাঁক দিয়ে আতংকিত দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে ছিল।

প্রথমটায় কালো কাপড়ে আবৃত ও মাথায় কালো কাপড় বাঁধা আহমদ মুসাকে সুষমা রাও চিনতে পারেনি। পরক্ষণে আহমদ মুসাকে চিনতে পেরেই 'ভাইয়া' বলে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

আহমদ মুসা তার হাত-পায়ের বাঁধন কাটতে কাটতে বলল, 'আর ভয় নেই। কিছু করার মত এখানে আর কেউ নেই। তবে তাড়াতাড়ি আমাদের সরে পড়তে হবে। গোলাগুলী হোক এটা চাইনি, কিন্তু হয়েই গেল।'

বাঁধনমুক্ত হয়েই সুষমা রাও ঝুপ করে বসে আহমদ মুসার পায়ে তার মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল।

আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে তুলে বলল, 'মানুষ মানুষের পায়ে হাত বা মাথা ঠেকাবার মত নত কোন অবস্থাতেই হতে পারে না।'

সুষমা রাও উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি মানুষকে নয়, মানুষরূপী ভগবানকে প্রণা করেছি।'

'মানুষ শুধু মানুষই। সে কোনোভাবেই আল্লাহর রুপ হতে পারে না। নবী-রসূলরাও মানুষ। আমি জানি, এ বিশ্বাসে তুমিও ফিরে এসেছ।'

বলেই আহমদ মুসা বাইরে বেরুবার জন্যে পা বাড়িয়ে বলল, 'এস।'

সুষমা রাও চলতে শুরু করে বলল, 'স্যরি ভাইয়া। আমি দিগি¦দিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। আজন্ম অভ্যাসটাই আমার সামনে এসে গিয়েছিল।'

আহমদ মুসা ও সুষমা রাও এক তলা হয়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল।

মূল রাস্তায় উঠতে হলে প্রায় ১০০ গজের মত অফিসের প্রাইভেট রাস্তা অতিক্রম করতে হবে।

'সুষমা আমরা রাস্তা দিয়ে যাব না। গুলীর শব্দ শুনে ভ্রাম্যমান কোন পুলিশ ইউনিট এদিকে এসে পড়তে পারে।' আহমদ মুসা বলল।

'ঠিক ভাইয়া।' বলল সুষমা রাও।

'এস' বলে আহমদ মুসা অফিসের সামনের বাগানে ঢুকে পড়ল এবং জঙ্গল এলাকার দিকে এগোল কোণাকুণি কিছু দূর গিয়ে রাস্তায় উঠার জন্যে।

আহমদ মুসা রাস্তার যেখান থেকে সুষমার বন্দীখানায় আসার জন্য জঙ্গল ভুমিতে নেমে এসেছিল, সেখানে পৌছে দাঁড়িয়ে পড়ল। একটা বড় পাথর দেখে নিজে বসল এবং পাশের একটা পাথর দেখিয়ে সুষমা রাওকে বসতে বলল। সুষমা রাও বসল।

'একটু জিরিয়ে নাও সুষমা। জানি না কতটা হাঁটতে হবে, গাড়ি কোথায় পাব!' বলল আহমদ মুসা।

'আমি হাঁটতে পারব ভাইয়া।' সুষমা রাও বলল।

'ধন্যবাদ সুষমা। কিন্তু তোমার বাড়ি তো অনেক দূর।' বলল আহমদ মুসা।

হঠাৎ আতংক-বেদনায় ভরে গেল সুষমা রাওয়ের মুখ।

'আমাকে কি আমার বাড়িতে নিচ্ছেন?' বলল সুষমা রাও।

'হ্যাঁ। বাড়িতেই তো যাবে।' আহমদ মুসা বলল।

মুখ নত করল সুষমা রাও।

আহমদ মুসা সুষমার দিকে তাকাল। একটু চিন্তা করল। বলল, 'সত্যিই তাহলে তোমার পিতা তোমাকে কিডন্যঅপ করিয়েছেন?'

জবাব দিল না সুষমা রাও। দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। বলল, 'কিডন্যাপ করাননি, কিডন্যাপ করেছেন। তার গোয়েন্দা বিভাগই আমাকে কিডন্যাপ করেছে।'

আহমদ মুসা আলতোভাবে সুষমা রাওয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, ‘আজকের দুনিয়াকে বড় জটিল করে তুলেছি আমরা বোন। ঘটাতে হয় না, অনেক সময় অনেক কিছু ঘটাতে বাধ্যও হতে হয়।’

‘আপনি জানেন না ভাইয়া। ভেতরের ব্যাপার অত্যন্ত ভয়াবহ। আমার পিতা শুধু আন্দামানের গভর্নর নন। তিনি ‘মহাসংঘ’ নামক নিখিল ভারত সন্ত্রাসী আন্দোলনের একজন শীর্ষ নেতা এবং এই সন্ত্রাসী আন্দোলনের আন্দামান শাখার তিনি প্রধান। তার ভিন্ন একটা গোপন নামও আছে। ‘মহামুনি শিবদাস সংঘমিত্র’ নামে তিনি সন্ত্রাসী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন।’ থামলো সুষমা রাও।

‘তুমি এত জানলে কি করে? আগে তো বলনি?’ বলল আহমদ মুসা।

‘আমি জানতাম না। অপহৃত হয়ে এখানে আসার পর সব জানতে পেরেছি। মহিলা গোয়েন্দা যারা আমার প্রহরায় ছিল, যারা আপনার হাতে মারা পড়ল, তারা গোয়েন্দা পুলিশ হলেও মূলত ওরা ঐ ‘মহাসংঘ’-এর সদস্য। মহাসংঘের সদস্য হিসেবেই আমার পিতার দ্বারা পুলিশের চাকরিতে শামিল হয়েছে। আমার সামনে ওরা কথা বলতো না, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লেই ওদের কথার বান ছুটতো। আমি ঘুমের ভান করে ওদের কথা শুনতাম। আমার কিডন্যাপ সংক্রান্ত কথা, আব্বার কথা, মহাসংঘের কথা তাদের কাছ থেকেই শুনেছি।’

থামল একটু সুষমা রাও। একটা দম নিল।

সেই ফাঁকে আহমদ মুসার প্রশ্ন, ‘তোমার কথা কি শুনেছ?’

‘আমাকে অপহরণ করা হয়েছে শাহ বানুদের বিকল্প হিসেবে। দরকার হলে আমার উপর চরম নির্যাতন চালিয়েও আহমদ শাহ আলমগীরের কাছ থেকে তথ্য আদায় ছিল ওদের লক্ষ্য।’

থেমে গেল সুষমা রাও। কান্নায় তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। মুখ মুছে আবার সে বলল, ‘কোন পিতা তার কন্যা সম্পর্কে এমন সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য হলেও আমার ক্ষেত্রে এটাই ঘটেছে।’ থামল সুষমা রাও।

‘তোমার আব্বার সম্পর্কে আরও কিছু শুনেছ?’

‘বিক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা তারা করেছে, ওদের পরিকল্পনা, আব্বাকে দিল্লীর গভর্নর বানানো। তারপর লোক সভায় নিয়ে আসা। এভাবে শীর্ষ নেতাদের

অনেককে তারা পার্লামেন্টে নিয়ে আসবে এবং দেশব্যাপী তাদের পরিচিত করাবে।' বলল সুষমা রাও।

'মহাসংঘ সম্পর্কে ওরা কি বলেছে?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'শিবাজীর স্বপ্নের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ওদের লক্ষ্য। সাম্প্রদায়িক, অসাম্প্রদায়িক দলের অধিকাংশই তাদের 'মহাসংঘ'-এর সদস্য। এমনকি কম্যুনিষ্ট পার্টির উপর তলার প্রায় সব নেতাই তাদের সদস্য। তারা তাদের 'মহাসংঘ'কে 'ডুবো হিমালয়' বলে ডাকে। বলে যে, যেদিন হিমালয় জাগবে, সেদিন শুধু তারাই থাকবে আর কেউ থাকবে না।' থামল সুষমা রাও।

'আমরা অনেকেই 'মহাসংঘ'কে 'ডুবো পাহাড়' বলে থাকি। বাইরের এই ধারণা এবং ওদের কথার মধ্যে আশ্চর্য মিল দেখছি।' আহমদ মুসা বলল।

'আপনি 'মহাসংঘ'কে জানতেন?'

'খুব সামান্য। আন্দামানে ওদের কিছু নেতার সাথে দেখা হয়েছে, নাম জেনেছি, যাদের সাথে আমার মোকাবিলা হয়েছে।'

একটু থেমেই আহমদ মুসা আবার বলল, 'তুমি হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহ সম্পর্কে কিছু জানতে পেরেছ। উনিও সম্ভবত এদের কোন গোপন বন্দীখানায় বন্দী আছেন।'

'উনি হোটেল সাহারার মালিক হাজী সাহেব না?'

'হ্যাঁ, সুষমা। তুমি কি কিছু শুনেছ তার সম্পর্কে?'

'কিছু শুনেছি ভাইয়া। গতকাল বড় কেউ একজন এসেছিল আমার কক্ষে আমাকে বুঝাবার জন্যে। সে সময় তার মোবাইলে একটা কল এসেছিল। সে কলে কথা বলার সময় এক জায়গায় তিনি বলেছিলেন, 'যতদিন না আহমদ মুসা ধরা পড়ছে, ততদিন হোটেল সাহারার মালিক হাজী সাহেবকে ছাড়া বা মারা কিছুই করা যাবে না। সে আমাদের একজন বড় টোপ। তাকে উদ্ধার করার জন্যে আহমদ মুসা আসবেই।' বলল সুষমা রাও।

'আলহামদুলিল্লাহ। ধন্যবাদ সুষমা। তুমি অত্যন্ত বড় একটা সুখবর শুনিয়েছ। তিনি বেঁচে আছেন, এই খবর আমার জন্যে, তাঁর পরিবারের জন্য আকাশ ছোঁয়া আনন্দের সংবাদ।' বলল আহমদ মুসা।

‘আলহামদুলিল্লাহ, সংবাদটা যে আমি দিতে পারলাম।’

‘আগের কথায় ফিরে আসি সুষমা রাও। বাড়ি যাওয়া প্রশ্নে ভেবে-চিন্তে কথা বল। এখনই সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার।’

‘দুঃখিত ভাইয়া, আমার পিতার কাছে বংশীয় মর্যাদা ও রাজনৈতিক প্রয়োজনের চেয়ে বড় কিছু নেই। সুস্মিতা বালাজী আপা ও আমার ঘটনা তারই কিঞ্চিত প্রমাণ। এখন আপনিই সিদ্ধান্ত দিন ভাইয়া, আমার কি করা উচিত।’

‘তুমি কি সুরূপা সিংহাল ও সাজনা সিংহালকে চেন?’

হাসল সুষমা রাও। বলল, ‘কি বলছেন ভাইয়া, ওরা আমার বোন, খালাতো বোন। সুরূপা সিংহাল এখানে থাকে। কিন্তু সাজনা সিংহাল তো মহারাষ্ট্রে থাকে। আপনি চিনলেন কি করে?’

‘সাজনা সিংহাল পোর্ট ব্লেয়ারে বেড়াতে এসেছে। সুরূপার ওখানে আছে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আপনি এত কিছু জানলেন কি করে? সুস্মিতা আপা বলেছে?’ সুষমা রাও বলল।

আহমদ মুসা তার গ্রীনভ্যালি থেকে পোর্ট ভ্যালিতে আসা, সুরূপাদের সাথে দেখা হওয়া থেকে শুরু করে সব কথা সুষমা রাওকে সংক্ষেপে বলল।

আহমদ মুসা থামলে মুহূর্ত কয়েক চুপ থেকে বলল, ‘থ্যাংক গড, তিনি আপনাকে সব বিপদ থেকে বাঁচিয়েছেন। আমাদের মত মজলুমদের জন্যেই জালেমের বিরুদ্ধে আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করেন।’

একটু থেমেই আবার বলে উঠল, ‘সুরূপার বাড়ি আমার নিজের বাড়ি। ওখানকার চেয়ে ভালো থাকার জায়গা আমার আর নেই। আর আমার সবচেয়ে লাভ আপনি ওখানে থাকবেন।’

‘এবার আমরা উঠতে পারি, চল।’ উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল আহমদ মুসা।

সুষমা রাও আহমদ মুসার সাথে সাথেই উঠে দাঁড়াল।

দুজন আবার হাঁটতে লাগল রাস্তায় উঠার জন্যে।

নাস্তার টেবিলে বসে ছিল সুরূপা সিংহাল, সাজনা সিংহাল ও সুষমা রাও।

সুরূপার স্বামী অরূপ রতন সিংহাল নাস্তার টেবিলে বসতে বসতে সুরূপা সিংহালকে জিজ্ঞেস করল, 'আহমদ মুসা ভাই সাহেব কোথায়?'

'তুমি ব্যস্ত ছিলে তোমার কম্পিউটার নিয়ে, আর উনি ভোরের নামায সেরেই নিচে নেমে গিয়েছিলেন সমুদ্র তীরে। এই এসে গোসলে ঢুকেছেন। তুমি করেছ যন্ত্র চর্চা, উনি করেছেন মাঠ চর্চা, আর আমরা করেছি গৃহ চর্চা। গৃহ চর্চা তো কোন কাজ নয়, তাই একটু আগেই আসতে পেরেছি নাস্তার টেবিলে।' বলল সুরূপা সিংহাল।

'দেখ। আমার কিছু দোষ হতেই পারে। ভাই সাহেবকে দোষ দিও না। মাঠের পরিস্থিতি কোন সময়ই তাঁর হাতে থাকে না। অতএব তাঁর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম মানতেই হবে।' অরূপ রতন সিংহাল বলল।

'এই কিছুক্ষণ আগে সুস্মিতা আপা টেলিফোন করেছিলেন। বললেন, 'ভাই সাহেব সব কাজ কাঁটায় কাঁটায় করেন, শুধু নিজেরটা ছাড়া।' বলেছেন, 'তাঁর নিজের ক্ষেত্রে তাঁকে কোন ছাড় যেন না দেই।' বলল সুরূপা সিংহাল।

'কিন্তু সেভাবে যদি তিনি নিজের কথা ভাবতেন, তাহলে আন্দামান তাঁকে দেখতে পেত না, আমরাও দেখতে পেতাম না। তিনি মদীনায় বসে স্ত্রী, ছেলে নিয়ে সংসার করতেন।' অরূপ রতন সিংহাল বলল।

'দুলাভাই ঠিকই বলেছে......।' সুষমা রাও তার কথা শেষ করতে পারলো না। আহমদ মুসাকে নাস্তার টেবিলে আসতে দেখে থেমে গেল সুষমা রাও।

টেবিলের হেডচেয়ারের দুপাশে বসেছে সুরূপা ও অরূপ সিংহাল। সুরূপার পাশের চেয়ারটাতে বসেছে সাজনা সিংহাল, তারপর সুষমা রাও।

আহমদ মুসা দ্রুত এসে অরূপ সিংহালের পাশের আরেকটি চেয়ারে বসল।

'ভাই সাহেব, আবার আপনি এ চেয়ারে বসলেন।' তারপর হেডচেয়ারটির দিকে ইঙ্গিত করে অরূপ সিংহাল বলল, 'ওটা আপনার, দয়া করে ওখানে বসুন।'

‘আপনাদের অনেক অনুরোধ রক্ষা করেছি। আর নয়। ঐ অবস্থানটা ফ্যামিলির হেডব্যক্তির জন্যে। এটাই নিয়ম। ভাই সাহেব, আপনি ওখানে বসুন। অথবা ওটা খালিই থাকুক।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ফ্যামিলির সবার সম্মানিত ব্যক্তিই ওখানে বসেন। আসল ব্যাপার হল যারা টেবিলে বসবেন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিতজনই ঐ চেয়ারে বসবেন, এটাই কথা। আমরা যারা টেবিলে আছি, তাদের মধ্যে ঐ চেয়ার আপনার প্রাপ্য। আমরা নয়, সবাই এ কথাই বলবে।’ বলল সুরূপা সিংহাল।

‘এ নিয়ে আর কথা বাড়াব না। আমি মেহমান। ও জায়গা ফ্যামিলি প্রধানের বা ফ্যামিলির অন্য কারও, তাই কথাটা বলছিলাম।’

বলে আহমদ মুসা উঠে গিয়ে চেয়ারটিতে বসল।

হাসল অরূপ রতন সিংহাল। বলল, ‘আমরা আপনাকে মেহমান নয়, পরিবারের একজন বলে মনে করি ভাই সাহেব।’

‘ধন্যবাদ।’

বলে আহমদ মুসা একটু গম্ভীর হল। বলল, ‘দুঃখিত যে নাস্তার সময়ের একটু পরে আমরা নাস্তা করছি। বেরিয়েছিলাম প্রতিদিনের মত সাগর তীরে একটু দৌড়াদৌড়ি করেই চলে আসব। কিন্তু বেরিয়েই রিকশা যাত্রী দুজন লোকের মধ্যকার আলোচনার একটা অংশ শুনে তাদের পিছু নিতে হয়েছিল। দেরিটা সেই কারণেই।’

‘এমন কি গুরুত্বপূর্ণ কথা যে তাদের পিছু নিতে হল, সেটা কি বলা যায় স্যার?’ সাজনা সিংহাল বলল।

‘ওদের কথোপকথনের মধ্যে ‘হাজী আবদুল্লাহ’ নাম শুনতে পেয়েছিলাম।’ আহমদ মুসা বলল।

‘বুঝেছি। ধন্যবাদ।’ বলল সাজনা সিংহাল।

‘পিছু নেয়ার রেজাল্ট কি হল, সেটা কি বলা যায় ভাই সাহেব?’ বলল অরূপ সিংহাল।

‘অবশ্যই। পিছু নিয়ে ওদের সব কথা শুনেছি। তার মধ্যে আমার জন্যে কথাটা ছিল হাজী আবদুল্লাহকে যেখানে রেখেছে, তারা সেখানকার পাহারাদার।

সেখানেই তারা যাচ্ছিল। আমি ওদের সাথে শেষ পর্যন্ত গিয়ে বাড়িটা দেখে এসেছি।' আহমদ মুসা বলল।

'তার মানে হাজী সাহেবকে যেখানে বন্দী করে রাখা হয়েছে, সে জায়গাটা দেখে এসেছেন। থ্যাংকস গড।' বলল সুরূপা সিংহাল।

'হ্যাঁ, যা বুঝেছি, যা শুনেছি, তা যদি সত্য হয়।' আহমদ মুসা বলল।

'তাহলে স্যার, আজ রাতেই আপনার দ্বিতীয় অভিযান।' বলল সাজনা সিংহাল। নাস্তার মধ্যেই কথা চলছিল।

সাজনার কথার জবাবে কিছু না বলে হাসল আহমদ মুসা।

'ভাইয়া, আপনি হাসছেন। আমি যেখানে বন্দী ছিলাম সে বন্দীখানায় আপনার ঢোকার আগের ঘটনা মনে হলে এখনও আমার গা কাঁপে। আমার কক্ষের পাঁচ প্রহরী আপনার গুলীতে মরল। ওরাও তো আপনার আগেই আপনাকে গুলী করেছিল, সে গুলী যদি আপনার লাগত! আপনার সেসব কথা মনে পড়ে না?' বলল সুষমা রাও।

'ওসব দুঃখের কথা মনে না পড়াই ভালো সুষমা।' আহমদ মুসা বলল।

'ওটা তো শংকা, আতংক ও বীভৎসতার কথা, দুঃখ কোনটা?' প্রশ্ন সুষমা রাওয়ের।

'এখানে দুঃখটা হল পাঁচটা মেয়ের মৃত্যু মানে পাঁচটা পরিবারে দুঃখের পাহাড় নেমে আসা।' আহমদ মুসা বলল।

টেবিলের সবাই আহমদ মুসার দিকে তাকাল। আহমদ মুসার ভারী কণ্ঠ তারা লক্ষ্য করল।

সঙ্গে সঙ্গে কেউ কথা বলল না। একটু পর অরূপ রতন সিংহাল বলল, 'ভাই সাহেব, আপনার মন খুবই সংবেদনশীল। মানুষ, জীব নির্বিশেষে সকলের প্রতি আপনার ভালোবাসা দেখি। তাহলে আপনিই আবার কেমন করে কারও প্রতি গুলী চালাতে পারেন, যেমন ঐ পাঁচটি মেয়েকে মারলেন।'

আহমদ মুসার মুখে বিষণœতার একটা ছায়া নেমেছে। বলল, 'আমার সামনে স্থির লক্ষ্য ছিল সুষমাকে উদ্ধার করা। এই পথে যে বাধাই আসুক তাকে সরিয়ে ফেলা। আমি আগে সুযোগ পেয়ে প্রু ুষ পুলিশদের সংজ্ঞাহীন করে পথ

পরিষ্কার করেছি। কিন্তু মেয়েগুলোর ক্ষেত্রে সে সুযোগ পাইনি। ওরাই আগে গুলী করেছে। ওদের না মারলে ওদের পরের গুলীতেই আমাকে মরতে হতো। আমি সুষমাকেও উদ্ধার করতে পারতাম না।'

'ধন্যবাদ ভাই সাহেব। এটাই পৃথিবীর নিয়ম। গোলাপ তুলতে গেলে কাঁটার ঘা সইতে হয়, পরীক্ষায় ভালো করতে হলে ভালো পড়ার কষ্ট, উপার্জন করতে হলে কাজ করার কষ্ট স্বীকার করতেই হয়। সুষমার মুক্তির মূল্য দেয়া তাদের জন্যে অবধারিত ছিল।'

'ধন্যবাদ ভাই সাহেব' বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। তার নাস্তা খাওয়া শেষ।

আহমদ মুসা তার ঘরের দিকে যাবার উদ্যোগ নিতেই সুরূপা সিংহাল হঠাৎ দ্রুত কণ্ঠে বলে উঠল, 'ভাই সাহেব, জরুরি খবর আছে। আপনি ড্রইং-এ একটু বসুন। আমরাও আসছি।'

ঔৎসুক্য, কৌতুহল আহমদ মুসাকে ঘিরে ধরল। ড্রইংরুমের দিকে পা বাড়িয়ে বলল, 'সুখবরের শিরোনাম বলতে পারেন বোন।'

'হ্যাঁ পারি।' বলে একটু স্বর নামিয়ে সুরূপা বলল, দিল্লী থেকে মার্কিন রাষ্ট্রদূত আপনাকে টেলিফোন করেছিলেন। আপনি না থাকায়, আপনার মোবাইলে আমিই এ্যাটেন্ড করেছিলাম।'

'ধন্যবাদ' বলে আহমদ মুসা গিয়ে ড্রইং রুমে বসল।

সবাই এল ড্রইংরুমে।

'আবারও আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি যে আপনি টেলিফোনটি ধরেছিলেন। গত রাতে অনেক সময় ধরে তাকে টেলিফোনে পাওয়ার চেষ্টা করেছি। পাইনি।' বলল আহমদ মুসা।

'অনেক রাতে গতকাল উনি ফেরেন। এসেই আপনার মেসেজ পান। অত রাতে টেলিফোন না করে সকালে টেলিফোন করেন। উনি ৯টা থেকে ১০টার মধ্যে আপনার কলের অপেক্ষা করবেন। এরপর ৪টা থেকে ৬টা পর্যন্ত উনি ফ্রি থাকবেন।'

আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকাল। ঘড়িতে সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, বেজেছে। আহমদ মুসা বলল, 'বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবো না। এখনই টেলিফোনটা সেরে নেই।'

কথা শেষ করেই পকেট থেকে মোবাইল বের করে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের নাম্বারে টেলিফোন করল।

রিংটোন তিনবার বেজে উঠতেই ওপার থেকে একটা ভারী গলা বলে উঠল, 'গুড মর্নিং বিভেন বার্গম্যান। কেমন আছেন?'

'গুড মর্নিং রবার্ট পাওয়েল। আমি ভালো আছি। আপনি কেমন?'

রবার্ট পাওয়েল নয়াদিল্লীস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত। আহমদ মুসার কথার উত্তরে সে বলল, 'ভালো মি. বার্গম্যান। আমি আপনাকে খুঁজে হয়রান। আন্দামানে গিয়েও পাইনি। এদিকে বার বার আমাকে তাকিদ দিচ্ছে আপনাকে লোকেট করার। আন্দামানের খবরে উনি উদ্বিগ্ন।'

'স্যরি। আন্দামানে যখন আপনি এসেছিলেন, তখন আমি পোর্ট ব্লেয়ার থেকে অনেক দূরে আহত হয়ে পড়েছিলাম। আপনি এখানে আসার খবর আমি ওখান থেকেই পেয়েছিলাম। কিন্তু তিনি আপনার টেলিফোন নাম্বার তখন দিতে পারেননি। প্রেসিডেন্ট আন্দামানের কোন খবরে উদ্বিগ্ন?'

'মি. প্রেসিডেন্ট আমাকে আন্দামানের খবর নিয়মিত মনিটর করে পাঠাতে বলেছেন। আমি সেটা পাঠিয়ে যাচ্ছি। সম্প্রতি সেখানে রহস্যজনক নিহতের হার বেড়ে গেছে। যারা মারা যাচ্ছে তাদের প্রায় একশ ভাগই সিআইএ-এর তথ্যমতে ভারতের সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসী গোষ্ঠী 'মহাসংঘে'র লোক। সিআইএ এ তথ্য দিয়েছে যে, মহাসংঘের বিপরীতে 'বিভেন বার্গম্যান' নামে একজন লোক কাজ করছে। এর বেশি সিআইএ আর কোন তথ্য দিতে পারেনি। মি. প্রেসিডেন্ট সেখানকার প্রকৃত অবস্থা কি জানতে চান আপনার কাছ থেকে। কোন সাহায্য আপনার দরকার কিনা জানতে চেয়েছেন।'

'ধন্যবাদ মি. এ্যামবেসডর। আপনি আন্দামানের খোঁজ রাখছেন এজন্যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। পরিস্থিতি এখনো আরও জটিলই রয়েছে। বিশেষ করে মুসলমানদের বিশেষ কম্যুনিটির লোক যে পরিকল্পিতভাবে নিহত

হচ্ছিল, সেটা বন্ধ হয়েছে। ষড়যন্ত্রকারী সংগঠনের লোকরাই এখন নিহত হচ্ছে। তবে সমস্যার জটিলতা তাতে কমেনি। প্রধানত যাকে উদ্ধার করতে আমার আন্দামানে আসা, তাকে উদ্ধার করা যায়নি। তার উপর কিডন্যাপ হয়েছেন হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহ। আপনি সেটা জানেন। 'মহাসংঘ' সংগঠনটি 'ডুবো পাহাড়ে'র মতই বিপজ্জনক। খোদ আন্দামানের গভর্নর এর সাথে জড়িত দেখে মনে হচ্ছে, সরকার এবং সরকারের রাজনৈতিক মহলে 'মহাসংঘে'র শিকড় মজবুতভাবে বিস্তৃত। আর এরা কতটা বেপরোয়া তা বুঝা যায়, স্বয়ং গভর্নর তার নিজের মেয়েকে কিডন্যাপ করার ঘটনা থেকে। এই..........।'

আহমদ মুসার কথা আর অগ্রসর হতে পারলো না। এ্যামবেসেডর আহমদ মুসাকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'তুমি নিশ্চিত যে, গভর্নর বিবি মাধব এ কাজ করেছিলেন? সিআইএ সূত্রও আমাকে এটাই জানিয়েছে।'

'ইয়েস মি. এ্যামবেসেডর, গভর্নর বিবি মাধবের মেয়ে সুষমা রাও-ও এ ব্যাপারে নিশ্চিত। আমি তো নিশ্চিত অবশ্যই।' আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসার শেষ বাক্যটার রেশ মেলাবার আগেই এ্যামবেসেডর দ্রুত কণ্ঠে বলে উঠল, 'কিন্তু বিবি মাধব নিজের মেয়েকে কেন কিডন্যাপ করবেন? এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের সিআইএ দিতে পারেনি।'

'মি. এ্যামবেসেডর, যে কারণে বিবি মাধব বা মহাসংঘ শাহ আলমগীরের মা-বোনকে কিডন্যাপ করেছিল, সেই একই কারণে সুষমা রাওকে তারা কিডন্যাপ করেন। আহমদ শাহ আলমগীরের মা-বোন হাতছাড়া হয়ে যাবার পর সুষমা রাওকে কিডন্যাপ করা হয়। সুষমা রাওকে আহমদ শাহ আলমগীরের সামনে হাজির করে তারা সুষমার উপর সব রকমের নির্যাতন চালিয়ে আহমদ শাহ আলমগীরকে মুখ খুলতে বাধ্য করতে চেয়েছিল। ওদের.......।'

আবারও আহমদ মুসাকে তার কথার মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রদূত রবার্ট পাওয়েল বলল, 'বিবি মাধবও এত জঘন্য?'

'মি. এ্যামবেসেডর, বিবি মাধব জঘন্য নয়, জঘন্য হল 'মহাসংঘ'। এই 'মহাসংঘ'ই মানুষকে অমানুষ বানাচ্ছে।' আহমদ মুসা বলল।

‘ঠিক বলেছ মি. বার্গম্যান। তারা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে গুজরাটে যা করেছিল, সেই কাজই নিরবে আরও নিখুঁতভাবে, আরও সামগ্রিকভাবে করার কাজ তারা শুরু করেছে আন্দামান থেকে। একে আগে বাড়তে দেয়া যায় না। ভারত সরকারও নিশ্চয়ই একে আগে বাড়তে দেবে না। কিন্তু একটা কথা বলতো, ‘আহমদ শাহ আলমগীরের কাছ থেকে কি কথা বের করতে চায়?’

‘কি একটা বাক্স নাকি আহমদ শাহ আলমগীর কোথায় রেখেছে তা জানতে ও পেতে চায়। বাক্সে কি একটা দলিল ও আরও কিছু আছে। এর বেশি কিছু আমরা জানতে পারিনি এ্যামবেসেডর।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আহমদ শাহ আলশগীরের কাছে থাকা কাগজপত্র ওদের কাছে এত মূল্যবান হবে কেন? আহমদ শাহ আলমগীর কি গোপন কোন গোষ্ঠীর সাথে ছিল, যাদের কোন কাগজপত্র তার কাছে গচ্ছিত আছে?’ এ্যামবেসেডর বলল।

‘এমন কথা কেউ বলে না। এমন কোন সংগঠন আন্দামানে নেই।’

একটু থামল আহমদ মুসা। থেমেই আবার বলে উঠল, ‘মি. এ্যামবেসেডর, আন্দামানে বর্তমান পরিস্থিতিতে আপনারা কি করতে পারেন বলুন?’

‘আমরা অবশ্যই অনেক কিছুই করতে পারি। সবচেয়ে বড় যে কাজ করতে পারি সেটা হল ভারত সরকারকে গোটা বিষয় জানিয়ে তার কাছ থেকে প্রতিকার দাবী করা।’ বলল এ্যামবেসেডর রবার্ট পাওয়েল।

‘কি বলবেন আপনি?’

‘বলব ‘মহাসংঘে’র কথা। বলব আন্দামানে তাদের নির্মূল অভিযান, আহমদ শাহ আলমগীর ও হাজী আবদুল্লাহকে বন্দী করে রাখার কথা ইত্যাদি।’

কথা শেষ করেই এ্যামবেসেডর আবার দ্রুতকণ্ঠে বলে উঠল, ‘সুষমা রাও কি কোন ষ্টেটমেন্ট দিতে পারে?’

‘কাজে আসবে কি? আমি সুষমাকে জিজ্ঞাসা করে দেখব। আমি মনে করি আপনি ভারত সরকারকে রাজি করাতে পারেন এবং ভারত সরকার সিবিআই-এর ভালো ইউনিটকে আন্দামানে পাঠাতে পারেন, তাহলে তারা হাজী

আবদুল্লাহ ও আহমদ শাহ আলমগীরকে উদ্ধার করে হাতে-কলমে সব প্রমাণ করতে পারে।' আহমদ মুসা বলল।

'আমার পারার কথা বলছ কেন? স্বয়ং মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে। তুমি চিন্তা করো না সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমাকে তোমার দিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে বলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। আর শোন, আমার সব চুল সাদা হয়েছে। তুমি অনেক ছোট বলেই তোমাকে 'তুমি' বলেছি, কিছু মনে করো না। তাহলে কথার এখানেই শেষ বাই।' বলল এ্যামবেসেডর রবার্ট পাওয়েল।

'ধন্যবাদ মি. এ্যামবেসেডর। মি. প্রেসিডেন্টকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাবেন। বাই।' বলে মোবাইল অফ করে ফিরে এল সোফার দিকে। ধপ করে বসে পড়ল সোফায়।

পিন পতন নিস্তব্ধতার মধ্যে সুরূপা সিংহাল, সাজনা সিংহাল, অরূপ রতন সিংহাল ও সুষমা রাও আহমদ মুসার কথা শুনছিল। আহমদ মুসা যখন মোবাইল নিয়ে সরে যায়নি তখন কথা শোনা যেতে পারে বলে সবাই মনে করেছে।

আহমদ মুসা সোফায় বসতেই সাজনা সিংহাল বলল, 'স্যার, টেলিফোনে 'প্রেসিডেন্ট' শব্দ কয়েকবার এসেছে। শেষে আপনি প্রেসিডেন্টকে কৃতজ্ঞতা জানালেন। কোন প্রেসিডেন্ট? ভারতের?'

'না সাজনা, মার্কিন প্রেসিডেন্টের কথা আমরা বলেছি।' আহমদ মুসা বলল।

সাজনা কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই সুষমা রাও বলে উঠল, 'আমাকে কি জিজ্ঞাসা করে দেখার কথা এ্যামবেসেডরকে বললেন ভাইয়া?'

'তোমার ঘটনা সম্পর্কে তিনি তোমার কাছ থেকে একটা ষ্টেটমেন্ট চান।' আহমদ মুসা বলল।

'কেন? তিনি কি করবেন?' বলল সুষমা রাও।

'তিনি এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট আন্দামানের ব্যাপারে ভারত সরকারকে বলবেন। তোমার ষ্টেটমেন্ট একটা দলিল হিসেবে ব্যবহৃত হবে।' আহমদ মুসা বলল।

'অবশ্যই, আমি ষ্টেটমেন্ট দেব ভাইয়া।'

'ঠিক আছে। তৈরি করে রাখ। তার বিশেষ টেলিফোনে আমি পাঠিয়ে দেব।' আহমদ মুসা বলল।

'ফ্যাক্সেও তো পাঠাতে পারেন।' বলল সুষমা রাও।

'না ফ্যাক্স, ই-মেইল, সাধারণ টেলিফোন কিছুই ব্যবহার করা যাবে না। অন্যেরা ধরে ফেলবে। ওটা মার্কিনীদের নিজস্ব চ্যানেলে পাঠাতে হবে।' আহমদ মুসা বলল।

'ভাইয়া, আপনি যে সব কাজের কথা বললেন, সেসব কাজে কি তিনি ভারত সরকারকে বলে সাহায্য করাতে পারবেন?' বলল সুষমা রাও।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বলাই যথেষ্ট। তার উপর মার্কিন প্রেসিডেন্ট মার্কিন প্রেসিডেন্ট এ ব্যাপারে যদি একটা ইঙ্গিতও করেন, তাহলে দেখবে ভারতীয় আইন-শৃঙ্খলা এজেন্সী কিভাবে আন্দামানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।'

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'চা এখন আর আমি খাচ্ছি না। এখনই একটু বেরুতে হবে।'

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা তাকাল সাজনা সিংহালের দিকে। বলল, 'দেখ, আমার পাগড়ী কোথায়?'

'শিখ সাজার পাগড়ী তো? নিয়ে আসছি স্যার। ইস্ত্রি হয়ে আছে।' বলেই দৌড় দিল সাজনা সিংহাল।

মুহূর্ত কয়েক পরেই সাজনা ইস্ত্রি করা পাগড়ী নিয়ে হাজির হল।

'ধন্যবাদ, সাজনা।'

বলে পাগড়ী হাতে নিয়ে আহমদ মুসা তার ঘরের দিকে পা বাড়াল।

আহমদ চলে গেলে সাজনা সিংহাল অরূপ রতন সিংহালের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দুলাভাই, স্যারকে মার্কিন সরকার এত গুরুত্ব দেন কেন?'

'দেবারই কথা সাজনা। বলা হয় আহমদ মুসা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এক ষড়যন্ত্রের অক্টোপাস থেকে মুক্ত করে শান্তি, স্বচ্ছতা ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছে, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফাউন্ডার ফাদারসদের স্বপ্ন ছিল।

তাই নতুন করে পুরাতনের স্বকীয় অবস্থানে ফিরে যাওয়া আমেরিকার বর্তমান নায়করা আহমদ মুসার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া স্বাভাবিক।'

'খুব বড় বিষয়। আমি জানতাম না দুলাভাই, এত বড় পরিচয় তার! কিন্তু এই তুলনায় তাকে উপযুক্ত গুরুত্ব আমরা দিচ্ছি না।' সাজনা বলল।

'তাহলে এ বাড়িতে আর তাকে পাবে না। যতই ঝুঁকি থাক, সোজা গিয়ে হোটেলে উঠবেন।' বলল সুরূপা সিংহাল।

সাজনার মুখ ম্লান হল। বলল, 'তাহলে থাক বাবা বড় বড় ফর্মালিটি। উনি থাকছেন, সেটাই ভালো।'

বলে উঠে দাঁড়াল সাজনা সিংহাল। একটু পরে বলল, 'চল সুষমা নিচে বাগানে যাই।'

সবাই উঠে দাঁড়াল।

# ৫

সাগরের তীর ঘেষে দাঁড়ানো অভিজাত 'সী ভিউ' রেষ্টুরেন্ট। আহমদ মুসা সাগরের প্রান্তের একটা টেবিলে বসে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিল।

আহমদ মুসা প্রায় নিয়মিতই এই সাগর তীরে আসে এবং এক সময় এই টেবিলে এসে বসে।

যথারীতিই একজন নিষ্ঠাবান শিখের পোশাক আহমদ মুসার দেহে।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আহমদ মুসা তাকিয়েছিল আন্দামান সাগরের স্থির কাল পানির দিকে।

তার টেবিলে তার মুখোমুখি আর একজন এসে বসল।

আহমদ মুসা সাগর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে তার সামনে এসে বসা লোকটির দিকে তাকাল। তাকিয়েই চমকে উঠল আহমদ মুসা। সেদিন রিকশায় চড়ে যাওয়া এই লোকটিকেই অনুসরণ করে আহমদ মুসা হাজী আবদুল্লাহকে রাখা বন্দীখানায় পৌছেছিল। রিকশা চড়ে যাওয়ার সময় ওদের কথোপকথন থেকে এই লোকটির নাম শুনেছিল 'হরিকিষাণ'। পরে ওখানে গিয়ে দেখেছিল হরিকিষাণ ঐ বন্দীখানার প্রহরা-ব্যবস্থার প্রধান। সম্ভবত সে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে থাকা ছাড়াও সন্ত্রাসবাদী সংস্থা 'মহাসংঘ'-এর প্রভাবশালী সদস্যও।

আহমদ মুসা তাকে চিনতে পেরেই সিদ্ধান্ত নিল লোকটিকে একটু বাজিয়ে দেখতে হবে। কিছু পাওয়া যেতেও পারে।

পরিচিত লোককে নতুন করে দেখছে এমন একটা ভাব নিয়ে আহমদ মুসা লোকটির উদ্দেশ্যে হিন্দী ভাষায় বলল, 'হরিকিষাণজী, আপনি কেমন আছেন?'

হরিকিষাণ লোকটি ওয়েটারের দিকে তাকিয়ে তার অপেক্ষা করছিল। আহমদ মুসার সম্বোধন শুনে সে ফিরে তাকাল। কিন্তু আহমদ মুসাকে চিনতে না

পারায় একটা বিব্রত ভাব তার চোখে-মুখে ফুটে উঠল। বলল, 'আপনি আমাকে চিনেন? কিন্তু আমি তো..........।'

'চিনতে পারছেন না, এই তো?' আহমদ মুসা হরিকিষাণের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল।

কথাটা শেষ করে আহমদ মুসা একটু থামল। পরক্ষণেই মুখে হাসি টেনে বলল, 'কেন মনে পড়ছে না? ওল্ড সেন্ট্রাল মেডিকেল ষ্টোর'-এর বাড়িতে আমি আপনাকে দেখেছিলাম। আমি সাবেক জেনারেল জগজিত জয়রাম মহাগুরুর পক্ষ থেকে সেখানে গিয়েছিলাম হাজী আবদুল্লাহকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে।'

আসলে আহমদ মুসা জেনারেল জগজিত জয়রাম মহাগুরুকে চিনেই না। হরিকিষাণকে অনুসরণ করে সেদিন ওল্ড সেন্ট্রাল মেডিকেল ষ্টোরের ঘাঁটিতে গিয়ে আড়াল থেকে হরিকিষাণদের মুখেই ঐ জেনারেলের নাম এবং তার লোকদের আসার কথা শুনেছিল।

হরিকিষাণের মুখে লজ্জামিশ্রিত হাসি ফুটে উঠেছিল। সে বলল, 'স্যরি, সেদিন ছিল রাত, আর আপনি হ্যাট পরেছিলেন। তাই চিনতে পারছিলাম না।'

তার অন্ধকারে ঢি ছোড়ার কৌশলটা কাজে লেগেছে দেখে আনন্দিত হল আহমদ মুসা।

'তাই হবে। যাক, আপনারা কেমন আছেন? হাজী আবদুল্লাহর খবর কী?'

'কেন, আপনি কিছু জানেন না?'

হরিকিষাণের কথায় মনে মনে উদ্বিগ্ন হল আহমদ মুসা। হাজী সাহেবের কিছু হয়নি তো! কিছু না জানার কথা বলছে কেন? ঘটেছে কি কিছু?

আহমদ মুসা হরিকিষাণের দিকে চোখ তুলে বলল, 'আমি সেদিন ওখান থেকে ফিরেই কলকাতা গিয়েছিলাম, গত রাতে ফিরেছি। বিশেষ কিছু কি ঘটেছে?'

'বড় কিছু ঘটেছে। বিপদ দেখা যাচ্ছে সামনে।' বলে থামল হরিকিষাণ।

আরও উদ্বিগ্ন হল আহমদ মুসা। বলল, 'কি ঘটেছে?'

'সিবিআই তদন্তে আসছে। সম্ভবত হাজী সাহেবের পরিবার থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অভিযোগ গেছে যে, পুলিশ তাকে নিয়মমাফিক

গ্রেফতার না করে বেআইনিভাবে লুকিয়ে রেখেছে। আমি সবকিছু জানি না। তবে আজই সিবিআই-এর শক্তিশালী টিম আসছে। আর সিবিআই গোয়েন্দারা নাকি ইতিমধ্যেই এসে গেছে।'

আহমদ মুসা মনে মনে খুশি হল। বুঝল যে, মার্কিন রাষ্ট্রদূত তাহলে এ্যাকশনে গেছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বা সরকারের চাপেই তাহলে এই ঝড়ের সৃষ্টি হয়েছে।

আহমদ মুসা কণ্ঠে কৃত্রিম ভয় নিয়ে বলল, 'তাহলে এখন কি করা?'

'সে চিন্তা উপর ওয়ালারা করছে। আজ হাজী আবদুল্লাহকে সরিয়ে ফেলা হবে। বন্দীখানা থেকে বের করে নিয়ে হাত-পা বেঁধে নৌকায় তুলে মাঝ সাগরে ডুবিয়ে দেয়া হবে।'

চমকে উঠল আহমদ মুসা। কিন্তু নিজেকে দ্রুত সামলে নিয়ে বলল, 'সিবিআই-এর হাতে ধরা পড়া থেকে বাঁচার এটাই উপায়। আপনার তো তাহলে অনেক দায়িত্ব মি. হরিকিষাণ। হাজী আবদুল্লাহকে সরাবার দায়িত্ব তো আপনাকেই নিতে হবে।'

আহমদ মুসা চাইল তাদের পরিকল্পনার বিস্তারিতটা জানতে।

আহমদ মুসার কথার জবাবে হরিকিষাণ বলল, 'আমার দায়িত্ব ঐ বাড়ি পাহারা দেয়া। ঐ অপারেশনের জন্যে লোক পাঠানো হবে পোর্ট ব্লেয়ার হেড অফিস থেকে। রাত ৩টার দিকে পানি সাপ্লাই সংস্থার ওয়াটার ক্যারিয়ার নিয়ে তারা আসবে।'

'সিবিআই-এর গোয়েন্দা আগেই এসেছে বললেন, ওরা কিছু টের পাবে না তো?' বলল আহমদ মুসা। তার কণ্ঠে কৃত্রিম উদ্বেগ।

'হ্যাঁ, ওরা ইতিমধ্যেই এসেছে শুনেছি। কিন্তু ওরা আমাদের গোপন বন্দীখানার সন্ধান পাবে কি করে? অতএব ভয়ের কিছু নেই।'

'ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করুন। আপনি কখন যাচ্ছেন ডিউটিতে?' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল আহমদ মুসা।

'সারদিন যাচ্ছি না। রাত ৮টার দিকে যাব।'

'ওকে, হরিকিষাণ। আসি। বাই।' বলল আহমদ মুসা।

বেরিয়ে এল আহমদ মুসা রেষ্টুরেন্ট থেকে।

আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল আহমদ মুসা। ঠিক সময়েই সে সবকিছু জানতে পেরেছে। অবশ্যই হাজী সাহেবকে বাঁচাতে হবে। ওদের হাত থেকে হাজী সাহেবকে ছিনিয়ে নেয়ার চেয়ে ওরা রাত ৩টায় বন্দীখানায় পৌছার আগেই তাকে সরিয়ে নেয়া অনেক সহজ হবে।

কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাবল হাজী সাহেবকে সে উদ্ধার করলে তাকে যে আন্দামান সরকার 'মহাসংঘে'র সাথে মিলে আটক করেছিল, তা প্রমাণ করার পথ থাকবে না এবং মহাসংঘে'র সাথে আন্দামান সরকারের সম্পর্ক থাকার বিষয়টি প্রমাণ করার একটা সুযোগ হাতছাড়া হবে। আহমদ মুসা চিন্তা করে দেখেছে, হাজী আবদুল্লাহ ও আহমদ শাহ আলমগীরকে উদ্ধার করা এবং মহাসংঘে'র কিছু লোক ক্ষয় হওয়া সমস্যার সমাধান নয়। সাম্প্রদায়িক ও সন্ত্রাসী সংগঠন 'মহাসংঘ' যদি টিকে থাকে, তাদের কাজ করার সুযোগ যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে ভারতের প্রশাসনযন্ত্রে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি আরও বাড়বে এবং বর্তমানের মত সাম্প্রদায়িক দুষ্কৃতি আরও বৃদ্ধি পাবে। এক হাজী আবদুল্লাহ ও আহমদ আলমগীরকে উদ্ধার করলেও আরও শত শত হাজী আবদুল্লাহ ও আহমদ শাহ আলমগীরকে তারা কব্জা করবে। সুতরাং প্রয়োজন এই সন্ত্রাসী সংগঠনের সমূলে উচ্ছেদ। আর এই কাজ শুধু করতে পারে ভারত সরকারই। এজন্যে প্রয়োজন মহাসংঘকে ভারত সরকারের কাছে হাতে-নাতে ধরিয়ে দেয়া। এর একটা সুযোগ তার হাতে এসেছে। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার অবশ্যই তাকে করতে হবে।

হাজী আবদুল্লাহকে উদ্ধার করে নিজেদের গোপন আশ্রয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত পাল্টাল আহমদ মুসা।

সঙ্গে সঙ্গেই যে চিন্তাটা এসে আহমদ মুসার মাথায় ভর করল সেটা হল, কিভাবে হাজী আবদুল্লাহ ওদের হাতে থাকা অবস্থায় ওদেরকে সিবিআই-এর হাতে ধরিয়ে দেবে? সিবিআই-এর গোয়েন্দারা যারা এসেছে তাদেরকে হাজী আবদুল্লাহর বন্দী থাকার অবস্থানটা জানিয়ে দিতে পারলেই কাজ হয়ে যেত। কিন্তু সেটা কিভাবে? ওদের কোন কিছুই তো তার জানা নেই।

আহমদ মুসা বাসার দিকে হাঁটছিল। তার মাথার মধ্যে তখন তোলপাড় করছিল এসব চিন্তা। হঠাৎ তার মনে পড়লো দিল্লীস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে।

আহমদ মুসা পকেটে হাত দিল সঙ্গে সঙ্গেই। না পকেটে মোবাইল নেই। মর্নিং ওয়াকের সময় সাধারনত সে মোবাইল পকেটে নেয় না। সেই সিলসিলায় আজও মোবাইল তার সাথে নেই।

আহমদ মুসা হাঁটার গতি দ্রুত করল।

ঊাসার গেটে এসে পৌছাতেই দেখল, দু'তলার ব্যালকনি থেকে সাজনা সিংহাল তাকে ব্যস্ত হয়ে ডাকছে। আহমদ মুসা দৌড় দিল।

এক তলার ড্রইংরুমে প্রবেশ করেই দেখতে পেল হাতে মোবাইল নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছে সুরূপা সিংহাল।

'ধন্যবাদ' বলে আহমদ মুসা তার হাত থেকে মোবাইল নিল।

'এক্সেলেন্সী মি. রবার্ট পাওয়েল। মার্কিন রাষ্ট্রদূত।' মোবাইলটি আহমদ মুসার হাতে দিতে দিতে ফিসফিসে কণ্ঠে বলল সুরূপা সিংহাল।

আহমদ মুসা মোবাইলটি কানে তুলে নিয়েই শুনল, 'গুড মর্নিং বিভেন বার্গম্যান। কেমন আছ? তোমার কাজ হয়ে গেছে। সিবিআই ও অন্যান্য গোয়েন্দারা মুভ করেছে।' বলল ওপার থেকে রাষ্ট্রদূত।

'ধন্যবাদ স্যার। আমি কিছুটা জানতে পেরেছি।' আহমদ মুসা বলল।

'কিভাবে?' বলল ওপার থেকে মার্কিন রাষ্ট্রদূত। তার কণ্ঠে বিস্ময়।

'আকস্মিক এক সুযোগ পেয়ে গোপন 'মহাসংঘেক্ষর একজনের কাছ থেকে জানতে পারলাম, সিবিআই অপারেশন ইফনিট আসছে, গোয়েন্দা ইউনিট অলরেডি এসে গেছে।'

'কিন্তু ওরা জানল কি করে? এই উদ্যোগ তো খুবই গোপনে চলছে। প্রধানমন্ত্রী সরাসরি এ বিষয়টার তত্ত্বাবধান করছেন।'

'তাহলে সিবিআই-এর শীর্ষ পর্যায়ে কোথায় ওদের লোক আছে নিশ্চয়?'

'সাংঘাতিক ব্যাপার। বিষয়টা প্রধানমন্ত্রীকে তাহলে জানাতে হয়।'

বলে একটা দম নিয়েই মার্কিন রাষ্ট্রদূত রবার্ট পাওয়েল বলল, 'শোন তোমাকে যে জন্যে টেলিফোন করেছি। তোমাকে একটা বিশেষ মোবাইল নাম্বার দিচ্ছি। সেটা আন্দামানে যাওয়া সিবিআই অপারেশন চীফের। তার সাথে যোগাযোগ রাখবে। তোমার 'বিভেন বার্গম্যান' নাম সে জানে। তোমার সাহায্য তাদের প্রয়োজন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী আমার মাধ্যমে তোমাকে এ অনুরোধ করেছেন।'

কথা শেষ করেই বিশেষ মোবাইল নাম্বারটি বলল মার্কিন রাষ্ট্রদূত।

আহমদ মুসা নাম্বারটি লিখে নিয়ে বলল, 'অনেক ধন্যবাদ মি. এ্যামবেসেডর। এই নাম্বারের চেয়ে বেশি মূল্যবান এই মূহুর্তে আমার কাছে আর কিছু নেই। এই সুযোগ হাতে পাওয়ার জন্যে আমি আপনাকে টেলিফোন করতে যাচ্ছিলাম। আপনি টেলিফোন না করলে এতক্ষণে আমার টেলিফোন পেয়ে যেতেন।'

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। ঈশ্বর তোমাকে সাহায্য করুন।' বলল মার্কিন রাষ্ট্রদূত।

'একটা বিষয়, সিবিআই অপারেশন টীম কখন আন্দামানে পৌছেছে?' আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

'ধাজ সন্ধ্যা নাগাদ পৌছেছে বলে আমি জানি।'

'এই সময়-সূচী ঠিক থাকা খুব জরুরি স্যার। এর চেয়ে যেন দেরি না হয়।'

'কেন? কোন সমস্যা আছে?'

'ইয়েস মি. এ্যামবেসেডর। আজ মধ্যরাতের দিকে সিবিআই এ্যাকশনে আসার আগেই হাজী সাহেবকে হত্যা করে তারা তাকে বেআইনিভাবে বন্দী করে রাখার দায় থেকে নিজেদের মুক্ত করতে চায়।'

'সর্বনাশ। তাহলে এখন প্রধানমন্ত্রীকে আমি বলছি যে, তাদের অবশ্যই সন্ধ্যার মধ্যে আন্দামানে পৌছাতে হবে। কিন্তু পৌছে অল্প সময়ের মধ্যে কি তারা কিছু করতে পারবে?' বলল রবার্ট পাওয়েল। তার কণ্ঠে উদ্বেগ।

'সেটা আমার উপর ছেড়ে দিন মি. এ্যামবেসেডর।'

‘স্যরি। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে তুমি আহমদ মুসা। ধন্যবাদ তোমাকে।’

‘ধন্যবাদ স্যার।’

‘ঈশ্বর তোমাকে সাহায্য করুন। বাই।’

আহমদ মুসা কথা শেষ করে মোবাইলটা পাশের সোফায় ছুড়ে দিয়ে নিজেও ধপ করে বসে পড়ল সোফার উপর। তারপর দু’হাত দু’দিকে ছড়িয়ে দিল। তার মুখে স্বস্তির একটা আনন্দ।

উপরে দু’তলার ল্যান্ডিং-এ দাঁড়িয়ে সুষমা রাও ও সাজনা সিংহাল এবং সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে সুরূপা সিংহাল আহমদ মুসার কথা শুনছিল। তারা বুঝল আজ রাতে ভয়ানক কিছু ঘটতে যাচ্ছে। হাজী সাহেবের জীবনও বিপন্ন। তবে আহমদ মুসার মুখে স্বস্তি দেখে তারা আবার আশান্বিত হল। সুষমা রাও, সাজনা সিংহাল সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে নেমে এল নিচে। আহমদ মুসার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, ‘ভাইয়া আপনার কথা শুনে আমরা আতংকিত হয়েছিলাম। কিন্তু আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, আপনি আশংকা-আতংকের মত কিছুই যেন বলেননি।’

আহমদ মুসা সোজা হয়ে বসল। বলল, ‘সুষমা, বলা যায় আমি আন্দামানে এতদিন একাই লড়াই করেছি। মনে হয় এবার এই লড়াইয়ে সিবিআই তথা ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারকে শামিল করতে পারছি। এ কারণেই আশংকার মধ্যে আমার এই আনন্দ।’

সুষমাসহ ওদের মুখেও স্বস্তির ভাব ফুটে উঠল। সুষমাই বলল, ‘হাজী আংকল নিরাপদ হবেন তো?’

গম্ভীর হল আহমদ মুসা। বলল, ‘নিরাপত্তা দেয়ার এষতিয়ার শুধুই আল্লাহর হাতে। কোন মানুষ ভবিষ্যত সম্পর্কে কিছুই বলতে পারে না বোন।’

বলেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘যাই, গোসল সেরে নাস্তা খেয়ে লম্বা আরেকটা ঘুম দেব।’

সিঁড়িতে কয়েক ধাপ উঠে আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে আহমদ মুসা সাজনাকে লক্ষ্য করে বলল, ‘তুমি একটু দেখবে সাজনা মোটর সাইকেলটা ঠিক-ঠাক আছে কিনা, পুরো ট্যাংক তেল ভরেছে কিনা এবং সাইলেন্সার ঠিকমত লাগিয়েছে

কিনা।’ বলেই আবার ঘুরে দাঁড়াল আহমদ মুসা। তারপর সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে উঠে গেল দুতলায়।

সুরূপা সিংহাল, সাজনা সিংহাল ও সুষমা রাও তিন জন এসে বসল সোফায়। তিনজনই গা এলিয়ে দিল সোফায়।

চোখ বন্ধ করেছিল সাজনা। চোখ বন্ধ করেই বলল, ‘মনে হচ্ছে দীর্ঘ এক স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে চলছি আমি।’

সুষমাও ঐভাবে চোখ বন্ধ করে সোফায় গা এলিয়ে দিল। বলল, ‘স্বপ্নও এত সুন্দর, এত দীর্ঘ, এত থ্রিলিং হয় না সাজনা।’

‘তুমি খুব ভাগ্যবান সুষমা। এই সুন্দর, এই দীর্ঘ এবং থ্রিলিং স্বপ্নের তুমি একটা বড় অংশ। নায়ক আহমদ শাহ আলমগীর শত্রুর কবলে, তোমার এখন বুক ভরা দুঃখ। কিন্তু আমি নিশ্চিত, নায়ক নায়িকার বুকে ফিরে আসবেই। স্বপ্নের থ্রিল তো তোমাকে ঘিরেই।’

‘থ্রিল দেখলে, থ্রিলের মূল্যটা দেখেছে? আহমদ শাহ আলমগীর কি অবস্থায় কে জানে! নিজের পিতা হয়ে গেল আমার জন্য বিপজ্জনক। মা ও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি।’ বলল সুষমা রাও। তার কণ্ঠ ভারী। চোখ অশ্রু সজল হয়ে উঠেছে।

তার পাশেই বসেছিল সুরূপা সিংহাল। সে সুষমা রাওয়ের কাঁধে হাত রেখে বলল, ‘ধৈর্য ধরতে হবে বোন। দেখ না সুস্মিতা বালাজীকে। সে প্রায় ২০ বছর ধরে বনবাসে। আমাদের হাসি-কান্না সবই আমাদের জীবনের এক একটি দাবী হিসেবে আসে। জীবন-নাট্যের এক মহানায়ক আহমদ মুসার কথাই একবার ভেবে দেখ না। আহমদ শাহ আলমগীর তার কে? আন্দামানের যে লোকগুলোকে সে বাঁচাতে এসেছে, তারা তার কে? কেউ না। দেখ এদের জন্যেই তিনি বাড়ি-ঘর, স্ত্রী-পুত্র থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়েছেন শুধু নয়, মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন কয়েকবার। এই যে মৃত্যুর মুখে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, তিনি কি জানেন যে তিনি ফিরে আসবেন। ফিরে আসা, না আসা দুটোকে মেনে নিয়েই তিনি সামনে অগ্রসর হন। এটা আকাশস্পর্শী ভারী সিদ্ধান্ত। চূড়ান্ত কোরবানী এটা। জীবনেরই এক দাবী

হিসেবে একে তিনি নিজের জীবনের জন্যে নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন।' থামল সুরূপা সিংহাল।

সুষমা রাও ওড়নার আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বলল, 'তুমি ঠিক বলেছ আপা। জীবনের জন্যে সুখের মত দুঃখও একটি বাস্তবতা। কিন্তু আপা তুমি একজন দেবতার উদাহরণ এনেছ। দেবতার এবং মানুষের শক্তি তো এক নয় আপা। আহমদ মুসা দেবতার মতই স্বপ্নের নায়ক, কল্পনার নায়ক, আমরা মাটির মানুষ তাঁকে শুধু নমষ্কারই করতে পারি, সমকক্ষ হতে পারি না। দেখলে তো মাত্র ক'ঘণ্টা পরে রাতে এক জীবন-মরণ লড়াইয়ে নামার আগে উনি দীর্ঘ ঘুম দিতে গেলেন। বাড়ির কথা, স্ত্রীর কথা, সন্তানের কথা, নিজের জীবনের কথা মনে পড়লে এমন নিশ্চিন্ত থাকা কি কারও পক্ষে সম্ভব!' থামল সুষমা রাও।

সুরূপা সিংহাল বলল, 'উনি দেবতা নন সুষমা। উনি মাটির মানুষ। আর সত্যিকার মানুষ দেবতার চেয়ে বড় হন। মুসলমান ধর্মের ইতিহাসে পড়েছ যে, ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টির পর তার ফিরিশতা অর্থাৎ এ্যাঞ্জেলদের মানুষকে সিজদা করতে বলেছিলেন। ঈশ্বরের পর মানুষের চেয়ে বড় কেউ নেই। একজন কবি বলেছেন, 'আপনার লয়ে বিব্রত থাকিতে আসেনি কেহ অবনি পরে।' সকলে যখন সবার তরে হয়, তখন সমাজ হয় সোনার সমাজ। আহমদ মুসারা সোনার সমাজের সোনার টুকরো।'

'একটা কথা আপা, তোমার এ সোনার টুকরো'র পরিচয় কিন্তু তোমাদের দেখা 'ভালো মানুষ'দের সাথে মিলে না। আমাদের ইতিহাসের 'ভালো মানুষরা' 'অহিংসা পরমধর্ম', সর্বজীবে দয়া'র অনুসারী, তারা সমাজের সংঘাত থেকে দূরে থেকে নিরিবিলি নিরুপদ্রব জীবন যাপন করতে চান এবং নিজেরা ভালো থেকে মানুষকে ভালো থাকার উপদেশ দেন। কিন্তু আহমদ মুসা মানুষকে শুধু ভালো থাকা নয়, ভালো হতে বলা নয়, মন্দের প্রতিরোধ এবং মজলুমের পক্ষে লড়াইয়েও নামেন। আপা, এই দুই ভালোর মধ্যে আসলে ভালো কোনটা?'

'আহমদ মুসাই আসল ভালো'র প্রতীক । আমাদের কবি বলেছেন না যে, 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।' অন্যায়-অত্যাচার সহ্য করা অন্যায়-অত্যাচার করার মতই পাপ। শুধু ভালো করা

নয়, মন্দের আক্রমণ থেকেও মানুষকে বাঁচাতে হবে। আহমদ মুসা দুই কাজই করেন।' বলল সুরূপা সিংহাল।

সঙ্গে সঙ্গেই সাজনা বলে উঠল, 'জুলুমের প্রতিকার, জালেমের বিচার করা আইনের কাজ, রাষ্ট্রের কাজ। কেউ নিজে এর প্রতিকার বা বিচারের নামে যা করবে সেটা কি অবৈধ এবং আইনের প্রতি হস্তক্ষেপ হবে না?'

'জুলুম, জালেমের বিচার করা রাষ্ট্রের কাজ, আইনের কাজ। কিন্তু জালেমের হাত থেকে, জালেমের হাত থেকে মজলুমকে রক্ষা করা যে কোন ব্যক্তির কাজ। যেমন কেউ কাউকে নির্যাতন করছে, যাকে নির্যাতন করা হচ্ছে আর যারা এই দৃশ্য দেখছে তাদের প্রত্যেকের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে মজলুমকে রক্ষা করা তারপর জালেমকে আইনের হাতে তুলে দেয়া।' বলল সুরূপা সিংহাল।

'কিন্তু মজলুমকে রক্ষা করতে গিয়ে যদি জালেমকে আঘাত করতে হয়, সেটা কি তাহলে আইন হাতে তুলে নেয়া হবে না?' জিজ্ঞেস করল সাজনা।

'মজলুমকে তাৎক্ষণিক রক্ষার জন্যে যতটুকু করার প্রয়োজন পড়ে, সেটা অবশ্যই আইন হাতে তুলে নেয়ার মধ্যে পড়বে না। কিন্তু মজলুমকে রক্ষা করার পর ক্রুদ্ধ হয়ে বা প্রতিশোধ বশত জালেমের উপর বাড়তি যা কিছুই করা হোক-তা আইন হাতে তুলে নেয়ার বা নিজে বিচারক সাজার মত অপরাধমূলক কাজ হবে।' সুরূপা সিংহাল বলল।

সুরূপা সিংহালের কথা শেষ হতেই সুষমা রাও উঠে দাঁড়াল। বলল, 'ধন্যবাদ সুরূপা আপা। আপনি আহমদ মুসাকে যতটা ডিফাইন করেছেন, আহমদ মুসা নিজেও বোধ হয় এভাবে নিজেকে ডিফেন্ড করেন না। ধন্যবাদ আপনাকে। এবার চলুন, নিশ্চয় ভাইয়া গোসল সেরে বেরিয়েছেন।'

উঠে দাঁড়াল সুরূপা সিংহাল ও সাজনা সিংহাল দুজনেই।

উঠতে উঠতে সাজনা সিংহাল বলল, 'চল আহমদ মুসা ভাইয়ার কাছ থেকে সুরূপা আপার ওকালতির ফি আদায় করব।'

হেসে উঠল সাজনা সিংহাল ও সুষমা রাও দুজনেই।

সুরূপা সিংহালও হাসল। বলল, 'অন্তত তোমরা যে এটুকু মনে করেছ আমি আহমদ মুসার উকিল হতে পারি, এটাও আমার জন্যে সৌভাগ্যের।'

বলেই দু'হাতে দুজনের গলা জড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত দোতলায় উঠতে লাগল।

ঠিক রাত ২টা ৪৫ মিনিটে আট সিটের একটা ল্যান্ড ক্রুজার জীপ ওল্ড সেন্ট্রাল মেডিকেল ষ্টোর থেকে প্রায় তিনশ গজ দূরে মিডল পোর্ট রোডের পাশে এক ঝোপের অন্ধকারে এসে দাঁড়াল। জলপাই রঙের জীপটি অন্ধকারে একদম মিশে গেল। জীপে আটজন আরোহী। পেছনে তিন তিন করে ছয় জন। আর সামনে দুজন। ড্রাইভিং সিটে একজন তার পাশের সিটে একজন। জীপটি সিবিআই-এর।

ড্রাইভিং সিটের পাশের সিটে মেজর সুরজিত সিন্ধিয়া। সিবিআই অফিসার।

জীপটি দাঁড়াতেই মেজর সুরজিত সিন্ধিয়া গলায় ঝুলানো নাইট ভিশন দুরবিন দ্রুত চোখে লাগাল।

দূরবিনের দুচোখ ওল্ড সেন্ট্রাল মেডিকেল ষ্টোরের দিকে। সামনের গোটা রাস্তাসহ মেডিকেল ষ্টোরের গাড়ি বারান্দা পর্যন্ত পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে মেজর সুরজিত সিন্ধিয়া। দেখল গাড়ি বারান্দা এলাকায় দুটি ওয়াটার ক্যারিয়ার দাঁড়িয়ে আছে। খুশি হল মেজর সুরজিত সিন্ধিয়া। বিভেন বার্গম্যানের দেয়া তথ্য অনুসারে ওয়াটার ক্যারিয়ারে করে হাজী আবদুল্লাহকে হত্যা করার জন্যে নিয়ে যাওয়া হবে।

মেজর সুরজিত সিন্ধিয়া ড্রাইভিং সিটে বসা লোকটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'লেফটেন্যান্ট শিকার আমাদের ঠিক জায়গায় রয়েছে। ঠিক সময়েই আমরা এসেছি।'

মেজর সুরজিতের জীপটি দাঁড়াবার তিন মিনিটের মধ্যে অনুরূপ আরেকটা জীপ এসে পঞ্চাশ গজ পেছনে দাঁড়াল।

এ জীপেও আটজন আরোহী।

এ জীপের পাশের সিটে রয়েছে কর্নেল সুরেন্দ্র সিং।

জীপ থামতেই সে অয়্যারলেস তুলে নিয়ে বলল, 'সুরজিত সব ঠিক ঠাক আছে?'

'জি স্যার। আমরা ঠিক সময়ে এসেছি। ওল্ড মেডিকেল ষ্টোর বাড়িটির গাড়ি বারান্দা এলাকায় দুটি ওয়াটার ক্যারিয়ার দেখতে পাচ্ছি।' বলল মেজর সুরজিত সিন্ধিয়া।

'ওকে। বিভেন বার্গম্যানও তো বলেছে ওয়াটার ক্যারিয়ারে করেই হাজী আবদুল্লাহকে পাচার করা হবে।' বলল কর্নেল সুরেন্দ্র সিং।

'ইয়েস স্যার।'

'ওদিকে চোখ রেখ। ওদের গাড়ি মুভ করলেই আমরা অগ্রসর হবো। সামনে চৌমাথার মুখেই ওদের আটকাতে হবে।'

'ইয়েস স্যার।'

'ধন্যবাদ। বাই।'

বলেই অয়্যারলেসের লাইনটা কাট করে আরেকটা লাইনের নব পুশ করল কর্নেল সুরেন্দ্র সিং।

অয়্যারলেসে সঙ্গে সঙ্গেই একটা কণ্ঠ ভেসে উঠল, 'ইয়েস স্যার, আমি শংকর।'

'তোমরা বাড়ির পেছনে ঠিকভাবে পজিশন নিতে পেরেছ?'

'জি স্যার। পেছন দিয়ে কেউ পালাতে পারবে না।'

'ওকে, সব দিকে ঠিকভাবে নজর রাখ। বাই।'

বলে কর্নেল সুরেন্দ্র সিং লাইনটা অফ করে দিল।

রাত ২ টা ৫৫ মিনিট। কর্নেল সুরেন্দ্র সিং এর অয়্যারলেস টেলিফোন আবার বেজে উঠল।

'হ্যালো, কর্নেল সুরেন্দ্র বলছি।' টকিং লাইন অন করেই বলল কর্নেল সুরেন্দ্র সিং।

ওপার থেকে একটা কণ্ঠ ভেসে এল, 'ইয়েস, আমি বিভেন বার্গম্যান। আপনাদের উপস্থিতি ওদের কাছে ধরা পড়ে গেছে। ওরা মুভ করেছে। আপনাদের প্রতিরোধ ও হাজী আবদুল্লাহকে নিয়ে পালানোর কাজ একই সাথে করবে ওরা। ওকে। বাই।'

ওপার থেকে অয়্যারলেস টেলিফোন লাইন কেটে গেল। কর্নেল সুরেন্দ্র সিং ধন্যবাদও দিতে পারল না।

সঙ্গে সঙ্গেই কর্নেল সুরেন্দ্র সিং পুশ করল সুরজিতের লাইন।

'হ্যালো, সুরজিত!' ওপার থেকে সাড়া দিল।

'ইয়েস, কর্নেল সুরেন্দ্র বলছি। ওরা টের পেয়েছে। মুভ! বেরুবার রাস্তা ওদের ব্লক করো।' নির্দেশ দিল কর্নেল সুরেন্দ্র।

কর্নেল সুরেন্দ্রের কথা শেষ হবার পরবর্তী দুই তিন সেকেন্ডের মধ্যেই একটা বোমা বিস্ফোরিত হল মেজর সুরজিতের গাড়ির উপর।

কর্নেল সুরেন্দ্রর 'মুভ' শব্দ উচ্চারিত হবার সাথে মেজর সুরজিত ড্রাইভার লেফটেন্যান্ট বরুনকে 'মুভ' করার ইঙ্গিত দিয়েছিল। বোমা যখন পড়ল তখন কয়েক গজ 'মুভ' করেছে মেজর সুরজিতের জীপ। সুতরাং বোমাটা গিয়ে সরাসরি আঘাত করল জীপের গজ চারেক পেছনের মাটিকে। আঘাতের ধ্বংসাত্মক একটা ঢেউ এসে আঘাত করল জীপের পেছনে। প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল জীপ। শেষ পর্যন্ত উল্টে গেল না। কিন্তু আহত হয়ে লুটিয়ে পড়েছে পেছনের তিন জন সাথী।

পেছনে না তাকিয়েই মেজর সুরজিত পেছনের উদ্দেশ্যে বলল, 'যারা ভালো আছ তারা সাথীদের দেখ।' আর ড্রাইভারকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'মুভ অন লেফটেন্যান্ট। চৌমাথার মুখে পৌছাতে হবে।'

ওদিকে বোমা বিস্ফোরিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই এদিকে ব্রাশ ফায়ারের শব্দ হল। এক পশলা ব্রাশ ফায়ারের শব্দ, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে একটু পরে আরেক পশলা ব্রাশ ফায়ারের শব্দ হল এবং তার প্রায় সাথে সাথেই আরেকটা বোমা বিস্ফোরণের শব্দ হল কর্নেল সুরেন্দ্রের জীপের আট দশ গজ দূরে।

কর্নেল সুরেন্দ্রের জীপ তখন এগিয়েছিল মুভ করার জন্যে। প্রথম বোমা বিস্ফোরণের পরে মুহূর্তের জন্যে থমকে গিয়েছিল কর্নেল সুরেন্দ্রের জীপের ষ্টার্ট।

কর্নেল সুরেন্দ্রের মুখের সামনে অয়্যারলেস। সে চিৎকার করছিল, 'মেজর সুরজিত হ্যালো, হ্যালো, মেজর সুরজিত।'

অয়্যারলেস হাতে থাকলেও বোমার ধাক্কা সামলানো, করণীয় সম্পর্কে তাৎক্ষণিক নির্দেশ দেয়া ইত্যাদি চিন্তা করতে গিয়ে কর্নেল সুরেন্দ্রের কল এ্যাটেন্ড করতে পারেনি মেজর সুরজিত। প্রথম সুযোগেই অয়্যারলেস মুখের কাছে নিয়ে মেজর সুরজিত বলল, 'ইয়েস মেজর। কয়েকজন লোকসহ আমাদের গাড়ির পেছনটা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। আমরা এগোচ্ছি স্যার। আপনারা ওকে স্যার? দ্বিতীয় বোমার কি অবস্থা?'

'বেভ বয়, মুভ। দ্বিতীয় বোমা আমাদের পর্যন্ত পৌছার আগেই বিস্ফোরিত হয়েছে। ব্রাশ ফায়ার তো নিশ্চয় তোমরা করনি। বেশ একটু দূরত্বে মানে বোমারুদের অবস্থান যেখানে ছিল, সেখান থেকে ব্রাশ ফায়ার হয়েছে।' বলল কর্নেল সুরেন্দ্র।

'ঠিক তাই স্যার। তাহলে স্যার ব্রাশ ফায়ার আপনাদের গাড়ি থেকেও হয়নি?' বলল মেজর সুরজিত।

'অবশ্যই না।' কর্নেল সুরেন্দ্র বলল।

'তাহলে?' প্রশ্ন ফের সুরজিতের। ভাবছিল, হিসেব মেলাচ্ছিল কর্নেল সুরেন্দ্র। বলল, 'ব্রাশ ফায়ার বিভেন বার্গম্যানের। প্রতিরোধ তত্ত্ব অনুযায়ী একটি করে নয়- বোমা আরও আসা উচিত ছিল। বিভেন বার্গম্যানের ব্রাশ ফায়ার আক্রমণকারীদের হত্যা করেছে।'

কর্নেল সুরেন্দ্রের কথা শেষ হতেই মেজর সুরজিত বলল, 'স্যার দুটি ওয়াটার ক্যারিয়ারই ছুটে আসছে।'

'চৌমাথা পর্যন্ত আসেনি নিশ্চয়।'

'না স্যার।'

'চৌমাথা দখল কর। তারপর আরও সামনে এগোও।'

মেজর সুরজিতের গাড়ি তখনও চৌমাথা থেকে প্রায় ৫০ গজ দূরে। কিন্তু চৌমাথা থেকে ওল্ড সেন্ট্রাল মেডিকেল ষ্টোরের দূরত্ব মোট ৫০ গজের বেশি নয়।

ওয়াটার ক্যারিয়ার দুটো ইতিমধ্যেই ২৫ গজ পার হয়ে এসেছে। সুতরাং চৌমাথা থেকে তারা মাত্র পঁচিশ গজ দূরে। আর তারা আসছে মরণপণ গতিতে।

মেজর সুরজিতের গাড়ি যখন ১০ গজের মাথায় পৌছেছে, তখন প্রচ-বেগে একটা ওয়াটার ক্যারিয়ার এসে তার রাস্তার মুখে আড়াআড়ি দাঁড়িয়ে গেল এবং পরক্ষণেই তাতে জ্বলে উঠল আগুন। আর তার সাথে দ্বিতীয় ওয়াটার ক্যারিয়ারটি চৌমাথায় এসে বাঁক নিয়েই দক্ষিণের রাস্তা ধরে দ্রুত এগিয়ে চলল।

চৌমাথা থেকে উত্তর-দক্ষিণে যে রাস্তা বেরিয়ে গেছে তার নাম 'সী এন্ড লেক রোড'। মানুষ সংক্ষেপে একে 'সী লেক রোড' বলে ডাকে। রাস্তার উত্তর প্রান্ত পোর্ট ব্লেয়ার লেক পর্যন্ত গেছে, আর দক্ষিণ মাথা এঁকে-বেঁকে সাগর তীরে গিয়ে শেষ হয়েছে। মেজর সুরজিতের জীপ দাঁড়িয়ে গেল।

রাস্তার দুধারেই সেখানে গভীর খাদ। বিশাল ওয়াটার ক্যারিয়ার পাশ কাটিয়ে সামনে এগোবার কোন উপায় নেই। তার উপর গোটা ক্যারিয়ারটিই এখন জ্বলন্ত। তেল ঢেলে দেয়ায় মাটিতেও আগুন জ্বলছে।

কর্নেল সুরেন্দ্রর জীপও এসে দাঁড়াল মেজর সুরজিতের জীপের পেছনে।

মেজর সুরজিতরা গাড়ি থেকে নেমেছে কর্নেল সুরেন্দ্রও নামল গাড়ি থেকে। বলল, 'মেজর, ঐ ওয়াটার ক্যারিয়ারে করে হাজী আবদুল্লাহকে নিয়ে ওরা পালাচ্ছে।'

'স্যার গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে এ রাস্তা থেকে নেমে দক্ষিণের রাস্তায় উঠা যাবে। মাটি এবড়ো-থেবড়ো, কিন্তু বড় কোন প্রতিবন্ধকতা নেই।' বলল মেজর সুরজিত সিন্ধিয়া।

'হ্যাঁ, এটাই বিকল্প। চল কুইক।' নিজের গাড়ির দিকে এগোতে এগোতে বলল কর্নেল সুরেন্দ্র।

ঠিক এ সময় একটানা ব্রাশ ফায়ারের আওয়াজ এল দক্ষিণের রাস্তার দিক থেকে অর্থাৎ দূরে ছুটে চলা ওয়াটার ক্যারিয়ারের দিক থেকে। তার সাথে সাথেই দুতিনটি টায়ার বাষ্ট হবার বিকট শব্দ।

কর্নেল সুরেন্দ্র এবং মেজর সুরজিত দুজনই চোখে নাইট ভিশন দূরবিন লাগিয়ে দেখল, ওয়াটার ক্যারিয়ারটি রাস্তার এ পাশে কাত হয়ে গেছে এবং

একজন আপাদ মস্তক কালো কাপড়ে আবৃত লোক ওয়াটার ক্যারিয়ারটির সামনের দিকে ষ্টেনগান তাক করে দাঁড়িয়ে আছে। কর্নেল সুরেন্দ্র বলল, ‘ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কেউ পালাতে পারেনি। বিভেন বার্গম্যান ওদেরকে গাড়ির মধ্যেই আটকে রেখেছে।’

কথাগুলো বলেই সে পা বাড়াল রাস্তা থেকে নামার জন্যে এবং বলল, ‘একটি গাড়ি এখানে থাক। আরেকটি ওখানে আসবে। মেজর সুরজিত, মেজর পুরন্দর এবং আরও কয়েকজন এস। ছুটতে হবে ওদিকে।’

কর্নেল সুরেন্দ্র সিং, মেজর সুরজিত ও মেজর পুরন্দরসহ আরও তিন জন ছুটল ওয়াটার ক্যারিয়ারের দিকে।

ওরা গিয়ে পৌছল। ওরা দেখল, পাঁচজন লোক গাড়ির মাথার পাশে হাত তুলে বসে আছে। কাল জুতা, কাল প্যান্ট, কালো জ্যাকেট আর কালো হ্যাট পরা বিভেন বার্গম্যান ওদের দিকে ষ্টেনগান তাক করে দাঁড়িয়ে আছে।

ওখানে পৌছার পরই মেজর সুরজিত ও মেজর পুরন্দরের ষ্টেনগান তাক হল ওদের লক্ষ্যে। আর তার সাথেই বিভেন বার্গম্যঅন তার ষ্টেনগানের মাথা সরিয়ে নিয়ে ষ্টেনগান ঝুলালো কাঁধে।

কর্নেল সুরেন্দ্র এগিয়ে গেল বিভেন বার্গম্যান ওরফে আহমদ মুসার দিকে। আহমদ মুসার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, ‘গুড মর্নিং বিভেন বার্গম্যান। আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।’

‘ধন্যবাদ কর্নেল।’ বলেই আহমদ মুসা ঐ পাঁচ জনের দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে মাঝের একজন সুঠামদেহীকে দেখিয়ে বলল, ‘আপনি নিশ্চয় চিনবেন, ইনি জেনারেল জগজিত জয়রাম। ইনি আন্দামান মহাসংঘের দ্বিতীয় ব্যক্তি। পুরো নাম এখন তাঁর জেনারেল জগজিত জয়রাম মহাগুরু। ডাকা হয় জেনারেল স্বামীজী বলে। ওর সামনে পড়ে থাকা তাঁর ঐ মোবাইলে উনি গাড়ি কাত হয়ে পড়ার পর টেলিফোন করেছিলেন সম্ভবত মহাসংঘের এক নম্বর ব্যক্তি কিংবা সংঘের অন্য কাউকে। আমি কলটা সমাপ্ত করতে দেইনি। এ কল থেকে এবং মোবাইল থেকে আরও প্রমাণ পেতে পারেন।’ থামল আহমদ মুসা।

'ধন্যবাদ বিভেন বার্গম্যান। নয়া দিল্লীতে শুধু আপনার নাম শুনেছি। আজকের সফল অভিযানের সব কৃতিত্ব আপনার। আমাদের জীবনও আপনি বাঁচিয়েছেন। আপনি যদি ভারতীয় না হন, তাহলে আপনার প্রতি গোটা ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতা।' বলল কর্নেল সুরেন্দ্র।

'ধন্যবাদ কর্নেল। একটু বেশি বলেছেন আপনি। আমি যা করেছি সেটা সামান্য সহযোগিতা মাত্র। কৃতজ্ঞতা আমাদের ঈশ্বরকে জানানো উচিত। আমি এখন চলি। আপনাদের এখন অনেক কাজ। ঘণ্টা দেড়েক পর আমি আপনার সাথে কথা বলব।'

বলে একটু থেমেই আবার বলে উঠল, 'হাজী আবদুল্লাহকে ওরা সংজ্ঞাহীন করে চাদরে জড়িয়ে সিটের সেকেন্ড সারির ছাদের সাথে টাঙিয়ে রেখেছে।'

থামল আহমদ মুসা। তাকাল সবার দিকে। বলল, 'আসি কর্নেল সুরেন্দ্র, মেজর সুরজিত, মেজর পুরন্দর। সকলকে আবার ধন্যবাদ।'

আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়িয়ে রাস্তার ঢাল থেকে নিচে নেমে গেল। ওখানে কাত হয়ে পড়েছিল একটা মোটর সাইকেল। মোটর সাইকেলটি তুলে নিয়ে আহমদ মুসা ওখানেই চড়ে বসল। মোটর সাইকেলটি নিঃশব্দে উঠে গেল রাস্তার উপর। দ্রুত হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

কর্নেল সুরেন্দ্র তাকিয়েছিল আহমদ মুসার দিকে। সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে অনেকটা স্বগত কণ্ঠে বলল, 'মি. বার্গম্যানের কাছ থেকে একটা শিক্ষা পেলাম। এ ধরনের অপারেশনে সাইলেন্সার যুক্ত মোটর সাইকেল খুবই কার্যকরী। সুতরাং গাড়ি থাকলেও, তার সাথে মোটর সাইকেল অবশ্যই থাকা দরকার।'

কথা শেষ করেই কর্নেল সুরেন্দ্র তাকাল মেজর সুরজিতের দিকে। বলল, 'মেজর তোমরা এদের হাত-পা বেঁধে গাড়িতে তোল।'

ইতিমধ্যে গাড়িও এসে গেছে।

কথা বলার সময়ই কর্নেল সুরেন্দ্র রুমাল দিয়ে ধরে তুলে নিয়ে রুমালে জড়িয়ে জেনারেল জগজিত জয়রামের মোবাইল পকেটে রাখল।

মেজর সুরজিত ও মেজর পুরন্দর সকলের পকেটে এবং গাড়ি সার্চ করে যা কিছু পেল সব ভিন্ন কাপড়ে বেঁধে গাড়ির একটা ব্যাগে রেখে দিল।

জেনারেল জগজিত জয়রামসহ গ্রেফতারকৃত সকলকে গাড়ির মেঝেয় তুলল এবং হাজী আবদুল্লাহকে বাঁধন খুলে দিয়ে যতেœর সাথে গাড়ির সিটে শুইয়ে দিল।

কর্নেল সুরেন্দ্র মেজর পুরন্দরকে বলল গাড়িতে উঠে বসতে এবং গাড়ি সামনের ওল্ড সেন্ট্রাল মেডিকেল ষ্টোর বাড়িটাতে নিয়ে যেতে। অন্যদিকে প্রথম গাড়ির ড্রাইভিং অফিসার লেফটেন্যান্ট বরুনকে বলল গাড়ির তিনজন প্রহরীকে ওল্ড সেন্ট্রাল মেডিকেল ষ্টোরের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে গাড়ি নিয়ে হেডকোয়ার্টারে চলে যেতে এবং আরেকটি গাড়ি নিয়ে এখনি চলে আসতে।

মেজর পুরন্দর গাড়ি নিয়ে উঠে গেল রাস্তায় এবং চলল গোপন বন্দীখানা হিসেবে ব্যবহৃত বাড়িটার দিকে।

কর্নেল সুরেন্দ্র ও মেজর সুরজিত ধীরে ধীরে হেঁটে চলে গেল রাস্তায়।

দুজনে হেঁটে চলল বাড়িটার দিকে।

‘মেজর, বিভেন বার্গম্যানকে কেমন মনে হল তোমার?’ বলল কর্নেল সুরেন্দ্র।

‘অদ্ভুত স্যার। কিন্তু এমন দক্ষ, অন্যের প্রয়োজনের প্রতি এত সচেতন এবং এমন বিনীত স্বভাবের মানুষ স্যার সিআইএ’র হতে পারে না। দেখলেন তো, কৃতিত্ব তিনি নিলেন না, বললেন কৃতজ্ঞতা ঈশ্বরের প্রাপ্য।

‘ঠিক বলেছ মেজর সুরজিত। সিআইএ’র প্রতি পদক্ষেপে বড় হওয়ার একটা অহমিকা আছে, অন্যের ত্রুটি ধরার প্রবণতা আছে। বিভেন বার্গম্যানের মধ্যে এটা নেই।’ কর্নেল সুরেন্দ্র বলল।

‘তাহলে কে তিনি স্যার? নাকি মার্কিন মনের রূপান্তর ঘটছে? নতুন মার্কিন প্রেসিডেন্ট কিন্তু ‘প্রেসিডেন্ট জেফরসন’ হয়ে দাঁড়াচ্ছেন। ‘বিশ্বটা আমার তরে’ না বলে তিনি ‘সকলে আমরা সকলের তরে’ বলছেন।’ বলল মেজর সুরজিত।

‘হতে পারে মেজর। দিন কারও সমান যায় না। কলিংগ যুদ্ধের ভয়ংকর যোদ্ধা সম্রাট অশোক কলিংগ যুদ্ধের পর ‘স্মৃতি অশোক’ এ পরিণত হয়েছিলেন। যাক, বার্গম্যানের আরও পরিচয় আমরা পাব। আমাদের গোটা অপারেশনে তিনি আমাদের সাথে আছেন।’

কথা শেষ করেই কর্নেল সুরেন্দ্র হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে উঠল। ওল্ড মেডিকেল ষ্টোর বাড়িটার দিকে থেকে কিছুটা হৈ চৈ এর মত শোনা যাচ্ছে। দ্রুতকণ্ঠে সে বলল, ‘কিছু ঘটল নাকি ওখানে?’

বলেই কর্নেল সুরেন্দ্র অয়্যারলেস তুলে নিল মুখের কাছে। কল করল মেজর পুরন্দরকে।

মেজর সুরজিত সিন্ধিয়াও উদগ্রীব হয়ে উঠল কি ঘটেছে তা শোনার জন্যে।

# ৬

বিবি মাধবের খাটের পাশে 'কিট ক্যাবিনেটে'র উপরে রাখা মোবাইলটা বেজে উঠল।

বালিশে আধা-শোয়া বিবি মাধবের চোখটা সবে ধরে এসেছিল।

মোবাইলের রিংটোন তার সে ঘুমের জাল ছিড়ে ফেলল। লাফ দিয়ে উঠে বসল। মোবাইলটি হাতে নিয়ে বলল, 'হোল্ড অন।'

বলে সে দ্রুত খাট থেকে নামল এবং ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

গভর্নর বিবি মাধবের স্ত্রী পাশেই শুয়ে ছিল। তার চোখ দুটি ছিল বোজা। বিবি মাধব যখন মোবাইল নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, সে চোখ খুলল। দ্রুত উঠে বসে খাট থেকে নেমে এল সেও। বিড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে সে স্বামীর পিছু নিল।

বিবি মাধবের স্ত্রীর চোখে-মুখে, কৌতুহল দুই-ই। তার স্বামী বিবি মাধব সারারাত ঘুমায়নি। আধা ঘণ্টা আগে বেড রুমে এসেছে, কিন্তু বেডে আসেনি। ঘরময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছে এবং ঘড়ি দেখছে বার বার। মিনিট পাঁচেক আগে বেডে এসে সে আধা-শোয়া হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল। মিসেস বিবি মাধবও ঘুমাতে পারেনি।

সে চোখ বুজে শুয়ে থেকে উদ্বেগের সাথে স্বামীর অস্থির অবস্থা অবলোকন করছে। তার মনে নানা প্রশ্ন, নানা চিন্তা। বড় কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয়। কি সেটা? তাদের মেয়ে সুষমা রাওয়ের কিছু ঘটেছে কি? সুষমা রাওয়ের কথা মনে হতেই উদ্বেগ বেড়ে যায় মিসেস বিবি মাধবের। এই তো কয়েকদিন আগেও তার স্বামী নিশ্চিন্ত নিশ্চয়তার সাথে বলতো, 'তাদের মেয়ে শীঘ্রই মুক্ত হবে। তার কোন ক্ষতি হয়নি।' কিন্তু গত কয়েখ দিন থেকে এই নিশ্চয়তার কথা তার স্বামী বলছে না। সুষমা রাওয়ের কথা উঠলেই, নানাভাবে সে তার কথা এড়িয়ে যায়। তার খারাপ কিছু ঘটেনি তো? অবশ্য কয়দিন থেকে তাদের মেয়ে সুরূপা সিংহাল টেলিফোনে

তাকে সান্ত¦না দিচ্ছে যে, সুষমা রাওয়ের মত নিষ্পাপ-নির্দোষ মেয়ের কোন ক্ষতি ঈশ্বর করবেন না। সে যেমন গিয়েছিল, তেমনি আপনার কোলে ফিরে আসবে। কিন্তু মন মানছে কই?’

মিসেস বিবি মাধব স্বামীর পিছু নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

গভর্নল বিবি মাধব ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে প্রবেশ করল ষ্টাডিতে।

এক হাতে মোবাইল ছিল। অন্য হাতটা দিয়ে নব ঘুরিয়ে ঠেলে দরজার পুরোটাই খুলে দিল। শেষ প্রান্তে খোলা দরজা ধরে রাখার জন্যে ছিল একটা চুম্বক। সেই চুম্বকে দরজা খট করে আটকে গেল।

দরজা পুরো খোলা রইল। গভর্নর বিবি মাধব দ্রুত গিয়ে বসল ষ্টাডিরুমের একটা চেয়ারে।

বিবি মাধব মনোযোগ দিল মোবাইলের দিকে। কথা বলা শুরু করল সে।

মিসেস বিবি মাধব খোলা দরজার ওপাশে দরজার চৌকাঠ ঘেঁষে দাঁড়াল। উৎকর্ণ হল মোবাইলের কথা শোনার জন্য।

তার স্বামী বিবি মাধবই তখন কথা বলছিল।

‘কি বলছ জেনারেল স্বামীজী নিহত? কখন কিভাবে ঘটনা ঘটল? তোমরা হাজী আবদুল্লাহকে নিয়ে বন্দীখানা থেকে বেরুচ্ছ, এটা তো জেনারেল স্বামীজী আমাকে জানালেন।’ থামল বিবি মাধব। কণ্ঠ তার উত্তেজিত।

ওপার থেকে কি যেন বলল তা শোনার পর গভর্নর বিবি মাধব আবার বলল, ‘এটা কি করে সম্ভব? আজ সন্ধ্যায় সিবিআই আন্দামানে এসে পৌছেছে। কিভাবে তাদের পক্ষে এমন অভিযান চালানো সম্ভব? তারা এই বন্দীখানার খোঁজ নিল কখন, খোঁজ পেল কখন?’ থামল গভর্নর বিবি মাধব।

অল্প কিছু শোনার পর বলল, ‘থাম, শোন, সুষমা রাওকে সিবিআই উদ্ধার করেনি। করলে তারা সুষমাকে আমার বাড়িতেই নিয়ে আসত। সুষমা রাওকে যে আমরাই কিডন্যাপের নাট করে আটক করেছি শাহ আলমগীরকে কথা বলতে বাধ্য করার জন্য, এটা আহমদ মুসা জানতেও পারে, আন্দাজও করতে পারে। আমি নিশ্চিত, আহমদ মুসাই সুষমা রাওকে আমাদের বন্দীখানা থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে, সিবিআই নয়।’

থামল গভর্নর বিবি মাধব। ওপারের কথা শুনছে সে।

খোলা দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে মিসেস বিবি মাধবও শুনছে গভর্নর বিবি মাধবের সব কথা। সুষমা রাওয়ের কথা শুনে তার চোখ দুটি ছানাবড়া হয়ে গেল। গলা ফেটে একটা চিৎকার তার বেরিয়ে আসছিল। মুখে হাত চেপে ধরে অনেক কষ্টে সে ভেতর থেকে ঝড়ের মত বেরিয়ে আসা কষ্ট-যন্ত্রণার বিস্ফোরণ আটকে দেয়। শেষ পর্যন্ত সে শুনতে চায় সুষমা রাও সম্পর্কে।

ওপারের কথা শোনার পর গভর্নর বিবি মাধব আবার কথা বলা শুরু করল, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। নিশ্চয় বড় কিছু ঘটে গেছে। আমি শুটু এটুকু জানতে পেরেছি, সিবিআই সর্বভারতীয় একটা তদন্তে গোপনে আন্দামানে আসছে। গোপনেই তারা তাদের মত করে তদন্তে গোপনে আন্দামানে আসছে। গোপনেই তারা তাদের মত করে তদন্ত করবে। এখন এই ঘটনা প্রমান করছে, সিবিআই হাজী আবদুল্লাহ, আহমদ শাহ আলমগীরদের ব্যাপারে তদন্তের জন্যেই আন্দামানে এসেছে। খুব ক্ষতি হল হাজী আবদুল্লাহ ওদের হাতে চলে যাওয়ায়। সে আমাদের অনেক কিছুই জানতে পেরেছে, বুঝতে পেরেছে। সুরক্ষা ও সতর্কতামূলক এত আয়োজনের পরও সুষমা ও হাজী আবদুল্লাহকে আটকে রাখা গেল না!'

কথা থেমে গেল গভর্নর বিবি মাধবের। সে সোজা হয়ে বসেছে। তার মুখম-ল শক্ত। দুচোখে হিং¯্রতা ঠিকরে পড়ছে।

মোবাইলে আবার কথা বলা শুরু করল সে। বলল, 'শোন আহমদ শাহ আলমগীরকে আর সময় দেয়া যাবে না। যা ইচ্ছা তাই কর, কিন্তু তার কাছ থেকে কথা আদায় করতেই হবে। আমিও যাচ্ছি সেখানে। তাকে হাতছাড়া করা যাবে না। সে রকম পরিস্থিতি হলে তাকে হত্যা করতে হবে।'

বলে একটু থামল বিবি মাধব। চেয়ারে একটু হেলান দিল। বলল আবার, 'এ দিকের কাজ সব বন্ধ। এখন রাস-ঘাঁটিকে রক্ষার ব্যবস্থা কর সবাই। পুলিশ, আর্মি ছাড়া যেই, ওদিকে যাবার চেষ্টা করুক,তাকে হত্যা করতে হবে। উইক এন্ডের গোটা দুদিন আমি ওখানে থাক। ওকে, বাই।'

কথা শেষ করেই সে স্থির বসে থাকল চেয়ারে। সে তাকিয়ে আছে সামনের টেবিলটার দিকে। কিন্তু চোখে কোন দৃষ্টি নেই। আত্মস্থ সে। ভাবছে সে। আহমদ মুসা এক বিরাট 'শনি' তাদের জন্যে। সে আন্দামানে পা দেবার পর থেকেই তাদের দুর্ভাগ্যের শুরু। তাদের 'মহাসংঘে'র ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে কে ব্রিফ করল? এর পিছনেও কি আহমদ মুসার হাত আছে? কিন্তু কিভাবে? কেন্দ্রীয় সরকারে তার তো কোন পরিচিতি থাকার কথা নয়! তাহলে কথা লাগানোর কাজ কে করল? হঠাৎ কেন্দ্রীয় সরকারই বা এত কঠোর হয়ে উঠল কেন? কেন্দ্রীয় সরকারের সিবিআই-এ, পুলিশে, সেনাবাহিনীতে 'মহাসংঘে'র শক্তিশালী লবী আছে। কিন্তু সব লবিকেই নিস্ক্রিয় দেখা যাচ্ছে। শুধু সিবিআই-এর লবী থেকে এটুকু জানানো হয়েছে, খোদ প্রধানমন্ত্রী এই অপারেশনের তত্ত্বাবধান করছেন। তার বাছাই করা সিবিআই সদস্য তিনি নিজে ব্রিফ করে আন্দামানে পাঠিয়েছেন। এক্ষেত্রে কারো কিছু করার নেই। মহাসংঘের জন্য এটা ভয়াবহ এক বিপর্যয়।

গভর্নর বিবি মাধবের কথা শেষ হলে মিসেস বিবি মাধব ফিরে চলল তার বেড রুমের দিকে। কিন্তু আসার সময় তার পায়ে যতটুকু শক্তি ছিল, সেই শক্তি এখন আর নেই। পিতা হয়ে নিজের মেয়েকে কিডন্যাপ করিয়েছে আহমদ শাহ আলমগীরকে কথা বলতে বাধ্য করার জন্যে! এখন তো দেখা যাচ্ছে, আহমদ শাহ আলমগীরকে তারাই কিডন্যাপ করেছে। কেন কিডন্যাপ করেছে? সুষমাকে সে ভালোবাসে এ অপরাধে নিশ্চয় নয়। কারণ, সুষমাকে গিনিপিগ বানিয়ে যে কথা আদায় করতে চেয়েছিল আহমদ শাহ আলমগীরের কাছ থেকে, সেটাই আসল। সেই আসল ব্যাপারটি কি, যার জন্যে নিজের মেয়েকে গিনিপিগে পরিণত করেছিল? ক্ষোভ, দুঃখ ও লজ্জায় মিসেস বিবি মাধবের বুক দুমড়ে-মুচড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছিল। তার মনের কোণে একটাই আশার আলো, আহমদ মুসা সুষমাকে উদ্ধার করেছে। আর যাই হোক, আহমদ মুসা একজন ভালো মানুষ এবং আহমদ শাহ আলমগীরের পক্ষের মানুষ। তার কাছে সুষমা সম্মান ও মর্যাদার সাথে থাকবে। হঠাৎ মিসেস বিবি মাধবের মনে পড়ল সুরূপা সিংহালের কথা। 'সুষমা যে অবস্থায় আপনার কাছ থেকে গিয়েছিল, সে অবস্থায় আপনার কাছে ফিরে

আসবে’- সুরূপা এই আশ্বাস তাকে দিয়েছিল কেন? তাহলে সে কি কিছু জানে? আহমদ মুসা সুস্মিতা বালাজীর কাছে ছিল কিছুদিন, এ কথা সুষমাই তাকে বলেছিল। আর সুস্মিতা বালাজীর সাথে গোটা পরিবারের মধ্যে একমাত্র সুরূপা সিংহালেরই নিয়মিত যোগাযোগ আছে। তাহলে সেই সূত্রেই কিছু কি জানতে পেরেছে সে? তার মনের কোণের আশার প্রদীপটা আরও উজ্জ্বলতর হল। সে বেড়ে এসে শুয়ে পড়ল। চাদর টেনে নিয়ে মুড়ি দিল।

মনে আশার দিকটা শক্তিশালী হবার সাথে সাথে সাহস হল মেয়ের মুখ সামনে নিয়ে আসার। সদানন্দ মেয়ের নিষ্পাপ মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠতেই দুচোখ বেয়ে নামল অশ্রুর ঢল। কোথায় আছে? কিভাবে আছে তার মেয়ে? এখন নিশ্চয় ঘুমুচ্ছে। চোখ মুছে উঠে বসল মিসেস বিবি মাধব। তার পাশের টিপয় থেকে মোবাইল নিয়ে তার ষ্টাডিতে চলে গেল সে।

মোবাইল করল সুরূপা সিংহালকে।

সুরূপা সিংহাল শুয়েছিল, কিন্তু ঘুমায়নি। তার স্বামীও ঘুমায়নি। আহমদ মুসা রাত ১২টার দিকে বেরিয়ে গেছে। তারপর তারা শুয়েছে বটে, কিন্তু তাদের ঘুম আসেনি। একজন মানুষ অন্যের স্বার্থে জীবন-মৃত্যুর লড়াইয়ে বেরিয়ে গেল, সে লড়াইয়ের পরিণতি না জেনে তারা ঘুমাবে কি করে। প্রতিমুহূর্তে তারা আহমদ মুসার টেলিফোনের অপেক্ষা করছে।

মোবাইল বেজে উঠতেই সুরূপা সিংহাল পাশ থেকে মোবাইল তুলে নিয়ে উঠে বসল।

‘হ্যালো।’ লাইন ওপেন করে বলল সুরূপা সিংহাল।

‘মা সুরূপা, আমি তোমার খালা, সুষমার মা। কেমন আছ মা? ঘুম ভাঙালাম মা? স্যরি।’

‘খবর ভালো তো খালাম্মা? আমরা জেগেই ছিলাম।’

‘খবর ভালো নয় মা। বুকটা হালকা করার জন্যে তোমাকে টেলিফোন করেছি। আমার মেয়ের যদি আরও কিছু খোঁজ পাই সে জন্যেই।’

‘বলুন, খালাম্মা। আরও খারাপ কিছু ঘটেনি তো?’

‘আরও খারাপ কি ঘটবে মা? জানো, আমার সুষমাকে তার পিতাই কিডন্যাপ করিয়েছিল তাকে গিনিপিগ হিসেবে ব্যবহার করে আহমদ শাহ আলমগীরের কাছ থেকে কথা আদায়ের জন্যে।’ বলে কান্নায় ভেঙে পড়ল মিসেস বিবি মাধব।

উদ্বেগ ফুটে উঠল সুরূপা সিংহালের চোখে-মুখে। এ গোপন খবরটা খালাম্মা জানলে পরিবারে আরও কিছু ঘটেও যেতে পারে। সে বিষয়টাকে হালকা করার জন্যে বলল, ‘আপনি শান্ত হোন খালাম্মা। কথাটা সত্য কিনা? কার কাছ থেকে শুনেছেন?’

‘তোমার খালু সাহেবের মুখ থেকে শুনেছি। এই অল্পক্ষণ আগে একজনের সাথে টেলিফোনে কথা বলার সময় এই কথাগুলো বলেছেন?’

‘এই এত রাতে কার সাথে তিনি এ নিয়ে আলাপ করবেন খালাম্মা।’ বলল সুরূপা সিংহাল।

‘হ্যাঁ তাই তো। কি যেন এক বড় ঘটনা ঘটেছে সুরূপা। কোন এক জেনারেল স্বামীজী নাকি আজ রাতে নিহত হয়েছেন। হাজী আবদুল্লাহকে কারা যেন উদ্ধার করে নিয়ে গেছে। আমার সুষমাকে এই হাজী আবদুল্লাহর মত করেই তোমার খালু সাহেবরা আটকে রেখেছিল জানলাম। আরও.....।’

মিসেস বিবি মাধবের কথার মাঝখানেই সুরূপা সিংহাল বলে উঠল, ‘হাজী আবদুল্লাহ উদ্ধার হয়েছেন?’ সুরূপার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আনন্দে। তার আনন্দের কারণ, হাজী আবদুল্লাহ উদ্ধার হওয়া আহমদ মুসার অভিযান সফল হওয়ার প্রমাণ।

‘হাজী আবদুল্লাহকে চেন?’ জিজ্ঞেস করল মিসেস বিবি মাধব।

‘চিনি না। শুনেছি যে, আহমদ শাহ আলমগীরের আত্মীয় তিনি।’

‘তাই হবে। সে কারণেই হয়তো তাকে আটকে রাখা হয়েছিল। টেলিফোনে তোমার খালু সাহেব আহমদ শাহ আলমগীরের ব্যাপারেও অনেক কথা বলেছে।’

‘কি কথা বলেছে খালাম্মা?’ জিজ্ঞেস করল সুরূপা সিংহাল। তার কণ্ঠে উদ্বেগ।

‘বলেছেন, আহমদ শাহ আলমগীরকে আর সময় দেয়া যাবে না। এই মুহূর্তে তার কাছ থেকে কথা আদায় করতে হবে। কথা আদায় করতে না পারলেও তাকে হত্যা করতে হবে। যেন হাজী আবদুল্লাহর মত কিছু না ঘটে, সে জন্যেই বোধ হয় এই চিন্তা তাদের। আরও একটা কথা, তোমার খালু সাহেব আজই সেখানে যাচ্ছেন।’ বলল মিসেস বিবি মাধব।

‘খুব খারাপ খবর খালাম্মা। সুষমা খুবই দুঃখ পাবে। ঈশ্বর এটা সত্য না করুন।’ বলল সুরূপা সিংহাল।

‘এটা তুমি বুঝেছ মা, কিন্তু মেয়ের বাপ হয়েও তোমার খালু সাহেব এ কথা বোঝার অবস্থায় নেই। থাকলে শুধু আহমদ শাহ আলমগীরের জীবন ধ্বংস করা নয়, নিজের মেয়ের জীবন নিজের হাতে বিপন্ন করার উদ্যোগ নিতে পারতেন না। আহমদ মুসাকে পেলে অনেক ধন্যবাদ দিতাম। তিনি আমার মেয়েকে বাঁচিয়েছেন।’

মুহূর্তের জন্যে থামল। থেমেই আবার বলল, ‘মা, আমার সুষমার আর কোন খবর জানাতে পার?’

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না সুরূপা সিংহাল। একটু ভাবল। তারপর বলল, ‘সে ভালো আছে খালাম্মা। আমি একটু দেখি খালাম্মা, কালকে আপনাকে আরও খবর দিতে পারি কিনা।’

‘ধন্যবাদ মা, ঈশ্বর তোমার ভালো করুন। এখন রাখলাম টেলিফোন।’

ওপার থেকে লাইন কেটে গেল।

মোবাইলের কল লাইন অফ করে দিল সুরূপা সিংহালও।

মোবাইল রাখতেই দরজায় নক করার শব্দ হল।

সুরূপার স্বামীও উঠে বসেছিল। সে তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

দরজায় নক করেছে সাজনা সিংহাল। তার পাশে দাঁড়ানো সুষমা রাও।

দরজা খুলে যেতেই সাজনা সিংহাল বলল, ‘নিশ্চয় স্যার এসেছেন।’

সুরূপা সিংহাল ও তার স্বামী ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

সবাই যখন দোতলার ড্রইং হয়ে নিচে নামার সিঁড়ির দিকে আসছিল, তখন আহমদ মুসা সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে শুরু করেছে।

সিঁড়ির মুখে সবাই স্বাগত জানাল আহমদ মুসাকে।

সবার সন্ধানী দৃষ্টি আহমদ মুসার দেহের দিকে। আহমদ মুসা ঠিক আছে কিনা, এটাই তাদের দেখার বিষয়। কিন্তু তার এলোমেলো চুল ও ধুলি ধুসরিত পোশাক ছাড়া দেহে আর কোন অস্বাভাবিকতা নেই।

'ভাই সাহেব, আসুন বসুন।' বলে সোফার দিকে এগোল সুরুপা সিংহাল।

আহমদ মুসা বসল। বসল সবাই।

'আমি দুঃখিত, আপনারা সকলেই এভাবে জেগে আছেন। সত্যি, আমি আপনাদের কষ্ট দিচ্ছি।' বসেই বলল আহমদ মুসা।

'ভাই সাহেব, আপনি মানুষের জন্যে অশেষ কষ্ট করছেন, মানুষের জন্যে জীবন দিতেও এগিয়ে যাচ্ছেন। আমরাও কিছু কষ্ট করতে শিখি, মানুষের প্রতি ভালোবাসা আমাদের মধ্যেও কিছু সৃষ্টি হোক, তা কি আপনি চাইবেন না?' শান্ত, গম্ভীর কণ্ঠে বলল সুরূপা সিংহাল।

চোখ বুজল আহমদ মুসা। তার মুখম-লে আবেগের একটা স্ফুরণ। সঙ্গে সঙ্গেই আবার চোখ খুলল। বলল, 'আপনি খুব বড় একটা কথা বলেছেন বোন। আমিসহ সব মানুষের কাছে আমি এটাই চাই, আপনাদের ক্ষেত্রে চাইব না কেন! বোন, আমি সত্যিই ভাগ্যবান যে, আপনাদের মত ভালো মানুষের সাথে আমার দেখা হয়েছিল।'

'না ভাই সাহেব, কথাটা উল্টো। সৌভাগ্য আমাদের। একটি অতি ভালো মানুষকে সামনে দেখে আমরা ভালো হবার চেষ্টা করছি। সুরূপা এই যে মানুষের জন্যে কষ্ট করার কথা বলল, মানুষকে ভালোবাসার কথা বলল, এমন কথা সে কোন দিন বলেনি।' আহমদ মুসা থামতেই বলল সুরূপা সিংহালের স্বামী।

'ভাইয়া, দুলাভাই যে কথা বলেছেন, সেটা আমাদের সকলের কথা। কিন্তু এ প্রসঙ্গ থাক ভাইয়া, আমরা উদগ্রীব আপনার অভিযানের খবর এবং হাজী

আবদুল্লাহ চাচার অবস্থা জানার জন্যে।' আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল সুষমা রাও।

'আলহামদুলিল্লাহ। হাজী সাহেব মুক্ত হয়েছেন, অভিযান সফল হয়েছে বোন'। আহমদ মুসা বলল।

'আর জেনারেল স্বামীজী নিহত হয়েছেন।' আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই বলে উঠল সুরূপা সিংহাল।

আহমদ মুসা চমকে উঠল। তার চোখে-মুখে ফুটে উঠল বিস্ময়। বলল, 'কি জেনারেল স্বামীজী মারা গেছেন? কিন্তু আমি তো তাকে বন্দী করে সিবিআই-এর কর্নেল সুরেন্দ্রের গাড়িতে তুলে দিয়ে এলাম। আপনি এই খবর কি করে জানলেন বোন?'

'আমার খালাম্মা সুষমার মা আমাকে এই তো কয়েক মিনিট আগে টেলিফোন করেছিলেন। তিনি এ খবর আমাকে দিয়েছেন। হাজী আবদুল্লাহ উদ্ধার হয়েছেন, সে কথাও তিনি বলেছেন। তিনি খালু সাহেবের টেলিফোনের আলাপ আড়ি পেতে শুনতে গিয়ে এসব খবর জেনেছেন।' বলল সুরূপা সিংহাল।

'আম্মা টেলিফোন করেছিলেন? এই সময়ে? এই খবর জানাতে নিশ্চয় নয়। কোন খারাপ খবর আছে আপা?' সুষমা রাও বলল। তার কণ্ঠে উদ্বেগ।

'ঠিক সুষমা, এ খবর দেবার জন্যে নয়। কিছু খারাপ খবর আছে। তোমার পিতা যে তোমাকে কিডন্যাপ করিয়েছিলেন এবং তোমাকে যে গিনিপিগ সাজাতে চেয়েছিলেন আহমদ শাহ আলমগীরের কাছ থেকে কথা আদায়ের জন্যে, এটা তিনি জানতে পেরেছেন। খুবই আপসেট হয়ে পড়েছেন তিনি। টেলিফোনেই তিনি অনেক কেঁদেছেন।' বলল সুরূপা সিংহাল।

'কি করে জানতে পারলেন? আব্বার ঐ টেলিফোন আলোচনা থেকে?' কম্পিত কণ্ঠ সুষমা রাওয়ের। মুষড়ে পড়া চেহারা। চোখ দুটি তার ছলছল করছে।

'হ্যাঁ সুষমা। তোমার আব্বার ঐ টেলিফোন কথোপকথন থেকে আরও খারাপ খবর তিনি দিয়েছেন।' বলল সুরূপা সিংহাল।

'আরও খারাপ খবর? কি সেটা?' অশ্রুরুদ্ধ কন্ঠ সুষমা রাওয়ের।

'আহমদ শাহ আলমগীরের কাছ থেকে কথা আদায় করা যাক বা না যাক অবিলম্বে তাকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন তোমার আব্বা। তিনি নিজে আজ ভোরে যাচ্ছেন সেখানে। হাজী আবদুল্লাহর মত আহমদ শাহ আলমগীর হাতছাড়া হয়ে সব তথ্য ফাঁস হয়ে যাক, তারা হাতে-নাতে ধরা পড়–ক, এ তারা চাচ্ছেন না।' বলল সুরূপা সিংহাল।

সুষমা রাও কোন কথা বলতে পারলো না। দুহাতে মুখ ঢেকে সে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

সুরূপা সিংহালের শেষ কথা শুনে সোজা হয়ে বসেছে আহমদ মুসা। তার চোখ দুটি চঞ্চল। একটা প্রবল উত্তেজনা তার মুখে এসে আছড়ে পড়েছে। বলল আহমদ মুসা সুরূপা সিংহালকে লক্ষ্য করে, 'সুষমার মা কি এই কিছুক্ষণ আগে জেনারেল স্বামীজীর মৃত্যু এবং হাজী আবদুল্লাহর উদ্ধারের খবর দেয়ার সময় এ খবর দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, ভাই সাহেব।'

আহমদ মুসা কিছু বলল না। মুখ নিচু করে মুহূর্ত কাল ভাবল। তারপর পকেট থেকে বের করল মোবাইল। হাত ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে মোবাইলের বোতাম টিপতে শুরু করল কল করার জন্য।

মোবাইল সে মুখের সামনে তুলে নিল।

ওপার থেকে সাড়া পেয়েই আহমদ মুসা বলল, 'গুড মর্নিং, কর্নেল সুরেন্দ্র বলছেন? আমি বিভেন বার্গম্যান।'

'ইয়েস মিঃ বার্গম্যান। আপনি বাড়ি থেকে কথা বলছেন?'

'ইয়েস কর্নেল, আমি বাসা থেকে বলছি। আপনারা সবাই ঠিক-ঠাক পৌছেছেন?'

'হ্যাঁ। আমাদের বন্দীখানা অভিযানও ভালো হয়েছে। মূল্যবান কিছু দলিল প্রমাণাদি পাওয়া গেছে। কিন্তু একটা দূর্ঘটনা ঘটে গেছে।'

কর্নেল সুরেন্দ্র একটু থামতেই সেই ফাঁকে আহমদ মুসা বলে উঠল, 'হ্যাঁ, আমি সে কথাই বলতে চাচ্ছি। আমি তো জেনারেল স্বামীজীকে অক্ষত অবস্থায় আপনার হাতে তুলে দিয়েছিলাম। সে মারা গেল কি করে?'

‘মেজর পুরন্দরের সাথে গাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে আমি ও মেজর সুরজিত হেঁটে যাচ্ছিলাম বন্দীখানার দিকে। মাঝ বরাবর যাওয়ার পর বন্দীখানার গাড়ি বারান্দায় হৈ চৈ শুনতে পাই। আমরা দৌড় দেই। গিয়ে দেখি, জেনারেল স্বামীজী পটাসিয়াম সায়নাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। পটাসিয়াম সায়নাইড তার জামার বোতামের সাথে ছিল।’ বলল কর্নেল সুরেন্দ্র।

‘হ্যাঁ কর্নেল সুরেন্দ্র, জেনারেল স্বামীজীর পূর্বসুরী মহাগুরু শংকরাচার্য শিরোমনিও ধরা পড়ার মুখে পটাসিয়াম সায়নাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেছিল। যাক, আপনাদের বিরাট ক্ষতি হল। ‘মহাসংঘে’র সবকিছু তার কাছ থেকে জানা যেত।’ আহমদ মুসা বলল। থাক মি. বার্গম্যান এখন বলুন, কি চিন্তা করছেন আপনি?’ বলল কর্নেল সুরেন্দ্র।

‘ঘটনা দ্রুত সামনে গড়াচ্ছে মি. কর্নেল। হাজী আবদুল্লাহ আপনাদের হাতে পড়ার মত এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি এড়ানোর জন্যে তারা রাস দ্বীপে বন্দী করে রাখা আহমদ শাহ আলমগীরকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সম্ভবত মোগল বংশীয় কোন গুরুতর তথ্য তার কাছ থেকে তারা আদায় করতে চায়। আজ তারা যে তথ্যের জন্যে শেষ চেষ্টা করবে। তারপর পেল বা না পেল উভয় অবস্থাতেই তাকে হত্যা করবে। পোর্ট ব্লেয়ার থেকে ইতিমধ্যেই মহাসংঘের নেতারা রাস দ্বীপে যাত্রা করেছে বা যাত্রা করছে বলে জানতে পেরেছি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘গুরুতর ইনফরমেশন মি. বার্গম্যান। কি করার কথা ভাবছেন? সময় তো হাতে নেই।’ বলল কর্নেল সুরেন্দ্র।

‘এখনি আমাদের রাস দ্বীপে মুভ করা দরকার। আপনাদের কি চিন্তা?’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমিও তাই ভাবছি। কিন্তু কোথায় যাব, কি করব, এ নিয়ে তো আমাদের ভাবার কোন সময় নেই। আপনি আমাদের সাহায্য করতে পারেন।’ বলল কর্নেল সুরেন্দ্র।

‘অবশ্যই মি. কর্নেল। আমি মনে করছি, আপনারা আপনাদের ওয়েতে রাস দ্বীপে যাত্রা করুন। আমি আমার নিজস্ব ব্যবস্থায় রাস দ্বীপে যাত্রা করছি।

আপনারা ১নং ন্যাঙাল জেটিতে গিয়ে নামুন। এই ঘাঁটিটি রাস দ্বীপের ধ্বংসপ্রাপ্ত ফার্ষ্ট সার্কেলের পাশে। আমাদের টার্গেট ফার্ষ্ট সার্কেল। বিস্তারিত আমি রাস দ্বীপে পৌছে বলব। ১নং ন্যাঙাল ডকইয়ার্ডে নামার পর সিবিআই-এর পোশাক আপনাদের পরিত্যাগ করতে হবে এবং আপনাদের সবাইকে পুরাতত্ব কর্মীর পোশাক পরতে হবে। আপনারা রাস দ্বীপে ঐ ন্যাঙাল ডকইয়ার্ডেই অপেক্ষা করবেন। আমি রাস দ্বীপে পৌছেই আপনার সাথে যোগাযোগ করব।' আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ মিঃ বার্গম্যান। একটা পথ আমাদের সামনে তৈরি হল। আপনি বললেন, ফার্ষ্ট সার্কেল আমাদের টার্গেট। কিন্তু সার্কেলটা তো বিরাট এবং গোটাটাই তো বিধ্বস্ত, পরিত্যক্ত।' থামলো কর্নেল সুরেন্দ্র।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'মি. কর্নেল সুরেন্দ্র! অন্ধকারের জীবরা বিধ্বস্ত, পরিত্যক্ত স্থানের অলি-গলিই বেশি পছন্দ করে। আর ফার্ষ্ট সার্কেল একেবারে পরিত্যক্তও নয়। ওখানে একটা পুরাতত্ব অফিস আছে।'

'ধন্যবাদ মি. বার্গম্যান, বুঝেছি। দ্বীপে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ আছে, আপনি আমাদের সাথে গেলেই পারতেন।'

'তা হতো। কিন্তু পরিকল্পনাটা একটু ভিন্ন। আপনারা টার্গেটে প্রবেশ করবেন উত্তর দিক থেকে, আর আমি প্রবেশ করব দক্ষিণ দিক থেকে। সে কারণে আলাদা পথে যাওয়াই ভালো। তবে কিছু যদি করতে চান, তাহলে সিবিআই-এর আইডেনটিটি কার্ড আমাকে দিতে পারেন। কিন্তু দিতে চাইলেও এই সময়ে দিতে পারবেন না।'

কর্নেল সুরেন্দ্র হেসে উঠল। বলল, 'মনে করুন আপনার কার্ড হয়ে গেছে। এখন বলুন কার্ড আপনি কোথায় ডেলিভারি নেবেন। এখন বাজে সাড়ে ৪টা, আমরা রাস দ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করব ঠিক ভোর সাড়ে ৫টায়।'

আহমদ মুসাও হাসল। বলল, 'তাহলে আপনাদের ভিডিও ক্যামেরা কার সাথে ছিল- বন্দুকের নলের সাথে, মাথার ক্যাপের সাথে, না গাড়ির হেডলাইটের সাথে?'

হাসল কর্নেল সুরেন্দ্রও। বলল, ‘সত্যি মি. বিভেন বার্গম্যান, আপনার অসাধারন মেধা। আমাদের ষ্টেনগান, রিভলবার এবং গাড়ির হেডলাইট সবকিছুর সাথেই ভিডিও ক্যামেরা আছে। মাথার ক্যাপেও ভিডিও ক্যামেরা থাকে। কিন্তু সেটা আমরা রাখি অপারেশনের সময় নয়, সাধারণ চলাফেরার সময়। ভিডিও থেকে আপনার সুন্দর ছবি করে নেব। আমাদের এখানকার হেডকোয়ার্টারে আইডেনটিটি কার্ড তৈরির অটো সিস্টেম রয়েছে।’

‘কিন্তু একজন কর্নেল হয়ে ‘সিবিআই কর্নেলে’র এ ধরনের আইডেনটিটি কার্ড আপনি দিতে পারেন?’ আহমদ মুসা বলল।

আবারও হাসল কর্নেল। বলল, ‘আপনার নাম ছাড়া অন্য কোন পরিচয় আমাকে জানানো হয়নি। কিন্তু এটুকু বলে দেয়া হয়েছে, আপনার নির্দেশ বা ইচ্ছা পূরণের জন্যে যে কোন আইন আমি ভাঙতে পারি।’

‘ধন্যবাদ কর্নেল। আপনার হেডকোয়র্টারের সামনে যে পোষ্টাল বক্স রয়েছে, তাতে আইডেনটিটি কার্ডটা ফেলে রাখবেন। সকাল ৭টার আগে পোষ্টাল বক্স ক্লিয়ার হয় না। তার আগেই কোন এক সময় আমি ওটা সংগ্রহ করে নেব।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ধন্যবাদ মি. বার্গম্যান। খুব নিরাপদ প্রস্তাব। আমি সেটাই করব।’

‘অল রাইট। তাহলে কথা শেষ।’

‘ইয়েস, বাই।’

‘বাই।’ বলে আহমদ মুসা কল অফ করে দিল।

মোবাইলটা পাশে সোফার উপর রেখে আহমদ মুসা সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে বলল, ‘যাক একটা সমস্যার বোধ হয় সহজ সমাধান হয়ে গেল। সিবিআই আইডেনটিটি কার্ড পেলে কারও বোট আর হাইজ্যাক করতে হবে না। কার্ড দেখিয়ে যে কোন বোট দখলে নিতে পারব। আর রাস দ্বীপে ঢুকতেও কোন সমস্যা হবে না।’

আহমদ মুসা কথা শেষ করল। কিন্তু কারও মুখে কোন কথা নেই। সুষমা রাওয়ের কান্না থেমে গেছে। তার মুখে আশা-নিরাশার ছাপ। তার অসহায় চোখের নির্ভরতার এক দৃষ্টি আহমদ মুসার উপর নিবদ্ধ। আর সুরূপা সিংহাল, তার স্বামী

এবং সাজনা সিংহালের বিস্ময়-বেদনার দৃষ্টি আহমদ মুসার দিকে। এইমাত্র সারা রাতের এক অভিযান থেকে ফিরল, আবার এখনি যাত্রা করবে রাস দ্বীপে এক মহাঅভিযানে। তারা কি বলবে, কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। টেলিফোনে আহমদ মুসার কথায় সব তারা জেনেছে। এখনি যাত্রা করা দরকার, সেটা তারা বুঝেছে। কিন্তু একজন লোক এই অবস্থায় কি করে যাত্রা করতে পারে, এ প্রশ্নও তাদের মনে জাগছে। আহমদ মুসার এই গমনকে স্বাগত জানানো কষ্টকর, আবার 'না' বলাও অসম্ভব।

অবশেষে নিরবতা ভাঙল সুরূপা সিংহাল, 'ভাই সাহেব, এটাই তো আপনার জীবন!' কাঁপল সুরূপা সিংহালের কণ্ঠ। আবেগে রুদ্ধ হয়ে গেল তার গলার স্বর।

গম্ভীর হল আহমদ মুসা। বলল, 'শুধু আমার নয়, মানুষের জীবনই এটা। কে কখন কি করবে, কোথায় যাবে ইত্যাদি সবই একজন ঠিক করেন, যিনি সবার মালিক, সবকিছুর মালিক। আমরা শুধু বাছাই করি ভালো কাজে আমি সন্তুষ্ট, না খারাপ কাজে সন্তুষ্ট। মহামুনি শিবদাস সংঘমিত্ররা রাস দ্বীপে যাচ্ছেন আহমদ শাহ আলমগীরকে হত্যার জন্যে, আর আমি এবং কর্নেল সুরেন্দ্ররা যাচ্ছি তাকে বাঁচাবার জন্য। ঘটনা ঘটবে, সে ঘটনায় আমরা হাজির থাকব, কিন্তু কে কি রোল প্লে করব সেটা বাছাইয়ের ব্যাপারটাই হল আসল।'

'এই বাছাইয়ের কাজটা সেই একজনের অমোঘ বিধানের অধীন নয় কি?' প্রশ্ন করল সুরূপা সিংহালের স্বামী।

'না এই বাছাইয়ের এখতিয়ার মানুষের নিজস্ব। এই বাছাইটাই হল পরীক্ষা। এই পরীক্ষা দেয়ার জন্যে দুনিয়ায় মানুষের আগমন। আমাদের ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, 'আমি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছি এটা দেখার জন্যে যে, কারা সুন্দর ও মহৎ জীবনচর্চা বেছে নেয়।'

সুরূপা সিংহাল দুহাত জোড় করে অবনত মাথায় স্রষ্টার উদ্দেশ্যে প্রনাম করে বলল, 'মহান জগৎ প্রভুর কথা মেনে নিচ্ছি। কিন্তু তার পরীক্ষার এই জীবন নাটক মাঝে মাঝে এমন মর্মান্তিক হয়ে ওঠে কেন? এই সময় এই মুহূর্তে আপনার

রাস দ্বীপে অভিযানকে মেনে নিতে খুব কষ্ট হচ্ছে, নিষেধ করতেও ভয় পাচ্ছি।' ভারী কান্নাভেজা কণ্ঠ সুরূপা সিংহালের।

'সন্তানকে মানুষ শাস্তি দিতে অবশ্যই কষ্ট পায়, কিন্তু এই কষ্ট স্বীকার করে নেয়া হয় বৃহত্তর মঙ্গলের জন্যে। এখানেও সেই বাছাইয়ের প্রশ্ন। কষ্টের চেয়ে সব সময় মঙ্গলকে বড় করে দেখতে হয় বোন।' বলল আহমদ মুসা।

'মানুষের কষ্ট, মানুষের অশ্রুর কি কোন মূল্য নেই। তাহলে জগৎ প্রভু এটা দিলেন কেন?' সুরূপা সিংহাল বলল।

'কষ্ট ও অশ্রু আসে মানুষের প্রতি, জীবনের প্রতি ভালোবাসা থেকে। এই ভালোবাসা আল্লাহর একটি শ্রেষ্ঠ নেয়ামত, সৃষ্টি প্রকৃতির একটি প্রাণসত্তা। মানুষের জীবনকে মহত্ত করছে এই ভালোবাসা। পরিবার, সমাজ ও বিশ্ব মানবকে একটা গ্রন্থিতে আবদ্ধ রেখেছে এই ভালোবাসাই। এই ভালোবাসা না থাকলে আমি আপনাদের বাড়িতে আশ্রয় পেতাম না, আমার মত একজন অজানা, অচেনা মানুষের কল্যাণ চিন্তা তাহলে আপনাদের কষ্ট দিত না, অশ্রুসিক্ত করতো না।' আহমদ মুসা থামল।

কথা বলল না। সুরূপা সিংহাল। কারও মুখেই কোন কথা নেই। সকলের মুগ্ধ, সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আহমদ মুসার প্রতি নিবদ্ধ। কথা বলতে যাচ্ছিল সাজনা সিংহাল।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। হাতের ঘড়ির দিকে একবার তাকাল। বলল, 'পৌনে পাঁচটা বাজতে যাচ্ছে। আমি একটু ফ্রেশ হয়ে নেই। পাঁচটার মধ্যেই বের হবো।' বলে আহমদ মুসা এগোল তার কক্ষের দিকে।

# ৭

আহমদ মুসার বোট পোর্ট ব্লেয়ার থেকে সোজা পূর্বদিকে এগিয়ে গিয়েছিল। রাস দ্বীপ অতিক্রম করার পর পূর্ব দিক থেকে এসে দক্ষিণ উপকূলে প্রবেশ করছিল। দক্ষিণ উপকূল বরাবর তীরের একদম গা ঘেঁষে পশ্চিম দিকে এগিয়ে দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণায় এসে আহমদ মুসার বোট দক্ষিণমুখী একটা খাড়িতে প্রবেশ করল।

খাড়িটা দশ মাইল পর্যন্ত ভেতরে এগিয়ে গেছে। শেষ হয়েছে পাহাড়-ঘেরা এক সংকীর্ণ উপত্যকায় গিয়ে। উপত্যকাটি নিয়েছে হ্রদের রূপ। বৃটিশ আমলে রাস দ্বীপ আন্দামান প্রশাসনের কেন্দ্র ছিল, তখন এই হ্রদটি পর্যটন-পিয়াসীদের একটা স্বর্গ ছিল। হ্রদটি পাহাড় ঘেরা হলেও এর তিন দিকে মোট পাঁচটি প্রশস্ত গিরিপথ ছিল, যেগুলো দিয়ে গাড়ি করে অনায়াসে হ্রদের উপকূলে পৌছা যেত। রাস দ্বীপ ধ্বংসকারী ভুমিকম্পের সময় এই পাঁচটি গিরিপথের চারটিই সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। মাত্র সোজা উত্তরমুখী মাঝের একটি গিরিপথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করার উপযুক্ত আছে। আহমদ মুসা তথ্যটি শুনেছিল হাজী আবদুল্লাহর কাছে। তিনি আন্দামানে গোয়েন্দা বিভাগের চীফ থাকা কালে ব্যাপক সফরের সময় এই বিষয়টি অবলোকন করেন। মজার ব্যাপার হল উত্তর দিকে এগিয়ে এই গিরিপথের যেখানে শেষ সেখান থেকেই রাস দ্বীপের ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রশাসনিক এলাকা শুরু এবং এই এলাকার ফার্ষ্ট সার্কেলে গভর্নরের যে আন্ডারগ্রাউন্ড শেল্টার ছিল সেটা এখন সেখানে যেখানে 'মহাসংঘে'র হেডকোয়ার্টার উত্তর দিকে  মাত্র মাইল খানেক ব্যবধানে।

আহমদ মুসা তার বোট নিয়ে দ্রুত এবং নিঃশব্দে খাড়ির শেষ প্রান্তে হ্রদের মুখে এসে পৌছল।

আহমদ মুসা বেছে বেছে সাইলেন্সার বোট যোগাড় করেছিল। তার সিবিআই আইডেনটিটি কার্ড এ ব্যাপারে তাকে খুবই সাহায্য করেছে।

হ্রদের মুখে পৌছার পর হ্রদের গোটা দৃশ্য আহমদ মুসার সামনে আসার সাথে সাথে আহমদ মুসার দুই চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। দেখল, হ্রদের উত্তর-প্রান্তে যেখানে পায়ে হেঁটে পার হওয়ার গিরিপথটি অবস্থিত, সেখানে বড় আকারের দুটি বোট নোঙর করা রয়েছে। দুটি বোটই দোতলা এবং চার ইঞ্জিন বিশিষ্ট।

স্তম্ভিত আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি তার বোট খাড়ির কিনারে একটা ঝোপের আড়ালে সরিয়ে নিল।

আড়ালে বসে দূরবিন দিয়ে বোট দুটিকে অনেকক্ষণ ধরে পর্যবেক্ষণ করল। কোন মানুষের নড়াচড়ায় বোট দোল খাওয়ার কথা। কিন্তু মোটেও সেরকম দুলছে না এবং পানির ঢেউও তার নজরে পড়ল না।

প্রায় ঘণ্টা খানেক অপেক্ষার পরও বোটে মানুষ থাকার কোন আলামত না পেয়ে আহমদ মুসা ভাবল, বোটে নিশ্চয় কেউ নেই।

কিন্তু ভাবনা বা ধারণার উপর ভিত্তি করে সে এগোতে পারে না। তার সন্দেহ নেই এই বোটগুলো 'মহাসংঘ'র হবে। এই সময় তাদের চোখে পড়ার অর্থ তার গোটা প্ল্যান বানচাল হয়ে যাওয়া। সুতরাং আহমদ মুসা সামনে অগ্রসর হবার সিদ্ধান্ত নিতে পারলো না।

কিন্তু বসে থেকে সময় কাটানোরও সুযোগ নেই।

হঠাৎ আহমদ মুসার মনে হল, সে দুই বোটে ক্লোরোফরম বোম ছুড়তে পারে। সাইলেন্সার লাগানো সে ধরনের মিনি রকেট লাঞ্চার তার কাছে আছে। দুই বোটের লোকদের সংজ্ঞাহীন করতে দুই বোমই যথেষ্ট হবে। তারপর সে নিশ্চিন্তে সামনে এগোতে পারবে। খুশি হল আহমদ মুসা।

ব্যাগ থেকে ক্লোরোফরম বোমার কৌটা বের করলো। খুলল কৌটা। দেখল মাত্র দুটি বোমাই রয়েছে। তার অর্থ এখন দুটি বোমা ব্যবহার করলে এই সুযোগ সে আর পাচ্ছে না। তবু খুশি হল আহমদ মুসা যে, অন্তত দুটি বোমা তার রয়েছে, যার প্রয়োজন এই মুহূর্তে খুব বেশি।

আহমদ মুসা ব্যাগ থেকে টুকরো টুকরো পার্টস বের করে জোড়া লাগিয়ে পিস্তলাকৃতির, কিন্তু লম্বা নলের ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করল। তাতে বোমা ফিট করে দুটি বোমাই ছুড়ল দুবোট লক্ষ্য করে। প্রথম বোমাটি প্রথম বোটের দোতলা অংশের

গোড়ায় ডেকের উপর পড়ল। বেলুন ফাটার মত ছোট্ট একটা শব্দ হল মাত্র। দ্বিতীয় বোমা দ্বিতীয় বোটের নিচ তলার কেবিনের দরজায় গিয়ে আঘাত করল।

পনের মিনিট অপেক্ষা করল আহমদ মুসা। কোন লোক বের হল না। বোটের কোন নড়াচড়াও লক্ষ্য করলো না। মানুষ থাকলে বোমার শব্দ যত ছোটই হোক মানুষ বের হতো। মানুষ কি ঘুমিয়ে আছে? সেটাও হতে পারে। যদি হয় তাহলে চিন্তাই নেই। তারা এখন লম্বা ঘুম দেবে।

আহমদ মুসা বোট চালিয়ে হ্রদে ঢুকে পড়ল। বোট নিয়ে নোঙর করল বোট দুটির পাশে। বোট থেকে নামল পাশের বোটে। দুই বোটই দেখল। দুই বোটেই অনেকগুলো করে বাক্স।

দুই বোটের অবস্থা আয়োজন দেখে আহমদ মুসা ভাবল, বোটগুলো হয় কোথা থেকে এসেছে, কিংবা কোথাও যাচ্ছে। কোনটি ঠিক?

আহমদ মুসা বোট দুটির ইঞ্জিন পরীক্ষা করল। দেখল, অন্তত গত ২ ঘণ্টায় ইঞ্জিন চালু করা হয়নি। ফুয়েল মিটার সাক্ষ্য দিচ্ছে ফুয়েল ট্যাংক একশ ভাগ ভর্তি। সব মিলিয়ে আহমদ মুসা ভাবল, দুই ঘণ্টা আগে বোটটি এলে লোক নেমে যাওয়ার সাথে কিংবা এতক্ষণে মালগুলো সব নেমে যেত এবং ফুয়েল ট্যাংক কিছুতেই পূর্ণ থাকতো না। সুতরাং বোট দুটি যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে।

এই চিন্তার পরেই হঠাৎ আহমদ মুসার মনে প্রশ্ন জাগল, 'মহাসংঘে'র এখানকার লোকেরা পালাবার বিকল্প ব্যবস্থা করে রাখেনি তো? আর পেছন দিয়ে পালাবার এর চেয়ে সহজ ও নিরাপদ পথ আর নেই।

আহমদ মুসা যতই ভাবল এই বিশ্বাসই তার দৃঢ় হল।

এই বিশ্বাস দৃঢ় হবার সাথে সাথে আহমদ মুসা ভাবল, সে যে এই পথে এসেছে, তার কোন চিহ্ন এখানে রেখে যাবে না। সুতরাং সামনে এগোবার আগে তার বোটটি ডুবিয়ে দিতে হবে।

আহমদ মুসা তার বোটটি ডুবিয়ে দিল সঙ্গে সঙ্গেই।

আহমদ মুসা গিরিপথে উঠে এল।

ব্যাগ থেকে ডিষ্ট্যান্ট সাউন্ড মনিটরিং (উঝগ) যন্ত্র কানে লাগিযে সে গিরিপথ দিয়ে হাঁটতে লাগল। উত্তর প্রান্তে গিরিপথের প্রায় মুখের কাছে এসে

একটা গুহা মত স্থান বেছে নিয়ে একটা পাথরের আড়ালে বসল। হাত ঘড়ির দিকে তাকাল আহমদ মুসা। দেখল সকাল ১০টা। বেশ দেরি হয়ে গেছে, মনে মনে ভাবল আহমদ মুসা। কিভাবে এগোবে সে চিন্তা তাকে গুছিয়ে নিতে হবে।

অন্যদিকে কর্নেল সুরেন্দ্রদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। 'মহাসংঘে'র এই হেডকোয়ার্টারের লোকেশন ও বিবরণ তাদের জানাতে হবে। তারপর দুই দিক থেকে এক সাথেই অগ্রসর হতে হবে।

মহামুনি শিবরাম সংঘমিত্র ওরফে বিবি মধাব বলছিল, 'আসল পক্ষ সিবিআই নয়। সিবিআইকে এখানে যারা আনল তারাই আমাদের আসল দুশমন।'

শিবদাস সংঘমিত্রের সামনে বিশাল টেবিল। টেবিলকে সামনে রেখে তীরের মত সোজা হযে বসে আছে সে। তার সামনে টেবিলের এ পাশে বসে জেনারেল কালিকা কৃষ্ণমূর্তি। ইনিও জেনারেল স্বামীজীর মতই ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন অবসর প্রাপ্ত জেনারেল। জেনারেলের মৃত্যুর পর ইনিই এখন আন্দামান 'মহাসংঘ'র সেকেন্ড ইন কমান্ড।

মহামুনি শিবদাস সংঘমিত্র এবং জেনারেলের গোটা শরীর কাল পোশাকে ঢাকা। মাথায় বাঁধা কাল রুমাল। চোখে কালো গগলাস। মহামুনি শিবদাস সংঘমিত্রের বাড়তি যে জিনিস আছে সেটা হল দীর্ঘ গোঁফ। শিবদাস সংঘ মিত্রকে বিবি মধাব বলে চেনার কোন উপায় নেই।

শিবদাস সংঘমিত্র থামতেই জেনারেল কালিকা কৃষ্ণিমূর্তি বলল, 'গুরুজী আসল শত্রুতো আহমদ মুসা। তিনিই কেন্দ্রে কথা লাগিয়ে সিবিআইকে আন্দামানে টেনে এনেছেন। কিন্তু দিল্লী কি আহমদ মুসাকে চেনে না? তার কথা শুনল কেন?'

'দিল্লী তার কথা শুনেনি। আজ সকালেও আমি খোঁজ নিয়েছি। প্রধানমন্ত্রীর পি.এ 'মহাসংঘের'র প্রতি বহুদিন থেকে সহানুভূতিশীল। সে জানাল, গোটা ব্যাপারের পেছনে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট। মার্কিন রাষ্ট্রদূত নয়, খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট।' বলল মহামুনি শিবদাস সংঘমিত্র।

‘কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্ট আহমদ মুসার এত খয়ের খাঁ হল কেন?’ জেনারেল কালিকা কৃষ্ণিমূর্তি বলল।

‘মূর্খের মত কথা বলছ জেনারেল। গত কয়েক বছর আহমদ মুসা সেখানকার জনগণের পক্ষে কি অসাধ্য সাধন করেছে, কিভাবে মার্কিন সরকার টুইন টাওয়ারের ব্যাপারে আহমদ মুসার তদন্ত মেনে নিয়ে নিজেদের মত পাল্টালো, তা তোমার সামনে নেই?’

‘সেটা আছে গুরুজী। কিন্তু আমি বলছি, আহমদ মুসার কথা শুনে ভারতের প্রতি এত কঠোর হওয়ার তৎপর্য কি?’ বলল জেনারেল কালিকা কৃষ্ণমূর্তি।

‘ভারতের প্রতি কঠোর হয়নি, কঠোর হয়েছে ‘মহাসংঘে’র প্রতি। ‘মহাসংঘ’ সম্পর্কে সব রিপোর্ট আহমদ মুসা আমেরিকাকে দিয়েছে। আমেরিকা ‘মহাসংঘ’কে চরমপন্থী ও সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসেবে ধরে নিয়েছে। তারা ‘মহাসংঘ’কে ‘ডুবো পাহাড়ে’র মত ভয়ংকর মনে করছে। মনে করছে যে, ‘ডুবো পাহাড় মহাসংঘ’ ভারতে জেগে ওঠার সুযোগ পেলে শুধু ভারতের গণতন্ত্র নয়, ভারতের সংখ্যালঘুদেরও বিনাশ হবে। গুজরাটের ঘটনা এবং আন্দামানে সংখ্যালঘু হত্যার অব্যাহত ঘটনাকে সাম্প্রতিক দৃষ্টিন্ত হিসেবে আহমদ মুসা আমেরিকার নজরে এনেছে। আর আমেরিকা এসব এনেছে ভারত সরকারের নজরে। ভারত সরকারও বিষয়টা জেনে ভবিষ্যত চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়েছে। সুতরাং ভারত সরকার আহমদ মুসাকে সাহায্য করছে না, সাহায্য করছে নিজেদেরকেই। তারা এখন সাহায্যকারী শক্তি মনে করছে আহমদ মুসাকে।’

দীর্ঘ বক্তব্য দিয়ে থামল মহামুনি শিবদাস সংঘমিত্র।

‘তাহলে এক সঙ্গে সবাইকে মোকাবিলা করতে হবে দেখছি।’ বলল জেনারেল কালিকা কৃষ্ণমূর্তি।

‘এটা নতুন কথা নয় কৃষ্ণমূর্তি। আমাদের বাপুজি শিবাজীকে সবার বিরুদ্ধেই লড়াই করতে হয়েছে।’

বলেই শিবদাস সংঘমিত্র টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ল। বলল, ‘থাক এসব কথা। আমাদের করনীয়ের দিকে নজর দাও। আমি ঠিক করেছে আহমদ শাহ

আলমগীরকে আন্দামান থেকে মহারাষ্ট্র বা গুজরাটে সরিয়ে নেব। অল্প সময়ে তার মুখ খোলার নতুন কোন ব্যবস্থা করা যাবে না। তার কাছ থেকে বাপুজী শিবাজীর পবিত্র দলিল ও মোগলদের গুপ্ত ধনের নক্সা পাওয়ার আগে তাকে কিছুতেই হত্যা করা যাবে না। কারণ তার ফলে চিরতরে হারিয়ে যাবে বাপুজীর দলিল এবং মোগলদের বিশাল গুপ্তধন।' থামলো শিবদাস সংঘমিত্র।

'তাহলে এই মুহূর্তে কি করনীয়?' বলল জেনারেল কালিকা কৃষ্ণমূর্তি।

'দিল্লী সরকার যেহেতু আহমদ মুসার দিকে চলে গেছে, তাই যেমন করে ওরা আমাদের দুই বন্দীখানার সন্ধান পেয়েছে, সেভাবে আজ না হয় কাল তারা এ ঘাঁটিরও সন্ধান পেয়ে যাবে। তাই দেরি না করে আজই আহমদ শাহ আলমগীরকে এখান থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। সাত্তার দিঘীতে আমাদের দুটি বোট আছে। বোটে ইতিমধ্যেই এখনকার কিছু সরঞ্জাম তুলেছি। এখনই আহমদ শাহ আলমগীরকে বোটে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করো। আর কিছু লোক তুমি বোট দুটিতে নিয়ে যাও তারপর বোট দুটি টেন ডিগ্রী চ্যানেলে নিয়ে যাও। ওখানে একটি জাহাজ অপেক্ষা করছে। জাহাজটিতে ত্রিরঙ্গা পতাকার পাশে আমাদের বাপুজীর ছবি সম্বলিত একটা পতাকাও দেখবে। ঐ জাহাজে উঠবে। জাহাজ কোথায় যাবে, সে আদেশ জাহাজকে দেয়া আছে।' থামল শিবদাস সংঘমিত্র।

'ধন্যবাদ গুরুজী। আমার পর এ ঘাঁটির দায়িত্বে কে থাকবে?' বলল জেনারেল কালিকা কৃষ্ণমূর্তি।

'পোর্ট ব্লেয়ার থেকে আজ সন্ধার মধ্যে সাবেক ব্রিগেডিয়ার সুন্দরী সিংহানিয়া এসে পৌঁছাবে। সে আশা পর্যন্ত আমি এখানে থাকছি। আর...।'

কথা শেষ করতে পারলো না মহামুলি শিবদাস সংঘমিত্র ওরফে বিবি মধাব। তার মোবাইল বেজে উঠল।

কথা বন্ধ করে মোবাইল তুলে নিল শিবদাস সংঘমিত্র।

ওপারের কথা শুনতে পেয়েই বলল, 'বল কমান্ডার সুখদেব কি খবর।'

কমান্ডার সুখদেব রাস দ্বীপের ১নং ন্যাভাল ডকের ডেপুটি ইনচার্জ। সে অনেক দিন থেকে 'মহাসংঘ'র পক্ষে কাজ করছে।

'গুরুজী খবর ভালো নয়। ৫টি বোট নিয়ে চল্লিশ জন সিবিআই অফিসার এখানে নেমেছে প্রায় ঘন্টা দুই আগে। ওরা একটা মহড়ার জন্য এসেছে। কিন্তু এখন দেখছি সবাই সিবিআই- এর ইউনিফরম খুলে পুরাতত্ব কর্মীর ইউনিফরম পরেছে। তাদের কথাবার্তায় এখানকার পুরাতত্ত্ব অফিসের কথা শুনেছি। তাদের রাখ-ঢাক ও চলা-ফেরা দেখে মনে হচ্ছে তারা কোন বড় ও গোপন মিশন নিয়ে এখানে এসেছে।'

টেলিফোনে এই কথাগুলো শোনার সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল মহামুনি শিবদাস সংঘমিত্রের। চোখে নেমে এল স্পষ্ট আতংক-উদ্বেগের ছায়া। সে বলল, 'ধন্যবাদ সুখদেব। আমি দেখছি, ব্যাপারটা।' বলে টেলিফোন রেখে দিল।

'শিবদাস সংঘমিত্রের চেহারা ও কথার পরিবর্তন লক্ষ্য করছিল জেনারেল কালিকা কৃষ্ণমূর্তি। শিবদাস সংগমিত্র টেলিফোন রাখতেই জেনারেল বলে উঠল, 'কোন খারাপ খবর গুরুজী?'

মহামুনি শিবদাস সংঘমিত্র কোন কথা না বলে হাত ঘড়ির দিকে তাকাল। দেখল সকাল সাড়ে ৯টা। সময় দেখেই মুখ তুলল সে জেনারেল কৃষ্ণমূতির দিকে। বলল, 'আয়োজন কর সবাই আমরা সকাল সাড়ে দশটার মধ্যে বোটে উঠব। এক বোটে আহমদ শাহ আলমগীর, জিনিসপত্র ও লোকজন নিয়ে তুমি উঠবে। অন্য বোটে দুচারজন ক্রু নিয়ে আমি উঠব।'

মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে জেনারেল কৃষ্ণমূর্তির। নির্দেশের ধরন শুনেই সে বুঝল, সাংঘাতিক কিছু ঘটে গেছে। তাদেরকে ত্যাগ করে পালাতে হচ্ছে। সে আবার জিজ্ঞেস করল, 'বড় কোন খারাপ খবর গুরুজী?'

'হ্যাঁ, অর্ধশতের মত সিবিআই সদস্য ল্যান্ড করেছে এক নাম্বার ন্যাঙাল ডকে। তারা পুরাতত্ব কমীর ছদ্মবেশ নিয়েছে এবং তারা এই পুরাতত্ব অফিসে আসবে। মানে, তারা আমাদের হেডকোয়ার্টারের খবর পেয়েছে। এখানে অভিযানের জন্যেই তারা এসেছে।' বলল শিবদাস সংঘমিত্র।

'বুঝেছি গুরুজী। বিষয়টি একেবারে পানির মত পরিষ্কার। আপনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমরা এবার সিবিআইকে কাঁচকলা দেখাব।'

উঠে দাঁড়াল জেনারেল কালিকা কৃষ্ণমূর্তি। বলল, ‘যাই গুরুজী। আমি ব্যবস্থা করছি।’ বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল জেনারেল কালিকা কৃষ্ণমূর্তি।

মহামুনি শিবদাস সংঘমিত্র ওরফে গভর্নর বিবি মধাব মোবাইল তুলে নিল হতে। মোবাইলের কী গুলোর উপর দ্রুত আঙুল চালাতে লাগল।

পরবর্তী বই

# পাত্তানীর সবুজ অরণ্যে

**কৃতজ্ঞতায়ঃ**

1. Monirul Islam Moni
2. M-g Mustafa
3. Mahfuzur Rahman

## সাইমুম-৪৩

# পাত্তানীর সবুজ অরন্যে

আবুল আসাদ

# ১

আহমদ মুসা কর্নেল সুরেন্দ্রের কাছে টেলিফোন সেরে মোবাইলটি জ্যাকেটের পকেটে রেখে গুহার গায়ে হেলান দিল। মনে মনে ভাবল, ১৫ মিনিট পরে সে যাত্রা করবে। তাহলে কর্নেল সুরেন্দ্ররা এবং সে একই সময়ে 'মহাসংঘ'র আন্ডার গ্রাউন্ড ঘাঁটির মুখে প্রত্নতত্ব অফিস এলাকায় পৌছে যাবে। এদিকে তার ১৫ মিনিটের একটা বিশ্রামও হয়ে যাবে।

আহমদ মুসা তার গোটা শরীর ঢিলা করে চোখ বুঝল।

শুধু তার কানটাই সক্রিয় রইল। তার দুই কানে লাগানো ছিল 'সাউন্ড মনিটরিং'-এর দুই রিসিভার। কি যেন ভেবে পনের মিনিটের জন্যে মনিটরিং-এর রিসিভার কান থেকে নামিয়ে নেবার জন্যে ওদিকে হাত বাড়াতেই হালকা শব্দে একটা কোরাস ভেসে এল তার কানে।

হাত সরিয়ে নিল আহমদ মুসা। রিসিভার থামাল না।

সোজা হয়ে বসে শব্দের কোরাস বুঝার চেষ্টা করল।

কিছুটা শোনার পর তার মনে হলো অনেকগুলো লোকের এক সঙ্গে চলার জমাট শব্দ এটা। শব্দগুলো ক্রমেই স্পষ্টতর হচ্ছে। তার মানে একদল লোক এদিকে এগিয়ে আসছে।

কথাটা মনে আসতেই তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। কারা আসছে? মহাসংঘ'র লোকরা নিশ্চয়। কিন্তু দল বেঁধে এদিকে আসছে কেন? ওদের একটা অংশ কি এখান থেকে চলে যাচ্ছে? বোট দুটো কি এজন্যেই প্রস্তুত রাখা হয়েছে? এটা কি ওদের রুটিন যাতায়াত? ওরা এক নম্বর নেভি ডকে সিবিআই-এর লোকদের আসা টের পায়নি তো?

আহমদ মুসা গুহা থেকে বেরিয়ে দ্রুত গাছ-পালা ও আগাছার আড়াল নিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠতে লাগল।

সামনের এলাকা নজরে আসে এমন জায়গায় উঠে একটা গাছের আড়ালে বসল। পাহাড়ের গা গাছ-গাছড়া ও নানারকম আগাছায় ঢাকা। আহমদ মুসা বসলে ঢেকে গেলো তার দেহ। ব্যাগ থেকে দূরবীণ বের করে চোখে লাগাল সে।

সামনের এলাকাটা এবড়ো-থেবড়ো পাথুরে জমি। ঘাস-আগাছায় ঢাকা। মাঝে মাঝে বড় গাছ আছে, কিন্তু তার সংখ্যা খুব বেশি নয়। সুতরাং সামনে বহুদূর দেখা যায়। দৃষ্টি সার্কেলের প্রান্ত পর্যন্ত।

দূরবীনের চোখ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নেবার সময় হঠাৎ দূরবীনের চোখে ভেসে উঠল মানুষের সারি। যুদ্ধক্ষেত্রের ব্যুহের মত সারি বেঁধে এগিয়ে আসছে দশ বারোজন লোক। প্রত্যেকের হাতে কিছু লাগেজ এবং অস্ত্র। তার মধ্যে বেশ কয়েকজনের কাঁধে বড় বড় ব্যাগ। আর দুজন বহন করছে কফিনাকৃতির লম্বা একটি কাঠের বাক্স।

দূরবীনের চোখ এই গোটা দলের ওপর ঘুরে আসার আগেই স্নায়ু তন্ত্রীতে একটা শক ওয়েভ খেলে গেল। জেগে উঠল গোটা শরীর, শক্ত হয়ে উঠল গোটা দেহ।

হঠাৎ তার মনে জাগল, এই ঘাঁটি থেকে মহাসংঘের ওরা পালাচ্ছে শাহ আলমগীরকে নিয়ে। ওরা তাহলে অবশ্যই জেনেছে যে, নৌবাহিনীর ১নং ডকে সিবিআই-এর একটা দল নেমেছে, কিন্তু তারা বুঝতেও পেরেছে যে, সিবিআই-এর টার্গেট তাদের এই ঘাঁটি। এটা বুঝেই তারা পেছনের এই দরজা দিয়ে পালাবার জন্যে ছুটে আসছে।

আহমদ মুসা দূরবীন থেকে চোখ সরিয়ে নিল।

আনন্দের একটা অনুভূতি তাকে আচ্ছন্ন করল। সে নিশ্চিত এই দলের মধ্যে রয়েছে আন্দামানের গভর্নর বালাজী বাজি রাও মাধব এবং আহমদ শাহ আলমগীর। কফিনের মত লম্বা কাঠের বাক্সটায় যে আহমদ শাহ আলমগীরকে বহন করা হচ্ছে, সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই।

আহমদ মুসার ভাবনা দ্রুত হলো।

প্রথমেই ভাবল ব্যাপারটা কর্নেল সুরেন্দ্রকে জানানো দরকার।

পকেট থেকে মোবাইল তুলে নিল হাতে। মোবাইল করল সিবিআই-এর কর্নেল সুরেন্দ্রকে।

সব শুনে কর্নেল সুরেন্দ্র বলল, 'ধন্যবাদ স্যার, আমরা ৫ মিনিটের মধ্যে যাত্রা করছি। কিন্তু স্যার, গাড়ি চলবে না। যতটা পারি আমরা দৌড়ে এগুবো। এতেও তো সময় লেগে যাবে। ওরা ততক্ষণে............।' দ্রুত, উত্তেজিত কণ্ঠ কর্নেল সুরেন্দ্রের।

আহমদ মুসা তার কথার মাঝখানেই তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'চিন্তা নেই কর্নেল। আমি ওদের আটকে রাখব। ওদের হত্যা নয়, সারেন্ডার করাবার চেষ্টা করতে হবে। এজন্যই আপনাদের তাড়াতাড়ি এখানে পৌছা প্রয়োজন।'

'ওকে স্যার আমরা আসছি যতটা পারি দ্রুত।' বলল কর্নেল সুরেন্দ্র।

'ঈশ্বর সাহায্য করুন। বাই।'

মোবাইল পকেটে রেখে দিল আহমদ মুসা।

আবার চোখে দূরবীন লাগাল। দেখল ওরা আরও অনেকখানি পথ এগিয়ে এসেছে। ওরাও দ্রুত হাঁটছে।

দূরবীন চোখ থেকে নামাল আহমদ মুসা।

ওদের ঠেকানোর বিষয়টি মাথায় এসেছে।

ভাবছে সে। তার দরকার ফায়ারিং গান। কিন্তু তার ব্যাগে যে সাবমেশিনগান আছে, তা ছোট ম্যাগাজিনের এবং হালকা।

বোটে দেখা বাক্সগুলোর কথা মনে পড়ল আহমদ মুসার। ওগুলোর কয়েকটিতে হেভি মেশিনগান ও হেভি সাব-মেশিনগান রয়েছে। কিন্তু বোটে যাওয়া, আসা এবং অস্ত্রগুলো সংযোজন করার জন্যে যে সময় দরকার তা তার নেই।

হঠাৎ আহমদ মুসার মাথায় এল, সে বোট দুটোর নোঙর তুলে লেকের মাঝামাঝি কিংবা ওপারে গিয়ে অপেক্ষা করতে পারে। বোট দখল তাদের জন্য অসম্ভব হবে। তখন তারা ফিরে যাবার চিন্তা করবে। ভাববে যে, দ্বীপের জংগলে আত্মগোপন করে সুযোগ মত পালাবে। কয়েকটা গোপন ঘাটে তাদের বোটও রাখা আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু তারা ফেরার পথে গিরিপথ পার হবার আগেই কর্নেল সুরেন্দ্ররা এসে পড়বে।

খুশি হলো আহমদ মুসা। ওদের ফাঁদে ফেলার এটাই সবচেয়ে ভাল উপায় হবে।

আহমদ মুসা পাহাড় থেকে নেমে এল।

গিরিপথ ধরে ফিরে চলল লেকের দিকে বোটের উদ্দেশ্যে।

গিরিপথ বড়, ছোট নানা সাইজের পাথরে ভরা। যাবার সময় ধীরে-সুস্থে গেছে খুব অসুবিধা হয়নি। কিন্তু এখন তাড়াহুড়া করতে গিয়ে পথ চলাটা খুব কষ্টকর মনে হচ্ছে।

লেকের কিনারায় পৌছে আহমদ মুসা বোট দুটির নোঙর খুলে একটি আরেকটির পেছনে বাঁধল। বোট চালিয়ে নিয়ে গেলো লেকের মাঝখানে।

লেকের পানি যেমন শান্ত, নিস্তরংগ, তেমনি লেকের আবহাওয়াও একেবারে মৌন। লেকের তিন দিক জুড়ে পাহাড়। একদিক দক্ষিণ পাশটা মাত্র খোলা, তাও ঘন বনে ঢাকা। সুতরাং দক্ষিণ দিকে পাহাড়ের দেয়াল না থাকলেও দাঁড়িয়ে আছে জংগলের প্রাচীর। এই জংগলের প্রাচীরকে দুভাগ করে একটা খাড়ি বেরিয়ে সাগরে গিয়ে মিশেছে। চার দিক এভাবে ঘেরা বলেই বাতাসের প্রবাহহীন স্থির, শান্ত লেকটা।

বোটগুলোও স্থির, শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

আহমদ মুসা বোটের কেবিনে ঢুকে বাক্সগুলো পরীক্ষা করতে লাগল। সবগুলো বাক্সেই দেখল অস্ত্র। আহমদ মুসা বিশেষ ধলনের অটো রিভলবার রাইফেল বের করে নিল। এ রাইফেলে একবার ট্রিগার টিপলেই এক এক করে বারটি গুলী বেরিয়ে যায় যদি না অটো ষ্টপ ফাংশন অন করা থাকে। রাইফেলটির রেঞ্জও সাধারণ রাইফেল থেকে বেশি।

আহমদ মুসা রাইফেলটা নিয়ে কেবিনের দরজার পাশে বসল। এখান থেকে গিরিপথসহ লেকের উত্তর উপকূলের প্রায় গোটাটাই দেখা যাচ্ছে।

মোবাইলটা বেজে উঠল আহমদ মুসার।

মোবাইল কানের সামনে নিয়ে আসতেই কণ্ঠ শুনতে পেল সিবিআই কর্মকর্তা কর্নেল সুরেন্দ্রের।

'হ্যালো কর্নেল, কোন খবর?' বলল আহমদ মুসা।

'না মি. বার্গম্যান, খবর তেমন নয়। আমরা পুরাতত্ব অফিস মানে ওদের পরিত্যক্ত ঘাঁটি পর্যন্ত এসেছি। ওদের খবর কি?' কর্নেল সুরেন্দ্র বলল।

'আমি এখন লেকে। ওদের পালিয়ে যাবার বোট দুটি দখল করে লেকের মাঝ বরাবর নিয়ে এসে বসে আছি। মিনিট পনের ওদের খবর জানি না। তবে ওরা যে গতিতে আসছিল, তাতে আর পনের মিনিটের মধ্যে লেকের ধারে পৌছে যাবে। ওরা নিশ্চয় এখন গিরিপথের কাছাকাছি পৌছে গেছে।' আহমদ মুসা বলল।

'মি. বার্গম্যান, আপনি এনকাউন্টার নিয়ে কি ভাবছেন?' কর্নেল সুরেন্দ্র বলল।

'আমার ধারণা ওরা যখন লেকের ধারে পৌছবে, তখন আপনারা গিরিপথের মুখে পৌছে যাবেন। তখন ওরা বোট হাতের নাগালে না পেয়ে কি করে, সেটা দেখে আমরা সিদ্ধান্ত নেব। ভাল হয় যদি আপনি গিরিপথের মুখে এসে আমাকে একটা কল দেন।'

'ওকে মি. বার্গম্যান। আমরা আরও দ্রুত গিরিপথের মুখে পৌছার চেষ্টা করছি।'

'ওকে। বাই' বলে আহমদ মুসা কল অফ করে দিল।

আহমদ মুসা মোবাইল পকেটে রেখে দুপা সামনের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে বাক্সের স্তুপে ঠেস দিয়ে বসল।

দেহটাকে শিথিল করে দিল সে।

চোখ তার গিরিপথের দিকে নিবদ্ধ। কিন্তু তাতে শূন্য দৃষ্টি।

ভাবছে আহমদ মুসা।

ভাবছে সামনের এনকাউন্টার নিয়ে। কতটা সহজে আহমদ শাহ আলমগীরকে উদ্ধার এবং আন্দামানের গভর্নর বিবি মাধবসহ অন্যদের বন্দী করা যায়, এই চিন্তা এসে পেয়ে বসল আহমদ মুসাকে।

মনে মনে অনেক অংক কষার পর আহমদ মুসা এক নজরে বোঝার জন্য একটা ছক আঁকল। মনটা তার প্রসন্ন হয়ে উঠল। বিবি মাধবরা গিরিপথের এপ্রান্তে পৌছলেই কর্নেল সুরেন্দ্রকে এ একশন প্ল্যান সে জানিয়ে দেবে।

বিবি মাধবরা বারো জনের একটা দল।

মহামুনি শিবদাস সংঘমিত্র'র ছদ্মবেশে বিবি মাধব সবার সামনে।

মুখে তার লম্বা, গোঁফ, দাড়ি। গৈরিক রং করা। মাথায় গৈরিক পাগড়ী। গায়েও গৈরিক বসন। গলায় এক গুচ্ছ রুদ্রাক্ষের মালা। কপালে চন্দনের তিলক।

ভাব-গাম্ভীর্য বজায় রেখে দ্রুতই হাঁটছে বলা যায়। দীর্ঘদেহী বিবি মাধবের দ্রুত হাঁটা অনেকের জন্যে ডবল মার্চের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মহামুনি শিবদাস সংঘমিত্র ওরফে গভর্নর বিবি মাধবের পাশাপাশি হাঁটছিল সাবেক জেনারেল কৃষ্ণমূর্তি।

জেনারেল কৃষ্ণমূর্তি আন্দামানে মহাসংঘের দ্বিতীয় ব্যক্তি এবং রস দ্বীপের 'মহাসংঘ' ঘাঁটির প্রধান। সে ভারতীয় সেনাবাহিনীর আগাম অবসর দেয়া একজন মেজর। তার চরমপন্থী মতামতের জন্য তাকে আগাম অবসর দেয়া হয়। অবসর দেয়ার পরদিনই সে 'শিবাজী সন্তান সেনা'য় যোগ দেয়। সেই সূত্রে এখন 'মহাসংঘ'-এর প্রথম সারির নেতাদের একজন সে।

'মহামুনি প্রভু, সিবিআই আমাদের এই ঘাঁটি তো দূরে থাক কোন ঘাঁটির খবরই জানতো না। আজ একেবারে আমাদের এই ঘাঁটিতে এসে হাজির! কিভাবে?' বলল জেনারেল (অব) কৃষ্ণমূর্তি মহামুনি শিবদাস সংঘমিত্রকে লক্ষ্য করে।

'এটা বিস্ময়ের নয়, এর চেয়ে বড় বিস্ময়ের হলো সিবিআই একবার এসে চলে গেল, আবার ফিরে এল কেন? আসলে সবকিছুর মূলে রয়েছে আমেরিকান নাগরিক ছদ্মবেশে আসা বিভেন বার্গম্যান। সেই নয়া দিল্লীস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত ও তাদের সরকারকে ম্যানেজ করে আমাদের সরকারকে কোনভাবে বুঝিয়ে সর্বনাশটা করেছে।' বলল মহামুনি শিবদাস সংঘমিত্র ওরফে গভর্নর বিবি মাধব।

'প্রভু আমাদেরও তো লোক আছে। তারা কি করল?' জেনারেল (অব) কৃষ্ণমূর্তি বলল।

'সিবিআই'-এর এই অপারেশন প্রধানমন্ত্রী নিজেই তদারক করছেন। কারুরই কিছু করার সুযোগ নেই।' বলল বিবি মাধব।

'বিপদ এভাবেই বোধহয় আরেকটি বিপদ ডেকে আনে। প্রভু, আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি? আমার তো মনে হচ্ছে, আমাদের কোন ঘাঁটির সন্ধানই ওদের অজানা নেই।'

জেনারেল কৃষ্ণমূর্তির কথা শেষ হতেই থমকে দাঁড়াল বিবি মাধব। তাকাল সে জেনারেল কৃষ্ণমূর্তির দিকে। তার চোখ থেকে আগুন ছিটকে বেরুল। বলল, 'আজ মাফ করে দিলাম। এই ধরনের হতাশার কোন কথা দ্বিতীয়বার শুনলে শুধু আমাদের সাথে চলার নয়, বেঁচে থাকারও অধিকার হারাবে।'

'মাফ করুন গুরুজী।' সঙ্গে সঙ্গেই কাঁচু-মাচু মুখে ভয় জড়িত কণ্ঠে বলল জেনারেল কৃষ্ণমূর্তি।

কথা শেষ করেই জেনারেল কৃষ্ণমূর্তি বলল, 'গুরুজী আমরা গিরিপথটার মুখে এসে গেছি।'

'অলরাইট। সবাই আমাকে ফলো করো। আমার পেছনেই আহমদ শাহ আলমগীরের বাস্কেটের সাথে তুমি থাকবে। সবাইকে দ্রুত আসতে হবে। ওরা যদি ঘাঁটির উপর চোখ রেখে থাকে, তাহলে আমাদের চলে আসা ওদের কাছে

সংগে সংগেই ধরা পড়ে গেছে। তাহলে বুঝতে হবে অনেক আগেই ওরা আমাদের পিছু নিয়েছে।’ গভর্নর বিবি মাধব বলল।

সংকীর্ণ গিরিপথ দিয়ে সারিবদ্ধভাবে সকলেই ছুটল।

লেকের ধারে প্রথমেই পৌছল বিবি মাধব।

লেকের দিকে চোখ পড়তেই এক রাশ বিস্ময় এসে তাকে গ্রাস করল। দেখল যে, এই ঘাটে নোঙর করা তাদের দুটি বোট লেকের মাঝখানে ভাসছে।

‘জেনারেল কৃষ্ণমূর্তি, তুমি বোট দুটিকে ঠিকমত নোঙর করেছিলে? বোটগুলো ভেসে গেল কি করে?’ চিৎকার করে বলল বিবি মাধব।

জেনারেল কৃষ্ণমূর্তি ছুটে এসে বিবি মাধবের পেছনে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বলল, ‘প্রভু আমি বোট দুটো ভালভাবে নোঙর করেছিলাম। নোঙর আটকানো ছাড়াও চেন দিয়ে বেঁধেছিলাম পাথরের সাথে’

মহামুনিরূপী গভর্নর বিবি মাধব কোন জবাব দিল না। সে তাকিয়েছিল ভাসমান দুবোটের দিকে। ভাবছিল সে।

বোটের দিকে চোখ রেখেই হাতের ষ্টেনগানটা ফেলে দিয়ে ডান হাতটা পেছনে প্রসারিত করে বলল, ‘অটো রাইফেলটা দাও।’

জেনারেল কৃষ্ণমূর্তি তার পিঠে ঝুলন্ত অটো রাইফেলটা বিবি মাধবের হাতে তুলে দিল।

রাইফেলটা হাতে নিয়ে বিবি মাধব দুটি বোট লক্ষে অবিরাম গুলী চালাল। বারটা গুলীর গোটা ম্যাগাজিন শেষ করল সে।

তারপরও কিছুক্ষণ চোখ রাখল সে বোট দুটির উপর। তারপর চোখ ফেরাল সে জেনারেল কৃষ্ণমূর্তির দিকে। বলল, ‘নিশ্চিত হলাম বোট খালি কিনা। লোক থাকলে গুলী বৃষ্টির জবাব আসত কিংবা লোকদের নড়াচড়ায় বোট দুলত অথবা বোট সরিয়ে নেবার উদ্যোগ নিত। কোন কিছুই হয়নি। আর লোক থাকলে তারা বোট নিয়ে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে কেন! সুতরাং বোটে কেউ নেই।’

কথা শেষ করে মুহূর্তকাল থেমেই জেনারেল কৃষ্ণমূর্তিকে লক্ষ্য করে বলল, ‘তুমি কয়েকজনকে পাঠিয়ে দাও। ওরা গিয়ে বোট দুটি নিয়ে আসুক।’

জেনারেল কৃষ্ণমূর্তির পেছনেই দাঁড়িয়ে থাকা দুজন লোকের দিকে চোখ ফিরিয়ে সে বলল, 'তোমরা যাও, কুইক। দুজন দুটো বোট চালিয়ে নিয়ে এসো।'

ওরা দুজন আহমদ শাহ আলমগীরকে রাখা কাঠের লম্বা বাক্সটি বহন করে এনেছিল। লেকের কিনারায় পৌছে ওরা বাক্সটি নামিয়ে রাখলো।

হুকুম পেয়েই ওরা তৈরি হলো।

ওরা লেকের পানিতে নামতে যাচ্ছিল। এই সময় মেশিনগানের অব্যাহত গুলীর শব্দ এল গিরিপথের উত্তর প্রান্তের দিক থেকে।

চমকে উঠল বিবি মাধব।

জেনারেল কৃষ্ণমূর্তির দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওরা এসে গেছে। গিরিপথে ঢুকে গেছে। আক্রমণ করেছে ওরা আমাদের লোকদের।'

থামল বিবি মাধব। তার চোখ-মুখে সীমাহীন উদ্বেগ ও ভীতির চিহ্ন।

'হ্যাঁ, গুরুজী ওরা এসে গেছে। বোটও কাছে নেই আমরা সরে পড়তে পারছি না। এখন আমাদের ওদের প্রতিরোধ করতে হবে।' বলল জেনারেল কৃষ্ণমূর্তি। তারও মুখে বিমূঢ় ভাব।

'বোট আনা ও প্রতিরোধ দুই-ই আমাদের করতে হবে।' গভর্ণর বিবি মাধব।

'অতদূর থেকে বোট তীরে আনা পর্যন্ত নিরাপদ সময় আমরা পাব কিনা?' বলল জেনারেল কৃষ্ণমূর্তি।

'ঠিক বলেছ জেনারেল কৃষ্ণমূর্তি। তাহলে কি করা যায়?' বিবি মাধব বলল।

'গুরুজী আপনার নিরাপত্তার বিষয়টিই এখানে সবচেয়ে বড়। চলুন আমরা এ দুজনের সাথে বোটে চলে যাই। আপনি একটা বোটে অপেক্ষা করবেন, আমি আরেকটা বোট নিয়ে এসে এদের তুলে নিয়ে যাব।' বলল জেনারেল কৃষ্ণমূর্তি।

জেনারেল কৃষ্ণমূর্তি যখন কথা বলছিল, তখন তাদের কয়েকজন লোক তীরে এসে পৌছল। এই সময় গিরিপথের উত্তর প্রান্তের দিক থেকে বোম ফাটারও শব্দ এল।

'আমাদের লোকদের হাতে তো বোম নেই। তাহলে বোম ওরাই ফেলছে নাকি?' উদ্বিগ্ন ও দ্রুত কণ্ঠে বলল বিবি মাধব।

'ঠিক গুরুজী।' বলল জেনারেল কৃষ্ণমূর্তি।

'তাহলে তো ওরা আরও দ্রুত এসে পড়বে।!'

'হ্যাঁ প্রভু। আর দেরি করা ঠিক হবে না। আপনি পানিতে নেমে পড়ুন। আমি এদের কিছু নির্দেশ দিয়ে আসছি।'

জেনারেল কৃষ্ণমূতির কথা শেষ হবার সাথে সাথে বিবি মাধব গায়ের আলখেল্লা ও পায়ের জুতা খুলে ফেলে এবং গলায় ঝুলানো চাদর কোমরে বেঁধে পানিতে নেমে পড়ল।

ওরা চারজন সাঁতরে আসছে বোটের দিকে। বিবি মাধব সবার আগে। তারপর জেনারেল কৃষ্ণমূর্তি। তাদের পেছনে মহাসংঘের সৈনিক দুজন এক সাথে সাঁতরাচ্ছে।

দেখা গেল বিবি মাধব ও জেনারেল কৃষ্ণমূর্তি ভাল সাঁতরাতে পারে। ওরা পেছনের দুজনকে প্রায় আট-দশ হাত পেছনে ফেলে বোটের কাছে পৌছে গেল।

বোটে প্রথমে উঠল মহামুনি শিবদাস সংঘমিত্র' ওরফে গভর্নর বিবি মাধব। তার পরেই জেনারেল কৃষ্ণমূর্তি।

তারা উঠে বসে একটু রেষ্ট নিচ্ছিল আর দেখছিল তীরের পরিস্থিতি।

আহমদ মুসা কেবিন থেকে বেরিয়ে এসেছে। তার দুহাতে দুটি রিভলবার।

আহমদ মুসা কেবিন থেকে বেরিয়ে দুতিন ধাপ আসতেই সম্ভবত বোট দুলে উঠা দেখেই বিবি মাধব ও জেনারেল কৃষ্ণমূর্তি দুজনেই এক সাথে পেছনে তাকাল। তাদের দিকে তাক করা রিভলবার হাতে আহমদ মুসাকে দেখে তারা ভূত দেখার মত আঁতকে উঠল। তাদের আতংকিত বোবা দৃষ্টি যেন আটকে গেল আহমদ মুসার মুখে।

'স্রষ্টাকে ধন্যবাদ। আপনাকেই নৌকায় চেয়েছিলাম বিবি মাধব। আপনার খেলা শেষ। এবার দুজনেই ডেকের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন।' আহমদ মুসার কণ্ঠ এবার কঠোর।

মহামুনি শিবদাস সংঘমিত্রকে গভর্নর বিবি মাধব নামে সম্বোধন করায় জেনারেল কৃষ্ণমূর্তি চোখ ছানাবড়া করে তাকাল তাদের নেতা মহামুনি শিবদাস সংঘমিত্রের দিকে। তার চোখে-মুখে অপার বিস্ময়। সে আহমদ মুসার দিকেও তাকাল। চোখে তার একরাশ প্রশ্ন, অবিশ্বাসও কিছুটা।

আহমদ মুসা তার কথাটা শেষ করেই জেনারেল কৃষ্ণমূর্তিকে লক্ষ্য করে বলল, 'তাহলে তোমরা জাননা তোমাদের মহামুনি শিবদাস সংঘমিত্রই গভর্নর বিবি মাধব। তিনি আইনের লোক হয়ে ছদ্মবেশে তোমাদের নিয়ে সন্ত্রাস চালাচ্ছেন।'

জেনারেল কৃষ্ণমূর্তির বিস্ময়ে বোবা হয়ে যাওয়া দৃষ্টি আবার ঘুরে গেল বিবি মাধবের দিকে।

গভর্নর বিবি মাধব কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে ঘুরে দাঁড়াবার ক্রুব্ধ ভাব নিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল।

আহমদ মুসা রিভলবার নেড়ে ধমকে উঠে বলল, 'কোন কথা নয়, আগে দুজনে উপুড় হয়ে ডেকের উপর শুয়ে পড়ুন।'

কিন্তু তারা ডেকে শুয়ে পড়তে ইতস্তত করছিল।

আহমদ মুসার বাম হাতে ধরা রিভলবারটা একটু নড়ে উঠল। গর্জন করে ওঠা রিভলবার থেকে একটা গুলী বেরিয়ে বিবি মাধবের কানটা প্রায় স্পর্শ করে ছুটে গেল।

সংগে সংগেই বিবি মাধব এবং জেনারেল কৃষ্ণমূর্তি দুজনই শুয়ে পড়ল উপুড় হয়ে।

আহমদ মুসা পকেট থেকে কয়েক খন্ড রশি বের করে জেনারেল কৃষ্ণমূর্তির দিকে ছুড়ে দিয়ে বলল, 'গভর্নর বিবি মাধবকে পা'সহ পিছ মোড়া করে বেঁধে ফেল।'

জেনারেল কৃষ্ণমূর্তি ভয়ের সাথে তাকাল বিবি মাধবের দিকে। নির্দেশ পালনের কথা যেন সে ভুলে গেল।

নড়ে ওঠল এবার আহমদ মুসার ডান হাতের রিভলবার। গর্জে ওঠল আবার। একটা গুলী গিয়ে জেনারেল কৃষ্ণমূর্তির কানের একটা অংশ ছিড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

জেনারেল কৃষ্ণমূর্তি চিৎকার করে উঠে বসে রশি কুড়িয়ে নিয়ে গভর্নর বিবি মাধবের পা দুটি ও পরে পিছ মোড়া করে হাত দুটি বাঁধল।

'বিভেন বার্গম্যান ওরফে আহমদ মুসা', গর্জে উঠল গভর্নর বিবি মাধব, 'মনে রেখ আমি শুধু আন্দামানের গভর্নর নই, আমি ভারতে একজন রাজনীতিক। তোমাকে এই আচরণের জন্যে চরম মূল্য দিতে হবে।'

'আমার কথা পরে, আপনি নিজের কথা আগে ভাবুন বিবি মাধব। ভারতে সংবিধান এবং ভারতের জনগনের বিরুদ্ধে আপনি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। অন্যান্য সব প্রমাণ যোগড় হয়েছে। আজ আপনাকে হাতে-নাতে ধরায় সবচেয়ে বড় প্রমাণ যোগাড় হয়ে গেল।'

আহমদ মুসা এ কথাগুলো বলছিল আর বাঁধছিল জেনারেল কৃষ্ণমূর্তিকে। বাঁধা হয়ে গেলে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

তাকাল আহমদ মুসা সাঁতরে আসা বাকি দুই জনের দিকে। ওরা কূলের দিকে পালাচ্ছিল। আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'তোমরা তীরেই যাও, বোটে জায়গা হবে না।'

আহমদ মুসা রিভলবার পকেটে রেখে মোবাইল বের করল। কল করার জন্য মোবাইল মুখের কাছে তুলে নিল। ওপার থেকে কর্নেল সুরেন্দ্রের কণ্ঠ পেয়ে বলল, 'গুড নিউজ কর্ণেল মি. সুরেন্দ্র। পরিকল্পনা কাজ দিয়েছে। মহামুনি শিবনাথ সংঘমিত্র ওরফে গভর্নর বিবি মাধব একজন সংগীকে নিয়ে বোটে এসেছেন সাঁতরে। তাঁকে বন্দী করা হয়েছে। ওপার থেকে আপনার ভয় দেখানো খুব কাজ দিয়েছে।'

'স্যার, এটা তো ছিল আপনারই পরিকল্পনা। ধন্যবাদ স্যার। এখন কি করণীয় বলুন। গুলী করতে করতে তীর পর্যন্ত কি আমরা এডভান্স করব?' ওপার থেকে বলল সিবিআই-এর কর্নেল সুরেন্দ্র।

‘তাতে রক্তপাত হবে মি. সুরেন্দ্র। অনেক লোক মারা যেতে পারে। আমি অন্য চিন্তা করছি। বোটে মাইক্রোফোন আছে। আর ওরা প্রায় সবাই তীরে এসে দাঁড়িয়েছে এবং দুএকজন গিরিপথের এদিকের মুখ পর্যন্ত পৌছে গেছে। মাইক্রোফোনে আমি ওদেরকে আত্মসমর্পণের জন্যে আহবান জানাতে চাই। তাদের নেতা ধরা পড়ে গেছে। তারাও ধরা পড়ার অবস্থায়। তারা আত্মসমর্পণ করবে বলে মনে করি।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আপনি শান্তিপূর্ণ সমাধানের চিন্তা করছেন। ধন্যবাদ স্যার। আপনার আশা ব্যর্থ হলে তারপর আমরা অপারেশন শুরু করব।’ কর্নেল সুরেন্দ্র বলল।

‘মি. সুরেন্দ্র, এখন থেকে মিনিট খানেক পর আপনি আকাশের দিকে ফাঁকা গুলী ছুঁড়ে  এদিকে এগুতে থাকবেন। ইতিমধ্যে ওদেরকে আত্মসমর্পনের আহবান জানানো আমার শেষ হয়ে যাবে। ফাঁকা গোলাগুলী ছুঁড়ে ঐভাবে আপনার অগ্রসর হওয়া অব্যাহত রাখবেন যতক্ষণ না আমি মোবাইল করি।

ধন্যবাদ।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ওকে স্যার।’ কর্নেল সুরেন্দ্র বলল।

মোবাইল পকেটে রেখে আহমদ মুসা জেনারেল কৃষ্ণমূর্তি ওরফে ভাস্করের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, ‘তোমার পরিচয় জানা হয়নি। তুমি কে? তোমার নাম কি?’

জেনারেল কৃষ্ণমূর্তি এবার জবাব দিতে দেরি করল না। বলল, ‘আমার নাম জেনারেল কৃষ্ণমূর্তি। ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন সাবেক জেনারেল আমি। ‘মহাসংঘ’ এর রস দ্বীপের ঘাঁটির প্রধান।’

‘গুড।’ খুশি হলো আহমদ মুসা এই ভেবে যে, সর্বোচ্চ নেতা এবং এখানকার স্থানীয় নেতা দুজনেই ধরা পড়েছে। এতে ওদের আত্মসমর্পণ করানো সহজ হবে।

আহমদ মুসা বোটের পজিশন ঠিক-ঠাক করে নিয়ে হর্নটাকে তীরের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে মাউথ পীস মুখের সামনে ধরে উচ্চ কণ্ঠে বলতে লাগল, ‘মহাসংঘের কর্মীবৃন্দ, আপনাদের শীর্ষ নেতা মহামুনি শিবদাস সংঘমিত্র এবং রস দ্বীপের ঘাঁটি প্রধান জেনারেল কৃষ্ণমূর্তি ধরা পড়েছেন। তারা আমাদের হাতে

বন্দী। আপনারও ঘেরাওয়ের মধ্যে আছেন। পেছন থেকে সিবিআই-এর সৈন্যরা আপনাদের ঘিরে ফেলেছে। সামনে লেক। পালাবার পথ নেই। অতএব আত্মসমর্পণই বুদ্ধিমানের কাজ। না হলে সবাই মারা পড়বেন। আমি আপনাদের আত্মসমর্পণের আহবান জানাচ্ছি, চিন্তা করার জন্যে পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি। রাজি হলে সবাই গিয়ে সব অস্ত্র লেক-তীরের কাঠে বাক্সটার উপর রেখে হাত তুলে দাঁড়াবেন।'

আহমদ মুসার কথা শেষ হওয়ার সংগে সংগেই গিরিপথের উত্তর প্রান্ত থেকে বন্দুক ও মেশিনগানের গর্জন ভেসে আসতে লাগল। আহমদ মুসা বুঝল কর্নেল সুরেন্দ্ররা ফাঁকাগুলী করতে করতে অগ্রসর হওয়া শুরু করেছে।

মিনিট তিনেক পার হলো।

এর পরেই দেখা গেল মহাসংঘের অস্ত্রধারী কর্মীরা এক এক করে গিয়ে কাঠের বাক্সটার উপর অস্ত্রপাতি রেখে সার বেঁধে হাত তুলে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা গুনে দেখল ওরা দশজন।

আহমদ মুসা জেনারেল কৃষ্ণমূর্তিকে লক্ষ্য করে বলল, 'জেনারেল তোমরা মোট কজন এসেছ?'

'আমাদেরসহ মোট বারজন।' বলল জেনারেল কৃষ্ণমূর্তি।

'ধন্যবাদ জেনারেল।' বলে আহমদ মুসা পকেট থেকে মোবাইল বের করল। কল করল কর্নেল সুরেন্দ্রের নাম্বারে।

ওপার থেকে কর্নেল সুরেন্দ্রের কণ্ঠ পেতেই আহমদ মুসা বলে উঠল, 'কর্নেল মি. সুরেন্দ্র, ওরা আত্মসমর্পণে রাজি হয়েছে। ওরা নির্দিষ্ট করে দেয়া জায়গায় অস্ত্র জমা দিয়ে এসে সবাই হাত তুলে দাঁড়িয়েছে। এবার দ্রুত আপনারা চলে আসুন।'

'ধন্যবাদ স্যার, আপনার প্ল্যান কামিয়াব হয়েছে। আমরা আসছি।

আত্মসমর্পণকারী দশ জনকে সিবিআই জওয়ানরা পিছমোড়া করে বাঁধছিল, আহমদ মুসা দুই বোট তীরে এনে নোঙর করল।

বোট তীরে ভিড়তেই কর্নেল সুরেন্দ্র বোটে উঠল। বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, 'স্যার মি. বিভেন, আমি ওদের বিশেষ করে গভর্নর স্যারের একটা ফটো নিতে চাই তিনি যে অবস্থায় গ্রেফতার হয়েছেন, সে অবস্থায়।'

'হ্যাঁ সেটা তো আপনার একটা আইনি প্রয়োজন।' বলল আহমদ মুসা।

'ইয়েস মি. বিভেন স্যার।' বলেই কর্নেল সুরেন্দ্র তীরে দাড়ানো ক্যামেরাধারী একজনকে লক্ষ্য করে বলল, 'তোমার ওদিকের ফটো নেয়া শেষ তো! এখন বোটে এসো, এদের ফটো নিতে হবে।'

নির্দেশ পেয়েই লোকটি বোটে উঠে এল।

গভর্নর বিবি মাধব এবং জেনারেল কৃষ্ণমূর্তিকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'একসিলেন্সি মি. গভর্নর এবং জেনারেল স্যার আমার দায়িত্বের অংশ হিসেবে আমি আপনাদের ফটো নেব।'

ফটোগ্রাফার ক্যামেরা তাক করল গভর্নরের দিকে।

'দাঁড়াও কর্নেল সুরেন্দ্র, তো.......।' চিৎকার করে কথা বলতে যাচ্ছিল বিবি মাধব।

কর্নেল সুরেন্দ্র তাকে মাঝ পথে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'একসিলেন্সি, দয়া করে আমাকে সরকারি কাজে বাধা দেবেন না। আপনি কথা বলুন, তাতে আমার আপত্তি নেই।

কর্নেল সুরেন্দ্র যখন কথা বলছিল, তখন সিবিআই ফটোগ্রাফারের ক্যামেরা একের পর এক ক্লিক করে চলছিল।

'আমি আন্দামানের গভর্নর। আমাকে এভাবে গ্রেফতার করতে পার না প্রেসিডেন্ট অব ইন্ডিয়ার অনুমতি ছাড়া।' বলল বিবি মাধব ক্রুদ্ধ কণ্ঠে।

'প্রমাণ পেলে আন্দামানের যে কাউকে আমি গ্রেফতার করতে পারব, এ অথরিটি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী আমাকে আন্দামানে পাঠিয়েছেন। তার উপর এই দশ মিনিট আগে প্রধানমন্ত্রীকে আমি সব কথা জানিয়েছি। তিনি প্রেসিডেন্টকে জানিয়ে তার অনুমতি নিয়ে আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আপনাকে গ্রেফতার করার জন্যে।

তিনি আমাকে আরও জানিয়েছেন, 'আন্দামান হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে তাৎক্ষণিকভাবে আন্দামানের গভর্নরের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।' কর্নেল সুরেন্দ্র বলল।

এ কথা শোনার সংগে সংগে গভর্নর বিবি মাধবের মুখ মলিন হয়ে গেল। তার চোখে-মুখে নামল উদ্বেগের গভীর ছায়া। বলল, 'কর্নেল সুরেন্দ্র তোমার মোবাইলটা আমাকে দাও। আমি প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলব। প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রীকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে। এই বিভেন বার্গম্যান আমেরিকান পরিচয় দিয়ে সব কলকাঠি নেড়েছে। কিন্তু বিভেন বার্গম্যানকে তো প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী এবং তোমরাও জান না।'

'আমি জানতাম না একথা ঠিক একসিলেন্সি। কিন্তু এক মিনিট আগে প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলার সময় তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে, বিভেন বার্গম্যান আসলে আহমদ মুসা।' বলল কর্নেল সুরেন্দ্র।

'জানার পরেও প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী তাঁর কথা শুনেছেন? তোমরাও তাকে সহযোগিতা করছ?' উচ্চকণ্ঠে বলল বিবি মাধব। তার কণ্ঠে হতাশার সুর।

'একসিলেন্সি, আমরা তাকে সহযোগিতা করছি না, তিনিই দয়া করে আমাদের সহযোগিতা করছেন। আর প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী তাঁর কথা শুনবেন কেন? আন্দামানের প্রকৃত ঘটনা জানতে পেরে তারা সঠিক পদক্ষিপ নিয়েছেন। তিনি যদি এ ব্যাপারেও কোন সহযোগিতা করে থাকনে, সেটা তার শুভেচ্ছা।' কর্নেল সুরেন্দ্র বলল।

'তুমি ঠিক বলছ না। সে তার সম্প্রদায় মুসলমানদের স্বার্থে সব কিছু করেছে। আর......।' বিবি মাধব কথা শেষ করতে পারল না। মাঝপথেই থেমে যেতে হলো।

কর্নেল সুরেন্দ্র বিবি মাধবের কথার মাঝখানেই বলে উঠল, 'ব্যাপারটাকে ঐভাবে না দেখে বলুন যে, একদল মজলুম মানুষের স্বার্থে তিনি কাজ করছেন।'

'তার মানে তুমি বলতে চাচ্ছ, আমরা জালেম?' ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলল বিবি মাধব।

‘আমি কিছুই বলছি না একসিলেন্সি। সে কথা আইন বলবে, বিচার বলবে।’ কর্নেল সুরেন্দ্র বলল।

‘বিচার কি বলবে? আমরা জাতির স্বার্থে কাজ করেছি। ব্যক্তি স্বার্থে কিছু করিনি আমরা।’

কর্নেল সুরেন্দ্রের ঠোঁটে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল। বলল, ‘একসিলেন্সি আপনারা আমাদের অগ্রজ। একটা কথা বলি, একজনের সর্বনাশ করে আরেকজনের ‘পৌষ মাস’ আনা ভাল কাজ নয়, সব আইনেই এটা অপরাধ।’

কথা শেষ করেই কর্নেল সুরেন্দ্র আহমদ মুসার দিকে চেয়ে বলল, ‘চলুন স্যার, আহমদ শাহ আলমগীরকে বাক্স থেকে উদ্ধার করতে হবে।’

আহমদ মুসা মনে মনে আহমদ শাহ আলমগীরের কথা ভেবে অধীর হয়ে উঠেছিল। কর্নেল সুরেন্দ্র নিজের থেকেই একথা মনে করায় খুশি হলো আহমদ মুসা। দুজনে বোট থেকে নেমে চলল বাক্সটার দিকে।

বাক্সের পাশে দাঁড়াতেই বুকটা দুরু দুরু করে উঠল আহমদ মুসার। কি অবস্থায় দেখবে সে আহমদ শাহ আলমগীরকে!

বাক্সের উপরের ঢাকনায় অনেকগুলো বড় বড় ফুটো। বাক্সের দুপাশে দেয়াল এবং পা ও মাথার দিকেও কয়েকটা করে বড় ফুটো। বুঝল আহমদ মুসা, আহমদ শাহ আলমগীরের বাঁচার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা না হয় এজন্যে বাক্সে ভালো ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বাক্সটির দুপ্রান্ত প্লাষ্টিক দড়ি দিয়ে বাঁধা।

আহমদ শাহ আলমগীর সংজ্ঞাহীন, না সজ্ঞানে রয়েছে? ভাবল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা ঝুঁকে পড়ল বাক্সটির উপর।

ডান হাতের মধ্যমা দিয়ে প্রথমে জোরে একটি টোকা দিল। মুহূর্তকাল থেমে একই সাথে জোরে আরো একটি টোকা দিল।

এই টোকার ধরন আহমদ শাহ আলমগীরের কাছে পরিচিত। তাদের পরিবারে আঙুল বা কলিংবেল যাই হোক নক করার ক্ষেত্রে এই সংকেত ব্যবহার

করা হয়। টোকার এই সংকেতের মাধ্যমে আহমদ মুসা আহমদ শাহ আলমগীরকে এই মেসেজ দিতে চাইল যে, সে এখন আপন পরিবেশে, শত্রুদের হাতে নয়।

আহমদ মুসা নক করার কয়েক মুহূর্ত পরেই ভেতর থেকে বাক্সের ঢাকনায় ঠিক আহমদ মুসার নিয়মেই তিনবার নক হলো।

অপার খুশিতে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আহমদ মুসার। কর্নেল সুরেন্দ্রও ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিল। সে খুশি হয়ে আহমদ মুসাকে বলল, 'গুড নিউজ স্যার। আহমদ শাহ আলমগীর সজ্ঞানে এবং সচল অবস্থায় আছে। আপনার সংকেতের জবাব দিয়েছে সে। কিন্তু আপনার সাথে এ সহযোগিতা করল কেন সে? শত্রুর সংকেতে সে তো রেসপন্স করার কথা নয়।'

'আমি তার ফ্যামেলী কোডে সংকেত দিয়েছি কর্নেল।' আহমদ মুসা বলল।

'বুঝেছি।' প্রসন্ন মুখে কথাটা বলেই কর্নেল সুরেন্দ্র কোমরের বেল্টে ঝুলানো খাপ থেকে ছুরি বের করে দু'প্রান্তের বাঁধন কেটে দিল।

আহমদ মুসা দুহাত দিয়ে বাক্সের উপরের ঢাকনা তুলে বন্ধনের এক প্রতীক অর্গলটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

আহমদ মুসার চোখ দুটি গিয়ে স্থির হলো অপার প্রত্যাশিত আহমদ শাহ আলমগীরের মুখের উপর। অনিয়ন্ত্রিত, অগোছালো লম্বা দাড়ি-গোফ এবং মাথা থেকে নেমে আসা বিশৃঙ্খল লম্বা চুলে মুখ প্রায় ঢেকে গেছে। কালোর মধ্যে মুখের সাদা দীপ্তি এবং উজ্জ্বল চোখ দেখতে পেল আহমদ মুসা। শবাসনে থাকার মত চিৎ হয়ে সে শুয়ে ছিল। তার প্রলম্বিত হাত দুটি লম্বাভাবে দেহের উপর রাখা ছিল।

আহমদ শাহ আলমগীরের চোখ চার দিকে ঘুরে এসে আহমদ মুসার মুখের উপর স্থির হলো। ধীরে ধীরে তার চোখে ফুটে উঠল সাত রাজারধন কুড়িয়ে পাওয়ার এক আনন্দ।

আর আহমদ মুসার চোখে অবশেষে আহমদ শাহ আলমগীরকে ঘিরে পাওয়ার অশ্রুঘন এক আবেগ।

শোয়া থেকে তাকে তুলে আনার জন্যে আহমদ মুসা তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

আহমদ শাহ আলমগীরের ডান হাত উঠে এল। কাঁপছিল তার হাত। অপুষ্টিতে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে তার হাতের চামড়া। হাতের আঙুলগুলো অনেকটাই শিথিল।

আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে ফেলল। আহমদ শাহ আলমগীরের বাম হাত উঠে এল এবং আঁকড়ে ধরল আহমদ মুসার হাত।

আহমদ মুসা তাকে টেনে তুলল এবং জড়িয়ে ধরল। আহমদ শাহ আলমগীরও আহমদ মুসাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল।

'তুমি ঠিক আছ আহমদ শাহ আলমগীর?' নরম কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

'আমার সব দুঃখ, সব বেদনা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে। আমি আহমদ মুসাকে জড়িয়ে ধরতে পেরেছি। তিনি আমাকে উদ্ধার করতে এসেছেন, উদ্ধার করেছেন।' অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল আহমদ শাহ আলমগীর। তার শেষ কথাগুলো কান্নায় ভেঙে পড়ল।

আহমদ মুসা নরমভাবে আহমদ শাহ আলমগীরকে পিঠ চাপড়ে সান্তনা দিল। বলল, 'আমি আহমদ মুসা তুমি কি করে জানলে?'

'আপনি বিভেন বার্গম্যান, ওরফে আহমদ মুসা। আপনার সব কথাই ওরা গল্প করতো এবং বলতো, 'আহমদ মুসা আমাদের অপূরণীয় ক্ষতি করেছে সত্য, তবে আহমদ মুসা কেন তার বাবাও পারবে না তোকে উদ্ধার করতে। কিন্তু আমি নিশ্চিত ছিলাম।'

আহমদ মুসা আহমদ শাহ আলমগীরকে একটু উঁচু করে বাক্সের বাইরে নিয়ে এল। বলল, 'তোমার কাছ থেকে অনেক কথা শোনার আছে। চলো আগে বোটে, হাঁটতে পারবে?'

আহমদ শাহ আলমগীর কিছু বলার আগেই পাশ থেকে সিবিআই কর্নেল বলল আহমদ মুসাকে, 'স্যার শাহ সাহেবের বাক্সে শোয়া অবস্থায় একটা ফটো নেয়া হয়েছে, বাক্সের পাশে দাঁড়ানো অবস্থায় একটা ছবি নিতে চাই স্যার।'

'অবশ্যই, আপনার আইনের জন্যে যা যা প্রয়োজন, তা অবশ্যই করবেন।'

বলে আহমদ মুসা আহমদ শাহ আলমগীরকে বাক্সের পাশে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে সরে এল।

কিন্তু আহমদ শাহ আলমগীর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। টলে উঠল তার দেহ।

সিবিআই-এর ক্যামেরা ক্লিক করে উঠল।

বাক্সের পাশে টলায়মান আহমদ শাহ আলমগীরের দেহটাই ক্যামেরাবন্দী হয়ে গেল।

আহমদ মুসা এবং কর্নেল সুরেন্দ্র দৌড়ে গিয়ে ধরে ফেলল আহমদ শাহ আলমগীরকে। পড়ে যাওয়া থেকে বেঁচে গেল সে।

'স্যার এঁর দেহের কাঠামোটা শুধু ঠিক আছে, দীর্ঘ নির্যাতন তাঁর দেহের আর কিছু বাকি রাখেনি। দেখুন দুই হাতের কব্জিই ক্ষত-বিক্ষত। মনে হয় ভেতরে ঘা এখনও কাঁচা আছে। বাহুতেও দেখুন অনেক কালচে দাগ। কাপড়ের নিচে দেহের অবস্থা যে কি ঈশ্বর জানেন।' বলল কর্নেল সুরেন্দ্র।

'আল্লাহর অশেষ প্রশংসা কর্নেল। তাদের এতসব নির্যাতন ব্যর্থ হয়েছে। নির্যাতনের ভয়াবহ শক্তিকে পরাজিত করতে পেরেছে আহমদ শাহ আলমগীর। ওরা যা চেয়েছিল তার কাছ থেকে তা পায়নি।' আহমদ মুসা বলল।

'কারণ সম্ভবত এই যে, তার দেহের শক্তি যত কমেছে, মনের শক্তি তত বেড়েছে।'

কথা শেষ করেই কর্নেল সুরেন্দ্র বলল, 'স্যার চলুন একে তাড়াতাড়ি বোটে নিয়ে যাই। কিছু খাওয়াতে হবে। আমাদের কাছে চা, জুস ও শুকনো খাবার আছে।'

'হ্যাঁ চলুন। সত্যই ওকে খাওয়ানো প্রয়োজন। কখন খেয়েছে কে জানে? আর তাকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খাবার তাকে দেয়া হয়নি।' আহমদ মুসা বলল।

দু'জনে দুদিক থেকে ধরে আহমদ শহা আলমগীরকে বোটে তুলল।

বোটের কেবিনে বিছানা পাতাই ছিল।

আহমদ শাহ আলমগীরকে অজু করিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল আহমদ মুসা।

একজন সৈনিককে নিয়ে প্রবেশ করল কর্নেল সুরেন্দ্র। কর্নেল সুরেন্দ্রের হাতে পানির একটি বোতল, জুসের ক্যান এবং সৈনিকের হাতে পেপার প্লেটে শুকনো খাবার ও চা।

আহমদ শাহ আলমগীরকে খাবার দিয়ে কর্নেল সুরেন্দ্র আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, 'স্যার ওদিকের একটা ব্যবস্থা করতে হয়। কে কিভাবে আমরা যাব ঠিক করে ফেলতে হয়।'

'দিল্লী কি বলছে?'

'দিল্লী থেকে সিবিআই এর একটা টীম পোর্ট ব্লেয়ারে আসছে, তারা গভর্নর বিবি মাধবকে দিল্লী নিয়ে যাবে। আর অন্য সব বন্দীরা এখানে থাকবে। তাদের জিজ্ঞাসাবাবদ করে মহাসংঘের সব তথ্য জানতে হবে। 'মহাসংঘে'র সকল পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের গ্রেফতারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।'

'নাইস। বন্দীদের নিয়ে সবাই এক সাথে যেতে পারলে ভাল হয়। আমাদের দুটি বোট আছে। তৃতীয় একটি বোট ডোবানো আছে, এ বোটেই আমি এসেছিলাম। তিনটি হলেও এক সাথে আমরা যেতে পারছি না। এই..........।'

আহমদ মুসার কথার মাঝখানেই কর্নেল সুরেন্দ্র বলে উঠল, 'স্যরি স্যার মাঝখানে কথা বলার জন্যে। এক সাথে আমরা যাচ্ছি না। আমার সহকারী মেজর বীরবল সৈনিকদের নিয়ে এখানে থাকছে। আমরা মাত্র জনাছয়েক সৈনিক ও বন্দীদের নিয়ে এখন পোর্ট ব্লেয়ারে যাব। মেজর বীরবলরা মহাসংঘের রস দ্বীপের ঘাঁটি সার্চ করে তথ্য প্রমাণাদি যা পায় তা নিয়ে পরে পোর্ট ব্লেয়ারে যাবে। পোর্ট ব্লেয়ার থেকে পুলিশ আসার জন্যেও তাদের কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে। ঘাঁটির দায়িত্ব পুলিশের হাতে ন্যাস্ত করার আগে তারা যেতে পারবে না।'

'ওকে কর্নেল, সঠিক সিদ্ধান্ত।' বলল আহমদ মুসা।

'ধন্যবাদ স্যার। তাহলে ওদিকটা দেখি। সব ব্যবস্থা করে ফেলি।' কর্নেল সুরেন্দ্র বলল।

'ওকে কর্নেল।'

কর্নেল সুরেন্দ্র উঠে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল।

খাওয়া শেষ করেছে আহমদ শাহ্ আলমগীর।

খাবারের অবশিষ্ট নিয়ে বেরিয়ে গেল সৈনিকটি।

সৈনিকটি বেরিয়ে যেতেই আহমদ শাহ আলমগীর পশ্চিম দিকে ঘুরে সিজদায় পড়ে গেল। দীর্ঘক্ষণ সিজদায় থাকল।

সিজদা থেকে উঠে সালাম ফিরিয়ে ঘুরে বসল আহমদ মুসার দিকে।

তার চোখে অশ্রু। বলল সে, 'আপনার আন্দামানে আগমন অকল্পনীয় এক ব্যাপার। আল্লাহর অসীম দয়া। আমার এবং আমাদের সাহায্যের জন্যেই আপনাকে তিনি এখানে এনেছেন। যাদের কেউ থাকে না, আল্লাহ বোধ হয় এভাবেই তাদের সাহায্য করেন।' কান্না জড়ানো কণ্ঠ আহমদ শাহ্ আলমগীরের।

'অবশ্যই।' বলে আহমদ মুসা পকেট থেকে মোবাইল বের করল। বলল, 'তোমার আম্মা, শাহবানু, সুষমার সাথে কথা বলো। ওঁরা শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় আছে।'

'আমার মা-বোন এবং পরে সুষমাকে কিডন্যাপ করেছে আমাকে কথা বলতে বাধ্য করার অস্ত্র হিসাবে এটা আমি ওদের কাছেই শুনেছি। আবার ওঁরা তাদের হাতছাড়া হয়েছে, সে কথা বলেও তারা আমাকে নির্যাতন করেছে। আমি তখনই বুঝেছি, আপনিই তাদের উদ্ধার করেছেন।' বলল আহমদ শাহ আলমগীর।

আহমদ মুসা মোবাইল কল করতে করতে বলল, 'ধর তাদের যদি তোমার সামনে নিত আর তাদের নির্যাতন করতো, তাহলে কি ওদের প্রার্থীত তথ্য দিয়ে দিতে ওদেরকে?'

'আমার বলার কিছু ছিল না। ওরা যা জানতে চায় আমিতা জানি না।' আহমদ শাহ্ আলমগীর বলল।

'শোন আহমদ শাহ্ আলমগীর, ঐ বিষয়টা কি? তা জানার খুব ইচ্ছা আমারও। কোন তথ্য বা কি তোমার কাছে ওরা জানতে চাচ্ছিল?' বলল আহমদ মুসা দ্রুতকণ্ঠে এবং আগ্রহের সাথে।

'জি, সেটা এক বাক্সের কথা।' বলতে শুরু করল আহমদ শাহ আলমগীর, 'বাক্সটিতে না কি আছে............।'

আহমদ মুসা হাত তুলে ইশারা করে থামতে বলায় থেমে গেল আহমদ শাহ আলমগীর।

আহমদ মুসা মোবাইলে কল পেয়ে গিয়েছিল। কথা বলতে শুরু করেছিল।

.............আমি ভাল আছি, আহমদ শাহ আলমগীর ভাল আছে। খালাম্মাকে ডাক। আহমদ শাহ আলমগীরের সাথে কথা বল।'

আহমদ মুসা মুখ থেকে মোবাইল সরিয়ে আহমদ শাহ আলমগীরের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'শাহবানুর সাথে কথা বল। খালাম্মা আসছে। এঁদের সাথে কথা শেষ কর, তারপর সুসমার সাথেও লাগিয়ে দেব।'

আহমদ শাহ আলমগীরের চোখ-মুখ মুহূর্তেই আনন্দ-আবেগে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে দ্রুত হাত বাড়িয়ে মোবাইল নিল।

আহমদ মুসা তার হাতে মোবাইল তুলে দিয়ে বলল, 'তুমি কথা বল, আমি এখুনি আসছি।'

বলে আহমদ মুসা বোটের কেবিন থেকে বেরিয়ে এল। আহমদ মুসা চাইল, আহমদ শাহ আলমগীর সংকোচহীন পরিবেশে প্রাণখুলে কথা বলুক। সুষমার সাথে আহমদ শাহ আলমগীরের কথা বলার অবস্থা কেমন হবে, সেটাও ভাবনায় এল আহমদ মুসার। কান্না ও বাঁধভাঙ্গা আবেগের বন্যা নিশ্চয় দুজনের কণ্ঠই রুদ্ধ করে দেবে। এই না বলার মধ্যেই তাদের সব বলা হয়ে যাবে।

# ২

হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহর বিশাল ডাইনিং রুম। ডিম্বাকৃতি বিশাল টেবিলটি মেহমানদের জন্যে সুন্দর করে সাজানো। সব রেডি। মেহমানরা আসলেই খাদ্য পরিবেশন করা হবে। হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহ এবং তার স্ত্রী ঘুরে ঘুরে সব ঠিক-ঠাক আছে কিনা দেখছে।

ডাইনিংটি সাগরের তীর ঘেঁষে। ডাইনিং রুম লম্বালম্বি। পুব ধারটায় কাঁচের দেয়াল। কাঁচের ভিতর দিয়ে বিশাল আন্দামান সাগরের বিস্তীর্ণ অংশ দেখা যায়। কাঁচের দেয়ালের উত্তর প্রান্ত ঘেঁষেই একটা ল্যান্ডিং। সেখান থেকে একটা সিড়ি উঠে গেছে দুতলায়। ডাইনিং-এর জন্যেই সম্ভবত এই সিঁড়িটা ব্যবহার করা হয়। সিঁড়ির এই ল্যান্ডিংটার পূর্ব প্রান্তে একটা দরজা। দরজাটা খুলেই দেখা যাবে একটা পাথরের সিঁড়ি নেমে গেছে সাগরের পানিতে। পানির লেভেলে সিঁড়ির সাথে একটা সুন্দর বোট বাঁধা।

টেবিলের চারদিক এবং গোটা ব্যবস্থা পরিদর্শন শেষ করে হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহ এবং বেগম হাসনা আবদুল্লাহ দুজন এসে একটা সোফায় পাশাপাশি বসল।

বসেই হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে হাজী আবদুল্লাহ বলল, 'আহমদ মুসা তো এতক্ষণ এসে পৌছার কথা।'

'বাছাকে কোন টাইম ফ্রেমে বাঁধা চলে না। যে নিজে নিজের নিয়ন্ত্রক নয়, সে কোন নিয়মের মধ্যে নিজেকে বাঁধবে কি করে?' বলল বেগম হাসনা আবদুল্লাহ।

'আমাদের সবার জীবনই তো আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে। ফল বা রেজাল্ট যা কিছু তাঁর কাছ থেকেই আসে। কিন্তু কাজ করার পরিকল্পনার অধিকার তো তিনি মানুষকে দিয়েছেন। কাজ হলে ফল তিনি মানুষকে দেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে নিজের জন্যে রুটিন তৈরি করার এক্তিয়ার মানুষের রয়েছে। এ এক্তিয়ার আল্লাহ

আহমদ মুসাকে একটু বেশি দেবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।' হাজী আবদুল্লাহ বলল।

'ধন্যবাদ। ঠিক বলেছ।'

কথার সাথে সাথে বেগম হাসনা আবদুল্লাহ সোফায় গা এলিয়ে দিল। বলল, 'আমার কাছে সব স্বপ্ন মনে হচ্ছে। কি ছিল আন্দামান, কি হয়ে গেল। মাত্র একজন মানুষ এল, আর সব পাল্টে গেল!'

মিষ্টি হাসল হাজী আবদুল্লাহ। বলল, 'সেই মানুষটি তো শুধুই মানুষ নয় হাসনা। সে রূপকথা 'জিয়ন কাঠি' এবং সবাই যার সন্ধানে পাগল সেই 'সৌভাগ্য স্পর্শমনি' বা 'পরশ পাথর' সে। তার স্পর্শে লোহা সোনা হয় না বটে, কিন্তু তার পরশে অশান্তি শান্তিতে এবং সন্ত্রাস সুস্থতায় রূপান্তরিত হয়।'

হাজী আবদুল্লাহ থামতেই কলিং বেল বেজে উঠল। বাজল তাদের ফ্যামিলি কোডে।

বেগম হাসনা আবদুল্লাহর মুখে একটা আনন্দের প্রবাহ খেলে গেল। সুইচ কনট্রোল বাক্সটা হাতে তুলে নিতে নিতে বেগম হাসনা আবদুল্লাহ বলল, দেখ, ঠিক সময়েই এসে গেছে আহমদ মুসা।'

পরে কনট্রোল বক্সের একটা সুইচ টিপে বক্সটিকে মুখের কাছে নিয়ে বলল, 'আসসালামু আলায়কুম। বেটা আহমদ মুসা এসো।'

আহমদ মুসা এল। ড্রইং হয়ে ডাইনিং লাউঞ্জে প্রবেশ করল।

হাজী আবদুল্লাহ এবং বেগম হাজী আবদুল্লাহ উঠে দাঁড়িয়ে আহমদ মুসাকে স্বাগত জানাল।

আহমদ মুসা হাজী আবদুল্লাহর সাথে হ্যান্ডশেক করে এবং বেগম আবদুল্লাকে সালাম দিয়ে তাদের সামনের সোফায় গিয়ে বসল।

বেগম হাজী আবদুল্লাহ বসেই বলে উঠল, 'তুমি বহুদিন বাঁচবে বেটা। তোমার কথাই বলছিলাম আমরা, তুমি এসে পড়েছ।'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'খবরটা আনন্দের আম্মা। কিন্তু সমস্যা হলো, দুনিয়াতে যত বেশি সময় থাকব, হিসাবের খাতা ততই লম্বা হবে, পাকড়াও হওয়ার বিপদের ঝুঁকি ততই বাড়বে।'

‘তুমি এমন চিন্তা করলে আমাদের দশা কি হবে বাছা! পরের তরে তোমার জীবন, হিসাবের খাতায় তোমার বিরুদ্ধে তো লেখার কিছু নেই।’ বলল বেগম হাজী আবদুল্লাহ।

গাম্ভীর্য নেমেছে আহমদ মুসার মুখে। বলল, ‘আল্লাহর রসূল স.-এর সাহাবীরা যারা বেহেশতের আগাম সুসংবাদ পেয়েছিলেন, তারাও মহাহিসাবের দিনে তাদের কি হবে এ চিন্তায় অঝোর নয়নে কাঁদতেন।’

‘সুবহানাল্লাহ।’ উচ্চারিত হলো হাজী আবদুল্লাহর কণ্ঠে।

সবার চোখে-মুখেই উদ্বেগের মলিনতা।

একটা নিরবতা নামল সবাইকে ঘিরে।

নিরবতা ভাঙল আহমদ মুসাই। বলল হাজী আবদুল্লাহকে উদ্দেশ্য করে, ‘জনাব বিরাট সুখবর, গভর্নর বিবি মাধব স্বীকারোক্তিমূলক বিস্তারিত বক্তব্য দিয়েছে। সন্ত্রাসী দল ‘শিবাজী সন্তান সেনা’ এবং ‘মহাসংঘে’র গোটা নেটওয়ার্কের নাম-পরিচয় ধরা পড়ে গেছে। শীর্ষ নেতারাসহ প্রথম ও মাঝারী শ্রেণীর সব নেতাই ধরা পড়ে গেছে। আসার সময় কর্নেল সুরেন্দ্রের কাছে সর্বশেষ তালিকাটা দেখে এলাম।’

‘আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের হিন্দুস্তান বোধ হয় বেঁচে গেল এক সর্বনাশা ষড়যন্ত্রের কবল থেকে। মহাসংঘের শীর্ষ নেতা কে? তিনিও ধরা পড়েছেন?’ হাজী আবদুল্লাহ বলল।

‘তিনি শাসক দলসহ অনেক রাজনৈতিক দলের আধ্যাত্মিক নেতা এবং নির্দলীয় সক্রিয় রাজনীতিক রাজগুরু দেশমুখ লালা রামমনোহর লেহিয়া। তাকে সর্বশেষে আজ কিছুক্ষণ আগে গ্রেফতার করা হয়েছে।’

‘সঠিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, ঠিক লোককে গ্রেফতার করা হয়েছে।’ আনন্দ-বিস্ফোরিত চোখে বলল হাজী আবদুল্লাহ।

একটু থেমেই আবার বলল হাজী আবদুল্লাহ, ‘আন্দামানের আর নতুন কিছু ধর-পাকড় বাকী আছে?’

‘সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে থেকে আর নতুন কোন ধর-পাকড় নেই। যা হয়েছে শুরুতেই। বেশি লোক ধরা পড়েছে পুলিশ ও আমলাদের মধ্য থেকে।

কর্নেল সুরেন্দ্র বললেন, যে লিষ্ট তারা পেয়েছিল গভর্নর বিবি মাধবের ফাইল থেকে, সে লিষ্ট অনুসারে উল্লেখযোগ্য সবাই ধরা পড়েছে। এখন তারা আহমদ শাহ আলমগীর ও সুষমা রাওয়ের কিডন্যাপসহ প্রতিটি ঘটনা ও হত্যাকান্ডের পৃথক পৃথক তদন্ত করছে। মামলাগুলো আদালতে উঠলে সব রহস্য, সহ কথা প্রতিটি হিন্দুস্তানীর কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। বিশেষ করে আহমদ শাহ আলমগীর ও সুষমা রাওয়ের কিডন্যাপ হিন্দুস্তানের সর্বকালের ইতিহাসের বড় ঘটনায় পরিণত হবে বলে কর্নেল সুরেন্দ্র মনে করেন।' থামল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা থামতেই বেগম হাজী আবদুল্লাহ বলে উঠল, 'সব খবরই আনন্দের। কিন্তু সুষমা রাও ও মিসেস বিবি মাধবের কথা ভেবে আমার কষ্ট হচ্ছে। পিতা ও স্বামীর সম্বন্ধটা সবার ওপরে।'

'ঠিক বলেছেন আম্মা। এই সম্বন্ধ সবকিছুর ওপরে। সুষমা রাও এবং মিসেস বিবি মাধবও বিষয়টাকে স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করেছেন। খবর জানার পর মা ও মেয়ে বুক ভাঙা কান্নায় ভেংগে পড়েন, অঝোর ধারায় তাদের চোখে অশ্রু নামে। তাদের সামনে বসে থাকতে আমার খুব কষ্ট হয়েছে। অপরাধী মনে হয়েছে নিজেকে। সান্তনা দেবার মত কোন কথা তাই আমার মুখে যোগায়নি। কিন্তু শীঘ্রই মিসেস মাধব নিজেকে সামলে নেন। চোখ মুছে তাড়াতাড়ি বলল, 'স্যরি বেটা, আমাদের মাফ করো। আমাদের কান্নাকে ক্রিমিনালের প্রতি সমবেদনা মনে করো না। এ কান্না আমাদের আপন জনের বিয়োগ ব্যথার।' তারপর একটু থেমেই আবার বলে ওঠেন, 'আমাদের সাথে তুমিও চলো বেটা। সিবিআই যেটা চেয়েছে, তার কিডন্যাপ সম্পর্কে সেই ষ্টেটমেন্ট তো সুষমা দেবেই, আমিও তার মা হিসাবে সুষমাকে কিডন্যাপের অভিযোগে গভর্নর মাধবের বিরুদ্ধে কেস দায়ের করব। তিনি কিডন্যাপ করিয়েছেন, সেটা আমি তার মুখ থেকেই শুনেছি। সত্যিই সুষমা রাও সিবিআই ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে তার বিরুদ্ধে শক্ত জবানবন্দী রেকর্ড করিয়েছে। তার মা মিসেস মাধবও সুষমাকে কিডন্যাপের অভিযোগে শক্ত কেস দায়ের করেছে।'

'সত্যিই বিস্ময়কর এ ঘটনা বাছা।' বলল বেগম হাজী আবদুল্লাহ।

‘পাপের পাল্লা ভারী হলে, সহ্যের সীমা শেষ হয়ে গেলে এক সময় এরকমই হয়। আহমদ শাহ্ আলমগীরকে কিডন্যাপের একটা যুক্তি হয়ত তাদের দেয়ার মত আছে, কিন্তু নিজের মেয়েকে কিডন্যাপ করার কারণ হিসাবে যে যুক্তিই দাঁড় করানো হোক তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এই পাপই শেষে বিবি মাধবরা করেছেন। তাছাড়া সুস্মিতা বালাজীর সাথে নিজের মামা হয়ে যে আচরণ বিবি মাধব করেছেন, তা আপনারা শুনেছেন।’ আহমদ মুসা বলল।

‘হ্যাঁ মনে আছে, বিশ বছরের বনবাস জীবন, সেও এক অপরূপ রূপ কথা।’ বলল বেগম হাজী আবদুল্লাহ।

বেগম হাজী আবদুল্লাহর কথা শেষ হবার আগেই কলিংবেল বেজে উঠেছিল। কথা শেষ করে উঠে দাঁড়িয়ে বেগম হাজী আবদুল্লাহ বলল, ‘নিশ্চয় মেহমানরা কেউ এসেছে। দেখছি আমি। আহমদ মুসা তুমি বস।’

আহমদ মুসাও উঠে দাঁড়িয়েছিল।

বেগম হাজী আবদুল্লাহর কথার উত্তরে আহমদ মুসা বলল, ‘না আম্মা আপনি বসুন। সম্ভবত শাহবানুরা এসেছে।’

ইতিমধ্যেই হাজী আবদুল্লাহ উঠে দাঁড়িয়েছিল। হাত উঁচু করে আহমদ মুসাকে থামতে ইঙ্গিত করে বলল, ‘জনাব আহমদ মুসা, আপনি আমাদের অসীম সম্মানের দুর্লভ মেহমান। বয়সে বড় হওয়ার সুবাদে আপনার মহত্ত্বের সুবাদে আমরা অনুচিত সুযোগ আপনার কাছে নিচ্ছি। তাই বলে আমাদের মেহমানদের দরজা খুলে দেয়ার এবং তাদের স্বাগত জানানোর দায়িত্ব আপনাকে নিতে হবে, এতটা বেআদব হওয়া আমাদের ঠিক নয়।’ গম্ভীর কণ্ঠ হাজী আবদুল্লাহর।

কথা শেষ না করেই উত্তরের অপেক্ষা না করে বড় বড় পা ফেলে দরজার দিকে হাঁটতে লাগল হাজী আবদুল্লাহ।

কিন্তু উত্তর আহমদ মুসা দিলই। বলল বেগম হাজী আবদুল্লাহকে লক্ষ্য করে, ‘আম্মাজী একেবারে ‘তুমি’ থেকে ‘আপনি’, আর সন্তানের আসন থেকে একেবারে মাথায় তুলে বসানো, এটা কি হলো?’

গম্ভীর হয়ে উঠেছে বেগম হাজী আবদুল্লাহও। বলল, ‘ঠিকই বলেছেন উনি। তোমার সহজ-সারল্য, অন্যকে বড় করে দেখার, অন্যকে সম্মান দেয়ার

তোমার সার্বক্ষণিক আচরণের কারণে আমরা ভুলে যাই যে, তুমি দুর্লভ এক মানুষ, এক মহাসম্মানের মেহমান তুমি আমাদের, যার সামনে আমাদের সংযত, সপ্রতিভ ব্যবহার কাম্য। তুমি আমাদের মাফ কর আহমদ মুসা।' আবেগে ভারী কণ্ঠ বেগম আবদুল্লাহর।

আহমদ মুসা ধপ করে বসে পড়ল তার সোফায়। তারও মুখে গাম্ভীর্য নেমে এসেছে।

হাজী আবদুল্লাহ মেহমানদের নিয়ে প্রবেশ করল ড্রইংরুমে।

এসেছে মিসেস বিবি মাধব সুষমার মা, সুষমা রাও, আহমদ শাহ আলমগীর, তার মা সাহারা বানু ও বোন শাহবানু এবং তারিক মুসা মোপলা।

আহমদ মুসা এবং বেগম আবদুল্লাহ উঠে দাঁড়াল। হাসি মুখে স্বাগত জানাল মেহমানদের।

আহমদ শাহ আলমগীর, সুষমা, শাহবানু এবং তারিক মুসা মোপলা বেগম হাজী আবদুল্লাহকে পা ছুঁয়ে সালাম করল।

বেগম আবদুল্লাহ তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করে বলল, আমাকে নয় আগে সালাম করতে হতো আহমদ মুসাকে। তার সামনে আমাদেরকে আগে সম্মান দেখানো অপরাধ না হলেও অসৌজন্যমূলক।'

'স্যরি খালাম্মা। ঠিক বলেছেন আপনি। আমরা তাকে সালাম করছি। কিন্তু উনি পা ছুঁয়ে সালাম করতে দেন না।'

বলে আহমদ শাহ আলমগীর এগোলো আহমদ মুসার দিকে।

লম্বা চুল, দাড়ি, গোঁফ কেটে আহমদ শাহ আলমগীর নতুন মানুষ হয়েছে। দেহে দূর্বলতা থাকলেও চোখে-মুখে আগের সেই ক্লান্তি আর নেই। রক্তিম সাদা চেহারায় ঔজ্জ্বল্য ফিরে এসেছে। বাইশ-তেইশ বছরের সুদর্শন, টগবগে যুবকের চেহারা তার পুরোপুরি ফিরে এসেছে। তাকে মোগলদের একমাত্র প্রতিকৃতি হিসেবে খুবই উপযুক্ত মনে হচ্ছে।

আহমদ শাহ আলমগীরের সাথে তারিক মুসা মোপলা, সুষমা-শাহবানুরাও এগুচ্ছিল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা সোফায় বসে পড়ল। বলল, 'এসো সবাই আমার পা ছুঁয়ে সালাম করো। দু'একটা ফুলও পায়ের কাছে রাখতে পার। ভগবানরা নাকি অবতার হয়ে মাঝে মাঝে দুনিয়াতে আসেন মানুষের ত্রাতা হয়ে। আমি সেরকমই একজন অবতার কিনা!' গম্ভীর, ভারী কণ্ঠ আহমদ মুসার।

সুস্মিতা বালাজী, ড্যানিশ দেবানন্দ, সুরুপা সিংহাল এবং সাজনা সিংহালকে নিয়ে হাজী আবদুল্লাহও এসে দাঁড়িয়েছিল। তারাও শুনল কথাগুলো।

বেগম আবদুল্লাহ, সুষমার মা, সাহারা বানু সবাই উঠে দাঁড়িয়েছিল তাদের স্বাগত জানানোর জন্যে।

সুষমার মা মিসেস বিবি মাধব গিয়ে সুস্মিতা বালাজী ও সুরুপা সিংহালকে এক সাথে জড়িয়ে ধরল। সুস্মিতা বালাজী এসে সুষমা রাও শাহবানুকে জড়িয়ে ধরল এক সাথে।

আহমদ মুসার কথা শুনে থমকে দাঁড়িয়েছিল আহমদ শাহ আলমগীর ও তারিক মুসা মোপলা। আহমদ মুসার এমন কণ্ঠ, এমন কথা তারা কখনও শোনেনি। তারা ভেবেছিল বেগম আবদুল্লাহর কথায় আহমদ মুসা হাসবে এবং তার পা ছুঁতে গেলে আহমদ শাহ আলমগীরদের ধমকাবে। কিন্তু তার বদলে আহমদ মুসাকে অভিমান-ক্ষুব্ধ হতে দেখে আহমদ শাহ আলমগীর অবাক হয়েছে। তারা এই অবস্থাতেই গিয়ে পা ছুঁয়ে সালাম করল সুস্মিতা বালাজী এবং ড্যানিশ দেবানন্দকে।

সুস্মিতা বালাজী আহমদ শাহ আলমগীর ও তারিক মুসা মোপলার মাথায় হাত বুলিয়ে আহমদ মুসার দিকে কয়েক ধাপ এগিয়ে বলল, 'ছোট ভাই, আমরা অবিশ্বাস করার মত এমন কথা, আমরা ভয় পাবার মত এমন ক্ষুব্ধ কণ্ঠ তো আপনার কখনো শুনিনি? কি ব্যাপার ছোট ভাই, অবতার হওয়ার প্রশ্ন উঠল কেন?'

সুস্মিতা বালাজী থামতেই সুষমার মা মিসেস বিবি মাধব বলে উঠল, 'আরও কথা আছে সুস্মিতা। আমরা এসে কিন্তু এদের ঠোটে হাসি দেখেছি, কিন্তু চোখের দৃষ্টি ও মুখের চেহারায় কিন্তু হাসি দেখিনি। যেন বিব্রতকর কিছুর মাঝে আমরা এসে পড়েছি।'

মিসেস বিবি মাধব থামতেই শব্দ করে হেসে উঠল বেগম আবদুল্লাহ বলল, 'না বিব্রতকর কিছু ঘটেনি। ঘটেছে মজার কিছু।'

কথা শেষ করেই বেগম আবদুল্লাহ তাকাল হাজী আবদুল্লাহর দিকে। বলল বলে দাও আহমদ মুসাকে তুমি কি বলেছিলে?'

হাজী আবদুল্লাহ তাকাল আহমদ মুসার দিকে। তার মুখে স্নেহসিক্ত হাসি এবং চোখে সম্ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টি। বলল, 'তোমাকে জিজ্ঞাসা করছেন ওঁরা, তুমিই বল হাসনা।'

'ব্যাপারটা ঘটেছে মেহমানদের স্বাগত জানানোর বিষয় নিয়ে।' বেগম আবদুল্লাহ আহমদ মুসাকে হাজী সাহেব কি বলেছিল, আহমদ মুসা কি বলেছিল, বেগম আবদুল্লাহ কি বলেছিল সব তাদের জানিয়ে বলল, 'আসলে আহমদ মুসা সব সময়ই ব্যক্তি আহমদ মুসাকে বড় করে তুলে ধরার ঘোর বিরোধী।'

'এটাই আহমদ মুসা। বড়দের প্রতি, গুরুজনদের সাথে আহমদ মুসা এই ব্যবহারই করেন।' বলল সাহারা বানু।

'যার যে মর্যাদা সেটা তাকে দেয়া এবং যার যে সম্মান সেটা পাওয়াই তো স্বাভাবিক। গুণের স্বীকৃতি দেয়া তো অন্যায় নয় ছোট ভাই।' আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল সুস্মিতা বালাজি। সুস্মিতা বালাজীর শান্ত ও ভারী কণ্ঠস্বর।

আহমদ মুসা সোফায় সোজা হয়ে বসল।

তার ঠোঁটে হাসির অস্পষ্ট একটা ধারা ফুটে উঠল। বলল, 'সম্মান ও মর্যাদার পেছনে থাকে কারও কোন মহৎ চিন্তা বা কাজ। এই কাজ ও আদর্শের স্বীকৃতি, অনুসরণ স্বাভাবিক। অস্বাভাবিক, অসমিচীন হলো ব্যক্তিকে বড় করে তোলা। এই বড় করে তোলাটা ব্যক্তি-পুজা পর্যন্তও পৌছতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্রের কাজ আদর্শ আজ হারিয়ে গেছে। পূজা পায় এখন ব্যক্তি রামচন্দ্র, ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ। ইসলাম একে সমর্থন করে না, ইসলাম এর বিরুদ্ধে। আমাদের নবী মুহাম্মদ স. ছিলেন আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ, আল্লাহর বার্তাবাহক। মানুষের জন্যে মডেল জীবন তাঁর। তিনি শ্রেষ্ঠ মানুষ। কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে তিনি ছিলেন সকলের মত একজন মাটির মানুষ। নবী হওয়ার পরেও তিনি জীবিকার জন্যে পারিশ্রমিক নিয়ে ইহুদীকে পানি তোলার কাজ করে দিয়েছেন। সকলের সাথে পাতার

বিছানায় শুয়েছেন, শুকনো রুটি খেয়েছেন। তাকে আসতে দেখে বসে থাকা কাউকে উঠে দাঁড়াতে তিনি নিষেধ করেছেন। তার জন্যে সবার চেয়ে আলাদা কোন ব্যবহারের অনুমতি ছিল না। এভাবে আমাদের নবী স্বয়ং ব্যক্তি-মানুষকে বড় করে তোলার কোন রসম-রেওয়াজ গড়ে উঠতে দেননি এবং তিনি এই ধরনের মানসিকতার মূলোচ্ছেদ করেছেন। আমার কথা এখানেই। আমাদের রসূল স. ব্যক্তি বন্দনার মূলোচ্ছেদ করেছেন। সুতরাং আমাদের উচিত তাকে অনুসরণ করা।'

থামল আহমদ মুসা।

সবাই নিরব।

নিরবতা ভাঙল সেই সুস্মিতা বালাজীই। বলল, 'আল্লাহর রসূলের দৃষ্টান্ত দেয়ার পর আর কিছু বলার থাকে না। কিন্তু তাঁর কাজকে এত সম্মান, স্বীকৃতি দেয়া হলে ব্যক্তি এতটা নিষিদ্ধ হবে কেন? কাজ তো ব্যক্তিরই। তাছাড়া ব্যক্তি হলে, তার কাজও বড় হয়ে যেতে পারে। ব্যক্তির স্মরণ তার কাজকে সামনে আনতে পারে।'

'কাজের স্মরণ ব্যক্তির স্মরণও সামনে এনে দেয়। এতটুকুই যথেষ্ট। কিন্তু ব্যক্তির সামনে না হওয়াই ভাল।' আহমদ মুসা বলল।

'ইসলাম এই ব্যাপারে এত কঠোর কেন?' বলল সুস্মিতা বালাজিই।

'কঠোর এই কারণে যিশুর মত আর কাউকে যেন ঈশ্বর-পুত্র না বানানো হয়, রামচন্দ্রের মত আর যেন কেউ ভগবান না হন। ব্যক্তি-বন্দনা সংশিস্নষ্ট ব্যক্তির চরিত্র নষ্ট করে এবং তার প্রতিভার ক্ষতি করে। অন্যদিকে মানুষকেও অন্ধ ব্যক্তিকেন্দ্রীক করে দেয়। তখন মানুষ তার মূর্তি তৈরিতে যতটা অগ্রণী হয়, তার কাজ ও আদর্শের অনুসরণে ততটাই পিছিয়ে যায়।' আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ আহমদ মুসা। সবার তরফ থেকে ধন্যবাদ তোমাকে। বুঝতে পেরেছি, আমরা। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি যে, তিনি এই বোঝার সুযোগ আমাদের করে দিয়েছেন।' বলল হাজী আবদুল্লাহ। তার কণ্ঠ শ্রদ্ধাসিক্ত, নরম।

কিছু বলার জন্য মুখ খুলেছিল আহমদ শাহ আলমগীর।

আহমদ মুসা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, ‘এই বিষয়ে আর কোন কথা নয়। আমি একটা নতুন বিষয় এখানে উত্থাপন করতে চাই।’

বলে আহমদ মুসা থামল। হাসি মুখে তাকাল এক এক করে আহমদ শাহ আলমগীর, সুষমা রাও, শাহবানু এবং তারিক মুসা মোপলার দিকে।

হঠাৎ করে আহমদ মুসার এই দৃষ্টির কবলে পড়ে তারা চারজনই সংকুচিত হয়ে পড়ল। লাল হয়ে গেল সুষমা রাও ও শাহবানুর মুখ।

সবশেষে তাকাল আহমদ মুসা মিসেস বিবি মাধবের দিকে। বলল, ‘খালাম্মা আমি উত্থাপন করতে পারি?’

উজ্জ্বল হাসিতে ভরে উঠল সুষমার মা মিসেস বিবি মাধবের মুখ। বলল, ‘বেটা বুঝেছি আমি ইংগিত। এ অনুমতি আমার দেয়া আছে বেটা।’

‘ধন্যবাদ খালাম্মা।’ বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘মুহতারাম হাজী আবদুল্লাহ চাচাজীকে ধন্যবাদ। তার দাওয়াতে আমরা একত্রিত হবার সুযোগ পেয়েছি। এই দাওয়াতে আন্দামানের নতুন গভর্নর বিচারপতি বিশ্বনাথ রাও এবং দিল্লী থেকে সিবিআই প্রধানও আসছেন। আমি প্রস্তাব করছি, এই মহৎ অনুষ্ঠানে আহমদ শাহ আলমগীর-সুষমা এবং তারিক-শাহবানু ‘আকদ’ সম্পন্ন করা হোক।’ থামল আহমদ মুসা।

একটু নিরবতা।

আহমদ শাহ আলমগীর ও তারিক মুসা মোপলার চোখে-মুখে আকস্মিকতা সূচক বিস্ময়ভাব। সুষমা ও শাহবানুর মুখ নিচু। আর সুস্মিতা বালাজী, সুরূপা ও সাজনা সিংহালের চোখে-মুখে আনন্দ উপচে পড়ছে। সাহারা বানু ও মিসেস বিবি মাধব দু’জনেই গম্ভীর, মুখে প্রসন্ন ভাব।

প্রথমে নিরবতা ভাঙল বিবি মাধব। বলল, ‘বেটা আহমদ মুসা এই প্রস্তাব উত্থাপন করবে, আমি সেটা সুষমাদের দিকে তাকানো দেখেই বুঝেছি। আমি অনুমতিও দিয়েছি। আহমদ মুসাকে ধন্যবাদ যে, ভাই-বোনদের কথা সে এতটা মনে রাখে।’

মুহূর্তকালের জন্য থামল মিসেস বিবি মাধব। মুহূর্তের জন্যে মুখটা নিচু করেছিল। আবার মুখ তুলল। ভারী, গম্ভীর মুখে বলল, ‘সবাই জানেন আমার

স্বামী সুষমার বাবা বালাজী বাজিরাও মাধব এখন সরকারি কাষ্টডিতে এবং দিল্লীতে। এ ধরনের অনুষ্ঠানে পিতার হাজির থাকার কথা। সে সুযোগ নেই। কিন্তু বিষয়টি তাকে জানিয়ে আমি অনুমতি নিয়েছি। তাঁকে নেয়ার আগে সিবিআই আমাকে সুযোগ দিয়েছিল তাঁর সাথে একান্তে কথা বলার। আমি সে সময় আহমদ শাহ আলমগীরের সাথে সুষমার বিয়ে কথা তুলেছিলাম। তিনি অনুমতি দিয়েছেন। সুতরাং তিনি না থাকলেও তাঁর অনুমতি আমাদের সাথে আছে।' থামল মিসেস বিবি মাধব। তার শেষের কথা কান্নায় রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

সুষমা গিয়ে জড়িয়ে ধরল তার মাকে। কান্নায় ভেঙে পড়ল সুষমাও।

সাহারা বানু উঠে গিয়ে সুষমার মাথায় হাত বুলিয়ে মিসেস বিবি মাধবের কাঁধে হাত রাখল। বেগম আবদুল্লাহ গিয়ে মিসেস বিবি মাধবের পাশে বসল। তার একটি হাত তুলে নিল হাতে। বলল, 'মিসেস মাধব আমরা গর্বিত। আমাদের ভারতবাসী সকলের জন্যে আপনারা একটি মহৎ দৃষ্টান্ত।'

মিসেস মাধব চোখ মুছে বলল, 'স্যরি বেগম আবদুল্লাহ, স্যরি বোন সাহারা, স্যরি এভরিবডি।' তারপর সুষমাকে কোলে টেনে নিল এবং আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বেটা আহমদ মুসা, তুমি 'আকদ' এর আয়োজন কর। সুষমার বিয়েও মুসলমানী মতেই হবে। ভালোই হবে, গভর্নর বিচারপতি রাও থাকবেন। আমরা একই বংশের।'

এরই মধ্যে গভর্নর বিচারপতি বিশ্বনাথ রাও এবং দিল্লী থেকে আসা সিবিআই চীফ ব্রিগেডিয়ার যশোবন্ত যশোরাজকে রিসিভ করার জন্য হাজী আবদুল্লাহ বাইরে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে মেহমানদের সাথে নিয়ে ড্রইংরুমে প্রবেশ করলেন।

ড্রইংরুমে ঢুকেই গভর্নর বিচারপতি বিশ্বনাথ রাও এগিয়ে গেল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

গভর্নর বিচারপতি বিশ্বনাথ রাও হাত বাড়িয়ে দিল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা হ্যান্ডশেক করে বলল, 'ওয়েলকাম স্যার। আবার আপনার সাথে দেখা হওয়ার সৌভাগ্য হবে ভাবিনি।'

‘সৌভাগ্য আমার আহমদ মুসা। আমাদের দেখা যে কেউ পেতে পারে, কিন্তু আপনার দেখা পাওয়া দুর্লভ ব্যাপার। সেদিন আপনার সাথে আলোচনা আমার জীবনের স্মরণীয় ঘটনা।’ বলে গভর্নর বিচারপতি বিশ্বনাথ রাও পাশে এসে দাঁড়ানো সিবিআই চীফ যশোবন্ত যশোরাজকে আহমদ মুসার সাথে পরিচয় করিয়ে দিল।

আহমদ মুসা দ্রুত হাত বাড়িয়ে বলল, ‘কনগ্রাচুলেশন স্যার, সিবিআই একটা ঐতিহাসিক কাজ করেছে। ভারতের মানুষ চিরদিন মনে রাখবে এটা।’

সিবিআই প্রধান যশোবন্ত যশোরাজ আহমদ মুসার সাথে হ্যান্ডশেক করে বলল, ‘না মি. আহমদ মুসা, কনগ্রাচুলেশন আপনার প্রাপ্য। আমি দিল্লী থেকে আপনাকে অভিনন্দন জানাবার জন্যই এসেছি। আপনি জানেন না, সিবিআই একবার এসে বিভ্রান্ত ও ব্যর্থ হয়ে ফিরে গিয়েছিল। এবার আসলে আপনি সব কাজ করেছেন, সিবিআই শেষ মুহূর্তে আপনাকে সাহায্য করেছে মাত্র।’

‘ধন্যবাদ স্যার।’ বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই হাজী আবদুল্লাহ এগিয়ে এসে গভর্নর বিচারপতি রাও ও সিবিআই চীফকে একটা নির্দিষ্ট সোফা দেখিয়ে বলল, ‘স্যাররা বসুন।’

তারা গিয়ে বসল। সিবিআই চীফ আহমদ মুসাকে টেনে নিয়ে তার পাশে বসাল।

সবাই বসলে উঠে দাঁড়াল হাজী আবদুল্লাহ। সকলকে উদ্দেশ্য করে বলল, ‘ভদ্র মহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ! আমরা দুজন সম্মানিত মেহমানের অপেক্ষা করছিলাম। গভর্নর বিচারপতি বিশ্বনাথ রাও এবং সিবিআই চীফ মি. যশোবন্ত যশোরাজ এসেছেন। আমরা মেহমানদ্বয়কে আমাদের মাঝে স্বাগত জানাচ্ছি। লাঞ্চের পর আমাদের একটা প্রোগ্রাম আছে। লাঞ্চে যাওয়ার আগে এ বিষয়ে কিছু বলবেন মিসস বিবি মাধব।’

কথা শেষ করেই মিসেস বিবি মাধবের দিকে তাকিয়ে অনুরোধ করলেন তাকে বলার জন্যে।

উঠে দাঁড়াল মিসেস বিবি মাধব। বলল, 'সম্মানিত মেহমানদ্বয় এবং ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আসন্ন লাঞ্চের পর আমার মেয়ে সুষমা রাওয়ের সাথে আহমদ শাহ আলমগীর এবং আহমদ শাহ আলমগীরের বোন শাহবানুর সাথে আন্দামানের বাসিন্দ, এখন লন্ডন প্রবাসী তারিক মুসা মোপলার 'আকদ' এর অনুষ্ঠান হবে। সম্মানিত মেহমানদ্বয়সহ সকলকে উক্ত অনুষ্ঠানে শরীক হবার জন্যে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।'

মিসেস বিবি মাধবের কথা শেষ হতেই গভর্নর বিচারপতি বিশ্বনাথ রাও এবং সিবিআই চীফ যশোবন্ত যশোরাজ মৃদু হাততালির সাথে সাথে এক সংগে বলে উঠল, 'শুভ সংবাদ সুস্বাগত, শুভ সংবাদ সুস্বাগত।'

তাদের সাথে সাথে সবাই হাততালি দিয়ে উঠল।

মিসেস বিবি মাধব আবার উঠে দাঁড়াল এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানাল।

হাজী আবদুল্লাহ উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আমরা এখন লাঞ্চে......।'

সিবিআই চীফ যশোবন্ত যশোরাজ হাত তুলল হাজী আবদুল্লাহর উদ্দেশ্যে। হাজী আবদুল্লাহ মাঝখানে থেমে গেল।

উঠে দাঁড়াল যশোবন্ত যশোরাজ। বলল, 'আমি দুঃখিত মাঝখানে কথা বলার জন্যে। আমরা লাঞ্চের পর যেহেতু আরেকটা বড় অনুষ্ঠানে জড়িয়ে পড়ব, এজন্যে লাঞ্চের আগেই ভারত সরকারের একটা ঘোষণা আমরা সবাইকে জানাতে চাই। ঘোষণাটি আহমদ মুসার বিষয়ে। আজ প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেছেন, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অতি মূল্যবান সহযোগিতা দেয়ার জন্যে আহমদ মুসাকে 'ভারত মহাপদ্ম' পদক এবং পাঁচ লাখ ডলার পুরস্কার দেয়া হয়েছে।' আপনারা জানেন 'ভারত মহাপদ্ম পদক' বিদেশীদের জন্যে ভারতের সর্বোচ্চ সম্মাননা। আমি আপনাদের আনন্দের সাথে জানাতে চাই, গত কয়েকদিনে 'ব্ল্যাক আর্মি' বা 'শিবাজী সন্তান সেনা' ও 'মহাসংঘ' নামক সন্ত্রাসী সংগঠনের তৃতীয় পর্যায়ের নেতা সকলেই ধরা পড়েছে। এ কাজে সাবেক গভর্নর বিবি মাধব আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা দিয়েছেন। একটা ঘটনা তাকে সবচেয়ে বেশি বদলে দিয়েছে। সেটা হলো, কন্যা সুষমা রাওয়ের প্রতি তাঁর অবিচার। তিনি বলেছেন,

যে মত বা মতাদর্শ নিজের মেয়ের ব্যাপারেও এমন অন্ধ করে দেয়, তা অবশ্যই কল্যাণের নয়, ধ্বংসের।’ থামল যশোবন্ত যশোরাজ।

আহমদ মুসা সম্পর্কিত ঘোষণা শুনেই যশোবন্ত যশোরাজের কথার মাঝখানেই সবাই হাততালি দিয়ে উঠেছিল। এবার সকলে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে মোবারকবাদ দিতে শুরু করল। আহমদ শাহ আলমগীর ও তারিক মুসা মোপলা তাকে জড়িয়ে ধরল আনন্দে।

ধন্যবাদের উত্তর দেয়ার জন্যে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা। বলল, ‘পদক মানুষকে দেয়া হয় না, তার কাজকে দেয়া হয়। আমার কাজ ছিল আন্দামানের মজলুম মানুষের জন্যে। আমি পুরুষ্কারের অর্থ পেলে আন্দামানের মজলুমদের স্মরণে এমন একটি মিনার তৈরিতে এ টাকা খরচ করব, যে মিনার আন্দামানের চারদিকের গোটা সাগর এলাকা থেকে দেখা যাবে।’ যে মিনারে আলোর অক্ষরে লেখা থাকবে বৃটিশ কারাগারে মৃত মওলানা ফজলে হোক খয়রাবাদী, মওলানা ইয়াহিয়া আলী, মৌলভী আহমাদুল্লাহ, শহীদ শেরআলীসহ সবার নাম। এতে আরও থাকবে গাজী গোলাম কাদের ওরফে গোপী কিষন, গঙ্গারামসহ এ যুগের সব শহীদের নামও। নামগুলো আলো ছড়াবে গোটা আন্দামান ও চারদিকের সাগরে। এটা হবে ভারতের সংগ্রামী নতুন প্রজন্মের অনুপ্রেরণার উৎস।’

তালি বাজানো আগেই শুরু হয়েছিল গভর্নর বিচারপতি রাও ও সিবিআই চীফ যশোবন্ত যশোরাজ। আহমদ মুসার কথা শেষ হলে গোটা হল সকলের সম্মিলিত তালির শব্দে গম গম করে উঠল।

‘আপনার এই মহৎকাজে আমাদের সকল সহযোগিতা আপনি পাবেন।’ বলল গভর্নর বিচারপতি রাও।

হাজী আবদুল্লাহ দাঁড়িয়েছিল। কিছু বলার জন্য মুখ খুলেছিল, কিন্তু তার আগেই মিসেস বিবি মাধব বলল, একটা কৌতুহল। মহাসংঘে’র প্রধান লক্ষ্য ছিল একটা বাক্স উদ্ধার। এ রহস্যের কোন সমাধান হয়েছে?’

গভর্নর বিচারপতি রাও তাকাল সিবিআই চীফ যশোবন্ত যশোরাজের দিকে।

‘অল রাইট স্যার, আমি বলছি।’ বলে সিবিআই চীফ তাকাল মিসেস বিবি মাধবের দিকে। বলল, ‘জি ম্যাডাম, বাক্সটি বাস্তব। ঐতিহাসিক বাক্সটি বেরিয়েছে আহমদ শাহ আলমগীরের বাসা থেকেই। কিন্তু বাক্সের খবর আহমদ শাহ আলমগীর কিংবা তার পরিবারের কেউ জানতো না। আহমদ শাহ আলমগীরের পরিবারের অনুরোধে বাক্স রহস্যটির শেষ দেখার জন্যে আহমদ মুসা ও সিবিআই এর লোকরা এক সাথে বাক্সটি খুঁজতে শুরু করে। বাড়ির প্রতিটি জিনিস ও জায়গা অনুসন্ধানসহ সম্ভাব্য স্থানগুলো খুঁড়েও দেখা হয়, কিন্তু কিছুই পাওয়া যায় না। অবশেষে আহমদ মুসাই পিতলের প্লেটে আঁকা বাড়ির স্কেচে একটা ধাঁধাঁ খুঁজে পান। ধাঁধাঁটির রহস্যভেদ করেন আহমদ মুসা এবং ধাঁধাঁর সংকেত অনুসরণ করেই বাড়ির মাষ্টার বেডের প্রধান দরজার বটম চৌকাঠের তিন ফুট মাটির নিচে বাক্সটি উদ্ধার হয়।’ একটু থামল যশোবন্ত যশোরাজ।

থামতেই কয়েকজনের তরফ থেকে একই প্রশ্ন ছুটে এল, ‘কি পাওয়া গেল বাক্সতে?’

‘মহাসংঘ যা বলেছিল সেগুলোই। একটা পেপার ডকুমেন্ট, একটা নক্সা। মহাংসঘের মতে পেপার ডকুমেন্টটা জাতির উদ্দেশ্যে শিবাজীর একটা উইল। কিন্তু পেপার ডকুমেন্টে একটা শব্দও অক্ষত পাওয়া যায়নি। দলিলের একটা সীল অক্ষত পাওয়া গেছে। বিশেষজ্ঞরা সীলটিকে শিবাজীর ব্যক্তিগত সীল বলে চিহ্নিত করেছেন। আর নক্সাটি মোগল সম্রাটদের গুপ্ত ধনভান্ডারের।’ বলল যশোবন্ত যশোরাজ।

‘নক্সাটি যে মোগল গুপ্ত ধনভান্ডারেরই এটা কি নিশ্চিত?’ বলল সুরূপা সিংহাল।

হাসল সিবিআই প্রধান যশোবন্ত যশোরাজ। বলল, ‘নক্সা অনুসরণে আজ গুপ্তধন উদ্ধার করা হয়েছে। আগামীকালের পত্রিকা এবং টিভি নেটওয়ার্কে খবরটা আপনারা পেয়ে যাবেন।’

গুপ্তধন উদ্ধারের খবরে গোটা হলে একটা গুঞ্জন উঠল। সাজনা সিংহাল বলে উঠল, ‘এ গুপ্ত ধনের মালিক কি সরকার, না মোগলদের বংশধর আহমদ শাহ আলমগীর?’

গাম্ভীর্য নেমে এল যশোবন্ত যশোরাজের মুখে। 'চলমান বিধান অনুসারে সব গুপ্তধনের মালিক জাতি, মানে সরকার। কিন্তু এক্ষেত্রে এই জাতীয় নীতি অনুসরণ করা হয়নি। গুপ্তধনের নক্সার সাথে শেষ মোগল সম্রাটের উইল ছিল। উইলে বলা হয়েছে, যখন গুপ্তধন উদ্ধার হবে, তখন অবস্থা যাই হোক, গুপ্তধনের দুই তৃতীয়াংশ পাবে ভারতের জনগণ অর্থাৎ দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত সরকার। অবশিষ্ট অংশের দুই তৃতীয়াংশ নিয়ে মুসলিম ছাত্রদের বিজ্ঞান ও ধর্মশিক্ষার জন্যে একটা ফান্ড গঠিত হবে এবং গুপ্তধনের সর্বশেষ অংশ যার কাছে গচ্ছিত অবস্থা থেকে নক্সা পাওয়া যাবে তিনি পাবেন। ভারত সরকার উইলের ইচ্ছা গ্রহণ করেছেন। তবে মোগল পরিবারের সদস্যগণ, আহমদ শাহ আলমগীর, সাহারা বানু এবং শাহবানু গুপ্তধনের অর্থ গ্রহণ না করে তা মুসলিম ছাত্রদের ধর্ম ও বিজ্ঞান শিক্ষা তহবিলের সাথে যুক্ত করতে বলেছেন। এটাও ভারত সরকার মেনে নিয়েছেন। এর পরই গুপ্ত ধনভান্ডার উদ্ধার করা হয়।'

যশোবন্ত যশোরাজের কথার মাঝখান থেকেই সমগ্র হলরুমে আনন্দ ধ্বনি শুরু হয়েছিল। যশোবন্ত যশোরাজ থামলে হাততালিতে ভরে গেল হল।

হাততালির মধ্যেই সাজনা সিংহাল প্রশ্ন করল, 'স্যার, শিবাজীর পেপার ডুকুমেন্টে সীল ঠিক থাকলেও দলিলের লেখা অক্ষত পাওয়া গেল না কেন?'

'এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের ব্যাখ্যা নেয়া হয়েছে। তারা বলেছিল, লেখার কালি যেসব উপাদান দিয়ে তৈরি হয়েছিল, দীর্ঘ সময়ে সেসবের বিক্রিয়ার ফলেই চামড়ার কাগজ নষ্ট হয়ে গেছে। আর সীলের কালি ছিল ভিন্ন। আর গুপ্তধনের নক্সা ছিল পাতলা গোল্ড প্লেটের উপর খোদাই করা।' থামল যশোবন্ত যশোরাজ।

হাজী আবদুল্লাহ উঠে দাঁড়াল সংগে সংগেই। বলল, 'সিবিআই প্রধানকে ধন্যবাদ। তিনি আমাদের প্রত্যাশিত জিজ্ঞাসার জবাব দিয়েছেন। আরও জিজ্ঞাসা থাকতে পারে, তবে আর সময় নেয়া ঠিক হবে না। আমি সকলকে লাঞ্চের জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।'

বলে হাজী আবদুল্লাহ গভর্নর বিচারপতি রাও এবং যশোবন্ত যশোরাজকে সাথে নিয়ে টেবিলের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। অন্যদিকে বেগম আবদুল্লাহ মেয়েদের নিয়ে চললেন।

তখন বিকেল।

রোদের রং ফিকে হয়ে এসেছে।

সূর্য ডুবতে ঘণ্টা খানেকের বেশি বাকি নেই।

হাজী আবদুল্লাহর 'সী ভিউ ড্রইং রুম।' ডাইনিং রুমের উত্তর পাশের এ ড্রইং রুমটি প্রাইভেট, শুধু ফ্যামেলি ব্যহারের জন্য। সাগরের দিকে এগিয়ে তৈরি এ ড্রইং রুমটি। এর তিন দিকেই সাগর। ড্রইং রুমের সোফাগুলো কাঁচের দেয়ালকে সামনে রেখে এমনভাবে সাজানো যে সবাই তার সামনে সাগর দেখতে পাবে।

এ ড্রইংরুম থেকেও একটা সিঁড়ি নেমে গেছে সাগরে। এ সিঁড়ির গোড়াতেও একটা সুন্দর বোট বেঁধে রাখা।

আহমদ মুসা কাঁচের দেয়ালের ধার ঘেঁষে একটা সোফায় বসেছিল। তার সামনে কাঁচের একটা লম্বা টি টেবিল। বাঁ দিকে কাঁচের দেয়ালে দেখা যাচ্ছে আন্দামান সাগর। আহমদ মুসার সামনে টি টেবিলের উপর রাখা আছে একটা সুন্দর দূরবীন।

আহমদ মুসার ডান দিকে টি টেবিলকে সামনে রেখে বসেছে ড্যানিশ দেবানন্দ।

ড্রইংরুমের টেবিলগুলোতে বিকেলের নাস্তা এনে সাজানো হচ্ছে। অন্যরা কেউ এখনও আসেনি।

সবাই টায়ার্ড ছিল।

বিয়ের সব অনুষ্ঠান শেষ হতে বিকেল ৩টা বেজে যায়। তারপর সবাই রেষ্টে গেছে। বিয়ে অনুষ্ঠানের পর গভর্নর বিচারপতি বিশ্বনাথ রাও এবং সিবিআই প্রধান যশোরাজ চলে গেছে। দুই নব দম্পতিসহ অন্যরা সবাই এ বাড়িতেই রেষ্ট নিচ্ছে।

‘আন্দামানের ঘটনার সুন্দর সমাধান হলো। দুই দম্পতির মিলন ঘটল। ছোট ভাই সাহেব আপনি জীবনে এমন ঘটনার মুখোমুখি বহু হয়েছেন কিন্তু আজকের ঘটনার কি কোন বিশেষ দিক আপনার হৃদয়ে রেখাপাত করেছে?’ বলল ড্যানিশ দেবানন্দ।

‘ভাই সাহেব, আজকের ঘটনার বিশেষ দিক হলো, আন্দামানের গভর্নর এবং ভারতীয় সিবিআই চীফের উপস্থিতি। এমন পূর্ণ রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য এইভাবে খুব কম পেয়েছি। এজন্যে ভারত সরকারকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ।’

‘কিন্তু ভাইসাহেব, এক ‘মহাসংঘ’ শেষ হলো, আরেক ‘মহাসংঘ’ যদি গজায়?’ ড্যানিশ দেবানন্দ বলল।

‘যদি নয়, অবশ্যই গজাবে। তারও মোকাবিলা আপনারা এভাবে করবেন।’ বলল আহমদ মুসা।

‘তখন আহমদ মুসাকে কোথায় পাব?’ ড্যানিশ দেবানন্দ বলল।

ইতিমধ্যে প্রবেশ করেছে সুস্মিতা বালাজী, সিংহাল দম্পতি ও সাজনা সিংহাল। তাদের সাথে সাথেই এসে প্রবেশ করেছে সাহারা বানু ও মিসেস মাধব।

আহমদ মুসা সালাম দিয়ে স্বাগত জানাল সবাইকে।

আহমদ মুসার কথা ও ড্যানিশ দেবানন্দের প্রশ্ন শুনতে পেয়েছিল সুস্মিতা বালাজীরা।

সুস্মিতা বালাজী বলল, ‘ছোট ভাই মি. দেবানন্দের প্রশ্নের জবাব শুনতে আগ্রহী। বলুন।’

‘উত্তর সোজা। আর কোন আহমদ মুসা আসবে, অথবা ভারতেও তখন অনেক আহমদ মুসা তৈরি হবে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘তার মানে আপনি আর আসবেন না!’ গম্ভীর কণ্ঠ সুস্মিতা বালাজীর।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘পৃথিবীটা ওয়ান ওয়ে চলার পথ। এ পথ শুধু চলার, ফেরার নয়।’

‘পৃথিবীর জীবন পথ এবং ব্যক্তি মানুষের জীবন পথ এক নয় স্যার। ব্যক্তি মানুষ এক পথে বার বারও ঘোরা-ফেরা করে। আপনি এ সত্যটা পাশ কাটাচ্ছেন স্যার।’ বলল সাজনা সিংহাল।

‘বা! ছোট ভাইকে তো তুমি দারুণভাবে ধরেছো। চমৎকার।’ বলল সুস্মিতা বালাজী্

‘শুধু আজ নয় আপা, ছোট ভাইয়ের সাথে তর্কে-বিতর্কে সে ইউনিক।’ সুরূপা সিংহাল বলল।

‘আলোচনা ভাল, কিন্তু তর্ক-বিতর্ক কি খুব ভালো সুরূপা?’ বলল মুরুবিবয়ানার সুরে ড্যানিশ দেবানন্দ।

‘না দুলাভাই, তার তর্ক-বিতর্ক মনগড়া নয়। জানেন, আমাদের ছোট ভাই আর তার স্যার রস দ্বীপের অপারেশনে গেলে সাজনা মন্দিরে গিয়ে পূজা দিয়েছে এবং মসজিদে গিয়ে মোমবাতি ও লোবান দিয়ে এসেছে তার নিরাপদ........।’ সুরূপা সিংহালকে কথা শেষ করতে না দিয়ে সাজনা সিংহাল তার মুখ চেপে ধরল।

কিছু বলতে যাচ্ছিল আহমদ মুসা। কিন্তু বেগম আবদুল্লাহ এক হাতে সুষমা রাও, অন্য হাতে শাহবানুকে ধরে ড্রইং রুমে প্রবেশ করল। সুষমার পাশে রয়েছে আহমদ শাহ আলমগীর এবং শাহবানুর পাশে রয়েছে তারিক মুসা মোপলা।

ওরা ড্রইংরুমে ঢুকে সোজা আহমদ মুসার দিকে আসছিল।

আহমদ মুসা একটু সরে বসল।

ওদের গায়ে তখনও বিয়ের পোশাক।

আহমদ মুসা  হাসল। আহমদ মুসা আগে ‘আসসালামু আলাইকুম’ বলে ওদের স্বাগত জানাল।

‘ওয়া আলাইকুম’ বলে সুষমা রাও ও আহমদ শাহ আলমগীর এবং শাহবানু ও তারিক মুসা মোপলা দুই দম্পতিই হঠাৎ আহমদ মুসার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে তার কিছু বুঝে ওঠার আগেই তারা হাত দিয়ে আহমদ মুসার পা ছুঁয়ে সেই হাত চুম্বন করল।

তার সাথে সাথেই তারা উঠে দাঁড়াল এবং সুষমা রাও হাত জোড় করে বলল, ‘মাফ করুন ভাইয়া। আর কোন দিন সালাম করার জন্যে পায়ে হাত দেব না।’

‘আজ দেয়ার দরকার হলো কেন?’ আহমদ মুসা বলল।

‘হৃদয়ের যে সীমাহীন কৃতজ্ঞতা তা প্রকাশের জন্যে আপনার পায়ে মাথা রাখার চেয়ে উপযুক্ত কিছু পাইনি ভাইয়া।’ বলল সুষমা রাও।

আহমদ মুসা তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে। তীব্র অসন্তোষ তার চোখে-মুখে। বলল, ‘সুষমা নতুন। তার অনেক কিছু শেখার বাকি। কিন্তু আহমদ শাহ আলমগীর, তারিক, শাহবানু তোমাদের কথা কি সুষমার মতই?’

ওরা তিনজন কেউ কথা বলল না। তাদের মাথা নিচু।

আহমদ মুসাই আবার বলল, ‘তোমরা কি মনে কোন মানুষ তার নিজ শক্তিতে কোন মানুষের ভাল বা মন্দ করতে পারে?’

‘স্যরি ভাইয়া......।’ কথা কথা শেষ না করেই থেমে গেল আহমদ শাহ আলমগীর।

‘স্যার, শক্তি তো মানুষের নিজেরই।’ বলল সাজনা সিংহাল।

‘মানুষের কিছুই নয়। তার যে সত্তা সেটা তার নয়। মানুষের দেহ পরস্পর আলাদা বিলিয়ন বিলিয়ন কোষের (কণা) একত্র যোগফল। আল্লাহর আদেশের অধীন হয়ে তারা মানুষের দেহ তৈরি করেছে। কণাগুলো বিচ্ছিন্ন হলে মুহূর্তেই দেহ নামক কোন জিনিস আর চোখে পড়বে না। বল এই মানুষের নিজের কি থাকতে পারে? মানুষের ইচ্ছা, শক্তি সব কিছুই আল্লাহর তরফ থেকে অর্পিত। যদি বলতে চাও, মানুষকে অর্পণ-সূত্রে মালিক বলতে পার।’

‘ধন্যবাদ স্যার। বুঝেছি।’ বলল সাজনা সিংহাল।

‘তাহলে এটাও তোমরা বুঝবে, অর্পণ সূত্রে মালিক যে মানুষ, তাকে ধন্যবাদ দেয়া যায়, তাকে কৃতজ্ঞতা জানানো যায় এই জন্যে যে সে অর্পিত শক্তিকে মংগলের পথে ব্যায় করেছে। কিন্তু মাথা যদি নোয়াতে হয়, সিজদা যদি করতে হয়, তাহলে সেটা আল্লাহকেই করতে হবে। সুষমা তোমরা আল্লাহর যা প্রাপ্য সেটা আমাকে দিতে এসেছ।’ আহমদ মুসা বলল।

‘স্যরি ভাইয়া। আপনি আগেও এ সম্পর্কে বলেছেন। কিন্তু বিষয়টাকে এমন সিরিয়াসলি দেখিনি। আমরা একে নিছক একটা কালচার মনে করেছি। আর

ভাইয়া আমাদের আন্দামানে গুরুজনদের পা ছুঁয়ে সালাম করাটা মুসলমানদের জীবনেরও অঙ্গ হয়ে গেছে।' সুষমা বলল।

'আজকের জন্যেই এটা হয়েছে, ভবিষ্যতে আর হবে না।' বলল আহমদ শাহ আলমগীর।

আহমদ মুসা হাসল। ওদের উদ্দেশ্য করে বলল, 'যাও ভাইরা, বোনরা গিয়ে বস।'

আহমদ মুসাদের টি-টেবিলটি অনেক দীর্ঘ। এর তিন দিক ঘিরে দশটা সোফা পাতা। টেবিলে আহমদ মুসা ও ড্যানিশ দেবানন্দ ছাড়াও ওপ্রান্তে বসেছে সুস্মিতা বালাজী, সুরূপা ও সাজনা সিংহাল এবং সুরূপার স্বামী। মাঝের খালি সিটগুলোতে সুষমা ও শাহবানুরা গিয়ে বসল।

আহমদ মুসার উত্তর দিকে কাঁচের দেয়ালের গা ঘেঁষে পাতা আরেকটা টেবিলে বসে মিসেস বিবি মাধব, সাহারা বানু, বেগম আবদুল্লাহ এবং হাজী আবদুল্লাহ।

সবাই বসলে আহমদ মুসা দুদিকে তাকিয়ে বলল, 'নবীন-প্রবীণদের এই মেরুকরণ কিভাবে হলো? পরিকল্পিতভাবে, না আপনাতেই?'

'পরিকল্পিতও না, আপনাতেও নয়। তুমিই যুব-তরুণদের ওখানে টেনে নিয়েছ বেটা।' বলল মিসেস বিবি মাধব।

'তাহলে আমি আপনাদের টানতে পারলাম না কেন?' আহমদ মুসা বলল। তার মুখে হাসি।

'তুমি টেনেছ বাছা। কিন্তু প্রবীণরাই পিছিয়ে এসেছে যুব-তরুণদের সামনে রাখার জন্যে।' আবারও বলল মিসেস বিবি মাধবই।

নাস্তা পরিবেশিত হয়েছে।

নাস্তা খেতে খেতে আলোচনাও চলল।

নাস্তা হয়েছে, কিন্তু কথা-বার্তা এলোমেলোভাবে চলছেই।

কথার ফাঁকে আহমদ মুসা এক সময় টি-টেবিলের দূরবীনটি তুলে নিল। দূরবীনটি ড্যানিশ দেবানন্দের।

আহমদ মুসা দূরবীনটি চোখে লাগিয়েই বলে উঠল, 'বা! সাহেব, আপনার দূরবীনটি সাংঘাতিক পাওয়ারফুল।'

আহমদ মুসার দূরবীনের চোখ ছিল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে।

'সত্যিই চমৎকার আপনার দূরবীন। আমি আন্দামান সাগরের ওপারে থাই-মালয়েশিয়ার সীমান্তের উঁচু পাহাড়টা এবং পাত্তানীর সবুজ অরণ্য পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।' বলল আহমদ মুসা।

'টেলিস্কোপিক লেন্স-সিষ্টেমের এই দূরবীনটা সত্যিই খুব পাওয়ারফুল। দূরবীনের এটাই লেটেষ্ট জেনারেশন। ছোট ভাই দূরবীনটা আপনাকে গ্রহণ করাতে পারলে আমি খুব খুশি হবো। আমার কোন কাজে লাগে না। আপনার নানা অভিযানে নানা প্রয়োজনে দূরবীনের দরকার হয়। আপনার কাছে এর সদ্ব্যবহার হবে।' ড্যানিশ দেবানন্দ বলল।

আহমদ মুসার চোখে তখনও দূরবীন। দূরবীনের সাহায্যে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে দেখছিল। ড্যানিশ দেবানন্দের কথায় তার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'দখল করার আগে দিয়ে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ ভাই সাহেব।'

'ওটা কথার কথা হলো ছোট ভাই। আপনি জীবনে কোন কিছুর জবর দখল করেছেন?' ড্যানিশ দেবানন্দ বলল।

আহমদ মুসা কথা বলতে গিয়ে থেমে গেল। হঠাৎ অন্য কিছুর প্রতি মনোযোগ তার কথা থামিয়ে দিয়েছে। দেখা গেল সে লেন্স এডজাষ্টার ঘুরিয়ে ভিউ ক্লোজ করছে। দূরবীনের চোখ তার এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে।

আরও কিছুক্ষণ দেখে আহমদ মুসা বলল, 'মজার একটা জিনিস। আপনি দেখুন তো ভাই সাহেব।'

কথা শেষ করার সাথে সাথেই আহমদ মুসা চোখ থেকে দূরবীন সরিয়ে ড্যানিশ দেবানন্দের হাতে দিতে দিতে বলল, 'সামনেই দেখুন খেলনার মত মজার কিছু ভেসে আসছে।'

ড্যানিশ দেবানন্দ দূরবীন তার চোখে লাগাল। তার মুখে হাসি।

ইতিমধ্যে সকলের দৃষ্টিই আহমদ মুসাদের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে।

'কি ওটা স্যার?' সাজনা সিংহাল প্রশ্ন করল।

‘খেলনা নৌকা। সম্ভবত পাতার, রঙিন কাগজেরও হতে পারে। তার ছোট্ট মাস্তুলে পতাকা। পতাকাটাও মজার। আরও কি সব দেখলাম।’ বলল আহমদ মুসা।

ড্যানিশ দেবানন্দের দূরবীনের চোখ এক জায়গায় স্থির। মনোযোগ দিয়ে দেখছে সে। তার মুখে হাসি এখন নেই। গম্ভীর, ভারী হয়ে উঠেছে তার মুখ।

এক সময় সে চোখ থেকে দূরবীন সরাল। তার মুখ তখনও গম্ভীর। তার সাথে কিছুটা কৌতুহল ও উত্তেজনারও ছাপ। আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল সে, ‘ছোট ভাই, ওটা নৌকা কিন্তু নৌকা নয়। ওটা এক ধরনের এস ও এস (SOS)। চীনা-থাই প্রাচীন রীতি অনুসারে আল্লাহর কাছে চিঠি।’

‘আল্লাহর কাছে চিঠি?’ প্রশ্ন আহমদ মুসার। তার কণ্ঠে বিস্ময়।

‘হ্যাঁ ছোট ভাই, নৌকায় একটা চিঠি আছে। নৌকা ‘পবিত্র পাতা’র (Divine leaves) তৈরি। চীনা-থাই ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে সে দেশে এক প্রকারের গাছ আছে যা স্বর্গ থেকে আসা। ওর পাতাগুলো পবিত্র। পাতাগুলো হিন্দু মন্দিরে পূজার উপকরণ, বৌদ্ধ মন্দিরে বৌদ্ধের মূর্তির বেদি সাজানো হয় ঐ পাতা দিয়ে এবং এই পাতাগুলো দিয়ে মসজিদের মিম্বরের বিছানা তৈরি হয়, জায়নামাযও বানানো হয়। পাতাগুলো পানিতে পচেনা, শুকালেও ভেঙে যায় না। নৌকার ছোট মাস্তুলে একটা পতাকা দেখছেন। নীল বর্ডার দেয়া সাদা পতাকা। ওটা থাইল্যান্ডের সর্বপ্রাচীন ‘সাকোথাই’ রাজবংশের পারিবারিক পতাকা। সাকোথাই রাজবংশ এখন মংকুত বা চকরী রাজবংশ নামে থাইল্যান্ডে বর্তমান রয়েছে। অবশ্য এরা এখন ঐ পতাকা বদলেছে। সেই প্রাচীন সাকোথাই.......।’

‘কিন্তু ঐ খেলনা নৌকায় ঐ পতাকা কেন?’ ড্যানিশ দেবানন্দকে থামিয়ে তার কথার মাঝখানে বলে উঠল আহমদ মুসা।

‘সেই কথাই বলতে যাচ্ছি। পতাকার সাদা অংশে নিশ্চয় দেখছেন একটা লাল ছোপ। এটা একটা মেসেজ, এটাই এসওএস (SOS) । এই মেসেজে বলা হয়েছে, মানুষের শান্তির জীবনে আগুন লাগানো হয়েছে বা হচ্ছে কিংবা হবে। এই সংকট থেকে বাঁচার জন্যে সাহায্য চেয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে মেসেজ পাঠানো হয়েছে পবিত্র পাতার নৌকাকে বাহন সাজিয়ে। প্রাচীন বিশ্বাস হলো, আল্লাহ নিজ

কুদরতে এই মেসেজ কারও ঘাটে বা কারো হাতে পৌছে দেবেন। তাদের আরও বিশ্বাস, নৌকাটি যিনি প্রথম দেখবেন সাগরে বা ঘাটে, তিনিই হবেন স্রষ্টার সেই মনোনীত বক্তি।' ড্যানিশ দেবানন্দ বলল।

আহমদ মুসার চোখে-মুখে বিস্ময়। রূপকথার মতই লাগলো কথাগুলো। কিন্তু পাতার নৌকাটি বাস্তব। সেখানে পতাকা বাস্তব। তাতে রক্তের ছোপটাও বাস্তব। কণ্ঠে বিস্ময় নিয়েই আহমদ মুসা বলল, 'নৌকাটি তো এখানে আমিই প্রথম দেখলাম। তার মানে মেসেজটাকে আল্লাহ আমার কাছেই পৌছাচ্ছেন?'

ড্যানিশ দেবানন্দের মুখে হাসি। বলল, 'সাকোথাই ও তাদের বর্তমান উত্তরসূরীদের এটাই বিশ্বাস।'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'তার মানে বলতে চাচ্ছেন, নৌকা আমার কাছেই এসেছে।'

'আমি বলছি না, ওদের প্রাচীন বিশ্বাস বলছে।' বলল ড্যানিশ দেবানন্দ।

শুধু টেবিলের নয়, ঘরের সবাই শুনছিল আহমদ মুসাদের কথা। ড্যানিশ দেবানন্দ থামতেই বেগম আবদুল্লাহ বলে উঠল, 'আমার অবাক লাগছে মি. দেবানন্দ সাকোথাই রাজবংশের এই প্রাচীন বিশ্বাসের কথা জানলেন কি করে?'

'কারণ আমাদের জামাই দেবানন্দের মা চীনা-থাই প্রাচীন রাজবংশ 'সাকোথাই' এর একটি শাখার মেয়ে, যে শাখা ৭৮২ খৃষ্টাব্দে থাইল্যান্ডে নতুন চকরী রাজবংশ নাম নিয়ে তাদের সাম্রাজ্য পুনঃস্থাপন করে।'

'ওয়েলকাম জামাই। এই বড় খবরটি আমরা জানতাম না। নতুন পরিচয়ে ওয়েলকাম জামাই।' বলল বেগম আবদুল্লাহ।

মুহূর্তকাল নিরবতা।

সুস্মিতা বালাজী ড্যানিশ দেবানন্দের সামনে থেকে দূরবীনটা টেনে নিয়ে বলল, 'দেখি নৌকাটা এখন কোথায় কোন দিকে যাচ্ছে।'

দূরবীন চোখে লাগাল সুস্মিতা বালাজী।

তার দূরবীনের চোখ খুঁজতে লাগল নৌকাটিকে। এক সময় প্রায় চিৎকার করে সে বলে উঠল, 'নৌকাটি এসে গেছে আমাদের ঘাটের দিকেই আসছে।'

আহমদ মুসা সুস্মিতা বালাজীর কাছ থেকে দূরবীনটি নিয়ে চোখে লাগাল। একটু ঝুঁকে পড়ল কাঁচের দেয়ালটার উপর। দেখল, সত্যিই নৌকাটি এসে গেছে, নিচে নেমে যাওয়া সিড়ির যেখানে একটা বোট বাঁধা আছে, নৌকাটি প্রায় সেখানে পৌছে গেছে।

আহমদ মুসা দূরবীনটি টেবিলে রেখে ড্যানিশ দেবানন্দকে লক্ষ্য করে বলল, 'চলুন ভাই সাহেব নৌকাটি নিয়ে আসি। আমরা নামতে নামতে নৌকা ঘাটে পৌছে যাবে।'

আহমদ মুসা ও ড্যানিশ দেবানন্দ দুজনেই উঠে দাঁড়াল।

'জামাই দেবানন্দ তোমার রূপকথাকে জীবন্ত দেখলে সেটা একটা ভাগ্যের ব্যাপার হবে। গুডলাক দেবানন্দ।' উৎসাহ দিয়ে বলল হাজী আবদুল্লাহ।

আহমদ মুসাদের সাথে অনেকেই উঠে দাঁড়িয়েছিল। কেউ কাঁচের দেয়ালের পাশে গিয়ে দাঁড়াল, আবার কেউ কেউ সিঁড়ি মুখের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল।

আহমদ মুসারা নেমে গেল সিঁড়ির একদম পানির কিনারায়।

তখনও কয়েক গজ দূরে নৌকাটা। কিন্তু ঠিক সিঁড়ি বরাবরই ভেসে আসছে।

নৌকাটি এসে ঠিক ষ্টিলের সিঁড়ির সাথে আটকে গেল। যেন নোঙর করল নৌকাটি।

৬ ইঞ্চির মত লম্বা নৌকাটি। ঠিকই পাতার তৈরি। কাগজের নৌকার মত ডিজাইনেই যেন তৈরি হয়েছে নৌকাটি, দুই ইঞ্চি লম্বা মাস্তুলটি ও নৌকার মাঝখানের পিরামিড আকৃতির পেটের সাথে আটকানো। পতাকাটি দেড় ইঞ্চি বর্গাকৃতির।

ড্যানিশ দেবানন্দ বলল, 'ছোট ভাই আপনিই নৌকাটি তুলে নিন।'

'অবশ্যই'। আহমদ মুসা বিসমিল্লাহ বলে নৌকাটি পানি থেকে তুলে নিল।

নৌকা নিয়ে আহমদ মুসারা তাদের টেবিলে ফিরে এল।

পাশের টেবিল থেকে মিসেস বিবি মাধব, বেগম আবদুল্লাহ, সাহারা বানু ও হাজী আবদুল্লাহ আহমদ মুসাদের সাথে সাথেই ছুটে এল এ টেবিলে।

সবাই গাদাগাদি করে আহমদ মুসাদের টেবিল ঘিরে বসল। সবার দৃষ্টি ৬ ইঞ্চি নৌকাটির দিকে।

'মি. দেবানন্দ, সাকোথাই নৌকাটির পতাকায় রক্তের ছোপ দিয়ে 'এসওএস' সংকেত দেয়া হয়েছে বুঝলাম। এ সংকেত সাকোথাইদের কোন উত্তরসূরীদের কাছ থেকে এসেছে এটাও বুঝলাম। কিন্তু 'এসওএস' সংকেত কেন, কি ঘটনা, কোত্থেকে এল এই সংকেত ইত্যাদি বিষয় না জানলে এই 'এসওএস'-এর সার্থকতা কি?' বলল হাজী আবদুল্লাহ।

'স্যার, যে পাতা দিয়ে এই নৌকা তৈরি হয়েছে, রীতি অনুসারে তার সাথে একটা চিঠি জড়ানো থাকার কথা। তাতেই সব বিস্তারিত লেখা থাকে।' বলল ড্যানিশ দেবানন্দ।

'ভাই সাহেব, তাহলে খুলুন নৌকাটা। দেখা যাক চিঠি আছে কিনা, সে রকম চিঠি থাকলে সেটা একটা বড় ঘটনা হবে।' আহমদ মুসা বলল।

ড্যানিশ দেবানন্দ নৌকাটি টেনে নিয়ে বিসমিল্লাহ বলে পতাকাটি খুলে দিল নৌকা থেকে।

পাতা ভাঁজ করে তৈরি করা নৌকাটি খুলে ফেলল ড্যানিশ দেবানন্দ। পাতার সাথে এক সাথে ভাঁজ করা বেশ বড় একখন্ড কাগজও বেরিয়ে এল। নিজে না দেখেই কাগজটি ড্যানিশ দেবানন্দ তুলে দিল আহমদ মুসার হাতে।

কাগজ খন্ডটি ৬ ইঞ্চি ও ৫ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য-প্রস্থের। কাগজটি ওয়াটার প্রুফ। দুপাশেই লেখা। যে কালিতে লেখা তাও ওয়াটার প্রুফ এবং অমোচনীয়।

কাগজ ও কালি সম্পর্কে এ খবর দিল ড্যানিশ দেবানন্দ। কাগজ খন্ডটি আহমদ মুসার হাতে তুলে দেবার সময় আরও জানাল, 'আমার মা'র কাছে এই কালি সম্পর্কে শুনেছি। রাজ পরিবারের লোকরা ছাড়া এই কালি তৈরির ফর্মুলা আর কেউ জানে না। মা জানতেন তৈরি করতে, কিন্তু কোনদিন তৈরি করেননি। রাজ পরিবারের কেউ ভিন্ন পরিবারে গেলে এবং কোন জাতি বিষয়ক ডকুমেন্ট ছাড়া এ কালির ব্যবহার নিষিদ্ধ।'

আহমদ মুসা কাগজ খন্ডটি হাতে নিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখে বলল, একপাশে আরবী, অন্যপাশে সাকোথাই বর্ণমালা অর্থাৎ থাইভাষায় লেখা। আমি.....।'

আহমদ মুসা কথা শেষ করতে পারলো না। তার কথার মাঝখানে সাজনা সিংহাল বলে উঠল, 'আরবী কোত্থেকে এল স্যার? নৌকাটি আসতে পারে থাই-বার্মার দিক থেকে।'

'দক্ষিণ থাইল্যান্ডের পাত্তানী অঞ্চলের লোকেরা তাদের থাই ভাষা লেখার ক্ষেত্রে থাই ও আরবী দুই বর্ণমালাই ব্যবহার করে থাকে।' বলল আহমদ মুসা।

একটু থামল। মুখ তুলে সবার দিকে তাকাল। বলল, 'আমি নিশ্চিত কাগজের দুই পাশের লেখার বিষয়বস্তু একই। আরবী ভাষা আমরা দু'একজন ছাড়া কেউ বুঝব না। সুতরাং দেবানন্দ ভাই সাহেব চিঠির থাই ভাষার দিকটা পড়ুন। সে ভাষা আমরা সবাই বুঝব।'

বলে আহমদ মুসা চিঠি তুলে দিল ড্যানিশ দেবানন্দের হাতে।

'তথাস্তু ছোট ভাই' বলে চিঠি হাতে তুলে নিল ড্যানিশ দেবানন্দ। পড়তে শুরু করলঃ

''আমি যয়নব যোবায়দা। আমার নিকটতম একজন পূর্ব পুরুষ পাত্তানীর একজন রাজা সুলতান আবদুল কাদির কামালুদ্দিন। পূর্ববর্তী একজন পূর্ব পুরুষ পাত্তানী মুসলিম রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা সুলতাম আহমদ শাহ ওরফে চাউসির বাংগসা। চাউসির বাংগসা ছিলেন থাইল্যান্ডের 'সাকোথাই' রাজবংশের যুবরাজ। ১৩৫০ সালের দিকে পাত্তানী অঞ্চলে আসেন। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সুলতান আহমদ শাহ নাম গ্রহণ করেন। সে অঞ্চলে ১৬০০ খৃষ্টাব্দের দিকে মুসলিম রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সুলতান আহমদ শাহ এর উত্তরসূরীদের দ্বারা এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বংশেরই এক সুলতান হলেন, সুলতান আবদুল কাদের কামালুদ্দিন। এই সুলতান আবদুল কাদেরের সংগ্রামী পুত্র টংকু আবদুল কাদেরের নাতনি আমি। আমার ভাই জাবের বাংগসা জহীর উদ্দিন এবং আমার দাদী নিয়ে আমাদের তিনজনের পরিবার। ১৯০২ সালে পাত্তানী অঞ্চল পুরোপুরি

থাই শাসনে চলে যাওয়া এবং আমাদের বংশের অন্যান্য সকল সদস্য হিজরত করে মালয়েশিয়ায় চলে যাবার পর গত শত বছরে আমাদের এই পরিবার পাত্তানী-জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায়। শাসন ব্যাংককের হাতে থাকলেও লাখ লাখ পাত্তানী মুসলমানদের সামাজিক ও ধর্মীয় নেতৃত্ব এই পরিবারের উপর এসে বর্তেছে। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পাত্তানীরা প্রায় স্বাধনি জীবন-যাপন করছিল এবং চীন বংশোদ্ভুত আমাদের সাকোথাই পরিবারের কারণে থাইল্যঅন্ডের চিনা বংশোদ্ভুতদের (যাদের সংখ্যা তিন চতুর্থাংশে) মধ্যে ইসলামের প্রভাব দ্রুত বাড়ছিল। এই সময় বিনামেঘে বজ্রপাত ঘটল। এক রাতে আমাদের অঞ্চলের প্রধান সেনানিবাসের উপর এক নৃশংস হামলা হলো। সংঘর্ষে বেশ কিছু থাই সৈন্য নিহত ও আহত হলো। পরদিন ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়া আক্রমণকারীদের কিছু জিনিস কুড়িয়ে পাওয়া যায়। তার মধ্যে কয়েকটি বন্দুক, টুপি, ইত্যাদি রয়েছে। বন্দুকের প্রতিটি বাঁটে খোদাই করে 'আল্লাহ' শব্দ লেখা। টুপিরও চারধারে এমব্রয়ডারীতে 'আল্লাহ' শব্দ আঁকা।  গজব নাজিল হলো প্রথমই আমাদের পরিবারের উপর। আমার ভাই গ্রেফতার হলেন। পরে গ্রেফতার হলো আরো অনেক পাত্তানী যুবক। বিশেষ করে আমার ভাইয়ের গ্রেফতারে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হলো গোটা পাত্তানী অঞ্চলে। এই পরিস্থিতিতে পাত্তানীর আরও কয়েকটি থাই সেনাশিবীরে আক্রমণ হলো। পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে সেনাদের আক্রমণের শিকার হলো পাত্তানী গ্রাম। জীবন দেয়া-নেয়ার নৃশংসতায় পাত্তানীর সবুজ অরণ্য আজ রক্তাক্ত। এর ভবিষ্যৎ কি আমি জানি না। তবে আমি নিশ্চিত বলতে পারি, এসব কিছুর মধ্যে একটা ভয়াবহ ষড়যন্ত্র রয়েছে এবং সে ষড়যন্ত্রই জয়ী হতে যাচ্ছে। এই সংঘাত সৃষ্টির সাথে আমার ভাই, আমার পরিবার কিংবা পাত্তানীদের পরিচিত কোন সংস্থা-সংগঠন জড়িত নয়। একথা ঠিক আমার দাদা টংকু আবদুল কাদের এক সময় সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছিলেন। কিন্তু তার জীবদ্দশাতেই সর্বসম্মতিক্রমে অস্ত্র পরিত্যাগ করে শান্তিপূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের আন্দোলন তিনি শুরু করেন। শেষ দিকে তিনি বলতেন, 'আমাদের দেশের আদি পরিচয় 'সাকোথাই' (সুখের এক সুপ্রভাত) এবং 'মোয়াং থাই' ('মুক্ত মানুষের মাটি')। থাইল্যান্ডকে যদি আমরা এই আসল পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত

করতে পারি, তাহলে আমরা পাত্তানীর মুসলমানরা সেখানে সব অধিকারই পেয়ে যাব। আমাদেরকে এই প্রাপ্তির আন্দোলনটাই প্রথম করতে হবে। এজন্যে প্রয়োজন প্রতিটি মানুষের মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা।' টংকু আবদুল কাদেরের এই কথাগুলো আজ তলিয়ে যাচ্ছে। তার জায়গায় স্থান করে নিচ্ছে ঘাতকের অস্ত্র। ঘাতকের এই অস্ত্র যেমন থাই সৈন্যদের প্রতি উদ্যত, তেমনি উদ্যত পাত্তানীদের সত্য কথা, সুস্থ চিন্তার বিরুদ্ধেও। অন্যদিকে এই পাত্তানীরা থাই সৈন্যদের প্রতিশোধেরও শিকার। পাত্তানীরা আজ এই দ্বিমুখী আগুনের অসহায় ইন্ধন। এই আগুনে আমরা পুড়ে শেষ হবার মুখোমুখি। প্রতিটি নতুন দিন; অবস্থার নতুন অবনতি নিয়ে আসছে। এই অবনতি রোধ করে পাত্তানী ও থাই মুসলমানদের বাঁচাবে কে? আল্লাহই পারে। তাঁর কাছেই আমার চিঠি।''

চিঠি পড়া শেষ করল ড্যানিশ দেবানন্দ।

সবার চোখ ড্যানিশ দেবানন্দের মুখের দিকে। পিন পতন নিরবতার মধ্যে শুনছিল সবাই।

ড্যানিশ দেবানন্দ থামলেও পিনপতন নিরবতা ভাঙল না।

চিঠির কথাগুলো ভাবাচ্ছে সকলকে।

নিরবতা ভেঙে কথা বলল হাজী আবদুল্লাহ। বলল, 'আমি দুঃখিত, আমি নৌকাটিকে খেলনা মনে করেছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি, একটা জনগোষ্ঠীর তরফ থেকে মর্মান্তিক এক এসওএস।'

বলে মুহূর্তকাল থেমে আবার শুরু করল, 'থাইল্যান্ডের পাত্তানী অঞ্চলের ঘটনা জানি। কিন্তু ভেতরের এই ভয়াবহ ঘটনা আমি জানি না। আল্লাহ তাদের রক্ষা করুন।'

'চিঠিতে চিঠির লেখিকা যয়নব যোবায়দার যে পরিচয় দেয়া হয়েছে, সে দিক থেকে আমি মনে করি চিঠিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং চিঠির প্রতিটি কথা সত্য। আর সাকোথাইদের ইতিহাসে এমন চিঠি প্রেরণের দৃষ্টান্ত বেশি নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ ধরনের চিঠি ব্যক্তিগত বিষয়ে হয়ে থাকে। পরের জন্যে বা জাতীয় বিষয়ে এমন চিঠির ঘটনা আমি শুনিনি। আমি শুনেছি, জাতীয় বিষয়ে লেখা এ ধরনের চিঠি কখনও ব্যর্থ হয় না।' বলল ড্যানিশ দেবানন্দ।

‘ড্যানিশকে ধন্যবাদ। সে যে তার বংশের ঢোল পেটাচ্ছে, ব্যাপারটা তা নয়। থাইদের প্রাচীন সব ইতিহাসেই এসব কথা আছে। আমি থাই রূপকথাতেও এটা পড়েছি। কিন্তু আমাদের সামনে যে চিঠিটা সেটা রূপকথা নয়।’ বলল সুস্মিতা বালাজি।

‘রূপকথার মত এই চিঠিটির গন্তব্য কি আমাদের এ বাড়ি ধরে নিতে হবে?’ হাজী আবদুল্লাহ বলল।

‘এ ধরনের চিঠির গন্তব্য বাড়ি বা স্থান হয় না, হয় ব্যক্তি এবং সে ব্যক্তি হয় ঈশ্বরের প্রতিনিধি।’ বলল ড্যানিশ দেবানন্দ।

‘বাড়ির মালিক হিসাবে চিঠির মালিক তাহলে কি আমি হব?’ হাজী আবদুল্লাহ বলল।

‘আমি বলেছি, প্রথা অনুসারে নৌকা প্রথম যার নজরে পড়ে এবং যিনি নৌকা তুলে নেন, তিনি নৌকার মালিক হন।’ বলল ড্যানিশ দেবানন্দ।

‘চিঠি তো ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে লেখা। মানুষ এ চিঠি নিয়ে বা এর মালিক হয়ে কি করবে?’ বলল সাজনা সিংহাল।

‘সাকোথাইদের বিশ্বাস, ঈশ্বরের নামে লেখা চিঠি ঈশ্বরই তার মনোনীত লোকের হাতে পৌছে দেন। সুতরাং মানুষ চিঠির মালিক হন ঈশ্বরের তরফ থেকেই।’ ড্যানিশ দেবানন্দ বলল।

‘ও গড! স্যার তাহলে নৌকা দেখেছেন ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই!’ সাজনা সিংহাল বলল।

‘শুধু এখানে নয়, গোটা আন্দামানে আল্লাহ আর কাকে মনোনীত করতে পারে বল?’ বলল বেগম হাজী আবদুল্লাহ।

জানালার ভেতর দিয়ে আন্দামান সাগরের দিকে তাকিয়েছিল আহমদ মুসা। শূন্য দিগন্তে হারিয়ে যাওয়া তার দৃষ্টি। ভাবলেশহীন মুখ। চারপাশের কোন কথাই যেন তার কানে প্রবেশ করেনি।

ধীরে ধীরে এক সময় তার মুখ ঘুরে এল জানালা থেকে, আন্দামান সাগরের দিক থেকে।

বেগম হাজী আবদুল্লাহর কথা তখন শেষ হয়েছে। আহমদ মুসা বলে উঠল হাজী আবদুল্লাহকে লক্ষ্য করে, 'জনাব, চিঠিতে উল্লেখিত নাটের গুরু তৃতীয় শক্তিটি কে কে হতে পারে?'

'বলা মুস্কিল। তবে সেই শক্তি থাই সরকারের বন্ধু নয়, কিন্তু তারা পাত্তানী মুসলমানদের শত্রু, এ বিষয়টি চিঠি থেকে পরিষ্কার।' বলল হাজী আবদুল্লাহ।

'কিন্তু এ শক্তির পরিচয় কি হতে পারে?' আহমদ মুসা বলল। তার ভ্রুকুঞ্চিত।

'সুনির্দিষ্ট করে বলা মুস্কিল। তবে থাইল্যান্ডেরই কোন মুসলিম বিদ্বেষী গ্রুপ এরা হতে পারে।' হাজী আবদুল্লাহ বলল।

আহমদ মুসা পকেট থেকে মোবাইল বের করল। এই সময় তার চোখ গিয়ে পড়ল হঠাৎ টিভি স্ক্রীনের উপর। টিভি'র সাউন্ড তখন খুব কম করা ছিল। লাইভ টেলিকাষ্ট হচ্ছিল একটা ফুটবল খেলা। টিভি স্ক্রীনের বটমে নিউজের হাইলাইটস দেখাচ্ছিল। তাতে 'থাইল্যান্ডে রক্তক্ষয়ী সংঘাত' শিরোনাম দেখল আহমদ মুসা। দেখেই ঘুরে বসল।

আহমদ মুসাকে অনুসরণ করে সবার দৃষ্টি গিয়ে নিবদ্ধ হলো টিভি স্ক্রীনের ওপর। পড়ল সবাই, 'পাত্তানী অঞ্চলে পাত্তানী শহর থেকে ১০০ কিলোমিটার উত্তরে একটা থাই সেনাশিবিরের উত্তরে একটা থাই সেনাশিবিরের উপর আকস্মিক আক্রমণে ১১ জন থাই সেনা নিহত হয়েছে। থাই সৈন্যরা পাল্টা আক্রমণ চালায় এবং হামলাকারীদের অনুসরণ করে পাত্তানীদের একটা বড় গ্রামে পৌছে। সে গ্রামের মাদরাসায় তখন বার্ষিক ধর্মসভা চলছিল। থাই সৈন্যরা সে জমায়েতের উপর আক্রমণ চালায়। সংঘর্ষ বেধে যায়। সংঘর্ষে ৪৩ জন গ্রামবাসী নিহত হয়। আহতের সংখ্যা কয়েক শত।'

খবরটি পড়ার সাথে সাথে সবার মুখ বিষণ্নতায় ভরে গেল।

কিন্তু আহমদ মুসার মুখ ভাবলেশহীন, অনেকখানি অন্যমনস্ক যেন সে। এখান থেকেও অন্যকিছু সে দেখছে, ভাবনার ক্ষেত্র যেন তার অন্য কোথাও।

বিষাদ-নিরবতটা ভাঙল হাজী আবদুল্লাহ। বলল, 'বৎস আহমদ মুসা, টিভিতে যে কাহিনী আমরা পড়লাম, তাতে যারা থাই সেনা শিবির আক্রমণ

করেছিল এবং গ্রামের জনসভার দিকে পালিয়ে গিয়ে সেনা আক্রমণ সেখানে সেখানে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, তারাই তোমার সেই তৃতীয় পক্ষ। বুঝা যাচ্ছে, এরা এক বিপজ্জনক পক্ষ। বিপজ্জনক এক ফাঁদে আটকেছে থাই মুসলিম ও থাই সরকার দুই পক্ষকেই।'

আহমদ মুসা মুখ ঘুরিয়ে তাকাল হাজী আবদুল্লাহর দিকে। বলল, 'রাইট স্যার।' কণ্ঠ আহমদ মুসার নিস্তরঙ্গ ও নিরুত্তাপ।

বলেই আহমদ মুসা মোবাইল তুলে নিল হাতে। মোবাইলের স্ক্রীনে চোখ পড়তেই দেখল ব্যাটারীর রেড সিন্যাল, 'রিচার্জের ম্যাক্সিমাম সময় ৬ মাস পার হয়ে গেছে। আনএবল টু এ্যাক্ট।'

আহমদ মুসা হাতের মোবাইল টেবিলে রাখতে রাখতে বলল, মোবাইল বিদ্রোহ করেছে। ছয় মাস রিচার্জ করা হয়নি। ল্যান্ড টেলিফোনটা দিন আপা।'

টেবিলের ওপাশে সুস্মিতা বালাজীর কাছে একটা ল্যান্ড টেলিফোন ছিল।

সুস্মিতা বালাজী দাঁড়িয়ে টেলিফোনটা আহমদ মুসার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'ছোট ভাই, আমার মোবাইলটিও আইএসডি। দেব আপনাকে?'

অন্য সবাই এক সাথে বলে উঠল, 'কোথায় টেলিফোন করবেন? মোবাইল নিন।'

'সউদি আরবে জোসেফাইনের কাছে টেলিফোন করব। ল্যান্ড টেলিফোনটাই আরামদায়ক হবে।' শান্ত গলায় বলল আহমদ মুসা।

জোসেফাইনের নাম শুনতেই সকলের মুখে সম্ভ্রমপূর্ণ প্রসন্ন ভাব ফুটে উঠল।

এক টুকরো হাসি ফুটে উঠেছে সাজনা সিংহালের মুখে।

চট করে উঠে দাঁড়াল। একটু ঝুঁকে পড়ে টেলিফোন সেটের স্পীকার অন করে দিল।

'এ কি করলে সাজনা? সুষমা স্পীকার অফ করে দাও।'

সুষমা ওদিকে হাত বাড়াচ্ছিল।

আহমদ মুসা সুষমাকে নিষেধ করে বলল, 'সাজনা তার ম্যাডামের কথা শুনতে চায়। তাকে হতাশ করার দরকার নেই।'

সাজনা সিংহাল উঠে দাঁড়াল। বলল আহমদ মুসার উদ্দেশ্যে, 'স্যার, নাম আমার হচ্ছে। কিন্তু সকলেই উন্মুখ হয়ে আছে তাঁর কথা শোনার জন্যে। দেখুন, এক এক করে জিজ্ঞাসা করছি। কেউ না বলবে না।'

'না জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই। তোমার পক্ষে ভোট অনেক। তোমারই জিত হয়েছে।' আহমদ মুসা বলল।

'অনেক ধন্যবাদ স্যার। আমার চেয়ে অন্যেরা আরও খুশি হয়েছেন।' বলল সাজনা সিংহাল।

টেলিফোন সেট টেনে নিয়ে ডায়াল করল আহমদ মুসা।

সেকেন্ডের মধ্যে ওপার থেকে একটা নরম নারী কণ্ঠ ভেসে এল, 'আসসালামু আলাইকুম' আমি জোসেফাইন।

'ওয়া আলাইকুম আসসালাম। কেমন আছ জোসেফাইন?' বলল আহমদ মুসা। তার কণ্ঠ শান্ত, সম্ভ্রমপূর্ণ।

'আলহামদুলিল্লাহ। তুমি কোত্থেকে বলছ? ভাল আছ তো? তোমার মোবাইল বন্ধ কেন?'

'জোসেফাইন, তুমি তিনটা প্রশ্ন করলে। আমার প্রশ্নের জবাব দাওনি।'

'স্যরি। তোমার মোবাইল হঠাৎ রেসপন্স না করায় আমি ওরিড ছিলাম। আমি ভাল আছি, আহমদ আবদুল্লাহ ভাল আছে। ওকে, এখন বল।'

'আলহামদুলিল্লাহ, আহমদ আবদুল্লাহ ভাল আছে। কিন্তু তুমি ভাল নেই। একটা ক্লান্তি তুমি গোপন করছ। সকালেও কথা বলার সময় আমার এটা মনে হয়েছে।'

'ঠিক ধরেছ। গত ২দিন আমার জ্বর গেছে। গত রাত থেকে আমি ভাল।'

'জ্বরটা কেন, ডাক্তার কি বলেছেন?'

'চিন্তা করো না এ নিয়ে। ডাক্তার আয়েশা ও ডাক্তার ফাতিমা দেখেছেন। সিজনাল ধরনের জ্বর বলেছেন।'

'ওকে জোসেফাইন। আমার মোবাইলে চার্জ ছিল না সেজন্য পাওনি। আমি ভাল আছি। আমি এখনও বিয়ে বাড়িতেই আছি।'

‘ও নাইস। শাহবানু, সুষমারাও নিশ্চয় আছে। নতুন জীবনে ওদের ওয়েলকাম। আল্লাহ ওদের জীবন দীর্ঘ করুন, মঙ্গলময় করুন। আমার সালাম ওদের দিও। দুই বোনকে কিছু প্রেজেন্ট করেছ?’

‘স্যরি। আমি এ দিকটা তো ভাবিইনি।’

‘এটাই স্বাভাবিক। সব ভাবনা এক সাথে হয় না।’

‘এখন বল, তোমার পরমর্শ কি?’

‘দুবোনকে দুটি ‘ইউনিভার্স এ্যাটলাস’ উপহার দাও।’

‘ইউনিভার্স-এ্যাটলাস’। ওটা দিয়ে ওরা কি করবে?

‘কেন বৈচিত্রময় পৃথিবীর দেশ ও মানুষের ভূগোলকে দেখবে, রূপময় আকাশের বিশালতা ও অপরূপতাকে দেখবে এবং দেখবে এর বিজ্ঞানময় স্রষ্টাকে।’

‘ধন্যবাদ জোসেফাইন। ইউনিভার্স এ্যাটলাসের নতুন অর্থ দিলে তুমি আমাকে। তোমাকে ধন্যবাদ। এই এ্যাটলাস ওদের দেব।’

‘আলহামদুলিল্লাহ। এখন তোমার কথা বল।’

‘কোন কথা?’

‘যা বলার জন্যে টেলিফোন করেছ?’

‘কি করে নিশ্চিত হলে?’

‘তোমাকে অন্যমনস্ক দেখছি। তোমার মন অন্য কোথাও নিশ্চয়। তুমি আববা-আম্মার কথা জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছ। তুমি নিজে কয়েকদিন আগে খোঁজ নিলে ডাক্তার ফাতিমা আমেরিকা থেকে এসেছে কিনা। কিন্তু আজ তার নাম শুনেও কিছু বললে না। নিশ্চয় তোমার মন কোথাও আটকা পড়ে গেছে।’

‘ধন্যবাদ জোসেফাইন। তুমি ঠিকই ধরেছ। নতুন একটা বিষয় নিয়ে ভাবছি।’

বলে আহমদ মুসা সমুদ্র ভেংগে আসা পাতার বিস্ময়কর নৌকা, যয়নব যোবায়দার চিঠি এবং চিঠির সব কথা সংক্ষেপে বলল।

থামল আহমদ মুসা।

থামার সাথেই ওপার থেকে জোসেফাইন বলে উঠল, 'অদৃশ্য তৃতীয় পক্ষটা কে জান? ওরা বন্ধু বেশে শত্রু অতিশয়। ইসলামী বিপ্লবীর পোশাক পরে ওরা এসেছে।'

'এত তাড়াতাড়ি ওদের তুমি চিনলে কি করে? তুমি কিন্তু আমার ভাবনাকেই প্রকাশ করেছ জোসেফাইন। ধন্যবাদ।'

'ওয়েলকাম। ওদের চেনার জন্যে সময়ের প্রয়োজন নেই জনাব। সেই টুইন-টাওয়ারের নাইন-ইলেভেন পর বন্ধুবেশী এ ষড়যন্ত্রকারীদের সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে।'

বলে একটা দম নিয়েই জোসেফাইন বলল, 'তুমি থাইল্যান্ডে যাত্রা করছ কখন?'

'আমি যাচ্ছিই, এটা কেন ধরে নিলে?' মুখে হাসি টেনে বলল আহমদ মুসা।

সংগে সংগে জবাব এল না জোসেফাইনের কাছ থেকে। মুহূর্ত কয়েক পরে সে বলল, 'তুমি যাচ্ছ, আমি এ কথা বলিনি। তোমার যাওয়া উচিত বলেই আমি এ কথা বলেছি। আল্লাহর কাজের কোন আবেদনের সাড়া তিনি তাঁর কোন বান্দার মাধ্যমেই দেন। বোন যয়নব যোবায়দার দরখাস্তের সাড়া আল্লাহ দেবেন তার কোন বান্দাকে পাঠিয়েই। সেই সৌভাগ্যবান মানুষ আমার স্বামী হোন এটাই তো আমি চাইব।'

'ধন্যবাদ জোসেফাইন। অসংখ্য ধন্যবাদ আল্লাহকে, যিনি তোমাকে দিয়েছেন আমাকে জীবন সঙ্গিনী হিসাবে। থাইল্যান্ডে যাওয়ার ব্যাপারে আমার দ্বিধাগ্রস্ততা ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে গেল। আবারো ধন্যবাদ জোসেফাইন।'

'এত ধন্যবাদ তখন প্রয়োজন হয়, যখন পাওয়াটা আশাতীত হয়ে থাকে। তুমি কি ভেবেছিলে জোসেফাইনের পরামর্শ অন্যরকম হতে পারে?'

'না। আমি ভাবছিলাম অন্য বিষয়। আন্দামান থেকে ফিরে আমাদের আমেরিকা যাওয়ার প্রোগ্রাম আছে। আমেরিকায় তোমার আমন্ত্রণ যে কারণে, সে অনুষ্ঠান তো এ মাসেই। এটাই আমার ভাবনার বিষয় ছিল।'

'ঠিকই ভেবেছ। এ ব্যাপারে আমার মত হলো, আমেরিকা যাওয়ার প্রোগ্রাম বাতিলও নয়, আবার যাওয়ার সিদ্ধান্তও নয়। ওটা আল্লাহর হাতে থাক। এই মুহূর্তের জন্যে যেটা করণীয়, সেটাই করতে হবে।' বলল জোসেফাইন শান্ত, কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে।

'আমিন। সিদ্ধান্ত তুমি দিয়ে দিলে।' বলল আহমদ মুসা। তার মুখে সানন্দ হাসি।

'এ সৌভাগ্য আমার উপর বর্তালে আমি খুশিই হতাম। কিন্তু সত্য হলো, আমি তোমার সিদ্ধান্ত পূর্ণ করলাম মাত্র।'

'এটাই স্বাভাবিক জোসেফাইন। দু'জনে মিলেই তো আমরা পূর্ণাঙ্গ।' আবেগে ভারী কণ্ঠস্বর আহমদ মুসার।

'আলহামদুলিল্লাহ। এটাই আল্লাহর ইচ্ছা।'

একটু থেমে একটা দম নিয়েই আবার বলে উঠল জোসেফাইন, 'আজকে তোলা আহমদ আবদুল্লাহর একটা ছবি কম্পিউটারে পাঠাচ্ছি। তুমি ওটা থাইল্যান্ডে নিয়ে যেতে পারবে।'

'তোমার ছবিও।'

'পাঠাব না।'

'কেন?'

'চোখ বুজে দেখ, ছবিটা দেখতে পাবে। ওর চেয়ে ভাল ছবি কোন ক্যামেরা দিতে পারে না।'

'ঠিক জোসেফাইন।'

'ধন্যবাদ।'

'আর কিছু কথা?'

'আমার প্রশ্নের জবাব দাওনি। কখন তুমি যাত্রা করছ থাইল্যান্ডে?'

'আন্দামানে থাই ভিসার ব্যবস্থা আছে। যদি আজ ভিসা পেয়ে যাই, তাহলে প্লেনের সিট পেলে আজকেই চলে যাব।'

‘না, শাহবানু, সুষমা বোনদের এইমাত্র বিয়ে হলো। ওদের আনন্দের দিনে নিরানন্দ ডেকে এনো না। একদিন ওয়েট করো। তাছাড়া সবার কাছ থেকে বিদায় নিতে তো কিছু সময় লাগবে।’

থামলো জোসেফাইন। কিন্তু পরক্ষণেই আবার তার কণ্ঠ শোনা গেল। বলল, ‘তোমার আর কিছু কথা না থাকলে রাখি। ডাক্তার ম্যাডাম যে কোন সময় এসে পড়তে পারেন। তৈরি হতে হবে।’

‘ঠিক আছে জোসেফাইন। আন্দামান ছাড়ার আগে তোমাকে আবার কল করব।’

‘ওয়েলকাম। শাহবানু, সুষমাদের আমার স্নেহ দিও। আর হাজী আংকেল এবং বেগম আবদুল্লাহ, সাহারাবানু ও মিসেস বিবি মাধব খালাম্মাদের আমার কৃতজ্ঞতা জানিও। ওঁরা তোমাকে যে স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়েছেন, আমি এখন থেকেও তার উষ্ণতা পাচ্ছি। আল্লাহ ওঁদের সবার মংগল করুন।’

‘ওকে জোসেফাইন। আহমদকে আমার স্নেহ, আম্মাদের আমার সালাম দিও। আসসালামু আলাইকুম।’

‘ওয়া আলাইকুম সালাম। আল্লাহ হাফেজ।’

কথা শেষ করে আহমদ মুসা চেয়ারে হেলান দিল।

ঘরে পিনপতন নিরবতা।

নির্বাক সবাই।

সবার চোখে বিমর্ষ-বেদনার ছাপ।

আহমদ মুসাও কি দিয়ে কথা শুরু করবে তা ভেবে পেল না।

পল পল করে সময় বয়ে যাচ্ছে।

মুখ তুলল সাজনা সিংহাল। তার চোখ অশ্রুতে টল টল করছে বলল, ‘স্যার আপনি আজকেই যান। একদিন আরও থাকা মানে স্মৃতির আরও বেড়ে যাওয়া। মানুষের কষ্ট তাতে বাড়বে। আপনার মনে কিছুরই দাগ পড়ে না। কিন্তু সবার মন এমন পাথর নয়।’ থামল সাজনা সিংহাল।

তার দুগন্ড বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

সবার চোখই সিক্ত। মাথা নিচু।

চোখ মুছল সুষমা রাও। সে মুখ তুলল। বলল, 'ভাইয়া সাজনা একদমই ছেলে মানুষ। ওর মন একেবারে সাদা। দুঃখের কোন কাল দাগ সেখানে নেই। কিন্তু ভাইয়া আমরা সবাই মনে করেছিলাম, আপনাকে কিছুদিন আমরা পাব। কিছু জানব, শিখব আমরা। এতদিন সংঘাত-সংকটের মধ্যে দিন গেছে। আপনি জানেন না ভাইয়া, আমার আম্মা আজ বাদ ফজর সুস্মিতা বালাজী আপাকে সাথে নিয়ে পোর্ট ব্লেয়ার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে। আপনাকে সারপ্রাইজ দেবেন বলে কিছু বলেননি।'

এক ঝলক আনন্দে আহমদ মুসার মুখ ভরে গেল। সংগে সংগেই উঠে দাঁড়িয়ে মিসেস বিবি মাধবকে উদ্দেশ্য করে আহমদ মুসা বলল, 'আলহামদুলিল্লাহ, ওয়েলকাম, খোশ আমদেদ খালাম্মা।'

'আলহামদুলিস্লাহ। ধন্যবাদ বেটা। কিন্তু বেটা যে আলো তুমি এখানে জ্বেলেছ, তা একদমই ক্ষুদ্র। ভয় করছি, তুমি চলে গেলে অন্ধকারে না সব ছেয়ে যায় আবার।' বলল সুষমার মা মিসেস বিবি মাধব।

'ভয় নেই খালাম্মা। এ আলোর মালিক আল্লাহ। তিনিই একে আরও প্রজ্জলিত করবেন।' আহমদ মুসা বলল।

'এই তো শুনলাম, আল্লাহ তার ইচ্ছা তার বান্দাকে দিয়েই বাস্তবায়ন করেন। তুমি এমন এক দেবদূত বেটা। তুমি এভাবে চলে যেয়ো না। সাজনা একটু বেশি বলে ফেলেছে। আকস্মিক আঘাতটা তাকে বেশি আহত করেছে বলেই হয়ত। কিন্তু আমরা সবাই তো তার মত করেই ভাবছি।' মিসেস বিবি মাধব বলল।

সুস্মিতা বালাজী এবং ড্যানিশ দেবানন্দ পাথরের মত বসে আছে।

বিবি মাধব থামলে মুখ খুলে ধীরে ধীরে বলল, 'নৌকাটাকে আমি মজা হিসেবে নিয়েছিলাম। কিন্তু মজা যে ছোট ভাই আহমদ মুসার জন্যে 'সমর' হয়ে দাঁড়াবে, কল্পনাও করতে পারিনি। যাক ছোট ভাই, বিষয়টা কিন্তু ঐ রকম ইমারজেন্সী নয় যে আপনাকে আজ কিংবা কালই চলে যেতে হবে!'

আহমদ মুসা ম্লান হাসল। বলল, 'ভাইসাহেব, মেয়েটা লিখেছে প্রতিদিন পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে। টেলিভিশন নিউজেই দেখলেন এবং ১১ জন সৈনিক ও

৪৩ জন গ্রামবাসীর নিহত হবার খবর পড়লেন। এই ঘটনা নিশ্চয় আরও ঘটনার জন্ম দেবে। এটা নিশ্চয়ই ইমারজেন্সী।' আহমদ মুসা বলল।

কিছু বলতে যাচ্ছিল আহমদ শাহ আলমগীর। তাকে থামিয়ে দিয়ে আহমদ মুসা বলল, 'শাহ সাহেব শোন। তুমি ও দেবানন্দ ভাই সাহেব জনাব হাজী আংকলের পরামর্শ নিয়ে গভর্নর কিংবা সিবিআই যাকে বলে পার কাল ১২ টার মধ্যে আমি থাইল্যান্ডের ভিসা চাই। আজই বা কাল বিকালের জন্যে পোর্ট ব্লেয়ার এবং কোলকাতা ব্যাংকক প্লেনের টিকিট করে রাখ।'

আহমদ শাহ আলমগীর আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল।

আবার আহমদ মুসা তাকে থামিয়ে দিল।

আহমদ শাহ আলমগীরের চোখে নতুন অশ্রুর বেগ দেখা দিল।

ফুপিয়ে কেঁদে উঠল সুষমা রাও। সে মুখ তুলল কিছু বলার জন্যে।

আহমদ মুসা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'না, সুষমা তুমি যা বলবে তা আমি জানি।' বলে আহমদ মুসা তাকাল হাজী আবদুল্লাহর দিকে। কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল। কিন্তু তার আগেই সাজনা সিংহাল বলে উঠল, 'স্যার, গত কয়েকদিনের অভিজ্ঞতায় আমি আপনাকে পরম গণতন্ত্রী ভেবেছিলাম। কিন্তু দেখছি আপনি নির্দয়ভাবে মানুষের মুখ বন্ধ করতে পারেন।'

আহমদ মুসা মিষ্টি হাসল। বলল, 'মানুষের নয় ভাই-বোনদের মুখ বন্ধ করতে পারি। শাসন করার জন্যে ভাই-বোন তো পাইনি। তাই এমন সুযোগ পেলে ছাড়ি না।'

'আমি বুঝি তাহলে মানুষ?' ম্লান কণ্ঠে বলল সাজনা সিংহাল।

শব্দ করে হেসে উঠল আহমদ মুসা। বলল, 'তোমাকে মুখ বন্ধ করতে বললে করতে না। এমন ভাই-বোনও আছে যারা বড়দের উপর তাদের ইচ্ছা চাপিয়ে দেয়।'

'এ বেয়াদবদের আপনি খারাপ চোখে দেখেন তাহলে।' সাজনা সিংহাল বলল।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'উল্টো। ওরা বেশি অধিকার দাবী করে এবং পায়ও।'

'ও গড' বলে দুহাত দিয়ে মুখ ঢাকল সাজনা সিংহাল।

পাশ থেকে সুস্মিতা বালাজী সাজনা সিংহালের পিঠে একটা কিল দিয়ে বলল, 'এবার খুশি তো!'

মুখ ঢেকে রাখা আঙুলের ফাঁক দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে সাজনা সিংহালের। সেদিকে নজর পড়তেই ভ্রূকুচকালো সুস্মিতা বালাজী। কিন্তু মুখ খুলল না।

আহমদ মুসার দৃষ্টি আবার ফিরে গেল হাজী আবদুল্লাহর দিকে। বলল, 'জনাব আমি ভেবেছিলাম আন্দামানের কাজ শেষ হলে আপনাদের সবাইকে নিয়ে ওমরা করতে সউদি আরবে নিয়ে যাব। কিন্তু আমি পারছি না। আপনি দয়া করে এ দায়িত্ব নিন। আমি সউদি সরকারকে এবং দিল্লীস্থ সউদি রাষ্ট্রদূতের সাথে কথা বলেছি। দুচারদিনের মধ্যে সরকারি আমন্ত্রণ এসে যাবে। আপনারা মক্কা, মদিনা ও তায়েফ সফর করবেন।'

ঘর জুড়ে আনন্দের একটা গুঞ্জন উঠল।

গুঞ্জন ছাপিয়ে মিসেস বিবি মাধবের কণ্ঠ শ্রুত হলো। বলল, 'এই দাওয়াত কারা পাবে?'

একটা দ্বিধায় পড়ল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসাকে কথা বলতে হলো না। হাজী আবদুল্লাহ বলে উঠল, 'এখানে হাজির যারা তারা সবাই দাওয়াত পাবে, আহমদ মুসার কথার ধরনে এটাই আমি বুঝেছি।'

'তাহলে তো এখানের সবাই দাওয়াত পাচ্ছে।' হাসি মুখে বলল মিসেস বিবি মাধব।

বিস্মিত হলো আহমদ মুসা। তাকাল এবার সুরূপা সিংহালের দিকে। পরে দৃষ্টি ফিরিয়ে বিবি মাধবের দিকে চেয়ে বলল, 'সুরূপা বোনরাও কি..........।'

কথা শেষ করতে হলো না আহমদ মুসার। তার কথার মাঝখানেই বিবি মাধব বলল, 'হ্যাঁ বেটা সুরূপা, সাজনারা আমার আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছে।' সুস্মিতা আমাকে এদিকে এগিয়ে দিয়েছিল। পরে সুরূপাদের দেখেই আমি ফাইনালী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।'

আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল আহমদ মুসার মুখ। উঠে দাঁড়াল সে। বলল, 'ওয়েলকাম সুরূপা বোন, দুলাভাই এবং সাজনা।'

বসল আহমদ মুসা। বসতে বসতে বলল, 'সাজনা এত বড় কথা তুমি আমার কাছ থেকে লুকাতে পারলে?'

চোখ মুছে ফেলেছে সাজনা সিংহাল। বলল, 'আল্লাহর ইচ্ছা এ রকমই ছিল। আপনার কাছেই শুনেছিলাম, যেদিন যা ঘটবে, সেটা আগে থেকেই সুনির্দিষ্ট।'

'ঠিকই বলেছ। ধন্যবাদ সাজনা।' বলল আহমদ মুসা।

মুখ খুলেছিল সাজনা কিছু বলার জন্যে। কিন্তু তার আগেই সুস্মিতা বালাজী বলল, 'ছোট ভাই, মধুরতম একটা স্বপ্ন আপনি আমাদের সামনে নিয়ে এসেছেন। মক্কায় যাওয়া, আল্লাহর ঘর কাবা দর্শন খুব বড় একটা স্বপ্ন। সেখানে যাবার পরই শুধু উপলব্ধি করতে পারব এ স্বপ্নের স্বরূপ। কিন্তু মদীনায় যাব, ভাবী জোসেফাইনকে দেখতে পাব, এই আনন্দ এখনই পাগল করে তুলছে মনকে।'

সাজনা সিংহাল, সুষমা ও শাহবানু একই সাথে চিৎকার করে বলে উঠল, 'ঠিকই বলেছেন আপা। মনে হচ্ছে এখনই যদি যাবার ব্যবস্থা হতো!'

'দেখ এমনভাবে বলে তোমরা ওমরার পূণ্য নষ্ট করো না। আল্লাহ নিয়ত অনুসারে ফল দেন। আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে যদি ওমরা পালন কর তাহলে এর পূণ্য পাবে। আর যদি সৌদি আরব সফর হয় জোসেফাইনকে দেখার জন্য তাহলে আল্লাহর কাছ থেকে সেই পূণ্য মিলবে না।' আহমদ মুসা বলল।

কথা বলে উঠল মিসেস বিবি মাধব। বলল, 'ওদের কথা আমি বলি বেটা। আসলে নিয়ত ওদের ঠিক আছে। বৌমা জোসেফাইনকে দেখার বিষয়টা বাড়তি নিয়ত। বলতে পার এটা বোনাস আনন্দ।'

'ধন্যবাদ খালাম্মা।' বলে বিবি মাধবের দিকে চোখ সরিয়ে নিয়ে তাকাল হাজী আবদুল্লাহর দিকে। বলল, 'আমি এখন উঠতে চাই চাচাজান। বেশ কিছু কাজ আছে।'

সংগে সংগেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল আহমদ শাহ আলমগীরকে লক্ষ্য করে, 'শাহ ভাইটি এ বিশেষ দিনে তোমার আর বেরিয়ে কাজ নেই। আমি তো বেরুচ্ছিই। আমি থাই ইমিগ্রেশন হয়েই তাহলে যাই।'

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল আহমদ শাহ আলমগীর। বলল, 'ভাইয়া বিশেষ দিন কোন বাধা নয় এটা আপনিই সবচেয়ে ভাল জানেন। আমি কারও কোনই কাজে আসিনি ভাইয়া। আপনার এ নির্দেশটুকু পালনের সুযোগ আমাকে দিন। আপনি চলে যাবেন, নির্দেশ পালনের সুযোগ তো আর পাব না।' কান্নায় রুদ্ধ হয়ে গেল আহমদ শাহ আলমগীরের কণ্ঠ।

আহমদ মুসা কয়েকধাপ এগিয়ে আহমদ শাহ আলমগীরের কাঁধে হাত রেখে হাসি মুখে বলল, 'ঠিক আছে তুমিই যাবে ভাই।'

ড্যানিশ দেবানন্দ উঠে দাঁড়াল। বলল, 'অরিজিন্যাল নির্দেশনামায় ওর সাথে আমার নামও ছিল ছোট ভাই।'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'আমার কথা সংশোধন করছি। ঠিক আছে আপনারা যাবেন।'

তারিক মুসা মোপলা বিষন্ন মুখে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'স্যার আমি বাদ পড়েছি।'

আহমদ মুসা তার দিকে এগিয়ে গিয়ে তার পিঠ চাপড়ে বলল, 'তুমি আমার শিষ্য। আমার সাথে তুমি বেরুবে। আমি গাড়ির কাছে যাচ্ছি। তুমি তৈরি হয়ে এসো।'

আহমদ মুসা সবাইকে সালাম দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

হাজী আবদুল্লাহও উঠে দাঁড়াল। বলল, দেবানন্দ, শাহ আলমগীর তোমরা এসো। কাগজপত্র দেখি। তোমাদের এখনই বেরুনো উচিত। প্রয়োজন হলে গভর্নরকে বলে বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে। ভিসা আজ চাই-ই। ভিসা না হলেও আহমদ মুসা কিন্তু কালকেই চলে যাবে। সে সময়সূচী ঠিক রাখে। অবস্থা অনুকূল না হলে প্রতিকূলতার মধ্যেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ে।'

হাজী আবদুল্লাহর সাথে ড্যানিশ দেবানন্দ ও আহমদ শাহ আলমগীর বেরিয়ে গেল।

ঘরে তখন শুধু মেয়েরাই।

কেউ কথা বলছে না।

পাশের আন্দামান সাগরের মৌনতা যেন ঘরটাকেও এসে গ্রাস করেছে।

কারও মুখ নিচু। কারও শূন্য দৃষ্টি আন্দামান সাগরের দিকে।

সুস্মিতা বালাজী এক সময় সাগরের দিক থেকে শূন্য দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে সোফায় গা এলিয়ে দিল। চোখ বুজে ধীরে ধীরে বলল, 'আহমদ মুসার আন্দামান জীবনের পাতা উল্টে যাচ্ছে। কেউ একে রোধ করতে পারবে না।'

'তারপর আন্দামান কি ওর জীবন থেকে হারিয়ে যাবে? এ হয় না। এটা নিষ্ঠুরতা।' বলল সাজনা সিংহাল। তার কথা চিৎকারের মত শুনাল।

সুস্মিতা বালাজী তার একটা হাত সাজনা সিংহালের কাঁধে রাখল সান্তনার পরশ হিসাবে। বলল আবার ধীরে ধীরে, এটাই হয় সাজনা। এটাই ওঁর জীবন। মায়ার শৃংখলে বাঁধা পড়লে তিনি তো এগোতে পারতেন না। দেখ না জোসেফাইন ভাবী তাঁকে শৃংখলে বেঁধেছেন, কিন্তু ধরে রাখেননি।'

সাজনা সিংহাল কোন উত্তর দিল না। তার একটি হাত গিয়ে জড়িয়ে ধরল সুস্মিতা বালাজীর হাতকে।

অন্যকারও মুখে কোন কথা নেই।

দেয়ালের ঘড়িতে সময়ের কাঁটা এগিয়ে চলেছে টিক টিক করে।

# ৩

আহমদ মুসার গাড়ি ব্যাংকক এয়ারপোর্ট থেকে ব্যাংকক শহরে প্রবেশ করে সেন্ট্রাল এভেনিউ ধরে সোজা পশ্চিমে অগ্রসর হচ্ছে।

শহরের পশ্চিম প্রান্তে এই এভিনিউয়ের ধারে একটা ফ্যামিলি হোটেল আছে। একটা মুসলিম ফ্যামিলি হোটেল পরিচালনা করে। ঘরোয়া পরিবেশে চমৎকার খাওয়ার ব্যবস্থা আছে সেখানে। আহমদ মুসার ইচ্ছা সেখানে দুপুরের খাবার খেয়ে এসে উঠবে থাই-শেরাটন হোটেলে। তারপর লম্বা একটা ঘুম দিয়ে বিকেলে বেরুবে।

গাড়ি এগুচ্ছে।

আহমদ মুসার খুব ভাল লাগল মিৎসুবিশি জীপটা। নতুন গাড়ি এবং কমফোরটেবল। গাড়িতে যে দুর্দান্ত গতি আছে তা দেখলেই বোঝা যায়। স্পিডমিটারের দিকে তাকিয়ে এরই সমর্থন পেল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা বসেছিল পেছনের সিটে।

উর্দিপরা ক্যাব ড্রাইভার তরুণ বয়সের। 'তোমার নাম কি ছেলে?' পেছন থেকে ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

'ভূমিবল।' বলল ড্রাইভার।

'একেবারে রাজার নামে নাম। ভূমিবল তো তোমাদের রাজা ছিল।'

'জি স্যার তিনি রাজা ছিলেন। আমার বাপ-মা চেয়েছিলেন আমি রাজা হব না, কিন্তু রাজার মত হবো।'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'তুমি দেখতে রাজার মত, গাড়িও রাজার মতই।'

হাসল ড্রাইভার ছেলেটিও। বলল, 'গাড়ি এখনও আমার নয় স্যার। ব্যাংকে বন্ধক আছে। ঋণ শোধ হবার পর গাড়ি আমার হবে।'

গাড়ি তখন মধ্য ব্যাংকক পার হয়েছে। বাঁ দিকে আদালতসমূহ রেখে অনেকখানি এগিয়েছে গাড়ি। হঠাৎ কিছুদূর সামনে আহমদ মুসা চোখের পলকে গাড়ির জ্যাম গড়ে উঠতে দেখল। তার পরেই বোম বিস্ফোরণ ও ব্রাশ ফায়ারের শব্দ।

আহমদ মুসার ড্রাইভার ভূমিবল ব্যাপারটা বুঝতে দেরি করে ফেলেছিল। তাই সংগে সংগে গাড়িও থামাতে পারেনি।'

গাড়ি ঘটনাস্থলের প্রায় গা ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়াল। ড্রাইভার মুখ ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বলল, 'স্যার গাড়িটা ব্যাক করি।'

কিন্তু তার কথা শেষ না হতেই দুধার থেকে দুজন পুলিশ এসে গাড়ির দরজায় নক করতে লাগল।

পুলিশ অফিসার দুজনকে খুবই অস্থির ও অসহিষ্ণু দেখাল। তারা ঘটনাস্থলের ধোয়ার ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছে।

ড্রাইভার সুইচ টিপে দুদিকের দরজা আনলক করে দিল। দরজা খুলে যেতেই একজন পুলিশ অফিসার হাত ধরে টেনে ড্রাইভারকে তার সিট থেকে বের করতে করতে বলল, 'গাড়ি আমাদের দরকার। সন্ত্রাসীদের ফলো করতে হবে।'

ড্রাইভারকে বের করে দিয়ে পুলিশ অফিসারটি ড্রাইভিং সিটে বসল। অন্যদিকের দরজা দিয়ে অন্য পুলিশ অফিসারটি পাশের সিটে উঠে বসল।

গাড়ি ছুটতে শুরু করল।

অস্থির উত্তেজিত পুলিশ অফিসার দুজন একবারও পেছনের দিকে ফিরে তাকায়নি। পেছনের সিটে যে আরেকজন লোক আহমদ মুসা বসে আছে তা জানতেই পারল না।

ঘটনাস্থল অতিক্রম করার সময় আহমদ মুসা দেখল পুলিশের কয়েকটি গাড়ি বোম ও বুলেটে লন্ডভন্ড ও ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়ে আছে। কোন কোনটিতে আগুন জ্বলছে। দরজা খোলা অবস্থায় আরেকটি প্রিজন ভ্যানকে দেখল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা বুঝল, 'সন্ত্রাসীরা তাহলে তাদের কোন বন্দী সহযোগীকে ছিনিয়ে নিয়ে পালাচ্ছে।'

সোজা রাস্তা।

তীব্র বেগে ছুটে চলছিল গাড়ি।

সামনের দুজন অফিসারের মধ্যে ড্রাইভিং সিটের পুলিশ অফিসারকে সাব ইন্সপেক্টর লেবেলের মনে হলো আহমদ মুসার কাছে। আর পাশের সিটের পুলিশ অফিসারটি যে খুবই উচ্চপদস্থ হবেন, তার কাঁধের ইনসিগনিয়া দেখেই তা বুঝল আহমদ মুসা।

গাড়ি কিছুক্ষণ চলার পর আহমদ মুসা সামনেই দুটি মিটসুবিশি জীপ দেখতে পেল। ওদের পাগলের মত গতি দেখেই বুঝা যাচ্ছে ওরাই পলাতক।

শহর থেকে পশ্চিমমুখী হাইওয়ে ধরে এগুচ্ছে গাড়ি।

আগের গাড়ি দুটিও চলছিল ফুল স্পীডে।

আহমদ মুসাদের জীপ কিছুতেই ওদের সাথে দূরত্ব কমাতে পারছে না।

তখন গাড়ি শহর থেকে বেরিয়ে এসেছে। শহরতলির পরেই অনেকটা জনবিরল এলাকা। রাস্তার দু'দিকেই উঁচু-নিচু, এ্যাবড়ো-থেবড়ো জমি। মাঝে-মধ্যে বড় বড়, দীর্ঘ খাদ। আগাছা ও গাছ-গাছড়ায় ঢাকা জমি। এখান থেকে পশ্চিম দিকে সবচেয়ে কাছের শহর নাখোঁ, তাও তিরিশ চল্লিশ মাইল দূরে। এর পরের শহর ব্যান পং। ব্যান পং শহরটি থাইল্যান্ডের বিখ্যাত নর্থ-সাউথ হাইওয়ের উপর। এই হাইওয়ে থেকে পশ্চিমে সীমান্ত পর্যন্ত এলাকা ঘনবন আচ্ছাদিত পার্বত্যভূমি। এই পার্বত্যভূমিরই পশ্চিম ধার ঘেঁষে উত্তর-দক্ষিণে বিলম্বিত বিলাদতুংগ পর্বতশ্রেণী।

সূর্য তখন মাথার উপরে।

তীব্র বেগে ছুটছে গাড়ি।

দুই পুলিশ অফিসারের মত আহমদ মুসারও দৃষ্টি সামনে।

হঠাৎ বনের মাঝে দেখতে পেল সামনে কিছু দূরে রাস্তার ধারে একটা গাছ থেকে চলন্ত কিছু একটা নিচে পড়ল। সবুজের মধ্যে চলন্ত সাদাকে পরিষ্কার চোখে পড়েছে আহমদ মুসার।

ভ্রু-কুচকে গেল আহমদ মুসার।

বস্তুটি যে মানুষ এবং গাছ থেকে লাফ দিয়ে নেমেছে এতে তার কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু কে সে এই জনশূন্য এলাকায়?

পলাতকদের লোক?

তাহলে তো একজন নয়!

অনুসরণকারী গাড়ি আটকাবার জন্যে ওদের একটা পশ্চাত বাহিনীও হতে পারে।

সামনেই রাস্তার এলটার্ন।

এলটার্ন বলেই টার্নের ওপারে বেশ দূরে গাছ থেকে লাফিয়ে নামার ঘটনা ঘটলেও কৌণিক সংক্ষিপ্ত পথে তা সুন্দর দেখা গেছে।

রাস্তা এলটার্ন হওয়ার কারণে সামনের গাড়ি দুটোকেও আর দেখা যাচ্ছে না। টার্গের গাড়ি চোখের আড়াল হবার পর পুলিশের গাড়ি বাঁকে এসে গতি আরও বেশি দ্রুত করবে এবং তাদের দৃষ্টি সামনের দিক নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। এই সুযোগে কি সন্ত্রাসীরা পুলিশের গাড়ির উপর চড়াও হতে চায়?

গাড়ি তখন বাঁক পার হতে যাচ্ছিল।

'স্যার সাবধান। এখানে শত্রু ওঁৎ পেতে থাকতে পারে।' পেছন থেকে দ্রুত কণ্ঠে বলে উঠল আহমদ মুসা।

বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের মত চমকে ওঠে পেছনে তাকাল দুজন পুলিশ অফিসার। দুজনের হাতেই উঠে এসেছিল রিভলবার। গাড়ি ড্রাইভকারী পুলিশ অফিসার তার চোখ সামনে ফিরিয়ে নিলেও তার এক হাতে রিভলবার, অন্যহাতে ছিল ষ্টিয়ারিং হুইল।

পাশের পুলিশ অফিসারটির রিভলবার আহমদ মুসার দিকে তাক করা। বলল, 'কে তুমি? গাড়িতে ছিলে তুমি?'

'আমি এ গাড়ির যাত্রী। আমি ভাড়া করেছিলাম এ গাড়ি। আপনারা পেছনে তাকাননি, দেখতেও পাননি। সেসব কথা এখন নয়, পরে শুনবেন। আমি বলছি, আপনাদের গাড়ি যে কোন সময় আক্রান্ত হতে পারে।' বলল আহমদ মুসা।

‘তুমি কি করে জানলে?’ বলল পুলিশ অফিসারটি। তার চোখে সন্দেহের ছায়া।

গাড়ি তখন এল টার্নটি পার হয়ে এসেছে।

আহমদ মুসা জবাব দিতে শুরু করেছিল। কিন্তু কিছুই শোনা গেল না। গাড়ি দুদিক থেকে আসা ব্রাস ফায়ারের শব্দে ডুবে গিয়েছিল, সেই সাথে থেমেও গিয়েছিল আহমদ মুসার কণ্ঠ।

অকস্মাৎ গুলীবর্ষণের মধ্যে পড়ে দুই পুলিশ অফিসারসহ আহমদ মুসা গাড়ির মেঝেয় শুয়ে পড়ল।

পেছনের চাকায় গুলী খেয়ে গাড়িও দাঁড়িয়ে পড়েছে।

গুলী বৃষ্টিতে আকস্মিক ছেদ পড়ায় আহমদ মুসা ও পুলিশ অফিসার দুজন মাথা তুলছিল।

সেই সময়ই গাড়ির দুপাশের সবগুলো জানালা সশব্দে ভেঙে পড়ল। জানালা দিয়ে প্রবেশ করল ষ্টেনগানের চারটি ব্যারেল। চারটি মুখ উঁকি দিল তার সাথে। কালো হ্যাটধারী একজন বলল, ‘আল্লাহর শত্রুরা তোরা বেঁচে আছিল তাহলে? ভাল হলো। তোদের জীবিতই দরকার বেশি। তোদের কাছে আমাদের এক শতেরও বেশি মুজাহিদ বন্দী আছে। তোদের বিনিময়ে ওদের ছাড়িয়ে নেয়া যাবে।’

তার কথার মধ্যেই সবগুলো দরজার ছিটকিনি খুলে দেয়া হলো। টেনে খুলে ফেলল তারা দরজা। তারা টেনে বের করল দুজন পুলিশ অফিসার ও আহমদ মুসাকে। দুজন পুলিশ অফিসারের কাছ থেকে রিভলবার তারা আগেই কেড়ে নিয়েছিল।

আহমদ মুসাদের গাড়ি থেকে বের করেই পুলিশের গাড়ি ওরা রাস্তা থেকে উত্তর দিকের জংগলাকীর্ণ খাদের দিকে ঠেলে দিল।

সংগে সংগেই দক্ষিণ দিকে জংগল ফুঁড়ে তিনটি গাড়ি বেরিয়ে আসতে দেখল।

ওরা মোট আটজন। সবার হাতেই ছোট বাঁটের ছোট ব্যারেলের কারবাইন জাতীয় ষ্টেনগান। ওদের কারবাইনগুলো তাক করা দুজন পুলিশ অফিসারসহ আহমদ মুসার দিকে।

হ্যাটপরা লোকটিই তাদের নেতা।

সে তার রিভলবারের নল সিনিয়র পুলিশ অফিসারটির থুতনির নিচে ঠেকিয়ে বলল, 'বড়শীতে এতবড় মাছ উঠবে ভাবিনি। একেবারে থাই গোয়েন্দা পুলিশের দ্বিতীয় ব্যক্তি। সেই সাথে সিটি পুলিশের কমিশনার!' আর সন্দেহ নেই আমাদের সব পাত্তানীকে এবার ছাড়িয়ে নিতে পারব।' আর এই ছেলেটি কে? দেখতে খুব ভদ্র মনে হচ্ছে, কিন্তু শরীরটা দেখছি সৈনিকের। সেনা বাহিনীর লোক নয়তো?' আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে শেষ কথা কয়টি বলল হ্যাটধারী লোকটি।

তার কথা শেষ হতেই আহমদ মুসা বলে উঠল, 'আমি এই ট্যাক্সি ক্যাবের যাত্রী। ওঁদের গাড়ি নষ্ট হবার পর ওঁরা আমাদের ক্যাবটি দখল করেছেন।'

'ভাগ্য যখন তোমাকে আমাদের হাতে এনে দিয়েছে, তখন ধরে নাও তোমাদের ভাগ্যের এখানেই শেষ। আমরা একটা প্রিন্সিপাল মেনে চলি। সেটা হলো, বন্ধু যারা নয়, তারা সবাই আমাদের শত্রু। আর শত্রুকে জীবন্ত আমরা ছাড়ি না।' বলল লোকটি।

'বুঝলাম আমি বাঁচবো না। কিন্তু পুলিশ অফিসার দুজনকে তো বন্দীরা মুক্ত হবার পর ছাড়বেন বললেন।' আহমদ মুসা বলল।

জোরে হেসে উঠল হ্যাটধারী লোকটি। বলল, 'আল্লাহর শত্রুদের দেয়া ওয়াদার মূল্য নেই। আমাদের লক্ষ্য কাজ উদ্ধার।'

আহমদ মুসার থেকে মাত্র এক মিটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ষ্টেনগানধারীর ষ্টেনগানের কালো বাঁটে সাদা রংয়ে উৎকীর্ণ হিব্রু লেখা শুরুতেই চোখে পড়েছিল। তারপর যে লোকটি কথা বলছিল তার কালো হ্যাটে কালো রংয়ের একটা হিব্রু বর্ণ দেখা যাচ্ছে। বর্ণটায় হিব্রু ঈশ্বর শব্দের আদ্যাক্ষর। এই ছোট্ট দুটি দৃশ্য অনেক বড় কথা বলে দিল আহমদ মুসাকে। লেটেষ্ট ইসরাইলী অস্ত্রে সজ্জিত এই সন্ত্রাসীরা তাহলে কারা? এদের মুখে আল্লাহর নাম কেন?

পাত্তানীদের মুক্ত করার কথা এরা বলছে কেন? পাত্তানীদের সাথে ব্যাংককের ইসরাইলী অস্ত্রধারী ও ইসরাইলী ক্যাপ পরা এই সন্ত্রাসীদের সম্পর্ক কি?

এসব চিন্তায় যখন আহমদ মুসা হাবুডুবু খাচ্ছে, তিনটি গাড়ি এসে তখন পশ্চিমমুখী হয়ে ষ্টার্টের পজিশন নিয়ে দাঁড়াল এবং গাড়ি থেকে তিনজন বেরিয়ে এসে অন্যদের পাশে এসে দাঁড়াল।

আহমদ মুসার ডান পাশে দুজন পুলিশ অফিসার। আর সামনে ওরা সারি বেধে দাঁড়িয়ে। হ্যাটধারী মাঝখানে পায়চারী করছে আর কথা বলছে।

আহমদ মুসার বাঁ দিকে গজখানেক দূরে দাঁড়িয়েছিল যে ষ্টেনগানধারী সে তার ষ্টেনগানের ব্যারেল আহমদ মুসার দিক থেকে নামিয়ে ষ্টেনগানটি ডান হাতের কব্জিতে ঝুলিয়ে নিল। পকেট থেকে বের করল প্লাষ্টিকের সরু রশি। এগোলো পুলিশের দু'জন অফিসারের দিকে। প্রথমে পিছমোড়া করে বাঁধল পুলিশ কমিশনারকে। তারপর ঐভাবেই পিছমোড়া করে বাঁধতে লাগল সহকারী গোয়েন্দা প্রধানকে।

সহকারী গোয়েন্দা প্রধান বলল, 'তোমরা যাই কর। তোমাদের উদ্দেশ্য পূরণ হবে না। বন্দীদের তোমরা পাবে না।'

'না পেলেও চলবে। পাত্তানীর ইসলামী বিপ্লবীরা পুলিশের দু'জন শীর্ষ কর্মকর্তাকে শেষ করেছে এটা কম বড় পাওয়া নয়।' ঠান্ডা গলায় হাসতে হাসতে বলল হ্যাটধারী লোকটি।

শিউরে উঠল আহমদ মুসা লোকটির কথা শুনে। এরা হত্যা করে সেটা চালিয়ে দেবে ইসলামী বিপ্লবীদের নামে! কারা এরা? যয়নব যোবায়দা কথিত এরাই কি সেই তৃতীয় শক্তি?

সহকারী গোয়েন্দা প্রধানকে বাঁধা হয়ে গেছে।

এবার এগিয়ে আসছে লোকটি আহমদ মুসার দিকে।

তার হাতের কব্জীতে ঝুলছে বেঁটে-খাটো ভয়ংকর ষ্টেনগানটি। প্লাষ্টিকের বাঁটটি দুহাতে ধরে সে এগুচ্ছে। তার মুখে এক টুকরো বিজয়ীর হাসি।

আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়াল। যেন সে লোকটির মুখোমুখি হচ্ছে। আসলে আহমদ মুসা চাইল, লোকটি যেন তার ডানদিক দিয়ে পিছনে না গিয়ে তার সামনে দিয়ে তার বাম দিক ঘুরে পেছনে যায়।

তাই হলো।

লোকটি আহমদ মুসার সম্মুখ ঘুরে পেছনে যাচ্ছিল। আহমদ মুসা এই সময়টারই অপেক্ষা করছিল। প্রতিটি স্নায়ুতন্ত্রী, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শক্ত হয়েছিল, ঠিক নেকড়ের শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার পূর্বক্ষণের মত।

লোকটি আহমদ মুসার বুক বরাবর আসতেই আহমদ মুসা দুই ধাপ এগুনোর সাথে সাথেই তার বাম হাত বিদ্যুৎ বেগে এগিয়ে সাপের মত পেঁচিয়ে ধরল তার গলা। সেই তাকে এক ঝটকায় ঘুরিয়ে নিয়ে লোকটির পিঠকে সেঁটে ধরল বুকের সাথে। সেই সময় আহমদ মুসার ডান হাত লোকটির হাত থেকে ষ্টেনগান কেড়ে নিয়েই গুলী করেছে হ্যাটধারীকে। তারপর লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকাদের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিল ভয়ংকর মিনি ষ্টেনগানটিকে। ওরাও মরিয়া হয়ে গুলী করেছিল আহমদ মুসাকে। তাদের সবগুলো গুলী গিয়ে বিদ্ধ করেছিল তাদের সাথী লোকটিকে। শুধু একটি মাত্র গুলী গিয়ে বিদ্ধ করল আহমদ মুসার ডান হাতকে কনুইয়ের নিচে।

গুলীবিদ্ধ হওয়ার পর মুহূর্তের জন্যে ছেদ নেমেছিল আহমদ মুসার গুলীতে। কিন্তু আহমদ মুসা বুকে ধরা লোকটিকে ছেড়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে দুহাত দিয়ে ষ্টেনগান ধরে গুরী করা সম্পূর্ণ করেছিল, যাতে গুলী করার মত কেউ ওদের মধ্যে আর না থাকে।

দুজন পুলিশ অফিসারের চোখ বিস্ময়ে ছানাবড়া। যেন সিনেমার কোন পরিকল্পিত দৃশ্য দেখছে তারা। কিন্তু সিনেমা এটা নয়। সন্ত্রাসীদের ১১টি লাশ তাদের সামনে পড়ে আছে। তাদের সাথের নায়ক যাত্রী যুবকটিও আহত।

শিঘ্রই ওদের মুখ থেকে বিস্ময়ের ধাক্কা কেটে গেল। চোখে-মুখে ফুটে উঠল আনন্দ।

ওরা আহমদ মুসার দিকে তাকাল এবং এগিয়ে এল তার দিকে।

আহমদ মুসাও উঠে দাঁড়িয়েছে।

‘ওয়ান্ডারফুল ইয়ংম্যান। তুমি কল্পনাকেও হার মানিয়েছ। আমার গোটা চাকরি জীবনের সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা তুমি আজ ঘটিয়েছ। কনগ্রাচুলেশনস।’ বলল সহকারী গোয়েন্দা প্রধান অফিসারটি।

‘স্যার আমি আপনাদের হাতের বাঁধন খুলে দিচ্ছি।’ বলে আহমদ মুসা সহকারী গোয়েন্দা প্রধানের হাতের বাঁধন খুলে দিল।

বাঁধন মুক্ত হয়েই জড়িয়ে ধরল সে আহমদ মুসাকে। আহমদ মুসাকে আবার ধন্যবাদ দিয়ে সহকারী গোয়েন্দা প্রধান বলল, তুমি আহত ইয়ংম্যান, অফিসারকে আমি খুলে দিচ্ছি।

সিটি পুলিশ কমিশনার বাঁধন থেকে মুক্ত হয়েই ছুটে গেল আহমদ মুসার কাছে। পকেট থেকে বের করল পকেট ফার্স্ট এইড। ইনভেলাপ ছিঁড়ে বের করল এ্যান্টিসেপটিক মেডিকেটেড প্যাডযুক্ত ব্যান্ডেজ। আহমদ মুসার ডান হাতের আস্তিন সরিয়ে ব্যান্ডেজের একাংশ ছিঁড়ে আহত স্থানে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিতে দিতে বলল, ‘ধন্যবাদ ইয়ংম্যান। তোমাকে মনে হচ্ছে রূপকথার রাজপুত্র। আর রাজপুত্রকে মনে হচ্ছে অতি অভিজ্ঞ একজন শিকারী। এই অপারেশনে তুমি একটিও ভুল করনি। কে তুমি জানতে পারি?’

‘অফিসার এসব কথা এখন থাক। বেশ কিছু করণীয় আছে আমাদের এখন।’ বলল সহকারী গোয়েন্দা প্রধান সিটি পুলিশ কমিশনারকে লক্ষ্য করে।

‘ঠিক বলেছেন স্যার। যে গাড়িকে আপনারা অনুসরণ করছিলেন, তা এখন অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আপনারা সামনের নাখো শহরের পুলিশকে গাড়ি দুটোকে আটকাতে বলতে পারেন।’ বলল আহমদ মুসা।

‘কিন্তু গাড়ির নাম্বার না হলে.......।’

সহকারী গোয়েন্দা প্রধানের কথার মাঝখানেই আহমদ মুসা বলে উঠল, ‘পেছনের গাড়িটার নম্বর আমি দেখেছি স্যার। তাছাড়া গাড়ির বিবরণ দিলেও কাজ হবে।’

‘নাম্বার তোমার মুখস্ত আছে?’ সহকারী গোয়েন্দা প্রধান বলল। তার চোখে-মুখে বিস্ময়।

আহমদ মুসা নাম্বার বলল।

চোখ কপালে তুলেছে সিটি পুলিশ কমিশনার। বলল, ‘আমিও কয়েক ঝলক নাম্বার দেখেছি। কিন্তু মুখস্ত করিনি। মুখস্তের কথা মনেও হয়নি।’

সহকারী গোয়েন্দা প্রধান নাখো শহরের পুলিশের সাথে কথা বলছিল। পলাতক গাড়ির নাম্বার ওদেরকে দিয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিল।

টেলিফোন শেষ করেই সহকারী গোয়েন্দা প্রধান সিটি পুলিশ কমিশনারকে লক্ষ্য করে বলল, ‘তুমি পুলিশকে আসতে বল লাশগুলো নিয়ে যেতে হবে। ততক্ষণে এসো আমরা ওদের বডি চেক করি।’

লাশগুলোর বডি চেকিং-এর কাজে আহমদ মুসাও শরীক হলো।

হ্যাটওয়ালা নেতা লোকটির লাশ আহমদ মুসার সামনেই ছিল। আহমদ মুসা তাকে দিয়েই শুরু করল। তার গোটা দেহ সার্চ করে একটা মানিব্যাগ ও একটা মোবাইল ছাড়া কিছুই পেল না। মোবাইলের ফোন বুক ও সিমকার্ডে প্রচুর নাম ও টেলিফোন নাম্বার দেখল। সবগুলোই প্রায় মুসলিম নাম। ওনারস শিরোনামে নাম ‘ডি, দারায়ুস’। আর মানি ব্যাগে টাকা ছাড়া দেখল টোল ট্যাক্স ও লন্ড্রির স্লীপ। টোল ট্যাক্স ও লন্ড্রীর স্লীপ হাতে রেখে আহমদ মুসা মোবাইল ও মানিব্যাগ সহকারী গোয়েন্দা প্রধানের হাতে দিয়ে বলল, ‘স্যার যে মোবাইলগুলো পাওয়া যাবে তাতে পাওয়া টেলিফোন নাম্বারের একটা তালিকা হওয়া দরকার।’

‘অবশ্যই ইয়ংম্যান। মনে করিয়ে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু মোবাইল ও মানিব্যাগ লাশের পকেটেই থাক আপাতত। লাশগুলোর আইডেনটিফিকেশনের সময় ওগুলোর প্রয়োজন হবে।’

‘ঠিক স্যার।’ বলে আহমদ মুসা একটু থেমেই আবার বলা শুরু করল, ‘খাদে পড়ে যাওয়া ট্যাক্সি ক্যাবে যেতে চাই। আমার ব্যাগ ওখানে আছে। তাছাড়া গাড়ির কন্ডিশনটাও দেখে আসতে চাই। গাড়িটা বেচারা ট্যাক্সি-ক্যাব মালিকের ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে কেনা।’

সহকারী গোয়েন্দা প্রধান আহমদ মুসার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। মুখটা তার প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল। বলল, ‘ধন্যবাদ ইয়ংম্যান। তোমার মনটা দেখছি খুবই সংবেদনশীল। চিন্তা করো না, আমাদের রেসকিউ টীম গাড়িটা ওখান থেকে উদ্ধার করবে। আর ট্যাক্সি-ক্যাব মালিককে নতুন গাড়ির দাম আমরা দিয়ে দেব।’

‘ধন্যবাদ স্যার, গাড়ি থেকে ড্রাইভারের কাগজপত্রও নিয়ে আসবো।’

বলে আহমদ মুসা খাদের দিকে এগোলো।

আর সহকারী গোয়েন্দা প্রধান লাশগুলোর বডিসার্চ করার কাজ শেষ করতে মনোযোগ দিল।

পাশেই বডি সার্চরত সিটি পুলিশ কমিশনার সহকারী গোয়েন্দা প্রধানকে লক্ষ্য করে বলল, ‘স্যার ছেলেটাকে আমি বুঝতে পারছি না। দেখতে একেবারে সরল-স্বচ্ছ, আবার বুদ্ধি গোয়েন্দাদের মত। কমান্ডোদের মত ক্ষীপ্র, লড়াকু। আবার সৎ মানুষের মত দায়িত্বশীল। আশ্চর্যের বিষয়, ট্যাক্সি ক্যাবের সে আরোহী মাত্র ছিল। ট্যাক্সি-ক্যাব মালিকের ক্ষতির কথা তার মনে এল কি করে! বিষয়টা আমাদের ভাবার কথা!’

‘আমিও তোমার মত আশ্চর্যান্বিত থানি। তোমার মত আমিও ভাবছি। সে কোন গোয়েন্দা হতে পারে। কমান্ডো বা সৈনিকও হতে পারে কোন দেশের। অথবা সুশিক্ষেত, প্রশিক্ষিত একজন সিভিলিয়ানও হতে পারে। তবে সে ক্রিমিনাল নয় এটা মনে করি।’ বলল সহকারী গোয়েন্দা প্রধান।

সিটি পুলিশ কমিশনারের নাম উদয় থানি। আর ‘পুরসাত প্রজাদীপক’ হলো সহকারী গোয়েন্দা প্রধানের নাম।

সহকারী গোয়েন্দা প্রধানের কথা শেষ হতেই সিটি পুলিশ কমিশনার উদন থানি বলল, ‘স্যার আমারও তাকে ক্রিমিনাল মনে হয়নি। ট্যাক্সি ক্যাব মালিকের প্রতি তার সহানুভূতিও তাকে ক্রিমিনাল সাইকোলজি থেকে বহুদূর নিয়ে গেছে।’

‘ঠিক আছে, সবই জানা যাবে থানি। সেতো আমাদের সাথে আছে। গুলীটা তার হাতে খুব ডীপ হয়ে বসেছে অপারেশন দরকার হবে। পুলিশ হাসপাতালেই তাকে আমরা নেব।’ বলল সহকারী গোয়েন্দা প্রধান পুরসাত প্রজাদীপক।

লাশগুলোর বডি সার্চ শেষ হয়েছে।

আহমদ মুসা এল।

‘তোমার ব্যাগের কোন ক্ষতি হয়নি তো?’ আহমদ মুসাকে দেখেই বলে উঠল সহকারী গোয়েন্দা প্রধান পুরসাত প্রজাদীপক।

‘তেমন ক্ষতি হয়নি স্যার। তবে গাড়িটার বডি আস্ত নেই।’

কথা শেষ করে আহমদ মুসা হাতের এক গুচ্ছ কাগজ সহকারী গোয়েন্দা প্রধানের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, ‘এসব ক্যাব-ড্রাইভারের কাগজপত্র।’

‘তার কাগজপত্র তুমিই রাখ। তার সাথে যোগাযোগে তুমি সাহায্য করলে ভাল হবে।’ বলল সহকারী গোয়েন্দা প্রধান।

পুলিশের গাড়ির একটা বহর পৌছল সহকারী সিটি পুলিশ কমিশনার ও ব্যাংকক পশ্চিম জোনের এসপি’র নেতৃত্বে।

সহকারী গোয়েন্দা প্রধান ও সিটি পুলিশ কমিশনার ওদের সব বুঝিয়ে এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে আহমদ মুসাকে নিয়ে তারা একটি গাড়িতে উঠে বসল।

পুলিশ ড্রাইভার ষ্টার্ট দিল গাড়ি।

ছুঠল গাড়ি ব্যাংককের উদ্দেশ্যে।

সহকারী গোয়েন্দা প্রধান পুরসাত প্রজাদীপক আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, ‘ইয়ংম্যান, আমরা অনেক ঘটনা ঘটালাম, কিন্তু আমাদের পরিচয় এখনো হয়নি, পরষ্পরের নামও আমরা জানি না। তাছাড়া কথাও নিশ্চয় অনেক আছে। এসো আমরা সময়টা কাজে লাগাই।’

আহমদ মুসা খুশি হলো।

কথা শুরু হলো।

সহকারী গোয়েন্দা প্রধান পুরসাত প্রজাদীপকের বিশাল ড্রইংরুম।

একটা সোফায় আহমদ মুসা বসে আছে।

আহমদ মুসা এখন সুস্থ।

হাতের আহত স্থানটা সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেছে, আহমদ মুসা পুলিশ হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর একটা হোটেলে উঠেছে। হোটেল ঠিক করে দিয়েছে সহকারী গোয়েন্দা প্রধান পুরসাত প্রজাদীপক নিজেই। হোটেলটা পুরসাত প্রজাদীপকের বাড়ির কাছেই। পুরসাত প্রজাদীপকের বাড়ি শহরের ভিআইপি অফিসারদের রেসিডেন্সিয়ার এরিয়ার এক প্রান্তে। তার বাড়ির পরেই শহরের অভিজাত কমার্শিয়াল এলাকা। কমার্শিয়াল এলাকার শুরুতেই ব্যস্ত এভিনিউয়ের পাশে আহমদ মুসার অভিজাত হোটেলটি।

আহমদ মুসাকে বসিয়ে 'স্যার চা নিয়ে আসি' বলে বেরিয়ে গেছে বেয়ারা।

আহমদ মুসা হাত ঘড়ির দিকে তাকাল। বেলা ১২টা বাজতে যাচ্ছে। মিনিট পনের দেরী। ১২টায় আসার কথা বলেছেন পুরসাত প্রজাদীপক। তিনি অফিস থেকে আসবেন। খাবেনও আহমদ মুসাকে সাথে নিয়ে। আহমদ মুসা যোহরের নামায আগাম পড়ে বের হয়েছে। বিভেন বার্গম্যানের পরিচয় আহমদ মুসা এদের দিয়েছে। কিন্তু আহমদ মুসার পরিচয় এখনও এরা জানে না। আহমদ মুসা ব্যাংকক আসার আগে আন্দামানে ছিল এটাও এরা জেনে গেছে। ভারতের শীর্ষ পর্যায়ের শুধু কয়েকজন আহমদ মুসার পরিচয় জানে বলে এ পরিচয় এদের কাছে প্রকাশ পায়নি। ব্যাংককের মার্কিন দূতাবাসও আহমদ মুসার ব্যাপারে থাই সরকারকে অবহিত করেছে। আহমদ মুসা বেশ খাতির পাচ্ছে এ সরকারের কাছ থেকে। বিশেষ করে সহকারী গোয়েন্দা প্রধান পুরসাত প্রজাদীপক আহমদ মুসাকে খুবই স্নেহ করে এবং সিটি পুলিশ কমিশনার উদন থানির কারণে পুলিশেরও দারুণ আনুকুল্য পাচ্ছে আহমদ মুসা।

ঝুমুরের মিষ্টি পাতলা শব্দে মুখ তুলল আহমদ মুসা। দেখল ভেতর থেকে ড্রইংরুমে প্রবেশ করছে সহকারী গোয়েন্দা প্রধান পুরসাত প্রজাদীপকের মেয়ে সিরিত থানারতা। বিশ একুশ বছরের বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্রী। পরনে ব্লাউজ ও স্কার্ট। পায়ে দুই ফিতার হাই হিল স্যান্ডেল। দুধে আলতা পায়ের সাথে মানানসই সোনার সোনালী ঝুমুর। হাঁটার তালে তালে পাতলা মিষ্টি শব্দ হচ্ছে।

মেয়েটা এসে আহমদ মুসার পাশের সোফায় বসতে বসতে বলল, ‘স্যার, ভূজ বাহাদুর আপনাকে এভাবে একা ফেলে গিয়ে চা বানাচ্ছে এটা ঠিক করেনি।’

‘না, আমিই ঠিক করিনি। আমি পনের মিনিট আগে এসে গেছি। তোমার আববার সাথে আমার এ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল ১২টায়।’

‘না ঠিক করেছেন স্যার। যা ঘটার ছিল সেটাই ঘটেছে। আমারও কথা বলার সুযোগ হলো আপনার সাথে।’

কথায় ছেদ এনে মুহূর্তকাল থেমেই মেয়েটি আবার বলে উঠল, ‘আপনি সেদিন সাংঘাতিক কাজ করেছেন স্যার। আববা বলেন, তারা যা করতে সাহস করেনি, তাই আপনি করেছেন। আববা আরও কি বলেন জানেন, জীবনের মায়া যাদের আছে, তারা এমন কাজ করতে কখনই এগোয় না। জীবনের মায়া আপনার নেই?’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘জীবনের প্রতি মায়া থাকলেই কি কেউ মৃত্যু এড়াতে পারে?’

‘পারে না। কিন্তু আমি তা বলছি না। আমি বলছি, মৃত্যুকে আলিংগণ করতে যাওয়ার কথা। মৃত্যু ভয় যার মধ্যে আছে, সে এটা পারে না।’ বলল সিরিত থানারতা।

‘আসলে সেদিন আমি মৃত্যুকে আলিংগণ করতে যাইনি। বরং মৃত্যুর হাত থেকে নিজে বাঁচা এবং দুজন শীর্ষ পুলিশ অফিসারকে বাঁচাবার জন্যেই আমি ওটা করেছিলাম।’ আহমদ মুসা বলল।

‘বুঝলাম না।’ বলল মেয়েটি।

‘কথায় কথায় সন্ত্রাসীরা এ কথা বলেছিল যে, যারাই তাদের হাতে ধরা পড়ে, তাদের আর তারা জীবন্ত ছাড়ে না। প্রয়োজনীয় কথা আদায় করা, কিংবা তাদের কাজে লাগিয়ে পরে তাদের তারা হত্যা করে ফেলে। তাদের হাতে বন্দী হওয়ার অর্থ মৃত্যুকে আলিংগন করে নেয়া। সুতরাং আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম মৃত্যুকে আলিংগন করার আগে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে। চেষ্টা আমার সফল হয়। ওরাই মৃত্যুকে আলিংগণ করে।’

মেয়েটির চোখে মুগ্ধ দৃষ্টি। বলল, ‘আতংকের কথাকে আপনি সুন্দর সাহিত্যের ভাষায় বলেছেন। আপনাকে ধন্যবাদ।’

থামল মেয়েটি। তার মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠল। বলল আবার, ‘স্যার, আবার আববার কথায় ফিরে আসি। আববা বলেছেন যে, তাঁদের মত পুলিশেরা যা পারেনি, আপনি তাই পেরেছেন। তার অর্থ কার্যত আপনি আমাদের পুলিশদের চেয়েও বড়। তাহলে আপনি কে, এ প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই ওঠে। আববা বলেছেন, আপনি ‘বিভেন বার্গম্যান’। আমেরিকার নাগরিক। ‘সাকোথাই’ রাজবংশের পাত্তানী শাখার একজন শাহজাদীর আবেদনে আপনি তাদের সাহায্য করতে এসেছেন। কিন্তু এটা আপনার পরিচয় নয়। আসলে আপনি কে?’

আহমদ মুসার মুখে হঠাৎ গাম্ভীর্য নেমে এল। কিছুটা বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে তার মনে। বলল সে, ‘মিস সিরিত। তোমার পিতাও আমার পরিচয় এভাবে জিজ্ঞাসা করেনি। তুমি এতটা আগ্রহী কেন?’

‘ধারালো ও বিস্ময়কর কাজ দেখে তার কথার ওজন পরিমাপ করা যায় না। তার পরিচয়ের সাথে তার কথার ওজন পরিমাপ করা যায়। আমি আপনার পরিচয় জেনে আপনার কথা সম্পর্কে চিন্তা করতে চাই।’ বলল সিরিত থানারতা।

‘আমার কোন কথা সম্পর্কে ভাবতে চাও?’ আহমদ মুসা বলল।

‘পাত্তানী শাহজাদা জাবের বাংগসা জহীর উদ্দিনকে তার সাথীরাই মুক্ত করে নিয়ে গেছে। কিন্তু আপনি বলেছেন যে, তৃতীয় একটা সন্ত্রাসী পক্ষ ধরে নিয়ে গেছে। আপনার কথা সত্য নয়, এটাই আমি ভাবতে চাই।’ বলল সিরিত থানারতা। গম্ভীর এবং সিরিয়াস কণ্ঠ সিরিত থানারতার।

তার কণ্ঠে বিস্মিত হলো আহমদ মুসা। বলল, ‘দুই ধারণার মধ্যে একটা সত্য, একটা মিথ্যা হতেই পারে। কিন্তু তুমি এত সিরিয়াস কেন? তুমি এ নিয়ে এত ভাবছই বা কেন?’

‘আমি চাই, তার সাথীরা তাকে মুক্ত করে নিয়ে গেছে। কিন্তু আপনি অন্যরকম বলছেন। শুনতে কষ্ট লাগছে আমার।’ বলল সিরিত থানারতা। তার কণ্ঠ এবার নরম, বিনীত।

আহমদ মুসা গভীর দৃষ্টিতে তাকাল সিরিত থানারতার দিকে। তার মনে জিজ্ঞাসা, জাবের জহীর উদ্দিনের সাথে সিরিতের সম্পর্ক আছে? জাবের জহীর উদ্দিন ব্যাংককের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত। তাদের মধ্যে পরিচয় হয়ত কোনওভাবে থাকতে পারে। কিন্তু নিছক পরিচয় কি জাবের জহীর উদ্দিনের নিরাপত্তা সম্পর্কে তাকে এতটা উতলা করতে পারে! আহমদ মুসা বুঝতে পারছে সিরিত চাচ্ছে জাবের জহীর উদ্দিন সাথীদের দ্বারা মুক্ত হয়ে এখন নিরাপদ। আহমদ মুসার ধারণা তাকে কষ্ট দিচ্ছে, কারণ; আহমদ মুসার কথা সত্য হলে জাবের জহীর উদ্দিন সন্ত্রাসীদের হাতে বন্দী থাকে। এসব চিন্তা করে বলল আহমদ মুসা, 'মিস সিরিত, বুঝতে পারছি জাবের জহীর উদ্দিনের মঙ্গল চাও। তাহলে আমার কথায় তোমার কষ্ট না পেয়ে খুশি হওয়া উচিত ছিল।'

চোখ ভরা প্রশ্ন নিয়ে সিরিত থানারতা তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'বুঝলাম না আপনার কথা স্যার।'

'জাবের জহীর উদ্দিনকে তার সাথীরা উদ্ধার করে নিয়ে গেছে একথা যদি সত্য হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের যে অভিযোগ এসেছে তাও সত্য প্রমাণ হয়। আর সেদিন ওরা চারজন পুলিশকে হত্যা করে জাবের জহীর উদ্দিনকে উদ্ধার করে নিয়ে গেছে। আগের সেনা হত্যার দায়তো আছেই, এই পুলিশ হত্যার দায়ও বর্তাবে জাবের জহীর উদ্দিনের ঘাড়ে। এর অর্থ জাবের জহীর উদ্দিন পুরোপুরি একজন সন্ত্রাসী নেতা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু আমি চাচ্ছি জাবের জহীর উদ্দিনকে নির্দোষ প্রমাণ করতে।' আহমদ মুসা বলল।

উদ্বেগ-আতংকে চুপসে গেছে সিরিত থানারতার মুখ। তার চিন্তার ভুল তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। কিন্তু আহমদ মুসা যা বলেছে, তাতে জাবের জহীর উদ্দিন কিভাবে নির্দোষ প্রমাণ হবে এটা সে বুঝতে পারছে না। বলল, 'নির্দোষ প্রমাণ হবে কিভাবে?'

'আমি বলেছি, সন্ত্রাসী একটা তৃতীয় পক্ষ জাবের জহীর উদ্দিনকে বাগে নেবার জন্যে তাকে ছিনতাই করেছে। সন্ত্রাসী এই তৃতীয় পক্ষই পাত্তানী অঞ্চলে সন্ত্রাস করছে। সেনানিবাসে হামলা করছে, সেনা সদস্যদের হত্যা করছে এবং এসবের দায় জাবের জহীর উদ্দিনরাসহ শান্তিকামী মুসলমানদের উপর চাপাচ্ছে

তাদের সন্ত্রাসী প্রমাণের উদ্দেশ্যে। জাবের জহীর উদ্দিনকে ওরা ছিনতাই করে নিয়ে গেছে বিশেষ মতলবেই।' আহমদ মুসা বলল।

সিরিত থানারতার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বলল, 'ধন্যবাদ স্যার, আমি বুঝতে পেরেছি স্যার। কিন্তু আপনার কথা আপনার ধারণা, প্রমাণ হবে কি করে?'

'আমি তোমাদের থাই পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগকে এ বিষয়টা বলেছি। জাবের জহীর উদ্দিনের বোন যয়নব যোবায়দার চিঠি আমি তাদের দেখিয়েছি। পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ আমার কথাকে ইতিবাচক হিসাবে নিয়েছে। এ নিয়ে রাজনৈতিক পর্যায়ে আজ বৈঠক হচ্ছে। দেখা যাক কি হয়।' বলল আহমদ মুসা।

'ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করুন।' বলল সিরিত থানারতা।

মুহূর্ত কয়েক থেমেই সিরিত থানারতা বলল, 'আগের প্রশ্নটাই আবার করতে ইচ্ছা করছে, আপনি আসলে কে স্যার? একজন আমেরিকান বিভেন বার্গম্যান কেন এভাবে ছুটে এসেছেন? কেন তিনি এমন আন্তরিকতার সাথে জাবের জহীর উদ্দিনের স্বার্থকে নিজের স্বার্থ হিসাবে গ্রহণ করেছেন?'

'আমার যে পরিচয় পেয়েছ, তা কি যথেষ্ট নয় আমার উপর আস্থার রাখার জনে, মিস সিরিত?' আহমদ মুসা বলল।

'স্যরি স্যার। আমি সে অর্থে বলিনি। কৌতুহল থেকেই এই প্রশ্ন করেছি। আপনার উপর আস্থার জন্যে আপনার কোন পরিচয়ের দরকার নেই।'

সিরিত থানারতার কথা শেষ হবার সংগে সংগেই গাড়ি বারান্দায় গাড়ি পার্ক করার শব্দ হলো। পরক্ষণেই জুতার শব্দ শোনা গেল।

ড্রইংরুমে প্রবেশ করল থাইল্যান্ডের সহকারী গোয়েন্দা প্রধান পুরসাত প্রজাদীপক।

'গুড মর্নিং বিভেন বার্গম্যান। আমি আসার পথে ভাবছিলাম, নিশ্চয় তুমি এসে বসে আছ। তুমি বরং আগেই আসবে, তোমার লেট হবার কথা নয়। কতক্ষণ এসেছ তুমি?'

'১২ মিনিট হলো এসেছি। একটু আগেই আসা হয়ে গেছে।'

'ভালো করেছ।' বলে পুরসাত প্রজাদীপক তাকাল মেয়ে সিরিতের দিকে। বলল, 'ধন্যবাদ মা, তুমি বিভেনকে সঙ্গ দিয়েছ।'

‘এটা তো সৌভাগ্যের ব্যাপার ড্যাড। শুধু দুনিয়া নয়, দুনিয়ার বাইরের কথাও তাঁর কাছ থেকে জানা যায়।’ বলল সিরিত থানারতা।

উঠে দাঁড়াল সিরিত থানারতা। বলল, ‘ড্যাড তুমি বস। আমি দেখি ভুজ বাহাদুর চা আনতে এত দেরি করছে কেন?’

ভেতরে চলে গেল সিরিত থানারতা।

বসল আহমদ মুসার পাশের সোফায় পুরসাত প্রজাদীপক।

‘স্যার আপনি কাপড় ছেড়ে ফ্রেশ হয়ে আসলে ভাল হতো না?’ আহমদ মুসা বলল।

হাসল পুরসাত প্রজাদীপক। বলল, ‘মাঝে মাঝে ইউনিফরম ২৪ ঘণ্টাও গায়ে থাকে। সুতরাং ইউনিফরমে কোন সমস্যা নয়। আর আমি ফ্রেশ আছি। দীর্ঘ মিটিং থেকে বেরিয়ে হাত-মুখ ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি।’

‘ওকে স্যার।’ আহমদ মুসা বলল।

পুরসাত প্রজাদীপক তাকাল নিজের হাত ঘড়ির দিকে। বলল, ‘আমরা একটার দিকে লাঞ্চ খাব।’

‘ঠিক আছে স্যার।’ আহমদ মুসা বলল।

সোফায় গা এলিয়ে দিল পুরসাত প্রজাদীপক। চোখটাও বন্ধ করল। কিন্তু মুহূর্ত কয়েক পরেই আবার সোজা হয়ে বসল। দুই হাঁটুর উপর দুই কনুই রেখে মুখটা একটু নিচু করল। বলল, ‘স্যরি বিভেন বার্গম্যান, তোমার কথা সরকার গ্রহণ করেননি। কোন তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতির বিষয় কোনদিক দিয়ে কোনভাবেই সামনে আসেনি। জাবের বাংগসা জহীর উদ্দিন যে ঘটনায় যেভাবে গ্রেফতার হয়েছে, যে প্রচন্ড ঝুঁকি নিয়ে তাকে উদ্ধার করা হলো, তাতে মাঝখানে তৃতীয় পক্ষের কোন ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়নি এবং এর পক্ষে যুক্তিও যথেষ্ট নয়। থাই সরকারের জাতীয় নিরাপত্তা কমিটির এটাই রায়। স্যরি, বিভেন বার্গম্যান, আমাদের কোন কথা কাজে আসেনি। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি; তুমি যা ভেবেছ সেটাই সত্য। এখন কি করা যায় বল?’

‘ওরা যা চিন্তা করেছেন ওদের জন্যে এটাই স্বাভাবিক। যয়নব যোবায়দার চিঠি, চিঠি পাওয়ার কাহিনী তাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না।

অপরাধীদের একটা আত্মরক্ষার কৌশল একে তাঁরা মনে করতেই পারেন। বিশেষ করে জাবের জহীর উদ্দিনকে মুক্ত করে নিয়ে যাবার সময় রক্তক্ষয়ী ঘটনার ভিন্ন ব্যাখ্যা তাঁদের পক্ষে গ্রহণ করা কঠিন।' ধীর কণ্ঠে আহমদ মুসা বলল।

ভাবছিল সহকারী গোয়েন্দা প্রধান পুরসাত প্রজাদীপক। আহমদ মুসা কথা শেষ করার পরও কোন কথা সে বলল না। একটু পর সে মাথা তুলল। আবার সোফায় গা এলিয়ে বলল, 'তুমি খুব বুদ্ধিমান। বিষয়টা তুমি ঠিক বুঝেছ। কিন্তু এখন তাহলে কি করবে বল।'

'এখন আমি আমার মত করে এগোব স্যার। আমি যয়নব যোবায়দা ও জাবের জহীর উদ্দিনদের সাহায্য করতে চাই।'

'কিন্তু একা কি করবে?'

'কি করতে পারব আমি জানি না। কিন্তু আমি মনে করি এই ভাল কাজে ঈশ্বর নিশ্চয় সাহায্য করবেন।'

'তোমার বিস্ময়কর দক্ষতা-যোগ্যতার সাথে তোমার বিশ্বাসের এই মিশ্রণ এক বিরাট শক্তি হয়ে দাঁড়াতে পারে। এটা অভিজ্ঞতা যে, অনড় বিশ্বাসীরা যদি বুদ্ধি, দক্ষতা ও যোগ্যতার অস্ত্রে সজ্জিত হয়, তাহলে তারা অজেয় হয়ে ওঠে। গত কয়েকদিন ধরে তোমাকে দেখে আমার এই অভিজ্ঞতার কথাই বার বার মনে হয়েছে। আরেকটা কথা বলি বিভেন বার্গম্যান?'

'বলুন স্যার।'

সহকারী গোয়েন্দা প্রধান পুরসাত প্রজাদীপক সোজা হয়ে বসল। বলল, 'বিভেন বার্গম্যান তুমি মুসলিম। তোমার বিভেন বার্গম্যান নামটা ঠিক কিনা জানি না, তবে তুমি আমেরিকান এবং তোমার আমেরিকান ভিআইপি পাসপোর্টে কোন ত্রুটি নেই।'

থামল পুরসাত প্রজাদীপক।

আহমদ মুসা ম্লান হাসল। বলল, 'আপনি অতি অভিজ্ঞ একজন গোয়েন্দা কর্মকর্তা। ছদ্মবেশ আপনার কাছে ধরা পড়বে এটা স্বাভাবিক। সংগত কারণেই আমাকে পরিচয় গোপন করতে হয়েছে, এটাও আপনি নিশ্চয় বুঝবেন।'

'এটা আমার কাছে পরিষ্কার ইয়ংম্যান।'

বলে একটু থেমেই আবার বলা শুরু করল, 'নিষ্ঠাবান মুসলমানদের জন্যে পরিচয় গোপন করা কঠিন বিভেন বার্গম্যান। তোমার কপালে সিজদার চিহ্নই তোমার পরিচয় বলে দিয়েছে। আমি প্রথমে ওটাকে স্কিনের কোন প্রাকৃতিক স্পট মনে করেছিলাম। পরে বুঝেছি, ওটা প্রাকৃতিক নয় সিজদার দাগ।'

'পাসপোর্ট সম্পর্কে নিশ্চিত হলেন কি করে?' আহমদ মুসা বলল।

'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের গোপন ওয়েব সাইট থেকে আমরা এটা জেনেছি। তাছাড়া ইন্ডিয়ার সিবিআই চীফ আমার বন্ধু। তুমি যেহেতু ইন্ডিয়ায় অনেকদিন ছিলে, তাই তাঁকেও আমি তোমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি তোমার উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন এবং তিনি একটি মূল্যবান তথ্য দিয়েছেন যে, তুমি মার্কিন প্রেসিডেন্টের খুব প্রিয়ভাজন লোক। ব্যাংককস্থ মার্কিন দূতাবাসের তোমার ব্যাপারে উদ্বিগ্নতা দেখেও আমি এটা বুঝেছি। তবে সিবিআই চীফ যশোবন্ত যশোরাজ তোমার ব্যাপারে একটা রহস্য রেখে দিয়েছেন। শেষ কথা হিসাবে বলেছেন, বিভেন বার্গম্যানের একটা মূল্যবান পরিচয় তোমাকে দিলাম না, সেটার তোমার প্রয়োজন নেই বলে।'

থামল পুরসাত প্রজাদীপক।

'আমার পরিচয় আপনি যা জানেন, সবাই কি তা জেনেছে?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'আমি এবং আমাদের গোয়েন্দা বিভাগের চীফ ছাড়া আর কেউ জানে না। এটা জানানো হবে না।'

'ধন্যবাদ স্যার। বাড়তি ঝামেলা থেকে আমি বাঁচতে পারব।'

পুরসাত প্রজাদীপক একটু হাসল। বলল, 'বিভেন বার্গম্যান, থাই মুসলমানদের কাছে আমি কিন্তু চরম বিদ্বেষী হিসেবে পরিচিত।'

'কারণ?' ভ্রু কুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার।

'কারণ এই যে, আমি আইন রক্ষা ও আইন প্রয়োগে বিন্দুমাত্র কনসেশন দেই না। বিশ পঁচিশ ভাগ আইনের ভুল ব্যবহারও হয়। এই ভুল ব্যবহারকে উদ্দেশ্যমূলক, বৈষম্যমূলক বলে অভিহিত করা হয়। মুসলমানরা অনেক ক্ষেত্রে এর শিকার হয়েছে। এ সব থেকেই একটা ধারণা সৃষ্টি হয়ে গেছে। চলমান

পরিস্থিতিতে মুসলমানদের ক্ষেত্রে আমি বিশেষ সতর্ক, তারা বিশেষ পর্যবেক্ষণের অধীন। কিন্তু তাদের ব্যাপারে বিদ্বেষ বা বৈষম্যমূলক দৃষ্টি আমার নেই।' বলল সহকারী গোয়েন্দা প্রধান পুরসাত প্রজাদীপক।

'ধন্যবাদ স্যার।' বলল আহমদ মুসা।

'ওয়েলকাম ইয়্যম্যান।' বলে পুরসাত প্রজাদীপক তার হাত ঘড়ির দিকে তাকাল। আবার সোফায় গা এলিয়ে দিল। বলল, 'বিভেন বার্গম্যান, তুমি আমাদের ব্যক্তিগত সাহায্য পাবে। প্রয়োজন হলে, চাইলে যে কোন সময় পুলিশের সাহায্য তোমার জন্য ব্যবস্থা করা হবে। সরকার যাই ভাবুন, তোমার 'তৃতীয় পক্ষ তত্ব' আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। আজকের জটিল বিশ্ব-রাজনীতিতে অনেক দেশেই কোন স্বার্থের পক্ষে ষড়যন্ত্রকারী ও সাবোটিয়ার হিসাবে তৃতীয় পক্ষ সক্রিয় রয়েছে। আমি আন্তরিকভাবেই চাচ্ছি, তোমার এই তত্ব সত্য হোক এবং থাই মুসলমানদের উপর আরোপিত ইলজাম মিথ্যা প্রমাণ হোক।'

'সহযোগিতার এ প্রতিশ্রুতির জন্যে ধন্যবাদ স্যার।' আহমদ মুসা বলল।

'তোমার ঐ 'তৃতীয় পক্ষটি'কে, এ সম্পর্কে তুমি সুনির্দিষ্ট কোন চিন্তা করেছ?' জিজ্ঞেস করল পুরসাত প্রজাদীপক।

প্রশ্নটির সংগে সংগেই জবাব দিল না আহমদ মুসা। তৃতীয় পক্ষ সম্পর্কে তার সুস্পষ্ট একটি ধারণা আছে। তার উপর সেদিন তৃতীয় পক্ষের সন্ত্রাসীদের হাতে ইসরাইলী অস্ত্র এবং সন্ত্রাসীদের মাথায় 'হিব্রু' বর্ণমালা খচিত ক্যাপ দেখে তার ধারণা নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তৃতীয় পক্ষের এই পরিচয়ের কথা আহমদ মুসা ওদের এখনও জানায়নি। আহমদ মুসা আশংকা করছে থাই গোয়েন্দারা এটা জানতে পারলে ইসরাইলী গোয়েন্দারাও কোনওভাবে তা জেনে ফেলতে পারে। আহমদ মুসা চায় না, তৃতীয় পক্ষের অস্তিত্ব ও তাদের পরিচয় মুসলমানদের কাছে ধরা পড়ে গেছে, এটা তারা না জানুক। অপ্রস্তুত অবস্থায় ওদের মুখোশ খুয়ে যাওয়া সবদিক থেকে সুবিধাজনক হবে। এসব চিন্তা করে

আহমদ মুসা বলল, ‘আমরা ওদের ব্যাপারে এখনও শূন্য অবস্থানেই আছি। সামনে এগুলেই সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে বলে আমি মনে করি।’

‘অবশ্যই বিভেন বার্গম্যান। তবে তারা যারাই হোক, তারা থাই বৌদ্ধ এবং থাই মুসলিম কারোরই বন্ধু নয়।’

কথা শেষ করেই উঠে দাঁড়াল পুরসাত প্রজাদীপক। বলল, ‘বিভেন বার্গম্যান। তুমি একটু বস। আমি একটু ঘুরে আসি। আর হ্যাঁ, আমরা ঠিক একটাতেই লাঞ্চ করব।’

পুরসাত প্রজাদীপক হাঁটতে শুরু করল ভেতরে যাবার দরজার দিকে।

দরজা পর্যন্ত পৌছতেই সিরিত থানারতা বাইরে থেকে দৌড়ে ড্রইংরুমে প্রবেশ করল। উত্তেজনা ও কৌতুহল মিশ্রিত তার মুখ। দৌড়রত অবস্থায়ই বলল, ‘স্যার আপনি তো ড্রাইভার আনেন না। আজ কি ড্রাইভার এনেছেন?’

‘না আনিনি। এ কথা কেন বলছ?’

‘একজন প্রফেশনাল ড্রাইভারের ইউনিফরম পরা একজন লোক আপনার গাড়ির পাশ থেকে উঠে যেতে দেখলাম। তার হাঁটার মধ্যে পলাতক চোরের মত আচরণ ছিল। আমার দেখে ভাল মনে হয়নি।

আহমদ মুসা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘ড্রাইভার আসবে কোত্থেকে?’

ওদিকে পুরসাত প্রজাদীপকও ঘুরে দাঁড়িয়েছে। তার মুখেও একই কথা, এ সময় এখানে ড্রাইভার আসবে কোত্থেকে!’

বলে সে ড্রইংরুমের ভেতরে এসে আহমদ মুসার পাশে দাঁড়াল।

‘চলুন দেখে আসি। সন্দেহের শেষ রাখতে নেই। সেল্ফ ড্রাইফের চুক্তিতে আমি গাড়ি ভাড়া নিয়েছি। কোন ড্রাইভার আসার কথা নয়।’

বলে আহমদ মুসা বাইরের দরজার দিকে দ্রুত হাঁটতে শুরু করল। তার পেছনে পুরসাত প্রজাদীপক ও সিরিত থানারতা হাঁটতে শুরু করল।

গাড়ির কাছে পৌছে আহমদ মুসা পকেট থেকে পেন্সিল আকৃতির একটা ডেটোনেটরও বের করল।

অত্যন্ত পাওয়ারফুল এ ডেটোনেটর। মেটাল, বিস্ফোরক, এমনকি প্লাষ্টিক কভার উইপনস পর্যন্ত সে ডিটেক্ট করতে পারে।

গাড়ির কাছাকাছি পৌছতেই ডেটোনেটর বিপ বিপ করা শুরু করল। আর লাল সিগনালও ভীষণ নাঁচতে শুরু করেছে।

সবাইকে দাঁড় করিয়ে আহমদ মুসা বলল, 'গাড়িতে নিশ্চিত বোম পেতে রেখেছে। আপনারা দাঁড়ান, আমি দেখি বোমাটা কোথায় পেতেছে।'

আহমদ মুসা হাঁটতে শুরু করেছে। পুরসাত প্রজাদীপক খপ করে আহমদ মুসার হাত ধরে ফেলল। বলল, 'তোমার গিয়ে কাজ নেই। বোম ডিফিউজ করা বিস্ফোরক এক্সপার্টদের কাজ। আমি ওদের ডাকছি।'

কথা শেষ করেই পুরসাত প্রজাদীপক পুলিশ হেডকোয়ার্টারে টেলিফোন করল। দ্রুত একটি বোম স্কোয়াড পাঠানোর নির্দেশ দিল।

'বোম ডিফিউজ করা নয়, আমি যাচ্ছিলাম বোমটা কোথায় থাকতে পারে দেখতে।' বলল আহমদ মুসা।

'এ গাড়িতে হাত দেওয়াও ঠিক হবে না। পুলিশের বাড়িতে এসেছ, পুলিশের সাথে আছ। অতএব পুলিশী বিধান তোমার মানতে হবে।' বলল পুরসাত প্রজাদীপক।

পুলিশের বোম স্কোয়াড এল।

গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়তেই গাড়ির চার দরজা এক সাথে খুলে গেল। চারজন পুলিশ নেমে এল গাড়ি থেকে।

স্কোয়াডের ইন্সপেক্টর মংগুত এসে স্যালুট করল পুরসাত প্রজাদীপককে।

'গুড ডে ইন্সপেক্টর। ঐ গাড়িটায় বোম পাতা আছে। তোমরা দেখ।' আহমদ মুসার গাড়ির দিকে ইংগিত করে বলল পুরসাত প্রজাদীপক।

ইন্সপেক্টর তার বোম স্কোয়াডের তিন জনসহ এগোলো গাড়িটার দিকে।

তারা প্রথমে ডিটেক্টর দিয়ে গাড়ির চারদিক থেকে গাড়িটা পরীক্ষা করল। তারপর তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করল।

ইন্সপেক্টর মংগুত কয়েক ধাপ হেঁটে সহকারী গোয়েন্দা প্রধান পুরসাত প্রজাদীপকের কাছে এল। বলল, ‘স্যার ড্রাইভিং দরজার ভেতরের অংশে বোম ফিট করা আছে। গাড়ি স্ক্যান না করে গাড়ির দরজা খোলা নিরাপদ নয়। স্ক্যান করলে তবেই বুঝা যাবে ডিফিউজের কি ব্যবস্থা নেয়া যাবে।’

‘ওকে, গো অন।’

বোম স্কোয়াড ব্যাগ থেকে যন্ত্রপাতি বের করে ১ বর্গফুট আয়তন স্ক্রিন বিশিষ্ট একটা স্ক্যানার দাঁড় করিয়ে ফেলল।

গাড়ির চারদিক ঘুরে স্ক্যানিং সম্পূর্ণ করল বোম স্কোয়াড। স্ক্যানিং স্ক্রীনে গাড়ির ভেতরের প্রতি ইঞ্চির বিস্তারিত অবস্থা তারা দেখল এবং এসব দৃশ্যের ফটোও তৈরি হলো।

বোম স্কোয়াডের ইন্সপেক্টর মংগুত এবং সহযোগী তিন জন এল সহকারী গোয়েন্দা প্রধান পুরসাত প্রজাদীপকের কাছে। বলল, ‘স্যার ড্রাইভিং দরজার ভেতরের পাশে বোম পাতা রয়েছে এবং প্রত্যেক দরজার লকের সাথে ডেটোনেটর লাগানো রয়েছে। যে কোন দরজা খুলতে গেলেই বিস্ফোরণ ঘটবে। সুতরাং গাড়ি বাঁচিয়ে বোম ডিফিউজ করা অসম্ভব। এমনকি গাড়িটি ঠেলে স্থানান্তর করতে গেলে যে ঝাঁকুনি লাগবে ডোর লকে, তাতেও বোমের বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।’

‘ডোর লকে কোন ঝাঁকুনি লাগলেই বিস্ফোরণ! একেবারে আট-ঘাট বাধা পরিকল্পনা। মৃত্যু অবধারিত করেছিল গাড়ির মালিকের। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তা হয়নি। কিন্তু গাড়ি তো বাঁচছে না! বলে সহকারী গোয়েন্দা পুরসাত প্রজাদীপক তাকাল আহমদ মুসার দিকে।

‘গাড়ি না বাঁচলে যে ক্ষতি হবে তা পূরণ করা যাবে স্যার। কিন্তু তার আগে ওদের সাথে একটু কথা বলে দেখি স্যার আরও কি করা যায়।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ওয়েলকাম বিভেন বার্গম্যান। দেখ কি করা যায়।’ বলল পুরসাত প্রজাদীপক।

‘তোমাদের কাছে গ্লাস-কার্টার আছে?’ ইন্সপেক্টর মংগুতকে লক্ষ্য করে বলল আহমদ মুসা।

‘আছে স্যার।’ বলল ইন্সপেক্টর মংগুত।

‘গ্লাস ষ্টিকার হুক আছে?’

‘আছে স্যার।’

‘ওগুলো বের কর।’

‘ইন্সপেক্টর নির্দেশ দেবার আগেই তার একজন সাথী ব্যাগে সার্চ করা শুরু করে দিয়েছে। দু’টি জিনিস বের করে সে ইন্সপেক্টরের হাতে দিল।

আহমদ মুসা হাত বাড়িয়ে গ্লাস কাটার ও গ্লাস ষ্টিকার হুক নিয়ে নিল এবং ইন্সপেক্টরকে লক্ষ্য করে বলল, ‘ড্রাইভিং সিটের জানালার গোটা কাঁচ যদি সরিয়ে নেয়া যায়, তাহলে বোম ডিফিউজের কাজ করতে পারবেন না?’

ইন্সপেক্টর মংগুত এতক্ষণে হাসল। বলল, ‘পারব স্যার খুব সহজেই। কিন্তু গ্লাস কাটা ঝুঁকিপূর্ণ হবে স্যার।’

‘তা অবশ্যই। কিন্তু আমি সেটা দেখব।’

বলে আহমদ মুসা গাড়ির দিকে যাবার জন্যে পা বাড়াল।

‘আপনি কেন স্যার? কাজটা ওঁদের করতে দিন।’ বলল সিরিত থানারতা। তার কণ্ঠে উদ্বেগ।

‘না বিভেন বার্গম্যান তোমার দরকার নেই। ইন্সপেক্টররাই ওটা করবেন।’ পুরসাত প্রজাদীপক কতকটা নির্দেশের সুরে কথাগুলো বলে উঠল।

আহমদ মুসা মুখ ফিরাল পুরসতা প্রজাদীপকের দিকে। বলল, ‘স্যার ওরা কাজটাকে ঝুঁকিপূর্ণ মনে করছে। কিন্তু আমি ঝুঁকিপূর্ণ মনে করছি না। সুতরাং কাজটা আমারই করা উচিত।’

বলে হাঁটা শুরু করল আহমদ মুসা।

সিরিত থানারতা উপরের দিকে চেয়ে ভীতকণ্ঠে বলল, ‘গড ব্লেস হিম।’

পুরসাত প্রজাদীপক বলল, ‘সাবধান বিভেন, গড ইজ উইথ ইউ।’

আহমদ মুসা গিয়ে গাড়ির দরজার সামনে দাঁড়াল। আহমদ মুসার পেছনে পেছনে বোম স্কোয়াডের লোকরাও গিয়ে তার পাশে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা ইন্সপেক্টরকে বলল, 'আপার স্ক্যানার সেট করুন। আমি বোম ও ডেটোনেটরের অবস্থা দেখতে চাই।'

সংগে সংগেই দরজার সামনে স্ক্যানার তারা সেট করল।

আহমদ মুসা দেখল বোমাটা ড্রাইভিং সিট ও দরজার মাঝখানের ফ্লোরে আঠালো টেপ দিয়ে সেটে রাখা আছে। বোমের একটি গ্রন্থি থেকে বেরিয়ে আসা চারটি তার গাড়ির চারটি দরজার ডোর লকের দিকে ঢুকে গেছে।

আহমদ মুসা দরজার কন্ডিশন ভালো করে দেখল। গাড়িটা নতুন না হলেও দরজার সেটিং নিখুঁত দেখতে পেল। সুতরাং গাড়ির দরজা যেহেতু নড়বড়ে নয়, তাই জানালার গ্লাস কাটার চাপ দরজার কিছু অংশের উপর একটু বেশি পড়লেও ডোর লকের উপর বিন্দুমাত্রও পড়বে না।

নিশ্চিত হয়ে আহমদ মুসা জানালার গ্লাসের ঠিক মধ্যখানে গ্লাস ষ্টিকার বসিয়ে দিল।

গ্লাস কাটার হাতে নিল আহমদ মুসা।

বোম স্কোয়াডের ইন্সপেক্টর মংগুত বলে উঠল, 'স্যার খুব সাবধান! খুব সেনসেটিভ ডেটোনেটরও আছে। যা সামান্য কম্পন তাড়িত হয়েও বিস্ফোরণ ঘটায়।'

সহকারী গোয়েন্দা প্রধান পুরসাত প্রজাদীপক ও সিরিত থানারতাও আহমদ মুসার অনেকটা কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। পুরসাত প্রজাদীপক অনুরোধের স্বরে বলল, 'গাড়ির দাম বেশি নয়, বোম সমেত কার ধ্বংস করা হোক। তুমি এসব করতে যেয়ো না।'

পুরসাত প্রজাদীপক থামতেই সিরিত থানারতাও বলল, 'প্লিজ স্যার, বোম স্কোয়াড যাকে ঝুঁকিপূর্ণ বলছে, সে কাজ আপনি করবেন না।'

আহমদ মুসা পেছন ফিরে তাকাল। বলল, 'স্যার আমার লক্ষ্য বোমটা আস্ত পাওয়া। তাতে জানা যাবে এটা কোথা থেকে সাপ্লাই হয়েছে।'

সহকারী গোয়েন্দা প্রধান বিস্ময়ের সাথে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। তার মনে একটা আকস্মিক তোলপাড়ঃ যে ভাবনা পুলিশের ভাবার কথা ছিল, সেটা বিভেন বার্গম্যান ভাবছে!

কিছু বলতে যাচ্ছিল পুরসাত প্রজাদীপক। কিন্তু আহমদ মুসা তার আগেই হেসে উঠে বলল, 'গাড়ির দরজার যে কন্ডিশন, তাতে কাঁচ কাটতে যে প্রেশার পড়বে সেটা ডোর-লক পর্যন্ত পৌছাবে না। শুধু ডোর লকের কাছাকাছি বাম প্রান্তটা কাটা একটু ঝুঁকিপূর্ণ। তবু আমি মনে করি কাটারকে যদি কৌশলে ব্যবহার করা যায়, তাহলে ডোর লকে বিন্দুমাত্র চাপও পড়বে না।'

'যদি কৌশলে ব্যবহার করা না যায়?' শুকনো মুখে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল সিরিত থানারতা।

'সেভাবে ব্যবহার করা যাবে বলেই তো কাটতে যাচ্ছি।' বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা ঘুরে গাড়ির দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা বিসমিল্লাহ বলে স্থির হাতে কাটার ধরে কাটারের শীর্ষ কৌণিক পয়েন্টকে বাঁ প্রান্তের মাথায় গ্লাসের বুকে সেট করল। আহমদ মুসা ঝুঁকিপূর্ণ প্রান্তকেই প্রথমে কাটার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গ্লাসের উপর কাটারের শীর্ষ কৌণিক এমনভাবে সেট করেছে যাতে সর্বনিমণ পরিমাণ স্থানের উপর কাটারের চাপ লম্বভাবে পড়ে। কাটার সেট করেই আহমদ মুসা তা এক টানে জানালার বটম পর্যন্ত নিয়ে এল।

না কিছুই ঘটল না।

আলহামদুলিল্লাহ বলে আহমদ মুসা এরপর টপ ও বটম প্রান্ত কেটে ফেলল। সবশেষে গ্লাস ষ্টিকারের হুক ধরে রেখে ডান প্রান্ত কেটে ফেলল। বাঁ হাত দিয়ে জানালার গ্লাসটি টেনে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়াবার আগেই পেছন থেকে সিরিত থানারতা বলে উঠল, 'থ্যাংক গড, ওয়েল কাম স্যার, কনগ্রাচুলেশন।'

'ওয়েলকাম সিরিত।' বলে আহমদ মুসা বোম স্কোয়াডকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'ইন্সপেক্টর আপনারা কাজ শুরু করতে পারেন।'

'থ্যাংক ইউ স্যার।' বলে ওরা কাজে লেগে গেল।

সহকারী গোয়েন্দা প্রধান পুরসাত প্রজাদীপক তৎক্ষণাত কিছু বলেনি। চোখ ভরা বিস্ময় নিয়ে সে তাকিয়েছিল আহমদ মুসার দি। বোম স্কোয়াড কাজ

শুরু করলে পুরসাত প্রজাদীপক আলতোভাবে আহমদ মুসার পিঠে হাত রেখে বলল, 'তুমি নিশ্চয় বোমটাও ডিফিউজ করতে পারতে?'

'স্যার, এটুকু জানি বিভিন্ন ধরনের বোম কিভাবে ডিফিউজ করতে হয়।' বলল আহমদ মুসা।

'কি জান না বলতো? তোমার ব্যাপারে বিস্ময় বাড়ছেই বিভেন বার্গম্যান।'

'জানার বিষয় যে দুনিয়াতে কত, তা আমরা কেউ জানি না। জানা গেলে সবচেয়ে জ্ঞানী যে ব্যক্তি সে হয়ত বলতো আমি যা জানি, তা কিছু না জানার কাছাকাছি।' বলল আহমদ মুসা।

'কঠিন কথাও তুমি সুন্দর করে বলতে পার বিভেন বার্গম্যান।' পুরসাত প্রজাদীপক বলল।

কিছু বলতে যাচ্ছিল সিরিত থানারতা। কিন্তু তার আগেই গাড়ির ওখান থেকে ইন্সপেক্টর মংগুত বলে উঠল, 'থ্যাংক গড, বোমকে ডিফিউজ করা গেছে।'

বলে সে ছুটে এল আহমদ মুসার কাছে। বলল, 'স্যার আপনার কাছ থেকে আমরা একটা পুরনো শিক্ষা নতুন করে পেলাম যে, সংকট সমাধানের একটা না একটা পথ অবশ্যই থাকে, তাকে খুঁজে বের করতে হয়। আপনাকে ধন্যবাদ স্যার।'

'বোম ডিফিউজ করার জন্যে তোমাদের ধন্যবাদ ইন্সপেক্টর।'

'সেই সাথে ধন্যবাদ ঈশ্বরকে যে, তিনি বিভেন বার্গম্যানের জীবন বাঁচিয়েছেন।'

কথা শেষ করেই ইন্সপেক্টর মংগুতকে লক্ষ্য করে বলল, 'তুমি পুলিশ ষ্টেশনে খবর দাও। তারা আসুক কেসটা রেকর্ড করুক। ড্রাইভারের ছদ্মবেশে একজন এসে গাড়িতে বোম পেতে যায়। আমাদের গেটের দারোয়ানের ষ্টেটমেন্ট নিতে হবে। গেটের টিভি ক্যামেরার রেকর্ড থেকে ড্রাইভার লোকটার ফটো নিতে হবে। সে মনে হয় আশে-পাশে কোথাও ওঁৎ পেতে আছে গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটেছে তা নিজ চোখে দেখে যাওয়ার জন্যে। তদন্তের কাজ এখনই শুরু করতে হবে।'

একটু থামল পুরসাত প্রজাদীপক। বলল, ‘ইন্সপেক্টর, আমরা ভেতরে আছি।’

ঘুরে দাঁড়াল পুরসাত প্রজাদীপক আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘চলো বিভেন বার্গম্যান, চলো মা সিরিত।’

হাঁটতে লাগল পুরসাত প্রজাদীপক। তার পিছনে আহমদ মুসা ও সিরিত থানারতাও হাঁটতে শুরু করল।

আহমদ মুসা চলা শুরু করেই সিরিত থানারতাকে বলল, ‘আমি কৃতজ্ঞ মিস সিরিত। তুমি আমার জীবন বাঁচাতে সতর্ক করেছ।’

সিরিত থানারতা বিস্মিত চোখে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘কিভাবে স্যার?’

‘গাড়ি থেকে নকল ড্রাইভারকে পালাতে তুমিই দেখেছ এবং তাকে তুমি সন্দেহ করেছ। এই সন্দেহ থেকেই এই বোম উদ্ধার হলো।’ বলল আহমদ মুসা।

‘কিন্তু আমার এখনও বিস্ময় লাগছে স্যার তাকে আমার সন্দেহ হলো কেন? কেনই বা মনে হলো যে, ছুটে গিয়ে কথাটা আমার বলা দরকার। মনে হচ্ছে ভেতর থেকে কেউ একজন এসব করিয়েছে। স্যার এটা ঈশ্বরেরই কাজ।’ সিরিত থানারতা বলল।

‘ঠিক বলেছ সিরিত। এমনটা ঘটে। তবে ভাগ্যিস তুমি ওখানে ছিলে। কিন্তু বুঝতে পারছি না, তুমি তো ভেতরে চলে গিয়েছিলে, ওখানে গেলে কখন?’ বলল আহমদ মুসা।

সিরিত থানারতা তাকাল আহমদ মুসার দিকে। নিজের আঙুলে চাপ দিয়ে সামনে তার পিতার দিকে ইংগিত করে একটু দাঁড়াতে বলল।

আহমদ মুসা দাঁড়াল।

সিরিত থানারতা তার কণ্ঠ নামিয়ে বলল, ‘স্যার আমি আড়ি পেতে আপনাদের কথা শুনছিলাম। জাবের জহীর উদ্দিনের ব্যাপারে সরকার কি ভাবছে তা জানার জন্যে অপেক্ষা করতে পারছিলাম না। তবে দুঃখ পেয়েছি, সরকারের সিদ্ধান্তের শুনে। কিন্তু অন্য একটা লাভ হয়েছে। আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি মুসলমান। আমি খুশি হয়েছি।’

‘কেন?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘কারণ, জাবের বাংগসা জহীর উদ্দিনও মুসলমান। আমি এখন নিশ্চিত যে, সরকারের কথা যাই হোক জাবের জহীর উদ্দিনরা আপনার মত মিরাকল লোকের সাহায্য পাবে।’ সিরিত থানারতার শেষের কথাগুলো ভারী হয়ে উঠেছিল। সেই সাথে তার চোখ দু’টিও সজল হয়ে উঠেছিল।

‘ভেব না সিরিত, সব ঠিক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।’ সান্তনার কণ্ঠ আহমদ মুসার।

‘স্যার, আজ আপনার কথা শোনার পর ভাবনা অনেক কমেছে। কিছুক্ষণ আগে আপনার ও আববার আলোচনায় আরও আশান্বিত হয়েছি। তবু স্যার, কষ্ট মন থেকে যাচ্ছে না। স্যরি।’ কাঁপা কণ্ঠ সিরিত থানারতার।

‘ধৈর্য্য ধরতেই হবে সিরিত। আজ আল্লাহ যেমন তোমার মধ্যে কথা বলে উঠেছেন, যেভাবে তিনি আজ আমাদের সাহায্য করেছেন, সেভাবেই তিনি আমাদের সাহায্য করবেন।’ আহমদ মুসা বলল।

সিরিত থানারতা রুমাল দিয়ে চোখ ভাল করে মুছে নিয়ে বলল, ‘ধন্যবাদ স্যার। চলুন আমরা পিছিয়ে পড়েছি।’

ড্রইং রুমে ঢোকার মুখেই ভুজ বাহাদুরকে পাওয়া গেল। তাকে বলল পুরসাত প্রজাদীপক, ‘টেবিলে খাবার লাগিয়েছ?’

‘স্যার খাবার লাগিয়েও সরিয়ে নেয়া হয়েছিল, আবার লাগানো হচ্ছে। মাত্র পাঁচ মিনিট লাগবে। স্যার।’

‘আচ্ছা। তুমি ওদিকে দেখ।’ ভুজ বাহাদুরকে এ কথাগুলো বলে সোফায় বসে পড়ল পুরসাত প্রজাদীপক। বলল সে আহমদ মুসাকে, ‘এসো আমরা একটু বসি।’

‘স্যার, এই ফাঁকে আমি নামাযটা পড়ে নিতে চাই।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ও, তোমাদের মধ্যাহ্নের একটা নামায তো আছে। তা নামাযের জায়গাটা কোথায় হলে চলবে?’ পুরসাত প্রজাদীপক বলল।

‘যে কোন জায়গায়। একটু খালি মেঝে হলেই ভাল হয়।’ বলল আহমদ মুসা।

‘মা সিরিত, ওকে ওপাশের রুমটায় নিয়ে যাও। রুমটা খালি আছে, মেঝেও পরিষ্কার।’

‘ধন্যবাদ স্যার।’ বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

সিরিত থানারতাও উঠেছে। বলল, ‘স্যার আপনাদের নামায দিনে পাঁচবার হয়, ঠিক না?’

আহমদ মুসা সিরিত থানারতার পেছনে হাঁটতে হাঁটতে বলল, ‘হ্যাঁ।’

‘স্যার আপনাদের ধর্মে নিয়মিত অনেক ধর্মীয় আচার পালন করতে হয়, কিন্তু তা সহজ। কিন্তু আমাদের ধর্মে কোন ধর্মীয় কাজ নেই, দায়িত্বের ভার নেই, কর্তব্যের তাড়া নেই।’ সিরিত থানারতা বলল।

‘সেটাই তো ভাল।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ভাল কোথায় স্যার। মাঝে মাঝেই মনে হয়, ধর্মের কাজ যখন নেই, তখন ধর্মটা কেন! বিশ্বাসকে যৌক্তিক ও জীবন্ত রাখার জন্যে যদি কোন কাজ বা দায়িত্ব-কর্তব্য না থাকে, তাহলে বিশ্বাসও এক সময় হারিয়ে যায়। তাই হচ্ছে স্যার। আমরা আর নিজেকে বৌদ্ধ বলে গৌরব বোধ করি না।’

‘নো-কমেন্ট।’

‘কমেন্ট আপনি করবেন কেন, আমিই তো করলাম।’

বলে একটা দরজার সামনে থমকে দাঁড়াল। বলল, ‘স্যার খালি রুম এটাই।’

‘আমার তো খালি রুম দরকার নেই, দরকার কয়েক ফুট মেঝের। ধন্যবাদ সিরিত।’

আহমদ মুসা ঘরে ঢুকে গেল।

সিরিত ফিরে এল ড্রইং রুমে। বসল পিতার পাশে। বলল, ‘আববা, তোমার বোম স্কোয়াড কিন্তু গাড়ি সমেত বিস্ফোরণ ঘটানো ছাড়া বোম ডিফিউজের উপায় বের করতে পারেনি। মি. বিভেন সেটা পেরেছে।’

‘সেটাই ভাবছি সিরিত। যতই বিভেনকে দেখছি, বিস্ময় বাড়ছে। জানালার কাঁচ সরিয়ে বোম ডিফিউজ করার বুদ্ধিই শুধু সে বের করেনি, যে

জানালার গ্লাস কাটার ঝুঁকি নিতে সাহস করেনি আমাদের বোম স্কোয়াড, সেই কাজ সে অদ্ভুত দক্ষতার সাথে করেছে।' বলল পুরসাত প্রজাদীপক।

'কিন্তু আববা আমার কাছে এর চেয়েও বড় বিস্ময়ের হলো, একজন আমেরিকান মুসলমান পাত্তানীর একটি চিঠি পেয়ে তাদের সাহায্য করতে ছুটে এল একা!' সিরিত থানারতা বলল।

'বিস্ময়ের তো বটেই, কিন্তু মা, সে যে এ ধরনের দায়িত্ব নেয়ার উপযুক্ত তা সে ইতিমধ্যেই প্রমাণ করেছে।'

এ সময় গেটের সিকিউরিটি গার্ডম্যান ড্রইংরুমের দরজায় এসে ভেতরে আসার অনুমতি চাইল।

সে অনুমতি নিয়ে ভেতরে এসে একটি চিঠি পুরসাত প্রজাদীপকের হাতে দিয়ে বলল, 'স্যার এটা মেহমান বিভেন বার্গম্যানের জন্যে চিঠি।'

পুরসাত প্রজাদীপক চিঠিটি হাতে নিয়ে বলল, 'ঠিক আছে ওঁকে দিয়ে দেব।'

সিকিউরিটি চলে গেল।

চিঠিটি একটি চিরকুট।

চিরকুটটি হাতে পেয়েই ভ্রু'কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে সহকারী গোয়েন্দা প্রধান পুরসাত প্রজাদীপকের। অপরাধের বিভিন্ন ধারার সাথে পরিচিত পুরসাত প্রজাদীপক ভালো করেই জানে, এমন অবস্থায় এ ধরনের চিরকুট কোন ভাল খবর নিয়ে আসে অথবা বহন করে খারাপ কোন সংবাদ।

চিরকুটটির ভাঁজ খুলে চোখের সামনে তুলে ধরল।

এই সময় নামায শেষে ড্রইং রুমে প্রবেশ করল আহমদ মুসা।

পুরসাত প্রজাদীপক তাকে স্বাগত জানিয়ে বলল, 'এসো বিভেন বার্গম্যান। তোমার কাছে একটা চিরকুট এসেছে। তুমিই পড়।'

'আহমদ মুসা পুরসাত প্রজাদীপকের পাশের সোফায় বসতে বসতে বলল, 'আমার নামে চিরকুট?' আহমদ মুসার কণ্ঠে বিস্ময়।

পুরসাত প্রজাদীপক আহমদ মুসার হাতে চিরকুট তুলে দিয়ে বলল, 'গেট থেকে আমাদের সিকুরিটির লোক দিয়ে গেছে। তাকে এইমাত্র কে একজন লোক এটি দিয়ে গেছে।'

আহমদ মুসা চিরকুটটি হাতে নিয়ে দ্রুত তার ওপর চোখ বুলাল। আহমদ মুসার ঠোঁটে একটা হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'স্যার যারা বোম পেতেছিল আমাকে মারার জন্যে, তারাই এই চিরকুটটি পাঠিয়েছে।' পড়ছি শুনুনঃ

''বিভেন বার্গম্যান, বোমের হাত থেকে বেঁচে গেছ, আনন্দ করে নাও। জেনে রাখ, আমাদের 'ব্ল্যাক ঈগল'' যার উপর নজর ফেলে, সে আর বাঁচে না। তোমাকে বোমায় মারার সিদ্ধান্ত আমরা পাল্টেছি। তুমি আমাদের ১১ জনকে হত্যা করেছ। তোমার দেহকে আমরা এগার টুকরো করব। তবে মার্কিন নাগরিক হিসেবে তোমাকে একটা সুযোগ দিচ্ছি। তুমি কাল সকালের আগে যদি থাইল্যান্ড ত্যাগ করো, তাহলে তোমার মৃত্যুদন্ডাদেশ রহিত হয়ে যাবে।'

চিঠি পড়া শেষ করে আহমদ মুসা বলল, 'চিঠিতে কারও দস্তখত নেই। দস্তখতের স্থানে একটা 'ব্ল্যাক ঈগল' আঁকা। ঈগলটি সোজা উর্ধমুখী হয়ে ক্রিসেন্টের পেটে বসে আছে। ক্রিসেন্টের দু'টি বাহু ঈগলটির দু'পাশ দিয়ে উঠে দু'বাহুর দু'প্রান্ত যেখানে কাছাকাছি পৌছেছে, সেখানে একটি তারকা। তারকার ছয়টি বাহু। আর......।'

'থাক বিভেন বার্গম্যান। চিঠির মনোগ্রাম নয়, চিঠির বক্তব্যের দিকে এসো।' আহমদ মুসার কথার মাঝখানে বলে উঠল পুরসাত প্রজাদীপক।

'সাংঘাতিক-সর্বনাশা চিঠি এটা। কিছু করতে হবে।' বলল সিরিত থানারতা। তার মুখ ভয়ে-উদ্বেগে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

'ঠিক তাই মা। মারাত্মক চিঠি। সাংঘাতিক দুঃসাহস ওদের। পুলিশ কর্মকর্তার বাড়িতেও ওরা এভাবে চিঠি পাঠাতে পারে! কিন্তু বিভেন বার্গম্যান তুমি এ নিয়ে ভাবছ বলে তো মনে হচ্ছে না?' বলল পুরসাত প্রজাদীপক।

'স্যার আমার তো চিন্তার কিছু নেই। ওরা কিভাবে কোথায় আমাকে আক্রমণ করবে, এটা ওদের চিন্তার বিষয়। ওদের পরিকল্পনা আমার জানা

থাকলে তা নিয়ে চিন্তা করতাম। কিন্তু সেটা তো জানি না।' আহমদ মুসার কণ্ঠ গম্ভীর।

'কিন্তু সাবধান তো হতে হবে। এজন্যে চিন্তা করা দরকার।' বলল পুরসাত প্রজাদীপক।

'স্যার ওরা সর্বোচ্চ পর্যায়ের পুলিশ কর্মকর্তার বাসায় এসে গাড়িতে বোম পেতেছে, চিরকুট পাঠিয়ে থ্রেট করে গেছে। সাবধান হওয়ার আর জায়গা কোথায় থাকল স্যার?' আহমদ মুসা বলল।

যদি তাই তোমার বিশ্বাস হয়, তাহলে কাল সকালের আগেই থাইল্যান্ড থেকে চলে যাও বিভেন বার্গম্যান। তুমি খুব ভাল ছেলে, আমাদের অশেষ উপকার করেছ। তোমার কোন ক্ষতি আমরা সহ্য করতে পারবো না। ওদের শত্রুতা আমাদের সাথে। আমরা ওদের দেখে নেব।'

পুরসাত প্রজাদীপক থামতেই সিরিত থানারতা বলে উঠল, 'উনি যাবেন কেন আর যেতে বলছই বা কেন? তাঁকে নিরাপত্তা দেয়া তো তোমাদের কাজ।'

'আমি পালাব না মিস সিরিত। আমাকে এগার টুকরো করতে হলে তো তাদের আমার কাছে আসতে হবে, গায়ে হাত দিতে হবে। আমারও ওদের কাছে যাওয়া প্রয়োজন, জানা প্রয়োজন। না হলে জাবের জহীর উদ্দিনকে আমি উদ্ধার করব কি করে?' বলল আহমদ মুসা নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে।

সিরিত থানারতার বিস্ময়-বিস্ফোরিত চোখ আহমদ মুসার উপর নিবদ্ধ। তার ভাবনা, বিভেন বার্গম্যানের মনটা কি পাথরের তৈরি? সেখানে কোন ভয় প্রবেশ করে না? এই সাংঘাতিক অবস্থায় এভাবে এমন কথা সে বলতে পারে কি করে!

পুরসাত প্রজাদীপকও তাকিয়েছে আহমদ মুসার দিকে। তার চোখে মুগ্ধ দৃষ্টি। বলল, 'ধন্যবাদ, বিভেন বার্গম্যান, তুমি ঠিক তোমার মতই কথা বলেছ। তুমি নিশ্চিত থাক, আমার সবরকম সহযোগিতা তোমার সাথে আছে। কিন্তু বিভেন বার্গম্যান, অবশেষে চিঠির 'ব্ল্যাক ঈগল' এবং জাবের জহীর উদ্দিন যদি এক হয়ে যায়, তাহলে কেমন হবে?'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘এটা হওয়া অসম্ভব স্যার। ‘ব্ল্যাক ঈগল’ এর আজকের চিঠিও প্রমাণ করছে, ‘ব্ল্যাক ঈগল’ এবং জাবের জহীর উদ্দিনরা আলাদা।’

‘কিভাবে?’ উৎসুক কণ্ঠে বলল পুরসাত প্রজাদীপক।

‘চিঠির মনোগ্রামে ব্ল্যাক ঈগলের চারপাশে ক্রিসেন্টের বেষ্টন থাকলেও মনোগ্রামের শীর্ষে ক্রিসেন্টের দু’বাহুর মুখোমুখি হওয়ার জায়গায় দেখুন ছয় কোণের একটি তারকা। ছয় কোণের এই তারকা ইহুদীদের প্রতীক। এই তারকা মনোগ্রামটির শীর্ষে রয়েছে এবং এই তারকাই মনোগ্রামের মৌল পরিচয়। ‘ব্ল্যাক ঈগল’ মুসলিম সংগঠন হলে মনোগ্রামে এই চিহ্ন অবশ্যই ব্যবহৃত হতো না।’ আহমদ মুসা বলল।

ঠিকই বলেছ বিভেন বার্গম্যান। ইহুদীদের তারকার ছয়টি কোণ মুসলমানদেরর তারকায় পাঁচটি কোণ। মুসলিম সংগঠনের মনোগ্রামে ছয় কোণের তারকা ব্যবহৃত হতে পারে না। কিন্তু বিভেন বার্গম্যান এতে তো দুঃশ্চিন্তা আরও বেড়ে গেল। সিআইএ এবং পশ্চিমা গোয়েন্দা সংস্থা সমূহের সাহায্য এখনও তারা পায়। সে কারণে এখনও তারা অদম্য। তারা করতে পারে না এমন কিছু নেই। আজকের ঘটনা এবং এই চিঠিও তার একটা প্রমাণ। সুতরাং আমি মনে করছি বিভেন বার্গম্যান। এটাই ভাল যে, তুমি কাল সকালের মধ্যে চলে যাও। যুদ্ধে কৌশলগত পশ্চাৎ অপসরণ দোষের নয়।’ বলল পুরসাত প্রজাদীপক গম্ভীর কণ্ঠে।

‘ধন্যবাদ স্যার, আপনি আমার নিরাপত্তার কথা আন্তরিকভাবে ভাবছেন। কিন্তু স্যার আগেই বলেছি, আমি আমার মিশন শেষ না করে চলে যাবো না। আমি আপনাদের ঝুঁকির মধ্যে ফেলবো না স্যার। আমি আমার মত করে চলতে বাধা পাব না, এটুকু নিশ্চয়তা শুধু আপনার কাছ থেকে চাই।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তুমি আমাকে ভুল বুঝো না বিভেন বার্গম্যান। তোমাকে সাহায্য করার নীতিগত সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছে। আমি ওদের আলটিমেটাম এড়াবার জন্যেই তোমাকে ঐ পরামর্শ দিচ্ছিলাম। এরপরও তুমি এগোতে চাইলে আমাদের সাহায্য তুমি পাবে। দেশের সব পুলিশ অফিস, পুলিশ ষ্টেশনে অবস্থানের সুযোগ তুমি

পাবে, তুমি চাইলে পুলিশ শক্তিকেও তোমার পাশে পাবে।' বলল পুরসাত প্রজাদীপক।

'আপনাদের সাহায্য আমার দরকার হবে, কিন্তু পুলিশের আশ্রয় কিংবা পুলিশের যানবাহন আমি ব্যবহার করবো না।' আহমদ মুসা বলল।

'কেন?' জিজ্ঞাসা সিরিত থানারতার।

'পুলিশ ও পুলিশের অবস্থান সকলের চোখের সামনে থাকে। সুতরাং আমাকে খুঁজে পাওয়া ও আমার উপর চোখ রাখা সহজ হবে। এতে করে তারা তাদেরকে আমার চোখের আড়ালে রাখতে পারবে।' আহমদ মুসা বলল।

'তোমার এ কথা ঠিক বিভেন বার্গম্যান। কিন্তু তুমি হোটেল-রেষ্টহাউজে থাকতে গেলেও তো তাদের নজরে পড়ে যাবে।' বলল পুরসাত প্রজাদীপক।

'তবু এটা নিরাপদ, এ ঠিকানা তাদের অনেক খুঁজে বের করতে হবে, কিন্তু পুলিশ ষ্টেশন তাদের খুঁজতে হবে না।'

পুরসাত প্রজাদীপকের মুখে একটা সহজ হাসি ফুটে উঠল। চোখে তার প্রশংসার দৃষ্টি। কিছু বলার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিল। তার কথায় বাধা দিয়ে সিরিত থানারতা বলল, 'আর কোন কথা নয় এখন। খেতে খেতেও বাকি কথা বলতে পারবেন। উঠুন খেতে চলুন।'

'ঠিক বলে মা' বলে পুরসাত প্রজাদীপক উঠে দাঁড়াল। আহমদ মুসাও।

গাড়ি করে হোটেলে ফিরছিল আহমদ মুসা। জানালার কাঁচ কাটা সেই গাড়িটা নিয়ে।

আহমদ মুসা তখন গাড়িটা নিয়ে ভাবছিল। গাড়িটা হোটেলের একটি পর্যটন সংস্থার। বিরাট ক্ষতি হয়েছে গাড়ির। বেশ অর্থ দন্ড দিতে হবে তাকে। অবশ্য পুরসাত প্রজাদীপক ইতিমধ্যেই টেলিফোনে সংস্থাটিকে জানিয়ে দিয়েছে দুর্ঘটনার কথা। পুলিশ বিভাগই যে গাড়ির ক্ষতিপূরণ দেবে জানিয়ে দিয়েছে সেটাও। কিন্তু আহমদ মুসা পুলিশের এ অফার গ্রহণ করতে রাজি হয়নি।

হাউজিং পেরিয়ে বড় রাস্তায় এসে পড়ল আহমদ মুসার গাড়ি। এ রাস্তার ওধারেই আহমদ মুসার হোটেল। কিন্তু অনেকটা পথ ঘুরে সেখানে পৌছতে হবে।

রাস্তায় তখন গাড়ির প্রচন্ড ভিড়। দাঁড়িয়ে পড়ল আহমদ মুসার গাড়ি। রাস্তায় গাড়ির স্রোতে প্রবেশ করতে হলে উপযুক্ত স্পেসের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। আহমদ মুসার দৃষ্টি ছিল সামনে। একটা ভাঁজ করা কাগজ এসে পড়ল আহমদ মুসার কোলের উপর। টের পেল আহমদ মুসা। ভাঁজ করা কাগজটির দিকে একবার তাকিয়েই আহমদ মুসা খোলা জানালা দিয়ে পেছন ফিরে তাকাল। এই মাত্র হ্যাট মাথায় পরা একজন লোক তার গাড়ি অতিক্রম করে গেছে। নিশ্চয় সেই কাগজটা ফেলে গেছে।

পেছন দিকে তাকিয়ে সেই হ্যাটওয়ালাকে দেখতে পেল আহমদ মুসা। হ্যাঁ, দেখেই বুঝল একজন মেয়ে সে। কালো ফুল প্যান্ট, লাল হাফ হাতার শর্ট সার্ট, মাথায় বাদামী কালারের হ্যাট। মেয়েটি খুব নিশ্চিন্তে হাঁটছে। বুঝল মেয়েটি শত্রু নয়।

বিস্মিত আহমদ মুসা তার চোখ ফিরিয়ে নিল। কোল থেকে কাগজটি তুলে নিল। ভাঁজ খুলে কাগজটি মেলে ধরল চোখের সামনে।

কাগজটি একটা চিঠি। পরিষ্কার ইংরেজিতে লেখা। পড়ল আহমদ মুসাঃ

'আপনার একাধিক প্যান্ট ও সার্টের সাথে সুচাগ্র সাইজের ট্রান্সমিটার লাগানো আছে। আপনার লাগেজ ব্যাগেও তা লাগানো থাকতে পারে। আপনি যেখানেই থাকেন, যেখানেই যান, শত্রুরা ট্রান্সমিটারের সিগন্যাল অনুসরণ করে আপনাকে লোকেট করতে পারবে। প্রতি পদে তাদের পক্ষে আপনাকে অনুসরণ করা সম্ভব।'

আপনার একজন শুভাকাঙক্ষী

স্বাভাবিক বিস্ময়ের এক অক্টোপাস এসে আহমদ মুসাকে ঘিরে ধরল। শত্রুপক্ষের নজরে সে আছে, কিন্তু এতটাই ঘেরাও সে তাদের দ্বারা! কি করে এটা সম্ভব হয়েছে!

আহমদ মুসা হোটেলের রেন্ট-এ-কার কর্নারে নেমে গাড়িটা সংশিস্নষ্ট কোম্পানিকে জমা দিয়ে ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করে প্রবেশ করল পাশের একটি

পেশাকের দোকানে। দোকানটি শুধু পোশাকের নয়, হোটেলের একজন অতিথি তার নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহারের যা চাইতে পারে তার প্রায় সবই আছে। আহমদ মুসা দুই সেট পোশাকসহ আন্ডারওয়্যার থেকে শুরু করে গেঞ্জি, মোজা, জুতা সবই কিনল। দোকান থেকে বেরিয়ে উঠে এল হোটেলের লবীতে। গিয়ে দাঁড়াল রিসেপশনের পাশে বুকিং কাউন্টারে। বলল কাউন্টারের লোকটিকে, 'আমার হিসাবটা দিন। এখনই পাওনা মিটিয়ে দেব। আমি চারটার মধ্যেই চলে যাব।'

'ওকে স্যার' বলে লোকটি কম্পিউটারের হিসাব কষে হিসাবের কাগজ আহমদ মুসার হাতে দিল।

আহমদ মুসা টাকা পরিশোধ করে লিফটের দিকে চলল। পেছন থেকে একজন বেয়ারা পাশে এসে বলল, 'স্যার আপনি যাচ্ছেন, আমি আসব?'

আহমদ মুসা তার দিকে একবার তাকিয়ে বলল, 'এসো।'

দশতলার নিজের কক্ষে চলে এল আহমদ মুসা।

কয়েক মিনিটের মধ্যে বয়ও এসে পৌছল ঘরে। ঢুকেই বলল, 'স্যার আপনার তো লাগেজ রেডি হয়নি। এইমাত্র বাইরে থেকে আসলেন। আমি কি সাহায্য করব?'

তাকাল আহমদ মুসা বেল বয়ের দিকে। বলল, 'ঠিক আছে। একটু কষ্ট কর।'

পরে থাকা গায়ের সবকটা পোশাক খুলে নতুন কেনা সেটের একটি পরে নিয়েছিল আহমদ মুসা।

নতুন ব্যাগ গুছিয়ে নিচ্ছিল আহমদ মুসা। পুরনো কিছুই এ ব্যাগে তুলল না। চিরুনী, টুথ ব্রাশের মত জিনিসও নয়। এসব কিছুই আহমদ মুসা নতুন কিনে নিয়ে এসেছে।

বেল বয়টি পুরনো ব্যাগে কাপড়-চোপড়সহ সবকিছু গুছিয়ে তুলেছিল। বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, 'এত তাড়াতাড়ি টিকিট পেয়ে গেলেন স্যার, কোন এয়ার লাইন্সের টিকিট?'

বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের মত উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা। তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল বেল বয়ের দিকে। প্রথমেই যে বিষয়টি তার কাছে বড় হয়ে উঠল সেটা হলো ছেলেটি

তার সম্পর্কে অনেক কিছুই জানে। সে আজ যাচ্ছে, এটা সে জানে এবং তাড়াহুড়া করে তার চলে যাওয়া প্রয়োজন, এ বিষয়টাও তার জানা। এর এই অর্থ যে, ব্ল্যাক ঈগলের সাথে এর কোন রকম সম্পর্ক আছেই। তার পোশাক পরিচ্ছদ ও লাগেজে এমন ব্যাপক 'ট্রান্সমিটার' স্থাপন করা হোটেলের একাধিক লোকের সাথে 'ব্লাক ঈগলের'-এর যোগসাজস ছাড়া সম্ভব হয়নি। এই বেল বয় কি তাদের মধ্যে একজন?

আহমদ মুসার হাত প্যান্টের পকেটে চলে গেছে। বেরিয়ে এল রিভলবার নিয়ে। রিভলবার সোজা বেল বয়টির দিকে তাক করল। এগিয়ে গেল তার দিকে।

বেল বয়টি ভূত দেখার মত উঠে দাঁড়িয়েছে। তার দু'চোখ ভয়ে বিস্ফোরিত।

'তোমার নাম কি?' জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা। কঠোর কণ্ঠ তার।

'এ্যারন।' শুকনো কণ্ঠে আটকা গলায় বলল বেল বয়।

নাম শুনে আহমদ মুসার চোখে আনন্দের এক নতুন ঝিলিক দেখা গেল।

'এই হোটেলে 'ব্ল্যাক ঈগলে'র কয়জন আছ তোমরা?'

আহমদ মুসা এ্যারনের কপালে রিভলবার ঠেকিয়ে বলল, 'বলবে, না মরবে?'

মুখ তুলল বেল বয় এ্যারন। বলল সে, 'বলছি স্যার। আমরা দু'জন আছি। একজন লন্ড্রীতে, আমি বেল বয়।' মরার মত ফ্যাকাশে হয়ে গেছে তার মুখ।

'আমার পোশাক-লাগেজে 'ট্রান্সমিটার' বসিয়েছে কে?'

'আমরা দু'জনেই। লন্ড্রীতে এবং রুমে।'

'কেন?'

'আমরা করতে বাধ্য হয়েছিলাম।'

'কে বাধ্য করেছিল?'

'ব্ল্যাক ঈগল'-এর মি. আইজ্যাক।'

'কে এই আইজ্যাক?'

‘চিনতাম না। ব্যাংকক সেন্ট্রাল সিনাগগে তার সাথে আমাদের পরিচয় হয়।’

‘তিনি কি থাইল্যান্ডের মানুষ?’

‘না। তিনি ইংরেজি ও হিব্রু ভাষায় কথা বলেন।’

‘বললে তোমাদের বাধ্য করা হয়েছিল। কেন বাধ্য হয়েছিলে?’ বলল আহমদ মুসা।

‘বলেছিল যে তাদের পরিচয় আমরা জেনে গেছি। এখন হয় তাদের সাথে থাকতে হবে, নয়তো মরতে হবে আমাদের রাজি হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।’ বলল বেল বয় এ্যারন।

‘তিনি বা তারা কোথায় থাকেন? কিভাবে তোমাদের যোগাযোগ হতো তাদের সাথে?’

‘তারাই যোগাযোগ করতেন। কোথায় থাকেন জানি না। সিনাগগে কোন কোন শনিবারে তাদের দেখা যায়।’

‘তারা কেমন লোক বলে তোমাদের মনে হয়?’

‘ভালো মনে হয়নি স্যার।’

‘কিন্তু তারা তোমার জাতি ভাই।’

‘এখানে জাতির প্রশ্ন নয় স্যার। প্রশ্ন ন্যায়-অন্যায়ের। তাদের কথা না শুনলে তারা আমাদের হত্যা করতে চেয়েছিল?’

‘ঠিক আছে, লাগেজ বাধা শেষ কর। আমার তাড়া আছে।’ রিভলবার পকেটে রেখে বলল আহমদ মুসা।

বেল বয় এ্যারনের চোখে-মুখে আশার আলো ফুটে উঠল। বলল, ‘স্যার আমাকে মাফ করে দিয়েছেন?’

‘কি করব, তোমার দোষ খুঁজে পেলাম না।’

‘কিন্তু স্যার, তারা আমার সামনে একজনকে গুলী করে মেরেছিল। তার অপরাধ ছিল সে ঐ দিন আপনার গাড়িতে বোমা ফিট করতে পারেনি আপনি আগাম এসে পড়ায়।’

‘তুমি এ খবরও জান?’

‘হোটেলের পাশের পার্কে এ ঘটনা ঘটেছে। ডিউটি টাইমের বাইরে সময় পেলে আমরা ওখানে গিয়ে আড্ডা দিয়ে থাকি। ইদানিং কখনো কখনো তিনিও ওখানে যেতেন।’

‘ঠিক আছে, শেষ কর কাজ।’ বলে আহমদ মুসা নতুন ব্যাগটা গোছানো শেষ করে তালা লাগিয়ে ব্যাগটি পাশে নিয়ে সোফায় বসল।

বেল বয় এ্যারন তার ব্যাগ গোছানোর কাজ শেষ করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ‘স্যার একটা কথা বলব?’

‘বল।’

‘স্যার আপনি তাদের মত নন। তারা আপনার জানের দুশমন কেন?’

‘তারা আমার সামনে থেকে একজনকে কিডন্যাপ করেছে। আমি তাকে মুক্ত করার চেষ্টা করতে গিয়ে ঘটনাক্রমে তাদের কয়েকজন লোক আমার হাতে মারা গেছে। এরপরও লোকটিকে মুক্ত করা যায়নি।’

‘স্যার ওদের গল্পে আমি একজনকে ধরে রাখার কথা শুনেছি।’

‘কিভাবে কি বলেছিল তারা?’

‘মোবাইলে কারও সাথে কথা বলার সময় বলেছিল, বন্দীকে আমরা ব্ল্যাক ফরেষ্টের ঘাটি থেকে পাত্তানী জংগলের কাতান টেপাংগোর ঘাটিতে নিয়ে গেছি। কাজের অনেক সুবিধা হবে।’

ব্ল্যাক ফরেষ্টের নাম শুনে মনে মনে চমকে উঠল আহমদ মুসা। ব্যাংককের পশ্চিমে সীমান্ত ঘেষে শতাধিক মাইলের বিশাল এই ফরেষ্ট। ব্ল্যাঙ্ক টংকু পর্বতমালার অংশ এটা। যে তথ্য পাওয়া গেছে তাতে জাবের জহীর উদ্দিনকে ঐ ফরেষ্টের কোন ঘাঁটিতে রাখা হয়েছিল। এই ঘাঁটির সন্ধানেই বের হতে যাচ্ছিল আহমদ মুসা। ভীষণ খুশি হলো আহমদ মুসা এ্যারনের কাছে এই তথ্য পেয়ে। আহমদ মুসা বলল, ‘ধন্যবাদ এ্যারন, তুমি একটা ভালো তথ্য দিয়েছো। চলো আমরা বের হই। নতুন এ ব্যাগটা আমি হাতে রাখছি। ওটা তুমি নাও।’

আহমদ মুসা হোটেলের গাড়ি বারান্দায় এসে দেখল, প্রথম দিনের ক্যাব ড্রাইভার ভূমিবল দাঁড়িয়ে আছে।

খুশি হলো আহমদ মুসা। বলল, 'কেমন আছ ভূমিবল? সেই যে তোমার বাড়ি থেকে এসেছি, আর দেখা নেই। এ গাড়িটাই বুঝি নতুন কিনলে।'

আহত আহমদ মুসা পুলিশ হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হবার পর প্রথম কাজ হিসেবে গিয়েছিল ভূমিবলের বাড়িতে। ধ্বংস হওয়া গাড়ির যে ব্যাংক ঋণ বাকি ছিল, সেটা পরিশোধ করে আরেকটা নতুন গাড়ি কেনার টাকা সে গিফট করেছিল। ভূমিবলের মা ও বোন সাকোনার সাথেও তার পরিচয় হয়েছিল।

'জি স্যার' বলে ভূমিবল কৃতজ্ঞতা সূচক কিছু বলতে যাচ্ছিল। আহমদ মুসা তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'আমার তাড়া আছে। তুমি কি এয়ারপোর্টে যাবে?'

'অবশ্যই স্যার।'

আহমদ মুসা পাশে দাঁড়ানো 'এ্যারন'কে বলল, 'তোমার হাতের ব্যাগটা ভূমিবলের পাশের সিটে দিয়ে দাও।' বলে আহমদ মুসা এ্যারনের হাতে একশ ডলারের নোট গুজে দিয়ে হাতের ব্যাগটা নিয়ে ভূমিবলের পেছনের সিটে উঠল। ষ্টার্ট নিল গাড়ি।

হোটেল থেকে বেরিয়ে চলতে শুরু করেছে গাড়ি। ভূমিবল বলল, 'স্যার ম্যাডাম সিরিত ও সাকোনা অপেক্ষা করছে। ওদিক দিয়ে যাব কি?'

'কোথায় ওরা? কি করে জানল আমি এয়ারপোর্টে যাচ্ছি?'

'সাকোনা ম্যাডাম সিরিতের কাছ থেকে শুনে আমাকে টেলিফোন করেছে।'

'বুঝেছি, গোয়েন্দারা পুরসাত প্রজাদীপককে জানিয়েছে। ঠিক ওদের বলে দাও ওরা সিরিতের বাড়িতে অপেক্ষা করুক। আমি এয়ারপোর্ট থেকে ওখানে ফিরব।'

'তার মানে আপনি বিমানে কোথাও যাচ্ছেন না। তাহলে এয়ারপোর্টে কেন?'

'কিছু লোককে বুঝাবার জন্যে যে, আমি বিমানে দেশ ছেড়েছি। আমি এয়ারপোর্ট থেকে ফিরে আসব। আমাকে ডিপারচার পার্কিংএ নামিয়ে তুমি এ্যারাইভাল পার্কিং-এ চলে যাবে। আমি ডিপারচার লাউঞ্জ থেকে এ্যারাইভাল

লাউঞ্জে যাবো। এ্যারাইভাল লাউঞ্জে যাবার সময় তুমি তোমার পাশের ব্যাগটা আবর্জনার কন্টেইনারে ফেলে দিয়ে যাবে।’

ব্যগাটার দিকে একবার তাকিয়ে সে তার দুচোখ কপালে তুলে বলল, ‘বুঝলাম না স্যার।’

‘ওটা তুমি পরে জানবে। এখন তুমি বল, পাত্তানী অঞ্চলে তুমি কখনও গেছ কিনা।’

‘জি গিয়েছি স্যার। এ বছরও একবার গিয়েছি।’

‘এখন কি ব্যাংককের বাইরে যাবার জন্যে প্রস্তুত আছ তুমি? যাবে কি আমার সাথে পাত্তানী অঞ্চলে?’

‘পাত্তানী কেন আপনার সাথে কোথাও যেতে আমার আপত্তি নেই স্যার।’

‘ধন্যবাদ ভূমিবল। এবার স্পীড বাড়াও। তাড়াতাড়ি এয়ারপোর্ট থেকে ফিরে পাত্তানী যাত্রা করব।’

গাড়ির স্পিড বেড়ে গেল।

এয়ারপোর্ট রোড ধরে ছুটে চলল গাড়ি।

‘মাফ করবেন স্যার, ব্যাগটার ব্যাপারে কৌতুহল আমার যাচ্ছে না।’ বলল ভূমিবল দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘গায়ের নতুন পোশাক ও নতুন ব্যাগের জিনিসপত্র ছাড়া যে সব কাপড়-চোপড় আমি পড়েছি, সব আছে ঐ ব্যাগে। ওগুলো অপয়া হয়ে গেছে ভূমিবল।’

‘বুঝলাম না স্যার। পোশাকের কি দোষ হলো?’

‘শুধু পোশাক নয়, ঐসব কাপড়-চোপড়সহ ব্যাগ এবং হয়ত ব্যবহার্য সব কিছুতেই শত্রু পক্ষ সিগনালিং ট্রান্সমিটার সেট করেছে। এসব নিয়ে আমি যেখানেই যাব ট্রান্সমিটারের সিগন্যাল অনুসরণ করে ওরা আমাকে খুঁজে বের করতে পারবে। সেই জন্যে পুরনো সবকিছুই ফেলে দেয়া দরকার।’

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই ভূমিবল দ্রুতকণ্ঠে বলল, ‘এই কথা আমি সাকোনার কাছেও শুনেছি স্যার।’ এই মাত্র সে আমাকে বলল, ‘স্যার বিরাট ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়েছেন। তাঁর কাপড়-চোপড়, জিনিসপত্রে শয়তানরা

অটোমেটিক সিগন্যাল-চিপস সেট করেছে। যখন ইচ্ছা তার কাছে পৌছতে তাদের কোন অসুবিধা নেই। এই বিষয়টা নাকি সে আজ আপনাকে জানিয়েছে।'

'কি বললে, সাকোনা আমাকে জানিয়েছে? আজ!' বিস্ময় আহমদ মুসার চোখে-মুখে।

'জি, স্যার।'

আহমদ মুসা মুহূর্তকাল চিন্তা করল। বলল, 'আচ্ছা আমার গাড়ির জানালা দিয়ে একটা চিরকুট ফেলে দিয়ে উল্টো দিকে চলে গিয়েছিল একজন মেয়ে। পেছনে তাকিয়ে দেখেছিলাম, কালোপ্যান্ট, হাফ হাতা লাল সার্ট এবং বাদামী কালারের হ্যাট। তাহলে সে সাকোনা ছিল।'

'ঠিক স্যার। সে এখনও ঐ পোশাকেই আছে।'

'ভূমিবল, সে আমার অসীম উপকার করেছে। কিন্তু সে জানল কি করে? আর ঐ সময় সে যাচ্ছিল কোত্থেকে?'

'সে এই হোটেলে চাকরি করে স্যার। ভোরে ডিউটিতে এসেছিল।' বলল ভূমিবল।

'বুঝেছি। দাও ওর মোবাইল নাম্বারটা। ওকে একটা ধন্যবাদ দেই।'

ভূমিবল তার মোবাইলে 'সাকোনা'কে কল করে মোবাইলটা আহমদ মুসাকে দিয়ে বলল, 'স্যার কথা বলুন।'

আহমদ মুসা মোবাইলটি হাতে তুলে নিল।

কথা বলল সাকোনার সাথে।

# ৪

অদ্ভুত একটা জায়গা।

দু'পাহাড়ের মাঝখানে উঁচু পাথুরে-উপত্যকা।

উপত্যকাটা খুব বড় নয়।

পঞ্চাশ বর্গগজের বেশি হবে না।

এর উত্তর ও দক্ষিণে পাহাড়ের দেয়াল। পশ্চিমে ছোট্ট একটা গভীর হ্রদ। আর পূর্বে বিরাট জলাভূমি। এ জলাভূমি দক্ষিণে এগিয়ে গেছে পাত্তানী নদী পর্যন্ত। এখান থেকে পাত্তানী নদীর দূরত্ব ১০ কিলোমিটারের মত..... যেখানে পাত্তানী নদী একটা হ্রদে গিয়ে পড়েছে। পাত্তানীর সবচেয়ে নিকটবর্তী শহর 'ইয়ালা' এখান থেকে ৫০ কিলোমিটারের মত দূরে।

দু'পাহাড়ের কোলের এই ছোট্ট পাথুরে উপত্যকার আকাশটা আরও অদ্ভুত। দু'দিক থেকে পাহাড়ের মাথাটা কার্নিসের মত এগিয়ে এসে উপত্যকার আকাশকে ঢেকে দিয়েছে।

এই উপত্যকায় গড়ে উঠেছে একটা পাথুরে বাড়ি। বাড়িটা কতকটা দুর্গের ষ্টাইলে তৈরি।

বাড়িটার একটা কাহিনী আছে। পাত্তানী অঞ্চলের মুসলিম সালতানাতগুলো যখন থাই রাজার অধীনে চলে যায়, তখন রাজ্যচ্যুত সুলতান আবদুল কাদির কামালুদ্দিন জংগলে পালিয়ে এসে বিদ্রোহী তৎপরতা শুরু করেন। তিনিই সে সময় মালয়েশিয়া সীমান্তের কাছাকাছি দীগন্ত প্রসারী ঘন জংগলের মধ্যে দু'পাহাড়ের মাঝখানের এই দুর্গম স্থানে তাঁর বিদ্রোহের রাজধানী গড়ে তোলেন। পরবর্তী কালে তার সশস্ত্র আন্দোলন যখন অস্ত্র পরিত্যাগ করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ফিরে আসে, তখন বিদ্রোহের রাজধানী পরিত্যাগ করে তারা চলে যায় এবং বাড়িটা চোর-ডাকাত ও বেআইনি কাজের আড্ডা হয়ে দাঁড়ায়। এখানে আসা-যাওয়ার মাধ্যম হলো নৌকা বা অন্য কোন জলযান।

একটা সুন্দর বোট এসে উপত্যকার পূর্ব তীরে নোঙর করল।

পানির লেভেল থেকে উপত্যকার সারফেস প্রায় বিশ ফিট উপরে। স্থানান্তরযোগ্য একটা সিঁড়ি দিয়ে উঠা-নামা করা যায়।

নিচে বোট থেকে কিংবা দূর থেকে উপত্যকটার বাড়িটা দেখা যায় না। গোটা পাহাড় এবং পাহাড়ের গা ঘন বনে আচ্ছাদিত।

বোটটা উপত্যকায় ভীড়তেই বোটের কেবিন থেকে বেরিয়ে এল প্রায় ৬ ফুট লম্বা তীরের মত ঋজু দেহের একজন মানুষ।

সে কেবিন থেকে বেরিয়ে আসতেই মাঝারী শব্দে তিনবার তিন নিয়মে বোটটার হর্ন বেজে উঠল।

সংগে সংগেই ক্রেন জাতীয় কিছুর মাথা উপত্যকার ফ্লোরের বাইরে বেরিয়ে এল। ক্রেনের মাথায় প্রায় গার্ড বক্সের মত বড় ষ্টিল বক্স। সেই বক্স থেকে নেমে এল লিফট, একেবারে বোটের ওপর। বোটের কেবিন থেকে বেরিয়ে আসা লোকটি লিফটে উঠে বসল।

লিফট উঠে এল উপরে।

ক্রেনটি গুটিয়ে গিয়ে লিফটিকে বাড়িতে প্রবেশের গেটে নামিয়ে দিল।

গেট থেকে লাল পাথরের একটা রাস্তা সোজা এগিয়ে একটা উঁচু বারান্দার সিঁড়িতে গিয়ে পৌছেছে। এই রাস্তার দু'পাশে সারিবদ্ধ ঘর। ঘরগুলোর দরজা ও জানালা জাতীয় গবাক্ষগুলো দেখলে মনে হয় এগুলো দুর্গমুখের প্রতিরক্ষা আয়োজনের অংশ। গবাক্ষগুলো দিয়ে বন্দুক ব্যবহার করা যায়, কামানও ব্যবহার করা যায়।

গেটের ভেতরে দু'পাশে দু'জন প্রহরী দাঁড়িয়ে ছিল।

বোট থেকে উঠে আসা লোকটি ডিজিটাল লক ব্যবহার করে গেট খুলে ভেতরে প্রবেশ করতেই সামরিক কায়দায় স্যালুট দিল।

লোকটি এগোলো লাল রাস্তা ধরে উঁচু বারান্দার দিকে। গেটের চারজন প্রহরীর  দু'জন চলল তার পিছু পিছু।

পাঁচ ধাপের সিঁড়ি ভেঙে বারান্দায় উঠে লোকটি ধীর পায়ে গিয়ে দাঁড়াল বারান্দা পেরিয়ে বন্ধ দরজার সামনে।

সংগে সংগে দরজা খুলে গেল।

সোফায় সাজানো ঘরটি।

একটি সোফায় বসেছিল তিনজন লোক। ভদ্র পোশাক, কিন্তু খুনি চেহারা।

লোকটি ঘরে ঢুকতেই তিনজনই উঠে দাঁড়াল।

'মি. আশের, লেভিকে দেখছি না। সে কোথায়?'

তিন জনের একজনকে লক্ষ্য করে বলল লোকটি।

তিনজনের যে লোকটি সামনে ছিল, সে হাতের গগলসটা পকেটে রেখে বলল, 'মি. হাবিব হাসাবাহ স্যার, আপনার নির্দেশক্রমে লেভিকে পাত্তানীতে আসা আগন্তুককে অনুসরণ করার জন্যে পাঠানো হয়েছিল। সে ফেরেনি, কোন খবরও দেয়নি। আমরা এখানে আসার পূর্ব পর্যন্ত তাকে পাত্তানী শহর, ও সুলতান গড়সহ আশে-পাশের সব এলাকায় খুঁজেছি। পাওয়া যায়নি তাকে।'

কথার ওপর কোন মন্তব্য না করে হাবিব হাসাবাহ সামনের দরজার দিকে হাঁটতে শুরু করে বলল, 'এসো তোমরা।'

হাবিব হাসাবাহ প্রবেশ করল যে ঘরে, সেটা একটা বড় অফিস কক্ষ।

ঘরের মাঝখানে বড় একটি টেবিল। টেবিলের সামনে চারটে চেয়ার। টেবিলের ওপাশে একটি বড় রিভলভিং চেয়ার রয়েছে। তার বাম পাশে সাইড টেবিলে একটা কম্পিউটার। কম্পিউটারের ওপাশে সাইড টেবিলে একা সুইচ বোর্ড রাখা। তাতে নানা রঙের ও আকারের অনেকগুলো সুইচ।

হাবিব হাসাবাহ গিয়ে রিভলভিং চেয়ারে বসল। বসতে বলল ওদের তিনজনকে সামনের চেয়ারে।

হাবিব হাসাবহ থাইল্যান্ডের 'ব্ল্যাক ঈগল'-এর প্রধান। সে লেবাননের ইহুদী বংশোদ্ভুত। আমেরিকায় সে বড় হলেও অনর্গল আরবী বলতে পারে। আরবী পোশাক পরলে তাকে একজন জবরদস্ত আলেম বলে মনে হয়। মানুষের মধ্যে ঘুরে বেড়ানোর সময় আলেমের পোশাকই সে পরিধান করে।

'পাওয়া যায়নি তাকে, এর অর্থ কি তোমরা মনে করছ?' বসেই প্রশ্ন করল হাবিব হাসাবাহ।

আশের নামের লোকটি বলল, 'অন্তত সে স্বাধীন অবস্থায় নেই স্যার।'

'না সে বন্দী নেই। তোমরা ভুলে যাচ্ছ কেন, সে বন্দী থাকলে সিগন্যাল পাঠাবার মত ব্যবস্থা তার কাছে আছে।' বলল হাবিব হাসাবাহ।

'স্যরি স্যার, বিষয়টা আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম। আপনার কথাই ঠিক স্যার, সে বন্দী নেই।' বলল বসে থাকা তিনজনের মাঝের জন।

'কিন্তু ড্যান, এটা ঠিক না হলেই ভাল হতো।' হাবিব হাসাবাহ বলল।

'স্যরি স্যার।' বলল ড্যান।

আশের, ড্যান এবং অন্যজন লাদিনো-এই তিনজনই হাবিব হাসাবাহর দক্ষিণ হস্ত। এই তিনজনই মিসরীয় ইহুদী। কিন্তু তারা লেখাপড়া করেছে আমেরিকায়। এরা আঞ্চলিক আরবীও অনর্গল বলতে পারে, এই নামগুলো তাদের প্রকৃত নামের অংশ। কিন্তু প্রকাশ্যে এই নাম ব্যবহার হয় না। বাইরের জন্যে তাদের চমৎকার মুসলিম নাম রয়েছে। 'আশের'-এর মুসলিম নাম শেখ আবু দাউদ, ড্যান-এর নাম শেখ আমর ঈসা এবং লাদিনোর নাম শেখ আলী ইলিয়াস। হাবিব হাসাবহারও বাইরের পরিচয় শেখ হাবিব হাসাবাহ।

'ঠিক আছে। আগন্তুক সম্পর্কে কি জান তোমরা?'

'তার ব্যক্তি পরিচয় সম্পর্কে কিছুই জানতে পারিনি স্যার। তাকে আমরা প্রথম দেখি চাস্ফুতে। নিয়ম অনুযায়ী আমাদের লোকরা 'চাস্ফু' জংশনে রেল ও সড়কপথে আসা নতুন লোকদের ওপর নজর রাখছিল। নাখো সান্তান থেকে আসা বাস পরিবর্তনের জন্যে নামা একজন শিখ যাত্রী আমাদের লোকদের বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একজন শিখ যুবক সে। মাথায় বাদামী পাগড়ী মুখ ভরা দাড়ি। গায়ে ইংলিশ পোশাক একদম আধুনিক শিখ। কিন্তু এলাকার কিছুই চেনে না। এমনকি ট্রেন থেকে নেমে কোন দিকে যাবে কি করবে এটা নিয়েও দ্বিধায় পড়েছিল। পদে পদে জিজ্ঞাসা করে সামনে এগুচ্ছিল। সুযোগ বুঝে আমাদের লোকরা তার কাছে যায় এবং তাকে সাহায্য করার সুযোগ নেয়। যাত্রী পরিচয়ে তার সাথেই বাসে ওঠে লেভি। সর্বশেষ যোগাযাগ হয় তার সাথে মোবাইলে। ফটথালং বাস ষ্টেশনের গাড়ি থেকে সে আমাকে মোবাইলে জানায়, লোকটির নাম বাজাজ সিং। পাত্তানী শহরের জন্যে টিকিট করলেও তার আগেই সুলতান গড়ে

সে নামবে। আমি আমার মুসলমান নাম 'জহীর উদ্দিন' বলেছি। তাতে তার কোন প্রতিক্রিয়া বুঝিনি। এ পর্যন্ত তার সাথে কথা বলে কিছুই আদায় করতে পারিনি। তবে সন্দেহের বিষয় হলো, সুলতান গড়ে কোথায় যাবে এই প্রশ্ন সে এড়িয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, সে-ই আমাকে প্রশ্ন করেছে বেশি। তার প্রশ্নের মূল বিষয় হলো, এদিকের আইন-শৃঙ্খলা কেমন, কিছু সংঘর্ষের ঘটনা মানুষকে সবচেয়ে বেশি আলোড়িত করেছে ইত্যাদি। লেভি'র এই কথাগুলো স্যার আমাকেও সন্দিগ্ধ করে তোলে। আমি তাকে বাজাজ সিংকে অনুসরণ করা অব্যাহত রাখতে বলি। এখানেই তার সাথে আমার কথা শেষ হয়। তারপর ঘণ্টা দুয়েক পর্যন্ত তার কোন টেলিফোন না পেয়ে আমিই তাকে টেলিফোন করি। কিন্তু তার কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। সুলতান গড়ে আমরা যাই। কিন্তু তার সন্ধান মেলেনি।'

দীর্ঘ বক্তব্য দিয়ে থামল ড্যান।

'তুমি ঠিকই বলেছ ড্যান, কথাগুলো সন্দেহের। সংঘর্ষগুলো কেন এবং কোন ঘটনা বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, এসব তো পত্র-পত্রিকা থেকেই জানা গেছে। সে প্রশ্ন করে তা জানার চেষ্টা করল কেন? তার মানে সে অন্য কিছু জানতে চায়। এমনও হতে পারে যে, পরে আরও আলোচনা হয়েছে এবং আরও কিছু জানাজানি হয়েছে। তার ফলে কিছু ঘটে থাকতে পারে। এখন প্রয়োজন বাজাজ সিংকে খুঁজে বের করা।' বলল হাবিব হাসাবাহ।

'স্যার, বিভেন বার্গম্যান কি সত্যি চলে গেছেন?' প্রশ্ন করল লাদিনো।

'বৃটিশ এয়ারওয়েজের হিথ্রোগামী একটি ফ্লাইটে বোর্ডিং কার্ড সে নেয়। যাত্রী তালিকায় তার নাম আছে, এ খবর আমি পেয়েছি। সুতরাং ঐ ব্যাপারে সন্দেহ করার এখনও কিছু ঘটেনি।' হাবিব হাসাবাহ বলল।

কথা বলার জন্য মুখ খুলেছিল ড্যান। হাবিব হাসাবাহ তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'এ প্রসঙ্গ আপাতত থাক।' এরপর বলল, 'বিবৃতিটি জাবের জহীর উদ্দিনকে দিয়ে সই করিয়েছ?'

মুখ বিমর্ষ হয়ে উঠল ড্যানের। বলল, 'সই' করানো যায়নি স্যার। তার এক কথা তোমাদের কোন সহযোগিতা আমরা করব না। তাকে বাধ্য করার জন্য

যা করা প্রয়োজন, তা আমরা করেছি। সে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছে, কিন্তু সে রাজি হয়নি।’

‘তাকে নিয়ে এসো।’ নির্দেশ দিল হাবিব হাসাবাহ।

সংগে সংগেই আশের ও ড্যান ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অল্পক্ষণ পরেই জাবের জহীর উদ্দিনকে নিয়ে তারা ঘরে প্রবেশ করল।

বাইশ-তেইশ বছরের যুবক জাবের জহীর উদ্দিন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। সোনালী গায়ের রং। তার মধ্যে চাইনিজ চেহারাই বেশি স্পষ্ট। পরতে গ্যাবাডিন জাতীয় কাপড়ের প্যান্ট। গায়ে সার্ট নেই, একটা জ্যাকেট মাত্র। বোতাম খোলা। মাথার চুল ছোট। আঁচড়ানো নয়।

জাবের জহীর উদ্দিনকে নিয়ে ওরা ঘরে ঢুকতেই হাবিব হাসাবাহ তার বাম পাশের সাইড টেবিলে রাখা সুইচ বোর্ডের একটা সুইচ টিপে দিল। সংগে সংগেই তার টেবিলের ডান দিকে একটু দূরে মেঝের একটা অংশ সরে গেল এবং সেই সুড়ঙ্গ পথে বড় আকারের হাতল ওয়ালা চেয়ার উঠে এল। চেয়ারের সাথে নানা রকম তারের সংযোগ। হাবিব হাসাবহ আরেকটা সুইচ টিপতেই চেয়ারটির ওপর চোখ ধাঁধানো বাল্ব নেমে এল ছাদের দিক থেকে।

‘জাবেরকে চেয়ারে বসিয়ে দাও আশের।’ হাসাবাহ বলল ভারী গলায় আদেশের সুরে।

আশের ও ড্যান জাবেরের দু’হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে বসাল সেই চেয়ারে।

জাবের একটুও আপত্তি না করে বসল চেয়ারে। তাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। কিন্তু চোখ দু’টি বড় উজ্জ্বল।

হাবিব হাসাবাহ তার চেয়ার একটু ঘুরিয়ে নিয়ে মুখোমুখি হলো জাবের জহীর উদ্দিনের। বলল, ‘জাবের তুমি ষ্টেটমেন্ট সই করোনি কেন?’

‘আমি তোমাদের জঘন্য ষড়যন্ত্রের সহযোগী হবো, তা তোমরা ভাবলে কি করে?’ বলল জাবের জহীর উদ্দিন দৃঢ়কণ্ঠে।

‘তুমি তো আমাদের সহযোগিতা করছ। খুবই মূল্যবান সহযোগিতা। সেদিন তোমার আঙুল কেটে তার রক্তে তোমার জামা রাঙিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেটা আমাদের খুব কাজ দিয়েছে।’

‘কি কাজ দিয়েছে?’ বিস্ময়ের সুরে বলল জাবের জহীর উদ্দিন।

‘সেটা শুনে তোমার কাজ নেই। শোন ষ্টেটমেন্টে স্বাক্ষর করা এবং ভিডিও ক্যামেরার সামনে কিছু বলে আমাদের সহযোগিতা তোমাকে করতে হবে।’ শক্ত কণ্ঠ হাবিব হাসাবাহর।

‘আমি আমার কথা বলে দিয়েছি, জ্ঞানত এবং প্রত্যক্ষভাবে কোন সহযোগিতাই আমি তোমাদের করব না। তোমরা মুসলমানদের শত্রু, ইসলামের শত্রু, আমাদের মাতৃভূমি থাইল্যান্ডের শত্রু।

হো হো করে হাসল হাসাবাহ। বলল, ‘শত্রু আমরা নই। সরকারের খাতায় শত্রু তুমি। তুমি শত্রু হিসাবেই পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছিলে। তারপর তুমি তোমার সন্ত্রাসী সংগীদের সহায়তায় পালিয়ে এসেছ। এখন পুলিশ হন্যে হয়ে গোটা দেশে তোমাকে খুঁজছে, আমাদের নয়। আগের জীবনে ফিরে যাবার আর কোন পথ তোমার নেই। সুতরাং আমাদের সাহায্য তোমাকে করতেই হবে।’

‘পুলিশ এবং সরকার আমাদের ভুল বুঝেছে। এ ভুল তাদের একদিন ভাঙবে।’

‘হয়তো ভাঙবে। কিন্তু তা শোনার জন্যে তোমরা কেউ বেঁচে থাকবে না, এমনকি ‘পাত্তানী’ নামটাও তখন বেঁচে নাও থাকতে পারে।’ বলল হাবিব হাসাবাহ। তার ঠোঁটে বিদ্রুপের হাসি।

‘হ্যাঁ তোমরা এটাই চাচ্ছ। কিন্তু জেনে রেখ, তোমরা ষড়যন্ত্রকারীরা সর্বশক্তিমান নও। আল্লাহই সর্বশক্তিমান।’ বলল জাবের জহীর উদ্দিন।

আল্লাহর নাম শুনেই ক্রোধে ফুঁসে উঠল হাবিব হাসাবাহ। বলল, ‘জান, তোমার ঐ চেয়ার ও চেয়ারের তারগুলোই সর্বশক্তিমান। একটা সুইচ টিপলেই তারগুলো তোমার দেহে যন্ত্রণার জাহান্নাম সৃষ্টি করবে আর চেয়ার তোমাকে

একবিন্দু নড়তে দেবে না, মুখও খুলতে পারবে না চিৎকারের জন্যে। যন্ত্রণার আগুন তাতে আরও দাউ দাউ করে বাড়বে।'

'হ্যাঁ এ শক্তিটুকু তোমাদের আছে। কিন্তু আমাকে পক্ষে নেবার শক্তি তোমাদের নেই।' বলল দ্বীধাহীন কণ্ঠে জাবের জহীর উদ্দিন।

সংগে সংগে কোন উত্তর এল না হাবিব হাসাবাহর তরফ থেকে। তার দৃষ্টি জাবের জহীর উদ্দিনের ওপর নিবদ্ধ। দৃষ্টিতে একটা শূন্যতা। ভাবছে সে।

হঠাৎ তার ঠোটে একটা ক্রুর হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'তোমার বোনের নাম যয়নব যোবায়দা না? খুব সুন্দর নাম।'

জাবের জহীর উদ্দিন কোন উত্তর দিল না। কিন্তু তার চোখ দুটি চঞ্চল হয়ে উঠেছে। শয়তান তার বোনের কথা জিজ্ঞাসা করছে কেন?'

'তোমার বোন খুব সুন্দরী না? ঠিক খলিফা হারুন অর রশীদের মহিয়সী যোবায়দার মত?'

এবারও কোন কথা বলল না জাবের জহীর উদ্দিন। কিন্তু কেঁপে উঠেছে তার অন্তরটা। তার প্রিয় বোন, একমাত্র বোন যয়নব যোবায়দার সম্মান ও মর্যাদার চেয়ে বড় কিছু নেই তার এই দুনিয়ায়।

আবার কথা বলে উঠল হাবিব হাসাবাহই। বলল, 'কথা বলছ না কেন? শক্তি, দৃঢ়তার বাহাদুরী এতটুকুই! বোনের নাম শুনেই কথা বন্ধ হয়ে গেছে, মর্যাদায় আঘাত লেগেছে। কিন্তু জান কি, তোমার সুন্দরী বোন এখন আমাদের কব্জায়?'

'কি বলছ তোমরা, এ হতে পারে না?' প্রতিবাদে চিৎকার করে উঠল জাবের জহীর উদ্দিনের কণ্ঠ।

'এ হতে পারে, হয়েছে। তুমি যদি চাও তাকে এখানে নিয়ে আসছি। তোমার সামনেই তার সর্বস্ব লুণ্ঠনের ব্যবস্থা করছি।'

'না আমার বোনের গায়ে তোমরা হাত দিতে পারবে না। আমার সাথে তোমাদের বাগড়া। আমার বোনকে এর মধ্যে তোমরা টেনে এন না।' ব্যাকুল, বিনীত জাবের জহীর উদ্দিনের কণ্ঠ।

মুখে হাসি ফুটে উঠল হাবিব হাসাবাহর। বলল, 'তুমি যদি এটা চাও, সেটা হতে পারে এক শর্তে।'

'সেটা কি?'

'আমরা যেভাবে চাইব, তুমি আমাদের সাহায্য করবে?'

সংগে সংগে উত্তর দিতে পারল না জাবের জহীর উদ্দিন। তাদের শর্ত তার কাছে হিমালয়ের মত দুর্বিষহ। কিন্তু তার বোনের নিষ্পাপ চেহারা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। এই বোনকে হায়েনার গ্রাসে কি করে সে ঠেলে দেবে। মনটা তার হু হু করে কেঁদে উঠল। তার মন বলে উঠল, বোনকে রক্ষা করাই আশু দায়িত্ব। অন্য দায়িত্বের কথা পরেও সে চিন্তা করতে পারবে।

জাবের জহীর উদ্দিনকে নিরব থাকতে দেখে হাবিব হাসাবাহ বলল, 'তাহলে তোমার সিদ্ধান্তে তুমি অটল। তাহলে..............।'

হাবিব হাসাবাহর কথা শেষ করতে না দিয়ে জাবের জহীর উদ্দিন বলল, 'আমি তোমাদের শর্তে রাজি। তবে আমাকে নিশ্চিত হতে হবে যে, তোমরা তার কোন অসম্মান করোনি এবং তাকে ছেড়ে দিতে হবে।'

জাবের জহীর উদ্দিনের কথা শুনেই হাবিব হাসাবাহ বলে উঠল, 'তোমার শর্ত মঞ্জুর জাবের। আমি এখনি বেরুব। কাল সকালে আমি আসব। তখন তোমার বোনের সাথে কথা হওয়ার পর বিষয়টা চুড়ান্ত হবে।'

'এখন কেন নয়?' জাবের জহীর উদ্দিন বলল।

'তোমার বোনকে ভিন্ন জায়গায় রাখা হয়েছে। এখন আমার অসুবিধা আছে। কাল সকালে তাকে নিয়ে আসব।' বলল হাবিব হাসাবাহ।

তাকাল জাবের জহীর উদ্দিন হাবিব হাসাবাহর দিকে। তার চোখে সন্দেহ।

বুঝতে পেরে হাবিব হাসাবাহ বলল, 'আমি বলেছি জাবের তোমার বোনের কোন ক্ষতি হবে না।'

বলেই হাবিব হাসাবাহ আশেরকে বলল, 'যাও জাবেরকে নিয়ে যাও। রেখে তাড়াতাড়ি এসো।'

জাবেরকে রেখে আশের ফিরে এল দু'মিনিটের মধ্যেই।

আশের ঘরে ঢুকতেই হাবিব হাসাবাহ বলল, 'কি ঘটল ড্যানরা কিছু বুঝতে পারছ না। বল দেখি তুমি কি বুঝেছ?'

'স্যার ঘোড়ার আগে গাড়ি জোড়া হয়েছে।' বলল আশের।

'না ঘোড়ার আগে গাড়ি জোড়া নয়, ঘোড়া ছাড়াই গাড়ি দৌড়ানো হলো বলা যায়। এখন যয়নব যোবায়দাকে হাজির করতে পারলেই কেল্লা ফতে।' বলল হাবিব হাসাবাহ।

'এটাই তো আসল বিষয় স্যার। সকালে তাকে যদি হাজির করা না যায়?' ড্যান বলল।

'যদিও এর কোন স্কোপ নেই। কাল সকালের মধ্যে যয়নব যোবায়দাকে এখানে হাজির করতে হবে যেভাবেই হোক। আজ এই সময় পর্যন্ত যয়নব যোবায়দা সুলতান গড়ের বাইরে যায়নি। সুলতান গড়ের ওপর যারা চোখ রাখছে, তাদের বলে দাও গোপনে যয়নব যোবায়দার অবস্থান যেন ঘেরাও করে রাখে এবং গতিবিধিকে ঘনিষ্ঠভাবে ফলো করে। অবিলম্বে তোমরা যাও। সবাই মিলে তাকে তুলে নিয়ে এসো। দেখ, তার যেন কোন অসম্মান না হয়। তার মর্যাদাহানিকর কোন কিছু হয়েছে তা যেন বলতে না পারে। তোমরা যাও।'

বলে উঠে দাঁড়াল হাবিব হাসাবাহ।

সবাই উঠে দাঁড়াল।

হাবিব হাসাবাহকে অনুসরণ করে সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

সুলতান গড়ে নেমে আহমদ মুসা প্রথমেই যে কাজটা করেছিল, সেটা শিখের পোশাক পরিবর্তন। ট্রেনে তেমন কিছু মনে হয়নি। কিন্তু চাস্ফু জংশনে নামার পর তার মনে সন্দেহ হয়েছে। তার পোশাক দেখে ও কথা শুনে অনেকেরই চোখে-মুখে সন্দেহের ভাঁজ পড়তে দেখেছে। এই সন্দেহ নিয়েই তাকে তারা সহযোগিতা করেছে, হয়ত পিছুও নিয়েছে। মুসলমানরা সন্দেহ করছে এই শিখ তাদের এলাকায় কেন? সরকারি কিংবা বিদেশী গোয়েন্দা নয় তো? এমন সন্দেহ

মুসলমানদের চোখে-মুখে দেখেছে। আবার অমুসলমানরাও অনুরূপ চিন্তা করেছে। তারা ভেবেছে ছদ্মবেশে আমি তাদের কোন প্রতিপক্ষ এলাম কিনা। এ রকম একজন জহীর উদ্দিনের কথা তার মনে পড়ল। সে তাকে ফলো করেছে চাস্ফু ষ্টেশন থেকে। প্রথমে আহমদ মুসা তাকে মুসলমান মনে করেছিল। কিন্তু কিছু কথা ও ঘটনায় তাকে সন্দেহ হয় যে সে প্রতিপক্ষ বা পুলিশের চর। হঠাৎ সে উধাও হয়ে যায় সুলতান গড়ের কাছাকাছি একটা বাস ষ্টেশনে নামার পর। ব্যাপারটি বিস্ময়কর মনে হয়েছে আহমদ মুসার কাছে। একটা বিষয় সে নিশ্চিত যে গোটা পাত্তানীকেই সংশয়, সন্দেহ ও সংঘাতের এক উর্বর ভূমি করে তোলা হয়েছে। আহমদ মুসা যেদিন ব্যাংকক থেকে পাত্তানী আসার জন্যে যাত্রা করেছে, সেই দিনই পাত্তানী শহরের উপকণ্ঠের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি এক দুঃসাহসিক হামলার শিকার হয়। ডজন খানেকেরও বেশি সৈনিক মারা যায়, লুট হয় অস্ত্র ভান্ডার। এই ঘটনার উত্তাপ উত্তেজনা এখনও এলাকার মানুষকে এক পায়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। বিশেষ করে নতুন লোকদের খুব বিপদ। তারা সব পক্ষেরই সন্দেহের শিকার হয়।

ষ্টেশনের পাশের একটা ঝোপের আড়ালে পোশাক পাল্টে ব্যাংকক থেকে কেনা প্যান্ট, সার্ট ট্যুরিষ্ট জ্যাকেট ও ট্যুরিষ্ট ক্যাপ পরে বের হয়ে এসেছিল।

ব্যাংককে ভূমিবলের কাছে আহমদ মুসা শুনেছিল সুলতান গড় ষ্টেশন থেকে পূর্বে সাগরের তীরে সুলতান শহরের মূল এলাকা। এখানে একটা ভাল ট্যুরিষ্ট হোটেল আছে।

আহমদ মুসা সেখানে এসেছে। কিন্তু কোথায় খুঁজবে হোটেল জিজ্ঞাসা করে কারো সন্দেহের শিকার হতে চায়নি। কিন্তু কত ঘুরবে হোটেলের জন্যে!

শহরের রাস্তাগুলো প্রশস্ত। কিন্তু গাড়ি-ঘোড়া দেখা যায় না বললেই চলে।

আহমদ মুসা রাস্তার বাম পাশের ফুটপাথ দিয়ে পূর্ব দিকে হাঁটছিল। শহরের পূর্ব প্রান্তের দিকে হোটেল পাওয়া যাবে বলে আহমদ মুসার বিশ্বাস।

আহমদ মুসার সমান্তরালে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল একজন গোয়ালা। একটা ঠেলা গাড়িতে করে দুধের ছোট ছোট জার নিয়ে সে হাঁটছিল। আহমদ মুসা ডাকে

দুধওয়ালাকে। দাঁড়ায় দুধওয়ালা। সে সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটা প্রাইভেট কারও দাঁড়িয়ে পড়ে হঠাৎ ইঞ্জিন বন্ধ হওয়ার কারণে।

আহমদ মুসা ইংরেজি ও দুই একটি থাই শব্দ মিশিয়ে জিজ্ঞাসা করে দুধওয়ালাকে যে এখানে ভাল হোটেল কোন দিকে। বুঝল না দুধওয়ালা আহমদ মুসার কথা কিছুই। কয়েকবার বুঝাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় আহমদ মুসা।

রাস্তার ওপাশে দাঁড়ানো প্রাইভেটকার থেকে একটা মেয়ে বেরিয়ে আসে। আঠার-বিশ বছর বয়সের তরুণী। বোরখা পরিহিত। মাথায় রুমাল বাঁধা। তার উপর একটা ওড়না মাথা ও গলায় জড়ানো। মুখ খোলা।

মেয়েটি গাড়ি থেকে বেরিয়ে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে পরিষ্কার ইংরেজিতে বলে, 'শহরের পূর্ব প্রান্তে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নিচে নামলে সাগরের ধারে উপত্যকায় পর্যটক হোটেল পাবেন। এই রাস্তা ধরেই যেতে পারবেন।'

'অনেক ধন্যবাদ ম্যাডাম।' বলল আহমদ মুসা।

মেয়েটির কথা মতই আহমদ মুসা পেয়ে যায় হোটেল।

হোটেল কক্ষে কাপড়-চোপড় গুছিয়ে অজু করে ফ্রেস হয়ে বসতেই তার মোবাইল বেজে ওঠে। ব্যাংকক থেকে পুরসাত প্রজাদীপকের টেলিফোন। কুশল বিনিময়ের পর পুরসাত প্রজাদীপক বলে, 'বিভেন তোমার যাওয়া বোধ হয় ধরা পড়ে গেছে ওদের কাছে। ওদের একজন বাসে তোমাকে ফলো করছিল, তাকে চিনতে পারে আমাদের একজন গোয়েন্দা। সুলতান গড়ের আগের বাসষ্টেশনে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জাবের জহীর উদ্দিনকে যারা কোর্ট থেকে কিডন্যাপ করেছিল, তাদেরই একজন সে। কিন্তু তার কাছ থেকে কিছু আদায় করা যায়নি। আজ কোর্ট থেকে রিমান্ডে নিয়ে বের হয়ে আসার সময় তাকে কারা যেন গুলী করে মেরে ফেলেছে। কোন কথা আদায় করার আগেই এ ঘটনা ঘটে গেল।'

'সে যে 'ব্ল্যাক ঈগল' গ্রুপের এবং ঐ কিডন্যাপের সময় সে উপস্থিত ছিল, তা আপনারা জানলেন কি করে?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'আমাদের কোর্টের ভিডিও ক্যামেরায় সবার ফটো ওঠে। এর মধ্যে যারা জীবিত আছে তাদের ফটো আমরা আলাদা করেছিলাম। এদের মধ্যে সেও আছে।

অন্যদের সাথে তার ফটোও আমরা প্রত্যেক থানায় ও গোয়েন্দাদের কাছে সরবরাহ করেছিলাম।'

বলে একটু থামে পুরসাত প্রজাদীপক। পরক্ষণেই আবার বলে সে, 'তোমার জন্য একটা দুঃসংবাদ আছে বিভেন।'

'কি দুঃসংবাদ?' দ্রুতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'তোমার চলে যাবার দু'দিন পর পাত্তানী শহরের উপকণ্ঠে যে সেনাফাঁড়ি আক্রমণ হয়েছিল, সেখানে জাবের জহীর উদ্দিনের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের প্রমাণ পাওয়া গেছে।' বলেছিল পুরসাত প্রজাদীপক।

'কি প্রমাণ?'

'সংঘর্ষে সম্ভবত সে আহত হয়েছিল। রক্তরঞ্জিত একটা সার্ট ঘটনাস্থলে পাওয়া গেছে। রক্ত ও সার্টের পরীক্ষায় পাওয়া গেছে রক্ত ও সার্ট দুই-ই জাবের জহীর উদ্দিনের। এটা প্রমাণ হওয়ার পর আমার ও তোমার কিছু করার থাকল না বিভেন।'

'রক্ত ও সার্ট জাবের জহীর উদ্দিনের এটা প্রমাণ হওয়ায় নিশ্চিত প্রমাণ হয় না যে সে ঐ সংঘর্ষে অংশ নিয়েছিল। জাবের জহীর উদ্দিন এখন তাদের হাতে। তাদের ষড়যন্ত্রে সফল করার জন্যে তারা সবকিছুই করতে পারে। জাবের জহীর উদ্দিনের সার্ট এবং তার রক্ত সংগ্রহ কঠিন কাজ নয়।' আহমদ মুসা বলেছিল।

'তোমার কথা ঠিক। কিন্তু এ কথা শুনবে কে বল। আর কে বিশ্বাস করবে। সরকারের হাতে প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে।' বলেছিল পুরসাত প্রজাদীপক।

'আমার মন বলছে, সব প্রমাণ খতিয়ে দেখা হয়নি। আপনি কি কষ্ট করে এটা নিশ্চিত করতে পারেন যে, ঘটনার সময়টা আর জহীর উদ্দিনের গায়ের জামায় যে রক্ত তার ক্ষরণের সময়টা একই ছিল?' আহমদ মুসা বলে।

'তোমার পয়েন্টটা বুঝেছি বিভেন। তোমাকে ধন্যবাদ। আমি এখনি এ পরীক্ষার ব্যবস্থা করছি। গুড লাক।' বলে ওপার থেকে ফোন রেখে দিল পুরসাত প্রজাদীপক।

সুলতান গড় আসার পর ৪৮ ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। রাতে ঘুমানো ছাড়া সবটা সময় সে চষে বেড়িয়েছে গোটা সুলতান গড়। জাবের জহীর উদ্দিন ও যয়নব যোবায়দাদের বাড়ি বের করতে পারেনি সে। কাউকে জিজ্ঞাসা করেনি সন্দেহ এড়ানোর জন্যে। শ্রমিক-মজুর শ্রেণীর সাধারণ লোকরা নিরাপদ। কিন্তু সহজে তাদের কথা বুঝানো মুশকিল, আবার ওদের কথা বুঝাও মুশকিল। থাই-মালয়ী মিশিয়ে তারা এমন ভাষা বলে কিছুই বুঝা যায় না। হোটেল বয়-বেয়ারাদের সাথেও এই কারণে আহমদ মুসা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেনি।

তখন বেলা ৪টা। বাইরে থেকে এসে আহমদ মুসা খেয়ে নামায পড়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে গত ৪৮ ঘণ্টার ব্যর্থতা নিয়ে ভাবছিল।

দরজায় নক হলো।

ভ্রু’কুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার। এ সময় কারও আসার কথা নয়।

উঠে আহমদ মুসা দরজা খুলল।

দরজার সামনে হোটেলের একজন বেয়ারা দাঁড়িয়ে।

‘মাফ করবেন স্যার। অবসর মত আপনি আমাকে আসতে বলেছিলেন। তাই এলাম স্যার।’ বলল বেয়ারা ছেলেটি।

‘ও ঠিক, ভুলেই গিয়েছিলাম আমি। এসো, ভেতরে এসো।’ বলল আহমদ মুসা।

দুপুরে খাবার সময় আহমদ মুসাই তাকে আসতে বলেছিল।

আহমদ মুসা ঘরে ঢুকে সোফায় বসল। বেয়ারা ছেলেটি ঘরে ঢুকে একটা সোফায় ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।

‘বস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?’

বেয়ারাটির নাম বাছির থানম।

ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে কথা বলতে পারে।

ছেলেটি শান্ত, ভদ্র স্বভাবের, হোটেলে আসার পর থেকেই দেখছে আহমদ মুসা। অন্যের মত বকশিস নেবার প্রবণতা তার নেই। কোন জিনিস কিনতে দিলে হিসাব করে প্রতিটি পাই ফেরত দেয়।

'না স্যার ঠিক আছে। বলুন।' আহমদ মুসা বসতে বলার জবাবে বলল বেয়ারা বাছির থানম।

'তুমি এই সুলতান গড়ের লোক না?' জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

'জি স্যার। আমাদের বাড়ি এখানেই।'

'আমি দু'দিন হলো এসেছি। একা একা কিছু এলাকা ঘুরেছি। বলত, সুলতান গড়ে দেখার মত কি কি আছে?'

হাসল বাছির থানম। বলল, 'পাহাড়, জংগল, এই হোটেলের নিচের সুন্দর সী-চি, হ্রদ ছাড়া এখানে দেখার তেমন কিছুই নেই স্যার। আর পুরনোর মধ্যে আছে সুলতান পাহাড়ের 'শাহ বাড়ি।'

'শাহ বাড়ি কি?' সংগে সংগেই প্রশ্ন করল আহমদ মুসা। মনে মনে সে খুশি হলো এই ভেবে যে, এটা যয়নব যোবায়দাদের বাড়ি হতে পারে।

'স্যার এটা পাত্তানীর শাহ সুলতানের বাড়ি।'

'শাহ সুলতান কে?'

'তিনি গোটা থাইল্যান্ডের রাজকুমার চাউশির বাংগসা। তিনি পাত্তানীতে প্রথম স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। তার পুরো নাম 'সুলতান আহমদ শাহ'।'

'তাহলে থাই রাজকুমার চাউশির বাংগসা মুসলমান হয়েছিলেন?'

'জ্বি স্যার। তাঁর মুসলমান নামই হলো সুলতান আহমদ শাহ। এটা কয়েকশ' বছরের আগের কথা স্যার।'

'এখনও বাড়িটি আছে?'

'পুরাতন অংশ ভাংচুর অবস্থায় আছে। পাশে নতুন বাড়ি তৈরি হয়েছে।'

'নতুন বাড়ি? কে থাকে সেখানে?' যেন কিছুই জানে না এমন একটা ভাব নিয়ে প্রশ্ন করল আহমদ মুসা।

সংগে সংগে জবাব দিল না বাছির থানম। দু'পা পিছিয়ে গিয়ে বারান্দাটা দেখে এল। তারপর গলাটা নামিয়ে বলল, 'ওখানে থাকেন জাবের বাংগসা জহীর উদ্দিন। তাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছিল। এখন নাকি তিনি জেল থেকে পালিয়ে সরকারের সাথে যুদ্ধ করছেন।'

‘জাবের বাংগসা জহীর উদ্দিন কে?’ না জানার ভান করে প্রশ্ন করল আহমদ মুসা। সে ছেলেটিকে বাজিয়ে নিতে চায়।

সে একই ফিস ফিসে গলায় বলল,‘শাহজাদা সুলতান বংশের লোক।’

‘কেন পুলিশ তাকে ধরেছিল? কেনই বা সে যুদ্ধ করছে?’

চোখে-মুখে ভয় ফুটে উঠল বাছির থানমের। ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল, ‘সেসব আমি বুঝি না স্যার। বলতে পারব না।’

‘এখন ঐ বাড়িতে কে থাকেন?’

‘শাহজাদী যয়নব যোবায়দা। জাবের বাংগসা জহীর উদ্দিনের বোন স্যার। শুনেছি সেও বাড়িতে সব সময় থাকে না। কখন আসে কখন যায়, কোথায় থাকে কেউ জানে না।’ বলল বাছির থানম। তার চোখে-মুখে বেদনার ছায়া।

‘জাবের বাংগসা জহীর উদ্দিন ও যয়নব যোবায়দা সম্পর্কে এখানকার লোকরা কি মনে করে?’

‘তারা ভাল স্যার। সবাই তাদের ভালবাসে। কিন্তু বলতে পারে না।’

‘কেন?’

হঠাৎ বাছির থানম চমকে উঠে ভয়ে চোখ বড় বড় করে বলল, ‘আপনি কি কাউকে বলে দেবেন, আমি এ কথা বললাম? আমাকে মাফ করবেন স্যার। আমি হঠাৎ বলে ফেলেছি।’

ভয়ার্ত বাছির থানমের কাকুতি-মিনতি দেখে মনটা কেঁদে উঠল আহমদ মুসার। এলাকার নিরীহ মানুষ এভাবেই চরম ভীতির মধ্যে বাস করছে। তারা জাবের জহীর উদ্দিন, যয়নব যোবায়দার মত তাদের সম্মানিত লোকদের নামটা পর্যন্ত নির্ভয়ে উচ্চারণ করতে পারে না।

গম্ভীর হয়ে উঠেছে আহমদ মুসার মুখ। বলল নরম কণ্ঠে, ‘বাছির থানম তোমার কি মনে হয় আমি তোমার কোন ক্ষতি করতে পারি?’

‘আপনি একটু ভিন্ন রকমের স্যার। আপনি মদ খান না, হোটেলের নাইট ক্লাবে যান না, খারাপ লোকদের সাথে আড্ডাবাজি করেন না, বাথরুমে গোসল করেন, সুইমিং পুলে নামেন না। সেই জন্যে কিছু বলতে সাহস করেছি। তবু ভয় থাকেই স্যার।’

‘ভয় নেই। আমাকে তোমার ভাই মনে কর।’

‘সত্যিই আপনি খুব ভাল স্যার।’ ছেলেটির গলা কাঁপল, চোখ দু’টি তার ছলছলিয়ে উঠেছে।

মনে মনে খুশি হলো আহমদ মুসা। খাঁটি একটা ছেলেকে পেয়েছে। সুলতান গড়ের জনজীবনের ভেতরে মাথা গলাবার একটা পথ হলো।

‘তোমার নাম বাছির থানম কেন? বাছির তো আরবী শব্দ, কিন্তু থানম তো থাই শব্দ।

‘আমার মা মুসলমান হওয়ার আগে থাই-বৌদ্ধ ছিলেন। থানম আমার মায়ের দিক থেকে এসেছে।’

‘শাহ বাড়ি দেখা যায় না?’

‘যায়। কিন্তু ......।’ আমতা আমতা করে বলল বাছির থানম।

‘কিন্তু কি?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘স্যার শুনেছি, পুলিশ এবং অন্য কারা যেন বাড়ির প্রতি সব সময় নজর রাখে।’

বলে সে একটা ঢোক গিলেই আবার বলল, ‘তাছাড়া স্যার আপনি বিদেশী। সন্দেহ কেউ করতেই পারে। ইতিমধ্যে স্যার আপনার সম্পর্কে একজন এসে খোঁজ খবর নিয়ে গেছে।’

চমকে উঠল আহমদ মুসা। বলল, ‘কি খোঁজ নিয়ে গেছে?’

‘হোটেলে রেজিষ্টার থেকে নিয়েছে নাম ঠিকানা, দস্তখতও দেখেছে এবং ছবিও নিয়েছে। তাকে বয়-বেয়ারাদের কাছ থেকেও খোঁজ খবর নিতে দেখেছি। কিন্তু কি বলেছে, কি জেনেছে সেটা আমি জানি না।’

‘ওরা কি পুলিশের লোক?’

‘না স্যার। পুলিশ তো সবার ক্ষেত্রে যা করে- তাই করেছে, আপনার নাম, ঠিকানা, ছবি প্রথম দিনই নিয়ে গেছে। এরা গতকাল এসেছিল, পুলিশের লোক এরা নয়।’

‘কারা হতে পারে বলে তোমার ধারণা?’

‘জানি না স্যার। তবে তাদের ব্যবহার ভাল নয়। প্রথমেই তারা এসে জিজ্ঞাসা করেছিল, কোন শিখ হোটেলে এসেছে কিনা। গত ৪৮ ঘণ্টায় একমাত্র আপনিই হোটেলে এসেছেন। সুতরাং আপনি তাদের টার্গেট হতে পারেন।’

বুঝল আহমদ মুসা ওরা হোটেল পর্যন্ত এসেছে। গত ৪৮ ঘণ্টায় একমাত্র আহমদ মুসাই যখন হোটেলে এসেছে, তখন তার ওপর ওরা নজর রাখবে। ব্যাংককে তার ফটো যদি তারা তুলে থাকে, কিংবা কোনভাবে তারা সেখানকার কোনও ফটো পেয়ে থাকে, তাহলে তারা তাকে চিনতেও পারবে নিশ্চয়।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘ওরা ওদের কাজ করুক, আমরা আমাদের কাজ করি। তুমি ‘শাহ বাড়ি’ আমাকে দেখাতে পারবে?’

‘আপনি যদি যেতে চান, দেখাতে পারব। তবে কাছে যাওয়া ঠিক হবে না।’

কথা শেষ করেই কি মনে হওয়ায় আবার দ্রুতকণ্ঠে বলে উঠল, ‘আজ খুব ভাল দিন স্যার। ‘শাহ বাড়ি’ যে পাহাড়ে, তার নিচে বিশাল, প্রশস্ত সমতল উপত্যকায় প্রতি বছর বার্ষিক ক্রীড়া উৎসব হয়। আজ সেই ক্রীড়া উৎসবের দিন। সেখানে যেতে অসুবিধা নেই। সেখান থেকে শাহ বাড়ি ভালভাবে দেখতে পাবেন।’

‘কি ধরনের ক্রীড়ানুষ্ঠান হয়?’ জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

‘ঘোড় দৌড়, তীরন্দাজী, কুস্তি, পাহাড়ে ওঠা ইত্যাদি। আপনি কি খেলায় অংশ নেবেন? মেলায় উপস্থিত যে কেউ যে কোন খেলায় অংশ নিতে পারে, কোন পরিচয়ের দরকার হয় না।’ বলল বাছির থানম।

‘খেলা লক্ষ্য নয়, আমি যেতে চাই ওখানে। তুমি কখন যেতে পারবে?’

‘স্যার আমার ডিউটি শেষ। আমি এখনি যেতে পারি।’

‘ধন্যবাদ বাছির থানম। আমিও এখন বেরুতে পারি।’

বলে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা। বলল, ‘বাছির, ৫ মিনিট লাগবে আমার তৈরি হতে।’

‘ঠিক আছে স্যার, আমি বাইরে অপেক্ষা করছি।’

বলে বাছির থানম ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আহমদ মুসা তৈরি হয়ে ঘরের দরজা লক করে বেরিয়ে এল।

হোটেল থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ক্যাব নিল আহমদ মুসা। পাহাড়ের গা বেয়ে এঁকে-বেঁকে এগোতে লাগল ট্যাক্সি পাহাড় ডিঙিয়ে ওপারে পৌছার জন্যে।

শহরের একদম দক্ষিণ প্রান্তে সাগরের গা ঘেঁষে শাহ বাড়ির পাহাড়।

হোটেল থেকে অনেকটা পথ।

বাছির থানম যাবার পথে দু'পাশের স্থানগুলোর নাম পরিচয় বলে যাচ্ছিল।

হঠাৎ আহমদ মুসার মনে পড়ল জাবের জহীর উদ্দিনকে আটকে রাখা 'কাতান টেপাংগো'র কথা। জিজ্ঞাসা করল ফিসফিসে কণ্ঠে, 'বাছির থানম, 'কাতান টেপাংগো' কোথায় জান?'

'টেপাংগো মালয়েশিয়া সীমান্তের কাছাকাছি একটা পাহাড়ের নাম। কাতান টেপাংগো চিনি না স্যার।'

'ধন্যবাদ বাছির থানম।' আহমদ মুসা বলল।

এই মাত্র বাড়ি এসেছে যয়নব যোবায়দা। মাথার চাদর ও রুমাল এবং গা থেকে বোরখা খুলে পরিচারিকার হাতে দিয়ে ইজি চেয়ারে ধপ করে বসে গা এলিয়ে দিল চেয়ারে।

বাইরে থেকে আসার ক্লান্তি শুধু নয়, একটা বিমর্ষভাবও তার সুন্দর মুখকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

বিশ বছর বয়স যয়নব যোবায়দার। পাঁচ ফিট কয়েক ইঞ্চি লম্বা হবে। সোনা রং গায়ের। চুলও সোনালী। চোখ নীল। গায়ে গাঢ় বাদামী রংয়ের থ্রি পীস।

ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজেছে যয়নব যোবায়দা।

চোখ বোজার পর তার অতীত ও বর্তমান এক হয়ে গেছে। ভবিষ্যতও কালো মেঘের রূপ নিয়ে সামনে হাজির। জাবের জহীর উদ্দিন কোর্ট থেকে

পালানো এবং তার নিজের সৈন্য ফাঁড়িতে সন্ত্রাসী হামলার খবর সংবাদপত্রে পড়ে যয়নব যোবায়দা সাংঘাতিকভাবে মুষড়ে পড়েছে। তার ভাই জাবের জহীর উদ্দিন সন্ত্রাসে নামবে, সন্ত্রাসী হবে, এটা তার কাছে অবিশ্বাস্য। এর চেয়েও অবিশ্বাস্য হলো তার ভাই জেল থেকে বেরুবার পর একবারও তার কাছে টেলিফোন করেনি। সে কিছুই বুঝতে পারছে না। না বুঝতে পেরে আরও আতংকিত হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে দাদীর পর, তার সবচেয়ে প্রিয়জন ফরহাদ ফরিদ উদ্দিন প্রাণে বাঁচার জন্যে পলাতক জিন্দেগী যাপন করছে। সে মেয়ে মানুষ তার কি করার ক্ষমতা আছে! দাদীর পরামর্শে আল্লাহর নাম নিয়ে বহু আশা করে চিঠি দিয়ে পাতার নৌকা ছেড়েছিল। সে কোন ঠিকানায় পৌছেছে, না সমুদ্রে সলিল সমাধি হয়েছে তা জানারও কোন উপায় নেই। আল্লাহ তাকে কোন সাহায্য করবেন না? চোখের দু'কোণ ভিজে উঠল তার।

খোলা দরজা পথে ঘরে প্রবেশ করল যয়নব যোবায়দার দাদী।

ধীরে ধীরে এসে সে যয়নব যোবায়দার মুখের সামনে দাঁড়াল। একটা হাত রাখল যয়নব যোবায়দার কপালে। স্নেহমাখা কণ্ঠে বলল 'খুব খারাপ লাগছে বোন?' যয়নব যোবায়দা চট করে চোখ খুলে উঠে দাঁড়াল ইজি চেয়ার থেকে। দু'হাত ধরে দাদীকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বলল, 'না দাদীমা আমার শরীর খারাপ করেনি।'

বলে যয়নব যোবায়দা দাদীর পায়ের কাছে কার্পেটের উপর বসে পড়ল।

'শরীর খারাপের কথা বলিনি বোন। মন খুব খারাপ করছে কিনা সেটাই জিজ্ঞাসা করেছিলাম। মন খারাপ এটা তোর জন্যে কোন খবর নয়, খুব খারাপ কিনা এটাই খবর।'

'শুধু আমার কথা বলছ কেন দাদী। তোমার দুঃখের কথা এড়িয়ে যাচ্ছ কেন?'

ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজল দাদী। কিন্তু বুজে যাওয়া চোখের পাতা ভেদ করে দু'চোখ থেকে বেরিয়ে এল অশ্রুর দুটি ধারা। বলল, 'তোরা তাই মনে করিস। তোরা কিছু না বললেই আমি কিছু দেখি না, শুনি না, বুঝি না। জহীর কোথায় হারিয়ে গেল বলিসনি, পাত্তানীর এত লোক খুন হচ্ছে,

সৈনিকরা মরছে কেন, তা তোরা বলিসনি। জহীরের মত তুইও হারিয়ে গেছিস কোন এক সকালে উঠে শুনব। সেদিনও জানব না কি হচ্ছে, এসব কেন হচ্ছে? কিন্তু আমার চোখ বন্ধ নয়, কারও বন্ধ নয়।’

‘কিন্তু তুমিই বল দাদী, এসব কথা শুনতে যতখানি কষ্ট, বলতে কষ্ট তার চেয়ে অনেক বেশি কি-না? তাই চেয়েছি দাদী তোমার ঘাড়েও বেদনার দুঃসহ বোঝা চাপিয়ে নিজের দুঃখ আরও না বাড়াতে।’ বলল যয়নব যোবায়দা। তার কণ্ঠ ভারী।

দাদী যয়নব যোবায়দার মাথাটা কোলে টেনে নিল। বলল, ‘বোকা বোন, দুঃখ ভাগ করে নিতে হয়। তাতে দুঃখের ভার কমে।’

বলে একটু থামল। বোধ হয় একটু ভাবল। তারপর সরাসরি তাকাল যয়নব যোবায়দার দিকে। চোখে চোখ রেখে বলল, ‘সত্যি করে বলতো যোবায়দা, জহীর কি সত্যই অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে?’

‘না দাদীমা, এটা সত্য নয়।’ দ্বিধাহীন দৃঢ় কণ্ঠে বলল যয়নব যোবায়দা।

‘তাহলে কি সত্য?’

‘পাত্তানীর নেতৃস্থানীয় আমাদের এই পরিবারকে সন্ত্রাসী সাজিয়ে পাত্তানীর মুসলমানদের উপর সন্ত্রাসের অভিযোগে ষড়যন্ত্র করা হয়েছে।’

‘তাহলে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা জহীরকে পুলিশের হাত থেকে মুক্ত করে নিয়ে যাওয়ার ব্যখ্যা কি এবং সেদিন সশস্ত্র হামলায় জহীর নিজে অংশ নেয়া এবং তার রক্তমাখা জামা পাওয়ারই বা ব্যাখ্যা কি?’

সংগে সংগে উত্তর দিল না যয়নব যোবায়দা। তাকে খুবই বিব্রত দেখাল। মুহূর্ত কয়েক পর ধীর কণ্ঠে বলল, ‘এই ব্যাখ্যা আমিও তালাশ করছি দাদীমা। কিন্তু নিশ্চিত করে বলতে পারি দাদীমা, ভাইয়ার নামে যা বলা হচ্ছে সব মিথ্যা, সব ষড়যন্ত্র।’

‘তোর নিশ্চিত হওয়ার কারণ?’

‘কারণ আমি ভাইয়াকে জানি, ভাইয়ার চিন্তাধারা আমি জানি। ইসলাম প্রচারে আল্লাহর রাসুল স. যে পথ অনুসরণ করেছেন, তার বাইরে আর কোন পথ ইসলামী নয়। ইসলাম প্রচারের পথে বাধা এলে তার মোকাবিলা শক্তি বা সন্ত্রাস

দিয়ে নয়, যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে করতে হবে। ইসলাম প্রতিটি মানুষকে সংশোধন করতে চায়, কাউকে সংহার নয়। আদর্শিক, সামাজিক ও সামষ্টিক প্রয়েঅজনে অস্ত্র ব্যবহারের অধিকার শুধু রাষ্ট্রের, এমন অনুমতি কেবল রাষ্ট্রের মত অথরিটিই দিতে পারে। এই বিশ্বাস ভাইয়ার মজ্জাগত বলা যা। সুতরাং তিনি সন্ত্রাসী কাজে রত হবেন এটা অবিশ্বাস্য।' যয়নব যোবায়দা বলল।

'মানুষের মত তো পরিবর্তন হতে পারে।' বলল দাদী।

'দাদী, ভাইয়ার ওটা মত নয়, ওটা তার বিশ্বাস, ঈমান। ঈমান পরিবর্তন করে মুসলমান থাকার প্রশ্ন ওঠে না।'

গম্ভীর হয়ে উঠেছে দাদীর মুখ। বলল, 'তুমি ঠিক বলেছ যোবায়দা। কিন্তু ঘটনাগুলোর ব্যাখ্যা তাহলে কি? ষড়যন্ত্র যদি হয়, তাহলে ষড়যন্ত্র কার, কেন? জহীর সে ষড়যন্ত্রের হাতে পুতুল হয়ে গেল কি করে?'

'পুতুল হয়েছে আমি মনে করি না দাদী। ঘটনাগুলোর ব্যাখ্যাও আমি জানি না। ভয়াবহ এক সংকট আমাদের গ্রাস করছে, আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু জানি না সে সংকটটা কি? জানাও আমার সাধ্যের অতীত। কি করব তার কোন কূল-কিনারা পাচ্ছি না।'

'তুই যে আল্লাহর 'কেয়ার অব'-এ একটা খোলা চিঠি পাঠিয়েছিলি তার কি হলো?'

বেদনায় ভারী হয়ে গেল যয়নব যোবায়দার মুখ। বলল, 'আল্লাহই সেটা জানেন দাদী।'

দাদী কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল। তখন ঘরে প্রবেশ করল পরিচারিকা নূরী। দাদী ও যয়নব যোবায়দাকে লক্ষ্য করে বলল, 'দাদী আম্মা, বেগম শাহজাদী আপা, মেলার প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে। চলুন।'

যয়নব যোবায়দা উঠে দাঁড়াল।

'তোরা যা যোবায়দা, আমার ভাল লাগছে না।' বলল দাদী।

'আমারও ভাল লাগছে না। মেলা দেখার মত মনের অবস্থা নেই। তবু দাদী, শাহ দাদুর শুরু করা এই মেলায় অন্তত দেখার মাধ্যমে অংশ নেয়া এই

বাড়ির রীতি। আমরা এই রীতির খেলাফ করতে পারি না দাদী।' যয়নব যোবায়দা বলল।

বলে যয়নব যোবায়দা দাদীকে টেনে ইজি চেয়ার থেকে তুলল। একটা চাদর এনে দাদীর গায়ে জড়িয়ে দিল।

আলমারি থেকে বের করে আনল দু'টি দূরবীন। বলল, 'চলো দাদী।'

'বাড়ির সবাই তো চলে যাচ্ছে, এই রীতি কি আর থাকবে?' বলে হাঁটতে লাগল দাদী।

দাদীর নাম বেগম শরীফুন নেসা। যয়নবের পিতা তাঁর একমাত্র সন্তান। দাদা মারা গেছেন তিরিশ বছর আগে, তখন দাদীর বয়স ৫০ বছর। দাদার মৃত্যুর পর বিশ বছর পর মারা যান যয়নবদের পিতা। যয়নবরা তখন কৈশোরেও পৌছেনি। আর যয়নবদের মা মারা গেছেন পিতার মৃত্যুর এক বছর পরেই। কার্যত তারা শিশুকাল, কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পৌছেছে দাদীর হাতেই।

'রীতি ঠিক আছে, আমরাই ঠিক থাকতে পারছি না দাদী। এটা আমাদের ব্যর্থতা।' বলল যয়নব যোবায়দা। ভারী কণ্ঠ তার।

দাদী একটা হাত রাখল যয়নব যোবায়দার পিঠে। সান্তনার সুরে বলল, 'সময় সমান যায় না, কারণ সব মানুষ সমান হয় না।'

'তাহলে সময় আবার আমাদের পক্ষে আসবে দাদী?'

'তার জন্যে একজন মানুষ প্রয়োজন যিনি সময়ের গতি ঘুরিয়ে দেবেন।'

'ভাইয়া নিজেই বিপদে, কোথায় সে মানুষ?' বলল যয়নব যোবায়দা।

'এমন মানুষের ব্যবস্থা আল্লাহই করে থাকেন যোবায়দা।' তিন তলার প্রশস্ত বারান্দায় পা রাখতে রাখতে বলল দাদী।

তিন তলার এ বারান্দা বাড়ির পশ্চিম দিকে। বারান্দাটি অন্য সব বারান্দার চেয়ে আলাদা। রেলিং থেকে তিনটি প্রশস্ত ষ্টেপ একটির চেয়ে অন্যটি উঁচু হয়ে উপরে উঠে গেছে। তিন সারিতে বসে অনেকগুলো মানুষ এখান থেকে নিচের দৃশ্যাবলি উপভোগ করতে পারে।

নিচেই পাহাড়ের গোড়ায় মেলার মাঠ। এই বারান্দা থেকে শুধু মেলার মাঠটি নয়, মাঠের চারদিকটাও ভালোভাবে দেখা যায়।

মেলায় বিচিত্র পোশাকের প্রচুর লোক। কিন্তু মাঠ বড় বলে কোথাও মানুষের বড় ভীড় সৃষ্টি হয়নি।

মেলার মূল খেলার মাঠের চারদিক ঘিরে প্রশস্ত জায়গা। এই প্রশস্ত জায়গায় প্রচুর দোকান বসে। মাঠের চারদিকে বসে মানুষ খেলাও দেখে। সারাদিনব্যাপী মেলার প্রথম অংশেই নানা রকম খেলা-ধুলার আসর বসে।

বিভিন্ন আইটেমে একের পর এক প্রতিযোগিতা হয়।

তীরন্দাজী দিয়ে খেলা শুরু হয় এবং শেষ হয় ঘোড় দৌড় দিয়ে। তীর নিক্ষেপ মেলার সর্বোচ্চ সম্মানের প্রতিযোগিতা।

টার্গেটে তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতার আয়োজন চলছে।

যয়নব যোবায়দা ও দাদী বসেছে পাশাপাশি সোফায়। পরিচারিকা 'নূরী' বসেছে এক ষ্টেপ পেছনে একটি চেয়ারে।

তিন জনের হাতেই দূরবীন।

যয়নব যোবায়দা ও দাদীর হাতের দূরবীণ দুটি বেশ বড় আকারের। এ দূরবীন দিয়ে তারা মেলার মাঠের ছোট এক খন্ড কাগজের লেখাও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। দূরবীন দুটি বিশেষ ধরণের। এ দিয়ে দূরের জিনিস নিখুঁতভাবে দেখা যায় এবং দেখাও যায় স্বাভাবিক আকারে।

যয়নব যোবায়দা ও দাদী দু'জনের চোখেই দূরবীন।

যয়নব যোবায়দার দূরবীনের চোখ একজনের ওপর পড়ে হঠাৎ স্থির হয়ে গেল।

দেখল আহমদ মুসাকে। তার বাড়ির দিকে তাকিয়ে কথা বলছে পাশের এক ছেলের সাথে। আহমদ মুসাকে দেখে চিনতে পারল। তাকেই সে সেদিন রাস্তায় ট্যুরিষ্ট হোটেলের পথ বাতলে দিয়েছিল। আর ছেলেটি ঐ হোটেলেরই বেয়ারার ইউনিফরম পরা।

বিস্মিত হলো যয়নব যোবায়দা, লোকটি কেন তার বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে! কি আলাপ করছে ছেলেটির সাথে?

আহমদ মুসা সরে গেল ক্যামেরার লেন্স থেকে।

যয়নব যোবায়দার দূরবীনের চোখ ফিরে এল তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতার দৃশ্যে।

তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল।

প্রতিযোগীর প্রত্যেকেই টার্গেটে তিনটি তীর নিক্ষেপ করবে। নির্দিষ্ট দূরত্বে একটি রাবার বোর্ডে একটি সাদা বৃত্ত আঁকা আছে। বৃত্তের কেন্দ্রে আরেকটা লাল বৃত্ত। লাল বৃত্তের মাঝখানে একটি চোখ আঁকা। চোখের ভেতর চোখের কাল মণিও আঁকা। তীর যদি চোখের মণি বিদ্ধ করে তাহলে তিন পয়েন্ট, চোখের মণির বাইরে লাল বৃত্তের মধ্যে কোথাও আঘাত করলে ২ পয়েন্ট আর লাল বৃত্তের বাইরে সাদা বৃত্তের কোথাও আঘাত করলে ১ পয়েন্ট এবং সর্বোচ্চ নাম্বারের তিনজনকে ফাষ্ট, সেকেন্ড, থার্ড করা হবে। কেউ যদি সর্বোচ্চ নয় পয়েন্ট অর্থাৎ তিন তীরই যদি টার্গেটের চোখের মণিতে লাগাতে পারে তাহলে সে মেলার চ্যাম্পিয়ন ঘোষিত হয়। আর যে সর্বোচ্চ সংখ্যক খেলায় জেতে, তাকে গেমস চ্যাম্পিয়ন খেতাব দেয়া হয়।

যয়নব যোবায়দারা তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতা দেখছিল। কেউ ভাল করছে না। ঘোষক মাইকে জানাল মাত্র একজন প্রতিযোগী আর বাকি। তখন পর্যন্ত একজনই সর্বোচ্চ ৫ পয়েন্ট পেয়েছে। শেষ প্রতিযোগী এল। সে আহমদ মুসা। যয়নব যোবায়দা বিস্ময়ের সাথে দেখল আহমদ মুসার তিনটি তীরই চোখের মণিকে বিদ্ধ করল।

এই সময় একজন পরিচারিকা বারান্দায় প্রবেশ করল। যয়নব যোবায়দাকে লক্ষ্য করে বলল, 'শাহজাদী আপা, ম্যাডাম আয়েশা শহর থেকে এসেছেন।'

'হ্যাঁ, ওঁকে আসতে বলেছি। আজই এসে গেলেন! ঠিক আছে, যাও তুমি ওঁকে বসিয়ে চা-নাস্তার ব্যবস্থা কর। আমি আসছি।'

পরিচারিকা চলে গেল।

'দাদী, ম্যাডাম আয়েশা কয়েকদিন হলো ব্যাংকক থেকে এসেছে। উনি জেদ্দাভিত্তিক একটা মানবাধিকার সংস্থার উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা। ওআইসির

একটা অংগ সংগঠন এটা। আমি এখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে ওঁকে কিছু জানিয়েছি। আর কিছু কথা বলতে চাই।' যয়নব যোবায়দা বলল।

'চেষ্টা কর বোন। কোন চেষ্টা কখন কাজে লেগে যায়, কে বলতে পারে!' বলল দাদী।

'তাহলে তুমি বস দাদী। ওঁর সাথে কথা বলে আসি আমি।'

'ঠিক আছে বোন।' বলল দাদী।

যয়নব যোবায়দা চলে গেল ভেতরে।

যয়নব যোবায়দা ড্রইংরুমে ঢুকতেই ম্যাডাম আয়েশা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'মিস যোবায়দা, আজ রাতেই চলে যাব, তাই বিনা নোটিশে হঠাৎ করে চলে এলাম। অসুবিধা করলাম না তো!'

মিষ্টি হেসে যয়নব যোবায়দা বলল, 'না ম্যাডাম। আমিই তো আপনার সাথে কথা বলতে চেয়েছিলাম। প্লিজ বসুন।'

দু'জনে বসল।

'মিস যোবায়দা, আপনার সব কথা নিয়ে অনেক ভেবেছি। যতই ভেবেছি, ততই বিষয়টা জটিল হয়ে উঠেছে। এমন জটিলতার ওপর কাজ করা মানবাধিকার সংস্থার স্কোপের মধ্যে পড়ে না।' বলল ম্যাডাম আয়েশা।

'কেমন জটিলতা দেখছেন ম্যাডাম?' বলল যয়নব যোবায়দা।

'থাই সরকার দৃঢ়ভাবে মনে করে যে, আপনার ভাই জাবের জহীর উদ্দিন পাত্তানী অঞ্চলের সাম্প্রতিক সন্ত্রাসের মধ্যমণি। কিন্তু আপনারা বলছেন থাই সরকার ভুল করছে। তৃতীয় একটি পক্ষের এটা ষড়যন্ত্র পাত্তানীর মানুষকে শিকার বানাবার জন্যে। এই তৃতীয় পক্ষের কিন্তু আপনারা নাম বলতে পারছেন না এবং চিনেনও না। আর থাই সরকার এমন কিছু বিশ্বাস করে না। এটাই হলো জটিলতা। সন্ত্রাস অব্যাহত থাকা এই জটিলতাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এই অবস্থায় আমাদের মানবাধিকার সংস্থার জন্যে কিছু করার কোন সুযোগ আমি দেখছি না।' ম্যাডাম আয়েশা বলল।

হতাশায় ভরে গেল যয়নব যোবায়দার মুখ। বলল, 'ম্যাডাম আপনি কি বিশ্বাস করেন জাবের জহীর উদ্দিন বা আমরা এই সন্ত্রাস করছি?'

‘না, আমি বিশ্বাস করি না। ব্যাংকক ও পাত্তানীতে এসে আমার অনুসন্ধান থেকেও আমি এটা জেনেছি। কিন্তু এই মতের পক্ষে থাই সরকারকে আমি কোন প্রমাণ দিতে পারছি না!’

‘এটা আমাদেরও সমস্যা। এখন আমরা কি করব?’ কান্না জড়িত কণ্ঠে বলল যয়নব যোবায়দা।

বেদনায় ভরে গেল ম্যাডাম আয়েশার মুখও। ম্যাডাম উঠে এসে যয়নব যোবায়দার পাশে বসল। একটা হাত তার কাঁধে রেখে সান্তনার সুরে বলল, ‘ধৈর্য ধরুন মিস যোবায়দা, আল্লাহই সাহায্য করবেন।’

‘আল্লাহর সাহায্যেরই অপেক্ষা করছি। কিন্তু সব তো শেষ হয়ে গেল। ষড়যন্ত্রকেই আরও পাকাপোক্ত হতে দেখছি।’ ওড়নার প্রান্ত দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলল যয়নব যোবায়দা।

‘এই বিপদে আমার একজনের কথাই শুধু মনে পড়ছে। তিনি আহমদ মুসা। মুসলমানদের এমন বহু বিপদে তিনি এগিয়ে এসেছেন। আল্লাহ ছাড়া এমন সংকট উত্তরণে তার বিকল্প আর কেউ নেই। তিনি আল্লাহর মূর্তিমান এক সাহায্য।’

প্রবল আগ্রহ ফুটে উঠল যয়নব যোবায়দার চোখে-মুখে। মনে হলো তার ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া নতুন রক্তে প্রবাহ এলো। বলল, ‘আমি তাঁর নাম শুনেছি। অনেক পড়েছি তাঁর সম্পর্কে। কিন্তু তিনি তো ধরা-ছোঁয়ার বাইরের এক ফেরেশতা-মানুষ। তাঁকে কোথায় পাব আমরা!’

‘তাঁকে কেউ খুঁজে পায় না মিস যয়নব। তিনিই খোঁজ নিয়ে জাতির সংকট কবলিত মানুষদের কাছে হাজির হন। সর্বশেষ তিনি আন্দামানে এসেছিলেন। আন্দামানের মুসলমানদের মহাসংকট কেটে গেছে।’ বলল ম্যাডাম আয়েশা।

‘আন্দামানে? এই তো কাছেই। কোনোভাবে তাঁকে কিছু জানাবার পথ নেই?’ কান্নাজড়িত কণ্ঠে ব্যাকুলভাবে বলল যয়নব যোবায়দা।

‘তিনি আন্দামান আছেন, না চলে গেছেন জানি না। এখানে আসার আগে জেদ্দায় ওআইসির মুসলিম সংখ্যালঘু সংক্রান্ত এক গোপন রিপোর্টে আমি

আন্দামানে তাঁর মিশন এবং মিশন সফল হওয়া সম্পর্কে জেনেছি।’ ম্যাডাম আয়েশা বলল।

‘ওআইসি’কে অনুরোধ করলে তারা আহমদ মুসার সাথে কোন যোগাযোগ করে দিতে পারে না?’

গম্ভীর হলো ম্যাডাম আয়েশার মুখ। বলল, ‘আহমদ মুসা আল্লাহর অনন্য এক বান্দাহ। এক আল্লাহ ছাড়া কারও অধীনে তিনি নন। তার নিজস্ব কোন চাওয়া, অভিলাষ নেই। নিজেকে নিয়ে তিনি কোন স্বপ্ন দেখেন না, তাই তিনি জগতের কারো মুখাপেক্ষেও নন। ওআইসি সব সময় তার খোঁজও জানতে পারে না। সুতরাং নির্দেশ দেয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।’

‘তাঁর কোন ঠিকানা, বাড়ি নেই?’ আশায় উচ্চকিত যয়নব যোবায়দার কণ্ঠ।

‘ঠিকানা, বাড়ি বলতে যা বুঝায় তা তাঁর নেই। সব মুসলিম দেশের তিনি নাগরিক। এমন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ফ্রান্সও তাঁকে নাগরিকত্ব দিয়ে সম্মানিত করেছে। তবে তাঁর স্ত্রী একটি বাচ্চা নিয়ে থাকেন মদিনায়।’

‘তাদের সাহায্য নেয়া যায় না।’

‘তাঁকে আমি দেখিনি। তার স্ত্রী ও ছেলেকে দেখা আমার এক আবেগময় স্বপ্ন। কিন্তু পারিনি। সৌদি আরবের রাষ্ট্র প্রধানকে ঘিরে যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা, সে রকমই নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে থাকেন তারা। সৌদি আরবের শীর্ষ পর্যায়ের অনুমতি ছাড়া বাইরের কেউ তাদের সাথে দেখা করতে পারে না। অন্য কোন যোগাযোগের মাধ্যম কাউকে জানানো হয় না।’

‘তাহলে?’ বলল যয়নব যোবায়দা। তার কণ্ঠে চরম হতাশার সুর।

‘একটু ধৈর্য ধরুন মিস যোবায়দা। আমি জেদ্দায় ফিরে এখানকার রিপোর্ট ওআইসির মানবাধিকার কমিশনকে দেব। তার সাথে অনুরোধ করব এখানকার ভয়াবহ অবস্থার কথা আহমদ মুসাকে জানানো যায় কিনা। তাছাড়াও মদিনায় যোগাযাগের একটা উদ্যোগ নেব। আমি কথা দিলাম।’

যয়নব যোবায়দা ম্যাডাম আয়েশার দু'টি হাত নিজের দু'হাতের মুঠোয় নিয়ে মুখে চেপে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ল। বলল, 'আপনার এই কথা মনে যে আশা জাগাচ্ছে, তা কল্পনাও করিনি। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাদের সাহায্য করুন।'

ম্যাডাম আয়েশা তাকে দু'হাত দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরল। বলল, 'বোন এমন ভেঙে পড়ো না। আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব। সবচেয়ে বেশি আল্লাহকে বলো। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

নাস্তা করার পর বিদায় নিল ম্যাডাম আয়েশা।

গাড়ি পর্যন্ত বিদায় দিয়ে যয়নব যোবায়দা ফিরে এসে নিজের দেহটাকে সোফায় ছেড়ে দিল। ম্যাডাম আয়েশাকে সব কথা বলতে পেরে ও তার কথা শুনে ভাল লাগছে। সবচেয়ে ভাল লাগছে আহমদ মুসার বিষয়টি। আহমদ মুসা সম্পর্কে অনেক কিছু জানে সে, কিন্তু তাকে এমনভাবে জানত না। তাহলে এমন মানুষও দুনিয়ায় আছে। কেমন হবেন তিনি দেখতে! কেমন হবে চেহারা! কেমনভাবে তিনি কথা বলেন! এমন ফেরেশতাতুল্য মানুষ তো তার দু'চোখ কখনও দেখেনি। মনটা ছুটে গেল আল্লাহর দিকে। একমাত্র তিনিই পারেন সাহায্য করতে। আহমদ মুসা তো তাঁরই বান্দাহ, তাঁরই মুখাপেক্ষী। অতএব তিনি পারেন আহমদ মুসাকে যে কোন সময় এখানে আনতে। একমুখী এই চিন্তায় ডুবে গিয়ে কখন যেন চোখ ধরে এসেছিল ঘুমে।

যয়নব যোবায়দার ব্যক্তিগত পরিচারিকা নূরীর উচ্চকণ্ঠে ঘুম ভেঙে গেল যয়নব যোবায়দার। চোখ খুলেই বলল, 'কি নূরী, হৈ চৈ করছিস কেন? কি হয়েছে?'

'কি হয়নি শাহজাদী আপা? আপনি দেখলেন না। এমন ঘটনা এখানকার মেলায় কোন সময় ঘটেনি। তীরন্দাজীতে যাঁকে আপনি প্রথম হতে দেখেছেন, তিনিই 'মেলায় চ্যাম্পিয়ন' হয়েছেন, আবার গেমসেরও চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।' বলল নূরী উৎসাহের সাথে।

'কি বলছিস? আর কয়টি খেলায় উনি জিতেছেন?' বিস্ময়ে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে যয়নব যোবায়দার।

'ঘোড় দৌড়ে জিতেছেন, কুস্তিতে জিতেছেন এবং লাঠি-বাজিতেও জিতেছেন। তিনি চারটি খেলায় অংশ নিয়ে চারটি খেলাতেই প্রথম হয়েছেন।' বলল নূরী।

'কে তিনি? জানা গেল? তিনি তো পাত্তানী নন।' জিজ্ঞাসা যয়নব যোবায়দার।

'তাকে 'ট্যুরিষ্ট' বলে পরিচয় দেয়া হয়েছে।' বলল পরিচারিকা নূরী।

হঠাৎ নিচে মাঠের দিক থেকে গুলীর শব্দ ভেসে এল। অনেকগুলো গুলীর শব্দ।

যয়নব যোবায়দা এবং নূরী দৌড় দিল পশ্চিমের সেই বারান্দার দিকে।

দাদী বারান্দাতেই বসে আছে। তার চোখে দূরবীন।

'কি হয়েছে দাদী?' জিজ্ঞেস করল যয়নব যোবায়দা। তার চোখে-মুখে উদ্বেগ। আবার কোন সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটল নাকি!

'দেখ মাঠের দিকে।' বলল দাদী। তার চোখ দূরবীনে। মনোযোগ দিল মাঠের ঘটনার দিকে।

দূরবীনসহ চোখ তুলে দ্রুত যয়নব যোবায়দা মাঠের দিকে তাকাল। দেখল বিক্ষেপ্তভাবে চারটি গুলীবিদ্ধ লাশ পড়ে আছে। আর দেখতে পেল আহমদ মুসার হাতে রিভলবার। সে দাঁড়িয়ে আছে। তার দিকে পুলিশ এগিয়ে আসছে। মাঠের সব লোক চারদিকে দাঁড়িয়ে আছে সবার চোখে ভীতি।

যয়নব যোবায়দা দেখল আহমদ মুসার শান্ত, সরল মুখ। একটা ঠিকরে পড়া জ্যোতি সে মুখে। এতবড় হত্যার ঘটনা ঘটেছে, তার কোন প্রতিচ্ছবি তার চোখে-মুখে নেই। যয়নব যোবায়দা বুঝতে পারছে আহমদ মুসার রিভলবারের গুলীতেই ওরা চারজন মরেছে। কিন্তু কোন ভীতি, দুশ্চিন্তা আহমদ মুসার মধ্যে নেই।

পুলিশ এলে আহমদ মুসার সাথে কথা শুরু হলো। যয়নব যোবায়দা দেখল, আহমদ মুসা একটা আইডেনটিটি কার্ড, একটা লাইসেন্স জাতীয় কাগজ ও পাসপোর্ট পুলিশকে দেখাল। পুলিশরা আহমদ মুসাকে একটা স্যালুট দিয়ে পিছনে সরে গেল এবং পরে লাশ নিয়ে তারা চলে গেল।

পুলিশ চলে গেলে মেলার লোকজন সবাই ছুটে এসে আহমদ মুসাকে ঘিরে ধরল ও আনন্দ করতে লাগল।

‘পুলিশ লোকটিকে স্যালুট করল কেনরে বোন? সেও কি পুলিশের লোক? না কি বড় কোন কেউ?’ দাদী জিজ্ঞেস করল যয়নব যোবায়দার দিকে মুখ ফিরিয়ে।

‘না দাদী, সে পুলিশের লোক নয়, এদেশেরও বড় কেউ নয়। এদেশের হলে সে পাসপোর্ট দেখাতো না। যখন সে আইডেনটিটি কার্ড দেখাল, তখন তার নিশ্চয় বড় পরিচয় আছে। হতে পারে আইডেনটিটি এদেশ থেকেই তাকে সাময়িকভাবে দেয়া হয়েছে। পুলিশ চিনেছে বলেই তাকে স্যালুট দিয়েছে। আর লাইসেন্সের মত যে কাগজ দেখাল, সেটা নিশ্চয় রিভলবারের লাইসেন্স। রিভলবারের বৈধ না হলে লোকটিকে পুলিশ নিশ্চয় ছাড়তো না।’

‘তাই হবে বোন। যা হোক, লোকটি কিন্তু বাজের মত ক্ষীপ্র এবং অত্যন্ত কুশলী। না হলে তাকেই মরতে হতো। সে তো নিজেকে বাঁচাবার জন্যে গুলী করেছে।’ বলল দাদী।

‘দাদী তুমি এভাবে বলো না, পুরো ঘটনা বলো।’ যয়নব যোবায়দা বলল।

‘ঐ যে লোকটি দুই পর্বেই চ্যাম্পিয়ন হলো, সে পুরষ্কারের মোট পঞ্চাশ হাজার টাকা মেলা কমিটির হাতে ফেরত দিয়ে অনুরোধ করেছে, আগামী বছর থেকে এই মেলায় শিশু-কিশোরদের দেশ সম্পর্কিত জ্ঞানের, বিশ্ব সম্পর্কিত জ্ঞানের এবং স্রষ্টা সম্পর্কিত জ্ঞানের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করতে হবে। মেলা কমিটির পক্ষ থেকে এই ঘোষণা আসার পর লোকটি এবং একটি ছেলে মেলা থেকে বের হয়ে আসতে যাচ্ছিল, এই সময় রিভলবারধারী চারজন লোক তাদেরকে ঘিরে ফেলে। অবাক কান্ড, লোকটি চোখের পলকে একজনকে আঘাত করে তাকে পেছন থেকে বুকের সাথে সেঁটে ধরে। বাকি তিনজন লোকটিকে লক্ষ্য করে গুলী করেছিল, কিন্তু তিনটি গুলীই গিয়ে লোকটির সামনে ঢাল হিসেবে ধরে রাখা তাদের লোককেই বিদ্ধ করল। এই সুযোগে লোকটি তার পকেট থেকে রিভলবার বের করে নিয়েছে এবং বিদ্যুত গতিতে তার রিভলবার ঘুরে গেল ঐ

তিনজনের ওপর দিয়ে। তিনজনই গুলী খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল। এই হলো ঘটনা। তার পরের ঘটনা তোদের দেখা।’ থামল দাদী।

‘লোকটি অদ্ভুত দাদী। খেলাতেও চ্যাম্পিয়ন। সংঘাতেও চ্যাম্পিয়ন। কিন্তু মেলা কমিটিকে যে পরার্ম তিনি দিলেন তা এসবের বিপরীত। তিনি শিশু-কিশোরদেরকে দেশ, বিশ্ব ও ধর্মজ্ঞানে গড়ে তোলার পরামর্শ দিয়েছেন। অথচ সংঘাতে তিনিই চ্যাম্পিয়ন হলেন।’ বলল যয়নব যোবায়দা।

‘না বোন, সংঘাতের চ্যাম্পিয়নের অর্থ ভিন্ন। সে তো সংঘাতের চ্যাম্পিয়ন নয়। সে আত্মরক্ষা করেছে মাত্র। নিজেকে রক্ষা করা প্রতিটি মানুষের অধিকার এবং দায়িত্ব। নিজের প্রতি এই দায়িত্বই সে পালন করেছে। তার মত যদি আমরা সবাই আমাদের রক্ষা করতে পারতাম, তাহলে আমাদের এই বিপর্যয় ঘটত না, অপরাধীদের দৌরাত্ম সর্বগ্রাসী হয়ে উঠত না। খেলা-ধুলা, তীরন্দাজী ইত্যাদির সাথে শিশু-কিশোরদের দেশ, বিশ্ব ও ধর্মজ্ঞান চর্চার কথা বলে সে শুধু জীবনকে ভারসাম্য করা নয়, বিনোদন ও অস্ত্রবাজীকে মানব জ্ঞান ও নৈতিকতার অধীনে আনতে বলেছে। আজকের জন্য এর চেয়ে ভাল কথা আর কি আছে?’

‘ধন্যবাদ দাদী, তুমি যে অপরূপ ব্যাখ্যা দিলে, সে ব্যাখ্যঅ তারও নিশ্চয় জানা নেই। তবে যাই হোক দাদী, লোকটির প্রতিভা ও যোগ্যতা অসাধারণ মাপের। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, তিনি এদেশের নন, কিন্তু পুলিশ তার কি পরিচয়পত্র দেখে তাকে স্যালুট করতে বাধ্য হলো।’ বলল যয়নব যোবায়দা।

‘এই প্রশ্নের জবাব তোর কাছে যেমন নেই, আমার কাছেও নেই। এর উত্তর পাওয়া ভবিষ্যতের জন্যে তুলে রেখে চলো এখন যাই। খাওয়া-দাওয়া করতে হবে। মেলাও আবার দেখতে হবে।’ বলল উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে।

সবাই উঠে দাঁড়াল এবং বারান্দা থেকে পা বাড়াল ভেতরে যাওয়ার জন্যে।

# ৫

রাত তখন ১টা।

আহমদ মুসা তার নতুন একতলা ভাড়া বাড়ির দরজা নিশব্দে লক করে বারান্দা পার হয়ে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামল। তারপর দু'শ গজের জায়গা পেরিয়ে রাস্তায় উঠে এল।

আহমদ মুসা সে মেলার দিনের ঘটনার পরই হোটেল ছেড়ে এই ভাড়া বাড়িতে এসে উঠেছে। বাছির থানমই তার পাড়ায় এই বাড়ি খুঁজে দিয়েছে। আহমদ মুসার সবচেয়ে সুবিধা হলো, এই পাড়া থেকে যয়নব যোবায়দাদের বাড়ি সোজা হিসাবে মাত্র ৫ মিনিটের দূরত্বে। কিন্তু মাঝখানে একটা পাহাড়, দু'টি উপত্যকা থাকায় ৫ মিনিটের জায়গায় আধা-ঘণ্টা সময় লাগে।

ঠিক আধা ঘণ্টাতেই আহমদ মুসা যয়নব যোবায়দার বাড়ি যে পাহাড়ের উপর তার গোড়ায় গিয়ে পৌছল। একটা পাথরের সিঁড়ি আকাবাঁকা হয়ে শাহ বাড়ি পর্যন্ত উঠে গেছে। বাড়িতে গাড়ি নিয়ে উঠার জন্যে পাহাড়ের গা বেয়ে ভিন্ন পাকা রাস্তা রয়েছে।

আহমদ মুসা সিঁড়ি ব্যবহার না করে সিঁড়ি থেকে একটু দূরে ছোট ছোট গাছ-গাছড়ার আড়াল নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগল।

দূর থেকে দেখলে মনে হয় না, কিন্তু উঠতে গিয়ে দেখল পাহাড় তার ধারণার চেয়ে অনেক উঁচু। শাহ বাড়ির পাশের লনে গিয়ে যখন উঠল, তখন ঘামে নেয়ে উঠেছে আহমদ মুসা।

লনে উঠার পর আহমদ মুসা বাড়ির চারদিক একবার ঘুরে এল। গাড়ি বারান্দা পার হওয়অর সময় দাঁড়ানো দুটি গাড়ির একটি গাড়ি থেকে আসা উত্তাপ অনুভব করল।

আহমদ মুসা গাড়ি দু'টির দিকে এগোলো। স্পর্শ করল দুটি গাড়িই। একটা একেবারেই ঠান্ডা, অন্যটি পুরোপুরি গরম। মনে হচ্ছে দু'চার মিনিট আগে

ইঞ্জিনের ষ্টার্ট বন্ধ হয়েছে। দুটি গাড়িই ভালো করে দেখল আহমদ মুসা। গরম গাড়িটায় সাইলেন্সার লাগানো। দ্বিতীয় গাড়িটায় নেই। এই ধরনের সাইলেন্সার যেসব গাড়িতে লাগানো হয়, সেসব গাড়ি কোন গোপন মিশনে যায়। এই রাত ২টায় গোপন মিশনে কে এল এই বাড়িতে? আহমদ মুসা নিশ্চিত ঠান্ডা গাড়িটাই যয়নব যোবায়দাদের হবে। আর গরম গাড়িটা নিশ্চয় কোন আগন্তুকের। এই আগন্তুক কি যয়নব যোবায়দা-পরিবারের বন্ধু, না শত্রু?

সতর্ক হলো আহমদ মুসা।

ধীরে ধীরে বারান্দায় উঠে গেল সে। ভেতরে ঢোকার দরজাটা বন্ধ। দরজার সামনে আসতেই বাতাসে লোহা পোড়ার একটা গন্ধ পেল আহমদ মুসা। এটা নিশ্চয় লেসার বীম দিয়ে লক পোড়ানোর গন্ধ। উদ্বেগ দেখা দিল আহমদ মুসার মনে। তাহলে শত্রুই ভেতরে ঢুকেছে দেখা যায়। কারা হতে পারে? ব্ল্যাক ঈগলরা? তারাই হবে। নিশ্চয় জাবের জহীর উদ্দিনকে হাতে নেয়ার জন্যে যয়নব যোবায়দা তাদের টার্গেট। আজ যয়নব যোবায়দা কি এ বাড়িতে আছে? খোঁজ না নিয়ে এরা আসেনি নিশ্চয়!

বিসমিল্লাহ বলে আহমদ মুসা দরজার হাতল ঘোরাল। দরজা খোলা। দরজা খুলে বিড়ালের মত নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করল আহমদ মুসা। ঘরে আলো নেই। ঘুটঘুটে অন্ধকার।

পেছনে দরজা বন্ধ করে অনেকক্ষণ স্থির দাঁড়িয়ে থাকল আহমদ মুসা অন্ধকারকে গা সহা করে নেবার জন্য।

আহমদ মুসা দরজার পেছনে সোজা বিপরীত দিকে তাকিয়েছিল। তার ধারণা এ ঘর থেকে ভেতরে যাবার দরজাটা সোজা বিপরীত দিকেই হবে। কিন্তু না, সেদিকে জমাট অন্ধকার। ঘর লম্বালম্বি, ঘরের বাম ও ডান দিকে তাকাল।

ডান দিকে চোখ পড়তেই একটা আলোর রেশ পেল। ওটাই দরজা।

দরজায় পৌছল আহমদ মুসা।

দরজার পরেই একটা করিডোর। করিডোরটা আরও স্বচ্ছ।

করিডোর সোজা সামনে তাকিয়ে দেখল, করিডোরটা একটা বড় বারান্দায় গিয়ে শেষ হয়েছে।

বারান্দা আরও একটু উজ্জ্বল।

কোত্থেকে সরাসরি একটা আলোর রেশ এসে পড়েছে বারান্দায়।

বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

বারান্দাটি বিশাল বৃত্তাকার একটা অংশ। এই বৃত্তাকার বারান্দার মাঝখানে বিশাল উঁচু একটা পাথুরে বেদি। কয়েকশ' লোক বসতে পারে সে বেদিতে। বেদির ডান প্রান্তে সিংহাসনকৃতির একটা বড় সুদৃশ্য চেয়ার। সে সিংহাসনের পেছনেই বারান্দায় এসে মিশে যাওয়া উপরে উঠার সিঁড়ি। সিঁড়ির মুখে উজ্জ্বল আলো। সে আলোই চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

নিশ্চিত বুঝল আহমদ মুসা, বেদিটি একটা দরবার হল। সুলতান বসতেন সিংহাসনাকৃতির এ চেয়ারে। চেয়ারের দু'পাশ দিয়ে বেদি থেকে সিঁড়ি নেমে গেছে বারান্দায়। সুলতান সিঁড়ি দিয়ে দু'তলা বা তিন তলা থেকে নেমে চেয়ারের পাশের সিঁড়ি দিয়ে এসে সিংহাসনে বসতেন। এই চেয়ারই একদিন ছিল পাত্তানীর শাসনের আসন।

আহমদ মুসা সিঁড়ির দিকে এগোবে এমন সময় ওপর থেকে নারী কণ্ঠের চিৎকার। কান্নাকাটি। তারপরেই গুলীর শব্দ।

চমকে উঠে আহমদ মুসা সিঁড়ির দিকে ছুটল। বেড়ালের মত নিঃশব্দে ছুটে গিয়ে দু'তলায় উঠল।

তখন কান্না, চিৎকার থেমে গেছে।

উৎকর্ণ হলো আহমদ মুসা। কান্নার শব্দ কি দু'তলা থেকে এসেছিল, না তিন তলা থেকে?

হঠাৎ একটা কণ্ঠ শুনতে পেল সে। ভারী ক্রুদ্ধ কণ্ঠ। বলছে, 'আমরা শুধু যোবায়দাকে নিয়ে যাব। কিন্তু যারা বাধা দেবে সবাইকে হত্যা করব।'

বলে একটু থেমেই কণ্ঠটি চিৎকার করে উঠল, 'সরে যাও সামনে থেকে।' পর মুহূর্তেই পরপর দু'টি গুলীর শব্দ। সেই সাথে আর্তচিৎকার।

আহমদ মুসা দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে তিন তলায় উঠল।

দক্ষিণ দিক থেকে শব্দ আসছে। ছুটল সেদিকে।

পৌঁছল দক্ষিণ প্রান্তে। দেখতে পেল ঘরটি।

কিন্তু ঘরের দরজায় দু'জন দাঁড়িয়ে আছে ষ্টেনগান নিয়ে, ওরা দেখতে পেয়েছে আহমদ মুসাকে। ষ্টেনগান তুলে ধরল ওরা।

উপায়ন্তর না দেখে আহমদ মুসা বাম পাশে নিজেকে মাটির উপর ছুড়ে দিল চোখের পলকে। এক ঝাঁক গুলী উড়ে গেল যেখানে সে দাঁড়িয়েছিল সেখান দিয়ে।

মাটিতে পড়েই আহমদ মুসা পরপর দু'টি গুলী করল দরজার ষ্টেনগানধারী দু'জনকে। ওরা ষ্টেনগানের নতুন লক্ষ্য স্থির করার আগেই গুলী খেয়ে পড়ে গেল।

গুলী করেই আহমদ মুসা গড়িয়ে দরজার সরাসরি সামনের অবস্থান থেকে একপাশে সরে গেল যাতে গুলীর শব্দ শুনে ভেতর থেকে যারা ছুটে আসবে প্রথমেই তাদের চোখে পড়ে না যায় সে। গুলীর শব্দ শুনেই গুলী করতে করতে ভেতর থেকে দু'জন বেরিয়ে এল। সামনে কাউকে না দেখে পাশে খোঁজ করার জন্যে তাকাতে লাগল। এই সময়টায় তাদের গুলী বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই সময়টুকুই আহমদ মুসার জন্যে যথেষ্ট। তার রিভলবার ওদের তাক করল। শেষ মুর্হর্তে ওরা দেখতে পেয়েছিল আহমদ মুসাকে। কিন্তু ষ্টেনগান সক্রিয় হবার আগেই আহমদ মুসার রিভলবারের দু'টি গুলী ওদের ওপর মোক্ষম আঘাত হানল। ভূমি শয্যা নিল ওরা।

গুলী করেই আবার স্থান পরিবর্তনে এগোলো আহমদ মুসা। ভাবল সে, ভেতরে অস্ত্রধারী যারা আছে, তারা এখন সাবধান হবে। না দেখে শুনে গেটের সামনে দৌড়ে আসবে না। সুতরাং আহমদ মুসাকেই এখন ওদের কাছাকাছি পৌছতে হবে।

আহমদ মুসা ফুটবলের মত দ্রুত গড়িয়ে দরজার পাশে দেয়ালের আড়ালে পৌছে উঠে দাঁড়াল। রিভলবারে নতুন করে গুলী লোড করল। তারপর রিভলবার বাগিয়ে দরজার চৌকাঠের সমান্তরাল হবার জন্যে এগোলো।

চৌকাঠের সমান্তরাল থেকে একটু মুখ বাড়াতেই আরেকজন ষ্টেনগানধারীর একেবারে মুখোমুখি হয়ে গেল। সে দরজার এদিকের দেয়াল ঘেঁষে সামনে আসছিল। তারও ষ্টেনগান উদ্যত ছিল, কিন্তু তার লক্ষ্য ছিল সামনে। সে

ট্রিগার টিপে ষ্টেনগানের মুখ ঘুরাতে গিয়েছিল। তবে তার আগেই আহমদ মুসার প্রস্তুত রিভলবারের গুলী তার মাথা গুড়িয়ে দিল।

গুলীর সাথে সাথেই আহমদ মুসা তার মুখটা দরজায় আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। তার চোখের অনুসরণ করে তার রিভলবারের নলও ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

ঘরের ভেতরে চোখ পড়তেই আহমদ মুসা দেখল, প্রায় ছয় ফুটের মত লম্বা বডি বিল্ডার জাতীয় একজন লোকের ভয়ংকর বেল্ট মেশিনগান। তার মেশিনগানটা দরজার দিকে তাক করা থাকলেও তার চোখ এসে পড়েছে আহমদ মুসার ওপর। তার চোখে এক বিমূঢ় ভাব ফুটে উঠেছে। সেটা কাটতেই তার পকেট মেশিনগারে ছোট্ট ব্যারেল আহমদ মুসার দিকে ফেরাতে যাচ্ছিল।

আহমদ মুসা কঠোর কণ্ঠে। বলল, 'তোমার মেশিনগানের ব্যারেল সুঁচ পরিমাণ নড়লে আমি গুলী করব। আর আমার গুলী...........।'

আহমদ মুসা কথা শেষ করতে পারল না। বেপরোয়া লোকটির মেশিনগানের ব্যারেল ঘুরে আসছিল। কথার মাঝখানেই আহমদ মুসার তর্জনি রিভলবারের ট্রিগার টিপে দিয়েছিল।

গুলী গিয়ে বিদ্ধ করল তার হাতকে। মেশিনগান পড়ে গেল তার হাত থেকে।

তার সামনেই পড়েছিল একজন তরুণীর লাশ। সেই লাশের ওদিকে পালংকের খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে আছে অভিজাত চেহারার অপরূপ একটি মেয়ে। কিন্তু অসীম আতংকে মুষড়ে গেছে তার চেহারা। মেয়েটিকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে আরেকজন তরুণী। তার মধ্যে রুখে দাঁড়ানো ভাব। আর পালংকের ওপ্রান্তে পালংকের খুঁটিতে ঠেশ দিয়ে আছে এক স্বর্গীয় চেহারার বৃদ্ধা। কিন্তু তার চোখ-মুখে বিপর্যস্ত-বিহবল দৃষ্টি।

হাতে গুলী খেয়েই ছয় ফুট দৈর্ঘ্যের বডি বিল্ডার লোকটি ঝড়ের গতিতে এগোলো মেয়ে দু'টির দিকে। সে বাম হাত দিয়ে পকেট থেকে আরেকটি রিভলবার বের করে নিয়েছিল।

আহমদ মুসা তার মতলব বুঝে ফেলল। সে মেয়ে দু'টিকে ঢাল বানিয়ে নতুন আক্রমণের পথ করতে চাচ্ছে।

‘দাড়াও।’ আহমদ মুসা তীব্র কণ্ঠে বলল।

কিন্তু তার দাঁড়ানোর কোন লক্ষণ নেই। সে প্রায় মেয়েদের পেছনে চলে গিয়েছিল। মেয়ে দু’টিকে সামনে টেনে নেবার জন্য সে হাতও বাড়িয়েছিল।

আহমদ মুসার তর্জনি আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তার রিভলবারের গুলী সামনের মেয়েটির কানের পাশ দিয়ে গিয়ে বিদ্ধ করল লোকটির বুকের বাম পাশ।

লোকটির দেহ টলে উঠে ছিটকে পড়ে গেল উল্টো দিকে।

আহমদ মুসার মুখে একটা বেদনার ছায়া নামল। মুখটা তার একটু উপর উঠল। তার মুখ থেকে স্বগত বেরিয়ে এল, ‘উঃ স্যরি। এই লোকটিকে মারতে চাইনি। এ জন্যেই প্রথম গুলীটা হাতে করেছিলাম। কিন্তু মারতেই হলো। বাঁচানো গেলে তার কাছ থেকে অনেক কথা আদায় করা যেত।’

বলেই আহমদ মুসা মাটিতে পড়ে থাকা গুলীবিদ্ধ মেয়েটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তার আহত স্থানের রক্তে তখনও কাপড় ভিজে উঠতে দেখা যাচ্ছিল। এটা তার বেঁচে থাকার লক্ষণ।

আহমদ মুসা মেয়েটির গলার শা-রগে হাত রেখে দেখল তার নাড়ী সচল। বেঁচে আছে মেয়েটি।

আহমদ মুসা ঘরে ঢুকেই বুঝতে পেরেছে তরুণী মেয়েটার পেছনে পালংকের খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে থাকা অভিজাত সুন্দর মেয়েটিই যয়নব যোবায়দা। আর ওপাশের বয়স্কা মহিলাই যয়নব যোবায়দার দাদী। বাছির থানম বলেছিল যয়নব যোবায়দারা এ বাড়িতেই সময় সময় থাকে। অন্যদিকে যয়নব যোবায়দার সামনের তরুণীটি এবং গুলীবিদ্ধ মেয়েটি বাড়ির পরিচারিকা হবে তা দেখেই বুঝতে পেরেছে আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা দাদীর দিকে চেয়ে বলল, ‘দাদীমা, মেয়েটি এখনও বেঁচে আছে।’

বলেই আহমদ মুসা তাকাল যয়নব যোবায়দার দিকে। তারপর সামনে দাঁড়ানো মেয়েটিকে লক্ষ্য করে বলল, ‘তুমি এসো। এর আহত জায়গার জামা ছিঁড়ে ফেল। ওখানকার রক্ত মুছে দাও।’

যয়নব যোবায়দা, দাদী এবং পরিচারিকা নূরী রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে ছিল আহমদ মুসার দিকে। যেন আকাশ থেকে পড়ল মেলার মাঠের চ্যাম্পিয়ন সেই লোকটিকে দেখে! সে কি করে এল এখানে? নিজেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে কেন বাঁচাচ্ছে সে তাদেরকে?

দাদীকে উদ্দেশ্য করে আহমদ মুসার কথা এবং পরিচারিকাকে কাজের জন্যে আহবান করা থেকে তারা সম্বিত ফিরে পেল।

আহমদ মুসার নির্দেশ শুনে পরিচারিকা নূরী তাকাল যয়নব যোবায়দার মুখের দিকে।

'তাড়াতাড়ি যাও, উনি যা বলছেন তা কর।' বলল যয়নব যোবায়দা। তার বিমূঢ় দৃষ্টি আবার ফিরে গেল আহমদ মুসার দিকে। কে এই লোক? কেমন করে সে বুঝল আজ এই সময় আমি আক্রান্ত হবো? গতকাল এই লোকটিও আক্রান্ত হয়েছিল। তাঁকে আক্রমণ করেছিল যারা এবং আমাকে আক্রমণকারী এরা কি একই গ্রুপের? তা কি করে হয়? আমাকে যারা কিডন্যাপ করতে এসেছিল, তারা নিশ্চয় ভাইয়া ও আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী। এ ষড়যন্ত্রকারীরা তার বিরুদ্ধে যাবে কেন? হাজারো চিন্তা যয়নব যোবায়দার মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল।

পরিচারিকা নূরী গিয়ে মেয়েটির গুলীবিদ্ধ স্থানের জামা ছিঁড়ে ফেলল। তারপর নিজের ওড়নার অংশবিশেষ ছিঁড়ে আস্তে আস্তে যত্নের সাথে রক্ত মুছে ফেলল।

আহমদ মুসা একটু ঝুঁকে পড়ে আহত জায়গাটা পরীক্ষা করল। আহমদ মুসা পরিচারিকা নূরীকে মেয়েটির বাম কাঁধটা একটু উঁচু করতে বলল। কাঁধটা উঁচু করলে আহমদ মুসা নিচের দিকটাও পরীক্ষা করল। মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আহমদ মুসার। মুখ তুলে বলল, 'দাদীমা, মিস যয়নব যোবায়দা এর আঘাত সিরিয়াস নয়। গুলীটা হার্টের অনেক বাইরে দিয়ে কোনাকুণিভাবে এগিয়ে কাঁধের নিচে পাঁজরের প্রান্তে চলে এসেছে। সামান্য অপারেশনেই গুলীটা বের করা যাবে। আর মেয়েটা আঘাতের কারণে ভয়ে সংগা হারিয়েছে।'

'ধন্যবাদ জনাব। তাহলে তো এখনই ডাক্তার ডাকতে হয়?' বলল যয়নব যোবায়দা।

'আপনাদের বিশ্বস্ত কোন ডাক্তার আছে?' আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

সংগে সংগে উত্তর দিল না যয়নব যোবায়দা।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'বুঝেছি। ডাক্তার ডাকার দরকার নেই। ডাক্তার বিশ্বস্ত না হলে অহেতুক পুলিশের ঝামেলায় পড়তে হবে। আপনারা রাজি হলে গুলীটি আমিই বের করতে পারি।'

দাদী অনেক আগেই এসে আহত মেয়েটির পাশে দাঁড়িয়েছিল। বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, 'তুমি কেমন ছেলে ভাই, তুমি আমাদের সবাইকে বাঁচালে, এখন আরেকজনকে বাঁচার জন্য অনুমতি চাইছ!'

'ধন্যবাদ দাদী মা। এখনই অপারেশন হবে।' বলে পরিচারিকা নূরীকে বলল মেয়েটিকে কাত করে শুইয়ে দিতে।

মেয়েটিকে কাত করে শুইয়ে দিল পরিচারিকা।

আহমদ মুসা জ্যাকেটের কলারের একটা গোপন বোতাম খুলে ভেতর থেকে দেড় ইঞ্চি লম্বা ও কোয়ার্টার ইঞ্চি প্রস্তের একটা ছুরি বের করল। ছুরির এ্যান্সিসেপটিক কভার খুলে ছুরিটি আনফোল্ড করে যয়নব যোবায়দার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার ফাষ্ট এইড বক্স আছে নিশ্চয়। আনিয়ে দিন প্লিজ।'

'আছে জনাব। নূরী ওঁকে সাহায্য কর। আমি নিয়ে আসছি।'

বলে যয়নব যোবায়দা দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মিনিট খানেকের মধ্যে ফাষ্ট এইড বক্স নিয়ে হাজির হলো।

আহমদ মুসা সংগে সংগে কাজে লেগে গেল।

বুক ও বাহুসন্ধির মাঝামাঝি জায়গায় গুলীটি আটকে আছে।

জায়গাটায় স্পিরিট ক্লিন করে ছুরি চালাবার আগে নূরীকে লক্ষ্য করে বলল, 'তুমি এর সামনে হাঁটু গেরে বস। এর দেহটাকে তোমার উপর ঠেস দিয়ে রাখ। মাথা ও দেহটাকে শক্ত করে ধরবে। আঘাত পেলে জেগে যাবার সম্ভাবনা আছে। দেখ যেন না নড়ে। এঁকে ক্লোরোফরম করলাম না। কারণ এ রক্ত ক্ষরণে দূর্বল হয়ে পড়েছে।'

যয়নব যোবায়দা মেয়েটির মাথার কাছে বসে পড়ে বলল, 'নূরী আমি এর মাথা ধরছি, তুই এর শরীরকে তোর সাথে সেঁটে নিয়ে শক্ত করে ধর।'

আহমদ মুসা দ্রুত ও নির্মর্মভাবে ছুরি চালার। মেয়েটি সংগা ফিরে পেয়ে চিৎকার করে উঠল, তখন আহমদ মুসা বুলেটটি বের করে ফেলেছে।

আহমদ মুসা দ্রুত ব্যান্ডেজ করে দিল মেয়েটির অপারেশন করা ও গুলীবিদ্ধ স্থানটি।

যয়নব যোবায়দা, দাদী, নূরী সবাই অপার বিস্ময়ের সাথে আহমদ মুসার কাজ দেখছিল। আর মাঝে মাঝেই তাকাচ্ছিল আহমদ মুসার ভাবলেশহীন, সরল, সুন্দর মুখের দিকে।

ব্যান্ডেজ হয়ে গেলে যয়নব যোবায়দার মুখ ফুঁড়েই যেন বেরিয়ে এল, 'ধন্যবাদ জনাব। আপনি কি ডাক্তারও।'

'না, ডাক্তার নই। যা দেখলেন এসব আমি দেখে শিখেছি। আমার দেহেও এমন অপারেশন অনেক হয়েছে তো!'

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা নূরীকে বলল, 'তুমি মেয়েটার সামনেটা ধর, আমি পায়ের দিকটা ধরছি। চলো একে এর বিছানায় শুইয়ে দিই।'

'স্যার একটু দাঁড়ান। আমি এর বিছানাটা ঠিক করে আসি।'

বলে দৌড় দিল পরিচারিকা নূরী।

'তুমি কে ভাই, আল্লাহর ফেরেশতার মত এভাবে হাজির হলে? তোমাকে ধন্যবাদ দেবার মত উপযুক্ত ভাষা দুনিয়ায় তৈরি হয়নি ভাই।' নূরী বেরিয়ে যেতেই বলল দাদী।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'দাদীমা আমাদের এই ক্ষুদ্র কাজকে ধন্যবাদ দেবার মত ভাষা যদি না থাকে, তাহলে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আমাকে এই জ্ঞান ও যোগ্যতা দান করেছেন, অপার বিস্ময়ের এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন তাঁকে ধন্যবাদ কিভাবে দেবেন!'

'তুমি মুসলমান ভাই?' প্রশ্ন দাদীমার। তার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

'হ্যাঁ, আমি এটা দাবী করি দাদীমা।' আহমদ মুসা বলল।

‘আলহামদুলিল্লাহ। কাল মেলার মাঠে যখন খেললে, চ্যাম্পিয়ন হলে, তখন তোমাকে বিদেশী ট্যুরিষ্ট বলা হয়েছিল। তবে আমি তোমার অন্য কোন পরিচয় আছে ভেবেছিলাম।’ বলল দাদীমা।

‘জনাব, কালকে মাঠে যারা আপনাকে আক্রমণ করেছিল, তারা এবং এই আক্রমণকারীরা কি এক?’ দাদী থামতেই প্রশ্ন করল যয়নব যোবায়দা।

আহমদ মুসা মূহূর্তের জন্যে মুখ তুলল যয়নব যোবায়দার দিকে। তারপর মুখ নামিয়ে বলল, ‘হ্যাঁ আমি এক মনে করি। আপনারা কি কাল মেলায় ছিলেন?’

‘না জনাব। আমরা সব সময়ের মত গতকালও বাসায় বসে দূরবীনে খেলা দেখেছি।’

কথা শেষ করে যোবায়দা আবার সংগে সংগেই বলে উঠল, ‘আক্রমণকারীরা কারা?’

‘এরা ব্ল্যাক ঈগল’-এর লোক।

‘ব্ল্যাক ঈগল কারা?’

‘এরাই থাইল্যান্ডে মুসলমানদের নামে সন্ত্রাস করে মুসলমানদের সন্ত্রাসী সাজাবার কাজ করেছে। বিভ্রান্ত পুতুল কিছু মুসলমানকেও তারা তৈরি করেছে তাদের জন্যে।’

অপার বিস্ময়ের এক সয়লাব এসে আছড়ে পড়েছে যয়নব যোবায়দার চোখে-মুখে। সে সংগে সংগে কথা বলতে পারল না। এই বিস্ময় তার বুকটাকেও যেন কাঁপাচ্ছে। গোটা শরীরকে এই বিস্ময় যেন ওজনহীন অনুভূতিহীন করে দিচ্ছে। যে কথা তারা শত চেষ্টাতেও জানতে পারেনি, যার অস্তিত্ব পুলিশও বিশ্বাস করে না, সে বিষয়টা ইনি এমন অবলিলাক্রমে বলে দিলেন?

নূরী এসে পড়েছে। বলল আহমদ মুসাকে, ‘সব ঠিক-ঠাক, চলুন স্যার।’

আহমদ মুসা ও নূরী ধরাধরি করে মেয়েটির দেহ চ্যাং দোলা করে নিয়ে চলল।

চলে গেল তারা ঘরের বাইরে পরিচারিকাটির ঘরের দিকে্

ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই যয়নব যোবায়দা ধপ করে পালংকের উপর বসে পড়ল।

দাদীও তার কাছে এসে বসল। বলল, 'আল্লাহর হাজার, লাখো শোকর। তিনিই এই ভাইকে অসহায়দের সাহায্যে পাঠিয়েছেন।'

যয়নব যোবায়দার সম্বিত হারা ভাব কেটে গেল। বলল, 'কে এই লোক দাদী? আল্লাহর ফেরেশতা নয় তো! সব যোগ্যতা তিনি রাখেন, সব কথা তিনি জানেন। কোন লোকের পক্ষে এটা কি করে সত্য হতে পারে!'

'আমার বিস্ময় লাগছে, তার কলারের ভেতর অপারেশন করার ছুরিও ছিল। তাহলে কি নেই তার কাছে? সত্যি বলেছিস বোন, ও অবিশ্বাস্য এক মানুষ।' বলল দাদী।

'বিশেষ করে মুসলমানদের মধ্যে এমন লোক একজনই আছেন। কিন্তু তিনি তো..........।'

কথা শেষ করতে পারলো না যয়নব যোবায়দা। ঘরে ঢুকল আহমদ মুসা ও পরিচারিকা নূরী।

ঘরে ঢুকেই আহমদ মুসা দাদীকে লক্ষ্য করে বলল, 'দাদী লাশগুলোকে কোথায় লূকাতে পারি? অহেতুক পুলিশের ঝামেলায় পড়া ঠিক হবে না।'

'আমাদের বাড়ির পেছনে একটা অন্ধ কূপ আছে। এ কূপই এর উপযুক্ত জায়গা। কূপের মুখে পাথর আছে। ওটা সরালেই কুপ ওপেন হয়ে যাবে।'

'ধন্যবাদ দাদীমা। বলেই আহমদ মুসা পরিচারিকা নূরীকে অনুরোধ করল, 'চলো, তুমি কষ্ট করে কূপটা আমাকে দেখিয়ে দেবে।'

একটা লাশ কাঁধে তুলতে যেয়ে হঠাৎ থেমে গেল আহমদ মুসা। নূরীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্যরি নূরী, একটু অপেক্ষা কর। আমি এদের সার্চ করি।'

ঘরের ৪টি লাশের পকেটে ৪টি মানিব্যাগ, বাড়তি গুলী ব্যারেল এবং সবশেষের শিকার ছয়ফুট লম্বা লোকের কাছ থেকে পাওয়া গেল একটা মোবাইলও। তিনটি মানিব্যাগই টাকায় ভর্তি। একটি মানিব্যাগ থেকেই শুধু বেরুল একটি ইনভেলাপ। ইনভেলাপে পোষ্টাল ছাপ নেই। ইনভেলাপটি এখনও পোষ্ট করা হয়নি বুঝল আহমদ মুসা।

টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলল ইনভেলাপের কভার। পেল ইনভেলাপের ভেতর একখন্ড কাগজ। কাগজে দেড় লাইন হিব্রু ভাষায় লেখা। তা হলো: 'জুদাহ,

নিচের রোডম্যাপ তোমাকে ডেষ্টিনেশনে নিয়ে আসবে।’ এই দেড় লাইন লেখার নিচে একটা রোডম্যাপ আঁকা। রোডম্যাপের স্থানিক ইনডিকেশনগুলোও হিব্রুতে লেখা। রোড শুরু হয়েছে পাত্তানী সিটি থেকে। কয়েকটি স্থান টাচ করে ডেষ্টিনেশন লাল ডট ‘কাতান টেপাংগো’ গিয়ে শেষ হয়েছে। মাঝের ডট চিহ্নিত স্থানগুলোর নাম তার পরিচিত নয়। মানচিত্রে এসব নাম নেই। ‘কাতান টেপাংগো’ নামও মানচিত্রে নেই। কিন্তু নামটি শুনেছে ব্যাংককের হোটেল বেয়ারার কাছে। এখানে জাবের জহীর উদ্দিনকে এনে রাখার কথা। রোডম্যাপের কাগজটির এক কোণে দিক নির্দেশের ইনডিকশেন রয়েছে।

আনন্দে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আহমদ মুসার। সে মুখ তুলল উপরে। স্বগতই তার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল, ‘আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইয়্যিন কাদির।’

আহমদ মুসা কাগজটি হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, ‘মিস যয়নব যোবায়দা, আপনি কি ‘কাতান টেপাংগো’ চেনেন?’

সংগে সংগে জবাব দিল না যয়নব যোবায়দা। সম্ভবত মনে করার চেষ্টা করছিল।

উত্তর দিল দাদী। বলল, ‘হ্যাঁ চিনি ভাই। কিন্তু হঠাৎ এ নামের কথা বলছ কেন?’

‘পরে বলব দাদীমা’ বলে নূরীকে নির্দেশ দিল টাকার মানিব্যাগগুলো ওদের পকেটে রেখে দাও।

আহমদ মুসা ইনভেলাপ এবং মোবাইলটা পকেটে ফেলে বাইরের ৪ জনকে সার্চ করার জন্যে বেরিয়ে গেল।

ওদের পকেটে টাকার মানিব্যাগ ছাড়া কিছুই পেল না।

আহমদ মুসা ঘরের ভেতরে ফিরে এল। বলল দাদীকে, ‘দাদীমা আপনারা ঐ ঘরে আহতের কাছে যান। নূরী আমাকে কূপটি দেখিয়ে দিয়ে ওখানে যাবে।’

আহমদ মুসা একটি লাশ তুলে নিল কাঁধে। চলতে লাগল। নূরী আগে আগে চলছে।

‘কি কাগজ পেয়ে সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল দাদীমা? হঠাৎ ‘কাতান টেপাংগো’র কথা জিজ্ঞেস করল কেন? ‘কাতান টেপাংগো’কি, কোথায় দাদীমা?’ বলল যয়নব যোবায়দা।

‘তোদের সম্মানিত পূর্ব পুরুষ সুলতান আবদুল কাদের কামালুদ্দিন রাজ্যহারা হয়ে ওখানে গিয়ে বিদ্রোহী ঘাঁটি তৈরি করেছিলেন। পরে অস্ত্র ত্যাগ করার পর ওখান থেকে সরে আসেন। এখন ওটা সমাজ বিরোধীদের ঘাঁটি।’ দাদী বলল।

‘এমন স্থানের সাথে ওঁর সম্পর্ক কি?’

‘সেই জানে।’

বলে একটু থেমেই আবার বলা শুরু করল, ‘দেখছিস যোবায়দা, এমনভাবে সে কাজ করছে যেন সেই বাড়ির মালিক আর আমরা মেহমান। মনে হচ্ছে কতদিনের পরিচিত সে। তার সবটাই অদ্ভুত।’

‘এখনও তার পরিচয় জানা হলো না দাদীমা?’

‘ধীরে সুস্থে কথা বলার সময় তো এখনো হয়নি।’

‘চলো দাদীমা। উনি এসে যেন না দেখেন যে আমরা ওঘরে যাইনি। তাছাড়া ও একা পড়ে আছে। আমাদের কারো বরং আগেই যাওয়া উচিত ছিল।’

বলে যয়নব যোবায়দা দাদীকে হাত ধরে তুলে নিয়ে তাকে সাথে করে হাঁটতে শুরু করল।

আহমদ মুসা লাশগুলো সব সরিয়ে ফেলল। ইতিমধ্যে নূরী রক্তের সব চিহ্ন মুছে ফেলল।

‘ধন্যবাদ নূরী, অনেক পরিশ্রম করেছ।’ আহমদ মুসা বলল নূরীকে।

‘কিন্তু স্যার, ব্যাপারটা উল্টো হলো, ধন্যবাদ তো আমরাই আপনাকে দেব।’ বলল নূরী।

‘ঠিক আছে, তোমরা ধন্যবাদ দিও। এখন চলো ওঁদের কাছে।’

আহমদ মুসাদের যেতে হলো না। দাদী ও যয়নব যোবায়দারাই এসে গেল।

‘এসো ভাই বস। তুমি ক্লান্ত। এখন পর্যন্ত বসারও সুযোগ পাওনি।’

দাদী আহমদ মুসাকে নিয়ে এসে বসাল তিন তলার বিশাল ড্রইং রুমটিতে।

বসেই আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকাল। বলল, ‘দাদীমা, এখন রাত ৪টা। একটা জরুরী কথা আপনাদের বলতে চাই। বলতে পারি কি না?’

‘আমাদের লজ্জা দিও না, বল।’ বলল দাদী।

‘এ বাড়িতে আপনাদের থাকা চলবে না। এমন কোন বাড়ি আপনাদের থাকার মত আছে কি না যার অবস্থান গোপন রাখা যায়?’ আহমদ মুসা বলল। তার কণ্ঠ গম্ভীর।

‘এ প্রশ্ন পরে। আগে আপনার পরিচয় বলুন প্লিজ। আমাদের জন্যে এতটা করছেন, এতটা ভাবছেন কেন?’ বলল যয়নব যোবায়দা। তার কণ্ঠ গম্ভীর।

‘আপনি আমাকে ডেকেছেন।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমি আপনাকে ডেকেছি!’ বিস্ময় বিজড়িত কণ্ঠ যয়নব যোবায়দার।

‘হ্যাঁ, বলে আহমদ মুসা জ্যাকেটের ভেতরের পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে যয়নব যোবায়দার দিকে তুলে ধরল। ছুটে এসে নূরী আহমদ মুসার হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে যয়নব যোবায়দার হাতে দিল।

যয়নব যোবায়দা চিঠির দিকে তাকাতেই তার চেহারা পাল্টে গেল। বিস্ময়, আবেগ, উত্তেজনায় সে মুষড়ে পড়ল, কণ্ঠ চিরেই যেন তার একটা আর্তস্বর বেরিয়ে এল, ‘এটা আপনি কোথায় পেয়েছেন?’

‘আন্দামানে।’

চোখ দু’টি ছানাবড়া হয়ে উঠল যয়নব যোবায়দার। মুহূর্ত কয়েক পাগলের মত তাকিয়ে থাকল আহমদ মুসার দিকে। মনে পড়ল ম্যাডাম আয়েশার কথা যে, আহমদ মুসা এখন আন্দামানে।

বলল যয়নব যোবায়দা কম্পিত ও কান্নাজড়িত কণ্ঠে, ‘আপনি কি আহমদ মুসা?’

‘হ্যাঁ, আমি আহমদ মুসা।’

আহমদ মুসার কণ্ঠ শেষ হবার আগেই যয়নব যোবায়দা সোফা থেকে কার্পেটের উপর সিজদায় ঢলে পড়ল। সিজদায় পড়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল সে। আবেগ রুদ্ধ কান্নায় তার গোটা দেহ কাঁপছে।

কারো মুখে কোন কথা নেই।

বিমূঢ় আহমদ মুসা।

কান্না থামছে না যয়নব যোবায়দার।

দাদী ধীরে ধীরে উঠে যয়নব যোবায়দার গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, 'উঠ বোন। কান্না নয়, এখন তো হাসা দরকার।'

যয়নব যোবায়দা উঠে জড়িয়ে ধরল দাদীকে। বলল, 'দাদী আল্লাহর এত দয়া করেছেন আমাদর! এত ভালবাসেন তিনি তাঁর অসহায় বান্দাদের। আবেদনটা একেবারে পৌছে দিয়েছেন তাঁর খাস সৈনিকের হাতে।'

দাদী যয়নব যোবায়দার মুখটা তুলে ধরে নিজের ওড়না দিয়ে তার চোখ-মুখ মুছে দিয়ে বলল, 'তাঁকে ডাকার মত ডাকলে তিনি এভাবেই সাড়া দেন বোন। তুই তাঁকে সেভাবেই ডাকতে পেরেছিস।'

দাদী যয়নব যোবায়দাকে তুলে এনে নিজের পাশে বসাল। তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'সবার স্বপ্ন, সবার আশা, সবার মাথার মণি আহমদ মুসাকে কিভাবে সম্বোধন করব?'

আহমদ মুসা ম্লান হাসল। বলল, 'দাদী তার নাতিকে যেভাবে সম্বোধন করে, সেভাবেই সম্বোধন করবেন। দাদীমা আমি কারও স্বপ্ন, আশা বা মাথার মণি কিছুই নই, আমি সবার পাশের লোক। আমাকে এভাবে না দেখলে আমি দুঃখ পাব।'

বলে আহমদ মুসা মুহূর্তকাল থেমেই আবার বলল, 'দাদীমা আমি আপনাদের থাকার ব্যাপারে একটা কথা বলেছিলাম, সেটা ঠিক হওয়া দরকার।'

যয়নব যোবায়দা আহমদ মুসার দিকে তাকাল। বলল, 'স্যার, আপনি যা বলবেন, আমরা সেটাই করব। সুলতান গড়ে থাকার আমাদের বিকল্প জায়গা নেই। তবে পাত্তানী সিটি এবং ব্যাংককে সে ধরনের বাড়ি আছে।'

‘মিস যোবায়দা’ পাত্তানী সিটির বাড়ি কি আপনাদের জন্যে নিরাপদ?’ বলল আহমদ মুসা।

‘ঐ বাড়িটা আমাদের সেটা কেউ জানে না। এমন কি কাগজপত্রও আমাদের নামে নেই। ইদানিং মাঝে মাঝে আমি ওখানে গিয়ে থাকছি।’ যয়নব যোবায়দা বলল।

‘ওখানে আপনারা কে কে থাকবেন?’

‘আমি দাদী এবং কয়েকজন পরিচারিকা।’ বলল যয়নব যোবায়দা।

‘এলাকাটা কেমন?’

‘শতভাগ মুসলিম এলাকা। পাত্তানী সিটির পুরনো অঞ্চল। আমাদের বাসাটা যেখানে, সেখানে রিকশা জাতীয় গাড়ি ছাড়া অন্য কোন গাড়ি যাবার সুযোগ নেই। আর সেখানে একটা ডাক দিলে মুহূর্তেই শত শত লোক হাজির হতে পারে।’

খুশি হলো আহমদ মুসা। বলল, ‘ঠিক আছে। ভালো জায়গা। আজ ভোরেই আপনাদের এ বাড়ি ছাড়তে হবে।’

‘ঠিক আছে স্যার।’ বলল যয়নব যোবায়দা।

কথা শেষ করেই আবার বলে উঠল, ‘বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে কি আমি কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারি?’

‘অবশ্যই।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ষড়যন্ত্রকারী দলের নাম আপনি ‘ব্ল্যাক ঈগল’ বলেছেন। এদের সম্পর্কে, ভাইয়া সম্পর্কে নিশ্চয় আরও কিছু জানেন।’ বলল যয়নব যোবায়দা।

‘ব্ল্যাক ঈগল’ সংগঠণ আসলে আন্তর্জাতিক একটি জায়োনিষ্ট সংগঠনের তৈরি। সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ঘটাচ্ছে মুসলিম পরিচয়ে। পুলিশের কাষ্টডি থেকে জাবের জহীর উদ্দিনকে এরাই ছিনিয়ে নিয়ে গেছে সন্ত্রাসের নেতা হিসেবে দেখাবার জন্যে। কিন্তু এই বিষয়টা থাই সরকারকে বিশ্বাস করানো যাচ্ছে না প্রমাণের অভাবে। সেদিন পাত্তানী শহরের উপকণ্ঠে সেনা ফাঁড়ির যে সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটল তা জাবের জহীর উদ্দিনের নেতৃত্বে হয়েছে বলে দেখানো হচ্ছে। তার রক্তমাখা সার্টকে এর প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। সার্ট ও রক্ত জাবেরের তা পরীক্ষায়

প্রমাণিত হয়েছে। আসলে এটা একটা ষড়যন্ত্র। আমি থাই গোয়েন্দা কর্মকর্তাকে অনুরোধ করেছি জামায় যে রক্তের দাগ আর তার শরীর থেকে বের হওয়ার সময় এবং সন্ত্রাসী ঘটনার সময় এক কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার জন্যে। সময় এক না হলে সে নির্দোষ প্রমাণিত হবে। আর সময় এক হলে প্রমাণ হবে সন্ত্রাসী ঘটনার সময় জাবের জহীর উদ্দিন ঘটনাস্থলে হাজির ছিল। হাজির থাকলেও সে নির্দোষ হতে পারে, কারণ জোর করে এনে হাজির রাখা কঠিন কিছু নয়। কিন্তু এটা প্রমাণ করা কঠিন।'

থামল আহমদ মুসা।

কিন্তু তৎক্ষণাৎ কেউ কথা বলল না।

দাদী ও যয়নব দু'জনেরই মুখ বেদনায় মুষড়ে গেছে।

একটু পর যয়নব যোবায়দাই নিরবতা ভাঙল। বলল, 'এখন কি করণীয়?'

'ওদের একজনকে জীবন্ত ধরতে পারলে তার কাছ থেকে তথ্য নিয়ে এগোনো যেত। কিন্তু এ পর্যন্ত ওদের দু'ডজনের মত লোক মারা গেলেও কাউকে জীবন্ত ধরা যায়নি। তবে আমি ব্যাংকক আর পাত্তানীতে এসেছি জাবের জহীর উদ্দিনকে সন্ধান করার জন্যেই। আমি ধারণা করছি, 'কাতান টেপাংগো'র মত কোন জায়গাতেই তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে।'

'একটি মানিব্যাগ থেকে একটা কাগজ পেয়ে আপনি খুশি হলেন, তাতে কি আছে?' বলল যয়নব যোবায়দা।

'কাতান টেপাংগো যাবার একটা রোডম্যাপ আঁকা আছে।' আহমদ মুসা বলল।

খুশি হয়ে উঠল যয়নব যোবায়দার মুখ। বলল, 'আমরা এখন পুলিশের আশ্রয় নিতে পারি না?'

'সমস্যা আছে। পুলিশের আয়োজন দেখে ওরা পালিয়ে যেতে পারে। আবার পুলিশেরই কেউ আগাম ওদের জানিয়ে দিতে পারে যে, পুলিশ ওদের অবস্থান সবই টের পেয়ে গেছে। সুতরাং পুলিশকে দিয়ে সমস্যার সমাধান হবে না।' আহমদ মুসা বলল।

'তাহলে?' বলল যয়নব যোবায়দা। তার মুখে অন্ধকার নেমে এসেছে।

'সব ঠিক হয়ে যাবে। হঠাৎ কাতান টেপাংগো যাবার রোড ম্যাপও পাওয়া গেল। এভাবেই আল্লাহ সাহায্য করবেন।'

আহমদ মুসা থামল। থেমেই আবার বলল, 'ভোর হচ্ছে। আপনারা তৈরি হোন। পরে কথা হবে।'

'আপনি কোথায় থাকবেন?' জিজ্ঞাসা যয়নব যোবায়দার।

'যেখানেই থাকি, আপনাদের ওপর চোখ থাকবে আমার।

মোবাইল বেজে উঠল আহমদ মুসার।

মোবাইল হাতে তুলল সে। মোবাইলের স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে প্রসন্ন হলো আহমদ মুসার মুখ।

মোবাইল অন করেই আহমদ মুসা বলল, 'গুড মর্নিং স্যার। কেমন আছেন?'

'ভাল আছি। তুমি ভোরে নামায পড়তে ওঠো, তাই টেলিফোন করলাম এ সময়। তোমার জন্যে সুখবর আছে।' ওপার থেকে বলল পুরসাত প্রজাদীপক।

'সুখবর? কি সেটা?'

'তোমার কথাই ঠিক। পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে জামার রক্তের ও সন্ত্রাসী ঘটনার সময়ের মধ্যে ৩ ঘণ্টার পার্থক্য রয়েছে।'

'আলহামদুলিল্লাহ। আপনাকে ধন্যবাদ স্যার। আপনি পরীক্ষার উদ্যোগ না নিলে এটা সম্ভব ছিল না।'

'আরও সুখবর আছে। সিক্যুরিটি কমিটি তাদের আগের সিদ্ধান্ত রিভিউ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তোমার কথাকেই এখন তারা গুরুত্ব দিচ্ছে। আই হোপ, তুমি জিতে যাচ্ছ বিভেন বার্গম্যান।'

'এর পেছনেও আপনারই অবদান স্যার। সিরিত থানারতা কি এটা শুনেছে?'

'শুনবে না মানে? সে আমার পেছনে লেগেই আছে। সে তোমার একজন যোগ্য লবিষ্ট।'

‘সে খুব ভাল মেয়ে। সে আমার লবিষ্ট নয় স্যার, সে সত্যের পক্ষে লবীং করছে।’

‘অল রাইট, ইয়ংম্যান, আমি রাখি তাহলে।’

‘স্যার আজ রাতে একটা ঘটনা ঘটে গেছে। ‘ব্ল্যাক ঈগল’রা যয়নব যোবায়দাকে কিডন্যাপ করতে এসেছিল।’

‘ও গড! নিশ্চয় ওরা ব্যর্থ হয়েছে?’

‘জি স্যার।’

‘ধন্যবাদ বিভেন বার্গম্যান। কিন্তু ওরা হঠাৎ যোবায়দাকে কিডন্যাপের সিদ্ধান্ত নিল কেন?’

‘স্যার আমার মনে হয় জাবের জহীর উদ্দিনকে তাদের পক্ষে কাজ করাতে ব্ল্যাক ঈগল ব্যর্থ হয়েছে। তাই যোবায়দাকে ধরে নিয়ে তাকে গিনিপিগ বানিয়ে জাবের জহীর উদ্দিনকে রাজি হতে বাধ্য করতে চেয়েছিল। স্যার ওরা মরিয়া হয়ে উঠেছে। ওরা এখন জাবের জহীর উদ্দিনের দাদীকেও কিডন্যাপ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে।’

‘তুমি ওদের নিরাপদ করার ব্যবস্থা করেছ নিশ্চয়। আমি কি পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করব?’

‘না স্যার। পুলিশ পাহারা বসালেই জানাজানি হয়ে যাবে তারা কোথায়।’

‘ঠিক বলেছ বিভেন বার্গম্যান। আর কিছু?’

‘না স্যার। ধন্যবাদ।’

দু’জনেই টেলিফোন রেখে দিল।

মোবাইলের স্পিকার অনক করে আহমদ মুসা কথা বলেছে। যয়নব যোবায়দা, দাদী সবাই শুনতে পেয়েছে দু’জনের কথোপকথন।

আহমদ মুসা টেলিফোন রাখতেই যয়নব যোবায়দা বলল, ‘সেদিনের পাত্তানী শহরে সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনার দায় থেকে ভাইয়া মুক্ত হয়েছেন, এটা পরিস্থিতি পাল্টে যাবার টার্নিং পয়েন্ট হবে ইনশাআল্লাহ। এই কৃতিত্ব আপনার স্যার। আপনার হাত ধরে আল্লাহ এটা করিয়েছেন।’ শেষের কথাগুলো কান্নায় রুদ্ধ হয়ে গেল।

পরিচারিকা নূরী দাঁড়িয়ে ছিল যয়নব যোবায়দার সোফার পেছনে। যয়নব যোবায়দা থামতেই সে বলে উঠল, 'শাহজাদী আপা ও দাদী বেগমের আরও বিপদ হতে পারে স্যার?' উদ্বেগ ভরা কণ্ঠ তার।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'আমি সম্ভাবনার কথা বলেছি। খারাপ, ভাল সব সম্ভাবনাই সামনে রাখতে হয়।'

'ধন্যবাদ স্যার। উনি কোন এক সিদ্ধান্ত রিভিউ করার কথা বললেন, সেটা কি স্যার।' চোখ মুছে বলল যয়নব যোবায়দা।

'থাইল্যান্ডে মুসলমানদের ওপর সন্ত্রাসী ব্লেম দেবার জন্য আবার তৃতীয় পক্ষ কাজ করছে, তারাই সব সন্ত্রাসী ঘটনার জন্যে দায়ী এবং তারাই জাবের জহীর উদ্দিনকে কিডন্যাপ করেছে- যা আগে থাই ন্যাশনাল সিকুরিটি কমিটি মেনে নেয়নি। তারা এখন সিদ্ধান্ত রিভিউ করতে রাজি হয়েছে রক্তমাখা জামার ষড়যন্ত্র প্রকাশ হবার পর।' আহমদ মুসা বলল।

'আলহামদুলিল্লাহ।' বলল যয়নব যোবায়দা।

'কার সাথে কথা বললে তুমি ভাই।' জিজ্ঞেস করল দাদী।

'ইনি থাই গোয়েন্দা বিভাগের সহকারী প্রধান পুরসাত প্রজাদীপক। তার আরও একটা পরিচয় আছে, তিনি জাবের জহীর উদ্দিনের খুব ঘনিষ্ঠ সিরিত থানারতার পিতা।'

যয়নব যোবায়দা ও দাদী দু'জনেই চমকে উঠে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। যয়নব যোবায়দা জিজ্ঞাসা করল, 'সিরিত থানারতা কি করেন? লেখা পড়া করেন? কোথায় পড়েন?'

'জাবের জহীর উদ্দিন ও সিরিত থানারতা একই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। খুব ভাল মেয়ে সে। জাবের জহীর উদ্দিনের ব্যাপারে সে খুবই আন্তরিক। অনেক সাহায্য করেছে সে আমাকে। গতকাল বিকেলেও টেলিফোন করেছিল এদিকের অবস্থা জানার জন্যে। আমি যদি আপনাদের দেখা পাই, তাহলে তার সমবেদনা ও শুভেচ্ছা আপনাদের দু'জনকে জানাতে বলেছে।' আহমদ মুসা বলল।

'আমাদের শুভেচ্ছা-সমবেদনা তার প্রতি।' বলল যয়নব যোবায়দা।

'তাকে না দেখেই গ্রহণ করলেন?' আহমদ মুসা বলল।

‘জনাব আহমদ মুসা যার পক্ষে বলেন, সে কত বড়, তার কত সৌভাগ্য! তার সম্পর্কে জানা আর কিছু থাকে না স্যার।’ যয়নব যোবায়দা বলল।

‘বোনকে এখনি দেখতে ইচ্ছা করছে আমার।’ বলল দাদী।

‘সে ব্যবস্থাও হয়ে যাবে দাদীমা। এখন দয়া করে আপনারা উঠুন। আপনাদের পৌছে দিয়ে আমাকে সুলতান গড়ে আবার ফিরে আসতে হবে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘সংগে সংগেই কেন?’ জিজ্ঞাসা যয়নব যোবায়দার।

‘ব্ল্যাক ঈগলের লোকরা সকাল থেকে দিনের কোন এক সময় এই বাড়িতে আসবে তাদের লোকদের খোঁজ নিতে, আপনাদের খোঁজ নিতে। আমি ফিরে এসে তাদের জন্যে অপেক্ষা করতে চাই।

‘স্যার, আপনি নিজের কথা ভাবেন না? আপনার এখন রেষ্ট অপরিহার্য।’ বলল যয়নব যোবায়দা। কণ্ঠ তার খুব নরম।

‘কিন্তু মিস যোবায়দা, ঐ কাজটা বেশি প্রয়োজন।’

বলেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

উঠে দাঁড়াল অন্য সবাই।

# ৬

পাত্তানী সিটির সাগর তীরের 'সি ভিউ ইন্টারন্যাশনাল' হোটেল।

ছ'তলার একটি ভিআইপি স্যুট।

আইজ্যাক জ্যাকব টেলিফোন রিসিভার ক্রাডলের উপর রেখে রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। ডীপ এসি সত্ত্বেও ঘাম ঝরছে তার কপাল থেকে।

ধপ করে সোফায় বসে পড়ল।

বস হাবিব হাসাবাহর যত ধমক আজ সে শুনেছে, গোটা জীবনে শোনা সব মন্দ কথা একত্র করলেও তার সমান হবে না। গা থেকে যে ঘাম ঝরেছে, তা শরীরের কষ্টের অসহায় কান্না।

অবশ্য গাল শোনার মতই ঘটনা ঘটেছে।

পরশু দিন মেলার মাঠে আমাদের লোকরা একজন যুবককে সন্দেহ করেছিল। তাকে আটকাবার জন্যে ওরা চারজন আক্রমণ করেছিল যুবকটিকে। কিন্তু যুবকটি চারজনকেই হত্যা করে। আবার গত রাতে জাবের জহীর উদ্দিনের বোন যয়নব যোবায়দাকে ধরে আনার জন্যে গিয়েছিল ৮ জন বাছাই করা লোক। তাদের নেতৃত্বে ছিল শীর্ষ কমান্ডো ড্যান। তাদের বাধা দেয়ার মত কেউ ছিল না বাড়িতে মাত্র ৫ জন মেয়ে ছাড়া। তাদের মধ্যে তিনজনই পরিচারিকা। একজন ছিল আশি বছরের বৃদ্ধা। কিন্তু সেই ৮ জনের কোন সন্ধান নেই। কমান্ডো নেতা ড্যানের মোবাইল নিরব। এই অবস্থায় কারো জন্যেই স্থির থাকার মত নয়।

ঘরের দরজা ঠেলে প্রবেশ করল বেয়ারা। বলল, 'স্যার, বেনজামিন স্যার এসেছেন।'

'নিয়ে এসো।' বলে আইজ্যাক সোফা থেকে উঠে অফিসিয়াল টেবিলের চেয়ারে গিয়ে বসল।

আইজ্যাক জ্যাকব 'ব্ল্যাক ঈগল'-এর পাত্তানী সিটির প্রধান। সুলতান গড়ও তারও অধীনে।

ঘরে প্রবেশ করল বেঞ্জামিন বেকার।

টেবিলের সামনে চেয়ার দেখিয়ে তাকে বসতে বলল আইজ্যাক জ্যাকব।

বেঞ্জামিন বেকার হলো পাত্তানী শহর অঞ্চলের কমান্ডো নেতা।

'কিছু শুনেছ?' বেঞ্জামিন বসতেই প্রশ্ন করল আইজ্যাক জ্যাকব।

'জি স্যার। কাতান টেপাংগো থেকে লাদিনো টেলিফোন করেছিল কিছুক্ষণ আগে।'

'কি ভাবছ তুমি?'

'স্যার আমার মতে লেভি নিখোঁজ বা নিহত হওয়ার দিন সুলতান গড় ট্যুরিষ্ট হোটেলে যে বিদেশী উঠেছিল, সেই সব নাটের গুরু। সে লেভিকে হত্যা করেছে, মেলার মাঠের আমাদের চারজনকে হত্যাকারী সে, তাও প্রমাণিত হয়েছে। হত্যাকান্ডের পর সে আর হোটেলে নেই। আমার মতে শাহ বাড়ি অভিযানে যে অসম্ভব কান্ড ঘটেছে তার পেছনে সেই রয়েছে।'

'ধন্যবাদ বেঞ্জামিন, আমাদের সবারও একই কথা। সেই এখন আমাদের প্রধান টার্গেট। এখনই তোমাকে বেরিয়ে পড়তে হবে। নিচে দু'গাড়ি লোক প্রস্তুত আছে। প্রথমে শাহ বাড়ি যাবে। সেখানকার প্রতি ইঞ্চি স্থান সন্ধান করবে। যুবকের এবং যয়নব যোবায়দাদের খোঁজ করবে। বসের নির্দেশ আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাকে সুখবর দিতে হবে। এর জন্যে যা করা দরকার করবে। পাত্তানী শহরাঞ্চলের সহকারী পুলিশ প্রধান মহিদল তোমাকে সবরকম সহায়তা করবে। পুলিশ চাইলেও পাবে। কিন্তু যেভাবেই হোক সেই যুবক ও যয়নব যোবায়দাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে হাতে পেতেই হবে।'

'যুবকটি বিভেন বার্গম্যান নয় তো, ব্যাংককে যে আমাদের অনেক সর্বনাশ করেছে?' বলল বেঞ্জামিন বেকার।

'সেটা জানার চেষ্টা চলছে। ছদ্মবেশ ধারণে যুবকটি অসম্ভব দক্ষ। সুলতান গড় ট্যুরিষ্ট হোটেল থেকে যুবকটির ফটো পাওয়া গেছে, সেটা মিলিয়ে দেখা হচ্ছে।' আইজ্যাক জ্যাকব বলল।

'ধন্যবাদ স্যার, আমি উঠছি।' বলল বেঞ্জামিন বেকার।

'এসো। আই উইস ইউ গুড লাক।' আইজ্যাক জ্যাকব বলল।

বেঞ্জামিন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পাঁচ মিনিট পর নিচ থেকে ‘ব্ল্যাক ঈগল’এর কোডেড হর্ন শুনতে পেল আইজ্যাক। জানালা দিয়ে নিচে হোটেলের বিশাল কারপার্কের দিকে তাকিয়ে আইজ্যাক দেখতে পেল যে, ‘ব্ল্যাক ঈগল’এর তিনটি গাড়ি হোটেলের গেট থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

পরবর্তী বই

# ব্ল্যাক ঈগলের সন্ত্রাস

## কৃতজ্ঞতায়ঃ Mahfuzur Rahman

# সাইমুম-৪৪

# ব্ল্যাক ঈগলের সন্ত্রাস

আবুল আসাদ

# ১

শাহবাড়ির পাহাড়ের গোড়ায় পৌছে আহমদ মুসা ভাবল, মসৃণ রাস্তা ধরে সে গাড়ি নিয়ে শাহবাড়িতে উঠে যেতে পারে। কিন্তু উঠতে গিয়ে মনের তরফ থেকে বাধা পেল আহমদ মুসা।

সুতরাং ওঠা বাদ দিয়ে আহমদ মুসা পাহাড় ঘুরে শাহবাড়ির পেছনে চলে এল এবং প্রথমবারের মত এবারও পাহাড় বেয়ে ক্রলিং করে শাহবাড়ির পেছনের সংকীর্ণ একটা চত্বরে উঠে এল।

একটা ছোট গাছের পাশে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিল আহমদ মুসা। তারপর বাড়ির দেয়ালের পাশ ঘেঁষে বাড়ির সামনের দিকে এগুতে লাগল। ইতিমধ্যেই কেউ এসেছে কিনা, তার অনেক খানি বোঝা যাবে সামনের দিকটা দেখলে।

বাড়ির সামনের অংশটা দেখা যাচ্ছে। আহমদ মুসা দেয়ালের যে বাঁকে এসে দাঁড়িয়েছে, সেটা পার হলেই গাড়ি বারান্দা দেখা যাবে।

আহমদ মুসা সোজাসুজি বাঁকটা পার না হয়ে গাড়ি বারান্দা দেখার জন্যে উঁকি দিল। দেখতে পেল গাড়ি বারান্দা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে তিনটি গাড়ি। দুটি মাইক্রো এবং একটি জীপ।

বিস্ময় আহমদ মুসার চোখে-মুখে। এতগুলো গাড়ি নিয়ে কারা এল? ব্ল্যাক ঈগলের লোকরা কি? তাদের আসাই স্বাভাবিক। ভোর পর্যন্ত তাদের লোকরা যয়নব যোবায়দাকে ধরে নিয়ে না ফেরায় এবং সম্ভবত যোগাযোগেও ব্যর্থ হওয়ায় খারাপ কোন কিছু ঘটার আশংকায় তারা ছুটে এসেছে।

আহমদ মুসা বেশ কিছু সময় অপেক্ষা করে বুঝল গাড়িতে কোন লোক নেই। যারা এসেছে নিশ্চয় সবাই ভেতরে ঢুকেছে।

আহমদ মুসা আড়াল থেকে বেরিয়ে এল।

বাহিরটা আরেকবার দেখে ভেতরে ওদের উপর চোখ রাখার সিদ্ধান্ত নিল।

ভেতরে ঢোকার দরজা খোলা পাবে ভেবেছিল। খোলাই পেল।

ধীরে ধীরে ঘরের দরজা খুলল। দিন হলেও ভেতরটা অন্ধকার দেখল। ভেতরটা সম্পর্কে ধারণা নেয়ার জন্য একটু অপেক্ষা করতে চাইল আহমদ মুসা।

কিন্তু দরজা খুলে স্থির হয়ে দাঁড়াবার আগেই ছুটে আসা একটা কিছু তার উপর পড়ল। এর নরম স্পর্শ পাবার সাথে সাথেই আহমদ মুসার অভিজ্ঞ অনুভূতি নিশ্চিত হলো কি ঘটতে যাচ্ছে। বুঝতে পারল বর্তমান সময়ের সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ভয়ংকর নরম ধাতব ফাঁস তাকে এসে ঘিরে ধরেছে।

ফাঁস আহমদ মুসাকে স্পর্শ করার সাথে সাথেই চোখের পলকে আহমদ মুসা বসে পড়ল। ঠিক যেমন মায়ের পেটে শিশু দুই হাঁটু, দুই হাত এবং মাথা এক সন্ধিস্থলে নিয়ে অবস্থান করে। এর ফলে নরম ধাতব ফাঁস প্রত্যেক অংগকে আলাদা করে আটকে ফেলে মানুষকে একেবারে নিস্ক্রিয় করে ফেলার যে কাজ করে তা করতে পারল না।

ফাঁদ তার বৈশিষ্ট্য অনুসারে নিক্ষিপ্ত হবার পর গুটিয়ে গিয়ে আহমদ মুসাকে রাগবি বলের মত রূপ দিল।

ফাঁদ যে ছুঁড়েছিল সম্ভবত সেই লোকটিই চিৎকার করে উঠল, 'শিকার ধরে পড়েছে।'

সংগে সংগেই ছুটে এল কয়েকজন লোক। তারা ফাঁদ ধরে টেনে-হিঁচড়ে আহমদ মুসাকে ভেতরে এক তলার দরবার কক্ষে নিয়ে গেল।

আহমদ মুসা ফাঁদের মধ্যে তার দেহকে যেভাবে গুটিয়ে নিয়েছিল, তাতে তার দেহ হয় ডান ও বাম দিকে কাত হয়ে, নয়তো চিৎ হয়ে থাকছে।

দরবার কক্ষে যখন তাকে আছড়ে ফেলল তখন তার দেহটা কাত হয়ে পড়ল। একজন তার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'লাদিনো বস, হোটেল থেকে এরই ফটো পাওয়া গেছে। তার মানে এই সেদিন মেলার মাঠে আমাদের চারজন লোককে হত্যা করেছে।' বলেই আহমদ মুসাকে কষে কয়েকটা লাথি লাগাল।

লাদিনো ব্ল্যাক ঈগলের এই দলের প্রধান। এরাই সকালে পাত্তানী সিটি থেকে শাহবাড়ি এসেছে তাদের লাপাত্তা হওয়া সাথীদের খোঁজে।

লাদিনো ছুটে এল তার সাথীর কথা শুনে। আহমদ মুসার কাছে এসে আহমদ মুসার মুখের দিকে ঝুঁকে পড়ল। দেখে সেও চিৎকার করে উঠল, 'ঠিক, কোন সন্দেহ নেই এই শয়তানই সেই শয়তান।'

বলে সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হুকুম দিল, 'একে ঝাড় বাতির হুকের সাথে টাঙাও। তারপর পেটাও। আজ আমাদের ৮ জন লোক গায়েব হওয়ার খবরও এই শয়তান দিতে পারবে। আমি নিশ্চিত, ঐ শয়তান আর এই শয়তান দু'জনেই আজ রাতে এখানে ছিল। যয়নবরা কোথায় এ কথাও এরাই বলতে পারবে।'

আহমদ মুসাকে টাঙ্গিয়ে দেয়া হয়েছে ছাদের ঝাড়বাতির হুকের সাথে। ফাঁসের গোড়াটাকে বাঁধা হয়েছে হুকের সাথে। ফাঁসের পেটে ঝুলছে আহমদ মুসা মাটি থেকে দুই ফিট উপরে।

আহমদ মুসার গুটানো দেহটা এবার ফাঁদে উপুড় হয়ে আছে। মেঝের বড় অংশই সে এখন দেখতে পাচ্ছে।

মেঝের উপর পড়ে থাকা একটা রক্তাক্ত যুবকের দেহ তার নজরে পড়ল। তেইশ চবিবশের মত বয়স হবে যুবকটির। বুঝাই যাচ্ছে তাকে নির্মমভাবে মেরেছে। আহত স্থানগুলো থেকে তখনও রক্ত ঝরছে। সম্ভবত ছেলেটিকেও সকালে এখানে ধরা হয়েছে। কিন্তু ছেলেটি কে? এখানে এসেছিল কেন?

লাদিনো নামের লোকটি এসে আহমদ মুসার পাশে দাঁড়াল। তার হাতে কালো রঙের একটি ব্যাটন। বুঝাই যাচ্ছে, শাল কাঠের ব্যাটনটি লোহার মত ভারী

হবে। ব্যাটনের উপর পেরেক বসানো। পেরেকগুলো সিকি ইঞ্চির মত লম্বা। পেরেকের মাথাগুলো তীক্ষ্ণ নয়, ভোঁতা ধরনের। এ ধরনের কাঁটাওয়ালা ব্যাটন বেয়াড়া মানুষকে কথা বলাবার জন্যে নাকি খুবই উপকারী।

লাদিনো ব্যাটনটি দিয়ে ফাঁসে আবদ্ধ ঝুলন্ত আহমদ মুসাকে একটা প্রচন্ড আঘাত করে বলল, ‘শয়তানের বাচ্চা, ঐ দিকে দেখ কথা বলায় কি হাল হয়েছে। আমরা জানতে চাই গত রাতে তুই এ বাড়িতে এসেছিলি কি-না, আমাদের ৮ জন লোক কোথায় গেল এবং কোথায় গেল এ বাড়ির লোকরা?’

‘একথা তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন? তোমরা তো এ বাড়িতে আমার আগে এসেছ। সব প্রশ্নের জবাব তোমাদের জানার কথা।’ বলল আহমদ মুসা।

লাদিনো তার হাতের ব্যাটন দিয়ে আহমদ মুসার দুই পাঁজরে পাগলের মত পেটাল। আহমদ মুসা দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করল অকথ্য যন্ত্রণা। সহ্যের সীমা ডিঙ্গিয়ে দুই চোখ ফেটেই যেন অবাধ্য অশ্রু গড়িয়ে পড়ল তার।

কিছুক্ষণ পিটিয়ে পেটানোতে ক্ষান্ত দিয়ে বলল, ‘আমার সাথে চালাকি করছিস। তুই মাঠে আমাদের ৪ জনকে মেরেছিলি, আজ রাতেই তুই-ই আমাদের ৮ জন লোককে গুম করেছিস। সরিয়েছিস যয়নবদেরকেও। তোকে মুখ খুলতেই হবে। না হলে পিটিয়েই মেরে ফেলব।’

‘যদি তোমরা নিশ্চিত হও, আমিই এজন্যে দায়ী, তাহলে ঐ ছেলেটিকে মেরেছ কেন? তার মানে আমি করেছি বলে যে কথা বলছ, সেটা তোমাদের অনুমান।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ঐ শয়তানও জড়িত আছে। না হলে বাড়িটা পাহাড়া দেবার জন্যে সে এসেছিল কেন? সেও জানে যয়নবরা কোথায় আছে।’ বলেই লাদিনো আবার ব্যাটর তুলল এবং পেটাতে শুরু করল আহমদ মুসাকে।

অন্যদিকে আরেকজন পেটাতে শুরু করল ঐ ছেলেটিকে।

সে কানফাটা চিৎকার করতে লাগল।

আহমদ মুসার পাঁজর ঝাঝরা হয়ে গেল। রক্তের স্রোত গড়িয়ে পড়তে লাগল নিচের মেঝেতে। আহমদ মুসার মুখ থেকে শব্দ বেরুচ্ছে না। কিন্তু

একদিকে অসহ্য যন্ত্রণা, অন্যদিকে ছেলেটির কানফাটা চিৎকার আহমদ মুসাকে অতিষ্ঠ করে তুলল।

আহমদ মুসা মুক্ত হওয়ার কাজ আগেই শুরু করে দিয়েছিল। দু'হাত দিয়ে জামার কলার থেকে চাকু বের করে হাতে নিয়েছে এবং বের করে নিয়েছে শোল্ডার হোলষ্টার থেকে রিভলবার। যেহেতু তাকে নিয়ে ফাঁসটা মাটি থেকে দুই ফিট উপরে ছিল এবং আহমদ মুসাও যেহেতু উপুড় হয়ে ছিল। তাই তার হাতের কাজ লাদিনোরা কেউ দেখতে পেল না। এই সুযোগ গ্রহণ করেই আহমদ মুসা ফাঁস দেড়ফুট পরিমাণ কেটে ফেলল। তারপর যতটা সম্ভব ঘরটাকে দেখার চেষ্টা করল। দেখতে পেল, তাকে এবং ছেলেটিকে নির্যাতন চালানো দু'জন ছাড়া অন্য সবাই মেঝের মাঝখানে বসে আছে। শূন্য বাড়ি থেকে হাতে বহন করার মত মূল্যবান যেসব জিনিস ওরা লুট করেছে, সেগুলো তারা দেখাদেখি করছে।

আহমদ মুসা যথাসম্ভব গুটিয়ে নিয়ে দেহটাকে ছেড়ে দিল ফাঁসের কাটা অংশ দিয়ে।

আহমদ মুসা মাটিতে পড়েই চিৎ হলো। হাতে তার রিভলবার,ট্রিগারে আঙুল।

আহমদ মুসা পড়তেই টের পেয়ে গেল তার পাশে দাঁড়ানো লাদিনো। সে পকেটে হাত দিল রিভলবার বের করার জন্যে।

সে সুযোগ আহমদ মুসা তাকে দিল না। গুলী করল লাদিনোকে। দ্বিতীয় গুলী ছুঁড়ল ছেলেটিকে নির্যাতনকারী লোকটির উদ্দেশে। দ্বিতীয় গুলী করেই আহমদ মুসা শুয়ে থেকে তার পাশে পড়ে যাওয়া লাদিনোর কোমরের বেল্ট থেকে পকেট মেশিনগান বের করে নিয়ে তাক করল বসে থাকা লোকদের। ঐ লোকরা প্রথমে বিমূঢ় হয়ে পড়লেও কেউ কেউ তাদের ষ্টেনগান তুলে বসে থেকেই গুলী চালানো শুরু করেছে। একটি গুলী এসে আহমদ মুসার বাম বাহুসন্ধির পেশী উড়িয়ে দিয়ে গেল।

গোটা দেহ কেঁপে উঠল আহমদ মুসার।

আহমদ মুসার দেহ লাদিনোর লাশের আড়ালে না থাকলে এতক্ষণে ঝাঝরা হয়ে যেত।

আহমদ মুসা নিজেকে সামলে নিয়ে লাদিনোর দেহকে কাত করে নিজের দেহের সাথে হেলান দিয়ে পকেট মেশিনগানটি লাদিনোর ঘাড়ের পাশ দিয়ে গলার উপর সেট করে ওদের দিকে গুলী বৃষ্টি শুরু করল। ওদের সামনে কোন কভার ছিল না। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ওদিক থেকে আসা ষ্টেনগানের গুলী বন্ধ হয়ে গেল। আরও কয়েক সেকেন্ড গুলীবৃষ্টি অব্যাহত রাখার পর গুরী বন্ধ করল আহমদ মুসা। এরপরও কিছুক্ষণ নিস্ক্রিয় পড়ে থেকে অপেক্ষা করল সে।

ওদিকের ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়েছে। এগিয়ে এল আহমদ মুসার কাছে।

ছেলেটি আহমদ মুসাকে বন্দী করে আনা দেখেছে। তাদের আনন্দ দেখে সে বুঝেছে যে নতুন বন্দী নিশ্চয় বড় কেউ। তার উপর নির্যাতনও সে লক্ষ্য করেছে। জীবনের আশা সে ছেড়ে দিয়েছিল। চোখ বুজে অকথ্য নির্যাতনও সহ্য করছিল। কিন্তু গুলীর শব্দে সে চোখ খুলেছিল। আঁৎকে উঠেছিল নতুন বন্দীকে মেরে ফেলল এই চিন্তা করে। চোখ খুলেই সে দেখল তার পাশে দাঁড়ানো শত্রু লোকটি গুলী খেয়ে ঢলে পড়ছে। নতুন বন্দীর ওখানেও একজন লোককে গুলীবিদ্ধ হয়ে পড়ে থাকতে দেখল। পরক্ষণেই ওপাশে বসে থাকা লোকদের নতুন বন্দীর দিকে গুলীবৃষ্টি করতে লাগল। প্রথমে ঘাবড়ে গিয়েছিল কিন্তু পরে নতুন বন্দীর দিক থেকে গুলীবৃষ্টি শুরু হলে খুশি হয় সে। গুলী বন্ধ হলে নতুন বন্দীর কোন সাড়া না পেয়ে সে উদ্বিগ্ন হয়ে ছুটে এসেছে তার দিকে।

আহমদ মুসার কাছে এসেই সে বলল, ‘স্যার আপনি ভালো তো? এ কি, আপনার বাহুতে গুলী লেগেছে স্যার!’

আহমদ মুসা উঠে বসল। গোটা দেহ তার রক্তাক্ত।

একদিকে পেরেকওয়ালা ব্যাটনের প্রহার ও বাহুতে গুলী লাগা, অন্যদিকে লাদিনোর গায়ের রক্ত তাকে ভিজিয়ে দিয়েছে।

আহমদ মুসা ছেলেটির প্রশ্নের জবাব না দিয়ে উঠে বসেই বলল, ’তোমার নাম কি?’

‘ফরহাদ ফরিদ উদ্দিন।’

‘তুমি ব্যাংকক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।’

‘জি, হ্যাঁ।’

'তুমি জাবের জহীর উদ্দিন ও যয়নব যোবায়দার বন্ধু এবং যয়নব যোবায়দার সাথে তোমার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে তাই না?'

ছেলেটির চাইনিজ-থাই ফর্সা চেহারায় বিস্ময়, সেই সাথে লজ্জায় লাল রং দেখা গেল। বলল, 'স্যার এতকিছু জানলেন কি করে? আপনি কে?' সংকুচিত ভাব ছেলেটার মধ্যে প্রকট হয়ে উঠেছে।

আহমদ মুসা তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে জিজ্ঞাসা অব্যাহত রাখল। বলল, 'গত তিন মাস ধরে পালিয়ে আছ। এক মাস হলো যয়নবদের সাথেও কোন যোগাযোগ করনি।'

'জি স্যার। ওদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই আমি কোন যোগাযোগ করিনি।'

'নিরুদ্দেশের এক মাস তুমি কোথায় ছিলে?'

'পাত্তানীর গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছি।'

'শুধু ঘুরে বেড়ানো?'

'আমি তাদেরকে পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন ও সংগঠিত করার চেষ্টা করেছি স্যার।'

'পরিস্থিতিটা কি বলত? মানুষকে কি বুঝিয়েছ?'

'পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি কনফিউজড স্যার। আমি সকলকে এই কথায় একমত করার চেষ্টা করেছি যে, পুলিশ ও সেনাসদস্যদের সাথে এবং নিজেদের মধ্যে সংঘাত থেকে দূরে থাকতে হবে। সেই সাথে সন্ত্রাসের কাজ কারা করছে এ সম্পর্কে তথ্য যোগাড় করতে হবে এবং এসব তথ্য পুলিশের কাছে পৌছে দিতে হবে।'

'ধন্যবাদ' বলে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা। বলল, 'তুমি বুদ্ধিমান ছেলে। এই লোকগুলো তোমার সাথে কথা বলেছে। আচ্ছা বলত এরা দেশী না বিদেশী, এদের কাউকে চেন কি-না, এরা পাত্তানী কি-না কিংবা এ অঞ্চলের কি-না?'

একটু অপেক্ষা করল ফরহাদ ফরিদ উদ্দিন। তারপর বলল, 'এখানে এই দশ জনের মধ্যে পাত্তানী কেউ নয়। আপনার পাশের যে লাশটি, এটিই শুধু

বিদেশী, অন্যরা সবাই থাইল্যান্ডের অন্যান্য অঞ্চলের। এদের এতক্ষণের বিভিন্ন আলোচনা ও চেহারা ছুরত দেখে মনে হয়েছে এরা সবাই ক্রিমিনাল।'

আহমদ মুসা রিভলবার জ্যাকেটের পকেটে রেখে দিয়ে পকেট থেকে মোবাইল বের করল। কল করল ব্যাংককে পুরসাত প্রজাদিপককে। আহমদ মুসার কণ্ঠ পেয়েই ওপার থেকে পুরসাত প্রজাদিপক বলল, 'বল বিভেন বার্গম্যান। নিশ্চয় কোন সুখবর দেবে?'

আহমদ মুসা মোবাইলের স্পীকার অন রেখেছিল। মোবাইলের কথা শুনতে পাচ্ছে ফরহাদ ফরিদ উদ্দিনও। আহমদ মুসাকে ওপার থেকে 'বিভেন বার্গম্যান' নামে সম্বোধন করায় অস্বস্তির একটা চিহ্ন ফুটে উঠল তার মুখে।

পুরসাত প্রজাদিপকের কথার জবাবে আহমদ মুসা বলল, 'স্যার আমার পক্ষ থেকে একটা খবর। সুখবর হবে কিনা সেটা আপনাদের উপর নির্ভর করে।'

'আচ্ছা, খবরটা বল।'

'ভোর রাতে আপনাকে জানিয়েছিলাম ওরা যয়নব যোবায়দাকে কিডন্যাপ করতে এসেছিল। কিডন্যাপ করতে আসা নিহত আটজনের মধ্যে একজন বিদেশীও ছিল। শাহবাড়ির পেছনের বন্ধ কূপে এদের লাশ আছে, পরীক্ষা করলেই এদের পরিচয় মিলবে। সকালেও আবার শাহবাড়ি আক্রান্ত হয়েছে। এবার তিন গাড়ি বোঝাই করে এসেছিল দশজন। আপনি জাবেরের বন্ধু ফরহাদকে জানেন। সে ওদের বন্দী হয়েছিল। আমিও বাড়িতে প্রবেশ করতে গিয়ে বন্দী হয়েছিলাম। শেষে যা হোক ওরা দশজনই মারা গেছে। এদের মধ্যেও একজন বিদেশী। অবশিষ্ট নয় জনের কেউ পাত্তানী অঞ্চলের নয় এবং তারা সবাই পেশাদার ক্রিমিনাল। আপনারা তদন্ত করলে বিষয়টা আরও পরিষ্কার হবে স্যার।'

'বুঝেছি, এই ঘটনাকে দ্বিতীয় প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করতে চাচ্ছ। গত রাতে এবং সকালের দু'টি অভিযানেই নেতৃত্ব দিয়েছে দুই বিদেশী। যারা তাদের সাথে ছিল, তারা পাত্তানীর লোক নয়, অ-পাত্তানী ক্রিমিনাল ওরা। এর অর্থ তৃতীয় যে পক্ষ জাবেরকে ছিনতাই করে নিয়ে গিয়ে তাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে ব্যবহার করছে, তারা আজ জাবেরের বোন যয়নবকে কিডন্যাপ করার জন্যে বার বার চেষ্টা করেছে।'

‘ঠিক স্যার।’

‘ধন্যবাদ। তোমার ‘বিদেশী’ ও ‘ক্রিমিনাল’ তথ্য দুটি যদি প্রমাণিত হয়, তাহলে এটা অবশ্যই একটা বড় প্রমাণ হবে। তুমি যয়নবকে বলে দাও থানায় একটা ডাইরী করতে। আমি পাত্তানী পুলিশকে বলে দিচ্ছি, ওরা সব লাশ উদ্ধার এবং তাদের ব্যবহৃত সব গাড়ি সীজ করে তদন্ত শুরু করবে। কিন্তু বিভেন বার্গম্যান তোমাকে আরও অনেক এগুতে হবে। এ পর্যন্ত সন্ত্রাসের যে সব ঘটনা ঘটেছে, সেসব যারা ঘটাল তাদের সব প্রমাণ দিনের আলোতে আনতে হবে এবং ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্যকে পরিষ্কারভাবে সামনে আনতে হবে। মনে রেখ, ওদের একজন লোককেও এখন পর্যন্ত ধরা যায়নি এবং কোন দলিলও হাত করা যায়নি।’

‘ঠিক বলেছেন স্যার। অনেক এগুতে হবে আমাদের।’

‘ধন্যবাদ বিভেন বার্গম্যান।’

‘ধন্যবাদ স্যার।’

আহমদ মুসা মোবাইল অফ করতেই ফরহাদ ফরিদ উদ্দিন বলল, ‘আলোচনায় যা শুনলাম, তা স্বপ্ন অবশ্যই নয়। তাহলে আপনিই তো আমাদের সব কাজ করছেন? কিন্তু নাম বিভেন বার্গম্যান, কিছুই বুঝতে পারছি না স্যার। আপনি কে স্যার?’

ফরহাদ ফরিদ উদ্দিনের কথায় কান না দিয়ে আহমদ মুসা বলল, ‘এমন রক্তাক্ত অবস্থায় বাইরে বেরুনো যাবে না। এখন কি করা যায় বল।’

‘স্যার উপরে গেষ্টরুমে আমি কখনও কখনও থাকি। সেখানে আমার কাপড়-চোপড় থাকার কথা। চলুন দেখি।’

উপরে দোতলায় উঠে গেল তারা।

উঠতে উঠতে ফরহাদ ফরিদ উদ্দিন বলল, ‘স্যার এই বাড়িটা এক কালে পাত্তানী এলাকার ‘রাজ ভবন’ ছিল। এর নিচ তলা ছিল জনগণের দরবার এলাকা। মানে সুলতানের শাসন অফিস। দ্বিতীয় তলা অতিথীশালা ও পরিবারের ষ্টাফদের আবাসিক এলাকা হিসাবে ব্যবহৃত হতো। আর উপরের তলা ছিল শাহ পরিবারের নিজস্ব আবাসিক এলাকা। বিশাল এই বাড়ির প্রত্যেক ফ্লোরের কোনটাতেই ৫০টির কম কক্ষ নেই। এই বাড়িতে ঢুকলেই শরীল রোমাঞ্চিত হয়

স্যার। বাড়িটা তৈরি করেছিলেন থাই রাজপুত্র বাংগসা ওরফে সুলতান আহমদ শাহ। কত পার্থক্য সেদিনের এই বাড়ি ও আজকের এই বাড়ির মধ্যে!'

থামর ফরহাদ ফরিদ উদ্দিন। তার কণ্ঠ ভারী হয়ে উঠেছিল।

তার আবেগটা আহমদ মুসার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বলল, 'ফরহাদ, এই বংশের সাথে তোমার আর কোন সম্পর্ক আছে?'

'এই কথা কেন জিজ্ঞেস করছেন স্যার?'

'এই বংশের প্রতি তোমার আবেগ এবং এই বাড়ির দ্বিতীয় তলায় তোমার স্থায়ী গেষ্ট হওয়া দেখে।'

'ঠিকই ধরেছেন স্যার। এই বংশেরই এক সন্তান আমি। প্রায় শত বছর আগে পাত্তানী অঞ্চল দুটি সালতানাতে বিভক্ত ছিল। যয়নব যোবায়দার দাদার বাপরা ছয় ভাই ছিলেন। ছয় ভাই ছয়টি সালতানাতে রাজত্ব করতেন। রাজ্যগুলো থাই কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে চলে গেলে যয়নব যোবায়দার দাদার বাবা সুলতান আব্দুল কাদের কামাল উদ্দিন ছাড়া অন্য পাঁচ ভাই হিজরত করে মালয়েশিয়া চলে যান। সেই পাঁচ ভাইয়েরই এক ভাইয়ের বংশধর আমি। জাবের বাংগসা জহীর উদ্দিন 'তাফসিরুল কুরআন' শিক্ষার জন্য ছোটবেলা মালয়েশিয়া যায়। পাঁচ বছর সে মালয়েশিয়ায় ছিল। কোর্স শেষ করে সে থাইল্যান্ডে ফিরে আসে। তার সাথে আমার এত বন্ধুত্ব হয় যে, আমিও তা সাথে থাইল্যান্ডে চলে আসি। ব্যাংককের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই। এই বাড়ির গেষ্ট রুম আমার জন্য স্থায়ীভাবে বরাদ্দ হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জাবেরের সাথে এখানে এলে বা সুলতান গড়ে থাকলে এই গেষ্ট রুমেই আমি থাকি। কিন্তু তাই বলে 'গেষ্ট' নয়, পরিবারের একজন সন্তান হিসাবেই দাদী এবং অন্যরা আমাকে দেখেন।'

থামল ফরহাদ ফরিদ উদ্দিন।

আহমদ মুসার ঠোঁটে মিষ্টি এক টুকরো হাসি। বলল, 'জামাই হিসেবে দেখেন না?'

ফরহাদ ফরিদ উদ্দিনের মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। লজ্জাজড়িত ধীর কণ্ঠে বলল, 'বিশ্বাস করুন স্যার, যয়নবের সাথে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে, এ

কথা আপনার কাছে আমি প্রথম শুনলাম। না দাদী, না অন্য কেউ এ ব্যাপারে আমাকে কিছু বলেছেন।'

'যয়নব যোবায়দার দিক থেকে?'

'না স্যার। যয়নব খুব ভালো মেয়ে। খুব নীতি-নিষ্ঠ সে। তিন তলায় তার এলাকায় কোন দিন আমি ঢুকিনি, ঢোকার অনুমতিও নেই। দাদী ও জাবেরের ঘর পর্যন্ত আমার যাতায়াত।'

'কথা বল না তোমরা?'

'তার ফরমাল অবস্থায় প্রয়োজনীয় যেটুকু সেটুকু কথাই হয়।'

'তার 'ফরমাল অবস্থা' বুঝলাম না ফরিদ।

'ফরমাল পোশাক পরে যখন সে বাইরে আসে।'

'ফরমাল পোশাক কি?'

'যখন সে বাইরে আসে, গা মাথা ঢেকে জাবের সাথে বাইরে আসে। এটাই তার ফরমাল অবস্থা।

'বুঝেছি।' বলে আহমদ মুসা একটু মিষ্টি হাসল। বলল, 'হতাশ হয়ো না ফরহাদ। তোমাদের বিয়ে ঠিক হয়ে থাকার কথা দাদী আমাকে বলেছেন এবং সেটা তিনি বলেছেন যয়নব যোবায়দার সামনে। তুমি খুশি?'

একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল ফরহাদ ফরিদ উদ্দিন। লাজ রাঙা মুখ নিচু করে বলল, 'ধন্যবাদ স্যার। দাদী আর জাবের আমাকে খুব ভালবাসেন।'

'আর যয়নব? তার প্রতি অবিচার করছ কেন?'

সলজ্জ হেসে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল ফরহাদ ফরিদ উদ্দিন, 'ওটা ভাবার সাহস আমার এত দিন হয়নি। সে আমার কাছে দুর্লভ এক 'মনি'।

আহমদ মুসা ঘরে ঢুকল। লজ্জা লুকাতে নতমুখী ফরহাদের কাঁধে হাত রেখে আহমদ মুসা বলল, 'ধন্যবাদ তোমাদের দু'জনকে। ভিন্ন ধরনের এক শিরী-ফরহাদ তোমরা এবং এটাই আদর্শ।'

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা ফরহাদের পিঠ চাপড়ে বলল, 'দেখি তোমার কি আছে দেখাও।'

প্রসঙ্গান্তরে যাবার সুযোগ পেয়েই যেন ফরহাদ ফরিদ উদ্দিন হঠাৎ এ্যাকটিভ হয়ে উঠল। ছুটে গেল ড্রেস-ক্যাবিনেটের কাছে। খুলে ফেলল ড্রেস-ক্যাবিনেট। বলল, 'দেখুন স্যার আপনি কি পছন্দ করবেন।'

'আর দেখাদেখি নয়। তুমি আমার জন্যে শার্ট, প্যান্ট দাও। আর জ্যাকেট থাকলে জ্যাকেট নিয়ে এস। আমার অনেক পকেট দরকার।' বলে আহমদ মুসা বসে পড়ল সোফায়। সামনে একটি আলমারির উপর একটা ফার্ষ্ট এইড বক্স দেখতে পেল। উঠে গিয়ে সেটা নামিয়ে আনল। বাক্সে দুই প্যাকেট এন্টিসেপটিক ও এন্টিপেষ্ট ফাইবার ব্যান্ডেজও পেল। একটা প্যাকেট ফরহাদের জন্যে, অন্যটি নিজের জন্যে নিয়ে নিল। বাহু সন্ধির বুলেটাহত স্থানের রক্ত বন্ধ করা প্রয়োজন।

ফরহাদ ফরিদ উদ্দিন কয়েকটা প্যান্ট, অনেকগুলো শার্ট এবং কয়েকটা জ্যাকেট এনে আহমদ মুসার কাছে রেখে বলল, 'কোনটা কোনটা আপনার পছন্দ হয় দেখুন।'

'ধন্যবাদ ফরহাদ।' বলে আহমদ মুসা একটা গাবাডিন প্যান্ট, একটা সুতি শার্ট এবং বেশি পকেটের একটা জ্যাকেট বেছে নিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেল। দরজা বন্ধ করার আগে বলল, 'নির্জন ঘরে তুমিও পোশাক পাল্টে নাও। সোফার উপর ব্যান্ডেজ প্যাকেট আছে। ব্যবহার করতে পার।'

পোশাক পাল্টে নিল ফরহাদ ফরিদ উদ্দিন।

আহমদ মুসাও বেরিয়ে এল।

'স্যার আপনি বুলেটাহত স্থান কি ব্যান্ডেজ করেছেন?'

'ব্যান্ডেজ করিনি, বেঁধেছি।'

'আমরা এখন কোথায় যাব স্যার?' বলল ফরহাদ ফরিদ উদ্দিন।

'তোমার এখানে কোন ঠিকানা নেই?'

'শাহবাড়ি ছাড়া এখানে কোন ঠিকানা নেই। আমি আজ এখানে এসেছিলাম পঞ্চাশ মাইল দূরের এক গ্রাম থেকে।'

'চিন্তা নেই তুমি যে ঠিকানায় এসেছিলে, সে ঠিকানায় তুমি যাবে।'

‘বুঝলাম না স্যার।’

‘দাদীমারা যেখানে আছেন, সেখানেই তুমি যাবে। তোমাকে কমপক্ষে ৭ দিন শুয়ে থাকতে হবে।’

‘কেন?

‘পেরেকওয়ালা ব্যাটনের প্রহারের প্রতিক্রিয়া কত তীব্র তা বুঝতে পারবে কয়েক ঘণ্টা পর থেকে।’

বলেই হাঁটা শুরু করল আহমদ মুসা।

পেছনে পেছনে ফরহাদ ফরিদ উদ্দিন।

গাড়ি বারান্দায় ব্ল্যাক ঈগলের তিনটি গাড়ি দাঁড়িয়েছিল।

আহমদ মুসা জীপের ড্রাইভিং সিটে উঠতে যাচ্ছিল। ফরহাদ ফরিদ উদ্দিন বলল, ‘স্যার আপনার একটা হাত আহত। আমি ড্রাইভ করতে পারি।’

আহমদ মুসা সরে গিয়ে পাশের সিটে বসল। ফরহাদ ফরিদ উদ্দিন উঠল ড্রাইভিং সিটে।

গাড়ি চলতে শুরু করল।

‘ফরহাদ, মেইন রোডে উঠেই এ গাড়ি দাঁড় করাতে হবে। একটা গাড়ি ঠিক করবে পাত্তানী সিটির ওল্ড এলাকার জন্যে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘স্যার এ গাড়ি নিয়েও তো আমরা পাত্তানী সিটিতে যেতে পারি।’ ফরহাদ বলল।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘এর অর্থ হবে আমাদের ঠিকানা শত্রু ব্ল্যাক ঈগলকে জানিয়ে দেয়া।’

‘কিভাবে?’ ফরহাদ বলল। তার চোখে-মুখে বিস্ময়।

‘এ গাড়ির কোথাও ট্রান্সমিটার চীপ লাগানো আছে। গাড়ি যেখানেই থাকুক, এই ট্রান্সমিটার তার অবস্থান জানিয়ে দেবে।’

ফরহাদের চোখ থেকে বিস্ময় তখনও কাটেনি। বলল, ‘কিভাবে জানলেন স্যার আপনি?’

‘বলব।’

বিস্ময় কাটেনি ফরহাদ ফরিদ উদ্দিনের চোখ থেকে। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল আজকের শুরু থেকে সব দৃশ্য। সব শক্তি, সব জ্ঞান দিয়ে যেন আল্লাহ এক ফেরেস্তাকে পাঠিয়েছেন। কে এই ফেরেস্তা? ফরহাদ ফরিদ উদ্দিন আহমদ মুসার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'আপনার পরিচয় সম্পর্কে প্রশ্ন কি আবার জিজ্ঞেস করতে পারি স্যার?'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'বললেই তো জানা শেষ হয়ে যাবে জানার আগ্রহটা থাক না।'

মেইন রাস্তায় গাড়ি পৌছে গিয়েছিল।

ফরহাদ ফরিদ উদ্দিন রাস্তার বাইরে একটা গাছের আড়াল নিয়ে গাড়ি দাঁড় করাল।

গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলল, 'স্যার, আপনি একটু বসুন, আমি গাড়ি দেখছি।' বলে ফরহাদ গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল।

আহমদ মুসা ফরহাদ ফরিদ উদ্দিনকে বলেছিল, পেরেকওয়ালা ব্যাটন চার্জের প্রতিক্রিয়া তুমি বুঝতে পারবে কয়েক ঘণ্টা পর থেকে। ৭ দিন তোমাকে শুয়ে থাকতে হবে। কথাটা আহমদ মুসার ক্ষেত্রে বেশি ফলেছে। সাত দিন তাকে বিছানা থেকে উঠতে হয়নি। অবশ্য ফরহাদ ফরিদ উদ্দিন সাত দিনেও সেরে উঠতে পারেনি। তার অবস্থা ছিল আরও কাহিল।

আহমদ মুসা মনে করেছিল, সে ফরহাদ ফরিদ উদ্দিনকে যয়নব যোবায়দাদের ওখানে পৌছে দিয়েই সুলতান গড়ে ফিরে যাবে তার সদ্য ভাড়া করা বাড়িতে। কিন্তু দাদী ও যয়নব তাকে ছাড়েনি। কোন কথা না শুনে আহমদ মুসা চলে আসতে গেলে আড়াল থেকে যয়নব যোবায়দা বেরিয়ে এসেছিল। কেঁদে উঠে বলেছিল, 'আপনি সবার জন্যে হবেন, কেউ আপনার জন্যে নয়, এটা শুধু সবার প্রতি আপনার জুলুম নয়, এটা আপনার অন্যায় আত্মপীড়ন। এই মনোভাব ইসলামের সামাজিক সম্পর্কের লংঘন।' বলে একটু থেমে আবেগকে সম্বরণ করে

নিয়ে আবার বলে উঠেছিল, ‘ভাই বোনের প্রতি দায়িত্ব পালন করবে, বোনেরও দায়িত্ব আছে ভাইয়ের প্রতি। দারুণ আহত অবস্থায় আপনি যেখানে যাবেন, সেই সদ্য ভাড়া করা বাড়িতে আপনার কেউ নেই। হাসপাতালে যাওয়া যেমন নিরাপদ হবে না, তেমনি যে কোন ডাক্তার ডাকাও নিরাপদ নয়। এই অবস্থার কথা জেনে আপনাকে আমরা ছাড়ব কি করে?’ অশ্রু সম্বরণের চেষ্টা সত্ত্বেও যয়নবের শেষের কথাগুলো কান্নায় রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

কোন কথা না বলে আহমদ মুসা ঘরের দরজা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে ধীরে ধীরে এসে সোফায় বসেছিল। বলেছিল, ‘স্যরি বোন। আমি বোনদের দায়িত্বশীল প্রমাণ করতে চাইনি। আমি চেয়েছিলাম, আমাদের সবার অবস্থান এক জায়গায় না হোক।’

‘আপনি যে সিদ্ধান্ত নেবেন, সেটাই হবে স্যার। পাশের বাড়িই একজন মহিলা সার্জনের। তিনি আমার মায়ের বন্ধু, তার ওপর বর্তমান সংকটে তিনি আমাদের একজন মুরুব্বিও। তিনি আপনাদের দেখবেন। তারপর যা ভালো মনে হয় করা যাবে স্যার।’ বলেছিল যয়নব যোবায়দা।

আহমদ মুসার চোখ দু’টো নিচু। ঠোঁটে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠতে দেখা গিয়েছিল। বলেছিল, ‘বোন কি ভাইকে ‘স্যার’ বলে?’

বিব্রত ভাব ফুটে উঠেছিল যয়নব যোবায়দার মুখে। কয়েক মুহূর্ত কথা বলেনি সে। তারপর বলেছিল, ‘স্যরি, অভ্যাসবশত বলেছি ভাইয়া।’

‘স্যার, আপনি ভাই হয়ে গেলেন। কিন্তু আপনার পরিচয় জিজ্ঞেস করেও জানতে পারছি না।’ ফরহাদ ফরিদ উদ্দিন বলেছিল।

‘তোমার ধারণা বলত তিনি কে হতে পারেন?’ বলেছিল দাদী।

‘না দাদীজী বলতে পারব না। অনেক ভেবেছি আমি। কাউকে আমি খুঁজে পাইনি। কাজ ও যোগ্যতার দিক দিয়ে রূপকথার রাজপুত্রের সাথে তার তুলনা হয়। কিন্তু রূপকথার রাজপুত্র তো এভাবে বাস্তবে আসে না!’ ফরহাদ ফরিদ উদ্দিন বলেছিল।

‘রূপকথার রাজপুত্র বাস্তব হয়ে আসে না, কিন্তু বাস্তবে রূপকথার রাজপুত্রের চেয়েও বড় রাজপুত্র থাকতে পারে।’ বলেছিল দাদী।

'আমি মানলাম দাদী, ইনি সেরকম কেউ, কিন্তু কে?' ফরহাদ ফরিদ উদ্দিন বলেছিল।

ফরহাদ থামতেই আহমদ মুসা বলেছিল, 'দাদীমা, প্লিজ এই আলোচনা রাখুন। প্রতিদিন পৃথিবীতে রূপকথার চেয়ে বড় হাজারো রূপকথা তৈরি হচ্ছে। এই রূপকথা যারা সৃষ্টি করছে, তারা সবাই সাধারণ মানুষ, রাজপুত্র নয় দাদীমা।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল দাদীমা। কিন্তু বলা হয়নি। পরিচারিকা ডাক্তারী ব্যাগ হাতে এ্যাপ্রন পরা একজন পঁয়তালিস্নশ-পঞ্চাশ বছরের মহিলাকে নিয়ে ড্রইং রুমে প্রবেশ করেছিল।

যয়নব যোবায়দা এগিয়ে গিয়ে মহিলাকে সালাম দিয়ে বলে, 'আসুন ডাক্তার খালাম্মা।'

যয়নব যোবায়দা ডাক্তার খালাম্মাকে আহমদ মুসাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। সালাম বিনিময় ও প্রাথমিক কথা শেষ হলে যয়নব যোবায়দার নির্দেশে পরিচারিকা আহমদ মুসাকে পাশের ঘরে নিয়ে যায়। চিকিৎসার জন্য তাকেই প্রথম দেখা হয়, পরে ফরহাদ ফরিদ উদ্দিনকে।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ব্যান্ডেজ শেষে দু'জনকে তাদের জন্যে নির্দিষ্ট ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়।

ডাক্তার খালাম্মা ফিরে আসেন ড্রইং রুমে।

শোফায় বসতে বসতে বলেছিলেন, 'তোমাদের পরিচারিকারা খুব দক্ষ। আমার নার্সের চেয়েও ভালো কাজ করেছে তারা।'

'এ মেয়েরা খুবই আন্তরিক ডাক্তার খালাম্মা।' বলে যয়নব যোবায়দা।

'ওদের কেমন দেখলে ডাক্তার মা?' দাদী বলেছিল উদগ্রীব কণ্ঠে।

মুখটা মলিন হয়ে যায় ডাক্তারের। বলেছিল, 'আমার ডাক্তারী জীবনে এমন বীভৎস দৃশ্য আমি দেখিনি আম্মাজী। শুনলাম পেরেকওয়ালা ব্যাটন দিয়ে ওদের পেটানো হয়েছে, বিশেষ করে বিভেন বার্গম্যান নামের ছেলেটার দু'পাজরে অক্ষত চামড়া নেই বললেই চলে। আর ওর বাম বাহু-সন্ধির মাসলটা বুলেট একেবারে তুলে নিয়ে গেছে। এদিকে ফরহাদ ছেলেটা মোটামুটি আছে। প্রায় সারা গায়েই পেরেকের আঘাত আছে, কিন্তু মেজর কিছু নয়।'

‘বিভেন বার্গম্যানের কেমন রেষ্ট দরকার হবে, ডাক্তার খালাম্মা?’ বলেছিল যয়নব যোবায়দা।

‘বেটি তার দু’পাজরে ও বাহু সন্ধিতে নতুন চামড়া গজাতে হবে। আট-দশদিন তাকে বিছানা থেকেও উঠতে দেয়া যাবে না। তারপরেও সপ্তাহখানেক রেষ্ট দরকার হবে। তবে এই ছেলেটার ক্ষেত্রে এত সময় লাগবে বলে মনে হয় না। মানসিক শক্তি তার অবিশ্বাস্য। এ ধরনের লোকদের যে কো ব্যধিই দ্রুত সেরে যায়।’

‘ব্যাপারটা কি করে বুঝলেন খালাম্মা?’ বলেছিল যয়নব যোবায়দা আগ্রহের সাথে।

‘তার বুলেট-বিদ্ধ ও ব্যাটনের পেরেক বিদ্ধ বিরাট আহত স্থান আমাকে পরিষ্কার করতে হয়েছে। এমন ক্ষেত্রে রোগীরা চিৎকার করে, উঃ আঃ তো করেই। যেমন ফরহাদ করেছে, সে খুব কষ্টও পেয়েছে। কান্না আটকাতে পারেনি বেচারা। কিন্তু বিভেন বার্গম্যানের মুখে কষ্টের একটি ভাঁজও পড়তে দেখিনি। গোটা সময় সে চোখ বন্ধ করে ছিল। যেন শান্তিতে ঘুমুচ্ছে। মাঝে মাঝে আমার প্রশ্নের জবাব দিয়েছে। সব সময় কণ্ঠ স্বাভাবিক ছিল। চা খেতে খেতে গল্প করেছে। এমন নার্ভের মানুষ আমি আগে দেখিনি। তাকে মনে হয়েছে একটা অনুভূতিহীন পাথর। আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমার কষ্ট লাগছে না? উত্তরে সে বলেছিল, কষ্ট লাগাই স্বাভাবিক। আমি বলেছিলাম, কিন্তু তোমাকে দেখে তো তা মনে হচ্ছে না? সে বলেছিল, কষ্ট হজম করতে পারলে বাইরে তা আর প্রকাশ পায় না। ঠিক বলেছে সে। কিন্তু এমন নার্ভ কম মানুষেরই থাকে। কে এই লোক বেটি?’

যয়নব যোবায়দা চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল যে, ডাক্তার খালাম্মাকে কতটুকু বলা যায়। কিছু না বললে তিনি মাইন্ড করতে পারেন। সেটা ভালো হবে না। এসব চিন্তা করে যয়নব যোবায়দা বলে, ‘উনি আমাদের মেহমান। একজন বিদেশী।’

‘কিন্তু সে তো খৃষ্টান। নাম শুনে তো তাই মনে হচ্ছে! এমন মারাত্মকভাবে আহত ও গুলীবিদ্ধ হলো কোথায়?’ ডাক্তার খালাম্মা বলেছিল। তাঁর চোখে বেদনা ও বিস্ময়।

যয়নব যোবায়দা একবার দাদীর দিকে তাকায়। একটু ভাবে। তারপর বলে, 'আপনি আমাদের বিপদের কথা জানেন। ফরহাদ ফরিদ উদ্দিনকেও আপনি চেনেন। সে সুলতান গড়ে আক্রান্ত ও কিডন্যাপড হলে এই বিদেশী তাকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেও বন্দী হয়। উভয়েই নির্যাতনের শিকার হয়। কিন্তু তারা অবশেষে নিজেদের মুক্ত করতে সমর্থ হয়।'

'আলহামদুলিল্লাহ। দেখ মানুষ মানুষের জন্য কত করতে পারে! বিদেশী বিভেন বার্গম্যানই বেশি নির্যাতিত হয়েছে।' বলেছিল ডাক্তার খালাম্মা।

যয়নব যোবায়দার এই বলা এবং ডাক্তার খালাম্মার এই শোনা যে সংকট ডেকে আনবে কেউ তখন এটা বুঝেনি।

সংকট এল তিন দিন পরেই।

আহমদ মুসা শুয়েছিল তার কক্ষে তার বেডে। ধীরে ধীরে এসে ফরহাদ আহমদ মুসার বিছানায় তার পাশে বসল।

আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি উঠে বসল। তুমি কষ্ট করে এলে কেন? ডাকলে আমি যেতাম।

তিন দিনেই আহমদ মুসা প্রায় সেরে উঠেছে, কিন্তু ফরহাদ ফরিদ উদ্দিনের জ্বরই এখনও সারেনি।

ডাক্তার খালাম্মা ঘরে ঢুকে ফরহাদ ফরিদ উদ্দিনকে দেখে বলল, ফরহাদ তোমার বিছানা থেকে উঠা ঠিক হয়নি। দাঁড়ালেও আহত স্থানগুলোর উপর চাপ পড়বে, তাতে জ্বর বাড়বে এবং নিরাময় বিলম্বিত হবে। শুয়ে পড়, এখানেই তোমাকে দেখব।'

সুবোধ বালকের মত সংগে সংগেই শুয়ে পড়ল ফরহাদ ফরিদ উদ্দিন।

'ফরহাদ আমাদের খুব ভালো ছেলে। বড়দের কথা মান্য করতে একটু দেরি করে না।' বলল দাদী প্রসন্ন মুখে।

মুখ টিপে হাসল যয়নব যোবায়দা। বলল, 'বুঝার আগে কাজ করলে তার ফল সব সময় ভালো হয় না।'

'ভালো একটা নীতি কথা বলেছ বেটি' বলে ডাক্তার খালাম্মা আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলে, 'তুমি একটা মিরাকল বিভেন বার্গম্যান। তিন সপ্তাহের নিরাময় তোমার ক্ষেত্রে তিন দিনে হয়ে গেছে। আজ আমি আমাদের ডাক্তারদের বৈঠকে তোমার কথা বললে সবার চোখ ছানাবড়া হয়েছে। একজন তো সব শুনে এতটা অভিভূত হয়েছে যে তোমাকে দেখার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে। আমি তাকে ওয়েলকাম করেছি। সে আসছে। সে একজন চর্ম বিশেষজ্ঞ হওয়া ছাড়াও একজন প্লাষ্টিক সার্জন। তার কাছ থেকে ভালো পরামর্শও পাবে।'

থামল ডাক্তার খালাম্মা।

ডাক্তার খালাম্মার শেষের কয়েকটি বাক্য শুনে মুখের সব আলো দপ করে নিভে গেল আহমদ মুসার। তার মিরাকল নিরাময়ের কথা শুনেই একজন শীর্ষ স্থানীয় বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সংগে সংগে তাকে দেখতে চলে আসতে, এটা একেবারেই স্বাভাবিক নয়। আহমদ মুসা জিজ্ঞেস করল ডাক্তার খালাম্মাকে, 'তারা কি আমার নাম জেনেছে?'

'হ্যাঁ তারা জিজ্ঞেস করেছে। আমি বলেছি তোমার নাম। বিদেশী তাও বলেছি।' বলল ডাক্তার খালাম্মা।

'কে জিজ্ঞেস করেছে?'

'কেন, ঐ স্কিন স্পেশালিষ্ট ও প্লাষ্টিক সার্জন। তাঁরই তো উৎসাহ বেশি।'

'কি নাম তার ডাক্তার খালাম্মা?'

'ডাক্তার এ্যাঞ্জেলো জুদাহ।'

নাম শুনেই চমকে উঠল আহমদ মুসা। তার নামের প্রথম অংশকে না ধরলেই শেষ অংশটা পরিষ্কার ইহুদী। বলে 'ডাক্তার খালাম্মা, ডাক্তার এ্যাঞ্জেলো আমাকে দেখার জন্য আসবেন এ কথা কখন আপনাকে বলেন? সংগে সংগেই?'

ডাক্তার খালাম্মা পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। ভাবনার একটা ছায়া ফুটে উঠল তার চোখে মুখে। আহমদ মুসার প্রশ্নের উত্তরে সংগে সংগেই সে কিছু বলল না। একটু ভেবে বলল, 'মনে পড়ছে সে মাঝখানে উঠে

টয়লেটে গিয়েছিল। টয়লেট থেকে আসার পর সে আলোচনায় আবার যোগ দেয় এবং বলে ঐ কথা। কেন প্রশ্ন করছ এসব, অন্য কিছু ভাবছ?'

'বলছি খালাম্মা। বললেন উনি আসছেন। উনারা কি আলাদাভাবে আসছেন? বাসা চিনবেন কি করে ওরা?' বলল আহমদ মুসা।

'এক সাথেই আশার কথা ছিল। কিন্তু হঠাৎ সে বলল, ওদিকে আমার এক বন্ধুরও যাওয়ার কথা। আমরা এক সাথেই যাবো। ক'মিনিট দেরী হবে। আপনার পেছনেই আমি আসছি। আমি বাসার ঠিকানা লিখে দিয়ে চলে এসেছি।' ডাক্তার খালাম্মা বলল।

আহমদ মুসা নিজের হাত ঘড়ির দিকে তাকাল। বলল, 'আপনারা এসেছেন সাত মিনিট। আর চার-পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ওরা এসে পড়বে নিশ্চয়।'

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা তাকাল দাদী ও যয়নব যোবায়দার দিকে। বলল, 'ভবিষ্যত জানেন একমাত্র আল্লাহ। কিন্তু আমি আশংকা করছি চার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই এখানে বড় কিছু ঘটতে যাচ্ছে। বাড়ির সামনের দিকে ছাড়া অন্য কোন পথ কি আছে যেখান দিয়ে আপনাদের বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব হতে পারে?'

সবার মুখ শুকিয়ে গেছে। প্রবল উদ্বেগ ফুটে উঠেছে তাদের চোখে মুখে। বলল ডাক্তার খালাম্মা চোখে-মুখে বিস্ময় নিয়ে, 'তুমি কি আশঙ্কা করছ ডাক্তার এ্যাঞ্জেলো কোন বিপদের.........।

ডাক্তার খালাম্মার কথা শেষ হলো না। কলিং বেল বেজে উঠল।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'ডাক্তার খালাম্মা ডাক্তার এ্যাঞ্জেলোর ডান তর্জনি কি ডিফেক্টিভ?'

বিস্ময় বিমূঢ় চোখে তাকাল খালাম্মা আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'হ্যাঁ, তুমি জানলে কি করে?'

'পরে বলব, ওরা এসে গেছে। আপনারা সবাই দু'তলায় জান। ফরহাদ তুমিও যাও। দয়া করে আমি না ডাকা পর্যন্ত কেউ নিচে নামবেন না। যান আপনারা, আমি গিয়ে দরজা খুলে দিচ্ছি।'

বলে আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি বালিশের নিচ থেকে রিভলবার বের করে মাথার পেছনে জ্যাকেটের গোপন পকেটে ঢুকিয়ে নিল।

‘খারাপ কিছুর আশংকা আছে?’ দ্রুত কম্পিত কণ্ঠে বলল যয়নব যোবায়দা।

‘প্রস্তুত থাকা ভালো।’ হাসি মুখে শান্ত কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

‘প্লিজ আপনারা দোতলায় যান।’

কথা বলতে বলতেই আহমদ মুসা ঘর থেকে বেরিয়ে দ্রুত পায়ে ছুটল বাইরের ঘরের দিকে।

আহমদ মুসা চলে যাবার পর ডাক্তার খালাম্মা যোবায়দাকে বলল, ‘তোমরা যাও, আমি দেখি ডাক্তার এ্যাঞ্জেলো সত্যি এলেন কিনা।’

‘প্লিজ খালাম্মা, উনি যা বলেছেন তার মধ্যেই কল্যাণ আছে। সব ঠিক ঠাক থাকলে তো উনি আমাদের ডাকবেনই।’ অনুরোধ করল যয়নব যোবায়দা ডাক্তার খালাম্মাকে।

ওরা সবাই দোতলায় উঠে গেল।

আহমদ মুসা ছুটে এসে ড্রইংরুমের বাইরের দরজার ডোর ভিউতে চোখ রাখল। দেখতে পেল দরজার সামনেই আছেন দীর্ঘদেহী পঞ্চাশের মত বয়সের একজন ভদ্রলোক। তার গায়ে তখনও ডাক্তারের এ্যাপ্রোন। তার পেছনে বারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন পুলিশ।

পুলিশ দেখে চমকে উঠল আহমদ মুসা। ডাক্তার এ্যাঞ্জেলোর সাথে তো আসার কথা ব্ল্যাক ঈগলের লোকরা। পুলিশ কেন তার সাথে?

একটা সন্দেহ উঁকি দিল আহমদ মুসার মনে। পুলিশের মাথা থেকে পা পর্যন্ত দৃষ্টি বুলাল আহমদ মুসা। না পুলিশী ক্যাপ, ইউনিফরম, বুট সব ঠিক আছে। কোন খুত নেই। কিন্তু আহমদ মুসার চোখ আটকে গেল পুলিশদের চুলের উপর। থাই পুলিশদের চুল মাথার ক্যাপ ছাপিয়ে এমন বেঢপ ভাবে বেরিয়ে আসে না। দ্বিতীয় আরেকটি জিনিস তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সেটা হলো, এই পুলিশদের বুটের কালো ফিতার প্রান্তের মেটাল মোড়কের সবটাই সাদা। কিন্তু থাই পুলিশের তা নয়। তাদের ফিতার মোড়কের অগ্রভাগের এক তৃতীয়াংশ কালো।

ডাক্তার এ্যাঞ্জেলোর চালাকি বুঝতে পারল আহমদ মুসা। ঝামেলা এড়াবার জন্যে ব্ল্যাক ঈগলের লোকদের সে পুলিশ সাজিয়ে নিয়ে এসেছে।

হাসল আহমদ মুসা।

ডোর ভিউ থেকে সরে এসে দরজার পাশের ছোট ‘কী’ বোর্ড থেকে চাবি হাতে নিল।

দরজাটির তালায় ভেতর বাহির দু’দিক থেকেই চাবি দেবার ব্যবস্থা আছে। খুশি হলো আহমদ মুসা। সে যে পরিকল্পনার কথা ভাবছে, তাতে এর প্রয়োজন আছে।

এ সময় কলিংবেল আবার বেজে উঠল। এবার পর পর দু’বার। আহমদ মুসা বুঝতে পারল ডাক্তার এ্যাঞ্জেলো অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছেন।

আহমদ মুসা দরজার লক আন-লক করে চাবিটা লকের ভেতরেই রেখে দিল।

দরজাটি দ্রুত খুলে বলল, ‘স্যরি স্যার দেরি হয়ে গেল। আমি ভেতরে রোগীর ঘরে ছিলাম। স্যার আপনি তো ডাক্তার এ্যাঞ্জেলো, ম্যাডাম ডাক্তার খালাম্মা আপনার কথা বলেছেন।’

তারপর লোকটিকে কথা বলার সুযোগ না দিয়েই বলল, ‘পুলিশ কেন স্যার, কি চায়?’

‘হ্যাঁ, আমি ডাক্তার এ্যাঞ্জেলো। এই পুলিশদের সাথে আমার রাস্তায় দেখা। ওরাও এখানে আসছে জেনে এক সাথেই এলাম। কি জন্যে ওরা এসেছে আমি জিজ্ঞেস করিনি।’

আহমদ মুসা কয়েক ধাপ এগিয়ে বারান্দার প্রান্ত পর্যন্ত পৌছে পুলিশদের সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল, ‘আপনারা এ বাড়িতে এসেছেন? কেন এসেছেন?’

বাড়ির উঠানে সদ্য আসা তিনটি গাড়ি। একটা ছোট কার অন্য দু’টি অটো-টেম্পো। পুলিশের সংখ্যা মোট এগার জন। তাদের সবার হাতেই খাটো ব্যারেলের হ্যান্ড মেশিনগান। আহমদ মুসা থাই পুলিশের হাতে এ ধরনের সাব-মেশিনগান দেখেনি।

কাঁধে সাবমেশিনগান ঝুলানো ও হাতে ব্যাটনধারী একজন পুলিশ একটু সামনে এগিয়ে এসে বলল, ‘আপনি কে?’

‘আমি আলী আবদুল্লাহ।’ আহমদ মুসা বলল।

'বিভেন বার্গম্যান কি ভেতরে?'

'হ্যাঁ।'

'আমরা তার সাথে কথা বলব।' পুলিশ লোকটি।

'আপনারা কোন থানা থেকে এসেছেন।'

একটু থতমত খেয়ে পুলিশ অফিসারটি একটা ঢোক গিলে বলল, 'না, আমরা পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে এসেছি।'

'ওয়েলকাম আপনাদের। আপনারা সকলে আসুন।'

বলে আহমদ মুসা দরজার একপাশে দাঁড়াল।

ভেতরে ঢুকল প্রথমে ডাক্তার এ্যাঞ্জেলো। বলল, 'আমিও তাকে দেখতে এসেছি।'

পুলিশরা সবাই এক এক করে ভেতরে ঢুকল।

সবশেষে আহমদ মুসা ঢুকল। ঢুকেই দু'হাত পেছনে নিয়ে দরজা ঠেলে বন্ধ করে দিল এবং একই সাথে লকে লাগানো চাবি ঘুরিয়ে লক বন্ধ করে ঘরের মাঝখানে এসে বলল, 'আপনারা একটু বসুন। আমি ওঁকে নিয়ে আসছি।' বলে আহমদ মুসা ড্রইংরুম থেকে ভেতরে যাওয়ার দরজায় এসে বলল, '৮ জনের সোফায় ১২জন বসতে একটু অসুবিধা হবে স্যার।'

একটা চেয়ার ঘরের এদিকের দেয়ালের সাথে আলগা করে রাখা ছিল। চেয়ারটি একটু টেনে আহমদ মুসা একজন পুলিশকে ডেকে বলল, 'আপনার ওখানে অসুবিধা হচ্ছে। এখানে বসুন।'

আহমদ মুসার কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই ব্যাটনধারী পুলিশ অফিসারটি বলল, 'মি. আবদুল্লাহ, বসার দরকার নেই। দু'জন আপনার সাথে যাচ্ছে। তারা বিভেন বার্গম্যানকে আনতে আপনাকে সাহায্য করবে।'

মনে মনে হাসল আহমদ মুসা। তার প্ল্যানটা একটু পাল্টে গেল। তাতে বরং তার লাভই হবে। দু'জন কম হলো এ রুমের থেকে।

'ঠিক আছে। আসুন, ওয়েলকাম।'

বলে আহমদ মুসা নব ঘুরিয়ে ভেতরে যাবার দরজা খুলে ফেলল। এবং দরজার এক পাশে দাঁড়াল। পুলিশ দু'জন এলে তাদেরকে ভেতরে যাবার জন্যে আহবান জানাল। দু'জন পুলিশেরই হ্যান্ডমেশিনগান কাঁধে ঝুলানো।

পুলিশ দু'জন ভেতরে ঢুকে গেল এক এক করে। তাদের পেছনে ঢুকল আহমদ মুসাও।

আহমদ মুসা ভেতরে ঢুকে গেল এক এক করে। তাদের পেছনে ঢুকল আহমদ মুসাও।

আহমদ মুসা ভেতরে ঢুকে দরজার পাল্লা আস্তে করে ঠেলে দিল এবং লকটাও টিপে দিয়েছে সাথে সাতে। অটো ক্লোজ হওয়ার মতই দরজাটা সামান্য শব্দ তুলে ক্লোজ হয়ে গেল।

দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দে দু'জন পুলিশ এক সাথেই পেছন ফিরে তাকাল। তাদের চোখে সন্দেহযুক্ত প্রশ্ন। কিন্তু তারা প্রশ্ন করার আগেই আহমদ মুসা চোখের পলকে মাথার পেছনে জ্যাকেটের পকেট থেকে রিভলবার বের করে তাদের দিকে তাক করে বলল, 'তোমরা কাঁধ থেকে মেশিনগান নামিয়ে নেবার সুযোগ পাবে না। তার আগেই আমার রিভলবারের দুই গুলী তোমাদের মাথা গুঁড়ো করে দেবে। আমার এই রিভলারে কোন শব্দ হয় না। নিঃশব্দে দুই গুলী তোমাদের মেরে ফেলবে। তোমাদের সঙ্গীরা কেউ জানতে পারবে না। যদি বাঁচার ইচ্ছা থাকে অস্ত্র ফেলে দাও।'

পুলিশ দু'জন একটু দ্বিধা করল, কিন্তু পরক্ষণেই কাঁধের হ্যান্ড মেশিনগান নিচে মেঝেয় ছেড়ে দিল।

দু'জনের দিকে রিভলবার নাচিয়ে বলল, 'তোমরা উপুড় হয়ে শুয়ে পড়। মনে রেখ, এক আদেশ কিন্তু দুবার করব না। দ্বিতীয় বার চলবে গুলী।'

উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল দু'জনেই।

আহমদ মুসা ঘরের এদিক-ওদিক তাকাল বাঁধার কিছু একটার খোঁজে।

ঘরটি নিচ তলার ডাইনিং রুম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ঘরের পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি উঠে গেছে। সিঁড়ির নিচ দিয়ে ওপাশে কিচেনে যাবার

দরজা। ঘরের অন্য দু'দিকে দু'টি কক্ষ। এ দু'টিই বাড়ির গেষ্ট রুম। এরই একটিতে আহমদ মুসা, অন্যটিতে থাকে ফরহাদ উদ্দিন।

খুঁজতে গিয়ে আহমদ মুসা অ্যাডহীসীভ টেপ পেয়ে গেল। এ টেপ তাদের ব্যান্ডেজ বাঁধার কাজের জন্যেই আনা হয়েছিল।

এই টেপ দিয়ে দ্রুত দুই পুলিশের হাত-পা ছাড়াও মুখ আটকে দিল যাতে চিৎকার করতে না পারে।

এরপর আহমদ মুসা মোবাইলে একটা টেলিফোন করল পাত্তানী শহরের এসপিকে। থাই গোয়েন্দা পুলিশের সহকারী প্রধান পুরসাত প্রজাদিপক পাত্তানী সিটির এসপিকে আহমদ মুসা সম্পর্কে আগেই বলে রেখেছে। আহমদ মুসাও তার সাথে কথা বলেছে বিভেন বার্গম্যান পরিচয়ে।

সিটি পুলিশ ধরলেই আহমদ মুসা এ বাড়ির ঠিকানা দিয়ে বলল, 'ব্ল্যাক ঈগলের লোকরা পুলিশের ছদ্মবেশ নিয়ে আমাদের ধরতে এসেছে। এখানে যয়নব যোবায়দাও আছে আপনি জানেন।'

'এখন কি অবস্থা?' সিটি পুলিশ সুপার জিজ্ঞেস করল।

'আমি ওদের আটকে রেখেছি। কতক্ষণ পারব জানি না।' আহমদ মুসা বলল।

'মি. বার্গম্যান মিনিট দশেক ওদের সামলান। ঐ এলাকায় পুলিশ ইন্সপেক্টর থাচিনের নেতৃত্বে একটা ভ্রাম্যমান টীম আছে। ওরা যাচ্ছে ওখানে। আমি একটি পুলিশ টীম নিয়ে নিজেই আসছি।' বলল পাত্তানী সিটি পুলিশ সুপার।

'ধন্যবাদ স্যার।' আহমদ মুসা বলল।

'ওয়েলকাম মি. বার্গম্যান।' বলে পুলিশ সুপার টেলিফোন রেখে দিল।

আহমদ মুসা মোবাইল পকেটে রেখে দু'জন পুলিশের হ্যান্ডমেশিনগান তুলে নিয়ে একটি কাঁধে ঝুলাল, অন্যটি হাতে রাখল।

ডান দিক থেকে পেছনে ঘুরতে গিয়ে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির দিকে নজর গেল আহমদ মুসার। দেখল, 'সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছে যয়নব যোবায়দা। তার দু'চোখে বিস্ময়, আতংক।

আহমদ মুসা দ্রুত কয়েক ধাপ এগিয়ে বলল, ‘আপনারা কেউ এদিকে থাকবেন, কাউকে আমার দরকার হতে পারে।’

যয়নব যোবায়দার পেছনে এসে দাঁড়াল ফরহাদ ফরিদ উদ্দিন এবং ডাক্তার খালাম্মা। উদ্বেগ-আতংকে সবার মুখই শুকনো।

আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল। যয়নব যোবায়দা শুকনো কম্পিত কণ্ঠে বলল, ‘আমি কিছুই বুঝতে পারছি না স্যার।’

আহমদ মুসা কোন কথা না বলে ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে চুপ থাকার ইশারা করে ঘুরে দাঁড়িয়ে চলল ড্রইং রুমের দরজার দিকে।

ড্রইংরুমের দরজায় গিয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াল। তারপর হ্যান্ড মেশিনগানের ট্রিগারে আঙুল রেখে বাম হাতে দরজার নব ঘুরিয়ে আস্তে স্বাভাবিকভাবে খুলতে লাগল। প্রথমেই তার নজরে পড়ল, দরজা সোজা চেয়ারটা যেখানে একজন পুলিশকে বসতে বলেছিল, সেটা খালি। খুশি হলো আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা ডান হাতের হ্যান্ডমেশিনগানটা একটু আড়াল করে বাম হাত দিয়ে দরজাটা পরিপূর্ণ খুলে দেয়ালের সাথে সেঁটে দিল। ইলাষ্টিক হুকে আটকে গেল দরজা।

সংগে সংগেই আহমদ মুসা হ্যান্ডমেশিনগানটা বাগিয়ে ধরে লাফ দিয়ে দরজা ডিঙ্গিয়ে ড্রইং রুমের মেঝেয় গিয়ে দাঁড়াল এবং নিচু গলায় কঠোর কণ্ঠে বলল, ‘একজনও অস্ত্র তোলার চেষ্টা করলে সবাইকে এক সাথে গুলী করে মারব।’

আহমদ মুসাকে অস্ত্র হাতে লাফ দিয়ে পড়তে দেখেই কয়েকজন উঠে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু আকস্মিকতা কাটিয়ে তারা অস্ত্র তোলার আগেই আহমদ মুসার মেশিনগান তাদের দিকে উদ্যত হলো এবং ধ্বনিত হলো তার কঠোর কণ্ঠ।

আহমদ মুসার হাতের হ্যান্ডমেশিনগানের হাঁ করা ব্যারেল দেখে এবং তার চোখের দিকে তাকিয়ে কেউই আর অস্ত্রে হাত দিতে সাহস করল না। বসে দাঁড়িয়ে যে যেভাবে ছিল সেভাবেই থাকল।

সেই ব্যাটনধারী পুলিশ অফিসার লোকটি উঠে দাঁড়িয়েছিল। তার হাতেও ছিল রিভলবার। সে বলল, ‘পুলিশের বিরুদ্ধে তুমি বন্দুক উঁচিয়েছ। এর পরিণতি জান? আমাদের দু’জন পুলিশ কোথায়? কি করেছ তাদের?’

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘আমার পরিণতির কথা পরে। কারণ আমার হাতে এখন বন্দুক। তোমার পরিণতির কথা ভাব।’

আহমদ মুসা যখন কথা বলছিল, তখন একে সুযোগ হিসাবে নিয়ে পুলিশ অফিসারটি তার রিভলবার তুলেছিল আহমদ মুসার লক্ষে।

কিন্তু আহমদ মুসা মুখে কথা বললেও হ্যান্ডমেশিনগানে আটকানো তার তর্জনি একটুও অসতর্ক হয়নি। পুলিশ অফিসারবেশী লোকটির রিভলবার থেকে গুলী বেরুবার আগেই আহমদ মুসার হ্যান্ডমেশিনগানের কয়েকটি গুলী ছুটে গেল তার দিকে। একটি গুলী বিদ্ধ করল তার রিভলবার ধরা হাতকে। আরও দু’টি গুলী তার বাহু ও উরুতে গিয়ে বিদ্ধ হলো।

সে আর্তনাদ করে বসে পড়ল সোফায়।

হ্যান্ডমেশিনগানের ব্যারেল সবার দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলল আহমদ মুসা, ‘ওর বুকে গুলি করিনি প্রথম কেস বলে। কিন্তু এরপর কেউ অস্ত্রে হাত দিলে এবার গুলী যাবে সরাসরি তার বুকে। সবাই অস্ত্র মেঝের মাঝখানে ফেলে দাও।’

সংগে সংগেই সবার অস্ত্র মেঝের মাঝখানে এসে জমা হলো।

সোজা হয়ে বসল ডাক্তার এ্যাঞ্জেলো। বলল ভীত কণ্ঠে, ‘আমি এসবের মধ্যে থাকতে চাই না। কিছু বুঝতে পারছি না আমি। আমি চলে যাই। বিভেন বার্গম্যানের সাথে আমি পরে দেখা করব।’

ডাক্তার এ্যাঞ্জেলো উঠে দাঁড়াল।

‘না, ডাক্তার এ্যাঞ্জেলো আপনি বসুন। আমার আশংকা, এই ভুয়া পুলিশদের পাঠিয়েছে যারা, তাদের আপনি খবর দেবেন এখান থেকে বেরিয়েই। সুতরাং পুলিশ আসা পর্যন্ত থাকুন। আপনাকে কি করবে তারাই সিদ্ধান্ত নেবে।’

‘আমাদের ভুয়া পুলিশ বলছ। তোমার কাছে কি প্রমাণ আছে?’ বলল আহত পুলিশবেশী অফিসার লোকটি।

প্রতিবাদ করলেও পুলিশবেশী সকলের মুখে ভীতির পর এবার মুষড়ে পড়া ভাব সৃষ্টি হয়েছে।

'প্রমাণ করা আমার দায়িত্ব নয়। পুলিশ আসছে, খোদ এসপি সাহেবও আসছেন। তাঁরাই প্রমাণ করবেন।'

ডাক্তার এ্যাঞ্জেলোও মুষড়ে পড়েছে। সে বলল, 'আমি পুলিশের অপেক্ষা করব কেন? এদের সাথে কিংবা তাদের সাথে আমার কি সম্পর্ক? আমি আপনাদের ডাক্তার খালাম্মার সাথে যোগাযোগ করে এসেছি। তাঁকে ডেকে দিন।'

পাশের ঘরে যয়নব যোবায়দা, ডাক্তার খালাম্মা ও ফরহাদ ফরিদ উদ্দিন সবাই দাঁড়িয়েছিল। তাদের সাথে আহমদ মুসার কথোপকথন সবই তারা শুনেছে। ডাক্তার এ্যাঞ্জেলোর শেষ কথাটা শুনে ডাক্তার খালাম্মা ড্রইং রুমে আসতে যাচ্ছিল। আহমদ মুসা দেখতে পেয়ে তাকে ইশারা করে ফিরিয়ে দিল। বলল সে ডাক্তার এ্যাঞ্জেলোর কথার উত্তরে, 'মি. ডাক্তার এ্যাঞ্জেলো, এখন ডাক্তার খালাম্মাকে ডাকার সময় নয়। আপনি যা বলার পুলিশকে বলবেন।'

হঠাৎ ডাক্তার এ্যাঞ্জেলো তার এ্যাপ্রনের পকেটে থাকা দুই হাতের ডান হাত রিভলবারসহ বের করে গুলী করল আহমদ মুসাকে। ডাক্তার এ্যাঞ্জেলোর চেহারায় পুটে উঠেছিল উৎকট বেপরোয়া ভাব।

একটু অসতর্ক ছিল আহমদ মুসা। আর ডাক্তার এ্যাঞ্জেলোর রিভলবারসহ হাতটা এত দ্রুত তার লক্ষে উঠে এসেছিল যে, পাল্টা আক্রমণের সময় তখন ছিল না। আত্মরক্ষার জন্যে দ্রুত বসে পড়েছিল আহমদ মুসা। ডাক্তার এ্যাঞ্জেলোর গুলীটা তার গলদেশের বাম গোড়ায় কাঁধের পেশি উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল। বসতে সে তিল পরিমাণ দেরি করলে গুলীটা তার হৃদপিন্ড ভেদ করে চলে যেত।

আহমদ মুসা বসে পড়ার জন্য যে সময় পেল সেই সময়ের মধ্যে তার হ্যান্ডমেশিনগানের লক্ষ্য ঠিক করে নিয়ে ট্রিগার টেপে তার হ্যান্ডমেশিনগানের। হাত, পাঁজরসহ কয়েক জায়গায় গুলী খেয়ে ঢলে পড়ে ডাক্তার এ্যাঞ্জেলো সোফার উপর।

ডাক্তার এ্যাঞ্জেলোকে গুলী করেই আহমদ মুসা তার হ্যান্ডমেশিনগানের ব্যারেল অন্যদের উপর একবার ঘুরিয়ে নিল। বলল, 'দেখ ডাক্তার এ্যাঞ্জেলোর ডাক্তার পরিচয়কেই বড় করে দেখেছিলাম। তাই তিনি আমাকে ফাঁকি দিতে পেরেছেন। কিন্তু তোমাদের ব্যাপারে আমার কোন বিভ্রান্তি নেই। অতএব যে যেমন আছ, ঠিক সে ভাবেই থাক।'

আহমদ মুসাকে গুলী লাগতে দেখে আর্তনাদ করে উঠেছিল যয়নব যোবায়দা এবং ফরহাদ ফরিদ উদ্দিন দু'জনেই।

'ও গড, বিভেন বার্গম্যান তো আগের আহত জায়গার পাশেই আবার গুলী খেয়েছে।'

ডাক্তার খালাম্মা কয়েক মুহূর্ত থেমে আবার আর্তকণ্ঠে বলে উঠল, 'ডাক্তার এ্যাঞ্জেলো বার্গম্যানকে গুলী করে আহত করল, আবার বার্গম্যান ব্রাশ ফায়ার করল ডাক্তার এ্যাঞ্জেলোকে। উনি হয়তো মরেই গেলেন! এসব কি হচ্ছে?'

এ সময় কলিং বেল বেজে উঠল।

আহমদ মুসা পুলিশদের উপর থেকে চোখ না সরিয়েই বলে উঠল, 'ফরহাদ তুমি এস।'

ফরহাদ তাকাল যয়নব যোবায়দার দিকে।

'দেরি করো না। উনি আহত, মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে আছেন উনি। যা বলছেন কর।' উদ্বেগ-আবেগজড়িত কণ্ঠে বলল যয়নব যোবায়দা।

অসুস্থ ফরহাদ ফরিদ উদ্দিন সব ভুলে দৌড়ে পৌছল ড্রইং রুমে।

'ফরহাদ, ডোর ভিউ দিয়ে দেখ বাইরে পুলিশ কিনা। পুলিশ হলে দরজা খুলে দাও।' বলে আহমদ মুসা একটা চাবি তার হাতে দিল।

ইতিমধ্যে কলিংবেল আবারো বেজে উঠল।

ফরহাদ দ্রুত এগিয়ে ডোর ভিউতে একবার চোখ রেখেই দ্রুত দরজা খুলে দিল।

ঘরের বড় পুলিশ অফিসার তার পাশের পুলিশ অফিসারকে বলল, 'ইন্সপেক্টর থাচিন, অস্ত্রগুলো নিয়ে নাও আর ওদের গ্রেফতার করতে বল।' বলে বড় পুলিশ অফিসারটি তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'আমি সিটি এসপি

উদয় থানি। আপনি তো মিঃ বিভেন বার্গম্যান স্যার। আপনি গুলীবিদ্ধ হয়েছেন দেখছি। তবু আপনি এদের আটকে রেখেছেন। ধন্যবাদ আপনাকে।'

'ধন্যবাদ মিঃ উদয় থানি। আমাকে গুলীবিদ্ধ করেছেন ডাক্তার এ্যাঞ্জেলো। এর আগে আমাকে গুলী করেছেন পুলিশ অফিসারবেশী ঐ আহত ভদ্রলোক। দু'জনকে নিরস্ত্র করার জন্যে আমাকে গুলী করতে হয়েছে। আমার হাতের হ্যান্ডমেশিনগানটিও ওদের।' বলে আহমদ মুসা হ্যান্ডমেশিনগানটি উদয় থানিকে দিয়ে দিল।

পাত্তানী সিটি এসপি উদয় থানি হ্যান্ডমেশিনগানটি আহমদ মুসার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'এটা রাখুন স্যার, আপনার কাজে লাগবে।'

একটু থেমেই আবার বলল, 'ইতিমধ্যে সহকারী গোয়েন্দা প্রধান পুরসাত প্রজাদীপক স্যারের সাথে আমার কথা হয়েছে। আপনি অসম্ভব বড় একটা কাজ করেছেন স্যার। কথিত 'ব্ল্যাক ঈগল' এর কাউকেই এখনও জীবন্ত হাতে পাওয়া যায়নি। এবার এক সঙ্গে দশজনকে অস্ত্রসহ এ্যাকশনকালে হাতে-নাতে ধরা গেছে। এটা....।'

সিটি এসপি উদয় থানির কথার মাঝখানেই আহমদ মুসা বলে উঠল, 'ওরা দশজন নয়, বার জন। আরও দু'জনকে পাশের ঘরে বেঁধে রেখেছি।'

'স্যার চলুন দেখি।' বলে সিটি এসপি উদয় থানি পাশের ঘরের দিকে হাঁটতে লাগল। আহমদ মুসাও চলল।

সিটি এসপি উদয় থানি ঘরে ঢুকে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা দু'জন পুলিশবেশী লোককে দেখতে পেল। দেখতে পেল যয়নব যোবায়দা, দাদী এবং ডাক্তার খালাম্মাকেও।

দাদী ইতোমধ্যে নিচে এসে গিয়েছিল।

আহমদ মুসা উদয় থানিকে ওদের সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'জাবের জহীর উদ্দিনের বোন যয়নব যোবায়দা ওদের টার্গেট। জাবেরের মত যয়নব যোবায়দাকেও ওরা হাতের মুঠোয় পেতে চায়।'

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এই চেষ্টা তারা করেছে বলেই তাদেরকে আজ এভাবে হাতে-নাতে ধরা গেল। অবশ্য সব কৃতিত্ব স্যার আপনার। তবে এর চেয়ে

বড় কৃতিত্বের কাজ আপনি থাইল্যান্ডের জন্য করেছেন, যার জন্যে শুধু থাই পুলিশ নয়, থাই সরকারও আপনার কাছে কৃতজ্ঞ স্যার।'

কথা শেষ করেই উদয় থানি তাকাল যয়নব যোবায়দার দিকে। বলল, 'শাহজাদী ম্যাডাম যোবায়দা, আমরা দুঃখিত আপনাদের সম্মানিত পরিবার এক ভয়ানক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে। তবে ম্যাডাম মেঘ কেটে যাচ্ছে আশা করি। মি. বিভেন বার্গম্যান স্যার বলা যায় অসাধ্য সাধন করেছেন। এটা শুধু আপনার পরিবারের প্রতি নয়, থাইল্যান্ডের প্রতি ঈশ্বরের একটা বিশেষ সাহায্য।'

'ধন্যবাদ স্যার। আমাদের পুলিশ বাহিনী ও সরকারের প্রতি সব সময়ই আমরা আস্থাশীল। আমাদের সংকট মোচনে তারা সফল হবেন। আমার অনুরোধ ভাইয়াকে তাড়াতাড়ি উদ্ধার করুন। আর ফরহাদ ফরিদ উদ্দিনের মত যারা পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, তাদের দয়া করে আপনারা অভয় দিন।' বলল যয়নব যোবায়দা।

'শাহজাদী ম্যাডাম, এ নিয়েও উর্ধ্বতন পর্যায়ে আলোচনা হয়েছে। আজকের পর তাদের আর হয়রানি করা হবে না।' সিটি এসপি উদয় থানি বলল।

'ধন্যবাদ স্যার।'

'ওয়েলকাম ম্যাডাম' বলে উদয় থানি তাকাল ডাক্তার খালাম্মার দিকে। 'ডাক্তার ফাতেমা জহুরা ম্যাডাম আপনি এখানে, আবার ডাক্তার এ্যাঞ্জেলো ভুয়া পুলিশের সাথে দেখছি। কি ব্যাপার?'

ডাক্তার খালাম্মা সংক্ষেপে ডাক্তার এ্যাঞ্জেলোর এখানে আসার ব্যাকগ্রাউন্ডটা বর্ণনা করে বলল, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তিনি ভুয়া পুলিশের সাথে আসবেন, তিনি ভুয়া পুলিশের সাথে আসবেন, তিনি মি. বার্গম্যানকে গুলী করবেন, এসব কি করে হয়?'

'ডাক্তার খালাম্মা, উনি ভুয়া পুলিশের সাথে আসেননি। তিনিই ভুয়া পুলিশকে নিয়ে এসেছে আমাকে, ফরহাদকে এবং ম্যাডাম যয়নবকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।' আহমদ মুসা বলল।

'ডাক্তার ফাতেমা জহুরা ম্যাডাম এ দুনিয়ায় কিছুই অসম্ভব নয়। এই গ্রুপের লোককে প্রথম আমরা হাতে পেয়েছি। বহু কিছুই এখন বেরিয়ে আসবে।'

একটু থামল সিটি এসপি উদয় থানি। কিছুক্ষণ পর আবার বলে উঠল যয়নব যোবায়দাকে লক্ষ্য করে, 'শাহজাদী ম্যাডাম, ফরহাদ সাহেবকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন, সে একটা এফআইআর লিখে দিয়ে আসবে।'

'ওকে স্যার সে যাচ্ছে আপনাদের সাথে।' বলে যয়নব যোবায়দা তাকাল ফরহাদ ফরিদ উদ্দিনের দিকে।

'ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি।' বলল ফরহাদ ফরিদ উদ্দিন।

'অসুস্থ তুমি, পারবে তো যেতে?' আহমদ মুসা বলল দরদ ভরা কণ্ঠে।

ফরহাদ ফরিদ উদ্দিন চোখ তুলল আহমদ মুসার দিকে। তার দু'চোখ অশ্রুতে ভরে উঠেছে। বলল, 'স্যার আপনি গুলীবিদ্ধ, রক্ত ঝরছে সেখান থেকে প্রবলভাবে। কিন্তু মনে হচ্ছে আপনার কিছুই হয়নি। এই শিক্ষা কেন আমরা নিতে পারবো না স্যার!' আবেগরুদ্ধ কণ্ঠ ফরহাদ ফরিদ উদ্দিনের।

ফরহাদ ফরিদ উদ্দিনের কথার সাথে সাথে ব্যস্ত হয়ে উঠল সিটি এসপি উদয় থানি। দ্রুত কণ্ঠে বলল, 'আমরা তো ওদের নিয়ে যাচ্ছি। বিভেন বার্গম্যান স্যারকে এখনি হাসপাতাল বা কোন ক্লিনিকে নেয়া দরকার। অপারেশন দরকার হতে পারে। রক্তও অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার।'

কথা শেষ করেই সিটি এসপি উদয় থানি, 'সবাইকে ধন্যবাদ, আমরা চলি' বলে ঘুরে দাঁড়াল। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়িয়েও থমকে দাঁড়াল উদয় থানি। আবার ঘুরে দাঁড়াল। বলল, 'তিনজন পুলিশের একটা টীম বাড়ির সামনে পাহারায় থাকবে। একটি ভ্রাম্যমান পুলিশ বক্সসহ তারা আসছে। সেখানেই তারা থাকবে। এটা উপরের হুকুম। আপনাদের কোন অসুবিধা হবে না।'

বলেই ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার হাঁটতে লাগল উদয় থানি।

ওদের সাথে আহমদ মুসাও ড্রইংরুমে গেল।

সবাই বেরিয়ে যেতেই যয়নব যোবায়দা তাকাল ডাক্তার খালাম্মার দিকে।

এ দৃষ্টির অর্থ বুঝল ডাক্তার খালাম্মা ফাতেমা জহুরা। বলল, 'বেটি ওকে হাসপাতালে নেয়ার দরকার নেই। ডাক্তার এ্যাঞ্জেলোর এই ঘটনা দেখার পর

আমি হাসপাতালকে বিশ্বাস করতে পারছি না। অপারেশন লাগলে এখানেই সেটা হবে।'

'ওকে ভালো করে দেখুন ডাক্তার খালাম্মা। উনি মানুষ নয় খালাম্মা, আল্লাহর ফেরেশতা উনি! অন্যের কথাই শুধু ভাবেন, নিজের দিকে তাকান না। আপনি তো দেখলেন খালাম্মা, যে গুলীটা তার কাঁধে লেগেছে, ত্বরিত বসে না পড়লে সে গুলীটা তার বক্ষ ভেদ করে যেত। তাহলে কি হতো ভাবতেও ভয় লাগে খালাম্মা। কিন্তু দেখুন, তাঁর মধ্যে এর সামান্য অনুভূতি, উদ্বেগও নেই।' আবেগ রুদ্ধ কণ্ঠে তার আপনাতেই থেমে গেল। চোখ দু'টিও তার অশ্রু সজল হয়ে উঠেছে।

'ঠিক বলেছ বেটি। তবে তিনি ফেরেশতা নন, ফেরেশতার চেয়ে বড়। ফেরেশতা যে মানুষকে সিজদা করেছে, তিনি সে ধরনের মানুষ। আমি ভাগ্যবান যে তাকে চিকিৎসা করার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু তার পরিচয় কি বেটি? তার সাথে বিভেন বার্গম্যান নাম মানায় না। বলল ডাক্তার খালাম্মা।

আহমদ মুসা ড্রইংরুমে থেকে এ ঘরে প্রবেশ করল।

'আপনাকে বলব খালাম্মা পরে।' দ্রুত কণ্ঠে বলল যয়নব যোবায়দা।

দাদী এগুলো আহমদ মুসার দিকে। রাজ্যের মমতা নিয়ে তাকাল তার দিকে। বলল, 'ভাই, আমাদের জন্যে তোমার যুদ্ধ তো এখনকার মত শেষ। এবার নিজের দিকে নজর দাও। আমার এই ডাক্তার বেটির হাতে নিজেকে ছেড়ে দাও ভাই।' ডাক্তার ফাতেমা জহুরার দিকে ইংগিত করল দাদী।

'হ্যাঁ বেটা, টেবিল তো রেডিই আছে। অন্য সবকিছুও প্রস্তুত আছে। চল টেবিলের দিকে।' দাদীর কথা শেষ হতেই বলল ডাক্তার ফাতেমা জহুরা।

'হাসপাতালে নিতে চাননি এজন্যে ধন্যবাদ ডাক্তার খালাম্মা। আমি রেডি চলুন।' হাসি মুখে বলল আহমদ মুসা।

'বেটা তুমি কি পাথরের? বুলেট বিদ্ধ হয়েও স্বাভাবিক থাকতে পার, হাসতে পার?' আহমদ মুসার ডান হাত ধরে টেবিলের দিকে টেনে নিতে নিতে বলল ডাক্তার ফাতেমা জহুরা।

‘মানুষ পাথর নয় ডাক্তার খালাম্মা। কষ্ট ও যন্ত্রণাবোধ সব মানুষের প্রায় একই রকম। তবে বড় কষ্টের কথা ভাবলে ছোট কষ্ট ভুলে থাকা যায় খালাম্মা, বড় বিপদ প্রতিরোধের বিষয় বড় হয়ে দেখা দিলে উপস্থিত কষ্টের কথা মানুষের মনে থাকে না। সবচেয়ে বড় কথা ডাক্তার খালাম্মা, ঈশ্বরের জন্যে সব ব্যাথা-বেদনা মানুষ হজম করতে পারে।’

‘ঠিক বলেছ বেটা, যুক্তি এবং বিজ্ঞানও এই কথা বলে। কিন্তু যে মানুষ একে বাস্তবে রূপ দিতে পারে, সেই মানুষ কিন্তু দেখা যায় না। তোমাকে ব্যতিক্রম হিসাবে দেখছি। তুমি কে বেটা, আমি এখনও কিন্তু জানি না।’ বলল ডাক্তার ফাতিমা জহুরা।

টেবিলে পৌছে গিয়েছিল আহমদ মুসা।

ডাইনিং টেবিলে একটা তোষক তার উপর রেক্সিন আর চাদর বিছানোই ছিল। একজন পরিচারিকা বিছানা ঝেড়ে-মুছে দিচ্ছিল। তারও কাজ হয়ে গেল।

বিছানায় শোবার সময় বলল, ‘পরিচয় যেটুকু বাকি আছে, সেটুকও হয়ে যাবে ডাক্তার খালাম্মা।’

ডাক্তার ফাতেমা জহুরা তার ব্যাগ খুলে ষ্টেরিলাইজড অপারেশন কীটস নিয়ে আহমদ মুসার মাথার কাছে গেল।

কীটসটা খুলে বিছানায় রেখে গম্লাভস পরতে পরতে বলল ডাক্তার ফাতেমা জহুরা, ‘কারও একজনের সাহায্য প্রয়োজন।’

যয়নব যোবায়দা বলল, ‘আমি আপনার পাশে আছি ডাক্তার খালাম্মা।’ বলে ডাক্তার ফাতেমা জহুরার পাশে এসে দাঁড়াল সে।

পরিচারিকরা দু’জন ড্রইংরুম পরিষ্কার করছিল, সেখানেই আবার ফিরে গেল।

অপারেশন শুরু করে দিল ডাক্তার ফাতেমা জহুরা।

# ২

মাগরিবের নামায শেষ করে বেডের পাশের সোফায় বসেছে আহমদ মুসা। একজন পরিচারিকা চা দিয়ে গেল।

পিরিচ সমেত চায়ের কাপ তোলার জন্যে বাম হাত এগিয়ে নিতে গিয়ে পারল না আহমদ মুসা। বেদনার চেয়ে ঘাড়ের ব্যান্ডেজটিই অসুবিধা করছে বেশি। ব্যান্ডেজ বাঁধার সময় ডাক্তার খালাম্মা তাকে বলেছে, 'হাতকে যাতে কাজে লাগাতে না পার এমন ব্যান্ডেজই বাঁধব। হাত না নাড়লে কাঁধ রেষ্টে থাকবে। দু'দিন এমন রেষ্টে থাকলে দু'দিন পরেই তুমি এ হাত দিয়ে কাজ করতে পারবে।'

ডান হাত দিয়ে চায়ের কাপ তুলে নিয়ে চায়ে চুমুক দিতে লাগল আহমদ মুসা।

দাদী এসে পাশে বসল আহমদ মুসার। বলল, 'কেমন আছ ভাই? জ্বর আসে নি তো?'

'না দাদীমা, আমি ভালো আছি।'

'কেমন করে যে ভালো থাক ভাই, তোমাকে দেখেই আমার জ্বর এসেছে।'

'একটা ওষুধ বলি দাদীমা?'

'জ্বরের? বল।'

'নামায পড়ার সময় যেমনটা হয়, সেভাবে মনোযোগ কালবের দিকে স্থির রেখে একশ বার বলুন, আমার জ্বর নেই। দেখবেন জ্বর আপনার থাকবে না।'

হাসল দাদী। বলল, 'তুমি দেখছি পীর-ফকিরের পথ ধরলে। তোমার এ কথার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কি?'

'ভিত্তি দু'টি দাদীমা। একটি হলো, একটা অনুভূমি থেকে আপনার জ্বর এসেছে, বিপরীত এক অনুভূতি দিয়ে আগের অনুভূতি মুছে ফেললেই জ্বর সেরে যাবে। দ্বিতীয়ত, রোগ নিরাময়ে ইতিবাচক মানসিক শক্তির ভূমিকা খুব বড়। আমি

সুস্থ আছি, এই ইতিবাচক চিন্তা বাড়িয়ে নিতে পারলে তা রোগ নিরাময়ে সহায়ক হয়।'

যয়নব যোবায়দা দাদীর খোঁজে সেখানে এসে দাঁড়িয়েছিল।

আহমদ মুসাকে কথা বলতে দেখে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল সে।

আহমদ মুসা থামলেই সে বলে উঠল, 'আপনি দেখছি স্যার মনো-চিকিৎসকও। কি নন স্যার আপনি?'

আহমদ মুসা উত্তরে কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার মোবাইল বেজে উঠল। থেমে গেল আহমদ মুসা।

মোবাইলটা বাম পাশে বেডের উপর ছিল। অভ্যাসবশত বাম হাতটা সেদিকে বাড়াতে গেল। ধাক্কা খেয়ে হাতটা থেমে গেল আহমদ মুসার।

যয়নব যোবায়দা ছুটে গেল। তার মাথার নাইলনের রুমাল কপালের উপর সরে গিয়েছিল। রুমালটি তাড়াতাড়ি কপালের উপর টেনে নিয়ে মোবাইল বিছানা থেকে তুলে আহমদ মুসার হাতে দিল।

'ধন্যবাদ।' বলে আহমদ মুসা মোবাইল মুখের কাছে তুলে নিল।

আহমদ মুসা 'হ্যালো' বলতেই ওপার থেকে গোয়েন্দা বিভাগের সহকারী প্রধান পুরসাত প্রজাদীপকের কণ্ঠ শুনতে পেল।

আহমদ মুসা মোবাইলের ভয়েস স্পীকার অন করে বলল, 'গুড ইভনিং স্যার।'

'গুড ইভনিং বিভেন বার্গম্যান। তোমাকে অভিনন্দন।'

'কেন স্যার?'

'তোমার ওখান থেকে মানে যয়নব যোবায়দার ওখান থেকে যে ১২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে তারা সবাই ব্ল্যাক ঈগলের বলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে প্রমাণিত হয়েছে। এদের মধ্যে একজন বিদেশী যার নাম বেঞ্জামিন বেকার। সে ইসরাইলেরই কোন এক স্থানের বাসিন্দা।'

'আলহামদুলিল্লাহ। এই সুখবরের জন্যে ধন্যবাদ স্যার।'

'আরও সুখবর আছে বিভেন বার্গম্যান। বিদেশী বেঞ্জামিন বেকারকে ওখানে প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসাবাদের পর কালকেই তাকে ব্যাংকক আনা হচ্ছে।

এছাড়া সুলতান গড়েড় শাহবাড়িতে সেদিন দুই ঘটনায় বিদেশীদের যে লাশ পাওয়া গেছে এবং ব্যাংককে প্রথম কিডন্যাপিংয়ের ঘটনায় যারা মরেছিল, তাদের মধ্যেকার বিদেশীদের লাশ সংরক্ষিত আছে, এসব লাশ ব্যাংককে এনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে এবং বেঞ্জামিন বেকারকেও এসব লাশ দেখানো হবে। ওদের জিজ্ঞাসাবাদ ও এসব পরীক্ষা থেকে তোমার 'তৃতীয় পক্ষ' তত্ত্বের বড় প্রমাণ পাওয়া যাবে।'

'ধন্যবাদ স্যার। আপনার শুভেচ্ছায় এটা সম্ভব হচ্ছে। স্যার, আমি শুধু দেখতে চাই জাবের জহীর উদ্দিন নির্দোষ, পাত্তানী মুসলমানরা নির্দোষ এবং এটা প্রমাণ হোক যে, তৃতীয় একটি পক্ষ মুসলমানদের উপর সন্ত্রাসের অভিযোগ চাপানোর পুরাতন প্রচেষ্টা নতুন করে শুরু করেছে।'

'আমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছ কেন বিভেন বার্গম্যান? আমরাই তো তোমাকে ধন্যবাদ দেব। আমরাই আমাদের দেশের এক গ্রুপ নাগরিককে ভুল বুঝেছিলাম, তাদের সন্ত্রাসী ধরে নিয়েছিলাম, তাদের জেল-জুলুমের শিকারে পরিণত করেছিলাম। তুমি এসে আমাদের সাহায্য করেছ। জান, আজ প্রধানমন্ত্রী এই ফাইল কল করেছিলেন। তিনি দেখেছেন ফাইল। তোমাকে নিয়েও আলোচনা করেছেন। তিনি তোমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।'

'ধন্যবাদ স্যার।'

'ধন্যবাদ বিভেন বার্গম্যান।'

মোবাইলের কল অফ করে পাশে রেখে দিল আহমদ মুসা।

দাদী এবং যয়নব যোবায়দা দু'জনেই টেলিফোনের আলোচনা শুনছিল। তাদের দু'জনেরই চোখ-মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

আহমদ মুসা মোবাইল রাখতেই দাদী এগিয়ে গেল আহমদ মুসার দিকে। হাত রাখল দাদী আহমদ মুসার মাথায়। বলল, 'তোমাকে দোয়া করার কোন ভাষা আমার নেই। আর আমার মত সামান্য কেউ তোমার জন্য কিইবা দোয়া করতে পারে! আমরা কৃতজ্ঞ ভাই। তুমি আমাদের জাতিকে, কম্যুনিটিকে বাঁচিয়েছ।' আবেগে রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল দাদীর কণ্ঠ।

ভারী হয়ে উঠেছিল যয়নব যোবায়দার কণ্ঠ। ভিজে উঠেছিল তার দু'চোখের কোণও। বলল, 'স্যার, জাবের ভাইয়ার উদ্ধারের জন্যে সরকার কি এবার চেষ্টা করবেন?' কান্না ভেজা কণ্ঠ যয়নব যোবায়দার।

আহমদ মুসা কিছু বলার আগেই বাহির থেকে ব্রাশ ফায়ারের শব্দ ভেসে এল।

শব্দ শুনেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল, 'দাদী আমার মনে হচ্ছে পুলিশবক্স আক্রান্ত হয়েছে। এটা প্রতিশোধ আক্রমণ অথবা আমাদের ধরার লক্ষে দ্বিতীয় আক্রমণ হতে পারে।'

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা বালিশের তলা থেকে হ্যান্ডমেশিনগান তুলে নিয়ে তাতে ম্যাগাজিন লাগাতে লাগাতে বলল, 'দাদী প্লিজ আপনারা উঠে যান।'

ডান হাতে বালিশ সরিয়ে বাম হাত দিয়ে হ্যান্ডমেশিনগান তুলে ধরেই তাতে ম্যাগাজিন পরিয়েছিল আহমদ মুসা। যেন বাম হাত খুবই স্বাভাবিক, একটু আহত নয়।

সবই দেখল দাদী ও যয়নব যোবায়দা। কিন্তু তাদের মুখে কোন কথা জোগাল না। বাইরে প্রচন্ড গোলাগুলী শুনে এবং বন্দুক নিয়ে অসুস্থ আহমদ মুসার বাইরে যাওয়া দেখে তারা পাথর হয়ে গিয়েছিল। তাই দোতলায় চলে যাবার জন্যে আহমদ মুসার যে আদেশ তা তারা ভুলে গিয়েছিল।

আহমদ মুসা দৌড়ে গিয়ে বাইরের দরজার ডোর ভিউতে চোখ রাখল।

বাইরে তাকিয়ে দেখল, বাড়ির বারান্দার নিচে কয়েকজন মানুষ তাদের দরজার দিকে হ্যান্ডমেশিনগান টার্গেট করে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকজন পুলিশবক্সকে টার্গেট করে গুলী ছুঁড়ছে। একজন পুলিশের লাশ পুলিশবক্সের সিঁড়ির উপর পড়ে আছে।

আহমদ মুসা বুঝল অবশিষ্ট দু'জন পুলিশ আকস্মিক আক্রান্ত হয়ে বক্সের ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। ওরা পুলিশকে পেছনে রেখে বাড়িতে ঢুকতে চাচ্ছে না হয়তো দুই কারণে। একটি হলো, পেছন থেকে আক্রান্ত হবার ভয়, দ্বিতীয়ত, তারা এখানকার খবর দিয়ে পুলিশ ডাকতে পারে।

কিন্তু পুলিশবক্সের নিচের অংশ বুলেটপ্রুফ বলে তারা চাচ্ছে উপরের অংশ ভেঙে পুলিশ দু'জনকে মারতে।

আহমদ মুসা দেখল পুলিশবক্সের উপরের অংশ ঝাঝরা হয়ে গেছে। এখন একটি ধাক্কা দিলেই উপরের অংশ ভেঙে পড়তে পারে। পুলিশকে কাবু করার পরই এদিকে আসবে।

ভাবল আহমদ মুসা, পুলিশকে ওরা কাবু করার আগেই তাকে যা করার করতে হবে। এ সময় তার ঘরের সামনের লোকরাও আক্রমণের জন্য টপমুডে নেই। এটাই তার জন্যে বড় সুযোগ।

আহমদ মুসা সোজা হয়ে দাঁড়াল। হ্যান্ডমেশিনগানের লোড একবার পরীক্ষা করল।

তারপর হ্যান্ডমেশিনগান ডান হাত দিয়ে ধরে বাঁ হাতে দরজা আনলক করল।

দরজার তালা খোলা হয়ে গেলে আহমদ মুসা ডান হাতে হ্যান্ডমেশিনগান বাগিয়ে ধরে তর্জনিটা ট্রিগারে রেখে বাম হাত দিয়ে নব ঘুরিয়ে এক ঝটকায় দরজা খুলে ফেলল। ডান হাতের তর্জনি হ্যান্ডমেশিনগানের ট্রিগারে চেপে ব্যারেল ঘুরিয়ে নিল ঘরের সামনে বারান্দার নিচে দাঁড়ানো পাঁচজন ব্ল্যাক ঈগলের উপর দিয়ে।

ঘটনা এত আকস্মিকভাবে ঘটল যে, কিছু বুঝে ওঠার আগেই তারা ব্রাশ ফায়ারের শিকার হলো।

এদিকে ব্রাশ ফায়ারের শব্দ শুনে পুলিশবক্স আক্রমণে যে চারজন নিয়োজিত ছিল, তারা ঘুরে দাঁড়িয়ে গুলী বর্ষণ শুরু করে দিল।

আহমদ মুসা দরজা বন্ধ করে ভেতরে চলে এসেছিল।

দরজায় এসে বিদ্ধ হতে লাগল ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী।

ঘরের এদিকে কোন জানালা নেই।

চারদিকে তাকাল আহমদ মুসা। ভেতরের দরজার পেছনে দেখতে পেল ফরহাদ ফরিদ উদ্দিন, যয়নব যোবায়দা এবং দাদীকে। উদ্বেগ-আতংকে মুষড়ে পড়েছে তারা সকলেই।

‘ভয় নেই দাদীমা, জয় আমাদের হবে ইনশাআল্লাহ।’

আহমদ মুসার চোখ পড়ল ষ্টিলবডির টিপয়ের উপর। দেখল টিপয়ের টপটা ষ্টিল শীটের।

আহমদ মুসা টিপয়টি বাঁ হাতে তুলে নিয়ে দরজার এ পাশে শুয়ে পড়ল। টিপয়টিকে মাথার সামনে নিয়ে এক ঝটকায় দরজা খুলে ফেলল এবং টিপয়ের প্রান্ত দিয়ে আগে বাড়ানো হ্যান্ডমেশিনগানের ব্যারেল দিয়ে ছুটল গুলীর বৃষ্টি।

ওরা এগিয়ে আসছিল আহমদ মুসার ব্রাশফায়ারে আহত অথবা নিহত তাদের সাথীদের দিকে। আহমদ মুসার গুলীর মুখে তারাও গুলী বর্ষণ শুরু করল। কিন্তু ওদের অসুবিধা ছিল ওদের সামনে আড়াল ছিল না। ওরা শুয়ে পড়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করল।

সুযোগ পেয়ে পুলিশ দু’জনও বেরিয়ে এসেছে তাদের বক্স থেকে। তাদের দু’জনের রিভলবারের গুলী ছুটল ওদের উদ্দেশ্যে। আহমদ মুসার গুলী ওদের মাথার উপর দিয়ে চলে গেলেও দু’জন পুলিশের টার্গেটেড গুলী ব্যর্থ হলো না।

আহমদ মুসা বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

ছুটে এল দু’জন পুলিশ। বলল, ‘স্যার আপনি আমাদের বাঁচিয়েছেন। আমাদের একজনকে ওরা মেরে ফেলেছে। আর একটু হলেই আমাদেরও মেরে ফেলত।’

আহমদ মুসা ওদের হাতে সাধারণ রিভলবার দেখে বলল, ‘তোমাদের হাতে সাধারণ রিভলবার কেন? তোমরা তো বাইরের অপারেশনে বা দায়িত্ব পালনে গেলে আধুনিক ষ্টেনগান ব্যবহার কর?’

‘একটা ভুল হয়েছে স্যার। এ্যামুনিশনসহ ষ্টেনগানের একটা ফোল্ডার আগেই গাড়িতে উঠেছিল এটা আমাদের বলা হয়। কিন্তু পুলিশবক্সে আসার পর গাড়িতে আমরা বাক্সটি পাইনি। কোন ভুলের ফলেই এটা হয়েছে। বিষয়টি আমরা তখনি এসপি সাহেবকে না পেয়ে ডিএসপিকে জানাই। এর ফলেই আমরা রিভলবার দিয়ে সন্ত্রাসীদের মেশিন রিভলবারের মোকাবিলা করতে পারিনি।’

ভ্রুকুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার।

পুলিশের একজন আবার বলে উঠল, ‘স্যার, এসপি সাহেব ডিএসপি মহিদলকে পাঠাচ্ছেন একদল পুলিশসহ। আমরা টেলিফোন করেছি।’

আহমদ মুসা কথা বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই পেছন থেকে কথা বলে উঠল ফরহাদ ফরিদ উদ্দিন, ‘স্যার দাদীমা ডাকছেন। আপনার আহত স্থান থেকে রক্ত বেরুচ্ছে। জামা ভিজে গেছে। আপনি আসুন।’

আহমদ মুসা পেছনে তাকিয়ে বলল, ‘আসছি।’

তারপর সামনে তাকিয়ে পুলিশ দু’জনকে বলল, ‘আমি ভেতর থেকে আসি। এর মধ্যে ডিএসপি সাহেব এসে পড়লে আমাকে ডেকো।’

আহমদ মুসা দরজা লক করে ভেতরে চলে গেল। ড্রইং রুমের পরের রুমে দাদী, যয়নব যোবায়দা এবং পরিচারিকারা অপেক্ষা করছিল।

আহমদ মুসার রক্তভেজা জামার দিকে তাকিয়ে দাদী বলল, ‘তুমি আমাদের জন্যে আর কত কষ্ট করবে ভাই! যে হাত দিয়ে তুমি চায়ের কাপ তুলতে পরো না, সেই হাত দিয়ে লড়াই করে আসলে।’

যয়নব যোবায়দারও চোখ ভরা অশ্রু। বলল, ‘আপনি বসুন স্যার। ডাক্তার খালাম্মা আসছেন।’

‘না ম্যাডাম যোবায়দা, আমি বসতে পারব না। ডিএসপি সাহেব আসছেন। এ সময় আমার ওখানে থাকা দরকার।’ বলল আহমদ মুসা।

‘কিন্তু স্যার, আপনি ভালো না থাকলে তো আমরাও ভালো থাকবো না।’ কান্নারুদ্ধ কণ্ঠ যয়নব যোবায়দার।

‘ভালো রাখার মালিক আল্লাহ বোন। মনে করুন, আমাদের ওহুদ যুদ্ধের কঠিন সময়ের কথা। রাসুল স. এর দাঁত ভেঙে গেছে, কপালে গভীর হয়ে বসে গেছে একটা লৌহ খন্ড। রক্তাক্ত মহানবী। তবু তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন এবং পলায়নপর শত্রু একত্রিত হয়ে আবার যাতে আক্রমণ করতে না পারে এজন্যে রক্তাক্ত, আহত, অবসন্ন সাথীদের নিয়ে শত্রুদের তাড়া করেছেন। আমরা তো তারই অনুসারী বোন।’

যয়নব যোবায়দার দু’গ- বেয়ে নামছে অশ্রুর দু’টি মোটা ধারা। দৃঢ় সংবদ্ধ দু’টি ঠোঁট তার কাঁপছে। একটা উচ্ছাস রোধ করছে সে।

আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়াল বাইরে যাবার জন্যে।

ফরহাদ ফরিদ উদ্দিন বলল, 'স্যার আমি আসি আপনার সাথে?' তার কণ্ঠ ভারী। তারও চোখে অশ্রু।

'এস।' বলল আহমদ মুসা।

'স্যার, ওকে আপনার মত লড়াই শেখান।' পেছন থেকে কান্না জড়িত ভাঙা গলায় বলল যয়নব যোবায়দা।

না দাঁড়িয়ে, পেছনে না তাকিয়েই আহমদ মুসা বলল, 'সেও লড়াই শিখেছে, শিখবে। কিন্তু সেটা অস্ত্রের লড়াই নয়, বুদ্ধির লড়াই। বুদ্ধির লড়াই অস্ত্রকে অচল করে দিতে পারে।'

আহমদ মুসা বাইরে এসে দেখল, পুলিশরা এসেছে। উর্ধ্বতন একজন পুলিশ অফিসারকেও দেখতে পেল সে। আহমদ মুসাকে দেখেই সে দ্রুত তার দিকে এগিয়ে এল।

আহমদ মুসা কয়েক ধাপ এগিয়ে বারান্দা থেকে নেমে গেল।

পুলিশ অফিসারটি তার সামনে এসেই বলল, 'স্যার আপনি নিশ্চয় বিভেন বার্গম্যান?'

আহমদ মুসার সাথে কথা বলার সময় পুলিশ অফিসারটির চেহারায় অসন্তুষ্টির ছায়া দেখে বিস্মিত হলো আহমদ মুসা।

'জি হ্যাঁ।' বলল আহমদ মুসা।

'আরেকটি পুলিশবক্স আমরা নিয়ে এসেছি। এবার ছয়জন পুলিশ পাহারায় থাকবে।'

'ধন্যবাদ মি. মহিদল।'

পুলিশ অফিসারটির চোখ পড়েছিল আহমদ মুসার হ্যান্ডমেশিনগানের দিকে। বলল, 'স্যার হ্যান্ডমেশিনগানটি কি সন্ত্রাসীদের?'

'না।'

'তাহলে এটা আপনার লাইসেন্সকৃত?'

'না। এটা ছিল আগের সন্ত্রাসীদের। এসপি উদয় থানি এটা আমার কাছে রেখেছেন প্রয়োজন হতে পারে বলে।'

আহমদ মুসা লক্ষ্য করল, পুলিশ অফিসারটির এ জিজ্ঞাসাবাদে সদিচ্ছার কোন সুর নেই।

আহমদ মুসা একটু থেমেই আবার বলল, 'মি. মহিদল অস্ত্রটা কি আপনি নিয়ে যেতে চান?'

'না, স্যার আমি তা পারি না। এসব অস্ত্র তো পাবলিকের কাছে থাকে না। তাই কৌতূহল বশতই প্রশ্ন করেছিলাম।' দ্রুত নিজেকে সহজ করে নিয়ে মহিদল বলল।

কথা শেষ করেই আবার সে বলে উঠল, 'চলি স্যার। আমার এ দিকের কাজ শেষ।'

বলেই ঘুরে দাঁড়িয়ে সে চলতে শুরু করল।

আহমদ মুসা বিস্মিত হলো, লোকটি তাকে একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত দিল না।

মনে তার নানা চিন্তা ঘুরপাক খেতে লাগল। সে ড্রইংরুম লক করে ধীরে ধীরে চলে এল ভেতরে। এসে বসল তার ঘরের সোফায়।

এর কিছুক্ষণ পরেই ডাক্তার খালাম্মাকে নিয়ে যয়নব যোবায়দা, দাদী এবং ফরহাদ এল।

'ওয়েলকাম ডাক্তার খালাম্মা। আসুন। আমি বসে আছি। যা করার করুন প্লিজ।' বলল আহমদ মুসা হেসেই। কিন্তু হাসিটা হাসির মত ছিল না।

'ধন্যবাদ বেটা। আমি বুঝতে পারছি তুমি খুব টায়ারড। তোমার শরীরের উপর খুবই অবিচার হচ্ছে বেটা।'

ডাক্তার খালাম্মা বলছিল আর আহমদ মুসার গায়ের রক্তমাখা জামা কাটছিল। ব্যান্ডেজ কেটে আহত স্থানের অবস্থা দেখে বলল, 'ইস, কি হয়েছে আহত জায়গাটার হাল! সেলাইগুলো কেটে গেছে। আবার সেলাই করতে হবে। তোমার কিন্তু খুব কষ্ট হবে বেটা।'

আহমদ মুসা তখন অন্য এক ভাবনার গভীরে নিমজ্জিত। ডাক্তার খালাম্মার কোন কথাই তার কানে যায়নি।

ডাক্তার খালাম্মা তাকাল যয়নব যোবায়দা, দাদীদের দিকে। তাদের চোখে-মুখে বিস্ময়। এ ঘরে আসা থেকেই তারা আহমদ মুসাকে গম্ভীর ও চিন্তান্বিত দেখছে। আহমদ মুসার এমন চেহারা তাদের কাছে অপরিচিত।

ডাক্তার খালাম্মা তার কাজে মনোযোগ দিল। কাঁচি দিয়ে কেটে ছেঁড়া সেলাই-এর কডগুলো তুলে ফেলতে লাগল।

'প্লিজ খালাম্মা' বলেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। সোফার ওপাশে পড়ে থাকা মোবাইল তুলে নিতেই তার মোবাইল বেজে উঠল।

কল অন করে মোবাইল স্ক্রীনে এসপি উদয় থানি'র নাম্বার দেখে ভীষণ খুশি হলো। শুভেচ্ছা জানিয়ে বলল, 'মি. উদয় থানি আপনার কাছেই আমি টেলিফোন করতে যাচ্ছিলাম।'

'জরুরী কিছু স্যার? আপনার কণ্ঠে আমি উত্তেজনা দেখছি। নিশ্চয় বড় কিছু হবে?' বলল উদয় থানি।

'মি. উদয় থানি, আমি মনে করছি ব্ল্যাক ঈগল তার লোকদের আজ রাতেই ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করবে।'

'তার মানে ওরা আমাদের পুলিশ হেডকোয়ার্টারে আক্রমণ করবে।'

'ব্ল্যাক ঈগলের চরিত্র আমি জানি। এই প্রথম ওদের কিছু লোক ধরা পড়েছে। তাদের উদ্ধার করতে দরকার হলে গোটা পুলিশ হেডকোয়ার্টার ওরা ধ্বংস করতে পারে। এমনকি যদি দেখে তাদের লোকদের উদ্ধার করা সম্ভব নয়, তাহলে তাদের লোকদেরসহ গোটা পুলিশ হেডকোয়ার্টার তারা উড়িয়ে দেবে।'

'এত বড় অনুমানের হেতু কি স্যার?'

'আমাদের এখানে ওদের সর্বাত্মক আক্রমণ ছিল সুপরিকল্পিত। অথচ নিজেদের রক্ষার জন্যে পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তির আগে ওদের উদ্ধারটাই বেশি প্রয়োজন। সুতরাং আমি মনে করছি আমাদের এখানে ওদের সর্বাত্মক আক্রমণই ওখানে আক্রমণ হওয়ার প্রমাণ।'

'আপনাদের অনুমান যুক্তিসংগত স্যার। আমি গ্রহণ করছি। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা কৃতজ্ঞ স্যার। আপনার ওখানে সন্ত্রাসীদের হামলা থেকে দু'জন পুলিশ রক্ষা পেয়েছে এবং ওদের হামলা ব্যর্থ হয়েছে আপনার জন্যেই।

আপনার ওখানে সন্ত্রাসীরা যে জবাব পেয়েছে, এখানে সে জবাবই তারা পাবে।' বলল উদয় থানি।

'আরেকটা বিষয় মি. উদয় থানি। এটা ভুল অনুমান হতে পারে। তবে আজকের ঘটনায় বিভিন্ন কার্যকরণ থেকে আমি মনে করছি, সন্ত্রাসীদের সাথে আপনাদের পাত্তানী পুলিশের কেউ বা কোন গ্রুপের যোগসাজশ আছে।' আহমদ মুসা বলল।

সংগে সংগেই জবাব এল না ওপার থেকে। একটুক্ষণ পরেই এসপি উদয় থানির বিস্মিত কণ্ঠ ভেসে এল, 'মি. বিভেন বার্গম্যান আপনি এ কথা বলছেন?'

'বলছি এ কারণেই যে এই যোগসাজশ আছে বলেই আমি পুলিশ হেডকোয়ার্টারে সন্ত্রাসীদের হামলার আরও বেশি আশংকা করছি মি. উদয় থানি। আমাদের এখানকার ঘটনায় এই যোগসাজশের কিছু আলামত পাওয়া গেছে বলে আমি মনে করি।' আহমদ মুসা বলল।

'আপনাদের কথা স্যার আমি অবিশ্বাস করি না। কিন্তু আলামতগুলো জানতে চাই স্যার।' বলল পাত্তানী শহরের এসপি উদয় থানি।

'আজ এখানে সন্ত্রাসীদের আক্রমণের মুখে একজন পুলিশ হত্যা ও পুলিশের বিপর্যয়ের বড় কারণ হলো এখানে ডিউটিরত তিনজন পুলিশের হাতে তাদের জন্যে নির্ধারিত সাবমেশিনগান ছিল না। হ্যান্ডমেশিনগানের আক্রমণের মুখে তাদের রিভলবার কোনই কাজ করেনি। দ্বিতীয়ত.........।'

আহমদ মুসাকে বাধা দিয়ে উদয় থানি বলল, 'স্যরি স্যার। অবাক করার মত কথা আপনি বললেন। বিষয়টা কি পুলিশ আপনাকে বলেছে? কি বলেছে?'

'তাদের বলা হয় তিনটি ষ্টেনগান ও এ্যামুনিশনস একটা ফোল্ডারে বা বাক্সে আগেই গাড়িতে উঠেছে। কিন্তু আমাদের এখানে এসে পুলিশ ফোল্ডার পেয়েছে, অথচ তার মধ্যে কিছুই ছিল না। তারা বিষয়টা আপনাকে না পেয়ে ডিএসপিকে জানায়।'

'ষ্ট্রেঞ্জ, এমনটা কিভাবে ঘটতে পারে! ডিএসপি সাহেব আমাকে কিছু বলেননি। কোন ত্বরিত ব্যবস্থাও নেননি। এটাও আমার বিশ্বাস করতে পারছি না।

স্যার, এ ব্যাপারে আপনি বোধ হয় আরও কিছু বলতে চান! দয়া করে বলুন স্যার।'

'কিছু মনে করবেন না মি. উদয় থানি। আমি এখন যা বলব সেটা আমার একটা ইমপ্রেশন। আমার মনে হয়েছে ডিএসপি মি. মহিদল সন্ত্রাসীদের ব্যর্থতায় খুশি হননি এবং সন্ত্রাসীদের হত্যায় আমার ভূমিকা ভালো চোখে দেখেননি। তিনি সামান্য একটি ধন্যবাদও আমাকে দেননি। বরং হ্যান্ডমেশিনগানটা আমার হাতে কেন, এর লাইসেন্স আছে কিনা, এসব প্রশ্নও তিনি তুলেছেন।'

'আপনি ইমপ্রেশনটা ঠিকই নিয়েছেন। আমি শুধু বিস্মিত নই, উদ্বেগও বোধ করছি। সাবমেশিনগান কেন গেল না, আমি এখনি দেখছি।'

'মি. উদয় থানি। আমার একটা অনুরোধ- দয়া করে মি. মহিদল যে ছয়জন পুলিশকে রেখে গিয়েছে তাদের পরিবর্তন করে অন্য ৬ জন দিন।'

'বুঝেছি স্যার। আপনি ঠিক বলেছেন? এখনি ছয় জন পুলিশ যাচ্ছে, আর ওরা ফেরত আসবে। স্যার আমাকে কোন পরামর্শ দেবেন।'

'মি. উদয় থানি। আপনি অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার। আপনি সব জানেন কি করতে হবে আপনাকে।' হাসি মুখে বলল আহমদ মুসা।

'ধন্যবাদ স্যার। আপনি অনেক পুলিশের জীবন বাঁচাবার, অনেক ক্ষতি এড়ানোর এবং ব্ল্যাক ঈগলের লোকদের ধরে রাখার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সন্ত্রাসীদের মোকাবিলায় পুলিশ হেডকোয়ার্টার রক্ষার দায়িত্ব আমি তো মহিদলকেই দিতে যাচ্ছিলাম। রক্ষা করলেন আপনি। আমি এখনি ওকে ডিউটি থেকে অফ করে দিচ্ছি। আর.......।'

হঠাৎ এই সময় টেলিফোনে একটা গুলীর শব্দ ভেসে এল। একটা 'আঃ' আর্তনাদ ভেসে এল। গলাটি উদয় থানির বুঝল আহমদ মুসা। তারপরই একটি শব্দ। মোবাইল পড়ে যাবার শব্দ। তার সঙ্গে সঙ্গেই আবার গুলীর শব্দ ভেসে এল। এর পরেই আবার দু'টি গুলীর শব্দ পেল টেলিফোনে।

তারপর সব চুপচাপ। কথা ও চেঁচামেচি ভেসে আসছে। কিন্তু কিছুই বুঝা যাচ্ছে না।

‘মি. উদয় থানি’, ‘মি. উদয় থানি’ বলে ডাকতে লাগল আহমদ মুসা, কিন্তু কোন উত্তর পেল না।

উদ্বেগ দেখা দিল আহমদ মুসার মনে। সন্ত্রাসীরা কি পুলিশ হেডকোয়ার্টার আক্রমণ করেছে? কিন্তু সবগুলোই তো রিভলবারের গুলীর শব্দ। ওদের মরিয়া আক্রমণ হেভি অস্ত্র দিয়ে হবার কথা, রিভলবার দিয়ে নয়।

মোবাইল বন্ধ করল আহমদ মুসা।

‘কি ঘটনা স্যার?’ বলল ফরহাদ ফরিদ উদ্দিন। তার কণ্ঠে উদ্বেগ।

যয়নব যোবায়দা, ডাক্তার খালাম্মা এবং দাদী সবারই চোখে-মুখে উদ্বেগ।

‘কি ঘটেছে আমি জানি না, কিন্তু বড় কিছু ঘটেছে। এসপি উদয় থানি গুলীবিদ্ধ হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে।’ বলল আহমদ মুসা। তার কণ্ঠে গভীর উদ্বেগ।

‘একজন পুলিশ অফিসারের যে ষড়যন্ত্র এবং পুলিশ হেডকোয়ার্টারে সন্ত্রাসীদের হামলার যে কথা আপনি টেলিফোনে বললেন, সেটাই ঘটল কিনা?’ বলল যয়নব যোবায়দা।

‘ঘটতে পারে, কিন্তু কি ঘটেছে বুঝতে পারছি না। তবে আমার মনে হচ্ছে গুলী বিনিময়টা পুলিশের মধ্যে হয়েছে।

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা ফরহাদ ফরিদ উদ্দিনের দিকে চেয়ে বলল, ‘তুমি বাইরে পুলিশদের কাছে বসে থাক। তাদের কাছে কোন খবর আসে কিনা দেখ।’

ফরহাদ ফরিদ উদ্দিনকে এ নির্দেশ দেয়ার পর ডাক্তার খালাম্মার দিকে চেয়ে বলল, ‘খালাম্মা আপনার কাজটা দয়া করে তাড়াতাড়ি সেরে ফেলুন। এসপি উদয় থানি যদি নিহত হয়ে থাকেন, তাহলে কোন বিপদ আমাদের উপর আসতে পারে।’

‘আমরা তো বিপদের মধ্যেই আছি। নিশ্চয় কোন বড় বিপদের কথা বলছেন?’ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল যয়নব যোবায়দা।

ডাক্তার খালাম্মা পুরানো আহত স্থানটা ড্রেসিং-এর কাজ শুরু করে দিল।

আহমদ মুসা তখন ড্রেসিং এর জন্যে স্থির হয়ে বসেছে। ঐ অবস্থায় বলল যয়নব যোবায়দার কথার উত্তরে, 'আমি একটা আশংকা করছি, কিন্তু তার আগে যদি বিপদ আসে?'

'বেটা এ সময় কথা না বললে আমার কাজটা সুন্দর হবে।' বলল ডাক্তার খালাম্মা।

'তুমি কাজ কর ডাক্তার মা। আর কেউ কথা বলবে না।' বলল দাদী।

'আমি দুঃখিত' বলে যয়নব যোবায়দা দাদীর পাশে গিয়ে বসল।

ড্রেসিং শেষ করে ডাক্তার হাত পরিষ্কার করে এসে সোফায় বসে বলল, 'বেটা বিভেন বার্গম্যান। তোমার নাম খৃষ্টান হলেও তুমি খৃষ্টান নও। যারা হারাম খায়, তাদের গা একটা বিজাতীয় গন্ধ ছড়ায়। অমুসলিম কলিগদের সাথে আমি কাজ করি বলে আমি এটা জানি। তুমি খৃষ্টান নও অবশ্যই। তোমার কথা-বার্তার ষ্টাইলেও এটা বুঝা গেছে। তুমি তাহলে কি? কে তুমি। আমার পুরানো প্রশ্ন এটা।'

ডাক্তার খালাম্মার কথা শেষ হতেই ঘরে ঢুকল ফরহাদ ফরিদ উদ্দিন। তার মুখে কিছুটা উত্তেজনা। আহমদ মুসার দৃষ্টি ফিরে গেছে তার দিকে। বলল, 'ফরহাদ, মনে হচ্ছে কিছু খবর আছে?'

'স্যার আগের ছয়জন পুলিশ চলে গেছে। নতুন ছয়জন পুলিশ এসেছে।' বলল ফরহাদ ফরিদ উদ্দিন।

'আলহামদুলিল্লাহ, এসপি উদয় থানি তাহলে বেঁচে আছেন।'

একটু থেমেই ফরহাদ ফরিদ উদ্দিনের দিকে তাকিয়ে আহমদ মুসা বলল, 'পুলিশরা কিছু বলেনি? বলাবলি করেনি?'

'নতুনরা নেমেই আগের পুলিশদের বলেছে, অফিসে একটু গোলমাল আছে, তোমরা তাড়াতাড়ি যাও। আমি তাদের জিজ্ঞেস করেছিলাম, কি গোলমাল? প্রশ্নের উত্তর তারা এড়িয়ে গেছে।' ফরহাদ ফরিদ উদ্দিন বলল।

আহমদ মুসা যয়নব যোবায়দাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'আমি যে বিপদের কথা বলেছিলাম, সে বিপদ কেটে গেছে। যে ছয়জন পুলিশ এতক্ষণ পর্যন্ত এখানে ছিল, তাদের প্রতি আমার আস্থা ছিল না। তাই এদের তুলে নিয়ে নতুন পুলিশ দিতে বলেছিলাম উদয় থানিকে। তিনি সেটা করেছেন।'

‘কেন তুমি সন্দেহ করেছিলে এই পুলিশ ছয়জনকে?’ বলল দাদীমা।

আহমদ মুসা পাত্তানী শহরের ডিএসপি মহিদলের সাথে সন্ত্রাসীদের সম্পর্কের বিষয় সামনে এনে বলল, ‘আগের ছয়জনকে মহিদল নিয়ে এসেছিল। সুতরাং তাদেরকে আমি বিশ্বস্ত মনে করিনি দাদীমা।’

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা বলল, ‘আমি মি. উদয় থানিকে আর একবার দেখি। ওখানে কি ঘটল জানতে পারলাম না।’

আহমদ মুসা আবার টেলিফোন করল এসপি উদয় থানিকে। মোবাইলে রিং হলো কিন্তু কেউ সাড়া দিল না।

আহমদ মুসা ভাবল ঘটনা এই হতে পারে যে, তাঁর হাত থেকে মোবাইল পড়ে যাবার পর সেটা আর তোলা হয়নি এবং উদয় থানি সেই ঘরে এখন নেই।

আহমদ মুসা স্বগত কণ্ঠে বলল, ‘আল্লাহ ভরসা।’

বলেই আহমদ মুসা তাকাল ফরহাদ ফরিদ উদ্দিনের দিকে। বলল, ‘পুলিশ থাকলেও আমাদের সতর্ক থাকা দরকার। পুলিশ হেডকোয়ার্টারে ওদের সম্ভাব্য আক্রমণ সফল হলে,ওরা এখানেও হামলা চালাতে পারে। এখন রাত ৮টা। রাত ২টা পর্যন্ত তুমি পাহারা দেবে। রাত ২টায় আমাকে জাগিয়ে দেবে। পরের দায়িত্ব আমার।’

‘অবশ্যই পারব স্যার।’ বলল ফরহাদ ফরিদ উদ্দিন।

‘কিন্তু উনি গুলী চালাতে জানেন না। পাহারা দেবেন কিভাবে?’ টিপ্পনি কাটার সুরে বলল যয়নব যোবায়দা।

মুখ লাল হয়ে উঠেছে ফরহাদ ফরিদ উদ্দিনের। বিব্রত কণ্ঠে কিছু বলতে যাচ্ছিল। আহমদ মুসা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, ‘বন্দুক চালনা ভালো জিনিস নয়। ফেৎনা-ফাসাদের আগ্রাসন মোকাবিলার অপরিহার্য কাজেই শুধু এই খারাপ কাজকে বৈধ করা হয়েছে। সবাইকে সব সময় এ কাজের জন্যে প্রয়োজন হয় না, হলে ফরহাদ ফরিদ উদ্দিন কারো পেছনে থাকবে না। আপাতত তার দায়িত্ব আমাকে প্রয়োজন অনুসারে ও ঠিক সময়ে জাগিয়ে দেয়া।’

মিষ্টি হাসি ফুটে উঠেছে যয়নব যোবায়দার ঠোঁটে।

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই দাদী বলল, 'খাবার দেয়া হয়েছে। এখন উঠ, সবাইকে খেতে হবে।'

'বিকেলে আমার নাস্তা একটু বড় হয়েছে। আমি এখন খাব না। দু'টায় উঠে কিছু খেয়ে নেব। চল ফরহাদ এশার নামায পড়ে নিই। তারপর আমি ঘুমাব, তুমি জাগবে।'

বলে উঠতে যাচ্ছিল আহমদ মুসা।

ডাক্তার খালাম্মা বলে উঠল, 'উঠ না, বিভেন বার্গম্যান। তোমার পরিচয় আমার কাছে কিছুটা পরিষ্কার হয়েছে। তুমি এর মধ্যে একবার 'আলহামদুলিল্লাহ', আরেকবার 'আল্লাহ ভরসা' বলেছ। তার মানে তুমি খৃষ্টান নও। তাহলে তোমার নাম বিভেন বার্গম্যান কেন? বলতে হবে কে তুমি? তোমার এই ছদ্মবেশ কেন?' ডাক্তার খালাম্মার নাছোড়বান্দা কণ্ঠ।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'খালাম্মা, আমার যে পরিচয় পেয়েছেন সেটা সত্য। আমার বাকি পরিচয় আপনি ম্যাডাম যয়নব যোবায়দার কাছ থেকে জানতে পারবেন। আমার ছদ্মবেশ বিপক্ষকে বিভ্রান্ত এবং কাজের সুবিধার জন্যে খালাম্মা।' গম্ভীর কণ্ঠ আহমদ মুসার।

আহমদ মুসার গম্ভীর, প্রশান্ত মুখের দিকে একবার তাকিয়ে ডাক্তার খালাম্মা বলল, 'ঠিক আছে বেটা।'

যয়নব যোবায়দা উঠে দাঁড়িয়েছিল। বলল ডাক্তার খালাম্মাকে, 'আসুন খালাম্মা। খেতে খেতে সব বলা যাবে।'

পরে আহমদ মুসাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'বোনকে 'ম্যাডাম' বলা কি ভালো দেখায়?'

'আপনিও আমাকে 'স্যার' বলেন।' বলল আহমদ মুসা।

যয়নব যোবায়দার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'আর বলব না ভাই সাহেব।'

যয়নব যোবায়দা পা বাড়াল ডাইনিং রুমের দিকে যাবার জন্যে।

আহমদ মুসারা এগুলো জায়নামাযের দিকে।

রাত তখন সাড়ে তিনটা। ব্ল্যাক ঈগলের পাত্তানী সিটির আইজ্যাক জ্যাকব এবং ব্ল্যাক ঈগলের থাই অপারেশন প্রধান শিমন আশের একটা ছোট ঝাউ গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে নাইটভিশন দূরবীন চোখে লাগিয়ে পাত্তানী পুলিশ হেডকোয়ার্টার এবং তার আশপাশ পর্যবেক্ষণ করছে।

পাত্তানী পুলিশ হেডকোয়ার্টার একটা উচ্চভূমির উপর। উচ্চভূমি গোটাটাই ফলজ গাছের বাগান। উচ্চভূমির মাঝখানে গড়ে তোলা হয়েছে লাল ইটের তৈরি পুলিশ হেডকোয়ার্টারটি। হেডকোয়ার্টারের চারদিক ঘিরে বাগান। এই বাগানেরই এখানে-সেখানে পুলিশদের রেসিডেন্সিয়াল বস্নক।

পুলিশ হেডকোয়ার্টার তিন তলা। কিন্তু মাটির নিচে রয়েছে আরও দু'টি আন্ডার গ্রাউন্ড ফ্লোর। এই ফ্লোরগুলোতে রাখা হয় ভয়ংকর সব ক্রিমিনালদের।

বাগানের ভেতর ছোট একটা ঝাউয়ের আড়াল থেকে আইজ্যাক জ্যাকব ও শিমন আশেরের নাইটভিশন দূরবীন এই পুলিশ হেডকোয়ার্টারকেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। তাদের উদ্দেশ্য পাহারায় থাকা পুলিশদের দেখা। তাদের নাইটভিশন দূরবীনের দৃষ্টিতে পুলিশ হেডকোয়ার্টারের ফ্রন্ট ভিউ নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে। কিন্তু একজন পুলিশকেও কোথাও পাহারায় দেখছে না।

স্বস্তির হাসি ফুটে উঠল আইজ্যাক জ্যাকব এবং শিমন আশের দু'জনের মুখেই। আইজ্যাক জ্যাকব বলল, 'মি. আশের স্যার, মনে হচ্ছে আমাদের ডিএসপি মহিদল পরিকল্পনা মাফিক কাজ করতে পেরেছে।'

'তাহলে তো কাজ শুরু করা দরকার। পুলিশ হেডকোয়ার্টারের ডিউটিরত ও পাহারায় থাকা পুলিশদের সংজ্ঞাহীন করার জন্য যে বিশেষ ক্লোরোফরম গ্যাস তাকে দেয়া হয়েছে, তার মেয়াদ দু'ঘণ্টা। এক ঘণ্টা পর সবাই সংজ্ঞা ফিরে পাবে। আমাদের কিন্তু ১৫ মিনিট সময়ের মধ্যে সব কাজ শেষ করে ফিরতে হবে।' বলল শিমন আশের।

'ঠিক। তা না হলে বাধা পাওয়ার ঝুঁকির মধ্যে পড়তে হবে। পুলিশ হেডকোয়ার্টারে কেউ এলে কিংবা টেলিফোন করে অব্যাহতভাবে নো রিপ্লাই

পেলে বিষয়টা ধরা পড়ে যেতে পারে।' বলে আইজ্যাক জ্যাকব হাতঘড়ির রেডিয়াম ডায়ালের দিকে তাকাল। সময় ৩টা বেজে ৩২ মিনিট। ঠিক তিনটা ৩০ মিনিটে সে ক্লোরোফরম গ্যাস ছেড়েছে। সুতরাং দুই মিনিট চলে গেছে অপারেশন শুরু হবার পর।

'চলুন তাহলে অগ্রসর হওয়া যাক। আমি সংকেত দিচ্ছি সবাই আমাদের ফলো করবে।' বলল শিমন আশের।

'না স্যার, সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হয়ে এভাবে অগ্রসর হওয়া যাবে না। আমি দেখে আসি।' বলে ছুটল আইজ্যাক জ্যাকব পুলিশ হেডকোয়ার্টারের দিকে।

গেটে পৌছেই সে দেখল গেটের দু'পাশের দুই গেট বক্সে চারজন পুলিশের দেহ সংজ্ঞাহীনভাবে কোনটা টেবিলে, কোনটা মেঝেতে পড়ে আছে। ভেতরে ঢুকে ডিউটি রুম পর্যন্ত একই দৃশ্য দেখল আইজ্যাক জ্যাকব। বিভিন্ন স্থান মিলে প্রায় তিরিশজন পুলিশকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় সে দেখতে পেল। ডিউটি রুমে ডিএসপি মহিদলকেও সংজ্ঞাহীন অবস্থায় দেখে সে ভীষণ খুশি হয়েছে। এটাই পরিকল্পনা ছিল যে, ডিএসপি মহিদল নিজেও সংজ্ঞাহীন হবে, যাতে সে সকল সন্দেহের উর্ধে থাকে।

ডিউটি রুম থেকে বেরুবার সময় আইজ্যাক জ্যাকব টেবিলের উপর ঢলে পড়ে থাকা পুলিশের দেহ তুলে ধরে একটা ঝাকুনি দিল ক্লোরোফরমের এ্যাকশন দেখার জন্যে।

ঝাঁকুনি দিয়ে ছেড়ে দিতেই গড়িয়ে দেহটি মেঝেয় পড়ে গেল।

হাসি মুখে ছুটে পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এল আইজ্যাক জ্যাকব।

পৌছে খবর দিল আশেরকে, 'স্যার মাঠ একদম পরিষ্কার। ৩০ জন পুলিশকে সংজ্ঞাহীন পড়ে থাকতে দেখে এলাম। ডিএসপি মহিদলকেও। চলুন যাওয়া যাক।'

'যাব। শোন আইজ্যাক জ্যাকব, তুমি তো জান, মহিদল যা বলেছে। তিন তলার রেড সিকিউরিটি রুমে লিফট আছে ভূগর্ভস্থ কক্ষে নামার। ভূগর্ভের গ্রাউন্ড ফ্লোরে আমাদের লোকদের রাখা হয়েছে। তুমি দশ বারো জনকে নিয়ে যাবে

তাদের উদ্ধারের জন্য। আমি অবশিষ্টদের নিয়ে নিচে পাহারায় থাকব। যাওয়া ও আসার মধ্যে দশ মিনিটের বেশি সময় তুমি পাবে না মনে রেখ।' বলল শিমন আশের।

'দশ মিনিট যথেষ্ট স্যার। চলুন।' আইজ্যাক জ্যাকব বলল।

সবাই পৌছল পুলিশ হেডকোয়ার্টারে।

পরিকল্পনা মোতাবেক আইজ্যাক জ্যাকব ১২ জনকে নিয়ে তিন তলার রেড সিকিউরিটি রুমের দিকে ছুটল সিঁড়ি দিয়ে। দুই তলা শূন্য দেখল। চার তলাও তাই। তবে রেড সিকিউরিটি রুমে ঢুকে দেখল চারজন পুলিশ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে আছে। খুশি হলো আইজ্যাক জ্যাকব। একজনের পাঁজরে লাথি মেরে বলল, 'হারামজাদারা, আমাদের লোকদের আটকে রেখেছিল?' লিফটের সুইচ অন করল আইজ্যাক জ্যাকব। লিফটের দরজা খুলে গেল।

লিফটে উঠল ওরা বার জন।

লিফট গিয়ে পৌছল ভূগর্ভস্থ দুই ফ্লোরের গ্রাউন্ড ফ্লোরে।

লিফটের দরজা খুলে গেল। সামনেই বিরাট হল ঘর।

হল ঘরে বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে তাদের ১২ জন লোক।

আইজ্যাক জ্যাকবদের দেখে ওরা আনন্দে চিৎকার করে উঠল।

দ্রুত ওদের বাঁধন খুলে দেয়া হলো।

আনন্দে একে অপরকে ওরা জড়িয়ে ধরল। কুশল বিনিময় শুরু হয়ে গেল।

আইজ্যাক জ্যাকব চিৎকার করে বলল, 'এখন এসব রাখ। আগে বের হও পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে।'

বলেই আইজ্যাক লিফটের বন্ধ দরজার দিকে চলল।

চাপল লিফটের উপরে উঠার সুইচ।

সবাই ছুটে আসতে লাগল লিফটের দিকে।

লিফটের দরজা খুলল না ।

সুইচের দিকে তাকাল আইজ্যাক জ্যাকব। দেখল সুইচে আলো জ্বলছে না। চমকে উঠল আইজ্যাক জ্যাকব। আবার সুইচ টিপল। না সুইচে আলো জ্বলছে

না। চমকে উঠল আইজ্যাক জ্যাকব। আবার সুইচ টিপল। না সুইচে আলো জ্বলছে না।

'তাহলে কি বিদ্যুৎ চলে গেছে?' স্বগত কণ্ঠেই যেন বলে উঠল আইজ্যাক জ্যাকব।

আইজ্যাক জ্যাকবের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল আগে বন্দী হয়ে আসা ১২ জনের একজন অ্যারন আজিজ।

অ্যারন আজিজ লেবানন বংশোদ্ভুত একজন ইহুদী। তার বর্তমান বসবাস থাইল্যান্ডে।

অ্যারন আজিজ বলল, 'স্যার বিদ্যুৎ যায়নি। দেখুন এই ঘরে তো বিদ্যুৎ আছে।'

'ঠিক তো বিদ্যুৎ যায়নি! তাহলে সুইচে বিদ্যুৎ নেই কেন?' তার চোখে-মুখে উদ্বেগ।

কথা শেষ করেই আবার বলে উঠল, 'শুধু লিফটের বিদ্যুৎ তো এভাবে যায় না! কেউ কি লিফটের বিদ্যুৎ লাইন কেটে দিল?' আর্তনাদের মত শোনার আইজ্যাক জ্যাকবের কথা।

সে পাগলের মত লিফটের সুইচ টিপতে লাগল। লাথি লাগাল লিফটের দরজায়।

আইজ্যাক জ্যাকবের লাথিতে লিফটের দরজায় সামান্য শব্দও হলো না।

অ্যারন আজিজ বলল, 'স্যার লিফট এবং সিঁড়ি মুখের দরজা কয়েক ইঞ্চি পুরু ষ্টিলের। আমরা অনেক লাথি-টাথি মেরে দেখেছি। মনে হয় বোমাতেও দরজার কিছু হবে না।

আইজ্যাক জ্যাকব মোবাইল বের করল শিমন আশেরকে টেলিফোন করার জন্যে। কিন্তু দেখল মোবাইলে নেটওয়ার্ক নেই।

'আমাদেরকে ওরা ট্রাপে ফেলেছে' বলে চিৎকার করে উঠে আইজ্যাক জ্যাকব তার মেশিনগানের সব গুলী উজাড় করল লিফটের দরজার উপর।

লিফটের দরজায় লাগা সবগুলো গুলী ঝরে পড়ল মেঝেতে। দরজায় সামান্য দাগও পড়ল না। তার মানে দরজাগুলো বুলেট প্রুফ।

ক্রোধে, ক্ষোভে, উদ্বেগে পাগলের মত হয়ে ওঠে আইজ্যাক জ্যাকব। উন্মত্তের মত লাথি দিতে লাগল লিফটের দরজার উপর।

ওদিকে শিমন আশের আইজ্যাক জ্যাকবকে তাদের লোকদের উদ্ধারের জন্যে পাঠিয়ে দিয়েই পুলিশ হেডকোয়ার্টার ভেতরে বিভিন্ন স্থানে পজিশন নেয়। পজিশন নিয়েই নির্দেশ দেয় সংজ্ঞাহীনদের পাশে পড়ে থাকা ষ্টেনগান ও রিভলবার নিয়ে তার সামনে এক জায়গা জমা করতে।

সে নিজে পজিশন নিয়েছিল দুই গেট বক্সের মাঝখানে।

অস্ত্রগুলো এক জায়গায় স্তুপ করার পর সবাই রিলাঙ মুডে গল্প-গুজব শুরু করল।

ঠিক এই সময় তিন তলায় গুলীর একটি শব্দ হলো।

শিমন আশের চমকে উঠে দাঁড়াল।

সাথে সাথে ব্ল্যাক ঈগলের যে যেখানে ছিল অস্ত্র নিয়ে উঠে দাঁড়াল। তাদের সবার দৃষ্টি তিন তলার দিকে।

অন্যদিকে গুলীর শব্দের সংগে সংগে সংজ্ঞাহীন পুলিশের সবাই গড়িয়ে গড়িয়ে বিভিন্ন দিকে সরে গেল এবং লুকানো অস্ত্র নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। তারা প্রত্যেকেই যার যার নিকটবর্তী ব্ল্যাক ঈগলের লোককে টার্গেট করল।

দুই গেট বক্সের চার সংজ্ঞাহীন পুলিশ বেরিয়ে এসেছে নিঃশব্দে। তাদের হাতেও গোপন স্থান থেকে বের করে নিয়ে আসা চার ষ্টেনগান।

গুলীর শব্দের পর থেকে তাদের বেরিয়ে আসার মধ্যে ১৫ সেকেন্ড সময়ও লাগেনি।

তারা দু'দিক থেকে যখন শিমন আশেরের পেছনে এসে দাঁড়াল, তখনও তার উদগ্রীব দৃষ্টি তিন তলার দিকে। তার হ্যান্ডমেশিনগান বেল্টে ঝুলছে এবং তার রিভলবার হাতে ঝুলছে।

চারজনের একজন গিয়ে তার ষ্টেনগানের বাঁট দিয়ে শিমন আশেরের রিভলবার ধরা হাতে আঘাত করল।

রিভলবার পড়ে গেল তার হাত থেকে।

চমকে উঠে চরকির মত ঘুরে দাড়াল শিমন আশের। তার একটা হাত চলে গিয়েছিল তার হ্যান্ডমেশিনগানের বাঁটে।

ষ্টেনগান দিয়ে যে পুলিশ শিমন আশেরের হাতে আঘাত করেছিল, তার ষ্টেনগান উঠে গিয়েছিল শিমন আশেরের বুক বরাবর। সে উঠে দাঁড়াবার সংগে সংগেই বলল, 'লাভ হবে না অস্ত্রে হাত দিয়ে তোমার সামনে চারটা ষ্টেনগান। একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে তুমি।'

শিমন আশেরের হাত সরে এল হ্যান্ডমেশিনগানের বাঁট থেকে।

চার পুলিশের একজন দ্রুত গিয়ে শিমন আশেরের দুই হাত পেছনে টেনে নিয়ে হাতকড়া পরিয়ে দিল।

শিমন আশের ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল, 'তোমরা চারজন। কিন্তু আমার তিন ডজন লোক তোমাদের হেডকোয়ার্টার দখল করে আছে। এখনি এসে পড়বে তারা।'

একজন পুলিশ শিমন আশেরকে ঘুরিয়ে দিল যাতে পুলিশ হেডকোয়ার্টারের ভেতরটা দেখতে পায়।

ভেতরে চোখ পড়তেই আঁৎকে উঠল শিমন আশের। দেখল, ব্ল্যাক ঈগলের প্রত্যেকের পেছনে একজন করে পুলিশ। সবারহ হাতেই হ্যান্ডকাফ।

বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ অবস্থা শিমন আশেরের। তাহলে পুলিশের সংজ্ঞাহীন হওয়ার ব্যাপারটা কি ভুয়া?'

এক পুলিশ বলল, 'আশা করবেন না যে, আপনাদের যারা বন্দী ব্ল্যাক ঈগলদের উদ্ধার করতে গেছে, তারা আপনাদের উদ্ধার করতে আসছে। উদ্ধার করতে গিয়ে ওরা নিজেরাই এখন সাথীদের সাথে খাঁচা-বন্দী হয়েছে।'

বিস্ময়-উদ্বেগে মুখ চুপসে গেল শিমন আশেরের। বলল, 'ডিএসপি মহিদলের সংজ্ঞা হারানোও কি নাটক?'

'না তারটাই আসল। তার সাথে আপনাদের যোগসাজশের শুধু ঐটুকুই বাস্তবায়িত হয়েছে। তাকে সংজ্ঞালোপ করে ফেলে রাখা হয়েছিল আপনাদের বিশ্বাস অর্জনের জন্যে।' বলল একজন পুলিশ।

এ সময় দোতলা থেকে এসপি উদয় থানির কণ্ঠ শোনা গেল। নির্দেশ দিল সে, 'বন্দী সবাইকে ব্ল্যাক চেম্বারে নিয়ে এস।'

পুলিশ হেডকোয়ার্টারের 'ব্ল্যাক চেম্বার' হলো একটা ট্রানজিট কক্ষ। মাত্র এক দরজার জানালাহীন এক বিশাল ঘর এটা। বাতাস যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু ক্ষুদ্রাকারের ভেন্টিলেশন রয়েছে ঘরটিতে। গ্রেফতারের পর ক্রিমিনালদের জেলে বা পুলিশ হাজতে কিংবা স্থানান্তরে পাঠানোর আগে এই ঘরে রাখা হয়।

হ্যান্ডকাফ পরা অবস্থায় প্রত্যেককে সেই ঘরে নিয়ে তোলা হলো।

ভূগর্ভস্থ কক্ষ থেকে আরও ২৪ জনকে হ্যান্ড কাফ পরা ও সংজ্ঞাহীন অবস্থায় এনে 'ব্ল্যাক চেম্বারে' তোলা হলো। এদের মধ্যে আইজ্যাক জ্যাকবও সংজ্ঞাহীন ছিল।

ব্ল্যাক চেম্বারে 'ব্ল্যাক ঈগল' এর বন্দীর মোট সংখ্যা ৪৮ জন।

বাম হাতে ব্যান্ডেজ বাধা এসপি উদয় থানি শিমন আশেরের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'তুমিই সম্ভবত পালের গোদা। তোমরা ডিএসপি মহিদলকে বশ করে মনে করেছিলে বন্দীদের উদ্ধার করাসহ যা ইচ্ছা তাই করে যাবে। কিন্তু পারনি। সত্যি বলতে কি তোমাদের এতবড় বিপর্যয় এত সহজে হবে আমরাও কল্পনা করতে পারিনি। এর অর্থ তোমাদের খেলা খতম হওয়ার পথে।'

শিমন আশেরের বিধ্বস্ত চেহারায় যেন আগুন জ্বলে উঠল। বলল, 'ব্ল্যাক ঈগলকে এত ছোট করে দেখ না। পস্তাতে হবে। মনে রেখ ব্ল্যাক ঈগলের ডানার নিচে গোটা দুনিয়া। আর থাইল্যান্ডেও ব্ল্যাক ঈগল দুর্বল নয়। শাহবাড়ি, যয়নব যোবায়দার বাসা এবং আজকের বিপর্যয় আমাদের কাছে দুর্বোধ্য। কিন্তু এর মূল্য তোমাদেরকে দিতে হবে।'

'মূল্য আমরা অনেক দিয়েছি। বহু থাই মানুষকে তোমরা মেরেছ। এবার আমাদের মূল্য আদায় করার পালা। কিন্তু বলত তোমরা এখানে মুসলমানদের ঘাড়ে চড়েছ কেন? তাদের ঘাড়ে সন্ত্রাসের বদনাম চাপিয়ে তোমাদের লাভ?' বলল এসপি উদয় থানি।

'ব্ল্যাক ঈগল কাউকে কৈফিয়ত দেয় না।' বলল শিমন আশের।

‘দেয় না। কিন্তু এবার দেবে।’ বলল উদয় থানি। তার কণ্ঠ কঠোর।

উদয় থানি থামতেই শিমন আশের বলে উঠল, ‘আমাদের এই চব্বিশ জন সংজ্ঞাহীন হলো কি করে?’

‘পুলিশদের সংজ্ঞাহীন করার জন্য তোমরা যে ক্লোরোফরম গ্যাস মহিদলকে দিয়েছিলে, সেই গ্যাস দিয়ে বন্দীখানায় এদের আমরা সংজ্ঞাহীন করেছি। যাতে নিরুপদ্রবে সবাইকে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে এই ব্ল্যাক-চেম্বারে আনতে পারি।’

বলেই এসপি উদয় থানি ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সংগে সংগে ষ্টিলের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

কপালের ঘাম মুছে এসপি উদয় থানি কম্যুনিকেশন রুমে ঢুকল ব্যাংককের সাথে কথা বলার জন্য। ডিএসপি মহিদলের ঘটনার ব্যাপারে পূর্বেও একবার সে কথা বলেছে ব্যাংককের সাথে।

# ৩

ভোর ৫টা। সূর্য ওঠার অনেক বাকি।

কয়েক কপি ব্যাংকক টাইমস হাতে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল ফরহাদ ফরিদ উদ্দিন।

ফজরের নামায পড়ার পর পত্রিকার জন্যে বাইরে গিয়েছিল।

দু'কপি নিজেদের জন্যে রেখে অবশিষ্ট ২ কপি কাগজ পরিচারিকার হাতে দু'তলায় পাঠিয়ে দিল ফরহাদ ফরিদ উদ্দিন।

নামায পড়ে শুয়ে ছিল আহমদ মুসা।

ফরহাদ ফরিদ উদ্দিন ১ কপি কাগজ আহমদ মুসার দিকে এগিয়ে দিল।

আহমদ মুসা পত্রিকা হাতে না নিয়ে বলল, 'তুমি পড় আমি শুনি ফরহাদ।'

বেডের পাশে সোফায় বসল ফরহাদ ফরিদ উদ্দিন। বলল, 'পুলিশ হেডকোয়ার্টারের ঘটনাকে পত্রিকা লীড আইটেম করেছে স্যার। একদম আট কলাম ব্যানার।'

'পড়।' বলল আহমদ মুসা।

'স্যার হেডিংটা হলো: 'অনেক সন্ত্রাসী কর্মকা--র সাথে জড়িত একটি সন্ত্রাসী গ্রুপের ৩৬ জনকে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে হামলার প্রাক্কালে পাকড়াও করা হয়েছে।' হেডিং এর নিচে একটা শোল্ডার। তা হলো, 'সন্ত্রাসীদের সাথে যোগসাজশকারী ডিএসপি মহিদলকে আহত অবস্থায় গ্রেফতার করা হয়েছে।'

'আমার অনুমান ঠিক হয়েছে। এখন পড় নিউজটা।'

পড়তে শুরু করল ফরহাদ ফরিদ উদ্দিন, 'গত রাতে পাত্তানী পুলিশ হেডকোয়ার্টারে হামলার চেষ্টা কালে 'ব্ল্যাক ঈগল' নামের এক সন্ত্রাসী গ্রুপের ৩৬ জন সন্ত্রাসী আটক হয়েছে। এর আগে এই রাতেই সন্ত্রাসীদের সাথে

যোগসাজশকারী ডিএসপি মহিদল পুলিশ হেডকোয়ার্টারে এক সন্ত্রাসী অপতৎপরতা চালানোর সময় আহত হয়ে গ্রেফতার হন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গত রাতে একজন শুভাকাঙক্ষী টেলিফোনে পাত্তানী এসপি উদয় থানিকে জানান যে, তার আশংকা আজ রাতে পাত্তানী পুলিশ হেডকোর্টার সন্ত্রাসীদের দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। তিনি আরও জানান, পাত্তানী ডিএসপি মহিদলের সাথে সন্ত্রাসীদের যোগসাজশ রয়েছে। শুভাকাঙক্ষী ব্যক্তিটি তার সন্দেহের সমর্থনে বিভিন্ন তথ্য দেন। ডিএসপি আড়ি পেতে এই টেলিফোন শুনছিলেন অথবা চলার সময় তার কানে কথা আসে। ডিএসপি যখন বুঝতে পারে সন্ত্রাসীদের সাথে তার যোগসাজশের কথা এসপি উদয় থানি জেনে ফেলেছে, তখন সে দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে হত্যার জন্যে গুলী করে এসপি উদয় থানিকে। শেষ মুহূর্তে টের পাওয়ায় উদয় থানি নিজেকে রক্ষা করতে সমর্থ হন। তবে তার হাতে গুলী লাগে। এসপিকে ডিএসপি'র গুলী করাটা একজন পুলিশ অফিসারের কাছে ধরা পড়ে যায়। ডিএসপি দ্বিতীয় গুলী করার আগেই তিনি ডিএসপির হাতে গুলী করেন। মরিয়া ডিএসপি বাম হাতে রিভলবার তুলে নিয়ে পুলিশ অফিসারকেও গুলী করতে যাচ্ছিল, এই সময় পেছন দিক থেকে ছুটে আসা দু'জন পুলিশ ডিএসপির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তার হাত থেকে রিভলবার কেড়ে নেয়। এভাবে ধরা পড়ে যায় ডিএসপি মহিদল।

ডিএসপি মহিদল গ্রেফতার হওয়ায় পুলিশ হেডকোয়ার্টারে আক্রমণের গোটা প্ল্যান ধরা পড়ে যায়। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি সবকিছু স্বীকার করেন। সন্ত্রাসীদের পরিকল্পনা ছিল, ডিএসপি মহিদল বিশেষ ক্লোরোফরম গ্যাস দিয়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টারের সবাইকে নির্দিষ্ট সময়ে আধা ঘণ্টার জন্য সংজ্ঞাহীন করে ফেলবে। ডিএসপি মহিদল নিজেও সংজ্ঞাহীন হবে সন্দেহের বাইরে থাকার জন্যে। এই আধা ঘণ্টা সময়ে সন্ত্রাসীরা পুলিশ হেডকোয়ার্টারে প্রবেশ করে তাদের ১২ জন বন্দী সহযোগীকে মুক্ত করে নিয়ে যাবে।

এসপি উদয় থানির কঠোর নির্দেশে পুলিশ হেডকোয়ার্টারের ঘটনা এবং ডিএসপি মহিদল ধরা পড়ার ঘটনা গোপন রাখা হয় এবং নাটকের দৃশ্য এমনভাবে সাজানো হয় যাতে সন্ত্রাসীরা মনে করে তাদের পরিকল্পনা মোতাবেক

কাজ হয়েছে। এই বিশ্বাস নিয়ে সন্ত্রাসীরা যখন হেডকোয়ার্টারে প্রবেশ করবে এবং আটক সাথীদের উদ্ধার করতে যাবে, তখন তাদের জালে আটকানো হবে।

এসপি উদয় থানির পরিকল্পনা শতভাগ কার্যকরী হয়েছে। পুলিশ হেডকোয়ার্টারে প্রবেশকারী ৩৬ জন সন্ত্রাসীর সকলকেই আটক করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ব্ল্যাক ঈগল এর দু'জন বিদেশী বড় নেতাসহ কয়েকজন বিদেশী রয়েছেন।

সন্ত্রাসীদের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত একটা প্রশ্নের জবাবে পুলিশের একটি সূত্র বলে, 'পাত্তানী অঞ্চলে সাম্প্রতিক সবগুলো ঘটনায় ব্ল্যাক ঈগল জড়িত। তারা সুপরিকল্পিতভাবে তাদের সন্ত্রাসের দায় চাপাত পাত্তানী মুসলমানদের ঘাড়ে। তাদের এই ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে জাবের জহীর উদ্দীনসহ বেশ কিছু পাত্তানী মুসলিম গ্রেফতার হয় বলে মনে করা হচ্ছে।'

অন্য একটি প্রশ্নের জবাবে এসপি উদয় থানি পুলিশকে তথ্য প্রদানকারী শুভাকাঙক্ষী ব্যক্তির পরিচয় প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে বলেন, তিনি থাই জনগণের বন্ধু। তার একক সাহায্যেই সন্ত্রাসীদের ষড়যন্ত্রকে দিনের আলোতে আনা সম্ভব হয়েছে।

বিনা রক্তপাতে বিপুল সংখ্যক ভয়ংকর সন্ত্রাসীদের ধরার পরিকল্পনা এবং তার সফল বাস্তবায়নে এসপি উদয় থানি সরকারসহ সর্বমহলে প্রশংসিত হচ্ছেন।

জানা গেছে গত রাতেই ৪৮ জন সন্ত্রাসীকে একটা বিশেষ বিমানে ব্যাংককে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এত বিপুল সন্ত্রাসী এভাবে হাতে-নাতে ধরা পড়ার ঘটনা থাইল্যান্ডের ইতিহাসে অনন্য। আজ থেকেই সন্ত্রাসীদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হবার কথা।'

আহমদ মুসা শুয়ে থেকে খবর পড়া শুনছিল।

ফরহাদ ফরিদ উদ্দিন খবর পড়া শেষ করতেই আহমদ মুসা বলে উঠল, 'আলহামদুলিল্লাহ। আশার চেয়ে ফল আল্লাহ বেশি দিয়েছেন।'

'হ্যাঁ ভাই, আহমদ মুসাকে আল্লাহ অসীম ভালোবাসেন। আহমদ মুসা নিকষ অন্ধকারে রাখলেও তা সোনালী সোবহে সাদেক রূপ নেয়। তোমাকে ধন্যবাদ ভাই।'

আহমদ মুসা ও ফরহাদ ফরিদ উদ্দিন দু'জনেই চোখ ফেরাল। দেখল দাদী ও যয়নব যোবায়দা দাঁড়িয়ে। তাদের হাতেও কাগজ।

আহমদ মুসারা তাদের দিকে তাকাতেই দাদী বলল, 'আমরা এ খবরটা আগেই শুনেছি থাই টিভি'র ওয়ার্ল্ড চ্যানেলে। নিউজের প্রায় সব কথাই দেখছি টিভিতে বলেছে। আমরা কানকে বিশ্বাস করতে পারিনি। খবরের কাগজ দেখে তবেই প্রাণ পেয়েছি। তাই কাগজ নিয়েই ছুটে এসেছি ভাই।'

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে থামল দাদী।

'আল্লাহর হাজার শোকর দাদীমা। সরকারের দিক থেকে অন্তত নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। পাত্তানী মুসলমানদের এখন সরকারের ভয়ে পালিয়ে বেড়াতে হবে না। জাবের জহীর উদ্দিনকে তো সরকারিভাবেই নির্দোষ করা হলো।' বলল আহমদ মুসা।

'ভাইয়াকে উদ্ধারের জন্যে তো সরকারও উদ্যোগ নেবেন।' যয়নব যোবায়দা বলল।

'অবশ্যই নেবে বোন।' বলল আহমদ মুসা।

'স্যার আপনিও সরকারের উপর ভরসা করছেন? আপনি আসার আগ পর্যন্ত সরকার সত্য উদ্ধার করতে পারেনি, চেষ্টাও করেনি। ব্ল্যাক ঈগলের কাঁউকে ধরার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত সরকারের কোন কৃতিত্ব নেই। গত রাতে ৩৬ জন সন্ত্রাসী ধরার কৃতিত্বও আপনার। ওরা এটা স্বীকারও করেছে।' ফরহাদ ফরিদ উদ্দিন বলল।

'ভাইয়া আমি সরকারের উপর নির্ভর করিনি। সরকার উদ্যোগ নিতে পারে কিনা আমি সেই কথা বলেছি।' বলল যয়নব যোবায়দা। তার কণ্ঠে অভিমানের সুর।

আহমদ মুসার ঠোঁটে অস্পষ্ট হাসি ফুটে উঠল। বলল যয়নব যোবায়দার কথার উত্তরে, 'ফরহাদ আমার সরকার নির্ভরতার কথা বলেছে।'

‘ও ভালো বুদ্ধিজীবী ভাইয়া। সে ‘আপনি’ বলেনি বলেছে, ‘আপনিও’। এটা বলে সে বুঝাতে চেয়েছে আমি যয়নব তো সরকারের উপর নির্ভর করেছিই, আপনিও নির্ভর করলেন?’ বলল যয়নব যোবায়দা।

‘যয়নব যোবায়দা ঠিকই বলেছে ফরহাদ। তুমিও ‘তুমি ভালো বুদ্ধিজীবী’ প্রশংসা পেয়েছ। তুমি আর কথা বাড়িয়ো না।’

‘তুমি ঠান্ডা বিরোধটা মিটিয়ে দিয়ে ভালো করেছ। এই প্রথম ফরহাদকে যয়নবের বিপরীত একটা কথা বলতে দেখলাম।’ দাদী বলল।

‘এটা ভালো দাদী। ওরা একে অপরকে সমান ভাবে, এটা স্বাভাবিক।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আল্লাহ বিপদ দূর করুন। আমার ভাই জহীর ফিরে আসুক। তারপর তোমার উপস্থিতিতে এদের দু’জনকে এক....।’

দাদীর কথার মাঝখানেই বেজে উঠল আহমদ মুসার মোবাইল।

থেমে গেল দাদী।

আহমদ মুসা মোবাইল অন করতেই দেখল স্ক্রীনে পুরসাত প্রজাদিপকের মোবাইল নাম্বার। আহমদ মুসা বলল, ‘গুড মর্নিং স্যার।’

‘গুড মর্নিং বিভেন বার্গম্যান। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে তোমাকে এই টেলিফোন করছি। তিনি তোমাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তুমি শুধু পাত্তানীর মুসলমানদের বাঁচাওনি, তুমি বাঁচিয়েছ থাই জনগণকে বিভেদের হাত থেকে।’ বলল থাই সরকারী গোয়েন্দা প্রধান পুরসাত প্রজাদিপক।

‘তাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাবেন স্যার। সরকারের পরোক্ষ সহযোগিতা না পেলে আমার স্বাধীনভাবে এগুনো সম্ভব হতো না।’ আহমদ মুসা বলল।

‘যে ৪৮ জন সন্ত্রাসীকে পাত্তানী থেকে ব্যাংকক আনা হয়েছে, তাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়ে গেছে। এদের মধ্যে কয়েকজন বিদেশী আছে। আমরা আশা করছি, ষড়যন্ত্রের শেকড়সহ গোটা ছক আমরা পেয়ে যাব। তুমি অসাধ্য সাধন করেছ বিভেন বার্গম্যান। আমরা বিরাট ঋণী হয়ে পড়লাম।’ বলল পুরসাত প্রজাদিপক।

‘এসব থাক স্যার। আমরা এখনও লক্ষে পৌছিনি। আমার থাইল্যান্ডে আসার প্রধান লক্ষের অন্যতম হলো, জাবের জহীর উদ্দিনকে মুক্ত করা। সে লক্ষ্য এখনও অর্জিত হয়নি।’

আহমদ মুসার মোবাইলের রীলে স্পীকার অন ছিল। মোবাইলের এ কথোপকথন দাদী, যয়নব যোবায়দা এবং ফরহাদসহ সবাই শুনছিল। আহমদ মুসা এটা তাদের শোনায় এ কারণে যে, সব বিষয়ের সাথে তারা জড়িত। সব কথা তাদের জানা দরকার।

আহমদ মুসা কথা শেষ করলেও সংগে সংগে উত্তর এল না পুরসাত প্রজাদিপকের কাছ থেকে।

কয়েক মুহূর্ত পর ওপার থেকে শান্ত, ভারী কণ্ঠ ভেসে এল। বলল, ‘বিভেন বার্গম্যান, এদিকে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হলো।’

‘কি সমস্যা?’ এই মাত্র পাত্তানী ও ব্যাংকক পুলিশ হেডকোয়ার্টারকে একজন মোবাইল টেলিফোনে জানিয়েছে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৪৮ জন সন্ত্রাসীকে ছেড়ে দেয়া না হলে তারা জাবের জহীর উদ্দিনকে হত্যা করবে এবং আরও কিছু করবে যা থাই সরকার কল্পনাও করতে পারে না।’

আহমদ মুসা টেলিফোন শুনতে শুনতেই তাকাল দাদীদের দিকে। দেখল তাদের চোখে-মুখে নেমে এসেছে আতংক।

সংগে সংগেই উত্তর দিল আহমদ মুসা। বলল, ‘হুমকিটা নিসন্দেহে বড় স্যার। কিন্তু এর দ্বারা তারা তাদের ব্যর্থতা ও দুর্বলতার প্রমাণ দিয়েছে।’

‘কেমন করে?’

‘ওরা জাবের জহীর উদ্দিনকে ছিনতাই করে নিয়ে গিয়েছিল তাকে তাদের পক্ষের প্রমাণ করে মুসলমানদের সন্ত্রাসী বানানোর ষড়যন্ত্র সফল করার জন্যে। কিন্তু সেই জাবের জহীর উদ্দিনকেই তারা প্রধান বিপক্ষ দাঁড় করাচ্ছে। এর অর্থ থাইল্যান্ডে তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে।’

‘ঠিক বলেছ বিভেন বার্গম্যান। কিন্তু ওরা মরিয়া হয়ে উঠেছে। কিছু একটা করে ফেলতে পারে, এ আশংকা আছে। এখন তোমার চিন্তা বল। এখানে সবাই এটা জানতে চায়।’

‘প্রতিশোধমূলক সন্ত্রাসী কিছু ঘটনা তারা ঘটাতে পারে। এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। তবে মনে করি, জাবের জহীর উদ্দিন ওদের দরকষাকষির শেষ অস্ত্র। এই অস্ত্রকে তারা শুরুতেই ব্যবহার করবে বলে মনে হয় না।’

‘আমাদের চিন্তাও এই রকম। কিন্তু নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। সরকার খুবই উদ্বিগ্ন। পত্র-পত্রিকার সব সমালোচনা সরকারকেই বিদ্ধ করবে। তাড়াতাড়ি কিছু একটা করতে হবে।’

‘স্যার পাত্তানীর ‘কাতান টেপাংগো’ স্থানটা কোথায়?’

‘ওটা পাত্তানী ও মালয়েশিয়া সীমান্ত এলাকার একটা পাহাড়। এ জায়গার কথা বলছ কেন? জাবের জহীর উদ্দিনকে তারা ওদিকে নিয়ে যেতে পারে?’

‘আমার সন্দেহের একটা স্থান ওটা।’

‘হ্যাঁ বিভেন বার্গম্যান। তোমার সন্দেহের পেছনে যুক্তি আছে। কাতান টেপাংগো’র একটা ইতিহাস আছে। এক সময় পাত্তানীদের ওটা একটি আশ্রয় ছিল। ওখানে কিছু অবকাঠামোও ছিল। কিন্তু ভূমিকম্পে তা নষ্ট হয়ে গেছে বলে শুনেছি। ও এলাকায় কখনও আমি যাইনি।’

‘স্যার পাহাড়ের একটা ম্যাপ এবং ওখানে যাবার পথের বিবরণ দিয়ে আপনি সাহায্য করতে পারেন?’

‘অবশ্যই পারব। আজই তা পেয়ে যাবে। কিন্তু তুমি যেতে চাচ্ছ না কি? শুনলাম তুমি আহত। তুমি এ কাজ কর না। তুমি পরামর্শ দাও। আমরা সেখানে বাহিনী পাঠাব। দরকার হলে তুমি তাদের সাথে যাও।’

‘না স্যার। আপনাদের বাহিনী যাক। কিন্তু আমার পথ হবে ভিন্ন।’ ‘কাতান টেপাংগো’র ম্যাপ ও বিকল্প সব রাস্তার বিবরণ পাওয়ার পর আমি এ নিয়ে আলোচনা করব।’

‘বুঝেছি। ঠিক আছে আলোচনা হবে। বিভেন বার্গম্যান, তুমি একটু কথা বল সিরিত থানারতার সাথে। সে কান্নাকাটি করছে।’

‘ঠিক আছে স্যার।’

ওপার থেকে সিরিত থানারতার কণ্ঠ শোনা গেল। বলছিল, ‘হ্যাঁলো, কেমন আছেন ভাইয়া আপনি?’ কান্নাজড়িত কণ্ঠ সিরিত থানারতার।

‘আমি ভালো আছি। কিন্তু তোমার চোখে পানি কেন?’

‘ভাইয়া আপনি ভালো করে জানেন, ওরা মানুষ নামের পশু। ওরা সব করতে পারে ভাইয়া।’

‘কিন্তু সিরিত থানারতা, সব সময় ‘যা ইচ্ছা তা করা’র ইচ্ছা পূরণ হয় না।’

‘আপনি আল্লাহর একজন প্রিয় বান্দা। তিনি আপনার কথা সত্যে পরিণত করুন।’

‘জাবের জহীর উদ্দিনের বোন ও দাদী আমার পাশে রয়েছেন। তুমি তাদের সাথে কথা বল।’

‘ওরা কথা বলবেন? মন্দ বলবেন না আমাকে?’

‘ওরা সব জানেন। তোমাকে খুব ভালো জানেন ওরা।’

‘ঠিক আছে ভাইয়া।’

আহমদ মুসা টেলিফোনটা দিল ফরহাদ ফরিদ উদ্দিনকে যয়নব যোবায়দাকে দেবার জন্যে এবং বলল, ‘যয়নব যোবায়দা আগে কথা বল, তারপর দাদীও কিছু বলবেন।’

যয়নব যোবায়দা মোবাইল হাতে নিল। যয়নব যোবায়দা কথা শুরু করার আগেই আহমদ মুসা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাইরেটা একটু দেখে আশ-পাশের দোকান ও পুলিশদের সাথে কথা বলে আহমদ মুসা ফিরে এল কয়েক মিনিট পর। দোকান থেকে টুকিটাকি কিছু জিনিসও কিনেছে আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা ঘরে ঢুকতেই দাদী বলে উঠল, ‘এইমাত্র কথা শেষ করলাম সিরিত থানারতার সাথে। তুমি তাকে দেখছি মুসলমান বানিয়ে ফেলছ ভাই। সালাম, কালাম, আল্লাহ হাফেজ সবই যে একদম মুসলমানের মত। খুব ভালো মেয়ে তো থানারতা। কিন্তু জহীর সব কথাই গোপন রেখেছে আমাদের কাছ থেকে।’

‘মনে হয় দাদীমা, জহীর অতটা এগোয়নি যতটা এগুলে আপনাদের বলা দরকার। আমার মনে হয়েছে জহীরের চেয়ে মেয়েটাই বেশি এগিয়েছে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আমারও তাই মনে হয় দাদীমা।’ যয়নব যোবায়দা বলল।

‘দাদীমা, ডাক্তার খালাম্মার বাসাটা কোন জায়গায়?’ আহমদ মুসা জিজ্ঞেস করল দাদীকে উদ্দেশ্য করে।

‘বাসাটা পাশেই। কিন্তু সোজা যাবার পথ নেই। উল্টো দিক থেকে পথ ঘুরে যেতে হয়। কেন জিজ্ঞেস করছ এ কথা?’ দাদী বলল।

‘আপনি, যয়নব যোবায়দা ও ফরহাদ এখনি ওখানে চলে যান।’ বলল আহমদ মুসা।

যয়নব যোবায়দা, দাদী, ফরহাদ সকলের চোখে-মুখে নতুন উদ্বেগ এসে ছায়া ফেলল। যয়নব যোবায়দা বলল, ‘আপনি কি কিছু আশংকা করছেন?’

আহমদ মুসা উত্তর দেবার আগেই তার মোবাইল বেজে উঠল।

আহমদ মুসা যয়নব যোবায়দার উদ্দেশ্যে ‘স্যরি’ বলে টেলিফোন ধরল। মোবাইল কানে তুলেই গলা পেল পাত্তানী সিটি এসপি উদয় থানির।

আহমদ মুসা ‘গুড মর্নিং’ বলতেই উদয় থানি বলল, ‘গুড মর্নিং বলবেন না স্যার, ব্যাড মর্নিং বলুন। গত রাতে আপনার কথায় সেই যে ছেদ পড়ল, তারপর গোটা রাতই বলা যায় দারুণ ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছে। আপনার সাথে যোগাযোগ করা হয়নি। বিশেষ করে ঐ মোবাইল সেটটা হারিয়ে যাওয়ায় আপনার নাম্বারটাও হারিয়ে ফেলি। এখন ব্যাংকক থেকে আপনার নাম্বার নিয়ে টেলিফোন করছি। আপনি আমাকে মাফ করবেন স্যার। আমরা আজ যে বিশাল বিজয় লাভ করেছি এবং একজন বিশ্বাসঘাতকও ধরা পড়েছে, সেটা এককভাবে আপনার সাহায্যেই। আপনাকে হাজারো অভিনন্দন স্যার।’ প্রায় এক নিঃশ্বাসে গড় গড় করে কথাগুলো বলে গেল উদয় থানি।

‘অতীত এখন অতীত। আসুন বর্তমানের কথা বলি। এখন কি ভাবছেন আপনি? ওরা বিরাট হুমকি দিয়েছে।’ বলল আহমদ মুসা।

'স্যার, এজন্যই তো আমি আপনার কাছে টেলিফোন করেছি। তারা দুটো হুমকি দিয়েছে। একটা স্পষ্ট যে, তাদের লোকদের ছেড়ে না দিলে ২৪ ঘণ্টা পর তারা জাবের জহীর উদ্দিনকে হত্যা করবে। আর দ্বিতীয় হুমকি হলো যা আমরা কল্পনা করতে পারি না, এমন ধ্বংসাত্মক কাজও তারা করবে। আমার কাছে তাদের দ্বিতীয় হুমকিটাই উদ্বেগজনক মনে হচ্ছে।' উদয় থানি বলল।

'ঠিক বলেছেন অফিসার। চাপ সৃষ্টির জন্যে কিছু ধ্বংসাত্মক বা ক্ষতিকারক কাজ আগে করবে এবং সর্বশেষে করবে আল্টিমেটাম দেয়া হত্যার কাজ।' বলল আহমদ মুসা।

'তাদের মটিভ সম্পর্কে আপনি কিছু ভাবছেন স্যার?' উদয় থানি বলল।

'অপরাধী, সন্ত্রাসীদের মতি-গতি সম্পর্কে আপনারাই ভালো জানবেন। তবে এটা স্বাভাবিক যে, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অগ্রাধিকারের স্থানগুলোয় আপনাদের চোখ রাখতে হবে।'

'ঠিক বলেছেন স্যার। এটাই প্রথম কাজ।' বলল উদয় থানি।

'তবে এই প্রথম কাজের আগে আরেকটি কাজ আছে অফিসার, সেটা হলো, পুলিশকে যাতে তারা পণবন্দী করতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে।' আহমদ মুসা বলল।

'সাংঘাতিক কথা বলেছেন স্যার। এ দিকটা তো আমরা ভাবিইনি। ধন্যবাদ স্যার, অসংখ্য ধন্যবাদ। সরকার ও জাতির একটা দুর্বল স্থান এটা। এখানে ঘা পড়লে গোটা জাতিই লাফিয়ে পড়বে। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার। এ বিষয়টা আমি ব্যাংককে এখনি জানাচ্ছি।'

'ধন্যবাদ অফিসার, বাই।'

আহমদ মুসা, মোবাইল অফ করতেই যয়নব যোবায়দা বলে উঠল, 'বুঝেছি ভাইয়া, ওরা এখানে হামলা ও আমাদের কাউকে পণবন্দী করার ভয় করছেন?'

'হ্যাঁ বোন। ওরা কি করতে পারবে আমি জানি না। কিন্তু আহত বাঘের মত ওদের দশা। ওদের সাধ্যে কুলোয়, এ রকম সব কিছুই ওরা করবে। এর মধ্যে তোমরা তাদের বড় টার্গেট। এর আগেও তোমাকে কিডন্যাপ করার চেষ্টা করেছে।

আমি মনে করি, তোমরা গুছিয়ে নিয়ে এখনই এ বাড়ি ত্যাগ কর।' বলল আহমদ মুসা।

'তুমিও কি ওখানে যাবে ভাই? তুমি না থাকলে আমরা নিরাপদ বোধ করব না।' দাদী বলল।

'চিন্তা করবেন না। আমি আপনাদের সাথে আছি দাদী।' বলল আহমদ মুসা।

যয়নব যোবায়দা সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে উঠে গেল প্রস্তুত হবার জন্য।

আহমদ মুসা আবার বাইরে এল। একজন পুলিশকে বলল তিনটা অটো রিকশা ডাকার জন্যে। বলল, 'বাড়ির মেম সাহেবরা একটু মার্কেটে যাবেন।'

একজন পুলিশ চলে গেল। চারদিকটা দেখে দোকানদারের সাথে কথা বলে ফিরে এল আহমদ মুসা। এখানে মোট পাঁচ জন লোককে নতুন পেল আহমদ মুসা। একজন পাশের বাড়ির এক লোকের সাথে দেখা করার জন্যে অপেক্ষা করছে। আর তিন জন এসেছে ভাড়া বাসার খোঁজে। দু'একটা বাড়ির খোঁজ পেয়েছে। কিন্তু বাসাওয়ালাকে একটু পরে পাওয়া যাবে। তারা অপেক্ষা করছে। আর একজন লোক এই মাত্র এসে চা খেতে বসেছে রোড-সাইড টি-ষ্টলে। তাদের সকলের বয়স কাছাকাছি পর্যায়ের নয়, এটাই আহমদ মুসার অসংগত মনে হয়েছে। আহমদ মুসার সন্দেহ সত্য হলে তাদের সকলকে এক বয়সের হতে হবে। তাহলে ওরা কি ছদ্মবেশ নিয়েছে! এই চিন্তা মাথায় উদয় হতেই চমকে উঠল আহমদ মুসা। মন বলল, এটা হতে পারে। তারা বিভিন্ন ছদ্মবেশে এসে জমা হতে শুরু করেছে এখানে।

আহমদ মুসা ড্রইংরুমে বসেছিল। ফরহাদ এসে বলল, 'আমরা প্রস্তুত ভাইয়া।'

ফরহাদের পেছনে যয়নব যোবায়দা ও দাদীও এসে দাঁড়িয়েছে।

ওদিকে দুটো অটো রিকশাও এসে গেছে।

আহমদ মুসা ভাবনায় ডুবেছিল।

ফরহাদের কথায় চমকে উঠে মুখ তুলল আহমদ মুসা।

ফরহাদও চমকে উঠল। আহমদ মুসাকে এমন অপ্রস্তুত সে কখনও দেখেনি। বলল, ‘স্যার, খারাপ কিছু ভাবছেন?’

হেসে উঠল আহমদ মুসা। বলল, ‘ভাবছিলাম। তবে খুব খারাপ কিছু নয়।’

সবার দিকে তাকিয়ে আহমদ মুসা বলল, ‘তোমরা রেডি? ঠিক আছে তোমরা একটু পরে বের হবে। আমি বেরিয়ে গিয়ে টি-স্টলে চা-খেতে বসতে পারি, এতটা সময় পরে বের হবে। তিনটা পায়নি, দুটো অটো রিকশা পেয়েছে। ফরহাদ তুমি একটিতে ড্রাইভারের পাশে বসবে।’

সবার মুখে-চোখে উদ্বেগ। যয়নব যোবায়দা বলল, ‘বাইরে কিছু কি ঘটার আশংকা করছেন?’

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘সব সময় সবকিছুর জন্যে প্রস্তুত থাকা ভালো।’

বলে আহম মুসা বাইরে বেরিয়ে এল। বেরুবার সময় পকেটের রিভলবার এবং শোল্ডার হোলষ্টারে হ্যান্ডমেশিনগানের অস্তিত্ব অনুভব করল।

আহম মুসা বেরিয়ে সোজা চলল টি-ষ্টলের দিকে। যাবার সময় দেখল আগন্তুকের সংখ্যা আরও একজন বেড়েছে।

ছয় জনের দু’জন বসে পুলিশের সাথে আলাপ করছে। অবশিষ্ট চারজন যে যেখানে ছিল সেখানেই বসে আছে।

আহমদ মুসা পুলিশদের কাছে চা পাঠাতে বলে এবং নিজের জন্য এক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে একটা বেঞ্চিতে বসল যয়নব যোবায়দাদের বাড়িকে সামনে রেখে। এখানে বসে ছয়জন আগন্তুকসহ পুলিশ বক্স, দুই অটোরিকশা সবই চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে।

দৃষ্টি সামনে রেখে চায়ে চুমুক দিচ্ছে আহমদ মুসা।

ফরহাদরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। বারান্দা থেকে লনে নেমেই দ্রুত গাড়িতে উঠল।

তাদের বাড়ি থেকে বেরুতে দেখে ছয়জনই উঠে দাঁড়িয়েছে। তাদের অবস্থা কিছুটা কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত। যেন শিকার এভাবে পালাবে তারা আশা করেনি।

অটো রিকশা তখন চলতে শুরু করেছে।

পুলিশের কাছে যে দু'জন ছিল, তাদের একজন হাত দিয়ে একটা সংকেত দিল। সংগে সংগেই ছয় জনের পোশাকের ভেতর থেকে ছয়টি হ্যান্ডমেশিনগান বেরিয়ে এল। দু'জন গুলী করল অটো রিকশার চাকা লক্ষে। পুলিশের কাছের দু'জন চোখের পলকে চা খাওয়ারত পুলিশদের নিরস্ত্র করে পুলিশ বক্সের ভেতর ঠেলে দিল। অন্যজন ফাঁকা আওয়াজ করে ত্রাসের সৃষ্টি করল।

এরা ছয় জনেই এই কান্ড করে বসবে, আহমদ মুসা এটা ভাবেনি। এই অবস্থায় এত বড় কিডন্যাপের ঘটনার জন্যে আরও লোক তাদের চাই এবং তাদেরই অপেক্ষা তারা করছে; খুব বেশি হলে তারা সাথীদের খবর দেয়া এবং যয়নব যোবায়দাদের ফলো করার মত কাজ করতে পারে---এটাই ভেবেছিল আহমদ মুসা। সে ক্ষেত্রে আহমদ মুসা পুলিশ দিয়ে তাদের আটকাবে মনে করেছিল। কিন্তু তারা এল একদম ডাইরেক্ট একশনে।

আহমদ মুসা চায়ের কাপ পিরিচ রেখে এক লাফে রাস্তায় নেমে এল। পকেট থেকে রিভলবার বের করে বাঁ হাতে নিল এবং হ্যান্ড মেশিনগান রাখল ডান হাতে।

আহমদ মুসা প্রথমে টার্গেট করল পুলিশের কাছের দু'জনকে, পরে যে দু'জন অটো রিকশার কাছে চলে গিয়েছিল সে দু'জনকে।

চারটি গুলী করতেই বাকি দু'জন ফিরে তাকিয়েছে আহমদ মুসার দিকে এবং গুলী করতে শুরু করেছে।

আহমদ মুসা শুয়ে পড়েছে একটা বিদ্যুতের পিলারকে আড়াল করে।

ওরা গুলী করতে করতে আহমদ মুসার দিকে ছুটে আসছে।

আহমদ মুসা ডান হাতের হ্যান্ডমেশিনগানের নল বিদ্যুৎ পিলারের বাইরে একটু বাড়িয়ে পিলার বরাবর সামনে অন্ধভাবে গুলী বর্ষণ শুরু করল। লক্ষ্য প্রতিপক্ষের গুলীর টার্গেট সরিয়ে দেয়া।

ওরা ছুটে আসছিল। ওদের কোন আড়াল ছিল না।

আহমদ মুসা গুলী বর্ষণ করলে পাল্টা আক্রমণের মুখে পড়ে ওরা রাস্তার এক পাশে সরে যেতে লাগল। কয়েক মুহূর্তের জন্যে ওদের গুলীর লক্ষ্য সরে গিয়েছিল।

এই সুযোগই চাচ্ছিল আহমদ মুসা এবং এই সুযোগের সে পুরো সদ্ব্যবহার করল।

বেরিয়ে এল পিলারের আড়াল থেকে। লক্ষ্য স্থির করে এবার গুলী করল। গুলীর বৃষ্টি গিয়ে ছেঁকে ধরল রাস্তার পাশে সরে যাওয়া দু'জনকে।

দু'জনেই মুখ থুবড়ে পড়ল। ওদের গুলী বন্ধ হয়ে গেল।

উঠে দাঁড়িয়ে আহমদ মুসা ছুটল যয়নব যোবায়দাদের দিকে। যাবার পথে পুলিশবক্সের ছিটকিনি খুলে বের করল পুলিশদের।

পুলিশরা আহমদ মুসাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে বলল, 'স্যার আমরা চা খাচ্ছিলাম। আকস্মিকভাবে ওরা আমাদের আক্রমণ করে। উপযুক্ত ফল পেয়েছে সন্ত্রাসীরা। দেখছি সবাই মারা গেছে স্যার। ধন্যবাদ স্যার। ওঁদের অবস্থা কি?'

'ওঁরা ভালো আছেন। ওদিকে যাচ্ছি।' বলে আহমদ মুসা চলল অটো রিকশার দিকে।

অটোরিকশার ড্রাইভার দু'জন গাড়ি থেকে নেমে আহমদ মুসাকে দেখে আতংকে চুপসে গেছে। আহমদ মুসা ওদের লক্ষ্য করে বলল, 'দেখছি একটা করে টায়ার নষ্ট হয়েছে, বাড়তি চাকা নেই?'

'আছে স্যার।' বলল ড্রাইভারদের একজন।

'তাড়াতাড়ি চাকা লাগাও।' নির্দেশ দিল আহমদ মুসা।

আর ফরিদদের উদ্দেশ্য করে বলল, 'তোমরা ড্রইং রুমে গিয়ে একটু বস। আমি এদিকে পুলিশদের দেখি ওরা হেডকোয়ার্টারকে জানাল কিনা।'

যয়নব যোবায়দা, দাদী ও দুই পরিচারিকা নামল।

‘দাদী আপনারা একটু বসুন। চাকা ঠিক হলে আমি ডাকব।’ বলল আহমদ মুসা দাদীকে।

‘আল্লাহ তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন ভাই’ বলে দাদী হাঁটতে লাগল। তার কণ্ঠ কান্না জড়ানো।

আহমদ মুসা পুলিশদের সাথে কথা বলল। তারা হেডকোয়ার্টারকে জানিয়েছে। এসপি উদয় থানি নিজে আসছে। আহমদ মুসাও উদয় থানি এবং ব্যাংককে থাই সহকারী গোয়েন্দা প্রধান পুরসাত প্রজাদিপকের সাথে কথা বলল। দু'জনেই বলল আমরা আশংকা করেছিলাম সরকারি স্থাপনা বা সেনা অথবা পুলিশের উপর হামলা হবে। কিন্তু হামলা হলো শাহ পরিবারের উপর। তারা শাহ পরিবারের আরও কাউকে পণবন্দী করতে চায়। তারা মনে করে সরকারের উপর এতে চাপ বেশি পড়বে এবং সন্ত্রাসীদের ছাড়তে বাধ্য হবে। এই অবস্থায় শাহ পরিবার সম্পর্কে কিছু প্রস্তাব পরামর্শ দিয়ে তারা তাদের কথা শেষ করেছে। তারা দু'জনেই আহমদ মুসার আকাশস্পর্শী প্রশংসা শুরু করেছিল। কিন্তু আহমদ মুসা টেলিফোন রেখে দেয়ার হুমকি দেয়ায় সে পথে তারা বেশি এগোতে পারেনি।

ততক্ষণে অটো রিকশার চাকা লাগানো হয়ে গিয়েছিল।

আহমদ মুসা উঠে গেল ড্রইংরুমে।

যয়নব যোবায়দারা কথা বলেছিল।

সবারই চোখে অশ্রু।

আহমদ মুসা কথা শুরুর আগেই দাদী কেঁদে উঠল। বলল, ‘আমরা কোথায় যাব ভাই? শাহবাড়িতে আক্রমণ হলো, এলাম এখানে। এ গোপন বাড়িটির সন্ধানও তারা পেয়ে গেল। ডাক্তার ফাতেমার ওখানে যাব। ওটাও নিশ্চয় গোপন থাকবে না। মাঝখানে তাকেও বিপদে ফেলা হবে। আমাদের জন্যে তো কোন নিরাপদ স্থান দেখছি না ভাই’ কান্নারুদ্ধ কণ্ঠেই কথাগুলো বলল দাদী।

আহমদ মুসা সোফায় বসল। নরম কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলল, ‘আমরা জঘন্য এক বেপরোয়া শত্রুর কবলে পড়েছি দাদী। তবে এই আক্রমণ ওদের শক্তির পরিচয় নয়। এগুলো ওদের দুর্বলতা ও হতাশা থেকে বাঁচার সর্বশেষ অপচেষ্টা। আমরা জয়ী হবো দাদীমা, ইনশাআল্লাহ।’

একটু থামল আহমদ মুসা।

সোফায় একটু ঠেস দিল। বলতে শুরু করল আবার, 'নিরাপদ জায়গা আছে দাদীমা। এইমাত্র থাই সহকারী গোয়েন্দা প্রধানের সাথে কথা হলো। এসব ঘটনায় সরকার খুবই উদ্বিগ্ন জানালেন তিনি। সরকারি তরফ থেকে তাকে বলা হয়েছে আপনার পরিবারকে নিরাপদ সরকারি তত্ত্বাবধানে রাখার জন্য। এসপি উদয় থানিও বলেছেন এ কথা। তিনি এখানে আসছেন। দাদীমা আপনারা চাইলে সরকার এই মুহূর্তেই এ ব্যবস্থা করবেন। আপনারা কি করবেন বলুন দাদীমা।'

'আমি কিছু ভাবতে পারছি না ভাই। যা করার তুমিই করবে।' বলল দাদী ভাঙা গলায়।

দাদীর কথা শেষ হতেই যয়নব যোবায়দা বলল, 'পাত্তানী অঞ্চলের শাসক এবং পরবর্তীকালে প্রধান পাত্তানী পরিবার হিসাবে এই পরিবার নান উত্থান-পতনের ভেতর দিয়ে এগিয়েছে, কিন্তু কখনই সরকারি নিরাপত্তা হেফাজত নেয়নি। সব সময় এই পরিবার জনপ্রিয়তাকে তাদের নিরাপত্তা মনে করেছে। এখনকার আমাদের অবস্থা অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে খারাপ। এ জন্যই নিশ্চয় আমাদের সাহায্যে আল্লাহ আপনাকে নিয়ে এসেছেন। এ পর্যন্ত আল্লাহর এ ব্যবস্থা আমাদের জন্যে যথেষ্ট হয়েছে। ভবিষ্যতেও যথেষ্ট হবে বলে আমি মনে করি।'

থামল যয়নব যোবায়দা। প্রথম দিকে তার কণ্ঠ ছিল কান্নারুদ্ধ। কিন্তু শেষ দিকে কান্না মুছে গিয়ে তার কণ্ঠ হয়ে উঠেছিল দৃঢ় প্রত্যয়ী।

উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আহমদ মুসার মুখ। বলল, 'যয়নব যোবায়দা, তুমি 'সাকোথাই' রাজবংশের যুবকদের এবং পাত্তানী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা 'চাউসির বাংগসা' ওরফে সুলতান আহমদ শাহের যোগ্য উত্তরসূরীর মত কথা বলেছ। তোমাকে ধন্যবাদ। তবে বোন যয়নব যোবায়দা আল্লাহ তাঁর ব্যবস্থা শুধু আহমদ মুসাকে দিয়ে নয়, সরকারকে দিয়েও চালাচ্ছেন। সেই হিসাবে সরকার যে প্রস্তাব দিয়েছেন, তা আল্লাহর ব্যবস্থারই অংশ হতে পারে।'

'ঠিক বলেছেন। আমাকে শুধরে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ। আমি বিষয়টা আপনার উপরই ছেড়ে দিচ্ছি ভাই সাহেব।' বলল যয়নব যোবায়দা।

‘ধন্যবাদ বোন যয়নব যোবায়দা। ওরা প্রস্তাব করেছে, ব্যাংককে সরকারি নিরাপত্তায় থাকতে। আমি..........।’

আহমদ মুসার কথার মাঝখানেই যয়নব যোবায়দা বলে উঠল, ‘নিজ মানুষদের ফেলে আমরা অন্য কোথাও যেতে পারব না।’

‘আমি সে কথাই বলতে যাচ্ছিলাম। এই যাওয়াকে মানুষ অন্য দৃষ্টিতে নিতে পারে। এজন্যে আমার প্রস্তাব হলো, তোমরা শাহ বাড়িতেই থাকবে। এই বাড়িকে সরকার ফুল সিকিউরিটির মধ্যে নিয়ে আসবে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘হ্যাঁ ভাই, এটাই ভালো হবে।’ দাদী বলল।

‘আমারও এটাই মত।’ যয়নব যোবায়দা বলল।

‘আমারও সুবিধা হলো দাদীমা। এই ব্যবস্থা হলে আমি একটু হাল্কা বোধ করব। আমি একদিন বা কয়েকদিন পাত্তানী শহরে থাকছি না।’ বলল আহমদ মুসা।

দাদী, যয়নব যোবায়দা ও ফরহাদ তিনজনেরই প্রশ্নবোধক দৃষ্টি ছুটে এল আহমদ মুসার দিকে। কথা বলল যয়নব, ‘আপনি কি তাহলে কোথাও যাচ্ছেন ভাই সাহেব?’

‘হ্যাঁ। তোমাদেরকে শাহ বাড়িতে পৌছে দেবার পর সম্ভব হলে আজকেই।’ বলল আহমদ মুসা।

‘কোথায়?’ দাদী বলল।

‘জাবের জহীর উদ্দিনের খোঁজে।’

‘পুলিশের সাথে?’ বলল ফরহাদ ফরিদ উদ্দিন।

‘না। পুলিশের পথ আর আমার পথ ভিন্ন হবে।’

‘আপনি সুস্থ নন। ডাক্তার খালাম্মা কি আপনাকে অনুমতি দেবেন?’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘এই ‘না’ বলা ডাক্তারের দায়িত্ব, কিন্তু আমার কাজ আমার প্রয়োজনে। ডাক্তারের দায়িত্ব থেকে রোগীর প্রয়োজন সব সময় অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে।’

একজন পুলিশ ড্রইং রুমের দরজায় এসে দাঁড়াল। বলল, আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, ‘এসপি স্যার এখানে আসতে চান স্যার।’

‘হ্যাঁ, ওয়েলকাম, আসতে বল।’ বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

যয়নব যোবায়দা গায়ের চাদরটা আরও ঠিক করে নিল এবং কপালে নেমে আসা মাথার রুমালটাকে চোখের উপর পর্যন্ত নামিয়ে নিল।

হাবিব হাসাবাহর সামনে টেবিলের উপর মোবাইল রাখা।

কল চলছে।

মোবাইলের ইনকামিং ও আউটগোয়িং ভয়েস অপশন অন করা।

মোবাইল টেবিলে রেখেই যেমন কথা বলা যাচ্ছে, তেমনি কথা শোনাও যাচ্ছে।

শূন্য অফিস ঘর।

মাত্র হাবিব হাসাবাহই তার চেয়ারে বসে।

মোবাইলে ওপার থেকে কথা ভেসে আসছে।

হাবিব হাসাবাহর বিব্রত মুখ। বিধ্বস্ত চেহারা।

ফোনের ওপ্রান্ত থেকে কথা বলছেন, ইহুদীবাদী বিশ্ব গোয়েন্দা সংস্থা ইরগুন জাই লিউমি’র (ইজালি) প্রধান আলেকজান্ডার জ্যাকব। সে কথা বলছে ইসরাইলী হাইফার গোপন হেডকোয়ার্টার থেকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ‘ইরগুন জাই লিউমি’র (ইজালি) হেডকোয়ার্টার বন্ধ হওয়াতে হাইফাতেই তাদের গোপন হেডকোয়ার্টার খোলা হয়েছে। এখানে হেডকোয়ার্টার হওয়াতে ইজালি’র লাভ হয়েছে। ইহুদী রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদকে ব্যবহার করা কিংবা মোসাদের তাদেরকে ব্যবহার করা সহজ হয়েছে।

ওপার থেকে আলেকজান্ডার জ্যাকব বলছিল, ‘এই বিভেন বার্গম্যান কয়েকদিন আগে পর্যন্ত আন্দামানে ছিল। ভারতীয় গোয়েন্দা সূত্র থেকে এই মাত্র শুনলাম, বিভেন বার্গম্যান আসলে আহমদ মুসা। এই আহমদ মুসা আমাদের মূর্তিমান যম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে জায়নবাদীদের সে উৎখাত করেছে। তার হাতে আমাদের সর্বশেষ বিপর্যয় ঘটেছে আন্দামানে। আমরা সেখানে মহাসংঘকে

সহযোগিতা করছিলাম। আমাদের শীর্ষ গোয়েন্দা কোহেনকে সে খুন করেছে এবং সেখানে আমাদের গোটা নেটওয়ার্ক তার হাতে ধ্বংস হয়েছে। থাইল্যান্ডে যা ঘটেছে, আহমদ মুসার জন্যে তা ঘটানো খুবই স্বাভাবিক। সে অদ্ভুত কুশলী। প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সে সব সময় সংশ্লিষ্ট দেশের আইনকে অর্থাৎ সরকারকে পক্ষে রাখতে সমর্থ হয়। এই অসাধ্য সাধন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও। তারই কৌশল ও চেষ্টায় সেখানে আমরা জায়নবাদী মানে ইহুদীবাদীরা মার্কিনীদের কাছে বন্ধু থেকে শত্রুতে পরিণত হই। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সে আমাদের মোকাবিলায় ইহুদীদের ব্যাপক সমর্থন অর্জন করে। ইহুদীবাদীরা রাজনৈতিক সন্ত্রাসী এবং ধার্মিক ইহুদীরা তা নয়- তার এই যুক্তি মার্কিন ইহুদীরাও গলধঃকরণ করে। এহেন ধূর্তের সাথে লড়াইয়ে থাইল্যান্ডে আমাদের যে ক্ষতি হয়েছে, তা খুব বড় নয়। সবচেয়ে অসুবিধার ব্যাপার হয়েছে, থাই সরকারকে সে শুধু পাশে পাওয়া নয়, সেখানকার মুসলমানদের সে নির্দোষ প্রমাণ করতে পেরেছে। এই অবস্থায় থাইল্যান্ডে আমাদের প্রধান কাজ হলো আহমদ মুসাকে হত্যা করা। জাবের জহীর উদ্দিন এবং তার পরিবারের লোকরা হবে আহমদ মুসাকে বাগে পাওয়ার টোপ। সুতরাং জাবের জহীর উদ্দিনকে ধরে রাখা আমাদের জন্য অপরিহার্য। ৪৮ জন বন্দীকে ছাড়লেও তাকে ছাড়বে না। যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে আমরা আহমদ মুসাকে হাতে পেতে চাই। শাহ পরিবারের লোকদের পণবন্দী করার চেষ্টা অব্যাহত রাখ। আলটিমেটাম ঘোষণার পরেই শাহ পরিবারের সদস্যদের কিডন্যাপ করার আরও একটা উদ্যোগ নিয়েছিলে, এজন্যে তোমাকে মোবারকবাদ। তুমি ব্যর্থ হয়েছ, আমাদের আরও ছয়জন লোকের জীবন গেছে, একে আমি বড় করে দেখছি না। এক.......।'

আলেকজান্ডার জ্যাকবের কথার মাঝখানেই হাবিব হাসাবাহ বলে উঠল, 'মাফ করবেন এক্সিলেন্সী। একটা কথা। এবার যে প্ল্যান আমরা করেছিলাম, তা প্রায় অব্যর্থ ছিল। কিন্তু পরিকল্পনার মাঝপথেই শাহ পরিবারের সদস্যরা অন্য কোথাও যাবার জন্যে বেরিয়ে পড়ে। তখন পর্যন্ত ওখানে আমাদের জমা হয়েছিল মাত্র ছয়জন লোক। এরাই মরিয়া হয়ে ওদের কিডন্যাপের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। এরপরও আহমদ মুসা না থাকলে তারা সফল হতো, এটা আমরা নিশ্চিত হয়েছি।'

বললাম তো সে আমাদের যম। ওকেই আগে সরাতে হবে। জাবের জহীর উদ্দিন ভালো টোপ। প্রভু জিহোবা আমাদের সাহায্য করুন।' বলল ওপার থেকে আলেকজান্ডার জ্যাকব।

'এক্সিলেন্সি, মনে হচ্ছে ওরা আলটিমেটাম না মেনে জাবের জহীর উদ্দিনকে উদ্ধার করার চেষ্টা করবে।' হাবিব হাসাবাহ বলল।

'আমরা এটাই চাই।'

'উদ্ধারের চেষ্টায় তো ঝাঁপিয়ে পড়বে পুলিশ। আহমদ মুসা যদি না আসে!'

'তুমি আহমদ মুসাকে চেন না। পুলিশের উপর ভরসা করে বসে থাকার লোক আহমদ মুসা নয়। পুলিশ উদ্ধারে আসবে। কিন্তু উদ্ধারের জন্য মূল ভূমিকা সে পালন করবে, এটা দেখতেই পাবে।' ওপার থেকে বলল আলেকজান্ডার জ্যাকব।

'ঠিক এক্সিলেন্সী। এ পর্যন্ত সব ঘটনার মধ্যে সে আছে।' বলল হাবিব হাসাবাহ।

'এই মুহূর্ত থেকে আহমদ মুসার পেছনে লোক লাগিয়ে দাও। তারা প্রতি পদে তাকে অনুসরণ করবে। সে উদ্ধার অভিযানে এসে তোমাদের দেখতে পাওয়ার আগে তোমরা যেন তাকে দেখতে পাও। এমন হলে তবেই আশা করা যায় তোমরা আহমদ মুসাকে কাবু করার সুযোগ পাবে।' আলেকজান্ডার জ্যাকব বলল।

'ধন্যবাদ এক্সিলেন্সী।' বলল হাবিব হাসাবাহ।

'ওয়েলকাম। ওকে। বাই।' ওপার থেকে টেলিফোন রেখে দিল আলেকজান্ডার জ্যাকব।

মোবাইল অফ করল হাবিব হাসাবহও।

যে বিধ্বস্ত চেহারা ছিল হাবিব হাসাবাহর, সেটা অনেকটাই কেটে গেছে এখন। মহাশক্তিধর আলেকজান্ডার জ্যাকব সর্বশেষ কয়েকটি বিপর্যয় ও ব্যর্থতার জন্যে তাকে খেয়ে ফেলবে এই ভয় ছিল হাবিব হাসাবাহর। কিন্তু বিভেন বার্গম্যানই আহমদ মুসা এটা জানার পর তার বিপর্যয় ও ব্যর্থতার অপরাধ

আলেকজান্ডার জ্যাকবরা ভুলেই গেছে। এখন তার বিপর্যয়-ব্যর্থতাকে স্বাভাবিক বলে ধরে নিয়েছে। মনে মনে দারুণ খুশি হাবিব হাসাবাহ। সে ধন্যবাদ দিল আহমদ মুসাকে। আহমদ মুসা অতটা যোগ্য ও ক্ষমতাধর না হলে হাবিব হাসাবাহর আজ অব্যাহত ব্যর্থতা ও বিপর্যয়ের জন্যে কি যে গতি হতো, তা ভাবতেই গা শিউরে ওঠে।

হাবিব হাসাবহ গুনগুনিয়ে একটা গানের কলি গাইতে গাইতে কলিং বেলে চাপ দিল নতুন অপারেশন প্রধানকে ডাকার জন্যে। বস আলেকজান্ডার জ্যাকবকে টেলিফোন করার আগে সবাইকে রুম থেকে বের করে দিয়েছিল নিজের নাজেহাল অবস্থাকে অন্যের কাছ থেকে আড়াল করার জন্যে।

# ৪

শাহ বাড়ির ছাদে হেলিকপ্টার ষ্টার্ট নিয়েছে। হাতে একটা ব্যাগ নিয়ে আহমদ মুসা প্রস্তুত।

হেলিকপ্টার ষ্টার্ট নেয়ার শব্দ শুনে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘দাদীমা এখন তাহলে যেতে হয়। হেলিকপ্টার ষ্টার্ট নিয়েছে।’

দাদীমা, যয়নব যোবায়দা ও ফরহাদ সবাই উঠে দাঁড়াল। দাদী বলল, ‘কি বলব ভাই, অসুস্থ শরীর নিয়ে তুমি অনিশ্চিত ও বিপজ্জনক এক অভিযানে যাত্রা করছ। শুধু আল্লাহকে বলব, তিনি তোমাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করুন, তোমাকে সফল করুন, তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন। তোমার মতো হাজারো আহমদ মুসাকে সৃষ্টি করুন। তাহলে দুনিয়ায় আমাদের মতো মজলুমদের আর কোন সমস্যা থাকবে না।’ বলে কান্নায় ভেঙে পড়ল দাদী।

দু’চোখ ছলছলিয়ে উঠেছে যয়নব যোবায়দা ও ফরহাদ ফরিদ উদ্দিনের। যয়নব যোবায়দা বলল, ‘যদি জানতাম আপনাকে এত কষ্টের মধ্যে ফেলব, তাহলে ঐভাবে চিঠি পাঠাতাম না, আপনাকে ডাকতাম না। কারও সুখের জন্যে, কারও মুক্তি বা নিরাপত্তার জন্য আরেকজনের এত কষ্ট হতে পারে না।’ যয়নব যোবায়দারও কান্নারুদ্ধ কণ্ঠ।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘দুনিয়ায় সব দাদী, সব মা, সব বোনেরা এমনটি হয়। আমি ভাগ্যবান দাদী। এমন স্নেহ দেবার দাদী, বোন, ভাই আমার দুনিয়া জোড়া। আপনাদের এই অশ্রু আমার জন্যে আশীর্বাদ।’ বলে সালাম দিয়ে আহমদ মুসা ছাদে ওঠার জন্যে হাঁটতে শুরু করল।

সবাই তার পেছনে হাঁটতে শুরু করল। যেতে যেতে যয়নব যোবায়দা বলল। ‘ভাই সাহেব, আমি কি ভাবী সাহেবার সাথে কথা বলতে পারি?’

‘অবশ্যই যয়নব যোবায়দা। আমি কিছুক্ষণ আগে জোসেফাইনের সাথে কথা বলেছি। তোমার কথা সে জানে।’

'ধন্যবাদ ভাই সাহেব।' বলল যয়নব যোবায়দা।

সিঁড়ির মুখে গিয়ে দাদী ও যয়নব যোবায়দা দাঁড়াল। আবার এক দফা সালাম বিনিময় হলো।

ফরহাদ ও আহমদ মুসা উঠে গেল ছাদে।

সর্বশেষে ফরহাদ ফরিদ উদ্দিন বিদায় জানাল আহমদ মুসাকে।

আহমদ মুসা ফরহাদের পিঠ চাপড়ে 'সাবধানে থেকো, সতর্ক থেকো' বলে হেলিকপ্টার উঠে গেল।

হেলিকপ্টার আকাশে উড়ল।

আহমদ মুসাকে নিয়ে ছুটল পশ্চিম দিকে।

হেলিকপ্টার আহমদ মুসাকে নামিয়ে দেবে সোয়াশ' কিলোমিটার পশ্চিমে 'হাটাই' শহরে।

আহমদ মুসার গতিবিধি যাতে শত্রুপক্ষের কাছে গোপন থাকে, এজন্যেই এই হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা।

হাটাই থেকে একটা প্রাইভেট জীপে অতপর আহমদ মুসাকে অগ্রসর হতে হবে পাত্তানী মালয় রোড ধরে দক্ষিণে। এই রোড পাত্তানীর শেষ শহর সিডাও পর্যন্ত গেছে। সিডাও থেকে ৩০ কিলোমিটারের মধ্যে মালয়েশিয়া সীমান্ত। মালয়েশিয়া পার হয়ে তাকে পৌছুতে হবে সীমান্ত থেকে ৪০ কি.মি. ভেতরে পাত্তানী-মালয় সড়কের শেষ প্রান্ত 'সুংচাই পেতানী' শহরে। এই শহর থেকে দুর্গম এলাকার মধ্যে একটা পথ-চিহ্ন ধরে পূর্ব দিকে এগিয়ে মালয়েশিয়া সীমান্তে আবার তাকে ফিরে আসতে হবে। মালয়েশিয়া অতিক্রম করে তাকে পাত্তানীর দুর্গম শহর বেতাংগে পৌছুতে হবে এখানে তাকে অনেকগুলো কাজ সেরে ১০০ কিঃ মিঃ উত্তরে গোপনে 'কাতান টেপাংগো' পৌছার চেষ্টা করতে হবে। এ যেন দরজায় প্রবেশ না করে দরজার সামনে থেকে গোটা ঘরের চারপাশ ঘুরে এসে দরজায় প্রবেশ করা। পাত্তানী শহর থেকে 'কাতান টেপাংগো' সত্তর আশি কিলোমিটারের বেশি নয়। এই 'কাতান টেপাংগো' আসতেই তাকে ৭০০ কিলোমিটার ঘুরতে হবে, তাও ভিন দেশের মধ্যে দিয়ে। চিন্তা ভাবনা করেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে আহমদ মুসা। থাই গোয়েন্দা বিভাগও আহমদ মুসার সাথে

একমত হয়েছে। পাত্তানী শহর থেকে কাতান টেপাংগো যাবার দুটি পথের বিবেচনা করে দেখা হয়েছে। জল পথে গেলে কাতান হ্রদ বা জলাভূমি পর্যন্ত পৌছার খবর পেয়ে যাবে ব্ল্যাক ঈগল। অন্যদিকে কাঁচা একটা পথ পাত্তানী থেকে কাতান টেপাংগো'র পাশ পর্যন্ত গেছে। কিন্তু এ পথ সম্পূর্ণটা বলতে গেলে আন্ডার ওয়ার্ল্ডের দখলে। এ পথে পা দিলেই সে খবর কাতান টেপাংগো পৌছে যাবে। কিন্তু ব্ল্যাক ঈগলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কাতান টেপাংগো পৌছুতে হবে যাতে বড় ধরনের রক্তপাত এড়ানো যায় এবং বাঁচানো যায় জাবের জহীর উদ্দিনকে। এ অবস্থাতেই হাটাই সুংগাই রোড ধরে মালয়েশিয়ায় প্রবেশ করে সুংগাই থেকে পাত্তানীর সীমান্ত শহর বেতাংগে গিয়ে সেখান থেকে পেছন দিক দিয়ে 'কাতান টেপাংগো' প্রবেশের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনা ও রুট নির্বাচন আহমদ মুসার এবং আহমদ মুসাই এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। বেতাংগ থেকে 'কাতান টেপাংগো'র রাস্তা অজ্ঞাত, অনিশ্চিত ও দুর্গম। মালয়েশিয়ার সুংগাই থেকে আসা কাঁচা রাস্তা বেতাংগ হয়ে কাতান পর্বত শ্রেণীর অনেক নিচে জংগলের মধ্য দিয়ে উত্তর দিকে এগিয়ে, পরে পূর্ব দিকে ফিরে পাত্তানী শহর পর্যন্ত গেছে। এ রাস্তা দিয়ে কাতান টেপাংগো যাওয়া যায় না। কাতান টেপাংগো যাওয়ার অজ্ঞাত পথ কাতান পাহাড়ের উপর দিয়ে। জনশ্রুতি অনুসারে কাতান পাহাড়ের এই পথ থেকে এক সুড়ংগ পথে কাতান টেপাংগো যাওয়া যায়। কাতান পাহাড়ের এক সময়ের এই রাস্তা অব্যাহত ভূমিকম্পে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই রাস্তার সন্ধান দিতে পারে শুধু পাহাড়ের সন্তান বলে কথিত 'কোহেতান (কাতান) কবির' বংশের কোন লোক। এরা এখনও পাহাড়ের বাস করে, পাহাড়ে পাহাড়েই ঘুরে বেড়ায়। বেতাংগ শহরের উত্তরাংশের একটি পাহাড়ে ওদের একটা ষ্টেশন আছে। এখানে ওদের কেউ না কেউ থাকে। আহমদ মুসাকে এই ঠিকানা খুঁজে বের করতে হবে। 'কোহেতান কবির'দের কারও সাহায্য নিতে হবে সামনে এগুবার জন্যে। এদিকে আহমদ মুসার এই অভিযান একেবারেই অনিশ্চিত যাত্রা। বেতাংগ পর্যন্ত পৌছে তাকে একেবারেই ভাগ্য, মানে আল্লাহর সাহায্যের উপর ভরসা করতে হবে।

এই চিন্তার মধ্যেই আহমদ মুসা পৌছে গেল হাটাই শহরে।

ছোট্ট হেলিকপ্টারটি তাকে পুলিশ অফিসের একটি মাঠে নামিয়ে দিল।

এখান থেকেই একলা যাত্রা আহমদ মুসার। নির্দেশিকা অনুসারে এখান থেকে একটা বাহন যোগাড় করে তাকে হাটাই সেন্ট্রাল রোডের ৯ নম্বর সরকারি গাড়ির পুলে যেতে হবে।

আহমদ মুসা মাঠ থেকে বেরিয়ে অটোরিক্সা যোগাড় করে ছুটল সেন্ট্রাল রোডের দিকে।

সেন্ট্রাল পুলে গিয়ে আহমদ মুসা দেখল, যেমন বলা হয়েছে ঠিক তেমনিভাবে নাম্বার ওয়ান পার্কিং লোকেশানে একটি ল্যান্ড ক্রুজার জীপ দাঁড়িয়ে আছে। চাবী ঝুলছে গাড়ির কী হোলে।

আহমদ মুসা দরজা খুলে গাড়িতে প্রবেশ করে প্রথমেই পকেট থেকে লাইটার বের করে বটমের একটি ক্ষুদ্র সাদা সুইটে চাপ দিল। সংগে সংগেই টপে একটা নীল আলো জ্বলে উঠল। নিশ্চিত হলো আহমদ মুসা যে অন্তত ২৫ বর্গফুট এলাকার মধ্যে কোন বিস্ফোরক নেই।

আহমদ মুসা লাইটারটি পকেটে রেখে দিল।

লাইটারটি অনেক কাজের। এটি একই সংগে লাইটার, ডিটেক্টর, ক্যামেরা, লেসারগান এবং রেডিও রিসিভার ট্রান্সমিটার।

লাইটারটা তাকে গিফট করেন থাই সহকারী গোয়েন্দা প্রধান পুরসাত প্রজাদিপক।

চাবি ঘুরিয়ে ড্যাশ বোর্ডে কেবিন খুলল আহমদ মুসা। তার নতুন পাসপোর্ট এখানেই থাকার কথা। পাসপোর্ট পেয়ে গেল আহমদ মুসা।

থাইল্যান্ডের এই পাসপোর্টে আহমদ মুসার নাম আহমদ মুসাই লেখা হয়েছে। পাসপোর্টে মালয়েশিয়ার ভিসা লাগানো রয়েছে।

পাসপোর্ট পকেটে পুরে গাড়ি ষ্টার্ট দিল আহমদ মুসা।

গাড়ি নেমে এল রাস্তায়।

হাটাই-সুংগাই রোড ধরে মালয়েশিয়া বর্ডারের দিকে এগিয়ে চলল আহমদ মুসার জীপ।

হাতঘড়ির দিকে তাকাল আহমদ মুসা। সকাল ১০টা।

আহমদ মুসার লক্ষ্য এই হাইওয়ের শেষ প্রান্ত সুংগাই পেতানী। আহমদ মুসা তিনটার মধ্যে সেখানে পৌছুতে চায়। মাঝখানে থাই-মালয়েশিয়া বর্ডারে এবং যোহরের নামাযের জন্যে তাকে থামতে হবে।

হাটাই শহর থেকে বেরুনোর পর হাইওয়ে ধরে তার গাড়ি তীব্র গতিতে চলতে শুরু করল। শীঘ্রই গতির কাটা ১০০ কিলোমিটার অতিক্রম করল।

বেতাংগ শহরের উত্তরাংশের সোগা কাতান পাহাড় খুঁজে পেয়েছে আহমদ মুসা। কিন্তু 'কোহেতান কবীর' পরিবার নামের কোন পরিবার খুঁজে পায়নি।

পাহাড়টি খুব ছোট নয়। ঝোপ, জংগল, ফল বাগান, সবজি বাগান, বাজার, প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদির বাইরে কয়েকশত পরিবারের বাস এই পাহাড়ে।

আহমদ মুসা গোটা পাহাড় ঘুরে বেড়িয়েছে। একে ওকে কোহেতান কবির পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছে। কিন্তু তারা কিছু বলতে পারেনি।

ভাষা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্থানীয় লোকরা অপভ্রংশ মালয়ী ও অপভ্রংশ আরবী মেশানো ভাষায় কথা বলে। লিখিত ভাষা ও কথ্য ভাষার মধ্যে এত পার্থক্য যে কোন কোন ক্ষেত্রে কথ্য শব্দ একেবারে নতুন রূপ নিয়েছে।

বেতাংগে পৌছার পরদিন ছিল শুক্রবার।

আহমদ মুসা সোগা কাতান পাহাড়ে ঘুরছিল। ঘুরতে ঘুরতে সে একটা রোড সাইড রেষ্টুরেন্টে বসে চা খেতে খেতে একজন যুবকের সাথে আলাপ করছিল। আহমদ মুসা কথার এক ফাঁকে তাকে 'কোহেতান কবির' পরিবারের কথা জিজ্ঞেস করে। সে জানায় যে, এ ধরনের কোন পরিবারের নাম সে শুনেনি। সে আরও জানায়, এখানে আসল নাম অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় না। ডাক নামই আসল নাম হয়ে যায়। তারা যে পাহাড়ী পরিবার একথা আহমদ মুসাকে জানায়। সে বলে, এখানে সব পরিবারের শেকড় পাহাড়ে। কিন্তু পাহাড়কে তারা এখন

ভুলেছে। অবশ্য দুএকটি পরিবার আছে, যাদের কাছে পাহাড়ই এখনও তাদের আবাস।

এ সময় আজানের শব্দ ভেসে আসে।

আহমদ মুসা হাতঘড়ির দিকে তাকায়। বেলা ১২টা।

'মসজিদ এখান থেকে কত দূর?' আহমদ মুসা জিজ্ঞেস করে যুবককে।

'এই পাহাড়েরই অল্প কিছু উত্তরে। কেন মসজিদে যাবেন? আজ জুমআর দিন এজন্য?' বলে যুবকটি।

'আমি মুসলমান কেমন করে জানলে?' জিজ্ঞেস করে আহমদ মুসা।

'কপালে সিজদার দাগ ছাড়াও চেহারা দেখেই আমি বুঝেছি। মুসলমানদের চেহারায় একটা পবিত্র লাবণ্য থাকে। আপনার চেহারায় তা আরও বেশি। চিনব না কেন?' যুবকটি বলে।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'তুমিও কি যাবে মসজিদে?'

'অবশ্যই যাব। না গেলে আগামী শুক্রবারে জবাবদিহী করতে হবে।' বলে যুবক।

'জুমআয় না গেলে জবাবদিহী করতে হয়? কার কাছে?' জিজ্ঞেস করে আহমদ মুসা।

'কেন মসজিদে একজন করে সরদার থাকেন। তিনি বংশের সরদারের চেয়েও শক্তিশালী।' বলে যুবক।

'তার কাজ কি?' বলে আহমদ মুসা।

'এলাকার মানুষদের সাপ্তাহিক দানে গড়ে ওঠা তহবিলের তিনি পরিচালক। সামাজিক বিচার-ফায়সালা করেন। এবং মানুষকে ইসলামী অনুশাসনের উপর থাকার ব্যাপারে তাকিদ করেন।' যুবকটি বলে।

'তহবিল দিয়ে কি কাজ হয়?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'তহবিলের কাজ তিনটি। মসজিদের সাথে একটা মক্তব আছে, সেটা চালানো। এলাকার দরিদ্র লোকদের স্বাবলম্বী হওয়ার কাজে সাহায্য করা এবং দরিদ্র শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার জন্য সাহায্য দেয়া।' যুবকটি বলে।

‘বাঃ সুন্দর ব্যবস্থা।’ বলে আহমদ মুসা। একথা শুনে আনন্দে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

যুবকটি উঠে দাঁড়ায়। বলে, ‘চলুন বিদেশী ভাই, আজান শোনা গেলেও জায়গাটা খুব কাছে নয়, যেতে কিন্তু সময় লাগবে। পাহাড়ে ওঠা-নামা ও অনেক বাঁক ঘুরে যেতে হবে।

বেশ বড় মসজিদটি। আহমদ মুসা দেখল, মেয়েরাও মসজিদে উপস্থিত। মসজিদের ডান দিকে বসেছে ছেলেরা, বাম দিকে মেয়েরা। মাঝখানে ৪ ফুটের মতো উঁচু পার্টিশন, কাপড়ের। খুশি হলো আহমদ মুসা। বহু মুসলিম দেশেও যা দেখা যায় না, তা এই জংগলের জনপদে এসে দেখতে পেল সে।

মসজিদে ঢুকে সুন্নাত নামায শেষ করে বসেই একটা গুঞ্জন শুনতে পায়। পাশেই বসেছিল সাথে আসা যুবকটি। তাকে জিজ্ঞেস করলে সে জানায়, ‘বিদেশী ভাইয়া, ইমাম সাহেব অসুস্থ। তিনি হাসপাতালে। সহকারী মৌলভীসাহেব নামায পড়াবার কথা ছিল, কিন্তু তিনি বাড়ি গিয়েছিলেন, আসার পথে দূর্ঘটনায় পড়ে তিনিও হাসপাতালে। এখন খুতবা পড়ার লোক নেই। এখন যোহর পড়বে কিনা, সেই আলোচনা চলছে।’

শুনেই আহমদ মুসা বলে, ‘যোহর পড়ার দরকার নেই। খোতবা পড়ার কেউ না থাকলে আমি পড়াতে পারি।’

শুনে যুবকটি দারুণ খুশি হয়ে ওঠে। সে দ্রুত উঠে সরদারের কাছে চলে যায় এবং তাকে বিষয়টা বলে।

সরদার স্বয়ং যুবকটির সাথে আহমদ মুসার কাছে আসে।

সরদার ৭০ উর্ধ্ব সম্পূর্ণ সফেদ কেশধারী হলেও তার স্বাস্থ্য অটুট। সে আহমদ মুসাকে স্বাগত জানিয়ে বলে, ‘আমরা খুব খুমি হবো বাবা তুমি জুমআ পড়িয়ে দিলে। এই মসজিদের একশ’ বছরের ইতিহাসে আজকের মতো ঘটনা ঘটেনি।’

আহমদ মুসা সবিনয়ে বলে, ‘আপনাদের অনুমতি হলে আমি পড়িয়ে দেব।’

খুশি হয়ে সরদার উঠে দাঁড়ায় এবং তার জায়গায় ফিরে গিয়ে সবার উদ্দেশ্যে বলে, 'আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। একজন মেহমান এসেছেন। তিনি জুমআর নামায পড়াবেন। নামাযের সময় হয়ে গেছে। আমি তাঁকে মিম্বরে আসার অনুরোধ করছি।'

আহমদ মুসা উঠে গিয়ে সবাইকে সালাম দিয়ে মিম্বরে বসে।

মুয়াজ্জিন খোতবার বই আহমদ মুসার হাতে দিয়ে আযান দিতে চলে যায়। আহমদ মুসা উঠে দাঁড়ায় খোতবা দেবার জন্যে।

হাতের খোতবার বই দেয়ালের তাকে রেখে খোতবা শুরু করে আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার আরবী উচ্চারণ অত্যন্ত মিষ্টি এবং তেলাওয়াত মর্মস্পর্শী।

আহমদ মুসা হামদ, সানা ও তেলাওয়াতের পর মালয়, আরবী ও ইংরেজী মেশানো ভাষায় তার খোতবায় দুটি বিষয় তুলে ধরে। এক. জান্নাতের পথ কঠিন কেন এবং জাহান্নামের পথ সহজ কেন। দুই. দুনিয়াতে মুসলমানরা আজ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পদানত হওয়ার মূল কারণ কি। প্রথম বিষয়ের উপর আহমদ মুসা একটা হাদীস বর্ণনা করে বলে, অনন্ত সুখের জান্নাত দুঃখ, বেদনা, ত্যাগ, কোরবানীর সাগর দিয়ে ঘেরা, অন্যদিকে অনন্ত দুঃখ ভোগের জাহান্নাম ভোগ-লিপ্সার আকর্ষণ দিয়ে সাজানো। জান্নাতের চারদিকের দুঃখ, ত্যাগ-কোরবানীর সাগর পাড়ি দিতে ধৈর্য প্রয়োজন, লোভ সম্বরণ প্রয়োজন। অনেকেই এটা পারে না বলে তাদের জন্যে জান্নাতের পথ কঠিন হয়ে যায়। আর জাহান্নামের চারদিকে সাজানো ভোগ-লিপ্সার আকর্ষণ অধিকাংশ মানুষই উপেক্ষা করতে পারে না। এরাই গিয়ে জাহান্নামের আগুনে পুড়ে যেমন পতঙ্গ প্রদীপের আগুনে গিয়ে আত্মাহুতি দেয়। ইতিহাস থেকে নানা উপমা ও দৃষ্টান্ত তুলে ধরে আহমদ মুসা তার আলোচনাকে প্রাণস্পর্শী করে তোলে। দ্বিতীয় বিষয়ের আলোচনায় আহমদ মুসা বলে, ভালো কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের প্রতিরোধের দায়িত্ব ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিত্যাগ করে মুসলমানরা যখন অন্যায়, অসত্য, জুলুম, নির্যাতনের সাথে গলাগলি করে দুনিয়ার সমৃদ্ধি সন্ধান করে, তখন নৈতিক বা আদর্শিক শক্তির বিলয় ঘটে। আদর্শিক শক্তির অনুপস্থিতি

মুসলমানদের অর্থনৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তির পতন ত্বরান্বিত করে। এভাবেই ন্যায়েল শক্তি যখন আমরা হারালাম, তখন অন্যায়ের শক্তি এসে আমাদের গ্রাস করল।

আহমদ মুসার এই খোতবা এতই দরদ মাখা ছিল যে মুসলিস্নদের অধিকাংশই অশ্রুসিক্ত হয়।

নামায শেষ হলে প্রথমেই সরদার এসে আহমদ মুসার সাথে কোলাকুলি করে এবং দাওয়াত দেয় আহমদ মুসাকে তার বাসায়। উল্লেখযোগ্য সবাই এসে আহমদ মুসার সাথে সালাম বিনিময় করে। কেউ কেউ দূর থেকে তাকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চলে যায়। আহমদ মুসা চাইছিল কোহেতান কবির পরিবারের কথা সরদারকে কিংবা কাউকে জিজ্ঞেস করে। কিন্তু সেরকম সুযোগ  সে পায় না। অবশেষে সে ভাবে, ইতিমধ্যে কিছু না হলে দাওয়াত খেতে গিয়ে সে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবে।

তৃতীয় দিনের বিকেল।

আহমদ মুসা হাঁটছিল প্রশস্ত একটা উপত্যকার পথ ধরে।

দু'পাশেই ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে যাওয়া উঁচু টিলা জাতীয় পাহাড়। খুব উঁচু নয় কিন্তু প্রশস্ত। এটাই সোগা কাতান পাহাড়। আহমদ মুসা ঘুরে ফিরে এখানেই ছুটে আসে।

আজও এসেছে সেভাবেই। আহমদ মুসা ধীরে ধীরে হাঁটছিল।

হঠাৎ সূর্যের আলো উবে গেল।

আহমদ মুসা তাকাল আকাশের দিকে।

দেখল টস টসে পানি ভরা মেঘ। এ মেঘ যে কতটা বিপজ্জনক, তিন দিনে টের পেয়েছে আহমদ মুসা। এ মেঘ মাথার উপর আসা মানে বালতি থেকে পানি ঢালার বেগে বৃষ্টি এসে ছেঁকে ধরা।

আহমদ মুসা পাহাড়ের আশ্রয়ে উঠার জন্যে দৌড় দিল।

অনেক খানি উঠে গেল পাহাড়ে।

পাহাড় শীর্ষের শুরুতেই বড় টিলার শীর্ষে একটা সুন্দর বাড়ি। পাহাড় শীর্ষের টিলাগুলোর মধ্যে এই টিলাই সবচেয়ে বড় এবং বাড়িটাও বড় সবার চেয়ে।

ঘুরাঘুরির সময় কয়েকবার দেখেছে সে এ বাড়িটা।

বড় বড় ফোটায় অঝোর ধারায় বৃষ্টি নেমে এল।

আহমদ মুসা যখন দৌড়ে বাড়িটার বারান্দায় উঠল, তখন আধাভেজা হয়ে গেছে সে।

বারান্দাটা আসলে বাড়ির গেটের সামনের ষ্টান্ডিং স্পেস।

বারান্দায় উঠে মুখ তুলতেই বড় দরজার মুখোমুখি হলো আহমদ মুসা।

দরজার পাশেই একটা কাঠের প্লেট দেয়ালের সাথে সেঁটে রাখা আছে। এটা একটা নেমপ্লেট। তাতে মালয়ী ভাষায় লেখা 'কবিলা আল কাতান'।

নেমপ্লেটটি পড়ে আহমদ মুসা তার চোখ ফিরিয়ে আনল দরজার উপর।

ঠিক এই সময়ই দরজা আস্তে আস্তে খুলে গেল।

খোলা দরজায় দাঁড়ানো এক তরুণী। পরনে পাজামা। গায়ে কামিজের উপর ওড়না। মাথায় মালয়েশীয় পরদার রুমাল। ফর্সা ও বুদ্ধিদীপ্ত মালয়ী চেহারা।

দরজা খুলেই সালাম দিয়েছে তরুণীটি।

তার চোখে-মুখে কিছুটা বিস্ময়, কিছুটা লজ্জা,কিছুটা আনন্দ।

সালাম দিয়েই তরুণীটি বলল,'ভেতরে আসুন স্যার। ভিজে গেছেন। বৃষ্টির ঝাপটা বারান্দায়ও আসছে। আরও ভিজে যাবেন।' পরিষ্কার ইংরেজি ভাষা মেয়েটির কণ্ঠে।

'ধন্যবাদ' বলে আহমদ মুসা ভেতরে ঢুকল।

মেয়েটি একপাশে সরে দাঁড়িয়েছিল।

ঘরটা প্রায় ফাঁকাই।

ঘরে ঢুকেই ডান দিকে দেয়ালের পাশে জুতো রাখার র‍্যাক। সামনের দেয়ালের পাশে একটা আলনা দেখতে পেল। চারদিকের দেয়ালে সাঁটা কয়েকটা

হ্যাংগার। ঘরের মাঝখানে কাঠের টেবিল। তার চারপাশে চেয়ার। বার্নিস করা সুন্দর চেয়ার টেবিল।

ঘরটা যে ট্রানজিট বুঝল আহমদ মুসা। জুতো ও বাড়তি কাপড় এখানে ছাড়া হয়। ভেতরে প্রবেশের আগে অনেক সময় আগন্তুককে এখানে ওয়েটও করতে হয়।

আহমদ মুসা ভেতরে ঢুকল মেয়েটি দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল। ঘরের বাম পাশে একটা দরজার দিকে ইংগিত করে বলল, 'স্যার ওদিকে ড্রইং, চলুন।'

মেয়েটির চোখে-মুখে একটা অন্তরঙ্গ ভাব। চেনা-জানার একটা ছাপ সেখানে।

বিস্মিত আহমদ মুসা বলল, 'মনে হচ্ছে আপনি আমাকে চেনেন। কিন্তু আমি আপনাকে কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না।'

আহমদ মুসা জুতো খুলে র‍্যাকে রাখতে রাখতে বলল।

মেয়েটি কোন জবাব না দিয়ে বলল, 'স্যার আপনি জ্যাকেটটাও খুলতে পারেন। ওটা বেশি ভিজে গেছে।'

সত্যি ভিজা জ্যাকেটে অস্বস্তি লাগছিল আহমদ মুসার। খুশি হয়ে আহমদ মুসা জ্যাকেট খুলে দেয়ালেল হ্যাংগারে ঝুলাল।

মেয়েটি 'আসুন স্যার' বলে তখন হাঁটতে শুরু করেছে।

মেয়েটির পেছনে পেছনে আহমদ মুসা ড্রইং রুমে প্রবেশ করল।

বিশাল ড্রইং রুম।

লাল কার্পেটের উপর লাল সোফাসেট সাজানো।

ড্রইং রুমের আরেক অংশে কার্পেটের উপর পুরু ফরাশ এবং সোফসেট পাতা।

'স্যার আমাদের পাহাড়ি কায়দার ফরাশ এবং ইংরাজী কায়দার সোফাসেট দুই-ই আছে। স্যার সোফাসেট আমার পছন্দ, আপনারও নিশ্চয় তাই। বসুন স্যার।' একটা সোফা দেখিয়ে বলল মেয়েটি।

মেয়েটির কথা বলায় কোন আড়ষ্টতা নেই। কণ্ঠ সংযত, ভদ্র। চেহারায় পাহাড়ি লজ্জার পুরু ছাপ, কিন্তু কথাগুলো স্পষ্ট, খোলামেলা। বিস্মিত হলো আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা বসল।

'স্যার গতকাল আপনাকে আমি মসজিদে দেখেছি। জুমআর খোতবা দিয়েছিলেন, নামায পড়িয়েছিলেন। ইসলামকে আপনি উত্তর আধুনিক ভাষায় তুলে ধরেছেন স্যার। এমন খোতবা শুনিনি কখনও। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

কথা শেষ করে একটু থেমেই আবার বলে উঠল, 'স্যার একটু বসুন। আমি দাদুকে ডাকি।'

বলে দৌড় দিল মেয়েটি।

আহমদ মুসা আরেকবার তাকাল ড্রইং রুমের চারদিকে। ঐতিহ্য ও আধুনিকতায় সাজানো ঘর। সামনের দেয়ালে একটা দীর্ঘ পাহাড় শ্রেণীর দৃশ্য। কাতান পাহাড়ই হবে এটা, ভাবল আহমদ মুসা। অন্যপাশের দেয়ালে একটি নগরীর সুন্দর দৃশ্য। নিশ্চয় এটা বেতাংগ নগরী।

ঘরে ঢুকল সৌম্য দর্শন একজন বৃদ্ধ।

তার দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠল আহমদ মুসা। এ যে মসজিদের সেই সরদার, যে তাকে দাওয়াত করেছিল।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়েছিল। মুখ তার হা হয়েছিল সালাম দেয়ার জন্যে। কিন্তু সরদারের মুখে সালাম উচ্চারিত হয়েছে।

সরদার এসে হ্যান্ডশেক করল আহমদ মুসার সাথে। বলল, 'খুব খুশি হয়েছি এভাবে তোমাকে আমার বাসায় পেয়ে।'

থামল মুহূর্তের জন্যে। আবার বলে উঠল,'অনেক সম্মানী, অনেক জ্ঞানী, অনেক বড় কেউ তুমি, কিন্তু আমার নাতির মতো। তোমার মতোই আমার এক নাতি কি এক পাহাড়-বিদ্যায় পাশ করে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায়। অতএব সেদিন তোমাকে 'তুমি' বলেছি, আজও বলছি।'

'অবশ্যই জনাব। আমি খুশি হবো'। আহমদ মুসা বলল।

সরদার আহমদ মুসাকে বসতে বলে নিজেও বসল।

বসেই বলল সরদার, 'আমি জামাল উদ্দিন আল কাতানী। কবিলা আল-কাতানের আমি বর্তমান সরদার। পাহাড়েই আমাদের বাড়ি। শুক্রবারসহ সপ্তাহের দু'একদিন আমি এ বাড়িতে থাকি।'

থামল সরদার জামাল উদ্দিন।

'আমি আহমদ মুসা। গত পরশু পাত্তানী থেকে আমি এখানে এসেছি।' বলল আহমদ মুসা। মনে মনে ভাবল গোপন করে আর লাভ নেই। ব্ল্যাক ঈগল তার পরিচয় জেনে গেছে। আর যারা আহমদ মুসাকে জানে না, তাদের কাছে আসল-নকলের কোন পার্থক্য নেই।

'কিন্তু তুমি তো থাইল্যান্ডের নও। তোমার আরবী, ইংরেজি, মালয় উচ্চারণ থেকে বুঝেছি তুমি আশে-পাশের কোন দেশেরও নও। তাহলে তোমার বাড়ি কোথায়?' জিজ্ঞাসা সরদারের।

সেই মেয়েটি চা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল।

কথা শেষ করেই সরদার বলল, 'দাও বোন চা দাও।'

মেয়েটি পাশের একটি টি-টেবিলে চায়ের ট্রে রেখে দুই কাপে চা ভরে একটি সরদার, অন্যটি আহমদ মুসার দিকে এগিয়ে দিল।

সরদার মেয়েটির দিকে ইংগিত করে বলল, 'এ আমার নাতনী আলিয়া কাতানী। তোমার সাথে তো আগেই দেখা হয়েছে। ও কুয়ালামপুরের ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটিতে 'ভাষাতত্ব' বিষয়ে পড়ে। মসজিদে তোমার বক্তৃতা শুনে ও দারুণ অভিভূত হয়েছে। ও বলছে, ইসলামের উপর বক্তৃতা সে কুয়ালামপুরে প্রায়ই শোনে। কিন্তু এমন বক্তৃতা নাকি সে..........।'

'থাম দাদু। সাক্ষাতে এত প্রশংসা করতে মানা আছে।' সরদারের কথার মাঝখানেই বলে উঠল আয়েশা আলিয়া কাতানী। লজ্জায় তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে। তৃতয়ি একটা কাপে চা ঢেলে নিয়ে দাদুর ওপাশের এক সোফায় গিয়ে সে বসল।

'আয়েশা ঠিক বলেছে।' আহমদ মুসা বলল।

'আমি খুশি। ও বড় পন্ডিত হবে।'

বলেই সরদার জামাল উদ্দিন কাতানী দৃষ্টি ফেরাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'ভাই, আমি তোমাকে দাওয়াত করে রেখেছি মাত্র। কিন্তু বৃষ্টি তোমাকে নিয়ে এসেছে এখানে। নিশ্চয় তুমি চিনে বাড়িতে ওঠনি!'

'জ্বি না। তবে এই বাড়ি আগে দেখেছি। গত কয়েকদিন ধরে এই পাহাড়ে আমি ঘুরছি।' আহমদ মুসা বলল।

'এই পাহাড়ে? কেন?' জিজ্ঞাসা জামাল উদ্দিন কাতানীর।

সংগে সংগে উত্তর দিল না আহমদ মুসা।

চোখ তুলে তাকাল একবার বৃদ্ধ জামাল উদ্দিন কাতানীর দিকে। তার মনে হলো, তার অনুসন্ধান সম্পর্কে বলার উপযুক্ত জায়গা এটা হতে পারে।

মুহূর্তকালের এই ভাবনার পর আহমদ মুসা বলল, 'আমি একটা পরিবারকে খুঁজছি জনাব।'

'একটা পরিবার? কোন পরিবার?' বলল সরদার জামাল উদ্দিন। তার চোখে-মুখে কৌতুহল।

আয়েশা আলিয়া কাতানীও উদগ্রীব হয়ে উঠেছে।

'কাতান পাহাড়ের একটা পরিবার। শহরের এই পাহাড়েও তাদের একটা ঠিকানা আছে। পরিবারের নাম কোহেতান কবীর।'

নাম শোনার সংগে সংগে চমকে উঠল সরদার জামাল উদ্দিন কাতানি। ভ্রু কুচকালো আয়েশা আলিয়া কাতানীরও।

'কেন খুঁজছো ঐ পরিবারকে? পরিচয় আছে ওদের সাথে?' বলল সরদার জামাল উদ্দিন কাতানী। তার চোখে-মুখে বিস্ময়।

'না পরিচয় নেই। ওদের নাম জানি এবং কিছু জানি ওদের সম্পর্কে।' আহমদ মুসা বলল।

'তুমি পাত্তানী শহর থেকে এসেছ বললে। কার কাছ থেকে শুনেছ ওদের সম্পর্কে?' বলল সরদার জামাল উদ্দিন।

'কিছু শুনেছি পাত্তানীর শাহ পরিবারের কাছ থেকে, কিছু শুনেছি থাই গোয়েন্দা বিভাগের কাছ থেকে।' আহমদ মুসা বলল।

‘শাহ পরিবারকে তুমি চেন? কাকে চেন?’ সরদার জামাল উদ্দিনের চোখে সন্দেহের ছায়া। তার কণ্ঠ তীক্ষ্ণ।

‘শাহজাদী যয়নব যোবায়দাকে চিনি। তার দাদীমাকেও জানি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ওদের সম্পর্কে আর কি জান?’ বলল সরদার জামাল উদ্দিন দ্রুতকণ্ঠে।

আহমদ মুসার ঠোঁটে অস্পষ্ট একটা হাসি ফুটে উঠেছে। সে নিশ্চিত যে, এই কাতানী পরিবার ‘শাহ পরিবার’কে চেনে। তাহলে এরা কি ‘কোহেতোন কবির’ পরিবারকেও চিনতে পারে? বলল আহমদ মুসা, ‘শাহজাদী যয়নব যোবায়দার ভাই জাবের বাংগসা জহীর উদ্দিন থাই সরকারের হাতে বন্দী ছিল। ব্ল্যাক ঈগল তাকে ছিনিয়ে এনেছে থাই সরকারের কাছ থেকে। এখন সে ব্ল্যাক ঈগলের হাতে বন্দী। শুধু বন্দী নয়, তার জীবন বিপন্ন। ব্ল্যাক ঈগলের লোকজনকে যদি থাই সরকার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ছেড়ে না দেয় তাহলে জহীরকে ব্ল্যাক ঈগলরা হত্যা করবে।’

থামল আহমদ মুসা।

বিস্ময়, উত্তেজনা ও সন্দেহের ঝড় বইছে সরদার জামাল উদ্দিনের চোখে-মুখে। আয়েশা আলিয়া কাতানীও যেন বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ।

সরদার জামাল উদ্দিনের বিস্ময় হলো, আহমদ মুসা এসব কি বলছে! অবশ্য সরদার জামাল উদ্দিনরাও থাই টিভি ও পত্র-পত্রিকা থেকে জেনেছে ব্ল্যাক ঈগল ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম দিয়েছে তাদের লোককে না ছাড়লে তারা জাবের জহীর উদ্দিনকে হত্যা করবে। এটা তো থাই প্রপাগান্ডা বলেই সরদার জামাল উদ্দিনরা জানে। কিন্তু আহমদ মুসাও ঠিক থাই সরকারের মতোই কথা বলছে। সে থাই গোয়েন্দা কিংবা থাই এজেন্ট? কিন্তু এত ভালো লোক এই পথে কিভাবে যায়!

সতর্ক হলো সরদার জামাল উদ্দিন। বলল, ‘ব্ল্যাক ঈগলকে তোমরা কোত্থেকে পেলে? জাবের জহীর উদ্দিনকে তো মুক্ত করেছে ‘মুজাহেদীন পাত্তানী মুভমেন্ট’ (এমপিএম) এবং জাহের জহীর উদ্দিন এখন এমপিএম-এর সাথে থেকে থাই নীপিড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করছে।’

'না জনাব। জাহের জহীর উদ্দিন ব্ল্যাক ঈগলের হাতে বন্দী আছে। আর এমপিএম এখন সশস্ত্র বা হিংসাত্মক আন্দোলনে নেই। তাদের নাম ভাক্সিয়ে ব্ল্যাক ঈগল ষড়যন্ত্রমূলখ কাজে রত আছে।' আহমদ মুসা বলল।

'ব্ল্যাক ঈগল কে?' সরদার জামাল উদ্দিনের প্রশ্ন।

'আন্তর্জাতিক একটি ষড়যন্ত্রকারী সংস্থা। থাইল্যান্ডে এদের কাজ হলো নিজেরা থাই পুলিশ, থাই আর্মির বিরুদ্ধে সন্ত্রাস করে তার দায় মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দেয়া। সে কারণে থাই পুলিশরা মুসলমানদের উপর নীপিড়ন শুরু করে, আর মুসলমানরা থাই সরকারের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হয়। এভাবে থাই মুসলমানদের তারা ধ্বংস করতে চায়।' বলল আহমদ মুসা।

'তোমার কথা যে ঠিক এবং এরা ব্ল্যাক ঈগল তার প্রমাণ কি?' সরদার জামাল উদ্দিন বলল। তার গলায় অসন্তুষ্টির সুর।

আহমদ মুসা তাকাল সরদার জামাল উদ্দিনের দিকে। বলল, 'আপনার কণ্ঠে কিছুটা বিরক্তি, কিছুটা অসন্তুষ্টি দেখতে পাচ্ছি। আপনি যে প্রশ্ন করছেন তার জবাব দেব। কিন্তু আপনি যদি সত্য জানার জন্যে প্রস্তুত থাকেন, তাহলে শুধু বলব।'

গম্ভীর হয়ে উঠল সরদার জামাল উদ্দিন। বলল, 'তুমি আমার জানা ও বিশ্বাসের বিপরীত কথা বলছ। তবে মনে রেখ, আমার ধর্ম এবং সত্য আমার কাছে সব চেয়ে বড়।'

'ধন্যবাদ জনাব' বলে কথা শুরু করল আহমদ মুসা, 'প্রমাণের কথা যেহেতু বলেছেন, আমাকে অনেক কথা বলতে হবে। আমি থাইল্যান্ডে আসার গত কয়েক সপ্তাহে যা ঘটেছে সব কথাই এর মধ্যে আসবে। কিন্তু সেদিকে না গিয়ে আমি ওদের তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলব। এক. ওরা পকেট মেশিনগানসহ এ ধরনের যে অস্ত্র ব্যবহার করে, তাতে খোদাই করা সাংকেতিক অক্ষর ও নাম্বার হিব্রু ভাষায় লেখা। তার মানে এ অস্ত্রগুলো ইসরাইলে তৈরি, দুই. 'মুজাহেদীন পাত্তানী মুভমেন্ট' (এমপিএম) নামের কভারে 'ব্ল্যাক ঈগল'এর যারা বাইরে থেকে এসে থাইল্যান্ডে কাজ করছে, তাদের অধিকাংশই আরব বংশোদ্ভুত, আরবী ভাষায় ফ্লুয়েন্ট কথা বলতে পারে এবং নামও আরবীয় তাদের, কিন্তু তারা

মুসলমান নয়, এবং তিন. তারা তাদের চিঠিপত্রে, বিভিন্ন ডকুমেন্টে এবং তাদের জামা ও জ্যাকেটের কলার ব্যান্ডের ভেতরের অংশে পরিচয়মূলক যে মনোগ্রাম ব্যবহার করে সে মনোগ্রামের কেন্দ্রবিন্দুতে ব্ল্যাক ঈগল। ব্ল্যাক ঈগল বসে আছে মুসলমানদের প্রতীক অর্ধচন্দ্রের বুকের উপর। আর ঈগলের মাথার উপর রয়েছে ইসরাইলের ৬ কোণা তারকা।' থামল আহমদ মুসা।

সরদার জামাল উদ্দিনের চোখে-মুখে প্রবল বিস্ময়। সে একবার চাইল আয়েশা আলিয়া কাতানীর দিকে। একটু চিন্তা করল। তারপর উঠে দাঁড়াল।

ভেতরে হাঁটা শুরু করে বলল, 'আহমদ মুসা তুমি একটু বস। আর আয়েশা বোন তুমি একটু আমার সাথে এস।'

আয়েশা আলিয়া কাতানীও উঠে দাদুর সাথে ভেতরে গেল।

দু'জনের মুখই গম্ভীর।

সরদার জামাল উদ্দিন গিয়ে ঢুকল নাতি আবদুল কাদের কামাল উদ্দিনের কক্ষে।

'দাদু তুমি ভাইয়াকে দেয়া তাদের মেশিনগান ও বুলেট প্রুফ জ্যাকেটটা দেখবে নাকি?' বলল আয়েশা আলিয়া কাতানী।

'হ্যাঁ বোন। আহমদ মুসা হয় ইবলিস শয়তানের চেয়েও বড় কেউ, অথবা জিবরাইলের মতো সৌভাগ্যের কোন ফেরেশতা। তার কথার বিষয়টা পরখ করা যাবে আমাদের আবদুল কাদের কামাল উদ্দিনের মেশিনগান ও ঐ জ্যাকেট থেকে।' সরদার জামাল উদ্দিন কাতানী বলল।

ওয়াল ক্যাবিনেট খুলে হ্যাংগার থেকে জ্যাকেট এবং ওয়াল ক্যাবিনেটের ভেতরের দেয়ালের গোপন কুঠরী থেকে হ্যান্ড মেশিনগান বের করে নিল।

দু'টি জিনিস টেবিলে রেখে দাদু ও নাতনি হুমড়ি খেয়ে পড়ল আহমদ মুসার কথার সত্যাসত্য পরখ করার জন্যে।

দেখল তারা হ্যান্ড মেশিনগান এবং জ্যাকেটের কলার ব্যান্ডের ভেতরের পাশ।

দু'জনেই মুখ তুলল।

বিস্ময়-বিস্ফোরিত দু'জনেরই চোখ।

আহমদ মুসা যা বলেছে হুবহু তারা তাই দেখতে পেল। হ্যান্ড মেশিনগানের গায়ে শুধু হিব্রু অক্ষর ও সংখ্যাই নয়, প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান 'ডেভিড বেনগুরিয়ান ষ্টিল ইঞ্জিনিয়ারিং' কোম্পানির নামও খোদাই করা হয়েছে। জ্যাকেটের কলার ব্যান্ডেও মনোগ্রাম তারা পেল ঠিক আহমদ মুসা যেমন বলেছে।

'দাদু উনি যা বলেছেন, ঠিক তেমনটাই তো পাওয়া গেল।' বলল আয়েশা আলিয়া কাতানী।

সরদার জামাল উদ্দিন আরও গম্ভীর হয়ে উঠেছে। তার কপাল কুঞ্চিত। ভাবছে সে। বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না বোন ঘটনা আসলে কি। মুজাহেদীন পাত্তানী মুভমেন্ট (এমপিএম) সম্পর্কে তার বক্তব্য মেনে নেয়া যায় না। কিন্তু তার উলেস্নখিত প্রমাণগুলোকেও উপেক্ষা করা যাচ্ছে না। দুটি প্রমাণ তো আমরা এখানে দেখলাম। আর মুজাহেদীন পাত্তানী মুভমেন্ট (এমপিএম) এর শীর্ষ যাদেরকে আমি দেখেছি তাদের বেশির ভাগই তো বিদেশী! কিন্তু মুসলমান নয়- এটা আমি মানতে পারছি না। শীর্ষ নেতা হাবিব হাসাবাহ একজন খুবই পরহেজগার মানুষ। আহমদ মুসার এই অভিযোগ অবিশ্বাস্য।'

'কিন্তু দাদু তার কথাগুলো যে সত্যি প্রমাণিত হলো, তার ব্যাখ্যা কি?' বলল আয়েশা আলিয়া।

'এখানে এসেই তো আমার সবকিছু গুলিয়ে যাচ্ছে। ছয় কোণা তারকা, ক্রিসেন্টের বুকের উপর ব্ল্যাক ঈগল এবং ইসরাইলের তৈরি অস্ত্র এসব ছোট বিষয় নয়।' সরদার জামাল উদ্দিন বলল।

কথা শেষ করেই চলতে শুরু করে বলল, 'এস আয়েশা বোন। ও একা বসে আছে।'

দু'জনেই ড্রইংরুমে ফিরে গেল।

আহমদ মুসার মুখে হাসি। বলল, 'আসুন জনাব। বসুন। আমার জন্যে কোন সুখবর আছে কি জনাব?'

গম্ভীর মুখ সরদার জামাল উদ্দিনের। আহমদ মুসার কথার জবাব না দিয়ে বলল, 'আচ্ছা বল, তোমার কথা যদি ঠিক হয়, ওরা যদি 'ব্ল্যাক ঈগল'ই হয়ে

থাকে, তাহলে পাত্তানীদের নেতা জাবের বাংগসা জহীর উদ্দিন ওদের সাথে এক হয়ে সংগ্রাম করছে কেন? এই তো সেদিন পাত্তানী শহরের উপকণ্ঠে ওদের এক অভিযানে জাবের বাংগসা জহীর উদ্দিন প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ঐ অভিযানে তিনি আহত হন। তার রক্তমাখা জামা থাই সৈন্যরা উদ্ধার করেছে। এর ছবি তারা সংবাদপত্রে প্রকাশও করেছে। এটা তুমি কি করে অস্বীকার করবে?'

আহমদ মুসা গম্ভীর হলো। সোজা হয়ে বসল। বলল, 'হ্যাঁ জনাব, আপনি যা বলেছেন, থাই সরকারও আমাকে এ কথাই বলেছিল। তারা আমাকে নতুনভাবে বুঝাতে চেষ্টা করছিল যে, আমি ঘটনাকে যেভাবে দেখছি সেটা ঠিক নয়। জাবের বাংগসা জহীর উদ্দিনকে তার দলের লোকরাই পুলিশের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে এবং সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে সে নিজে অংশগ্রহণ করছে। তার রক্তাক্ত জামা এর সর্বশেষ প্রমাণ। কিন্তু থাই সরকারের এ বক্তব্যের সাথে আমি একমত হইনি। আমি তাদের অনুরোধ করেছিলাম............।'

আহমদ মুসা আর সামনে এগুতে পারল না।

ড্রইং রুমের বাইরের দরজায় একটা শব্দ হয়েছে এবং তার সাথে একটা কণ্ঠ চিৎকার করে উঠেছে, 'থাম মিথ্যাবাদী। থাই সরকারের কুত্তা, এজেন্ট থাম।'

সবারই মাথা এক সাথে বোঁ করে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল সে শব্দ লক্ষে।

আহমদ মুসা দেখল একজন তরুণ যুবক। তার দুই হাতে দুই রিভলবার তাক করা আহমদ মুসার দিকে।

যুবকটি আহমদ মুসার ডান পাশ থেকে সোজা পূর্বে আট দশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে। আহমদ মুসা বসে আছে উত্তরমুখী হয়ে। তার সামনে সরদার জামাল উদ্দিন। তার পেছনে আয়েশা আলিয়া।

যুবকটিকে দেখে সরদার জামাল উদ্দিনের কণ্ঠ থেকে স্বগত একটা উক্তি বেরিয়ে এল, ভাই আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন!

আয়েশা আলিয়ার মুখ ফুটেও একটা স্বগোতুক্তি বেরিয়ে এসেছে, 'ভাইয়া।'

প্রথমটায় সরদার জামাল উদ্দিন ও আয়েশা আলিয়া দু'জনকেই বিস্ময় এসে ঘিরে ধরেছিল।

বিস্ময় থেকে মুক্ত হয়ে সরদার জামাল উদ্দিন তার নাতি আবদুল কাদের কামাল উদ্দিনকে লক্ষ্য করে দ্রুত কণ্ঠে বলল, 'কি করছ তুমি রিভলবার নামও। ইনি আমাদের মেহমান।'

'না দাদু ইনি মেহমান হতে পারেন না। এর ফটো আমি দেখেছি। এ খুনি বিভেন বার্গম্যান। এ পর্যন্ত এ আমাদের মুজাহেদীন পাত্তানী মুভমেন্টের প্রায় এক শতের মতো লোককে হত্যা করেছে। এর কারণেই গ্রেফতার হয়েছে আমাদের অর্ধশতের মতো লোক। একে দেখা মাত্র হত্যার নির্দেশ আছে।'

আবদুল কাদের কামাল উদ্দিনের দু'চোখ বারুদে আগুন লাগার মতো জ্বলছিল। তার কথা শেষ হওয়ার আগেই তার দুই তর্জনি দুই রিভলবারের ট্রিগারে চাপ বাড়াচ্ছিল।

আহমদ মুসার বাম পকেট থেকে তার বাম হাতে রিভলবার আগেই উঠে এসেছিল।

গুলী করার পূর্ব মুহূর্তে আবদুল কাদের কামাল উদ্দিনের দুই রিভলবারের নল শেষ বারের টার্গেট এডজাষ্ট করে নিচ্ছিল।

'ভাইয়া গুলী করো না, শোন।' বলে চিৎকার করে উঠল আয়েশা আলিয়া কাতানী।

ঠিক এ সময় আহমদ মুসার বাম হাত চোখের পলকে ছুটে যায় ডান পাশে। হাতে কালো রংয়ের ছোট রিভলবার। রিভলবার থেকে দুটি গুলীর শব্দ হলো।

বাম হাতটা ছুটে আসা ও গুলী করার সেকেন্ডের মধ্যে সম্পন্ন হয়ে গেল।

আহমদ মুসার দুটি গুলী লেগেছিল যুবকটির দুই হাতের দুই রিভলবারে। দুটি রিভলবারই যুবকটির হাত থেকে ছিটকে পড়ে গিয়েছিল।

আহমদ মুসা তার রিভলবার যুবকটির দিকে উদ্যত রেখেই উঠে দাঁড়িয়েছিল। ছিটকে পড়া রিভলবার দু'টি কুড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে যুবকটির মুখোমুখি হয়ে বলল, 'আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন এস, বস। তোমার সব অভিযোগ শুনব।'

কল্পনার চেয়ে দ্রুত ঘটনা ঘটে যাওয়ায় আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল।

বিমুঢ় ভাব কাটলে তার চোখে সেই বারুদের আগুন আবার জ্বলে উঠল। কিছু বলতে যাচ্ছিল।

'যা বলবে, সব বসে বল।' বলে আহমদ মুসা ডান হাত দিয়ে তাকে টেনে এনে তার দাদুর পাশে বসাল। আহমদ মুসার বাম হাতে তখনও উদ্যত রিভলবার।

সরদার জামাল উদ্দিন ও আয়েশা আলিয়া দু'জনেই অবিশ্বাস্য এক ঘটনা দেখে বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। যখন তারা সম্বিত ফিরে পেল, খুশি হলো যে আবদুল কাদের কামাল উদ্দিনের কোন ক্ষতি হয়নি, আহমদ মুসাও বেঁচে গেছে।

আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন পাশে এসে বসার পর সরদার জামাল উদ্দিন বলল, 'তোমাকে ধন্যবাদ আহমদ মুসা তোমার গুলী নিখুঁত হওয়ার জন্যে। আমার অবাক লাগছে, এত দ্রুত করা গুলী এত নিখুঁত হলো কি করে!'

'দাদু, এর নাম আহমদ মুসা নয় বিভেন বার্গম্যান।' বলল আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন। তার কন্ঠ ক্রোধ ও ক্ষক্ষাভে ভরা।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'দু'দিন আগ পর্যন্ত ওরা আমার নাম 'বিভেন বার্গম্যান'ই জানত। কিন্তু দু'দিন হলো তারা জানতে পেরেছে, আমি আসলে আহমদ মুসা। এরপরই তারা দেখামাত্র আমাকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছে।'

'কিন্তু আজও ওদের কাছে আপনার নাম বিভেন বার্গম্যান শুনেছি।' বলল আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন।

'তুমি মুসলমান। তুমি কেন, কোন মুসলমানের কাছেই আমার নাম 'আহমদ মুসা' একথা তারা প্রকাশ করবে না।' বলল আহমদ মুসা।

'কেন?' জিজ্ঞেস করল আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন।

'নাম নিয়ে তোমার প্রশ্ন থাক কামাল। জাবের বাংগসা জহীর উদ্দিনের রক্তমাখা জামা নিয়ে উনি কথা বলছিলেন। তুমিও শুনেছ। কথাটা তাঁকে শেষ করতে দাও।' বলল সরদার জামাল উদ্দিন।

আহমদ মুসা তাকাল আবদুল কাদের কামাল উদ্দিনের দিকে। বলল, ‘হ্যাঁ কামাল, আমার বিরুদ্ধে তোমার যে অভিযোগ, এ থেকেও তারও কিছু জবাব তুমি পেয়ে যাবে।’

আহমদ মুসা একটু থামল। পরক্ষণেই আবার বলা শুরু করল, ‘সরদার সাহেব, আমি বলেছিলাম জাবের জহীর উদ্দিনের কথিত রক্ত মাখা জামা সম্পর্কে আপনি যা বললেন, আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন যা মনে করে, থাই সরকারও আমাকে এটাই বুঝাবার চেষ্টা করেছিল। আমি তাদের বলেছিলাম, থাইল্যান্ডে সন্ত্রাস মুসলমানরা করছে না। করছে তৃতীয় একটি ষড়যন্ত্রকারী পক্ষ। এবং জাবের জহীর উদ্দিনকে ছিনতাই করে নিয়ে গেছে তার বন্ধুরা নয় শত্রুরা। তাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে তারা তাকে ব্যবহার করতে চায়। আমার এ মতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্যে থাই সরকার থেকে আমাকে বলা হয়, জাবের জহীর উদ্দিনের রক্তমাখা জামা সংঘর্ষের স্থলে পাওয়াই প্রমাণ করে জাবের প্রত্যক্ষভাবে সংঘর্ষে অর্থাৎ সন্ত্রাসে অংশগ্রহণ করেছিল। অতএব আমার কথাকে তারা অসত্য বলে অভিহিত করে। আমি তাদেরকে অনুরোধ করি, সংঘর্ষেল সময় এবং জাবেরের জামায় যে রক্ত পাওয়া গেছে তা ঝরার সময় এক কিনা পরীক্ষা করে দেখুন। সংঘর্ষ ও জামায় রক্ত লাগার সময় যদি এক হয়, তাহলে সংঘর্ষে জাবের জহীর উদ্দিন অংশগ্রহণ করেছিল বুঝা যাবে। আর যদি সময় এক না হয়, তাহলে প্রমাণ হবে জাবের জহীর উদ্দিন সংঘর্ষে অংশ নেয়নি। রক্ত পরীক্ষা করে প্রমাণিত হয়েছে জামার রক্ত লাগার সময় ও সংঘর্ষের সময় কয়েক ঘণ্টা আগের। তার মানে জাবের জহীর উদ্দিন সংঘর্ষে অংশগ্রহণের কথা মিথ্যা।’

বিস্ময়ে হা হয়ে গিয়েছিল সরদার জামাল উদ্দিনের মুখ। আয়েশা আলিয়ার মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল।

বিস্ময়ের একটা ছায়া নেমেছে আবদুল কাদের কামাল উদ্দিনের চোখে-মুখে। কিন্তু চোখে-মখের বিক্ষুব্ধ ভাব তখনও অটুট আছে। বলল, ‘তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন জাবের জহীর উদ্দিন মহোদয়ের রক্তমাখা জামা তারা সংঘর্ষের স্থানে নিয়ে গিয়েছিল এবং তা ওরা ফেলে রেখে এসেছিল জাবের জহীর উদ্দিন সংঘর্ষে অশং নিয়েছিল, এটা প্রমাণের জন্যে।’

'আমি বলতে চাচ্ছি শুধু নয়, এটাই সত্যি আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন।' আহমদ মুসা বলল।

'কিন্তু কেন আপনি বলতে চাচ্ছেন? আপনি কে? কেন আপনি আমাদের সংগ্রাম বিকৃত করছেন। কেন আপনি আমাদের ব্যাপারে নাক গলাচ্ছেন?' আবদুল কাদের কামাল উদ্দিনের মুখ থেকে বিস্ফোরণের মতো বেরিয়ে এল কথাগুলো।

আহমদ মুসা প্রথমে হাসল। তারপর গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, 'আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন আমি নাক গলাইনি, তোমাদের ঘটনা আমার নাককে তার মধ্যে টেনে এনেছে।'

বলে আহমদ মুসা থাইল্যান্ডে প্রথম যেদিন সে ল্যান্ড করে হোটেলে আসছিল, তখন সে কিভাবে জাবের জহীর উদ্দিনকে ছিনিয়ে নেয়ার ঘটনার মধ্যে পড়ে যায়, কিভাবে তার ট্যাক্সি পুলিশ দখল করে, কিভাবে পুলিশের হাতে সে বন্দী হয়, কিভাবে সে আহত হয়েও ডজন খানেক সন্ত্রাসীকে হত্যা করে, পুলিশ ও সরকারের আস্থা অর্জনের পর কিভাবে সে জাবের জহীর উদ্দিন ও থাই মুসলমানদের সন্ত্রাস থেকে আলাদা করার এবং সন্ত্রাসের জন্যে দায়ী তৃতীয় পক্ষকে চিহ্নিত করার কাজ শুরু করে, কিভাবে ব্যাংককে তার উপর বার বার আক্রমণ হয় সন্ত্রাসীদের পক্ষ থেকে, কিভাবে সন্ত্রাসীরা তাকে থাইল্যান্ড ছাড়ার জন্য আলটিমেটাম দেয়, হোটেলে কিভাবে সন্ত্রাসীদের লোকরা তার হাতে ধরা পড়ে, কিভাবে তাদের কাছ থেকে জানতে পারে যে জাবেরকে পাত্তানীর এক জায়গায় আটকে রাখা হয়েছে, কিভাবে আহমদ মুসা কৌশল করে পাত্তানী যাত্রা করে এবং পথে কি ঘটে, পাত্তানীতে আসার হোটেলে কিভাবে সে সন্ত্রাসীদের চোখে পড়ে যায়, কিভাবে সে হোটেল বয়ের মাধ্যমে শাহ পরিবারের সন্ধান পায়, তাদের বাড়ি দেখতে গিয়ে কিভাবে সে শাহবাড়ির নিচের মেলায় সন্ত্রাসীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়, কিভাবে সে সেই রাতে শাহবাড়িতে যায় এবং শাহ পরিবারের উপর সন্ত্রাসীদের আক্রমণ নস্যাৎ করে কিভাবে শাহ পরিবারকে এক বিপর্যয় থেকে বাঁচায় এবং এরপর কিভাবে শাহ পরিবারের সাথে জড়িয়ে পড়ে, কিভাবে তাদের উপর বার বার আক্রমণ হয়, কিভাবে তারা রক্ষা পায় ও অনেক সন্ত্রাসী বন্দী হয়

এবং সব শেষে কিভাবে সে পাত্তানী পুলিশ হেডকোয়ার্টারে সন্ত্রাসীদের আক্রমণের বিষয় আঁচ করে এবং কিভাবে পুলিশ হেডকোয়ার্টার রক্ষা ও সন্ত্রাসীরা পাকড়াও হয়, কিভাবে সন্ত্রাসীদের পক্ষ থেকে জাবের জহীর উদ্দিনকে হত্যার আলটিমেটাম দেয়া হয়, কিভাবে আহমদ মুসাকে হত্যার জন্যে সন্ত্রাসীরা সর্বাত্মক জাল পাতে, কিভাবে আহমদ মুসা শাহ বাড়ির ছাদ থেকে হেলিকপ্টারে চড়ে সন্ত্রাসীদের ফাঁকি দিয়ে 'হাঁটাই'তে আসে এবং সেখান থেকে কিভাবে মালয়েশিয়ার সুংগাই পেতানীতে আসে এবং সেখান থেকে কিভাবে সে বেতাংগ এল তার সংক্ষিপ্ত ও ধারাবাহিক বিবরণ আহমদ মুসা তুলে ধরল।

আহমদ মুসা যখন কথা শেষ করল, তখন সরদার জামাল উদ্দিন, আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন ও আয়েশা আলিয়া তিনজনই যেন স্বপ্নের জগতে। তাদের বিস্ময় বিস্ফোরিত দৃষ্টি আহমদ মুসার উপর আঠার মতো লেগে আছে। তাদের চোখের পাতাও যেন নড়ছে না। বাকরুদ্ধ তারা।

আহমদ মুসাও দীর্ঘ কথা শেষ করে সোফায় হেলান দিয়েছে।

পল পল করে বেশ কতকটা সময় বয়ে গেল। তারা কথা বলল না।

আহমদ মুসাই আবার মুখ খুলল। বলল, 'কি ব্যাপার আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন কথা বলছ না যে! আমার কথা বিশ্বাস করছ না? রূপ কথা মনে করছ আমার কথাকে?'

আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন মুখ নিচু করল।

সরদার জামাল উদ্দিন ও আয়েশা আলিয়ার মুখ নিচু হয়ে গেছে।

কথা বলল না তাদের কেউ।

বাইরে বৃষ্টি তখন থেমে গেছে।

নিস্তব্ধ চারদিকে।

আবদুল কাদের কামাল উদ্দিনকে আবার কিছু বলতে গিয়েছিল আহমদ মুসা। কিন্তু দেখল তার নত মুখ থেকে টপ টপ করে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে উরুর উপর রাখা তার দুই হাতের উপর। আয়েশা আলিয়ারও দুই গন্ড অশ্রুসিক্ত দেখতে পেল সে। শুধু মুখ শুকনো সরদার জামাল উদ্দিনের।

আহমদ মুসার মনটাও আবেগ প্রবণ হয়ে উঠল। কিন্তু নরম সান্তনা নয়, শক্ত কথাই বলল আহমদ মুসা, 'অশ্রু মুছে ফেল আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন, তোমাদের মতো তরুণদের চোখে আগুন থাকবে, অশ্রু নয়।' শক্ত কণ্ঠ আহমদ মুসার।

মুখ তুলে তাকাল আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন আহমদ মুসার দিকে।

তার মতো সরদার জামাল উদ্দিন ও আয়েশা আলিয়াও তাকিয়েছে আহমদ মুসার দিকে।

আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন রুমাল দিয়ে চোখ মুছল। তার মুখ গম্ভীর। বলল, 'সত্যি জনাব, আপনার শক্ত কণ্ঠ আমার কাছে নেতার আদেশের মতো মনে হয়েছে।' বলতে গিয়ে তার চোখে অশ্রুর একটা ঢেউ এল আবার।

আবার চোখ মুছল আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন।

'হয়তো শুনেছ নেতার কণ্ঠ। কিন্তু আমি নেতা নই কামাল। আমি কর্মি। কাজ করে বেড়াই আমি।'

'সত্যিকার নেতারাই এমন কথা বলতে পারেন স্যার।' বলল আয়েশা আলিয়া।

সেও তার চোখের অশ্রু মুছে ফেলেছে।

'কিন্তু প্রথমেই আপনি শাহ বাড়ির কথা কেন বলেননি? কেন বলেননি যে আপনি শাহ পরিবার থেকে এসেছেন? জানেন ঐ বাড়ি আমাদের কেন্দ্র। ঐ পরিবার আমাদের নেতা।' বলল আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন। তার কণ্ঠে অশ্রুভেজা আবেগ।

'শুরুত বললে এভাবে তোমরা বিশ্বাস করতে না।' আহমদ মুসা বলল।

'আমার একটা ব্যাপার খুব বিস্ময় লাগছে। শাহ পরিবারের সাথে এত তাড়াতাড়ি কিভাবে আপনি একাত্ম হয়ে গেলেন? শাহ পরিবার খুবই ধার্মিক পরিবার। আমি শুনেছি, বাইরের মানুষের সাথে মেলামেশা তো দূরে থাক সাক্ষাতও ওদের হয় না। আপনি কি আগে থেকে ওঁদের পরিচিত ছিলেন?' বলল আয়েশা আলিয়া।

'আমি কোনভাবেই পরিচিত ছিলাম না। এমনকি শাহ পরিবার সম্পর্কে আমার বলতে গেলে কিছুই জানা ছিল না। তবে থাইল্যান্ডে আমার আসার পেছনে একটা কাহিনী আছে। সে কাহিনীর সাথে এই পরিবার জড়িত।

বিস্ময়-কৌতুহলের একটা ঢেউ খেলে গেল ওদের তিনজনের চোখে-মুখে। আয়েশা আলিয়াই দ্রুত বলে উঠল, 'কাহিনীটা কি সত্যি ঘটনা?'

'সত্যি ঘটনা। তবে রূপকথার চেয়ে মজার।' আহমদ মুসা বলল।

'কি সে ঘটনা?' দ্রুতকণ্ঠে বলে উঠল আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন।

আহমদ মুসা সোফায় হেলান দিয়ে বসল। বলতে শুরু করল আহমদ মুসা, 'রূপকথা সাধারণত বড় হয়। এ রূপকথা কিন্তু খুব বড় নয়। ঘটনার সূত্রপাত আন্দামানে। আমি সেদিন আন্দামানে ঠিক আন্দামান সাগরের উপর দাঁড়ানো এক ড্রইং রুমে অনেকের সাথে বসে। বসে আছি জানালার পাশে। দৃষ্টি ছিল আদিগন্ত সাগরের দিকে। হঠাৎ............।'

'স্যার' বলে কথার মাঝখানে বাধ সাধল আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন।

তার চোখে-মুখে যেন একটা প্রশ্ন ঠিকরে পড়ছিল।

থেমে গেল আহমদ মুসা।

'স্যরি' বলে কথা শুরু করল আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন, 'স্যার আন্দামান সরকারের সাথে কি আপনার সংঘাত বেঁধেছিল?'

'হঠাৎ এ প্রশ্ন?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'আগে জবাবটা দিন। কারণ বলছি।' বলল আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন।

'আন্দামান সরকারের সাথে আমার সংঘাত বাধেনি। আন্দামান সরকারের গভর্নর একটি গোপন সন্ত্রাসী সংগঠনের নেতা ছিলেন, সে সন্ত্রাসী সংগঠনের সাথে আমার সংঘাত বেধেছিল। আর সন্ত্রাস থেকে মানুষকে রক্ষা করা, বাঁচানো যদি সন্ত্রাস হয় তাহলে সে সন্ত্রাস আমি করেছি।'

আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন তার সোফায় বলা যায় এ্যাটেনশন হয়ে বসেছে। তার চোখ দু'টিতে অপার বিস্ময়। সেই সাথে তার চোখ জুড়ে একটি ঔজ্জ্বল্য। আহমদ মুসা থামলেই আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন বলল, 'আপনি

যাদের সন্ত্রাসী সংগঠন বলছেন, তাদের সাথে দুনিয়ার আর কোথাও কি আপনার সংঘাত হয়েছে?’

‘আন্দামানে যাদের সাথে আমার সংঘাত হয়েছে, তারা ভারতের। কিন্তু তাদেরকে সাহায্য করেছে ইহুদীবাদী গোয়েন্দারা। এই ইহুদীবাদী সংগঠনের সাথে দুনিয়ার নানাস্থানে আমার সংঘাত হয়েছে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘সম্প্রতি কিছুদিন আগেও আমেরিকায় সংঘাত হয়েছে?’ জিজ্ঞাসা আবদুল কাদের কামাল উদ্দিনের। ওর কণ্ঠ ভারী ও ভেঙে পড়ার মতো।

‘হ্যাঁ, আমেরিকায়ও হয়েছে।’ আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন ছুটে গিয়ে আহমদ মুসার পায়ের কাছে বসল। তারপর আহমদ মুসার দুই হাঁটুর উপর মুখ গুঁজে বলল, ‘আমাকে মাফ করুন স্যার। আমি কি অকথ্য ভাষায় আপনাকে গালি দিয়েছি। আপনাকে হত্যা করার জন্যে রিভলবার উঠিয়েছিলাম। এমনকি আপনার ‘আহমদ মুসা’ নাম শুনেও বুঝতে পারিনি যে, আপনি সেই মহান বিপ্লবী!’ অপরিসীম আবেগের বিস্ফোরণ ঘটার মতো তার কণ্ঠ ভেঙে পড়ল এবং তার চোখ ফেটে অশ্রুও গড়িয়ে পড়ল।

আহমদ মুসা হেসে তাকে তুলে পাশে বসাল। বলল, ‘তুমি যা করেছ তার মধ্যে দিয়ে জাতির প্রতি তোমার ভালোবাসারই প্রকাশ ঘটেছে। অন্যায় কিছু করনি।’

বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে ছিল সরদার জামাল উদ্দিন এবং আয়েশা আলিয়া। আহমদ মুসা থামতেই সরদার জামাল উদ্দিন আহমদ মুসাকে উদ্দেশ্য করে বলল, ‘কি ব্যাপার আহমদ মুসা। আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না।’

আহমদ মুসা একটু হাসল। বলল, ‘কিছুই না জনাব, আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন আমার পরিচয় উদ্ধার করে ফেলেছে।’

‘কি পরিচয় পেল? কিভাবে পেল?’ বলল আয়েশা আলিয়া।

আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন চোখ মুছে বলল, ‘দাদু, আয়েশা, ওনার পরিচয় দিতে গেলে একটা বিরাট বক্তৃতা দিতে হবে। এইটুকু শুনুন, দুনিয়ার

সবচেয়ে মূল্যবান মেহমান আমাদের ঘরে এসেছেন। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করুন।'

বিস্ময় বিস্ফোরিত হযে উঠেছে আয়েশা আলিয়ার চোখ। অভিভূতের মতো যেন অজান্তেই সে উঠে দাঁড়িয়েছে। বলল, 'ভাইয়া, ইনি তাহলে কি সেই আহমদ মুসা?'

'হ্যাঁ আয়েশা, এঁর কথাই আমরা পত্রিকা, ম্যগাজিন ও ইন্টারনেটে পড়েছি।'

ধপ করে সোফায় বসে পড়ল আয়েশা আলিয়া। মুখ ঢাকল দু'হাত দিয়ে। যেন নিজেকে সে আড়াল করতে চায় আহমদ মুসার কাছ থেকে।

বিস্ময় সরদার জামাল উদ্দিনের চোখেও। বলল, 'আমি ভুলেই গিয়েছিলাম ব্যাপারটা। কয়েক দিন আগে ইন্দোনেশিয়ার পাহাড়ি কবিলাদের এক সম্মেলনে দেখা হয়েছিল মিন্দানাওয়ের প্রেসিডেন্ট মুরহামসারের সাথে। তিনি এক আহমদ মুসার গল্প করেছিলেন। গল্পটা যেন জগৎ জোড়া এক রূপকথা। এই রূপকথার আহমদ মুসার কাছে কিংবদন্তীর রবিনহুড, শার্লক হোমস তো বাচ্চা শিশু। সেই আহমদ মুসা নাকি এখন আন্দামানে, বলেছিলেন মুরহামসার। সেই তিনি এখন আমার বৈঠক খানায়! আমার সামনে!'

কথা শেষ করেই সরদার জামাল উদ্দিন চোখের পলকে গিয়ে আহমদ মুসার পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসল এবং মাথা নুইয়ে আহমদ মুসার হাত চুম্বন করল।

আহমদ মুসা সরদার জামাল উদ্দিনকে টেনে তুলে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আমি দুঃখিত। আপনি আমাকে আপনার নাতির মতো বলেও আমার পায়ের কাছে এসে বসেছেন। এটা ঠিক হয়নি।'

'দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই। আনুগত্য প্রকাশের, বুজুর্গের প্রতি শদ্ধা নিবেদনের এটাই আমাদের যুগ যুগান্তের পাহাড়ী রীতি।' বলল সরদার জামাল উদ্দিন।

'কিন্তু এটা ইসলামী রীতি নয়।' আহমদ মুসা বলল।

সরদার জামাল উদ্দিন আহমদ মুসাকে বসিয়ে নিজে তার সোফায় ফিরে গেল। বলল, 'এটা একটা রীতি মাত্র। ইসলাম লোকাল অনেক রীতিকেই গ্রহণ করেছে। আমাদের শাহ পরিবারের শেখ আবদুল কাদেরের কাছে এটা শুনেছি। তিনি এ রীতিকে অনুমোদন দিয়েছেন।'

আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'থাক এ প্রসংগ এখন। আমি উঠতে চাই।'

'না উঠবে কোথায়। তোমার হোটেলে থাকা চলবে না। আমি হোটেলে টেলিফোন করে দিচ্ছি, তোমার ব্যাগ সব দিয়ে যাবে কিংবা কামালকে পাঠাচ্ছি। সে গিয়ে নিয়ে আসবে।' বলল সরদার জামাল উদ্দিন।

'না জনাব, হোটেলে থাকাই আমার কাজের জন্যে সুবিধাজনক। আমি উঠি।' আহমদ মুসা বলল।

'এখানে থেকে দেখ কোন অসুবিধা হয় কিনা। অসুবিধা হলে আমিই তোমাকে হোটেলে দিয়ে আসব। আর আমি যা বুঝেছি, সেটা যদি সত্যি হয়, তাহলে গোটা বেতাংগ শুধু নয় সমগ্র কাতান পাহাড় অঞ্চলে আমার বাড়ির চেয়ে নিরাপদ জায়গা কোথাও নেই।'

আহমদ মুসা কৌতুহলি দৃষ্টি নিয়ে তাকাল সরদার জামাল উদ্দিন কাতানীর দিকে।

হাসল সরদার জামাল উদ্দিন কাতানী। বলল, 'তুমি কোহেতান কবীর' পরিবারকে খুঁজছ না? আমাদের কবিলাই সেই পরিবার।'

'কিন্তু বাড়ির নেমপ্লেটে তো তা লেখা নেই?' বলল আহমদ মুসা।

'এটা বাড়ির একটা ছদ্মবেশ।' সরদার জামাল উদ্দিন বলল।

'কেন?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

সরদার জামাল উদ্দিন গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, 'কোহেতান কবীর' পরিবার তুমি যাকে 'ব্ল্যাক ঈগল' বলছ, আমরা যাকে মুজাহেদীন পাত্তানী মুভমেন্ট' বলি তার সাথে যুক্ত হয়ে গেছে। এর পরেই এই ছদ্মবেশ সতর্কতার জন্যে।'

আহমদ মুসার চোখে-মুখে বিস্ময় ও আনন্দ দুয়েরই প্রকাশ ঘটল। তার মনে হলো, সে তার মিশনের সাফল্যের দ্বার প্রান্তে পৌছে গেছে। এই পরিবার কাতান টেপাংগো যাওয়ার রাস্তাও চেনে, 'ব্ল্যাক ঈগল'দেরও চেনে।

'আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি যে তিনি এভাবে আমাকে আপনাদের মধ্যে এনে দিয়েছেন। এ দিনটি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দের দিনগুলির একটি। আমি আপনাদের সাহায্য চাই।' আহমদ মুসা বলল।

'পরিস্থিতি তোমার কাছে যা শুনলাম তাতে আমরা তোমাকে সাহায্য করা নয় আমাদেরই তোমার সাহায্য ভিক্ষা করা উচিত যা শাহজাদী যয়নব যোবায়দা করেছে। কিন্তু এ প্রসংগ আপাতত মুলতবী থাক। এখন তুমি মুখ-হাত ধুয়ে কাপড় ছেড়ে ফ্রেশ হয়ে নাও। অনেক ভিজে গেছ তুমি।'

বলেই সরদার জামাল উদ্দিন তাকাল আবদুল কাদের কামাল উদ্দিনের দিকে। বলল, কামাল তুমি এঁকে টয়লেট দেখিয়ে দাও এবং একপ্রস্ত পোশাক এনে দাও। আর বোন আয়েশা তুমি যাও উপরের গেষ্টরুমে বেড ও সবকিছু ঠিক-ঠাক করে দাও।

উঠল সরদার জামাল উদ্দিন।

উঠল সবাই।

# ৫

মাগরিবের নামাযে ইমামতি করল আহমদ মুসা।

নামায শেষ করেই সরদার জামাল উদ্দিন আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, 'মুয়াজ্জাজ ভাই আহমদ মুসা, তোমার সাথে জরুরি আলাপ আছে। কিন্তু একটু বাজারে যেতে হবে আমাকে। আমি এখনি আসছি।'

উঠে দাঁড়াল সরদার জামাল উদ্দিন। বলল আয়েশা আলিয়াকে, 'আয়েশা বোন, তুমি এর মধ্যে চা-টা নিয়ে এস।'

চলে গেল সরদার জামাল উদ্দিন।

আহমদ মুসারা সবাই জায়নামায থেকে সোফায় ফিরে এল।

আহমদ মুসার সামনের সোফায় বসল আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন। পাশে একটু দূরের সোফায় বসল আয়েশা আলিয়া।

বসেই আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন বলল আহমদ মুসকে, 'স্যার কুরআন শরীফে ইহুদী-নাসারাদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে, তার মানে তাদেরকে সব সময় শত্রু হিসাবে দেখতে হবে। এ ব্যাপারে আপনার ব্যাখ্যা জানার জন্যে প্রশ্ন করেছি।'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'বন্ধু ও শত্রুতার নীতি নির্ণয় করতে হবে আল-কুরআন সামগ্রিকভাবে যে নীতি নির্ধারন করেছে, তার ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যেমন সুরা মায়েদার ৫১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, ''হে মুমিনগণ, ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা পরস্পর বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে কেউ তাদের বন্ধরূপে গ্রহণ করলো সে তাদেরই একজন হবে। আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।'' আল্লাহর এই নির্দেশ এমন সময়ে নাজিল হয়েছিল, তখন ছদ্মবেশী মুনাফিকরা ইহুদী-নাসারাদের সাথে ষড়যন্ত্র করেছিল এবং কোন যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে তাদের পক্ষে যোগদানের ষড়যন্ত্র করেছিল এবং কোন যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে তাদের পক্ষে

যোগদানের ষড়যন্ত্র করেছিল। মুসলমানদের যুদ্ধরত প্রতিপক্ষের সাথে সম্পর্কের নীতি হিসেবেই আল্লাহ এই আদেশ করেছেন। এই পরিস্থিতিতে এই নীতি অবশ্যই পালনীয়। এই নীতি সব সময় সব ক্ষেত্রে পালনীয় হবে না তা আল্লাহ রাববুল আলামিনই বলে দিয়েছেন। আল-কুরআনের সূরা 'মুমতাহানা'র ৯ নং আয়াতে আল্লাহ রাববুল আলামিন বলেছেন, ''আল্লাহ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা দীনের (বিশ্বাস ও ধর্মের) ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদের স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেছে এবং তোমাদের বহিষ্কার সাহায্য করেছে। তাদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে তারা তো জালিম।'' আল্লাহর এই আদেশে দেখা যাচ্ছে, মুসলমানদের ধর্ম ও বিশ্বাসের সাথে যারা যুদ্ধ করেনি, বৈরিতা করেনি এবং যুদ্ধ ও বৈরিতায় সাহায্য করেনি, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করা হয়নি। আর কারো সাথে এবং কোন জাতির সাথে বন্ধুত্ব ও শত্রুতাকে আল্লাহ স্থায়ী বিষয়ও করেননি। আল্লাহ তায়ারঅ সূরা 'মুমতাহানা'র ৭ আয়াতে বলেছেন, 'যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে সম্ভবত আল্লাহ তাদের ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন। আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।'

কথা শেষ করল আহমদ মুসা। তারপর আবদুল কাদের কামাল উদ্দিনের দিকে চেয়ে বলল, 'বিষয়টা তোমার কাছে পরিষ্কার হয়েছে কামাল?'

'স্যার জটিল বিষয়টাকে আপনি খুব সহজ করে বললেন।' আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন বলল।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'আল্লাহ তার দীনকে তার বান্দাদের জন্যে সহজ করেছেন, কঠিন করেননি। আর আল্লাহ কুরআন নাজিল করেছেন ইহুদী নাসারাসহ সব মানুষের জন্যে। কারও সাথে যুদ্ধমান পরিস্থিতি না থাকলে তার কাছে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে যেতে হবে। সুতরাং এ ধরনের সকলের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ যা স্বাভাবিক সম্পর্ক অবশ্যই রক্ষা করতে হবে।'

'কিন্তু স্যার, সত্য ও অসত্য তো দ্বন্দ্বমান। সত্যের শত্রু অসত্য এবং অসত্যের শত্রু সত্য। এ দুয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব সহযোগিতা তো হতে পারে না।' বলল আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন।

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ, সত্য ও অসত্য চির দ্বন্দ্বমান। কিন্তু সত্যপন্থী ও মিথ্যা-পন্থীর দ্বন্দ্ব চিরন্তন নয়, শত্রুতাও তাদের চিরস্থায়ী নয়। মিথ্যাপন্থী যে কোন সময় সত্যপন্থী হয়ে যেতে পারে। এ লক্ষে চেষ্টা করাও সত্য-পন্থীর দায়িত্ব এবং এজন্যে মিথ্যাপন্থীর সাথে একটা প্রয়োজনীয় সম্পর্ক তার রাখা প্রয়োজন। এ সম্পর্ক রক্ষার দাবি হলো, মিথ্যাপন্থী শত্রু হলেও সর্বাবস্থায় তার প্রতি সুবিচার করতে হবে। এই আদেশ আল্লাহ কুরআন শরীফে সুস্পষ্টভাবে দিয়েছেন। সূরা মায়িদার ৮ আয়াতে তিনি বলছেন, 'কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে, সদা সুবিচার করবে, এটা তাকওয়ার নিকটতর।' ধর্ম-বর্ণ, দলমত নির্বিশেষে এই সুবিচার প্রতিষ্ঠার নির্দেশ ইসলামে অবশ্য পালনীয় বিষয়।

'আপনার কথা বুঝেছি স্যার। আপনার কথাই ঠিক। কিন্তু সত্যপন্থী ও অসত্যপন্থীদের সহাবস্থান ও সহযোগিতা খুব কঠিন এবং খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। অসত্যপন্থীদের সংস্পর্শ-সাহচার্যে সত্যপন্থীদের কাজ ও বিশ্বাসেও বিচ্যুতি আসতে পারে। ইসলামের ইতিহাসে এর সাক্ষ্য ছড়িয়ে আছে।' বলল আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'তোমাকে ধন্যবাদ আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন। তোমার আশঙ্কা ঠিক। সত্যপন্থীরা জ্ঞান, বুদ্ধি, উদ্যোগ, আয়োজনে দূর্বল হয়, তাহলে তোমার আশঙ্কা সত্য হতে হবে, ইতিহাসও এর সাক্ষী। আর সত্যপন্থীরা যদি সর্বক্ষেত্রে সফল হয়, তাহলে তোমার আশঙ্কার উল্টোটা ঘটবে। তোমাদের খুব কাছের একটা দেশের দৃষ্টান্ত দেখ। বাংলাদেশ ভারত উপমহাদেশের একটা অংশ। ভারতে আটশ বছর মুসলিম শাসন ছিল এবং এই মুসলিম শাসনের কেন্দ্র ছিল দিলস্নী। শাসনের শক্তি, প্রভাব, প্রতিপত্তি সবকিছুর চুড়ান্ত প্রদর্শনি ছিল সেখানে। মুসলিম শাসনকেন্দ্রের আটশ' বছরের প্রভাব-প্রতিপত্তি সত্ত্বেও দিলস্নী ও তার আশ-পাশের অঞ্চলে মুসলমানরা সাংঘাতিকভাবে সংখ্যালঘিষ্ট। মুসলিম শাসনকেন্দ্র থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী অঞ্চলে ছিল বাংলাদেশ প্রদেশটি। অথচ এই বাংলাদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। এর কারণ বাংলাদেশে প্রভাবশালী রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি ছিল না, ফলে উন্নততর

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রভাব বেশি কাজ করেছে। প্রতিটি মানুষই শান্তি, সম্মান ও সমৃদ্ধির জীবন চায়। শাসকের তলোয়ারের ছায়া থেকে অনেক দূরে মুসলিম শাসনের একটি প্রদেশ বাংলাদেশে ইসলামের মহান অনুসারীরা তাদের কাজ, কথা ও চরিত্রের মাধ্যমে আপামর মানুষদের শান্তি, সম্মান ও সমৃদ্ধির জীবনের সন্ধান দিয়েছিল। তার ফলেই বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিল। সুতরাং উন্নততর ধর্ম ও সংস্কৃতির অনুসারী মানুষদের সহাবস্থানে ভয় করার কিছু নেই।'

আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন ও আয়েশা আলিয়া মন্ত্রমুগ্ধের মতো কথা শুনছিল আহমদ মুসার। তাদের ধর্ম ইসলামের এক নতুন রূপ তাদের সামনে আসছে জীবন্ত হয়ে, যে সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান ছিল না।

এবার মুখ খুলল আয়েশা আলিয়া। বলল, 'ধন্যবাদ আপনাকে স্যার। প্রথম দিন থেকেই আপনার কাছে নতুন কথা শুনছি এবং সত্য হিসাবে তা শিরোধার্য হয়ে উঠেছে।'

আয়েশা আলিয়া থামতেই আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন বলে উঠল, 'হতেই হবে। তার পরিচয় সামনে রাখলে এ প্রশ্নও তোমার মনে উঠতো না। যাক। কিন্তু...........।'

বলেই কথা শেষ না করে থেমে গেল আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন। একটা ঢোক গিলল। কিছুটা গম্ভীর হয়ে উঠল তার মুখ। বলল, 'কিন্তু আমীর হাবিব হাসাবহ এতটাই উল্টো ব্যাখ্যা করেন তাহলে?'

'কি নাম বললে?' আহমদ মুসা বলল।

'হাবিব হাসাবাহ।' বলল আবদুল কাদের।

'কে তিনি? কিসের আমীর তিনি?' আহমদ মুসার প্রশ্ন।

'কেন তিনি আমাদের পাত্তানী মুজাহেদীনদের আমীর!'

'হাবিব হাসাবাহ। কতদিন থেকে তাকে তোমরা জান?' বলল আহমদ মুসা।

'দু' বছর।' আবদুল কাদের বলল।

‘দুবছর আগে তিনি কোথায় ছিলেন, কি করতেন?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘তা আমরা জানি না। তার আরও ঘনিষ্ঠজনরা তাকে জানতে পারেন। তবে শুনেছি, তিনি জার্মানীতে বসবাসকারী একটি থাই মুসলিম পরিবারের সন্তান। তিনি আল আজহারে লেখা-পড়া করেছেন। তিনি ছাত্রজীবন থেকেই মিশনারী চরিত্রের। শেকড় সন্ধানে তিনি থাইল্যান্ডে আসেন এবং জাতির দুঃসময় দেখে তাদের সাথে থাকার সিদ্ধান্ত নেন।’ থামল আবদুল কাদের।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘জার্মানীতে তো নয়ই, কোন দেশেই কোন মুসলিমের নাম এমন হয় না। ‘হাসাবাহ’ শব্দটি হিব্রু, আরবী নয়। ‘হাবিব’ শব্দটি আরবী বটে, কিন্তু আরবী ইহুদীরা এই নাম ব্যবহার করে থাকে। এখন বল, লোকটি ‘থাই’ চেহারার?’

‘জি না। তার চেহারা আরবীদের মতো। শুনেছি, তার আববা থাই হলেও , মা আরবী। এ কারণেই তার আরবী চেহারা।’ বলল আবদুল কাদের।

‘আবদুল কাদের, লোকটি ইহুদী। তোমার মানতে কষ্ট হবে, কিন্তু তিনি ইহুদী হলে তবেই আজ থাইল্যান্ডে যা ঘটছে, তার সাথে তোমার আমীর হাবিব হাসাবাহর সম্পর্ক দাঁড় করানো যায়। হাবিব হাসাবাহ কোথায়..........।’

কথা শেষ করতে পারলো না আহমদ মুসা। দরজায় নক হলো।

আহমদ মুসা থামল।

‘দাদাজান এসেছেন।’ বলে আবদুল কাদের উঠে গেল দরজা খুলে দেবার জন্যে।

দরজা খুলে দিল আবদুল কাদের।

দাদাকে সালাম দিয়ে স্বাগত জানাল।

তার দাদা সরদার জামাল উদ্দিন ভেতরে প্রবেশ করলো। আবদুল কাদের দরজা বন্ধ করতে গিয়ে সামনে চোখ পড়তেই দেখল নিচে উপত্যকার দিক থেকে একজন লোক তার বাড়ির রাস্তা ধরে উপরে উঠে আসছে।

‘কে আসছে’ এই কৌতূহল নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল আবদুল কাদের।

লোকটি আরও সামনে এগিয়ে এল।

চেহারায় চোখ পড়তেই চমকে উঠল আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন। লোকটি 'সাবাত সোলায়মান'। একজন থাই মুসলিম। সে বেতাং এলাকায় 'মুজাহেদীন পাত্তানী মুভমেন্ট' ওরফে 'ব্ল্যাক ঈগল'-এর নেতা হাবিব হাসাবাহর প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। প্রত্যেক এলাকায় এমন বিশেষ লোক রয়েছে। মনে করা হয়, এরা গোপন গেরিলা ইউনিটের সদস্য। এরা খুবই পাওয়ার ফুল। তাদের বাড়িতে সে কয়েকবার এসেছে।

আবদুল কাদের ভেতরে ছুটে গিয়ে তার দাদাকে বলল, 'দাদা, সাবাত সোলায়মান আসছেন।'

'সাবাত সোলায়মান? ভালো। খুব ভালো করিতকর্মা লোক। নিয়ে এস।' বলেই হঠাৎ সরদার জামাল উদ্দিন বিমর্ষ হয়ে পড়ল। তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'কোন অসুবিধা নেই তো?'

সাবাত সোলায়মান নামটা শুনেই চমকে উঠেছিল আহমদ মুসা। নামটা শুনেই বুঝেছিল ওটা ইহুদী নাম। নামটা শুনে ভ্রুটাও কুঞ্চিত হয়ে উঠেছিল আহমদ মুসার। সে কি জেনে-শুনে আসছে? কিন্তু তা সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না। আহমদ মুসা তার উদ্দেশ্যের কথা কারও কাছে বলেনি। বলল, 'কোন অসুবিধা নেই।'

'আমি নিয়ে আসছি গিয়ে' বলে আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন ছুটে গেল।

আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সাবাত সোলায়মান এল।

আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন তাকে সালাম দিল। সাবাত সোলায়মান সালাম নিয়ে বলল, 'তোমাদের বাসায় যে মেহমান এসেছিলেন, তিনি আছেন?'

'আছেন।' বলল আবদুল কাদের।

'চল।' বলে দ্রুত উঠে এল বারান্দায়।

লোকটি বারান্দায় উঠে আসতেই আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন দেখল সাবাত সোলায়মান লোকটি তার পেছনেই। ডান হাতটি তার পকেটে।

ড্রয়িং রুমে প্রবেশ করল তারা।

আহমদ মুসাসহ অন্য সবাই উঠে দাঁড়াল।

আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন মেহমান সাবাত সোলায়মানকে বসতে বলার জন্যে তার দিকে তাকিয়েছিল। তাকিয়েই চমকে উঠল সাবাত সোলায়মানের হাতে রিভলবার দেখে।

সাবাত সোলায়মান আহমদ মুসাকে একনজর দেখেই পকেট থেকে রিভলবার সমেত হাত বের করে এনেছিল এবং রিভলবার তুলেছিল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে।

সাবাত সোলায়মানের হাতের রিভলবার সরদার জামাল উদ্দিন ও আয়েশা আলিয়া দুজনেই দেখতে পেয়েছিল। তাদের চোখে আতংক।

বিমূঢ়ভাব আবদুল কাদের কামাল উদ্দিনেরও।

আহমদ মুসার দিকে রিভলবার তুলেই সে চিৎকার করে উঠল, 'সেদিন মসজিদেই তোমাকে চিনতে পেরেছি তুমি আহমদ মুসা। দেখামাত্র গুলীর নির্দেশ তোমাকে। কিন্তু নিশ্চিত হবার জন্যে একটু অপেক্ষা করেছি। আজ তোমার ফটো পেয়েছি। কয়েকদিন জীবন বেশি পেলে। আজ তোমার দিন শেষ।'

কথা শেষ হবার আগেই তার রিভলবার থেকে গুলী বেরিয়ে এল।

আহমদ মুসার দুচোখ স্থিরভাবে নিবদ্ধ ছিল সাবাত সোলায়মান লোকটির তর্জনির দিকে। আর তার ডান হাত সেঁটে ছিল পকেটের সাথে।

সাবাত সোলায়মানের তর্জনি ট্রিগারে চেপে বসার সংগে সংগেই নিজের মাথা পেছন দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ছিটকে পড়েছিল সোফার উপর এবং এই ফাঁকে পকেট থেকে বের করে নিয়েছিল রিভলবার। পিঠ দিয়ে সোফা স্পর্শ করতেই হাতে তুলে নেয়া রিভলবার থেকে পর পর দুটি গুলী করেছিল আহমদ মুসা।

সাবাত সোলায়মান তার প্রথম গুলীকে ব্যর্থ হতে দেখে নতুন টার্গেটে রিভলবার নামিয়ে নিতে যাচ্ছিল। কিন্তু সে সময়েই আহমদ মুসার প্রথম গুলী এসে বিদ্ধ হলো তার হাতে। হাতের রিভলবার ছিটকে পড়ে গেল। আহত হাতের প্রতি কোন ভ্রুক্ষক্ষপ না করে সাবাত সোলায়মান তার বাম হাত বাম পকেটের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই আহমদ মুসার দ্বিতীয় গুলী এসে বিদ্ধ করল সাবাত সোলায়মানের বাম বুক।

মেঝের উপর ঢলে পড়ে গেল সাবাত সোলায়মানের দেহ। ঢলে পড়ে বুক চেপে ধরে সে চিৎকার করে বলল, 'আমাকে মারলেও তুমি পালাতে পারবে না এখান থেকে আহমদ মুসা। আমি একা আসিনি। জিহোভা অবশ্যই তোমাকে শাস্তি দেবেন।'

কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। শেষ বাক্যটা সাবাত সোলায়মান হিব্রু ভাষায় বলল।

সাবাত সোলায়মানের পকেটের মোবাইল বেজে উঠল এই সময়।

আহমদ মুসা উঠে দ্রুত ছুটে গিয়ে তার পকেট থেকে মোবাইল বের করল। নিশ্চয়ই সাবাত সোলায়মানের কোন সাথীর টেলিফোন হবে। তার শেষ কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে আশে-পাশে কোথাও থেকে ওরা টেলিফোন করেছে। হয়তো গুলীর শব্দও ওরা শুনতে পেয়েছে।

আহমদ মুসা মোবাইল তুলে নিয়ে যতটা পারা যায় সাবাত সোলায়মানের কণ্ঠ নকল করে বলল, 'হ্যালো।'

ওপার থেকে কে একজন বলল, 'সাবা, গুলী-গোলার শব্দ পেলাম। তুমি ঠিক আছ?' ওপারের কণ্ঠে উদ্বেগ।

'আমি আহত। শয়তানটা আমাকে দুটি গুলী করেছে। তোমরা এস। জিহোভা আমাদের সাহায্য করুন।'

বেদনাকাতর আর্তকণ্ঠে কথাগুলো বলল আহমদ মুসা। তার কণ্ঠ অনেকটাই সাবাত সোলায়মানের মতো শোনাল। শেষ বাক্যটা আহমদ মুসাও হিব্রু ভাষায় বলল। কণ্ঠটা সাবাত সোলায়মানেরই এ বিশ্বাস নিশ্চিত করার জন্য হিব্রু ভাষা ব্যবহার করল।

আহমদ মুসা সাবাত সোলায়মানের সাথীদের সবাইকে সামনে আনতে চায়। এ জন্যেই সে সাবাত সোলায়মানের আহত হওয়ার খবরটা ওদের জানাল, যাতে তাকে উদ্ধার করতে ওরা সবাই ছুটে আসে।

'তুমি কোথায়?' ওপার থেকে জিজ্ঞেস করল।

'আমি বারান্দার সিঁড়ির আড়ালে।'

'তুমি অপেক্ষা কর। আমরা আসছি।'

কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে ওপার থেকে মোবাইল বন্ধ হওয়ার শব্দ এল।

আহমদ মুসা মোবাইল বন্ধ করে পকেটে রেখে দিতে দিতে আবদুল কাদের কামাল উদ্দিনকে লক্ষ্য করে বলল, 'এর লাশটা বারান্দার সিঁড়ির আড়ালে ঠেস দিয়ে রেখে আসি।'

বলেই আহমদ মুসা সাবাত সোলায়মানের লাশটি পাঁজাকোলা করে তুলে নিল।

সরদার জামাল উদ্দিন, আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন ও আয়েশা আলিয়া সবাই রাজ্যেল আতংক-উদ্বেগ নিয়ে পাথরের মূর্তির মত নিশ্চয় দাঁড়িয়েছিল। কিছুক্ষণ আগে যে আহমদ মুসার মৃত্যু তাদের কাছে অবধারিত মনে হয়েছিল, সেই আহমদ মুসা দৃশ্যপট পাল্টে দিল। এ সিনেমার কোন দৃশ্য নয়। নিদারুণ এক বাস্তবতা।

আহমদ মুসার কথায় সম্বিত ফিরে পেল আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন। বলল দ্রুত কণ্ঠে, 'স্যার লাশটা ওখানে আমি নিতে চাই।'

'বড় ভাই থাকতে ছোট ভাই এসব করে না।' বলল হাসি মুখে আহমদ মুসা।

'বুঝলাম, সাবাত সোলায়মানের সাথীরা আসছে। নিশ্চয় ওরা শুধু লাশ নিয়ে চলে যাবে না!' বলল সরদার জামাল উদ্দিন।

'অবশ্যই জনাব। ওরা সামনা সামনি লড়াইয়ে আসুক। এজন্যেই ওদের এভাবে ডেকেছি। এতে আমাদের সুবিধা হবে। আমরা ওদের জানব, কিন্তু ওরা আমাদের জানবে না। তা না হলে ওরা আমাদে রজানত, ওদের শিকার হতাম আমরা। ওদের আমরা জানতে পারতাম না।' আহমদ মুসা বলল।

বিমুগ্ধ ভাব ফুটে উঠল সরদার জামাল উদ্দিনের গোটা চেহারায়। বলল, 'ধন্যবাদ আহমদ মুসা। আল্লাহর হাজার শোকর। আগুনের মত গরম পরিবেশেও তোমার মাথা এত ঠান্ডা থাকে। মুহূর্তের মধ্যে এমনভাবে নিখুঁত চিন্তা তুমি করতে পার!'

আহমদ মুসা সরদার জামাল উদ্দিনের দু'একটা কথা শুনেই লাশ নিয়ে চলতে শুরু করেছিল।

আহমদ মুসার পিছু নিয়ে আবদুল কাদের ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আয়েশা আলিয়া ছুটে এসে তার দাদার হাত ধরে বলল, 'সাবাত সোলায়মানের সাথীরা কি অনেক?'

'হতে পারে। আমি জানি না। কিন্তু ভেব না। আল্লাহর কাছে সংখ্যা বড় নয়। আর আহমদ মুসা আল্লাহর কি ধরনের সৈনিক, তাতো ইতিমধ্যেই বুঝে গেছ নিশ্চয়।'

বলেই সরদার জামাল উদ্দিন হাঁটতে শুরু করে বলল, 'এস, বাইরে গিয়ে দেখি। শয়তানরা কিন্তু এখনি এসে যেতে পারে।'

আয়েশা আলিয়াও দাদার পিছনে হাঁটতে শুরু করল।

আহমদ মুসা বারান্দায় সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

সাবাত সোলায়মানের লাশকে সে ইতিমধ্যেই নিচে সিঁড়ির পাশে রেখে এসেছে।

আহমদ মুসার একটু পেছনে দাঁড়িয়ে আছে আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন।

সরদার জামাল উদ্দিন ও আয়েশা আলিয়া গিয়ে দাঁড়াল আবদুল কাদের কামাল উদ্দিনের পেছনে। তাদের সবার চোখে-মুখে উদ্বেগ।

আহমদ মুসা তার হাতের মোবাইল স্ক্রীনের দিকে তাকিয়েছিল। এই মোবাইলটাই পেয়েছিল সে সাবাত সোলায়মানের পকেট থেকে। আহমদ মুসার চোখে-মুখে নিশ্চিন্ত ভাব।

কিন্তু অস্থির হয়ে উঠেছে সরদার জামাল উদ্দিন ও অন্য সবাই।

সরদার জামাল উদ্দিন বলেই ফেলল, 'ভাই আহমদ মুসা, এই মুক্ত জায়গায় আমাদের দাঁড়ানো ঠিক হচ্ছে না। ওদের চোখ এ দিকেই। ওদের কয়েকজনকে দেখা যাচ্ছে। ওরা ধীরে ধীরে এদিকে এগুচ্ছে।'

'এদিকে চোখ আছে ঠিকই, কিন্তু ওরা এদিক দিয়ে আক্রমণ করবে না। চোখের সামনে এভাবে আসাই তার প্রমাণ।'

'তার মানে?' বলল সরদার জামাল উদ্দিন। তার কণ্ঠে বিস্ময়।

'তার মানে ওরা আমাদের পেছন দিক দিয়ে আক্রমণ করবে।' বলল আহমদ মুসা।

'বুঝেছি। তাহলে চল ওদিকে দেখি।' বলল সরদার জামাল উদ্দিন।

'পেছনে কি দরজা আছে?'

'আছে। ভেতর থেকে তালাবন্ধ।'

'তালা আজ কোন বাধা নয়।' বলেই আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনারা এখানে দাঁড়ান। আমি ওদিকে দেখি।'

আহমদ মুসা ভেতরে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছিল। সরদার জামাল উদ্দিন জিজ্ঞেস করল, 'শত্রু যদি পেছন থেকে আসে, তাহলে আমাদের এখানে থাকা কেন?'

থমকে দাঁড়াল আহমদ মুসা। মুখ ফিরিয়ে বলল, 'ওরা যাতে বুঝতে পারে পেছনে আমাদের কোন সতর্কতা নেই, চোখ নেই। তাহলে ওরা নিশ্চিন্তে পেছন দিক থেকে আসতে পারে।'

'আমরা বুঝেছি ধন্যবাদ স্যার।' হাসি মুখে এক সাথে বলে উঠল, আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন এবং আয়েশা আলিয়া।

'আলহামদুলিল্লাহ।' বলে আহমদ মুসা দ্রুত পায়ে ঢুকে গেল ভেতরে।

সাবাত সোলায়মানের সাথে কথা শেষ করেই দানিয়েল দানেশ মোবাইল পকেটে ফেলে বলল, 'সাবাত সোলায়মান আহত। এখনি আমাদের মুভ করা দরকার।'

'তাহলে তো সাবাত সোলায়মানের সন্দেহ ঠিক। লোকটি আহমদ মুসাই।' বলল দানিয়েল দানেশের পাশে দাঁড়ানো মিকাইল মৈনাক।

দানিয়েল দানেশ এবং তার সহকারী মিকাইল মৈনাক আরও কয়েকজন আজই বেতাংগে এসে পৌছেছে। সাবাত সোলায়মানের পাঠানো ছবি দেখে

লোকটি যে আহমদ মুসা তা নিশ্চিত করার পরই কাতান টেপাংগো থেকে এদের পাঠানো হয়েছে। পাঠানো হয়েছে আহমদ মুসাকে বন্দী করার জন্যে নয়, দেখা মাত্র হত্যা করার জন্যে।

সাবাত সোলায়মান আহমদ মুসাকে সব সময় চোখে চোখেই রেখেছিল। আহমদ মুসা যখন সরদার জামাল উদ্দিনের বাড়িতে প্রবেশ করে, তখন নিচে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল সাবাত সোলায়মান। এ সময়ই এসে পৌছে দানিয়েল দানেশরা। মোবাইলে যোগাযোগ হলে সাবাত সোলায়মান তাদেরকে লোকেশান জানিয়ে এখানেই ডেকে পাঠায়। দানিয়েল দানেশ ও মিকাইল মৈনাক আরও পাঁচজন সাথীসহ সেখানে এসে পৌছায়।

এসেই দানিয়েল দানেশ সাবাত সোলায়মানকে প্রশ্ন করে, 'সরদার জামাল উদ্দিনরা তো আমাদের লোক। আহমদ মুসা সেখানে কেন?'

'আমি দেখেছি বৃষ্টির তাড়া খেয়ে সে প্রথমে তাদের বাড়ি সামনে পেয়ে সেখানে উঠেছে। সরদার জামাল উদ্দিনের সাথে গত জুমার নামাযে তার পরিচয় হয়েছে, কিন্তু এ কয়দিন সে আসেনি এ বাড়িতে।' বলেছিল সাবাত সোলায়মান।

'আচ্ছা বুঝলাম। এখন বলুন, আপনি কিছু করণীয় চিন্তা করছেন কিনা।' বলে দানিয়েল দানেশ।

'হ্যাঁ, আমাদের এখনই ওখানে যাওয়া উচিত। কিন্তু এক সাথে যাওয়া যাবে না। আহমদ মুসা সন্দেহ করতে পারে। আমি..........।'

সাবাত সোলায়মানের কথার মাঝখানে কথা বলে ওঠে দানিয়েল দানেশ। থেমে যায় সাবাত সোলায়মান।

দানিয়েল দানেশ বলে, 'ঠিক বলেছেন মি. সাবাত সোলায়মান। আহমদ মুসাকে সন্দেহ করতে দেয়া যাবে না। সে অত্যন্ত বিপজ্জনক। আগাম সন্দেহ করলে তাকে বাগে আনা যাবে না।'

'হ্যাঁ, তাই আমি ভাবছি, আগে বাড়িটা ঘেরাও করে ফেলতে হবে, যাতে তার পালাবার পথ বন্ধ হয়। তারপর প্রথমে আমি একাই যাব মনে করছি। আমি ওদের সবার পরিচিত এবং এখানেই থাকি বলে কেউ কিছু ভাববে না। এই অবস্থায় অতর্কিতে গুলী করে হত্যা করা আমার পক্ষে সহজ হবে। প্রথম দর্শনে

আমি এই চেষ্টাই করব। আমার চেষ্টা যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে তোমাদের মোবাইল করব, তাও না পারলে ওয়াম বাটন প্রেস সিষ্টেমে আমি মিসকল দেব।' বলেছিল সাবাত সোলায়মান।

এসব কথা সামনে এসে গিয়েছিল দানিয়েল দানেশের। মিকাইল মৈনাকের কথার জবাবে সে বলল, 'হ্যাঁ, আহমদ মুসা না হলে গুলী করার দরকার নেই।'

কথা শেষ করেই দানিয়েল দানেশ মোবাইল তুলে একটা কল করল। বলল, 'তোমরা তিন জন বাড়ির সামনে থাক। অস্ত্র বাগিয়ে খুব ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে আগাও। যাতে তাদের সব মনোযোগ তোমাদের দিকে নিবদ্ধ থাকে। যে তরফেরই হোক গুলীর শব্দ শোনার পর তোমরা বাড়িতে প্রবেশ করবে।'

মোবাইল বন্ধ করে পকেটে রেখেই বলল দানিয়েল দানেশ, 'চল আমরা পেছন দিক দিয়ে বাড়িতে ঢুকব।'

সরদার জামাল উদ্দিনের বাড়িটার পেছনের দিকটায় ফলের বাগান। ছোট-বড় অনেক গাছ। বড় গাছের বিভিন্ন ধরনের আগাছা।

গাছ-গাছড়ার আড়াল নিয়ে তারা বাড়ির পেছনের পাশে গিয়ে পৌছল। বাড়ির কোন পাশে বা পেছনে কোথাও চাকর-বাকরদের যাতায়াত ও মাল-পত্র আনা-নেয়ার জন্য একটা দরজা থাকবেই, এটা তারা ধরেই নিয়েছিল।

তারা পেয়ে গেল দরজা। পুরু ষ্টিলশীটের বড় দরজা।

ডিজিটাল লক। ভেতর থেকে বন্ধ করা।

দানিয়েল দানেশ পকেট থেকে ল্যাসার বীম কাটার বের করে দরজার লক এরিয়া গোটাটাই কেটে ফেলল। খসে পড়ল কাটা অংশটা। তৈরি হলো টেনিস বল আয়তনের একটা ছিদ্র। দরজাও একটু নড়ে উঠে কিঞ্চিত পেছনে সরে গেল।

হঠাৎ একটা অব্যাহত যান্ত্রিক শব্দ কানে এল দানিয়েল দানেশের। দরজায় সৃষ্ট ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল দানিয়েল দানেশ। শুনতে পেল অব্যাহত অ্যালার্ম বাজার শব্দ। দেখল ভেতরের ঘরটা আলোকিত। ঘরে কেউ নেই।

বুঝে নিয়েছিল দানিয়েল যে ডিজিটাল লকের সাথে এলার্ম সংযোগ ছিল। ডিজিটাল লকটা আনলক হলেও এলার্মের সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি।

দানিয়েল দানেশ তাড়াতাড়ি দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করল। দেখল কেটে ফেলা ডিজিটাল লকটি দরজার পাশের দেয়ালে একটা তারে ঝুলছে। তারটি ছিড়ে ফেলল সে।

থেমে গেল এলার্ম।

দানিয়েল দানেশের সংগে সংগে অন্য সবাই প্রবেশ করল ভেতরে।

ভেতরটা কোন ঘর নয়, আয়তাকার একটা প্যাসেজ।

এলার্ম থামলেও আতংক কাটেনি দানিয়েল দানেশের। এলার্ম বেজেছে তার অর্থই হলো প্রতিপক্ষের কাছে তাদের আগমনের কথা ঘোষণা হয়ে গেছে। অতএব শত্রুদের অলক্ষে পেছন দিক থেকে নিরাপদ আক্রমণের যে চিন্তা তারা করেছিল, তা ভন্ডুল হয়ে গেল।

প্যাসেজটির সামনে তিন ধাপের একটা সিঁড়ি। সিঁড়ির মাথায় একটা বড় খোলা দরজা। দরজার ওপারটাও আলোকিত।

কিছুক্ষণ স্থির দাঁড়িয়ে থাকার পর দানিয়েল দানেশ আস্তে আস্তে সিঁড়ির দিকে এগুতে শুরু করল। হঠাৎ সামনে থেকে পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েই দানিয়েল দানেশ ছুটে গিয়ে সিঁড়ির পাশে দু'ফুট উঁচু দেয়াল সেঁটে হামাগুড়ি দেয়ার মত করে বসল। তার সাথের অন্যরাও এভাবে গিয়ে দেয়ালের আশ্রয় নিল।

এছাড়া তাদের লুকানোর কোন জায়গা ছিল না। লুকানোর জন্যে এটা মোটেও ভাল জায়গা না হলেও যে বা যারা আসছে প্রথমেই তাদের দৃষ্টিতে পড়া থেকে বেঁচে যাবে। তার উপর দেখার জন্যে তারা নিশ্চয় সিঁড়ি পর্যন্ত আসবে। আসলেই সে বা তারা তাদের হ্যান্ড মেশিনগানের আওতায় এসে যাবে।

পায়ের শব্দ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এই ভাবনা দানিয়েল দানেশের থেমে গেল।

সে সতর্ক হয়ে উঠল। তাহলে ওরা নিশ্চয় খোলা দরজা দেখতে পেয়েছে। আমরা ভেতরে প্রবেশ করেছি, এটাও নিশ্চয় তারা সন্দেহ করেছে।

এই চিন্তা শেষ হবার আগেই অনেকগুলো পায়ের শব্দ ভেসে এল দানিয়েল দানেশের কানে। পায়ের শব্দগুলো দরজার কাছাকাছি আসতেই একটা শক্ত চাপা কণ্ঠ চিৎকার করে উঠল, 'সামনে এক পাও নয়, দাঁড়ান আপনারা।'

ঘটনাটা বুঝতে দানিয়েল দানেশের মুহূর্তও দেরি হলো না। আগে যার পায়ের শব্দ শুনেছিল, সে নিশ্চয়ই তাদের আগমন টের পেয়ে দরজার আড়ালে লুকিয়ে অপেক্ষা করছিল। এই সময় বাড়ির অন্যরা এসে পৌছেছে। প্রথম লোকটি আহমদ মুসা হবার সম্ভাবনাই বেশি।

এসব কথা দানিয়েল দানেশের মাথায় বিদ্যুতের মত মুহূর্তেই খেলে গেল। এখন তার কি করা দরকার তাও মাথায় এসে গিয়েছিল। তাদের কথা বলা ও দাঁড়ানোর সুযোগটাকে গ্রহণ করতে হবে। দানিয়েল দানেশ রিভলবার বাগিয়ে আড়াল থেকে লাফিয়ে বের হয়ে এসে দাঁড়িয়েই রিভলবারের টার্গেট ঠিক করতে গেল।

কিন্তু দেখল আহমদ মুসার বাম হাত যখন দু'জনকে ঠেলে মেঝেয় ফেলে দিচ্ছে, তখন তার ডান হাতের মেশিন রিভলবার তার লক্ষে আগেই উঠে এসেছে।

দানিয়েল দানেশের টার্গেটে স্থির হবার আগেই আহমদ মুসার রিভলবারের পর পর দু'টি গুলী এসে তার মাথা ও বুককে বিদ্ধ করল।

দানিয়েল দানেশের পেছনে অন্যরাও তার সাথেই বেরিয়ে এসেছিল। তারাও আহমদ মুসার গুলী বৃষ্টির মুখে গিয়ে পড়ল। ডান দিকে শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়ানো একজনই শুধু গুলী করার সুযোগ পেল। কিন্তু তার ডান হাতের মেশিন রিভলবারের গুলী দরজার সাথে তার কৌণিক অবস্থানের কারণে অধিকাংশই দরজায় গিয়ে বিদ্ধ হলো। দরজাকে পাশ কাটিয়ে কয়েকটি গুলীই শুধু আহমদ মুসার দিকে ছুটে যেতে পারল। তার একটি গিয়ে আহমদ মুসার বাম বাহু বিদ্ধ করল। কিন্তু লোকটি টার্গেট এডজাষ্ট করার দ্বিতীয় সুযোগ পেল না। তার আগেই আহমদ মুসার বৃষ্টির মত ছুটে আসা গুলীর শিকার হলো।

আহমদ মুসা কয়েক ধাপ এগিয়ে এসে দরজার দু'পাশে তাকিয়ে দেখল আর কেউ নেই।

মেঝের উপর পড়ে যাওয়া সরদার জামাল উদ্দিন ও আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন উঠে বসেছে। আয়েশা আলিয়াও ছুটে ঘরে প্রবেশ করেছিল। আহমদ মুসার বাহু থেকে রক্ত ঝরতে দেখে সে আতংকিত হয়ে ছুটে এসে বাহু ধরে বলল, 'স্যার আপনি আহত। আর কোথাও গুলী লাগেনি তো?'

আহমদ মুসার নজর তখন বাইরের দিকে। তিনজন ছুটে আসছে ঘরের দিকে। আহমদ মুসা আয়েশা আলিয়াকে জোরে পাশের দিকে ঠেলে দিয়ে লাফ দিয়ে ঘরের পূর্ব প্রান্তে মেঝের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েই গুলী শুরু করল ঐ তিনজনকে লক্ষ্য করে।

ওরা তিনজন প্রথমে আহমদ মুসাকে দেখতে পায়নি। যখন দেখতে পেয়েছে, তখন আহমদ মুসার গুলী বর্ষণ শুরু হয়ে গেছে। আক্রমণ কিংবা আত্মরক্ষার জন্যে ওরা কোন কিছুর আড়াল নেবার সুযোগ পেল না।

ওরা তিনজনই অসহায়ভাবে মৃত্যুকে আলিংগণ করল।

আর কাউকে না দেখে আহমদ মুসা পেছন ফিরল। আয়েশা আলিয়া ও সরদার জামাল উদ্দিনদের লক্ষ্য করে বলল, 'স্যরি আপনাদের ধাক্কা দিতে হয়েছে। আঘাত পাননি তো!'

'আপনি নিজে গুলীবিদ্ধ হয়ে এই কথা বলছেন, আপনি ঐ ধাক্কাটুকু না দিলে তো ওরা না মরে আমরাই তাদের আগে মরতাম।' বলল আয়েশা আলিয়া।

সরদার জামাল উদ্দিন ও আবদুল কাদেরও আহমদ মুসার পাশে দাঁড়াল। সরদার জামাল উদ্দিন বলল, 'আল্লাহর শোকর আহমদ মুসা, ঠিক সময়ে তুমি এসে পড়ে সাক্ষাত মৃত্যু থেকে আমাদের বাঁচিয়েছ।'

'আপনাদের ওখানে রেখে এসেছিলাম। আপনারা এভাবে এসে ঠিক করেননি।' বলল আহমদ মুসা।

'বিপদ এলার্ম শুনে আমরা সব ভুলে গিয়েছিলাম। তুমি বিপদে পড়েছ কিনা এ ভয়ও আমাদের পেয়ে বসে। কিন্তু তুমি দরজার আড়ালে কি করছিলে?' বলল সরদার জামাল উদ্দিন।

'এলার্ম শুনেই আমি দ্রুত এদিকে আসি। তার আগেই ওরা ভেতরে প্রবেশ করেছে। আমি বাইরের দরজা খোলা দেখি। আমি দরজার আড়ালে যাই লুকানো স্থান থেকে ওদের আরও ভেতরে এগিয়ে আনার জন্যে যাতে ওরা আমাকে দেখতে পাওয়ার আগেই আমার গুলীর আওতায় আসে।'

'আমরা দুঃখিত আহমদ মুসা। এভাবে আসাটা আমাদেরকে বিপদে ফেলেছিল। তোমাকেও বিপদে ফেলেছিল।' বলল জামাল উদ্দিন।

‘এখন কোন কথা নয় দাদা। উনি আহত। চলুন ভেতরে। ওকে হাসপাতালেও নিতে হতে পারে। আসুন, আমি ডাক্তারকে টেলিফোন করতে যাচ্ছি।’ বলল আয়েশা আলিয়া।

বলেই ছুট দিয়েছিল আয়েশা আলিয়া।

‘থাম আয়েশা। আগেই ডাক্তার নয়। দেখি আহত স্থানটা। গুলী ভেতরে নাও থাকতে পারে। ছোট-খাট আঘাতের ব্যবস্থা আমিই করতে পারব।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আমারও নার্সিং ট্রেনিং আছে স্যার।’ বলল আয়েশা আলিয়া।

‘আমিও ভাল ফাষ্ট এইড জানি।’ বলল আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন।

‘আমিও জানি।’ হাসতে হাসতে বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার হাসি ও রসিকতাপূর্ণ কথায় সবাই বিস্মিত হয়ে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল আয়েশা আলিয়া, ‘স্যার মনে হচ্ছে আপনার কিছুই হয়নি। হাসি-রসিকতা দূরে থাক, আমরা হলে আতংক-আর্তনাদেই ডুবে থাকতাম।’

আহমদ মুসা একটু হাসল। কিছুই বলল না।

আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন কিছু বলতে যাচ্ছিল। তাকে বাধা দিয়ে সরদার জামাল উদ্দিন বলল, আর কোন কথা নয়, চল।

সবাই চলতে শুরু করল।

# ৬

'কিন্তু আহমদ মুসা, তুমি সবই বলেছ, তবে তুমি কেন বেতাংগে এসেছ সেটাই বলনি।' বলল সরদার জামাল উদ্দিন।

ড্রইং রুমে সবাই গল্প করছিল।

আহমদ মুসা বসেছে বড় একক একটা সোফায়। তার সামনের একটা সোফায় পাশাপাশি বসেছে সরদার জামাল উদ্দিন ও আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন। তাদের পেছনের অন্য একটা সোফায় বসেছে আয়েশা আলিয়া।

আহমদ মুসার ডান বাহুতে ব্যান্ডেজ। আঘাত বড় ক্ষতিকর ধরনের নয়। তবে গুলী বের করতে ছোট খাট অপারেশন দরকার হয়।

'ঠিক, কথাটা এখনও বলা হয়নি। এটাই শেষ কথা। হয় তো সে কারণেই এ পর্যন্ত বলা হয়নি।'

বলে একটু থামল আহমদ মুসা। গম্ভীর হয়ে উঠল তার মুখ। বলল, 'আপনি কাতান টেপাংগোর রাস্তা চেনেন?'

'হ্যাঁ, চিনি।' সরদার জামাল উদ্দিন বলল।

'এই পথের সন্ধান নেবার জন্যেই আমি বেতাংগে এসেছি।' বলল আহমদ মুসা।

'ওখানেই কি আমাদের জাবের বাংগসা জহীর উদ্দিন বন্দী আছেন?' সরদার জামাল উদ্দিন বলল।

'হ্যাঁ সরদার জী।' আহমদ মুসা বলল।

সংগে সংগে কোন কথা এল না সরদার জামাল উদ্দীনের কাছ থেকে। কিছুটা আত্মস্থ হয়ে পড়েছিল সে। একটুক্ষণ পরেই মুখ তুলে সে বলল, 'বেতাংগ থেকে উপত্যকার পথে যে রাস্তাটা কাতান টেপাংগো থেকে পাত্তানী গেছে, সেটা তো তুমি জান। আবার যে রাস্তা পাত্তানীর দিকে থেকে কাতান টেপাংগো এসেছে, সেটাও তোমার জানার কথা। তার মানে.........।

আহমদ মুসা সরদার জামাল উদ্দিনের কথার মাঝখানেই বলে উঠল, 'দুই রাস্তাই চিনি। কাতান টেপাংগোর সঠিক লোকেশান জানি না। আর ঐ দুই পথের কোনটাই নিরাপদ নয়। শুরুতেই ওদের নজরে পড়ার সম্ভাবনা আছে। ওদের নজর এড়িয়ে সেখানে পৌছুতে না পারলে ওরা জাবের জহীর উদ্দিনকে হত্যা করবে এটা নিশ্চিত।'

'আমি সে কথাই বলছিলাম। ওদের চোখে ধুলা দেবার জন্যে তাহলে ঐ দুই পথ এড়িয়ে তৃতীয় একটি গোপন পথ রয়েছে, সেটারই সন্ধান চাও?' বলল সরদার জামাল উদ্দিন।

'ঠিক।' আহমদ মুসা বলল।

সরদার জামাল উদ্দিন তাকাল নাতি আবদুল কাদের কামাল উদ্দিনের দিকে। বলল, 'তুমি কি কাতান টেপাংগো ঢুকেছ?'

'না ঢুকিনি।' বলল আবদুল কাদের।

সরদার জামাল উদ্দিন তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'কাতান টেপাংগো পর্যন্ত রাস্তা আমরা জানি। কিন্তু গত তিন বছর আমরা কাতান টেপাংগো ঢুকিনি। অর্থাৎ কাতান পাহাড় পার হয়ে টেপাংগো ঢোকার গিরিপথ পর্যন্ত যেতে পারব। তার পরের এলাকাটা নিষিদ্ধ, কিছু লোক ছাড়া অন্য সকলের জন্যে।'

'এই 'অন্য সকলের' মধ্যে আপনারাও পড়েছেন?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'তুমি যা বল সেই 'ব্ল্যাক ঈগল'-এর প্রধান হাবিব হাসাবাহর পরামর্শ কমিটির সদস্য এবং তার ষ্টাফরাই মাত্র ওখানে প্রবেশ করতে পারে। এদিকের গিরিপথও তারা বন্ধ করে দিয়েছে।' বলল সরদার জামাল উদ্দিন।

'ওরা কি উপত্যকার এই দুই পথে আসা-যাওয়া করে? এই পাহাড়ী পথ ওরা চেনে না?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'না এই পথ ওরা চিনে না। আমরা এবং পাহাড়ের কিছু পরিবার ছাড়া এই পথের সন্ধান কেউ জানে না। ননপাহাড়ী কাউকে আমরা এই পথের সন্ধান জানাই না।' বলল সরদার জামাল উদ্দিন।

'পাহাড়ী, ননপাহাড়ীর এই পার্থক্য কেন?' আহমদ মুসা বলল।

‘একটা বিশেষ কারণ আছে।’ জবাব দিল সরদার জামাল উদ্দিন।

‘বিশেষ কারণটা কি জানাবার মত?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘তোমাকে বলা যাবে না এমন কথা আমাদের থাকতে পারে না। ঘটনা হলো, একটা জনশ্রুতি আছে, কাতান পাহাড়ের ‘শাহ রোড’ বা ‘কিং রোডের দু’ধারের কিছু নির্দিষ্ট স্থানে অঢেল গুপ্তধন লুকানো আছে। এই গুপ্তধনের সন্ধানে আসা মানুষের রক্তে পাহাড়ের গা অব্যাহতভাবে রঞ্জিত হয়েছে। তারপর আল্লাহর ইচ্ছায় একটা ভূমিকম্প পাহাড়ের মানচিত্র পাল্টে দিয়েছে। তারপর শাহ রোড কেন্দ্রিক গুপ্তধনের সব নকশা অচল হয়ে গেছে। এই শাহ রোডের সন্ধান এখন শুধু পাহাড়ি কয়েকটি পরিবারই জানে। গুপ্তধনের সেই হানাহানি পাহাড়কে যেন আর গ্রাস না করে, এ জন্যে এই পথের সন্ধান আর কাউকে জানানো হয় না।’ বলল সরদার জামাল উদ্দিন।

‘শাহ রোড বা কিং রোড নামটা কেন? গুপ্তধনের এই জনশ্রুতির রহস্য কি?’ আহমদ মুসা জিজ্ঞেস করল।

‘নাম সম্পর্কেও একটা জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। বলা হয়, থাইল্যান্ড ও মালয় অঞ্চলের রাজ্যচ্যুত বা বিদ্রোহী রাজা-রাজপুত্র, দস্যু-জলদস্যুদের আশ্রয় নেবার গোপন স্থান ছিল গল্পের কোহেতান বা কাতান এই পাহাড়। এই রাজা-রাজপুত্ররা কোহেতান বা কাতান পাহাড়ের যে গোপন পথ ব্যবহার করতো, তাকেই নাম দেয়া হয়েছে শাহ রোড বা কিং রোড। এই নামের সাথে গুপ্তধনের গল্পের সম্পর্ক আছে। মনে করা হয় এত রাজা-রাজপুত্র যখন এসেছে, তখন তাদের রাজকোষও এসেছে। এই রাজকোষেরই সন্ধান করা হতো কিং রোডের দু’পাশে। থামল সরদার জামাল উদ্দিন।

‘আমার মনে হয় জনশ্রুতির সবটুকুই ভিত্তিহীন গাল গল্প নয়, এর মধ্যে ইতিহাসও আছে। রাজ্যচ্যুত বা বিদ্রোহী রাজা-রাজপুত্ররা এই পাহাড় অঞ্চলে পালিয়ে এসেছেন, এটা ইতিহাস। থাইল্যান্ডের সোকোথাই রাজবংশের রাজপুত্র আবদুল কাদের আহমদ শাহ ওরফে ‘চাওসির বাংগসা’ এ অঞ্চলে পালিয়ে আসা এই ইতিহাসের একটা প্রমাণ।’ বলল আহমদ মুসা।

'তাহলে তো গুপ্তধনের কথার মধ্যেও সত্যতা আছে ধরে নিতে হয়।' বলল আয়েশা আলিয়া।

'এটা ধরে নেয়া কেন, এটাই বাস্তবতা যে রাজার সাথে রাজকোষও থাকবে।' আহমদ মুসা বলল।

'তাহলে স্যার আপনিও কিং রোডে গিয়ে গুপ্তধনের সন্ধান করবেন নাতো?' বলল আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'রাজা কে না হতে চায়, রাজকোষ কে না পেতে চায়। তবে আমার কাছে এখন জাবের জহীর উদ্দিন যে কোন রাজকোষের চেয়ে মূল্যবান। তাকে বাঁচানো এবং তাকে আবার পাত্তানীদের মাঝে ফিরিয়ে আনার চেয়ে বড় লোভনীয় কাজ আমার কাছে আর কিছু নেই।'

'ধন্যবাদ স্যার।' বলল আয়েশা আলিয়া।

'আল্লাহর শোকর যে, তোমার মত সোনার মানুষ আল্লাহ এ যুগে সৃষ্টি করেছেন। তুমি আমাদের নেতা সম্পর্কে যা ভাবছ, আমরাও তেমন করে ভাবতে পারি না। তার চেয়েও ট্রাজেডি হলো, যারা আমাদের নিশ্চিহ্ন করতে চাচ্ছে, যারা আমাদের নেতাকে বন্দী করে হত্যা করতে চাচ্ছে তাদেরই আমরা সাহায্য করছি। আমরা আমাদের শত্রুদের চেনার যোগ্যতার হারিয়ে ফেলেছি।' সরদার জামাল উদ্দিন বলল। ভারাক্রান্ত কণ্ঠ তার।

আহমদ মুসা প্রসংগ পাল্টিয়ে বলল, 'কাতান-টেপাংগে যারা ঢুকতে পারে, তারা কারা? আমি বলতে চাচ্ছি তারা এ দেশীয় কিনা?'

সংগে সংগে উত্তর দিল না সরদার জামাল উদ্দিন কিংবা আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন। তারা পরষ্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। ভাবছিল তারা।

একটু পর কথা বলে উঠল আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন। বলল, 'আগে এ বিষয়টা আমাদের মাথায় আসেনি। এখন মনে হচ্ছে, ওদের কারও চেহারা মালয়ী বা পিওর থাই নয়। আর কারও নামই থাই মুসলমানদের মত নয়। কারও কারও চেহারা থাই বা চীনা চেহারার সাথে কিছুটা মিললেও, অধিকাংশের চেহারাই কিন্তু এদেশীয় নয়।'

‘এ এক ভয়াবহ ষড়যন্ত্র। আহমদ মুসাকে আল্লাহ্ এখানে না নিয়ে এলে আমরা এ ষড়যন্ত্রের কিছুই জানতে পারতাম না। শুধু তাই নয়, ষড়যন্ত্রের গুটি হিসাবে আমরা যে কাজ করতাম, তাকেই জাতির স্বার্থে পবিত্র দায়িত্ব পালন বলে মনে করতাম। বিস্ময় লাগছে আমার, এত বড় ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে নিশ্চয় অনেক দিন লেগেছে। অঢেল পয়সা ও অনেক শ্রম খরচ হয়েছে। কিন্তু এত সব করে কি লাভ হয়েছে তাদের? আমাদের লোকরা কষ্ট ভোগ করেছে, জেল-জুলুমের শিকার হয়েছে, কিন্তু তাদের কি লাভ হয়েছে?’ বলল সরদার জামাল উদ্দিন।

‘যে লাভ তারা চায়, সে লাভ তারা ষোল আনা পেয়েছে। ইসলামকে তারা সন্ত্রাসের ধর্ম সাজাতে চায়, মুসলমানদের সন্ত্রাসী সাজাতে চায়। সে উদ্দেশ্য তাদের হাসিল হয়েছে। পৃথিবীর অনেক দেশের মুসলিম জাতি-গোষ্ঠীর মত থাই মুসলমানদের বিরুদ্ধেও চরম পন্থা ও সন্ত্রাসের কাহিনী জগৎময় প্রচার হয়েছে। থাই মুসলমানদের যে ক্ষতি হবার হয়েই গেছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কিন্তু স্যার, আপনি তো বলেছেন থাই সরকারের কাছে বিষয়টি এখন পরিষ্কার। তাহলে ক্ষতি ও বদনাম থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারি।’ বলল আযেশা আলিয়া।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘খারাপ খবর পৃথিবীর সবাই জানতে পেরেছে, কিন্তু ভাল খবরটা তাদের কারো কানেই পৌছুবে না। কারণ গ্লোবাল মিডিয়া কমবেশি তাদেরই নিয়ন্ত্রণে। অনেক দেশের প্রেসিডেন্টও তাদের প্রপাগান্ডার শিকারে পরিণত হয়েছেন। এ থেকেই আমাদের অসহায়ত্ব অনুমান করা যায়।’

‘তাহলে আমাদের উপায়?’ আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন বলল।

‘উপায় খোঁজার অবস্থায় আমরা নেই। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বুদ্ধি বিবেচনায় আমরা পেছনে বলে আমরা যেমন একটা শক্তি হয়ে দাঁড়াতে পারিনি। এই কারণেই গ্লোবাল কোন মিডিয়াও আমাদের হাতে নেই। সুতরাং এ দিকটা না ভেবে ষড়যন্ত্রের হাত থেকে আত্মরক্ষাকেই বড় করে দেখতে হবে। থাই

মুসলমানরা ষড়যন্ত্রের কবল মুক্ত হচ্ছে, এটাকেই আমাদের বড় করে দেখা দরকার।'

'আলহামদুলিল্লাহ। ধন্যবাদ আহমদ মুসা। সত্যি, ষড়যন্ত্র ও বদনাম মুক্তভাবে বাঁচাই এখন আমাদের কাছে বড়। আহমদ মুসা এখন বল করণীয় কি? তোমার সাথে কাতান টেপাংগো যেতে আমরা প্রস্তুত।'

'ধন্যবাদ জনাব, আজই রওয়ানা হতে চাই।' আহমদ মুসা বলল।

'আমি কিন্তু যাচ্ছি।' বলল আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন।

'সাথী পেলে আমি খুশি হবো। বিশেষ করে তোমাদের মত সাথী। চল তৈরি হই।' বলল আহমদ মুসা।

সবাই উঠে দাঁড়াল।

'আমার কি কাজ?' বলল আয়েশা আলিয়া।

থমকে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

হাসল। একটু ভাবল। বলল, 'তুমি তো একা পড়ে গেছ। মেয়েদের জন্যে একা কোন মিশনে যাওয়ার অনুমতি নেই। ওঁরা দু'জন আমার সাথে যাবার জন্যে তৈরি। তোমার সাথী নেই।'

'আছে স্যার। ওর কোন মিশন আছে কিনা?' বলল আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন।

'মিশন আছে। কিন্তু সাথী পাবে কোথায়? ভাই তুমি একাই, অন্য কোন সাথী চলবে না মেয়েদের জন্যে।' আহমদ মুসা বলল।

'আসল সাথী স্যার। যাকে বলতে পারেন জোড়া।' বলল আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন।

'ভাইয়া, এসব এখন কেন?' বলে আয়েশা আলিয়া তার ভাই আবদুল কাদের কামাল উদ্দিনকে থামিয়ে দিতে চেষ্টা করল।

'আলহামদুলিল্লাহ। সুন্দর সুসংবাদ। কিন্তু সে কোথায়?' আহমদ মুসা বলল।

'আমার সাথে কিছুক্ষণ আগে কথা হয়েছে। আপনার কথা শুনেই ছুটে পালিয়েছে। এখনি এসে পৌছুবে। এ বছরই মালয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের

হয়েছে। ক'দিন হলো শিক্ষকের চাকরি পেয়েছে মালয় বিশ্ববিদ্যালয়েই।' বলল আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন।

'সাথী বলছ, জোড়া বলছ, বিয়ে হয়েছে এ কথা বলছ না কেন?' আহমদ মুসা বলল।

'সব ঠিক-ঠাক স্যার। শুধু বিয়ের আসনে বসাই বাকি। আপনি বললে..........।'

আবদুল কাদের কামাল উদ্দিনকে কথার মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে আয়েশা আলিয়া বলে উঠল, 'এসব কথা থাক। ঠিক আছে, আমি কোথাও যাচ্ছি না।' বিব্রত আয়েশা আলিয়ার মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে লজ্জায়।

'না বোন আয়েশা, তোমার জন্যে মিশন ঠিক হয়ে গেছে। তুমি অবশ্যই তা থেকে পিছু হটবে না।' বলল আহমদ মুসা।

গম্ভীর হয়ে উঠল আয়েশা আলিয়ার মুখ। বলল, 'স্যার আপনার ইচ্ছা ও আদেশের চেয়ে বড় কিছু আমার কাছে নেই। আপনি আমাদের নেতা। আপনার নির্দেশে আমি আগুনেও ঝাঁপ দিতে পারি।' আয়েশা আলিয়ার শেষ কথাগুলো আবেগে কাঁপছিল।

'সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। তাহলে বিয়েটা তুমিই পড়িয়ে দাও আহমদ মুসা। তার পরেই আমরা মিশনে বেরুবো। কিন্তু আয়েশা আলিয়াদের মিশন কোথায়, সেটা কিন্তু বলনি আহমদ মুসা।'

'বলছি, আয়েশা আলিয়ারা দু'জন উপত্যকার পথে কাতান টেপাংগের কিছু দূর নিচে লেক চ্যানেলের এপারের ফেরিঘাটে গিয়ে পৌছুবে। সেখানে বসে তারা পাহারা দেবে চ্যানেলের পথকে, যাতে এদিকে হাবিব হাসাবাহ এবং তার লোকরা পালাতে না পারে। ওরা এ পথে পালাবার চেষ্টা করতেও পারে। এটা খুব বড় একটা কাজ।' বলল আহমদ মুসা।

'কিন্তু লেক চ্যানেল অনেক প্রশস্ত। এপারে বসে চ্যানেল পাহারা দেয়া বা এ পথে কাউকে আটকানো সম্ভব নয়। এটা নিশ্চয় তোমার বিবেচনায় আছে।' বলল সরদার জামাল উদ্দিন।

‘ওপারেও ব্যবস্থা আছে। ওপারে ঘাটওয়ালা কয়েকদিন থাকবে না। ঘাটে ও ঘাটওয়ালার বাড়িতে কয়েকজন পুলিশ ঘাটওয়ালা ও তার আত্মীয়ের ছদ্মবেশ নিয়ে থাকবে। আপনার মত করে আমিও এখন বুঝতে পারছি, ঘাটওয়ালারা ওখানে বসে গোটা চ্যানেলে ওদের আটক করতে পারবে না। এজন্যে আয়েশা আলিয়াদের ওখানে পাঠানো হচ্ছে। ওরা পথ-যাত্রীর ছদ্মবেশে ঠিক সময়ে ওখানে গিয়ে পৌছুবে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ঠিক সময়টা আমরা কি করে ঠিক করব?’ বলল আয়েশা আলিয়া।

‘ঠিক সময়টা আমিই ঠিক করে মোবাইলে জানাব। তোমাদের গাড়িটা হবে উভচর। স্থলের গতিতে সে পানিতেও চলতে পারবে। এ রকম একটি গাড়ি বেতাংগোতে এসেছে। তোমরা তা পেয়ে যাবে। আমি তার ব্যবস্থা করে যাব।’ আহমদ মুসা বলল।

‘শহরে থাই সরকারের কমিশনারের সাথে দেখা হয়েছে?’ বলল সরদার জামাল উদ্দিন।

‘কমিশনারকে আমি কি উদ্দেশ্যে এসেছি সেটা ছাড়া সব জানিয়েছি। কমিশনার সাহেব আমাকে টেলিফোন করেছিলেন। কথা হয়েছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তুমি সরকারি সুযোগ-সুবিধা নিয়ে এখানে থাকতে পারতে। তাদের কাছে অনেক সহযোগিতাও পেতে। তুমি তা নাওনি কেন?’ বলল সরদার জামাল উদ্দিন।

‘সরকারি লোকদের উপর অবশ্যই ব্ল্যাক ঈগলের চোখ থাকবে। আবার সরকারি লোকজনদের কেউ কেউ ব্ল্যাক ঈগলের পক্ষে কাজও করতে পারে। এজন্যেই আমি গোপনে থাকছি।’

আহমদ মুসা সরদার জামাল উদ্দিনেরদিকে মুখ তুলে তাকিয়ে বলল, ‘যা করার আমাদের তাড়াতাড়ি করতে হবে জনাব।’

আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন বৈঠকখানাটা একটু গোছ-গাছ করছিল। জানালার দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠল, ‘স্যার আবদুল জববার আল যোবায়ের

এসে গেছে।’ বলেই সে তাকাল আয়েশা আলিয়ার দিকে। বলল, ‘আয়েশা যাও তুমি তৈরি হও। খালাম্মার ওখানে টেলিফোন করে ওঁদের আসতে বল।’

লজ্জায় মুখ লাল হয়ে যাওয়া আয়েশা আলিয়া বলল, ‘তুমিই টেলিফোন কর ভাইয়া।’

এই আবদুল জববার আল-যোবায়েরের সাথেই আয়েশা আলিয়ার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে।

আয়েশা আলিয়া থামতেই তার দাদু সরদার জামাল উদ্দিন বলল, ‘পাহাড়ে তো আর খবর দেয়া যাবে না। তোমাদের খালাদের আমি টেলিফোন করছি আসার জন্যে। তুমি ভেতরে যাও বোন। দেখ কি করার আছে। দেখি যোবায়ের আসছে, কথা বলি তার সাথে।’

আয়েশা আলিয়া ভেতরে চলে গেল। তার মধ্যে লজ্জা, আবেগ, উত্তেজনা ও নার্ভাস ভাব। সব মিলিয়ে তার মুখে অপরূপ এক লাবণ্য।

সরদার জামাল উদ্দিন আহমদ মুসাকে নিয়ে বাইরে বেরুবার জন্যে পা বাড়াল।

শাহ রোড বা কিং রোড কোন রোড নয়, উঁচু-নিচু, এবড়ো-থেবড়ো ও ছোট-বড় পাথরে ঢাকা একটা শুকিয়ে যাওয়া নদীর মত প্রলম্বিত চ্যানেল।

দিগন্ত প্রসারিত শাহ রোড বা কিং রোড নামক চ্যানেল ধরে এগিয়ে যাচ্ছে আহমদ মুসা। সাথে সরদার জামাল উদ্দিন ও আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন।

আগে হাঁটছিল আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন। মাঝখানে আহমদ মুসা। আর পেছনে সরদার জামাল উদ্দিন।

চ্যানেলের দু’পাশে উঁচু-নিচু পাহাড়ের সারি, পাথরের স্তুপ এবং মাঝে মাঝেই এদিক-সেদিক গিরি গলিপথ। আবদুল কাদের এক জায়গায় চ্যানেলের পথ পরিত্যাগ করে পশ্চিম দিকের সংকীর্ণ এক গিরিপথে প্রবেশ করল।

‘আমরা কিং রোডের চ্যানেল ছাড়ছি, ভুল হচ্ছে না তো?’ আহমদ মুসা বলল।

‘স্যার সামনে গিয়ে কিং রোড একটা খাদে শেষ হয়েছে।’ পেছনে না তাকিয়েই বলল আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন।

‘পূর্ব দিকেও তো গিরিপথ দেখছি। আমাদের তো যেতে হবে পূর্ব দিকেই, কাতান টেপাংগো তো ওদিকেই?’ আবার আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

‘স্যার পূর্ব দিকের রাস্তা ঘুরে-ফিরে আমাদের ফেলে আসা অনেক পেছনে কিং রোডে গিয়েই উঠেছে। পথভ্রষ্ট করার এক গোলক ধাঁধাঁ ওটা।’ বলল আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন।

আবদুল কাদেরের পেছন থেকে তার দাদা সরদার জামাল উদ্দিন বলে উঠল, ‘ভাই আহমদ মুসা পশ্চিম পাশে ও পেছনে আরও কিছু পশ্চিমমুখী পথ এই পথের মতই রয়েছে। ওগুলোর কোনটা দিয়েই লক্ষে পৌছা যাবে না। ওসবের সবগুলোই কোনটা পাহাড়ের দেয়ালে, কোনটা গিরিখাদের মুখে গিয়ে শেষ হয়ে গেছে। মাত্র এই একটি পথই নানা গোলক ধাঁধাঁ পেরিয়ে কাতান টেপাংগোর দেয়াল পর্যন্ত পৌছেছে।

পাহাড়ের এই পথ ধরে ঘণ্টা দুয়েক চলল। পথটির দু’পাশে অনেক গলিপথ তারা পেরিয়ে এল। কোন কোন গলিপথ তাদের পথ থেকেও প্রশস্ত। এসব ক্ষেত্রে কোন পথ বেছে নেবে তা নির্ণয় করতে ষোল আনা ভুল হবার সম্ভাবনা। এক জায়গায় তো চলে আসা পথটি ছেড়ে দিয়ে পাশের একটা অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ গলিপথ ধরতে হয়েছে তাদের। আহমদ মুসা জিজ্ঞেস করে জেনেছে চলে আসা পথ ধরে তারা সামনে এগুলে ঘণ্টা তিনেক ঘোরার পর আবার পেছনে ফিরে গিয়ে কিং রোডেই উঠতে হতো।

ঘণ্টা তিনেক চলার পর একটা প্রশস্ত চ্যানেলে তারা ফিরে এল। আহমদ মুসা খুশি হয়ে বলল, ‘তিন ঘণ্টা পর কিং রোড আবার আমরা পেয়ে গেলাম।’

হাসল আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন। বলল, ‘স্যার এটা শেষ ধাঁধাঁ। এটা একদম কিং রোডের মত, কিন্তু কিং রোড নয়। এটা ধরে এগুলে পাহাড়ের ডান পাশে অর্থাৎ পশ্চিম প্রান্তের লেকে গিয়ে পড়তে হবে।’

কথা শেষ করেই ‘আসুন’ স্যার বলে চ্যানেলের কয়েক গজ এগিয়ে বাঁ দিকের সংকীর্ণ গিরিপথে প্রবেশ করল।

এক ঘণ্টা চলার পর সামনেই একটা পাহাড়ের পাশ দিয়ে আরেকটা প্রশস্ত চ্যানেল দেখতে পেলো। আহমদ মুসা বলে উঠল, ‘আবদুল কাদের, এবার ভুল হবে না। ওটা নিশ্চয় কিং রোড।’

হাসল আবদুল কাদের। বলল, ‘এবার ঠিক ধরেছেন। আমরা কিং রোডে ফিরে এসেছি। আমরা যতটা পথ এগিয়েছি, আর ততটুকু এগুলেই কাতান টেপাংগো পৌছে যাব স্যার। আমরা অর্ধেক পথ পার হয়েছি।’

আবদুল কাদের কিং রোডে উঠেছে। আহমদ মুসা কিং রোডে উঠতে গিয়ে শেষ পাহাড়টার পাশ দিয়ে গিরি পথ অতিক্রম করছে। হঠাৎ ক্ষয়ে যাওয়া বিছানো পাথরের মাঝামাঝি স্থানে একটা অমসৃণ বৃত্ত, বৃত্তের নিচের দিকে গভীর ও পুরানো কিছু সুশৃঙ্খল রেখা দেখে চমকে উঠল আহমদ মুসা। থমকে দাঁড়াল। এগুলো পাথরটার দিকে।

দাঁড়াল পাথরটার পাশে।

পকেট থেকে টিস্যু পেপার বের করে পাথরের উপরটা মুছল আহমদ মুসা।

মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আহমদ মুসার। যা ভেবেছিল তাই, সুশৃংখল রেখাগুলো আরবী ক্যালিওগ্রাফি।

সরদার জামাল উদ্দিন ও আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন আহমদ মুসার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের চোখে-মুখে বিস্ময়।

ক্যালিওগ্রাফির লেখা পড়ল আহমদ মুসা। ক্যালিওগ্রাফিতে একটা শব্দই লেখা রয়েছে। সেটা ‘তাহতা’ অর্থাৎ ‘নিচে’।

আহমদ মুসা মুখ ফেরাল সরদার জামাল উদ্দিনের দিকে। বলল, ‘ক্যালিওগ্রাফিক ষ্টাইলে এখানে একটি আরবী শব্দ লেখা রয়েছে।’

‘আরবী শব্দ? কি শব্দ? কি লেখা?’ বলল সরদার জামাল উদ্দিন। তার কণ্ঠে উত্তেজনা।

আহমদ মুসা বলল, ‘নিচে।’

'নিচে অর্থ কি?' বলল সরদার জামাল উদ্দিন।

আহমদ মুসা ভাবছিল। বলল, 'এটা একটা সংকেত হতে পারে। পাথরটার নিচটা দেখতে হবে।'

বলেই আহমদ মুসা হাত দিয়ে চাপ দিয়ে পাথরটা পরীক্ষা করল।

পাথরটা বড়, কিন্তু খুব বড় নয়। পাথরটা তেমন নড়ল না বটে, কিন্তু লুজ মনে হলো তার কাছে।

'আসুন জনাব আমরা পাথরের তলাটা দেখি।' বলল আহমদ মুসা সরদার জামাল উদ্দিনকে লক্ষ্য করে।

তিনজনে পাথরটার একটা প্রান্ত ধরে উল্টে ফেলল। পাথরের তলদেশটির চার প্রান্ত এবড়ো-থেবড়ো হলেও মাঝখানটি বিস্ময়করভাবে মসৃণ। এই মসৃণ জায়গায় খোদাই করা গাছের ছবি।

গাছের ছবিটা দেখেই আহমদ মুসা তাকাল চারদিকে। না, কোথাও কোন গাছের চিহ্ন নেই।

'স্যার, পাথরের তলায় ওটা তো গাছ মনে হচ্ছে।' বলল আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন।

'হ্যাঁ, আবদুল কাদের।' বলে আহমদ মুসা টিস্যু পেপারটি কুড়িয়ে নিয়ে পাথরের গা ভালো করে পরিষ্কার করল। গাছটার শাখা-প্রশাখা পরিষ্কারভাবে চোখে পড়ল।

আহমদ মুসা নিশ্চিত যে, ক্যালিওগ্রাফির সংকেত অনুসরণে পাথরের তলায় গাছ যখন পাওয়া গেছে, তখন গাছও একটা সংকেত হবে অথবা এর কোন অর্থ অবশ্যই থাকবে।

আহমদ মুসার দুই চোখ গভীরভাবে দেখতে লাগল পাথরের মাঝে খোদাই করা গাছটিকে।

হঠাৎ আহমদ মুসার চোখ দুটি তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আনন্দে।

চোখ দুটি তার আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। দেখল যেন আরও ভালোভাবে।

গাছের উপর চোখ রেখেই বলল, 'মনে হচ্ছে জনাব সুখবর, রাজভান্ডার পেয়ে গেছি।' আহমদ মুসার ঠোঁটে হালকা হাসি।

সরদার জামাল উদ্দিন ও আবদুল কাদের কামাল উদ্দিনও ঝুঁকে পড়ল পাথরের উপর।

আহমদ মুসা বলল, 'দেখুন গাছের মাঝ বরাবর ডান থেকে বামে, গাছের খোদাই করা ডালগুলোর সংযুক্ত অংশের উপর ভালো করে চোখ রাখুন, দেখবেন আরবী শব্দ তৈরি হয়ে যাচ্ছে।'

সরদার জামাল উদ্দিন বলল ধীরে ধীরে, 'হ্যাঁ ভাই আহমদ মুসা সেরকমই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু পড়তে পারছি না। 'আইন', 'মিম' ছাড়া আর কোন অক্ষর স্পষ্ট হচ্ছে না।'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'স্পষ্ট হবে। আর একটু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখুন। দেখুন আইনের মাথায় একটা গোলাকার আপেল ঝুলছে। ওটাকে নোকতা ধরুন। তাহলে আইনটা 'গায়েন' হয়ে যাবে। গায়েনের পর দেখুন বাম দিকে বিলম্বিত হয়ে যাওয়া শাখা কাছাকাছি পাশাপাশি দু'জায়গায় পিরামিড হয়ে উঠেছে। প্রথম পিরামিডের সুঁচালু মাথার উপর দেখুন একটা পাতা গোলাকার অবস্থায় ঝুলে আছে। দ্বিতীয় পিরামিডের নিচে দেখুন দুটি ফুল একই বৃন্তে ফুটে আছে। প্রথম পিরামিডকে 'নুন' এবং দ্বিতীয় পিরামিডকে 'ইয়া' ধরতে হবে। এবার প্রথম আরবী বর্ণের সাথে পরের বর্ণের মিমকে যুক্ত করুন। তাহলে পাওয়া যাচ্ছে একটা শব্দাংশ 'গানিমা'। 'গানিমা'র মিম শব্দের পরে দেখুন তলোয়ারের মত একটা শাখা বাম পাশের শেষ পর্যন্ত গেছে এবং তলোয়ারের শেষ প্রান্তটা বাঁকা হয়ে একটু উপরে উঠে গেছে। আর তলোয়ারের বুকের উপর দেখুন ঝুলন্ত দুটি পাতা কুঁকড়ে বৃত্তাকার হয়ে আছে। ও দুটি বৃত্তকে দুই নোকতা ধরুন। তাহলে ওটা হয়ে যাচ্ছে আরবী অক্ষর 'তা'। সব মিলে শব্দটা দাঁড়াচ্ছে 'গানিমাত'।

আহমদ মুসার শব্দটা উচ্চারণ শেষ হতেই সরদার জামাল উদ্দিন বিস্ময় ও আনন্দে চিৎকার করে উঠল, 'মানে 'মাল', ধনসম্পদ'। তাহলে এখানেই কি কিংবদন্তীর সেই ধন-সম্পদের একটা ভান্ডার লুকানো আছে? তুমি কি সেই খবরের কথা বলছ?'

সরদার জামাল উদ্দিনের কথা শেষ হতেই আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন বলে উঠল, ‘গানিমাত মানে কি ধন-সম্পদ? ‘মালে গানিমাত’ যুদ্ধলব্ধ ধন বুঝতাম।’

‘গানিমাত’ মানে সহজে যে ধন-সম্পদ লাভ হয়। যুদ্ধ জয় থেকে সহজেই সম্পদ লাভ করা যায় বলে ওকেও মালে গানিমাত বলে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ভাই আহমদ মুসা, সত্যই তুমি মনে করছ এখানে ধন-ভান্ডার আছে? ‘গানিমাত’ শব্দ কি সেই ইংগিতই দিচ্ছে?’ বলল সরদার জামাল উদ্দিন।

আহমদ মুসা কথা বললেও তার অনুসন্ধানী চোখ পাথরের গাছ ও আশে-পাশে ‘গানিমাত’ বা সহজলভ্য ধনভান্ডারটি এখানে কিংবা কোথায় তার ইংগিত খুঁজে ফিরছিল।

পাথরের দিক থেকে মুখ না তুলেই আহমদ মুসা বলল, ‘অবশ্যই জনাব একটা ধনভান্ডার আছে। কিন্তু কোন জায়গায় সেটা আছে, তারই সংকেত আমি খুঁজছি।’

হঠাৎ আহমদ মুসার চোখে পড়ল গাছের গোড়ার ঠিক নিচে পাথরের গায়ে খোদাই করে চোখে পড়ার মত স্পষ্ট করে মিম লেখা। মিমের পরেই একটা তীর আঁকা। তীরের মাথায় একটা ‘এক’ লেখা। তারপর আবার ‘তীর’। তীর চিহ্নের পর দুই লেখা। এরপর তৃতীয় তীর এবং তারপর ‘তিন’ লেখা। লক্ষণীয় বিষয় হলো, তৃতীয় তীরের মাথা নিমণমুখী এবং ‘তিন’ অংকের মাথাও নিচের দিকে।

আহমদ মুসা অংকের এই সংকেতটি দেখাল সরদার জামাল উদ্দিনকে এবং আমার অনুমান ভুল না হলে এটাই ধন-ভান্ডারে পৌছার সংকেত।

আগ্রহ ভরে দেখল সরদার জামাল উদ্দিন ও আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন।

ভাবছিল আহমদ মুসা। ভাবছিল ধনভান্ডার কোথায় লুকানো আছে, এ নিয়ে নয়। ভাবছিল ধনভান্ডার উদ্ধার আগে, না কাতান-টেপাংগো যাওয়া আগে।

‘ভাই আহমদ মুসা, আমরা কিছু বুঝতে পারছি না অংকের সংকেত থেকে। পাথরকে সামনে রেখে আমরা দাঁড়িয়ে আছি পশ্চিমমুখী হয়ে। তাহলে

তীরের সংকেত আমাদের যেতে বলছে দক্ষিণ দিকে। কিন্তু এক,দুই, তিন-এর সংকেতটা বুঝছি না।’ বলল সরদার জামাল উদ্দিন।

‘সংকেত দক্ষিণ দিকের নয়। দেখুন অংকগুলোর আগে ‘মিম’ হল ‘মাগরিব’ এর প্রথম বর্ণ। অথএব ইংগিতটা ‘মাগরিব’ বা পশ্চিম দিকে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘এক, দুই, তিন এর ব্যাখ্যা কি?’ বলল আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন।

‘পশ্চিম দিকে পরপর তিনটি স্থান অথবা তিনটি পাহাড়কে নির্দেশ করা হয়েছে। তৃতীয় স্থান বা পাহাড়ের কোথাও লুকানো রয়েছে ধনভান্ডার।’ আহমদ মুসা বলল।

সবাই তাকাল পশ্চিমের পাহাড়ের দিকে। সামনে পাহাড়ের বহু টিলা। তারা যে টিলায় দাঁড়িয়ে সেখান থেকে প্রথম টিলাটা ২০০ গজের মত দূরে হবে। দ্বিতীয় টিলার দূরত্ব হবে ৫০০ গজের মত। আর তৃতীয় টিলাটি কম পক্ষে আধা মাইল দূরে। তৃতীয় টিলাকে টার্গেট ধরলে আধা মাইল দূরের ঐ টিলাতেই তাদের যেতে হবে।

কিন্তু আহমদ মুসার মনের ভেতর থেকে এর পক্ষে কোন সাড়া পেল না।

আহমদ মুসার দুই চোখ ফিরে গেল আবার সেই অংকের সংকেতে আর কোন ইশারা পায় কিনা দেখার জন্যে।

অংক ও তীরের স্থানটাকে আরো ভালো করে মুছে পরিষ্কার করল। তীরের উপর এবার নজর পড়তেই তার চোখে পড়ল, তীরের কিছু উপরে কনুই পর্যন্ত একটা হাত আঁকা। তীরের উপর থেকে ধুলো-বালি সরে যাওয়ায় আহমদ মুসা দেখতে পেল তীরের দন্ডটা প্লেইন নয়, খাঁজ কেটে অনেকগুলো ভাগে ভাগ করা। আহমদ মুসার চোখ দু’টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। গুণে দেখল প্রত্যেকটা তীরে ২০টি করে খাঁজ কাটা আছে। তার মানে তৃতীয় স্থানটা এখান থেকে ৬০ হাত দূরে।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘তিনটি তীর ও তিনটি অংকে তিনটি স্থানকে দেখানো হয়েছে। তিনটি স্থান একটি অপরটি থেকে ২০ হাত ব্যবধানে

রয়েছে। আপনারা দেখুন তীরের পাশে হাত আঁকা আছে এবং প্রত্যেকটি তীরে ২০টি করে খাঁজ আছে।'

শুনেই সরদার জামাল উদ্দিন ও আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন ঝুঁকে পড়ে পাথরের উপর চোখ বুলাতে লাগল।

কথা শেষ করেই আহমদ মুসার মনে হলো সংকেতে তিনটা তীর, তিনটা অংক দিয়ে স্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছে কেন? পশ্চিমে ৬০ গজ বুঝলেই তো হয়ে যেত? হঠাৎ আহমদ মুসার মনে হল, তিনটি স্থানেও ধাঁধাঁ থাকতে পারে। আহমদ মুসা বলল, 'আমাদেরকে ২০ হাত থেকে প্রথম স্থানে যেতে হবে। ওখানে নিশ্চয় কোন সংকেত পাওয়া যাবে, সেই অনুসারে আমাদের সামনে এগুতে হবে।

গাছওয়ালা পাথরটি উল্টিয়ে আগের অবস্থায় রেখে আহমদ মুসা ঠিক পশ্চিমমুখী হয়ে ২০ হাত এগুলো। ঠিক বিশতম হাতের জায়গায় এলো-মেলো, এবড়ো-থেবড়ো অবস্থায় তিনটি পাথর পাওয়া গেল। তিনটি আরবী 'এক' লেখাও পাওয়া গেল। প্রত্যেকটি 'এক' অংকের সাথে রয়েছে একটি দিক নির্দেশক তীর। তীরের ফলকের সামনে একটিতে 'মিম' অর্থাৎ মাগরিব, 'দ্বিতীয়টি 'জিম' অর্থাৎ জুনব (দক্ষিণ) এবং তৃতীয়টির সামনে 'শিন' অর্থাৎ শেমাল (উত্তর)।

আলোচনা করে পশ্চিমে যাবারই সিদ্ধান্ত নিল তারা। কিন্তু হঠাৎ আহমদ মুসার মনে হলো, পশ্চিমে যেতে হবে আগে থেকেই জানা, তাহলে তিন দিকের এই ধাঁধাঁ সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি?

সন্দেহের কথা সবাইকে বলে আহমদ মুসা তিনটি পাথরের সংকেতের মধ্যে আর কোন সংকেত পাওয়া যায় কিন দেখার জন্য তিন পাথরের সংকেত ভালোভাবে পরীক্ষা করতে শুরু করল। এই পরীক্ষা করতে গিয়ে আহমদ মুসা বিস্ময়ের সাথে দেখল উত্তর দিকে ইংগিতকারী পাথরের সংকেতে একটি 'মিম' বাড়তি আছে। সে 'মিম'টি পাথরটির 'এক' অংকের নিচে ছোট্ট করে লেখা।

আহমদ মুসা স্মরণ করল সংকেতওয়ালা পাথরটির গাছের 'মিম'টির কথা। 'মিম'টি সেখানে কোন অংকের সাথে ছিল না। ছিল প্রথম 'এক' অংকের পেছনের তীরের পেছনে। অর্থাৎ ঐ মিমটি সেখানে শুধু দিক জ্ঞাপক ছিল না, ছিল মূল সংকেত। সুতরাং 'মিম'কেই অনুসরণ করতে হবে।

‘আমাদেরকে উত্তর দিকে বিশ হাত চলতে হবে।’ বলল আহমদ মুসা।

সরদার জামাল উদ্দিন ও আবদুল কাদের দু’জনেই বিস্ময় ভরা দৃষ্টিতে তাকাল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা তাদেরকে ‘মিমের’ রহস্য খুলে বলল।

বিস্ময় তাদের চোখ-মুখ থেকে গেল না। তারা অনুসরণ করতে লাগল আহমদ মুসাকে।

বিশতম হাতের স্থানে এবারও পেল তিনটি পাথর। তিনটি পাথরেই ডানাছাড়া পাখির ছবি আঁকা। একটি পাখি পশ্চিমমুখী, একটি উত্তরমুখী, তৃতীয়টি পূর্বমুখী। পশ্চিমমুখী পাখির চোখের নিচে ঠোটের উপর একটি ছোট ‘মিম’ আঁকা।

সরদার জামাল উদ্দিন ও আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন দু’জনেই মিমটা দেখল।

এবার পশ্চিম দিকে ২০ হাত যাবার পালা। সবাই তাকাল পশ্চিম দিকে। বিশ হাত দূরে এই পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু অংশ। এটাই মূল অংশ পাহাড়ের। ওখানে পৌছার একটাই সংকীর্ণ গিরিপথ। গিরিপথের দুই পাশে গভীর গিরি খাদ।

সেই সংকীর্ণ গিরিপথ ধরে তারা এগুলো। দশ বারো হাত দূরত্বের স্বল্প পথ পেরিয়ে পাহাড়ের গলিতে গিয়ে পৌছল। গলিটির দক্ষিণ দিকে মূল পাহাড়। আর পশ্চিম, উত্তর এবং পূর্ব দিকে পাহাড়ের দেয়াল। পূর্ব দিকের দেয়ালে মাত্র একটা সংকীর্ণ পথ।

এই গলিপথে তারা এগুলো ২০ হাত পূর্ণ করে।

যেখানে গিয়ে দাঁড়াল তারা, তার সামনে দক্ষিণ পাশের পাহাড়ের দেয়ালে এবড়ো-থেবড়ো বড় একটা পাথর। পাথরটি যেন তিলকের মত পাহাড়ের বুকে ঢুকে গেছে। পাথরের এক স্থানে অমসৃণ গায়েই নিচের দিকে মাথা বাঁকানো তীর আঁকা। তীরের পেছনেও মিম আঁকা।

‘আলহামদুলিল্লাহ আমরা পৌছে গেছি। আমি নিশ্চিত এই পাথরটিই ধনভান্ডারের মুখের তিলক। এটা সরালেই সেই ধনভান্ডার উন্মুক্ত হয়ে যাবে।

সরদার জামাল উদ্দিন ও আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন আলহামদুলিল্লাহ বলে উঠল।

আহমদ মুসা বলল, 'আমার একটা প্রশ্ন। আমরা একটা মিশনে এসেছি। হঠাৎই আমরা একটা রাজভান্ডারের মুখোমুখি হয়েছি, যদি সংকেতের বক্তব্য সত্য হয়। এখন আমাদের কি করণীয়?'

সংগে সংগেই আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন বলে উঠল, 'মিশনটাই আগে সমাপ্ত করা দরকার। ওটা বেশি জরুরি।'

আহমদ মুসার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'ধন্যবাদ আবদুল কাদের। তোমার কাছে এই উপযুক্ত জবাবই আশা করছিলাম।'

আহমদ মুসা থামতেই সরদার জামাল উদ্দিন বলল, 'আমিও তোমাদের সাথে একমত। তবে আমরা সংকেত ধরে এত দূর এলাম সেটা কি, তা আমরা এখনো জানি না। আমি মনে করি আমাদের এই জানার কাজটা কমপ্লিট হওয়া দরকার।'

'আপনার কথাতেও যুক্তি আছে। জনাব। যে অনুসন্ধিৎসায় আমরা এ পর্যন্ত এসেছি, তা শেষ করা দরকার।'

বলে একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর আবার শুরু করল, 'পাথরের উপর ক্যালিগ্রাফী দেখতে পাওয়া এবং সংকেত অনুসরণে এগিয়ে যাবার জন্যে মনে অনুসন্ধিৎসার সৃষ্টি হওয়াকে আমি আল্লাহর ইচ্ছা হিসাবে গ্রহণ করেছি। আমি মনে করছি আল্লাহ আমাদেরকে কোন ধন-ভান্ডার বা অন্য কোন কিছুর কাছে পৌছাতে চান। এই চিন্তাতেই আমি কিছুটা সময় এর পেছনে ব্যয় করেছি। অতএব যা জানার জন্যে এসব করেছি তা জানা প্রয়োজন।'

'ধন্যবাদ স্যার। এটাই ঠিক সিদ্ধান্ত।' বলল আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন।

'একার পক্ষে সম্ভব নয়, আসুন সবাই মিলে পাথরটাকে সরাতে চেষ্টা করি।' বলে পাথরের দিকে এগিয়ে গেল আহমদ মুসা।

পাথরটিকে দেকেই আহমদ মুসা বুঝল, পাথরটি লম্বভাবে পাহাড়ের বুকে ঢুকে আছে। কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে মসৃণ সমতল একটি

পাথর পাহাড়ের উপর বসে আছে। আরও একটু মনোযোগ দিলে দেখা যাবে পাথরটি ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে, যা পাহাড়ের স্বাভাবিক দৃশ্য। কিন্তু দৃষ্টি একটু প্রসারিত করলেই দেখা যাবে ভিন্ন চিত্র। যে পাথর ভেতর থেকে প্রাকৃতিকভাবে উঠে আসে, তার নিচের দিকটা সরু ও মাথাটা মাটি থেকে উঠেই মোটা হয়ে যায় না।

তিনজনে মিলে পাথরটা সরিয়ে পাশের একটা পাথরে ঠেস দিয়ে রাখল। পাথর সরাতেই তার নিচে দেখা গেল পাথর কুচি ও মাটিতে নিচটা ভর্তি। স্থানটা গোলাকার।

আগ্রহের সাথে সবাই স্থানটা দেখছিল।

জমাট বাঁধা পাথর কুটি ও মাটির মধ্যে দুটো চেইন সবারই এক সাথে নজরে পড়ল। তিনটি হাত এক সাথেই সেদিকে এগুলো।

আহমদ মুসা হাত টেনে নিয়ে বলল, 'আমার মনে হয় পাথর ও মাটি কোন কনটেইনারে আটকে আছে। দুই চেইন ধরে টানলেই ওটা বেরিয়ে আসবে।'

তাই হলো। আবদুল কাদের ও সরদার জামাল উদ্দিন, দুজন দুই চেইন ধরে কিছুক্ষণ টানাটানি করতেই টবের মত উপরে প্রসারিত ও পেছনটা সরু একটা কনটেইনার বেরিয়ে এল।

কনটেইনার ও চেইন দু'টিই পিতলের তৈরি। কিন্তু বিবর্ণ হয়ে গেছে, চেনার উপায় নেই।

কনটেইনারটি পাশে রেখে দিল তারা।

পাথর মাটির মধ্য থেকৈ কনটেইনারটি উঠিয়ে নেবার পর ভেতরে দেখা গেল গুহার গোলাকার মুখ জুড়ে কালো একটা ঢাকনা গুহা-মুখের ফুট দেড়েক নিচে।

আহমদ মুসা হাত ঢুকিয়ে ঢাকনাটা স্পর্শ করে বুঝল, ওটা ধাতব। ঢাকনার মাঝখানে হাত দিয়ে ধরার একটি রিং পেল আহমদ মুসা। রিং ধরে ঢাকনা উপরে তোলার চেষ্টা করতেই গুটিয়ে ছোট্ট হয়ে গেল।

সংগে সংগেই চোখ ধাঁধিয়ে গেল সকলের। গোটা গুহা জুড়ে সোনালী সূর্যের ঝিলিক। গুহাভর্তি অঢেল সোনার মোহর।

তিনজনই বিস্ময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সেদিকে।

'আলহামদুলিল্লাহ।' বলে উঠল আহমদ মুসা।

'আলহামদুলিল্লাহ।' বলল সরদার জামাল উদ্দিন ও আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন এক সাথেই।

স্বর্ণ মুদ্রার উপরে আয়তাকার একটা বাক্স দেখতে পেল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা ঝুঁকে পড়ে বাক্সটি তুলে নিল। বাক্সটি সোনার।

বাক্সটি উল্টিয়ে আহমদ মুসার মনে হলো এয়ারটাইট লক। বাক্সের মূল অংশ ও ঢাকনা মুখে মুখে ভিড়ানো।

খোলার কৌশল খুঁজতে গিয়ে বাক্সের দুই পাশে মূল অংশের উপরে ঢাকনার প্রান্ত ঘেঁষে নিচে বুড়ো আঙুলের ছাপ আঁকা দেখল।

বুঝল এ দুই স্থানে বুড়ো আঙুল দিয়ে চাপ দিতে বলা হয়েছে।

দুই বুড়ো আঙুল দিয়ে চাপ দিল আহমদ মুসা। সংগে সংগেই উপরের ঢাকনাটা ছিটকে উপরে উঠে পড়ে গেল।

সকলের আগ্রহী চোখ গিয়ে আছড়ে পড়ল বাক্সের ভেতরে।

বাক্সে তিন খন্ড চামড়ার কাগজ। সুন্দর, মসৃণ। এক সময় সাদা ছিল, এখন বিবর্ণ। তাতে আরবী লেখা। কালো কালিতে।

সকলের চোখেই অপার অনুসন্ধিৎসা। কি লেখা আছে কাগজটিতে!

সবাই সাবধানে হাতে নিয়ে দেখল চামড়ার কাগজ।

সরদার জামাল উদ্দিন বলল, 'আমরা যাবার আগে কাগজে কি লিখা আছে জেনে যেতে চাই। ভাই আহমদ মুসা তোমার কি মত? তুমি পড়বে কাগজটা?'

হেসে আহমদ মুসা বলল, 'আমি সেটাই ভাবছি। না পড়ে, না জেনে সামনে যেতে মন সায় দিচ্ছে না।'

'তাহলে স্যার পড়ুন। নিশ্চয় এতে ধনভান্ডার যিনি রেখেছেন তার পরিচয় ও তাঁর কথা জানা যাবে।' বলল আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন।

পড়তে শুরু করল আহমদ মুসা।

# ৭

লেদার পেপার থেকে পড়ছিল আহমদ মুসা:

'আমি আবদুল আজিজ মালাকি। মালয় রাজ্যের হতভাগ্য সুলতান। পরাজিত ও রাজ্যহারা হয়ে পালিয়ে এসেছি এই কোহেতান পাহাড়ে আশ্রয় নেবার জন্রে এবং আমার এই অর্থ-কড়ির একটা কিনারা করার জন্যে। যুগ, বহু যুগ, শতবর্ষ বা বহু শতবর্ষ পরে যিনি বা যারা এই গনিমত পাবেন, তারা নিশ্চয়ই এই সম্পদের ইতিহাস জানতে আগ্রহী হবেন। তাদের জন্যেই আমার ও আমাদের সম্পর্কে কয়েকটি কথা।

এই ধনভান্ডার 'মালাকি আল-ফালাহ' সালতানাতের। মালাকি আল-ফালাহ সালতানাত গঠিত হয় প্রায় ৪০০ বছর আগে মালয়ের পশ্চিম উপকূলের 'মালাকা' বন্দর শহরে। আমার পিতামহের পিতামহ শাইখ ওয়াকিল বিন ওয়ালিদ একজন ব্যবসায়ী ও ইসলাম ধর্মের প্রচারক ছিলেন। এই উপলক্ষেই মালয় অঞ্চলে এসেছিলেন এবং ইসলাম প্রচারের নেশাতেই তিনি এক সময় মালাকা অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। সময়টা খৃষ্টীয় ১৩৯৬ সাল। এক সময় মালাকা অঞ্চলে স্থানীয়-অস্থানীয় মিলে মুসলমানদের সংখ্যা প্রচুর হয়ে দাঁড়ায়। তরুণ ওয়াকিল ইবনে ওয়ালিদ তাদের সামনে দাঁড়ান। অবস্থার কারণেই প্রতিষ্ঠিত হয় মালাকা আল-ফালাহ সালতানাত। সুলতান আমার পিতামহের পিতামহ শেখ ওয়াকিল বিন ওয়ালীদ। পরবর্তী একুশ বছরের মধ্যে মালয়ের এ অঞ্চল শান্তি ও সমৃদ্ধির দেশে পরিণত হয়। আর বন্দর নগরী মালাকা হয়ে দাঁড়ায় গোটা অঞ্চলের ট্রেডিং ক্যাপিটাল।

তবে শান্তির ঘরে আগুন লাগে শীঘ্রই। ১৫১১ সালের এক কুলগ্নে পর্তুগীজরা এসে নোঙর করে মালাকাতে। সমুদ্রে যেমন তারা ছিল জলদস্যু, তেমনি স্থলেও তারা সুযোগমত লুটতরাজ শুরু করল। সমৃদ্ধ মালাকাকে তারা ভালোভাবেই টার্গেট করেছিল। শীঘ্রই তাদের সৈন্য ও যুদ্ধ জাহাজে ছেয়ে যায়

মালাকা। মালাকা আল-ফালাহ সালতানাতের সমৃদ্ধি ছিল, কিন্তু সেই অনুযায়ী শক্তি ছিল না। তাদের আন্তরিকতা ছিল, দেশপ্রেম ছিল, কিন্তু কূটনীতিতে অনকে পেছনে ছিল।

পর্তুগীজরা দখল করে নিল মালাকাসহ সংশ্লিষ্ট অঞ্চল। মালাকা আল ফালাহ সালতানাত মধ্যাঞ্চলীয় পাহাড়ের এ পাশের কেলানতান অঞ্চলে চলে আসে। মালাকা বিপর্যয়েও আমাদের কোন শিক্ষা হয় না। কেলানতানে আশ্রয় পাওয়ার পর আল-ফালাহ সালতানাত আয়েশের কোলে গা ভাসিয়ে দিল এবং সম্পদ ও শান্তির খোঁজে আবার পাগল হয়ে উঠল। সম্পদকে শক্তি বাড়াবার কাজে ব্যবহার না করে, সম্পদ দিয়ে শুধু সম্পদ বাড়াবার কাজই চলল। ওদিকে মালাকারের মালাকা ও উপকূলীয় অঞ্চল ১৬৪১ সালের দিকে পর্তুগীজদের হাত থেকে ডাচদের হাতে চলে গেল। যা করা উচিত ছিল মালাকা আল-ফালাহ সালতানাতের তা করল ডাচরা। পরবর্তী ৫০ বছরে কিছু পরিবর্তন ঘটল জনশক্তির ক্ষেত্রে। ডাচদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে ইন্দোনেশিয়া ও সেলেবিস দ্বীপাঞ্চল ছেড়ে হাজার হাজার মালাকা মালয় অঞ্চলে চলে আসল। তখন একটা জাগরণও হলো এবং ১৭০০ শতকের দিকে সকলের সমন্বয়ে মালয় রাষ্ট্র গঠিত হলো। মালাকা আল-ফালাহ সালতানাতও এ রাষ্ট্রের একটা অংগ হিসাবে যোগদান করল। কিন্তু দেখা গেল আসল শিক্ষা তাদের হয়নি। শক্তির চেয়ে সম্পদ আহরণের দিকে তাদের মনোযোগ নিবদ্ধ থাকল। চারদিকের পরিস্থিতি কি, সময়ের দাবি কি, সে দিক থেকে তারা চোখ বন্ধই রাখল। পরবর্তী একশ বছরে তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হলো না। এর ফলেই মালয় রাষ্ট্র পারল না, কিন্তু বৃটিশরা ১৮২০ সালের দিকে মালাকা অঞ্চল, পেনাংগ; সিংগাপুর দখল করে নিল। আরও একশ বছর পার হলো। বৃটিশদের ষড়যন্ত্র আরও সামনে অগ্রসর হলো, তাদের শক্তি আরও বাড়ল। কিন্তু মালয় রাষ্ট্র, মালাকা আল-ফালাহ সালতানাত, প্রভৃতির দেশীয় শক্তির অনৈক্য ও দুর্বলতা আরও বেড়ে গেলো। আর এই সময়েই বৃটিশরা গোটা মালয় উপদ্বীপ দখল করে নিল। যে সময় বৃটিশ সৈন্যরা কেলানতান দখল করে, সে সময় কেলানতানের মালকা আল-ফালাহ সালতানাতের দুর্ভগা সুলতান আমিই ছিলাম। যেদিন রাজধানী 'মালাকা ছানি'র

৫০ মাইল দূরের শেষ দূর্গের পতন ঘটল বৃটিশদের হাতে, তখনই আমাদের পরাজয় সম্পূর্ণ হয়ে গেলো। আমি রাজধানী ত্যাগ করলাম পরিবার ও সম্পদ সাথে করে নিয়ে।

কিন্তু এই সম্পদের এক কপর্দকও আমি রাখলাম না আমার পরিবারের জীবিকা নির্বাহের জন্য। যতদিন বাঁচব পরিশ্রমলব্ধ আয় দ্বারা জীবন নির্বাহ করে অতীতের কৃত পাপের কিছু প্রায়শ্চিত্ত হলে তা করব। রাজভান্ডার থেকে আনা সব অর্থই এই গুহায় জমা রাখলাম এই আশায় যে, এই সম্পদ দিয়ে আমরা যা করিনি, করতে পারিনি, তার কিছুটা হলেও এই সম্পদ দিয়ে কেউ হয়ত শক্তি অর্জন করবেন আর আমার মন বলছে, এমন লোকই এই অর্থের সন্ধান পাবেন। আমার মন থেকে আসা এই কথা মহান আল্লাহরই কথা, এই প্রার্থনা মহান আল্লাহর কাছে আমি করি।'

পড়া শেষ হলো আহমদ মুসার।

পড়তে পড়তে আহমদ মুসার মন বেদনায় ভারী হয়ে উঠেছিল। ছোট্ট তিন খন্ড কাগজের কথায় মালয় অঞ্চলের চারশ বছরের ইতিহাস যেন তার সামনে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সে ইতিহাস বেদনার, ব্যর্থতার এবং সব হারানোর এক অসহনীয় যন্ত্রণার।

সরদার জামাল উদ্দিন ও আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন বিষণ্ন, গম্ভীর। তাদের চোখও সজল।

নিরবতা ভাঙল আহমদ মুসাই। কাগজের টুকরোগুলো সোনার বাক্সে পুরে তা বন্ধ করতে করতে বলল, 'বলুন জনাব।'

সরদার জামাল উদ্দিনকে লক্ষ্য করে কথাটি বলেছিল আহমদ মুসা।

'যে উপলব্ধি হয়েছে এই বক্তব্যে, সে উপলব্ধি যদি তখন সব মুসলিম শাসকের হতো! তাহলে এই এলাকার ইতিহাস ভিন্ন হতো।' বলল সরদার জামাল উদ্দিন।

'শুধু এ এলাকার নয়, গোটা বিশ্বের ইতিহাস ভিন্ন হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু এ উপলব্ধি সেদিন কোন মুসলিম শাসকের ছিল না। মুসলমানরা তাজমহল, আল-

হামরা গড়েছে, কিন্তু ক্লাইভ-ফার্ডিন্যান্ডদের ষড়যন্ত্র মোকাবিলার শক্তি অর্জন করেনি।' আহমদ মুসা বলল।

'আজও কি এই উপলব্ধি হয়েছে স্যার?' বলল আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন। তার কণ্ঠ ভারী।

'হয়নি আবদুল কাদের। হলে, আল্লাহর দেয়া অঢেল পেট্রডলার আকাশস্পর্শী ইমারত, মসৃণ হাইওয়ে নির্মাণ হবার আগে অন্তত আত্মরক্ষার জন্য স্বনির্ভর একটা ব্যবস্থা গড়ে উঠতো।' আহমদ মুসা বলল। তারও কণ্ঠ ভারী।

কথা শেষ করেই সোনার বাক্সটি আবার স্বর্ণ মুদ্রার স্তুপের উপর রেখে বলল, 'আমাদের এখানকার কাজ শেষ। আসুন গুহামুখ আমরা বন্ধ করি।'

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

উঠে দাঁড়াল সরদার জামাল উদ্দিন ও আবদুল কাদের কামাল উদ্দিনও।

'ভাই আহমদ মুসা, এ স্বর্ণমুদ্রাগুলো শুধু টাকাই নয়, আমাদের পূর্ব পুরুষদের অমিতাচার, ব্যর্থতার শিক্ষা ও সাক্ষ্য হয়ে এসেছে আমাদের জন্যে।' বলল সরদার জামাল উদ্দিন। তার কণ্ঠও ভারী।

'ঠিক বলেছেন জনাব।'

বলে আহমদ মুসা গুহামুখ বন্ধের কাজে মন দিল।

কাজে লাগল সকলেই।

গুহামুখ বন্ধ হয়ে গেল।

আহমদ মুসারা বেরিয়ে এল পাহাড়ের সেই গলি থেকে, পাহাড় থেকে।

উঠে এল তারা কিং রোডে আবার।

তাদের মিশনের সেই যাত্রা শুরু হলো নতুন করে।

লক্ষ্য কাতান টেপাংগো।

আগের মতই আগে আগে চলছে আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন, মাঝখানে আহমদ মুসা এবং পেছনে সরদার জামাল উদ্দিন।

পরবর্তী বই

# বসফরাসের আহ্বান

## কৃতজ্ঞতায়ঃ Mahfuzur Rahman

# সাইমুম-৪৫

# বসফরাসের আহ্বান

আবুল আসাদ

# ১

কিংরোডের এক জায়গায় এসে রাস্তার পূর্ব পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ল আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন। ঘুরে দাঁড়িয়ে আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, 'স্যার, এবার আমাদের কিংরোড ছাড়তে হবে। কাতান পাহাড়কেও। এখন পূর্ব দিকে এগোতে হবে।'

আহমদ মুসা এগোলো রাস্তার পূর্ব পাশের দিকে। পূর্ব দিকের ল্যান্ড স্পেসের দিকে তাকিয়ে দেখল আহমদ মুসা, যা চিন্তা করেছিল তাই। কিংরোডের চার-পাঁচ গজ পরেই এক খাড়া খাদ। খাদের মুখ তিরিশ-চল্লিশ গজের মতো প্রশস্ত।

'গিরিখাদের গভীরতা কেমন আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'স্যার, থাই-মালয়েশিয়া পর্বতমালার এটাই সবচেয়ে বড় ক্যানিয়ন (গিরিখাদ)। এটা শুধু কাতান পর্বত শ্রেণী থেকে তেপাং পর্বতকেই আলাদা করেনি, কাতানকেও প্রায় বিভক্ত করে উত্তরে বহুদূর এগিয়ে গেছে। গভীরতাও স্যার দেড় হাজার ফুটের কম হবে না।' বলল আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন।

‘তাহলে ক্যানিয়নটা পার হয়ে তেপাংগে পৌঁছার কোনো প্রাকৃতিক ব্যবস্থা ক্যানিয়নের কোথাও আছে নিশ্চয়?’ বলল আহমদ মুসা।

‘ঠিক ধরেছেন স্যার। ক্যানিয়ন বেয়ে একশ’ ফিটের মতো নামলেই অদ্ভুত একটা জায়গা পাওয়া যাবে যেখানে কাতান থেকে বেরিয়ে যাওয়া ও তেপাং থেকে বেরিয়ে আসা দু’টি বারান্দা পরস্পরের দিকে এগিয়ে একটা সেতুর সৃষ্টি করেছে। ওটা পার হয়ে ওপারের ক্যানিয়নের দেয়াল বেয়ে আবার তেপাং-এর মাথায় উঠতে হবে।’ আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন বলল।

আহমদ মুসারা ক্যানিয়নের দিকে এগোলো। ক্যানিয়নের ধারে পৌঁছে নিচের দিকে উঁকি দিয়ে বলল, ‘তোমার সে বারান্দা তো দেখা যায় না। ও, এখানে ক্যানিয়নের এপার-ওপার দুই ধারকেই পরস্পরের দিকে এক টু ঝুঁকে যেতে দেখা যাচ্ছে। এতেই আড়াল হয়ে গেছে বারান্দাটা।’

‘এটাও আল্লাহর একটা কুদরত স্যার। এর ফলে বারান্দাটা আড়াল হয়ে গেছে এবং আগন্তুকদের জন্যে এই ক্যানিয়নটা অনতিক্রম্য হয়ে গেছে।’ আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন বলল।

‘হাবিব হাসাবাহরা জানে না?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘হাবিব হাসাবাহই শুধু জানে স্যার, দলের আর কেউ জানে না। তবে মি. হাবিব হাসাবাহও এটা দেখেনি, বর্ণনা শুনেছে মাত্র। সে এদিক দিয়ে আসা-যাওয়ায় আগ্রহী নয় সময়সাপেক্ষ ও কষ্টকর বলে। এজন্যেই সম্ভবত তার টেপাংগো ঘাঁটি থেকে এদিকে আসার একমাত্র সংকীর্ণ গিরিপথটি পাথরের দেয়াল তুলে বন্ধ করে দিয়েছে।’ বলল আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন।

‘আসতে চায় না এ পথে, এর চেয়ে তোমরা যাতে তোমাদের ইচ্ছেমতো পেছন দরজা দিয়ে তাদের টেপাংগো ঘাঁটিতে না যেতে পার, এটা নিশ্চিত করা ছিল তার কাছে বেশি জরুরি।’ আহমদ মুসা বলল।

আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন ও সরদার জামাল উদ্দিন দু’জনেই হাঁ করে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। তাদের চোখে-মুখে বিস্ময়। বলল সরদার জামাল উদ্দিন, ‘ঠিক বলেছ ভাই। একবার এ পথ দিয়ে আমি অনাহূতভাবেই গিয়েছিলাম তাদের টেপাংগো ঘাঁটিতে। মুখে কিছু না বললেও খুবই বিরক্ত

হয়েছিলেন। তারপরই ঐ পথে দেয়ালটা ওঠে। তখন আমরা বুঝিনি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, তোমার কথাই শতভাগ ঠিক।'

'এ থেকে এটাও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তারা আমাদের একটুও বিশ্বাস করে না, ব্যবহার করে মাত্র।' আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন বলল।

'বিশ্বাসের তো প্রশ্নই ওঠে না, যাদের ধ্বংস করাই লক্ষ্য, তাদের ওরা বিশ্বাস করবে কেন? ঠিক আছে। চল, এবার ক্যানিয়নের বারান্দার দিকে নামি।' বলল আহমদ মুসা।

'ঠিক আছে স্যার, আসুন।' বলে আবদুল কাদের বিশেষ স্থান দিয়ে ক্যানিয়নের গা বেয়ে নিচে নামতে শুরু করল।

দুই ঘণ্টা লাগল ক্যানিয়ন পার হয়ে ওপারে তেপাং পর্বতের উপরে পৌঁছতে।

আহমদ মুসা তেপাং-এ পৌঁছে সামনে তাকিয়ে দেখল, ছোট-বড় অসংখ্য চূড়ায় আকীর্ণ এবড়ো-থেবড়ো পাহাড়ের বুক। বলল আহমদ মুসা, 'আবদুল কাদের, সামনে তো চলার মতো ট্র্যাক নেই কিংরোডের মতো?'

আবদুল কাদের কিছু বলার আগেই তার দাদা সরদার জামাল উদ্দিন বলল, 'সামনে চেয়ে দেখ, সব চূড়ার ওপর দিয়ে প্রায় পিরামিডের মতো একটা চূড়া দেখা যাচ্ছে। ওটাই তেপাং পর্বতের প্রাণকেন্দ্র। ওটার গোড়াতেই সেই পুরানো ঘাঁটি, যেখানে এখন হাবিব হাসাবাহরা আড্ডা গেঁড়ে বসেছে। ঐ চূড়ার গোড়াতেই ঘাঁটিতে একটা সুড়ঙ্গ পথ রয়েছে। পথটার বাইরের মুখ পাথরের দেয়াল তুলে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। চূড়াটিকে আমাদের নাক বরাবর রেখে পথ ডিঙিয়ে টিলা এড়িয়ে আমাদের অগ্রসর হতে হবে।'

'ধন্যবাদ দাদাজী। চূড়ার পথটা নিশ্চয় চার-পাঁচ মাইলের বেশি হবে না।' বলল আহমদ মুসা।

'কিঞ্চিৎ বেশি হবে স্যার। আসুন চলতে শুরু করি।'

বলে হাঁটা শুরু করল আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন।

চলতে শুরু করল সবাই। আরও দু'ঘণ্টায় তারা এসে পৌঁছল পিরামিড আকারের চূড়ার গোড়ায়।

সুড়ঙ্গ মুখের দেয়াল দেখতে পেল আহমদ মুসা। মুখের দেয়ালটা দেখা যায় না ছড়ানো ছিটানো স্তূপীকৃত পাথরের জন্যে। দেয়ালটাকে আড়াল করার জন্যেই এই ব্যবস্থা। এগোচ্ছিল দেয়ালটাকে পরখ করে দেখার জন্যে। তার পকেটের মোবাইল বেজে উঠল।

মোবাইল ধরল আহমদ মুসা।

ওপ্রান্ত থেকে থাইল্যান্ডের সহকারী গোয়েন্দা প্রধান পুরসাত প্রজাদিপকের কণ্ঠ শুনতে পেল। শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর আহমদ মুসা বলল, 'বলুন জনাব। আমরা তেপাং পাহাড়ে।'

'ধন্যবাদ আহমদ মুসা। কিন্তু নতুন মারাত্মক একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। তোমার মতামত সবাই আমরা আশা করছি।'

'বলুন জনাব। পরিস্থিতিটা কি?' আহমদ মুসা বলল।

'খুবই উদ্বেগের আহমদ মুসা। ঘণ্টাখানেক আগে হাবিব হাসাবাহ শেষ হুমকিটা দিয়েছে। বলেছে, আগামী পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে যদি হেলিকপ্টার তার তেপাং পাহাড়ের লাল পতাকা চিহ্নিত স্থানে না পৌঁছে, তাহলে পাঁচ ঘণ্টা এক মিনিটে জাবের জহীর উদ্দিনকে হত্যা করা হবে।'

শুনে আহমদ মুসা একটুও না ভেবেই বলল, 'জনাব, এ আল্টিমেটামের কোনো গুরুত্ব নেই। নিশ্চিত থাকুন, হাবিব হাসাবাহ পালিয়ে নিরাপদ হওয়ার আগে জাবের জহীর উদ্দিনকে হত্যা করবে না। জাবের জহীর উদ্দিন এখন তার বর্ম। নিজেকে নিরাপদ করার আগে সে বর্ম পরিত্যাগ করতে পারে না।'

'ধন্যবাদ আহমদ মুসা। কিন্তু এ আল্টিমেটামের তাহলে অর্থ কি?' পুরসাত প্রজাদিপক বলল।

'আমার ধারণা, সে ইতোমধ্যেই পালিয়েছে বা পালাচ্ছে। আল্টিমেটামের মাধ্যমে সে জানিয়ে দিয়েছে যে, পাঁচ ঘণ্টা সে লাল পতাকার ঐ ঘাঁটিতেই থাকবে। এটা জেনে চারদিকের পাহারা শিথিল হবে, এটাই চেয়েছে সে।' আহমদ মুসা বলল।

'বুঝেছি আহমদ মুসা। কিন্তু ওরা হঠাৎ পালানোর ইচ্ছা প্রকাশ করার মতো দুর্বলতা প্রকাশ করল কেন?' বলল পুরসাত প্রজাদিপক।

'আসলে ওদের অনেক লোক মারা গেছে এবং ধরা পড়েছে। আমার মনে হয়, বেতংগে ওদের মূল বাহিনী শেষ হয়ে গেছে। আর ওদের অবস্থানের স্থানটাও ধরা পড়ে গেছে, এটা ওরা নিশ্চিত হয়েছে। সুতরাং পালানো ছাড়া পথ নেই।' আহমদ মুসা বলল।

'পালাতে পারবে না। উপত্যকার সব পথ বন্ধ। হ্রদ ও পাহাড়ের মধ্যের জলপথেও শক্ত পাহারা বসানো আছে, সে তো তুমি জানই।'

হঠাৎ থেমে গেল পুরসাত প্রজাদিপক। কয়েক মুহূর্ত পরেই আবার বলে উঠল, 'কিন্তু আহমদ মুসা, জলপথটা অনেক প্রশস্ত। পাহারা বসানো আছে শুধু উত্তর তীরে। জরুরি মুহূর্তে এই পাহারা তো গোটা জলপথ কভার করতে পারবে না।'

'চিন্তার কিছু নেই। দক্ষিণ তীরে অবস্থান নেয়ার জন্যে দু'জনকে আমি পাঠিয়েছি। ওরা দক্ষিণ তীরে জেলেদের যে ছাউনি আছে, সেখানে জেলে বেশে বসে থাকবে।' আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ আহমদ মুসা। আহমদ মুসা, আমাদের গোটা নির্ভরতা কিন্তু তোমার ওপর। আল্টিমেটাম দেয়ার পর এদিক থেকে ঘাঁটির দিকে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। তোমার পরিকল্পনা কি?' বলল পুরসাত প্রজাদিপক।

'আমরা তেপাং পাহাড়ে পৌঁছে গেছি। সামনে কি পরিস্থিতি আমি জানি না। তবে আল্টিমেটামে যে সময় দিয়েছে, তার একাংশ সময়েই ওখানে আমরা পৌঁছে যাব ইনশাআল্লাহ।' আহমদ মুসা বলল।

'গড ব্লেস ইউ ইয়ংম্যান। আমরা এদিকে হেলিকপ্টার সরবরাহের সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করছি- এই কথা বলে কালক্ষেপণ করব। এর মধ্যে তোমার অপারেশন শেষ হবে আশা করছি। আর আমি যয়নব যোবায়দাদের জানিয়ে দিচ্ছি, তুমি ভালো আছ। ওরা জাবের জহীর উদ্দিনের ব্যাপারে যতটা উদ্বিগ্ন, তার চেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন তোমার ব্যাপারে। ওরা আল্টিমেটাম দেয়ার পর যয়নব যোবায়দারা একটু বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। বার বার টেলিফোন করছে। বেশি ভেঙে পড়েছে আমার মেয়ে সিরিত থানারতা। তবে সিরিত ও যয়নব নিশ্চিত

যে, তুমি জাবের জহীর উদ্দিনকে উদ্ধার করবেই। ঈশ্বর তাদের বিশ্বাসকে রক্ষা করবেন নিশ্চয়ই। আর কোনো পরামর্শ কিংবা কোনো কথা আছে আহমদ মুসা?'

'ধন্যবাদ, তেমন কিছু থাকলে জানাব।'

'ওকে, গুডবাই সালাম।' বলে ওপার থেকে টেলিফোন রেখে দিল পুরসাত প্রজাদিপক।

মোবাইল পকেটে রেখে আহমদ মুসা আবদুল কাদেরদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'শুনলেন তো সব। এখন আমাদের দ্রুত ঘাঁটিতে পৌঁছতে হবে এবং সেটেল করতে হবে ওরা জানবে না এমন ভাবে। জাবের জহীর উদ্দিনের জীবন সত্যি ঝুঁকির মুখে।'

'আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গটা খুব দীর্ঘ নয়। চার-পাঁচশ' গজের বেশি হবে না। ঘাঁটি পর্যন্ত পৌঁছতে আমাদের সময় বেশি লাগবে না।' বলল আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন।

'শুধু সুড়ঙ্গে দেয়াল নয়, সুড়ঙ্গ পথে আরও প্রতিবন্ধকতা তারা রাখতে পারে। দেয়ালের চেয়ে সেগুলো আরও মারাত্মক হতে পারে আবদুল কাদের। সে হিসেব তোমাকে রাখতে হবে।' আহমদ মুসা বলল।

কথা শেষ করে আহমদ মুসা এগোলো সুড়ঙ্গ মুখের দিকে। লক্ষ্য, পাথরের ফাঁক দিয়ে দেয়ালের গাঁথুনি পরখ করে দেখা।

আবদুল কাদের কামাল উদ্দিনও তার পিছে পিছে যাচ্ছে।

সুড়ঙ্গ মুখে পৌঁছতেই পকেটের মোবাইলটি আবার বেজে উঠল আহমদ মুসার।

মোবাইল ধরে 'হ্যালো' বলতেই ওপার থেকে সালাম ভেসে এল থাইল্যান্ডের সহকারী গোয়েন্দা প্রধান পুরসাত প্রজাদিপকের কণ্ঠ থেকে।

সালাম নিয়ে বলল, 'বলুন জনাব, নতুন কোনো খবর নিশ্চয়?'

'হ্যাঁ আহমদ মুসা। তুমিও পেয়ে থাকতে পার। পঁচিশ-তিরিশ মিনিট আগের ঘটনা। তেপাং পাহাড়ের দিক থেকে একটি ইঞ্জিনচালিত দ্রুতগামী বোট হ্রদের দিকে যাচ্ছিল। উত্তরের অবস্থান থেকে আমাদের লোক চ্যালেঞ্জ করলে দ্রুত দিক পরিবর্তন করে ক্যানেলের দক্ষিণ দিক দিয়ে পালাতে চেষ্টা করে। কিন্তু

দক্ষিণ দিক থেকে গর্জে ওঠে হেভি মেশিনগান। তারা গুলির দেয়াল সৃষ্টি করে। কয়েকটা গুলি নাকি বোটকেও হিট করে। বোটটি গতি পরিবর্তন করে পাহাড়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এই খবর তোমাকে দেবার জন্যেই এই টেলিফোন করা।' ওপার থেকে বলল পুরসাত প্রজাদিপক।

'আলহামদুলিল্লাহ। সন্দেহ নেই হাবিব হাসাবাহ পালাচ্ছিল। ব্যর্থ হয়েছে তার প্রথম উদ্যোগ।' আহমদ মুসা বলল।

'তুমি ঠিকই সন্দেহ করেছিলে আহমদ মুসা। আল্টিমেটামটা তার ছিল ট্র্যাপ। কিন্তু সে তো আল্টিমেটাম না দিয়েই পালাতে পারতো।' বলল পুরসাত প্রজাদিপক।

'সে জানে, তার পথে টাইট পাহারা বসেছে। সে চেয়েছিল পাহারাটাকে শিথিল করতে। স্বাভাবিকভাবে সবারই মনোযোগ আল্টিমেটামের সময়ের দিকে থাকবে, এটাই সে ধারণা করেছিল।' আহমদ মুসা বলল।

'তুমি বললে, ওটা তার প্রথম উদ্যোগ। আরও উদ্যোগ সে কোন দিকে নেবে?' বলল পুরসাত প্রজাদিপক।

'পাহাড়ের পথসহ সম্ভব-অসম্ভব সব উদ্যোগই সে নেবে।' আহমদ মুসা বলল।

'আমাদের লোকরা এলার্ট আছে। সবাইকে বলে দিয়েছি। পাহাড়ের দিকে তো তোমরাই আছ।' বলল পুরসাত প্রজাদিপক।

'অবশ্যই। আমরা এ দিকটা দেখছি জনাব।'

'ওকে, ধন্যবাদ। সালাম।' বলল পুরসাত প্রজাদিপক।

মোবাইল লাইন কেটে গেল ওপার থেকে।

আহমদ মুসা মোবাইল রেখে সরদার জামাল উদ্দিনের দিকে তাকাল। বলল, 'আমার মনে হয়, হাবিব হাসাবাহ পালাবার জন্যে অতঃপর এই পথই বেছে নেবে।'

'কিন্তু এ পথ তো সে চেনে না।' বলল আব্দুল কাদের কামাল উদ্দিন।

'চেনা পথের চেয়ে তার নিরাপত্তা এখন বেশি প্রয়োজন। পথ না চিনলেও কোন দিকের কোথাও সে পৌঁছতে পারবেই।'

‘ঠিক বলেছেন স্যার। এখন তাহলে আমাদের কি করণীয়?’ আবদুল কাদের বলল।

‘সুড়ঙ্গের প্রাচীর আমরা ভাঙছি না, তাকেই ভেঙে বেরিয়ে আসতে দাও। আমরা তার জন্যে অপেক্ষা করব।’ বলল আহমদ মুসা।

কথা শেষ করেই চাপা আওয়াজের একটা ‘দুপ’ শব্দ শুনতে পেল। তার সতর্ক হয়ে ওঠা দুই চোখ সংগে সংগেই দেখতে পেল, সুড়ঙ্গের দেয়ালের দিক থেকে মার্বেল আকারের একটা সাদা বল গুলির মতো বেরিয়ে এল।

আহমদ মুসা পরিচিত শব্দ শুনেই আঁচ করতে পেরেছিল। এবার সাদা বলটা দেখেই চিৎকার করে উঠল, ‘দূরে ছুটে পালাও তোমরা।’ বলটা কোন গ্যাস বোমা হবে, বুঝতে পেরেছিল আহমদ মুসা।

বলে আহমদ মুসা নিজেও দেয়ালের গোড়া থেকে একটা লাফ দিল যেদিকে বলটি গিয়ে পড়ল তার বিপরীত দিকে। কিন্তু দূরে যেতে পারল না। লাফ দিয়ে সে গিয়ে পড়ল একটা পাথরের প্রান্তে। পাথরটা ছিল আলগা। চাপে পাথরটা উল্টে গেলে আহমদ মুসা ছিটকে অন্য একটা পাথরের ওপর আছড়ে গিয়ে পড়ল।

ততক্ষণে গ্যাস বলটা ফেটে সাদা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল চারদিকটা।

আহমদ মুসা ধরে নিয়েছিল, ওটা সংজ্ঞালোপকারী বোমাই হবে। হাবিব হাসাবাহ চায় আমাদের সংজ্ঞাহীন করে বিনা লড়াইয়ে হত্যা বা বন্দী করে রেখে নিজে সরে পড়বে।

আহমদ মুসা পাথরের ওপর আছড়ে পড়েই নিঃশ্বাস বন্ধ করেছিল। সে জানে, এ ধরনের বোমার কার্যকারিতা দেড়-দু’মিনিটের বেশি থাকে না।

আহমদ মুসা শ্বাস বন্ধ করার সাথে আরেকটা কাজ করল। সেটা হলো, জ্যাকেটের পকেট থেকে রিভলভার বের করে রিভলভারসমেত ডান হাত দেহের নিচে চাপা দিয়ে রাখল।

উপুড় হয়ে পড়ে আছে আহমদ মুসা। কিন্তু মুখ তার ডান দিকে কাত হয়ে আছে। কপালের বাম পাশটা ফেটে যাওয়ায় রক্ত গড়িয়ে এসেছে পাথরের ওপর। চোখ দু’টি তার বন্ধ। ডান হাত ডান পাঁজরের নিচে আটকা। আর বাম হাতটা

পাশের একটা পাথরের ওপর দিয়ে ঝুলছে। নিরেট সংজ্ঞাহীন দেহের একটা অবস্থা।

আহমদ মুসা পাথরের ওপর পড়েই ভাবতে শুরু করেছে, যে ভাবেই হোক, হাবিব হাসাবাহ এখনি বেরিয়ে আসবে। সে তাদের অজ্ঞান অবস্থার সুযোগ নেবে। দেয়ালের গায়ে কোন গোপন দরজা আছে? গোপন দরজা রেখেই হয়তো দেয়াল তৈরি হয়েছে। তারপর পাথর ছড়িয়ে তাকে আরও আড়াল করে ফেলা হয়েছে। এমনটা খুবই স্বাভাবিক! আর দেয়ালের গায়ে চোখ রেখে দেখার মতো কোন ঘুলঘুলি নিশ্চয় ছিল। সেই ঘুলঘুলি দিয়েই গ্যাস বোমা ছোঁড়া হয়েছিল।

এক মিনিটও তখন পার হয় নি। দেয়ালের দিকে বোমা ফাটার একটা আওয়াজ হলো। আহমদ মুসা চোখ একটু ফাঁক করে দেখল, দেয়ালের এক প্রান্তে বোমার বিস্ফোরণ ঘটেছে।

বুঝল আহমদ মুসা, তাহলে গোপন দরজা নেই। বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দেয়ালের গায়ে সুড়ঙ্গ সৃষ্টি করা হলো বেরিয়ে আসার জন্যে। দু'মিনিট হয়নি, তাই আহমদ মুসা শ্বাস তখনও বন্ধ রেখেছে।

আবার চোখ বুজল আহমদ মুসা। ওরা এখনই বেরিয়ে আসবে।

বোমা বিস্ফোরণের আগুন নিভে গেছে।

সুড়ঙ্গের দেয়ালের গায়ে প্রায় এক গজ ব্যাসের একটা গোলাকার পথ খুলে গেছে।

হাবিব হাসাবাহ তাকালো তার পাশে দাঁড়ানো জহীর উদ্দিনের দিকে।

জাবের জহীর উদ্দিনের বিধ্বস্ত চেহারা। চুল উষ্কখুষ্ক। কাপড় ময়লা। দুই হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। পায়েও শিকল পরানো।

হাবিব হাসাবাহর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন। তাদের দু'জনের হাতে স্টেনগান। দু'জনেরই পিঠে ভারি ব্যাগ।

হাবিব হাসাবাহর হাতে রিভলভার এবং কাঁধে ঝুলানো একটা ব্যাগ।

হাবিব হাসাবাহ জাবের জহীর উদ্দিনের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে পেছনের একজনকে বলল, 'তুমি জাবেরকে নিয়ে বাইরে যাও। দেখ ওদের তিন জনের কি অবস্থা। স্টেনগানের ট্রিগারে আঙুল রেখে বাইরে যাবে। দেখ যদি কেউ জ্ঞান না হারায়, তাহলে সংগে সংগেই শেষ করে দেবে।'

লোকটা নীরবে একটা স্যালুট করে জাবের জহীর উদ্দিনকে ঠেলে নিয়ে দেয়ালের পথ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

লোকটা বাইরে বেরিয়ে দেয়ালের গোড়া পার হয়ে সুড়ঙ্গ মুখের সামনেই সরদার জামাল উদ্দিন ও আবদুল কাদের কামাল উদ্দিনকে পাশাপাশি পেল। দু'জনই সংজ্ঞাহীন। তারপর সে জাবের জহীর উদ্দিনকে নিয়ে এগোলো আহমদ মুসার কাছে। জাবেরকে দিয়ে পাথরের ওপর দিয়ে ঝুলন্ত তার হাত নেড়ে দেখল সংজ্ঞা নেই।

লোকটি পেছনে হটে সুড়ঙ্গ মুখের দিকে একটু এগিয়ে বলল, 'স্যার, সবাই সংজ্ঞাহীন।'

হাবিব হাসাবাহ তার দ্বিতীয় বডিগার্ড নিয়ে বেরিয়ে এল।

হাবিব হাসাবাহর চোখ প্রথমেই পড়ল সরদার জামাল উদ্দিন ও আবদুল কাদের কামাল উদ্দিনের ওপর। তার ঠোঁটে ক্রুর হাসি ফুটে উঠল। কয়েক ধাপ এগিয়ে তাদের দু'জনের পাঁজরে দু'টি লাথি মেরে চিৎকার করে বলল, 'এ গাদ্দার দু'জনকে শান্তিতে মরতে দেব না। জীবন্ত টুকরো টুকরো করব। এরা শুধু আহমদ মুসাকে সাহায্য করেনি, আমাদের অনেক লোকের হত্যার নিমিত্তও তারা।'

রিভলভার পকেটে রেখে একটা চুরুট ধরাল হাবিব হাসাবাহ। এগোলো এবার আহমদ মুসার দিকে। আহমদ মুসাকে এক নজর দেখে বলল, 'এ হারামজাদাই তাহলে আহমদ মুসা। সাধারণ একজন হয়েও অসাধারণ সবার কাছে। আজ হাবিব হাসাবাহর হাতে এর সব লীলাখেলার শেষ। আমাদের কত যে ক্ষতি করেছে, তার হিসেব দুঃসাধ্য, একে একবার নয়, লাখো বার মারলেও এর পাপ মোচন হবে না।'

হাবিব হাসাবাহ যখন কথা বলছিল, তখন জাবের জহীর উদ্দিন চোখ ছানাবড়া করে তাকিয়ে ছিল আহমদ মুসার দিকে। এই তাহলে তাদের স্বপ্নের

নায়ক আহমদ মুসা! স্বপ্নপুরুষ! গোটা দেহে তার শিহরণ জাগল। তার সাথে বুকের ভেতরটা তার মোচড় দিয়ে উঠল আহত আহমদ মুসাকে সংজ্ঞাহীনভাবে পাথরের ওপর পড়ে থাকতে দেখে। আজই কি এই অবস্থায় এই মহান বিশ্বনায়কের জীবনের ইতি ঘটতে যাচ্ছে? হাহাকার করে উঠল তার মন। সে চিৎকার করে বলল, 'হাবিব হাসাবাহ, তোমরা একে মের না। তোমরা আমার কাছে, আমাদের কাছে যা চাও তা দেব, যা করতে বলবে তা করব। আমি থাইল্যান্ডের প্রতি ঘরে ঘরে তোমাদের পক্ষে কাজ করব, তোমরা শুধু একে মের না।' কান্নাঝরা কণ্ঠ জাবের জহীর উদ্দিনের।

হো হো করে হেসে উঠল হাবিব হাসাবাহ। বলল, 'থাইল্যান্ডে আমাদের এখন করার কিছুই নেই। আমরা আর কিছু চাই না। তোমার এবং তোমাদের আর কোন মূল্য আমাদের কাছে নেই। সবই ফাঁস হয়ে গেছে। এখন আমাদের শুধু প্রতিশোধের পালা। তোমাকে মারব সবার শেষে। তোমাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেই আমরা দুঃসময় পাড়ি দেব। আমাদের যখন মুক্তি, তখনই তোমার ঘটবে মৃত্যু।'

বলেই হাবিব হাসাবাহ দু'জন গার্ডকে লক্ষ্য করে বলল, 'তোমরা গিয়ে আহমদ মুসাকে চিৎ করে শুইয়ে জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা কর। ওর জ্ঞান ফিরলে তবেই নাটক জমবে। জ্ঞান ফিরলে ওর ডান হাতটা আগে কাটবো। ঐ হাতই করেছে আমাদের বেশিরভাগ সর্বনাশ।'

গার্ড দু'জন হাবিব হাসাবাহকে নীরবে স্যালুট দিয়ে তার হুকুম পালনের জন্যে এগোলো।

ওরা পাশাপাশি হেঁটে এগোচ্ছে আহমদ মুসার দিকে। পাহাড়ের পাদদেশে পিন-পতন নীরব পরিবেশে তাদের পায়ের শব্দ খুবই স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে আহমদ মুসা। তারা কতটা এগোলো, তারা কতটা এখনো দূরে তা সহজেই পরিমাপ করতে পারছে আহমদ মুসা চোখ বুজে থেকেই।

আহমদ মুসা আত্মরক্ষার জন্যে আক্রমণকেই বেছে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। প্রথম সুযোগকেই সে কাজে লাগাবে।

ওদের পায়ের শব্দ যখন আহমদ মুসার পায়ের কাছাকাছি পৌঁছল, তখন আহমদ মুসা চোখ খুলল এবং তার রিভলভার ধরা ডান হাতও বেরিয়ে এল পাঁজরের নিচ থেকে।

আহমদ মুসার দিকে এগিয়ে আসা দু'জনের দৃষ্টি আহমদ মুসার দিকেই নিবদ্ধ ছিল। দেখতে পেল ওরা আহমদ মুসার চোখ এবং রিভলভার নিয়ে ডান হাত বেরিয়ে আসার দৃশ্য।

ভূত দেখার মতো আঁতকে উঠে কাঁধে ঝুলানো স্টেনগানে ওরা হাত দিতে যাচ্ছিল।

আহমদ মুসার রিভলভার বেরিয়ে আসার পর এক সেকেন্ডও অপেক্ষা করেনি। আহমদ মুসার তর্জনী পর পর দু'বার ট্রিগারে চেপে বসল।

দু'জনেই কপালের মাঝ বরাবর গুলি খেয়ে নিঃশব্দে ছিটকে পড়ল মাটিতে।

দ্বিতীয় গুলির পর তৃতীয় একটা গুলিও আহমদ মুসার রিভলভার থেকে বেরিয়ে গেল প্রায় সংগে সংগেই।

আহমদ মুসা দেখতে পেয়েছিল, হতচকিত হাবিব হাসাবাহও হাতের চুরুট ফেলে দিয়ে পকেটে হাত দিয়েছিল রিভলভার বের করার জন্যে।

আহমদ মুসার তৃতীয় গুলি গিয়ে বিদ্ধ করল হাবিব হাসাবাহর রিভলভার ধরা ডান হাতকে।

তার হাত থেকে রিভলভার ছিটকে পড়ে গেল।

হাত থেকে রিভলভার ছিটকে পড়ার সাথে সাথে হাবিব হাসাবাহর বাম হাত চলে গেল বাম পকেটে। বিদ্যুৎ বেগে বেরিয়ে এল ডিম আকৃতির একটা গোলাকার বস্তু নিয়ে।

তার দু'চোখে আগুন। গুলিতে গুঁড়িয়ে যাওয়া রক্তাক্ত ডান হাতের দিকে তার বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। মরিয়াভাব তার চোখে-মুখে।

আহমদ মুসা বুঝল কি ঘটতে যাচ্ছে।

এবার চতুর্থ গুলি ছুঁড়ল আহমদ মুসা।

হাবিব হাসাবাহর হাত হাতের বস্তুটিকে ছোঁড়ার পর্যায়ে উঠে আসার আগেই আহমদ মুসার চতুর্থ বুলেটটি গিয়ে বিদ্ধ করল হাবিব হাসাবাহর বুককে।

গুলি খেয়ে তার দেহ টলে উঠলেও হাবিব হাসাবাহ ছুঁড়তে চেষ্টা করেছিল তার হাতের বস্তুটি। হাতটা তার সামনের দিকে এগিয়েও আবার ঢলে পড়ে গেল। তার সাথে সাথে সে টলে চিৎ হয়ে পড়ে গেল একটা পাথরের ওপর।

জাবের জহীর উদ্দিন বোবা বিস্ময় নিয়ে তাকিয়েছিল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা জাবের জহীর উদ্দিনের দিকে এগোবার জন্যে পা তুলে বলল, 'জাবের তুমি ঠিক আছ তো?'

কোন উত্তর না দিয়ে জাবের জহীর উদ্দিন পাগলের মতো ছুটে এসে আহমদ মুসার পায়ের ওপর আছড়ে পড়ল। কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল, 'আপনাকে ভাই বলব, না স্যার বলব, না মহান আমীর বলব কিছু বুঝতে পারছি না। বদর যুদ্ধে মহানবী স.-এর বাহিনীর সাহায্যে আসা সেই ফেরেশতার মতো আপনি এসেছেন। কল্পনাতেও যাকে ছোঁয়া যায় না, সেই আপনাকে পাঠানোর মতো এত করুণা আল্লাহ করেছেন আমাদেরকে!'

আহমদ মুসা রিভলভার পকেটে রেখে জাবের জহীর উদ্দিনকে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরল। বলল, 'তোমার ওপর দিয়ে অনেক নির্যাতন-নিপীড়ন গেছে। বদরের সাহাবীদের মতো ত্যাগ, ঈমান ও দৃঢ়তার পরিচয় তোমরা দিতে পেরেছ বলেই আল্লাহর সাহায্য তোমাদের জন্যে এসেছে।'

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা বলল, 'চল জাবের, সরদার জামাল ও আবদুল কাদের কামাল উদ্দিনদের জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করি। তুমি ওদের চেন না? কোহেতান কবিলার লোক এরা।'

'আমার আব্বার কাছ থেকে এই কবিলার গল্প শুনেছি। এরা নাকি আমাদের পরিবারের খুব অনুগত। তবে এরা পাহাড় থেকে খুব একটা বাইরে যেত না। আমার সাথে দেখা হয়নি। হাবিব হাসাবাহদেরকে এদের ব্যাপারে খুব গল্প করতে শুনেছি। প্রথম দিকে প্রশংসা শুনেছি, কিন্তু দু'দিন থেকে এদের

বিশ্বাসঘাতক বলে গাল দিচ্ছে। ওদের ব্ল্যাক ঈগলের সবচেয়ে মূল্যবান লোকদের নাকি তারা আপনার সাহায্যে হত্যা করেছে।'

আহমদ মুসার পাশে হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছিল জাবের জহীর উদ্দিন। আবদুল কাদেরদের পাশে এসে গেছে আহমদ মুসারা। আহমদ মুসা পকেট থেকে সরু ইঞ্চিখানেক লম্বা এক অ্যালুমিনিয়াম টিউব বের করে জাবের জহীর উদ্দিনের হাতে দিয়ে বলল, 'টিউবের মুখটা ওদের নাকে ধরে দু'পাশের লাল বোতামে একসাথে দু'তিনবার চাপ দাও।'

জাবের জহীর উদ্দিন টিউবটা নিয়ে এগোলো আবদুল কাদেরের দিকে।

আহমদ মুসা পকেট থেকে মোবাইল বের করে বলল, 'জাবের, তোমার কথা যয়নব যোবায়দা ও ফরহাদ ফরিদ উদ্দিনদের জানিয়ে দেই।'

একটু থেমেই আবার বলল, 'জাবের, তোমার হবু শ্বশুর পুরসাত প্রজাদিপককেও জানিয়ে দেই। সিরিত থানারতা ওদিকে পাগলের মতো হয়ে আছে।'

থমকে দাঁড়িয়েছে জাবের জহীর উদ্দিন। ফিরে তাকিয়েছে আহমদ মুসার দিকে। লজ্জায় রাঙা হয়ে গেছে তার মুখ। বলল সে, 'আপনি সিরিত থানারতাকে চেনেন? স্যারকে চেনেন?'

'শুধু চিনব কেন? ওদের বাড়িতে থাকলাম, খেলাম। সব বলব, যাও তুমি ওদের জ্ঞান ফেরাও।' বলল আহমদ মুসা।

চলার জন্যে ফিরে দাঁড়াতে গিয়েও আবার বলল, 'স্যার, দাদী ও যয়নবকেও এটা বলেছেন?'

মিষ্টি হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'শুধু বলেছি নয়, সিরিত থানারতার সাথে ওদের কথা বলিয়েও দিয়েছি। কি, খুশি তো! তোমার কঠিন কাজটা আমি করে দিয়েছি।'

জাবের জহীর উদ্দিন লাজনম্র একটু হাসি হাসল। বলল, 'স্যার, আপনার সাক্ষাৎ যে পায়, তার এমন সৌভাগ্যই হয়। আমি সংগ্রামী আহমদ মুসাকেই চিনতাম স্যার এতদিন। কিন্তু এই মিনিটখানেকের পরিচয়েই আমার মনে হচ্ছে, ভাই আহমদ মুসা, মানুষ আহমদ মুসা তার চাইতে অনেক বড়।'

কথাগুলো বলতে গিয়ে জাবের জহীর উদ্দিনের কণ্ঠ ভারি হয়ে উঠেছে। চোখের কোণ তার ভিজে উঠেছে।

কথা শেষ করেই জাবের জহীর উদ্দিন ঘুরে দাঁড়িয়ে আবদুল কাদেরের কাছে যাবার জন্যে পা বাড়াল।

আহমদ মুসা মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল হাবিব হাসাবাহর শেষ খবরটা এবং জাবের জহীর উদ্দিনের সুস্থ থাকার কথাটা যয়নব ও পুরসাত প্রজাদিপকদের জানানোর জন্যে। কথা বলল আহমদ মুসা থাই প্রধানমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও এদিকে আয়েশা আলিয়াদের সাথেও।

তারপর টেলিফোন করল আন্দামানে আহমদ শাহ আলমগীর-সুষমার কাছে, সুস্মিতা বালাজীর কাছে, স্বরূপা সিংহাল-সাজনা সিংহালের কাছে, শাহবানুদের কাছে এবং হাজী আবদুল্লাহ ও খালাম্মার কাছে।

শেষ টেলিফোনটা করল মদীনা শরীফে ডোনা জোসেফাইনের কাছে।

টেলিফোন শেষ করতে বেশ সময় লেগেছে।

মোবাইল বন্ধ করে আহমদ মুসা তাকাল আবদুল কাদেরদের দিকে। দেখল, ওদের জ্ঞান ফিরেছে। গল্পে ব্যস্ত ওরা।

আহমদ মুসার টেলিফোন শেষ হয়েছে দেখতে পেল ওরাও।

ওরা দ্রুত এগিয়ে এল আহমদ মুসার কাছে। আবদুল কাদের দ্রুত কণ্ঠে বলল, 'আল্লাহর হাজার শোকর যে, আপনার কোন ক্ষতি হয়নি, শয়তানদের শেষ করেছেন। একটাই দুঃখ স্যার, যুদ্ধের শ্বাসরুদ্ধকর ফিনিশিং আমি দেখতে পেলাম না, যা শুনলাম বড় ভাই জাবের জহীর উদ্দিনের কাছে। আমরা ভেবে পাচ্ছি না স্যার, আমরা একসাথেই ছিলাম। গ্যাস বোমায় আমরা জ্ঞান হারালাম, আপনি কিভাবে বেঁচে গেলেন?'

'তোমাদের সতর্ক করার সুযোগ আমি পাইনি। সংজ্ঞালোপকারী এ ধরনের গ্যাস বোমার কার্যকারিতা দেড়-দুই মিনিটের বেশি থাকে না। এ সময় নিঃশ্বাস বন্ধ রেখে বেঁচে যাওয়া যায়।' বলল আহমদ মুসা।

'সুবহানআল্লাহ! দুনিয়ায় চলতে গেলে কত যে বুদ্ধি, কত জ্ঞান যে দরকার! আজ এ বুদ্ধি যদি আপনার মাথায় না থাকতো, তাহলে ওরা লাশ না হয়ে

আমরা লাশ হতাম। হাবিব হাসাবাহ নাকি ঘোষণাই করেছিল আমাদের কাকে কত টুকরা করে মারবে।' বলল সরদার জামাল উদ্দিন।

'সরদারজী, এসব কথা এখন থাক। আপনি আসুন, আবদুল কাদের, জাবের তোমরা এস এই পাথরটায় একটু বসি। জরুরি কথা আছে।'

বলে আহমদ মুসা কয়েক ধাপ পিছিয়ে একটা সমতল বড় পাথরের এক প্রান্তে গিয়ে বসল। সবাই গিয়ে বসল তার সামনে।

'স্বয়ং পুলিশ প্রধান, গোয়েন্দা প্রধান ও পুরসাত প্রজাদিপক আসছেন হেলিকপ্টার নিয়ে। ওরা এসে ঘাঁটি সার্চ করার পর আমরা সবাই যাব থাই রাজার প্রাসাদে। তিনি সবাইকে দাওয়াত করেছেন। আমি যে কথাটা বলতে চাই সে কথা বলার সুযোগ আর হবে না। এখনই সেটা সারতে হবে।' আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসা আবার কথা শুরু করতে যাচ্ছিল, তার আগেই আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন বলল, 'স্যার, এদের তিনজনকে সার্চ করলে হতো না? কি নিয়ে সরে পড়েছিল দেখা যেত!'

'না আবদুল কাদের, এসব সার্চের কাজ ওরা করবেন। আমাদের কাজ শেষ।'

বলে আহমদ মুসা মুহূর্তকাল থেমে আবার বলা শুরু করল, 'যে গুপ্ত ধনভাণ্ডার খুঁজে পাওয়া গেছে, সে ব্যাপারেই কথা বলতে চাই। জাবের জহীর উদ্দিন ঘটনার কথা জানে না। সরদারজী, আপনি বিষয়টা জাবের জহীর উদ্দিনকে বলুন।' শেষ বাক্যটা আহমদ মুসা সরদার জামাল উদ্দিনকে লক্ষ্য করে বলল।

সরদার জামাল উদ্দিন তেপাং পাহাড়ে আসার পথে গুপ্ত ধনভাণ্ডার খুঁজে পাওয়ার কাহিনী, গুপ্ত ধনভাণ্ডারের বিবরণ এবং গুপ্ত ধনভাণ্ডারের মালিকের কথা সংক্ষেপে জাবের জহীর উদ্দিনকে বলল।

সরদার জামাল উদ্দিন থামলে আহমদ মুসা বলল, 'এ ধনভাণ্ডার আপনারা কিভাবে কাজে লাগাবেন, সেটাই আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই।'

আহমদ মুসার কথা শেষ না হতেই সরদার জামাল উদ্দিন বলে উঠল, 'আমরা কাজে লাগাব কি? এই ধনভাণ্ডার আল্লাহ তোমার হাতে তুলে দিয়েছেন। আমরা কতবার এই পথ দিয়ে যাতায়াত করেছি, ধনভাণ্ডারের সন্ধান আমরা

পাইনি। ধনভাণ্ডারের পথ আল্লাহ তোমাকেই দেখিয়েছেন, এই ধনভাণ্ডার তোমার হাতেই দিয়েছেন আল্লাহ। এর দায়িত্ব তোমার।'

'আমি এক উসিলা মাত্র। এ ধনভাণ্ডার মালয়ী, থাই মুসলমানদের এবং এ অঞ্চলবাসীর। এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আপনাদেরকেই নিতে হবে।' বলল আহমদ মুসা।

'তুমি উসিলা, সেটা তুমি বলতে পার। কিন্তু আসলেই আল্লাহ ঐ ধনভাণ্ডার তোমার হাতেই তুলে দিয়েছেন। এটাই সত্য।' জোর দিয়ে বলল সরদার জামাল উদ্দিন।

'এটা আংশিক সত্য। সত্যের অপর অংশটা হলো, ধনভাণ্ডার একা আমার হাতে তুলে দেননি। ধনভাণ্ডার যখন পাওয়া যায়, তখন আপনারা আমার সাথে ছিলেন। এর অর্থ, ধনভাণ্ডার যখন আল্লাহ আমাকে দেখালেন, তখন আল্লাহ আপনাদের আমার সাথে রেখেছেন। আর সম্পদের ওপর মালিকানার খোদায়ী একটা উসিলা হলো, যার মাটিতে, বা যে দেশের মাটিতে সম্পদ পাওয়া যাবে, সম্পদ সেই দেশের বা সেই দেশের মানুষের। যেহেতু দেশ আপনাদের, তাই এই সম্পদের মালিক আপনারা। এই সম্পদ পাওয়ার আল্লাহ আমাকে উসিলা বানিয়েছেন, এটাই সত্য।' থামল আহমদ মুসা।

ধীর কণ্ঠে সরদার জামাল উদ্দিন বলল, 'তোমার কথার ওপর কথা বলা আমাদের বেআদবি। কিন্তু যেহেতু তুমি আমার নাতির মতো, তাই কিছু কথা বলে রাখি। আবারও বলছি, তোমার কথা মেনে নেবার পরও তোমাকে উসিলা বানিয়েছেন আল্লাহ নিশ্চয় কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে। সেই উদ্দেশ্যটা কি? তোমাকে ছাড়াও এই ধনভাণ্ডার আল্লাহ আমাদের দিতে পারতেন, তা দেননি। তোমাকে উসিলা বানিয়েছেন কেন?'

'হয় তো আল্লাহ চান, এ ধনভাণ্ডারের ব্যাপারে কোনো পরামর্শ চাইলে আমি তা যেন দিই।' বলল আহমদ মুসা।

'তাহলে বল, এ ধনভাণ্ডার কে রাখবে, এর ব্যবহারের ব্যবস্থাপনা কি হবে?' সরদার জামাল উদ্দিন বলল।

'এই ব্যাপারে আপনাদের চিন্তাটা কি বলুন, তাহলে আমার পরামর্শ দেয়া সহজ হবে।' বলল আহমদ মুসা।

সরদার জামাল উদ্দিন তাকাল জাবের জহীর উদ্দিনের দিকে। বলল, 'জাবের জহীর উদ্দিন আমাদের নেতা। এ ব্যাপারে কথা বলা তারই হক।'

'ধনভাণ্ডার যাদের দ্বারা আল্লাহ আবিষ্কার করিয়েছেন, আমি তাদের মধ্যে ছিলাম না। অতএব, এ ব্যাপারে কোনো মত দেবার কথা আমার নয়। তবু বলতে হলে আমি বলব, আল-কাতান বা কোহেতান পাহাড়ের ধনভাণ্ডার আপাতত কোহেতান কবিলার প্রধান জনাব সরদার জামাল উদ্দিনের তত্ত্বাবধানে থাকবে। আর এ ধনভাণ্ডারের ব্যবহার ব্যবস্থাপনার বিষয়টা আমাদের সকলের সম্মানিত নেতা, থাইল্যান্ডের এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের নায়ক আমাদের মহান ভাই আহমদ মুসা ঠিক করে দেবেন।' বলল জাবের জহীর উদ্দিন।

কিছু বলতে যাচ্ছিল সরদার জামাল উদ্দিন। তার আগেই আহমদ মুসা বলে উঠল, 'জাবের, সর্বাবস্থায় সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যে, কোনো মানুষের এতে ভাগ বসাবার অধিকার নেই। কোনো আবেগের বশবর্তী হয়ে এটা ভুলে যাওয়া উচিত নয়।'

'স্যরি। আল্লাহ আমাকে মাফ করুন। আপনি আমাকে শুধরে দিয়েছেন ভাই। আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন।' বলল জাবের জহীর উদ্দিন। তার কণ্ঠ ভারি।

'ধন্যবাদ জাবের। আল্লাহ আমাদের সকলকে মাফ করুন।' জাবের থামতেই বলল আহমদ মুসা।

কথা শেষ করে একটা দম নিয়েই আবার বলা শুরু করল আহমদ মুসা। বলল, 'আমার মত হলো, জাবের জহীর উদ্দিন এবং জনাব সরদার জামাল উদ্দিনরা যৌথ উদ্যোগে ধনভাণ্ডারটি উদ্ধার করবেন। জাবের ঠিকই বলেছে, ধনভাণ্ডার আপাতত সরদার জামাল উদ্দিন আমানত হিসেবে রাখবেন। তারপর আমি মনে করছি ধনভাণ্ডারের বণ্টনটা এভাবে হবেঃ ধনভাণ্ডার সমান চার ভাগে ভাগ হবে। এর এক ভাগকে দুই ভাগে ভাগ করে এর এক অংশ দিতে হবে থাই সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ছাত্রবৃত্তি বিভাগকে। অন্য অংশ পাবে মালয়েশিয়া

সরকারের অনুরূপ ছাত্রবৃত্তি তহবিল। চার ভাগের অবশিষ্ট তিন ভাগের এক ভাগ পাবে থাই সরকারের স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা মুসলিম এডুকেশন ট্রাস্ট। এর অবশিষ্ট দুই ভাগের এক ভাগ যাবে মালয়েশিয়া সরকারের ইসলামিক একাডেমি অব সায়েন্স- এর গবেষণা প্রকল্প প্রমোশন ফান্ডে। চার ভাগের শেষ ভাগের তিন-চতুর্থাংশ পাবে শাহ পরিবার তাদের দাবি-দাওয়া আন্দোলনের তহবিল হিসেবে। অবশিষ্ট এক-চতুর্থাংশ পাবে জনাব সরদার জামাল উদ্দিনের কবিলা আল-কোহেতান, যা তারা ব্যয় করবে কোহেতানের পাহাড়ী পরিবারগুলোর শিক্ষা উন্নয়নে।' থামল আহমদ মুসা।

'আলহামদুলিল্লাহ্।' সরদার জামাল উদ্দিন, জাবের জহীর উদ্দিন ও আবদুল কাদের কামাল উদ্দিন একসাথে বলে উঠল।

'সবচেয়ে ভালো লাগছে, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ডের মুসলিম-অমুসলিম কেউ বঞ্চিত হলো না এই ফান্ড থেকে এবং এই ফান্ড ব্যয় হবে সর্বসাধারণের জাতীয় কল্যাণে। ফান্ড যেহেতু মুসলমানদের, তাই মুসলমানরা অগ্রাধিকার পেয়েছে বটে, কিন্তু অমুসলিমরাও ন্যায্য অংশ পেয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্।' জাবের জহীর উদ্দিন বলল।

'ধনভাণ্ডারের তিন-চতুর্থাংশই ব্যয় হচ্ছে শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়নে। এর পেছনে আপনার কি চিন্তা কাজ করেছে স্যার?' জিজ্ঞাসা আবদুল কাদের কামাল উদ্দিনের।

'আবদুল কাদের, ধনভাণ্ডারের সাথে রাখা ধনভাণ্ডারের মালিকের যে বক্তব্য লিখিত আছে, তার কথা মনে আছে তোমার নিশ্চয়। তার বক্তব্যে আছে, কি করে ধীরে ধীরে বিদেশীরা মালয় উপদ্বীপ দখল করে নেয়। মুসলমানদের তখন অর্থবল, জনবল, অস্ত্রবল কিছুরই অভাব ছিল না। অভাব ছিল সচেতনতার, অভাব ছিল শত্রুকে চেনা ও বোঝার মতো জ্ঞানের, অভাব ছিল জাতীয় বোধ ও ঐক্যের। এসব অভাবের মূল কারণ ছিল উপযুক্ত শিক্ষার অভাব, যে শিক্ষা নিজেকে চেনায়, জাতিকে চেনায়, দেশকে চেনায় এবং নিজেকেসহ দেশ ও জাতিকে সমৃদ্ধ করার, দেশ ও জাতিকে রক্ষা করার উপযুক্ত করে তোলে। এই শিক্ষার অভাব এখনও প্রকট। উপযুক্ত শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাবেই আমরা দেশ ও

জাতির ঐক্য ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পারছি না এবং ষড়যন্ত্রের শিকার হচ্ছি। এই যে তোমরা সংকটে পড়েছিলে, এখানে তোমাদের জ্ঞান ও সচেতনতার অভাব মুখ্য কারণ হিসেবে কাজ করেছে। এজন্যেই উপযুক্ত শিক্ষার উন্নতি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তারের জন্যে বেশি অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এখন বন্দুক, বোমা কোনো পরিবর্তনের অস্ত্র নয়, আসল অস্ত্র হলো উপযুক্ত জ্ঞান এবং জ্ঞানের উপযুক্ত ব্যবহার। আজ অস্ত্র ও অর্থবলের মতো হার্ড পাওয়ারের চাইতে সুপরিকল্পিতভাবে রচিত গ্রন্থাদি, সুসম্পাদিত বহুল প্রচারিত পত্র-পত্রিকা, শক্তিশালী ইলেকট্রনিক মিডিয়া আর জ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তির সুপরিকল্পিত সফট পাওয়ারের শক্তি অনেক বেশি। ধনভাণ্ডারের মালিক এটাই চেয়েছিলেন যে, তার ধনভাণ্ডার উপযুক্ত হাতে পড়ুক এবং উপযুক্ত কাজে লাগুক। আমি তার এই আশা পূরণ করার চেষ্টা করেছি।' থামল আহমদ মুসা।

'আলহামদুলিল্লাহ্।' বলে উঠল একসাথে তিনজনই।

কিছু বলতে গেল সরদার জামাল উদ্দিন। এ সময় হেলিকপ্টারের শব্দ তাদের কানে এল।

তিনজনের ছয়টি চোখই ছুটে গেল পূর্ব দিকে। বড় হেলিকপ্টার। সামরিক হেলিকপ্টার বলে মনে হচ্ছে।

'আমার মনে হচ্ছে, যে হেলিকপ্টার আসছে, এই হেলিকপ্টারে করে আমরা সবাই যাব থাইরাজা আনন্দ মহিদল ভূমিবলের প্রাসাদ-অফিসে। তিনি দাওয়াত দিয়েছেন আমাদের সকলকে। সেখানে যারা যাচ্ছেন তাদের মধ্যে রয়েছে দাদী, যয়নব যোবায়দা ও ফরহাদ ফরিদ উদ্দিন। তাছাড়া সেখানে যাচ্ছে সিরিত থানারতা এবং যাচ্ছে আয়েশা আলিয়া ও আবদুল জব্বার আল যোবায়েরও। আর....।'

'সবাই মানে আয়েশা আলিয়া ও জাফর জামিল ওখানে যাচ্ছে কিভাবে?' আহমদ মুসার কথার মাঝখানেই কথা বলল সরদার জামাল উদ্দিন। তার চোখে-মুখে বিস্ময়।

একই ধরনের বিস্ময় জাবের জহীর উদ্দিনের চোখে-মুখে। সরদার জামাল উদ্দিন থামতেই জাবের জহীর উদ্দিন বলে উঠল, 'মহারাজা, প্রধানমন্ত্রী

আপনার সাথে দেখা করবেন, আমাদেরকেও ডাকতে পারেন, এটা ঠিক আছে। কিন্তু দাদীরা যাচ্ছেন কেন বুঝতে পারছি না।'

'আমি টেলিফোনে সবার সাথে আলোচনা করেছি। দাদী ও যয়নবের সাথেও। আয়েশা আলিয়ার সাথেও কথা বলেছি। আমি প্রধানমন্ত্রীকে বলেছি, তাই সবাইকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এবং নিয়ে যাবারও ব্যবস্থা করেছেন।' বলল আহমদ মুসা।

'কেন? সবাইকে প্রয়োজন কেন?' বলল জাবের জহীর উদ্দিন।

'দু'টি কারণে। এক. সবার সাথে আমি দেখা করতে চাই, দুই. জাবের জহীর উদ্দিন, যয়নব যোবায়দা এবং আয়েশা আলিয়ার বিয়ে আমি দেখে যেতে চাই। আমি দুঃখিত, তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করার সময় পাইনি। আমি যয়নব যোবায়দা, দাদী, আয়েশা আলিয়াদেরকে বলেছি। জাবের, সরদারজী, আপনাদের আপত্তি নেই তো? থাই রাজার প্রাসাদেই এই তিন জোড়া বিয়ের আয়োজন করা হচ্ছে।'

অপার বিস্ময় জাবের জহীর উদ্দিনের মনে। সরদার জামাল উদ্দিন ও আবদুল কাদেরের চোখে-মুখেও। বলল জাবের জহীর উদ্দিন, 'আমাদের ব্যাপারে আপনার যে কোনো সিদ্ধান্ত আমাদের সৌভাগ্য। কিন্তু....।'

জাবের জহীর উদ্দিনের কথার মাঝখানেই সরদার জামাল উদ্দিন বলে উঠল, 'আমিও একে আমাদের পরম সৌভাগ্য বলে মনে করছি।'

'কিন্তু সম্মানিত ভাই, এটা আজই কেন? এত তাড়াহুড়া করে কেন?' বলল জাবের জহীর উদ্দিন সরদার জামাল উদ্দিনের কথা শেষ হবার সংগে সংগেই।

'তোমাদেরকে আরেকটা কথা জানানো হয়নি। আমি আজই মদীনায় আমার বাড়িতে যাব।'

কথাটা শুনে বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মতো চমকে উঠল তিনজনই। হঠাৎ যেন রাতের অন্ধকার নামল তাদের চোখে-মুখে। সবাই বিস্ময়তাড়িত বোবা দৃষ্টি নিয়ে তাকাল আহমদ মুসার দিকে।

কিছুক্ষণ কেউ কথা বলতে পারল না।

একসময় নীরবতা ভাঙল জাবের জহীর উদ্দিন। ধীর কণ্ঠে বলল, 'আপনার সাথে তো কিছুই কথা হলো না আমার। আপনার সম্পর্কে কত কথা শুনেছি, কত পড়েছি। এক স্বপ্ন ছিলেন আপনি আমাদের কাছে। হাবিব হাসাবাহদের মুখেই প্রথম শুনলাম যে, আপনি সম্ভবত থাইল্যান্ডে এসেছেন। ওরা নিশ্চিত তখনও জানতো না, কিন্তু বলতো যে, আহমদ মুসা ছাড়া তাদের ক্ষতি করার এমন লোক পৃথিবীতে দ্বিতীয় কেউ নেই। তারা সন্দেহ করতো যে, আন্দামানে যখন আপনি এসেছেন, তখন থাইল্যান্ডেও আসতে পারেন। মাত্র কয়েকদিন আগে তারা নিশ্চিত হয় যে, আপনিই আহমদ মুসা। আমি এটা জানার পর কি যে খুশি হয়েছিলাম। সেদিনই প্রথম ভাবতে শুরু করলাম, আল্লাহ আমাকে মুক্ত করবেন। মুক্ত করার জন্যেই আল্লাহ আপনাকে থাইল্যান্ডে নিয়ে এসেছেন। সেদিন থেকেই কত স্বপ্ন দেখছি, আপনাকে কত কথা বলব, কত কথা জানব। আপনি কেন আন্দামানে এলেন আর কিভাবেই বা এলেন থাইল্যান্ডে? এসব নানা প্রশ্ন জমাট বেঁধে আছে আমার মধ্যে।' বলল জাবের জহীর উদ্দিন। অশ্রুভেজা তার কণ্ঠ।

আহমদ মুসা একটা হাত জাবেরের পিঠে রেখে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'আমরা এখনও একসাথে একবেলার মতো আছি। অনেক কথা হবে। আন্দামানের আহমদ শাহ আলমগীরের টেলিফোন নাম্বার আমি তোমাকে দিয়ে যাব। তার সাথে কথা বলে আন্দামানের সব ঘটনা জানতে পারবে। আর থাইল্যান্ডে কিভাবে এলাম, এটা যয়নব যোবায়দার কাছ থেকে জানতে পারবে। সেই আমাকে নিয়ে এসেছে থাইল্যান্ডে।'

জাবের জহীর উদ্দিন বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'যয়নব আপনাকে নিয়ে এসেছে থাইল্যান্ডে?'

'সে এক রূপকথা জাবের। তুমি যোবায়দার কাছে শুনে নিও।'

বলেই আহমদ মুসা আকাশের দিকে তাকাল। বলল, 'হেলিকপ্টার এসে গেছে। চল আমরা একপাশে সরে যাই। মাঝের এই এলাকাটা কিছুটা সমতল। এখানে হেলিকপ্টার ল্যান্ড করাতে সুবিধা হবে।'

উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

তার সাথে উঠে দাঁড়াল সবাই। একপাশে তারা সরে গেল।

একে একে দু'টি হেলিকপ্টারই ল্যান্ড করল। হেলিকপ্টারগুলো মাউন্টেইন ল্যান্ডার। সুতরাং কোনো অসুবিধাই হলো না ল্যান্ড করতে।

প্রথমে হেলিকপ্টার থেকে নামল পুলিশ প্রধান থানম কিত্তিকাচরণ। তারপর নামল সহকারী গোয়েন্দা প্রধান পুরসাত প্রজাদিপক। তারপরেই নেমে এল আরও কয়েকজন পুলিশ ও গোয়েন্দা অফিসার।

অন্য হেলিকপ্টার থেকে নামল একদল পুলিশ।

পুলিশ প্রধান অফিসারদের নিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল আহমদ মুসাদের দিকে।

আহমদ মুসারাও এগোলো তাদের দিকে। মুখোমুখি হলো তারা।

আহমদ মুসা স্বাগত জানিয়ে হাত বাড়াল পুলিশ প্রধানের দিকে হ্যান্ডশেকের জন্যে।

কিন্তু পুলিশ প্রধান দু'হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে। বলল, 'কংগ্র্যাচুলেশন বিভেন বার্গম্যান ওরফে আহমদ মুসা। আমরা কৃতজ্ঞ আপনার কাছে। প্রথমটায় আপনার কথায় আমরা আস্থা রাখতে পারিনি বলে দুঃখিত।'

থাইল্যান্ডের সবচেয়ে সম্মানিত পুলিশ অফিসার, পুলিশ প্রধানকে জড়িয়ে ধরে আহমদ মুসা বলল, 'কৃতজ্ঞতা আমাকেই প্রকাশ করতে হবে স্যার। আপনার বিভাগের সহযোগিতা না পেলে আমি এভাবে এগোতে পারতাম না।'

আহমদ মুসা জাবের জহীর উদ্দিনকে দেখিয়ে বলল, 'এ হলো ঘটনার মধ্যমণি জাবের জহীর উদ্দিন।'

পুলিশ প্রধান এগোলো জাবের জহীর উদ্দিনের সাথে হ্যান্ডশেক করার জন্যে।

এই ফাঁকে সহকারী গোয়েন্দা প্রধান পুরসাত প্রজাদিপক এসে জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে। বলল, 'ওয়েল ডান ইয়ংম্যান। তুমি সকলকে নির্বাক করে দিয়েছ।'

তারপরেই কানে কানে আহমদ মুসাকে বলল, 'তোমার হুকুম মতো তিন জোড়া বিয়ের কাজ পুরোদমে চলছে। তোমার টিকেটও রেডি, কিন্তু সিরিত থানারতারা কি তোমাকে ছাড়বে?'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'স্যার, কেউ ছাড়ে না। তবু ছাড়তেই হয়। এটাই পৃথিবীর এক নিষ্ঠুর নিয়ম।'

'তবুও মধুর এই পৃথিবী' বলে পুরসাত প্রজাদিপক আহমদ মুসাকে ছেড়ে দিয়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরল জাবের জহীর উদ্দিনকে। বলল, 'তুমি ঠিক আছ বেটা?' গভীর আবেগ পুরসাত প্রজাদিপকের কণ্ঠে।

আহমদ মুসা পুরসাত প্রজাদিপক ও পুলিশ প্রধানকে পরিচয় করিয়ে দিল সরদার জামাল উদ্দিন ও আবদুল কাদের কামাল উদ্দিনের সাথে। বলল, 'বেতাংগ থেকে এই টেপাংগ পাহাড় পর্যন্ত আমার অভিযানের এরা ছিলেন মধ্যমণি।'

'না স্যার', বলে উঠল সরদার জামাল উদ্দিন, 'আমরা আসলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। আহমদ মুসা অদ্ভুত প্রজ্ঞার পরিচয় না দিলে ওরা তিনজন লাশ না হয়ে আমরা তিনজন লাশ হয়ে যেতাম। জাবের জহীর উদ্দিনও বাঁচত না।'

কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে একবার আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল পুলিশ প্রধান থানম কিত্তিকাচরণ।

তার আগেই আহমদ মুসা বলে উঠল, 'মাফ করবেন স্যার, হাবিব হাসাবাহদের সার্চ বাকি আছে, ঘাঁটিও সার্চ করা দরকার স্যার।'

মিষ্টি হাসল থানম কিত্তিকাচরণ। বলল, 'আমি শুনেছি, তুমি প্রশংসা পছন্দ কর না। সত্যিই যদি তোমার মতো দুনিয়ার সব লোক হতো আহমদ মুসা!'

একটু থেমেই আবার আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, 'দেখ, অফিসাররা ভিকটিমদের ফটো নিচ্ছে, সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করছে। ওরাই সার্চ করবে ভিকটিমদের। টেররিজম প্রিভেনশন ব্যুরোর (TPB) চীফও এসেছেন। তার নেতৃত্বেই পুলিশরা ঘাঁটি সার্চ করবে, ফটো নেবে। অনেক সময় লাগবে ওদের। ওরা থাকবে, আমরা চলে যাব এখনি তোমাদের নিয়ে।'

বলেই পুরসাত প্রজাদিপকের দিকে চেয়ে নির্দেশ দিল, 'মি. প্রজাদিপক, TPB চীফ চুলাংকরণকে সব কাজ আরেকবার বুঝিয়ে দিয়ে আসুন। আমরা

এখনই স্টার্ট করব। এরা সবাই ক্লান্ত। তাছাড়া বিয়ের আয়োজনে এদের রেডি হবারও প্রশ্ন আছে।’

‘জ্বি স্যার, আমি আসছি।’ বলে অফিসারদের দিকে চলে গেল পুরসাত প্রজাদিপক।

‘আহমদ মুসা, একটা সুখবর আছে। পুরসাত প্রজাদিপক আজই থাইল্যান্ডের গোয়েন্দা প্রধানের দায়িত্ব নিচ্ছেন। আর গোয়েন্দা প্রধান আজকেই রয়্যাল কাউন্সিলের একজন সদস্য হিসেবে নিয়োগ পেয়ে গেছেন।’ বলল পুলিশ প্রধান থানম কিত্তিকাচরণ।

‘খুব খুশি হলাম স্যার। আপনারা সঠিক মূল্যায়ন করছেন।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আহমদ মুসা, তুমি এভাবে না গিয়ে আর একদিন সময় দিতে পার না আমাদের?’ পুলিশ প্রধান থানম কিত্তিকাচরণ বলল।

‘স্যার, আমার ছেলে অসুস্থ। আমার স্ত্রীকে সত্যিই একটু আপসেট মনে হলো, যদিও সে নিজেকে চেপে রাখার চেষ্টা করেছে। আমি একটু উদ্বিগ্ন।’ আহমদ মুসা বলল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে এল পুরসাত প্রজাদিপক। বলল, ‘সব ঠিক-ঠাক স্যার। আমরা এখন যেতে পারি।’

‘ঠিক আছে চল।’ বলে পুলিশ প্রধান থানম কিত্তিকাচরণ আহমদ মুসার হাত ধরে পাশাপাশি হেলিকপ্টারের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

পুরসাত প্রজাদিপক জাবের জহীর উদ্দিন, সরদার জামাল উদ্দিন এবং আবদুল কাদেরকে নিয়ে পেছনে হাঁটা শুরু করল।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সবাইকে নিয়ে একটি হেলিকপ্টার আকাশে উড়ল।

থাইরাজা আনন্দ মহিদল ভূমিবলের খাস ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে এল আহমদ মুসা।

ড্রইংরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে রাজা আনন্দ মহিদল ভূমিবল এবং রানী মাহা সারাখান ভূমিবল বিদায় দিল আহমদ মুসাকে। বিদায়ী হ্যান্ডশেক করতে গিয়ে রাজা ভূমিবল বলল, 'আহমদ মুসা, নিজের জীবন বিপন্ন করে নিঃস্বার্থ সেবা দিয়ে থাইল্যান্ডকে আপনি অসীম কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। চিরদিন মনে রাখবে এটা থাইল্যান্ড।'

'সিরিত থানারতা ও জাবের বাংসা জহীর উদ্দিনের বিয়ে দক্ষিণের পাত্তানীদের সাথে অবশিষ্ট থাইল্যান্ডকে আরও একাত্ম করবে এবং এরও সবটা কৃতিত্ব আপনার আহমদ মুসা।' রাজা ভূমিবলের কথা শেষ হবার পরেই বলে উঠল রানী মাহা সারাখান ভূমিবল।

'আপনাদের ধন্যবাদ এক্সিলেন্সি। যে আতিথ্য, যে আন্তরিকতা দিয়েছেন আপনারা, আমারও চিরদিন তা মনে থাকবে। আমি যা কিছুই করেছি, তার জন্যে সকল কৃতিত্ব আমার মালিকের, আমার স্রষ্টার। মহামান্য রানী, আমিও আশা করি, পাত্তানী মুসলমানদের সাথে অবশিষ্ট থাইল্যান্ড আরও একাত্ম হয়ে যাবে। ওরা বেশি কিছু চায় না, ওদের বিশ্বাস এবং বিশ্বাসভিত্তিক কাজের স্বাধীনতা ওদের জন্যে যথেষ্ট। বহুজাতিক রাষ্ট্রে জাতিগুলোর স্বায়ত্তশাসন রাষ্ট্রকে দুর্বল করে না, শক্তিশালীই করে।'

'ধন্যবাদ আহমদ মুসা, তোমার এ কথাগুলো আমাদেরও কথা। সত্যি আহমদ মুসা, সবার যদি তোমার মতো এমন পরার্থের জীবন হতো, মানুষ যদি হতো এমন ঈশ্বরকেন্দ্রিক, তাহলে দুনিয়ায় স্বর্গ নেমে আসত। তোমাকে ঈশ্বর দীর্ঘজীবী করুন।' বলল রাজা আনন্দ মহিদল ভূমিবল।

'ধন্যবাদ এক্সিলেন্সি। গুড বাই।'

'গুড বাই, গড ব্লেস ইউ।' বলল রাজা ও রানী দু'জনেই।

আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়িয়ে করিডোর ধরে চলতে শুরু করল।

করিডোরেই কিছুটা সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে প্রধানমন্ত্রী চিয়াং মাই থাকসিন।

আহমদ মুসাকে স্বাগত জানিয়ে আহমদ মুসার পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করল। আহমদ মুসার হাতে সে একখণ্ড কাগজ তুলে দিয়ে বলল, 'এটা ইন্টারপোলের একটা ই-মেইল বার্তার কপি। আমরা ক'মিনিট আগে পেয়েছি। আমরা হাবিব হাসাবাহর ফটো পাঠিয়েছিলাম তাদের কাছে তার পরিচয় জানার জন্যে। তারা এই ই-মেইলে জানিয়েছে, হাবিব হাসাবাহ জায়োনিস্ট গোয়েন্দা সংস্থা ইরগুন জাই লিউমির একজন শীর্ষস্থানীয় সদস্য। এর আগে সে মুসলিম পরিচয় নিয়ে লেবানন, চীনের জেন জিয়াং ও সোমালিয়াতেও কাজ করেছে। ধন্যবাদ আপনাকে আহমদ মুসা। আপনি শুরুতেই যেটা বলেছিলেন, তা শতভাগ সত্য প্রমাণিত হয়েছে।'

'আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা কী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কি আপনারা সরকারিভাবে কোনো বক্তব্য দেবেন?' বলল আহমদ মুসা।

হাসল প্রধানমন্ত্রী চিয়াং মাই থাকসিন। বলল, 'আমরা অফিসিয়ালী কোনো বক্তব্য দিচ্ছি না। আমরা প্রেসকে সব দিয়ে দিচ্ছি। ওরাই ষড়যন্ত্রটা ফাঁস করবে। হাবিব হাসাবাহর ফটো, এমনকি ই-মেইলের কপিও আমরা দিয়ে দিচ্ছি।'

'এটাই যথেষ্ট হবে স্যার। ধন্যবাদ।' বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে বলল, 'গাড়ি রেডি স্যার?'

'গাড়িতে নয়, আপনি হেলিকপ্টারে যাচ্ছেন এয়ারপোর্টে। হিজ এক্সিলেন্সি রাজা ভূমিবল তার ব্যক্তিগত হেলিকপ্টার অফার করেছেন আপনাকে এয়ারপোর্টে নেবার জন্যে। বাইরের লনে হেলিকপ্টার রেডি।' প্রধানমন্ত্রী বলল।

প্রাসাদ থেকে বাইরে এল তারা।

প্রাসাদের তিন পাশে বাগান, কিন্তু বিস্তীর্ণ লন। ডজনখানেক হেলিকপ্টার একসাথে এ লনে ল্যান্ড করতে পারে। জাতীয় দিবসে সেনাবাহিনীসহ বিভিন্ন বাহিনীর প্যারেড এখানেই অনুষ্ঠিত হয়।

সামনেই রাজকীয় হেলিকপ্টার দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পেল আহমদ মুসা।

বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল পুলিশ প্রধান, নতুন গোয়েন্দা প্রধান পুরসাত প্রজাদিপকসহ আরও কিছু শীর্ষ আমলা ও পুলিশ অফিসার।

আরও একটু দূরে হেলিকপ্টারের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল দাদী, জাবের জহীর উদ্দিনসহ সকলকে।

আহমদ মুসারা বেরিয়ে আসতেই গোয়েন্দা প্রধান পুরসাত প্রজাদিপক এগিয়ে এল আহমদ মুসাদের দিকে। প্রধানমন্ত্রীকে স্যালুট করে সে বলল, 'স্যার, সব রেডি।' তারপর আহমদ মুসার দিকে চেয়ে বলল, 'আহমদ মুসা বিদায়-আদায় নিয়ে এসেছ সবার কাছ থেকে। কিন্তু সবাই আবার এখানে এসে গেছে। কাউকে মানানো যায়নি।'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'আমার অসুবিধা নেই। বিয়ের অনুষ্ঠানে কম ধকল যায়নি ওদের ওপর দিয়ে। তাই কষ্ট করে আর আসতে নিষেধ করেছিলাম। এসেছে ভালোই হয়েছে। আবার সবার সাথে দেখা হবার সুযোগ হলো।'

'ধন্যবাদ আহমদ মুসা।' বলল গোয়েন্দা প্রধান পুরসাত প্রজাদিপক।

আহমদ মুসাকে সাথে নিয়ে চলল হেলিকপ্টারের দিকে।

দাদীর কাছাকাছি পৌঁছতেই দাদীও এগোলো আহমদ মুসার দিকে।

প্রধানমন্ত্রীসহ সবাই থমকে দাঁড়াল।

আহমদ মুসাও দাদীর দিকে এগোলো। আহমদ মুসা মুখোমুখি হলো দাদীর। অন্যরাও সবাই এসে সামনে দাঁড়াল। জাবের জহীর উদ্দিন ও সিরিত থানারতা, ফরহাদ ফরিদ উদ্দিন ও যয়নব যোবায়দা, জাফর জামিল ও আয়েশা আলিয়া সবাই বিয়ের পোশাক পরেই চলে এসেছে। তাদের সাথে সরদার জামাল উদ্দিন এবং আবদুল কাদের কামাল উদ্দিনও।

'দাদী, আবার দেখা হওয়ায় খুব খুশি হলাম। কিন্তু আপনার কষ্ট হয়েছে আসতে।'

দাদীর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছে। সে আহমদ মুসার মাথায়-কপালে একটা চুমু খেয়ে বলল, 'দাদীকে এমন কষ্ট দেবার জন্যে আর হয়তো কোনোদিন আসবে না তুমি, এই জন্যেই ছুটে এসেছি ভাই। তুমি আল্লাহর তরফ থেকে ফেরেশতা হয়ে এসেছিলে। ফেরেশতারা আল্লাহর ইচ্ছাতে আসে, ডাকলে আসে না। সেজন্যে শেষ দেখার সুযোগ নেবার জন্যে ছুটে এসেছি।' কান্নায় রুদ্ধ হয়ে গেল দাদীর কণ্ঠ।

সবার চোখ দিয়েই অঝোর ধারায় নামছে অশ্রু।

আহমদ মুসার চোখও সিক্ত হয়ে উঠেছে। দাদীর কথার কি জবাব দেবে সে! এটাই তো বাস্তবতা। কত দেশের এমন কত দৃশ্য তার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে, এটাও তেমনি হারিয়ে যাবে, এরাও হারিয়ে যাবে সবাই। কোনোদিন এরা এভাবে আর সামনে এসে দাঁড়াবে না। স্মৃতির জগতে আবেগের ঢেউ যেন উথলে উঠতে চাইল আহমদ মুসার। আহমদ মুসা বড় দুর্বল এখানে!

আহমদ মুসা নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'দাদী, এক দেশে নয় বটে, এক বিশ্বেই তো আমরা আছি। বেদনার মধ্যে এটাই আমাদের সান্ত্বনা।'

জাবের জহীর উদ্দিন, ফরহাদ ফরিদ উদ্দিন, আবদুল জব্বার আল যোবায়ের একে একে সবাই এসে জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে। কান্না চাপতে গিয়ে কোনো কথাই বলতে পারল না তারা।

ওরা সরতেই সিরিত থানারতা, যয়নব যোবায়দা এবং আয়েশা আলিয়া একসাথে এসে হঠাৎ আহমদ মুসার পায়ের কাছে বসে পড়ল। কাঁদছে তারা তিনজনই।

ওরা তিনজনই বিয়ের পোশাকে সজ্জিতা। মাত্র মুখটুকু ছাড়া ওরা আপাদমস্তক বিয়ের পোশাকে মোড়া।

কি বলে আহমদ মুসা সান্ত্বনা দেবে ওদের!

একটু ভাবল। বলল, 'একটা সুখবর দেব তোমাদের, তোমরা উঠে দাঁড়াও।'

অশ্রুভেজা মুখ তুলল সিরিত থানারতা। বলল, 'আপনাকে বলতে হবে, আপনি আজ যাবেন না।' কান্নায় ভেঙে পড়া তার কণ্ঠ।

'তার চেয়েও বড় সুখবর দেব, তোমরা উঠে দাঁড়াও।' আহমদ মুসা বলল।

মাথা নিচু করে তিনজনই উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়িয়েই যয়নব যোবায়দা বলল, 'আপনি যে সময় থাইল্যান্ডে ছিলেন, লড়াইয়ের মধ্যে ছিলেন। ভালো খাওয়া, নিশ্চিন্ত ঘুম কিছুই আপনার কোনোদিন হয়নি। আপনার সব কথা

শিরোধার্য। কিন্তু আজ আপনি যেতে পারবেন না।' তার কণ্ঠ দৃঢ়। চোখ মুছে ফেলেছিল সে।

ম্লান হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'তোমাদের আবেগ, তোমাদের যুক্তি সব ঠিক আছে। কিন্তু অনুরূপ একটা আবেগ এবং যুক্তিই আমাকে এখন বাড়িতে যেতে বাধ্য করছে।'

বলে একটু থামল আহমদ মুসা। পরক্ষণেই আবার বলে উঠল, 'তোমাদের একটা সুখবর দেব বলেছি। সেটা হলো, শীঘ্রই তোমাদের সাথে আমাদের দেখা হচ্ছে ইনশাআল্লাহ। সামনের জিলহজ্ব মাসে তোমাদের হজ্বের ব্যবস্থা হবে। হজ্বের সময় এবং হজ্ব শেষে মদীনা শরীফে তোমরা আমাদের মেহমান হবে। এটা বেশি আনন্দের হবে না?'

'হবে, কিন্তু আমরা এটা ওটা দুটোই চাই।' বলল আয়েশা আলিয়া। তার কণ্ঠ গম্ভীর।

আয়েশা আলিয়ার কথা শেষ হতেই দাদী বলল, 'তোমরা জেদ করো না। হজ্ব বেশি আনন্দের, ওটাই আমরা চাই।'

বলে কয়েক ধাপ এগিয়ে এসে দাদী তিনজনের গায়ে হাত বুলিয়ে আহমদ মুসার সামনে থেকে সরিয়ে নিল। বলল, 'উনি তোমাদের বড় ভাই। কত বড় ভাই জান না। উনি যা বলেন, তার মধ্যেই কল্যাণ আছে।'

'তাই বলে উনি আমাদের বিয়ের সাজ পরিয়েই চলে যাবেন দাদী!' বলে সিরিত থানারতা দাদীকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল।

দাদী তাকে বুকে জড়িয়ে রেখে গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, 'বিয়ের সাজ পরিয়ে নয় বোন, বিয়ে দিয়েই যাচ্ছেন।'

দাদী সিরিত থানারতার চোখ মুছে দিয়ে বলল, 'আর দেরি নয়, হাসিমুখে বিদায় দাও বড় ভাইকে তোমরা।'

এগিয়ে এসেছে পুরসাত প্রজাদিপকসহ সবাই।

পুরসাত প্রজাদিপক বলল, 'আহমদ মুসা, আমরা কিন্তু দাওয়াত পেলাম না।'

হাসল আহমদ মুসা। ঘুরে দাঁড়াল সবার দিকে। বলল, ‘প্রধানমন্ত্রী স্যারসহ সবাইকে আমি সৌদি আরব সফরের দাওয়াত করছি। প্রধানমন্ত্রীসহ সরকারি সবাই বিদেশে প্রাইভেট সফরও করতে পারেন। আমি আন্তরিকভাবে সবাইকে দাওয়াত করছি। আপনারা সম্মতি দিলে আমি ব্যবস্থা করব।’

পুরসাত প্রজাদিপক তাকাল প্রধানমন্ত্রীর দিকে। প্রধানমন্ত্রী বলল, ‘ধন্যবাদ আহমদ মুসা। আমরা খুশি সৌদি আরব সফর করতে পারলে, বিশেষ করে আপনার আতিথ্যে। আমরা জানাব আপনাকে।’

‘ধন্যবাদ স্যার। আমি যোগাযোগ করব।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ধন্যবাদ আহমদ মুসা।’ বলল প্রধানমন্ত্রী। হেলিকপ্টারের প্রটোকল অফিসার এসে পাশে দাঁড়িয়েছিল। সে ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিল বার বার।

আহমদ মুসা তার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘চল অফিসার।’

বলে আহমদ মুসা সবার কাছ থেকে বিদায় নিল। জাবের, দাদীদের দিকে চেয়ে বলল, ‘দাদী এবং ভাইয়েরা, বোনেরা, আমি আসি। আল্লাহ হাফেজ।’

বলে আহমদ মুসা প্রটোকল অফিসারের সাথে হেলিকপ্টারের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

জাবেররা সবাই বলে উঠেছে, ‘ফি আমানিল্লাহ। আল্লাহ হাফেজ।’

পেছনে তাকাচ্ছে আহমদ মুসা বার বার।

হাত নেড়ে বিদায় জানাচ্ছে প্রধানমন্ত্রীসহ সকলেই।

# ২

আহমদ মুসা সোফায় বসে। তার কোলে আহমদ আবদুল্লাহ।

নিচে কার্পেটে আহমদ মুসার পায়ের কাছে ডোনা জোসেফাইন। তার মাথা আহমদ মুসার উরুতে।

অনেক ঘোরাফেরা ও দুষ্টুমির পর নেতিয়ে পড়েছে আহমদ আবদুল্লাহ। এখন ঘুমাবে সে।

'ওকে ওর বেডে রেখে আসি।' বলল জোসেফাইন।

'না, তোমাকে উঠতে হবে না। ও কোলেই ভালো ঘুমাবে।'

বলে একটা হাত আহমদ মুসা জোসেফাইনের মাথায় রাখল।

জোসেফাইনেরও একটা হাত ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে আহমদ মুসার হাত ধরল।

'অসুখ কাটিয়ে উঠেছে আহমদ আবদুল্লাহ। গত দু'দিন থেকে ওর মুভমেন্টটা একদম নরমাল হয়ে গেছে।' বলল জোসেফাইন।

'তাহলে দেখা যাচ্ছে, অসুস্থ হবার পর দেড় মাস লাগল তার নরমাল হতে। খুব কষ্ট পেয়েছে বেচারা এবার পেটের অসুখে। আমার মনে হয়, পয়জনিংটা পানি থেকেই হয়েছিল।'

'আমি তাই মনে করেছি। মেয়েদের যে কনফারেন্সে গিয়েছিলাম, সেখানে ছোট একটা বটলড ওয়াটার নিয়েছিলাম। পানিটার ব্র্যান্ড মনে নেই, আউটডেটেড হতে পারে পানিটা।'

'যাক, আল্লাহ আমাদের সাহায্য করেছেন। আরও খারাপ হয়নি, এটা আল্লাহরই সাহায্য।'

'আলহামদুলিল্লাহ, সবাই সাহায্য করেছেন। হাসপাতালের ডিজি বার বার কেবিনে এসেছেন তার খোঁজ নিতে। আমাদের মদীনার গভর্নরের স্ত্রী দু'দিন এসে দেখে গেছেন হাসপাতালে। তুমি গভর্নর সাহেবকে একটা ধন্যবাদ দিও।'

‘ঠিক আছে।’ বলল আহমদ মুসা।

হঠাৎ আহমদ মুসা ডোনা জোসেফাইন যে হাত দিয়ে আহমদ মুসার হাত ধরেছিল, সে হাত টেনে নিয়ে একটা আঙুলের মাথা আস্তে স্পর্শ করে বলল, ‘আঙুলের মাথা এখনও কিছুটা ফোলা দেখছি। ওষুধ ব্যবহার করছ না?’

হাসল ডোনা জোসেফাইন। বলল, ‘থাক না পবিত্র হেরার, পবিত্র গুহার মধুর স্মৃতিটা।’

আহমদ আবদুল্লাহ সুস্থ হবার পর তাকে নিয়ে আহমদ মুসা ও জোসেফাইন ওমরাহ্ করতে গিয়েছিল। আহমদ আবদুল্লাহকে সাথে নিয়ে দু’জন হেরা গুহায় উঠেছিল। গোটা একটা বেলা তারা গুহায় ছিল। বের হবার সময় পাথরের ওপর একটা পা ফসকে যাওয়ায় হাত দিয়ে দেহের ভারসাম্য রক্ষা করতে গিয়ে একটা পাথরের সাথে ডান হাতের মধ্যমা জোরে লাগায় আঙুলের মাথাটা থেঁতলে যায়।

‘স্মৃতি তো মনে রাখার বিষয়, আঙুলে থাকার ব্যাপার নয়।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ঠিক। তবে আঙুলের ব্যথা যতবার পাই, হেরার প্রশান্তির স্মৃতি তা স্মরণ করিয়ে দেয়, মন তা করে না।’

‘সত্যি জোসেফাইন, খুব সজীব ঈমান তোমার। এবার ওমরাহ্ করতে গিয়ে দেখেছি এক ভিন্ন রকম জোসেফাইনকে। তাওয়াফ, সা’য়ী ও নামাযে তোমার যে ধ্যানমগ্ন রূপ আমি দেখেছি, তেমন অতীতে দেখিনি।’ আহমদ মুসা বলল।

জোসেফাইন ওর হাতটা ওপরে তুলে দু’হাত দিয়ে আহমদ মুসার হাত আঁকড়ে ধরে বলল, ‘যদি তাই বল, তাহলে এটা তোমার ঈমানেরই কৃতিত্ব। তোমার ঈমান আমাকে সঞ্জীবিত করেছে, আমাকে নতুন মানুষ বানিয়েছে। আমি প্রতিদিন মসজিদে নববীতে প্রতি নামাযের পরে আমার প্রিয় রাসূল(সাঃ)-কে উসিলা করে বলি, আল্লাহ যেন তোমাকে ইহজগতে ও পরজগতে এর অফুরান জাযাহ দেন।’ ভারি কণ্ঠ জোসেফাইনের।

আহমদ মুসা জোসেফাইনের দু'হাত দু'হাতে ধরে চুম্বনে চুম্বনে ভরে দিয়ে বলল, 'আমি ভাগ্যবান, আল্লাহর অশেষ দয়ায় তোমাকে পে....।'

ডোনা জোসেফাইন এক হাত দিয়ে আহমদ মুসার মুখ চেপে ধরে বলল, 'আমার সম্পর্কে এভাবে বলো না, মেইলিগুলি, তাতিয়ানা আপারা অনেক অনেক বড় ছিলেন, তাদের মতো বড় জায়গায় উঠার যোগ্য আমি নই। ওরা আমার প্রেরণা, আমার আদর্শ।'

দু'চোখে অশ্রুর ধারা নেমেছিল জোসেফাইনের।

আহমদ মুসা দু'হাত দিয়ে জোসেফাইনের মুখ একটু তুলে ধরে চোখের অশ্রু মুছে দিয়ে বলল, 'বড়কে চিনতে হলে বড়ই হতে হয় জোসেফাইন। বড় হৃদয় না হলে ওদের এভাবে বড় দেখতে পেতে না।'

'তুমি এভাবে বলো না। বড়কে চেনার মতো বড় হওয়া বড়োর সমকক্ষ হওয়া নয়।' বলল জোসেফাইন।

'ধন্যবাদ জোসেফাইন। তোমাকে এমন করে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সেই আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনকেও ধন্যবাদ।'

জোসেফাইন হাসল। বলল, 'তুমি কথার রাজা, যুক্তির রাজা। তুমি আইনজীবী হলেও দুনিয়াজোড়া নাম করতে।'

'আইনজীবী এখনও হতে পারি।' হেসে বলল আহমদ মুসা।

'পার না। ইসলামী বিশ্বের আজকের প্রয়োজনের প্রায়োরিটি তালিকা যদি করা হয়, তাহলে আইন ব্যবসায়ের স্থান হবে নিচে। আমি জানি, প্রায়োরিটিই তোমার সিলেকশন।'

'ধন্যবাদ জোসেফাইন। তোমার চেয়ে বেশি আমাকে কে চিনবে বল?'

বলে ঠোঁটে একটা আঙুলের টোকা দিয়ে বলল, 'তুমি এবার তায়েফ বেড়িয়ে অনেক সুন্দর হয়েছো।'

লাজ-রাঙা হাসি ফুটে উঠল জোসেফাইনের মুখে। আহমদ মুসার উরুতে মুখ গুঁজে বলল, 'সুন্দর যদি হয়েই থাকি, সেটা তায়েফ বেড়িয়ে নয়, তোমাকে পাশে পাবার কারণে। বিয়ের পর এবারের মতো এতটা দীর্ঘ সময় এমন নিরবচ্ছিন্নভাবে তোমাকে আর কখনও পাশে পাইনি।'

সংগে সংগে কথা বলতে পারল না আহমদ মুসা। বেদনাতাড়িত এক কঠিন সত্য কথা জোসেফাইন বলেছে। আবেগে হঠাৎ করেই হয়তো হৃদয়ের একান্ত গোপন একটা কথা সে বলে ফেলেছে। সত্যি সে কষ্ট দিচ্ছে জোসেফাইনকে।

আহমদ মুসা জোসেফাইনের চুলে আঙুল চালিয়ে নাড়তে নাড়তে বলল, 'দূরত্ব তোমাকে কষ্ট দেয়, আমাকেও কষ্ট দেয় জোসেফাইন। এবার আসার সময়ই ভেবেছি, এরপর যেখানে আমি যাব, তুমি আমার সাথী হবে।'

ডোনা জোসেফাইন চট করে আহমদ মুসার উরু থেকে মুখ তুলল। তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'আমার কথা থেকে কষ্ট আবিষ্কার করলে কেন? তোমার সান্নিধ্যে আমি ভালো থাকি, এটা সত্য। তোমার কাছ থেকে দূরে থাকলে শূন্যতার একটা চাপ মনে থাকে, এটাও সত্য, কিন্তু এটা আমার জন্যে দুঃখ নয়। দুঃখ অনুভবের ব্যাপার। দুঃখ অনুভূত না হলে সেটাকে দুঃখ বলা যাবে না। তোমার সান্নিধ্যের শূন্যতা যে চাপ সৃষ্টি করে, সেটা থেকে গৌরব অনুভব করি আমি, বুক ভরা আনন্দ অনুভব করি আমি, দুঃখ নয়। এটা তুমিও জান।'

'জানি জোসেফাইন। জানি বলেই তো দূরে আমি থাকতে পারি। তোমার গৌরব অনুভব, তোমার বুক ভরা আনন্দ অনুভব আমাকে শক্তি যোগায় জোসেফাইন।' বলল আহমদ মুসা।

'তবে ঐভাবে কথা বললে কেন? আহমদ আবদুল্লাহ বড় না হলে কোথাও বেরুতে আমি পারবো না।' জোসেফাইন বলল।

আহমদ আবদুল্লাহকে সোফায় শুইয়ে দিয়ে জোসেফাইনকে সোফায় পাশে তুলে নিয়ে বলল, 'এ বিষয়ের আলোচনা থাক।'

ডোনা জোসেফাইন আহমদ মুসার গলা জড়িয়ে ধরে কাঁধে মুখ গুঁজে বলল, 'তাহলে বল, সিরিত থানারতা, যয়নব, আয়েশারা কবে আসছে। ওদের দেখার জন্যে মন কেমন করছে বুঝাতে পারবো না।'

'ওরাও তোমাকে দেখার জন্যে এমনি পাগল হয়ে আছে। আমি সৌদি সরকারকে বলেছি। তারা দাওয়াতের ব্যবস্থা করছে। এ জিলহজ্বেই ওরা আসবে।'

‘তুমি ওদের বিয়ে দিয়ে এসে ভালো করেছ। না হলে ওরা এভাবে একসাথে আসতে পারতো না।’

‘শুধু আসতে পারতো না নয়, বিয়েও অনেকদিন অনিশ্চিত হয়ে থাকতো। বিশেষ করে যয়নব যোবায়দা ও ফরহাদ ফরিদ উদ্দিন এবং সিরিত থানারতা ও জাবের জহীর উদ্দিনের বিয়ের ক্ষেত্রে দু’পক্ষই উন্মুখ, কিন্তু কে কথা পাড়বে, কোন পক্ষ প্রথম উদ্যোগ নেবে, এটা হচ্ছিল না।’

‘সিরিত থানারতাদের এটা হতে পারে। কিন্তু যয়নবদের ক্ষেত্রে এটা তো হবার কথা নয়। তারা একই বংশ, আবার কাছাকাছিও!’

‘ওদের ক্ষেত্রেই প্রবলেম বেশি ছিল। ফরহাদ ফরিদ উদ্দিন ও যয়নব দু’জনেই চাপা, দশ বছর গেলেও তাদের ইচ্ছার কথা তারা জানাতো না। আর জাবের জহীর উদ্দিন ও দাদী এ বিষয়টা কোনোদিন ভাবেওনি। বিয়ের আগে দাদী ও জাবের দু’জনেই আমাকে বলেছিল, যে বিষয়টা আমাদের কখনও মাথায় আসেনি, সেটাই তুমি প্রায় চোখের নিমেষে করে ফেললে!’

‘তোমার অনেক পুণ্য হবে। তুমি যে কত ঘর এভাবে বেঁধেছ! কিন্তু আমাদের ঘরটা আমিই বেঁধেছি।’

আহমদ মুসা জোসেফাইনের মুখ কাঁধ থেকে সরিয়ে মুখের কাছে এনে তার গালে টোকা দিয়ে বলল, ‘ঘর বুঝি একা বাঁধা যায়!’

‘আমি উদ্যোগ নিয়েছি, তোমাকে সম্মত করেছি। তা না করলে দশ বছর কেন, বিশ বছরেও তোমার দিক থেকে কথা আসতো না।’

বলে জোসেফাইন মুখ গুঁজল আহমদ মুসার বুকে।

আহমদ মুসা দু’হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, ‘তোমার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ জোসেফাইন।’

হঠাৎ ডোনা জোসেফাইন আহমদ মুসার বুক থেকে মুখ তুলে বলল, ‘গতকাল গভর্নর হাউজ থেকে একটা বড় এনভেলাপ দিয়ে গেছে। তুমি তখন বাসায় ছিলে না। তোমাকে দেখানো হয়নি। নিয়ে আসি ওটা।’ বলে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটল নিজের বেডরুমের দিকে।

মিনিটের মধ্যে একটা এনভেলাপ নিয়ে ফিরে এল ডোনা জোসেফাইন। আহমদ মুসা এনভেলাপ খুলে দেখল অনেকগুলো চিঠি। চোখ বুলিয়ে দেখল চিঠির কপিগুলো।

আহমদ মুসার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'জোসেফাইন, আমেরিকায় আমি যাদের হজ্বের জন্যে দাওয়াত করে এসেছিলাম, এগুলো তাদের কাছে প্রেরিত সৌদি সরকারের দাওয়াতের আনুষ্ঠানিক চিঠির কপি।'

ডোনা জোসেফাইনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল খুশিতে। বলল, 'দেখি চিঠিগুলো।'

চিঠিগুলো হাতে নিয়ে এক এক করে পড়তে লাগল, 'মিসেস জেফারসন, জর্জ আব্রাহাম জনসন, মিসেস জনসন, কামাল সুলাইমান, বুমেদিন বিল্লাহ, ডঃ হাইম হাইকেল, মিসেস হাইকেল, মিঃ মরিস মরগ্যান ও মিসেস মরগ্যান।'

শেষ নামটা পড়ার পর ডোনা জোসেফাইনের মুখের আনন্দ-ঔজ্জ্বল্য হঠাৎ দপ করে নিভে গেল। তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'সারাহ জেফারসনের চিঠি কোথায়? সে কি আসবে না?' ডোনা জোসেফাইনের কণ্ঠ শুকনো।

'মনে হয়, সে আসবে না বলে দিয়েছে। তাই চিঠি যায়নি। নিয়ম হলো, যারা আসার কনসেন্ট দেয়, তাদেরকেই আনুষ্ঠানিক ইনভাইটেশন লেটার পাঠানো হয়।' বলল আহমদ মুসা নরম কণ্ঠে সান্ত্বনা দেয়ার মতো করে।

ডোনা জোসেফাইন কোনো কথা বলল না। নীরবে এসে সোফায় আহমদ মুসার পাশে বসল। তার মুখ ভারি। কষ্টের প্রকাশ চোখে-মুখে।

আহমদ মুসা তাকাল ডোনা জোসেফাইনের মুখের দিকে। বলল, 'তুমি ভেব না জোসেফাইন। ব্যাপারটা আসলে কি আমি খোঁজ নেব।'

'খোঁজ নিয়ে কি করবে? দেখবে যে, সে রিগ্রেট করেছে, এজন্যেই ফরমাল চিঠি পায়নি। আসল ব্যাপার হলো, সে আসতে চায় না এবং তুমিও চাও না সে আসুক।' ভারি কণ্ঠ ডোনা জোসেফাইনের।

আহমদ মুসা দু'হাত দিয়ে ডোনা জোসেফাইনকে জড়িয়ে কাছে টেনে নিল। বলল, 'তুমি মন খারাপ করো না জোসেফাইন। সে আসতে চায় না, এর মধ্যেই ওর কল্যাণ আছে।'

ডোনা জোসেফাইনের ঠোঁটে একটা ম্লান হাসি ফুটে উঠল। হাসিটা কান্নার চেয়ে করুণ। বলল, 'ডোনা জোসেফাইন আহমদ মুসার কাঁধে মুখ গুঁজে আছে! এর মধ্যে তুমি কল্যাণ দেখছ, তাই না? তোমরা মেয়েদের মন জান না। আমি একজন মেয়ে। আমিই বুঝতে পারি, অনুভব করতে পারি। তুমি যাকে কল্যাণ বলছ, তা কত কষ্টের, কত মর্মান্তিক ও যাতনার!'

'এই দুর্ভাগ্যজনক বিষয়টা আমাদের ভুলে থাকা উচিত জোসেফাইন। মানুষের যেখানে কিছু করার থাকে না, সেটা আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিতে হয়। এর মধ্যেই শান্তি ও সান্ত্বনা আছে। তুমি ওকে আল্লাহর হাতে ছেড়ে দাও।' বলল আহমদ মুসা।

ডোনা জোসেফাইন আহমদ মুসার কাঁধ থেকে মুখ তুলল। তার দু'চোখ থেকে নেমে এল নীরব অশ্রুর দু'টি ধারা। চোখে তার শূন্য দৃষ্টি। মাথাটা কাত করে আহমদ মুসার কাঁধে হেলান দিয়ে বলল, 'তার ব্যাপারে মানুষের করণীয় সব কি শেষ হয়ে গেছে!' ধীর স্বগতঃ কণ্ঠ জোসেফাইনের। যেন তার নিজের কাছেই নিজের জিজ্ঞাসা ওটা।

কর্ডলেস ল্যান্ড টেলিফোনটা বেজে উঠল।

টেলিফোনটা ড্রইংরুমের ওপাশে।

ডোনা জোসেফাইন উঠে চোখ মুছে দ্রুত টেলিফোন ধরতে গেল।

ওপারের কথা শুনেই 'প্লিজ হোল্ড অন' বলে টেলিফোন রিসিভারটা মুখের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে চাপা কণ্ঠে বলল, 'ওআইসি'র সেক্রেটারি জেনারেল।'

'নিয়ে এস।' বলে আহমদ মুসা সোজা হয়ে সোফায় বসল।

ডোনা জোসেফাইন কর্ডলেস টেলিফোনের রিসিভারটা আহমদ মুসার হাতে দিল।

'থ্যাংকস' বলে রিসিভারটা নিল আহমদ মুসা।

টেলিফোন আহমদ মুসার হাতে দিয়ে ড্রইংরুম থেকে জোসেফাইন বের হয়ে গেল ঘুমানো আহমদ আবদুল্লাহকে কোলে তুলে নিয়ে।

চলল বেডরুমে আহমদ আবদুল্লাহকে শুইয়ে দেবার জন্যে।

দু'মিনিট পরেই জোসেফাইন ফিরে এল। দেখল, আহমদ মুসা কর্ডলেস রিসিভারটা চার্জ স্ট্যান্ডে রেখে সোফায় ফিরে যাচ্ছে।

'শেষ হয়ে গেছে কথা?' পেছন থেকে বলে উঠল জোসেফাইন।

পেছন ফিরে 'হ্যাঁ' বলে একটু দাঁড়িয়ে ডোনা জোসেফাইনের একটা হাত জড়িয়ে ধরে তাকে নিয়ে একটা সোফায় বসল। বলল, 'ওরা আসতে চান, এখনি আসবেন কিনা এ জন্যেই টেলিফোন করেছিলেন।'

'ওরা কারা?' বলল জোসেফাইন।

'ঐ তো যিনি টেলিফোন করেছিলেন, ওআইসি'র সেক্রেটারি জেনারেল ডঃ ওমর আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাকর এবং আরেকজন হলেন ওআইসি'র নিরাপত্তা চীফ জেনারেল তাহির তারিক।' বলল আহমদ মুসা।

'কম্বিনেশনটা সুবিধের মনে হচ্ছে না।' বলল ডোনা জোসেফাইন। ঠোঁটে হাসি।

'সুবিধের নয় কেন?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'সেক্রেটারি জেনারেল ও নিরাপত্তা চীফ যখন একসাথে আসছেন, তখন একটা খারাপ খবর নিশ্চয় তাদের সাথে আসছে।'

বলল জোসেফাইন আহমদ মুসার পাশে বসতে বসতে।

আহমদ মুসা জোসেফাইনের মাথাটা ঠেস দিয়ে শরীরটাকে সোফার ওপর লম্বা করে দিয়ে বলল, 'তুমি রীতিমত গোয়েন্দা হয়ে গেলে দেখছি!'

জোসেফাইন হাতের আঙুল দিয়ে আহমদ মুসার মাথায় জোরে একটা টোকা দিয়ে বলল, 'এই সহজ মন্তব্যের জন্যে গোয়েন্দা হবার দরকার হয় না জনাব। কোনো ডেলিগেশন কিংবা মিশনে ওআইসি'র মতো সংস্থার সেক্রেটারি জেনারেলের সাথে যখন সংস্থার নিরাপত্তা চীফ যুক্ত হন, তখন ধরে নিতে হবে নিশ্চয় সিকিউরিটির সাথে সংশ্লিষ্ট কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে। আলোচনা

যখন করবে, তখন নিশ্চয় সিকিউরিটি বিষয়ে কোন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। আর সিকিউরিটি সমস্যা সব সময় কোন খারাপ মেসেজ নিয়েই আসে।'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'ধন্যবাদ জোসেফাইন। তুমি 'না' বলতে গিয়ে সিচুয়েশনের চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়ে আরও জোরালো প্রমাণ দিলে যে, গোয়েন্দাদের মতো বিশ্লেষণী শক্তি তোমার আছে।'

'থাক, তোমার এসব কথা রাখ। মেহমানরা এসে যাবেন। আমি উঠি।'

বলে জোসেফাইন উঠে দাঁড়াল। ড্রইংরুমের চারদিকে তাকাল। বলল, 'সব ঠিক আছে। তুমি উঠে ঠিক হয়ে নাও।'

'ধন্যবাদ জোসেফাইন' বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

জোসেফাইন টেলিফোনের দিকে একটু এগিয়ে রিসিভার তুলে নিয়ে গেটে রিং করে বলল, 'সিকিউরিটি, দু'জন মেহমান আসছেন, অ্যালার্ট থাক।'

আহমদ মুসার বাড়ির গেটে সৌদি সশস্ত্র বাহিনীর দু'জন সামরিক পুলিশ এবং দু'জন সামরিক গোয়েন্দা সব সময় পাহারায় থাকে। তারা বাড়ির চারধারেও চোখ রাখে। এছাড়া বাড়ি থেকে একটু সামনে বড় রাস্তার মুখে স্থায়ী একটি সামরিক ছাউনিও রয়েছে। আহমদ মুসার বাড়ির দিকে কোন অপরিচিত গাড়ি বা মানুষ যেতে চাইলে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ ও সার্চ করা হয়ে থাকে। আহমদ মুসাকে সৌদি সরকার একজন ক্যাবিনেট মিনিস্টারের মর্যাদা দেয়।

জোসেফাইন সিকিউরিটির কাছে টেলিফোন করার পাঁচ মিনিটের মধ্যে দু'টি সাদা ও একটি লাল রঙের কার এল। সেনা ছাউনির প্রহরীরা আহমদ মুসার বাড়িমুখী রাস্তার মুখে গাড়ি তিনটিকে দাঁড় করাল।

গাড়ি থামতেই পেছনের লাল গাড়ি থেকে একজন নেমে সেনা প্রহরীদের কাছে নিজের গোয়েন্দা অফিসারের আইডি দেখিয়ে বলল, 'আগের দুই গাড়িতে ওআইসি'র সেক্রেটারি জেনারেল ও সিকিউরিটি প্রধান রয়েছেন।'

প্রহরী সেনা অফিসার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গোয়েন্দা অফিসারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তাদের গাড়িতে ফ্ল্যাগ নেই কেন?'

নিয়ম অনুসারে দু'জনের গাড়িতেই ওআইসি ও সৌদি ফ্ল্যাগ থাকার কথা।

‘আহমদ মুসার বাড়িতে তারা যাচ্ছেন, এটা বাইরের লোকদের কাছ থেকে গোপন রাখতে চান। এজন্যে তারা ওআইসি’র নিজস্ব নাম্বারের গাড়িও নেননি।’ বলল গোয়েন্দা অফিসার।

শুনেই সেনা প্রহরী কোথাও ওয়্যারলেস করে সামনের গাড়ি দু’টির নাম্বার দিল।

মিনিটখানেক পরেই ওপ্রান্ত থেকে জবাব এল, ‘ওকে, ক্লিয়ার। গাড়ি ট্রান্সপোর্ট পুল থেকে ওআইসি’র নামে ভাড়া নেয়া হয়েছে।’

ওয়্যারলেস অফ করে সেনা প্রহরী এগোলো সামনের সাদা গাড়ি দু’টির দিকে। ওআইসি’র সেক্রেটারি জেনারেল ডঃ ওমর আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাকর এবং সিকিউরিটি প্রধান জেনারেল তাহির তারিক দু’জনকেই একনজর করে দেখে দু’জনের কাছেই দুঃখ প্রকাশ করল দেরি করিয়ে দেবার জন্যে।

গাড়ি তিনটি আহমদ মুসার বাড়িমুখী রাস্তায় প্রবেশ করে ছুটল তার বাড়ির দিকে। সেনা প্রহরী ঘুরে দাঁড়িয়ে পা বাড়াল ছাউনিতে উঠে আসার জন্যে। ওয়্যারলেসে আবার কথা বলছিল আহমদ মুসার বাড়ির গেটে পাহারায় থাকা মিলিটারি পুলিশের সাথে।

কথা শুরু করেছিল ওআইসি’র সেক্রেটারি জেনারেল ডঃ ওমর আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাকর।

বলছিল সে, ‘জনাব আহমদ মুসা, আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি মদীনাতুন্নাবীকে অনেক বেশি সংগ দিলেন।’

ডঃ ওমর আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাকর মদীনায় জন্মগ্রহণকারী একজন সম্মানী ব্যক্তিত্ব। তিনি মদীনা ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের একজন অধ্যাপক ছিলেন। তিনি সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ বড় বড় পদে দায়িত্ব পালন করেন। সবশেষে তিনি জাতিসংঘে সৌদি আরবের স্থায়ী প্রতিনিধি ছিলেন।

আহমদ মুসা চায়ের কাপ মুখে তুলছিল। কাপটা পিরিচে নামিয়ে রাখল। তার মুখের চেহারা ঈষৎ পাল্টে আবেগঘন হয়ে উঠেছে। বলল সে, ‘না জনাব, এবার একটু বেশি প্রিয় মদীনাতুন্নাবীর সংগ লাভের সৌভাগ্য পেয়ে আমি ধন্য

হয়েছি। দুঃখিত, মন চাইলেও এই সুযোগ আমি সব সময় পাই না।’ আহমদ মুসার কণ্ঠ ঈষৎ ভারি।

আহমদ মুসার আবেগ সবাইকে স্পর্শ করেছে।

সবার চোখে-মুখে একটা আবেগের স্ফূরণ ঘটেছে।

‘কিন্তু আহমদ মুসা, মদীনাতুন্নাবীকে সংগ দেয়া কিংবা তার সংগ লাভের চেয়ে অনেক বড় কাজ আপনি করেন। প্রিয় নবী আল্লাহর রাসূল(সাঃ) নিশ্চয় অনেক খুশি আপনার প্রতি। রাব্বুল আ’লামীনও সন্তুষ্ট আছেন। তাঁর বিপদগ্রস্ত বান্দাহদের সাহায্যে ছুটে যাওয়ার চেয়ে বড় কোন কাজ আছে বলে আমার জানা নেই।’ বলল ডঃ ওমর আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাকর।

‘যদি রাব্বুল আ’লামীন আমার কাজ কবুল করেন, তবেই তো তাঁর সন্তুষ্টি। তাঁর সন্তুষ্টি, আর প্রিয়নবী(সাঃ)-এর খুশি ও শাফায়েতই তো আমাদের পরম পাওয়া।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, রাব্বুল আ’লামীনের সন্তুষ্টি লাভ এবং প্রিয়নবী(সাঃ)-এর খুশির কাজই আপনি করেছেন এবং করছেন।’ বলল ডঃ ওমর আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাকর।

‘অবশ্যই আমরা সবাই সাক্ষী।’ বলেই একটু থেমে জেনারেল তাহির তারিক সংগে সংগেই আবার বলে উঠল, ‘আমি আপনাকে আরেকটা বিষয়ে ধন্যবাদ জানাতে ও সেই সাথে একটা অভিযোগও করতে চাই।’

আহমদ মুসা তাকাল জেনারেল তাহির তারিকের দিকে। ঠোঁটে এক টুকরো মিষ্টি হাসি ফুটে উঠল তার। বলল, ‘ওয়েলকাম জনাব।’

‘আপনাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ যে, আপনি এবার আমাদের বাড়ির পাশ আন্দামান পর্যন্ত গিয়েছিলেন। আর অভিযোগ হলো, বাড়ির পাশে গিয়েও আমাদের বাড়িতে আপনি যাননি।’ বলল জেনারেল তাহির তারিক। তারও মুখে হাসি।

জেনারেল তাহির তারিকের বাড়ি বাংলাদেশে। তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল। একজন বিখ্যাত নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ তিনি। তিনি দীর্ঘদিন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স বিভাগের চীফ ছিলেন।

জাতিসংঘ শান্তি মিশন বিভাগের তিনি সিকিউরিটি চীফ ছিলেন তিন বছর। সর্বশেষে তিনি বাংলাদেশের ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্সের প্রধান ছিলেন। এই দায়িত্বে থাকা অবস্থাতেই তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে রিটায়ার করার পরদিনই তাকে ওআইসি'র নিরাপত্তা বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তার বয়স এখন পঞ্চাশ বছর। কিন্তু দেখলে মনে হয় তিনি চল্লিশ বছরও ক্রস করেননি। মেদহীন ও পেটা লোহার মতো ঋজু শরীর তার। একহারা ফর্সা চেহারায় শক্ত দুই চিবুক ও মাথার সামনের দুই-চারটা পাকা চুল তাকে আরও ব্যক্তিত্বপূর্ণ করে ফেলেছে।

জেনারেল তাহির তারিকের কথায় হেসে ফেলল আহমদ মুসা। বলল, 'জনাবের অভিযোগ অবশ্যই ছোট নয়। সম্মানিত এক বড় ভাইয়ের বাসায় ঢুকে গেট থেকে অ্যাবাউট টার্ন করা অবশ্যই বড় অভিযোগের বিষয়।' বলে আহমদ মুসা থামল।

মুখের হাসি সরে গিয়ে ধীরে ধীরে আহমদ মুসার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, 'জনাব, বাংলাদেশ আমার কাছে বিরাট আগ্রহ ও আকর্ষণের বস্তু। মুসলিম বিশ্বের মানচিত্রের দিকে চাইলেই আমার চোখ আটকে যায় বাংলাদেশের উপর। বাংলাদেশ অনাত্মীয় পরিবেশ ঘেরা এক অরক্ষিত ভাইয়ের মতো। গোটা মুসলিম দুনিয়ায় বাংলাদেশ একমাত্র দেশ, যার কোন মুসলিম প্রতিবেশী দেশ নেই অন্তত তার চারদিকে এক হাজার মাইলের মধ্যে। অথচ মুসলিম দুনিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম জনসংখ্যার দেশ এটি। শুধু তাই নয়, আমি যতদূর জেনেছি, এতটা সংবেদনশীল ও ধর্মভীরু মানুষের দেশ আর কোনটা নয়। এমন দেশের দরজা থেকে চলে এসেছি, সেখানে যাইনি, এটা আমার দুর্ভাগ্য।'

জেনারেল তাহির তারিকের মুখও গম্ভীর হয়ে উঠেছিল। একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'বাংলাদেশকে আপনি এতটা ঘনিষ্ঠভাবে অনুভব করেন আহমদ মুসা! সত্যি বলছি, এমন দৃষ্টিতে বাংলাদেশকে আমি দেখিনি কখনও। সত্যিই তো বাংলাদেশের এক হাজার মাইলের মধ্যে কোন মুসলিম প্রতিবেশী নেই!'

‘আমরা বাইরে থেকে যেটা বুঝি, আপনাদের ভেতর থেকে তা বোঝার কথা নয়। আপনাদের বিষয়টা স্বাভাবিক হয়ে গেছে, অস্বাভাবিকতাটা বাইরে থেকে আমরা দেখতে পাই।’ বলল আহমদ মুসা।

‘বাংলাদেশ এমন অনাত্মীয় পরিবেশের মধ্যে আছে বলেই সেদেশের মানুষ যেমন সচেতন, সংগ্রামী, তেমনি ধর্মভীরুও। বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনীও মনন ও দক্ষতার দিক থেকে মুসলিম বিশ্বের অতুলনীয় এক নিরাপত্তা বাহিনী। সেখানকার রাজনীতিকরাও ইসলামী বিশ্বের, ইসলামী স্বার্থের খুবই ঘনিষ্ঠ।’ বলল ডঃ ওমর আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাকর।

‘ধন্যবাদ জনাব আপনাদের, বাংলাদেশ সম্পর্কে এই সুধারণা প্রকাশের জন্যে।’

বলে একটু থেমে ডঃ ওমর আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাকরের দিকে চেয়ে বলল, ‘জনাব, আমরা এবার প্রসংগে আসতে পারি।’

‘ঠিক, জেনারেল তাহির তারিক। জনাব আহমদ মুসার বেশি সময় নষ্ট করা আমাদের ঠিক হবে না।’ বলল ওআইসি’র সেক্রেটারি জেনারেল ডঃ ওমর আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাকর।

‘আমার সময় নিয়ে ভাববেন না জনাব। ওয়েলকাম। আপনাদের কথা বলুন।’ আহমদ মুসা বলল হাসিমুখে।

গম্ভীর হয়ে উঠল ওআইসি’র সেক্রেটারি জেনারেল ডঃ ওমর আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাকরের মুখ। সে একটু নড়ে-চড়ে উঠে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বসল। বলতে শুরু করল, ‘জনাব আহমদ মুসা আপনি জানেন, ইস্তাম্বুলে ‘ওআইসি ইন্সটিটিউট অব অ্যাডভান্সড রিসার্চ এন্ড টেকনোলজি’ আছে। সংক্ষেপে সেটা ‘ওআইসি আইআরটি (OIC IRT)’ বলে পরিচিত। দৃশ্যত ওটা ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা রিসার্চ উইং। কিন্তু আসলে প্রতিষ্ঠানটি ওআইসি পরিচালিত স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। ওআইসি’র নিরাপত্তা কমিটি মনোনীত তিন সদস্যের একটা কমিটি এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন। প্রতিষ্ঠানটি মানব কল্যাণকর মৌলিক কিছু বিষয়ে গবেষণায় রত। তার মধ্যে একটি হলো, আক্রান্ত দেশের ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি হ্রাস। গণবিধ্বংসী যে সব অস্ত্র প্রচলিত আছে বা প্রচলিত

হতে যাচ্ছে, সে সব অস্ত্রকে আঘাত হানার আগেই নিউট্রাল, নিষ্ক্রিয় বা নিরাপদ-ধ্বংসের উপায় বের করার মহৎ কাজে নিয়োজিত এই প্রতিষ্ঠান। তুরস্ক সরকার ইস্তাম্বুলের 'রোমেলী হিসার' অর্থাৎ রোমেলী দুর্গের পশ্চিম টাওয়ারের নিচে অবস্থিত গোপন আন্ডারগ্রাউন্ড ফ্লোরগুলো ছেড়ে দিয়েছে এই প্রতিষ্ঠানের জন্যে। দুর্গে একটা সেনা গ্যারিসন থাকায় এই গবেষণাগারটি খুবই নিরাপদ। ওআইসি বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করে সেখানে গড়ে তুলেছে অত্যাধুনিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান। কিছু অত্যন্ত প্রতিভাবান বিজ্ঞানী সেখানে কাজ করছে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা বিষয়ে সেখানে গবেষণা চলছে। চাঞ্চল্যকর কিছু সফল আবিষ্কারও হয়েছে।'

থামল ডঃ ওমর আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাকর। গ্লাস তুলে নিয়ে কয়েক ঢোক পানি পান করল। তার মুখ হয়ে উঠেছে আরও গম্ভীর।

কথা বলা শুরু করল আবার, 'গবেষণাগারে সম্প্রতি কিছু রহস্যজনক ঘটনা ঘটেছে। প্রথমে বিজ্ঞানীদের ব্যবহৃত বিশেষ কিছু কম্পিউটারে অজ্ঞাত কেউ সার্চ করার কয়েকটি আলামত পাওয়া যায়। তারপর একদিন একজন সিকিউরিটি অফিসারকে দায়িত্ব পালনের এলাকায় মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। দৃশ্যত সে বিষক্রিয়ায় মারা গেছে বলে দেখা যায়। পরীক্ষায় প্রমাণ হয়, সে সাপের বিষের ক্রিয়ায় মারা গেছে। কিন্তু সর্প দংশনের যে চিহ্ন ছিল, তার গভীরতা, বিস্তার, প্রকৃতি দেখে বিশেষজ্ঞরা একে সন্দেহ করেছে। ওআইসি'র একজন কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স এজেন্টকে সংগে সংগেই তদন্তের জন্যে কাজে লাগানো হয়। তিনি কাজ শুরু করার দু'দিন পর তার মৃতদেহ পাওয়া যায় বসফরাসের পানিতে। পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট বলছে, সে ডুবে মারা গেছে। এরপর তুর্কি প্রধানমন্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে ওআইসি'র তিনজন এবং তুরস্কের দু'জন নিরাপত্তা অফিসার নিয়ে পাঁচ সদস্যের একটা নিরাপত্তা টিম গঠন করা হয় তদন্তের জন্যে। টিম দায়িত্ব গ্রহণের একদিন পর তারা সেদিন রাত নয়টায় একসঙ্গে বের হন ঘটনাস্থল সরেজমিনে দেখার জন্যে। তারা একটা গাড়িতে করেই বের হন। তাদেরই একজন ড্রাইভ করেন গাড়ি। চরম বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, তাদের আর কোন

খোঁজ পাওয়া যায়নি। গাড়িটারও সন্ধান মেলেনি। শুধু আমরা নই, তুর্কি সরকারও ভয়ানক উদ্বিগ্ন।'

আবার থামল ডঃ ওমর আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাকর। তার চোখে-মুখে উদ্বেগ ও হতাশা। শরীরটা পেছন দিকে সোফায় এলিয়ে দিল ডঃ ওমর আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাকর। বলল, 'আমরা খুবই উদ্বিগ্ন। তুর্কি সরকারও ভীষণ উদ্বেগের মধ্যে পড়েছে। সন্দেহ করছি, আমরা বড় কোন ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়েছি। কিন্তু এই সন্দেহ প্রমাণ করার মতো কোন তথ্য আমাদের হাতে নেই। তাহলে ঘটনাগুলো কি সবই কাকতালীয়? এটা হতে পারে না। আর ষড়যন্ত্র যদি ধরে নিতে হয়, তাহলে সেটা বিরাট হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সর্পদংশনের ক্যামোফ্লেজে সিকিউরিটি অফিসার হত্যা, ডুবে মরার ক্যামোফ্লেজে এক গোয়েন্দা হত্যা এবং পাঁচজন শীর্ষস্থানীয় গোয়েন্দাকে একসাথে গায়েব করে ফেলা, এসব কোন বড় ও শক্তিশালী শত্রুর কাজ বলে ধরে নিতে হবে। কে এই শত্রু? আমাদের তো কোন শত্রু নেই। এসব ব্যাপার নিয়ে আমরা দীর্ঘ আলোচনা করেছি। তুর্কি প্রধানমন্ত্রীর সাথে বসেছি। তারাও আমাদের মতোই বিমূঢ়। আমরা অনেক ভেবেছি। শেষে আমি ও তুর্কি প্রধানমন্ত্রী মিলেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি আপনাকে ডাকার।'

বলে মুহূর্তকাল থেমেই বলে উঠল, 'আমরা আর কোন বিকল্প খুঁজে পাইনি। আপনাকে বিষয়টা দেখার দায়িত্ব নিতে হবে। এটা আমাদের সকলের তরফ থেকে অনুরোধ।'

থামল ডঃ ওমর আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাকর। সংগে সংগেই জেনারেল তাহির তারিক বলে উঠল, 'আমাদের আশংকা এবং এ আশংকাকে আমি সত্য বলে মনে করি, ইস্তাম্বুলের রোমেলী দুর্গ ঘিরে বড় ঘটনা ঘটেছে। আপনার সাহায্য দরকার এবং অবিলম্বে।'

আহমদ মুসার কপাল কুঞ্চিত। ভাবছিল সে।

বলল, 'বড় ঘটনার জন্যে বড় কারণ থাকতে হয়। কি কারণ এমন থাকতে পারে বলে আপনারা মনে করেন?'

‘কারণ জানলে তো শত্রুকে কিছুটা চেনা যেত। কিন্তু এত বড় ঘটনার কারণ হতে পারে এমন কোন কিছু খুঁজে আমরা পাচ্ছি না।’ বলল জেনারেল তাহির তারিক।

ধীরে ধীরে আহমদ মুসা সোফা থেকে গা তুলে সোজা হয়ে বসল। বলল, ‘বলতে আপত্তি না থাকলে দয়া করে বলুন, কোনো গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় রিসার্চ ইন্সটিটিউট সম্প্রতি কি সাফল্য লাভ করেছে?’

ডঃ ওমর আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাকর ও জেনারেল তাহির তারিক পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। পরে ডঃ ওমর আবদুল্লাহ বলল, ‘আপনার কাছে কোন কিছুই বলতে আমাদের আপত্তি নেই। আমাদের ইন্সটিটিউটে অনেক বিষয় নিয়ে গবেষণা চলছে। অনেক বিষয়ে আমরা সাফল্য পেয়েছি। সম্প্রতি সবচেয়ে বড় সাফল্য আমাদের অর্জিত হয়েছে। সেটা হচ্ছে, আমরা গণবিধ্বংসী অস্ত্রের হাত থেকে মানুষকে বাঁচানোর নিরাপদ প্রতিরক্ষা কৌশল আবিষ্কারে সাফল্য অর্জন করেছি। আমাদের বিজ্ঞানীরা ‘ম্যাগনেটিক কন্ট্রোল গাইডেড ইন্টিগ্রেটেড ফোটন-নেট (MCGI Foton-Net)’ আবিষ্কার করেছে। এটা কোন অস্ত্র নয়, কিন্তু উড়ে আসা সব রকম অস্ত্রকে এই ফোটন-নেট গিলে ফেলতে পারে এবং তা আকাশের নিরাপদ দূরত্বে বহন করে নিয়ে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে।’

আহমদ মুসার মুখের চেহারা পাল্টে গেছে। আনন্দ-বিস্ময়ের ঢেউ এসে আছড়ে পড়েছে তার চোখে-মুখে। সোজা হয়ে বসেছে সে সোফায়। ডঃ ওমর আবদুল্লাহর কথা শেষ হতেই আহমদ মুসা বলল, ‘এটা কি তত্ত্বগত আবিষ্কার না এর পরীক্ষাও হয়েছে?’

‘সব রকম টেস্ট শেষ হয়েছে। এখন আমাদের ‘সোর্ড’ শতভাগ অ্যাকিউরেট।’ বলল ডঃ ওমর আবদুল্লাহ।

‘‘সোর্ড’ কি? ওটা কি ‘ফোটন-নেট’ এর নাম?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘জ্বি, ‘সোর্ড’ ‘ম্যাগনেটিক কন্ট্রোল গাইডেড ইন্টিগ্রেটেড ফোটন-নেট (MCGI Foton-Net)’-এর ব্যবহারিক নাম। SOWRD (সোর্ড)-এর

এলাবোরেশন হলোঃ Savior Of World Rational Domain (SOWRD)।' বলল জেনারেল তাহির তারিক।

'ব্যবহারিক নামটাতো চমৎকার! তবে আরও সুন্দর হতো যদি Rational-এর জায়গায় 'Human' যোগ করা যেত। অবশ্য ডাকনামটা 'সোর্ড' হতো না, কিংবা কোন ভালো শব্দও হতো না।' আহমদ মুসা বলল।

ডঃ ওমর আবদুল্লাহ সংগে সংগেই বলে উঠল, 'ধন্যবাদ জনাব আহমদ মুসা। আমাদের চিন্তা মিলে গেছে। আমরাও 'Human'-এর কথাই চিন্তা করেছিলাম। তবে ব্যবহারিক নামের সংক্ষিপ্ত উচ্চারণে একটা তাৎপর্য আনার জন্যেই আমরা 'Rational' শব্দ এনেছি। তবে 'Human' ও 'Rational' ভিন্ন শব্দে হলেও একই অর্থ বুঝায়। 'Human' বা মানুষ হলো Rational। পশুর গুণ যেমন Animality বা পশুত্ব, তেমনি মানুষের গুণ Rationality বা মনুষ্যত্ব। Rational বলেই মানুষ প্রকৃতপক্ষে মানুষ। সুতরাং Rational Domain দ্বারা 'Human Domain' বুঝাচ্ছে।'

'ধন্যবাদ, আপনাদের সিদ্ধান্ত ঠিক।'

একটু থামল আহমদ মুসা। সংগে সংগেই আবার বলে উঠল, 'সোর্ড আবিষ্কারের বিষয় কোন পর্যায় পর্যন্ত জানাজানি হয়েছে?'

'ওআইসি'র শীর্ষ দুই ব্যক্তি, ওআইসি নিরাপত্তা কমিটির আমরা তিনজন, তুর্কি প্রধানমন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট পাঁচ জন বিজ্ঞানী ছাড়া আর কেউ জানে না এই আবিষ্কারের কথা।' বলল জেনারেল তাহির তারিক।

'প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক দিক থেকে 'সোর্ড' কি ব্যাপক ব্যবহারের উপযোগী হতে পারে?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'আণবিক বোমার চেয়ে অনেক কম জটিল এবং খরচও তার চেয়ে অনেক কম। ব্যবহারের দিক থেকে অনেক কম ঝুঁকিপূর্ণ। ব্যাপক ব্যবহারের মতো এই প্রযুক্তিটি।'

কথা শেষ করে জেনারেল তাহির তারিক বলে উঠল, 'জনাব আহমদ মুসা, আমরা বোধহয় আলোচনা থেকে অনেকটা দূরে সরে এসেছি।'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আমাদের আলোচনা ঠিক পথেই চলছে জনাব। ভবিষ্যতে নতুন কিছু সামনে আসবে কিনা আমি জানি না, তবে এই মুহূর্তে আমি নিশ্চিত, ‘সোর্ড’-এর আবিষ্কার রোমেলী দুর্গে বিপদ ডেকে এনেছে।’ থামল আহমদ মুসা।

ডঃ ওমর আবদুল্লাহ ও জেনারেল তাহির তারিক দু’জনেই চমকে উঠে প্রায় একসাথে আহমদ মুসার দিকে তাকাল। বিস্মিত চার চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো আহমদ মুসার মুখে। তাদের বিস্ময়ভরা চোখে একটা বিহ্বলতাও ফুটে উঠেছে। হঠাৎ করেই তাদের মনে দানা বেঁধে উঠতে শুরু করেছে নতুন আতংকের একটা অস্থিরতা। মুখে তাদের কোন কথা যোগাল না।

আহমদ মুসাই আবার কথা বলে উঠল, ‘আমার মনে হয়, ‘সোর্ড’-এর তথ্য এমন কোন পক্ষের কাছে পৌঁছেছে, যারা এর ব্যাপারে সাংঘাতিক সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তারা ‘সোর্ড’-এর ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য জানতে চায় কিংবা সব তথ্য জেনে গেছে, এখন অন্য কিছু করতে চায়।’

‘অন্য কিছু বলতে তারা কি করতে চায় ভাবছেন?’ জিজ্ঞাসা জেনারেল তাহির তারিকের। তার কণ্ঠে উদ্বেগ।

চোখ বন্ধ করেছে আহমদ মুসা। ভাবছে সে। অন্যদিকে ডঃ ওমর আবদুল্লাহ ও জেনারেল তাহির তারিক অপার আগ্রহ ও আশংকা নিয়ে তাকিয়ে আছে আহমদ মুসার দিকে।

একসময় আহমদ মুসা চোখ খুলল। সোজা হয়ে বসল সে। বলল, ‘অনেক কিছুই করতে পারে। ‘সোর্ড’-এর প্ল্যান চুরি, ফাইল চুরি এবং সোর্ড-এর ল্যাবরেটরী প্রোটোটাইপ চুরি থেকে শুরু করে বিজ্ঞানীদের হত্যা, কিডন্যাপ ইত্যাদি সব ধরনের ঘটনাই ঘটতে পারে।’ থামল আহমদ মুসা।

ডঃ ওমর আবদুল্লাহ এবং জেনারেল তাহির তারিকের মুখ-চোখের আলো যেন দপ করে নিভে গেল। আতংকের মূর্তিমান অন্ধকার নামল তাদের চোখে-মুখে। কিছুক্ষণ তারা কথা বলতেই পারল না।

ওদের নীরবতা ভাঙলে ডঃ ওমর আবদুল্লাহ বলল, ‘ঘটনা এতদূর গড়িয়েছে, সর্বনাশ! যে কোনো মুহূর্তেই একটা কিছু ঘটে যেতে পারে। জনাব

আহমদ মুসা, আপনি দয়া করে তাড়াতাড়ি চলুন ইস্তাম্বুলে। আপনি শুধু শুনেই ঘটনা ধরে ফেলেছেন। ইনশাআল্লাহ, ওখানে গেলে সংকটটাও আপনি দূর করতে পারবেন।' উদ্বেগ-আতংকে কম্পিত কণ্ঠ ডঃ ওমর আবদুল্লাহর।

'জনাব, এখন একদিন দেরি করতেও আমাদের ভয় হচ্ছে। জনাব ওমর আবদুল্লাহ আমাদের কথা বলেছেন। আপনি আমাদের অনুরোধ রাখুন।' বলল জেনারেক তাহির তারিক। তার কণ্ঠেও উদ্বেগ।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'আপনারা এখন বাঁধা দিলেও আমি ইস্তাম্বুল যাব, বসফরাসে রোমেলী দুর্গে যাব।'

ডঃ ওমর আবদুল্লাহ ও জেনারেল তাহির তারিকের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে উঠল দু'জনেই। তারা উঠে এসে জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে। বলল ওমর আবদুল্লাহ, 'আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘ সুস্থ জীবন দান করুন। আল্লাহ জ্ঞান, বুদ্ধি, শক্তি আপনার বাড়িয়ে দিন।' আবেগে ভারি শোনাল ডঃ ওমর আবদুল্লাহর কণ্ঠস্বর।

দু'জনেই ফিরে গিয়ে বসল তাদের আসনে।

আহমদ মুসাও বসল।

বসেই ডঃ ওমর আবদুল্লাহ পকেট থেকে দু'টি চিঠি বের করে আহমদ মুসার দিকে এগিয়ে দিল। বলল, 'একটা ম্যাডাম জোসেফাইনের জন্যে। তাকে তুরস্কের ম্যাডাম প্রেসিডেন্ট তার পক্ষের স্টেট গেস্ট হিসেবে তুরস্ক সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। অন্য চিঠিতে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট তার পক্ষে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে আপনাকে আমন্ত্রণ করেছেন। এ আমন্ত্রণ আপনারা গ্রহণ করলে তারা সম্মানিত বোধ করবেন।'

আহমদ মুসা চিঠি দু'টি গ্রহণ করে আবার তা ডঃ ওমর আবদুল্লাহর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'দুঃখিত, আমরা এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারছি না।'

অন্ধকার নামল ডঃ ওমর আবদুল্লাহর মুখে। বলল, 'কিন্তু এই তো বললেন, আপনি যাচ্ছেন।'

'যাব, কিন্তু রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে যাব, এ কথা আমি বলিনি।' আহমদ মুসা বলল।

‘রাষ্ট্রীয় অতিথি করলে, তাতে আপনি আপত্তি করবেন কেন?’ বলল ডঃ ওমর আবদুল্লাহ।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আমরা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে তুরস্কে যেতে চাই না। রাষ্ট্রীয় অতিথি হলে এটাই ঘটবে।’

‘বুঝেছি জনাব আহমদ মুসা। আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার সিদ্ধান্তই ঠিক।’ বলল ডঃ ওমর আবদুল্লাহ। তার মুখ এবার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

‘তাহলে কিভাবে যাবেন, কখন যাবেন আমরা জানলে ব্যবস্থা নিতে পারি জনাব।’ বলল জেনারেল তাহির তারিক।

‘সেটাও আমার ওপর ছেড়ে দিন। আপনাদের কোন ব্যবস্থা করতে হবে না। এখন দয়া করে যদি সম্ভব হয়, তাহলে রোমেলী দুর্গের ভেতরের এবং দুর্গের ‘ওআইসি আইআরটি’র ভেতরের একটা করে মানচিত্র, পাঁচ বিজ্ঞানীর ছবি ও তাদের বিস্তারিত বায়োডাটা আজকেই আমাকে দিন।’ বলল আহমদ মুসা।

ওআইসি’র সেক্রেটারি জেনারেল তাকাল ওআইসি’র সিকিউরিটি প্রধান জেনারেল তাহির তারিকের দিকে।

জেনারেল তাহির তারিক সংগে সংগেই বলে উঠল, ‘আল্লাহর হাজার শোকর, আপনি কাজ শুরু করেছেন। আমি নিজেই এগুলো আপনাকে পৌঁছে দিয়ে যাব জনাব।’

জেনারেল তাহির তারিক থামতেই ডঃ ওমর আবদুল্লাহ বলে উঠল, ‘জনাব আহমদ মুসা, আপনাদের যাওয়ার ব্যাপারে তাহলে আমাদের কিছু করণীয় আছে কিনা?’

‘জনাব, আমি যখন যেটা প্রয়োজন বোধ করব, তখনই তা জানাব।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আলহামদুলিল্লাহ। ঠিক আছে। আমরা জেনারেল তারিককে আপনাকে সহযোগিতা করার জন্যে মনোনীত করেছি। তিনি জানালেই আমরা সব ব্যবস্থা করে দেব। তাছাড়া আমাদের তো বটেই, তুর্কি প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের দরজাও আপনার জন্যে চব্বিশ ঘণ্টা খোলা থাকবে।’

‘ধন্যবাদ জনাব।’ বলল আহমদ মুসা।

'ধন্যবাদ। আমরা এখন উঠতে চাই জনাব আহমদ মুসা। আমাদের জন্যে আপনার আর কোন কথা?'

ডঃ ওমর আবদুল্লাহ বলল।

আহমদ মুসা একটু ভেবে বলল, 'আমি রোমেলী দুর্গে পৌঁছা পর্যন্ত বাইরের সকল লোকের আইআরটি সেন্টারে প্রবেশ বন্ধ থাকবে, বিজ্ঞানীরা আইআরটি সেন্টারের বাইরে বেরুতেঁ পারবেন না এবং আমি সেখানে যাচ্ছি কিংবা নতুন তদন্ত হচ্ছে, এমন কোন কথা সেন্টারের কাউকে জানানো যাবে না।'

'আপনার পরামর্শ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হবে জনাব।' বলল জেনারেল তাহির তারিক।

বিদায় চেয়ে উঠে দাঁড়াল ডঃ ওমর আবদুল্লাহ। উঠে দাঁড়াল জেনারেল তাহির তারিকও।

তাদের সাথে আহমদ মুসাও উঠে দাঁড়াল।

বিদায়ী হ্যান্ডশেকের হাত বাড়িয়ে ডঃ ওমর আবদুল্লাহ বলল, 'জনাব আহমদ মুসা, আপনি ওআইসি'র সবচেয়ে স্পর্শকাতর এবং সবচেয়ে বিপদগ্রস্ত একটা প্রজেক্টের প্রতি যে এহসান করলেন, তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি এহসান আল্লাহ আপনার প্রতি, আপনার পরিবারবর্গের প্রতি করুন।' আবেগে ভারি কণ্ঠ ডঃ ওমর আবদুল্লাহর।

'আল্লাহ আমাদের সকলের সহায় হোন। আমার কোন এহসান নেই, আমি কোন এহসান করিনি। আল্লাহ আমাকে যে এহসান করেছেন, তারই কিছুটা আমি বণ্টন করি মাত্র তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে।' বলল আহমদ মুসা। আহমদ মুসার কণ্ঠও ভারি।

ফিরে দাঁড়িয়ে চলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছিল ওরা দু'জন। আহমদ মুসা ডঃ ওমর আবদুল্লাহকে সম্বোধন করে বলল, 'চিঠি তুর্কি প্রেসিডেন্টের দপ্তরে ফেরত যাওয়া দরকার, যাতে ঐ দপ্তর জানতে পারে যে, আমি আমন্ত্রণ গ্রহণ করিনি।'

ডঃ ওমর আবদুল্লাহ মুখ ফিরিয়ে বলল, 'ধন্যবাদ জনাব আহমদ মুসা। তাই হবে। আমি সব বুঝতে পেরেছি।'

ডঃ ওমর আবদুল্লাহ থামতেই জেনারেল তাহির তারিক বলল, 'যে আল্লাহ আপনাকে এই অসীম দূরদৃষ্টি দিয়েছেন, আমি প্রাণভরে তাঁর শুকরিয়া আদায় করছি। আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘ হায়াতে কামেলা দান করুন।'

'আলহামদুলিল্লাহ।' বলল আহমদ মুসা।

ওরা দু'জন আবার ঘুরে দাঁড়াল। চলতে শুরু করল দরজার দিকে।

ওদের পিছে পিছে হাঁটছে আহমদ মুসা। গাড়ি পর্যন্ত ওদের পৌঁছে দিল।

'আমার কোন সন্দেহ নেই, তোমার এই ইস্তাম্বুল অ্যাসাইনমেন্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি দেখতে পাচ্ছি, বসফরাসের এই আহবানের মধ্যে তোমার জন্যে এক কঠিন দায়িত্বের হাতছানি আছে। তুমি সাংঘাতিক ব্যস্ত থাকবে। আমি ও আহমদ আবদুল্লাহর উপস্থিতি কি তোমাকে অসুবিধায় ফেলবে না?' বলল ডোনা জোসেফাইন।

আহমদ মুসা ও জোসেফাইন সোফায় পাশাপাশি বসেছিল।

আহমদ মুসা জোসেফাইনের একটা হাত হাতে তুলে নিয়ে বলল, 'তোমার উপস্থিতি এক শূন্যতা থেকে আমাকে বাঁচাবে। আমার প্রেরণা, আমার শক্তি বাড়বে জোসেফাইন।'

জোসেফাইন আহমদ মুসার হাতটা দু'হাতে ধরে তুলে নিয়ে, তাতে মুখ গুঁজে বলল, 'আমি জানি। কিন্তু ভাবছি আহমদ আবদুল্লাহর কথা। ভিন্ন আবহাওয়া ও অপরিচিত পরিবেশে সে কেমন থাকবে?'

'ভালো থাকবে ইনশাআল্লাহ। বসফরাসের পশ্চিম তীরে, ইস্তাম্বুলের ইউরোপীয় অংশে, গোল্ডেন হর্নের পূর্বকূলে যেখানে বসফরাস, গোল্ডেন হর্ন ও মর্মর সাগর একসাথে আছড়ে পড়েছে, এমন জায়গায় তুর্কি সরকারের ভিভিআইপি রাষ্ট্রীয় অতিথিদের একটা রিসোর্ট এলাকা আছে। সেখানে সবচেয়ে সুন্দর একটা কটেজ তুমি পাচ্ছ। দেখবে, খুব ভালো থাকবে আহমদ আবদুল্লাহ।' বলল আহমদ মুসা।

‘তুমি যে বর্ণনা দিলে, তাতেই বুকটা আমার তোলপাড় করে উঠেছে। বুঝতে পারছি কেমন লাগবে জায়গাটা। ধন্যবাদ তোমাকে। কিন্তু তুমি তো বললে রাষ্ট্রীয় আতিথ্য তুমি প্রত্যাখ্যান করেছো, তাহলে রাষ্ট্রীয় অতিথিদের রিসোর্ট কি করে আবার এল?’ বলল জোসেফাইন।

‘আমার ও তোমার নামে আসা রাষ্ট্রীয় আতিথ্যের চিঠি প্রত্যাখ্যান করেছি, রাষ্ট্রীয় আতিথ্য প্রত্যাখ্যান করিনি। ভিন্ন নামে ফরাসি রয়্যাল সদস্যের ভিন্ন এক পরিচয়ে তুমি রাষ্ট্রীয় অতিথি হয়েছ। আর আমি যাচ্ছি ট্যুরিস্ট হিসেবে। আমি হবো অলিখিত রাষ্ট্রীয় অতিথি। আমরা যাব একই প্লেনে, কিন্তু ডিপারচার লাউঞ্জ থেকে তুমি বেরুবে ভিভিআইপি গেট দিয়ে, আর আমি বেরুবো সাধারণ বিজনেস ক্লাসের গেট দিয়ে।’ আহমদ মুসা বলল।

জোসেফাইন সোজা হয়ে বসল। বলল, ‘তারপর?’

‘তারপর তুরস্কের ম্যাডাম প্রেসিডেন্টের পার্সোনাল সেক্রেটারি মিস লতিফা আরবাকান তোমাকে রাষ্ট্রীয় কায়দায় রিসিভ করে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে নিয়ে যাবে। সেখানে তুমি ম্যাডাম প্রেসিডেন্টের সাথে ডিনার করবে, বিশ্রাম নেবে। পরে তোমাকে নিয়ে যাওয়া হবে ‘গোল্ড রিসোর্ট’-এ।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তুমি তখন সেখানে থাকবে না?’ বলল জোসেফাইন শুকনো কণ্ঠে।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আমি তখন অনেকখানি দূরে ইস্তাম্বুলের পূর্বাংশে রোমেলী দুর্গে অথবা দুর্গসংলগ্ন কোন এক বাড়িতে বা ফ্ল্যাটে থাকব।’

জোসেফাইনের মুখে অন্ধকার নেমে এল। সে আস্তে আস্তে নিজের মাথা আহমদ মুসার কাঁধে ন্যস্ত করল। বলল, ‘বুঝতে পেরেছি। কিন্তু তুমি আছ, অথচ নেই, এটা আমি সহ্য করব কি করে? সবই যে শূন্য হয়ে যাবে?’

আহমদ মুসা জোসেফাইনকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, ‘এ অসুবিধাটুকু তোমাকে মানিয়ে নিতে হবে। তুমি তো সেখানে একা হয়ে যাচ্ছ না। এখান থেকে আয়া ও পরিচারিকা দু’জনকে নিচ্ছ। তোমার সাথে সর্বক্ষণ ম্যাডাম প্রেসিডেন্টের পিএস মিস লতিফা আরবাকান থাকবেন। ইংরেজি, ফরাসি ও আরবিতে ভীষণ ফ্লুয়েন্ট চৌকস মেয়েটিকে দেখবে তোমার খুবই ভালো লাগবে। নিরাপত্তার বিষয়টা ঠিক রেখে আমি যতটা পারি সেখানে যাবার চেষ্টা করব।’

‘ধন্যবাদ তোমাকে।’ বলে কোল থেকে উঠে বসল জোসেফাইন। একটা হাত দিয়ে আহমদ মুসার গলা পেঁচিয়ে সোফায় গা এলিয়ে বলল, ‘আমরা কবে যাচ্ছি?’

আহমদ মুসা উত্তর দেবার জন্যে মুখ খুলেছিল। সেই সময়েই টেলিফোন বেজে উঠল। থেমে গেল আহমদ মুসা।

জোসেফাইন দ্রুত উঠে গিয়ে টেলিফোন ধরল। আহমদ মুসার টেলিফোন।

কর্ডলেস রিসিভারটি এনে আহমদ মুসার হাতে দিল জোসেফাইন। ফিস ফিস করে বলল, ‘জনাব ওমর আবদুল্লাহর টেলিফোন।’

আহমদ মুসা টেলিফোন তুলে সালাম দিতেই ওপার থেকে সালাম গ্রহণ করে বলে উঠল ওআইসি’র সেক্রেটারি জেনারেল ওমর আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাকর, ‘দুঃসংবাদ আহমদ মুসা, রোমেলী দুর্গের আমাদের রিসার্চ ইঞ্জিনিয়ার ইন্তেকাল করেছে।’

‘ইন্তেকাল?’ প্রশ্ন আহমদ মুসার।

‘ডাক্তাররা তাই বলেছেন। হার্ট ফেইলিওর।’ বলল ওমর আবদুল্লাহ ওপার থেকে।

‘বয়স কত হবে?’

‘চল্লিশ।’

‘কি দায়িত্ব ছিল তার?’

‘সে একজন লাইট মেটাল ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার। কনসেপ্ট অনুসারে যারা সোর্ড-এর বডি ডিজাইন ও নির্মাণ করেছে, তাদের একজন সে।’ বলল ডঃ ওমর আবদুল্লাহ।

‘সোর্ড সম্পর্কে সে কি জানত?’

‘জানত না। কনসেপ্ট-এর দিক দিয়ে সে এতটুকু জানত যে, কণাবিজ্ঞানের অত্যন্ত তীব্র গতির কোন কণা পরীক্ষণের যন্ত্র তারা তৈরি করছে। যন্ত্রের তিনটা অংশ। প্রত্যেকটা অংশকে সে একটা যন্ত্র হিসেবে জানত। কিন্তু

তিনটা মিলে যে একটা যন্ত্র সেটা জানত না। যন্ত্রের তিন অংশের একীকরণের কাজ বিজ্ঞানীরা নিজে করেছেন।'

'আলহামদুলিল্লাহ।' স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল আহমদ মুসা।

'জনাব আহমদ মুসা, তার সম্পর্কে এতকিছু জিজ্ঞেস করছেন কেন? আপনি কিছু সন্দেহ করছেন?' বলল ডঃ ওমর আবদুল্লাহ।

'সন্দেহ করাই উচিত। তবে আরও বিস্তারিত জানার পর নিশ্চিত বলা যাবে।'

'ভয়ংকর কথা বলেছেন আহমদ মুসা। সন্দেহ সত্য হলে তো.....।' কথা শেষ করতে পারলো না ডঃ ওমর আবদুল্লাহ। শুকনো গলায় তার কথা যেন আটকে গেল।

'জনাব, আপনি জেনারেল তাহির তারিককে বলুন, আজই আমি ইস্তাম্বুল যাব। ব্যবস্থা যেন করেন।' বলল আহমদ মুসা শান্ত শক্ত কণ্ঠে।

'ধন্যবাদ জনাব আহমদ মুসা। আপনার কাছে আমরা এটাই চাচ্ছি। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। ধরে নিন সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আপনারা প্রস্তুত হোন।' বলল ডঃ ওমর আবদুল্লাহ।

'ধন্যবাদ জনাব।' বলল আহমদ মুসা।

'তাহলে সব ঠিক হয়ে গেল। এখনকার মতো এতটুকুই।'

সালাম দিয়ে টেলিফোন রেখে দিল ডঃ ওমর আবদুল্লাহ।

আহমদ মুসাও টেলিফোন রেখে দিল।

পাশে দাঁড়িয়েছিল জোসেফাইন।

আহমদ মুসা তাকাল জোসেফাইনের দিকে। আহমদ মুসার চোখে একটু বিব্রত দৃষ্টি। জোসেফাইনের সাথে পরামর্শ ছাড়াই ইস্তাম্বুল যাত্রার তারিখ আজ স্থির করে ফেলেছে। সব গুছিয়ে নেয়া কঠিন হবে।

আহমদ মুসার চোখের ভাষা, মুখের ভাব, মনের কথা জোসেফাইনের চেয়ে বেশি কে আর বুঝতে পারবে!

জোসেফাইন ধীরে ধীরে আহমদ মুসার আরও কাছে এগিয়ে এসে কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, 'ভেব না তুমি, দেখবে আমি সব ঠিক করে নেব। মূল গোছ-গোছটা করাই আছে। তুমি ঠিকই সিদ্ধান্ত নিয়েছ।'

জোসেফাইন আরও ক্লোজ হলো আহমদ মুসার। কাঁধে রাখা হাতটা দিয়ে গলা পেঁচিয়ে ধরে বলল, 'ইন্তেকাল করেছেন যিনি, তিনি কি নিহত হয়েছেন বলে তুমি সত্যিই মনে কর?'

'এখনও এটাই আমার বিশ্বাস।' আহমদ মুসা বলল।

'দেখা যাচ্ছে, রোমেলী দুর্গে এ পর্যন্ত যতগুলো মৃত্যুর ঘটনা ঘটলো, সবই অপঘাতে, কিন্তু সবগুলোই হত্যাকাণ্ড। তাহলে তো দাঁড়াচ্ছে, প্রতিপক্ষ অত্যন্ত চালাক। ধরা-ছোঁয়া, এমনকি সন্দেহের সম্পূর্ণ বাইরে থেকে সামনে এগোতে চাচ্ছে। এ হবে এক কঠিন শত্রু।'

'ঠিক বলেছ জোসেফাইন। তবে আমার কিন্তু খুব আনন্দ লাগছে। বসফরাস আমাকে ডাকছে। ইস্তাম্বুলের কয়েক হাজার বছরের ইতিহাসকে জীবন্ত দেখতে পাচ্ছি আমার সামনে। অদৃশ্য শত্রু কে, কেমন জানি না। কিন্তু ইস্তাম্বুলের হয়ে লড়াইয়ে যেতে খুবই ভালো লাগছে আমার।' বলল আহমদ মুসা।

'না, তুমি ইস্তাম্বুলের হয়ে লড়াইয়ে যাচ্ছ না। তুমি ইস্তাম্বুলে লড়াইয়ে যাচ্ছ 'সোর্ড'-এর পক্ষে—মানে মানুষের 'Rational Domain'-এর হয়ে।' বলল জোসেফাইন।

আহমদ মুসা জোসেফাইনকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরল। বলল, 'তুমি আমার 'বন্ধু' এবং 'গাইড'। এখন ফিলোসফারও।'

'না, এগুলো আমার উপযুক্ত পরিচয় নয়।' বলল জোসেফাইন।

'উপযুক্ত পরিচয় তাহলে কি?' আহমদ মুসা বলল।

'আমি স্ত্রী, আমি সহধর্মিণী।' বলল জোসেফাইন।

'সে তো আছই। তার ওপর তুমি 'ফ্রেন্ড, ফিলোসফার এন্ড গাইড'।' আহমদ মুসা বলল।

'দেখ, ছোট বিশেষণ বড় বিশেষণকে বিশেষিত করতে পারে না, ছোট গুণ পরে এসে বড় গুণের মাথায় বসতে পারে না। 'স্ত্রী' নারীর জন্যে হিমালয়ের

মতো সর্বোচ্চ এক পরিচয়। অন্য কোন ‘বিশেষণ’, অন্য কোন ‘গুণ’কে ভিন্নভাবে এনে এর পাশে দাঁড় করানো এর অমর্যাদা করা। ‘স্বামী’ ও ‘স্ত্রী’ উভয় পরিচয়ই পূর্ণাংগ। স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের জন্যে যা উচিত, যা প্রয়োজন তার সবকিছুর সমাহার এই দুই পরিচয়ে।’ বলল জোসেফাইন।

আহমদ মুসা জোসেফাইনের মুখ নিজের মুখের কাছে এগিয়ে আনতে আনতে বলল, ‘ভারি, খুব ভারি কথা বলেছ জোসেফাইন, তার ওপর এখন একটা মিষ্টি প্রলেপ প্রয়োজন।’

আহমদ মুসার মুখ এগিয়ে যাচ্ছিল জোসেফাইনের মুখের দিকে।

জোসেফাইন দুই মুখের মাঝখানে তর্জনী দাঁড় করিয়ে আহমদ মুসার বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে খসিয়ে নিয়ে ছুটে পালাতে পালাতে বলল, ‘আমার এখন অনেক কাজ। তোমার লাগেজ আমি গুছিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু তোমার ইমারজেন্সী হ্যান্ডব্যাগ তোমাকেই গুছিয়ে নিতে হবে।’

‘ধন্যবাদ জোসেফাইন।’ বলে আহমদ মুসাও উঠে দাঁড়াল।

# ৩

অফিসের টেবিলে বসে কয়েকদিনের হিসেব-নিকেশ করছিল আহমদ মুসা।

তার অফিসটা রোমেলী দুর্গের পশ্চিম টাওয়ারের আন্ডারগ্রাউন্ডে। সেখানে তিনটি গোপন ফ্লোর রয়েছে। টপ ফ্লোর, সেকেন্ড ফ্লোর এবং বটম ফ্লোর। এই তিনটি ফ্লোর নিয়েই ওআইসি'র 'আইআরটি' অর্থাৎ 'ইন্সটিটিউট অব অ্যাডভান্সড রিসার্চ এন্ড টেকনোলজি'র অফিস। ফ্লোরগুলো টপ থেকে বটমের দিকে ক্রমশ বড় হয়েছে। দুর্গের পশ্চিম টাওয়ারটি দুর্গ-অঞ্চলের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের মাথায়। টাওয়ার-ফ্লোরের দশ ফিট নিচে টপ ফ্লোর। এই ফ্লোরের আয়তন সাড়ে তিন হাজার ঘন ফিটের মতো। এর নিচের সেকেন্ড ফ্লোরটির আয়তন টপ ফ্লোরের দ্বিগুণেরও বেশি অর্থাৎ প্রায় আট হাজার ঘন ফিট। কিন্তু বটম ফ্লোরটি বলা যায় একটা মাঠের মতো। আয়তন বিশ হাজার ঘন ফুট। এই তিনটি ফ্লোরের টপ ও সেকেন্ড ফ্লোর নির্মিত হয়েছে ১৪৫২ খৃস্টাব্দে। দুর্গটি নির্মিত হয় সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদের দ্বারা। আর বিশ হাজার ঘন ফিটের বটম ফ্লোরটি নির্মাণ করেছে ওআইসি'র ইঞ্জিনিয়াররা। তিন ফ্লোরের টপ ফ্লোরে বিজ্ঞানীদের পার্সোনাল ফ্ল্যাট। সেকেন্ড ফ্লোরটি রিসার্চ সেন্টার এবং লাইব্রেরী। আর বটম ফ্লোরটি ল্যাবরেটরী ও টেস্ট সেন্টার।

বিজ্ঞানীদের সাথে আহমদ মুসার অফিসও সেকেন্ড ফ্লোরে।

ফ্লোরটির ঠিক মাঝখানে লাইব্রেরী। বৃত্তাকার লাইব্রেরীর চারদিকের বহির্দেয়ালে রয়েছে ছয়টি দরজা। এই ছয়টি দরজা ছয়টি রিসার্চ কমপ্লেক্সে ঢোকার পথ। একেকটি কমপ্লেক্সে বিজ্ঞানীরা এককভাবে বা যৌথভাবে কাজ করেন। এই ফ্লোরে ছয়টি রিসার্চ কমপ্লেক্স ছাড়াও প্রশাসনিক ও নিরাপত্তা কক্ষ রয়েছে।

ওআইসি'র এই 'আইআরটি'তে আহমদ মুসা রেসিডেন্ট ডাইরেক্টর (আরডি)-এর চাকরি নিয়ে এসেছে। জেনারেল তাহির তারিকের নেতৃত্বে তিন সদস্যের যে সেল এই ইন্সটিটিউট পরিচালনা করে, তাদের কেউ এখানে থাকেন না। ডাইরেক্টর ম্যানেজমেন্ট (ডিএম) একজন আছেন। তিনি প্রশাসনিক বিষয়গুলো দেখেন। আর প্রজেক্টের প্রধান বিজ্ঞানী 'চ্যান্সেলর অব আইআরটি' হিসেবে সমগ্র রিসার্চ উইং পরিচালনা করেন। আহমদ মুসার নতুন চাকরিতে তার নতুন নাম হয়েছে খালেদ খাকান। তার পরিচয়, মধ্য এশিয়া অঞ্চলের বিজ্ঞানের একজন অধ্যাপক।

আহমদ মুসা বিজ্ঞানীদের সাথে থাকার জন্যে টপ ফ্লোরে একটা ফ্ল্যাট পেয়েছে। অবশ্য আহমদ মুসা রোমেলী দুর্গের উত্তর পাশে আরও উঁচু একটা পাহাড়ে বাসা ভাড়া নিয়েছে। ইচ্ছেমতো দু'জায়গাতেই সে থাকে।

কাজে যোগ দেয়ার পর বেশ কয়দিন পার হয়ে গেছে আহমদ মুসার।

এই কয়েকদিনের হিসেব একসাথে তার সামনে এসেছে মালার মতো সারিবদ্ধভাবে সাজানো পুঁথির আকারে।

আহমদ মুসা নিশ্চিত হয়েছে যে, বাইরের কেউ আইআরটি'র প্রশাসনিক বিভাগের কম্পিউটার নেটওয়ার্কের একটা কম্পিউটারে 'প্রজেক্ট রেকর্ড' ফাইলের আইডি ও পাসওয়ার্ড খুঁজেছে। কম্পিউটারের প্রসিডিংস মনিটরে দেখা গেছে, অজ্ঞাত সেই লোকটি দশ জোড়া আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করেছে। কম্পিউটারের ইমেজ আইতে লোকটির ছবি আসার কথা, কিন্তু আসেনি। অতি চালাক লোকটি মুখোশ পরা ছিল। কিন্তু কম্পিউটারের ক্যারেক্টার মনিটর থেকে জানা গেছে, লোকটি তার কম্পিউটার ব্যবহারের গোটা সময়ের সত্তর ভাগ বাম হাত ব্যবহার করেছে। তার অর্থ, লোকটি বাঁ-হাতি। খুশি হয়েছে আহমদ মুসা। এসব তথ্য কম মূল্যবান নয়।

কার্যত সর্পদংশনে মারা যাওয়া লোকটির ব্যাপারেও আহমদ মুসা বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেছে। আহমদ মুসা লোকটির মেডিক্যাল রিপোর্ট পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়েছে, তার দেহে যে বিষ পাওয়া গেছে, তা নিঃসন্দেহে সাপের বিষ। কিন্তু আহত স্থানটি সর্পদংশনের ক্ষত নয়। এটা সন্দেহ নয়, সত্য।

তবে ঐ ক্ষত সৃষ্টি করেই তার মাধ্যমে রক্তে সাপের বিষ ঢুকানো হয়েছে। এক্ষেত্রে যে প্রশ্নটি আহমদ মুসাকে উদ্বিগ্ন করেছে, সেটা হলো তার দেহে এই ক্ষত সৃষ্টিটি কে করল? কোন অপরিচিত লোকের পক্ষে এতো ঘনিষ্ঠ হয়ে ঐ ধরনের আঘাত করার সুযোগ নেয়া সম্ভব নয়। দুর্গের সেনা-নিরাপত্তা ডিঙানোর প্রশ্ন তো আছেই। এ থেকে এটাই স্বতঃসিদ্ধ হয়ে ওঠে যে, আঘাতকারী লোকটি নিহত নিরাপত্তা গোয়েন্দার খুবই পরিচিত বা আস্থাভাজন এবং সেনা-নিরাপ ত্তা কর্মীদেরও পরিচিত কেউ। তাহলে সে কি ভেতরের না বাইরের পরিচিত কেউ?

তারপর তদন্তের জন্যে নিযুক্ত একজন নিরাপত্তা গোয়েন্দার বসফরাসে ডুবে মরার ঘটনাটিও আহমদ মুসা অনুসন্ধান করেছে। তার পোস্টমর্টেম রিপোর্ট দেখেছে আহমদ মুসা। ওতে সন্দেহের মতো কিছুই সে দেখেনি। একজন স্রেফ ডুবে মরেছে। ঐ দুই নিরাপত্তা গোয়েন্দা যে ফ্ল্যাট দু'টিতে এসে উঠেছিল, সেখানেও গেছে আহমদ মুসা। একসাথে থাকতো ওরা। আহমদ মুসা ওদের ব্যবহৃত বই-পুস্তক, কাগজপত্র, কম্পিউটার সবই পরীক্ষা করেছে। তাদের কম্পিউটারের গোপন ফাইলে আহমদ মুসা তাদের ডেইলি নোটস পেয়েছে। ডেইলি নোটসে শেষ পর্যন্ত সন্দেহ করার মতো কিছু পাচ্ছে না বলে লিখেছে। তবে ডেইলি নোটসে দু'জনেই একটা কথা লিখেছে, 'সিক্সথ সেন্স' এর কথা বার বারই বলেছে, আমরা সব সময় কারো নজরের মধ্যে রয়েছি। সুতরাং, আমরা হাওয়ায় ঝাণ্ডা উড়াচ্ছি না। এখন কাজ হলো, চোখের আড়ালের এই শত্রুকে চোখের সামনে নিয়ে আসা। কিন্তু সে সময় তাদের দেয়া হয়নি। আহমদ মুসা গোয়েন্দাদ্বয়ের এভাবে মরার ঘটনা অনুসন্ধান করা থেকে একটা কথাই বুঝল যে, আহমদ মুসাও কারো না কারো নজরের মধ্যে রয়েছে। আহমদ মুসা ওআইসি ও টার্কি গোয়েন্দাদের গঠিত পাঁচ সদস্যের যৌথ তদন্ত টিমের নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার ব্যাপারেও অনুসন্ধান করেছে। কিন্তু সামনে এগোবার মতো কোন ক্লু এখনো পায়নি। শেষ একটা ব্যবস্থা হিসেবে তারা তদন্ত কাজে নিযুক্ত হবার পর তাদের মোবাইল বা ল্যান্ড টেলিফোনে যে কলগুলো করেছে কিংবা যে কলগুলো তারা রিসিভ করেছে, তার একটা নির্ঘণ্ট এবং কথা-বার্তার রেকর্ড আহমদ মুসা টার্কিশ গভর্নমেন্টের কাছে চেয়েছিল। সেই রেকর্ডগুলোই এখন তার সামনে। বহুক্ষণ

ধরে এই রেকর্ডগুলোই পরীক্ষা করছিল আহমদ মুসা। কিন্তু নতুন কোন ক্লু পায়নি। পাঁচ সদস্যের তদন্ত টিমের নেতা মেজর ইমাম সেদিন টেলিফোন করে অন্য চার সদস্যকে ডেকে নিয়েছিল এবং একত্রিত হয়ে কোথাও বেরিয়েছিল। তারপরেই অন্তর্ধান। ডেকে নেয়ার সময়ের কথা-বার্তা থেকে কোথাও একসাথে বের হবার আহবান ছাড়া আর কিছুই মেলেনি। কোথায় বেরিয়েছিল তারা, এ প্রশ্নের জবাব খোঁজারও চেষ্টা করেছে আহমদ মুসা। তাদের অফিসের গার্ডবয় একজন তুর্কি যুবক। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আহমদ মুসা জানতে পেরেছিল, তারা পাঁচজন একটা গাড়িতে উঠেছিল। ড্রাইভিং সিটে বসেছিল মেজর ইমাম। তিনি তুর্কি সেনা গোয়েন্দার কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের একজন তুখোড় অফিসার। পাঁচ সদস্যের টিমেরও তিনি প্রধান। তিনি গাড়ি স্টার্ট দেবার আগে সাথীদের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, রোমেলী দুর্গের ওপরে উত্তর পাশে 'আলালা' পাহাড়ের 'সরাই'তেঁ আমরা যাব। আমাদের গোয়েন্দা সূত্র কিছু তথ্য দিয়েছে। এরপর তাদের গাড়ি স্টার্ট নিয়ে চলে যায়। এটাই তাদের শেষ যাওয়া। গার্ড যুবকের কাছে এই তথ্য জানার পর আহমদ মুসা আলালা পাহাড়ের 'সরাই'তে গিয়েছিল। 'সরাই' আলালা পাহাড়ের একটি ট্যুরিস্ট ভিলা। এতে ছোট-বড় বেশ কয়েকটি ফ্ল্যাট আছে। ফ্ল্যাটগুলো সব ভাড়ায় চলে। আহমদ মুসা দেখেছে, ট্যুরিস্ট, নন-ট্যুরিস্ট সব ধরনের লোকই 'সরাই'তেঁ রয়েছে। 'সরাই'-এর বৈশিষ্ট্য হলো, এর দক্ষিণ ও পশ্চিম অংশের কিছু ফ্ল্যাট থেকে রোমেলী দুর্গের প্রায় গোটাটাই দেখা যায়। আহমদ মুসা এই সরাইয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম সন্ধিস্থলের একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে। এই ফ্ল্যাট থেকে দূরবীনে রোমেলী দুর্গের পশ্চিম টাওয়ারসহ দুর্গের অনেক অংশ বিশেষ করে পশ্চিম অংশ নিখুঁতভাবে দেখা যায়। আহমদ মুসা এই ফ্ল্যাটে প্রতিদিনের একটা অংশ কাটায়।

আহমদ মুসা রোমেলী দুর্গে গিয়ে পাঁচ সদস্যের গোয়েন্দা টিমের সেখানে তদন্তে যাওয়ার কোন হদিসই বের করতে পারেনি। ঐ পাঁচ সদস্যের গোয়েন্দা টিমের মেজর ইমাম কোন এক গোয়েন্দা সূত্র থেকে সরাইতে যাওয়ার ব্যাপারে একটা তথ্য পেয়েছিল। কি তথ্য পেয়েছিল, এটা জানার চেষ্টা করেছে আহমদ মুসা তুরস্কের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ থেকে। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার, সামরিক

গোয়েন্দা বিভাগ থেকে ঐ দিন, ঐ সময় দূরে থাক, তদন্ত টিমে যোগ দেয়ার পরও কেউই সরাসরি মেজর ইমামের সাথে কথা বলেনি। কারণ, তদন্ত টিমটি তুর্কি সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের অধীন নয়, এটা সরাসরি ওআইসি সিকিউরিটি চীফ জেনারেল তাহির তারিকের অধীন। এ ধরনের তদন্ত টিম যে গঠিত হয়েছে এবং তাতে মেজর ইমাম যোগ দিয়েছে, এ তথ্য তুর্কি সামরিক গোয়েন্দার শীর্ষ ব্যক্তি, তুর্কি প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট ছাড়া আর কেউ জানেই না। সুতরাং তদন্তের ব্যাপারে ঐ ধরনের টেলিফোন মেজর ইমাম পাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। আহমদ মুসা নিশ্চিত বুঝেছে, তদন্ত টিমকে ট্র্যাপে ফেলতে শত্রুপক্ষেরই টেলিফোন ছিল ওটা। এই চিন্তা থেকে আহমদ মুসা নিশ্চিত হয় যে, তদন্ত টিম গঠনের কথা এবং কাদের নিয়ে গঠিত হয়েছে সে কথা শত্রুপক্ষ জানতে পেরেছিল এবং সেই সাথে তারা জানে তুর্কি সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের চলমান ‘আইডেন্টিফিকেশন কোড’। তার মানে, তুর্কি সামরিক গোয়েন্দা বিভাগে কোন গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ের কারো সাথে তাদের সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু এই প্রশ্নটি আহমদ মুসার কাছে পরিষ্কার হয়নি, তারা তদন্ত টিমকে সরাই’তে ডেকেছিল কেন? এই প্রশ্নের সন্ধানেই আহমদ মুসা সরাইয়ের সাথে সম্পর্ক রাখার একটা ব্যবস্থা করেছে।

ভাবনায় ডুবেছিল আহমদ মুসা। তার সামনে খোলা টেলিফোন মনিটরিং ডকুমেন্টের ফাইলটা। ফাইলটা বন্ধ করল আহমদ মুসা। নতুন একটা হিসেব তার সামনে এসে গেল।

বাইরের কে বা কয়জন কিভাবে গবেষণাগারে প্রবেশ করেছিল, কিংবা সে যদি পরিচিত কেউ বা ভেতরের কেউ হয়, তাহলে সে কে? যতটা অনুসন্ধান করতে পেরেছে, তাতে জেনেছে বাইরের কোন লোক ভেতরে প্রবেশের প্রশ্নই ওঠে না। পাঁচ জন বিজ্ঞানী, ডাইরেক্টর ম্যানেজমেন্ট এবং ভেতর ও বাইরের দু’জন সিকিউরিটি ছাড়া বাইরের কারও প্রবেশাধিকার নেই। কিন্তু বাইরের বা ভেতরের কেউ এটা করেছে। আচ্ছা, গোপন তদন্তে নিয়োজিত দু’টি গোয়েন্দা টিমের খবর ওরা পেয়েছিল কি করে? এটা তো কোন ঘোষিত তদন্ত ছিল না? এমনকি বিষয়টি এ প্রতিষ্ঠানেরও কাউকে জানানো হয়নি! তাহলে শত্রুপক্ষের বড় কোন সোর্স এ পক্ষের কোথাও আছে। আর দুই তদন্ত টিম টার্গেট হলো এটা ঠিক আছে, কিন্তু

সিকিউরিটির লোকটি টার্গেট হলো কেন? অন্য কেউ নয় কেন? কোন কিছু জেনে ফেলার জন্যে তাকে মারা হয়েছে, না পথের বাঁধা দূর করার জন্যে তাকে মারা হয়েছে?

ফাইল বন্ধ করলেও এসব নতুন চিন্তার মধ্যে ডুবে গিয়েছিল আহমদ মুসা। পায়ের শব্দে মুখ তুলল সে। দেখল, ডাইরেক্টর ম্যানেজমেন্ট (ডিএম) ডঃ আবদুল্লাহ বিন বাজ তার টেবিলের দিকে আসছে।

ডঃ শেখ আবদুল্লাহ বিন বাজ এর অফিস মানে গোটা প্রশাসনিক অফিস এই টাওয়ারের বাইরে, পাশেই। দুর্গের ভেতরেই ওটা নতুন একটা বিল্ডিং। ডঃ আবদুল্লাহ বিন বাজসহ ছোট্ট প্রশাসনিক স্টাফ সেখানেই বসেন। প্রশাসনিক স্টাফদের ভেতর ডঃ আবদুল্লাহ বিন বাজই গবেষণাগারে প্রবেশ করতে পারেন।

ডঃ শেখ বাজ এগিয়ে এসেছে আহমদ মুসার টেবিলের পাশে।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়ে সালাম দিয়ে হ্যান্ডশেক করে স্বাগত জানাল তাকে। বলল, 'ডঃ বাজ, আমি আপনাকে ডেকেছিলাম, কষ্ট দিয়েছি। প্লিজ বসুন।'

ডঃ বাজ বসতে বসতে বলল, 'কোন কষ্ট নয় স্যার। এটা আপনার ডিউটি, আমারও ডিউটি।'

ডঃ বাজ ইংরেজিতে জবাব দিল আহমদ মুসার। সে আরবিভাষী, সৌদি। সৌদি আরবের বিখ্যাত বাজ পরিবারের ছেলে। এই বাজ পরিবার বাদশাহ ইবনে সৌদের গুরু শেখ আবদুল ওয়াহাব নজদী পরিবারেরই একটা শাখা। এই পরিবারকে সম্মান করে আহমদ মুসা। আহমদ মুসা খুশি হয়েছে যে, এই পরিবারের ছেলে এই ধরনের একটি দায়িত্ব পাওয়ারই উপযুক্ত।

কিন্তু ডঃ শেখ বাজ জানে না এখানে আহমদ মুসার মিশন সম্পর্কে। রেসিডেন্ট ডাইরেক্টর ছিল না, এখন নেয়া হয়েছে এটাই সে জানে।

'ধন্যবাদ ডঃ শেখ বাজ। আপনাকে ডেকেছি কারণ আমি আসার পর আপনার সাথে কিছু অফিসিয়াল কথা ছাড়া আর কোন কথাই হয়নি। কেমন আছেন?' আহমদ মুসা বলল।

'আলহামদুলিল্লাহ। ভালো স্যার। আপনি কেমন বোধ করছেন? কেমন লাগছে ইন্সটিটিউট? কেমন দেখছেন ইস্তাম্বুলকে?' বলল ডঃ শেখ বাজ।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'আমি খুব ভালো বোধ করছি। ভালো লাগছে সবকিছু।'

'ধন্যবাদ স্যার। আমরা একটা অস্বস্তিতে আছি। একজন প্রকৌশল বিজ্ঞানী ও একজন সিকিউরিটি অফিসারের পরপর মৃত্যু হলো। মৃত্যুকে সন্দেহজনক মনে করা হলেও তদন্ত এগোতে পারেনি, নিশ্চয় জানেন। এর মধ্যে বড় পদে আপনার আগমন আমাদের আশান্বিত করেছে। ইতোমধ্যেই আপনি একটা উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছেন। কি জানি, আমরা আগের চেয়ে অস্বস্তিও যেন কম অনুভব করছি।' বলল ডঃ শেখ বাজ।

'ধন্যবাদ। কিন্তু তদন্ত কেন এগোতে পারল না? আপনাদের অভিমত কি?' আহমদ মুসা বলল।

'সাধারণ দৃষ্টিতে সবটাই দুর্ভাগ্য বলে মনে হয়। সবগুলো মৃত্যুই দুর্ঘটনা বা স্বাভাবিক কারণে হয়েছে। শুধু শেষ পাঁচ জনের নিখোঁজ হওয়া ছাড়া।'

'আচ্ছা বলুন তো ডঃ শেখ বাজ, বিজ্ঞানীরা, আপনারা কয়েকজন ও সিকিউরিটি দু'জন ছাড়া ভেতরে আর কেউ কি প্রবেশ করে?' আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

ডঃ শেখ বাজ একটু চিন্তা করে বলল, 'না স্যার, বাইরের অন্য কেউ ভেতরে আসতে পারে না, আসা নিষিদ্ধ।'

'আচ্ছা, টপ ফ্লোরে রেসিডেন্সিয়াল কোয়ার্টার রয়েছে। যারা ওখানে থাকেন, তাদের কেউ এখানে আসে না?' আহমদ মুসা বলল।

'আসার বিধান নেই। তবে বিভিন্নভাবে কেউ কেউ আসেন। যেমন, যে তারিখে আমার বাসায় ফেরার কথা, সেদিন হয়তো আমার স্ত্রী এসে আমাকে নিয়ে গেল। এ ধরনের ঘটনা অন্যদের ক্ষেত্রেও ঘটে। তবে বাইরের এমন কেউ এসে বাস করে না।' বলল ডঃ শেখ বাজ।

'এমন যারা আসেন, তারা সেকেন্ড ফ্লোর এবং বটম ফ্লোরে যান কিংবা যেতে পারেন?'

'বটম ফ্লোরে এমন কেউ এবং অন্য কেউই যেতে পারে না। ইন্সটিটিউটের চ্যান্সেলর প্রধান বিজ্ঞানী ডঃ আমির আবদুল্লাহ আন্দালুসীই শুধু

জানেন বটম ফ্লোরে প্রবেশের একমাত্র দরজার ছয়টি ডিজিটাল লকের কোনটি দিয়ে কখন কোন কোড ব্যবহার করে প্রবেশ করা যাবে। তিনিই মাত্র দরজা খোলেন এবং বিজ্ঞানীদের ভেতরে নিয়ে যান। সুতরাং তার দৃষ্টির বাইরে কারও সেখানে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। তবে সেকেন্ড ফ্লোরে যাওয়ার ক্ষেত্রে এমন বিধি-নিষেধ নেই। যারা এ ফ্লোরে আসেন, তারা ইচ্ছে করলে সেকেন্ড ফ্লোরে যেতে পারেন।' বলল ডঃ শেখ বাজ।

আহমদ মুসা মনে মনে ভাবল, সেকেন্ড ফ্লোরে তো মাস্টার কম্পিউটারটা রয়েছে, যেখানে বিভিন্ন বিষয়ের সাথে ইন্সটিটিউটের রিসার্চ ব্লু-প্রিন্টের বিবরণসহ বিজ্ঞানীদের বায়োডাটা ও রিসার্চ স্পেসিফিকেশন রয়েছে। এই কম্পিউটারেই প্রবেশ করতে চেয়েছিল অদৃশ্য অজানা কেউ। এই অজানা কেউ কে হতে পারে? এসব চিন্তা আহমদ মুসার মাথায় বিদ্যুৎ চমকের মতো খেলে গেল। আহমদ মুসা বলল ডঃ শেখ বাজ-এর কথা শেষ হবার পর, 'এভাবে যারা আসেন বা এসেছেন, তাদের কোন হিসেব এন্ট্রিলগ রেজিস্টারে আছে?'

'জ্বি স্যার। নিয়ম অনুসারে প্রত্যেকেরই নাম, পরিচয়, দস্তখত এন্ট্রিলগে রয়েছে। এছাড়া ক্লোজ-সার্কিট ক্যামেরা লগের ফটোও আমরা কম্পিউটারে পাব।'

'ম্যামেরা লগে কি শুরু থেকেই সব ফটো বা দৃশ্য সংরক্ষিত আছে?'

'অবশ্যই স্যার। শুধু ফাস্ট এন্ট্রি নয় স্যার, প্রত্যেক ফ্লোরেরই আলাদা আলাদা এন্ট্রি ক্যামেরা লগ রয়েছে কম্পিউটারে। এ লগগুলো প্রতি মাসে রুটিন চেক হয়। সম্প্রতি সন্দেহজনক একটা ঘটনা ঘটার পর সবগুলো লগ কমপ্লিট চেক করা হয়।' বলল ডঃ শেখ বাজ।

'সন্দেহজনক কি ঘটনা?'

'মাস্টার কম্পিউটারে সন্দেহজনক সার্চের প্রমাণ পাওয়া গেছে।'

বিষয়টা আহমদ মুসা আগে থেকেই জানে। তার তদন্তের এটাও একটা ইস্যু।

বলল আহমদ মুসা, 'লগ পরীক্ষা থেকে কিছু পাওয়া গিয়েছিল?'

‘কিছু পাওয়া যায়নি স্যার। অজানা-অপরিচিত কারও প্রবেশের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বিজ্ঞানীদেরও গুরুত্বপূর্ণ অফিসিয়াল কাজের গোপনীয়তার স্বার্থে কক্ষ পর্যায়ে সিসিটিভি ক্যামেরা পাহারায় রাখা হয়নি। সেটা থাকলে গোপনে কে মাস্টার কম্পিউটারে বসেছিল, তা জানা যেত।’ ডঃ শেখ বাজ বলল।

‘ডঃ শেখ বাজ, আমাদের ইন্সটিটিউটের ভেতরে বাইরে সার্বিক নিরাপত্তার ব্যাপারে কি আপনি সন্তুষ্ট?’

‘জ্বি স্যার। বাইরের নিরাপত্তা তুর্কি নিরাপত্তা বাহিনী রক্ষা করে। দুর্গে প্রবেশ তারা নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের ক্লিয়ারেন্স ছাড়া ইন্সটিটিউট পর্যন্ত কেউ পৌঁছতে পারে না। ইন্সটিটিউটে প্রবেশের গেট নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের একজন সিকিউরিটি অফিসার। পালাক্রমে একজন সিকিউরিটি ইনস্টিটিউটের প্রধান গেট রক্ষা করে। ভেতরের জন্যে একজন সিকিউরিটি অফিসার আছেন। কিন্তু সন্দেহজনক ঘটনা ঘটার পর তাকেও বাইরের নিরাপত্তা রক্ষায় নিয়োগ করা হয়েছে সম্প্রতি। ইনস্টিটিউটের নিরাপত্তার দিকটা আমি মনে করি এই দিক দিয়ে নিশ্চিত।’

‘ঠিক আছে, ডঃ শেখ বাজ। এনট্রান্স লগ এবং সিসিটিভি ক্যামেরা লগ আমার টেবিলে দেবেন। আমিও একটু দেখব।’

বলে আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল বেলা তিনটা বাজতে যাচ্ছে।

তারপর আহমদ মুসা তাকাল ডঃ শেখ বাজের দিকে। বলল, ‘ডঃ শেখ বাজ, আমি উঠব।’

‘কোথায় যাবেন স্যার? বাসায়? আপনি তো এ সময় বের হন না।’ বলল ডঃ শেখ বাজ।

‘আমি পুলিশের জোনাল আর্কাইভসে যাব।’

‘আলালা পাহাড়ের আল-আলা পার্কের লাগোয়া যে বড় পুলিশ অফিস ওটায়?’ জিজ্ঞেস করল ডঃ শেখ বাজ।

‘হ্যাঁ’ বলল আহমদ মুসা।

‘আর্কাইভসে কি কাজ?’

‘তেমন কিছু না। সুলতান মুহাম্মদ মটরওয়ে থেকে যে রাস্তা আলালা পাহাড়ের ‘সরাই’ পর্যন্ত এসেছে, সে রাস্তায় গত একমাস ধরে যে সব গাড়ি চলাচল করেছে তার একটা তালিকা দরকার।’

‘সে তো অনেক বড় ব্যাপার! আপনি গোয়েন্দার মতো কথা বলছেন দেখছি! এ দিয়ে কি করবেন?’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘এটা ইস্তাম্বুল শহরে গাড়ি চলাচলের একটা স্যাম্পলিং। এটা আমার একটা হবি।’

বলে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

রোমেলী দুর্গ যে পাহাড়ে তার উত্তর-পশ্চিমে আলালা পাহাড়। অপেক্ষাকৃত অনেক উঁচু। এই পাহাড়েই ‘সরাই’ বিল্ডিং-এ আহমদ মুসা ভাড়া থাকে। এই পাহাড়ের ওপরেই সমতল বিরাট এলাকা জুড়ে একটি পার্ক। এটাই আল-আলা পার্ক। পার্কের পাশে বিরাট টিলা জুড়ে পুলিশ আর্কাইভস। পার্কের চারদিক ঘিরে রাস্তা। রাস্তার পাশ থেকে একটা সিঁড়ি উঠে গেছে টিলার ওপরে। এ সিঁড়ি দিয়েই উঠতে হয় পুলিশ আর্কাইভসে।

আর্কাইভসে মাগরিবের নামায পড়ে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় আহমদ মুসা বেরিয়ে পড়ল আর্কাইভস থেকে।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে রাস্তা অতিক্রম করে আহমদ মুসা পার্কে প্রবেশ করল।

আহমদ মুসা তার গন্তব্য আড়াল করার জন্যে গাড়ি পার্কের বাইরে রেখে পার্কের ভেতর দিয়ে হেঁটে পুলিশ আর্কাইভসে গিয়েছিল।

পার্কে প্রবেশের গেটের উদ্দেশ্যে হাঁটতে লাগল আহমদ মুসা। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত নামলেও পার্ক তখনও দিনের আলোর মতোই ঝলমলে।

প্রচুর লোক তখনও পার্কে। কেউ পায়চারি করছে, কেউ কেউ এখানে ওখানে বসে গল্প করছে।

ইস্তাম্বুল যেমন পাহাড়ের শহর, তেমনি গাছ-গাছালিরও শহর।

পার্কের ফ্লোরও উঁচু-নিচু। বিভিন্ন গাছ-গাছালিতে পরিকল্পিতভাবে সজ্জিত পার্কটি।

একটু নিরিবিলি জায়গা দেখেই এগোচ্ছিল আহমদ মুসা। একটা গাছের ছায়া পার হচ্ছিল সে।

পেছন থেকে চার জন লোক আহমদ মুসার দিকে ছুটে গেল। তাদের দু'জন জামার তলা থেকে লোহার ব্যাটন বের করে নিয়েছে। অন্য দু'জনের হাতে রিভলভার। পেছনের ব্যাটনধারী বেড়ালের মতো নিঃশব্দে এগিয়ে আহমদ মুসার মাথা লক্ষ্যে আঘাত করল।

শেষ মুহূর্তে পায়ের শব্দে টের পেয়েছিল আহমদ মুসা। দ্রুত মাথাটা বাম দিকে সরিয়ে নিয়েছিল সে। কিন্তু তবু আঘাতটা এড়াতে পারল না। হাতুড়ির মতো একটা আঘাত নেমে এল মাথার ডান পাশের ওপর এবং তা নেমে গেল কান মাড়িয়ে। আরেকটা আঘাত এসে তার কাঁধ যেন গুঁড়িয়ে দিল।

আহমদ মুসা পড়ে গিয়েছিল উপুড় হয়ে। কিন্তু পড়ে গিয়েই ফলোআপ আঘাত থেকে বাঁচার জন্যে গড়িয়ে বাম দিকে সরে গেল।

দুই ব্যাটনধারী ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল নতুন করে আঘাত করার জন্যে।

আহমদ মুসা সরে গিয়েই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

দুই ব্যাটনধারী ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল তার দিকে।

আহমদ মুসা দেহ শূন্যে তুলে তার দু'পা ছুঁড়ে দিল ওদের দু'জনের ধাবমান পায়ের দিকে। অব্যর্থ আঘাত। ওরা গোড়াকাটা গাছের মতো আছড়ে পড়ল আহমদ মুসার ওপর।

প্রস্তুত আহমদ মুসা। ওরা দু'জন নিজেদের সামলে নেবার আগেই দু'হাতে ওদের দু'জনের গলা সাঁড়াশির মতো প্রচণ্ডভাবে পেঁচিয়ে ধরল। তারপর ওদের গলা মুচড়ে দিয়ে ওদের হাতের ব্যাটন কেড়ে নিল।

অন্যদিকে রিভলভারধারী দু'জন ছুটে আসছিল রিভলভার বাগিয়ে।

আহমদ মুসা তখন ব্যাটন হাতে বসা অবস্থায় ছিল। উঠে দাঁড়াবার সময় নেই। নতুন ভাবনার অবকাশ নেই। তবে আহমদ মুসার এ চিন্তা ছিল যে, জানাজানি, শোরগোল এড়াবার জন্যে ওরা পারতপক্ষে গুলি চালাবে না। আহমদ

মুসা দ্রুত চিন্তা করে এই মুহূর্তে তার হাতে থাকা শেষ সুযোগ হিসেবে ব্যাটন দু'টি সর্বশক্তি দিয়ে ছুঁড়ে মারল ওদের রিভলভার ধরা হাতের দিকে।

প্রচণ্ড গতিতে লোহার সলিড ব্যাটন ছুটে গিয়ে ঠিক ঠিক আঘাত করল ওদের রিভলভার ধরা হাতে। ওদের হাতের রিভলভার ছিটকে পড়ে গেল। হাতও ওদের আহত হলো।

আহমদ মুসা ব্যাটন ছুঁড়েই উঠে দাঁড়াল। সেই সাথে গলার মোচড়ের আঘাত তখনও সামলে উঠতে না পারা একজনের কোমরের বেল্ট ধরে এক হ্যাঁচকা টানে মাথার উপর তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল ব্যাটনে আঘাতপ্রাপ্ত দু'জনের উপর।

এদিকে আহমদ মুসার পাশে পড়ে থাকা দ্বিতীয় জন মরিয়া হয়ে টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে পেছন থেকে পেঁচিয়ে ধরল আহমদ মুসার গলা।

আহমদ মুসা দু'হাতের কনুই দিয়ে প্রচণ্ড কয়েকটা ঘা দিল লোকটির পাঁজরে। ব্যথায় কোঁৎ কোঁৎ শব্দ বেরুলো তার মুখ থেকে। কিন্তু আহমদ মুসার গলা সে ছাড়ল না। বরং গলায় তার হাতের চাপ আরও তীব্র হলো। শ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হলো তার। লোকটি তার গায়ের সাথে লেপটে থাকায় কনুই এর আঘাত আর কার্যকরী হচ্ছিল না। লোকটিকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করার এক কৌশল হিসেবে আহমদ মুসা পা দু'টিকে একটু ফাঁক করে, শক্ত করে সর্বশক্তিতে দেহের উপরের অংশে প্রচণ্ড এক ঝাঁকি দিয়ে বাঁকিয়ে নিয়ে মাথাটা অনেকটা লম্বভাবে নিজের পায়ের দিকে ছুঁড়ে দিল।

লোকটির পেছন দিকটা উল্টে এসে ছিটকে আহমদ মুসার সামনের দিকে চলে এল। অন্যদিকে আহমদ মুসা তার কোমর থেকে পা পর্যন্ত অবস্থানটা অনড় রাখার চেষ্টা করে তা নিচের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে তার মাথাটা হাঁটুর লেভেলে পৌঁছার পর আরেকটা ঝাঁকুনি দিয়ে ওপর দিকে তোলার চেষ্টা করল। মাথাটা ওপর দিকে উঠল না বটে, কিন্তু নিচের দিকে যাওয়ার গতি থেকে থেমে যাওয়ায় একটা ঝাঁকুনির সৃষ্টি হলো। এই ঝাঁকুনি ও লোকটির দেহ উল্টে গিয়ে পড়ার প্রবল চাপ-দুইয়ে মিলে আহমদ মুসার গলায় পেঁচানো লোকটির দু'হাত শিথিল হয়ে গেল।

আহমদ মুসা লোকটির হাতের বাঁধন থেকে মুক্ত হয়েই বুক ভরে এক শ্বাস নিয়ে তার পায়ের কাছে পড়ে যাওয়া লোকটির কোমরের বেল্টের নিচে হাত চালিয়ে তার দেহটা শূন্যে মাথার ওপর তুলে নিল।

ওরা তিনজন সার বেঁধে ছুটে আসছিল।

আহমদ মুসা লোকটিকে ছুঁড়ে মারল তাদের ওপর।

তিনজনই পেছনের দিকে ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল।

আহমদ মুসা ছুটে গেল পড়ে থাকা দু'টি রিভলভারের দিকে। কুড়িয়ে নিল দু'টি রিভলভার দু'জায়গা থেকে।

রিভলভার দু'টি কুড়িয়ে নেবার পর মাথা তুলে দেখল, ওরা চারজন উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে পালাচ্ছে।

গুলি করার জন্যে রিভলভার তুলেও থেমে গেল আহমদ মুসা। শুরুতেই খুনোখুনিতে যেতে চায় না সে। রিভলভার দু'টি ফেলে দিয়ে বসে পড়ল সে। একটা প্রবল ক্লান্তি ঘিরে ধরছে যেন তার দেহকে। মাথার ডান পাশ ও কাঁধে অসহ্য একটা যন্ত্রণা। একটু জিরিয়ে নিয়ে উঠবে, ভাবল আহমদ মুসা। অবসন্নতায় মাথা ঝুঁকে পড়েছিল নিচের দিকে।

পায়ের শব্দে চমকে উঠে মুখ তুলল আহমদ মুসা। দেখল, একজন পুরুষ, একজন মহিলা তার দিকে ছুটে আসছে।

ওরা এল আহমদ মুসার কাছে। পুরুষটি আঁতকে ওঠা কণ্ঠে বলল, 'আপনার ডান পাশটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। আপনাকে এখনি হাসপাতালে নেয়া দরকার।'

'আক্রমণের গোটা ঘটনা আমরা দাঁড়িয়ে দেখেছি, আমরা কিছু করতে পারিনি, দুঃখিত। লোকজন ডাকার কথাও মনে হয়নি। ঘটনা এত দ্রুত ঘটে গেল!' মহিলাটি বলল।

পুরুষটির বয়স চল্লিশ প্লাস হবে। মহিলাটির বয়সও চল্লিশ হবে। দু'জনেরই পরনে বিকেলের ওয়াকিং ট্রাউজার। পুরুষটির গায়ে ফুল টি-শার্ট, আর মহিলাটির গায়ে হালকা ফুলহাতা জ্যাকেট। দু'জনের কথাবার্তায় শিষ্টাচার ও চোখে আন্তরিক সমবেদনা।

আহমদ মুসা মেয়েটির কথার উত্তরে বলল, ‘ধন্যবাদ। এ ধরনের আকস্মিক ঘটনায় বাইরে থেকে কিছু করার থাকে না।’

‘এখনি আপনাকে হাসপাতালে নিতে হবে। মাথার ডান পাশ ও বাঁ কাঁধের আঘাত সাধারণ নয়।’ বলল পুরুষটি।

‘হাস্পাতাল-ক্লিনিকে আমি যাব না। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি বাসায় ফিরব। পার্কের উত্তর গেটে আমার গাড়ি আছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ঠিক আছে। একটু সামনেই আমাদের বাড়ি। আমরা দু’জনেই ডাক্তার। আপনাকে কিন্তু আমরা এ অবস্থায় কিছুতেই ছেড়ে দিতে পারি না।’ বলল পুরুষটি।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আপনার ইথিকসকে আমি ভাঙতে বলতে পারি না। চলুন।’

বলে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

ডাক্তার পুরুষ ও মহিলা দু’জন হেঁটেই পার্কে এসেছিল। আহমদ মুসাকে নিয়ে তারা আহমদ মুসার গাড়িতেই উঠল।

ডাক্তার পুরুষটি ড্রাইভিং সিটে বসল। ডাক্তার মহিলাটি পেছনের সিটে আহমদ মুসার পাশে বসল।

‘আপনি ঠিক তুর্কি নন বলে মনে হয়। কোথায় থাকেন আপনি?’

‘রোমেলী দুর্গের এক প্রতিষ্ঠানে চাকরি করি।’ বলল আহমদ মুসা।

ডাক্তারদের বাড়ি দূরে নয়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেল তারা।

মাথা, কান ও কাঁধের ড্রেসিং শেষ করতে এক ঘন্টা সময় লেগে গেল। মাথার ডান পাশটা থেঁতলে অনেকটা চামড়া উঠে গিয়েছিল। কান কয়েক জায়গায় ফেটে গিয়েছিল। কাঁধের বাহুর সন্ধিস্থলের জায়গাটাও দারুণ থেঁতলে গিয়েছিল। কোন ফ্র্যাকচার হয়েছে কিনা, এক্স-রে না করলে বোঝা যাবে না।

ডাক্তার দু’জনে মিলে ড্রেসিং-এর কাজটা করল।

ড্রেসিং শেষে সবকিছু সরিয়ে দু’হাত পরিষ্কার করে ওরা দু’জন ফিরে এলে আহমদ মুসা বলল, ‘আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। আমাকে নিশ্চয় এখন ছুটি দেবেন?’

কথা শেষ করেই আবার দ্রুত বলে উঠল, 'ওহো, আপনাদের নামটাও জানা হয়নি। ডাক্তারদের নাম জেনে রাখা ভালো।'

ডাক্তার পুরুষটি বলল, 'আমার নাম ডাঃ ইয়াসার তইফুন, আর ওর নাম ডাঃ রাসাত কাসাভা।'

বলে ডাঃ ইয়াসার আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, 'আপনার নামও কিন্তু জানা হয়নি।'

'আমার নাম খালেদ খাকান।' বলল আহমদ মুসা।

'ঠিকই ভেবেছি, আপনার তুর্কি অরিজিন আছে। নামটাও তুর্কি। খুশি হলাম। এবার আসুন পাশের ঘরে।'

'কেন?' বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

পাশের ঘরটা একটা বেডরুম। গেস্টরুমই হবে। একটা খাট। খাটের বিপরীত দিকে এক সেট সোফা সুন্দর করে সাজানো। আর ঘরে আছে একটা ওয়্যারড্রোব, একটা ছোট ডাইনিং টেবিল ও চেয়ার।

ঘরে ঢুকে ডাক্তার ইয়াসার বলল, 'মিঃ খালেদ খাকান, আপনাকে ঘন্টাখানেক রেস্ট নিতে হবে। আপনার শরীর থেকে অনেক রক্তক্ষয় হয়েছে। হাসপাতালে নিলে রক্ত দেয়ার কথা উঠতো।'

'তথাস্তু' বলে শুয়ে পড়তে পড়তে আহমদ মুসা বলল, 'ডাক্তারের হিসেব ও আমার হিসেব ভিন্ন। যা রক্ত গেছে, আরও ততটা রক্ত গেলেও আমি রক্ত নিতাম না।'

ডাঃ ইয়াসার ও ডাঃ রাসাত একটু পিছিয়ে সোফায় বসল। বসতে বসতে ডাঃ ইয়াসার বলল, 'আপনার কথা এক দিক দিয়ে ঠিক মিঃ খালেদ খাকান। আমি আপনার মতো বিস্ময়কর পেশেন্ট কোন দিন পাইনি। আপনাকে যে ধরনের ড্রেসিং করতে হয়েছে, তাতে লোকাল অ্যানেসথেসিয়া অপরিহার্য ছিল। আপনি অ্যানেসথেসিয়া নিলেন না। আমি বিস্মিত হয়েছি, ড্রেসিং-এর সময় আপনার চোখে-মুখে বেদনার সামান্য ভাঁজও পড়েনি। এ ধরনের শক্ত নার্ভ কারও থাকতে পারে, তা আমার কাছে অবিশ্বাস্য ছিল।'

এক মুহূর্ত থেমে আবার বলে উঠল ডাঃ ইয়াসার, 'আপনার সত্যিই কোন অনুভূতি নেই?'

'অনুভূতি তো জীবনের লক্ষণ। ওটা তো থাকতেই হবে। আসলে অনুভূতির প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা যায় ধৈর্য্যের দ্বারা। ধৈর্য্য নার্ভ বা অনুভূতিকে সীমাহীন শক্তি দিতে পারে।' আহমদ মুসা বলল।

'আপনি ঠিকই বলেছেন, ধৈর্য্য নার্ভকে সীমাহীন শক্তি দিতে পারে। কিন্তু এ ধরনের ধৈর্য্য একজন অসাধারণেরই শুধু থাকতে পারে, সাধারণের নয়। আমার মনে হচ্ছে, এই অসাধারণের মধ্যে একজন আপনি। আল-আলা পার্কে আপনার ওপর হামলার সময়ও কিন্তু এটা আপনি প্রমাণ করেছেন। প্রথমেই যে পরিমাণ আহত আপনি হন, তাতে দু'জন রিভলভারধারীসহ চার জনের বিরুদ্ধে লড়াই করে জয়ী হওয়া সত্যি একজন অসাধারণের কাজ। আপনার বুদ্ধি, ক্ষিপ্রতা ও কৌশল আমাদের সত্যিই অভিভূত করেছে। আপনার প্রফেশন কি বলবেন দয়া করে?' ডাঃ রাসাত কাসাভা বলল।

'একটা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের আমি একজন ব্যবস্থাপনা এক্সিকিউটিভ।' আহমদ মুসা বলল।

'কি গবেষণাগার?' জিজ্ঞাসা ডাক্তার ইয়াসারের।

'ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান।'

'আপনি তো দেখছি একজন প্রফেশনাল বুদ্ধিজীবী। এদিক থেকে আপনি একজন নির্বিরোধ ব্যক্তি। আপনাকে এভাবে ওরা আক্রমণ করল কেন? কারা ওরা? ওদের আপনি চেনেন? কি উদ্দেশ্য ওদের?' বলল ডাক্তার ইয়াসার।

'আপনার কোন প্রশ্নেরই জবাব আমার কাছে নেই।' আহমদ মুসা বলল।

'আমার মনে হয়, পুলিশে আপনার খবরটা দেয়া উচিত।' বলল ডাঃ ইয়াসার।

'আইনের কথা তাই। কিন্তু আমি কোন ঝামেলায় জড়াতে চাই না।'

'কিন্তু ঝামেলা তাতে আরও বাড়বে। ওরা সাহস পেয়ে যাবে। আবারও আক্রমণ করতে পারে ওরা।' বলল ডাঃ ইয়াসার।

'আমি অফিসে গিয়ে পরামর্শ করে দেখব। তবে আমি এসবে ভয় পাই না। যদি আল্লাহ না চান, কেউ আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর চাইলে পুলিশ কিংবা কেউ আমাকে বাঁচাতেও পারবে না।'

'আপনি তো দেখছি একজন গোঁড়া অদৃষ্টবাদী!' ডাঃ রাসাত কাসাভা বলল।

'এটা বিজ্ঞান-মনস্কতাও।' আহমদ মুসা বলল।

'বিজ্ঞান-মনস্কতা?' বলল ডাঃ রাসাত কাসাভা। তার চোখে-মুখে কৌতুকের চিহ্ন।

'কেন, বিজ্ঞান বলছে না মানুষের বংশ-গতি, জীবন-গতি সবকিছু মানবদেহের 'জীন' কণার মধ্যে 'এনকোডেড' রয়েছে!'

ডাঃ রাসাত ও ডাঃ ইয়াসার দু'জনেরই চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

বলল ডাঃ রাসাত, 'আপনি সত্যিই বিস্ময়কর মানুষ। সুন্দর কথা বলেন। কিন্তু বলুন তো, আপনি যদি চার জনের সাথে ফাইট না করতেন, তাহলে 'জীন' কি আপনাকে রক্ষা করতো?'

'চার জনের সাথে আমি ফাইট করবো এবং জয়ী হবো, সেটা আল্লাহতায়ালা 'জীন'-এ এনকোডেড করে রেখেছেন।'

হো হো করে হেসে উঠল ডাঃ ইয়াসার ও ডাঃ রাসাত দু'জনেই। ডাঃ রাসাত বলল, 'আপনার সাথে কথায় পারা যাবে না। তবে আপনি খুব হালকা কথার মধ্যে খুব ভারি কথা বলেছেন। আপনার মতো বিশ্বাস যাদের থাকে, তারাই অজেয় হন।'

'আপনারা কি বিশ্বাসী নন? আপনাদের মধ্যে কি বিশ্বাস নেই?' বলল আহমদ মুসা।

উত্তর দেয়ার জন্যে মুখ খুলেছিল ডাঃ ইয়াসার।

ঘরের আর একটা দরজার পর্দা ঠেলে ঘরে প্রবেশ করল একজন তরুণী। অপরূপা সুন্দরী তরুণী, যেন ডানাকাটা পরী।

মেয়েটি বলতে বলতে প্রবেশ করছিল, 'বিশ্বাস আছে জনাব, কিন্তু তার অ্যাকশন নেই। আছে বিশ্বাস, কিন্তু তার জীবন নেই। বিশ্বাস আছে অবশ্যই

জনাব, কিন্তু সেটা অবাঞ্ছিত গরীব আত্মীয়ের অসহ্য উপস্থিতির মতো, যাকে ফেলাও যায় না, রাখাও যায় না।'

হেসে উঠল আহমদ মুসা মেয়েটির বাচনভংগীতে। বলল, 'আপনি অবস্থার একটা চমৎকার ডেফিনিশন দিয়েছেন।'

বলেই আহমদ মুসা ডাক্তার ইয়াসার ও ডাক্তার রাসাতের দিকে চেয়ে বলল, 'এই ডেফিনিশন সম্পর্কে আপনাদের বক্তব্য কি?'

আহমদ মুসার কথার কোন উত্তর না দিয়ে ডাঃ রাসাত মেয়েটিকে দেখিয়ে হাসিতে মুখ রাঙিয়ে বলল, 'ও সাবাতিনি ইয়াসার। আমাদের মেয়ে। কয়েকদিন হলো ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। খুব পড়ুয়া, টকেটিভও। পাশের রুমে তার স্টাডিতে বসে পড়েছিল। কথা বলার সুযোগ পেয়ে বেরিয়ে এসেছে।'

'ঠিক বলেছেন আম্মা। আমি পড়ার টেবিলে বসে আপনাদের ইন্টারেস্টিং আলোচনা শুনছিলাম। শেষে মিঃ খালেদ খাকান এমন প্রশ্ন আপনাদের করেছেন, যে প্রশ্নের সঠিক জবাব আপনারা দেবেন না ভেবেই আমি বেরিয়ে এসেছি সত্য জবাবটা দেয়ার জন্যে। আপনাদের ঠোঁটে ঈশ্বর আছে, কিন্তু বুকে ঈশ্বর নেই।' বলল সাবাতিনি ইয়াসার।

'সুন্দর ডেফিনিশন এবং স্পষ্ট কথার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু আমি কি জানতে পারি, আপনার ঈশ্বর আপনার কোথায় মানে ঠোঁটে না বুকে রয়েছে?' আহমদ মুসা বলল।

মেয়েটির দুই ঠোঁট হাসিতে ভরে গেল। বলল, 'জবাব আছে। তার আগে বলব, আমি বয়সে আপনার ছোট। আপনি আমাকে 'আপনি' সম্বোধন করে কথা বলায় আমি অস্বস্তি বোধ করছি। এ অস্বস্তি নিয়ে আপনার সাথে আমার কোন কথা হবে না।'

আহমদ মুসার ঠোঁটে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'ঠিক আছে সাবাতিনি, বল তোমার উত্তরটা।'

'জবাবটা আপনি দিয়ে রেখেছেন। ঐ যে বলেছেন মানবদেহের 'জীন-কোষ-কণা'র বংশ-গতির কথা। সে বংশ-গতির আমিও শিকার। আমার বিশ্বাস আমার পূর্বসূরীদের মতোই তো হবে।' বলল সাবাতিনি।

‘তোমার এই উত্তরটা কিন্তু সত্য বা সংগত হলো না সাবাতিনি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কেন নয়? আমি তো বিজ্ঞানের কথা বলেছি, যেটা আপনিও বলেছেন।’ বলল সাবাতিনি।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘সাবাতিনি, আল্লাহর দেয়া দৈহিক ব্যবস্থা ‘জীন’-এর বংশ-গতি কিন্তু মানব জীবনের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে না। আল্লাহ মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন। এই ইচ্ছাশক্তিই মানুষের বিশ্বাস ও কর্মকে রূপায়িত করে পরিচালনা করে। এই কারণেই দেখ এক বিশ্বের, এক দেশের, এমনকি এক বাড়ির মানুষ বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন বিশ্বাস ও বিভিন্ন কর্মধারা অনুসরণ করে। বিভিন্ন ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেরই এটা ফল।’

গম্ভীর হয়ে উঠেছে সাবাতিনি ইয়াসারের মুখ। বলল, ‘বিভিন্ন ইচ্ছাশক্তি, বিভিন্ন ‘জীন-কণা’ যদি মানুষের ইচ্ছাশক্তির পরিচালক হয়ে দাঁড়ায়, ইচ্ছাশক্তি তাহলে স্বাধীন থাকছে না।’

‘তুমি বলতে চাচ্ছ, একই বংশে, একই বাড়িতে বিভিন্ন জীনই বিভিন্ন ইচ্ছাশক্তির উৎস এবং তা যদি হয়, তাহলে ইচ্ছাশক্তি স্বাধীন নয়। এই মত ঠিক নয় এই কারণে যে, একজন মানুষ তার জীবনে তার বিশ্বাস ও কর্মধারা একাধিক বা বহুবার চেঞ্জ করতে পারে এবং আমাদের চোখের সামনেই তা করছে। কিন্তু একজন মানুষের দেহ-কোষের ‘জীন-কণা’ তো এভাবে চেঞ্জ হতে পারে না, চেঞ্জ হয় না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ‘জীন’ চেঞ্জ হয় না, কিন্তু ইচ্ছা চেঞ্জ হয়। এর পরিষ্কার অর্থ ইচ্ছাশক্তি ‘জীন’ নির্ভর নয়, স্বাধীন।’ বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা থামতেই ডাঃ রাসাত বলে উঠল, ‘ইচ্ছা যে কোন বিশ্বাস, যে কোন কর্মধারা চয়েস করতে পারে, যেহেতু সে স্বাধীন। কিন্তু এই চয়েস তো সত্য, মিথ্যা, ন্যায়, অন্যায়, ভালো, মন্দের বিচারে চূড়ান্ত নয়। কারণ চয়েস দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন হচ্ছে, কিন্তু সত্য, ন্যায়, ভালো তো একটাই, বিভিন্ন নয়।’

‘ঠিক ধরেছেন ডাঃ রাসাত। মানুষের ইচ্ছাশক্তি স্বাধীন, কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। ইচ্ছাশক্তি স্বাধীন, কিন্তু অন্ধ। ইচ্ছাশক্তি স্বাধীন, কিন্তু এর নিজস্ব কোন রূপ নেই, রঙ নেই। ইচ্ছাশক্তি একটা সিদ্ধান্ত, যা ঠিক করতে, ভুলও করতে পারে বা

ভালো করতে পারে, আবার মন্দও করতে পারে, যা সত্য পথে চলতে পারে, আবার ভুল পথেও চলতে পারে।' বলল আহমদ মুসা।

'যে ইচ্ছাশক্তি মানুষের বিশ্বাস ও কর্মধারার চালিকাশক্তি, সে ইচ্ছাশক্তি এমন অন্ধ হওয়াটা তো মানুষের জন্যে বিপজ্জনক। শুধু বিপজ্জনক নয়, ধ্বংসকারীও।' বলল ডাঃ রাসাত। গম্ভীর তার কণ্ঠ।

'ঠিক ডাঃ রাসাত। সত্যিই সব মানুষ এক বিপজ্জনক ও ধ্বংসকরী অবস্থার মধ্যে রয়েছে। আমাদের ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআনে একটা ছোট্ট সূরা রয়েছে। তার নাম 'আসর' বা 'কাল'। এই সূরা বা ভার্স-এ আল্লাহতায়ালা 'কাল'-এর (যে কাল মানুষের ক্ষতি ও সফলতার সাক্ষী) শপথ করে বলেছেন, নিশ্চয় সব মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে, শুধু তারা ছাড়া যারা বিশ্বাসী, যারা সৎকর্মশীল এবং যারা সত্য ও ধৈর্য্যের উপদেশ দেয়। এই ভার্স-এ একথা.......।'

'স্যরি, আমি জানতে চাচ্ছি, ইচ্ছাশক্তি যদি অন্ধ হয় এবং তা যদি মানুষের বিশ্বাস ও কর্মধারার পরিচালক হয়, তাহলে অন্ধ ইচ্ছাশক্তির হাত থেকে বেঁচে মানুষ নিশ্চিতভাবে অবিশ্বাসী না হয়ে সুবিশ্বাসী, অসৎকর্মশীল না হয়ে সৎকর্মশীল হবে কি করে?' বলল দ্রুতকণ্ঠে সাবাতিনি ইয়াসার।

'বলছি সাবাতিনি। বলেছি, মানুষের ইচ্ছাশক্তি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। ইচ্ছাশক্তির বিচারবোধ বা জ্ঞানচক্ষু নেই, এই অর্থেই সে অন্ধ। এই অন্ধ ইচ্ছাশক্তিকে পথ চেনাবার জন্যে আল্লাহ মানুষকে 'অন্ধের যষ্টি'ও দিয়েছেন। এই 'অন্ধের যষ্টি' হলো মানুষের বিবেক ও জ্ঞান। ইচ্ছাশক্তির সাথে সাথে আল্লাহ মানুষকে এই দুই জিনিস দিয়েছেন, যাতে মানুষের ইচ্ছাশক্তি সঠিকভাবে চলার দিক নির্দেশনা পায়। ইচ্ছাশক্তির দিক নির্দেশনা স্বরূপ এই দুই জিনিসের মধ্যে 'বিবেক' খারাপ-ভালো, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সব মানুষের মধ্যে সমানভাবে আছে। আর দ্বিতীয় বিষয় 'জ্ঞান' মানুষকে শিক্ষার মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। জ্ঞানের আবার দু'টি উৎস রয়েছে। একটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী-রাসূলদের মাধ্যমে আসা 'ওহী'র জ্ঞান, অন্যটি জাগতিক শিক্ষা থেকে অর্জিত জগৎ বিষয়ক জ্ঞান। ওহীর জ্ঞান মানুষকে 'বিশ্বাস' ও 'কর্মপদ্ধতি বা কর্মধারা' সম্পর্কে জ্ঞান দান করে। মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে মংগলের পথে, ন্যায়ের পথে,

শান্তি-স্বস্তির পথে, পরকালীন ভালোর পথে পরিচালনার জন্যে 'ওহী'র জ্ঞান অনুসরণ অপরিহার্য। ইচ্ছাশক্তির হাতে যদি 'অন্ধের যষ্টি' 'বিবেক' ও 'ওহী'র জ্ঞান না থাকে, তাহলে ইচ্ছাশক্তির যাত্রা হয় বিপজ্জনক, ধ্বংসকরী।'

''ওহী'র জ্ঞান থাকলে 'বিবেক'-এর কি প্রয়োজন আছে? এ দুইয়ের পার্থক্য কি, সম্পর্ক কি?' জিজ্ঞাসা সাবাতিনির।

আহমদ মুসা বলল, 'বিবেক হলো মানব মনের ভালো-মন্দ বাছাইয়ের একটা সহজাত শক্তি। এটা সকল মানুষের 'জীন'-এ এনকোডেড একটা কমন বিষয়। অন্যদিকে 'ওহী'র জ্ঞান হলো আল্লাহতায়ালা কর্তৃক তাঁর নবী-রাসূলদের মাধ্যমে পাঠানো মানুষকে মঙ্গল ও মুক্তির পথে পরিচালনার জন্যে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবন-পদ্ধতি। 'বিবেক-জ্ঞান' ও 'ওহী'র জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য হলো, 'বিবেক-জ্ঞান' বলতে পারে কাজটি ভালো না মন্দ, গ্রহণীয় না বর্জনীয়। কিন্তু 'বিবেক-জ্ঞান' মানুষকে মঙ্গল ও মুক্তির পথে পরিচালনার জন্যে কোন করণীয় ও কর্মপ্রণালী তৈরি করে না। এমনকি 'বিবেক-জ্ঞান' একজন স্রষ্টা আছেন, এমন একটা অনির্দিষ্ট অনুভূতি দান করা ছাড়া স্রষ্টার পরিচয়, স্রষ্টার ইচ্ছা, স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্কের বিষয়ে কিছুই বলতে পারে না। বিবেকের পক্ষে পারা সম্ভব নয়, এমন সব জ্ঞানের বিশ্বাস নিয়েই নবী-রাসূলরা দুনিয়ায় এসেছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে। মানুষের জন্যে 'ওহী'র জ্ঞান সুনির্দিষ্ট করার পর বিবেক-জ্ঞান কেন প্রয়োজন, এ প্রশ্নও উঠতে পারে। এক্ষেত্রে অনুধাবনের সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, 'ওহী'র জ্ঞান মানব মনের সহজাত প্রবণতায় সাধারণভাবে এনকোডেড কোন বিষয় নয়, এটা আয়ত্ত সাপেক্ষ, যা প্রচারের মাধ্যমে সবার কাছে পৌঁছার কথা। কিন্তু দুনিয়ার সব জায়গার সব মানুষের কাছে এই প্রচার নাও পৌঁছতে পারে। সেক্ষেত্রে বিবেক-জ্ঞান হবে তাদের অবলম্বন, যার কাছ থেকে তাদের ইচ্ছাশক্তি পাবে দিক-নির্দেশনা। ' থামল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা থামতেই সাবাতিনি বলে উঠল, 'আপনার শেষের কথায় একথা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে, 'ওহী'র জ্ঞান পৃথিবীর সব জায়গায় সব মানুষের কাছে পৌঁছা দরকার। না হলে তারা ঠকবে, একমাত্র এবং অনির্দিষ্ট বিবেক-জ্ঞান নিয়েই তাদের চলতে হবে এবং তার ফলে জীবন-পরিচালনার সঠিক নির্দেশনা

থেকে তারা বঞ্চিত হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু দুনিয়ার সব মানুষের কাছে 'ওহী'র জ্ঞানের কি প্রচার হচ্ছে? না হলে তার উপায় কি? দ্বিতীয় বিষয় হলো, 'বিবেক-জ্ঞান' যেভাবে মানব প্রবণতার একটা সহজাত বিষয় হিসেবে 'এনকোডেড' হয়েছে, সেভাবে 'ওহী'র জ্ঞান মানব-প্রবণতার সহজাত বিষয় হিসেবে এনকোডেড হলে দুনিয়ার কেউই তাহলে এই জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থাকতো না। এ বিষয় সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'সাবাতিনি, তোমার শেষ বিষয় থেকেই শুরু করি। 'বিবেক-জ্ঞান' অপরিবর্তনশীল। দুনিয়ার প্রথম মানুষের এই জ্ঞান যেমনি ছিল, দুনিয়ার শেষ মানুষেরও তেমনি থাকবে। এজন্যে বিবেক-জ্ঞান শুরুতেই সর্বকালের মানুষের জন্যে এনকোডেড করা গেছে। কিন্তু ওহীর জ্ঞান পরিবর্তনশীল। সময় ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে 'ওহী'র জ্ঞানভিত্তিক জীবন-পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়ে আসছে। এই পরিবর্তনশীলতার জন্যে 'বিবেক-জ্ঞান'-এর মতো একে 'এনকোডেড' করা হয়নি। আধুনিক কালে এসে পরিবর্তন প্রয়োজনের সমাপ্তি ঘটানো হয়েছে মানবজাতির জন্যে সর্বশেষ ও আগামী সর্বকালের জন্যে 'ওহী'র জ্ঞান বা ওহীভিত্তিক জীবন-পদ্ধতি প্রেরণের মাধ্যমে। 'ওহী'র জ্ঞান সহজাত প্রবণতার ন্যায় এনকোডেড (Encoded) না হবার আরেকটা কারণ হলো, এই জ্ঞান প্রকৃতিজাত বা সহজাত হলে একে মানুষের জন্যে পরীক্ষার বিষয় করা যেত না। অথচ কে ভালো হতে চায়, কে চায় না- এই পরীক্ষা মানব সৃষ্টির সবচেয়ে বড় বিষয়। এর মাধ্যমেই পরকালীন জীবনের জন্যে পুরষ্কার বা তিরস্কার নির্ধারিত হবে।'

'ধন্যবাদ জনাব। আপনি ধর্মবেত্তা বা বিজ্ঞান-বেত্তা অথবা দার্শনিক হলে ভালো হতো। আমার অনার্সের সাবসিডিয়ারী বিষয়ের একটি হলো ধর্ম। আমাদের স্যাররা কিন্তু আপনার মতো এত গভীর, সেই সাথে সর্বাধুনিক দৃষ্টিভংগীর ধারে-কাছে নেই। আপনি বিরক্ত হতে পারেন। কিন্তু এসব বিষয়ে আমার আপনাকে বিরক্ত করার সম্ভাবনা আছে। যাক, আপনি একটা সাংঘাতিক কথা বলেছেন। আপনি ইসলামকে সর্বশেষ এবং আগামী সর্বকালের ধর্ম বা

জীবন-পদ্ধতি হিসেবে অভিহিত করে সব ধর্মকে বাতিল করে দিয়েছেন।' বলল সাবাতিনি ইয়াসার।

'আমি বাতিল করিনি। স্বাধীন নিয়মেই সব বাতিল হয়ে যাবার কথা। নতুন সংবিধান চালুর অর্থ আগের সংবিধান আর নেই। এটাই স্বাভাবিক। ধর্ম এর বাইরে নয়।' আহমদ মুসা বলল।

সাবাতিনি কিছু বলতে যাচ্ছিল। তাকে বাঁধা দিয়ে ডাঃ ইয়াসার বলে উঠল, 'আর নয় সাবাতিনি। উনি সুস্থ নন। ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও।'

'স্যরি আব্বা, স্যরি জনাব। তবে আমি অপ্রয়োজনীয় কিছু বলিনি।' বলল সাবাতিনি প্রথমে তার আব্বা, পরে আহমদ মুসার দিকে ঘুরে।

'মিঃ খালেদ খাকান, আপনি যতক্ষণ ইচ্ছা রেস্ট নিন, তবে এক ঘন্টার কম নয়। আমরা পাশের ঘরেই আছি।' বলল ডাঃ রাসাত।

'ধন্যবাদ ডাক্তার।' বলে একটু থেমেই আবার সাবাতিনিকে লক্ষ্য করে বলল, 'আমার একটা প্রশ্ন, আপনার বাড়ির অপজিটে রাস্তার পশ্চিম পাশে বাগান ঘেরা বড় বাড়িটা কার?'

'কেন, বাড়িটা ভালো লেগেছে আপনার? ভালো লাগলেও লাভ নেই। ওটা 'সিনাগগ'। শুধু সিনাগগও নয়, ওটা একটা জুইশ কমপ্লেক্স। ওকে শুধু ইস্তাম্বুল নয়, তুর্কি জুইশদের রাজধানীও বলতে পারেন।' বলল ডাঃ রাসাত।

আহমদ মুসা মুখে বেজার ভাব এনে বলল, 'আমি হতাশ হলাম।'

কিন্তু বাড়িটার এই পরিচয় পেয়ে ভীষণ খুশি হয়েছে আহমদ মুসা। আজ পুলিশ আর্কাইভসে পাঁচ গোয়েন্দা নিখোঁজ হওয়ার দিনের নির্দিষ্ট সময়ের সিসিটিভির এই রাস্তার মনিটরিং-এর ছবিগুলো পরীক্ষা করতে গিয়ে সে দেখেছে, পাঁচ গোয়েন্দাকে বহন করা গাড়িটি সর্বশেষ ঐ বাড়িতেই প্রবেশ করে। গাড়িটার বের হবার দৃশ্য পরবর্তী চার-পাঁচ ঘন্টার মনিটরিং-এর ছবি পরীক্ষা করেও আর সে পায়নি। এর অর্থ, এখান থেকেই পাঁচ গোয়েন্দা এবং তাদের গাড়িটা উধাও হয়েছে।

'বাড়িটার কি কি সুন্দর লেগেছে আপনার কাছে?' জিজ্ঞেস করল ডাঃ রাসাতই আবার।

'সবই সুন্দর লেগেছে। যে টিলার ওপর বাড়িটা, তা আনকমন। এই আয়তনের কোন টিলার এত প্রশস্ত ফেস খুবই দুর্লভ। বাড়িটার বিশালত্ব এবং দুর্গ ধরনের বৈশিষ্ট্য দৃষ্টি আকর্ষণের মতো। বাড়িটা যেন চারদিক থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রেখে তার নিরাপত্তা ও নিরিবিলি পরিবেশকে অখণ্ড করে তুলেছে। বাড়ির মিছিলে থেকেও সে যেন একা, ভিন্নতর, স্বতন্ত্র। চারিদিকে হৈ চৈ, কিন্তু সে মৌন।' থামল আহমদ মুসা।

হেসে উঠল ডাঃ রাসাত, ডাঃ ইয়াসার এবং সাবাতিনি একসাথে। বলল ডাঃ রাসাত, 'বাড়িটা সব সময় আমাদের নজরে আসে কিন্তু কখনও বিশেষ বলে মনে হয়নি। অথচ আপনার বর্ণনা শুনে বাড়িটা আমার কাছে সবিশেষ হয়ে উঠেছে। আমরাও যেন ভালোবেসে ফেলছি বাড়িটাকে বর্ণনার মাধুর্যে। আপনি কি কবি না শিল্পী?'

'দুই-ই আম্মা। কবির কথামালা, শিল্পীর তুলি যেমন সাধারণকে অসাধারণ এবং অরূপকেও অপরূপা করে, উনিও তাই করেছেন।' বলল সাবাতিনি। তার চোখে-মুখে বিচ্ছুরিত এক বিমুগ্ধতা। তার অতল নীল চোখে নিজেকে হারিয়ে ফেলার এক আনমনা দৃষ্টি।

'চাঁদের কলঙ্কের মতো বাড়িটার কিছু দোষও আছে। বাড়িটাতে কোন প্রাণের স্পন্দন নেই। বাড়িটার বড়, ভারি সিংহদ্বারটি আমার কাছে কারাগারের নিষ্ঠুর দরজা বলে মনে হয়।' বলল আহমদ মুসা।

আবারও হেসে উঠল ডাঃ ইয়াসার ও ডাঃ রাসাত।

কিন্তু গম্ভীর সাবাতিনি বলে উঠল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, 'আপনার অনুভূতি এত স্পর্শকাতর জনাব!' সাবাতিনির কণ্ঠে কম্পিত এক আবেগ।

'মিঃ খালেদ খাকান, আপনার অনুভূতিটা ঠিক। বাড়িটার বিরাটত্ব, গেটে দারোয়ান না থাকা, গেট ঘন ঘন না খোলা ইত্যাদি কারণে আপনার এই অনুভূতির সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু বাড়িটা প্রাণহীন নয়, বাড়িতে লোক আছে। গেট ভেতর থেকে নিয়ন্ত্রিত। গেটের সামনে লোক গেলেই ভেতর থেকে টিভি স্ক্রীনে তাকে দেখা যায় আর তখন দরজা খুলে দেয়া হয়। বাড়িটা পারিবারিক নয় বলে মানুষের

আনাগোনা, যাতায়াত কম। যারা ওখানে আসেন, নির্দিষ্ট সময়গুলোতে আসেন।' সাবাতিনির কথা শেষ না হতেই বলল ডাঃ রাসাত।

'তাই হবে। কিন্তু শনিবার সিনাগগে প্রচুর ভিড় হয়।' বলল আহমদ মুসা।

'হতো। কিন্তু পাশেই সিজলি বিজনেস ডিস্ট্রিক্ট-এ সম্প্রতি আরেকটা সিনাগগ হয়েছে। ভিড়টা ওখানে চলে গেছে। এ সিনাগগে ইস্তাম্বুলের জুইশ দায়িত্বশীলরা আসেন। ইস্তাম্বুলের বাইরে থেকেও দায়িত্বশীলরা আসেন। এখন বলা যায়, এটা বিশেষ সিনাগগ। এখানে প্রার্থনার অনুষ্ঠান দীর্ঘ হয়। কারণ, প্রার্থনার সাথে মিটিং-সিটিংও থাকে।' বলল ডাঃ রাসাত।

আহমদ মুসা মনে মনে ধন্যবাদ দিল রাসাতকে। বাড়িটা সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পাওয়া গেল। ষড়যন্ত্রের প্রাথমিক এক রূপরেখাও অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অন্য কিছু না ঘটলে পাঁচ গোয়েন্দা এই ভবনে ঢুকেই নিখোঁজ হয়েছে। এটাই আজকের বড় পাওয়া। আনন্দিত কণ্ঠে আহমদ মুসা বলল, 'অনেক কথা হলো। মন ভালো লাগছে আমার। আঘাতের বেদনাও যেন কমে গেছে। আমাকে রিলিজ করলে খুশি হই।'

'রিলিজ আপনি হয়েই আছেন। আপনি যেহেতু নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করবেন, এজন্যেই বলছি, আপনি কিছু সময় রেস্ট নিন। আর এখনই যদি যেতে চান, তাহলে আপনার ড্রাইভ করা হবে না, আমরাই আপনাকে পৌঁছে দেব।' বলল ডাঃ ইয়াসার।

'না ডাক্তার, আপনাদের আর কষ্ট দেয়া ঠিক হবে না। রেস্ট নেয়া আমার জন্যে ভালো আর আপনাদেরও কষ্ট দেয়া থেকে বাঁচা যাবে। এই চোখ বুজলাম, ধন্যবাদ।' বলে আহমদ মুসা বালিশে মাথাটা রাখল।

'ধন্যবাদ মিঃ খালেদ খাকান। আমরা ওপাশের ঘরটায় আছি।'

বলে ডাঃ ইয়াসার ঘর থেকে বের হবার জন্যে পা বাড়াল। তার সাথে ডাঃ রাসাতও।

'আমিও আসছি জনাব। আমার কথা কিন্তু শেষ হয়নি।' বলল সাবাতিনি।

'শেষ হবার কথা নয়। একজন ছাত্রীর জন্যে এটাই স্বাভাবিক। ধন্যবাদ।' আহমদ মুসা বলল।

‘ধন্যবাদ জনাব।’ বলে সাবাতিনি পাশের ঘরে ঢুকে গেল।

# ৪

মোবাইলে রিং শুনে আহমদ মুসা চোখ খুলল। ডান হাত দিয়ে বালিশের পাশের মোবাইলটি অন করল আহমদ মুসা। অভ্যাসমতো ডান পাশ ঘুরে বাম হাত দিয়ে মোবাইল নিয়ে কানে তুলতে চাইল।

অন্যদিনের মতোই ডান পাশ ঘুরতে গেল আহমদ মুসা। তখন মাথা ও ডান কাঁধের ব্যথায় প্রচন্ড ঘা লাগল। মুখ থেকে 'আহ' শব্দ বেরিয়ে এল আপনাতেই। পাশ ফিরতে পারল না আহমদ মুসা।

বাঁ হাত ঘুরিয়ে মোবাইল নিয়ে চোখের সামনে ধরল। মোবাইল স্ক্রীনে 'DJ' শব্দ দেখে চমকে উঠল আহমদ মুসা। ডোনা জোসেফাইনের টেলিফোন! নিশ্চয় সে তার বেদনাজড়িত আর্তকণ্ঠ শুনতে পেয়েছে। আহমদ মুসা তার আহত হওয়ার খবর গত রাতে ডোনা জোসেফাইনকে জানায়নি। ভেবেছিল, তেমন বড় আঘাত নয়, তাকে অহেতুক চিন্তায় ফেলার দরকার নেই। এখন জানতে পারলে তো সে কেন গোপন করেছি তা নিয়ে মন খারাপ করবে। একই শহরে কয়েক মাইলের ব্যবধানে দু'জন থাকছি, সন্ধ্যার এত বড় খবর সকাল নয়টা পর্যন্ত জানানো হয়নি, এই দায়িত্বহীনতা আড়াল করার মতো নয়। যাক, যা হবার হয়েছে। বেশি রাতের ব্যাপার, সুযোগ পায়নি টেলিফোন করতে, এটাই বলার মতো একটা কথা।

পরিকল্পনা অনুসারে একই প্লেনে একই দিনে আহমদ মুসা ও ডোনা জোসেফাইন ইস্তাম্বুল এসেছে। থাকার জায়গাও দু'জনের দু'জায়গায়। দু'জনেই ইস্তাম্বুলের ইউরোপীয় অংশে থাকছে। কিন্তু ডোনা জোসেফেইনের থাকার জায়গা করা হয়েছে গোল্ডেন হর্নের দক্ষিণে আদি ইস্তাম্বুল অংশে।

ডোনা জোসেফাইনের থাকার এলাকা সিলেকশন তার নিজের। ওসমানীয় খলিফারা যেখানে বসে পাঁচশ' বছর ধরে ইউরোপ ও এশিয়া শাসন করেছিল, গোল্ডেন হর্নের উত্তরের সেই ইস্তাম্বুলে থাকার জন্যে পছন্দ করেছিল

ডোনা জোসেফাইন। কিন্তু যে স্থানে থাকতে চেয়েছিল, সেই স্থান সে পায়নি। তার পছন্দ ছিল আইয়ুব সুলতান মসজিদের আশে-পাশে কোথাও থাকা, যাতে মসজিদটিতে ইচ্ছেমতো নামায পড়ার সুযোগ হয়। কিন্তু নিরাপত্তার দিক বিবেচনা করে সেখানে রাখার ব্যবস্থা তুর্কি সরকার করতে পারেনি। ঐ এলাকায় প্রেসিডেন্সিয়াল কোন অতিথি ভবন নেই। পরিবর্তে ডোনা জোসেফাইনকে যেখানে রাখা হয়েছে, সেটা ধর্মীয় আবেগের দিক দিয়ে না হলেও ঐতিহ্য-আবেগের দিক দিয়ে অতুলনীয়। মর্মর সাগর, বসফরাস প্রণালী এবং গোল্ডেন হর্ন একসাথে আছড়ে পড়ছে ঈগলের ঠোঁটের মতো যে ভূ-খণ্ডের ওপর, সেখানেই ওসমানীয় খলিফাদের পাঁচশ' বছর শাসন পরিচালনার গৌরব-দীপ্ত কেন্দ্র 'তোপকাপি' প্রাসাদ। এই প্রাসাদ এলাকা সংরক্ষিত এবং সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থার অধীন। এই প্রাসাদের উত্তর-পূর্ব দিকে মর্মর সাগর, বসফরাস, গোল্ডেন হর্নের আছড়ে পড়া পানির আরও নিকটে প্রাসাদ এরিয়ার মধ্যেই রয়েছে হাই সিকিউরিটি ব্যবস্থার অধীন একটা প্রেসিডেন্সিয়াল ভবন। তোপকাপি প্রাসাদে এলে প্রেসিডেন্ট এখানে বিশ্রাম নেন। এই ভবনে প্রেসিডেন্সিয়াল স্যুইট ছাড়াও ভিভিআইপি প্রেসিডেন্সিয়াল অতিথিদের জন্যে আছে আরও কিছু স্যুইট। এই স্যুইটের একটা দেয়া হয়েছে ডোনা জোসেফাইনকে। তার স্যুইটের বারান্দায় বসে মর্মর সাগর, বসফরাস ও গোল্ডেন হর্নের অপরূপ দৃশ্য উপভোগ করা যায়। আইয়ুব সুলতান মসজিদের আশেপাশে থাকার ইচ্ছে পূরণ না হলেও তোপকাপি প্রাসাদের সান্নিধ্যে কল্পনার মর্মর, বসফরাস ও গোল্ডেন হর্নকে হাতের মুঠোয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছে ডোনা জোসেফাইন। স্যুইটে উঠেই ডোনা জোসেফাইন টেলিফোন করে তার আবেগের কথা আহমদ মুসাকে জানিয়েছে।

কোন জরুরি প্রয়োজন না হলে ডোনা জোসেফাইন আহমদ মুসাকে দিনে-রাতে দু'বারের বেশি টেলিফোন করে না। দু'বার টেলিফোনের একটা রাত দশটায় আর দ্বিতীয়টা হলো সকাল নয়টায়।

মোবাইল কানের পাশে নিয়েই আহমদ মুসা বলল, 'আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছ জোসেফাইন?'

‘ওয়া আলাইকুম সালাম। তুমি অসুস্থ! তোমার কি হয়েছে? তুমি তো এমন কঁকিয়ে ওঠ না সাধারণ কোন বেদনাতেই?’

‘মোবাইলটা নেয়ার জন্যে হঠাৎ পাশ ফিরেছিলাম। অজান্তেই ব্যথা পেয়েছি, অজান্তেই শব্দটা বেরিয়ে এসেছে। তোমাকে বলা হয়নি, একটা সুখবর হলো, গতকাল নতুন শত্রুদের সাক্ষাৎ মিলেছে। কিন্তু খারাপ খবর হলো, ওদের ‘বিনা মেঘে বজ্রপাত’-এর মতো আক্রমণে মাথার ডান পাশ ও কাঁধ আহত হয়েছে। ঐ ব্যথাতেই ডান পাশ ফিরতে পারছিলাম না।’ আহমদ মুসা বলল।

‘স্যরি, তুমি বিষয়টাকে খুব হালকাভাবে দেখছ। এমনটা যদি হয়, তাহলে কিন্তু আমি মর্মর, বসফরাস ও গোল্ডেন হর্ন-তীরের আরাম-আয়েশের এই অবকাশ কেন্দ্র ছেড়ে উঠব তোমার আলালা পাহাড়ের সরাইতে।’ বলল ডোনা জোসেফাইন।

‘স্যরি জোসেফাইন, আমি সাড়ে দশটায় রোমেলী দুর্গে ফিরেছি। তখন তুমি ঘুমিয়ে পড়ার কথা। তোমাকে ঘুম থেকে তুলে এই দুঃসংবাদটা দেয়া আমি ঠিক মনে করিনি। আর ভোরে নামায পড়েই আবার আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।’

জোসেফাইনের জবাব সংগে সংগে এলো না। একটু সময় নিয়ে ধীর কণ্ঠে বলল, ‘ধন্যবাদ। মাথার ডান পাশের আঘাতটা তোমার কেমন? তুমি এখানে এস, না হলে কিন্তু আমি ওখানে যাব।’ বলল ডোনা জোসেফাইন।

‘না জোসেফাইন, তেমন বড় আঘাত নয়। যেখানে আহত হই, সেখান থেকেই দু’জন ডাক্তার দম্পতি আমাকে তাদের বাসায় নিয়েছিলেন। ওরাই চিকিৎসা করেন। আমি ওখানে দু’ঘন্টার মতো বিশ্রাম নেয়ার পর বাসায় ফিরেছি। আমিই তোমার ওখানে আসব। প্লিজ, তুমি আহমদ আবদুল্লাহকে নিয়ে ‘সরাই’তে কিংবা ‘রোমেলী’তে এস না। এ দু’জায়গা এখন ওদের নজরে।’

‘বল, তুমি আরও সাবধান হবে। তোমার এবারের শত্রু ষড়যন্ত্রকারী এবং ওরাই অফেন্সিভে। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, তুমি শত্রুকে দেখছ না, এমনকি জানই না তারা কারা! অথচ তুমি সর্বক্ষণ ওদের নজরে রয়েছ। এমন লড়াই বিপজ্জনক।’ বলল ডোনা জোসেফাইন। তার কণ্ঠ ভারি।

‘অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে জোসেফাইন। ডাক্তার-দম্পতির বাড়ি থেকে একটা বড় ক্লু আমি পেয়ে গেছি। আর.......।’

‘না, এসব কথা টেলিফোনে নয়। আমি জানি, অবস্থার পরিবর্তন আল্লাহ করবেন।’ আহমদ মুসার কথায় বাঁধা দিয়ে বলল ডোনা জোসেফাইন।

‘ধন্যবাদ জোসেফাইন। এখন বল, তুমি এদিক-সেদিক ঘুরছ, না শুধু ঘরে থাকছ? ঠিক-ঠাক সহযোগিতা পাচ্ছ তো?’ আহমদ মুসা বলল।

‘প্রয়োজনের বেশি বলতে পার। আমার সেক্রেটারি লতিফা আরবাকান খুব বুদ্ধিমতী, খুব স্মার্ট, খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্না। তার ব্যবস্থাপনায় কোন ত্রুটি নেই। প্রতিদিনই বের হচ্ছি। আগে-পেছনে দুই গাড়িতে দশ জন সিকিউরিটির লোক থাকে। আমার গাড়ি সেক্রেটারি লতিফা আরবাকান নিজে চালায়। তার পাশে বসে আমার পরিচারিকা। দু’একদিন পরপরই যাচ্ছি হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (আইয়ুব সুলতান)(রাঃ)-এর মাজার সংলগ্ন মসজিদে। মসজিদে নামায পড়ি ও দোয়া করি। ওখানে অনেকটা সময় কাটিয়ে ফিরে আসি। জান, সুলতানের মাজারের সামনে যখন দাঁড়াই, তখন চোখ ফেটে পানি আসে। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি আল্লাহর পথে লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে শত শত মাইল পথ পেরিয়ে এই সুদূর ইউরোপের রণক্ষেত্রে এসেছিলেন! নিজেকে তখন ছোট মনে হয় এবং হৃদয় থেকে তার জন্যে দোয়া বেরিয়ে আসে। এবার তুমি সময় নিয়ে এখানে এস। তোমাকে নিয়ে আমি তার মসজিদ ও মাজার জিয়ারতে যাব। তাঁদের সাথে তোমার মিল আছে। তোমাকে পাশে নিয়ে দোয়া করলে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অনেক বেশি পাব।’

‘তাঁদের সাথে আমাদের তুলনা করতে পার এই অর্থে যে, তাঁরা সূর্য আর আমরা পৃথিবী। আমাদের কোন আলো নেই, আমরা তাঁদের আলোতে আলোকিত হই। ঠিক জোসেফাইন, তোমাদের নিয়ে তাঁর কবর জিয়ারতে যাব। আমি ইস্তাম্বুল এসে সেদিনই তাঁর কবর জিয়ারতে গিয়েছিলাম। মন ভরে থাকতে পারিনি। তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে হয়েছিল।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তাঁদের সাথে তোমার তুলনা করেছিলাম এই অর্থে যে, দেশ, বাড়ি-ঘর ছেড়ে তাঁরা যেমন আল্লাহর জন্যে মানুষের কল্যাণে ঘুরে বেড়িয়েছেন নানা দিকে, নানা দেশে, তুমিও তো তেমনি করছ।’

বলে একটু থেমেই জোসেফাইন আবার বলে উঠল, ‘আজ নয়, তুমি দু’একদিন পরে এস। রেস্ট নিলে তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে।’

‘ধন্যবাদ জোসেফাইন। আহমদ আবদুল্লাহ কেমন মেজাজে আছে ওখানে? জ্বালায় না তো তোমাকে বেশি?’ আহমদ মুসা বলল।

‘মহাখুশি সে! আমি তাকে পাই-ই না বেশি। সেক্রেটারির সাথে মহা খাতির হয়েছে। তার সাথে আর পরিচারিকার সাথে সে ঘুরে বেড়ায়। আর যতক্ষণ বাড়িতে থাকে, সামনের ব্যালকনি বারান্দা তার প্রিয়। সে অবাক-বিস্ময়ে সারাক্ষণ চেয়ে থাকে বসফরাস, মর্মর সাগরের আদিগন্ত পানির দিকে। এ তার নতুন অভিজ্ঞতা।’ বলল জোসেফাইন।

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল। দরজায় নক হলো এ সময়। সংগে সংগে আহমদ মুসা প্রসংগ পাল্টিয়ে বলল, ‘জোসেফাইন, সম্ভবত কোন মেহমান দরজায় নক করছে। তোমার সাথে....।’

আহমদ মুসার কথায় বাঁধা দিয়ে ডোনা জোসেফাইন বলল, ‘আমি টেলিফোন রাখছি। পরে কথা বলব তোমার সাথে। আসসালামু আলাইকুম।’

‘ধন্যবাদ। ওয়া আলাইকুমুস সালাম।’

বলে আহমদ মুসা মোবাইল অফ করে দিল। দরজার মাথার ওপরে সেট করা সিসিটিভি স্ক্রীনে আগেই দেখতে পেয়েছে দরজার বাইরে জেনারেল তাহির তারিক এসে দাঁড়িয়েছেন।

মোবাইল রেখে দিয়ে আহমদ মুসা রিমোট কন্ট্রোলের বোতাম টিপে দরজা আনলক করে দিল। সংগে সংগে দরজা পাশের দিকে সরে গিয়ে দেয়ালে ঢুকে গেল।

দরজায় দাঁড়িয়ে জেনারেল তাহির তারিক।

আহমদ মুসা সালাম দিয়ে বলল, ‘আসুন জেনারেল তাহির তারিক।’

আহমদ মুসা উঠে বসেছে।

জেনারেল ঘরে ঢুকে ‘কেমন আছেন মিঃ আহমদ মুসা’ বলে সোজা আহমদ মুসার কাছে এল। মাথার ব্যান্ডেজের এরিয়া দেখে তার বাহু ও কাঁধে হাত দিয়ে ব্যান্ডেজের পজিশনটা দেখে নিয়ে বলল, ‘আল্লাহ রক্ষা করেছেন।

আঘাত মাথার খুলিতে না লেগে চামড়া কেটে পিছলে নেমে গেছে। কাঁধে তো যন্ত্রণা নেই, তাই না?'

'না জেনারেল তাহির তারিক, কাঁধে কোন যন্ত্রণা নেই, কাঁধে কোন ফ্র্যাকচার হয়নি।' বলল আহমদ মুসা।

'আলহামদুলিল্লাহ্। আল্লাহর হাজার শোকর। আপনি ঠিক সময়ে নিজেকে সরিয়ে নিতে পেরেছিলেন।' বলল জেনারেল তাহির তারিক।

খাটের পাশেই সোফায় বসল জেনারেল তাহির তারিক।

বসেই বলে উঠল, 'রাতেই আমি আসতে চেয়েছিলাম। আপনি নিষেধ করলেন। কিন্তু সারারাত আমি উদ্বেগে ঘুমাতে পারিনি। আঘাত কেমন, আপনি এত তাড়াতাড়ি টার্গেট হয়ে গেলেন, শত্রু সরাসরি আক্রমণ করতেও সাহস পেল ইত্যাদি চিন্তা সারারাত আমাকে কষ্ট দিয়েছে।'

'কিন্তু কালকের ঘটনা আমাকে আনন্দিত করেছে।' বলল আহমদ মুসা।

'আনন্দ পেয়েছেন? কিভাবে?' বলল জেনারেল তাহির তারিক।

'ইস্তাম্বুলে আসার পর বলা যায় অন্ধকারেই ঘুরছিলাম। কিন্তু কার্যকারণ সামনে রেখে সামনে এগোতে চেষ্টা করছিলাম। কালকে প্রথমবারের মতো শত্রুদের আমি সামনে পেলাম। এছাড়া আমাদের পাঁচ গোয়েন্দা যে বাড়িতে ঢোকার পর নিখোঁজ হয়ে গেছেন, সেটাও আমি গতকালের অভিযানে জানতে পেরেছি। সম্ভবত এ জানার ব্যাপারটা ঠেকানোর জন্যেই ওরা আমাকে সরিয়ে ফেলতে চেয়েছে তাৎক্ষণিকভাবেই। শত্রুদের পরিচয়ের একাংশও আমি জানতে পেরেছি বলে মনে হচ্ছে।' আহমদ মুসা বলল।

জেনারেল তাহির তারিকের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'আলহামদুলিল্লাহ্। ধন্যবাদ আহমদ মুসা। সত্যি আল্লাহর বিশেষ সাহায্য আপনার সাথে রয়েছে।'

'কিন্তু একটা জিনিস আমি বুঝতে পারছি না, কালকে আমি পুলিশ আর্কাইভসে গিয়েছিলাম এবং কি জন্যে গিয়েছিলাম তা শত্রুর কাছে প্রকাশ হয়ে গিয়েছিল। তারা আর্কাইভসের বাইরে আমার বের হওয়ার জন্যে ওঁৎপেতে ছিল।' আহমদ মুসা বলল।

বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলল জেনারেল তাহির তারিক। কয়েক মুহূর্ত আহমদ মুসার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, ‘আপনি পুলিশ আর্কাইভসে যাচ্ছেন, এটা আমদের এখানকার কেউ জানত?’

‘হ্যাঁ, আমি এ ব্যাপারে আলাপ করেছিলাম ডঃ শেখ বাজের সাথে। তিনিই শুধু জানতেন।’

মুখটা বিমর্ষ হয়ে গেল জেনারেল তাহির তারিকের। একটুক্ষণ ভেবে একটা ঢোক গিলে বলল, ‘কিন্তু ডঃ শেখ বাজ তো খুবই পরীক্ষিত মানুষ। তার বিশ্বস্ততা নিয়ে প্রশ্ন তোলার মতো কিছুই আমরা পাইনি অতীতে। তাহলে সে কি কাউকে বাই দি বাই বলে ফেলেছিল?’ অনেকটা স্বগত কণ্ঠের মতো বলল জেনারেল তাহির তারিক।

‘আমি তার সাথে রাত্রেই কথা বলেছি জেনারেল। ডঃ শেখ বাজ বিষয়টি আর কাউকেই জানাননি। তিনি বলেছেন এবং আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি ও অফিস রেকর্ডেও পেয়েছি, ডঃ শেখ বাজ গতকাল বিকেল তিনটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত অফিসে ছিলেন। সন্ধ্যা ছয়টার পর তিনি হাঁটাহাঁটি করার জন্যে বাইরে গিয়েছিলেন। বেলা তিনটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত অফিসে থাকাকালে তিনি বাইরে কোন টেলিফোনও করেননি। অফিসের মোবাইল মনিটরিং রেকর্ড থেকে এ বিষয়টা নিশ্চিত হওয়া গেছে। আমি মনে করি, কালকের ঘটনায় তিনি সন্দেহের ঊর্ধ্বে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তাহলে কিভাবে শত্রুর কাছে কথাটা পৌঁছতে পারে?’

‘সেটাই ভাবনার বিষয়। শত্রুর কাছে আমাদের গতিবিধি পৌঁছার ঘটনা ও আমার সন্দেহ যদি সত্য হয়, তাহলে অতীতে আমাদের দুই তদন্ত টিম কিভাবে ব্যর্থ ও শেষ হয়ে যায় তা পরিষ্কার হয়ে যাবে।’

‘এখন আমাদের কি করণীয় বলুন।’ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জেনারেল তাহির তারিক বলল।

‘আপাতত কিছুই করার নেই। আমাদের নিরাপত্তা-ব্যবস্থার মধ্যে কোথাও ছিদ্র আছে কিনা খুঁজে বের করতে হবে। আমি ডঃ শেখ বাজকেও বলেছি,

বিষয়টা যে আমাদের নজরে এসেছে, কোন দ্বিতীয় জন যেন আর জানতে না পারে।’

বলে একটু থামল আহমদ মুসা। একটু ভেবে নিয়ে ধীরে ধীরে বলল, ‘আমি শুনেছি, এখানে যারা থাকেন তাদের স্ত্রীরা মাঝে মাঝে এখানে আসেন। হয়তো এসে স্বামীকে বাড়িতে বা প্রোগ্রামে নিয়ে যান কিংবা তারা এদিকে বেড়াতে এসে স্বামীর সাথে দেখা করে যান। শুনেই আমার মনে হয়েছে, নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এটা একটা লিকেজ হতে পারে।’ বলল আহমদ মুসা।

জেনারেল তাহির তারিকের চোখে উদ্বেগ ফুটে উঠল। বলল, ‘জ্বি, এটা ঘটে। দু’দশ মিনিটের জন্যে ওরা আসেন, আমরা এটাকে খুব ক্ষতিকর মনে করিনি। ব্যাপারটা স্পর্শকাতর। শুরু থেকেই এটা না হলে ভালো হতো। কিন্তু রেওয়াজ চালু হবার পর বিনা কারণে এটা বন্ধ করাও কষ্টকর ছিল। আপনার পরামর্শ বলুন, প্লীজ। কোন সৌজন্যবোধ নয়, নিরাপত্তাই আমাদের কাছে বড়।’

‘আপাতত কোন পরিবর্তন দরকার নেই। সব কিছু যেমন চলছিল, তেমন চলুক। শুধু একটা অনুরোধ করব আপনার কাছে। আপনি দয়া করে এই ইনস্টিটিউটে যারা থাকেন, তাদের স্ত্রীদের ফটো ও তাদের জন্ম পরিচয় থেকে তাদের কমপ্লিট বায়োডাটা আমাকে দেবেন।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ধন্যবাদ। আমি তার ব্যবস্থা করছি। ফটো ও বায়োডাটা সবার আছে। আমরা নিয়োগ দেয়ার সময়ই সবার স্ত্রীদের বায়োডাটাও নিয়েছি। কিন্তু আপনি যেমনটা চাচ্ছেন, তেমনটা কমপ্লিট নাও হতে পারে। যদি না হয়, তাহলে কমপ্লিট করেই আপনাকে দেব।’ জেনারেল তাহির তারিক বলল।

‘ধন্যবাদ জনাব।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আল্লাহর হাজার শুকরিয়া। আপনার চিন্তা ও কাজ সঠিক পথেই এগোচ্ছে মিঃ খালেদ খাকান। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন।’ জেনারেল তাহির তারিক বলল। তার কণ্ঠে আবেগ।

ডোরবেল থেকে সংকেত এল কেউ বাইরে এসেছে। দরজার ওপরের সিসিটিভির স্ক্রীনে দেখা গেল, ডঃ শেখ বাজ দরজার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন।

আহমদ মুসা রিমোটের সুইচ টিপে ডোরলক খুলে দিল।

আল-আলা সিনাগগের বিশাল প্রেয়ার হল। সাড়ে তিনশ’-চারশ’ লোক বসতে পারার মতো বিশাল হল ঘরটি।

অন্ধকার হল ঘরটি। শুধু প্রেয়ার পরিচালনার মঞ্চে অনেক উঁচু ছাদে একটা হলুদ বাল্ব জ্বলছে। অনুরূপ আর একটি বাল্ব জ্বলছে হলের মাঝ বরাবর ছাদে। এই দুই আলো ঘরের অন্ধকারকে ভৌতিক করে তুলেছে।

হলের চেয়ারের প্রথম রো’তে বসে আছে সাতজন মানুষ। আর প্রেয়ার হলের নিচে পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে চারজন লোক আসামীর এজলাসে দাঁড়ানো মানুষের মতো অ্যাটেনশন অবস্থায়।

চেয়ারের প্রথম রো থেকে পাঁচ-ছয় গজ সামনে থেকে শুরু হয়েছে প্রেয়ার মঞ্চ। হলের ফ্লোর থেকে প্রেয়ার মঞ্চটি এক ফুটের মতো উঁচু।

প্রেয়ার মঞ্চটি নাটকের মঞ্চের মতোই বেশ বড়। প্রেয়ার মঞ্চের পাথরের ফ্লোরটি শূন্য। কার্পেট বিছানো নেই কিংবা চেয়ারও নেই।

চেয়ারে বসা সারিবদ্ধ সাতজনের মাঝের ব্যক্তি তার হাতের রেডিয়াম ডায়ালের দিকে তাকাল। তারপর পাশের ব্যক্তির দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, ‘গ্র্যান্ড রাব্বি স্যার তো কোনদিন এক মিনিটও লেট করেন না! এখন তো বারটা চার মিনিট!’

তার কথা শেষ না হতেই মঞ্চের ঠিক মাঝখানের একটা বর্গাকৃতি অংশ কয়েক ইঞ্চি নেমে গিয়ে পাশে সরে গেল। সংগে সংগেই ফ্লোরে উঠে এল একটি চেয়ার। চেয়ারটা আলোকিত। চেয়ারে বসে গ্র্যান্ড রাব্বি আইজ্যাক বেগিন। মাথায় তার কালার টুপি, গায়ে কালো পোশাক। মুখটি খোলা।

ফ্লোরে চেয়ারটি স্থির হয়ে দাঁড়াতেই ঢোলের গমগমে ধ্বনির মতো আইজ্যাক বেগিনের কণ্ঠ বলল, ‘ঠিক বলেছেন সিনাগগ প্রধান ও আমাদের ‘ওয়ান ওয়ার্ল্ড অরবিট’ (থ্রি জিরো) ইস্তাম্বুল শাখার প্রধান ডেভিড ইয়াহুদ। আমার চার মিনিট লেট হয়েছে। চারজন অপদার্থ লোক আমাদের পিছিয়ে দিয়েছে। এই চার মিনিট তারই সিম্বল। আর হলের অন্ধকারটা ঐ চারজনের প্রতি ঘৃণার প্রতীক, যারা মিশন পরিত্যাগ করে জান বাঁচানোর জন্যে ফিরে এসেছে।’

বলে একটু থামল আইজ্যাক বেগিন।

আইজ্যাক বেগিন 'ওয়ান ওয়ার্ল্ড অরবিট' বা 'থ্রি জিরো' সংগঠনের ইউরোপ চ্যাপ্টারের প্রধান হিসেবে কাজ করছেন।

কয়েক মুহূর্ত পর আইজ্যাক বেগিনের কণ্ঠ আবার ধ্বনিত হলো প্রেয়ার মঞ্চের পাশে দাঁড়ানো চারজনের উদ্দেশ্যে, 'তোমরা জান, ডেভিড ইয়াহুদ তোমাদের কি জন্যে এনেছেন এখানে?'

চারজন হাতজোড় করে বলল, 'বিচারের জন্যে।'

'ধন্যবাদ। বল, তোমাদের পক্ষ থেকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে কি বলার আছে।' আইজ্যাক বেগিন বলল।

চারজনের একজন বলল, 'আমাদের টার্গেট খালেদ খাকান একা ছিলেন, অপ্রস্তুত ছিলেন। আমাদের মিশন সফল হওয়া সম্পর্কে ওভার সিওর ছিলাম। আমরা আক্রমণ করি। তাকে কাবু করেও ফেলা হয়। কিন্তু অবিশ্বাস্য এক দ্রুততার সাথে সে পাল্টা আক্রমণে আসে এবং আমরাই তার শিকারে পরিণত হই। এই আকস্মিকতায় এবং পাল্টা আক্রমণের কোনই পথ না দেখে এক উপায়হীন বিমূঢ় অবস্থায় আমরা পালিয়ে আসি।'

'আমাদের অভিধানে 'পালানো' নামক কোন শব্দ নেই। পালানো মানে খরচ হয়ে যাওয়া।'

আইজ্যাক বেগিনের কথা শেষ হবার সাথে সাথেই তার হাতের রিভলভার চারবার গর্জন করে উঠল।

প্রেয়ার মঞ্চের পাশে দাঁড়ানো চারটি দেহ মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে নিঃশব্দে মেঝের ওপর পড়ে গেল।

সংগে সংগে হলে আলো জ্বলে উঠল। সেই সাথে প্রেয়ার মঞ্চে আইজ্যাক বেগিনের সামনে একটি টেবিল এবং টেবিলের তিন দিক ঘিরে সাতটি চেয়ার মেঝের নিচ থেকে উঠে এল।

ফ্লোরের চেয়ারে বসা সাতজন নিঃশব্দে উঠে এসে আইজ্যাক বেগিনের সামনের সাতটি চেয়ারে বসল।

শিরদাঁড়া খাঁড়া করে অ্যাটেনশন অবস্থায় বসেছিল আইজ্যাক বেগিন।

ওরা সাতজনও সেভাবেই অ্যাটেনশন হয়ে বসল।

'মিঃ ডেভিড ইয়াহুদ, টেলিফোনে আপনার কিছু কথা শুনেছি। আপনিই শুরু করুন, ঘটনা সম্পর্কে আপনার কথা বলুন।' প্রথমেই কথা বলল আইজ্যাক বেগিন।

'আমরা নিশ্চিত জেনেশুনেই আমাদের অপেক্ষাকৃত চৌকশ চারজনকে খালেদ খাকানকে হত্যা করার জন্যে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু সে এত বড় ফাইটার তা আমরা বুঝতে পারিনি।'

'আপনি ডঃ শেখ বাজের সাথে তার কথাবার্তার মনিটরিংটা কি ভালো করে শুনেছেন? মনে হয় শোনেননি। শুনলে বুঝতেন, এর আগে যাদের আমরা 'ডিল' করেছি, তাদের থেকে খালেদ খাকান কত আলাদা! উকিলদের মতো প্রশ্ন, গোয়েন্দাদের মতো বিশ্লেষণ, ডাক্তারদের মতো তার ডায়াগনোসিস থেকে আপনার বোঝার কথা ছিল, সে সাধারণ কেউ নয়।' বলল আইজ্যাক বেগিন।

'ঠিক স্যার, আমরা এতটা গভীরে যাইনি। আমরা নিশ্চিত ছিলাম, আমাদের বাছাই করা চারজন যে কোন একজন মানুষকে কাবু করার জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু আমাদের হিসেবে ভুল ছিল। আমাদের আন্দাজের বাইরেও শক্তিমান ও কুশলী মানুষ আছে।' ডেভিড ইয়াহুদ বলল।

'কে এই লোক? কোত্থেকে একে আমদানি করল? এসেছে রেসিডেন্ট ডাইরেক্টর হিসেবে, কিন্তু কাজ শুরু করেছে গোয়েন্দার মতো। একে কিন্তু সময় দেয়া যাবে না। আমাদের গ্রাসে পড়লে তার বাঁচার আর অধিকার নেই। কৌশল এবং শক্তি দু'টিরই ব্যবস্থা কর। আগের মতো কৌশলে যদি কাজ হয়, তাহলে শক্তি ব্যবহারে না যাওয়াই ভালো।'

'যথা আজ্ঞা এক্সিলেন্সি। সে আর বেঁচে নেই ধরে নিন। জীবনের খাবারটা দু'একদিন খেয়ে নিক।' বলল ডেভিড ইয়াহুদ।

'তাই হোক ডেভিড। এখন আসল কথায় আসা যাক। আমাদের মূল কাজটা কতদূর এগোলো? বিজ্ঞানী ইঞ্জিনিয়ার সহযোগিতা করেনি, বরং বাঁধার সৃষ্টি করেছিল। তাকে সরানো হয়েছে। পরে আমাদের দু'টি অপশন ছিল। এক. প্রধান বিজ্ঞানীর সাথে যোগাযোগ এবং তা সফল না হলে বিজ্ঞানীকেই কিডন্যাপ করা, দুই. এই অপশন কাজে না এলে গোটা এই পাহাড়কেই ধূলায় পরিণত করা,

যার সাথে ধূলা হয়ে যাবে সকল বিজ্ঞানী, সমাধি হয়ে যাবে তাদের ভয়ংকর আবিষ্কার ‘সোর্ড’-এর। প্রথম অপশনটা কতদূর এগোলো?’

ডেভিড ইয়াহুদ তাকালো ‘থ্রি জিরো’-এর ইস্তাম্বুল প্রজেক্টের অপারেশন চীফ ইরগুন ইবানের দিকে। বলল, ‘অবস্থার বিবরণটা তুমিই দাও।’

‘ধন্যবাদ, স্যার’, বলে শুরু করল ইরগুন ইবান, ‘গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির প্রধান ও ‘সোর্ড’-এর জনক বিজ্ঞানী ডঃ আমির আবদুল্লাহ আন্দালুসীর সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা এখনও সফল হয়নি। যোগাযোগের জন্যে ইনস্টিটিউটে প্রবেশ সম্ভব নয়। নিশ্ছিদ্র একটা নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বাইরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সেনাবাহিনীর হাতে। এরপরও গোপনে অথবা গায়ের জোরে গবেষণাগারে ঢোকা যায়, কিন্তু আমরা যে যোগাযোগ চাই, তা এর দ্বারা হবে না। এজন্যে আমরা বিজ্ঞানীর ইস্তাম্বুলস্থ বাড়ির সন্ধান করছি। তিনি সপ্তাহের কোন এক সময় দুর্গ প্রাঙ্গণ থেকে সামরিক হেলিকপ্টারে তার বাড়ি যান। বাড়িতে একদিন কাটিয়ে আবার ফিরে আসেন। আমরা তার বাড়ির ঠিকানা জানার অন্যান্য চেষ্টার সাথে হেলিকপ্টারের ফ্লাইটটাকে লোকেট করার চেষ্টা করছি। তার বাড়ির সন্ধান পেলে আমরা সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ পাব। তিনি লোভ এবং ভয়েও রাজি না হলে আমরা তার পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যকে কিডন্যাপ করে তার ওপর চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করবো। সেটাও কাজ না করলে খোদ তাকে কিডন্যাপ করা হবে। এই গোটা অপারেশনের জন্যে আমাদের সময় প্রয়োজন। সময় বেশি লাগলেও এটাই নিশ্চিত পথ। এসব কিছুতে কাজ না হলে গবেষণাগার ধ্বংস করার অপশন তো আমাদের রয়েছেই।’

থামল ইরগুন ইবান।

সংগে সংগেই আইজ্যাক বেগিন বলে উঠল, ‘বিজ্ঞানীকে কিডন্যাপ করে খুব লাভ হবার সম্ভাবনা নেই। গবেষণা ধ্বংস করে আমরা তাদের ক্ষতি করতে পারবো, আমরাও ক্ষতি থেকে রক্ষা পাব, কিন্তু ‘সোর্ড’কে হাত করে যে লাভ করতে চাই তা হবে না। আমরা চাই ক্ষতি থেকে বাঁচতে, তার সাথে চাই ষোল

আনা লাভ। সুতরাং যে কোন মূল্যে, যে কোনভাবে বিজ্ঞানী আন্দালুসীর সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।'

'এর জন্যে সর্বাত্মকভাবে প্রচেষ্টা চালানো হবে। অন্যান্য বিজ্ঞানীদের ব্যাপারেও একই প্রচেষ্টা আমাদের আছে। এসব থেকেও কোন রেজাল্ট আমাদের আসতে পারে। সব চেষ্টার পরই গবেষণাগার ধ্বংস।' বলল ডেভিড ইয়াহুদ।

'আর এই প্রচেষ্টা সফল করার জন্যে প্রয়োজন খালেদ খাকানকে এই মুহূর্তে সীন থেকে সরানো। এটা এই মুহূর্তের টপ প্রায়োরিটি।' বলল আইজ্যাক বেগিন।

বেগিন কথা শেষ করতেই ডেভিড ইয়াহুদের টেলিফোন বেজে উঠল।

'এক্সকিউজ মি' বলে টেলিফোন ধরল ডেভিড ইয়াহুদ।

ওপারের কণ্ঠস্বর শুনেই বলল, 'বল স্মার্থা, কোন গুরুত্বপূর্ণ কিছু?'

স্মার্থা 'থ্রি জিরো' সংগঠনের ইস্তাম্বুল শাখার একজন গোয়েন্দা কর্মী। পেশায় সে একজন শিক্ষিকা ও সমাজকর্মী।

'জ্বি স্যার। খালেদ খাকান ঘটনার পর কোথায় প্রাথমিক চিকিৎসা নেয়, তার সন্ধান পেয়েছি। আমাদের সিনাগগের ঠিক বিপরীত দিকে রাস্তার ওপাশে ডাঃ ইয়াসার ও ডাঃ রাসাতের বাড়ি। তারা দু'জনেই পার্ক থেকে খালেদ খাকানকে বাড়িতে এনে চিকিৎসা করেন। খালেদ খাকান দুই ঘন্টা তাদের বাসায় থাকেন।' বলল স্মার্থা।

'ওয়ান্ডারফুল স্মার্থা। ওরা যদিও আমাদের সিনাগগের সদস্য নয়, কিন্তু একটা ধার্মিক ইহুদি পরিবার ওটা। ওরা আমাদের সাহায্য করবে। খালেদ খাকানের সাথে তাদের পরিচয়ের সুযোগ আমাদের ব্যবহার করতে হবে।' ডেভিড ইয়াহুদ বলল।

'এটা সম্ভব স্যার। আমি ওদের সাথে আলোচনা করে বুঝেছি, খালেদ খাকানের সাথে ওদের একটা হৃদ্যতার সৃষ্টি হয়েছে। তারা একে অপরের সাথে যোগাযোগ রাখবে বলে কথা হয়েছে। খালেদ খাকান পরে টেলিফোনে তাদের সাথে যোগাযোগও করেছে।' বলল স্মার্থা।

'গুড। ধন্যবাদ স্মার্থা। আর কিছু কথা?' ডেভিড ইয়াহুদ বলল।

'না স্যার, ধন্যবাদ।' বলল স্মার্থা।

'ওকে বাই।' বলে টেলিফোন রেখে দিল ডেভিড ইয়াহুদ।

আইজ্যাক বেগিনসহ সবাই ডেভিড ইয়াহুদের কথা শুনছিল।

ডেভিড ইয়াহুদ টেলিফোন রাখতেই আইজ্যাক বেগিন বলল, 'কার সাথে কথা বললেন? খুব খুশি মনে হল!'

'খবর কিছুটা খুশিরই বটে। আমাদের এক গোয়েন্দা কর্মী জানাল, সেদিন ঘটনার পর মারাত্মক আহত খালেদ খাকান যেখানে যাদের কাছে চিকিৎসা নিয়েছে, তার সন্ধান পাওয়া গেছে। আমাদের এই সিনাগগের অপজিটে আমাদের কমিউনিটিরই একজন ডাক্তার দম্পতি থাকেন। তারাই আহত খালেদ খাকানকে পার্ক থেকে বাড়িতে নিয়ে চিকিৎসা করেন।' বলল ডেভিড ইয়াহুদ।

মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আইজ্যাক বেগিনের। বলল, 'অবশ্যই খুশির খবর। নিশ্চয়ই ডাক্তার দম্পতির সাথে খালেদ খাকানের অন্তত কৃতজ্ঞতার একটা সম্পর্ক সৃষ্টি হবার কথা।'

'অবশ্যই তা হয়েছে। আমাদের কর্মী স্মার্থা বলল, তাদের মধ্যে একটা হৃদ্যতার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে। খালেদ খাকান তাদের সাথে যোগাযোগও রাখছে।' বলল ডেভিড ইয়াহুদ।

'জিহোভা আমাদের প্রতি সদয় আছেন। কাজ এখন অনেক সহজ হয়ে গেল। ডাক্তার দম্পতির বন্ধু সেজে খালেদ খাকানের কাছে যাবার সুযোগ নেবে অথবা ডাক্তার দম্পতিকে দিয়ে দাওয়াত করিয়ে খালেদ খাকানকে তাদের বাসায় নিয়ে এস। তারপর স্বাভাবিক পথে তার অস্বাভাবিক মৃত্যুর জন্যে আমাদের বহু অস্ত্রের যে কোনটি তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করো।' আইজ্যাক বেগিন বলল।

'আমি ভাবছি ডাক্তার দম্পতি সরাসরি আমাদের এ ধরনের সহযোগিতা করবেন কিনা। তারা আমাদের সিনাগগের সদদ্য নয়। তারা সহায়তা করলে কাজ সহজ হবে।' বলল ডেভিড ইয়াহুদ।

'ধরে নাও, তারা সহযোগিতা করবেন না, কিন্তু সহযোগিতা আদায় করতে হবে। অনুরোধ, লোভ, ভয় সব অস্ত্রই ব্যবহার করবে। অতি শীঘ্র কাজটা হোক, আমি চাই মিঃ ডেভিড ইয়াহুদ।' আইজ্যাক বেগিন বলল। তার কণ্ঠ শক্ত।

'তাই হবে জনাব।' বলল ডেভিড ইয়াহুদ। বিনীত তার কণ্ঠ।

উপস্থিত অন্য সকলের দিকে তাকিয়ে আইজ্যাক বেগিন বলল, 'ইস্তাম্বুলের দায়িত্বশীল তোমাদের সকলকে এখানে ডেকেছি এই কারণে যে, তোমরাও দায়িত্ব অবহেলাকারীদের দেখ এবং সবকিছু নিজ কানে শোন। এখন সবাইকে তোমাদের জানাতে হবে, কোন কারণেই কোন ব্যর্থতা আমরা সহ্য করবো না। আমাদের সাফল্যের ওপর নির্ভর করছে আমাদের সমমনা বহু রাষ্ট্রের যুদ্ধ-শক্তির ভবিষ্যৎ। আমরা ব্যর্থ হলে তাদের আক্রমণ-শক্তি জিরো হয়ে যাবে। এই কারণে তারা আমাদের ডলারের পাহাড় দিয়েছে। আমাদের ব্যর্থ হওয়া যাবে না।' বলল আইজ্যাক বেগিন। তার কথাগুলো ছুরির মতো ধারাল। কথা শেষ করেই উঠে দাঁড়াল আইজ্যাক বেগিন। তার সংগে সংগেই সবাই উঠে দাঁড়িয়ে মঞ্চ থেকে নেমে গেল।

পর মুহূর্তেই চেয়ার-টেবিল অদৃশ্য হয়ে গেল মঞ্চ থেকে।

পাথুরে মেঝের শূন্য রূপ আবার ফিরে এল।

# ৫

গোল্ডেন হর্নের দক্ষিণ তীরে এর দ্বিতীয় ব্রীজের একটু পশ্চিমে বিশাল জায়গা জুড়ে তুর্কি জনগণের অতি প্রিয় 'আইউপ' (আইয়ুব) সুলতান কমপ্লেক্স। বিশাল মসজিদ, প্রশস্ত-সুন্দর কবরগাহ, মুসাফিরদের জন্যে সরাইখানা এবং বৃহৎ একটি মার্কেট নিয়ে এই কমপ্লেক্স।

কমপ্লেক্সে প্রবেশ করে 'আইউপ সুলতান মসজিদ'-এর সুউচ্চ মিনার এবং আইউপ সুলতান কবরগাহের গম্বুজ নজরে পড়তেই একটা আবেগ এসে আহমদ মুসাকে ঘিরে ধরল। তুর্কিদের অতি প্রিয় 'আইউপ সুলতান' আসলে ইতিহাসের হযরত আবু আইয়ুব আনসারী(রাঃ)। রাসূলুল্লাহ(সাঃ)-এর এক অতি প্রিয় সাহাবা ছিলেন তিনি। তিনি সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি যার বাড়িতে আল্লাহর নবী মদীনায় প্রথম প্রবেশের পর বসবাস করেছেন। এই সৌভাগ্য লাভের জন্যে মদীনার সবাই লালায়িত ছিল। কিন্তু উটে সওয়ার আল্লাহর রাসূল(সাঃ) বলেছিলেন, তার উট নিজ ইচ্ছায় যার বাড়িতে গিয়ে বসে পড়বে, তিনি সে বাড়িরই আতিথ্য গ্রহণ করবেন। আল্লাহর রাসূলের উট স্বেচ্ছায় তার বাড়িতে বসাতে আবু আইয়ুব আনসারী এবং তার পরিবার তাদের হৃদয়ের সব আবেগ উজাড় করে পরম অতিথিকে গ্রহণ করেছিলেন। রাসূল(সাঃ)-এর সাহাবী পরম সৌভাগ্যবান মদীনার সেই আবু আইয়ুব আনসারী আইউব সুলতান নাম নিয়ে ঘুমিয়ে আছেন ইস্তাম্বুল নগরীর এখানে। তুর্কিরা বলে, যারা দুনিয়ার সুলতান(বাদশাহ), তাদের নামের আগে সুলতান বসে। কিন্তু আবু আইয়ুব আনসারী তাদের হৃদয়ের সুলতান বলে তার নামের পরে তারা 'সুলতান' বসিয়েছে।

আহমদ মুসা আহমদ আবদুল্লাহকে কোলে নিয়ে স্ত্রী জোসেফাইনের হাত ধরে এগোচ্ছিল আইউপ সুলতান মসজিদের দিকে।

জোসেফাইনের হাতে একটা চাপ দিয়ে আহমদ মুসা বলল, ‘হাজারো মসজিদের মিনার শোভিত ইস্তাম্বুলের দৃশ্য চোখে পড়লে, ইস্তাম্বুলে এলে কোন কথা তোমার প্রথম মনে পড়ে বল তো?’

‘এই সেই ইস্তাম্বুল যা একদিন রোমানদের রাজধানী ছিল, যেখানে বসে তারা এশিয়া শাসন করেছে, এই সেই ইস্তাম্বুল যেখানে বসে মুসলমানরা ইউরোপ শাসন করেছে এবং তিন হাজার বছরের এই সেই ইস্তাম্বুল যা এখন মুসলমানদের সাথে আছে, যদিও মুসলমানরা তাদের বহু গৌরবের বহু কিছু হারিয়েছে।’ বলল জোসেফাইন। আবেগজড়িত তার কণ্ঠ।

‘তোমার কি মনে পড়ে, এই কথাই না?’ কথা শেষ করেই আবার প্রশ্ন করল আহমদ মুসাকে।

আহমদ মুসার মুখ গম্ভীর। আবেগে তা ভারি হয়ে উঠেছে। বলল, ‘না জোসেফাইন, আমি অন্য কথা ভাবি। আমি ভাবি আবু আইয়ুব আনসারীর কথা। ইস্তাম্বুলের সবকিছু ছাপিয়ে তার নামটাই আমি সবার ওপরে জ্বলজ্বল করে উঠতে দেখি। মুসলিম-ইস্তাম্বুল নগরীর জনক বিজয়ী সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদ রানা। কিন্তু এ নগরীর প্রকৃত জনক আবু আইয়ুব আনসারীই। সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদ ১৪৫৪ খৃস্টাব্দে ইস্তাম্বুল জয় করেন। কিন্তু সাড়ে সাতশ’ বছর আগে বিজয়ের বীজ বপন করে যান আবু আইয়ুব আনসারী(রাঃ)। ইস্তাম্বুল বিজয়ের সাড়ে সাতশ’ বছর আগে তার শেষ ইচ্ছায় এ নগরীতে প্রবেশের প্রধান সড়কের ওপর অন্ধকারে তাকে দাফন করা হয়। তিনি বলেছিলেন, তার কবরের ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে মুসলিম বাহিনী ইস্তাম্বুল জয় করবে। তার এই ইচ্ছার সাড়ে সাতশ’ বছর পর এটাই হয়েছিল।’

আহমদ মুসার কথা শেষ না হতেই দাঁড়িয়ে গেল ডোনা জোসেফাইন। আহমদ মুসার হাত টেনে ধরল। ডোনা জোসেফাইনের চোখে-মুখে রাজ্যের কৌতুহল। দাঁড়িয়ে গেল আহমদ মুসাও।

জোসেফাইন বলল, ‘তুমি যে বিস্ময়কর ঘটনার কথা বলছ, তাতো আমি জানি না। কোথাও পড়িনি। আমি হযরত আবু আইয়ুব আনসারী(রাঃ)-এর জীবনী পড়েছি। তাতে তিনি যুদ্ধে গিয়ে ইস্তাম্বুলে ইন্তেকাল করেন, এর বেশি কিছু লেখা

নেই। বল তুমি। মহান সাহাবীর কাহিনীটা আমি শুনতে চাই, তার পবিত্র কবরগাহের সামনে দাঁড়িয়েই শুনতে চাই।' থামল জোসেফাইন। তার কণ্ঠ আবেগাপ্লুত।

'বলছি। বড় কোন কাহিনী নয় জোসেফাইন। সপ্তম শতাব্দীর তখন শেষ। খলিফা মুয়াবিয়া(রাঃ)-এর শাসনকাল। তার ছেলে ইয়াজিদ সেনাপতি। রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী ইস্তাম্বুল তখন 'কনস্ট্যান্টিনোপল'। বিজয়ের জন্যে ইয়াজিদের নেতৃত্বে এক সৈন্যবাহিনী পাঠানো হয়। সে বাহিনীতে শামিল ছিলেন ছিয়াশি বছর বয়স্ক আবু আইয়ুব আনসারী(রাঃ)। দীর্ঘ এক বছর অবরোধ করে রেখেও ইস্তাম্বুল জয়ে ব্যর্থ হয় মুসলিম বাহিনী। এ সময় মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন বৃদ্ধ আবু আইয়ুব আনসারী(রাঃ)। মৃত্যু আসন্ন হয়ে উঠে তার। শুনে বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ ইয়াজিদ ছুটে গেলেন বুজুর্গ সাহাবী আবু আইয়ুব আনসারীর শয্যাপাশে। পরম শ্রদ্ধাভরে তার কাছে তার শেষ ইচ্ছা জানতে চাইলেন। বললেন, বলুন চাচাজান, আপনি কি চান? খলিফার সাথে আলাপ করে ইনশাআল্লাহ তার ব্যবস্থা করব। আবু আইয়ুব আনসারী(রাঃ) বললেন, বলে লাভ কি, যা চাই তা দিতে পারবে না। ইয়াজিদ বুজুর্গ সাহাবীর শেষ ইচ্ছা জানার জন্যে নাছোড়বান্দা। বললেন, বলুন মেহেরবানী করে, আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব। মুমূর্ষু মুজাহিদ বুজুর্গ সাহাবী আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, আমি চাই আমার মৃত্যুর পর আগামীকাল কনস্ট্যান্টিনোপলের প্রবেশ পথের ওপর আমাকে কবর দিয়ে আসবে। শেষ ইচ্ছা শুনে হতবাক ইয়াজিদ জানতে চাইলেন, তার এই শেষ ইচ্ছার কারণ কি! আবু আইয়ুব আনসারী(রাঃ) জানালেন, কনস্ট্যান্টিনোপলের বিজয় একদিন আসবেই। আমি চাই, সে বিজয়ের দিনে বিজয়ী মুসলিম সৈনিকরা যেন আমার কবরের ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে রোমান রাজধানীতে প্রবেশ করে। তার মৃত্যুর পর ইয়াজিদ রোমক সেনাপতিকে অনুরোধ করে রোমক সৈন্যের ব্যূহের ওপারে ইস্তাম্বুলে প্রবেশকারী সড়কের ওপর তাকে দাফন করেন। এই ঘটনার সাড়ে সাতশ' বছর পর এই সড়কের ওপর দিয়েই ওসমানীয় খলিফা দ্বিতীয় মুহাম্মদের বিজয়ী বাহিনী ইস্তাম্বুলে প্রবেশ করেছিল।' থামল আহমদ মুসা।

জোসেফাইন আবেগ-উচ্ছ্বসিত চোখে মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে ছিল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা থামলে জোসেফাইনের চোখ ধীরে ধীরে সরে গেল আইউপ সুলতান মসজিদের ওপর, সেখান থেকে ঘুরে গিয়ে নিবদ্ধ হলো আইউপ সুলতান কবরগাহের ওপর। তারপর দু'চোখ তার আবার ফিরে এসে নিবদ্ধ হলো আহমদ মুসার ওপর। বলল, 'অপরূপ কাহিনী মহান বুজুর্গ মুজাহিদ সাহাবীকে জীবন্ত করে তুলেছে। যেন দেখতে পাচ্ছি দু'পক্ষের সারি সারি সৈন্য, সেই সড়ক, সেই কবরে মহান মুজাহিদ সাহাবীকেও। তুমি সত্যিই বলেছ, ইস্তাম্বুলের সব দৃশ্য ছাপিয়ে এই দৃশ্যই বড় হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে, ১৪৫৪ খৃস্টাব্দে সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদের বিজয়ী বাহিনী ইস্তাম্বুলে প্রবেশ করছে সে মহান মুজাহিদের ডাকে, পরিচালনায়। তুর্কিরা ঠিক নাম দিয়েছে তাকে, 'আইউপ সুলতান'। ইস্তাম্বুলের চিরন্তন সুলতান তিনি!'

আবেগে কাঁপছে জোসেফাইনের কণ্ঠ। অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে তার দু'চোখের দু'কোণ থেকে।

আহমদ মুসা একটা রুমাল জোসেফাইনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'ঠিক, তিনি ইস্তাম্বুলের চিরন্তন সুলতান। হৃদয়ের সুলতান তো মৃত্যুর ঊর্ধ্বে। আলহামদুলিল্লাহ্।'

জোসেফাইন রুমাল দিয়ে চোখ মুছে বলল, 'চল।'

পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করল আবার।

'আইউপ সুলতান' মসজিদে তারা দু'রাকাত করে নফল নামায পড়ল। কিছু সময় কাটাল তাসবীহ পাঠ ও ধ্যানমগ্নতায়।

জোসেফাইন নামায পড়ছিল মেয়েদের পাশে, আর আহমদ মুসা পুরুষদের এলাকায়।

আহমদ মুসা মসজিদ থেকে বেরিয়ে এসে দেখল, জোসেফাইন আগেই বেরিয়ে এসেছে। দাঁড়িয়ে আছে আহমদ আবদুল্লাহকে নিয়ে।

আহমদ মুসা ওদের কাছে গেল।

আহমদ আবদুল্লাহর হাতে ছোট্ট দামি একটা ইলেক্ট্রনিক খেলনা এবং চাইল্ড গ্রেড দামি একটা চকোলেটের প্যাকেট।

দেখেই আহমদ মুসা বলল, 'এ সময় এসব এর হাতে কোত্থেকে এল জোসেফাইন?'

জোসেফাইন হাসল। বলল, 'আমার এক আমেরিকান বান্ধবী এগুলো দিল একে। এই তো এইমাত্র চলে গেল। আমরা একসাথে নামায পড়লাম।'

'তুমি আসবে জানত সে? কি করে সে উপহারগুলো নিয়ে এল?' বলল আহমদ মুসা।

'প্রায়ই সে এখানে আসে। এই সময়। আমিও এ সময়েই আসি। দেখা হয়। একসাথে নামায পড়ি, মহান বুজুর্গের কবর জিয়ারত করি। জান, আহমদ আবদুল্লাহর জন্যে সে পাগল। সাংঘাতিক ভালোবাসে। আহমদ আবদুল্লাহও তাকে পেলে আমাকে ভুলে যায়।'

'তোমার বান্ধবী শ্বেতাংগ আমেরিকান, না কোন মাইগ্রেটেড আমেরিকান?'

'একেবারেই খাস শ্বেতাংগ। কিন্তু শ্বেতাংগ কোন কালচার তার মধ্যে নেই। ইসলাম সম্পর্কে তার গভীর জ্ঞান, গভীর আগ্রহ আমার খুব ভালো লাগে। তোমার সাথে আজ তাকে পরিচয় করাতে চাইলাম। তিনি বললেন কি জান? বললেন, 'অপ্রয়োজনে অন্য কারো স্বামীর সাথে পরিচয় করা ইসলামী কালচার নয়।' বলেই হেসে আবার বলেছেন, 'মসজিদে ঢোকার সময় তাকে আমি দেখেছি। আপনারা তখন দাঁড়িয়ে কোন গল্পে ডুবে গিয়েছিলেন।' আজ তাকে খুব চঞ্চল দেখলাম। আহমদ আবদুল্লাহকে লম্বা একটা চুমু খেয়ে ছুটে চলে গেল।'

'তোমার বান্ধবী কি করেন? কোথায় থাকেন? কোথায় তার সাথে তোমার পরিচয় হলো?' বলল আহমদ মুসা।

'এখানে বুজুর্গের এই কমপ্লেক্সেই তার সাথে আমার প্রথম দেখা। থাকেন, বলেছেন, তোপকাপিরই কোন এক সরকারি গেস্ট হাউসে। তোপকাপিতে নাকি অনেক এবং অনেক রকম গেস্ট হাউস আছে। এক মজার ঘটনার মাধ্যমে আমাদের বুজুর্গের মাজারে তার সাথে পরিচয় হয়। আমার

সেক্রেটারি লতিফা আরবাকান গেছে অজু করতে, আমি মোনাজাত করছিলাম। এই সুযোগে আহমদ আবদুল্লাহ মাজারের ওপাশে চলে গেছে। সেখানে বসে মেয়েটি কুরআন শরীফ পড়ছিল। আহমদ আবদুল্লাহ গিয়ে তার কোলে উঠে বসেছে। মেয়েটি একটা আয়াত পর্যন্ত পড়া শেষ করে কুরআন বন্ধ করে রেখে আহমদ আবদুল্লাহকে বুকে জড়িয়ে ধরে হাসতে হাসতে আমাদের খোঁজে এসেছে। ততক্ষণে আমার মোনাজাত হয়ে গিয়েছিল। লতিফা আরবাকানও এসে গিয়েছিল। আমরা আহমদ আবদুল্লাহকে খুঁজছিলাম। তাকে দেখে আমরাও তার দিকে এগিয়ে গেলাম। সে হাসতে হাসতে আমাকে লক্ষ্য করে বলল, 'আপনি নিশ্চয় এর মা? বাচ্চার চেহারায় আপনার এক্সপ্রেশন আছে। নাম কি বাচ্চার?'

'আহমদ আবদুল্লাহ।'

আমি নাম বলতেই তিনি বললেন, 'চমৎকার নাম। একটা ছন্দ আছে। কিন্তু আপনার ছেলে তো আমাকে কিছুটা পটিয়ে ফেলেছে। আমি কুরআন শরীফ পড়ছিলাম। সে সোজা গিয়ে আমার কোলে উঠে বসেছে। যেন কত দাবি, কত বছরের চেনা। '

আমি হেসে বললাম, 'মায়ের চেহারার সাথে আপনার চেহারার খুব একটা অমিল নেই। হয়তো মা-ই মনে করে বসেছে।'

'সে বলল, 'আমার কিন্তু খুব ভালো লাগছে। বাচ্চারা আমার খুব প্রিয়। দেখুন, সে তার ভুল বুঝতে পেরেছে। উশখুশ করছে আপনার কোলে যাবার জন্যে। কিন্তু ছাড়তে ইচ্ছে করছে না। আমি আর একটু নিয়ে থাকি।' বলে বাচ্চার দু'গালে দু'বার চুমু খেল। আবদুল্লাহরও দেখলাম আমার কাছে আসার চেষ্টা বন্ধ হয়ে গেছে। মেয়েটির দিকে সে একবার চেয়ে তার বুকে মুখ গুঁজল। মেয়েটি তাকে জড়িয়ে ধরে খুশিতে যেন আত্মহারা হয়ে গেল। তারপর থেকে আহমদ আবদুল্লাহর সাথে তার মহাখাতির হয়ে গেল। সেও প্রায়ই এখানে আসে। খুব ভক্ত মহান বুজুর্গের। তোমার আজকের কাহিনী শুনলে তো সে আরও পাগল হয়ে যাবে।' বলল জোসেফাইন।

'নাম কি তোমার বান্ধবীর? আমেরিকার কোথায় থাকেন?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

জিভ কেটে মুহূর্তের জন্যে চোখ বুজল ডোনা জোসেফাইন। তারপর হেসে উঠল। বলল, 'কি উত্তর দেব! সত্যি, নাম জিজ্ঞেস করার কথা মনেই হয়নি। দোষ আমার একার নয়। উনিও আমার নাম জিজ্ঞেস করেননি। উনি জিজ্ঞেস করলে আমারও মনে হতো। স্যরি।'

হাসল আহমদ মুসাও। বলল, 'অবাক হওয়ার মতো কথা শোনালে! দু'জনের ক্ষেত্রেই একই কাণ্ড ঘটল কি করে?'

'এর কারণ আমি মনে করি, আমরা এত দ্রুত অন্তরংগ হয়ে উঠি যে, নাম জিজ্ঞেস করার পর্যায় কখন যেন পেছেনে পড়ে যায়। আমাদের যখন দেখা হতো, যতক্ষণ আমরা একসঙ্গে থাকতাম, সবটা সময় আহমদ আবদুল্লাহকে নিয়ে আমরা ব্যস্ত থাকতাম। নিরিবিলি অন্তরংগ কোন আলোচনা হয়নি।' বলল জোসেফাইন।

'এমনটাই ঘটেছে জোসেফাইন। কিন্তু এটা মনে থাকার মতো ঘটনা। আজ নাম জানার একটা সুযোগ চলে গেল। আমার সাথে দেখা হলে, নামের প্রশ্ন হয়তো উঠতো। যাক, চল আমরা সামনে এগোই।'

'চল। একদিন দেখা হলে নিশ্চয় আমি প্রথমেই তার নাম জেনে নেব।' বলল জোসেফাইন।

তারা হাঁটতে লাগল আবু আইয়ুব আনসারী(রাঃ)-এর কবরগাহের দিকে।

বেলা বারটা।

আহমদ মুসা অফিস থেকে বেরুল। উদ্দেশ্য, আল-আলা পাহাড়ের সিনাগগ দিনের বেলায় একটু ভালো করে দেখা।

অফিস থেকে বেরুতেই দেখল, ডঃ শেখ বাজ অফিসে আসছে। দেখা হতেই বলল, 'স্যার, এ সময়ে যে বেরুলেন?'

আহমদ মুসা এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল, আশে-পাশে কেউ নেই। সিকিউরিটির লোকটি বেশ একটু দূরে। বলল আহমদ মুসা, 'আমি আল-আলা

পাহাড়ের দিকে একটু যাচ্ছি। ডাঃ ইয়াসারদের সাথেও দেখা করতে পারি। আচ্ছা ডঃ শেখ বাজ, আপনি আল-আলা পাহাড়ের সিনাগগ সম্পর্কে কিছু জানেন? ওদের কেউ এখানে আসে কি? কিংবা ওদের কারো সাথে আমাদের কারো জানাশোনা আছে কিনা?’

‘আমি কিছু জানি না, তবে আমাদের ইঞ্জিনিয়ার বিজ্ঞানী যিনি মারা গেলেন, তার কাছ থেকে শুনেছি, তিনি এবং ঐ সিনাগগের যিনি প্রধান রাব্বি, ডেভিড ইয়াহুদ বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে একসাথে পিএইচডি করেছেন। পিএইচডি’র পর ডেভিড ইয়াহুদ বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়েই চাকরি পেয়েছিলেন। আর তিনি দেশে ফেরার পর চাকরি নিয়ে চলে আসেন ইস্তাম্বুলে আমাদের এই ইনস্টিটিউটে। সম্প্রতি ডেভিড ইয়াহুদ ঐ সিনাগগে প্রধান রাব্বির দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন।’ বলল ডঃ শেখ বাজ।

শুনে চোখ কপালে তুলল আহমদ মুসা। ‘বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন রিসার্চ অধ্যাপক সিনাগগের রাব্বি হয়েছেন?’ অনেকটা স্বগতঃ কণ্ঠে আহমদ মুসা উচ্চারণ করল কথাটি। এই সাথে তার মনে জাগল অনেক কথা। ডেভিড ইয়াহুদ কি আমাদের এই গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং তার একটা সফল সৃষ্টি উড়ন্ত সকল ধরনের অস্ত্র-বিনাশী ‘সোর্ড’-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মিশন নিয়েই এখানে এসেছেন? তিনিই কি মূল ব্যক্তি? মনে হয় না। বরং তাকে ব্যবহারের জন্যে আনা হয়েছে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। আমাদের ইঞ্জিনিয়ার বিজ্ঞানীর সহপাঠী বলেই ডেভিড ইয়াহুদকে এখানে আনা হয়ে থাকতে পারে যাতে আমাদের ইঞ্জিনিয়ার বিজ্ঞানীর সাথে পরিচয়ের সূত্র ধরে ইনস্টিটিউটের গবেষণায় ও গবেষণাগারে প্রবেশ করার সুযোগ তাদের হয়। আমাদের ইঞ্জিনিয়ার বিজ্ঞানীও তাদের হাতের পুতুল হতে চায়নি বলেই কি তাকে মরতে হয়েছে! এখন তাদের পরিকল্পনা কি? কোন পথে এগোচ্ছে তারা? ইত্যাদি নানা প্রশ্ন, নানা কথা আহমদ মুসাকে অস্থির করে তুলেছিল। সে আনমনা হয়ে পড়েছিল কিছুটা।

ডঃ শেখ বাজই আবার কথা বলল, ‘স্যার কিছু ভাবছেন?’

আহমদ মুসা সম্বিত ফিরে পেল। বলল, 'না ডঃ বাজ, তেমন কিছু না। আপনাকে ধন্যবাদ ডঃ বাজ একটা ভালো খবর দেয়ার জন্যে। এই তথ্যটা কি জেনারেল তাহির তারিককে জানিয়েছিলেন?'

'না স্যার। আমার মনে পড়েনি। আপনি প্রশ্ন করার পর মনে পড়েছে আমার। আর একে আমি তেমন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বলে মনে করিনি।' বলল ডঃ বাজ।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'দেখুন, আমাকে স্যার স্যার বলবেন না। আমরা এক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়লে বোধহয় সহপাঠী হতাম। ভাই বলতে পারেন।'

'না স্যার, অফিসে এটা হয় না। বাইরে অবশ্যই ভাই বলব। কিন্তু অফিস চলবে অফিসের নিয়মে।' বলল ডঃ বাজ।

আবার হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'ঠিক আছে। 'ডাইরেক্টর ম্যানেজমেন্ট'-এর উপযুক্ত কথাই আপনি বলেছেন। ধন্যবাদ। আপনি অফিসে যান, আমি আসছি।'

'আসসালামু আলাইকুম' বলে আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়াল।

'জেনারেল তাহির তারিক স্যার আসবেন বলেছেন। উনি যোগাযোগ করলে কি বলব?' জিজ্ঞাসা ডঃ বাজের।

'বলবেন, আমি ডাঃ ইয়াসারদের ওদিকে গেছি।' আহমদ মুসা বলল।

'ইয়েস স্যার' বলে ডঃ বাজও যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা গাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করল।

ডঃ ডেভিড ইয়াহুদ সম্পর্কে জেনে খুব খুশি হলো আহমদ মুসা। ইঞ্জিনিয়ার বিজ্ঞানীসহ সব মৃত্যু, সব নিখোঁজের কেন্দ্র এই সিনাগগ এবং হতে পারে ঐ ডঃ ডেভিড ইয়াহুদ, এই বিশ্বাস দৃঢ় হলো আহমদ মুসার। দিনের বেলা সিনাগগকে একটু ভালো করে দেখা আরও জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার সাথে ডাঃ ইয়াসারদের কাছ থেকে আরও কিছু জানাও যেতে পারে।

গাড়িতে উঠে বসল আহমদ মুসা। গাড়ি চলতে শুরু করল।

আহমদ মুসা আল-আলা পাহাড়ে পৌঁছে গাড়ি ড্রাইভ করে সিনাগগের রাস্তার সামনে পৌঁছল।

সিনাগগটি চারদিক দিয়ে দেয়াল ঘেরা। প্রাচীরের পাশ দিয়ে পাথর বিছানো প্রাইভেট রাস্তা। এগুলো আশপাশের বাড়িতে যাবার পথ। আহমদ মুসা গাড়িতে করে পাথর বিছানো পথে বাড়ির চারদিকটা ঘুরে আসতে চাইল। কিন্তু পারল না। সিনাগগের পেছনটায় খাড়া একটা খাদ। কতটা গভীর বোঝা গেল না। ছোট-বড় নানা রকম গাছ-গাছড়ায় ভর্তি। আহমদ মুসা ফিরে এল বাড়ির সামনের বড় রাস্তায়। মোটামুটি বাড়ির বাইরেটা দেখা হয়ে গেছে তার।

গাড়িতে উঠল। গাড়ি স্টার্ট দিল। কয়েক গজ সামনেই রাস্তার ডান পাশে ডাঃ ইয়াসারদের বাড়ি। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আহমদ মুসা মনে করল, আজ ডাক্তারদের বাড়ি না-ই বা গেলাম।

বিপরীত দিক থেকে আরেকটা গাড়ি আসছিল এদিকে। ডাঃ ইয়াসারের বাড়ির সামনে গিয়ে মুখোমুখি হয়ে গেল দুই গাড়ি।

পাশ কাটাবার জন্যে আহমদ মুসা গাড়ি বাঁ দিকে ঘুরিয়ে নিচ্ছিল। কিন্তু সামনের গাড়িটা থেমে গেল। গাড়িটা থামতেই গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল ডাঃ ইয়াসার এবং ডাঃ রাসাত।

ওদের দেখে আহমদ মুসাও গাড়ি থামিয়ে দিয়েছে।

'কি ব্যাপার মিঃ খালেদ, আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছেন! গাড়ি ঘুরিয়ে নিন। আগে আপনি ঢুকুন আমাদের গেট দিয়ে, পেছনে আমরা। পালাবার পথ নেই।' বলল ডাঃ রাসাত।

আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে চাইল।

আহমদ মুসা কিছু বলার আগে ডাঃ ইয়াসার বলে উঠল, 'মিঃ খালেদ খাকান, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে লাভ নেই। যেতে আপনি পারছেন না। অতএব, সময়ক্ষেপণে কোন লাভ নেই জনাব। আসুন।'

আহমদ মুসা গাড়ি ঘুরিয়ে নিল।

সাবাতিনিও বাড়িতে। সে বেরিয়ে এসেছে।

গাড়ি বারান্দায় নেমে এসে দাঁড়িয়েছে সে। আহমদ মুসার গাড়ি থামলে তার গাড়ির দরজা খুলে আহমদ মুসাকে স্বাগত জানিয়ে বলল, 'ওয়েলকাম, আসুন স্যার।' আহমদ মুসা গাড়ি থেকে নামল।

ডাঃ ইয়াসার ও ডাঃ রাসাতও গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে।

'আমাদের গেটেই এভাবে ধরা পড়ে যাবেন, এমনটা ভাবতেই পারেননি স্যার, তাই না মাম্মি, ড্যাডি?' হাসতে হাসতে বলল সাবাতিনি।

'ঠিক আছে, স্যারকে কি খাওয়াবে দেখ। আমরা সকলেই তোমার গেস্ট আজ।' বলল ডাঃ ইয়াসার।

'থ্যাঙ্কস ড্যাডি। মাম্মির রান্না করা খাবার দিয়ে হোস্ট হওয়া কঠিন নয়। ওয়েলকাম সকলকে। আসুন।' বলল সাবাতিনি হাসতে হাসতে। সবাই বসল গিয়ে ড্রইংরুমে।

সাবাতিনি ভেতরে গিয়েছিল। একটু পরে বেরিয়ে এসে বলল, 'ড্যাডি, মিঃ ইরগুন ইবান আসছেন। স্যারের সাথে নাকি তাকে পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন!' সাবাতিনির অস্বস্তি ও অসন্তুষ্টির ভাব।

আহমদ মুসা তাকিয়েছিল ডাঃ ইয়াসারের দিকে। সাবাতিনির কথা শোনার সাথে সাথে ডাঃ ইয়াসারের মুখের আলো যেন হঠাৎ দপ করে নিভে গিয়েছিল। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিল। তবে সাবাতিনির কথার উত্তরে কথা বলতে তার দেরি হলো। একটু সময় নিয়ে সে বলল, 'তুমি তাকে কি বলেছিলে যে মিঃ খালেদ খাকান এসেছেন, না তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন?' ডাঃ ইয়াসারের কণ্ঠে কতকটা বিব্রত হওয়ার আমেজ।

'না ড্যাডি, আমি কিছু বলিনি। উনিও জিজ্ঞেস করেননি। মনে হলো উনি জানতেন। কারণ সোজাসুজি তিনি জানিয়েছেন যে, তিনি আসছেন।' বলল সাবাতিনি।

পরিস্থিতি একটু বেসুরো হয়ে উঠেছিল। এটা কাটিয়ে উঠতেই এগিয়ে এলো ডাঃ রাসাত। বলল, 'মিঃ খালেদ খাকান, মিঃ ইরগুন ইবান আমাদের প্রতিবেশী। এখানকার সিনাগগের একজন সদস্য। তার সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি একজন মুষ্টিযোদ্ধা। আমার মনে হয়, তার সাথে পরিচিত হয়ে আপনিও খুশি হবেন।'

'আমারও তাই মনে হয় রাসাত। একজন মেহমান পেয়েছিলাম, দু'জন হয়ে গেল। এটা আমাদের সৌভাগ্যই।'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আকস্মিকতা ভাগ্যের কাজ। মানুষের হাত এর ওপর নেই। আমার আসার কথা ছিল না এখানে। কিন্তু এসে গেছি। ইরগুনও সেভাবেই আসছেন। তাকে ওয়েলকাম।’

ইরগুন ইবানকে মুখে ওয়েলকাম জানালেও আহমদ মুসার মনে নানা চিন্তার ভিড়। তার বুঝতে বাকি নেই ইরগুন ইবান কে। সে শত্রুপক্ষের একজন, এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই। ডেভিড ইয়াহুদের তরফ থেকেই সে আসছে, যারা সেদিন তাকে আক্রমণ করেছিল ইরগুন ইবান তাদের গ্রুপেরই একজন, এ ব্যাপারেও সে নিশ্চিত। কিন্তু সে নিশ্চিত হতে পারছে না সে আসছে কেন? তাকে নিছক দেখার জন্যে সে অবশ্যই আসছে না। তাহলে কি জন্যে আসছে? এই শত্রুপক্ষ সম্পর্কে আহমদ মুসারা জেনেছে, তাতে পরিষ্কার এরা আক্রমণের নানা পন্থা ব্যবহার করে। তারা এখানে লোক পাঠাচ্ছে কোন কৌশল সাথে নিয়ে!

বৈঠকখানার দরজায় নক হলো। আহমদ মুসার চিন্তায় ছেদ নামল। সাবাতিনি ভেতরে চলে গিয়েছিল। সে ছুটে এসে দরজা খুলে দিল।

দরজায় একজন লোক দাঁড়িয়ে।

খোলা দরজায় সাবাতিনির মুখোমুখি হতেই লোকটি বলল, ‘আমি ইরগুন ইবান, টেলিফোন করেছিলাম।’

স্বাগত জানানোর মতো কোন কথা না বলে সাবাতিনি দরজার পাশে সরে দাঁড়িয়ে বলল, ‘আসুন ভেতরে, সবাই আছে।’

ইরগুন ইবান ভেতরে প্রবেশ করল।

ডাঃ ইয়াসার ও ডাঃ রাসাত উঠে দাঁড়িয়ে তাকে স্বাগত জানাল। ডাঃ রাসাত বলল, ‘আমরা খুশি হয়েছি মিঃ ইবান আপনি আসায়।’

আহমদ মুসাও উঠে দাঁড়িয়েছিল।

ডাঃ রাসাতের কথা শেষ হতেই আহমদ মুসা ইরগুন ইবানের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, ‘আমি খালেদ খাকান।’

ইরগুন ইবান হ্যান্ডশেকের জন্যে আহমদ মুসার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, ‘খুশি হলাম খালেদ খাকান, আপনার সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পেয়ে।’

বলে মুখ ঘুরিয়ে ডাঃ রাসাতের দিকে চেয়ে বলল, ‘আমি অবশ্য না ডাকতেই এসে পড়েছি।’

‘আপনি প্রতিবেশী। আপনি যে কোন সময় আসতে পারেন। দাওয়াত বা অনুমতির প্রশ্ন এখানে নেই।’ বলল ডাঃ রাসাত।

ইরগুন ইবান হাত টেনে নিয়েছে আহমদ মুসার হাত থেকে। কিন্তু তার আগেই ইরগুন ইবানের ডান হাতের তর্জনীর একটা অস্বাভাবিক সাইজের আংটি আহমদ মুসার নজরে পড়েছে। আংটির পাথরটা পিরামিড আকৃতির। তবে পিরামিডের ওপরের শীর্ষটা সরু নয়, ফ্ল্যাট। সবচেয়ে লক্ষণীয় হলো, পাথরের নিচের মেটালিক বেজটা। যেটার ওপর-নিচের প্রশস্ততা কিছুটা অস্বাভাবিক। কিছুটা অস্বাভাবিক এই আংটিটা চোখে পড়তেই তার মনে হলো, এই ধরনের আংটি এর আগে কোথায় যেন সে দেখেছে। হঠাৎ তার মনে পড়ল, ফিলিপাইনে এক মেয়ের পাল্লায় সে পড়েছিল। মেয়েটা ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যানের গোয়েন্দা কর্মী ছিল। সে এই ধরনের আংটির পয়জন ও পিন দিয়ে আহমদ মুসাকে হত্যা করতে গিয়েছিল।

চমকে উঠল আহমদ মুসা। এই আংটি যদি সেই আংটির মতো কিছু হয়ে থাকে, তাহলে ইরগুন ইবান তাকে হত্যার জন্যেই এখানে এসেছে।

‘আমি মিঃ খালেদ খাকানের পাশেই বসি। গল্প বেশি জমবে।’ বলে মিঃ ইরগুন ইবান আহমদ মুসার দিকে এগিয়ে এল।

আহমদ মুসার দু’পাশের দু’টি সোফা ফাঁকা ছিল। সে এসে আহমদ মুসার বাম পাশের সোফাটায় বসল।

আহমদ মুসার বাঁ হাত ও দেহের বাম পাশটা ইরগুন ইবানের ডান হাতের আওতায় চলে এল। মনে মনে হাসল আহমদ মুসা।

গল্প জমে উঠল। ইরগুন ইবান হাত নেড়ে কথা বলছে।

আহমদ মুসার বাম হাত সোফার হাতলে।

মাঝে মাঝে কথা বলার সময় ইরগুন ইবানের চলন্ত হাত আহমদ মুসার বাম হাতের আশপাশ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আহমদ মুসা গল্পের মধ্যে থাকলেও ইরগুন ইবানের হাতটাকে সে ফলো করছে।

কথার মাঝখানে ইরগুন ইবান অকাল্ট সায়েন্স বা হস্তরেখা বিজ্ঞান নিয়ে কথা তুলল এবং সে বলল, জার্মানিতে এই সাবজেক্টের ওপর লেখাপড়া করেছে।

খুব ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট।

ডাঃ ইয়াসার প্রথমে হাত বাড়িয়ে দিল তার দিকে। তারপর ডাঃ রাসাতের হাত দেখল সে।

হস্তরেখা বিজ্ঞান সম্পর্কে সে কতটা জানে সেটা ভিন্ন কথা, তবে হস্তরেখা সম্পর্কে তার জ্ঞান কিছুটা যে আছে তা বোঝা গেল। বিজ্ঞ হস্তরেখাবিদের মতো কথা বলে ডাঃ ইয়াসার এবং ডাঃ রাসাত দু'জনকেই চমৎকৃত করে ফেলেছে।

চমৎকৃত ডাঃ ইয়াসার বলল, 'আপনি মুষ্টিযুদ্ধ চর্চা করেছেন, কিন্তু এ চর্চা করতে গেলেন কেন?'

'মুষ্টিযুদ্ধ শক্তি ও কৌশল নির্ভর হলেও ভাগ্যেরও একটা দিক আছে। প্রতিপক্ষের হস্তরেখা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে তার শক্তি ও দুর্বলতা সম্পর্কে জানা যেতে পারে। বিজয়ের জন্যে এর গুরুত্ব আছে।'

বলে ইরগুন ইবান ফিরল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'এবার মিঃ খালেদ খাকান, আপনার পালা। দেখি আপনার হাত।'

আহমদ মুসা হাত বাড়িয়ে দিতে দিতে বলল, 'কারও ভবিষ্যৎ বাণীর ওপর আমি বিশ্বাস করি না। অকাল্ট সায়েন্সও এক ধরনের ভবিষ্যৎ বাণী। তবে হাতটা আপনাকে দেখতে দিচ্ছি এ কারণে যে, আপনাকে আমার হাত দেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতে চাই না।'

ইরগুন ইবান একবার মুখে হাসি টেনে ঠাণ্ডা চোখে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে আহমদ মুসার হাত দেখার প্রতি মনোযোগ দিল।

আহমদ মুসা লক্ষ্য করল, ইরগুন ইবানের তর্জনীর সেই আংটিটি উল্টে গেছে। এ পর্যন্ত আংটির পাথর দিকটা ছিল আঙুলের পিঠে, সেটা এখন চলে গেছে আঙুলের বিপরীত পাশে।

সাবাতিনি ড্রইংয়ের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'খাবার টেবিলে সব রেডি ড্যাডি, মাম্মি।'

বলার পরেই হাত দেখার প্রতি তার নজর পড়ল। বলল, 'বাহ, এখনো হাত দেখ চলছে নাকি!'

বলে সে এগিয়ে এসে মায়ের পাশে সোফায় বসল।

হঠাৎ আহমদ মুসার হাত থেকে মুখ তুলল ইরগুন ইবান। তার চোখে-মুখে উদ্বেগ। বলল উদ্বেগ ও আতংকের সুরে, 'মিঃ খালেদ খাকান, আপনার হাত বলছে আপনি মারা যাচ্ছেন, সেটা এখনি।'

বলেই ইরগুন ইবান আহমদ মুসার হাত ছেড়ে দিয়ে কিছুটা উঠে ডান হাত দিয়ে আহমদ মুসার বাম বাহু চেপে ধরল এবং বাম হাত দিয়ে আহমদ মুসার ডান হাত ধরতে গেল, যেন সে আহমদ মুসাকে সাহায্য করতে যাচ্ছে, তাকে বাঁচাতে চাচ্ছে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে।

কিন্তু ইরগুন ইবানের বাম হাত আহমদ মুসার ডান হাত পর্যন্ত পৌঁছার আগেই আহমদ মুসার ডান হাতের একটা প্রচন্ড ঘুষি আধা-আধি উঠে দাঁড়ানো ইরগুন ইবানের বাম কানের পেছনটায় আঘাত হানল।

ইরগুন ইবানের ডান হাত খসে গেছে আহমদ মুসার বাম বাহু থেকে। তার দেহটা টলে উঠে পড়ে গেল মেঝেতে।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

মেঝেতে পড়ে গিয়েই ইরগুন ইবান কয়েকবার মাথা ঝাঁকিয়ে সেন্সটাকে সক্রিয় করে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিল।

আহমদ মুসা ততক্ষণে পকেট থেকে রিভলভার বের করেছে। রিভলভার ইরগুন ইবানের দিকে তাক করে বলল, 'একটু নড়া-চড়া করলে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব। বলেছিলেন না যে, আমি মারা যাচ্ছি। উল্টো হয়ে গেল ব্যাপারটা।'

বলে আহমদ মুসা ডাঃ ইয়াসারকে লক্ষ্য করে বলল, 'ডাক্তার ইয়াসার, আপনি ইরগুন ইবানের ডান হাতের তর্জনী থেকে আংটি খুলে নিন।'

ডাঃ ইয়াসার, ডাঃ রাসাত ও সাবাতিনি মুহূর্তে ঘটে যাওয়া এই ঘটনায় বিস্ময়ে যেন বোবা হয়ে গেছে। পাথরের মতো বসে আছে তারা।

আহমদ মুসা ডাঃ ইয়াসারকে আহবান জানালে নড়ে উঠল সে। তাকাল সে একবার ডাঃ রাসাতের দিকে, আর একবার আহমদ মুসার দিকে। কি করবে, কি করবে না বুঝতে পারছে না সে।

ওদিকে প্রাথমিক আকস্মিকতা কাটিয়ে উঠার পর ইরগুন ইবানের চেহারায় একটা মরিয়াভাব ফুটে উঠল। কঠোর কণ্ঠে বলল সে, ‘তোমাকে তোমার আচরণের জন্যে চরম মূল্য দিতে হবে খালেদ খাকান।’

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘তোমরা কি করতে বাকি রেখেছ? সেদিন আল-আলা পার্কে তোমরা আমাকে মারতে চেষ্টা করেছিলে, আজ তোমার আংটির বিষাক্ত পিন আমার শরীরে ঢুকিয়ে আমাকে মারতে চেষ্টা করেছিলে। কি আর মূল্য দিতে হবে আমাকে! দু’বার আমাকে মারার চেষ্টা, আবারও চেষ্টা করবে, এই তো? আমি তার জন্যে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তোমাকে এখন আমাকে হত্যা চেষ্টার অপরাধে ধরে থানায় দেব।’

কথা শেষ করে আহমদ মুসা না তাকিয়েই ডাঃ ইয়াসারকে উদ্দেশ্য করে বলল, ‘ডাক্তার ইয়াসার, আপনি দয়া করে এর ডান হাতের তর্জনী থেকে আংটিটা পাথরে চাপ না পড়ে এমন সাবধানে খুলে নিন। আর ডাঃ রাসাত, আপনি আপনার বাগান থেকে কোন গাছের একটা বড় পাতা নিয়ে আসুন।’

এমনিতেই বিস্ময়-বিমূঢ় ডাক্তার পরিবার, ইরগুন ইবান তারপর খালেদ খাকানের কথা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়ল। একটা বিষয় তারা পরিষ্কার বুঝল, ইরগুন ইবানরাই সেদিন খালেদ খাকানকে মারার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আজ কিভাবে ইরগুন ইবান আহমদ মুসাকে মারার চেষ্টা করেছিল, সেটা তারা বুঝল না। আংটির বিষাক্ত পিনের রহস্য তাদের কাছে এখনও পরিষ্কার হয়নি।

তবু খালেদ খাকানের আহবানে ডাঃ ইয়াসার ও ডাঃ রাসাত দু’জনেই উঠে দাঁড়াল। ডাঃ ইয়াসার উদ্বেগ ও বিব্রতকর চেহারায় এগোলো ইরগুন ইবানের দিকে। আর ডাঃ রাসাত গাড়ি বারান্দার ওপাশের টব থেকে একটা বড় পাতা আনার জন্যে বেরিয়ে গেল।

আংটি খুলে নেয়ার জন্যে ডাঃ ইয়াসার কাছাকাছি হতেই ইরগুন ইবান তার ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে তর্জনীর আংটির পাথরের উপর চাপ দিতে গেল।

ব্যাপারটা চোখ এড়াল না আহমদ মুসার। সংগে সংগেই আহমদ মুসার পিস্তল গর্জন করে উঠল। বুলেট গিয়ে বিদ্ধ হলো হাতের কব্জির কিছু ওপরে।

চিৎকার করে উঠল ইরগুন ইবান। তার তর্জনী আংটির পাথর স্পর্শ করেই সরে এল আকস্মিক আঘাতে।

গুলি করেই আহমদ মুসা বলল, 'তুমি যেভাবে আছ সেভাবে থাক, যে হাত যেখানে আছে, সেভাবেই থাকবে। তুমি মরতে চেষ্টা করেছিলে, মরতে তোমাকে দেয়া হবে না।'

গুলির শব্দে চমকে উঠে ডাঃ ইয়াসার পিছিয়ে গিয়েছিল। সাবাতিনিও চমকে উঠে কাঁপতে শুরু করেছে। ডাঃ রাসাত ছুটে এসে ঘরে ঢুকেছে। তার হাতে একটা বড় পাতা এবং চোখে আতংক। ঘরে ঢুকে ইরগুনের রক্তাক্ত হাতের দিকে চোখ পড়তেই ভীষণভাবে আঁৎকে উঠল সে।

'স্যরি আমি, এসব ঘটনার জন্যে', বলে উঠল আহমদ মুসা, 'আসলে তার হাতে ঐ সময় গুলি করা ছাড়া তাকে আত্মহত্যা থেকে বাঁচাবার আর কোন পথ ছিল না। আমি সব বলছি ডাঃ ইয়াসার, আপনি আগে তার হাতের আংটি খুলে নিন।'

এবার ডাঃ ইয়াসার এগিয়ে গিয়ে ইরগুন ইবানের আহত হাতের তর্জনী থেকে সাবধানে আংটি খুলে নিল।

'এবার ডাক্তার ইয়াসার, আপনি ডাঃ রাসাতের হাতের পাতাটার বোঁটার মূল শিরায় আংটির পাথরের শীর্ষ অংশ চেপে ধরুন মাত্র সেকেন্ডের জন্যে।' বলল আহমদ মুসা।

'আচ্ছা' বলে ডাঃ ইয়াসার এগোলো ডাঃ রাসাতের হাতের পাতার দিকে। ডাক্তার পরিবারের সবাই চোখ ভরা উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকিয়ে আছে পাতার দিকে। ডাক্তার দম্পতি এখন বুঝতে পারছে, পাতায় বিষক্রিয়া দেখতে চায় খালেদ খাকান।

তারা বিস্ময়ের সাথে দেখল, মাত্র তিন-চার সেকেন্ডের মধ্যে বিরাট তরতাজা পাতাটি কালো রং ধারণ করে একদম চুপসে গেল। এ যে অত্যন্ত তীব্র ও ভয়ংকর বিষের ফল!

তারা তাকাল আহমদ মুসার দিকে। তাদের দৃষ্টিতে ভয়, উদ্বেগ ও বিমূঢ় ভাব।

আহমদ মুসা বলল, 'আমার হাত দেখার নাম করে আগাম মৃত্যুর খবর ঘোষণা করে ডান হাত দিয়ে সে আমার বাহু চেপে ধরেছিল ঐ বিষ আমার দেহে ঢুকিয়ে আমাকে হত্যার জন্যে। আমি মরে গেলে আপনার ধরে নিতেন আমার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে এবং তাকে বাহবা দিতেন মৃত্যুর আগাম খবর নিখুঁতভাবে বলার জন্যে।'

মৃত্যুর পাণ্ডুরতা ডাক্তার দম্পতির চেহারায়।

আর অপার বিস্ময় নেমেছে সাবাতিনির চোখে-মুখে। সে কম্পিত গলায় বলল, 'আপনি কি করে বুঝলেন যে, আংটির পাথরে ঐভাবে বিষাক্ত পিন লুকানো আছে এবং পাথরটি দেহে চেপে ধরলে বিষাক্ত পিনটি দেহে আঘাত করবে?'

'আমরা এমন ভয়ংকর পরিস্থিতিতে কখনও পড়িনি, এমন বিস্ময়কর সব দৃশ্য চোখে দেখব কোনদিন ভাবিনি। কিন্তু সাবাতিনির প্রশ্ন আমাদেরও।' বলল ডাঃ রাসাত।

'ওর সাথে হ্যান্ডশেক করার সময় তার তর্জনীর আংটির আকার দেখে আমার সন্দেহ হয়েছিল। দেখুন, আংটির মেটালিক বেজটা অন্যান্য আংটির চেয়ে দ্বিগুণ প্রশস্ত। আরেকটা বিষয় দেখুন, মেটালিক বেজটা আংটির পাথরকে চেপে ধরে নেই বরং দৃশ্যমানভাবেই আলগা। এ দু'টি কারণে আমি সন্দেহ করি যে, আংটিটি একটা মারণাস্ত্র। আংটির পাথর স্প্রিং-এর ওপর বসানো আছে, আর স্প্রিং থেকে একটা বিষাক্ত পিন সেট করা পাথরের ভেতর দিয়ে। চাপে পাথরটি বসে গেলেই পাথর থেকে পিনটি বেরিয়ে আসবে এবং চাপ দেয়া বস্তুকে আঘাত করবে।' আহমদ মুসা বলল।

অপার বিস্ময় ডাক্তার পরিবারের সকলের চোখে-মুখে। ডাঃ রাসাতই আবার বলে উঠল, 'আমরাও আংটিটি দেখেছি, কিন্তু সন্দেহ হয়নি। আংটির কোন

অস্বাভাবিকতা আমাদের নজরে পড়েনি। এর অর্থ আমরা অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে ওটা দেখিনি। কিন্তু আপনি দেখেছেন। কেন?’

আহমদ মুসা গম্ভীর হলো। অন্যসব চেপে গিয়ে সাদামাটা ব্যাখ্যা হিসেবে বলল, ‘গায়ে পড়ে দাওয়াত নেয়া, বিনা কারণে আমার সাথে পরিচিত হবার তার আগ্রহে তার প্রতি আমার সন্দেহ হয়েছিল। তাছাড়া সেদিন আমার ওপর আক্রমণ হওয়ার পর আমি সতর্ক ছিলাম যে, সেদিন ব্যর্থ হলেও তারা অন্য কোন কৌশলে আমার ওপর আবার আক্রমণ চালাতে চেষ্টা করবে। এই কারণে লোকটার ওপরে সন্দেহ হওয়ায় আমি তার সবকিছুই অনুসন্ধিৎসার দৃষ্টিতে দেখেছি....।’

আহমদ মুসার কথার মাঝখানেই চিৎকার করে উঠল সাবাতিনি, ‘স্যার, মিঃ ইবান তার গলার ক্রস কামড়ে ধরে দেখুন পড়ে যাচ্ছে।’

আহমদ মুসা কয়েক মুহূর্তের জন্যে ইরগুন ইবানের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তাকিয়েছিল ডাক্তার দম্পতির দিকে। এরই সুযোগ ইরগুন ইবান গ্রহণ করেছে।

আহমদ মুসা মুখ ফিরিয়ে দ্রুত ইরগুন ইবানের দিকে এগোলো। মুখ থেকে চেন ধরে টেনে বের করল যিশুর মূর্তি সম্বলিত ক্রসটি।

কিন্তু ইরগুন ইবানের দেহ ততক্ষণে নেতিয়ে পড়ে গেছে মেঝের ওপর। নাড়ি, চোখ পরীক্ষা করে দেখল, সে আর ইহজগতে নেই।

হতাশভাবে আহমদ মুসা ফিরল ডাক্তার দম্পতির দিকে। বলল, ‘ধরা পড়ার চেয়ে সে মৃত্যুকেই পছন্দ করেছে। আমি জীবিত রাখতে চেয়েছিলাম, পারলাম না।’

বলে আহমদ মুসা পাশের সোফায় ধপ করে বসে পড়ল। ভেতর থেকে মন তার চিৎকার করে উঠল, অদৃশ্য শত্রুদের খুব ভেতরের একজনকে একেবারে হাতের মুঠোয় পেয়েও হাতে রাখা গেল না। ওদের পরিচয় জানার জন্যে খুব দরকার ছিল একে।

ভেতরের এই অস্বস্তিকে চাপা দিয়ে আহমদ মুসা বলল, ‘আমার আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল।’

‘এতো অস্বাভাবিক মৃত্যু, এখন কি করা যাবে? পুলিশ তো ঝামেলা করবে।’ বলল ডাঃ ইয়াসার।

‘আমার সত্যি এখন ভয় করছে।’ বলল ডাঃ রাসাত।

‘আমি এসে সত্যি আপনাদের মহা ঝামেলায় ফেললাম। কিন্তু পুলিশের ভয় আপনাদের করতে হবে না।’

‘স্যরি, ঝামেলার কথা বলছি না। তাছাড়া আমরাই তো আপনাকে ডেকেছিলাম। আমরা বলছি, এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতির কথা।’ বলল ডাঃ রাসাত।

আহমদ মুসা তৎক্ষণাৎ কোন উত্তর না দিয়ে মোবাইল বের করে কোথাও টেলিফোন করল।

ওপারের সংযোগ পেয়ে গেলে সে সালাম দিয়ে বলে উঠল, ‘মিঃ তাহির তারিক, আমি আল-আলা পাহাড়ে ডাঃ ইয়াসার দম্পতির বাসায়। দাওয়াত ছিল। বাইরের একজন লোক এসেছিল। সব পরে বলব। আমি আক্রান্ত হয়েছিলাম। লোকটি ধরা পড়ার পর আত্মহত্যা করেছে। এখন একে সরিয়ে ফেলা দরকার, তার ব্যাপারে অনুসন্ধানও হওয়া উচিত।’

ওপারের কথা শুনে মোবাইল অফ করে ডাঃ ইয়াসারদের লক্ষ্য করে বলল, ‘এখনি পুলিশ এসে লাশ নিয়ে যাবে। আমি বাদী হয়ে কেস করবো। আপনাদের কোন ঝামেলা হবে না। কালকে পত্রিকায় একটা নিউজ প্রকাশ হবে যে, আপনার বাড়িতে দাওয়াতে আমি এসেছিলাম, সেও উপস্থিত দাওয়াতে হাজির হয়েছিল। সে আমাকে হত্যার জন্যে আক্রমণ করে। এখন ইরগুন ইবানের ব্যাপারে পুলিশী তদন্ত চলছে।’

‘ধন্যবাদ। ইরগুন ইবানের লোকরা ঝামেলা করে কিনা, সেটা একটা ভাবনার বিষয়।’ বলল ডাঃ ইয়াসার।

‘তারা আপনাদের ঝামেলায় ফেলবে না, বরং তারা চেষ্টা করবে ইরগুন ইবানের কোন পরিচয় পুলিশকে যেন না বলেন। আপনারা ওদের জানিয়ে দেবেন, পুলিশকে ইরগুন ইবানের পরিচয় আপনারা দেননি। পুলিশকে বলবেন, সে

আপনাদের একজন প্যাশেন্ট। কিন্তু যে ঠিকানায় সে প্যাশেন্ট হয়েছে, পুলিশ অনুসন্ধান করে সেটাকে ভুয়া পাবে।' আহমদ মুসা বলল।

দুঃখের মধ্যেও হেসে উঠল ডাঃ ইয়াসার ও ডাঃ রাসাত দু'জনেই। বলল, 'ধন্যবাদ, মনে হচ্ছে সমাধান আমরা পেয়ে গেছি। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই পুলিশের একটা গাড়ি এসে পৌঁছল। গাড়ি থেকে নামল সাদা পোশাকধারী চার-পাঁচ জন পুলিশ।

গাড়ির শব্দ শুনেই বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিল ডাঃ ইয়াসার ও ডাঃ রাসাত।

গাড়ি থেকেই পুলিশদের একজন জিজ্ঞেস করল ডাঃ ইয়াসারকে লক্ষ্য করেই, 'আপনি নিশ্চয় ডাঃ ইয়াসার। আমাদের ঘরটায় নিয়ে চলুন।'

ডাঃ ইয়াসার ও ডাঃ রাসাত পুলিশদের নিয়ে ড্রইংরুমে প্রবেশ করল।

দু'জন পুলিশ পেছনে পেছনে একটা স্ট্রেচার নিয়ে প্রবেশ করেছিল।

পুলিশদের একজন একটা সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করল। অবস্থার কয়েকটা ফটোও তুলল পুলিশরা। তারপর একজন নির্দেশ দিল লাশটা গাড়িতে নিতে।

দু'জন পুলিশ স্ট্রেচারে করে লাশ নিয়ে বেরিয়ে গেল। তাদের সাথে বেরিয়ে গেল আরও দু'জন। অবশিষ্ট একজন বেরিয়ে যাবার আগে আহমদ মুসার দিকে চেয়ে বলল, 'স্যার, আপনি বাসায় ফিরলে কাউকে আমাদের রিং দিতে বলবেন। আমরা স্টেটমেন্টটায় স্বাক্ষর করিয়ে আনব।'

বলে বেরিয়ে গেল পুলিশ অফিসারটি।

পুলিশ অফিসারটি বেরিয়ে যেতেই আহমদ মুসা বলল, 'ডাঃ ইয়াসার, ডাঃ রাসাত, যা ঘটেছিল এখন আপনারা সব ভুলে যান। কোন পক্ষ কোন অসুবিধা করলে আমাকে জানাবেন।'

'ধন্যবাদ।' বলল ডাঃ ইয়াসার।

'স্যার, কিছু মনে না করলে আমি একটা কথা বলতে চাই।' বলল সাবাতিনি।

'কিছু মনে করার প্রশ্ন কেন?' আহমদ মুসা বলল।

'সাংঘাতিক যা ঘটে গেল, অবস্থার ওলট-পালট যেভাবে হলো, আমি বলতে সাহস পাচ্ছি না বিষয়টাকে আপনি কিভাবে নেবেন এই ভেবে।' বলল সাবাতিনি।

'আমি তো বলেছি, যা কিছু ঘটেছে তা এখন একেবারেই ভুলে যেতে হবে।' আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ। তাহলে আমি যে 'হোস্ট' ছিলাম, সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে জানাচ্ছি, খাবার টেবিল তৈরি হয়ে আছে।' বলল সাবাতিনি দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'ঠিক সাবাতিনি, ঠিক এই সময় এই ধরনের প্রস্তাব বেসুরো হবারই কথা। কিন্তু তুমি খাবার এই আমন্ত্রণ এখন না জানালেও নিজ থেকেই আমি খেতে চাইতাম। কারণ, আমি চলে গেলে আগামী অন্তত কয়েক ঘন্টা খাবার টেবিলের দিকে কেউ যাবে না। আমি তোমাদের সকলের সাথে খেয়ে বাড়িটাতে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে এনে বাসায় ফিরতে চাই।'

'আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আপনি সাইকোলজিস্টও। ঠিক বলেছেন, অন্তত আজ আমরা কেউ খাবার টেবিলে যেতে পারতাম না।' আবেগজড়িত ভারি কণ্ঠে বলল ডাঃ রাসাত।

কথা শেষ করে একটু থেমেই আবার বলে উঠল, 'চলুন, আমরা একটু ফ্রেশ হয়ে খাবার টেবিলে যাই। এর মধ্যে কাজের লোকরা ড্রইংরুমটা পরিষ্কার করে ফেলবে।'

কথা শেষ করেই সাবাতিনিকে ডাঃ রাসাত বলল, 'সাবাতিনি, তোমার বাথটা মিঃ খালেদকে দেখিয়ে দাও। আর তুমি বেসিনে মুখ ধুয়ে নিয়ে খাবার টেবিল ঠিক-ঠাক করে নাও।'

সবাই গিয়ে বসল খাবার টেবিলে।

সাবাতিনি হোস্টের মতো খাবার গোটা সময় তত্ত্বাবধান কাজটা করল এবং খেলোও। তার মা ডাঃ রাসাত খাবার সময় আলোচনা শুরু করেছিল ঘটনা সম্পর্কে, কিন্তু সাবাতিনি বাঁধা দিয়ে থামিয়ে দিয়েছে। বলেছে, 'কথা শুরু হলে কথাই চলবে, খাওয়া হবে না। আমি খাওয়া নষ্ট করতে দেব না। খাওয়া শেষ হলে আমি নিজে কথা শুরু করে দেব।'

সত্যি খাওয়া শেষ হলে সকলকে চা পরিবেশন করে নিজে তার চায়ে চুমুক দিয়ে সাবাতিনি আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, 'স্যার, আপনার পুরো পরিচয় আপনি দেননি। আপনার যে পরিচয়, একটি গবেষণা ইনস্টিটিউটের আকস্মিক পরিচালক, তার সাথে প্রকৃত অবস্থার মিল পাওয়া যাচ্ছে না। আপনার টেলিফোনের পাঁচ মিনিটের মধ্যে পুলিশ এসে যায়, তারা এসে কোন জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়া লাশ নিয়ে যায়, আপনাকে স্যার বলে সম্বোধন করে, পুলিশরা স্টেটমেন্ট স্বাক্ষর করার জন্যে আপনার বাসায় যেতে চায়, এসবের কোনটাই আপনার কথিত পরিচয়ের সাথে মিলে না। বরং এসব থেকে মনে হয়, আপনি পুলিশ কিংবা সরকারের কোন বড় কর্তা, না তার চেয়ে আরও বড় কিছু।'

আহমদ মুসা শেষ চুমুক দিয়ে কাপটা পিরিচে রেখে হেসে বলল, 'সাবাতিনি খুব বুদ্ধিমতী, বয়সের তুলনায়।'

বলে থামল আহমদ মুসা। তার মুখ থেকে হাসির রেশ কেটে গিয়ে সেখানে ফুটে উঠল জমাট এক গাম্ভীর্য। বলল, 'তুমি ঠিকই ধরেছ সাবাতিনি। তবে আমি পুলিশ কিংবা সরকারের কেউ নই। এর বেশি আমার সম্পর্কে আর কিছু বলব না। প্রসঙ্গটা না বলা অবস্থায় থাক কোন এক ভবিষ্যতের জন্যে।'

উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা। বলল, 'আতিথেয়তার জন্যে ধন্যবাদ এবং যা কিছু অপ্রীতিকর ঘটেছে, তার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করছি।'

'চলুন আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।' বলল সাবাতিনি।

সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আহমদ মুসা সাবাতিনিকে বলল, 'কষ্ট করার দরকার কি? এখন তো একটু রেস্ট নেবে।'

'আসল কথা হলো আমাদের রাস্তার মাথার মার্কেটটায় আমি যাব।' বলল সাবাতিনি।

সবাইকে গুড ইভনিং জানিয়ে সাবাতিনিকে আসতে বলে বেরিয়ে এল আহমদ মুসা।

সাবাতিনিও বেরিয়ে এল আহমদ মুসার পিছু পিছু।

আহমদ মুসা গাড়ির ড্রাইভিং সিটে উঠে গাড়ি স্টার্ট দিল।

সাবাতিনি তার পাশের সিটে উঠে বসেছে।

গম্ভীর হয়ে উঠেছে তার মুখ। আহমদ মুসার দিকে একবার তাকিয়ে বলল, 'আমার মার্কেটে যাবার কথা মিথ্যা স্যার। দুঃখিত, আমি মিথ্যা কথা বলেছি।'

বলে থামল সাবাতিনি।

আহমদ মুসা বিস্মিত হয়ে সাবাতিনির দিকে চাইল। তার মুখ দেখে বুঝল, তার কথা শেষ হয়নি। বলল আহমদ মুসা, 'থামলে কেন, বল।'

'স্যার, আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই। আমার মনে হচ্ছে, আমার ড্যাডি, মাম্মি বিপদে পড়েছে। আপনি যতটা সহজভাবে বলছেন ঘটনাটা মিটে যাবে, তা বোধহয় হবে না।'

থামল সাবাতিনি। তার চোখে-মুখে ভয়ের চিহ্ন।

'কেন হবে না? বল।' প্রশ্ন করল আহমদ মুসা সাবাতিনিকে।

'স্যার, ইরগুন ইবান আসার মধ্যে কাহিনী আছে। ড্যাডি, মাম্মি সম্ভবত ভয়ে সেটা প্রকাশ করেননি।' বলল সাবাতিনি।

আহমদ মুসার ঔৎসুক্য বেড়ে গেল। প্রশ্ন করল সাবাতিনিকে, 'কাহিনীটা কি?'

'ড্যাডি মাম্মিকে একদিন একান্তে কাহিনীটা বলছিলেন। সেটা হলো, সিনাগগের প্রধান ডেভিড ইয়াহুদ আমার আব্বাকে বলেছেন আপনাকে একদিন দাওয়াত দিয়ে আনার জন্যে। সে সময় ইরগুন ইবানকে সিনাগগ থেকে তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। ড্যাডির কাছে এমন প্রস্তাব কোন কারণে ভালো লাগেনি। তিনি বিষয়টা এড়াবার জন্যে বলেছিলেন যে, আপনি তেমন পরিচিত নন। এটা তিনি ভালো মনে করেছেন। তখন ডেভিড ইয়াহুদ হুমকি দিয়ে বলেছে যে, ড্যাডিকে এটা করতে হবে, দ্বিতীয়বার যেন 'না' শব্দ না বলা হয়। আরো বলে, 'স্মার্থা' নামে একটি মেয়ে আপনার ব্যাপারে ড্যাডির সাথে যোগাযোগ করবে। তিনি আরও হুমকি দেন যে, এ বিষয়টা যদি খালেদ খাকানকে আগে জানানো হয়, যদি প্ল্যানটা ব্যর্থ হয়, তাহলে এর যে ফল ড্যাডিকে ভোগ করতে হবে তা ড্যাডি কল্পনাও করতে পারবে না।'

থামল সাবাতিনি মুহূর্ত কালের জন্যে। তারপর আবার বলে উঠল, 'আমি মনে করি, আপনার বিরুদ্ধে এটা গভীর ষড়যন্ত্র এবং আমার ড্যাডি, মাম্মিও এখন খুব বিপদে। কারণ, তাদের প্ল্যান ব্যর্থ হয়েছে। এতসব কথা মাম্মি, ড্যাডি আপনাকে বলেনি। আমি এটা বলার জন্যেই এসেছি।'

'ধন্যবাদ সাবাতিনি। বিষয়টা উদ্বেগের, ওরা না করতে পারে এমন কিছু নেই। কিন্তু কাল পত্রিকায় দেখা যাবে, যা ঘটেছে, তাতে তোমার মাম্মি-ড্যাডির কোন হাত ছিল না এবং তারা ইরগুন ইবানের প্রকৃত পরিচয় পুলিশের কাছে গোপন করেছেন, এজন্যে আশু টার্গেট হওয়া থেকে তারা বেঁচে যাবেন। প্রধান টার্গেট এখন আমি। সুতরাং, তাদের আশু নজর আমার ওপরই পড়বে। ভয় নেই তোমাদের। একটা কথা তোমাকে আরও বলি, সিনাগগের ওপর এখন পুলিশের সার্বক্ষণিক নজর থাকবে। তোমাদের ক্ষতি করার সুযোগ তারা পাবে না।' বলল আহমদ মুসা।

'ধন্যবাদ স্যার। আমার একটা কৌতুহল আছে।' সাবাতিনি বলল।

'বল।' বলল আহমদ মুসা।

'আপনার ওপর এই আক্রমণ কেন? আপনাকে তারা হত্যা করতে চাচ্ছে কেন?' সাবাতিনি বলল।

'ওদের দুরভিসন্ধি কার্যকরী করার পথে ওরা আমাকে বাঁধা মনে করছে, এমন কিছু হতে পারে।' বলল আহমদ মুসা।

'দুরভিসন্ধিটা কি?' জিজ্ঞাসা সাবাতিনির।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'তুমি এখনও ছোট। সব প্রশ্ন করতে নেই, সব কিছু জানতে নেই।'

'সব প্রশ্ন করতে নেই, সব কিছু জানতে নেই, এটা ঠিক আছে। কিন্তু আমি ছোট- একথা ঠিক নয়। আমার বয়স ঊনিশ, পূর্ণ একজন নাগরিক এখন আমি। আর প্রচুর গোয়েন্দা বই আমি পড়েছি। আমি এসব বিষয় অনেক বুঝি। জানেন, সেদিন আমাদের এক প্রফেসর আমাকে বলেছে আমি গোয়েন্দা হিসেবে কাজ করবো কিনা। আমি কি কাজ জিজ্ঞেস করলে সে বলল, খুবই একটা সহজ কাজ। তোমার বাড়ি তো রোমেলী দুর্গের পাশেই। রোমেলী দুর্গের পশ্চিম পাশে একটা

রিসার্চ ইনস্টিটিউট আছে। ঐ ইনস্টিটিউটে পাঁচজন বিজ্ঞানী আছেন, তাদের বাসা ইস্তাম্বুলের কোথায় কোথায় তা খুঁজে বের করতে হবে। এক একটি বাড়ি খুঁজে দেয়ার জন্যে এক হাজার ডলার করে পাবে। দেখুন কত বড় অফার!' থামল সাবাতিনি।

খুব হালকা স্বরে কথা বলছিল সাবাতিনি। কিন্তু সাবাতিনির দেয়া তথ্য শ্বাসরুদ্ধকর হয়ে উঠেছিল আহমদ মুসার জন্যে। তার গোটা দেহে খেলে গেল গরম চাঞ্চল্যের এক শিহরণ। ষড়যন্ত্রকারী সন্ত্রাসীরা বিজ্ঞানীদের বাড়ি সন্ধান করছে, এটা খুব বড় একটা ঘটনা, উদ্বেগজনক খবর। প্রফেসরের দেয়া অফার নিয়ে সাবাতিনি কি করল, শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কোন দিকে গড়িয়েছে- তা জানার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল সে। কিন্তু হঠাৎ থেমে যায় সাবাতিনি।

'অফারের কি হল সাবাতিনি? তুমি গ্রহণ করেছ?' বলল আহমদ মুসা।

'টাকার অফারটা ভালো স্যার, কিন্তু কাজটা আমার পছন্দ হয়নি। কারও বাড়ি খুঁজে বের করার মধ্যে কোন থ্রিল বা কোন গোয়েন্দা যোগ্যতার প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয়নি। গবেষণাগারে গেলেই তো তাদের বায়োডাটা, তাদের ঠিকানা উদ্ধার করা যায়। কিংবা তাদের অনুসরণ করলেও তা জানা যেতে পারে। এসব কথা তুলে আমি বলেছিলাম, কাজটা আমার পছন্দ নয়।' থামল সাবাতিনি।

'তারপর?' আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

'তারপর স্যার বললেন, পছন্দ হবে। থ্রিল আছে। ঐ গবেষণা ইনস্টিটিউটে কারও পক্ষেই ঢোকা সম্ভব নয়। তাছাড়া ওদের কোন বায়োডাটা অফিসে পাওয়া যাবে না, এটাও নিশ্চিত। আর তারা বাড়িতে যাতায়াত করেন সামরিক হেলিকপ্টারে। সপ্তাহে তারা একদিন বাড়িতে যান। কিন্তু যাওয়ার কোন দিন, ক্ষণ ঠিক নেই। অতএব, তাদের বাড়ি খুঁজে বের করার মধ্যে বিরাট থ্রিল আছে। আমি বললাম, থ্রিল আছে বুঝা গেল। তবে গবেষণা কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞানীদের ঠিকানা প্রয়োজনেই আড়াল করতে চাচ্ছেন। কিন্তু আপনারা ঠিকানা কেন চাচ্ছেন, আমি বুঝতে পারছি না। স্যার বললেন, এসব নিয়ে তোমার কাজ নেই। তোমাকে একটা দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে, সেটা তুমি করবে। আমি বললাম, মন না চাইলে সে

কাজ করা যায় না স্যার। এ জন্যেই উদ্দেশ্যটা জানতে চাচ্ছিলাম। স্যার বললেন, দেখ, তোমাকে এখন সেটা বলা যাবে না। কিন্তু কাজটা মহৎ। মনে রেখ, বিজ্ঞানীরা মহাক্ষতিকর কাজেও জড়িত থাকে। সে কাজ থেকে তাদের বিরত রাখাও মানবজাতির জন্যে প্রয়োজন। স্যারের কথা আমার ভালো লাগল। বললাম, আমাকে কি করতে হবে জানালে আমি কাজটা করতেও পারি। তিনি বললেন, রোমেলী দুর্গে তোমার নিয়মিত যাওয়ার অভ্যেস করতে হবে, যেমন উইকএন্ডে অনেকেই সেখানে যায়। এভাবে ওখানকার দায়িত্বরত কিছু সেনা অফিসারের সাথে তোমার পরিচিত হতে হবে। তুমি মুসলিম নাম 'সায়েমা সাবাতিনি' হিসেবে তাদের কাছে পরিচিত হবে। রোমেলী দুর্গের সর্ব পশ্চিমের সর্ববৃহৎ টাওয়ারের গোড়ায় হেলিকপ্টার ল্যান্ডিং করার মতো একটা জায়গায় সপ্তাহে পাঁচ দিন পাঁচটা হেলিকপ্টার ল্যান্ড করে। তোমার টার্গেট হবে হেলিকপ্টারের দশ গজের মধ্যে পৌঁছা। তোমাকে একটা পিস্তল দেয়া হবে। তাতে থাকবে রাবার বুলেট। অলক্ষ্যে তোমাকে পিস্তল থেকে রাবার বুলেট ছুঁড়তে হবে হেলিকপ্টারের গায়ে। এক সপ্তাহে সব হেলিকপ্টারে বুলেট ছুঁড়তে পারবে না। ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানীকে বহনকারী পাঁচটা হেলিকপ্টারের জন্যে তোমাকে পাঁচ সপ্তাহ বা তার চেয়ে বেশি সময় ব্যয় করতে হতে পারে। ব্যস, এটুকুই তোমার দায়িত্ব। আমি বললাম, পিস্তলের শব্দে তো বিষয়টা সবার চোখে পড়ে যাবে। স্যার বললেন, পিস্তলের একটুকুও শব্দ হবে না। কাজটা আমার কাছে ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে। আমি কাজটা গ্রহণ করেছি এই জন্যে যে, কোন খারাপ কাজ হয়তো এর দ্বারা বন্ধ হবে।' থামল সাবাতিনি।

আহমদ মুসা ভাবছিল। বলল, 'তোমার দায়িত্ব ছিল বিজ্ঞানীদের বাড়ি খুঁজে দেয়া, হেলিকপ্টারে রাবার বুলেট ছুঁড়েই সে দায়িত্ব পালন হয় কি করে?'

হাসল সাবাতিনি। বলল, 'আমি স্যারকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলাম। স্যার বলেছিলেন, রাবার বুলেট গিয়ে হেলিকপ্টারের গায়ে একটা জিনিস পেস্ট করে দেবে, ওটাই আমাদের বিজ্ঞানীদের বাড়ি দেখিয়ে দেবে।'

আহমদ মুসার চিন্তায় চলছে তোলপাড়। ওদের ষড়যন্ত্র, ষড়যন্ত্রের লক্ষ্য সবকিছুই আহমদ মুসার কাছে পরিষ্কার। ওরা এবার বিজ্ঞানীদেরই সরিয়ে দিতে

চায়। সাবাতিনিকে এ কাজের জন্যে কেন বাছাই করেছে, সেটাও বুঝতে পারছে সে। কিন্তু সাবাতিনি কি সেটা জানে?

'সাবাতিনি, এ কঠিন কাজের জন্যে ওরা তোমার মতো একজন নতুনকে বাছাই করল কেন?' প্রশ্ন করল আহমদ মুসা।

হাসল সাবাতিনি। বলল, 'স্যার, এ প্রশ্নও তাদের আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। উত্তরে প্রফেসর স্যার বলেছিলেন, তুমি ঐ এলাকার মেয়ে। তোমার চেহারা তুর্কিদের মতো, কিন্তু তোমার মতো সুন্দরী তাদের মধ্যে খুব বেশি নেই। তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। ছাত্র-ছাত্রীদের অবাধ গতিকে সবাই একটু মেনে নেয় এবং সর্বশেষ বিষয় হলো, তুমি আমার ইহুদি কমিউনিটির মেয়ে, সেজন্যে তোমার ওপর আস্থা রাখা যায়।'

'উনি ঠিকই বলেছেন। তুমি কি কাজ শুরু করে দিয়েছ?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'একদিন দুর্গের ভেতরটা ঘুরে এসেছি। শুনলাম যে, দুর্গের আশে-পাশেই আপনার অফিস। আপনার সাহায্য চাইব ভাবছি। যতটা আপনাকে বুঝেছি, এটা আপনার বাঁ হাতেরও কাজ নয়।'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'বলো, কোন দরকার হলে, আমি অবশ্যই সাহায্য করব। আচ্ছা, তোমার সেই প্রফেসর স্যার কোন বিভাগের, কি নাম? ভদ্রলোক বোধহয় অন্যায় কাজ, ক্ষতিকর গবেষণাও দেখতে পারেন না?'

'তাই স্যার। তার নাম আলী আহসান বেগভিচ। তিনি বসনিয়া থেকে এসে এখানে সেটেল করেছেন।'

'মুসলিম নাম দেখছি। তিনি তো ইহুদি।'

'কেন, অনেক ইহুদির এমন মুসলিম নাম আছে। আমি তাকে তো মুসলমানই মনে করতাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু দূরে একটা সিনাগগ আছে। সিনাগগের একটা বার্ষিক অনুষ্ঠানে আমি গিয়েছিলাম। সেখানে তার সাথে আমার নতুন করে পরিচয় হলো। দেখলাম যে, তিনি ইহুদি।'

'ধন্যবাদ সায়েমা সাবাতিনি, অনেক কথা হলো।' বলল আহমদ মুসা।

হেসে উঠল সাবাতিনি। বলল, 'স্যার, ও নামতো আমার ঐ দুর্গের জন্যে।'

কথা শেষ করেই আবার বলে উঠল সাবাতিনি, 'স্যার, আমাকে এখানেই নামিয়ে দিন। এসেছি যখন, মার্কেটটা ঘুরেই যাই।'

আহমদ মুসা গাড়ি থামাল।

গাড়ি থেকে নামার আগে সাবাতিনি একটা নেমকার্ড আহমদ মুসার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'স্যার, আমার নেমকার্ডটা। আমার টেলিফোন নাম্বার এতে আছে। আপনার একটা মোবাইল নাম্বার তো সেদিন আমাকে দিয়েছিলেন। আমি বিরক্ত করলে কিছু মনে করবেন না স্যার। স্যার, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আপনার সাথের মুহূর্তগুলো অবিস্মরণীয়, ঠিক আপনার মতোই।' বলে হাসতে হাসতে নেমে পড়ল সাবাতিনি।

'গুড ইভনিং সাবাতিনি।' বলল আহমদ মুসা।

সাবাতিনি নেমে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ল বিদায় জানাতে।

আহমদ মুসাও তার দিকে হাত নেড়ে গাড়ি স্টার্ট দিল।

# ৬

কথা বলছিল জেনারেল তাহির তারিক, '...আল্লাহর হাজার শোকর। তিনি আমাদের সাহায্য করেছেন। কিন্তু আমরা উদ্বিগ্ন খালেদ খাকান, ইতোমধ্যেই খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে আপনার জীবনের ওপর দু'টি ভয়াবহ ধরনের হামলা হলো। আমি ভাবছি, আমরা যথেষ্ট সাবধান কিনা। আপনাকে উপযুক্ত সহযোগিতা আমরা দিচ্ছি কিনা। প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রী দু'জনেই উদ্বিগ্ন। তারা গোটা পরিস্থিতি রিভিউ করতে বলেছেন।'

কথা হচ্ছিল ইনস্টিটিউটের অফিসে বসে।

আহমদ মুসা ছাড়াও এখানে আরও হাজির আছে তুরস্কের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা প্রধান হাজী জেনারেল মোস্তফা কামাল এবং ওআইসি'র সেক্রেটারি জেনারেল ডঃ ওমর আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাকর।

জেনারেল তাহিরের কথা শেষ হতেই হাজী জেনারেল মোস্তফা কামাল বলল, 'জেনারেল তাহির ঠিক বলেছেন। প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী দু'জনই উদ্বিগ্ন। অহেতুক যেন তাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলা না হয়, তারা বলেছেন।'

'আমারও সেই কথা। আমাদের সতর্কতার সাথে এগোতে হবে। খালেদ খাকানের প্রতি আমাদের বিরাট দায়িত্ব আছে। তার নিরাপত্তার বিষয়টা আমাদের প্রথম বিবেচ্য।' বলল ডঃ ওমর আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাকর।

'আমি দুঃখিত, আমি ভেবেছিলাম এখন আমাদের কি করতে হবে এ নিয়ে আলোচনা হবে, কিন্তু আলোচনা হচ্ছে অতীত নিয়ে, কোন ব্যক্তির নিরাপত্তা নিয়ে। আমি মনে করি, এমন সব আলোচনা করার সময় এটা নয়। সাবধান হওয়া কিংবা ঝুঁকি নেয়ার কোন মাত্রা নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়। অতি সাবধান হওয়ার পরেও অঘটন ঘটে যায়। আর ঝুঁকি না নিয়ে কোন লড়াইয়ে নামা সম্ভব নয়। আমি মনে করি, আমাদের যতটা সাবধান হওয়া সম্ভব, ততটা সাবধান আমরা আছি।' বিনীত কণ্ঠে, কিন্তু দৃঢ় উচ্চারণে বলল আহমদ মুসা।

'আপনি ঠিকই বলেছেন জনাব খালেদ খাকান। কিন্তু বড় দু'টি ঘটনা আমাদের উদ্বিগ্ন করেছে, যার একটিতে আপনি মারাত্মক আহত হয়েছেন, অন্যটিতে বলা যায় মৃত্যু আপনাকে ছুঁয়ে গেছে। এ জন্যেই সবাই ভাবছেন, আরও সাবধান হওয়ার প্রয়োজন আছে।' হাজী জেনারেল মোস্তফা কামাল বলল।

'আমি মনে করি, অফিসের জন্যে যে সাবধানী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, তা যথেষ্ট। আর আমি যেভাবে চলাফেরা করছি, সেভাবেই চলাফেরা করতে চাই। সাবধানতার নামে আমার পেছনে যদি প্রহরী দেয়া হয়, তাহলে যে লক্ষ্যে পৌঁছতে চাই, তা পারবো না...।'

আহমদ মুসার কথার মাঝখানে কথা বলে উঠল হাজী জেনারেল মোস্তফা কামাল, 'অজ্ঞাতে, অলক্ষ্যে প্রহরীরা যদি আপনাকে অনুসরণ করে আর ওদের নজরে যদি না পড়ে তাহলে ক্ষতি কি?'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'প্রথমবার হয়তো ওরা বুঝতে পারবে না। কিন্তু যখন তারা দেখবে, আমার বিপদকালে পেছন থেকে, পাশ থেকে লোকজনরা যেয়ে হাজির হয়েছে, তাহলে ওদের জানা হয়ে যাবে যে, আমার আশে-পাশে, পেছনে লোক থাকে।'

'তাহলে আপনার নিরাপত্তার দিকটা দেখার উপায় কি, যা সবাই চাচ্ছেন।' বলল জেনারেল তাহির তারিক।

'দেখুন, ওরা যে বিষয়ের জন্যে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন, সেটা আসলে আনন্দের। আমার ওপর ওদের দু'বারের আক্রমণ প্রমাণ করেছে, আমরা সঠিক পথে চলছি। ঐ হামলা আরও প্রমাণ করেছে, তাদের পরিচয় আমাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়েছে বলে তারা ভীত হয়ে পড়েছে। তাদের ভয় যত বাড়বে, তাদের মরিয়াভাব তত বাড়বে। আমি চাই, তারা আক্রমণে আসুক। তাদের পরিচয় বেশি বেশি সামনে আসুক, তারপর সুযোগ হবে আমাদের আক্রমণের। সুতরাং উদ্বেগ নয়, এ পর্যন্ত যা ঘটেছে, তার জন্যে আমাদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিত।' আহমদ মুসা বলল।

‘ধন্যবাদ মিঃ খালেদ খাকান। আপনি ঠিক বলেছেন। এটাই সাফল্যের পথ। এটাও আমি মনে করি। কিন্তু এই সাথে স্বীকার করতে হবে, এটা সাংঘাতিক ঝুঁকিপূর্ণ। এটা নিয়েই আমরা ভাবছি।’ হাজী জেনারেল মোস্তফা কামাল।

‘এই ঝুঁকি নেয়ার বিকল্প নেই জনাব। দু’টি বড় ঘটনা ঘটার পর, ওদের পরিচয়-পরিকল্পনার একটা দরজা আমার সামনে খুলে গেছে। এটা আল্লাহর সাহায্য। এ সাহায্য তাদেরকেই করা হয় যারা অগ্রসর হয়, ঝুঁকি নিতে রাজি হয়।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কিন্তু আপনি শুধু সাফল্যের কথা ভাবছেন, নিজের নিরাপত্তার কথা ভাবছেন না।’ বলল হাজী জেনারেল মোস্তফা কামাল।

‘ওটা ভাবার দায়িত্ব আল্লাহর। আমার ঈমান হলো, আল্লাহ যখন আমার জীবন-মৃত্যুর ফায়সালা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, তখন তার আগে মৃত্যু হবে না। অতএব, এ নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। কারণ, চিন্তা করে, সাবধান হয়ে মৃত্যু ঠেকানো যাবে না।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আলহামদুলিল্লাহ্। আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া যে, আল্লাহ আপনাকে এমন সাহস ও বিশ্বাসের তৌফিক দিয়েছেন। এমন কথা বলার লোক আমাদের মধ্যে প্রচুর আছে। কিন্তু এমন কথার ওপর আপনার মতো আমল করার লোক খুব কম আছে।’ বলল ওআইসি’র সেক্রেটারি জেনারেল ডঃ ওমর আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাকর। আবেগরুদ্ধ তার কণ্ঠ।

‘মুহতারাম ডঃ ওমর সাহেব যা বলেছেন, তারপর আর কিছু বলার থাকে না। অনেক ধন্যবাদ খালেদ খাকান আপনাকে। একটা কথা, ওদের পরিচয়, পরিকল্পনা সম্পর্কে আমরা কতটুকু জেনেছি?’ বলল হাজী জেনারেল মোস্তফা কামাল।

‘ওদের কিছু ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা গেছে কিন্তু ওদের কোন সাংগঠনিক পরিচয় এখনও জানা যায়নি। ওদের ঘাঁটির সন্ধান মিলেছে। জানা গেছে, ঐ ঘাঁটিতে পাঁচ গোয়েন্দার গাড়ি ঢোকার পরই তারা নিখোঁজ হয়ে গেছেন। আমাদের পরবর্তী পরিকল্পনা হলো, গোপনে এ ঘাঁটিতে প্রবেশ করা।’ আহমদ মুসা বলল।

'আলহামদুলিল্লাহ্। এ অগ্রগতি অনেক, আমরা তো একেবারেই অন্ধকারে ছিলাম। আপনাকে বোধহয় আরেকটা তথ্য এখনও জানানো হয়নি। আমরা ইরগুন ইবানের জামার ব্র্যান্ড ট্যাগে লেখা 'One Orld O'bit' এবং এই লেখার নিচে তিন শূন্য 'কোডেড' করা পেয়েছি। আমরা খোঁজ নিয়ে দেখেছি, এই 'ব্র্যান্ড-নেম' দুনিয়াতে কোন জামার নেই। আমরা এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারিনি।' বলল হাজী জেনারেল মোস্তফা কামাল। কথা শেষ করেই হাজী জেনারেল একটা কাগজখণ্ড আহমদ মুসার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'ট্যাগের লেখা এখানে হুবহু লেখা আছে।'

শুনেই আহমদ মুসার চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কাগজখণ্ডের লেখার ওপর চোখ বুলাল আহমদ মুসা। আহমদ মুসার মুখে হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'ধন্যবাদ জেনারেল মোস্তফা কামাল। একটা রহস্যের সমাধান হয়ে গেল। ইরগুন ইবানের জামার ব্র্যান্ড-ট্যাগে লিখিত 'One Orld O'bit' আসলে হবে 'One World Orbit' 'ওয়ান ওয়ার্ল্ড অরবিট'। হিব্রু ভাষার লোকাল উচ্চারণে 'World'-এর 'ডব্লিউ' এবং 'Orbit'-এর 'আর' থাকে না। 'One Orld O'bit'-এর তিন শব্দের প্রথম তিন 'O' নিয়ে হয়েছে তিন শূন্য বা 'থ্রী জিরো'। বোঝা গেল, ইরগুন ইবানদের সংগঠনের নাম 'ওয়ান ওয়ার্ল্ড অরবিট' বা 'থ্রী জিরো'।'

'চমৎকার। ধন্যবাদ খালেদ খাকান। তোমার এই সিদ্ধান্ত একদম ঠিক। আমার মনে পড়েছে, 'ওয়ান ওয়ার্ল্ড অরবিট' নামে একটি গোপন য়ুদীয়-খৃস্টান গ্রুপ গোটা দুনিয়ায় কাজ করছে। কিন্তু ওটা তো কালচারাল সংগঠন।' বলল হাজী জেনারেল মোস্তফা কামাল।

'কালচারাল নামের আড়ালে রাজনৈতিক কাজ করা সুবিধাজনক জনাব। আসলে জনাব, এটা বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে গঠিত একটা আমব্রেলা সংগঠন। পশ্চিমের বেশ কিছু শক্তিমান দেশের গোয়েন্দা সংস্থা এর সাথে কাজ করে। 'এক বিশ্ব গঠন' এদের বাহ্যিক শ্লোগান। কিন্তু আসল লক্ষ্য হলো, অন্যসব জাতি, রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্য ও শক্তি ধ্বংস করে সবাইকে পশ্চিমের একটি একক

আধিপত্যের অধীনে নিয়ে আসা। সেটাই হবে ‘ওয়ান ওয়ার্ল্ড’। ‘ওয়ান ওয়ার্ল্ড অরবিট’ এই লক্ষ্যেই কাজ করছে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘সর্বনাশ! এদেরই টার্গেট আমাদের গবেষণা ইনস্টিটিউট! ভয়ানক ব্যাপার তাহলে! ওদের তো অনেক ক্ষমতা!’ বলল হাজী জেনারেল মোস্তফা কামাল।

‘ওদের অনেক ক্ষমতা, তবে আল্লাহর চেয়ে বেশি নয়।’ আহমদ মুসা বলল।

‘স্যরি, বিষয়টা যে কঠিন, জটিল এই অর্থে বলেছিলাম। ধন্যবাদ মিঃ খালেদ খাকান, আপনার মতো আত্মবিশ্বাসই প্রয়োজন। আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করুন।’ বলল হাজী জেনারেল মোস্তফা কামাল।

‘আমি বাইরে বেরুবো একটু। আমার জন্যে আপনাদের আর কিছু পরামর্শ?’ বলে আহমদ মুসা সবার দিকে তাকাল।

‘হ্যাঁ, মিঃ খালেদ খাকান। আমরা আপনাকে যে জন্যে চেয়েছিলাম, সেটা হয়ে গেছে। আপনার সময় আমরা নষ্ট করব না।’ ওআইসি’র সেক্রেটারি জেনারেল ডঃ ওমর আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাকর বলল।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

উঠে দাঁড়াল জেনারেল তাহির তারিকও। সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল, ‘আমি মিঃ খালেদ খাকানকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।’

সবাইকে সালাম জানিয়ে বেরিয়ে এল আহমদ মুসা।

সাথে জেনারেল তাহির তারিক।

আহমদ মুসা বেরিয়েই একটা চিরকুট জেনারেল তারিকের হাতে দিল। বলল, ‘মেয়েটার নাম সাবাতিনি ইয়াসার। ডাঃ ইয়াসার ও ডাঃ রাসাতের মেয়ে। এদের বাড়িতেই আমার চিকিৎসা হয়েছিল, আপনি জানেন। আবার এদের বাড়িতেই ইরগুন ইবানের সাথে ঘটনা ঘটেছে, এটাও আপনি জানেন। ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। সে বুদ্ধিমতী ও অনুসন্ধিৎসু মেয়ে। জাতিতে ইহুদি, কিন্তু আমার ভক্ত। সে ‘থ্রী জিরো’দের ট্র্যাপে পড়েছে। ওদের পক্ষে কাজ করার জন্যে তাকে রোমেলী দুর্গে আসতে হবে। যেসব হেলিকপ্টার বিজ্ঞানীদের বাড়িতে

চলাচল করে, তার কাছাকাছি পর্যন্ত তাকে আসতে হবে এবং একটি রাবার বুলেট ছোঁড়ার মাধ্যমে তাকে হেলিকপ্টারে ট্রান্সমিটার চিপস সেট করতে হবে। কিন্তু তার ওপর আমাদের চোখ রাখতে হবে। আর যেদিন পিস্তল দিয়ে রাবার বুলেট ছুঁড়ে ট্রান্সমিটার চিপস সেট করার চেষ্টা করবে, সেদিনই তাকে গ্রেফতার করতে হবে। কিন্তু তার সাথে কোন প্রকার দুর্ব্যবহার যেন না করা হয়। সে আমার মেহমান। তাকে গ্রেফতার করা প্রয়োজন ষড়যন্ত্র থেকে আমাদের বাঁচা এবং তাকে বাঁচানোর জন্যে। কিন্তু এটা জানানোর প্রয়োজন নেই। যা বলার আমি যথাসময়ে বলব।' থামল আহমদ মুসা।

'আমি বুঝেছি। কিন্তু যারা তাকে ব্যবহার করছে, তাদের সম্পর্কে কি ব্যবস্থা?' বলল জেনারেল তাহির তারিক।

'মেয়েটি 'থ্রী জিরো' গ্রুপের মাত্র একজনকে চেনে, যে তাকে কাজে লাগিয়েছে। লোকটি ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তার ব্যাপারটাও আমি দেখছি। সে আমার নজরে আছে।' বলল আহমদ মুসা।

'ধন্যবাদ। কিন্তু আপনি এখন কোথায় কোথায় বেরুবেন?' বলল জেনারেল তাহির তারিক।

পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল ইনস্টিটিউটের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডঃ শেখ বাজ।

'আমি আল-আলা পাহাড়ের আল-আলা সিনাগগটিতে যাব।'

বলেই আহমদ মুসা ফিরল ডঃ বাজের দিকে। বলল, 'আজ ফিরতে একটু দেরি হতে পারে। আপনি কি থাকছেন ইনস্টিটিউটে?'

'থাকব স্যার। কোন পরামর্শ স্যার?' বলল ডঃ বাজ।

আহমদ মুসা একটু দ্বিধা করল। তারপর বলল, 'আমি মধ্যরাতের মধ্যে না ফিরলে আপনি জেনারেল তাহিরকে সেটা জানিয়ে দেবেন।'

'অবশ্যই স্যার।' বলেই চমকে উঠে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'কেন স্যার, আপনি ফিরবেন না?'

তার কথার উত্তর দেবার আগেই জেনারেল তাহির তারিক এসে আহমদ মুসার দু'হাত ধরল। বলল, 'আপনি কি সে রকম অভিযানে...।' কথা শেষ না করেই থেমে গেল জেনারেল তাহির তারিক। তার কণ্ঠে উদ্বেগ।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'না, মাত্র একটা অনুসন্ধানে। ভাবনার কিছু নেই।'

'প্লিজ টেক কেয়ার অব ইউ, আমার অনুরোধ।' বলল স্নেহের স্বরে জেনারেল তাহির তারিক। তার কণ্ঠে উদ্বেগ তখনও।

'অবশ্যই।' বলে সালাম দিয়ে ডঃ শেখ বাজের পিঠ চাপড়ে আহমদ মুসা পা বাড়াল তার অফিস রুমের দিকে।

আল-আলা সিনাগগের পেছনটায় ঘুটঘুটে অন্ধকার।

সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারে গিয়ে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

এটা সিনাগগের পশ্চিম পাশ।

পূর্বের মূল গেট কিংবা উত্তর ও দক্ষিণের অংশ দিয়ে সিনাগগে ঢোকার চেষ্টা করা যেত। হয়তো সেটা অপেক্ষাকৃত সহজ হতো। কিন্তু সহজ বলেই সিনাগগ প্রহরীদের দৃষ্টি সেদিকে কেন্দ্রীভূত থাকবে, এটা ধরে নিয়েছে আহমদ মুসা। তাই পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবেশকেই নিরাপদ ভেবেছে আহমদ মুসা। আহমদ মুসা শুরুতেই সংঘাতে যেতে চায় না। এই যাত্রায় সিনাগগটা দেখতে চায় সে। ওখানে পাঁচ গোয়েন্দা ঢোকার পর নিখোঁজ হওয়ার কোন ক্লু সেখানে পাওয়া যায় কিনা, এটা খোঁজ করা তার একটি লক্ষ্য। তার সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হলো, সদ্যোজাত 'থ্রী জিরো' সংগঠনের কোন পরিচয়-পরিকল্পনা সিনাগগ থেকে উদ্ধার করা যায় কিনা তা দেখা।

সিনাগগের পশ্চিম দেয়াল থেকেই খাদের খাড়া দেয়াল নেমে গেছে। খাদের দেয়াল ও সিনাগগের দেয়ালের মাঝখানে আধা-ঢালু ফুটখানেকের মতো জায়গা আছে। সেটাও আগাছায় ভরা।

আহমদ মুসা ফুটখানেক প্রশস্ত কাঁথির উপর দিয়ে এগিয়ে সিনাগগের দেয়ালের মাঝ বরাবর এসে পৌঁছল। এখান থেকে একটা মোটা পাইপ উঠে গেছে উপর দিকে। মনে হয়, স্যুয়ারেজ এবং বর্জ্য ওয়াটারের যৌথ পাইপ এটা। এই পাইপ দিয়েই উপরে উঠার সিদ্ধান্ত নিল আহমদ মুসা।

পাইপটা চেক করতে গিয়ে হঠাৎ আহমদ মুসা দেখল, পাইপের গোড়ায় একটা মোটা দড়ি বাঁধা। ভ্রু কুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার।

পাইপের গোড়ায় বাঁধা দড়িটা খাদে নেমে গেছে।

আহমদ মুসা আস্তে দড়িটা টানল। উঠে আসতে লাগল দড়িটা। গজ তিনেক উঠে আসতেই দেখল, দড়িটা আসলে একটা দড়ির মই।

আহমদ মুসার চোখে-মুখে এবার বিস্ময় নামল। খাদের চারদিকে তাকাল। দিনের বেলা যা দেখেছিল, তারই একটা অন্ধকার ইমেজ তার সামনে এল। খাদটা সিনাগগের বাউন্ডারি ওয়ালের। খাদের তিন দিকের উঁচু দেয়ালের কালো দেহটা স্পষ্ট তার চোখে পড়ছে। আর খাদের ভেতরটা তার চারপাশের দেয়ালের গাছ-গাছড়ায় ঢাকা বলে অপেক্ষাকৃত বেশি অন্ধকার।

আহমদ মুসা ভাবল, দড়ির মই এখানে কেন?

মই থাকার অর্থ খাদে কেউ বা কারা উঠা-নামা করে।

জংগলাকীর্ণ খাদে নামার ব্যবস্থাটা কেন? প্রশ্নটি আহমদ মুসার কাছে খুব বড় হয়ে উঠল। ভাবল সে, সিনাগগের সাথে কোন বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে এই খাদের। শুধুই পরিত্যক্ত জংগলাকীর্ণ খাদ এটা নয়। কোন রহস্য লুকিয়ে থাকতে পারে এখানে।

আহমদ মুসা দড়ির মই বেয়ে খাদে নামার সিদ্ধান্ত নিল।

দড়ির মইয়ে ঝুলে পড়ে কয়েক গজ নামার পর আহমদ মুসা হাতের মেশিন রিভলভারটি কাঁধে রেখে পকেট থেকে পেন্সিল টর্চ হাতে নিল। খাদের দেয়াল ঘেঁষে নিচের দিকে আলো ফেলল। দেখল, নিচের দিকটা পরিষ্কার। খাদের মেঝেরও কিছুটা অংশ নজরে এল। যতটা বোঝা গেল, মেঝেটা পরিষ্কার ও সমতল।

যতই নিচে নামতে লাগল আহমদ মুসা, গাছ-গাছড়া ততই কমতে লাগল। এক জায়গায় এসে দেখল, গাছ-গাছড়া একেবারেই নেই এবং খাদের গা মসৃণ পাথরের তৈরি। বুঝল আহমদ মুসা, এটা পরিত্যক্ত কোন খাদ নয়। এটা রহস্যের কোন কেন্দ্র বা রহস্যের কোন দরজা হতে পারে।

খুশি হলো আহমদ মুসা।

মাঝে মাঝে টর্চ জ্বেলে নিচটা দেখে নিচ্ছে আহমদ মুসা।

মেঝের চার-পাঁচ ফিট উপরে এসে থেমে গেল আহমদ মুসা।

টর্চের আলো ফেলে খাদের মেঝে ভালোভাবে দেখল এবং মেঝে সংলগ্ন খাদের চারদিকের দেয়ালটাও দেখে নিল। মেঝেটা পাথরের। মেঝের চারদিক দিয়ে খাদের দেয়ালের গোড়া বরাবর বেশ গভীর নালা। নালাটা খাদের পানি নিষ্কাশনের জন্যে, এটা মনে হলো আহমদ মুসার কাছে। সংগে সংগে তার মনে এল, তাহলে তো খাদের তলা থেকে একটা স্যুয়ারেজ আউটলেট আছে! বের হবার কোন পথও কি আছে কিংবা সিনাগগে ঢোকার কোন পথ? কি কাজে ব্যবহার হয় সুন্দর করে রাখা এই খাদটা?

এসব প্রশ্ন নিয়ে আহমদ মুসা খাদের মেঝেতে নামল।

মেঝেতে নামার পর মেঝেটা কি কাজে ব্যবহার হয় সেটা তালাশের দিকে প্রথমে মনোযোগ দিল আহমদ মুসা।

খাদের পানি নিষ্কাশনের একটা জায়গা খুঁজে পেল সে। সেখানে নালার প্রান্তে দেয়ালের গায়ে ছয় ইঞ্চি আয়তনের একটা সুড়ঙ্গ মুখ। সুড়ঙ্গ মুখে জালি লাগানো।

খাদের মেঝে ও দেয়াল সতর্কভাবে পরীক্ষা করল কিন্তু কিছুই পেল না আহমদ মুসা। খাদের মেঝে ও দেয়াল আয়তাকার, চতুষ্কোণ ইত্যাদি বিভিন্ন সাইজের পাথরে তৈরি। তবে একটা অসঙ্গতি লক্ষ্য করল আহমদ মুসা। বড়, গোলাকার এবড়ো-থেবড়ো দু'টি পাথর রয়েছে। একটি দেয়ালে, অন্যটি মেঝেতে। দু'টি পাথর গোটা মেঝে ও দেয়ালকে বেখাপ্পা করে তুলেছে। আহমদ মুসার মনে পড়ল একটা মহাজনী উক্তি, 'সুরের মধ্যে বেসুরো কিছু ঘটলে তার

পেছনে একটা কারণ কাজ করবে।' আহমদ মুসা এই কারণ সন্ধানের জন্যে পূর্ব দেয়ালের বেঢপ আকৃতির পাথরের দিকে এগোলো।

আহমদ মুসা আবার খুঁটে খুঁটে পরীক্ষা করল দেয়ালের পাথরটিকে। কিন্তু পাথরের গা থেকে কোন ক্লু পেল না। শুধু দেখল, পাথরের চারদিকের গোলাকার প্রান্ত খুব মসৃণভাবে সেট হওয়া, অন্য পাথরগুলোর মতো এবড়ো-থেবড়ো জোড়া নয়।

আহমদ মুসার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

সরে গিয়ে মেঝের গোলাকার পাথরটিকেও দেখল আহমদ মুসা। বিস্ময়ের সাথে দেখল, জোড়া লাগানোটা মসৃণ।

আহমদ মুসা নিশ্চিত হলো, এ পাথর দুটোই শুধু যান্ত্রিকভাবে সেট করা। অন্যগুলো হাতে করা। এর কারণ কি হতে পারে চিন্তা করতে গিয়েই সে বড় আশার আলো দেখতে পেল।

আহমদ মুসা দ্রুত এগোলো দেয়ালের গোলাকার পাথরটির দিকে।

পাথরটির মাঝখানে পা দিয়ে জোরে একটি হ্যাঁচকা চাপ দিল।

পাথরটি নড়ে উঠে কয়েক ইঞ্চি ভেতরে ঢুকে গেল। তারপর তা দ্রুত সরে গেল এক পাশে।

উন্মুক্ত হলো একটা সুড়ঙ্গ পথ। আবছা আলো তাতে।

আহমদ মুসা বুঝল, সিনাগগে প্রবেশের এটা গোপন পথ।

আহমদ মুসা ঢুকতে যাবে সুড়ঙ্গ পথে, এমন সময় তার পকেটের মোবাইলে ভাইব্রেশন অনুভব করল।

মোবাইলটি হাতে নিয়ে অন করে দেখল, জোসেফাইনের কল।

'আসসালামু আলাইকুম জোসেফাইন, আমি বাইরে। কিছু খবর?' বলল আহমদ মুসা।

'ওয়া আলাইকুম সালাম। একটা খবর। তুমি সিনাগগে, এ খবর তারা পেয়ে গেছে।' জোসেফাইন বলল।

শুনেই ভ্রু কুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার। বলল, 'ধন্যবাদ জোসেফাইন। আমি সিনাগগে। আর কিছু?'

‘না, আর কিছু নয়। ফি আমানিল্লাহ।’ বলল জোসেফাইন।

‘আসসালামু আলাইকুম।’ বলে মোবাইল বন্ধ করল আহমদ মুসা।

জোসেফাইনের দেয়া খবর নিয়ে মুহূর্ত কাল ভাবল আহমদ মুসা। আহমদ মুসা সিনাগগে আসছে- এ খবর এরা পাওয়ার অর্থ সকলেই সতর্ক, প্রবেশের সবগুলো পথের উপর তাদের চোখ থাকবে। এই খাদ এবং এই সুড়ঙ্গ পথের উপরও কি? এ পর্যন্তকার অবস্থায় তা মনে হয়নি। তাদের এই গোপন পথ এত তাড়াতাড়ি ধরা পড়ে যাবে, এতটা দুর্বল আত্মবিশ্বাস ওদের নয় নিশ্চয়। যাই হোক, তাকে সামনে এগোতে হবে।

আহমদ মুসা প্রবেশ করল সুড়ঙ্গ পথে। সুড়ঙ্গ পথের মুখ বন্ধ করার জন্যে আহমদ মুসা পেছন ফিরল।

সুড়ঙ্গ মুখ থেকে সরে যাওয়া পাথরটিকেও প্রথম দেখল আহমদ মুসা। পাথরটিকে মুভ করার কৌশল পাথরটিতেই আছে, কারণ, পাথরটির মাঝখানে চাপ দেবার ফলেই তা মুভ করে, খুলে যায়।

আহমদ মুসা পাথরের এ দিকটি ভালো করে পরীক্ষা করল। সুইচ জাতীয় কিছু পেল না। দেখল, পাথরের গোড়ার বরাবরটাই কতকগুলো চাকার উপরে এবং চাকাগুলো ইস্পাতের মজবুত রেলের উপর। রেলটা পাশের দিকে মুভেবল, বুঝল আহমদ মুসা। এ কারণেই পাথরে শক্ত চাপ পড়লে তা আগে-পেছনে মুভ করে। রেলটি ইস্পাতের পিচ্ছিল বেদীর উপর থাকায় মুভ করতে কোন অসুবিধা হয় না।

আহমদ মুসা আগের মতোই পাথরটির মাঝখানে প্রচণ্ড চাপ দিল। আগে যা ঘটেছিল, সেভাবেই পাথরটি সামনের দিকে সরে গেল এবং সংগে সংগে পাথরটি দ্রুত সরে গিয়ে সুড়ঙ্গের দরজা বন্ধ করে দিল।

আহমদ মুসা লক্ষ্য করল, পাথরটি দরজায় সেট হওয়ার সাথে সাথেই পাথরের দুই প্রান্তে দু’টি হাতল ছিটকে বেরিয়ে এল। বুঝল আহমদ মুসা, ভেতর থেকে দরজার পাথরটি পেছন দিকে টানার জন্যে এই দুই হাতল ব্যবহার করতে হবে।

আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়াল।

ওদিক থেকে আসা আলোতে সুড়ঙ্গে আলো-অন্ধকার।

আহমদ মুসা সুড়ঙ্গ পথে দশ-বারো ফিট এগোনোর পর একটা আলোকোজ্জ্বল ফ্লোরে এসে দাঁড়াল।

সিনাগগের ভূ-গর্ভস্থ একটা ফ্লোর এটা।

আহমদ মুসা অনুমান করল, উপরে আরেকটা ভূ-গর্ভস্থ ফ্লোর রয়েছে। তারপরেই গ্রাউন্ড ফ্লোর।

আহমদ মুসা ভাবল, সিনাগগের গোপন ভূ-গর্ভস্থ কক্ষে 'থ্রী জিরো' সংগঠনের পরিচয়-পরিকল্পনা সম্পর্কে কোন তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যেতে পারে।

আহমদ মুসা নজর বুলাল ফ্লোরটির চারদিকে। ফ্লোরের পশ্চিম ও উত্তর অংশ মোটামুটি ফাঁকা। এ অংশে কিছু বাক্স-পেটরা ছাড়া তেমন কিছু নেই। কিন্তু দক্ষিণ ও পূর্ব অংশে বেশ কিছু সারিবদ্ধ সুন্দর কক্ষ দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎ আহমদ মুসার নজরে পড়ল, ফ্লোরের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে মোটা রড দিয়ে তৈরি খোঁয়াড়ের মতো একটা জায়গা।

প্রশ্ন জাগল আহমদ মুসার মনে, এটা ওদের কোন বন্দীখানা নয়তো?

আহমদ মুসা এগোলো খোঁয়াড় মতো জায়গাটার দিকে।

খোঁয়াড়ের ফ্লোর ফুটখানেক উঁচু। বেশ বড় খোঁয়াড়টি। আয়তনটা আট বর্গফুটের কম হবে না। খোঁয়াড়ের একদিকে দেয়াল, তিনদিকে মোটা রডের বেড়া, ফ্লোর থেকে ছাদ পর্যন্ত উঁচু। খোঁয়াড়ের দেয়ালের দিকে নজর পড়ল আহমদ মুসার। দেখতে পেল, পরিষ্কার দেয়ালে সাদা পাথরের ওপর ফিংগার প্রিন্টের মতো কালো দাগ ইংরেজি '5' অংকের আকারে সাজানো বেমানান লাগছে বলেই বিষয়টা আহমদ মুসার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আরেকটা মজার বিষয় আহমদ মুসা দেখল যে, একই সাইজের ফিংগার প্রিন্টের মতো দাগগুলোর সংখ্যাও পাঁচ। এই সংখ্যা আহমদ মুসাকে দারুণভাবে আকর্ষণ করল। নিকট থেকে দেখতে চাইল দাগগুলো আসলে কি।

আহমদ মুসা খোঁয়াড়ের গ্রীল ডোরটি খোলার জন্যে ডান হাতের মেশিন রিভলভারটি বাম হাতে নিয়ে ডান হাত খালি করতে যাচ্ছিল, এমন সময় পেছন থেকে 'হা হা' শব্দের অট্টহাসি তার কানে এল। একই সাথে আরেকটা উচ্চকণ্ঠ,

‘হ্যাঁ খালেদ খাকান, ঠিক জায়গায় পৌঁছেছ। ঢুকে যাও খোঁয়াড়ে। তোমার আগে ওখানে পাঁচ গোয়েন্দাও....।’

কথা শেষ করতে পারল না পেছনের কণ্ঠ।

ওদিকে গুলি খেয়ে ছিটকে পড়ার মতোই আহমদ মুসার দেহ আছড়ে পড়েছিল সামনের দিকে। তার চোখের সামনে এসে গিয়েছিল পেছনটা। ট্রিগারে লাগসইভাবে সেঁটে ছিল তার তর্জনী। তার দেহ মাটি ছোঁয়ার আগেই শব্দ লক্ষ্যে তার মেশিন রিভলভার গুলি বৃষ্টি শুরু করেছিল। তার সাথে সাথেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ‘হা হা’ অট্টহাসি এবং দ্বিতীয় কণ্ঠের বিকট উচ্চারণ।

দেহটি মাটি ছোঁবার পর পেছনটা সম্পূর্ণ নজরে এল আহমদ মুসার, দেখল, লিফটের সামনে পড়ে থাকা লাশগুলোর মধ্যে থেকে একজন উঠে দাঁড়াচ্ছে তার স্টেনগানটা হাতে নিয়ে।

আহমদ মুসার মেশিন রিভলভার তাকে টার্গেট করল। লোকটি তার স্টেনগান এদিকে ফেরানোর আগেই সে লাশ হয়ে পড়ে গেল।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়িয়েই ছুটল লিফটের দিকে।

লিফট অটোমেটিকভাবে বন্ধ হবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু একটা লাশ লিফটের দরজার উপরে পড়ে থাকায় তা বন্ধ হতে পারছিল না।

আহমদ মুসা লাফ দিয়ে লিফটের ভেতরে ঢুকল। ‘ওপেন’ বোতাম টিপে দরজা সরিয়ে নিল। তারপর লাশের পাটা সরিয়ে দিল লিফটের দরজা থেকে।

মোট পাঁচটি লাশ লিফটের বাইরে পড়েছিল। সবার হাতেই স্টেনগান।

আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল আহমদ মুসা। ক্ষিপ্রতার প্রতিযোগিতায় সে জিতেছে।

লিফটের কী-বোর্ডের মনিটরে দেখল আহমদ মুসা, ‘গ্রাউন্ড জিরো’ ফ্লোর থেকে অস্থিরভাবে লিফট কল করা হচ্ছে।

লিফটের ‘জিরো’ সুইচ অন করল আহমদ মুসা। তারপর তার মেশিন রিভলভার দু’হাতে বাগিয়ে ধরে দরজার পাশে লিফটের গা সেঁটে দাঁড়াল, যাতে কারও সরাসরি দৃষ্টি তার উপরে না পড়ে।

উঠতে শুরু করল লিফট।

একটা মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে লিফট দাঁড়াল 'গ্রাউন্ড ফ্লোর' মানে 'জিরো'তে। লিফট কী-বোর্ড দেখে বুঝেছে আহমদ মুসা, 'গ্রাউন্ড টু' হলো ভূ-গর্ভস্থ সবচেয়ে নিচের ফ্লোর। তার উপরের ফ্লোর হলো 'গ্রাউন্ড ওয়ান' এবং 'গ্রাউন্ড ফ্লোর'টাই হলো 'গ্রাউন্ড জিরো'। এটাই হলো সিনাগগের মূল ফ্লোর। এর উপরে আরও তিনটি ফ্লোর আছে, সেগুলোতে সিনাগগ সংক্রান্ত বিভিন্ন অফিস এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসস্থল। কিন্তু সেগুলোর অধিকাংশই ফাঁকা। সিনাগগের সাম্প্রতিক ব্যবস্থায় দু'একজন কর্মকর্তা ছাড়া কাউকেই সিনাগগে থাকতে দেয়া হয় না। সবাই বাইরে বাড়ি ভাড়া নিয়েছে।

লিফট 'জিরো'তে দাঁড়াবার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে লিফটের দরজা ওপেন হয়ে গেল।

লিফটের দরজা খুলতে শুরু করার সময় ওদের কথা কানে এল আহমদ মুসার। একজন বলছে, 'না, আর গুলি-গোলার শব্দ কিন্তু নেই। তাহলে কি শয়তান খালেদ খাকান মারা পড়েছে? কিন্তু ওরা কিছু জানাচ্ছে না কেন?'

'ওসব ভেবে লাভ নেই। চল সবাই নিচে যাই। বাইরে যারা পাহারায় আছে, তাদের আমি খাদের চারধারে পাহারায় থাকতে বলেছি।' বলল আর একজন।

অন্য একজন বলল, 'আমাদের রাব্বি প্রধান ডেভিড ইয়াহুদকে জানানো দরকার ছিল না কি?'

'আমরা খবর পাওয়ার পর তাকেও খবরটা জানিয়েছি। আবার এইমাত্র টেলিফোন করেছি। তিনি বলেছেন, খালেদ খাকান যেন জীবন্ত বের হতে না পারে। হত্যাই তার একমাত্র শাস্তি। দেখামাত্রই তাকে হত্যা করতে হবে।' বলল দ্বিতীয়জন।

লিফটের দরজা তখন পুরোপুরি খুলে গিয়েছিল।

ওরা একসাথে লিফটের দিকে এগিয়ে আসছে। ওদেরও হাতে স্টেনগান।

আর ফুট দুই-তিন এগোলেই আহমদ মুসা ওদের নজরে পড়ে যাবে পুরোপুরি।

ওরা এ সুযোগ পাওয়ার আগেই আহমদ মুসা মেশিন রিভলভারের ট্রিগার চেপে রেখে বেরিয়ে এল লিফটের দরজার আড়াল থেকে।

আহমদ মুসার মেশিন রিভলভার গুলি বৃষ্টি শুরু করেছিল দরজার ওপাশের প্রান্ত থেকে। মুহূর্তেই আহমদ মুসা দরজার মাঝ বরাবর এসে দাঁড়াবার সাথে সাথেই অর্ধ বৃত্তাকারে ঘুরে দরজার এ প্রান্তে এসে থামল।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই, পাল্টা আক্রমণের কোন চেষ্টা না করেই ওরা ছয়জন গুলি খেয়ে ঝাঁঝরা দেহ নিয়ে লাশ হয়ে পড়ে গেল।

এ গুলির শব্দ বাইরে গেলে কি প্রতিক্রিয়া হয়, দেখার জন্যে আহমদ মুসা লিফট লক করে দিয়ে বেরিয়ে অল্প দূরে লিফটমুখী একটা ঘরে প্রবেশ করল। ঘরটি অন্ধকার।

ঘিরে কেউ নেই নিশ্চয়। ঘরে কেউ থাকলে গুলির শব্দে নিশ্চয় সে বের হতো।

আহমদ মুসা দরজার একপাশে অন্ধকারে দাঁড়াল। ভাবল, এখানে দাঁড়িয়েই কয়েক মিনিট সে প্রতীক্ষা করবে গুলির শব্দে ভেতর বা বাইরে থেকে কেউ এদিকে এগোয় কিনা।

আহমদ মুসার অপেক্ষার পালা শুরু। তার ডান হাতের রিভলভারটা উদ্যত।

হঠাৎ মাথার পেছনে একটা ভারি স্পর্শ অনুভব করল আহমদ মুসা। সেই সাথে একটা কর্কশ কণ্ঠ বলে উঠল, ‘তোমার হাতের রিভলভার ফেলে.....।’

লোকটির বাক্য শেষ হলো না। তার বদলে তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল একটা আর্তনাদ।

লোকটির কথা শেষ হবার আগেই আহমদ মুসার মেশিন রিভলভারের কয়েকটি গুলি তার বুক এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছে।

মাথার পেছনে ভারি কিছুর স্পর্শ এবং তার সাথে কর্কশ কণ্ঠ শ্রুত হবার সাথে সাথেই আহমদ মুসার আত্মরক্ষার চিন্তা মুহূর্তও দেরি না করে সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছিল।

তখন আহমদ মুসার দেহ বোঁটা থেকে খসে পড়া ফলের মতোই টুপ করে দ্রুত নিচে নেমে গিয়েছিল এবং তার চেয়েও দ্রুত উপরে উঠে এসেছিল তার রিভলভার ধরা ডান হাত।

আহমদ মুসার মাথা যখন লোকটির পেট পর্যন্ত নেমে এসেছিল, তখন আহমদ মুসার ডান হাত পৌঁছে গিয়েছিল তার মাথার উপরে। তর্জনী চেপেছিল আহমদ মুসা মেশিন রিভলভারের ট্রিগারে। গুলির বৃষ্টি ছুটছিল পেছনের লোকটির বুক লক্ষ্যে।

লোকটির মনোযোগ কেন্দ্রীভূত ছিল তার কথার দিকে, তার রিভলভারের ট্রিগারে থাকা তর্জনীর দিকে নয়। যখন সে টের পেল তার রিভলভার থেকে টার্গেটের মাথা খসে গেছে, তখন কথা বন্ধ করে রিভলভারের নল রি-অ্যাডজাস্ট করার জন্যে যেটুকু সময় তার প্রয়োজন ছিল, সেটা সে পায়নি। তার আগেই গুলি বৃষ্টি আছড়ে পড়েছিল তার বুকে। এই অসতর্কতাই তার মুখ বন্ধ করে দিয়েছে।

লোকটির লাশ পেছনে ছিটকে পড়ে গেছে।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়ে আগের মতো পজিশন নিল সেই দরজার পাশেই। আর বেশি দেরি করতে হলো না।

দ্রুত, নিঃশব্দ পায়ে শিকারী বেড়ালের মতো ছুটে এল স্টেনগানধারী তিনজন লোক।

চারদিকে নজর রেখে তারা ছুটে এল লাশের দিকে। লাশের দিকে একবার তাকিয়েই তারা চোখ ভরা আতংক নিয়ে স্টেনগান বাগিয়ে কি যেন পরামর্শ করল তিনজনে।

আহমদ মুসা ঘর থেকে বেরিয়ে এল প্রশস্ত করিডোরে।

আহমদ মুসা ওদের মাথার উপর দিয়ে গুলি ছুঁড়ল। বলল, 'তোমাদের অস্ত্র ফেলে দিয়ে হাত তুলে......।'

কথা শেষ না করেই আহমদ মুসা নিজের দেহকে বাম দিকে মেঝের উপর ছুঁড়ে দিল। এক ঝাঁক গুলি এসে সে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান দিয়ে ছুটে গেল। আহমদ মুসা দাঁড়িয়ে থাকলে তার বুক, মাথা ঝাঁঝরা হয়ে যেত।

আহমদ মুসা বাঁ দিকে ঝাঁপ দিলেও তার তর্জনী রিভলভারের ট্রিগার থেকে সরেনি এবং তার দু'চোখও নিবদ্ধ ছিল ওদের ওপর। ঝাঁপ দেবার পরেই সে ট্রিগার টিপে ধরেছিল মেশিন রিভলভারের। আহমদ মুসা শূন্যে থাকতেই এক ঝাঁক গুলি ওদের দিকে ছুটে গিয়েছিল। আহমদ মুসার দেহ যখন মাটিতে পড়ল, তখন মেশিন রিভলভারের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া ওদের দেহও পড়ে যাচ্ছিল।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। মনে মনে প্রশংসা করল ওদের তিনজনের। মৃত্যুকে ওরা ভয় করেনি। প্রথম সুযোগেই ওরা শত্রুকে আঘাত হেনেছে। আহমদ মুসা ওদের মুভমেন্ট বুঝতে পেরে যদি যথাসময়ে ঝাঁপ না দিত, তাহলে ওদের আক্রমণ সফল হতো।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়েই ছুটল সিনাগগের গেটের দিকে।

সিনাগগের গেটের সামনে বিশাল একটা হল ঘর। এটাই প্রধান প্রার্থনা কক্ষ। প্রার্থনা কক্ষের পূর্ব প্রান্তে একটা প্রশস্ত করিডোর প্রধান গেট পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। করিডোরের দু'পাশে কক্ষের সারি।

আহমদ মুসা যখন হল পেরিয়ে করিডোর মুখের কাছাকাছি পৌঁছেছে, তখন দেখল তিনজন স্টেনগানধারী করিডোরে প্রবেশ করেছে। ওরা দেখতে পেয়েছে আহমদ মুসাকে, আহমদ মুসাও দেখেছে ওদের।

ওদের করিডোরে দেখেই একটা পিলারের আড়ালে আশ্রয় নিল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসাকে দেখেই ওরা গুলি ছুঁড়তে শুরু করেছে। গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তেই ওরা এগিয়ে আসছে।

আহমদ মুসা পিলারের পেছনে লুকিয়েছে, দেখেছে তা ওরা। ওরা গুলিবর্ষণ অব্যাহত রেখে এগিয়ে গেলো পিলার লক্ষ্যে। আহমদ মুসা যেন পাল্টা গুলিবর্ষণের সুযোগ না পায়, এটাই ওরা চাচ্ছে।

সত্যিই আহমদ মুসা বেকায়দায়। গুলি এসে পিলারকে এমনভাবে ছেঁকে ধরেছে যে, উঁকি মারা কিংবা গুলি করার জন্যে রিভলভার ধরা হাত বাইরে নেয়ার

কোন সুযোগ নেই। গুলিগুলো আসছে মাথা সমান উঁচু রেঞ্জ দিয়ে। তার উপরে গুলির লেভেল উঠছে না।

ওরা করিডোর পার হয়ে সামনে এগোতে চাচ্ছে।

আহমদ মুসা পিলারের ওপর দিকে তাকাল। দেখল, পিলারের প্রায় আট ফিটের মাথায় পিলারের ভেতর থেকে ইস্পাতের একটা বার এক ফিটের মতো বেরিয়ে এসেছে। ইস্পাত বারের প্রান্তটা উপর দিকে বাঁকানো। সম্ভবত ডেকোরেশন পিস অথবা ঝুলন্ত ফুলের বাস্কেট টাঙানোর জন্যেই সবগুলো বা কোন কোন পিলারে এ ধরনের ইস্পাত বার রাখা হয়েছে।

আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া আদায় করল আহমদ মুসা। এটা তার জন্যে এক অমূল্য সাহায্য।

আহমদ মুসা তার মেশিন রিভলভারের বাঁট কামড়ে ধরে দু'হাত উপরে তুলে ইস্পাত বারটি ধরার জন্যে বিসমিল্লাহ বলে লাফ দিল।

হাতে পেয়ে গেল ইস্পাত বারটি।

ইস্পাত বারটি দু'হাতে ধরার পর বাম হাতের উপর দেহের ভার ছেড়ে দিয়ে ডান হাত মুক্ত করে মুখে কামড়ে ধরে রাখা রিভলভারটি হাতে নিল। গুলি তখনও একই লেভেলে হচ্ছে। তার মানে, আহমদ মুসা লাফ দিয়ে উপরে উঠেছে এটা তারা টের পায়নি। খুশি হলো আহমদ মুসা। উঁকি মেরে দেখল, ওরা করিডোর থেকে হলে নেমে এসেছে। আহমদ মুসা সময় নষ্ট করল না। ওরা টের পেয়ে গেলে আবার সংকটে পড়বে সে।

ওদের একজন আহমদ মুসার পিলারের উপর দিকে ইংগিত করে কি যেন বলে উঠল। সংগে সংগেই ওদের তিনজনের চোখ এদিকে নিবদ্ধ হলো, আর নড়ে উঠল ওদের স্টেনগান।

সবকিছু বুঝে গেল আহমদ মুসা। প্রস্তুত ছিল সে। তার মেশিন রিভলভারও তৈরি। তার তর্জনী চেপে বসল রিভলভারের ট্রিগারে।

লক্ষ্য একেবারে নাকের ডগায়।

ওরাও দেখতে পেয়েছিল আহমদ মুসার রিভলভার। ওদের বিস্ফারিত চোখে মরিয়াভাব। উঠে আসছিল ওদের তিনটি স্টেনগান।

কিন্তু স্টেনগানগুলো টার্গেট পয়েন্টে উঠে আসার আগেই ওরা আহমদ মুসার মেশিন রিভলভারের গুলি বৃষ্টির শিকার হয়ে গেল। পড়ে গেল হলের মেঝেতে তিনটি লাশ।

আহমদ মুসা লাফ দিয়ে নামল পিলারের ইস্পাত বার থেকে।

নেমেই করিডোরের দিকে ছুটে গিয়ে দেখল, সিনাগগের প্রধান দরজাটি বন্ধ। ওরা দরজা বন্ধ করে দিয়েই ঢুকেছিল।

আহমদ মুসা পেছন ফিরে ছুটল লিফটের দিকে। লিফট দিয়ে নামল 'গ্রাউন্ড টু'তে। ছুটল সেই খোঁয়াড়ের দিকে। খোঁয়াড়ের দেয়ালে '5' আকৃতিতে সাজানো ফিংগার প্রিন্টের মতো পাঁচটি কালো দাগ তখনই পরীক্ষা করতে চেয়েছিল। আক্রান্ত হবার ফলে পারেনি। সেটাই এখন দেখতে চায় সে।

আহমদ মুসা খোঁয়াড়ে ঢুকে সেই দেয়ালে ফিংগার প্রিন্টের মতো চিহ্নগুলোর মুখোমুখি দাঁড়াল।

চিহ্নগুলোর উপর নজর পড়তেই আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল আহমদ মুসার চোখ। পাঁচটি কালো চিহ্নের সবগুলোই সুস্পষ্ট ফিংগার প্রিন্ট।

আহমদ মুসার কোন সন্দেহ নেই যে, ঐ ফিংগার প্রিন্ট নিহত পাঁচ গোয়েন্দার। তারা তাদের মৃত্যু নিশ্চিত জেনেই মৃত্যুর পূর্বে শত্রুকে চিহ্নিত করার জন্যে এই ফিংগার চিহ্ন রেখে গেছে একটা দর্শনীয় পদ্ধতিতে।

আহমদ মুসা পকেট থেকে মোবাইল হাতে নিয়ে কল করল জেনারেল তাহির তারিককে। জেনারেল তাহির তারিক আহমদ মুসার কণ্ঠ শুনতে পেয়েই বলে উঠল, 'কি খবর খালেদ খাকান! আপনি ভালো আছেন? এইমাত্র গোয়েন্দা সূত্র জানাল, সিনাগগে গোলাগুলি চলছে। ওখানে পুলিশ গেছে। আমিও আসছি। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা প্রধান হাজী জেনারেল মোস্তফা কামালও যাচ্ছেন।' উদ্বেগ জেনারেল তাহিরের কণ্ঠে।

'পাঁচ গোয়েন্দা সম্ভবত নিহত হয়েছেন। তারা একটা গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন রেখে গেছেন। আসুন দেখবেন। গোটা সিনাগগ তদন্তও হওয়া প্রয়োজন। আপনারা এলেই আমি বেরুব। আমাকে একটু বেরুতে হবে জরুরি কাজে।' বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা থামতেই জেনারেল তাহির তারিক বলে উঠল, ‘কিন্তু সিনাগগের কি অবস্থা, কি ঘটেছে, তা তো বললেন না। এত গুলি-গোলা.....।’

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই আহমদ মুসা বলল, ‘আমি এখানে আসছি, এ খবর এরা আগেই পেয়ে যায়। তার ফলে আমার গোপন অনুসন্ধান সম্ভব হয়নি। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছে। ওদের পনের জন মারা গেছে। এই মুহূর্তে সিনাগগে ওদের কোন লোক নেই।’

‘আপনি ওখানে যাচ্ছেন, এ খবর ওরা আগেই পেয়ে যায়?’ বলল জেনারেল তাহির তারিক।

‘হ্যাঁ, পেয়ে যায়।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আপনি তো সুস্থ আছেন?’ প্রশ্ন জেনারেল তারিকের।

‘আলহামদুলিল্লাহ্। ভালো আছি।’ আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসা সিনাগগ থেকে বেরিয়ে গেল তার গাড়ির কাছে। গাড়িটা সে পার্ক করে এসেছিল সিনাগগের বাইরে রাস্তার পাশে।

আহমদ মুসা গাড়ির কাছে যেতেই রাস্তার ওপ্রান্তের দিক থেকে একটা গাড়ি এসে আহমদ মুসার কাছে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল মিস লতিফা আরবাকান। বলল আহমদ মুসাকে, ‘স্যার, ও গাড়ির কোথাও ওরা বোমা বা কোন বিস্ফোরক রেখে গেছে। ও গাড়িতে এখন উঠবেন না। চলুন ঐ গাড়িতে। ম্যাডাম আছেন।’

বোমা ও বিস্ফোরকের কথা শুনে চমকে উঠল আহমদ মুসা। কিন্তু তার চেয়েও বেশি চমকে উঠল ম্যাডাম মানে জোসেফাইন এখানে আসার সংবাদে।

‘আপনারা এখানে, এ সময়ে?’ দু’চোখ কপালে তুলে বলল আহমদ মুসা।

উত্তরের অপেক্ষা না করেই আহমদ মুসা এগোলো গাড়ির দিকে।

আহমদ মুসা গাড়ির কাছে পৌঁছতেই গাড়ির পেছন সিটের দরজার কাঁচ নেমে গেল। জানালা দিয়ে শোনা গেল জোসেফাইনের কণ্ঠ, 'আসসালামু আলাইকুম, আসুন।'

গাড়ির দরজাও খুলে গেল সেই সাথে।

আহমদ মুসা গাড়িতে উঠে বসতেই জোসেফাইন আবার বলল, 'আলহামদুলিল্লাহ্, তিনি সুস্থ রেখেছেন তোমাকে।'

'আলহামদুলিল্লাহ্। তোমরা এখানে জোসেফাইন! আমার কাছে তো স্বপ্নের মতো লাগছে।' বলল আহমদ মুসা।

'আমিও ভাবিনি আসব, কিন্তু এসে গেছি। পরে কথা হবে, এবার চলি আমরা।'

বলে জোসেফাইন হাত দিয়ে ইশারা করে ডাকল তার পারসোনাল সেক্রেটারি মিস লতিফা আরবাকানকে।

লতিফা আরবাকান এসে ড্রাইভিং সিটে উঠছিল।

'আমিই ড্রাইভ করব। এই রাতে মিস লতিফার ড্রাইভ না করাই ভালো।' বলে আহমদ মুসা গাড়ি থেকে নামতে যাচ্ছিল।

জোসেফাইন আহমদ মুসার হাত ধরে আটকে ফেলে বলল, 'মিস লতিফা খুবই এক্সপার্ট ড্রাইভার। উইম্যান কার রেসিং-এ মিস লতিফা ইস্তাম্বুলের চ্যাম্পিয়ন। ওকে, গাড়ি ছাড়ুন মিস লতিফা।'

গাড়ি স্টার্ট নিয়ে চলতে শুরু করল।

আহমদ মুসা আবারও বলল, 'জোসেফাইন, তোমরা এই রাতে এই বিপদের মধ্যে এখানে এসেছ! আমি যে বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'পরে সব বলব। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমার কাছে তোমার দেয়া মেশিন রিভলভার আছে, জেফি জিনার কাছেও রিভলভার ছিল, লতিফা আরবাকানের কাছেও রিভলভার আছে। তুমি জান না, আমাদের মিস লতিফা আরবাকান বয়সে কম হলেও সেনাবাহিনী থেকে জেদ করে রিটায়ারমেন্ট নেয়া একজন ব্রিলিয়ান্ট সেনা অফিসার অর্থাৎ ক্যাপ্টেন। আর টুয়েন্টি ফাইভ এজ গ্রুপে মিস লতিফা

সেনাবাহিনীতে পরপর তিনবার র‍্যানডম পিস্তল শুটিং-এ চ্যাম্পিয়ন ছিল। সে দক্ষতা তার আরও বেড়েছে।'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'মিস লতিফা আরবাকানকে ধন্যবাদ। আমি খুব খুশি যে, তুমি তাকে পিএস হিসেবে পেয়েছ। কিন্তু একটা বিষয় তুমি জান না জোসেফাইন, মিস লতিফা আরবাকান সেনাবাহিনী থেকে রিটায়ারমেন্ট নিলেও তুর্কি সেনাবাহিনীর স্বেচ্ছাসেবী মহিলা গোয়েন্দা ইউনিটের একজন বড় অফিসার এখন সে।'

বিস্ময় নামল জোসেফাইনের চোখে-মুখে, তার সাথে আনন্দও।

আর মিস লতিফা আরবাকান চমকে উঠে মুহূর্তের জন্যে একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে নিয়ে বলল, 'ধন্যবাদ স্যার। কিন্তু আমি যতদূর জানি, এই বিষয়টাতো স্যার, আপনার জানার কথা নয়।'

'আমার জানার কথা নয়, এ কথা ঠিক। আমাকে কেউ জানায়নি। কিন্তু আপনাকে প্রথম দিন দেখেই জেনে ফেলেছি যে, আপনি তুর্কি সেনাবাহিনীর 'ভি ডব্লিউ সি এস' ইউনিটের (Voluntary Women Counter-spionage Unit) সদস্য।' বলল আহমদ মুসা।

'ধন্যবাদ স্যার। কিন্তু কিভাবে সেটা জানলেন?' মিস লতিফা আরবাকানের চোখে-মুখে বিস্ময়।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'আপনার বাঁ হাতের অনামিকায় একটা গোল্ড রিং আছে। যে গোল্ড রিং-এ 'VWCS' অক্ষরগুলো উৎকীর্ণ আছে। আমি জানি, 'VWCS'-এর সকল সদস্যের বাঁ হাতের অনামিকায় এই রিং থাকে। এটা তাদের প্রাথমিক আইডেন্টিফিকেশন।'

মিস লতিফা আরবাকানের চোখে-মুখে নামল এবার অপার বিস্ময়। বলল, 'এই ছোট বিষয়টাও আপনার নজর এড়ায়নি স্যার! আপনি অসাধারণ, অনন্য অসাধারণ স্যার আপনি।'

'আপনিও কম অসাধারণ নন মিস লতিফা। আমি খুব খুশি আপনাকে সাথী পেয়ে।'

বলেই জোসেফাইন প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে বলল, 'সিনাগগে কি ঘটল, এটা কিন্তু আমাদের জানা হয়নি।'

'সেটা বলব, কিন্তু তার আগে বল, জেফি জিনা কে যার নাম তুমি বললে।' আহমদ মুসা বলল।

হাসি ফুটে উঠল জোসেফাইনের মুখে। বলল, 'ও হো, তোমাকে তো বলা হয়নি। ওটা আমার সেই বান্ধবীর নাম, হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর মাজারে যার সাথে আমার দেখা। তুমি এটা জান।'

'তাহলে 'জেফি জিনা' তার নাম। কিন্তু তিনি তোমার সাথে এই সময়ে এলেন কি করে? এবং তিনি এখন কোথায়?'

'সে অনেক কথা। এতক্ষণ ছিলেন। পুলিশ সিনাগগে ঢোকার পর উনি চলে গেছেন। হঠাৎ অসুস্থ বোধ করছিলেন।' বলল জোসেফাইন।

'ছাড়লে কেন? এত রাতে উনি কিভাবে গেলেন?' আহমদ মুসা বলল।

'অসুবিধা হবে না। উনি নিজের গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন। তার সাথে তার পিএ মহিলাও রয়েছেন।' বলল জোসেফাইন।

'কিন্তু তিনি তোমার সাথে এলেন, তাকে এই রাতে পেলে কোথায়?' আহমদ মুসা বলল।

'সেটাই তো আসল কথা। তার কাছ থেকেই জানতে পারি, তুমি সিনাগগে যাচ্ছ এবং শত্রুরা তোমার যাওয়ার খবর আগাম পেয়ে গেছে। আমি....।'

জোসেফাইনের কথার মাঝখানে আহমদ মুসা বলে উঠল, 'তিনি তোমাকে জানান?' আহমদ মুসার চোখ ভরা বিস্ময়।

'হ্যাঁ, তিনি আমাকে জানান।'

'উনি কিভাবে জানলেন? ক'টায় তিনি জানান?'

'উনি রাত দশটা থেকে আমাকে টেলিফোন করছিলেন। আমার মোবাইল বন্ধ ছিল, আমি গিয়েছিলাম তোপকাপি প্রাসাদের এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। রাত এগারটা পর্যন্ত আমি ছিলাম সেখানে। উনি আমাকে টেলিফোনে না পেয়ে সোজা

আমার বাসায় চলে এসে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। আমি ফিরে এসে তার কাছ থেকে সবকিছু শুনি এবং সংগে সংগেই তোমাকে টেলিফোন করি।'

'এই খবর দেবার জন্যে তিনি ঐ রাতে তোমার ওখানে এসেছিলেন!' বলল আহমদ মুসা। তার চোখে বিস্ময়।

'খুব ভালো বন্ধু তিনি আমার। খবরটা তাকে খুবই উদ্বিগ্ন করেছিল। আমি তার সাথে যখন কথা বলেছি, তখন তাকে দারুণ উদ্বিগ্ন দেখেছি।' জোসেফাইন বলল।

আহমদ মুসার চোখে-মুখে তখনও দারুণ বিস্ময়। বলল, 'কিন্তু তিনি এই গুরুতর খবরটা জানলেন কি করে?'

'এ বিষয়ে আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, সেদিন রাত নয়টায় ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স ক্লাবে গিয়েছিলেন তার একজন আমেরিকান অধ্যাপিকা বান্ধবীর সাথে দেখা করতে। বান্ধবীর কক্ষে যাবার সময় একটা কক্ষের পাশ দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন। রুমটার একটা দরজা খোলা ছিল। ভেতরে কেউ একজন টেলিফোনে কথা বলছিলেন। কথার মধ্যে তোমার নাম 'খালেদ খাকান' শুনে সে থমকে দাঁড়িয়ে যায়। ভেতরের লোকটি টেলিফোনে বলছিল, বুঝলাম। কিন্তু খালেদ খাকান লোকটা আল-আলা সিনাগগে আজ রাতে যাচ্ছে, এটা নিশ্চিত হওয়া গেল কি করে? তার কথা শেষ হওয়ার কিছু পর আবার কণ্ঠ শোনা যায়। তিনি বলেন, কখন যাচ্ছে, কতজন যাচ্ছে- এটা কি জানা গেছে? তার কথা শেষ হওয়ার পর আবার নীরবতা। কিছুপর তার কণ্ঠ শোনা যায় আবার, খবরের জন্যে ধন্যবাদ। দু'বার খালেদ খাকান আমাদের হাত থেকে বেঁচে গেছে, সেদিন খালেদ খাকান আমাদের একজন লোককে হত্যা করেছে, তার আজ শেষ দিন। সিনাগগ থেকে সে জীবন্ত বের হতে পারবে না। তার মৃত্যুদণ্ড আগেই ঘোষিত হয়েছে, আজ তা বাস্তবায়নের রাত। তার কথা বন্ধ হয়ে যায়। আর কোন কথা হয়নি। এই টেলিফোনের কথা শুনে সে সংগে সংগেই আমাকে টেলিফোন করে। বার বার আমাকে পাওয়ার চেষ্টা করে টেলিফোনে। না পেয়ে সে ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। বান্ধবীর সাথে কথা বলার প্রোগ্রাম বাতিল করে সে ছুটে আসে আমার বাসায়। প্রায় পৌনে দু'ঘন্টা অপেক্ষা করে আমাকে পায়। আমি এজন্যে

দুঃখপ্রকাশ করেছিলাম। উত্তরে সে কি বলেছিল জান? বলেছিল, আরও দু'ঘন্টা অপেক্ষা করতে হলেও করতাম।'

থামল জোসেফাইন।

'তোমার বান্ধবী আসলেই তোমার সত্যিকার একজন বান্ধবী। তাকে আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা দিও। আচ্ছা বল, তুমি তো আমাকে খবর জানালেই, আবার এলে কেন? তিনিই বা এলেন কেন?' আহমদ মুসা বলল।

'এখানেই জেফি জিনার ভূমিকা আছে। সে আমাকে বলে, এই খবর দেয়াই যথেষ্ট নয়, বিষয়টা পুলিশকে জানানো উচিত। তার কথার উত্তরে সত্য গোপন করে বললাম, তার কোন ব্যাপারে পুলিশকে জানানোর অনুমতি নেই। তখন সে বলে, এ রকম হতে পারে, তাহলে কিছু একটা করা দরকার। এত বড় খবর পাওয়ার পর ঘরে বসে থাকা সম্ভব কি করে? আমি বলি, আমারও মন এটাই বলছিল। কিন্তু আমরা কি করতে পারি? সে বলে, আমাদের একটা কাজই করার আছে, সেটা হলো সংকটের জায়গায় আমরা উপস্থিত হতে পারি। আমরা কোন সাহায্যে আসতে পারবো কিনা সেটা আল্লাহই বলতে পারেন। কিন্তু না গেলে আল্লাহ যে কিছু করবেন, তারও সুযোগ থাকে না। তার এ কথার পর আমরা সিনাগগে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।' থামল জোসেফাইন।

'তোমার বান্ধবী তো আমার বিস্ময় বাড়িয়েই তুলছে। আশ্চর্য, এমন বান্ধবী এখনো দুনিয়াতে মিলে?'

বলে একটু থামল আহমদ মুসা। বলল আবার, 'তোমার বান্ধবী জেফি জিনা কি ঐ অধ্যাপকের নাম বলেছিলেন?'

'আমি জিজ্ঞেস করিনি, তিনিও বলেছেন বলে মনে পড়ছে না।' বলল জোসেফাইন।

'নামটা জানতে হবে।' আহমদ মুসা বলল।

'জানা যাবে। সকালেই জেনে নেব।' বলল জোসেফাইন।

'নামটা না জানালেও চলবে জোসেফাইন। রুমটার নাম্বার কিংবা আইডেন্টিফিকেশন পেলেও চলবে।' আহমদ মুসা বলল।

'ওটা তো পাওয়া যাবেই।' বলল জোসেফাইন।

গাড়ি তখন গোল্ডেন হর্নের দ্বিতীয় ব্রীজ অতিক্রম করছিল।

বাইরে দৃষ্টি ছিল জোসেফাইনের। বলল, 'রাতের গোল্ডেন হর্ন, মর্মর সাগর, বসফরাসের পটভূমিতে ইস্তাম্বুলকে অপরূপ লাগে। সত্যিই ইস্তাম্বুল ভূমধ্যসাগরের তীরে সবুজ জনপদের গলায় বিমুগ্ধকরী সৌন্দর্যের এক মুক্তা।'

আহমদ মুসাও দৃষ্টি ফিরিয়েছিল বাইরে। বলল, 'আমার মনে কি হয় জানো জোসেফাইন? পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবির সর্বশ্রেষ্ঠ এক কবিতা হচ্ছে ইস্তাম্বুল।'

'ধন্যবাদ। আমিও কি কিছু বলতে পারি?' বলল মিস লতিফা আরবাকান।

'বলুন, মিস লতিফা।' জোসেফাইন বলল।

'ইস্তাম্বুলের মানুষগুলো সম্পর্কে কিছু বলুন।'

'বুঝেছি মিস লতিফা, আপনি কি বলতে চান। ইস্তাম্বুলের মতোই ইস্তাম্বুলের ইতিহাসও ইতিহাসের পাতায় বিশেষ করে, মুসলিম ইতিহাসের পাতায় প্রোজ্জ্বল এক মুক্তার মতো। সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদ এবং সোলেমান দ্য ম্যাগনিফিসেন্টরা ইস্তাম্বুলের মুক্তার মতোই মানুষ। ওরা ইস্তাম্বুলের শুধু নয়, শুধু তুরস্কের নয়, গোটা ইসলামী দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সন্তান।'

'ধন্যবাদ স্যার। আমরা এসে গেছি।' বলল মিস লতিফা আরবাকান।

মর্মর সাগরের তীরে তোপকাপি প্রাসাদের দ্বিতীয় গেট দিয়ে প্রবেশ করল গাড়ি।

# ৭

রোমেলী দুর্গে আহমদ মুসার অফিস কক্ষ।

চেয়ারে বসে আছে আহমদ মুসা।

তার সামনে একটা ফাইল খোলা। ফটোসহ বায়োডাটা টাইপের কাগজপত্র সে ফাইলে।

ফাইলের দিকে তাকিয়ে আছে আহমদ মুসা। কিন্তু দৃষ্টি তার ফাইলে নেই। মন-মনোযোগটা হারিয়ে গেছে অন্য কোথাও।

ভেতরে তার এক প্রবল অস্বস্তি এবং তোলপাড়। বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে তার, কিন্তু ঘুরে-ফিরে তার সন্দেহের দৃষ্টি সেদিকেই পড়ছে কেন?

আহমদ মুসার অফিস কক্ষে হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করল জেনারেল তাহির তারিক এবং তার সাথে ডঃ শেখ আবদুল্লাহ বিন বাজ।

তাদের দু'জনের পায়ের শব্দেও আহমদ মুসার হারিয়ে যাওয়া ভাব কাটল না। মুখ তুলল না আহমদ মুসা। নিশ্চল, নিস্পন্দ সে। যেন ফাইলের দিকে তাকিয়ে পাথর হয়ে গেছে সে।

জেনারেল তাহির তারিকরা যতটা দ্রুত আহমদ মুসার অফিস কক্ষে ঢুকেছিল, ততটাই থমকে গেল তারা আহমদ মুসার নিজেকে হারিয়ে ফেলা তন্ময় ভাব দেখে।

তারা কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াল। বুঝল তারা যে, আহমদ মুসা গভীর চিন্তায় নিমগ্ন।

জেনারেল তাহির তারিক তাকাল ডঃ শেখ বাজের দিকে।

ডঃ শেখ বাজ একটু সচল হলো। আর দু'একধাপ এগিয়ে টেবিলের ধারে গিয়ে বলল, 'আসসালামু আলাইকুম, স্যার।'

চমকে উঠে মুখ তুলল আহমদ মুসা।

সামনে জেনারেল তাহির তারিক এবং ডঃ শেখ বাজকে দেখে উঠে দাঁড়াল। হেসে বলল, 'স্যরি, আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন। আমি একটু আনমনা হয়ে পড়েছিলাম। প্লিজ, বসুন আপনারা।'

বসল জেনারেল তাহির তারিক ও ডঃ শেখ বাজ।

আহমদ মুসাও বসল।

'আপনার এমন আপনহারা চেহারা আমি আর কখনও দেখিনি। গত রাতে আপনার উপর দিয়ে যে ধকল গেছে, তাতে আপনি আজ অফিসে না আসলেও পারতেন। আপনার যথেষ্ট বিশ্রাম হচ্ছে না বলে আমি মনে করি।' বলল জেনারেল তাহির তারিক।

'না, সেরকম কিছু নয়। আমি কোন ক্লান্তি অনুভব করছি না। আমি আমাদের সমস্যাগুলো নিয়েই ভাবছিলাম।' আহমদ মুসা বলল।

'যার মন ক্লান্ত হয় না, তার দেহ ক্লান্ত হওয়ারও সুযোগ পায় না। আপনার মন কখনও ক্লান্ত হবার নয়, আমি জানি খালেদ খাকান। তবু কাজ ও বিশ্রামের একটা অংক আছে, সে অংক মানতে হয় আমাদের। যাক, মিঃ খালেদ খাকান। আমি এখানে আসার আগে টেলিফোন পেলাম হাজী জেনারেল মোস্তফা কামালের। তিনি সাংঘাতিক খুশি। তিনি জানালেন, আপনার অনুমান শতভাগ ঠিক। ঐ পাঁচটি ফিংগার প্রিন্ট আমাদের পাঁচজন গোয়েন্দার। তাদের গলিত দেহাবশেষও পাওয়া গেছে। আর....।'

জেনারেল তাহিরের কথার মাঝখানে আহমদ মুসা বলে উঠল, 'কোথায় পাওয়া গেছে তাদের দেহাবশেষ?'

'খাদের ফ্লোরে যে পাথরটা দেখিয়ে এসেছিলেন। বলেছিলেন যে, পাথরটা কোন সুড়ঙ্গ বা সিঁড়ি পথের মুখ হতে পারে। ঠিকই পাথরটা সরিয়ে একটা সিঁড়িপথ পাওয়া গেছে। সিঁড়িটা সিনাগগ থেকে বেরুবার একটা গোপন পথ। ঐ সিঁড়ি দিয়ে একটা স্যুয়ারেজ পথও পাওয়া গেছে। সেখানেই পাঁচটি লাশ পাওয়া গেছে।'

একটু থামল জেনারেল তাহির তারিক। বলে উঠল সংগে সংগেই আবার, 'যা বলছিলাম, সিনাগগ সার্চ করে কিছু মূল্যবান ডকুমেন্ট পাওয়া গেছে বলে মনে করা হচ্ছে। সবাই মনে করছে, আপনার দেখা দরকার ওগুলো।'

'আলহামদুলিল্লাহ্‌। আমি দেখব ওগুলো। আচ্ছা, সিনাগগে যারা মারা গেছে, তাদের পরিচয় পাওয়া গেছে?' বলল আহমদ মুসা।

'সে চেষ্টা হচ্ছে। তবে লাশের মধ্যে আপনি যার কথা বলেছিলেন, সেই ডঃ ডেভিড ইয়াহুদের লাশ নেই।'

'ওদের কথা-বার্তায় শুনেছিলাম যে উনি সিনাগগের বাইরে আছেন, তবে এসেছেন কিংবা এসে পৌঁছেছিল কিনা এটা নিশ্চিত হবার জন্যেই লাশের মধ্যে তাকে সন্ধান করার কথা বলেছিলাম।' আহমদ মুসা বলল।

'জনাব খালেদ খাকান, রাতেই প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী আপনার সিনাগগ অপারেশনের রেজাল্টের কথা শুনেছেন। ভোর রাতেই তারা আমাকে টেলিফোন করে তাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা আপনাকে জানাতে বলেছেন। আপনি তাদের কল করলে তারা খুশি হবেন। ভোর রাতে টেলিফোন করে আপনাকে কষ্ট দিতে তারা চাননি।'

'ঠিক আছে, আমি তাদের টেলিফোন করব। কিন্তু আমরা আসলে খুব একটা এগোইনি। ওদের খবর দেবার মতো তেমন কিছু নেই।' আহমদ মুসা বলল।

'বলছেন কি আপনি! আমরা গত কয়েক মাসে এক ইঞ্চি এগোতে পারিনি। আপনি মাত্র কয়েক দিনে শুধু ষড়যন্ত্রটাকেই সামনে এনে ফেলা নয়, তাদের উপর আপনি শক্ত আঘাতও করেছেন।' বলল জেনারেল তাহির তারিক।

'কিছুটা আমরা এগিয়েছি বটে। কিন্তু তাদের দিকে এগোবার দরজা আমরা পেয়েছিলাম। সেটা আল-আলা সিনাগগ। কিন্তু গত রাতের পর সে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আমি বন্ধ করতে চেয়েছিলাম না, মাত্র একটা গোপন অনুসন্ধানে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমার যাওয়াটা জানাজানি হয়ে যাওয়ায় বড় ঘটনা ঘটে গেল এবং সে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। এখন আমাদের সামনে দু'টি দুর্বল অবলম্বন অবশিষ্ট আছে, সে দু'টা হলো ....।'

বলে হঠাৎ থেমে গেল আহমদ মুসা। তার মনে হলো, সিনাগগে যাবার বিষয়টা এভাবে বলেই জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। সেদিনও তার সিনাগগে যাবার খবরটা জেনারেল তাহির তারিক ও ডঃ শেখ বাজের কাছে আহমদ মুসা বলেছিল। সেভাবে আর কোন কথা বলা যাবে না।

আহমদ মুসাকে হঠাৎ থেমে যেতে দেখে জেনারেল তাহির ও শেখ বাজ উৎসুক হয়ে উঠল। আহমদ মুসাকে খুব চিন্তিত দেখে এ বিষয়ে কিছু না বলে জেনারেল তাহির তারিক জিজ্ঞেস করল, 'জানা-জানির বিষয়টা কিভাবে ঘটল? ওদের কাছে খবরটা কিভাবে পৌঁছল? আমার কাছে বিষয়টা খুব সাংঘাতিক মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, আমাদের নিরাপত্তায় কোন ফুটো আছে। এ ফুটো বন্ধ না করলে তো আমরা সামনে এগোতে পারবো না।'

গম্ভীর হয়ে উঠল আহমদ মুসার মুখ, 'আমি এ বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্যেই আপনাদের ডেকেছি।'

বলে নড়ে-চড়ে বসল আহমদ মুসা। বলল, 'এ পর্যন্ত আমার মনে হয়, খবর পাচার বা লীক-আউট হওয়ার তিনটি ঘটনা ঘটেছে। আমি আল-আলা পাহাড়ের পুলিশ আর্কাইভসে কি উদ্দেশ্যে গিয়েছিলাম, সেটা শত্রুরা জেনে ফেলে। পরে আমি ডাঃ ইয়াসারের বাসায় যাওয়ার খবরও পাচার হয়ে যায়। তৃতীয় ঘটনা গত রাতে। আমি যে সিনাগগে যাচ্ছি, সেটাও শত্রুদের আগাম জানা হয়ে যায়। এর অর্থ আমাদের অফিসে কোন লিকেজ রয়েছে এবং বাইরের কারো সাথে তার যোগাযোগ রয়েছে।' থামল আহমদ মুসা।

চোখে-মুখে উদ্বেগ ফুটে উঠল জেনারেল তাহির তারিক ও ডঃ শেখ বাজ দু'জনেরই।

'সাংঘাতিক কথা! তাহলে তো আমাদের সব তথ্যই শত্রুরা পেয়ে যাচ্ছে! এমন কি এই কথা-বার্তাও হয় তো!' বলল ডঃ শেখ বাজ।

'শেখ বাজ, তোমার শেষ কথাটা আতংকজনক। এতটা সন্দেহ করার কি আছে?' বলল জেনারেল তাহির তারিক।

'আমার একথা বলার কারণ হলো, খালেদ খাকান স্যার তথ্য পাচারের যে তিনটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন, সেখানে স্যারের যাওয়ার বিষয়ে

আমাদের সাথেই আলাপ হয়েছে। অফিসের আর কেউ এসব বিষয় জানার প্রশ্নই ওঠে না।' বলল ডঃ শেখ বাজ।

'বিষয়টা তাহলে তো গুরুতর অবস্থার দিকে টার্ন নিচ্ছে। আমাদেরকে সামনে রেখেই তাহলে সন্দেহের যাত্রা শুরু করতে হবে।' জেনারেল তাহির তারিক বলল।

'জেনারেল তাহির তারিক দুইয়ে দুইয়ে চার হওয়ার মতো অংকের কথা বলেছেন। কিন্তু অংক ও ষড়যন্ত্র এক জিনিস নয়। ষড়যন্ত্রের অন্ধকার গলি অংকের নিয়মে চলে না। এখানে যা দৃশ্যমান হয়, বাস্তবতা তার চেয়ে ভিন্ন হয়ে থাকে। আপনাদের দু'জনের সাক্ষাতে যে কথা হয়, তা পাচার হওয়ার উৎস অনেক কিছুই হতে পারে। আমাদের দৃষ্টি সেদিকে নিবদ্ধ হওয়া দরকার।' বলল আহমদ মুসা।

'তাহলে করণীয় বলুন মিঃ খালেদ খাকান।' জেনারেল তাহির তারিক বলল।

আহমদ মুসা তার ফাইলের তলা থেকে একখণ্ড কাগজ বের করে জেনারেল তাহিরের হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'এই কাজটা এখনি এই মুহূর্তে সম্পন্ন করতে হবে। সেনাবাহিনীর এ বিষয়ক একজন এক্সপার্ট এসেছেন। তিনিই কাজটা করবেন। তার অনুসন্ধান শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা কেউ কোন কথা আর বলব না।'

জেনারেল তাহির তারিক আহমদ মুসার দেয়া কাগজখণ্ড তার চোখের সামনে তুলে ধরল। পড়ল, 'আমাদের গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ফ্লোরে সবগুলো প্রশাসনিক কক্ষের প্রতিটি ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা, অফিসের জিনিসপত্র সবকিছু ট্রান্সমিশন-সেনসেটিভ স্ক্যানার দিয়ে স্ক্যান করে প্রমাণ করতে হবে, অফিসের কোথাও কোন গোপন ট্রান্সমিটার নেই। অনুসন্ধানের এই সময়টা অফিসের সবাইকে তাদের স্ব স্ব জায়গায় ডিউটিরত অবস্থায় থাকতে হবে। এ বিষয়টা লিখে দিলাম এই কারণে যে, শত্রুদের কাছে এ তথ্য যাতে না যায়, আমরা আমাদের অফিসে ট্রান্সমিটার থাকার বিষয় সন্দেহ করেছি এবং তার সন্ধান করছি।'

পড়ে জেনারেল তাহিরের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, ‘ধন্যবাদ মিঃ খালেদ খাকান। এ বিষয়টি যে আপনার মাথায় এসেছে, এজন্যে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি।’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘কাজটা শেষ হবার আগে আমরা কেউ কথা বলব না জেনারেল তাহির তারিক।’

চমকে উঠল জেনারেল তাহির। বলল, ‘স্যরি, উৎসাহের বশে ভুলে গিয়েছিলাম। সত্যিই স্যরি।’

বলে জেনারেল তাহির তারিক কাগজখণ্ড তুলে দিল ডঃ শেখ বাজের হাতে। শেখ বাজও পড়ল কাগজখণ্ড। তার মুখও আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, ‘আলহামদুলিল্লাহ, স্যার ঠিক পথে এগোচ্ছেন।’

‘আবার কথা!’ বলল জেনারেল তাহির তারিক ডঃ শেখ বাজকে লক্ষ্য করে।

ডঃ শেখ বাজ জিভ কাটল।

সবাই যে যার টেবিলে চলে গেল।

দু’ঘন্টা ধরে চলল ট্রান্সমিশন-সেনসেটিভ স্ক্যানার (TSS)-এর অনুসন্ধান। TSS যন্ত্রটি ট্রান্সমিশন-সেনসেটিভ ডিটেক্টরের (TSD) উন্নততর সংস্করণ। এই যন্ত্রটি দুই বর্গফুট এরিয়ার মধ্যে আলপিনের আগার চেয়েও সূক্ষ্ম ট্রান্সমিটার যে কোন কভারের মধ্যেই থাক, তা বের করে ফেলতে পারে।

দুই ঘন্টার অনুসন্ধান শেষে অনুসন্ধান টিমের প্রধান কর্নেল জামালী ওনাল আহমদ মুসার কাছে এসে তার হাতে একটা এনভেলাপ তুলে দিয়ে বলল, ‘স্যার, অত্যন্ত পাওয়ারফুল একটা ট্রান্সমিটারের সন্ধান পাওয়া গেছে। আমার রিপোর্টে তার সব বিবরণ রয়েছে।’

‘ধন্যবাদ’ বলে আহমদ মুসা এনভেলাপটি নিয়ে বলল, ‘প্লিজ কর্নেল, একটু বসুন।’

বসল কর্নেল জামালী ওনাল।

আহমদ মুসা এনভেলাপ খুলে রিপোর্টের উপর চোখ বুলাতে গিয়ে মুখ মলিন হয়ে গেল তার। ডঃ শেখ আবদুল্লাহ বিন বাজের কোট-পিনে ট্রান্সমিটার।

তার সন্দেহ তাহলে সত্য প্রমাণ হলো! কিন্তু এই সত্য হওয়াটা খুবই বেদনাদায়ক। ঘরের পরিবেশ বৈরি হলে তার চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি আর কিছু নেই। আহমদ মুসা বলল, 'কর্নেল, এই ট্রান্সমিটারের মেসেজ কতদূর পৌঁছতে পারে এবং এই মেসেজ একাধিক জন রিসিভ করতে পারে কিনা?'

'শহরাঞ্চলে এর রেঞ্জ দশ বর্গমাইলের বেশি নয়। কিন্তু শহরের বাইরে এর রেঞ্জ চার গুণ বেশি হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এর মেসেজ ট্রান্সমিটটা টার্গেটেড। এর মেসেজ রিসিভ করার জন্যে এর গোপন কোডের ফ্রিকোয়েন্সি জানা থাকা দরকার।'

'ধন্যবাদ কর্নেল।' বলল আহমদ মুসা।

'ধন্যবাদ স্যার।' বলে উঠে দাঁড়াল কর্নেল জামালী ওনাল।

কর্নেল উঠে যেতেই আহমদ মুসা কর্নেলের দেয়া এনভেলাপ নিয়ে ছুটল জেনারেল তাহির তারিকের কক্ষে।

আহমদ মুসা জেনারেল তাহিরের কক্ষে গিয়ে তাকে এনভেলাপ দিয়ে সবকিছু বলল। সব শুনে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল জেনারেল তাহির তারিকের। বলল ভারি, ভাঙা কণ্ঠে, 'শেষ পর্যন্ত ডঃ শেখ বাজ এই বিশ্বাসঘাতকতা করল!'

'না মিঃ জেনারেল তারিক, ডঃ শেখ বাজ নিরপরাধ। ওর 'কোট-পিন' যে একটি ট্রান্সমিটার, তা উনি জানেন না, আমি নিশ্চিত।' আহমদ মুসা বলল।

'তাহলে?' জিজ্ঞাসা জেনারেল তাহির তারিকের।

'বলছি। তার আগে ডঃ শেখ বাজকে এখানে ডাকুন।'

কথা শেষ করে একটু থেমেই আবার বলল, 'তাকে বলুন, আসার আগে তার কোটটা যেন তিনি খুলে রেখে আসেন।'

'কেন মিঃ খালেদ খাকান?' বলল জেনারেল তাহির তারিক।

'তার কোটে 'কোট-পিন' আছে। সেটা থাকলে কোন কথা বলা যাবে না।'

'বুঝেছি, ধন্যবাদ।' বলে জেনারেল তাহির ডঃ শেখ বাজকে তার নিজের কক্ষে আসতে বলল এবং বলে দিল, আসার সময় যেন সে তার কোট কক্ষে খুলে রেখে আসে।

মিনিটখানেকের মধ্যেই ডঃ শেখ বাজ জেনারেল তাহিরের কক্ষে এল।

ডঃ শেখ বাজ বসলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এক মিনিট, আমি আসছি।'

আহমদ মুসা ঘরের বাইরে এসে সোজা গিয়ে ঢুকল শেখ বাজের কক্ষে। দেখল, ডঃ শেখ বাজের কোট তার হ্যাংগারে টাঙানো এবং কোট-পিনটা জ্বলজ্বল করছে তার কোটে। খুশি হলো আহমদ মুসা।

ফিরে এল সে জেনারেল তাহিরের কক্ষে।

ডঃ শেখ বাজ কোট-পিনটা পকেটে নিয়ে এসেছে কিনা, সেটা নিশ্চিত হবার জন্যেই আহমদ মুসা ডঃ বাজের কক্ষে গিয়েছিল। এটা নিশ্চিত হবার তার প্রয়োজন ছিল দুই কারণে—এক. ডঃ শেখ বাজের নির্দোষিতা সম্পর্কে আরও নিশ্চিত হওয়া, দুই. আরও সাবধানতা অবলম্বন করা যে, কোট-পিনটা তার সাথে ভুলক্রমেও আসেনি।

আহমদ মুসা এলে জেনারেল তাহির তারিক বলল, 'মিঃ খালেদ খাকান, শুরু করুন।'

'মিঃ শেখ বাজ, কিছু ব্যক্তিগত প্রশ্ন করলে তো কিছু মনে করবেন না?' আহমদ মুসা বলল।

'স্যার, ব্যক্তিগত কিংবা যে কোন প্রশ্ন করার অধিকার আপনার আছে।' বলল ডঃ শেখ বাজ।

'ধন্যবাদ ডঃ শেখ বাজ।'

বলে একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর শুরু করল, 'বিয়ের আগে আপনার স্ত্রীর সাথে প্রথম দেখা আপনার কোথায় হয়?'

'প্রথম দেখা হয় লেবাননের আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে এক আন্তর্জাতিক ছাত্র-সেমিনারে। তারপর জার্মানিতে আমরা একসাথে পিএইচডি করি।' বলল ডঃ শেখ বাজ।

'আপনার স্ত্রীর জন্মস্থান লেবাননের বেকাতে। কখনও আপনি সেখানে গেছেন?'

‘না, যাইনি। এমন কি বিয়ের পর লেবাননেও আর যাওয়া হয়নি।’ ডঃ শেখ বাজ বলল।

‘আপনি কি আপনার স্ত্রীর একাডেমিক রেকর্ডগুলো দেখেছেন?’

‘একসাথে পিএইচডি করার সময় গ্র্যাজুয়েশন সার্টিফিকেট, মার্কসশীট দেখেছি। অন্যকিছু দেখার কখনও প্রয়োজন হয়নি।’ বলল ডঃ শেখ বাজ।

‘বৈরুতে হায়ার স্কুলে ঢোকার সময় আপনার স্ত্রী শুধু নাম নয়, গোটা একাডেমিক রেকর্ড বদলে ফেলেন, এটা কি আপনি জানেন?’

বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে ডঃ শেখ বাজ তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল প্রতিবাদী কণ্ঠে, ‘এটা কি ঠিক স্যার?’

‘দুঃখিত ডঃ শেখ বাজ। আমি যা বলেছি, তা সম্পূর্ণ সত্য। শুধু তাই নয়, আপনার স্ত্রী বেকাতে এক লেবাননী ইহুদি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক স্কুল তিনি শেষ করেন ইসরাইলে। তারপর ফিরে আসেন লেবাননে। তখন তার নাম ছিল আলিশা দানিয়েল। লেবাননে তিনি ফেরার পর ‘আয়েশা আজিমা’ নামে একজন প্রাথমিক স্কুল পাস ছাত্রী রহস্যজনকভাবে খুন হয়। অন্যদিকে এই ছাত্রীর গোটা পরিবারের সবাই এক বিস্ফোরণে নিহত হয়। আয়েশা আজিমা খুন হওয়ার পর আলিশা দানিয়েল হয়ে যান আয়েশা আজিমা। এই নাম ও আয়েশা আজিমার একাডেমিক রেকর্ড নিয়ে তিনি ভর্তি হন বৈরুতের হায়ার স্কুলে। ফিলিস্তিনের গোয়েন্দা বিভাগের অনুরোধে লেবাননের গোয়েন্দা বিভাগ অনুসন্ধান করে এ তথ্য জানিয়েছে। আমি ফিলিস্তিন সরকারকে অনুরোধ করেছিলাম এ তথ্য জানার জন্যে।’ থামল আহমদ মুসা।

ডঃ শেখ বাজ নির্বাক, নিস্তব্ধ। সে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে আহমদ মুসার দিকে। তার চোখে-মুখে অসীম বিস্ময়। এক অসহায় ভাব ফুটে উঠেছে তার চেহারায়।

আহমদ মুসা তার একটি হাত ডঃ শেখ বাজের কাঁধে রাখল। সান্ত্বনা দিয়ে বলল, ‘মন শক্ত করুন ডঃ শেখ বাজ। আপনার স্ত্রী গুরুতর কাজে আপনার অজান্তে আপনাকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করছেন।’

আহমদ মুসা একটু থামল। থেমেই আবার বলে উঠল, ‘আপনি আপনার ‘কোট-পিন’টা কোথায় পেয়েছিলেন ডঃ বাজ?’

‘আমার স্ত্রী সংগ্রহ করেন। তিনিই আমাকে এটা ব্যবহারের জন্যে দেন।’ বলল শুকনো কণ্ঠে ডঃ শেখ বাজ।

‘আপনি জানেন না শেখ বাজ, আপনার কোট-পিনটা একটা ট্রান্সমিটার। অফিসে আপনি যত কথা বলতেন, যত কথা আপনাকে বলা হতো, ঐ ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে সব চলে যেত আপনার স্ত্রীর কাছে রক্ষিত গ্রাহক যন্ত্রে। আপনার স্ত্রী সেগুলো সংগে সংগেই জানিয়ে দিতেন ষড়যন্ত্রকারী......।’

আহমদ মুসার কথায় বাঁধা দিয়ে আর্তকণ্ঠে বলে উঠল ডঃ শেখ বিন বাজ, ‘আর বলবেন না স্যার। আমি সহ্য করতে পারছি না। আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে। আমি সব বুঝতে পারছি। কেন সে কোট-পিনটার প্রতি এত লক্ষ্য রাখত, কেন সে প্রতিদিন কোটে আমার কোট-পিনটাকে ঠিকঠাক করে দিত। আমি ভাবতাম, কোট-পিনে যেহেতু ‘কাবা’ শরীফের প্রতিকৃতি আছে, তাই এর প্রতি তার এই যত্ন।’

থেমে গেল ডঃ শেখ বাজ। কান্নায় রুদ্ধ হয়ে গেল তার কণ্ঠ।

সান্ত্বনা দেবার জন্যে ডঃ শেখ বাজের কাঁধে হাত রাখল আহমদ মুসা।

এই সান্ত্বনায় সে আরও ভেঙে পড়ল। তার দু’চোখ থেকে নেমে এল অশ্রুর বন্যা। দু’হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে।

জেনারেল তাহির তারিক তার চেয়ার থেকে উঠে এল এবং ডঃ শেখ বাজের পাশে বসল। কয়েকখণ্ড টিস্যু পেপার তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, ‘চোখ মোছ ডঃ শেখ বাজ। তুমি কি কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই তুখোড় ছাত্রনেতা নও, যে জাতির কাছে নিজের জীবন উৎসর্গ করার শপথ নিয়েছিল! তুমি কি সেই ডঃ শেখ বাজ নও, যে এই গবেষণা ইনস্টিটিউটের চাকরিকে যুদ্ধ হিসেবে নিয়েছিল! তুমি বরং এখন আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর যে, তোমার প্রতি, তোমার জাতির প্রতি, মানবতার প্রতি তোমার স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতা আল্লাহ যথাসময়ে ধরিয়ে দিয়েছেন আরও কোন বড় ক্ষতি হবার আগেই।’

ডঃ শেখ বাজ চোখ মুছল। বলল, 'আমার কষ্ট অন্য জায়গায় স্যার। আয়েশা আজিমা আমার এত কাছের হয়েও এত দূর হতে পারল কি করে! সে তো মানুষ।। হৃদয় ছাড়া তো কোন মানুষ নেই! সেই হৃদয়কে পদদলিত করে কোন স্বার্থে সে আমার সাথে, আমার পরিবারের সাথে এই বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারল!' বলে আবার কান্নায় ভেঙে পড়ল সে।

'তোমার এই কষ্ট স্বাভাবিক ডঃ বাজ। কিন্তু সে তার হৃদয়বৃত্তি, প্রেম-ভালোবাসা এবং পরিবারের প্রতি দায়িত্বের চাইতে তার জাতিগত পরিচয় ও দায়িত্বকেই বড় করে দেখেছে। তোমাকেও শক্ত হতে হবে শেখ বাজ। ন্যায়ের প্রতি তোমার দায়িত্বকেও সবার উপরে স্থান দিতে হবে তোমাকে। তোমার ক্ষেত্রে যা ঘটল, ষড়যন্ত্রের রঙ্গমঞ্চে এমন ঘটনা আগেও ঘটেছে, ভবিষ্যতেও ঘটবে।' বলল আহমদ মুসা।

চোখ মুছে সোজা হয়ে বসল ডঃ শেখ বাজ। সে বলল জেনারেল তাহিরকে লক্ষ্য করে, 'স্যার, আয়েশা আজিমা এখন বাড়িতে আছে। তিনটায় যাবে সে আমার মেয়েকে আমার বোনের বাড়ি থেকে আনতে। তার আগেই তাকে আপনারা গ্রেফতার করুন।'

থামল। একটা দম নিল। তারপর সে হাতজোড় করে বলল, 'আমি আপনাদের সাথে যেতে পারবো না। আপনারাই তাকে গ্রেফতার করে আনুন। আমি তার দিকে চাইতে পারবো না। আমি সহ্য করতে পারবো না অসহ্য সেই দৃশ্যটাকে। আমার এই দুর্বলতাকে আপনারা ক্ষমা করুন।' আবার কান্নায় ভেঙে পড়ল ডঃ শেখ বাজ।

আহমদ মুসা ও জেনারেল তাহির তারিক দু'জনেই দু'দিক থেকে ডঃ শেখ বাজের পিঠে সান্ত্বনার হাত রাখল। জেনারেল তাহির তারিক বলল, 'ঠিক আছে ডঃ বাজ, তুমি যেভাবে চাচ্ছ, সেভাবেই হবে। তবে আমরা তোমার বাসায় যাব আরও ঘণ্টা দুয়েক পর। এ দুই ঘণ্টা আমাদের ব্যস্ত থাকতে হবে। আজ টেস্ট ল্যাবে আমাদের একটা আবিষ্কারের ল্যাব-প্রদর্শনী হবে। সেখানে ওআইসি চেয়ারম্যান, সেক্রেটারি জেনারেল, তুর্কি প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রী আসছেন।'

থামল জেনারেল তারিক।

‘কিন্তু তাকে ধরাটাই আপনাদের এই মুহূর্তের প্রথম প্রায়োরিটি হওয়া উচিত। তাকে ধরলে ষড়যন্ত্রটাকেও আপনারা ধরতে পারবেন। আমি জানি না, আমাদের এই চিন্তা-ভাবনা সে জানতে পারছে কিনা। কিন্তু তাকে কোনভাবেই পালাবার সুযোগ দেয়া উচিত নয়।’ বলল ডঃ শেখ বাজ শুকনো, ভাংগা কণ্ঠে।

শুনেই জেনারেল তাহির তারিক একবার আহমদ মুসার দিকে চেয়ে মোবাইল তুলে একটা কল করল। কল পেয়ে সালাম বিনিময়ের পর বলল, ‘স্যার, ল্যাব-প্রদর্শনীটা দু’ঘণ্টা পিছিয়ে দিতে হবে। একটা ইমারজেন্সি কাজ দেখা দিয়েছে। মিঃ খালেদ খাকানকে এখনি বেরুতে হবে। আমি তার সাথে যেতে পারি। মাননীয় প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, এই ডিসপ্লেতে খালেদ খাকানের উপস্থিত থাকা খুব জরুরি। আপনি যদি যোগাযোগ করে একটা সিদ্ধান্ত নেন ভালো হয়।’

বলে ওপারের কথা শুনে টেলিফোন রেখে দিল জেনারেল তাহির তারিক। বলল, ‘ডক্টর বিজ্ঞানী আমির আবদুল্লাহ আন্দালুসী প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী হাউজের সাথে যোগাযোগ করে এখনি জানাবেন।’

‘প্রদর্শনীতে আজ কোন বিষয়টা দেখানো হবে?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘আমাদের ‘সোর্ড’-এর ফোটন-নেট যে কোন উড়ন্ত বস্তুকে আটকে আরো উপরে সরিয়ে নিয়ে বিস্ফোরণ ঘটায়। আমাদের বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করেছিল এই বিস্ফোরণটা পৃথিবীর আবহাওয়ামণ্ডলের বাইরে নিয়ে গিয়ে করার। সে ক্ষেত্রে আমরা সফল হয়েছি। আজ সেটাই ল্যাব-ডিসপ্লেতে দেখানো হবে।’ বলল জেনারেল তাহির।

‘শুরু থেকেই আমার একটা জিজ্ঞাসা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ‘এসডিআই’ এবং আমাদের ‘সোর্ড’-এ দু’য়ের পার্থক্য কি? দু’টিই তো উড়ে আসা অস্ত্র ধ্বংস করে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘দু’য়ের মধ্যে যোজন যোজন পার্থক্য। মার্কিন ‘এসডিআই’ হলো কাউন্টার ক্ষেপণাস্ত্র যা আক্রমণকারী ক্ষেপণাস্ত্রকে পূর্বাহ্নে আঘাত করে ধ্বংস করে। আর আমাদের ‘সোর্ড’ কোন অস্ত্র নয়। এটা উড়ন্ত সকল বস্তুকে গ্রেফতার

করার একটা ব্যবস্থা। 'সোর্ড'-এর ফোটন-নেট উড়ন্ত বস্তুকে বন্দী করে মানুষের পৃথিবী, পৃথিবীর আবহাওয়া থেকে অনেক দূরে নিয়ে গিয়ে ফোটন-চুম্বক ডেটোনেটরের মাধ্যমে উড়ন্ত অস্ত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিস্ফোরণ ঘটায়। 'সোর্ড'-এর এই কীর্তিটা আজ নিজ চোখে দেখবেন 'সোর্ড'-এর ল্যাব-ডিসপ্লের সময়।'

টেলিফোন বেজে উঠল জেনারেল তাহির তারিকের।

'নিশ্চয় ডক্টর আন্দালুসী টেলিফোন করেছেন' বলে টেলিফোন ধরল জেনারেল তাহির তারিক।

টেলিফোনে কথা বলার পর রিসিভার রাখতে রাখতে বলল, 'হ্যাঁ, ল্যাব-ডিসপ্লে দু'ঘণ্টা পিছিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রেসিডেন্ট বলেছেন, খালেদ খাকান চাইলে দু'ঘণ্টা কেন, দু'দিন পেছাতেও আমাদের আপত্তি নেই। তাহলে তো হয়ে গেল। এখন মিঃ খালেদ খাকান, বলুন কি করতে হবে আমাদের? আমরা ডক্টর শেখ বাজের কোট-পিনটা এখন নিয়ে নেব এভিডেন্স হিসেবে?'

'এখন নয়। এখন পিন ট্রান্সমিশন বন্ধ রাখা যাবে না। 'কোট-পিন' ধরা পড়েছে সন্দেহ হলে ঘটনা ভিন্ন দিকে যেতে পারে। ডঃ শেখ বাজ এখন কোট-পিন সমেত কোট পরে স্বাভাবিকভাবে অফিস করবেন। আমার মনে হয় ডঃ বাজ, আপনি আইটি ইঞ্জিনিয়ার ইসমত কামালকে সাথে নিয়ে গত মাসের ডোরভিউ-এর মনিটরিং রিপোর্ট তৈরি করে ফেলুন।' বলে আহমদ মুসা ইন্টারকমে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিল ইসমত কামালকে এবং নির্দেশ দিল এখনি ডঃ শেখ বাজের কক্ষে আসতে।

'ধন্যবাদ' বলে উঠে দাঁড়াল ডঃ শেখ বাজ। বলল, 'স্যার, ওদিকে দেখছি। আই উইশ ইউ অল গুডলাক, স্যার।' ভারি কণ্ঠ ডঃ বাজের। বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে।

'খুব ভালো ছেলে। অসহনীয় এক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ল। কাজ যাই হোক, ওকে সাথে নিয়ে ব্যস্ত রাখার ব্যবস্থা করে গেলাম।' বলল আহমদ মুসা। উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

উঠে দাঁড়াল জেনারেল তাহির তারিকও।

‘জেনারেল, আপনি হাজী মোস্তফা কামালকে বলুন আমাদের পুলিশী সাহায্য দরকার। কিন্তু পুলিশ যেন আমরা পৌঁছার পরে পৌঁছে।’

মনে মনে বলল আহমদ মুসা, এখন আয়েশা আজিমাই আমাদের প্রধান দরজা লক্ষ্যে পৌঁছার। তাকে হাতছাড়া হতে দেয়া যাবে না। ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকও দরজা হতে পারেন, আয়েশা আজিমার পরেই তার পালা আসবে। ‘থ্রী জিরো’র কাছে পৌঁছার জন্যে তার বাড়তি হাতিয়ার সাবাতিনি ইয়াসার। কিন্তু তাকে নিয়ে বেশি দূর যাওয়া যাবে না।

‘কিছু ভাবছেন আহমদ মুসা?’ বলল জেনারেল তাহির তারিক।

‘ভাবছি থ্রী জিরো’র ষড়যন্ত্রের কথা। হিসেব কষলে খুব একটা এগোতে পারিনি আমরা। কতগুলো বিকল্প নিয়ে তারা এগোচ্ছে, বিস্তারিত না জানলে প্রতিরোধ দাঁড় করানো যাবে কোন পথে? চলুন, আয়েশা আজিমাকে হাতে পাওয়ার উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।’

‘চলুন।’ বলল জেনারেল তাহির তারিক।

সাইমুম সিরিজের পরবর্তী বই

# রোমেলী দুর্গে

**কৃতজ্ঞতায়ঃ Meah Imtiaz Zulkarnain**

# সাইমুম-৪৬

# রোমেলী দুর্গে

আবুল আসাদ

# ১

'স্যরি ম্যাডাম। আপনাকে মুখ খুলতেই হবে, আমাদের প্রশ্নের জবাব দিতেই হবে। দরকার হলে আপনাকে আমরা থানায় নেব। আপনার পেছনে যে মহিলারা দাড়িয়ে আছেন, তারা পোশাকে সিভিলিয়ান বটে, কিন্তু তারা দায়িত্বশীল পুলিশ অফিসার। বাড়িটাও চারিদিক থেকে পুলিশে ঘেরা।' বলল আহমদ মুসা।

আয়েশা আজীমা মাথা নিচু করে বসেছিল। তার মুখে কিন্তু ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই। আহমদ মুসা শান্ত কণ্ঠের কঠোর কথাগুলো আয়েশা আজীমার চেহারায় সামান্য চাঞ্চল্যেরও সৃষ্টি করল না।

আহমদ মুসার ডান পাশের সোফায় বসেছিল তাহির তারিক, বাম পাশের আরেক সোফায় বসেছিল জেনারেল হাজী মোস্তফা কামাল।

আয়েশা আজীমা বসে ছিল সামনে একটু দূরের একটা সোফায়। মাঝখানে লাল কার্পেটে মোড়া বর্গাকৃতির ছোট্ট একটা চত্বর। তাতে শুধু একটা 'টী' টেবিল।

তার পরনে পাজামা ও ফুলহাতা কামিজ। কামিজের উপর একটা কুকিং অ্যাপ্রন।

আয়েশা আজীমা রান্নাঘরে ছিল। সেখানে সে যেভাবে ছিল মহিলা পুলিশ অফিসারেরা তাকে সেভাবেই ধরে নিয়ে এসেছে।

তার মাথায় একটা রুমাল বাঁধা।

বৈরুতের আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিছাত্রী ও সেরা সুন্দরী ছিল আয়েশা আজীমা। সৌদি ছাত্র শেখ বাজের মেধা ও বিত্তই সম্ভবত শেখ আয়েশা আজীমাকে আকৃষ্ট করে। আকর্ষণ শেষে প্রেম ও বিবাহে পরিণতি লাভ করে।

আয়েশা আজীমা আহমদ মুসার কথার কোন জবাব না দেয়াতে আহমদ মুসা জেনারেল তারিক ও জেনারেল হাজী মোস্তফা কামালের দিকে একবার তাকাল। তারপর মুখ ঘুরিয়ে আয়েশা আজীমাকে লক্ষ্য করে বলল, 'দেখুন, চুপ থেকে লাভ নেই। ড. শেখ বাজ হাতে-নাতে ধরা পড়েছেন। তার কাছ থেকে কোটপিনের আকারে এই শক্তিশালী ট্রান্সমিটার পাওয়া গেছে। তিনি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছেন, তার কোটপিনে যে ট্রান্সমিটার তা তিনি জানেন না। কিন্তু আইন তার এ কথা মানবে না। ধরা পড়ার পর সব অপরাধীই এমন কথা বলে। এখন আমরা জানতে চাই আপনার এ ব্যাপারে বক্তব্য কি? কারণ তিনি বলেছেন, কোটপিন আপনার সংগ্রহ করা।'

থামল আহমদ মুসা।

আয়েশা আজীমা একবার মুখ তুলে আহমদ মুসার দিকে চাইল। কোন কথা নেই তার মুখে। তবে প্রথমবারের মত তার চোখে-মুখে উদ্বেগ ফুটে উঠতে দেখা গেল।

আহমদ মুসা মুখ একটু নিচু করে ভাবল। তার ঠোঁটে ফুটে উঠল এক সূক্ষ্ম হাসি। বলল সে, 'তাহলে বুঝা গেল মিসেস বাজ, আপনি কিছুই জানেন না। ড. শেখ বাজই মিথ্যা কথা বলেছেন। সত্য তাহলে তার কাছেই পাওয়া যাবে। তার কাছ থেকেই সত্য এবার বের করতে হবে। সত্য বের করার কৌশল পুলিশের জানা আছে। বাবা ডেকে সব সত্য কথা বলে দেবেন তিনি। আমরা উঠছি। যতদিন না বিষয়টির সুরাহা হয় ততদিন আপনি পুলিশের কাস্টডিতে...।'

কথা শেষ করতে পারল না আহমদ মুসা। চিৎকার করা কান্না জড়িত কণ্ঠে বলল আয়েশা আজীমা, 'না, আমি সব বলব। ওর কোন দোষ নেই। ওঁর মত

ভাল মানুষ কোন অপরাধ করতে পারেন না। তার কোন ক্ষতি করবেন না, তাকে আপনারা ছেড়ে দিন।’

কথাগুলো বলে থামল আয়েশা আজীমা। দু’হাতে মুখ ঢেকে সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে।

‘ওঁর কোন দোষ নেই দোষটা তাহলে কার, এটাই তো আমরা জানতে চাচ্ছি। সব বলুন আপনি আমাদের।’ বলল আহমদ মুসা।

আয়েশা আজীমা হাতের রুমাল দিয়ে চোখ মুছে বলল, ‘আমি একটা স্টেটমেন্ট করব, আপনি লিখুন।’

আহমদ মুসা তাকাল তুরস্কের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা প্রধান জেনারেল হাজী মোস্তফা কামালের দিকে।

বুঝতে পেরে জেনারেল হাজী মোস্তফা কামাল ইশারা করে আয়েশা আজীমার পেছনে দাঁড়ানো তিন মহিলা পুলিশ অফিসারের একজনকে ডেকে বলল, ‘মিসেস বেরিল ডেডেগ্লু, আপনি ওঁর স্টেটমেন্টটা লিখুন।’

মিসেস বেরিল ডেডেগ্লু এই এলাকার একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত তদন্ত অফিসার।

মিসেস ডেডেগ্লু পকেট থেকে নোটশিট ও কলম বের করে আয়েশা আজীমার পাশের সোফায় বসে পড়ল। বলল, ‘ওয়েলকাম ম্যাডাম, বলুন।’

আয়েশা আজীমা মিসেস ডেডেগ্লুর কাছ থেকে নোটশীট ও কলম নিয়ে নিল এবং কয়েকটি নোটশীটের শেষ প্রান্তে নিজের নাম দস্তখত করে ওগুলো মিসেস ডেডেগ্লুর হাতে ফেরত দিল।

স্টেটমেন্ট করার আগেই স্টেটমেন্টশীটে সত্যয়নকারী দস্তখত করায় অবাকই হল আহমদ মুসা। বেরিল ডেডেগ্লুও। তার চোখেও বিস্ময়।

‘লিখুন’, বলতে শুরু করল আয়েশা আজীমা, ‘আমি আয়েশা আজীমা ওরফে আলিশা দানিয়েল স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে এই স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্য দিচ্ছি যে, ‘আমি ওয়ান ওয়ার্ল্ড অরবিট (থ্রি জিরো) নামক সংস্থার দেয়া অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে তাদের সরবরাহ করা ‘কোটপিন’ আকারের শক্তিশালী ট্রান্সমিটার আমার স্বামীর কোটে নিয়মিত লাগিয়ে রাখার মাধ্যমে রিসার্চ সেন্টারের যাবতীয়

কথোপকথন পাচার করেছি। আমার স্বামীর বিশ্বাস ও ভালোবাসা ব্যবহার করা তাঁর অজ্ঞাতে তাঁদেরই বিরুদ্ধে এ ষড়যন্ত্র করতে আমি বাধ্য হয়েছি। কেন এভাবে আমি বাধ্য হলাম, কেন আমার প্রিয়তম স্বামী ও তার প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এই বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্র করতে বাধ্য হলাম, তার পেছনে আছে আমার এক অসহায়ত্ব। সে অসহায়ত্ব হলো আমার স্বামীকে রক্ষার এক নিরুপায় ব্যবস্থা। আমি ওদের ষড়যন্ত্রের সাথী না হলে ওরা আমার স্বামীকে হত্যা করত। আমি জানি আমার স্বামীকে কেউ-ই ওদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারত না। শুধু 'থ্রি জিরো'ই তখন আমার শত্রু হতো না, তুরস্কের পুলিশ ও সেনাবাহিনীতে আমার মত ছদ্মবেশী অনেকে আছে যারা 'থ্রি জিরো' অর্থাৎ ওয়ান ওয়ার্ল্ড অরবিট-এর পক্ষে কাজ করছে তারাও আমার স্বামীর হন্তায় পরিণত হতো। আমার অন্যায় হয়েছে, আমার ছদ্মবেশ সম্পর্কে আমার স্বামীকে না বলা, এমন ছদ্মবেশ নিয়ে তার মত একজন ভালো ও জাতিপ্রেমিক মানুষকে বিয়ে করাও আমার অন্যায় হয়েছিল। কিন্তু তার প্রতি আমার প্রেম আমাকে অন্ধ করেছিল। তাঁকে বিয়ে না করেও পারিনি, তাঁকে হারাবার ভয়ে আমার ছদ্মবেশ সম্পর্কেও তাঁকে বলতে আমি সাহস পাইনি।

আমি স্বীকার করছি। আমার ছদ্মবেশ ছিল পরিকল্পিত। হাজারো ইহুদী তরুণী যেভাবে তাদের নাম পরিচয় পাল্টে মুসলিম ও খ্রিস্টান সমাজে ঢুকে পড়েছে, আমি তাদেরই একজন। লেবাননের বেকা অঞ্চলের এক ইহুদী পরিবারে আমার জন্ম। স্কুল সার্টিফিকেট পর্যায় পর্যন্ত আমি ইসরাইলের তেলআবিবে পড়ি। তারপর বেকায় ফিরে আসি। বেকায়ই আমার পরিবারের পরিচিত আয়েশা আজীমার নাম পরিচয় আমাকে গ্রহণ করতে বলা হয়। তার সমস্ত শিক্ষা ডকুমেন্টও আমাকে দেওয়া হয়। এই সব ডকুমেন্টের জোরে আমি আয়েশা আজীমা রূপে বৈরুতের আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে যাই। আমি পুরোপুরি আয়েশা আজীমা হয়ে যাই। পরে শুনেছি, স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় পাশের পর আয়েশা আজীমা নিহত হয়। কেউ আমাকে বলেনি, তবে এখনও আমি বিশ্বাস করি আমাকে আয়েশা আজীমা বানাবার জন্যেই তাঁকে হত্যা করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শেষ দিকে হঠাৎই কৃতি ছাত্র শেখ আবদুল্লাহ বিন বাজের

সাথে আমার পরিচয় হয়। ভালো লেগে যায়। শুধু কৃতি ছাত্র বলে নয়, তার চরিত্রের দৃঢ়তা ও মেয়েদের প্রতি নির্মোহ ভাব আমাকে আকৃষ্ট করে বেশি। তার মত ঠাণ্ডা ছেলেকে উত্তপ্ত করতে আমার অনেক সময় লেগেছে। জার্মানিতে পিএইচডি করার সময় তার কাছ থেকে বিয়ের ইতিবাচক সাড়া আমি পাই। ইতিমধ্যে 'থ্রি জিরো'-এর সাথে আমার পরিচয় হয়ে গেছে। পরে জেনেছি তারাই জার্মানিতে পড়ার জন্য আমার স্কলারশিপের ব্যবস্থা করেছে। বৈরুতে আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার খরচও আমার বাবা-মায়ের মাধ্যমে তারাই দেয় বলে জানতে পারি। শেখ আবদুল্লাহ বিন বাজের সাথে আমার সম্পর্কে 'থ্রি জিরো' আমাকে দারুণভাবে কনগ্রাচুলেট করে এবং বলে যে, সৌদি আরবের এমন পরিবারের ছেলে সে সৌদি আরবের বড় কোন এক দায়িত্বে যাবেই। শেখ বাজের উপর তাদের চোখ রাখাকে আমি ভাল চোখে দেখিনি, কারণ এটা আমার একান্তই প্রাইভেট ব্যাপার। কিন্তু আমার করার কিছু ছিল না। কেউ আমাকে না বলে দিলেও আমি জানতাম, আমাদের জাতীয় এই সংগঠনের কথা আমাকে মানতে হবে। পিএইচডি করার পর জার্মানির মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখ বাজের চাকরি হয়ে গেল। 'থ্রি জিরো'র লোকরা এসে আমার সাথে দেখা করল। সংবাদপত্রের বিজ্ঞপ্তির একটা কাটিং আমার হাতে তুলে দিয়ে বলল, মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখ বাজের চাকরি করা যাবে না। যে কোনভাবে এই বিজ্ঞপ্তির চাকরিই যোগাড় করতে বলো। আমি বিজ্ঞপ্তি পড়ে দেখলাম, সেটা ইস্তাম্বুলের ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ অ্যান্ড টেকনোলজি সংস্থায় 'ডাইরেক্টর অব ম্যানেজমেন্ট' পদে নিয়োগের একটা বিজ্ঞপ্তি। আমি ওদের বললাম, এটা একটা ম্যানেজারিয়াল পদ, কিন্তু শেখ বাজের পছন্দ একাডেমিক কাজ। তারা চাপ দিয়ে বলল, না এই চাকরিই তাঁকে যোগাড় করতে হবে। তারা যুক্তি হিসেবে বলল, ওআইসির গোপন অর্থ ও তত্ত্বাবধানে এই ইনস্টিটিউট তৈরি হয়েছে। এটাকে ঘিরে নিশ্চয়ই ওআইসির এক বড় পরিকল্পনা আছে। সেখানে কি হয় এটা আমাদের জানা দরকার। সুতরাং শেখ বাজকে সেখানে ঢুকাতেই হবে। আমি পছন্দ করি বা না করি, এটা আমাকে মেনে নিতে হয়। প্রতিষ্ঠানটি ইস্তাম্বুলে এবং রিসার্চ ও টেকনোলজির সাথে জড়িত বলে এই চাকরি নেওয়ার জন্য শেখ বাজ আনন্দের সাথে রাজি হয়ে যায়। বরং

আমি তার কাছ থেকে ধন্যবাদই পাই যে এমন একটা বিজ্ঞাপনের দিকে আমার নজর গেছে। ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ এন্ড টেকনোলজি (আইআরটি)-তে তার চাকরি হয়ে যায়। এই পদের জন্য তার মত যোগ্য লোকই তারা খুঁজছিল। তার চাকরি হওয়ার পরই নতুন সঙ্কট আমার সামনে স্বমূর্তিতে আবির্ভূত হয়। ‘থ্রি জিরো’ অনেকগুলো ‘আল্লাহ’ শব্দ অঙ্কিত অন্ধকারেও জ্বলে এমন দামি পাথরের তৈরি দেওয়াল ‘শো পিচ’ আমাকে দিয়ে বলে আইআরটির তিন ফ্লোরেই দেওয়ালের দর্শনীয় স্থানে শেখ আব্দুল্লাহর দ্বারা এগুলো লাগিয়ে দিতে। তাদের প্রস্তাবে আমি চমকে যাই। বুঝতে পারি ‘শো পিচ’ এর কভারে এগুলো নিশ্চয়ই গোয়েন্দা যন্ত্র, গোপন ক্যামেরা বা গোপন ট্রান্সমিটার হতে পারে। আমি ওদের বললাম, এটা সেট করাকে শেখ বাজ নিজেও সন্দেহের চোখে দেখতে পারে অথবা কারও সন্দেহের শিকার হতে পারে। সেসহ আমরা ধরা পড়ে যেতে পারি। আমার যাই হোক, আমার স্বামীর কোন ক্ষতি আমি করতে পারবো না। তাদের প্রস্তাব ব্যর্থ হয়ে যায়। এরপরই তারা আনে ‘কোটপিন’-এর প্রস্তাব। এটাও ঝুঁকিপূর্ণ বলে আমি এই ব্যাপারে সহযোগিতা করতে অপারগতা প্রকাশ করি। এরপরই তারা আবির্ভূত হয় স্বমূর্তিতে। বলে যে, ‘আমি যদি প্রতিদিন স্বামীর কোটে তাদের দেওয়া কোটপিন রাখার ব্যবস্থা করতে অস্বীকার করি, তাহলে যে স্বামীকে রক্ষার ক্ষেত্রে এই ঝুঁকি নিতে চাচ্ছি না, সেই স্বামীকেই আমাকে হারাতে হবে। আমি অস্বীকার করার পর একদিনও তাঁকে বাচতে দেয়া হবে না। আর আমি যদি তাদের এসব কথা আমার স্বামী, পুলিশ বা কাউকে বলি, তাহলে স্বামীর সাথে আমার মেয়েকেও শেষ করে ফেলবে ওরা। আমি নিরুপায় হয়ে যাই। আমি স্বামীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাই না, কিন্তু তার চেয়েও বড় হল, আমি কিছুতেই তাঁকে হারাতে চাই না, এই পর্যায়ে এসেই আমার জন্য কম ক্ষতিকর হিসেবে তাদের ‘কোটপিন’-এর প্রস্তাব গ্রহণ করি। প্রাণপ্রিয় স্বামীর সাথে এই বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য প্রতিপল, প্রতিক্ষণ আমি দগ্ধ হয়ে এসেছি। একটা সান্ত্বনা আমার ছিল, সেটা হল স্বামীর সাথে এই বিশ্বাসঘাতকতা করে আমি আমার স্বামীকে রক্ষা করেছি। আমার স্বামীকে দয়া করে আপনারা রক্ষা করবেন। আমিই

আমার স্বামীর জন্য মুসিবত। আমি চাই এই মুসিবত থেকেও উনি মুক্তি পান। আর আমিও চাই দুঃসহ, দুর্বহ ব্ল্যাকমেইলের হাত থেকে মুক্তি।'

কান্নারুদ্ধ কণ্ঠে থামল আয়েশা আজীমা।

সংগে সংগেই আহমদ মুসার প্রশ্ন, 'ম্যাডাম, এই দুঃসহ, দুর্বহ ব্ল্যাকমেইল যারা করতো, যারা এখানে আপনার সাথে যোগাযোগ করতো, তাদের পরিচয় সম্পর্কে দয়া করে বলুন।'

'আমার স্টেটমেন্ট শেষ জনাব। আমার স্বামীকে দয়া করে দেখবেন।'

বলেই আয়েশা আজীমা তার বাম হাতের অনামিকার আংটির নিল পাথরটাকে কামরে ধরল।

আয়েশা আজীমাকে তার হাতের আংটি মুখে নিতে দেখেই আহমদ মুসা উঠে দাড়িয়ে তার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল হাতটাকে ধরে ফেলার জন্যে। কিন্তু হাতটা ধরে ফেলার আগেই হাতের আংটি কামড়ে ধরেছিল আয়েশা আজীমা।

আহমদ মুসা দ্রুত হাতটা টেনে নিল আয়েশা আজীমার মুখ থেকে।

আয়েশা আজীমার মুখে এক টুকরো নির্দোষ হাসি ফুটে উঠেছিল। কিন্তু মুহূর্তেই তা কোথায় মিলিয়ে গেল। সোফার উপর এলিয়ে পড়ল আয়েশা আজীমার দেহ।

পেছনে নির্বাক দাঁড়ানো দুই পুলিশ অফিসার ও আয়েশার স্টেটমেন্ট লেখা পুলিশ অফিসারগণ। এই তিন পুলিশ অফিসার গিয়ে ধরল আয়েশা আজীমাকে। তাদের একজন বলল, 'আমরা বুঝতেই পারিনি ইনি কি করতে যাচ্ছেন। তাকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিতে হবে।'

হতাশ আহমদ মুসা ধপ করে সোফায় বসে বলল, 'কোন লাভ নেই পুলিশ অফিসারগণ। পটাসিয়াম সাইনাইড কাউকে এন্টিডোজ নেয়ার সুযোগ দেয় না।'

উঠে দাঁড়িয়েছিল জেনারেল তাহির এবং জেনারেল হাজী মোস্তফা কামালও। তারাও বসল।

আয়েশা আজীমাকে সোফায় শুইয়ে দিতে দিতে বলল মিসেস বেরিল ডেডেগ্লু, 'স্যার, সংগে সংগেই কি করে নিশ্চিত হলেন, উনি পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়েছেন?' প্রশ্নের লক্ষ্য আহমদ মুসা।

'সেদিন 'থ্রি জিরো'র ইরগুন ইবানও আমার হাত ফসকে এভাবেই মরেছে পটাসিয়াম সাইনাইড খেয়ে। সেদিন তাকে বাঁচানো যেমন জরুরি ছিল, একে বাঁচানোও তেমন জরুরি ছিল।' বলল আহমদ মুসা।

'তবুও এর কাছ থেকে কিছু জানা গেল।' বলল জেনারেল হাজী মোস্তফা কামাল।

'শুধু নিজের সম্পর্কে বলেছেন, ষড়যন্ত্র সম্পর্কে একজনের নাম প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই বলেননি। আমরা জানি ডঃ বাজ নির্দোষ। আয়েশা আজীমা তাকে নির্দোষ প্রমাণ করায় আমাদের কোন লাভ হয়নি।' আহমদ মুসা বলল।

'তবে ডঃ বাজকে গ্রেফতার করা হয়েছে, আপনি এই চাল না চাললে আমার মনে হয় আয়েশা আজীমা এটুকুও বলতেন না। আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল জেনারেল তারিক।

'ঠিক বলেছেন জনাব। স্বামীর প্রতি ভালোবাসায় কোন খাদ ছিল না তার। স্বামীকে বাঁচানোর জন্যেই এই স্টেটমেন্ট তিনি দিয়েছেন।' বলল আহমদ মুসা।

'ইস্তাম্বুলের ষড়যন্ত্রের যারা হোতা, যারা তাকে ব্ল্যাকমেইল করেছে তাদের সম্বন্ধে না বলায় কি প্রমাণ হয় যে তিনি 'থ্রি জিরো'র প্রতিও বিশ্বস্ত ছিলেন।' পুলিশ অফিসার বেরিল ডেডেগ্লু বলল।

'হ্যাঁ, বলা হয় দ্বৈত আনুগত্য আয়েশা আজীমার মধ্যে ছিল। একদিকে তিনি স্বামীকে ভালোবাসতেন বলে স্বামীর সমাজ ও জাতির প্রতিও তার একটা ভালোবাসা ছিল। আবার যারা পেছন থেকে সহযোগিতা দিয়ে তাকে এ পর্যন্ত নিয়ে এসেছে, তাদের প্রতিও একটা আনুগত্য তার ছিল। তবে আয়েশা আজীমার স্টেটমেন্টের শেষ কথা প্রমাণ করে তিনি তাদের জাতির ওই লোকদের ভয় করতেন, ভালোবাসতেন না। তাদের হাত থেকে স্বামীকে মুক্ত করা ও নিজে মুক্ত হবার জন্যেই তার এই মৃত্যু।' বলল আহমদ মুসা।

‘অনেক ইহুদিই কিন্তু ওদের ষড়যন্ত্রের সাথে নেই।’ জেনারেল হাজী মোস্তফা কামাল বলল।

‘অনেক’ বলছেন কেন, আমার জানা মতে নব্বই ভাগ ইহুদিই ওদের সাথে নেই। তারা ধার্মিক, শান্তি ও সহাবস্থানে বিশ্বাসী। মাত্র জায়নিস্ট বা ইহুদীবাদী বলে পরিচিত মুষ্টিমেয়রাই পৃথিবীব্যাপী ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। তাদের চাঁদাবাজি ও হুমকি-ধমকিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ ইহুদীরা অতিষ্ঠ ও অসহায়।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ঠিক বলেছেন জনাব খালেদ খাকান। এই সাধারণ শান্তিবাদী ইহুদীরা ঐক্যবদ্ধ না থাকা এবং অসংগঠিত হওয়ার কারণেই এদের কণ্ঠ শ্রুত হয় না, এদের কণ্ঠ কোন শক্তি নয়।’

বলেই একটু থেমে আবার বলে উঠল, ‘করনীয় কাজের কথায় আমরা ফিরে আসতে পারি। প্রথমে ডঃ শেখ বাজকে ডাকা দরকার। তিনি এলেই আমরা লাশ নেবার ব্যবস্থা এবং অন্যান্য কাজ করতে পারি।’

‘ধন্যবাদ জনাব। আমি ডাকছি ড. শেখ বাজকে। আপনি অন্য বিষয় নিয়ে ভাবুন প্লিজ।’ জেনারেল হাজী মোস্তফা কামালকে লক্ষ্য করে বলল জেনারেল তাহির।

‘ঠিক আছে, আপনারা এসব করুন। আমাকে এখনি উঠতে হবে। আয়েশা আজীমার মৃত্যুর সংবাদ প্রকাশ হবার আগেই আমি আরেক ঘাঁটিতে হানা দিতে চাই। সেখানে থাকেন আয়েশা আজীমা বা সেদিনের ইরগুন ইবানের চেয়ে বড় কেউ। তাকে আমাদের হাতে পেতেই হবে। ‘থ্রি জিরো’র ভেতরে ঢোকার প্রত্যক্ষ এই একটা দরজাই আমাদের সামনে খোলা আছে।’

বলেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

‘আল্লাহ আপনাকে সফল করুন খালেদ খাকান। কিন্তু একা যাবেন না। অগ্রবাহিনী কিংবা পশ্চাৎবাহিনী যেভাবেই হোক আপনার পছন্দনীয় একদল পুলিশ আপনি নিন।’ বলল জেনারেল তাহির আহমদ মুসাকে।

জেনারেল তাহির থামতেই জেনারেল হাজী মোস্তফা কামাল বলল, ‘আমি পুলিশ প্রধানকে বলে দিচ্ছি এবং মোবাইল নাম্বারও দিচ্ছি। তিনি আপনার সাথে

যোগাযোগ করে সব ব্যবস্থা করে দেবেন। কোথায় যাচ্ছেন, কি কাজ- এ সম্পর্কে তিনি কিছু জিজ্ঞেস করবেন না, আপনিও তাকে কিছু বলবেন না।'

'ধন্যবাদ আপনাদের। আমি আসি। আমি যাচ্ছি গোল্ডেন হর্নের ওপারে। আসসালামু আলাইকুম।' বলে আহদ মুসা বেরুবার জন্যে দরজার দিকে পা বাড়াল।

ডঃ শেখ বাজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আহমদ মুসা গাড়ি নিয়ে ছুটল বসফরাস ব্রীজ অর্থাৎ কামাল আতাতুর্ক ব্রীজের দিকে। ওই ব্রীজ দিয়ে বসফরাস উপকুলের হাইওয়ে ধরে গোল্ডেন হর্নের গালাটা ব্রীজ পার হয়ে ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব তাড়াতাড়ি পৌছা যাবে।

আহমদ মুসার গাড়ি বসফরাস ব্রিজে ওঠার পরই গাড়ির রিয়ারভিউতে দেখল ৪টা গাড়ি সারি বেঁধে একই গতিতে তার পেছনে ছুটে আসছে।

ব্রীজের মাঝামাঝি এসে দেখল ব্রীজের ওপাশ থেকে আরও চারটা গাড়ি হঠাৎ রং সাইড এ এসে আহমদ মুসার গাড়ির সামনে দাঁড়াল। গোটা রাস্তা জুড়ে তারা দাড়িয়ে। কোনভাবেই তাদের পাশ কাটানো সম্ভব নয়।

আহমদ মুসা ডান দিকে ব্রীজে ওপাশে রিটার্ন লেনের দিকে তাকিয়ে দেখল সেখানে কতকগুলো গাড়ি দাড়িয়ে ডানদিকটাও ব্লক করে ফেলেছে।

আশ্চর্যের বিষয়, সবগুলো গাড়িই, ওয়াগন মিনিট্রাক। আর আহমদ মুসার গাড়ি ১৩০০ সিসির আমেরিকান কার। ওদের তুলনায় বাচ্চা।

তিন দিক থেকেই অবরুদ্ধ আহমদ মুসা। হার্ড ব্রেক কষে গাড়ি দাড় করায় আহমদ মুসা। বাঁ দিকে দেখেছে আহমদ মুসা ব্রীজের ফেঞ্চ-ওয়ালের সমান্তরাল প্যানেলবার গাড়ির সমান্তরালে।

আহমদ মুসার গাড়ি দাড়িয়ে পড়তেই তিন পাশের গাড়িগুলোও দাঁড়িয়ে পড়েছে।

তিন দিকে উঁচু গাড়ির দেয়ালের মাঝখানে আহমদ মুসার গাড়ি।

গাড়িগুলো থামতেই নেমে এল একদল মানুষ। প্রত্যেকের হাতে স্টেনগান।

আহমদ মুসা বুঝে গেছে সব। নিশ্চয় ‘থ্রি জিরো’র লোকরাই আগাম পরিকল্পনার মাধ্যমে তাকে সব দিক দিয়ে ঘিরে ফেলেছে। ঘেরাও করে ফেলা এতগুলো স্টেনগানের বিরুদ্ধে তার এক রিভলবার কোন কাজেই আসবে না। বরং তাদের গুলী এড়াতে হলে তাকে রিভলবার বের করা চলবে না। মাত্র খোলা থাকা বসফরাসের দিকসহ চারিদিকে একবার চেয়ে মুহূর্তের জন্য করনীয়টা ঠিক করে নিয়ে আহমদ মুসা বসফরাসের দিকে মানে বাম দিকের দরজা খুলে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে গাড়ির ছাদে উঠে দু’হাত তুলে দাঁড়াল।

সংগে সংগেই ডান পাশ থেকে একজন চিৎকার করে বলল, ‘কেউ গুলী করবে না। ওকে মৃত পেলেও আমাদের চলবে, কিন্তু জীবন্তই বেশি দরকার। একটা গুলিতে তার আরামের মৃত্যু হলে তার কাছে আমাদের পাওনা শোধ হবে না। তোমরা কয়েকজন গিয়ে তাকে বেঁধে গাড়িতে তোল।’ নির্দেশের সাথে সাথেই তিন দিক থেকে চার পাঁচজন ছুটল আহমদ মুসার দিকে।

‘তোমরা কারা? আমার দোষটা কি? তোমরা এসব কথা বলছ কেন?’

চিৎকার করে এসব কথা বলতে বলতে আহমদ মুসা ইঞ্চি ইঞ্চি করে পেছনে হটে গাড়ির বাম প্রান্তের দিকে এগোচ্ছিল। সে জানে ব্রীজের ফেঞ্চ-ওয়ালের প্যানেলবার থেকে দু’শ ফুটেরও বেশি নিচে বসফরাসের পানি। ওদিকেও মৃত্যুর হাতছানি তবু তার রক্তের জন্যে হন্যে হয়ে থাকা ‘থ্রি জিরো’র কশাইদের হাতে পড়ার চেয়ে বসফরাসের পানিতে ঝাঁপ দেওয়া অনেক ভালো।

আহমদ মুসার গাড়ির ছাদ থেকে ব্রীজের ফেঞ্চ-ওয়ালের প্যানেলবারের ব্যবধান দেড় ফুটের বেশি নয়।

আহমদ মুসার দিকে ছুটে আসা লোকগুলো তার গাড়ির পাশে এসে গেছে। ওরা উঠে আসছে গাড়ির ছাদে।

আহমদ মুসা তখন গাড়ির ছাদের বাম পাশের শেষ প্রান্তে।

লোকগুলো উঠে এসেছে গাড়ির ছাদে। তাদের চোখে-মুখে ক্রুর হাসি। যেন কাঁটা-ছেঁড়ার জন্যে একটা অসহায় গিনিপিগ তারা পেয়ে গেছে।

লোকগুলো এগুচ্ছে আহমদ মুসার দিকে। তাদের কয়েকজনের দেহ আহমদ মুসা ও স্টেনগানধারীদের মাঝখানে একটা দেয়াল সৃষ্টি করেছে।

লোকগুলো আরও ক্লোজ হয়েছে আহমদ মুসার।

হঠাৎ আহমদ মুসা এবাউট টার্ন করে লাফ দিয়ে ব্রীজের ফেঞ্চ-ওয়ালবারে উঠে দেহে একটা ঝাঁকি দিয়ে দক্ষ সাঁতারুর মত শূন্যে সামনে দু'হাত বাড়িয়ে ড্রাইভ দিয়ে বাতাস কেটে ছুটল বসফরাসের নিল জলরাশির দিকে। পেছনের লোকগুলো তখন চিৎকার করে উঠে সবাই কাঁধের স্টেনগান হাতে নিয়ে গুলী করতে শুরু করেছে উড়ন্ত দেহ লক্ষ্যে।

মেজর জেনারেল হাজী মোস্তফা কামালের বাম পাশ থেকে টেলিফোন বেজে উঠল।

বিরক্তির ভাব ফুটে উঠল তার চোখে-মুখে।

তার সামনে একটা ফাইল খোলা। ছড়িয়ে আছে অনেক কাগজপত্র। সে ও জেনারেল তাহির তারিক দু'জনে কাগজগুলো পরীক্ষা করছিল। এ কাগজগুলো এনেছে তারা আয়েশা আজীমার ব্যক্তিগত ফাইল থেকে। নোটবুকগুলোও তার আনা হয়েছে। ডঃ শেখ বাজ তাদেরকে প্রয়োজনের চেয়েও বেশি সহযোগিতা করেছে। তার চোখে অশ্রু ছিল, কিন্তু মৃতা স্ত্রীর কোন কিছুই সে তাদের কাছে গোপন রাখেনি। সে চেয়েছে তার স্ত্রীকে যারা ব্ল্যাকমেইল করেছে, ভয়ানক ষড়যন্ত্রের কাজে ব্যবহার করেছে, তাদের স্বরূপটি উদঘাটিত হোক। তাদের কালো থাবা থেকে রক্ষা পাক তাদের প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠান এবং পৃথিবীর শান্তিকামী মানবতার আশার প্রদীপ 'আইআরটি' (ইনিস্টিটিউট অব রিসার্চ অ্যান্ড টেকনোলজি)। তার স্ত্রীর শেষ পরিচয়টা তাকে আরও বেশি কষ্ট দিচ্ছে। ডঃ বাজ জেনারেল তাহির তারিকদের কাছ থেকে শুনেছে, তার স্ত্রী তাকে সব সন্দেহ থেকে বাঁচাবার জন্যেই নিজের সব কথা সে বলেছে এবং সব অপরাধের স্বীকৃতি দিয়েছে। তার স্ত্রী নিজের দায়ভার নিয়ে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছে, কিন্তু চেয়েছে স্বামীর গায়ে যেন কোন কালো দাগ না লাগে। ইহুদী কন্যা হিসেবে ষড়যন্ত্রে শামিল থাকলেও স্বামীকে সে ভালবেসেছে প্রাণ দিয়ে। স্ত্রী আয়েশা

আজীমা তাকে ঠকিয়েছে তার পরিচয় গোপন করে, জঘন্য অপরাধ করেছে তাকেও ষড়যন্ত্রের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে, কিন্তু সে সমগ্র অন্তর দিয়ে অনুভব করছে তার ভালোবাসায় সামান্য কোন খাদ ছিল না। ডঃ শেখ বাজের চোখে অবিরল অশ্রু শুধু এ কারণেই।

একরাশ বিরক্তি নিয়েই জেনারেল হাজী মোস্তফা কামাল তাকাল টেলিফোনের সাইড টেবিলের দিকে। লাল, নীল, সাদা ও কালো অনেকগুলো টেলিফোন সেখানে। পিএবিএক্স ও প্রাইভেট কালো ও সাদা টেলিফোন দুটোই তাকে বিরক্ত করে বেশি।

কিন্তু নীল টেলিফোনটা বাজতে দেখে মুখের বিরক্তি ভাবটা কেটে গেল জেনারেল হাজী মোস্তফা কামালের। এ টেলিফোনটা গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের।

টেলিফোন তুলে নিয়ে নিস্পৃহভাবে ওপারের কথা শুনল, দু'একটা নির্দেশও দিল।

টেলিফোন রেখে ঘুরে বসে কাগজ-পত্রে মনোযোগ দেবার আগে বলল, 'জেনারেল তাহির, বসফরাস ব্রীজে কি যেন একটা ঘটনা ঘটেছে। প্রচুর গোলা-গুলি হয়েছে। কিন্তু প্রাণহানির ঘটনা নেই। প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে ভয়ানক যানজট ছিল। বিস্তারিত তদন্ত রিপোর্ট এখনও পুরো পাওয়া যায়নি।'

বসফরাস ব্রীজ, আর গোলা-গুলির কথা শুনে আগ্রহের সাথে মুখ তুলল জেনারেল তাহির তারিক। বলল, 'ঘটনা ঘটেছে ক'টায়?'

'পৌনে একটায়।' বলল জেনারেল হাজী মোস্তফা কামাল।

ভ্রু কুঞ্চিত হলো জেনারেল তাহির তারিকের। বলল, 'মিঃ খালেদ খাকান ড. বাজের বাড়িতে যাওয়ার জন্যে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিল বারটা তিরিশ মিনিটে। গোল্ডেন হর্নে যাবার জন্যে তিনি যদি বসফরাস ব্রীজ ব্যবহার করে থাকেন, তাহলে কতকটা এই সময়েই তো তার ব্রীজ অতিক্রম করার কথা।'

'আপনি মিঃ খালেদ খাকানের বিষয়টা এর মধ্যে আনছেন কেন? আপনি কিছু ভাবছেন?' বলল জেনারেল হাজী মোস্তফা কামাল।

‘ঠিক তেমন নয়, তবে এই সময় মিঃ খালেদ খাকান ঐ এলাকায় থাকার কথা, যদি তিনি বসফরাস ব্রীজ ব্যবহার করে থাকেন, এটাই বলছি।’ জেনারেল তাহির তারিক বলল।

সংগে সংগে কথা বলল না জেনারেল হাজী মোস্তফা কামাল। ভাবান্তর ঘটেছে তার চোখে-মুখে। ছোট হয়ে এসেছে তার দুই চোখ। সিরিয়াসলিই ভাবছে সে।

কয়েক মুহূর্ত চিন্তার পর ঘুরল টেলিফোনের দিকে। তুলে নিল নীল টেলিফোন। একটা কল করল।

ওপার থেকে সাড়া পেতেই বলল, ‘ওয়া আলাইকুম সালাম। হ্যাঁ, বসফরাস ইষ্ট পুলিশ স্টেশন! তোমরাই তো দেখেছ বসফরাসের ঘটনাটা?’

ওপারের উত্তর শুনে নিয়ে জেনারেল হাজী মোস্তফা কামাল বলল, ‘হ্যাঁ, বল, ওখানে কি ঘটেছে? হত্যা, কিডন্যাপের চেষ্টা? ব্রীজ থেকে একজন বসফরাসে লাফিয়ে পড়েছে? জানা গেছে সে কে? গ্রেফতার হয়েছে কেউ?’ জেনারেল হাজী মোস্তফা কামালের চোখে বিস্ময় ও উদ্বেগ দুইয়ের মিশ্রণ।

ওপ্রান্তের উত্তর শোনার পর জেনারেল হাজী মোস্তফা কামাল বলল, ‘আক্রান্ত বলে যে কারটিকে তোমরা সন্দেহ করছ, তার নাম্বার কত?’

ওপার থেকে উত্তর পেল। উত্তর পাওয়ার সাথে সাথেই তার চোখে-মুখে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার প্রকাশ ঘটল। দ্রুত কণ্ঠে সে বলল, ‘স্পটে কে আছে?’

উত্তর শুনে নিয়ে বলল, ‘আমরা যাচ্ছি সেখানে, জানিয়ে দাও ওদের।’

বলেই টেলিফোন রেখে ঘুরল জেনারেল তাহির তারিকের দিকে।

জেনারেল তাহিরের চোখে-মুখে প্রশ্ন, তার সাথে আশঙ্কার কালো ছায়া।

ঘুরে বসেই জেনারেল হাজী মোস্তফা কামাল বলল, ‘সর্বনাশ হয়েছে, আক্রান্ত গাড়িটা খালেদ খাকানের। তার মানে তিনি ব্রীজ থেকে লাফিয়ে পড়েছেন।’ শুষ্ক, উদ্বেগাকুল গলা জেনারেল মোস্তফা কামালের।

মুখের আলো যেন দপ করে নিভে গেল জেনারেল তাহিরের। চোখে – মুখে তার এক বোবা আতঙ্ক। কয়েক মুহূর্ত তার বাক স্ফূরণ হলো না। দ্রুত

নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল, 'তার পরের খবর কি, মানে খালেদ খাকানের খবর কি?' কম্পিত কণ্ঠ জেনারেল তাহির তারিকের।

'বসফরাসে অনুসন্ধান চলছে। পুলিশ, গোয়েন্দা ও নৌবাহিনীর কয়েকটা ইউনিট কাজে নেমেছে। চলুন আমরা যাই। যেতে যেতেই প্রধানমন্ত্রীকে বিষয়টা জানাব।'

বলে উঠে দাঁড়াল জেনারেল হাজী মোস্তফা কামাল।

উঠে দাঁড়াল জেনারেল তাহিরও।

উঠেই আবার বসে পড়ল জেনারেল হাজী মোস্তফা কামাল। বলল, 'জেনারেল মিঃ তাহির, আপনি গাড়ির দিকে যান। জরুরি আরও কয়েকটা কল সেরে আমি আসছি।'

'আসুন' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল জেনারেল তাহির তারিক।

ঘর থেকে বেরিয়ে লিফট হয়ে নেমে এল আন্ডার গ্রাউন্ড ফ্লোরের একদম গাড়ি বারান্দায়। এ বিশেষ গাড়ি বারান্দায় লিফটের সামনেই তার ও জেনারেল হাজী মোস্তফা কামালের গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। একটু দুরেই এটেনশন অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল দু'জন কমান্ডো। তারা গাড়ির সিকিউরিটির দায়িত্ব পালন করছিল।

তারা জেনারেল তাহিরকে দেখে স্যালুট দিয়ে আবার স্থির দাঁড়িয়ে গেল।

নানা আশংকা জেনারেল তাহিরকে ঘিরে ধরেছে। আহমদ মুসা দু'শ দশ ফিট উঁচু বসফরাস ব্রীজ থেকে নিচে লাফিয়ে পড়েছে, এ কথা মনে হতেই বুক কেপে উঠছে জেনারেল তাহিরের। কোন মানুষ কি এমন সাহস করতে পারে। আহমদ মুসাই হয়ত পারে। কিন্তু তারপর কি ঘটেছে? আর ভাবতে পারছে না জেনারেল তাহির। গোটা সত্ত্বা তার একসঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠছে, আহমদ মুসার মহান জীবনের পরিসমাপ্তি আল্লাহ এভাবে করবেন না। চোখের কোণ ভারী হয়ে উঠল জেনারেল তাহির তারিকের। সমগ্র অন্তর থেকে একটা প্রার্থনা তার উচ্চারিত হলো, 'আল্লাহ তোমার সৈনিককে রক্ষা করার দায়িত্ব তোমার।'

লিফট থেকে বেরিয়ে এল জেনারেল হাজী মোস্তফা কামাল।

দু'চোখের কোণ মুছে ফেলল জেনারেল তাহির তারিক।

লিফট থেকে বেরিয়েই জেনারেল মোস্তফা কামাল বলল, 'জেনারেল তাহির, প্রধানমন্ত্রীকেও খবরটা দিলাম। সামরিক গোয়েন্দা সূত্রে তিনি ইতিমধ্যেই খবর পেয়ে গেছেন। তিনি প্রেসিডেন্টকেও এ খবর জানিয়েছেন। তারা খুবই উদ্বিগ্ন। বসফরাস জুড়ে জরুরি অবস্থা জারি করেছেন প্রধানমন্ত্রী। ছয় ঘণ্টার জন্যে বিদেশি এবং যেকোন নৌযানের বসফরাসে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং যেসব নৌযান বসফরাস ও মর্মর সাগরে আছে, সেগুলোর বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ব্যাপক সন্ধান শুরু হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ওখানে যাচ্ছেন। চলুন, আমরা চলি।'

বলেই নিজের গাড়িতে গিয়ে উঠল জেনারেল মোস্তফা কামাল। জেনারেল তাহির তারিক কোন কথা বলল না। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে জেনারেল মোস্তফার পেছন পেছন চলল।

ব্রীজের গোড়ায় পৌঁছেই জেনারেল মোস্তফা কামালরা ব্রীজের ঠিক গোড়ার আইল্যান্ডে পুলিশের একটা জটলা দেখল। জেনারেল মোস্তফা কামাল বলল, 'ঠিক এখানকার মত ব্রীজের ওপ্রান্তেও পুলিশ অস্থায়ী অফিস বসিয়েছেন। চলুন আমরা স্পটটা দেখে আসি।'

স্পটে দুজন পুলিশ অফিসার দাঁড়িয়েছিল।

আহমদ মুসার পরিত্যক্ত কারটিও ব্রীজের দেয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল।

জেনারেল তাহিররা গাড়ি থেকে নামল।

দু'জন পুলিশ অফিসার স্যালুট করে এগিয়ে এসে বলল জেনারেল মোস্তফাকে, 'স্যার, গাড়িটা এখানেই পাওয়া গেছে, একটুকুও সরানো হয়নি।'

'থ্যাংকস অফিসার।' বলল জেনারেল মোস্তফা।

'চলুন গাড়িটাকে আগে দেখা যাক।' বলে জেনারেল তাহির তারিক গাড়ির দিকে এগোলো।

গাড়ির ভেতর-বাহির পরীক্ষা করে গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বলল জেনারেল তাহির তারিক, 'এটা খালেদ খাকানেরই গাড়ি, কোন সন্দেহ

নেই। কিন্তু গাড়িতে কোন কিছুই রেখে যাননি। তার মোবাইল, রিভলবার ও আইডি কার্ড তার পকেটেই ছিল।'

উদ্বেগ-আতঙ্কে ভরা জেনারেল মোস্তফা কামালের চেহারা। বলল, 'ড্যাশবোর্ডের ভয়েস রেকর্ডার শূন্য। কিছুই বলে যাননি। বলবেন বা কি। আমি বুঝতে পারছি না, ব্রীজ থেকে লাফিয়ে পড়ার অসম্ভব সিদ্ধান্তটা কেন নিলেন!'

'সঙ্কটের চরম মুহূর্তে তার মনে যে কাজকে অগ্রাধিকার দেন সেটাকেই তিনি গ্রহণ করেন। যে কোন সঙ্কটে তার মনটা স্থির থাকে।' বলল জেনারেল তাহির তারিক। তার কণ্ঠ শুষ্ক।

দু'জনেই গিয়ে দাঁড়াল ব্রীজের ফেন্স ওয়ালের সম্ভাব্য যে স্থান থেকে তিনি লাফিয়ে পড়েছেন সেখানে। নিচে বসফরাসের পানির দিকে তাকিয়ে জেনারেল তাহির বলল, 'তিনি বসফরাসের নিচে ঠিক লম্বভাবে গিয়ে পড়েছেন। এখানে দাড়িয়েই যদি ওরা ব্রাশ ফায়ার করে থাকে, তাহলে গুলির মুখে পড়ার তার সম্ভাবনা রয়েছে, যদি না ততক্ষণে রেঞ্জের বাইরে গিয়ে থাকেন। যতই তার দেহটা নিচের দিকে নেমেছে, ততই তা ব্রীজের ইনওয়ার্ডের দিকে বাক নিয়েছে, আর ওদের ব্রাশ ফায়ারের গুলির গতি ব্রীজ থেকে আউটওয়ার্ড হওয়াই স্বাভাবিক।'

'কিন্তু গুলী থেকে বাঁচলেও এত বড় দূরত্ব থেকে আছড়ে পড়ার আঘাত থেকে তিনি বাচবেন কি করে?' কম্পিত কণ্ঠ জেনারেল মোস্তফা কামালের।

বেদনায় মুখটা আরও চুপসে গেল জেনারেল তাহির তারিকের। বলল, 'কিন্তু তার জীবনের ইতি এভাবে ঘটতে পারে না, অবশ্যই পারে না। আসুন আমরা আর কিছু না ভাবি।'

'ভাবনাকে দেয়াল দিয়ে আটকানো যায় না। সুতরাং এ প্রসঙ্গ থাক। চলুন আমরা নিচের পুলিশের অপারেশন অফিসে যাই। অনুসন্ধান কতদূর এগিয়েছে চলুন দেখি।'

বলে গাড়ির দিকে এগোলো জেনারেল মোস্তফা কামাল।

জেনারেল তাহিরও গিয়ে গাড়িতে উঠল।

নীচে পৌছতেই পুলিশ অফিসাররা স্বাগত জানিয়ে জেনারেল মোস্তফা কামালদের নিয়ে গেল তাঁবু খাটিয়ে তৈরি করা অস্থায়ী অফিসে।

‘নতুন কোন খবর আছে? প্রত্যক্ষদর্শী কাউকে পাওয়া গেছে?’ বলল জেনারেল মোস্তফা।

‘স্যার, অনুসন্ধান চলছে। প্রত্যক্ষদর্শীর সন্ধানও চলছে। এ এলাকায় অনেককেই পাওয়া যাচ্ছে, যারা সেসময় এখানে হাজির ছিল। আকস্মিক ঘটনা তাই অনেকেরই নজরে পড়েনি। অনেকের নজর গেছে ব্রীজ থেকে আসা ব্রাশ ফায়ারের দিকে। পানিতে পড়ার দৃশ্য দেখেছে এমন কাউকে পাওয়া যাইনি এখনও।’ ঘটনার মনিটররত পুলিশ অফিসার বলল।

‘সিসিটিভি’র মনিটর থেকে তো এ দৃশ্য পাবার কথা। সেখানে কি দেখা গেছে?’ বলল দ্রুত কণ্ঠে জেনারেল মোস্তফা কামাল।

‘স্যার, এই মাত্র প্রিন্টগুলো এসেছে। দেখুন ছবিতে একব্যক্তিকে ব্রীজ থেকে লাফিয়ে পড়তে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু বসফরাসের পানি থেকে পঞ্চাশ ফিট লেবেলের পর তাকে আর দেখা যাচ্ছে না। দু’দিক থেকে আসা দুই সারি জাহাজের আড়ালে চলে যান তিনি। সে সময় একটা জাহাজ বহরের দুই কলাম বসফরাস ব্রীজ অতিক্রম করছিল। জাহাজের দুই কলাম CCTV-র ফোকাসকে আংশিকভাবে বাধাগ্রস্ত করেছে।’ বলল দায়িত্বশীল পুলিশ অফিসার।

জেনারেল মোস্তফা ও জেনারেল তাহির পুলিশ অফিসারের কথা শুনছিল, সেই ছবিগুলোও দেখছিল। তারা দেখল, পুলিশ অফিসার যা বলল ঘটনা তাই। আহমদ মুসার ডাইভ দেয়া দু’হাত সামনে ছড়িয়ে রেখে নিপুণ ডাইভারের মত ছুটে আসা দেহ বসফরাসের পানির কিছু উপরে এসে বিশাল জাহাজের আড়ালে চলে গেছে।

ছবিগুলোর দিকে নজর রেখেই জেনারেল তাহির তারিক বলল, ‘জাহাজের দুই কলামের মাঝ বরাবর ফাঁকা থাকার কথা, না কোন নৌযান চলছিল?’

‘চলার কথা না, ধরে নেয়া যায় চলছিল।’ বলল পুলিশ অফিসার।

তাহলে জাহাজের দুই কলাম ছাড়াও আরও ছোট-খাট নৌযানকে প্রত্যক্ষদর্শীর তালিকায় রাখতে হবে।’ বলল জেনারেল তাহির তারিক।

‘স্যার, সেটাকেও আমরা হিসেবে রেখেছি। সেসব নৌযানকে লোকেট করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।’ পুলিশ অফিসার বলল।

‘ধন্যবাদ।’ বলল জেনারেল মোস্তফা কামাল।

‘জাহাজ বহরটা কোন দেশের ছিল? ওদের বক্তব্য কি?’ জেনারেল তাহির বলল।

‘ওটা ছিল সোভিয়েত যুদ্ধ জাহাজের একটা বহর। যাচ্ছিল ওরা ভূমধ্যসাগরের এক মহড়ায় অংশ নিতে। প্রাথমিক যোগাযোগ ওদের সাথে হয়ে গেছে। তাৎক্ষনিক তারা বলেছে, ব্রীজ থেকে বসফরাসে পড়তে কাউকে তারা দেখেছে কিংবা এরকম কেউ তাদের জাহাজে পড়েছে অথবা উদ্ধার করেছে তারা কাউকে, এমন কোন খবর তাদের কাছে নেই। তবে তারা আরও চেক করে দেখবে।’ বলল পুলিশ অফিসারটি।

‘ধন্যবাদ অফিসার!’ বলে জেনারেল তাহির তাকাল জেনারেল মোস্তফা কামালের দিকে। বলল, ‘আমার মনে হয় আমরা ঘুরে-ফিরে একটু দেখতে পারি। আপনি কি আসবেন?’

‘অবশ্যই, চলুন।’ বলে উঠে দাঁড়াল মোস্তফা কামাল।

পুলিশ ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে জেনারেল তাহির বলল, ‘আসুন আমরা গাড়ি না নিয়ে বসফরাসের তীর ধরে হাটি। করনীয় তো আমাদের কিছু নেই।’

‘চলুন। তবে আমি আশাবাদী কিছু একটা সংবাদ খুব তাড়া তাড়াতাড়িই আমরা পাব। নৌবাহিনীর ওয়াটার স্ক্যানিং কাজ শুরু করে দিয়েছে দেখছি। পানির যে কোন গভীরে হিউম্যান বডিকে ওয়াটার স্ক্যানার লকেট করতে পারে।’ বলল জেনারেল মোস্তফা কামাল।

মুখটা বিষণ্ন হয়ে গেল জেনারেল তাহির তারিকের। তার চোখে-মুখে উদ্বেগের ছায়া আরও গভীর হলো। বলল, ‘আমরা তাঁর বডি নয়, তাঁকে চাই আমরা। এই বসফরাসে এসে তিনি শেষ হয়ে যাবেন, তা হয় না, হতে পারে না।’ শুষ্ক কণ্ঠ জেনারেল তাহিরের।

‘এটা আমাদের সবারই চাওয়া। আল্লাহ আমাদের এই চাওয়াকে মঞ্জুর করুন।’ জেনারেল মোস্তফা কামাল বলল।

বসফরাসের প্রায় পানি ঘেঁষে প্রান্ত বরাবর আপ-ডাউন হাইওয়ে। তার পাশ দিয়ে সুদৃশ্য ফুটপাত। এই রাস্তাগুলো নীল বসফরাসের গলায় যেন হীরকের হার। বসফরাসের তীরে মাঝে মাঝে রয়েছে ফেরী ঘাট। ঘাটগুলো বোট, ফেরি ও মানুষের ভীড়ে ব্যস্ত থাকে। ছোট বোটগুলো ঘাটে ছাড়াও তীরে ভিড়ে থাকে, কিন্তু তা ব্যতিক্রম।

ব্রীজের নিচে নেমে ফুটপাত ধরে হাঁটতে শুরু করেছে সকলেই।

ব্রীজের নিচে বিরাট এক ফেরি ঘাট।

ঘাটে বেশ কিছু ফেরি ও বোট দাড়িয়ে আছে। এসব ঘাটে ফেরি ও বড় বড় বোট ছাড়াও ছোট ছোট বোটও ভাড়ায় পাওয়া যায়।

ফুটপাত দিয়ে হেঁটে ফেরিঘাট অতিক্রম করছিল জেনারেল তাহিররা।

‘ঘিয়ে ভাজা কোন কিছুর গন্ধ পাচ্ছি জেনারেল তারিক।’

বলে ডান দিকের পাহাড়ের ঢালের দিকে তাকাল।

বসফরাসের তীর এখানে হাইওয়ে ও ফুটপাতের পর ঢালু হয়ে ক্রমশ উপরে পাহাড়ে উঠে গেছে। এই ঢালে গড়ে উঠেছে মনোরম সব রেস্টুরেন্ট, ক্লাব ও ঘর-বাড়ি।

জেনারেল তাহিরও তাকাল পাহাড়ের ঢালের দিকে।

‘জেনারেল তাহির, আমরা কিন্তু খেয়াল করিনি, লাঞ্চের সময় অনেক আগে পার হয়ে গেছে। বেশি উপরে নয়, এই ঢালেই সুন্দর রেস্টুরেন্ট আছে। আমরা কি যেতে পারি?’ বলল জেনারেল মোস্তফা কামাল।

খেয়ে সময় নষ্ট করতে মন চাইছিল না জেনারেল তাহিরের। তার কাছে এখন আহমদ মুসার সন্ধান করার চেয়ে বড় কিছু নেই। তবে ক্ষুধায় পেট চোঁ চোঁ করছে, এ কথাও ঠিক। হয়ত জেনারেল মোস্তফা কামাল বোধ হয় বেশি কষ্ট পাচ্ছে ক্ষুধায়। জেনারেল তাহির সায় দিল জেনারেল মোস্তফা কামালের কথায়। বলল, ‘হ্যাঁ, আমরা রেস্টুরেন্টে যেতে পারি জেনারেল মোস্তফা।’

লাঞ্চের পিক আওয়ার শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। তবে মাঝে মাঝে টেবিল এ দু'চারজন লোক আছে। কেউ কেউ খাচ্ছে, কেউ কেউ বসে গাল-গল্প করছে। গল্পের প্রধান সাবজেক্ট হলো বসফরাস ব্রীজের ঘটনা।

গল্পের সাবজেক্ট শুনে খুশি জেনারেল তাহির তারিক। রেস্টুরেন্টের ঠিক নিচেই দুর্ঘটনার বাঁ ঘটনার স্থান।

মাঝখানের এক ফাঁকা টেবিল দেখে বসেছে জেনারেল তাহিররা।

খেতে শুরু করেছে তারা।

নানারকম কথা তাদের কানে আসছে বিভিন্ন দিক থেকে। ব্রীজে গোলা-গুলি কারা করল, কেন করল-তা নিয়ে নানা রকম ধারনার কথা। ব্রীজ থেকে যে লাফ দিয়ে পড়েছে, সে পাগল না হয়ে যায় না। কেউ বলছে জীবন বাঁচাবার জন্যেই ওটা করেছে। আবার কেউ বলছে, জীবন বাঁচাবার জন্যে কেউ মৃত্যুমুখে ঝাপ দেয় না। বেঘোরে মারা গেল লোকটা।

জেনারেল তাহিরদের পেছনের টেবিলে তিনজন লোক এসেছে সব শেষে। এই মাত্র তাঁর খাওয়া শুরু করেছে। তাদেরই একজন বলল, 'কিছু না জেনেই বলা হচ্ছে বেঘোরে প্রাণ দিয়েছে লোকটা। আসলে লোকটা মরেনি বলেই মনে হয়। একটা মোটর বোট তাঁকে তুলে নিয়ে দ্রুত চলে গেছে।'

তাঁর কথা শেষ হতেই তাঁর টেবিলের একজন বলল, 'দেখেছ তুমি? তখন কোথায় ছিলে?'

'আমিও একটা বোটে এই ঘাটের দিকে আসছিলাম। গোলা-গুলির মুখে সামনের ঐ বোটটি সামনের দিকে ছুটে পালায়, আমি পিছনের দিকে সরে যাই।' বলল দ্বিতীয় লোকটি।

খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে জেনারেল তাহির ও জেনারেল মোস্তফা কামাল দু'জনেরই।

শিরদাঁড়া সোজা করে বসেছে তারা। তাদের সমস্ত মনোযোগ এখন ওদের কথার দিকে।

ঐ টেবিলের তৃতীয় লোকটি বলল, 'সোয়া দু'শ ফিট উপর থেকে পড়লে কারও কিন্তু বাচার কথা নয়।'

'কিন্তু লোকটা যখন পানিতে ডুবে যাবার পর ভেসে উঠতে পেরেছে, তখন বলতে পার নিজ চেষ্টায় সে ভেসে উঠেছে। তার অর্থ সে মরেনি।' বলল প্রথম লোকটি।

জেনারেল তাহির ও জেনারেল মোস্তফা কামাল দু'জনেরই দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

জেনারেল মোস্তফা কামাল চট করে পেছন ফিরে লোকটাকে একবার দেখে নিল। তারপর সে জেনারেল তাহিরের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'লোকটার কাছে আরও কিছু জানার আছে।'

'ওদের খাওয়া শেষ হলেই ভাল হয়।' বলল জেনারেল তাহির।

'না, এক মিনিট নষ্ট করা যায় না জেনারেল তাহির।' জেনারেল মোস্তফা কামাল বলল।

'তা ঠিক।' বলল জেনারেল তাহির।

উঠে দাঁড়াল জেনারেল মোস্তফা কামাল।

গেল পেছনের টেবিলে।

'এক্সকিউজ মিঃ জনাব' বলে পকেট থেকে আইডেন্টিটি কার্ড বের করে লোকটার সামনে ধরে বলল, 'আমি টার্কিশ ইন্টারনাল সিকিউরিটি সার্ভিস (TISS)-এর ডিজি জেনারেল মোস্তফা কামাল। আমি আপনাদের কথা সামনের টেবিল থেকে শুনেছি। যে লোকটা প্রাণ বাঁচানোর জন্যে বসফরাসে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তুরস্কের সম্মানিত মেহমান তিনি। ঘটনার সাথে তুরস্কের মর্যাদা জড়িত হয়ে পড়েছে। যে বোটটি তাঁকে তুলে নিয়ে গেছে তাঁর কোন হদিস কি দয়া করে দিতে পারেন?'

জেনারেল মোস্তফার পরিচয় জানার পর খাওয়া বন্ধ করে তিনজনই উঠে দাঁড়িয়েছে। তুরস্কের বহুল পরিচিত গোয়েন্দা সংস্থা TISS-এর স্বয়ং ডিজিকে তাদের সামনে দেখে তারা মুহূর্তের জন্যে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। নিজেকে সামলে নিয়ে প্রথম লোকটি বলল, 'সিওর স্যার, আমি বলছি।'

বলে একটু থামল লোকটি। স্মরণ করছে সে।

'আপনারা বসুন।' বলল জেনারেল মোস্তফা কামাল।

‘ওকে স্যার। ঠিক আছে। বলছি আমি।’

একটু থেমেই বলা শুরু করল, ‘বোটটির পেছনের দু’পাশেই নাম্বার সাইনের উপরে কনকর্ডের ছবি আঁকা ছিল। বোটে ‘কনকর্ড’ মনোগ্রাম ব্যবহার করা একটা আনকমন ব্যাপার। এ কারণেই ‘কনকর্ড’ সাইনটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাঁর সাথে নাম্বার সাইনটিও। নাম্বার সাইনটিও ছিল মজার। মনে পড়ছে নাম্বার সাইনটি ছিল- ‘এমভি’ ড্যাশ ‘বি’ ড্যাশ টি নাইনটি ট্রিপল নাইন (T90999)।’

জেনারেল মোস্তফা কামাল পকেট থেকে কলম ও নোটপ্যাড বের করে দ্রুত নাম্বার লিখে নিল। তারপর সেখানে দাড়িয়েই পকেট থেকে অয়ারলেস বের করে একটা জরুরি মেসেজ ট্রান্সমিট করলঃ ‘রেড এলার্ট ফর অল সিকিউরিটি সার্ভিস অ্যান্ড পুলিশ। ‘এমভি ড্যাশ বি ড্যাশ টি নাইনটি থাওজ্যান্ড নাইন হান্ড্রেড নাইনটি নাইন’ নাম্বারের মোটর বোট যেখানে যে অবস্থায় পাওয়া যাবে আটকান এবং আমাকে খবর দিন। বোটের বাড়তি চিহ্ন ‘কনকর্ড’ মনোগ্রাম। ওভার।’

মেসেজ শেষ করে জেনারেল মোস্তফা কামাল দাঁড়ানো লোকটিকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বলল, ‘আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনি তুরস্কের সীমাহীন উপকার করেছেন। এমন একটা ক্লুর জন্যে দেশের নিরাপত্তা বাহিনীগুলো এবং পুলিশ হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।’

‘আল্লাহ তাঁকে বাঁচিয়ে রাখুন।’ বলল লোকটি। তাঁর কণ্ঠও আবেগঘন।

‘আমিন। আমরা সবাই এটা চাই।’ বলে জেনারেল মোস্তফা কামাল আবারো তাদের ধন্যবাদ দিয়ে তার খাবার টেবিলে ফিরে এল।

টেবিলে বসতে বসতে বলল জেনারেল মোস্তফা কামাল, ‘এখন অপেক্ষা ছাড়া আর কি করার আছে জেনারেল তাহির?’

‘চলুন, আমরা বোট নিয়ে আমরা বসফরাসের দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যাই। ও বোটটাতো ওদিকেই গেছে। বোট ডিটেক্ট হবার পর ও দিক থেকেই খবর আসবে। আমরা যতটা সামনে যাব ততটাই আমরা এগিয়ে থাকব।’

‘ঠিক বলেছেন, চলুন, উঠি।’

বলেই উঠে দাঁড়াল জেনারেল মোস্তফা কামাল।

রেস্টুরেন্ট থেকে বেরুবার জেনারেল মোস্তফা কামাল একটা পুলিশ বোট কল করল।

রেস্টুরেন্টের বিল চুকিয়ে ঘাটে নেমে এসে দেখল, একটা পুলিশ বোট অপেক্ষা করছে।

একজন পুলিশ অফিসার তীরে দাড়িয়ে অপেক্ষা করছিল।

জেনারেল মোস্তফা কামালরা ওয়াক ওভার ব্রীজ দিয়ে পৌছতেই অফিসার দ্রুত এসে স্যালুট করে বলল, 'স্যার, বোট রেডি।'

'এস।' বলে জেনারেল মোস্তফা কামাল বোটে উঠল। তার পেছনে জেনারেল তাহির। সবশেষে পুলিশ অফিসার।

বোটটা ছোট। দুই রোতে চারটি সিট।

জেনারেল তাহির ও জেনারেল মোস্তফা কামাল সামনের দুই সিটে বসল। পেছনের দুই সিটের একটিতে পুলিশ অফিসার।

ড্রাইভিং সিটে ছিল আরেকটি পুলিশ অফিসার।

'বোটটি ধীরে ধীরে হর্ন ও মর্মরের সংযোগস্থলের দিকে এগিয়ে নাও। ওখানে গিয়ে আবার ভাবব।' বলল জেনারেল মোস্তফা কামাল পুলিশ অফিসারকে লক্ষ্য করে।

ধীর গতিতে চলেছে বোটটি।

বসফরাসের কামাল আতাতুর্ক থেকে বসফরাস-হর্ন-মর্মর সাগরের সন্ধিস্থল খুব বেশি দূরে নয়। প্রায় এসে পড়েছে বোট সেখানে।

জেনারেল মোস্তফা কামাল ও জেনারেল তাহির তারিকের অপেক্ষারও অবসান হলো।

ওয়ারলেস বিপ করতে শুরু করল।

শসব্যস্তে কল ওপেন করল জেনারেল মোস্তফা কামাল।

কথা বলে উঠল ওয়ারলেস।

'আমি পুলিশ ইন্সপেক্টর মোহাম্মদ আইদিন গোল্ডেন হর্নের আয়ুব সুলতান ব্রীজ থেকে। ব্রীজের ঘাটে টি ৯০৯৯৯ বোটটি পাওয়া গেছে। বোট ও

বোটের লোকজনদের আটকানো হয়েছে। কোন নির্দেশ, স্যার। ওভার।' ওপ্রান্ত থেকে বলল পুলিশ ইন্সপেক্টর আইদিন।

'বোটে কোন যাত্রী আছে?' জিজ্ঞাসা জেনারেল মোস্তফা কামালের।

'নেই স্যার, তিনজন ক্রু ও মালিক ছাড়া আর কেউ নেই।' পুলিশ ইন্সপেক্টর বলল।

'তুমি ওদেরকে আটকে রাখ, আমরা আসছি কয়েক মিনিটের মধ্যে। আমরা এখন হর্নের মুখে।' বলল জেনারেল মোস্তফা কামাল।

ওয়ারলেস কল অফ করতেই উদগ্রীব কণ্ঠে জেনারেল তারিক বলল, 'জিজ্ঞেস করলেন না বসফরাস থেকে উদ্ধার করা লোকটি কোথায়?'

'বিষয়টা ওদের অজানাই থাক। বোটটা শত্রু পক্ষের কিনা কে জানে! আগে জানলে ওরা সাবধান হতে পারে, কিংবা কিছু ঘটেও যেতে পারে ওখানে। আমরা ক'মিনিটের মধ্যেই ওখানে পৌছাচ্ছি।' বলল জেনারেল মোস্তফা কামাল।

'ঠিক আছে।' জেনারেল তাহির বলল।

জেনারেল মোস্তফা কামাল কোন কথা বলল না। তার দৃষ্টি সামনে হর্নের দিকে।

বোট ইতোমধ্যেই টার্ন নিয়ে দ্রুত গতিতে গোল্ডেন হর্নে প্রবেশ করেছে।

# ২

তোপকাপি ভিআইপি গোল্ড রিসোর্টের ভিআইপি ক্লিনিক।

সংজ্ঞা ফেরেনি তখনও আহমদ মুসার।

আহমদ মুসার মাথার কাছে একটা চেয়ারে বসে আছে ডোনা জোসেফাইন।

কয়েকজন নার্স কক্ষটিতে। যে কোন নির্দেশের অপেক্ষায়।

কক্ষে প্রবেশ করল কয়েকজন ডাক্তার।

প্রধান ডাক্তার মানে ক্লিনিকের চীফ ডাঃ মোস্তফা সাইদ দ্রুত এগিয়ে এল ডোনা জোসেফাইনের দিকে। বলল, 'ম্যাডাম সমস্ত পরীক্ষা শেষ। সব কিছু ওকে আছে। বুকে প্রচন্ড চাপের কারণে ফুসফুসে চাপ পড়ে ফলে অক্সিজেন শূন্য হয়ে যায় ফুসফুস। তার ফলেই সংজ্ঞা হারান তিনি। হার্ট, ব্রেন সব ঠিকমত কাজ করছে এখন। স্বাভাবিক হয়ে আসছেন তিনি।'

বলেই ডাঃ মোস্তফা সাইদ এগিয়ে গিয়ে আহমদ মুসার পালস দেখল। বলল, 'আমি মনে করি, আর ক'মিনিটের মধ্যেই তাঁর জ্ঞান ফিরে আসবে।'

আহমদ মুসার হাতটা আস্তে আস্তে বেদে রেখে বলল, 'ম্যাডাম, আমরা অফিসে আছি। কোন দরকার হলে নার্সকে বলবেন।'

ডাক্তার বেরিয়ে গেল। নার্সরাও। শুধু দু'জন নার্স থাকল।

ডাক্তাররা সান্ত্বনা দিলেও উদ্বেগের কালো মেঘ জোসেফাইনের মুখ থেকে কাটেনি। তবে আগের সেই অস্থিরতা এখন নেই।

ডাক্তাররা বেরিয়ে যেতেই জোসেফাইনের পারসোনাল সেক্রেটারি লতিফা আরবাকান নার্স দু'জনকে বলল, 'সিস্টার, তোমরা বাইরে তোমাদের টেবিলে গিয়ে বস।'

'ইয়েস ম্যাডাম।' বলে নার্স দু'জন বেরিয়ে গেল।

কক্ষের দরজা বন্ধ হয়ে জেতেই লতিফা আরবাকান বলল, 'ম্যাডাম, শয়তানদের কয়েকজন স্যারের বন্ধুর পরিচয় দিয়ে গোল্ড রিসোর্টে ঢোকার চেষ্টা করেছিল। গোল্ড রিসোর্ট কর্তৃপক্ষ ও পুলিশকে তারা আইডি কার্ড দেখিয়ে বলেছিল যে, 'আমরা মিস্টার খালেদ খাকানের কর্মস্থল আইআরটিতে তাঁর সহকর্মী ও বন্ধু। আমরা খালেদ খাকানকে দেখতে এসেছি।' পুলিশ আমার সাথে যোগাযোগ করলে, আমি তাদের নাম জানতে চেয়েছিলাম। যে পাঁচটি নাম তারা বলল, তাদের চারজনের নাম আইআরটির স্টাফদের সাথে মিলে গেল। একটি নামই শুধু নতুন। ইনি নাকি অফিসের নতুন রিক্রুট। যাদের নাম মিলে যায়, তাদের মধ্যে ডঃ শেখ বাজের নাম ছিল। ডঃ শেখ বাজের সাথে বছরখানেক আগে আমার ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা হয়েছিল। আমি তাঁর সাথে কথা বলতে চাইলাম। কথা বলে দেখলাম সে নকল লোক। আরবী ধাঁচে ইংরেজি বলার চেষ্টা করলেও আমার জানা কোনো তথ্যই সে ঠিক মত বলতে পারেনি। পুলিশ ওদের গ্রেফতার করতে চেয়েছিল। কিন্তু ওরা গোলা-গুলি চালিয়ে কয়েকজন পুলিশকে আহত করে পালিয়েছে। আপনার মনের উপর নতুন করে প্রেসার সৃষ্টি না হোক, এজন্যেই খবরটা আগে আপনাকে দেইনি।'

'ধন্যবাদ লতিফা। তুমি একটা বড় বিপদ থেকে আমাদের বাঁচিয়েছ। তুমি এতোটা সতর্ক না হলে বড় একটা কিছু ঘটতে পারতো। কিন্তু ওরা তো শক্তি বৃদ্ধি করে আবার ফিরে আসতে পারে।' বলল জোসেফাইন।

'সে সম্ভাবনা নেই। তোপকাপি প্রাসাদ ও সংলগ্ন গোটা এলাকায় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। গোল্ড রিসোর্টকে সবদিক থেকে ঘিরে রেখেছে পুলিশ।'

'আলহামদুলিল্লাহ।' বলল জোসেফাইন।

এ সময় আহমদ মুসার দুই হাত নড়ে উঠল আর নড়তে লাগল তাঁর চোখের দুই পাতা।

মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল জোসেফাইনের। বলল, 'আলহামদুলিল্লাহ, ওর সংজ্ঞা ফিরে আসছে। যাও লতিফা তুমি আহমদ আব্দুল্লাহকে নিয়ে এস।'

লতিফা আরবাকান দ্রুত দরজার দিকে হাঁটতে শুরু করেও ফিরে দাঁড়াল। বলল, 'ছোট সাহেবের ঘুম যদি না ভেঙ্গে থাকে?'

'আস্তে আস্তে সুড়সুড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে ওর ঘুম ভাঙ্গিয়ে নিও। তার আব্বার কথা শুনলে দেখবে ঘুমের সব জড়তা তার চলে যাবে।' জোসেফাইন বলল।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল লতিফা আরবাকান।

ধীরে ধীরে চোখ খুলল আহমদ মুসা।

প্রথমেই তার দু'হাত নরম বেডের উপর বুলাল। তার খোলা চোখ কক্ষের ও জোসেফাইনের মুখে এসে নিবদ্ধ হতে রাজ্যের বিস্ময় নামল আহমদ মুসার চোখে। বলল, 'জোসেফাইন তুমি! আমি কোথায়?'

জোসেফাইন ছুটে এসে আহমদ মুসার পাশে বসে তার চুলে হাত ধুঁকিয়ে বলল, 'তুমি গোল্ড রিসোর্টের ক্লিনিকে।'

'আমি ছিলাম বসফরাসের পানিতে। এখানে এলাম কিভাবে? আর কাউকে দেখছি না, তুমি জানলে কিভাবে?' বলল আহমদ মুসা। তার কণ্ঠে বিস্ময়।

'বলছি। আল্লাহর হাজার শোকর। সোয়া দু'শ ফুট উঁচু থেকে কেউ লাফিয়ে পড়ার কথা ভাবতে পারে! আল্লাহ বাঁচিয়েছেন।' বলল জোসেফাইন।

'আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু আমি এখানে কি করে এলাম, এত দূরে, একেবারে তোমার এখানে!' আহমদ মুসা বলল।

'সব পরে জানাব। বসফরাস থেকে একটা বোট তোমাকে তুলে নিয়ে আয়ুব সুলতান ব্রীজের ঘাটে পৌঁছে। জটলা দেখে সেখানে হাজির হওয়া আমার বান্ধবী জেফি জিনা তোমাকে দেখে চিনতে পেরে তোমাকে উদ্ধার করে এখানে নিয়ে আসে।'

'মিস জেফি জিনা ওখানে? আমাকে উদ্ধার করার অর্থ কি? আমাকে কেউ কি বন্দী করেছিল?' বল আহমদ মুসা। তার কণ্ঠে বিস্ময়।

'সব আমি শুনিনি। তোমাকে নিয়ে সবাই আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। তবে এটা লতিফা আমাকে বলেছে, তোমাকে এখানে আনার কিছুক্ষণ পরই চার পাঁচজন তোমার অফিস সহকর্মীর পরিচয় দিয়ে গোল্ড রিসোর্টে ঢোকার চেষ্টা

করেছিল। লতিফা ওদের নাম শোনার পর ওদের ভুয়া পরিচয়ের কথা জেনে গোল্ড রিসোর্টে ঢুকতে দিতে নিষেধ করে। তখন পুলিশকে ওরা আক্রমণ করে। তিনজন পুলিশ আহত হলেও সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।’

একটু থামল জোসেফাইন। পরে বলল, ‘থাক এসব কথা। এসব নিয়ে তুমি এই মুহূর্তে ভেব না।’

‘ভাবছি না, অবস্থাটা বুঝতে চেষ্টা করছি। বুঝতে পারছি, নদীতেও ওদের পাহারা ছিল। ওরাই......।’

জোসেফাইন আহমদ মুসার ঠোঁটের উপর হাত চাপা দিয়ে বলল, ‘প্লিজ, এসব বিষয় এখন থাক। আমাকে একটু সময় দাও। তোমাকে সংজ্ঞাহীন দেখে আমাদের দম বন্ধ হবার জোগাড় হয়েছিল।’ ভারী কণ্ঠ জোসেফাইনের। তার দুই চোখের কোনে অশ্রু চিক চিক করে উঠেছিল।

আহমদ মুসা তাকাল জোসেফাইনের দিকে। গভীর, অন্তরঙ্গ দৃষ্টি।

জোসেফাইনের একটা হাত ছিল আহমদ মুসার মাথায়, অন্য হাতটা ছিল বেডের উপর।

আহমদ মুসা বেডের উপর থেকে জোসেফাইনের হাত তুলে নিয়ে টানল জোসেফাইনকে নিজের দিকে।

জোসেফাইন বেডের উপর অনেকটা আলতোভাবে বসে ছিল। সে খসে পড়ল আহমদ মুসার বুকের উপর।

আহমদ মুসার দু’হাত তাঁকে আঁকড়ে ধরতে যাচ্ছিল।

জোসেফাইন আহমদ মুসার বুক থেকে তার মুখ তুলে তার হাতের বাঁধন থেকে বেরুতে বেরুতে বলল, ‘দরজায় নার্সরা বসে আছে, আহমদ আব্দুল্লাহও এখনি এসে পড়বে।’

জোসেফাইন উঠে বসেছে এই সময় দরজায় নক হলো।

জোসেফাইন উঠে পাশের চেয়ারে বসতে বসতে বলল, ‘হ্যাঁ, ভেতরে আসুন।’

প্রবেশ করল একজন নার্স। তার হাতে কর্ডলেস টেলিফোন। বলল, ‘এক্সকিউজ মি ম্যাডাম, আপনার একটা কল এসেছে, জরুরি।’

‘কার কল’ জিজ্ঞেস করল জোসেফাইন।

‘জেনারেল মোস্তফা কামাল ও জেনারেল তারিক।’ বলল নার্স।

জোসেফাইন আহমদ মুসার দিকে একবার তাকিয়ে নার্সকে বলল, ‘নিয়ে এস টেলিফোন।’

জোসেফাইন টেলিফোন কানের কাছে তুলে নিয়ে বলল, ‘আসসালামু আলাইকুম। আমি জোসেফাইন মানে মিসেস খালেদ খাকান।’

‘ওয়া আলাইকুম সালাম। আমি জেনারেল মোস্তফা কামাল। মিঃ খালেদ খাকান কোথায়? আমরা ভীষণ উদ্বিগ্ন।’ বলল জেনারেল মোস্তফা কামাল।

‘উনি গোল্ড রিসোর্টের ক্লিনিকে। জ্ঞান ফিরেছে। ভালো আছেন জনাব। টেলিফোন তাঁকে দিচ্ছি।’ জোসেফাইন বলল।

‘থাক, আমরা এখনি আসছি। আল্লাহ তাঁকে দ্রুত সুস্থ করে তুলুন।’ বলল জেনারেল মোস্তফা কামাল।

‘আসুন জনাব।’

‘ওকে। আসসালামু আলাইকুম।’ বলল ওপার থেকে।

জোসেফাইনও টেলিফোন রেখে দিল।

ডাক্তাররা ভেতরে ঢুকল।

ডাক্তাররা আহমদ মুসাকে স্বাগত জানিয়ে কিছু জরুরি জিজ্ঞাসাবাদ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করল।

জোসেফাইন ঘরের একপাশে দাঁড়িয়েছিল। সে বিস্মিত হয়েছে। ডাক্তারদের কাউকে চিনতে পারছে না সে।

হঠাৎ জোরে দরজা ঠেলে একজন ঘরে প্রবেশ করল। দ্রুত কণ্ঠে বলল, ‘সব ক্লিয়ার, তাড়াতাড়ি।’

তার কথা শেষ হতেই একজন ডাক্তারের হাতে রিভলবার উঠে এল। তাক করল আহমদ মুসাকে এবং চিৎকার করে বলল, ‘হারাজাদাকে ক্লোরোফরম করে বাঁধ।’

ডাক্তারবেশী তিনজন এগুলো আহমদ মুসার দিকে। তাদের একজনের হাতে ক্লোরোফরমের শিশি।

ঘটনার আকস্মিকতায় জোসেফাইন প্রথমে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। আহমদ মুসার দিকে রিভলবার তাক হতে দেখেই জোসেফাইন সম্বিত ফিরে পেল। দ্রুত ওড়নার আড়ালে হাত দিয়ে কাঁধে ঝুলন্ত ছোট ব্যাগের পকেট থেকে ছোট্ট একটা রিভলবার বের করে আহমদ মুসার দিকে রিভলবার তাক করে থাকা ডাক্তারকে লক্ষ্য করে প্রথম গুলী ছুঁড়ল সে। প্রথমেই আহমদ মুসাকে বেকায়দা অবস্থা থেকে মুক্ত করা তার লক্ষ্য।

ডাক্তারটির মাথা গুড়িয়ে দিল জোসেফাইনের গুলী।

গুলীর শব্দে অবশিষ্ট তিনজন ফিরে তাকিয়েছে জোসেফাইনের দিকে।

যে লোকটি পরে ঘরে ঢুকেছিল, তারই চোখ প্রথম পড়েছিল জোসেফাইনের উপর। সংগে সংগে রিভলবার তুলে নিয়েছিল সে। জোসেফাইনও তার দিকে তাকিয়েছিল। সে নিশ্চিত ছিল আহমদ মুসাকে বাঁধতে ও ক্লোরোফরম করতে এগিয়ে যাওয়া তিনজনকে আহত মুসাই ম্যানেজ করতে পারবে।

জোসেফাইনের রিভলবারই প্রথমে টার্গেট করেছিল লোকটিকে। সুতরাং জোসেফাইনের রিভলবারের বুলেটই প্রথমে আঘাত করল লোকটিকে। বুলেটটি বিদ্ধ হয়েছিল তার বুকে। তার রিভলবারেরও ট্রিগার টেপা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বুলেটটি বিদ্ধ হবার পর মর্মান্তিক ঝাঁকুনি তার হাতকে কাপিয়ে দিয়েছিল। গুলীটি লক্ষভ্রষ্ট হয়ে জোসেফাইনের মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে যায়।

ওদিকে আহমদ মুসা ওরা তিনজন একশন এ যাবার আগেই দু'পায়ের স্নেক নক ব্যবহার করে ওদের তিনজনকেই মাটিতে ধরাশায়ী করেছে এবং সংগে সংগেই উঠে দাঁড়িয়েছে।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াবার সংগে সংগেই জোসেফাইন তার দিকে রিভলবার ছুড়ে দিয়েছিল।

আহমদ মুসা ওদের দিকে রিভলবার তাক করে বলল, 'যে যেভাবে আছ, সেভাবে থাক। নড়বার চেষ্টা করো না। তিনজনকে মারতে আমার তিন সেকেন্ডের বেশি সময় লাগবে না।'

এই সময় বাইরে অনেকগুলো পায়ের ছুটে আসার ভারী শব্দ পাওয়া গেল।

পরক্ষনেই দরজা ঠেলে ছুটে এসে ঘরে প্রবেশ করল জেনারেল মোস্তফা কামাল, জেনারেল তারিকসহ কয়েকজন পুলিশ।

ঘরে ঢুকেই চিৎকার করে উঠল জেনারেল মোস্তফা কামাল, 'মিঃ খালেদ খাকান, আপনি ঠিক আছেন তো?'

'আলহামদুলিল্লাহ। পুলিশকে বলুন এ তিনজনকে এরেস্ট করতে, মিঃ জেনারেল মোস্তফা কামাল।' বলল আহমদ মুসা।

'হ্যাঁ, এরেস্ট কর তিনজনকে।' বলল জেনারেল মোস্তফা কামাল।

ওরা তিনজন তাকাল আহমদ মুসা, জেনারেল মোস্তফা, জেনারেল তাহির ও চারজন পুলিশসহ সবার দিকে। সবার হাতের রিভলবার, স্টেনগান তাদের দিকে তাক করা।

তিনজন পুলিশ ওদের দিকে এগোচ্ছিল।

চতুর্থজন পুলিশ অফিসার। সে বলল ঐ তিনজনকে লক্ষ্য করে, তোমরা উপুড় হয়ে শুয়ে পড়।

পুলিশ অফিসারটির কর্কশ নির্দেশের সাথে সাথেই ওরা শুয়ে পড়ল উপুড় হয়ে এবং তার সাথে সাথেই দেখা গেল তাদের অনামিকা আঙ্গুল তাদের মুখে চলে গেছে।

চমকে উঠে আহমদ মুসা লাফ দিয়ে ওদের সামনে গিয়ে পড়ল। একজনের আঙ্গুল টেনে বের করল তার মুখ থেকে। কিন্তু দেখল সব শেষ হয়ে গেছে। নীল হয়ে উঠেছে তার মুখ।

'দুর্ভাগ্য, হাতে পেয়েও এদের জীবিত ধরা যাচ্ছে না।' স্বগত কণ্ঠ আহমদ মুসার।

'ওদের হাতের রিং এ পটাসিয়াম সায়ানাইডের মত কিছু ছিল নিশ্চয়!' বলল জেনারেল মোস্তফা।

'হ্যাঁ, মিঃ জেনারেল। আগের ঘটনাগুলোতে এধরনের বিষয়ই ছিল।' আহমদ মুসা বলল।

'প্রথম দু'জন দেখছি গুলীতে মরেছে। ওরা দু'জন নিশ্চয় আক্রমণে এসেছিল। এরা তিনজন আক্রমণে আসেনি?' জিজ্ঞাসা জেনারেল মোস্তফার।

‘আসলে ওরা সকলেই এসেছিল ডাক্তারের ছদ্মবেশে আমার কাছে আসার সুযোগ নিয়ে আমাকে কিডন্যাপ করতে। এরা তিনজন এসেছিল আমাকে বাঁধতে এবং ওরা দু’জন রিভলবার নিয়ে আমাকে পাহারা দিচ্ছিল। আমি নিরস্ত তখন। আমি বাঁধাই পড়ে যেতাম যদি জোসেফাইন ওদের দুজনকে গুলী করে না মারতো। ওরা দু’জন মারা পড়ার পর আমি আক্রমণে যেতে সুযোগ পাই। আর তার রিভলবারও আমার দিকে ছুড়ে দেয়। সেটা দিয়েই ওদের নিষ্ক্রিয় করেছিলাম। তখনই আপনারা এসেছেন।’ আহমদ মুসা বলল।

ঘরের একপাশে দাঁড়ান জোসেফাইনের দিকে না তাকিয়েই জেনারেল মোস্তফা কামাল বলল, ‘তাঁকে মোবারকবাদ। কৃতজ্ঞ আমরা তার প্রতি। আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা যা পারেনি, সেটা তিনিই করেছেন।’

জেনারেল মোস্তফা কামাল থামতেই জেনারেল তারিক বলে উঠল, ‘শুধু তাই নয়, বেগম খালেদ খাকান যে বুদ্ধিমত্তা ও দৃঢ়তার সাথে সংজ্ঞাহীন জনাব খালেদ খাকানকে হর্নের আইয়ুব সুলতান ফেরিঘাট থেকে উদ্ধার করে এনেছেন, সেটা বিস্ময়কর। যারা বসফরাস থেকে উদ্ধার করে খালেদ খাকানকে আইয়ুব সুলতান ফেরিঘাট এ নিয়ে এসেছিল, তাদের হাত থেকে ষড়যন্ত্রকারীরা মিঃ খালেদ খাকানকে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু বেগম খালেদ খাকান সেখানে হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত হন এবং নিজেকে স্ত্রী পরিচয় দিয়ে আপনাকে উদ্ধার করে আনতে সমর্থ হন।’

বিস্ময় ফুটে উঠেছে আহমদ মুসার চোখে-মুখে। বলল, ‘ষড়যন্ত্রকারীরা কারা? মানে আমার আইআরটির শত্রুরা। ওরাই যদি হয়, তাহলে একা জোসেফাইন আমাকে ছাড়িয়ে আনল কি করে? কি ঘটনা বলুন তো? আমি কিছু শুনেছি! পুরোটা বলুন।’

‘যারা আপনাকে বসফরাস থেকে তুলে নিয়েছিল, তাদের খোজ পাওয়ার পরই আমরা হর্নের আইয়ুব ফেরিঘাটে চলে আসি। ওদেরকে আমরা পেয়ে যাই। জিজ্ঞাসাবাদ করে আমরা সব কিছু জেনে নেই আপনাকে যাতে দ্রুত খুঁজে পেতে পারি। তারা বলেছে, আপনাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ওখানে ওরা পৌছার পাঁচ মিনিটের মধ্যে দু’জন লোক এসে হাজির হয়। ওরা মনে হয় জেনেই এসেছিল।

এসেই আপনাকে দাবি করল যে, আপনি ওদের লোক বসফরাস ব্রীজ থেকে পড়ে গিয়েছিলেন। তারা যখন ওদের সাথে কথা বলছিল এই সময় আপনার স্ত্রী জোসেফাইন ম্যাডাম পাশ দিয়ে ঘাট এ নেমে যাবার পথে ওখানে দাড়িয়ে যান। তিনি আপনাকে দেখতে পেয়ে ছুটে আসেন। তখন উদ্ধারকারীদের সাথে আলাপ চলছিল ওদের। ম্যাডাম জোসেফাইন দ্রুত এগিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে বলেন, 'এঁর এ অবস্থা কেন? কি হয়েছে ওঁর?' উদ্ধারকারীদের একজন তাকে জিজ্ঞেস করেন এঁকে আপনি চেনেন?

ম্যাডাম জোসেফাইন কথা বলায় আগের যারা মিঃ খালেদকে আগে থেকেই দাবি করছিল, তারা তেড়ে উঠে। একজন বলে, মিথ্যা বলছে এই বিদেশী মহিলা। নিশ্চয়ই কোন বদ মতলব আছে। ইতিমধ্যেই দু'জন পুলিশ এসে দাড়িয়েছিল। তারাও শুনছিল কথা। লোকটার কথা শেষ হতেই ম্যাডাম জোসেফাইন তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, 'আমার নাম মারিয়া জোসেফাইন। ইনি আমার স্বামী। নাম মিঃ খালেদ খাকান।'

সংগে সংগেই ওরা বলে উঠল, 'হ্যাঁ, ওঁর নাম খালেদ খাকান। ইনি ইনিস্টিউট অব রিসার্চ এন্ড টেকনোলজিতে চাকরি করেন। উনি মিথ্যা পরিচয় দিয়েছেন। দেখুন ইনি ইউরোপীয় আর মিঃ খাকান এশিয়ান।'

পুলিশের একজন এগিয়ে এসে সংজ্ঞাহীন আহমদ মুসার পকেট সার্চ করে আইডেন্টিটি কার্ড বের করে দেখল। তারপর ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, উনি ইনিস্টিটিউট অব রিসার্চ এন্ড টেকনোলজিতে চাকরি করেন। বলেই পুলিশটি জিজ্ঞেস করল ম্যাডাম জোসেফাইনকে, 'উনি সত্যিই স্বামী হলে বলুন, উনি যে প্রতিষ্ঠান এ চাকরি করেন তার পুরো নাম কি?' ম্যাডাম সঠিক জবাব দেন। পুলিশ ওদের জিজ্ঞেস জিজ্ঞেস করে, 'বল, উনি কোন পদে চাকরি করেন?' ওরা উত্তর দিতে পারে না। পুলিশ ম্যাডামকে একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে। ম্যাডাম সঠিক উত্তর দেন। এরপর আপনার উচ্চতা ও আইডি মার্ক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। ওরা উত্তর দিতে পারে না। ম্যাডাম ঠিক জবাব দেন। পুলিশ ওদের তাড়িয়ে দিয়ে আপনাকে ম্যাডামের গাড়িতে তুলে দেয়। ম্যাডাম নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলে পুলিশকে অনুরোধ করে তাদের পৌঁছে দিতে। পুলিশ আপনাকে কাছের ক্লিনিকে ভর্তি

করতে বললে, ম্যাডাম বলেন, তোপকাপি এলাকায় আমাদের গোল্ড রিসোর্টে নিজস্ব ক্লিনিক রয়েছে, তাঁকে ওখানেই নিতে চাই।' পুলিশের গাড়ি ম্যাডামের গাড়ির পেছন পেছনে এসে এই গোল্ড রিসোর্টে পৌঁছে দিয়ে যায়।'

কথা শেষ করল জেনারেল মোস্তফা কামাল।

আহমদ মুসার চোখেমুখে অপার বিস্ময়। সে অবাক হয়, জোসেফাইনের একজন নতুন বান্ধবী জেফি জিনা তার জন্য এতটা করেছে! নিজেকে ভিন্ন একজনে মানুষের স্ত্রী বলেও পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু জেফি জিনা আমার নাম, আমার প্রতিষ্ঠানের নাম, আমার পদের নাম জানতে পারে, কিন্তু আমার উচ্চতা ও আইডি মার্ক জানল কি করে! এ জিজ্ঞাসার কোন উত্তর পেল না আহমদ মুসা। বরং বিস্ময় বাড়লই তার।

আনমনা হয়ে পড়েছিল আহমদ মুসা।

এই বিস্ময় জোসেফাইনেরও চোখে-মুখে। জেফি জিনা সেখানে আমার নামে পরিচয় দিয়েছে! হ্যাঁ, সে পরিচয় না দিলে তো সে সংজ্ঞাহীন আহমদ মুসাকে শত্রুর কবল থেকে উদ্ধার করতে পারতো না। জেফি জিনার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল জোসেফাইনের মন। অকল্পনীয় ও দুঃসাহসিক এক উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে সে। ভাগ্যিস জেফি জিনার দেওয়া তথ্য ভুল প্রমাণিত হয়নি। ভুল প্রমাণ হলে সেও বিপদে পড়তো। কিন্তু জেফি জিনা আহমদ মুসার এসব তথ্য জানল কি করে। এসব ভাবনা তার বিস্ময় আরও বাড়িয়েই দিল।

জেনারেল মিঃ মোস্তফা কামাল বলল, 'মিঃ আহমদ মুসা, ক্লিনিকের ভিন্ন একঘরে আপনাকে নিতে হবে।'

জেনারেল মোস্তফার এ কথার দিকে কোন মনোযোগ নেই আহমদ মুসার। বলল, 'কি ঘটল বলুন তো। শুরুতেই তো এরা একবার এ ক্লিনিকে হানা দিয়েছিল। কিন্তু তার পরে তো সতর্ক পাহারাই থাকার কথা ছিল।'

পুলিশ অফিসারের চোখে সঙ্কুচিত ভাব ফুটে উঠল। সে একটু এগিয়ে সামনে পড়ে থাকা একটি লাশের গা থেকে ডাক্তারের অ্যাপ্রন সরিয়ে বলল, 'স্যার, এই দেখুন এরা সুপার সিকিউরিটি ফোর্স (SSF) এর ইউনিফরম এরা এসেছিল। এক গাড়িতে ওরা ১৫জন এসেছিল। ওরা এসে প্রথমেই গোল্ড রিসোর্ট

চেকপোস্টের দখল নিয়েছিল। এজন্য পুলিশ দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিল। ওদের বাধা দিতে গেলে সংঘর্ষে যেতে হয়, এ সাহস তারা পায়নি। ওদের কয়েকজন চেকপোস্ট দখল করে পুলিশদের নিরস্ত্র করে সেখানকার পুলিশদের হত্যা করে সাইলেন্সার লাগানো রিভলবার দিয়ে। ভুয়া SSF-এর অবশিষ্ট কয়েকজন অন্য পুলিশদের দিকে ছুটে যায়। বাকিরা ছুটে আসে ক্লিনিকের দিকে। ডাক্তাররা বলেছে, 'সশস্ত্র লোকরা ভেতরের ডাক্তারদের পোশাক খুলে নেয়।'

থামল পুলিশ অফিসারটি।

সংগে সংগেই জেনারেল মোস্তফা কামাল বলল, 'SSF-এর একটা ইউনিট আসছিল তোপকাপি প্রাসাদে। তাদের গাড়ি নির্জন এপ্রোচ গার্ডেনে প্রবেশের সংগে সংগেই একটা গ্যাস বোমা এসে পড়ে গাড়িতে। মুহূর্তে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে সবাই। ঐ SSF-দের ইউনিফরম ও গাড়ি নিয়ে সন্ত্রাসীরা গোল্ড রিসোর্টে হামলা চালায়। এক মাত্র ড্রাইভার শেষ মুহূর্তে বাঁচবার চেষ্টা করেও আংশিক আক্রান্ত হয়। সে তাড়াতাড়ি জ্ঞান ফিরে পেয়ে টেলিফোন করে SSF হেডকোয়ার্টারে। আমরা জানতে পারি তার পরেই। এসএসএফ উদ্ধার ইউনিট ছুটে আসে, আমরাও ছুটে আসি। পুলিশও খবর পেয়ে পৌঁছে যায়।'

জেনারেল মোস্তফা কামাল থামতেই আহমদ মুসা মুখ খুলেছিল কিছু বলার জন্যে।

তখন তিনজন ডাক্তার প্রবেশ করল ঘরে। তাদের কারও ডাক্তারের অ্যাপ্রন নেই। অন্যান্য স্টাফদের সাথে এ তিনজন ডাক্তারকেও আটকে রেখেছিল সন্ত্রাসী 'থ্রী-জিরো'র লোকরা।

ঘরে প্রবেশ করল এ সময় জোসেফাইনের পার্সোনাল সেক্রেটারি লতিফা আরবাকান আহমদ আব্দুল্লাহকে নিয়ে। তার চোখে মুখে বিস্ময় ও আতঙ্ক।

সে ছুটে এল ঘরের একপাশে দাঁড়ানো জোসেফাইনের কাছে।

'ডাক্তার, আপনারা মিঃ খালেদ খাকানকে ভিন্ন ঘরে নিয়ে যান। তাকে ভাল করে দেখুন। জ্ঞান ফেরার পরই তার উপর দিয়ে বিরাট ধকল গেছে।' বলল জেনারেল মোস্তফা কামাল একজন ডাক্তারকে লক্ষ্য করে।

‘প্লিজ জেনারেল মোস্তফা, আপনারা আপত্তি না করলে ওকে এখন অন্য ঘরে নয়, আমি বাসায় নিয়ে যেতে চাই।’ বলল জোসেফাইন।

জেনারেল মোস্তফা কামাল জোসেফাইনের দিকে চকিতে একবার মুখ তুলল, মুখ নামিয়ে নিল সংগে সংগেই। বলল, ‘ওয়েলকাম ম্যাডাম। আমাদের আপত্তি নাই।’

তারপর ডাক্তারের উদ্দেশ্য করে জেনারেল মোস্তফা কামাল বলল, ‘আপনারা জনাব খালেদ খাকানকে দেখুন। তারপর ওকে গোল্ড রিসোর্ট কটেজে রেখে চিকিৎসার সব ব্যবস্থা করে আসুন।’

ডাক্তারদের দিক থেকে ফিরে জেনারেল মোস্তফা কামাল পুলিশ অফিসারকে বলল, ‘এখন থেকে গোল্ড রিসোর্টের নিরাপত্তায় পুলিশের সাথে সাথে এসএসএফও থাকবে।’

বলেই উঠে দাঁড়াল জেনারেল মোস্তফা কামাল, তার সাথে সাথে জেনারেল তাহিরও।

‘মিঃ খালেদ খাকান, আপনি বিশ্রাম নিন। আমরা পরে কথা বলব। এখন চলি।’ আহমদ মুসার দিকে দিকে ফিরে বলল জেনারেল মোস্তফা কামাল।

‘আসুন। আয়েশা আজীমা মানে ডঃ বাজের ওখান থেকে কিছু পাওয়া গেছে?’ বলল আহমদ মুসা।

‘তেমন কিছু নয়। তবে ভাল করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়নি। আপনি সুস্থ হয়ে ফিরে আসুন। এক সাথে সব পরীক্ষা করা যাবে।’ বলল জেনারেল মোস্তফা কামাল।

‘আর একটা কথা। ওরা এখন মরিয়া হয়ে উঠবে। বিজ্ঞানীদের নিরাপত্তার দিকে বেশি নজর দিতে হবে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘দোয়া করুন মিঃ খালেদ খাকান। আর আপনি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন। আল্লাহ আপনাকে যেভাবে বাঁচিয়েছেন, সেভাবেই আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন। আসি। আসসালামু আলাইকুম।’

ওরা বেরিয়ে গেল।

‘স্যার, পাশের রুম এ চলুন। আমরা আপনার ব্লাডপ্রেসার ও হার্টবিটটা একটু দেখতে চাই।’ বলল একজন ডাক্তার আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে।

আহমদ আবদুল্লাহ গিয়ে গাঁট হয়ে বসেছিল আহমদ মুসার কোলে। তার চোখে-মুখে কিন্তু আনন্দের চেয়ে বিস্ময়ই বেশি। সে বারবারই তাকাচ্ছে ছড়ানো রক্ত আর পরে থাকা লোকগুলোর দিকে।

জোসেফাইন এগিয়ে গিয়ে আহমদ আব্দুল্লাহকে আহমদ মুসার কোল থেকে নিয়ে বলল, ‘ও আমার কাছে থাক। এসো পাশের রুমে।’

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

লতিফা আরবাকান গিয়ে জোসেফাইনের কোল থেকে আহমদ আব্দুল্লাহকে নিয়ে বলল, ‘ম্যাডাম, আপনি স্যারকে পাশের রুম এ নিয়ে যান।’

আহমদ আবদুল্লাহ লতিফা আরবাকানের কোলে উঠেই তার মাথায় বাঁধা রুমাল নিয়া টানাটানি আরম্ভ করল।’

‘হ্যালো স্যার জুনিয়র, একি করছ তুমি। তোমার তো কাজ হবে মানুষের নেকাব রক্ষা করা, বেনেকাব করা নয়।’ বলল লতিফা আরবাকান। তার মুখে আনন্দের হাসি।

হাসল জোসেফাইন। বলল, ‘বল বেটা আহমদ, এটা আমার অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। মায়ের কোল থেকে কেড়ে নেয়ার প্রতিবাদ।’

আহমদ মুসার ঠোটে হাসি।

চোখ তার নিচু।

হাঁটতে শুরু করেছে সে দরজার দিকে।

জোসেফাইনও তার পাশে হাঁটছে।

লতিফা আরবাকান আহমদ আব্দুল্লাহর বিদ্রোহের সাথে অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে আর ওদের পেছনে পেছনে হাঁটছে।

সবশেষে বেরিয়ে এল ডাক্তাররা।

দরজার বাইরে পুলিশ, এসএসএফ-এর লোকরা ও দু’জন ক্লিনার দাড়িয়ে আছে।

আহমদ মুসা ঘর থেকে বেরুতেই পুলিশ ও এসএসএফ-এর লোকরা তাকে স্যালুট করল।

একজন পুলিশ এগিয়ে এসে আহমদ মুসাকে পাশের ঘরের দিকে নিয়ে চলল।

বিস্ময়কর এক স্থানে তোপকাপি প্রাসাদের গোল্ড রিসোর্ট অতিথিশালা।

অতিথিশালার ডুপ্লেক্স কটেজের দু'তলার পূর্ব দিকের একটা ইজি চেয়ারে আধ-শোয়া অবস্থায় আহমদ মুসা। তার স্থির দৃষ্টি সামনে, এক খণ্ড সাগরের বুকে। মর্মর সাগর, বসফরাস ও গোল্ডেন হর্নের মিলিত স্থান এটা। এই সাগর শুধু পানির নয়, স্মৃতিরও এক সমুদ্র, তোপকাপি প্রাসাদের মত গৌরবেরও সাগর এটা। ইউরোপ বিজয়ী মুসলিম সেনাবাহিনীর কলতানে মুখরিত ছিল এই সাগর। সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মাদ, সুলতান সুলায়মান, সুলতান বায়েজিদের মত জগত বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী মুসলিম রাষ্ট্রনায়করা হর্ন-বসফরাস-মর্মরকে হয়তো এভাবেই দেখেছেন।

নিজেকে স্মৃতির ভিড়ে হারিয়ে ফেলেছিল আহমদ মুসা।

একটি ট্রেতে করে দুই গ্লাস ফলের রস ও একটি বাটিতে বাদাম নিয়ে বারান্দায় প্রবেশ করল জোসেফাইন।

আহমদ মুসাকে সালাম দিয়ে ট্রেটা দুই ইজি চেয়ারের মাঝখানের টি-টেবিলে রেখে পাশের ইজি চেয়ার এ বসল জোসেফাইন।

সালামের জবাব দিয়ে আহমদ মুসা ইজি চেয়ারে সোজা হয়ে বসল। বলল, 'আহমদ আবদুল্লাহ কোথায়?'

'লতিফার সাথে পেছনের বাগানে।' বলল জোসেফাইন।

'লতিফার সাথে ভাব হয়েছে কেমন? কিছুক্ষণ আগে আমার কোলে উঠে তো বিদ্রোহ করল।'

'ওটা বিদ্রোহ ছিল না, ছিল তোমার কোলে থাকার ওঁর আকাঙ্ক্ষা। তোমাকে সব সময় পায় না, পেলে আর ছাড়তে চায় না।' বলল জোসেফাইন।

'তোমাকে কষ্ট দিয়ে যাচ্ছি, এখন আবার বাচ্চাকেও কষ্ট......।'

আহমদ মুসার কথা শেষ হলো না। জোসেফাইন আহমদ মুসার মুখে হাত চাপা দিল। বলল, 'এ প্রসঙ্গ থাক। জেফি জিনার তখন শেষ হয়নি। কিছু ভাবলে?'

'জেফি জিনা নিজেকে আহমদ মুসার স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়েছেন, এটা সে সময়ের জন্যে খুব স্বাভাবিক ছিল। স্ত্রী পরিচয় না দিলে তিনি আমাকে তাদের হাত থেকে উদ্ধার করতে পারতেন না।' আহমদ মুসা বলল।

'সে সময়ের জন্যে ওটা খুব স্বাভাবিক ছিল অবশ্যই। কিন্তু একজন মেয়ে নিজেকে অন্য কারও হৃদয় অত্যন্ত বড় না হলে, অসম্ভব আন্তরিক না হলে বান্ধবীর স্বামীকে ঐ অবস্থায়ও নিজের স্বামী বলে পরিচয় দেয়া সম্ভব নয়। আর তার সাথে আমার পরিচয়ও তেমন নয়। আসলে তার মত এমন কাউকে আমি জীবনে দেখিনি, তিনি এসেই যে আমাকে জয় করে নিয়েছেন। আমি তাকে কতোটা ভালবেসেছি জানি না, কারণ তার পরীক্ষা কখনও হয়নি। কিন্তু তিনি আমাকে অসম্ভব রকম আপন করে নিয়েছেন।' জোসেফাইন বলল।

'তুমি ঠিক বলেছ জোসেফাইন। তিনি সত্যিই অসাধারণ একজন। কিন্তু আমার সাথে তার দেখা হলো না। তিনি কি বান্ধবীর স্বামীকে এড়িয়ে চলছেন? সংজ্ঞাহীন একজনকে নিয়ে এসে, তার সংজ্ঞা না ফিরে আসতেই চলে যাওয়ার অর্থ এটাই।' আহমদ মুসা বলল।

জোসেফাইনকে একটু বিব্রত দেখালো। এই চলে যাওয়াটা তার কাছেও স্বাভাবিক মনে হয়নি। একটু সময় নিয়ে বলল, 'জেফি জিনা একজন শ্বেতাঙ্গীনি হলেও ইসলামের বিধি-বিধান আন্তরিকভাবে মেনে চলেন। হতে পারে বিনা প্রয়োজনে বান্ধবীর স্বামীর মুখোমুখি হওয়াকে ঠিক মনে করেন না।'

'হতে পারে। কিন্তু বলত, আমার উচ্চতা, ওজন, আইডি মার্ক, ইত্যাদি তথ্য তিনি কিভাবে জানলেন? এতো সত্যিই বিস্ময়কর। তিনি গণক এমন দাবি নিশ্চয়ই করবেন না।'

‘এ বিস্ময় তো আমারও। জেফি জিনা টেলিফোন করলে আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম এ কথা। সে হেসে বলেছল, ‘এটা আল্লাহরই একটা সাহায্য। এ সাহায্য এমনভাবে ওঁর জন্যে আসবে, এটা আল্লাহর তরফ থেকেই ব্যবস্থা হয়েছিল।’ বলল জোসেফাইন।

‘এটা জবাব বটে, কিন্তু এতে সমস্যার সমাধান হয় না।’ আহমদ মুসা বলল।

জোসেফাইন উত্তর দেবার আগেই টি-টেবিলে রাখা আহমদ মুসার মোবাইল বেজে উঠল।

মোবাইল তুলে নিল আহমদ মুসা। কল অন ও লাউডস্পিকার অন করে দিয়ে বলল, ‘হ্যালো।’

ওপ্রান্ত থেকে ভেসে এল কণ্ঠ, ‘আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংকস গড, আপনাকে পেয়েছি স্যার। আমি খুব বিপদে।’

‘বলো সাবাতিনি। কি ঘটেছে, কি বিপদ?’ আহমদ মুসা বলল। হাতের চায়ের কাপটি টি-টেবিলে রেখে সোজা হয়ে বসল আহমদ মুসা।

ওপ্রান্ত থেকে সাবাতিনির কণ্ঠ, ‘আজকেই আমাকে রোমেলী দুর্গে যেতে হবে সেই কাজের জন্যে।’

‘হ্যাঁ, আজ প্রধান বিজ্ঞানী আন্দালুসির সাপ্তাহিক অবকাশে বাসায় যাবার কথা। কিন্তু তুমি বিপদ ভাবছো কেন?’

‘বিপদ নয় কেন? ধরা পড়ে গেলে হয় জেলে যেতে হবে, নয়তো গুলী খেয়ে মরতে হবে। আর দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে ওরাও ছাড়বে না।’

‘ছাড়বে না বলছো কেন? ওরা কি তোমাকে কোন থ্রেট করেছে?’ আহমদ মুসা বলল।

‘থ্রেট ওইভাবে করেনি তবে বলেছে, সহজ কাজটা তোমাকে পারতেই হবে। মনে রেখ, আমাদের কোন প্রোগ্রামে ব্যর্থতা বলে কিছু নেই কিন্তু। এই কথা থ্রেট ছাড়া আর কি!’

থামল সাবাতিনি মুহূর্তের জন্যে। বলে উঠল আবার, ‘স্যার, শখের বশে গোয়েন্দা হতে চেয়েছিলাম। এমনটা হবে ভাবিনি। মনে হচ্ছে আমাকে তারা

তাদের কর্মী মনে করছে। তাদের লোকদের মতই আমাকে ডিল করছে। কিন্তু আমি ওদের লোক নই, ওদের কোন পয়সা আমি নেই না। আমার খুব ভয় করছে স্যার।' কান্নাভেজা কণ্ঠ সাবাতিনির।

'কোন ভয় নেই। তুমি ঠিক সময়ে রোমেলী দুর্গে যাও, সাহসের সাথে কাজটা করবে। যাই ঘটুক আমি দেখব। তোমার কোন ক্ষতি হবে না।' আহমদ মুসা বলল সান্ত্বনার সুরে।

'কিন্তু আপনি কোথায়? কিভাবে আমাকে দেখবেন। তাহলে আপনি রোমেলী দুর্গে আসুন।' আকুল অনুরোধ ঝরে পড়ল সাবাতিনির কণ্ঠে।

'আমার উপর আস্থা আছে?'

'আছে স্যার। একশ ভাগের বেশি।'

'তাহলে যাই ঘটুক, মনে করবে আমি তোমার পাশে আছি। শোন, তোমার প্রফেসর আলী আহসান বেগভিচ এখন কোথায়?'

'মানে এখন বর্তমানে?'

'হ্যাঁ '

'তিনি ছুটিতে যাচ্ছেন। আজই ছুটি নিয়েছেন। টিচার্স কোয়ার্টার থেকেও বেরিয়ে এসেছেন। তিনি তার এক আত্মীয়ের বাসায় উঠেছেন বসফরাসের ওপারে ফাতিহ পাশা পার্ক এলাকায় একটা বাড়িতে।'

একটু চিন্তা করল আহমদ মুসা। বলল, 'তোমার কাজের জন্যে সে রিভলবারটা তিনি তোমায় দিয়ে দিয়েছেন?'

'না দেননি। আমি এখন সেখানে যাচ্ছি। ওটা দেবার জন্যে তিনি ডেকেছেন।'

'কিভাবে যাবে, চিনবে কি করে?'

'ঠিকানা দিয়েছেন স্যার এইমাত্র।'

'কি ঠিকানা?'

'ফাতিহ পাশা পার্কের পূর্ব-দক্ষিণ পাশ বরাবর রাস্তার ওধারে ২৯৫ নাম্বার বাড়ি। আমাকে বলা হয়েছে, বাড়িটির গেটের শীর্ষ ফলাগুলোর মধ্যে ডান

থেকে নাম্বার শিষ ফলা স্পর্শ করে গেটবক্সের সামনে গিয়ে দাড়াতে হবে, মিনিট খানেকের মাঝেই একজন বেরিয়ে এসে একটা গিফটবক্স দিয়ে যাবে।'

'আর কোন পরামর্শ দিয়েছেন তিনি?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। যদি ধরা পড়ে যাই আমি। তিনি বলেছিলেন, আমাদের কোন লোক ধরা পড়ে না। যদি বোঝ তুমি ধরা পড়ছ তাহলে তোমার রিভলবারের ট্রিগার-রিং এর মাথার উপরে একটা লাল বোতাম আছে, তাতে বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে জোরে চাপ দেবে। সংগে সংগে খবর আমাদের কাছে পৌঁছে যাবে। রোমেলী দুর্গ থেকে তোমাকে আমরা সংগে সংগেই উদ্ধার করে ফেলব।' থামল সাবাতিনি।

লাল বোতামের কথা শুনতেই চমকে উঠল আহমদ মুসা। সাবাতিনি থামতেই আহমদ মুসা বলল, 'সাবাতিনি খবরদার, ভুলেও লাল বোতামে চাপ দেবে না।'

'কেন?' প্রশ্ন সাবাতিনির। তার কণ্ঠে ভয়।

'ওতে 'পয়জন পিস' আসে।চাপ দেবার সংগে সংগেই তোমার মৃত্যু হবে। ভয় করো না, লাল বোতামে চাপ না দিলে তোমার কোন ক্ষতি হবে না।' আহমদ মুসা বলল।

সাবতিনি কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না। পরে কম্পিত কণ্ঠে বলল, 'ধন্যবাদ স্যার। আমাকে বাঁচালেন। স্যার, আমার বাসায় এমন মৃত্যু দেখেছি। মনে পড়ছে আমার। ওরা এতবড় বিশ্বাসঘাতক, এতবড় খুনি স্যার। আমি তার অনুরোধে শখের বসে কাজ করছি, কোন বিনিময় তো ওদের কাছে নেইনি।' কান্নায় ভেঙ্গে পড়া সাবাতিনির কণ্ঠ।

আহমদ মুসা কিছু বলবার আগেই সাবাতিনির কণ্ঠ আবার শোনা গেল, 'আমি যদি ওদের এই কাজ না করি, করবো না আমি।'

'ওদের এই কাজ না করেও তুমি বাঁচতে পারবে না। তোমার আব্বা-আম্মার উপরও বিপদ নেমে আসবে। ওদের নিষ্ঠুরতার কোন সীমা নেই। তার চেয়ে শোন, ওরা যেভাবে বলছে কাজটা করে দাও, শুধু লাল বোতামে চাপ দেয়া

ছাড়া। কাজটা ঠিকভাবে করেছ, সেটা ওদের খুবই দরকার আর এটা তোমার বাঁচার জন্যে দরকার। আমাদের জন্যেও খুব দরকার।' বলল আহমদ মুসা।

'আগের দুটো বুঝলাম, আপনাদের কেন দরকার সেটা বুঝলাম না স্যার।' সাবাতিনি বলল।

'ওরা হেলিকপ্টার ফলো করবে এবং বিজ্ঞানীর বাড়ি যাবে। ওদেরকে এভাবে আমরা দিনের আলোতে আনতে চাই।'

'বুঝেছি স্যার। ব্যাপারটা চোরের উপর বাটপারি।' বলল সাবাতিনি। তার কণ্ঠ এবার হালকা।

থেমেই আবার বলে উঠল সাবাতিনি, 'ওদের নয় স্যার, আপনার নির্দেশেই আমি এ কাজ করবো।'

'ওয়েলকাম সাবাতিনি। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। ওখানে তোমার ধরা পড়ার কোন ভয় নেই, ওদিক থেকে তোমার ক্ষতি হবে না। আমার উপর নির্ভর করতে পার।' বলল আহমদ মুসা।

'স্যার, আমার পরিচিত দুনিয়ার মধ্যে আমি সবচেয়ে আপনার উপরই নির্ভর করি। আপনি বললে আমি বোধহয় আস্থার সংগে আগুনেও ঝাপ দিতে পারি।'

'এমন অন্ধ নির্ভরতা ঠিক নয় সাবাতিনি। আল্লাহর পরে নিজের বিবেককেই মনে করতে হবে সবচেয়ে বড়। যাক, শোন, প্রফেসর আলী আহসান বেগভিচের কোন আইডি মার্ক আছে?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'তার মাথায় একটা চুলও নেই। তাই তিনি সবসময় লাল তুর্কি টুপি পড়ে থাকেন। চোখ দুটো তার তীরের মত তীক্ষ্ণ। খুব অস্বস্থিকর চোখের দৃষ্টি। বোধহয় এটা আড়াল করার জন্যে গোল্ডেন কালারের ডীপ সানগ্লাস পরেন। তার বাঁ কানের নিচে একটা ক্ষতচিহ্ন আছে। ফেস মেকআপ দিয়ে ওটাকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করেন, কিন্তু পারেন না। আর......।'

সাবাতিনিকে আর এগুতে দিল না আহমদ মুসা। তার কথার মাঝখানে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'আর দরকার নেই সাবাতিনি। তোমাকে ধন্যবাদ।'

‘ধন্যবাদ স্যার। আমি ওখানে যাত্রা করছি স্যার। ওখান থেকেই রোমেলী দুর্গে আসবো। আসসালামু আলাইকুম।’

‘ওকে সাবাতিনি। ওয়া আলাইকুম সালাম। আল্লাহ তোমার সহায় হোন।’

বলে আহমদ মুসা কল অফ করে মোবাইল রেখে দিল।

মোবাইল রাখতেই জোসেফাইন বলল, ‘তুমি তাকে আশ্বাস দিলে, কিন্তু মেয়েটি উভয় সঙ্কটে। একদিকে মৃত্যু, অন্যদিকে পুলিশে ধরা পড়ার ভয়। কেন তুমি তাকে এমন বিপদের মুখে ঠেলে দিলে?’

‘তুমি জান, মেয়েটি আগেই ওদের ট্রাপে পড়েছে। ওদের ইচ্ছে মত না চললে, তাকে ওরা বাঁচতে দেবে না।

আমি তাকে ও তার পরিবারকে বাঁচাবার চেষ্টা করছি।’

‘কিভাবে?’

‘সাবাতিনি ওদের দেয়া দায়িত্ব পালন করবে, তাতে সে ও তার পরিবার বাঁচবে। মনে করেছিলাম, ওকে গ্রেফতার করাব। কিন্তু তা করলে শত্রুরা তাদের বর্তমান প্রোগ্রাম পাল্টে ফেলবে। আমরা ওদের ফাঁদে ফেলার সুযোগ হারাব। অন্যদিকে সাবাতিনিকে ওরা কোন সন্দেহ করতে পারবে না। তার ও তার পরিবারের কোন ক্ষতি হবে না। সে বাইরে থাকলে আরেকটা উপকার হবে, শত্রুদের সম্পর্কে জানার সে একটা মাধ্যম হবে।’

‘কিন্তু মেয়েটিকে এই বিপদজনক কাজে ব্যবহার করা তোমাদের ঠিক হবে না। তোমার উপর মেয়েটির সীমাহীন আস্থা।’

‘আমি জানি জোসেফাইন। আমার বা আমার মিশনের জন্যে তাকে ব্যবহার করিনি। আমি তা করি না। আমার ভার আমিই বহন করি। আজ তাকে আমি চাপ দিয়ে রোমেলী দুর্গে যে পাঠালাম, সেটা তার ও তার পরিবারের ভালোর জন্যেই। প্রফেসর আলী আহসান বেগভিচের ঠিকানা ও আইডি জানায় আমার উপকার হয়েছে, কিন্তু তাতে তার ক্ষতির কোন সম্ভাবনা নেই।’ বলল আহমদ মুসা।

জোসেফাইন একটু এগিয়ে এসে আহমদ মুসার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'আমার গর্ব যে, তোমার এই সুবিচারবোধ অন্য যে কারো চেয়ে বেশি।'

আহমদ মুসা কাঁধ থেকে জোসেফাইনের হাতটা হাতের মুঠোয় নিয়ে বলল, 'আল্লাহর বান্দাদের তো উচিত নিজের সুবিধার চেয়ে অন্যের অসুবিধাকে অগ্রাধিকার দেয়া। সুন্দর ও শান্তির সমাজ, যা আল্লাহ চান, এভাবেই গড়ে উঠতে পারে।'

বলেই আহমদ মুসা এক হাত দিয়ে মোবাইলটা আবার তুলে নিল।

'জেনারেল মোস্তফাকে ব্যাপারটা জানিয়ে দেই!' বলে আহমদ মুসা একটা কল করল।

ওপারে জেনারেল মোস্তফার কণ্ঠ পেয়ে সালাম দিয়ে বলল, 'জেনারেল মোস্তফা, সাবাতিনি রোমেলী দুর্গে যাচ্ছে। বিজ্ঞানী মিঃ আন্দালুসির হেলিকপ্টারের টেকঅফ ক'টায়?'

'এখন থেকে দুঘণ্টা পর ঠিক বেলা দশটায়। এই মাত্র আমি সব খোঁজ নিলাম সব ঠিক আছে। আপনি যেভাবে বলেছেন, সেভাবেই কাজ হবে।' বলল জেনারেল মোস্তফা।

'প্রোগ্রামের কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে জেনারেল মোস্তফা। সাবাতিনিকে তার কাজ শেষ করে নীরবে চলে যেতে দিতে হবে। আচ্ছা বলুন তো, অভিজাত সিজলি বা বিয়েগ্ল এলাকায় কোন ভিআইপির বাড়ি কি খালি আছে?' আহমদ মুসা বলল।

জেনারেল মোস্তফা একটু চিন্তা করে বলল, 'হ্যাঁ, সুইচ কনসুলেটের একটা ভাড়া নেয়া বাড়ি খালি হয়েছে। সুইচ কনসাল আঙ্কারায় বদলী হয়ে গেছেন। নতুন কেউ সহসা আসছেন না সম্ভবত। ওরা বাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। বাড়িটির নাম 'ওয়েসিস'।'

'তাহলে ব্যবস্থা করুন, হেলিকপ্টার ঐ বাড়িতেই ল্যান্ড করবে। বাড়িতে জনাব আন্দালুসির একটা নেমপ্লেট লাগিয়ে দিন।'

'বুঝেছি মিঃ খালেদ খাকান। বাড়িটাকে আন্দালুসির বাড়িতে পরিণত করতে হবে। চাকর-বাকর, কুক, ড্রাইভার সবাই হবেন গোয়েন্দা, এই তো।

সাবাতিনিকে গ্রেফতার করতে নিষেধ করছেন কেন? ওদিক থেকে তার কোন ভয় নেই? কিংবা ওদিকের সাথে এই দরজা আরও খোলা রাখতে চান?'

'দু'টোই। আয়েশা আজীমার মৃত্যুর পর সাবাতিনি ছাড়া আর কোন মাধ্যম আমাদের হাতে নেই। আরেকটা কথা জেনারেল, আজ দুপুর বারটার দিকে আমি ফাতিহ পাশা পার্ক এলাকায় একটা বাড়িতে যাব। পার্কের পূর্ব-দক্ষিন এলাকায় হবে বাড়িটা।' বলল আহমদ মুসা।

'আপনি যখন যাবেন, তখন সেটা নিশ্চয়ই ছোট ব্যাপার নয়?'

'টার্গেটটা বড়। ধরতে পারলে ভালো। এ জন্যে বিষয়টা আপনাকে জানালাম। ঐ এলাকায় আপনার কিছু লোক থাকতে পারে।'

'ঠিক আছে। কিন্তু অতবড় দুর্ঘটনা ঘটে গেল আপনার উপর দিয়ে। আজকেই কি আপনার বের হওয়া উচিত?'

'কিন্তু দেরি করা যাবেনা। সে ইতিমধ্যেই জায়গা চেঞ্জ করেছে। কর্মস্থল থেকে সে ছুটিও নিয়েছে। সে আবারও জায়গা বদলাতে পারে। আর আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি।' বলল আহমদ মুসা।

'ঠিক আছে। আমাদের লোকরা পার্কের ঐ এলাকায় থাকবে। যদি দরকার হয়, তাহলে আমাদের সিকিউরিটির প্রথম নাম্বারটায়, যা আপনার মোবাইলে আছে, টেলিফোন করে জিরো নাইন জিরোতে কল করবেন, তাহলে পার্ক এলাকার টিম লিডারকে পেয়ে যাবেন।'

'ধন্যবাদ জেনারেল।'

'ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।' ওপার থেকে টেলিফোন রেখে দিল জেনারেল মোস্তফা কামাল।

আহমদ মুসা টেলিফোন রাখতেই জোসেফাইন বলে উঠল, 'তোমাকে যেতে বাধা দেব না, কিন্তু বসফরাস ব্রীজ হয়ে ওপারে যাও আমার মন তা মেনে নিতে পারছে না। তুমি বোট নিয়ে ওপারে যাও।'

'ওয়াটার ওয়েকে তুমি নিরাপদ মনে করছ কেন?' আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

‘ওরা জানে তুমি এখানে আছো। নিঃসন্দেহে বলা যায় ওরা সম্ভাব্য সকল সড়কপথের উপর চোখ রাখছে।’ বলল জোসেফাইন।

‘এ ভয় যদি তুমি কর, তাহলে সব রুটেই ভয় আছে। কারণ আমি গোল্ড রিসোর্টের তোপকাপি প্রাসাদ এলাকা থেকে বের হলেই ওরা খবর জানতে পারবে। এর ফলে সড়ক পথ কিংবা পানি পথ যে পথেই যাই ওরা খবর পেয়ে যাবে। সেদিন যে আমি বসফরাস ব্রীজে আক্রান্ত হলাম, সেটা তারা আয়েশা আজীমার বাড়ি থেকে বের হবার পরই জানতে পারে। তবে সেদিন ওরা যে সুযোগ পেয়েছিল, আজ তা পাবে না। সেদিন আমি শুধু অসতর্ক নয়, সামনের দৃষ্টিটা থাকলেও আমি নিজেকে নিজের মাঝে হারিয়ে ফেলেছিলাম।’ আহমদ মুসা বলল।

‘এমন তো তোমার হয় না। কি ভাবছিলে তুমি।’

‘আয়েশা আজীমার কাহিনী ও ডঃ বাজের জন্যে তার অকপট স্বীকারোক্তি আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। আয়েশা আজীমা শুধু নিজেকেই কুরবানী দেয়নি, তার স্বজাতির ষড়যন্ত্রকেও খানিকটা প্রকাশ করে দিয়েছে। এভাবে আচ্ছন্ন থাকার কারণেই আয়েশা আজীমার বাড়ির ড্রাইভার, দারোয়ান ও কাজের লোকদের কেউ যে বাড়ির ঘটনা বাইরে সংগে সংগেই পাচার করতে পারে, সে কথা তখন মনেই আসেনি আমার।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আসলে তোমার মনটা খুব সেনসিটিভ, খুব নরম। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর ‘রাহমান’, ‘রহিম’ পরিচয়টাই সৃষ্টি জগতের জন্যে সবচেয়ে বড়। মহান আল্লাহ নিজেই তার সম্পর্কে কুরআন শরীফে বলেছেন, ‘দয়াকে তোমার প্রভু তার জন্যে কর্তব্য হিসেবে ঠিক করেছেন।’ মানুষের মধ্যেও দয়া দেখাতে আল্লাহ বেশ ভালোবাসেন। আর তোমার মধ্যে দয়ার প্রকাশ আমাকে বেশি গর্বিত করে। যাক, আরেক......।’

কথা শেষ করতে পারল না জোসেফাইন। তার কথার মাঝখানে আহমদ মুসা বলল, ‘তাহলে আমার কঠোরতা নিশ্চয়ই তোমাকে দুঃখিত করে?’

গম্ভীর হলো জোসেফাইন। বলল, ‘তোমার কঠোরতা আইনের পক্ষে, নীতির পক্ষে, একেই বলে সুবিচার। মজলুমের পক্ষে দাড়িয়ে, সুবিচারের পক্ষে

দাড়িয়ে যে কঠোরতা, তা মানবতা ও দয়া থেকেই উৎসারিত। এটা দয়ার উন্নততর রূপ। ইসলামের শাস্তি আইনের কঠোরতা মানুষ ও মানবতার প্রতি অপার ভালোবাসা থেকেই নির্ধারিত।'

'ধন্যবাদ জোসেফাইন। তুমি কিন্তু দার্শনিক হয়ে যাচ্ছ। যাক, বল, তুমি কি যেন বলতে যাচ্ছিলে।' আহমদ মুসা বলল।

'ও আচ্ছা, আমার একটা কৌতূহল, বসফরাসের অস্বাভাবিক ঐ উচ্চতা থেকে কিভাবে লাফিয়ে পড়েছিলে। আমি অবাক হচ্ছি, তোমার তেমন কোন ক্ষতি হয়নি। অন্যদিকে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিলে কিভাবে।' বলল জোসেফাইন।

'পানির কাছাকাছি পৌঁছেও আমি ডাইভিং-এর নিয়ম অনুযায়ী দুই হাত সামনে ছড়িয়ে দিয়ে দুই বড় জাহাজের মাঝ দিয়ে পড়েছিলাম। আমি চেয়েছিলাম, সরাসরি পানি যেন আমি পেয়ে যাই। কিন্তু দুর্ভাগ্য, শেষ মুহূর্তে একটা কার্গো ফেরির প্রান্ত ঘেঁষে ছিটকে পড়ে আরেকটা বোটের পেটে বাড়ি খেয়ে পড়ি পানিতে। সৌভাগ্য হলো, কার্গোতে নরম কিছু বোঝাই ছিল এবং আরেকটা সৌভাগ্য হলো, অতবড় উচ্চতা থেকে নিচে পড়বার যে বেগ তা কার্গো বোট ও অন্য যে বোটের পেটে ধাক্কা খেয়েছিলাম সেই বোট এবং বসফরাসের পানি এই তিনের মধ্যে বণ্টন হওয়ায় আমি বড় ক্ষতি থেকে বেঁচে যাই। কার্গোর নরম লাগেজে ধাক্কা খেয়ে পেছনে পড়ার আঘাত দু'হাত দিয়ে সামলে নেই, কিন্তু ছিটকে পড়া পাঁজরটা বোটের পেটে সরাসরি ধাক্কা খেয়ে যায়। হয়তো এই আঘাতেই আমি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলি। তবে সংজ্ঞা হারাবার আগে সর্বশক্তি দিয়ে পানিতে ভেসে উঠতে সমর্থ হই। সম্ভবত পেছনের বোটের লোকেরা এই অবস্থায় আমাকে উদ্ধার করে।'

থামল আহমদ মুসা।

মাথার পাশেই দাঁড়িয়েছিল জোসেফাইন। আহমদ মুসার মাথা বুকে টেনে নিয়ে বলল, 'যা ঘটেছে সেটা মিরাকল। আল্লাহ তোমাকে নিজ হাতে বাঁচিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ।' আবেগে ভারী হয়ে উঠেছে জোসেফাইনের কণ্ঠ।

'অবশ্যই জোসেফাইন, আল্লাহই রক্ষা করেছেন। কি ঘটেছে আমি বর্ণনা দিয়েছি। কিন্তু কিভাবে ঘটেছে, তা আমি জানি না। আমার নিজের উপর কিংবা

কোন কিছুর উপরই আমার নিয়ন্ত্রণ ছিল না। সব কিছুর নিয়ন্ত্রক যিনি তিনিই সব নিয়ন্ত্রণ করেছেন।'

থামল আহমদ মুসা। পরক্ষনেই আবার বলল, 'তুমি ওয়াটারওয়ে ব্যবহার করতে বলেছ। ভালো পরামর্শ তোমার। ফাতিহ পাশা পার্কের এলাকাতেই রয়েছে একটা ফেরিঘাট। একটাই অসুবিধা হবে গাড়ি থাকবে না, গাড়ি ভাড়া করতে হবে।'

'অসুবিধা নেই। ফেরিঘাটে একটা গাড়ি রাখতে বলতে পার।' বলল জোসেফাইন।

'তাহলে যে আবার ফিরতে হবে ব্রীজ হয়ে।' হেসে বলল আহমদ মুসা।

'অসুবিধা হবে না। গাড়িটা আবার কোন ঘাটে রেখে আসবে।' বলল জোসেফাইন। গম্ভীর কণ্ঠ তার।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'রিভলবার চালাবার মত বুদ্ধিতেও তুমি একদম গোয়েন্দা হয়ে পড়েছ। ধন্যবাদ জোসেফাইন।'

'বেশি প্রশংসা কিন্তু বিপরীত অর্থও বুঝায়' বলে আহমদ মুসার পিঠে একটা কিল দিয়ে জোসেফাইন চায়ের কাপ নিয়ে দ্রুত চলে গেল ঘরের দিকে।

# ৩

ফাতিহ্ পাশা পার্কের পূর্ব-দক্ষিন পাশের রাস্তার ওধারে সম্ভাব্য সবগুলো এলাকা তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছে ৩৯৫ নং বাড়ি। অবশেষে ৩৯৫ নাম্বার একটা বাড়ি সে পেয়েছে, তা পার্কের প্রায় দক্ষিণ-পশ্চিম কোনে এবং বাড়িটাও একটা পুলিশ ফাঁড়ি।

ক্লান্ত আহমদ মুসা পুলিশ ফাঁড়ির সামনে একটা বেঞ্চিতে বসে পড়ল। পার্কের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের বাড়িগুলো থেকে শুরু করে পশ্চিম-উত্তরের এই প্রান্ত পর্যন্ত বাড়িগুলোর নাম্বার তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। ফাতিহ্ পাশা পার্কের সত্যিকার দক্ষিণ পশ্চিম যাকে বলে, সেখানে বাড়ি রয়েছে মাত্র বিশটি। বাড়িগুলোর নাম্বার ৩৪৬ থেকে ৩৬৫ পর্যন্ত। তারপর ৩৯৭ পর্যন্ত অবশিষ্ট বাড়িগুলো রয়েছে পার্কের দক্ষিণ এবং দক্ষিন-পশ্চিমাঞ্চলের প্রান্ত পর্যন্ত। সাবাতিনি কি তাকে ভুয়া নাম্বার দিয়েছে? না সে নিজে প্রতারিত হয়েছে? এ দুটোর কোনটিই সম্ভব নয়। সাবাতিনি তাকে ভুয়া নাম্বার দিতে পারে না। অন্যদিকে সাবাতিনি প্রতারিত হলে প্রফেসর আলী আহসান বেগভিচ নির্দেশিত বাড়িতে সে পৌঁছাবে কি করে? সাবাতিনির ওখানে পৌছা বেগভিচদের জন্যেই প্রয়োজনীয়। তাহলে? উত্তর খুঁজতে গিয়ে হঠাৎ আহমদ মুসার মনে পড়ল প্রফেসর বেগভিচরা যে বাড়ির নাম্বারে সাবাতিনিকে ডেকেছিল, সাবাতিনি আসার পর তার নাম্বার আবার পাল্টে ফেলেছে। এটাই ঘটেছে নিশ্চয়। কিন্তু কোন নাম্বারকে ৩৯৫ বানাল? যে কোন নাম্বারকেই পাল্টাতে পারে।

আবার চিন্তায় বুঁদ হয়ে গেল আহমদ মুসা।

তার মনে প্রশ্ন জাগল, নাম্বার ৩৯৫ বানাল কেন? যে নাম্বারটিকে সে চেঞ্জ করেছে সে নাম্বারের সাথে ৩৯৫ নাম্বারের কি মিল আছে? মিল থাকাটাই স্বাভাবিক। ধাঁধার সাইকোলজি এটাই যে অঙ্কগুলো ঠিক থাকে, চেঞ্জ হয় অঙ্কের বিন্যাস। এখানে যদি তাই করা হয়ে থাকে, তাহলে তিনটি অঙ্ক দিয়ে ছয় সেট

সংখ্যা তৈরি করা যায়। সেগুলো হলো ৩৯৫,৩৫৯,৯৫৩,৯৩৫,৫৯৩ এবং ৫৩৯। এই ছয় সেট সংখ্যার যেকোন একটি হবে আসল সংখ্যা। ভাবলও অনেকক্ষণ আহমদ মুসা। ঠিকানার একটি প্রধান বিষয় ছিল বাড়িটা ফাতিহ পাশা পার্কের পূর্ব-দক্ষিন কোনে। এই দিক নির্দেশনাকে প্রধান ধরলে এই ছয় সেট চারটিই অর্থাৎ ৯৫৩, ৯৩৫, ৫৯৩ এবং ৫৩৯ বাদ হয়ে যায়। কারণ সংখ্যাগুলো ফাতিহ পাশা পার্কের রাস্তার বিপরীত দিকের কোন পাশেরই সংখ্যা নয়। ৩৯৫ যে আসল সংখ্যা নয় তা এ থেকে প্রমাণ হয়েছে। তাহলে একমাত্র ৩৫৯ সংখ্যাটিই বাকি থাকে। সুতরাং এই সংখ্যাটিই হতে পারে আসল ঠিকানা।

আহমদ মুসার মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠল। তার মনে হলো তার হিসেবে কোন ভুল নেই, ৩৫৯-ই হবে সেই বাঞ্ছিত নাম্বার।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। গাড়িতে উঠে ছুটল ৩৫৯ নাম্বার বাড়ির দিকে।

দক্ষিণ দিক থেকে যাচ্ছে বলে ৩৫৯ নাম্বার বাড়িটা রাইট লেনে পড়েছে, সে যাচ্ছে লেফট লেন ধরে। সুতরাং তাকে আরও উত্তরে টার্ন ঘুরে বাড়িটার দিকে ফিরে আসতে হবে।

টার্নটা ৩৫৯ নাম্বার বাড়ির দু তিনটি বাড়ির উত্তরেই। আহমদ মুসা টার্ন ঘুরে দ্বিধাহীনভাবে গাড়ি চালিয়ে এসে ৩৫৯ নাম্বার বাড়ির সামনে দাড় করাল। বাড়িটা চারতলা।

আহমদ মুসা ঠিক করেই এসেছে, একজন ট্যাক্স গোয়েন্দার পরিচয় নিয়ে সে বাড়িতে ঢুকবে, বাড়িটার ভাড়া সংজ্ক্রান্ত সব কাগজপত্র সার্চ করার পরোয়ানা নেবে। গোয়েন্দার আইডেন্টিটি কার্ড তার পকেট এ রয়েছে। তুরস্কের মত দেশে কোন বাড়িতে প্রবেশের ক্ষেত্রে এর চেয়ে নিরাপদ ব্যবস্থা আর নেই। পুলিশ কিংবা গোয়েন্দা পুলিশের উপস্থিতি জানলে বাড়ির অনেকেই সরতে পারে। যার ফলে শিকার ভাগতে পারার সম্ভাবনা থাকে। ট্যাক্স-গোয়েন্দাকে মানুষ বাড়িতে ঢুকতে দেখলে অসন্তুষ্ট হয়, উদ্বিগ্ন হয়, কিন্তু পালায় না কেউ।

আহমদ মুসা তার গাড়ি গেটের সামনে দাড় করিয়ে নামল গাড়ি থেকে। বাম পাশেই গেটবক্স।

আহমদ মুসা গেটবক্সের দিকে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে, ঠিক সে সময়েই গেটের বিশাল দরজাটা দ্রুত ডান দিকে সরে গিয়ে উন্মুক্ত করে দিল গেট।

কিছুটা বিস্মিত আহমদ মুসা পকেটে হাত পুরেই উন্মুক্ত দরজা দিয়ে ভেতরে তাকাল। চোখ পড়ল সরাসরি লাল তুর্কি টুপিধারি একজন লোকের উপর। চোখে গোল্ডেন ফ্রেমের সানগ্লাস। তার স্থির দৃষ্টি আহমদ মুসার দিকে। তার ডান হাতের রিভলবার আহমদ মুসার দিকে উঠে আসছে।

চোখ পড়তেই আহমদ মুসা তাকে চিনতে পেরেছিল। রিভলবার উঠে আসা দেখেই বুঝেছিল কি ঘটতে যাচ্ছে।

বাম দিকে দেহটাকে ছুড়ে দিয়েছিল আহমদ মুসা। প্রায় তার সাথে সাথেই গুলিরও শব্দ হয়েছিল।

আহমদ মুসার কোটের ডান হাতার একটা অংশ ছিঁড়ে নিয়ে গুলিটা চলে গেল।

বাম দিকে ছিটকে যাবার সময় আহমদ মুসাও রিভলবার ধরা বাম হাত পকেট থেকে বের করে এনেছিল। আঙ্গুলটাও ছিল ট্রিগারে।

মাটিতে পড়ার আগেই ট্রিগার টিপেছিল আহমদ মুসা। গেটের সামনের জায়গা নিচু ও ঢালু। গুলীটা কিছুটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। ডান হাতকে টার্গেট করা গুলীটা গিয়ে বিদ্ধ হলো প্রফেসর বেগভিচের হাঁটুতে।

আহমদ মুসা মাটিতে পড়ে স্থির হবার আগেই ব্রাশ ফায়ারের শব্দ ভেসে এল। এক ঝাঁক গুলী ছুটে এল সেই সাথেই।

আহমদ মুসা নিরাপদেই দ্রুত গড়িয়ে গেটবক্সের দিকে সরে গেল।

ব্রাশ ফায়ার থামলো না। গেটের সামে দাঁড়ানো আহমদ মুসার গাড়ি ঝাঁঝরা হয়ে গেল। গুলীবৃষ্টি এসে গেটবক্স ঘিরে ধরল।

আহমদ মুসা লক্ষ্য করল, গুলির আওয়াজটা ক্রমশ নিচে আসছে। গুলী শুরু হয়েছিল দু'তলা থেকে। মনে হয় ওরা ক্রমশ নিচে নেমে আসছে।

আহমদ মুসা গেটবক্সকে সামনে রেখে উঠে দাঁড়াল। এগোলো গেটবক্সের দিকে। গেটবক্সের দরজায় চাপ দিতেই তা খুলে গেল। গেটবক্সের

আরেকটা দরজার দিকে আর গেটবক্সের ভেতর ও বাহির দু'দিকেই পর্যবেক্ষণ জানালা।

ভেতরের পর্যবেক্ষণ জানালা দিয়ে আহমদ মুসা উঁকি দিল বাইরে। প্রথমেই চোখ পড়ল সিঁড়ি ঘরের দিকে। সিঁড়ি ঘরটা জানালা থেকে সামনে সোজা সামনে একটা ছোট চত্বরের ওপারে। দক্ষিণ দিকে ঘুরেই দেখতে পেল হাঁটুতে গুলিবিদ্ধ প্রফেসর বেগভিচ ডান পাটা টেনে নিয়ে গাড়ির ড্রাইভিং সিট এ উঠে বসেছে।

আহমদ মুসা বুঝল সে পালাচ্ছে।

সংগে সংগেই আহমদ মুসা রিভলবার তাক করল প্রফেসর বেগভিচের গাড়ির সামনের চাকা। নির্ভুল নিশানা। একটা গুলী গিয়ে বিদ্ধ হলো সামনের চাকার পেটে। শব্দ তুলে চাকাটা দেবে গেল।

প্রফেসর বেগভিচ তাকাল গেটবক্সের দিকে। তার রিভলবার থেকে কয়েকটা গুলী ছুটে এল গেটবক্স লক্ষ্যে।

ওদিকে সিঁড়িঘরের দিক থেকেও ছুটে এল গুলীর ঝাঁক। সম্ভবত গুলীর শব্দ থেকে তারা আহমদ মুসার অবস্থান আঁচ করে নিয়েছে।

আহমদ মুসা আড়াল থেকে ব্রাশ ফায়ারের উৎস সিঁড়ি ঘরের দিকে নজর রেখে এক হাতে রিভলবার ধরে অন্য হাতে দ্রুত মোবাইলে একটা কল করল পার্কে অপেক্ষমাণ গোয়েন্দাদের। তাদেরকে বাড়ির নাম্বার দিয়ে এদিকে আসতে বলল।

গেটবক্সের জানালা লক্ষ্যে গুলীবৃষ্টি অব্যাহতভাবে চলছে।

আহমদ মুসা বুঝতে পারছে, ওরা গুলীর দেয়াল সৃষ্টি করে এদিকে অগ্রসর হতে চাচ্ছে।

অব্যাহত গুলীর কারণে সিঁড়িঘরের দিকে নজর রাখতে পারছে না আহমদ মুসা। আড়ালে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে এমন জায়গায় চোখ রেখেছে তার মানে ওরা সামনে মুভ করতে চাইলে সে জায়গা তাদের অতিক্রম করতেই হবে।

তবে আহমদ মুসার দিক থেকে গুলীর শব্দ না পেয়ে ওরা সম্ভবত বিভ্রান্তিতে পড়ে যাবে যে, আহমদ মুসা পালাল কিনা। এরকমটা তারা ভাবলে এমন কিছু করে বসবে যা তাকে সুযোগ করে দেবে।

ওদিকে ব্রাশ ফায়ার হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। আহমদ মুসা তার দিক থেকে কোন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করল না। ওরা কিছু করবে বলে যা ভেবেছিল আহমদ মুসা, সেটাই ঘটছে মনে করল সে। ট্রিগারে আঙুল চেপে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করল আহমদ মুসা।

হঠাৎ ব্রাশ ফায়ার আবার শুরু হলো। এবার গুলীর লক্ষ্য শুধু জানালা নয়, গুলী এখন গেটকেই কভার করেছে। দু'একটা গুলী জানালা লক্ষ্য করে আসছে।

এই গুলীর আড়ালে ষ্টেনগান বাগিয়ে গুঁড়ি মেরে মেরে দু'জন দৌড় দিয়েছে সিঁড়িঘর থেকে গেটের দিকে। এমন সুযোগের জন্যেই ওঁৎপেতে ছিল আহমদ মুসা। তার রিভলবার দু'বার অগ্নিবৃষ্টি করল। চত্বরটার মাঝখানে ওদের দু'টি লাশ ঢলে পড়ল।

এর জবাব এল ওদিক থেকে। দুই ষ্টেনগান থেকে বৃষ্টির মত গুলী ছুটে এল জানালা লক্ষ্যে।

এই সময় গেটবক্সের বাইরে অনেকগুলো পায়ের শব্দ পাওয়া গেল।

আহমদ মুসা দ্রুত মাথা নিচু করে গেটবক্স থেকে বাইরে এল। বেরিয়েই দেখতে পেল সাদা পোশাকের সাতজন গোয়েন্দা পুলিশ।

আহমদ মুসা নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, 'ভেতরে চারজন ষ্টেনগানধারী ছিল। দু'জন মারা গেছে। দু'জন সিঁড়ি ঘরে লুকিয়ে থেকে গুলী করছে। আসল শিকার প্রফেসর বেগভিচ আহত অবস্থায় চত্বরের গাড়িতে বসে আছে। তাকে পালাতে দেয়া যাবে না।'

'ধন্যবাদ স্যার, ওয়েল ডান স্যার। আমরা দেখছি। আমাদের সাথে বুলেটপ্রুফ গাড়ি আছে।'

বলে সে সাথীদের দিকে ফিরল। বলল, 'রেডি।'

তারা এগোলো গাড়ির দিকে।

গুলী-গোলার শব্দ শুনে পুলিশের দু'টো গাড়িওঁ এসে দাঁড়িয়েছিল।

গোয়েন্দা অফিসার একটু এগিয়ে গিয়ে তাদেরকেও কিছু নির্দেশ দিল।

নির্দেশের সংগে সংগেই, পুলিশের দু'টি গাড়ি বাড়ির দু'পাশের দু'দিকে এগোলো। তাদের দৃষ্টি বাড়িটার পেছন দিকে।

গোয়েন্দা পুলিশরাও তাদের গাড়িতে উঠে বসেছে। পুলিশরা দু'দিক থেকে বাড়ির পেছন দিকে এগিয়ে যাবার পর গোয়েন্দা পুলিশের গাড়ি গেট পার হয়ে ছুটল সিঁড়ি ঘরের দিকে। তাদের গাড়িতে ফিট করা গান থেকেও গুলীবৃষ্টি হচ্ছে।

ওদিক থেকে গুলী বন্ধ হয়ে গেল।

আহমদ মুসা ছুটল গাড়ির দিকে। ওদের গুলীর কভার নিয়ে আহত প্রফেসর বেগভিচ পালাতেও পারে, এ আশংকা আছে।

গেট পার হতেই গাড়ির ভেতরটা চোখে পড়ল আহমদ মুসার। প্রফেসর বেগভিচকে দেখা পেল না। তাহলে কি প্রফেসর বেগভিচ সত্যিই পালাল! মনটা খারাপ হয়ে গেল আহমদ মুসার।

তবুও দ্রুত গিয়ে আহমদ মুসা দাঁড়াল গাড়ির পাশে। গাড়ির ভেতরে চোখ যেতেই আহমদ মুসা দেখতে পেল গাড়ির সিটে ঢলে পড়ে আছে প্রফেসর বেগভিচের দেহ।

এবার নতুন আশংকা আহমদ মুসার মনে, পটাশিয়াম সাইনাইড কি প্রফেসর বেগভিচকেও কেড়ে নিল তাদের হাত থেকে! প্রফেসর বেগভিচের নীল হয়ে যাওয়া মুখের উপর ভালো করে নজর পড়তেই নিশ্চিত হলো তার আশংকাই ঠিক।

আহমদ মুসা গাড়ির দরজা খুলে ফেলল।

প্রফেসর বেগভিচকে সার্চ করতে চায় সে। প্রফেসর বেগভিচ কোথায় বেরুচ্ছিল গাড়ি নিয়ে। বেরুবার মুখেই সে আহমদ মুসার মুখোমুখি হয়েছে। অপ্রস্তুত অবস্থায় সে ধরা পড়েছে। সুতরাং তার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় কিছু পাওয়া অসম্ভব নয়।

প্রফেসর বেগভিচের প্যান্টের পকেটে একটা রুমাল এবং একগোছা চাবি সমেত একটা রিং পেল। কোটের দুই সাইড পকেটের একটিতে একটি সিগারেট

লাইটার পেল, অন্য পকেটে পাসপোর্ট এবং এয়ার লাইন্সের একটি টিকিট পাওয়া গেল। আহমদ মুসা দেখল, টিকিটটা ইস্তাম্বুল-তেলআবিব (ইসরাইল) রুটের। তার মানে, প্রফেসর বেগভিচ ইসরাইল যাবার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল, ভাবল আহমদ মুসা। সিগারেট লাইটার একই সাথে মিনি বন্দুক ও ক্যামেরাও। এই সিগারেট লাইটারের পিনাকৃতির বুলেট ৬ ফিটের মধ্যে যে কোন শিকারকে তাৎক্ষণিক মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারে। পিনাকৃতি বুলেটের মাথায় বিশেষভাবে মাখানো থাকে পটাশিয়াম সাইনাইড।

সিগারেট লাইটার পকেটে পুরল আহমদ মুসা।

কোটের ভেতরের দুই পকেটের একটিতে পেল একটি মানিব্যাগ, অন্যটিতে চামড়ার কভারের মধ্যে পেল একটা 'মাইক্রো ভিসিডি'।'

দারুণ খুশি হলো আহমদ মুসা। এই মাইক্রো ভিসিডিও 'মাইক্রো চিপস'-এর মতই এক একটা মেমোরি সাগর। মাইক্রো ভিসিডিটাও পকেটে পুরল আহমদ মুসা।

মানিব্যাগে পেল ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা আইডি কার্ড এবং এক হাজার ডলারের অনেকগুলো নোট।

টাকা ও আইডি কার্ড সমেতই মানি ব্যাগটা আহমদ মুসা প্রফেসর বেগভিচের পকেটেই আবার রেখে দিল।

আহমদ মুসা গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল।

গোয়েন্দা পুলিশের গাড়ি সিঁড়ি ঘরের সামনে দাঁড়িয়েছিল। আহমদ মুসা বুঝল, বন্দুকধারীদের অনুসরণ করে গোয়েন্দারা বাড়িতে ঢুকে গেছে।

আহমদ মুসা মোবাইল বের করে কল করল জেনারেল মোস্তফা কামালকে। প্রফেসর বেগভিচের পরিণতিসহ এখানকার সব কথা জানিয়ে বলল, 'প্রফেসর বেগভিচ ইসরাইল যাবার জন্যে বেরুচ্ছিলেন। তাঁর পকেটে যা পাওয়া গেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো একটা মাইক্রো ভিসিডি। আমার মনে হয় এটা কাজে লাগতে পারে।'

ওপ্রান্ত থেকে জেনারেল মোস্তফা বলল, 'ধন্যবাদ। আপনি চলে আসুন। আমি গোয়েন্দা অফিসারকে বলে দিচ্ছি তারা কয়েকজন পুলিশকে পাহারায় রেখে

অবশিষ্ট পুলিশ দিয়ে লাশগুলো নিয়ে এখানে চলে আসবে। আর এদিকের খবর ভালো। সাবাতিনিকে নিরাপদে তার দায়িত্ব পালন করতে দেয়া হয়েছে। কিন্তু তার হাত কেঁপে যাবার ফলে 'ট্রান্সমিশন চিপস বুলেট'টা হেলিকপ্টারের পেটে পেষ্ট না হয়ে টপে পেষ্ট হয়েছে।'

'ঠিক আছে, সে সন্দেহের শিকার না হলেই হয়। ট্রিপল জিরোর লোক বা লোকরা উপস্থিত থেকে নিশ্চয় সবকিছু অবজারভ করেছে।' আহমদ মুসা বলল।

'না, সন্দেহ করার মত কিছুই ঘটেনি। হেলিকপ্টার দর্শকের ষ্টাইলে সে রিভলবার কোটের আড়ালে রেখেই গুলী ছুঁড়তে পেরেছে। কিন্তু আমি ভাবছি খালেদ খাকান, প্রফেসর বেগভিচ মারা যাবার পর তার এই নতুন ঠিকানার খোঁজ জানার ব্যাপারে সন্দেহের তীর সাবাতিনির দিকে নিক্ষিপ্ত হতে পারে।' বলল জেনারেল মোস্তফা কামাল।

'তার সম্ভাবনা আছে। আবার নেইও বলা যেতে পারে। গেটে আকস্মিক দেখা হয়েছে, এটাই তাদের মনে হতে পারে। তাছাড়া হেলিকপ্টারে 'ট্রান্সমিশন চিপ' স্থাপনের তার দায়িত্ব সে ঠিক ঠিক পালন করেছে। তবু তার উপর নজর রাখার ব্যবস্থা করুন। সাবাতিনির মাধ্যমে তাদের কাজ যদি শেষ হয়ে থাকে, তাহলে সাবাতিনিকে পথের কাঁটাও ভাবতে পারে।' আহমদ মুসা বলল।

'আপনি ঠিক বলেছেন। আমি এখনি ব্যবস্থা করছি। দু'জন গোয়েন্দা তার উপর সার্বক্ষনিক নজর রাখবে। ঠিক আছে, আপনি চলুন প্লিজ।' বলল জেনারেল মোস্তফা কামাল।

'ওকে। আসছি আমি। আসসালামু আলাইকুম।'

আহমদ মুসা রেখে দিল মোবাইল।

গোয়েন্দা কয়েকজনও এসে পৌঁছল। অফিসার আহমদ মুসার সামনে এসে বলল, ওদের ধরা গেল না স্যার। বাড়িতে একটা সুড়ঙ্গ পথ আছে। সে পথেই ওরা পালিয়েছে। সুড়ঙ্গ পথটা একটা ষ্ট্রিরস সোয়ারেজে গিয়ে মিলেছে। প্রফেসর বেগভিচের খবর কি স্যার ?'

'সে নেই। ধরা পড়ার চাইতে পটাশিয়াম বিষ নেয়া সে বেশি পছন্দ করেছে।' আহমদ মুসা বলল।

‘ও গড! তাহলে আমাদের মিশনটাই ব্যর্থ।‘ বলল গোয়েন্দা অফিসারটি।

‘না, আমাদের মিশন ব্যর্থ হয়নি। শুনুন অফিসার, আপনারা পুলিশের সাথে লাশগুলো নিয়ে আসুন। আমি জেনারেল মোস্তফার ওখানে যাচ্ছি। আপনারা আসুন।‘ আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়াল গেটের দিকে। দেখল, জেনারেল মোস্তফার পাঠানো গাড়িটাও এসে পৌঁছেছে।

আহমদ মুসা গাড়িতে গিয়ে উঠল।

গাড়ি ষ্টার্ট নিল।

গাড়ি তখন বসফরাস ব্রীজের গোড়ায় পৌঁছেছে। মোবাইল বেজে উঠল আহমদ মুসার।

মোবাইল ধরতেই ওপার থেকে জেনারেল মোস্তফা বলল, ‘দুঃসংবাদ খালেদ খাকান, আমাদের লোকরা এই মাত্র খবর দিল যে, সাবাতিনি পাহাড় থেকে পড়ে মাথা ফেটে মারা গেছে।‘

‘ইন্নালিল্লাহি...।‘ আহা, সরল, সোজা, রহস্যপ্রিয় মেয়েটা! আমরা তাকে বাঁচাতে পারলাম না।‘ বলল আহমদ মুসা।

‘স্যরি খালেদ খাকান। ও যে এত তাড়াতাড়ি সন্দেহের শিকার হবে তা বোঝা যায়নি।‘ জেনারেল মোস্তফা কামাল বলল।

‘কিন্তু জেনারেল, সে সন্দেহের শিকার নাকি তার প্রয়োজন ওদের শেষ হয়ে যাওয়ায় ওরা পথ পরিষ্কার করেছে, তা বলা মুস্কিল। আমি আসছি। জেনারেল, সিজলির ‘ওয়েসিস’ বাড়িটায় সার্বক্ষনিক পাহারায় যেন ঘাটতি না হয় দেখবেন প্লিজ।‘

‘সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। ওয়েসিসে যাবার প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ যতগুলো পথ আছে, সবগুলোর উপরে গোপনে চোখ রাখা হয়েছে। ওরা তাদের চোখ এড়াতে পারবে না।‘ বলল জেনারেল মোস্তফা কামাল।

‘ধন্যবাদ জেনারেল। আর কোন কথা ?’ আহমদ মুসা বলল।

‘না, ধন্যবাদ। আসুন।‘

‘ওকে জেনারেল। আসসালামু আলাইকুম।‘ মোবাইল রাখল আহমদ মুসা।

জেনারেল মোস্তফা কামাল তার অফিসে তার চেয়ারে বসতে বসতে বলল, ‘ভিসিডিতে কি আছে তা জানতে সত্যিই আমার তর সইছে না। ভিসিডিটা দিন মি. খালেদ খাকান।‘

টেবিলের এপাশে বসেছিল আহমদ মুসা, জেনারেল তারিক ও প্রধানমন্ত্রীর সিকিউরিটি এডভাইজার ড. মোহাম্মদ আইদিন।

আহমদ মুসা পকেট থেকে ভিসিডিটা বের করে জেনারেল মোস্তফার হাতে দিল।

জেনারেল মোস্তফা আগ্রহের সাথে ভিসিডিটা হাতে নিয়ে কম্পিউটারে সেট করে প্লে অপশনে ক্লিক করে বলল, ‘প্রফেসর বেগভিচ দেশ থেকে বেরুবার সময় ভিসিডিটা পকেটে রেখেছিল, তখন এটা শূন্য নয় নিশ্চয়।‘

কম্পিউটার স্ক্রীন সচল হলো।

মুহূর্তের জন্য ধোঁয়াটে হয়ে উঠল কম্পিউটার স্ক্রীন। একটু পর ধোঁয়া কেটে গিয়ে বেরিয়ে এলো বসফরাস। স্ক্রীনের সেন্ট্রাল পয়েন্টে এসে গেল বসফরাস তীরের রোমেলী দুর্গ।

হঠাৎ আবার ধোঁয়ায় ঢেকে গেল স্ক্রীনটা। এই ধোঁয়ার মধ্যেই যেন একটা সুড়ঙ্গ নেমে এল। সুড়ঙ্গটা গোটা কম্পিউটার স্ক্রীন জুড়ে বিস্তৃত হলো। সুড়ঙ্গটা দ্রুত উপরে উঠে আসতে লাগল, তার সাথে দৃষ্টিটা ছুটল সুড়ঙ্গের বটমের দিকে। উধাও হয়ে গেল সুড়ঙ্গ। ফুটে উঠল একটা কক্ষের দৃশ্য। কক্ষটি নানারকম জটিল কলকব্জা ও কম্পিউটারে ঠাসা।

চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠেছে জেনারেল তাহির তারিকের। চিৎকার করে বলল, ‘এ যে আমাদের প্রধান বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসির ল্যাব। এই ছবি এ সিডিতে কি করে এল!’

‘সর্বনাশ। বাইরের আমরা দু’একজন ছাড়া তো এই ল্যাব আর কেউ দেখেনি। কোন ধরণের ক্যামেরা ভেতরে যাবার প্রশ্নই নেই। এ ছবি উঠল কি করে।‘ বলল জেনারেল মোস্তফা কামাল।

আহমদ মুসার চোখে বিস্ময় নয়, উদ্বেগ ফুটে উঠেছে। তার স্থির দৃষ্টি ছিল ছবির এংগেলের দিকে।

কক্ষের দৃশ্যটা স্থির ছিল না। একেকটা যন্ত্র-যন্ত্রাংশের উপর একেক সময় স্থির হচ্ছিল। মূল ফোকাসের সময় যন্ত্র-যন্ত্রাংশের ছবিগুলো এতই বড় হচ্ছিল যে, সূচের ডগা পরিমাণ বিন্দুও মার্বেলের মত বড় মনে হচ্ছিল।

হঠাৎ দৃশ্যপট পাল্টে গেল। উবে গেল ল্যাব-কক্ষের দৃশ্য। স্ক্রীনে এল বিরাট একটা হলঘরের ছবি। ঘরটা ভর্তি নানারকম, নানা আকারের দুর্বোধ্য সব যন্ত্রপাতি, ক্রুজ মিসাইল ধরণের ও রকেটলাঞ্চার আকারের দ্রব্যে ভর্তি। হলঘরটা যেমন একটা ক্রিকেট মাঠের মত বিস্তৃত, তেমনি জাম্বোজেটের মত উঁচু।

এই ঘরের দৃশ্যের উপর চোখ পড়তেই জেনারেল তাহির তারিক এবং জেনারেল মোস্তফা কামাল দু’জনেই এক সাথে চিৎকার করে উঠল, ‘সর্বনাশ, কি দেখছি আমরা। এযে আমাদের আইআরটির টপ সিক্রেট রিসার্চ-ট্রেজার এবং গ্রাউন্ডের দৃশ্য!’

আর কারো মুখ থেকেই কোন কথা উচ্চারিত হলো না। সকলের পলকহীন দৃষ্টি কম্পিউটার স্ক্রীনে ফুটে উঠা দৃশ্যের দিকে।

কম্পিউটার স্ক্রীনে ছবির ফোকাস একেকটা যন্ত্র বা আইটেমের উপর গিয়ে পড়ছে। বিস্ময়ের ব্যাপার যন্ত্র বা আইটেমের সূক্ষ্ম খাঁজসহ একমাত্র বটম ছাড়া সব দিকের দৃশ্যই পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। এমন মাল্টি ডাইমেনশনাল ছবি কি করে সম্ভব! এ প্রশ্নও বিস্ময় বিস্ফোরিত চোখগুলোতে।

ছবির ফোকাস এক এক করে সবগুলো জটিল যন্ত্রপাতি, ক্রুজ মিসাইল ও রকেটলাঞ্চার ধরণের জিনিস এবং ছোট-খাট সব দ্রব্যাদির উপর দিয়ে ঘুরল প্রায় স্থির গতিতে।

আধা ঘন্টা সময় তখন পার হয়ে গেছে।

হঠাৎই ঘরের দৃশ্য উবে গেল।

অন্ধকার নেমে এল স্ক্রীনে।

ভিডিও'র দৃশ্য স্ক্রীন থেকে চলে গেলেও দর্শকদের চোখগুলো যেন আঠার মত লেগে আছে স্ক্রীনে।

অনেকক্ষণ কথা বলল না কেউ। জেনারেল মোস্তফা কামাল, জেনারেল তাহির তারিক, প্রধানমন্ত্রীর সিকিউরিটি এডভাইজার ড. মোহাম্মদ আইদিনদের চোখে-মুখে ভয় ও উদ্বেগের চিহ্ন। আহমদ মুসার মুখে কিন্তু স্বস্তির চিহ্ন। আইআরটির তথ্যাদি সম্বলিত মহাগুরুত্বপুর্ণ এ ভিডিও চিত্র বাইরে পাচারের উদ্যেগ আল্লাহ্ ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

জমাট নিরবতার মধ্যে প্রথম কথা বলে উঠল জেনারেল মোস্তফা কামাল। বলল, 'আল্লাহ্ রক্ষা করুন, আমাদের আইআরটি'র কিছুই তো ওদের অজানা নেই। কিন্তু এ ছবি তারা তুলল কি করে। ভেতরে ক্যামেরা প্রবেশ করার ব্যাপারটা অসম্ভব।'

'ঠিক বলেছেন জেনারেল মোস্তফা। এমন ছবি তোলা অসম্ভব। যাদের ল্যাব, টেষ্টিং গ্রাউন্ড ও রিসার্চ ট্রেজারে প্রবেশের অনুমতি আছে, তারা ছাড়া ঐ সব স্থানে প্রবেশ করা যে কোন কারও পক্ষে অসম্ভব।'

'ঠিক বলেছেন জেনারেল মোস্তফা। এমন ছবি তোলা অসম্ভব। যাদের ল্যাব, টেষ্টিং গ্রাউন্ড ও রিসার্চ ট্রেজারে প্রবেশের অনুমতি আছে, তারা ছাড়া ঐ সব স্থানে প্রবেশ করা যে কোন কারও পক্ষে অসম্ভব। আর যাদের প্রবেশ করার অনুমতি আছে, তাদের বিশ্বস্ততা প্রশ্নাতীত। তাহলে এটা ঘটল কি করে ?' বলল জেনারেল তাহির তারিক।

'আমার মনে হয় উপগ্রহের বিশেষ ক্যামেরা থেকে এসব ছবি উঠেছে। উপগ্রহ থেকে ভু-অভ্যন্তরের বিভিন্ন রকমের ছবি তোলা এখন একটা সাধারণ ব্যাপার। আইআরটি'র গোপন তথ্য যোগাড়ে তারা ভূ-উপগ্রহ ব্যবহার করেছে দেখা যাচ্ছে।' প্রধানমন্ত্রীর সিকিউরিটি এডভাইজার ড. মোহাম্মদ আইদিন বলল।

আহমদ মুসা চেয়ারে সোজা হয়ে বসল। বলল, 'ভিডিও চিত্র আকাশ থেকে কিংবা উপগ্রহের ক্যামেরা থেকে তোলা নয়। ছবির ফোকাসগুলো উপর থেকে নয়, বিভিন্ন কৌণিক এঙ্গেলে এসেছে। এমন এংগেল ভূ-পৃষ্ঠের বাইরে হতে

পারে না। কোন পাহাড়, বা ব্রীজের উপর থেকেও তোলা হতে পারে ভিডিও চিত্রগুলো।‘

বিস্মিত জেনারেল মোস্তফা কামাল, আপনার ব্যাখ্যাই বেশি যুক্তিসংগত। কিন্তু এ ধরণের ক্যামেরা কি আছে ?’

‘মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ষ্ট্রাটেজিক রিসার্চ সম্প্রতি এ ধরণের ক্যামেরা তৈরি করেছে। ভূ-পৃষ্ঠ থেকেই এ ক্যামেরা ভূ-অভ্যন্তরের মাল্টি ডাইমেনশনাল ছবি তুলতে পারে। এ ক্যামেরার ফোকাস কৌণিকভাবে ভূগর্ভে প্রবেশ করলেও টার্গেটের উপর ফোকাসের ক্ষেত্রে কখনও তা ভার্টিকাল এবং বিভিন্ন উচ্চতায় সমান্তরাল হতে পারে। তার ফলে টার্গেটের একমাত্র তলদেশ ছাড়া সব পাশের সব এংগেলের ছবি তুলতে পারে। আমার মনে হচ্ছে সর্বাধুনিক এ ক্যামেরাই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে।‘ বলল আহমদ মুসা।

‘কিন্তু আবিষ্কৃত হলেও এ ক্যামেরা তো মার্কেটে আসেনি। উইপনসের সবগুলো লেটেষ্ট মার্কেট রিপোর্ট আমার কাছে আছে। তাহলে ষড়যন্ত্রকারীরা এ ক্যামেরা পেল কি করে বুঝতে পারছি না।‘ জেনারেল মোস্তফা কামাল বলল।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘ষড়যন্ত্রকারীরা ও মার্কিন ষ্ট্রাটেজিক রিসার্চ ল্যাবের মালিকরা যদি কাছাকাছি হয়, তাহলে তো ঐ ক্যামেরা কেনার জন্য মার্কেটের প্রয়োজন হয় না!’

‘আপনি কি তাই মনে করেন মি. খালেদ খাকান ?’ জিজ্ঞাসা ড. মোহাম্মদ আইদিনের।

‘এটা মনে করার কথা নয়, চোখেই দেখা যাচ্ছে ড. আইদিন। এই ভিডিও ক্যাসেট নিয়ে প্রফেসর বেগভিচ যাচ্ছিলেন ইসরাইলে। ইসরাইল আর মার্কিন বর্তমান শাসকদের একটি মহলের ষ্ট্রাটেজিক স্বার্থ একই। অতএব মার্কিন ষ্ট্রাটেজিক ল্যাব থেকে ইসরাইল ষ্ট্রাটেজিক ক্যামেরা পেতেই পারে। আর ইসরাইল ও ষড়যন্ত্রকারী ‘থ্রি জিরো’ হতে পারে একই স্বার্থের দুই নাম।‘ আহমদ মুসা বলল।

‘সর্বনাশ, আমাদের আইআরটি তাহলে এক মহাষড়যন্ত্রের মুখে। কিন্তু একটা কথা, ইসরাইলের সাথে আমাদের তুরস্কের সম্পর্ক তো খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ।

তার পরেও কি তারা আমাদের সাথে এতবড় একটা ষড়যন্ত্রের কাজ করতে পারে ?' বলল ড. আইদিনই।

হাসল আহমদ মুসা। কিন্তু আহমদ মুসা কিছু বলার আগেই উত্তরটা এল জেনারেল তাহিরের কাছ থেকে। বলল, 'তুরস্ককে নিজের স্বার্থে সে বন্ধু মনে করে এবং ইসরাইল নিজের স্বার্থেই ওআইসির গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইআরটিকে তুরস্কে স্থান দেয়ার সিদ্ধান্তকে বৈরিতার চোখে দেখছে।'

ড. আইদিন তাকাল জেনারেল তাহিরের দিকে। বলল, 'ঠিক বলেছেন। এটাই কারণ। ওরা তুরস্কের বন্ধু, কিন্তু সেটা যখন ওদের জন্য লাভজনক।'

একটু থামল ড. আইদিন। বলল সংগে সংগেই আবার, 'ওদের ক্যামেরা আমাদের গবেষণাগারের সর্বত্র পৌছেছে। আমাদের অত্যন্ত স্পর্শকাতর গবেষণাগার আইআরটির কোন গোপনীয়তা আর অবশিষ্ট নেই। এখন আমাদের করণীয় কি ?'

'ভিসিডিটা এখনও ওদের হাতে পৌঁছেনি। ভিসিডিটা আগে যদি কোনওভাবে পাঠিয়ে দিত, তবে আজ এতটা ঝুঁকি নিয়ে প্রফেসর বেগভিচ এটা সাথে নিত না। তবে ভিসিডির কপি আরও কারো কাছে থাকতে পারে, তবে নাও থাকতে পারে। হতে পারে, প্রফেসর বেগভিচ নিজেই ব্রীজ থেকে ছবি নিয়েছিলেন আইআরটি গবেষনাগারের। তিনি ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচিত প্রফেসর বলে তার মাধ্যমে ছবি নেয়াই ছিল নিরাপদ। আমার মনে হয়, সেটাই করা হয়েছে। মনে হয় ফাতিহ পাশা পার্ক সংলগ্ন ঐ বাড়িটা এবং প্রফেসরের বিস্ববিদ্যালয়ের কোয়ার্টার খোঁজ করলে ক্যামেরার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। আর...।'

আহমদ মুসা কথা শেষ করতে পারলো না। কথার মাঝখানেই বলে উঠল জেনারেল মোস্তফা কামাল, 'ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ, আমি এখনই নির্দেশ দিচ্ছি অনুসন্ধান করে দেখার জন্যে।'

'ধন্যবাদ জেনারেল। আমি যে কথা বলছিলাম। আমাদের করণীয় বিষয় নির্ভর করে 'থ্রি জিরো' কি করতে চায় তার উপর। আইআরটি গবেষণাগারের যে বিস্তারিত ছবি তারা সংগ্রহ করেছে, তা তারা তাদের অনেক কাজেই লাগাতে পারে। তবে তারা আইআরটির থিয়োরিটিক্যাল গবেষণা ও প্র্যাকটিক্যাল অর্জন

সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চায়। এই জানার জন্যে তারা কি করছে, এটাই আমাদের দেখার বিষয়, সেই সাথে প্রতিরোধ-প্রতিকারের বিষয়ও।' আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ খালেদ খাকান। এটাই এখন প্রধান বিষয়।'

একটু থামল জেনারেল মোস্তফা কামাল। বলল আবার, 'আমাকে উঠতে হচ্ছে। খালেদ খাকান যা বলেছেন, সে বিষয়ে এখনি কয়েকটা মেসেজ পাঠাতে হবে। আসছি আমি।'

জেনারেল মোস্তফা কামাল উঠতেই ড. আইদিন বলল, 'আমাকে উঠতে হবে এখন। বিষয়টি আমি প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টকে এখনি জানাতে চাই।'

ড. আইদিনও উঠে দাঁড়াল।

সালাম দিয়ে সে পা বাড়াল বাইরের দিকে।

বেরুতে গিয়ে জেনারেল মোস্তফা কামাল বলল, 'মি. খালেদ খাকান, আপনারা বসুন। আরও কিছু কথা আছে। আপনাদের চা দিতে বলছি।'

বেরিয়ে গেল জেনারেল মোস্তফা।

আহমদ মুসা চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বলল, 'থ্রি জিরোর নিকটে যাবার একটা ছাড়া সব পথ আপাতত হাতছাড়া। এখন...।'

'একটা কোনটা ?' আহমদ মুসার কথার মাঝখানে বলে উঠল জেনারেল তাহির তারিক।

'সিজলিতে বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসির নতুন বাড়ি। এই বাড়িটা এখন থ্রি জিরোর টার্গেট। ড. আন্দালুসিকে ঘিরে তাদের যে টার্গেট, তা অর্জন করতে তাদের ঐ বাড়িতে আসতে হবে।' আহমদ মুসা বলল।

'এই কনট্যাক্ট পয়েন্ট গুরুত্বপূর্ণও।' বলল জেনারেল তাহির তারিক।

'হ্যাঁ, জেনারেল তারিক। বিজ্ঞানী আন্দালুসিই তাদের আসল উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করতে পারে।' আহমদ মুসা বলল।

'হ্যাঁ, মি. খালেদ খাকান, আপনি ঠিক বলেছেন।' বলল জেনারেল তারিক।

‘বাড়িটার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নতুন করে রিভিও করা দরকার।‘ আহমদ মুসা বলল।

‘ঠিক বলেছেন। আজ সকালেও আমি ও জেনারেল মোস্তফা কামাল সেখানে গিয়েছিলাম। নিরাপত্তার বিষয়টা আমরা পর্যালোচনা করেছি। কুক, পরিচারক-পরিচারিকা ও বয়-বেয়ারার ছদ্মবেশে মোট ৮ জন মহিলা-পুরুষ গোয়েন্দা বাড়ির ভেতরে নিয়োজিত আছেন। এছাড়া বাড়ির সকল এপ্রোস রোডসহ চারদিকে সার্বক্ষণিক পাহারার ব্যবস্থা নতুন করে নিশ্চিত করা হয়েছে।‘ বলল জেনারেল তাহির তারিক।

‘ধন্যবাদ। প্রশ্ন হলো, ওরা কোন পথে অগ্রসর হতে চায়। উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে তারা কোন কৌশল গ্রহণ করতে চাচ্ছে।‘ আহমদ মুসা বলল।

‘আপনি আগেই এই উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন। এটাই এখনকার বড় প্রশ্ন। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না এখন তাদের মতলবটা কি। আপনি নিশ্চয় কিছু ধারণা করছেন ?’ জেনারেল তাহির তারিক বলল।

‘ওদের সামনে মাত্র একটা অপশন নিশ্চয় নেই। তবে তাদের টার্গেট যে ‘সোর্ড’-এর ফর্মূলা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ফর্মুলার জন্যেই তাদের প্রয়োজন বিজ্ঞানীকে। কিন্তু সোর্ড-এর ফর্মুলার জন্য তারা এতটা মরিয়া কেন ?’ আহমদ মুসা বলল।

‘কারণ, তাদের উড়ন্ত ধরণের সকল অফেনসিভ অস্ত্র অচল হয়ে পড়ছে। এতে করে তাদের দাঁত ও থাবা ভোতা হয়ে পড়বে।‘ বলল জেনারেল তারিক।

‘কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা। ওদের দাঁত বা থাবা রক্ষা বা অস্ত্রগুলোকে সচল রাখাই একমাত্র টার্গেট হলে ওরা খুব সহজেই বিজ্ঞানীদের সমেত আইআরটিকে নিশ্চিহ্ন করতে পারে। ওদের উপগ্রহের নিস্পলক চোখ আইআরটির উপর নিবদ্ধ আছে। ওদের হাতে এমন অস্ত্র আছে যা রোমেলী দূর্গের ঐ অংশসহ ১০০ ফুট গভীর পর্যন্ত দুনিয়া থেকে মুছে ফেলতে পারে। তা না করে ফর্মুলা হাত করার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে কেন ? নিছক আত্মরক্ষা নয়, ফর্মুলাই ওদের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ। এটা শুধু ‘সোর্ড’-এর টেকনোলজি হাত করার জন্যে কিনা ? ওরা তো এমনিতেই নিরাপদ। রকেট ও রকেট জাতীয় অস্ত্র ধ্বংসের

প্রতিরক্ষা শিল্ড (ষ্ট্রাটেজিক ডিফেন্স ইনিশিয়েটিভ-SDI) তো আছেই! তাহলে সোর্ড-এর ফর্মুলার জন্য এতটা পাগল হয়ে উঠবে কেন ? আমি মনে করি এ প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ।‘ থামল আহমদ মুসা।

‘মি. আহমদ মুসা, আপনি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন। এভাবে আমি বিষয়টাকে দেখিনি। ধন্যবাদ আহমদ মুসা। কিন্তু কি হতে পারে বিষয়টা ?’ বলল জেনারেল তাহির তারিক।

আহমদ মুসার চোখে-মুখে ভাবনার চিহ্ন।

এ সময় চা-নাস্তার ট্রলি ঠেলে ঘরে প্রবেশ করল বেয়ারা।

ট্রলিতে দুই কাপ চা, দুই হাফ প্লেটে কাবাব সাজানো। তার পাশে সসের বাটি। যেন কাবাব দিয়ে ধোঁয়া উঠছে, এমন মনে হচ্ছে দেখতে।

জেনারেল তাহির সাগ্রহে বলল, ‘যাক তুমি আসতে বেশ দেরি করলেও ভালো নাস্তা এনেছো হে।‘ জেনারেল তাহিরের লক্ষ্য নাস্তার দিকে।

কিন্তু আহমদ মুসার লক্ষ্য বেয়ারার পায়ের দিকে। বেয়ারার পায়ে পুলিশের কমব্যাট বুট দেখে বিস্মিত হলো আহমদ মুসা। তুরস্কে পুলিশ ও অফিসের বেয়ারারাও কি ওদের লোক! তারা তো কমব্যাট বুট পরে না এবং তারা ইউনিফরম পরে বটে, কিন্তু কমব্যাট ইউনিফরম নয়! বেয়ারার পরনে ননকমব্যাট ইউনিফরম ঠিক আছে, কিন্তু ইউনিফরমটা তার দেহের চেয়ে অনেক বড়। বুটের মত এটাও বিদঘুটে দেখাচ্ছে।

হঠাৎ মনে একটা চিন্তার উদয় হওয়ায় চমকে উঠল আহমদ মুসা।

চেয়ারে সোজা হলো তার দেহ। তীক্ষ্ণ হলো তার দৃষ্টি।

বেয়ারা টেবিলে চা, নাস্তা সাজিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। স্যালুট দিয়ে জেনারেল তাহিরকে লক্ষ্য করে বলল, ‘জেনারেল স্যার ভিসিডিটা আমাকে এখুনি নিয়ে যেতে বলল। ড. আইদিনকে ওটা দেবেন তিনি।‘

জেনারেল তাহির কাবাবের প্লেটটা টেনে নিচ্ছিল। বলল, ‘ও, প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্টের সাথে তিনি বোধ হয় কথা বলেছেন। ঠিক আছে বেয়ারা, ওটা বের করে নাও।‘

জেনারেল তাহির তারিকের নির্দেশ দেবার আগেই বলা যায় বেয়ারা হাঁটা শুরু করেছিল।

আহমদ মুসার চোখে-মুখে তখন চিন্তার ঝড়। হঠাৎ যেন তার মুখ ফুঁড়ে বেরিয়ে এল, 'দাঁড়াও বেয়ারা, আমি জেনারেল মোস্তফার সাথে কথা বলে নিই।'

একথা বলার সাথে সাথেই পকেটে হাত পুরেছে আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার নির্দেশ শুনেই বেয়ারা বোঁ করে এদিকে ঘুরল। সেই সাথে তার হাতে উঠে এসেছে রিভলবার।

আহমদ মুসার হাত পকেটে ঢুকলেও তার চোখ দু'টি আঠার মত লেগেছিল বেয়ারার উপর।

বেয়ারাকে পকেট থেকে রিভলবার বের করে ঘুরতে দেখে মোবাইল ছেড়ে রিভলবার নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল আহমদ মুসার হাত।

আর রিভলবার সমেত হাত বেরিয়ে আসার সাথে সাথে আহমদ মুসা টেবিল-লেবেলের উপরে বেড়ে থাকা তার দেহকে টেবিলের সমান্তরালে বাঁদিকে নিয়েছিল। তার রিভলবার থেকে গুলীও বেরিয়ে গিয়েছিল প্রায় সংগে সংগেই।

বেয়ারা ও আহমদ মুসা দু'জনের রিভলবার থেকে প্রায় একই সময়ে গুলী বেরিয়ে ছিল।

বেয়ারার গুলী আহমদ মুসার ডান কাঁধের বাহু সন্ধিতে একটা ছোবল মেরে কিছু গোসত তুলে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। দেহটা তার বাঁ দিকে সরে না গেলে বুকটা এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যেত বেয়ারার গুলীতে।

আহমদ মুসার মত সাবধান হতে পারেনি বেয়ারা। তার ফলেই আহমদ মুসার নিক্ষিপ্ত বুলেট বেয়ারার বাম বুক একেবারে বিধ্বস্ত করে দেয়।

বেয়ারার দেহ একবার টলে উঠে আছাড় খেয়ে পড়ে গেল টেবিলের পাশে।

আহমদ মুসার দেহটা সোজা হলো চেয়ারে।

বিস্ময়-বিস্ফোরিত চোখ দু'টি জেনারেল তাহিরের। মুহূর্তের জন্যে বাকহারা হয়ে গিয়েছিল সে। আহমদ মুসার গুলীটা ছিল জবাবী বা

আত্মরক্ষামূলক, এটা বোঝা গেছে। কিন্তু বেয়ারা আহমদ মুসার কথা শুনে ক্ষেপে উঠে আহমদ মুসাকে গুলী করে বসল কেন ? তাহলে কি ...!

জেনারেল তাহিরের চিন্তায় ছেদ নামল।

ছুটে এসে ঘরে প্রবেশ করল জেনারেল মোস্তফা কামাল এবং তার সাথে কয়েকজন পুলিশ।

জেনারেল মোস্তফা কামালের চোখ প্রথমেই পড়ল বেয়ারার রক্তাক্ত লাশের উপর। তারপর দেখতে পেল আহমদ মুসাকে বাঁ হাত দিয়ে ডান বাহুসন্ধি চেপে ধরে বসে থাকতে। আহমদ মুসার হাত ছাপিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে আহত স্থান থেকে।

জেনারেল মোস্তফার চোখ গিয়ে পড়ল জেনারেল তাহির তারিকের উপর।

জেনারেল তাহির তারিক ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে।

সে দ্রুত উঠে দাঁড়াল। দ্রুত, সংক্ষেপে সব কথা বলে শেষ করল এই বলে যে, মি. খালেদ খাকান তার দেহটা ঠিক সময়ে সরিয়ে নিতে না পারলে বেয়ারার আগে তিনি লাশ হতেন। আর যদি ব্যাপারটা আঁচ করতে না পারতেন এবং অবিশ্বাস্য দ্রুততার সাথে মোবাইলের বদলে রিভলবার বের না করতেন, তাহলে আগে উনি, তারপর আমাকেও লাশ হতে হতো এবং ভিসিডিটা চলে বেয়ারার হাতে।‘

বিস্ময় বিস্ফোরিত হয়ে উঠেছে জেনারেল মোস্তফা কামালের দুই চোখ।

সে দ্রুত ছুটে এল আহমদ মুসার কাছে, ‘মি. খালেদ খাকান, আঘাতটা কেমন ? বুলেট ভেতরে আছে কিনা ? চলুন, পাশেই আমাদের পুলিশ হাসপাতালের ভিআইপি উইং।‘

আহমদ মুসাকে দু’হাতে জড়িয়ে ধরে তুলতে যাচ্ছিল জেনারেল মোস্তফা কামাল।

একজন পুলিশ বলল, ‘স্যার, আমরা ষ্ট্রেচার নিয়ে আসছি।‘ বলে দৌড় দিল পুলিশটি।

আহমদ মুসা নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করে বলল, ‘আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হবেন না। আমার আঘাত তেমন নয়। গুলীটা বেরিয়ে গেছে। আপনি বরং

দেখুন আসল বেয়ারা কোথায় ? মনে হচ্ছে তাকে কোথাও আটকে রেখে বেয়ারার পোশাকধারী এই লোক এসেছিল ভিসিডিটা হাত করতে। থ্রি-জিরোর এজেন্ট জাতীয় কেউ এ হতে পারে।'

বেয়ারাকে পর্যবেক্ষন করছিল যে পুলিশ অফিসারটি, সে বলে উঠল, 'স্যার এ আমাদের পুলিশের র‍্যাপিড কমব্যাট ব্যাটেলিয়নের লোক। নাম জোসেফ সেদ্দিক। সিকিউরিটি হেডকোয়ার্টারে আজ তার কোন ডিউটি ছিল না।'

'ধন্যবাদ অফিসার। তুমি যাও, এর ব্যাপারে সব তথ্য আমরা চাই। এর সংগী-সাথীদের হদিস আমাদের প্রয়োজন। এর ব্যাপারটা জানাজানির আগেই এ কাজ করতে হবে।'

কথা শেষ করে অন্য একজন অফিসারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'অপারেশনের ফুল ব্যবস্থাসহ ডাক্তারকে তুমি আসতে বল হাসপাতাল থেকে। আর লাশ নিয়ে যা করা দরকার তার ব্যবস্থা কর। ঘরটা পরিস্কারের ব্যবস্থা কর।'

পুলিশের দু'জন অফিসার বেরিয়ে গেল।

দুই-তিন মিনিটের মধ্যেই ডাক্তাররা এসে গেল। সাথে একটা ট্রলি। ট্রলিটাই একটা অপারেশন বেডে পরিণত হলো। বেডের নিচের লেয়ারে অপারেশনের সব সরঞ্জাম।

ডাক্তারদের সব নির্দেশ দিয়ে আহমদ মুসাকে বলল, 'মি. খালেদ খাকান, ডাক্তাররা তাদের কাজ সারুন। আমি আসছি। জেনারেল তাহির এখানে থাকছেন।'

বেরিয়ে গেল জেনারেল মোস্তফা কামাল।

পাকা দশ মিনিট পর ফিরে এল জেনারেল মোস্তফা কামাল। তখন আহমদ মুসার ব্যান্ডেজ বাঁধা শেষ।

আহমদ মুসা হাসপাতালের ঢিলাঢালা পোশাক পরে সোফায় এসে বসেছে।

ব্যাগ-ব্যাগেজ নিয়ে ডাক্তাররাও বেরিয়ে গেল।

জেনারেল মোস্তফা কামাল এসে তার চেয়ারে বসল। তার মুখ মলিন। বলল, 'প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে উদ্বিগ্ন। তারা

বলছেন, এই ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো ছাড়া আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি হবে না। তারা ঠিকই বলেছেন। তাদের ভিসিডিটা আমরা হাত করার কয়েক ঘন্টার মধ্যে সেটা উদ্ধারের জন্যে আমাদের সিকিউরিটি হেডকোয়ার্টারে ওরা অভিযান চালাতে পারল কি করে, এর কোন জবাব নেই। মি. খালেদ খাকানের অস্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তার কারণে আপনারা বেঁচে গেছেন, ভিসিডিটা যে রক্ষা পেয়েছে সেটা ভিন্ন খাত। তাদের অভিযানকে সফলই বলতে হবে। অনেক প্রশ্ন সামনে এসে গেছে। ভিসিডিটা যে এখানে, সেটা তারা জানলো কি করে ? জানার পর উদ্ধার অভিযানের পরিকল্পনা এত দ্রুত কিভাবে হলো এবং তার বাস্তবায়নই বা এত দ্রুত, এত নিখুঁতভাবে কেমন করে হতে পারল ?’

থামল জেনারেল মোস্তফা। তার কন্ঠে হতাশার সুর।

‘জেনারেল মোস্তফা’, বলতে শুরু করল আহমদ মুসা, ‘তারা এত দ্রুত জানতে পারা এবং সফল অভিযান করায় বিস্ময়ের কিছু নেই। আমি নিশ্চিত নিরাপত্তা ব্যবস্থার সর্বত্র তাদের লোক আছে। এরা ঠিক আয়েশা আজীমার মত। এরা তুর্কি প্রজাতন্ত্রের চাকরি করে, টাকা নেয়, কিন্তু আনুগত্য করে বিশেষ ষড়যন্ত্রের। নির্দেশ পেলেই এরা সক্রিয় হয়ে উঠে। বর্তমান ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। আর ...।‘

আহমদ মুসার কথার মাঝখানেই জেনারেল মোস্তফা বলে উঠল, ‘আপনি ঠিক বলেছেন মি. খালেদ খাকান। ঘটনাটা ঠিক আয়েশা আজীমার মতই। বেয়ারাটা আসলে একজন পুলিশ অফিসার। আসল নাম তার জোসেফ সেদ্দিক নয়, তার প্রকৃত নাম ডেভিড বেনইয়ামিন। তুরস্কের এক ইহুদী পরিবারে জন্ম। স্কুল ফাইনালের আগে নাম পাল্টিয়ে খৃষ্টান নাম জোসেফ সেদ্দিক গ্রহণ করে। ইতিমধ্যেই আমাদের র‌্যাপিড কমব্যাট ব্যাটেলিয়নে এ ধরণের তিনটি নাম পাওয়া গেছে। তাদের কাউকেই এখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমার এখন মনে হচ্ছে, এরা সকলেই আয়েশা আজীমার মত ইচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে ‘থ্রি জিরো’র পক্ষে কাজ করে। বিষয়টা আমি উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনতে চাই।‘

‘কিন্তু জেনারেল মোস্তফা, অপরাধকে জাতিগত কালার দেয়া ঠিক হবে না। পৃথিবীর বহু দেশের বহু ঘটনায় আমি ইহুদীদের দেশপ্রেমিক দেখেছি,

ইহুদীদের নাম ভাঙ্গিয়ে গোষ্ঠী বিশেষের ষড়যন্ত্রের ঘোর বিরোধী দেখেছি তাদেরকে। তুরস্কেও এমন লোক প্রচুর আছে। যেমন ইস্তাম্বুলের ইয়াসার পরিবার।' বলল আহমদ মুসা।

'ধন্যবাদ খালেদ খাকান। আমিও এমনটাই মনে করি। তবু আমার এখন মনে হচ্ছে, তাদের উপর চোখ রাখা দরকার। ভালো-মন্দের পার্থক্যটা হওয়া দরকার। অনেক ভালো লোকও জাতিগত ক্রিমিনালদের চাপে, ভয়ে অপরাধে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হচ্ছে। যদি চোখ রাখা হয়, তাহলে এই ভালো লোকদের সাহায্য করা, রক্ষা করা যাবে।' জেনারেল মোস্তফা কামাল বলল।

'হ্যাঁ, এই সতর্কতা প্রয়োজন। কিন্তু একজনও যাতে অহেতুক সন্দেহের শিকার না হয়, তা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে।' আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ মি. খালেদ খাকান। এদিকে তো নজর রাখতেই হবে। যাক এ প্রসংগ, এখন বলুন, আমরা আমাদের আসল কাজে কিভাবে এগোব। ওরা দেখা যাচ্ছে সাংঘাতিক একশনে।' বলল জেনারেল মোস্তফা।

'ওরা একশনে থাকলেই আমাদের লাভ। আর ওদের এখন একশনে থাকতেই হবে। টার্গেটে পৌঁছতে ওরা এখন আর বেশি সময় নিতে চায় না। আমার মনে হয় ওদের সবটা মনোযোগ বিজ্ঞানীদের উপর। সুতরাং সিজলি এলাকায় বিজ্ঞানীদের বাড়ি এখন আমাদেরও মনোযোগের কেন্দ্র।' আহমদ মুসা বলল।

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা বলল, 'আমি এখন উঠতে চাই।'

'অবশ্যই মি. খালেদ খাকান। আপনার রেষ্ট প্রয়োজন। আপনি কোথায় যেতে চান, রোমেলী দুর্গে, না গোল্ড রিজর্টে ?'

'প্রথমে গোল্ড রিজর্টে।' বলল আহমদ মুসা।

'হেড কোয়ার্টারের লনে আপনার জন্যে হেলিকপ্টার অপেক্ষা করছে। ওরা রেডি।' বলল জেনারেল মোস্তফা।

'হেলিকপ্টার কেন ?' আহমদ মুসা বলল।

'প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর এটাই নির্দেশ। আপনাকে নিয়ে একের পর এক ঘটনা ঘটেই চলেছে। এই হেলিকপ্টার আপনার ডিসপোজালে থাকবে। আপনি স্বাধীনভাবে একে ব্যবহার করবেন।' জেনারেল মোস্তফা বলল।

‘ধন্যবাদ। তবে আকাশ নয়, মাটিকেই আমি পছন্দ করি। শত্রুরা মাটিতে তাই আমাকেও মাটিতেই থাকতে হবে।‘ বলল আহমদ মুসা।

‘বিষয়টা আপনার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। কখন কি ব্যবহার করবেন, সেটা আপনিই দেখবেন। তবে তারা বলেছেন, আপনার নিরাপত্তা আমাদের নাম্বার ওয়ান প্রায়োরিটি।’ জেনারেল মোস্তফা কামাল বলল।

‘ধন্যবাদ জেনারেল মোস্তফা।’ আহমদ মুসা বলল।

‘এখন কিন্তু আপনাকে হেলিকপ্টারেই যেতে হবে। আপনি এখানে আছেন, এখান থেকে বেরুবেন, এটা শত্রুরা সবাই জানে। কোন ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না।’ বলল জেনারেল মোস্তফা।

‘ধন্যবাদ, আমি বুঝেছি আপনাদের কথা।’ বলে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

‘একটা কথা মনে পড়ে গেছে মি. খালেদ খাকান। খুব আগ্রহ আমার তা জানার। আপনি কি করে বুঝলেন যে বেয়ারা নকল?’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘প্রথমত তার পায়ে ছিল পুলিশের কমব্যাট বুট, যা বেয়ারারা পরে না। দ্বিতীয় হলো, বেয়ারার ইউনিফরম তাঁর গয়ে ফিট ছিল না। সংগে সংগেই আমার মনে এ কথা এসেছিল যে, সে নকল বেয়ারা। আসল বেয়ারাকে সে কোথাও আটকে রেখে এসেছে। আর তার সাথে আমার মনে হয়েছিল, তার টার্গেট ভিসিডি।’

‘ধন্যবাদ খালেক খাকান। আল্লাহ আপনাকে আরও বেশি বেশি সাহায্য করুন। আমার মনে হয় আল্লাহ আপনার মনে ইলহাম করেন।’ বলল জেনারেল তাহির।

‘অসহায় বান্দার বিপদে আল্লাহ বান্দার মনে বাণী পাঠান। বান্দার প্রতি আল্লাহর ‘রহমান’ নামের এ এক অসীম দয়া।’ আহমদ মুসা বলল।

‘সব মানুষই কি আল্লাহর এ বাণী শুনতে পান?’ জিজ্ঞাসা জেনারেল তাহিরের।

‘অবশ্যই পান। অনেক সময় এটা বিবেকের রায় আকারে আসে। আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদরা বরং আরও অগ্রসর হয়ে বলেছেন, মহান

লেখকদের যত মহৎ লেখা এবং বিজ্ঞানের যত আবিষ্কার, সবই স্রষ্টার দান। স্রষ্টার কাছ থেকে এটা প্রথমে মানুষের অবচেতন মনে আসে। তারপর অবচেতন থেকে চেতনায়।' আহমদ মুসা বলল।

'আধুনিক চিন্তাবিদরা সত্যিই এমন কথা বলতে পেরেছেন?' বলল জেনারেল মোস্তফা। তার চোখে মুখে বিস্ময়।

'হ্যাঁ, জেনারেল মোস্তফা। আর্নল্ড টয়েনবি ও দাইমাকু ইকেদার মত আধুনিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠ বিবেকরাই এ কথা বলেছেন।' আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ খালেদ খাকান। আরও একটা বড় বিষয়ে আপনি আমার শিক্ষক হলেন।' বলল জেনারেল তাহির।

'আমারও।' বলল জেনারেল মোস্তফা।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

তার সাথে উঠে দাঁড়াল দুই জেনারেলও। বলল, 'চলুন, আমরা আপনাকে হেলিকপ্টারে দিয়ে আসি।'

সবাই হাঁটতে লাগল ঘরের দরজার দিকে।

# ৪

অল্পক্ষণ  হলো মিটিং শুরু হয়েছে। একটা বড় টেবিল ঘিরে চারজন মানুষ।

প্রধান বা সভাপতির আসনে বসেছে ‘থ্রি জিরো’র ইউরোপীয় প্রধান আইজ্যাক বেগিন। তার পাশেই ইসরাইলী রাস্ট্রদূত বসেছে। তাদের সামনে টেবিলের ওপ্রান্তে বসেছে ‘থ্রি জিরো’র ইস্তাম্বুল প্রজেক্টের প্রধান প্রফেসর ডক্টর ডেভিড ইয়াহুদ। তার পাশেই ‘স্মার্থা’। স্মার্থা ইস্তাম্বুল প্রজেক্টের নতুন অপারেশন চীফ। ইরগুন ইবান নিহত হবার পর তার দায়িত্ব এসে পড়েছে স্মার্থার উপর।

প্রফেসর ডক্টর ইয়াহুদ তাদের ইস্তাম্বুল প্রজেক্ট সম্প্রতি মারাত্মক যে বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে, তার উপর পূর্ণাঙ্গ ব্রিফিং শেষ করল।

‘থ্রি জিরো’র ইউরোপীয় প্রধান আইজ্যাক বেগিনের মুখ আষাঢ়ে মেঘের মত ভারি।

মাথা নিচু করে সে ডক্টর ডেভিড ইয়াহুদের কথা শুনছিল।

ডক্টর ইয়াহুদের কথা শেষ হলে ধীরে ধীরে মুখ তুলল আইজ্যাক বেগিন। চোখে-মুখে তার অনেক প্রশ্ন। মুখ ফাঁক করেছে প্রশ্ন করার জন্যে।

এই সময় ইন্টারকমে কথা বলে উঠল আইজ্যাক বেগিনের পিএস।

‘বল রবিন। জরুরি কিছু?’ জিজ্ঞাসা আইজ্যাক বেগিনের।

‘স্যার, বেঞ্জামিন এসেছে। ভেতরে পাঠাব?’ বলল রবিন।

‘বেঞ্জামিন? লরেন্স কোথায়? আমি তো লরেন্সের টেলিফোনের অপেক্ষা করছি। পাঠাও তাকে।’ আইজ্যাক বেগিন বলল।

‘লরেন্স তো এভাবে আমাদের দূতাবাসে আসার কথা নয়। তার উপর পুলিশের নজর আছে বলে আমরা জানি।’ বলল তুরস্কে কার্যরত ইসরাইলি রাষ্টদূত।

'আমি সে কথাই ভাবছি। টেলিফোনে মেসেজ আসবে লরেন্সের কাছ থেকে। কিন্তু সেই মেসেজের বদলে বেঞ্জামিন আসছে কেন? লরেন্সের মোবাইল ঘন্টা খানেক আগে থেকে বন্ধ।' আইজ্যাক বেগিন বলল।

'লরেন্সের সাথে গোয়েন্দা হেডকোয়ার্টারেই যেহেতু ডিউটি ছিল, তাই জরুরি কোন কথা তার থাকতে পারে।' বলল ড.ইয়াহুদ।

দরজায় নক হলো।

'এস রবিন।' বলল আইজ্যাক বেগিন।

রবিন লরেন্সকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল।

রবিন লরেন্সকে ভেতরে ঢুকিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল।

নির্দেশ মত স্মার্থার পাশে একটা খালি চেয়ারে বসল বেঞ্জামিন।

বেঞ্জামিন পুলিশের গোয়েন্দা হেডকোয়ার্টারে একজন সিভিলিয়ান কেমিষ্ট অফিসার।

সবার চোখ বেঞ্জামিনের দিকে নিবদ্ধ।

মুখ খুলল বেঞ্জামিন। একবার ড. ইয়াহুদের দিকে তাকিয়ে চোখ নিবদ্ধ করল আইজ্যাক বেগিনের দিকে। তার চোখ-মুখ ভীত ও ফ্যাকাসে। বলল, 'স্যার, লরেন্স নিহত হয়েছেন।'

'কখন, কিভাবে? সে তার কাজ করতে পারেনি?' জিজ্ঞাসা আইজ্যাক বেগিনের।

'সে বেয়ারার ছদ্মবেশে নাস্তা নিয়ে ঘরে ঢুকেছিল। জেনারেল মোস্তফা তখন ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু খালেদ খাকান তাকে গুলী করে মেরেছে।'

'খালেদ খাকান কি করে তাকে সন্দেহ করল? লরেন্স অত্যন্ত চালাক লোক। একাধিক অপশন দেয়া হয়েছিল। যে কোন মূল্যে আজকেই ভিসিডি উদ্ধার করতে হবে। সুযোগ পেলে চায়ে বিষ মিশিয়ে ওদের হত্যা করে ভিসিডির কাছে পৌঁছতে হবে। এ সুযোগ না পেলে ঘরে বিষাক্ত গ্যাস ছুঁড়ে সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এই দুই ক্ষেত্রে সন্দেহ হবার আগেই তো কাজ শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু সে

খালেদ খাকানের সন্দেহের শিকার হলো কি করে? জেনারেল মোস্তফা সন্দেহ করলে একটা কথা ছিল যে, সে লরেন্সকে চিনতে পেরেছে।'

বেঞ্জামিন বলল, 'আমি বলাবলি করতে শুনেছি যে, লরেন্স ঘরে প্রবেশ করার আগেই জেনারেল মোস্তফা বেরিয়ে এসেছিল এবং তাঁর নির্দেশেই লরেন্স নাস্তা নিয়ে যান ঐ ঘরে। তিনি জেনারেল মোস্তফার বরাত দিয়ে ভিসিডিটি কম্পিউটার থেকে নিয়ে আসার চেষ্টাও করেন। সেই সময় খালেদ খাকান বাধা দিলে লরেন্স তাকে গুলী করেন। কাঁধে গুলীবিদ্ধ হয়েও খালেদ খাকান গুলী করে হত্যা করে লরেন্সকে।'

'তাই হবে। ওতো খালেদ খাকান নয়, আমাদের চিরশত্রু, আমাদের সীমাহীন সর্বনাশের হোতা সেই আহমদ মুসা। নিখুঁত মেকআপে তার চেহারা অনেক খানি পরিবর্তন করেছিল। দেরি হয়েছে তাকে চিনতে। সব ব্যাপার আমরা জেনেছি। তার নাম পাল্টিয়ে তুর্কি সরকার ও ওআইসি তাকে নিয়ে এসেছে তাদের আইআরটি রক্ষার জন্যে।' থামল আইজ্যাক বেগিন।

ড. ডেভিড ইয়াহুদ, স্মার্থা সকালের চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত। অবচেতন মনে শিউরেও উঠেছে তারা। তারা সবাই জানে, সব যুদ্ধেই অবশেষে তারা আহমদ মুসার কাছে হেরেছে। সাধারণ ঐ লোকটি একেবারেই অসাধারণ। যেমন সে ক্ষীপ্র, তেমনি ধুর্ত, তার সাহসেরও পরিমাপ নেই।

তাদের মুখে কোন কথা নেই।

কথা বলে উঠল আইজ্যাক বেগিন। বলল বেঞ্জামিনকে লক্ষ্য করে, 'তুমি এবার এস।'

'ইয়েস স্যার।' বলে বেঞ্জামিন উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বেঞ্জামিন বেরিয়ে যেতেই আইজ্যাক বেগিন বলল, 'এখন দুই টার্গেট, 'সোর্ড'-এর ফর্মুলা হাত করা এবং আহমদ মুসাকে হত্যা করা। দেখামাত্র তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত আমাদের আগে থেকেই আছে। সেটাই কার্যকারী করতেই হবে।'

'সে সাংঘাতিক ধড়িবাজ। তার ফাইল আমি মোসাদ-এর ওয়েবসাইটে পড়লাম। তাকে ধরার জন্যে, তাকে শেষ করার জন্যে হাজারো ফাঁদ পাতা হয়েছে,

হাজারো সুযোগ আমাদের হাতে এসেছে, কিন্তু সবই আমাদের ব্যর্থ হয়েছে। ইস্তাম্বুলে আমাদের যে অভিজ্ঞতা, তাও এ কথাই বলছে যে, তার সাথে লড়াই নয় ধ্বংস করতে হবে তাকে। আমি মনে করি স্যার, আইআরটি সমেত তাকে ও বিজ্ঞানীদের ধ্বংস করা হোক। তাতে আহমদ মুসাসহ ওদের সোর্ড ও গবেষণা কার্যক্রম শেষ হয়ে যাবে।' বলল স্মার্থা।

গম্ভীর হলো আইজ্যাক বেগিন এবং ড. ডেভিড ইয়াহুদের মুখ। ড. ইয়াহুদ তাকাল আইজ্যাক বেগিনের দিকে।

আইজ্যাক বেগিন সোজা হয়ে বসল চেয়ারে। বলল, 'স্মার্থা, তুমি আমাদের অপারেশন স্কোয়াডের একটি কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব। তোমার জানা দরকার যে, সোর্ড, সোর্ডের বিজ্ঞানী বা আইআরটি ধ্বংস করা আমাদের মিশন নয়। আমরা 'সোর্ড'-এর ফর্মুলা চাই, আমরা চাই সোর্ডের ডিজাইন।'

'কিন্তু স্যার, আমি বুঝতে পারছি না, 'সোর্ড' এবং এর ডিজাইনে এত গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে কেন? আমি জানি, মার্কিন ইহুদী কণাবিজ্ঞানী ইলাম ইমামুয়েল আলোক কণা ফোটন নিয়ে 'সোর্ড'-এর অনুরূপ গবেষণায় সফল হয়েছেন। এর অর্থ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'সোর্ড' জাতীয় ডিফেনসিভ শিল্ডের মালিক হওয়ার সাথে সাথে গোপনে ইসরাইলও এর মালিক হয়ে গেছে। অতএব সোর্ড কিংবা সোর্ডের ফর্মূলার দরকার ইসরাইলের নেই। এরপরও স্যার, আইআরটির সোর্ড ও সোর্ডের ফর্মূলা পাওয়ার জন্যে অহেতুক আমরা এত ক্ষতি স্বীকার করছি কেন? সব সমেত আইআরটি ধ্বংস করলেই তো আমাদের কাজ শেষ হয়ে যায়। সোর্ড ওদের হাতে না থাকলেই আমরা বেঁচে যাই।' বলল স্মার্থা।

'তুমি যে তথ্য দিয়েছ তা ঠিক। কিন্তু সব তথ্য তুমি দিতে পারনি। আমাদের কণাবিজ্ঞানী ইলাম ইমামুয়েল আলোক-কণার 'ফোটন'- শিল্ড আবিষ্কার করেছেন, যার ফাংশন ডিফেন্সিভ অস্ত্র হিসেবে ওদের সোর্ড এর মতই। কিন্তু ওদের 'সোর্ড'- এর ভয়াবহ অফেনসিভ ক্যারেক্টার রয়েছে, যা আমাদের ফোটন শিল্ডে নেই।' বলল আইজ্যাক বেগিন।

'বুঝলাম না, স্যার?' স্মার্থা বলল।

‘বলছি শোন, ইস্তাম্বুলের ‘আইআরটি’ গবেষণাগার ‘সোর্ড’ নামের যে ‘ফোটন-শিল্ড তৈরি করেছে তা যেমন ডিফেনসিভ অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায়, তেমনি অফেনসিভ অস্ত্র হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। আইআরটির প্রধান বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসির বহু আগের লেখা ‘টেকনোলজিক্যাল ইউজ অব ফোটনস’ নামের একটা নিবন্ধ তার গোপন ওয়েব সাইট থেকে আমাদের বিজ্ঞানীরা উদ্ধার করেছেন। তাতে অন্যান্য বিষয়ের সাথে তিনি গামা-ফোটনের ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিজম নতুন উপাদান ‘আল-সালাম’- এর কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন এই ‘আল-সালাম’- এর প্রযুক্তিগত ব্যবহার ফোটন-নেটকে ভয়ংকর মারণাস্ত্রে রূপ দিতে পারে, যা পাল্টে দিতে পারে দুনিয়াকে। তার মতে ‘আল-সালাম’- এর প্রযুক্তি রূপকে যদি ফোটন-নেটের সাথে যুক্ত করা হয়, তাহলে এমন একটা অস্ত্র তৈরি হবে যা আলোর গতিতে দুনিয়ার যে কোন প্রান্তে পৌছে যে কোন দুর্ভেদ্য সাইলোতে ঢুকে পড়ে মেটালিক-ননমেটালিক সব অস্ত্রকে সম্পূর্ণ হাওয়া করে দিতে পারে। আজ আইআরটিতে বসে ড. আন্দালুসি যে ‘সোর্ড’ তৈরি করেছেন, তাতে এই অফেনসিভ ক্যারেক্টার যুক্ত রয়েছে। ‘সোর্ড’- এর যে অর্থ তার মধ্যেও এর ইংগিত আছে। ‘সোর্ড’ -কে সেভিয়ার অব ওয়ার্ল্ড র‍্যাশনাল ডোমেইন বলা যায়। সংক্ষেপে এর অর্থ ‘মানব-ধর্মের ত্রাতা’। মানব ধর্ম বলতে ওরা বুঝাচ্ছে ‘শান্তি’ (rational domain)। আর বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসি ফোটনের ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিজম- এর নতুন উপাদানের নাম রেখেছেন ‘আল-সালাম’ মানে শান্তি। এর অর্থ তারা বুঝাচ্ছেন, আমরা মনে করছি, দুনিয়ার সব অস্ত্রকে তার নিজ নিজ সাইলোতে ধ্বংস করে দিয়ে তারা দুনিয়াতে যুদ্ধহীন শান্তি নিয়ে আসবেন। এটাই আমাদের আতংকের বিষয়। আমরা চাই আমাদের সাইলোগুলোতে আমাদের অস্ত্র অটুট রেখে দুনিয়ার সব অস্ত্র ধ্বংস করতে। এজন্যেই আমরা মরিয়া ওদের ‘সোর্ড’ এবং তার ফর্মুলা হাত করতে।’

থামল আইজ্যাক বেগিন।

স্মার্থার ঠোঁট শুকনো। তার চোখে অসহায় দৃষ্টি।

তার ঠোঁট নড়ল, কিন্তু কথা বেরুলো না। কথা যেন গলায় আটকে গেছে।

স্মার্থা সামনের গ্লাসের ঢাকনা সরিয়ে এক গ্লাস পানি সবটাই খেয়ে নিল।

গ্লাসটা টেবিলে রেখে সে বলল, ‘স্যার আমাদের বিজ্ঞানী গামাফোটনের ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিজম-এর আল-সালাম উপাদান খোঁজার চেষ্টা করছে না?’

চেয়ারে গা এলিয়ে দিল আইজ্যাক বেগিন। তার চোখে-মুখে দারুণ হতাশার ছাপ। বলল, ইউরোপ-আমেরিকার কার্যরত আমাদের সকল কণাবিজ্ঞানী অবিরাম চেষ্টা করেও এই ব্যাপারে এক ধাপ এগোতে পারেনি। এমনকি কোন সম্ভাবনাও তারা সৃষ্টি করতে পারেনি।’

স্মার্থারও চোখে-মুখে ভীতি-মিশ্রিত হতাশার সুর। বলল, ‘দক্ষিণ স্পেনের প্রায় পরিত্যক্ত শহর গ্রানাডার দরিদ্র মরিসকো পরিবারের সন্তান ড. আমির আবদুল্লাহ আন্দালুসি যা পারলো, আমাদের হাজারো বিজ্ঞানীরা তা পারল না?’

‘তিনি দরিদ্র মরিসকো ঘরের সন্তান বটে, কিন্তু তার বাল্য-কৈশোরের গোটা সময় কেটেছে মালাগা, গ্রানাডা, কার্ডোভার ভাঙা লাইব্রেরীগুলোতে। সে যেন কোন হারানো জিনিস অবিরাম খুঁজে ফিরেছে। কিছু পেয়েছে কিনা জানি না, কিন্তু অনুসন্ধিতসু কিশোর মাদ্রিদের আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কণা-পদার্থ বিজ্ঞানে সর্বকালের সর্বোচ্চ নাম্বার নিয়ে পাস করেছে। আর বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তার ‘ক্যারেক্টার’ অব ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিজমের যে গবেষণাপত্র তিনি তৈরি করেন, তা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সর্বোচ্চ মান লাভ করে। সুতরাং তিনি সামান্য থেকে উঠে আসা হলেও একজন অসামান্য মানুষ। তাকে ইউরোপ-আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণাগারগুলো যে কোন মূল্যে কিনতে চেয়েছিল। কিন্তু তিনি নামমাত্র বেতনে সৌদি আরবের মদিনা বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। সেখান থেকেই তিনি এসেছেন ওআইসির আইআরটি প্রজেক্টে।’

থামল ড. ডেভিড ইয়াহুদ।

কথা বলে উঠল আইজ্যাক বেগিন। বলল, ‘ড. আন্দালুসি যা পেরেছেন, তা আমাদের বিজ্ঞানীরা না পারাটা বিস্ময়ের নয়। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি নিউটন আবিষ্কার করেন, আর কোন বিজ্ঞানী পারেননি। আইনস্টাইন আবিষ্কার করেন, আপেক্ষিক তত্ত্ব। অন্য কোন বিজ্ঞানীর পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। বিজ্ঞানের জগতে এটাই ঘটে।’

‘স্যার, এখন তাহলে আমাদের করনীয়? আমার মনে হচ্ছে, আমাদের দুনিয়ার এখন প্রথম এবং একমাত্র কাজই হবে, যে কোন মূল্যে সোর্ডের ফর্মুলা হস্তগত করা এবং বিজ্ঞানীদের সমেত আইআরটিকে ধ্বংস করা।’ বলল স্মার্থা।

‘সেটাই তো আমরা চাচ্ছি। কিন্তু হচ্ছে কই। আমাদের চলার পথ তো ধীরে ধীরে সংকুচিতই হয়ে পড়ছে। স্মার্থা, তুমি যা বলেছ আমরা সেটাই চিন্তু করছি। যে কোন মূলেই আমরা সোর্ডের ফর্মুলা হাত করব এবং আইআরটিকে অবশ্যই আমরা চলতে দেব না।’ আইজ্যাক বেগিন বলল।

‘আমাদের অনেক ক্ষতি হলেও আমরা একটা বড় সাফল্য পেয়েছি। প্রফেসর বেগভিচের আত্মা শান্তি পাক। তার চেষ্টাতেই আমরা আইআরটির প্রধান বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসির বাসার সন্ধান পেয়েছি। এখন আমরা কার্যকরী কিছু ভালো পদক্ষেপের দিকে এগোতে পারব।’ বলল ড. ডেভিড ইয়াহুদ।

‘সেই পদক্ষেপগুলো সম্পর্কে কি চিন্তা করেছেন? আমাদের কিন্তু দ্রুত এগোতে হবে। অনেক সময় আমাদের নষ্ট হয়েছে ইতিমধ্যেই।’ আইজ্যাক বেগিন বলল।

‘ড. আন্দালুসিকে ভয় দেখিয়ে আমরা কাজ আদায় করব। সেটা ব্যর্থ হলে আমরা তাকে কিডন্যাপ করে ফর্মুলা আদায়ের ব্যবস্থা করব। কিন্তু অনেক বিবেচনার পর এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, তাকে ভয় দেখিয়ে কিংবা কিডন্যাপ, নির্যাতন করে কিংবা হত্যার ভয় দেখিয়েও তার কাছ থেকে কিছু আদায় করা যাবে না। তিনি তার জীবনের চেয়ে আইআরটি’র স্বার্থ, জাতির স্বার্থকে অনেক বড় বলে মনে করেন। সুতরাং আমরা ভাবছি যে, তিনি তার জীবনের চেয়ে যাকে বেশি ভালোবাসেন, যার ক্ষতি তিনি সহ্য করতে পারবেন না, এমন কিছুর উপর আমাদের হাত দিতে হবে। এই লক্ষ্যে আমরা তার পারিবারিক তথ্য সংগ্রহ শুরু করেছি। শীঘ্রই আমরা এ বিষয়ে একটা কমপ্লিট চিত্র পেয়ে যাব। আমরা এখন তারই অপেক্ষা করছি।

‘ধন্যবাদ ড. ডেভিড ইয়াহুদ। আপনারা ঠিক পথে এগোচ্ছেন। ড. আন্দালুসির মত আদর্শনিষ্ঠ ও জাতিগত- প্রাণ লোকদের শারীরিক নির্যাতন চালিয়ে বা ক্ষতি করে দূর্বল করা যায় না। আঘাত দিতে হয় এদের মনে। এরা

নীতিনিষ্ঠ, আদর্শবাদী বলে তাদের মনটা স্পর্শকাতর হয়ে থাকে। তাই তাদের মনে উপযুক্ত আঘাত পড়লে তাদের আদর্শিক ও মানসিক প্রতিরোধ ধ্বসে পড়ে। সুতরাং ড. আন্দালুসির ব্যাপারে আপনারা সঠিক পথ বেছে নিয়েছেন।' বলল আইজ্যাক বেগিন।

'কিন্তু আহমদ মুসাকে পথ থেকে সরাতে না পারলে এই কাজ নিরাপদ হবে না বলে আমি মনে করি। এই ইস্তাম্বুলেই সে আমাদের অনেকগুলো উদ্যোগ র্ব্যথ করে দিয়েছে।' ইসরাইলী রাষ্ট্রদূত বলল।

'আহমদ মুসা ও সোর্ড- এর ফর্মূলা দু'টিই আমাদের নাম্বার ওয়ান প্রায়োরিটি। এ ব্যাপারে উপর থেকেও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। আহমদ মুসার একদিন বেঁচে থাকা মানে আমাদের হায়াত একদিন কমে যাওয়া। আমাদের দুর্ভাগ্য বসফরাস ব্রীজ থেকে পড়েও সে বেঁচে গেল। বারবার গুলীর মুখ থেকে বেঁচে গেছে। তার আমরা কোন ক্ষতি করতে পারিনে, তার হাতে আমাদের ক্ষতি আকাশ স্পর্শ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল আমাদের জন্যে স্বর্গভূমি, সেখান থেকে আমরা উৎখাত হয়েছি। আমাদের কিছু বিজ্ঞানী ও আমলা নাম ভাঁড়িয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে টিকে আছে বলেই কিছু সুবিধা আমরা পাচ্ছি। যেখানেই আমাদের প্রজেক্ট সেখানেই আহমদ মুসা। এই আহমদ মুসা তুরস্কেও এসেছে। একথা ঠিক, সে থাকবে আর আমরা সফল হবো, এটা অসম্ভব। বিজ্ঞানী ও আহমদ মুসাকে এক সাথেই ধরতে হবে।' বলল আইজ্যাক বেগিন।

'আহমদ মুসা এক জায়গায় থাকে না, সর্বশেষ তথ্য হলো সে এখন হেলিকপ্টার ব্যবহার করে।' ড. ডেভিড ইয়াহুদ বলল।

ভ্রু কুঞ্চিত হলো আইজ্যাক বেগিনের। বলল, 'আহমদ মুসাকে তুর্কি সরকার এতটা গুরুত্ব দিচ্ছে!'

'ওআইসি নিশ্চয় এর পেছনে রয়েছে। কারন আইআরটি তো ওআইসির একটি প্রতিষ্ঠান। ওআইসি গুরুত্ব দিলে তুর্কি সরকার অবশ্যই গুরুত্ব দিতে বাধ্য। তাছাড়া আমি শুনেছি, খালেদ খাকান ওরফে আহমদ মুসা খোদ তুর্কি প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর মেহমান হিসেবে এখানে এসেছে।' ইসরাইলী রাষ্ট্রদূত বলল হতাশ কন্ঠে।

'স্বাভাবিক। স্বপ্ন তারা দেখতেই পারে। অটোম্যানদেরই উত্তরসূরী তো তারা! কিন্তু স্বপ্নটা তারা বেশি দেখে ফেলেছে। এই স্বপ্ন শীঘ্রই মুখ থুবড়ে পড়বে। অটোম্যানদের সেই দিন আর ফিরে...।'

কথায় ছেদ পড়ল আইজ্যাক বেগিনের।

পকেটের মোবাইল বেজে উঠেছে তার।

কথা বন্ধ করে মোবাইল তুলল আইজ্যাক বেগিন।

মোবাইলের স্ক্রীনের দিকে একনজর তাকিয়েই মুখের কাছে নিয়ে বলল, 'বল অ্যালিয়াস, কোন-খবর?'

অ্যালিয়াস সিজলি এলাকায় বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসির নতুন বাড়ির আশে-পাশে মোতায়েন 'থ্রি জিরো'র লোকদের একজন।

'স্যার, বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসি চলে যাচ্ছেন। তিনি হেলিকপ্টারে উঠছেন। তার বাড়ির লনেই হেলিকপ্টারটা রয়েছে।' বলল অ্যালিয়াস।

'যেতে পারেন। হয়তো ইনস্টিটিউট থেকে ডাক পড়েছে। উইকএন্ডটা গোটা দিন বাসায় থাকতে পারলেন না। তুমি হেলিকপ্টারের পাশে মানে বিজ্ঞানীকে বিদায় দিতে আসা কাউকে দেখছ?' আইজ্যাক বেগিন বলল।

'দেখছি স্যার। একজন সুবেশধারী মহিলাকে দেখছি। তার পেছনে পরিচারিকা ধরনের আরও দু'জন মহিলা এবং আরও দুতিন জন লোক। পেছনের এরা সবাই কাজের মানুষ বলে মনে হচ্ছে।' বলল অ্যালিয়াস।

'সুবেশধারী তাঁর স্ত্রী হতে পারেন। বয়স কত মনে হচ্ছে?' আইজ্যাক বেগিন বলল।

'স্যার তিরিশের মত বয়স হবে।' বলল অ্যালিয়াস।

'বয়সের পার্থক্য ঠিক আছে। মুসলমানদের আইডিয়েল পরিবারগুলোতে ৫ থেকে ১০ বছরের পার্থক্য স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে থাকে। নিশ্চিত উনি ম্যাডাম আন্দালুসি।'

থামল আইজ্যাক বেগিন।

'কোন নির্দেশ স্যার?'

‘হ্যাঁ, বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসি চলে যাচ্ছেন। তোমাদের কাজ বেড়ে যাচ্ছে। তোমরা বিজ্ঞানীর পরিবার সম্পর্কে আরও খোঁজ খবর নাও। বাড়িতে কে কখন আসা-যাওয়া করে তার তালিকা রাখ। অন্যান্য খোঁজ আমরা নিচ্ছি। আবার কোন দিন বিজ্ঞানী আসছেন সে খোঁজ নাও। বিজ্ঞানীর সাথে আমরা একবার কথা বলব, তারপর যা করার তা আমরা করব। বাড়ির চাকর-বাকর, লোকেরা যারা বাইরে বের হয়, তাদের সাথে সম্পর্ক কর এবং বাড়ির নিয়ম-কানুন, রুটিন সম্পর্কে জান। কিন্তু সাবধান, কোনোভাবেই ওদের মনে যেন তোমাদের সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক না হয়।’

‘আপনাদের এই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন হবে স্যার।’

‘ধন্যবাদ অ্যালিয়াস।’

মোবাইল রেখে দিল আইজ্যাক বেগিন। তাকাল ড. ডেভিড ইয়াহুদের দিকে। বলল, ‘ড. ইয়াহুদ, বিজ্ঞানীর বাড়িটার একটা নক্সা আপনার কাছে দেখেছি, সেটা রুম-অ্যারেঞ্জমেন্টর ডিজাইন। আমাদের প্রয়োজন ডিটেইল লে-আউট।’

‘আমরা সেটার সন্ধান করেছি। বাড়িটার নির্মাতা ইস্তাম্বুলের পূর্ব বিভাগ। পূর্ব বিভাগে বাড়ির লে-আউট থাকার কথা। কিন্তু সেখানে পাওয়া যায়নি।’ বলল ড. ডেভিড ইয়াহুদ।

‘ড. ইয়াহুদ, আপনি সুইচ দূতাবাসে যোগাযোগ করুন। ওখানে জোসেফ জাকারিয়া আছে ডাইরেক্টর এ্যাডমিনিস্ট্রেশন হিসেবে। তার কাছে সাহায্য পাবেন। ওরা ভাড়া নেবার সময় বাড়ির লে-আউট নিশ্চয় নিয়েছিল, কিংবা তারা একটা লে-আউট তৈরি করেছিল। যা হোক, আমরা যা চাই, ওদের কাছ থেকে তা পাওয়া যাবে।’

ড.ডেভিড ইয়াহুদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বলল, ‘অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটা দিক আপনি সামনে নিয়ে এসেছেন। বিষয়টা আমার মনেই হয়নি। ধন্যবাদ মি. বেগিন। আমরা অবশ্যই...।’

ডেভিড ইয়াহুদের কথা শেষ না হতেই উঠে দাঁড়াল আইজ্যাক বেগিন। বলল, ‘ধন্যবাদ ডেভিড ইয়াহুদ। আমি উঠছি। জরুরি কাজ আছে।’

ড. ডেভিড ইয়াহুদও উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘চলুন আমিও বেরুবো।’ বেরিয়ে এল তারা সবাই ঘর থেকে।

ড. ডেভিড ইয়াহুদ তার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, ‘জেমস জোসেফ, তোমার হাতে মাত্র এক ঘন্টা সময় আছে। তোমার এ্যাপয়েনমেন্টা রাত ঠিক আটটায়। রেডি় হয়ে নাও।’

জেমস জোসেফও ঘড়ির দিকে তাকাল। বলল, ‘ঠিক আছে স্যার। আমি যাচ্ছি’

বলেই উঠে দাঁড়িয়ে জেমস জোসেফ ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

জেমস জোসেফ বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসির বাড়িতে অভিযানের নতুন সদস্য। সে ইস্তাম্বুলের ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির মেকানিক্যাল স্পেস সাইন্সের ছাত্র। সেই সাথে সে জায়নবাদী আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থার সক্রিয় কর্মী।

জেমস জোসেফ বেরিয়ে যেতেই বাইরে গাড়ি দাঁড়াবার শব্দ হলো। কয়েক মুহূর্ত পরে ঘরে ঢুকল আইজ্যাক বেগিন।

ঘরে ঢুকেই বলল, জেমস জোসেফকে বেরিয়ে যেতে দেখলাম। সব রেডি তো। ওরা তো বেরুচ্ছে ঠিক সময়ে?’

‘হ্যাঁ, ঠিক সময়ে বেরুচ্ছে। স্মার্থা এবার নেতৃত্বে আছে। আপনি সব ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।’ বলল ড. ডেভিড ইয়াহুদ।

‘বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট ডেলিগেশনের সাথে স্মার্থা বেমানান।

‘স্মার্থা শিক্ষকতা করলেও সে ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজিতে কণাবিজ্ঞানের একটা বিষয়ের উপর পিএইচডি করছে। সুতরাং বেমানান হওয়ার কথা নয়।’ বলল ড. ডেভিড ইয়াহুদ।

‘ধন্যবাদ ডক্টর। আমি খুব উদ্বিগ্ন। ক’দিন আমি ছিলাম না। এর মধ্যে অনেক কিছু ঘটে গেছে। বিস্তারিত একটু বলুন ডক্টর।’ আইজ্যাক বেগিন বলল।

‘সত্যিই অনেক কিছু ঘটে গেছে।’

বলে একটু থামল ড. ডেভিড ইয়াহুদ।

সোজা হয়ে বসল চেয়ারে। বলল, 'বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসির বাড়ি আমরা যতটা প্রটেকটেড মনে করেছিলাম, তার চেয়ে অনেক সুরক্ষিত বাড়িটা। আমরা নিশ্চিত হয়েছি, বিজ্ঞানীর বাড়ির কাজের লোকগুলো অবশ্যই পুলিশ বা গোয়েন্দা বিভাগের লোক। মোতায়েনকৃত আমাদের লোকেরা তাদের কাছ থেকে কথা আদায় করতে গিয়ে বিপদে পড়ার মুখোমুখি হয়েছে। প্রয়োজনীয় কোন কথা আদায় করতে পারেনি। যে কথাগুলো তারা আদায় করতে পেরেছে তা উল্টা-পাল্টা বা ফাঁদ জাতীয় বলেই আমাদের মনে হয়েছে।'

'পরীক্ষামূলকভাবে হকার-ফেরিওয়ালা পাঠাবার যে কথা হয়েছিল, সেটার কিছু করা গেছে?' বলল আইজ্যাক বেগিন।

'ও পরীক্ষাও হয়ে গেছে। ফেরিওয়ালা, নিউজপেপার হকার ও হোম সার্ভিসের লোকদের পাঠিয়েছিলাম। ওরা গেট পর্যন্তও পৌঁছতে পারেনি। তার আগেই তাদের ধরে ফেলা হয়েছে। অবশ্য পরে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ওরা আমাদের লোক, কিন্তু সেই সাথে ওরা প্রকৌশলীও। সুতরাং কোন অসুবিধা হয়নি। তবে পরিষ্কার হয়েছে, বিনা বাধায় বিজ্ঞানীর বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে পারা যাবে না। জোর করে যাওয়ার চেষ্টা করলে লড়াই করতে হবে নিঃসন্দেহে।' ড. ডেভিড ইয়াহুদ বলল।

'জেমস জোসেফদের দ্বারা যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছিলেন, সেটার ব্যাপারে আপনি কতটা নিশ্চিত?' বলল আইজ্যাক বেগিন।

'হ্যাঁ। অনেক চিন্তা করে এই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির ছেলেরা যদি বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসির সাথে দেখা করার একটা অফিসিয়াল উদ্যোগ নেয় তাহলে তারা সে অনুমতি পেতে পারে। এমন ভাবনা থেকেই জেমস জোসেফকে দিয়ে ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির এক গ্রুপ ব্রিলিয়ান্ট ছাত্রকে উৎসাহিত করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্রিলিয়ান্ট ছাত্রদের রিসার্চ ফোরাম আছে। তারা বিজ্ঞান-টেকনোলজির অত্যাধুনিক টপিক্সের উপর মাঝে মাঝেই সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, গোলটেবিল ও গ্রুপ জিসকাশনের আয়োজন করে। বড় বড় বিজ্ঞানী ও শিক্ষকদের এসব অনুষ্ঠানে আনা এবং তাদের সাথে গ্রুপ করে দেখা করা তাদের নিয়মিত প্রোগ্রামের অংশ। তাদের এসব প্রোগ্রাম ও

পরিচয়ের নানারকম পেপারস-ব্রসিয়ারস আছে। জেমস জোসেফ এই ফোরামের একজন সদস্য, অবশ্য মূল বডিতে সে নেই। তবে তার প্রস্তাবকে তারা গ্রহণ করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে আইআরটির টেলিফোন নাম্বার যোগাড় করে ফোরামের প্রেসিডেন্ট বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসিকে টেলিফোন করে। ফোরামের একটা গ্রুপ তার সাথে দেখা করতে চাইলে বিজ্ঞানী তার অপরাগতার কথা প্রকাশ করেন। এই অবস্থায় ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির কণাবিজ্ঞান বিভাগের ডীন ড. ফাতিমা বাদরুমা ফোরামকে পরামর্শ দেন তাদের 'হিস্ট্রি এন্ড মেথডলজি অব স্ট্রাটেজিক রির্সাচ' বিষয়ের ভিজিটিং প্রফেসর ড. সারার সাহায্য নিতে। তিনি জানান, কিছুদিন আগে ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সায়েন্স এন্ড ইমান বিল গায়ে'-এর উপর সাড়া জাগানো যে আন্তর্জাতিক সেমিনার হয়, তাতে বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসি ও ড. সারা ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে। আমি তখন দেখেছি মার্কিন স্ট্রাটেজিক রিসার্চেও ড. সারাকে ড. আন্দালুসি খুব রেসপেক্ট করেন। তিনি যদি ফোরামের পক্ষে ড. আন্দালুসিকে অনুরোধ করেন, তাহলে ড. আন্দালুসি নিশ্চত রাজি হবেন। ড. ফাতিমা বাদরুমার পরামর্শ অনুসারে ফোরাম প্রতিনিধিরা ড. সারার সাথে দেখা করে তাঁকে অনুরোধ করেন। প্রতিনিধি দলে জেমস জোসেফও ছিল। সেই ফোরামের পক্ষ থেকে একটা ফোল্ডার তৈরি করে ড. সারাকে দেয়া হয়। ড. সারা অনেক আলোচনা ও জিজ্ঞাসাবাদের পর ফোরামের পক্ষে ড. আন্দালুসিকে অনুরোধ করতে রাজি হন। তার অনুরোধেই ড. আন্দালুসি রাজি হন ফোরামকে সাক্ষাৎকার দিতে। আমরা চেয়েছিলাম ড. আন্দালুসি যেন তাঁর বাড়িতে সাক্ষাৎ দিতে রাজি হন। এ জন্যেই সিজলি এলাকায় তার বাড়ির কাছের ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির ফোরামকে আমরা ব্যবহার করেছি। আমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। সাক্ষাৎ দিতে রাজি হওয়ার পর ড. আন্দালুসি বলেন, অফিসে আমি কাউকে সাক্ষাৎ দেই না। তার উপর আগামী শুক্রবার সিজলিতে আমার বাসাতেই থাকব। বিশ্ববিদ্যালয়ও ঐ এলাকাতেই। সুতরাং সাক্ষাৎটা আমার বাসাতেই হবে।' থামল ড. ডেভিড ইয়াহুদ।

খুশিতে উঠে দাঁড়িয়েছে আইজ্যাক বেগিন। সে হাত বাড়িয়ে ড. ইয়াহুদের সাথে হ্যান্ডশেক করে বলল, ইশ্বর আমাদের সাহায্য করছেন। না হলে

এতবড় সুযোগ আমরা এভাবে পেয়ে যাই! এখন বলুন, অপারেশন টিমটা আপনার কেমন হয়েছে। তারা পরিকল্পনা অনুসারে ড. আন্দালুসিকে তার স্ত্রী সমেত ওখান থেকে বের করতে পারবে তো?'

'অবশ্যই বিজ্ঞানীর বাসার মূল অপারেশনে নেতৃত্ব দেবে স্মার্থা। তার সাতে আমাদের আটজন চৌকশ কমান্ডো। জেমস জোসেফ এদের সাথে থাকবে। কারণ যেখানে ওদের আটকে রাখা হবে, সেটা জেমস জোসেফেরই জানা। অন্যদিকে বিজ্ঞানীর বাসায় যাওয়ার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র প্রতিনিধিদলকে কিডন্যাপ করবে অন্য একটা কমান্ডো দল। এরও নিরাপদ পরিকল্পনা করা হয়েছে। আটকে রাখার জায়াগাও ঠিক করা আছে। আমাদের লোকদের প্রত্যেকের ডুপ্লিকেট আইডি কার্ড তৈরি করা হয়েছে। এই আই ডি কার্ডগুলো নিয়ে ছাত্র সেজে আমাদের স্মার্থা বাহিনী বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসির বাড়িতে প্রবেশ করবে। ছাত্র প্রতিনিধি দলের যে নাম পরিচয় বিজ্ঞানীকে আগেই সরবরাহ করা হয়েছে, তাতে কারও ছবি নেই, ছবি তারা চায়ওনি। সুতরাং কোন দিক দিয়ে কোন অসুবিধা হবে না।'

খুশিতে আইজ্যাক বেগিনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'আপনি বললেন, বিজ্ঞানীর বাড়িতে চাকর-বাকর যারা আছে, তারা হয় পুলিশের না হয় গোয়েন্দা বিভাগের লোক। বাড়িতে তাদের সংখ্যা কত হতে পারি এ ব্যাপারে কিছু জেনেছেন?'

'বিজ্ঞানীর বাড়ির উপর আমাদের যারা চোখে রেখেছে, তাদের মতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে যারা বাইরে এসেছে, তাদের সংখ্যা পাঁচ-ছয় জনের বেশি নয়।'

'তার মানে বিজ্ঞানীর বাড়িতে ঐ ধরনের লোক সাত আটজনের বেশি হবে না। আর তোমার স্মার্থা বাহিনীতে থাকছে ১০ জন। তুমি কি মনে করছ? সাফল্যের ব্যাপারে কিন্তু কোন ঝুঁকি থাকা চলবে না।' বলল আইজ্যাক বেগিন।

'কোন চিন্তু নেই। আমার লোকরা প্রস্তুত অবস্থায় প্রথম আঘাত করবে। ওরা থাকবে অপ্রস্তুত। স্মার্থার পরিকল্পনা হলো, প্রথম আঘাতেই ওদের অধিকাংশ লোককে টার্গেটে নিয়ে আসা। এজন্যে কথা হয়েছে, সাক্ষাতের এক

পর্যায়ে আমাদের লোকরা চোখের পলকে গোটা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়বে এবং একযোগে আক্রমণ করবে। ওদেরকে প্রস্তুতির কোন সুযোগ দেয়া যাবে না। শুধু বিজ্ঞানী ও তার স্ত্রীকে কোন আঘাত করতে নিষেধ করা হয়েছে। ওদের ধরে নিয়ে যেতে হবে।' ড. ডেভিড ইয়াহুদ বলল।

'কেন, বিজ্ঞানীর বাচ্চাদের বাদ দিচ্ছেন কেন? ওদের ধরে নিয়ে যেতে হবে। স্ত্রীর সাথে ওরাও হবে বিজ্ঞানীকে কথা বলাবার অব্যর্থ টোপ।' আইজ্যাক বেগিন বলল।

'না, বিজ্ঞানীর ছেলে-মেয়েরা এখন এখানে নেই। এই তথ্য আমরা নিশ্চিতই জানতে পেরেছি।'

বলেই দ্রুত ঘড়ির দিকে তাকাল ড. ডেভিড ইয়াহুদ। বলল, 'এখন ১০টা বিশ মিনিট। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেলিগেটদের কিডন্যাপের অপারেশন এখন নিশ্চয় শেষ হয়েছে। স্মার্থা বাহিনী যাচ্ছে এখন বিজ্ঞানীর বাড়িতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট ডেলিগেশনের ছদ্মবেশে। কিন্তু এতক্ষনেও টেলিফোন আসছে না কেন? প্রথম অপারেশনের পরেই তার খবর জানানোর কথা ছিল।'

থামল ড. ডেভিড ইয়াহুদ।

তাকাল আবার ঘড়ির দিকে।

সংগে সংগেই বেজে উঠল তার মোবাইল।

দ্রুত মোবাইল মুখের কাছে তুলে ধরল ড. ডেভিড ইয়াহুদ। ওপারের কন্ঠ শুনেই বলল, 'বল জেমস জোসেফ, সুখবর?'

'জি স্যার। অপারেশন সাকসেসফুল। দু'টি ক্লোরোফরম টাইম বোমার স্বয়ংক্রিয় বিস্ফোরণে দুই গাড়ির সবাই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। পরে আমাদের ড্রাইভার গাড়ি দু'টিকে ড্রাইভ করে সিজলি পাহাড়ে নিয়ে যায়। একটা ঝোঁপে তাদের সংজ্ঞাহীন দেহ লুকিয়ে রেখে গাড়ি নিয়ে চলে আসে। ম্যাডাম স্মার্থার নেতৃত্বে আমরা নতুন ছাত্র ডেলিগেটরা এখন যাচ্ছি বিজ্ঞানীর বাড়ির দিকে।'

'ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাদের। টেলিফোনটা স্মার্থাকে দাও।' বলল ডেভিড ইয়াহুদ।

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা।

ওপার থেকে স্মার্থার গলা পেতেই ড. ডেভিড ইয়াহুদ বলল, 'এখন আর কোন কথা নয়। গড ব্লেস ইউ স্মার্থা। এটাই আমাদের সর্বোচ্চ সুযোগ। লক্ষ্য অর্জনের জন্য আশা করি সব কিছুই করবে। গড ব্লেস ইউ। গুড বাই।'

মোবাইল রেখে দিল ড. ডেভিড ইয়াহুদ। বলল আইজ্যাক বেগিনের দিকে তাকিয়ে, 'ওরা বিজ্ঞানীর বাড়িতে যাত্রা করেছে মি. আইজ্যাক বেগিন। ঈশ্বরকে ডাকুন।'

'গড হেলপ আস।' বলল আইজ্যাক বেগিন।

'সামনে আধ ঘন্টা সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আসুন আমরা সুখবরের জন্য অপেক্ষা করি।' ড. ডেভিড ইয়াহুদ বলল।

'ঠিক আছে। কিন্তু সুড়ঙ্গ পথ সম্পর্কে ওদের সুস্পষ্ট ধারণা আছে তো। ঠিকভাবে বুঝতে না পারলে বিজ্ঞানী ও তার স্ত্রীকে নিয়ে পালানোর সব আয়োজন পন্ড হয়ে যাবে।' বলল আইজ্যাক বেগিন।

'সে রকম কোন অসুবিধা হবে না। অপারেশন টীমে যারা আছে, তারা প্রত্যেককেই বাড়ির নকশা, ঘরগুলোর নকশা, সুড়ঙ্গের মুখ এবং তাদের অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেয়া হয়েছে।' বলল ড. ডেভিড ইয়াহুদ।

আইজ্যাক বেগিনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'ধন্যবাদ।'

বলে সোফায় গা এলিয়ে দিল। পকেট থেকে মোবাইল বের করে বলল, 'মাফ করবেন ড. ইয়াহুদ, একটা জরুরি টেলিফোন সেরে নেই।'

'অবশ্যই।' বলল ড. ইয়াহুদ।

আইআরটি-তে রোববারের সকাল।

ফরমাল অফিস নেই। তবু নাস্তার পর ড. শেখ আবদুল্লাহ বিন বাজ এবং আইটি ইঞ্জিনিয়ার ইসমত কামাল বেশ অনেকক্ষণ আগে অফিসে এসেছে।

অফিসের লাউঞ্জে বসে আহমদ মুসা তাদের সাথে আলাপ করছিল।

বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসির দক্ষিণহস্ত তরুণ আলোক বিজ্ঞানী ড. ইবনুল আব্বাস আবদুল্লাহ সেসুসি লাউঞ্জে ঢুকল।

সবার উদ্দেশ্যে সালাম দিয়ে এক জনের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'এখন দশটা বিশ মি. খালেদ খাকান। মাত্র বিশ মিনিট লেট। ছুটির দিনে এই লেট নিশ্চয় কাউন্টেবল নয়।' ড. সেসুসির মুখে হাসি।

সকাল ৯টায় আহমদ মুসা অফিসে এসেছে। সকাল সাড়ে ৮ টায় ড. সেসুসি টেলিফোন করেছিল আহমদ মুসাকে। বলেছিল, আপনি যখন এসেছেন, তখন আমিও ১০টার দিকে লাউঞ্জে আসছি।

'ওয়েলকাম ড. সেসুসি। ছুটির দিন না হলেও বিজ্ঞানীদের লেট দোষনীয় নয়। বিজ্ঞানীরা অংকে একেবারে অ্যাকুরেট বলেই ব্যক্তি জীবনের কাজ-কর্মে অনেক খানি বেহিসেবী। সুতরাং বিশ মিনিট লেট আমরা সানন্দে গ্রহন করলাম।' হাসতে হাসতে বলল আহমদ মুসা।

'ধন্যবাদ। তবে মি. খালেদ খাকান বিজ্ঞানীদের এই বেহিসেবী হবার কথা তাদের পরিবারের কাছে না বলা উচিত। তাতে পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে।' বলল ড. সেসুসি মুখ টিপে হেসে।

'পরিস্থিতি আরও খারাপ না করার কথা বলছেন। তার মানে পরিস্থিতি এখন খারাপ। তাই কি ড. সেসুসি?' বলল ড. আবদুল্লাহ বাজ। তার ঠোঁটে হাসি।

হাসল ড. সেসুসি। বলল, 'সবে তো আমাদের সাথে আসলেন। আমাকে এখনো বুঝে সারেননি হয়তো। কিন্তু গত তিন মাসে আমাদের চার বিজ্ঞানীর বাড়িতে কয়েকবার গেছি। সেখানে ভাবীদের কাছে মজার মজার কথা শুনেছি। আল্লাহ নাকি বিজ্ঞানীদের মাথায় বস্তুবিজ্ঞানের জ্ঞান ও তার প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং সেই সাথে মগজ থেকে সংসার বুদ্ধির জ্ঞান কেটে নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। আন্দালুসি ভাবীর কাছে এ অভিযোগ শুনেছি। তিনি আমাকে বলেছেন, 'বিয়ের পর গত ২৫ বছরে তোমার স্যার একদিনের জন্যেও কোন অবকাশ সফরে নিয়ে যাবার সময় পাননি। আমার স্ত্রীর সামনে এ কথা বলায় আমি বিপদেই পড়েছিলাম।'

হেসে উঠল আহমদ মুসা ও ড. বাজ দু’জনেই। ড. বাজ বলল, ‘বিপদে পড়েছিলেন কেন, আপনার তো শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ হয়েছে।’

‘ঠিক বলেছেন। পরের উইক এন্ডেই আমি উইক এন্ডের সাথে আরও দু’দিন যোগ করে স্ত্রীকে নিয়ে ‘লেক ভ্যান’-এ গিয়েছিলাম তিনদিনের অবকাশ যাপনে। নূহ আ.- এর কিস্তির মাউন্ট আরারা দেখা আমার স্ত্রীর একটা বড় শখ ছিল।’ বলল ড. সেসুসি। তার মুখে হাসি।

‘তাহলে আল্লাহ নিশ্চয় বিশেষ আনুকুল্য দেখিয়ে আপনার মগজের সংসার-বুদ্ধির সবটুকু অংশ কেটে রাখেননি।’ বলল আহমদ মুসা মিষ্টি হেসে।

‘আল হামদুলিল্লাহ। দোয়া করুন, দয়া করে আর যেন না কাটেন। ঘরের বিপদের মত বড় বিপদ আর নেই। গত উইক এন্ডেও ড. আন্দালুসি বাসায় যাননি। এ উইক এন্ডেও যেতে পারলেন না।’ ড. সেসুসি বলল। তার মুখেও মিষ্টি হাসি।

আহমদ মুসা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠেছে। বলল দ্রুত কণ্ঠে, ‘তা ঠিক। কিন্তু ড. আন্দালুসি মিসেস আন্দালুসির অনুমতি নিয়েছেন। মিসেস আন্দালুসি শুধু অনমুতিই দেননি, বলেছেন, ‘দেশ, ধর্ম, জাতি, সর্বোপরি মানুষের প্রয়োজনে ড. আন্দালুসি যা করেন তার সাথে তিনি আছেন।’

গম্ভীর হয়ে উঠল ড. সেসুসির মুখও। বলল, ‘ম্যাডাম রসিকতা করে অনেক সময় অনেক কথা বলেন। কিন্তু তিনি একজন মডেল বিজ্ঞানীর মডেল স্ত্রী। তিনি একদিন হাসতে হাসতে আমাকে বলেছেন, ‘বেটা! বিজ্ঞানীদের স্ত্রীরা কিন্তু স্বভাবগতভাবে বিজ্ঞানের সতীন। এ ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের ও তাদের স্ত্রীদের কিন্তু সচেতন থাকা দরকার। স্ত্রীরা অবশ্যই ত্যাগ স্বীকার করবে, কিন্তু স্বামীদের তার স্বীকৃতি দেয়া উচিত, ঠিক যেমন তোমার স্যার দিয়ে থাকেন।’

ড. সেসুসি কথা শেষ করে একটু থেমে আবার বলে উঠল, ‘ম্যাডামের কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে।’

ড. সেসুসি কথা শেষ করতেই আহমদ মুসার মোবাইল বেজে উঠল।

আহমদ মুসা মোবাইল বের করে স্ক্রীনের দিকে চেয়ে জোসেফাইনের নাম দেখেই বলল, ‘মাফ করবেন, আমি কলটা রিসিভ করছি।’

বলে আহমদ মুসা সোফা থেকে উঠে ঘরের একটা প্রান্তে সরে গেল।

‘হ্যালো, জোসেফাইন। আসসালামু আলাইকুম। ভালো আছ?’ আহমদ মুসা বলল।

‘ওয়া আলাইকুম সালাম। আমরা ভাল আছি। এইমাত্র আমার সেই বান্ধবী জেফি জিনা একটা খবর দিল। মনে হয় খবরটা খুব খারাপ।’ বলল জোসেফাইন।

‘খবরটা খুব খারাপ?’ দ্রুত কণ্ঠ আহমদ মুসার।

‘আজ ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির একটা ছাত্র প্রতিনিধিদলের সাথে বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসির সাক্ষাতকার ছিল বিজ্ঞানীর সিজলির বাড়িতে। এই উপলক্ষে জেফি জিনাকেও চায়ের আমন্ত্রণের কথা বলেছিলেন বিজ্ঞানী। জেফি জিনা..........।’

জোসেফাইনের কথায় বাধা দিয়ে আহমদ মুসা মাঝখানেই বলে উঠল, ‘সেখানে কিছু ঘটেছে?’ উদ্বিগ্ন কণ্ঠ আহমদ মুসার।

‘সেখানে কিছু ঘটার কথা নয়, একটা সন্দেহজনক ঘটনার খবর দিয়েছে জেফি জিনা।’

মুহূর্তের জন্যে থামল জোসেফাইন, তারপর বলে উঠল, ‘জেফি জিনা বিজ্ঞানীর বাড়ি যাচ্ছিলেন তার গাড়িতে করে। তিনি ছাত্র প্রতিনিধি দলের দু’টি মাইক্রো দেখেছিলেন তার সামনে। তিনি দেখেন, মাইক্রো দু’টি ডানদিকে শেষ একজিট রোড পার হয়ে বিজ্ঞানীর বাড়ির দিকে কয়েক গজ এগিয়ে হঠাৎ থেমে যায়। থামাটা এত আকস্মিক ছিল যে, পেছনের মাইক্রোটা সামনের মাইক্রোকে মৃদু ধাক্কা দিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। পরক্ষণেই রাস্তার পাশ থেকে দু’জন লোক হঠাৎ বেরিয়ে এসে দুই মাইক্রোর ড্রাইভিং সিটে উঠে যায়। তার পরেই মাইক্রো দু’টি দ্রুত ঘুরে সেই ডানের একজিট রোড ধরে ডান দিকে চলে যায়। জেফি জিনা ততক্ষণে ডানর একজিট রোডটার কাছে এসে পড়েছিল। যখন মাইক্রো দু’টি ঘুরে দাঁড়িয়ে ডানের রোড ধরে চলছিল, তখন জেফি জিনা সেই দু’জন ড্রাইভারের পাশে বসা একজনকে দেখেন যাকে ছাত্র বলে তিনি চিনতে পারেন। সে ছাড়া মাত্র প্রতিনিধিদলের কাউকে গাড়ির সিটে বসা দেখতে পাননি। বিস্মিত হন জেফি

জিনা। তিনি রাস্তা থেকে একটু সরে গাড়িটা দাঁড় করান। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে টেলিফোন করে ছাত্র প্রতিনিধিদলের যে কারও টেলিফোন যোগাড়ের চেষ্টা করেন। টেলিফোন নাম্বার পেতে দেরি হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের কণাবিজ্ঞান বিভাগের ডীনের অফিস থেকে প্রতিনিধিদলের নেতা ছাত্রটির টেলিফোন নাম্বার পেয়ে যান। কিন্তু তিনি টেলিফোন করার চেষ্টা করাকালেই মাইক্রো দু'টিকে দ্রুত ফিরে আসতে দেখেন। তিনি মোবাইল রেখে ড্যাশ বোর্ড থেকে তার দুরবিনটা নিয়ে তাকান মাইক্রোর দিকে। পরে দুই মাইক্রোতে ওঠা দু'জন লোককেই ড্রাইভ করতে দেখেন। কিন্তু সিটগুলোতে বসা যাদের দেখলেন, তাদেরকে তার ছাত্র বলে মনে হয়নি। জেফি জিনার বিস্ময় সন্দেহে পরিণত হয়। তিনি দ্রুত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাওয়া প্রতিনিধি দলের নেতা ঐ ছাত্রের নাম্বারে টেলিফোন করেন। কিন্তু বারবার টেলিফোন করেও কোন উত্তর পাননি তিনি। বারবারই নো-রিপ্লাই হয়। ততক্ষণে মাইক্রো দু'টি চলে গেছে। বিজ্ঞানীর বাড়ি সেখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। কিন্তু প্রবল দ্বিধায় পড়েন তিনি। তার নিশ্চিত মনে হয়, ঐ দুই মাইক্রোতে যারা গেছে তারা ছাত্র-প্রতিনিধি দল নয়। প্রবল ........।'

'ইন্নালিল্লাহ...। স্যরি জোসেফাইন, তুমি একটু হোল্ড কর। তোমার সাথে আরও কথা বলতে হবে। আমি একটা টেলিফোন করে নেই।'

বলেই কল হোল্ড করে আহমদ মুসা দ্রুত ওয়ান টাস ডায়ালে জেনারেল মোস্তফা কামালকে টেলিফোন করল। ওপার থেকে তার কণ্ঠ পেতেই সালাম দিয়ে দ্রুত কণ্ঠে বলল, 'জেনারেল, এখনি আপনি সিজলি এলাকার পুলিশ ষ্টেশনগুলোকে দ্রুত বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসির বাড়িতে পৌছার জন্যে মুভ করতে বলুন। আর আপনি বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসিকে টেলিফোন করুন। জরুরি।'

'বুঝতে পারছি কিছু ঘটেছে। কি ঘটেছে? বাড়িতে তো আমাদের শক্তিশালী গোয়েন্দা টিম রয়েছে।' দ্রুত, উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল জেনারেল মোস্তফা।

'ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির ছাত্র-প্রতিনিধিদলের সাথে ড. আন্দালুসির একটা সাক্ষাতকার ছিল আজ সকালে। যা খবর পেলাম, তাতে মনে হচ্ছে ছাত্র প্রতিনিধিদলকে কিডন্যাপ করে শত্রু পক্ষের কেউ সেখানে গেছে।' আহমদ মুসা বলল।

‘ও গড! বুঝেছি। আমি পুলিশ ষ্টেশনগুলোতে টেলিফোন করছি। আমরা যাচ্ছি সেখানে, আপনি প্লিজ আসুন মি. খালেদ খাকান।’

বলেই ‘আসসালাম’ কথাটি কাঁপা কণ্ঠে উচ্চারণ করে কল লাইন কেটে দিল।

আহমদ মুসা জোসেফাইনের হোল্ড লাইনটা অন করে বলল দ্রুত কণ্ঠে, ‘মনে হয় সাংঘাতিক কিছু ঘটে গেছে সেখানে। তোমার বান্ধবী জেফি জিনা শেষ পর্যন্ত কোথায় ছিলেন?’

‘প্রবল দ্বিধা নিয়ে অবশেষে তিনি বিজ্ঞানীর বাড়ির দিকেই এগোন। কিন্তু বিজ্ঞানীর বাড়ির রাস্তায় যাবার আগেই দু’জন লোক এসে তার পথ রোধ করে দাঁড়ায়। বলে, বিজ্ঞানী স্যারের বাড়ি যেতে হলে পাশ লাগবে। পাশ আছে কিনা। তখন জেফি জিনা জানান, তার দাওয়াত আছে সেখানে। কিন্তু সেই লোক দুজন বলে, ছাত্র প্রতিনিধি দলের পাশ ছিল, তাঁরা গেছে। পাশ না থাকলে আপনাকে যেতে দিতে পারি না। তখন জেফি জিনা তাদেরকে বলে, তোমরা যদি সরকারি কিংবা সিকিউরিটির লোক হও, তাহলে এখনি পুলিশকে খবর দিয়ে বিজ্ঞানী স্যারের বাড়িতে যাও। তার বিপদের আশংকা করছি আমি। সেই দু’জন লোক জানায়। ভয় নেই, বাড়িতে তাঁর নিরাপত্তার জন্যে ব্যবস্থা আছে। তার পরেই জেফি জিনা আমাকে টেলিফোন করে তোমাকে সব জানাবার অনুরোধ করে তিনি দ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে গেছেন।’

থামল জোসেফাইন।

‘তোমার বান্ধবীকে ধন্যবাদ জোসেফাইন। দোয়া করো, বিজ্ঞানী স্যারের যেন কোন বিপদ না হয়। যে উদ্দেশ্যে আমি এখানে এসেছিলাম জোসেফাইন, তা সম্পাদনে বোধ হয় ব্যর্থ হলাম। রাখি। দেখি ওদিকে কি অবস্থা।’ গম্ভীর অথচ ভাঙা কণ্ঠস্বর আহমদ মুসার।

‘তুমি তো ভেঙে পড়ার জন্যে নও। আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করবেন। ইনশাআল্লাহ তুমি সফল হবে। আমি রাখছি, আসসালামু আলাইকুম।’ গভীর মমতা মাখানো কণ্ঠ জোসেফাইনের।

আহমদ মুসা মোবাইল রাখল পকেটে।

ড. বাজ ও ড. সেসুসি চোখ-মুখ ভরা উদ্বেগ নিয়ে আহমদ মুসার দিকে অপলক দৃষ্টি রেখে পাথরের মত স্থির হয়ে বসে আছে।

আহমদ মুসা তাকাল তাদের দিকে। বলল, 'শুনেছেন তো সব। খবর সত্য হলে, ধরেই নিতে হবে ড. আন্দালুসি বিপদে পড়েছেন।' গম্ভীর ও শান্ত কণ্ঠ আহমদ মুসার।

'আমি কয়েকবার স্যারের মোবাইলে টেলিফোন করলাম। রিং হচ্ছে, কিন্তু কেউ এ্যাটেন্ড করছে না। এই মোবাইল সব সময় তিনি কাছে রাখেন।' বলল ড. সেসুসি। কান্না ভেজা তার কণ্ঠ।

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল ড. বাজ। আহমদ মুসা দ্রুত কণ্ঠে বলে উঠল তার আগেই, 'আমি সিজলিতে যাচ্ছি। আপনারা অফিসে থাকুন।'

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

ড. বাজ ও ড. সেসুসি উঠে দাঁড়াল।

'স্যার, আমাদের জন্যে আর কোন নির্দেশ?' বলল ড. বাজ।

'আপনাদেরকেও সাবধান থাকতে হবে। ওরা ক্ষ্যাপা কুকুরের মত হয়ে গেছে। আসি। আসসালামু আলাইকুম।'

সালাম নিয়ে ড. বাজ সংগে সংগেই বলে উঠল, 'স্যার, আপনার নিরাপত্তা আমাদের জন্যে বেশি প্রয়োজনীয়। হেলিকপ্টার ওয়ার্কশপে, আসতে বলি?'

'না ড. বাজ। তাতে আরও দেরি হয়ে যাবে। আমাকে এখনই বেরুতে হবে। আর সিজলি তো বেশি দূরে নয়।'

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল।

সিজলিতে বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসির বাড়ির সামনে হেলিকপ্টার ল্যান্ড করতেই জেনারেল মোস্তফা হেলিকপ্টার থেকে লাফ দিয়ে নেমে ছুটল ড. আন্দালুসির বাড়ির দিকে। পুলিশ প্রধান নাজিম এরকেনের টেলিফোনে আগেই

জেনেছেন ড. আন্দালুসির বাড়িতে ৭টি লাশ ছাড়া কিছু নেই। পুলিশ প্রধানের হেলিকপ্টারটিকেও একটু দূরে দাঁড়ানো দেখল।

সিকিউরিটি কর্মীদের স্যালুটের মধ্যে দিয়ে জেনারেল মোস্তফা কামাল বিজ্ঞানী আন্দালুসির বাড়িতে ঢুকে গেল।

পুলিশ প্রধান নাজিম এরকেন জেনারেল মোস্তফা কামালকে স্বাগত জানাল। বলল, 'বেজমেন্টসহ গোটা বাড়ি সার্চ করা হয়ে গেছে স্যার। যে সাতটি লাশ পাওয়া গেছে, তার সবই আমাদের গোয়েন্দাদের।'

'ওদের লাশ পড়লেও তা তারা রেখে যায়নি নিশ্চয়?' গম্ভীর কণ্ঠ জেনারেল মোস্তফা কামালের।

'অবশ্যই।' বলল পুলিশ প্রধান।

'চলুন, আমি একটু দেখতে চাই, বাড়িটাই আমাদের পুলিশ ও গোয়েন্দাদের যারা বাইরে পাহারায় ছিল, তাদের বক্তব্য কি?'

'কোন গোলা-গুলীর শব্দ তারা পায়নি। মনে করা হচ্ছে, তাদের রিভলবার, ষ্টেনগান সবকিছুতেই সাইলেন্সার লাগানো ছিল।' বলল পুলিশ প্রধান।

'কিন্তু আমাদের লোকরা তাদের চলে যেতে দেখলো না কেন? তারা কিভাবে হাওয়া হয়ে গেল বুঝতে পারছেন কিছু?' জিজ্ঞাসা জেনারেল মোস্তফার।

'মাইক্রো দু'টি বাইরে পড়ে আছে। আমাদের লোকেরা তাদের কাউকে বাড়ি থেকে বের হতেই দেখেনি। এটা ঠিক হলে দু'টি বিকল্প থাকে, এক. তারা বাড়িতেই কোথাও লুকিয়ে আছে এবং দুই. তারা বাড়ি থেকে কোন বিকল্প পথে পালিয়েছে।' পুলিশ প্রধান বলল।

'বিকল্প পথটা কি?' জিজ্ঞাসা জেনারেল মোস্তফার।

'সুড়ঙ্গ পথ হতে পারে। কিন্তু আমরা বাড়ির একতলা ও বেজমেন্ট ইঞ্চি ইঞ্চি করে খতিয়ে দেখেছি। সুড়ঙ্গের কোন অস্তিত্ব আমরা পাইনি। আরেকটা কথা, আমরা এমনভাবে খুঁজেও কোন সুড়ঙ্গ পেলাম না, কিন্তু বাইরের লোকরা এসে তাড়াহুড়োর মধ্যে তা পেয়ে যাওয়া স্বাভাবিক নয়। সুতরাং তাদের অন্তর্ধান একটা বড় রহস্য!' পুলিশ প্রধান বলল।

'আসুন, আরেকবার আমরা দেখি বাড়িটা।'

বলে পা বাড়াল জেনারেল মোস্তফা কামাল। তার পেছনে পেছনে হাঁটতে লাগল পুলিশ প্রধান নাজিম এরকেনসহ আরও কয়েকজন পুলিশ অফিসার।

আন্ডার গ্রাউন্ড ফ্লোরসহ সব ফ্লোর ও ঘর দেখে জেনারেল মোস্তফা পুলিশ প্রধানসহ আবার ফিরে এল ড্রইংরুমে।

বসল দু'জনেই সোফায়। দু'জনের চোখে-মুখে উদ্বেগ।

পুলিশ প্রধান নাজিম এরকেন সোফায় সোজা হয়ে বসে মনে হয় কিছু শোনার জন্যে অপেক্ষা করল। তারপর বলল, 'স্যার, কোন সুড়ঙ্গ পথ যদি না থাকে, তাহলে ধরে নিতে হবে পেছনের দরজা দিয়েই তারা পালিয়েছে। পেছনের পনের গজ দূরে বাউন্ডারি ওয়াল। ওয়ালের বাইরে একটা প্রাইভেট রোড আছে। সেখানে গাড়ি রেখে এসে থাকলে এ দিক দিয়ে পালিয়ে যাবার একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়।'

সোফায় মাথা রেখে দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে দিয়ে বসেছিল জেনারেল মোস্তফা কামাল। সেও সোজা হয়ে বসল। বলল, 'দু'জন লোককে কিডন্যাপ করে ডজন খানেক লোক পেছনের বাউন্ডারি ওয়াল ডিঙিয়ে চলে যাবে, বাইরে মোতায়েন করা আমাদের কোন লোকের নজরে পড়বে না, এটা স্বাভাবিক নয় মি. নাজিম এরকেন।'

'এ যুক্তিও ঠিক স্যার, কিন্তু বাড়ির তিনদিকে বাগান থাকলেও বাড়ির পেছনে গাছ-গাছড়াটা একটু বেশি। এছাড়া আমাদের লোকদের নজর কিন্ত বাড়ির সামনের গেট ও বাড়ির এ্যাপ্রোস রোডের উপর বেশি ছিল। বাড়ির ঠিক পেছনে সরাসরি কোন পাহারা ছিল না। ওয়ালের বাইরে প্রাইভেট রোডটার উপর চোখ রাখার ব্যবস্থা ছিল। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, তাদের চোখ ছিল রাস্তাটির দু'প্রান্তের মুখে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়া বিস্তারিত কিছু বলা যাবে না।'

পুলিশ প্রধান নাজিম এরকেনের কথা শেষ হতেই ঘরে ঢুকল একজন পুলিশ অফিসার। বলল, 'জনাব খালেদ খাকান সাহেব এসেছেন।'

জেনারেল মোস্তফা কামাল ও পুলিশ প্রধান নাজিম এরকেন দু'জনেই চমক ভাঙার মত নড়ে-চড়ে বসল। যেন প্রাণ পেল তারা!

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিয়ে এস। আমরা ওনার জন্য অপেক্ষা করছি।’ বলল জেনারেল মোস্তফা কামাল পুলিশ অফিসারকে লক্ষ্য করে।

পুলিশ অফিসার চলে গেল।

কয়েক মুহূর্ত পরেই আহমদ মুসা ঘরে ঢুকল।

জেনারেল মোস্তফা কামাল ও পুলিশ প্রধান নাজিম এরকেন দু’জনই উঠে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানাল আহমদ মুসাকে। হাসি নয়, তার মুখে বেদনা যেন উথলে উঠছে! জেনারেল মোস্তফা জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে। বলল, ‘আমরা বিস্মিত, বিপর্যস্ত মি. খালেদ খাকান। আপনার জন্যে আমরা অপেক্ষা করছি।’

জেনারেল মোস্তফা কামাল আহমদ মুসাকে ধরে নিয়ে পাশের সোফায় বসাল। তারপর নিজের আসনে ফিরে গিয়ে বসতে বসতে বলল, ‘ভূতুড়ে ঘটনা ঘটেছে মি. খালেদ খাকান! বাড়ির চারদিকে পুলিশ পাহারায় ছিল। তাছাড়া বাড়ির ভেতরে কাজের লোক ও পরিবারের সদস্যের ছদ্মবেশে ছয়জন মহিলা ও দু’জন পুরুষ গোয়েন্দা অফিসারসহ সর্বমোট আটজন গোয়েন্দা কর্মী পাহারায় ছিল, অথচ দশজনের একটা দল বাড়িতে প্রাবেশ করে সাতজন গোয়েন্দা কর্মীকে খুন করে বিজ্ঞানী ও একজন গোয়েন্দা মহিলা কর্মীকে কিডন্যাপ করে হাওয়া হয়ে গেল। তারা কিভাবে পালাল তার হদিস পাওয়া যাচ্ছে না।’

‘মহিলা গোয়েন্দা অফিসারকেও হয়তো তারা বিজ্ঞানীর সাথে গ্রেফতার করেছে?’ আহমদ মুসা বলল।

‘তাই মনে হচ্ছে। কারণ তার লাশও নেই, পালাতেও পারেনি। কিন্তু অন্যদের খুন করে তাকে নিয়ে যাবে কেন?’ বলল পুলিশ প্রধান নাজিম এরকেন।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘তাকে ভুল করে নিয়ে গেছে।’

‘ভুল করে কিভাবে?’ জিজ্ঞাসা জেনারেল মোস্তফা কামালের।

‘মহিলা গোয়েন্দা অফিসারকে ওরা বিজ্ঞানীর স্ত্রী মনে করেছে এবং খুশি হয়ে তাকে তাদের প্রয়োজনের বড় অস্ত্র হিসেবে সাথে করে নিয়ে গেছে।’ বলল আহমদ মুসা।

বেদনার সাথে সাথে বিস্ময় নামল জেনারেল মোস্তফা ও নাজিম এরকেন দু’জনের চোখে-মুখেই। দ্রুত কথা বলে উঠল জেনারেল মোস্তফা কামাল। বলল,

‘বুঝেছি, স্ত্রী মনে করে নিয়ে গেছে। কারণ, বিজ্ঞানী কথা না বললে, কথা মত কাজ না করলে স্ত্রীকে লাঞ্ছিত করে, তার উপর নির্যাতন চালিয়ে বিজ্ঞানীকে ওদের কথা মতো চলতে বাধ্য করবে। এটা খুবই উদ্বেগের বিষয় মি. খালেদ খাকান।’

‘অবশ্যই উদ্বেগের খবর জনাব! কিন্তু এর মধ্যেও আনন্দের বিষয় হলো, মহিলাটি আমাদের বিজ্ঞানীর স্ত্রী নন।’

‘খবরটা আনন্দের কেন? স্ত্রী না হলেও মেয়েটিকে লাঞ্ছিত করতে পারে, সে নির্যাতিতা হতে পারে।’ বলল জেনারেল মোস্তফা কামাল।

‘আনন্দের এই কারণে যে, বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসি মেয়েটি তার স্ত্রী নয় বলার পর মেয়েটিকে গিনিপিগ বানাতে পারবে না। অন্যদিকে বিজ্ঞানীকে তাদের ইচ্ছামত কাজ করাতে ও কথা বলাতে বাড়তি কোন সুযোগ তারা পাবে না।’ আহমদ মুসা বলল।

জেনারেল মোস্তফা কামাল ও পুলিশ প্রধান নাজিম এরকেন দু’জনের মুখেই কিছু উজ্জ্বলতা ফিরে এল। বলল জেনারেল মোস্তফা কামাল, ‘ধন্যবাদ খালেদ খাকান। এখন চলুন, ঘটনার সব জায়গা আপনিও একটু দেখুন। কোন দিক দিয়ে পালাল সেটা উদ্ধার হলে আমাদেরও সামনে এগোবার একটা পথ হয়।’

‘চলুন দেখি’ বলে উঠে আহমদ মুসা পুলিশ প্রধান নাজিম এরকেনকে জিজ্ঞেস করল, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে কি যোগাযোগ হয়েছে, আটকে রাখা ছাত্র প্রতিনিধিদলের সদস্যরা মুক্ত হয়েছে, তদন্তে ওরা আমাদের কিছু সাহায্য করতে পারে?’

‘পুলিশ ছাত্র প্রতিনিধিদলকে সিজলি পাহাড় এলাকা থেকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় উদ্ধার করেছে। ওরা এখন হাসপাতালে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ হয়েছে। তারাও তদন্ত শুরু করেছে। সব রকম সহযোগিতা তারা আমাদের করবে।’ বলল পুলিশ প্রধান নাজিম এরকেন।

আহমদ মুসা একবার জেফি জিনার কথা বলতে চাইল যে, সে মূল্যবান সাহায্য করতে পারে। কিন্তু আহমদ মুসা বলল না, চেপে গেল। কারণ আহমদ মুসা ইতোমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করেছে। বাইদিবাই

বিশ্ববিদ্যালয়ে জেফি জিনা নামে কোন শিক্ষিকা বা গবেষক আছেন কিনা জিজ্ঞেস করেছিল। কিন্তু এ নামে বিশ্ববিদ্যালয়ে কেউ নেই বলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে জানান। বিষয়টা আহমদ মুসার কাছে কিছুটা জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসির সাথে তিনি পরিচিত হলেন কি করে? আর বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি কেউ না হলে তিনি ছাত্রদের সাথে চায়ের দাওয়াত পেলেন কি করে? সুতরাং বিষয়টার কূল কিনারা করতে না পেরে আহমদ মুসা জেফি জিনা সম্পর্কে পুলিশ প্রধানকে কিছু বলল না। শুধু বলল, 'মি. নাজিম এরকেন ছাত্র প্রতিনিধি দলের ছদ্মবেশে শত্রুদের যারা বিজ্ঞানীর বাড়িতে অভিযান পরিচালনা করেছিল, তাদের মধ্যে সাইন্স এন্ড টেকনোলজি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রও ছিল।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল পুলিশ প্রধানের চোখ দু'টি। বলল, 'স্যার, এটা তো অতি মূল্যবান ও সুনির্দিষ্ট ইনফরমেশন। তার নামটা জানা যাবে স্যার?'

'এখনও জানা যায়নি। আমি চেষ্টা করব জানার।' আহমদ মুসা বলল।

'আলহামদুলিল্লাহ। আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার পুলিশ বাহিনী, আপনার গোয়েন্দা বিভাগ নেই। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় তথ্য আপনার কাছেই আসছে। আমরা কৃতজ্ঞ।' বলল জেনারেল মোস্তফা কামাল।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'একটা প্রবাদ আছে, ঝড়ে বক পড়ে, ফকিরের কেরামতি বাড়ে। ব্যাপারটা এই রকমই। অকল্পনীয় সব সোর্স থেকে তথ্য আসে। এটা মনে করি আল্লাহর খাস সাহায্য। আমার কোন কেরামতি নেই।'

হাঁটতে হাঁটতেই কথা বলছিল আহমদ মুসা।

আগে আগে হাঁটছিল পুলিশ প্রধান নাজিম এরকেন।

চলছিল উপর তলায় উঠার সিঁড়ির দিকে।

আহমদ মুসা দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, 'নিহত সব লাশ এক তলায়।' তাহলে বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসি সাক্ষাৎকার দেয়ার জন্যে নিচে ড্রইংরুমে নেমেছিলেন নিশ্চয়! সুতরাং সবাই নিচে ছিলেন। সব ঘটনা এক তলায় ঘটেছে, উপর তলায় নয়। তারা পালিয়েছে হয় একতলা হয়ে না হয় আন্ডার গ্রাউন্ড কোন পথ দিয়ে। সুতরাং নিচের তলা ও আন্ডার গ্রাউন্ড ফ্লোরটাই শুধু দেখতে চাই।'

একটু থেমেই আবার বলে উঠল, ‘চলুন, পেছনের দরজা পর্যন্ত যাওয়া যাক।’

চলল সবাই। এবার আহমদ মুসা সকলের আগে।

ওপরে ওঠার সিঁড়ির ডান পাশ ঘেঁষে একটা করিডোর সামনে চলে গেছে। এ করিডোরটাই কয়েকটা বাঁক নেবার পর পেছনের দরজায় গিয়ে ঠেকেছে।

হাঁটছে আহমদ মুসা।

তার দৃষ্টি দু’পাশের দেয়াল ও মাটির দিকে। তার বিশ্বাস এ পক্ষের ৭ জন লোক নিহত। এরা একেবারেই অপ্রস্তুত ছিল, সুতরাং প্রস্তুত ও পরিকল্পিত অবস্থায় আক্রমণের সুযোগ তারা পেয়েছে। কিন্তু তাই বলে ওপক্ষ আহত-নিহত হওয়ার কোন ব্যাপার ঘটবেই না, এটা স্বাভাবিক নয়। আর যেহেতু দু’জনকে বন্দী করে তাড়াহুড়ো করে পালাতে হয়েছে, তাই তারা কিছু চিহ্ন রেখে যাবেই। তার মধ্যে রক্তের দাগ একটি।

কিন্তু আহমদ মুসা পেছনের দরজা পর্যন্ত হেঁটেও কোন চিহ্ন বা অস্বাভাবিক কিছু পেল না। দরজা খুলে বাগানটাও দেখল। কিছুই পেল না।

ফিরে এল আবার সিঁড়ির গোড়ায়।

সিঁড়ির বাম পাশ ঘেঁষে আর একটা করিডোর সামনে চলে গেছে। এ করিডোরের ডান পাশ দিয়ে বরাবর একটা দেয়াল। আর বাম পাশ দিয়ে যে দেয়াল তার মাঝ বরাবর বড় একটা দরজা।

ঐ দরজার দিকে ইংগিত করে জেনারেল মোস্তফা কামাল বলল, ‘ওটাই আন্ডার গ্রাউন্ড ফ্লোরে নামার দরজা মি. খালেদ খাকান।’

করিডোরের মেঝে ও দু’ধারের দেয়ালও পাথরের। বর্গাকৃতি পাথরের জোড়াগুলোও ধবধবে সাদা।

করিডোর ও দুই দেয়ালের উপর সূঁচ খোঁজার মত তীক্ষ দৃষ্টি ফেলে এগিয়ে চলছে আহমদ মুসা। দরজা পর্যন্ত যেতে বার দুয়েক দাঁড়াল।

দরজার সামনে এসে আবার দাঁড়াল আহমদ মুসা।

দরজা কালো রং করা ষ্টিলের স্লাইডিং ডোর। ডিজিটাল, ম্যানুয়াল দু'ভাবেই খোলা যায়। তবে ম্যানুয়াল সিষ্টেম অফ করে ডিজিটাল সিষ্টেম চালু করতে হয়। আবার ডিজিটাল সিষ্টেম অফ করে ম্যানুয়াল সিষ্টেম চালু করা যায়।

পুলিশ প্রধান এগিয়ে এসে দরজাটা খুলে দিল। সরে গেল ষ্টিলের স্লাইডিং ডোরটা দেয়ালের ভেতরে।

দরজার পরেই সিঁড়ির কাছে বড় একটা ষ্ট্যান্ডিং। ষ্ট্যান্ডিং-এর ডান ও বাম পাশ দিয়ে দু'পাশের দেয়াল ঘেঁষে দু'টি প্রশস্ত সিঁড়ি দু'দিকে নেমে গেছে।

ষ্ট্যান্ডিং-এর সামনেটা রেলিং ঘেরা। রেলিং ষ্ট্যান্ডিং-এর সামনেটা ঘুরে এসে দু'পাশে সিঁড়ির সাইড রেলিং হয়ে নিচের ফ্লোর পর্যন্ত নেমে গেছে। সিঁড়ি ও রেলিং দু'টোই ব্ল্যাক ষ্টিলের।

আহমদ মুসারা ষ্ট্যান্ডিং-এ এসে দাঁড়াল।

নীচে বড় একটা হলঘর।

সিঁড়ি বরাবর অংশটুকু ছাড়া গোটা হলঘর লাল কার্পেটে ঢাকা। চারদিক ঘিরে সোফার সারি। মাঝখানটা ফাঁকা।

গোটা হলঘরটা উজ্জ্বল আলোয় প্লাবিত। ষ্ট্যান্ডিং এর উপরে দেয়ালে দু'পাশে দু'টি লাইট। সে আলোতে কালো সিঁড়িতে সাদা প্রতিফলনের সৃষ্টি করেছে।

আহমদ মুসা সিঁড়ি দু'টোকে একবার তীক্ষ দৃষ্টিতে দেখল। ডানদিকে সিঁড়ির দ্বিতীয় ষ্টেপের রেলিং সংলগ্ন একটা জায়গায় একটু ঝুঁকে পড়ে বলল, 'আসুন, আমরা ডান পাশের এ সিঁড়ি দিয়ে নামি।'

সবাই নেমে এল নিচে।

সিঁড়ি থেকে নেমে হলঘরে ঢোকার মত প্রশস্ত একটা জায়গা দু'প্রান্তে বাদ রেখে সোফা সাজানো। সিঁড়ি প্রান্তের সোফার সারিটা সিঁড়ি যতটা প্রশস্ত তার চেয়ে কিছু বেশি জায়গা রেখে সাজানো হয়েছে।

'শত্রুরা বিজ্ঞানীকে কিডন্যাপ করে আন্ডার গ্রাউন্ড এই ঘরে নেমে এসেছিল। নিশ্চয়ই এই ঘর বা এই আন্ডার ফ্লোরের কোন স্থান দিয়ে সুড়ঙ্গ পথ আছে।'

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা তাকাল জেনারেল মোস্তফার দিকে। বলল, 'জেনারেল মোস্তফা ও জেনারেল তাহির তারিককে এই বাড়ির ইন্টারনাল, এক্সটারনাল ডিজাইন, লে-আউট, নকশা যোগাড় করতে বলেছিলাম। সেটা পেলে সহজেই বের হতো সিঁড়ি পথটা কোথায়।'

'জেনারেল তাহির আমাকে বলেছিলেন, সেসব যোগাড় হয়েছে। আমার অফিসে এই বাড়ি সংক্রান্ত ফাইলে সব আছে। বলব কি সে ফাইল আনতে?' বলল জেনারেল মোস্তফা।

'ঠিক আছে। আমরা আর একটু দেখি। না হলে ফাইলের সাহায্য নেয়া যাবে।' আহমদ মুসা বলল।

'মি. খালেদ খাকান, আপনি কিভাবে নিশ্চিত হলেন কিডন্যাপটা এই আন্ডার গ্রাউন্ড ফ্লোরে নেমে এসে তারপর হয়েছে?' জিজ্ঞাসা জেনারেল মোস্তফার।

'কিডন্যাপারদের এক বা একাধিক লোক আহত হয়েছে। কিডন্যাপ করে পালাবার সময় পথে আহতদের থেকে রক্তের ফোটা পড়েছে। কেউ যাতে তাদের অনুসরণ করার সুযোগ না পায়, এজন্যে তারা রক্তের দাগ মুছে ফেলার চেষ্টা করেছে। এর পরও করিডোরে দুই জায়গায় এবং সিঁড়িতে এক জায়গায় সামান্য পরিমাণে হলেও শুকিয়ে যাওয়া রক্তের দাগ আমি দেখেছি।' আহমদ মুসা বলল।

'এবার নিয়ে তিনবার এ পথে এলাম, আমার কিন্তু তা চোখে পড়েনি। ধন্যবাদ আপনার চোখের দৃষ্টিকে।' বলল পুলিশ প্রধান নাজিম এরকেন।

'চোখের খুব বেশি কৃতিত্ব নেই। আমি আগেই ধরে নিয়েছিলাম এ পক্ষের ৭ জনকে হত্যা করতে ওদের কাউকে না কাউকে নিশ্চয় অন্তত আহত হতেই হবে। আহতদের নিয়ে তাড়াহুড়ো করে পালাবার সময় পথে তাদের পালানোর চিহ্ন হিসেবে রক্তের দাগ ফেলে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। এই ক্লুটা খোঁজার চেষ্টার ফলেই তা পেয়ে গেছি।'

'ধন্যবাদ খালেদ খাকান। আপনি ঠিক চিন্তা করেছেন। দুর্ঘটনার সাইক্লোনের মধ্যেও আপনার মাথা ঠান্ডা থাকে। আপনি একটা দৃষ্টান্ত।' বলল জেনারেল মোস্তফা কামাল।

আহমদ মুসার নজর তখন সিঁড়ির গোড়ার দিকে। জেনারেল মোস্তফার কথা শেষ হতেই আহমদ মুসা বলল, 'জেনারেল দেখুন দু'পাশের সিঁড়ির লেভেল থেকে সোফায় সারির দূরত্ব একটু বেশি মনে হচ্ছে না?'

'হ্যাঁ, এতটা দূরত্ব না রাখলেও হতো। সিঁড়ি থেকে নেমে হলরুমে প্রবেশের জন্যে যথেষ্ট জায়গা রাখার পরও এতটা জায়গা শূন্য রেখে দেয়া 'অডলুকিং' মনে হচ্ছে।' বলল জেনারেল মোস্তফা।

'অডলুকিং লাগছে আরও এই কারণে যে এই ফাঁকা জায়গা কার্পেটে ঢেকে না দেয়ার মধ্যে কোন যুক্তি নেই। ঘরের সৌন্দর্য নষ্ট করে এটা কেন করা হয়েছে সেটা একটা বড় প্রশ্ন।' পুলিশ প্রধান নাজিম এরকেন বলল।

'এই সৌন্দর্যহানির কারণ আছে। আমার সন্দেহ সত্য হলে আন্ডার গ্রাউন্ড স্পেসটা এখানেই আছে।' বলল আহমদ মুসা।

চমকে উঠল জেনারেল মোস্তফা, পুলিশ প্রধান নাজিম এরকেনসহ উপস্থিত পুলিশ অফিসাররাও। চোখ বড় বড় করে জেনারেল মোস্তফা ও নাজিম এরকেন এক সাথেই দু'জনে বলে উঠল, 'এখানে সুড়ঙ্গ রয়েছে?'

'হ্যাঁ, এখানেই রয়েছে এবং আমরা এই যে সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছি, আমি মনে করছি এখানেই রয়েছে সুড়ঙ্গের মুখ।' বলল আহমদ মুসা।

'মি. খালেদ খাকান আপনি - ভবিষ্যত বক্তার মত কথা বলছেন। এখানে সুড়ঙ্গের মুখ আছে, কোনো চিহ্ন দেখে নিশ্চয় এ কথা বলছেন, সেটা কি?'

'আমি নিশ্চিত নই, তবে বিভিন্ন অসঙ্গতি, অস্বাভাবিকতা ও নানা কার্যকরণ থেকে এ ধারণা করছি। আপনারা দেখুন ওপাশের সিঁড়ির গোড়ায় শেষ পিলার একটাই, কিন্তু এ পাশের প্রান্তে জোড়া পিলার। মূল পিলারের সাথে আরেকটা পিলার। দ্বিতীয় পিলারটার মাথা হাতল আকারের এবং সাইড রেলিং-এর টপ বরাবর আসা ষ্টিল বার থেকে বিচ্ছিন্ন। দ্বিতীয় পিলারটার গোড়া দেখুন গাড়ির গিয়ারের মত রাবারের কভার। এ থেকে এ সিদ্ধান্ত স্বতঃসিদ্ধ হয়ে উঠে যে এর একটা ফাংশন আছে। কি সেই ফাংশন? এ প্রশ্নের উত্তরেই আমার সিদ্ধান্ত, গোপন সুড়ঙ্গের মুখ এখানেই।'

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা দুই ধাপ এগিয়ে গিয়ে শেষ দ্বিতীয় পিলারের শীর্ষ হাতল দু'হাতে ধরে জোরের সংগে নিচের দিকে টানল।

সংগে সংগে সিঁড়ির গোড়া থেকে পাশের মেঝের সোফার সারির পাশ ঘেঁষে একটা আয়তাকার অংশ সরে গেল। বেরিয়ে পড়ল আলোকজ্জল একটা সিঁড়ি মুখ।

'ও গড! আলহামদুলিল্লাহ।' জেনারেল মোস্তফা কামাল ও নাজিম এরকেন এক সাথেই বলে উঠল।

'আসুন, নামি।'

বলে সুড়ঙ্গের সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল আহমদ মুসা।

'গ্যাস মাস্ক তো লাগবে না আহমদ মুসা?' জিজ্ঞাসা জেনারেল মোস্তফার।

'না মি. জেনারেল। আমার মনে হয় সুড়ঙ্গ স্বল্প দীর্ঘই হবে এবং সুড়ঙ্গে আলো-বাতাসের ব্যবস্থা নিশ্চয় আছে।' বলল আহমদ মুসা।

'চলুন মি. খালেদ খাকান।'

বলে তাকাল জেনারেল মোস্তফা পুলিশ প্রধান নাজিম এরকেনের দিকে।

পুলিশ প্রধান তার পাশেই দাঁড়ানো সিজলি এলাকার পুলিশ কমিশনারকে তাদের সাথে যেতে বলল। আর সবাইকে সব ফরমালিটি শেষ করে লাশগুলো নিয়ে যেতে বলল। আর কয়েকজন পুলিশকে থাকতে হবে এই বাড়ির পাহারায় এ নির্দেশও দিল।

পুলিশ কমিশনার পাশের পুলিশ অফিসারদের সব নির্দেশ দিয়ে সুড়ঙ্গে নামার জন্যে সবার সাথে পা বাড়াল।

সিঁড়ি দিয়ে প্রায় পনের ফিট নামার পর একটা প্রশস্ত ল্যান্ডিং পাওয়া গেল যেখানে চার পাঁচ জন লোক এক সাথে দাঁড়ানো যায়। এখান থেকে সুড়ঙ্গের শুরু। সিঁড়িটা অন্ধকার। ল্যান্ডিং দেয়ালে রয়েছে একটা সুইচ বোর্ড। তাতে চারটি সুইচ। প্রথম সুইচের নিচে দু'টি এ্যারো চিহ্ন মুখোমুখি আর দ্বিতীয় সুইচের নিচে দু'টি এ্যারো চিহ্ন বিপরীতমুখী। তৃতীয় সুইচের নিচে একটা মশালের ছবি আর চতুর্থ সুইচের নিচে আঁকা একটা ছোট্ট হাতপাখা। জেনারেল মোস্তফারাও দেখছিল সুইচ বোর্ড।

জেনারেল মোস্তফা বলল, 'এ্যারো চিহ্নিত সুইচ দু'টি সুড়ঙ্গের সিঁড়ির মূখ বন্ধ করা ও খোলার জন্য, মশাল চিহ্নিত সুইচটা চেপে সুড়ঙ্গে আলো জ্বালাতে হবে, আর বাতাসের জন্যে চাপতে হবে পাখার সুইচ।'

আহমদ মুসা একটু হাসল। বলল, 'সুইচ চাপুন জনাব।'

জেনারেল মোস্তফা একে একে তিনটি সুইচই চাপল। কিন্তু সিঁড়ির মুখ যেমন বন্ধ হলো না, তেমনি সুড়ঙ্গে আলো জ্বললো না, বাতাসও এল না।

জেনারেল মোস্তফা কামাল তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'সুইচগুলো ওয়ার্ক করছে না মি. খালেদ খাকান।'

'সুইচগুলোর মধ্যে নির্মাতারা একটা ধাঁধাঁ তৈরি করে রেখেছে জেনারেল মোস্তফা। এবার আপনি বিপরীত এ্যারো চিহ্নিত সুইচ টিপুন এবং মশাল ও পাখা চিহ্নিত সুইচ এক সাথে চাপুন এবং মশাল ও পাখার সুইচ আগে চাপতে হবে।' আহমদ মুসা বলল।

তাই করল জেনারেল মোস্তফা।

এবার সুড়ঙ্গে আলো জ্বললো, বাতাস এল এবং সিঁড়ি মুখ বন্ধ হয়ে গেল।

বিস্মিত জেনারেল মোস্তফা বলল, 'মি. খালেদ খাকান, আপনি এই ধাঁধাঁটি কি করে ধরলেন?'

'সুইচ বোর্ডটার সবটা বিষয় আপনি ভালোভাবে দেখে বুঝার চেষ্টা করলে আপনিও ধরতে পারতেন। দেখুন, এ্যারো আঁকা সুইচ দু'টোর উপরে দু'টো সুইচের স্থান কভার করে লম্বা দু'টো এ্যারো আঁকা। বোর্ডের মত একই কালারের হওয়ার কারণে এ তীর দু'টো খুব তাড়াতাড়ি চোখে পড়ছে না। এর অর্থ, এই তীর দু'টির একটির শুরু প্রথম সুইচ থেকে, কিন্তু মাথাটা দ্বিতীয় সুইচে, আর দ্বিতীয় তীরটির শুরু দ্বিতীয় সুইচ থেকে, মাথাটা প্রথম সুইচে। এর অর্থ হলো, প্রথম সুইচটির কাজ পাওয়া যাবে দ্বিতীয় সুইচ থেকে। মশাল ও পাখা আঁকা সুইচের মাথার উপরে দেখুন বোর্ডের মত একই কালারে দু'টি সমান্তরাল সরল রেখা সুইচ দু'টোকে যুক্ত করেছে। এটার ইংগিত হলো, এ সুইচ দু'টির ফাংশন এক সাথে, সুতরাং এদের অফ, অন একই সময়ে করতে হবে।' বলল আহমদ মুসা।

‘মশাল ও পাখার সুইচ দু’টি কেন আগে চাপতে হবে, সে কথা কিন্তু বলেননি।’ জেনারেল মোস্তফা বলল।

‘মশাল ও পাখার সুইচ আগে অন না করে সিঁড়ি বন্ধের সুইচ অফ করলে সিঁড়ি মুখের দরজা বন্ধ হতো না। নির্মাতারা এটাই চেয়েছেন। কারণ সিঁড়ি মুখের দরজা আগে বন্ধ হলে সিঁড়ি মুখ থেকে আসা আলো-বাতাস বন্ধ হয়ে যেত। তাতে সুড়ঙ্গ অন্ধকারে ডুবে যেত, বাতাসও বন্ধ হতো। এই সংকট যাতে না হয়, এ জন্যে মশাল ও পাখার সুইচ দু’টি আগে অন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।’ বলল আহমদ মুসা।

জেনারেল মোস্তফা কামাল একদিকে কথা শুনছিল, অন্যদিকে তার চোখ দু’টি আঠার মত লেগেছিল সুইচ বোর্ডের উপর। আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই জেনারেল মোস্তফা বলে উঠল, ‘পেয়েছি মি. খালেদ খাকান, আগে-পরের ক্লুটা পেয়ে গেছি। এই দেখুন, মশাল ও পাখার দুই সুইচের পাশেই বোর্ডের কালো অংশে ‘২’ লেখা ও এ্যারো চিহ্নিত দুই সুইচের পাশে একইভাবে ‘১’ লেখা।

‘ধন্যবাদ জেনারেল মোস্তফা। এবার আসুন, আমরা সামনে অগ্রসর হই।’

বলে আহমদ মুসা হাঁটতে শুরু করল।

সবাই হাঁটতে শুরু করল আহমদ মুসার পেছনে পেছনে।

হাঁটা শুরু করে জেনারেল মোস্তফা বলল, ‘মি. খালেদ খাকান, আপনি গোয়েন্দা ট্রেনিং-এর অদ্বিতীয় এক শিক্ষক হতে পারেন।’

আহমদ মুসা জেনারেল মোস্তফার কথার দিকে কান না দিয়ে বলল, ‘জেনারেল, ওদের পালানোর পথ তো পেয়ে গেলাম, ওদের ধরার পথ এখন আমাদের দরকার। আইআরটি কিংবা বিজ্ঞানী কারও কোন ক্ষতি হতে দিতে আমরা পারি না। এজন্যে ওদের কোন সময় দেয়া যাবে না।’

‘ঠিক মি. খালেদ খাকান। ওরা সময় পেয়ে আমাদের দারুণ ক্ষতি হবে। কিন্তু সামনে আমি অন্ধকার দেখছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেউ না কেউ এই গ্যাং মানে ‘থ্রি জিরো’র সাথে জড়িত। আমি মনে করি এদের খুঁজে বের করাকে আমাদের

প্রথম গুরুত্ব দিতে হবে। সিদ্ধান্ত আপনাকেই নিতে হবে।' বলল জেনারেল মোস্তফা।

'এ পর্যন্ত আমি যা জানতে পেরেছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছেলে তাদের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত আছে। এই সুড়ঙ্গ দিয়ে পালানোর সময়ও ছেলেটি তাদের সাথে ছিল।' আহমদ মুসা বলল।

'এটা তো স্পেসেফিক ইনফরমেশন। তাকে লোকেট করতে পারলে আমরা অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারবো।' বলল জেনারেল মোস্তফা।

'তবে তার নামটা আমি এখনও জানতে পারিনি। চেষ্টা করছি।' আহমদ মুসা বলল।

কথা বলতে বলতে হাঁটছে তারা।

একশ' গজও তখন পার হয়নি তারা। সুড়ঙ্গ শেষ হয়ে গেল, তারা একটা সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এ এসে হাজির হলো।

আহমদ মুসা পেছনে তাকিয়ে বলল, 'আমার অনুমান ভুল না হলে আমরা বাড়ির উত্তর প্রান্তের সীমানা দেয়ালের কাছে এসে গেছি। এ দেয়ালের বাইরে রয়েছে ওয়াটার সাপ্লাই প্ল্যান্ট, তার সাথে বেশ ফাঁকা জায়গাও রয়েছে।'

'তার মানে ওরা এখানে পালাবার জন্যে গাড়ি রাখার ব্যবস্থা করেছিল। চলুন উপরে ওঠা যাক।'

'সিঁড়ির গোড়ায় ল্যান্ডিং এর দেয়ালে আগের মত সুইচ বোর্ড এবং সুইচ বোর্ডের চারটি সুইচ পাওয়া গেল। এখানেও ধাঁধাঁ সেই একই রকমের।

আহমদ মুসারা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল।

সিঁড়ি মুখ যেখানে শেষ হয়েছে, সেটা ভাঙা, পরিত্যক্ত সামগ্রী ফেলার একটা ঘর। সুড়ঙ্গ মুখ জুড়ে রয়েছে এই ঘরটির মেঝেরই একাংশ।

আর ঘরটির উত্তর দেয়ালটাই আসলে সীমান্ত দেয়াল।

আহমদ মুসা ঘরে উঠে চারদিকে একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলতেই দেখতে পেল, ঘরের উত্তর দিকের অর্থাৎ সীমান্ত দেয়ালের গায়ে দেয়াল রংয়ের একটা ষ্টিলের দরজা। এখানেও দেখল দরজার গায়ে দু'টি দেয়াল রংয়ের বোতাম। দুই বোতামের নিচে আঁকা এ্যারো চিহ্নের সেই ধাঁধাঁ।

আহমদ মুসারা দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল। বাইরে গাড়ির চাকার দাগও তাদের খুব সহজেই চোখে পড়ল।

‘আমাদের দুর্ভাগ্য, কিডন্যাপারদের এই সাফল্যের কারণ তাদের সফল পরিকল্পনা। তারা বাড়ির নকশা হাত করতে সফল হয়েছে। জেনারেল মোস্তফা, আপনারা দেখুন বাড়ির নকশা কারা বের করল, কিভাবে বের করল।’

‘অবশ্যই দেখছি। কিন্তু বলুন আমরা এগোবো কোন পথে? তাড়াতাড়ি কিছু করতে না পারলে ফলাফল ভয়াবহ হতে পারে। তুরস্কও বেকায়দায় পড়েছে ওআইসি’র অন্যান্য সদস্যের কাছে।

গম্ভীর হয়ে উঠল আহমদ মুসার মুখ। বলল, ‘এই বিপর্যয়ের ভার আমার উপরই বর্তায় বেশি।’

‘না মি. খালেদ খাকান। আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। আপনি যদি বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসিকে এখানে আনার ব্যবস্থা না করতেন, বাড়িতেই যদি তাঁকে রাখা হতো, তাহলে তার স্ত্রী ও বাচ্চারাও আজ তার সাথে বন্দী হতো। সেটা হতো অত্যন্ত ভয়াবহ। তাতে বিজ্ঞানী তাদের সব কথা মানতে বাধ্য হয়ে তাদের হাতের পুতুলে পরিণত হতে পারতেন। সবকিছু আমাদের হাতছাড়া হয়ে যেত। বিজ্ঞানী কিডন্যাপ হলেও এই মহাদুর্যোগ থেকে আল্লাহ আমাদের বাঁচিয়েছেন।’ বলল জেনারেল মোস্তফা।

আহমদ মুসার চোখে-মুখে তখন গভীর চিন্তার ছাপ। যেন কোন গভীর ভাবনায় ডুবে গেছে আহমদ মুসা।

জেনারেল মোস্তফা থামলেও আহমদ মুসা কোন কথা বলেনি।

জেনারেল মোস্তফাই আবার কথা বলল, ‘কি ভাবছেন মি. খালেদ খাকান?’

আহমদ মুসা ধীরে ধীরে মুখ তুলে জেনারেল মোস্তফার দিকে তাকাল। বলল, ‘আমাকে এখুনি যেতে হবে। চলুন ফিরে যাই, গাড়ি তো ওখানে।’

‘চলুন। কিন্তু আপনি পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে কি ভাবছেন, আমাদের আপনার কিছু বলার আছে কিনা? সময় নষ্ট করা যাবে না কিছুতেই।’

সীমানা ওয়ালের দরজা বন্ধ করে ঘর থেকে বেরিয়ে সবাই হাঁটা শুরু করেছে গাড়ির কাছে আসতে।

হাঁটতে হাঁটতে বলল আহমদ মুসা, 'জেনারেল মোস্তফা, জনাব নাজিম এরকেন, আপনারা একটু চেষ্টা করুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জ্ঞান ফিরে এলে তাদের কাছ থেকে জানুন কিডন্যাপকারীদের কাউকে তারা চেনে কিনা। নিশ্চয় তাদের সাথেরই কেউ কিডন্যাপারদের একজন বা কিডন্যাপারদের লোক। বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ করলে কোন ক্লু পাওয়া যাবেই। বাড়ির নকশা কারা পূর্ত দফতর থেকে যোগাড় করেছে, তাদের চিহ্নিত করতে পারলেও কিডন্যাপারদের কাছে পৌছা সম্ভব হবে। তাদের গাড়ি দু'টির ষ্টিয়ারিং হুইলে দু'জন ড্রাইভারের ফিংগার প্রিন্ট পাওয়া যাবে, তাও সাহায্যে আসতে পারে। আর আমিও একটা ক্লু সামনে রেখে বেরুচ্ছি। কিন্তু আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কিছুই করতে পারবো না।'

'নিশ্চয় আল্লাহ সাহায্য করবেন। আমরা ভয়ংকর এক বিপদের মধ্যে আছি। আল্লাহ আমাদের একমাত্র ভরসা।' বলল জেনারেল মোস্তফা।

'অবশ্যই।' বলল আহমদ মুসা।

তারা পৌছে গেছে গাড়ির সামনে।

আহমদ মুসা এগোল গাড়ির দিকে।

জেনারেল মোস্তফা ছুটে এল আহমদ মুসার কাছে। বলল, 'আপনি হেলিকপ্টারে যেতে পারেন মি. খালেদ খাকান।'

'দরকার নেই জেনারেল। আমার নামে বরাদ্দ হেলিকপ্টার তো অফিসে আছে। দরকার হলে নিয়ে নেব। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার পায়ের তলায় মাটি দরকার।' হেসে বলল আহমদ মুসা।

জেনারেল মোস্তফা ও নাজিম এরকেনও হেসে ফেলেছে। জেনারেল মোস্তফা বলল, 'দুঃখের মধ্যেও আপনি হাসতে পারেন, হাসাতেও পারেন মি. খালেদ খাকান। আমরা এখন হেলিকপ্টারে উঠব বটে, কিন্তু আমাদের পায়ের তলাতেও মাটি দরকার।'

‘পায়ের তলায় মাটি না থাকলে হেলিকপ্টার আকাশে উড়বে কি করে! হেলিকপ্টার আকাশে উড়ার জন্যে যেমন মাটি দরকার, তেমনি ল্যান্ড করার জন্যেও মাটি প্রয়োজন।’ হেসেই বলল আহমদ মুসা।

‘ধন্যবাদ মি. খালেদ খাকান। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন।’

‘ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।’ বলে আহমদ মুসা গাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলো।

‘ওয়া আলাইকুম সালাম।’ বলল জেনারেল মোস্তফা। সেও ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করেছে।

# ৫

ষ্টার্টারের চাবিতে হাত দিয়েছে আহমদ মুসা। চাবিটা ঘুরাবার আগেই বেজে উঠল আহমদ মুসার মোবাইল।

মোবাইল হাতে নিয়ে স্ক্রীনের দিকে তাকাল। দেখল জোসেফাইনের নাম্বার। মনে হঠাৎ যেন আনন্দের বন্যা নামল আহমদ মুসার। তার সমগ্র অন্তর যেন জোসেফাইনের টেলিফোনেরই অপেক্ষা করছিল।

টেলিফোনটা মুখের কাছে নিয়ে সালাম দিয়েই বলল, 'জোসেফাইন, তোমার টেলিফোন সাংঘাতিকভাবে আশা করছিলাম। ধন্যবাদ তোমাকে টেলিফোনের জন্যে।'

'যার বেশি দরকার সেই কিন্তু টেলিফোন করে, তুমি কিন্তু টেলিফোন করনি।'

'এই মুহূর্তে তোমার টেলিফোন যে আমি সাংঘাতিকভাবে আশা করছিলাম, সেটা বুঝলাম তোমার টেলিফোন পাওয়ার পর।'

'এটা আমাকে বিশ্বাস করতে বল?' হাসতে হাসতে বলল জোসেফাইন।

'তোমাকে বিশ্বাস করতে বলব কি, আমারও বিশ্বাস হচ্ছে না। অবচেতন মনের চাওয়া চেতন মন সব সময় জানতে পারে না।' আহমদ মুসা বলল।

'রাখ দর্শনের কথা, বল তুমি কি বলবে, না ওটাও অবচেতন মনে আছে।' বলল জোসেফাইন।

'জোসেফাইন, তোমার বান্ধবী ঠিকই সন্দেহ করেছিল, খবর ঠিক দিয়েছিল। কিন্তু আমরা বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসিকে রক্ষা করতে পারিনি। যথাসময়ে আমরা পৌছতে পারিনি, বিজ্ঞানীকে ওরা কিডন্যাপ করেছে।' আহমদ মুসা বলল।

'ইন্নালিল্লাহ! ভয়ানক দুঃসংবাদ। তুমি এখন কোথায়?' বলল জোসেফাইন।

‘বিজ্ঞানীর বাড়ির সামনে গাড়িতে উঠে বসেছি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তুমি কোথাও যাচ্ছ? তোমার সাথে কথা বলে ঠিক এটাই ভেবেছি। তোমার জন্যে আমার কাছেও জরুরি তথ্য আছে। কয়েক মিনিট আগে জেফি জিনা আমাকে টেলিফোন করেছিলেন। বিজ্ঞানী কিডন্যাপ হওয়ার বিষয় সেও নিশ্চয় জেনেছেন।’

‘ধন্যবাদ জোসেফাইন। ওঁকেই আমার এখন খুব বেশি দরকার। বলতো কি ইনফরমেশন দিয়েছেন। নিশ্চয় আগের মতই জরুরি কিছু হবে।’

‘একটা ঠিকানা দিয়েছেন এবং বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের একটা প্রতিনিধিদল তাদের রিসার্চ ফোরামের পক্ষ থেকে তার সাথে দেখা করে ড. আন্দালুসির সাথে তাদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিতে অনুরোধ করেছিল। সে সময় ছাত্রদের একজন জেমস জোসেফ তাকে ষ্টুডেন্ট রিসার্চ ফোরামের একটা ফোল্ডার দিয়েছিল। ফোল্ডারে রিসার্চ ফোরামের কাগজ-পত্রের মধ্যে একটা চিরকুট ছিল। তাতে জনৈক ডিওয়াই লিখেছিল, জেমস জোসেফ, তুমি প্রতিনিধি দলে অবশ্যই থাকবে। যে কোন মূল্যে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতেই হবে। আর নতুন ঠিকানা ফাতিহ সুলতান মোহাম্মদ বাইপাস সড়কের ৯৯ নম্বর বাড়িটা ভালো করে দেখে আসবে। ঠিকানাটা তোমার চিনে নেয়ার দরকার হবে। এই চিরকুটটা সে সময় গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি, এখন এটা তোমার কাছে অমূল্য হতে পারে, জেফি জিনা বলেছেন।’

আহমদ মুসার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সেই সাথে তার মনে দারুণ এক বিস্ময়ও। কে এই জেফি জিনা? ছাত্র প্রতিনিধি দল বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসির সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দেবার জন্যে তারা জেফি জিনার কাছে কেন গিয়েছিল? আর বিজ্ঞানী ড. আন্দালূসিই বা কোন কারণে জেফি জিনাকে দাওয়াত করেছিল ছাত্রদের সাথে? তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন গুণী অধ্যাপক হলে একটা অর্থ পাওয়া যেত। কিন্তু ঐখানে ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজিতে কোন অধ্যাপক নেই। তাহলে কে তিনি?

ভাবনায় ডুবে গিয়েছিল আহমদ মুসা। জোসেফাইনের কথা শেষ হলেও উত্তরে আহমদ মুসা কিছু বলেনি।

জোসেফাইন আবার কথা বলে উঠল, 'কি ভাবছ? কি হলো তোমার? কথা বলছ না যে?'

'হ্যাঁ, জোসেফাইন তোমার বান্ধবী যে ঠিকানা দিয়েছেন, সেটা সত্যিই অমূল্য। যে ছেলেটা জেফি জিনাকে ফোল্ডারটা দিয়েছিল, তারই নাম জেমস জোসেফ এবং অনুমান সত্য হলে বিজ্ঞানীর বাড়িতে হামলাকারী গ্রুপের সাথে তিনি তাকে দেখেছিলেন। সুতরাং এই ঠিকানা বিজ্ঞানীর উদ্ধার অভিযানের জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু আমি ভাবছিল জোসেফাইন, তোমার এই বান্ধবীটি কে? ঘটনা দেখে মনে হচ্ছে, তিনি ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির অত্যন্ত পরিচিত কেউ অথবা প্রভাবশালী ও গুণী একজন অধ্যাপক হবেন। কিন্তু জেফি জিনা নামে কোন অধ্যাপক ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। তাহলে জেফি জিনা নামটা কি নকল? আমরা কিছু বুঝতে পারছি না জোসেফাইন।'

থামল আহমদ মুসা।

'আমার কাছে তার নাম বদলাবার দরকার কি? নামটা নকল বলে আমার মনে হচ্ছে না। কিন্তু তোমার কথা ঠিক যে, সে বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় কেউ না হলে এসব ঘটনার সাথে তাকে জড়িত দেখা যাচ্ছে কেন?' বলল জোসেফাইন।

'কিন্তু ঐ নামে বিশ্ববিদ্যালয়ে কেউ নেই, এটাও তো সত্য! আমার আরেকটা বিষয় বিস্ময়কর বলে মনে হচ্ছে, বিজ্ঞানীর বাড়িতে হামলা হচ্ছে, এই খবরটা তিনি পুলিশকে না দিয়ে তোমাকে দিলেন কেন! আবার এখন এই যে, গুরুত্বপূর্ণ চিঠি ও ঠিকানার খবর কেন তোমাকে দিলেন! পুলিশকে সরাসরি দিতে পারতেন। কিন্তু ভায়া-মিডিয়া দেয়ার মত সময় খরচ অযথা করলেন কেন? সত্যি আমিও কিছু বুঝতে পারছি না। তুমি সব বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে কি কিছু মনে করবেন উনি?' আহমদ মুসা বলল।

'কি জিজ্ঞেস করব?' জোসেফাইন বলল।

'যেমন তিনি এখন কোথায়? তার সাথে আমি কথা বলতে পারি কিনা? তাঁর আরও সহযোগিতা আমাদের দরকার। তিনি যদি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় থাকেন, তাহলে আমি তো কাছেই আছি। আমি গিয়েও তার সাথে দেখা করতে পারি। ইত্যাদি বিষয় তাঁর কাছে তুলতে পার।' আহমদ মুসা বলল।

'কিন্তু এসব প্রশ্ন করে, এসব বিষয় তুলে তার নাম ও পেশার পরিচয় পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না।' বলল জোসেফাইন।

'একবার তার ঠিকানা জানলে তার সব পরিচয়ই আমরা বের করতে পারব। তার নাম, পেশা নিয়ে আজ এ সময় হঠাৎ প্রশ্ন তুলতে গেলে আমরা তাকে সন্দেহ করছি ভাবতে পারেন।'

'ঠিক বলেছ জোসেফাইন। কোনোভাবে তাঁকে হিট করা ঠিক হবে না। শুরু থেকেই তিনি আমাদের যে সহযোগিতা দিয়ে আসছেন, তা অমূল্য। হতে পারে আমাদের সন্দেহ ঠিক নয়। নাম হয়তো তার ঠিক আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক না হয়েও তার অবস্থান এমন গুরুত্বপূর্ণ যে সব জায়গায় তিনি আছেন। অথবা তিনি অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কেউ হতে পারেন। ঠিক আছে, আসলে যা আমরা চাই, সে তথ্য তিনি তো দিয়েছেনই। আবার টেলিফোন করলে বাই দি বাই কিছু আলোচনা করতে পার।' আহমদ মুসা বলল।

'ঠিক আছে, যতটা পারি করব। তোমার এখন কি প্রোগ্রাম?' বলল জোসেফাইন।

'তোমার বান্ধবী জেফি জিনা যে ঠিকানা দিয়েছেন, সেটাই এখন আমাদের টার্গেট। সে বিষয়টা জেনারেল মোস্তফাদের সাথে আলোচনা করছি।'

'ঠিক আছে, সময় আর নষ্ট করব না। আমি রাখছি। ফি আমানিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম।'

'ওয়া আলাইকুম সালাম।'

মোবাইল পকেটে রেখে তাকাল আহমদ মুসা বাইরের গাড়ি ও হেলিকপ্টারের দিকে। দেখল বাড়ির সামনে জেনারেল মোস্তফা ও পুলিশ প্রধান নাজিম এরকেন তার গাড়ির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আহমদ মুসা বুঝল, আমি কেন দেরি করছি, কেন আমি দাঁড়িয়ে আছি, এ নিয়ে তাদের মনে প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে বলেই তারা এদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আহমদ মুসা গাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে এল। সংগে সংগে জেনারেল মোস্তফা কামাল ও পুলিশ প্রধান নাজিম এরকেনও ছুটে এল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসার কাছাকাছি এসেই জেনারেল মোস্তফা জিজ্ঞেস করল, ‘কি ব্যাপার মি. খালেদ খাকান। নতুন কোন খবর অথবা কিছু ঘটেছে?’

জেনারেল মোস্তফারা আহমদ মুসার সামনে এসে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা জেনারেল মোস্তফার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল, ‘ফাতিহ সুলতান মোহাম্মাদ বাইপাস রোডের ৯৯ নম্বর বাড়িটার চারদিকে সাদা পোশাকের পুলিশ দিয়ে পাহারা বসাতে হবে এখনই। লক্ষ্য রাখতে হবে ঐ বাড়ির অথবা সেখানকার অন্য কেউ যাতে সন্দেহ না করে যে, চারদিক থেকে বাড়িটার উপর চোখ রাখা হচ্ছে। দ্বিতীয় কথা হলো, বাড়িটাতে কেউ যাক ক্ষতি নেই, কিন্তু বাড়ি থেকে কেউ বেরুলে সবার অলক্ষ্যে তাকে আটকাতে হবে।’

থামল আহমদ মুসা।

জেনারেল মোস্তফা ও নাজিম এরকেনের চোখে বিস্ময় এবং অনেক প্রশ্ন। কিন্তু আহমদ মুসা কাউকে কোন প্রশ্ন না করতে দিয়ে পুলিশ প্রধান নাজিম এরকেনকে বলল, ‘মি. এরকেন, এখনি আপনার পুলিশকে নির্দেশ দিয়ে দিন।’

‘ঠিক আছে স্যার। আমি নির্দেশ দিচ্ছি।’ বলে মোবাইল তুলে নিল হাতে। একটু সময় নিয়ে বিষদ নির্দেশ দিল।

কথা শেষ করে মোবাইল অফ করে দিয়ে নাজিম এরকেন আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, ‘কিন্তু কাকে রক্ষার জন্যে কিংবা কাকে ধরার জন্যে আমরা বাড়িটার উপর চোখ রাখব স্যার?’

‘সন্দেহ করা হচ্ছে, কিডন্যাপাররা বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসিকে নিয়ে ঐ বাড়িতে উঠেছে।’ আহমদ মুসা বলল।

বিস্ময় ও আনন্দে পাল্টে গেল জেনারেল মোস্তফা ও নাজিম এরকেনের চেহারা। মুহূর্ত কয়েক যেন তারা কথা বলতে পারল না।

প্রথম মুখ খুলল জেনারেল মোস্তফা। বলল সে, ‘মি. খালেদ খাকান, আপনার কথা আমার কাছে মহাআনন্দের আর স্বপ্নের মত লাগছে। আপনি ঠিক বলছেন তো! সত্যিই আপনি এত তাড়াতাড়ি এতদূর পর্যন্ত এগোতে পেরেছেন?’

‘আমার স্ত্রী টেলিফোন করেছিলেন। আমাদের অত্যন্ত সচেতন একজন শুভাকাংক্ষী এই তথ্য আমাদের দিয়েছেন। তাঁর দেয়া তথ্য আগেও সত্য প্রমাণিত হয়েছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আলহামদুলিল্লাহ। আমরা কোন প্রশ্ন তুলছি না মি. খালেদ খাকান। আমাদের বিস্ময় লাগছে, সোনার হরিণটা এত তাড়াতাড়ি হাতের মুঠোয় আসবে। এখন বলুন, আপনার পরিকল্পনা কি?’

‘এখন সেখানে রওয়ানা হতে চাই।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমরাও! যদি আপনি ঠিক মনে করেন।’ জেনারেল মোস্তফা বলল।

‘এ অভিযান তো আপনাদের। আমি সহযোগিতা করছি মাত্র।’ বলল আহমদ মুসা।

একটু থেমেই বলল, ‘এ অভিযানটা আমাদের হবে খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। ওরা বিপদ বুঝলে বিজ্ঞানীকে হত্যাও করতে পারে। আমাদের এ ধরনের অবস্থার শিকার হওয়া চলবে না।’

‘ঠিক মি. খালেদ খাকান! প্ল্যানটা কি হবে একটু ভাবা প্রয়োজন।’ পুলিশ প্রধান নাজিম এরকেন বলল।

‘বলুন, কি করা যায়।’ আহমদ মুসা বলল।

কথা বলল পুলিশ প্রধানই আবার। বলল, ‘দিনের বেলায় বাড়িটা গোপনে ঘিরেই রাখতে হবে, যেভাবে আপনি বলেছেন। গভীর রাতে গোপনে বাড়িতে প্রবেশ করতে হবে, যাতে ওদের এড়ানো এবং বিজ্ঞানীকে নিরাপদে উদ্ধারের ব্যবস্থা করা যায়।’

‘রাতে হলেও প্রথমে দল বেঁধে বা একাধিক লোক বাড়িতে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। বাড়িতে সার্বক্ষণিক পাহারার ব্যবস্থা নিশ্চয় তারা রেখেছে। ওরা টের পেয়ে গেলে দু’টি ঘটনা ঘটবে। এক. বিজ্ঞানীর জীবনের তারা ক্ষতি করবে অথবা দুই. বিজ্ঞানীকে নিয়ে পালিয়ে যাবার সুযোগ তারা নেবে। এ বাড়িতেও সুড়ঙ্গ পথের ব্যবস্থা নেই তা বলা যাবে না।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ঠিক মি. খালেদ খাকান! এ ধরনের কোন ঝুঁকি নেয়া যাবে না। আপনার পরামর্শ কি? আমরা তাহলে কিভাবে এগোবো?’ বলল জেনারেল মোস্তফা।

আহমদ মুসা ভাবছিল। বলল, ‘চলুন ওখানে গিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে। তবে আমি মনে করছি, দিনে কিংবা রাতে, যখনই সম্ভব হয় আমি গোপনে বাড়িটাতে প্রথম প্রবেশ করব। আমি মোবাইলে মিসকল দেব, তখন অবস্থা বুঝে আপনারা প্রবেশ করবেন।’

‘কিন্তু মি. খালেদ খাকান, ওরা খুব বিপজ্জনক লোক। ওরা কত লোক ভেতরে আছে, তাও জানা নেই। আপনি যদি বিপদে পড়েন?’ বলল জেনারেল মোস্তফা কামাল।

‘নিরাপদে বাড়িটিতে প্রবেশ করে বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসিকে নিরাপদ করা এখনকার জন্যে সবচেয়ে বড় কাজ এবং এটা আমাদের করতে হবে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘অবশ্যই মি. খালেদ খাকান। ঠিক আছে, আমরা যাত্রা করতে পারি।’ বলল জেনারেল মোস্তফা।

‘আমার মনে হয়, আমরা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন গাড়িতে যাচ্ছি। সাদা পোশাকে আরও কিছু পুলিশ। তারাও এক গাড়িতে দু’জনের বেশি যাবে না। বাড়িটার উত্তর পাশেই একটা হোটেল আছে। আর বাড়ির পেছনে, মানে পশ্চিম দিকে একটা বড় মসিজদ রয়েছে। আর দক্ষিণ পাশে একটা কম্যুনিটি হাসপাতাল। আমাদের লোকরা রাস্তার পাশে অবস্থান নেয়া ছাড়াও এই তিনটি স্থানকে কেন্দ্র করা হোক। আমরাও সেখানে অবস্থান নিতে পারি।

‘আশ্রয়ের একটা জায়গা থাকা দরকার। সেই হিসেবেও কেন্দ্রগুলো ঠিকই হয়েছে। কিন্তু আপনার লোকদের বলে দিন যেন সব রাস্তার উপর নিচ্ছিদ্র অবরোধ থাকে। আর কেউ যেন পালাতে না পারে।’ কথা শেষ করেই আহমদ মুসা বলল, ‘আসুন, আমরা যাত্রা করি।’

বলে সালাম দিয়ে আহমদ মুসা গাড়ির দিকে এগোলো।

‘ঠিক আছে মি. খালেদ খাকান, আমি বিষয়টা আবার আমাদের লোকদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।’ নাজিম এরকেন বলল।

জেনারেল মোস্তফা কামাল সালাম নিয়ে ‘গুডলাক মি. খালেদ খাকান’ বলে তার গাড়ির দিকে এগোলো।

এগোলো পুলিশ প্রধান নাজিম এরকেনও।

‘না, থামবেন না ড. আন্দালুসি। আরও একটু বিস্তারিত বলুন, সোর্ড নামে যে অস্ত্র তৈরি করেছেন, সেটা কিভাবে ফাংশন করে?’

কথাগুলো বলছিল ডেভিড ইয়াহুদ।

সে একটা চেয়ারে বসে। তার পাশের চেয়ারেই বসেছিল আইজ্যাক বেগিন।

তাদের সামনে আরেকটা কাঠের চেয়ারে বাঁধা অবস্থায় বসে আছেন বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসি। ড. আন্দালুসির পাশেই আরেকটা কাঠের চেয়ারে বাঁধা অবস্থায় আছে বিজ্ঞানীর সাথে ধরে আনা মহিলা গোয়েন্দা অফিসার।

আর তাদের সকলকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে পাঁচ ছয়জন ষ্টেনগানধারী অস্ত্র বাগিয়ে এ্যাটেনশন অবস্থায়।

ঘরটা আন্ডার গ্রাউন্ড একটা কক্ষ। বেশ বড়।

এটা ফাতিহ সুলতান মোহাম্মদ রোডের ৯৯নং বাড়িটির একটা কক্ষ।

বাড়িটা চারদিক থেকে প্রাচীর ঘেরা।

প্রাচীর ঘেরা জায়গার মাঝখানে বাড়িটা।

বাড়ির সম্মুখ ভাগের প্রাচীর রাস্তা থেকে কয়েক গজ ভেতরে। রাস্তা থেকে প্রাচীর গেট পর্যন্ত রাস্তা পাথর বিছানো। গেটে গ্রীলের দরজা। গেট থেকে একটা পাথর বিছানো পথ গাড়ি বারান্দায় গেছে। গাড়ি বারান্দা থেকে তিন ধাপের একটা সিঁড়ি পেরোলে বারান্দা। বারান্দায় সোজা এগোলেই বাড়িতে প্রবেশের মূল দরজা। ভেতরে প্রবেশ করলেই বিশাল একটা লাউঞ্জ। লাউঞ্জের চারদিকে বিভিন্ন করিডোর। লাউঞ্জের ডান দিকের দু’প্রান্ত দিয়ে দুটি সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে। সিঁড়িগুলো দেয়ালের সাথে যুক্ত হয়ে উপরে উঠে গেছে। ওপাশের সিঁড়ির গোড়ার পাশে দেয়ালে রয়েছে একটা দরজা। দরজা থেকে একটা সিঁড়ি নেমে গেছে আন্ডার গ্রাউন্ড ফ্লোরে।

আন্ডার গ্রাউন্ডে অনেকগুলো কক্ষ।

কক্ষগুলো ষ্টোর এবং শেল্টার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ঐতিহ্যবাহী সাম্রাজ্যের কেন্দ্র হিসেবে তুরষ্ক সব যুদ্ধ অথবা যুদ্ধ-ঝুঁকির মধ্যে ছিল। একমাত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছাড়া ঠান্ডাযুদ্ধ পর্যন্ত সকল যুদ্ধের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ এক পক্ষ ছিল তুরষ্ক। এজন্যে তুরষ্কে, বিশেষ করে শহরাঞ্চলের বাড়িতে আন্ডার গ্রাউন্ড শেল্টার রয়েছে।

আন্ডার গ্রাউন্ড ফ্লোরটির একটা বড় ও বিশেষ কক্ষে ড. আন্দালুসিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

ডেভিড ইয়াহুদের প্রশ্নের জবাবে ড. আন্দালুসি বলল, 'আমি বলেছি, 'সোর্ড' কোন অস্ত্র নয়, এটা আত্মরক্ষার একটা মেকানিজম। এটা কারো বিরুদ্ধে নয়, অন্যের হিংসার হাত থেকে নিজেকে রক্ষার একটা মাধ্যম মাত্র।'

'তবু এটা অস্ত্র। অস্ত্রকে যা ব্যর্থ, নিষ্ক্রিয় করে, কিংবা ধ্বংস করে, সেটা অস্ত্রের চেয়েও বড় অস্ত্র। 'সোর্ড' এ ধরনেরই একটা ভয়াবহ অস্ত্র। যাই হোক, বলুন কিভাবে এটা ফাংশন করে? এর বেসিক কনসেপ্ট কি?' ড. ডেভিড ইয়াহুদ বলল।

'নিয়ন্ত্রিত আলোক কণার একটা দেয়াল উড়ন্ত ও অগ্রসরমান যে কোন কিছুর গতিরোধ করে এবং একে পৃথিবীর আবহাওয়ার বাইরে নিয়ে ধ্বংস করে। এটাই এর কনসেপ্ট যে, ইন্টিগ্রেটেড আলোক কণার শক্তিকৃত চৌম্বকত্ব ও সর্বভেদী ক্ষমতা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অধীনে উড়ন্ত অগ্রসরমান সকল মেটালিক, নন-মেটালিক বস্তুকে আকাশেই অবরুদ্ধ এবং তার বিলয় ঘটাতে পারে।' বলল বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসি।

'তার মানে আকাশপথের আক্রমণকারী সব অস্ত্রকেই সোর্ড ধ্বংস করতে পারবে। এর অর্থ সোর্ড মানব কল্যাণের বড় অস্ত্র। তাই নয় কি?' ডেভিড ইয়াহুদ বলল।

'অবশ্যই। আমি তো বলেছি এটা আক্রমণ করার কোন অস্ত্র নয়, আত্মরক্ষার মাধ্যম।' বলল ড. আন্দালুসি।

‘তাহলে বলুন, কল্যাণের মাধ্যম যে জিনিসটা, তার উপর সকলের অধিকার আছে কিনা?’ ড. ডেভিড বলল।

ড. আন্দালুসি তাকাল পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে ডেভিড ইয়াহুদের দিকে। তার দু’চোখে অন্ধকার। সে পরিষ্কার বুঝতে পারল, ডেভিড ইয়াহুদের কথা কোন দিকে যাচ্ছে।

ভাবতে গিয়ে ডেভিড ইয়াহুদের কথার জবাব দিতে পারল না ড. আন্দালুসি।

ডেভিড ইয়াহুদই কথা বলে উঠল আবার। বলল, ‘মঙ্গলজনক আবিষ্কার কারও একার নয়। সকলেরই অধিকার আছে তা থেকে উপকার নেয়ার। সুতরাং ড. আন্দালুসি, ‘সোর্ড’-এর ফর্মূলা আমরা চাই।’

বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসির দৃষ্টি তীক্ষ্ণ এবং মুখের ভাব শক্ত হয়ে উঠেছে। বলল, ‘আমাকে কি এজন্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে?’

‘ধন্যবাদ ড. আন্দালুসি, আমাদের মনের কথা আপনিই বলে দিয়েছেন। হ্যাঁ, ড. আন্দালুসি, আপনার ঐ মহামঙ্গলের আবিষ্কারের প্রতিই আমাদের লোভ। ফর্মূলা আদায়ের জন্যেই আমরা আপনাকে তুলে নিয়ে এসেছি।’

‘বৃথাই কষ্ট করেছেন। এই ফর্মূলা আপনারা কেন, দুনিয়ার অন্য আর কাউকেই দেয়া হবে না।’ বলল ড. আন্দালুসি। শক্ত কণ্ঠ তার।

‘সাধারণভাবে সকলের জন্যে কল্যাণকর কোন কিছু যদি কেউ কুক্ষিগত করে রাখতে চায়, সেটা অন্যায়। আমরা এ অন্যায় বরদাশত করব না। আমরা কল্যাণের মহৎ লক্ষ্যেই তা ছিনিয়ে নেব। এজন্যেই আপনাকে এখানে আনা হয়েছে।’

হাসল বিজ্ঞানী আন্দালুসি। বলল, ‘আপনারা কল্যাণের লক্ষ্যে নয়, মানুষের অকল্যাণের লক্ষ্যেই এই আবিষ্কারকে হাত করতে চান। আমরা এটা হতে দেব না।’

‘দেবেন আপনারা, তা জানি বলেই তো আমরা সোর্ড-এর পিতাকে নিয়ে এসেছি। দেবেন না কেন? কল্যাণের আবিষ্কার, যেমন ধরুন কোন ওষুধ, গোটা

মানব জাতির সম্পদ। এ ধরনের কল্যাণের আবিষ্কার 'সোর্ড' কুক্ষিগত করে রাখা দুরভিসন্ধিমূলক।' বলল ডেভিড ইয়াহুদ কঠোর কণ্ঠে।

'উল্টো কথা বলছেন। 'সোর্ড'-এর ফর্মূলা আপনাদের হাত করতে চাওয়াই দুরভিসন্ধিমূলক। একটা জঘন্য উদ্দেশ্য নিয়েই আপনারা 'সোর্ড'-এর ফর্মূলাকে হাত করতে চাচ্ছেন।'

আইজ্যাক বেগিন এতক্ষণ কথা বলেনি। তার চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। বাজের মত হিংস্র শিকারীর দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে ড. আন্দালুসির দিকে। বলল, 'দুরভিসন্ধিটা কি ড. আন্দালুসি?'

'সোর্ড-এর যে ফর্মূলা, তা দিয়ে শুধু সোর্ডের মত আত্মরক্ষার অস্ত্র নয়, আক্রমণের অস্ত্রও তৈরি হতে পারে। এই আক্রমণাত্মক অস্ত্র হবে আত্মরক্ষার অস্ত্র 'সোর্ড'-এর সম্পূর্ণ বিপরীত ও ভয়াবহ। সমন্বিত ও শক্তিকৃত ফোটনের স্বনিয়ন্ত্রিত ও স্বউৎক্ষিপ্ত ফোটন-এ্যারো পৃথিবীর যে কোন স্থান থেকে যে কোন স্থানের বোমা, ক্ষেপণাস্ত্র মাইলো এবং অস্ত্র গুদাম নিজেই খুঁজে নিয়ে চোখের পলকে সেগুলোকে নিস্ক্রিয় ও নিরস্থিত করে দিতে পারে। আপনাদের দুরভিসন্ধি হলো সোর্ডের ফর্মূলা হাত করে এই অস্ত্র তৈরি করে গোটা পৃথিবী দখল করে নেয়া।'

আইজ্যাক বেগিন এবং ডেভিড ইয়াহুদের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। যেন আকাশের চাঁদ তারা হাতে পেয়ে গেছে।

তারা এতটাই অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে, তৎক্ষণাত কোন কথা তারা বলতে পারেনি।

নিরবতা ভেঙে প্রথম কথা বলল আইজ্যাক বেগিন। বলল, 'ধন্যবাদ ডক্টর, আমরা যা জেনেছি, আপনি তা নিশ্চিত করলেন। এখন আসুন, আমরা একটা ডিল করি। আমরা সোর্ডের ফর্মূলা চাই, বিনিময়ে যা চাইবেন দিতে রাজি আছি। টাকার যে অংক বলবেন, সেই অংকই আমরা দেব। বলুন ডক্টর।'

হাসল ডক্টর আন্দালুসি। বলল, 'আমি একজন বিজ্ঞানী, ব্যবসায়ী নই। তাছাড়া আমার গবেষণা মানব কল্যাণের উদ্দেশ্যে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পর্বত হিমালয়। ঐ হিমালয় পরিমাণ অর্থ দিলেও আমি মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করব না, ফর্মূলাটি আমরা দেব না।'

গম্ভীর হয়ে উঠল আইজ্যাক বেগিন ও ডেভিড ইয়াহুদের মুখ। তাদের চোখের দৃষ্টি তীব্র হয়ে উঠেছে। দু'জন দু'জনের দিকে একবার তাকাল। তারপর আইজ্যাক বেগিন চোখ ঘুরিয়ে তাকাল ড. আন্দালুসির দিকে। মুহূর্তের জন্যে একবার চোখ বুজল। তারপর চোখ খুলে বলল, 'ডক্টর, নিশ্চয় এটা আপনার শেষ কথা নয়। শেষ কথার আগে আরও অনেক কিছুই বাকি আছে। হ্যাঁ বলুন ডক্টর, আমাদের কথায় রাজি হয়ে যান, রাজি না হয়ে আপনার অন্য কোন উপায়ও নেই।'

'না, আমার শেষ কথাই বলে দিয়েছি।' বলল ডক্টর আন্দালুসি।

চোখ দু'টি জ্বলে উঠল আইজ্যাক বেগিনের। তাকাল ডেভিড ইয়াহুদের দিকে। বলল, 'আপনার মিশন শুরু করুন মি. ডেভিড। নষ্ট করার মত সময় আমাদের হাতে নেই।'

ডেভিড ইয়াহুদ তাকাল ড. আন্দালুসির দিকে। কাঠের চেয়ারটিতে হাত, পাসহ গোটা দেহ শক্ত করে বাঁধা ড. আন্দালুসির। একমাত্র মাথা ছাড়া দেহের কোন অংশ একটু নড়াবার উপায় নেই। চেয়ারের তলা থেকে একটা বৈদ্যুতিক তার বেরিয়ে কার্পেটের তলায় ঢুকে গেছে।

পাশের চেয়ারে ড. আন্দালুসির সাথে কিডন্যাপ করে আনা মহিলা গোয়েন্দা অফিসার সাইমি ইসমাইলকে চেয়ারের সাথে একইভাবে বেঁধে রাখা হয়েছে। তার চেয়ারের তলা থেকেও একটা বৈদ্যুতিক তার কার্পেটের তলায় ঢুকে গেছে।

ডেভিড ইয়াহুদ চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে তাকাল সাইমি ইসমাইলের দিকে। বলল, 'ম্যাডাম, আপনার স্বামীকে বুঝান। এটা তার গবেষণাগার কিংবা ড্রইংরুম নয়। এখানে ওঁকে সংবর্ধনা দেবার জন্যে আনা হয়নি। আনা হয়েছে ফর্মূলা আদায়ের জন্যে! এ লক্ষে যা করা দরকার আমরা তাই করব। আপনি তাঁকে বুঝান।'

গোয়েন্দা অফিসার সাইমি ইসমাইলের চোখে-মুখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে। বলল, 'আপনাদের ভুল হচ্ছে। আমরা স্বামী-স্ত্রী নই, আমি তাঁর একজন কর্মচারী, সিকিউরিটির দিকটা আমি দেখি।'

‘আপনি মিথ্যা কথা বলছেন। আমাদের বোকা সাজাতে চাইছেন। বিজ্ঞানীর সাথে তাঁর স্ত্রীকে ধরে এনেছি, সেটা বুঝেই পরিচয় গোপন করতে চাইছেন। মিথ্যা কথা বলে লাভ হবে না।’

বলেই ডেভিড ইয়াহুদ চেয়ারের একটা হুক থেকে রিমোটটা টেনে নিয়ে বলল, ‘ড. আন্দালুসি, কেউ কথা না শুনলে তাকে কথা শোনাবার ফর্মূলা আমাদের আছে। সে রকম একটা ফর্মূলাই আমরা এখন প্রয়োগ করছি। রেডি স্যার।’

ডেভিড ইয়াহুদের তর্জনি রিমোর্ট কন্ট্রোলের একটা লাল বোতামে চেপে বসল।

সংগে সংগে ঝাঁকি দিয়ে উঠল ড. আন্দালুসির দেহ। অসহনীয় যন্ত্রণাকাতর একটা আর্ত চিৎকার বেরিয়ে এল ডক্টর আন্দালুসির কণ্ঠ থেকে। ড. আন্দালুসির হাত, পা যেন সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিবাদ করছিল। শক্ত করে বাঁধা সিল্কের কর্ড দেহে কামড়ে বসেছিল। সেই কামড়ে পাতলা চামড়ার ওপরের অংশ কেটে দু’ভাগ হয়ে গেল। দু’হাত ও দু’পায়ের বাঁধনের স্থান থেকে ঝর ঝর করে রক্ত বেরিয়ে এল। তার দু’চোখ বিস্ফোরিত হয়ে ফেটে পড়ার উপক্রম হলো। যতক্ষণ ডেভিড ইয়াহুদের তর্জনি লাল বোতাম চেপেছিল, ততক্ষণ ড. আন্দালুসির আর্ত চিৎকার থামেনি।

বোতাম থেকে তর্জনি উঠল।

চিৎকার ধীরে ধীরে থেমে গেল।

তার মাথাটা চেয়ারের আশ্রয়ে ঢলে পড়ল। চোখ দু’টি তার বুজে গেছে।

আইজ্যাক বেগিন ও ডেভিড ইয়াহুদের মুখে প্রশান্তি। সাইমি ইসমাইলের চোখে মুখে আতংক। সে ভাবছে, ফর্মূলা না পেলে তারা বিজ্ঞানীকে মেরে ফেলতে পারে। অন্যদিকে ‘সোর্ড’-এর ফর্মূলা সম্পর্কে সে যা জেনেছে, তাতে এই ফর্মূলা কিছুতেই এদের হাতে দেবেন না বিজ্ঞানী। তাহলে? প্রশ্নের উত্তর ভাবতে গিয়ে কেঁপে উঠল সাইমি ইসমাইল।

‘ড. আন্দালুসি কথা বলুন। কি ভাবছেন আমাদের প্রস্তাব সম্পর্কে।’ বলল আইজ্যাক বেগিন।

ড. আন্দালুসি স্থির, নিরব। কথা বলল না, চোখও খুলল না।

আইজ্যাক বেগিনের চোখে আবার আগুন দেখা গেল। তাকাল সে ডেভিড ইয়াহুদের দিকে।

ড. ইয়াহুদের হাতের রিমোর্ট কনট্রোল আবার নড়ে উঠল। তার তর্জনি আবার সক্রিয় হলো। চেপে বসল সেই লাল বোতামে।

শক্ত বাঁধনের মধ্যেও বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসির দেহ লাফিয়ে ওঠার চেষ্টা করল। আর মুখ থেকে বেরিয়ে এল বুক ফাটা চিৎকার।

হাত পায়ের বাঁধন থেকে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল তাজা রক্ত। যন্ত্রণার অসহনীয় তীব্রতায় বড় হয়ে বের হয়ে আসা চোখ দু'টি তার যেন ফেটে যাচ্ছে।

সুইচ থেকে ডেভিড ইয়াহুদ তার তর্জনি না তোলা পর্যন্ত ড. আন্দালুসির বুকফাটা চিৎকার থামল না।

পাশের চেয়ারে বাধা সাইমি ইসমাইল চিৎকার করে উঠল, 'আপনারা এটা কি করছেন! উনি একজন বিজ্ঞানী। দয়া করে এই অমানুষিক কাজ বন্ধ করুন।'

সুইচ থেকে তর্জনি উঠল ইয়াহুদের।

চিৎকার থামলো ডক্টর আন্দালুসির। তার মাথাটা নেতিয়ে পড়ল চেয়ারে। চোখ বুজে গেছে তার। চেয়ারের হাতলে বাধা দু'হাত তার কাঁপছে। রক্ত গড়িয়ে পড়ছে চেয়ারের হাতা দিয়ে।

'ম্যাডাম, আমরা তো এই খারাপ পথে যেতে চাইনি। উনি বাধ্য করেছেন। আপনি তাকে বলুন, ফর্মূলা উনি আমাদের দিয়ে দিতে রাজি হোন।' সাইমি ইসমাইলের দিকে চেয়ে বলল ডেভিড ইয়াহুদ।

সাইমি ইসমাইল কিছু বলার আগেই ক্লান্ত, কাঁপা স্বরে ডক্টর আন্দালুসি বলল, 'ম্যাডাম সাইমি ইসমাইল, আপনি ওদের বলে দিন, কোন নির্যাতন করেই তারা যা চায় তা পাবে না। আর আমাকে ওরা মেরে ফেলতে পারবে না। কারণ তাতে তাদের সোনার ডিম তারা চিরতরে হারাবে।'

হো হো করে হেসে উঠল আইজ্যাক বেগিন। বলল, 'আপনি অস্বাভাবিক বুদ্ধিমান বিজ্ঞানী। আমাদের উদ্দেশ্য ঠিক বুঝেছেন। কিন্তু এটা বুঝেননি যে,

আমরা কতদূর পর্যন্ত যেতে পারি। যারা দৈনিক শত নির্যাতন হজম করতে পারে, তারা কিন্তু মানসিক চাপে মোমের মত গলে যায়।'

একটু থামল আইজ্যাক বেগিন।

পাশের টিপয়ের গ্লাস থেকে কয়েক ঢোক পানি খেল। তারপর একটা হাসল। বলল, 'ড. আন্দালুসি, আপনার উপর আঘাত আপনি সহ্য করেছেন, কিন্তু সাইমি ইসমাইলের উপর এ ধরনের আঘাত আপনি কতক্ষণ সহ্য করবেন? এখানেই শেষ নয়। অস্ত্র আমাদের আরও আছে। আপনার চোখের সামনে বিবস্ত্র সাইমি ইসমাইল মানুষ-হায়েনার দ্বারা লুণ্ঠিত হবে, তারপরও আপনি কতক্ষণ চুপ করে থাকবেন।'

কথা শেষ করে আইজ্যাক বেগিন তাকাল আবার ডেভিড ইয়াহুদের দিকে। বলল, 'এবার সাইমিকে কিছুটা নাচান মি. ইয়াহুদ। তারও কিছু গান আমরা শুনি।'

চমকে উঠে চোখ খুলল বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসি। তার চোখে-মুখে উদ্বেগ, যে উদ্বেগ তার চোখে-মুখে কঠিন নির্যাতনেও ফুটে উঠতে দেখা যায়নি। চেয়ারে এলিয়ে পড়া মাথা তুলে সে বলল, 'সাইমি ইসমাইল আমার স্ত্রী নন। তিনি একজন নির্দোষ মহিলা। তাঁকে আপনারা ছেড়ে দিন। দাবি আপনাদের আমার কাছে। আমাকে নিয়ে আপনারা যা ইচ্ছা তাই করুন।'

আইজ্যাক বেগিনের আবার সেই অট্টহাসি। বলল, 'আমরা ঠিক সিলেকশন করেছি। এ ওষুধেই কাজ দেবে। আগাও ডেভিড ইয়াহুদ।'

ডেভিড ইয়াহুদ রিমোর্টটা হাতে তুলে নিল আবার।

ঠিক এই সময় দরজায় নক হলো। দ্রুত নক হলো পরপর তিনবার। এর অর্থ কেউ জরুরি সাক্ষাৎ চায়।

আইজ্যাক বেগিন তাকাল ডেভিড ইয়াহুদের দিকে। ডেভিড ইয়াহুদ উঠে দাঁড়াল। দরজার দিকে ঘুর দাঁড়িয়ে বলল, 'ভেতরে এস।'

ভেতরে প্রবেশ করল জেমস জোসেফ। তার চোখে-মুখে উদ্বেগ।

'কি ব্যাপার জেমস, তোমাকে উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে! কোন খবর?' জিজ্ঞাসা ডেভিড ইয়াহুদের।

‘স্যার, বাড়িটার চারদিকে নতুন কিছু লোকের আনাগোনা দেখা যাচ্ছে। আমাদের ইনফরমাররা বলছে, লোকগুলো সাদা পোশাকে পুলিশ হতে পারে।’

ডেভিড ইয়াহুদের চেহারায় কেউ যেন এক রাশ কালি ঢেলে দিল। বলল, ‘খবরটা কি ঠিক? এটা কি করে সম্ভব? বাড়িটাতো আমরা নিয়েছি মাত্র সাত দিন হলো। আমাদের লোকরাও জানে না। আমাদের লোকরা যারা আজ এখানে এসেছে, তারাও এই বাড়িটা প্রথম দেখল। কিভাবে এটা বাইরের কেউ জানতে পারে? লোকজন যে পুলিশের তা কি করে জানা গেল?’

আমাদের লোকরা তাদের সাথে মেলা-মেশার ফলে তাদের কথাবার্তা শুনে এবং বাড়িটার উপর চোখ রাখা দেখে তাদের সন্দেহ হয়েছে। সবশেষ এইমাত্র খবর পেলাম ঐ লোকদের একজন মোবাইলে কাউকে বলছেন, একজন বিখ্যাত লোককে কিডন্যাপ করার ঘটনা ঘটেছে। উদ্ধার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের থাকতে হবে। এই কথার পর এখন আর সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।’ বলল জেমস জোসেফ।

উঠে দাঁড়াল আইজ্যাক বেগিনও।

সেও এসে দাঁড়াল ডেভিড ইয়াহুদের পাশে জেমস জোসেফের কাছে। তাদের সকলের মুখ পাণ্ডুর, ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। বলল আইজ্যাক বেগিন, ‘ধন্যবাদ জেমস, খবরটা পেতে যে আরও দেরি হয়নি এজন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। কথা শুনে মনে হচ্ছে, ওরা কমব্যাট ষ্টেজে এখনও আসেনি। নিশ্চয় ওরা কোন কিছুর অপেক্ষা করছে। এরই সুযোগ আমাদের গ্রহণ করতে হবে।’

একটু থামল আইজ্যাক বেগিন।

চোখ তুলল ডেভিড ইয়াহুদের দিকে। বলল, ‘মি. ডেভিড ইয়াহুদ, আন্ডার গ্রাউন্ড গ্যারেজে কয়টি গাড়ি আছে?’

‘দু’টি বুলেটপ্রুফ গাড়িসহ সাতটি গাড়ি আছে।’ বলল ডেভিড ইয়াহুদ।

‘লোকদের ডাক। এদের দু’জনকে বুলেটপ্রুফ গাড়িতে তোল। এ গাড়িতে আমি উঠব এবং জেমসসহ উঠবে আরও তিনজন। অন্য বুলেটপ্রুফ গাড়িতে তুমি উঠবে কয়জনকে নিয়ে বাকি ৫ টি গাড়িতে অবশিষ্ট জনশক্তি উঠবে। সাতটি গাড়ি দু’গ্রুপে ভাগ হবে। একটা গ্রুপ আপনার নেতৃত্বে যাবে দক্ষিণের পথ

ধরে। আর অন্য গ্রুপ নিয়ে আমি যাব উত্তর দিকে। এতে ওরা বিভ্রান্তিতে পড়বে এবং ওদের জনশক্তি ভাগ হয়ে যাবে। এর জন্যে তাদের গাড়িও লাগবে। তাদের এই অপ্রস্তুতি হবে আমাদের জন্যে বড় সুযোগ।'

মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ডেভিড ইয়াহুদের। বলল, 'ধন্যবাদ মি. বেগিন। এ সময়ের জন্যে এর চেয়ে ভালো পরিকল্পনা আর হয় না। কিন্তু বেরুবার মুখেই যদি আমরা আক্রমণের মুখে পড়ি!'

'সে ধরনের আক্রমণকে ব্যর্থ করে দেবার জন্যেই সাতটি গাড়ি এক সাথে বের হতে হবে। তাদের তাৎক্ষণিক ঐ আক্রমণ সাতটি গাড়িকে মোকাবিলার জন্য যথেষ্ট হবে না। তারা বাড়তি প্রস্তুতি নেবার আগেই আমরা তাদের আওতার বাইরে চলে যাব।' বলল আইজ্যাক বেগিন।

'রাস্তার দু'ধারেও ওদের লোক মোতায়েন আছে বলে মনে করা হচ্ছে।' জেমস জোসেফ বলল।

'ওসব বাধা ধর্তব্য নয় জেমস। কোন গাড়ির দৃঢ় সংকল্প গতিকে আকস্মিক চেষ্টায় মোকাবিলা সহজ নয়। ও বিষয়ে চিন্তা করার কিছু নেই।'

কথা শেষ করেই তাকাল ডেভিড ইয়াহুদের দিকে। বলল, 'আমি তৈরি হয়ে উপরে যাচ্ছি মি. ডেভিড ইয়াহুদ। এদের এখনি গাড়িতে নিন। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সবগুলো গাড়ি এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে, আমি এটাই চাই।'

বলেই আইজ্যাক বেগিন উপরে ওঠার সিঁড়ির দিকে চলল। অন্যদিকে ডেভিড ইয়াহুদ রিমোর্ট কনট্রোলের 'কল' বোতামে চাপ দিয়ে রিমোর্ট কনট্রোলকে মুখের কাছে নিয়ে বলল, 'সাতটি গাড়িই রেডি কর। তিন চার মিনিটের মধ্যেই আমরা বেরুবো। ইট ইজ অ্যান ইমারজেন্সি। ওভার।'

রিমোর্টটা মুখ থেকে সরিয়েই চারদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা স্টেনগানধারীদের উদ্দেশ্য করে বলল, 'তোমাদের দু'জন এস। এদের বাঁধন খুলে দিয়ে হাত-পা বেঁধে ফেল। মুখে ভালো করে টেপ পেস্ট করে দাও। তারপর নিয়ে চল গ্যারেজে। আর জেমস জোসেফ, ওদিকে দেখ গাড়ি ঠিক ঠাক রেডি হচ্ছে কিনা।'

ডেভিড ইয়াহুদের কথা শেষ হবার সংগে সংগে 'ইয়েস স্যার' বলে জেমস জোসেফ ছুটল গ্যারেজের দিকে।

দু'জন স্টেনগানধারী ড. আন্দালুসি ও সাইমি ইসমাইলের বাঁধন খোলা শুরু করেছে।

ডেভিড ইয়াহুদ পকেট থেকে তার মোবাইল তুলে নিল। তার তর্জনি অস্থির হলো মোবাইলের 'কী'গুলোর উপর একটা কল করার জন্যে।

# ৬

গোল্ডেন হর্নের একদম পশ্চিম প্রান্ত এলাকার ফ্লাইওভার-৩ জংশন দিয়ে ফাতিহ সুলতান মোহাম্মদ বাইপাস রোডে প্রবেশ করেছিল।

বাইপাস রোড ধরে তীরের গতিতে পূর্ব দিকে এগিয়ে চলেছে আহমদ মুসার গাড়ি।

ড্যাশ বোর্ডে রাখা মোবাইল বেজে উঠল আহমদ মুসার।

মোবাইল হাতে নিয়ে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে দেখল কলটা জেনারেল মোস্তফার কাছ থেকে এসেছে। আহমদ মুসা দ্রুত মোবাইলটা কানের কাছে তুলে নিল। এ সময় জেনারেল মোস্তফার ফোন নিশ্চয় কোন ছোট কারণে নয়। তারাও এই বাইপাস রোডের বিপরীত রোড ধরে আসছে। জেনারেল মোস্তফার ফাতিহ সুলতান মোহাম্মদ বাইপাস সড়কে প্রবেশ করেছে গোল্ডেন হর্ন এলাকার জংশন নং ৫ দিয়ে। তাদের গাড়ি ছুটে আসছে পশ্চিম দিকে। তাদের গাড়ি বাইপাস রোড ধরে ৯৯ নাম্বার বাড়ির দিকে আসছে। আসছে আহমদ মুসারাও।

মোবাইল তুলে নিয়ে সালাম দিতেই ওপ্রান্ত থেকে জেনারেল মোস্তফার দ্রুত কণ্ঠ শুনতে পেল আহমদ মুসা। বলল, 'মি. খালেদ খাকান, এই মাত্র ৯৯ নাম্বার বাড়ির এলাকা থেকে আমাদের জানাল, বাড়িটা থেকে কয়েকটি গাড়ি বেরিয়ে এসেছে। তারা পালাচ্ছে।' জেনারেল মোস্তফার উদ্বিগ্ন ও উত্তেজিত কণ্ঠ।

'ওরা কোন দিকে পালাচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'জানা যায়নি। ও কথা শেষ করতে পারেনি, তার আগেই সে গোলা-গুলীর মধ্যে পড়ে যায়। সম্ভবত তার মোবাইল পড়ে যায়, কিন্তু মোবাইল বন্ধ হয়নি। আমি তার মোবাইলেও কিছুক্ষণ গোলা-গুলীর শব্দ পেয়েছি।'

'ওদের পালাবার সম্ভাব্য রুট কি হতে পারে জেনারেল?' বলল আহমদ মুসা।

‘নিরানব্বই নাম্বার বাড়ির সামনে একটা টার্ন নেবার পাস-পয়েন্ট আছে। সুতরাং বাইপাস রোডের পূর্ব- পশ্চিম যে কোন দিকে তারা যেতে পারে।’ জেনারেল মোস্তফা বলল।

‘ঠিক আছে, আমার মনে হয় মোতায়েনরত পুলিশ ওদের গাড়িগুলোর গতিরোধ করতে চেষ্টা করেছিল এবং পুলিশ পাল্টা আক্রমণের শিকার হয়। পুলিশের ক্ষতিও হয়েছে বলে মনে হয়। এই কারণেই ওদিক থেকে ইনফরমেশন আসা বন্ধ হয়েছে।’

আহমদ মুসা কথা বলছিল এবং ইস্তাম্বুলের সিটি ম্যাপের উপরও চোখ বুলাচ্ছিল। বাইপাস রোডের ৯৯ নাম্বার বাড়ির অবস্থানটা দেখে নিয়ে বলল, ‘জেনারেল মোস্তফা, আমার মনে হয় যদি ওরা পূর্ব দিকে গিয়ে থাকে, তাহলে এখনি ওদের সাক্ষাত আপনারা পেয়ে যাবেন।’

‘ইউ আর রাইট খালেদ খাকান। আমি দেখতে পাচ্ছি ডানের ফেরার রাস্তা দিয়ে ৪টা গাড়ি জোটবদ্ধ হয়ে ছুটে আসছে। তাদের মধ্যে একটা বুলেটপ্রুফ গাড়ি। সামনেই ওদকিরে রাস্তায় যাবার টার্ন-পয়েন্ট। আমরা ওদের গতিরোধ করব। ওকে খালেদ খাকান।’

জেনারেল মোস্তফার মোবাইল অফ হয়ে গেল।

আহমদ মুসা মোবাইলটা ড্যাশ বোর্ডে রেখে দুরবিনটা তুলে নিয়ে সামনের রাস্তার উপর চোখ বুলান। আহমদ মুসার এখান থেকে ৯৯ নাম্বার বাড়িটা জেনারেল মোস্তফাদের অবস্থানের তুলনায় দ্বিগুণ দূরে। আর বাইপাসের এই দিকটা গোল্ডেন হর্নের এলাকা অতিক্রম করে শহরের পশ্চিম প্রান্তের পার্বত্য উপকণ্ঠ ঘুরে উত্তরের পার্বত্য ভূমির দিকে এগিয়ে গেছে।

আহমদ মুসা বুঝতে পারল না পলাতকরা অপেক্ষাকৃত এই নিরাপদ রুট বাদ দিয়ে পূর্ব দিকে জংশন ৫-এর দিকে গেল কেন! ওদিকটার তো দক্ষিণে গোল্ডেন হর্ন ও পূর্বে বসফরাস দ্বারা ক্লোজ হয়ে গেছে। ওরা এই সময়ে গোল্ডেন হর্ন কিংবা বসফরাসের ব্রীজে উঠার ঝুঁকি নেবে, এটায় সায় দিচ্ছে না তার মন কিছুতেই।

হঠাৎ আহমদ মুসার মনে হলো ওরা ক্যামোফ্লেজের আশ্রয় নেয়নি তো। পুলিশকে বিভ্রান্ত করার জন্যে তারা দু'ভাগ হয়ে দু'রুটকেই ব্যবহার করতে পারে। এতে পুলিশের প্রতিরোধ শক্তি দু'ভাগ হয়ে যাবে এবং দু'ভাগের কোনভাগে বিজ্ঞানীরা আছেন, এটা নিয়ে দ্বিধায় পড়বে পুলিশরা। আরেকটা কৌশলও তারা করতে পারে। সেটা হলো, দু'রুটে যাওয়া দু'ভাগের যেভাগে বিজ্ঞানীরা থাকবেন না, সেভাগে গাড়ির সংখ্যা বেশি রেখে নিরাপত্তার বেশি ব্যবস্থা করে পুলিশের দৃষ্টি সেদিকে বেশি আকৃষ্ট রেখে অন্য ভাগে বিজ্ঞানীদের নিয়ে নিরাপদে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারে। এটা ভাবতে গিয়ে জেনারেল মোস্তফাদের দিকে যাওয়া ৪টি গাড়ির জোটবদ্ধ যাত্রাকে কিছুটা প্রদর্শনী বলে মনে হলো আহমদ মুসার কাছে। আহমদ মুসার এই ভাবনা ঠিক হওয়ার অর্থ এই বাইপাসের পশ্চিমমুখী রুট ধরে ওদের কোন গাড়ি কি এগিয়ে আসছে!

এই চিন্তার সাথে সাথেই আহমদ মুসা একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। ডান পাশে ফেরার রোডটিতে যাওয়ার জন্য সামনে এসে পড়া পাস-পয়েন্টে গাড়ি ঘুরিয়ে নিল।

রং সাইড দিয়েই মাঝারি গতিতে এগিয়ে চলল আহমদ মুসার গাড়ি।

বাইপাস খুব ব্যস্ত নয়, কিন্তু গাড়ি চলাচল করছে খুব কমও নয়। এই গাড়ি চলাচলের মধ্যেই আহমদ মুসার গাড়ি ঠিক রাস্তার মাঝখান দিয়ে দ্বিধাহীন গতিতে এগিয়ে চলছে। সামনে থেকে আসা গাড়িগুলোই বরং আহমদ মুসার গাড়ির বেপরোয়া গতি দেখে তাদের গতি ঠিক করে নিচ্ছে।

এভাবে চলার তিরিশ সেকেন্ডও পার হয়নি। বাইপাস সড়কের ডানদিকের একটা সংযোগ রাস্তার থেকে একটা মোটর সাইকেল দ্রুত বেরিয়ে এল।

মোটর সাইকেলে একজন পুলিশ অফিসার। মাথায় হ্যাট, শোল্ডার ব্যান্ডে লাল রংয়ের ডবল ক্রিসেন্ট থেকে বুঝা যাচ্ছে ফাস্ট গ্রেডের একজন পুলিশ অফিসার সে।

পুলিশ অফিসারের মোটর সাইকেলটি বিদ্যুৎ গতিতে এগিয়ে আহমদ মুসার গাড়ির সামনে গিয়ে গাড়ির রাস্তা ব্লক করে দাঁড়াল।

তার মোটর সাইকেলের সামনে পর্যন্ত গিয়ে হার্ড ব্রেক কষল আহমদ মুসা।

পুলিশ অফিসার মোটর সাইকেল থেকে নেমে পড়েছে।

গাড়ি দাঁড় করিয়েই আহমদ মুসাও গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। আহমদ মুসা ঝামেলায় পড়তে চায় না। আহমদ মুসার অনুমান সত্য হলে ওদের সাথে দেখা হওয়ার খুব বেশি দেরি নেই।

গাড়ি থেকে দু'তিন ধাপ এগিয়ে পুলিশ অফিসারের মুখোমুখি হলো।

আহমদ মুসা দেখল, পুলিশ অফিসারটি পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের এক তরুণী।

'ম্যাডাম, আমি দুঃখিত। ইচ্ছা করেই এবং বাধ্য হয়েই আমাকে এই বেআইনি কাজটি করতে হয়েছে। আমার মনে হয় আমি বড় ধরনের একটা ঘটনার মুখোমুখি হতে যাচ্ছি। আমি আপনার সহযোগিতা চাই।' বলল আহমদ মুসা।

পুলিশ অফিসার মেয়েটি মাথা থেকে হ্যাট খুলল। বলল, 'আপনি অনেকগুলো কথা বলেছেন, কিন্তু কোন কথাই আপনার আইন ভাঙার পক্ষে যুক্তি নয়। আপনি দয়া করে রাস্তায় ফিরে যান।' পুলিশ অফিসার মেয়েটির কণ্ঠ শক্ত।

'আপনি আইনের কথা বলেছেন ম্যাডাম, ধন্যবাদ! কিন্তু শুরুতেই ইচ্ছে করে এবং বাধ্য হয়েই আমাকে আইন ভাঙতে হয়েছে। এখনও আমি আপনার কথা মানতে পারবো না। অনেক ইমারজেন্সি আছে, যখন আইন ব্রেক করা অপরিহার্য হয়ে যায়।' আহমদ মুসা বলল।

পুলিশ অফিসার মেয়েটি তীক্ষ্ণ, গভীর দৃষ্টিতে আহমদ মুসার দিকে তাকাল। তার মুখটি সহজ হয়ে উঠল। বলল পুলিশ অফিসার মেয়েটি, 'আমি বুঝতে পারছি, আপনার সব কথাই সত্য, কিন্তু আইন ভাঙা কেন অপরিহার্য তা আমি বুঝিনি। প্রতিদিন রাস্তার মানুষ ও যাত্রীদের অনেকে হাজারো অপরিহার্য সিচুয়েশনে পড়ে, কিন্তু ট্রাফিক আইন ভাঙার অনুমতি কেউ পায় না।'

'ঠিক বলেছেন ম্যাডাম, কিন্তু আমার বিষয়টা ন্যাশনাল ইমারজেন্সির সাথে জড়িত।'

বলে আহমদ মুসা পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে পুলিশ অফিসার মেয়েটির সামনে তুলে ধরল।

কার্ডের দিকে তাকিয়েই পুলিশ অফিসার মেয়েটি চমকে উঠল। দেখল, তুরস্কের জাতীয় নিরাপত্তা প্রধান জেনারেল মোস্তফার দস্তখতসহ প্রধানমন্ত্রীর কাউন্টার সাইন করা স্পেশাল গ্রেডের সিকিউরিটি কার্ড। এই কার্ড যার হাতে থাকে সে যা প্রয়োজন তা করার স্বাধীনতা পায় এবং সব দায় থেকে মুক্ত থাকে।

কার্ডের উপর চোখ বুলিয়েই পুলিশ অফিসার মেয়েটি এটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে স্যালুট দিল আহমদ মুসাকে বলল, 'স্যরি স্যার। আপনি এখন স্বাধীন।'

'ধন্যবাদ ম্যাডাম। নরম মনের মেয়েরাও যে কত কঠোর হতে পারে নিছক আইন রক্ষায়, তার একটা দৃষ্টান্ত আজ দেখলাম।'

আহমদ মুসা কথাটা বলে মেয়েটির দিকে মুখ তুলতেই তার চোখ মেয়েটির পেছনে সামনের রাস্তার উপরে পড়ে গেল। দেখতে পেল, তিনটি গাড়ি একই সমান্তরালে এগিয়ে আসছে। মাঝের গাড়িটি যে বুলেটপ্রুফ তা দেখেই বুঝল আহমদ মুসা। সংগে সংগে মনে পড়ল, জেনারেল মোস্তফা যে চারটি গাড়ির কথা বললেন তারও একটি বুলেটপ্রুফ ছিল। এর অর্থ এরা নিশ্চিতই কিডন্যাপারদের একটা অংশ। হতে পারে এদের সাথেই আছেন বিজ্ঞানীরা।

ওরা এসে পড়েছে।

আহমদ মুসা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল।

আহমদ মুসা দ্রুত নিজের কোট খুলে পুলিশ অফিসার মেয়েটির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'ম্যাডাম, আপনি পুলিশের টুপিটা খুলে ফেলুন। ইউনিফরমের উপর কোটটা পরে নিন। প্লিজ কারণ জিজ্ঞেস করবেন না।'

বলেই আহমদ মুসা প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে মেশিন রিভলবারটার স্পর্শ একবার নিয়ে দ্রুত একটু সরে গেল সড়কের উত্তর পাশের দিকে।

আহমদ মুসার কার ও পুলিশ অফিসার মেয়েটির মোটর সাইকেল সড়কের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল। ঐ তিনটি গাড়িও পাশাপাশি সড়কের মাঝখান দিয়ে আসছিল। অনেকটা দূরে থাকতেই তারা এটা লক্ষ্য করেই সম্ভবত

গাড়ি তিনটি সমান্তরালে সারিবদ্ধভাবেই মাঝপথ এড়িয়ে সড়কের ডানপাশে মানে উত্তর পাশের দিকে সরে গেছে।

আহমদ মুসা সড়কের উত্তর পাশের দিকে একটু সরে ছুটে আসা তিনটি গাড়ির বরাবর দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে গাড়ি তিনটি থামানোর চেষ্টা করতে লাগল। আহমদ মুসার ভাবখানা এই রকম যে, তার গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে, এজন্যে গাড়িগুলোর সে সাহায্য চাইছে। গাড়িগুলো সাধারণ হলে এই অবস্থায় তারা অবশ্যই দাঁড়াবে। আর যদি গাড়িগুলো ডেভিড ইয়াহুদের 'থ্রি জিরো'র হয় এবং বিজ্ঞানীকে যদি সাথে নিয়ে থাকে, তাহলে আহমদ মুসাকে পিষে ফেলে হলেও তারা সামনে এগোবে।

গাড়িগুলো তীরবেগে ছুটে আসছে। হাত তোলার পর ওদের গাড়ির গতি আরও বেড়েছে বলে মনে হলো আহমদ মুসার কাছে।

তখন গাড়ি ৫০ গজ দূরেও নয়।

আহমদ মুসা ভাবল, বুলেটপ্রুফ গাড়িটাকে বড় কোন ঝুঁকির মধ্যে না ফেলে তার গতি ব্লক করে বিজ্ঞানীকে অক্ষত উদ্ধার করতে হবে।

আহমদ মুসা ডান হাত দিয়ে পকেট থেকে বিদ্যুৎ বেগে মেশিন রিভলবার বের করে আনল।

ট্রিগারে আঙুল চেপেই আহমদ মুসা রিভলবার বের করে এনেছিল। বের করেই ট্রিগার চেপে রিভলবার ঘুরিয়ে আনল ডান পাশের গাড়ির বাম চাকা এবং বাম পাশের গাড়ির ডান চাকার উপর।

গুলী করেই আহমদ মুসা নিজের দেহটাকে ছুঁড়ে দিয়ে দক্ষ এক্রব্যাটের মত নিজের দেহকে হাতের উপর কয়েকবার ঘুরিয়ে নিল। কয়েকগজ ডানে গিয়ে তার দেহ মাটির উপর পড়ে স্থির হলো।

আহমদ মুসার হাতে রিভলবার উঠতে দেখে তিন গাড়ি থেকেই তাকে উদ্দেশ্য করে গুলী করা হয়েছিল। কিন্তু ততক্ষনে আহমদ মুসার দেহ তিন গাড়ির মধ্য অবস্থান থেকে সরে গিয়েছিল এবং দু'পাশের ব্রাশ ফায়ারের প্রবল শব্দে গতি পরিবর্তন করেছিল। তার ফলে তাদের গুলীও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যায়।

অন্যদিকে টায়ার বিস্ফোরণের পর দু'গাড়িই একটি বাম দিকে, অন্যটি ডান দিকে টার্ন নিয়ে একটা আরেকটার উপর আছড়ে পড়ে। মাঝের বুলেটপ্রুফ গাড়িও তাদের সাথে সামান্য ধাক্কা খেয়ে থেমে যায়। সম্ভবত ড্রাইভার পাশের দু'গাড়ির গতি দেখে শেষ মুহূর্তে ব্রেক কষতে পেরেছিল।

আহমদ মুসার দেহ মাটিতে পড়বার সংগে সংগেই সে আবার উঠে দাঁড়াল। জাম্প করার সময় সে মেশিন রিভলবারটা ছুঁড়ে দিয়েছিল এদিকে। সেটাও পাশে পড়েছিল। উঠে দাঁড়াবার সময় রিভলবারটাও কুঁড়িয়ে নিয়েছে সে।

আহমদ মুসা পুলিশ অফিসার মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দ্রুত বলল, 'ম্যাডাম, আপনি এই গাড়ির আরোহীদের একটু দেখুন, এরা যাতে আক্রমণে আসতে না পারে।'

বলেই আহমদ মুসা ছুটল বুলেটপ্রুফ গাড়িটার দিকে।

বুলেটপ্রুফ গাড়িটার ওপাশ দিয়ে দু'টি মাথা উপরে উঠতে দেখা গেল। কার মাথা স্পষ্ট হলো না আহমদ মুসার কাছে, কারণ ঐ গাড়িতে বিজ্ঞানী ডঃ আন্দালুসি এবং সাইমি ইসমাইলেরও থাকার কথা। সুতরাং রিভলবার তুলেও গুলী করতে পারলো না।

কিন্তু পরমুহূর্তেই গাড়ির উপর দিয়ে স্টেনগানের ব্যারেল দেখা গেল এবং সেই সাথে ছুটে এল গুলীবৃষ্টি।

আহমদ মুসা সংগে সংগেই বসে পড়েছিল মাটিতে এবং দু'হাঁটু বুকের সাথে গুটিয়ে নিয়ে দ্রুত ফুটবলের মত গড়িয়ে বুলেটপ্রুফ গাড়ির এপাশে চলে এল। যেহেতু ওরা গাড়ির ভিতর দিয়ে গুলী করছিল, তাই সবগুলো গুলী আহমদ মুসার মাথার অনেক উপর দিয়ে চলে যায়। আর ওরা মাথা লুকিয়ে গুলী শুরু করার কারণে আহমদ মুসার ফুটবলের মত গড়িয়ে আসাটা দেখতে পায়নি।

বুলেটপ্রুফ গাড়ির আড়াল থেকে গুলী শুরু হলে পুলিশ অফিসার মেয়েটি ছুটে গিয়ে আহমদ মুসার গাড়ির আড়াল নিয়ে গুলী করা শুরু করেছে। এই গাড়িটাই ওদের গুলী বর্ষণের টার্গেট হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আহমদ মুসা বুলেটপ্রুফ গাড়ির এপাশে আশ্রয় নেয়ার পর ধীরে ধীরে এগিয়ে গাড়ির পেছন ঘুরে এসে গাড়ির ওপাশটাকে সামনে নিয়ে আসার লক্ষ্যে এগোচ্ছিল।

আহমদ মুসা তখন গাড়ির পেছন দিকে টার্ন নিচ্ছিল। টার্ন নেবার সময় পেছন দিকে দৃষ্টি গিয়েছিল এমনিতেই। তাকিয়েই দেখতে পেল, দু'জন আহত লোক টায়ার ফেটে যাওয়ায় এক্সিডেন্টের মুখে পড়া এ পাশের গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে। মাথা থেকে নেমে আসা রক্তে তাদের মুখ ভেসে যাচ্ছে। কিন্তু তাদের হাতে রিভলবার। রিভলবার তুলছে তারা আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা তার দেহটা গাড়ির পেছনে আড়াল করেই বাম হাতে মেশিন রিভলবার থেকে গুলীবৃষ্টি করল।

ওরাও গুলী করেছিল। কিন্তু আহমদ মুসার দেহ ততক্ষনে বুলেটপ্রুফ গাড়ির পেছনে আশ্রয় নিয়ে ফেলেছে। কিন্তু ওদের কাছে তখন আড়াল নেয়ার কিছু ছিল না। ফলে ওরা আহমদ মুসার গুলী বর্ষণের অসহায় শিকারে পরিণত হয়।

গুলী বন্ধ করেই আহমদ মুসা পেছন দিক একবার দেখে নিশ্চিত হয়ে ঘুরে দাঁড়াল এবং বিড়ালের মত চলতে শুরু করল।

গাড়ির উপর দিয়ে এদের যে গুলীবর্ষণ চলছে, তাতে কিছু পরিবর্তন বুঝতে পারলো আহমদ মুসা। এখন দু'টি নয়, একটি স্টেনগান থেকে গুলী বর্ষণ চলছে। একজনের স্টেনগান থামল কেন?

সংগে সংগেই আহমদ মুসার মন বলে উঠল, আহমদ মুসার পাল্টা গুলী বর্ষণের শব্দ থেকে ওরা ধরে নিয়েছে বুলেটপ্রুফ গাড়ির এপাশে নিশ্চয় শত্রু এসে গেছে। তাই একজনকে গুলী বর্ষণে রেখে আরেকজন নিশ্চয় এদিকে আসছে।

আহমদ মুসা মেশিন রিভলবারটা ডান হাতে নিয়ে অদৃশ্য টার্গেটের দিকে স্থির করে বিড়ালের মত নিঃশব্দে দ্রুত গাড়ির পেছনটা ঘুরে গাড়ির ওপাশে টার্ন নেবার আগে গাড়ির কোণাটায় মুহূর্ত দাঁড়িয়ে ট্রিগারের উপরে তর্জনীটাকে শক্ত করে এক ঝটকায় গাড়ির ওপাশে গিয়ে দাঁড়াল।

ওপাশে ঘুরতেই চোখ পড়ল একজন শ্বেতাংগ চেহারার লোকের উপর। একেবারে মুখোমুখি তারা শ্বেতাংগ লোকটির হাতে উদ্ধত রিভলবার। কিন্তু ঘটনার

আকস্মিকতায় সে কিছুটা বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। এরই সুযোগ গ্রহণ করল আহমদ মুসার রিভলবার। আহমদ মুসার তর্জনি ট্রিগারে চেপে বসেছে। এক পশলা গুলি গিয়ে ঝাঁঝরা করে দিল শ্বেতাংগ লোকটির বুক।

গুলী করেই আহমদ মুসা তাক করল দ্বিতীয় লোকটিকে। সে গাড়ির উপর দিয়ে অদৃশ্য শত্রু লক্ষ্যে গুলী করছিল। এদিকে গুলীর শব্দ শুনে সে গুলী বন্ধ করে তার স্টেনগানটা মূহুর্তে ঘুরিযে নিয়ে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়েছিল। আহমদ মুসার রিভলবার তখন তার দিকে হাঁ করে আছে।

আহমদ মুসা দেখল, স্টেনগানধারী লোকটি একজন তরুন। আহমদ মুসার হঠাত মনে পড়ল, কিডন্যাপারদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ছাত্রকে জেফি জিনা দেখেছিল এবং ডেলিগেটদের সাথে যে ছেলেটি জেফি জিনাকে একটি ফোল্ডার দিয়েছিল যার মধ্যে ৯৯নং বাসার ঠিকানা ছিল, এই কি সেই ছাত্র।

এই চিন্তা করেই আহমদ মুসা তরুণকে লক্ষ্য করে বলল, ‘তুমি শত্রুতামূলক আচরণ না করলে আমি তোমাকে গুলী করব না। তুমি তোমার স্টেনগান ফেলে দাও। আত্নসমর্পন না কররে তোমার বাঁচার কোন সম্ভাবনা ...।‘

পুলিশ অফিসার মেয়েটি আহমদ মুসার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। এদিক থেকে তার লক্ষ্যে গুলী বন্ধ হওয়ায় এবং এদিকে গুলীর শব্দ শুনেই সে ছুটে এসেছিল।

আহমদ মুসার কথা শেষ হবার আগেই তরুণটির স্টেনগানের ব্যারেল বেপরোয়াভাবে উঠে এল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে।

আহমদ মুসার মুখের কথা থেমে গিয়েছিল। কিন্তু তার আগেই সক্রিয় হয়ে উঠেছিল তার তর্জনি। চেপে ধরেছিল মেশিন রিভলবারের ট্রিগারকে। এক পশলা গুলী গিয়ে আছড়ে পড়ল তরুণটির বুকে। স্টেনগানটি হাতে ধরেই সে টলে উঠে আছড়ে পড়ল মাটিতে।

‘ধন্যবাদ মি.....’ বলল পুলিশ মেয়েটি।

‘খালেদ খাকান।‘ আহমদ মুসা বলল।

‘ধন্যবাদ মি. খালেদ খাকান।‘ বলল পুলিশ অফিসার মেয়েটি।

‘ধন্যবাদ নয়, আমি তরুণটিকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম। আমি মনে করি, টেকনোলজি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে তরূণটি।‘ আহমদ মুসা বলল।

‘না, আমি এজন্যে ধন্যবাদ দেইনি। ধন্যবাদ দিয়েছি অবিশ্বাস্য ধরনের এই সফল অপারেশন দেখে।‘ বলল পুলিশ অফিসার মেয়েটি।

আহমদ মুসা পুলিশ মেয়েটির এই সব কথা যেন শুনতেই পায়নি।

বলল, ‘ম্যাডাম অফিসার ...।‘

আহমদ মুসার কথার মাঝখানেই পুলিশ অফিসার মেয়েটি বলে উঠল, ‘আমার নাম আয়েশা আরবাকার।‘

নাম শুনে একটু চমকে উঠে তাকাল পুলিশ অফিসার মেয়েটির দিকে আহমদ মুসা। মেয়েটির নাম শুনে জোসেফাইনের পিএস লতিফা আরবাকানের কথা মনে পড়েছে। তার সাথে এ মেয়েটির চেহারারও মিল আছে। বলল আহমদ মুসা, ‘আপনার কি লতিফা আরবাকান নামে কোন বোন আছে?’

পুলিশ অফিসার মেয়েটি চমকে উঠল। বলল, ‘হ্যাঁ আছে। আপনি কি তাকে চেনেন?’

বলে এক মুহূর্ত থেমেই আবার বলে উঠল, ‘তাহলে কি আপনি ম্যাডাম মারিয়া জোসেফাইনের স্বামী সেই খালেদ খাকান?’ বলল পুলিশ অফিসার মেয়েটি। তার চোখে-মুখে অপার বিস্ময়। সে ম্যাডাম মারিয়া জোসেফাইন ও তাঁর স্বামী খালেদ খাকান সম্পর্কে লতিফা আরবাকানের কাছে অনেক কথা শুনেছে এবং প্রতিদিনই শুনছে। সেই খালেদ খাকান ইনি!

তার চিন্তা বেশি দূর এগোতে পারলনা। তার কথা শেষ হতেই আহমদ মুসা বলল, ‘ মিস, মিসেস আয়েশা আরবাকান..।‘

এবারও পুলিশ অফিসার মেয়েটি আহমদ মুসার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলল, ‘ মিস আয়েশা আরবাকান।‘ তার মুখে হাসি।

‘হ্যাঁ মিস আযেশা আরবাকান। চলুন গাড়ির ভেতরটা দেখি। সেখানে দু’জন বন্দী থাকার কথা।‘

বলে আহমদ মুসা হাঁটতে শুরু করেছে।

পাশাপাশি আয়েশা আরবাকানও হাঁটতে শুরু করেছে। বলল, 'বন্দীর কথা বললেন, কারা এই বন্দী? এই বন্দী উদ্ধারের জন্যেই কি আপনার এই অভিযান?'

'বন্দীর একজন বিজ্ঞানী এবং আরেকজন আপনাদের লোক সাইমি ইসমাইল।' আহমদ মুসা বলল।

'বিজ্ঞানী মানে, ড. আন্দালুসি?' জিজ্ঞাসা আয়েশা আরবাকানের।

'হ্যাঁ, কিন্তু আপনি জানলেন কি করে?' আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

'আমি লতিফার কাছে শুনেছি উনি কিডন্যাপ হয়েছেন। সরকার অবশ্যই ঘটনা গোপন রাখায় কেউ জানতে পারেনি। গোয়েন্দা অফিসার সাইমি মিসিং হবার কথাটা বিভাগীয় সূত্রেই জানি।' আয়শা আরবাকান বলল।

গাড়ির দরজা খোলাই ছিল।

প্রবেশ করল দু'জনই।

গাড়ির পেছনের সিটে হাত-পা বেঁধে বসিয়ে রাখা হয়েছে বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসী এবং সাইমি ইসমাইলকে। দু'জনের মুখই চওড়া টেপ পেস্ট করে বন্ধ রাখা হয়েছে।

ড. আন্দলুসির চেহারা বিধ্বস্ত।

দু'জনেই দেখতে পেল তাদেরকে।

আহমদ মুসার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে সামনের সিটের উপরে উঠে আহমদ মুসা ড. আন্দালুসির মুখের টেপ খুলে দিল ও হাত-পায়ের বাঁধন কেটে ফেলল। আয়েশা আরবাকানও মুক্ত করল গোয়েন্দা অফিসার সাইমি ইসমাইলকে।

মুক্ত হয়েই সাইমি ইসমাইল বলল দ্রুত কণ্ঠে আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, 'আমার ভুল না হয়ে থাকলে আপনি মি. খালেদ খাকান। আপনি তাড়াতাড়ি আন্দালুসির সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করুন। উনি অসুস্থ।'

আহমদ মুসা বলল, 'মিস আয়েশা আরবাকান, মিস সাইমি ইসমাইল আপনারা ড. আন্দালুসিকে সিটে শুইয়ে দিন। প্রচুর ঠান্ডা পানি খাওয়ান তাকেঁ, তাঁকে ইলেকট্রিক শক দেয়া হয়েছে বুঝতে পারছি। গাড়ির দরজা বন্ধ করে

এয়ারকন্ডিশনকে ফ্রিজিং পয়েন্টে নিয়ে যান। আমি জেনারেল মোস্তফা এবং নাজিম এরকেনকে ডাকছি। ওরা কাছেই আছেন।'

বলে আহমদ মুসা ড. আন্দালুসিকে সালাম দিয়ে বেরিয়ে এল।

আহমদ মুসা বেরিয়ে আসার সময় ড. আন্দালুসি বলল, 'ধন্যবাদ আপনাকে মি. খালেদ খাকান। আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হবেন না্ ওরা আমার দেহকে কষ্ট দিলেও, মন আমার আগের চেয়ে হাজার গুন বেশি তাজা ও শক্তিশালী হয়েছে।'

আহমদ মুসার মুখে উজ্জ্বল হাসি ফুটে উঠেছিল। ড. আন্দালুসিকে আবার ধন্যবাদ দিয়ে বলেছিল, 'একজন মুমিনের চরিত্র এরকমই হয়ে থাকে স্যার।'

আহমদ মুসা বেরিয়ে যেতেই সাইমি ইসমাইল ও আয়েশা আরবাকান দু'জনে আহমদ মুসার নির্দেশ পালনে কাজে লেগে গেল।

ড. আন্দালুসিকে শুইয়ে দিয়ে গাড়ির রেফ্রিজারেটর বক্স থেকে পানির প্লাস্টিক বতলের ৫০০ মিলিমিটারের পানি সবটুকু খাইয়ে দিল।

তাঁর বুকটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল।

পানি খাওয়ার পর ড. আন্দালুসি বলল, 'মনে হচ্ছিল এক সাগর পানিতেও আমার তৃষ্ণা মিটবেনা। কিন্তু তোমাদের এক বোতল ঠান্ডা পানিতেই আমার তৃষ্ণা মিটে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ।'

গাড়ির এয়ারকন্ডিশন আস্তে আস্তে নিচে নামিয়ে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নিয়ে এল।

কাজ শেষ করে সাইমি ইসমাইল সিটে বসতে বসতে বলল, 'মিস আয়শা আরবাকান ধন্যবাদ আপনাকে। আপনার সৌভাগ্য যে, আপনি এই রকম একটি অপারেশনে খালেদ খাকানের সহযোগী হতে পেরেছেন।'

হাসল আযেশা আরবাকান। বলল, 'খালেদ খাকান সাহেব রং সাইডে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। তাকেঁ পাকড়াও করার জন্যে মোটর সাইকেল নিয়ে রাস্তায় প্রবেশ করেছিলাম।'

তারপর কি কি ঘটেছিল তার সব বিবরণ দিযে বলল, 'এই অপারেশনে একটাই কাজ করেছি, সেটা হোল আপনার হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে

আপনাকে মুক্ত করেছি। তবে আমি সৌভাগ্যবান। তিনটি বেপরোয়া গাড়ির বিরুদ্ধে একজন মানুষের অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য এক অপারেশনের দৃশ্য দেখলাম। তীর বেগে ছুটে আসা তিনটি গাড়ির মাত্র ৫০ গজ সামনে দাঁড়িয়ে গুলী করে দু'পাশের দু'গাড়ির মধ্যে সংঘাত ঘটিয়ে রাস্তা ব্লক করা একটা শিল্পকর্মের মত নিখুঁত ও সুন্দর কারুকাজ বলে আমার কাছে মনে হয়েছে। আমি না দেখলে এমন ঘটতে পারে তা বিশ্বাস করতামনা।'

'আমিও তার সম্পর্কে এমন সব কথাই শুনেছি। তবে তোমার মত কোন সৌভাগ্যের মুখোমুখি হইনি।

'এখন বারবার আমার একটা কথাই মনে জাগছে, সেটা হলো, আসল পরিচয় তাঁর কি? আমার বোন মিসেস খালেদ খাকানের পার্সোনাল সেক্রেটারী। আমার বোন বলেছে, মিসেস খালেদ খাকান ফরাসি এবং ফ্রান্সের রাজবংশের একজন রাজকুমারী। ফ্রান্সের রাজকুমারীকে যে বিয়ে করে সে ফ্রান্সের রাজকুমার না হলেও সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে তার চেয়ে বড় কেউ নিশ্চয় হবেন। তার সিকিউরিটি কার্ডে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিস্বাক্ষর এবং তার স্ত্রী প্রেসিডেন্টের স্ত্রীর রাস্ট্রীয় মেহমান হিসেবে তোপকাপিতে রয়েছেন। ম্যাডাম প্রেসিডেন্ট তার নিজের পিএসকে মিসেস খালেদ খাকানের পিএস হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। সুতরাং খালেদ খাকানের অতুলনীয় কাজের মতই তার অতুলনীয় কোন পরিচয় আছে।'

চোখ বুজে শুয়েছিলেন বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসি। ধীরে ধীরে চোখ খুললেন তিনি। বললেন, 'তোমাদের কথা সত্য বলেই হয়তো মি. খালেদ খাকান ভিন্ন ধরনের মানুষ। উনি প্রশংসা পছন্দ করেন না। যাক, এখান থেকে আমাদের যাওয়া প্রয়োজন। তোমরা দেখ, মি. খালেদ খাকান একা বাইরে গিয়ে কি করছেন।'

'ঠিক আছে স্যার। আমরা দেখছি ওদিকে।

বলেই দু'জন গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল।

আহমদ মুসা গাড়ি থেকে বেরিয়েই টেলিফোন করেছিল জেনারেল মোস্তফাকে। তাকে খবরটা মানে বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসির উদ্ধারের খবর দিলে জেনারেল মোস্তফা কয়েক মুহূর্ত বিস্ময় ও আনন্দে কথা বলতে পারেনি। তারা আহমদ মুসাকে ধন্যবাদ দিয়ে বলে, 'এখানে বড় ঘটনা ঘটেছে। এসে বলব। আমরা আসছি। আপনারা সাবধান থাকবেন।'

আহমদ মুসা জেনারেল মোস্তফার সাথে কথা বলার পর প্রথমেই এল আইজ্যাক বেগিনের লাশের কাছে। আহমদ মুসা তাকে 'থ্রি জিরো'র ইউরোপীয় প্রধান হিসেবে চেনেন না। নামও জানে না। কিন্তু ইউরোপীয় চেহারা ও বিজ্ঞানীর বহনকারী গাড়ির প্রধান হিসেবে দেখে নিশ্চিত হয়েছে একজন খুব বড় নেতা হবেন।

আহমদ মুসা তাকে সার্চ করল। পকেট থেকে পেল মোবাইল ও একটি মানিব্যাগ। মানিব্যাগে কিছু ডলার ও টার্কিশ লিরা পেল। তার সাথে মানিব্যাগের কয়েন কেবিনে একটি সীম এবং মাইক্রো চিপ পেল আহমদ মুসা। সীম ও চিট পকেটে রেখে মোবাইলটা হাতে নিল। মেনু বাটনে চাপ দেবার জন্যে আঙুল তুলেছিল আহমদ মুসা। আঙুল মেনু বাটন স্পর্শ করার আগেই মোবাইল নতুন মেসেজের সংকেত দিয়ে উঠল।

আহমদ মুসার আঙুল থেমে গেল।

মেসেজের সংকেত শেষ হবার পর আহমদ মুসা মেসেজটা দেখার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠল। এই সময় আসা মেসেজ নিশ্চয় জরুরি ও গুরুত্বপূণ হবে। যিনি মেসেজ পাঠিয়েছেন, তিনি জানেন না এখানে কি ঘটেছে।

মেসেজটি ওপেন করল আহমদ মুসা। মাত্র কয়েকটি শব্দের একটি মেসেজ: Change Direction to 101 Barbaros Boulevard ম্যাসেসের শেষে প্রেরকের নাম Dy লেখা। চট করেই আহমদ মুসার মনে পড়ল Dy বর্ন দুটির অর্থ David, Yahood, এই ডেভিড ইয়াহুদ তুরস্কে 'থ্রি জিরো'র প্রধান। তিনি একে মেসেজ পাঠিয়েছেন যে, গতি পরিবর্তন করে ১০১ বারবারোজ বুলেভার্ডে যাও। মানে বন্দী বিজ্ঞানীকে অন্য কোন ঠিকানায় যাবার কথা ছিল,

শেষ মুহুর্তে কোন কারণে গন্তব্য চেঞ্জ করে নতুন ঠিকানা ১০১ বারবারোজ বুলেভার্ডে যেতে বলা হয়েছে।

গাড়ির শব্দ পেল আহমদ মুসা। মোবাইলটা অফ করে পকেটে রেখে দিল। ফিরে দাঁড়িয়ে দেখল কয়েকটি পুলিশের গাড়িসহ দু'টি কার এসে দাঁড়িয়েছে। দু'টি কারের একটি থেকে নামছে জেনারেল মোস্তফা, অন্যটি থেকে পুলিশ প্রধান নাজিম এরকেন।

আহমদ মুসা এক ধাপ, দু'ধাপ করে তাদের দিকে এগোলো। আর তারা দু'জন ছুটে এল আহমদ মুসার দিকে। তারা দু'জন এক সাথেই জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে। জেনারেল মোস্তফা বলল, 'খালেদ খাকান, আপনি আমাদের সকলের গর্ব। আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন।' আর পুলিশ প্রধান বলল, 'আল্লাহ আপনাকে সবচেয়ে ভালোবাসেন, কারন আপনি সব বান্দাকে ভালোবাসেন। এজন্য বিজয় সব সময় আপনার হাতেই ধরা দেয়।' পুলিশ প্রধানের কণ্ঠ আবেগে ভারি হয়ে উঠেছে।

'চলুন দেখবেন বিজ্ঞানী ড. আন্দলুসিকে।' বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল সাইমি ইসমাইল ও আয়েশা আরবাকান। তাদের উপর চোখ পড়তেই পুলিশ প্রধান সাইমি ইসমাইলকে স্বাগত জানিয়ে আয়েশা আরবাকানকে বলল, 'তুমি এখানে কি করে?'

আয়েশা কিছু বলার আগেই আহমদ মুসা বলল, 'উনি এই অপারেশনে আমার সাথী।'

বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলল পুলিশ প্রধান।

আয়েশা প্রতিবাদে কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই আহমদ মুসা বলল, 'চলুন বিজ্ঞানী একা আছেন।'

'চলুন।' বলল জেনারেল মোস্তফা।

জেনারেল মোস্তফা ও নাজিম এরকেন ঘুরে দাঁড়িয়ে কয়েক ধাপ সামনে এগোতেই দেখতে পেল আইজ্যাক বেগিনকে। তাকে দেখেই চমকে উঠল তারা। বলল, 'ইনি তো আইজ্যাক বেগিন। ইনি ইহুদীবাদী একটি গোপন আন্দোলনের

ইউরোপীয় নেতা। কি আশ্চর্য! ইনি এস্তাম্বুলে এসেছেন এবং কিডন্যাপের সাথে ইনিও জড়িত!'

'যে গাড়িতে বিজ্ঞানী ও সাইমি ইসমাইলকে পাওয়া গেছে, সেই গাড়িতে ইনি এবং ইউনির্ভাসিটি অব টেকনোলজির একজন ছাত্র ছিল। এ দেখুন তার লাশ।' সামনের একটা লাশের দিকে ইংগিত করে বলল আহমদ মুসা।

জেনারেল মোস্তফা ও নাজিম এরকেন সামনে এগিয়ে ছাত্রটিকেও দেখল। পুলিশ প্রধান বলল, 'চিনতে পেরেছি। এর ছবি আমাদের ছাত্র অপরাধী ফাইলে রয়েছে। এর বিরুদ্ধে রহস্যজনক গতিবিধির অভিযোগ রয়েছে।'

'এখানে কতজন মারা গেছে মি. খালেদ খাকান?' জিজ্ঞাসা জেনারেল মোস্তফার।

'গুলীতে চারজন। অন্য ছয় জন গাড়ির একসিডেন্টএ?।'

বিজ্ঞান ড. আন্দলুসি যে গাড়িতে আছেন, সে গাড়ির পাশে সবাই এসে পৌছেছে।

আহমদ মুসা জেনারেল মোস্তফাদের লক্ষ্য করে বলল, 'জেনারেল মোস্তফা, কথা আদায়ের জন্যেই নিশ্চয় বিজ্ঞানীকে বৈদ্যুতিক শক দেয়া হয়েছিল। তিনি অসুস্থ। তাকে একটু ঠান্ডায় রাখা হয়েছে। আসুন তাঁর সাথে কথা বলুন।'

বলে গাড়ির দরজা খুলল আহমদ মুসা।

দরজা খুলতেই বিজ্ঞানী ড. আন্দলুসি উঠে বসছিলেন।

'স্যার, আপনি শুয়ে থাকুন তুরস্কের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা প্রধান জেনারেল মোস্তফা এবং পুলিশ প্রধান জনাব নাজিম এরকেন এসেছেন। তারা একটু দেখা করবেন আপনার সাথে।'

জেনারেল মোস্তফা ও নাজিম এরকেন গাড়ির ভেতর দিকে এগোলো। আহমদ মুসা সরে দাঁড়িয়ে তাদের জন্য বসার জায়গা করে দিয়ে বলল, 'আপনারা তার সাথে বসুন। আমি আসছি।'

বলে আহমদ মুসা সরে এল।

একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল সাইমি ইসমাইল ও আয়েশা আরবাকান। আহমদ মুসা ওদের লক্ষ্য করে বলল, 'পুলিশ এখনি লাশগুলোকে নিয়ে যাবে।

আপনার আইজ্যাক বেগিন বাদে অন্য নিহতদের পকেটগুলো সার্চ করে দেখুন। পকেটের কাগজপত্র ও মোবাইলগুলো কাজে লাগতে পারে।'

'ঠিক স্যার। ধন্যবাদ, আমরা দেখছি।'

বলে ওরা দু'জন কাজে লেগে গেল।

আহমদ মুসা দাঁড়াল গাড়ি ঠেস দিয়ে। তার মাথায় একটা চিন্তা অবিরাম ঘুরপাক খাচ্ছে। সেটা হলো, তাদের অপারেশনের একটা মধ্যবর্তী সময় তারা গন্তব্য পরিবর্তন করল কেন? হঠাত তার মনে হলো, ডেভিড ইয়াহুদের ওখানে কি ঘটেছে তার মধ্যে এ প্রশ্নের উত্তর নিহিত থাকতে পারে, কারণ ডেভিড ইয়াহুদই গন্তব্য চেঞ্জ করেছেন।

জেনারেল মোস্তফা ও নাজিম এরকেন এল এ সময়। আহমদ মুসা জেনারেল মোস্তফাকে লক্ষ্য করে বলল, 'জেনারেল মোস্তফা, আপনি টেলিফোনে বলছিলেন যে, ওখানে কি একটা নাকি ঘটেছে?'

'হ্যাঁ, সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে খালেদ খাকান। এখনি ছুটতে হবে প্রধানমন্ত্রীর ব্রিফিং-এ। আমাদের অসুস্থ প্রধান বিচারপতি মিলিটারি এ্যাম্বুলেন্সে সামরিক হাসপাতালে যাচ্ছিলেন, ওরা পালানোর পথে এই এ্যাম্বুলেন্স কিডন্যাপ করেছে। দু'তিন মিনিট পরেই ফাতিহ সুলতান মোহাম্মদ বাইপাশ সড়কের ওপ্রান্তের জংশন এলাকা থেকে খবর এল, সেখানে রাস্তার পাশে মিলিটারী এ্যাম্বুলেন্সকে পড়ে থাকতে দেখা গেছে। 'ওরা মানে এই আইজ্যাক বেগিনের কিডন্যাপাররা?' আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

'হ্যাঁ ওদের চারটি গাড়ির তিনটিই আমাদের পুলিশের হাতে পড়ে। ধরা পড়া নিশ্চিত যেনে ওরাই ওদের গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে উড়িয়ে দেয় এবং সবাই মারা পড়ে। কিন্তু বুলেটপ্রূফ গাড়িটা আমাদের তিনজন পুলিশের লাশের উপর দিযে পালাতে সক্ষম হয়। ওরাই কিডন্যাপ করে এ্যাম্বুলেন্সটিকে।' জেনারেল মোস্তফা বলল।

'এ্যাম্বুলেন্সকে কিডন্যাপ করল কেন? ওরা কি জানত যে, এ্যাম্বুলেন্সে প্রধান বিচারপতি আছেন?' বলল আহমদ মুসা।

‘না, ওরা বুলেটপ্রুফ গাড়ি ছেড়ে দিয়ে এ্যাম্বুলেন্স নিয়েছিল। জংশন-৬ এলাকা নিরাপদে পার হবার জন্যেই তারা এ্যাম্বুলেন্সের কভার নিয়েছিল।‘ জেনারেল মোস্তফা বলল।

‘বুঝলাম, প্রধান বিচারপতির পরিচয় পাবার পর তারা তাকেঁ কিডন্যাপ করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না তাঁকে দিয়ে কি করবে ওরা? ড. আন্দালুসীকে কিডন্যাপ করার সুস্পষ্ট কারণ রয়েছে। তাঁর ক্ষেত্রে তো এরকম কোন কারণ নেই।’ বলল আহমদ মুসা।

জেনারেল মোস্তফা বলল, ‘তাদের পরিত্যাক্ত মিলিটারী এ্যাম্বুলেন্সে একটা চিঠি পাওয়া গেছে। তাতে লেখা হয়েছে, ‘বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসিকে উদ্ধার করার প্রচেষ্টা অবিলম্বে পরিত্যাগ করতে হবে। তার প্রমাণ হিসেবে অবিলম্বে খালেদ খাকানকে তুরস্ক থেকে বহিস্কার করতে হবে। এ দু’টি নির্দেশ মানা না হলে প্রধান বিচারপতিকে হত্যা করা হবে।’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘এখন তাহলে কি? বিজ্ঞানী তো উদ্ধার হয়ে গেছেন।’ বলল আহমদ মুসা।

‘এখন ভয় হলো, ক্রুদ্ধ হয়ে তারা যেন প্রধান বিচারপতিকে হত্যা না করে বসে।’ বলল জেনারেল মোস্তফা। চোখে-মুখে তার উদ্বেগ।

আহমদ মুসা কথা বলার জন্যে মুখ খুলেছিল। এ সময়েই বেজে উঠল জেনারেল মোস্তফার টেলিফোন।

‘এক্সকিউজ মি!’ বলে জেনোরেল মোস্তফা মোবাইল তুলে নিল। মোবাইল স্ক্রীনে প্রধানমন্ত্রীর নাম্বার দেকে চমকে উঠে মুখের কাছে মোবাইল এনে বলল, ‘আসসালামু আলাইকুম, স্যার, আমি মোস্তফা কামাল। কিছু আদেশ স্যার?’

ওপার থেকে প্রধানমন্ত্রী কথা বলল। ওপারের কথা শুনে বলল, ‘স্যার, ড. আন্দালুসি এখন ভালো আছেন।’

ওপার থেকে প্রধানমন্ত্রী আবার কথা বলল। তার কথা শুনে জেনারেল মোস্তফা বলল, ‘স্যার, এখনি তাঁকে বলছি। জি স্যার, ব্রিফিং-এ আমি তাঁকেও নিয়ে আসব। তিনি আমার পাশেই আছেন স্যার।’

'জি স্যার, তাকে মোবাইল দিচ্ছি।' বলল ওপারের কথা শুনে জেনারেল মোস্তফা।

জেনারেল মোস্তফা মোবাইলটি আহমদ মুসার দিকে তুরে ধরে বলল, 'জনাব খালেদ খাকান, মহামান্য প্রধানমন্ত্রী।'

আহমদ মুসা মোবাইলটি হাতে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে সালাম দিয়ে বলল, 'আপনি ভালো আছেন স্যার?'

'ধন্যবাদ স্যার। আমি যা করেছি, আমার জায়গায় অন্য কেউ হলে সেও নিশ্চয় তা পারতো।' বলল আহমদ মুসা ওপারের কথা শুনে।

'এক্সকউজ মি স্যার, আমি মনে করি ওদের ফলো করাই এখন প্রথম কাজ। আমি একটা পরিকল্পনা অলরেডি করে ফেলেছি।' ওপারের কথা শুনে বলল আহমদ মুসা আবার।

'ধন্যবাদ স্যার, মহামান্য প্রেসিডেন্টকে আমার সালাম দেবেন। নিশ্চয় দু'একদিনের মধ্যেই আমি আপনাদের সাথে দেখা করব।' বলল আহমদ মুসা আবার।

'দোয়া করুন স্যার, আমি যা ধারণা করেছি তা যেন ঠিক হয়। আমি জনাব জেনারেল মোস্তফাকে টেলিফোন দিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম।'

আহমদ মুসা মোবাইলটা আবার জেনারেল মোস্তফাকে দিল।

জেনারেল মোস্তফা টেলিফোন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কথা শুনে 'জি' 'জি' করে অবশেষে বলল, 'স্যার, মি. খালেদ খাকান অবশ্যই সব ব্যাপারে স্বাধীন স্যার। আমরা তাকে সব ধরনের সহযোগিতা করছি। তাঁর সাথে পরামর্শ করেই আমরা আসছি স্যার।'

সালাম দিয়ে মোবাইল রেখে দিল জেনারেল মোস্তফা। মুখ তুলল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'প্রধান বিচারপতির কিডন্যাপের বিষয়ে আপনি কি ভাবছেন, সে বিষয়ে সহযোগিতা করাকেই আমাদের প্রধান কাজ বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। বলুন মি. আহমদ মুসা আমরা কি করতে পারি?'

'ঘটনার পর আইজ্যাক বেগিনের মোবাইল নিয়ে আমি যখন 'মেনু' উইনডো ওপেন করতে যাচ্ছিলাম, তখন একটা মেসেজ আসে তার মোবাইলে।

মেসেজে একটা নতুন ঠিকানা দেয়া হয়েছে। সব কার্যকারণ বিচার করে আমার মনে বলছে, এই ঠিকানায় আমরা প্রধান বিচারপতিকে পাব। এই ঠিকানাকেই আমি এখন টার্গেট করতে চাচ্ছি।' বলল আহমদ মুসা।

জেনারেল মোস্তফা ও পুলিশ প্রধান নাজিম এরকেনসহ সকলের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল পুলিশ প্রধান,'ঠিকানাটা কি?'

'১০১ বার্বারোস বুলেভার্ডে।' আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসার মুখে ঠিকানাটা উচ্চারিত হতেই সাইমি ইসমাইলের চোখে-মুখে চাঞ্চল্য দেখা দিল। সে বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে,'স্যার এ সম্পর্কে আমিও একটা তথ্য দিতে পারি।'

সবাই তাকাল সাইমি ইসমাইলের দিকে।

'ওয়েলকাম মিস সাইমি ইসমাইল, বলুন।' বলল আহমদ মুসা।

'স্যার, আমাদেরকে আজ যখন গাড়িতে তোলা হচ্ছিল, তখন আইজ্যাক বেগিনের মোবাইলে একটা কল আসে। তিনি কলটি রিসিভ করে এ কথাগুলো বলেছিলেন, ১০১ বার্বারোস বুলেভার্ড রেডি? ধন্যবাদ। আমাদের লক্ষ্য এখন পিয়েল পাশা বুলেভার্ড। এটা কাছে।' সাইমি ইসমাইল বলল।

'ধন্যবাদ সাইমি ইসমাইল। আপনার এই তথ্য ১০১ বার্বারোস বুলেভার্ডকে কনফার্ম করল। আসলে শুরুতে গন্তব্য পিয়েল পাশা বুলেভার্ড ছিল। কিন্তু সম্ভবত তাদের গাড়ি বহর আক্রান্ত হওয়া এবং প্রধানবিচারপতিকে কিডন্যাপ করায় পিয়েল পাশা বুলেভার্ড কাছে বলেই ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায়, অথবা সেখানে অন্য কোন অসুবিধা দেখা দেয়, তার ফলেই তারা গন্তব্যস্থান হিসেবে ১০১ বার্বারোস বুলেভার্ডকে ঠিক করে।' থামল আহমদ মুসা।

সংগে সংগেই পুলিশ প্রধান প্রধান নাজিম এরকেন বলে উঠল, 'আলহামদুলিল্লাহ। ঠিকানা সম্পর্কে আপনার কথা ঠিক। এখন আমাদের কি করণীয় স্যার?'

'দয়া করে ১০১ বার্বারোস ঠিকানাটার চারপাশে আপনাদের লোকদের সাদা পোশাকে এমনভাবে অবস্থান নিতে বলুন, যাতে কারও মনে সামান্য সন্দেহের উদ্রেকও না হয়। এ ঠিকানায় ঢুকতে কাউকে তারা বাধা দেব না। কিন্তু

কেউ বেরুলে তাকে ফলো করবে এবং নিরাপদ জায়গায় তাকে আটক করবে।' আহমদ মুসা বলল।

'অল রাইট' বলে পুলিশ প্রধান একটু সরে দাঁড়িয়ে তার পকেট থেকে মিনি অয়্যারলেস বের করে নির্দেশ দিতে শুরু করল।

'এরপর করণীয় কি মি. খালেদ খাকান?' বলল জেনারেল মোস্তফা।

'আমাদের লক্ষ্য হলো, প্রধান বিচারপতিকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা।'

বলে একটু থামল আহমদ মুসা। একটু ভাবল, তারপর বলল, 'বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসি ওদের হাত ছাড়া হওয়া এবং আইজ্যাক বেগিনের পরিণতির কথা জানতে পারলে ওরা ক্ষ্যাপা কুকুরের মত হবে। রাগের মাথায় ওরা প্রধান বিচারপতির ক্ষতি করতে পারে। এই সম্ভাবনা রোধের জন্যে অবিলম্বে তাকে উদ্ধারের পদক্ষেপ নিতে হবে।'

থামল আহমদ মুসা।

'আপনি কি উদ্ধার অভিযানের পরিকল্পনা নিয়ে কিছু ভেবেছেন?' জিজ্ঞাসা পুলিশ প্রধান নাজিম এরকেনের।

'উদ্ধার অভিযান এমন হবে যা শেষ মুহূর্তের আগে ওরা টের পাবে না। টের পেলে ওরা মরিয়া হয়ে প্রধান বিচারপতিকে হত্যাও করে ফেলতে পারে। উদ্ধার অভিযানের বিষয় যখন তারা টের পাবে, তখন তাদের করার কিছুই থাকবে না, এই ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে।' আহমদ মুসা আহমদ মুসা বলল।

'সে ব্যবস্থার কথাই ভাবুন মি. খালেদ খাকান।' বলল জেনারেল মোস্তফা।

চোখ বন্ধ করেছিল আহমদ মুসা। ভাবছিল সে।

জেনারেল মোস্তফা থামতেই আহমদ মুসা বলে উঠল, দু'একজনকে ঐ বাড়িতে ওদের অলক্ষ্যে প্রবেশ করতে হবে। তাদের কাজ হবে প্রধান বিচারপতিকে সাহায্য করা, নিরাপদ করা। তারা সংকেত দিলে, তারপর ঐ ঠিকানায় সর্বাত্মক অভিযান পরিচালিত হবে।'

থামল আহমদ মুসা।

সবাই নিরব।

ভাবছে সবাই।

সব শেষে সবাই তাকাল আহমদ মুসার দিকেই। জেনারেল মোস্তফা বলল,‘এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চয় কিছু ভাবছেন মি. খালেদ খাকান?’

‘আমাকে ওরা তুরস্ক ছাড়া করতে চাচ্ছে, আমিই আগে দেখা করতে চাই ওদের সাথে।’ বলল আহমদ মুসা। তার মুখভরা হাসি।

কিন্তু হাসতে পারল না আর কউ। বলল জেনারেল মোস্তফা,‘আপনি একা?’

‘ওদের নজর এড়াবার জন্যে একাই সবচেয়ে ভালো। তাছাড়া এই মুহূর্তে দ্বিতীয় জনের সিলেকশন মুস্কিল।’ আহমদ মুসা বলল।

‘জেনারেল তাহির তারিক আংকারা থেকে ফিরেছেন, তাঁর সাথে কি একটু কথা বলবেন?’ জিজ্ঞাসা জেনারেল মোস্তফার।

‘সময় কম। এই সময়ে তার উদ্বেগ বাড়িয়ে লাভ নেই।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমি খুব সামান্য একজন কমান্ডো। আমি ও আমার সাথীরা সেদিন বিজ্ঞানী স্যারের কিডন্যাপ ঠেকাতে ব্যর্থ হয়েছি। এরপরও আমি কি আমার সহযোগিতা অফার করতে পারি?’ বলল সাইমি ইসমাইল।

‘বোন ভাইকে এমন সহযোগিতা অফার করাটাই স্বাভাবিক। সেদিন তোমরা ব্যর্থ হওনি বোন। তুমি ছাড়া সবাই তো সেদিন জীবন দিয়েছে। বিজ্ঞানীর স্ত্রী মনে না করলে তোমাকেও ওরা মেরে ফেলত। সেদিন দিনটা ওদের ছিল, পরিকল্পনাও ছিল ওদের। তাই বিজয়ও ওদের হয়েছে। কিন্তু তোমরা সেদিন ব্যর্থ হওনি।’আহমদ মুসা বলল।

আবেগে মুখ ভারি হয়ে উঠেছিল সাইমি ইসমাইলের। তার দুধে-আলতা রংয়ের গালে স্ফটিকের মত দু’ফোটা অশ্রুও নেমে এসেছিল।

বলল, ‘তাহলে কি ভাইয়ের সাথী হতে পারব আমি?’ আবেগরূদ্ধ কণ্ঠ সাইমি ইসমাইলের।

মিষ্টি হাসি ফুটে উঠল আহমদ মুসার ঠোঁটে। বলল, 'আমাদের ঐতিহ্য হলো, এ ধরনের লড়াই-এ বোনরা শুরুতেই শামিল হয় না। বিবি খাওলাদের ডাক পড়ে যুদ্ধের পরিনতি পর্বে। জেনারেল মোস্তফা ও জনাব নাজিম এরকেনের সাথে আজকে তুমিও থাকবে যুদ্ধের সমাপ্তি টানার অভিযানে।'

'ধন্যবাদ। কষ্ট হলেও ভাইদের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া বোনদেরও ঐতিহ্য।' বলল সাইমি ইসমাইল চোখ মুছতে মুছতে।

'আরেক বোনের তো কথা বলা হচ্ছে না! বোনরা সবসময় আবদার করেই কি অধিকার আদায় করবে?' বলল আয়েশা আরবাকান।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'তুমি তো আমার সাথেই আছ। তোমার দুই রিভলবারের সবগুলো গুলিই তুমি খরচ করেছ এই অভিযানে। আমি মোস্তফা ও জনাব নাজিম এরকেনের কাছে তোমার নামও রিকমেন্ড করব এই অভিযানে শামিল করার জন্য।'

'জনাব খালেদ খাকান, আয়েশা আরবাকানও আমাদের মহিলা কমান্ডো ইউনিটের একজন চৌকশ সদস্য। তাকে আমরা ওয়েলকাম করব এই অভিযানে।' বলল পুলিশ প্রধান নাজিম এরকেন।

'ধন্যবাদ মি. নাজিম এরকেন।'

বলেই আহমদ মুসা তাকাল জেনারেল মোস্তফার দিকে। বলল, 'আমার গাড়ি ওরা ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। একটা গাড়ির ব্যবস্থা করুন। আমি এখনি বের হতে চাই।'

'চলুন, আমরা ড. আন্দালুসিকে নিয়ে মিলিটারী হাসপাতাল পর্যন্ত একসাথে যাই। ওখানেই একটা ভাল গাড়ি আপনার জন্য থাকবে। প্রয়োজনীয় কমব্যাট ব্যাগও পাবেন তাতে।'

কথা শেষ করে একটু থেমেই জেনারেল মোস্তফা আবার বলল, 'আমি ভাবছি, আপনি ১০১ বার্বারোস বুলেভার্ড ঠিকানায় পৌঁছে আমাদেরকে একটা সঙ্কেত দেবেন। আপনার সঙ্কেত পাওয়ার পর আমরা ওদিকে মুভ করব। যাতে আপনি বাড়িতে প্রবেশের বিশ-পঁচিশ মিনিটের মধ্যে আমরা সেখানে পৌঁছতে পারি।'

‘ধন্যবাদ, ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। চলুন আমরা মুভ করি হাসপাতালের দিকে।’

‘চলুন। মি. খালেদ খাকান আপনি সাইমি ইসমাইল ও আয়েশা আরবাকানকে নিয়ে ড. আন্দালুসির সাথে বুলেটপ্রুফ গাড়িতে বসুন। সাইমি ইসমাইলই গাড়িটা ড্রাইভ করবে।’

বলে জেনারেল মোস্তফা তার গাড়ির দিকে এগোলো। অন্যেরাও এগোলো তাদের গাড়ি লক্ষ্যে।

স্টার্ট নিল সবগুলো গাড়ি।

জেনারেল মোস্তফা ও পুলিশ প্রধান নাজিম এরকেনের গাড়ি সবার আগে। তারপরে বিজ্ঞানীকে নিয়ে আহমদ মুসাদের বুলেটপ্রুফ গাড়ি। সবার পেছনে পুলিশের দুটি গাড়ি।

গাড়ির ছোট্ট বহরটি এগিয়ে চলল মিলিটারী হাসপাতালের দিকে।

# ৭

একশ’ এক বার্বারোস বুলেভার্ড-এর ৪ তলা বাড়ির আন্ডারগ্রাউন্ড ফ্লোরের একটা প্রশস্ত কক্ষে বসে আছে ড. ডেভিড ইয়াহুদ।

মাথার চুল তার উস্কো-খুস্কো। মুখ শুকনো। চোখদুটি লাল। ব্লাড প্রেশার বেড়ে গেছে। এর মধ্যে ডাক্তার এসে একবার চেক করে গেছে।

দু’ঘন্টা ধরে বসে আছে এই চেয়ারে। তেলআবিব, ইউরোপের কয়েকটি রাজধানী ও ওয়াশিংটনে অনেকগুলো টেলিফোন করেছে এই দু’ঘন্টায়। জানিয়েছে সে ‘থ্রি জিরো’র মহাবিপর্যয়ের কথা। বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসিকে কিডন্যাপ করতে পারার তাদের সাফল্যের কথা। একদিন আগে আইজ্যাক বেগিনও এভাবেই তেলআবিব, ইউরোপ ও আমেরিকার কয়েকটি রাজধানীর গুরুত্বপুর্ণ মহলকে এ কথাগুলো জানিয়েছিল। তারা অভিনন্দন জানিয়েছিল আইজ্যাক বেগিন ও ড. ডেভিড ইয়াহুদকে এবং আশা করেছিল যে, সোর্ড-এর ফর্মুলা হস্তগত করা সম্ভব হবে, যা তাদেরকে গোটা দুনিয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার অকল্পনীয় এক সুযোগ এনে দেবে। আইজ্যাক বেগিন ও ড. ডেভিড ইয়াহুদ তাদের নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছিল, তার স্ত্রীকেও যখন আমরা আটক করতে পেরেছি, তখন সাফল্য সম্পর্কে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। একদিন, দুদিন, তিনদিন, কয়দিন সে নির্যাতন সহ্য করবে। নিজে সহ্য করত্রে পারলেও তার চোখের সামনে স্ত্রী লাঞ্ছিত হবার বিভৎস দৃশ্য সে কয়দিন সহ্য করবে! সে মুখ খুলবে, খুলতেই হবে। শুধু তাই নয় তাকে আমাদের ল্যাবরেটরীতে বশংবদের মত কাজ করতে বাধ্য করা হবে। এধরনের কত আশার কথাই না ড. ডেভিড ইয়াহুদ তেলআবিব, ইউরোপ ও আমেরিকার তাদের মুরুব্বীদের জানিয়েছিলেন। কিন্তু সবই ভণ্ডুল হয়ে গেল। খোদ আইজ্যাক বেগিন নিহত হলেন এবং বিজ্ঞানীকে তারা উদ্ধার করে নিয়ে গেল। সব আশায় গুঁড়েবালি পড়ে গেল! কেন এমনটি হল? আমাদের গোপন ঠিকানার সন্ধান ওরা কি করে পেল? আর উদ্ধার করার ব্যাপারটা

এক অসম্ভব কাহিনী। ৬ জন লোক নিজেদের গাড়ির মধ্যকার দুর্ঘটনায় মারা গেছে, ৪ জন গুলিতে। যে রিপোর্ট সংগ্রহ হয়েছে, তাতে মাত্র একজন লোক এই সর্বনাশটা করেছে। কে এই লোক আমরা জানি। ওরা পরিচয় ভাড়িয়ে বলে খালেদ খাকান, আমরাও বলি। বলি এই কারণে যে, খালেদ খাকান নামেই যদি তাকে শেষ করে দেয়া যায়, সেটাই ভালো। তাছাড়া 'আহমদ মুসা' নামটা প্রকাশ পেলে ওই পক্ষের ও সাধারণ মানুষের সাহস আরও বাড়বে। আর আমাদের হতাশা তাতে বাড়বে।

এই খালেদ খাকান ব্যাটা আমাদের লোকদের খবর, আমাদের ঘাঁটির ঠিকানা একের পর এক পেয়ে যাচ্ছে কি করে? এ পর্যন্ত আমাদের বিরুদ্ধে সে যত অভিযান করেছে, সবগুলোই ছিল সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে। কোথা থেকে পাচ্ছে এই খবরগুলো সে।

দুঃখের মধ্যেও ড. ডেভিড ইয়াহুদের সান্তনা হলো, তেলআবিব, ইউরোপ, আমেরিকা তাকে সাহস দিয়েছে। যে কোন মূল্যে সোর্ড-এর ফর্মুলা হাত করতে হবে। এই ক্ষেত্রে সব রকম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে বিজ্ঞানীদের সমেত রোমেলী দূর্গ নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে। সে ব্যবস্থাও তারা করেছে। ড. ডেভিড ইয়াহুদরা গ্রীন সিগন্যাল দিলেই তারা কাজ শুরু করবে। তার জন্য আরেকটা আশার কথা হল এনজিও'র পরিচয়ে ইউরোপ থেকে কিছু চৌকশ জনশক্তি পাঠানো হয়েছে তাকে সাহায্য করার জন্য। এটা তার জন্য খুব বড় একটা সুখবর। আহমদ মুসা আসার পর তার হাতে 'থ্রী জিরো'র মূল্যবান জনশক্তি নষ্ট হয়েছে, যার সংখ্যা পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গেছে।

শেষের চিন্তাগুলো উজ্জ্বীবিত করল ড. ডেভিড ইয়াহুদকে।

এসময় ঘরে প্রবেশ করল শীর্ষ গোয়েন্দা স্মার্থা ও নতুন অপারেশন চীফ সোলেমান স্যামসন।

তারা ঘরে ঢুকতেই ড. ডেভিড ইয়াহুদ বলল, 'প্রধান বিচারপতির খবর কি?'

'এই গ্রাউন্ডফ্লোরের এক সেলে তাকে রাখা হয়েছে। সেলে গ্রীলের গেট। দু'জন স্টেনগানধারীকে সেখানে পাহারায় রাখা হয়েছে। আর গ্রাউন্ডফ্লোর থেকে

আন্ডারগ্রাউন্ডের সিঁড়িমুখেও দু'জন পাহারায় রাখা হয়েছে।' বলল সোলেমান স্যামসন।

'বাড়ির বাইরে কি অবস্থা?' জিজ্ঞাসা ড. ডেভিড ইয়াহুদের।

'বাড়ির গেটবক্সে পাহারায় থাকবে দু'জন স্টেনগানধারী। আর ৪ জন ছদ্মবেশে বাড়ির চারিদিকে নজর রাখবে। বাড়ির সামনে যেখান থেকে প্রাইভেট রাস্তা বাড়ির গেট পর্যন্ত এসেছে, সেখানে বড় রাস্তার বার্বারোস বুলেভার্ডের একটি তেমাথা। এখানে বিপরীত দিক থেকে আরেকটি রাস্তা এই বুলেভার্ডের সাথে মিশেছে। এই তেমাথায় একটা কক্ষ ভাড়া নিয়ে একটা ইনফরমেশন সেন্টার খুলে স্মার্থা বসছে। সেখানে বসে বুলেভার্ডসহ বাড়ির তিনদিকে সে নজর রাখতে পারবে।' বলল সোলেমান স্যামসন।

'ধন্যবাদ। প্রধান গেট ছাড়া ডুপ্লেক্সে ঢোকার কি আর কোন পথ আছে?'

'না স্যার, এই ডুপ্লেক্সে প্রাইভেট কোন এক্সিট নেই।'

'ঠিক আছে, চল আমরা প্রধান বিচারপতির ওখানে যাই। চুপ করে বসে থাকলে চলবে না। প্রধান বিচারপতির কিডন্যাপকে কাজে লাগাতে হবে। বিজ্ঞানী আমাদের হাতছাড়া হয়েছে। এখন খালেদ খাকানকে তুরস্ক থেকে তাড়াতে হবে। প্রধান বিচারপতিকে এই দাবি আদায়ের পণবন্দি বানাতে চাই। প্রধান বিচারপতির এই মর্মে বিবৃতি আদায় করতে হবে যে, জনৈক খালেদ খাকানকে তুরস্ক থেকে না তাড়ালে আমার মুক্তির সম্ভাবনা নেই। প্রধান বিচারপতির এই বিবৃতি সরকারের কাছে এবং সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে পাঠাতে হবে। জনগণের পক্ষ থেকেও দাবি উঠাতে হবে যে, একজন খালেদ খাকানের জন্যে প্রধান বিচারপতির এই অবস্থা চলতে দেয়া যেতে পারে না। তাদের তরফ থেকে দাবি উঠাতে হবে, খালেদ খাকানকে বহিষ্কার করে প্রধান বিচারপতিকে মুক্ত করা হোক।' বলল ডেভিড ইয়াহুদ।

'ধন্যবাদ স্যার। চমৎকার একটা কৌশল বের করেছেন। এভাবে চাপ সৃষ্টি করে, গণদাবি তুলে যদি তুরস্ক থেকে খালেদ খাকানকে বহিষ্কার করা যায়, তাহলে বিরাট লাভ হবে আমাদের। আমাদের লক্ষ্য অর্জন সহজ হয়ে যাবে।'

'চল যাই।' বলে উঠে দাঁড়াল ডেভিড ইয়াহুদ।

উঠে দাঁড়াল সোলেমান স্যামসন ও স্মার্থা।

বেরিয়ে এল তারা ঘর থেকে।

আন্ডারগ্রাউন্ড ফ্লোরের যে সেলে প্রধান বিচারপতি বন্দী আছে, সে সেলের পেছনে এসে দাড়াল তিনজন। সেলের দেয়ালের হাংগার থেকে তিনজনই আপাদমস্তক কাল পোশাক পরল এবং মুখে পরল মুখোশ।

সেলের পাহারায় থাকা দু'জন গার্ড আগেই দেখতে পেয়েছিল তাদের তিনজনকে। ওরা গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়াতেই সেলের দরজা তারা খুলে দিল।

সেলে প্রবেশ করল তিনজন।

প্রধান বিচারপতি খাটিয়ায় শুয়ে ছিল। মুখোশ পরা তিনজন ঘরে ঢুকতেই প্রধান বিচারপতি উঠে বসলো।

প্রধান বিচারপতি ঋজু গড়নের হাল্কা-পাতলা মানুষ, কিন্তু লম্বা হবেন প্রায় ৬ ফুটের মত। সহজ-সরল চেহারার ভদ্রলোক মানুষ।

জল্লাদের পোশাক পরে তিনজনকে ঘরে ঢুকতে দেখে ভীতির একটা ছাপ তার চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে।

বেডের সামনে একটাই চেয়ার। ড. ডেভিড ইয়াহুদ চেয়ারটিতে বসতে বসতে বলল, 'অনুমতি ছাড়াই বসলাম স্যার, আপনি তো এখন প্রধান বিচারপতি নন।'

একটু থামল ড. ডেভিড ইয়াহুদ। তারপর পকেট থেকে রিভলবার বের করেই প্রধান বিচারপতির দিকে পরপর দু'টি গুলী করল। একটা গুলী প্রধান বিচারপতির মাথার ডান পাশে, দ্বিতীয় গুলী মাথার বাম পাশের চুল ছুঁয়ে চলে গেল।

ভীষণভাবে চমকে উঠেছে প্রধান বিচারপতি। কেঁপে উঠেছে তাঁর দেহ। প্রবল আতঙ্ক চোখে-মুখে।

ড. ডেভিড ইয়াহুদ বলল, 'স্যার, গুলী দু'টি ভেতরদিকে আর আধা ইঞ্চি করে সরে এলে আপনার মাথা গুঁড়ো হয়ে যেত এবং আপনি লাশ হয়ে যেতেন। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, মৃত্যুটা আপনার কত কাছাকাছি। আপনি যদি

আমাদের সহযোগীতা না করেন, তাহলে পরের গুলী মাত্র আধা ইঞ্চি মাথার দিকে সরে আসবে।'

থামল ড. ডেভিড ইয়াহুদ।

'কি সহযোগীতা?' শুকনো কন্ঠে জিজ্ঞেস করল প্রধান বিচারপতি।

'একজন লোককে তুরস্ক থেকে বহিষ্কারে সাহায্য করতে হবে।' বলল ড. ডেভিড ইয়াহুদ।

'কে সেই লোক?'

'লোকটির নাম মি. খালেদ খাকান।'

'কে সে?'

'সে তুরস্কের লোক নয়।'

'আমি তাকে চিনি না। আমাকে কি করতে হবে?'

'আমরা তাকে চিনি। আমাদের জন্য সে সাংঘাতিক ক্ষতিকর। তার বহিষ্কারের উপর আপনার মুক্তি নির্ভর করছে। অতএব, সরকারের কাছে আপনি একটা আবেদন জানাবেন যে, তাকে বহিষ্কার করার ব্যাপারে আমাদের দাবি সরকার যেন মেনে নেন।' ড. ডেভিড ইয়াহুদ বলল।

'তাকে বহিষ্কার করা হবে কেন? সে কি বৈধভাবে তুরস্কে নেই? আমি একটা অন্যায় দাবি কিভাবে করতে পারি?' বলল প্রধান বিচারপতি।

'আপনি বাঁচার জন্য করতে পারেন। আপনি সরকারকে বলুন, তাকে বহিষ্কার করার উপর আপনার প্রাণে বাঁচা ও নির্যাতন-নিপীড়ন থেকে বাঁচা নির্ভর করছে। আপনাকে এই আপিল করতে হবে করুণ সুরে, যেন আপনি অপরিসীম নির্যাতন-নিপীড়নের মধ্যে এই বিবৃতি দিচ্ছেন।'

বলেই ড. ডেভিড ইয়াহুদ পেছনে দাঁড়ানো সাথীদের একজনকে লক্ষ করে বলল, 'স্যামসন, রেকর্ডার বের করে তাঁর বক্তব্য রেকর্ড কর।'

সঙ্গে সঙ্গেই স্যামসন কাল আলখেল্লার ভেতর থেকে রেকর্ডারসহ হাত বের করে এগোলো প্রধান বিচারপতির খাটিয়ার দিকে। সে প্রধান বিচারপতির সামনে খাটিয়ায় বসল। রেকর্ডার অন করে তা তুলে ধরল প্রধান বিচারপতির মুখের কাছে।

প্রধান বিচারপতির হাত দিয়ে রেকর্ডারটি পাশের দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, 'আমি একজন বিচারপতি। নিছক প্রাণ বাঁচাবার জন্যে একজন নির্দোষ লোক সম্পর্কে এমন দাবি আমি করতে পারি না।'

চেয়ারে বসা লোকটির হাতের রিভলবার সঙ্গে সঙ্গে উঠে এল প্রধান বিচারপতির লক্ষ্যে। তার সাথে সাথে একটা গুলীও বর্ষিত হল। এবার ফাঁকা গুলী নয়। প্রধান বিচারপতির বাম হাতের কাঁধ-সন্ধিস্থলের এক খাবলা গোশত তুলে নিয়ে গুলীটা বেরিয়ে গেল।

প্রধান বিচারপতি আর্তনাদ করে উঠে ডান হাত দিয়ে বাম কাঁধ চেপে ধরল।

'এই গুলীটা নমুনা গুলী ছিল। এরপর বুক ভেদ করে গুলী চলে যাবে। এবার বক্তব্যটা দিন। যে আর্তস্বরে চিৎকার করলেন, সেই আর্তস্বরেই একটা বক্তব্য দিন।' ড. ডেভিড ইয়াহুদ বলল।

'কিন্তু আমি প্রাণভয়ে একজন নির্দোষ মানুষের ক্ষতি করতে পারব না।' বলল প্রধান বিচারপতি। বেদনার্ত তার কণ্ঠ।

'সামসন, রেকর্ডারটি স্মার্থাকে দিয়ে চাবুকটা নিয়ে এস। সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না।' নির্দেশ দিল চেয়ারে বসা লোকটি।

চাবুক নিয়ে এল স্যামসন।

'চাবুক চালাতে থাক, যতক্ষণ না বক্তব্য রেকর্ড করতে রাজী হয়।'

বলে চেয়ার নিয়ে দরজার কাছে সরে বসল ডেভিড ইয়াহুদ। স্মার্থাও।

চাবুক চলল প্রধান বিচারপতির পিঠে, বুকে যেখানে সুযোগ পাচ্ছে সেখানে। প্রথম কয়েক ঘা মুখ বুজে সহ্য করল। কিন্তু তারপরেই তার মুখ থেকে বুক ফাটা আর্তচিৎকার বেরিয়ে আসতে লাগল।

চাবুক কিন্তু থামল না। অল্পক্ষণের মধ্যেই দেহটা ঝিমিয়ে পড়ল প্রধান বিচারপতির। চিৎকারের শক্তিও আর থাকল না।

চেয়ারে বসা ড. ডেভিড ইয়াহুদ স্যামসনকে থামতে নির্দেশ দিল। তারপর চেয়ার নিয়ে এগিয়ে এল ডেভিড ইয়াহুদ প্রধান বিচারপতির নেতিয়ে পড়া দেহের কাছে। বলল, 'স্যরি, আমরা এই খারাপ কাজটা করতে চাইনি। আপনিই

বাধ্য করেছেন স্যার। বক্তব্যটি দিয়ে দিন। বক্তব্যটি দিলে কয়েকদিনের মধ্যেই আপনি ছাড়া পেয়ে যাবেন।'

প্রধান বিচারপতি চোখ খুলল। বলল, 'বলেছি তো, আমি একজন বিচারপতি। নির্যাতনের ভয়ে, মৃত্যু-ভয়ে এধরনের বক্তব্য আমি দিতে পারি না। পারব না।'

'প্রধান বিচারপতি মহোদেয়! মৃত্যুর চেয়েও বড় শাস্তি আমরা দিতে পারি। আমরা কি সে ব্যবস্থাই করব?' বলল ডেভিড ইয়াহুদ।

'ভয় দেখিয়ে লাভ হবে না, যে মৃত্যুকে ভয় করেনা, তাকে আর কি দিয়ে ভয় দেখাবে?' প্রধান বিচারপতি বলল।

'আছে। আপনার স্ত্রী-কন্যাকে ধরে আনা হচ্ছে। সহ্য করতে পারবেন, আপনার চোখের সামনে তাদের লাঞ্চনা?' বলল ডেভিড ইয়াহুদ।

চোখ খুলল প্রধান বিচারপতি। তার চোখে মুখে আতঙ্ক। বলল, 'তারা নির্দোষ, নিরীহ, আমার দোষ তাদের ঘাড়ে চাপাবেন কেন? না, এটা তোমরা পার না।' উদ্বেগ-আতঙ্কে ভেঙ্গে পড়া কণ্ঠ প্রধান বিচারপতির।

ডেভিড ইয়াহুদ উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আমি যাচ্ছি আপনার স্ত্রী-কন্যাকে আনার ব্যবস্থা করতে।'

বলে ডেভিড ইয়াহুদ তাকাল স্যামসনের দিকে। বলল, 'তাঁকে দশ মিনিট সময় দাও। এ সময়ের মধ্যে তিনি যদি বক্তব্য দিতে রাজী হন, তাহলে আমাকে টেলিফোন করবে। আমি তাহলে তাঁর স্ত্রী-কন্যাকে ধরে আনার ব্যবস্থা নিয়ে এগোবো না। তোমার টেলিফোন না পেলে বুঝবো উনি রাজী হন নি।'

স্যামসনকে এই নির্দেশগুলো দিয়ে ড. ডেভিড ইয়াহুদ আবার তাকাল প্রধান বিচারপতির দিকে। বলল, 'প্রধান বিচারপতি মহোদয়! দশ মিনিটের মধ্যে রাজী না হলে কয়েক ঘন্টার মধ্যে আপনার স্ত্রী-কন্যাকে আপনি এখানে দেখতে পাবেন।'

বলেই কোন উত্তরের অপেক্ষা না করে ডেভিড ইয়াহুদ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দশ মিনিট শেষ হতে আর মাত্র এক মিনিট বাকি।

স্যামসন ও স্মার্থা প্রধান বিচারপতির সেলে প্রবেশ করল। স্যামসন বলল, 'স্যার, দশ মিনিটের আর মাত্র এক মিনিট বাকি। আপনি রাজী হয়েছেন,এই টেলিফোন তাহলে আমি স্যারকে করছি না।'

প্রধান বিচারপতির রক্তাক্ত দেহ বিছানার উপর নেতিয়ে পড়েছিল। চোখ বন্ধ ছিল তার। বলল সে, 'আমাকে কি বলতে হবে, তোমরা লিখে দাও।' ক্ষীণ কণ্ঠ প্রধান বিচারপতির। চোখ বন্ধ রেখেই কথাগুলো সে বলল।

'ধন্যবাদ বিচারপতি মহোদয়! আপনার শুভবুদ্ধির জন্য।'

বলেই স্যামসন স্মার্থার দিকে তাকাল।

স্মার্থা কাল আলখেল্লার ভেতর থেকে এক খণ্ড কাগজ বের করে প্রধান বিচারপতির দিকে তা এগিয়ে দিল।

ঠিক এসময়েই ব্রাশফায়ারের শব্দ হল। চমকে উঠে স্যামসন ও স্মার্থা সেলের দরজার দিকে তাকাল। দেখল, সেলের গেটে দাঁড়ানো দু'জন স্টেনগানধারী প্রহরীকে। তারা স্টেনগান বাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের স্টেনগানের ব্যারেল থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। স্যামসন ও স্মার্থা দ্রুত তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দেখল সামনে কেউ নেই। সিঁড়ি পর্যন্ত ফাঁকা।

'কী ব্যাপার? গুলী করলে কাকে?' জিজ্ঞাসা স্যামসনের।

'একটা ঢিল ধরনের কিছু গায়ে এসে পড়েছে। তাই সাথে সাথে গুলী চালিয়েছি।' বলল একজন প্রহরী।

'কোথায় ঢিল?' বলল স্যামসন।

প্রহরীর খুঁজতে লাগল ঢিল। পেল না।

'থাক। চল চারদিকটা খুঁজে দেখি।' স্যামসন বলল। ঘরটা তালাশ করতে বেরুল চারজনই। তাদের হাতে উদ্যত স্টেনগান ও রিভলবার।

পরবর্তী বই

# 'বসফরাসে বিস্ফোরণ'

**কৃতজ্ঞতায়ঃ**

1. Abir Tasrif Anto
2. Jamirul Haqe
3. Sharwat Kabir Safin
4. Nazrul Islam
5. Abu Taher
6. Mujtahid Akon
7. Neehon Forid
8. Monirul Islam Moni
9. Mahfuzur Rahman
10. Md. Jafar Ikbal Jewel
11. Shaikh Noor-E-Alam

সাইমুম-৪৭

# বসফরাসে বিস্ফোরণ

আবুল আসাদ

# ১

বিদ্যুৎ বিভাগের লাইন চেকিং কাজের লক্কড় মার্কা একটা গাড়ি ড্রাইভ করে আহমদ মুসা বার্বারোস বুলেভার্ড থেকে ১০১ নম্বর বাড়ির সংযোগ রাস্তায় প্রবেশ করল।

আহমদ মুসার পরনেও বিদ্যুৎ বিভাগের লাইনম্যানদের পোশাক। মাথার চুল অগোছালো। চেহারায় রোদ পোড়া, ক্লান্ত ভাব। পায়ে পুরানো ময়লা বুট।

বিদ্যুৎ বিভাগের গাড়িটি ১০১ নম্বর বাড়ির সংযোগ রাস্তায় ঢুকতেই দু'জন লোক এসে হাত তুলে গাড়ির সামনে দাঁড়াল।

গাড়ি দাঁড় করাল আহমদ মুসা।

'কোথায় যাও?' বলল একজন।

'একশ' এক নম্বর বাসা থেকে টেলিফোন করেছে। জরুরি।' স্থানীয় টার্কিস ভাষায় বলল আহমদ মুসা। এ ধরণের প্রয়োজনীয় কয়েকটি বাক্য সে গত আধা ঘন্টা ধরে মুখস্থ করেছে।

উত্তর শুনে লোক দু'জন একটু দ্বিধায় পড়ে গেল। পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। একজন আরেকজনকে বলল, 'নিশ্চয় লাইনে কোন সমস্যা দেখা দিয়েছে, জরুরি টেলিফোন করেছে।'

অবশেষে তারা সামনে থেকে সরে গেল। হাত দিয়ে ইশারা করে যেতে বলল।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল আহমদ মুসা। ওদের দু'জনের পকেটে রিভলবার আছে, তাদের পকেটের ওজন দেখেই তা বুঝতে পেরেছে আহমদ মুসা। সেই সাথে আরও বুঝতে পারল, বাড়িটাকে তারা কড়া পাহারায় রেখেছে।

আহমদ মুসার লক্কড় মার্কা পিকআপ গাড়িটা গিয়ে বাড়ির গাড়ি বারান্দায় থামল।

হাতে প্লাস্টিকের ছোট্ট থলে নিয়ে লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নামল আহমদ মুসা।

গাড়ি বারান্দার পরেই তিন ধাপের সিঁড়ি পেরিয়ে ওপরে উঠলেই মূল বারান্দা। মূল বারান্দাতেই বড় দরজা। এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করা যায় বাড়ির ড্রইং রুমে।

কিন্তু আহমদ মুসা এ দরজার দিকে না এগিয়ে বারান্দাটির পাশ দিয়ে বাড়িটিতে প্রবেশের আরেকটি বড় দরজার দিকে এগোলো।

বাড়িতে প্রবেশের এটাই প্রধান দরজা।

দরজায় দ্রুত নক করল আহমদ মুসা, কাজের তাড়া থাকলে যেমনটা হয়।

দরজা খুলে গেল।

দরজায় দাঁড়িয়ে গুন্ডাকৃতির একজন মানুষ। কঠোর মুখে ভীষণ বিরক্তি প্রকাশ করল আহমদ মুসাকে দেখে।

কিছু বলতে যাচ্ছিল লোকটি। তার আগেই আহমদ মুসা 'আমি ইলেকট্রিসিয়ান, ভেতর থেকে জরুরি কল করেছে' বলে অনুমতি না নিয়েই ভেতরে ঢুকে গেল।

লোকটি এমনটা আশা করেনি। সে দু'ধাপ পিছিয়ে গিয়ে দু'হাত প্রসারিত করে বাঁধা দিয়ে বলল, 'দাঁড়াও, যেতে পারবে না এখন। আমি জিজ্ঞেস করে দেখি, তোমাকে কেউ ডেকেছে কিনা?'

'যাও, জিজ্ঞেস করে এসো।' বলল আহমদ মুসা।

লোকটির দু'দিকে প্রসারিত হাত নেমে এলো নিচে।

'তুমি এখানে দাঁড়াও। আমি ভেতরের লোকের সাথে কথা বলছি।' বলে লোকটি পকেট থেকে মোবাইল বের করে পেছন ফিরে দাঁড়াল কথা বলার জন্যে।

আহমদ মুসার বাম হাতে ঝুলছিল একটা টুলস ব্যাগ, ডান হাত খালি ছিল।

লোকটি ঘুরে দাঁড়াতেই আহমদ মুসার ডান হাত দ্রুত তার ডাক পকেটে চলে গেল, আর বাম হাতের টুলস ব্যাগ বাম কাঁধে তুলে নিয়ে হাতটি মুক্ত করল।

আহমদ মুসার ডান হাত বেরিয়ে এলো একটা ভাঁজ করা ছোট্ট রুমাল নিয়ে।

লোকটা তখন সবে সম্পূর্ণ ঘুরে দাঁড়িয়েছে মাত্র।

আহমদ মুসা দু'ধাপ সামনে এগিয়ে গেল দ্রুত, বিড়ালের মতো নিঃশব্দে। সংগে সংগেই তার বাম হাত চোখের পলকে পেঁচিয়ে ধরল লোকটির গলা সাঁড়াশির মতো। সেই সাথে তার ডান হতের রুমাল এসে চেপে বসল লোকটির নাকে।

লোকটি নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে প্রাণপণ চেষ্টা করল কয়েক মুহূর্ত। কিন্তু পারল না। কয়েক মুহূর্তেই সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

আহমদ মুসা তার সংজ্ঞাহীন দেহ ডিঙিয়ে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করল।

ভেতরটায় একটা লাউঞ্জ।

লাউঞ্জের চারদিকেই ঘর। পশ্চিম-উত্তর কোণে একটা সিঁড়ি ওপর দিকে উঠে গেছে। সিঁড়ির গোড়া দিয়ে লাউঞ্জ থেকে একটা করিডোর চলে গেছে পশ্চিম দিকে।

আহমদ মুসাদের পাওয়া তথ্য সত্য হলে এই বাড়িতেই এনে তোলা হয়েছে কিডন্যাপড হওয়া অসুস্থ বিচারপতিকে। বাড়ির ভেতর-বাইরের পাহারাও এটাই প্রমাণ করেছে।

কিন্তু এখন কোন্ দিকে অগ্রসর হবে বুঝতে পারলো না আহমদ মুসা। লাউঞ্জের বাম দিকের ঘরগুলোর সব দরজাই বন্ধ। ভাবল আহমদ মুসা, এক তলার কোন ঘরে অবশ্যই তিনি নেই। এসব ঘরে সাধারণত প্রহরী ও বাড়ির কর্মচারীরাই থাকে। হয় তাকে আন্ডারগ্রাউন্ড কোন ফ্লোরে রাখা হয়েছে, না হয় ওপর তলার কোথাও। বাড়িটি তিন তলা।

সিঁড়ি দিয়ে ওপর তলায় ওঠা যায়, কিন্তু পশ্চিম দিকের করিডোরটি কোথায় গেছে?

আহমদ মুসা এগোলো সিঁড়ির গোড়ার দিকে।

সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছেই আহমদ মুসা দেখতে পেল, সিঁড়ির গোড়া থেকে করিডোরের যে দেয়াল শুরু হয়েছে, সিঁড়ির গোড়ার পরেই এর সংলগ্ন দেয়ালে লিফটের দরজা। লিফটের দরজার ফ্লোর ইনডিকেটরে গ্রাউন্ড প্রথম ও দ্বিতীয় ফ্লোরের আগে আরও দু'টি ফ্লোর ইনডিকেটর, ইউজি ওয়ান ও ইউজি টু রয়েছে। এর অর্থ আন্ডারগ্রাউন্ডে দুটি ফ্লোর আছে এবং এই লিফট দিয়েই সেখানে যাওয়া যাবে।

আহমদ মুসা পা তুলল লিফটের দিকে যাওয়ার জন্যে।

এই সময় তার মনে হলো তার পেছনে মানুষ।

পকেটের হাতটা রিভলবারের বাঁটটা চেপে ধরল। মাথা ঘোরাতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই দু'পাশ থেকে দু'টি শক্ত বস্তু এসে তার মাথায় চেপে বসল। স্পর্শ থেকেই বুঝল দু'টিই রিভলবারের নল।

আহমদ মুসা পকেট থেকে হাত বের না করে ওদেরকে কথায় জড়িয়ে সময় নিতে চাইল। বলল সে, 'তোমরা কে, কি চাও?'

কথার সাথে সাথেই দু'জন তার সামনে এসে দাঁড়াল। তাদেরও হাতে রিভলবার।

আহমদ মুসার মাথা থেকে রিভলবারের নল এক তিলও সরেনি।

তার সামনের গিয়ে দাঁড়ানো একজন বলল, 'আমরা কে, কি চাই, তা নয়। তুমি কে, কি জন্যে এখানে ঢুকেছ, সেটা বলো।'

'তোমরা আমাকে এ প্রশ্ন করছ কেন, তোমরা জান আমি কে?' বলল আহমদ মুসা।

'কেন প্রশ্ন করছি জান না? গেটের আমাদের প্রহরীকে তুমি সংজ্ঞাহীন করে ভেতরে ঢুকেছ। তুমি বিদ্যুৎ বিভাগের লোক নও, কে তুমি?' বলল সেই আগের লোকটিই।

কথা বলার জন্যে আহমদ মুসা মুখ তুলেছিল লোকটির দিকে। তাকাতে গিয়ে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়ানো একটা মেয়ের ওপর চোখ পড়ল। হাতে তার বই, পরনে ক্রিম রংয়ের প্যান্টের ওপর ক্রিম রংয়ের বিশেষ কাটিং-এর কোট। হঠাৎ আহমদ মুসার মনে পড়ল এটা 'বসফরাস কলেজ অব টেকনোলজি'র ছাত্রীদের ইউনিফরম। মেয়েটি বিস্ময় বিস্ফোরিত চোখে এদিকে তাকিয়েছিল। আহমদ মুসার চোখে চোখ পড়তেই মেয়েটি কয়েক ধাপ ওপরে উঠে আড়ালে সরে গেল।

উত্তর না দিয়ে আহমদ মুসাকে এদিক-ওদিক তাকাতে দেখে ধমক দিয়ে সেই লোকটি তার রিভলবার আহমদ মুসার দিকে তাক করে বলল, 'চালাকি করার চেষ্টা করো না, চারদিকে গুলীতে মাথার খুলি গুঁড়ো হয়ে যাবে।'

'কি জানতে চাও তোমরা?' বলল আহমদ মুসা শান্ত কণ্ঠে।

ক্রোধে ফেটে পড়ল সামনে লোকটি। আহমদ মুসার কপালে রিভলবার ঠেকিয়ে বলল, 'তুমি এখানে এসেছ কেন?'

'তোমরা জান যে, প্রধান বিচারপতিকে উদ্ধার করতে এসেছি আমি এখানে। তাকে তোমরা কিডন্যাপ করে এখানে নিয়ে এসেছ।' লোকটির মতোই উচ্চ স্বরে দৃঢ় কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

সামনের লোকটি আহমদ মুসার কপাল থেকে রিভলবার সরিয়ে আহমদ মুসার হাঁটুতে একটা লাথি মারল এবং দু'ধাপ পেছনে সরে গিয়ে চিৎকার করে বলল, 'এবার তুই মর্।'

তার হাতের রিভলবারটা আবার উঠে আসতে লাগল আহমদ মুসার লক্ষ্যে।

লাথিটা খুব জোরেই মেরেছিল। আহমদ মুসা তার পা'টা একটু শিথিল করে না নিলে হাঁটুটা ভেঙেই যেত।

এভাবে আকস্মিক লাথি খেলে পড়ে যাবার কথা। আহমদ মুসাও পড়ে গিয়েছিল। এমন একটা সুযোগই চাইছিল সে। পড়ে যাওয়ায় সে পেছন থেকে টার্গেট-করা দুই রিভলবারের আওতার বাইরে চলে এসেছে।

পড়ে যাওয়ার সময় আহমদ মুসার দেহ মেঝে স্পর্শ করার আগেই তার ডান হাত পকেট থেকে বের হয়ে এসেছে রিভলবার নিয়ে।

আহমদ মুসা চিৎ হয়ে পড়ে গিয়েছিল বলে তাকে লাথি মারা লোকটি তার সামনেই ছিল।

'এবার তুই মর্' বলে লোকটি তার রিভলবারের ট্রিগার টেপার আগেই আহমদ মুসা তার ট্রিগার টিপে দিয়েছিল।

আহমদ মুসার রিভলবারের গুলী ৪০ ডিগ্রী এ্যাংগেলে গিয়ে লোকটির বাম বক্ষ বিদ্ধ করেছে। গুলী খেয়ে তার দেহ ঝাঁকুনি দিয়ে উঠলেও তার তর্জনিটা রিভলবারের ট্রিগারে ঠিকই চেপে বসেছিল। কিন্তু টার্গেটটা দেহের কম্পনের সাথে কেঁপে গিয়েছিল। গুলীটা আহমদ মুসার মাথার ওপর দিয়ে গিয়ে পেছনে দাঁড়ানো একজন রিভলবারধারীর হাঁটুতে গিয়ে বিদ্ধ করল।

লোকটির হাত থেকে রিভলবার পড়ে গেল। সে দু'হাত দিয়ে হাঁটু চেপে ধরে বসে পড়ল।

আহমদ মুসা প্রথম গুলী করেই দ্বিতীয় গুলীটি করল সামনে দাঁড়ানো দ্বিতীয় লোকটিকে লক্ষ্য করে।

আহমদ মুসা তখনও পড়ে আছে চিৎ হয়ে।

দ্বিতীয় গুলী করেই চোখ ফিরিয়ে দেখল পেছনে দাঁড়ানো অন্য লোকটি তার ডান পাশে। লোকটির রিভলবার উঠে এসেছে আহমদ মুসার লক্ষ্যে। আহমদ মুসা তার রিভলবার ঘুরিয়ে নিয়েছে, কিন্তু টার্গেটকে তাক করার সময় নেই।

আহমদ মুসার এই চিন্তা যত দ্রুত চলেছে, তার চেয়ে দ্রুত সচল হয়ে উঠেছে তার শরীর।

উদ্ধত রিভলবারের ওপর চোখ পড়ার সাথে সাথেই আহমদ মুসার দেহ মিডল ব্যাটে পেটানো ফুলটস ক্রিকেট বলের মতো গড়িয়ে গেল লোকটির দু'পায়ের দিকে।

লোকটি গুলী করেছিল। গুলীটি আহমদ মুসার গড়ানো দেহের প্রান্ত থেকে মাত্র ছয় সাত ইঞ্চি দূরে মেঝেকে গিয়ে বিদ্ধ করেছে। যথাসময়ে তার দেহ না গড়ালে গুলীটি তার বাম বুককে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিত।

রিভলবারের টার্গেট সরিয়ে নিয়ে লোকটি দ্বিতীয় গুলীর জন্যে ট্রিগারে তর্জনি চাপছিল। কিন্তু তার আগেই আহমদ মুসার গড়ানো দেহ প্রচন্ডভাবে আঘাত করল তার দু'পায়ে।

লোকটি হুমড়ি খেয়ে উপুড় হয়ে পড়ে গেল।

আহমদ মুসা উঠে বসেছে।

লোকটিও পড়ে গিয়েই এক মোচড়ে দেহটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে উঠে বসেছে। রিভলবার সে ছাড়েনি। তার রিভলবারও ঘুরে আসছে আহমদ মুসার দিকে। লোকটির চোখে-মুখে বেপরোয়া ভাব।

আহমদ মুসার হাতের রিভলবারও উদ্ধত ছিল। বেপরোয়া লোকটিকে সময় দেয়া যাবে না ভেবেই আহমদ মুসা তর্জনি চাপল তার রিভলবারের ট্রিগারে।

রিভলবার থেকে বেরিয়ে গেল একটা গুলী। আর তার সাথে সাথেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

উঠে দাঁড়িয়ে স্থির হবার আগেই তার দেহটা ঝাঁকুনি দিয়ে কেঁপে উফল। একটা গুলী তার উরুতে এসে বিদ্ধ হয়েছে। গুলীটা বাম উরুর বাম পাশের একটা অংশকে আগ্রাসি এক কামড় দিয়ে কিছু অংশ তুলে নিল।

আহমদ মুসার দেহ কেঁপেছে, কিন্তু তার রিভলবার ধরা ডান হাত ও দু'চোখ এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করেনি। দু'চোখ ও রিভলবার এক সংগেই ঘুরে গেল শব্দ লক্ষ্যে।

আহমদ মুসা দেখল, হাঁটুতে গুলী খাওয়া লোকটিই রিভলবার তুলে নিয়ে তাকে গুলী করেছে।

তার দিকে চোখ পড়ার সংগে সংগেই আহমদ মুসা গুলী করল লোকটিকে তাকে দ্বিতীয় গুলী করার সুযোগ না দিয়ে।

বসে থাকা লোকটির মাথা গুঁড়ো হয়ে গেল। নিঃশব্দে সে ঢলে পড়ল মেঝেতে।

আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়াল সিঁড়ির গোড়ার দিকে। তাকে হয় আন্ডারগ্রাউন্ড ফ্লোরে নামতে হবে, নয়তো ওপরে যেতে হবে। সে নিশ্চিত এই বাড়িতেই প্রধান বিচারপতি বন্দী আছেন।

ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে সিঁড়ির দিকেও চোখ গেল আহমদ মুসার। দেখল সিঁড়ির মাথায় সেই মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। তার সাথে সৌম্য দর্শন একজন বৃদ্ধ। লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়ানো। তার বাম হাত সিঁড়ির রেলিংয়ে রাখা। লোকটির মাথার চাঁদিতে ছোট্ট একটা টুপি।

তার মানে বৃদ্ধটি ইহুদি, মেয়েটি নিশ্চয় বৃদ্ধটিরই কেউ। তাহলে সেও তো ইহুদি! তারা কি এই কিডন্যাপারদের অংশ? কিন্তু ওরা তো এ্যাকশনে নেই। একই দলের হলে ওরা নির্বিকার দর্শক হবে কেন? একই দলের হলে হয় এ্যাকশনে আসার কথা, নয়তো পালানোর কথা, অথচ তাদের দেখে মনে হচ্ছে শংকিত, বিস্মিত দর্শকের ভূমিকায়। একই বাড়িতে তাহলে এরা কারা?

আহমদ মুসার চোখে-মুখে যখন এসব প্রশ্ন, তখন শংকিত, বিস্মিত বৃদ্ধটি বলে উঠল, 'এসব এখানে কি ঘটছে, কেন ঘটছে, ওরা কারা? আপনি কে?'

এক নিঃশ্বাসে অনেক প্রশ্ন করে থামল বৃদ্ধটি। কণ্ঠে তার শংকা ও উদ্বেগ ঝরে পড়ল।

'আপনি এই লোকটিকে চেনেন না? এরা তো এই বাড়িরই লোক মনে হচ্ছে।' বলল আহমদ মুসা।

'না, এদের আমি চিনি না। আমি ওপর তলায় থাকি। নিচ তলাটা আমি ভাড়া দিয়েছি ডেভিড ইয়াহুদ নামে একজন ভদ্রলোককে অফিস করার জন্য। তারা কয়েকদিন হলো এখানে বসছেন।' বলল বৃদ্ধটি।

'ডেভিড ইয়াহুদকে আপনি কতদিন ধরে চেনেন?' আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

‘জার্মানিতে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন আমি পড়ি, তখন সে ছাত্র ছিল সেখানে।’ বৃদ্ধটি বলল।

বৃদ্ধ থামতেই মেয়েটি ফিস ফিস করে তাকে কিছু বলল।

শুনেই চমকে উঠল বৃদ্ধটি। বিস্ফোরিত চোখে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল বৃদ্ধটি চিৎকার করে, ‘প্রধান বিচারপতিকে ওরা কিডন্যাপ করে এখানে এনেছে, এটা নাকি আপনি বলেছেন? কি ঘটনা?’

‘জি, ওরা আজ প্রধান বিচারপতিকে কিডন্যাপ করে এখানে এনেছে। আমরা নিশ্চিত জেনেই তাকে উদ্ধারের জন্যে এসেছি।’ বলল আহমদ মুসা।

‘তাঁর মানে প্রধান বিচারপতি এখন আমার এই বাড়িতে বন্দী আছেন!’ কম্পিত কণ্ঠে বলল বৃদ্ধটি।

‘আমি তাই মনে করি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ওপরের তলায় নেই, আমি ওপরে থাকি বলে নিশ্চিত করে বলতে পারি। তাহলে নিচ তলায় আছেন। চলুন দেখি।’ বলল বৃদ্ধটি।

‘বাবা, কিন্তু উনি তো আহত। ঊরুতে গুলী লেগেছে ওনার।’ বলল মেয়েটি।

মেয়েটির হাতে তখনও কয়েকটি বই।

‘ঠিক তো। যাও, তুমি গিয়ে ফার্স্ট এইড বক্সটা নিয়ে এসো। আমি নিচে নামছি।’ বলল বৃদ্ধটি।

‘না, এসব এখন নয়। আসুন, আগে প্রধান বিচারপতির সন্ধান করি। ওটাই বেশি জরুরি।’

‘জরুরি অবশ্যই। সাধারণ ব্যান্ডেজে সময় বেশি লাগবে না।’ বলল মেয়েটি।

‘আমার হাঁটুতে ক্রেপ গার্ডার আছে। আমি ওটা টেনে ওপরে তুলে নিয়েছি। অন্তত রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে এতে।’ বলল আহমদ মুসা।

বৃদ্ধটি এক হাতে সিঁড়ির রেলিং ধরে অন্য হাতে লাঠিতে ভর দিয়ে নিচে নেমে এলো।

তার সাথে মেয়েটি নেমে এলো।

আহমদ মুসাও সিঁড়ির গোড়ায় চলে এসেছে।

বৃদ্ধ ও মেয়েটি এসে তার সামনে দাঁড়াল।

বৃদ্ধটি বলল, 'আমি ডেভিড হারজেল। বসফরাস কলেজ অব টেকনোলজি থেকে আমি রিটায়ার করেছি। ফিজিক্স পড়াতাম। তবে অধ্যাপনা নয়, ব্যবসায় ছিল মূল নেশা। এখন ব্যবসাটা কর্মচারীরা দেখে।' আর বৃদ্ধ মেয়েটিকে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বলল, 'আমার মেয়ে হান্নাহ হাগেরা, বসফরাস কলেজ অব টেকনোলজি ছাত্রী। কলেজ-হোস্টেলেই সে থাকে।'

'আপনি বোধ হয় কলেজেই ফিরে যাচ্ছিলেন?' আহমদ মুসা বলল মেয়েটিকে লক্ষ্য করে।

'কি করে বুঝলেন?' বলল মেয়েটি। তার বিস্ময় ভরা দৃষ্টি আহমদ মুসার দিকে।

'কয়েকটি বই হাতে নিয়ে আপনি নামছিলেন।' আহমদ মুসা বলল।

মেয়েটি হাতের বইগুলোর দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'ভুলেই গিয়েছিলাম বইগুলোর কথা। এই জরুরি বইগুলো নেয়ার জন্যে আধ-ঘন্টা আগে বাসায় এসেছিলাম। ফিরতে গিয়েই এই সাংঘাতিক ঘটনার মুখে পড়লাম।'

'সাংঘাতিক ঘটনা না ঘটিয়ে উপায় ছিল না। চলুন, আমরা দেখি।'

বলে আহমদ মুসা চলতে শুরু করল লিফটের দিকে।

তার পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করল হান্নাহ হাগেরা ও বৃদ্ধ ডেভিড হারজেল।

আহমদ মুসা গিয়ে দাঁড়াল লিফটের সামনে। নিচে নামার জন্যে ডাউন বাটনে চাপ দিল, কিন্তু লাইট ইনডিকেটর জ্বলল না।

লিফটের দরজার চারদিকটা একবার দেখল আহমদ মুসা। তারপর টপে ফ্লোর ইন্ডিকেটরের ডান পাশে প্রায় অদৃশ্য একটা বোতামের ওপর চাপ দিল। সংগে সংগেই ডাউন মুভিং ইন্ডিকেটরে আলো জ্বলে উঠল।

বৃদ্ধ ডেভিড হারজেল নিরবে আহমদ মুসার কাজ দেখছিল। তার চোখে-মুখে বিস্ময়! লিফটের মুভিং ইন্ডিকেটর যে বিদ্যুৎ কানেকশনের অভাবে কাজ করছে না, তা বুঝল কেমন করে? প্রায় অদৃশ্য বাটন সে খুঁজে পেল কেমন করে

এত দ্রুত? আর টপ ফ্লোর ইন্ডিকেটরের দু'পাশেই অনুরূপ বাটন আছে, কিন্তু ডান দিকের বাটনটাই চাপল কেন?

এসব প্রশ্ন ও একরাশ বিস্ময় নিয়ে বৃদ্ধ ডেভিড হারজেল বলল, 'ফ্লোর ইন্ডিকেটরের দু'পাশেই অনুরূপ বাটন আছে। আপনি কি করে বুঝলেন ডান পাশের বাটন টিপলেন লিফট বিদ্যুৎ কানেকশন পাবে?'

'এ ব্যবস্থা আপনারাই করে রেখেছেন। বাম বাটনের সারপেসের দিকটি দুই অর্ধবৃত্তে বিভক্ত এবং ডানেরটি বিভক্ত নয়। এতেই বামেরটি ডিসকানেক্ট, আর কানেক্ট করার বাটন।' আহমদ মুসা বলল।

'অসাধারণ আইকিউ আপনার! এ পর্যন্ত কেউই না বলে দিলে এই গোলকধাঁধাঁ ভাঙতে পারেনি। আপনার কাছেই প্রথম এই গোলকধাঁধাঁ পরাজিত হলো।' বলল বৃদ্ধ।

'শুধু আই কিউ নয়, লড়াইতেও অসাধারণ! উনি যে অবস্থায় পড়েছিলেন, তাঁর বাঁচা অবিশ্বাস্য ছিল। কিন্তু উনি শুধু বাঁচেননি, যাদের পরাজয় অকল্পনীয় ছিল, তারা সবাই মরেছে ওনার হাতে।' মেয়েটি বলল।

'আসুন' বলে লিফটে প্রবেশ করল আহমদ মুসা মেয়েটির কথা শেষ হবার আগেই।

ডেভিড হারজেল ও হান্নাহ হাগেরা লিফটে প্রবেশ করল।

প্রথমে তারা সার্চ করল আন্ডারগ্রাউন্ড ফ্লোর ওয়ান।

লিফট 'আন্ডারগ্রাউন্ড ফ্লোর ওয়ান'- এ পৌঁছলে আহমদ মুসা বৃদ্ধ ও মেয়েটিকে লিফট থেকে নামতে অনুরোধ করে লিফট লক করে পরে নিজে নামল।

'লিফট লক করার দরকার হলো কেন?' জিজ্ঞাসা ছিল বৃদ্ধ ডেভিড হারজেলের।

'যাতে অন্য কোন ফ্লোর থেকে কেউ লিফট ব্যবহারের সুযোগ না পায়।' আহমদ মুসা বলল।

'বুঝেছি, আর ইতোমধ্যে 'আন্ডারগ্রাউন্ড ফ্লোর-টু' থেকে কেউ পালাতে না পারে, এজন্যেই এ ব্যবস্থা। আপনি অনেক দূরের ভবিষ্যতকেও দেখেন।' বলল হান্নাহ হাগেরা।

‘এটা ভবিষ্যত দর্শন নয়। ভবিষ্যত স্রষ্টা ছাড়া আর কেউ জানেন না। আমি যেটা করেছি সেটা কমনসেন্সের ব্যাপার।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আন্ডারগ্রাউন্ড ফ্লোর ওয়ান’ কতকগুলো প্রায় ফাঁকা কক্ষের সমষ্টি। সব কক্ষেই অনুসন্ধান হলো, কিন্তু কিছুই মিলল না। অফিস ঘরের টেবিলে একটা নোট-শিট পেল। আজকের তারিখ দেয়া ওপরের শিটটাতেই শুধু বিক্ষিপ্ত কিছু লেখা। শিটটা ছিঁড়ে আহমদ মুসা পকেটে পুরল। বলল মেয়েটি ও বৃদ্ধকে লক্ষ্য করে, ‘এ ফ্লোরটি বন্দী কাউকে রাখার উপযুক্ত নয়। চলুন, নিচের ফ্লোরটি দেখি।’

বলে আহমদ মুসা লিফটের দিকে পা বাড়াল।

সবাইকে নিয়ে লিফট নেমে এলো ‘আন্ডারগ্রাউন্ড ফ্লোর-টু’ মানে আন্ডারগ্রাউন্ড ফ্লোরের সবচেয়ে নিচের তলায়।

লিফট থেকে ডেভিড হারজেল ও হান্নাহ হাগেরা নেমে গেলে আহমদ মুসা লিফট লক করে বেরিয়ে এলো।

নিচের ফ্লোরটির অর্ধেকটাই ফাঁকা। বাকি অংশের তিন দিকে সারিবদ্ধ কেবিন। এর পরেই মাঝখানে রয়েছে প্রশস্ত অনেকখানি জায়গা।

‘এখানে অল্পক্ষণ আগেও লোক ছিল, এখন নিশ্চয় নেই।’ আহমদ মুসা বলল।

ডেভিড হারজেল হাঁটতে হাঁটতেই তাকাল আহমদ মুসার দিকে। তার চোখে-মুখে প্রশ্ন। বলল, ‘কেন বলছেন এ কথা?’

আহমদ মুসা কেবিনগুেলোর দরজা খুলে দেখছিল।

সব কেবিনের দরজা বন্ধ, কিন্তু লক করা নয়। এক প্রান্তের একটা কেবিনের দরজাই শুধু খোলা।

আহমদ মুসা সে দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। বলল ডেভিড হারজেলের প্রশ্নের জবাবে, ‘খেয়াল করে দেখুন, পাতলা একটা সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। এই ফরাসি মৃগনাভির সুগন্ধ আমি আপনাদের গেটে এর চেয়ে বেশি পরিমাণে পেয়েছি। আমার বিশ্বাস এখানকার সুগন্ধের উৎস আগের, গেটেরটা পরের। তুরস্কের প্রধান বিচারপতি এই সুগন্ধ ব্যবহার করেন, এটা আমি তার লাইফ-ডসিয়ার থেকে জানি। ইন্টারনেটে এই লাইফ-ডসিয়ার আছে।’

‘আপনার এই অনুমান প্রশংসনীয়, কিন্তু এতটুকুতেই কি বলা যায় প্রধান বিচারপতিকে এখানে আটকে রাখা হয়েছিল? ফরাসি ঐ মৃগনাভি অনেকেই ব্যবহার করেন, এটাই স্বাভাবিক।’ বলল হান্নাহ হাগেরা।

‘আপনার কথাও ঠিক।’ বলে আহমদ মুসা খোলা দরজা দিয়ে কেবিনে প্রবেশ করল।

ডেভিড হারজেল ও হান্নাহ হাগেরাও কেবিনের দরজায় এসে পড়েছে।

কেবিনটির খাটের এদিকের পায়ার পাশে পড়ে থাকা একটা চকচকে ছোট্ট জিনিসের দিকে আহমদ মুসার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।

আহমদ মুসা গিয়ে ওটা তুলে নিল।

জিনিসটার ওপর চোখ বুলিয়েই আহমদ মুসা একটু উচ্চ স্বরে বলে উঠল, ‘হ্যাঁ, মি. ডেভিড হারজেল, প্রধান বিচারপতি এখানে ছিলেন। তার চিহ্ন তিনি এখানে ফেলে রেখে গেছেন।’

ডেভিড হারজেল ও হান্নাহ হাগেরা দু’জনেই জিনিসটা তুলে নেয়াকে উৎসুকের দৃষ্টিতে দেখছিল। বলল হান্নাহ হাগেরা দ্রুত কণ্ঠে, ‘কি ওটা পেলেন?’

আহমদ মুসা জিনিসটা তাদের দিকে তুলে ধরে বলল, ‘বিচারপতির মনোগ্রামের কোটপিন। বিচারপতিরা এটা পরেন।’

ডেভিড হারজেল ওটা দেখে বলল, ‘ঠিক বলেছেন। এটা বিচারপতিদের কোটপিন।’

বলার সাথে সাথে বৃদ্ধ ডেভিড হারজেলের মুখটা কঠোর হয়ে উঠল। বলল, ‘ওরা আমার বাড়িকে সন্ত্রাসের আড্ডা বানিয়েছিল! ডেভিড ইয়াহুদকে আমি প্রতিভাবান একজন ভালো মানুষ মনে করতাম।’

মুহূর্তের জন্যে একটু থেমেই আবার বলে উঠল, ‘কিন্তু তাঁকে নিয়ে এসেই আবার সরিয়ে নিল কেন?’

‘ওরা বুঝতে পেরেছিল, তাদের এই আড্ডার ঠিকানা আমরা পেয়ে গেছি।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আপনারা কে? আপনার পরিচয় কিন্তু জানা হয়নি।’ জিজ্ঞাসা ডেভিড হারজেলের।

'আমি খালেদ খাকান। আমি আপনাদের পুলিশকে সাহায্য করছি।' আহমদ মুসা বলল।

'আপনার নাম বললেন, পরিচয় কিন্তু বললেন না। আপনি পুলিশ এটুকু মাত্র বোঝা গেছে।' বলল হান্নাহ হাগেরা।

'প্লিজ এসব কথা পরে হবে। এখন উদ্বেগজনক হলো অসুস্থ প্রধান বিচারপতি কোথায় কিভাবে আছেন! তাকে অবিলম্বে উদ্ধার করতে না পারলে তার ক্ষতি হতে পারে।' আহমদ মুসা বলল। আহমদ মুসার গম্ভীর কণ্ঠে উদ্বেগ ঝরে পড়ল।

ডেভিড হারজেল ও হাগেরার চোখে-মুখে উদ্বেগের ছায়া খেলে গেল। বলল ডেভিড হারজেল, 'কিন্তু তারা প্রধান বিচারপতিকে কিডন্যাপ করেছে কেন? তাকে নিয়ে তারা কি করবে? আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'এর উত্তর দিতে হলে অনেক কথা বলতে হবে। শুধু এটুকু জেনে রাখুন, ওরা বিদেশের স্বার্থে গোপনে কাজ করেন। রোমেলী দুর্গের ল্যাবরেটরী অব টেকনোলজিকে ওরা ধ্বংস করতে চায়। ওরা ল্যাবরেটরীর প্রধান বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসিকে কিডন্যাপ করেছিল। তাকে উদ্ধার করা হলে ওরা সুযোগ পেয়ে চীফ জাস্টিসকে কিডন্যাপ করেছে। সম্ভবত পণবন্দী হিসেবে কিংবা প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে ওরা প্রধান বিচারপতিকে হত্যাও করতে পারে।' আহমদ মুসা বলল।

'সাংঘাতিক ঘটনা! কিন্তু প্রধান বিচারপতিকে ওরা সরিয়ে নিয়েছে। কোথায় পাওয়া যাবে ওদের?' উদ্বেগে ডেভিড হারজেলের কণ্ঠ কাঁপছিল।

ভাবছিল আহমদ মুসা। বলল, 'ওরা বেশিক্ষণ আগে যায়নি প্রধান বিচারপতিকে নিয়ে। ওরা চারজনকে পেছনে রেখে গিয়েছিল, তাদের উদ্দেশ্য পেছনটা নিরাপদ রাখা এবং তাদের এ ঘাঁটির সন্ধান সত্যিই কেউ পেয়েছে কিনা, কেউ আসে কিনা, সেটা দেখার জন্যে। আমার ধারণা তাদের এখান থেকে পালানোর সময় আধা ঘন্টার বেশি হবে না।'

ভ্রু কুঞ্চিত হয়ে উঠেছিল হান্নাহ হাগেরার। আধা ঘন্টা আগে বাড়িতে আসার সময় ঠিকই সে দেখেছিল দু'টি গাড়িকে তাদের বাড়ি থেকে চলে যেতে। সামনে একটা মাইক্রোবাস ছিল, পেছনে একটা জীপে ছিলেন ডেভিড ইয়াহুদ

আংকেল। তাহলে কি প্রধান বিচারপতিকে নিয়েই তারা পালাচ্ছিলেন ঐ সময়! বুকটা কেঁপে উঠল হান্নাহ হাগেরার। বলল সে, 'হ্যা, আধা ঘন্টা আগে আমি বাড়িতে আসার সময় দু'টি গাড়ি আমাদের বাড়ি থেকে যেতে দেখেছি। একটা মাইক্রো, অন্যটা জীপ। জীপ চলাচ্ছিলেন ডেভিড ইয়াহুদ আংকেল নিজে।'

আহমদ মুসার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'সন্দেহ নেই ঐ মাইক্রোবাসেই অসুস্থ প্রধান বিচারপতি ছিলেন। আপনি ঠিক কোন্ জায়গায় ওদের দেখেছিলেন, কোন্ দিকে যাচ্ছিলেন?'

'গাড়ি দু'টি প্রধান রাস্তায় উঠতে যাচ্ছিল, সে সময় আমি ওদের ক্রস করি। আমি অটো রিকশায় আসছিলাম। ডেভিড ইয়াহুদ আংকেল আমাকে দেখেননি, আমি তাকে দেখেছি। পরে আমি পেছনে ফিরে তাকাইনি। ওরা রাস্তায় উঠে কোন্ দিকে গেছে দেখিনি। তবে...।'

বলে থেমে গেল হান্নাহ হাগেরা।

'তবে কি?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'আমি যখন ডেভিড ইয়াহুদ আংকেলকে ক্রস করে এসেছি, সে সময় তার কণ্ঠ থেকে দু'টি শব্দ আমার কানে এলো। একদম অচেনা দু'টি শব্দ, আমি বুঝলাম না। পেছন দিকে তাকালাম। দেখলাম একজন জীপের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বুঝলাম তাকে লক্ষ্য করেই শব্দ দু'টি বলা হয়েছে। এই লোকটি চারজনের একজন যারা আপনার সাথে সংঘর্ষে এই মাত্র মারা গেল।'

একটু থামল হান্নাহ হাগেরা।

আহমদ মুসা উন্মুখ হয়ে উঠেছে। বলল, 'শব্দ দু'টি কি মিস হান্নাহ হাগেরা?'

'শব্দ দু'টি এই রকম: ডেকেল কারমেল।'

শব্দ দু'টি শুনে একটু ভাবল। চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আহমদ মুসার। বলল দ্রুত কণ্ঠে, ইস্তাম্বুলে 'পাম ট্রি গার্ডেন' নামে কোন বাগান বা 'পাম ট্রি গার্ডেন' নামে কোন এলাকা আছে?'

ডেভিড হারজেল ও হান্নাহ হাগেরা কথা বলল না তৎক্ষণাত। ভাবছিল তারা। একটু পর বলল, 'না, এ নামের কোন বাগান বা স্থানের নাম আমরা শুনিনি।'

আহমদ মুসা পকেট থেকে মোবাইল বের করে দ্রুত একটা কল করল।

ওপারের সাড়া পেয়েই আহমদ মুসা বলল, 'আমি খালেদ খাকান, জেনারেল মি. মোস্তফা, ইস্তাম্বুলে 'পাম ট্রি গার্ডেন' বা 'পাম গার্ডেন' এলাকা বলে কিছু আছে?'

'না, মি. খালেদ, এমন নামের স্থান বা গার্ডেন ইস্তাম্বুলে নেই। আপনি কোথায়?'

'আমি ঐ ঠিকানা থেকে কথা বলছি। এখান থেকে ওরা পালিয়েছে। আমার মনে হয় 'পাম গার্ডেন' নামের কোথাও পালিয়েছে। আপনি কোথায়?'

'এখনও হাসপাতালে। পুলিশপ্রধান নাজিম এরকেন তোমার ওখানে রওয়ানা দিয়েছে।' বলল ওপার থেকে জেনারেল মোস্তফা।

'এখন আর ওঁদের আসার প্রয়োজন ছিল না। যাক, শুনুন, আপনার পাশে কি কম্পিউটার আছে?' আহমদ মুসা বলল।

'হ্যাঁ, আছে। কেন বলছেন? কি করতে হবে?' বলল জেনারেল মোস্তফা ওপার থেকে।

'আপনি দয়া করে ইন্টারনেটে ইস্তাম্বুল ফাইলে 'পাম ট্রি গার্ডেন' অথবা 'ডেকেল কারমেল' নামে কিছু পান কিনা দেখুন। আমি আপনার উত্তরের অপেক্ষা করছি।' আহমদ মুসা বলল।

'বুঝেছি খালেদ খাকান। দেখছি আমি। ধন্যবাদ। সালাম।'

ওপার থেকে মোবাইল অফ হয়ে গেল।

আহমদ মুসা হাত নিচে নামাল। কিন্তু মোবাইলটা হাতেই রাখল।

ডেভিড হারজেল ও হান্নাহ হাগেরা আহমদ মুসার দিকে তাকিয়েছিল। তাদের চোখে-মুখে প্রশ্ন। মোবাইলে কথা দু'একটা তাদেরও কানে গেছে। বলল ডেভিড হারজেল আহমদ মুসা তাদের দিকে ঘুরে তাকাতেই, 'তাহলে ডেকেল কারমেল অর্থ কি পাম ট্রি গার্ডেন?'

'হ্যাঁ।' আহমদ মুসা বলল।

'এটা তো হিব্রু শব্দ!' জিজ্ঞাসা ডেভিড হারজেলের।

'হ্যাঁ, হিব্রু শব্দ!' আহমদ মুসা বলল।

'কিন্তু এর অর্থ আমি ইহুদি হয়েও জানি না। আপনি জানলেন কি করে?' বলল ডেভিড হারজেল।

'ইসরাইল একটা মৃত ভাষাকে জীবিত করছে তো, তাই এর প্রতি স্বাভাবিক আগ্রহ আছে আমার।' আহমদ মুসা বলল।

'জেনারেল মোস্তফা কে, মি. খালেদ খাকান?' বলল হান্নাহ হাগেরা। তার চোখে-মুখে বিস্ময়!

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'উনি তুরস্কের নিরাপত্তা-গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান হাজী জেনারেল মোস্তফা কামাল।'

'তাহলে তো মনে হয়, আপনি তার চেয়ে বড়। তুরস্কের নিরাপত্তা গোয়েন্দাপ্রধানকে যিনি নির্দেশ দিতে পারেন তিনি তো নিশ্চয় অসম্ভব বড় হবেন। আপনি যেটুকু পরিচয় দিয়েছেন, তার সাথে আপনার কাজ মেলে না।' হান্নাহ হাগেরা বলল।

'বড় হবার প্রয়োজন হয় না। বন্ধুস্থানীয় যারা, তাদের নির্দেশ দেয়া যায়, এমনকি অবস্থা বিশেষে যে কেউ যে কাউকে নির্দেশ দিতে পারে।' আহমদ মুসা বলল।

কিছু বলতে যাচ্ছিল ডেভিড হারজেল। তখন মোবাইল বেজে উঠল আহমদ মুসার।

থেমে গেল ডেভিড হারজেল।

আহমদ মুসা মোবাইল উঠিয়ে নিয়ে সালাম দিতেই ওপার থেকে জেনারেল মোস্তফা বলে উঠল, 'হ্যাঁ, মি. খালেদ খাকান। আপনার চেষ্টা সফল। 'পাম ট্রি গার্ডেন'- এর সন্ধান পাওয়া গেছে। ওটা একটা বাসা-কাম-ল্যাবরেটরি।'

'কার বাসা?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'ইস্তাম্বুলের ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির স্কুল অব এ্যাডভান্স ফিজিক্স-এর রিটায়ার্ড প্রফেসর আবু আবদুর রহমান আরিয়েহর বাড়ি। তার ব্যক্তিগত ল্যাবরেটরি রয়েছে ঐ বাড়িতে।' বলল জেনারেল মোস্তফা।

'তার পরিচয় সম্পর্কে আপনি কত দূর জানেন?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'তিনি পার্টিকেল ফিজিক্সের একজন প্রতিভাবান প্রফেসর। লেবাননে জন্ম। লেখাপড়া শেষে ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি নিয়ে এসে তুরস্কেই থেকে গেছেন। রিটায়ার করার পর অধিকাংশ সময়ই ইউরোপে কাটান। ক'দিন আগে তিনি জার্মানিতে গিয়েছিলেন। ফিরেও এসেছেন সম্ভবত।'

বলে একটু থামল জেনারেল মোস্তফা। তারপর বলল, 'তার সম্পর্কে এত কথা কেন? পাম গার্ডেনেরই বা খোঁজ করছেন কেন?'

'সব বলব। আপনি অবিলম্বে সাদা পোশাকের পুলিশ দিয়ে বাড়ির গোটা কমপ্লেক্স ঘিরে ফেলার ব্যবস্থা করুন। বাড়ি থেকে কেউ বেরুলে তাকে গোপনে আটকে রাখার ব্যবস্থা করুন। আমি ওখানে যাচ্ছি। বাড়িটার ঠিকানা বলুন।' আহমদ মুসা বলল।

বাড়ির নম্বর ও লোকেশন আহমদ মুসাকে জানিয়ে জেনারেল মোস্তফা বলল, 'পুলিশপ্রধান নাজিম এরকেনকেও আমি জানাচ্ছি। আমিও যাচ্ছি ওখানে। আমার অনুমান মিথ্যা না হলে আপনি সন্দেহ করছেন প্রধান বিচারপতিকে সরিয়ে নিয়ে ওখানেই রাখা হয়েছে। একটা কথা মি. খালে খাকান, আপনাকে অসুস্থ মনে হচ্ছে। আপনি ঠিক আছেন তো?'

'কেমন করে মনে হলো আমি অসুস্থ?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'আপনি নিশ্চয় একটা কথা জানেন না, আমি একজন সাউন্ড এ্যানালিস্টও। আপনার কথার প্রতিটা শব্দের মধ্যে সূক্ষ্ম একটা কম্পন আছে। এই ধরণের কম্পন কোন দৈহিক আঘাত থেকে আসে। আমি ঠিক বলেছি কিনা বলুন।' জেনারেল মোস্তফা বলল।

‘হ্যাঁ, জেনারেল মোস্তফা, আমার হাঁটুর একটু ওপরে একটা গুলী আঘাত করেছে। খুব বড় আঘাত নয়। একটা পাশ ঘেঁষে গুলীটা বেরিয়ে গেছে। আমি ভালো আছি, মি. জেনারেল।’ বলল আহমদ মুসা।

‘গুলী লেগেছে? তাহলে আপনি চলে আসুন, না আমি আসব? আপনার চিকিৎসার পর আমরা ওদিকে এগোবো। আমি বলে দিচ্ছি বাড়িটা ঘিরে রাখবে।’ প্রায় এক নিঃশ্বাসে দ্রুত কণ্ঠে বলল কথাগুলো জেনারেল মোস্তফা।

‘এই তো আপনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এজন্যেই কথাটা গোপন করেছিলাম। আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না। চিকিৎসার যদি কিছু থাকে করেই আমি ওখানে যাচ্ছি। আপনি আসুন।’ আহমদ মুসা বলল।

‘না, মি. খালেদ খাকান, এ ব্যাপারে আপনার ওপর আমার আস্থা নেই। আপনি আপনার নিজের ওপর অবিচার করেন অথচ সুবিচারের শুরু নিজের হক থেকেই। আল্লাহ এটা চান।’ বলল গম্ভীর কণ্ঠে জেনারেল মোস্তফা।

‘আমি এটা মানি। অবস্থার কারণে ব্যতিক্রম কখনও হতেই পারে। এক্ষেত্রে কনসেশন আল্লাহ দিয়েছেন।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আজ ঐ ধরণের কনসেশন আল্লাহ দেবেন না। আমি রাখছি। আপনি কথা রাখবেন, তারপর ওখানে যাবেন। আমি যাচ্ছি।’

‘ধন্যবাদ।’ বলে আহমদ মুসাও মোবাইল অফ করে দিল।

আহমদ মুসা কথা শেষ করতেই ডেভিড হারজেল বলল, ‘পাম গার্ডেন পেয়েছেন? কোথায়? ওখানে যাবেন, এখনি?’

‘সন্ধান পেয়েছেন ওনারা। পূর্ব ইস্তাম্বুলের পাহাড় এলাকায়। হ্যাঁ, জনাব, যেতে হবে আমাকে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ঠিক আছে, যাবেন। আগে চলুন, আপনার আঘাতের শুশ্রূষা দরকার। তারপর যাবেন। দরকার হলে আমিই আপনাকে পৌঁছে দেব।’ বলল হান্নাহ হাগেরা।

‘ঠিক আছে চলুন।’ আহমদ মুসা বলল।

সবাই বেরিয়ে এলো বেসমেন্ট থেকে। সিঁড়ি দিয়ে পাশাপাশি ওপরে উঠছিল আহমদ মুসা ও হান্নাহ হাগেরা। সামনে ডেভিড হারজেল।

‘আপনার কি ক্রেপ ব্যান্ডেজ আছে?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা মেয়েটিকে।

‘আপনি ইস্তাম্বুলে খুব বেশি দিন আগে আসেননি তাহলে?’ বলল হান্নাহ হাগেরা।

‘কেন বলছেন এই কথা?’ আহমদ মুসা বলল।

‘কারণ ইস্তাম্বুলে এটা আইন যে, কলেজ লেভেলের প্রত্যেক মেয়েকে সিভিল ডিফেন্স ও নার্সিং ট্রেনিং এবং হাসপাতালে তিন মাস কাজ এবং এই লেভেলের ছেলেদেরকে তিন মাস সামরিক ট্রেনিং ও তিন মাস সামরিক ক্যাম্পে থাকা বাধ্যতামূলক। এই সাথে প্রতিটি বাড়িতে একটি মিনি মেডিকেল কাউন্টার থাকতে হবে।’ বলল হান্নাহ হাগেরা হাসি মুখে।

উঠে এসেছে তারা দু’তলায়।

ওপরে ওঠার পরেই লাউঞ্জের মতো প্রশস্ত একটা জায়গায় গুচ্ছাকারে সোফা সাজানো।

হান্নাহ হাগেরা আহমদ মুসাকে সোফায় বসার আমন্ত্রণ জানিয়ে বলল, ‘মেডিকেল জিনিসপত্র সব ঠিকঠাক করে আমি আসছি।’

আহমদ মুসা বসল।

পাশে বসল ডেভিড হারজেলও। ডেভিড হারজেল বসেই আহমদ মুসার দিকে চেয়ে বলল, ‘আমি বিস্মিত হচ্ছি, মি. খালেদ খাকান। ডেভিড ইয়াহুদের সাথে দীর্ঘদিনের পরিচয়েও আমি তাকে চিনতে পারিনি। আমি বুঝতে পারছি না তার এসব করার পেছনে লক্ষ্য কি, স্বার্থ কি?’

‘ওরা সম্ভবত একটা গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কর্ম চুরি করতে চায়।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কি বিষয়ের গবেষণা কর্ম?’ জিজ্ঞাসা ডেভিড হারজেলের।

‘সম্ভবত পারটিকেল ফিজিক্সের কোন বিষয়ে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘পারটিকেল ফিজিক্সের বিখ্যাত গবেষক প্রফেসর আরিয়েহের তো ড. ডেভিড ইয়াহুদের সাথে সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। সে আবার পারটিকেল ফিজিক্সের

কোন্ গবেষণা কর্ম নিয়ে এমন হন্যে হলো? ফিজিক্সের মতো কোন গবেষণা কর্ম নিয়ে তার তো আগ্রহী হওয়ার কথা নয়!’ বলল ডেভিড হারজেল।

আহমদ মুসা বিস্মিত হলো প্রফেসর আরিয়েহের নাম শুনে। এই প্রফেসর আরিয়েহ নিশ্চয় প্রফেসর আবু আবদুর রহমান আরিয়েহ। উনিও তো পারটিকেল ফিজিক্সের প্রফেসর। বলল আহমদ মুসা, ‘মি. ডেভিড হারজেল, আপনি কি প্রফেসর আরিয়েহকে চেনেন?’

‘আগে প্রায়ই দেখা হতো। এখনও সিনাগগে মাঝে মাঝে দেখা হয়। লোকটা খুব গুণী লোক। বিজ্ঞানের জগত ছাড়া তাঁর আর কোন জগত নেই।’ বলল ডেভিড হারজেল।

‘উনি থাকেন কোথায়?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘আগে বিশ্ববিদ্যালয় কোয়ার্টারে থাকতেন, এখন কোথায় থাকে জানি না।’ ডেভিড হারজেল বলল।

আহমদ মুসা নিশ্চিত হলো ডেভিড হারজেল সব কথাই সত্য বলেছেন। আবু আবদুর রহমান আরিয়েহ কোথায় থাকেন জানলে তিনি পাম গার্ডেনও চিনতে পারতেন। হঠাৎ আহমদ মুসার মনে পড়ল আবু আবদুর রহমান আরিয়েহ সিনাগগে যান কেন? তাহলে কি...? মনে সন্দেহটি উঁকি দিতেই আহমদ মুসা জিজ্ঞেস করল, ‘মি. ডেভিড হারজেল, বিজ্ঞানী আবু আবদুর রহমান আরিয়েহ সিনাগগে যান কেন?’

হাসল ডেভিড হারজেল। বলল, ‘আপনি কি তাকে মুসলিম মনে করেছেন? সে একজন সক্রিয় ইহুদি।’

‘তাহলে নামটা?’ আহমদ মুসা বলল।

‘এমন নাম আপনি প্রচুর দেখবেন। অনেক রকম সুবিধা লাভের জন্যে স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় অনেক ইহুদিই, বিশেষ করে রাজনৈতিক চিন্তায় নাম পাল্টায়। তাঁর নামও ঐভাবে পাল্টানো হয়েছে।’ বলল ডেভিড হারজেল।

‘ডেভিড ইয়াহুদের মতো কোন গোপন সংগঠনের সাথে কি তিনি জড়িত?’ আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

‘তা আমি জানি না। তিনি নিরেট একজন গবেষক। তবে আমাদের ইহুদিদের মধ্যে যারা চরমপন্থী তাদের সাথেই তার ওঠাবসা।’ বলল ডেভিড হারজেল।

‘এ চরমপন্থীরা কারা?’ বলল আহমদ মুসা।

‘এ ব্যাপারে আমার স্বচ্ছ ধারণা নেই। তবে আমি যেটা বুঝেছি তাতে ইহুদিবাদকে আধিপত্যের এক অস্ত্র হিসেবে যারা দেখতে চায়, প্রফেসর আরিয়েহ তাদের সাথে একমত।’

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল। ঠিক এ সময় হান্নাহ হাগেরা এসে দাঁড়িয়েছিল। বলল, ‘সব ঠিক ঠাক, আসুন, মি. খালেদ খাকান।’

বলেই হান্নাহ হাগেরা চলতে শুরু ককরল। আহমদ মুসাও তার পিছু পিছু চলল।

লাউঞ্জ থেকে এক করিডোর ধরে সামনে এগিয়ে শেষ প্রান্তের একটা রুম বাড়ির মেডিকেল কর্নার।

মোটামুটি বড়-সড় ঘর। দু’টি বেড। বসার জন্যে কয়েকটি সোফা ও চেয়ার। একটা উঁচু লম্বা টেবিল, ঠিক অপারেশন টেবিলের মতো। স্টিলের ফ্রেমে একটা কাচের আলমারি। তাতে ওষুধপত্র ও চিকিৎসা সরঞ্জাম।

ঘরটিতে আয়োডিনের গন্ধ হাসপাতালের মতোই।

আহমদ মুসা দেখল, ছোটখাট অপারেশনের মতোই ব্যান্ডেজ ও অন্যান্য সরঞ্জাম একটা ছোট টেবিলে সাজানো। অনুরূপ আরেকটা টেবিলে পানির গামলা। ঘরের অন্য পাশে রয়েছে একটা পানির বেসিন।

সব দেখে আহমদ মুসা কিছু বলার জন্যে হান্নাহ হাগেরার দিকে চাইতেই সে বলল, ‘আপনি টেবিলে উঠে শুয়ে পড়ুন। আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে।’

আহমদ মুসার মুখে বিব্রত ভাব ফুটে উঠল। নিজের উরুর ব্যান্ডেজ সে নিজেই করতে চায়। বলল সে, ‘ধন্যবাদ, মিস হান্নাহ হাগেরা, ছোট শুশ্রূষা ও ব্যান্ডেজের কাজটা আমিই করে নিতে পারব।’

হান্নাহ হাগেরা তাকাল আহমদ মুসার দিকে। তার চোখে বিস্ময়! বলল, 'আপনি একা কিভাবে করবেন? কেন করবেন? বলেছি তো এর ওপর আমার ট্রেনিং আছে।'

'স্যরি, নিজের যে কাজটা নিজে করতে পারা যায়, সে কাজটা আপনিও নিশ্চয় অন্য কাউকে দেবেন না করতে।' বলে হাসল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার দিকে একবার গভীর দৃষ্টিতে চাইল হান্নাহ হাগেরা। ঠোঁটে ফুলে উঠল এক টুকরো হাসি। বলল, 'নিজে করার মতো কাজ এটা নয়, বিশেষ করে সাহায্যকারী যখন থাকে। আমি বুঝেছি, আপনি একটু গোঁড়া মুসলমান। তাই...।'

'না, আমি গোঁড়া মুসলমান নই। 'মুসলিম' শব্দের আগে গোঁড়া, অগোঁড়া বিশেষণ লাগানো যথার্থ নয়।' বলল আহমদ মুসা। তার মুখে হাসি।

'কেন, যারা ধর্মীয় অণুশাসন মানার নামে বাড়াবাড়ি করে, তাদেরই তো গোঁড়া বলা হয়?' বলল হান্নাহ হাগেরা।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'ধর্মীয় অনুশাসন মানার নামে যদি কেউ বাড়াবাড়ি করে, তাহলে সেটা ধর্মীয় আদর্শ ও অনুশাসনের পরিপন্থী কাজ। এটাকে গোঁড়ামি বলা যায় না। গোঁড়ামি অর্থে সাধারণত যারা ধর্মীয় আদর্শ ও অনুশাসন পুরোপুরি মানতে চেষ্টা করে তাদেরকে বুঝানো হয়। কিন্তু 'গোঁড়ামি' শব্দের ব্যবহার এক্ষেত্রে যথার্থ নয়। এখানে 'গোঁড়ামি'র বদলে 'একনিষ্ঠ' বা 'নিষ্ঠাবান' শব্দের ব্যবহার যথোপযুক্ত। কারণ ধর্মীয় আদর্শ ও অনুশাসন পুরোপুরি মেনে চলতে চেষ্টা করা ভালো জিনিস, কিন্তু 'গোঁড়ামি' শব্দ থেকে এই ভালো অর্থ বুঝায় না।'

'তার মানে আপনি ধর্মের নিষ্ঠাবান অনুসারি। ধন্যবাদ আপনাকে।'

বলেই ঘুরে দাঁড়িয়ে পেছনের ওয়াল হ্যাংগারে এক সেট পোশাক দেখিয়ে বলল, 'ব্যান্ডেজ শেষে আপনি এ পোশাক পরে নেবেন। পরনের জামা-কাপড় আপনার নষ্ট হয়ে গেছে। আর হ্যাঁ, বিদ্যুৎ অপারেটরের চেহারাটাও এই সুযোগে পাল্টে নেবেন।' হান্নাহ হাগেরার মুখে হাসি।

বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলো হান্নাহ হাগেরা।

হান্নাহ হাগেরাকে দেখেই ডেভিড হারজেল বলল, 'কি ব্যাপার, তুমি চলে এলে?'

'বাবা, উনি একাই নিজের ট্রিটমেন্ট করবেন।' বলল হান্নাহ হাগেরা। তার ঠোঁটে হাসি।

'উনি তাই বললেন? আশ্চর্য মানুষ!' ডেভিড হারজেল বলল।

'সব দিক দিয়েই আশ্চর্য মানুষ বাবা তিনি! তবে গত আধা ঘন্টায় তাঁর যে পরিচয় মিলেছে তাতে 'আশ্চর্য' বিশেষণ তাঁর জন্যে যথেষ্ট নয়। যিনি তুরস্কের সিকউরিটি চীফ জেনারেল মোস্তফাকে ডিকটেট করতে পারেন তাঁর পরিচয় কি হতে পারে বাবা ভেবে দেখ।' বলল হান্নাহ হাগেরা।

'হ্যাঁ, দেখছি ডেভিড ইয়াহুদরা তো কম নয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যে নামবে সে তো ওদের থেকে বড়ই হবে।' ডেভিড হারজেল বলল।

'কিন্তু বাবা, বুঝতে পারছি না, ডেভিড ইয়াহুদ আংকেলরা কাজটা কি করছেন? বিজ্ঞানীকে ধরে রাখতে পারেননি, বাগে পেয়ে অসুস্থ বিচারপতিকেই পণবন্দী বানিয়েছেন। এতটা মরিয়া কেন ওরা? কি কারণে?'

ভাবনায় কপাল কুঞ্চিত হয়ে উঠেছিল ডেভিড হারজেলের। ধীরে ধীরে বলল, 'সব কথা আমি খালেদ খাকানকে বলিনি। ডেভিড ইয়াহুদের সন্ত্রাসী কাজ-কর্মের দিকটা আমি একেবারেই জানি না, কিন্তু তাদের ধ্বংসকারী গবেষণা কর্মের দিকটা আমি কিছু জানি। একদিন সিনাগগে নিরিবিলি আলাপকালে বিজ্ঞানী আবু আবদুর রহমান আরিয়েহ বলেছিলেন, 'দুনিয়াটা হাতের মুঠোয় আসতে দেরি নেই। মানুষ পরমাণুকে নিজের ইচ্ছার অধীন করে বিধ্বংসী মারণাস্ত্র বানিয়েছে, তেমনি আলোর পরমাণু ফোটন পারটিকেলকে দাস বানিয়ে দুনিয়ার সব শক্তির সব সমরস্ত্রকে অদৃশ্য এক অস্ত্র দ্বারা নিরব ধ্বংসের শিকারে পরিণত করব।' আমি বিস্মিত কণ্ঠে বলেছিলাম, 'এমন অস্ত্রের কল্পনা কি বাস্তব?' উত্তরে তিনি বলেছিন, 'বলতে পারেন সাফল্য থেকে মাত্র আমরা এক গজ দূরে।'

বলে একটু থামল ডেভিড হারজেল। পর মুহূর্তেই আবার বলে উঠল, 'কিন্তু বুঝতে পারছি না, তাদের কথা সত্য হলে তারা তো ভয়ংকর অস্ত্র আবিষ্কার

করছে, তাহলে তারা অন্য একজন বিজ্ঞানীর গবেষণা নিয়ে এমন মরিয়া হয়ে উঠল কেন?'

'বাবা, বিজ্ঞানী বিজ্ঞানীর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়। এও হয়তো তেমনি একটা ব্যাপার। কিন্তু বাবা, আমি ভাবছি অন্য কথা, ডেভিড ইয়াহুদ আংকেল এমন ভয়ংকর অস্ত্র তৈরী করছেন কেন, কার স্বার্থে? কোন রাষ্ট্রের তারা কেউ নন, মালিকও তারা কোন রাষ্ট্রের নন, তাহলে দুনিয়ার সব অস্ত্রাগার ধ্বংস করে তারা কি করবেন?' বলল হান্নাহ হাগেরা। তার কণ্ঠে বিস্ময়!

'এর উত্তর আমিও জানি না, মা। ডেভিড ইয়াহুদ ও আবু আবদুর রহমান আরিয়েহ দু'জনেই তুরস্কের নাগরিক। কিন্তু তুরস্কের পক্ষে তারা কাজ করছে না, এ কথা পরিস্কার। আবু আবদুর রহমান আরিয়েহের কথাবার্তায় যে ইংগিত পেয়েছি, তাতে বুঝা যায় তারা জায়নবাদী কোন চক্রান্ত বা পশ্চিমী কোন পাওয়ার সিন্ডিকেটের পক্ষে কাজ করছে। এটা যদি সত্য হয়, তাহলে তা হবে সাংঘাতিক বিপজ্জনক।' বলল ডেভিড হারজেল। তার চোখে-মুখে দুশ্চিন্তার কালো ছাপ।

হান্নাহ হাগেরার চোখে-মুখেও আশংকার ছাপ। বলল, 'ব্যাপারটা আমার কাছে সিরিয়াস মনে হয়নি। কিন্তু এখন আপনার শেষ কথাগুলো শুনে আমি আতংকিত বোধ করছি। এতো পৃথিবীর বিরুদ্ধে, পৃথিবীর মানুষের বিরুদ্ধে একটা ভয়াবহ ষড়যন্ত্র। আমি ভেবে পাচ্ছি না আমাদের তুরস্ক এই ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের স্থান হয়ে দাঁড়াল কেমন করে?'

দু'জনই সোফায় বসে আলোচনায় তন্ময় হয়ে গিয়েছিল।

আহমদ মুসা পেছনে এসে গিয়েছিল।

হান্নাহ হাগেরার কথার জবাবে কিছু বলতে যাচ্ছিল ডেভিড হারজেল। কিন্তু তার আগেই আহমদ মুসা বলল, 'স্যরি মিস হান্নাহ, তুরস্ক কেন ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের স্থান হয়ে দাঁড়াল?'

হান্নাহ হাগেরা বসে থেকেই পেছন ফিরে তাকাল। দেখল, আহমদ মুসা একদম তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার পরনে নতুন প্যান্ট ও শার্ট। আগের জ্যাকেটটাও তার গায়ে আছে।

হান্নাহ হাগেরা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'বসুন, বলছি আপনার উত্তর।'

আহমদ মুসা বসতে বসতে বলল, ‘আমাকে এখনি ছুটতে হবে।’

‘হ্যাঁ, যে প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করছিলেন। কি সব ভয়ংকর অস্ত্র নাকি আবিষ্কৃত হয়েছে! ফোটন পারটিকেল ব্যবহার করে নাকি দুনিয়ার সব মারণাস্ত্র তার অস্ত্রাগারেই নিরবে ও পলকের মধ্যে ধ্বংস করার অস্ত্র আবিষ্কার করেছে এক ব্যক্তি বা একটি সংঘ এবং এই আবিষ্কারের গবেষণা নাকি তুরস্কেই হয়েছে! এই ভয়ংকর খবরের কথাই বলছিলাম।’

চমকে উঠল না আহমদ মুসা। কিন্তু বিস্মিত হলো এই ভেবে যে, তাহলে ডেভিড ইয়াহুদরা আমাদের আইআরটি ফোটনের গামা পারটিকেল থেকে সোর্ড (SOWRD-Saviour of world Rational Domain) আবিষ্কার করেছে, সে খবর এঁদের কানে পর্যন্তও পৌঁছে গেছে! তবু স্বাভাবিক জিজ্ঞাসা হিসেবেই বলল, ‘এমন সাংঘাতিক খবর আপনারা কোথা থেকে পেলেন?’

হান্নাহ হাগেরা তার পিতার দিকে চাইল।

ডেভিড হারজেল একটু নড়ে বসল। একটা অস্পষ্ট চিন্তার রেখা তার মুখে ছায়া ফেলেছিল। বলল, ‘ডেভিড ইয়াহুদ বলেছিল, তারা নাকি এ ধরণের ভয়ংকর গবেষণা করছে। সাফল্য থেকে তারা নাকি মাত্র এক গজ দূরে! এই গল্পটাই আমি হান্নাহর কাছে করছিলাম।’

হাসল আহমদ মুসা। মনে মনেই বলল, তারা তো গবেষণা করছে না, গবেষণার ফল তারা হাইজ্যাক করতে চাচ্ছে। কিন্তু তা মারণাস্ত্র নয়, মারণাস্ত্র থেকে রক্ষার অস্ত্র। তবে এসব মনের কথা না বলে আহমদ মুসা বলল, ‘মারাত্মক খবর! কিন্তু তারা কি ঐ ভয়ংকর অস্ত্র পাওয়া থেকে এক গজ দূরে! না গবেষণার সাফল্য থেকে এক গজ দূরে!’

‘হ্যাঁ, গবেষণার সাফল্য থেকে তারা মাত্র এক গজ দূরে, এই কথাই তারা বলছেন।’ বলল ডেভিড হারজেল।

আহমদ মুসা এবার একটু বিস্মিতই হলো! ডেভিড ইয়াহুদরা তো আমাদের আইআরটি থেকে সফল অস্ত্র ‘সোর্ড’ হাইজ্যাক করতে চাচ্ছে! তাছাড়া এটা তো মারণাস্ত্র নয়, মারণাস্ত্রকে অচল করার অস্ত্র। আর এ অস্ত্র তো কোন অস্ত্রাগারে গিয়ে তা ধ্বংস করবে না। তাহলে অমন কথা ডেভিড ইয়াহুদ বলল

কেন? এসব কথা আহমদ মুসার মনে নতুন করে জাগল। কিন্তু কোন সমাধান পেল না।

আহমদ মুসার চিন্তা আবার ঘুরে গেল বন্দী, অসুস্থ প্রধান বিচারপতির দিকে। আহমদ মুসার দেহটা সোজা হয়ে এ্যাটেনশনের রূপ নিল। বৃদ্ধ ডেভিড হারজেলকে লক্ষ্য করে বলল, 'আমি এখন উঠতে চাই স্যার, অনেক ধন্যবাদ।'

কথা শেষ করেই চাইল আহমদ মুসা হান্নাহ হাগেরার দিকে। তার রক্তাক্ত কাপড়ের প্যাকেটটা পাশ থেকে হাতে তুলে নিয়ে বলল, 'এটা আমি বাইরের ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে যাব। নতুন এক প্রস্থ কাপড়ের জন্যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কাপড়গুলো ফেরত পাঠানো শোভন হবে না। আপনি এমন অবস্থায় পড়লে কি করতেন বলুন তো?'

হাসল হান্নাহ হাগেরা। বলল, 'আমি বলতে পারি যদি আপনি আমাকে কপি না করার প্রতিশ্রুতি দেন।'

'এভাবে কপি সাধারণত আমি করি না। সুতরাং আপনি বলুন।' আহমদ মুসা বলল।

'আমি নতুন আর এক প্রস্থ কাপড় তার জন্যে পাঠিয়ে ঋণটা শোধ করতাম।' বলে হাসতে লাগল হান্নাহ হাগেরা।

'আমার মনের কথাই আপনি...?'

আহমদ মুসাকে কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে উঠল হান্নাহ হাগেরা, 'আপনি আপনার মনের কথার দোহাই দিয়ে এখন প্রতিশ্রুতি উল্টালে চলবে না। আপনি আমাকে কপি করবেন না স্বীকার করে নিয়েছেন।'

'আপনার মতো আমারও তো ঋণ শোধ করা দরকার, সেটা কিভাবে হবে?'

'দুনিয়াতে মহাজন-খাতক, দাতা-গ্রহীতার সম্পর্কের বাইরে কোন সম্পর্ক নেই?' জিজ্ঞাসা হান্নাহ হাগেরার। তার কণ্ঠ গম্ভীর।

'অবশ্যই আছে এবং সে মানবিক সম্পর্কটাই প্রধান।' আহমদ মুসা বলল।

'তাহলে তো কথা থাকে না।' হান্নাহ হাগেরা বলল। তার মুখে হাসি।

‘ধন্যবাদ মিস হান্নাহ। আমি...’

আহমদ মুসাকে আবার বাধা দিয়ে হান্নাহ হাগেরা বলে উঠল, ‘এ ধরণের ‘ধন্যবাদ’ সাধারণত সম্পর্কের ইতি ঘটানোর সমার্থক। কিন্তু গত ১ ঘন্টায় এমন এক মহাঘটনার সাথে আমাদের জড়িয়েছেন, যা ইচ্ছা করলেই আমরা ভুলে যেতে পারবো না। এ ব্যাপারে আপনার কাছ থেকে আমরা কিছু আশা করি।’

আহমদ মুসার মুখে ভাবনার একটা ছায়া নামল। বলল, ‘সব ধন্যবাদ বিদায়ের নয়, মিস হান্নাহ। ঘটনার ব্যাপারে মিস হান্নাহ যে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, সেটা আমার জন্যে আরও আনন্দের। আপনারা আমাকে সহযোগিতা করেছেন, আরও সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে। ওয়েল মিস হান্নাহ, আমি আপনাদের সাহায্য চাই।’

বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

উঠে দাঁড়াল মিস হান্নাহ ও ডেভিড হারজেলও। ডেভিড হারজেল বলল, ‘অবশ্যই, ইয়ংম্যান! সাহায্য করার যদি কিছু থাকে, অবশ্যই পাবে।’

‘ধন্যবাদ আপনাদের, আমি চলি।’ বলল আহমদ মুসা।

হান্নাহ হাগেরা আহমদ মুসা দিকে এগিয়ে এল। আহমদ মুসার হাত থেকে রক্তাক্ত জামা-কাপড়ের প্যাকেট নিয়ে বলল, ‘ট্রাসে আমিও ফেলে দিতে পারব। চলুন, আপনাকে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিই।’

আহমদ মুসা গাড়িতে উঠলে হান্নাহ হাগেরা বলল, ‘আমরা তুরস্কের কোন কাজে লাগলে খুশি হবো। সত্যি, আপনার সাথের এক ঘন্টা আমার কাছে এক হাজার বছরের মতো দীর্ঘ মনে হচ্ছে!’

আহমদ মুসা গাড়ি স্টার্ট দিয়েছিল। ‘আসি, মিস হান্নাহ, প্রার্থনা করুন বিপদটা তাড়াতাড়ি যেন কেটে যায়! ওকে, বাই!’ বলল আহমদ মুসা।

হান্নাহ হাগেরা বলতে চাইল, ‘বিপদ তাড়াতাড়ি শেষ হলে তো আপনি হাওয়া হয়ে যাবেন!’ কিন্তু বলল সে, ‘ঈশ্বর আমাদের ওপর সদয় হোন! আসুন স্যার। বাই!’

হান্নাহ হাগেরা ফিরে এলো তার পিতার কাছে। পিতার পাশে বসেই বলল, ‘বাবা, বিজ্ঞানী আবু আবদুর রহমান আরিয়েহই যে তোমাকে ঐ

আবিষ্কারের কথা বলেছেন, সেটা গোপন করলে কেন? তিনিই তো আবিষ্কারের কথা বলেছিলেন! তাঁর নাম না বলে ড. ইয়াহুদের নাম বললে কেন?'

বৃদ্ধ ডেভিড হারজেল একটু গভীর দৃষ্টিতে তাকাল হান্নাহ হাগেরার দিকে। ধীর কণ্ঠে বলল, 'সব সময় সব কথা বলতে নেই। আমি তাদের সাথে একমত নই বটে, কিন্তু আমি বিজ্ঞানী আবু আবদুর রহমানকে ঝামেলায় জড়াতে চাইনি। তিনি একজন গুণী, নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ।'

'কিন্তু বাবা, তিনি তো ঝঞ্ঝাট বাঁধানোর অস্ত্র তৈরী করছেন।' বলল হান্নাহ হাগেরা।

'তা করছেন। কিন্তু আমি মনে করি, তিনি কোন বিশেষ গরজে এটা নাও করতে পারেন। বিজ্ঞানীরা কোন সিংহাসনে বসতে চান না। যারা বসতে চান, তারাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের ব্যবহার করেন।' ডেভিড হারজেল বলল।

'কিন্তু বাবা, তুমি যা বলেছ, তাতেই তো দেখা যাচ্ছে যে, তিনিই দুনিয়াকে দাস বানানোর কথা বলছেন। তার মানে তিনি অস্ত্রের জোরে দুনিয়াকে দাস বানাতে চান।' বলল হান্নাহ হাগেরা।

'তিনি চান, একথা ঠিক নয়। তিনি হয়তো জায়নবাদীদের কোন রাজনৈতিক অভিলাষের শিকার হয়েছেন।' ডেভিড হারজেল বলল।

'এই জায়নবাদীরা কারা, বাবা? শুনেছি, জার্মানিতে নিরীহ ইহুদিরা যে মার খেল তার পেছনে ছিল এই জায়নবাদীদের হাত। তারা কারা? এখন তারা কি চাচ্ছে?' বলল হান্নাহ হাগেরা।

'এসব বিষয় নিয়ে তুমি মাথা ঘামিয়ো না হান্নাহ। ওরা বিপজ্জনক। শুধু সেদিন জার্মানিতো নয়, এখনও দুনিয়া জুড়ে নিরীহ ইহুদিরা তাদের হাতে মার খাচ্ছে। এরা ওদের চাঁদা দিয়ে চলার অসহায় গর্দভ মাত্র। কিছু বলে লাভ নেই।' বলল ডেভিড হারজেল। তার চোখে-মুখে বেদনার প্রকাশ।

'তাহলে কি ওদের ভয়ে তুমি বিজ্ঞানী আবু আবদুর রহমানের নাম খালেদ খাকানের কাছে বলনি?' জিজ্ঞাসা হান্নাহ হাগেরার।

‘না, মা। ভয়ে নয়, সমবেদনায়। বিজ্ঞানী লোকটাকে আমার কাছে নিরীহ বলে মনে হয়। ভয় করলে ডেভিড ইয়াহুদের নাম বলতাম না।’ বলল ডেভিড হারজেল।

‘তাহলে আমাকে ভয় করতে বলছ কেন? জিজ্ঞাসা আবারো হান্নাহ হাগেরার।’

‘ভয় না করলেও আমার কিছু করার ক্ষমতা, সময় কোনটাই নেই। কিন্তু তুমি ভয় করলে অনেক কিছু করার সময় ও সুযোগ তোমার আছে। আমি চাই না এ পথ তুমি মাড়াও। এই পথকে ভয়ের চোখে দেখাই নিরাপদ।’ ডেভিড হারজেল বলল। গম্ভীর হয়ে উঠেছিল কণ্ঠ তার।

সংগে সংগেই কোন উত্তর দিল না হান্নাহ হাগেরা। গাঢ় একটা ভাবনার ছায়া তার চোখে-মুখেও। এক সময় বলল হান্নাহ হাগেরা অনেকটা স্বগত কণ্ঠেই, ‘ঠিক আছে, বাবা, কিন্তু এ অব্যাহত ষড়যন্ত্রের প্রতিরোধ করবে কে?’

‘আমি জানি না, মা। হয়তো খালেদ খাকানরাই।’ বলেই উঠে দাঁড়াল ডেভিড হারজেল।

হান্নাহ হাগেরার ভাবনা-কাতর চোখে-মুখে এক টুকরো প্রশান্তির আলো জ্বলে উঠলো খালেদ খাকানের নাম শুনে।

সোফায় গা এলিয়ে দিল হান্নাহ হাগেরা।

# ২

গাড়ি বারান্দায় গিয়ে গাড়ি থামতেই ডেভিড ইয়াহুদ লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নামল।

দ্রুত বারান্দার তিনটি ধাপ পেরিয়ে বারান্দায় উঠে গেল। বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল বিজ্ঞানী আবু আবদুর রহমান আরিয়েহ।

আবু আবদুর রহমান আরিয়েহের চোখে-মুখে উত্তেজনা। সে দাঁড়িয়েছিল যেন ডেভিড ইয়াহুদের অপেক্ষায়!

ডেভিড ইয়াহুদ বারান্দায় উঠে আসতেই তার সাথে হ্যান্ডশেক করে আবু আবদুর রহমান আরিয়েহ তাকে টেনে নিয়ে ঘরে ঢুকে গেল।

পাশাপাশি সোফায় বসেই আবু আবদুর রহমান আরিয়েহ বলল, 'আপনারা এ কি করলেন? এ বিপজ্জনক বন্দীকে এখানে নিয়ে এলেন কেন?'

'করার কিছুই ছিল না। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। বন্দীকে আমরা তুলেছিলাম ডেভিড হারজেলের ওখানে। আমাদের একটা ভুলের জন্যে ঐ ঠিকানাটা প্রতিপক্ষের হাতে চলে যেতে পারে সন্দেহ করেই দ্রুত ওখান থেকে সরে আসতে হয়েছে।' বলল ডেভিড ইয়াহুদ।

'ঐভাবে এ ঠিকানাও শত্রুপক্ষের জানা হয়ে যেতে পারে। এ সিদ্ধান্ত ঠিক হয়নি।' আবু আবদুর রহমান আরিয়েহ বলল।

'ঠিক হয়নি এটা আমি জানি। এই সেনসেটিভ ঠিকানার ওপর কারও কোন প্রকার সন্দেহের দৃষ্টি না পড়ে এই সার্বিক প্রচেষ্টা আমাদের রয়েছে। এখন কি করা যায় বলুন।' বলল ডেভিড ইয়াহুদ।

'আমরা যে গবেষণার কাজ এখানে করছি, তার অগ্রাধিকার সবার ওপরে। যে কোন মূল্যে এর গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা রক্ষা করতে হবে। আমি মনে করি, বন্দীকে অবিলম্বে অন্য কোথাও শিফ্‌ট করুন।' বিজ্ঞানী আবু আবদুর রহমান বলল।

'কিন্তু ইস্তাম্বুলে নিরাপদ কোন আশ্রয় আমাদের আর নেই। এখানে বন্দীকে রাখা ঠিক হবে না, এ বিষয়ে আমিও একমত। তাহলে কি করা যায় বলুন?' বলল ডেভিড ইয়াহুদ।

'আপনারা প্রধান বিচারপতিকে কেন বন্দী করেছেন, বলুন তো?' জিজ্ঞাসা বিজ্ঞানী আবু আবদুর রহমানের।

'বিজ্ঞানী হাতছাড়া হয়ে যাবার পর সুযোগ পেয়ে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে তাকে পণবন্দী করা হয়েছে চাপ সৃষ্টি করে বিজ্ঞানীকে ফেরত পাওয়া বা অন্য কোন সুবিধা লাভের ক্ষীণ আশায়।' বলল ডেভিড ইয়াহুদ।

'আপনাদের সিদ্ধান্ত ঠিকই তাৎক্ষণিক, সুচিন্তিত নয়। কারণ প্রধান বিচারপতির বিনিময়ে তারা বিজ্ঞানীকে আমাদের হাতে তুলে দেবে না। প্রধান বিচারপতিকেই উদ্ধারের জন্যে তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। প্রধান বিচারপতিকে বন্দী করে রাখার মধ্যে কোন লাভ নেই, ষোল আনাই ক্ষতির আশংকা।' বিজ্ঞানী আবু আবদুর রহমান বলল।

'আপনার পরামর্শ কি তাহলে?' জিজ্ঞাসা ডেভিড ইয়াহুদের।

চোখ বন্ধ করে এক মুহুর্ত ভেবে বিজ্ঞানী আবু আবদুর রহমান বলল, 'তাকে ছেড়ে দিয়ে আসাই সব দিক থেকে মঙ্গল। প্রধান বিচারপতিকে পেলে ওদের অনুসন্ধান বন্ধ হয়ে যাবে। আমাদের এই গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি রক্ষা পেয়ে যাবে এবং নতুন করে সংঘবদ্ধ হয়ে আমরা নতুন উদ্যোগে কিছু করার সুযোগ পাব।'

ডেভিড ইয়াহুদ একটু ভেবে বলল, 'আপনার যুক্তিই ঠিক মি. আরিয়েহ। তাহলে ওদের আমি বলে দিই ওরা তাকে রাস্তার পাশে কোন এক জায়গায় ফেলে রেখে আসবে।'

'উনি কি অবস্থায় আছেন?' জিজ্ঞাসা বিজ্ঞানী আবু আবদুর রহমানের।

'উনি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় আছেন। আগে চোখ বাঁধা ছিল, এখন বাঁধা নেই।' বলল ডেভিড ইয়াহুদ।

'ঠিক আছে, যেভাবে বলেছেন সেটাই করুন। আপদ বিদায় হোক!' বিজ্ঞানী আবু আবদুর রহমান বলল।

'আসছি আমি, বলে আসি ওদের।'

বলে ডেভিড ইয়াহুদ দ্রুত উঠে গেল।

দু'মিনিট পরে ফিরে এলো ডেভিড ইয়াহুদ। বলল, 'ওদের পাঠিয়ে দিয়েছি। সাবধানে কাজটা সারতে বলেছি।'

ডেভিড ইয়াহুদ বসল বিজ্ঞানী আবু আবদুর রহমান আরিয়েহর পাশে।

'এটাই ভালো হলো, ড. ডেভিড ইয়াহুদ! আমাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। নিশ্চিত লাভ ছাড়া ক্ষতির ঝুঁকি বাড়ানোর কোন দরকার নেই।' বিজ্ঞানী ড. আরিয়েহ বলল।

সোফায় গা এলিয়ে দিয়েছিল ডেভিড ইয়াহুদ। সোজা হয়ে বসল। তার সারা মুখ জুড়ে হতাশার ছাপ। বলল ধীরে ধীরে, 'অনেক দিনের পরিকল্পনার জাল পেতে বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসিকে ধরলাম। লাভ হলো না। জাল কেটে বেরিয়ে গেল। এই আহমদ মুসাই অতীতে আমাদের বার বার সর্বনাশ করেছে। এবারের সর্বনাশটাও সে-ই করল। সে দৃশ্যপটে উদিত না হলে সোর্ডের ফর্মুলা, সোর্ডের মডেল সবই এতদিন আমাদের হাতে এসে যেত। হঠাৎ কোত্থেকে উদয় হলো এই শয়তানটা!'

'হঠাৎ কেন আসবে? ওআইসি ও তুরস্ক সরকার পরিকল্পনা করেই তাকে নিয়ে এসেছে। আহমদ মুসা এখন ইসলামী বিশ্বের শেষ তুরুপের তাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেখা যাচ্ছে, যেখানেই তাদের অনতিক্রম্য ক্রাইসিস, সেখানেই আহমদ মুসাকে হাজির করা হচ্ছে।' বলল বিজ্ঞানী ড. আরিয়েহ।

'বুঝতে পারছি না আমি, আমরা এখন কোন্ পথে এগোবো? আমি নতুন করে তেলআবিব ও ইউরোপ-আমেরিকার আমাদের নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ করেছিলাম, আহমদ মুসাকে মোকাবিলা করতে পারে এমন কাউকে পাঠানোর জন্যে। তারা কোন আশ্বাস দিতে পারেনি। তারা বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসিকে হাতে আনাকেই গুরুত্ব দিয়েছিল সবচেয়ে বেশি। কিন্তু তাকে হাতে এনেও রাখতে পারলাম না। আমি ভাবছি, তাকে কিডন্যাপ করার নতুন উদ্যোগ শুরু করার কোন বিকল্প নেই। একজন ব্যক্তিকে তারা তো বাক্সবন্দী করে রাখতে পারবে না। প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলে তাকে হাতে পাওয়ার একটা সুযোগ পাওয়া যাবেই।' বলল ড. ডেভিড ইয়াহুদ। দূর্বল ও বেদনার্ত কণ্ঠ তার।

সোফায় গা হেলান দিয়ে ভাবছিল বিজ্ঞানী ড. আরিয়েহ। তার চোখ দু'টি বোজা ছিল। সে সোজা হয়ে বসল। মাথা নিচু হলো তার। বলল, 'ফোটন পারটিকেলস'-এর ঝাঁককে একটা স্বয়ংক্রিয় ডিফেনসিভ শিল্ডে পরিণত করা এবং তাকে স্বয়ংক্রিয় ক্যারিয়ারে পরিণত করে বন্দী মারণাস্ত্রকে গভীর মহাশূণ্যে নিয়ে ধ্বংস করার বিজ্ঞান ও টেকনোলজি আমার কাছে এখনও আকাশ কুসুম বলেই মনে হয়। বুঝতেই পারছি না এই অসাধ্য ও কল্পনার একটা বিষয়কে ড. আন্দালুসিরা কিভাবে বাস্তবে পরিণত করল। এতো সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ডিফেন্স টেকনোলজি! একে হাত করতে না পারলে তো আমাদের সব আশা-ভরসাই শেষ হয়ে যাবে!' হতাশ কণ্ঠস্বর বিজ্ঞানী ড. আরিয়েহর।

'আমাদের সাফল্য আর কত দূরে ড. আরিয়েহ?' জিজ্ঞাসা ডেভিড ইয়াহুদের।

'ল্যাবরেটরি টেস্ট তো অনেক আগেই হয়ে গেছে। মডেল টেস্টও সফল হয়েছে। অপারেশন শুরুর জন্যে প্রস্তুত হতে আরও কিছুটা সময় লাগবে।' বলল ড. আরিয়েহ।

ড. ইয়াহুদের চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'রোমেলী দুর্গের ওদের 'ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ এন্ড টেকনোলজি', ওদের সোর্ড, ওদের বিজ্ঞানীরা আমাদের প্রথম টার্গেট হতে পারে না? সবার অলক্ষ্যে ওদের সব চিহ্ন আমরা দুনিয়ার বুক থেকে মুছে ফেলতে পারি না?'

'একটা বিকল্প পথ হিসেবে এটা আমাদের সামনে আছে। কিন্তু এর পথে আছে অদৃশ্য দেয়ালের বাধা। ওদের সোর্ডের ডিফেনসিভ শিল্ডের মনিটর যদি সুপার সেনসেটিভ হয় এবং যদি সোর্ডের শিল্ড হাইয়েস্ট পাওয়ার পারটিকেলের হয়, তাহলে আমাদের ফোটন সাইলেন্ট ডেস্ট্রাকশন ডেমন (Foton Silent Destruction Deomon-FSDD) ধ্বংস করার বদলে সোর্ডের হাতে বন্দী হয়ে যেতে পারে। সুতরাং আমাদের ফোটন সাইলেন্ট ডেস্ট্রাকশন ডেমন (FSDD) বা 'ডাবল ডি' ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমস্যা আছে।' বলল বিজ্ঞানী আরিয়েহ গম্ভীর কণ্ঠে।

‘কিন্তু তারা যদি অপ্রস্তুত অবস্থায় থাকে এবং সে সম্ভাবনাই বেশি।’ ড. ডেভিড ইয়াহুদ বলল।

‘সেটাও সম্ভাবনার ব্যাপার।’ নিশ্চিত করে বলা যায় না যে, তারা সব সময় প্রস্তুত থাকে না। থাকারই কথা।’ বলল ড. আরিয়েহ।

‘আর কি বিকল্প আছে?’ বলল হতাশ কণ্ঠে ড. ডেভিড ইয়াহুদ।

‘বিকল্প আর কিছু নেই। ওদের বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসিকে কিডন্যাপ করা অথবা মেরে ফেলা অথবা ওদের ধ্বংস করা-এই দুই পথেই আমাদের এগোতে হবে।’ ড. আরিয়েহ বলল।

‘কিন্তু ওদের ধ্বংস করার পথই তো অনিশ্চিত।’ বলল ডেভিড ইয়াহুদ।

‘আমি তত্ত্বগত অসুবিধার কথা বলেছি। বাস্তবে সুবিধাও থাকতে পারে, আশংকা সত্য নাও হতে পারে। বিষয়টা আরও বিবেচনা সাপেক্ষ, যা ভাবছি সে রকম অসম্ভব নাও হতে পারে।’ ড. আরিয়েহ বলল।

ড. আরিয়েহর কথা শেষ হবার আগেই ড. ডেভিড ইয়াহুদের টেলিফোন বেজে উঠেছিল।

ড. ইয়াহুদ তার মোবাইল বের করে নিয়েছিল তার পকেট থেকে। ড. আরিয়েহর কথাও তখন শেষ হয়ে যায়।

ড. ইয়াহুদ মোবাইলে ও প্রান্তের সাড়া পেতেই বলে উঠল, ‘কি খবর জোনাহ, কাজ শেষ?’

‘হ্যাঁ, শেষ। তাকে এই মাত্র ওরা তুলে নিয়ে গেছে।’ বলল ওপার থেকে।

‘এত তাড়াতাড়ি? তোমরা ওখানেই?’ এপার থেকে প্রশ্ন ড. ইয়াহুদের।

‘বলছি। আমরা তাকে হাইওয়ের বাঁদিকেই চৌরাস্তার টপ ফ্লাইওভারে ফেলে রেখে চলে এসে আবার রাস্তা ঘুরে ওদিকে গিয়েছিলাম। মানুষের জটলা দেখে আমরা যাচ্ছিলাম ওখানে। পৌঁছতেই দেখলাম একজন তার সংজ্ঞাহীন দেহ গাড়িতে তুলল। গাড়িতে তুলে দরজা বন্ধ করে মোবাইলে কথা বলতে বলতে গাড়ির ড্রাইভিং সিটের দিকে যাচ্ছিল। স্পষ্ট শুনলাম উনি বলছিলেন, ‘জেনারেল, তাকে পাওয়া গেছে মাঝপথেই। প্রয়োজন নেই আর আপনাদের আসার। হাসপাতালে ফিরুন। আমি ওঁকে নিয়ে হাসপাতালে আসছি।’ কথা শেষ করেই

গাড়ি নিয়ে উনি ছোটেন সিজলীর দিকে। আমার মনে হয় লোকটি কোন সরকারি লোক হবেন।'

'লোকটি কেমন? ইউনিফর্মে ছিল?' জিজ্ঞাসা ড. ইয়াহুদের।

'না, সিভিল ড্রেসে। একহারা সাধারণ ফিগার। এশীয় চেহারা।' বলল ওপার থেকে জোনাহ।

'ঠিক আছে তোমরা চলে এসো। ওকে।'

বলে মোবাইল মুখের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে অফ করে দিল।

মোবাইলের লাউড স্পীকার অন ছিল। মোবাইলের সব কথা ড. আরিয়েহও শুনছিল।

মোবাইল বন্ধ করে ড. ইয়াহুদ কিছু বলার আগেই ড. আরিয়েহ বলে উঠল, 'মি. ইয়াহুদ, বুঝা যাচ্ছে, যে লোকটি প্রধান বিচারপতিকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে গেছে সে তাকে উদ্ধার করতেই এদিকে আসছিল এবং জেনারেল মোস্তফারাও আসছিল উদ্ধার অভিযানেই। কিন্তু এদিকে কেন?'

থামল ড. আরিয়েহ। তার চোখে-মুখে উদ্বেগের ছায়া। বলল সে, 'টেলিফোনে জোনাহ যা বলল তাতে তো বুঝা যাচ্ছে ওরা এদিকেই আসছিল। কিন্তু কেন এদিকে বলা মুস্কিল। এ পথ দিয়ে তো অনেক দিকেই যাওয়া যায়।'

'তা যাওয়া যায়। এখানেও তো আসা যায়।' বলল ড. আরিয়েহ।

'তা আসা যায়। কিন্তু তারা এখানে আসবে কেন?' বলল ড. ইয়াহুদ।

'এ প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। কিন্তু যে উত্তর আমাদের জানা নেই, তা কারও জানা নেই, তা ঠিক নাও হতে পারে। ডেভিড হারজেলের বাড়ির সন্ধান তারা পেয়েছিল, এ কথা আমরা জানি। সুতরাং আমাদের এ ঠিকানার নিরাপত্তা নিয়ে আশংকা আমরা করতেই পারি।' বলল ড. আরিয়েহ।

ড. ইয়াহুদ কোন উত্তর দিল না। তাকিয়ে ছিল সে ড. আরিয়েহর দিকে। একটু সময় নিয়ে ধীর কণ্ঠে সে বলল, 'ড. আরিয়েহ, আপনি ঠিক বলেছেন। আহমদ মুসা যেন বাতাস থেকে সব কিছুর গন্ধ পায়! এখন আমাদের করণীয় কি ভাবছেন?'

'আমি আমাদের এই গুরুত্বপূর্ণ ঠিকানার নিরাপত্তা নিয়ে ভাবছি। এ ঠিকানাও ছেড়ে দিতে হয় কিনা তা আমাদের ভাববার বিষয় হয়ে দাঁড়াল।' ড. আরিয়েহ বলল।

'আপনার ভাবনা ঠিক। কিন্তু প্রধান বিচারপতিকে উদ্ধারের পর আমাদের এই ঠিকানা ওদের সন্দেহের তালিকায় আর নেই। কারণ প্রধান বিচারপতিকে তারা পেয়েছে অন্য এক জায়গায়। এর অর্থ এখানে তাকে আনা হয়নি। অতএব, এ ঠিকানার সন্ধান তারা পেলেও এটা এখন তাদের ভুলে যাবার কথা।' বলল ড. ইয়াহুদ।

'আপনার যুক্তি ঠিক। প্রধান বিচারপতিকে উদ্ধারের পর আমাদের এ ঠিকানা নিয়ে তাদের ভাববার কথা নয়। এ যুক্তির সাথে আমিও একমত। কিন্তু আশংকা থেকে মুক্ত হতে পারছি না।' ড. আরিয়েহ বলল।

'আশংকা থাকা ভালো। আমরা সাবধান হতে পারব। কিন্তু সাবধান থাকার জন্য বেশি কিছু করার দরকার নেই।' বলল ড. ইয়াহুদ।

'আপনার কথা ঠিক। কিন্তু আমাদের 'ডাবল ডি' মানে 'ফোটন সাইলেন্স ডেসস্ট্রাকশন ডেমন' (FSDD) গবেষণার অংশ বিশেষ অন্যত্র আমি সরিয়ে ফেলতে চাই, বিশেষ করে 'মডেল' ও 'টেস্ট' অংশ অন্যত্র সরিয়ে রাখাই ভালো। শুধু 'রিসার্চ অংশ এখানে থাকবে।' ড. আরিয়েহ বলল।

'কিন্তু এত বড় জায়গা কোথায় পাওয়া যাবে?' জিজ্ঞাসা ড. ইয়াহুদের।

'চিন্তা করুন। আমিও চিন্তা করছি। জায়গা অবশ্যই পাওয়া যাবে। ইউরোপ-আমেরিকার দূতাবাস কর্তৃপক্ষ যারা ইস্তাম্বুলে আছেন তারাও আনন্দের সাথে আমাদের সাহায্য করবেন।

'ঈশ্বর আমাদের সহায় হোন! আমরা আরও একটু ভাবনা-চিন্তা করি। আপনি যেটা বলেছেন সে রকমই সিদ্ধান্ত হতে পারে, যদি জায়গা পাওয়া যায়। ধন্যবাদ ড. আরিয়েহ আমি উঠি। আমাদের কোথায় কি অবস্থা একটু খোঁজ নিতে হবে।'

উঠে দাঁড়াল ড. ইয়াহুদ।

ড. আরিয়েহও উঠে দাঁড়াল। হাত বাড়িয়ে দিল ড. ইয়াহুদের দিকে। বলল, ‘ভাববেন না, ড. ইয়াহুদ, আমরা দুর্বল হইনি। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মারণাস্ত্র এখন আমাদের হাতে এবং এই খবর কেউ জানে না, ইউরোপ-আমেরিকাও নয়। ওরা জানলে পাগল হয়ে যাবে। আমাদের কোন শর্তই ওরা অপূর্ণ রাখবে না। সোর্ড ইউরোপ-আমেরিকার আতংকের কারণ বটে, কিন্তু ‘ডাবল ডি’র খবর জানলে ওদের শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যাবে। অতএব, আমাদের চিন্তার কিছু নেই।’

‘ধন্যবাদ ড. আরিয়েহ। ‘সোর্ড’-এর ফর্মুলা হাত করা এবং সোর্ড ও তার গবেষণা ধ্বংস করার জন্যে ওরা আমাদের সাহায্য করছে। এই সাহায্য আমাদের ও আমাদের ‘ডাবল ডি’র শত্রু ‘সোর্ড’কে ধ্বংস করতে যেমন আমাদের সুযোগ করে দিয়েছে, তেমনি আমাদের ‘ডাবল ডি’র গবেষণা তৈরিতেও সাহায্য করছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। তিনি তাঁর আশীর্বাদ আমাদের ওপর ঢেলে দিয়েছেন।’

কথা শেষ করে ড. আরিয়েহর হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, ‘আসি, বাই!’

‘ঈশ্বর আমাদের সহায় হোন! আসুন।’ বলল ড. আরিয়েহ।

ইস্তাম্বুল সামরিক হাসপাতালের ভিভিআইটি স্যুট।

ইজি চেয়ারে শুয়ে বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসি। তার বাম ও ডান পাশের সোফাগুলোর বাম পাশের একটি সোফায় বসে আছে তুরস্কের অভ্যন্তরীণ সিকউরিটি চীফ জেনারেল মোস্তফা কামাল এবং ডান পাশের পাশাপাশি দু’সোফায় বসে আছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট আহমদ আরদোগাল বাবাগলু ও প্রধানমন্ত্রী হোসেইন ইসমাইল সেলিক।

প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী দেখতে এসেছেন বিজ্ঞানী ড. আব্দুল্লাহ আন্দালুসিকে। জেনারেল মোস্তফা কামাল হাসপাতালেই ছিলেন। ভিভিআইপি অতিথিদের তিনিই সাথে করে কক্ষে নিয়ে এসেছেন।

বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসি অনেকখানি সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তার সুস্থ হেয়ে উঠতে সময় লাগছে। ইলেক্ট্রিক শক তার দেহের কোষগুলোর বিরাট ক্ষতি

করেছে। আস্তে আস্তে সেরে উঠছেন। সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তাকে হাসপাতালে রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

কুশল বিনিময় ও টুকটাক কথা চলছিল বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসি এবং প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে। প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী দু'জনেই আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছিলেন যে, আল্লাহ শুধু বিজ্ঞানীকে নন, একটা শ্রেষ্ঠ গবেষণাকে তিনি রক্ষা করেছেন।'

'ঠিক বলেছেন স্যার, মানবতার পক্ষের একটা গবেষণাকে তিনি সব দিক দিয়েই সাহায্য করেছেন। খালেদ খাকান কে আমি জানি না। তবে তাকে সাক্ষাত ফেরেশতা বলে মনে হয়েছে আমার কাছে। তিনি আসার পর যা ঘটছে, তিনি যা করছেন এবং আমাদের উদ্ধারের ঘটনা আমি দেখলাম, তাতে তিনি আল্লাহর তরফ থেকে এক জীবন্ত সাহায্য। আপনাদের মোবারকবাদ যে, এমন একজন ব্যক্তিকে আপনারা বাছাই করেছেন।'

'ড. আন্দালুসি, আপনি যেমন আল্লাহর এক বিশেষ সাহায্য মুসলিম উম্মার জন্যে, তেমনি তিনিও এক সাহায্য। আল্লাহর অসীম দয়ার জন্যে আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ।' বললেন প্রেসিডেন্ট।

এভাবেই তাদের অনির্দিষ্ট আলোচনা এগিয়ে চলছিল।

প্রেসিডেন্টের পি.এস. এসে প্রবেশ করল।

প্রেসিডেন্টকে কানে কানে কিছু বলে সরে দাঁড়ালো পেছন দিকে।

প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আহমদ মুসা এসেছে। তাকে আসতে বলি?'

'ইয়েস মি. প্রেসিডেন্ট, আপনার যদি আপত্তি না থাকে।' প্রধানমন্ত্রী বললেন।

'আমার আপত্তি থাকার কোন প্রশ্নই নেই।'

বলে তাকালেন বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসির দিকে। বললেন, 'মি. খালেদ খাকান আসছেন, ড. আন্দালুসি!'

'ওয়েলকাম। তার আসার জন্যে কোন অনুমতির দরকার নেই।' বলল বিজ্ঞানী ড. আন্দুলুসি।

প্রেসিডেন্টের পি.এস. বেরিয়ে গেল।

মিনিট খানেকের মধ্যে আহমদ মুসাকে নিয়ে প্রবেশ করল ভিভিআইপি রুমটির সিকিউরিটি অফিসার তুর্কি সেনাবাহিনীর একজন কর্ণেল।

আহমদ মুসা ঘরে প্রবেশ করে সালাম দিয়ে বলল, 'স্যরি, আমি নিশ্চয় অসময়ে এসে পড়েছি।'

কক্ষের সবাই সালাম দিয়ে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী বললেন, 'না, মি. খালেদ খাকান, আপনি নিশ্চয় সুসময়ে এসেছেন। পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত জেনারেল মোস্তফাসহ বিভিন্ন সূত্রে জেনেছি। কিন্তু আপনার কাছ থেকে কিছু শোনা হয়নি। ওদের পর পর কয়েকটা সেট ব্যাক হবার পর এবং প্রধান বিচারপতিকে তারা ছেড়ে দেয়ার পর কি মনে হয় যে, তারা অফেনসিভে আসবে? কিন্তু তার আগে বলুন, আপনি কেমন আছেন? কবে আপনি হাসপাতলে থেকে বেরুলেন? আপনার আঘাতের অবস্থা কি? আঘাতটার ব্যাপারে কিন্তু আপনি নিজের প্রতি যথেষ্ট অবহেলা দেখিয়েছেন, ডাক্তারের কাছে আমি শুনেছি।'

'আলহামদুলিল্লাহ, আমি ভালো আছি। গতকাল হাসপাতাল থেকে বেরিয়েছি। জেনারেল মোস্তফা তখন ছিলেন সেখানে।'

বলে একটু থেমেই আবার বলা শুরু করল, 'আপনি প্রধান বিচারপতিকে ছেড়ে দেয়ার কথা তুলেছেন। প্রধান বিচারপতিকে পণবন্দী রেখে তাদের উদ্দেশ্য হাসিল হবে না ভেবেই তারা তাঁকে ছেড়ে দিয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। তাদের উদ্দেশ্য সফল না হওয়া কিংবা তাদের ষড়যন্ত্রের মূলোচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত অফেনসিভের আশংকা বাদ দেয়া যাবে না।' আহমদ মুসা বলল।

'ঠিক, মি. খালেদ খাকান। ওদের অফেনসিভ যে কোন দিক থেকে যে কোন সময় আসবে এটাই ধরে নিতে হবে। ওরা যথেষ্ট দূর্বল হয়েছে, তবে ওদের মূলোচ্ছেদ ঘটেনি।' বললেন প্রেসিডেন্ট।

'ঠিক, মি. প্রেসিডেন্ট।'

বলে একটু থামল আহমদ মুসা।

তাকাল প্রেসিডেন্টের দিকে। বলল, ‘কিছু জরুরি বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্যে আমি এসেছিলাম। আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে, ড. আন্দালুসি যদি অনুমতি দেন, তাহলে কথা বলতে পারি।’

‘আমাদের আপত্তি থাকবে কেন? আমাদের উপস্থিতিতে কথা বলায় আপত্তি নেই তো?’ বললেন প্রেসিডেন্ট।

প্রেসিডেন্টের কথা শেষ হতেই বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসি বলে উঠল, ‘আমার অনুমতির প্রয়োজন এ কথা মেনে হলো কেমন করে আপনার? আপনাকে যে কোন সহযোগিতা করতে পারলে খুশি হবো।’

‘ধন্যবাদ সকলকে। যে কথাটা আমি বলতে চাই, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে আমার কাছে। মি. প্রেসিডেন্ট ও মি. প্রধানমন্ত্রী তা শোনার মতো সময় দিলে আমি খুব খুশি হবো।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ধন্যবাদ মি. খালেদ খাকান। তাহলে শুরু করুন আপনার কথা।’ প্রেসিডেন্ট বললেন।

‘ধন্যবাদ মি. প্রেসিডেন্ট।’ বলে একটু থামল। মুহুর্তের জন্যে একটু ভাবল। তাকাল বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসির দিকে। বলল, ‘ড. আন্দালুসি, আমাদের সোর্ড (Saviour of World Rational Domain-SOWRD) তো ডিফেনসিভ অস্ত্র, ফোটন পারটিকেলস দিয়ে কি অফেনসিভ অস্ত্র তৈরী সম্ভব?’

বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসির চোখে-মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল। সে গভীর দৃষ্টিতে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘মি. খালেদ খাকান, এ প্রশ্ন কেন করছেন?’

‘কারণ পরে বলব। আপনি বলুন এটা সম্ভব কিনা?’ বলল আহমদ মুসা।

‘মি. খালেদ খাকান, যে শক্তি বা বস্তু ব্যবহারে ডিফেনসিভ অস্ত্র বানানো যায়, তা দিয়ে অফেনসিভ অস্ত্র বানানোও সম্ভব।’ বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসি বলল।

‘ধন্যবাদ ড. আন্দালুসি। ফোটন পারটিকেলস দিয়ে যে অফেনসিভ অস্ত্র তৈরী হবে, তার চরিত্র কেমন হতে পারে, তার ধ্বংসকারী ক্ষমতা কি ধরণের হবে?’ বলল আহমদ মুসা।

সংগে সংগে উত্তর দিল না বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসি। একটু ভাবল। তারপর বলল, 'অস্ত্রের চরিত্র ও ধ্বংসকারিতা নির্ভর করবে কি ধরণের ফোটন পারটিকেলস কি মাত্রায় ব্যবহার করা হবে তার ওপর।'

'প্রচলিত পরমাণু অস্ত্র ও ফোটন অস্ত্রের মধ্যে চরিত্রগত পার্থক্য কি হতে পারে?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

হাসল বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসি। বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না, আপনি এসব সাংঘাতিক বিষয় নিয়ে কেন আলোচনা করছেন।'

বলে থামল বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসি। গম্ভীর হয়ে উঠল তার মুখ। শোয়া অবস্থা থেকে মাথাটা ওপরে তুলে বসার চেষ্টা করল ইজি চেয়ারে। তারপর বলল, 'ফোটন বুলেট বা ফোটন এক্সপ্লোশনের সাধারন যে চরিত্র তাতে সহজ ভাষায় যা বলা যায় তা হল, পরমানু অস্ত্র ধ্বংস করে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে, আর ফোটন ধ্বংস করবে নিরব-নিস্তব্ধ আঘাতে এবং এ ক্ষেত্রে ধ্বংসও হবে টোটাল, কোন ধ্বংসাবশেষও থাকবে না। এ এমন এক ভয়ংকর দৃশ্য যার কল্পনাও মানুষের বিবেক ও সত্তাকে অবশ করে দেয়ার মতো'। বলল বিজ্ঞানী ডঃ আন্দালুসি। তাঁর গোটা মুখমণ্ডল বেদনাক্লিস্ট হয়ে উঠেছে।

উপস্থিত সকলের চোখে-মুখেও বিস্ময় ও বেদনার চিহ্ন!

'ড. আন্দালুসি, এ ধরনের অস্ত্র তৈরির গবেষণা চলছে এবং গবেষণার চূড়ান্ত সাফল্য গজ খানেকের বেশি দুরে নয়, এমন তথ্য তথ্য বা এমন দাবি কি বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে?'

আহমদ মুসার কথা শুনেই তড়াক করে উঠে সোজা ইজি চেয়ারে বসল ড. আন্দালুসি। তাঁর চোখে-মুখে বিস্ময় ও আতংকের চিহ্ন! তীব্র দৃষ্টিতে সে তাকিয়েছে আহমদ মুসার দিকে। বলল দ্রুত ও শুকনো কণ্ঠে, 'নিশ্চয় মি. খালেদ খাকান, আপনি কোন ভয়ংকর রসিকতা করছেন না!'

'না জনাব। যদি বিষয়টা ভয়ংকর হয়, তাহলে আমি ভয়ংকর বাস্তবতাকেই তুলে ধরেছি। তথ্যটা আমি যেখান থেকে যেভাবে পেয়েছি, তাতে এটা বিশ্বাস করেছি।' বলল আহমদ মুসা।

‘কে বা কারা এই অস্ত্র তৈরি করেছে বা করছে?’ জিজ্ঞাসা বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসির। তাঁর কণ্ঠে কম্পন স্পষ্ট।

‘ওয়াল ওয়ার্ল্ড অরবিট বা থ্রি জিরো’ এই অস্ত্র তৈরি করেছে বা করছে।‘ বলল আহমদ মুসা।

‘থ্রি জিরো’ মানে যারা আমাদের গবেষণা হাত করার চেষ্টা করছে, যারা আমাকে কিডন্যাপ করেছিল, তারা?’

‘ইয়েস ড. আন্দালুসি, আমি এই তথ্যই পেয়েছি।’ আহমদ মুসা বলল।

জবাবে কোন কথা বলল না বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসি। তাঁর গোটা চেহারা উদ্বেগ ও আতংকের কালো চাদরে ঢেকে গেছে। সেই সাথে গভীর ভাবনার রেখা তাঁর চোখে-মুখে।

প্রেসিডেন্ট আহমদ আরদোগাল বাবাগলু, প্রধানমন্ত্রী হোসেইন ইসমাইল সেলিক ও তুরস্কের নিরাপত্তাপ্রধান জেনারেল মোস্তফার চোখে-মুখেও বিস্ময়, উদ্বেগ, আতংক! প্রেসিডেন্ট বললেন আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, ‘মি. খালেদ, ভয়ংকর এক তথ্য আপনি দিলেন। আপনি সত্য বলেছেন এবং বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসির বক্তব্যে বুঝেছি, এ ধরনের অস্ত্র তৈরি থিয়োরিটিক্যালি সম্ভব। কিন্তু যিনি আপনাকে খবরটি দিয়েছেন বা যে সুত্রে আপনি খবরটি পেয়েছেন, সেই সুত্র কতটা সত্য ইনফরমেশন দিয়েছে বলে আপনি মনে করেন?’

‘মি. প্রেসিডেন্ট, সুত্রের সত্যতা সম্পর্কে আমি একশ’ ভাগ নিশ্চিত।’ কোন প্রকার সন্দেহ থাকলে বিষয়টা আমি এখানে তুলতাম না’। বলল আহমদ মুসা ধীর ও দৃঢ় কণ্ঠে।

‘ধন্যবাদ আহমদ মুসা। কথাটা বললাম এই কারনে যে, খবরটা শ্বাসরুদ্ধ হবার মতো ভয়ংকর, বিশেষ করে ‘থ্রি জিরো’র মতো সন্ত্রাসী সংস্থার হাতে এই অস্ত্র গেলে গোটা পৃথিবীতে তো বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে!’ প্রেসিডেন্ট বললেন উদ্বিগ্ন কণ্ঠে।

‘ওদের সংঘটনের নাম ‘One World Orbit’। তারা গোটা দুনিয়া দখল করে একক একটি রাষ্ট্র বানাতে চায় যার নিয়ন্ত্রক হবে তারা। এজন্যই এমন

অস্ত্র তাঁদের চাই, যা দিয়ে কয়েক মুহূর্তে দুনিয়ার সব শক্তিকে ধ্বংস করতে পারে।' বলল আহমদ মুসা।

'তাহলে ওঁরা তো পশ্চিমাদেরও বিরোধী?' প্রেসিডেন্ট বললেন।

'অবশ্যই। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমাদের বন্ধু নয়, ওদের ব্যবহার করছে মাত্র।' বলল আহমদ মুসা।

'থ্রি জিরো'-এর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে পূর্ব-পশ্চিম সবাই আমরা এক হতে পারি, একে অপরকে সহযোগিতা করতে পারি। অন্তত ভয়ংকর এই অস্ত্রের ব্যাপারে এক সাথে কাজ করতে পারি।' বললেন প্রধানমন্ত্রী।

'পশ্চিমীদের জানালে হিতে বিপরীত হতে পারে। পশ্চিমীরা সন্ত্রাসী এই সিন্ডিকেটের হাত থেকে অস্ত্রটা নিয়ে সেটা আমাদের উপর প্রয়োগ করতে পারে। 'থ্রি জিরো' বিপদে পড়লে ওদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে আমাদের ধ্বংস করার সুযোগ নিতে পারে। সুতরাং কল্যাণ হলো, বিষয়টা কাউকে না জানিয়ে এই ভয়ংকর অস্ত্রের হাত থেকে দুনিয়ার মানুষকে রক্ষার জন্যে আমাদেরই উদ্যোগ গ্রহন করা।' আহমদ মুসা বলল।

স্বস্তিতে মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও নিরাপত্তাপ্রধান জেনারেল মোস্তফার। পরক্ষনেই আবার উদ্বেগ নেমে এলো প্রেসিডেন্টের চোখে-মুখে। বললেন, 'কিন্তু আমরা যদি যথাসময়ে ওদের সব পরিকল্পনা নস্যাত করতে সমর্থ না হই, অস্ত্র যদি তৈরি হয়ে যায় বা এর ব্যবহার হয়, তাহলে?'

'এ ঝুঁকি আছে, মি. প্রেসিডেন্ট। তবে আমি মনে করি অস্ত্র তারা এতো তাড়াতাড়ি ব্যবহার করবে না। তাঁদের অস্ত্র তৈরি যদি সম্পূর্ণও হয়ে যায়, তাহলেও তারা অস্ত্রের উৎপাদন, ব্যবহারের পরিকল্পনা, প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে চিন্তা করবে। চিন্তা করবে তারা অস্ত্র ব্যবহারের পরবর্তী অবস্থা নিয়েও। তারা অস্ত্রাগার ধ্বংস করতে পারবে, কিন্তু দুনিয়ার সব মানুষকে তো ধ্বংস করতে পারবে না। ধ্বংস করতে পারবে না দুনিয়ার কোটি কোটি সংখ্যক প্রচলিত অস্ত্র। অতএব, চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আগে তাঁদের অনেক ভাবতে হবে, অনেক প্রস্তুতিরও প্রয়োজন আছে। সুতরাং সময় আমরা পাবো'। আহমদ মুসা বলল।

আবার মুখে ঔজ্জ্বল্য ফিরে এল প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর। বললেন প্রেসিডেন্ট, 'এখন তাহলে কি করনীয়? 'থ্রি জিরো' কোথায় তাঁদের গবেষণা চালাচ্ছে? সেটা কি তুরস্কে? ইস্তাম্বুলে?'

'নিশ্চিত করে বলা যাবে না। গবেষণার বিভিন্ন পার্ট থাকতে পারে। সব এক যায়গায় থাকতে পারে, আবার অনেক যায়গায় বিভক্ত অবস্থায় থাকতে পারে। তবে এটা আমি নিশ্চিত মনে করি যে, মূল গবেষক ইস্তাম্বুলে আছেন'। আহমদ মুসা বলল।

'তিনি ইস্তাম্বুলে আছেন? তিনি তুরস্কের বাসিন্দা, নাগরিক? না তিনি আছেন, এখানে এখন?' বলল বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসি। তাঁর কণ্ঠে বিস্ময়-পীড়িত কম্পন।

'আমি যতটা জেনেছি তিনি তুরস্কের বাসিন্দা।' বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা কথা শেষ করলেও কেউ কথা বলল না। প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, জেনারেল মোস্তফা, বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসি সবার চোখে-মুখেই বিস্ময়।

নিরবতা ভাঙল বিজ্ঞানী ডঃ আন্দালুসি। বলল, 'শুধু ইস্তাম্বুল নয়, গোটা তুরস্কে অ্যাডভান্সড ফিজিক্স ও পারটিকেল বিজ্ঞান নিয়ে যারা কাজ করে, প্রত্যেককেই আমি চিনি। তাঁদের গবেষণা সম্পর্কেও মোটামুটি জানি। এদের কেউ হবেন নিশ্চয়।' বলল বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসি।

'এই অনুসন্ধানের ব্যাপারে কিছুটা এগিয়েছি, নিশ্চিত হবার জন্যে আরও কিছুটা সময় লাগবে। আমি আশাবাদী খুব সত্বরই এ ব্যাপারে একটা সুখবর আমি দিতে পারব'। আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ মি. খালেদ খাকান।' কথাটা প্রায় এক সাথেই বলে উঠলেন প্রেসিডেন্ট ও বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসি।

আহমদ মুসা তাদেরকে ধন্যবাদ দিয়ে ড. আন্দালুসির দিকে চেয়ে বলল, 'ড., একটা বিষয় আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে, ফোটন পারটিকেলস থেকে তৈরি ওদের ধ্বংসাত্মক অস্ত্র প্রতিরোধের ক্ষেত্রে আমাদের সোর্ড-এর কি ভুমিকা হতে পারে?'

আহমদ মুসার প্রশ্নে খুশির প্রকাশ ঘটল প্রধানমন্ত্রীর চোখে। বললেন, 'ধন্যবাদ খালেদ খাকান, এ প্রশ্নটা আমার মনেও জেগেছে। বিষয়টা আমাদের জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

ভ্রু কুঞ্চিত হল ড. আন্দালুসির। ভাবল সে। একটু পর ধীর কণ্ঠে বলল, 'এর সুস্পষ্ট জবাব দেয়া কঠিন। ফোটন পারটিকেলস থেকে মারনাস্ত্র কোন্ শ্রেণীর ফোটনের এবং কত মাত্রার তা জানলে নির্দিষ্ট জবাব দেয়া যেত। তবে একটা কথা বলতে পারি, ফোটন পারটিকেলসের মারনাস্ত্র কোন না কোন মেটালে তৈরি ক্ষেপণাস্ত্রবাহিত হয়ে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানবে। আমাদের সোর্ড মেটালিক সে ক্ষেপণাস্ত্রকে বন্দী করে ধ্বংস করতে পারবে। আর ফোটন পারটিকেলস মারনাস্ত্র যদি শ্রেণী ও মাত্রার বিচারে আমাদের সোর্ড এর চেয়ে কম পাওয়ারফুল হয়, তাহলে সে ফোটন মারনাস্ত্রকেও নিউট্রাল করে ফেলতে পারবে আমাদের সোর্ড। আর ফোটন মারণাস্ত্রটি শ্রেণী ও মাত্রায় বেশি পাওয়ারফুল হলে সোর্ডের শিল্ড কেটে তা বেরিয়ে যাবে, কিন্তু লক্ষ্যে পৌছাতে পারবে না। কারন গাইডেড হবার মতো মেটালিক যান বা ক্ষেপণাস্ত্র তাঁর থাকবে না। তবে সমস্যা এই যে, প্রচলিত কোন রাডারে ফোটন মারনাস্ত্র ও ক্ষেপণাস্ত্র ধরা পড়বে না অতি ক্ষুদ্র অবয়ব হওয়ার কারণে। তবে ফোটন মারনাস্ত্রের লক্ষ্যবস্তুতে যদি সোর্ড মোতায়েন থাকে এবং সোর্ড যদি অ্যাকটিভেটেড (চালু) অবস্থায় থাকে, তাহলে ফোটন মারনাস্ত্র একটা নির্দিষ্ট দুরত্বে পৌছার পর সোর্ডের চোখে ধরা পড়ে যাবে এবং তারপর যা ঘটবে তা আগেই বলেছি।'

'তাঁর মানে আমাদের সোর্ড যদি অ্যাকটিভেটেড অবস্থায় মোতায়েন থাকে, তাহলে লক্ষ্যবস্তু ফোটন মারনাস্ত্রের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে।' বলল জেনারেল মোস্তফা কামাল।

'তাত্ত্বিকভাবে আমি তাই মনে করি। ফোটন মারনাস্ত্রের কম্পোজিশন ও শক্তির ডিটেইলটা পেলে সুনির্দিষ্ট একটা অপিনিওন দাঁড় করানো যেতে পারে'। বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসি বলল।

'তাহলে এখন ফোটন মারণাস্ত্রের কম্পোজিশন ও শক্তিকে বিস্তারিত জানা প্রথম বিষয় হিসাবে দাঁড়াচ্ছে। পরের বিষয় হলো, এই সর্বনাশা মারনাস্ত্র ও

তাঁর গবেষণাকে দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত করা। আপনি এ ব্যাপারে কিছু জানেন, মিঃ খালেদ খাকান?' বললেন প্রধানমন্ত্রী।

'মি. প্রধানমন্ত্রী, আপনি যেটা বলছেন সেটা আমারও কথা। এই দুই লক্ষ্যে আমরা কাজ করব, ফল আল্লাহ্‌র হাতে।' আহমদ মুসা বলল।

'আমি বুঝতে পারছি না, এই ভয়ংকর অস্ত্র তৈরি যখন সম্পূর্ণ করেছে, তখন কেন তারা আমাদের সোর্ড-এর ফর্মুলা ও গবেষণা হাত করার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে? ড. আন্দালুসি এ বিষয়ে আপনি কিছু বলবেন দয়া করে?' বললেন প্রেসিডেন্ট।

'অবশ্যই মি. প্রেসিডেন্ট। তিনটি কারনে তারা মরিয়া হয়ে উঠতে পারে। এক. ফোটন পার্টিকেলস থেকে এ্যান্টি-এটাকিং ডিফেন্সিভ শিল্ড তারা আবিষ্কার করতে পারেনি। দুই. তারা পশ্চিমের ননকনভেনশনাল অস্ত্র ভাণ্ডারকে অচল হয়ে পড়ার ভয়াবহ অবস্থা থেকে রক্ষার কোন দায়িত্ব পেয়েছে পশ্চিমের কাছ থেকে এবং তিন. আত্মরক্ষার এই সুযোগ তারা আমাদের হাত থেকে কেড়ে নিতে চায়। মিঃ খালেদ খাকান, কি ভাবছেন এ ব্যাপারে?' বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসি বলল।

'আমার নতুন কিছু কথা নেই। ডঃ আন্দালুসি যা বলেছেন, সেটা আমারও কথা। প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে একটা কথা বলতে চাই, ওদের গবেষণার কথা আমরা জানতে পেরেছি, এটা 'থ্রি জিরো'র কোনভাবেই জানা ঠিক হবে না। জেনে ফেললে অনেক কিছু ঘটাতে পারে। ওদের অপ্রস্তুত রেখে আমাদের ওদের ওপর গিয়ে পড়তে হবে।' আহমদ মুসা বলল।

'তথাস্তু, আহমদ মুসা। সরকারের কোন ব্যক্তি ও সরকারি প্রতিষ্ঠানকেও আমরা এ বিষয়ে কিছুই জানাবো না। কিন্তু আমরা সাংঘাতিকভাবে উদ্বিগ্ন, খালেদ খাকান। আমাদের যে কোন সাহায্য আপনার জন্যে প্রস্তুত থাকবে। জেনারেল মোস্তফা সব ব্যবস্থা করবেন। আল্লাহ্ আপনাকে সাহায্য করুন! আপনার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। আপনি জীবন বাজি রেখে যা করছেন কোন মূল্যে তাঁকে পরিমাপ করা যাবে না। আল্লাহ্ আপনাকে এর জাযাহ দান করুন!' বললেন প্রেসিডেন্ট।

'মি. প্রেসিডেন্ট, আমি আল্লাহ্‌র বান্দাদের জন্যে কাজ করছি। আল্লাহ্ যদি সন্তুষ্ট হন, এটাই আমার পরম পাওয়া।' বলল আহমদ মুসা নরম কণ্ঠে।

‘এটাই ঠিক, মি. খালেদ খাকান। মানুষ জাগতিক কোন লাভের জন্যে এভাবে জীবন পণ করে কাজ করতে পারেনা। একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যে যে কাজ সে কাজেই মানুষ এতটা নিবেদিত, এতটা বেপরোয়া হতে পারে।’ বললেন প্রেসিডেন্ট।

ঘরে প্রবেশ করল প্রেসিডেন্টের পি.এস.। বলল সে প্রেসিডেন্টকে, ‘স্যার, ডাক্তার ও নার্স এসেছেন।’

‘স্যরি। আমরা অনেক সময় নিয়েছি। ওঁদের আসতে বল। আমরা উঠছি।’

বলেই উঠে দাঁড়ালেন প্রেসিডেন্ট।

উঠে দাঁড়ালেন প্রধানমন্ত্রী, জেনারেল মোস্তফা, আহমদ মুসা সকলেই।

প্রেসিডেন্ট কয়েক ধাপ এগিয়ে আহমদ মুসার সাথে হ্যান্ডশেক করে বললেন, ‘ইয়াংম্যান, আপনি আমাদের গর্ব। আল্লাহ্‌ আপনার বুদ্ধি, শক্তি সব বাড়িয়ে দিন। আজ আসি, আবার দেখা হবে। আসসালামু আলাইকুম।’

প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিল। সব শেষে বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো আহমদ মুসা ও জেনারেল মোস্তফা।

হাসপাতালের লাউঞ্জে বেরিয়ে জেনারেল মোস্তফা আহমদ মুসাকে ডেকে নিয়ে এক প্রান্তের নিরিবিলি সোফায় গিয়ে বসল। বলল, ‘অবস্থা সত্যিই ভয়ংকর। কোন্‌ পথে কিভাবে এগোবেন বলে ভাবছেন?’

‘পথ এখনও বের হয়নি। পথ বের করার জন্যে কিছু কাজ করতে হবে। সেদিন আপনি যে পাম গার্ডেনের ঠিকানা দিয়েছিলেন, গোপনে সেখানে একটা হানা দেব। দেখি সেখানে কোন ক্লু মিলে কিনা?’ বলল আহমদ মুসা।

‘আমাদের কিছু করনীয় আছে?’ জিজ্ঞেস করল জেনারেল মোস্তফা।

‘আপনাকে জানাবো। আমি সেখানে যাবার আগে আপনার সাথে তো আলোচনা হবেই।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ধন্যবাদ মি. খালেদ খাকান। তাহলে আমি উঠছি। আপনি না হয় আমাদের অফিসে চলুন। এক সাথে যাওয়া হবে।’ জেনারেল মোস্তফা বলল।

‘গেলে বাড়তি কি লাভ হবে?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা। তার মুখে হাসি।

হাসল জেনারেল মোস্তফাও। বলল, ‘আপনি যে ধরনের লাভের কথা বলছেন, তেমন কিছু আমার হাতে নেই। তবে আপনাকে একটা সাইন্স ফিকশন দেখাতে পারি। সদ্য রিলিজড্ হয়েছে। বিজ্ঞানের যে দিকটা আলোচনা হলো, সে ধরনের বিষয়েরই একটা ছবি।’

‘আপনি যখন দেখেছেন, তখন অবশ্যই ভালো হবে। আমারও লোভ জাগছে। চলুন।’ বলল আহমদ মুসা।

দু’জন উঠে দাঁড়াল।

লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে এগোলো গাড়ির দিকে।

জেনারেল মোস্তফার প্রতিশ্রুত সিনেমাটি দেখল আহমদ মুসা। প্রথমে হালকা মুডে, রসিকতার মধ্যে দেখা শুরু করলেও শীঘ্রই সে সিরিয়াস হয়ে উঠল।

দেখল আহমদ মুসা, দু’জন প্রতিদ্বন্দ্বী বিজ্ঞানীর কাহিনী সিনেমাটি। দু’জন বিজ্ঞানীর একজন হলেন প্ল্যানেট আর্থ-এর বিজ্ঞানী ড. লেভী, অন্য বিজ্ঞানী পৃথিবীর প্রতিবেশী গ্রহ ‘নেবুলা’র ড. ক্রিস্টি ক্রায়েস্ট। দু’জন বিজ্ঞানী একে অপরকে টপকে যাওয়ার প্রতিযোগিতায় পাগল। একজনকে আরেকজন মিথ্যা প্রমাণিত করতে পারলে খুব খুশি। একজন একটা আবিষ্কার করলে, তার বেটার ভারশন তৈরি করতে না পারলে অন্যজন স্থির থাকতে পারে না। দু’জনের প্রতিযোগিতা শেষে বিধ্বংসী প্রতিযোগিতায় রূপ নিল। ড. লেভী হয়ে দাঁড়ালেন পৃথিবীর রক্ষক, আর ড. ক্রিস্টি ক্রায়েস্ট তাঁর গ্রহ-রাজ্য নেবুলার পাহারাদার। তাঁদের এই বিপজ্জনক অবস্থায় ঠেলে দিল প্ল্যানেট আর্থ ও প্ল্যানেট নেবুলা উভয়কেই। নেবুলার বিজ্ঞানী ড. ক্রিস্টি ক্রায়েস্ট পরমাণুর নিউক্লিয়াসের কানেকটিভিটির সুত্র আবিষ্কার করে তাঁকে কাজে লাগিয়ে এ্যান্টি –রিঅ্যাকটিভ ‘ডিঅ্যাকটিভ ভিটিং এন্ড ডিফিউজিং ওয়েভগান’ নামের অস্ত্র তৈরি করছে।

ভয়াবহ এই অস্ত্র প্ল্যানেট আর্থের একটি প্রাণীরও কোন ক্ষতি না করে পৃথিবীর সব অস্ত্র মুহূর্তে অচল করে দিতে পারে। অন্য দিকে এর পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে প্ল্যানেট আর্থের বিজ্ঞানী ড. লেভী আলোর ফোটন পারটিকেলস-এর গ্রেড এইড থেকে 'হর্ন অব গড' ওরফে 'সাইলেন্ট ডেথ ওয়ারিওর' নামের অস্ত্র আবিষ্কার করেছে। এই মারণাস্ত্র শুধু প্ল্যানেট নেবুলার সব অস্ত্র ভাণ্ডার নয়, সেখানকার সব ধরনের মেটালকে মুহূর্তের মধ্যে হাওয়া করে দিবে। ফলে প্ল্যানেট নেবুলার সব কল-কারখানা বন্ধ করা সহ অফিস-আদালত ও বাড়ি-ঘরের কাজও অচল করে দেবে। এই আবিষ্কারের কথা ঘোষিত হবার পর প্ল্যানেট নেবুলার অনুরোধে প্ল্যানেট আর্থ ও প্ল্যানেট নেবুলা'র মধ্যে বৈঠক বসল। আলোচনার পর নিঃশর্তভাবে সারেন্ডার করল নেবুলার বিজ্ঞানী ড. ক্রিস্টি ক্রায়েস্ট।

এই হলো সিনেমাটির কাহিনী।

সিনেমাটি শেষ হবার পর ক্রেডিট লাইনের এক জায়গায় কাহিনীর আইডিয়ার জন্যে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হয়েছে জনৈক বিজ্ঞানী ডঃ আরিয়েল আরিয়েহ-এর।

প্রথমে দু'চারটি কথা বললেও আহমদ মুসা নির্বাকভাবে সিনেমাটি দেখা শেষ করল।

সিনেমাটি তাঁকে দারুণভাবে বিস্মিত করল। তাঁর মনে হলো, তাঁদের আইআরটির প্রতিরক্ষা অস্ত্র 'সোর্ড' ও 'থ্রি জিরো'র ফোটন পারটিকেলসের বিধ্বংসী অস্ত্রের কথা পরোক্ষভাবে সিনেমায় বলা হয়েছে। সিনেমাটি আমেরিকায় তৈরি। নাম দেখা গেল, নির্মাতা সংস্থাটি একটি লিমিটেড ফার্ম। তারা এ ধরনের একটা সিনেমা কিভাবে তৈরি করতে পারল? ব্যাপারটা কাকতালীয়? একটা সাইন্স ফিকশন লেখকের চিন্তা ও একটি বাস্তবতা কি কাকতলীয়ভাবেই মিলে গেছে? কাহিনীর আইডিয়া এসেছে ড. আরিয়েল আরিয়েহর কাছ থেকে। এই বিজ্ঞানী ড. আরিয়েল আরিয়েহ কে? হঠাৎ মনে পড়ল 'থ্রি জিরো' র বিজ্ঞানী ড. আবু আবদুর রহমানের নামের শেষেও আরিয়েহ আছে। তাহলে ড. আরিয়েল আরিয়েহও কি ইহুদি বিজ্ঞানী? তাই হবে। আরিয়েল আরিয়েহ পুরোটাই হিব্রু নাম যার অর্থ ঈশ্বরের সিংহ আরিয়েহ। আর 'আরিয়েহ' হলো ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ

তাওরাত-এর একজন সেনাধ্যক্ষ। সিনেমার আরেকটি জিনিস আহমদ মুসার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হলো। সেটা হলো, ড. লেভী নিরব ধ্বংসের যে অস্ত্র তৈরি করেছে, সেটা ফোটন পারটিকেলস-এর এইটথ গ্রেড থেকে তৈরি। 'থ্রি জিরো' র বিজ্ঞানী ড. আরিয়েহ নিরব ধ্বংসের অস্ত্র তৈরি করেছে, সেটা তাহলে কত গ্রেড থেকে তৈরি? ফোটন পারটিকেলস-এর অষ্টম গ্রেড? কিন্তু আলোর পারটিকেলস-এর তো কোন অষ্টম গ্রেড নেই? নাম হর্ন অব গড, ড. লেভীর মারণাস্ত্রগুলো খুব মজার মনে হলো আহমদ মুসার কাছে। 'হর্ন অব গড' অর্থাৎ আল্লাহ্র শিং-ই শেষ পর্যন্ত জয়ী হল।

আহমদ মুসা চিন্তায় একেবারে বুঁদ হয়ে গিয়েছিল। কখন কথা শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু সম্বিত ফিরে আসেনি আহমদ মুসার। জেনারেল মোস্তফা হাসি মুখে তাকিয়ে আছে আহমদ মুসার দিকে। এক সময় বলে উঠল, 'মি. খালেদ খাকান, আপনাকে নিয়ে এসে বৃথা যায় নি। সিনেমাটি আপনাকে দারুণভাবে ভাবাতে পেরেছে দেখছি।'

ভাবনার জগত থেকে ফিরে এলো আহমদ মুসা। তাকাল জেনারেল মোস্তফার দিকে। বলল, 'জেনারেল মোস্তফা, ফিল্মটি তো আপনি আগে অবশ্যই দেখেছেন। আমরা সামরিক হাসপাতালে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম, সেটার পর এ ফিল্মটি আবার দেখে আপনার কি মনে হচ্ছে?'

গম্ভীর হল জেনারেল মোস্তফা।

'কিছু যে মনে হবে, এজন্যেই ফিল্মটি দেখার জন্যে আপনাকে নিয়ে এসেছি। সত্যিই আমি ভেবে অবাক হয়েছি, ফিল্মটি যেন আমাদের আইআরটির সোর্ড ও থ্রি জিরোর ফোটন মারনাস্ত্রেরই কাহিনী! পার্থক্য শুধু এটুকু যে, ফিল্মের বিজ্ঞানী ক্রিস্টি ক্রায়েস্টের 'ডিএ্যাকটিভেটিং অ্যান্ড ডিফিউজিং' অস্ত্র গিয়ে সব অস্ত্রাগারের সব অস্ত্র নিষ্ক্রিয় করে দেয়। আর সোর্ড মাত্র এটাকিং অস্ত্রকে আটকে ফেলে দূর আকাশে নিয়ে গিয়ে তাঁকে ধ্বংস করে দেয়।' বলল জেনারেল মোস্তফা।

'বিষয়টাকে আপনি কি কাকতালীয় বলবেন?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'বলতে কষ্ট হবে, কিন্তু আর কি ব্যাখ্যা হতে পারে বলুন তো?' জেনারেল মোস্তফা বলল।

'থ্রি জিরো ইহুদিবাদীদের সংস্থা, আর ফিল্মটিও নিশ্চয় কোন ইহুদিবাদীর পরিকল্পিত।' আহমদ মুসা বলল।

'তাদের মধ্যে কোন যোগসূত্র থাকার কথা বলছেন?'

'অনুমান করে বলার মধ্যে কোন লাভ নেই। এটা অনুসন্ধানের বিষয়, বিশেষ করে বিজ্ঞানী ড. আরিয়েল আরিয়েহ কে, তা জানতে পারলেই অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে।' আহমদ মুসা বলল।

টেলিফোন বেজে উঠল জেনারেল মোস্তফার।

মোবাইল তুলে নিয়ে হ্যালো বলতেই ওপার থেকে পুলিশপ্রধান নাজিম এরকেন বলল, 'জেনারেল মোস্তফা, আমি এখন রোমেলী দুর্গে। এখানে বিস্ময়কর ভূতুড়ে একটা ঘটনা ঘটেছে। রোমেলী দুর্গের উত্তর পাশে নৌবাহিনীর জরুরী অস্ত্র ডিপোর সব অস্ত্র হাওয়া হয়ে গেছে। ধাতব ডাস্টের একটি স্তর ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই, এমনকি সেই ডিপোর জানালার গরাদসহ কোন প্রকার মেটাল অবশিষ্ট নেই। আর...।'

'বলুন রোমেলী দুর্গের কি অবস্থা?' পুলিশপ্রধান নাজিম এরকেনকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল জেনারেল মোস্তফা। তাঁর চোখে-মুখে উদ্বেগ ও ভীতি নেমে এসেছে।

'রোমেলী দুর্গের সব ঠিক আছে।' বলল পুলিশপ্রধান নাজিম এরকেন।

'একটু ধরুন মি. নাজিম এরকেন।'

বলেই জেনারেল মোস্তফা উৎসুক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকা আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, 'মি. খালেদ খাকান, বোধ হয় ভয়ানক এক দুঃসংবাদ। আমাদের রোমেলী দুর্গের উত্তর পাশের নৌবাহিনীর অস্ত্র ডিপোর সব অস্ত্র ও ডিপোর সব ধরনের জিনিস ডাস্ট হয়ে গেছে, কিন্তু রোমেলী দুর্গের সব ঠিক আছে।'

বিদ্যুস্পৃষ্ট হওয়ার মতো চমকে উঠল আহমদ মুসা। নেমে এলো তাঁর চোখে- মুখে উদ্বেগ। মুহূর্ত ভাবল আহমদ মুসা। মুহূর্তের জন্যে তাঁর চোখ দু'টিও বুজে গিয়েছিল। চোখ খুলেই আহমদ মুসা বলল, 'ওকে বলুন, বিষয়টা সম্পূর্ণ

গোপন রাখতে হবে। তথ্যটা বাইরে প্রকাশ হতে দেয়া যাবে না। আর চলুন, ওখানে যেতে হবে আমাদের।'

জেনারেল মোস্তফা বিষয়টি পুলিশপ্রধানকে জানালে পুলিশপ্রধান বলল, 'সে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। আর্মস ডিপোর স্টাফদের পর্যন্ত ভিতরে ঢুকতে দেয়া হয় নি। সেনাবাহিনীর কয়েকজন টপ অফিসার ও পুলিশের মধ্যে আমিই শুধু বিষয়টা জেনেছি।'

'মিঃ নাজিম এরকেন, আমি খালেদ খাকানকে নিয়ে আসছি।'

বলে সালাম দিয়ে মোবাইল অফ করে দিল জেনারেল মোস্তফা।

মোবাইলটা পকেটে রেখে জেনারেল মোস্তফা আহমদ মুসাকে বলল, 'কিছু আন্দাজ করেছেন, মিঃ খালেদ খাকান?'

'চলুন, গিয়ে দেখা যাক। তবে আমি ভাবছি, 'থ্রি জিরো' কি রোমেলী দুর্গে আইআরটি'র ওপর আক্রমন করল, না ডিপোটির ওপর টেস্ট আক্রমন? সিদ্ধান্তের আরও কিছু বিষয় জানা দরকার।' বলল খালেদ খাকান।

'চলুন, তাহলে বেরুনো যাক।' বলেই উঠে দাঁড়াল জেনারেল মোস্তফা।

আহমদ মুসাও উঠে দাঁড়াল।

# ৩

নৌবাহিনীর আপতকালীন অস্ত্রাগারের অবস্থা দেখে হতবাক হলো আহমদ মুসা। অস্ত্রের স্থানগুলো আছে, কেসগুলো আছে কিন্তু অস্ত্রগুলো নেই, হাওয়া হয়ে গেছে! জানালার ষ্টীল ফ্রেম ও অন্যান্য মেটালিক আসবাবপত্র সবই হাওয়া! স্থানগুলোতে অস্বাভাবিক বর্ণের পাউডারের সূক্ষ্ম আস্তরন লক্ষণীয়। মেঝের পাউডারের মতো ঘরের দেয়াল-ছাদও একটা ভিন্ন বর্ণের সূক্ষ্ম আস্তরণে যেন ঢেকে গেছে, আহমদ মুসার সাথে জেনারেল মোস্তফা, পুলিশপ্রধান নাজিম এরকেন দেখল সব ঘুরে ঘুরে।

গোটা সময়ে কেউ একটা কথাও বলেনি। সবার চোখে-মুখেই অপার বিস্ময়, আর গভীর উদ্বেগের সমাহার!

অস্ত্রাগার ও তাঁর আশপাশটা দেখা শেষ করে আহমদ মুসা জেনারেল মোস্তফার দিকে তাকিয়ে বলল, 'চলুন, রোমেলী দুর্গে যাই।'

নৌবাহিনীর আপতকালীন এই অস্ত্রাগারের ৫০ ফুটের মাথায় রোমেলী দুর্গের শুরু। শুরুতেই রোমেলী দুর্গের উত্তর টাওয়ার।

দুর্গে প্রবেশ করে আহমদ মুসারা শুরুতেই দেখল দুর্গের উত্তর টাওয়ার। টাওয়ারটা একেবারেই অক্ষত। গোটা দুর্গের কোথাও কোন প্রকার ক্ষতি বা অস্বাভাবিকতা দেখা গেল না।

তারা ইন্সটিটিউট রিসার্চ এন্ড টেকনোলজির আহমদ মুসার কক্ষে গিয়ে বসল।

আহমদ মুসারা বসার পরপরই ঘরে প্রবেশ করল তরুন আলোক-বিজ্ঞানী ড. ইবনুল আব্বাস আব্দুল্লাহ সেনুসী।

বিজ্ঞানী ড. ইবনুল আব্বাস আব্দুল্লাহ ইন্সটিটিউটের প্রধান ড. আন্দালুসির প্রধান গবেষণা সহকারী। বলল সে, 'আমাদের ল্যাবরেটরিসহ

ইন্সটিটিউটের প্রতিটি ইঞ্চি জায়গা আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি। সব ঠিক আছে।'

'ড. আন্দালুসিকে আপনি জানিয়েছেন বিষয়টি?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'জি জনাব, আপনার টেলিফোন পেয়েই বিষয়টি আমি ড. আন্দালুসিকে জানিয়েছি।' বলল ড. ইবনুল আব্বাস।

'শুনে তিনি কি বললেন?' আহমদ মুসা বলল।

'তিনি খুব উদ্বিগ্ন হয়েছেন। বলেছেন, আইআরটিকে লক্ষ্য করেই তারা ফোটন মারণাস্ত্রের হামলা চালিয়েছিল। আমাদের সোর্ড শিল্ড অ্যাকটিভ না থাকলে আমাদের আইআরটি'রও একই দশা হতো।' ড. বিজ্ঞানী ইবনুল আব্বাস বলল।

'নৌবাহিনীর আর্মস ডিপো ধ্বংস হওয়ার ব্যাখ্যা কি ড. ইবনুল আব্বাস?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'আমাদের সোর্ড শিল্ডের আওতার বাইরে ছিল ওটা। আর ওদের ফোটন অফেনসিভ আর্মস-এর বিস্তার ছিল আমি মনে করি রোমেলী দুর্গ থেকে দু'শ ফুট বেশি। এই বর্ধিত অংশ দুর্গের দু'দিকেই বিস্তৃত ছিল। কিন্তু দুর্গের দক্ষিন অংশে উল্লেখযোগ্য কোন ধাতব স্ট্রাকচার না থাকায় সেটা আমরা বুঝতে পারছি না।' বলল ড. ইবনুল আব্বাস।

'আপনারা সোর্ড শিল্ডকে অ্যাকটিভ রেখেছিলেন, না অ্যাকটিভ করেছেন?' বলল আহমদ মুসা।

'অ্যাকটিভ ছিল না, ঘণ্টা খানেক আগে আমরা অ্যাকটিভ করেছি। হাসপাতাল থেকেই ড. আন্দালুসি এই নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন।' ড. ইবনুল আব্বাস বলল।

'মাত্র এক ঘণ্টা আগে? তার মানে গত এক ঘণ্টার মধ্যে ওদের এই আক্রমণটা হয়েছে? ইন্না লিল্লাহ! যদি সোর্ড অ্যকটিভ করা না হতো, তাহলে কি হতো!'

বলল আহমদ মুসা। তাঁর কণ্ঠে উদ্বেগের স্পষ্ট প্রকাশ ঘটল। ভাবল সে, হাসপাতালে তাঁদের সাথে এই বিষয়ে আলোচনার পরপরই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে ড. আন্দালুসি আইআরটিকে সোর্ড শিল্ড অ্যাকটিভ করার নির্দেশ দিয়েছেন। মনে মনে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল আহমদ মুসা। ড. আন্দালুসির দূরদৃষ্টিরও প্রশংসা করল।

ভাবতে গিয়ে একটু আনমনা হয়ে পড়েছিলে আহমদ মুসা। জেনারেল মোস্তফার মোবাইল বেজে উঠার শব্দে সে সম্বিত ফিরে পেল।

জেনারেল মোস্তফা টেলিফোন ধরে জি, ইয়েস স্যার বলেই কথা শেষ করল।

আহমদ মুসা বুঝল, প্রধানমন্ত্রীর বা প্রেসিডেন্টের মতো ওপরের কারও টেলিফোন নিশ্চয়ই।

মোবাইল পকেটে রেখে জেনারেল মোস্তফা তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'মি. খালেদ খাকান, প্রেসিডেন্টের ইনার সিকিউরিটি টীমের জরুরী বৈঠক বসেছে। আপনাকে নিয়ে এখনি যাবার জন্য আমার ওপর নির্দেশ হয়েছে। চলুন উঠি।'

আহমদ মুসার সাথে কথা শেষ করেই জেনারেল মোস্তফা পুলিশপ্রধান নাজিম এরকেনকে লক্ষ্য করে বলল, 'মি. নাজিম এরকেন, আপনি এ ঘটনার উপর প্রধানমন্ত্রীর জন্যে ব্রীফ তৈরি করুন। আর এ দিকটা দেখুন আপনি।'

বলে উঠে দাঁড়াল জেনারেল মোস্তফা।

সাথে আহমদ মুসাও।

সকলের সাথে সালাম বিনিময় করে তারা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো।

বসফরাসের তীরেই প্রেসিডেন্টের অবকাশকালীন প্রাসাদ। গত পক্ষকাল ধরে প্রেসিডেন্ট এখানেই অবস্থান করছেন। প্রধানমন্ত্রীও এখানে এসেছেন আংকারা থেকে দু'দিন হলো।

আহমদ মুসারা প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে প্রবেশ করে ভেতরের কার পার্কিং-এ নামতেই একজন প্রোটোকল অফিসার এগিয়ে এলো। বলল জেনারেল মোস্তফা

ও আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, ‘স্যার, মহামান্য প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী মহোদয় আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। আসুন স্যার।’

প্রোটোকল অফিসারকে অনুসরন করল আহমদ মুসা ও জেনারেল মোস্তফা।

হাঁটতে হাঁটতে প্রোটোকল অফিসার বলল, ‘প্রেসিডেন্ট চলে গেছেন তাঁর আন্ডারগ্রাউন্ড অফিস রুমে। সেখানেই আপনাদের ডেকেছেন।’

এ করিডোর, সে করিডোর ঘুরে একটা লিফটের সামনে এসে দাঁড়াল তারা।

ঘুরতে গিয়ে প্রোটোকল অফিসার হোঁচট খেল জেনারেল মোস্তফার সাথে। প্রোটোকল অফিসারের জুতার অগ্রভাগটা ঠোকর খেল জেনারেল মোস্তফার জুতার সাথে।

পড়ে যাচ্ছিল প্রোটোকল অফিসারটি। জেনারেল মোস্তফা তাঁকে ধরে ফেলল।

প্রোটোকল অফিসারটি ‘স্যরি’; ‘স্যরি’ বলতে বলতে বিনয়ে বিগলিত হয়ে গেল।

‘না, না, ঠিক আছে। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়েছেন তো! আমি চলা অবস্থায় ছিলাম। এরকম ঘটতেই পারে। এ কিছু না, ঠিক আছে। ওকে লেট আস প্রোসিড।’ বলল জেনারেল মোস্তফা।

আহমদ মুসার মুখে কিন্তু একটা বিরক্তি ভাব ফুটে উঠেছিল। আহমদ মুসা জেনারেল মোস্তফার পাশাপাশি হাঁটছিল। আহমদ মুসা দেখেছে, জেনারেল মোস্তফার সাথে তার এভাবে হোঁচট লাগার কথা নয়। প্রোটোকল অফিসার খুব শর্ট স্পেস নিয়ে ঘুরেছে। ঘোরার সময় জুতাটাও সে চালিয়েছে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি জোরে। সে কি অমনোযোগী হয়ে পড়েছিল, না তাঁর কাণ্ডজ্ঞানের অভাব আছে?’

কিন্তু আহমদ মুসা কিছু বলল না।

জেনারেল মোস্তফার কথার জবাবে প্রোটোকল অফিসার বলল, 'স্যার, আমার আর সামনে এগোবার অনুমতি নেই। লিফটে আপনারা একাই যাবেন। লিফটের গোঁড়ায় প্রেসিডেন্টের পি.এস. আপনাদের রিসিভ করবেন।'

লিফটে উঠল জেনারেল মোস্তফা ও আহমদ মুসা।

সত্যি প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী আহমদ মুসাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।

আহমদ মুসারা মিটিং রুমে প্রবেশ করতেই প্রেসিডেন্ট বললেন, 'ওয়েলকাম, মি. খালেদ খাকান! আপনাদের জন্যেই আমাদের অপেক্ষা। আসুন, বসুন।'

একটা ডিম্বাকৃতি টেবিলের একপাশে একটা কিং চেয়ারে বসে আছেন প্রেসিডেন্ট। তাঁর ডান পাশে প্রধানমন্ত্রী। তার ডান পাশে প্রধানমন্ত্রী। সামনে আরও চারজন। প্রেসিডেন্ট সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন আহমদ মুসাকে। চারজনের একজন তিন বাহিনীর কমান্ডার-ইন-চীফ, দ্বিতীয় জন প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা এ্যাডভাইজার, তৃতীয় জন পার্লামেন্টের নিরাপত্তা বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান এবং চতুর্থ জন পার্লামেন্টের বিরোধী দলীয় নেতা।

পরে সবাইকে আহমদ মুসার পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন, 'তাঁর সম্পর্কে আমি আগেই আপনাদের ব্রীফ করেছি। তিনি তুরস্কের জন্যে, মুসলিম উম্মার জন্যে যা করেছেন তার জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ।'

কথা শেষ করে একটু থামলেন প্রেসিডেন্ট। তারপর মুখ ঘুরিয়ে তাকালেন প্রধানমন্ত্রীর দিকে। বললেন, 'এবার মিটিং-এর কাজ শুরু হতে পারে মিভ প্রধানমন্ত্রী।'

ঠিক এই সময়েই আহমদ মুসার মোবাইল বেজে উঠল।

বিব্রত হলো আহমদ মুসা। বলল, 'এক্সকিউজ মি, মিস্টার প্রেসিডেন্ট। মোবাইল আমার অফ আছে। কিন্তু ইমার্জেন্সি অপশনে কলটি এসেছে। আমি কি এ্যাটেন্ড করতে পারি?' বলল আহমদ মুসা বিনীতভাবে।

'অবশ্যই মি. খালেদ খাকান। নো ম্যাটার। আপনি কলটি এ্যাটেন্ড করুন।' বললেন প্রেসিডেন্ট।

‘ধন্যবাদ, একসেলেন্সি।’ বলে আহমদ মুসা মোবাইল নিয়ে একটু দুরে সরে গেল।

স্ক্রীনের নম্বারটি দেখেই বুঝল জোসেফাইনের ফোন। একটু উদ্বিগ্ন হলো আহমদ মুসা। মোবাইল বন্ধ দেখেও ইমারজেন্সী অপশনে কলটি সে করেছে। এ রকম সে করে না। কোন কি বিপদ হয়েছে তাঁর?’

কলটি অন করেই সালাম দিয়ে আহমদ মুসা দ্রুত কণ্ঠে বলল, ‘তোমরা ভালো আছো তো জোসেফাইন?’

‘স্যরি, আমরা ভালো আছি। কিন্তু একটা খবর দেয়ার জন্যে তোমাকে এই কলটি করতে হলো। এইমাত্র জেফি জিনা আমাকে জানাল, তুমি এখন প্রেসিডেন্ট হাউজে থাকতে পার কোন গুরুত্বপূর্ণ মিটিং-এ। প্রেসিডেন্ট হাউজের একজন প্রোটোকল অফিসার ‘থ্রি জিরো’ র এজেন্ট। তার উপর বিশেষ নির্দেশ গেছে মিটিংটি মনিটর করার। খবরটি এইটুকুই। ওকে। সালাম। রাখি?’ টেলিফোনের ওপার থেকে বলল জোসেফাইন।

‘ধন্যবাদ জোসেফাইন। বিরাট উপকার করলে তুমি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমার নয়। ধন্যবাদ প্রাপ্য জেফি জিনার।’ বলল জোসেফাইন।

‘তাকেও ধন্যবাদ।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ঠিক আছে। জানাবো তাকে। রাখছি টেলিফোন। সালাম।’

‘আসসালামু আলাইকুম’ বলে আহমদ মুসাও কল অফ করে দিল।

আহমদ মুসা ফিরে এলো টেবিলে। সে কানে কানে বিষয়টা জানালো জেনারেল মোস্তফাকে।

চমকে উঠল জেনারেল মোস্তফা। উদ্বেগে ছেয়ে গেল তার চোখ-মুখ। সে উঠে দাঁড়াল চেয়ার থেকে। বলল, ‘মহামান্য প্রেসিডেন্ট, জনাব খালেদ খাকান এইমাত্র জানতে পেরেছেন, প্রেসিডেন্টের একজন প্রোটোকল অফিসার ‘থ্রি জিরো’ র লোক। তাঁর উপর দায়িত্ব পড়েছে এই মিটিং-এর আলোচ্য বিষয় মনিটর করার।’

থামল জেনারেল মোস্তফা।

প্রেসিডেন্ট সোজা হয়ে বসলেন। তারও চোখ-মুখ ছেয়ে গেল উদ্বেগে। বললেন, 'প্রেসিডেন্ট হাউজে এখন তিনজন প্রোটোকল অফিসার। তিনজনই আজ হাজির আছে। এই তিনজনের মধ্যে কে সে? অবস্থার প্রেক্ষিতে মি. খালেদ খাকানের দেয়া তথ্য সত্য বলে মনে করছি। ধন্যবাদ, মি. খালেদ খাকান।'

'তিন প্রোটোকল অফিসারকেই গ্রেপ্তার করে তাদের কাছ থেকে তথ্য নেয়া হোক!' বলল প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা উপদেষ্টা।

হঠাৎ আহমদ মুসার মনে পরে গেল আসার পথে লিফটের সামনে প্রোটোকল অফিসারের সাথে জেনারেল মোস্তফার হোঁচট লাগার কথা। এই হোঁচট লাগাকে তখনই স্বাভাবিক বলে মনে হয়নি।

ভ্রু কুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার। সে কি তাহলে হোঁচট লাগার মহড়া করে জুতার মাধ্যমে জুতায় অথবা হাত দিয়ে কোট প্যান্টের কোথাও ট্রান্সমিটার চিপস পাচার করেছে?

কথাটা মনে আসতেই আহমদ মুসা জেনারেল মোস্তফাকে বলল, 'নিশ্চয়ই ঐ প্রোটোকল অফিসারটি। তার জুতার সাথে আপনার জুতার হোঁচট লাগিয়ে ট্রান্সমিটার চিপস পাচার করেছে অথবা পোশাকেও তা লাগিয়ে দিতে পারে।'

ভ্রু কুঞ্চিত হলো জেনারেল মোস্তফারও। বলল, 'সত্যিই তার হোঁচট লাগানোটা আমাকে অবাক করেছে। চলুন দেখি, জুতাটা আগে চেক করি।'

টর্চ আনা হল। ম্যাগনিফাইং গ্লাস আহমদ মুসার কাছেই ছিল।

জুতায় টর্চের আলো ফেলে আহমদ মুসা জেনারেল মোস্তফার বাম জুতা পরীক্ষা করতে লাগল ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে। বাম জুতার সামনের বাম পাশে টপটার তলার দিকে টার্ন নেবার জায়গায় আলপিনের মাথার মতো ক্ষুদ্র একটা চিপস পাওয়া গেল। বিশেষ ধরনের চুম্বক দিয়ে ওটা তুলে নেয়া হল।

আহমদ মুসা জেনারেল মোস্তফার পোশাকের সামনের দিকটার ওপরও চোখ বুলাতে চাইল। আহমদ মুসার মনে পড়ল লোকটিকে পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচানোর জন্যে যখন তাকে ধরেছিল জেনারেল মোস্তফা, তখন লোকটির বাম

হাত জেনারেল মোস্তফার বাম হাত চেপে ধরেছিল। দেহের আর কোন জায়গায় তার হাত পড়েনি।

আহমদ মুসা তার বাম হাত ও কোটের হাতা পরীক্ষা করল। আতিপাতি অনুসন্ধানের পর হাতার বোতামে আরেকটা চিপস পাওয়া গেল। এ চিপসটাও বিশেষ চুম্বক দিয়ে তুলে নেয়া হল।

চিপস দু'টি প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীও দেখলেন ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে।

তারপর আহমদ মুসা লেজার বীমার দিয়ে পুড়িয়ে দিল চিপস দু'টি।

এতক্ষন কেউ কথা বলেনি।

নীরবতা ভাঙলেন প্রেসিডেন্ট। বললেন, 'মিঃ খালেদ খাকান, ঘটনা কি বলুন তো?'

'ঘটনাটা জেনারেল মোস্তফার সাথে ঘটেছে। তিনিও বলতে পারেন।' আহমদ মুসা বলল।

'আপনিই বলুন মি. খালেদ খাকান। ঘটনা আমার সাথে ঘটলেও গোটা ঘটনা আপনার দেখার সুযোগ হয়েছে।' বলল জেনারেল মোস্তফা।

'ধন্যবাদ, জেনারেল মোস্তফা।' বলে আহমদ মুসা লিফটের সামনে পৌঁছে প্রোটোকল অফিসার পেছন ফিরতে গিয়ে কিভাবে জেনারেল মোস্তফার পায়ের সাথে তার পা হোঁচট খায়, কিভাবে প্রোটোকল অফিসার পড়ে যাচ্ছিল, কিভাবে জেনারেল মোস্তফা তাকে পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করল, কিভাবে ভারসাম্য রক্ষার জন্যে প্রোটোকল অফিসার তার বাম হাত দিয়ে জেনারেল মোস্তফার বাম হাত আঁকড়ে ধরেছিল, তার বিস্তারিত বর্ণনা করল। 'প্রোটোকল অফিসারের জুতার মাথায় একটা ট্রান্সমিটার চিপস সাজানো ছিল, সেটা হোঁচট লাগানোর সময় জেনারেল মোস্তফার জুতায় পাচার করেন এবং তার হাতে বাড়তি ব্যাবস্থা হিসেবে আরেকটি চিপস ছিল, সেটা তিনি পড়ে গিয়ে অন্য জুতায় পেস্ট করতে চেয়েছিলেন। পড়ে যেতে না পেরে তিনি জেনারেল মোস্তফার হাতার বোতামে সেটা লাগিয়ে দেন। আমি এরকমই ধারনা করছি।' বলল আহমদ মুসা।

‘ধন্যবাদ, মি. খালেদ খাকান! আপনি হোঁচটটাকে অস্বাভাবিক মনে করেছিলেন বলেই একটা বড় সিক্রেট আউট হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচলাম, তেমনি শয়তানটাকে ধরা সহজ হয়ে গেল।’ জেনারেল মোস্তফা বলল।

প্রেসিডেন্ট আহমদ আরদোগাল বাবাগলু একটা টেলিফোনে কথা শুনছিলেন। টেলিফোনটা রেখে দিয়ে বললেন, ‘জেনারেল মোস্তফা, শয়তানটা ধরা পড়ল ঠিকই কিন্তু ধরে রাখা গেল না। ধরা পরার সংগে সংগেই সে পটাসিয়াম সাইনাইড খেয়েছে। মি. খালেদ খাকানের কথা থেকে কে কালপিট তা আঁচ করতে পেরেই আমি তাকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছিলাম। বোধ হয় কিছু সে আঁচ করতে পেরেছিল। পালাচ্ছিল সে। বাইরে গেটে গাড়িতে ওঠার মুহূর্তে তাকে ধরে ফেলা হয়। কিন্তু লাভ হলো না। আমাদের সিক্রেটটা রক্ষা পেলেও ভয়ানক শত্রু হাতের মধ্য থেকে বেরিয়ে গেল।’

বলে একটু থামলেন প্রেসিডেন্ট। তারপর আবার বলা শুরু করলেন, ‘ধন্যবাদ মি. খালেদ খাকান। আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন! আপনার অদ্ভুত বুদ্ধি-শক্তিকে আল্লাহ আরও বাড়িয়ে দিন!’

আহমদ মুসার উদ্দেশ্যে কথা শেষ করে ঘুরে বসলেন প্রেসিডেন্ট। সবার উদ্দেশ্যে বললেন, ‘এবার মিটিং শুরু হতে পারে। আমাদের সামনে ভয়াবহ বিপদ দুটি। এক. শত্রুরা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে এমনকি প্রেসিডেন্ট ভবনের মতো স্থানেও অবস্থান নিতে পেরেছে। দুই. এক ভয়াবহ মারনাস্ত্র আমাদের মাথার ওপর ঝুলে আছে। সে এমন এক মারনাস্ত্র যা অদৃশ্য এবং তার ধ্বংসলীলাও অদৃশ্য। আমরা কিভাবে এই দুই সংকটের মোকাবিলা করব, সে ব্যাপারে যার যার চিন্তার কথা বলুন।’

সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ডার-ইন-চীফ আলী আব্দুল্লাহ গুল বলল, ‘আমাদের পরিচিত ও প্রধান সামরিক ঘাঁটিগুলোকে অবিলম্বে সোর্ড শিল্ডের নিরাপত্তা বলয়ে আনা দরকার। আমাদের প্রধান শিল্প-কারখানাগুলোকেও এই নিরাপত্তা আমব্রেলা দিতে হবে। আর এই ভয়ানক শত্রুদের ষড়যন্ত্রের নেটওয়ার্ক ভেঙে দেয়ার জন্যে আমাদের গোয়েন্দা ব্যাবস্থাপনার সর্বাত্মক ব্যবহার হওয়া উচিত।

এক্ষেত্রে আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় ভাই মি. খালেদ খাকানের সাহায্যই হবে আমাদের জন্যে মুখ্য বিষয়।'

থামল সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ডার-ইন-চীফ আলী আব্দুল্লাহ গুল।

পার্লামেন্টের বিরোধী দলের নেতা, পার্লামেন্টের নিরাপত্তা বিষয়ক কমিটির প্রধান, প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা বিষয়ক কমিটির প্রধান ও প্রধানমন্ত্রী হোসেন ইসমাইল সেলিক কমবেশি একই কথা বললেন। প্রধানমন্ত্রী তার কথায় একটা যোগ করেছেন, সেটা হল যে, তিনি বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসির সাথে আলোচনা করেছেন। তুরস্ককে সোর্ডের নিরাপত্তা দেয়া সম্ভব বলে তিনি জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রীর শেষ কথাটা শুনে প্রেসিডেন্ট 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে আহমদ মুসার দিকে তাকালেন। বললেন, 'বলুন মি. খালেদ খাকান আপনি কি ভাবছেন?'

'আরও সংকট মোকাবিলার জন্যে সবাই যা বলেছেন তার সাথে আমি একমত। কিন্তু এ সংকটের নিরাপদ ও স্থায়ী সমাধান হলো ধ্বংসের এই অস্ত্রকে শুরুতেই গোড়া সমেত উপড়ে ফেলা। ষড়যন্ত্রের গবেষণাগারকে শেষ করে দেয়া। এই লক্ষ্যে দ্রুত এগুনো দরকার।' বলল আহমদ মুসা।

প্রেসিডেন্টের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, 'এই দুরূহ দায়িত্ব মি. খালেদ খাকান, আপনাকেই নিতে হবে।'

'একসেলেন্সি, আমি চেষ্টা করছি, চেষ্টা করব। জানি না কতখানি সফল হব!' আহমদ মুসা বলল।

'মি. খালেদ খাকান, আমাদের সরকারের সব রকম সাহায্য আপনার সাথে থাকবে। যেখানে যখন প্রয়োজন, সেনাবাহিনীকে ডাকলেও পাবেন।' বললেন প্রেসিডেন্ট।

'একসেলেন্সি, আমি কালকের মধ্যেই ইস্তাম্বুলের এমন একটা মানচিত্র চাই, যাতে কোন্টা দোকান, কোন্টা কিসের কারখানা, তার ইন্ডিকেশন থাকবে। ফাঁকা জায়গাগুলোর মালিক কারা বা কে? তারও জওয়াব থাকতে হবে মানচিত্রে।' বলল আহমদ মুসা।

প্রেসিডেন্ট তাকালেন জেনারেল মোস্তফার দিকে। প্রেসিডেন্টের ইচ্ছা বুঝে জেনারেল মোস্তফা বলল, ‘একসেলেন্সি, এ ধরনের মানচিত্র আছে, খুবই সিক্রেট। তবে মি. খালেদ খাকান অবশ্যই এটা পাবেন।’

‘ধন্যবাদ জেনারেল মোস্তফা।’ বললেন প্রেসিডেন্ট।

‘ধন্যবাদ জেনারেল মোস্তফা।’ আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই প্রেসিডেন্ট বললেন, ‘সোর্ড-এর মোতায়েন করা, সেটা কি হয়েছে?’

‘একসেলেন্সি, বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসি নিজেই বলেছেন, এটা অবিলম্বে হওয়া দরকার।’ বলল জেনারেল মোস্তফা।

‘মোতায়েন হয়েছে কিনা?’ জিজ্ঞাসা প্রেসিডেন্টের।

‘প্রয়োজনীয় লোকেশনের ম্যাপ মনে হয় পৌঁছে গেছে, একসেলেন্সি। আমি এখনি একবার খোঁজ নেব।’

‘ধন্যবাদ, খোঁজ নিন। আমরা এখন তাহলে উঠতে পারি। মি. খালেদ খাকান, আপনি একটু বসলে বাধিত হবো।’ বললেন প্রেসিডেন্ট।

‘অবশ্যই বসব, মি. প্রেসিডেন্ট।’ বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা ছাড়া অন্য সবাই উঠে দাঁড়াল। প্রেসিডেন্টও উঠে চলে গেছেন তার পেছনের দরজা দিয়ে।

সবাই আহমদ মুসার সাথে হ্যান্ডশেক করে বিদায় নিল।

সবাই চলে যেতেই একজন অফিসার ঘরে ঢুকল। বলল, ‘আপনি আসুন স্যার, মহামান্য প্রেসিডেন্ট আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।’

অফিসারটির সাথে লিফট দিয়ে উঠে এলো আহমদ মুসা।

প্রাসাদের গ্রাউন্ড ফ্লোরে ওঠার পর ভিন্ন একটা লিফটে প্রাসাদের দু’তলায় গেল।

অফিসারটি এনে বসাল তাকে একটা ড্রইং রুমে। বলল, ‘ এটা মহামান্য প্রেসিডেন্টের প্রাইভেট ড্রইং রুম। এখানে তিনি তার ব্যক্তিগত মেহমানদের বসান।’

আহমদ মুসা বসল। তার আগে নজর বুলিয়ে দেখেছে, একেবারে বসফরাসের ওপরেই যেন ড্রইং রুমটি! নিচে উঁকি দিলে বসফরাসের পানিতে গিয়ে নজর পড়ে। অসম্ভব সুন্দর জায়গা! বসফরাসের বহু দূর দেখা যায় এখানে বসে। দেখা যায় রোমেলী দুর্গের চূড়াও।

অফিসারটি ড্রইং রুমের একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল।

প্রেসিডেন্ট ঢুকলেন ড্রইং রুমে। সংগে সংগেই অফিসারটি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

প্রেসিডেন্ট ড্রইংরুমে প্রবেশ করলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। সালাম দিয়ে হাত বাড়াল হ্যান্ডশেকের জন্য।

প্রেসিডেন্ট হ্যান্ডশেক করে জড়িয়ে ধরলেন আহমদ মুসাকে। বললেন, 'আপনাকে খালেদ খাকান বলে ডাকতে ভাল লাগে না, মি. আহমদ মুসা।'

বলে আহমদ মুসাকে নিয়ে সোফায় বসতে বসতে বললেন, 'এখন তো আমাদের নিজস্ব পরিমন্ডলে আপনি আহমদ মুসা হয়ে যেতে পারেন।'

'হ্যাঁ, যাদের কাছে পরিচয়টা গোপন করতে চেয়েছিলাম, সেই শত্রুরা আমার পরিচয় জানতে পেরেছে নিশ্চয়। সুতরাং বিষয়টা আর গোপন নেই। তবে নামটা গোপনই থাক, তুরস্কের কাজটা খালেদ খাকানই শেষ করুক।' বলল আহমদ মুসা। তার মুখে হাসি।

'আপনার এখানে কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো? ম্যাডাম বোর ফিল করছেন নাতো?' বলল প্রেসিডেন্ট।

'কোন অসুবিধে নেই। লতিফা আরবাকান খুব চৌকস মেয়ে। তিনি ম্যাডামকে নানাভাবে ব্যস্ত রেখেছেন। আর ইউর একসেলেন্সি, গোল্ড রিজর্টে থেকে কেউ বোর ফিল করে না।' আহমদ মুসা বলল।

'আলহামদুলিল্লাহ' বলে প্রেসিডেন্ট সোজা হয়ে বসলেন তার সোফায়। গম্ভীর হয়ে উঠেছে তার মুখ। বললেন, 'আমি সত্যিই খুব উদ্বিগ্ন, আহমদ মুসা! সোর্ড মোতায়েন হলে নিরাপত্তা সমস্যার একটা আশু সমাধান হবে! কিন্তু ওদের ভয়াবহ ষড়যন্ত্র নস্যাতের কি হবে? আপন কি ভাবছেন এ ব্যাপারে?'

‘আল্লাহ ভরসা, একসেলেন্সি। আমি অগ্রসর হবার একটা পথ পেয়েছি। সেদিন প্রধান বিচারপতিকে উদ্ধারের জন্যে যে বাড়িতে ঢুকেছিলাম, সেখান থেকে একটা ক্লু পেয়েছি। সেটা ধরেই সামনে এগোব। আমার মনে হয় আমি লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করুন। আমি ভেবে পাচ্ছিনা, তুরস্কের কারা এ ভয়ানক গবেষণার সাথে জড়িত!’

‘আমি যতটা জেনেছি ‘থ্রী জিরো’র সাথে এখানে জায়োনিস্ট একটা গ্রুপ জড়িত।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কিন্তু এর জন্যে তো ব্যাতিক্রমধর্মী প্রতিভার বিজ্ঞানী দরকার। ড. আন্দালুসির মত বিজ্ঞানী কি খুব বেশী তৈরি হয়?’ বললেন প্রেসিডেন্ট।

আহমদ মুসার মনে পড়ল বিজ্ঞানী ড. আব্দুর রহমান আরিয়েহের কথা। তিনিও পার্টিকেল ফিজিক্সের বিজ্ঞানী। কিন্তু তিনিই সেই বিজ্ঞানী তা সে জানেনা। সুতরাং আহমদ মুসা সেদিকে গেল না। বলল, ‘নিশ্চয় ওদের কেউ আছে। ইনশাআল্লাহ সবই আমরা জানতে পারব।’

বেয়ারা নাস্তার ট্রলি নিয়ে প্রবেশ করল।

নাস্তার বিশাল আয়োজন দেখে আহমদ মুসা বলল, ‘দেখছি ডিনারের কাজ হয়ে যাবে!’

‘ডিনার পর্যন্ত তো আপনাকে রাখা যাবে না, থাকবেন না। সেই কবে আসার পর মাত্র ১ দিনের জন্য মেহমানদারির সুযোগ পেয়েছিলাম। তারপর আপনাদের আর পাইনি। অনেক ঝড়-ঝাপটা আপনার উপর দিয়ে গেল। সৌভাগ্যবশত আজ আমার বাড়িতে আপনাকে পেলাম। ছাড়ি কি করে?’

‘ধন্যবাদ, মি. প্রেসিডেন্ট। আসুন, দেরি করে লাভ নেই।’

প্রেসিডেন্ট এগিয়ে এসে বললেন, এ সময় এত সব খাবার বয়স আমার নেই। আমি কফি খেয়ে আপনাকে সঙ্গ দেব। আপনি শুরু করুন।

‘ধন্যবাদ, মি. প্রেসিডেন্ট’ বলে আহমদ মুসা নাস্তা খাবার জন্যে কাঁটা চামচ হাতে নিতেই কাঁটা চামচের ব্রান্ড নামের উপর আহমদ মুসার চোখ আটকে

গেল। পড়ল, 'আরিয়েহ স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ।' কিছুটা বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠল আহমদ মুসার চোখে মুখে!

নাস্তা খাওয়া শুরু করে আহমদ মুসা বলল, 'মি. প্রেসিডেন্ট, আপনাদের কাঁটা চামচ কি আপনাদের দেশীয় কোম্পানীর?'

'হ্যাঁ, মি. আহমদ মুসা। কোম্পানী আমাদের দেশীয়। সুন্দর নয় জিনিসগুলো? এ কোম্পানীর এই প্রোডাক্টগুলো বিদেশেও খুব পপুলার।'

'কোম্পানীটা কি প্রাইভেট?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'হ্যাঁ, প্রাইভেট।' প্রেসিডেন্ট বলল।

'স্যরি, মালিক কে বা কারা কোম্পানিটির?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

হাসল প্রেসিডেন্ট। বলল, 'মালিক বা মালিকদের নাম আমি জানিনা। তবে বিরাট পুঁজিওয়ালা কোম্পানি ওটা। উত্তর ইস্তাম্বুলে বসফরাসের তীরে পাহাড় অঞ্চলে বিশাল এলাকা নিয়েছে ওদের গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রির জন্যে। কিন্তু কোম্পানীর বিষয়টি আপনার এভাবে মাথায় ঢুকল কেন?'

কোম্পানীর নামের প্রথম শব্দ আহমদ মুসার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। 'আরিয়েহ' নামটা হিব্রু। তৌরাতের সৈনিকের আরিয়েহ! তুরস্কের একটি কোম্পানীর নামের আগে হিব্রু শব্দ কেন? এ জিজ্ঞাসা থেকেই আহমদ মুসার প্রশ্নগুলো। কিন্তু আহমদ মুসা এসব কোন কথা না তুলে বলল, 'আমাদের এশিয়ান প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে বিদেশী তৈজসপত্রই সব সময় দেখে আসছি। তুরস্কের প্রেসিডেন্টের খাবার টেবিলে দেশী কাঁটা চামচ দেখেই আমি কোম্পানী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। ধন্যবাদ আপনাকে, একসেলেন্সি।'

আরও কথাবার্তা হলো।

নাস্তা শেষ করে কফি খেয়ে বিদায় নিল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসাকে লিফট পর্যন্ত এগিয়ে বিদায় নেবার সময় প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন, 'মি. আহমদ মুসা, সব ব্যাপারে আপনার যে অনুসন্ধিৎসা, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। আমি এই কাঁটা চামচ ব্যাবহার করছি অনেক দিন। কিন্তু আমি খেয়ালই করিনি কাঁটা চামচ ঐ কোম্পানির। তবে কোম্পানি সম্পর্কে কোন এক অকেশনে আমি ঐ কথাগুলো জানতে পারি।'

‘আপনার প্রাসাদের এসব কেনাকাটা কার দায়িত্ব?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘ব্যবস্থাপনার একটা উইং আছে। তারাই এসব দেখে।’ প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন।

উইংটির হেড কে জানতে ইচ্ছা হয়েছিল আহমদ মুসার। কিন্তু প্রশ্নটাকে সৌজন্যের খেলাফ মনে করে বিদায় নিয়ে চলে এসেছিল।

# ৪

পাম গার্ডেনের প্রাচীর টপকানোর পর প্রতি মুহুর্তে বিপদের আশংকা নিয়ে এক পা দু'পা করে আহমদ মুসা যখন পাম গার্ডেনের মূল বিল্ডিং-এর দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল,তখন দূরে কৃষ্ণ সাগরের বুকে সোবহে সাদেকের সফেদ আলো ফুটে উঠেছে।

তার সাথে পাম গার্ডেন এলাকার গোটা অবয়বও স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

প্রাচীর ঘেরা বিশাল পাম গার্ডেন এলাকা। উত্তর ইস্তাম্বুলের বসফরাসের পশ্চিমে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে জেকেরিয়ার উত্তর-পূর্বে বিশাল এলাকা নিয়ে এই পাম গার্ডেন এলাকা। গোটা এলাকাই উঁচু প্রাচীরে ঘেরা।

আহমদ মুসার চাহিদা অনুসারে জেনারেল মোস্তফার নির্দেশে মধ্যরাত থেকে নিরাপত্তা রক্ষীরা পাম গার্ডেন এলাকা ঘিরে রেখেছে। জেনারেল মোস্তফাও একটু দূরে দাঁড়িয়ে আহমদ মুসার সংকেতের অপেক্ষা করছে।

ঠিক হয়েছে আহমদ মুসা গোপনে একাই ভেতরে প্রবেশ করবে। ভেতরটা অনুসন্ধানের পর করণীয় সম্পর্কে আহমদ মুসা জানানোর পর বাইরের নিরাপত্তা বাহিনী মুভ করবে।

আহমদ মুসা দেয়ালের গোঁড়ায় দাঁড়িয়ে ওপর দিকে তাকাল। দেয়ালটা ৪ তলার উঁচু পর্যন্ত উঠে গেছে। দেয়াল ডিঙাতে তাকে চারতলা উঁচু পর্যন্ত উঠতে হবে।

পেছন দিকে দরজা আছে কিনা তা দেখার জন্যে আহমদ মুসা দেয়ালের গোঁড়া ধরে হাঁটতে লাগল।

গোটা পেছনটা ঘুরল আহমদ মুসা। কিন্তু সলিড ওয়াল ছাড়া আর কিছুই পেলনা। একতলা পরিমান উঁচুতে কোন জানালা পর্যন্ত নেই। দেয়ালের স্ট্রাকচার অনেকটা গোডাউন বা জেলখানার মত।

দেয়ালের গোঁড়ায় দাঁড়িয়ে হতাশ ভাবে চারদিকে তাকাল আহমদ মুসা। ভোরের সফেদ আলো নেমে আসলেও তখনও অন্ধকার কাটেনি। তবে বিল্ডিং-এর স্ট্রাকচারগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই আলো-আঁধারের মধ্যে আহমদ মুসার প্রাচীরের ভেতরে কম্পাউন্ডে সিনাগগের স্ট্রাকচার নজরে পড়ল। ভাল করে দেখল সিনাগগই, কিন্তু এত ছোট!

কৌতূহলবশতই সেদিকে এগুলো আহমদ মুসা।

ডিজাইনের দিক দিয়ে বিল্ডিংটি নিখুঁত এক সিনাগগ, এমনকি দরজা, জানালার কারুকাজ পর্যন্ত সিনাগগের।

কিন্তু এত বড় কমপ্লেক্সের মধ্যে এত ছোট সিনাগগ কেন?

দরজার দিকে আরেকটু এগোলো আহমদ মুসা।

দরজার ওপরের মাথায় চৌকাঠে মাকড়সার জাল দেখে বিস্মিত হল আহমদ মুসা। এত সুন্দর করে সিনাগগ তৈরি হয়েছে তার ব্যবহার হবে না কেন?

দরজার আরও ঘনিষ্ঠ হলো আহমদ মুসা।

দরজার মুখোমুখি হতেই দরজার সুশৃঙ্খল ডিজাইনের মধ্যে অসম একটা আঁকাজোঁকার ওপর আহমদ মুসার নজর আটকে গেল। ডিজাইনগুলোর সবই দরজার রংয়ে দরজার ওপর খোদাই করা। সুশৃঙ্খল ডিজাইনের ওপর বিশৃঙ্খল আঁকাজোঁকা সহজেই আহমদ মুসার নজরে পড়ে গিয়েছিল।

আঁকাজোঁকার ওপর নজর স্থির হতেই আহমদ মুসা দেখল ওগুলো অর্থহীন নয় আঁকাজোঁকা নয়। ওগুলো হিব্রু অক্ষর।

হিব্রু অক্ষর দেখে আগ্রহ বাড়ল আহমদ মুসার। অক্ষরগুলো মিলিয়ে আহমদ মুসা পড়ল শব্দটি ইলিরাজ (Eliraz)। হিব্রু 'ইলিরাজ' শব্দের অর্থ 'মাই গড ইজ মাই সিক্রেট' (আমার ঈশ্বর আমার গোপনীয়তা)।

আহমদ মুসার মনে পড়ল, ইহুদীরা এই কথাকে তাদের গোপনীয়তার শপথ কিংবা গোপনীয়তা রক্ষার দোয়া হিসেবে ব্যবহার করে। কিন্তু আহমদ মুসা বুঝতে পারল না, এই কথাটি এখানে এই দরজার উপর লেখা কেন? আহমদ মুসা জানে এই পাম গার্ডেনে গোপনীয়তার কিছু অবশ্যই আছে। কিন্তু গোপনীয়তা রক্ষার দোয়াটা এই দরজায় কেন? তাহলে কি এখানে গোপনীয়তার কিছু আছে?

আহমদ মুসার মন খুশি হয়ে উঠল। প্রশ্ন এলো মনে, এই ছোট্ট স্থাপনার সিনাগগের ডিজাইন কি কোন ক্যামোফ্লেজ?

ভেতরে ঢোকার জন্যে দরজা ঠেলল আহমদ মুসা।

খুলে গেল দরজা।

আহমদ মুসা ভেতরে ঢুকে পকেট থেকে পেন্সিল টর্চটা বের করে জ্বালাল।

ঘরের চারদিক দেখল।

ঘরটি প্রার্থনার ঘরের মতো করেই সাজানো। ঘরের পশ্চিম দিকে একটা বেদি। বেদির ওপর একটা ডেস্ক।

আহমদ মুসা উঠে গেল বেদির ওপর। দেখল বুক সমান উঁচু ডেস্কটি একটা বাক্স বা আলমারির মতো। বাক্স বা আলমারির দু'টি পাল্লা এলুমিনিয়াম প্যানেলের ওপর দাঁড়ানো।

ডেস্কটি দেখলেই মনে হবে উঁচু চেয়ারে বসে ডেস্কে বই, ফাইল ইত্যাদি রাখা হয়। আর অনুষ্ঠানের জিনিসপত্র, কাগজপত্র রাখা হয় ডেস্কের আলমারিতে।

কোন কাগজপত্র কি আছে ডেস্কের আলমারিতে? তাতে গোপনীয় বা প্রয়োজনীয় কিছু থাকতে পারে?

আহমদ মুসা আলমারিটি খোলার জন্যে এলুমিনিয়াম প্যানেলের উপর দাঁড়ানো দু'টি পাল্লা দু'দিকে ঠেলে দিল।

খোলা জায়গা দিয়ে সামনে তাকাতেই বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল আহমদ মুসার মুখ। দেখল কংক্রিটের একটা সরু সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে।

বিস্ময়-বিমুগ্ধ আহমদ মুসা আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করল। সে ভাবল, নিশ্চয় এই সিঁড়ি পাম গার্ডেন থেকে বেরুবার একটা গোপন এক্সিট পয়েন্ট। তার মানে এই সিঁড়ি দিয়ে পাম গার্ডেনে প্রবেশ করা যাবে।

পকেট থেকে আহমদ মুসা মেশিন রিভলবারটা বের করে হাতে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামা শুরু করল।

আহমদ মুসার বাম হাতে টর্চ এবং ডান হাতে উদ্যত রিভলবার।

সিঁড়িটি মোটামুটি প্রশস্ত, একটা লম্বা ঘরে গিয়ে শেষ হলো।

ঘরটিতে একটা খাটিয়া, পানির পাত্র, ইত্যাদিসহ টুকিটাকি জিনিস রয়েছে। দেখলেই মনে হবে মিনি সিনাগগটির এটা একটা রেস্ট রুম অথবা মালখানা এবং এটা এখানেই শেষ।

কিন্তু আহমদ মুসা এটা মানতে পারল না। নিশ্চয় এখানে একটা গোপন পথ পাওয়া যাবে পাম গার্ডেনের ভেতরে ঢোকার।

আহমদ মুসা ঘরের চারদিকটা ঘুরল। মেঝে, দেয়াল সবটাই সলিড।

খাটিয়াটি ঘরের কোণায়। দেয়াল সেঁটে পাতা আছে।

খাটিয়ার উপর হালকা বেড।

খাটিয়ার নিচটা দেখার জন্যে আহমদ মুসা খাটিয়ার লম্বা লম্বি প্রান্ত ধরে ওপরে তুলল।

খাটিয়ার মাথা তিন-সাড়ে তিন ফুটের মতো ওপরে ওঠাতেই খাটিয়াটি আকস্মাৎ হাত থেকে ছুটে গিয়ে দেয়ালের গায়ে সেঁটে গেল এবং নিচের মেঝেটা চোখের পলকে দেয়ালে ঢুকে গেল। আর তার সঙ্গেই একটা সিঁড়িপথ উন্মুক্ত হয়ে গেল।

আল্লাহর এই সাহায্যের জন্যে তার শুকরিয়া আদায় করে আহমদ মুসা এক হাতে টর্চ অন্য হাতে রিভলবার নিয়ে নামতে শুরু করল। বিশ-বাইশ স্টেপের একটা দীর্ঘ সিঁড়ি।

সিঁড়িটা এবার নেমে এলো বিশাল ফুটবল খেলার মাঠের মতো একটা হলঘরে। মেরিল দুর্গের নিচে আইআরটি'র টেস্ট গ্রাউন্ডের মতোই এটা বিশাল।

বিশাল ক্ষেত্রটির চারদিকে চাইতে গিয়ে একে পরিত্যক্ত মনে হলো। বিশাল ক্ষেত্র জুড়ে মেঝের এখানে-সেখানে ইস্পাত ও কংক্রিটের স্থাপনা। ভাঙাচোরা। দেখেই মনে হচ্ছে, তাড়াহুড়ো করে ভেঙেচুরে কেউ যেন এগুলো থেকে কিছু খুলে নিয়ে গেছে!

এদিক-ওদিক ঘুরে-ফিরে দেখতে গিয়ে মেঝেতে পড়ে থাকা অবস্থায় সরু লম্বা প্লাস্টিকের একটা সাইনবোর্ড পেল। সাইনবোর্ডটি হিব্রু ভাষায়। হিব্রু ভাষা দেখে সাইন বোর্ড হাতে তুলে নিল আহমদ মুসা। পড়ল 'ফোটন সাইলেন্ট ডেস্ট্রাকশন ডেমন' (FSDD) টেস্ট কাউন্ট ডাউন।

সাইন বোর্ডের নামে বিস্ময়-বিস্ফারিত হল আহমদ মুসার চোখ। ওদের ফোটন মারনাস্ত্রটি কি এই 'ফোটন সাইলেন্ট ডেস্ট্রাকশন ডেমন' (FSDD)? এখানেই কি তার টেস্ট হতো? ল্যাবরেটরি তাহলে কি ওপরে? কিন্তু (FSDD) এখানে কেন? কোথায় গেল ওসব? ওরা কেউ কি এখানে নেই তাহলে? ওপরটা দেখতে হবে। ছুটল আহমদ মুসা ওপরে ওঠার জন্যে সিঁড়ির খোঁজে।

সিঁড়ি পেল না, কিন্তু বিশাল লিফট পেয়ে গেল।

লিফটে উঠে ওপরে চলে এলো আহমদ মুসা।

ওপরে উঠেই আহমদ মুসার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, এ বাড়িতে কেউ নেই।

আহমদ মুসা টেলিফোন করল জেনারেল মোস্তফার কাছে। বলল, 'আমরা ঠিক ঠিকানায় এসেছি। কিন্তু ইতোমধ্যেই চিড়িয়া উড়ে গেছে। আপনি চলে আসুন এবং দয়া করে আইআরটি'র বিজ্ঞানী ড. ইবনুল আব্বাসকে এখানে আসতে বলুন। সব কিছুই তারা নিয়ে গেছে, কিন্তু যা পড়ে আছে তা থেকে ওদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যাবে বলে আমি মনে করি।'

'ঠিক আছে মি. খালেদ খাকান। আমি বিজ্ঞানী ড. ইবনুল আব্বাসকে এখনি আসতে বলছি। আর আমি আসছি।' বলল জেনারেল মোস্তফা টেলিফোনের ওপার থেকে।

জেনারেল মোস্তফা এলে আহমদ মুসা বলল, 'বিজ্ঞানী ইবনুল আব্বাস আসলে এক সাথে সব দেখা যাবে! আসুন, আমি যা দেখেছি সে বিষয়ে আপনার সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় করি।'

গল্প চলল তাদের দু'জনের মধ্যে।

আধা ঘণ্টার মধ্যে বিজ্ঞানী ড. ইবনুল আব্বাস এসে পৌঁছলেন।

আহমদ মুসা টাকে স্বাগত জানিয়ে বলল, 'আপনার জন্যে আমরা অপেক্ষা করছি। 'থ্রী জিরো'র এটা একটা ঘাঁটি। ওদের যে ফোটন মারনাস্ত্রের কথা আমরা জানি, তার গবেষণা, পরীক্ষা ইত্যাদি বোধ হয় এখানেই হয়েছে। এ বিষয় সুস্পষ্ট ধারনা নেয়ার জন্যে আমরা আপনাকে কষ্ট দিয়েছি। আপনি এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করলে বাধিত হবো।'

'অবশ্যই, চলুন দেখি।' বলল বিজ্ঞানী ড. ইবনুল আব্বাস।

পাম গার্ডেনের মূল বিল্ডিংটি তিনতলা। তিনতলাটা বসবাসের জন্যে। দু'তলায় ল্যাবরেটরি। গ্রাউন্ড ফ্লোরটা স্টোর। আণ্ডারগ্রাউন্ড দুই ফ্লোরের ওপরের তলাটি হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং শপ। আর তার নিচের ফ্লোরটি টেস্ট গ্রাউন্ড।

বিজ্ঞানী ড. ইবনুল আব্বাস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখল। সময়ের জ্ঞান তার ছিল না। যেন নেশার ঘোর তাকে পেয়ে বসেছিল! সর্বশেষে 'ফোটন সাইলেন্ট ডেস্ট্রাকশন ডেমন'-এর সাইন বোর্ড নিয়ে বিজ্ঞানী ইবনুল আব্বাস টেস্ট গ্রাউন্ডের মাটিতেই বসে পড়ল। সাইন বোর্ডটির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে স্বগত কণ্ঠে বলল, 'এ যে দেখছি মানবের সাথে দানবের লড়াই!' আমাদের অস্ত্রের নাম 'saviour of world rational demon' (বিশ্বের মানব সম্প্রদায়ের রক্ষক) আর ওদেরটা হলো 'foton sailent destrauction demon' (নিরব ধবংসের ফোটন-দানব)। আমাদেরটা মানুষের শান্তি-স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে, আর ওদেরটা ধংসের তাণ্ডব চালিয়ে মানুষকে দাস বানানোর জন্যে।'

শান্ত কণ্ঠে এই স্বগোতক্তি করার পর বিজ্ঞানী ড. ইবনুল আব্বাস মুখ তুলে আহমদ মুসার দিকে ফিরে বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন, এখানেই ফোটন মারনাস্ত্র যার নাম 'ফোটন সাইলেন্ট ডেস্ট্রাকশন ডেমন'-এর গবেষণা, নির্মাণ, টেস্ট ও ব্যবহারের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। তবে ফোটন অস্ত্র ও এর মূল বাহক যন্ত্র এখানে তৈরি হলেও কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ পার্টস ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে এসেছে। ট্রাস কর্নারে জমা কার্টুনগুলো থেকে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। যেসব স্পেয়ার পার্টসের স্পেসিফেকিশনে ওদের ফোটন মারনাস্ত্র, অবয়ব, প্রকার ও শক্তিরও আঁচ করা যাবে। তবে এ ব্যাপারে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োজন।'

থামলেন বিজ্ঞানী ড. ইবনুল আব্বাস।

'আপনি আনন্দের কথা শোনালেন। যদি ওদের মারনাস্ত্রের আকৃতি, প্রকৃতি ও শক্তি সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়, তাহলে সেটা হবে আমাদের জন্য বিরাট লাভের। আপনি তাদের সে অস্ত্র এখান থেকেই ব্যবহৃত হয়েছে বললেন। কিন্তু সে রকম সাইলো-টাইলো তো এখানে নেই।' বলল আহমদ মুসা।

'ফোটন অস্ত্রের জন্যে সাইলোর দরকার হয় না। এর জন্যে বিরাট বপুর ভারী ক্ষেপণাস্ত্রেরও দরকার হয় না। জটিল ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবস্থাপনায় বিশেষ ধাতব-পরমাণুকে আলোতে রূপান্তরিত করা হয়। সে আলোর ঘনীভুত আঁধারে স্থাপন করা হয় অকল্পনীয় মাত্রার এ্যাকটিভেটেড ও কমপ্রেসড ফোটন পারটিকেলস। তারপর একে পরিচালিত করা হয় লক্ষ্যের দিকে। এর গতি আলোর গতির মত হয় না। গতি নিয়ন্ত্রিত করা যায় বলে এটা মিনিটে গোটা পৃথিবী একবার ঘুরে আসতে পারে, আবার মিনিটে এক মাইল দুরেও পাঠানো যায়।' বলল বিজ্ঞানী ড. ইবনুল আব্বাস।

'যা বললেন, সেটা ওদের ফোটন মারনাস্ত্রের ফাংশন। ওদের এ অস্ত্র অফেনসিভ। কিন্তু আমাদের ডিফেনসিভ অস্ত্র 'সোর্ড'-এর ফাংশন কেমন?' বলল আহমদ মুসা।

'ওদের, 'সাইলেন্ট ডেস্ট্রাকশন ডেমন' (নিরব ধ্বংস দানব) ও আমাদের 'সেভিয়ার অব ওয়ার্ল্ড র‍্যাশনাল ডোমেইন' (বিশ্ব মানবতার রক্ষক) অস্ত্রের মূল কনসেপ্ট একই। উভয়েই ফোটন পারটিকেলস থেকে তৈরি। উভয়ের ধ্বংস ক্ষমতার চরিত্রও একই রকম। তবে দুই অস্ত্রের প্রয়োগ সম্পূর্ণ ভিন্ন। ওদেরটা সবার শক্তিকে ধ্বংস করে সবাইকে দাস বানানোর লক্ষ্যে সৃষ্টি। আর আমাদেরটা মাত্র আক্রমন করতে আসা অস্ত্রকে ধ্বংস করে পৃথিবীর সব মানুষকে রক্ষার লক্ষ্যে তৈরি। নির্মাণ কৌশলের দিক দিয়েও দুই অস্ত্রের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। ফোটন পারটিকেলসকে ধ্বংসাত্মক আক্রমনের অস্ত্র হিসেবে তৈরি করা সহজ। ওরা সেটাই করেছে। কিন্তু আমরা ফোটন পার্টিকেলসকে আক্রমণকারী সব অস্ত্রকে ধ্বংস করার আত্মরক্ষামূলক অস্ত্র হিসেবে ডেভেলপ করেছি। এটা অত্যন্ত কঠিন কাজ। আক্রমণকারী অস্ত্র আক্রমনে ছুটে এলে তাকে আকাশেই বন্দী করে দূর আকাশে নিয়ে গিয়ে ধ্বংস করা হবে যাতে পৃথিবীর কোন ক্ষতি না হয়। এটা অত্যন্ত জটিল এক টেকনোলজিক্যাল উদ্ভাবনির মধ্যমে তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।'

'আল্লাহর রহমতে আমরা গর্ব করতে পারি, দুনিয়াতে এটা আমাদের অদ্বিতীয় এক উদ্ভাবন। দুনিয়ার আর কারও বিজ্ঞান এর ধারে কাছেও যেতে

পারেনি। এজন্যে আমাদের সোর্ড'কে বাগিয়ে নেয়া, এর সূত্র ও নির্মাণ কৌশলকে হাত করার জন্যে ওরা মরিয়া হয়ে উঠেছে।'

দীর্ঘ বক্তব্য দিল বিজ্ঞানী ড. ইবনুল আব্বাস আব্দুল্লাহ।

'আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ আমাদের দুনিয়ার মানুষকে রক্ষার জন্য এ ধরনের অস্ত্র উদ্ভাবনের তৌফিক দিয়েছেন। এর দ্বারা আবার প্রমানিত হলো, আমরা দুনিয়ার সব মানুষ, আল্লাহর সব বান্দাহর স্বার্থ ও শান্তির পক্ষে। আমাদের হাতে বিজ্ঞান ফিরে আসা মাত্র আমরা তাকে ধ্বংস নয়, মানুষের কল্যাণ ও তাদের রক্ষার কাজে লাগিয়েছি।' বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা থামতেই জেনারেল মোস্তফা বলে উঠল, 'ধন্যবাদ, ড. ইবনুল আব্বাস, ধন্যবাদ মি. খালেদ খাকান। এখন আপনারা একটা পরামর্শ দিন, এই পাম গার্ডেনকে কি আমরা এভাবেই রেখে যাব, না একে আমাদের তত্বাবধানে নেয়া দরকার।'

'না, না এটাকে ফেলে রাখা বা অরক্ষিত রাখা যাবে না। এখানে এমন কিছু তথ্য-উপাত্ত এখনও আছে, যা খুবই মূল্যবান। আমি মনে করি, পাম গার্ডেনকে আইআরটির তত্বাবধানে দেয়া উচিত।' দ্রুত কণ্ঠে জোর দিয়ে বলল ড. ইবনুল আব্বাস।

'ঠিক আছে। আমরা পাম গার্ডেনকে আপাতত তালাবদ্ধ করে এর চারদিকে পাহারা বসিয়ে রাখছি। তারপর সরকার আপনাদের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।' জেনারেল মোস্তফা বলল।

'ঠিক আছে তাহলে আপনি এটাই করুন। আমরা গাড়িতে গিয়ে বসছি, আপনি আসুন।' বলল আহমদ মুসা।

'ঠিক আছে। ধন্যবাদ।' জেনারেল মোস্তফা বলল।

আহমদ মুসা ও বিজ্ঞানী ড. ইবনুল আব্বাস পাম গার্ডেন থেকে বেরিয়ে গাড়ির দিকে এগোলো।

আহমদ মুসারা গিয়ে গাড়িতে বসার কয়েক মিনিটের মধ্যেই জেনারেল মোস্তফা চলে এলো।

জেনারেল মোস্তফা বসেই বলল, 'মি. খালেদ খাকান, আমরা যাচ্ছি এখন প্রধানমন্ত্রীর অফিসে। বিষয়টা তাকে ব্রিফ করা দরকার।'

আহমদ মুসা তখন ভাবছিল অন্য বিষয়। জেনারেল মোস্তফার কথায় এদিকে মনোযোগ দিয়ে বলল, 'জেনারেল মোস্তফা, আপনারা যান। আমাকে একটা জরুরি কাজে যেতে হবে কয়েক জায়গায়।'

জেনারেল মোস্তফা একটু ভাবল। বলল, 'সেটা নিশ্চয়, আমি মনে করি, এর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক আছে মি. খালেদ খাকান। উইস ইউ গুড লাক!'

'ধন্যবাদ জেনারেল মোস্তফা' বলে আহমদ মুসা গাড়িতে স্টার্ট দিল।

বসফরাস কলেজ অব টেকনোলজির কার পার্কিং-এ গাড়ি পার্ক করে কলেজ ক্যাফেটেরিয়াটা খুঁজে নিল আহমদ মুসা।

ঢুকল ক্যাফেটেরিয়ায়।

বেশ বড় ক্যাফেটেরিয়া।

ঘড়িতে দেখল বিকেল ৬টা বাজতে কিছু বাকি।

ক্যাফেটেরিয়াটি গমগমে নয়। তবে প্রায় টেবিলেই একজন দু'জন করে বসে আছে।

একটা খালি টেবিল বেছে নিয়ে বসল গিয়ে তাতে আহমদ মুসা।

হান্নাহ হাগেরার জন্যে এখন অপেক্ষা।

টেলিফোনে কথা হয়েছে আধা ঘণ্টা আগে। তিনটায় তার ক্লাস শেষ হবার পর সে হোস্টেলে ফিরেছে। সে বলেছে ছ'টায় সে ক্যাফেটেরিয়াতে থাকবে।

গোটা ক্যাফেটেরিয়ার ওপর একবার চোখ বুলাল আহমদ মুসা। না, হান্নাহ হাগেরা আসেনি এখনও।

চোখ ঘুরিয়ে নিতেই দরজায় চোখ পড়ল আহমদ মুসার। চোখ পড়ল হান্নাহ হাগেরার দিকে। সে দরজায় দাঁড়িয়ে ভেতরে চোখ বুলাচ্ছে।

সেও দেখতে পেয়েছে আহমদ মুসাকে।

হাত তুলে আঙুল নাচিয়ে আহমদ মুসাকে স্বাগত জানিয়ে চলে এলো আহমদ মুসার কাছে।

আহমদ মুসা একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, 'ধন্যবাদ, তুমি ঠিক ছয়টাতেই ক্যাফেটেরিয়াতে এসেছ হান্নাহ।'

'এ কৃতিত্ব আমার নয়, সময়টা যাকে দিয়েছিলাম তার। এক মিনিট দেরি করার সাহস আমার হয়নি।' বলল হান্নাহ হাগেরা।

'বুঝলাম না, আমি ভীতির বিষয় হলাম কেমন করে?' আহমদ মসা বলল। তার কণ্ঠে বিস্ময়!

হাসল হান্নাহ হাগেরা। বলল, 'শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসা থেকে ভয় ও সতর্কতা আসে।'

'তা আসতে পারে। তুমি কেমন আছ? তোমার আব্বা কেমন আছেন?' বলল আহমদ মুসা।

'জিজ্ঞেস করলেন না, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পাত্র আপনি হলেন কি করে?' আহমদ মুসার কথায় কান না দিয়ে বলল হান্নাহ হাগেরা।

'আমাদের সমাজে ছোটরা বড়দের শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা দেয়া স্বাভাবিক নিয়ম।' বলল আহমদ মুসা।

হান্নাহ হাগেরার ভারী মুখেই হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'আপনাকে ফাঁদে ফেলে কার সাধ্য! সব পথই আপনার জানা। ধন্যবাদ। এখন বলুন, কি জন্যে আমাকে তলব করেছেন?'

'তলব করিনি। একটা সাহায্য চাইতে এসেছি।' আহমদ মুসা বলল।

'সাহায্য? আমার কাছে? তাও আবার আপনি?' বলল হান্নাহ হাগেরা। তার মুখে বিস্ময়!

একটু থেমে মুখে হাসি টেনে বলল, 'কি সাহায্য করে সৌভাগ্যবতী হতে পারি বলুন?'

'ডেভিড ইয়াহুদরা বিধ্বংসী যে মারনাস্ত্র তৈরি করেছে বলে তোমরা বলেছিলে, সে সম্পর্কে কি তোমরা আর কিছু জেনেছ?' আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

বিস্ময়ের রেখা ফুটে উঠল হান্নাহ হাগেরার চোখে-মুখে। বলল, 'না, এ ব্যাপার নিয়ে তো আর আমরা চিন্তা করিনি। কেন এ কথা জিজ্ঞেস করছেন?'

'জানো তো ডেভিড ইয়াহুদরা আমাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করছে। তাদের হাতের ভয়ানক অস্ত্র আমাদেরই তো আতংকের বিষয়! খোঁজ-খবর তো আমাদের নিতেই হবে। সে কারণেই এ ব্যাপারে আমাদের খোঁজ-খবর নিতে হচ্ছে।' আহমদ মুসা বলল।

'কিন্তু আমরা তো আর ঐ ব্যাপারে খোঁজ নিইনি।' হান্নাহ হাগেরা বলল।

'ডেভিড ইয়াহুদ বিজ্ঞানী নন আমরা জানি। তার পক্ষে কে এই গবেষণা কাজ করছে বলতে পার তোমরা?' আহমদ মুসা বলল। আহমদ মুসার দৃষ্টি হান্নাহ হাগেরার ওপর স্থির নিবদ্ধ।

হান্নাহও আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে।

হান্নাহ হাগেরা বলতে চাইল যে, বিষয়টার অত দূর আমরা জানি না। কিন্তু আহমদ মুসার চোখের সামনে মিথ্যা কথাটা গলা পর্যন্ত এসেও আটকে গেল। তার মনে হল আহমদ মুসার মিষ্টি, অথচ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি তার অন্তরের কথাগুলো যেন সব পড়তে পারছে!

কোন কথাই বলল না হান্নাহ হাগেরা।

আহমদ মুসাই আবার মুখ খুলল। বলল, 'প্লিজ হান্নাহ, কারও ক্ষতি আমরা করতে চাই না। আমরা চাই, ঐ ভয়ংকর ধ্বংসাত্মক অস্ত্র শুধু নয়, কোটি মানুষকে বাঁচাতে চাই সন্ত্রাসীদের দাসত্বের হাত থেকে। প্লিজ আমাদের সাহায্য কর।'

হান্নাহ হাগেরার মনে পড়ল তার পিতার কাছ থেকে শোনা কথা, ডেভিড ইয়াহুদরা দুনিয়ার সবার অস্ত্র ধ্বংস করে দুনিয়ার সবাইকে পদানত করতে চায়। খালেদ খাকান তো চাইছে তাদেরই বাঁচাতে। এমন ভয়ংকর অস্ত্র তৈরি করছে যে বিজ্ঞানী আব্দুর রহমান আরিয়েহ সন্ত্রাসীদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে, সেই বিজ্ঞানীর নিরাপত্তা তার কাছে বড় হবে কেন? তার নাম গোপন করে অবশ্যই ঠিক করেননি তার আব্বা।

সোফায় হেলান দিয়ে সোজা হয়ে বসল হান্নাহ হাগেরা। বলল, 'আমি যতটা জানি, সেই বিজ্ঞানীর নাম আব্দুর রহমান আরিয়েহ। তিনি...।'

'তিনি পার্টিকেল সাইন্সের একজন রিটায়ার্ড প্রফেসর।' বলল আহমদ মুসা।

'তাহলে আপনি জানেন তাকে?' হান্নাহ হাগেরা বলল।

'এটুকুই। তিনি কোথায় থাকেন?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'স্যরি। আমার দৌড় নাম জানা পর্যন্তই। আর আমার সাথে তার পরিচয় সিনাগগে। আব্বাও তিনি কোথায় থাকেন জানেন না। তবে আমার ধারণা বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানতে পারেন।' বলল হান্নাহ হাগেরা।

হান্নাহ'র শেষের কথাগুলো আহমদ মুসার কাছে পৌঁছেনি। সে তখন ভাবছিল অন্য কথা। আসলেই তার ঠিকানা এদের কারও জানার কথা নয়। ঐ ধরনের ভয়ংকর অস্ত্র যিনি তৈরি করেন, যেখানে বসে তৈরি করেন, তার অবস্থান হান্নাহ ও ডেভিড হারজেলের মতো কিছুটা বাইরের লোকদের জানানো হবে তা স্বাভাবিক নয়। তাছাড়া পাম গার্ডেনই যদি ড. আব্দুর রহমান আরিয়েহর কর্মস্থল-আবাসস্থল হয়ে থাকে, তাহলে তো তিনি সেখানে এখন নেই।

ভাবনার মধ্যে কিছুটা আনমনা হয়ে পড়েছিল। হান্নাহ হাগেরার কথার জবাব দেয়া হয়নি।

হান্নাহই কথা বলল আবার, 'কি ভাবছেন?'

'ভাবছি বিজ্ঞানী আব্দুর রহমান আরিয়েহর কথা। কি করে জানব সে কি করছে, কতোটা এগিয়েছে! তবু খুশি হলাম হান্নাহ যে, তোমার কাছে তার নামটি জানা গেল। বলতে পার, বিজ্ঞানী আব্দুর রহমান কোন্ সিনাগগের সদস্য ছিলেন?' বলল আহমদ মুসা।

'স্যরি! আমি জানিনা। ঠিক আছে আমি আব্বাকে জিজ্ঞেস করছি।' বলেই হান্নাহ হাগেরা তার মোবাইলে একটা কল করল।

কথা শুরুর আগেই আহমদ মুসা দ্রুত তাকে বলল, 'তুমি একটু জিজ্ঞেস করবে, সেখানে সদস্যদের রেজিস্টার রাখা হয় কিনা কিংবা যারা আসে সবার রেজিস্ট্রেশন হয় কিনা।'

‘ধন্যবাদ’ বলে মোবাইল কলের দিকে মনোযোগ দিল।

কথা বলল সে তার আব্বার সাথে। সে কোন্ সিনাগগের সদস্য, সিনাগগে রেজিস্টার আছে কিনা, নাম রেজিস্ট্রি করতে হয় কিনা ইত্যাদি সব কথাই সে জিজ্ঞেস করল।

কথা শেষ করে, কল অফ করে সিনাগগটির নাম উল্লেখ করে বলল, ‘আব্বার সাথে আব্দুর রহমান আরিয়েহর এই সিনাগগে দেখা হতো। আব্বা বললেন, সিনাগগে কোন রেজিস্টার রাখা হয়না। রেজিস্টার সিনাগগ কাউন্সিলে। সিনাগগ কাউন্সিলই সদস্যদের পছন্দ অনুসারে সিনাগগ বরাদ্দ করেন।’

‘ধন্যবাদ। তোমাকে কষ্ট দিলাম।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ধন্যবাদ দিয়ে উঠতে চাচ্ছেন তা হবে না। আমাদের কেন্টিনের বিকালের নাস্তা খুব ভাল।’ বলল হান্নাহ হাগেরা।

‘নাস্তায় আপত্তি নেই। এর জন্যে ধন্যবাদ পাবেন।’ আহমদ মুসা বলল।

হান্নাহ হাগেরা হেসে উঠল। বলল, ‘ধন্যবাদ সবচেয়ে সহজ ও সস্তা পেমেন্ট।’

‘কারণ এটার সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয়। যেমন রোদ, বৃষ্টি, বায়ু, ইত্যাদির কোন মূল্য লাগে না। কারণ আল্লাহ এগুলো সবার জন্যে অপরিহার্য করেছেন।’ আহমদ মুসা বলল।

আল্লাহর প্রতি আপনার খুব বিশ্বাস, না?’ জিজ্ঞাসা হান্নাহ হাগেরার।

‘হ্যাঁ, যিনি সৃষ্টি করেছেন, পালন করেছেন এবং যাঁর কাছে আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে, তাঁর প্রতি বিশ্বাস অবশ্যই থাকবে। তোমার বিশ্বাস নেই?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

গম্ভীর হল হান্নাহ হাগেরার মুখ। বলল, ঈশ্বর একজন আছেন বিশ্বাস করি। কিন্তু সিনাগগে আমি যাই না। কোন আনুষ্ঠানিকতাও পালন করি না। এসবের মধ্যে আমি কোন প্রাণ খুঁজে পাই না। ধর্ম যদি ঈশ্বরের ইচ্ছায় জীবন গঠনের জন্যে হয়, তাহলে জীবন গঠনের কিছু পাই না ধর্মে।’

‘কোন ধর্মেই পাবে না বা নেই, একথা ঠিক নয়। তোমার ধর্মে এটা ঠিক হতে পারে।’ আহমদ মুসা বলল।

'সব ধর্মই তো ধর্ম। একই ধরনের। তবে মানি, আপনাদের ধর্মে দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আছে। এটা ইউনিক ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা আপনাদের ধর্মকে সক্রিয় রেখেছে।' বলল হান্নাহ হাগেরা।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'হান্নাহ, তুমি আমাদের ধর্মকে আংশিকভাবে দেখেছো। পুরোটা দেখলে বলতে ইসলাম সত্যিই মানুষের জীবন গঠনের ধর্ম!'

হাসল হান্নাহ হাগেরা। বলল, 'এটা কিন্তু এক ধরনের ধর্ম প্রচার।'

'ভালোর দিকে ডাকা সব সময়ই ভালো কাজ।' আহমদ মুসা বলল।

'তার মানে ভালোর দিকে যাওয়া সব সময়ই ভালো। অর্থ ভালোর দিকে আমাকে যেতে হবে। তার মানে আপনি আমাকে 'প্ররোচনা' দিচ্ছেন ধর্মান্তরিত হওয়ার জন্যে।' বলল হান্নাহ হাগেরা। তার মুখে হাসি।

'ভালো'র দিকে যেতে বলাকে 'প্ররোচনা' বলে না, 'প্রেরণা' বলে।' আহমদ মুসা বলল।

নাস্তা এসে গেল টেবিলে।

'মেনে নিলাম 'প্রেরণা' দিয়েছেন। এখন প্রেরণা কাজে লাগলে হয়। আসুন শুরু করি। খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।' কথা বলার সাথে সাথেই হান্নাহ হাগেরা আহমদ মুসার প্লেটে মাছের গরম কাটলেট তুলে দিল।

'প্রেরনা' কাজে লাগা, না লাগা নির্ভর করে গ্রহণকারীর আন্তরিকতার ওপর।' বলে আহমদ মুসা কাঁটা চামচ হাতে তুলে নিল।

'ঠিক আছে বলটা আমার কোর্টেই থাক। তবে প্রেরণাদাতাকে বলের খোঁজ-খবর নিতে হবে।

'কিন্তু এটা শর্ত হওয়া উচিত নয়।' আহমদ মুসা বলল।

হান্নাহ হাগেরা হাসল। বলল, 'তথাস্তু।'

বলে হান্নাহ হাগেরাও কাঁটা চামচ হাতে নিল।

মুখ বিষণ্ন আব্দুর রহমান আরিয়েহর।

তার অফিস রুমের পাশেই বসার ঘরে একটা সোফায় গা এলিয়ে বসে আছে সে।

বলছিল ডেভিড ইয়াহুদ, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ড. আরিয়েহ। আপনি সন্দেহ ঠিকই করেছিলেন। আপনি ঠিক সময়ে সরে আসার সিদ্ধান্ত না নিতে পারলে সর্বনাশ হয়ে যেত!'

'সর্বনাশ হয়েছে কিনা কে বলতে পারে?' সোফায় সোজা হয়ে বসল ড. আবদুর রহমান আরিয়েহ।

'তার মানে?' বলল ডেভিড ইয়াহুদ। সেও সোফায় সোজা হয়ে বসেছে।

'তাড়াহুড়া করে আমাদের সেখান থেকে আসতে হয়েছে। প্রয়োজনীয় সব আমরা সরিয়ে এনেছি বটে, কিন্তু অপ্রয়োজনীয় কিছু সেখানে পড়ে আছে এবং আমাদের FSDD-এর স্থাপনার চিহ্ন সেখানে রয়েছে যা থেকে এর ডিজাইন সম্পর্কে একটা ধারনা হতে পারে। তেমনিভাবে অপ্রয়োজনীয় জিনিসের মধ্যে এমন কিছু থাকতে পারে যা থেকে কোন গবেষণার প্রকার-প্রকৃতি সম্পর্কে জানা যেতে পারে।' বলল ড. আরিয়েহ।

'আপনার কথা ঠিক। একটা ধারণা তারা পেতে পারে। তবে সে ধারণা দ্বারা তারা অবশ্যই আমাদের FSDD সম্পর্কে কোন কিছুই আঁচ করতে পারবে না বলেই আমি মনে করি। কিন্তু আমি ভাবছি বাড়িটার ঠিকানা তারা কিভাবে পেল? দ্বিতীয়ত বাড়িটার লোকদের কারও সম্পর্কে তারা কিছু জানতে পেরেছে কিনা, বিশেষ করে আপনার নাম?' ডেভিড ইয়াহুদ বলল।

'তা পারবে না। বাড়িটা রেজিস্ট্রি করা আছে পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণাকারী একটা এনজিও'র নামে। এনজিওটা আমার নাম ব্যবহার করেছিল। কিন্তু এ দ্বারা বাড়িটা আমার তা প্রমাণিত হবে না। কারণ রেজিস্ট্রেশনের পরবর্তী রেকর্ডে আমার নাম নেই।' বলল ড. আরিয়েহ।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, শুরু থেকেই আমরা এতটা সতর্ক ছিলাম। কিন্তু এখন আমাদের সতর্ক হতে হবে। এক এক করে আমরা পেছনে হটে এই শেষ অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছি। আমাদের লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত এই অবস্থানকে আমাদের রক্ষা করতে হবে।' ড. ডেভিড ইয়াহুদ বলল।

‘কিন্তু কিভাবে সেটা আমরা পারব? পাম ট্রি গার্ডেনের ঘাঁটিটাকে আমরা সবচেয়ে নিরাপদ মনে করেছিলাম। কিন্তু সেটাও তো ওদের নজরে পড়ে গেল।’ বলল ড. আরিয়েহ।

‘নিশ্চয়েই অসাধ্য সাধন করেছে খালেদ খাকান নামের শয়তান আহমদ মুসা। সে ইস্তাম্বুলে আসার পর থেকেই আমাদের পিছু হটা শুরু হয়েছে। তার মতো বড় শয়তান আর নেই। তাকে পথ থেকে সরাতে না পারলে আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব হবেনা।’ বলল ড. ডেভিড ইয়াহুদ।

‘কিন্তু কিভাবে? চেষ্টা তো কম হয়নি!’ ড. আরিয়েহ বলল।

ড. ডেভিড ইয়াহুদ ভাবছিল। সংগে সংগেই সে ড. আরিয়েহর কথার জবাব দিল না।

একটু ভেবে ডেভিড ইয়াহুদ বলল, ‘তাকে পথ থেকে সরাবার আমরা কোন চেষ্টাই বাকি রাখিনি। হত্যাই তাকে আমাদের পথ থেকে সরাবার একমাত্র পথ। সে চেষ্টা অতীতে বহুবার করা হয়েছে, এবারও কয়েকবার করা হয়েছে। কিন্তু তার ক্ষেত্রে কোন চেষ্টাই সফল হয়নি।’ একটু থামল ড. ডেভিড ইয়াহুদ।

‘তাহলে?’ বলল ড. আরিয়েহ।

‘আমি একটা নতুন চিন্তা করেছি। আমাদের কর্মী স্মার্থা প্রেসিডেন্ট হাউজে আমাদের অত্যন্ত বিশ্বাসী একজন লোককে অনেকদিন আগে সেট করেছে। স্মার্থা আমাকে গতকাল জানিয়েছে, ট্রান্সমিটার সেট করতে গিয়ে প্রোটোকল পদে নিয়োগ করা আমাদের লোক ধরা পড়ার পর বিপর্যয়ের মধ্যে আমরা পড়েছিলাম, সেটা কাটিয়ে ওঠা গেছে। প্রেসিডেন্টের ব্যবস্থাপনা বিভাগে লোক থাকায় খাদ্য তৈরি বিভাগে দু’জন লোক ঢোকানো গেছে। এরা দু’জন আগে ইস্তাম্বুল সেনা গ্যারিসনের কুকিং-এ কাজ করত। সুতরাং অসুবিধা হয়নি।’

থামল আবার ডেভিড ইয়াহুদ।

‘এখন কি করতে চান?’ জিজ্ঞাসা ড. আরিয়েহর।

‘এবার বড় ঘটনা ঘটাতে চাই। স্বয়ং প্রেসিডেন্টকে কিডন্যাপ করবো এবার আমরা। একমাত্র তাঁকে কিডন্যাপ করলেই আহমদ মুসাকে আমাদের হাতে তুলে দিতে বা বহিস্কার করতে বাধ্য করা যাবে। তাকে হাতে পেলে বা

বহিষ্কার করতে পারলে ওদের সোর্ড-এর ফর্মুলা উদ্ধার ও বিজ্ঞানীদের হাতে পাওয়াও সহজ হয়ে যাবে।' বলল ডেভিড ইয়াহুদ।

'কিন্তু প্রেসিডেন্টকে কিডন্যাপ করা কি সম্ভব হবে? সফল হলে তার ফল হবে অকল্পনীয়, কিন্তু ব্যার্থ হলে তার কুফলও হতে পারে...।'

ড. আরিয়েহর কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল, 'স্যার, খারাপ কিছু ভাবার দরকার নেই। এছাড়া আমাদের হাতে আর কোন বিকল্প নেই। দেয়ালে আমাদের পিঠ ঠেকে গেছে। আমাদের বিজয়ী হতেই হবে। আর...।'

মোবাইল বেজে উঠল ডেভিড ইয়াহুদের। কথা থামিয়ে মোবাইল তুলে নিল।

'হ্যাঁ, ওয়েলকাম স্মার্থা। বল।' বলে স্মার্থার সাথে কথা বলতে শুরু করল ডেভিড ইয়াহুদ। কথা বলতে বলতে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ড. ডেভিড ইয়াহুদের মুখ।

স্মার্থাকে 'ধন্যবাদ' দিয়ে কথা শেষ করেই ডেভিড ইয়াহুদ ফিরে তাকাল ড. আরিয়েহর দিকে। বলল, 'একটা সুখবর ড. আরিয়েহ। আমার চিন্তার সাথে এই সুখবরটা পরিপুরক। স্মার্থা জানাল, প্রেসিডেন্ট ইস্তাম্বুলে থাকার যে সময় নির্ধারিত ছিল, তার আগেই তিনি আংকারা চলে যাচ্ছেন। তাঁর অফিস ও পার্সোনাল স্টাফের অগ্রবর্তী দল ইতিমধ্যেই আংকারা চলে গেছে। দু'একদিনের মধ্যে তিনি চলে যাবেন। একটা মিনিমাম স্টাফ নিয়ে তিনি আছেন।'

থামল ড. ডেভিড ইয়াহুদ।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আপনি যে সুযোগ চাচ্ছিলেন, মনে হয় ঈশ্বর সে সুযোগ আপনাকে দিয়েছেন। এখন দেখুন সুযোগ কিভাবে কাজে লাগাবেন।' বলল বিজ্ঞানী ড. আরিয়েহ।

'সেজন্যে আরও তথ্য আমাদের দরকার। আমাদের বেন গালিব গিদন প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের ব্যবস্থাপনা বিভাগে এবং আরও দু'জন কুকিং বিভাগে থাকলেও তাদের টেলিফোন-মোবাইল ব্যবহার করতে না পারা এবং প্রাসাদের বাইরে বেরুতে বিধি-নিষেধ থাকার কারণে তাদের কাছ থেকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা পাওয়া কঠিন। তবে স্মার্থা চেষ্টা করে বেন গালিব গিদনের সাথে

যোগাযোগ করতে। তাছাড়া সে খবরটা জেনেছে ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির শিক্ষকদের কাছ থেকে। শিক্ষকরা গিয়েছিলেন প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা প্রোগ্রামে নিয়ে আসার জন্যে।'

থামল ড. ডেভিড ইয়াহুদ।

'প্রেসিডেন্ট কি তাদের দাওয়াত গ্রহন করেছেন? গ্রহন করলে খুব ভাল হয়।' বলল ড. আরিয়েহ।

'কেন বলছেন এ কথা?' ড. ডেভিড ইয়াহুদ বলল।

'প্রেসিডেন্ট দাওয়াত কবুল করলে শিক্ষকদের সাথে তাঁর আরও যোগাযোগ হবে। স্মার্থা এই সুযোগ নিতে পারবে। আমি সেই কথাই বলছিলাম।' বলল ড. আরিয়েহ।

'ঠিক বলেছেন ড. আরিয়েহ। প্রেসিডেন্ট দাওয়াত গ্রহন করেছেন। স্মার্থা নিশ্চয় এ সুযোগ গ্রহন করতে পারবে।' ড. ডেভিড ইয়াহুদ বলল।

'স্মার্থা কতটা পারবে, সেটাই চিন্তার কথা।' বলল ড. আরিয়েহ।

'সেটা চিন্তার কথা বটে, তবে স্মার্থা শিক্ষক হিসেবে খুব পরিচিত। তার ওপর ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজিতে নিউক্লিয়ার বিষয়ের ওপর স্মার্থা একটা কোর্স করছে। সেই সূত্রেও স্মার্থা শিক্ষকদের সাথে পরিচিত এবং তাদের সাথে ব্যাপক ওঠাবসা আছে।' ড. ডেভিড ইয়াহুদ বলল।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। সত্যই স্মার্থা বড় একটা সুযোগ করে দিতে পেরেছে। ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করুন!'

বলেই হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বিজ্ঞানী ড. আরিয়েহ উঠে দাঁড়াল। বলল, দেরি হয়ে গেছে। ওরা ল্যাবে বসে আছে। যাই।'

ড. ডেভিড ইয়াহুদও উঠে দাঁড়াল। বলল, 'মি. আরিয়েহ, ওদের সোর্ড-এর পাওয়ারের পরিমাপ করাটা কি সম্ভব হয়েছে? আমাদের 'ডাবল ডি' ওদের 'সোর্ড'-এর ডিফেন্স ভাঙতে না পারলে আমাদের সব প্লান-পরিকল্পনাই তো মাঠে মারা যাবে!'

'হ্যাঁ, মি. ডেভিড ইয়াহুদ, ওদের 'সোর্ড'-এর ডিফেন্স পাওয়ার যে এত উঁচু মানের তা আমি ভাবতেই পারিনি। আমাদের ডেমন 'ডাবল ডি' যে ৯০ ভাগ

অংশ সরাসরি 'সোর্ড'-এর মুখোমুখি হয়েছিল তার সবটাকেই 'সোর্ড' ভয়ংকর ব্ল্যাক হোলের মতো শুধু গিলেই ফেলেনি, আমাদের অ্যাটাকিং ফোটন পার্টিকেলগুলোকে রূপান্তরিত করে তার সহযোগী বানিয়ে ফেলেছে। সোর্ড-এর আওতার বাইরে থাকা মাত্র দশ ভাগ ডাবল ডি গিয়ে ওদের নৌবাহিনীর একটা অস্ত্র ডিপোকে ধ্বংস করে দিয়েছে। এ ধ্বংসটুকুই আমাদের প্রথম আনুষ্ঠানিক আক্রমণ মিশনের ফল।

থামল ড. আরিয়েহ মুহূর্তের জন্যে। পর মুহূর্তেই আবার মুখ খুলেছিল কথা শুরুর জন্যে। কিন্তু তার আগেই ড. ডেভিড ইয়াহুদ বলে উঠল, 'আপনার সহযোগী বিজ্ঞানী আইতানের কাছে এ ভয়ংকর খবর আমি শুনেছি মি. আরিয়েহ। কিন্তু, 'সোর্ড'-এর ব্ল্যাক হোলের মতো এমন ভয়ংকর গ্র্যাভিটেশনাল ক্ষমতার কথা তিনি বলেননি। 'সোর্ড'-এর পাওয়ার কি সত্যিই এতটা ভয়ংকর?'

থামল ড. ডেভিড ইয়াহুদ। তার মুখ উদ্বেগ-আতংকে ভরা।

ড. আরিয়েহর মুখ ভয়ানক বিমর্ষ। সোফায় আবার সে বসে পড়ল। মনে হলো যেন আছড়ে পড়ল তার দেহটা সোফার ওপর। বলল, 'বিস্ময় আমাদের হতবাক করে দিয়েছে! সর্বোচ্চ শক্তির আলোক পার্টিকেল তারাও ব্যবহার করেছে, আমরাও ব্যবহার করেছি। কিন্তু সেই পার্টিকেল শক্তিকে অতটা মাল্টিপ্লাট করল কি দিয়ে, কিভাবে? অলৌকিক এই গ্র্যাভিটেশনাল পুল (চৌম্বক আকর্ষণ শক্তি) এলো কি করে তাদের পার্টিকেলে? এই শক্তি বলেই সোর্ড যে কোন চলন্ত মরনাস্ত্র বন্দী করে ধ্বংস করতে পারে। আমার মনে হয় আজকের দিনে এটাই বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় বিস্ময়!'

'আপনারা বিষয়টার পরীক্ষা ও পরিমাপে কতটা এগোতে পেরেছেন?' জিজ্ঞাসা ড. ডেভিড ইয়াহুদের।

ওটা দীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপার। ওটার ওপর কোন সিদ্ধান্ত আটকে রাখা ঠিক হবে না। এখন আমাদের হাতে যে অস্ত্র আছে তাকেই কাজে লাগাতে হবে। সোর্ড-এর প্রতিরক্ষা সব কিছুকে বা গোটা দেশকে রক্ষা করতে পারে না। আমাদেরকে এই সুযোগ নিতে হবে। আমাদের শক্তি ছোট নয়। একদিনেই আমরা এদের অস্ত্রাগার, শিল্প-কারখানা, পরিবহন ব্যবস্থা ইত্যাদি ধ্বংস করে

দেশকে বিরান ভূমিতে পরিণত করে দিতে পারি। ওদের ষ্টিল ফ্রেমের আকাশচুম্বি বিল্ডিংগুলো চোখের পলকে ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি মনে করি এরপর তারা আমাদের পায়ে পড়ে আমাদের দাবি মেনে নেবে।'

থামল ড. আরিয়েহ।

ওটা আমাদের সর্বশেষ সিদ্বান্ত। ওদিকে এখন যাওয়া যাচ্ছে না। কারণ সকল প্রকার আন্তর্জাতিক জানাজানি ও প্রতিক্রিয়া আমাদের এখন এড়িয়ে চলতে হবে। আমাদের সব পরিকল্পনা ফেল করলে শেষ সিদ্বান্ত আমাদের নিতে হবে, তখন পশ্চিমের সাথে আমাদের 'গিভ এন্ড টেক'- এর ভাগাভাগিতে যেতে হবে। এতে আমাদের মনোপলি থাকবে না এবং আসল লক্ষ্যও আমরা অর্জন করতে পারবো না। সুতরাং আমাদেরকে অন্য উপায়ে লক্ষ্য অর্জনে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে। আমরা যে পরিকল্পনা নিয়েছি, সেটা সফল হবে বলে আমি মনে করি।' বলল ড. ডেভিড ইয়াহুদ।

'ঈশ্বর আমাদেরকে সাহায্য করুন!' বলে আবার উঠে দাঁড়াল ড. আরিয়েহ। তার চোখে আশার আলো।

ড. আরিয়েহ ও ড. ডেভিড ইয়াহুদ দু'জনেই বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

# ৫

নানা চিন্তা কিলবিল করছে আহমদ মুসার মাথায়। আইআরটির ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ এন্ড টেকনোলজি'র ওপর ওদের আক্রমণ ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু ওদের আক্রমণের শক্তি যে কত ভয়ানক তা প্রমাণিত হয়েছে নৌবাহিনীর অস্ত্র 'ডিপো'র ওপর ওদের আক্রমণের প্রকৃতি দেখে। এ এক ধরনের ভৌতিক ধ্বংসলীলা। আক্রমণকে কেউ দেখবে না, বুঝবে না, কিন্তু চোখের পলকে আস্ত্রাগার, কলকারখানা হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে। আমাদের 'সোর্ড'-এর প্রটেকশন আমব্রেলা ছাড়া এই নিরব ধ্বংসলীলা রোধ করার আর কোন উপায় নেই। কিন্তু 'সোর্ড'-এর এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কতটা দেয়া যাবে, কত কত জায়গায় দেয়া যাবে? ধ্বংসের এই দৈত্য আগে বাড়তে দিলে গোটা দুনিয়ার কি হবে! সকলের নিরাপত্তার একমাত্র উপায় ড. আরিয়েহ এবং তার অস্ত্র ও গবেষণাকে ধ্বংস করা। এই কাজ দ্রুতই হতে হবে। কিন্তু আরিয়েহকে পাওয়া যাবে কোথায়? সে কি ইস্তাম্বুলেই আছে, না বাইরে কোথাও পালিয়েছে? বিশাল তার লটবহরকে এত তাড়াতাড়ি বাইরে নেয়া সম্ভব নয়। এটা নিশ্চিত যে, তারা ইস্তাম্বুলেই আছে। তাছাড়া 'সোর্ড'-এর ব্যাপারটার কোন হেস্তনেস্ত না করে তারা দূরে সরবে না। 'সোর্ড'কেই এখন তাদের একমাত্র ভয়। রোমেলী দুর্গে 'আইআরটি'র ওপর আক্রমণ করে তারা বুঝেছে 'সোর্ড'-এর কাছে তাদের অস্ত্র অচল। সুতরাং 'সোর্ড' এখন তাদের পথের একমাত্র বাধা, একমাত্র শত্রু। এ শত্রুকে রেখে তারা কোথাও যাবে না। আমরা যেমন এখন ড. আরিয়েহ-ডেভিডদের অস্ত্র ধ্বংস করাকেই প্রধান কাজ ভাবছি, তেমনি ওরাও 'সোর্ড'-এর ফর্মুলা হাত করা এবং আমাদের আইআরটি ধ্বংস করে 'সোর্ড'কে শেষ করে দেয়াকেই নিশ্চয় সবচেয়ে বড় বিষয় ভাবছে। সামনে একটা ভয়ংকর লড়াই। লড়াইয়ের চ্যালেঞ্জ তাদের মতো আমরাও গ্রহণ করেছি। কিন্তু সমস্যা হলো, ওরা আমাদের সব জানে, কিন্তু ওদের আমরা কয়েকটা নাম ছাড়া কিছুই জানি না। ওদের ঘাঁটির সন্ধান করতে না পারলে

আমরা ওদের ওপর আঘাত করতে পারছি না। ড. আরিয়েহর নাম পেলাম। এখন সবচেয়ে বড় দরকার ওদের ঘাঁটির সন্ধান পাওয়া।

আহমদ মুসার হাত দু'টি গাড়ির স্টিয়ারিং হুইলে ঠিকভাবে থাকলেও এবং তার দুই চোখের দৃষ্টি ঠিকভাবে কাজ করলেও এই সব চিন্তায় কিছুটা আনমনা হয়ে পড়েছিল।

কিন্তু জেনারেল মোস্তফার অফিস ক্রস করে যেতেই সে সম্বিত ফিরে পেল সম্ভবত গেটের সেন্ট্রির লম্বা স্যালুট দেখেই।

গাড়ি পেছনে নিয়ে গেট দিয়ে জেনারেল মোস্তফার অফিসে প্রবেশ করল।

গাড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল জেনারেল মোস্তফা। আহমদ মুসা গাড়ি থেকে নামতেই বলল, 'কি ব্যাপার মি. খালেদ খাকান, আপনিও এমন আপনভোলা হয়ে পড়েন? বেমালুম অফিস পার হয়ে যাবার মতো এতটা?'

হাসল আহমদ মুসা। ডান হাতের ব্যাগটা বাম হাতে নিয়ে জেনারেল মোস্তফার সাথে হান্ডশেক করে বলল, 'মাথায় এখন একটাই চিন্তা ড. ডেভিডদের নতুন ঠিকানা কোথায়?'

গম্ভীর হলো জেনারেল মোস্তফার মুখ। বলল, 'হ্যাঁ, এটাই তো এখনকার সবচেয়ে বড় চিন্তা। কিন্তু কিছু সুরাহা হলো মি. খালেদ?'

দু'জনেই গাড়ি বারান্দা থেকে বারান্দার ধাপ ভেঙে অফিসের দিকে উঠছিল। আলো কোন দিকেই দেখা যাচ্ছে না। এলাম একটা বিষয় আলোচনার জন্যে।'

অফিসে ঢুকে আহমদ মুসাকে চেয়ারে বসিয়ে নিজের আসনে গিয়ে বসল। বলল, 'বলুন মি. খালেদ খাকান। আমরা কি করব?'

আহমদ মুসা মুখ খুলেছিল কথা বলার জন্যে। তার মোবাইল বেজে উঠল।

মোবাইল-স্ক্রীনে নামটা দেখেই আহমদ মুসা মোবাইল মুখের কাছে তুলে নিয়ে বলল, 'আসসালামু আলাইকুম, জোসেফাইন, সব ঠিক-ঠাক তো! ভালো আছ তো!'

‘ওয়া আলাইকুম সালাম। আমরা ভালো আছি। একটা জরুরি ব্যাপারে টেলিফোন করেছি। জেনি জিফা এইমাত্র টেলিফোন করেছিল। প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে কিছু ঘটতে যাচ্ছে বলে সে জানিয়েছে।’ ওপার থেকে বলল জোসেফাইন।

‘কি ঘটতে যাচ্ছে? কেন তিনি বললেন? কি জানতে পেরেছেন তিনি? এ সম্পর্কে তিনি কিছু বলেছেন?’ আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

‘একজন শিক্ষিকা তার বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা কোর্স করেন। তার কথাবার্তায় তিনি বিষয়টা আঁচ করেছেন। তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কি একটা অনুষ্ঠান হবে! প্রেসিডেন্টকে সেখানে নেয়া হবে। সেই সূত্রে শিক্ষক প্রতিনিধিদল প্রেসিডেন্ট ভবনে কয়েকবার গেছেন। কোর্স করতে আসা শিক্ষিকা শিক্ষক প্রতিনিধি দলের সাথে যেসব কথা বলেছেন এবং যে চিঠিটা তিনি দিয়েছেন তা থেকেই তার সন্দেহ হয়েছে।’ বলল জোসেফাইন।

‘তেমন দু’একটা কথা কি তিনি জানিয়েছেন, চিঠিটা কি ছিল?’ আহমদ মুসা জিজ্ঞেস করল।

‘হ্যাঁ, চিঠিটা জেফি জিনাকেই দিয়েছিল প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের বেন গালিব গিদন নামের একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে দেয়ার জন্যে। তাকে বলা হয়েছিল, কার পার্কিং-এ তাদের স্বাগত জানাতে আসা প্রোটোকল অফিসারের পাশেই লোকটি থাকবে। তার শার্টের নেম-ব্যান্ড–এ ‘বেন গালিব’ লেখা থাকবে। হ্যান্ডশেক করার সময় তাকেই চিঠিটা দিয়ে দিতে হবে। জেফি জিনা বলল, সে জানত যে, প্রেসিডেন্ট হাউজের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের একজন ‘থ্রি জিরো’র বলে একটা সন্দেহ রয়েছে। বেন গালিব গিদন নামের ‘গিদন’ শব্দ দেখে তাঁর সন্দেহ হয়। এ নামটি হিব্রু। তাওরাতের একজন বীর যোদ্ধার নাম এটা। এই সন্দেহ থেকেই চিঠিটা সে পড়ে। চিঠির বক্তব্যকে তার রহস্যপূর্ণ মনে হয়। চিঠিতে লেখা ছিল:

‘বেন গালিব গিদন,

তোমার ডেভিরা, পিতা, দু’চার দিনের মধ্যে চলে যাচ্ছেন তুমি জান। যাওয়ার আগে একটা বুঝাপড়া হওয়া

দরকার। ঘুম হলে সে ভালো থাকে। ডেব্রা, তোমার বোন, আসছে। ইলিরাজ ব্যাপারে তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি।

তোমার অ্যান্টি-

এসএম সিমশন।'

কথা শেষ করল জোসেফাইন।

'চিঠিটা কি উনি প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের বেন গালিবকে দিয়েছেন?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'দিয়েছে। না দিলে তো তিনি সন্দেহ করেছে, এটা ধরা পড়ে যেত। চিঠিটি কপি করে নিয়েছিল সে।'

'চিঠি থেকে কি সন্দেহ করেছিলেন তিনি?' বলল আহমদ মুসা।

'তিনি বলেছেন, 'ডেভিরা' বলতে প্রেসিডেন্টকে বুঝানো হয়েছে। 'পিতা' শব্দ 'ডেভিরা'র পরে বসায় ওর কোন অর্থ নেই। প্রেসিডেন্টকে নিয়েই কিছু ঘটতে যাচ্ছে বলে তিনি মনে করেন। 'ডেভিরা' শব্দের মতো 'ডেব্রা' শব্দেরও ভিন্ন অর্থ আছে।' জোসেফাইন বলল।

মুহূর্তের জন্যে ভাবল আহমদ মুসা। মনের পাতায় গেঁথে যাওয়া চিঠির কথাগুলোর ওপর একবার নজর বুলাল সে। বলল, 'ধন্যবাদ জোসেফাইন। আমার মনে হয় 'ইলিরাজ' শব্দেরও বিশেষ অর্থ আছে। তোমার বান্ধবী 'জেফি জিনা'কেও ধন্যবাদ। তাঁর বলা আর কোন কথা আছে জোসেফাইন?'

'আমার বুঝি কোন কথা নেই? জেফির কথাই শুধু শুনতে চাচ্ছ যে!'

হাসি চাপতে চাপতে কথাটা বলল জোসেফাইন, বুঝল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার মুখেও হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'আমি জোসেফাইনের কথা শুনেছি, জেফির নয়।'

'কিন্তু আমি তো জেফি'র কথা বলছি।' জোসেফাইন বলল।

'কিন্তু মধুর কণ্ঠটা জোসেফাইনের, ভাষাও জোসেফাইনের, বিষয়ের কথা বাদ দাও।' বলল আহমদ মুসা।

'যাক, প্রশংসার দরকার নেই। তোমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। কিন্তু তুমি এখন কোথায়?' বলল জোসেফাইন।

‘জেনারেল মোস্তফার অফিসে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কয়টা বাজে এখন?’ জোসেফাইনের জিজ্ঞাসা।

ঘড়ির দিকে না তাকিয়েই আহমদ মুসা বলল, ‘আজকে কিন্তু ঠিকই লাঞ্চে আসব। শর্ত হলো তোমার দেয়া ইনফরমেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এ সম্পর্কিত জরুরি কিছুতে জড়িয়ে না পড়লে ঠিকই আমাকে লাঞ্চের টেবিলে পাবে।’ হাসতে হাসতে বলল আহমদ মুসা।

ওপার থেকে উত্তর আসতে একটু দেরি হলো। মূহূর্ত পরেই শোনা গেল জোসেফাইনের কণ্ঠস্বর। বলল, ‘লাঞ্চের কথা বলো না, আসতে পারবে না। অনুরোধ, লাঞ্চটা ঠিক সময়ে খেয়ে নিও। আর ডিনার থেকে কিন্তু ছুটি নেই, মনে রেখ।’

‘নিয়ন্ত্রণের রশিটা তো এমন করে টানা দেখে? নতুন মনে হচ্ছে।’ বলল আহমদ মুসা। তার মুখে হাসি।

‘কেন, বয়স বাড়ার সাথে সাথে স্বার্থ বুদ্ধি বাড়বে না?’ বলল জোসেফাইন। তার কণ্ঠ গম্ভীর।

‘তোমার স্বার্থ চিন্তা কত আছে আমি তা জানি। বল তো ব্যাপার কি?’

‘বলব না, তুমি ডিনারে এসো।’ জোসেফাইন বলল ওপার থেকে।

গম্ভীর হলো আহমদ মুসা। বলল, ‘জোসেফাইন, এতটা সময় আমাকে অশান্তিতে রাখতে পারবে তুমি?’

জোসেফাইনের উত্তর এলো একটু দেরিতে। বলল, ‘তুমি এখন যুদ্ধক্ষেত্রে। আবেগকে এতটা প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক হচ্ছে না। আমি...।’

জোসেফাইনের কথার মাঝখানেই আহমদ মুসা বলল, ‘একে আবেগ বলো না জোসেফাইন। এ আত্মা ও অস্তিত্বের আকুতি।’

‘স্যরি! আমার এ কথার অর্থ- প্রতি পদক্ষেপে তোমাকে স্বাভাবিক, সচেতন ও সাবধান থাকতে হবে। তুমি এমন একটা পথে, যেখানে জীবন ও মৃত্যু এক সাথে...।’

আবেগে রুদ্ব হয়ে গেল জোসেফাইনের গলা। কথা আটকে গেল তার।

কিন্তু সংগে সংগেই সে নিজেকে সামলে নিয়ে গলাটাকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে বলল, ‘আজকের দিনটা কোন্ দিন বলত?’

‘আজ...?’ হঠাৎ সচেতন হয়ে স্মৃতির সন্ধানে লাগল আহমদ মুসা। কিছুটা বিব্রত হয়ে উঠল সে।

জোসেফাইনই আহমদ মুসাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এলো। বলল, ‘কয়েক বছর আগের এক সুন্দর অপরাহ্ন, প্যারিসের এক মসজিদ...।’

‘স্যরি, আর বলো না জোসেফাইন। এদিন তো ভোলার নয়। ভুলিনি তো এর আগে। আজ ভুললাম কি করে এই প্রিয় দিনটাকে! তোমার টেবিলে মেহেদীর রংটা দেখেও আমার মনে পড়া উচিত ছিল। ধন্যবাদ তোমাকে। আমি আসছি।’

‘আবার তুমি আবেগকে বড় করছ। না, তুমি আসবে না এখন। তোমার সামনে যে কাজ তা আমাদের ব্যাক্তিগত স্বার্থের চেয়ে অনেক বড়। সকালে তোমাকে বলিনি তার কারণও এটাই। আমি ডিনারে তোমার অপেক্ষা করবো।’ বলল জোসেফাইন।

‘ধন্যবাদ জোসেফাইন। সত্যিই সাংঘাতিক গোলকধাঁধায় পড়েছি। সমাধানটা দেখা যাচ্ছে খুব কাছে, কিন্তু কোন পথ আমরা পাচ্ছি না। তাহলে এখনকার মত এটুকুই।’ আহমদ মুসা বলল।

‘অসময়ে তোমার অনেকটা সময় নিয়েছি। দুঃখিত। খোদা হাফেজ! আসসালামু আলাইকুম।’ বলল জোসেফাইন।

‘কিন্তু আমি আনন্দিত হয়েছি। ওয়া আলাইকুম সালাম।’

আহমদ মুসা কল অফ করতেই উৎকণ্ঠিত জেনারেল মোস্তফা বলল, ‘স্যরি মি. খালেদ খাকান, ম্যাডামকে কষ্ট দিবেন না। আমাদের অপরাধী করবেন না।’

একটু থামল। বলল আবার সংগে সংগেই, ‘মি. খালেদ খাকান, ম্যাডাম কি তথ্য দিলেন। প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ, চিঠি, সন্দেহ ইত্যাদি সব কথা শুনলাম। কিছুই বুঝলাম না।’ জেনারেল মোস্তফার চোখে-মুখে এবার স্পষ্ট উদ্বেগ।

‘গুরুতর কিছু তথ্য দিয়েছে। প্রেসিডেন্ট হাউজের একজন কর্মকর্তার কাছে একটা চিঠি পাঠানো হয়েছে। চিঠিটা রহস্যপূর্ণ।’ আহমদ মুসা বলল।

‘চিঠিতে কি ছিল সেটা কি জানা গেছে?’ দ্রুত কন্ঠে বলল, জেনারেল মোস্তফা।

‘চিঠিটা ছোট। আমাকে বলেছে। লিখুন, আমি বলছি।’

‘ধন্যবাদ’ বলে জেনারেল মোস্তফা একটা নোট প্যাড টেনে নিল। আহমদ মুসা বললে লিখে ফেলল জেনারেল মোস্তফা।

লেখার পর বলল, ‘হ্যাঁ, মি. খালেদ খাকান, বেন গালিব গিদনকে আমিও চিনতে পারছি। সে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের প্রশাসন বিভাগের কর্মচারী ব্যবস্থাপনা শাখার একজন কর্মকর্তা।’

‘সে কি ইহুদি?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

প্রশ্ন শুনে বিস্মিত চোখে তাকাল জেনারেল মোস্তফা আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘না তো, সে ইহুদি নয় তো!’

‘কিন্তু তার নামের ‘গিদন’ শব্দটা হিব্রু, ইহুদিরাই শুধু ব্যবহার করে থাকে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘কোন অর্থ আছে এ শব্দের?’

‘তাওরাতে উল্লিখিত একজন যোদ্ধার নাম এটা।’ বলল আহমদ মুসা।

বিস্ময় বিমূঢ় চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল জেনারেল মোস্তফা। একটু পর বলল, ‘অথচ সে বলেছিল সিরিয়ার এক গ্রামের নাম গিদন। ওটা ছিল তার পূর্বপুরুষের বাসস্থান। পূর্বপুরুষের স্মৃতি হিসেবেই তারা নামের সাথে এই নাম ব্যবহার করে থাকে।’

মুহূর্তের জন্যে থেমেই আবার বলে উঠল, ‘দুনিয়াটা বড় অসরল। ধীরে ধীরে আমার কাছে স্পষ্ট হচ্ছে মি. খালেদ খাকান যে, আমরা মুসলমানরা ছাড়া দুনিয়ার সবাইকেই দেখছি ধর্মকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যবহারের ক্ষেত্রে দারুন মৌলবাদী। ওসমানীয় খিলাফত আমলে আমাদের তুরস্কে মুসলমানদের চেয়ে খৃষ্টান প্রজাদেরকেই বেশি সুযোগ-সুবিধা দেয়া হতো। আর আমাদের আজকের নব্য তুরস্কে ধর্মনিরপেক্ষতার স্বার্থে ইসলাম নির্বাসিতই হয়েছিল। কিন্তু আমরা ধর্ম ছাড়লেও ওরা কিন্তু দেখছি ওদের ধর্ম ছাড়েনি। যাক, আসুন, চিঠির দিকে মনোযোগ দিই।’

চিঠির ওপর নজর বুলাল জেনারেল মোস্তফা। বলল, 'সত্যিই চিঠিটা রহস্যপূর্ণ। এই রহস্য থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার, এই চিঠির পেছনে কোন ষড়যন্ত্র আছে অবশ্যই। চিঠির কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার হলে রহস্যটা বুঝা যাবে। বেন গালিব গিদনের 'পিতা' কে বা কি, 'বুঝাপাড়া' বলতে কি বুঝানো হয়েছে, 'ইলিরাজ' কি ইত্যাদি। আপনি কিছু বুঝছেন, মি. খালেদ খাকান?'

'আমিও চিন্তা করছি। যার কাছে তথ্য এসেছে তিনি কিছু ক্লু দিয়েছেন। বলেছেন; 'পিতা' শব্দের কোন অর্থ নেই। তেমনি আমার বোন শব্দেরও কোন অর্থ নেই। কারণ 'বোন' শব্দ 'পিতা'র মতো 'ডেব্রা' শব্দের পরে বসেছে। 'পিতা' ও 'বোন' যদি অনর্থক শব্দ হয়, তাহলে 'ডেভিরা', ' ডেব্রা' শব্দের নিশ্চয় কোন অর্থ আছে। 'গিদন' ও 'ইলিরাজ' শব্দ হিব্রু। 'ডেভিরা' ও 'ডেব্রা' নিশ্চয় হিব্রু শব্দ। এ দুটি শব্দের অর্থ জানা দরকার। হিব্রু ডিকশনারী নিশ্চয় আপনার অফিসে আছে।'

সংগে সংগে জেনারেল মোস্তফা উঠে গিয়ে হিব্রু ডিকশনারি নিয়ে এলো।

বসে ডিকশনারি থেকে শব্দ দু'টি খুঁজে বের করল। বলল, 'হ্যাঁ, মি. খালেদ খাকান, 'ডেভিরা' শব্দের অর্থ আশ্রম, আশ্রয় এবং 'ডেব্রা' শব্দের অর্থ মৌমাছির ঝাঁক। আর 'গিদন' শব্দের অর্থ আপনি তো বলেছেনই। 'ইলিরাজ' শব্দ আপনার জানা। ওটার অর্থ কি?'

'ইলিরাজ' অর্থ 'গোপন'।' বলল আহমদ মুসা।

'বিদঘুটে' সব অর্থ! চিঠিটার অর্থ তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে মি. খালেদ খাকান?' জিজ্ঞাসা জেনারেল মোস্তফার।

আহমদ মুসা একটু ভাবল। বলল, 'তোমার আশ্রয় দু'চার দিনের মধ্যে চলে যাচ্ছে তুমি জান। যাওয়ার আগে একটা বুঝাপাড়া হওয়া দরকার। ঘুম হলে সে ভালো থাকে। মৌমাছির ঝাঁক আসছে। গোপন ব্যাপারে তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি।' তিনটি হিব্রু শব্দের অর্থ পাওয়ার পর এই দাঁড়াচ্ছে চিঠির বক্তব্য। যিনি এই তথ্যটা দিয়েছেন, তার বক্তব্য হলো চিঠির 'ডেভিরা' বা 'আশ্রয়' শব্দের অর্থ 'প্রেসিডেন্ট'। এদিক থেকে 'বুঝাপড়া' ও 'ঘুম' বিষয়টি প্রেসিডেন্টের সাথে সম্পর্কিত। এখন প্রশ্ন হলো: 'বুঝাপড়া', 'ঘুম' বলতে কি বুঝানো হয়েছে? আর

পরবর্তী দুই বাক্যের 'মৌমাছির ঝাঁক' ও 'গোপন ব্যাপার' বিষয় দুটিও রহস্যপূর্ণ।'

'প্রেসিডেন্টের সাথে বেন গালিব গিদনের কি বুঝাপড়া হতে পারে! নিশ্চয় এটা কোন ষড়যন্ত্র। আর শেষের 'গোপন ব্যাপার'টাও সেই ষড়যন্ত্র। কিন্তু 'ঘুম' আর 'মৌমাছির ঝাঁক' বলতে কি বুঝাচ্ছে?'

থামল জেনারেল মোস্তফা।

'আসল বিষয় সম্ভবত এই শব্দ দু'টির অর্থের মধ্যে নিহিত রয়েছে।'

বলে থামল আহমদ মুসা।

সোফায় গা এলিয়ে দিল আহমদ মুসা। অর্ধবোজা তার চোখ। গভীর ভাবনার ছাপ তার চোখে- মুখে।

হঠাৎ সোজা হয়ে বসল আহমদ মুসা। তাকাল জেনারেল মোস্তফার দিকে। বলল, 'মি. জেনারেল, 'বুঝাপড়া' ব্যাপারটা যদি তার ক্ষতি করার কোন ষড়যন্ত্র হয়, তাহলে 'ঘুম' ও 'মৌমাছির ঝাঁক' সেই ক্ষতি করার অস্ত্র হতে পারে। যে ধরনের 'ক্ষতি' করা হবে, সেই ধরনের অস্ত্র হবে। এখন প্রশ্ন হলো, কি ধরনের ক্ষতি করতে চায়? আমার মনে হচ্ছে, তাঁকে কিডন্যাপ করার চেষ্টা করা হবে। আর...।'

'কিডন্যাপ? প্রেসিডেন্টকে!' আহমদ মুসার কথায় বাধা দিয়ে বলল জেনারেল মোস্তফা। তার দু'চোখ ছানাবড়ার মতো বিস্ফোরিত!

একটু সামলে উঠেই জেনারেল মোস্তফা আবার দ্রুত কন্ঠে বলে উঠল, 'এমন সাংঘাতিক চিন্তাটা আপনার কেন এলো?'

'দেখুন, ইতিমধ্যে ওরা তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্যে দু'টি কিডন্যাপের আশ্রয় নিয়েছে। তৃতীয় প্রচেষ্টাও কিডন্যাপেরই হতে পারে। বড় কোন ভিভিআইপিকে কিডন্যাপ তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্যে সহজ। আর প্রেসিডেন্ট হতে পারেন তাদের সবচেয়ে মূল্যবান শিকার, লক্ষ্য অর্জনে যা হবে অব্যর্থ।' আহমদ মুসা বলল।

'আপনার কথায় যুক্তি আছে।' শুকনো কন্ঠে বলল জেনারেল মোস্তফা। তার চোখ- মুখ থেকে রক্ত যেন সরে গেছে। তাকে ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে।

কথাটা শেষ করে মুহূর্তের জন্যে থেমেই আবার বলল, 'তাহলে, 'ঘুম' ও 'মৌমাছির ঝাঁক' বলতে কি বুঝানো হয়েছে?'

'তাদের অতীতের দু'টি কিডন্যাপেই তারা ক্লোরোফরম জাতীয় সংজ্ঞালোপকারী বস্তু ব্যবহার করেছে। প্রেসিডেন্টের ক্ষেত্রেও এটাই ঘটতে পারে। 'ঘুম' শব্দটি আমি মনে করি, এরই ইংগিত দিচ্ছে।' আহমদ মুসা বলল।

'তার মানে কোনওভাবে সংজ্ঞাহীন করে তাকে কিডন্যাপ করা হবে? 'মৌমাছির ঝাঁক' কথাটার কি অর্থ দাঁড়াচ্ছে?' বলল অস্থির কন্ঠে জেনারেল মোস্তফা।

'চিঠির 'ঘুম' শব্দের ইংগিত এ রকমই বলছে। আমার মতে 'মৌমাছির ঝাঁক' হতে পারে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে প্রশাসন বিভাগে কর্মরত সেই বেন গালিব গিদনকে তাদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে সাহায্য দিতে আসবে তারা।' বলল আহমদ মুসা।

'তার মানে এটা একটা পরিপূর্ণ ষড়যন্ত্র! ওরা আঁট-ঘাট বেঁধে লেগেছে। আমাদের মনে হচ্ছে, প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে গিদনের মতো, সেই প্রটোকল অফিসারের মতো তাদের আরও লোক অনুপ্রবেশ করে থাকতে পারে। এত বড় ষড়যন্ত্র একার পক্ষে সম্ভব নয়।'

থামলো জেনারেল মোস্তফা। তার শুষ্ক কন্ঠ কাঁপছিল।

থেমেই আবার বলে উঠল, 'এখনি প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের অফিসকে জানাতে হবে। মি খালেদ খাকান, এখনই আমাদের কিছু করা দরকার। কিন্তু কি করা দরকার? ষড়যন্ত্র কত দূর এগিয়েছে কে জানে! যদি কিছু...।'

কন্ঠ আপনাতেই থেমে গেল জেনারেল মোস্তফার।

'চিঠির যা বক্তব্য তাতে প্রেসিডেন্ট আংকারা যাওয়ার আগেই তারা ঘটনা ঘটাবার চেষ্টা করবে।' আহমদ মুসা বলল।

'তার মানে যে কোন সময় ঘটনা ঘটতে পারে। তারিখ ঘোষণা করা হয়নি। কিন্তু এ সপ্তাহেই তিনি আংকারা যাবেন। তার মানে আর চার দিন বাকি। খুব বেশি ভাবার সময় নেই। এখন বলুন, কি করব আমরা? আমাকে এখনি একবার প্রধানমন্ত্রীর অফিসে যেতে হবে।' জেনারেল মোস্তফা বলল।

‘দুটি কাজ এখনি করুন। এক. মৌমাছির ঝাঁক মানে বাইরের লোক যাতে কোন পরিচয়েই কোনভাবেই ভেতরে ঢুকতে না পারে, সেটা নিশ্চিত করুন। দুই. প্রেসিডেন্ট প্রাসেদের চীফ অব স্টাফকে বলুন, তিনি যেন বেন গালিব গিদনকে চোখে চোখে রাখেন অথবা তাকে গ্রেফতারও করতে পারেন। আপনি প্রধানমন্ত্রীর ওখানে যান, কিন্তু আমাকে এখনই প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে যাবার ব্যবস্থা করে দিন। প্রধানমন্ত্রীর ওখান থেকে আপনিও সেখানে আসুন।’ আহমদ মুসা বলল।

কোন কথা না বলে জেনারেল মোস্তফা অয়ারলেস তুলে নিল। প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের চীফ অব স্টাফ ইসমত ইউসুফ ইনুনুর সাথে সংযোগ নিয়ে সালাম দিয়ে বলল, ‘আমি জেনারেল মোমস্তফা কামাল। বেন গালিব গিদন কোথায়?’

সালাম নিয়ে ওপার থেকে ইসমত ইউসুফ ইনুনু বলল, ‘স্যার, আজ প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের ইন্টারনাল স্টাফদের বার্ষিক গেট টুগেদার। বেন গালিব গিদন ওখানেই গেছে। আমিও যাব। তাকে দরকার স্যার?’

‘না। শোন, তাকে সার্বক্ষণিক নজরদারিতে রাখ। আর প্রেসিডেন্টের সার্বক্ষণিক পার্সোনাল সিকিউরিটি বাড়িয়ে দাও। আর উনি এখানে থাকা পর্যন্ত আগামী কয়েকদিন দর্শনার্থীসহ সব রকম প্রোগ্রাম বাতিল করে দাও। মি. খালেদ খাকান প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে যাচ্ছেন। তার প্রয়োজন অনূসারে তাকে সহযোগিতা করো। একটু পরে আমিও আসব।’ জেনারেল মোস্তফা বলল।

‘আপনার নির্দেশ পালিত হবে স্যার। আজ সকালে প্রেসিডেন্ট ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলোজিতে একটা প্রোগ্রাম করেছেন। কয়েকটা সাক্ষাৎকার ছাড়া সামনের কয়েকদিন বড় কোন প্রোগ্রাম নেই।’ বলল ইসমত ইউসুফ ইনুনু।

‘মাননীয় প্রেসিডেন্টের আজকের প্রোগ্রামটা ভালো হয়েছে। তিনি এখন কোথায়?’ জেনারেল মোস্তফা বলল।

‘উনি রেস্টে আছেন। একবার হয়তো অনুষ্ঠানেও আসবেন।’ বলল ইসমত ইউসুফ ইনুনু।

‘ঠিক আছে সাবধান থেক। মি. খালেদ খাকান যাচ্ছেন?’ জেনারেল মোস্তফা বলল।

‘স্যার, কিছু কি ঘটেছে? কোন কিছুর আশংকা আছে?’ বলল ইসমত ইউসুফ ইনুনু।

‘যে কোন সময় যে কোন কিছু ঘটতে পারে। আবার নাও ঘটতে পারে। কিন্তু ঘটবে এটা সামনে নিয়েই এ্যালার্ট থাকি আমরা।’ জেনারেল মোস্তফা বলল।

‘অবশ্যই স্যার।’

‘ধন্যবাদ।’ বলে সালাম দিয়ে কল অফ করে দিয়েই জেনারেল মোস্তফা আহমদ মুসার দিকে চেয়ে বলল, ‘তাহলে মি. খালেদ খাকান, আমি উঠছি।’

‘আমিও উঠব। কিন্তু প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের একটা লে-আউট আমি চাই, জনাব।’ বলল আহমদ মুসা।

‘অবশ্যই এটা আপনার দেখা উচিত।’

বলেই জেনারেল মোস্তফা কম্পিউটার থেকে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের একটা লে-আউটের প্রিন্ট বের করে আহমদ মুসার হাতে দিয়ে বলল, ‘খেলাফত আমলের দোলমাবাসি প্যালেসই এখন প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ। প্রেসিডেন্ট যখন ইস্তাম্বুলে থাকেন, তখন এই প্রাসাদেই তিনি উঠেন। আগের লে-আউটের বড় ধরনের কোন পরিবর্তন হয়নি। আপনি দেখুন, কোন কিছু প্রশ্ন থাকলে ইসমত ইউসুফ ইনুনু উত্তর দিতে পারবে।’

‘ধন্যবাদ’ বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

উঠে দাঁড়াল জেনারেল মোস্তফাও।

দু’জনে এক সাথেই বেরিয়ে এলো।

গাড়ি বারান্দায় নেমে আহমদ মুসার সাথে হ্যান্ডশেক করে নিজের গাড়ীর দিকে এগোতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে বলল, ‘মি. খালেদ খাকান, সত্যিই আমি উদ্বিগ্ন বোধ করছি। ওদের হাত প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের ভেতরেও প্রবেশ করেছে।’

‘আল্লাহ হাফেজ, জেনারেল মোস্তফা।’

বলে আহমদ মুসা নিজের গাড়ির দিকে এগোলো।

প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের গেটে আহমদ মুসার গাড়ি ব্রেক করতেই একজন লোক, গোয়েন্দা অফিসারই হবে, ছুটে এলো আহমদ মুসার গাড়ীর জানালায়। আহমদ মুসা নিজের আইডি কার্ড তাকে দেখাতেই সে স্যালুট দিয়ে সরে দাঁড়িয়ে ইংগিতে গেট খুলে দিতে বলল।

আহমদ মুসার গাড়ি কার পার্কে দাঁড়াতেই একজন প্রোটোকল অফিসার ছুটে এলো। আহমদ মুসার গাড়ির দরজা খুলে স্বাগত জানিয়ে বলল, 'ইনুনু স্যার ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, আমি প্রোটোকল অফিসার আহমদ তুঘরিল।'

আহমদ মুসা গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো।

হাঁটতে লাগল প্রোটোকল অফিসার আহমদ তুঘরিলের সাথে।

কার পার্কের পরে প্রেসিডেন্ট ভবনের মূল ফটক। ফটকে বডি স্ক্যানিং এর ব্যবস্থা আছে। স্ক্যানিং মেশিনের ভেতর দিয়েই সকলকে যেতে হয়।

কিন্তু প্রোটোকল অফিসার আহমদ মুসাকে পাশের গ্রীল গেট দিয়ে নিয়ে গেল যে গেট শুধু প্রেসিডেন্টই ব্যবহার করেন।

প্রাসাদে প্রবেশ করল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা প্রাসাদের আশেপাশে যাদেরই দেখল, তাদের মধ্যে একটা ত্রস্ত ভাব।

'আপনাদের যে বার্ষিক গেট টুগেদার হচ্ছিল, সেটা কি চলছে? মি. ইসমত ইউসুফ ইনুনু কি ঐখানেই ব্যস্ত?' প্রোটোকল অফিসারকে জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'স্যার, মহামান্য প্রেসিডেন্ট হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তিনি গেট টুগেদার অনুষ্ঠনে আসছিলেন। আসার পথে হঠাৎ সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। তাঁকে সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে যেতে দেখে তার পিএস ও চারজন সিকিউরিটি অফিসারও সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। ইনুনু স্যার খবর পেয়ে ছুটে যান। তিনি বেন গালিব

গিদনকে ডাক্তার ডাকার জন্যে পাঠিয়ে দিয়ে কয়েকজনকে নিয়ে ধরাধরি করে প্রেসিডেন্টকে তার কক্ষে নিচ্ছিলেন। আমি তখন এসেছি আপনাকে রিসিভ...।'

প্রোটোকল অফিসারের কথা শুনে আহমদ মুসা একবারে বজ্রাহতের মতো হয়ে গেল। প্রবল উদ্বেগ-আতংকের ছায়া নেমেছে তার চোখে। রহস্যময় সেই চিঠির 'ঘুম'-এর কথা তার মনে পড়েছে। মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল সে।

পরক্ষণেই সম্বিৎ ফিরে পেয়ে প্রায় চিৎকার করার মতো কন্ঠে বলল, 'আমাকে প্রেসিডেন্টের কাছে নিয়ে চল। সেখানে মি. ইনুনুও নিশ্চয় আছেন। চলো, দৌড় দাও।'

প্রোটোকল অফিসার একবার আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে দৌড় দিল। আহমদ মুসাও তার পিছনে দৌড়াচ্ছে।

দৌড়াবার পথেই আহমদ মুসা এক জায়গায় দেখতে পেল পাঁচ ব্যক্তি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে আছে। চারজন অস্ত্রধারী, একজন নিরস্ত্র।

আহমদ মুসা থমকে দাঁড়ালো। বলল প্রোটোকল অফিসারকে লক্ষ্য করে, 'এঁরাই কি প্রেসিডেন্টের পিএস ও পাঁচ জন সিকিউরিটি?'

প্রোটোকল অফিসারও থমকে দাঁড়িয়েছে। বলল, 'হ্যাঁ, স্যার।'

আহমদ মুসা বসে পড়ে একজনের নাকের কাছে মুখ নিয়ে গন্ধ শুঁকার চেষ্টা করল।

গন্ধ শুঁকেই চমকে উঠল সে। যা সন্দেহ করেছিল। তাদের সংজ্ঞাহীন করে রাখা হয়েছে। যে গন্ধটা পেল তা এক ধরনের ক্লোরোফরম জাতীয় গ্যাস। এর বৈশিষ্ট্য হলো দূর থেকে ফায়ার করে গ্যাসটা বাতাসে ছড়িয়ে দিলে এক থেকে তিন মিনিটের মধ্যে কেউ এর সংস্পর্শে এলে সে ধীরে ধীরে তিন থেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে। ব্যাপারটা মানুষের কাছে অসুস্থ হয়ে পড়ার মতো দেখায়। আহমদ মুসা নিশ্চিত হলো, এটা বেন গালিব গিদনদেরই কাজ। তাহলে প্রেসিডেন্টের কি অবস্থা? ওরা ক্লোরোফরম বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে চুপ করে অবশ্যই বসে নেই। তাহলে কি করেছে ওরা?

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

উদ্বেগে আচ্ছন্ন তার মুখ। প্রোটোকল অফিসারকে বলল, ‘চল। প্রেসিডেন্টকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে?’

আবার ছুটতে লাগল প্রোটোকল অফিসার আহমদ তুঘরীল।

তারা প্রবেশ করেছে প্রেসিডেন্টের রেসিডেন্সিয়াল উইং-এ।

পেছনে পায়ের শব্দ শুনে মুখ ঘুরিয়ে দেখল, পোশাক পরা কয়েকজন সিকিউরিটির লোক ছুটে আসছে।

আরও কিছুটা এগিয়ে সুন্দর সাজানো একটা লাউঞ্জ পার হয়ে কয়েকটা ঘরের একটা সুন্দর ব্লক দেখতে পেল।

ফ্লোরটা তিন তলায় হতে পারে।

প্রোটোকল অফিসার বলল, ‘ঘরগুলোর সবই প্রেসিডেন্টের শয়নকক্ষ। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শয়নকক্ষে তিনি থাকেন।’

ঘরের সামনে তিনজন লোককে দাঁড়ানো এবং চারটি দেহ পড়ে থাকতে দেখল।

আরও কাছে এগিয়ে তারা দেখে বুঝল চারটি দেহই সংজ্ঞাহীন।

প্রোটোকল অফিসার বলল, ‘স্যার, প্রেসিডেন্টকে যারা ধরাধরি করে নিয়ে এসেছিল, সেই চীফ অব স্টাফ ইসমত ইউসুফ ইনুনু ও আরও চারজন সিকিউরিটির লোকও সংজ্ঞাহীন পড়ে আছে।

আহমদ মুসারা পৌছে গেল সেখানে।

আহমদ মুসা দাঁড়িয়েই দাঁড়ানো তিনজনের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, ‘প্রেসিডেন্ট কোথায়? দ্রুত ও শক্ত কন্ঠ আহমদ মুসার।

পেছন থেকে দৌড়ে আসা সিকিউরিটির লোক এসে দাঁড়িয়েছে। তারাও শুনতে পেল আহমদ মুসার প্রশ্ন।

তিনজনের একজনের হাতে ডাক্তারী ব্যাগ। সেই বলল, ‘মি. গিদন আমাকে ডাকতে গিয়েছিল অসুস্থ প্রেসিডেন্টকে এসে দেখার জন্যে। আমরা এসে প্রেসিডেন্টকে পাইনি। এঁদের পাঁচজনকে সংজ্ঞাহীনভাবে পড়ে থাকতে দেখতে পেলাম। প্রেসিডেন্টের পার্সোনাল স্টাফ এসে বলল, মুখে গ্যাস মাস্ক লাগানো ডাক্তারের মতো এ্যাপ্রোন পরা চারজন লোক প্রেসিডেন্টকে তুলে নিয়ে গেছে।’

থামল ডাক্তার, সে ইংগিত করে প্রেসিডেন্টের পার্সোনাল স্টাফকে দেখিয়ে দিয়েছিল।

'কোথায় তুমি তাদেরকে দেখছ?' আহমদ মুসার প্রশ্ন সেই পার্সোনাল স্টাফকে উদ্দেশ্য করে।

'লিফটের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল।' বলল লোকটি।

'তুমি চেন তাদের?'

'না।'

'তুমি তাদের ফলো করনি, অন্তত গেট পর্যন্ত?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'স্যার, আমাকে ওরা বলল, আমরা প্রেসিডেন্টকে নিয়ে যাচ্ছি। তুমি গিয়ে ডাক্তারকে ডেকে আন। তিনি অবশিষ্টদের ব্যবস্থা করবেন। আমি সংগে সংগেই ডাক্তারের খোঁজে চলে যাই। ডাক্তারকে না পেয়ে দ্রুত এখানে ফিরে এসে দেখি ডাক্তার সাহেব এখানে।'

আহমদ মুসা পাশে এসে সিকিউরটির লোকদের একজনকে বলল, 'আপনারা নিশ্চয় নিচের সিকিউরটি ক্যাম্প থেকে এসেছেন। সংজ্ঞাহীন প্রেসিডেন্টকে নিয়ে নিশ্চয় কেউ নিচে নামেনি? আমরা নিচ থেকে আসলাম। আমরা এটা দেখিনি।'

'গেটের দিকে যাবার পথেই আমাদের ক্যাম্প। কেউ নিচে যায়নি।'

'আর কোন গেট নেই?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'আছে, কিন্তু সেগুলো পার্মানেন্টলি বন্ধ। বন্ধ থাকলেও সে গেটগুলোতেও পাহারা আছে।' বলল সিকুউরিটিদের একজন।

'কিন্তু গেটগুলো তো কেউ খুলতেও পারে!' বলল আহমদ মুসা।

আমাদের সিকিউরিটি অফিস থেকে গেটগুলোকে সার্বক্ষণিক মনিটর করা হয়। আমরা এখানে আসার আগ পর্যন্ত গেটগুলো আমাদের পর্যবেক্ষণে ছিল। কিন্তু সেদিকে কেউ যায়নি।'

আহমদ মুসা এবার তাকাল ডাক্তার ও পার্সোনাল স্টাফ লোকটার মাঝখানে দাঁড়ানো লোকটার দিকে। আহমদ মুসা নিশ্চিত এই লোকটাই বেন গালিব গিদন। তবু আহমদ মুসা জিজ্ঞেস করল, 'আপনিই কি বেন গালিব গিদন?'

লোকটি ভীত ও বিস্মিত চোখে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'জি স্যার।'

'ওরা কোন্ দিকে যেতে পারে মি. গিদন?'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা স্যার। ডাক্তার আনতে গিয়েছিলাম। এসে দেখি এই অবস্থা।' বলল গিদন।

'গেটগুলো ছাড়া বাড়ি থেকে বেরুনোর আর কোন পথ আছে?'

'আমি জানি না স্যার। আমার মনে হয় সে রকম কোন ব্যবস্থা নেই।' বলল গিদন মুখটা নিচু রেখেই।

'তাহলে ওরা গেল কোন্ দিক দিয়ে?' বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা এখানে আসার আগে গাড়ীতে বসে যতটা সম্ভব প্রাসাদের লে-আউটের ওপর নজর বুলিয়েছে। গ্রাউন্ড মানে ফার্স্ট ফেজ লে-আউটের দক্ষিন-পূর্ব কোণের দিকে এক জায়গায় নিম্নমুখী একটা এ্যারো আঁকা আছে। এ ধরনের এ্যারো লে-আউটের অন্য আর কোথাও নেই। আর প্রেসিডেন্টের শয়নকক্ষের যে ব্লক, তা প্রাসাদের দক্ষিণ-পূর্ব এলাকাতেই। এখান থেকে বসফরাসের পানি ও তীর খুব বেশি দূরে নয়। লে-আউটের তীরটা এই দক্ষিণ-পূর্ব এলাকায় সুনির্দিষ্টভাবে কোন এলাকাকে মিন করছে তা বলা মুস্কিল।'

'এটাই এখন সবচেয়ে বড় রহস্যের স্যার।' বলল লোকটি।

'আপনার কাছেও এটা রহস্য?'

লোকটি চোখ তুলে চাইল আহমদ মুসার দিকে। তার চোখে-মুখে বিস্ময় ও ভয় দুইই! বলল, 'শুধু রহস্য নয় স্যার, সাংঘাতিক একটা রহস্য।'

'এ সময়টা মিথ্যা বলার সময় নয় মি. গিদন। কিছু জানলে সেটা বলুন।' বলল আহমদ মুসা নরম কন্ঠে।

লোকটির চোখ দু'টি চমকে উঠে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'স্যার আমি যা জানি তাই বলেছি।'

চারজন সিকিউরিটির লোকসহ সবার দৃষ্টি বেন গালিব গিদনের দিকে। সবার মনেই বিস্ময় কেন তাকে এভাবে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে! তাকে কি সন্দেহ করা হচ্ছে? কেন?

আহমদ মুসা পকেট থেকে রিভলবার বের করল। তাক করল তার দিকে। বলল, 'আমি কিন্তু এক কথা দু'বার বলি না। বল, প্রেসিডেন্টকে কিডন্যাপ করে কোন্ পথে নিয়ে যাওয়া হয়েছে?' শক্ত কন্ঠ আহমদ মুসার।

বেন গালিব গিদন ভয়ার্ত চোখে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। কিন্তু কোন কথা বলল না।

আহমদ মুসা তার চোখের দিকে তাকিয়েই বুঝল, এ থ্রি জিরোর কোন পাকা ক্যাডার নয়। 'থ্রি জিরো'র অনেককেই সে মুখোমুখি দেখেছে। তাদের চোখে ভয় থাকে না, থাকে হিংসার আগুন, ক্রোধের বহ্নি শিখা। ওদের কথা বলানো যায় না, একে কথা বলানো যাবে।

আহমদ মুসা আবার কথা বলল।

'আমি তিন গোণা পর্যন্ত সময় দিলাম।'

বলেই আহমদ মুসা গুণতে লাগল, এক দুই...।

বেন গালিব গিদন চিৎকার করে কেঁদে উঠল, 'আমি কিছুই জানিনা। আমাকে...।'

আহমদ মুসার তর্জনি ট্রিগারে চেপে বসল। একটি গুলি বেরিয়ে গিয়ে বেন গিদনের কব্জির নিচে হাতের তালুর ওপরের একটা অংশ খাবলা দিয়ে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

সে চিৎকার করে কব্জি চেপে ধরল।

চমকে উঠল উপস্থিত সবাই। ভীত-বিব্রত সবাই। কিন্তু আহমদ মুসাকে কিছু বলতে সাহস পাচ্ছে না কেউ। তারা মনে করছে সে এ ব্যাপারে নিশ্চয় দায়িত্বপ্রাপ্ত কেউ।

আহমদ মুসার রিভলবারের নল একটুও নড়েনি। বলল কঠোর কন্ঠে, 'গুলিটা তোমার কব্জি টেস্ট করেছে। যা জিজ্ঞেস করেছি তার উত্তর না দিলে এবার মাথা গুঁড়ো করে দেব।'

আহমদ মুসার রিভলবারের নল উঠতে লাগল তার মাথা লক্ষ্যে।

'আমি বলছি, আমি বলছি স্যার।'

চিৎকার করে বলল বেন গালিব গিদন।

কান্নায় ভেঙে পড়ল সে। বলতে লাগল, 'ওরা সুড়ঙ্গ পথে এসেছিল। প্রেসিডেন্টের পারসোনাল সিকিউরিটি অফিসার এক লাখ ডলারের বিনিময়ে সুড়ঙ্গের মুখ ভেতর থেকে খুলে দিয়েছিল। আমিই তাকে টাকাটা দিয়েছিলাম। ঐ সিকিউরিটি অফিসারই তাকে দেয়া গ্যাসটিউব স্প্রেয়ার থেকে ক্লোফরম স্প্রে করেছিল।'

'সুড়ঙ্গের মুখ কোথায়?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'প্রেসিডেন্টের বেড রুম ব্লকের ঠিক কেন্দ্রে বিশাল স্টিল লকারের মধ্যে।' বলল বেন গালিব গিদন।

'প্রেসিডেন্টের সে সিকিউরিটি অফিসারের নাম কি?' আহমদ মুসা বলল।

'সোলেমান আফেন্দী।'

বলে সামনে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে থাকা চারজন সিকিউরিটি অফিসারের একজনকে দেখিয়ে দিল সে।

মোবাইল বেজে উঠল আহমদ মুসার।

মোবাইল পকেট থেকে বের করে স্ক্রীনের দিকে একবার তাকিয়ে মুখের কাছে তুলে নিয়ে সালাম দিয়ে বলল, 'জেনারেল মোস্তফা, সব শুনেছেন। আমি আসার পূর্বক্ষণে ঘটনা ঘটেছে। প্রেসিডেন্টকে সংজ্ঞাহীন করে কিডন্যাপ করা হয়েছে। তার সাথে আটজন সিকিউরিটি অফিসারও সংজ্ঞাহীন। সিকিউরিটি অফিসার সোলেমান আফেন্দী বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সেই সুড়ঙ্গ পথ খুলে দিয়েছে।'

'প্রেসিডেন্টকে সুড়ঙ্গ পথে নিয়ে গেছে? তাহলে তো গোটা বসফরাস ও তীরবর্তী সব রাস্তা বন্ধ করে দিতে হবে। এখন আপনি কি করছেন? আমরা আর কি করব? প্রেসিডেন্ট কিডন্যাপ হয়েছেন এই সংবাদটাকে গোপন রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে।' ভীত, উদ্বেগ-ভরা কন্ঠে বলল জেনারেল মোস্তফা।

সুড়ঙ্গ দিয়ে কিডন্যাপের কথাটা বেন গালিব গিদনের কাছ থেকে বের করেছি। সোলেমান আফেন্দীর নামও সেই বলেছে। শুনুন...।'

‘ধন্যবাদ মি. খালেদ খাকান। তাকে যে আপনি এত তাড়াতাড়ি কথা বলাতে পেরেছেন।’ বলল জেনারেল মোস্তফা।

‘কথা বলাবার জন্যে তাকে গুলী করে আহত করতে হয়েছে। যাক। শুনুন, আমি সুড়ঙ্গে প্রবেশ করছি। আপনারা সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে পালাবার সব পথ বন্ধ করে দিন। এ পর্যন্ত সব মিলিয়ে মিনিট সাতেক সময় গেছে। ওরা নিশ্চয় সুড়ঙ্গ থেকে বের হতে পারেনি।’

‘ধন্যবাদ মি. খালেদ খাকান, সিকিউরিটি অফিসারদের কাউকে নিয়ে আপনি সুড়ঙ্গে নামুন।’ বলল জেনারেল মোস্তফা।

‘সুড়ঙ্গ দিয়ে এগোতে হবে ওদের অলক্ষ্যে। ওদের টের পেতে দেয়া যাবে না। ওরা নিশ্চয় সুড়ঙ্গ পথকে বিপজ্জনক করে গেছে। সুড়ঙ্গে ওদের সাথে লড়াই করা যাবে না। কারণ ওদের হাতে প্রেসিডেন্ট আছেন। ওখানে নিরব লড়াইয়ের প্রয়োজন হবে। সুতরাং লোক বেশি নিয়ে লাভ নেই। ওদের অস্ত্রে ওদের ঘায়েল করব, এটাই হবে আমাদের চেষ্টা।’

‘ধন্যবাদ, মি. খালেদ খাকান। আপনার সিদ্ধান্তই ঠিক। প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা আমাদের কাছে সবচেয়ে বড়।’ বলল জেনারেল মোস্তফা।

‘আরেকটা বিষয়, সুড়ঙ্গ কি একমুখী, না এর শাখা-প্রশাখা আছে?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘আমি সুড়ঙ্গে কোনদিন প্রবেশ করিনি। তবে জানি, সুড়ঙ্গটা একমুখী। কিন্তু ধাঁধা সৃষ্টির জন্যেই এর ব্লাইন্ড শাখা-প্রশাখা রয়েছে।’ বলল জেনারেল মোস্তফা।

‘ধন্যবাদ, জেনারেল মোস্তফা। আর কিছু?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘আর কি বলব! প্রধানমন্ত্রী শুনে কেঁদে ফেলেছেন। তিনি বলেছেন উপরে আল্লাহ এবং তাঁর বান্দা খালেদ খাকানই আমাদের ভরসা। আল্লাহ আপনাকে সব সময় সাহায্য করেছেন। এই কঠিন বিপদেও তিনি আপনাকে, আমাদেরকে সাহায্য করুন। পুলিশপ্রধান ও অন্যরা দুই-এক মিনিটের মধ্যেই প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে পৌছে যাবেন। আমি এদিকটা দেখব।’

‘আল্লাহ সহায়। আসসালামু আলাইকুম।’

আহমদ মুসা কল অফ করে দিল।

তাকাল আহমদ মুসা সিকিউরিটি অফিসারদের দিকে। বলল, ‘তোমরা একজন এখনই এই বেন গালিব গিদন ও সোলেমান আফেন্দীকে গ্রেফতার কর। আর দু’জন যাও সুড়ঙ্গের মুখ ঠিক আছে কিনা দেখ। অন্যজন আমাকে ওখানে নিয়ে চল।’

সিকিউরিটি অফিসারদের চারজনেই পা ঠুকে আহমদ মুসাকে স্যালুট দিল।

আহমদ মুসা ব্যাগ খুলে একবার চেক করল তার গ্যাস মাস্ক, অত্যাধুনিক গ্যাস গান মাল্টি ডিটেক্টর, নাইট ভিউ গগলস, হিউম্যান বডি ওয়েভ, সেঞ্জিং মনিটর ইত্যাদি সব ঠিক আছে কিনা।

# ৬

সুড়ঙ্গের মুখ থেকে পঁয়ষট্টি এবং প্রায় পঁয়তাল্লিস ডিগ্রি কৌণিক পথে সিঁড়ি দিয়ে নামার পর সমতল সুড়ঙ্গ পেয়ে গেল আহমদ মুসা। হেঁটে চলার মতো যথেষ্ট বড় আয়তনের সুড়ঙ্গটি।

ওপরে-নিচে পাশে সব দিকেই পাথরের দেয়াল।

নিকশ অন্ধকার।এক সময় হয়তো আলোর বন্দোবস্ত ছিল। এখন নেই।

সুড়ঙ্গের সমতলে এসে আহমদ মুসা থমকে দাঁড়িয়েছে।

সামনে পা ফেলার আগে তার মনে হলো, শত্রুরা শুধুই চলে যায়নি, তাদের যাতে কেউ ফলো করতে না পারে সেজন্যে তারা অবশ্যই কিছু করেছে বা করবে। কি করতে পারে? বিস্ফোরক পাততে পারে। গ্যাস ছাড়তে পারে। বাইলেনগুলোতে চোরাগুপ্তা হামলার জন্যে পাহারা বসাতে পারে।

আহমদ মুসা গ্যাস-মাস্ক পরে আছে। সুতরাং গ্যাস তার জন্যে কোন সমস্যা নয়। মাল্টি ডিটেক্টর তার হাতে আছে। এ ডিটেক্টর বিস্ফোরক যে কোন অবস্থায় থাক ডিটেক্ট করতে পারে। হিউম্যান বডি-ওয়েভ সেঞ্জিং মনিটরটি আহমদ মুসা জুড়ে দিয়েছে বিস্ফোরক ডিটেক্টরের সাথে। এর ফলে দু'টি বিষয়কে এক সাথে মনিটর করা যাবে।

আহমদ মুসা চলতে শুরু করল। তার দৃষ্টি বিস্ফোরক ডিটেক্টর ও হিউম্যান বডি ওয়েভ সেঞ্জিং মনিটরের দিকে। দ্রুত এগোচ্ছে আহমদ মুসা।

ওরা কি সুড়ঙ্গ থেকে বের হতে পেরেছে? মনে হয় না। প্রেসিডেন্টকে কিডন্যাপ করার পর তারা এ পর্যন্ত যে সময় পেয়েছে, তাতে তারা সুড়ঙ্গের অর্ধেক পথ পার হতে পারে। সুতরাং তারা যখন সুড়ঙ্গের প্রান্তে পৌঁছবে তখন নিশ্চয় উদ্ধার অভিযানের জন্যে সেনা সদস্য ও পুলিশ মোতায়েন হয় যাবে। সুতরাং প্রেসিডেন্টকে নিয়ে তাদের সরে পড়া অবশ্যই সম্ভব হবে না। তখন তারা কি

পদক্ষেপ নেবে সেটাই চিন্তার বিষয়। কারণ এর সাথে প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তার বিষয় জড়িত আছে।

সুড়ঙ্গের অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছে আহমদ মুসা। কতটা পথ বলা মুস্কিল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তার মনে হলো অর্ধেকটা পথ সে অবশ্যই পার হয়েছে। সংগে সংগেই চমকে উঠল আহমদ মুসা। তার মানে ওরা সুড়ঙ্গের বাইরের প্রান্তে পৌছে গেছে। যে কোন ঘটনার সময় তাহলে আসন্ন।

আহমদ মুসা তাকাল হিউম্যান সেঞ্জিং মনিটরের দিকে। কিন্তু স্ক্রিনটা অন্ধকার। তার মানে কোন হিউম্যান বডি তার রেঞ্জের মধ্যে আসেনি।

যতটা সম্ভব একই দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে আহমদ মুসা।

হঠাৎ সংগে সংগে কয়েকটা ধাতব সংঘর্ষের শব্দ কানে এলো আহমদ মুসার। শব্দগুলো কানে পৌঁছতেই আহমদ মুসা ডান দিকে কাত হয়ে পড়ে গেল সুড়ঙ্গের দেয়ালে।

কিন্তু দেরী করে ফেলেছিল আহমদ মুসা। খেসারত দিতে হলো বাম বাহুকে। কাঁধের সন্ধিস্থলের বাহু-মাস্‌লের একটা অংশ উড়ে গেল।

হাত থেকে পড়ে গেল স্টিকটা।

অবিরাম গুলী আসছে।

আহমদ মুসা শুয়ে পড়েছিল সুড়ঙ্গের ফ্লোরের একপাশে।

গুলীগুলোর সবই সুড়ঙ্গের ফ্লোরের এক-দেড় ফুট ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে।

আহমদ মুসা শুয়ে থেকেই স্টিকটা টেনে তার মাথায় সেট করা হউম্যান বডি সেঞ্জিং মনিটরের দিকে তাকাল। দেখল ১০০ মিটার সংখ্যাটি ফ্লাশ করছে। তার মানে ওরা একশ' মিটার দূরত্বে অবস্থান করছে। নিশ্চয় ওরাও তাদের সেঞ্জিং মনিটরে আহমদ মুসার অবস্থান চিহ্নিত করেছে। তার অবস্থান টের পেয়েই তারা গুলী ছুঁড়ছে।

আহমদ মুসা শুয়ে থেকেই ব্যাগ থেকে ব্যান্ডেজ-কটনের একটা বড় টুকরা বের করে বাম বাহুটা বেঁধে নিল।

ইতিমধ্যে গুলীবর্ষণ কমে এসেছিল।

আহমদ মুসা ক্রলিং করে এগোবার সিদ্ধান্ত নিল। গুলী যেহেতু ফ্লোরের এক-দেড় ফুট ওপর দিয়ে যাচ্ছে, তাই ক্রলিং করে সে এগোতে পারে।

বাড়তি সতর্কতা হিসাবে আহমদ মুসা ব্যাগ থেকে বুলেট-প্রুফ হেড কভার বের করে মাথায় পরে নিল। মুখে গ্যাস-মাস্ক থাকায় হেড কভারটা সেট করতে একটু অসুবিধা হলেও মোটামুটি সেট হয়ে গেল।

ক্রলিং করে এগোতে লাগল আহমদ মুসা।

আট-দশ ফুট এগোতেই আবার গুলী বৃষ্টি বেড়ে গেল।

আহমদ মুসা কিন্তু থামল না। এগোতেই লাগল।

আহমদ মুসা পাল্টা গুলী করতে পারছিল না। কারণ ওদের সাথে প্রেসিডেন্ট আছেন। কোনক্রমেই তার নিরাপত্তাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলা যাবে না।

আরও বিশ বাইশ মিটার চলার পর আহমদ মুসার মোবাইল বেজে উঠল।

থমকে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

মোবাইল বের করে কল অন করতেই ওপার থেকে জেনারেল মোস্তফার উদ্বিগ্ন কন্ঠ শুনতে পেল আহমদ মুসা। বলছিল সে, 'মি. খালেদ খাকান, আপনি ঠিক আছেন? কোন্ অবস্থানে আপনি?'

'আমি ভালো আছি। আমি সুড়ঙ্গে ওদের থেকে ৭০ মিটার দূরে, গুলী বৃষ্টির মধ্যে ক্রলিং করে এগোচ্ছি।' বলল আহমদ মুসা।

'খুব সাবধান, মি. খালেদ খাকান। আপনার নিরাপত্তা কিন্তু আমাদের কাছে খুব বড় বিষয়। এদিকে কিন্তু মহাসংকট! আমরা সুড়ঙ্গ এলাকাসহ গোটা বসফরাস অঞ্চল বন্ধ করে দিয়েছি। ওরা সম্ভবত সুড়ঙ্গের মুখের কাছাকাছি কোথাও অবস্থান করছে। পাঁচ মিনিট আগে ওরা দু'ঘন্টার আল্টিমেটাম দিয়েছে। এ সময়ের মধ্যে একটা হেলিকপ্টারে বিজ্ঞানী ড. আমির আব্দুল্লাহ আন্দালুসি ও খালিদ খাকানকে নিয়ে সুড়ঙ্গ গেটে পৌঁছাতে হবে। হেলিকপ্টারে করে যাবার পথে তারা কোন নিরাপদ স্থানে পৌঁছে প্রেসিডেন্টকে মুক্তি দেবে। তারা কোন নিরাপদ স্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত আকাশে কোন বিমান হেলিকপ্টার উড়লে, তাদের ফলো করলে তারা প্রেসিডেন্টসহ হেলিকপ্টার ক্রাশ করবে। আর দু'ঘন্টার মধ্যে হেলিকপ্টার সুড়ঙ্গ মুখে না পৌঁছলে তারা প্রেসিডেন্টকে সেখানেই হত্যা করবে,

এবং সেই সাথে 'নিরব ধ্বংসের দৈত্য' নামের মারণাস্ত্র ঝাঁপিয়ে পড়বে ইস্তাম্বুলের ওপর। এসব আপনি আরও ভালো বুঝবেন। এখন আমরা উভয় সংকটে! প্রেসিডেন্টের জীবনকে কোনভাবেই আমরা ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে পারি না। এখন বলুন, আপনার পরামর্শ কি?' জেনারেল মোস্তফা কামাল বলল।

'ওরা যা বলেছে তাই করবে। চিনি আমি ওদের। আপনারা তাদের দাবি মেনে নিন। বলুন যে, খালেদ খাকানকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সম্ভবত সুড়ঙ্গে ঢুকেছে। তাকে লোকেট করার আমরা চেষ্টা করছি। তাকে পেলেই আমরা তাকেসহ বিজ্ঞানীকে হেলিকপ্টারে করে সুড়ঙ্গে মুখে পৌঁছাব।' বলল আহমদ মুসা।

'ওদের দাবি আমরা মেনে নেব? আপনিই এটা বলছেন? আর কোন পথ নেই?' বলল জেনারেল মোস্তফা ভাঙা গলায়। তার কন্ঠে কান্নার সুর।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'আল্লাহর উপর ভরসা হারানো আমাদের ঠিক নয়। এখনও এক ঘন্টা পঞ্চান্ন মিনিট আমদের হাতে আছে। এ সময়ে অনেক কিছুই ঘটতে পারে।'

'স্যরি। আল্লাহর উপর আমাদের ভরসা আমাদের আছে। বরাবরের মতো আপনার কাছেও আমাদের অনেক আশা। এই ১ ঘন্টা ৫৫ মিনিট সময়ের জন্যে আপনি কি ভাবছেন? আমদের কি করণীয় বলে আপনি মনে করেন?' বলল জেনারেল মোস্তফা।

'প্রেসিডেন্ট ওদের হাতে থাকায় পরিস্থিতির উপর কমান্ড ওদের হাতে। প্রেসিডেন্টকে উদ্ধার করার যে কোন অভিযান ঝুঁকিপূর্ণ দু'দিক থেকেই। ওরা প্রেসিডেন্টকে হত্যা করতে পারে, আবার আমাদের আক্রমণেও প্রেসিডেন্টের ক্ষতি হতে পারে। প্রেসিডেন্টকে উদ্ধারের জন্যে এমন একটা পদ্ধতি দরকার যাতে প্রেসিডেন্টের কোন ক্ষতি হবে না, আবার ওরাও প্রেসিডেন্টের ক্ষতি করার কোন সুযোগ পাবে না।' বলল আহমদ মুসা।

'এমন পদ্ধতিটা কি? গ্যাস-বোম, গ্যাস-বুলেট, গ্যাস-স্প্রে এই ধরনের অস্ত্র এক্ষেত্রে নিরাপদ। কিন্তু ওদের গ্যাস-মাস্ক আছে এটা নিশ্চিত। সুতরাং এ

ধরনের কোন অস্ত্র কাজে আসবে না। আপনি কি অন্য কোন রকম কোন অস্ত্রের কথা চিন্তা করছেন?' বলল জেনারেল মোস্তফা।

'নার্ভ গ্যাসের তিনটি প্রকার খুব বেশি পরিচিত। সেগুলো হলো এনজি-১, এনজি-২ ও এনজি-৩। এই তিনটি নার্ভ গ্যাসই ভয়ংকর। প্রথমটি মানুষের মৃত্যু ঘটায়, দ্বিতীয়টি মানুষকে পঙ্গু করে দেয় এবং তৃতীয়টি মানুষের চিন্তা ও চলচ্ছক্তি বহুদিনের জন্যে অচল করে দেয়। কিন্তু আরেকটা নার্ভ গ্যাস আবিষ্কৃত হয়েছে, যাকে এনজি-৪ বলা হচ্ছে। এই গ্যাস-অস্ত্র ওগুলোর মতো ক্ষতিকর নয়। মানুষের মস্তিষ্কের ওপর এর কোন ক্রিয়া নেই। এই নার্ভ গ্যাসের ব্যবহারে মানুষের চলচ্ছক্তি, কাজ করার শক্তি কয়েক ঘন্টার জন্যে রহিত হয়ে যায়। এই সময় তার হাত-পা একেবারেই অকার্যকর থাকে। কিন্তু চিন্তা-চেতনা পরিষ্কার থাকে। কথাও স্বাভাবিকভাবে সে বলতে পারে। আমি এ অস্ত্রের কথাই চিন্তা করছি। এই অস্ত্রের বড় গুণ হলো, গ্যাস-মাস্ক এক্ষেত্রে অকার্যকর। এই গ্যাস মানুষের যে কোন ধরনের পোশাক ভেদ করে লোমকূপ দিয়ে দেহে প্রবেশ করে।' আহমদ মুসা থামল।

'আলহামদুলিল্লাহ! ধন্যবাদ মি. খালেদ খাকান, আপনি সুন্দর একটা সন্ধান দিয়েছেন। এই নার্ভ উইপন আমাদের ডিপার্টমেন্টে নেই। সেনাবাহিনীর আছে কি না তা বলতে পারছি না। আমি এখনি খোঁজ নিচ্ছি। আমি আপনাকে এখনি জানাচ্ছি মি. খালেদ খাকান।'

বলে সালাম দিয়েই কল অফ করে দিল জেনারেল মোস্তফা।

আহমদ মুসাও কল অফ করে দিয়ে আগের মতোই ক্রলিং করে সামনে এগোতে লাগল। ওদের দাবি মেনে নেয়ার ঘোষণা দেয়ার আগেই ওদের থেকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে তাকে পৌঁছতে হবে।

মিনিট পাঁচেক পরেই আবার আহমদ মুসার মোবাইল পকেটে নাচা-নাচি শুরু করে দিল।

আহমদ মুসা নিয়ে কল অন করে সালাম দিতেই ওপার থেকে জেনারেল মোস্তফার গলা পেল।

সালামের উত্তর দিয়েই সে বলল, 'আলহামদুলিল্লাহ, মি. খালেদ খাকান। এনজি-৪ নার্ভ গ্যাস মাত্র সপ্তাহ খানেক আগে 'স্যাম্পল' হিসেবে সেনাবাহিনীর হাতে এসেছে। তারা মাত্র দু'বার এর টেস্ট করেছে। কিন্তু তারা বলেছে, এ নার্ভ গ্যাস দূর থেকে স্প্রে করা যায় না। এর বুলেট কিংবা বোমাও তৈরী হয়নি। এর পাইপ গানের রেঞ্জ মাত্র কয়েক মিটার। এখন...।'

'হ্যাঁ, জেনারেল মোস্তফা, সর্বোচ্চ ২৫ মিটার দূর থেকে এটা ছোঁড়া যায়।' জেনারেল মোস্তফার কথার মাঝখানেই বলে উঠল আহমদ মুসা।

'আপনি এত ডিটেইল জানেন? ওরা তো বলল, আবিষ্কারের পর মাত্র মাস দুয়েক হলো এর সফল টেস্ট হয়েছে। দুনিয়ার অধিকাংশ সেনাবাহিনী নাকি এর এখনও খোঁজই জানে না! আপনি কি করে জানলেন ওরা বিস্ময় প্রকাশ করেছে!' বলল জেনারেল মোস্তফা।

'থাক, ওসব কথা জেনারেল মোস্তফা। এখন জেনারেল মোস্তফা, এ ব্যাপারে আপনাদের চিন্তা বলুন।' আহমদ মুসা বলল।

'হ্যাঁ, ওদের সাথেও আমার আলাপ হয়েছে মি. খালেদ খাকান। ওরা আপনার সাথে একমত যে, প্রেসিডেন্টকে নিরাপদে উদ্ধারের জন্যে এই নার্ভ গ্যাসের ব্যবহারই একমাত্র পথ। কিন্তু গুহামুখের যে অবস্থান, তাতে ওদের নজর এড়িয়ে ওদের অতটা কাছে যাওয়া সম্ভব নয়। আরেকটা হতে পারে ওদের দাবি মেনে নিয়ে ওদেরকে হেলিকপ্টার সরবরাহের ছলে ওখানে নেমে এই নার্ভ গ্যাসের ব্যবহার করা। কিন্তু হেলিকপ্টারকে যেখানে ল্যান্ড করতে হবে, সেখানে থেকে সুড়ঙ্গ মুখের দূরত্ব এতটা যে, হেলিকপ্টারে বসে এ অস্ত্র ব্যবহার করা যাবে না। হেলিকপ্টার থেকে বের হয়ে সামনে এগিয়ে সে অস্ত্রের ব্যবহার করতে গেলে কিডন্যাপকারীদের নজরে পড়তে হবে এবং তাতে প্রেসিডেন্টের জীবন বিপন্ন হতে পারে। এই অবস্থায় সবার মত হল, কিছু করা আপনার পক্ষেই শুধু সম্ভব। অবশ্য সুড়ঙ্গের স্বল্প পরিসর জায়গায় গুলী বৃষ্টির মধ্যে সামনে এগোনো যে বিপজ্জনক, সেটা আমরা ভেবেছি। তবু...।'

জেনারেল মোস্তফার কথার মাঝখানেই আহমদ মুসা বলে উঠল, 'আমি এগোবার চেষ্টা করছি এবং এগোচ্ছি। কিন্তু এনজি-৪ পাইপগান এখানে আমার কাছে পৌঁছার ব্যাপারে কি চিন্তা করেছেন?'

'এনজি-৪ পাইপগান নিয়ে দু'জন কমান্ডো যাবে, আমরা চিন্তা করেছি।' বলল জেনারেল মোস্তফা।

'কিন্তু তারা যদি গুলী খেয়ে মারা যায়? সুড়ঙ্গের শেষ বাঁক থেকে সুড়ঙ্গ মুখ পর্যন্ত একশ' পচিশ মিটার জায়গাটা খুবই বিপজ্জনক। সুড়ঙ্গ এখানে একেবারে সোজা। তার ওপর বাঁকের পরের কিছুটা জায়গা উঁচু, মানে সামনের দিকে গড়ানো। এখানে এসে বেশ কয়েকটা ফ্লোরকে হিট করেছে। ভাগফল, বিপজ্জনক ঐ এলাকার একেবারে শেষ প্রান্তে এলে তারা আমার সন্ধান পায় হিউম্যান বডি সেঞ্জিং মনিটরের মাধ্যমে। তবু আমাকে গুলী খেতে হয়েছে। আহত হওয়ার মাধ্যমে আমি বেঁচে গেছি। কিন্তু এখন ঐ বিপজ্জনক এলাকা অতিক্রম করা তাদের জন্যে কঠিন হবে। এই অনিশ্চয়তার ওপর আমাদের উদ্ধার মিশন তো নির্ভর করতে পারে না!'

থামল আহমদ মুসা।

'স্যরি, মি. খালেদ খাকান, আপনি যে গুলীবিদ্ধ আপনি সেটা আমাদের জানান নি। আমরা...।'

আহমদ মুসা জেনারেল মোস্তফার কথায় বাধা দিয়ে বলল, 'এই বিষয় এখন আমাদের আলোচ্য নয়। আল্লাহ বাঁচিয়ে রেখেছেন, এটাই বড় কথা।' এখন বলুন, জেনারেল মোস্তফা, ডল রোবট আপনারা পাঠাতে পারবেন কি না। ওগুলো তো দূর নিয়ন্ত্রিত, বাঁকা পথেও তাকে চালানো যায়।'

'ইউরেকা, ইউরেকা, পেয়েছি, পাওয়া গেছে পথ! ধন্যবাদ আপনাকে মি. খালেদ খাকান। কয়েক কিলোমিটার দূরে পাঠনো যায় দূর নিয়ন্ত্রিত এমন রোবট যন্ত্র আমাদের আছে। এখনই ব্যাবস্থা করছি। কয়েকটা রোবটকে আমরা পাঠাব।' বলল জেনারেল মোস্তফা উচ্ছ্বসিত কন্ঠে।

'ধন্যবাদ, জেনারেল মোস্তফা। এখন কয়েকটা কথা শুনুন। প্রথম কথা হলো, এখনই আপনারা এনজি-৪ পাইপগানসহ কয়েকটা রোবট যন্ত্র পাঠিয়ে

দেবেন। দুই. সুড়ঙ্গ মুখ অর্থাৎ তাদের অবস্থান পর্যন্ত এখনও আমার সামনে ৫০ মিটার পথ। ওদেরকে এনজি-৪ পাইপগানের রেঞ্জে আনতে হলে আমাকে আরও ২৫ মিটার এগোতে হবে। আমি এই পঁচিশ মিটার পথ এগোবার পর এবং এনজি-৪ পাইপগান হাতে পাওয়ার পর আপনারা ওদের দাবি মানার ঘোষণা দেবেন। দাবি মানার ঘোষণা আগে এলে আমার সামনে এগোনোটা চুক্তির খেলাফ হবে। ওদের দাবি মানার পর আমি আর সামনে এগোবো না। তাহলে ওরা নিশ্চিত হবে সব দিক থেকেই আমরা অফেনসিভ কাজ বন্ধ করেছি। ওরা নিশ্চিত হবার ফলে অসতর্কও হবে। এর দশ মিনিট পর এনজি-৪ ব্যবহার করব। তৃতীয়ত. আমি এনজি-৪ ব্যবহার করার দশ মিনিট পর আপনারা হেলিকপ্টার নিয়ে সুড়ঙ্গ মুখে ল্যান্ড করবেন। চতুর্থত. ওদের দাবি মেনে নিলে ওরা নিশ্চয় শর্ত দেবে যে, ওদের একজন বা দু'জন হেলিকপ্টারের ভেতরের অবস্থা দেখার এবং আমাকে ও বিজ্ঞানীকে বেঁধে নিষ্ক্রিয় করে রাখার জন্যে। হেলিকপ্টার ল্যান্ড করলে ঐ রকম শর্ত যদি না দেয় অথবা কেউ যদি হেলিকপ্টারে না যায়, তাহলে ধরে নিতে হবে এনজি-৪ তার মিশন সম্পূর্ন করেছে। তখন...।'

আহমদ মুসাকে বাধা দিয়ে জেনারেল মোস্তফা বলে উঠল, 'কিন্তু খোদা না খাস্তা, যদি এনজি-৪ কার্যকরী না হয়, তাহলে কি হবে?'

'আমি এক দিকের বিকল্প বলেছি। খোদা না করুক, আমার দিক থেকে যদি কোন সাড়া না পান, তাহলে এটাই হবে আপনাদের কাজ। অন্যদিকে আগে ঘটেছে, কি করতে হবে আমিই সেটা আপনাদের জানাব।' বলল আহমদ মুসা।

'আল্লাহ সে ধরনের পরিস্থিতি আনবেন না। আমরা আপনার কলের অপেক্ষা করব।' জেনারেল মোস্তফা বলল।

'ওকে, আসসালামু আলাইকুম।'

ওপার থেকে, 'খোদা হাফেজ, ওয়া আলাইকুম সালাম।' শুনতে পেল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা কল অফ করে মোবাইল পকেটে রেখে কিছুক্ষণ চোখ বুজে রেস্ট নিল। তারপর শুরু করল আবার ক্রলিং।

এবার গতি দ্রুত করল আহমদ মুসা।

আবারও গুলী বর্ষণ শুরু হলো।

গুলী বৃষ্টি চলতে লাগল এবার অঝোর ধারায়।

আহমদ মুসার ভাগ্য ভালো এ জায়গাটা একটু উচু হয়ে সামনের দিকে গেছে। ফলে গুলীগুলো আরও একটু নিরাপদ দূরত্ব দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। সামনে কোথাও যদি এর বিপরীত হয় মানে ফ্লোরটা নিচু হয়, তাহলেই বিপদ ঘটতে পারে।

এরকম কিছু ঘটলো না। আহমদ মুসা সামনে এগিয়েই চলল।

আহমদ মুসার মোবাইল নড়েচড়ে উঠল।

কল এসেছে।

উদ্বিগ্ন হলো আহমদ মুসা, জেনারেল মোস্তফার কল কেন আবার!

দেহের ভারটা ডান পাশে নিয়ে সামনে এগোনো অব্যাহত রেখেই আহমদ মুসা কষ্ট করে আহত বাম হাত দিয়েই মোবাইল বের করে স্ক্রীনের দিকে তাকিয়েই থমকে গেল। জোসেফাইনের টেলিফোন।

টেলিফোন মুখের কাছে নিয়ে সালাম দিয়ে আহমদ মুসা জোসেফাইনকে কথা বলার সুযোগ না দিয়েই বলল, 'আমি ভালো আছি, ডার্লিং জোসেফাইন! এক ঘণ্টা পর ইনশাআল্লাহ তোমার সাথে কথা বলল। দোয়া করো। ভালো থেকো।'

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই ওপার থেকে জোসেফাইন বলল, 'আল্লাহ হাফেজ! আসসালামু আলাইকুম।' জোসেফাইনের কন্ঠ ভারী। ভারী কন্ঠ কাঁপছিল তার।

'ওয়া আলাইকুম সালাম!' বলে আহমদ মুসা কল অফ করে দিল।

মনটা খারাপ হয়ে গেল আহমদ মুসার। জোসেফাইনের কম্পিত ভারী কন্ঠ তার সমগ্র চেতনায় একটা যন্ত্রনার সৃষ্টি করেছে।

মূহুর্তের জন্যে চোখ বন্ধ করল। মনে মনে বলল, 'সব অবস্থায় একমাত্র মহান আল্লাহরই সব প্রশংসা।'

আহমদ মুসা তার এগোনোর গতি আরও দ্রুত করল। আবৃত হাতটাকেও পুরোপুরি কাজে লাগাল।

একে তো ভ্যাপসা গরম। তার ওপর পরিশ্রম ও আহত বাহুর ওপর বাড়তি চাপ- সব মিলিয়ে ঘামে গোসল হয়ে গেছে আহমদ মুসার।

এক জায়গায় এসে আবার থমকে গেল আহমদ মুসা। হঠাৎ এখানে এসে সুড়ঙ্গের ফ্লোর উটের পিটের মতো ফুলে উঠেছে। গুলীগুলো প্রায় তার গা ছুঁয়েই বেরিয়ে আসছে। গুলী চলা অবস্থায় আর এক ইঞ্চিও সামনে এগোনো সম্ভব নয়।

হতাশ হয়ে আহমদ মুসা গা এলিয়ে দিল সুড়ঙ্গের ফ্লোরের ওপর। হতাশ হলেও আশার আলো একটা রয়েছে। সে থেমে গেলে গুলীও থেমে যাবে, অন্তত কমে যাবে। তার সুযোগ সে নিতে পারবে।

মন কিছুটা প্রসন্ন হলো।

আর কত দূরে সে ২৫ মিটার রেঞ্জ থেকে?

হিউম্যান বডি সেঞ্জিং মনিটরটা সে টেনে নিল। তার স্ক্রিনের ওপর চোখ পড়তেই আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল আহমদ মুসার চোখ। ২৫ মিটারের বেশি জায়গা সে অতিক্রম করে এসেছে। সামনে আর মাত্র ২৪ মিটার বাঁকি।

আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল আহমদ মুসা, ঠিক জায়গায় আল্লাহ থামিয়ে দিয়েছেন তাকে।

এবার আহমদ মুসার দৃষ্টি প্রসারিত হলো পেছনের নিকশ কালো অন্ধকারের দিকে।

এখন তার ডল-রোবট আসার অপেক্ষা।

সময়ের পরিমাপ করল আহমদ মুসা। প্রায় ১ ঘন্টার মতো সময় হাতে আছে। রোবটের যে গতি, তাতে এই পথটা পাড়ি দিতে ১৫ থেকে ২০ মিনিটের বেশি লাগবে না। এর অর্থ রোবটের জন্যে আরও কমপক্ষে আধা ঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে।

গুলী বৃষ্টি কমে এসেছে।

আরও আধা ঘন্টা পার হলো। রোবট এলো না।

পকেটের মোবাইল আবার সাড়া দিয়ে উঠল আহমদ মুসার।

আহমদ মুসা মোবাইলের রিং টোন বন্ধ করে ভাইব্রেশন এলার্ট অন করেছে।

এখন শত্রুরা এতই কাছে যে, নিচু স্বরে কথা বলাও ঝুকিপূর্ণ।

আহমদ মুসা পকেট থেকে মোবাইল বের করে দেখল, জেনারেল মোস্তফার টেলিফোন।

কল অন করে আহমদ মুসা মোবাইল ফ্লোরে রেখে মোবাইলে মুখ ঠেকিয়ে ফিস ফিসে কন্ঠে বলল, 'জেনারেল মোস্তফা আমি নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে গেছি। এখন রোবটের অপেক্ষা।'

'প্রস্তুতিতে একটু সময় লেগেছে। প্রায় ১৫ মিনিট আগে চারটা রোবট তাদের যাত্রা শুরু করেছে। মনিটরিং-এ থাকা সেনা অফিসার আমাকে কিছুক্ষণ আগে জানালেন, ১০ মিনিট পর্যন্ত পথ ভালোভাবেই চলেছে, ইনশাআল্লাহ ঠিকঠাক তা লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে।' বলল জেনারেল মোস্তফা।

রোবট হাতে পাওয়ার পর আমি একটা মিস কল দিব, তারপর আপনারা দাবি মানার ঘোষনা দিবেন।' আহমদ মুসা বলল।

'ওদের সাথে আবার আমাদের কথা হয়েছে। আমরা বলেছি, দাবি মানার বিষয়টি আমরা বিবেচনা করছি। শীঘ্রই আমরা জানাচ্ছি। তারা দাবির সাথে আরও কিছু কথা যোগ করেছে। তারা বলেছে, সুড়ঙ্গ পথে যারা তাদের পিছু নিয়েছে, তাদের পিছু নেয়া অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং দাবি মানার সংগে সংগে তাদের পিছু হটে সরে যেতে হবে।' বলল জেনারেল মোস্তফা।

'আমি অগ্রসর হওয়া বন্ধ করে দিয়েছি এবং আপনারা দাবি মানার পর আমি অবশ্যই অন্তত পাঁচ মিটার পেছনে সরে যাব।' আহমদ মুসা বলল।

'ঠিক আছে, পিছু হটা শুরু হলেই চলবে। আর শুনুন, ম্যাডাম টেলিফোন করেছিলেন। উনি খুব উদ্বিগ্ন। বিষয়টা দেখলাম উনি জানেন। আমি তাঁকে বলেছি, কোন ভয় নেই, জনাব খালেদ খাকান পরিকল্পনা মোতাবেক এগোচ্ছেন। অবশ্য আপনার আহত হওয়ার কথা আমি তাকে জানাইনি।' বলল জেনারেল মোস্তফা।

'ধন্যবাদ জেনারেল, প্রেসিডেন্ট কিডন্যাপ হওয়ার কথা ম্যাডাম কি করে জানলেন? আপনারা তো কয়েকজন ছাড়া আর কারো কাছেই এটা প্রকাশ করেননি।' আহমদ মুসা বলল।

‘উনি তার বান্ধবীর কাছ থেকে জেনেছেন। আমি এ বিষয়ে তাঁকে আর কিছু জিজ্ঞেস করিনি।’ বলল জেনারেল মোস্তফা।

‘ঠিক আছে। আমি বুঝেছি। তাহলে এখানেই কথা শেষ। আসসালামু আলাইকুম।’

‘ওয়া আলাইকুম সালাম। ‘আল্লাহ হাফেজ!’ ওপার থেকে বলল জেনারেল মোস্তফার কন্ঠ।

আহমদ মুসা মোবাইলের কল অফ করতে করতে ভাবল জোসেফাইনের বান্ধবীর কথা। নিশ্চয়ই সে শিক্ষিকার কাছ থেকেই খবরটা জেনেছে। জোসেফাইনের এই বান্ধবী মহিলা আসলে কে? নিজে গরজ করে কেন এত তথ্য সংগ্রহ করে? বলতে গেলে আহমদ মুসার সাফল্য অনেকখানিই তার সাহায্যের ফল। কেন এত উপকারী সে? কেন সে সরাসরি কথা বলে না? এবার এ ব্যাপারে কিছু খোঁজ-খবর নিতেই হবে।

আহমদ মুসা কল অফ করে মোবাইল পকেটে পুরে পেছনে তাকাতেই দেখতে পেল আবছা এক নীল ডট। নীল ডটটা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

খুশি হলো আহমদ মুসা। রোবট এসে গেছে!

মিনিট খানেকের মধ্যে দু’টি রোবট তার হাতে এসে পৌছল।

পেছনে আর কোন ডট চিহ্ন দেখলো না। তার মানে চারটা রোবটের মধ্যে দু’টি শেষ পর্যায়ে এসে ওদের গুলীতে ধ্বংস হয়েছে কিংবা অন্যকিছু ঘটেছে। দু’টি যে ঠিকঠাক পৌছতে পেরেছে এজন্যে আহমদ মুসা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল।

দুই রোবটের সাথে বেঁধে দেয়া এনজি-৪ এর দু’টি পাইপগান খুলে নিয়ে রোবটকে নিষ্ক্রিয় করে পাশে রেখে দিল।

পেন্সিল টর্চ জ্বেলে আহমদ মুসা পাইপ গান দু’টোকে পরীক্ষা করল। দেখল, দু’টিই ঠিকঠাকভাবে লোডেড। ফায়ারিং ডিস্ট্যান্স সর্বোচ্চ ২৫ মিটার, সেটাও পরিষ্কার লেখা আছে পাইপগানের গায়ে। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও পেল পাইপগানের গায়ের লেখা থেকে। সেটা হলো, পাইপগান ফায়ার করার ১০ সেকেন্ডের মধ্যে গ্যাস টিউব সর্বোচ্চ দূরত্বে পৌঁছে নিরবে বিকিরণ শুরু করবে।

দূরত্ব কম হলে আরও কম সময় লাগবে। বিকিরন কেন্দ্রের ৫ বর্গমিটার জায়গা জুড়ে এনজি-৪ গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে। গন্ধহীন অদৃশ্য এই গ্যাস ছড়িয়ে পড়ার ৫ মিনিটের মধ্যে এর এ্যাকশন পূর্ণভাবে প্রকাশ পাবে। এক সময়ের জন্যে দু'টি গ্যাস টিউব সর্বোচ্চ ডোজ।

'তার মানে', ভাবল আহমদ মুসা, 'পাইপগান ফায়ার করার ছয় মিনিটের মধ্যেই ভিকটিমরা শারীরিকভাবে অচল হয়ে পড়বে।'

বিষয়গুলো সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে আহমদ মুসা তার মোবাইল থেকে একটা মিস কল দিল জেনারেল মোস্তফাকে।

মাত্র পাঁচ মিনিট। আহমদ মুসার হাতের মোবাইল ভাইব্রেট করতে শুরু করল। দেখল মোবাইলের স্ক্রীনে মেসেজের সিগন্যাল।

মেসেজটি ওপেন করল আহমদ মুসা। জেনারেল মোস্তফার মেসেজ: দাবি মানার সম্মতি তাদের জানিয়ে দেয়া হলো। তারা খুশি হয়ে অভিনন্দন জানিয়েছে আমাদের।'

মোবাইলের কল অফ করে আহমদ মুসা হিউম্যান বডি সেঞ্জিং মনিটরটা সামনে এনে শেষ বারের মতো পরীক্ষা করল, শত্রুরা ঠিক ২০ মিটার দূরে।

আহমদ মুসা দুই পাইপগানের ডিস্ট্যান্স এডজাস্ট করে সময় দেখে নিয়ে বিসমিল্লাহ বলে প্রথমে একটা পাইপ গান ফায়ার করল।

প্রথম পাইপগান ফায়ার করার পর দ্বিতীয় পাইপ গান তুলে নিয়ে হিউম্যান বডি সেঞ্জিং মনিটরে আবার ওদের ২০ মিটার দূরত্ব ঠিক আছে কি না দেখে নিয়ে আল্লাহর নাম নিয়ে দ্বিতীয় ফায়ার করল আহমদ মুসা। সময়টা আবার দেখে নিল। মনে মনে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করল, 'হে জগতসমূহের মহান সর্বশক্তিমান মালিক, আমার জ্ঞান-সামর্থ্য অনুসারে আমি চেষ্টা করলাম, ফল আপনার হাতে, ফল দেবার মালিক আপনি। আপনার কাছে সবচেয়ে ভালোটা প্রার্থনা করছি। আপনি আমাদের সাহায্য করুন।'

বলতে গেলে এই প্রার্থনাতেই আহমদ মুসার কেটে গেল ছয় সাত মিনিট।

শেষে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আহমদ মুসা ভাবল, আল্লাহ করেন তো এই সময়ের মধ্যে এনজি-৪ গ্যাস টিউব তার মিশন শেষ করেছে।

পরীক্ষার জন্যে আহমদ মুসা ক্রলিং করেই সামনে এগোবার সিদ্ধান্ত নিল। ওরা সক্রিয় থাকলে অবশ্যই গুলী আসবে। যেহেতু এই এগিয়ে যাওয়া হবে ওয়াদার খেলাফ, তাই এ গুলী বৃষ্টি ভয়াবহ ধরনের তীব্র হতে পারে।

বিসমিল্লাহ বলে আহমদ মুসা অগ্রসর হতে লাগল। খুব দ্রুত সে ঝুঁকিপূর্ণ উঁচু জায়গাটা পার হলো। কিন্তু ওদিক থেকে কোন গুলী এলো না।

মনটা খুশিতে ভরে গেল আহমদ মুসার।

তবু নিশ্চিত হবার জন্যে সাবধানে আরও অগ্রসর হওয়া অব্যাহত রাখল।

কিন্তু গুলী আর এলো না।

আহমদ মুসা আরও এগোল।

চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। অন্ধকারের মধ্যে সুড়ঙ্গের ওদিক থেকে বড় দু'টি চোখ জ্বল জ্বল করছে। আলোর কালার দেখে বুঝল, ও দু'টি দরজার ঘুলঘুলি। তার মানে সে দরজার শেষ প্রান্তে এসে গেছে। মনিটরটি টেনে নিয়ে দেখল মাত্র ৪ থেকে ছয় মিটার দূরে ওরা। তার মানে আহমদ মুসা ওদের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে।

আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল আহমদ মুসার মন। তাদের এনজি-৪ পুরোপুরি কাজ করেছে। ওরা সবাই এখন শারীরিকভাবে অকেজো।

আহমদ মুসা ব্যাগ থেকে টর্চ বের করে বাম হাতে নিয়ে ডান হাতে রিভলবার বাগিয়ে টর্চ জ্বালল।

টর্চের আলো গিয়ে পড়ল লুটোপুটি খেয়ে পড়ে থাকা কিছু মানুষের ওপর।

পড়ে আছে পাঁচজন মানুষ।

সকলেই নিশ্চল।

তাদের চোখে দৃষ্টি আছে, দৃষ্টির ভাষা আছে, কিন্তু গতি নেই।

ওদের চোখ-ভরা বিস্ময় আর ভয়!

আহমদ মুসার দু'চোখ আকুল হয়ে খুঁজছিল প্রেসিডেন্টকে।

প্রেসিডেন্ট ঐ পাঁচজনের মধ্যে নেই।

আহমদ মুসার লাইটের ফোকাস আরও সামনে গিয়ে সুড়ঙ্গ- মুখের দরজার ওপর গিয়ে পড়ল।

এগোল আহমদ মুসা দরজার দিকে ওদের ডিঙিয়ে।

দরজাটা ১ ইঞ্চিরও বেশি পুরু ইস্পাতের প্লেট। বিদ্যুৎ খুঁটির মতো মোটা ইস্পাতের দু'টি বার দিয়ে দরজা স্থায়ীভাবে বন্ধ। বার দু'টি দু'পাশের পাথরের দেয়ালে ঢোকানো এবং সিমেন্টের প্লাস্টার দিয়ে আটকে দেয়া। দরজাটা যেমন পুরু, তেমনি স্টিলের হুকটা হেভি। মনে হয় কামানের গোলা মেরেও এই দরজার কিছু করা যাবেনা।

বিকল্প পথ তাহলে আছে।

আহমদ মুসার টর্চের ফোকাস বামে, সামনে ঘুরে ডান দিকের একটা সিঁড়ির ওপর এসে পড়ল।

সিঁড়িটা একতলা সমান উঁচু এবং তা গিয়ে শেষ হয়েছে একটা দরজায়।

সুড়ঙ্গ-মুখের দরজার মতোই ও দরজাটা পুরু স্টিলের মনে হলো।

দরজাটা আধা খোলা।

দরজার পাশেই পাঁচ-ছয় ইঞ্চি আয়তনের একটা স্টিল বার দেখে আহমদ মুসা বুঝল সুড়ঙ্গের দরজার মতো এই হেভি স্টিল বারটা দিয়েই এই দরজা বন্ধ ছিল। এ দরজাও কামান দেগে ভাঙার মতো নয়।

আহমদ মুসার মনে পড়ল প্রাসাদের লে-আউটে সে সুড়ঙ্গ-মুখের পাশে মিলিটারী পর্যবেক্ষন টাওয়ার দেখেছিল। এটাই কি সে টাওয়ার হতে পারে?

এক হাতে টর্চ, অন্য হাতে রিভলবার বাগিয়ে আহমদ মুসা দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠল।

পা দিয়ে দরজা ধীরে ধীরে পিছন দিকে ঠেলে দিয়ে তাকাল ঘরের ভেতরে। রিভলবারের ট্রিগারে তর্জনি ছিল আহমদ মুসার।

কিন্তু ভেতরে দেখল একই দৃশ্য।

প্রথমেই নজর পড়ল দু'জনের ওপর। দুই চেয়ারে ওদের দু'জনের দেহ নেতিয়ে পড়ে আছে।

ওদের দু'জনের সামনেই গ্রেনেড লাঞ্চার ও হেভি মেশিনগান। ওগুলো ফায়ার প্যানেলে বাইরের বিভিন্ন ডাইরেকশনে তাক করে পেতে রাখা।

পর্যবেক্ষণ প্যানেলে রয়েছে একাধিক দূরবিন।

আহমদ মুসা বুঝল, এসব জিনিসই মিলিটারিদের। সন্ত্রাসী কিডন্যাপাররা এগুলো দখল করে নিয়েছিল মাত্র।

আহমদ মুসা এবার তাকাল ঘরের পেছন দিকে। চেয়ার দু'টির একটু পেছনেই দেখতে পেল দু'টি সংজ্ঞাহীন দেহ। তাদের দেহে সামরিক পোশাক। এরাই পর্যবেক্ষণ টাওয়ারে ছিল, এদের মেরে বা সংজ্ঞাহীন করেই তারা সিঁড়ি মুখের পর্যবেক্ষণ টাওয়ার দখল করে নিয়েছিল।

আরো পেছনে এলো আহমদ মুসার চোখ।

পেছনে দেয়ালের সাথে লাগানো একটা বেড দেখতে পেল। পর্যবেক্ষণ টাওয়ারের সৈনিকদের বিশ্রাম নেয়ার মতো একটা সাধারণ বেড। বেডের ওপর দেখতে পেল প্রেসিডেন্টের দেহ।

আহমদ মুসা ছুটে গেল প্রেসিডেন্টের কাছে। সংজ্ঞাহীন প্রেসিডেন্ট। নেতিয়ে পড়ে আছে তাঁর দেহ।

আহমদ মুসা প্রেসিডেন্টের শিথিল একটা হাত তুলে পাল্‌স পরীক্ষা করল। পাল্‌স স্বাভাবিক।

আহমদ মুসা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল।

এই সময়ই মোবাইল কেঁপে উঠল আহমদ মুসার।

মোবাইলের কল অন করে সালাম দিতেই ওপার থেকে জেনারেল মোস্তফার উদ্বিগ্ন কন্ঠ, 'মি. খালেদ, এদিকে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা। আপনার কলের অপেক্ষা করছিলাম। কি অবস্থা? সব ঠিক তো?'

'মিশন সাকসেসফুল! এই মাত্র প্রেসিডেন্টের সংজ্ঞাহীন দেহের পাশে এসে আমি বসলাম।' বলল আহমদ মুসা।

'আলহামদুলিল্লাহ! প্রধানমন্ত্রী মহোদয় আমার পাশে। আপনি তাঁর সাথে কথা বলুন।' জেনারেল মোস্তফা বলল।

‘আসসালামু আলাইকুম, মি. খালেদ খাকান।’ ওপার থেকে প্রধানমন্ত্রীর গলা শোনা গেল।

‘ওয়া আলাইকুম সালাম। আলহামদুলিল্লাহ! স্যার, আমি মহামান্য প্রেসিডেন্টের পাশে বসে। তিনি সংজ্ঞাহীন, কিন্তু ভাল আছেন। আমি পাল্‌স পরীক্ষা করেছি। একদম নরমাল।’

‘ধন্যবাদ মি. খালেদ খাকান। আমরা সবাই, আমার দেশ আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।’ প্রধানমন্ত্রীর ভারী কন্ঠ। আবেগে কাঁপছে তাঁর কন্ঠ।

‘স্যার, সব প্রশংসা আল্লাহর। তিনিই আমাদের সাহস, বুদ্ধি, শক্তি সব কিছু দিয়েছেন।’

‘ঠিক মি. খালেদ খাকান। কিন্তু আল্লাহ যাঁকে দিয়ে তাঁর কাজ করান, তিনি ভাগ্যবান। ভাগ্যবানকেই তিনি বাছাই করেন। শুনুন মি.! আমরা সবাই হেলিকপ্টার নিয়ে আসছি। আমি ম্যাডামকেও আনতে পাঠিয়েছি। তিনিও আসবেন। লতিফা আরবাকান তাঁকে নিয়ে আসবে। ওকে...।’

প্রধানমন্ত্রীর কথার মাঝখানেই আহমদ মুসা বলল, ‘স্যার, আপনারা আসুন। কিন্তু একটা হেলিকপ্টারেই আসতে হবে। যাতে পাহারায় বা পর্যবেক্ষণে থাকা শত্রুপক্ষ বুঝে যে, তাদের দাবি অনুসারেই হেলিকপ্টার এসেছে বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসি ও খালেদ খাকানকে ওদের হাতে তুলে দিতে। তারা বুঝুক যে, তাদের বিজয় হয়েছে। প্রেসিডেন্টকে নিরাপদ স্থানে না পৌঁছানো পর্যন্ত শত্রুপক্ষকে গুড হিউমারে রাখতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিল প্রধানমন্ত্রী। বলল, ‘ধন্যবাদ, মি. খালেদ খাকান, আপনি ঠিক বলেছেন। আবেগ আমাদের বাস্তবতা থেকে সরিয়ে এনেছিল। জেনারেল মোস্তফা ও পুলিশপ্রধানই শুধু প্রেসিডেন্টকে আনতে যাবে। আর প্রেসিডেন্ট ও আপনাকেই শুধু নিয়ে আসবে। হেলিকপ্টার চলে আসার মিনিট পনের পরে চারদিকের পুলিশ ও সেনা অফিসাররা গিয়ে সুড়ঙ্গের সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করবে। আমরা সকলেই সামরিক হাসপাতালের চত্বরে অপেক্ষা করছি।’

‘ধন্যবাদ স্যার, ঠিক চিন্তা করেছেন। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন!’ আহমদ মুসা বলল।

‘ওকে, মি. খালেদ খাকান। আসসালামু আলাইকুম।’ বলল প্রধানমন্ত্রী।

‘ওকে স্যার, ওয়া আলাইকুম সালাম।’

বলে আহমদ মুসা মোবাইলের কল অফ করে দিল।

আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকাল। দেখল, কিডন্যাপার ‘থ্রি জিরো’দের দেয়া দাবি পূরনের শেষ সময়ের আর ২০ মিনিট বাকি আছে। বিশ মিনিটের মধ্যে হেলিকপ্টার পৌঁছলেই ওরা ভাববে ওদের দাবি পূরণের জন্যেই হেলিকপ্টার এসেছে। আহমদ মুসার উদ্বেগ হলো, ওরা কোনওভাবে সন্দেহ করলে ওরা মরিয়া হয়ে মেটালিক ধ্বংসের অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে যার ফলে হেলিকপ্টার, গাড়ী মেটালিক কোন কিছু ব্যবহারই সম্ভব হবে না। প্রেসিডেন্ট ভবনের ওপর আমাদের সোর্ড- এর ডিফেন্স আমব্রেলা আছে, সামরিক হাসপাতাল পর্যন্ত সবটা পথের ওপর নেই।

আহমদ মুসাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলার ১০ মিনিটের মধ্যে হেলিকপ্টার এসে গেল।

বিমানবাহিনী হেলিকপ্টারের দক্ষ পাইলট গুহামুখের একদম সন্নিকটেই হেলিকপ্টার ল্যান্ড করাল। এসব মাউন্টেন রাইডার হেলিকপ্টার পাহাড়ে ল্যান্ড করার সামান্য সুযোগও কাজে লাগাতে পারে।

হেলিকপ্টার ল্যান্ড করেতেই আহমদ মুসা পর্যবেক্ষণ টাওয়ারের দরজা খুলে প্রেসিডেন্টকে কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে এসে এগোলো হেলিকপ্টারের দিকে।

দীর্ঘ সময় পর বাইরের আলো-বাতাসের সাথে এই প্রথম সাক্ষাৎ আহমদ মুসার।

চারদিকে চোখ যেতেই দেখল, পাহাড় ও বসফারাসে সেনা ও পুলিশের বেস্টনি তৈরী হয়ে আছে।

হেলিকপ্টার থেকে সিঁড়ি নেমে এসেছে।

আহমদ মুসা সিঁড়ির গোড়ায় পৌছতেই জেনারেল মোস্তফা ও পুলিশপ্রধান নেমে এলো।

তিনজন ধরাধরি করে প্রেসিডেন্টকে হেলিকপ্টারে তুলল।

হেলিকপ্টারটি একটি ফ্লাইং হাসপাতালও। একজন ডাক্তারও আছে।

প্রেসিডেন্টকে বেডে রাখতেই তাঁকে নিয়ে কাজে লেগে গেল ডাক্তার।

আহমদ মুসা প্রেসিডেন্টকে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই জেনারেল মোস্তফা আহমদ মুসাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। তারপর পুলিশপ্রধানও।

'তুরস্ক আপনার এত ঋণ শোধ করবে কি করে মি. খালেদ খাকান?' আবেগে কন্ঠ ভেঙে পড়ল জেনারেল মোস্তফার।

জেনারেল মোস্তফা, মি. খালেদ খাকানের গুলীবিদ্ধ স্থান থেকে রক্ত বেরুচ্ছে নতুন করে। ডাক্তার এদিকে দেখুন।' বলল পুলিশপ্রধান নাজিম এরকেন।

জেনারেল মোস্তফা ডাক্তারের দিকে একবার তাকিয়ে ছুটে এলো আহমদ মুসার আহত জায়গাটা দেখার জন্যে। বলল, 'এদিকের চাপে ভূলেই গেছি আপনার আহত হওয়ার কথা।'

ডাক্তার উঠে দাঁড়িয়েছিল।

'না, ডাক্তার সাহেব, আপনি প্রেসিডেন্টকে পরীক্ষা করুন। ভার তুলতে গিয়ে চাপে একটু ব্লিডিং হচ্ছে। হাসপাতালে তো যাচ্ছিই। এখন কিছু দরকার নেই।'

'আপনি প্রেসিডেন্টকে আনতে গেলেন কেন? আমরাই নিয়ে আসতাম। একটা বাহু এভাবে আহত হওয়ার পর কিছুতেই এ ভার বহন করা ঠিক হয়নি। কেন আমাদের নামতে নিষেধ করেছিলেন?' বলল জেনারেল মোস্তফা।

'আপনারা পরিচিত ব্যক্তিত্ব। হেলিকপ্টারে পুলিশপ্রধান ও গোয়েন্দাপ্রধান এসেছেন, এটা শত্রুকে জানানো হতো না। অন্য কিছু ঘটেছে বলে সন্দেহ করতো। যাক এ প্রসংগ। আসুন বসি।' আহমদ মুসা বলল।

হেলিকপ্টার আকাশে উঠে আসার পর দ্রুত চলতে শুরু করেছে।

বসেছে আহমদ মুসারা।

'মি. খালেদ খাকান, আয়নার সামনে দাঁড়ালে আপনি নিজেকে নিজেই বোধ হয় চিনতে পারবেন না। ধুলো, বালি, কালিতে আপনার পোশাকেরই শুধু রং পাল্টায়নি। মুখটাকেও অচেনা করে দিয়েছে।'

বলে হাসল জেনারেল মোস্তফা।

'বহুকালের পুরানো সুড়ঙ্গ। ধুলো, বালি, কালির স্তর পড়ে গেছে। ওর মধ্যে দিয়েই গড়াগড়ি দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে।' আহমদ মুসা বলল।

পাশ থেকে ডাক্তার বলে উঠল, 'আমাদের মহামান্য প্রেসিডেন্ট পারফেক্টলি ওকে। অল্পক্ষনের মধ্যেই তাঁর জ্ঞান ফিরে আসবে। হাসপাতালে নিয়ে এ্যান্টি এনজি-৪ ইনজেকশন দিলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই উনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবেন।'

এবার দশ মিনিটও লাগল না সামরিক হাসপাতালে পৌঁছতে।

হেলিকপ্টার ল্যান্ড করল সামরিক হাসপাতালের চত্বরে।

হেলিকপ্টার ল্যান্ড করতেই সিঁড়ি নেমে গেল। ছুটে এলো এ্যাম্বুলেন্স। সেনারা চারদিকে সতর্ক অবস্থানে। হেলিকপ্টার থেকে নিরাপদ দূরে কয়েকটা কার দাঁড়িয়ে আছে।

এ্যাম্বুলেন্সটা উঠে এলো হেলিকপ্টারের দরজার সমতলে। হাসপাতালের কয়েকজন ডাক্তার এ্যাম্বুলেন্স থেকে নেমে এসে হেলিকপ্টারের বেডটাকে গড়িয়ে এ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে গেল।

নিচে নেমে গেল এ্যাম্বুলেন্স।

'মি. খালেদ খাকান, সিঁড়ির গোড়ায় প্রধানমন্ত্রী। আপনি আগে নামুন।' বলল জেনারেল মোস্তফা আহমদ মুসাকে।

'অলরাইট' বলে আহমদ মুসা সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। তার পেছনে পেছনে জেনারেল মোস্তফা এবং পুলিশপ্রধান নাজিম এরকেন।

সিঁড়ির গোড়ায় মাটিতে পা দেবার আগেই আহমদ মুসা দেখতে পেল অল্প একটু দূরে কারের খোলা দরজা দিয়ে আহমদ মুসার দিকে হাত নাড়ছে তার ছেলে আহমদ আব্দুল্লাহ। তার পাশে জোসেফাইন। আর ড্রাইভিং সিটে দেখতে পেল লতিফা আরবাকানকে।

আহমদ মুসা হাত নেড়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে সামনে তাকাল প্রধানমন্ত্রীর দিকে।

সিঁড়ি থেকে নেমে মাটিতে পা রাখতেই আহমদ মুসাকে এসে জড়িয়ে ধরল প্রধানমন্ত্রী। বলল, ‘আমার সরকার, আমার জনগণের পক্ষ থেকে আপনাকে অভিনন্দন। মহাআতংক, মহাক্ষতি থেকে আপনি আমাদের রক্ষা করেছেন। আল্লাহ আপনাকে এর জাযাহ দিন!’ অশ্রুরুদ্ধ কন্ঠ প্রধানমন্ত্রীর।

‘ধন্যবাদ স্যার’ বলে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, ‘স্যার, আমার গোটা শরীর ধুলো-বালিতে ভরা। আপনার কাপড়-চোপড়ও নষ্ট হয়ে গেল।’

‘আপনি ধুলো-ময়লার মধ্যে সাতার কেঁটেছেন, আর আমি জামা-কাপড়েও কিছু ধুলো-কালি লাগাতে পারবো না!’

বলেই প্রধানমন্ত্রী আহমদ মুসার আহত বাহু স্পর্শ করে জানতে চাইলেন, ‘হেলিকপ্টারে ডাক্তার ছিল, উনি কি আপনার আহত স্থানটা পরীক্ষা করেছেন? ‘

‘আমি নিষধ করেছিলাম। এখন গিয়ে দেখাব।’ বলল আহমদ মুসা।

‘এই তো আপনার জন্যে এ্যাম্বুলেন্স অপেক্ষা করছে! ম্যাডাম এসেছেন।’ প্রধানমন্ত্রী বললেন।

এ্যাম্বুলেন্স ও জোসেফাইনের কারটি পাশেই এসে দাঁড়িয়েছিল।

মোবাইল বেজে উঠেছে প্রধানমন্ত্রীর। মোবাইলটা তুলে নিতে নিতে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘মি. খালেদ খাকান, আপনি এ্যাম্বুলেন্সে যান। আমি আসছি হাসপাতালে।’

‘ওকে স্যার। আসসালামু আলাইকুম।’

বলে আহমদ মুসা এ্যাম্বুলেন্স ও গড়ির দিকে এগোলো।

এ্যাম্বুলেন্সের দরজা খুলে একজন ডাক্তার নিচে এসে দাঁড়িয়েছিল। আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, ‘আসুন স্যার।’

আহমদ মুসা হেসে বলল, ‘না, ডাক্তার, আপনি চলুন। আমি ঐ কারে আসছি।’

আহমদ মুসা এগোলো কারের দিকে।

গাড়ির দরজা খুলে ড্রাইভিং সিট থেকে নেমে এসেছে লতিফা আরবাকান।

এদিকে গাড়ির পেছনের দরজা খুলে আহমদ আব্দুল্লাহও বেরিয়ে এসেছে।

জোসেফাইন গাড়ির ভেতরে সিটে বসে আছে। আহমদ মুসা আহমদ আব্দুল্লাহকে ডান হাতে কোলে তুলে নিয়ে চুমু খেল কপালে।

'তোমার কাপড়ে ময়লা, মুখে ময়লা। কেন? ময়লা পরিষ্কার করনি কেন?'

আহমদ আব্দুল্লাহকে চুমু খেয়েই একটু ঝুঁকে পড়ে সালাম দিল জোসেফাইনকে।

জোসেফানের মুখে হাসি, চোখে অশ্রু।

সালাম নিয়ে বলল, 'আহমদকে নামিয়ে দাও তোমার আঘাতে চাপ পড়ছে।'

আহমদ মুসা আহমদ আব্দুল্লাহকে নামিয়ে দিয়ে সামনে তাকিয়ে সালাম দিল লতিফা আরবাকানকে।

সালাম নিয়ে লতিফা আরবাকান বলল, 'স্যার উঠুন।'

'ধন্যবাদ' বলে আহমদ মুসা আহমদ আব্দুল্লাহকে গাড়িতে তুলে নিজে উঠে বসল।'

লতিফা আরবাকান গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিয়ে নিজে সিটে গিয়ে বসল।

গাড়ির সিটে বসে স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে লতিফা আরবাকান বলল, 'স্যার, কত বড় ঘটনা যে ঘটে গেল, মানুষ জানতেই পারলো না। জানতেই পারলো না, একজন বিদেশী তাদের প্রেসিডেন্টকে উদ্ধারের জন্যে কি করেছেন, কিভাবে রক্ত ঝরিয়েছেন, কিভাবে মৃত্যুর মুখে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন! আমার তুরস্কের পক্ষ থেকে আপনাকে কনগ্র্যাচুলেশন স্যার।'

আবেগ-উচ্ছ্বাসজড়িত কান্নায় লতিফা আরবাকানের কন্ঠ রুদ্ধ হয়ে এসেছিল।

'উনি তো বিদেশী নন লতিফা। গোটা দুনিয়া তো ওঁর দেশ।' বলল জোসেফাইন। শান্ত, ভারী কন্ঠ জোসেফাইনের।

‘ধন্যবাদ, ম্যাডাম। এটাই উপযুক্ত উত্তর। ধন্যবাদ আপনাদের।’ লতিফা আরবাকান বলল। তখনও কান্না তার কন্ঠে।

গাড়ি স্টার্ট নিল।

চলতে শুরু করল গাড়ি।

আহমদ আব্দুল্লাহ আহমদ মুসার কোলে মুখ গুঁজেছে।

আহমদ মুসা গভীর দৃষ্টি নিয়ে তাকাল জোসেফাইনের দিকে। বলল, ‘তুমি এসেছ, ধন্যবাদ।’

জোসেফাইনের নিরব সজল দৃষ্টি আহমদ মুসার চোখে।

ধীরে ধীরে আনত হলো জোসেফাইনের মুখ।

তার মাথাটা ধীরে ধীরে গিয়ে ন্যস্ত হলো আহমদ মুসার কাঁধে। তার সজল চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ল দু’ফোটা অশ্রু।

জোসেফাইনের একটি হাত আঁকড়ে ধরেছে আহমদ মুসার একটা হাতকে।

হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটারে যাবার পথে আহমদ মুসা ঘড়িতে সময় দেখে জোসেফাইনকে বলল, ‘যথাসময়ে বাড়িতে ফিরে গিয়ে ওয়াদা মতো তোমার সাথে ডিনার করতে পারছি, ইনশাআল্লাহ!’

জোসেফাইনের ঠোঁটেও মধুর এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল। বলল, ‘ইনশাআল্লাহ!’

# ৭

'থ্রি জিরো'র শয়তানি দেখছি আমাদের অতিষ্ঠ করে তুলল। এর অবসান না ঘটালে চলছে না।' বলছিলেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট আহমদ আরদোগাল বাবাগলু।

বৈঠকটা প্রেসিডেন্টের মিনি ক্যাবিনেটের যা রাষ্ট্রের নিরাপত্তার বিষয়টা বিশেষভাবে দেখে থাকে।

আজকের মিনি ক্যাবিনেটে হাজির আছেন প্রধানমন্ত্রী, দেশরক্ষামন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং গোয়েন্দা বিভাগ ও সশস্ত্র বাহিনী প্রধান।

প্রেসিডেন্ট যা বললেন, তার মধ্যে অস্থিরতার একটা প্রকাশ আছে। এর কারনও আছে। থ্রি জিরোর কবল থেকে প্রেসিডেন্টের উদ্ধার এবং থ্রি জিরোর ৭ জন লোক ধরা পড়ার পর তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে। প্রতিশোধের জন্যে ইতিমধ্যেই তারা ৩টি ট্রেন ও দু'টি বাসস্ট্যান্ডের প্রায় তিরিশটির মতো বাস হাওয়া করে দিয়েছে। ওদের এই ভয়ানক অদৃশ্য অস্ত্র মানুষের মধ্যে প্যানিক সৃষ্টি করেছে। থ্রি জিরো হুমকি দিয়েছে, তাদের দাবি মেনে না নিলে তারা ধ্বংসযজ্ঞের সৃষ্টি করবে। শিল্প-কারখানা, ট্রেন, বাস, লঞ্চ, স্টিমার, অস্ত্রগুদাম সব তারা ধোঁয়ার মতো শূন্যে মিলিয়ে দেবে। তারা তাদের সর্বশেষ দাবিতে আজ বলেছে, আগামী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে তাদের ৭জন লোককে ছেড়ে দেয়াসহ মি. খালেদ খাকান ও বিজ্ঞানী ড. আন্দালুসিকে তাদের হাতে তুলে না দিলে তারা আক্রমন শুরু করবে।

বিষয়টি নিয়ে সকালে ক্যাবিনেট আলোচনা হয়েছে। আহমদ মুসার সাথেও প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী আলোচনা করেছেন। এখন আবার মিনি ক্যাবিনেট আলোচনায় বসেছে ক্যাবিনেটে আলোচিত বিষয় নিয়ে আরও আলোচনার জন্যে।

প্রেসিডেন্ট কথা শেষ করলে নড়েচড়ে বসলেন প্রধানমন্ত্রী। বললেন, 'মাননীয় প্রেসিডেন্ট, ওদের মোকাবিলায় আমরা অনেক দূর এগিয়ে আছি। ওদের

অনেক ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে ওদের। প্রায় ফাইনাল স্টেজে আমরা এসেছি পৌঁছেছি। আমরা ওদের উৎখাত করতে পারবো ইনশাআল্লাহ।

'কিন্তু আমাদের হাতে সময় তো বেশি নেই। অবশ্যই মি. খালেদ খাকান কি ভাবছেন, কি করছেন, সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর সাথে আর কিছু আলোচনা হয়েছে জেনারেল মোস্তফার?' জেনারেল মোস্তফার দিকে তাকিয়ে বললেন প্রেসিডেন্ট।

'সকালের বৈঠকের পর তার সাথে আর কোন যোগাযোগ হয়নি মহামান্য প্রেসিডেন্ট। স্যার, তার কাজের একটা স্টাইল হলো, কোন ভাবনা, কোন পরিকল্পনা চূড়ান্ত না হলে তিনি বলেন না। আর কোন কাজে হাত দিলে সেটা শেষ না করে ছাড়েন না। আমরা দেখেছি, যখন নিরব থাকেন তিনি, তখনই তিনি সবচেয়ে বেশি কাজ করেন।' বলল জেনারেল মোস্তফা।

'ঠিক বলেছেন, জেনারেল মোস্তফা। তবে পরশু দিন সকাল পর্যন্ত সময়। সেই হিসাবে সময় বেশি নেই। তার সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ আমাদের থাকতে হবে।' বললেন প্রধানমন্ত্রী।

'অবশ্যই স্যার। আমি এ মিটিং...।'

জেনারেল মোস্তফার কথার মাঝখানেই তার মোবাইল বেজে উঠল।

জেনারেল মোস্তফা থেমে গিয়ে 'মাফ করুন আপনারা' বলে মোবাইল ধরল জেনারেল মোস্তফা।

ওপারের কথা শুনতেই মুখে অন্ধকার নামল জেনারেল মোস্তফার।

ওপারের কথা শুধু শুনলই। বলল না কিছু।

এক সময় কল অফ করে দিয়ে তাকাল প্রেসিডেন্টের দিকে।

জেনারেল মোস্তফার চোখ-মুখের অবস্থা দেখে সবাই বুঝতে পারল কোন দুঃসংবাদ নিশ্চয়।

জেনারেল মোস্তফা মুখ থেকে টেলিফোন সরাতেই সবাই প্রায় এক সঙ্গে বলে উঠল, 'কোন খারাপ সংবাদ জেনারেল মোস্তফা?'

'থ্রি জিরো'র টেলিফোন। ওরা তাদের দাবির সাথে আরেকটা বিষয় যোগ করেছে। সেটা হলো, তাদের দেয়া দাবি মানার সময় পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে

আক্রমণাত্মক কিছু করা যাবে না। যদি এরকম আক্রমণাত্মক কিছু দেখতে পায়, তাহলে আলটিমেটাম বাতিল হয়ে যাবে এবং তারা এ্যাকশন শুরু করবে। দেশকে তারা লন্ড ভন্ড করে দেবে।' বলল জেনারেল মোস্তফা।

জেনারেল মোস্তফা কথা শেষ করলো, কিন্তু কেউ কিছু বলল না। কারও কাছ থেকে কোন কথা এলো না। হঠাৎ করেই বিষাদের একটা কালো ছায়া সবার চোখে-মুখে নেমে এসেছে।

নিরবতা ভাঙল জেনারেল মোস্তফাই। বলল, 'আমরা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছার আগে বিষয়টা মি. খালেদ খাকানকে জানানো দরকার।

'ঠিক বলেছ, জেনারেল মোস্তফা। তুমিই টেলিফোন কর তাকে এখনি।' প্রেসিডেন্ট বললেন।

'ইয়েস স্যার' বলে জেনারেল মোস্তফা কল করল আহমদ মুসাকে।

বিষয়টা তাকে জানিয়ে তার মতামত জানতে চাইল।

আহমদ মুসার কথা সে শুনল।

শেষে সালাম দিয়ে কল অফ করে প্রেসিডেন্টের দিকে তাকাল জেনারেল মোস্তফা। বলল, 'মহামান্য প্রেসিডেন্ট, আহমদ মুসা বলেছেন, দেশকে লন্ডভন্ড করে দেবার সাধ্য তাদের নেই। সকল সামরিক, শিল্প ও গভর্নমেন্ট স্থাপনা সোর্ডের ডিফেন্স শিল্ডের আওতায় আনা হয়েছে। এরপর বাকি বেসরকারি ও অন্য ধরনের হাজারো টার্গেট। এসব টার্গেটকে আক্রমণের আওতায় আনা অকল্পনীয়, অবশ্যই তাদের অসাধ্য। কিন্তু তিনি বলেছেন, ওদের শেষ দাবি মেনে নেয়ার জন্যে। মেনে নেয়ায় আমাদের কাজের কোনই ক্ষতি হবে না। আমরা যা করব, তা ওদের চোখের সামনে করব না, জানিয়েও করব না।

থামল জেনারেল মোস্তফা।

'আলহামদুলিল্লাহ! আহমদ মুসা ঠিক কৌশল নিয়েছেন। আমরা তার কৌশল গ্রহন করলাম। আর আমাদের দেশকে লন্ডভন্ড করার থ্রি জিরোর দাবি প্রত্যাখান করে মি. খালেদ খাকান যা বলেছেন, সেটাও ঠিক। তবে ক্ষতি যেটুকুই করতে পারুক, সেটাও আমাদের ক্ষতি। সে ক্ষতিও আমাদের এড়াতে হবে। আলহামদুলিল্লাহ! আহমদ মুসার ওপর আমাদের আস্থা আছে। তিনি পারবেন

অগ্রসর হতে, যেভাবে চাইছেন। তাকে সর্বাত্মক সাহায্য তোমরা কর।’ প্রেসিডেন্ট বললেন।

‘ইয়েস স্যার।’ বললেন প্রধানমন্ত্রী।

‘সবাইকে ধন্যবাদ’ বলে উঠে দাড়ালেন প্রেসিডেন্ট।

প্রচন্ড চাপ আহমদ মুসার মনের ওপর।

ওদের আলটিমেটামের ৪৮ ঘন্টার অনেকটা সময় কেটে গেছে। কিন্তু সামনে এক ইঞ্চি এগোনো যায়নি। এবার প্রয়োজন ওদের আসল ঘাঁটির সন্ধান, যেখানে চলছে তাদের গবেষণা, আছে ভয়ংকর অস্ত্রের কারখানা। ওদের পরিত্যক্ত পাম ট্রি গার্ডেনের ঘাঁটির কাগজপত্র ঘেঁটে বিশেষ কিছু পাওয়া যায়নি। ওদের অস্ত্রের নাম ও প্রকৃতি সম্পর্কে আরও কিছু। অদ্ভুত ওদের অস্ত্রটির নাম; ‘ফোটন সাইলেন্ট ডেস্ট্রাকশন ডেমন’ মানে ‘নিরব ধ্বংসের দৈত্য ফোটন।’ সংক্ষেপে ‘ডাবল ডি’। অস্ত্রের নামটা কিন্তু সার্থক। সত্যি ওটা নিরব ধ্বংসের দৈত্য। নিরবে, নিঃশব্দে ধ্বংস করে দেয় মেটালের তৈরি সব কিছু। অস্ত্রটি মানুষ হত্যা করে না, কিন্তু মানুষের, সমাজের, সভ্যতার, শক্তির সব অবলম্বনকে ধ্বংস করে দেয়। এ অস্ত্র ভালো হাতে থাকলে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু এ শয়তানদের হাতে থাকার অর্থ অন্য সবারই মহাসংকটে পড়া। অন্য সবাইকে গোলাম বানাবার অস্ত্র হতে পারে এটা। শয়তান তার অস্ত্র অক্ষত রাখবে, ধ্বংস করবে অন্য সকলের অস্ত্র। এমন ধ্বংসের দুনিয়ার মানুষের শত্রু, মানবতার শত্রু। তার হাতে নিরব ধ্বংসের দৈত্য নামের ফোটন অস্ত্র থাকা দুনিয়ার জন্যে, দুনিয়ার মানুষের জন্যে মোটেও নিরাপদ নয়। তাদের এই অস্ত্র, এই গবেষণা সহ তাদের ধ্বংস করতে হবে। তাহলে আমাদের অস্ত্র সোর্ড হয়ে দাঁড়াবে মানবতাকে রক্ষার অপ্রতিদ্বন্দ্বী অস্ত্র। সব দেশ যদি ডিফেন্সের সোর্ড পেয়ে যায়, তাহলে আক্রমণকারী সব অস্ত্র অচল হয়ে পড়বে। ফলে এধরনের অস্ত্র তৈরিতে সব দেশই নিরুৎসাহিত হবে। ফলে বিলিয়ন বিলিয়ন অর্থে অস্ত্র তৈরি হবে না এবং সেই অর্থ সাশ্রয় হবে।

মানুষের, মানবতার কল্যাণে লাগবে সেই অর্থ এবং এভাবেই আমাদের অস্ত্র, সেভিয়ার অব ওয়ার্ল্ড র‍্যাশনাল ডোমেইন (দুনিয়ার মানুষ্যত্ব- আদর্শের রক্ষক) নাম সার্থক হবে।

ভাবনায় ডুবে গিয়েছিল আহমদ মুসা।

'সোর্ড' এর কথা ভাবতে গিয়ে একটা আবেগ এসে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

জোসেফাইন আহমদ মুসার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করল। পারল না। আহমদ মুসার চোখ ঠিকই আছে তার দিকে, কিন্তু তাতে কোন দৃষ্টি নেই।

জোসেফাইন সামনের সোফা থেকে উঠে এসে আহমদ মুসার পাশে বসল। ধীরে ধীরে হাত রাখল আহমদ মুসার কাঁধে।

আহমদ মুসা একটু চমকে উঠে ফিরে তাকাল জোসেফাইনের দিকে।

আহমদ মুসার চোখে তখনও শূন্য দৃষ্টি।

জোসেফাইন আহমদ মুসার কাঁধে চাপ দিয়ে বলল, 'কি ভাবছ এমন করে?'

আহমদ মুসা পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল জোসেফাইনের দিকে। বলল, 'ভাবছি ওদের আলটিমেটামের কথা। সময় যাচ্ছে, কিন্তু সামনে এগোবার পথ দেখা যাচ্ছে না। ওদের ঘাঁটি, হেড কোয়ার্টার ওরা কোথায় শিফ্‌ট করল, সেটাই আমরা লোকেট করতে পারছি না। সবচেয়ে বেদনার বিষয় হয়েছে, ওদের যে ৭ জন লোক ধরা পড়েছিল, পুলিশের অসতর্কতার কারণে তাদের কাউকে বাঁচিয়ে রাখা যায়নি। জ্ঞান ফেরার সংগে সংগেই ওরা পটাসিয়াম সাইনাড খেয়ে...।'

মোবাইল বেজে উঠল জোসেফাইনের।

জোসেফাইন আহমদ মুসার কথার মাঝখানেই বলে উঠল, 'এক্সকিউজ মি, টেলিফোনটা ধরছি।'

বলে জোসেফাইন সোফার একপাশে কাত হয়ে কলটা অন করল।

ওপারে জেফি জিনার কণ্ঠ শুনেই জোসেফাইন বলল, 'আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন?'

‘ভালো। আপনি কেমন আছেন? ব্যাস্ত নন তো আপনি?’ বলল জেফি জিনা।

‘ব্যস্ত থাকব কেন, আমার তো কোন কাজ নেই। আহমদের আব্বার সাথে একটু কথা বলছিলাম খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে আছেন এখন তিনি।’ বলল জোসেফাইন।

‘কি নিয়ে ওঁর দুশ্চিন্তা?’ জিজ্ঞাসা জেফি জিনার।

‘ওরা ৪৮ ঘন্টার আলটিমেটাম দিয়েছে। এই আলটিমেটামের মোকাবিলা করতে হলে ওদের হদিস প্রয়োজন। সে হদিস এদের কাছে নেই।’ বলল জোসেফাইন।

সংগে সংগে উত্তর দিল না জেফি জিনা।

মূহুর্ত কয়েক পরে তার কণ্ঠ শোনা গেল। বলল, ‘আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কোর্স করছেন সেই শিক্ষক স্মার্থা দু’দিন আগে টেলিফোনে কারও সাথে কথা বলার সময় বলছিল, বসফরাসের পূর্বে উত্তর ইস্তাম্বুলের একটা বড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স তাদের নতুন ঠিকানা। আমি জানিনা এটা কোন গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন কি না?’

‘ধন্যবাদ মিস জেফি, প্লিজ আপনি ওর সাথে একটু কথা বলুন। তার আরও কিছু জিজ্ঞাসাও থাকতে পারে।’ জোসেফাইন বলল।

‘প্লিজ, না। হঠাৎ কথা বলতে খারাপ লাগবে। পরিচয় নেই, উনিই বা কি ভাববেন? আমার যা জানা আপনাকে তো বললাম। প্লিজ।’

‘ঠিক আছে। সে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের কি নাম বলছিল?’ জিজ্ঞাসা জোসেফাইনের।

‘নাম বলেনি, বলেছিল ঐটুকুই। গত দু’দিন থেকে সে হঠাৎ করেই উধাও। আচ্ছা থাক, আহমদ আব্দুল্লাহ কেমন আছে?’

‘ভালো আছে।’

‘অনেক দিন ওর সাথে দেখা হয়নি, না?’ বলল জেফি জিনা।

‘আসুন না আমাদের বাসায়। এলেন না কোন দিন।’ জোসেফাইন বলল। তার কন্ঠে অনুযোগের সুর।

‘যাবো একদিন।’ বলল জেফি জিনা।

‘সে দিন কবে আসবে? আসার কথা বললেই কোন না কোন অসুবিধা দাঁড় করাবেনই?’ জোসেফাইন বলল।

‘হযরত আইয়ুব সুলতান রা.-এর ওখানে এর মধ্যে কবে আসবেন?’ জিজ্ঞাসা জেফি জিনার।

‘যাওয়ার আগে আপনাকে জানাব। আপনাকে না পেলে তো মজা হবে না।’ বলল জোসেফাইন।

‘ধন্যবাদ। আর কথা নয়। আপনি অবশ্যই ব্যস্ত। রাখি।’ জেফি জিনা বলল।

‘আবার ব্যস্ততার কথা!’ বলল জোসেফাইন।

‘স্যরি। আসসালামু আলাইকুম।’

‘ধন্যবাদ। ওয়া আলাইকুম সালাম।’ বলে মোবাইলের কল অফ করে দিল জোসেফাইন।

আহমদ মুসা উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে ছিল জোসেফাইনের দিকে। বলল, ‘তোমার বান্ধবী কি বলছিল? কি এক ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের কথা বললে?’

‘স্মার্থা মানে সেই শিক্ষিত মেয়েটা। সে নাকি দু’দিন আগে কারও সাথে টেলিফোনে কথা বলার সময় বসফরাসের পশ্চিমে উত্তর ইস্তাম্বুলে একটা ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সে তাদের নতুন ঠিকানার কথা বলেছে।’

আহমদ মুসা সোজা হয়ে বসল।

ভ্রূ কুঞ্চিত হলো তার। বলল আহমদ মুসা দ্রুত কন্ঠে, ‘ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের নাম বলেছে?’

‘নাম নয়, শুধু ঐ টুকুই বলেছিল।’ বলল জোসেফাইন।

‘বসফরাসের পশ্চিমে উত্তর ইস্তাম্বুলে একটা ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স’ কথাটা কয়েকবার মনের মধ্যে আওড়াল আহমদ মুসা। শুনেছে এমন কথা সে এর আগে। কোথায়? হঠাৎ আহমদ মুসার মনে পড়ল, প্রেসিডেন্ট কিছু দিন আগে তাকে বলেছিলেন, বিজ্ঞানি আবদুর রহমান আরিয়েহকে বসফরাসের পূর্ব পাড়ে পার্বত্য এলাকায় একটা ইন্ডাস্ট্রিয়েল কমপ্লেক্স স্থাপনের অনুমতি দিয়েছিলেন।

সংগে সংগেই লাফ দিয়ে উঠল আহমদ মুসা সোফা থেকে অপ্রত্যাশিত কিছু পেয়ে যাবার আনন্দে। বলল, 'বোধ হয় পেয়ে গেছি জোসেফাইন!'

বলেই আবার বসে পড়ল। বলল, 'জোসেফাইন, আমার মোবাইলটা দাও তো!'

আহমদ মুসার আনন্দে জোসেফাইনেরও মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। দ্রুত উঠে গিয়ে মোবাইল এনে আহমদ মুসার হাতে দিয়ে বলল, 'কি পেয়ে গেছ? ওদের নতুন ঠিকানা?'

'বলছি জোসেফাইন, প্রেসিডেন্টকে টেলিফোনটা করে নিই।'

বলে কল করল প্রেসিডেন্টকে।

ওপারে প্রেসিডেন্টের কন্ঠ পেয়েই আহমদ মুসা বলল, 'মি. প্রেসিডেন্ট! স্যার, এভাবে বিরক্ত করার জন্যে আমি দুঃখিত। জরুরি...।'

'মি. খালেদ খাকান, এধরনের কথার আশ্রয় নেবেন আপনি, এটা আমার জন্যে খুবই দুঃখের। আমার ২৪ ঘণ্টা সময় আপনার জন্যে ওপেন। প্লিজ বলুন।' আহমদ মুসার কথার মাঝখানেই বলে উঠলেন প্রেসিডেন্ট।

'ধন্যবাদ, স্যার। একটা জরুরি বিষয়ের জন্যে আপনাকে টেলিফোন করেছি। একদিন আপনি বলেছিলেন, বিজ্ঞানি আবদুর রহমান আরিয়েহকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের জন্যে একটা বিশাল এলাকা বরাদ্দ দিয়েছিলেন বসফরাসের পূর্ব পাড়ে উত্তর ইস্তাম্বুলে। সে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের নামও আপনি বলেছিলেন। আমি মনে করতে পারছি না। আপনি কি একটু সাহায্য করতে পারবেন?' বলল আহমদ মুসা।

'হ্যাঁ, মি. খালেদ খাকান, ঘটনাটা আমার মনে আছে। নাম হলো, 'আরিয়েহ ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড'।'

'অনেক ধন্যবাদ, স্যার।' আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ দিন, কিন্তু বিদায় নেবেন না। যেজন্যে এত বড় ধন্যবাদ, সেই আরিয়েহ ইন্ডাস্ট্রিজ নিয়ে আপনার আগ্রহ কেন বলুন।' প্রেসিডেন্ট বললেন।

'স্যার, আমার ইনফরমেশন যদি ঠিক হয়, তাহলে এটাই আমাদের খুঁজে বেড়ানো সোনার হরিণ।' আহমদ মুসা বলল।

‘আলহামদুলিল্লাহ! আপনার জিজ্ঞেস করা দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল। থ্রি জিরোর সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু হবে এটা। একদম সোনার হরিণ হবে তা বুঝিনি। আলহামদুলিল্লাহ! পরবর্তী প্রোগ্রাম আপনার কি? জেনারেল মোস্তফারা জানতে পেরেছেন এ বিষয়টা?’ জিজ্ঞেস করলেন প্রেসিডেন্ট।

‘না, এখনো জানাইনি। তথ্যটা পাওয়ার পর প্রথম টেলিফোনটা আপনাকে করেছি বিষয়টা নিশ্চিত হবার জন্যে। আমার প্রোগ্রাম আমি পরে জানাব। তার আগে আরও কিছু বিষয় জানা দরকার। ইতিমধ্যে আমার একটা অনুরোধ। আরিয়েহ ইন্ডাস্ট্রিজ থেকে বাইরে বেরুবার যত পথ আছে, অলিগলি আছে, সবখানে সাদা পোশাকে পুলিশ ও গোয়েন্দা মোতায়েন করা দরকার। যারা শিল্প-কারখানাটি থেকে বের হবে, তারা কোথায় কোথায় যায়, কোথায় থাকে তা শেষ পর্যন্ত মনিটর করতে হবে। আরিয়েহ ইন্ডাস্ট্রিজ-এর স্যাটেলাইট ক্লোজ ফটো দরকার। পরে সব আলোচনা করবো স্যার।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ধন্যবাদ, মি. খালেদ খাকান। আপনি যা বলেছেন, তা এখন থেকেই কার্যকর হবে। স্যাটেলাইট ফটো আপনি অল্পক্ষণের মধ্যে পেয়ে যাবেন।’ বললেন প্রেসিডেন্ট।

‘ধন্যবাদ, স্যার।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ওকে, মি. খালেদ খাকান। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন। আসসালামু আলাইকুম।’ বললেন প্রেসিডেন্ট।

আহমদ মুসা সালাম নিয়ে মোবাইলের কল অফ করে দিল।

মোবাইল অফ করে দিয়ে মূহুর্তকাল চোখ বন্ধ করে থাকল আহমদ মুসা।

তারপর চোখ খুলেই সে জড়িয়ে ধরল জোসেফাইনকে। বলল, ‘তোমার বান্ধবীকে ধন্যবাদ। প্রায় সব ক্রিটিক্যাল ব্যাপারে তার সহযোগিতা তোমার মাধ্যেমে এসেছে। কিন্তু আমার বিস্ময় লাগছে, এতো সাহায্য যিনি করছেন, তিনি কিন্তু একদিনও কথা বলেননি, সরাসরি কোন তথ্য তিনি আমাকে দেননি। এটা সত্যি বিস্ময়কর! এর কোন অর্থ তুমি পেয়েছ, আমি কিন্তু পাইনি।’

দু’জনই পাশাপাশি বসল। ভাবনার ছাপ জোসেফাইনের চোখে-মুখে। বলল, ‘অনেক সময় আমারও বিস্ময় ঠেকেছে! খুব জরুরি বিষয় যা তোমাকে

সরাসরি জানানো দরকার, সেটাও আমার মাধ্যমে বলেছেন। তার ফলে সময় নষ্ট হয়েছে। সময় নষ্ট হওয়ার বিষয়টি বুঝেও তিনি সরাসরি টেলিফোন করেননি। সত্যি এ রহস্যের কোন জবাব নেই আমার কাছে। আজও আমি তাকে অনুরোধ করেছিলাম নতুন ঠিকানার বিষয়টি তোমাকে বুঝিয়ে বলার জন্যে। কিন্তু পাল্টা তিনি আমাকে অনুরোধ করেছেন সরাসরি কথা বলা থেকে রেহাই পাবার জন্যে।'

থামল জোসেফাইন।

'অথচ দেখ, সাহায্য করার আগ্রহ তারই বেশি। কিন্তু কথা বলার আগ্রহ নেই। বিষয়টা মেলে না।' আহমদ মুসা বলল।

'শুধু আগ্রহ নয়, উদ্বেগও তার মধ্যে আমি দেখেছি। সেই যে আলালা পাহাড়ের সিনাগনে, তুমি যেখানে বিপদে পড়েছিলে, সেদিন আমাকে নিয়ে সেখানে যাওয়ার সময় তার মধ্যে যে উদ্বেগ দেখেছি, আবেগ দেখেছি তা বিস্ময়কর! বসফরাসের ব্রীজ থেকে লাফিয়ে পড়ার ঘটনায় তোমাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় শত্রুর হাত থেকে কৌশলে তিনি উদ্ধার করে আনলেন, সে দিন তার মধ্যে যে উদ্বেগ, আবেগ ও আন্তরিকতা দেখেছি তার কোন তুলনা হয় না। একেবারে একদম কাছের মানুষ না হলে এমন মনোভাব কারও মধ্যে সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। এভাবে প্রতিটি ইনফরমেশন দেয়ার সময় তার মধ্যে আমি এই আবেগ-আন্তরিকতা দেখেছি। সত্যি আমি বিষয়টা ভাবতে...।'

জোসেফাইনের কথার মাঝখানেই আহমদ মুসা বলে উঠল, 'দেখ, একটা বিষয় এখনও আমার কাছে রহস্য! তিনি শত্রুর কবল থেকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় আমাকে উদ্ধার করলেন। বুঝলাম একজন বান্ধবীর স্বামীকে তিনি উদ্ধার করেছেন, কিন্তু বান্ধবীর স্বামীটিকে তিনি চিনলেন কি করে? এক ঝলক কোথাও যদি দেখেও থাকেন, ফটোও যদি দেখে থাকেন, তবু ঐ রকম বিপর্যস্ত অবস্থায় চিনতে পারার কথা নয়। আরেকটা কথা ঐ অবস্থায় চিনতে পারার জন্যে যে গভীরভাবে দেখা প্রয়োজন, সেভাবে দেখার জন্যে উনি সেদিন সেখানে গেলেন কেন?'

থামল আহমদ মুসা।

‘প্রশ্নগুলো আমার কাছেও বিস্ময়ের! তবে আমার বান্ধবীর নিয়ে অন্য কিছু ভেব না। সে অত্যন্ত আন্তরিক। প্রতিবার, প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি কথায় এর প্রকাশ আমি দেখেছি। তার মুখটা তার মনের আয়না। অদ্ভূত এক সরলতা, পবিত্রতা তার চোখে-মুখে! তার সান্নিধ্যে গেলে মন ভরে যায়, অপার এক আনন্দ পাওয়া যায়। বাচ্চারাই মানুষের অন্তর ভালো বুঝতে পারে। কারও কাছে তারা যায়, কারও কাছে যায় না। আমাদের আহমদ আব্দুল্লাহ তার জন্যে পাগল। দেখা পেলেই তার কোলে গিয়ে মুখ গুঁজবে। সেও...।’

‘যাক, আর বলো না জোসেফাইন। বুঝতে পারছি, তুমি তার প্রেমে পড়ে গেছ। তবে এটাও মনে রেখ, যে কোন সৌন্দের্যের প্রশংসা করে কিংবা যে সবার মধ্যে সৌন্দর্য, সরলতা, পবিত্রতা দেখে, সে কিন্তু সবার চেয়ে সুন্দর হয়। অতএব, জোসেফাইন...।’

আহমদ মুসা কথা শেষ করার আগেই জোসেফাইন আহমদ মুসার পিঠে একটা কিল দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ‘তুমি কথাটাকে এখন অন্যদিকে ঘোরাচ্ছ, আমি চললাম।’

আহমদ মুসা হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল জোসেফাইনকে। ছুটে পালাল জোসেফাইন।

হাসল আহমদ মুসা। মনে মনে বলল, ‘তুমি অন্যের প্রশংসা যতটা কর, তার একাংশও নিজের প্রশংসা শুনতে পার না।’

আহমদ মুসা সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে মোবাইলটা টেনে নিল।

আহমদ মুসা টেলিফোন করল ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির রেজিস্ট্রার তাইয়ের ইসমাইলকে।

তাইয়ের ইসমাইলের সাথে আহমদ মুসার কয়েক বার দেখা হয়েছে।

টেলিফোনে তাইয়ের ইসমাইলকে পেল আহমদ মুসা। সালাম ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর বলল, ‘আমি একটা ফেভার চাই আপনার।’

‘অবশ্যই, স্যার। বলুন।’ বলল রেজিস্ট্রার।

'আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ে 'জেফি জিনা' নামে একজন বিদেশী অধ্যাপিকা আছেন। তার কিছু তথ্য আমাকে দিতে হবে। তিনি কোন্ দেশের, কোন্ ঠিকানার, কতদিন আছেন, থাকেন কোথায় ইত্যাদি।' বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা যখন কথা বলছিল, তখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল জোসেফাইন।

আহমদ মুসার অনুরোধের উত্তরে ওপার থেকে রেজিস্ট্রার বলল, 'ঠিক আছে স্যার, জানাব আপনাকে খোঁজ নিয়ে।'

ধন্যবাদ ও সালাম জানিয়ে কল অফ করে দিল আহমদ মুসা।

'ধন্যবাদ, ঠিক করেছ। এবার ওঁকে ধরা যাবে।' বলল জোসেফাইন।

আবার আহমদ মুসা হাত বাড়াল। জোসেফাইনকে ধরার জন্যে।

এবার আর পালালো না জোসেফাইন।

হাত ধরলেও বাধা দিল না।

টানল জোসেফাইনকে আহমদ মুসা নিজের দিকে।

বোঁটা ছেঁড়া ফলের মতো জোসেফাইন এসে পড়ল আহমদ মুসার কোলে।

'ঝামেলা করো না, আহমদ আবদুল্লাহ নড়ছে, এখনি উঠবে ঘুম থেকে।' বলল জোসেফাইন। তার মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে।

আহমদ মুসার পরনে শিখ ড্রাইভারের পোশাক। মাথায় শিখের পাগড়ি। মুখভরা কালো দাড়ি। গায়ে ড্রাইভারের ইউনিফরম।

পেছনের সিটে ইস্তাম্বুল হার্ডওয়্যার লিমিটেড-এর জিএম ইসমাত ওসমানেগলু। জরুরি ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানটির কিছু স্পেয়ার পার্টস দরকার। পার্টসগুলোর স্পেসিফিকেশন আছে। তার অনুকরণেই স্পেয়ার পার্টসগুলো তৈরি

হবে। এই অর্ডার নিয়েই যাচ্ছে প্রতিষ্ঠানের জিএম ইসমাত ওসমানেগলু আরিয়েহ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড কোম্পানীর কাছে।

আহমদ মুসা আরিয়েহ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ওয়েব সাইটে দেখেছে, কোম্পানিটি জার্মানি ও জাপানের মিল-মেশিনারিজ এবং অফিস ইকুপমেন্ট তৈরিকারি দু'টি সোল এজেন্ট হওয়া ছাড়াও অর্ডারের ভিত্তিতে স্পেয়ার পার্টস তৈরি ও সরবরাহ করে থাকে।

আরিয়েহ ইন্ডাস্ট্রিজের ভেতরে ঢোকা এবং ভেতরের একটা অবস্থা সম্পর্কে ধারণা নেয়ার জন্যে এর চেয়ে সস্তা ব্যবস্থা করার কোন পথ আর আহমদ মুসারা পায়নি।

আহমদ মুসা নকল ড্রাইভার। কিন্তু ইস্তাম্বুল হার্ডওয়্যারের জিএম ইসমাত ওসমানেগলু নকল নন। তিনি সত্যিই প্রতিষ্ঠানটির জিএম। একজন দেশপ্রেমিক মানুষ। তাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে আনা হয়েছে। তবে স্পেয়ার পার্টস তাদের দরকার, এটা ঠিক।

বসফরাসের পূর্ব তীর ধরে একটা দামি মার্সিডিস এগিয়ে চলছে উত্তর দিকে।

গাড়িটা হাইওয়ের কেলি ইবরাহিম অংশে পৌঁছার পর সতর্ক হয়ে উঠল আহমদ মুসা। সামনেই 'মারকাজ বেকিজ'-এর মোড়।

গাড়ি পৌঁছল মারকাজ বেকিজ-এর বিখ্যাত ব্যস্ত স্থানটিতে। এখান থেকে রাহিকায়া রোড পূর্ব দিকে গেছে। এই রোড ধরে তাদের পূর্বে পার্বত্য এলাকার দিকে এগোতে হবে।

রাহিকায়া রোড সাত-আট মাইল চলার পর গাড়ি গিয়ে পড়ল আকবাবা রোডে।

ঠিক যে স্থানটায় আহমদ মুসাদের গাড়ি আকবাবা রোডে উঠল, সেখানে সামনে বিরাট একটা বনজ উপত্যকা। তারপরেই একটা পার্বত্য ভূমি ধীরে ধীরে উপরে উঠে গেছে।

এই বনজ উপত্যকাতেই গড়ে উঠেছে আরিয়েহ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড।

রাহিকায়া রোড থেকেই একটা পাথুরে প্রাইভেট রোড গাছের সারির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেছে আরও ভেতরে।

আহমদ মুসার গাড়ি একটি প্রাইভেট রোডে গিয়ে পড়ল।

পেছন থেকে ইসমত ওসমানেগলু আহমদ মুসাকে বলল, 'ওদের সাথে যোগাযোগ করে আসিনি। ওরা কি ঢুকতে দেবে, সাক্ষাৎ দিতে রাজি হবে?'

'সেটাও টেস্ট করা আমাদের আজকের একটা লক্ষ্য।'

আড়াইশ' তিনশ' গজ এগোবার পর বাধা পেয়ে আহমদ মুসা গাড়ি থামিয়ে দিল।

দু'জন লোক রাস্তার দু'পাশ থেকে লাল পতাকা তুলে গাড়ি থামাতে নির্দেশ দিল।

আহমদ মুসা গাড়ি রাস্তার একপাশে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল।

লাল পতাকাধারী দু'জন লোক ছুটে এলো গাড়ির কাছে। একজন লোক খোলা জানালার দিকে ইসমাত ওসমানেগলুর সাথে কথা বলার জন্যে এগোলো, আরেকজন দাঁড়াল আহমদ মুসার পাশে এসে।

'স্যার, কোথায় যাবেন?' ইসমত ওসমানেগলুর দিকে এগিয়ে যাওয়া লোকটি জিজ্ঞেস করল ইসমাত ওসমানেগলুকে।'

'আরিয়েহ ইন্ডাস্ট্রিজে।' বলল ইসমত ওসমানেগলু।

'কার কাছে?' আবার জিজ্ঞাসা লোকটির।

'জরুরি প্রয়োজন। সেল্‌স বা প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টের দায়িত্বশীল যাকেই পাই তার সাথে আলোচনা করব।' বলল ইসমাত ওসমানেগলু।

লোকটি একটু চিন্তা করল। বলল, 'আপনি কি এ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়েছেন?'

'বললাম তো খুব জরুরি ব্যাপার। মার্কেটে অনেক ঘুরেছি, তারপর সোজা এখানে আসছি শেষ ভরসা হিসেবে। যোগাযোগের সময় পাইনি।' বলল ইসমত ওসমানেগলু।

'ঠিক আছে, এসব গেটে গিয়ে সংশ্লিষ্ট অফিসারকে বলবেন। কিন্তু আপনাদেরকে গাড়ি রেখে যেতে হবে। প্লিজ আপনারা নামুন। গাড়ি এখানেই পার্ক করা থাকবে।'

আহমদ মুসা নেমেছে। ইসমাত ওসমানেগলুও নামল।

'গাড়ি নিয়ে যাওয়া যাবে না কেন?' গাড়ি থেকে নেমেই আহমদ মুসা জিজ্ঞেস করল তার সামনের লোকটিকে।

'এখানকার এটাই নিয়ম। সবাইকেই এখানে গাড়ি রেখে যেতে হয়। শুধু তো গাড়ি নয়, আপনাদের ব্যাগে, পকেটে মেটালিক কিছু থাকলে সেগুলোও রেখে যেতে হবে।' জবাবে লোকটি বলল।

ভ্রূ কুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার।

তার মনের কোণে একটা চিন্তা ঝিলিক দিয়ে উঠল। মনে মনে চমকে উঠল। কিন্তু বিষয়টা মনেই রেখে মুখে বিস্ময় টেনে বলল, 'আমরা যে স্পেয়ার পার্টস কিনতে যাচ্ছি, তার অনেক রকমের স্যাম্পল আমাদের ব্যাগে আছে ! সেগুলো না নিলে আমাদের চলবে কি করে?'

'আমরা সেটা জানি না। সেটা ওখানে গিয়েই বলবেন। তারা সেটা দেখবেন, এমনকি পকেটের চাবি, হাতের আংটি সবই আপনাদেরকে গাড়ির ভেতর রেখে যেতে হবে।' একেবারে নিরস কন্ঠে বলল লোকটি।

'আচ্ছা একটা কথা, আপনাদের ইন্ডাস্ট্রিজের লোকরাও কি এভাবে মেটালিক সব কিছু রেখে ভেতরে যায়?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা। তার মনে এ রকমের অনেক প্রশ্ন কিলবিল করছে।

'তারা এ পথে যান না।' বলল লোকদের একজন।

'কোন্ পথে যান? আমরাও সে পথে যেতে পারি? কোন্ দিকে পথটা?' জিজ্ঞেস করল আবার আহমদ মুসা।

লোক দু'জন বিরক্তির দৃষ্টিতে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'সেটা আকাশ দিয়ে কি পাতাল দিয়ে তা আমরা জানি না। কথা রাখলে, আমরা যেভাবে বলেছি, সেভাবে যেতে পারেন। না হলে ফিরে যান।'

‘দুঃখিত, মাফ করবেন। আমরা তো সাংঘাতিক ঝামেলায় পড়েছি! জিনিসগুলো খুব জরুরি। সেজন্যেই বলছিলাম। আমরা যদি মালিকদের অনুরোধ করি টেলিফোনে, তাহলে কি তারা পথটা আমাদের দেখিয়ে দিতে পারেন?’ খুব নরম গলায় বিনয়ের সাথে বলল আহমদ মুসা।

লোকটি পূর্ণ দৃষ্টিতে আহমদ মুসার দিকে তাকাল। ওষুধে ধরেছে বলে মনে হলো। তার চোখে নরম ভাব নেমে এসেছে। বলল, ‘স্বয়ং ঈশ্বর নেমে এলেও সে পথের সন্ধান পাবেন কিনা সন্দেহ আছে। আরে মিয়া, যাবেনই বা কি করে? পাহাড়ে কি গাড়ি চলে?’

‘পাহাড়ে যাবো কেন?’ আহমদ মুসা বলল।

‘পথ তো ওখানেই।’ বলল একজন।

‘পাহাড়-টাহাড় থাক, এখন বলুন, কোনওভাবে গাড়ি নিয়ে গেটে যেতে পারবো কিনা?’ বলল আহমদ মুসা।

‘দেখুন, আপনারা ফিরে যান। এভাবে স্পেয়ার পার্টস কেনার জন্যে এখানে কখনও কেউ আসেনি। আপনারা ফিরে গিয়ে বসদের সাথে যোগাযোগ করুন।’ বলল ওদের দু’জনের একজন।

‘সেটাই ভালো!’ বলে আহমদ মুসা ইসমাত ওসমানেগলুকে বলল, ‘ঠিক আছে। গাড়িতে উঠুন।’

আহমদ মুসা ও ওসমানেগলু দু’জনেই গাড়িতে উঠল।

আহমদ মুসা গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে চলতে শুরু করল।

‘গেলেই কি ভালো হতো না গাড়ি রেখে!’ ইসমাত ওসমানেগলু বলল।

‘দরকার নেই, ইসমাত ওসমানেগলু, যেজন্যে আসা তা হয়ে গেছে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘হয়ে গেছে?’

‘হ্যাঁ, ইসমত ওসমানেগলু।’

‘আলহামদুলিল্লাহ!’ বলল ব্যবসায়ী ইসমাত ওসমানেগলু। কথা সে বাড়াল না। সে জানে, গোয়েন্দা বিভাগের অনেক জরুরি কাজ। জরুরি প্রয়োজন থাকে। সব জানা তাদের ঠিক নয়।

আরিয়েহ ইন্ড্রাস্ট্রিজের পূর্ব প্রান্তের পাহাড়ে উঠেছে আহমদ মুসা।

স্যাটেলাইট ফটোতে পাহাড়ের এই এলাকা নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করেছে আহমদ মুসা। আরিয়েহ ইন্ড্রাস্ট্রিজে ঢোকার পথে দু'জন লাল পতাকাধারীর কাছ থেকে জেনেছিল এই পাহাড়ী এলাকা থেকে আরিয়েহ ইন্ড্রাস্ট্রিজে ঢোকার গোপন পথ রয়েছে।

গাড়ি ও কোন প্রকার মেটাল দ্রব্য নিয়ে সামনে অগ্রসর হওয়ার পথ নেই, লাল পতাকাধারীরা বাধা দেয়া থেকে এ বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, আরিয়েহ ইন্ড্রাস্ট্রিজের চারদিক ঘিরে একটা নিষিদ্ধ এলাকা তারা সৃষ্টি করেছে যে এলাকায় তাদের নিরব ধ্বংসের দৈত্য সক্রিয় থাকে। শত্রুরা যাতে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রবেশ করতে না পারে এজন্যেই এই ব্যবস্থা। কেউ প্রবেশ করতে চেষ্টা করলে তাদের অস্ত্র হাওয়া হয়ে যাবে, এমনকি বিস্ফোরকের সাথে যদি মেটালিক কিছু থাকে, তাহলে তাও বিস্ফোরিত হয়ে নষ্ট হয়ে যাবে।

আহমদ মুসারা পাহাড়ের গোপন পথেই আরিয়েহ ইন্ডাসস্ট্রিজে প্রবেশের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। লাল পতাকাধারীদের কথা থেকে যা বুঝা গেছে তাতে এই পথে মেটালিক অস্ত্র নিয়ে প্রবেশ করা যাবে। কিন্তু আহমদ মুসারা মেটালিক অস্ত্র ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রাণহানি এড়িয়ে যুদ্ধ ছাড়াই আরিয়েহ ইন্ড্রাস্ট্রিজের গবেষণাগার ও অস্ত্রশস্ত্র দখলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এজন্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা গ্যাস অস্ত্র ব্যবহারের।

আহমদ মুসা ক্রলিং করে এগোচ্ছে।

এলাকাটা ফ্লাট, কিন্তু এবড়ো-থেবড়ো।

টার্গেটটা এখনও বেশ দূরে।

টার্গেট হলো ছোট আকারের ডিশ প্লাস কম্যুনিকেশন এ্যান্টেনা। এ্যান্টেনা দাঁড়িয়ে আছে প্রায় চার ফুট উচু পাথুরে পিলারের ওপর। পিলারটা হবে

চার বর্গফুটের মতো প্রশস্ত। আহমদ মুসারা সন্দেহ করেছে গোপন সুড়ঙ্গ পথ এখানেই থাকতে পারে।

আহমদ মুসা ধীরে ধীরে ঐ এ্যান্টেনার দিকেই এগোচ্ছে।

আহমদ মুসার গায়ে পাথুরে রঙের একটা বুলেট প্রুফ জ্যাকেট। কপাল পর্যন্ত নেমে এসেছে বুলেট প্রুফ জ্যাকেটটি। গলায় ঝুলছে হিউম্যান বডি সেঞ্জিং মনিটর ও একটি গ্যাস মুখোশ। হাতের কাছে জ্যাকেটের বুক পকেটে রয়েছে আল্ট্রা ক্লোরোফরম গান। এই গ্যাস ক্যাপসুল বুলেট মানুষের সংস্পর্শে যাওয়ার সংগে সংগেই মানুষের সংজ্ঞা লোপ পায়।

সামনে বড় পাথর পথ রোধ করে উঁচু হয়ে আছে।

পাথরটা ডিঙাবার জন্যে মাথা তুলেছিল আহমদ মুসা।

হঠাৎ সামান্য যান্ত্রিক একটা শব্দে সামনে তাকিয়ে হালকা অন্ধকারে দেখতে পেল, এ্যান্টেনাটি একদিকে কাত হয়ে গেছে।

কৃষ্ণপক্ষের রাত হলেও তারার আলো উন্মুক্ত জায়গায় অন্ধকার অনেকখানি ফিকে করে দিয়েছে।

আহমদ মুসা মাথাটা পাথরের আড়ালে এনে চোখ রাখল টার্গেট স্থানটার দিকে।

পার হলো কয়েক মূহুর্ত।

প্রশস্ত পিলারের ভেতর থেকে মানুষ বেরিয়ে আসতে দেখল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার চোখ এবার আঠার মতো লেগে গেল দৃশ্যটির ওপর।

এক এক করে পাঁচজন লোক বেরিয়ে এলো।

পঞ্চম ব্যক্তি বেরিয়ে এলে একজন গিয়ে কাত হয়ে পড়া এ্যান্টেনার গোড়ায় কি যেন করলো। এ্যান্টেনা আবার সোজা হয়ে প্রশস্ত পিলারের ওপর দাঁড়িয়ে গেল।

আহমদ মুসা বুঝল পিলারটি আসলে সিঁড়ির মুখ বা সুড়ঙ্গ মুখ। এ্যান্টেনা হচ্ছে সুড়ঙ্গ মুখের ক্যামোফ্লেজ। আর এ্যান্টেনার গোড়ায় রয়েছে সুড়ঙ্গ মুখ খোলার চাবিকাঠি।

পাঁচজন একত্র হয়ে উদ্যোগ নিল সামনে মানে পাহাড়ের ওপর দিকে এগোবার।

আহমদ মুসা আর সময় নষ্ট করল না।

তারা এ সিদ্ধান্তই নিয়েছে প্রথম সুযোগেই তারা আক্রমণে যাবে, লোকটিকে অচল করে দেবে। সেই ফর্মুলাই এখন বাস্তবায়ন শুরু করার পালা।

আহমদ মুসাও বুক পকেট থেকে আল্ট্রা ক্লোরোফরম গ্যাস ক্যাপসুল বের করল। গানটা ওদের দিকে তাক করে ট্রিগারে চাপ দিল। মানব দেহের সান্নিধ্যে গিয়ে অটো-বিস্ফোরণযোগ্য ক্যাপসুল বুলেট ছুটল সামনের পাঁচজনের দিকে।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড!

ওরা পাঁচজনই সংজ্ঞা হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল পাথুরে চত্বরে।

একটু সময় অপেক্ষা করল আহমদ মুসা। তার পর এগোলো ক্রলিং করেই ওদের দিকে।

ওদের কাছে পৌঁছে আহমদ মুসা পেন্সিল টর্চ জ্বেলে ওদের একবার করে দেখে নিতে লাগল।

একটি মুখে টর্চের আলো স্থির হয়ে গেল। স্তম্ভিত হয়ে গেল বিজ্ঞানী আবদুর রহমান আরিয়েহকে দেখে! আজই তার ফটো দেখেছে আহমদ মুসা জেনারেল মোস্তফার ফাইলে।

আনন্দে ভরে গেল আহমদ মুসার মন। শুরুতেই পেয়ে গেছে আসল লোককে। সাথের এ লোকগুলোও নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ কেউ হবে।

আহমদ মুসা দ্রুত মেসেজ পাঠালো পাথুরে এই এলাকার পাশে অপেক্ষমান তার টিমের লোকজনদের কাছে। তাদের তাড়াতাড়ি আসতে বলল এই পাঁচজনকে নিয়ে যাবার জন্যে।

আহমদ মুসা সেই পাথরের আড়ালে বসে অপেক্ষা করতে লাগল ওদের আসার জন্যে।

এই সময় আহমদ মুসা একটা চাপা হিস হিস শব্দ শুনে ওপরের দিকে তাকাল।

দেখল, মাথার ওপর একটা হেলিকপ্টার নেমে আসছে।

হেলিকপ্টারের আলো নেভানো ও অনেকটা নিঃশব্দে। নিয়ন্ত্রিত শব্দের এ হেলিকপ্টারগুলো অত্যন্ত দামি।

হেলিকপ্টারটি ল্যান্ড করল যেখানে পাঁচজন লোক সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে আছে, তা থেকে কিছুটা পূর্বে, পাহাড়ের আরও উঁচুতে। ওখানে পাহাড়ের মাথাটা যথেষ্ট সমতল।

ওদের সংজ্ঞাহীন হওয়ার ঘটনার পর পরই হেলিকপ্টার আসায় আহমদ মুসা বুঝল, হয় এই হেলিকপ্টারে আবদুর রহমান আরিয়েহদের কোথাও যাবার কথা ছিল অথবা এই হেলিকপ্টারে বড় কেউ আসছেন, যাদের স্বাগত জানানোর জন্যই তারা যাচ্ছিলেন ওদিকে।

হেলিকপ্টার থেকে এক এক করে নামল চারজন মানুষ। ওরা এগিয়ে আসতে লাগল এ্যান্টেনার দিকে।

এ্যান্টেনার সামনেই পড়ে আছে পাঁচজনের সংজ্ঞাহীন দেহ।

কথা বলছিল হেলিকপ্টার থেকে নেমে আসা লোকগুলো।

বেশ বড় গলাতেই কথা বলছিল তারা।

কে একজন বলছিল, ‘মি. ডেভিড ইয়াহুদ, বিজ্ঞানি আরিয়েহ ও তার সহযোগি চারজন বিজ্ঞানী ঠিক রাত ৯টায় এখানে রেডি থাকবেন এবং তাদেরকে এখান থেকে নিয়ে তৃতীয় জায়গাটায় মিটিং-এ বসব, এটাই তো সিদ্ধান্ত ছিল। ওরা আসেননি, আর্শ্চয!’

‘আমি স্তম্ভিত হচ্ছি, মি. বেন জায়ন বেন ইয়ামিন! মিটিং-এর স্থান শেষ মূহুর্তে পাল্টে আমরা আরিয়েহ ইন্ডাস্ট্রিজেই মিটিংটা করব ঠিক করা হয়েছে, এটা তো বিজ্ঞানী আরিয়েহদেরকে জানানো হয়নি! তাহলে সিদ্ধান্ত অনুসারে ওরা এখানে থাকবেন না কেন, বিশেষ করে ‘থ্রি জিরো’র সুপ্রিম কমান্ডার বেন জায়ন বেন ইয়ামিন হেলিকপ্টারে থাকবেন, তার উপস্থিতিতে সিদ্ধান্তের অন্যথা তিনি করবেন, তা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।’

একথাগুলো ‘থ্রি জিরো’র ইস্তাম্বুল প্রধান ডেভিড ইয়াহুদের। তা প্রথম জনের কথা থেকেই আহমদ মুসা বুঝল। আর যাকে লক্ষ্য করে ডেভিড ইয়াহুদ

কথাগুলো বললেন অর্থাৎ যিনি প্রথম কথা বলেছিলেন, তিনি বেন জায়ন বেন ইয়ামিন ও 'থ্রি জিরো'র সুপ্রিম কমান্ডার মানে সুপ্রিমপ্রধান।

একই সাথে বিস্ময় ও আনন্দে আহমদ মুসার মন নেচে উঠল। 'থ্রি জিরো'র সব হিরোকে আল্লাহতায়ালা এক সাথে করে তাদের কাছে এনে দিয়েছেন। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল আহমদ মুসা।

ওরা এসে পৌঁছে গেছে সংজ্ঞাহীন পাঁচজনের কাছে।

কাছাকাছি হতেই ওরা চারজন ছুটে এলো মাটিতে পড়ে থাকা পাঁচজনের দিকে।

ওরা চারজনই ঝুঁকে পড়েছে ওদের সংজ্ঞাহীন দেহের ওপর।

এটাই সময়, সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল আহমদ মুসা।

বুক পকেট থেকে আরেকবার উঠে এলো ক্লোরোফরম গান আহমদ মুসার হাতে।

ক্লোরোফরম গানটা ওদের দিকে টার্গেট করে ট্রিগারে তর্জনি চেপে ধরল আহমদ মুসা।

ছুটল ক্যাপসুল বুলেট ওদের চারজনের দিকে।

মাত্র আট-দশ সেকেন্ড। এর মধ্যেই ওদের চারজনের সংজ্ঞাহীন দেহ ঝরে পড়ল ওদের পাঁচজনের ওপর। ওরা সেই যে ঝুঁকে পড়েছিল, উঠে দাঁড়ানোরও আর সুযোগ পেল না।

পেছনে পায়ের পরিচিত শব্দ পেল আহমদ মুসা। মুখ ঘুরিয়ে দেখল, তার দশ জনের টিমটি এসে গেছে।

আহমদ মুসা কমান্ডো টিমের নেতা মুরাদ আনোয়ারকে নির্দেশ দিল, 'এ্যান্টেনার কাছে ৯ জন লোক সংজ্ঞাহীন পড়ে আছে। প্রথমে এদের সবাইকে পিছমোড়া করে বাঁধ। তারপর এদের নিয়ে নিচে গিয়ে পুলিশে কাছে হস্তান্তর কর। তারা যেন জেনারেল মোস্তফা ও পুলিশপ্রধানের নির্দেশ আনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। মনে রেখ, এরা সবাই ভিভিআইপি বন্দী। একটুও অসাবধান হওয়া যাবে না।'

ওরা নির্দেশ নিয়ে স্যালুট করে চলে গেল।

আহমদ মুসা এবার কল করল জেনারেল মোস্তফাকে।

ওপারে জেনারেল মোস্তফার কন্ঠ পেতেই আহমদ মুসা সালাম দিয়ে বলল, 'আল্লাহর অসীম করুণা, যুদ্ধ শুরুর আগেই যুদ্ধের বড় বিজয়টাই হয়ে গেছে! ধ্বংসের নিরব দৈত্যের প্রধান বিজ্ঞানী আবদুর রহমান আরিয়েহসহ চারজন বিজ্ঞানী, 'থ্রি জিরো'র সুপ্রিমপ্রধান বেন জায়ন ও ড. ডেভিড ইয়াহুদসহ আরও নেতা, সব মিলিয়ে ৯ জন এখন আমাদের হাতে। কমান্ডোরা ওদের পাহাড়ের নিচের ক্যাম্পে নিয়ে যাচ্ছে।'

'ধন্যবাদ, মি. খালেদ খাকান। আপনি শুধুই বড় বিজয় বলছেন কেন? এটাই সবচেয়ে বড় বিজয়। প্রধান বিজ্ঞানীসহ পাঁচজন বিজ্ঞানী মাইনাস হলে নিশ্চয় ওদের ধ্বংসের নিরব দৈত্য অচল হয়ে পড়বে। আর বেন জায়ন ও ডেভিড ইয়াহুদ আমাদের হাতে আসা মানে ওদের সংগঠনকে এখন আমরা হাতের মুঠোয় আনতে পারব। এই অসাধ্য সাধন কি করে হলো মি. খালেদ খাকান?' বলল জেনারেল মোস্তফা।

'এটা একেবারেই আল্লাহর বিশেষ রহমত। এ্যান্টেনার স্থানটা পরীক্ষা করার জন্য পাহাড়ে উঠেছিলাম।'

বলে আহমদ মুসা ওদের ৯ জন সংজ্ঞাহীন করার ঘটনা সংক্ষেপে জানিয়ে বলল, 'কমান্ডোরা ওদের রেখে ফিরে এলেই আমি এ্যান্টেনার সিঁড়ি পথে ভেতরে ঢুকবো।'

'পাহাড়ের নিচের ক্যাম্পে আমি যাচ্ছি, মি. খালেদ খাকান। পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে আপনার কিছু বলার আছে?' জেনারেল মোস্তফা বলল।

'চারদিকের বেষ্টনিকে আরও ক্লোজ করুন এবং আপনি ও নাজিম এরিকেন আরিয়েহ ইন্ডাস্ট্রিজের গেটের দিকে চলে আসবেন। আমি ভেতরে ঢোকার পর পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আপনার সাথে মোবাইলে আলাপ করবো।' আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ, মি. খালেদ খাকান। আমি আপনার কলের অপেক্ষা করব। আর বেন জায়ন ও ডেভিড ইয়াহুদদের আমি গোয়েন্দা হেড কোয়ার্টারে সরিয়ে নিচ্ছি। ওকে মি. খালেদ খাকান। আসসালামু আলাইকুম।'

‘ওয়া আলাইকুম সালাম’ বলে আহমদ মুসা কল অফ করে দিল।

আহমদ মুসা অপেক্ষা করতে লাগল কমান্ডোদের।

ওরা এলেই একটা পরিকল্পনা করে আহমদ মুসা প্রবেশ করবে থ্রি জিরোর গবেষণাগার, অস্ত্রাগার আরিয়েহ ইন্ডাস্ট্রিজের অভ্যন্তরে, যেখানে আছে নিরব ধ্বংসের দৈত্য, ‘Fotan silent destruction demon’ যার বলে তারা ধরাকে সরা জ্ঞান করছে, দাস বানাতে চাচ্ছে আর সব মানুষকে।

আহমদ মুসার অপেক্ষার ইতি হলো।

তারার আবছা আলোতেই আহমদ মুসা দেখতে পাচ্ছে, কমান্ডোরা সার বেঁধে উঠে আসছে পাহাড়ের ওপরে।

পরবর্তী বই

# মাউন্ট আরারাতের আড়ালে


**কৃতজ্ঞতায়ঃ**

1. Ashrafuj Jaman
2. Ahsan Bandarban
3. Md Amdadul Haque Swapan
4. Hm Zunaid
5. Nazmus Sakib

# সাইমুম-৪৮

# মাউন্ট আরারাতের আড়ালে

আবুল আসাদ

# ১

আহমদ মুসা ও সাতজন কমান্ডো এক এক করে অ্যান্টেনার খোলা বেজ মুখ দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল।

প্রথমেই পাথুরে সিঁড়ি।

সিঁড়ির সাত-আটটা ধাপ পেরুতেই একটা দরজার ল্যান্ডিং-এ গিয়ে তারা পৌঁছল।

দেখেই বোঝা গেল, সিঁড়িটা লিফটের আরেকটা দরজা।

দরজাটা পাথরের।

দরজা খোলার চিন্তায় আহমদ মুসা দরজা ও দরজার চারপাশের চৌকাঠের মতো প্রান্তের ওপর চোখ বোলাতে লাগল।

ডান ও বাম পাশের দুই চৌকাঠে ভার্টিক্যালি লম্বা দু'টি করে বাটন দেখতে পেল আহমদ মুসা।

দু'পাশের দু'বাটনেই হিব্রু ভাষায় ওপেন ক্লোজ লেখা। কিন্তু দু'পাশের বাটনের লেখা এক রকমের নয়।

বাঁ পাশের চৌকাঠের লেখা সোজা মানে ওপেন শব্দ ডান দিক থেকে লেখা এবং ক্লোজ শব্দ বাঁ দিক থেকে লেখা, কিন্তু ডান দিকের চৌকাঠে শব্দ দু'টি বাঁ দিক থেকে লেখা।

পেছনে দাঁড়ানো কমান্ডো নেতা মুরাদ আনোয়ারের দিকে ফিরে তাকিয়ে আহমদ মুসা বলল, 'মনে হচ্ছে মুরাদ আনোয়ার, একটা ধাঁধা না ভাঙতে পারলে আমরা দরজা খুলতে পারবো না।'

মুরাদ এগিয়ে এল।

দেখল দুই চৌকাঠের চারটি বাটনকে ও বাটনের লেখাগুলোকে।

ভাবনার ছায়া নামল মুরাদ আনোয়ারের মুখে। ভাবছিল আহমদ মুসাও।

কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে কাটল।

'কিছু ভেবে পেলে মুরাদ আনোয়ার?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'ধাঁধায় ফেলার জন্যে 'ওপেন' শব্দ সোজা আর উল্টো করে দু'বার লিখেছে। আমার মনে হয়, দুই 'ওপেন' বাটনের একটা চাপলেই আমাদের চাওয়াটা পেয়ে যাব মানে দরজা খুলে যাবে।'

'চাপ দাও, মুরাদ আনোয়ার।' বলল আহমদ মুসা।

মুরাদ আনোয়ার দুই ওপেন বাটনই পরপর নানাভাবে চাপল, কিন্তু পাথরের দরজা যেমন ছিল, তেমনি থাকল।

মুরাদ আনোয়ারের চোখে-মুখে হতাশা ফুটে উঠল। বলল, 'তার মানে ধাঁধার অর্থ এটা নয়। নিশ্চয় আরও জটিল কিছু আছে।' বলেই হঠাৎ থেমে গেল মুরাদ আনোয়ার। তার চোখে-মুখে নতুন ভাবনার আলো। বলল, 'দু'পাশের দুই 'ওপেন'-এ চাপ দেয়ার পর গোপন আরও একটা কমান্ড নিশ্চয় আছে। সেটা খুঁজে বের করতে হবে।'

আহমদ মুসা ভাবছিল।

হঠাৎ তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দু'পাশের চৌকাঠের বাটন চারটির ওপর আরও একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে বলল, 'না, মুরাদ আনোয়ার, তার মনে হয় দরকার হবে না। খুব সহজ একটা গাণিতিক নিয়ম রয়েছে ধাঁধার পেছনে।

দেখ, ‘ক্লোজ’ শব্দ দু’টিই মাইনাস পজিশনে রয়েছে। মাইনাসে মাইনাসে প্লাস। তার মানে, ক্লোজ শব্দের বাটন দু’টি একসাথে চাপলেই দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। আর দেখ, ‘ওপেন’ বাটন দু’টির একটি প্লাস, অন্যটি মাইনাস পজিশনে। প্লাসে-মাইনাসে মাইনাস। অতএব, ‘ওপেন’ বাটন দু’টি একসাথে চাপলেই আমি মনে করি দরজা খুলে যাবে। চেষ্টা কর মুরাদ আনোয়ার।’

বলে আহমদ মুসা রিভলভার ধরা ডান হাতটা প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে পেছনে দাঁড়ানো কমান্ডোদের দিকে একবার তাকাল।

বাটন দু’টি পুশ করতে এগিয়ে গেছে মুরাদ আনোয়ার।

লম্বা একটা ‘হিস’ শব্দ শুনে ঘুরে দাঁড়াতেই সামনের দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল সে। দেখল, দরজাটা হাওয়া। ওপার থেকে অর্ধডজন স্টেনগান হাঁ করে আছে তাদের দিকে। সবচেয়ে সংগীন অবস্থা মুরাদ আনোয়ারের। তার বুকে রিভলভার চেপে ধরে আছে একজন।

আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়াতেই সে চিৎকার করে উঠল, ‘সবাই হাত ওপরে তোল। না হলে সবাই একসাথে লাশ হয়ে...।’

মুরাদ আনোয়ার আহমদ মুসার বাম দিকে চল্লিশ ডিগ্রী কোণে দাঁড়িয়েছিল। ফলে মুরাদ আনোয়ারের বুকে যে রিভলভার তাক করেছিল, তার বাম পাশ গোটাই আহমদ মুসার সামনে অবারিত।

লোকটি যখন হাত ওপরে তোলার নির্দেশ দিচ্ছিল, তখন পকেটের ভেতরে থাকা আহমদ মুসার রিভলভার উঠে এসেছিল লোকটির মাথা লক্ষ্যে।

কথা শেষ হবার আগেই আহমদ মুসার রিভলভারের গুলি লোকটির বাম কানের পাশ দিয়ে ঢুকে গেল তার মাথায়।

গুলিটা করেই আহমদ মুসা চিৎকার করে উঠল, ‘কমান্ডোজ, গেট চেঞ্জড।’

আহমদ মুসাও কাত হয়ে আছড়ে পড়েছিল মেঝেতে।

আহমদ মুসার আশংকাই সত্য হলো। আহমদ মুসার গুলি লোকটিকে হিট করার সাথে সাথেই ওদের ছয়টি স্টেনগান গর্জন করে উঠেছে।

আহমদ মুসার কমান্ড ছাড়াও ওদের স্টেনগান তাদের টার্গেট করা টের পেয়েছিল আহমদ মুসার সাথী কমান্ডোরা। আত্মরক্ষার জন্যে তারাও শুয়ে পড়েছিল। কিন্তু দেরি হয়ে গিয়েছিল। কমান্ডো নেতা মুরাদ আনোয়ারসহ কয়েকজনের দেহ ঝাঁঝরা হয়ে গেল। কাঁধে, পাঁজরে লেগে কয়েকজন আহত হলো।

মাটিতে শুয়ে পড়ার আগেই আহমদ মুসা পকেট থেকে রিভলভার বের করে নিয়েছিল এবং ওদের ছয়জনকে টার্গেট করে গুলি করাও শুরু করেছিল।

দু'জন কমান্ডো কাঁধে ও পাঁজরে গুলি খেলেও দুর্ধর্ষ কমান্ডোদের দু'জন মোহাম্মদ পাশা ও সোলেমান পাল্টা আঘাত হানতে মুহূর্ত দেরি করেনি। তার ফলেই শেষ রক্ষা হয়েছিল।

ওদের চারজনকে গুলি করতে করতেই আহমদ মুসার গুলি শেষ হয়ে গিয়েছিল। শেষ দু'জনকে হত্যা করেছিল মোহাম্মদ পাশা ও সোলেমান। তা না হলে নির্ঘাত ব্রাশফায়ারের মুখে পড়ে যেত আহমদ মুসা।

ওদের স্টেনগানধারী ছয়জনের রক্তের স্রোতের মধ্যে থেকে একজন মাথা তুলল। সে হাতের স্টেনগানটির ব্যারেল মরিয়া হয়ে একবার ওপরে তোলার চেষ্টা করল। পারল না। হাত থেকে খসে পড়ে গেল স্টেনগান। সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করে সে বলল, 'শয়তান, তোরা আমাদের নেতা, আমাদের বিজ্ঞানীদের ধরেছিস। কিন্তু তোদের উদ্দেশ্য সফল হবে না। আমাদের 'নীরব' ধ্বংসের দৈত্য 'ডাবল ডি' এবং আমাদের গবেষণা তোরা হাত করতে পারবি না। দেখ, আমাদের সুইসাইড স্কোয়াডের নেতা মাথায় গুলি খেয়ে মরলেও তার হাত তার গলায় ঝোলানো রিমোটের রেড বাটনকে প্রাণপণে চেপে ধরেছিল। মরে গেলেও দেখ চেপে ধরেই আছে। এখনি ডাবল ডি'র সবকিছুসহ গোটা গবেষণাগার ও এই কমপ্লেক্স ধূলো হয়ে যাবে। তার সাথে তোদেরও কবর হবে।'

শেষ কথার সাথে সাথে লোকটির মাথাটি নেতিয়ে পড়ল মেঝের ওপর।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়েছিল। দ্রুত কণ্ঠে বলল, 'মোহাম্মদ, সোলেমান, কুইক, আমাদের এখনি বেরুতে হবে এখান থেকে। তবে আমাদের ভাইদের লাশ

কি করে রেখে যাই! তোমরা দু'জন দু'জনকে টেনে নিতে পারবে কিনা? আমি দু'জনকে নিচ্ছি।'

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা দু'জনকে দুই কাঁধে তুলে নিয়ে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল।

পেছনে মোহাম্মদ পাশা ও সোলেমান দুই সাথীর লাশ টেনে নিয়ে উঠতে লাগল।

সুড়ঙ্গ-সিঁড়ির মুখ কমিউনিকেশন অ্যান্টেনার পথে আহমদ মুসা বেরিয়ে এল।

আহমদ মুসা সাহায্য করল আহত দু'কমান্ডো ভাইকে তাদের সাথীদের লাশ নিয়ে বেরিয়ে আসতে।

আহত দু'সাথী দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

'দম নেবার সময় নেই প্রিয় কমান্ডো ভাইরা। যতটা দ্রুত সম্ভব, আমাদেরকে পাহাড়ের ওপরে উঠে যেতে হবে। এস।'

বলেই আহমদ মুসা দু'সাথীর লাশ আবার কাঁধে তুলে নিয়ে পাহাড়ের ওপরে এগোতে লাগল।

'ভাববেন না ভাই, আমরা পারব আপনাকে ফলো করতে। চলুন।' বলল মোহাম্মদ পাশা ও সোলেমান একসাথেই।

সুড়ঙ্গের সিঁড়ি মুখ থেকে বিশ গজের মতো এগিয়েছে আহমদ মুসারা।

সুড়ঙ্গের মুখ থেকে পনের গজ ওপরে একটা টিলার দেয়াল। সে দেয়াল পার হয়ে আহমদ মুসারা মাত্র পাঁচ গজ এগিয়েছিল। এই সময়ই প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ হলো। ভূমিকম্পের প্রবল ধাক্কা খাওয়ার মতো পাহাড়টাও প্রচণ্ডভাবে কেঁপে উঠল।

বড় কিছুর আশংকায় আহমদ মুসাদের চোখ আপনাতেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

মুহূর্তে কয়েকবার চিৎকার করে মোহাম্মদ পাশা বলল, 'আল্লাহ আমাদের রক্ষা করেছেন খালেদ খাকান ভাই। আল্লাহর হাজার শুকরিয়া।'

'আলহামদুলিল্লাহ!' বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। ওদিকের অবস্থা দেখার জন্যে কয়েক ধাপ সামনে এগিয়ে টিলাটার ওপর দিয়ে ওদিকে নজর ফেলতেই চমকে উঠল। টিলাটার ওপারে পাহাড়ের অবশিষ্ট অংশসহ সবকিছু হারিয়ে গেছে। প্রশস্ত গভীর অন্ধকার খাদ শুধু সামনে।

পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মোহাম্মদ পাশা এবং সোলেমানও।

'মনে হয়, রিমোটের এ্যাকশন ডাইরেক্ট ছিল না। রিমোটকে এক বা একাধিক ম্যাকানিজমের চেইন্ড রিএ্যাকশনকে অ্যাকটিভেট করতে হয়েছিল। তার জন্যে কমপক্ষে বেশ কয়েক মিনিট বরাদ্দ ছিল। সেই সময়টুকুতেই আল্লাহ আমাদের বাঁচিয়েছেন।' বলল আহমদ মুসা।

'কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, হঠাৎ এভাবে ওরা সবকিছু ধ্বংস করল কেন?' বলল মোহাম্মদ পাশা।

'নিশ্চয় ওদের কাছে নির্দেশ এসেছিল। ওদের নেতা ও বিজ্ঞানী যাদের আমরা ধরেছি, তাদের কাছ থেকে কিংবা অন্যদিক থেকে তারা চূড়ান্ত নির্দেশ পেয়েছিল। তার ফলেই আমরা ব্যর্থ হলাম ওদের ধ্বংসের দৈত্য ও গবেষণাগার হাত করতে।'

আহমদ মুসার মোবাইল বেজে উঠল।

ওপার থেকে জেনারেল মোস্তফার উদ্বিগ্ন কণ্ঠ শোনা গেল, 'মি. খালেদ খাকান, আপনারা কোথায়? ভালো আছেন আপনারা?' আর্ত-চিৎকারের মতো শোনাল জেনারেল মোস্তফার কণ্ঠ।

'ভয় নেই জেনারেল, আমরা নিরাপদ আছি। ঠিক সময়ে আমরা বেরিয়ে আসতে পেরেছি। ভেতরের ওরা বাইরে থেকে মেসেজ পেয়েছে। আমরা যাদের ধরেছি, তারা কি কোন মেসেজ পাঠিয়েছে?' আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

'স্যরি মি. খালেদ খাকান। ওদের শীর্ষ বিজ্ঞানী আব্দুর রহমান আরিয়েহের গোপন দ্বিতীয় মোবাইলটা তার কাছে রয়েই গিয়েছিল। সেই মোবাইলেই উনি ওদের কাছে মেসেজ পাঠিয়েছিলেন। বিস্ফোরণের পর উনিই চিৎকার করে বিষয়টি আমাদের জানিয়েছেন। হেসে বলেছেন, 'অন্তত, আমাদের

নীরব ধ্বংসের দৈত্য এবং আমাদের গবেষণা আমরা তোমাদের হাতে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারলাম।' বলল জেনারেল মোস্তফা।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'বললেন না ওকে যে, আপনাদের নীরব ধ্বংসের দৈত্যকে আপনারা ধ্বংস করে ভালো করেছেন। ওর কোন প্রয়োজন আমাদের নেই। আমরা মানবতাকে ধ্বংস নয়, রক্ষা করতে চাই। সেই রক্ষার অস্ত্রই হলো আমাদের 'সেভিয়ার অব ওয়ার্ল্ড র‍্যাশনাল ডোমেইন (সোর্ড)'। আমরা আমাদের 'সোর্ড'কে রক্ষা করতে পেরেছি। দানবের বিরুদ্ধে মানবতার জয় হয়েছে।'

'বলব মি. খালেদ খাকান! আপনারা আসুন।' বলল জেনারেল মোস্তফা।

'স্যরি জেনারেল। আপনাকে বলা হয়নি। আমরা কমান্ডো নেতা মুরাদ আনোয়ারসহ চারজনকে হারিয়েছি। কমান্ডো মোহাম্মদ পাশা ও সোলেমান মারাত্মক আহত। আমি ওদের নিয়ে পাহাড়ের ওপরে আছি। চার ভাইয়ের লাশও আমাদের সাথে আছে। প্লিজ একটা হেলিকপ্টার পাঠান।' বলল আহমদ মুসা।

'ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। বড় দুঃসংবাদ মি. খালেদ খাকান। আল্লাহর অশেষ প্রশংসা, আরও ক্ষতির হাত থেকে আল্লাহ আমাদের রক্ষা করেছেন। আমি হেলিকপ্টার নিয়ে আসছি মি. খালেদ খাকান।'

কথা শেষ করেই জেনারেল মোস্তফা বলল, 'একটু ওয়েট প্লিজ মি. খালেদ খাকান, প্রধানমন্ত্রীর টেলিফোন এসেছে।'

দু'মিনিটেই জেনারেল মোস্তফা টেলিফোনে ফিরে এলেন। বললেন, 'মি. খালেদ খাকান, প্রধানমন্ত্রী তার এবং প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে আপনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তারা আপনার সাথে দেখা করতে চান। সব শুনতে চান আপনার মুখ থেকে।'

'তাদের ধন্যবাদ। আমি তাদের সাথে দেখা করার জন্যে উদগ্রীব। তাহলে আসুন জেনারেল মোস্তফা।'

আহমদ মুসা সালাম দিয়ে কল অফ করল।

আহমদ মুসা ডিনার শেষে গোল্ড রিজর্টের দক্ষিণ বারান্দায় এসে বসল। গা এলিয়ে দিল ইজি চেয়ারে।

মর্মর সাগরের স্নিগ্ধ বাতাস সেখানে শান্তির পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে।

আহমদ মুসার দৃষ্টি তোপকাপি প্রাসাদের প্রান্ত পেরিয়ে মর্মর সাগরের ওপর নিবদ্ধ। মর্মর সাগরের কালো বুকের ওপর দিয়ে বসফরাসের আলোকোজ্জ্বল ব্রীজের একটা অংশ দেখতে পাচ্ছে।

এই অপরূপ দৃশ্য দেখতে গিয়ে মুহূর্তে কয়েকশত বছর আগে ছুটে গেল তার মন। জীবন্ত রূপ নিয়ে এলো তুরস্কের বিশ্ব কাঁপানো সুলতানদের স্মৃতি। তুরস্কের মহান সুলতান বায়েজিদ, সুলতান দ্বিতীয় মোহাম্মদ, সুলতান সোলেমান দি ম্যাগনিফিসেন্টরাও মর্মর সাগর আর বসফরাসকে এভাবেই দেখতেন। সেই মর্মর সাগর আছে, বসফরাস আছে, তোপকাপি প্রাসাদ আছে, কিন্তু নেই তারা, নেই সেই সময়, নেই তুরস্কের সেই দিন। ইউরোপের অর্ধেক এবং ভূমধ্যসাগর জুড়েও ওড়ে না আর ইসলামের অর্ধচন্দ্র পতাকা।

ভাবতে গিয়ে একটা আবেগ আচ্ছন্ন করে ফেলল আহমদ মুসাকে। দু'চোখের কোণ তার ভারী হয়ে উঠল অশ্রুতে।

জোসেফাইন এসে বসল তার পাশের ইজি চেয়ারে।

আহমদ মুসা চিন্তায় মগ্ন থাকায় তা টের পেল না।

জোসেফাইন ধীরে ধীরে হাত রাখল আহমদ মুসার কাঁধে। বলল আস্তে আস্তে, 'এত বড় কাজের পর কোন ভাবনায় আবার নিজেকে এমন হারিয়ে ফেলেছ?'

ধীরে ধীরে আহমদ মুসা মুখ ঘোরাল জোসেফাইনের দিকে। কাঁধ থেকে জোসেফাইনের হাত নিজের দু'হাতের মুঠোয় ধরে ওপরে তুলে নিয়ে একটা চুম্বন এঁকে দিয়ে বলল, 'ভাবনায় নয়, অতীতের এক সুখ-স্মৃতিতে হারিয়ে গিয়েছিলাম। ভাবছিলাম, তুরস্কের অমর বিজেতা সুলতান সোলেমান দি ম্যাগনিফিসেন্ট এবং বায়েজিদদের কথা। আলোর মেঘমালায় সাজানো মর্মর সাগর ও বসফরাসের কালো বুকের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল, আমি যেন তাদের চোখেই মর্মর আর

বসফরাসকে দেখছি। ভেসে উঠেছিল আমার চোখে মর্মর আর বসফরাসের সে স্বর্ণালী দৃশ্য।'

'স্যরি, তোমাকে এক দরিদ্র বাস্তবতায় এভাবে ফিরিয়ে আনার জন্যে। তুমি যাকে সুখ-স্মৃতি বলছ, তা সুখ-স্মৃতি মাত্র নয়, আসলে এক টনিক, এক গাইড, এক পাওয়ার জেনারেটর। এ আমাদের সামনে এক 'ভিশন' তুলে ধরে, সামনে এগোবার ক্ষমতা দেয়।' বলল জোসেফাইন।

'তোমার সব কথা ঠিক জোসেফাইন। কিন্তু সুখ-স্মৃতিকে সংগ দেবার সময় আমাদের খুব কম। তুমি আমার সময় বাঁচিয়েছ।' আহমদ মুসা বলল।

'সময় বাঁচানোর প্রশ্ন আসছে কেন? তোমাদের এখানের কাজ শেষ। আপাতত হাতে তো প্রচুর সময়।' জোসেফাইন বলল।

'হ্যাঁ, হঠাৎ করেই যেন শেষ হয়ে গেল। ওরা সবাই এভাবে ধরা পড়বে, তা ভাবা যায়নি। এখানে তোমার বান্ধবীর কৃতিত্ব অনেক বেশি। এই ঠিকানার সন্ধান তার কাছ থেকেই তুমি দিয়েছিলে। আমি ভাবছি তাকে একটা বড় পুরস্কার দেয়া যায়। কি দেয়া যায় বলো তো। আমি তুরস্ক সরকারকে বলব।'

হঠাৎ সোজা হয়ে বসল, মুখ গম্ভীর হলো জোসেফাইনের। তাতে বেদনার ছাপ। বলল, 'সে সুযোগ পাবে না, সে সুযোগ সে তোমাদের দিল না।'

আহমদ মুসাও সোজা হয়ে বসল। বলল, 'বুঝলাম না জোসেফাইন। সে সুযোগ পাবো না কেন?'

'তোমাকে বলতে ভুলে গেছি। সে আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যাচ্ছে। সে আজ রাতের ফ্লাইট ধরছে।' বলল জেসেফাইন।

'হঠাৎ এভাবে চলে যাচ্ছেন? তুমি তো টেলিফোনে তখন কিছু বলোনি। জানতে কি আগে?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'আমি জানতাম না। সেও আমাকে তখন টেলিফোনে কিছু বলেনি। সন্ধ্যায় আমি আয়েশা আরবাকানকে নিয়ে বাগানের দিকে বেরিয়েছিলাম। ফিরে এসে গেটম্যানের কাছে একটা এনভেলাপ পেলাম। চিঠিটা নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের

একজন মেসেঞ্জার এসে দিয়ে গেছে। ঘরে এসে এনভেলাপ খুলে দেখি জেফি জিনার চিঠি। ওতেই পড়লাম, সে আজ চলে যাচ্ছে মায়ের অসুখের খবর পেয়ে।'

কথা শেষ করেই জোসেফাইন উঠে দাঁড়াল। বলল, 'এনভেলাপটা এখানেই ঐ শোপিসটার ওপরে রেখেছি।'

বলে জোসেফাইন গিয়ে দেয়ালের শোপিসের ওপর থেকে এনভেলাপ এনে তা থেকে চিঠি বের করে আহমদ মুসার হাতে দিল। বলল, 'পড়ে দেখ। দুঃখজনক যে, সে তার আমেরিকার ঠিকানা চিঠিতে দেয়নি। ভুলেও যেতে পারে তাড়াহুড়োয়।'

চিঠি হাতে নিয়েই পড়তে শুরু করল আহমদ মুসা।

শুরুতেই চিঠিতে জোসেফাইনকে সম্বোধন করেছে 'আপা' বলে। তারপর লিখেছে, 'বন্ধু নয়, 'আপা' বলেই সম্বোধন করলাম।' এই এক বাক্য পড়তেই চিন্তার কোথায় যেন হোঁচট লাগল আহমদ মুসার। এরকম একটা বাক্য কোথায় যেন পড়েছে তার মনে হলো।

আবার পড়তে শুরু করল, 'আপা, আম্মার অসুস্থতার খবর পেয়ে হঠাৎ আমাকে আমেরিকা ফিরতে হচ্ছে। তোমাকে টেলিফোন করেছিলাম, না পেয়ে খবরটা জানানোর জন্যে চিঠির আশ্রয় নিতে হলো। তোমাকে এভাবে ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে। তার চেয়ে বড় কষ্ট হচ্ছে ছোটমণি আহমদ আবদুল্লাহকে আর দেখতে পাবো না বলে। কারও মায়ার বাঁধন আবারো আমাকে এভাবে বাঁধবে, এটা ভাবিনি। এটা আমার একটা নতুন অভিজ্ঞতা।

বুঝেছি আপা, এটাই দুনিয়া। এই দুনিয়ায় হাসির চেয়ে কান্নাই সম্ভবত বেশি আছে। আবার ব্যাপারটা এমনও হতে পারে যে, মানুষ 'জন্ম'র আনন্দের চেয়ে মৃত্যুর বেদনাকেই বড় করে দেখে। যেমন সুখ-স্মৃতির চেয়ে, দুঃখের স্মৃতিই মানুষের মনে থাকে বেশি। এরপরও বলব, দুনিয়ার সেরা মহাকাব্যগুলোর অধিকাংশই বিয়োগান্তক। এই বিশ্বচরাচরে হাসির বন্যার চেয়ে কান্নার প্লাবন আসলেই বড়।

স্যরি, বিদায়ের সময় এসব কথা বলা ঠিক হচ্ছে না। আমার মনে হয়, তুরস্কে তোমাদের মিশন শেষ। এরপর তুমি ঘরে ফিরবে, না নতুন কোন মিশনে, নতুন কোথাও যাবে- আমি জানি না। তবে যেখানেই থাক, যেখানেই থাকি, এক পৃথিবীতেই আমরা থাকব, এটাই সান্ত্বনা।

কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকলে, সেটা অনিচ্ছাকৃত। মাফ করে দিও। আমার ছোটমণিটার জন্যে অনেক দোয়া, অনেক ভালোবাসা।'

চিঠি পড়া শেষ হলো আহমদ মুসার। চিঠির কথাগুলো তার মনে অনেক জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তুলল। চিঠির কথায়, চিঠির ভাষায় একটা পরিচিত মনের ছোঁয়া যেন লাগছে।

চিঠির শেষে নাম স্বাক্ষরের ওপর নজর পড়ল আহমদ মুসার। স্বাক্ষরে দু'টি শব্দ 'জেফি জিনা'। নামের অক্ষর লেখার, বিশেষ করে 'জে', 'এফ,' 'এন' অক্ষরগুলোর স্টাইলের ওপর নজর পড়তেই চমকে উঠল আহমদ মুসা। তার স্মৃতির দুয়ার যেন এক ধাক্কায় খুলে গেল। বিস্ময়-দৃষ্টি নিয়ে চিঠির লেখার ওপর আবার নজর বোলাল দ্রুত। জেফি জিনা নয়, সব ছাপিয়ে আরেকটা নাম যেন কথা বলে উঠল।

বিস্ময়-দৃষ্টি নিয়ে তাকাল আহমদ মুসা জোসেফাইনের দিকে। বলল, 'জোসেফাইন, এ চিঠি কি জেফি জিনার? জেফি জিনা কে?'

আহমদ মুসার জিজ্ঞাসার সুরে জোসেফাইনের চোখেও বিস্ময় ফুটে উঠল। বলল, 'হ্যাঁ, চিঠি তো জেফি জিনার। কেন, জেফি জিনা তো জেফি জিনাই!' জোসেফাইন কৌতুহল উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে।

'কিন্তু জোসেফাইন, আমি নিশ্চিত, এই চিঠির লেখা ও ভাষা দুই-ই সারা জেফারসনের।'

'সারা জেফারসনের!' শব্দটা জোসেফাইনের কণ্ঠ ভেদ করে একটা প্রবল উচ্ছ্বাসের তোড়ে যেন বেরিয়ে এলো।

ছুটে এসে সে আহমদ মুসার পাশে হাঁটু গেঁড়ে বসল। চিঠিটা আহমদ মুসার হাত থেকে নিয়ে তাতে চোখ বোলাল। তারপর ছুটে ঘরের ভেতরে চলে গেল। মিনিটখানেকের মধ্যে বেরিয়ে এলো। হাতে একখণ্ড কাগজ।

আবার গিয়ে হাঁটু গেঁড়ে বসল জোসেফাইন আহমদ মুসার পাশে। বলল, 'তোমার কাছে পাঠানো সারা জেফারসনের চিঠি নিয়ে এলাম। এস তো দেখি, চিঠি দু'টি মিলিয়ে।'

চিঠি দু'টি পাশাপাশি রেখে দু'জনেই দেখল। জোসেফাইন প্রায় আর্তনাদ করে বলে উঠল, 'ঠিক, সারা জেফারসনের লেখা এটা। তার মানে, জেফি জিনাই সারা জেফারসন।'

বলেই জোসেফাইন আহমদ মুসার উরুতে মুখ গুঁজল।

কয়েক মুহূর্ত পরে মুখ তুলল।

অশ্রুতে ধুয়ে গেছে তার মুখ। বলল, 'এত ঘনিষ্ঠ, এত আপন হয়েও সে পরিচয় গোপন করল? আমার যে কত আশা ছিল তার দেখা পাওয়ার, তার সাথে কথা বলার! আমাকে বড় বোন ডেকে আবার এতটা নিষ্ঠুর হলো সে!'

কথা বলার সাথে সাথে তার দু'চোখ থেকে দু'গণ্ড বেয়ে নেমে এল অশ্রুর ধারা।

আহমদ মুসা তাকে কাছে টেনে নিল। বাম বাহুর মধ্যে তাকে জড়িয়ে রেখে বলল, 'তোমার আবেগ, তোমার কথা ঠিক আছে। আমিও দারুণ বিস্মিত হয়েছি এভাবে তার পরিচয় গোপনে। আমার বিস্ময়ও ঠিক আছে। কিন্তু তার দিকটা ভাব। সে তার দিক থেকে ঠিকই করেছে। তার সেই চিঠিটা আবার পড়ে দেখ।'

জোসেফাইন মুখ তুলে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। তার চোখে-মুখে প্রতিবাদের চিহ্ন। বলল, 'না, সে ঠিক করেনি, তার চিঠি আমার মুখস্থ। ভালোবাসা পাপ নয় যে সে অপরাধীর মত পালিয়ে বেড়াবে। কেন সে নিজেকে অপরাধী ভাববে? অপরাধী নয় সে।'

কান্নায় রুদ্ধ হয়ে গেল জোসেফাইনের শেষ কথাগুলো।

ম্লান হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'তোমার কথা নীতিগত দিক দিয়ে ঠিক জোসেফাইন। কিন্তু তুমি একবার তার জায়গায় নিজেকে দাঁড় করিয়ে দেখ, তুমি যা সহজ মনে করছ তা সহজ নয়। তার জন্যে বিষয়টি কষ্টকর আর আমাদের জন্যে বিব্রতকর। সে এটাই এড়াতে চেয়েছে।'

কোন উত্তর দিল না জোসেফাইন। চোখ মুছে মাথা নিচু করল।

একটু পর মাথা নিচু রেখেই স্বগতঃকণ্ঠে বলল জোসেফাইন, 'সে পরিচয় দিয়েই দেখতো, আমাদের বিব্রতভাব ও তার কষ্ট দূর করতে পারতাম কিনা!'

বলে মুখ তুলল জোসেফাইন। বলল, 'আমাকে একটা অনুমতি দেবে?'

আহমদ মুসা তাকাল জোসেফাইনের দিকে। বলল, 'অনুমতির প্রশ্ন কেন? তোমার ইচ্ছাই যথেষ্ট। বল?'

'আমি আমেরিকা যাব।' বলল জোসেফাইন আহমদ মুসার দিকে চোখ তুলে।

মুহূর্তের জন্যে একটা বিস্ময়ের ঝলক খেলে গেল আহমদ মুসার চোখে-মুখে। একটু ভাবল। অস্পষ্ট এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল আহমদ মুসার ঠোঁটে। বলল, 'তুমি সারা জেফারসনকে জবাব দিতে চাও?'

জোসেফাইনের চোখে-মুখে গাম্ভীর্যের সাথে একটা দৃঢ়তা ফুটে উঠল। বলল, 'হ্যাঁ, তাকে জবাব দিতে চাই। সে যেভাবে নির্বাক-বিস্ময়ে পীড়িত করেছে, আমিও তাকে ঠিক সে নির্বাক-বিস্ময়ে অভিভূত করব।'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'শুধু এ জন্য তুমি আমেরিকা পর্যন্ত ছুটবে?'

হাসল জোসেফাইন। বলল, 'হ্যাঁ, বলারও কিছু আছে। সে যে পরিস্থিতিতে যেভাবে ভালোবেসেছে, সেটা অন্যায় নয়, অপরাধ নয়। কেন সে তাহলে পালিয়ে বেড়াবে? কেন স্বাভাবিক বিষয়টা সহজভাবে বলতে পারবে না? কেন সে অসহনীয় এক কষ্টে দগ্ধ হবে?'

হাসি দিয়ে কথা শুরু করেছিল জোসেফাইন। কিন্তু শেষে তার কণ্ঠ আবেগের উচ্ছ্বাসে প্রায় রুদ্ধ হয়ে গেল।

জোসেফাইনের আবেগ-রুদ্ধ কথা আহমদ মুসাকেও স্পর্শ করেছিল। তার মুখে নেমে এল বিষণ্নতার একটা ছায়া। বলল গম্ভীর কণ্ঠে, 'এসব বলে কতটা লাভ হবে জোসেফাইন? তোমার যুক্তি ঠিক। কিন্তু তার কাছে যেটা বাস্তবতা, সেটা কি সে ডিঙাতে পারবে? তাকে তার মত করে থাকতে দেয়াই ঠিক নয় কি জোসেফাইন?' নরম কণ্ঠ আহমদ মুসার।

ম্লান হাসল জোসেফাইন। বলল, 'এসব কি আমাকে যেতে না দেয়ার যুক্তি তোমার?'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'তোমার ইচ্ছাই আমার অনুমতি জোসেফাইন। আমি যা বললাম, সেটা তোমার কথার পাশে আমার কথা মাত্র।'

'ধন্যবাদ।' বলল জোসেফাইন হাসিমুখে।

'যাওয়া সম্পর্কে তোমার পরিকল্পনা কি?' আহমদ মুসা বলল।

'পরিকল্পনাটা তুমিই করে দেবে। মদীনা শরীফে ফিরে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে।'

বলে জোসেফাইন উঠে ইজি চেয়ারটা টেনে আহমদ মুসার চেয়ার ঘেঁষে তা সেট করে গা এলিয়ে দিল ইজি চেয়ারে এবং বলল, 'আমাদের তাকে কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত। তার পরিচয় জানার পর এটা অপরিহার্য হয়ে গেছে।'

'পরিচয় জানার আগেও এটা অপরিহার্য ছিল। কিন্তু সুযোগ পাইনি। তুমি যাচ্ছ, আমার পক্ষ থেকে তাকে কৃতজ্ঞতা জানাবে।'

হাসল জোসেফাইন। বলল, 'আমার কৃতজ্ঞতা আমি জানাব। দরকার বোধ করলে তোমার কৃতজ্ঞতা তুমি জানিও।'

'তোমার কৃতজ্ঞতা কিসের? তুমি না ঝগড়া করতে যাচ্ছ।' আহমদ মুসা বলল।

'ঝগড়া যে কারণে, সে কারণে ঝগড়া তো হবেই। কৃতজ্ঞতার কারণ ভিন্ন।' বলল জোসেফাইন।

'কৃতজ্ঞতার কি কারণ?' আহমদ মুসা বলল।

'আমার স্বামীকে সে সাহায্য করেছে, একাধিকবার বড় বড় বিপদ ও মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে, বিশাল এক দায়িত্ব পালনে আমার স্বামীর যে সাফল্য, তা তার সাহায্যেরও ফল।' বলল জোসেফাইন। কথার শেষ দিকে কান্নায় তার চোখ ভিজে উঠেছিল।

আহমদ মুসার মুখও গম্ভীর হয়ে উঠেছে। তারও চোখে-মুখে কৃতজ্ঞতার আলো। বলল, 'ঠিক বলেছ জোসেফাইন। তার সাহায্যগুলো ছিল অমূল্য, অকল্পনীয়ভাবে তা পেয়েছি। তার প্রতিটি সাহায্যই ছিল আমাদের সাফল্যের এক

একটা করে টার্নিং পয়েন্ট। তখন বিস্মিত হয়েছি। মাঝে মাঝেই ভেবেছি, সে তাদের ঘনিষ্ঠদের মধ্যেকার কেউ ভালো একজন হবেন। কিন্তু সারা জেফারসনের পরিচয় পেয়ে আরও বিস্মিত হচ্ছি, সে তাদের ভেতরের খবরগুলো এত নিখুঁতভাবে কিভাবে পেত!'

'আমার মনে হয় কি জান, 'স্মার্থা' মেয়েটা 'থ্রি জিরো'র হার্ডকোরের একজন ছিল। স্মার্থা তাদের স্বার্থে গোয়েন্দাগিরি করত আর সারা জেফারসন তার ওপর গোয়েন্দাগিরি করত। আমার মনে হয়, স্মার্থার গতিবিধি সে অনুসরণ করত।' বলল জোসেফাইন।

'কিন্তু এই কাজটা অত্যন্ত কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ।' আহমদ মুসা বলল।

'এই ঝুঁকিপূর্ণ কাজটাই সে তোমাদের স্বার্থে নিঃস্বার্থভাবে নিজেকে গোপন রেখে করেছে। পরিমাপ করতে পার এই ত্যাগের?' বলল জোসেফাইন।

'এর পরিমাপ আল্লাহ করবেন। তিনিই মাত্র তাকে এর উপযুক্ত জাযাহ দিতে পারেন। নিঃস্বার্থ যে কাজ তা আল্লাহর জন্যেই হয়। সে এটাই করেছে।' ধীর ও শান্ত কণ্ঠ আহমদ মুসার।

অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল জোসেফাইন আহমদ মুসার দিকে। আহমদ মুসার কথা শেষ হলেও সংগে সংগে জবাব দিল না জোসেফাইন।

মুহূর্ত কয়েক পর ধীরে ধীরে বলল জোসেফাইন, 'আল্লাহ তো জাযাহ অবশ্যই দেবেন। আল্লাহর বান্দার কাছেও তাঁর প্রাপ্য অবশ্যই আছে। যারা বিনিময় চায় না, তাদের প্রতি দায়িত্ব আরও বেড়ে যায়।'

'তোমার কথা ঠিক জোসেফাইন। পৃথিবীতে অনেক মানুষ আছে যারা শুধু দেয়, নেয় না। তাদের প্রতি দায়িত্ব পালনকেও তারা সহজে গ্রহণ করে না। সারা জেফারসন হতে পারে সে ধরনেরই মানুষ। তুমি যাচ্ছ। ঘনিষ্ঠ হলে তুমিই ভালো বুঝবে।' আহমদ মুসা বলল।

'তুমি যে ধরনের মানুষের কথা বলেছ, সে ধরনের মানুষ দুনিয়াতে আছে। কিন্তু সারা জেফারসন সে ধরনের মানুষ নয়। তার জীবনের এখন সফলতার শুরু মাত্র। জীবনের সবটাই তার পাবার বাকি। অনেক স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা, অনেক কিছুরই কাঙাল সে। আমি দেখেছি, হৃদয়ের সবটুকু

ভালোবাসা দিয়ে আহমদ আবদুল্লাহকে সে জড়িয়ে ধরতো, চুমো খেত পাগলের মত। এটা এক বুভুক্ষু হৃদয়ের পরিচয়। তার সাথে আমার যতবার দেখা হয়েছে, বুকে জড়িয়ে ধরেছে আমাকে। এটা সৌজন্যমূলক নয়। তার বুকে আমি বোনের উত্তাপ পেয়েছি, যা অন্তরঙ্গ, একান্ত আপন। এর মধ্যেও রয়েছে হৃদয়ের শূন্যতা পূরণের প্রয়াস। তোমার এসব বোঝার কথা নয়, বুঝবে না। সুতরাং তার সম্পর্কে কোনও শেষ কথা তুমি বলো না। তার ব্যাপারটা ছেড়ে দাও আমার ওপর।'

'ধন্যবাদ জোসেফাইন। সারা জেফারসন ভালো মেয়ে। অজ্ঞাতেই আমি তার ক্ষতি করেছি। তুমি যদি তাকে সহজ করতে পার, স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে পার, তখন সে অতীত ভুলে গিয়ে বর্তমানকে আঁকড়ে ধরবে সানন্দে, তাহলে শুধু আনন্দিত হওয়া নয়, এক অপরাধবোধ থেকেও মুক্তি পাব জোসেফাইন।' বলল আহমদ মুসা। আহমদ মুসার কণ্ঠ কিছুটা ভারী হয়েছিল।

জোসেফাইন আহমদ মুসাকে জড়িয়ে ধরল। তারপর স্বামীর বুকে মুখ গুঁজে বলল, 'দোয়া কর আমি যেন সফল হই।'

আহমদ মুসার বুক থেকে মুখ তুলে বলল জোসেফাইন, 'ও! ভুলে গেছি। চিঠির সাথে একটা ইন্টারনেট ডকুমেন্ট আছে। সে যখন পাঠিয়েছে, তখন নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ কিছু।'

বলেই জোসেফাইন তার ইজি চেয়ারের ওপর থেকে এনভেলাপটি নিয়ে ভেতর থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করল। কাগজের ভাঁজ খুলে কাগজটার ওপর নজর বোলাল। তিন পৃষ্ঠার একটা লেখা। ওপরে শিরোনাম: 'গন্তব্য না জানা একটা মেসেজ'। শিরোনামের ওপর হাতের লেখা দু'টি লাইন। হাতের লেখাটা সারা জেফারসনের।

কাগজটি আহমদ মুসার দিকে এগিয়ে ধরে বলল, 'একটা মজার শিরোনামের একটা মেসেজ, তুমি পড়।'

আহমদ মুসা তখন ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ দু'টিও বন্ধ করেছে। বলল, 'তুমিই পড় জোসেফাইন। আমি শুনছি। কার মেসেজ, সারা জেফারসনের?'

‘না। সে ফরওয়ার্ড করেছে মাত্র।’

বলেই জোসেফাইন মেসেজের শেষটা দেখে নিল। বলল, ‘মেসেজটি জনৈক ড. আজদা আয়েশার।’

চিঠিটি হাতে নিয়ে জোসেফাইনও ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিল। বলল, ‘পড়ছি, শোন।’

‘প্রথমে সারা জেফারসনের ফরওয়ার্ডিংটা পড়ছি। ফরওয়ার্ডিংয়ে সে লিখেছে, ‘প্রিয় জোসেফাইন, ইন্টারনেটে জনৈক ড. আজদা আয়েশার এই মেসেজটি আমি পাই। আমার কাছে মেসেজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। তোমার স্বামী সম্মানিত খালেদ খাকান বিষয়টা আরও ভালো বুঝবেন। তার জন্যেই মেসেজটা পাঠালাম।’

লাইন কয়টা পড়ে একটু থামল জোসেফাইন। বলল, ‘দেখেছ, এই লাইনকয়টাতেও সে নিজেকে কেমনভাবে গোপন করেছে! খালেদ খাকান ছাড়া তোমার আর কোন পরিচয়ই যেন সে জানে না। আর দেখ, ‘তোমার স্বামী’ শব্দ না লিখলেও সে পারত। তার মত ক্ষেত্রে অন্য সবাই ‘তোমার স্বামী’ শব্দ এড়িয়ে যেত, এমন কিছু লেখা তাদের জন্যে কষ্টকর। কিন্তু সারা জেফারসন লিখতে পেরেছে। কারণ, তোমাকে নিয়ে আমার সাথে হিংসা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার লেশমাত্র তার মনে নেই। আশ্চর্য, সে আমাকে হিংসার বদলে বোনের নিবিড় ভালোবাসা দিয়েছে। আর সর্বতোভাবে তোমার থেকে দূরে থেকেছে, সম্পূর্ণভাবে আড়ালে রেখেছে নিজেকে। কত বড় ত্যাগের আদর্শ থেকে এমন মন সৃষ্টি হতে পারে, তা অনেকের জন্যে কল্পনা করাও মুশকিল।’

কথা শেষ করেই আহমদ মুসার কাছ থেকে কিছু শোনার অপেক্ষা না করে পড়তে শুরু করল মেসেজটা:

‘আমি ড. আজদা আয়েশা। একজন টার্কিশ কুর্দি আমি। আমি জার্মানির বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গত বছর পিএইচডি করেছি ইতিহাসে। তারপর ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েই অধ্যাপনার চাকরি করছি। কয়েকমাস আগে আমাদের প্রতিবেশী আর্মেনিয়ার একটা কাগজে বিস্ময়ের সাথে দেখলাম, আমার ছোট ভাই আতা সালাহউদ্দিন মাদক ব্যবসায়ী সন্ত্রাসী হিসেবে বিচারের সম্মুখীন। আমার ভাইয়ের

জন্যে এ এক অকল্পনীয় অভিযোগ। সঙ্গে সঙ্গেই দেশে চলে এলাম। আমার চোখের সামনেই আমার ছোট ভাই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড নিয়ে কারাগারে ঢুকে গেল। দেখা করলাম কারাগারে তার সাথে। তার রুমে মাদকের প্যাকেট রেখে তাকে ফাঁসানো হয়েছে। আমার ভাইয়ের কথা আমি বিশ্বাস করি। আমার প্রতিবেশী এক যুবকের ক্ষেত্রে এই একই ঘটনা ঘটেছে। জানলাম, আমার এক ক্লাসমেট এভাবেই জেলে গেছে। আমিও আতংক বোধ করছি। এই তিনজন সম্পর্কেই আমি জানি, এরা মাদকসেবী বা মাদক ব্যবসায়ী হতে পারে না। কেন তাহলে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ? কি আছে এর পেছনে? আমি খোঁজ নেয়া শুরু করি আমার এলাকাসহ মাউন্ট আরারাতের সমগ্র দক্ষিণ এলাকায়। মাউন্ট আরারাতের দক্ষিণে তুরস্কের যে এলাকা বকের ঠোঁটের মত আর্মেনিয়া, নক্সিভ্যাম ও আজারবাইজানের মধ্যে ঢুকে গেছে, সেটাই আরা আরিয়াস। আমার এলাকা। অনুসন্ধানে আমার আরা আরিয়াসসহ এই এলাকায় গত ছয় মাসে দু'হাজার যুবক ঐ একই ধরনের অপরাধে যাবজ্জীবনের জন্যে জেলে গেছে। আমার গোটা এলাকা প্রায় যুবকশূন্য হয়ে গেছে। আরা আরিয়াস সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনেক পরিবার বিলীন হয়ে গেছে। ভিটেমাটি ছাড়া হয়েছে তারা। সবচেয়ে বড় কথা হলো, নতুন মুখে ভরে গেছে আমার এলাকা। বহু নতুন পরিবার এসে জেঁকে বসেছে এখানে। এরা তুর্কি পরিবার নয়। ভাষার উচ্চারণে এদের আমি আর্মেনীয় মনে করেছি। আতংকিত হয়ে আমি আরও গভীর অনুসন্ধানে নামি। তাতে আমার দু'টি জিনিস মনে হয়েছে, এক. আসল বিষয় মাদক ব্যবসা বা মাদক নয়, বিষয়টা মাউন্ট আরারাতকে কেন্দ্র করে কিছু। নতুন বসতির বাড়িগুলোর প্রত্যেকটা দরজায় মাউন্ট আরারাতের প্রতিকৃতি। ঐ লোকদের অনেকের বাহুতেই দেখেছি মাউন্ট আরারাতের উল্কি। দুই. মাউন্ট আরারাতের দক্ষিণসহ আরা আরিয়াস কুর্দি যারা স্বাধীনচেতা দেশপ্রেমিক, তাদের বিরুদ্ধে নীরব ক্যাম্পেইন চলছে। বলা হচ্ছে, এই দালালদের থাকার অধিকার নেই। উল্লেখ্য, মাদক ব্যবসায়ী সাজিয়ে যাদের জেলে পুরা হচ্ছে, তারাও এই শ্রেণীর। তার ওপর তাদের ক্রিমিনাল হওয়ার অভিযোগ তো আছেই। আমি বিষয়টি নিয়ে প্রশাসন ও পুলিশের সাথে কথা বলেছি। তারা চোখ বন্ধ করে কথা বলেছে, মাদকের হাত থেকে এলাকাকে

মুক্ত করার জন্যে ক্রিমিনালদের নির্মূল করা হবে। আর নতুন বসতি স্থাপনকারীদের সম্পর্কে আমার কথা শুনে তো তারা আমাকে বোকা ঠাওরেছে। বলেছে, আমি নাকি জার্মানীতে থাকায় দেশের কোন খোঁজ রাখি না। তারা বলেছে, ওরা নতুন আগন্তুক নয়, ওরা তুরস্কের বৈধ আর্মেনীয় নাগরিক। তুরস্ক-আর্মেনিয়া টেনশন ও কুর্দি বিদ্রোহকালীন বিভিন্ন সময়ে তারা আর্মেনিয়ায় চলে যায়। কিছু দিন আগে আর্মেনীয় তথাকথিত গণহত্যা বিষয়কে ফরগিভ এন্ড ফরগেট করার তুরস্ক-আর্মেনিয়া-মার্কিনীদের মধ্যেকার ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে মৈত্রী চুক্তির শর্ত হিসেবে উদ্বাস্তু আর্মেনীয় তুর্কিদের ফেরত নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। সুবিধা অনুসারে ওরা ধীরে ধীরে আসছে। তাদের কথা খণ্ডন করার মত যুক্তি আমার নেই। কিন্তু আমি নিশ্চিত, তাদের কথাটাই শেষ কথা নয়। কি করব এ নিয়ে যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়, তখন একটা ঘটনা ঘটল। সেদিন আমি বাগানে কাজ করছিলাম। বাগানের বাইরে ছেলেরা খেলছিল। মাঝে মাঝে দু'একজন ছেলে বাগানেও আসছিল বল কুড়ানোর জন্যে। বাগানের গাছঘেরা জায়গায় আমি কাজ করছিলাম। দরজাটা সেখান থেকে গাছের একটু আড়ালে পড়েছে। কাজের সময় নড়াচড়াকালে হঠাৎ আমার নজরে পড়ল নয়-দশ বছরের একটা ছেলে আমার বাড়িতে প্রবেশ করল। তার হাতে একটা থলে। কেন প্রবেশ করল? পানি খেতে? কৌতুহলবশত আমিও ছুটলাম। ড্রইং রুমের দরজা খোলা ছিল। এ দরজা দিয়েই সে প্রবেশ করেছে। আমি ভেতরে ঢুকেই দেখলাম, ছেলেটি সোফার কুশন উল্টিয়ে কি যেন রাখছে। আমি ছুটে গিয়ে দেখলাম, কয়েকটা প্যাকেট কুশনের তলায় রাখা হয়েছে। আমি ধরে ফেললাম ছেলেটিকে। হঠাৎ করেই আমার মনে হলো, প্যাকেটগুলো হেরোইন জাতীয় কোন মাদকের হবে নিশ্চয়। আমি ছেলেটাকে প্যাকেটগুলো হাতে নিতে বলে তাকে পুলিশে দেবার জন্যে নিয়ে চললাম। আমার বাড়ির সামনে রাস্তার বিপরীত দিকেই পুলিশ স্টেশন। আমি বাড়ির সামনের মাঠ পেরিয়ে ছেলেটিকে ধরে নিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়েছিলাম রাস্তা পার হয়ে থানায় যাবার জন্যে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে লোকজন জমে গিয়েছিল। হঠাৎ একটা গাড়ি এসে আমার সামনে দাঁড়াল। লাফ দিয়ে কয়েকজন লোক নামল গাড়ি থেকে।

তাদের মুখে মুখোশ। কিছু বুঝে উঠার আগেই আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে ছেলেটিকে নিয়ে গাড়িতে তুলল। তারপর দ্রুত গাড়ি চালিয়ে চলে গেল। যে লোকটি আমাকে ধাক্কা দেয়ার জন্যে আমার দিকে দু'হাত বাড়িয়েছিল, তার বাহুতে মাউন্ট আরারাতের উল্কি দেখেছি। প্রত্যক্ষদর্শী লোকজন নিয়ে আমি থানায় গেলাম। থানা আমাকে হতাশ করল। পুলিশ উল্টো অভিযোগ করল, ওরা আপনার ভাইয়ের দলেরই লোক। আপনার বাড়িতে রাখা অবশিষ্ট মাদকের প্যাকেটই তারা নিতে এসেছিল। আমরা দলটাকে খুঁজছি। বিষয়টির গভীরে যেতে চায়নি পুলিশ। ওইদিনই সন্ধ্যায় আমার ড্রইংয়ে ঢোকা সেই ছেলেটির লাশ পাওয়া গেল একটা রাস্তার পাশে। সম্ভবত ধরা পড়ার শাস্তি পেয়েছে ছেলেটি। এই ঘটনা থেকে আমি বুঝতে পেরেছি, আমার বাড়িতে মাদক রেখে আমাকেও জেলে পুরতে চেয়েছিল। আরও বুঝেছি, এই মাদকের সয়লাব গভীর কোন ষড়যন্ত্রের হাতিয়ার। কিন্তু জানি না সেই ষড়যন্ত্র কি? ষড়যন্ত্রকারীদের বাহুতে মাউন্ট আরারাতের উল্কি কেন? এই উল্কি আবার নতুন বসতি স্থাপনকারীদের দরজায় কেন? জানার জন্যে আমি আর কিছু করতেও পারব না। একবার বিপদ থেকে বেঁচেছি। আরও কি বিপদ অপেক্ষা করছে কে জানে! এই দুর্দিনে সাহায্য করার কাউকে দেখছি না, আল্লাহ ছাড়া। তাঁর ওপর ভরসা করেই আমাদের জনগণের এই বিপদ বার্তাটি ইন্টারনেটে ছেড়ে দিচ্ছি। আল্লাহই একে তার ঠিকানায় পৌঁছাবেন, এই আশায়।'
—ড. আজদা আয়েশা, আরা আরিয়াস, টার্কি।

মেসেজটি পড়া শেষ হলো জোসেফাইনের।

চিঠিটা পাশে রেখে তাকাল জোসেফাইন আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা সোজা হয়ে বসেছিল ইজি চেয়ারের ওপর।

জোসেফাইনের পড়া শেষ হলেও আহমদ মুসা কথা বলল না। ভাবছিল সে। কোথায় যেন মাউন্ট আরারাতের উল্কি সে দেখেছে। হঠাৎ মনে পড়ল, আর্মেনিয়ার রাজধানী ইয়েরেভেনের একটা আর্কাইভে একটা প্রাচীন বইয়ে শামিল তাকে আরারাতের উল্কিওয়ালা মানুষ দেখিয়েছিল। বলেছিল, এরা ছিল আর্মেনিয়ার একটা বিপজ্জনক গ্রুপ। বর্ণবাদী ও সাম্প্রদায়িক হোয়াইট ওলফের

চেয়ে শতগুণ বেশি হিংস্র ওরা। ওরা নিজেদের মনে করে বাইব্লিক্যাল আর্মেনিয়ার সৈনিক। আর মাউন্ট আরারাত ওদের বেথেলহেম।

এই স্মৃতির মধ্যে আহমদ মুসা গভীরভাবে ডুবে গিয়েছিল।

জোসেফাইন কিছুটা অপেক্ষা করে ধীরে ধীরে বলল, 'অন্য কিছু ভাবছ তুমি?'

চোখ ফিরিয়ে আহমদ মুসা তাকাল জোসেফাইনের দিকে। বলল, 'অন্য কিছু নয়। অনুরূপ একটা অতীতের স্মৃতি নিয়ে ভাবছিলাম।'

আহমদ মুসা ইয়েরেভেনের আর্কাইভে দেখা আরারাতের উল্কিওয়ালা সেই বিপজ্জনক লোকদের সম্পর্কে শামিলের কাছে যা শুনেছিল তা বলল।

জোসেফাইন বলল, 'সেই উল্কিওয়ালারা আর এই উল্কিওয়ালারা কি এক?' তার কণ্ঠে উদ্বেগ।

'আমি জানি না। এক হলে সেটা বিপজ্জনকই হবে।' আহমদ মুসা বলল।

'ওরা কি চায়?' জোসেফাইন বলল।

'এ সম্পর্কে এখনও কিছু শুনিনি। ড. আজদাও তার মেসেজে এ সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু লেখেনি।' বলল আহমদ মুসা।

জোসেফাইন কিছু বলল না। সে ভাবছিল, আজদার চিঠিতে বিষয়টাকে ততটা ভয়াবহ মনে হয়নি, কিন্তু আহমদ মুসা উল্কিওয়ালাদের যে পরিচয়ের কথা বলল, তাতে বিষয়টা একটা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে বলা যায়। এই সাথে একটা উদ্বেগ জোসেফাইনের মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল, তার মানে আহমদ মুসা ড. আজদার আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে! বুকের কোথায় যেন একটা প্রবল অস্বস্তি মুখ তুলল। জোসেফাইন আশা করেছিল, এ মিশন শেষ করে তারা একসাথে মদিনায় ফিরছে। আহমদ মুসার রেস্ট দরকার। তার ওপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে।

জোসেফাইনের চিন্তা শেষ হলো না।

আহমদ মুসার কথায় তার চিন্তায় ছেদ নামল।

'তুমি কি ভাবছ জোসেফাইন ড. আজদা আয়েশার মেসেজ নিয়ে?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

বুকের কোথায় যেন মুহূর্তের জন্যে সামান্য কাঁপুনি উঠল। কি উত্তর দেবে সে! যে কথা সে বলতে চায়, সে কথা সে বলতে পারে না। এতটা স্বার্থপর সে হবে কেমন করে! তাকাল সে আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'তুমি যে সিদ্ধান্ত নেবে, আমি তার সাথে আছি।'

'এতে কিন্তু তোমার মতের প্রকাশ ঘটল না।' বলল আহমদ মুসা। তার মুখে হাসি।

মুখ গম্ভীর হলো জোসেফাইনের। বলল, 'বিষয়টা গ্রহণ করার মত না হলে সারা জেফারসন মেসেজটা তোমাকে দিত না। মেসেজটা পড়ার পর গুরুত্ব সম্পর্কে আমার দ্বিধা ছিল, কিন্তু তোমার কাছে উল্কিওয়ালাদের পরিচয় জানার পর আমার মনে হচ্ছে, আমাদের জানা এই বিষয়গুলো কোন বিশাল ষড়যন্ত্র বা ঘটনার আইসবার্গ মাত্র এবং সেহেতু ড. আজদার আহ্বানে সাড়া দেয়া অপরিহার্যই মনে হচ্ছে আমার কাছে।'

হাসল আহমদ মুসা। হাত বাড়িয়ে জোসেফাইনের একটা হাত তুলে নিল নিজের দু'হাতের মুঠোয়। বলল, 'ধন্যবাদ জোসেফাইন। তুমি যখন কোন কিছুর পক্ষে যুক্তি দাও, তখন সেটা গ্রহণ করা আমার জন্যে শুধু আনন্দের নয়, তা আমার জন্যে শক্তির উৎসও হয়ে দাঁড়ায়। ধন্যবাদ জোসেফাইন তোমাকে।'

বলে জোসেফাইনকে কাছে টেনে নিল আহমদ মুসা।

জোসেফাইন স্বামীর বুকে মুখ গুঁজে বলল, 'তোমার বিশ্রাম দরকার ছিল, তা হলো না। সবই আল্লাহর ইচ্ছা।'

'ভেব না জোসেফাইন। কাজে আমি আনন্দ পাই। আনন্দই বিশ্রাম।' বলল আহমদ মুসা।

'আনন্দ সবটুকু নয়। রাতের নীরবতা ও ঘুম আল্লাহ দিয়েছেন বিশ্রামের জন্যেই।' জোসেফাইন বলল।

'আনন্দ ও রাত দুটোই আমার সাথে থাকছে জোসেফাইন।' বলল আহমদ মুসা।

'থাকছে না কিন্তু জোসেফাইন।' বলে হেসে উঠল জোসেফাইন।

‘এমন সাময়িক বিচ্ছেদ আকর্ষণ বাড়ায়।’ বলে হেসে উঠল আহমদ মুসাও।

‘আর আকর্ষণ বাড়াতে চেও না, তাহলে ছুটি মিলবে না।’ বলে জোসেফাইন আহমদ মুসার বাহুবন্ধন থেকে বেরিয়ে ছুটে ঘরে ঢুকে গেল হাসতে হাসতে। বলল একটু স্বর চড়িয়ে, ‘ওঠো না, কফি আনছি।’

প্রেসিডেন্ট হাউজ থেকে একটি মার্সিডিজ আহমদ মুসাকে নিয়ে বের হচ্ছিল বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে।

আহমদ মুসা ও জোসেফাইন পাশাপাশি বসেছে। তাদের পেছেনের সীটে বসেছে লতিফা আরবাকান আহমদ আব্দুল্লাহকে নিয়ে।

‘ম্যাডাম জোসেফাইন, ব্যালকনিতে মাননীয় প্রেসিডেন্ট ও ম্যাডাম দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছেন।’ বলল পেছন থেকে লতিফা আরবাকান।

লতিফা আরবাকান আহমদ মুসাদের সাথে যাচ্ছে প্রেসিডেন্টের স্ত্রীর নির্দেশে। আহমদ মুসা মাউন্ট আরারাত অঞ্চলে যাওয়ার জন্যে ভ্যানলেক বিমানবন্দরে নেমে যাবে। লতিফা আরবাকান জোসেফাইনের সাথে মদিনা শরীফ যাবেন। জোসেফাইন যতদিন চাইবেন লতিফা আরবাকান তার সাথে থাকবেন। আহমদ আব্দুল্লাহর খুব ভাব হয়েছে লতিফা আরবাকানের সাথে।

সংগে সংগেই আহমদ মুসা ও জোসেফাইন দু’জন দু’পাশের খোলা জানালা দিয়ে পেছনে তাকাল। দেখতে পেল প্রেসিডেন্ট ও তার বেগমকে।

আহমদ মুসা ও জোসেফাইন দু’জনেই হাত নেড়ে বিদায় জানাল।

আহমদ মুসা দেখতে পেল, প্রেসিডেন্টের গাড়ি বারান্দায় তখন দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতি। আহমদ মুসা তাদের উদ্দেশ্যেও হাত নাড়ল। তারাও হাত নাড়ল।

আহমদ মুসাদের গাড়ি প্রেসিডেন্ট হাউজের গেট দিয়ে বেরিয়ে এল।

আহমদ মুসাদের সামনে ছিল জেনারেল মোস্তফা ও দীর্ঘ অসুখ থেকে সদ্য ফিরে আসা জেনারেল তারিকদের দু'টি গাড়ি। আর আহমদ মুসাদের পেছনের একটা মাইক্রোতে গোয়েন্দা পুলিশের একটা দল।

আহমদ মুসা হাতের ঘড়ির দিকে তাকাল। সাড়ে এগারোটা বাজে। শিডিউলের চেয়ে একটু বেশি সময় গেছে প্রেসিডেন্ট হাউজের অনুষ্ঠানে।

প্রেসিডেন্ট তার বাড়িতে জোসেফাইন ও আহমদ মুসার জন্যে প্রায় ঘরোয়া একটা সংবর্ধনার আয়োজন করেছিল। এর আগের দিন আহমদ মুসারা আংকারা এসেছিল প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণে। তাদের সাথে এসেছিল গোয়েন্দা প্রধান জেনারেল মোস্তফা এবং জেনারেল তাহির তারিক। প্রেসিডেন্টের ফ্যামিলি পরিবেশে ঘরোয়া এ অনুষ্ঠানে হাজির ছিল প্রধানমন্ত্রী, প্রধান সেনাপতি, গোয়েন্দা প্রধান ও পুলিশ প্রধান। অনুষ্ঠানে খোদ প্রেসিডেন্ট আহমদ মুসা ও বেগম আহমদ মুসাকে তার নিজের পক্ষ থেকে ও তুরস্কের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল। আবেগজড়িত কণ্ঠে প্রেসিডেন্ট বলেছিল, কিন্তু কোন কৃতজ্ঞতাই যথেষ্ট নয়। আহমদ মুসা উত্তরে বলেছিল, 'ভাইয়ের জন্যে যে কাজ তা নিজেরই কাজ। নিজের কাজের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বা প্রত্যাশা বিব্রতকর। তুরস্ক আমার কাছে একটা স্বপ্নের দেশ। আজ বিদায় বেলায় মনে হচ্ছে, স্বপ্নের এই দেশ আমাকে অনেক দিয়েছে। তাই নিজেকে মনে হচ্ছে আরও সুস্থ, আরও সমৃদ্ধ।'

আহমদ মুসাকেও আবেগ স্পর্শ করেছিল। তার কণ্ঠও ভারী হয়ে উঠেছিল।

অনুষ্ঠান শেষে মাদাম প্রেসিডেন্ট একটা রূপোর কেসকেটে হীরার নেকলেস উপহার দিয়ে 'মাই ডটার' বলে জড়িয়ে ধরেছিল জোসেফাইনকে। আর প্রেসিডেন্ট তার ও তার দেশের পক্ষ থেকে আহমদ মুসার হাতে তুলে দিয়েছিল আহমদ মুসা, জোসেফাইন ও আহমদ আব্দুল্লাহর জন্যে তুরস্কের নাগরিকত্বের তিনটি সনদ ও তিনটি পাসপোর্ট। আহমদ মুসা ধন্যবাদের সাথে গ্রহণ করেছিল তুর্কি প্রেসিডেন্টের এ রাষ্ট্রীয় দান।

বিদায়ের সময়টা হয়েছিল খুবই আবেগঘন।

আবেগের সে উত্তাপ এখনও অনুভব করছে আহমদ মুসা।

গাড়ি ছুটে চলছিল আংকারা বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে।

# ২

ড. আজদা আয়েশার হাত স্টিয়ারিং হুইলে। দৃষ্টি সামনে।

চলছিল গাড়ি।

আনমনা হয়ে পড়েছিল ড. আজদা আয়েশা। ভাবছিল সে নিজেকে নিয়ে নয় শুধু। তার মাথায় আসছে না তার প্রিয় মাতৃভূমিতে এসব কি হচ্ছে! তার নিজের পরিবারের ওপর যেমন, তেমনি দেশের এই অঞ্চলের ওপর যেন একটা কালোছায়া নেমে আসছে সবকিছু গ্রাস করার জন্যে।

ড. আজদা আয়েশার গাড়ির নাক বরাবর এগিয়ে আসছিল একটা মাইক্রো রং সাইড নিয়ে।

সম্বিত ফিরে পেয়েছিল ড. আজদা আয়েশা। শেষ মুহূর্তে হার্ড ব্রেক কষেছিল সে।

মাইক্রোর সাথে সংঘর্ষ এড়াতে পারল ড. আজদা আয়েশা। সে বিস্মিত হলো, মাইক্রোটা রং সাইড নিয়ে এভাবে তার সামনে এল কেন?

তার মনের এই প্রশ্নের রেশটা না কাটতেই সে দেখতে পেল, মাইক্রো থেকে চারজন লোক লাফ দিয়ে নেমে দু'পাশ থেকে এসে তার গাড়ির দু'পাশে দাঁড়াল।

ড. আজদা আয়েশা কিছু ভাববার আগেই দু'দিক থেকে ওরা গাড়ির দু'পাশের দরজা টান দিয়ে খুলে ফেলল।

চোখের পলকে দু'জন ঝাঁপিয়ে পড়ল ড. আজদা আয়েশার ওপর। টেনে বের করল তারা ড. আজদাকে। তাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চলল মাইক্রোর দিকে। একজন চিৎকার করে বলল, 'তোর জন্যে আমাদের এক ছেলেকে মরতে হয়েছে। ধরা পড়া কাউকে যেমন আমরা রাখি না, তেমনি যার কাছে ধরা পড়ে তাকেও আমরা দুনিয়াতে রাখি না। আর তোকে আমরা গোরস্তানে নিয়ে মারব।'

ঘটনার আকস্মিকতায় প্রথমেই হতবিহ্বল হয়ে পড়েছিল ড. আজদা আয়েশা। বুঝতে পারছিল না কারা এরা, কেন তার ওপর এই আক্রমণ। কিন্তু ওদের কথা শুনে বুঝতে পারল সব ব্যাপার।

ড. আজদা আয়েশাকে যখন ওরা মাইক্রোতে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন 'বাঁচাও' 'বাঁচাও' বলে চিৎকার করছিল সে।

ঠিক এই সময়েই একটি জীপ এসে মাইক্রোর সামনে থামল।

পুলিশের জীপ।

জীপে একজন মাত্র পুলিশ। সেই ড্রাইভ করছিল গাড়ি।

জায়গাটা রাস্তার একটা মোড়। গোটা মোড় আলোকিত।

জীপটা দাঁড়াতেই পুলিশটি লাফ দিয়ে নামে গাড়ি থেকে। চিৎকার করে বলল, 'কে তোমরা? ছেড়ে দাও মেয়েটাকে। হাত তুলে দাঁড়াও।'

ঠিক এ সময় আরেকটি কার এসে দাঁড়াল জীপের পাশে। কার থেকে একজন যুবক এসে দাঁড়াল পুলিশের পাশে।

পুলিশের নির্দেশ শুনে কিডন্যাপকারীরা একসাথেই তাকাল পুলিশের দিকে।

পুলিশটিকে মনে হলো ওদের চেনা। ওদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ওদের একজন চিৎকার করে বলে উঠল, 'ইন্সপেক্টর দারাগ! চিন্তা নেই। আমরা হোলি আরারাতের লোক। হোলি আরারাত জিন্দাবাদ।'

কিডন্যাপারদের কথা শোনার সাথে সাথে পুলিশের চেহারা পাল্টে গেল। চোখ দু'টি তার লোভের আলোতে চক্ চক্ করে উঠল।

'মেয়েটা কে?' চিৎকার করে বলে উঠল পুলিশ।

'আতা সালাহ উদ্দিনের বোন। আরেক ড্রাগ ট্রেডার। অশান্তি সৃষ্টি করছিল। আমাদের একজন লোকও আমার হারিয়েছি। অবশেষে আজ হাতে পেয়েছি ইন্সপেক্টর।' বলল কিডন্যাপারদের একজন।

পুলিশের পাশে এসে দাঁড়ানো যুবকটি কিডন্যাপারদের কথা শুনে চমকে উঠল। ভালো করে তাকাল সে মেয়েটির দিকে। হ্যাঁ, ওরা ঠিক ঠিক বলেছে। আতা

সালাহ উদ্দিনের বোন ড. আজদা আয়েশাই তো সে! ভীষণ চমকে উঠল যুবকটি। আজদাকে শয়তানরা কিডন্যাপ করছে!

যুবকটির ভাবনা হোঁচট খেল পুলিশের উচ্চকণ্ঠে। পুলিশ চিৎকার করে বলছে, 'ঠিক আছে, নিয়ে যাও ওকে। পুলিশের সামনে পড়ো না। অযথা ঝামেলা হয় আমাদের। যাও তাড়াতাড়ি।'

যুবকটি ভীষণ অবাক হলো পুলিশের কথায়। কানকে যেন তার বিশ্বাস হলো না। তাকাল পুলিশের দিকে। পুলিশটি ইন্সপেক্টর লেভেলের একজন অফিসার। অবশ্যই তুর্কি, কিন্তু চেহারায় আর্মেনীয় ছাপ স্পষ্ট। তার মানে, তার মা আর্মেনীয় হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

যুবকটি পুলিশের কথার প্রতিবাদ করে বলল, 'মি. অফিসার, আপনি এ কি বলছেন! ক্রিমিনালদের হাত থেকে মেয়েটিকে রক্ষা করা, ক্রিমিনালদের পাকড়াও করা আপনার দায়িত্ব।'

'তুমি যেখানে যাচ্ছিলে যাও। পুলিশের কাজে নাক গলাতে এসো না। কে ক্রিমিনাল, সেটা পুলিশই ভালো জানে।'

বলেই পুলিশ কিডন্যাপারদের লক্ষ্য করে চিৎকার করে একটা গালি দিয়ে উঠল, 'শয়তানের বাচ্চারা, এখনও যেতে পারলি না?'

কিডন্যাপাররা টেনে-হিঁচড়ে ড. আজদাকে তাদের মাইক্রোতে তোলার কাজ শুরু করল। আর পুলিশ অফিসারটি তার জীপে ফিরে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতে গেল।

যুবকটি বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল।

হঠাৎ চোখ দু'টি তার জ্বলে উঠল। সে আকস্মিকভাবে তার ডান হাত বাড়িয়ে পুলিশ অফিসারের কোমরের রিভলভার বক্স থেকে প্রবল একটা হ্যাঁচকা টানে রিভলভার বের করে নিল। রিভলভার তুলল সে ড. আজদাকে পাঁজাকোলা করে ধরে মাইক্রোর দিকে এগোনোরত কিডন্যাপারদের দিকে। জ্বলছিল তখন যুবকটির দু'চোখ। পরপর সে চারটি গুলি করল।

অব্যর্থ লক্ষ্য যুবকটির।

চার কিডন্যাপারের সবাই কেউ মাথায়, কেউ পিঠে, কেউ বুকে গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়ল।

পুলিশ অফিসারটি ঘটনার আকস্মিকতায় প্রথমটায় বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। তারপরই সে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল যুবকটির ওপর।

যুবকটি কয়েক ধাপ এগিয়ে রিভলভার তাক করল পুলিশ অফিসারের দিকে। বলল, 'ওদের মত তুমিও ক্রিমিনাল। বাড়াবাড়ি করলে তোমাকেও গুলি করব।'

কিডন্যাপারদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে ড. আজদা আয়েশা কাঁপতে কাঁপতে ছুটে এসে যুবকটির গা ঘেঁষে দাঁড়াল। যুবকটি তার বাম হাত ড. আজদার পিঠে রেখে বলল, 'ভয় পেয়ো না ড. আজদা। ক্রিমিনালদের ভয় কিসের।'

'কিন্তু আমার জন্যে এই খুনোখুনির মধ্যে জড়িয়ে পড়লেন কেন ড. মোহাম্মদ বারজেনজো? সময় খারাপ, পুলিশকে তো আপনি জানেন।' বলল আজদা আয়েশা।

ওদিকে পুলিশ অফিসার থমকে দাঁড়িয়েছে। চিৎকার করে বলল, 'তুমি পুলিশ অফিসারের রিভলভার ছিনতাই করে চারজন লোককে খুন করেছ, তোমার বাঁচার আশা নেই। রিভলভার নামাও। দাও আমাকে রিভলভার।'

'না, রিভলভার তোমাকে দেব না। আমার বাঁচার আশা নেই বলেছ, তোমার মত ক্রিমিনালকে আমি বাঁচতে দেব না ভালো লোকদের বাঁচার স্বার্থেই।'

বলে যুবকটি রিভলভারের নল তাক করল পুলিশ অফিসারের দিকে।

পুলিশ অফিসার যখন কিডন্যাপারদের সাথে কথা বলছিল, সেই সময় আরেকটি গাড়ি এসে যুবকটির গাড়ির পেছনে দাঁড়িয়েছিল। দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে এসেছিল একজন মানুষ। কমপ্লিট ইউরোপীয়ান পোশাক। মাথায় হ্যাট। কপাল পর্যন্ত নামানো।

যুবকটির পেছনে দাঁড়িয়ে সব কিছুই সে দেখছিল, শুনছিল।

‘তোমার মত ক্রিমিনালকে আমি বাঁচতে দেব না’ বলে যুবকটি যখন রিভলভার তুলল পুলিশকে লক্ষ্য করে, তখন পেছনের আগন্তুক লোকটি যুবকটির পাশে এসে দাঁড়াল। বলল যুবকটিকে লক্ষ্য করে, ‘রিভলভারটি নামান।’

যুবকটি তাকাল আগন্তুক লোকটির দিকে। দেখল, ঋজু দেহের এক মানুষ। যতটুকু দেখা যাচ্ছে লোকটির চোখ-মুখ ভাবলেশহীন, কিন্তু অসম্ভব দৃঢ় এক ব্যক্তিত্বের ছাপ তার মুখে। তার দু’শব্দের কথাটি শান্ত, কিন্তু তার মধ্যে একটা নির্দেশ আছে, তা যেন অলংঘনীয়। বিস্মিত হলো যুবকটি। রিভলভারের নল নামিয়ে নিল সে বিনা বাক্যব্যয়ে।

সংগে সংগেই পুলিশ অফিসারটি বলে উঠল, ‘ধন্যবাদ আগন্তুক মহোদয়, এই যুবকটি আমার রিভলভার এক সুযোগে তুলে নিয়ে ঐ চারজন লোককে খুন করেছে। খুনির শাস্তি হতেই হবে।’

বলেই পুলিশ অফিসারটি যুবকটিকে ধমক দিয়ে বলল, ‘রিভলভার দিয়ে দাও, আর তুমি আন্ডার অ্যারেস্ট। পালানোর চেষ্টা করো না।’

ড. আজদা আয়েশার মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। এই ভয়ই সে করছিল, খুনের দায় এবার মোহাম্মদ বারজেনজোর ঘাড়ে চাপবে। উদ্বেগ-আতংকে ড. মোহাম্মদ বারজেনজোর কাঁধ আঁকড়ে ধরল ড. আজদা।

‘ধীরে অফিসার, ধীরে। আমি পেছনে দাঁড়িয়ে সব দেখেছি। আপনি কিডন্যাপারদের পালিয়ে যেতে বলছিলেন কিডন্যাপডকৃত মেয়েটিসহ। আসল ক্রিমিনাল তো আপনি। ড. মোহাম্মদ তো কিডন্যাপারদের হত্যা করে মেয়েটিকে বাঁচিয়েছে।’ বলল আগন্তুক লোকটি।

‘কে বলল, ওরা কিডন্যাপার? খুনকে ধামাচাপা দেয়ার জন্যে মেয়েটি বলবে, ওরা তাকে কিডন্যাপ করছিল, কিন্তু আইনে টিকবে না এই কথা। আমার চোখের সামনে ঘটনা ঘটেছে।’ বলে হো হো করে হেসে উঠল পুলিশ অফিসারটি।

আগন্তুক লোকটির মুখ-চোখ কঠোর হয়ে উঠেছে। বলল, ‘তাহলে মি. অফিসার, আমিও একটা কাহিনী বানাই।’

বলে আগন্তুক লোকটি পকেট থেকে রিভলভার বের করল। তাক করল পুলিশ অফিসারকে। বলল, ‘আমি আপনাকে হত্যা করব। হত্যার পর এই

রিভলভারটি মৃত ঐ চারজনের হাতে ধরিয়ে দেব। তারপর ড. মোহাম্মদ বারজেনজো থানায় গিয়ে খবর দেবে, ‘চারজন কিডন্যাপকারী ড. আজদাকে কিডন্যাপ করছিল। পুলিশ অফিসারটি ওদের বাঁধা দিলে ওরা পুলিশ অফিসারকে গুলি করে মারে। আমি পুলিশ অফিসারের পাশে ছিলাম সে সময়। আমি পুলিশ অফিসারের রিভলভার নিয়ে ওদের গুলি করে মারি। কেমন হবে এই কাহিনীটি, অফিসার?’

পুলিশ অফিসার আগন্তুক লোকটির কণ্ঠস্বর এবং তার কপাল বরাবর রিভলভারের নল উদ্ধত দেখে আতংকিত হয়ে উঠেছে। বলল, ‘পুলিশ অফিসারকে গুলি করতে পার না। পুলিশ মেরে পার পাবে না।’

আগন্তুক লোকটি তার রিভলভার পুলিশ অফিসারকে তাক করে রেখে ঠাণ্ডা কণ্ঠে বলল, ‘আমি নয়, প্রমাণ হবে কিডন্যাপকারীরা আপনাকে মেরেছে। তবে আপনার বাঁচার আরেকটা পথ আছে।’

‘কি সেটা?’ বলল পুলিশ অফিসার।

‘ঐ চারজন কিডন্যাপারকে হত্যার দায় আপনাকে নিতে হবে।’ বলল আগন্তুকটি। সেই ঠাণ্ডা কণ্ঠস্বর তার।

‘কিভাবে?’ জিজ্ঞাসা পুলিশ অফিসারের।

আগন্তুক লোকটি তার রিভলভার পুলিশ অফিসারের দিকে ধরে রেখেই পাশে দাঁড়ানো যুবকটিকে উদ্দেশ্য করে বলল, ‘ড. মোহাম্মদ বারজেনজো, আপনি আপনার হাতের পুলিশ অফিসারের রিভলভারটি রুমাল দিয়ে ধরে রুমাল দিয়ে ভালো করে মুছে ফেলুন এবং রুমাল দিয়ে নলটি ধরে রিভলভারটি পুলিশ অফিসারকে দিয়ে দিন।’

‘কিন্তু রিভলভারে আরও দু’টি গুলি আছে মনে হয়।’ বলল যুবক ড. বারজেনজো।

‘ধন্যবাদ হুঁশিয়ার থাকার জন্যে। কিন্তু ভয় নেই। আমি দেখবো।’ বলল আগন্তুক লোকটি।

ড. মোহাম্মদ বরজেনজো আগন্তুকের নির্দেশ মত রিভলভারটি রুমাল দিয়ে তার হাতের ছাপ ভালো করে মুছে পুলিশ অফিসারের হাতে দিয়ে দিল।

পুলিশ অফিসার রিভলভার হাতে পেয়েই চোখের পলকে রিভলভারের নল ঘুরিয়ে নিল আগন্তুকের লক্ষ্যে। কিন্তু তার রিভলভারের নল থেকে গুলি বেরুনোর আগেই আগন্তুকের হাতের রিভলভার গর্জন করে উঠল। গুলি গিয়ে পুলিশ অফিসারের ডান কাঁধের বাহুসন্ধিস্থলকে বিদ্ধ করল।

রিভলভার পড়ে গেল পুলিশ অফিসারের হাত থেকে।

পুলিশ অফিসারটি বাম হাত দিয়ে কাঁধ চেপে ধরে আর্তনাদ করে বসে পড়ল।

আগন্তুক লোকটি বাম হাত দিয়ে রিভলভার তুলে নিয়ে চারজন কিডন্যাপারের লাশের দিকে ফাঁকা গুলি করে অবশিষ্ট গুলিটা শেষ করল।

পুলিশ অফিসার চিৎকার করে বলল, আগন্তুককে লক্ষ্য করে, 'ক্ষমার অযোগ্য তোমার এই অপরাধের চড়া মূল্য তোমাকে দিতে হবে। তুমি একজন পুলিশ অফিসারকে গুলি করেছ।'

আগন্তুক লোকটি একটু হাসল। বলল শান্ত কণ্ঠে, 'কিছুই করতে পারবেন না আমার। একটা নতুন কাহিনী আবার তৈরি হলো। আপনি কিডন্যাপারদের যখন চ্যালেঞ্জ করেন, তখন আমরা আপনার সাথে ছিলাম। কিডন্যাপাররা আপনাকে গুলি করে পালাতে চেষ্টা করে। আমি আপনার হাত থেকে রিভলভার নিয়ে কিডন্যাপারদের গুলি করে মারি।'

পুলিশ অফিসারটি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, 'আমি বলব, এ কাহিনী ঠিক নয়।'

'প্রমাণ বলবে, এই কাহিনীই ঠিক। যে রিভলভার দিয়ে আমি আপনাকে গুলি করেছি, এ রিভলভার আমি এখন কিডন্যাপারদের হাতে দিয়ে দেব। এতে থাকবে ওদের একজনের আঙুলের ছাপ।'

একটু থামল আগন্তুক। তারপর আবার বলল সেই ঠাণ্ডা, শান্ত কণ্ঠে পুলিশ অফিসারকে লক্ষ্য করে, 'অফিসার, আপনার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত আমার প্রতি এই কারণে যে, আমি আপনার বুকে কিংবা মাথায় গুলি করিনি।'

আবার থামল আগন্তুক। সংগে সংগেই আবার বলে উঠল, ‘হত্যা একটা জঘন্য কাজ, আত্মরক্ষার ক্ষেত্র ছাড়া। কিন্তু আত্মরক্ষা করতে গিয়েও কষ্ট করে টার্গেট চেইঞ্জ করে আপনার বাহুসন্ধিতে গুলি করে আপনাকে বাঁচিয়েছি কেন জানেন? ঐ কিডন্যাপারদের পরিচয় আপনি জানেন, সে পরিচয় আপনার কাছ থেকে জানার জন্যে।’

পুলিশ অফিসারের চোখ-মুখ থেকে ক্রোধের ভাব উবে গেল। কিছুটা শান্ত হলো সে। সেও মনে মনে স্বীকার করলো, তার সহজ টার্গেট বুক, মাথায় গুলি না করে বাহু সন্ধির মত ঝুঁকিপূর্ণ প্রান্তিক টার্গেটে গুলি করেছে নিশ্চয় আমাকে বাঁচানোর জন্যেই। কিন্তু সেই সাথে বিস্ময় এসে তাকে ঘিরে ধরল, কিডন্যাপারদের পরিচয় জানতে চায় কেন সে! আর লোকটি সাধারণ নয়, দারুণ তীক্ষ্ণ ধী-শক্তিসম্পন্ন ও ক্ষীপ্র!

‘কে আপনি? আমি ওদের পরিচয় জানি কি করে বুঝলেন? আর ওদের পরিচয় দিয়েই বা আপনি কি করবেন?’ গড়গড় করে প্রশ্নগুলো করে গেল পুলিশ অফিসারটি।

‘ওরা আপনাকে নাম ধরে সম্বোধন করেছে, আর আপনিও ওদের চিনতে পেরেই ওদের আপনি সুযোগ দিয়েছিলেন মেয়েটিকে ধরে নিয়ে যেতে।’ বলল আগন্তুক লোকটি।

পুলিশ অফিসার সংগে সংগেই কোন উত্তর দিল না। তার চোখের স্থির দৃষ্টি আগন্তুক লোকটির দিকে। চোখে তার বিস্ময়, আগের সেই ক্রোধ এখন নেই।

কথা শেষ করেই আগন্তুক লোকটি ড. বারজেনজোকে লক্ষ্য করে বলল, ‘আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমি আমার রিভলভারটা কিডন্যাপারদের হাতে দিয়ে আসি।’

দু’হাতে দু’রিভলভার নিয়ে এগোলো আহমদ মুসা কিডন্যাপারদের লাশগুলোর দিকে।

ওখানে পৌঁছে আগন্তুক লোকটি নিজের রিভলভারটি ভালো করে রুমাল দিয়ে মুছে একজন কিডন্যাপারের হাতে ধরিয়ে দিল। তারপর ডান হাতে পুলিশ অফিসারের রিভলভার রেখে কিডন্যাপারদের লাশ উল্টে-পাল্টে প্রত্যেকের বাহু

দেখে নিল এবং প্রত্যেকের মানিব্যাগসহ সব পকেট হাতড়েও দেখল কোন কাগজপত্র পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু কোন কাগজপত্র পেল না। এমনকি কোন আইডি কার্ডও নয়।

ফিরে এল আগন্তুক লোকটি ড. বারজেনজোদের কাছে।

পুলিশ অফিসার তার বাম কাঁধ চেপে ধরে তখন বসেই ছিল। সে দেখছিল আগন্তুকের কাজকর্ম। আগন্তুক ফিরে আসতেই সে বলল, 'আপনি প্রত্যেকের বাহুতে কি দেখছিলেন, আর ওদের পকেট-মানিব্যাগেই বা কি খুঁজছিলেন?'

'ওদের বাহুতে একটা চিহ্ন খুঁজছিলাম এবং মানিব্যাগে ও পকেটে ওদের পরিচয়সূচক কোন কাগজপত্র পাওয়া যায় কিনা দেখছিলাম।' আগন্তুক বলল।

'কেন?' বলল পুলিশ অফিসার।

'না, এমনি। পরিচয় সম্পর্কে কৌতুহল আছে। আপনার কাছ থেকেও তো জানতে চেয়েছি।'

কথা শেষ করে একটু থেমেই আবার বলে উঠল আগন্তুক, 'আপনার পুলিশ কি আসছে লাশ নিতে? আমাদের মানে মি. বারজেনজো ও ড. আজদার কেইস তো রেকর্ড করাতে হবে।'

'বলেছি, ওরা আসছে। আসলেই আমরা থানায় যাব।'

বলে ডান হাতটা বাড়াতে গিয়ে পুলিশ অফিসারটি বেদনায় কঁকিয়ে উঠল।

তখনও রক্ত ঝরছিল আহত স্থান থেকে।

'ও! স্যরি। আপনার ওদিকে নজরই দেয়া হয়নি।'

বলে আগন্তুক ছুটল তার গাড়ির দিকে। এক মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল একটা অটো-ব্যান্ডেজ নিয়ে। এগোলো সে পুলিশ অফিসারের দিকে। বলল, 'অফিসার, ফাস্ট এইড হিসেবে এই ব্যান্ডেজ করে দিচ্ছি। আপনি আরাম পাবেন।'

'এতো মিলিটারিদের ফিল্ড ব্যান্ডেজ! একদম লেটেস্ট। খুব দামি। আপনি এ ব্যান্ডেজ পেলেন কোথায়?' বলল পুলিশ অফিসার।

‘হ্যাঁ, ব্যান্ডেজটা খুব কাজের। একদিকে রক্ত শুষে নিয়ে আহত জায়গাটা পরিষ্কার করে, অন্যদিকে ব্যান্ডেজটা ক্রেপ শক্তি চাপ সৃষ্টি করে রক্তপাতও বন্ধ করে দিতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, ব্যান্ডেজটা একটা ‘মেডিক্যাল কিট’। আহত জায়গার চিকিৎসাও শুরু করে দেয় ব্যান্ডেজটা।’

আগন্তুক কথা বলার সাথে সাথে ব্যান্ডেজের কাজও করছিল।

পুলিশ অফিসারটি বিস্ময়-দৃষ্টিতে দেখছিল আগন্তুককে। এমন অদ্ভুত লোক সে জীবনে দেখেনি। শত্রুতা করেছে, গুলি করে আহতও করেছে বটে। কিন্তু এ বিষয়টা তার কাছে আর বড় বিষয় নয়। তাকে যে সুযোগ পেয়েও হত্যা করেনি, এটাকেই সে বড় করে দেখছে। তারপর এ শুশ্রূষাও প্রমাণ করে, সে হিংসুটে কোন ক্রিমিনাল ধরনের লোক নয়।

অন্যদিকে ড. আজদা ও ড. মোহাম্মদ বারজেনজোর চোখে-মুখে বিস্ময় আর কৌতুহলের বন্যা। আগন্তুককে তাদের মনে হচ্ছে আল্লাহর পাঠানো ফেরেশতা। বুদ্ধি, ক্ষীপ্রতা, সাহস ও মানবতা সব দিক দিয়েই তাকে ফেরেশতার মত কোন অতি উঁচুস্তরের কেউ মনে হচ্ছে। গুলি করতেও যেমন সে দ্বিধা করেনি, তেমনি আবার সেই আহতের শুশ্রূষাতেও তার কোন জড়তা নেই!

আগন্তুকের কথা শেষ হতেই পুলিশ অফিসার বলল, ‘কিন্তু আপনি এ ব্যান্ডেজ পেলেন কোথায়? যুদ্ধক্ষেত্রের মত পরিবেশে সেনাবাহিনী এ ব্যান্ডেজ ব্যবহার করে। সাধারণভাবে এটা ব্যবহারও হয় না, কিনতেও পাওয়া যায় না।’

পুলিশ অফিসারের প্রশ্নের কোন সরাসরি জবাব না দিয়ে বলল, ‘টাকা হলে বাঘের চোখ মেলে।’

ঠিক এ সময় দু’টি পিকআপে পুলিশ এসে গেল।

একটা পিকআপের সামনের কেবিন থেকে লাফ দিয়ে নামল দু’জন পুলিশ অফিসার।

ছুটে এল দু’জন পুলিশ অফিসার। তাদের বসের ব্যান্ডেজ বাঁধা বাহুসন্ধির দিকে একবার ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে বলল, ‘আপনি ঠিক আছেন তো স্যার? আর কোন অসুবিধা নেই তো?’

‘আমি ঠিক আছি। আমাকে নিয়ে তোমরা ব্যস্ত হয়ো না। তোমরা সুরতহাল করে লাশগুলো ও ওদের মাইক্রোটা নিয়ে চলে এস। আমি যাচ্ছি ওদের নিয়ে। ঐ ভদ্রমহিলাকে ঐ ক্রিমিনালরা কিডন্যাপ করা থেকেই এই ঘটনা ঘটেছে। আমি ওদের কেইসটা রেকর্ড করাই। তোমরা এস।’ বলল পুলিশ অফিসার।

‘জ্বি স্যার, আপনি ওদের নিয়ে যান স্যার। আমরা আমাদের হাসপাতালে টেলিফোন করে রেখেছি স্যার। আপনার রেস্টও দরকার স্যার।’

মুখস্থ কথার মত গড়গড় করে কথাগুলো বলে গেল একজন পুলিশ অফিসার।

‘ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। তোমরা এস।’ বলল পুলিশ অফিসার রশিদ দারাগ।

‘স্যার, আপনি ওদের থানায় কেইস লেখানো রেখে চলে যাবেন হাসপাতালে।’ বলল সেই পুলিশ অফিসার।

‘হ্যাঁ, আমি ওদের ডিউটি অফিসারের হাতে দিয়েই চলে যাব।’ পুলিশ ইন্সপেক্টর রশিদ দারাগ বলল।

বলেই ইন্সপেক্টর দারাগ গিয়ে গাড়িতে উঠল। একজন পুলিশ উঠল তার গাড়ির ড্রাইভিং সিটে।

আগন্তুক লোকটি, ড. শেখ মোহাম্মদ বারজেনজো এবং ড. আজদা আয়েশা তিনজনেই গাড়ি নিয়ে ফলো করল ইন্সপেক্টর দারাগের গাড়িকে।

থানায় পৌঁছে ইন্সপেক্টর রশিদ দারাগ প্রথমে ডিউটি অফিসারকে দিয়ে নিজের একটি স্টেটমেন্ট রেকর্ড করাল। তাতে সে আগন্তুক লোকটি সর্বশেষে যে কাহিনী দাঁড় করিয়েছিল, সেটাই হুবহু বলে গেল। তারপর ড. আজদাদের বক্তব্য রেকর্ড করতে বলে সে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল।

যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার ফিরে তাকাল সে। বলল আগন্তুক লোকটিকে লক্ষ্য করে, ‘ইয়ংম্যান, আপনার নাম জানা হয়নি।’

‘আবু আহমদ আব্দুল্লাহ।’ বলল আগন্তুক লোকটি।

‘আপনার পরিচয় জিজ্ঞেস করবো না। কারণ নামের মতই একটা কিছু শুনতে হবে। শুধু সাবধান করে দিচ্ছি, সাপের লেজে কিন্তু পা দিয়েছেন, ছোবল

খেতে হবে। ড. আজদারা ছোবল খাচ্ছেন। আজকের ঘটনার পর ওদের কি হবে, তা বলার প্রয়োজন নেই। আবার দেখা হবে।'

আগন্তুক আবু আহমদ আব্দুল্লাহকে লক্ষ্য করে কথা কয়টি বলে পুলিশ ইন্সপেক্টর রশিদ দারাগ চলে যাচ্ছিল। আগন্তুক আবু আহমদ আব্দুল্লাহ তাকে লক্ষ্য করে বলল, 'শুনুন অফিসার, আপনার কথায় বোঝা যাচ্ছে, ড. আজদারা আরও বড় বিপদে পড়ছেন। এটা বলা কিন্তু আপনাদের দায়িত্ব নয়, দায়িত্ব নাগরিকদের রক্ষা করা।'

পুলিশ অফিসারটি হাসল। বলল, 'পুলিশরা খুব দুর্বল জীব। কিছু দায়িত্ব তারা পালন করে। সব দায়িত্ব তাদের নয়, সব দায়িত্ব পালনের ক্ষমতাও তাদের নেই।'

'সব দায়িত্ব পালনের কথা বলছি না অফিসার। ড. আজদাদের রক্ষার কথা বলছি।' বলল আগন্তুক আবু আহমদ আব্দুল্লাহ।

'এ ক্ষমতা পুলিশের নেই দেখতে পাচ্ছি।' পুলিশ অফিসার দারাগ বলল।

'কেন?' জিজ্ঞাসা আগন্তুক আবু আহমদ আব্দুল্লাহর।

'এই 'কেন'-এর জবাব আমিও সব জানি না।'

বলেই পুলিশ অফিসার তার গাড়ির দিকে এগোলো।

আগন্তুক কণ্ঠ একটু চড়িয়ে বলল, 'এই 'কেন' নিয়ে আপনার সাথে আরও কথা বলতে চাই অফিসার।'

'আপনার পরিচয় সম্বন্ধেও আমার জানার আছে।'

বলতে বলতে গাড়িতে উঠে বসল পুলিশ অফিসার দারাগ।

পুলিশ অফিসার দারাগ চলে যেতেই থানার ডিউটি অফিসার ড. আজদাদের তাড়া দিল, 'আপনারা আসুন, কাজটা সেরে ফেলি।'

ড. আজদা, ড. মোহাম্মদ বারজেনজো ও আগন্তুক আবু আহমদ আবদুল্লাহ সবারই বক্তব্য রেকর্ড করল ডিউটি অফিসার।

ডিউটি অফিসার ড. আজদা ও ড. মোহাম্মদ বারজেনজোর পরিচয় পেয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল। বলছিল, 'স্যার, আপনাদের দু'পরিবার আমাদের কুর্দি জাতির প্রাণ।'

ড. আজদা ও ড. মোহাম্মদ বারজেনজো চাপ না দেয়া পর্যন্ত চেয়ারে বসেনি।

ড. বারজেনজো বলেছিল, ‘এ পরিবারের কোন সম্মান কি এখন আছে!’

ডিউটি অফিসার বলেছিল, ‘যারা মানুষ তাদের কাছে আছে, তবে কিছু মতলবি মানুষের কাছে নেই। তারা অন্য কিছু চায়, অন্য কিছু করে।’

আগন্তুক আবু আহমদ আব্দুল্লাহ জিজ্ঞেস করেছিল, ‘তোমাদের অফিসার রশিদ দারাগ কি মতলবিদের দলে?’

ডিউটি অফিসার আগন্তুকের দিকে একবার তাকিয়ে একটু ভেবে বলেছিল, ‘তিনি চলমান স্রোতের বাইরে এক পা’ও রাখেন না। তবে তিনি দেশকে ভালোবাসেন। কিন্তু ঝামেলামুক্ত থাকতে চান সব সময়।’

ডিউটি অফিসারকে ধন্যবাদ দিয়েছিল আগন্তুক আবু আহমদ আব্দুল্লাহ।

জবানবন্দী রেকর্ডের পর তিনজনই বেরিয়ে এল থানা থেকে।

থানা থেকে বের হবার জন্যে পা বাড়িয়ে স্বস্তিতে ভরে গেল ড. আজদার মন। খুনোখুনি ও পুলিশের আচরণের মুখে একসময় তার মনে হয়েছিল, তার মুক্ত জীবনের এখানেই শেষ। তার দুর্ভাগ্যের সাথে ড. বারজেনজো জড়িয়ে পড়ায় আরও মুষড়ে পড়েছিল সে। ড. বারজেনজো ও তার মধ্যে এখনও বড় দূরত্বের দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে, এরপরও বারজেনজো তার জন্যে স্বস্তির একটা আশ্রয়। সেও তার সাথে সাথে খুনোখুনির মত বিপদে জড়িয়ে পড়ায় বুক ভেঙে গিয়েছিল তার। এ সময়ই আল্লাহর মূর্তিমান সাহায্যের মত এলেন আগন্তুকটি। সিচুয়েশন নিজের আয়ত্তে নেয়ার অদ্ভুত ক্ষমতা, ঠাণ্ডা-শান্ত কথাগুলো তার, কিন্তু তার মধ্যে যেন লুকিয়ে আছে অমোঘ শক্তি। বুদ্ধি, কৌশল, দূরদর্শিতা কোন ক্ষেত্রে তার ত্রুটি নেই, এরও প্রমাণ দিয়েছেন তিনি। তার মানবিকতা ও দরদের দিকটাও প্রশংসনীয়। পুলিশ অফিসার নীরব হয়েছে তার ব্যবহারের কারণেই। হঠাৎ তার মনে হলো, আগন্তুকের গাড়িতে সর্বাধুনিক ধরনের ঐ ব্যান্ডেজ ছিল কেন? এ প্রশ্নের উত্তর জানা তার কাছে পুলিশ অফিসারের চেয়েও অধিক জরুরি মনে হয়েছে। কিন্তু এর উত্তর সে পায়নি। আলো-অন্ধকারে কপাল পর্যন্ত নামানো ফেল্ট

হ্যাটের কারণে আগন্তুক লোকটিকে তখন ভালো করে দেখা যায়নি। তখন তাকে চালাক ধরনের রাশভারী ও দুর্বোধ্য মুখাবয়বের লোক মনে হয়েছিল। কিন্তু থানা-কক্ষের উজ্জ্বল আলোতে ফেল্ট হ্যাট খোলা আগন্তুককে একদমই ভিন্ন মনে হয়েছে। একহারা ঋজু গড়নের অনিন্দ্যসুন্দর এক যুবক সে। তার চেয়ে সুন্দর তার মুখের স্বচ্ছতা ও পবিত্রতা। এই মানুষ কিছুক্ষণ আগে অমন কঠোর ভূমিকা পালন করেছে, গুলি করেছে পুলিশ অফিসারকে, ভাবতেই কষ্ট লাগে।

থানা থেকে বেরিয়ে তারা তিনজনই এসে তাদের গাড়ির কাছে দাঁড়াল।

দাঁড়াতেই ভাবনার ইতি ঘটে গেল ড. আজদা আয়েশার। ড. আজদা আয়েশা পাশেই কিন্তু একটু দূরত্বে দাঁড়ানো আগন্তুক আবু আহমদ আব্দুল্লাহকে লক্ষ্য করে বলল, ‘স্যার, যদিও কোন ধন্যবাদ দিয়েই ঋণ শোধ হবে না, দায় শোধ হবে না, তবু ধন্যবাদ ছাড়া তো আর কিছু নেই দেবার। তাই আপনাকে ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি আল্লাহর সাহায্যের মত এসেছেন।’

ড. আজদার কথা শেষ হতেই ড. বারজেনজো বলে উঠল আগন্তুক আবু আহমদ আব্দুল্লাহকে লক্ষ্য করে, ‘আরও বেশি ধন্যবাদ আমার পক্ষ থেকে। আপনি আমাকে চার খুনের দায় থেকে মানে সাক্ষাৎ মৃত্যুদণ্ড থেকে বাঁচিয়েছেন অদ্ভুত বুদ্ধিমত্তা ও নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। এ ঋণের কোন পরিশোধ নেই মি. আবু আব্দুল্লাহ।’

আগন্তুক আবু আব্দুল্লাহ হাসল। বলল, ‘ড. আজদা যা বলেছেন, আমি যদি আল্লাহর সাহায্য হই, তাহলে তো আমার কোন কৃতিত্ব থাকে না। সবটা কৃতিত্বই আল্লাহর। আপনার আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা উচিত। যাক, এসব কথা আর নয়। এখন তো গৃহে ফেরার পালা, রাত অনেক হয়েছে। ড. আজদাকে কি ড. বারজেনজো পৌঁছে দেবেন?’

ড. বারজেনজো কিছু বলার আগেই ড. আজদা বলে উঠল, আগন্তুক আবু আব্দুল্লাহকে লক্ষ্য করে, ‘স্যার, আমার অনুমান সঠিক হলে আপনি বিদেশী। আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন, কোথায় যাবেন এত রাতে সেটা আমাদের জানা দরকার।’

ড. আজদার কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই ড. বারজেনজো বলল, 'ড. আজদা ঠিক বলেছেন। এটাই না আমাদের প্রথম জানা দরকার।'

'আপনাদের অনুমান সত্য। আমি আংকারা হয়ে ইস্তাম্বুল থেকে এসেছি। ইস্তাম্বুলে এসেছিলাম কয়েক মাস আগে। আজ দুপুরে আপনাদের হ্রদ-শহর 'ভ্যান'-এ এসে পৌঁছেছি। অসুবিধা নেই, আমি হোটেল বা রেস্টহাউজে জায়গা খুঁজে নেব।' বলল আগন্তুক আবু আব্দুল্লাহ।

ড. আজদার চোখে বিস্ময় ফুটে উঠেছিল। একদৃষ্টিতে সে তাকিয়েছিল আবু আব্দুল্লাহর দিকে। বলল, 'আপনি দুপুরে 'ভ্যান'-এ পৌঁছে, সন্ধ্যাতেই আরিয়াসে এসে পৌঁছেছেন। তার মানে, আপনার গন্তব্য আরিয়াস।'

'কেন, আমি আরিয়াস হয়ে অন্য কোথাও যেতে পারি না?' বলল আবু আব্দুল্লাহ।

'তা পারেন। আরিয়াস থেকে ইরান, আর্মেনিয়াও যেতে পারেন। কিন্তু সন্ধ্যার পর ইরান ও আর্মেনীয় সীমান্ত বন্ধ হয়ে যায়। আপনি ইরান বা আর্মেনিয়ায় যেতে চাইলে রাতটা 'ভ্যান'-এ থেকে সকালে যাত্রা করতেন।' ড. আজদা বলল।

গম্ভীর হলো আগন্তুক আবু আব্দুল্লাহর মুখ। বলল, 'আপনার কথা ঠিক। আমি আরিয়াসে এসেছি।'

'তাহলে আপনি হোটেল খুঁজছেন কেন? আপনি নিশ্চয় ট্যুরিস্ট হিসেবে আরিয়াসে আসেননি। কোন ট্যুরিস্ট এভাবে আসে না। কোথায় এসেছেন আপনি আরিয়াসে?' দৃঢ় কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ড. আজদা।

'আমার অনুরোধ, কথা আজ এ পর্যন্তই থাক। এখন কোন আলোচনার সময় নয়। পরে অবশ্যই দেখা হবে। এখন ড. আজদা কিভাবে যাবেন, সেটা বলুন। তার একা যাওয়া ঠিক হবে না। শুনেছেন তো পুলিশ অফিসারের কথা, সাপের লেজে পা দেয়া হয়েছে। ওরা নিশ্চয় সংগে সংগেই জেনে গেছে সব ব্যাপার। ওরা প্রতিশোধের জন্যে নিশ্চয় পাগল হয়ে উঠেছে। ড. বারজেনজো ড. আজদাকে বাড়িতে পৌঁছে দিন।' বলল আগন্তুক আবু আহমদ আব্দুল্লাহ।

উদ্বেগে পাংশু হয়ে উঠেছে ড. আজদা ও ড. বারজেনজো দু’জনেরই মুখ। প্রতিশোধের জন্যে ওদের পাগল হওয়ার যে কথা আগন্তুক বলেছেন, সেটা তারাও জানে।

শুকনো কণ্ঠে ড. বারজেনজো বলল, ‘আমি ড. আজদাকে পৌঁছে দিতে পারি। কিন্তু একটা সমস্যা আছে আমাদের। আমাদের মানে আমাদের দু’পরিবারের মধ্যে। আমি যেমন ওর সাথে ওদের বাড়ি যেতে পারি না, তেমনি এত রাতে তার বাড়ি ফেরাও তার পরিবার গ্রহণ করবে না।’

বিস্ময় ফুটে উঠল আগন্তুক আবু আব্দুল্লাহর চোখে-মুখে। বলল, ‘কেন, আপনাদের সম্পর্ক কি আপনাদের পরিবার মেনে নিচ্ছে না? প্রবলেমটা কি?’

ড. আজদা ও ড. বারজেনজো দু’জনেরই চোখ-মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। বিব্রত একটা ভাব ফুটে উঠল তাদের চোখে-মুখে।

দু’জনেই মুখ নিচু করেছিল।

মাথা তুলে জবাব দিল ড. বারজেনজো। বলল, ‘প্রবলেম হলো দু’পরিবারের রাজনৈতিক বৈরিতা। ড. আজদার গ্র্যান্ডফাদার মোস্তফা বারজানি বিখ্যাত বামপন্থী নেতা এবং কুর্দি বাম রাজনৈতিক আন্দোলন কুর্দি ডেমোক্র্যাট পার্টির ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা। আর আমার গ্র্যান্ডফাদার শেখ মাহমুদ বারজেনজো ছিলেন আধুনিক কুর্দিস্থানের প্রথম রাজা এবং কুর্দি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জাতীয়তাবাদী নেতা। আর আমার নানা সাইয়েদ নুরসি শুধু কুর্দিস্থান নয়, গোটা তুরস্ক ও ইরানের ধর্মীয় নেতা ছিলেন। আমাদের কনজারভেটিভ পরিবারের সাথে ড. আজদার পরিবারের একটা স্থায়ী রাজনৈতিক বৈরিতা আছে, তাছাড়া আমাদের ধার্মিক পরিবারের সাথে ড. আজদাদের ধর্মনিরপেক্ষ পরিবারের রয়েছে যোজন যোজন মানসিক পার্থক্য। এই সমস্যার কারণে আমাদের সম্পর্কের কথা আমরা পরিবারকে বলার অবস্থাতেও নেই।’ থামল ড. বারজেনজো।

‘আর আপনারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়েও বিয়ে করতে পারছেন না পরিবারকে বাদ দিয়ে।’ বলল আবু আহমদ আব্দুল্লাহ।

‘ঠিক তাই। আমরা পরিবারকে মাইনাস করার কথা কল্পনাও করতে পারি না।’ বলল ড. আজদা। ভারি কণ্ঠ তার।

‘বুঝেছি। এই কারণেই ড. বারজেনজো ড. আজদার বাড়ি যেতে পারছেন না। আবার এত রাতে ড. আজদাও একা বাড়িতে যেতে পারেন না, কথা উঠবে। তাহলে উপায় কি এখন?’

‘মি. আবু আব্দুল্লাহ, উপায় আপনিই করতে পারেন। আপনার থাকার জায়গা প্রয়োজন। আপনি ড. আজদার সাথে চলুন। আপনার থাকার জায়গাও হলো আর ড. আজদার সমস্যারও সমাধান হলো।’ বলল ড. বারজেনজো।

ড. আজদার মুখ প্রসন্ন হযে উঠল। যেন অন্ধকারে আলোর সন্ধান পেল। বলল, ‘উনি ঠিক বলেছেন স্যার। আপনি আমাকে সাহায্য করুন। আমার বাড়িতে আপনার কোনই অসুবিধা হবে না, যদিও এটা আমাদের গ্রামের বাড়ি। আমার ফুপা-ফুপি এসেছেন গতকাল, আজ মামা এসেছেন। তিনি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। আপনি ভালো সঙ্গও পাবেন স্যার।’

‘আমিও আপনাদের অনেক দূর এগিয়ে দিতে পারব। চলুন, যাওয়া যাক।’ ড. বারজেনজো বলল।

আবু আহমদ আব্দুল্লাহর ছদ্মনামের আড়ালে আহমদ মুসা মনে মনে খুশিই হলো। সে তো ড. আজদার সন্ধানে ড. আজদার বাড়িতেই যাচ্ছিল। দুপুরে ‘ভ্যান’ লেক-শহরে পৌঁছার পরই আহমদ মুসা আরা আরিয়াস অঞ্চলের নাগরিক তালিকা সার্চ করে ড. আজদা আয়েশার ঠিকানা যোগাড় করেছে। সেই ঠিকানাতেই যাচ্ছিল সে। ‘মেঘ না চাইতেই পানি’র মত সেই বাড়িতেই যাওয়ার সুযোগ হলো তাদের মেহমান হয়ে। বলল আহমদ মুসা, ‘ঠিক আছে, আমার আপত্তি করার কোন যুক্তি নেই।’

‘ধন্যবাদ মি. আবু আব্দুল্লাহ।’ বলল ড. বারজেনজো।

‘অনেক ধন্যবাদ স্যার। চলুন, যাওয়া যাক স্যার।’ বলল ড. আজদা।

সবাই তাদের গাড়ির দিকে এগোলো।

‘ড. বারজেনজো, আপনার সাথে আবার কিভাবে দেখা হবে? আমার কিছু প্রয়োজন আছে।’ বলল আহমদ মুসা।

ড. বারজেনজো হাসল। বলল, ‘আমার মনেও কিছু প্রশ্ন, কিছু কৌতুহল আছে। আপনার সাথে দেখা হওয়া আমারও প্রয়োজন।’

ড. বারজেনজোর কথা শেষ হতেই ড. আজদা বলে উঠল, ‘আমার তো অনেক কৌতুহল, অনেক প্রশ্ন আছে। আলহামদুলিল্লাহ্, কৌতুহল মেটানোর সুযোগ পেয়ে গেলাম।’

‘আলহামদুলিল্লাহ’ বলে আহমদ মুসা ড. বারজেনজোকে লক্ষ্য করে বলল, ‘তাহলে কিভাবে কোথায় দেখা হচ্ছে মি. বারজেনজো?’

‘ভেবে চিন্তে কাল সকালে ড. আজদার টেলিফোনে জানাব।’ বলল ড. বারজেনজো।

‘ধন্যবাদ।’ আহমদ মুসা বলল।

সালাম বিনিময়ের পর সবাই গিয়ে গাড়িতে উঠল।

আহমদ মুসা উঠল ড. আজদার গাড়িতে।

আহমদ মুসা তার ভাড়া করা গাড়ি থানা পর্যন্ত পৌঁছে ছেড়ে দিয়েছিল।

চলতে শুরু করল দু’টি গাড়ি।

আগে আজদার গাড়ি, পেছনে ড. বারজেনজোর গাড়ি।

# ৩

স্বপ্ন দেখছিল আহমদ মুসা।

দেখছিল, দু'জন মুখোশধারী লোক ড. আজদাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। ড. আজদা প্রাণপণে 'স্যার', 'স্যার' বলে চিৎকার করছিল।

'দাঁড়াও', 'দাঁড়াও' বলে ঘুমের মধ্যেই উঠে বসেছে আহমদ মুসা।

ঘুম ভেঙে গেল তার।

স্বপ্ন নয়, এবার বাস্তবেও ড. আজদার 'স্যার', 'স্যার' চিৎকার শুনতে পেল সে। একদম তার দরজার সামনে। মনে হচ্ছে, কেউ তাকে তার দরজার সামনে থেকেই ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

আঙ্কারা থেকে বিদায়ের সময় জেনারেল মোস্তফার দেয়া লেটেস্ট ভার্শন এম-১০ মেশিন রিভলভারটি বালিশের তলা থেকে বের করে হাতে নিয়ে জ্যাকেটটা গায়ে চাপিয়ে লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নামল সে।

ডান হাতে রিভলভার বাগিয়ে ধরে বাম হাত দিয়ে দরজার নব ঘুরিয়ে এক ঝটকায় খুলে ফেলল দরজা। আহমদ মুসা দেখতে পেল, তার দরজা সোজা করিডোর দিয়ে দু'জন মুখোশধারী টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে ড. আজদা আয়েশাকে।

আহমদ মুসা ওদিকে এগিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছে এমন সময় বাঁ দিক থেকে একটা ধাতব শব্দে সেদিকে ফিরে তাকাল। দেখল, তার দিকে রিভলভার তুলেছে একজন মুখোশধারী সন্ত্রাসী। তার রিভলভারের সেফটি ফ্ল্যাসপপিন তোলারই শব্দ পেয়েছে সে। তার মানে গুলি আসছে।

চিন্তার মতই দ্রুত আহমদ মুসা বাম দিকে ফ্লোরের ওপর নিজেকে ছুঁড়ে দিয়েছিল। গুলিটা যেন তার ডান কাঁধ ছুঁয়েই বেরিয়ে গেল। মুহূর্ত সময়ের দূরত্বে মাথাটা বেঁচে গেল আহমদ মুসার।

আহমদ মুসার দেহটা মাটি স্পর্শ করার আগেই তার ডান হাতের এম-১০ রিভলভার গুলি করেছিল সন্ত্রাসীকে লক্ষ্য করে যাতে সে দ্বিতীয় গুলি করার সুযোগ না পায়।

তার পাশেই আরেকজন সন্ত্রাসী দাঁড়িয়েছিল। তার রিভলভার তাক করেছিল কয়েকজন ভীতসন্ত্রস্ত নারী-পুরুষকে। তারা ড. আজদার ফুপি, ফুপা, মামা ও মামাতো ভাই-বোনরা হবেন।

ড. আজদার পিতা ইঞ্জিনিয়ার নাফী আগা বারজানী এবং মাতা লায়লা আজদা বারজানী থাকেন সোভিয়েত ইউনিয়নে দীর্ঘদিন ধরে। সোভিয়েত রাষ্ট্রীয় তেল কোম্পানীর তিনি একজন শীর্ষ ইঞ্জিনিয়ার। শোনা যায়, তারা কমিউনিস্ট পার্টি করেন।

আহমদ মুসা দেহটা মাটিতে পড়ার পর দ্বিতীয় গুলিটা করল দ্বিতীয় সন্ত্রাসীকে লক্ষ্য করে।

সন্ত্রাসীও রিভলভার উঁচিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল আহমদ মুসার দিকে। কিন্তু তার গুলি করার সুযোগ হলো না। তার আগেই বুকে গুলি খেয়ে ভূমি শয্যা নিল।

যে দু'জন সন্ত্রাসী ড. আজদাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, তারা ড. আজদাকে ছেড়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল।

তাদের দু'জনের রিভলভারই তাক করেছে আহমদ মুসাকে।

আহমদ মুসা ঘুরে ওদের তাক করার আগেই ওদের রিভলভার থেকে গুলি শুরু হলো।

আহমদ মুসা ফুটবলের মত দ্রুত গড়িয়ে গুলি যে দিক থেকে আসছে, সেদিকেই এগোলো। ঐদিকেই লাউঞ্জের পাশে করিডোরের প্যারালালে একটা পিলার রয়েছে। পিলারটাই আহমদ মুসার টার্গেট।

পিলারের আড়ালে গিয়ে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

ওদের গুলি বন্ধ হয়নি।

ওরা গুলি চালাতে চালাতেই এগিয়ে আসছে। কাছে এসে দু'দিক থেকে তাকে টার্গেট করার আগেই ওদের ঠেকাতে হবে, ভাবল আহমদ মুসা

আহমদ মুসা মুহূর্তকাল স্থির হয়ে দাঁড়ানোর পর দু'পাশের গুলির রেঞ্জ দেখে নিয়ে তার এম-১০ মেশিন রিভলভারের অটোমেটিক ফ্ল্যাসপপিন অন করে ওদের গুলির রেঞ্জ থেকে রিভলভারটা ওপরে তুলে ওদের গুলির শব্দ লক্ষ্যে রিভলভারের নল কৌণিক এ্যাংগেলে স্থির করে ট্রিগার চেপে ধরল তর্জনী দিয়ে।

রিভলভার থেকে অব্যাহত গুলির ঝাঁক বেরিয়ে যেতে লাগল। নির্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যে তার রিভলভারের নল ঘুরতে লাগল।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড।

ওদের গুলি থেমে গেল।

চকিতে উঁকি দিয়ে ওদিকে তাকাল আহমদ মুসা। দেখল, দু'জন রিভলভারধারী মেঝেতে গড়িয়ে গড়িয়ে পেছন দিকে সরে যাচ্ছে। ওরা আহত হয়েছে মনে হলো। কিন্তু ড. আজদাকে দেখতে পেল না আহমদ মুসা। এদিকে নিশ্চয় আসেনি। তাহলে?

চমকে উঠল আহমদ মুসা। তাহলে কি আরও সন্ত্রাসী ছিল? তারা ড. আজদাকে নিয়ে গেছে!

আর ভাবতে পারল না আহমদ মুসা।

সে গুলি করতে করতেই এগোলো গড়িয়ে চলা ওই দু'জনের দিকে। ওদিক দিয়েই বাইরে বেরুবার পথ।

এ সময় ড. আজদার মামা ও ফুপারা ছুটে এল। ওরা চিৎকার করে বলল, 'দু'জন সন্ত্রাসী ড. আজদার মুখ চেপে ধরে বের করে নিয়ে গেছে এই মাত্র।'

আহমদ মুসা ছুটল বাইরে বেরুবার জন্যে।

সন্ত্রাসী দু'জনের দেহ লাফ দিয়ে ডিঙানোর সময় দেখল, দু'জনের দেহই ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

বেরিয়ে এল আহমদ মুসা। বাইরের বারান্দায় এসে পৌঁছতেই দেখতে পেল, একটা গাড়ি দ্রুত চলে যাচ্ছে। চিৎকার শুনতে পেল ড. আজদার।

উপায় নেই দৌঁড়ে গিয়ে গাড়িকে ধরার।

রিভলভার তুলল আহমদ মুসা। অটোমেটিক ফ্ল্যাসপপিন অন করাই ছিল। ট্রিগার চাপল আহমদ মুসা।

বসে পড়ে মাটির এক ফুট উঁচু দিয়ে মাটির সমান্তরালে গুলি ছুঁড়েছিল আহমদ মুসা।

পেছন থেকে মাইক্রোর টায়ারে গুলি লাগানো খুব কঠিন। তবু তাড়াহুড়োর মধ্যে যা করেছে, এর বেশি কিছু করা যেত না। আল্লাহ ভরসা।

ভরসা ব্যর্থ হলো না। মুহূর্তের ব্যবধান। টায়ার ফাটার বিকট একটা শব্দ হলো।

ছুটল আহমদ মুসা গাড়ির দিকে।

গাড়িটির গতি বেশি ছিল না। তাই টায়ার ফাটার পর গাড়িটি কয়েকগজ গিয়ে থেমে গেল।

আহমদ মুসা গাড়ির কাছে পৌঁছার আগেই মাইক্রোর দু'পাশের দরজা খুলে তিনজন বেরিয়ে এল। এপাশে নেমেছিল দু'জন। দু'জনের হাতে দু'টি স্টেনগান।

তারা নেমেই আহমদ মুসার দিকে একবার তাকিয়ে স্টেনগান তুলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে।

কিন্তু আহমদ মুসা তার লেটেস্ট মডেলের এম-১০ মেশিন রিভলভার বাগিয়ে ধরেই দৌঁড়াচ্ছিল। শুধু ট্রিগার টিপতেই এক ঝাঁক গুলি গিয়ে ঘিরে ধরল ঐ দু'জনকে।

তৃতীয় জন বেরিয়েছিল ওপাশ দিয়ে। আহমদ মুসা তাকে দেখতে পায়নি।

গাড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে সে তার রিভলভার তুলেছিল।

তখন গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল ড. আজদাও। সে দেখতে পেয়েছিল গাড়ির আড়ালে দাঁড়ানো লোকটিকে। সে লোকটির রিভলভারের লক্ষ্য দেখেই চিৎকার করে উঠেছিল, 'গুলি, মি. আবু আব্দুল্লাহ।'

শেষ মুহূর্তেই মুখ তুলেছিল আহমদ মুসা। দেখতে পেয়েছিল লোকটির রিভলভারের নল। কিছুই করার ছিল না। কিন্তু দেহের দুর্বোধ্য সতর্কতা কোন অশরীরী নির্দেশে পলকেই দেহটাকে বাঁকিয়ে নিয়েছিল ডান দিকে।

গুলিটা এসে বিদ্ধ করল আহমদ মুসার বাম বাহুকে।

দেহটা একবার ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল আহমদ মুসার। যেন সে বুকেই গুলি খেয়েছে, এমন অবস্থা নিয়ে সে আছড়ে পড়ল। কয়েকবার কাতরানোর মত দেহটা এদিক-ওদিকে নড়িয়ে স্থির করে ফেলল দেহটাকে। লক্ষ্য, লোকটাকে আড়াল থেকে বের করে আনা।

আহমদ মুসার গুলি খেয়ে পড়ে যাওয়া গাড়ির আড়ালে দাঁড়ানো সন্ত্রাসীও দেখেছে। সে লাফ দিয়ে গাড়ির ওপর দিয়ে এপারে এসে ড. আজদার সামনে দাঁড়াল। তার মাথায় রিভলভার ঠেকিয়ে বলল, 'ওর মত যদি মরতে না চাও তাহলে চল। এক মুহূর্ত দেরি করলে মাথা উড়িয়ে দেব।'

ভয় ও উদ্বেগে কাঠ হয়ে যাওয়া ড. আজদা গাড়ির দিকে ঘুরে দাঁড়াল যন্ত্রচালিতের মত।

আহমদ মুসা একটা গুলি করল। গুলিটা সন্ত্রাসীটির কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। গুলির উত্তাপ যেন পেল সে।

চমকে উঠে পেছনে ফিরে তাকাল সন্ত্রাসীটি।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়েছিল তখন। তার রিভলভার তাক করাই ছিল সন্ত্রাসীটির দিকে। বলল আহমদ মুসা, 'হাতের রিভলভার ফেলে দিয়ে হাত তুলে...।'

কথা শেষ করতে পারল না আহমদ মুসা। সন্ত্রাসী লোকটির রিভলভার বিদ্যুৎ বেগে আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে ওপরে উঠল।

আহমদ মুসার কথা বন্ধ হয়ে গেল এবং সাথে সাথেই তার তর্জনী রিভলভারের ট্রিগারে চেপে বসল।

সন্ত্রাসী লোকটি আহমদ মুসার লক্ষ্যে রিভলভার তুলেছিল ঠিকই। কিন্তু ট্রিগার টেপার সময় হলো না। তার আগেই আহমদ মুসার রিভলভারের গুলি তার কপালে এসে বিদ্ধ হলো।

লোকটির দেহ এদিক-ওদিক কয়েকবার দোল খেয়ে খসে পড়ল মাটির ওপর।

ড. আজদা ছুটে এল আহমদ মুসার কাছে।

আহমদ মুসার বাম বাহু রক্তে ভেসে যাচ্ছিল।

'স্যার আপনি ভালো আছেন? একি হলো! গুলি লেগেছে আপনার?' আর্তকণ্ঠে বলে উঠল ড. আজদা আহমদ মুসার কাছে এসে।

ড. আজদার ফুপি, ফুপা, মামা সকলে ছুটে এল আহমদ মুসার কাছে।

ড. আজদার ফুপি কেঁদে উঠে বলল, 'বেটা যেন সাক্ষাৎ আল্লাহর ফেরেশতা। সে আমাদের আজদাকে আবার বাঁচাল। বাঁচাল আমাদের পরিবারকে। একি হলো তার! কেমন আছ বাছা তুমি!'

আহমদ মুসা হাতের রিভলভার পকেটে রেখে বলল, 'আমাকে নিয়ে আপনারা ব্যস্ত হবেন না। আমার তেমন কিছুই হয়নি।' মুখে হাসি নিয়ে বলল আহমদ মুসা।

ড. আজদারা আহমদ মুসার হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হলো। সদ্য গুলিবিদ্ধ একজন মানুষের চেহারা এমন বেদনাহীন, স্বচ্ছ ও হাসিমাখা হতে পারে না। তাহলে কি গুলি লাগেনি! রক্ত কিসের তাহলে!

ওদের কারও মুখেই যেন কথা জোগাল না।

আহমদ মুসাই আবার কথা বলল, ড. আজদাকে লক্ষ্য করে, 'ড. আজদা, এখনি থানায় টেলিফোন করা দরকার।'

থানার কথা শুনতেই ড. আজদাসহ সকলের মুখে উদ্বেগ নেমে এল। বলল আজদা ভীতকণ্ঠে, 'স্যার এতগুলো লোক মারা গেল। পুলিশ এলে কি ঘটবে স্যার! খুব ভয় করছে। গত রাতেও ওদের ব্যবহার দেখেছি।'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'এর মধ্যেও গত রাতের কথা আপনার মনে পড়েছে? ভাববেন না। আমি আমার রিভলভার দিয়ে ওদের সাতজনকেই হত্যা করেছি। আমি ওদের এটাই বলব।'

গম্ভীর হলো ড. আজদার মুখ। বলল, 'তাহলে আমাদের ভাবনাই আমরা ভাবব। আপনার ভাবনা আমরা ভাবতে পারবো না।' কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলল ড. আজদা।

'মা আজদা ঠিকই বলেছে। আপনি আমাদের জন্যে সব করলেন নিজের জীবন বিপন্ন করে। গুলিটা আপনার বাহুতে না লেগে বিপজ্জনক কোন জায়গায় লাগতে পারতো! আপনার কথাই তো আমাদের সবার আগে ভাবতে হবে। আসুক পুলিশ।' বলল ড. আজদার মামা ড. সাহাব নুরী।

একটু থেমেই সে আবার বলল, 'আমিই যাচ্ছি পুলিশকে টেলিফোন করতে।'

বলেই সে দ্রুত এগোলো বাড়ির দিকে।

'পুলিশ যতক্ষণ না আসছে ততক্ষণ আমরা বাইরেই দাঁড়াব। যেখানে যা কিছু যেমন আছে, তেমনি থাকা দরকার।' বলল আহমদ মুসা সবাইকে লক্ষ্য করে।

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা এগোলো গাড়ির পাশে পড়ে থাকা তিনটি লাশের দিকে।

আহমদ মুসা নিহত তিনজনেরই জামার বোতাম খুলে বাহু পরীক্ষা করল। তারপর জামার বোতাম লাগিয়ে দিয়ে ফিরে এল ড. আজদাদের কাছে।

'আপনি ওদের বাহুতে কি খুঁজলেন? আহত বাহু নিয়ে এসব করছেন কেন? রক্তক্ষরণ এখনও বন্ধ হয়নি।' বলল ড. আজদার ফুপা।

ড. আজদার ফুপা কামাল বারকি একজন রাজনীতিক ও ব্যবসায়ী। বিরাট সম্পত্তির মালিক। ইদানীং তিনি আংকারায় ব্যবসা করছেন। সেখানেও তিনি বাম আন্দোলনের সাথে যুক্ত।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'পুলিশ এসে পড়লে ঐ অনুসন্ধান করা যেত না। আমি ওদের দেহে একটা চিহ্ন খোঁজ করছিলাম।'

‘চিহ্ন? কি চিহ্ন?’ বলল ড. আজদার ফুপা কামাল বারকি।

আহমদ মুসা একটু ভাবল। একটু গাম্ভীর্য নেমে এল চোখে-মুখে। বলল, ‘বড় বড় অনেক গ্যাং-এর দেহে দলীয় চিহ্ন থাকে। সেরকম কোন দলের লোক কিনা ওরা, সেটাই দেখলাম।’

ড. আজদার ফুপা কিছু বলতে যাচ্ছিল, এ সময় দু’টি হেডলাইট ড. আজদাদের বাগানের গেট পেরিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছিল।

থেমে গেল ড. আজদার ফুপা কামাল বারকি।

‘নিশ্চয় পুলিশ আসছে।’ বলল আহমদ মুসা।

পুলিশের গাড়ি এসে দাঁড়াল সন্ত্রাসীদের মাইক্রোর ঠিক পেছনেই।

পুলিশের দু’টি গাড়ি। একটা জীপ, অন্যটি একটা ক্যারিয়ার।

জীপ থেকে নামল লোকাল থানার অফিসার ইনচার্জ। ক্যারিয়ার থেকে লাফ দিয়ে নামল কয়েকজন পুলিশ।

ড. আজদার বাড়ির সামনের লন-কাম-বাগানটিতে বিদ্যুতের দু’টি খুঁটি। গোটা বাগানই আলোকিত। গাড়ি বারান্দাতেও আলো। তার ফলে বাড়ির দেয়াল সবটাই আলোতে ঝলমল করছে।

মাইক্রোর একটু সামনেই দাঁড়িয়েছিল আহমদ মুসা ও ড. আজদারা।

পুলিশ অফিসার গাড়ি থেকে নামলে ড. আজদা ও তার মামারা পুলিশ অফিসারের দিকে এগোতে লাগল।

পুলিশ অফিসার মোস্তফা ওকালান কয়েক গজ এগিয়ে ড. আজদাদের সামনে এসে ড. আজদাকে লক্ষ্য করে বলল, ‘আপনিই তো ড. আজদা, ইঞ্জিনিয়ার নাফী আগা বারজানির মেয়ে? আপনাকেই কিডন্যাপের চেষ্টার ঘটনা ঘটেছে?’

‘হ্যাঁ অফিসার।’ বলল ড. আজদা।

‘আপনার সাথে এরা কারা?’ পুলিশ অফিসার ওকালান বলল। তার চোখে সন্ধানী দৃষ্টি।

ড. আজদা মামা, ফুপা সবাইকে পরিচয় করিয়ে দিল। আর আহমদ মুসাকে দেখিয়ে বলল, ‘আবু আহমদ আব্দুল্লাহ। আমার মেহমান।’

সেই সাথে ড. আজদা গত রাতে তাকে কিডন্যাপের চেষ্টার ঘটনাও বলতে গেল।

'আমি সে ঘটনা জানি মিস বারজানি। আমাকে জোনাল পুলিশ থেকে সব জানানো হয়েছে। তাহলে আপনার এই মেহমানই গত রাতে আপনার সাথে জোনাল পুলিশ অফিসে গিয়েছিলেন?' বলল পুলিশ অফিসার।

'জ্বি হ্যাঁ। ঘটনার সময় চলার পথে উনিও সেখানে দাঁড়ান। ইন্সপেক্টর দারাগ সব জানেন।' ড. আজদা বলল।

'কালকের ঘটনা জানেন, তবে সব জানেন না। উনি তো এ এলাকার লোক নন।'

একটু থেমেই আবার বলল, 'এখানে তিনটি লাশ আর চারটি লাশ কোথায়?'

'আর চারটি লাশ ভেতরে।' বলল ড. আজদার মামা ড. সাহাব নুরী।

'চলুন, দেখব।' পুলিশ অফিসার বলল।

'আসুন।' বলল ড. সাহাব নুরী।

চলার জন্যে পা তুলে পুলিশদের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'তোমাদের দু'জন আমার সাথে এস। আর অবশিষ্টরা বাইরে পাহারায় থাক। গাড়ি, লাশগুলো, হাতিয়ার যা যেমন যেখানে আছে তেমনই থাকবে।'

মাত্র জনাচারেক পুলিশ ছাড়া সবাই পুলিশ অফিসারের সাথে ভেতরে ঢুকে গেল।

ভেতরে ঢুকে ডান পাশে ড্রইংরুম ও বাম পাশে গেস্টরুমের মাঝে করিডোরটা পেরোলেই বেশ বড় একটা লাউঞ্জ। লাউঞ্জের অন্য তিন দিক দিয়েও ঘর। আবার দু'তলায় ওঠার সিঁড়িও এই লাউঞ্জ থেকেই। সন্ত্রাসীরা পানির পাইপ বেয়ে ছাদে উঠেছিল। তারপর চিলে-কোঠার তালা ভেঙে দু'তলায় প্রবেশ করেছিল। দু'তলায় তিনটি মাস্টার বেড আছে। তার একটি থেকে ড. আজদাকে ধরে নিয়ে লাউঞ্জে নেমে পালানোর চেষ্টা করেছিল। লাউঞ্জের পূর্ব প্রান্তের গেস্টরুম থেকেই বেরিয়ে এসেছিল আহমদ মুসা।

লাল কার্পেটে মোড়া লাউঞ্জটা বলতে গেলে ফাঁকাই। গুচ্ছাকারে সাজানো কয়েকটা সোফা সেট রয়েছে মাত্র।

বাইরের লাশগুলো যেভাবে দেখেছে, সেভাবে এ লাশগুলোও ঘুরে ঘুরে দেখে পুলিশ অফিসার মোস্তফা ওকালান বলল, 'এরা যদি সন্ত্রাসী হয়, তাহলে সন্ত্রাসীরা খুন হয়েছে তিন পর্যায়ে। প্রথমে লাউঞ্জে সিঁড়ির গোড়ায়, তারপর লাউঞ্জের এ প্রান্তে করিডোরের মুখে। সর্বশেষে বাইরে গাড়ির কাছে।'

কথাগুলো শেষ করেই পুলিশ অফিসার প্রশ্ন করল ড. আজদাদের দিকে চেয়ে, 'কথিত সন্ত্রাসীরা ড. আজদাকে কিডন্যাপ করার আগে আপনারা কে কোথায় ছিলেন?'

জবাব দিল ড. আজদা। বলল, 'দু'তলায় আমার আব্বা যে মাস্টার বেডে থাকতেন, তার কাছাকাছি ফ্যামেলি গেস্টরুমে ছিলেন আমার ফুপা-ফুপি। আমার ভাইয়ের মাস্টার বেডটায় ছিলেন আমার মামা। আমি ছিলাম আমার মাস্টার বেডে। আর নিচতলার গেস্টরুমে ছিলেন আমাদের মেহমান জনাব আবু আহমদ আব্দুল্লাহ।'

'কথিত সন্ত্রাসীরা আক্রান্ত হয়েছিলেন লাউঞ্জে নামার পর। তারা আক্রান্ত হয়েছিলেন নিচ থেকে। তার মানে আপনাদের মেহমান আবু আহমদ আব্দুল্লাহ ড. আজদাকে রেসকিউ করতে এগিয়েছিলেন। কিন্তু সন্ত্রাসীদের তিন পর্যায়ের যে হত্যাকাণ্ড তা তিনিই কি করেছিলেন?' জিজ্ঞেস করল পুলিশ অফিসার মোস্তফা ওকালান।

সংগে সংগে প্রশ্নের উত্তর এল না কারও কাছ থেকেই। ড. আজদা তাকাল তার মামা, ফুপা ও আহমদ মুসার দিকে।

উত্তর দিল আহমদ মুসা। বলল, 'আপনার অনুমান সত্য অফিসার। সব সন্ত্রাসীকে হত্যা আমিই করেছি।' স্বচ্ছ, সাবলীল কণ্ঠস্বর আহমদ মুসার।

'সন্ত্রাসীরা বোধ হয় আপনাকে দেখেই তাদের হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়েছিল! আর সেই সুযোগে ধীরে-সুস্থে দেখে-শুনে আপনি তাদের হত্যা করেছেন।' বলল পুলিশ অফিসার। তার কণ্ঠে বিদ্রুপের সুর।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'এ বিষয়টা আপনারাই ভালো জানেন। ক্রিমিনালদের ডীল করাই আপনাদের প্রাত্যহিক কাজ।'

মুখটা গম্ভীর হলো পুলিশ অফিসারের। কিন্তু উত্তরে কিছু না বলে উঠে দাঁড়াল পুলিশ অফিসার। বলল দু'জন পুলিশকে লক্ষ্য করে, 'তোমরা এই লাউঞ্জে পাহারায় থাক। সবকিছু যেমন আছে, তেমন থাকবে।'

তারপর তাকাল ড. আজদাদের দিকে। বলল, 'আপনারা কেউ কোথাও যাবেন না। এই ঘরেই অপেক্ষা করবেন। আরারাত রিজিওন ইজডির একজন শীর্ষ পুলিশ অফিসার 'ডাইরেক্টর অব পুলিশ' খাল্লিকান খাচিপ এখনি এসে পড়বেন। গোটা বিষয়টা তিনিই দেখবেন। আমি এর মধ্যে বাইরেটা একটু ঘুরে দেখি।'

বলে পুলিশ অফিসার মোস্তফা ওকালান বেরিয়ে গেলেন।

লাউঞ্জের দু'পাশে দু'জন পুলিশ তাদের হাতের স্টেনগান নিয়ে এ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল।

কয়েকটা সোফায় কাছাকাছি বসে আছে ড. আজদারা।

ড. আজদাদের মুখ বিষণ্ন। তাদের কারও মুখে কোন কথা নেই।

তাদের সকলের মনেই ঘটনার পরিণতি নিয়ে তোলপাড় চলছে।

কিন্তু আহমদ মুসার চোখে-মুখে কোন ভাবান্তর নেই। পুলিশ অফিসার তার উদ্দেশ্যে যে তীর্যক কথাগুলো বলেছে, তাতে বরং মজাই পেয়েছে আহমদ মুসা। কিন্তু আরারাত রিজিওন ইজডির পুলিশ অফিসারের 'খাল্লিকান খাচিপ' নামের এই শেষ অংশ 'খাচিপ' তার মনে একটা ধাক্কা দিয়েছে। 'খাল্লিকান' শব্দ টার্কিশ, কিন্তু 'খাচিপ' শব্দটি যতদূর তার মনে পড়ছে আর্মেনীয়। আহমদ মুসা আর্মেনিয়া থাকার সময় একদিন গিফটশপে সেলসম্যানের কাছে একজনকে 'খাচিপ' চাইতে শুনেছিল। সেলসম্যান তাকে একটি ছোট ক্রস দিয়েছিল। আহমদ মুসা তার আর্মেনীয় সাথীকে জিজ্ঞেস করে জেনেছিল, 'খাচিপ' অর্থ 'ছোট ক্রস'। তবে এই প্রাচীন আর্মেনীয় শব্দ নাকি এখন প্রায় ব্যবহার হয় না বললেই চলে।

কিন্তু প্রাচীন 'খাচিপ' মানে 'ছোট ক্রস' এই শব্দটি এই পুলিশ অফিসারের নামের সাথে কেন? এ শব্দের কি কোন ভিন্ন টার্কিশ অর্থ আছে!

এই ভাবনাতেই বুঁদ হয়ে গিয়েছিল আহমদ মুসা।

বুটের আওয়াজ তুলে মোস্তফা ওকালানসহ কয়েকজন পুলিশ অফিসার ভেতরে প্রবেশ করল, তখনই সম্বিত ফিরে পেল আহমদ মুসা।

ড. আজদারা সবাই পুলিশ অফিসারদের স্বাগত জানাল।

পুলিশ অফিসার মোস্তফা ওকালানের পাশের অপেক্ষাকৃত লম্বা গড়নের ভিন্ন রকমের পুলিশ অফিসারকে দেখে বুঝল, সেই হবে 'ইজডির' রিজিওনের 'ডাইরেক্টর অব পুলিশ' (ডিওপি) খাল্লিকান খাচিপ।

ড. আজদাদের কাছাকাছি হয়েই সেই পুলিশ অফিসার খাল্লিকান খাচিপ ড. আজদাকে লক্ষ্য করে বলল, 'আপনাদের নিয়ে এসব কি হচ্ছে মিস আজদা? আপনারা কুর্দিস্থান ও তুরস্কের বিখ্যাত ও সম্মানিত একটা ফ্যামেলি। এই ফ্যামেলির মুখে আপনারা চুনকালি মেখে দিলেন। আপনার ভাই আতা সালাহ উদ্দিন বারজানি ড্রাগ ব্যবসা করে জেলে গেলেন। আর আপনাকে নিয়ে একের পর এক ভয়াবহ ঘটনা। ভাগ-জোক নিয়ে এসব আপনাদের ইনফাইটিং নয় তো? যারা মারা গেছে, আপনারা যারা বেঁচে আছেন সবাই কি এক দলের? এমন প্রশ্ন উঠছে কারণ ড্রাগ ব্যবসা ব্যাপক হওয়ার আগে এ ধরনের ঘটনা আরিয়াস, ইজডির কেন গোটা তুরস্কেও ঘটেনি।'

ভয় ও বিব্রতকর অবস্থা ড. আজদার। কোন কথাই সে বলতে পারলো না।

ড. আজদার ফুপা কামাল বারকির চোখে প্রতিবাদের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল। বলল সে, 'কিন্তু অফিসার, আমাদের কথা না শুনে, ঘটনা ভালো করে না জেনেই তো আপনি মন্তব্য করছেন।'

অসন্তোষের ভাব ফুটে উঠল ডিওপি খাল্লিকান খাচিপের চোখে-মুখে। বলল, 'আমি শুনে এবং জেনেই কথা বলছি জনাব। আরও বলতে চাই, ড্রাগ সিন্ডিকেটের এই ইনফাইটিং-এ আবু আহমদ আব্দুল্লাহকে হায়ার করে আনা হয়েছে।'

কথা শেষ করেই ডিওপি খাল্লিকান খাচিপ থানার ইনচার্জ মোস্তফা ওকালানকে বলল, 'আপনি সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করে ফেলুন তাড়াতাড়ি।

তাড়াতাড়ি লাশগুলো ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে আমরা এদের সকলকেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে পুলিশ অফিসে নিয়ে যেতে চাই।'

আবার ড. আজদার দিকে ডিওপি খাল্লিকান খাচিপ তাকাল। বলল, 'আপাতত আপনাকে ও আবু আহমদ আব্দুল্লাহকে আমরা গ্রেফতার করছি। জিজ্ঞাসাবাদ ও তদন্তে ড্রাগ ব্যবসায় ও ড্রাগ সিন্ডিকেটে যদি আপনাদের সংশ্লিষ্টতা না থাকে, তাহলে আপনারা সম্মানের সাথে ছাড়া পেয়ে যাবেন।'

উদ্বেগ-আতংকে ফ্যাকাশে হয়ে গেল ড. আজদা ও অন্যদের মুখ।

পুলিশ অফিসারের এমন সরাসরি ও নগ্ন পক্ষপাতিত্বমূলক হস্তক্ষেপে বিস্মিত হলো আহমদ মুসা। বলল ডিওপি খাল্লিকান খাচিপকে লক্ষ্য করে, 'তুরস্কের আইনে কি বাদী ও আসামীকে একসাথে গ্রেফতার করতে হয়? আক্রান্ত ও আক্রমণকারীকে কি একচোখে দেখতে হয়?'

যেন চাবুকের একটা বড় ঘা খেল ডিওপি খাল্লিকান খাচিপ। একটা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে আহমদ মুসার দিকে তীব্র কণ্ঠে তাকিয়ে বলল, 'আপনি যে রিভলভার দিয়ে এদের হত্যা করেছেন, সে রিভলভার কোথায়?'

আহমদ মুসা পকেট থেকে রিভলভার বের করে ডিওপি খাল্লিকান খাচিপকে দেখাল।

ভ্রূকুঞ্চিত হলো ডিওপি খাচিপের। বলল ত্বরিত কণ্ঠে, 'এ রিভলভার আপনি পেলেন কোথায়? পুলিশও এ রিভলভার পায়নি। পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের কয়েকজন শীর্ষ কর্মকর্তা ছাড়া সাধারণের কাছে এটা বিক্রির প্রশ্নই ওঠে না। নিশ্চয়ই লাইসেন্স নেই এ রিভলভারের।'

আহমদ মুসার ঠোঁটে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল। জ্যাকেটের পকেট থেকে একখণ্ড কাগজ বের করে এগিয়ে দিল ডিওপি খাচিপের দিকে।

ডিওপি খাচিপ কাগজটা হাতে নিয়ে চোখ বোলাল। বিস্ময় ফুটে উঠল তার চোখে-মুখে। বলল, 'স্টেট সিকিউরিটি সার্ভিসের হেডকোয়ার্টার থেকে পারমিশন ইস্যু হয়েছে? ওখানে কি আপনার লোকজন আছে? কিংবা কাগজটা নকল নয়তো?'

‘সেরকম মনে করলে সেখানে একটা টেলিফোন করুন না। টেলিফোন নাম্বারটা তো আছেই।’ বলল আহমদ মুসা।

মুখটা চুপসে গেল পুলিশ অফিসারের। তাকাল একবার সে আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘টেলিফোন করার প্রয়োজন নেই। কোন কিছু নিশ্চিত করার পুলিশদের নিজস্ব পদ্ধতি আছে।’

ডিওপি খাল্লিকান খাচিপের কথার মাঝখানেই লোকাল থানা ইনচার্জ মোস্তফা ফিরে এলেন। ডিওপি খাচিপের কথা শেষ হতেই সে বলল, ‘স্যার, সুরতহাল রিপোর্ট কমপ্লিট।’

‘আলামতগুলো সব নেয়া হয়েছে?’ জিজ্ঞাসা ডিওপি খাচিপের।

‘জ্বি, লাশগুলোও সব নেয়া হয়েছে।’ বলল থানা ইনচার্জ মোস্তফা ওকালান।

ডিওপি খাচিপ থানা ইনচার্জ মোস্তফা ওকালানের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে তাকাল ড. আজদাদের দিকে। বলল, ‘তাহলে ড. আজদা ও মি. আবু আহমদ, আপনাদের যেতে হবে আমাদের সাথে।’

‘কোথায়?’ ড. আজদা কিছু বলার আগেই আহমদ মুসা বলল কথাটা।

‘আমার অফিসে খুব বড় ঘটনা এটা। আপনাদের স্টেটমেন্ট নিতে হবে।’

‘আমরা যাব থানায়। মামলা দায়েরের জন্যে। মামলার বিবরণীতে আমাদের সব কথা এসে যাবে। আমাদের স্টেটমেন্ট লাগবে না। এরপরও স্টেটমেন্ট নিতে চাইলে এখানেই নিতে হবে।’

মুহূর্তের জন্যে ভ্রূকুঞ্চিত হলো ডিওপি খাল্লিকান খাচিপের। ভাবনার একটা ছায়াও ফুটে উঠল তার মুখে। বলল, ‘আপনি যা বলছেন সেভাবেও হয়। আমি মনে করেছিলাম, আপনারা গেলে কেস নিয়ে আরও কথা হতো। আর সরকারিভাবেও তো কেস হচ্ছে, আপনাদের কেস করার দরকার আছে কি?’

‘সরকারি কেস এক ধারায়, আমাদের কেস হবে ভিন্ন ধারায়। সরকারি কেসের মূল কথা হবে, কিডন্যাপের চেষ্টা এবং এ চেষ্টা করতে গিয়ে ৭ জন কিডন্যাপার খুন, এ কিডন্যাপের মোটিভ কি, আর এর পেছনে আর কে আছে ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের কেসের মূল বক্তব্য হবে, আমাদের পরিবারের বিরুদ্ধে

ষড়যন্ত্র চলছে। এ পরিবারের ছেলে ড্রাগট্রেডের মিথ্যা অভিযোগে জেলে আছে। বাড়িতে ড্রাগ লুকিয়ে রেখে ড. আজদাকে ফাঁসাতে চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু যে ড্রাগ রাখতে এসেছিল, সে ধরা পড়ে যায়। তাকে থানায় নেয়ার পথে তাকে ষড়যন্ত্রকারীরাই হত্যা করে যাতে তাদের ষড়যন্ত্র ধরা পড়া ছেলেটি ফাঁস করে না দেয়। এরপর ড. আজদা ষড়যন্ত্রকারীদের দ্বারা গত সন্ধ্যায় এবং আজ রাতে আবার আক্রান্ত হয়েছেন। এ ষড়যন্ত্রকারীরা শুধু এ পরিবার নয়, আরিয়াস-আরারাত এক কথায় আরারাত সন্নিহিত গোটা ইজডির প্রদেশের হাজার হাজার পরিবারের বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্র চলছে। হাজারো তরুণকে ড্রাগ ট্রেডার সাজিয়ে জেলে পুরা হয়েছে। শতশত পরিবার বিরান হয়ে গেছে অথবা এই এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে। এই ব্যাপারে এই পরিবার এবং এই এলাকার পক্ষ থেকে সরকারের আশু তদন্ত ও আইনি প্রতিকার চাওয়া হবে।' থামল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার এই কথাগুলো বিস্ময়কর কোন কাহিনী ডিজক্লোস করার মত সকলের মনে তড়িৎ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল।

ডিওপি খাল্লিকান খাচিপের চোখ-মুখ যেন অনেকটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। উদ্বেগের চিহ্নও আছে তার মধ্যে। আর থানা ইনচার্জ মোস্তফা ওকালানের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে। অন্যদিকে ড. আজদার মামা ও ফুপাদের চোখে বিস্ময় ও কৌতুহল। কিন্তু অপার বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেছে ড. আজদা। সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না, তার, তার পরিবার ও তার অঞ্চলের একথাগুলো আবু আহমদ লোকটি জানল কি করে! শুধু জানা নয়, সে কথাগুলো মামলা দায়েরের ভাষায় এমনভাবে সাজিয়ে বলল, যা সে নিজেও কখনো কল্পনা করেনি। এ ধরনের কেস যে এই সময় করা যায়, সেটাও তার মাথায় নেই। কিন্তু লোকটির মাথায় এল কি করে! কে এই লোক? ড. আজদা আহমদ মুসাকে যতই দেখছে ততই যেন দেখার আগ্রহ বাড়ছে। কে এই বিস্ময়কর লোকটি?

ডিওপি খাচিপ দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়েছিল। বলল, 'আপনি এসব কি বলছেন? এ ধরনের অভিযোগ কখনও কেউ আমাদের কাছে করেনি।'

'এবার অভিযোগ পাবেন।' বলল আহমদ মুসা।

এবার হাসল ডিওপি খাচিপ। পুরোপুরিই নিজেকে সামলে নিয়েছে সে। বলল, 'ভালো! কেস দায়ের করুন। আপনার ভাষা শুনে মনে হচ্ছে, আপনি তুর্কি নন। আপনি রিভলভারের লাইসেন্স কিভাবে পেয়েছেন আমি জানি না। আপনি কিভাবে এদেশে আছেন সেটাও জানি না। আমি দেখব এসব। কিন্তু বেশি ঝামেলা করলে আপনিও বিপদে পড়বেন।'

বলে উঠে দাঁড়াল ডিওপি খাল্লিকান খাচিপ। থানা ইনচার্জ মোস্তফা ওকালানকে বলল, 'চল, এখানকার কাজ শেষ।'

কথা শেষ করেই হাঁটতে শুরু করল খাচিপ।

থানা ইনচার্জ ওকালান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা শুনছিল। সেও যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াবার সময় ড. আজদাকে বলল, 'আপনারা এখন আসতে পারেন।'

ড. আজদা তাকাল আহমদ মুসার দিকে সিদ্ধান্তের জন্যে।

'চলুন।' আহমদ মুসা বলল। আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

উঠে দাঁড়াল ড. আজদাও।

ড. আজদার মামা-ফুপারাও উঠে দাঁড়িয়েছে।

'মামা, ফুপা-ফুপি, আপনারা এ দিকটা দেখুন। আমরা থানা থেকে আসছি।'

ড. আজদার মামা, ফুপুরা ড. আজদার কথায় সায় দিল।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল আহমদ মুসা ও ড. আজদারা পুলিশের সাথে।

নাস্তার পর একটু রেস্ট নিয়ে ফ্রেশ হয়ে আহমদ মুসা এল লাউঞ্জে।

ড. আজদা, তার মামা ও তার ফুপা-ফুপুরা আগেই এসে বসেছিল লাউঞ্জে।

কথা বলছিল তারা আহমদ মুসা মানে তাদের মেহমান আবু আহমদ আব্দুল্লাহকে নিয়ে।

ড. আজদার ফুপা কামাল বারকি ড. আজদাকে লক্ষ্য করে শুরুতেই বলেছিল, 'লোকটি আসলে কে আজদা? আমি আমার জীবনে এমন বিস্ময়কর মানুষ দেখিনি। শুধু অস্ত্রের যুদ্ধে অবিশ্বাস্যভাবে শত্রুকে পরাজিত করাই নয়, কথার যুদ্ধে প্রদেশের শীর্ষ পুলিশ অফিসারকে যেভাবে পরাজিত করেছে, আমাদের মামলার বিষয়টাকে সে যেভাবে সাজাল তা বিস্ময়কর। আগন্তুক বলে মনেই হলো না। যেন সেই এ বাড়ির কর্তা, সব জানে সে। এটা কি করে সম্ভব!'

কামাল বারকি থামতেই কথা বলে উঠেছিল ড. সাহাব নুরী। সে বলে, 'উনি না থাকলে আজ কি ঘটত, তা ভাবতেও বুক কাঁপছে। আর উনি বুদ্ধি দিয়ে পুলিশ অফিসারকে কোণঠাসা করতে না পারলে আজদাকে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে যেতে হতো এবং নানা নাজেহালের শিকার হতে হতো।'

ড. আজদা ভাবছিল। তার চোখে-মুখে বিস্ময়। এ ধরনের মানুষের কথা কল্পনাই করা যায়, বাস্তবে দেখবে, এমন আশাও কেউ করে না। কিন্তু আশাতীত ঘটনা, আর আশাতীত মানুষকেই সে দেখছে। সত্যি কে এই লোক? কোত্থেকে হঠাৎ তার বিপদের সময় হাজির হলো?

ড. সাহাব নুরীর কথা শেষ হয়ে গিয়েছিল। তারপর কথা বলেছিল ড. আজদা। বলেছিল সে, 'মামাজি, ফুপাজি, উনি কে আমিও জানি না এখনো। আসলেই উনি একজন বিস্ময়কর মানুষ। গত সন্ধ্যার সব কথা তো আপনাদের বলা হয়নি। উনি উপস্থিত না থাকলে, উনি ব্যাপারটাকে ট্যাকল না করলে আমাকে খুনের কেসে জড়াতে হতো। ইন্সপেক্টর রশিদ দারাগ সন্ত্রাসীদের পক্ষ হয়ে মিথ্যা কাহিনী তৈরি করেছিল, যাতে আমি খুনের আসামী হয়ে যাই। পুলিশের মিথ্যা কাহিনীর মোকাবিলায় আবু আহমদ আব্দুল্লাহ সাহেবও আমাকে বাঁচানোর জন্যে একটা কাহিনী তৈরি করেছিলেন এবং ইন্সপেক্টর রশিদ দারাগকে বলেছিলেন, যদি এ কাহিনী রশিদ দারাগ মেনে না নেয়, তাহলে পুলিশ রশিদ দারাগকে মেরে ফেলে প্রমাণ করবেন, সন্ত্রাসীদের গুলিতে ইন্সপেক্টর দারাগ নিহত হবার পর তিনি ঐ চারজন সন্ত্রাসীকে মেরেছেন রশিদ দারাগের রিভলভার দিয়ে। ইন্সপেক্টর রশিদ দারাগ আবু আহমদ সাহেবকে গুলি করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার আগেই

আবু আহমদ আব্দুল্লাহ পুলিশ অফিসারের কাঁধে গুলি করে এবং বলে যে, আমি আপনাকে বুকে গুলি করে মেরে ফেলতে পারতাম, কিন্তু মারিনি। আশা করি সত্যটা মেনে নেবেন। না হলে মারার সিদ্ধান্ত এখনও নিতে পারি। বলে রিভলভার তুলেছিল পুলিশ অফিসারকে লক্ষ্য করে। অবাক ব্যাপার, হঠাৎ যেন পুলিশ অফিসার মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে! তখন কি ভেবে পুলিশ অফিসার আমাদের সহযোগিতা করেন। সেজন্যে আমি বেঁচে যাই।'

ড. আজদার মামা ও ফুপা-ফুপিরা নির্বাক হয়ে গিয়েছিল ড. আজদার কাহিনী শুনে। ভাবছিল, লোকটি কি অদ্ভুত! তার কি কোন অলৌকিক ক্ষমতা আছে? মামা ড. সাহাব নুরী বলেছিল অবশেষে, 'পুলিশ অফিসার খাল্লিকান খাচিপকে আবু আহমদ সাহেব তার রিভলভারের যে লাইসেন্স দেখিয়েছিলেন, তা ইস্যু হয়েছে স্টেট সিকিউরিটির হেড অফিস থেকে। হেড অফিস থেকে এ ধরনের যে লাইসেন্স ইস্যু হয়, তা বিশেষ ধরনের এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে ইস্যু করা হয়। কিন্তু এই আবু আহমদ কে যে, তার জন্যে এটা করা হলো!'

কিছু বলতে যাচ্ছিল ড. আজদা। দেখতে পেল, আবু আহমদ আব্দুল্লাহ লাউঞ্জে প্রবেশ করছে। থেমে গেল ড. আজদা। উঠে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানাল আহমদ মুসাকে। সামনে সোফা দেখিয়ে বলল, 'বসুন স্যার। আমরা আপনার অপেক্ষা করছি।'

সবাইকে সালাম দিয়ে সোফায় বসল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা বসতেই ড. আজদার ফুপা কামাল বারকি বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, 'আমরা কৃতজ্ঞ জনাব আবু আব্দুল্লাহ। আমাদের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। আজদাকে আজ যে দেখা যাচ্ছে, সেটা আপনার কারণেই।'

'এটা কি আমাকে বিদায় দেয়ার অনুষ্ঠান? বিদায় দেয়ার সময় এভাবে মানুষ কৃতজ্ঞতা জানায়।' বলল আহমদ মুসা। তার মুখে হাসি।

আহমদ মুসার কথা শেষ হবার আগেই ড. আজদা ছুটে গিয়ে দু'হাত জোড় করে আহমদ মুসার পায়ের কাছে কার্পেটের ওপর বসল। বলল, 'আমাদের

ভুল বুঝবেন না স্যার। আমাদের কথার অর্থ ওটা নয়, প্লিজ। আমার এবং আমার পরিবারের যিনি ত্রাতা, তার সম্পর্কে কি কেউ এমন করে ভাবতে পারে?'

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'স্যরি ড. আজদা। আমার কথাটাকে সিরিয়াসলি নিয়েছেন আপনি। আমি একটু রসিকতা করছিলাম।'

ড. আজদা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'স্যার, রসিকতা যেটা বলেছেন, সেটার ভারও বহন করার সাধ্য আমাদের হৃদয়ে নেই।'

'স্যরি ড. আজদা।' বলল আহমদ মুসা।

'মাফ করবেন স্যার।' বলে ড. আজদা উঠে গিয়ে তার আসনে বসল।

আহমদ মুসা ড. আজদার ফুপা কামাল বারকিকে লক্ষ্য করে বলল, 'জনাব, কৃতজ্ঞতা আমাকে নয়, কৃতজ্ঞতা জানানো দরকার আল্লাহকে। আমি আপনাদের এই আরিয়াসকে চিনি না, এখানে আমার স্বজনও নেই, এখানে আমার নিজের কোন প্রয়োজনও ছিল না, তাহলে আমি এখানে এলাম কেন? কিভাবে এলাম? এর জবাব আমার কাছে একটাই, সেটা হলো, আল্লাহ আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন। তারপর গত সন্ধ্যা থেকে আজ পর্যন্ত এখানে যা ঘটল, তা আমার কোন পরিকল্পনার অংশ নয়। গত সন্ধ্যা এবং রাতের দু'ঘটনায় আমি যা করেছি, তা আমার ইচ্ছায় হয়নি। আমাকে দিয়ে তা করানো হয়েছে। করিয়েছেন আল্লাহ। আমি মহান আল্লাহর একটা হাতিয়ার মাত্র। সুতরাং কৃতজ্ঞতা আপনাদের মহান আল্লাহকেই জানানো দরকার। তিনিই আমাকে এনেছেন, আমাকে দিয়ে এসব করিয়ে নেয়ার জন্যেই। তিনিই আপনাদেরকে আমার নতুন স্বজন বানিয়েছেন। হৃদয়ের সব কৃতজ্ঞতা তার দিকেই ধাবিত হওয়া দরকার।' থামল আহমদ মুসা।

কারও কাছ থেকে কোন কথা এল না।

ড. আজদা, তার মামা ড. সাহাব নুরী, তার ফুপা কামাল বারকি এবং ফুপি লায়লা কামাল সবাই নীরব। তাদের চোখে-মুখে বিস্ময় ও আবেগের একটা স্ফূরণ। হঠাৎ করেই তাদের মুখের ভাব, চোখের দৃষ্টি যেন গলিত মোমের মত অনেকটা নরম হয়ে গেছে। কারও কারও চোখে সেই দৃষ্টিতে একটা অপ্রস্তুতের ভাবও।

আহমদ মুসার কথাগুলোতেও একটা আবেগ ছিল। কথার শেষের দিকে তার কণ্ঠও ভারি হয়ে উঠেছিল।

অস্বস্তিকর নীরবতা ভাঙল ড. আজদার ফুপি লায়লা কামাল।

লায়লা কামালের বয়স ষাটোর্ধ্ব হবে। এই বয়সেও তার মেদহীন একহারা চেহারা। বোঝাই যায়, নিয়মিত উনি ব্যায়াম করেন এবং সম্ভবত ডায়েট কন্ট্রোলও করেন। চোখে তার দামী চশমা। নিয়মিত প্রসাধন ব্যবহার করেন, মুখ দেখলেই তা বোঝা যায়। পরনে আধুনিক পোশাক। ড. আজদার পরনে সালোয়ার কামিজসহ মাথায়-বুকে ওড়না থাকলেও মিসেস লায়লা পরেছেন ট্রাউজার ও শার্ট।

লায়লা কামালই নীরবতা ভাঙল। বলল, ‘বেটা, তুমি আমাদের স্বজন বলেছ, আমরা তোমাকে পর ভাবতে পারি না। তুমি শুধু অসম সাহসী এবং সব দিক থেকে যোগ্যতাসম্পন্নই নও, বেটা তুমি খুব ভালো ছেলেও। কিন্তু বেটা, তুমি যাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে বলেছ, তিনি তো আমাদের জীবনে নেই। আজদার বাবা মা’র মত আমরাও কমিউনিস্ট পার্টি করতাম। কমিউনিস্ট পার্টি এখন আমরা ঐভাবে না করলেও সেই আদর্শে বিশ্বাস করি। যে নেই, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাব কি করে?’

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘স্রষ্টা আপনার, বা আপনাদের জীবনে নেই বলেছেন। কিন্তু কোথাও নেই-এ কথা বলেননি। আসলে স্রষ্টা আছেন।’

‘আছেন স্রষ্টা, এ কথা আপনি বলছেন কি করে?’

‘আমি বলছি না, মানুষ, মানুষের ইতিহাস এ কথা বলছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কিভাবে?’ জিজ্ঞাসা ড. আজদার ফুপি লায়লা কামালের।

‘মানুষের জীবনের শুরু আছে এবং শেষও আছে। তাই মানুষ সৃষ্ট। সৃষ্ট বলে তার স্রষ্টাও আছে। আর একটা কথা, মানুষও তার জন্যে অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস সৃষ্টি করে। এগুলোর মধ্যে কোনটিই মানুষের জন্যে আপনা-আপনি সৃষ্টি হচ্ছে না।’ আহমদ মুসা বলল।

'মানুষ যেসব জিনিস তৈরি করে, সেক্ষেত্রে না হোক, প্রাকৃতিক জগতে তো সবকিছুই আপনা-আপনি সৃষ্টি হচ্ছে, কাউকেই তো সৃষ্টি করতে দেখা যাচ্ছে না।'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট সব জীবন ও বস্তুর মধ্যে সৃষ্টিগত ঐকতান আছে। এক আইন, একই দর্শন রয়েছে সব সৃষ্ট বস্তু ও জীব-জীবনের মূলে। এর অর্থ, এসব কোন কিছুই আপনা-আপনি সৃষ্টি নয়, একক এক স্রষ্টার সজ্ঞান পরিকল্পনা ও আইন কাজ করছে সৃষ্টি জগতের মূলে। আপনা-আপনি সৃষ্টি হলে সব বস্তু ও জীবের সৃষ্টিগত দর্শন ও আইন এক রকম হতো না। হতো ভিন্ন ভিন্ন।' আহমদ মুসা থামল।

কিন্তু অনেকক্ষণ কোন কথা বলল না লায়লা কামাল। গভীর একটা ভাবনার প্রকাশ তার চোখে-মুখে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'কিন্তু স্রষ্টা নিজেকে আড়ালে রাখার কারণ কি? বিভ্রান্তি তো এখানেই।'

'স্রষ্টা নিজেকে আড়ালে রাখেননি। আমরা তাঁকে দেখতে পাই না মাত্র। এটা আমাদের সৃষ্টিগত সীমাবদ্ধতা। যেমন, আপনি আপনার প্রয়োজনে রোবট তৈরি করলেন। রোবটটি আপনি যেমন চান সেভাবে কাজ করবে। কিন্তু তার চোখ আপনাকে দেখবে না, জানবে না এবং বুঝবে না যে, কে তার স্রষ্টা। এটা রোবটের সৃষ্টিগত সীমাবদ্ধতা।' আহমদ মুসা বলল।

সূক্ষ্ম এক টুকরো হাসি ফুটে উঠেছে লায়লা কামালের মুখে। বলল, 'আমরা রোবটকে বানাই নির্দিষ্ট কাজের জন্যে। কিন্তু আমাদের কাছে স্রষ্টা কি চান?'

'রোবটের স্রষ্টা হিসেবে মানুষ এবং মানুষের 'স্রষ্টা'র মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। মানুষ রোবট সৃষ্টি করে তার প্রয়োজনে কিছু নির্দিষ্ট কাজ করার জন্যে। কিন্তু মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ অভাবশূন্য, প্রয়োজনশূন্য। তিনি কোন কিছুরই মুখাপেক্ষী নন। মানুষের কোন কাজের দ্বারা উপকৃত হবার জন্যে তিনি মানুষ সৃষ্টি করেননি। বরং বিশ্বজগতের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন তিনি মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্যে। সূর্যের আলো মানুষ ও জীবজগতের জন্যে প্রয়োজন। সূর্য ও পৃথিবীর পারস্পরিক আকর্ষণের ভারসাম্য পৃথিবীর কক্ষপথের স্থিতির জন্যে

অপরিহার্য। চাঁদের আলো মানুষ, জীব ও উদ্ভিজ্জের জন্যে দরকারী। এইভাবে পৃথিবীর আলো, বাতাস, জীব-উদ্ভিজ্জ, পাহাড়, নদী, সমুদ্র সবকিছুই মানুষকে তার জীবনধারণে সাহায্য করছে। রোবটের স্রষ্টা মানুষ এবং মানুষের স্রষ্টা আল্লাহর মধ্যে এটাই পার্থক্য। মানুষ স্বার্থপর, তাই তার সৃষ্ট রোবটের কাছ থেকে স্বার্থ আদায় করে, কিন্তু মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ মানুষের কাছে কোন উপকার চান না, নেন না। আর সে প্রয়োজনও মানুষের স্রষ্টার নেই।'

ড. আজদা, তার মামা ড. সাহাব নুরী এবং ফুপা কামাল বারকি আহমদ মুসার কথাগুলো যেন গোগ্রাসে গিলছে। তাদের চোখে-মুখে বিস্ময়-বিমুগ্ধতা।

আর ড. আজদার ফুপি লায়লা কামালের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

আহমদ মুসা থামতেই সে বলে উঠল, 'তাহলে স্রষ্টা কষ্ট করে মানুষকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য কি? কোন কাজে না লাগলে, কোন স্বার্থ পূরণ না হলে তিনি মানুষ সৃষ্টি করবেন কেন? করেছেন কেন?'

'ধন্যবাদ। আপনার এ প্রশ্নটি চিরন্তনী একটা প্রশ্ন। এ প্রশ্নের জবাব স্বয়ং স্রষ্টা আল্লাহ আল-কুরআনের বহু জায়গায় অনেকভাবে দিয়েছেন। তার একটি হলো: তিনি বলেছেন, 'আমি জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছি দেখার জন্যে যে, কে ভালো কাজ করে।' অর্থাৎ আল্লাহ চান যে, মানুষ মন্দ কাজ না করে ভালো কাজ করুক। মানুষ কি করে এটাই তিনি দেখতে চান। মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য তাঁর এটাই।'

ড. আজদার ফুপু লায়লা কামালের মুখে সূক্ষ্ম এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'অর্থাৎ তিনি মানুষকে পরীক্ষা করতে চান। তোমার কথায়, তিনি চান মানুষ ভালো কাজ করুক। তুমি নিশ্চয় আরও বলবে যে, ধর্ম মানে আল-কুরআন যে ভালো কাজ করার নির্দেশ দিয়েছে, তা-ই। আর মানুষকে সে কাজ করতে হবে। কুরআন তো মুসলমানদের। কিন্তু আমরা আলোচনা করছি গোটা মানবজাতি নিয়ে। ভালো কাজের পরীক্ষা আল্লাহ তাদের কাছ থেকে কিভাবে নেবেন, যারা কুরআন দেখেনি বা চেনে না কিংবা একে গ্রহণ করার সুযোগ পায়নি? স্রষ্টার পক্ষের 'পরীক্ষা'র যে ইউনিভার্সেল তত্ত্বের কথা তুমি বললে, তার

মধ্যে তো এরা পড়ে না। যাদের পরীক্ষা করা হবে, তারা তো পরীক্ষার বিষয় মানে কোনটাকে 'ভালো' বলা হয়েছে, আর 'মন্দ'ই বা কি কি, তা তাদের জানা দরকার।'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'এ প্রশ্ন বা এ অজুহাত যাতে কোন মানুষের পক্ষ থেকেই উঠতে না পারে, তার জন্যে ব্যবস্থা কিন্তু স্রষ্টা আল্লাহ মানুষ সৃষ্টির সাথে সাথেই করে দিয়েছেন। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আল্লাহ স্বভাবজাত একটা সাধারণ নীতিবোধ দিয়েছেন, সে নীতিবোধ থেকে সভ্যতা বা লোকালয় থেকে অনেক দূরে গহীন কোন জংগলে জন্মগ্রহণকারী এবং জঙ্গলেই বেড়ে উঠা একজন মানুষও বলতে পারে, মানুষকে 'সাহায্য করা' ভালো কাজ, 'চুরি করা' মন্দ কাজ। বলতে পারে, মানুষকে 'ভালোবাসা' ভালো কাজ, 'গালি দেয়া' মন্দ কাজ। বলতে পারে, পিতা-মাতাকে 'মান্য করা, সম্মান করা' ভালো কাজ, 'অবাধ্য হওয়া' মন্দ কাজ। বলতে পারে, একজন পথহারাকে 'পথ দেখানো' ভালো কাজ, তার অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে তার 'ক্ষতি করা' মন্দ কাজ। এভাবে মানুষের মধ্যে স্রষ্টার দেয়া 'নীতিবোধ' থেকে মানুষের মধ্যে স্বভাবজাতভাবেই 'ভালো' ও 'মন্দ'-এর দীর্ঘ তালিকা তৈরি হয়ে থাকে। এর ভিত্তিতেও স্রষ্টা আল্লাহ মানুষের পরীক্ষা নেবেন যে, মানুষ মন্দ হতে দূরে থেকে কতটা ভালো কাজ করে।' থামল আহমদ মুসা।

ড. আজদার ফুপি লায়লা কামালের চোখে-মুখে একটা ঔজ্জ্বল্য ফুটে উঠেছে। তার চোখের একটা মুগ্ধ দৃষ্টিও আহমদ মুসার প্রতি নিবদ্ধ। কিন্তু পরক্ষণেই তার ঠোঁটে একটা রহস্যপূর্ণ হাসি দেখা গেল। বলল সে, 'ধন্যবাদ বেটা! তুমি একটা কঠিন প্রশ্নের একটা সুন্দর ও সহজ উত্তর দিয়েছ। কিন্তু উত্তর হিসেবে যে বিষয়টা বলেছ, তা অত্যন্ত ভারি। এর মধ্য দিয়ে একটা চিরন্তন দর্শন সামনে এসেছে। কিন্তু বেটা, এ দর্শন প্রমাণ করছে, 'ভালো' বা 'মন্দ' বেছে নেয়ার দায়িত্ব মানুষের স্বভাবজাত এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাহলে নবী-রাসূল ও ধর্মগ্রন্থের কোন প্রয়োজন নেই। তুমি কিন্তু তোমার নিজের ফাঁদেই নিজে পড়ে গেছ বেটা।' বলেই হেসে উঠল লায়লা কামাল।

একটু উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল আহমদ মুসা। বলল, ‘ভালো ও মন্দ বেছে নেয়ার ক্ষমতা মানুষের স্বভাবজাত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও নবী-রাসূল অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েন না। এর সহজ একটা দৃষ্টান্ত হলো, জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক সব দিক দিয়েই প্রতিটি মানুষ তাত্ত্বিকভাবে স্বশাসিত হতে পারে, কিন্তু বাস্তবে সমাজ শৃঙ্খলা, সমাজ পরিচালনা, জাতি ও দেশের সামষ্টিক রক্ষার প্রয়োজনে সরকার ও শাসকের প্রয়োজন। কারণ, সমাজ ও জাতি দেহে বিপর্যয়, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং তার মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক পর্যায়ে ধ্বংস ডেকে আনার শক্তি সমাজে প্রবল। সরকার ও শাসক এই শক্তির প্রতিরোধ করে। অনুরূপভাবে, মানুষের ‘নীতিবোধ’-এর বিপরীতে মানুষের মধ্যে রয়েছে দুর্নীতি প্রবণতার প্রবল শক্তি। প্রতিটি মানুষের এই ‘নীতিবোধ’ ও তার দুর্নীতি প্রবণতার মধ্যে বিরামহীন সংগ্রাম চলছে। যেহেতু ‘নীতিবোধ’-এর চাইতে ‘দুর্নীতি প্রবণতা’র মধ্যে মানুষের লাভ ও লোভ-লিপ্সা চরিতার্থের সীমাহীন সুযোগ রয়েছে, তাই দুর্নীতির প্রতি মানুষের আকর্ষণ বেশি হয়। ফলে মানুষকে যে পরীক্ষার জন্যে আল্লাহ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন, সে পরীক্ষায় অধিকাংশের ফেইল করার সম্ভাবনাই বেশি থাকে। এ কথা যে ঠিক, মানুষের ইতিহাস তার সাক্ষী। স্রষ্টার পরীক্ষায় মানুষের ফেইল করার অর্থ, দুনিয়ার জীবনে অশান্তি, বিপর্যয় এবং আখেরাতের জীবনে এর পরিণতি হিসেবে সীমাহীন শাস্তি। মানুষ এই ধ্বংস ও বিপর্যয়ের পথে যাতে না যায়, এজন্যে দয়াময় আল্লাহ মানুষের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে মানুষকে সাহায্য করার জন্যে যুগে যুগে নবী–রাসূল পাঠান সতর্ককারী হিসেবে, ‘নীতিবোধ’-এর প্রতি আহ্বানকারী হিসেবে। তাদের মাধ্যমে পাঠানো হয়, ‘ভালো’র দিকে আহ্বান ও ‘মন্দ’র প্রতি নিষেধের সুস্পষ্ট নীতিমালা, যাকে প্রচলিত ভাষায় আমরা বলি ধর্মগ্রন্থ, যেমন আল-কুরআন। সুতরাং মানুষের স্বভাবজাত নীতিবোধ যতটা জরুরি, ততটাই জরুরি নবী-রাসূলদের আগমন ও ধর্মগ্রন্থের উপস্থিতি। মানুষর স্বভাবজাত নীতিবোধের সাথে তার স্বভাবজাত (শয়তান পরিচালিত) দুর্নীতি প্রবণতার চিরন্তন লড়াইয়ে মানুষের বিজয় অর্জনের হাতিয়ারই হলো নবী-রাসূল এবং তাদের মাধ্যমে আসা ধর্মগ্রন্থ। সুতরাং, নবী-রাসূল ও তাদের মাধ্যমে আসা ধর্মগ্রন্থ অপ্রয়োজনীয় নয়, বরং দুর্নীতিজাত ইহকালীন ধ্বংস-বিপর্যয় ও

পরকালীন সীমাহীন শাস্তি থেকে বাঁচার জন্যে, স্বভাবজাত নীতিবোধকে বিজয়ী করার জন্যে এবং স্রষ্টার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্যে নবী-রাসূল ও তাদের মাধ্যমে আসা ধর্মগ্রন্থ মানুষের জন্যে অপরিহার্য।'

হাসি ও বিস্ময়-বিমুগ্ধতায় ভরে গিয়েছিল লায়লা কামালের চোখ-মুখ।

ড. আজদা ও তার মামা ড. সাহাব নুরী ও ফুপা কামাল বারকির চোখে-মুখেও অপার বিস্ময়-বিমুগ্ধতা।

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই লায়লা কামাল উঠে দাঁড়াল। কোমর বাঁকিয়ে মাথা নুইয়ে আহমদ মুসাকে ইউরোপীয় ঢংয়ে বাউ করে বলল, 'বেটা, তুমি আমার সন্তানতুল্য। কিন্তু তুমি কাজ করেছ আমার গুরুর মতো। এভাবে 'বাউ' করা ছাড়া তোমাকে শ্রদ্ধা জানানোর এই মুহূর্তে আর কিছু আমি পেলাম না। তুমি আমার হৃদয় নিংড়ানো শ্রদ্ধা গ্রহণ করো বাছা। আমি তোমার প্রতিটি কথা গ্রহণ করলাম। সেই সাথে মাফ চাইছি আমি স্রষ্টা আল্লাহর কাছে। আমি তাঁকে, তাঁর রাসূল(সাঃ)-কে, তাঁর বাণী(কুরআন)-কে চিনতে পেরেছি।' লায়লা কামালের শেষ কথাগুলো আবেগ-ভরা কান্নায় ভেঙে পড়ল।

রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বসে পড়ল লায়লা কামাল।

'উনি যা বলেছেন, সেটা আমারও কথা। বিস্ময়কর আপনি! অল্প কথায় অদ্ভুতভাবে আমার চোখ খুলে দিয়েছেন। ভাবনার এদিকটা কোনদিন কল্পনাও করিনি। আপনি আমার শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন।' প্রায় একসাথেই বলে উঠল ড. আজদার ফুপা কামাল বারকি ও মামা ড. সাহাব নুরী।

অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল ড. আজদার দু'চোখ থেকে। তার আনন্দ যে, তার পরিবারে যে পরিবর্তন সে চাচ্ছিল, সে পরিবর্তন যেন আকস্মিকভাবেই ঘটে গেল। আজ যদি তার আব্বা-আম্মা এখানে উপস্থিত থাকতেন! আহমদ মুসার প্রতি শ্রদ্ধায় নুয়ে পড়ল তার সমগ্র হৃদয়। অপরূপ এই মানুষ! বন্দুক হাতে যেমন অতুলনীয়, শান্তির বার্তাতেও তেমনি অভাবনীয় এক কুশলী মানুষ। আল্লাহর প্রতি সেজদায় অবনত হতে চাইল তার মাথা। আল্লাহ কোত্থেকে আনলেন অপরূপ সুন্দর, অসীম সাহসী, অকল্পনীয় কুশলী এই মানুষটিকে!

গম্ভীর হয়ে উঠেছিল আহমদ মুসার মুখ। ড. সাহাব নুরী ও কামাল বারকির কথা শেষ হলে আহমদ মুসা বলল, ‘আমি আবারও বলছি, আপনার সব কৃতজ্ঞতা, সব প্রশংসা আল্লাহর প্রতি হওয়া উচিত। তাঁর এবং রাসূল(সাঃ) –এর শেখানো কথারই কয়েকটা বলেছি মাত্র। মহান আল্লাহ আপনাদের কবুল করুন।’

বলেই আহমদ মুসা তাকাল ড. আজদার দিকে। বলল, ‘আপনার চোখের অশ্রু মুছে ফেলুন ড. আজদা। আপনি কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে। আপনার চোখে থাকতে হবে অশ্রুর বদলে সংগ্রাম ও শক্তির আগুন।’

‘জনাব, এ অশ্রু আনন্দের, যা পাওয়ার কথা কল্পনা করতে পারিনি তা পাওয়ার এই অশ্রু। আপনি শুধু আমার জীবন বাঁচিয়েছেন তা-ই নয়, আমার পরিবারকেও আপনি নতুন জীবন দিলেন। আলহামদুলিল্লাহ।’ বলল ড. আজদা।

ড. আজদা থামতেই তার ফুপু লায়লা কামাল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, ‘তোমাকে একটা কথা বলব বেটা।’

‘বলুন’। বলল আহমদ মুসা।

‘তোমার সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না বাছা। খুব জানতে ইচ্ছে করছে তোমার পরিচয়। তুমি আমাদেরকে বিমুগ্ধ, বিস্মিত ও চমৎকৃত করেছ।’

‘আমার সম্পর্কে কি বলব! আমি দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই। মদিনা শরীফে আমার একটা ঠিকানা আছে। সেখানে আমার স্ত্রী ও একটি ছেলে আছে। স্ত্রী ও ছেলে নিয়ে আমি ইস্তাম্বুলে গিয়েছিলাম একটা কাজে। কাজ শেষে ইস্তাম্বুল থেকে আংকারা হয়ে এখানে এসেছি। তুরস্কের একটা বিশেষ বিমান ভ্যান এয়ারপোর্টে আমাকে নামিয়ে দিয়ে আমার স্ত্রীকে নিয়ে মদিনা শরীফে গেছে। আমি এসে...।’

আহমদ মুসার কথার মধ্যেই কামাল বারকি বলে উঠল, ‘কিন্তু বিশেষ বিমান কিভাবে পেলেন? কে দিল?’

আহমদ মুসা একটু বিব্রত হলো। কথাটা হঠাৎ বেরিয়ে গেছে। একটু ভাবল আহমদ মুসা। মিথ্যা বলে কি লাভ! বলল সে, ‘আপনাদের প্রেসিডেন্টের নির্দেশে বিমানটি পেয়েছিলাম।’

কামাল বারকি, ড. সাহাব নুরী, লায়লা কামাল, ড. আজদা সবাই চমকে উঠে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। তাদের চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত, আমাদের প্রেসিডেন্ট তাকে বিশেষ বিমান দিয়েছেন! বলল লায়লা কামাল, 'বুঝতে পারছি না, প্রেসিডেন্ট বিশেষ বিমান কেন দিলেন তোমাকে? কে তাহলে তুমি, সেটাই আমাদের প্রশ্ন।'

'আমার অনুরোধ আপনাদের সবাইকে, এ ধরনের কোন প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না এখন। আমি যাবার সময় সব প্রশ্নের উত্তর আপনাদের দিয়ে যাব। প্লিজ, আমাকে আপনারা সহযোগিতা করুন।'

বলে আহমদ মুসা একটু থেমেই আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল। কামাল বারকি বলল, 'ঠিক আছে, আপনি যা ভালো মনে করেন, সেটাই হবে। আপনি যেন কি বলতে যাচ্ছিলেন, বলুন।'

কামাল বারকির কথা শেষ হতেই ড. আজদা বলে উঠল, 'অন্য সব কথা থাক, একটা বিষয় তো বলা যায়। স্যার, আপনি ভ্যান বিমানবন্দরে নামলেন কেন? কেনই বা অখ্যাত আরিয়াসে এলেন? আর এসেই জড়িয়ে পড়লেন আমাদের ঘটনায়। সবচেয়ে বড় কথা হলো, দেখা যাচ্ছে, আপনি এখানকার ভেতরের পরিস্থিতির অনেক কিছুই জানেন। গোটা বিষয় কি কাকতালীয়, না এর কোন ব্যাখ্যা আছে?'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'হ্যাঁ, আমি এই কথাই বলতে যাচ্ছিলাম।'

এইটুকু বলে একটু থামল আহমদ মুসা। একটা গাম্ভীর্য তার চোখে-মুখে। বলল, ধীর কণ্ঠে, 'ড. আজদা আয়েশা, আমি আপনার আহ্বানেই এখানে এসেছি। আপনার...।'

আহমদ মুসার কথার মাঝখানেই ড. আজদার মামা ড. সাহাব নুরী বলল, 'আজদার আহ্বানে!'

অন্য সবার চোখে-মুখেও বিস্ময়।

বিস্ময়ে 'হাঁ' হয়ে গেল আজদার মুখ। বলল সে, 'স্যার, আমার আহ্বানে আপনি এসেছেন! কিন্তু গতকাল সন্ধ্যার আগে তো আমি আপনাকে চিনতাম না! আর কোন আহ্বানই তো আমি কাউকে জানাইনি!'

আহমদ মুসা হাসল। জ্যাকেটের পকেট থেকে ভাঁজ করা কাগজ ড. আজদার দিকে বাড়িয়ে ধরল।

বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে ড. আজদা হাত বাড়িয়ে কাগজটি নিল। খুলল কাগজের ভাঁজ। শুরু করল পড়া।

কয়েক লাইন পড়েই চোখ তুলল ড. আজদা আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'স্যার, আমার ওয়েবসাইটে দেয়া আমার একটা আপীল এটা। আমার ওয়েবসাইটে পেয়েছেন?'

'আমি ওয়েবসাইট দেখিনি। আমার এক শুভাকাঙ্ক্ষী মহিলা আমার স্ত্রীর মাধ্যমে এ মেসেজটি আমার কাছে পাঠান বিষয়টিকে আমি গুরুত্বপূর্ণ মনে করব এই ভেবে। সত্যিই বিষয়টি আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে।' বলল আহমদ মুসা।

মুখ নিচু করেছিল ড. আজদা আয়েশা। আহমদ মুসার কথা শেষ হলে মুখ তুলল সে। তার দু'চোখ অশ্রুতে ভরা। বলল, 'আল্লাহর হাজার শোকর। অসীম দয়ালু তিনি। আমি মনে করছি, আমার আপীল তিনি সবচেয়ে উপযুক্ত হাতে পৌঁছিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ।'

বলে ড. আজদা তাকাল ফুপির দিকে। বলল, 'ফুপু, আল্লাহ আছেন। তিনি কত কাছে আছেন, কত দ্রুত তিনি মানুষের আপীল শুনেন, এই আপীলের সাফল্যই তার প্রমাণ।'

বলে হাতের কাগজটি তুলে দিল ফুপুর হাতে। বলল, 'এই আবেদন আমি আমার ওয়েবসাইটে দিয়েছিলাম এই বিশ্বাসে যে, আল্লাহ আমার এই আপীল দেখবেন এবং এই আপীল তিনি তার মনোনীত কাউকে দেবেন যাতে তিনি আমাদের সাহায্য করতে পারেন।'

ড. আজদার ফুপু লায়লা কামাল আজদার দেয়া মেসেজটি পড়ল এবং মেসেজটি সে তার স্বামী কামাল বারকির হাতে দিল। কামাল বারকি এবং ড. সাহাব নুরী দু'জনেই একে একে মেসেজটি পড়ল।

ড. সাহাব নুরী মেসেজটি পড়া শেষ করে মুখ তুলে সবার দিকে একবার তাকিয়ে বলল, 'যেমন অদ্ভুত মেসেজটি পাঠানো, তেমনি অদ্ভুত মেসেজ পেয়ে জনাব আবু আহমদ আব্দুল্লাহর চলে আসা।'

'গোটা ঘটনা অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। তবে গায়েবের প্রতি বিশ্বাস ঈমানের অঙ্গ এবং গায়েবের প্রতি বিশ্বাসের চেয়ে এটা ছোট বিষয়। সুতরাং আবু আহমদ বলার পর ঘটনার মধ্যে অবিশ্বাস বা বিস্ময়ের কিছু নেই। আর একটি কথা, রূপকথার মত বন্দী রাজকুমারীর আহ্বানে হাতি-ঘোড়া, লোক-লস্কর ছাড়া রাজকুমার আবু আহমদের এই আগমন আমার কাছে বিস্ময়কর মনে হতো আমি আগের অবস্থায় থাকলে, কিন্তু আবু আহমদের যে চৌকস পরিচয় ইতোমধ্যেই পেয়েছি, তাতে বিস্ময় বা অবিশ্বাসের কোন অবকাশ নেই।'

একটু থামল লায়লা কামাল। গম্ভীর হয়ে উঠল তার মুখ। বলল, 'বেটা আবু আহমদ আব্দুল্লাহ, তোমার কাছে আমার জিজ্ঞাসা, আমার ভয় করছে, আজদাকে সাহায্য করার জন্যে এখানে আসার আগে তোমার যে ইচ্ছা, যে সিদ্ধান্ত ছিল, গত সন্ধ্যা থেকে আজ পর্যন্ত যে ভয়াবহ ঘটনা ঘটল, তাতে তোমার সেই ইচ্ছা বা সিদ্ধান্ত ঠিক আছে কিনা? বিপদ সম্পর্কে আমাদেরও সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না, কিন্তু ভয়াবহ সব ঘটনা দেখে বুঝতে পারছি, বিপদটা খুবই বড়, এদের মোকাবিলা বিপজ্জনক হবে। বেটা আবু আহমদ, তুমি কি ভাবছ এ ব্যাপারে? আমরা কি বিপদ থেকে উদ্ধার পাব?'

গম্ভীর হয়ে উঠল আহমদ মুসার মুখ। বলল, 'বিপদ থেকে ড. আজদা ও আরিয়াসের মানুষ উদ্ধার পাবে কিনা, এটা আল্লাহ বলতে পারেন। এখানে আসার আগেই বিপদের ভয়াবহতা সম্পর্কে আমার উপলব্ধি ছিল। আমি জেনে বুঝেই এসেছি এবং আল্লাহ সহায় হলে বিপদের মূলোচ্ছেদ ঘটার পরই আমি যাব।'

'আলহামদুলিল্লাহ!' ড. আজদারা সবাই সমস্বরে বলে উঠল।

'স্যরি জনাব আবু আহমদ, আজদার মেসেজে তো বিপদের পরিচয় ও ভয়াবহতা সম্পর্কে কোন কথা নেই। এখানে আসার আগে তাহলে বিপদের ভয়াবহতা উপলব্ধি আপনার কিভাবে হয়েছিল?' বলল ড. সাহাব নুরী।

‘গত কয়েক বছর আগে আমাকে আর্মেনিয়ায় আসতে হয়েছিল আরেকটা কাজে। সে সময় আর্মেনিয়ায় বিপজ্জনক একটা গ্রুপের সন্ধান পেয়েছিলাম। আমি অনেকটাই নিশ্চিত, সে গ্রুপটিই আরিয়াস-আরারাত অঞ্চলের বর্তমান ঘটনাপ্রবাহের সাথে জড়িত।’ আহমদ মুসা বলল।

আর্মেনিয়ার নাম শুনে সবাই যেন নড়েচড়ে বসল। তাদের চোখে দুর্ভাবনার চিহ্ন। কথা বলল কামাল বারকি। বলল সে, ‘এ বিষয়টার সাথে আর্মেনিয়া জড়িত? রাজনীতিরও কি যোগ আছে বিষয়টার সাথে?’

‘এর কোন সঠিক জবাব আমার কাছে নেই। আরও জানতে হবে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘অবশ্যই। যাই হোক, ভয় কিন্তু আমাদের বেড়ে গেল। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন।’ বলল ড. সাহাব নুরী।

ড. সাহাব নুরী থামলেও সংগে সংগে কেউ কথা বলল না। সবাই যেন ভাবছে।

কিছুক্ষণ নীরবতা।

নীরবতা ভাঙল ড. আজদা। বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, ‘স্যার, আমরা তো মামলা করে এলাম। সরকারও একটা মামলা সাজাবে। এখন কি ঘটবে? আমাদের কি করণীয়?’

‘ধন্যবাদ ড. আজদা, এ বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের ভাবা দরকার এখন। এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন আপনাদের নিরাপত্তা। ওরা পরাজয় মেনে নেয়নি। প্রথম আক্রমণে ব্যর্থতার পরপরই দ্বিতীয় আক্রমণ করেছে। দ্বিতীয় ব্যর্থতার পর অবশ্যই তারা ক্ষ্যাপা কুকুরের মত হয়েছে। আক্রমণের যে কোন সুযোগ তারা কাজে লাগাবে, রাত বা দিন যখনই হোক।’ আহমদ মুসা বলল।

ভয়-উদ্বেগে ছেয়ে গেল ড. আজদাদের মুখ। কামাল বারকি বলল, ‘আপনার কথা ঠিক। কিন্তু এখন কি করণীয়? আমরা কি পুলিশ প্রটেকশন চাইব?’

‘তা চাওয়া যায়, এটাই সবচেয়ে সহজ পথ। কিন্তু কতটা ফলপ্রসূ হবে, সেটাই প্রশ্ন। ইজডির প্রদেশের পুলিশ প্রধান খাল্লিকান খাচিপকে যেমনটা দেখা গেল, তা আশাব্যাঞ্জক নয়। গত সন্ধ্যায় খাল্লিকানের ডেপুটি রশিদ দারাগকেও

প্রথমে হোস্টাইল দেখা গেছে। পরে অনেকটা বাধ্য হয়েই তিনি আমাদের সহযোগিতা করেছেন। এখানকার পুলিশ স্টেশনের মোস্তফা ওকালানকে পরিষ্কার বোঝা যায়নি। আমার মনে হয়, ইজডির অঞ্চলের পুলিশ মাদকের ভয়াবহ বিস্তার নিয়ে খুব উত্তেজিত অবস্থায় আছে। মাদকের সাথে যাকে কিংবা যে পরিবারকেই যুক্ত দেখছে, তাদের বিরুদ্ধে তারা খড়গহস্ত হচ্ছে। ড. আজদার পরিবার সম্পর্কেও তারা খারাপ ধারণা নিয়ে বসে আছে। সুতরাং পুলিশের আন্তরিক কো-অপারেশন কতটা পাওয়া যাবে, ঠিক বলা যাবে না।'

'তাহলে?' প্রশ্ন ড. আজদার। তার মুখে এক অসহায় ভাব।

''ভ্যান' শহরে আমাদের একটা বাড়ি আছে, 'কারস' শহরেও আরেকটা বাড়ি আছে। আজদা মাকে আমরা সেখানে পাঠিয়ে দেব, না তাকে তার বাবা-মা'র কাছে মস্কোতে পাঠিয়ে দেব? গতকাল তার বাবা-মা টেলিফোন করেছিল। ওরা আসছেন। তারা চাচ্ছে, ড. আজদা মস্কোতে তাদের সাথে যাক। ওরা এলে আতা সালাহ উদ্দিনের ব্যাপারে আপীল করার যে সিদ্ধান্ত হয়েছে, তা চূড়ান্ত হবে।' বলল ড. আজদার ফুপু লায়লা কামাল।

লায়লা কামালের কথা শেষ হতেই ড. আজদার মামা ড. সাহাব নুরী বলল, 'আমার সাথেও কিছুক্ষণ আগে আপা-দুলাভাইয়ের কথা হয়েছে। আতা সালাহ উদ্দিনের এ দুর্ঘটনার পর বিশেষ করে গত সন্ধ্যা ও আজ রাতের ঘটনা শোনার পর ওরা বলছেন আজদাকে অবিলম্বে মস্কো পাঠিয়ে দিতে, অথবা মস্কো যেতে না চাইলে তাকে জার্মানি পাঠিয়ে দিতে।'

'এসব আপনাদের ব্যাপার, আপনারা সিদ্ধান্ত নেবেন। তবে নিরাপত্তার ব্যাপারে চিন্তা এই মুহূর্ত থেকেই করা দরকার।' বলল আহমদ মুসা।

'আমি মস্কো কিংবা জার্মানি কোথাও যাব না। আর পুলিশ কেসের জন্যে যে কোন সময় আমার প্রয়োজন হবে। আমি আমাদের ইজডির এলাকার বাইরে যেতে পারবো না।' ড. আজদা বলল।

'তাহলে তো অন্য সব চিন্তা করে লাভ নেই। নিরাপত্তা-ব্যবস্থা নিয়েই ভাবতে হবে এখন।' বলল কামাল বারকি।

'বেটা আবু আহমদ, আমি একটা অনুরোধ করব?' ড. আজদার ফুপু লায়লা কামাল বলল।

'অনুরোধ নয়, বলুন।' আহমদ মুসা বলল।

'আমাদের আজদাকে এখানে থাকতেই হচ্ছে। বাড়ি পাহারার জন্যে পুলিশকে আমরা হায়ার করব। কিন্তু বাছা, তোমাকেও থাকতে হবে এ বাড়িতে। তাছাড়া তুমি আজদার মেহমানও। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যতদিন সংকট দূর না হয়, ততদিন আজদার সাথে আমি এখানে থাকব।' বলল লায়লা কামাল।

আকাশের চাঁদ যেন হাতে পেল ড. আজদা। দুঃখের মধ্যে তার মুখটা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'ফুপু আম্মা আমার কথাই বলেছেন। প্লিজ, আপনি হ্যাঁ বলুন। আর আরিয়াস-আরারাত অঞ্চলে যখন আপনি থাকছেন, তখন এখানে থাকাই সব দিক দিয়ে ভালো হবে।' আহমদ মুসার উদ্দেশ্যে হাতজোড় করে বলল ড. আজদা।

'ধন্যবাদ, এ অঞ্চলে কোথাও আমাকে থাকতে হবে আর সে থাকাটা এখানে হলে আমার আপত্তি নেই। আর ফুপুজি ঠিকই বলেছেন, পুলিশকে হায়ার করা যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট পুলিশরাও এতে কিছু উপকৃত হয়। ওদের সার্ভিস ভালো পাওয়া যায় এবং ওদের কিছু নিয়ন্ত্রণও। এটা ইমিডিয়েটলি করা দরকার। দরখাস্ত নিয়ে গেলে থানা ইনচার্জ ওপর থেকে মৌখিক অনুমতি নিয়ে এখনি এটা করে দিতে পারে।'

'আমিই যাচ্ছি।' বলে ড. সাহাব নুরী উঠে গিয়ে একদৌড়ে একশিট কাগজ ও কলম নিয়ে এল। কাগজ ও কলম ড. আজদাকে দিয়ে বলল, 'নিজ হাতেই তুমি দরখাস্তটা লিখে দাও।'

ড. আজদা দরখাস্ত লিখে ড. সাহাব নুরীর হাতে দিয়ে বলল, 'মামা, কিছু পয়সা ওদের এ্যাডভান্স করতে হয়।'

'সে তুমি ভেব না মা। যা দরকার আমি করে আসব।'

বলে দরখাস্ত নিয়ে বেরিয়ে গেল ড. সাহাব নুরী।

ড. সাহাব নুরী বেরিয়ে গেলে ড. আজদার ফুপা তুরস্ক বিশেষ করে এ অঞ্চলের পুলিশের অবস্থা নিয়ে কথা তুলল।

এ নিয়ে কিছুক্ষণ কথা চলল।

এই কথার মধ্যেই পরিচারিকা এল চা নিয়ে।

চা খাওয়া চলছে। এই সময় বাড়ির কেয়ারটেকার লোকটি অনুমতি নিয়ে লাউঞ্জে প্রবেশ করল। দরজা পেরিয়ে করিডোরের মুখে দাঁড়িয়ে ড. আজদাকে লক্ষ্য করে বলল, 'ছোট ম্যাডাম, ইজডির হোম সার্ভিসের গাড়ি এসেছে। কিছু প্রয়োজন আছে? বলবেন কিছু?'

'হ্যাঁ আংকল, ওদের দাঁড়াতে বলুন। আমি আসছি।'

চলে গেল কেয়ারটেকার।

ড. আজদা উঠতে যাচ্ছিল।

'হোম সার্ভিস কি নিয়মিত আসে?' জিজ্ঞেস করল ড. আজদাকে।

ড. আজদা আবার বসে পড়ল। বলল, 'স্যার, নিয়মিতই বলা যায় আসে।'

'কোন বিশেষ কোম্পানী, না যে কোন কোম্পানী?' আহমদ মুসা বলল।

'অনেক কোম্পানী আছে, কিন্তু ইজডির কোম্পানীর জিনিস নিয়ে থাকি।' বলল আজদা।

'হোম সার্ভিস তো খুব সকালে আসে।' ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল আহমদ মুসা।

'জ্বি, এর চেয়ে সকালে আসে। আজ এক ঘণ্টার মত লেইট করেছে।' ড. আজদা বলল।

ভ্রুকুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার।

ভাবনার একটা ঝিলিক খেলে গেল আহমদ মুসার মুখে। বলল, 'ড. আজদা, আপনি বসুন। আমি গাড়ির দিকে একটু যাই, তারপর আপনি যাবেন।'

কৌতুহলের চিহ্ন ফুটে উঠল ড. আজদার চোখে-মুখে। পরপরই দুর্ভাবনার একটা কালো ছায়া নামল সেখানে। প্রশ্ন জেগে উঠল তার চোখে। কিন্তু প্রশ্ন না করে বলল, 'ঠিক আছে স্যার, আমি বসছি।'

আহমদ মুসা উঠে গেল।

ঘর থেকে বেরিয়ে দেখল, হোম সার্ভিসের গাড়িটা বারান্দার ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। বিস্মিত হলো সে এই দেখে যে, গাড়িটা তার মুখ ইতোমধ্যে ঘুরিয়েও নিয়েছে। ফেরার জন্যে সে প্রস্তুত।

হোম সার্ভিসের গাড়িগুলো কোনটা পেছন দরজা আবার কোনটা পাশের দরজা দিয়ে সাপ্লাই দেয়। কিন্তু গাড়ির কোন দরজাই খোলা নেই। ড্রাইভার তার ড্রাইভিং সীটে। আর 'ইজডির হোম সার্ভিস কোম্পানী লিমিটেড'-এর ইউনিফর্ম পরা একজন লোক হাতে রিসিট ও কলম নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ শুকনো ও চোখ দু'টিতে ভয়ের ছায়া দেখতে পেল সে।

আহমদ মুসার মনের অস্পষ্ট আশংকাটা এবার বাস্তব রূপ নিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা তার জ্যাকেটের বড় পকেট দু'টিতে হাত পুরে গাড়ি বারান্দায় নামল। বলল কোম্পানীর লোকটিকে লক্ষ্য করে, 'ছোট ম্যাডাম অসুস্থ বোধ করছেন। আমিই সাপ্লাই নেব, তুমি বিস্কুট ছাড়া বেকারী আইটেমের...।'

আহমদ মুসা কথা শেষ করতে পারলো না। হঠাৎ উঁচু গাড়ির ওপরের অর্ধেকটা ঘর্ষণের মত একটা ধাতব শব্দ তুলে চোখের পলকে নিচে নেমে গেল।

উন্মুক্ত হয়ে যাওয়া পথে দেখা গেল গাদাগাদি করে দাঁড়ানো অনেকজন মানুষ। সবার হাতে স্টেনগান। সামনে যারা দাঁড়ানো, টার্গেট লক্ষ্যে উঠে আসছে তাদের হাতের স্টেনগান।

ঘর্ষণের ধাতব শব্দ আহমদ মুসার সপ্ত ইন্দ্রিয়কে সতর্ক করে দিয়েছিল। বেরিয়ে এসেছিল তার ডান হাত চোখের পলকে। তার তর্জনীটা আগে থেকেই তার এম-১০-এর ট্রিগার স্পর্শ করেছিল।

গাড়ির পেছনের স্লাইডিং ডোরটা কিছুটা নামতেই আহমদ মুসার চোখ গাড়ির ভেতরটায় পৌঁছে গিয়েছিল। আর তার তর্জনীটা হুকুম পেয়েছিল সংগে সংগেই।

স্লাইডিং নেমে যাবার আগেই আহমদ মুসার এম-১০ গুলিবৃষ্টি শুরু করেছিল।

গাড়ির ভেতরে স্টেনগানধারীরা গাড়ির পেছনের দরজার ঘুলঘুলি দিয়ে নিরস্ত্র এবং হোম সার্ভিস আইটেমের অর্ডার দানরত আহমদ মুসাকে আগেই দেখেছিল। কিন্তু নিরস্ত্র ও অপ্রস্তুত এই লোকটির কাছ থেকে আক্রমণ হতে পারে, তা তারা কল্পনা করেনি। তারা মনে করেছিল, নিরস্ত্র এই কর্মচারী বা আত্মীয় লোকটিকে ধরে তার সাহায্যে ড. আজদাকে খুঁজে বের করে তাকে শেষ করার কাজটা আগে সমাধা করবে। আর যদি বাঁধা আসে, তাহলে সে কেন, কাউকেই ছাড়বে না। রক্তের নদী বইয়ে দিয়ে হলেও তারা বারজন আজ দু'বারের ব্যর্থ মিশন সমাপ্ত করেই ফিরবে।

কিন্তু বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত তারা আহমদ মুসার এম-১০-এর অসহায় শিকার হলো। যাদের হাতে স্টেনগান উদ্যত ছিল, তারা কিছুটা ওপরে উঠার সাথে সাথে গুলির ঝাঁকের গ্রাসে পরিণত হলো। তাদের পেছনে দাঁড়ানো অন্যরা স্টেনগান তাক করারও সুযোগ পেল না।

বারোজনের লাশে স্তুপীকৃত হয়ে পড়ল গাড়ির ভেতরটা।

ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে পালাচ্ছিল।

ভয়ে কম্পনরত কোম্পানীর সেলসম্যান লোকটা শুকনো কণ্ঠে চিৎকার করে বলল, 'স্যার একজন পালাচ্ছে।'

আহমদ মুসা তাকাল সেদিকে। দেখল, গাড়ির ড্রাইভিং ডোরের নিচে একটা স্টেনগান পড়ে আছে। সন্ত্রাসীটি তখন দৌঁড়ে গাড়ির সামনে পনের-বিশ গজের মত চলে গেছে। আহমদ মুসা তার পায়ের দিকে লক্ষ্য করে এক পশলা গুলি করল। আহমদ মুসা চাচ্ছিল তাকে জীবিত ধরতে। কিন্তু ভাগ্য খারাপ, লোকটি ঐখানে রাস্তার বাঁক ঘুরতে গিয়ে পায়ের সাথে পা বাড়ি খাওয়ায় পড়ে গেল। যে গুলি তার পায়ে লাগার কথা তা গিয়ে একদম লাগল তার বুকে।

অন্যদের মত সেও প্রাণহীন লাশ হয়ে গেল।

ড. আজদারা তখন কেউ আহমদ মুসার পেছনে, কেউ পাশে এসে দাঁড়াল।

ড. আজদা এসে আহমদ মুসার ডান পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। কাঁপছে সে। তাদের সকলের দৃষ্টি তখনও রাস্তার ওপর গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে যাওয়া লোকটির দিকে। গাড়ির ভেতরে চোখ তাদের যায়নি।

পেছনে দাঁড়ানো লায়লা কামালই প্রথম দেখতে পেল ভয়াবহ দৃশ্যটা। বলল চিৎকার করে, 'আজদা গাড়ির ভেতরে দেখ।'

গাড়ির ভেতরে একবার তাকিয়েই চিৎকার করে উঠে ড. আজদা আহমদ মুসাকে আঁকড়ে ধরল।

'বোন আজদা আয়েশা, যুদ্ধক্ষেত্রে ভীত হবার কোন সুযোগ নেই।' নির্দেশসূচক গম্ভীর কণ্ঠ আহমদ মুসার।

আহমদ মুসাকে ছেড়ে দিয়ে ড. আজদা মুখ তুলে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। মুখটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার। বিস্ময়কর এই মানুষটি তাকে বোন ডেকেছেন। কখন মহীরূহ রূপ এই মানুষটিকে সে জড়িয়ে ধরেছিল, সে বুঝতেই পারেনি। মনোবিজ্ঞানীও কি এই লোকটি! ঠিক প্রয়োজন মুহূর্তেই তিনি তাকে বোন সম্বোধন করেছেন। অসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে নুয়ে এল ড. আজদার মাথা। গত ১২ ঘন্টারও কম সময়ে এই মহান লোকটি তাকে তিনবার মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। সে তো হোম সার্ভিসের কাছে আসার জন্যে উঠেই ছিল। এলে তো তাকেই এখন লাশ হয়ে পড়ে থাকতে হতো!

'ড. আজদা আয়েশা, তাড়াতাড়ি থানায় খবর দিন। ড. সাহাব নুরী নিশ্চয় এখনও থানায় আছেন। পুলিশ নিয়ে আসতে বলুন তাকে।' বলল আহমদ মুসা ড. আজদাকে।

'জ্বি ভাইয়া, আমি যাচ্ছি, এখনি থানায় খবর দিচ্ছি।' অনেকটা রোবটের মত কথা বলল ড. আজদা। ঘটনার ভয়াবহতা তাকে যে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, সে ঘোর এখনও তার কাটেনি।

ড. আজদার ফুপা কামাল বারকি ও ফুপু লায়লা কামালও অনেকটা নির্বাক। কি করে কি ঘটল, তা জিজ্ঞেস করার ভাষাও তারা যেন ভুলে গেছে। শুধু এটুকুই বুঝছে, হোম সার্ভিসের ছদ্মবেশে সন্ত্রাসীরা এসেছিল। আতংকে তারা

শিউরে উঠছে এই ভেবে যে, হোম সার্ভিসের কাছে আসার জন্যে আজদা তো উঠেই দাঁড়িয়েছিল, আসলে তো সে-ই লাশ হয়ে যেত।

আহমদ মুসা হাতের রিভলভারটি পকেটে রেখে ডাকল ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কোম্পানীর সেলসম্যান ছেলেটিকে।

ছেলেটি কাঁপতে কাঁপতে এসে আহমদ মুসার কাছে দাঁড়াল।

'সন্ত্রাসীরা তোমাকে এবং তোমার গাড়ি কোথায় পেল?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা ছেলেটিকে।

ছেলেটি কেঁদে ফেলল। বলল, 'আমরা এদিকে আসছিলাম। 'এলিকয়' চৌরাস্তার ক্রসিংয়ে এরা গাড়ি থামায় এবং বলে, আমরা বেশি পরিমাণে বেকারীর জিনিস কিনব। আমাদের সাথে চল। বলে আমাদের আরাস নদীর তীরে পাহাড়ের আড়ালে এক নির্জন স্থানে নিয়ে যায়। আমাদের ড্রাইভারকে ওরা মেরে ফেলে এবং বলে, তাদের কথামত কাজ না করলে আমাকেও মেরে ফেলবে। আমাদের গাড়ি থেকে সব মাল নামিয়ে ওরা বারজন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গাড়িতে উঠে বসে। ওদের অন্য একজন গাড়ি চালিয়ে এখানে নিয়ে আসে।'

'ওদের নিজেদের মধ্যে কোন কথা বলতে শুনেছ কিংবা ওরা টেলিফোনে কারও সাথে কথা বলেছে কিনা?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'স্যার, ওদের কারও হাতে মোবাইল দেখিনি। আমি ড্রাইভারের পাশে বসেছিলাম। সে কোন কথা বলেনি।' বলল ছেলেটি।

'ঠিক আছে, ভয় নেই। পুলিশ জিজ্ঞেস করলে সত্য যা তাই বলবে।' আহমদ মুসা বলল।

টেলিফোন করে ভেতর থেকে আজদা এল। বলল, 'স্যার, পুলিশ রওয়ানা দিয়েছে। মামারও কাজ হয়ে গেছে। তিনিও আসছেন।'

'ভাই বলার পর আবার 'স্যার' কেন?' বলল আহমদ মুসা আজদাকে। তার মুখে হাসি।

'অভ্যাস হয়ে গেছে তো। আর বলব না। কিন্তু 'বোন' বলার পর 'আপনি' সম্বোধন করছেন কেন? এসবও তাহলে চলবে না। ড. আজদা নয়, শুধু আজদা আয়েশা আমি।'

‘ঠিক আছে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ড. বারজেনজো শুনলে খুব খুশি হবে। সে আপনার দারুণ ভক্ত হয়ে গেছে। সকাল থেকে এ পর্যন্ত দু’বার টেলিফোন করেছে। আমি মামা, ফুপা-ফুপিদের পরিবর্তনের কাহিনী তাকে বলেছি। সে দারুণ খুশি হয়েছে। সে চাচ্ছে, তার পরিবারের সাথে আপনাকে পরিচয় করিয়ে দিতে। ওখানে নাকি আপনি আরও ভালো করতে পারবেন।’ বলল ড. আজদা।

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল। পুলিশের গাড়ি আসতে দেখে থেমে গেল আহমদ মুসা।

পুলিশের দু’টি গাড়ি। তাদের মধ্যে একটা ড. সাহাব নুরীর গাড়ি।

পুলিশের গাড়ি দু’টি গাড়ি বারান্দা থেকে বেরিয়ে রাস্তাটি যেখানে বাগানের দিকে টার্ন নিয়েছে, সেখানে একটি লাশ পড়েছিল, তার পেছনে এসে দাঁড়াল।

থানার ইনচার্জ অফিসার মোস্তফা ওকালান লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে লাশটা ভালো করে দেখল। তারপর চারদিকটার ওপর চোখ পড়তেই ‘সালাম’ দিয়ে হোম সার্ভিসের গাড়ির দিকে এগোলো।

গাড়ির পেছনে আহমদ মুসাসহ সকলেই দাঁড়িয়েছিল।

পুলিশ অফিসার মোস্তফা ওকালান আহমদ মুসার সামনে এসে বলল, ‘এখানেই তো লাশগুলো?’

‘জ্বি হ্যাঁ, গাড়ির ভেতরে।’ আহমদ মুসা বলল।

গাড়ির পেছন ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ভেতরটা সে একবার গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করল। তারপর মুখ ঘুরিয়ে আহমদ মুসাকে বলল, ‘অভিনন্দন আপনাকে। সন্ত্রাসীদের আপনি গাড়ি থেকে নামতেই দেননি। বুঝতে পারছি, ওরা হোম সার্ভিসের ছদ্মবেশে এসেছিল। গাড়িতে হোম সার্ভিসের পণ্যের বদলে ছিল ওরা ১২ জন সন্ত্রাসী। ওরা ভেবেছিল, বাড়িতে যেহেতু মেহমান ছাড়া বাড়ির দায়িত্বশীল আর কেউ নেই, তাই ড. আজদাই অর্ডার নিয়ে আসবে। আর তাকে খুন করে তারা পালিয়ে যাবে। যদি আজদা না আসে তাহলে বাড়িতে ঢুকে তাকে

খুঁজে বের করে খুন করার মত জনশক্তি নিয়ে তারা এসেছিল। কিন্তু তারা গাড়ি থেকে বের হতেই পারেনি। কি ঘটেছিল বলুন তো।'

আহমদ মুসা গোটা কাহিনীটা সংক্ষেপে বলল।

পুলিশ অফিসার মোস্তফা ওকালান কাহিনী শোনার পর তার চোখ-মুখের ওপর দিয়ে বিস্ময় ও কৌতুহলের ঢেউ খেলে গেল। ফুটে উঠল তার চোখে আহমদ মুসার প্রতি একটা সমীহ দৃষ্টি। বলল, 'আপনি ড. আজদাকে বাঁধা দিলেন কেন? আপনার মনে হোম সার্ভিস সম্পর্কে সন্দেহ হলো কেন?'

'বিষয়টা খুব সাধারণ ছিল। যে বাড়িতে রাতে এত গুলি-গোলা হলো, যে বাড়িতে পুলিশের এত আনাগোনা, যা আশেপাশের লোকেরা সবাই জানতে পেরেছিল, সে বাড়িতে সকালে হোম সার্ভিসের গাড়ি আসার বিষয়টা আমার কাছে স্বাভাবিক মনে হয়নি। দ্বিতীয়ত, গাড়িটা নির্দিষ্ট সময়ের এক ঘণ্টা পরে আসাটা আমার কাছে সন্দেহজনক মনে হয়েছে। কারণ, হোম সার্ভিসের রুট শিডিউল, টাইম শিডিউল থাকে, সেটা ব্রেক করে না। হয় ঠিক সময়ে আসবে, না হলে আসেই না। কাস্টমাররাও এটা জানে। তৃতীয়ত, দ্বিতীয় আক্রমণের প্রকৃতি দেখে আমার আশংকা হয়েছিল, শত্রুদের তৃতীয় আক্রমণও এ পক্ষ গুছিয়ে উঠার আগেই ঘটতে পারে। রাতের ঘটনার পর পুলিশ ও অন্যান্য ঝক্কি ঝামেলা সামলাতে এ পক্ষের সকাল হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং এ পক্ষের সকালটা কাটবে অনেকটা নিশ্চিন্ত ও শিথিলভাবে। এই অবস্থা শত্রুপক্ষের তৃতীয় আক্রমণের জন্যে খুব অনুকূল হতে পারে। এ আশংকা মনে থাকায় হোম সার্ভিসের গাড়িকে সন্দেহের চোখে দেখা স্বাভাবিক ছিল।' বলল আহমদ মুসা।

পুলিশ অফিসার মোস্তফা ওকালানের চোখে-মুখে বিস্ময়। বলল, 'মি. আবু আহমদ আবদুল্লাহ, নিশ্চয় আপনি কোন গোয়েন্দা সার্ভিসের লোক। পরিচয় আপনি গোপন করছেন। অথবা আপনি নিশ্চয় আর এক শার্লক হোমস। শার্লক হোমসের মতই আপনার বিবেচনা-বিশ্লেষণে কোন খুঁত নেই। ধন্যবাদ আপনাকে। কিন্তু মি. আবু আহমদ আবদুল্লাহ, আপনি ভিমরুলের চাকে ঢিল দিয়েছেন। ভালো ছিল এদের না ঘাঁটানো। এদের শক্তি সম্পর্কে আমার কোন আন্দাজ নেই, আপনিও পারবেন না।'

‘কারা এরা?’ বলল আহমদ মুসা।

‘আমি জানি না। এরা বহুরূপী। এদের আসল রূপ সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই। এরা অপরাধী সংগঠন নয়। বরং এরা পুলিশকে অপরাধ দমনে সাহায্য করছে। তাদের সাহায্যেই এই অঞ্চলের ড্রাগ-নেটওয়ার্ককে ভেঙে ফেলা গেছে। বহু অপরাধী ধরা পড়েছে। তাদের সাহায্যে বাকিদেরও আমরা ধরে ফেলব। শুধু ড্রাগ-ব্যবসায় নয়, চুরি, ডাকাতি, খুন সব অপরাধ দমনের ক্ষেত্রেই তারা সাহায্য করছে। এদের সাথে বারজানি পরিবারের এই সংঘাতকে আমরা দুঃখজনক মনে করছি। ড. আজদার ভাই আতা সালাহ উদ্দিন বারজানি অপরাধ করেই জেলে গেছে। ড. আজদার কোন অপরাধ আমরা পাইনি। কিন্তু তার সাথে ওদের সংঘাত বাঁধল কেন? ওরা কেন ড. আজদাকে মারতে চায়, এ প্রশ্নেরও আমাদের কাছে কোন জবাব নেই। জানি না, তদন্ত কতদূর কি করতে পারবে!’

ড. আজদা, ড. সাহাব নুরী, কামাল বারকি ও তার স্ত্রী লায়লা কামাল গোগ্রাসে গিলছিল আহমদ মুসা ও পুলিশ অফিসারের মধ্যেকার কথাগুলো।

‘ওরা পুলিশকে এই সাহায্য করছে কেন?’ আহমদ মুসা বলল।

‘পুলিশকে সহযোগিতা করা তো সব নাগরিকের দায়িত্ব।’ বলল পুলিশ অফিসার মোস্তফা ওকালান।

‘ওদের বহুরূপী বললেন কেন?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘এই কারণে যে, এই সাহায্যের কাজটা তারা নানা নামে করে। তবে তারা যে সবাই মিলে এক, সেটা আমরা বুঝি। তাহলে কেন বহু নাম, এক নাম নয়, সেটা আমরা জানি না। অবশ্য এ নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা নেই। সাহায্য করছে, এটাই আমাদের কাছে বড় কথা, নাম নয়।’

‘আচ্ছা অফিসার, এই এলাকায় নতুন বসতি এবং পুরাতনরা উচ্ছেদ হওয়া, এ সম্পর্কে কিছু জানেন?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘উচ্ছেদের ঘটনা আমাদের সামনে আসেনি। জমি-জমা, বাড়ি-ঘর বিক্রি করে অন্যত্র চলে যাবার ঘটনা আছে। এ ধরনের অভ্যন্তরীণ মাইগ্রেশন তো স্বাভাবিক ব্যাপার। নতুন বসতি বলতে যা ঘটছে, সেটাও স্বাভাবিক। দেশের

অন্যান্য অঞ্চল থেকে অনেক মানুষ জমি-জমা কিনে এখানে বসতি করছে। এর মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই।'

'কারা যাচ্ছে, কারা আসছে, এ বিষয়টা আপনারা কখনও ভেবে দেখেছেন?' বলল আহমদ মুসা।

'না, এরকম কিছু আমরা দেখিনি, আমাদের দেখার কথাও নয়। কিন্তু এ ধরনের প্রশ্ন কেন করছেন বুঝতে পারলাম না।' বলল থানা ইনচার্জ অফিসার মোস্তফা ওকালান।

'এমনিই বলছিলাম। তবে তুরস্কে জাতিগত একটা সংঘাত তো আছেই, তাই না? যেমন দেখুন, আর্মেনীয়রা এখনও সমস্যা হয়েই আছে।' বলল আহমদ মুসা।

থানা ইনচার্জ মোস্তফা ওকালান তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'মি. আবু আহমদ আব্দুল্লাহ, আপনি অনেক জানেন। আপনি খুবই দূরদর্শী। আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আমরা সরকারি চাকুরে। বেশি জানতেও নেই, বেশি বলতেও নেই।'

বলেই মোস্তফা ওকালান নড়েচড়ে উঠে বলল, 'কাজ শুরু করি। আমাদের বড় স্যার খাল্লিকান খাচিপ আসতে চেয়েছিলেন। শেষে জানালেন আসছেন না। আগের মতই এ ঘটনাটা। তদন্ত একই রকম হবে। তবে তিনি বলেছেন, কেস শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনি ইজডির বাইরে যাবেন না।' থামল মোস্তফা ওকালান।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'আপনার স্যার আইনের কথা বলেননি। আমি আসামী নই। তাকে বলবেন, আমি তার আদেশ মানতে বাধ্য নই। আমি ইজডিতে থাকলে আমার ইচ্ছাতেই থাকব।'

'মি. আবু আহমদ, এ বিষয় নিয়ে কথা বাড়াবার দরকার নেই। এসব ব্যাপার আমার ওপর ছেড়ে দিন।' বলল থানা ইনচার্জ মোস্তফা ওকালান।

কথা শেষ করে মোস্তফা ওকালান পেছন ফিরে সহকারীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমাদের কাজ কত দূর?

‘স্যার, সুরতহাল শেষ হয়েছে। নিচের লাশটি গাড়িতে তোলা হয়েছে। এখন আমরা ওদের বক্তব্য এখানেও নিতে পারি। আবার ওরা থানায় মামলা রেকর্ড করাতে পারেন।’ বলল মোস্তফা ওকালানের সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর।

মোস্তফা ওকালান তাকাল আহমদ মুসার দিকে।

‘আমরা থানায় যাব মামলা রেকর্ড করার জন্যে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ঠিক আছে।’ বলে মোস্তফা ওকালান হোম সার্ভিসের সেলসম্যান ছেলেটিকে ডেকে বলল, ‘গাড়িটিকে ওরা কোত্থেকে হাইজ্যাক করেছে?’

ছেলেটি কাঁপতে কাঁপতে বলল, ‘স্যার, এলিকয় ক্রসিং থেকে ওরা আমাদের কিছু জিনিস কিনবে বলে নিয়ে যায়। আরাস নদী এলাকায় একটা পাহাড়ের আড়ালে নিয়ে আমাদের ড্রাইভারকে ওরা হত্যা করে এবং গাড়ির জিনিসপত্র ওখানে নামিয়ে ফেলে। হত্যার ভয় দেখিয়ে ওরা বাধ্য করে আমাকে তাদের কথামত কাজ করতে।’

মোস্তফা ওকালান তার সহকারী সাব-ইন্সপেক্টরকে ডেকে বলল, ‘তুমি ছেলেটিকে গ্রেফতার কর। আর থানায় টেলিফোন করে আরাস নদীর ঐ পাহাড়ী এলাকা থেকে নিহত ড্রাইভার ও গাড়ির মালামাল উদ্ধার করে আনতে বল।’

স্যালুট দিয়ে সাব-ইন্সপেক্টর হোম সার্ভিসের সেলসম্যান ছেলেটিকে নিয়ে একজন পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে বলল, ‘একে গাড়িতে তোল।’ তারপর ওয়্যারলেসে কথা বলতে লাগল থানার সাথে।

আহমদ মুসা ও ড. আজদা তৈরি হবার জন্যে চলল বাড়ির ভেতরে। তাদের সাথে ড. সাহাব নুরী এবং কামাল বারকি ও লায়লা কামাল।

বাড়ির ভেতরে ঢুকেই ড. আজদার ফুপা কামাল বারকি বুকে জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে। বলল, ‘বেটা, নিশ্চয় আল্লাহর কোন অলৌকিক ক্ষমতা আছে তোমার। তুমি আজদাকে হোম সার্ভিসে যেতে বাঁধা না দিলে সে বেঘোরে মারা পড়ত। আমরা তুরস্কের হয়েও যা জানি না, তা তুমি জান কি করে? আল্লাহ তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন বেটা।’

আহমদ মুসা কামাল বারকিকে ধন্যবাদ দিয়ে বলল, ‘আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করুন। তিনি যেন সব সময় আমাদের এভাবে সতর্ক হবার সুযোগ দেন।’

‘ফি আমানিল্লাহ। তুমি ঠিক বলেছ বেটা। পুলিশের দারোগা ওকালানও দেখছি ভয় করে এ সন্ত্রাসীদের।’ বলল কামাল বারকি।

আহমদ মুসা নিচতলার লাউঞ্জে প্রবেশ করে তার ঘরের দিকে যাচ্ছিল।

‘ভাইয়া, আপনার ঘর ওদিকে নয়। আপনার ঘরের ‘মেরাজ’ হয়েছে।’ বলল ড. আজদা। তার ঠোঁটে হাসি।

‘মেরাজ মানে?’ বলল আহমদ মুসা।

‘মেরাজ মানে আপনার ঘরের দু’তলায় ঊর্ধ্বগমন ঘটেছে। এখন থেকে দু’তলায় থাকবেন। আপনি কাছাকাছি থাকলে আমরা নিশ্চিন্ত থাকব, এই চিন্তাতেই আমরা এটা করেছি। চলুন, আপনার ঘর দেখিয়ে দিই।’ বলল ড. আজদা। কথা না বাড়িয়ে সিঁড়ির দিকে হাঁটতে লাগল আহমদ মুসা।

হাঁটতে লাগল ড. আজদাও।

ড. আজদার মামা ও ফুপা-ফুপিরা লাউঞ্জের সোফায় বসে বলল, ‘আমরা আর ওপরে উঠছি না। তোমরা তৈরি হয়ে এস। আমরা এখানেই বসছি।’

দু’তলায় উঠে গেল আহমদ মুসা ও ড. আজদা।

সেদিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল লায়লা কামাল, ড. আজদার ফুপি। বলল, ‘এই জুড়িটা যদি জীবনের জন্যে হতো, তাহলে হাতে স্বর্গ পেতাম।’

‘ওরকম চিন্তা করে ওদের সম্পর্ককে ছোট করো না। আবু আহমদ আব্দুল্লাহ ছেলেটা একেবারেই অতুলনীয়। সব দিক থেকেই অসম্ভব সচেতন। দেখ, আজদা গাড়ির ভেতর রক্তে ডুবে থাকা লাশের স্তূপ দেখে আকস্মিকভাবে ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে পাশে পেয়ে জড়িয়ে ধরেছিল আবু আহমদ আব্দুল্লাহকে। মানুষের মন বড় বিচিত্র। অনেক সময় সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক যুগে যা ঘটে না, এক মুহূর্তেই তা ঘটে যেতে পারে। আবু আহমদ আব্দুল্লাহ তেমন কিছুর পথ বন্ধ করার জন্যেই নিশ্চয় কোন দেরি না করে ‘বোন’ বলে সম্বোধন করেছিল আজদাকে।’ বলল কামাল বারকি, ড. আজদার ফুপা।

‘ধন্যবাদ ভাইসাহেব, বিষয়টা আমিও লক্ষ্য করেছি। সুন্দরী মেয়ের স্পর্শকে নানা পরিস্থিতিতে, বিভিন্ন কারণে প্রশ্রয় না দেবার লোক হয়তো আছে, কিন্তু সংগে সংগেই তাকে বোন বলার মত সততা দেখানোর লোক আমি দেখিনি।

সোনার মানুষ কেমন হয় আমি জানি না, কিন্তু সোনার মানুষ যদি কাউকে বলতে হয়, তাহলে তাকেই বলতে হবে। গত পনের-বিশ ঘণ্টার ইতিহাস এটাই বলে।’

দু’তলা থেকে নেমে এসেছে আহমদ মুসা ও ড. আজদা। ড. সাহাব নুরীর শেষ কয়েকটা কথা তাদের কানে গেল।

‘বিশ ঘণ্টার ইতিহাস কি বললে মামা?’ বলতে বলতে তাদের সামনে এসে দাঁড়াল ড. আজদা। কিছুটা পেছনে দাঁড়িয়ে আহমদ মুসা।

‘না, কিছু না। আমরা নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম। তোমরা যাচ্ছ? গিয়ে কি হয়, আমাদের টেলিফোন করো। আমরা চিন্তায় থাকব।’ বলল ড. সাহাব নুরী।

‘হ্যাঁ মামা, আমরা যাচ্ছি। দোয়া করো।’ বলল ড. আজদা।

‘হ্যাঁ, আসছি আমরা। পুলিশ অফিসার মোস্তফা ওকালান এখন টেলিফোন করেছিলেন, আমরা পাহারার জন্যে যে পুলিশ চেয়েছিলাম তারা এসেছে। দিনে দু’জন পুলিশ পাহারায় থাকবে, রাতে চারজন। আপনারা ওদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলে ভালো হয়।’ বলল আহমদ মুসা।

সালাম দিয়ে হাঁটা শুরু করল বাইরে বেরুবার জন্যে।

ড. আজদাও তার পিছু নিল।

# ৪

সকাল ৭টা। কুরআন পড়া শেষ করে উঠে দাঁড়াতেই ঘরে ঢুকল ড. সাহাব নুরী। সালাম দিয়েই আহমদ মুসাকে বলল, 'মি. আবু আহমদ আব্দুল্লাহ, আপনি কি একটু সময় দেবেন?'

'এটা তো জিজ্ঞাসা বা সম্মতি দেয়ার বিষয় নয়! আপনাকে উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে। কি ব্যাপার বলুন তো?' বলল আহমদ মুসা।

'মধ্য ভ্যান-এ আমার বন্ধু পরিবার সাংঘাতিক বিপদে পড়েছে। সেখানে আমাকে এখনি যেতে হবে। আপনিও যদি যান।'

গত রাতেই ড. সাহাব নুরী ও ড. আজদার সাথে আহমদ মুসা লেকসিটি ভ্যান শহরে এসেছে। এই ভ্যান শহরের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ভ্যান স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. সাহাব নুরী।

আহমদ মুসা ভ্যানে এসেছে পুলিশ রেকর্ড থেকে উল্কিওয়ালাদের সম্পর্কে খোঁজ নেবার জন্যে। এ পর্যন্ত প্রতিপক্ষের যারা মারা পড়েছে, সবাই উল্কিওয়ালা। সুতরাং উল্কিওয়ালাদের সম্পর্কে জানলে অগ্রসর হওয়া সহজ হবে। জানা যাবে তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সবই।

ড. সাহাব নুরীর কথা শেষ হতেই ঘরে প্রবেশ করেছে ড. আজদা।

'কি বিপদ মি. সাহাব নুরী? আপনার এ বন্ধু কে বা কারা?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'আমার অভিভাবক এবং শিক্ষক সাংঘাতিক পুলিশী ঝামেলায় পড়েছেন। এখনি যেতে হবে সেখানে। ওরা খুবই আপসেট হয়ে পড়েছেন।' বলল ড. সাহাব নুরী।

'কাদের কথা বলছেন? কারা বিপদে পড়েছেন মামা?' ড. আজদার জিজ্ঞাসা।

‘তুমি জান তাকে। ভ্যান পুরাতত্ত্ব জাদুঘরের প্রধান এবং জাদুঘরের মাউন্ট আরারাত সেকশনের বিশেষ তত্ত্বাবধায়ক ড. মাহজুন মাজহার। জাদুঘরে আজ কি এক ডাকাতি হয়েছে। এজন্যে পুলিশ তার বাড়ি ঘিরে রেখেছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই তার বাড়িতে আরও পুলিশ আসবে। স্যার খুব সরল-সোজা বিজ্ঞানী মানুষ। খুব নাকি ভেঙে পড়েছেন।’

ভ্যান জাদুঘরের মাউন্ট আরারাত সেকশনের বিশেষ তত্ত্বাবধায়ক শুনেই আহমদ মুসার আগ্রহ দারুণ বেড়ে গেল।

কিছু বলতে যাচ্ছিল আহমদ মুসা।

তার আগেই ড. আজদা কথা বলা শুরু করেছে। বলছে, ‘মামা, ঐ স্যারের মেয়ে সাহিবা সাবিত তো আমার বান্ধবী। কলেজে ক্লাসমেট ছিল আমার। এখন সে ভ্যান বিশ্ববিদ্যালয়েই পুরাতত্ত্বের ওপর পিএইচডি করছে। গতকালও টেলিফোনে তার সাথে আমার কথা হয়েছে। আমাকেও যেতে হবে।’

‘বেশ, চল। ভালোই হলো। কিন্তু মি আবু আহমদ আব্দুল্লাহ, আপনাকে যেতেই হবে।’ বলল ড. সাহাব নুরী।

‘না ডাকলেও আমি যাব। ড. মাহজুন মাজহারকে আমারও প্রয়োজন। চলুন। আমি প্রস্তুত।’ আহমদ মুসা বলল। তার মুখে হাসি।

‘ধন্যবাদ আবু আহমদ আব্দুল্লাহ। আমি কৃতজ্ঞ। আপনাকে সেখানে খুব বেশি প্রয়োজন। আসুন।’

বলে ঘর থেকে বের হওয়ার জন্যে হাঁটা শুরু করল ড. সাহাব নুরী।

‘চলুন ভাইয়া, ওরা খুব ভালো মানুষ। কিন্তু ভীষণ বিপদ ওদের।’ বলল ড. আজদা।

‘কিন্তু ঘটনাটাই এখনও জানতে পারলাম না।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ছয়টার খবরে না বললেও আটটার খবরে নিশ্চয় বিস্তারিত বলবে। আর কাগজেও বিস্তারিত জানতে পারব। ওখানে গিয়েই আমরা কাগজ পেয়ে যাব।’ বলল ড. আজদা।

আহমদ মুসা ও ড. আজদা বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

সকালের প্রাচীন ও ব্যস্ত শহর ভ্যান। রাস্তা প্রায় ফাঁকা। সকাল সাড়ে ৭টার মধ্যে পৌঁছে গেল তারা ড. মাহজুন মাজহারের বাড়িতে।

ড. মাহজুন মাজহারের বাড়ির সামনে পুলিশের গাড়ি। তাদের বাগানঘেরা দু'তলা বাংলো সাইজের বাড়ির সব দিকেই পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল।

নিচেই বাড়ির গেটে দাঁড়িয়েছিল সাহিবা সাবিত। তার চোখে –মুখে উদ্বেগের বিস্ফোরণ।

ড. সাহাব নুরী গাড়ি থেকে নামতেই সাহিবা সাবিত এসে তাদের ওপরে নিয়ে চলল। যাবার পথেই ড. আজদা সাহিবা সাবিতকে আহমদ মুসার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বলল, 'তোমাকে যে মেহমানের কথা বলেছিলাম, ইনি তিনিই। আমাদের পরিবারের চরম বিপদের সময়ের পরম বন্ধু। ইনি আবু আহমদ আব্দুল্লাহ।'

শুনেই দাঁড়িয়ে গেল সাহিবা সাবিত।

সাহিবা সাবিতের মুখে দুঃখের মধ্যেও ফুটে উঠেছে বিস্ময় আর আনন্দের ঔজ্জ্বল্য।

হালকা নীল ট্রাউজারের ওপর সাদা শার্ট পরা সুন্দরী তরুণী সাহিবা সাবিত বাউ করল আহমদ মুসাকে। বলল, 'আজদা আমাকে আপনার সম্পর্কে এত কথা বলেছে যে, আমি আপনাকে শার্লক হোমস ভেবে বসে আছি। তবে ইংরেজ শার্লক হোমসের চেয়ে আপনি অনেক সুন্দর। ওয়েলকাম স্যার।'

'ধন্যবাদ সাহিবা সাবিত। আমি আপনাকে অন্য একটা অনুরোধ করব। আমার এখনি একটা পত্রিকা দরকার, যাতে মিউজিয়ামের ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট আছে।' আহমদ মুসা বলল।

'আজকের সবগুলো পত্রিকাই আমি কিনেছি। চলুন, দেখবেন।'

বলে আবার হাঁটতে শুরু করল সাহিবা সাবিত।

সাহিবা সাবিত আহমদ মুসাদেরকে একেবারে ভেতরে ফ্যামিলি ড্রইংরুমে নিয়ে এল। সেখানেই বসেছিল তার আব্বা ভ্যান পুরাতত্ত্ব মিউজিয়ামের প্রধান ড. মাজহার।

আহমদ মুসাদেরকে দেখে ড. মাহজুন মাজহার উঠে দাঁড়িয়েছে। স্বাগত জানাল ড. সাহাব নুরী ও ড. আজদাকে। আহমদ মুসার ওপর চোখ পড়তেই থমকে গেল তার কথা। জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল ড. সাহাব নুরীর দিকে।

কিন্তু সাহাব নুরী কিছু বলার আগেই সাহিবা সাবিত বলল, 'বাবা, ইনিই আবু আহমদ আব্দুল্লাহ। আজদাদের বিপদে হাতেম তায়ী হয়ে এসেছে। তবে বাবা, এই হাতেম তায়ী কিন্তু একইসাথে শার্লক হোমস ও রবিনহুড।'

'পুরাতত্ত্বের বর্ণনায় বিশেষণের ব্যবহার হয় না। কিন্তু মিস সাহিবা সাবিত পুরাতত্ত্বের ছাত্রী হয়ে যেভাবে বিশেষণের ব্যবহার করছেন, তা অবাক হওয়ার মত। যাক।'

বলে আহমদ মুসা হাত বাড়িয়ে দিল ড. মাহজুন মাজহারের দিকে।

আহমদ মুসার সাথে হ্যান্ডশেইক করে বলল, 'ইয়ংম্যান, বিশেষণ আসে আসলে মানুষ যা আশা করে, তার চেয়ে বেশি পাওয়ার ইমোশন থেকে। সব কথা ধরতে নেই। যাক, হাতেম তায়ী, শার্লক হোমস কিংবা রবিনহুড না হোক, বিপদের সময় যে কোন শুভাকাংক্ষীর উপস্থিতি মূল্যবান।'

'ধন্যবাদ স্যার। আপনাদের ঘটনার কথা শুনেছি। অনুমতি হলে আজকের কাগজগুলো আমি দেখতে চাই। জানতে চাই পুরো ঘটনা।' বলল আহমদ মুসা।

ড. মাহজুন মাজহার তাকাল মেয়ে সাহিবা সাবিতের দিকে।

সাহিবা সাবিত আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, 'আসুন স্যার।' বলে সাহিবা সাবিত হাঁটতে লাগল।

পেছনে আহমদ মুসাও।

ফ্যামিলি ড্রইংরুমের ওপাশে পরিবারের মিডিয়া রুম। সে রুমে টেলিভিশন, রেডিও, কম্পিউটার, সংবাদপত্র এবং ছোট ছোট ওয়াল-ক্যাবিনেটগুলোতে বাছাই করা কিছু বই।

দৈনিক কাগজগুলো নিয়ে বসলো আহমদ মুসা একটা টেবিলে।

'স্যার, আপনি বসুন। আমি ওদিকটা খোঁজ নিই। পুলিশ হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যেই আসবেন।' বলল সাহিবা সাবিত।

‘ঠিক আছে। পুলিশ এলে আমাকে একটু জানাবেন।’ আহমদ মুসা বলল।

‘শিওর স্যার। আপনার যে কোন সহযোগিতাকে ওয়েলকাম।’ বলল সাহিবা সাবিত।

বলেই ছোট একটা বাউ করে চলে গেল সাহিবা সাবিত।

কাগজগুলোর দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল আহমদ মুসা। স্বাধীন ও সবচেয়ে দায়িত্বশীল ইংরেজি দৈনিক Van Times দেখল। ‘ভ্যান পুরাতত্ত্ব মিউজিয়ামের মাউন্ট আরারাত সেকশনে রহস্যজনক হানা। ছয়জন প্রহরী সেনা নিহত। নিহত সন্ত্রাসীদের একজন।’

আহমদ মুসা শিরোনামটা পড়ার পর নিউজ পড়তে শুরু করলঃ

ভ্যান, ২ আগস্ট, রাত ৩টা। গত রাত দু’টায় ভ্যান পুরাতত্ত্ব মিউজিয়ামে এক দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী হানা হয়েছে। এই হানার কেন্দ্রবিন্দু ছিল মিউজিয়ামের মাউন্ট আরারাত সেকশন। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে কি ক্ষতি হয়েছে জানা যায়নি। সন্ত্রাসী-দুষ্কৃতিকারীদের আক্রমণে ছয়জন প্রহরী সেনা নিহত এবং ৮ জন আহত হয়েছে। হানাদারদের একজন নিহত হয়েছে ঘটনা শেষে পালাবার সময়। মিউজিয়ামের প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ মাউন্ট আরারাত সেকশনের বিশেষ তত্ত্বাবধায়ক ড. মাহজুন মাজহারের কোন গোপন ইনভলভমেন্ট এই ঘটনার সাথে যুক্ত থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

ঘটনার প্রাপ্ত বিবরণ ও অনুসন্ধান থেকে জানা গেছে, ঐতিহাসিক ভ্যান ক্যালিস প্রাসাদে প্রতিষ্ঠিত পুরাতত্ত্ব মিউজিয়ামে প্রবেশের জন্যে দুষ্কৃতিকারীরা তিন দিক থেকে অভিযান চালায়। এভেনিউয়ের পাশ ছাড়া এই তিন দিকেই পাহারা দেয়ার জন্যে সেনাক্যাম্প আছে। তিন ক্যাম্পে তিন শিফটে পাঁচ পাঁচ করে মোট পনের জন সৈনিক পাহারায় থাকতো। এভেনিউয়ের দিকের মূল গেটে দু’টি গার্ড বক্স। এর একটিতে পুলিশ অন্যটিতে মিউজিয়ামের নিজস্ব গার্ড সার্বক্ষণিক পাহারায় থাকতো।

দুষ্কৃতিকারীরা মূল গেট ছাড়া অন্য তিন দিক থেকে সন্তর্পণে ক্রলিং করে পাহারায় থাকা সেনাদের অলক্ষ্যে তাদের ক্যাম্প ঘিরে ফেলে অতর্কিতে তাদের

ওপর চড়াও হয়। সাইলেন্সার লাগানো অস্ত্রে তারা বেপরোয়া গুলি চালায়। এতে ৮ জন সেনা মারা যায়। আহতদের তারা বেঁধে মুখে টেপ পেস্ট করে দেয়। তারপর ধীরে-সুস্থেই যেন ভ্যান ক্যালিস প্রাসাদে প্রবেশ করে।

মিউজিয়ামের সব সিকিউরিটি ব্যবস্থা সম্পর্কে দুষ্কৃতিকারীরা অবহিত ছিল। ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা ও নেটওয়ার্কের একমাত্র সুইচটি ছিল মিউজিয়ামের রেক্টর ড. মাহজুন মাজহারের অফিস কক্ষে তার কম্পিউটার টেবিলের একটা গোপন স্থানে। সুতরাং তার অফিস কক্ষ বন্ধ থাকলে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা ও এ্যালার্ম সিস্টেমকে অকেজো করার কোন উপায় থাকে না। রেক্টরের রুম ডিজিটাল লক ব্যবহার ছাড়া অন্যকোন উপায়ে খুলতে গেলে প্রধান গেটের সিকিউরিটি এ্যালার্ম বেজে উঠবে। আর রেক্টরের অফিস কক্ষের ডিজিটাল লক যদি প্রথম প্রচেষ্টায় খুলতে না পারে, একাধিক চেষ্টা করতে যায়, তাহলেও প্রধান গেটের সিকিউরিটি এ্যালার্ম বেজে উঠবে। দুষ্কৃতিকারীরা এ সব কিছুই জানতো। তারা রেক্টরের অফিস কক্ষের ডিজিটাল লক ব্যবহার করেই তার অফিসে প্রবেশ করে এবং ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা, এ্যালার্ম নেটওয়ার্কের সুইচ অফ করে দেয়।

প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, দুষ্কৃতিকারীরা মিউজিয়ামের মাউন্ট আরারাত সেকশন ছাড়া অন্য আর কোন সেকশনে প্রবেশ করেনি। এমনকি 'গোল্ড এন্ড ডায়মন্ড' সেকশনেও প্রবেশ করেনি। সেখানে রয়েছে প্রায় আড়াই হাজার বছরের ভ্যান রাজবংশগুলোর স্বর্ণমুদ্রা ও গোল্ড-ডায়মন্ড অলংকারের নমুনা প্রদর্শনী। নমুনা প্রদর্শনী হলেও আজকের টাকায় তার মূল্য কোটি টাকা হবে। কিন্তু দুষ্কৃতিকারীরা সেদিকে যায়নি। তারা শুধুই প্রবেশ করেছে মাউন্ট আরারাত সেকশনে। এ সেকশনে আছে বিভিন্ন যুগে মাউন্ট আরারাতের ওপর লেখা পুরাতন সব পুস্তক- পুস্তিকা ও গ্রন্থের প্রদর্শনী। আর আছে সেখানে মাউন্ট আরারাতের ওপর তৈরি বিভিন্ন ধরনের, বিভিন্ন সময়ের ভিডিও এবং প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত বিভিন্ন মানচিত্র এবং ফটোগ্রাফের সংগ্রহ। মাউন্ট আরারাত সেকশনেও তারা ডিজিটাল লক ব্যবহার করে প্রবেশ করে। এ ডিজিটাল লকেরও কোড একমাত্র রেক্টর সাহেবই জানেন। আর এ কোড তিনি সংরক্ষিত রেখেছেন তার কম্পিউটারের গোপন ফাইলে।

মিউজিয়ামের আরারাত সেকশনে একটা অবাক ব্যাপার দেখা গেছে। সেটা হলো, সেকশনের সবগুলো জিনিস যেমন ছিল তেমনি আছে। চোর-ডাকাত ঢুকলে বা কোন কিছু খোঁজার জন্যে কেউ ঢুকলে যেমন একটা লণ্ডভণ্ড দশা হওয়ার কথা, তেমন অবস্থা নয়। দুষ্কৃতিকারীরা কেন ঢুকেছিল, কি নিয়ে গেছে, তা এখনও পরিষ্কার হয়নি। লগ দেখে সবকিছু মেলানোর পর বোঝা যাবে কি হারিয়েছে।

এই রক্তাক্ত ও দুঃসাহসিক ঘটনা কে বা কারা ঘটাল তা পরিষ্কার হয়নি। দুষ্কৃতিকারীদের যে একজন মারা গেছে, তাকে প্রাথমিকভাবে তুর্কি নাগরিক বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে মনে করা হচ্ছে, ঘটনা যে বা যারাই ঘটাক, মিউজিয়ামের রেক্টরের সহযোগিতা ছাড়া হয়নি। কারণ, রেক্টরের কক্ষের এবং মিউজিয়ামের মাউন্ট আরারাত সেকশনের ডিজিটাল লক খোলার ক্ষেত্রে তার সহযোগিতার বাইরে আর কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না। জানা গেছে, এই সন্দেহবশেই রাতেই ভ্যানের সম্মানিত প্রবীণ অধ্যাপক ও বিজ্ঞানী ড. মাহজুন মাজহারের বাড়ি পুলিশ ঘিরে ফেলেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে অভিজ্ঞ মহল বলছেন, কি সত্য বেরিয়ে আসবে তা পরে জানা যাবে, তবে এ সত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে ড. মাহজুন মাজহারের মত একজন সম্মানিত ব্যক্তিকে কোন প্রকার হয়রানি করা ঠিক হবে না। তিনি শুধুই একজন সম্মানিত ব্যক্তি নন, তার পরিবারও ঐতিহ্যবাহী। তুর্কি-আর্মেনীয় মিশ্র রক্তের এই পরিবারটির অবদান আছে ভ্যানের রাজনীতি ও ইতিহাসে। এই পরিবারটি অতীতেও দুর্ভাগ্যের শিকার হয়েছে। ড. মাহজুন মাজহারের একজন কৃতী পূর্বপুরুষ, ভ্যান শহরের জনপ্রিয় মেয়র বেড্রোম কাপামাসি গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হয়েছিলেন।

সর্বশেষ খবর:

আমাদের পত্রিকার তৃতীয় সংস্করণ ছাপার জন্যে যখন প্রেসে যাচ্ছে, তখন সর্বশেষ খবর হলো, মিউজিয়ামের মাউন্ট আরারাত সেকশন থেকে খৃস্টপূর্ব ৩শ’ অব্দের একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাপ হারিয়ে গেছে। এই ম্যাপটি তৈরি হয়েছিল সেই সময়ের ওরান্তি রাজবংশের তত্ত্বাবধানে। ভিন্ন ধরনের এক গ্রীষ্মকালে মাউন্ট আরারাতের সব দিকের, সব অংশের এই বিস্তারিত ম্যাপ তৈরি করেছিলেন

রাজসভার একজন ভূ-বিজ্ঞানী। মনে করা হচ্ছে, দুষ্কৃতিকারীরাই এই ম্যাপ নিয়ে গেছে।

কিন্তু একটা পুরানো ম্যাপের জন্য এতবড় রক্তাক্ত ও দুঃসাহসিক অভিযান পরিচালিত হওয়ায় সচেতন মহলে বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে।'

আহমদ মুসা রিপোর্টটি কয়েকবার পড়ল। তার নিশ্চিত মনে হলো, ভ্যান পুরাতত্ত্ব মিউজিয়ামের এই ডাকাতির সাথে উল্কিওয়ালা অর্থাৎ ড. আজদাদের প্রতিপক্ষ যারা, তাদের যোগ আছে। সব বাদ দিয়ে মাউন্ট আরারাতের মানচিত্র হারাবার কারণ এটাই। কিন্তু মানচিত্রটিতে কি ছিল? কেন তা এত মূল্যবান হলো? এ বিস্ময় আহমদ মুসার মনে সৃষ্টি হলো।

আর এই ডাকাতির সাথে ড. মাহজুন মাজহারের যোগ আছে বলে তার মনেই হলো না। ড. মাহজুন মাজহারের চেহারা দেখেই তার মনে হয়েছে, তিনি নির্দোষ। আর নিউজে তার অপরাধী হওয়ার যে ভিত্তির কথা বলা হয়েছে, তাও খুব ঠুনকো। অনুসন্ধান তো পরের কথা, সাধারণ যুক্তিতেই তা টিকবে না।

ভাবনাতেই আপনা-আপনি আহমদ মুসার চোখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পায়ের শব্দে চোখ খুলল আহমদ মুসা। দেখল, সাহিবা সাবিত আসছে।

সাহিবা সাবিতের হাসি-খুশি চেহারা গভীর উদ্বেগে ভরা। মুখ শুকনো। শুকনো কণ্ঠে আহমদ মুসার দিকে চেয়ে বলল, 'স্যার, আপনি কি ক্লান্ত? আপনার চোখ বুজে আসছে দেখলাম।'

'না মিস সাহিবা সাবিত, ঘুমাচ্ছিলাম না, ভাবছিলাম।' আহমদ মুসা বলল।

'কি ভাবছিলেন এত গভীরভাবে?' জিজ্ঞাসা সাহিবা সাবিতের।

'ভাবছিলাম মিউজিয়ামে ডাকাতির ঘটনা নিয়েই।' আহমদ মুসা বলল।

'দেখলেন তো ব্যাপারটা কি সাংঘাতিক! আর বাবাকে দায়ী করা হয়েছে কিভাবে? সূর্য পূর্বে না উঠে, পশ্চিমে উঠা সত্য ভাবতে পারি, কিন্তু ঘটনার সাথে বাবা বিন্দুমাত্র জড়িত আছেন তা বিশ্বাস করবো না। কিন্তু পুলিশকে এ কথা বিশ্বাস করাবে কে?'

বলে একটু থেমেই আবার বলা শুরু করল, 'স্যার, পুলিশের বড় কর্তা এসেছেন। আব্বাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। আপনি কি যাবেন ওখানে?'

'কে, কোন অফিসার এসেছেন?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'ভ্যানের পুলিশ প্রধান ডাইরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ মাহির হারুন এসেছেন। তিনি পুলিশের পূর্ব তুরস্ক মানে আনাতোলিয়া জোনেরও প্রধান।' বলল সাহিবা সাবিত।

'চল যাই, দেখি ওনারা কি আলোচনা করছেন।'

বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

'চলুন স্যার।' বলে হাঁটতে শুরু করল সাহিবা সাবিত।

নিচের তলার ড্রয়িং রুমে বসেছিল ভ্যানের পুলিশ প্রধান ডিজিপি মাহির হারুন।

একটি সোফায় বসেছিল মাহির হারুন। তার সামনের সোফায় সাহিবা সাবিতের বাবা ড. মাহজুন মাজহার বসেছিল। আরও দু'জন পুলিশ ডিজিপি মাহির হারুনের পেছনের সোফায় বসেছিল।

ড. মাহজুন মাজহারের ডানপাশের আড়াআড়ি সোফায় বসেছে ড. সাহাব নুরী ও ড. আজদা আয়েশা।

সাহিবা সাবিত পিতার পাশেই বসেছিল। সেখান থেকেই সে উঠে গিয়েছিল আহমদ মুসার কাছে।

দোতলা থেকে নামার সিঁড়ির গোড়াতেই বিশাল একটা লাউঞ্জ। সেটাই বাড়ির অতিথি ড্রইং রুম। এখানেই বসেছে পুলিশ এবং ড. মাহজুন মাজহাররা।

দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নামছিল আহমদ মুসা ও সাহিবা সাবিত।

সাহিবা সাবিত আগে ছিল। আর আহমদ মুসা নামছিল তার পিছে পিছে।

ভ্যান পুলিশের ডিজিপি মাহির হারুনের সোফাটা ছিল সিঁড়িমুখী।

পায়ের শব্দেই সম্ভবত ডিজিপি মাহির হারুন মুখ তুলে তাকাল সিঁড়ির দিকে।

সিঁড়ির ওপর তার চোখ পড়তেই চোখটি যেন চলে গেল আহমদ মুসার ওপর। সম্ভবত আহমদ মুসাকে পরিপূর্ণভাবে দেখা শেষ হতেই এক অপার

বিস্ময়ে ছেয়ে গেল তার মুখ। ধীরে ধীরে বিস্ময়ের বদলে তার চোখে-মুখে নেমে এল সমীহ এবং দেহে একটা জড়সড় ভাব।

আহমদ মুসা সিঁড়ি থেকে ফ্লোরে নেমে এসেছে।

ডিজিপি মাহির হারুন এবং ড. মাহজুন মাজহারের কাছাকাছি এসে গেছে আহমদ মুসা।

ডিজিপি মাহির হারুন অনেকটা সম্মোহিতের মত উঠে দাঁড়িয়েছে। অজান্তেই যেন পা ঠুকে স্যালুট দিল আহমদ মুসাকে। তার চোখে ভেসে উঠেছে, জেনারেল মোস্তফার মত তুরস্কের ডাকসাইটে সিকিউরিটি চীফ এবং নাজিম এরকেনের মত তুরস্কের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও রাশভারী পুলিশ প্রধানের কথা। এই মি. খালেদ খাকানের ব্যক্তিত্বের কাছে তারা যেভাবে নরম হয়ে পড়েছে এবং সব ব্যাপারে তাকে যেভাবে সমীহ করেছে, তাতে মি. খালেদ খাকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা তার জন্যে কঠিন।

স্যালুট দেয়ার পর ডিজিপি মাহির হারুন বলল, 'স্যার, আপনি এখানে!'

আহমদ মুসা ডিজিপি মাহির হারুনের সাথে হ্যান্ডশেইকের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আপনি নিশ্চয় ডিজিপি মাহির হারুন। কিন্তু আপনি কি আমাকে চেনেন? আমার তো তেমন কিছু মনে পড়ছে না?'

ডিজিপি মাহির হারুন একটু মাথা নুইয়ে হ্যান্ডশেইক করে বলল, 'স্যার, আপনি আমাকে চিনবেন না। কিন্তু আমি আপনাকে চিনি।'

'কিভাবে?' আহমদ মুসা বলল। কিছুটা বিস্মিত হয়েছে সে। আহমদ মুসা তো তুরস্কের এ অঞ্চলে কখনো আসেনি।

'স্যার, আমি ইস্তাম্বুলে গিয়েছিলাম তুরস্কের সিকিউরিটি প্রধান জেনারেল মোস্তফা কামালের সাথে দেখা করার জন্য। তিনি তখন ওখানেই ছিলেন। সেখানে জেনারেল মোস্তফার সাথে আপনাকে প্রথম দেখি। দ্বিতীয়বার দেখি আপনাকে আমাদের পুলিশ হেডকোয়ার্টারে। আমি আরও কয়েকজন পুলিশ অফিসারের সাথে আমাদের স্যার তুরস্কের পুলিশ প্রধান নাজিম এরকেনকে আপনাকে নিয়ে তার অফিসে ঢুকতে দেখেছিলাম। তৃতীয়বার দেখেছি আপনাকে প্রেসিডেন্ট ভবনে। তখন অফিসের এক কাজে আংকারা পুলিশ হেডকোয়ার্টারে গিয়েছিলাম

আমি। প্রেসিডেন্ট আপনাকে বিদায় সংবর্ধনা দেয়ার অনুষ্ঠান করছিলেন। সেসময় প্রেসিডেন্ট হাউজের লনে অন্য অনেকের সাথে আমিও ছিলাম।' বলল ডিজিপি মাহির হারুন।

'ধন্যবাদ অফিসার।' আহমদ মুসা বলল। সেই সাথে ভাবল, ডিজিপি মাহির হারুন এ কথা না বললেই ভালো হতো। কথাগুলো হাটে হাঁড়ি ভাঙার মত হয়েছে, যা এই পর্যায়ে আহমদ মুসার কাম্য ছিল না।

'এক্সকিউজ মি স্যার। আপনি তো বিশেষ বিমানে সেদিন ম্যাডামসহ মদিনায় ফিরে গেলেন। কিন্তু ভ্যানে কিভাবে এলেন আপনি?' বলল ডিজিপি মাহর হারুন।

আহমদ মুসা একটু হাসল। বলল, 'ম্যাডাম মদিনা গেছেন আর আমি ভ্যানে নেমেছি।'

বলে আহমদ মুসা ড. আজদা আয়েশাকে দেখিয়ে বলল, 'ওর একটা আহ্বানে আমি এখানে এসেছি।'

'ওয়েলকাম স্যার। আমাদের 'ভ্যান' ও আরারাত অঞ্চল সৌভাগ্যবান আপনাকে পেয়ে। আতিথ্য করার সুযোগ পেলে আমি ধন্য হবো স্যার।' বলল ডিজিপি মাহির হারুন।

'ধন্যবাদ অফিসার।'

বলে আহমদ মুসা একটা সিংগল সোফা পেছন থেকে টেনে নিয়ে বসতে যাচ্ছিল।

ডিজিপি মাহির হারুন তাড়াতাড়ি সরে দাঁড়িয়ে নিজের আসনে আহমদ মুসাকে বসতে আহ্বান জানিয়ে আহমদ মুসার হাত থেকে সোফাটি নিয়ে নিল।

আহমদ মুসা গিয়ে ডিজিপি'র সোফায় বসলে মাহির হারুন আহমদ মুসার পাশে এসে বসল।

সাহিবা সাবিত, ড. মাহজুন মাজহার, ড. সাহাব নুরী ও ড. আজদা সকলের মুখ বলা যায় বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গিয়েছিল। ডাকসাইটে পুলিশ অফিসার ডিজিপি হারুন তাদের আবু আহমদ আবদুল্লাহকে 'স্যার' বলছেন! তাকে স্যালুট করছেন! তাকে চেয়ার ছেড়ে দিচ্ছেন! তাদের আবু আহমদ আব্দুল্লাহকে

প্রেসিডেন্ট বিদায় সংবর্ধনা দিয়েছেন! তুরস্কের পুলিশ প্রধান নাজিম এরকেন ও তুরস্কের সিকিউরিটি সার্ভিসের প্রধান জেনারেল মোস্তফা তাদের আবু আহমদ আব্দুল্লাহকে নিয়ে বৈঠক করেন একান্তে! একি তারা শুনল! তাদের আবু আহমদ আব্দুল্লাহর নাম খালেদ খাকান! সব বিস্ময়ের সম্মিলিত ভারে তারা হতবাক, হতভম্ব। আহমদ মুসাকে চেয়ার দেয়ার কথাও তার ভুলে গেছে।

'স্যার. আপনি ভ্যানে এসেছেন জানলাম, কিন্তু হঠাৎ এখানে?' বলল ডিজিপি মাহির হারুন।

'আমি আরিয়াস থেকে ভ্যানে এসেছিলাম একটা কাজে। ড. মাহজুনরা ড. আজদাদের বন্ধু পরিবার। ড. মাহজুন মাজহারদের এই বিপদের কথা শুনে ড. আজদা, ড. সাহাব নুরী এসেছেন। আমিও তাদের সাথে এসেছি।' আহমদ মুসা বলল।

'স্যার, আমার জন্যে এক বিরাট সমস্যা। ড. মাহজুন মাজহার সম্মানিত পরিবারের একজন সম্মানিত ব্যক্তি। ভ্যান মিউজিয়ামের ভয়ানক ঘটনার দায় এড়াতে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের কোন যুক্তি তার কাছেও নেই দেখলাম। এই অবস্থায় আইনের দাবি তো আমাকে পূরণ করতেই হবে। এটা আমার জন্যে এক উভয় সংকট স্যার।' বলল ডিজিপি মাহির হারুন।

আহমদ মুসা ও ডিজিপি মাহির হারুনের কথা সবাই দারুণ আগ্রহে শুনছিল। ডিজিপি মাহির হারুনের শেষ বক্তব্যটা শুনে সাহিবা সাবিত ও ড. আজদাদের মুখ যেন অমাবস্যার অন্ধকারে ছেয়ে গেল। ডিজিপি মাহির হারুনের কথার অর্থ কি তারা বোঝে। আহমদ মুসার নতুন পরিচয় এবং ডিজিপির সাথে তার সম্পর্ক দেখে তারা যতখানি খুশি হয়ে উঠেছিল, ততখানিই তারা আবার হতাশায় ডুবে গেল।

ডিজিপির কথা শেষ হতেই আহমদ মুসা হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে উঠল। বলল ডিজিপি মাহির হারুনকে, 'এ বিষয়ে আমি আপনার সাথে পরে কথা বলছি। আপনি একটু বলুন, দুষ্কৃতিকারীদের যে লোকটি মারা গেছে, তার লাশ কোথায়?'

'সুরতহাল রিপোর্টের পরপরই লাশ পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।' ডিজিপি বলল।

‘লাশটি এখন কোথায় খোঁজ নিয়ে একটু জানবেন? লাশের একটা বিষয় সম্পর্কে আমার জরুরি জানা দরকার।’ বলল আহমদ মুসা।

‘বিষয়টা কি বলুন। জানার জন্যে চেষ্টা করে দেখি।’ ডিজিপি বলল।

‘লাশের দুই বাহু দেখতে বলুন তাতে কোন উল্কি আঁকা আছে কিনা। থাকলে উল্কিটা কিসের?’ বলল আহমদ মুসা।

ডিজিপি মাহির হারুন তার মোবাইল বের করে কল করল সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসারকে। কানেকশন হয়ে গেলে ডিজিপি বিষয়টি অফিসারকে বুঝিয়ে বলে নির্দেশ দিল, ‘বিষয়টি জেনে অবিলম্বে আমাকে জানাও।’

মোবাইল অফ করে পেছনে বসা পুলিশ অফিসারদের কয়েকটি নির্দেশ দিয়ে আহমদ মুসার দিকে ঘুরতেই ডিজিপি মাহির হারুনের মোবাইল আবার বেজে উঠল।

কল অন করে ওপারের কথা শুনে বলল, ‘তুমি নিশ্চিত তো?’

ওপারের জবাব শুনে ‘থ্যাংক ইউ অফিসার’ বলে কল অফ করে দিল। তার মুখটা সাফল্যে উজ্জ্বল।

ডিজিপি আহমদ মুসার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল, ‘স্যার, আপনি যা চাচ্ছিলেন, তা পাওয়া গেছে। লাশের ডান বাহুতে উল্কি আছে, মাউন্ট আরারাতের সিম্বলিক উল্কি।’

‘ধন্যবাদ অফিসার, আমি এটাই আশা করছিলাম। এই একই গ্রুপ ভ্যান মিউজিয়ামের মাউন্ট আরারাত সেকশনে ঢুকেছিল।’ আহমদ মুসা বলল।

‘স্যার, আমি বুঝতে পারছি না এরা কোন গ্রুপ?’ বলল ডিজিপি মাহির হারুন।

‘আমিও জানি না। আমি এটা বের করার চেষ্টা করছি। তবে উল্কিটাই এদের আইডেনটিফাইং মার্ক। এই গ্রুপই ড. আজদাকে এ পর্যন্ত একবার কিডন্যাপ ও দু’বার হত্যার চেষ্টা করেছে। এ খবর পত্রিকাতেও এসেছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘জ্বি স্যার, এ রক্তাক্ত ভয়ানক ঘটনার খবর আমি পত্রিকায় পড়েছি।’

বলে একটু থামল ডিজিপি হারুন। পরক্ষণেই আবার বলে উঠল, 'স্যার, আজদাকে বারবার আক্রমণ করা এবং মিউজিয়ামের আরারাত সেকশনে হানা দেয়া সন্ত্রাসীরা একই গ্রুপ, কিন্তু লক্ষ্যের সাজুয্য কোথায়? এরা কি চায়?'

'অফিসার, এটাই এখনকার সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। এর সাথে সহযোগী প্রশ্নগুলো হলো, এরা মাউন্ট আরারাতের উল্কি বাহুতে লাগায় কেন? এরা মিউজিয়ামের মাউন্ট আরারাত সেকশনে হানা দিয়ে মাউন্ট আরারাতের একটা পুরানো মানচিত্র নিয়ে গেল কেন? তারা আরিয়াসসহ ইজডির অ্যাগ্রি, কারস, ভ্যান বিশেষ করে মাউন্ট আরারাত সন্নিহিত ইজডির এলাকা থেকে অত্যন্ত নীরবে বিশেষ ধরনের লোকদের জেল-জুলুমের শিকার বানিয়ে এলাকা ছাড়া করে এবং সে স্থানে বিশেষ শ্রেণীর লোকদের বসানো হচ্ছে কেন? সব প্রশ্নেরই জবাব প্রয়োজন।' আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসার কথা শেষ হলেও কথা সরলো না ডিজিপি মাহির হারুনের মুখ থেকে। তার বিস্ময় দৃষ্টি আহমদ মুসার দিকে। সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে, মাত্র ক'দিন হলো আহমদ মুসা এসেছে, এর মধ্যেই ভয়ানক ধরনের এত কথা জানল কি করে, যা সে এই অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক পুলিশ অফিসার হয়েও জানে না! বলল সে একটু সময় নিয়ে, 'স্যার, মাত্র কয়েকটা বাক্যে আপনি এই অঞ্চলের একটা ভয়ংকর চিত্র তুলে ধরেছেন। দুঃখিত স্যার, এভাবে আমি বিষয়টাকে জানি না। একটা ঝামেলা এই এলাকায় হচ্ছে, ড্রাগ সমস্যা হঠাৎ করেই যেন এই এলাকায় বেড়ে গেছে। পুলিশ এ সংক্রান্ত সব ঘটনাকেই সিরিয়াসলি দেখছে। কিন্তু এ সবের পেছনে কোন গভীর অর্থ বা গভীর ষড়যন্ত্র আছে কিনা তা আমার সামনে নেই, পুলিশ অবশ্যই জানে না। তবে স্যার, আপনি যখন বলছেন, তখন এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বিশেষ শ্রেণীর উচ্ছেদ হওয়া এবং বিশেষ এক শ্রেণীর পুনর্বাসিত হওয়ার যে কথা বলেছেন, তার পেছনের উদ্দেশ্য কি?'

'এই উদ্দেশ্য অনুসন্ধানের বিষয়।' বলল আহমদ মুসা।

'এ নিয়ে আপনি কি ভাবছেন স্যার? আমার মনে হয়, আপনি বিষয়টিকে টেকআপ করেছেন।' ডিজিপি মাহির হারুন বলল।

‘আমি আপনাদের সাহায্য করতে চাই। বিষয়টি নিয়ে আমি এখনও খুব চিন্তা-ভাবনার সুযোগ পাইনি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘স্যার, আপনি বিষয়টি দেখুন। আমরা আপনাকে সহযোগিতা করব।’

‘ধন্যবাদ অফিসার। এ নিয়ে আপনার সাথে পরে কথা বলব। এখন বলুন, ভ্যান মিউজিয়ামে হানা দেয়া সম্পর্কে। ড. মাহজুন মাজহারকে আপনাদের দোষী মনে হচ্ছে কেন?’ বলল আহমদ মুসা।

‘স্যার, দোষী মনে করা হচ্ছে না, দোষী হয়ে পড়ছেন। তার অফিস কক্ষে ঢুকেই এ্যালার্ম নেটওয়ার্ক ও ক্লোজ সার্কিট নেটওয়ার্ক নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। আর তার অফিস কক্ষের এবং মিউজিয়ামের আরারাত সেকশনে প্রবেশের ডিজিটাল লকের কোড একমাত্র তিনিই জানেন। অতএব দায়গুলো তার ওপরই বর্তাচ্ছে।’ ডিজিপি মাহির হারুন বলল।

আহমদ মুসার ঠোঁটে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল। বলল ড. মাহজুন মাজহারের দিকে চেয়ে, ‘স্যার, আপনাদের মিউজিয়ামের ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা মিউজিয়ামের কতটা কভার করে?’

‘মিউজিয়ামের সবটা কভার করে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা। এমনকি কম্পাউন্ডের ভেতর যে কয়জন স্টাফ বাস করেন, তাদের এলাকাও ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার চোখের আওতায় রয়েছে।’ বলল ড. মাহজুন মাজহার।

‘ধন্যবাদ, আপনার অফিস কক্ষ ও মিউজিয়ামের মাউন্ট আরারাত সেকশনের বাইরের দরজা এলাকা এবং ভেতরের অবস্থান কি ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার চোখে রয়েছে?’ আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

‘জ্বি, সবটাই ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার আওতায়।’ বলল ড. মাহজুন মাজহার।

‘ধন্যবাদ স্যার’ বলে আহমদ মুসা তাকাল ডিজিপি মাহির হারুনের দিকে। বলল, ‘আমি বলছি, শুনুন প্লিজ। ভ্যান মিউজিয়ামের রেক্টর ড. মাহজুন মাজহার প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে তার তর্জনী দিয়ে ডিজিটাল কী’তে নক করে দরজা খোলেন এবং প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে একইভাবে ডিজিটাল লকের কী’তে তর্জনী দিয়ে নক করে দরজা বন্ধ করেন। প্রতিদিনই ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার

চোখ নিখুঁতভাবে প্রত্যক্ষ করে এবং সে নিখুঁত ছবিটি পাঠিয়ে দেয় সিকিউরিটি কক্ষের স্ক্রীনে। যারা সেখানে বসেন, তারা এটা প্রত্যক্ষ করেন এবং ছবিগুলো সিরিয়াসলি সংরক্ষিত হয় ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার আর্কাইভ ফাইলে। সিকিউরিটি রুমে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার ডিসপ্লে স্ক্রীন যারা দেখেন, তারা ইচ্ছা করলে ড. মাহজুন মাজহার তর্জনী দিয়ে অফিস কক্ষ ও মাউন্ট আরারাত সেকশনের ডিজিটাল লকের যে নব বা কীগুলোতে নক করেন, তা মুখস্থ করে ফেলতে পারে। আবার প্রতিদিনের যে ছবিগুলো ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার আর্কাইভে জমা হয়, তা থেকেও ইচ্ছা করলে কেউ সংশ্লিষ্ট ছবিগুলো সংগ্রহের মাধ্যমে ড. মাহজুন মাজহারের অফিস কক্ষ ও মাউন্ট আরারাত সেকশনের ডিজিটাল লকের ওপেনিং ও ক্লোজিং কোড নাম্বার করায়ত্ত্ব করতে পারে। যারা পরিকল্পনা করে ভ্যান মিউজিয়ামে রক্তাক্ত হানা দেয়ার কাজ করেছে, তারা এই দুই উৎস থেকে ডিজিটাল লক দু'টোর ওপেনিং ও ক্লোজিং কোড নাম্বার জোগাড় করতে অবশ্যই পারে। সিকিউরিটি সিস্টেমে এই লুক হোলস থাকার পর ড. মাহজুন মাজহারকে দোষ দেবার কোন সুযোগ নেই।' থামল আহমদ মুসা।

ডিজিপি মাহির হারুন দুই চোখ ছানাবড়া করে তাকিয়ে আছে আহমদ মুসার দিকে। তার মনে তোলপাড়। সত্যি তো, এ দিকটা তো তারা বিবেচনা করে দেখেনি। ডিজিটাল লক দু'টির সিক্রেট কোড এই দুই পথে ফাঁস হওয়া যতটা সহজ, ড. মাহজুন মাজহারকে দোষী বানানো ততটাই কঠিন। তার মন খুশি হয়ে গেল। সে বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, 'স্যার, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি চিন্তার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ খুলে দিয়েছেন। সত্যি বলেছেন, সিকিউরিটি সিস্টেমে এই লুক হোলস থাকার পর ড. মাহজুন মাজহারকে কিছুতেই দায়ী করার সুযোগ নেই।'

বলেই ডিজিপি মাহির হারুন পেছন ফিরে ভ্যান শহরের ডাইরেক্টর অব পুলিশ (ডিপি) আফেনদি আফেটকে লক্ষ্য করে বলল, 'তুমি ভ্যান মিউজিয়ামের ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার মনিটরিং কক্ষসহ গোটা সিকিউরিটি অফিসে গত ছয় মাসে সিভিলিয়ান যারা প্রবেশ করেছেন, তার সব ফিল্ম সিজ করো। আর ক্লোজ সার্কিট নেটওয়ার্কের ফিল্ম আর্কাইভও তুমি বাজেয়াপ্ত করো। তারপর সিরিয়াসলি

পরীক্ষা করে দেখ, কোন অংশ খোয়া গেছে কিনা, খোয়া গেলে খোয়া যাওয়া অংশটা কি?'

কথা শেষ করে ঘুরে বসল ডিজিপি মাহির হারুন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে ড. মাহজুন মাজহারকে লক্ষ্য করে বলল, 'আমাদের মাফ করুন স্যার। আপনাকে এভাবে হয়রানি করার জন্যে দুঃখিত আমরা। এই সাথে আমরা শুকরিয়া আদায় করছি আমাদের সম্মানিত অতিথি খালেদ খাকানকে। তিনি আমাদের যে সহযোগিতা করেছেন তা অমূল্য। আর তিনি শুধু আমাদের কেন, সমগ্র তুরস্কের সম্মানিত বন্ধু। খোদ আমাদের প্রেসিডেন্ট তাকে অভিনন্দিত ও সম্মানিত করেছেন। আমরা আনন্দিত যে, আল্লাহ তাকে এখানে এনেছেন। আমাদের আশা, তার সবরকম সাহায্য-সহযোগিতা আমরা পাব।' থামল ডিজিপি মাহির হারুন।

'ধন্যবাদ অফিসার, এটা কোন হয়রানি নয়। আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন। রক্তাক্ত ও রহস্যপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে আমার প্রতিষ্ঠানে। আপনারা যা করেছেন, করছেন সবই আমাদের প্রতিষ্ঠান ও দেশকে সাহায্যের জন্যেই। আমার সম্মানিত অতিথি আবু আহমদ আব্দুল্লাহকে ধন্যবাদ দেবার কোন ভাষা আমার জানা নেই। প্রেসিডেন্ট যাকে অভিনন্দিত করেন, যার প্রশংসা করেন, তার ব্যাপারে আমি আর কি বলব। তিনি আমাকে বিস্মিত, অভিভূত করেছেন। আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি ড. সাহাব নুরী ও ড. আজদাকে। তারাই এই সম্মানিত মেহমানকে এখানে এনেছিলেন। আমি মনে করি, এই রক্তাক্ত ঘটনার ব্যাপারে তার যে দূরদৃষ্টি ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দেখলাম, তাতে আমি নই, পুরো দেশই উপকৃত হবে। আল্লাহ তাকে এবং আমাদের সবাইকে সাহায্য করুন।' থামল ড. মাহজুন মাজহার।

ড. সাহাব নুরী ও ড. আজদার চোখে-মুখে গর্ব ও আনন্দের মিশ্রণ। আর তরুণী সাহিবা সাবিতের সুন্দর মুখ অপার মুগ্ধতায় আরও অপরুপ হয়ে উঠেছে। অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা তার মুগ্ধ দৃষ্টি থেকে শ্রদ্ধা, সম্মানের যেন বন্যা ছুটছে আহমদ মুসার প্রতি। উজাড় করে দিচ্ছে যেন তার হৃদয়কে। নির্বাক সে।

‘দুঃখিত, ঘটনা যা নয় তা বলা সুবিচার নয়, বিব্রতকর। আমি যদি উল্লেখযোগ্য কিছু করে থাকি, বলে থাকি, তার সব কৃতিত্বই আল্লাহর, আমার স্রষ্টার। আমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, মেধা, শক্তি যাকে আমাদের বলি, তা আমাদের নয়, আল্লাহর দেয়া। সুতরাং প্রশংসা আমাদের তাঁরই করা উচিত।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ধন্যবাদ স্যার, এটাও আমাদের জন্যে বড় শিক্ষা। মনে রাখব স্যার। আমরা উঠি।’

বলে উঠে দাঁড়াল ডিজিপি মাহির হারুন।

তারপর আহমদ মুসার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে হ্যান্ডশেইক করতে করতে বলল, ‘স্যার, আমার অফিসে, আমার বাড়িতে আপনাকে ওয়েলকাম। আর আপনার সাথে যোগাযোগ রাখার অনুমতি দিন স্যার।’

‘ধন্যবাদ অফিসার! ড. আজদার কাছে আমার টেলিফোন নাম্বার পাবেন। আর আমার চেয়ে আপনাকেই আমার বেশি দরকার হতে পারে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘সে হবে আমার সৌভাগ্য স্যার।’ বলে সালাম দিয়ে ডিজিপি মাহির হারুন ঘুরে দাঁড়াল যাবার জন্যে।

ড. আজদা তাড়াতাড়ি উঠে এসে আহমদ মুসার টেলিফোন নাম্বার লেখা একটা স্লীপ ডিজিপি মাহির হারুনের হাতে তুলে দিল।

ধন্যবাদ ড. আজদা।’ কাগজটি হাতে নিয়ে বলল ডিজিপি মাহির হারুন।

পুলিশ অফিসাররা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

‘সাহাব, আজদা তোমাদের নাস্তা করা হয়নি নিশ্চয়? তোমরা তো খুব সকালে বেরিয়েছ।’ পুলিশ অফিসাররা বেরিয়ে যেতেই বলল ড. মাহজুন মাজহার।

‘ঠিক, নাস্তার কথা আমাদের খেয়ালই হয়নি। তবে এ নিয়ে ব্যস্ত হবেন না।’ বলল ড. সাহাব নুরী সপ্রতিভ কণ্ঠে।

‘আমরাও নাস্তা করিনি। ঠিক আছে, চল ওপরে যাই।’ বলল ড. মাহজুন মাজহার।

'নাস্তা তৈরি হচ্ছে বাবা। আমি একবার ওপরে গিয়ে দেখে এসেছি।' বলল সাহিবা সাবিত।

আহমদ মুসা বলল, 'নাস্তার তুর্কি সময় এখনও হয়নি। ৯টা বাজতে এখনও অনেক সময় বাকি। আমি কাগজ পড়া শেষ করতে পারিনি।'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ড. মাহজুন মাজহার বলল, 'হ্যাঁ, ঠিক তাই। ৯টা বাজতে এখনও আধা ঘণ্টা বাকি।'

থামল একটু, আবার বল সাহিবা সাবিতের দিকে তাকিয়ে, 'মা, ওকে স্টাডিতে নিয়ে যাও। আমরা আসছি। একসাথে নাস্তা করব।'

সাহিবা সাবিত খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে কয়েক ধাপ আহমদ মুসার দিকে এগিয়ে বলল, 'স্যার, আসুন।'

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

দু'জন এগোতে শুরু করেছে দু'তলায় উঠার সিঁড়ির দিকে।

ড. আজদা ডাকল সাহিবা সাবিতকে।

'এক্সকিউজ মি!' বলে ছুটে এল সাহিবা সাবিত ড. আজদার কাছে। ড. আজদা তাকে কানে কানে কিছু বলল, 'রাঙা' হয়ে গেল সাহিবা সাবিতের মুখ। 'ওকে!' বলে ছুটেই আবার ফিরে গেল আহমদ মুসার কাছে।

দু'জনে আবার হাঁটতে লাগল সিঁড়ির দিকে।

সামনে হাঁটছে সাহিবা সাবিত।

ঘাড় ফিরিয়ে সাহিবা সাবিত বলল, 'স্যার, একটা কথা বলি?'

'বলুন।' বলল আহমদ মুসা।

'বাঃ আবার আপনিতে উঠলাম! তখন স্টাডিতেই তো আমাকে তুমিতে নামিয়েছেন।' বলল সাহিবা সাবিত। তার মুখে দুষ্টুমির হাসি।

'বলেছি নাকি! ঠিক আছে, কি বলবে বল।' নির্বিকার কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

'আমি বলতে চাচ্ছি, বিশ্ববিখ্যাত চরিত্র 'শার্লক হোমস', 'রবিনহুড' যেমন তাদের আসল নাম নয়, তেমনি 'আবু আহমদ আব্দুল্লাহ' ও 'খালেদ খাকান' কোনটাই আপনার আসল নাম নয়!' সাহিবা সাবিত বলল।

‘‘শার্লক হোমস’ ও ‘রবিনহুড’ সেই লোকদের আসল নাম ছিল কিনা আমি জানি না। কিন্তু আমাকে তোমার সন্দেহ হওয়ার কারণ?’ বলল আহমদ মুসা। তার চোখে কিছুটা বিস্ময়।

‘ডিজিপি সাহেব আপনার নাম বললেন খালেদ খাকান, আর আমাদের কাছে আপনার নাম আবু আহমদ আব্দুল্লাহ। তার মানে, তুরস্কের ওমাথা থেকে এমাথায় এসেই আপনি নাম পাল্টেছেন তাহলে ওমাথাতেও আপনি নাম পাল্টেছেন?’ সাহিবা সাবিত বলল।

‘চমৎকার যুক্তি দিয়েছ সাহিবা সাবিত। তোমার ওকালতি পড়া দরকার ছিল।’ বলল আহমদ মুসা। তার মুখে এবার স্পষ্ট হাসি।

‘কথা অন্য দিকে ঘোরাবেন না প্লিজ স্যার, আমার কথার জবাব দিন।’ সাহিবা সাবিত বলল।

‘তুমি একটা জটিল প্রশ্ন করেছ। প্রশ্নটির উত্তর দেয়া এখন সম্ভব নয়।’ বলল আহমদ মুসা।

‘জটিল প্রশ্ন? আসল নাম বলা জটিল হবে কেন? আমি এ যুক্তি মানছি না।’ সাহিবা সাবিত বলল। হালকা জেদ ফুটে উঠল সাহিবা সাবিতের কণ্ঠে।

‘জটিলতা আছে। অনেক সময় নানা কারণে নাম গোপন করতে হয়। মানে এটা তেমনই একটা সময়।’ বলল আহমদ মুসা। গম্ভীর কণ্ঠ তার।

সাহিবা সাবিত পেছন দিকে ফিরে আহমদ মুসার দিকে তাকাল। আহমদ মুসাকে বোঝার চেষ্টা করছে যেন।

‘ঠিক আছে, এই সময়ের জন্যে মানলাম, সব সময়ের জন্যে নয়।’ সাহিবা সাবিত বলল। তার মুখে হাসি।

তারা স্টাডি রুমে পৌঁছে গিয়েছিল।

আহমদ মুসা তার আগের চেয়ারেই বসল।

‘স্যার, আপনি একটু বসুন, আমি আসছি।’ বলে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে সাহিবা সাবিত।

আহমদ মুসা ‘ভ্যান টাইম’ আগেই পড়েছিল। এবার ভ্যানের আরেকটি বড় পত্রিকা ‘ভ্যান-এক্সপ্লোরার’ টেনে নিয়ে তাতে মনোযোগ দিল।

একসময় ঘরে পায়ের শব্দে মুখ তুলল আহমদ মুসা। দেখল সাহিবা সাবিতকে নতুন রূপে। পরনে হালকা সবুজ সালওয়ার এবং সেই হালকা সবুজ ফুলহাতা কামিজ। একই রঙের ওড়না মাথা ও গায়ে পেঁচানো। নতুন পোশাকের ওপর আহমদ মুসার চোখ আটকে গিয়েছিল।

'স্যার কেমন লাগছে বলুন।' মুখ ভরা হাসি নিয়ে বলল সাহিবা সাবিত।

'একজন মুসলিম মেয়ের মত লাগছে।' বলল আহমদ মুসা গম্ভীর কণ্ঠে।

'তার মানে, আগে আমি মুসলিম মেয়ে ছিলাম না?' বলল সাহিবা সাবিত প্রতিবাদের কণ্ঠে।

'তুমি মুসলিম ছিলে, কিন্তু মুসলিমের মেয়ে ছিলে না।' আহমদ মুসা বলল।

'ইসলামের কি কোন কম্পালসারি ড্রেসকোড আছে?' জিজ্ঞাসা সাহিবা সাবিতের। সে আহমদ মুসার মুখোমুখি এসে বসেছে।

''ড্রেস কোড' বলতে অনেকটা ইউনিফর্ম ড্রেস বোঝায়। সে রকম কোন ড্রেস কোড ইসলামে নেই। ইসলাম একটা প্রিন্সিপাল বলে দিয়েছে। বলেছে, মেয়েদের তাদের সৌন্দর্যের স্থানগুলোকে ঢেকে রাখতে হবে।' বলল আহমদ মুসা।

সাহিবা সাবিতের মুখটা একটু রাঙা হয়ে উঠল। একটু ভাবল। বলল, 'এই হুকুম ছেলেদের ওপর নেই কেন?'

'ছেলেদের সম্পর্কেও বলা হয়েছে। তাদের পোশাক হাঁটুর ওপরে উঠতে পারবে না। তবে 'সৌন্দর্যের স্থানগুলো ঢাকতে হবে'-এই ধরনের নির্দেশ ছেলেদের ক্ষেত্রে নেই।' আহমদ মুসা বলল।

'এই নির্দেশের কথাই আমি বলছি স্যার। এমন নির্দেশ মাত্র মেয়েদের ক্ষেত্রে আসবে কেন?' বলল সাহিবা সাবিত।

'এর পক্ষে অনেক যুক্তি, অনেক কথা আছে। আমি মাত্র একটা সহজ যুক্তির কথা বলব সাহিবা।'

বলে একটু থেমেই আবার বলা শুরু করল, ‘সুন্দর ও মূল্যবান জিনিস আড়াল করতে হয় অন্যের নজর থেকে। কারণ, অন্যের লোভ অনর্থের সৃষ্টি করতে পারে। মেয়েরা বা মেয়েদের সৌন্দর্য তেমনি একটা বস্তু যা আড়াল করতে হয়।’

‘যুক্তিটা বুঝলাম স্যার। কিন্তু ছেলেদের সৌন্দর্য আড়াল করতে হবে না কেন? তা কি লোভের বস্তু নয়?’ বলল সাহিবা সাবিত।

‘তোমার প্রশ্ন খুবই সংগত সাহিবা সাবিত। কিন্তু সমস্যা হলো, পুরুষরা নিজেদের রক্ষা করতে পারে, মেয়েরা তাদের রক্ষা করতে পারে না। আরেকটা বড় বিষয় হলো, মেয়েরা এই বিষয়ে পুরুষদের ওপর আক্রমণাত্মক নয়। অন্যান্য জীবজগতেও দেখবে, এটাই সত্য। প্রকৃতিগতভাবেই মেয়ে প্রজাতি এই ক্ষেত্রে নন-এ্যাগ্রেসিভ, সংরক্ষণবাদী। অন্যদিকে এক্ষেত্রে পুরুষরা একেবারেই উল্টো। নারীরা, নারীদের সৌন্দর্য পুরুষদের শুধু আক্রমণ নয়, ভায়োলেন্সেরও শিকার হয়। প্রাচীন, আধুনিক সব ইতিহাস এ ধরনের ঘটনায় ভরপুর। সুতরাং নারী ও নারীর সৌন্দর্য প্রয়োজন অনুযায়ী আড়াল করা তাদের এবং সমাজের জন্যে কল্যাণকর।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আপনার সব যুক্তি মানলাম স্যার। কিন্তু সব মানুষ খারাপ নয়, বরং বেশিরভাগই ভালো। ইতিহাস এরও সাক্ষী। তাহলে কিছু খারাপ লোকের কারণে মেয়েদের জন্যে এত আয়োজন করতে হবে কেন?’ সাহিবা সাবিত বলল।

‘নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে এমন ভালো মানুষ অনেক আছে, আবার অনেকে আছে যারা সুযোগ ও সাহসের অভাবে ভালো থাকে, কিন্তু শয়তান যেহেতু আছে, শয়তানী প্রবণতা থেকে কোন মানুষই মুক্ত নয়। এই কারণেই আল্লাহ সাবধান হওয়ার বিধানকে সাধারণ করে দিয়েছেন। এ বিধানের যৌক্তিকতার আরেকটা দৃষ্টান্ত দেখ, চোর সমাজের ক’জন, অপরাধী সমাজের ক’জন, কিন্তু দেখ, সাধারণভাবে সবার জন্যে আইন তৈরি হয়েছে। আইন সবাইকেই পাহারা দেয়। মেয়েদের সৌন্দর্য আড়ালের ব্যাপারটাও এরকমই।’

আহমদ মুসা কথা শেষ করল।

কিন্তু কোন কথা এল না সাহিবা সাবিতের কাছ থেকে। ভাবছিল সে। তার চঞ্চল চোখ দু’টিতে অনেক প্রশ্ন। বলল, ‘স্যার, আপনি যা আমাকে বললেন,

আমার ২৪ বছর বয়সে, আমার বাবা তা আমাকে বলেননি কেন? আমার বাবার মত লাখো বাবা তো এটা বলেন না! কেন বলেন না? জ্ঞান-শিক্ষায় তারা তো সমাজের শীর্ষে!'

'সাহিবা সাবিত, বিষয়টা বুঝতে সমাজ-সভ্যতার গভীরে আমাদের প্রবেশ করতে হবে। সভ্যতা-সংস্কৃতির একটা চরিত্র আছে। যে জাতি রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যখন শীর্ষে পৌঁছে, তখন চারপাশে অন্যজাতির ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তার রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তখন আধিপত্যের অধীন জাতিগুলোর জীবনে আধিপত্যকারীদের শিক্ষা-সংস্কৃতিই প্রভাবশীল হয়ে থাকে। সেটাই হয়েছে আমাদের জীবনে, মুসলিম দেশগুলোতে। এটা আধিপত্যবাদী শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রবল স্রোত। এই স্রোতেই ভেসে যাচ্ছে সবাই। এককভাবে বাবাদের কোন দোষ নেই।' আহমদ মুসা বলল।

'স্রোত আপনাকে ভাসাতে পারেনি কেন?' জিজ্ঞাসা সাহিবা সাবিতের।

'চাইনি বলে।' আহমদ মুসা বলল।

সাহিবা কিছু বলতে যাচ্ছিল। স্টাডিতে প্রবেশ করল ড. আজদা। বলল, 'নাস্তা রেডি। সবাই নাস্তার টেবিলে গেছে।'

'চলুন স্যার।' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে সাহিবা সাবিত তাড়া দিল আহমদ মুসাকে।

নাস্তার টেবিলে সবাই বসল।

সাহিবা সাবিতের দিকে তাকিয়ে ড. মাহজুন মাজহার কিছুটা বিস্ময় নিয়ে বলল, 'সাহিবা সাবিত মা, জন্মের পর এই প্রথম তোমাকে এই পোশাকে দেখলাম। হঠাৎ এই পোশাক?'

'বাবা, আমি মুসলিম মেয়ে হয়েছি। দেড় দু'ঘন্টায় বাবা আমি স্যারের কাছে অনেক কিছু শিখেছি। আরও শিখতে চাই বাবা।' বলল সাহিবা সাবিত।

'ধন্যবাদ মা। আমি ও তোমার মা একসাথে তোমাকে নিয়ে এই ধরনের কয়েক সেট পোশাক তৈরি করে দিয়েছিলাম। বোধহয় পোশাকগুলো পরাই হয়নি।' বলল মাহজুন মাজহার।

‘হ্যাঁ, বাবা তখন পোশাক তৈরি হয়েছিল, কিন্তু মন তৈরি হয়নি।’ হেসে বলল সাহিবা সাবিত।

ড. মাহজুন মাজহারের ঠোঁটেও মিষ্টি হাসি। বলল, ‘মনটা তৈরি হলো কখন মা?’

‘আজদা কিছুক্ষণ আগে আমাকে বলল, আমাদের মেহমান এ ধরনের পোশাক পছন্দ করেন না, আর এ পোশাক পরেই তুমি তার সামনে ঘুরছ। আমি ওকে নিয়ে ওপরে এলাম। এসেই পোশাক পাল্টে ফেললাম। কিন্তু মনটা পাল্টে দিয়েছেন উনি।’ বলল সাহিবা সাবিত। তার মুখে আবেগ-রাঙা হাসি।

‘পাল্টে দিয়েছেন? মন কি দু’এক মিনিটে পাল্টাবার জিনিস?’ বলল ড. আজদা। তার ঠোঁটে দুষ্টুমির হাসি। মনে হয় ঠোঁটের পেছনে যেন আরও কথা আছে।

‘কি বল আজদা! এক পলকের দেখা, একটা কথাতেও মনে ওলট-পালট ঘটে যেতে পারে।’ সাহিবা সাবিত বলল।

ড. আজদা কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল। কিন্তু তার আগেই ড. মাহজুন মাজহার বলল, ‘আলহামদুলিল্লাহ, এটাই হোক। মনে হচ্ছে, আমার মনের একটা অব্যক্ত চাওয়া যেন পূরণ হলো। এ চাওয়াটা আমার কাছেও যেন খুব স্পষ্ট ছিল না। আজ তোমাকে এই সুন্দর পোশাকে দেখে মনটা যখন আমার খুশিতে ভরে গেছে, তখন বুঝতে পারছি, আমার মন এটাই চাইতো।’

‘ধন্যবাদ বাবা।’ বলল সাহিবা সাবিত।

‘ধন্যবাদ আমাকে নয় মা, কৃতজ্ঞ হও আবু আহমদ আব্দুল্লাহর কাছে। উনি যেন এক পরশমণি। ওনার পরশে ঘটনা পাল্টে যায়, মানুষও পাল্টে যায়।’

আহমদ মুসার চোখে-মুখে অস্বস্তি। বলল, ‘গরম সুন্দর নাস্তা কিন্তু আমরা নষ্ট করে ফেলছি।’

‘স্যরি, ঠিক বলেছেন জনাব আব্দুল্লাহ। আসুন আমরা শুরু করি।’

বলেই প্লেট টেনে নিয়ে কাঁটা চামচ হাতে নিল ড. মাহজুন মাজহার।

সবাই নাস্তার দিকে মনোযোগ দিল।

নাস্তা শেষে সবাই কফি খাচ্ছে ড্রইং রুমে সোফায় ফিরে গিয়ে।

ড. আজদা চারদিকে চাইল। দেখল, সাহিবা সাবিত নেই। কফি তো নিল সে। কোথায় গেল কফি নিয়ে?

কফি হাতে নিয়েই খুঁজতে বেরুল সাহিবা সাবিতকে ড. আজদা।

সাহিবা সাবিতকে পেল ড. আজদা ড্রইং রুমের পাশের একটা ঘরে।

সাহিবা সাবিতের হাতে ক্যামেরা। কফিটা তার ঠাণ্ডা হচ্ছে ঘরের একটা টেবিলে।

‘তোর হাতে এ সময়ে ক্যামেরা! ক্যামেরা নিয়ে কি করছিস?’ ড. আজদা বলল।

‘তোমাদের মেহমান, বাবার পরশমণির কয়েকটা ছবি নিলাম এই জানালা দিয়ে। প্লিজ, তুমি ওকে কিছু বলো না।’ বলল সাহিবা সাবিত।

জানালার দিকে এগিয়ে ড. আজদা দেখল, সত্যিই জানালা দিয়ে আহমদ মুসাকে সম্মুখ থেকে দেখা যাচ্ছে।

ফিরে দাঁড়াল ড. আজদা সাহিবা সাবিতের দিকে। বিস্ময় তার চোখে। বলল, ‘কি সাহিবা, পরশমণি স্পর্শ করে ফেলল নাকি!’

‘বিদ্রূপ করো না আজদা। এই স্পর্শ আমার মত মেয়েদের সারা জীবনের চাওয়া হতে পারে।’ বলল সাহিবা সাবিত। তার কণ্ঠ গম্ভীর, আবেগে ভারি।

ড. আজদা দু’ধাপ এগিয়ে সাহিবা সাবিতের কাঁধে হাত রেখে দরদভরা কণ্ঠে বলল, ‘আমি বিদ্রূপ করিনি সাহিবা, আমার কথা তুমি বুঝেছ?’

সাহিবা সাবিত জড়িয়ে ধরল ড. আজদাকে। বলল, ‘এসব কথা থাক। চল ড্রইংয়ে যাই। আমাদের আসাটা ‘অড’ হয়ে গেছে।’

ড. আজদা ও সাহিবা চলল ড্রইংয়ের দিকে।

# ৫

বারবার হাতঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিল ওরান্তি ওরারতু। তার চোখে-মুখে অধৈর্য ভাব। স্বাভাবিকভাবে কথা বলে গেলেও তার অস্থিরতা কারুরই নজর এড়াবার কথা নয়।

বিষয়টা লক্ষ্য করে মুখে হাসি টেনে মিহরান মুসেগ মাসিস নিজের হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে বলল, 'মি. ওরান্তি ওরারতু, এখন মাত্র ভোর পৌনে পাঁচটা। ওরা ভ্যান থেকে যাত্রা করেছে ৪টায়। রাস্তায় কয়েক জায়গায় চেকিং আছে। ওদের ইজডির এসে পৌঁছতে সোয়া ঘণ্টা লাগবেই। চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই।'

ইজডির শহরটি আর্মেনিয়ার লাগোয়া তুর্কি প্রদেশ ইজডির-এর রাজধানী। মাউন্ট আরারাত পর্বতটি এ প্রদেশেই অবস্থিত। ইজডির শহরটি মাউন্ট আরারাত থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। এখান থেকে আর্মেনিয়া সীমান্ত মাত্র ১৫ কিলোমিটার দূরে।

মিহরান মুসেগ মাসিসের কথা শেষ হতেই ওরান্তি ওরারতু বলল, 'ওরা কখন আসবে এ নিয়ে আমার কোন চিন্তা নেই। উদ্বিগ্ন আমি মাউন্ট আরারাতের ডকুমেন্ট নিয়ে। ডকুমেন্টটি কখন আমাদের হাতে পৌঁছবে, এ নিয়েই আমার অস্থিরতা। আপনি জানেন মি. মিহরান মাসিস, দুর্লভ এই মানচিত্রটি হাতে পাওয়া আমার কত বছরের সাধনা।'

ওরান্তি ওরারতু 'লাভার অব নোহা'স হোলি আর্ক' গ্রুপের প্রেসিডেন্ট। এই গ্রুপকে সংক্ষেপে 'হোলি আর্ক গ্রুপ' বলা হয়। সাধারণ মানুষের কাছে এরা পয়গম্বর নুহ-এর স্মৃতিধন্য মাউন্ট আরারাতের ভক্ত বলে পরিচিত। এদের কাছে 'মাউন্ট আরারাত' দেবতা, এই মাউন্ট আরারাতের প্রতি এদের এত ভক্তির আধিক্য, এটাই মানুষ জানে। এই জানার আড়ালে এই গ্রুপ আসলে একটি ভয়ংকর লোভী চক্র। লোভ থেকেই এই গ্রুপের জন্ম। একটা লোক-বিশ্বাসের এর

উত্তরসূরী। শত শত বছর ধরে বংশ-পরম্পরায় এক শ্রেণীর বিশেষ করে আরারাত আর্মেনীয় খৃস্টানদের মধ্যে এ বিশ্বাস চলে আসছে যে, হযরত নুহ আ.-এর নৌকায় টন টন স্বর্ণ ছিল। নুহ আ. –এর একজন ভক্ত অতি পুরাতন ধর্মালয়ের একজন সেবক এই টন টন স্বর্ণ নৌকায় তুলেছিল হাতির পিঠে করে। প্লাবন শেষ হবার পর সেই আবার স্বর্ণ নামিয়ে নিয়ে পাহাড়ের বড় গুহায় রেখেছিল সাময়িকভাবে। বোধহয় ভেবেছিল, সব ঠিক-ঠাক করে স্বর্ণের ভাণ্ডারকে আবার ঐ ধর্মশালায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু প্লাবনে ধর্মশালাটি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হওয়ায় সে স্বর্ণভাণ্ডারকে গুহা থেকে আর নিয়ে যায়নি। সে ভেবেছিল, স্বর্ণভাণ্ডার পবিত্র পর্বতের গুহায় থাকবে, এটাই বোধহয় আল্লাহর ইচ্ছা। সেই থেকে স্বর্ণের সেই অতুল ভাণ্ডার পর্বতের সেই গুহাতেই আছে। 'হোলি আর্ক গ্রুপ' সেই স্বর্ণেরই তালাশ করছে বহু বছর ধরে। কিন্তু গুহাটির সন্ধান তারা পায়নি। মাউন্ট আরারাতের দুই শৃঙ্গের মাঝখানে যেখানে নুহ আ.-এর নৌকা প্লাবনের পর ল্যান্ড করেছিল, তারই আশেপাশে কোন বড় গুহায় স্বর্ণভাণ্ডার রয়েছে। কিন্তু মাউন্ট আরারাতের বরফ প্রায় তিনশ' ফুটের মত গভীর হওয়ায় গুহা চিহ্নিত করা যেমন কঠিন, গুহাগুলোর ভেতরটা তালাশ করা আরও কঠিন। সবচেয়ে বড় যে মুশকিলে তারা পড়েছে সেটা হলো, ১৮৪০ সালের ভয়াবহ ভূমিকম্পে পাহাড়ে বিরাট পরিবর্তন আসে এবং অনেক গুহা বন্ধ হয়ে যায়। স্বর্ণভাণ্ডারের গুহা অনুসন্ধানও কঠিন হয়ে যায়। প্রয়োজন পড়ে ভূমিকম্প-পূর্ব সময়ে পর্বতের গুহাগুলোর অবস্থান জানা। এই তথ্য লাভের জন্য 'হোলি আর্ক গ্রুপ' হন্যে হয়ে ছুটে বেড়ায়। অন্যদিকে মিহরান মুসেগ মাসিস 'সান অব হোলি আরারাত' (Son of Holy Ararat- SOHA) সম্প্রদায়ের প্রেসিডেন্ট। খুব প্রাচীন এই সম্প্রদায়। সময়ের পরিবর্তনে সম্প্রদায়ের নামটি অভিন্ন থাকলেও সম্প্রদায়টির প্রকৃতি পাল্টে গেছে। প্রাচীনকালে সম্প্রদায়টি ধর্মভীরু মানুষের প্রতিষ্ঠান ছিল। সকল প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ ও বৈষম্য চিন্তার বাইরে ছিল। মধ্যযুগে সোহা (SOHA) সম্প্রদায় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হলো। তারা দাবি তুললো, মাউন্ট আরারাত আর্মেনিয়ার এবং আর্মেনিয়া মাউন্ট আরারাতের। তাদের কাছে মাউন্ট আরারাত দেবতা, সে দেবতার সৃষ্টি আর্মেনিয়া। তারা বলল, সৌভাগ্য দেবতা মাউন্ট

আরারাতকে বাদ দিয়ে আর্মেনিয়ার অস্তিত্ব কল্পনাই করা যায় না। এই সব কথা ও দাবি সামনে এনে 'সোহা' সম্প্রদায় হিংসাত্মক এক সন্ত্রাসী আন্দোলন শুরু করল, নুহ ও জেসাসের হোলি ল্যান্ড আর্মেনিয়া ও হোলি মাউন্ট আরারাতের জন্যে হত্যা-লুণ্ঠনকে তারা পুণ্য বলে মনে করল। তাদের এই হত্যা ও সন্ত্রাসের শিকার হলো তুর্কি মুসলিম জনসাধারণ। এরই অংশ হিসেবে 'সোহা'রা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে তুরস্কের বিরুদ্ধে রাশিয়াকে সাহায্য-সহযোগিতা করার ষড়যন্ত্র করে। এরই জবাবে তুরস্ক 'সোহা' নামের আর্মেনীয় তুর্কি নাগরিকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। একেই আর্মেনিয়া ও পশ্চিমী মিত্ররা আর্মেনীয় গণহত্যা নাম দিয়েছে। পরে আর্মেনীয় সরকার সোহাদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়। এইভাবে 'সোহা'দের আন্দোলন স্তিমিত হয়ে শেষ পর্যন্ত অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু আধুনিককালে এসে 'হোলি আর্ক গ্রুপ'-এর উস্কানি এবং অঢেল অর্থ-সাহায্যে 'সোহা'রা আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে। উভয়ের স্বার্থ উদ্ধারে দুই গ্রুপের মধ্যে একটা আন-হোলি সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সোহারা চায়, তুরস্কের ইজডির, কারস, অ্যাগ্রি ও ভ্যান প্রদেশসহ মাউন্ট আরারাতকে আর্মেনিয়ার সাথে এক করে ফেলতে। এতে মাউন্ট আরারাত আর্মেনিয়ার এবং আর্মেনিয়া মাউন্ট আরারাতের এই আবহমান লক্ষ্য তাদের হাসিল হবে। অন্যদিকে হোলি আর্ক গ্রুপ চাচ্ছে, নিরপদ্রবে, কোন বাঁধা-বিপত্তি, নজরদারি ছাড়া মাউন্ট আরারাতে স্বর্ণভাণ্ডারের সন্ধান করতে। গোটা এলাকা বিশেষ করে মাউন্ট আরারাত তুর্কি সৈন্যের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে থাকায় স্বর্ণভাণ্ডারের সন্ধান করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। মাউন্ট আরারাত আর্মেনিয়ার অংশ হলে এই অসুবিধা থাকবে না। তখন মাউন্ট আরারাতকে বৈঠকখানার মত ব্যবহার করা যাবে এবং মাউন্ট আরারাতের স্বর্ণভাণ্ডার হাতের মুঠোয় এসে যাবে।

'মাউন্ট আরারাতের হাজারো মানচিত্র আছে। খুব বিস্তারিত, খুব সূক্ষ্ম মানচিত্রও রয়েছে। কিন্তু সব বাদ দিয়ে ঐ বিশেষ মানচিত্রটা কেন এত জরুরি মি. ওরান্তি ওরারতু?' বলল মিহরান মুসেগ মাসিস ওরান্তি ওরারতুর কথা শেষ হতেই।

‘আসলে ঐ মানচিত্রটা অদ্বিতীয় মি. মিহরান মাসিস। এক দুর্লভ মানচিত্র ওটা। বলা যায়, এক উলঙ্গ মানচিত্র ওটা মাউন্ট আরারাতের। খৃস্টপূর্ব ৫শ’ অব্দের এক দুর্লভ গ্রীষ্মকাল এসেছিল। ইতিহাসের সবচেয়ে বড় খরাপীড়িত গ্রীষ্মকাল ছিল এটা। মাউন্ট আরারাতের ১৪০০০ ফুট-লেভেল থেকে ১৭০০০ ফুট পর্যন্ত সব সময় বরফে ঢাকা থাকে। কিন্তু সেই গ্রীষ্মকালে মাউন্ট আরারাতের বরফের লেভেল ১৬০০০ ফিট পর্যন্ত উঠে যায়। ইতিহাসে প্রথমবারের মত মাউন্ট আরারাতের ২০০০ ফুট এলাকার বরফ গলে নগ্ন হয়ে পড়ে। এরই সুযোগ নেন ওরান্তি রাজবংশের তৎকালীন রাজসভার শিল্প ও ভূ-তত্ত্ববিদ সভাসদ নাইরো নারিজিয়ান। ইতিহাসে প্রথমবারের মত নগ্ন হয়ে পড়া মাউন্ট আরারাতের ঐ অংশের (১৪০০০ থেকে ১৬০০০ ফিট) বিস্তারিত মানচিত্র আঁকেন তিনি। যাতে পর্বতের প্রতি ভাঁজ ও প্রতি গুহা শুধু নয়, বড় বড় পাথরের অবস্থানও সে মানচিত্রে চিহ্নিত হয়। আর আপনি জানেন, আমাদের পিতা নুহের নৌকা প্লাবন শেষে মাউন্ট আরারাতের ১৫ হাজার ৫শ’ ফিট উচ্চতায় এক গিরিভাঁজে ল্যান্ড করেছিল। এখানেই নৌকাটি এখনও আছে কোন গুহায় অথবা পাহাড়ের কোন ধ্বংসস্তুপের আড়ালে। ৫শ’ খৃস্টপূর্ব অব্দে কিন্তু সব গুহা ও পর্বতের ভাঁজ সবই অক্ষত ছিল। সুতরাং নারিজিয়ানের ঐ মানচিত্রে নুহের নৌকা এবং আশেপাশের সব গুহাসহ সব গুহার অবস্থান জানা যাবে। আর এটা নিশ্চিত, নৌকার আশেপাশের কোন নিরাপদ গুহাতেই স্বর্ণভাণ্ডার সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। মানচিত্রটি পেলে এই সব গুহার লোকেশন হিসেব-নিকেশ করে বের করে নেয়া যাবে। এখানেই মানচিত্রটির গুরুত্ব মি. মিহরান মাসিস।’

দীর্ঘ বক্তব্য দিয়ে থামল ওরান্তি ওরারতু।

‘আপনার কথাগুলো রূপকথার মত মনে হচ্ছে।’ বলল মিহরান মাসিস।

‘বাস্তবতা অনেক সময় রূপকথাকেও ছাড়িয়ে যায়।’ ওরান্তি ওরারতু বলল।

‘তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু এই বিস্ময়কর মানচিত্রের সন্ধান কি করে পেলেন? জানলেন কি করে যে, মানচিত্রটি ভ্যান মিউজিয়ামের মাউন্ট আরারাত

সেকশনে আছে? আমি তো বহুবার মিউজিয়ামের আরারাত সেকশনে গেছি, কিন্তু মানচিত্রটি তো দেখিনি!' বলল মিহরান মাসিস।

'সে আর এক কাহিনী মি. মিহরান মাসিস। বেশ কিছুদিন আগে ইয়েরেভেনের সেন্ট মেরী মনস্টারিতে কয়েকদিন ছিলাম। মনস্টারির জ্যেষ্ঠতম ফাদার পিটার জনকে আপনি চেনেন। বয়স তার ১০৯ বছর। জীবন্ত এক মিউজিয়াম তিনি। মাউন্ট আরারাতকে যিশুর জন্মস্থান বেথেলহেমের মতই ভক্তি করেন তিনি। আর মাউন্ট আরারাত সম্পর্কে তার চেয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি আর্মেনিয়া ও তুরস্কে আর কেউ নেই। মাউন্ট আরারাত বিষয়ে তার সাথে কয়েকদিন ধরে আলাপ করেছি। কথায় কথায় আমি মাউন্ট আরারাতের স্বর্ণভাণ্ডারের কল্পকাহিনী সম্পর্কে বলেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, এটা কল্পকাহিনী নয়, পিতা নুহার নৌকার মতই বাস্তবতা ওটা। তবে মা মেরীর ঐ সম্পদ মা মেরী মানুষের চোখ থেকে আড়াল করে ফেলেছেন। পিতা নুহার নৌকা ল্যান্ড করার জায়গায় যেদিকে নৌকার সামনের দিকটা ছিল, তার সামনের এক গুহায় স্বর্ণভাণ্ডার সংরক্ষিত করা হয়েছিল। কিন্তু ১৮৪০ সালের ভয়াবহ ভূমিকম্পের মাধ্যমে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তাহলে আমাদের পবিত্র পর্বতের আদিরূপ আর নেই। এটা ভক্তদের জন্যে এক বিরাট ক্ষতি নয় কি?' তিনি বলেছিলেন, 'এটা ঈশ্বরের ইচ্ছায় হয়েছে বৎস। এ নিয়ে কথা তোলো না। তবে পবিত্র পর্বতের আদিরূপ দেখতে চাইলে, তারও একটা সুযোগ ঈশ্বর রেখেছেন।' বলে থেমে গিয়েছিলেন তিনি। ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। আমি উদগ্রীব হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কি সেই সুযোগ, কোথায় সেই সুযোগ?' তিনি আমার দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছিলেন। স্থির দৃষ্টিতে দেখেছিলেন আমাকে। পরে বলেছিলেন, 'কি বলছিলে, তুমি 'লাভার অব হোলি আরারাত'-এর নেতা? হ্যাঁ, তোমার এটা জানার রাইট আছে।' বলে একটু চুপ থেকে তিনি শুরু করেছিলেন, 'অন্তত একটা মানচিত্রে পবিত্র মাউন্ট আরারাতের আদিরূপ সংরক্ষিত আছে। এই মানচিত্রটি তৈরি হয়েছিল খৃস্টপূর্ব ৫শ' অব্দের কোন এক সময়। সময়টি ছিল এক মাহেন্দ্রক্ষণ। যখন পবিত্র মাউন্ট আরারাত মাথায়-টুপির মত আস্তরণ ছাড়া সমগ্র গা থেকে বরফের পোশাক ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিল,

যেমনটা ছিল ঠিক প্লাবন ও প্লাবন-উত্তর কিছু সময়ে। সেই সময় ওরান্তি রাজবংশের বিজ্ঞানী সভাসদ ঈশ্বরভক্ত নাইরো নারিজিয়ান এই মানচিত্র তৈরি করেন।' বলে আবার থেমে গিয়েছিলেন বৃদ্ধ পিটার জন। ইজিচেয়ারে গা'টা এলিয়ে আবার চোখ বুজেছিলেন। মানচিত্রের কথা শুনে বুকটা আমার তোলপাড় করে উঠেছিল। মানচিত্রটা কোথায় পাওয়া যাবে, তা জানার জন্যে আমি মরিয়া। আমি বললাম, 'ঐ মানচিত্রেই পবিত্র মাউন্ট আরারাতের আদি রূপ জানা যাবে। কিন্তু মানচিত্রটি পাওয়া যাবে কোথায়?' বৃদ্ধ ফাদার আবার চোখ খুলল। তাকাল আমার দিকে। চোখে সেই সন্ধানী দৃষ্টি। বলল, ''লাভার অব হোলি মাউন্ট আরারাত' সংগঠনের তুমি প্রধান না! হ্যাঁ, তোমাকে বলা যায়। মানচিত্রটি ওরান্তি রাজবংশের প্রপার্টি ছিল। অনেক রাজনৈতিক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে মানচিত্রটির স্থান হয় লেক-ভ্যানতীরস্থ ঐ অঞ্চলের প্রাচীনতম মনস্টারি তিলকিটেপী ধর্মালয়ে। এই যুগের এক খনন কাজের মাধ্যমে তিলকিটেপী ধর্মমঠ আবিষ্কৃত হলে অন্যান্য সব প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্যের সাথে পোড়া চোয়াং রক্ষিত মানচিত্রটিও ভ্যান ক্যালিস প্রাসাদ মিউজিয়ামে নিয়ে যাওয়া হয়। আমি তখন ভ্যানে ছিলাম। আমার মত প্রবীণ ধরনের কয়েকজন গীর্জার প্রতিনিধি ও প্রত্নতত্ত্ববিদকে ডাকা হয় মানচিত্রটাকে ক্ল্যাসিফাই করার ক্ষেত্রে মতামত দেয়ার জন্যে। আমরা মানচিত্রটিকে মাউন্ট আরারাতের প্রাচীনতম মানচিত্র হিসেবে অভিহিত করি। এরপরই অতি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে ভ্যান ক্যালিস মিউজিয়ামের মাউন্ট আরারাত সেকশনে ওটা রাখা আছে। আমি আনন্দিত, মাউন্ট আরারাতের আদিরূপের নিদর্শন ঈশ্বর এভাবে সংরক্ষিত করলেন।' বৃদ্ধ ফাদার পিটার জনের এই কাহিনী আমার হাতে আকাশের চাঁদ তুলে দেয়। হাতে চাঁদ পাওয়ার মতই খুশি হই। সেই মানচিত্র নিয়েই ওরা এখন ভ্যান থেকে আসছে। আমার মন অস্থির হবে না কেন বলুন?'

'আপনার কথা ঠিক ওরান্তি ওরারতু! সত্যিই মানচিত্রটি মহামূল্যবান। আর এ মানচিত্রের সন্ধান পাওয়ার কাহিনী রূপকথাকে হার মানায়। আমি মনে করছি, আমাদের মিশন সফল হবে, দুর্লভ মানচিত্রের এই সন্ধান পাওয়াটা তারই লক্ষণ।' বলল মিহরান মাসিস।

‘ঈশ্বর আপনার কথাকে সত্যে পরিণত করুন।’ বলে আবার হাতঘড়ির দিকে তাকাল ওরান্তি ওরারতু। বলল, ‘দেরি নেই, অল্পক্ষণের মধ্যেই ওরা এসে যাবে।’

ওরান্তি ওরারতুর কথা শেষ হতেই বাইরের লনে গাড়ির শব্দ পেল।

কান খাড়া ওরান্তি ওরারতু এবং মিহরান মাসিস দু’জনেরই।

গাড়ির শব্দ তাদের বাড়ির গাড়ি বারান্দায় এসে থেমে গেল।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ওরান্তি ওরারতু ও মিহরান মাসিস দু’জনেই।

দু’জনেই ছুটল বাইরে বেরুবার জন্যে।

মানচিত্রটি বার বার খুঁটে খুঁটে দেখার পর মুখ তুলল মিহরান মাসিস ও ওরান্তি ওরারতু দু’জনেই।

তাকাল তারা পরস্পরের দিকে। তাদের চোখে-মুখে বিস্ময় ও আনন্দ।

প্রথমেই মুখ তুলল মিহরান মাসিস। বলল, ‘আমার অবাক লাগছে, সে সময়ের শিল্পীরাও এমন থ্রি-ডাইমেনশনাল নকশা আঁকতে পারতো! পবিত্র মাউন্ট আরারাতের অদ্ভুত এই থ্রি-ডাইমেনশনাল নকশা। ছবির মতই দেখা যাচ্ছে সব কিছু।’

‘ছবি কয়টি ডাইমেনশনালে তা নিয়ে আমার কাজ নেই মি. মিহরান মাসিস, আমার আগ্রহ আরারাতের সাড়ে পনের হাজার ফিট থেকে ষোল হাজার ফিটের বরফমুক্ত এলাকা, বিশেষ করে মাউন্ট আরারাতের পশ্চিম ঢালের উত্তর-পশ্চিম কোণটা। পনের হাজার পাঁচশ’ ফিট ওপরের এই স্থানেই প্লাবন শেষে মহান পিতা নুহের নৌকা ল্যান্ড করেছিল। নকশার এই স্থানে নজর করে দেখুন, পাহাড়ের এক গভীর ভাঁজে শিল্পী নৌকার মত একটা স্থাপনার ওপরের অংশ এঁকেছেন। নৌকার ডেকটা দেখা না গেলেও দেখুন, ডেকের ওপরের বিশাল দুই-আকৃতির একটা স্থাপনাকে শিল্পী স্পষ্ট করে তুলেছেন। এই স্থাপনার সামনের প্রান্ত থেকে কিছুটা জায়গা বাদ দিয়ে আরও সামনে তীরের মত কৌণিক একটা

জিনিসকে মাথা উঁচু করে থাকতে দেখা যাচ্ছে! নিশ্চয় সামনের গুহাই হবে। এর চারপাশে পর্বতের গায়ে এবং পর্বতের খাঁজ ও ভাঁজের মেঝেতে দেখুন, নানা আকারের গুহাকে শিল্পী খুব স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছেন। এই গুহাগুলোই আমাদের সব আগ্রহ ও আকর্ষণের কেন্দ্র। আকুলভাবে এই গুহাগুলোর অবস্থা ও দর্শনই আমরা চেয়েছি। ঈশ্বর সেটা আজ আমাদের দিলেন। শিল্পীকে ধন্যবাদ যে, পবিত্র পর্বতের নকশা আঁকার ক্ষেত্রে এই এলাকার নকশাতেই যেন নজর দিয়েছেন বেশি, এই এলাকার নকশাকেই তিনি সবচেয়ে বিস্তারিত ও নিখুঁত করতে চেয়েছেন। দখুেন পর্‌বতরে ঢাল, খাঁজ ও ভাঁজে পাথরগুলোর অবস্থানকেও তিনি স্পষ্ট করে তুলেছেন। ধন্যবাদ শিল্পীকে। ধন্যবাদ ঈশ্বরকে। পবিত্র স্বর্ণভাণ্ডারের প্রতি আমাদের যে আকর্ষণ, তাকেও অনুমোদন দিয়েছেন নিশ্চয়।’

দীর্ঘ বক্তব্য দিয়ে থামল ওরান্তি ওরারতু। তার কণ্ঠে উত্তেজনা এবং চোখে-মুখে লোভের আগুন যেন জ্বল জ্বল করে উঠেছে।

‘সত্যিই ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করেছেন। না হলে এই দুর্লভ ডকুমেন্ট আমরা হাতে পেতাম না। কিন্তু আসল কাজই আমাদের বাকি। পনের হাজার পাঁচশ’ ফিট লেভেলের গুহাগুলোর সন্ধান আমরা পেলাম, লোকেশনও জানলাম, কিন্তু খুঁজে বের করব কি করে? তুর্কি সৈন্যরা তো কাউকে পাহাড়ে দু’দণ্ডও দাঁড়াতে দেয় না।’ বলল মিহরান মাসিস।

‘সেটাই তো সমস্যা। তবে এই সমস্যা দূর করার কাজও তো আমরা শুরু করে দিয়েছি। এবং সে কাজ খুব ভালোভাবেই এগোচ্ছে। এই অঞ্চলের টার্গেট পরিবারগুলোকে ড্রাগ-ব্যবসায়ের ফাঁদে ফেলার আমাদের কৌশল খুবই কাজ দিচ্ছে। আমাদের দেয়া তথ্য ঠিক ঠিক পাওয়ায় পুলিশও খুব উৎসাহিত হয়ে উঠেছে। পুলিশের অধিকাংশকেই আমরা কিনতে পেরেছি। শুধু ইজডির এলাকারই আড়াই হাজার পরিবারের তিন হাজার মানুষকে আমরা জেলে ঢোকাতে পেরেছি। ইতোমধ্যেই এখান থেকে বারশ’ পরিবার উচ্ছেদ হয়ে গেছে। এই বারশ’ পরিবারের জায়গায় আমাদের পরিকল্পনা অনুসারে নতুন বারশ’ পরিবারকে বসাতে পেরেছি, যাদের মোট জনসংখ্যা পাঁচ হাজার হবে। যে হারে

আমাদের কাজের অগ্রগতি হচ্ছে, তাতে বছরখানেকের মধ্যে ইজডির, কারস, অ্যাগ্রি ও ভ্যান প্রদেশ এলাকায় টার্গেটেড পরিবারগুলোকে উচ্ছেদ এবং তাদের স্থানে আমাদের লোকদের পুনর্বাসন সম্ভব হবে।' ওরান্তি ওরারতু বলল।

'আমিও তাই মনে করছি। আমরা যতটা চাচ্ছি তার চেয়েও কাজ দ্রুত হচ্ছে। কিন্তু আমি ভয় করছি, পুরাতন পরিবারের উচ্ছেদ আর নতুন পরিবারের পুনর্বাসন সরকারের চোখে না পড়ে যায়।' বলল মিহরান মাসিস।

'নতুন পরিবারের পুর্নবাসন হচ্ছে এ কথা কেন বলছেন? আপনিই না সবকিছু করেছেন। ইস্তাম্বুল, আংকারাসহ উত্তরের শহরগুলোতে যে আর্মেনীয় পরিবারগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তাদের মধ্যে যারা বেশি রাজনীতি সচেতন, তাদেরকে গত দশ-পনের বছর ধরে দক্ষিণ-পূর্ব ইজডির, কারস, অ্যাগ্রি ও ভ্যানের মত প্রদেশগুলোতে ভোটার বানানো হয়েছে পরিকল্পিতভাবে সুনির্দিষ্ট সব ঠিকানায়। কেউ বুঝতে পারলেও প্রমাণ করতে পারবে না যে, অন্য অঞ্চল থেকে এরা এসেছে। গত তিনটি নির্বাচন কিংবা তারও বেশি সময়ের ভোটার তালিকায় তাদের নাম আছে, মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স পরিশোধ আছে। অতএব ভয়ের কিছু নেই মি. মিহরান মাসিস।'

হাসলো মিহরান মাসিস। বলল, 'ধন্যবাদ মি. ওরান্তি ওরারতু। কাগজে-কলমে আমরা ঠিক আছি। কিন্তু আসলেই তো তারা হবে নতুন। এ বিষয়টা প্রশাসনসহ সচেতনদের চোখে পড়ে যেতে পারে। আমি এই ভয়টাই করছি।'

হাসল ওরান্তি ওরারতুও। বলল, 'যাদের আপনি সচেতন বলছেন, যারা প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে পারে, তারা হয় জেলে থাকবে, নয়তো উচ্ছেদ হবে টাকা-পয়সা নিয়ে। সুতরাং প্রতিক্রিয়া প্রকাশের কেউ থাকবে না মি. মিহরান মাসিস।'

'এটাই ভরসা মি. ওরান্তি ওরারতু যে, যারা উচ্ছেদ হচ্ছে, তারা ঠিক উচ্ছেদ নয়। তারা জমি ও সম্পদের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ পেয়ে নিজেরা সরে যাচ্ছে। সুতরাং তাদের কোন অভিযোগ থাকছে না, প্রতিক্রিয়া প্রকাশেরও সুযোগ তাই হবে না। টাকা-পয়সা প্রচুর খরচ হলেও অবাঞ্ছিত পপুলেশনকে

এইভাবে সরিয়ে দেয়ার আমাদের কৌশল খুবই ভালো হয়েছে।’ বলল মিহরান মাসিস।

‘এজন্যে ধন্যবাদ দিতে হয় ‘আমরা মানুষ’ নামের ইহুদি এনজিওকে। বুদ্ধিটা ওরাই দিয়েছে। ‘আমরা মানুষ’-এর প্রেসিডেন্ট মোশে অ্যাসেনাথ বলেছিলেন, ‘এই ধরনের তৃণমূল পরিবর্তনের কাজ কখনও গায়ের জোরে করবে না, বুদ্ধি দিয়ে করবে। বুদ্ধির সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হলো টাকা। কৌশলে ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি কর, নিরাপত্তাহীনতার আতংক ছড়াও, তারপর টাকা দাও নিরাপদ স্থানে সরে পড়ার জন্যে। দেখবে, ওরা তোমার শত্রু হয়ে নয়, তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে সরে যাচ্ছে, তুমি যেমনটি চাও।’ টার্গেটেড পরিবার ও লোকদেরকে ড্রাগ-ব্যবসায়ের ফাঁদে ফেলার বুদ্ধিও ‘আমরা মানুষ’ নামের ঐ ইহুদি এনজিওর কাছ থেকেই আমরা পেয়েছি। ধন্যবাদ তাদেরকে। তাদের এই বুদ্ধি মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে কাজ দিচ্ছে।’ ওরান্তি ওরারতু বলল।

‘ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। কিন্তু মি. ওরান্তি ওরারতু, একটা বড় গণ্ডগোল তো বেঁধে গেছে। আরিয়াসের বারজানি পরিবারকে কেন্দ্র করে আমাদের পরিকল্পনা সাংঘাতিকভাবে মার খেয়েছে। আপনি জানেন, ঐ পরিবারের সবচেয়ে সক্রিয় সদস্য যুবক আতা সালাহ উদ্দিন বারজানিকে ড্রাগ-ব্যবসায়ের ফাঁদে ফেলে জেলে পুরেছি। তার পিতা-মাতা আছেন মস্কোতে। তাদের তরফ থেকে এখনও ভয়ের কিছু ঘটেনি। কিন্তু আতা সালাহ উদ্দিনের বোন ড. আজদা আয়েশা এসেছে জার্মানি থেকে। সেই এসে ঝামেলা পাকিয়েছে। তাকে ড্রাগের ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল। ড্রাগ-ফাঁদ পাতার জন্য আমাদের বালক-বালিকা বাহিনীর একজন বালককে পাঠানোও হয়েছিল ড. আজদার ঘরে ড্রাগ রাখার জন্যে। কিন্তু ড. আজদা তাকে ধরে ফেলে। গোপনীয়তা যাতে বালকটি ফাঁস করতে না পারে সেজন্যে থানায় নিয়ে যাওয়ার পথে আমাদের লোকরা বালকটিকে হত্যা করে।’

বলে মিহরান মাসিস থামল এবং টেবিল থেকে পানির গ্লাস তুলে নিল।

‘চমৎকার কাজ করেছে আমাদের লোকরা। এরপর আমাদের কিছু লোক সেখানে মারা গেছে, এই তো! এটা আমি ভ্যান থেকেই শুনেছি।’ বলল ওরান্তি ওরারতু।

মিহরান মাসিস পুরো গ্লাসের পানি ঢক ঢক করে গিলে নিয়ে বলল, ‘শুধু লোক মারা যাওয়া নয়, সেই লোকেরা কি অবস্থায় কিভাবে মারা গেল, তা অ্যালার্মিং। আমাদের একজন মূল্যবান বালক হারাবার শোধ নেয়ার জন্যে সেদিনই সন্ধ্যা রাতে ড. আজদাকে কিডন্যাপ করতে গিয়েছিল আমাদের কিছু লোক। ঠিক সেসময় পুলিশ সেখানে হাজির হয় এবং কিডন্যাপ করে ফেরার পথে আমাদের চারজনই পুলিশের গুলিতে মারা যায়, অথচ পরিচয় জানার পর পুলিশ তাদের মারার কথা নয়। আমাদের নীতি অনুসারে সেদিন রাতেই ড. আজদাকে তার বাড়ি থেকে ধরে আনার জন্যে দুর্ধর্ষ কয়েকজনকে পাঠানো হয়েছিল। তারা সকলেই মারা পড়ে। এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে শত্রুকে সময় না দেয়ার আমাদের যে নীতি, সেই অনুসারে হোম সার্ভিসের গাড়ি করে হোম সার্ভিসের ছদ্মবেশে আমাদের ৭জন কমান্ডো যায় সেখানে। ৭ জন কমান্ডোই মারা পড়েছে। পরবর্তী এই দু’ঘটনায় পুলিশের সাহায্য আমরা পাইনি।’

বিস্ময় ফুটে উঠেছিল ওরান্তি ওরারতুর চোখে-মুখে। মিহরান মাসিস থামতেই সে বলে উঠল, ‘কে হত্যা করল তাদের? ঐ পুঁচকে মেয়েটা? তা কি করে সম্ভব?’

‘মেয়েটা নয়, তাদের বাড়িতে আসা একজন মেহমান। সম্ভবত ড. আজদার কোন আত্মীয়।’ মিহরান মাসিস বলল।

‘বারজানি পরিবার ও তাদের আত্মীয়-স্বজনের সবাই তো আমাদের নখদর্পণে। তাদের মধ্যে কেউ এই অসাধ্য সাধন করেছে বলে তো মনে হয় না।’ বলল ওরান্তি ওরারতু।

‘আমিও বুঝতে পারছি না কি ঘটনা। ইজডির পুলিশের ডিওপি খাল্লিকান যে মেসেজ আমাদের দিয়েছেন, সেটাও উদ্বেগজনক। বলেছেন তিনি, ড. আজদাদের মেহমান লোকটি সাধারণ নয়। রাষ্ট্রের শীর্ষ পর্যায়ের সাথে তার যোগাযোগ থাকতে পারে।’ মিহরান মাসিস বলল।

‘রাষ্ট্রের শীর্ষ পর্যায়ের সাথে তার যোগাযোগ থাকতে পারে? তাহলে সে সে?’ বলল ওরান্তি ওরারতু। উদ্বেগ তার কণ্ঠে।

তার কথা শেষ হতেই মিহরান মাসিসের পিএস মিহরান মাসিসকে লক্ষ্য করে বলল, ‘স্যার, আরিয়াস থেকে মি. ভারদান এসেছেন।’

‘হ্যাঁ, আমরা তাকেই আশা করছিলাম। নিয়ে এস তাকে।’

ভারদান বুরাগ আরিয়াস অঞ্চলের ‘সোহা’ প্রধান।

মিনিটখানেকের মধ্যেই ভারদান বুরাগ ঘরে প্রবেশ করল। মিহরান মাসিস ও ওরান্তি ওরারতু দু’জনেই স্বাগত জানাল তাকে।

ভারদান বুরাগ গিয়ে মিহরান মাসিসের সামনের সোফায় বসল।

‘সোজা আরিয়াস থেকে এলেন?’ জিজ্ঞেস করল মিহরান মাসিস ভারদান বুরাগকে।

‘স্যার, আরিয়াস থেকে ভ্যান হয়ে এখানে আসছি স্যার।’

‘বল কি খবর?’ জিজ্ঞাসা মিহরান মাসিসের।

‘ভালো নয় স্যার। লোকটি এসে সবকিছুই লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে।’ বলল ভারদান বুরাগ।

‘কোন লোক? ড. আজদার অতিথি?’ মিহরান মাসিস বলল।

‘ঠিক বলেছেন স্যার! ঐ লোকটিই।’ ভারদান বুরাগ বলল।

‘লণ্ডভণ্ড কি করছে? দু’ঘটনায় আমাদের তেরজন লোক মেরেছে, সেটাই কি?’ বলল মিহরান মাসিস।

‘শুধু এটাই নয় স্যার। লোকটি যে যাদুকর। এসেই যেন সব জেনে ফেলছে। এসেই নাকি সে পুলিশকে জানিয়েছে, ইজডিরসহ দক্ষিণ-পূর্বের কয়েকটি প্রদেশ থেকে লোক উচ্ছেদ করে বাইরের লোক এনে পুনর্বাসন করা হচ্ছে। সর্বশেষে আমরা জানতে পেরেছি, সে লোক লাগিয়েছে বাড়ি বাড়ি ঘুরে একটা রিপোর্ট তৈরি করতে তাদের অভিযোগ সত্য প্রমাণের জন্য।’ ভারদান বুরাগ বলল।

ভারদান বুরাগের কথা শুনে মিহরান মাসিস ও ওরান্তি ওরারতু দু’জনের মুখ কালো হয়ে গেছে। ওরান্তি ওরারতুর মুখ ফেটেই যেন চিৎকার বেরুল, ‘বলছ কি ভারদান বুরাগ? এসেই লোকটা এসব জানতে পেরেছে?’

‘সেটাই তো আশ্চর্যের। তারা থানায় যে কেস করেছে, তাতেও তাদের এসব কথা আছে। পুলিশ আমাদের এটা জানিয়েছে।’ বলল ভারদান বুরাগ।

‘লোকটি কে তোমরা জেনেছ?’ জিজ্ঞাসা মিহরান মাসিসের।

‘জানা যায়নি। তবে সে যে বারজানি পরিবারের আত্মীয় নয়, এটা নিশ্চিত। পুলিশের কাছ থেকেও এ ব্যাপারে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। পুলিশ সদস্য রশিদ দারাগ চিকিৎসা নিচ্ছেন ভ্যানে। আর ডিওপি খাল্লিকান খাচিপ তেমন কিছু তথ্য দিতে পারেননি।’ ভারদান বুরাগ বলল।

‘কোথায় এখন লোকটি?’ বলল ওরান্তি ওরারতু।

‘গতকাল ভ্যানে এসেছে। এসে এখানেও গণ্ডগোল পাকিয়েছে।’ ভারদান বুরাগ বলল।

‘কি গণ্ডগোল?’ মিহরান মাসিস বলল।

‘গণ্ডগোল মানে এখানেও আমাদের কাজে বাগড়া দেবে বলে মনে হচ্ছে। আমি এখানে রওয়ানা দেয়ার আগে পুলিশ সূত্রে জানতে পারলাম, ভ্যান ক্যালিস প্রাসাদ মিউজিয়ামের এই রাতের রক্তাক্ত অভিযানের ঘটনাকে সে মাউন্ট আরারাতের উল্কিধারী মানে আমাদের কাণ্ড বলে পুলিশকে জানিয়েছে। আরও মজার...।’

ভারদান বুরাগের কথার মাঝখানেই ওরান্তি ওরারতু উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে উঠল, ‘উল্কিধারীর কথা সে বলেছে? জানল কি করে আমাদের মাউন্ট আরারাতের সদস্যরা উল্কি ধারণ করে! অসম্ভব ব্যাপার!’

‘সে জন্যেই তো লোকটা যাদুকর। আরও একটা বড় ব্যাপার হলো, ভ্যানের পুলিশ সূত্রেই আমি জানলাম, মিউজিয়ামে রক্তাক্ত এ ঘটনার দায়ে মিউজিয়ামের প্রধান গ্রেফতার হওয়া অবধারিত ছিল। ডিজিপি পুলিশ নিয়ে স্বয়ং গিয়েছিলেন ড. মাহজুন মাজহারকে গ্রেফতারের জন্যে। কিন্তু সেখানেও হাজির ঐ যাদুকর লোকটি ড. আজদা ও ড. সাহাব নুরীকে নিয়ে। লোকটি তার যুক্তি দিয়ে ঘটনার মোড় একেবারে পাল্টে দেন এবং ড. মাহজুন মাজহার নির্দোষ হয়ে যান এবং মিউজিয়ামের হামলাকারীরা কিভাবে, কোন কৌশলে মিউজিয়ামে

প্রবেশ করেছে, তারও সম্ভাব্য তথ্য সে পুলিশকে দিয়েছে। পুলিশ সে অনুসারে তদন্তও শুরু করে দিয়েছে।'

'অসম্ভব সব কথা বলছেন মি. ভারদান। কিভাবে একজন লোক এভাবে সবজান্তা হতে পারে? পুলিশকে দেখছি এভাবে সে হাতের মুঠোয় নিয়ে ফেলেছে। কল্পনারও অতীত ঘটনা এসব।' বলল মিহরান মাসিস।

'ভ্যানে কোথায় উঠেছে লোকটা?' বলল ওরান্তি ওরারতু।

'ভ্যান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ড. আজদার মামা ড. সাহাব নুরীর বাড়িতে।' ভারদান বুরাগ বলল।

ওরান্তি ওরারতু তাকাল মিহরান মাসিসের দিকে। বলল, 'এসব শুনে আর লাভ নেই মি. মিহরান মাসিস। এখন বলুন কি করা যায়? ঐ লোকটিকে এক মুহূর্তও বাঁচিয়ে রাখা যায় না।'

'এখন সব কাজ ছেড়ে ঐ লোকটিকেই দেখতে হবে। সত্যিই বলেছেন, ওকে বাঁচিয়ে রেখে আমাদের সামনে এগোনো সম্ভব নয়।' বলল মিহরান মাসিস।

'একজনের জন্যে সব কাজ বন্ধ থাকবে না। আমাদের সব কাজই চলবে, চলতে হবে আরও দ্বিগুণ বেগে। এর পাশাপাশি আমরা লোকটিকেও দেখবো। আমাদের বাছাই করা কমান্ডোদেরকে আজই পাঠাতে হবে ভ্যানে। দরকার হলে আমিও সেখানে যাবো। ভ্যানে এই মুহূর্ত থেকেই তার ওপর চোখ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।' ওরান্তি ওরারতু বলল।

'তার ওপর সার্বক্ষণিক চোখ রাখার ব্যবস্থা আমরা করেছি। সে আরিয়াস থেকে ভ্যানে এলে আমাদের দু'জন তাকে অনুসরণ করে ভ্যানে এসেছে এবং তার ওপর সার্বক্ষণিকভাবে চোখ রাখছে।' বলল ভারদান বুরাগ।

ওরান্তি ওরারতুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'ধন্যবাদ মি. ভারদান বুরাগ। আমি আনন্দিত যে, আপনারা সময়ের সাথে এগোচ্ছেন।'

ভারদান বুরাগের কথা শেষ হতেই মিহরান মাসিস বলল, 'তাহলে এখন উঠা যাক। আজকেই ভ্যানে লোক পাঠাতে হবে। কাদের পাঠানো যায়, আপনিও ভাবুন। আমিও দেখছি। সংশ্লিষ্ট ঘটনাগুলোর এ পর্যন্তকার বিশ্লেষণে বুঝেছি,

লোকটি বিপজ্জনক। সাবধানে এগোতে হবে। তাকে কাবু করতে, বাগে আনতে আরও কি করা যায়, সেসব বিকল্প নিয়েও ভাবতে হবে।’

‘ঠিক মি. মিহরান মাসিস। আপনি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, সেসব নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে।’

বলে উঠে দাঁড়াল ওরান্তি ওরারতু।

উঠে দাঁড়াল মিহরান মাসিস।

ভারদান বুরাগও।

# ৬

আহমদ মুসা ভ্যান ক্যালিস মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে গাড়ি ড্রাইভ করে নেমে এল লেক ভ্যানের তীরে। তারপর লেক ড্রাইভে উঠে তার গাড়ি ছুটে চলল দক্ষিণে।

লেক ড্রাইভ লেক ভ্যানের তীর বরাবর তৈরি মনোরম সড়ক। পর্যটকদের অত্যন্ত প্রিয় এই সড়ক। একদিকে পাহাড়ের শ্রেণী, তার পাদদেশে পরিকল্পিত বনায়নের সবুজ-সমারোহ। অন্যপাশে হ্রদের দিগন্ত প্রসারিত নীল-শান্ত জলরাশি।

এই সুন্দর সড়ক লেক ড্রাইভ ধরেই এগিয়ে চলেছে আহমদ মুসার গাড়ি।

ড. সাহাব নুরী, ড. আজদা ও সাহিবা সাবিতরাই আহমদ মুসাকে এনেছে এই লেক ড্রাইভ দেখার জন্যে।

আহমদ মুসা এসেছিল ভ্যান ক্যালিস মিউজিয়াম দেখতে। আসলে আহমদ মুসা সরেজমিনে যাচাই করতে চেয়েছিল মাউন্ট আরারাতের মানচিত্র চুরির বিষয়টা। তার সাথে এসেছিল ড. সাহাব নুরী ও ড. আজদা। আর সাহিবা সাবিতকে ড. মাহজুন মাজহারই পাঠিয়েছিল গাইড হিসেবে।

মিউজিয়ামে সাহিবা সাবিতই প্রস্তাব করেছিল লেক ড্রাইভে যাবার জন্যে। বলেছিল, এ সময় লেক ড্রাইভ ফাঁকা থাকে, বেড়িয়ে আরাম আছে। সকালে বিকালে তো গাড়ির হাট বসে যায়।

ড. সাহাব নুরী ও ড. আজদা বিষয়টা আহমদ মুসার ওপর ছেড়ে দিয়েছিল। আহমদ মুসা প্রথমে সাহিবা সাবিতের প্রস্তাবে রাজি হয়নি। কিন্তু শেষে নাছোড়বান্দা সাহিবা সাবিতের জেদে আহমদ মুসা বলে, ঠিক আছে, চল আগে মিউজিয়ামে যাই।

মিউজিয়ামে এসে গাড়ি থেকে নেমেই সাহিবা সাবিত মিউজিয়ামের এক ড্রাইভারকে ডেকে তার হাতে টাকা দিয়ে বলেছিল, আমরা লেক ড্রাইভে যাব, আপনি গাড়িতে পেট্রল ভরে রাখুন। সকালে পেট্রল নেয়া হয়নি।

এর মাধ্যমে লেক ড্রাইভে আসা পাকাপোক্ত হয়ে যায়। আহমদ মুসাকে আসতে হয় লেক ড্রাইভে।

কিন্তু লেক ড্রাইভে যাত্রা করে কয়েক গজ যেতেই একটা মারাত্মক ঘটনার মুখোমুখি হয় তারা।

গাড়ি ড্রাইভ করছিল আহমদ মুসা।

ড্রাইভ করে কয়েক গজ যেতেই আহমদ মুসার জ্যাকেটের বুক পকেটে গুঁজে রাখা কলমের মাথা থেকে খুব ধীরলয়ে বিপ বিপ শব্দ বেরিয়ে আসে এবং একটা লাল সিগন্যাল আসতে শুরু করে।

চমকে উঠেছিল আহমদ মুসা। একসাথেই তার সারা দেহের রক্ত কণিকায় একটা বিদ্যুৎ চমক খেলে যায়।

চোখের পলকে আহমদ মুসা গাড়ি রাস্তার কিনারায় ঘুরিয়ে নেয়। রাস্তার কিনারায় গিয়ে একটা হার্ডব্রেক কষে আহমদ মুসা। দ্রুত কণ্ঠে আদেশের স্বরে বলে, সবাই তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে পড়ুন।

আহমদ মুসার পাশে বসেছিল ড. সাহাব নুরী এবং পেছনের সীটে বসেছিল ড. আজদা ও সাহিবা সাবিত। আকস্মিকভাবে গাড়ি ঘুরিয়ে হার্ডব্রেক কষায় প্রায় সকলেই সীটের ওপর পড়ে গিয়েছিল।

এই অবস্থায় আহমদ মুসার নির্দেশ পেয়ে তারা বিমূঢ়ভাবে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়েছিল।

কিন্তু আহমদ মুসার শক্ত হয়ে উঠা গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে কোন কথা না বলে তারা দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে পড়ে।

আহমদ মুসাও দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে গাড়ি ঘুরে বিমূঢ়ভাবে দাঁড়ানো ড. আজদাদের কাছে গিয়ে বলে, গাড়ির কোথাও বোমা বা কোন ধরনের বিস্ফোরক পাতা আছে। আপনাদের আরও সরে আসতে হবে গাড়ির কাছ থেকে।

‘বোমা? গাড়িতে বোমা পাতা আছে?’ আতংকিত কণ্ঠে বলল ড. সাহাব নুরী। আর ড. আজদা ও সাহিবা সাবিতের চোখ বিস্ফারিত। আকস্মিক আতংকে তারা প্রায় বাকরুদ্ধ।

তারা ফুটপাতের ওপর উঠে আরও কিছুটা দূরে সরে গেল।

গাড়ি তখন মিউজিয়ামের গেট থেকে খুব দূরে আসেনি। মিউজিয়ামের গেটের সামনে পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল।

আহমদ মুসা হাত তুলে তাদের ডাকে।

গেটের পুলিশের সাথে আহমদ মুসাকে পরিচয় করে দিয়েছিল সাহিবা সাবিত। সাহিবা সাবিত আহমদ মুসার অলক্ষ্যে পুলিশ অফিসারকে এ কথাও বলেছিল যে, খোদ ডিজিপি মাহির হারুন এনাকে 'স্যার' বলে, বুঝলেন!

আহমদ মুসার হাত ইশারা পেয়ে ছুটে আসে পুলিশের গাড়িটি।

আহমদ মুসা ইশারা করে তাদের গাড়ি থেকে একটু দূরে পুলিশের গাড়ি দাঁড় করায়।

দ্রুত পুলিশরা গাড়ি থেকে নেমে আসে। পুলিশ এসে স্যালুট দিয়ে আহমদ মুসাকে বলে, 'কোন সমস্যা স্যার? গাড়ির কি কিছু হয়েছে স্যার?'

'গাড়িতে বোমা বা কোন ধরনের বিস্ফোরক পাতা আছে।' বলল আহমদ মুসা।

শুনেই তটস্থ হয়ে উঠে পুলিশ। পুলিশ অফিসার উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে, 'স্যার, তাহলে তো এখনি বোমা স্কোয়াডকে ডাকতে হয়।'

'সে অনেক সময়ের ব্যাপার। আপনারা একটু দাঁড়ান, আমি একটু দেখি, বোমা বা বিস্ফোরক বাইরে কোথাও পাতা আছে কিনা। বাইরে পাতা থাকলে খুব ঝামেলার বিষয় হবে না।'

বলে পা বাড়াল আহমদ মুসা তাদের গাড়ির দিকে।

ছুটে এসে সাহিবা সাবিত আহমদ মুসার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনাকে কিছুতেই গাড়ির দিকে যেতে দেব না।'

বলেই সাহিবা সাবিত তাকাল পুলিশ অফিসারের দিকে। বলল, 'অফিসার, আপনি বোমা স্কোয়াড ডাকুন।'

আহমদ মুসাও বলল, 'ঠিক আছে, ডাকুন বোমা স্কোয়াডকে।'

পুলিশ অফিসার সংগে সংগেই ওয়্যারলেস করল পুলিশ হেডকোয়ার্টারে।

'ঠিক আছে সাহিবা, বোমা স্কোয়াড আসছে। আমি একটু দেখি, বোমাটা তারা কোথায় পেতেছে।'

সাহিবা সাবিত তাকিয়েছিল আহমদ মুসার চোখের দিকে। অদ্ভুত এক সম্মোহন শক্তি সে চোখে। সে দৃষ্টির সামনে নিজেকে হারিয়ে ফেলল। মোমের মত গলে গেল যেন সে। আহমদ মুসাকে আর বাঁধা দিতে পারল না।

আহমদ মুসা গাড়ির দিকে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল গাড়ির মাঝের গেট বরাবর। মুহূর্তের জন্যে ভাবে, বোমা যদি সত্যিই পাতা থাকে, তাহলে তা পাতা হয়েছে, ড. আজদা অথবা আমাকে মারার জন্যে। সুতরাং তারা চাইবে, বোমার প্রথম আঘাতেই যেন তাদের লক্ষ্য অর্জিত হয়। সুতরাং গাড়ির মাঝখানে কোথাও তাদের বোমা পাতবে, এটাই যুক্তির দাবি।

গাড়িটি জাপানের মিতসুবিশি কোম্পানীর ৬ সীটের হাইল্যান্ডার জীপ। নিচের বটমটা দেখা খুব কষ্টসাধ্য নয়।

আহমদ মুসা গাড়ির প্রান্তে মুখ নিয়ে দেহটাকে মাটির সমান্তরালে এনে গাড়ির মধ্যাঞ্চলে একটু খোঁজাখুজি করতেই দেখতে পায়, গাড়ির লম্বালম্বি চেসিসের মধ্য বরাবর স্থানে আঠালো টেপ দিয়ে বোমাটি আটকানো।

দ্রুত ভালো করে দেখার জন্যে আহমদ মুসা মাথাটি ভেতরে নিয়েছিল। দেখতে পেল, টাইমারযুক্ত বোমা। টাইমারের দিকে তাকিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আহমদ মুসা। এখনও দেড় মিনিট বাকি।

আহমদ মুসা পকেট থেকে লেজার কাটার নিয়ে বাম হাতের বৃদ্ধা, তর্জনী ও মধ্যমা এই তিন আঙুল দিয়ে অতি সন্তর্পণে বোমাটি ধরে ডান হাত দিয়ে লেজার কাটারের সাহায্যে বোমাকে গাড়ির চেসিস থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল এবং বোমাটিকে ঐভাবে বাম হাতের তিন আঙুলে আলতোভাবে ধরে পেছনমুখী ক্রলিং করে ইঞ্চি ইঞ্চি করে গাড়ির তল থেকে বের হয়ে এসেছিল।

ঘামে ভিজে গিয়েছিল আহমদ মুসার দেহ।

আহমদ মুসা বের হয়ে আসতেই পুলিশরা ছুটে এল।

'স্যার, বোমা পাওয়া গেছে?' বলল পুলিশ অফিসারটি।

‘হ্যাঁ অফিসার, এটা টাইম বোমা। আর মাত্র ৩০ সেকেন্ড সময়। কোন নিরাপদ জায়গায় একে ফেলতে হবে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘স্যার, আমাদের ফুটপাতের ওপারেই একটা পরিত্যক্ত ভাঙা স্থাপনা আছে, সেখানেই ছুঁড়ে দিন স্যার।’ বলল পুলিশ অফিসার।

ড. সাহাব নুরী, ড. আজদা ও সাহিবা সাবিত আহমদ মুসার হাতে বোমা দেখে ও মাত্র ৩০ সেকেন্ড সময় আছে জেনে আতংকে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল।

আহমদ মুসা দ্রুত কয়েক পা হেঁটে ফুটপাতে উঠে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে বাম হাতের তিন আঙুলেই বোমাটি ছুঁড়ে দিল পরিত্যক্ত স্থাপনার দিকে।

মাত্র কয়েক মুহূর্ত। বিকট শব্দে বোমার বিস্ফোরণ ঘটল। মুহূর্তেই পাথরের তৈরি পরিত্যক্ত স্থাপনা ধুলো হয়ে গেল।

সকলের বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখ সেদিকে।

পুলিশের বোমা স্কোয়াডও এসে গেছে।

ড. সাহাব নুরী, ড. আজদা ও সাহিবা সাবিত এল আহমদ মুসার কাছে।

আহমদ মুসা ঘুরে ফিরে আসছিল।

সাহিবা সাবিত আহমদ মুসার মুখোমুখি হয়ে বলল, ‘কি দরকার ছিল এই ঝুঁকি নেয়ার, স্যার? পুলিশের বোমা স্কোয়াড তো এসেই পড়ল।’

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘তেমন বড় কোন দরকার ছিল না। তবে এটুকু হতো যে, বোমা স্কোয়াড এসে বোমা পেত না, আর তুমি গাড়ি পেতে না, আর আমি বোমাটা কোথাকার তৈরি তা জানতে পারতাম না।’

‘অমন লাখো গাড়িও আপনার সমান নয়। তবে আমি বলতে পারব না বোমাটা কোথাকার তৈরি তা না জানলে কি এমন ক্ষতি হতো?’ বলল বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে সাহিবা সাবিত।

পুলিশ অফিসার সামনে এগিয়ে এল আহমদ মুসার। বলল, ‘স্যার, বোমাটি কোথাকার তৈরি তা কি আপনি জেনেছেন?’

‘একটা ব্র্যান্ড চিহ্ন দেখেছি, নিশ্চিত করে কিছু বলার আগে আরও ভাবতে হবে অফিসার।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ধন্যবাদ স্যার। আর একটা কথা, আমাদের মনে হয় মিউজিয়ামের ড্রাইভার তেল ভরার জন্যে গাড়ি নিয়ে যাবার পর গাড়িতে বোমা পাতা হয়েছে। তাকে গ্রেফতার করলেই সব জানা যাবে।’ পুলিশ অফিসারটি বলল।

‘তাকে গ্রেফতার করুন, জিজ্ঞাসাবাদ করুন, কিন্তু আমার মনে হয়, সে কিছুই জানে না। গাড়িতে তেল ভরার সময় বোমা পাতার কাজটা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। ঐ সময়টায় কি কি হয়েছে, কে কি দেখেছে, তা জানা গেলেই সত্যটা জানা যাবে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘কিন্তু স্যার, ওখানে তো অনেক লোক থাকে। এত লোকের মধ্যে কেউ ঐ ধরনের কিছু করে ফেলল, সেটা কতটা সম্ভব!’ পুলিশ অফিসার বলল।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘ওখানে শুধু তেল ভরাই হয় না, গাড়ির পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করা হয়। আর পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় অনেক কিছুই করা সম্ভব।’

অফিসার আহমদ মুসাকে একটা স্যালুট দিয়ে বলল, ‘ধন্যবাদ স্যার, ঠিক বলেছেন আপনি।’

একটু থেমেই পুলিশ অফিসারটি আবার বলে উঠল, ‘স্যার, বোমার এ কেসটা কি ম্যাডাম সাহিবা করবেন? গাড়িটা তো তার।’

‘ওকে অফিসার, কেস আমিই করব। এখনি ফেরার পথে থানায় কেসটা রেকর্ড করে যাব।’ বলল সাহিবা সাবিত।

‘ওকে ম্যাডাম’ বলে অফিসারটি সবাইকে সালাম দিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠল।

পুলিশ চলে যেতেই সাহিবা সাবিত আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, ‘চলুন স্যার, আমরা ফিরি। ফেরার পথে কেসটা দায়ের করে যাব।’

‘কিন্তু সাহিবা সাবিত, আমি লেক ভ্যান দেখব বলে লেক ড্রাইভে যাবার জন্যে অলরেডি কিছুটা পথ এগিয়ে এসেছি। আমি লেক ড্রাইভটা ঘুরে আসি, তোমরা গাড়ি নিয়ে চলে যাও।’ বলল আহমদ মুসা।

বিমর্ষতার একটা ছায়া খেলে গেল সাহিবা সাবিতের মুখে। ভাবল সে, এভাবে সরাসরি ফিরে যাবার কথা বলা তার ঠিক হয়নি। সাহিবা সাবিত তাকাল

ড. আজদার দিকে। আবার ফিরে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'স্যার, এতবড় ঘটনা ঘটল, আপনার পোশাক ধূলি-ধূসরিত হয়েছে, এজন্যেই বলছিলাম স্যার। কিন্তু আপনার সিদ্ধান্তের সাথে আমি আছি স্যার।'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'সাহিবা, তোমার প্রস্তাবে আমি কিছু মনে করিনি। তুমি যেটা বলেছ সেটাই স্বাভাবিক। আমার অনুরোধ, তোমরা মামলা দায়েরের কাজটা শেষ করে যাও। আমি পরে আসব, মনে হচ্ছে আমার কিছু কাজ আছে।'

'মনে হচ্ছে কিছু কাজ আছে, এর অর্থ কি ভাইয়া? আপনি লেক ড্রাইভে যাবেন, সেটাই কি কাজ?' বলল ড. আজদা।

'লেক ড্রাইভে যাওয়া কোন কাজ নয়। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, যে যাওয়াটা আমার বাঁধাগ্রস্ত হয়েছে, সে যাওয়াটা আমার শেষ করা দরকার। এই 'শেষ করা'টাকেই আমি কাজ বলছি।' আহমদ মুসা বলল।

'তাহলে স্যার, আমাদের ফিরিয়ে দিচ্ছেন কেন?' বলল সাহিবা সাবিত।

'বড় একটা ঘটনা ঘটে গেছে। কেস দায়ের হওয়া জরুরি। এছাড়া তেমন আর কোন কারণ নেই।'

'তাহলে ঘুরে এসেই আমরা কেস দায়ের করব। আমরা এখন যাত্রা করতে পারি।' সাহিবা সাবিত বলল।

'ভাইয়া, চলুন আমরা যাত্রা করি।' বলল ড. আজদা।

সবাই গাড়িতে উঠল। আগের মতই আহমদ মুসা ড্রাইভিং সীটে। তার পাশে ড. সাহাব নুরী। পেছনের সীটে ড. আজদা ও সাহিবা সাবিত।

গাড়ি স্টার্ট নিয়ে চলতে শুরু করল।

এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি ড. সাহাব নুরী। গাড়ি চলতে শুরু করলে সে বলল, 'মি. আবু আহমদ আব্দুল্লাহ, মৃত্যু থেকে আমরা কয়েক মিনিটের ব্যবধানে ছিলাম। গাড়ি ঐ কয়েক মিনিট চললে আমাদের সাক্ষাৎ মৃত্যু ঘটতো। আপনি আমাদের বাঁচিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আপনাকে বিব্রত করবো না। কারণ প্রশংসা আপনি পছন্দ করেন না।'

বলে থামল ড. সাহাব নুরী। একটু থেমেই বলল, 'কিন্তু একটা বিস্ময় আমার মনে মি. আবু আহমদ। বোমার অস্তিত্ব আপনি টের পেলেন কি করে?'

আহমদ মুসা ডান হাত স্টিয়ারিং হুইলে রেখে বাঁ হাত দিয়ে পকেটের কলমটা বের করে বলল, 'এই কলম আমাকে সিগন্যাল দিয়েছে।'

'ওটা কি এক্সক্লুসিভ ডিটেক্টর জনাব?' জিজ্ঞাসা সাহিবা সাবিতের।

'আরও অনেক কিছু।' হাসির সাথে বলল আহমদ মুসা।

কলমটি পকেটে রাখল আহমদ মুসা।

গাড়ি চলছিল পশ্চিম দিকে লেক অভিমুখে।

তীরের কাছাকাছি পৌঁছে লেক ড্রাইভে উঠল আহমদ মুসার গাড়ি। এবার গাড়ি চলতে শুরু করল তীর ঘেঁষে দক্ষিণ দিকে।

গাড়িতে নীরবতা।

নীরবতা ভাঙল সাহিবা সাবিত। বলল, 'স্যার, পুলিশ সাহস করল না। বোমা স্কোয়াডকে ডেকে পাঠাল। কিন্তু আপনি বোমার সন্ধানে লাগলেন। বোমাটা বের করেও আনলেন। কিন্তু টাইম বোমার বার্স্ট হওয়ার সময় যদি ঐ সময়েই শেষ হয়ে যেত এবং বিস্ফোরণ ঘটত?'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'ঐ বোমায় আমার মৃত্যু লেখা থাকলে, সেটাই ঘটতো, কিন্তু মৃত্যু লেখা ছিল না বলে টাইম বোমার সময় তখন দেড় মিনিট ছিল।'

আহমদ মুসার নির্বিকার এই জবাবে সবার চোখে-মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল।

সাহিবা সাবিতের চোখে-মুখে তখন অপরিচিত এক বেদনার কালো ছায়া। বলল সে, 'জীবনকে ভালোবাসা মানব ফিতরাতেরই একটা অংশ এবং এটা আল্লাহর দেয়া। আপনি এই ফিতরাতকে লংঘন করেছেন স্যার।'

গম্ভীর হয়ে উঠল আহমদ মুসার মুখ। বলল, 'তুমি খুব ভারি কথা বলেছ সাহিবা সাবিত। আমার ওপর তোমার অভিযোগটাও মারাত্মক এবং এটা সত্য। কিন্তু সাহিবা সাবিত, জীবনের ঝুঁকি জীবন সংগ্রামেরই একটা অংশ। একে বাদ দিলে জীবনের চাকা পদে পদে অচল হয়ে পড়তে পারে।'

'জেনারেল রুল হিসেবে আপনার কথা সত্য। কিন্তু অনেক বিশেষ ক্ষেত্রে এটা সত্য নয়। যেমনঃ একটা গাড়ি রক্ষার জন্যে আপনি জীবনের ঝুঁকি নিতে পারেন না।' গম্ভীর ও ভারি কণ্ঠ সাহিবা সাবিতের।

'তোমার এ কথাও সত্য সাহিবা সাবিত। কিন্তু সাহিবা, এই ঘটনায় গাড়ি রক্ষা মূল বিষয় ছিল না। মূল বিষয়টা ছিল বিস্ফোরকের সন্ধান করা। পুলিশের বোমা স্কোয়াডও এটাই করতো। তারা যেটা করতো, আমিও সেটাই করেছি। গাড়ির বটমটা দেখতে দিয়ে গাড়ির চেসিসের সাথে বোমাটা দেখে ফেলি। একই সাথে দেখে ফেলি যে, বোমাটা টাইম বোমা এবং সময় দেড় মিনিট আছে। এই সময়ের মধ্যে বোমাটা বাইরে নিয়ে নিরাপদে বিস্ফোরণ ঘটানো সম্ভব। আমি তাই করেছি। আল্লাহর দেয়া ফিতরাত আমি লংঘন করিনি সাহিবা।' বলল আহমদ মুসা।

সাহিবা সাবিতের মুখ থেকে বেদনার মেঘ অনেকখানি কেটে গেছে। চোখে তার মুগ্ধতার একটা ঔজ্জ্বল্য। ঠোঁটে প্রসন্নতার অপরিস্ফুট হাসি। বলল, 'স্যার, কথার রাজা যদি কেউ হন, তাহলে যুক্তিও তার হাতের মুঠোয় চলে যায়। সুতরাং আমার কোন কথা নেই। তবে স্যার, আমার মতটা বলি। এ ধরনের ঝুঁকি আমি নিজের জন্যে পছন্দ করি না, অন্য কারও জন্যে করব কেন?'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'তোমার এই যুক্তিতে আমার সব যুক্তি শেষ, সব কথা শেষ। তাহলে তোমাকে তো কথার সম্রাট বলতে হয়। কি বল তুমি আজদা?'

'ঠিক বলেছেন ভাইয়া। আসলেই সে কথার সম্রাট। ওর গোটা একাডেমিক ক্যারিয়ারে ডিবেটে প্রথম স্থান ওর জন্যে বরাদ্দ।' ড. আজদা বলল।

ড. আজদার কথাগুলো আহমদ মুসার কানে গেল না। তার চোখ তখন গাড়ির রিয়ারভিউ মিররে নিবদ্ধ। রিয়ারভিউতে দেখতে পাচ্ছে সে একটা গাড়িকে। অনেকক্ষণ ধরেই দেখছে গাড়িটাকে। আহমদ মুসাদের গাড়ির সমান গতিতে আসছে। গাড়ির গতি অতিসন্তর্পণে কম-বেশি করে কমিয়ে-বাড়িয়ে পরীক্ষা করে দেখেছে, গাড়িটির নিজস্ব কোন গতি নেই। তার মানে, গাড়িটি তাদের অনুসরণ করছে। নিশ্চয় ওরা উল্কিওয়ালারাই। ওরাই বোমা পেতে ছিল।

বোমার ফাঁদ ওদের ব্যর্থ হয়ে গেছে। বোমার ফাঁদ ব্যর্থ হলে বিকল্প চিন্তাও তাদের ছিল! আহমদ মুসা স্বীকার করল, আসলেই গ্রুপটা দূরদর্শী ও নাছোড়বান্দা। কিন্তু গাড়িটা আমাদের অনুসরণ করছে কেন? কি তাদের মতলব? আহমদ মুসা ডুবে গিয়েছিল চিন্তায়।

তার দু'হাত স্টিয়ারিং হুইলে এবং চোখ দু'টি সামনে প্রসারিত। কিন্তু তার মনটা পড়ে আছে দু'পাশের রিয়ারভিউ মিররে। মাঝে মাঝেই দু'চোখ চকিতে ফিরিয়ে এনে মনিটর করছে রিয়ারভিউয়ের দৃশ্য।

হঠাৎ আহমদ মুসার নীরব হওয়ায় বিস্ময় সৃষ্টি হয়েছে ড. আজদাসহ সবার মধ্যে। পাশের সীটে বসা ড. সাহাব নুরী আহমদ মুসার চোখে-মুখের ভাবান্তর আরও কাছ থেকে লক্ষ্য করছে। তার বিস্ময় আরও বেশি। সে পেছন ফিরে ড. আজদাদের দিকে মুখ নেড়ে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল তাদের দিকে। তারাও প্রশ্ন ফিরিয়ে দিল।

কথা বলল আহমদ মুসাই প্রথম। বলল, 'মি. সাহাব নুরী, এই রাস্তা এভাবে কত দূর গেছে?'

'লেক হিল টানেল পর্যন্ত গেছে।' বলল ড. সাহাব নুরী।

'তারপর?' আহমদ মুসা বলল।

'তারপর রোড টানেলে ঢুকে গেছে। টানেল প্রায় তিন কিলোমিটার দীর্ঘ হবে। টানেল শেষে রোড এভাবেই সামনে লেকের ও প্রান্তে গিয়ে পৌঁছেছে। তবে আমাদের সামনে যাওয়া শেষ হবে লেক হিল টানেলে গিয়ে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিশেষ পারমিশন ছাড়া টানেলে ঢোকা নিষিদ্ধ।' বলল ড. সাহাব নুরী।

'মাঝখানে রোড স্টেশন কিংবা এ জাতীয় কিছু আছে?' আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

'সেরকম কিছু নেই। কেন এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন?' বলল ড. সাহাব নুরী।

'সামনে কি আছে আমি বুঝতে চেষ্টা করছি ড. সাহাব নুরী।' আহমদ মুসা বলল।

'কেন? সামনে এগোলেই তো সব দেখা যাবে।' বলল ড. সাহাব নুরী।

‘সামনে যাওয়াটা কতটা নিরাপদ সেটাই আমি ভাবছি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কেন এই ভাবনা, কিছু ঘটেছে?’ সাহাব নুরী বলল। তার কণ্ঠে দুশ্চিন্তার ছাপ।

কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি ভাবনার ছায়া নেমেছে ড. আজদা ও সাহিবার চোখে-মুখে।

‘ঘটেছে নয়, ঘটছে মি. সাহাব নুরী। আমাদেরকে পেছন থেকে ফলো করা হচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ফলো করা হচ্ছে?’ বলল ড. সাহাব নুরী। তার কণ্ঠে উদ্বেগ।

মুহূর্তে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ল ড. আজদাদের মুখেও।

ড. সাহাব নুরীও গাড়ির রিয়ারভিউ মিররের দিকে তাকাল। দেখতে পেল গাড়িটাকে।

রাস্তায় এখন গাড়ি নেই বললেই চলে। আসলে লেক ড্রাইভে এ সময় কেউ আসে না। লেক ড্রাইভ জমজমাট হয়ে ওঠে বেলা ৩টার পর।

‘গাড়িটা আমাদের ফলো করছে, এটা কি করে বোঝা গেল মি. আবু আহমদ আব্দুল্লাহ?’ জিজ্ঞেস করল ড. সাহাব নুরী।

‘এটা বোঝার জন্যে যা করা দরকার, তা করার পর আমি নিশ্চিত হয়েছি গাড়িটা আমাদের ফলো করছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ওদের লক্ষ্য কি?’ বলল ড. সাহাব নুরী। তার কণ্ঠে উদ্বেগ।

‘আমি সেটাই বোঝার চেষ্টা করছি। সামনে ওদের লোকজন থাকতে পারে। কোথায় কিভাবে থাকতে পারে, সেটা আন্দাজ করার জন্যেই সামনে কি আছে তা জানতে চাচ্ছিলাম।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ঠিক বলেছেন মি. আবু আহমদ। ওরা আমাদের শুধুই ফলো করছে তার অর্থ সামনে ওদের লোক আছে কোন এক জায়গায় ওঁৎ পেতে।’ বলল ড. সাহাব নুরী।

ড. সাহাব নুরী কথা বললেও তার উদ্বিগ্ন চোখ নিবদ্ধ ছিল গাড়ির রিয়ারভিউ মিররে।

কথা শেষ করেই সে চিৎকার করে উঠল, ‘মি. আবু আহমদ আব্দুল্লাহ, গাড়িটা এবার দ্রুত এগিয়ে আসছে। আপনি গাড়ির গতি বাড়ান।’

আহমদ মুসাও দেখতে পেয়েছিল যে, গাড়িটা ডাবল স্পীডে এগিয়ে আসছে। আহমদ মুসা তার গাড়ির গতি না বাড়ালে দু’তিন মিনিটের মধ্যেই গাড়িটা আহমদ মুসাদের সমান্তরালে এসে যাবে।

আহমদ মুসা তার গাড়ির গতি বাড়াল না। বলল, ‘বাড়িয়ে লাভ নেই। আমরা গতি বাড়াব, সেটা ঐ গাড়িটা জানে এবং গাড়ির গতি বাড়িয়ে লাভ হবে না, সেটাও জানে। জানে বলেই গাড়িটা তার গতি বাড়িয়েছে।’ আহমদ মুসা থামল।

‘তাহলে আমাদের এখন কি করণীয়?’ বলল সাহিবা সাবিত। তার কণ্ঠ শুষ্ক। চোখে-মুখে উদ্বেগ।

ড. সাহাব নুরী ও ড. আজদারও উদ্বেগে মুষড়ে পড়া ভাব।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘ওরা কি করছে তা দেখা ছাড়া আমাদের কিছু করণীয় দেখছি না। পেছন থেকে গাড়িটা আসছে, দেখা যাক গাড়িটার কি ভূমিকা হয়।’

কথা বলছিল সামনের দিকে তাকিয়ে। সামনে আর কোন গাড়ি সে দেখতে পাচ্ছে না। দেখতে পেল, ওপাশে ফেরার রাস্তা দিয়ে দু’টি মাইক্রো আসছে পাশাপাশি। ঐ দু’টি মাইক্রো ছাড়া ওপাশের ফেরার রাস্তাতেও কোন গাড়ি নেই।

হঠাৎ আহমদ মুসার খেয়াল হলো, তাদের ফলোকারী গাড়ি এবং সামনের মাইক্রোবাস দু’টির গতি একই রকম। শুধু তাই নয়, পেছনের গাড়ি এবং সামনের দু’টি মাইক্রো আহমদ মুসাদের গাড়ি থেকে সমান দূরত্বে।

ভাবতে ভাবতেই পেছনের গাড়ি এবং সামনের দু’টি মাইক্রো আহমদ মুসাদের গাড়ির আরও ক্লোজ হয়ে গেল।

হঠাৎ আহমদ মুসার নজরে পড়ল, তার গাড়ি থেকে বিশ-পঁচিশ গজ সামনে দু’পাশের রাস্তার একটি লিংক চ্যানেল।

লিংক চ্যানেলটা নজরে পড়তেই হঠাৎ যেন সব বিষয় আহমদ মুসার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। মাইক্রো দু'টির টার্গেট লিংক চ্যানেল দিয়ে এ রাস্তায় ঢুকে পড়া এবং আহমদ মুসার গাড়ির একেবারে মুখোমুখি দাঁড়ানো।

আহমদ মুসার ভাবতে যতক্ষণ সময় লাগল, ততক্ষণে ঘটনা ঘটে গেছে। মাইক্রো দু'টি লিংক চ্যানেল দিয়ে এ রাস্তায় ঢুকে আহমদ মুসার গাড়ির দিকে ছুটে আসছিল সমান্তরালে গোটা রাস্তা কভার করে।

'সবাই সাবধান!' বলে হার্ডব্রেক করল আহমদ মুসা।

সামনের দু'গাড়িও গজ চারেক এগিয়ে এসে আহমদ মুসার গাড়ির মতই হার্ডব্রেক কষল।

অনুরূপভাবে পেছনের ফলো করে আসা গাড়িটাও আহমদ মুসার গাড়ি থেকে চার গজ মত দূরে এসে বিকট শব্দ তুলে হার্ডব্রেক কষল।

সামনের দু'টি মাইক্রো থামার সংগে সংগেই দুই মাইক্রোর ছাদের একটা অংশ সামনে থেকে সরে গেল। সেখানে বেরিয়ে এল আহমদ মুসাদের গাড়ি তাক করা রকেট লাঞ্চার। আর দু'মাইক্রো থেকে নেমে এল আপাদমস্তক কালো পোশাকের আটজন মানুষ। ওদের সবার হাতে মিনি মেশিনগান। ওরা ছুটে এল আহমদ মুসার গাড়ির সামনে।

কি ঘটতে যাচ্ছে আহমদ মুসা সবই বুঝতে পারল।

ওরা সামনে দাঁড়ানোর আগেই আহমদ মুসা তার এম-১০ রিভলভারের বাঁট দিয়ে তার সামনের উইন্ড স্ক্রীন ভেঙে ফেলল।

একটা রিভলভার হাতেই ছিল আহমদ মুসার এবং জ্যাকেটের বাম পকেট থেকে আরেকটা বাম হতে তুলে নিল।

তার দু'হাতে রিভলভার। তাক করা সামনের দিকে।

ওরা এসে দাঁড়াল সামনে। ওদের হাতেও মিনি মেশিনগান উদ্যত।

রিয়ারভিউয়ে আহমদ মুসা দেখতে পেল, পেছনের গাড়ি থেকেও দু'জন নেমেছে। তারা পজিশন নিয়েছে পেছনে।

এই সময় সামনের গাড়ি থেকে একজন চিৎকার করে বলল, 'আবু আহমদ আব্দুল্লাহ, তোমার খেলা শেষ। তোমাকে হয় আত্মসমর্পণ করতে হবে,

নয়তো তোমাদের সকলকে ধ্বংস হতে হবে। তোমাদের সমেত গাড়িটাকে ছাতু বানিয়ে দিতে আমাদের দু'রকেট লাঞ্চারের একটিই যথেষ্ট। তবে আমরা চাই তোমাকে ও ড. আজদাকে জীবন্ত হাতে পেতে। তোমরা আমাদের লোক মেরেছ। তোমাদের মারার আগে সেই শোধ আমরা তুলতে চাই। এখন সিদ্ধান্ত তোমার। দু'মিনিটের মধ্যে তোমাকে জানাতে হবে, তুমি ও ড. আজদা আত্মসমর্পণ করছ কিনা।'

আহমদ মুসার চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ড. আজদা, সাহিবা সাবিত ও সাহাব নুরীদের বাঁচানোর একটা বিকল্প তার সামনে এসেছে। কিন্তু এ বিষয়ের দিকে না গিয়ে সে বলল, 'তোমরা কে জানি না, কিন্তু তোমাদের ঐ রকেট লাঞ্চার দিয়ে আমাদের ধ্বংস করার ভয় দেখিও না। তোমাদের হাতে যে রকেট লাঞ্চার দেখছি, তার ডেস্ট্রাকশন রেডিয়াস হল ৪০ বর্গফুট। সুতরাং আমাদের গাড়ি ধ্বংস করতে চাইলে তোমাদের তিন গাড়ি এবং তোমরাও ধ্বংস হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তোমরা বন্দুকধারী, দশটি মিনি মেশিনগানের গুলি চালিয়ে আমাদের চারজনকে হত্যা করতে পার, কিন্তু শুনে রাখ, আমাদের চারজনকে মারতে হলে তোমাদের কমপক্ষে চারজনকে মরতে হবে। তবে আমার দুই হাতের রিভলভার আরও বেশি মারতে পারে, কারণ, আমার হাত তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষিপ্র এবং আমার গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। সুতরাং তোমাদের প্রস্তাব নয়, আমার প্রস্তাবে তোমাদের রাজি হতে হবে।' থামল আহমদ মুসা।

ওদিক থেকে সংগে সংগেই উত্তর এল না।

এদিকে ড. সাহাব নুরী, ড. আজদা ও সাহিবা সাবিত আতংকে একেবারে চুপসে গেছে। ড. আজদা ও সাহিবা সাবিত দু'জনেই কাঁপছে। আর ড. সাহাব নুরী তার বুকের কাঁপুনি থামাতেই পারছে না।

কিন্তু তারা সকলেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে আহমদ মুসার নির্ভয় ও স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর শুনে। তার চেয়ে বড় বিষয় হলো, তারা যে ভয় দেখিয়েছিল, সে ভয় আহমদ মুসা তাদের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে এবং তার প্রস্তাব ওদেরকে গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়ে কার্যত সিচুয়েশনের কমান্ড প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু আবু

আহমদ আব্দুল্লাহর প্রস্তাবটি কি, এ বিষয়টি বিরাট কৌতুহলেরও সৃষ্টি করেছে তাদের মধ্যে।

আহমদ মুসা কথা শেষ করার পর ওদের তরফ থেকে কোন কথা এল না। বেশ কিছুক্ষণ নীরবতার পর ওদিক থেকে একটা ভারি কণ্ঠ বলল, 'ভয় দেখিয়ে লাভ নেই। বল, তোমার প্রস্তাব কি?'

'আমি অনর্থক ভয় দেখাই না। আমি যা বলেছি, তাই ঘটবে। সে যাক, ড. আজদার কোন দোষ নেই। তাকে কিডন্যাপ করার জন্যে তোমাদের লোক যারা কয়েকবার গিয়েছিল, তাদের আমিই হত্যা করেছি। আমার প্রস্তাব হলো, ড. আজদা, ড. সাহাব নুরী ও সাহিবা সাবিত অর্থাৎ আমি ছাড়া গাড়িতে যারা আছেন, সবাই এ গাড়ি নিয়ে চলে যাবেন। আমি একাই আপনাদের হাতে থেকে যাব। এটাই আমার প্রস্তাব।'

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই 'না' বলে আর্তনাদ করে উঠল সাহিবা সাবিত। বলল, 'এ প্রস্তাব চলবে না। যা ঘটার একসাথে ঘটবে। মরলে একসাথে মরব।' আবেগরুদ্ধ কণ্ঠ সাহিবা সাবিতের।

আহমদ মুসার প্রস্তাবে বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে ড. আজদা ও ড. সাহাব নুরীর চোখ। এতো আত্মঘাতী প্রস্তাব আবু আহমদের! বিচ্ছিন্নভাবে চিন্তা করার কথা তো ভাবেনি! যা ঘটবে একসাথেই তাদের ওপর ঘটবে, এটাই তো তারা ভাবছিল। এসব চিন্তাই এসে ঘিরে ধরেছে ড. সাহাব নুরী ও ড. আজদাকে। তাদের কথাই ভাষা পেয়েছে সাহিবা সাবিতের আর্তনাদ ও কথার মধ্যে।

আহমদ মুসার প্রস্তাবের উত্তর এল ওপার থেকে। বলল আবার সেই ভারি কণ্ঠ, 'তোমার প্রস্তাব মেনে নিচ্ছি আমরা দুই শর্তে। এক. তোমার হাতের দু'টি রিভলভার তোমার গাড়ির ভাঙা উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে এদিকে ফেলে দিতে হবে। দুই. রিভলভার দু'টি ফেলে দেয়ার পর তুমি দু'হাত তুলে বেরিয়ে আসবে। তুমি এসে আমাদের লোকদের সামনে হাত তুলে দাঁড়াবার পর ড. আজদারা গাড়ি নিয়ে চলে যেতে পারবে।'

'আমাকে হাতে পাওয়ার পর এদেরকে নিরাপদে যেতে দেবে, তার গ্যারান্টি তোমাদের শর্তে নেই। ইচ্ছে করলে তোমরা আমাদের সবাইকে

একসাথে মেরে ফেলতে পার। এই ব্যাপারে আমার শর্ত হলো, অস্ত্র আগে ছাড়ব না। অস্ত্র হাতে নিয়েই বের হবো এবং তোমাদের লোকদের সামনে দাঁড়াব। এরপর ড. আজদারা চলে যাবে। তারা নিরাপদ দূরত্বে চলে যাওয়ার পর আমি অস্ত্র ত্যাগ করব।' থামল আহমদ মুসা।

'আমরা বিরোধিতা করছি স্যার। আপনি এই প্রস্তাব থেকে সরে আসুন। যা ঘটে ঘটুক, একসাথেই আমাদের ওপরে ঘটুক।' কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল সাহিবা সাবিত।

'আমারও কথা এটাই ভাইয়া। আপনি প্লিজ এমন কিছু করবেন না।' বলল ড. আজদা। তারও কণ্ঠ কান্নায় ভেঙে পড়ল।

ওদিক থেকে সেই কণ্ঠ আবার ধ্বনিত হলো। বলল, 'ঠিক আছে আবু আহমদ। তোমার কথা মেনে নিলাম। তুমি অস্ত্র নিয়েই বেরিয়ে এস। ড. আজদাদের গাড়ি কিছু দূরে চলে যাবার পর যখন আমরা বলব, তখন অস্ত্র ত্যাগ করে হাত তুলে দাঁড়াতে হবে।'

'ঠিক আছে। আমি বেরুচ্ছি।' বলে আহমদ মুসা তাকাল ড. সাহাব নুরীর দিকে।

ড. সাহাব নুরীর মুখ বেদনায় দীর্ণ। তার চোখ দিয়ে গড়াচ্ছে অশ্রু।

'আমি যাচ্ছি। আপনি ড্রাইভিং সীটে এসে তাড়াতাড়ি গাড়ি নিয়ে চলে যাবেন।' বলল আহমদ মুসা। আহমদ মুসা তার বাঁ হাত ড. সাহাব নুরীর কাঁধে রেখে তাকে সান্ত্বনা দিল।

ড. সাহাব নুরী কিছু বলতে গিয়েও পারল না। কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল তার।

একসাথে কেঁদে উঠেছে সাহিবা সাবিত ও ড. আজদা।

আহমদ মুসা তার হাতটা ড. সাহাব নুরীর কাঁধ থেকে নামিয়ে তাকাল পেছন দিকে। একটু উচ্চকণ্ঠে ডাকল ড. আজদা ও সাহিবা সাবিতকে।

তারা মুখ তুলে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। দু'জনেই মুখ খুলেছিল কিছু বলার জন্যে।

আহমদ মুসা তাদের বাঁধা দিয়ে বলল, 'এখন কোন কথা নয়। এভাবে ভেঙে পড়া ঠিক নয়। আল্লাহর ওপর ভরসা কর এবং কিছু চাইলে, শুধু তাঁর কাছেই

চাও। বিপদ দেবার ক্ষমতা তাঁরই, বিপদ থেকে বাঁচানোর ক্ষমতাও তাঁর। স্মরণ কর, আল্লাহ বলেছেন, 'ফা-ইন্নামাআল উসরে ইয়োসরা, ইন্নামাআল উসরে ইয়োসরা (সংকটের সাথে সমাধান থাকে, নিশ্চয় সমাধান থাকে সংকটের সাথে)। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এ অমোঘ কথার ওপর ভরসা রাখো। কেঁদো না কেউ।'

বলে আহমদ মুসা তাদের কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে দ্রুত গাড়ি থেকে নিচে নেমে গেল।

অসহায় কান্নায় ভেঙে পড়ল ড. আজদা ও সাহিবা সাবিত।

ড. সাহাব নুরী ড্রাইভিং সীটে এসে বসল এবং গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরতি যাত্রা শুরু করল।

গাড়ি থেকে নেমে আহমদ মুসা ঠিক গাড়ির সামনে দাঁড়াল। তার দু'হাতের রিভলভার উদ্যত সামনের আট দুষ্কৃতিকারীর দিকে।

ড. সাহাব নুরী গাড়ি ঘুরিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে শুরু করেছে, তা পেছন দিকে না তাকিয়েও বুঝল আহমদ মুসা।

হঠাৎ আহমদ মুসার মনে হলো, পেছন থেকে পায়ের চারটি শব্দ এগিয়ে আসছে। আহমদ মুসা ভাবল, নিশ্চয় পেছনের গাড়ির লোক হবে তারা। কেন আসছে তারা? কি তাদের উদ্দেশ্য? গুলি করার ইচ্ছা থাকলে পেছন থেকে এতক্ষণে গুলি করতে পারতো।

পেছন থেকে পদশব্দ দ্রুত হয়েছে।

আরও কিছু ভাবার আগেই পেছন থেকে দু'জন তার দু'হাতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দু'টো রিভলভারই তার হাত থেকে ছুটে গেল।

রিভলভার দু'টি পেছন থেকে আসা দু'জনে তুলে নিয়েছে।

হো হো করে হেসে উঠল গাড়ির ভেতর থেকে সেই কণ্ঠ। বলল, 'আবু আহমদ, হাত ওপরে তোল।'

আহমদ মুসা হাত ওপরে তুলল।

আবার হেসে উঠল সেই কণ্ঠ। বলল, ‘আবু আহমদ, প্রতিশ্রুতি আমরা রক্ষা করতে পারলাম না। কোন শিকার হাতের মুঠোয় আসার পর তাকে ছেড়ে দেয়া আমাদের নীতি নয়।’

আহমদ মুসা দেখল, একটি রকেট লাঞ্চার ওপরে উঠছে।

বুঝতে পারল আহমদ মুসা, ড. আজদাদের গাড়ি লক্ষ্যেই রকেট লাঞ্চার ওপরে উঠছে।

এই বিশ্বাসঘাতকতায় আহমদ মুসার সর্বাঙ্গে যেন আগুন ধরে গেল। ভাবল, এবার তার রুখে দাঁড়ানোর সময় এসেছে। তার দু’হাত উঠে আছে কান পর্যন্ত। সে হাতের কয়েক ইঞ্চি পেছনে জ্যাকেটে রাখা আছে যাদুকরী মিনি মেশিন রিভলভার। ট্রিগার টিপে ধরলেই এ রিভলভার থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ২৪টি গুলির মিছিল বেরিয়ে আসে। গুলিগুলো আকারে ছোট, কিন্তু প্রত্যেকটি একটি বোমার মত ভয়ংকর।

আহমদ মুসা তাকাল চারদিকে রকেট লাঞ্চারধারীদের দিকে। আহমদ মুসা নিরস্ত্র হবার পর ওরা এখন নিশ্চিন্ত। ওদের ভয়ংকর গানগুলোর ব্যারেল নিচে নামানো।

তখনও রকেট লাঞ্চারের সুঁচালো মাথা ওপরে ওঠা শেষ হয়নি।

আহমদ মুসার ডান হাত বিদ্যুৎ গতিতে ঢুকে গেল ঘাড়ের নিচে জ্যাকেটের পকেটে। হাতটি চোখের পলকে বেরিয়ে এল, তর্জনী রিভলভারের ট্রিগারে।

হাত বেরিয়ে আসার সাথে সাথেই আহমদ মুসা গুলিবর্ষণ শুরু করেছে। গুলি অব্যাহত রেখেই সে বসে পড়ল এবং পাল্টা গুলি থেকে বাঁচার জন্যে শুয়ে পড়ল। গুলিবর্ষণ তার থামেনি।

পাল্টা গুলিও চলছিল।

কিন্তু আহমদ মুসার রিভলভার এতই ক্ষিপ্রতার সাথে চারদিক ঘুরে এল এবং তার গুলি এতই পয়েন্টেড হলো যে, পাল্টা আঘাতের চেষ্টা যারা করছিল, তারাও গুলি খেয়ে ঢলে পড়ল মুহূর্তে। আহমদ মুসা দ্রুত তার অবস্থানের পরিবর্তন করায় পাল্টা যে গুলি হয়েছিল তা কাজে আসেনি।

গুলি করতে করতেই আহমদ মুসা দ্রুত গড়িয়ে সরে এসেছিল পাশাপাশি দাঁড়ানো দুই মাইক্রোর মাঝখানে আড়াল নেয়ার জন্যে। গড়িয়ে সরে আসার সময় আহমদ মুসা একটা মিনি মেশিনগানও কুড়িয়ে এনেছিল।

আহমদ মুসাদের গাড়ির পেছনে ওদের যে গাড়িটি দাঁড়িয়েছিল, তার দু'জন লোক শুরুতেই আহমদ মুসার গুলিতে মারা পড়েছিল। অবশিষ্ট দু'জনও ঘটনার আকস্মিকতার ধাক্কা সামলে গুলি করতে শুরু করেছিল।

আহমদ মুসা মাইক্রোর আড়াল নেয়ার পর কুড়িয়ে পাওয়া মিনি মেশিনগান দিয়ে ওদের লক্ষ্যে গুলি করা শুরু করে।

ওরা ফাঁকা রাস্তার ওপর দাঁড়িয়েছিল। তারা তাদের গাড়ির আড়াল নেবে, এমন আত্মরক্ষামূলক চিন্তা আগে করেনি। আহমদ মুসার গুলি শুরু হলে তারা এটা বুঝল এবং পেছন দিকে ছুটল গাড়ির আড়াল নেবার জন্যে। কিন্তু যাওয়া তাদের শেষ হলো না। ওদের গাড়ির সামনেই ওরা গুলি খেয়ে ঢলে পড়ল।

হঠাৎ আহমদ মুসার খেয়াল হলো, পাশের মাইক্রো থেকে যে লোকটি তার সাথে কথা বলেছে এবং শেষ সময়ে যে রকেট লাঞ্চার তাক করছিল ড. আজদাদের গাড়ি লক্ষ্যে, সে লোকটি কোথায়?

এই কথা মনে হবার সাথে সাথে আহমদ মুসা তার মিনি মেশিনগান ধরা হাত পাশের মাইক্রোর দিকে ঘুরিয়ে নিল অব্যাহত গুলির একটা দেয়াল সৃষ্টি করে।

এভাবে বাঁ দিকে ঘুরতে গিয়েই আহমদ মুসা দেখল, পাশের মাইক্রোর ওপাশ থেকে একজন লোক ছুটে গিয়ে মাইক্রোর সামনে পড়ে থাকা নিহত একজনের মিনি মেশিনগান হাতে তুলে নিচ্ছে। কিন্তু মিনি মেশিনগান হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াবার আগেই আহমদ মুসার গুলির দেয়ালের মধ্যে পড়ে ঝাঁঝরা দেহ নিয়ে একজন সাথীর মৃতদেহের ওপর আছড়ে পড়ল।

আহমদ মুসা দেখতে পেল, এই লোকটি অন্যদের চেয়ে আলাদা। এর পরনে আপাদমস্তক কালো পোশাক নেই। তার বদলে রয়েছে কুর্দিশ মৌলভির পোশাক।

এর এই পোশাক কেন? সংগে সংগেই এ প্রশ্ন জাগল আহমদ মুসার মনে। এটা কি উল্কিওয়ালাদের এক ক্যামোফ্লেজ? এটাও হতে পারে মানুষকে প্রতারণা করার জন্যে, নিজের প্রশ্নের জবাব নিজেই দিল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা বুঝল, মাইক্রো থেকে এই লোকটিই তার সাথে কথা বলেছিল এবং এর হাতেই ছিল রকেট লাঞ্চার। আর তার হাতে মিনি মেশিনগান ছিল না। ছিল না বলেই সে আক্রমণে আসতে পারেনি। অবশেষে একটা মিনি মেশিনগান কুড়িয়ে আনতে গিয়েই তাকে শেষ হতে হলো।

আহমদ মুসা চারদিকে চোখ বোলাল। দেখল, তেরটি লাশ তার সামনে। এরা শুধু আমাকে নয়, আমাদের সবাইকেই মারতে চেয়েছিল, সবাইকে মারতে গিয়েই এরা সবাই লাশ হয়ে গেল, হিসেব করল আহমদ মুসা। আল্লাহর অসীম অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে তাঁর প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতায় বিনত হলো আহমদ মুসার হৃদয়-মন-মাথা সবই। নিজের জীবন দিয়ে হলেও তিনজন নিরপরাধ মজলুমকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম বলে আল্লাহ আমাকেও বাঁচিয়ে দিলেন! আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে সজল হয়ে উঠল আহমদ মুসার দু'চোখ।

গাড়ি সামনের দিকে চলছিল। কিন্তু সাহিবা সাবিত ও ড. আজদা দু'জনেই আকুল চোখে তাকিয়েছিল পেছনে। অবিরাম অশ্রু ঝরছিল তাদের চোখ দিয়ে।

সাহিবা সাবিত ও ড. আজদা দু'জনেরই চোখ নিবদ্ধ ছিল আহমদ মুসা যেখানে ঘেরাও হয়েছেন, সেই ঘটনাস্থলের দিকে।

হঠাৎ তারা গুলি-গোলার অব্যাহত শব্দ শুনতে পেল।

খোলা ছিল তাদের গাড়ির সবগুলো জানালাই।

ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল তারা দু'জনেই। তাহলে কি সব শেষ হয়ে গেল! বুকটা থরথর করে কেঁপে উঠল সাহিবা সাবিতের। পেছনে তাকিয়ে সে চিৎকার

করে বলল, 'গাড়ি থামান মামা। ওখানে গুলি-গোলা হচ্ছে। দেখা দরকার ওর কি হলো। থামান মামা গাড়ি।'

'না সাহিবা সাবিত, ওর নির্দেশ, আমাদের নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে হবে। তোমাদের, আমাদের বাঁচানোর জন্যেই তিনি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তোমাদের কোন বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারি না।' বলল ড. সাহাব নুরী।

'না, ওর কথা আমি মানি না। উনি নিজের ওপর অবিচার করেছেন, আমাদের প্রতি অবিচার করেছেন। আমি যাব সেখানে।'

বলে ড্রাইভিং সীটের দিকে এগোলো সাহিবা সাবিত। বলল, 'মামা, হয় আপনি সেখানে চলুন, না হয় ড্রাইভিং আমাকে দিন। আমি সেখানে যাব।'

'তুমি পাগল সাহিবা। সেখানে গিয়ে তুমি, আমি, আমরা কি করব। এই চিন্তা করেই তো তিনি আমাদের চলে আসতে বাধ্য করেছেন। ঠিক আছে, চল আমরা এক জায়গায় গিয়ে গাড়ি পার্ক করি। ওরা চলে গেলে আমরা সেখানে গিয়ে খোঁজ নেব।' বলল ড. সাহাব নুরী।

'সেখানে প্রচণ্ড গুলি-গোলার শব্দ শোনার পর আমি ফিরতে পারবো না। আপনারা আমাকে নামিয়ে দিন, হেঁটেই আমি সেখানে যাব।' সাহিবা সাবিত বলল। স্থির সিদ্ধান্ত তার কণ্ঠে।

'সাহিবা একটু বুঝতে চেষ্টা কর, আমরা সেখানে গিয়ে কি করব, কি করতে পারব?' বলল ড. সাহাব নুরী। কণ্ঠ তার নরম।

'ওর সাথে মরতে তো পারব!' সাহিবা সাবিত বলল কান্নাজড়িত কণ্ঠে।

ড. সাহাব নুরী তাকাল ড. আজদার দিকে।

ড. আজদা বলল, 'সাহিবা সাবিত যা বলেছে সেটাই আমার মত। উনি যদি না থাকেন, তাহলে আমরা পালিয়েও বাঁচতে পারবো না। মরতে যদি হয়, তাহলে তার সাথে মরাই ভালো।' কান্নায় ভেঙে পড়া ড. আজদার কণ্ঠ।

'ঠিক আছে, আল্লাহ ভরসা।' বলে গাড়ি ঘুরিয়ে নিল ড. সাহাব নুরী।

ছুটে চলল গাড়ি ফেলে আসা সেই ঘটনাস্থলের দিকে।

আহমদ মুসা সার্চ করছিল লাশগুলো উল্কিওয়ালা বলে তার কাছে পরিচিত এই গ্রুপটির ঠিকানা কিংবা এদের আরও পরিচয় পাওয়া যায় কিনা এজন্যে।

আপাদমস্তক কালো ইউনিফর্ম পরা লাশগুলো ওদের বিশেষ কমান্ডো বলে তার মনে হলো। এর আগে এই গ্রুপের আরও যাদের লাশ দেখেছে, তারা এই ধরনের ইউনিফর্ম পরা ছিল না।

এদের সার্চ করে কিছু পেল না আহমদ মুসা।

সব শেষে আহমদ মুসা সবার পরে নিহত হওয়া কুর্দিশ মৌলভীর পোশাক পরা লোকটির কাছে এল। এই লোকটিকেই দলনেতা মনে হয়েছে আহমদ মুসার।

তার পকেটে পেল একটা মানিব্যাগ। মানিব্যাগ খুলতেই চোখে পড়ল কিছু আর্মেনীয় ও টার্কিশ টাকা এবং আইডি কার্ড। দ্রুত আইডি কার্ডটাই দেখল আহমদ মুসা। কার্ডটিতে লোকটির একটি কুর্দিশ নাম আছে। পরিচয় লেখা হয়েছে একটি কুর্দি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ধর্মীয় শিক্ষক হিসেবে।

আইডি দেখেই আহমদ মুসা বুঝল, এটা ভুয়া। তুর্কি পুলিশকে বোকা বানানোর জন্যেই এই পরিচয় নেয়া হয়েছে।

মানিব্যাগটা আরও ভালো করে সার্চ করতে গিয়ে মানিব্যাগের একটা কেবিনে পেল চার ভাঁজ করা ছোট্ট এক টুকরো কাগজ। গুরুত্বপূর্ণ হবে কিছু, এটা মনে করে কাগজটা তাড়াতাড়ি খুলে দেখল, ওটা একদমই সাদা একটা চিরকুট। হতাশ হয়েও আহমদ মুসা ভাবল, একটা সাদা কাগজকে এভাবে সযত্নে ভাঁজ করে মানিব্যাগের গোপন পকেটে রাখা হবে কেন? একটা রহস্যের গন্ধ পেল আহমদ মুসা।

কাগজটি পকেটে পুরল আহমদ মুসা।

হঠাৎ পেছনে গাড়ির শব্দ পেয়ে 'ডিজিপি মি. মাহির হারুন এত তাড়াতাড়ি এসে পড়লেন'-এই বিস্ময় নিয়ে পেছনে তাকাতেই দেখল, ড. সাহাব নুরীর গাড়ি। গাড়িটি এসে দাঁড়িয়ে গেছে পেছনের সেই গাড়িটার কাছে।

গাড়ি থেকে নেমেছে ড. সাহাব নুরী ও ড. আজদা। যন্ত্রচালিতের মত তারা আসছে আহমদ মুসার দিকে। আনন্দ-বিস্ময় যেন ফেটে পড়ছে তাদের চোখ–মুখ দিয়ে।

ওরা এসে গেছে।

কোন কথা না বলে আহমদ মুসাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল ড. সাহাব নুরী।

আর পাশে দাঁড়ানো ড. আজদার দু'চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিল। আর ঠোঁটে ছিল হাসি।

আহমদ মুসা ড. সাহাব নুরীকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'খুশির সময় এ কান্না কেন?

'কান্না এটা নয়, অপার বিস্ময় ও সীমাহীন আনন্দের গলিত রূপ এটা।' বলল ড. সাহাব নুরী।

'আল্লাহর জন্যেই এ কৃতজ্ঞতার অশ্রু ভাইয়া। আপনি জীবিত আছেন, জীবন্ত আপনাকে দেখতে পাব, এটা ছিল সব হিসেব, সব কল্পনার অতীত।' চোখ মুছে বলল ড. আজদা।

'কিন্তু তোমরা গাড়ি নিয়ে ফিরে এলে কেন, কোন হিসেব থেকে? এমনটা তো হবার কথাই নয়?' বলল আহমদ মুসা। তার কণ্ঠে বিস্ময়।

হাসল একটু ড. আজদা। বলল, 'আমি উত্তর দিচ্ছি। আমার সাথে একটু আসুন ভাইয়া, প্লিজ!'

বলে পেছন ফিরে তাদের গাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল ড. আজদা।

ড. সাহাব নুরীর দিকে একবার তাকিয়ে ড. আজদার পেছনে হাঁটতে শুরু করল আহমদ মুসা।

ড. সাহাব নুরীও হাঁটতে লাগল আহমদ মুসার পেছনে।

গাড়ির পাশে গিয়ে দাঁড়াল আহমদ মুসা ও ড. আজদা। তাদের পেছনে ড. সাহাব নুরী।

গাড়ির জানালা খোলা।

গাড়ির সীটে বসে দু'হাঁটুতে মুখ গুঁজে কাঁদছে সাহিবা সাবিত। কান্নার বেগে কাঁপছে তার শরীর। নীরব কান্না।

আহমদ মুসা তাকাল ড. আজদার দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে।

'সাহিবাই আমাদের এখানে ফিরে আসতে বাধ্য করেছে ভাইয়া। গোলা-গুলির শব্দ শোনার সাথে সাথে সে গাড়ি ঘুরিয়ে এখানে আসতে বলে। আপনার নির্দেশের কথা বলে মামা তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে। কিন্তু সাহিবা বলে, গাড়ি যদি ফিরিয়ে না আনা হয়, তাহলে সে হেঁটে হলেও এখানে আসবে। এখানে এসে আমরা কি করব, এর উত্তরে সে বলে, কিছু না পারলে আমরা তার সাথে মরতে তো পারব। আমিও তার কথায় একমত হই এবং আমরা ফিরে আসি। ফিরে আসার সময় সে শক্ত ছিল। কিন্তু এখানে এসে আপনাকে নিরাপদে দেখে সে এভাবে কান্নায় ভেঙে পড়েছে। এটা সুখের কান্না, স্বস্তির কান্না ভাইয়া।' বলল ড. আজদা। তার মুখে হাসি।

কিন্তু আহমদ মুসার মুখে অস্বস্তির একটা ছায়া খেলে গেল। নিছক আনন্দের কান্না এত দীর্ঘ হয় না, এত গভীর হয় না। গোলা-গুলিতে সে নিশ্চয় আহমদ মুসাকে মৃত ভেবেছিল। তাই মরার জন্যেই সে এসেছিল এখানে। কিন্তু আহমদ মুসাকে নিরাপদ দেখে আকস্মিকভাবে কল্পনাতীত কোন প্রাপ্তি পাওয়ার আনন্দের বাঁধভাঙা জোয়ার নিয়ে হৃদয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, যা তার বুক ধারণ করতে পারছে না। সে আনন্দময় এক বেদনা। সে বেদনারই কান্না এটা। মনে মনে উদ্বিগ্ন হলো আহমদ মুসা। এ কান্না শুধু সাহিবা সাবিতের নয়, এ কান্না নতুনভাবে প্রস্ফুটিত এক হৃদয়ের কান্না, যার পরিচয় সাহিবা নিজেও হয়তো জানে না। মনটা কেঁপে উঠল আহমদ মুসার। ভাবল, বাঁচাতে হবে সাহিবা সাবিতকে।

ড. আজদার কথা শেষ হলে ড. আজদার হাসির সাথে আহমদ মুসাও হাসল। বলল একটু উচ্চকণ্ঠে, 'ছোট বোনরা বড় ভাইয়াদের সব সময় একটু বেশি ভালোবাসে। সাহিবা সাবিত এটাই প্রমাণ করেছে ড. আজদা। আজ সকালেই আমি আমার স্ত্রীকে বলেছি, ড. আজদার পর আরও একটা মিষ্টি ছোট বোন পেয়েছি আমি।'

বলে আহমদ মুসা টান দিয়ে গাড়ির দরজা খুলে ফেলল। বলল, ‘সাহিবা বোন, এস। বাইরে এস।’

ধীরে ধীরে মুখ তুলল সাহিবা সাবিত।

অশ্রু ধোয়া তার কোমল, সুন্দর মুখটি।

চোখ তুলে তাকিয়েছে সে আহমদ মুসার দিকে। কিন্তু তার চোখে আহমদ মুসার সম্বোধনের প্রতি কোন সাড়া নেই। চোখ দু’টিতে তার তীরবিদ্ধ হরিণীর মত বিস্ময় ও বেদনার বিস্ফোরণ।

চোখ দু’টি তার কিছুক্ষণ পলকহীন স্থির থাকার পর আস্তে বুজে গেল। মুখ ঘুরে গেল। মাথাটি আবার ঝুলে গেল তার দু’হাঁটুর ওপর।

আবার তার সেই কান্না।

ফুলে ফুলে উঠছে তার দেহ কান্নার বেগে।

ওর কাঁদা উচিত, ভাবল আহমদ মুসা। কিন্তু বিব্রত হয়ে পড়েছিল আহমদ মুসা এখন কি বলবে সে এই ভেবে।

গাড়ির শব্দ শোনা গেল। সেই সাথে পুলিশের গাড়ির সাইরেন।

একাধিক গাড়ির জমাট একটা শব্দ।

‘পুলিশ এসে গেছে ভাইয়া। কেমন করে খবর পেল ওরা?’ বলল ড. আজদা।

বিব্রতকর অবস্থা কেটে গেল আহমদ মুসার। ফিরে দাঁড়াল সে। বলল, ‘পুলিশের ডিজিপি মাহির হারুনকে আমি টেলিফোন করেছিলাম।’

‘চল দেখি কে আসলেন?’ বলে হাঁটতে লাগল আহমদ মুসা।

সবাই এগোলো তার সাথে।

পুলিশ বহরের সামনের জীপেই ছিল ডিজিপি মাহির হারুন।

পুলিশের গাড়ি থামতেই নেমে পড়েছে ডিজিপি মাহির হারুন। আহমদ মুসাকে দেখতে পেয়েই দ্রুত হাঁটতে শুরু করেছে আহমদ মুসার দিকে।

‘স্যার, আসসালামু আলাইকুম। স্যার, টেলিফোনে সব কথা শুনে সংগে সংগেই রওয়ানা দিয়েছি। একটা বড় খবর আছে স্যার।’ উচ্চকণ্ঠে এই কথাগুলো বলে মুহূর্তের জন্যে থামল ডিজিপি মাহির হারুন।

মুহূর্ত পরেই আবার বলে উঠল, ‘আংকারা থেকে আমাদের হেডস্যার পুলিশ প্রধান আমাকে টেলিফোন করেছিলেন। স্যার, তিনি নির্দেশ দিয়েছেন আপনার নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়ার জন্যে এবং আরও বলেছেন, আপনাকে সবরকম সহায়তা দেয়ার জন্যে।’

একনাগাড়ে তার কথা বলা শেষ হলে চোখ তুলে তাকিয়েছে সে আহমদ মুসার দিকে। কিন্তু আহমদ মুসা তার মুখোমুখি হয়ে সালাম নিয়ে হ্যান্ডশেইক করে বলল, ‘আপনাদের পুলিশ প্রধানকে ধন্যবাদ। কিন্তু প্লিজ অফিসার, এ কথাগুলো আপনি গোপন রাখুন। শত্রুপক্ষ এসব না জানলে আমাদের কাজের সুবিধা হবে।’

পুলিশ অফিসার ডিজিপি মাহির হারুনের উৎসাহের আগুনে পানি ছিটানোর মত ব্যাপার ঘটল। অনেকটাই চুপসে গেল ডিজিপি মাহির হারুন। বলল, ‘বুঝেছি স্যার! এখনও কাউকে এসব কথা আমি বলিনি।’

‘ধন্যবাদ অফিসার। টেলিফোনে সব কথা সংক্ষেপে আপনাকে বলেছি। রেকর্ডের জন্যে লিখিত চাইলে, সেটাও আমি দেব। আপনি এদিকটা দেখুন। আমাকে ফিরতে হবে এখনি। এদের ওপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘অবশ্যই স্যার। আপনি ওদের নিয়ে যান। পুলিশের একটা গাড়ি আপনাদের সাথে পাঠাচ্ছি আপনার নিরাপত্তার জন্যে।’ ডিজিপি মাহির হারুন বলল।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘ধন্যবাদ অফিসার। পুলিশ প্রটেকশন দরকার নেই। সাথে আমাদের আল্লাহর প্রটেকশন আছে। চলি।’

আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়িয়ে ড. সাহাব নুরীদের বলল, ‘আসুন আমরা চলি।’

নতুন বিস্ময়ের ধাক্কা তখন ড. আজদা ও ড. সাহাব নুরীর চোখে। ডিজিপির কথা তারা শুনেছে। তুরস্কের পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন তাদের আবু আহমদ আব্দুল্লাহর নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে! আসলেই কে তাদের এই আবু আহমদ আব্দুল্লাহ!

আহমদ মুসার আহ্বান পেয়ে আহমদ মুসার পেছনে হাঁটতে শুরু করেছে তারা।

# ৭

'সাহিবা, শোন মা।' ডাকল ড. মাহজুন মাজহার সাহিবা সাবিতকে।

সাহিবা সাবিত তার সামনে দিয়ে যাচ্ছিল।

সাহিবা সাবিত ঘুরে দাঁড়িয়ে পিতার দিকে কয়েক ধাপ এগিয়ে বলল, 'বলুন বাবা।'

'আজ ভালো লাগছে শরীরটা?' জিজ্ঞেস করল মেয়েকে ড. মাহজুন মাজহার।

'হ্যাঁ বাবা, ভালো।' বলল সাহিবা সাবিত।

'কিন্তু মা, মুখটাকে তোমার খুব বিষণ্ন লাগছে।' বলল সাহিবার বাবা।

'ও কিছু নয়, রাত জেগে পড়েছি তো এই কারণে।'

কথাটা বলেই সাহিবা সাবিত ভাবল, এই মিথ্যা বলাটা তার ঠিক হয়নি।

'আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে মা?' জিজ্ঞাসা ড. মাহজুন মাজহারের।

'না বাবা, আজ যাব না। ড. আজদা টেলিফোন করেছিল, সে আসছে। আমার স্টাডির একটা বিষয় নিয়ে তার সাথে আলাপ করতে চেয়েছিলাম তো।' বলল সাহিবা সাবিত।

'তোমার কাছে শুনেছিলাম, ডিজিপি মাহির হারুন গত রাতে আমাকে বললেন সেদিনের কথা। তিনি বললেন ঘটনাটা অলৌকিকের মত। আবার ড. আজদার কাছে ঘটনাগুলোর কথা শুনেছি, সেগুলোও বিস্ময়কর, অলৌকিকের মতই। সত্যিই বিস্ময়কর এই আবু আহমদ আব্দুল্লাহ। আমি ডিজিপি মাহির হারুনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তার কোন পরিচয় তারা উদ্ধার করতে পেরেছেন কিনা। তিনি বললেন, তার ব্যাপারে অনুসন্ধানের সুযোগ আমাদের নেই। স্বয়ং পুলিশ প্রধান তাকে সম্মান করে, সমীহ করে। প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রীর সাথে নাকি তার সম্পর্ক। আল্লাহই পাঠিয়েছেন আমাদের বিপদের সময় তাকে।'

রাঙা হয়ে উঠেছিল সাহিবা সাবিতের মুখ। কিন্তু তার বুকের মধ্যে তখন বেদনার ঝড়। কতকটা রোদ-বৃষ্টির মত অবস্থা। তার পিতা থামলে বলল সে, 'সাধারণ বিবেচনার বাইরে উনি বাবা। ওরা মনে হয় আল্লাহর বিশেষ সৃষ্টি। পরার্থেই ওদের জীবন। বাবা, আমাদের রক্ষার স্বার্থে উনি নিজেকে ওদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন নিজের মৃত্যু অবধারিত জেনেও। এই কুরবানীর কোন পরিমাপ হয় না বাবা।' অপ্রতিরোধ্য এক উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়ল সাহিবা সাবিতের কণ্ঠ। চোখ তার ভিজে উঠেছে অশ্রুতে।

ড. মাহজুন মাজহার তাকিয়েছিল তার মেয়ের দিকে। সাহিবা সাবিতের আবেগের উত্তাপ, অশ্রুর স্পর্শ তার হৃদয়কেও ছুঁয়ে গেল। এই আবেগ ও অশ্রুর মধ্যে ড. মাহজুন মাজহার একটা নতুনত্বের প্রকাশ দেখে চমকে উঠল।

এ সময় সিঁড়ি দিয়ে দু'তলায় উঠে এল ড. আজদা।

সাহিবা সাবিত চোখ মুছে 'আসি বাবা' বলে ছুটে গেল ড. আজদার দিকে।

সাহিবা সাবিতের দিকে নিবদ্ধ ড. মাহজুন মাজহারের চোখে উদ্বেগের একটা ছায়া নামল।

সাহিবা সাবিত ড. আজদাকে স্বাগত জানিয়ে তার হাত ধরে তাকে নিয়ে চলল তার নিজস্ব স্টাডি রুমে।

তারা স্টাডি রুমে গিয়ে টেবিলে না বসে মুখোমুখি এক সোফায় গিয়ে বসল।

'তোমাকে বিষণ্ন দেখাচ্ছে। আমি ভেবেছিলাম, তুমি যখন আমাকে ডেকেছ তখন নিশ্চয় সুস্থ্। কিন্তু...।'

'থাক এসব কথা আজদা। আমি ভালো আছি। এস, কাজের কথায় আসি।' ড. আজদার মুখের দিকে না তাকিয়ে মাথা নিচু রেখে কথাগুলো বলল সাহিবা সাবিত।

ড. আজদা তার নত মুখের দিকে মুহূর্তকাল চেয়ে থেকে স্নেহের সুরে বলল, 'সাহিবা, তোমার কাজের কথা বল।'

সাহিবা সাবিত মুখ তুলল।

বলল, 'ধন্যবাদ আজদা। আমার পিএইচডি থিসিসের যে অংশ নিয়ে আমি এখন কাজ করছি, সেটা তুরস্কের জাতিদেহে কুর্দিদের অবস্থান নিয়ে। এ ব্যাপারে তোমার একটা দৃষ্টিভংগি আমি জানতে চাই। এর সাথে আছে তুরস্কের এই পূর্ব আনাতোলিয়ান অঞ্চলের ভবিষ্যত রাজনীতি নিয়ে কথা। এ ব্যাপারেও তোমার একটা ব্রীফ চাই আমি।'

'দুটোই খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রথম বিষয় সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভংগির কথা বলতে পারি। আমি কুর্দি সম্প্রদায়ের সচেতন সদস্য হিসেবে বলছি, তুরস্ক, ইরাক, ইরান, আজারবাইজান, আর্মেনিয়াসহ এই গ্রন্থিতে কুর্দি সম্প্রদায়কে নিয়ে যে রাজনীতি হচ্ছে, সে রাজনীতি কুর্দিদের সৃষ্টি নয়। যেভাবে ইসলামী খিলাফত বা ইসলামী সাম্রাজ্য ভেঙে তুর্কি, ইরাকি, সিরীয়, লেবাননী, জর্দানি ইত্যাদি জাতির উদ্ভব ঘটানো হয়েছে, সেভাবেই কুর্দিদের দাঁড় করানো হয়েছে মুসলিম ভূ-খণ্ডগুলোকে আরও খণ্ড-বিখণ্ড করার জন্যে। কুর্দিরা পশ্চিমী পুঁজিবাদী ও কমিউনিস্টদের মধ্যকার পৌনে এক শতাব্দী কালের ঠাণ্ডা যুদ্ধেরও শিকার হয়েছে। এ সবের কোনটিই কুর্দিদের স্বার্থে হয়নি, হয়েছে সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে। সাম্রাজ্যবাদী এই ষড়যন্ত্রই তুরস্কে তুর্কিদের সাথে কুর্দিদের বিরোধ বাঁধিয়েছে। তুরস্কের সমাজে, রাষ্ট্রে, অর্থনীতিতে তুর্কি ও কুর্দি বলে কোন বিভেদ ছিল না। তুরস্কের দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট ইসমত ইনোনু একজন কুর্দি ছিলেন। আবার অষ্টম প্রেসিডেন্ট তুরগুত ওজালও একজন কুর্দি ছিলেন। তুরস্কের প্রশাসন ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তুর্কি-কুর্দি কোন বিভেদ নেই। এই ঐক্য ও সংহতিকে মূল দৃষ্টি হিসেবে সামনে আনলে তুমি সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্রটা দেখতে পাবে এবং বাঞ্ছিত উপসংহারে পৌঁছতে পারবে।'

বলে থামল ড. আজদা। কথা শুরু করল আবার, 'তোমার দ্বিতীয় বিষয়টার ওপর আমি কিছু বলতে পারবো না সাহিবা। তবে একজনের নাম বলতে পারি। তিনি খুব স্বচ্ছ দৃষ্টি রাখেন।'

'কে তিনি?' জিজ্ঞাসা সাহিবা সাবিতের।

'তিনি আবু আহমদ আব্দুল্লাহ।' বলল ড. আজদা।

সাহিবা সাবিতের সারা মুখে রক্তের এক আবির রঙ খেলে গেল।

সে মুহূর্তের জন্যে মুখ নিচু করে আবার স্বাভাবিক হয়ে বলল, ‘তুমি ঠিকই বলেছ আজদা। কিন্তু আমি ওর সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলতে পারবো না।’ সাহিবা সাবিত বলল। তার সারা মুখে সেই বিষণ্নভাব আবার ফিরে এসেছে।

ড. আজদা তাকাল সাহিবা সাবিতের দিকে। বলল, ‘তুমি ওকে ভুল বোঝ না সাহিবা। ওর বিবেচনাকে আমাদের শ্রদ্ধা করা উচিত।’

‘আমি ওকে ভুল বুঝিনি আজদা। আমি ভুল করেছিলাম, সেটাই আমি নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করছি। কিন্তু আজদা, তিনি ঐভাবে একটা হৃদয়কে সরাসরি গুলি করে বধ না করলেও পারতেন। তার কথা অন্যভাবে জানান দেয়া যেত। ব্যাপারটা একটা হৃদয়কে পয়েন্ট ব্ল্যাংক গুলি করার মত হয়েছে।’ বলল সাহিবা সাবিত। তার কণ্ঠ আবেগে কাঁপছিল।

‘তোমার দিক দিয়ে তুমি ঠিকই বলেছ সাহিবা। স্পর্শকাতর এ বিষয়টাকে অন্যভাবেও ম্যানেজ করতে পারতেন। কিন্তু তার দিকটাও ভাব সাহিবা। আমার মতে তিনি তোমাকে সাহায্য করতে চেয়েছেন। তোমার মধ্যে বিভ্রান্তি যেন এক মুহূর্তও আর না থাকে, কষ্ট যাতে আরও গভীর হবার সুযোগ না হয়, এ জন্যেই তিনি তাৎক্ষণিকভাবে বিভ্রান্তির নিরসনে এসেছেন।’ বলল ড. আজদা।

‘পেরেছেন কি তিনি কষ্টের হাত থেকে বাঁচাতে? পারেননি। যখন তিনি এ চেষ্টা করেছেন, তখন তো একটা জীবনের কুরবানী হয়ে গেছে। মরাকে কি আর বাঁচানো যায় আজদা!’ বলল সাহিবা সাবিত। তার কণ্ঠ কাঁপছে। দু’চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু।

ড. আজদা উঠে গিয়ে সাহিবা সাবিতের পাশে বসে তাকে জড়িয়ে ধরল।

সাহিবা সাবিতের মাথাটি ঢলে পড়ল ড. আজদার কাঁধে। নীরব কান্নায় ভেঙে পড়ল সে।

কান্নায় বাঁধা দিল না ড. আজদা। শুধু বড় বোনের মত তার পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিল।

সাহিবা সাবিত একটু শান্ত হলে ড. আজদা বলল, ‘তুমি এ ভুলটা কেন করলে সাহিবা? তুমি জানতে তিনি বিবাহিত।’

'সব ভুলে গিয়েছিলাম, সব ভেসে গিয়েছিল বোধহয় সামনে থেকে। সেই সাথে আমি কখন অথৈ সাগরে ডুবে গেছি বুঝতে পারিনি। অন্যায় হয়তো হয়েছে, কিন্তু অন্যায় কিভাবে হলো আমি বুঝতে পারিনি।' কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল সাহিবা সাবিত।

'সব ঠিক হয়ে যাবে সাহিবা। একটু শক্ত হও। তবে মনে কোন অপরাধবোধ আনা ঠিক হবে না। যা ঘটেছে তা অন্যায় নয়।' বলল ড. আজদা।

ড. আজদার কাঁধ থেকে মাথা তুলল সাহিবা সাবিত। চোখ মুছে বলল, 'না আজদা, আমার মধ্যে অন্যায় বোধ নেই। থাকবে কেন? আমি এখনও আমার অধিকারের মধ্যে রয়েছি, কারও অধিকার আমি লংঘন করিনি। আমার ভালো লাগা, ভালোবাসা কারও ক্ষতি করেনি, ওরও নয়।'

'সাহিবা, এভাবে না ভেবে তোমার সব ভুলে যাওয়া উচিত।' বলল ড. আজদা।

'এটা আমি বলতে পারবো না, তবে তোমাকে এ কথা দিতে পারি যে, ওকে বিব্রত করবো না, উনি নতুন সাহিবাকে দেখবেন।' বলল সাহিবা ধীর কণ্ঠে।

বলেই সোজা হয়ে বসল সাহিবা। বলল, 'এসব কথা থাক আজদা, এস আমরা আমাদের কাজের কথায় ফিরে যাই। আমার জিজ্ঞাসার দ্বিতীয় বিষয়ের ব্যাপারে।'

'সেটাই তো বলছিলাম, এ বিষয়ে আবু আহমদ ভাইয়া তোমাকে সাহায্য করতে পারেন। এ বিষয়টি নিয়ে ওর সাথে আমার একদিন আলোচনা হয়েছিল। দেখলাম, উনি এ বিষয়ে একটা তথ্যের ভাণ্ডার।' বলল ড. আজদা।

সাহিবা সাবিতের চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই সেখানে নামল বিষণ্নতা। বলল, 'ওর কাছে কয়দিন আমি যাব না।'

'কেন?' বলল ড. আজদা।

'ঐ যে তুমি শক্ত হতে বললে। সেটাই। মনটাকে আমার আগে শক্ত করতে হবে, যাতে ওর সংস্পর্শে ভেঙে পড়ে কোন নতুন অনর্থ না ঘটায়।' সাহিবা বলল। ভারি কণ্ঠ তার।

'ঠিক চিন্তা করেছ সাহিবা। মনটাকে তোমার শক্ত করা দরকার।'

বলে একটু থেমে আবার কথা শুরু করল ড. আজদা। বলল, ‘ছেলেমেয়েদের মেলামেশার ক্ষেত্রে ইসলাম যে সীমার নির্দেশ করেছে, সুস্থ সম্পর্ক রাখার ক্ষেত্রে তা মানার কোন বিকল্প নেই। তোমার ক্ষেত্রে, আমার ক্ষেত্রে যা ঘটেছে, অবাধ মেলামেশার সুযোগ না থাকলে তা ঘটতো না।’

‘আমারটা তো বুঝলাম। তোমার ক্ষেত্রে কি ঘটেছে?’ বলল সাহিবা। তার চোখে বিস্ময়।

‘ছোট্ট একটা ঘটনা ঘটেছে। সকালে যেদিন দুষ্কৃতিকারীরা আমাদের বাড়িতে হামলা করেছিল। সেদিন ভীতিকর এক পরিবেশে তার পাশে দাঁড়ানো অবস্থায় আমি ওকে জড়িয়ে ধরেছিলাম। এটা ছিল ওর কাছে আমার আশ্রয় খোঁজা। তিনিও নিশ্চয় এটা বুঝেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও অন্যকিছু ভাববার সুযোগ বন্ধ করার জন্যেই তিনি সংগে সংগেই আমাকে বোন বলে সম্বোধন করেছিলেন।’ ড. আজদা বলল।

‘এটা কি তুমি ড. বারজেনজো ভাইয়াকে বলেছ?’ একটু মিষ্টি হেসে বলল সাহিবা সাবিত।

ড. আজদার মুখ লাল হয়ে উঠল। বলল, ‘এটা ওকে বলার মত কোন গুরুত্বপূর্ণ কথা নয়।’

‘গুরুত্বপূর্ণ নয় বলছ কেন? টার্নিং পয়েন্টের মত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারতো। যেমন আকস্মিক ঝড় পুরানো স্থাপনা ভেঙে নতুন স্থাপনার দুয়ার উন্মুক্ত করে, তেমনি মুহূর্তের ঘটনা চিরজীবনের হয়ে দাঁড়াতে পারে।’ বলল সাহিবা সাবিত গম্ভীর কণ্ঠে।

‘ঠিকই বলেছ সাহিবা। এটাই অবাধ মেলামেশার কুফল। যার অসহায় শিকার আমাদের পশ্চিমী সমাজ। এখানে ঘরে-বাইরে আজ সম্পর্কের অস্থিরতা, দাম্পত্য-জীবনে অব্যাহত ভাঙন, পরিবার ব্যবস্থায় বিপর্যয়।’ ড. আজদা বলল।

‘হ্যাঁ আজদা, তিনি পাথর বলেই তিনি যেমন বাঁচলেন, তুমি বাঁচলে, আমার পথও বন্ধ করা হলো। কিন্তু সবাই তো তার মত বিকর্ষণকারী পাথর নয়, সবাই আকর্ষণ করে। বহুমুখী এই আকর্ষণ থেকেই বহুমুখী বিপর্যয় এসেছে আমাদের পশ্চিমী সমাজে। কিন্তু আমরা বাঁচবো কি করে? ছোটবেলা থেকে

ছেলেমেয়ের অবাধ মেলামেশাই তো আমাদের লাইফস্টাইল।’ বলল সাহিবা সাবিত।

‘এ লাইফস্টাইল স্বাভাবিক নয়, সুস্থ নয়, তাই ইসলামীও নয়। আবু আহমদ ভাইয়া স্বাভাবিক ও সুস্থ ইসলামী লাইফস্টাইল অনুসরণ করেন বলেই তিনি বাঁচতে পারেন। আমাদেরও বাঁচিয়েছেন। তিনি একটা জীবন্ত মডেল আমাদের কাছে।’ ড. আজদা বলল।

সাহিবা সাবিত আকস্মিকভাবে ড. আজদার কাছ থেকে একটু সরে বসল। বলল, ‘দেখ আজদা, তুমি এভাবে ওর প্রশংসা করো না, মনকে কিন্তু শক্ত করতে পারবো না, বিগড়ে যাবে কিন্তু মন।’ মুখে হাসি নিয়ে বলল সাহিবা সাবিত।

কথা শুনে ড. আজদাও হেসে উঠল। একটু উঠে সাহিবা সাবিতকে ধরে তার পিঠে কয়েকটি স্নেহের থাপ্পড় মেরে বলল, ‘কানে তালা লাগিয়ে বুঝি মনটাকে ঠিক করবে! মনকে ঠিক করতে হবে বাস্তবতা দিয়ে, বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে।’

সাহিবা সাবিত জড়িয়ে ধরল ড. আজদাকে। হাসতে হাসতে বলল, ‘ভয় পেয়ো না আজদা। ওকে বিব্রত করবো না। বলেছি তো, উনি নতুন সাহিবাকে দেখবেন।’

সাহিবার মুখে হাসি, কিন্তু চোখে অশ্রু।

‘ধন্যবাদ সাহিবা।’ বলল ড. আজদা। সেও জড়িয়ে ধরল সাহিবাকে।

সাহিবার চোখের অশ্রু তার দু’গণ্ডে গড়িয়ে পড়ল।

ভ্যান ক্যালিস প্রাসাদ মিউজিয়ামের ডিজি ড. মাহজুন মাজহারের অফিস।

ড. মাহজুন মাজহার একটা সোফায় বসে। তার সামনের সোফায় পাশাপাশি বসে ভ্যান পুলিশ প্রধান ডিজিপি মাহির হারুন এবং ভ্যানের গোয়েন্দা প্রধান এরফান এফেন্দী।

কথা বলছিল পুলিশ প্রধান মাহির হারুন। বলল, 'স্যার, তদন্তের ব্যাপারে সব আপনাকে বললাম। আমাদের তদন্তে খুঁত নেই। আবু আহমদ আব্দুল্লাহ যে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, সেভাবেই কাজ হয়েছে। ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার গত ছয় মাসের ভিডিও ক্লিপ থেকে বাইরের তিনজন সন্দেহজনক লোককে চিহ্নিত করা হয়েছে। মিউজিয়ামের গণসংযোগ বিভাগের ডাইরেক্টর মিসেস অ্যানোশ আব্দুল্লাহ গাজেন পাস ইস্যু করে প্রথমে তাদের ভেতরে ঢুকিয়েছে। পরে এই তিনজনই সাংবাদিক পরিচয়ে মিসেস অ্যানোশ আব্দুল্লাহর পাশে মিউজিয়ামের যত্রতত্র ঘুরে বেড়িয়েছে। এই তিনজনই আমাদের প্রাইম সাসপেক্ট। দুঃখের বিষয়, এদের তিনজনকেই লেক ড্রাইভে এক ভয়ংকর অপারেশনে অস্ত্রধারী কমান্ডো হিসেবে মৃত পাওয়া গেছে। এদের সহযোগিতাকারী হিসেবে মিসেস অ্যানোশ গাজেনের নাম এসেছে। এখন তো আমাদের এ্যাকশনে যেতে হয়।' থামল ডিজিপি মাহির হারুন।

ড. মাহজুন মাজহার বলল, 'মিসেস অ্যানোশ আব্দুল্লাহ গাজেন একজন পুরানো, অভিজ্ঞ অফিসার। মিউজিয়ামের সকলের কাছে সে সম্মানিতও। তার ব্যাপারটা একটু কেয়ারফুলি ডীল করুন, আমার অনুরোধ। আপনারা কি তার সাথে এ নিয়ে কথা বলেছেন?'

'জ্বি হ্যাঁ, তার সাথে আমরা কথা বলেছি। উনি বলেছেন, একটা রেস্টুরেন্টে ঐ তিনজনের সাথে তার পরিচয়। ওরা নিজেদের ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক বলে পরিচয় দিয়েছিল। পরে অবশ্য সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে নিয়েছে এমন পরিচয়পত্র দেখিয়েছিল। মিউজিয়াম সম্পর্কে সেদিন তারা তাদের গভীর আগ্রহের কথা বলে এবং জানায় যে, তারা মিউজিয়ামের ওপর ধারাবাহিক গবেষণামূলক ফিচার প্রকাশ করতে চায়। এজন্যে তারা মাঝে মাঝে মিউজিয়ামে যেতে চায়। তারা আমার সাহায্য কামনা করে। যতটা সম্ভব তিনি তাদের সহযোগিতা করেন। এই ছিল তার বক্তব্যের সার কথা।'

'ভেতরে কি আছে জানি না কিন্তু এই কথাগুলোকে আমার কাছে নির্দোষ বলেই মনে হয়।' বলল ড. মাহজুন মাজহার।

‘তার কথাগুলোকে নির্দোষ মনে হচ্ছে স্যার। কিন্তু তিনজন যে পরিচয় দেয় তা দোষযুক্ত। ভ্যানের ফ্রিল্যান্স কিংবা পেশাদার কোন সাংবাদিকই এদের চেনে না। নিজেদের সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে যে পত্রিকার আইডেনটিটি কার্ড তারা দেখিয়েছিল, ঐ নামের কোন সংবাদপত্র এখন ভ্যানে চালু নেই। কিন্তু মিসেস অ্যানোশ গাজেন এসব কোন কিছু খোঁজ না নিয়েই ওদেরকে মিউজিয়ামে ঢোকার অবাধ সুযোগ দিয়েছেন। এটা তার বোকামী, না অন্য কিছু, সেটাই আমরা বুঝতে পারছি না।’

এই সময় ড. মাহজুন মাজহারের পিএস আহমদ মুসাকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল।

ড. মাহজুন মাজহারসহ সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে আহমদ মুসাকে স্বাগত জানাল।

ড. মাহজুন মাজহার আহমদ মুসাকে তার পাশের সোফায় নিয়ে বসাল।

‘আপনি কষ্ট করে এসেছেন, এজন্যে আপনাকে ধন্যবাদ স্যার। স্যার, আমি আপনাকে আমাদের মিউজিয়ামের ডাইরেক্টর পাবলিক রিলেশন্স সম্পর্কে একটা ইংগিত দিয়েছিলাম। এতক্ষণ ঐ তিনজন ও তার বিষয় নিয়েই আলোচনা করছিলাম।’

বলে ডিজিপি মাহির হারুন মিসেস অ্যানোশ আব্দুল্লাহ গাজেন সম্পর্কে এতক্ষণ যে আলোচনা হয়েছে তা সংক্ষেপে আহমদ মুসাকে জানিয়ে বলল, ‘ঐ তিনজন মূল কালপ্রিটের মৃত্যুর পর একমাত্র মিসেস অ্যানোশ আব্দুল্লাহ গাজেনই আছেন যার সাথে মিউজিয়ামের ভয়াবহ ঘটনার একটা লিংক আছে। এখন আমরা কি করব, সেটাই আলোচনার বিষয়।’

‘আমার মতে আশু করণীয় হলো, মিসেস অ্যানোশ গাজেনকে সার্বক্ষণিক পাহারায় রাখা। উল্কিওয়ালারা যারা মিউজিয়ামে ডাকাতি করেছে, তারা মিসেস অ্যানোশ গাজেনকে হত্যা করতে পারে। কারণ, আমাদের সামনে একমাত্র সেই আছে যার মাধ্যমে ঘটনা ফাঁস হতে পারে।’ বলল আহমদ মুসা।

ডিজিপি, গোয়েন্দা অফিসার এরফান এফেন্দী এবং ড. মাহজুন মাজহারের চোখে-মুখে বিস্ময়। ডিজিপি মাহির হারুন ও গোয়েন্দা এরফান

এফেন্দী ভাবল, এই সহজ কথাটা আমাদের মনে হয়নি কেন? এটাই তো স্বাভাবিক।

‘ঠিক আছে স্যার, আমি নির্দেশ দিচ্ছি, পুলিশের একটা দল সব সময় অলক্ষ্যে তার পাহারায় থাকবে। আরও আমাদের কি করণীয় স্যার?’ ডিজিপি মাহির হারুন পকেট থেকে ওয়্যারলেস বের করে পুলিশকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে বলল, ‘মিসেস অ্যানোশ গাজেনের বাড়িতে এখনি সাদা পোশাকে পুলিশের প্রহরা বসাও। এখন তিনি বাড়িতে থাকার কথা।’

‘ধন্যবাদ অফিসার। মিসেস অ্যানোশ গাজেন সম্পর্কে গভীর অনুসন্ধান প্রয়োজন। তার বর্তমান পরিচয়ের আড়ালে আর কোন পরিচয় আছে কিনা।’ বলল আহমদ মুসা।

‘কেন এ কথা বলছেন স্যার? আপনি কি অন্য কিছু সন্দেহ করছেন?’ বলল ডিজিপি মাহির হারুন। তার ভ্রূকুঞ্চিত।

‘আচ্ছা, মিসেস অ্যানোশ আব্দুল্লাহ গাজেনের নামের অ্যানোশ ও গাজেন শব্দ দু’টি কি টার্কিশ?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘শব্দ দুটি তুরস্ক, আর্মেনিয়া, আজারবাইজানে কিছু কিছু ভিন্ন উচ্চারণে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়।’ বলল ড. মাহজুন মাজহার।

‘আচ্ছা, অ্যানোশ’ শব্দ কারও নামের অংশ হতে পারে, কিন্তু ‘গাজেন’ শব্দ কি তুরস্কে নাম হিসেবে মুসলমানরা ব্যবহার করে?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

ভ্রূকুঞ্চিত হলো ড. মাহজুন মাজহারের। বলল, ‘গাজেন’-এর টার্কিশ সমতুল্য শব্দ হলো ‘গায়িন’। এই ‘গায়িন’ শব্দ ছেলেদের নামের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় তুরস্কে। কিন্তু ‘গাজেন’ নাম তুরস্কে ব্যবহার হয় না, এটা আর্মেনীয় শব্দ।’

‘শুধু এটা আর্মেনীয় নামবাচক শব্দই নয়। এর পেছনে একটা ইতিহাস আছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কি ইতিহাস?’ জিজ্ঞাসা ড. মাহজুন মাজহার ও ডিজিপি মাহির হারুন দু’জনেরই।

‘ধর্মের জন্যে, আর্মেনীয় জাতির জন্যে জীবনদানকারী একজন খৃস্টান সন্ন্যাসিনীর নাম ‘গাজেন’। তার এই নামে আর্মেনিয়ার একটি চার্চেরও ‘গাজেন’ নামকরণ করা হয়েছে।’

ড. মাহজুনসহ সবার চোখে-মুখে বিস্ময়। ডিজিপি মাহির হারুন বলল, ‘তাহলে মিসেস অ্যানোশ আব্দুল্লাহ তার নামের শেষে এই নাম গ্রহণ করেছেন কেন?’

‘সেটাই তো প্রশ্ন। তিনি মুসলিম হয়ে এ নাম গ্রহণ করেছেন কেন? এ জন্যেই তার ব্যাপারে অনুসন্ধানের কথা আমি বলেছি। হতে পারে, তার পরিচয় আরও আছে। হতে পারে, তিনি ঐ তিনজনের ব্যাপারে যা বলেছেন, গোটাটাই মিথ্যা।’ আহমদ মুসা বলল।

ড. মাহজুন মাজহার নীরব।

নীরব ডিজিপি মাহির হারুন এবং গোয়েন্দা অফিসারও।

গোয়েন্দা অফিসার কানে কানে কি বলল ডিজিপি মাহির হারুনকে।

মাহির হারুন বলল, ‘তাহলে তো স্যার আমার গ্রেফতার করতে পারি মিসেস গাজেনকে। গ্রেফতারের জন্যে যথেষ্ট দলিল আমাদের হাতে আছে। আমি সেই কথাই ড. মাহজুন মাজহার স্যারকে বলছিলাম।’

‘না মি. ডিজিপি, তাকে গ্রেফতার না করে তাকে ফলো করে তার সম্পর্কের সূত্রগুলো বের করাতেই লাভ বেশি। আমরা চাই তার পেছনে কারা আছে, সেটা জানতে। একসময়তো তাকে গ্রেফতার করতেই হবে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ধন্যবাদ স্যার, আমরা এটাই করব। তবে তার বিরুদ্ধে একটা কেস দায়ের...।’

ডিজিপি মাহির হারুনের কথার মাঝখানেই তার ওয়্যারলেস অস্থিরভাবে বিপ বিপ করে উঠল।

কথা বন্ধ করে ‘এক্সকিউজ মি স্যার!’ বলে সে ওয়্যারলেস তুলে নিল।

ওয়্যারলেস তুলে নিয়ে কথা কিছুটা শুনেই 'হোল্ড অন' বলে কলটাকে হোল্ড করে সে আহমদ মুসার দিকে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'স্যার, ঘটনা ঘটেই গেছে, মিসেস গাজেন নিহত হয়েছেন।'

'কোথায়?' দ্রুত প্রশ্ন করল আহমদ মুসা।

'স্যার, আমাদের পুলিশ তার বাড়ির চারদিকে পাহারা বসিয়েছে। তারাই জানাল, মিসেস গাজেন তার বাগানে কাজ করছিলেন, এ সময় গুলিতে তিনি নিহত হয়েছেন। বাগানের পাশে দাঁড়ানো একটা গাড়ি থেকে তাকে গুলি করা হয়। পরপর দু'টি গুলি করার পরই গাড়িটি পালিয়ে যায়।' বলল ডিজিপি মাহির হারুন।

'তার বাড়িতে আর কে আছে?' বলল আহমদ মুসা।

'একজন পরিচারিকা এবং একজন আয়া ছাড়া তার বাড়িতে আর কেউ নেই। পরিচারিকা বাড়ির কাজকর্ম করে আর আয়া রাঁধা-বাড়াসহ মিসেস গাজেনের স্টাফ হিসেবে কাজ করে।' বলল ড. মাহজুন মাজহার।

'মি. ডিজিপি, আত্মীয়ের পরিচয়ে বা অন্য কোন কথা বলে তার বাড়িতে লোক ঢুকতে চেষ্টা করতে পারে। তাদের বাঁধা দিতে হবে। কাউকে বাড়িতে ঢুকতে দেয়া যাবে না। আর আপনার পুলিশ বাড়িতে ঢুকে পরিচারিকা ও আয়াকেও গ্রেফতার করবে। দরকার হলে আরও পুলিশ যেতে বলুন সেখানে।' আহমদ মুসা বলল।

ডিজিপি তার ওয়্যারলেসের কল অন করে বলল, 'ওখানে এখন কি অবস্থা?'

ওপারের কথা শুনতে গিয়ে ডিজিপি মাহির হারুনের চোখে-মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল। কথা শোনার মাঝখানেই সে বলে উঠল, 'শোন, বাড়িতে কাউকে ঢুকতে দেয়া যাবে না। বাড়াবাড়ি করলে গুলি কর। লাশ ওখানেই এখন থাকবে। আর তোমরা কয়েকজন ভেতরে ঢুকে যাও। বাড়িতে পরিচারিকা, আয়া বা যাকে পাও তাকেই গ্রেফতার কর। ওখানে কতজন পুলিশ পৌঁছেছে? দরকার হলে আরও পুলিশ ডেকে নাও। আমিও বলে দিচ্ছি। ওকে। যখন যা হয় আমাকে জানাবে। বাই।'

কথা শেষ করে ডিজিপি তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘স্যার, আপনার কথা ঠিক। আত্মীয়ের পরিচয়ে কয়েকজন লোক এসেছে, তারা বাড়িতে ঢুকতে চাচ্ছে এবং লাশও হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাচ্ছে। তাদের গ্রেফতার করলে কেমন হয়?’

‘এতক্ষণে ওরা চলে গেছে। বাঁধা পাওয়ার পর, পুলিশ বলে আঁচ করতে পারলে, এক মুহূর্তও আর তাদের থাকার কথা নয়। গ্রেফতার করলেও খুব একটা লাভ হতো বলে মনে হয় না। ওরা সম্ভবত ভাড়াটিয়া লোক হবে। আমার মনে হয়, ওদের পাঠানো হয়েছিল বাড়ি থেকে কম্পিউটার, ডায়েরি, নোটবই ইত্যাদির মত কিছু জিনিস নিয়ে যেতে, অথবা বাড়ির ঘরগুলো জ্বালিয়ে দিতে।’

কোন কথা না বলে ভ্যানের পুলিশ প্রধান ডিজিপি মাহির হারুন ওয়্যারলেস তুলে নিয়ে যোগাযোগ করল মিসেস গাজেনের বাড়িতে পাহারায় থাকা সংশ্লিষ্ট পুলিশের সাথে। সংযোগ হতেই সে দ্রুত বলল, ‘ওরা যারা বাড়িতে ঢুকতে যাচ্ছিল, তাদের কি খবর?’

শুনল ডিজিপি মাহির হারুন ওপারের কথা। ওপারের কথা শেষ হলে ‘ওকে’ বলে লাইন অফ করেই বলল, ‘স্যার, এবারও আপনি ঠিক বলেছেন। বাঁধা পাওয়ার পরই কিছু একটা সন্দেহ করেই দ্রুত ওরা পালিয়েছে।’

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল আহমদ মুসা। তখনই তার মোবাইল বেজে উঠে তাকে থামিয়ে দিল।

‘এক্সকিউজ মি’ বলে মোবাইল বের করল পকেট থেকে। মোবাইলের স্ক্রীনে কলারের নাম দেখেই মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল আহমদ মুসার। টেলিফোন করেছে তুরস্কের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা প্রধান জেনারেল মোস্তফা কামাল, ইস্তাম্বুলের কাজে আহমদ মুসার সবচেয়ে বড় সাথী।

আহমদ মুসা কল অন করেই বলল, ‘আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো জেনারেল মোস্তফা। কেমন আছেন?’

‘ওয়ালাইকুম সালাম। আমরা ভালো আছি। আমরা খুব খুশি হয়েছি, আমরা আপনাকে যেতে দিলেও তুরস্ক আপনাকে যেতে দেয়নি।’ বলল ওপার থেকে জেনারেল মোস্তফা।

‘হ্যাঁ, সেটাই ঘটেছে জেনারেল। একজন বিপদগ্রস্ত মেয়ের আবেদন আমি উপেক্ষা করতে পারিনি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কি ঘটনা বলুন তো?’ জিজ্ঞাসা ওপার থেকে জেনারেল মোস্তফার।

ড. আজদার ইন্টারনেট আপীলের বিষয়টা সংক্ষেপে জানানোর পর বলল, ‘ড. আজদার বলা ঘটনাগুলো আমার কাছে খুব বড় ঘটনার আইসবার্গ বলে মনে হয়েছে। তাই ওদের পাঠিয়ে আমি ভ্যানে যাত্রা বিরতি করেছি।’

‘যে সব রিপোর্ট এখানে পেয়েছি, তাতে বিষয়টাকে খুব রহস্যপূর্ণ ও বড় কোন বিষয় বলে আমারও মনে হয়েছে। আপনি তো সরেজমিনে আছেন। ব্যাপার কি বলুন তো?’

‘আমি কাজ সবে শুরু করেছি। এখনও ঘটনার গভীরে যেতে পারিনি। তবে আমি ড. আজদার ইন্টারনেট থেকে যা আঁচ করেছিলাম, তাতে মনে হয়েছিল, আর্মেনিয়ার কুখ্যাত সন্ত্রাসী সংগঠন এর সাথে জড়িত। কেন জড়িত, কি চায় ওরা এ ব্যাপারটা খুব স্পষ্ট নয় এখনও। এই মাত্র আমরা খবর পেলাম, মিউজিয়ামে ডাকাতির ব্যাপারে আমাদের সামনে এগোবার একমাত্র লিংক পারসনকে ওরা হত্যা করেছে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘বিষয়টা ওখানে খুব জটিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। একটা কথা আপনি বলুন, বিষয়টার সাথে কোন রাজনীতির গন্ধ আছে কিনা।’ ওপার থেকে বলল জেনারেল মোস্তফা।

‘খুব নিশ্চিত করে বলতে পারবো না। তবে ওদের সকলের বাহুতেই মাউন্ট আরারাতের উল্কি আছে। আর আমি যা মনে করেছি, এদের গোড়া যদি আর্মেনিয়ায় থাকে, তাহলে এর সাথে ধর্ম ও রাজনীতি দুই-ই জড়িত আছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘এটা একটা খুব বড় ব্যাপার। আমাদের একটা অনুরোধ মি. খালেদ খাকান।’ বলল জেনারেল মোস্তফা।

‘বলুন মি. জেনারেল।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া যে, আপনি ওখানে হাজির। আমাদের সবার অনুরোধ, ওখানকার বর্তমান বিষয়ে অনুসন্ধানের নেতৃত্ব আপনি নিন। ড.

আজদার সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনার চ্যাপ্টার তো আপনি দেখছেনই। এখন গোটা বিষয়টার দায়িত্ব দয়া করে আপনাকে নিতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ বিষয় নিয়ে প্রেসিডেন্টের সাথেও আলাপ করেছেন। রাজনৈতিক বিষয় জড়িত থাকায় বিষয়টি জটিল হয়ে উঠতে পারে। ইতোমধ্যে নিশ্চয় আপনি দেখেছেন, আমাদের পুলিশ ও আমলাতন্ত্রে কিছু কিছু প্রশ্নে সমস্যা আছে। এই তদন্তের ব্যাপারটা সে ধরনেরই একটি বিষয়।' বলল জেনারেল মোস্তফা।

'বুঝেছি জেনারেল মোস্তফা। আপনি যে সমস্যার কথা বললেন, সেটা আসলেই একটা বড় সমস্যা। ঠিক আছে, উল্কিওয়ালাদের বিষয়টা কি, সেটা দেখার আমারও একটা আগ্রহ আছে। আল্লাহ ভরসা।' আহমদ মুসা বলল।

'আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের বাঁচালেন মি. খালেদ খাকান। এখানকার আর্মেনীয় নাগরিক ও আর্মেনিয়া আমাদের জন্যে একটা মাথা ব্যথা। কিছু ঘটলেই এর সাথে আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ যুক্ত হয়। সেই জন্যেই বিষয়টির নিশ্ছিদ্র ও গ্রহণযোগ্য তদন্ত প্রয়োজন।'

মুহূর্তের জন্যে থামল জেনারেল মোস্তফা কামাল। আবার বলে উঠল, 'ওখানকার পুলিশ ও প্রশাসনের সাথে আমরা কথা বলব।'

'এখানে ভ্যানের পুলিশ প্রধান ডিজিপি মাহির হারুন আমার সামনেই আছে।' আহমদ মুসা বলল।

'প্লিজ মি. খালেদ খাকান, ওকে একটু দিন। আমার পাশে পুলিশ প্রধান নাজিম এরকেনও আছেন।' বলল জেনারেল মোস্তফা ওপার থেকে।

'ওকে, দিচ্ছি।' বলে আহমদ মুসা তার মোবাইলটি ডিজিপি মাহির হারুনের দিকে এগিয়ে ধরে বলল, 'আংকারা থেকে সিকিউরিটি চীফ জেনারেল মোস্তফা কামাল কথা বলবেন।'

মোবাইল নিয়েই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আসসালামু আলাইকুম, স্যার আমি মাহির হারুন।'

তারপর ডিজিপি মাহির হারুন শুধু অবিরাম 'স্যার', 'স্যার' বলে কথা শুনতেই লাগল।

কথা শোনা শেষ হলে ডিজিপি মাহির হারুন মোবাইল আহমদ মুসার দিকে এগিয়ে দিয়ে বল, 'স্যার, স্যাররা আপনার সাথে আরেকটু কথা বলবেন।'

ওপারের সাথে সালাম বিনিময়ের পর বলল, 'হ্যাঁ মি. নাজিম এরকেন, কেমন আছেন আপনি?'

'হ্যাঁ, ভালো আছি মি. খালেদ খাকান। আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা আপনি গ্রহণ করুন। জেনারেল মোস্তফা আপনার সাথে আর একটু কথা বলবেন।' ওপার থেকে বলল তুরস্কের পুলিশ প্রধান নাজিম এরকেন।

'আচ্ছা দিন তাকে।' আহমদ মুসা বলল।

ওপার থেকে জেনারেল মোস্তফার কণ্ঠ শোনা গেল। বলল সে, 'ডিজিপি মাহির হারুন খুব সৎ ও দেশপ্রেমিক পুলিশ অফিসার। তার সহযোগিতা আপনি পাবেন। আর যখনি বলবেন, আমি ও নাজিম এরকেন ওখানে যাব।'

'কিন্তু সমস্ত কেসের সাথে আমার জড়িত থাকার বিষয় গোপন থাকতে হবে। ডিজিপি মাহির হারুন ছাড়া পুলিশের আর কেউ জানবেন না, এটা আমার শর্ত।' বলল আহমদ মুসা।

'ঠিক আছে, ডিজিপি মাহির হারুনকে এটা বলে দেব। আপনিও এটা তাকে নির্দেশ দিন।' জেনারেল মোস্তফা বলল।

'ঠিক আছে, এখনকার মত তাহলে কথা শেষ।' বলল আহমদ মুসা।

'ওকে মি. খালেদ খাকান, আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘ জীবন দিন এবং তিনি যা পছন্দ করেন, সব নিয়ামত আপনাকে দিন। আসসালামু আলাইকুম।' কথা শেষ করল জেনারেল মোস্তফা।

আহমদ মুসা সালাম নিয়ে কল অফ করে দিল।

আহমদ মুসা কল অফ করতেই ডিজিপি মাহির হারুন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'স্যার, আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। আপনার সাথে কাজ করার সৌভাগ্য আমার পুলিশ জীবনের বড় পাওয়া হবে স্যার। আপনার নির্দেশে সবকিছু চলবে স্যার।'

'বসুন অফিসার। এটা আপনার স্যারদেরকেও বলেছি আপনাকেও বলছি, আমি যে এই তদন্তে পুলিশের সাথে যুক্ত, এ বিষয়টা আপনি ছাড়া পুলিশের

আর কেউ জানবে না। আমি ভিন্নভাবে কাজ করব, পুলিশকে যখন যা করতে হয় আমি আপনাকে বলব।' আহমদ মুসা বলল।

ডিজিপি মাহির হারুন বসেই এ্যাটেনশন হয়ে বলল, 'ঠিক আছে স্যার। আমি বুঝেছি স্যার। স্যার, মিসেস গাজেন হত্যাকাণ্ড ঘটনার এখন কি করব স্যার?'

'আপনি চলে যান সেখানে। আইন অনুসারে যা করার তা করুন। আমিও আসছি। আমি মিসেস গাজেনের বাড়ি সার্চ করব। আমি যাওয়ার আগে বাড়ির কোন কিছুতে কেউ হাত দেবেন না।' আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসা থামতেই ড. মাহজুন মাজহার বলল, 'এসব খুব বড় ও জটিল বিষয়। এ ব্যাপারে কিছু বলা বা করার যোগ্যতা আমার নেই। তবে, আলহামদুলিল্লাহ, খুব খুশি হয়েছি যে, তদন্তের ব্যাপারে সবাই সচেতন হয়েছেন। বিশেষ করে আবু আহমদ আব্দুল্লাহকে এর সাথে যুক্ত করায় তার অসাধারণ বুদ্ধি ও শক্তির সাহায্যে আমরা সফল হবো ইনশাআল্লাহ। কিন্তু একটা কথা জনাব আবু আহমদ আব্দুল্লাহ। ইস্তাম্বুলে আংকারায় আপনি 'খালেদ খাকান', আর এখানে আপনি আবু আহমদ আব্দুল্লাহ কেন?'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'নানা কারণে সত্য অনেক সময় প্রকাশ করা যায় না। ইস্তাম্বুল-আংকারা এবং এখানে সেটাই ঘটেছে। আসল পরিচয়টা গোপন করেছি স্যার। আপাতত তা গোপনই থাক, স্যার।'

'ঠিক আছে, যার মধ্যে কল্যাণ বেশি সেটাই হওয়া উচিত।'

'ধন্যবাদ স্যার!' বলে আহমদ মুসা একটু থেমেই আবার বলল, 'স্যার, এবার আমাদের উঠতে হয়।'

'অবশ্যই, অবশ্যই। আমার একটু বাইরে বেরুতে হবে।'

বলে উঠে দাঁড়াল ড. মাহজুন মাজহার।

আহমদ মুসারাও উঠে দাঁড়াল।

ভাড়া করা ট্যাক্সি।

ড্রাইভারকে মিসেস গাজেনের বাড়ির ঠিকানা দিয়ে সীটে গা এলিয়ে দিয়েছে আহমদ মুসা। মিসেস গাজেনের চিন্তাই তার মাথায়।

গাজেনকে ওরা হত্যা করল কেন? মিসেস গাজেন যদি ওদের ভেতরের লোক হতো, তাহলে হত্যা না করে তাকে সরিয়ে নিত। তাকে হত্যা করা হয়েছে নিশ্চয় কোন কিছু ফাঁস হবার ভয়ে। তাহলে মিসেস গাজেনের সাথে তাদের কি সম্পর্ক ছিল? মিসেস গাজেনের নামের বৈশিষ্ট্য বলে যে, সে আর্মেনীয় অথবা আর্মেনীয় বংশোদ্ভূত। জাতিগত কারণেই মিসেস তাদের সাহায্য করতো, না কোন আর্থিক সুবিধা নিতো সে, কিংবা সে কোন ভীতি বা ব্ল্যাকমেইলের শিকার ছিল কিনা।

যাই হোক, মিসিং লিংক পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে কোন একটা কিছু তাদের দরকার। সাহিবা সাবিতের কাছে এই মাত্র জানতে পেরেছে, মিসেস গাজেনের লেখার অভ্যাস ছিল। মাঝে মাঝে ছদ্মনামে তিনি পত্রিকার মতামতের কলামে লিখতেন। আরেকটা বড় খবর জানা গেছে তার কাছ থেকে। মিসেস গাজেনের জীবন একটা ট্র্যাজেডি। প্রথম যৌবনে একটা ছেলেকে ভালোবাসতো সে। কিন্তু ছেলেটির কাছ থেকে সে বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়। তারপর সে বিয়েই করেনি। এই ব্যাকগ্রাউন্ডের মেয়েরা হতাশাবাদী অথবা প্রতিহিংসাপরায়ণা হয়। দেখা যাক, মিসেস গাজেনের ভাণ্ডার থেকে কি পাওয়া যায়। কিছু পাওয়া যাক বা না যাক, এটা স্পষ্টতই আঁচ করা যাচ্ছে যে, মাউন্ট আরারাত ঘিরে অথবা মাউন্ট আরারাতের সেন্টিমেন্টকে কাজে লাগিয়ে একটা ষড়যন্ত্রের কুণ্ডলী দানা বেঁধে উঠছে। একটা নতুন বিপদ ঘনিয়ে আসছে আনাতোলিয়ার ওপর। কি বিপদ, কি সে ষড়যন্ত্র? এই অঞ্চলে, এই ভূ-খণ্ডে ষড়যন্ত্র নতুন নয়। কিন্তু পূর্ব আনাতোলিয়ার ওপর এবার এই ষড়যন্ত্রের ছোবল উদ্যত হয়েছে কেন?

আহমদ মুসার গাড়ি এসে মিসেস গাজেনের বাড়ির লনে প্রবেশ করল।

কিছু পুলিশ ছুটে এসে ঘিরে ধরল গাড়ি।

ডিজিপি মাহির হারুন ছিল কাছেই।

সে দ্রুত এসে পুলিশদের আহমদ মুসাকে দেখিয়ে বলল, 'ইনি একজন সিনিয়র সাংবাদিক। একে আমরা ডেকেছি। তিনি ঘটনা ও বাড়ির সবকিছু দেখতে ও জানতে এসেছেন। আমিই ওকে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছি।'

ওদিকে আহমদ মুসাও গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে।

সালাম বিনিময় করল দু'জনে। তারপর ডিজিপি মাহির হারুন বলল, 'কিলিং স্পটটা আগে দেখবেন চলুন। এরপর ভেতরটা দেখা যাবে।'

বলে হাঁটতে লাগল ডিজিপি মাহির হারুন। তার সাথে হাঁটতে লাগল আহমদ মুসাও।

পরবর্তী বই

# বিপদে আনাতোলিয়া

**কৃতজ্ঞতায়ঃ**

1. Md Rashed
2. Meah Imtiaz Zulkarnain

## সাইমুম-৪৯

# বিপদে আনাতোলিয়া

আবুল আসাদ

# ১

মিসেস গাজেনের বাড়িটা সুন্দর একটা ডুপ্লেক্স। নিচের তলাতে থাকে আয়া ও পরিচারিকা। রান্না-বান্না, ষ্টোর সব নিচ তলাতেই। সব মিলিয়ে নিচ তলায় ৫টি ঘর।

নিচ তলা থেকে সার্চ শুরু করেছিল আহমদ মুসা।

কাজে লাগতে পারে এমন কিছুই পেল না সে নিচ তলায়।

নিচ তলায় সিঁড়ির গোড়ায় বড় একটা লাউঞ্জের মত জায়গা। নিচ তলার কেন্দ্র এটাই। এখান থেকে রান্নাঘর, স্টোর, ড্রয়িং, শোবার ঘর সবই দেখা যায়। এখানে দোল খাওয়া একটা ইজি চেয়ার।

আহমদ মুসা আয়াকে জিজ্ঞেস করল, 'এ ইজি চেয়ারটা কার?'

সার্চের সময় আয়া ও পরিচারিকাকে আহমদ মুসা সাথেই রেখেছিল।

'এখানে ম্যাডাম বসতেন। ছুটির দিন কিংবা অফিস থেকে আসার পর বিকেলে এখানে বসতেন। আমরা কাজ তরতাম, আর তিনি বসে বসে দেখতেন এবং গল্প করতেন।' আহমদ মুসার প্রশ্নের উত্তরে বলল আয়া।

পরিচারিকা ও আয়া দু'জনেই মধ্যম বয়সের। পরিচারিকা গোবেচারা চেহারার, কিন্তু আয়ার চোখ-মুখ খুব শার্প। আর্মেনীয়, না তুর্কি বুঝা মুশকিল। তবে কথায় আর্মেনীয় টানটা একটু খেয়াল করলেই বুঝা যায়।

'মিসেস গাজেন ছুটি ও অবসর আর কিভাবে কাটাতেন আয়া?' জিজ্ঞাসা আহমেদ মুসার।

'লিখে-পড়ে তিনি সময় কাটাতেন,' বলল আয়া।

'কি লিখতেন?' জিজ্ঞাসি আহমদ মুসার।

''দৈনিক ভ্যানের নিকল'-এ নিয়মিত তিনি ছদ্মনামে কলাম লিখতেন।' আয়া বলল।

'তাঁর সে কলামের কি কোন কালেকশন আছে?' বলল আহমদ মুসা।

'আছে অবশ্যই। তার স্টাডিতে পাওয়া যেতে পারে।' আয়া বলল।

'নিচের কাজ শেষ। চলুন উপরটা দেখব।'

বলে আহমদ মুসা ইজি চেয়ার ক্রস করে সিঁড়ির দিকে যাবার সময় ইজি চেয়ারের পেছনের 'সেফারস প্লেট' তার নজরে পড়ল। প্রস্তুতকারী প্রতাষ্ঠানের নামটাই তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। টার্কিস হরফে 'আডিরা ফার্নিচারস'। 'আডিরা' হিব্রু শব্দ। অর্থ- 'শক্ত', 'শক্তিশালী'। সেফারস প্লেটে একটা মনোগ্রাম। বহুকোণ বিশিষ্ট তারার মধ্যে আর্টিস্টিক কায়দায় হিব্রু অক্ষরে আডিরা লেখা।

হঠাৎ আহমেদ মুসার কি মনে পড়ল। একটু ঘুরে সামনে গিয়ে ইজি চেয়ারের একটা হাতলের উপর চোখ ফেলল। তার সন্দেহ ঠিক। এগুলোও হিব্রু অক্ষর। এগুলোও হিব্রু অক্ষর। উপর থেকে নিচে একটি করে অক্ষর বেশ স্পেস দিয়ে লেখা হয়েছে। মোট চারটি অক্ষর। চারটি অক্ষরকে একত্রিত করলে একটা শব্দ হয়ে যায়। সেটা হলো হিব্রু 'বাটিয়া' শব্দ যার অর্থ 'ঈশ্বরের কন্যা'।

এগুলো নিশ্চয় মিসেস গাজেনের হাতের লেখা, তাহলে হিব্রু তিনি জানতেন, ভাবল আহমদ মুসা। আহমদ মুসার মনে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে।

আপনাতেই আহমদ মুসা বলল, 'একটা কিছু লেখা দেখলাম। কিন্তু বুঝলাম না।' বলেই আহমদ মুসা সিঁড়ির দিকে চলল।

উপরে উঠে এল আহমদ মুসা আয়াকে সাথে নিয়ে।

উপরে চারটি রুম। একটা ড্রইং, একটা মাস্টার বেড, একটি অতিথি কক্ষ এবং একটি স্টাডি রুম। মাস্টার বেড রুমের সাথে আরেকটা ছোট কক্ষ আছে। ওটা ড্রেসিং রুম।

মাস্টার বেডে ঢুকেই আহমেদ মুসা দেয়ালে দেখল একটা ছবি টাঙানো। নবযৌবনা এক মহিলা।

'মিসেস গাজেনের ছবি, না?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা আয়াকে।

'জি হ্যাঁ, অনেক আগের ছবি তাঁর।' বলল আয়া।

'তোমার ম্যাডাম তো খুবই সুন্দরী, বিয়ে করেননি কেন? মিসেসই বা হলেন কেমন করে?' ছবির দিকে চোখ রেখেই জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

একটুক্ষণ চুপ করে থাকল আয়া। তারপর বলল, 'স্যার, এটা তার পার্সোনাল ব্যাপার। তিনি কোন দিন বলেননি, আমিও জিজ্ঞেস করিনি। তবে আমি শুনেছি, তিনি প্রথম যৌবনে বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হন। কিন্তু এসব নিয়ে তার কোন দুঃখবোধ ছিল না। তিনি নিজেকে 'ডটার অব গড' ভাবতেন। যতদূর জানি, তাঁর মিসেস লেখার কারণ মানুষের কৌতুহল থেকে নিজেকে রক্ষা করা।'

'উনি কোন ধর্ম অনুসরণ করতেন?' বলল আহমদ মুসা।

'স্যার, আমি তাঁকে কোনদিন কোন ধর্মশালায় যেতে দেখিনি। বাড়িতে কোন ধর্মগ্রন্থও আমার চোখে পড়েনি।'

আয়াকে ধন্যবাদ দিয়ে আহমদ মুসা আয়ার সহযোগিতায় শোবার ঘরটা তন্ন তন্ন করে খুঁজল। কাগজ-পত্র, খাতা-ডাইরি এসবই তার লক্ষ্য ছিল। আলমারি, ড্রয়ার, সবই দেখা হয়ে গেল। কিছুই পাওয়া গেল না।

স্টাডি রুমটাও দেখা গেল ফাঁকা। কিছু বই কিছু ফাইল ছাড়া কিছুই নেই। বইয়ের অধিকাংশই ইতিহাস বিষয়ক। প্রত্নতত্ত্বের উপর কিছু বই আছে। চরিত্রের দিক দিয়ে বইগুলো সবই একাডেমিক ও প্রফেশনাল। ফাইলগুলো দুই ধরনের। তাঁর লেখার কালেকশান, অন্যদিকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বিষয়ক অন্য লেখকদের লেখা একটি কালেকশন। মিসেস গাজেনের লেখার কিছু শিরোনাম দেখে বুঝল তার লেখার মূল বিষয় হলো, সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে জাতিগত

বিভেদের বিলোপ সাধন। মনে মনে হাসল আহমদ মুসা। মিসেস গাজেনের নাম খ্রীস্টান ধর্মযাযিকার হলেও তিনি লেখেন ইহুদি স্বার্থের পক্ষে। ইহুদিদের তথাকথিত মানবতাবাদের রাজনীতিকরা চাচ্ছে, দুনিয়ার সব ধর্ম ও সব জাতির বিলয় ঘটু। শুধু টিকে থাকুক বনি ইস্রাইল জাতি ও তাদের ইহুদি ধর্ম।

অবশ্য আহমদ মুসা স্বীকার করল তুরস্কের পূর্ব আনাতোলিয়া অঞ্চলের রাজনীতিতে মিসেস গাজেনের ভূমিকা খৃস্টানদের পক্ষে গেছে। কারণ এ অঞ্চলে তুর্কি স্বতন্ত্রের বিলুপ্তির পর হবে তুর্কি শাসনের বিলুপ্তি। মাউন্ট আরারাতকেন্দ্রিক পূর্ব আনাতোলিয়া অঞ্চল নিয়ে আর্মেনিয়ার যে নীল-নকশা তার বাস্তবায়নের জন্যে এমন একটা পরিস্থিতিই দরকার।

কিছু বই, বইয়ের র‌্যাক, টেবিল, টেবিলের ড্রয়ার ও একটা কম্পিউটার ছাড়া স্টাডিতে আর কিছু নেই।

আহমদ মুসা কম্পিউটার চেক করল। কম্পিউটারে মাত্র কয়েকটি ফাইল আছে। ফাইল সবই লেখা এবং লেখা সংক্রান্ত তথ্যবিষয়ক। কোন গোপন ফাইল কম্পিউটারে নেই।

ড্রইংরুম ও গেস্টরুমও দেখা হয়ে গেছে। সেদু'টি রুম আরও ফাঁকা।

কোথাও কোন কিছু না পাওয়াই প্রমাণ করেছে, বিষয়টা অস্বাভাবিক। মিইজিয়ামে রক্তাক্ত অভিযানে জড়িতদের সাথে মিসেস গাজেনের যোগসাজশ, তার হিব্রু জানা, জিউইশ ব্যাকগ্রাউন্ডর ভ্যান-ক্রনিকল পত্রিকায় লেখা, তার নাম, তার দৃষ্টিভঙ্গি প্রমাণ করে বড় কোন বিষয়ের সে একটা গ্রন্থি। যদি তাই হয়, তাহলে এর পরিচয় কোথাও না কোথাও সে রাখবে। সে 'কোথাও' টা কোথায়?

এ সম্পর্কে জানার হাতের কাছে একমাত্র মাধ্যম হলো আয়া মেয়েটা। এই বুদ্ধিমতি, চালাক মেয়েটা কিছুই জানে না, তা হতে পারে না।

আহমদ মুসা আয়া মেয়েটাকে লক্ষ্য করে বলল, 'মিসেস গাজেনকে না জানলে, হত্যাকারীদের মোটিভ বুঝা যাবে না। হত্যার মটিভ না জানলে হত্যাকারীদের চিহ্নিত করা মুষ্কিল। কিন্তু মিসেস গাজেনের পরিচয়মূলক কিছুই তো পেলাম না।'

মেয়েটার চোখে-মুখে চাঞ্চল্যের প্রকাশ ঘটল। বলল, 'স্যার একটা জায়গা অবশিষ্ট আছে, কিন্তু...।'

'কিন্তু কি?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'স্যার, বিষয়টা আমি পরিষ্কারভাবে জানি না। শোবার ঘরের আলমারির নিচ থেকে একটা কিছু বের করতে দেখেছি। এর বেশি কিছু আমার জানা নেই।'

'কি ধরনের জিনিস বের করতে দেখেছেন?' বলল আহমদ মুসা।

'ছোট আয়তাকার বাক্সের মত।' বলল আয়া মেয়েটা।

'চলুন তো দেখি।' বলেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

দু'জনে মাস্টার বেডে ঢুকে আলমারির গোড়ায় গিয়ে বসল।

আহমদ মুসা নিজেই একটা স্টিক দিয়ে আলমারির নিচের জায়গাটা এদিক-ওদিক দেখল। কাঠিতে কিছুই বাঁধলো না।

এবার আহমদ মুসা আলমারির নিচটা হাত দিয়ে হাতড়াল। আলমারির তলা ও মাটির মধ্যবর্তী স্থান গোটাই ফাঁকা।

আরেকটা জিনিস দেখে বিস্মিত হলো। সেটা আলমারির বটমে দু'পাশ থেকে দূরত্বের ঠিক মাঝখানে আলমারির 'মেকারস প্লেট' লাগানো। আহমদ মুসার কাছে এটা স্বাভাবিক মনে হলো না। এ প্লেট সাধারণত আলমারির মাথায় লাগানো তাকে, যাতে সহজে মানুষের চোখে পড়ে। আরেকটা জিনিসও বিদঘুটে ঠেকল। মেকারস প্লেটটা অবস্থানগত ভারসাম্যের দিক দিয়ে যেখানে লাগানো দরকার ঠিক তার দুই তিন ইঞ্চি উপরে লাগানো। অন্য একটি বিষয় হলো, আলমারির দরজার নিচের কাঠামোটা যার সাথে আলমারির খুরা রয়েছে, সেটা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি চওড়া।

এ সবের সাথে কি আলমারির নিচ থেকে আয়তাকার বাক্স বের করার কোন সম্পর্ক আছে?

মেকার্স প্লেট নেড়েচেড়ে দেখার সময় দু'আঙুল দিয়ে দুই প্রান্তে চাপ দিল। সংগে সংগে প্লেটটি খসে পড়ে গেল। প্লেটটি চুম্বকে আটকে ছিল, বুঝল আহমদ মুসা।

মেকার্স প্লেট সরে গেলে সেখানে প্লেটটির আকার থেকে কিছুটা ছোট আয়তাকার একটা উইনডো বেরিয়ে এল। সেই উইনডো পথে সবুজ রংয়ের আংটার মাথা দেখা গেল।

আহমদ মুসার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। নিশ্চিত হলো সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে।

আংটা ধরে টান দিতেই ইঞ্চি খানেক বেরিয়ে এল। সংগে সংগেই কিছু একটা পড়ার শব্দ হলো আলমারির তলায়।

আহমদ মুসা আলমারির তলায় হাত দিয়ে স্টিলের আয়তাকার একটা বাক্স বের করে আনল।

আয়া মেয়েটি আনন্দে বলে উঠল, 'স্যার, এই বাক্সই আমি ম্যাডামের হাতে দেখেছি।'

আহমদ মুসা ঢাকনা খুলে দেখর বাক্সে একটা ডাইরি রয়েছে।

আহমদ মুসা আয়াকে ধন্যবাদ দিয়ে বলল, 'বাক্সে একটা ডাইরি দেখে যতটা খুশি হয়েছি, বাক্স ভর্তি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ হীরা পেলেও এত খুশি হতাম না। আপনি সাহায্য করেছেন। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদ নয় স্যার, ম্যাডামের হত্যাকারীরা শাস্তি পেলেই আমি খুশি হবো।' বলল আয়া মেয়েটা।

'অবশ্যই ওরা শাস্তি পাবে।' বলে উঠে দাঁড়ার আহমদ মুসা।

'আমরা কী করব স্যার, আমাদের কী হবে?' বলল আয়া।

'আপনারা যেভাবে আছেন, সেভাবেই থাকবেন। আপনাদের কোন ভয় নেই। আপাতঃত পুলিশ পাহারা তো থাকছেই।' আহমদ মুসা বলল।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য হাঁটা শুরু করল আহমদ মুসা।

একটা প্রাইভেট বাড়িকে আহমদ মুসা তার অফিস বানিয়েছে। ডিজিপি মাহির হারুন ও অন্যদিকে ড. আজদা, সাবিহা সাবিত, ড. সাহাব নূরী, ড. মোহাম্মাদ বারজেনজো ছাড়া এই বাড়ির নতুন পরিচয়ের খবর আর কেউ জানে না।

ড. মোহাম্মদ বারজেনজো সেই রাতের ঘটনার পর জরুরী প্রয়োজনে ইস্তাম্বুল গিয়েছিলেন।

সেই প্রাইভেট হাউস মানে আহমদ মুসার অফিসে তার বিশ্রাম কক্ষে আহমদ মুসা সেই ডাইরী নিয়ে বসেছে।

ডাইরির পাতা উল্টাচ্ছে আহমদ মুসা। ঠিক ডাইনী নয় এটা। বিচ্ছিন্ন স্মৃতিচারণ।

স্মৃতিচারণের বিষয় দেখে দেখে পড়তে লাগল আহমদ মুসা। শুরুতেই সে লিখেছে:

'প্রথম যেদিন নিজের সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে জানলাম, দেখলাম জীবনটাই কৃত্রিমতায় সাজানো। যে পিতাকে মুসলিম পিতা হিসাবে জেনেছি, জানলাম তিনি একজন ইহুদি আর্মেনীয়। আর জানতাম আমার মুসলিম পিতা বিয়ে করেছেন কনভার্টেড সুন্দরী আর্মেনীয়কে, যার হাজারো দৃষ্টান্ত আছে তুরস্কে, আর্মেনিয়ায়। পরে জানলাম মায়ের এ পরিচয় ঠিক নয়। তিনিও আর্মেনীয় ইহুদি। মুসলিম ও আর্মেনীয় শব্দ মিলিয়ে আমার নাম হলো অ্যানোশ আব্দুল্লাহ্ গাজেন। আমি মুসলিম পরিচয় নিয়ে বড় হলাম। কিন্তু আমার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হলো ইয়েরেভিনের একটি হিব্রু স্কুলে। তারপর আমরা একদিন রাতের অন্ধকারে মাইগ্রেট করে তুরস্কের পূর্ব আনাতোলিয়ার সবচেয়ে বড় শহর ভ্যানে চলে এলাম আর্মেনিয়া থেকে পালিয়ে আসা এক মুসলিম পরিবার হিসেবে। ভ্যানে আমাদের জন্যে বাড়ি, ব্যবসা, নাগরিক কাগজপত্র সবই প্রস্তুত ছিল। কিভাবে ছিল তা তখন বুঝিনি, কিন্তু এখন বুঝেছি। এসবই জগতজোড়া ইহুদি আণ্ডারওয়ার্ল্ডের কাজ।'

'এ বিষয়গুলো আমি জানতে পারি, যখন আমার আঠারো বছর বয়স। তখন আমি ভ্যানের এক সুন্দরী কলেজ ছাত্রী। আমি মুষড়ে পড়ি আমার নতুন পরিচয়ে। কিন্তু আমার এই মানসিক অবস্থার উন্নতি ঘটে যখন আমি ভ্যান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, যখন আমি আর্মেনীয় বংশজাত একজন ইহুদি তরুণকে ভালোবেসে ফেলেছি। অতীতকে ভুলে গিয়ে আমি আমার প্রতিভাবান প্রেমিককে ঘিরে নতুন জীবনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠি। তখন আমার সুখস্বপ্ন ষোলকলায় পূর্ণ

হয় যখন আমি পূর্ব আনাতোলিয়ান সুন্দরী প্রতিযোগীতায় প্রথম হই এবং প্রেমিককে বিয়ে করার কথা প্রকাশ করে দিন-তারিখের জন্য পিতামাতাকে বলি।’

‘আমার স্বপ্নের ষোলকলা যখন পূর্ণ ভাবছি, তখনই আমার জীবনের অন্ধকার পথে যাত্রা শুরু। একদিন গভীর রাতে আমাদের বাড়িতে আমার পিতা-মাতার সামনে তিনজন আগন্তুক আমাদের কম্যুনিটি লিডারের পরিচয় দিয়ে বলল, আংকারা সামরিক স্কুল থেকে অলরাউন্ডার, ব্রিলিয়ান্ট রেকর্ড নিয়ে পাস করে আসা ভ্যান সামরিক গ্যারিসনে সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত একজন অমিত সম্ভবনাময় সামরিক অফিসারকে ভালোবাসতে হবে। তাকে বিয়ে করতে হবে। আমি এ প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করি। উত্তরে সাপের মত ঠাণ্ডা গলায় ওরা জানায় যে, আমার জীবন, আমার বাপ-মায়ের জীবন, আমাদের বাড়িঘর, ব্যবসা-বাণিজ্য সবই তাদের। তাদের কথার অন্যথা করার উপায় আমাদের নেই। তাদের কথা না মানলে পরের দিনই আমার প্রেমিকের লাশ আমি দেখতে পাব। তারপর আমার পিতামাতা, তার...। আমি তাদের কথায় রাজি হয়ে যাই। আমি হয়ে যাই তাদের হাতের পুতুল। সেই সামরিক অফিসারের সাথে তারাই আমার পরিচয় করিয়ে দেয়। প্রথম দৃষ্টিতেই সে আমাকে পছন্দ করে, তারপর ভালোবাসা, তারপর...। সে পাগল হয়ে উঠে। আমি বুঝতে পারি, সে অলক্ষ্যেই আমাদের স্বার্থের ফাঁদে আটকা পড়ে গেছে। সে স্বার্থ কি আমি জানি না, জানে আমাদের কম্যুনিটির গুরুরা, যারা আমাদের ব্যবহার করে। সে গোপনে আমাকে বিয়ে করে। এই কথা সে প্রকাশ করতে পারেনি পারিবারিক ও আইনি কারণে। কারণ স্ত্রী আছে। আজও আমি তাঁর গোপন স্ত্রী। আজও আমার গোপন স্বামী আমাদের কম্যুনিটির স্বর্থে কাজ করছেন। সে স্বার্থটা কি আমি জানি না। জীবনটা যদি আমার এটুকুর মধ্যে শেষ হতো, তাহলেও ভালো ছিল।’

‘কিন্তু তা হয়নি। আমার সৌন্দর্য্য, আমার যৌবনকে এটুকু মূল্যে বিক্রি করে আমার কম্যুনিটি সন্তুষ্ট হতে চায়নি। তখন আমি আমার পিতা-মাতা থেকে আলাদা হয়ে এক গোপন বাড়িতে থাকি। এ গোপন বাড়িটি আমার গোপন স্বামীই ঠিক করে দিয়েছেন। আমার স্বামীর পোস্টিং তখন আংকারার হেডকোয়ার্টারের সেন্ট্রাল কমান্ডে। প্রতি উইক-এন্ডে আসেন। সেই সময় একদিন রাতে আমাদের

কম্যুনিটির দু'জন এলেন। তারা দু'জন সামরিক অফিসারের ফটো দেখিয়ে তাদের পরিচয় বললেন। একজন ভ্যান-এর ব্রিগেড কমান্ডার। এরা এখন থেকে সপ্তাহের দুইদিন ভিন্ন দিনে আসবেন সময় কাটাবার জন্যে। আমাকে তাদের সংগ দিতে হবে। তারা নাকি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমাকে দেখেছেন এবং তারা নাকি আমার সাথে সাক্ষাতের জন্যে উদগ্রীব। উল্লেখ্য, যে ধরনের অনুষ্ঠানে তারা আমাকে দেখেছেন, সে সব অনুষ্ঠানের আয়োজক আমাদের কম্যুনিটির লোকেরা। শান্তি, সম্প্রীতির প্রসারমূলক ও বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালনমূলক এসব অনুষ্ঠানে সম্ভাবনাময়, প্রতিভাবান সামরিক অফিসারদেরও ডাকা হয় গণসংযোগের কথা বলে। যথারীতি আমি এ প্রস্তাব অস্বীকার করে বলি, গোপন হলেও সে আমার স্বামী। তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা আমি করতে পারবো না। তখন আবারও আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়, তাদের কথার অমান্য করার সুযোগ আমার নেই। আমার জীবন তাদের, আমার নয়। এর সাথে ভয় দেখানোর পালা। তারাই জয়ী হয়। আমার জীবন আরও অন্ধকারে ডুবে যায়। এ ভাবেই চলছে আমার জীবন।'

'মিউজিয়ামে চাকুরীর ব্যবস্থাটা আমার কম্যুনিটির লোকরাই করে দিয়েছে। আমার গোপন স্বামীর অনুমতিও এতে ছিল। চাকুরীর সুবাদে নতুন ডুপ্লেক্স বাড়িটাতে আছি আমি। এটা একদিকে সামরিক গ্যারিসন, অন্যদিকে মিউজিয়াম দু'টোরই কাছে। এ ডুপ্লেক্স বাড়ির ভালো দিক হলো, উপর তলাটা নির্জন, আমার অন্ধকার জীবনের জন্যে সুবিধাজনক।'

'আমাকে ওরা সন্দেহ করছে কি? ডিজিপি মাহির হারুন সেদিন আমার সাথে যেভাবে কথা বলল, তাতে সেটাই মনে হয়। সেদিন আমার সাথে যেভাবে কথা বলল, তাতে সেটাই মনে হয়। সেদিন আমার কম্যুনিটির লোকেরা এসে আমাকে বলে গেছে, সবই ঠিক-ঠাক চলছিল, কিন্তু কি যেন আবু আহমদ নামের ঘোড়েল একজন লোক এসেছে ভ্যান-এ। আমি যেন কথা-বার্তায় সাবধান থাকি। বিশেষ করে সামরিক অফিসারদের পরিচয়ের ব্যাপারটা খুবই স্পর্শকাতর। এটা কোনও ভাবেই প্রকাশ হতে দেয়া যাবে না।'

'সেদিন এক অনুষ্ঠানে দেখলাম, প্রথম যৌবনে আমি যেমন ছিলাম, সে ধরনেরই কিছু মেয়ের আনাগোনা। বুঝলাম, আমাদের কম্যুনিটির লোকেরাই

তাদের আমদানি করেছে। আমার অফিসারদের সাথেও দেখি তাদের পরিচয় করানো হচ্ছে। বুঝতে বাকি রইল না, তারা আমার মতই কোন হতভাগি। আমার মত এই হতভাগিদের জীবনের বিনিময়ে আমাদের কম্যুনিটির লোকেরা যে ব্যবসায় করছে, সে ব্যবসায়ের স্বার্থ কি, লক্ষ্য কি?'

ডাইরিটা এ পর্যন্ত পড়েই আহমদ মুসা পড়া বন্ধ করল। আগে-পিছের পাতা উল্টাতে লাগল সেই সামরিক অফিসারদের নাম কোথাও আছে কিনা, কোনওভাবে নাম কোথাও পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু না, তন্ন তন্ন করে খুঁজেও নাম কোথাও পেল না। আশ্চর্য, অনাহুত বিশ্বাসঘাতকতা ও ব্ল্যাকমেইলের শিকার একজন মহিলা তার কম্যুনিটির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। সব কথাই সে বলেছে, কিন্তু নামগুলো উল্লেখ করেনি। কম্যুনিটির স্বার্থ কি জানতো না, তবু কম্যুনিটির স্বার্থ সে রক্ষা করতে চেয়েছে, স্বার্থ রক্ষা করেছে তার সাথে সম্পর্কিত সামরিক উচ্চপদে আসিন। তাদের নাম-পরিচয় জানা একন এই মুহূর্তের জন্য সবচেয়ে বড় কাজ।

আহমদ মুসা টেলিফোন করল মিসেস গাজেনের আয়া সোমিকে।

ওপার থেকে সোমির কণ্ঠ পেতেই আহমদ মুসা বলল, 'আমি মিসেস গাজেনের খবর নিতে চাই। আমার কয়েকটা কথা জানার আছে।'

'ওয়েলকাম স্যার, বলুন।' বলল গাজেনের আয়া।

'মিসেস গাজেনের কি এক বা একাধিক বন্ধু ছিল যাদের সাথে তিনি অন্তরঙ্গভাবে মিশতেন?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

ওপার থেকে কোন জবাব এল না। নিরব সোমি, মিসেস গাজিনের আয়া।

সোমাকে নিরব দেখে আহমদ মুসাই আবার বলল, 'দেখুন সোমি, মিসেস গাজেনের হত্যাকারীদের পাকড়াও করতে আপনার সাহায্য আমরা চাই। ওদের পাকড়াও করতে যে প্রশ্ন আমি করেছি, তার উত্তর জানা খুবই জরুরী।'

'স্যরি স্যার। ম্যাডামের পার্সোনাল বিষয় নিয়ে কথা বলতে বিব্রত লাগছে স্যার।' সোমি ওপার থেকে বলল।

'তিনি এখন নেই। এখন তাঁর পার্সোনাল বিষয় নিয়ে কথা বলতে বিব্রত লাগছে স্যার।' সোমি ওপার থেকে বলল।

'তিনি এখন নেই। এখন তাঁর পার্সোনাল ব্যপার আর পার্সোনাল নেই। তার হত্যাকারীদের ধরার জন্যে সব কথা আমাদের জানা দরকার।' বলল আহমদ মুসা।

'কি বলব বুঝতে পারছি না।' প্রতি উইক এন্ডে নিয়মিত একজন আসতেন। শনিবার রাতে আসতেন। রোববার রাতে চলে যেতেন। ঘর থেকে তিনি বেরুতেন না। আমরা উপরে যেতাম না। খানা পরিবেশন ম্যাডামই করতেন। ম্যাডাম তার সম্পর্কে কিছু বলেননি। তবে আচার-ব্যবহারে তাঁকে স্বামীস্থানীয় বলেই আমাদের মনে হয়েছে। পরের উইকে মঙ্গল ও বৃহঃস্পতিবার রাতেও তিনি বা কেউ আসতেন। সব আসাটাই রাত দশটার পর। রাত দশটার পর আমরা শুয়ে পড়তাম।' আয়া সোমি বলল।

'আপনারা তাঁকে বা তাদেরকে দেখেছেন?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'মঙ্গল ও বৃহঃস্পতিবার রাতে যারা আসতেন, তাদের দেখার প্রশ্নই ওঠে না। রাতেই তারা চলে যেতেন। উইক এন্ডে যিনি আসতেন, তিনি দু'একবার পলকের জন্য আমার চোখে পড়েছেন মাত্র।' বলল সোমি।

'তার মুখের বা শরীরের কোন বৈশিষ্ট্য বা চিহ্ন আপনার মনে পড়ে?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'কপাল চওড়া, হাসি মাখা মুখ। এটুকুই আমার নজরে পড়েছে।' বলল সোমি।

'ওদের কোন জিনিসপত্র, ফেলে যাওয়া কোন চিহ্ন?' আহমদ মুসার আবার জিজ্ঞাসা।

'স্যার, এ রকম কিছু মনে পড়ছে না।' বলল সোমি।

'কত দিন পর্যন্ত ওরা এসেছেন। মনে ওদের আসাটা অনাহুত ছিল কিনা, ওরা এখনও আসে কিনা?' আহমদ মুসা বলল।

'কোন আসাটাই এখন আগের মত নিয়মিত নয় স্যার। তবে আসা বন্ধ হয়নি।' বলল সোমি।

'তোমার ম্যাডামের বয়স কত ছিল?' জিজ্ঞেস করলো আহমদ মুসা।

'স্যার, চল্লিশ হবে। তবে স্যার, তিনি বয়সের চেয়ে ছোট ছিলেন। অদ্ভুত ছিল তার দেহগঠন। মেকআপ না করলেও তাঁকে তিরিশের বেশি মনে হতো না।' বলল সোমি।

'তাই হবে। ওরা কম্যুনাটির শ্রেষ্ঠ মেয়েদেরকেই বাছাই করে তাদের স্বার্থক যুপকাষ্ঠে বলি দেয়ার জন্যে।' আহমদ মুসা বলল।

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা সোমিকে ধন্যবাদ দিয়ে বলল, 'দরকার হলে আপনাকে আবার বিরক্ত করব ম্যাডাম সোমি।'

কর অফ করে দিয়ে আহমদ মুসাও সোফায় গা এলিয়ে দিল।

মাথা খালি করে একটু বিশ্রাম নিতে চেয়েছিল। কিন্তু রাজ্যের চিন্তা এসে ঘিরে ধরল।

ওয়েটার কফি দিয়ে সরে যেতেই সোহা'র (Son of Holy Ararat) প্রেসিডেন্ট মিহরান মুসেগ মিসিস বলল, 'মি. জেনারেল, তাড়াতাড়ি আমাদের আসল কথাটা দরকার।'

'বলুন।' বলল জেনারেল মেডিন মেসুদ।

জেনারেল মেডিন মেসুদ তুর্কি সেনাবাহিনীর শীর্ষ জেনারেলদের একজন। তিনি স্টাফ অফিসের প্রধান। অফিসারদের ট্রান্সফারের প্রধান ব্যক্তি সে।

মিহরান মুসেগ মাসিস তাকাল হোলি আরারাত গ্রুপের অন্যতম ভারদান বুরাগের দিকে।

ভারদান বুরাগ নড়ে-চড়ে বসে বলল, 'দেখুন, গত কয়েকদিনে পূর্ব আনাতোলিয়ায় আমাদের আরারাত অঞ্চলে আমাদের প্রায় অর্ধশত নিরপরাধ মানুষ নিহত হয়েছে। অথচ মাদকের বিস্তারের মত সামাজিক অপরাধ দমনে আমাদের লোকরাই সেখানে সবচেয়ে বেশি সক্রিয়। আমাদের লোকদের উপর নির্যাতন নিপীড়ন ও হত্যার জন্যে দায়ী শুধু পুলিশ, ঐ অঞ্চলের সেনা অফিসাররাও দারুন উৎসাহী।'

বলে ভারদান বুরাগ পকেট থেকে ভ্যান, অগ্রি, ইজদির ও কারস প্রদেশের সামরিক অফিসারদের তালিকা জেনারেল মেডিন মেসুদের সামনে রেখে বলল, ‘এই অফিসারদের সরিয়ে দিয়ে তাদের নামের বিপরীতে লিখা অফিসারদের এনে বসাতে হবে।’

ভারদান বুরাগের কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই মিরহান মুসেগ মাসিস বলল, ‘এটা করতেই হবে, না করলে আমাদের ধ্বংস করে ছাড়বে।’

‘কিন্তু এত স্টাফ এইভাবে বদল হয় না, করা যায় না।’ ক্ষোভ ঝরে পড়ল জেনারেল মেডিন মেসুদের কণ্ঠে।

তার চোখে-মুখে বিরক্তিরও চিহ্ন।

‘সবই সম্ভব। আপনারা ইচ্ছা করলে কোন কিছুই অসম্ভব নয়। অনেক সাহায্য করেছেন আপনি। এ সাহায্যও করতে হবে।’

‘তাহলে গোটা দেশের সেনা অফিসারকেই বদলি করুন। তাহলে অন্যকিছু ধারণা করার সুযোগ হবে না।’ ভারদান বুরাগই বলল।

দুই চোখ ছানাবড়া করে তাকাল জেনারেল মেডিন মেসুদ ভারদান বুরাগদের দিকে। বলল, ‘দেখুন, রসিকতা করার ব্যপার নয় এটা।’

‘আমরা রসিকতা করছি না। সত্যিই বলছি, শুধু চারটি প্রদেশে সেনা অফিসারদের ট্রান্সফার নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই পারে কেউ। সুতরাং সারা দেশের সেনা অফিসারদের ট্রান্সফার করার কথা আমরা সিরিয়াসলি বলছি।’ বলল ভারদান বুরাগ।

‘এ ধরনের ঘটনা নজিরবিহীন। কোন যুক্তি নেই এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণের।’ জেনারেল মেডিন মেসুদ বলল। বিরক্তি ও অসন্তোষের ভাব ফুটে উঠল ভারদান বুরাগ ও মিহরান মুসেগের চোখে-মুখে। ভারদান বুরাগ বলল, আপনার কোন যুক্তি আমরা শুনতে চাই না। বলুন, আমরা যা বলেছি, তা করবেন কিনা। আপনি যদি অস্বীকার করেন, তাহলে কি ঘটতে পারে আপনি জানেন। আপনার মান-সম্মান শুধু নয়, চাকরিই শুধু নয়, কোর্ট মার্শাল হবে আপনার।’

মুহুর্তেই মুষড়ে পড়ল জেনারেল মেডিন মেসুদ। নিচু হয়ে গেল তার মাথা। বলল, ‘আমি করব না বলছি না।’

একটু থেমেই আবার বলল, 'এক সাথে করায় অসুবিধা আছে, আপনাদের প্রায়োরিটি বলুন।'

সংগে সংগে উত্তর না দিয়ে ভারদান বুরাগ ও মিহরাম মুসেগ পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল এবং ভারদান বুরাগ বলল, 'ঠিক আছে, আগ্রি ও ইজদির প্রদেশের সেনা অফিসারদের আগে ট্রান্সফার করুন।'

ইজদির প্রদেশেই মাউন্ট আরারাত অবস্থিত।

আর আগ্রি এই প্রদেশের পশ্চাৎভুমি। ভ্যান প্রদেশ আগ্রির পেছনে। আর কারস ইজদির প্রদেশের উত্তরে।

'ওকে, তাই হবে। তবে এমাসে নয়, বিভিন্ন সময়ে।' জেনারেল মেডিন মেসুদ বলল।

'ধন্যবাদ। কিন্তু বাকি দুই প্রদেশের ট্রান্সফার করতে হবে, একটু পরে হলেও।' বলল ভারদান বুরাগ।

'ঠিক আছে। কিন্তু এই ট্রান্সফার দিয়ে আপনারা কী করতে চান?' জেনারেল মেডিন মেসুদ বলল।

হাসল ভারদান বুরাগ। বলল, 'অন্য কিছু নয়, লক্ষ্য আমাদের লোকদের বাঁচানো।'

'কিন্তু শুধু সেনা অফিসারদের বদলি করলেই কি এলক্ষ্য অর্জন হবে? এক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকাই তো বড়।' বলল জেনারেল মেডিন মেসুদ।

'ওটা আগে থেকেই আমাদের বিবেচনায় আছে।' বলল মিহরান মুসেগ মাসিস।

কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বলল জেনারেল মেডিন মেসুদ, 'ওকে, আপনারা সফল হোন। কিন্তু আপনারা আমার প্রতি অবিচার করেছেন।'

'কিন্তু আমরা আপনার জন্যে তো কম করিনি। আপনি যত দ্রুত এতদূর এসেছেন, তার পেছনে আমাদের অবদান অনেকখানি। আপনি তুরস্কের সবচেয়ে ধনী জেনারেলদের একজন সেটাও কি আমাদের কাজ নয়? আর আমরা তো অবিচার করিনি, আমরা উপকার চাচ্ছি আপনার কাছে। এটা কি চাইতে পারি না?'

‘চাইতে পারেনা। কিন্তু চাওয়াটা হয়ে দাঁড়াচ্ছে সীমাছাড়া।’ বলল জেনারেল মেডিন মেসুদ।

হাসল ভারদান বুরাগ। বলল, ‘কিন্তু আমাদের চাওয়াটা আমাদের কাছে এক ইঞ্চিও বেশি নয়। সুতরাং গাছাড়া চাওয়া এটা নয়।’

‘একথা ঠিক, প্রয়োজন থেকেই চাওয়ার সৃষ্টি হয়, কিন্তু সব চাওয়া পূরণ হবার মত নয়। কিন্তু আপনারা সেটাই করতে চাচ্ছেন।’ জেনারেল মেডিন মেসুদ বলল।

‘কি করব, এটাই আমাদের নীতি।’

‘আমাদের চাওয়া পূরণ হতেই হবে এবং আপনাকে তা করতেই হবে।’ ভারদান বুরাগ।

‘হ্যাঁ, আমি পণবন্দী।’ জেনারেল মেডিন মেসুদ বলল। তার মুখে অসহায় ভাব।

‘যদি এটাই ভাবেন, তাহলে...।’

বলেই উঠে দাঁড়াল ভারদান বুরাগ। বলল আবার জেনারেল মেডিনকে লক্ষ্য করে, ‘আমাদের সময় দেয়া, আমাদের সাহায্য করার জন্যে ধন্যবাদ।’

মিহরান মুসেগ মাসিসও উঠে দাঁড়িয়েছে।

উঠে দাঁড়াল জেনারেল। হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডশেক করল ভারদান বুরাগ ও মিহরান মুসেগের সাথে। অতিকষ্টে মুখে হাসি ফুটানোর চেষ্টা করেছিল জেনারেল। বেরিয়ে এল তারা রেস্টুরেন্ট থেকে।

মিহরান মুসেগ ও ভারদান বুরাগ রেস্টুরেন্টের সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। আর জেনারেল মেডিন মেসুদ ভিন্ন আর একটি দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

গাড়িতে উঠল মিহরান মুসেগ ও ভারদান বুরাগ। ড্রাইভিং সীটে বসল মিহরান মুসেগ। গাড়িটা তারই। তার পাশের সীটে ভারদান বুরাগ। ভারদান বুরাগের মুখে হাসি।

কিন্তু ভাবছিল মিহরান মুসেগ মাসিস। বলল সে, ‘আজ জেনারেলকে আনউইলিং হর্স মনে হলো। আমি তার পিঠে চড়ে বসে আছি সেটা পছন্দ করছেন না।’

সেটাই স্বাভাবিক। তার উপর মুসলমানের বাচ্চা। বিশ্বাসঘাতকতা করলেও ঈমান ওদের সরে যায় না। সুযোগ পেলেই মাথা তোলে। কিন্তু জেনারেল মাথা তুলে কোন ফল পাবে না। আমাদের কিছু ভিডিও অডিওর মধ্যে তার প্রাণ বাধা আছে। সুতরাং প্রাণ রক্ষা করতে চাইলে আমাদের পুতুল তাকে হতেই হবে।' বলল ভারদান বুরাগ হাসতে হাসতেই।

'তার ভাবান্তর ঘটেছে বেশ আগে থেকেই। গাজেনের গোপন স্বামী হওয়া সত্ত্বেও অনেক আগে থেকেই তিনি মিসেস গাজেনের খোঁজ খবর নেওয়াও ছেড়ে দিয়েছিলেন।' মিহরান মুসেগ বলল।

ওটা বড় কথা নয়। কারণ তার জন্যে নতুন সারপ্রাইজ ছিল। যাদের প্রতি তার আকর্ষণ মিসেস গাজেনের চেয়ে অনেক বেশি। সুতরাং দেশপ্রেম তার মনে উঁকি-ঝুঁকি মরলেও সে সাধু হয়ে যায় নি। অতএব, ভয়ের কিছু নেই তার তরফ থেকে।' বলল ভারদান বুরাগ।

'কিন্তু ধরুন দু'টো প্রদেশ থেকে আমাদের বাঞ্ছিত সেনা অফিসারদের বসাল অন্যদের সরিয়ে দিয়ে, তাতেই কি আমাদের কাজ হয়ে যাবে? একাই একশ আবু আহমদ তো আছেই, কার সাথে এসে জুটেছে দেশভক্ত পুলিশ অফিসাররাও। তাদের ম্যানেজ করা না গেলে আমরা এগোবো কিভাবে?' মিহরান মুসেগ মাসিস বলল।

'ভাববেন না মি. মুসেগ। সেনাবাহিনী হাতে থাকলে খুব বেশি চিন্তা আর আমাদের থাকে না। আর আমরা তো দু'টো কাজ করব। এক, মাউন্ট আরারাতের স্বর্ণভান্ডার হস্তগত করার চেষ্টা, দ্বিতীয় হলো, আমাদের লোক দিয়ে গণবিদ্রোহ শুরুর মাধ্যমে গণহত্যা ঘটিয়ে এই অঞ্চলকে তুরস্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করা। এই দুই বিষয়ে পুলিশের করণীয় কিছু নেই। মাউন্ট আরারাত পাহারা দেয় সেনাবাহিনীর লোকেরা, সুতরাং সেখানে পুলিশ থাকছে না। অন্যদিকে সরকার ও পুলিশের গণহত্যা ইস্যু করে যে বিদ্রোহ হবে সেখানে কিছু করার শক্তি পুলিশের থাকবে না। ডাকা হবে সেনাবাহিনী যারা থাকবে আমাদের অনুগত। অতএব, চিন্তার কিছু নেই মি. মিহরান মুসেগ।' বলল ভারদান বুরাগ।

'এ দু'টো কাজই তো লং টার্মের। এখন আমরা কি করব?' বলল মিহরান মুসেগ।

'কি করব মানে? আমাদের মাউন্ট আরারাতের স্বর্ণভান্ডার অভিযানের গ্রাউন্ডওয়ার্ক তো চলছেই, চলবে। আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে, এমন বাছাই করা লোকদের মাদক ব্যবসায়ী হিসেবে জেলে পাঠানোর কাজও যেমন চলছে, তেমনি চলবে।' ভারদান বুরাগ বলল।

'কিন্তু এই কাজগুলো তো বন্ধ হওয়ার পথে। কমপক্ষে দশ জায়গায় আমাদের লোকেরা হাতে-নাতে ধরা পড়েছে। আর প্রাণহানির ঘটনা তো এলার্মিং। আমাদের বেস্ট জনশক্তির একটা অংশ শেষ হয়ে গেছে। পুলিশ ও গোয়েন্দারা আমাদের কৌশল বুঝে ফেলেছে। এই পথে আমরা আর এগোতে পারবো বলে মনে হয় না। সব নষ্টের মূল আবু আহমদ। সেই আমাদের সব লোককে খুন করেছে। তার ব্যাপারে তো আমরা কিছুই করতে পারলাম না। তাকে এভাবে মাঠে রেখে কি আমরা এগোতে পারব? শোনা যাচ্ছে, মিউজিয়ামে হানা দেয়া ও হত্যাকান্ডের ঘটনার তদন্তের দায়িত্ব সরকার নজীরবিহীনভাবে তাকেই দিয়েছে। ক্ষমতাহীনভাবে সে যতটা ভয়ংকর, ক্ষমতা পেয় সে কতটা ভয়ংকর হবে কে জানে।' বলল মিহরান মুসেগ।

ভারদান বুরাগের চোখে মুখেও বিমর্ষতা নেমে এল। বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন, ঐ লোকটা আমাদের ব্যর্থতার জীবন্ত নজীর। কিন্তু আমরা কি করব। চেষ্টার তো আমরা ত্রুটি করিনি। লোকটা যাদু জানে, কিংবা আগের-পরের সবকিছুই সে দেখতে পায়। তাকে কোন ফাঁদেই আটকানো গেল না। এ ক্ষেত্রে যুদ্ধের কৌশল হলো, সামনের বাধা এড়িয়ে এগোবার নতুন পথ সৃষ্টি করা। আমরা তাই করেছি। আমাদের দু'টি লক্ষ্যই এধরনের। এখানে আবু আহমদ বাধা হয়ে দাঁড়ানোর আর কোন স্কোপ নেই। এ অর্থ তাকে আমরা রেহাই দিচ্ছি না। সামনে এগোবার বিজয় রথ থেকে ঠিক সময়েই মোক্ষম অস্ত্রটি মারা হবে।'

'ঈশ্বর আমাদের সহায় হোন।' বলে স্লো হয়ে আসা গাড়ির গতিতে ব্রেক কষল মিহরান মুসেগ। পৌঁছে গেছে তারা হোটেলে।

# ২

প্লেনটা আছে আংকারার খুব কাছের শহর আংগোরায়। আংগোরা তুর্কি সেনাবাহিনীর প্রশাসনিক সদর দফতর।

গন্তব্য আংগোরা হলেও আহমদ মুসাকে নামতে হবে আংকারা বিমান বন্দরে। সেখান থেকে পাহাড়ী পথে বিশ মিনিটের ড্রাইভে আংগোরা।

আংকারা বিমান বন্দরে তাকে রিসিভ করার জন্যে প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে আসতে চেয়েছিল জেনারেল মোস্তফা। কিন্তু আহমদ মুসা রাজি হয়নি। বলেছিল, আমার মিশনটা গোপন। শুরুতেই ভিআইপি পরিচয় পেলে মিশনটা আর গোপন কি! জেনারেলের পরিচয় তো জানাই গেছে। উত্তরে আহমদ মুসা বলেছিল, আমরা তাকে জানাতে পেরেছি, কিন্তু সে জানতে পারুক তা আমি চাই না। তার মাধ্যমে ষড়যন্ত্র জানা যায় কিনা, সেই চেষ্টাই আমরা করব। এজন্যই তাকে গ্রেফতারের আমি বিরোধিতা করেছি।

মিসেস আব্দুল্লাহ্ গাজেনের ডিইরি থেকে যে ইংগিত পাওয়া গেছে, তার ভাত্তিতে অনুসন্ধান চালিয়েই জেনারেল মেডিন মেসুদের পরিচয় জানা গেছে। মিসেস গাজেনের ডিইরিতে জেনারেল সম্পর্কে কয়েকটা ক্লু পাওয়া গিয়েছিল। তার প্রশস্ত কপাল। সদা হস্যোজ্জ্বল মুখ। ট্রেনিং-এ ব্রিলিয়ান্ট রেকর্ডের অধিকারী। ট্রেনিং-এর পর প্রথম নিয়োগ পায় ভ্যান ইউনিটে। এনব ক্লু সামনে রেখে আহমদ মুসার অনুরোধে তুরস্কের অভ্যন্তনীণ নিরাপত্তা প্রধান জেনারেল মোস্তফা অনুসন্ধান চালিয়ে চারজন সিনিয়র জেনারেলকে চিহ্নিত করে। এই চারজন জেনারেলের ব্যক্তিগত জীবনের উপর অনুসন্ধান চালানো হয়। খোঁজ নেয়া হয় ভ্যান-এর সাথে কার যোগাযোগ বেশি, কে বেশি বেশি ভ্যান-এ যায়। এই অনুসন্ধান থেকে বেরিয়ে আসে জেনারেল মেডিন মেসুদের নাম। সে এক সময় প্রতিটি উইক এন্ডে ছুটি কাটাতে ভ্যান-এ যেত। ভ্যান-এ তার কোন নিজস্ব বাড়ি নেই। সুতরাং ভ্যান-এ

গেলে তার ওঠার কথা সেখানকার সবচেয়ে সুন্দর সেনা রেস্ট হাউজে। কিন্তু অধিকাংশ সময় সেনা রেস্ট হাউজে উঠতোই না। কোন কোন সময় যখন উঠতো, তখনও সে সেখানে থাকতো না। তার ফ্যামিলি রেকর্ড থেকে এটাও জানা যায় যে, তার দাম্পত্য জীবনে কোন সমস্যা না থাকলেও বিয়েটা তার অমতে হয়েছিল। তার সার্ভিস রেকর্ড থেকে আরেকটি বিষয়ও জানা যায়, সেটা হলো ভ্যান-এ তার প্রথম পোস্টিং হওয়ার পর সেখান থেকে তার ট্রান্সফার ঠেকানো এবং তদ্বির করে কয়েকবার ভ্যান-এ পোস্টিং নেবার তার একজন সেনা অফিসারের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে এবং বিভিন্ন সাক্ষ্য থেকে সেনা অফিসার মেডিন মেসুদ বলেই প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং মিসেস গাজেনের গোপন স্বামী হিসেবে জেনারেল মেডিন মেসুদের বিশাল সম্পত্তির সাথে তার আয়ের কোন সংগতি নেই। এটাও প্রমাণ করে তার অবৈধ আয়ের পেছনে তার কোন অবৈধ তৎপরতা বা যোগসাজশের সম্পর্ক আছে।

জেনারেল মেডিন মেসুদ চিহ্নিত হবার পর তাকে গ্রেফতারের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু আহমদ মুসা এই সিদ্ধান্তে বাধা দেয়। বলে যে, তাকে গ্রেফতার করে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু কোন্ ষড়যন্ত্রে সে যুক্ত, সে ষড়যন্ত্রের প্রকৃতি ও পরিধি কি তা নাও জানা যেতে পারে। অথচ সেসব জানা, শাস্তি পাওয়ার চেয়ে অনে বেশি প্রয়োজন। আহমদ মুসার এ যুক্তিকে তুর্কি সরকার গ্রহণ করে এবং বিকল্প হিসাবে কি করা যায় সে দায়িত্ব তারা আহমদ মুসার উপরই অর্পণ করে।

সে দায়িত্ব নিয়েই আহমদ মুসা আজ যাচ্ছে আংগোরায়।

কারও 'এক্সকিউজ মি!' শব্দে আহমদ মুসার চিন্তার স্রোতটা বাধা পেয়ে থেমে গেল।

সুন্দর সুরেলা কণ্ঠ। মিষ্টি উচ্চারণ।

আহমদ মুসা মুখ তুলে চাইল। দেখল, তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে বিশ-বাইশ বছরের অসম্ভব সুন্দরী একটি মেয়ে।

দেখেই আহমদ মুসা চিনতে পারল। ইস্কান্দরুন থেকে এ মেয়েটি বিমানে উঠেছে। তার বাম পাশের প্যাসেজের ওপারে জানালার কাছের একটা সীটে বসেছিল মেয়েটি।

ভ্যান থেকে আহমদ মুসার বিমানটি উড়ে ইস্কান্দরুনে কয়েক মিনিটের একটা যাত্রা বিরতি করেছিলে। ইস্কান্দারুন তুরস্কে ভূমধ্যসাগর উপকুলের একটা গুরত্বপুর্ণ নৌবন্দর। এটা পর্যটন শহরও। সেই সাথে এটা তুরস্কের কৌশলগত নৌঘাঁটিও।

আহমদ মুসা মুখ তুলে তাকাতেই মেয়েটি বলল, 'আমি আপনার পাশের সীটে বসতে পারি? আমি স্টুয়ার্ডকে বলেছি।' মেয়েটির চোখে-মুখে বিব্রত ভাব। কণ্ঠে সংকোচ।

মেয়েটির বিব্রতভাব ও সংকোটকে মেকি বলে মনে হলো না আহমদ মুসার। তার চোখের ভাষায় কোন মতলবের চিহ্ন নেই। তার বদলে আছে অসহায়ত্বের প্রকাশ।

'আসনটা শূন্য। আমার আপত্তি নেই।'

'থ্যাংক ইউ...।' মেয়েটি কথা শেষ করল না। প্রশ্নবোধক চিহ্ন ফুটে উঠেছে তার চোখে মুখে।

'আবু আহমদ আব্দুল্লাহ।' নিজের নাম বলল আহমদ মুসা।

'থ্যাংক মি. আব্দুল্লাহ।' বলে মেয়েটি আহমদ মুসার পাশের শূন্য সীটে বসে পড়ল।

'স্যরি, টু ডিস্টার্ব ইউ। আমি ওখানে কমফোর্ট ফিল করছিলাম না।' বসেই বলল মেয়েটি।

আহমদ মুসা এর আগেই লক্ষ্য করেছে মেয়েটার পাশের সীটে খুবই সুবেশধারী ক্রিমিনাল চেহারার একজান মানুষ।

আহমদ মুসা মেয়েটার কথার জবাবে বলল, 'ওয়েলকাম মিস। আপনার অবশিষ্ট ভ্রমণ সুন্দর হোক।'

আহমদ মুসার পাশের শূন্য আসনটিতে বসতে গিয়ে বলল মেয়েটি, 'আমার নাম সানেম, সালিহা সানেম।'

'ধন্যবাদ।' বলল আহমদ মুসা।

'আপনি তো আংকারা যাচ্ছেন?' মেয়েটির প্রশ্ন।

'হ্যাঁ, আংকারা।' আহমদ মুসা বলল।

‘আপনি কি সেনাবাহিনীতে চাকুরী করেন?’ জিজ্ঞানা আবার মেয়েটির।

বিস্মিত আহমদ মুসা তাকাল মেয়েটির দিকে। বলল, ‘সেনাবাহিনীতে চাকুরীর কথা ভাবলেন কি করে?’

‘স্যরি, সেনাবাহিনীর অফিসাররা সাধারণঃত স্মার্ট হয়, চৌকশ হয় এবং শরীরাও সাধারণঃত মেদহীন হয়। আপনিও সেরকমই, তাই বলছিলাম।’ মেয়েটি বলল।

‘স্যরি, আমার ইমেজ আপনাকে বিভ্রান্ত করেছে। আমি সেনাবাহিনীতে চাকুরী করি না।’ আহমদ মুসা বলল।

ট্রলিতে নাস্তা আসছে। সালিহা সানেমের চোখ ওদিকে গেল।

আহমদ মুসা উঠে টয়লেটের দিকে চলে গেল। ফিরে এসে দেখল নাস্তা পরিবেশিত হয়েছে।

সালিহা সানেম মদ খাচ্ছে পানির মত। পুরা এক বোতল সে নিয়ে নিয়েছে।

তার নাস্তার সাথেও মদের বোতল দেখল আহমদ মুসা।

বিস্মিত আহমদ মুসা বসতেই সালিহা সানেম বলে উঠল, ‘আপনি ছিলেন না। আমি যা নিয়েছি, আপনার জন্যেও তাই নিয়েছি। ঠিক করিনি?’

‘ধন্যবাদ।’ বলল আহমদ মুসা।

নাস্তা দেয়া শেষ করে নাস্তার ট্রলি নিয়ে ফিরছিল বিমান ক্রুরা।

আহমদ মুসা মদের বোতল ওদের ফেরত দিয়ে বলল, ‘এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি দিন।’

পানি দিয়ে ওরা চলে গেল।

‘আমি আমার বোতল শেষ করে ফললাম, আর আপনি ফেরত দিলেন?’

‘আমি মদ খাই না।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ডাক্তারের নির্দেশ? কোন অসুখ-বিসুখ?’ বলল সালিহা সানেম।

‘কোন অসুখ-বিসুখ নয়। আমি মুসলিম।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমিও তো মুসলিম।’ বলল সলিহা সানেম।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'মুসলিম অবশ্যই, কিন্তু মুসলিমদের জন্যে মদ নিষিদ্ধ, এটা আপনি মানেন না।'

'আমি কেন, আমার চারদিকের প্রায় সবই তো মদ খায়।' সালিহা সানেম বলল।

'তারাও মানেন না।' বলল আহমদ মুসা।

'বুঝলাম, আপনি ধর্ম মেনে চলেন। আমি আপনাকে আধুনিক মানুষ মনে করেছিলাম।' সালিহা সানেম বলল।

আবার হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'ধর্ম মানলে বুঝি আধুনিক মানুষ হওয়া যায় না? ধর্ম ও আধুনিকতা কি দুই ভিন্ন জিনিস?'

'স্যরি, আমি তাই মনে করি। যারা ধর্ম মানে, তারা অতীতমুখী। অতীতমুখী হয়ে আধুনিক হওয়া যায় না।' বলল সালিহা সানেম।

'আচ্ছা বলুনতো, যারা ধর্ম মানে, তারা কি আধুনিক ডিজাইনের বিল্ডিং-এ বাস করে না? তারা কি আধুনিক কল-কারখানায় তৈরি আধুনিক কাপড়ের, আধুনিক ডিজাইনের পোষাক পরে না, যেমন আমি? খাবার টেবিলে কি আধুনিক বাসন-কোসন ব্যবহার করে না তারা? কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানসহ সব আধুনিক বিষয় কি তারা পড়ে না? তারা কি নানা ধরনের আধুনিক পেশায় নিয়োজিত নেই? তাদের ঘরে কি কম্পিউটার নেই? তারা কি সব ধরনের আধুনিক কম্যুনিকেশন সিস্টেম ব্যবহার করে না? তারা কি আধুনিক কালের সমৃদ্ধ ভাষা চর্চ্চা করে না? আধুনিক হোটেল-রেস্তোরাঁয় খাবার খায় না? পর্যটন-দেশ ভ্রমণে তারা কি নেই? তারা কি স্কলারশীপ পায় না? স্কলারশীপ নিয়ে বা নিজ খরচে তারা কি দেশ-বিদেশে পড়ছে না? ধর্ম যারা মেনে চলে তাদের মধ্যে বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, লেখক, কবি, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার কি নেই?' আহমদ মুসা থামল।

'আপনার সব প্রশ্নের জবাব আমার কাছে 'হ্যাঁ'।' বলল সালিহা সানেম। সে কিছুটা বিব্রত।

'তাহলে ধর্ম যারা মানে তারা তো আধুনিক। অতীতমুখী হলো কেমন করে তারা?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'বিশ্বাসে তারা অতীতমুখী।' বলল সালিহা সানেম।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'সে বিশ্বাসগুলো কি? আল্লাহতে বিশ্বাস করা, সে বিশ্বাসের ভিত্তিতে আল্লাহর হুকুম অনুসারে নামায পড়া, রোযা রাখা, যাকাত দেয়া, আখেরাতে বিশ্বাস করা, ইহজগতের কৃতকর্মের জন্যে পরজগতে পুরস্কার অথবা শাস্তি পাওয়া, এসব কি?'

সালিহা সানেমের চোখে-মুখে বিব্রত অবস্থা বেড়ে গেছে। বলল, 'হ্যাঁ, এসবই। আরও আছে যেমন বোরখা পরা, ছেলেমেয়েদের মেলা-মেশাকে বাঁকা দৃষ্টিতে দেখা, ইত্যাদি।' কণ্ঠ তার শিথিল।

'ধন্যবাদ, কথাগুলো খোলাখুলি বলার জন্য। কিন্তু বলুন তো, আল্লাহতে বিশ্বাস করা যদি অতীতমুখিতা বা পুরাতনপন্থা হয়, তাহলে এর আধুনিক পন্থাটা কি হবে?' খুব শান্ত ও নরম কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

চোখ-মুখের সেই বিব্রত ভাব নিয়েই সে বলল, 'না, ঠিক আল্লাহতে বিশ্বাস করা পুরাতন পন্থা বা অতীতমুখিতা নয়, এই বিশ্বাসকে উপলক্ষ্য করে যে বাড়াবাড়ি করা হয়, সেটাই অতীতমুখিতা।'

'আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের দাবী অনুসারেই তো নামায পড়া হয়, রোযা রাখা হয়, যাকাত দেয়া হয়। এসবকে আপনি কি বলবেন?' বলল আহমদ মুসা।

'নামায, রোযা, যাকাত এসব কারও অভ্যাস হিসাবে ভালো জিনিস। কিন্তু এসব নিয়ে যখন বাড়াবাড়ি করা হয়, অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়, এসব না করলে কাফের বলা হয়, তখন এই প্রবণতা অন্ধ অতীতমুখী মানসিকতার পর্যায়ে পড়ে যায়।' সালিহা সানেম বলল।

'সমাজে কখনও কখনও কেউ কেউ এটা করেন। কিন্তু আল্লাহ এটা করতে বলেননি। নামায, রোযার মত এবাদতগুলোতে যদি আন্তরিকতা না থাকে, নিজ ইচ্ছা না থাকে, একাগ্রতা না থাকে তাহলে তা আল্লাহ গ্রহণই করবেন না। কিন্তু একটা কথা বলুন মিস সালিহা সানেম, আপনি যা বিশ্বাস করেন, আপনি যা স্বীকার করেন, তা করা আপনার উচিত কিনা?' আহমদ মুসা বলল।

'অবশ্যই তা করা উচিত।' বলল সালিহা সানেম।

'যদি তা না করেন, তাহলে মানুষ আপনাকে কি বলবে?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘ওয়াদা ভংগকারী বলবে, বিশ্বাস ভংগকারী বলবে’ বলল সালিহা সানেম।

‘আল্লাহকে যদি আপনি বিশ্বাস করেন, আপনি যদি নিজেকে মুসলিম মনে করেন, তাহলে বিশ্বাসের দাবী মুসলমান হওয়ার জন্য অপরিহার্য শর্ত হিসাবে সে কাজগুলো, যেমন নামায, রোযা, হজ্জ্ব, যাকাত, সৎ ও পবিত্র জীবন যাপন, হারাম পরিহার ইত্যাদি করা দরকার, সেগুলো না করলে আপনার পরিচয় কী হবে, কী বলবে মানুষ আপনাকে?’ আহমদ মুসা বলল।

সংগে সংগে উত্তর দিল না সালিহা সানেম। তার বিস্মিত দৃষ্টি আহমদ মুসার উপর নিবদ্ধ। ধীরে ধীরে মাথা নিচু করল। তারপর মুখ না তুলেই আস্তে আস্তে বলল, ‘তার মানে আপনি বলছেন, আমি বিশ্বাস ভংগকারী। আর বিশ্বাস ভংগকারী মুসলিম হওয়ার মানে অপরিহার্য শর্ত লংঘনকারী হিসাবে আমাকে কফের বলা যায়।’ বিস্মিত কণ্ঠ সালিহা সানেমের।

‘না মিস সানেম, আমি তা বলছি না। যদিও ‘কাফের’ শব্দের অর্থ বিশ্বাস অস্বীকারকারী, তবুও এ শব্দ কোন মুসলিমের উপর প্রয়োগ করা যায় না। কারণ অনেক ক্ষেত্রে একজন মুসলিম নামায না পড়লেও, রোযা না করলেও, হারাম খেলেও, পবিত্র জীবন যাপন না করলেও সে তার বিশ্বাস বা ঈমান পরিত্যাগ করে না। কাজে-কর্মে ঈমানের প্রকাশ না ঘটলেও ঈমান তার মধ্যে থাকে। তাই তো দেখা যায় বেনামাযি লোক এক সময় নামায পড়ে, এক সময় রোযা না করলেও, কোন এক সময় সে একনিষ্ঠ রোযাদার হয়ে যায়। সুতরাং কোন মুসলিমকে কাফের বলা ঠিক নয়।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ধন্যবাদ। আপনি ঠিক বলেছেন। মুসলিম হিসাবে ইসলামের কোন অনুশাসন আমি অনুসরণ করি না, এ কথা ঠিক। কিন্তু আল্লাহর প্রতি আমার বিশ্বাস নেই, রসূলকে মানি না, এমন চিন্তা আমার মনে কোন সময় আসেনি। কিন্তু দেখুন, আমার পোষাক-পরিচ্ছদ ও আচার-আচরণ, চলা-ফেরা দেখেই আমাকে কাফেরের খাতায় নাম লিখে দিয়েছে। এটাই তো অন্ধত্ব, পশ্চাৎমুখিতা।’ বলল সালিহা সানেম।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'ওদের বাড়াবাড়ি আছে ঠিকই, কিন্তু আপনার পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণ, চলা-ফেরায় কি বাড়াবাড়ি নেই?'

সালিহা সানেম একটু ভাবল। বলল, 'সোসাইটিতে যা প্রচলিত আছে, তার বাইরে আমি কিছুই করতে পারি না, কিছুই করি না। এসব আমার বাড়াবাড়ি নয়।'

'আপনি আপনার সোসাইটির একজন। আপনার মত বহুজন নিয়েই আপনার সোসাইটি। সমাজ যা প্রচলন করে, সমাজে যা প্রচলিত হয়, তাতে সোসাইটির প্রত্যেক সদস্যের অংশ আছে। কিন্তু সে দায় সম্পর্কে আমার কোন কথা নেই। আমি জানতে চাচ্ছি, আধুনিকতা হিসাবে আপনি যা পরেন, যা করেন সে ব্যাপারে আপনার মন কি বলে?' আহমদ মুসা বলল।

'কঠিন প্রশ্ন। এসব ব্যাপারে মন আলাদা কিছু বলে কিনা বুঝিনি, ভেবেও দেখিনি কখনও। আমি যা করছি, মন তো তার সাথেই আছে।' বলল সালিহা সানেম।

'আচ্ছা, আপনাদের ক্লাবে আড্ডায় যখন আপনি দেখেন ছেলেরা ফুলড্রেসে, আর মেয়েরা অর্ধনগ্ন বা নামমাত্র পোষাকে, তখন কি আপনার কিছুই মনে হয় না? কেন মেয়েদের এ পোষাক? কার স্বর্থে? সে স্বার্থ কি মেয়েদের?' আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসার প্রশ্ন শেষ হলেও তৎক্ষণাত উত্তর এল না সালিহা সানেমের কাছ থেকে। তার মাথাটা নিচু হয়েছে। ভাবছে সে।

ধীরে ধীরে মুখ তুলে সালিহা সানেম বলল, 'আমি বুঝেছি আপনার কথা। আপনি বলতে চাচ্ছেন, নারীদের মনোরঞ্জনের উপকরণে পরিণত করা হয়েছে, ভোগের পন্য হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে নারীরা। আমি এভাবে কোনদিন ভাবিনি। আমি মনে করতাম এটা নারীদের অধিকার, স্বধীনতা । কিন্তু আপনি যেটা বোঝাতে চাচ্ছেন, সেটা আমি বুঝতে পেরেছি। তবে মেনে নেয়ার জন্যে আরও ভাবতে হবে।'

'অবশ্যই ভাববেন মিস সালিহা সানেম। ইসলাম বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানচর্চ্চাকে স্বাগত জানায়। আল্লাহর গোটা সৃষ্টিই তো জ্ঞানময়, বিজ্ঞা...।'

আহমদ মুসার কথার মাঝখানেই সীট বেল্ট বাঁধার ঘোষণা এল, ‘আংকারায় ল্যান্ড করতে যাচ্ছে বিমান।’

আহমদ মুসা থেমে গিয়েছিল। সীট-বেল্ট বাঁধায় মনোযোগ দিয়েছে সবাই। আহমদ মুসা এবং সালিহা সানেমও।

ট্যাক্সিএ সীটে গা এলিয়ে দিয়ে আহমদ মুসা তার গন্তব্য আংগোরার কথাই ভাবছে। আংগোরা একটি সামরিক নগরী। পর্বত্য শহর। এখানে বেসরকারি কিছু লোকও আছে। কিন্তু তারাও সামরিক ব্যক্তিদেরই বংশধর। এখানে কয়েকটা ভালো হোটেল আছে পর্যটকদের জন্যে। সে হোটেলগুলোরই একটিতে আহমদ মুসার জন্যে সীট বরাদ্দ হয়েছে একজন পর্যটক হিসাবে।

রাস্তার দু’পাশের দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হলো আহমদ মুসা। চারদিকটা সবুজ টিলা, আর সবুজ উপত্যকায় ভরা। গাড়িটা যখন চড়াইয়ে উঠেছে তখন চারদিকের সবুজ দৃশ্য এবং টিলার উপরের ছবির মত রং-বেরং এর বাড়ি চোখ জুড়িয়ে দিচ্ছে। রাস্তার দু’ধারটাও ছবির মত সাজানো।

ড্রাইভারের কাছ থেকে জানল প্রাইভেট বাড়ি কিছু আছে, কিন্তু রাস্তার দু’পাশের অধিকাংশ বাড়িই হোটেল-মোটেল জাতীয়। প্রচুর পর্যটক আসে। তাছাড়া প্রচুর দেশীয় লোক এখানকার নিরিবিলি পরিবেশে ছুটি কাটাতে আসে।

আহমদ মুসার গাড়ি একটা সবুজ চড়াই অতিক্রম করছিল। দেখতে পেল, দু’টি মাইক্রো ও একটা প্রাইভেট কার দাঁড়িয়ে আছে। ওখানে একটা মেয়েকে পাঁচ-ছয় জনে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে রাস্তার পাশের একটা মোটেলে ঢুকে গেল। মেয়েটা প্রাণপণে চিৎকার করছিল বাঁচাও, বাঁচাও বলে।

ড্রাইভার বলল, ‘স্যার, এমনটা এই অঞ্চলে প্রায়ই ঘটে। বাড়িগুলো যেমন সুন্দর লাগছে, এখানে যারা সময় কাটাবার জন্যে আসে তারা সবাই কিন্তু এ রকম সুন্দর নয়। নানা রকম গ্যাং এখানে আছে, বাইরে থেকেও আসে। অপহরণ ও নানা অপরাধমূলক ঘটনা এখানে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার।’

আহমদ মুসার গাড়িটা চড়াই অতিক্রম করে একটা উপত্যকায় নামছিল। আহমদ মুসার কানে মেয়েটার বাঁচার জন্যে প্রাণপণ চিৎকার তখনও বাজছিল।

হঠাৎ আহমদ মুসার মনে পড়ল মেয়েটার পরনে দেখা নীল প্যান্ট ও গোলাপী শার্টের কথা। মানে নীল প্যান্ট আর গোলাপী শার্টই সালিহা সানেমের পরনে ছিল। সেই সাথে আরও মনে পড়ল, সালিহা সানেম যে সীট ছেড়ে দিয়ে সরে এসেছিল সে সীটের পাশের সীটের সুবেশধারী ক্রিমিনাল চেহারার লোক ও তার লোলুপ দৃষ্টির কথা।

মনে পড়ার সংগে সংগেই আহমদ মুসা বলল, 'গাড়ি ঘুরাও ড্রাইভার। ঐ মেয়েটাকে যে বাড়িতে নিয়ে গেছে, সেখানে চল।'

ড্রাইভার বলল, 'স্যার, ওখানে যেতে হলে সাত-আট মাইল ঘুরতে হবে। সামনে আরও তিন মাইল গেলে তবেই আমরা ফিরতি পথে যাওয়ার প্যাসেজ পাব।'

'গাড়ি ঘুরিয়ে এই পথেই ব্যাক করো।' নির্দেশ দিল আহমদ মুসা।

ড্রাইভার ভীত কণ্ঠে বলল, 'স্যার, তাহলে নির্ঘাত আমাকে জেলে যেতে হবে। গাড়িটাও আটক হয়ে যাবে বহুদিনের জন্যে।'

'আমি সেটা দেখবো। গাড়ি ঘুরাও ড্রাইভার।' ধমকে উঠল আহমদ মুসার কণ্ঠ।

ড্রাইভার একবার মুখ ফিরিয়ে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে নিল। আর মনে মনে বলল, 'আল্লাহ্! এটুকু পথ যেন আমি পুলিশের হাতে পড়া ছাড়াই অতিক্রম করতে পারি।'

নির্বিঘ্নে পথটুকু পেরিয়ে এল গাড়িটি। যে বাড়িটিতে মেয়েটিকে তারা তুলেছে তার সামনে মেইন রোডের উপর আহমদ মুসা নেমে পড়ল।

ড্রাইভারকে ধন্যবাদ দিয়ে তার হাতে একশ ডলারের একটি নোট তুলে দিয়ে বলল, 'তুমি থাকতে পারো, আবার চলেও যেতে পার।'

গাড়ির ভাড়া ঠিক হয়েছিল পঞ্চাশ ডলার। একশ ডলার হাতে পেয়ে ড্রাইভার আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলল, 'স্যার, দরকার হলে সারাদিন আমি এখানে আপনার জন্যে অপেক্ষা...।'

আহমদ মুসা দৃঢ় পদক্ষেপে এগোলো বাড়িটার দিকে, যেন সেও একজন কাস্টমার ঐ মোটেলের। মোটেলের প্রধান গেটে তাকে আটকাল দু'জন নিরাপত্তা প্রহরী। বলল, 'স্যার, রুম খালি নেই। রেস্টুরেন্টও বন্ধ।'

আহমদ মুসা প্রহরীদের দিকে তাকিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল, 'যারা মেয়েটিকে ভেতরে নিয়ে গেছে, আমি তাদের দলের লোক। আমাকে নিয়ে চল তাদের কাছে।'

নিরাপত্তা প্রহরীদের একজন বলল, 'স্যার, আমাদের গেট ছাড়ার অনুমতি নেই। আপনি ভেতরে গিয়ে অন্যদের বলুন।'

নিরাপত্তা প্রহরীরা বিশ্বাস করেছে তার কথা। খুশি হলো আহমদ মুসা।

'বাইরে কার সাথে কথা বলছিস তোরা। কাউকে ভেতরে ঢকতে দিবি না। মোটেল বন্ধ।' বলতে বলতে বিপুল বপু একজন লোক গেটে এসে দাঁড়াল।

নিরাপত্তা প্রহরী দু'জন তাকে স্যালুট করল। একজন বলল, 'স্যার, এই লোক ওদের সাথের। যেতে চায় তাদের কাছে।'

বিপুল বপু লোকটি আহমদ মুসার দিকে তাকাল সন্দেহের দৃষ্টিতে। বলল, 'বলুন তো, তাদের সাথে যে মেয়েটি আছে, তার পোষাক কেমন?'

'নীল প্যান্ট ও গোলাপি শার্ট।' বলল আহমদ মুসা।

লোকটির দু'চোখ থেকে সন্দেহ সরে গেল।

বলল, 'আসুন ভেতরে।'

আহমদ মুসা ভেতরে ঢুকল। বলল, 'ওরা কোথায়? আমাকে নিয়ে চলেন ওদের কাছে। জরুরি কথা আছে ওদের সাথে।'

'ওদের কি কথা শোনার সময় আছে? যে মাল নিয়ে এসেছে, কোটিতে একটাও সে রকম মেলে না! ওরা এখন পাগল তাকে নিয়ে।' বলল লোকটি।

'সেটা আমি জানি।'

বলে আহমদ মুসা তাকাল মোটেলের দু'তলার সিঁড়ির দিকে। সেদিকে যাবার জন্যে পা বাড়াল আহমদ মুসা।

'আহা কি করেন, ওরা তো উপরের দিকে নেই। যে চিৎকার, আর্তনাদ চলছে, তাকি উপর তলায় বলে? ওরা আছে আন্ডার গ্রাউন্ডে।'

বলে বিশাল বপু লোকটি এগোলো উপরে ওঠার সিঁড়ির পাশের একটা রুমের দিকে। রুমের দরজা বন্ধ। লোকটি চাবি দিয়ে লক খুলে ঘরে প্রবেশ করল। ঘরে বড় একটি আলমারি। লোকটি এগোলো আলমারির দরজার দিকে। আলমারির দরজা বন্ধ। হাতল ঘুরিয়ে সে আলমারির দরজা খুলে ফেলল। বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, 'যান, ভেতরে বেজমেন্ট ফ্লোরে তাদের সবাইকে পাবেন।'

আলমারির দরজা আসলে একটা সিঁড়িমুখের গেট।

গেট পেরিয়ে সিঁড়ি মুখের স্ট্যান্ডিং-এ এসে দাঁড়াতেই সা নারী কণ্ঠের কান্না এবং কথা-বার্তা ও হাসির শব্দ শুনতে পেল।

পেছনে আলমারির দরজা বন্ধ হয়ে গেছে।

আহমদ মুসা শিকারী বাঘের মত নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নিচে নামতে শুরু করল। নেমে এল বেজমেন্টে। বিরাট ঘরের দু'পাশ জুড়ে 'এল্'(L) প্যাটার্নে বেশ কিছু ঘর। সবগুলো ঘরই বন্ধ।

কান্নাকাটি ও কথা-বার্তার শব্দ আসছে শেষ প্রান্তের দিক থেকে।

সারিবদ্ধ ঘরগুলোর দেয়াল ঘেঁষে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল আহমদ মুসা। তার জ্যাকেটর দুই পকেটে তার দুই হাত। দুই হাতের তর্জনী দুই রিভলভারের দুই ট্রিগারে। দুই রিভলভারের মিনি সাইলেন্সেরও অন করে নিয়েছে।

কিছুটা এগোনোর পর নিশ্চিত হলো ডান পাশের একটা ঘরের কোনার দিক থেকে কথা-বার্তা ও কান্নাকাটির শব্দ আসছে। শিকারী নেকড়ের মত নিঃশব্দে এগোচ্ছে আহমদ মুসা। আর একটা কক্ষ পার হলেই করিডোরের বাঁকে পৌঁছে যাবে। করিডোরটা ঐখনে বাঁক নিয়ে ডান দিকে এগিয়ে গেছে, যেদিক থেকে কথা ও কান্নাকাটির শব্দ আসছে, সেদিকে।

করিডোরে পৌঁছাতে আর গজ দুয়েক জায়গা বাকি। হঠাৎ খুবই অস্পষ্ট একটা শব্দে গোটা দেহে উষ্ণ শিহরণ জাগাল।

অজান্তেই থমকে গেল সে। শব্দটা স্পষ্ট হচ্ছে তার কাছে। পদশব্দ।

এগিয়ে আসছে কেউ। তার পায়ের শব্দই বলছে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে স্টেপ নিয়ে ফেলেছে।

এই চিন্তার সাথেই পকেট থেকে রিভলভার সহ ডান হাত বের করে সোজা লম্বা বসে পড়ল আহমদ মুসা।

সংগে সংগে একটা লোহার রড ঘাড়ের উপর দিয়ে মাটিতে গিয়ে আঘাত করল। সে আঘাতের একটা অংশ তার ঘাড়েও অনুভূত হলো। ঘাড়টা থেঁতলে যাওয়ার মত চিন চিন করে উঠল। অন্যদিকে লোহার রডধারী লোকটিও ভারসাম্য রক্ষা করতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। তার মাথাটা এসে পড়ল আহমদ মুসার পিঠের উপর।

আহমদ মুসা বোঁ করে ঘুরেই রিভলভার চেপে ধরল তার মাথায়। কিন্তু সে সময়েই লোকটির দুই জোড়া পায়ের আঘাত দুই হাতুড়ির মত এসে পড়ল আহমদ মুসার মাথায়। আহমদ মুসা উল্টে পড়ে গেল। কিন্তু আহমদ মুসা হাতের রিভলভার ছাড়েনি।

লোকটি দু'পা দিয়ে আঘাত করেই পা দু'টি মাটিতে ছুড়ে দিয়ে তার ওপর ভর করে দক্ষ এ্যাক্রবেটের মত উঠে দাঁড়িয়েছে। কোমর থেকে ছুরি খুলে নিয়েই লোকটি ছুঁড়ে মারল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে।

আহমদ মুসা গড়িয়ে একপাশে সরে গিয়ে আঘাতটা আড়াল করল।

আঘাতটা ব্যর্থ হওয়ায় লোকটি পকেট থেকে পিংপং বলের মত একটি গোলাকার বস্তু হাতে নিয়ে ছুঁড়ে মারার জন্য হাত তুলল।

আহমদ মুসা আর সময় নষ্ট করল না। তার তর্জনি চেপে বসল তার রিভলভারের ট্রিগারে।

সাইলেন্সার লাগালো রিভলভার থেকে নিঃশব্দে একটা গুলি বেরিয়ে লোকটির কপাল দিয়ে ঢুকে মাথাটাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। জ্যাকেটটা ঠিক করে বিভলভারটা হাতে নিয়েই এগোলো সামনের দিকে।

ঘরটির দেয়ালের শেষ প্রান্তে গিয়ে দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে পশ্চিম দিকে এগিয়ে যাওয়া করিডোরের দিকে উঁকি দিল। দেখল করিডোরে কেউ নই। করিডোরের দক্ষিণ পাশে একটা দরজা। দরজাটা আধাবন্ধ। ঐ ঘর থেকেই শব্দগুলো আসছে।

আহমদ মুসা করিডোরে নেমে গেল। নিঃশব্দ পায়ে এগোলো দরজার দিকে। দরজার পাশে দাঁড়াল আহমদ মুসা। কোন কিছু দেখা যাচ্ছে না। তবে সব কথা, সবার কথা পাচ্ছে, বুঝতে পারছে সে। কিছু একটা ঘটল, মেয়েটা চিৎকার করে কেঁদে উঠল। কান্নারত অবস্থায় বলছে, 'আমাকে ছেড়ে দাও তোমরা। আমার সর্বনাশ করো না। আমি তোমাদের কী ক্ষতি করেছি? আমাকে ছেড়ে দাও তোমরা।'

এখন নিঃসন্দেহ হলো যে, এটা সালিহা সানেমের গলা।

সালিহা সানেম থামতেই এজন লোক হো হো করে হেসে উঠল। বলল, 'অত বাহাদুরি কোথায় গেল? তুমি না জেনারেলের মেয়ে? কোথায় জেনারেল, ডাক? আমাদের চেন না। তোমার বাপের মত অনেক জেনারেল আমাদের পকেটে আছে। মন্ত্রীরাও আমাদের সালাম করে। আমাদের না হলে ওদের একদিনও চলে না। আমাদের কোন ক্ষতি করনি বলছো? নাইট ক্লাবে আমাদের সাথে নাচতে তো আপত্তি করনি। নেচে-গেয়ে তো আমাদের পাগল করেছ। যখন বললাম, এই পাগলকে শান্ত কর। তখন গালি-গালাজ শুরু করলে। অত সতী-সাধ্বী হলে নাইট ক্লাব গিয়েছ কেন? মানুষের মনে আগুন জালিয়েছ কেন? এটা ক্ষতি নয়? জামা খুলেছি। এবার শালির প্যান্ট কেটে ফেল, খুলে পড়ে যাক।'

সম্ভবতঃ ভিতরে কিছু ঘটল। সালিহা সানেম চিৎকার করে উঠল।

আহমদ মুসা ভাবল, আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।

আমদ মুসা তার জ্যাকেটের পকেটে একটা রিভলভার রেখে ডান হাতে একটা রিভলভার বাগিয়ে ধরে এক লাফে দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। নির্দেশ দিল সবাইকে মাথার উপর হাত তুল...

আহমদ মুসা কথা শেষ করতে পারল না। তার বাম দিকে কিছু দূরে এ দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়ানো একজন লোক এদিকে ঘুরেই গুলি করল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে।

এমন ঘটনা আহমদ মুসার জন্য অপ্রত্যাশিত ছিল না।

আহমদ মুসা নিজেকে এক পাশে সরিয়ে নিয়েই লোকটিকে গুলি করল।

লোকটি দ্বিতীয় গুলি করার আগেই বুকে গুলি খেয়ে ভূমিশয্যা নিল।

ইতিমধ্যে ঘরের অন্য পাঁচজনই রিভলভার পকেট থেকে আহমদ মুসার বাম হাত রিভলভারসহ বেরিয়ে এসেছিল। আহমদ মুসার ডান হাত গুলি করার সাথে সাথেই তার বাম হাতও সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। প্রথম গুলি করার পর ডান হাতও বাম হাতের সাথে যুক্ত হলো। পাঁচ জনের মধ্যে চারজনই গুলি খেয়ে পড়ে গেল। পঞ্চম লোকটি, মানে ক্রিমিনাল চেহারার সুবেশধারী লোকটি সালিহা সানেমের পেছনে দাঁড়িয়ে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছিল।

লোকটি তার রিভালভারের নল সালিহা সানেমের মাথায় ঠেকিয়ে দাবী করল যে, আহমদ মুসা তার হাতের রিভলভার ফেলে না দিলে সে সালিহা সানেমকে গুলি করবে। সে আহমদ মুসাকে রিভলভার ফেলে দিয়ে হাত তুলে দাঁড়াবার নির্দেশ দিল।

আহমদ মুসা রিভলভার ফেলে দিয়ে দুই হাত কান পর্যন্ত উঠাল।

লোকটি সালিহা সানেমের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে হো হো করে হেসে উঠল। বলল, 'তুমি যেই হও, তোমার হাতের তারিফ করি। তেমার মত এত দ্রুত রিভলভার চালানোর মত লোক জীবনে আমি দেখিনি, ওয়েস্টার্ন উপন্যাসে পড়েছিই শুধু।'

লোকটি মুহূর্তের জন্যেও সালিহা সানেমের মাথা থেকে রিভলভার সরায়নি।

সে আহমদ মুসাকে নির্দেশ দিল হাত উপরে রেখে দরজা থেকে সরে পশ্চিমের দেয়ালের দিকে চলে যেতে।

আহমদ মুসা বিনা বক্য ব্যয়ে তাই করল।

লোকটি সালিহা সানেমকে দরজার দিকে হাঁটার নির্দেশ দিল।

হাঁটতে লাগল সালিহা সানেম।

লোকটিও তার রিভলভারের নল সালিহা সানেমের মাথায় চেপে ধরে চোখ দু'টো আহমদ মুসার উপর নিবদ্ধ রেখে সালিহা সানেমের সাথে হাঁটা শুরু করেছে।

আহমদ মুসা বলল, 'বৃথাই চেষ্টা করছ। তোমার বাঁচার উপায় নেই। একবার দরজার দিকে তাকাও।'

লোকটি ফাঁদে পড়ে গেল। সত্যিই সে সংগে সংগে চোখ ফিরাল দরজার দিকে। এটুকু সুযোগেই আহমদ মুসা চাচ্ছিল।

লোকটি চোখ ফেরাতেই আহমদ মুসা মাথার পেছরে জ্যাকেটের গোপন এক পকেটে আটকানো রিভলভার ডান হাতে তুলে নিয়েই গুলি করল।

আহমদ মুসা গুলি করেছিল লোকটির রিভলভার ধরা হাতে।

লোকটি অসম্ভব ক্ষীপ্র। সে দরজার দিকে চোখের একটা পলক ফেলেই বুঝতে পেরেছে যে তাকে ফাঁদে ফেলা হয়েছে।

সংগে সংগে সে তার রিভলভার ধরা হাত ও মুখ এক সাথেই আহমদ মুসার দিকে ঘুরিয়েছে। তার ফলে তার হাতটা আগের জায়গা থেকে সরে এসেছে। আর তার জায়গায় গিয়ে সেট হয়েছে তার মাথা।

হাতের বদলে মাথায় গুলি খেল লোকটা।

দেহটা তার পাক খেয়ে পড়ে গেল মেঝেতে।

মেয়েটা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে এবং ডুকরে কেঁদে উঠল।

আহমদ মুসা সালিহা সানেমের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'শান্ত হও বোন, আর ভয় নেই।'

আহমদ মুসা নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে গায়ের জ্যাকেটটা খুলে সালিহা সানেমের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'জ্যাকেটটা পরে নাও।'

সালিহা সানেমের বোধ এতক্ষণে যেন ফিরে এল। বিব্রতকর এক অস্বস্তিতে তার মুখ কুঁকড়ে গেল। তাড়াতাড়ি সে তার প্রায় নগ্ন গায়ে জ্যাকেটটা পরে নিল।

তার গায়ের গোলাপি সর্টটা টুকরো টুকরো অবস্থায় মেঝেতে পড়ে ছিল।

আহমদ মুসা বাম হাতের রিভলভারটা পকেটে পুরে ডান হাতের রিভলভার বাগিয়ে ধরে ঘর থেকে বেরুবার জন্যে পা বাড়িয়ে বলল, 'এসো সানেম।'

সালিহা সানেম আহমদ মুসার পেছনে পেছনে চলতে লাগল।

আহমদ মুসা ওপরে গ্রাউন্ড ফ্লোরে উঠে এল।

রিসেপশন কাউন্টারেই পেল বিপুল বপু লোকটাকে। আহমদ মুসা এগোলো তার দিকে।

বিপুল বপু লোকটি আহমদ মুসার হাতে রিভলভার আর মেয়েটাকে বেঢপ জ্যাকেট পরা বিধ্বস্ত অবস্থায় দেখে ভীত সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে উঠে দাঁড়াল।

'আপনাদের আন্ডারগ্রাউন্ডটা ক্রিমিনালদের আড্ডাখানা, তাই না? ক্রিমিনালদের সাথে তাহলে ক্রিমিনালদের যোগ আছে? এখানকার থানার ফোন নম্বর দিন।' ধমকের সুরে বলল আহমদ মুসা।

লোকটি পুলিশের কথা শুনে আর্তনাদ করে উঠল। বলল, 'স্যার, বিশ্বাস করুন, আমরা প্রাণের ভয়ে ওদের কথা শুনতে বাধ্য হই। আমরা ক্রিমিনাল নই। আমরা ব্যবসায়ী।'

'পুলিশের টেলিফোন নাম্বার দিন, তাদের কাছেই আপনার এ কথাগুলো বলবেন।' আহমদ মুসা বলল।

বিপুল বপু লোকটি আহমদ মুসার সামনে এসে হাত জোড় করে বলল, 'স্যার, পুলিশকে ডাকবেন না দয়া করে। আমাদের ব্যবসায় বন্ধ হয়ে যাবে তাহলে।'

'আন্ডারগ্রাউন্ড ফ্লোরে ছয়-সাতটা লাশ পড়ে আছে। পুলিশ না এলে ওগুলোর কী হবে?'

'ছয়-সাতটা লাশ?' উচ্চারণ করল বিপুল বপু লোকটি। তার দুই চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে।

তারপর 'ও গড!' বলে বসে পড়ল সে।

'পুলিশের নাম্বার দিলেন না? আমি থাকা অবস্থায় পুলিশ এলে আপনাদেরই ভালো হতো?' বলল আহমদ মুসা।

তড়িঘড়ি করে উঠে দাঁড়াল বিপুল বপু লোকটি। বলল, 'স্যার, দিচ্ছি টেলিফোন।'

বলে সে ছুটল রিসেপশন টেবিলে। ইনডেক্স দেখে নাম্বার বের করে নিজেই ডায়াল করল। বলল, 'স্যার, রিং হচ্ছে। টেলিফোন নিন আপনি।'

‘তুমিই জানাও পুলিশকে। আসতে বল পুলিশকে তাড়াতাড়ি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ধন্যবাদ স্যার। সেই ভালো। আমি বলছি পুলিশকে।’ বলল বিপুল বপু লোকটি।

সাত-আট মিনাটের মধ্যেই পুলিশ চলে এল। একজন পুলিশ অফিসার পাঁচ-ছয় জন পুলিশ নিয়ে রিসেপশন লিউঞ্জে প্রবেশ করল।

‘কি মি. নাদির। কী ঘটিয়েছেন আপনি? কোথায় খুন? কোথায় লাশ?’ লাউঞ্জে দাঁড়িয়ে পুলিম অফিসারটি বিপুল বপু লোকটিকে লক্ষ্য করে বলল।

তড়িঘড়ি ছুটে এল নাদির নামের বিপুল বপু লোকটি পুলিশের কছে। বলল, ‘স্যার আমি ঘটাইনি। ওরা সাক্ষী।’ আহমদ মুসাদের দেখিয়ে বলল নাদির সামের বিপুল বপু লোকটি।

আহমদ মুসা ও সালিহা সানেম তখন বসে রিসেপশনের সামনের দু’টি সোফায়। পুলিশ অফিসার তাকাল তাদের দিকে।

‘খুনের সময় আপনারা ছিলেন?’ জিজ্ঞেস করল পুলিশ অফিসার।

‘ছিলাম শুধু তাই নয়, যাদের লাশ পড়ে আছে, তাদের আমিই খুন করেছি।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আপনি? তাহলে পালাননি কেন?’

‘পালাব কেন? লাশ আপনাদের হাতে তুলে দেবার জন্যে বসে আছি।’ আহমদ মুসা বলল।

পুলিশ অফিসার একবার দৃষ্টি তুলে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘আপনি খুন করেছেন? কেন?’

আহমদ মুসা তাকাল বিপুল বপু মি. নাদিরের দিকে। বলল, ‘বলুন মি. নাদির, পুলিশ অফিসারকে সব খুলে বলুন।’

বিপুল বপু পুলিম অফিসারকে বলল কিভাবে সাত আটজন লোক ক্রন্দনরত সালিহা সানেমকে হোটেলে নিয়ে এল, কিভাবে অস্ত্রের মুখে তারা বাধ্য করল বেজমেন্টের রুম তাদের ছেড়ে দিতে, কিভাবে আহমদ মুসা অস্ত্রধারীদের লোক পরিচয় দিয়ে বেজমেন্টে চলে গেল। শেষে সে বলল, ‘এই মাত্র বেজমেন্ট

রুম থেকে এসে ইনি আমাকে বললেন, ঐ সাত-আটজন অস্ত্রধারী নিহত হয়েছে, পুলিশে খবর দাও। আমি পুলিশকে খবর দিয়েছি স্যার। ওদের সাত-আটজন নিহত হওয়ার কথা শুনেছি, এখনও দেখিনি। আমরা পুলিশের জন্য অপেক্ষা করছি।'

পুলিশ অফিসার ঘুরল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'চলুন আমাদের সাথে। লাশগুলো আগে দেখব।'

'আমরা এখানে বসে আছি। মি. নাদিরকে নিয়ে আপনারা দেখে আসুন।' আহমদ মুসা বলল ঠান্ডা কণ্ঠে।

পুলিশ অফিসার ইতস্তত করছিল।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'পালানোর ইচ্ছা থাকলে আগেই পালাতাম। এখনো পালাতে পারি। আপনারা কয়েকজন আমাদের আটকাতে পারবেন না।'

পুলিশ অফিসার মুহূর্ত কয় আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'ঠিক আছে, আপনারা বসুন। আমরা আসছি। নিয়ম অনুসারে একজন পুলিশ এখানে থাকবে।'

'নিয়ম তো আপনাদের পালন করতেই হবে।' বলে হাসল আহমদ মুসা।

একজন ছাড়া পুলিশ অফিসার অন্য পুলিশ সদস্য ও মি. নাদিরকে নিয়ে বেজমেন্টে নেমে গেল। ফিরে এল মিনিট দশেক পর।

পুলিশ অফিসার এলে আহমদ মুসা বলল, 'ভিকটিম এই মেয়ের জবানবন্দী নিয়ে নিন। আমরা চলে যাবো।'

'কিন্তু আপনাদের যে থানায় যেতে হবে।' পুলিশ অফিসার বলল।

'থানায় যাবার দরকার নেই। আপনি মেয়েটার জবানবন্দী নেবেন। আপনারা মামলা দায়ের করবেন। আপনারা ডাকলে মেয়েটি সাক্ষ্য দেবার জন্যে আসতে পারে।' আহমদ মুসা বলল।

'কিন্তু নিয়ম হলো...।' কথা বলতে শুরু করেছিল পুলিশ অফিসার। আহমদ মুসা পুলিশ অফিসারকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'এটাও নিয়ম।'

পুলিশ অফিসারের মুখে অসন্তোষ ফুটে উঠল।

বলল, 'আমরা যে নিয়মের কথা বলব, সেটাই মানতে হবে।'

আহমদ মুসা সালিহা সানেমের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার আইডি কার্ড দাও।'

সালিহা সানেম তার আইডি কার্ড বের করে আহমদ মুসার হাতে দিল।

আহমদ মুসাও নিজের আইডি কার্ড বের করে দু'টি আইডি কার্ড পুলিশ অফিসারের সামনে তুলে ধরে বলল, 'আপনি ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার লিখে নিন। দরকার হলে গিয়ে আমাদের এ্যারেস্ট করে নিয়ে আসবেন। এখন আমাদের হাতে সময় নেই; আমরা চললাম।'

পুলিশ অফিসার দু'টি আইডি কার্ডের দিকে নজর বুলিয়েই চমকে উঠল। সংগে সংগে উঠে দাঁড়িয়ে আহমদ মুসাকে স্যালুট করল। বলল, 'স্যার, মাফ করুন। আপনাদের পরিচয় জানলে এসব কথা বলতাম না। স্যার, আমি ম্যাডামের জবানবন্দী লিখে নিচ্ছি, একটু সময় দিন স্যার।'

সালিহা সানেমের আইডি কার্ডে তার পরিচয় দেয়া ছিল 'আংগোরা মিলিটারি স্টাফ কলেজের ট্রেইনি, জেনারেল মেডিন মেসুদের মেয়ে।' আর আহমদ মুসার আইডি কার্ডে পরিচয় লেখা ছিল, 'ভিভিআইপি সিকিউরিটি পারসোনেল।' তার কার্ডে ইনস্ট্রাকশন ছিল, কার্ড হোল্ডার সব জায়গায় অ্যাকসেস পাবেন এবং যে সহযোগিতা তিনি চাইবেন, তা তাকে দিতে হবে।' কার্ডে তুরস্কের পুলিশ প্রধান নাজিম এরকেন এবং তুরস্কের অভ্যন্তরীণ সিকিউরিটি প্রধান জেনারেল মোস্তফা কামালের দস্তখত ছিল।

'ঠিক আছে, ওর জবানবন্দী লিখে নিন। আমিও আমার ছোট্ট একটা মন্তব্য লিখে দেব।' বলল আহমদ মুসা পুলিশ অফিসারের কথার জবাবে।

'ধন্যবাদ স্যার!' বলে পুলিশ অফিসার নিজেই লিখতে বসে গেল।

ড্রইং রুমের দরজা খুলে যেতেই আহমদ মুসা দেখতে পেল সালিহা সানেমকে। সালিহা সানেমই প্রথম সালাম দিল আহমদ মুসাকে।

সালামের জবাব দিয়ে আহমদ মুসা ভেতরে দিল আহমদ মুসাকে।

সালামের জবাব দিয়ে আহমদ ভেতরে প্রবেশ করল।

সালিহা সানেম সোফা দেখিয়ে বলল, 'বসুন স্যার। আব্বা হঠাৎ টেলিফোন পেয়ে হেড কোয়ার্টারে গেছেন। এখনি এসে যাবেন। আমাকে এ্যাটেন্ড করতে বলেছেন আপনাকে।'

'ধন্যবাদ।' বলল আহমদ মুসা।

সালিহা সানেম আহমদ মুসার সামনে এক সোফায় বসল।

সালিহা সানেমের পোষাক দেখে বিস্মিত হলো আহমদ মুসা। ফুলহাতা কামিজ পরেছে। একটা ওড়না মাথার উপর দিয়ে গলা পেঁচিয়ে গায়ের উপর নেমে এসেছে। পরনে ঢিলা সালওয়ার। মুখে বাহুল্য মেকআপ নেই। যেটুকু আছে সেটা খুবই স্বাভাবিক। মুখে গাম্ভীর্য।

গতকালের চেয়ে তার আজকের এই রূপ কত ভিন্ন। গতকাল পরনে ছিল টাইট প্যান্ট। বোতাম খোলা সার্ট। চোখে-মুখে উপচে পড়া চপলতা।

বসেই সালিহা সানেম বলল, 'স্যার, আব্বা আপনার ভক্ত হয়ে গেছেন। গতকাল থেকে কতবার যে আপনার কথা তিনি বলেছেন! যতবার বলেছেন, ততবারই আব্বার কণ্ঠকে কান্নায় ভারি দেখেছি। আব্বাকে এমন ভেঙে পড়া অবস্থায় কখনও দেখিনি। জানেন, আজ ভোরে আমি আব্বাকে কুরআন শরীফ পড়তে দেখেছি। আব্বা যে কুরআন পড়তে জানেন, সেটাই আমি জানতাম না।'

'সালিহা সানেম, এটা আমার প্রতি ভক্তির প্রকাশ নয়। আপনার প্রতি তার সীমাহীন ভালোবাসা এটা। আপনি তার একমাত্র সন্তান। আপনার বিপদে পড়া তার সমগ্র সত্তাকেই নাড়া দিয়েছে। কুরআন যে তিনি পড়েছেন, সেটা আপনার বিপদ মুক্তির জন্যে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা থেকে।' আহমদ মুসা বলল।

'কিন্তু তিনি আপনাকে এ্যাঞ্জেল, মানে আল্লাহর ফেরেশতা বলে অভিহিত করেছেন এবং বলেছেন, 'আমি সৈনিক হিসেবে ঝুঁকি নিতে অভ্যস্ত। কিন্তু জনাব আবু আহমদ যে পরিস্থিতিতে যে কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন এবং যে ঝুঁকি নিয়েছেন, তা আমি পারতাম না।''

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘এমন তিনি বলতেই পারেন। আপনার মুক্ত হওয়া তাকে সীমাহীন আনন্দ দিয়েছে। আর বেশি আনন্দিত হলে মানুষ কথা বেশি বলেন এবং বিশেষণও বেশি ব্যবহার করেন।’

‘আপনিও বেশি বলছেন স্যার, যাতে কোন প্রশংসা আপনার উপর আরোপ না হয়।’ বলল সালিহা সানেম।

গম্ভীর হলো আহমদ মুসা। বলল, ‘প্রশংসা এভাবে অপাত্রে আরোপ করা হবে কেন? আমি যে কৌশল, বুদ্ধি, সাহস ও শক্তি দেখিয়েছি, তার কোনটা আমি সৃষ্টি করেছি বা কোনটার আমি মালিক? একটারও নয়। আমি যা পেয়েছি, তাতে আমিও বিস্মিত হয়েছি, কৃতজ্ঞ হয়েছি আল্লাহর প্রতি যে, তিনি এই শক্তি, সাহস, কৌশল আয় বুদ্ধি আমাকে দিয়েছেন।’

আহমদ মুসার কথা শেষ হলেও সালিহা সানেম কিছু বলল না। গাম্ভীর্যের একটা ছাপ নামল সালিহা সানেমের চোখে-মুখে। সেই সাথে মাথাটা তার নিচু হলো।

মুহূর্ত কয় পর সে মাথা তুললো। বলল আস্তে আস্তে, ‘স্যার, গতকাল প্লেনে আমি বলেছিলাম, আমি আপনার কথা বুঝলাম তবে মানতে পারলাম না। মেনে নেয়ার জন্যে আমাকে আরও ভাবতে হবে। গতকাল ঐ ঘটনার সময় আমার মনে সেই ভাবনা এসেছিল। আমি গতকাল সারারাত এ নিয়ে ভেবেছি স্যার, ওরা আমার উপর যে আক্রমণ করেছিল, তাতে ওরা দোষী। কিন্তু ওদের চেয়ে আমি বেশি অপরাধী। আমি গত কয়েকদিন এস্কান্দারুন সী বিচে এবং এস্কান্দারুনের নাইট ক্লাবে যে পোষাক পরে যেভাবে ওদের সাথে মানে সবার সাথে নেচেছি, সেটা তাদেরকে আমার প্রতি প্রলুব্ধ করা ও আমন্ত্রণ জানানোর মতোই। তারা যখন প্রলুব্ধ হয়ে আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এসেছে নগ্ন দাবী নিয়ে তখন তাদেরকে আমি অপমান করেছি। সে অপমানের শোধ তাদের নেবারই কথা। তার চেয়ে বেশি কিছু তো করেনি। আমার অপরাধই তাদের অপরাধী বানিয়েছে। আমি...’

কথা শেষ করতে পারলো না সালিহা সানেম। কান্নায় আটকে গেলে তার কথা। দু’হাতে মুখ ঢাকল সে।

‘ধন্যবাদ সালিহা সানেম, তোমার উপলব্ধির জন্যে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘উপলব্ধি এল অনেক দেরিতে। অনেক পাপ করেছি আমি। আল্লাহর কাছে তো আমি দাঁড়াতে পারবো না। কী বলব আল্লাহকে আমি! আজ ফজরে আমি চেষ্টা করেও নামাযে দাঁড়াতে পারিনি।’ বলল আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে সালিহা সানেম।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘তুমি কুরআন শরীফ পড়া জান না?’

‘না, জানি না স্যার। ছোট বেলায় দাদার কাছে কিছু সূরা ও দোয়া শিখেছিলাম। তিনি নামাযও শিখিয়েছিলেন। এটুকুই আমার সম্বল।’

‘কুরআন পড়নি সে জন্যেই হতাশ হচ্ছ এবং আল্লাহর কাছে দাঁড়াবে কিভাবে সেটা ভাবছ। ভাবনার কিছু নেই সানেম। আল্লাহ রহমান, রহীম। তিনি গফুর। তিনি তাঁর বান্দাহদের মাফ করার জন্যে সর্বক্ষণ তৈরি আছেন। যতই গুনাহ নিয়ে বান্দার তাঁর ক্ষমার জন্যে প্রার্থনা করুক, তিনি মাফ করেন। কুরআন শরীফে তিনি বলেছেন, ‘বল (হে রসূল), হে আমার বান্দারা, যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছ (অন্যায়, অবিচার, অনাচার, গুনাহের মাধ্যমে), আল্লাহর ক্ষমা সম্পর্কে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সব অপরাধ মাফ করে দেবেন। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তোমরা আল্লাহর দিকে ফিরে এস এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ কর সেই শাস্তি আসার আগে যখন তিনি আর ক্ষমা করবেন না।’ বলল আহমদ মুসা।

একটু নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল সালিহা সানেম আহমদ মুসার দিকে। তার দু’চোখ অশ্রুসিক্ত, কিন্তু তাতে আশার ঔজ্জ্বল্য। বলল, ‘আমার জন্যে তো সেই শাস্তির সময় আসেনি, যখন আর তিনি ক্ষমা করবেন না?’

‘অবশ্যই না। গতকাল তো তিনি তোমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। এটা তো তোমার প্রতি আল্লাহর দয়া ও করুণা।’ আহমদ মুসা বলল।

সালিহা সানেমের চোখ দু’টি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

‘আল্লাহর হাজার শুকরিয়া...’

কথা শেষ করতে পারল না সালিহা সানেম। আবেগে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। অশ্রুসিক্ত চোখ তার অশ্রুতে আবার ভরে গেল।

ড্রইংরুমে প্রবেশ করল এক পরিচারিকা। বলল সালিহা সানেমকে, ‘ছোট ম্যাডাম, সাহেব এসেছেন। আসছেন তিনি।’

চলে গেল পরিচারিকা। সালিহা সানেম তাড়াতাড়ি চোখ মুছল।

ঘরে ঢুকল জেনারেল মেডিন মেসুদ।

জেনারেলের পোষাক তার পরনে। আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল তার সাথে হ্যান্ডশেক করার জন্যে। কিন্তু জেনারেল মেডিন মেসুদ হ্যান্ডশেক নয়, জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে। বলল, ‘আপনি আত্মীয়ের চেয়ে বড় আত্মীয় আমার। আপনাকে স্বাগত।’

সোফায় বসতে বসতে জেনারেল মেডিন মেসুদ বলল, ‘দুঃখিত আমি, মি. আবু আহমদ। আমি সময় দিয়েও থাকতে পারিনি। অফিসে জরুরি কাজ পড়েছিল।’

বলেই তাকাল মেয়ে সালিহা সানেমের দিকে। বলল, ‘ধন্যবাদ মা, তুমি মেহমানকে এ্যাটেন্ড করেছ। চা-টা দিয়েছ মেহমানকে?’

‘জ্বী, আমি নিষেধ করেছি। আমি আপনার অপেক্ষা করছি।’ আহমদ মুসা বলল।

উঠে দাঁড়াল সালিহা সানেম। বলল, ‘বাবা তোমরা কথা বল। আমি ওদিকে দেখছি।’ ড্রইং থেকে বেরিয়ে গেল সালিহা সানেম।

‘ধন্যবাদ স্যার। আমাকে সময় দেবার জন্যে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘মি. আবু আহমদ এই সৌজন্যের দরকার নেই। বলেছি, আপনি আমার আত্মীয় হয়ে গেছেন। আপনি আমার পরিবারের একজন।’ জেনারেল মেডিন মেসুদ বলল।

‘ধন্যবাদ আপনার এই শুভেচ্ছার জন্যে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘নিশ্চয় আপনার কিছু কথা আছে। বলুন মি. আবু আহমদ।’ জেনারেল মেডিন মেসুদ বলল।

সংগে সংগেই আহমদ মুসা কিছু বলল না। ভাবল, সরাসরি কথাটা পাড়বে, না কৌশলের আশ্রয় নিয়ে সবকিছু জানার চেষ্টা করবে। আহমদ মুসার মন বলল, জেনারেলের মন যে অবস্থায় আছে, তাতে সরাসরি কথায় আসা যায়। সত্যের একটা শক্তি আছে।

এসব ভেবে আহমদ মুসা বলল, ‘স্যার, কিছু জানার আগে আমার সম্পর্কে বলতে চাই। আমি পুলিশের লোক নই, আমি সেনাবাহিনীর লোক নই, কোন গোয়েন্দা বিভাগের লোকও নই। আমি শখের গোয়েন্দাও নই। আমি একজন স্বাধীন মানুষ। তবে নিজ ইচ্ছায় অথবা কোন আহবানে সাড়া দিয়ে কাউকে বা কোন দেশকে সাহায্য করতে আমি ভালোবাসি। এ রকম একটা কাজ নিয়ে আমার এখানে আসা।’

‘সত্য ও সুন্দর পরিচয়ের জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। বলুন কী কাজে এসেছেন? আমি কী সাহায্য করতে পারি?’ বলল জেনারেল মেডিন মেসুদ।

‘আপনার সম্পর্কে কিছু কথা জানতে চাই।’ বলল আহমদ মুসা।

‘বলুন কী কথা?’ জিজ্ঞাসা জেনারেল মেডিন মেসুদের।

‘এক বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে তুরস্কের শত্রু একটা সন্ত্রাসী সংগঠনের ট্র্যাপে পড়েছেন আপনি।’ ধীর, শান্ত, শক্ত কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

কথাটা শুনে চমকে উঠল না জেনারেল মেডিন মেসুদ। ধীরে ধীরে চোখ তুলে একবার তাকাল আহমদ মুসার দিকে। দেখল তার মুখভাবে তেমন কোন পরিবর্তন নেই। আবার মুখ নিচু করল মেডিন মেসুদ।

বেশ সময় নিল সে কথা বলতে। একসময় মুখ তুলে সে বলল, ‘আমার উত্তর ‘না’ হলে আপনার কাজ কি হবে, আর ‘হ্যাঁ’ হলে আপনি কী করবেন?’

‘উত্তর ‘না’ হলে আমাকে আরও অনুসন্ধান করতে হবে। আর ‘হ্যাঁ’ হলে আমি পরবর্তী কাজে হাত দেবার চেষ্টা করবো।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমার কথা জানার আগে আপনি কি বলবেন, আপনি কতটা জানতে পেরেছেন?’ জিজ্ঞাসা জেনারেল মেডিন মেসুদের।

‘মি. জেনারেল স্যার, মিসেস অ্যানোস আব্দুল্লাহ গাজেনের ডায়েরি থেকে আমি সবকিছুই জানতে পেরেছি। ডায়েরিতে আপনার নাম ছিল না। সে নামও যোগাড় হয়েছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তাহলে তো আপনার সবকিছুই জানা হয়ে গেছে। আর কী জানতে চান?’ বলল জেনারেল মেডিন মেসুদ।

‘স্যার, দেশের শত্রুদের বিরুদ্ধে আপনার সাহায্য চাই।’ আহমদ মুসা বলল।

‘সেটা কী?’ জেনারেল মেডিন মেসুদ বলল।

‘উল্কি চিহ্নধারী, যারা মিসেস অ্যানোস আব্দুল্লাহ গাজেনকে তাদের পক্ষে কাজ করতে বাধ্য করেছিল, যারা আপনাকে ট্র্যাপে ফেলেছিল, যারা এখন মাউন্ট আরারাত অঞ্চলে, বলতে গেলে গোটা পূর্ব আনাতোলিয়া জুড়ে এক শ্রেণীর লোককে উচ্ছেদ করে, অস্থানীয় এক শ্রেণীর লোককে বসাচ্ছে, তারা কারা? এটাই আমার প্রথম জানার বিষয়।’ আহমদ মুসা বলল।

ভাবছিল জেনারেল মেডিন মেসুদ। তার কপালে কয়েকটা ভাঁজের সৃষ্টি হয়েছে। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে। বলল, ‘মানবিক দুর্বলতার কারণেই আমি ওদের ট্র্যাপে পড়ি। আমি মিসেস অ্যানোস আব্দুল্লাহর অসহায়ত্ব দেখে সব বুঝেছিলাম। আমি তাকেও বাঁচাতে পারিনি, আমিও বাঁচতে পারিনি। চাকুরীকে আমি ভয় করি না, শাস্তিকেও নয়। কিন্তু ভয় করেছি আমার পরিবারের বিপর্যয়কে। আমি ওদের বিরুদ্ধে কোন এ্যাকশনে যেতে পারিনি এ কারণেই। ওরা আমাকে ওদের সার্বক্ষণিক নজরদারিতে রেখেছে। আমার অফিসে, আমার চার পাশেও অনেক দালাল সৃষ্টি করেছে। আমি ভয় করছি, আপনি এখানে এসেছেন, এটাও ওদের নজরে পড়বে।’ থামল জেনারেল মেডিন মেসুদ।

ভ্রু কুচকে গেল আহমদ মুসার। বলল, ‘আমি এখানে এটাও কি ওদের নজরদারিতে পড়বে? এতটাই ক্লোজভাবে ওরা ওয়াচ করছে আপনাকে?’

‘শুধু আমাকে নয়, যাদেরকে ওরা ব্যবহার করে প্রত্যেককেই ওয়াচে রাখে। অতি সম্প্রতি আমার প্রতি ওয়াচ তাদের বেড়েছে। আমি তাদের অনেক কিছু জানি বলেই হয়তো অথবা ওরা বড় কিছু করতে যাচ্ছে। সে কারণেই তাদের এই বাড়তি সতর্কতা।’

একটু থামল জেনারেল মেডিন মেসুদ। টিপয়ে রাখা গ্লাসের পানি থেকে এক ঢোক পানি গিলে বলল, ‘আপনাকে কি ওরা চেনে?’

'চেনাই স্বাভাবিক। অনেক কয়টা এনকাউন্টার ওদের সাথে আমার হয়েছে। তবে কতটুকু জানে, সবাই চেনে কিনা, তা আমি জানি না।' আহমদ মুসা বলল।

'তাহলে আপনার পরিচয় ওদের সবার কাছে আছে অবশ্যই। এটাই ওদের নিয়ম।' বলল জেনারেল মেডিন মেসুদ।

'তাহলে আমি এখানে এসেছি তা ওদের নজরে পড়েছে বলছেন?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'আমার তাই মনে হয়।' জেনারেল মেডিন মেসুদ বলল।

'ঠিক আছে। এতোটা আমি ভাবিনি। সাবধান হতে হবে। এবার প্লিজ বলুন আমি যা জানতে চেয়েছি।' বলল আহমদ মুসা।

মুহূর্তের জন্য চোখ বুজল জেনারেল মেসুদ।

তারপর সোজা হয়ে সোফায় বসল। বলল, 'ওরা ওদের পরিচয় সম্পর্কে কোন সময়ই কিছু বলেনি। তবে আব্দুল্লাহ গাজেনের কাছ থেকে আমি জেনেছি, এখন ওরা দুই সংগঠন এক সাথে কাজ করছে। একটা হলো 'সোহা', মানে Son of Holy Ararat (SOHA), আর একটা 'Lover of Holy Ararat', সংক্ষেপে, 'হোলি আর্ক গ্রুপ' বলে এরা নিজেদের পরিচয় দেয়। এদের মধ্যে 'সোহা' সংগঠনটি কোন একটা রাজনৈতিক লক্ষ্যে কাজ করছে। আর 'হোলি আরারাত' বা 'আর্ক' গ্রুপটা ক্রিমিনাল সংগঠন। শুনেছি নুহ (আঃ)- এর নৌকার গুপ্তধন উদ্ধারের জন্যে এরা কাজ করছে। এই দুই সংগঠন কেন একত্রিত হলো, এটা অজানা রহস্য। 'সোহা' কী রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্যে কাজ করছে, এটাও আমার কাছে স্পষ্ট নয়।'

'পূর্ব আনাতোলিয়ার কয়েকটি প্রদেশে বিশেষ করে মাউন্ট আরারাত অঞ্চলে মাদক ব্যবসার ফাঁদ পেতে ওরা শত-শত সৎ ও দেশপ্রেমিক মানুষকে জেলে পুরেছে, বহু পরিবারকে তারা বিরান করেছে এবং নতুন বসতি নিয়ে আসছে তারা এই অঞ্চলে। এ সম্পর্কে, এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আপনি কী জানেন?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘এ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। ভ্যান অঞ্চলে আমি বেশ কিছু দিন যাই নি।’ বলল জেনারেল মেডিন মেসুদ।

‘ওদের সাথে সর্বশেষ যোগাযোগ আপনার কবে হয়েছে?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

সংগে সংগে জবাব দিল না জেনারেল মেডিন মেসুদ। নতুন একটা ভাবনার রেখা তার চোখে-মুখে। বলল একটু সময় নিয়ে, ‘সাত দিন আগে ওরা এসেছিল।’

‘কোথায় এসেছিল? বাসায় না অফিসে?’ বলল আহমদ মুসা।

‘ওরা অফিসে যায় না। বাসায় এসেছিল।’ জেনারেল মেডিন মেসুদ বলল।

‘এই সময় তো ওদের ক্রাইসিস ঐ অঞ্চলে। সে সব কোন বিষয় নিয়ে কি তারা এসেছিল?’ আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

‘ওরা এসেছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ দাবী নিয়ে।’ জেনারেল মেডিন মেসুদ বলল।

‘কী সেটা?’ বলল আহমদ মুসা।

‘তারা ইজদির, আগ্রি, ভ্যান, কারস প্রভৃতি প্রদেশে মোতায়েন করা সেনা অফিসারদের একটা তালিকা নিয়ে এসেছিল। এই মুহূর্তে ওদের ট্রন্সফার চেয়েছিল এই প্রদেশগুলোএ বাইরে কোথাও। সেই সাথে তারা এসেছিল সেনা অফিসারদের আরেকটি তালিকা। তাদের দাবী ছিল ওদের ট্রান্সফার করার পর ঐ শূন্য স্থানগুলো তাদের মনোনীত সেনা অফিসারদের দ্বারা পূরণ করতে।’ ভ্রূ কুচকে গেল আহমদ মুসার।

‘কেন তারা চেয়েছে এটা? কিছু বলেছে তারা?’

‘না বলেনি।’ জবাব জেনারেল মেডিন মেসুদের।

‘বদলি এবং নতুন নিয়োগগুলো কি হয়ে গেছে?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘না, আমি সব ট্রান্সফারে রাজী হইনি। তাদের প্রচন্ড চাপ ও ভয় দেখানো সত্ত্বেও আমি ইজদির প্রদেশ সব এবং আগ্রি ও কারস প্রদেশের দু’একটা ট্রান্সফারে রাজী হয়েছি।’ জেনারেল মেডিন মেসুদ বলল।

‘তাহলে ওদের দেয়া তালিকা অনুসারে ইজদির প্রদেশের সব ট্রান্সফার হয়ে গেছে?’ বলল আহমদ মুসা।

‘না, তারা কোন টাইম লিমিট দেয়নি। কিন্তু ‘অবিলম্বে’ করতে হবে এই দাবী ছিল।’

আহমদ মুসার কপালের ভাঁজ আরও গভীর হলো। ভাবছিল আহমদ মুসা। তাদের এই ট্রান্সফার চাওয়া এবং তাদের পছন্দমত লোক বসানোর অর্থ হলো সেনা বিরোধিতা পরিহার করা অথবা সেনা সহায়তা লাভ করা। কিন্তু কেন? তারা পুলিশের ক্ষেত্রে এমন ধরনের কিছু করেনি তা নিশ্চিত। কিন্তু কেন করেনি? হঠাৎ আহমদ মুসার অবচেতন মনের কোন অতল থেকে একটা প্রবল জিজ্ঞাসা ভেনে এলো। তাহলে কি বড় ধরনের এমন কিছু করতে চাচ্ছে যাতে সেনা সহযোগিতা অপরিহার্য? সেটা বিদ্রোহ ধরনের কোন কিছু যেখানে পুলিশের তেমন কিছু ভূমিকা পালনের নেই? চিন্তার মধ্যে ডুবে গিয়েছিল আহমদ মুসা।

জেনারেল মেডিন মেসুদ বলল, ‘কী ভাবছেন মি. আবু আহমদ?’

‘ভাবছি, ওরা অপছন্দের সেনা অফিসারদের ট্রান্সফার ও পছন্দের সেনা অফিসারদের সেখানে এনে কী করতে চায়, কী তাদের টার্গেট, এটাই ভাবছিলাম।’ বলল আহমদ মুসা।

‘এলাকায় কিছু কাজ তারা বাগিয়ে নিতে চায়, এটাই আমি মনে করেছিলাম।’ বলল জেনারেল মেডিন মেসুদ।

‘সেটাই ভাবা যেত যদি ট্রান্সফার ও রিপ্লেসমেন্টের ঘটনা এক, দুই বা কিছু জায়গায় হতো বিচ্ছিন্নভাবে। কিন্তু তা হয়নি। তারা দেশের একটা অঞ্চলের চার-পাঁচটি প্রদেশ থেকে সরিয়ে দেশপ্রমিক সেনা অফিসারদের একখানে আনতে চায়, তাদের আজ্ঞাবহদের এলাকায়। এ ধরনের আয়োজন কিছু কাজ বাগিয়ে নেয়ার জন্যে হতে পারে না। আমার ধারণা, এর সাথে রাজনৈতিক বা ভূখন্ডগত স্বার্থ জড়িত থাকতে পারে।’ আহমদ মুসা বলল।

চমকে উঠল জেনারেল মেডিন মেসুদ।

তার চোখের দৃষ্টিও চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বলল, ‘মি. আবু আহমদ, আপনি সাংঘাতিক বিষয়ের দিকে ইংগিত করেছেন। তারা যে দাবী করেছে, একটা প্রদেশে

তারা সে দাবী আদায় করে নিয়েছে। তার লক্ষ্য যে, আপনি যা বলেছেন, ঐ ধরনের কিছু হতে পারে তা আমি ভাবতেও পারিনি। আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু সেটা কী? তারা তো কোন রাজনৈতিক দল নয়। কোন রাজনৈতিক দলের সাথে তাদের সম্পর্ক আছে বলেও জানি না। আর ভূখন্ডগত লক্ষ্য অর্জনের ব্যাপারটাতো আরও বড়।' জেনারেল মেডিন মেসুদের কণ্ঠে চিন্তার সুর। মুখে তার উদ্বেগের চিহ্ন।

'কিন্তু এমন হতে পারে আমরা হয়তো যা চিন্তা করতে পারছি না, এমন কিছু তো থাকতে পরে, ঘটতেও পারে। মাদক ব্যবসায়ের ফাঁদে ফেলে যাদের জেলে পাঠানো হচ্ছে, যাদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে এবং যাদের সেখানে বসানো হচ্ছে, দেখা যাচ্ছে তারা দুই শ্রেণীর মানুষ। 'সোহা' ও 'হোলি আর্ক গ্রুপ' সংগঠনগুলোর লোকজন এবং যাদের মাউন্ট আরারাত অঞ্চলে বসানো হচ্ছে, তারা দেখা যাচ্ছে আর্মেনীয় অরিজিন। তারপর তারা মাউন্ট আরারাতের উল্কি পরে। কিন্তু কেন? এই 'কেন'-এর উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের যেতে হবে সীমান্তের ওপারে আর্মেনিয়ায়। আর্মেনীয়দের ধর্মীয় জীবন শুধু মাউন্ট আরারাত কেন্দ্রিক নয়, মাউন্ট আরারাত কেন্দ্রিক তাদের একটা রাজনৈতিক দর্শনও আছে। আর্মেনীয়রা বলে প্লাবন সরে গেলে হযরত নূহ (আঃ)- এর কিস্তি যখন মাউন্ট আরাতের উপর এসে দাঁড়ালো, তখন প্লাবন থেকে জেগে ওঠা প্রথম ভূখণ্ড হিসাবে আর্মেনিয়ার রাজধানী 'ইয়েরেভেন'কে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। এই দেখতে পাওয়া থেকেই হযরত নূহ (আঃ)-এর নাম দিয়েছেন 'ইয়েরেভেন'। 'ইয়েরেভেন' অর্থ 'দেখা গেছে'। আর্মেনীয়রা মনে করে থাকে, হযরত নূহ (আঃ) নিজেই মাউন্ট আরারাত ও আর্মেনিয়াকে এক অবিচ্ছেদ্য অংশ করে গেছেন। এ ছাড়া তারা বলে মাউন্ট আরারাত সন্নিহিত গোটা অঞ্চল নিয়ে ছিল আর্মেনীয়দের 'ওরারতু' সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্যের নাম থেকে মাউন্ট আরারাতের নামকরণ করা হয়। সুতরাং ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উভয় দিক দিয়েই মাউন্ট আরারাত সন্নিহিত গোটা অঞ্চল আর্মেনীয়দের। তারা নিজেদের সেই 'ওরারতু' সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনে করে। কে জানে আপনার কথিত 'সোহা' ও 'হোলি আর্ক গ্রুপ' কোন লক্ষ্যে কাজ করছে। তবে আমি এটুকু জানি উল্কিওয়ালারা আর্মেনিয়ার অতিপ্রাচীন উগ্র জাতীয়তাবাদী একটা গ্রুপ। তারা গ্রেটার আর্মেনিয়ার জন্যে কাজ করে আসছিল।

আমি জানি না, ‘সোহা’ ও ‘হোলি আর্ক গ্রুপ’ এর উল্কিওয়ালারা সেই উল্কিওয়ালাদের উত্তরসূরী কিনা!’ দীর্ঘ বক্তব্য দিয়ে থামল আহমদ মুসা।

জেনারেল মেডিন মেসুদ স্তম্ভিত চোখে চেয়েছিল আহমদ মুসার দিকে। বলল, মি. আবু আহমদ, আপনি অদ্ভুত এক ইকুয়েশন করেছেন। যা মিলে গেছে উদ্ভুত পরিস্থিতির সাথে। আমি বিস্মিত হয়েছি। আপনি তুরস্কের সাথে আর্মেনিয়ার সংঘাতের অত্যন্ত গভীরে প্রবেশ করেছেন। প্রফেশনাল প্রয়োজনেই সামরিক একাডেমিতে আমাকে দেশের ইতিহাস ও প্রতিবেশীদের সাথে সম্পর্কের ইতিহাস পড়তে হয়েছে। কিন্তু ইকুয়েশনটা এভাবে আমাদের সামনে আসেনি। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। মাউন্ট আরারাত ও আর্মেনিয়া সম্পর্কে যা বলেছেন তাতো সত্যই। ওরারতু সাম্রাজ্য সম্পর্কে যা বলেছেন তা যে সত্য তার প্রমাণ আমাদের সামনেই রয়েছে। ‘হোলি আর্ক গ্রুপ’- এর তুরস্কের চীফ যিনি তার নাম ‘ওরান্ত ওরারতু’। অর্থাৎ, ‘ওরারতু সাম্রাজ্য তারা ফিরিয়ে আনতে চায়’- আপনার এ কথা সত্য।’ বলে একটু থামল জেনারেল মেডিন মেসুদ।

গম্ভীর হয়ে উঠল তার মুখ। সে মুখে অপরাধবোধের একটা চিহ্ন। বলল ধীর কণ্ঠে, ‘আমি জানি না তারা দেশের কী সর্বনাশ করার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। আমি তাদের সহযোগিতা করেছি, এখনও করছি। এখন বলুন আমি কী করতে পারি?’

‘জেনারেল মেডিন মেসুদ, শুধু আপনি কেন, এমন শত শত মানুষকে বিভিন্নভাবে ট্রাপে ফেলে ওরা ব্ল্যাকমেইলিং করছে। ওদের ষড়যন্ত্র বানচাল করে ওদের শাস্তি দেয়ার মাধ্যমেই শুধু ওদের এই কালো থাবা থেকে দেশের মানুষকে বাঁচানো সম্ভব। আপনি সাহায্য করেছেন। ওদের পরিচয় আপনার মাধ্যমেই জানতে পারলাম। এখন ওদের কোন ঠিকানা অথবা ওদের কোন কনট্যাক্ট সূত্র আমাদের পাওয়া দরকার যাতে বড় কিছু ঘটে যাওয়ার আগেই ওদের পাকড়াও করা যায়।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমি ওদের কোন ঠিকানা কোন দিন পাইনি। টেলিফোন নাম্বারও না। তবে অ্যানোস আব্দুল্লাহ্ গাজেন কি এক প্রেক্ষাপটে আমাকে ওদের একটা কনট্যাক্ট পয়েন্ট দিয়েছিলেন। আমি কোন দিন সেটা খতিয়ে দেখতে চেষ্টা করিনি। সেটা হলো...।’

কথা শেষ করতে পারলো না জেনারেল মেডিন মেসুদ।

'বাবা, তোমরা সাবধান! সাবধান! ওরা প্রহরীদের মেরে ফে...।' চিৎকার করে কথাগুলো বলতে বলতে ড্রইংরুমে প্রবেশ করল সালিহা সানেম।

কিন্তু সে কথা শেষ করতে পারল না। তার আগেই প্রচণ্ড শব্দে খুলে গেল দরজা। হুড়মুড় করে ঘরে প্রবেশ করল জনা পাঁচেক লোক। ওদের হাতে উদ্যত রিভলভার।

ওদের রিভলভার তাক করেছে জেনারেল মেডিন মেসুদ ও আহমদ মুসা দু'জনকেই।

আহমদ মুসা ও জেনারেল মেডিন মেসুদ দু'জনেই উঠে দাঁড়িয়েছিল।

ঘটনাটা তাদের কাছে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতই আকস্মিক।

আহমদ মুসার হাত দু'টি মাথা পর্যন্ত উঠেছিল। ওরা হাত তুলতে নির্দেশ দেয়নি তখনও। মনে হবে যেন আহমদ মুসা ভয়েই আগাম হাত তুলে ফেলেছে। আসল ব্যাপার হলো, আহমদ মুসার সাথের একমাত্র রিভলভারটা রয়েছে মাথার পছনে জ্যাকেটের গোপন পকেটে আটকানো। আরও একটা রিভলভার পকেটে ছিল। সেটা সিকিউরিটির লোকজন গেটেই রেখে দিয়েছে।

ড্রইংয়ে ঢুকেই ওদের একজন চিৎকার করে জেনারেল মেডিন মেসুদকে লক্ষ্য করে বলল, 'বিশ্বাসঘাতক, আমাদের সাথেও গাদ্দারী করলি? আমাদের শত্রু এক শয়তানকে আমাদের সব কথা বলে দিলি? এতক্ষণ তোর লাশ ফেলে দিতাম। কিন্তু সময় নিলাম এই কথা বলার জন্যে যে, তুই আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলি, কিন্তু তাতে লাভ হলো না। কারণ যে শয়তানকে সব কথা বলেছিস, তাকেও তোর সাথেই যেতে হবে পরপারে।'

বলে হো হো করে হেসে উঠল লোকটি। বলল, 'মনে করেছিলি চারদেয়ালের ভেতর ষড়যন্ত্র করবি, কেউ জানতে পারবে না। কিন্তু জানিস না তোকেও আমরা সার্বক্ষণিক পাহারায় রেখেছি। তোর বাড়ির ড্রইংরুমসহ কয়েকটি স্থানে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরাসহ ট্রান্সমিটার পতা রয়েছে। তোর সব কথা সব দৃশ্যই আমাদের কাছে পৌঁছে যায়।' একটু থামল লোকটি।

তাকাল সে ড্রইং রুমের ভেতরের দরজায় দাঁড়ানো সালিহা সানেমের দিকে। বলল, 'ভালোই হলো জেনারেল। তোর প্রাণ-ভোমরা অতিব আদরের একমাত্র সন্তানও হাজির। সেই প্রাণ-ভোমরা চোখের সামনে গুলি খেয়ে ঢলে পড়তে দেখলে তোর কেমন লাগবে?' বলেই রিভলভারের নল সে সালিহা সানেমের দিকে ঘুরিয়ে নিল।

'নিরস্ত্র একজন মহিলাকে মারতে আপনাদের লজ্জা হচ্ছে না।' বলল আহমদ মুসা।

'তাহলে শয়তান তোকে দিয়েই শুরু করি।' বলে রিভলভারের নল সে ঘুরিয়ে নিচ্ছিল।

আহমদ মুসার মাথা পর্যন্ত তোলা হাত দু'টো মাথার পেছন পর্যন্ত নেমে গিয়েছিল। লোকটির কথার রেশ বাতাসে মেলাবার আগেই তার ডান হাত মাথার পেছন থেকে রিভলভার টেনে নিয়েই হাতটা সামনে এনেই গুলি করল লোকটির ঠিক কপাল লক্ষ্য করে।

গুলি করেই আহমদ মুসা বাঁ দিকে মেঝের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু তার চোখ এবং রিভলভার ধরা হাতটা লক্ষ্য থেকে সরে আসেনি।

অন্য চারজন ইতিমধ্যে আহমদ মুসাকে টার্গেট করে ফেলেছিল। গুলি তারা করল। কিন্তু ততক্ষণে আহমদ মুসার দেহটা মাটিতে গিয়ে পড়েছে। চারটি গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পেছনের দেয়ালে গিয়ে আঘাত করল।

আহমদ মুসা মাটিতে পড়েই রিভলভারের ট্রিগার চেপে ধরেছিল। স্বয়ংক্রিয় রিভলভার থেকে একের পর এক বেরুতে লাগল গুলি। আহমদ মুসা শুধু তার রিভলভারের নলটাকে অবশিষ্ট চারজনের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিল। ওদিকে ওরা চারজন প্রথম গুলি করার পর দ্বিতীয় গুলির জন্যে রিভলভারের নল ঘুরিয়ে নিচ্ছিল নতুন টার্গেটের দিকে। কিন্তু দ্বিতীয় গুলি করার পজিশনে পৌঁছার আগেই আহমদ মুসার স্বয়ংক্রিয় রিভলভারের চারটি গুলি ওদের চারজনকে শিকার করে ফেলল।

ড্রইংরুমের ভেতরের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা সালিহা সানেম যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল।

আর বিমূঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিল জেনারেল মেডিন মেসুদ। তার পরনে জেনারেলের ইউনিফর্ম। কিন্তু সে সশস্ত্র ছিল না। আহমদ মুসার সাথে আলোচনায় বসার আগেই রিভলভার রেখে এসেছিল।

গুলি খেয়ে শেষ চারজনকে পড়ে যেতে দেখল জেনারেল মেডিন মেসুদ। তাকাল সে আহমদ মুসার দিকে। আহমদ মুসাএ হাতে রিভলভার। তখনও মেঝে থেকে ওঠেনি সে।

জেনারেল মেডিন মেসুদ ছুটে গেল আহমদ মুসার কাছে। বলল, 'আমি ঠিক আছেন তো মি. আবু আহমদ?'

'আল হামদুলিল্লাহ। আমি ঠিক আছি জেনারেল।'

জেনারেল মেডিন মেসুদ জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে। বলল, 'ধন্যবাদ আবু আহমদ। গতকাল আমার মেয়েকে বাঁচিয়েছেন। আজ আবার আমাদের দুজনকেই বাঁচালেন। আল্লাহ্'র হাজার শোকর।'

জেনারেল মেডিন মেসুদ আহমদ মুসাকে টেনে এনে বসাল সোফায়।

এই সময় সিকিউরিটির লোকেরা দৌড়ে এসে ঘরে ঢকল। একজন অফিসার পাঁচটি লাশের দিকে একবার তাকিয়ে বলল, 'স্যার, আপনারা ভলো আছেন তো? স্যার, গেটের তিন জন সিকিউরিটিকে মারতে ওরা সাইলেন্সার লাগানো রিভলভার ব্যবহার করেছে। রাস্তায় গাড়িতে থাকা আমরা কিছুই বুঝতে পারিনি।'

'হ্যাঁ, আমরা ভালো আছি। এই ভালো থাকার কৃতিত্ব তাঁর। মি. আবু আহমদের কাছে রিভলভার না থাকলে এবং তিনি বিস্ময়কর ধরনের ক্ষীপ্র না হলে ওদের বদলে আমাদের লাশই পড়ে থাকতো।' বলল জেনারেল মেডিন মেসুদ।

'স্যরি, ইট ইজ এ গ্রেট ল্যাপস অন আওয়ার পার্ট, স্যার।' সেই অফিসারটি বলল।

'ল্যাপস কিছু হয়নি তোমাদের। বল, ওরা সফল হয়েছিল।' বলল জেনারেল মেডিন মেসুদ। সে একটু থেমেই আবার বলল, 'লাশগুলোর ব্যবস্থা কর অফিসার।'

‘স্যার, পুলিশকে ইনফর্ম করেছি। ওরা আসছে। স্যার, আপনারা একটু ওদিকে বসুন। আমরা এদিকটা দেখছি।’ অফিসারটি বলল।

‘ওকে নিয়ে তুমি এসো বাবা ভেতরের লাউঞ্জে। আমি দেখছি ওদিকে।’ বলেই সালিহা সানেম ভেতরে ঢুকে গেল।

‘চলুন মি. আবু আহমদ। আমরা ওদিকে বসি।’ বলল জেনারেল মেডিন মেসুদ।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, ‘মি. জেনারেল, ওদের বলুন ওরা লাশগুলোকে ভালোভাবে যেন সার্চ করে। ওদের পরিচয়, ঠিকানা আমাদের দরকার।’

জেনারেল তাকাল অফিসারের দিকে। অফিসার স্যালুট দিয়ে বলল, ‘আমরা সবকিছু ভালোভাবে দেখব স্যার।’

‘আচ্ছা মি. আবু আব্দুল্লাহ, আপনার কাছে তো রিভলভার থাকার কথা নয়। ওটা তো সিকিউরিটিরা গেটেই রেখে দেয়ার কথা।’ চলতে চলতে বলল জেনারেল মেডিন মেসুদ।

‘আমার পকেটের রিভলভারটা ওদের দিয়েছিলাম। কিন্তু লুকানো দ্বিতীয় রিভলভার আমি দেইনি।’ বলল আহমদ মুসা।

‘গোপন করলেন কেন? আপনি কি জানতেন এ ধরনের ঘটনা ঘটবে?’ বলল সালিহা সানেম।

‘জানার কথা অবশ্যই নয়। আমি আমার অভ্যাস বশতই আমার গোপন অস্ত্রটি আমার কাছে রেখেছিলাম।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ধন্যবাদ। মি. আবু আব্দুল্লাহ। আপনার এই অভ্যেস আজ আমাদের বাঁচিয়েছে।’ বলল জেনারেল মেডিন মেসুদ।

‘আচ্ছা ধরুন স্যার, যদি আপনার কাছে রিভলভার না থাকতো, তাহলে কী করতেন আজ?’ জিজ্ঞাসা সালিহা সানেমের।

‘কী করতাম ঘটনা ঘটার পর বলা মুষ্কিল। তবে প্রথম সুযোগেই ওদের একজনের অস্ত্র দখল করার চেষ্টা করতাম। আল্লাহর সাহায্য চাইতাম...’

‘ধন্যবাদ মি. আবু আহমদ। সব বিষয়ই আল্লাহ্ আপনাকে অকৃপণ হাতে দিয়েছেন। তাঁর হাজার শোকর।’ বলল জেনারেল মেডিন মেসুদ।

আহমদ মুসা কিছু বলার জন্য মুখ খুলেছিল। কিন্তু তার আগেই সালিহা সানেম বলল, ‘আমরা এসে গেছি। আসুন, বসেই আমরা কথা বলি।’

সবাই এগোলো বসার জন্যে সোফার দিকে।

# ৩

আংকারা এয়ারপোর্ট।

ভি.ভি.আই.পি. পার্কিং-এ গাড়ি থেকে নামল আহমদ মুসা।

একজন সামরিক অফিসার ছুটে এসে বলল, 'স্যার আসুন।'

আহমদ মুসাকে নিয়ে অফিসারটি লিফটে প্রবেশ করল।

লিফট তাদেরকে ভি.ভি.আই.পি. লাউঞ্জে নিয়ে এল।

অফিসারটি আহমদ মুসাকে একটা সোফায় বসিয়ে তার তিন-চার গজ পেছনে গিয়ে এ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল।

মিনিট খানেকের মধ্যেই জেনারেল মেডিন মেসুদ সেখানে এল। সেনা অফিসারকে যেতে বলে আহমদ মুসার কাছে এল সে।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়ে তার সাথে হ্যান্ডশেক করল। বলল, 'সালিহা সানেম আসেনি?'

ম্লান হাসল জেনারেল মেডিন মেসুদ। বলল, 'একদম ছেলে মানুষ। জেদ ধরে বসে আছে। আমাকে বলেছে, আমি স্যারকে বিদায় দিতে পারবো না। আমি যাব না এয়ারপোর্টে। এই জেদ থেকে তাকে নড়াতে পারিনি।'

বলে জেনারেল মেডিন মেসুদ পকেট থেকে একটা ফোল্ডার বের করে আহমদ মুসার হাতে দিয়ে বলল, 'এতে আপনার টিকেট ও বোর্ডিং কার্ড রয়েছে।'

'ধন্যবাদ!' বলে ফোল্ডারটি নিয়ে আহমদ মুসা হ্যান্ড ব্যাগের পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, 'আমার সাথে প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের বৈঠক হয়েছে। সেখানে জেনারেল মোস্তফা এবং সেনাপ্রধানও ছিলেন। আপনার বিষয়টি নিয়েও আমি আলোচনা করেছি। আপনি পদত্যাগ করতে চান, সে কথাও আমি আলোচনা করেছি। তারা পদত্যাগের সাথে একমত হননি। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে, তার তত্বাবধানে সেনা, পুলিশ ও বাছাইকরা কিছু গোয়েন্দা অফিসারকে নিয়ে 'অ্যান্টি টেরোরিস্ট ব্যুরো' (ATB) নামে একটা 'অপারেশন সেল' হচ্ছে, সেখানেই

আপনাকে কো-ডাইরেক্টর হিসাবে নিতে চান। আমি এটাকে খুব ভালো মনে করেছি।'

'আমি পদত্যাগ অফার করেছি আমার বিবেকের তাড়নায়। তবে আমার জন্যে তাঁরা যা ভালো মনে করছেন, আপনি যা ভালো মনে করছেন, তার মধ্যেই আমার কল্যাণ আছে বলে আমি মনে করছি।' বলল জেনারেল মেডিন মেসুদ।

'ধন্যবাদ জেনারেল। প্রধানমন্ত্রী শিঘ্রই আপনাকে ডাকবেন।' আহমদ মুসা বলল।

জেনারেল মেডিন মেসুদ কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলা হলো না। সালিহা সানেম গট গট করে পা ফেলে সেখানে এসে হাজির হলো। তার পরনে তুর্কি সুলতান পরিবারের ঐতিহ্যিক পোষাক। মুখের একাংশে পাতলা একটা নেকাব।

খুশি হলো আহমদ মুসা। বলল, 'ধন্যবাদ সালিহা সানেম, তুমি এসেছ সেজন্য।'

সালিহা সানেম নিজেকে সোফার উপর ছুঁড়ে দেবার মত ধপ করে বসে বলল, 'ওয়েলকাম, স্যার। আমি এসেছি, কিন্তু বিদায় দেবার জন্যে নয়। একটা কথা বলার জন্যে এসেছি।'

'কী কথা?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'আপনি কবে আসবেন, এ ওয়াদা নেবার জন্যে আমি এসেছি।' বলল সালিহা সানেম।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'ভ্যান অঞ্চলে যে আমি আসব কখনও ভাবিনি, গতকাল আমি আংকারার আংগোরায় এসেছি, এটাও আমার ভাবনার অতীত ছিল। এভাবেই আবার একদিন হয়তো আংকারায় এসে পড়ব। ওয়াদা আমার নিও না বোন।'

বোন সম্বোধনে কেমন যেন ছায়া নেমে এসেই যেন আবার মিলিয়ে গেল।

একটু দেরি করল উত্তর দিতে। একটু ম্লান হাসি ফুটে উঠল মিস সালিহা সানেমের মুখে। বলল সে, 'বোন বললে তো আসা মাস্ট হয়ে গেল। তাহলে তো ওয়াদা করতেই হবে।'

‘ভাইয়ের বাড়িতে যাওয়াটাও বোনের জন্যে মাস্ট। আমি তোমাকে, জেনারেল সাহেব ও ম্যাডামকে মদীনায় আমার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এবারই হজ্বে আসুন। অথবা ওমরার জন্যেও আসতে পারেন। আমরা খুশি হবো।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ভাইয়া ঠিক বলেছেন বাবা। আমরা যাব। তুমি প্রোগ্রাম কর।’ সালিহা সানেম বলল।

‘আলহামদুলিল্লাহ্। ওর আমন্ত্রণ খুবই মূল্যবান মা। খুবই আনন্দের হবে আমাদের জন্যে। হজ্বের স্বপ্ন আমাদের মনে ছিল। সে স্বপ্ন উনি বাস্তবতায় নিয়ে এলেন। আমরা শীঘ্রই পারিবারিকভাবে বসে সিদ্ধান্ত নেব।’ বলল জেনারেল মেডিন মেসুদ।

‘ওয়েলকাম জেনারেল। আমরা খুবই খুশি হবো। আমাকে প্লীজ আপনি জানাবেন।’ আহমদ মুসা বলল।

একটু থেমেই আবার মুখ খুলল আহমদ মুসা। বলল, ‘একটা বিষয় আমি ভেবেছিলাম, কিন্তু বলতে ভুলে গেছি।’

‘আমি কি সানেম মাকে একটু ঘুরে আসতে বলব?’ জিজ্ঞাসা জেনারেল মেডিন মেসুদের।

‘না, ও থাকলে ক্ষতি নেই। বিষয়টা তেমন কিছু নয়।’ আহমদ মুসা বলল।

বলে একটু থামল আহমদ মুসা। শুরু করল আবার, ‘আপনি কি ভেবেছেন আপনার বৈঠকখানায় আমাদের আলোচনা ওরা সংগে সংগেই জানতে পারে, যার ফলে সংগে সংগেই ওরা আক্রমণ করে আমাদের হত্যার জন্যে। কিভাবে এটা সম্ভর হয়েছে?’

জেনারেল মেডিন মেসুদ বলল, ‘বাড়ির কেউ এটা ওদের জানিয়েছে বলে সন্দেহ করেন? কিন্তু...’

জেনারেল মেডিন মেসুদের কথার মাঝখানেই বলে উঠল আহমদ মুসা, ‘কিন্তু আপনার কথা ঠিকই, বড়ির কেউ সব কথা শোনেনি। শুনলেও একই সবকিছু শোনা ও বলা সম্ভব নয়।’

‘তাহলে?’ জিজ্ঞাসা জেনারেল মেডিন মেসুদের।

'আমি মনে করি আপনার বাসায় ওরা সিসিটিভি ক্যামেরা ও ট্রান্সমিটার বসিয়ে রেখেছে। আপনাকে সবসময় ওরা ওয়াচে রেখেছে এবং আপনার সব কথা-বার্তাও মনিটর করছে।'

মুখ মলিন হয়ে গেল জেনারেল মেডিন মেসুদের। বিস্ময়ও নামল তার চোখে-মুখে। বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন, এটাই ঘটেছে। ধন্যবাদ আপনাকে। আমি আজই এসব খুঁজে বের করব। এখনি খবর দিচ্ছি সেনাবাহিনীর আলট্রা সেন্সর টিমকে।'

'ওরা কারা বাবা? ওরা তোমাকে অনেক কথা বলেছে।' বলল সালিহা সনেম।

বিব্রত জেনারেল মেডিন মেসুদ কিছু বলার আগেই আহমদ মুসা বলল, 'ওরা দেশের শত্রু বোন।'

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই জেনারেল মেডিন মেসুদ বলল, 'আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছি মি. আবু আহমদ। মাউন্ট আরারাত অঞ্চলের যে সেনা অফিসারদের ট্রান্সফার করা হয়েছিল এবং তাদের জায়গায় যাদের রিপ্লেস করা হয়েছিল, সেই ট্রান্সফার ও রিপ্লেসমেন্ট বাতিল করার অর্ডার তৈরি করেছি। কালকেই এটা কার্যকরী হবে।'

'না মি. জেনারেল এটা করবেন না। ওদেরকে আমরা ওদের মত করে চলতে দিতে চাই। ট্রান্সফার ও রিপ্লেসমেন্ট বাতিল করলে ওরা বুঝতে পারবে যে, ওদের ষড়যন্ত্র আমরা ধরতে পেরেছি। তাদের এই ষড়যন্ত্র ধরা পড়েছে এটা ওদের আমরা জানতে দিতে চাই না। আমরা দেখতে চাই, কী ষড়যন্ত্র ওরা করেছে। প্রধানমন্ত্রী, সেনাপ্রধান জেনারেল মোস্তফা সবাই আমার সাথে একমত। এটা আমাদের জন্যে একটা সুযোগ। এই সুযোগ আপনিই সৃষ্টি করে দিয়েছেন মি. জেনারেল।' বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই এয়ার লাইন্সের একজন অফিসার এসে জেনারেল মেডিন মেসুদকে বলল, 'স্যার, বোর্ডিং শেষ। স্যারকে নিতে এসেছি।'

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'চলুন অফিসার।'

হ্যান্ডশেকের জন্য আহমদ মুসা হাত বাড়িয়ে দিল জেনারেল মেডিন মেসুদের দিকে।

'সময় খুব তাড়াতাড়িই চলে গেল। আমি কৃতজ্ঞ মি. আবু আহমদ। আপনার হতে আমার নতুন জন্ম হয়েছে।' হ্যান্ডশেক করতে করতে বলল জেনারেল মেডিন মেসুদ।

'আমি কিছুই করিনি জেনারেল। যেটা ঘটেছে, সেটা আপনার তকদির। আল্লাহ্ মানুষের জন্যে খেদমত চান। আল্লাহ্ আপনার সহায় হোন।'

বলেই আহমদ মুসা তাকাল সালিহা সানেমের দিকে। হসল। বলল, 'এবার তুমি বিদায় না জানালেও আমি বিদায় নেব।'

'আমি বিদায় জানাব না। তবে বলব আসুন।' বলল সালিহা সানেম।

'এটা বিদায় জানাবারই ভাষা।' বলল আহমদ মুসা।

হাসল সালিহা সানেম। বলল, 'আমি পরাজয় স্বীকার করলাম। জানেন তো মেয়েদের মন নরম।'

'আল্লাহ্ নরম মন পছন্দ করেন। আল্লাহ্ হাফেজ বোন।'

বলে সকলের উদ্দেশ্যে সালাম দিয়ে আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করল।

আহমদ মুসার পেছনে চলল এয়ার লাইন্সের অফিসার। আহমদ মুসা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে। এরপরও সেদিকে সম্মোহিতের মত তাকিয়ে আছে সালিহা সানেম।

জেনারেল মেডিন মেসুদ ধীরে ধীরে হাত রাখল মেয়ের কাঁধে। বলল, 'চল মা।'

চমকে উঠে পেছন ফিরে তাকাল সালিহা সানেম। সেই সাথে চোখের অশ্রু মোছার চেষ্টা করল। বলল, 'বাবা, ওকে না দখলে আমাদের পৃথিবী দেখা অসম্পুর্ণ থেকে যেত। পৃথিবীর মানুষ সম্পর্কে আমার ধারণা পাল্টাতো না। অর্থ ও এনজয়মেন্টের বাইরে আজকের মানুষ কিছুই ভাবে না। আমি ওকে বিদায় জানাব কি করে, উনি যে আমাকে নতুন জীবন দিয়ে গেলেন।' আবেগে জড়িয়ে গেল

শেষের কথাগুলো সালিহা সানেমের। নতুন করে সিক্ত হলো তার চোখ দু'টি অশ্রুতে।

'মা, আমিও জীবনে প্রথম বারের মত এমন মানুষের মুখোমুখি হলাম। তুমি সব কথা জান না মা। উনি ইচ্ছে করলে আমার জীবন ধ্বংস করে দিতে পারতেন। কিন্তু তার পরিবর্তে তিনি আমাকে নতুন জীবন দিয়ে গেলেন। কুরআন শরীফে পড়েছি, আল্লাহ্ বান্দার জন্যে তার দয়াকে অবশ্যকর্তব্য করে নিয়েছেন। ইনি আল্লাহর সে ইচ্ছারই একজন সাক্ষাত দূত। অপরাধীরা এদের স্পর্শেই সোনার মানুষ হয়ে যান। আল্লাহ্ ওকে দীর্ঘজীবী করুন।' বলল জেনারেল মেডিন মেসুদ।

'ওর পরিচয় সম্পর্কে কিছুই জানি না। কে উনি, ওর পরিচয় কী?' জিজ্ঞাসা সালিহা সানেমের।

'আমিও জানিনা মা। আমাদের প্রধানমন্ত্রী, প্রেসিডেন্টও ওকে সমীহ করেন, শ্রদ্ধা করেন। তার যে কোন কথাই মেনে নেন। বিস্ময়কর এই মানুষ। তার পরিচয় সম্পর্কে আমিও কিছুই জানি না।' বলল জেনারেল মেডিন মেসুদ।

'এ কারণে আরও কষ্ট লাগছে বাবা।' বলল সালিহা সানেম।

'আমাদের এই কষ্টই ওদের জীবনের সার্থকতা মা। মানুষকে এভাবে জয় করতে পারার চেয়ে বড় সার্থকতা আর নেই মা।'

কথা শেষ করেই বলল, 'চল মা।' বাবা-মেয়ে দু'জনেই হাঁটা শুরু করল। আকাশে উড়ল আহমদ মুসার প্লেন।

'বাবা, এ প্লেন কি ইস্কান্দারুন হয়ে ভ্যান যাবে?' বলল সালিহা সানেম।

'না মা, ভ্যানের জন্যে এটা বিশেষ ফ্লাইট। মি. আবু আহমদের জন্যে এই ফ্লাইটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভ্যানকে এটা জানিয়েও দেয়া হয়েছে মি. আবু আহমদ নামে একজন বিশেষ মেহমান যাচ্ছে এই ফ্লাইটে।'

'আলহমদুলিল্লাহ্। আল্লাহ্ তার সম্মান বাড়িয়ে দিন।' বলল সালিহা সানেম। লিফট থেকে নেমে তারা গাড়ির দিকে এগোলো।

ইজদির-ভ্যান হাইওয়ে ধরে একটা ব্রান্ড নিউ মাইক্রো ছুটে যাচ্ছে ভ্যানের দিকে।

মাইক্রোটি সেনাবাহিনীর। গাড়ির নাম্বার বলছে মাইক্রোটি ইজদির সেনা-ডিভিশনের। নাম্বার জিরো থারটিন।

মাইক্রোতে আরোহী পাঁচজন। ড্রাইভিং আসনে একজন সেনা ড্রাইভার। মাঝের সীটে দু'জন, সাধারণ পোষাক পরা লোক।

আর একদম পেছনের সীটে দু'জন সামরিক অফিসার। চলছে গাড়ি। মাঝের সীটে সাধারণ পোষাক পরা দু'জন কথা বলছিল। দু'জনের একজনের পরনে কমপ্লিট স্যুট। অন্যজন প্যান্টের সাথে জ্যাকেট পরেছে।

স্যুট পরা লোকটি পেছন দিকে সামরিক অফিসারের পোষাক পরা দু'জনকে লক্ষ্য করে বলল, 'সাইমন, সোরেন শোন, এটা চূড়ান্ত একটা মিশন। এতে ব্যর্থ হওয়া যাবে না। তোমরা তাকে মারতে না পারলে, হয় সে মারবে তোমাদের, না হয় আমরা মারব তোমাদর। তোমাদের দু'জনের কোমরের বেল্টে বোমা পাতা আছে। তার রিমোট কন্ট্রোল আছে আমাদের হাতে। তোমরা তাকে মারতে ব্যর্থ হলেই তোমাদের দেহ উড়ে যাবে। আর যদি মারতে পার, তাহলে শুধু নতুন জীবন পাবে না, পাবে অঢেল টাকা, দুইজনে পাঁচ মিলিয়ন করে দশ মিলিয়ন ডলার।'

'স্যার। আমরা মারতে যাচ্ছি, মরতে নয়। এটা নিশ্চিত হলেই হয় যে, তিনি এই ফ্লাইটে আসছেন। ভ্যান এয়ারপোর্টে নামছেন, ভিভিআইপি কার পার্কিং-এ তিনি আসছেন গাড়িতে ওঠার জন্যে। তাহলে সে নির্ঘাত আমাদের হাতে মরবে যদি ভিভিআইপি কার পার্কিং-এ ঢোকার আমরা সুযোগ পাই।' বলল সেনা অফিসারের পোষাক পরা দু'জনের একজন।

সুটধারীই আবার কথা বলল, 'যা নিশ্চিত হতে চাইছো, তা সবই নিশ্চিত। মি. আবু আহমদ এই ফ্লাইটেই আসছেন। কারণ এ বিশেষ ফ্লাইটটি আবু আহমদের জন্যেই। এয়ারপোর্টের কী পয়েন্টে বসা আমাদের লোক আজ সকালেই এই নিশ্চিত খবরটা দিয়েছে। ক'মিনিট আগেও জানিয়েছে বিশেষ প্লেনটি এখন মধ্য পথে। আর ভিভিআইপি লাউঞ্জ থেকে তারা যে এক্সিট প্ল্যান করেছে এয়ারপোর্টের

সিকিউরিটির লোকরা, সেটাও আমাদের সেই লোকই যোগাড় করে দিয়েছে। তাকে স্বাগত জানানোর জন্যে ভিভিআইপি লাউঞ্জে তার সাথে মিলিত হবেন ভ্যানের পুলিশ প্রধান মাহির হারুন, ড. আজদা, ড. সাহাব নূরী, সাবিহা সাবিত। তাকে নিয়ে নাম্বার ওয়ান ভিভিআইপি কার পার্কিং-এ আসবে। এক নাম্বার ট্রাকে প্রস্তুত আছে তার জন্য গাড়ি। লিফট থেকে তারা বের হয়ে গাড়ির দিকে এগোবে গাড়িতে ওঠার জন্যে।

এই এক্সিট প্ল্যানটা নিশ্চিত। আর তোমাদের এয়ারপোর্টে ঢুকতে কোন অসুবিধা হবে না। ইজদির পদেশের সেনা ডিভিশনের একজন জেনারেল কমান্ডিং অফিসারের চিঠি তোমাদের কাছে থাকবে। চিঠিতে লেখা আছে তিনি তার একজন আতশয়াকে রিসিভ করার জন্যে তোমাদের পাঠিয়েছেন। একজন ভিভিআইপি প্যাসেঞ্জারের নামও যোগাড় করা হয়েছে প্লেনের যাত্রী লিস্ট থেকে। ঐ যাত্রীকে যারা রিসিভ করতে যাবেন, এয়ারপোর্টে ঢোকার মুখে তাদের গাড়ি আটকাবার ভিন্ন ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুতরাং ভিভিআইপি কার পার্কিং-এ ঢুকতে পারার ব্যাপারটাও নিশ্চিত।'

'তাহলে স্যার, আবু আহমদের মৃত্যুর ব্যাপারটাও নিশ্চিত।' বলল পেছন থেকে সামরিক অফিসারের পোষাক পা দ্বিতীয় লোকটি।

'ধন্যবাদ, এই রকম ডিটারমিনেশনই তো চাই। তবে আবার সাবধান করে দিচ্ছি, আবু আহমদের রিভলভার অসম্ভব ক্ষীপ্র। তোমরা যদি আগে তার চোখে পড়ো, তাহলে তোমরা কিছুই করতে পারবে না তাকে।' বলল স্যুট পরা লোকটিই আবার।

'ধন্যবাদ স্যার। অবশ্যই আমরা সাবধান থাকবো। তবে জেনে রাখবেন স্যার, স্নেক গ্রুপের আমরা যারা, তাদের গুলি কখনো মিস হয় না।' সেনা অফিসারের পোষাক পরা অন্যজন বলল।

'ধন্যবাদ!' বলল মাঝের আসনের স্যুট পরা সেই লোকটি। সীটে এবার সোজা হয়ে বসল মাঝের আসনের লোকটি।

ছুটে চলেছে গাড়ি। নিরবতা কয়েক মুহূর্তের।

নিরবতা ভাঙল মাঝের আসনের লোকটি। বলল একটু ছোট স্বরে, 'আমি বুঝতে পারছি না আংকারায় আমাদের পাঁচজন লোক জেনারেল মেডিন মেসুদের বাড়িতে ঐভারে বেঘোরে মারা পড়ল কী করে? জেনারেল মেসুদ কি আমাদের হাতের বাইরে চলে গেল?'

'সর্বনাশের হোতা এখানেও সেই আবু আহমদ নামের শয়তান লোকটা। আমাদের লোক যারা জেনারেলের উপর চোখ রাখছিল, তারা গত পরশু আমাদের জানায়, আবু আহমদকে জেনারেলের মেয়ের সাথে জেনারেলের বাড়িতে ঢুকতে দেখা গেছে। আমরা তখনই বিপদের গন্ধ পাই এবং ঘটনা মনিটর করতে বলি। পরে রাতেই তারা আবার যোগাযোগ করে। তারা জানায় যে, আবু আহমদ জেনারেলের মেয়েকে গুন্ডাদের হাত থেকে রক্ষা করে তাকে পৌঁছে দেবার জন্যেই জেনারেলের বাড়িতে এসেছে। জেনারেলের মেয়েকে কিডন্যাপ করা হয়েছিল। জেনারেলের সাথে আবু আহমদের যে কথা-বর্তা হয়েছিল তার বিষয়বস্তু ছিল গুন্ডাদের হাত থেকে তার মেয়েকে উদ্ধার সম্পর্কে। এথেকে প্রাথমিক আশংকা আমাদের কেটে যায়। আরপর কি হলো আর জানা যায়নি। কিন্তু হঠাৎই গতকাল বেলা ১২ টার দিকে খবর আসে, আমাদের পাঁচজন লোক জেনারেলের বাসভবনে নিহত হয়েছে। তাঁরা জানায়, আমাদের আংগোরা ঘাঁটি প্রধানের নেতৃত্বে ঘাঁটির চারজন লোক তড়িঘড়ি করে বেরিয়ে যায় সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে। তাদের নিহত হবার খবর আসে বেলা ১২ টায়। পরে রহস্য পরিষ্কার হয়ে যায়। ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা ও ট্রান্সমিটার মনিটর থেকে জানা গেছে সব ব্যাপার। জেনারেলের সাথে আমাদের গোপন সম্পর্কের বিষয়টি আবু আহমদ জানতে পেরেছিল আগেই। আবু আহমদের সরাসরি জিজ্ঞাসাবাদে জেনারেল সব কিছু স্বীকার করে বসে। এটুকুই শুধু জানা গেছে। তবে সিসিটিভিতে দেখা গেছে, আমাদের লোকদের আবু আহমদ কিভাবে খুন করেছে। সম্ভবতঃ জেনারেল আবু আহমদের জিজ্ঞাসাবাদে সব ফাঁস করে দিলে আমাদের লোকরা জেনারেল ও আবু আহমদকে হত্যার জন্যেই ওখানে তাড়াহুড়া করে ছুটে যায়। সিসিটিভি'র রিপোর্টে দেখা গেছে, আমাদের লোকরা আবু আহমদ, জেনারেল ও ওখানে উপস্থিত সবাইকেই টার্গেট করেছিল।' দীর্ঘ বক্তব্য দিয়ে থামল স্যুট পরা লোকটি।

‘তাহলে জেনারেল বিশ্বাসঘাতকতা করেছেই দেখা যাচ্ছে।’ বলল জ্যাকেট পরা লোকটি।

‘আবু আহমদের কাছে ধরা পড়ার পর সে গড় গড় করে সব বলে দিয়েছে।’ স্যুট পরা লোকটি বলল।

‘আবু আহমদকে জেনারেলের ওখানেই মারতে পারলে ভালো হতো। আমাদের লোকরা সে চেষ্টাই করেছিল। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। আবু আহমদ নিশ্চয় ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছে সব কিছু এবং তা সরকারকে জানিয়ে দিয়েছে। এখন তাকে মেরে সেই ফলতো আমরা পাবো না।’ বলল জ্যাকেটওয়ালা।

‘আবু আহমদ দুনিয়ায় না থাকলে সরকার সবকিছু জানলেও আমাদের কোন ক্ষতি হবে না। সরকার আমাদের কিনে ফেলা ও দুর্নীতিবাজ সেনা, পুলিশ ও গোয়েন্দাদের দিয়ে আমাদের আট-ঘাট বাধা পরিকল্পনাকে বাধা দিতে পারবে না। শুধু চাই আমরা এখন আবু আহমদের মৃত্যু।’ স্যুট পরা লোকটি বলল।

এয়ারপোর্টের প্রবেশ পথে এসে পড়েছে গাড়ি।

‘গেটের বাইরে পুলিশের যে গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে, তার পাশে গাড়ি দাঁড় করাও।’ নির্দেশ দিল স্যুটধারী লোকটি।

পুলিশের গাড়ির পাশে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল। সেনা অফিসারের পোষাক পরা দু’জন গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। সেনা অফিসারের পোষাক পরা দু’জন পেছনের সীট থেকে মাঝের সীটে এসে বসল। স্যুট পরা লোকটি গাড়ির জানালার কাছে মুখ নিয়ে বলল, ‘তোমরা যাও। ভিভিআইপি কার পার্কিং-এ তোমারা ঢুকে যাওয়ার পর আমরা ঢুকব। ভিভিআইপি কার পার্কিং-এর সর্বশেষ প্যাসেজে দাঁড়িয়ে থাকবে এই পুলিশের গাড়ি। এই গাড়িতে আমরা থাকব। মনে থাকে যেন দু’জনে দু’টি গুলি এক সাথেই করবে। টার্গেট গুলিবিদ্ধ হয়েছে নিশ্চিত হয়ে তোমরা দ্রুত গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে আসবে। আমাদের পুলিশের গাড়ি তোমাদের ফলো করবে। তোমাদের কোন ভয় নেই। যাও তোমরা।’

গাড়িটা স্টার্ট নিয়ে চলল এয়ারপোর্টে প্রবেশের জন্যে।

স্যুট ও জ্যাকেটধারী পুলিশের গাড়ির কাছে যেতেই সামনের ও পেছনের দুই দরজা এক সাথে খুলে গেল।

গাড়িটার ড্রাইভিং সীটে ছেটে ছিল একজন পুলিশ। পেছনের সীটে ডিডিপি(ডেপুটি ডাইরেকটর অব পুলিশ) র‍্যাংকের একজন পুলিশ অফিসার। কিন্তু দু'জনের কাছেই ইজদির প্রদেশের ডিডিপি ও সাব ইন্সপেক্টর অব পুলিশের আইডি কার্ড আছে। কার্ডে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর স্বাক্ষর। সেই সাথে তাদের কাছে ইজদির প্রশাসন-কতৃপক্ষের চিঠি। তারা এসেছে একজন ভিভিআইপি প্যাসেঞ্জারকে রিসিভ করে ইজদির নিয়ে যাবার জন্যে।

স্যুট পরা লোকটি বসল ডিডিপি'র পাশে। আর জ্যাকেট পরা লোকটি বসল ড্রাইভিং সীটে বসা ইন্সপেক্টরের পাশে।

বসেই স্যুট পরা লোকটি পকেট থেকে দু'টি আইডি কার্ড বের করে ডিডিপি-কে দেখিয়ে বলল, 'এই দেখুন আইডি কার্ড। আমরা দু'জন বোনাফাইড গোয়েন্দা অফিসার।' হেসে উঠল দু'জনই হো হো করে।

গাড়ি ভিভিআইপি লাউঞ্জে রেখে লিফট দিয়ে উঠে ভিভিআইপি লাউঞ্জে ঢুকল ড. আজদা, ড. সাহাব নূরী ও সাবিহা সাবিত। তারা দেখল, ভ্যান পুলিশের ডিজিপি মাহির হারুন আগে থেকেই সেখানে উপস্থিত।

ড. আজদাদের দেখেই ডিজিপি মাহির হারুন বলল, 'আমি আপনাদের কথাই ভাবছিলাম। আপনারা দেরি করছেন কেন?'

'ধন্যবাদ স্যার। প্লেন সিডিউল সময়ে আসলেও পনের-বিশ মিনিট সময় আছে প্লেন ল্যান্ড করতে।' বলল ড. আজদা।

'আপনি বলছেন আরও পনের বিশ মিনিট দেরি আছে। কিন্তু আরও বিশ মিনিট আগে আংকারা থেকে পুলিশ প্রধান এরকেন আমাদের তাড়া দিয়েছেন যাতে তাড়াতাড়ি আমি এয়ারপোর্টে এসে আবু আহমদের সিকিউরিটির বিষয়টা দেখি।' ডিজিপি মাহির হারুন বলল।

'মি. আবু আহমদের নিরাপত্তা নিয়ে ওরা এত উদ্বিগ্ন?' বলর ড. আজদা।

‘কারণ মি. আবু আহমদকে আমরা চিনি না, তারা চেনেন। এসব বিষয় নিয়ে আজ সকালেই প্রসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, সেনা প্রধান ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা প্রধানের সাথে সম্মিলিত মিটিং করেছেন দীর্ঘক্ষণ ধরে। সেখান থেকেই তিনি সোজা এসেছেন আংকারা এয়ারপোর্টে।’ ডিজিপি মাহির হারুন বলল।

‘আসলে উনি কে স্যার? রাষ্ট্রের শীর্ষ ব্যক্তিরা যার সাথে দীর্ঘক্ষণ বসে মিটিং করেন, তিনি অতি অসাধারণ। কে তিনি?’ জিজ্ঞাসা সাবিহা সাবিতের। বিস্ময় তার চোখে।

‘আমি জানি না সাবিহা সাবিত। আমি বিস্মিত উপরের যারা জানেন, তারা কেউ মুখ খুলেন না। কয়েকদিন আগে আমি আংকারা গেলে পুলিশ প্রধান মি. এরকেনকে জিজ্ঞেস করেছিলেন মি. আবু আহমদ আসলে কে? তিনি বলেছিলেন যে এ প্রশ্ন তারও। কিন্তু প্রশ্নটা তিনি অন্য কাউকে করতে সাহস পাননি। তিনি বলছেন, প্রসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও জেনারেল মোস্তফা ছাড়া আর কেউ তার পরিচয় জানেন না।’ বলল ডিজিপি মাহির হারুন।

মুখ হা হয়ে গেল ড. আজদা, ড. সাহাব নুরী ও সাবিহা সাবিতের। সাবিহা সাবিতই বলল, ‘এমন ব্যক্তিত্ব কে হতে পারেন স্যার, আমাদের দেশে কিংবা মুসলিম বিশ্বে?’

কিছু বলতে যাচ্ছিল ডিজিপি মাহির হারুন, এ সময় এয়ার লাইনসের প্রোটকল অফিসার এসে মাহির হারুনকে বলল, ‘স্যার, প্লেন ল্যান্ড করেছে। মি. আবু আহমদই প্রথম নামবেন।’

সবার চোখ গেল কাঁচের দেয়ালের ভেতর দিয়ে বাইরে।

দুই তিন মিনিটের মধ্যেই এয়ার লাইন্সের সেই প্রোটোকল অফিসার আবু আহমদকে নিয়ে প্রবেশ করল ভিভিআইপি লাউঞ্জে।

বেশ দূরে থাকতেই আহমদ মূসা ডিজিপি মাহির হারুনসহ সকলের উদ্দেশ্যে সালাম দিয়ে বলল, ‘ধন্যবাদ মি. মাহির হারুন কষ্ট করে এসেছেন সেজন্য।’

সবাই সালাম নিল। সালাম নিয়ে ডিজিপি মাহির হারুন বলল, ‘আমার কষ্টের কথা বললেন, ওদের কষ্টের কথা বললেন না। বৈষম্য করা হলো না?’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘ওরা আমার ভাই-বোন তো। ভাইয়ের জন্যে ওরা একটু কষ্ট করতেই পারে।’

‘আমাকে ভাই বলা হোল না, এটাও তো একটা বৈষম্য।’ বলল ডিজিপি মাহির হারুন। তার মুখে হাসি।

‘আপনি ভাই অবশ্যই। কিন্তু তার সাথে আপনি ভ্যানের পুলিশ প্রধানও। আপনার কাজ, সব সময় আইনের নিয়ন্ত্রণ। অতএব সে সময় খুবই মূল্যবান। সব নাগরিকের এই মূল্য সম্পর্কে সচেতন থাকা দরকার।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ধন্যবাদ মি. আবু আহমদ। সত্যিকার বড় যারা, তারা সবাইকে বড় করে দেখে। পুলিশকে এই মর্যাদার আসন কেউ দেয় না।’

আহমদ মুসা ডিজিপি মাহির হারুনের সাথে হ্যান্ডশেক করার পর ড. সাহব নূরীর সাথে হ্যান্ডশেক করে সাবিহা সাবিতের সামনে গিয়ে বলল, ‘ভাববেন না মি. মাহির হারুন সাবিহা সাবিতদের জেনারেশনকে দেখবেন ভিন্নভাবে। ওরা দেশ, জাতিকে বড় করবে, পুলিশকেও বড় করবে। কেমন, তাই না সাবিহা সাবিত?’

মুহূর্তের জন্যে কথায় ছেদ টেনেই আহমদ মুসা আবার বলল, ‘কি খবর, সাবিহা সাবিত? তোমাদের থিসিসের একটা শক্ত অংশ নিয়ে বিপদে পড়েছিলে, সেটা কেটেছে?’

হাসল সাবিহা সাবিত। সেই সাথে বিস্মিত তার চোখ। বলল, ‘ঐ ছোট ঘটনাও আপনার মনে আছে?’

‘ওটা ছোট ঘটনা নয়। ড. আজদাকে জিজ্ঞেস করে দেখ। যারা ডক্টরেট করেছে তারা এটা জানে। তাই না ড. আজদা?’ বলল ড. আজদার দিকে তাকিয়ে আহমদ মুসা। সবাই মিলে বসতে গেল।

বসতে গিয়ে আহমদ মুসা হাতের ব্যাগটা সোফায় রেখে বলল, ‘আপনারা বসুন। আমি একটু ফ্রেশ হয়ে আসি। অজু বাকি আছে, প্লেনে অজুটা করতে পারিনি।’

আহমদ মুসা এগোলো টয়লেটের দিকে।

সবাই বসেছে।

ড. সাহাব নূরী বলল, 'তার মানে মি. আবু আহমদ সব সময় অজুর সাথে থাকেন?'

হ্যাঁ মামা, এটা আমি খেয়াল করেছি। আমি দেখেছি, নামাযের সময় নয়, তবুও তিনি অজু করে এলেন। তার মানে অজু ভাঙলেই তিনি অজু করেন।' ড. আজদা বলল।

'আমি শুনেছি দরবেশ-বুজুর্গদের এ গুণ থাকে। খুবই ভালো ও মহৎ গুণ এটা। এ গুণও মি. আবু আহমদের আছে! এটা এটা বড় ব্যাপার। একজন লোক যখন সব সময় আল্লাহমূখী থাকতে চায়, তখন তার মধ্যে এ গুণের সৃষ্টি হয় শুনেছি।' বলল ডিজিপি মাহির হারুন।

'একটা ব্যাপার আপনারা লক্ষ্য করুন। কিছুক্ষণ আমরাই আলোচনা করলাম যে তিনি বড় একজন ব্যক্তিত্ব, যার পরিচয় তুরস্কের পুলিশ প্রধানকেও জানতে দেয়া হয়নি! প্রেসিডেন্ট আর প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে যার পরিচয় সীমাবদ্ধ! সেই ব্যক্তিত্ব একমাত্র আমাদের মাঝে এলেন কিন্তু বুঝা গেল না যে তিনি এত বড় একজন ব্যক্তিত্ব! তিনিই প্রথম আমাদের সালাম দিয়েছেন। কথাও বলেছেন তিনি আমাদের সাথে। আমার থিসিসের মত ছোট ঘটনার খবরও তিনি নিয়েছেন। এ সবের মাধ্যমে তিনি আমাদের গুরুত্বকেই বড় করে তুলে ধরেছেন, নিজের বড় ব্যক্তিত্বের, তার নিজের মর্যাদার কথা এবং তা প্রদর্শন করার বিষয় তিনি বিন্দুমাত্রও ভাবেননি।' সাবিহা সাবিত বলল।

'এটা সত্যিকার বড়ত্বের প্রমাণ। সত্যিকার বড়দের কাছে একজন পথের মানুষও পর্বতের মত বড়। বড়রা কিন্তু নিজেকে সবার চেয়ে ছোট মনে করে। মি. আবু আহমদের মধ্যে এইমাত্র এই গুণেরই তো আমরা প্রকাশ দেখলাম।' বলল ডিজিপি মাহির হারুন।

আহমদ মুসা ফ্রেশ হয়ে ফিরে এসেছে। গল্পগুজব চলছে।

এরই মধ্যে স্ন্যাক্স পরিবেশন করেছে লাউঞ্জের লোকরা।

সিকিউরিটির একজন লোক এসে বলল ডিজিপি মাহির হারুনকে, 'স্যার, সব রেডি। মেহমানের গাড়ি পার হবার পর, অন্য যাত্রীরা তাদের গাড়িতে উঠবেন।'

‘ঠিক আছে, আমরা উঠছি।’ বলল ডিজিপি মাহির হারুন।

সবাই উঠে দাঁড়াল। চলল সবাই লিফটের দিকে।

লিফটে উঠে ডিজিপি মাহির হারুন বলল ড. আজদাকে, ‘আপনাদের ট্রাভেল প্ল্যানটা কী ড. আজদা?’

‘ধন্যবাদ। আমরা একপাই গাড়ি এনেছি সবাই আমরা এক সাথে যেতে চাই বলে। স্যার ও মামা বসবেন পেছনের সীটে। সাবিহা সাবিত গাড়ি ড্রাইভ করবে। আমি বসব তার পাশের সীটে।’

‘অল রাইট। আমার গাড়িটা থাকবে আপনাদের গাড়ির পেছনে। আপনাদের গাড়ি স্টার্ট নিয়ে এগোলে আমার গাড়ি স্টার্ট নেবে।’

লিফট থেকে ভিভিআইপি কার পার্কিং-এ এসে ডিজিপি মাহির হারুন আহমদ মুসার সাথে হ্যান্ডশেক করে তার গাড়ির দিকে এগোলো। আহমদ মুসাও এগোলো তার গাড়ির দিকে।

আহমদ মুসার ডান পাশে সাবিহা সাবিত। তবে সে ধাপ খানেক সামনে এগিয়েছে, ড্রাইভিং সীটে যাবে বলেই তার এই এগোনোটা।

গাড়ির কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে তারা।

আশ-পাশটা দেখতে গিয়ে হঠাৎ সাবিহা সাবিতের চোখ দু’টি দুই তিন সারি সামনের একটা গাড়ির জানালায় আটকে গেল। দেখল গাড়িটার দু’টি জানালা অর্থাৎ ড্রাইভিং সীট ও পেছনের সীটের জানালা দিয়ে রিভলভারের দুই নল তাক করেছে আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে। রিভলভারের নলগুলো জানালার বাইরে বেরিয়ে আসেনি বলে সাধারণভাবে তা কারো নজরে পড়ার কথা নয়। বুঝতে পারল সাবিহা সাবিত কী ঘটতে যাচ্ছে।

কেঁপে উঠল তার গোটা অন্তরাত্মা। এখন তো চিৎকার করার সময় নেই, সাবধান করারও সময় নেই। পিছু হটে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়ার সময়ও নেই।

আর কিছু ভাবতে পারল না সাবিহা সাবিত। চোখের পলকে নিজের দেহটাকে সে সরিয়ে নিল আহমদ মুসার সামনে।

প্রায় একই সংগে দু’টি গুলি এসে বিদ্ধ হলো সাবিহা সাবিতের বাম বুকে। পড়ে যাচ্ছিল সাবিহা সাবিত পেছন দিকে।

আহমদ মুসার চোখে সবটা বিষয় ধরা পড়ে গেছে ততক্ষণে। জ্যাকেটের পকেট থেকে তার ডান হাতে উঠে এসেছে রিভলভার।

আহমদ মুসা বাঁ হাত দিয়ে সাবিহা সাবিতকে বুকে আঁকড়ে ধরে ডান হাত দিয়ে গুলি করল গাড়িটার সামনের টায়ারে।

গাড়িটা চলতে শুরু করেছিল। একটা বাঁক নিয়ে শব্দ করে গাড়িটা থেমে গেল। গাড়ি থেকে বের হয়ে দু'জন সেনা অফিসার ছুটে পালাচ্ছিল।

আহমদ মুসা গুলি করতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই দু'সেনা অফিসারের দেহই বিস্ফোরিত হলো। দু'টি দেহই অগ্নি গোলক হয়ে কিছুটা উপরে উঠে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ল।

ডিজিপি ছুটে আসছিল আহমদ মুসার গাড়ির দিকে। আহমদ মুসা তাকে লক্ষ্য করে বলল, 'মি. মাহির হারুন, আপনি ওদিকটা দেখুন ওদের আরেকটা গ্রুপ ভিভিআইপি কারপার্কেই আছে।'

'দেখছি আমি মি. আবু আহমদ।' বলে ডিজিপি মাহির হারুন সন্ত্রাসীদের গাড়ির দিকে ছুটল।

ড. সাহাব নূরী, আপনি ড্রাইভে বসুন। আর ড. আজদা আপনি দরজা খুলুন। একে হাসপাতালে নিতে হবে। দ্রুত কণ্ঠে আহমদ মুসা বলল ওদের লক্ষ্য করে।

গাড়ির দরজা খুলল ড. আজদা ছুটে এসে।

আহমদ মুসা সাবিহা সাবিতকে পাঁজকোলা করে নিয়ে গাড়িতে উঠল। সীটের উপর শুইয়ে দিতে গেল সাবিহা সাবিতকে।

'স্যার, আমাকে শক্ত করে ধরে রাখুন। ওরা আমাকে নিতে আসছে। আর একটু সময় চাই। একটা কথা বলতে চাই।' খুব কষ্টের সাথে বেরিয়ে আসা এই কয়েকটা কথা প্রথম শোনা গেল সাবিহা সাবিতের কণ্ঠ থেকে।

'ঠিক আছে আমি ধরে আছি তোমাকে। তোমার কিছু হবে না। আমরা নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে হাসপাতালে। কী বলবে বল তুমি।'

‘আমার চেয়ে সুখী মানুষ এই মুহূর্তে দুনিয়াতে আর কেউ নেই, স্যার। ওরা আপনাকে মারতে চেয়েছিল। আমি আপনাকে বাঁচাতে পেরেছি আল্লাহ্’র ইচ্ছায়।’ থেমে গেল সাবিহা সাবিতের কণ্ঠ।

চোখ দু’টি বুজে গেল তার।

‘তুমি এটা করতে গেলে কেন, সাবিহা? আমার তো দুনিয়াতে চাইবার কিছু নেই! কিন্তু তোমার তো জীবনের শুরু।’ আহমদ মুসা বলল।

‘দুনিয়াতে আপনার চাইবার কিছু নেই। কিন্তু দুনিয়ার প্রয়োজন আছে আপনাকে। আমার মত সাবিহা সাবিত শত আছে, আরও শত জন্মাবে। কিন্তু আপনার মত লোকদের আল্লাহ্ কদাচিৎ দুনিয়াতে পাঠান। আমি খুব খুশি। আমি আপনার বাহুর উপর মরতে পারছি। আমি...।’

‘তুমি এত কথা বলো না সাবিহা। আল্লাহ্ তোমাকে বাঁচাবেন। আমরা যাচ্ছি হাসপাতালে।’ বলল আহমদ মুসা।

দু’চোখ বুজে গিয়েছিল সাবিহা সাবিতের। খুলে গেল আবার। গভীর ক্লান্তি সে চোখে। যেন ঘুমে ছেয়ে আছে তার দুই চোখ। তার অস্ফুট কণ্ঠে আমি সেটা জানার জন্যে তো আর বেঁচে থাকবো না। বলবেন কি স্যার আপনার পরিচয়।’

আহমদ মুসার দু’চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ল দু’ফোটা অশ্রু। বলল, ‘আমার পরিচয় না দেয়া আমার অহংকার নয়, সাবিহা; সেটা আমার প্রয়োজন। দুঃখিত আমি এর জন্যে। আমি তোমাদের এক ভাই- আহমদ মুসা।’

দু’চোখ বুজে গিয়েছিল সাবিহা সাবিতের। চমকে ওঠার মত প্রচণ্ড শক্তিতে তা যেন খুলে গেল। স্থির হলো আহমদ মুসার মুখের উপর। প্রাণ ভরে সমগ্র সত্তা দিয়ে যেন দেখছে আহমদ মুসাকে।

ওদিকে সিটের এক কোনে কোন রকমে বসে সাবিহা সাবিতের মাথায় হাত রেখে অঝোরে কাঁদছিল ড. আজদা। আহমদ মুসার কণ্ঠের শেষ উচ্চারণ শুনে সেও চমকে উঠে তাকিয়েছিল আহমদ মুসার দিকে। তার সে চোখেও বিস্ময়ের ঝড় উঠেছে।

আবার চোখ দু’টি বুজে গেল সাবিহা সাবিতের। কিন্তু তার ঠোঁটে অসীম এক প্রাপ্তি ও প্রসন্নতার হাসি। বলল অস্ফুট কণ্ঠে চোখ বুজে থেকেই,

‘আলহমদুলিল্লাহ্! আমার সৌভাগ্য। আল্লাহ্’র অসীম দয়া। আল্লাহ্’র কাছে নিয়ে যাবার মত সঞ্চয় আমার কিছুই ছিল না। কিন্তু এখন আল্লাহ্-কে বলতে পারবো, তার অতিপ্রিয় এক বান্দার পাশে আমি দাঁড়াতে পেরেছিলাম।’

চোখ দু’টি তার আবার খুললো। দৃষ্টি নিবদ্ধ আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘অনেক, অ-নে-ক বড় আপনি, পরকালেও কি পাশে থাকতে পা-রবো আপনার।’ তার চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে এবং তার কণ্ঠের শেষ শব্দের সাথে অবরুদ্ধ আবেগের একটা উচ্ছ্বাস যেন ভেঙে পড়ল। কেঁপে উঠল তার দেহটা। সেই সাথে তার মুখটা গড়িয়ে পড়ল এক পাশে। তার মুখে, দেহে নেমে এল প্রশান্তির এক নিখুঁত নিস্তব্ধতা।

সাবিহা সাবিতের মাথা জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল ড. আজদা।

আহমদ মুসার মুখ থেকে বেরিয়ে এল, ‘ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন’। কাঁপা, ভাঙা কণ্ঠ আহমদ মুসার।

গাড়ি থামিয়ে দিয়েছিল ড. সাহাব নূরী।

তার চোখ দিয়েও অশ্রু গড়াচ্ছে।

‘ড. নূরী, আপনি ড. মাহজুন মাজহারকে টেলিফোন করুন। তাঁকে ঘটনা জানিয়ে হাসপাতালে আসতে বলুন। আর চলুন আপনি হাসপাতালে।’

আহমদ মুসাই সাবিহা সাবিতের দেহ যেভাবে ধরে বসেছিল, সেভাবেই তাকে গাড়ি থেকে বের করে এনে হাসপাতালের ট্রলিতে তুলে দিল।

পাশেই সাবিহা সাবিতের পিতা ড. মাহজুন মাজহার দাঁড়িয়েছিল। মেয়ের রক্ত ভেজা লাশ দেখেই তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল সে।

তার পাশে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

সান্তনা দেয়ার চেষ্টা করলো না আহমদ মুসা। কাঁদা উচিত। মিনিট খানেক অপেক্ষার পর হাসপাতালের লোকরাই বিনয়ের সাথে বলল, ‘স্যার, দয়া করে আমাদের কাজ করতে দিন,০ প্লীজ।’

ড. মাহজুন মাজহার মুখ তুলল। তাকাল ওদের দিকে। অশ্রু ধোয়া তার মুখ।

উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘চল বাবা, কোথায় যাবে।’

ট্রলি থেকে একটু সরে দাঁড়াতে গিয়ে দেখতে পেল আহমদ মুসাকে। সংগে সংগে জড়িয়ে ধরল তাকে। কেঁদে উঠল আবার।

'স্যরি, স্যার। আমাকে বাঁচাতে গিয়েই জীবন দিতে হয়েছে সাবিহা সাবিতকে। আমি স্যরি।' বলল আহমদ মুসা।

ড. মাহজুন মাজহার আহমদ মুসাকে ছেড়ে দিয়ে তার দুই হাত আহমদ মুসার কাঁধে রেখে বলল, 'স্যরি কেন?' আমার মেয়ে কি যা করার নয় তাই করেছে, আমার মেয়ে কি অন্যায় কিছু করেছে? আমি কাঁদছি কি এই জন্যে যে আমার মেয়ে কেন জীবন দিতে গেল? না, তা নয় মি. আবু আহমদ। আমার এ কান্না গৌরবের। দেশের জন্যে বিনা দ্বিধায় জীবন দেয়ার মত সাহস আমার মেয়ে দেখাতে পেরেছে, এই দরনের মহৎ সিদ্ধান্ত সে নিতে পেরেছে, এই গৌরবেই আমি কাঁদছি। আলহামদুলিল্লাহ্! আমার মেয়ে ক'দিনেই আপনাকে চিনতে পেরেছে, বুঝতে পেরেছে যে, শত সাবিহা সাবিতের বিনিময়ে হলেও আপনাকে বাঁচানো দরকার। আমি...।'

আহমদ মুসা জড়িয়ে ধরল ড. মাহজুন মাজহারকে। বলল, 'স্যার, এভাবে বলবেন না। দুনিয়ার সব মানুষ সমান। আর কারও জন্যে পৃথিবীর কোন কাজ আল্লাহ্ আটকে রাখেন না। তিনিই সবকিছুর নিয়ামক ও নিয়ন্তা।'

ড. মাহজুন মাজহার বলল, 'তোমার কথাও ঠিক। কিন্তু আল্লাহ্ যেমন পাঁচ আঙুলকে সমান করে সৃষ্টি করেননি তেমনি দুনিয়ার সব মানুষ মেধা, যোগ্যতার দিক দিয়ে সমান নয়।'

কথা শেষ করে বলল, 'চল, আমরা ওদিকে যাই। ড. আজদা ও ড. সাহাব নূরী সাবিহা সাবিতের সাথে গেছে।'

দু'জনেই চলল হাসপাতালের ভেতরে।

এক ঘন্টা পরে ভ্যান-এর পুলিশ প্রধান ডিজিপি মাহির হারুন এল হাসপাতালে।

আহমদ মুসা তখন বসেছিল হাসপাতালের ভিআইপি রিসেপশন লাউঞ্জে। সেখানে বসেছিল, আহমদ মুসা, ড. আজদা, ড. সাহাব নূরী, ড. মাহজুন মাজহার একজন পুলিশ ইনস্পেক্টর।

ডিজিপি মাহির হারুন লাউঞ্জে প্রবেশ করতেই পুলিশ ইনসপেক্টর উঠে দাঁড়াল।

'তুমি একটু ওদিকে বস ইনসপেক্টর।'

পুলিশ ইনসপেক্টর একটা স্যালুট দিয়ে বাইরে চলে গেল।

ডিজিপি মাহির হারুন বসেই বলল, 'স্যরি ড. মাহজুন মাজহার। সাবিহা সাবিত মেয়েটা অত্যন্ত ব্রাইট ছিল। সে আমাদের সবার আদরের। কেউই...।'

'মি. মাহির হারুন, সাবিহা সাবিত বড় ছিল বলেই অতো বড় সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে, বড় সাহস দেখাতে পেরেছে।' বলল ড. মাহজুন মাজহার। তার শেষের কথাগুলো কান্নায় ভেঙে পড়ল।

ড. আজদা ড. মাহজুন মাজহারের পিঠে সান্তনার হাত রেখে বলল, 'আপনি ঠিক বলেছেন আংকল। বুকে দুই দুইটি গুলি খাবার পরও তার চোখে মুখে দুঃখ-বেদনার কোন চিহ্ন ছিল না। একটুও কাঁদেনি, আর্তনাদ করেনি সাবিহা। মৃত্যুকে আসন্ন জেনেও সে বলেছে, আমার চেয়ে সুখি মানুষ এই মুহূর্তে, স্যার, ওরা আপনাকে মারতে চেয়েছিল, আমি আপনাকে বাঁচাতে পেরেছি আল্লাহ্'র ইচ্ছায়। দুনিয়াতে আপনার চাইবার কিছুনেই হয়তো, কিন্তু দুনিয়ার প্রয়োজন আছে আপনাকে। শেষ মুহূ...।'

ড. আজদার কথার মাঝখানে আহমদ মুসা বলে উঠল, 'সাবিহা সাবিত ছিল এখানে আমাদের সবার ছোট, কিন্তু সবার চেয়ে বড় কাজ সে করেছে। আল্লাহ্ তার শাহাদাত কবুল করুন। তার জন্যে এখন দোয়াই হবে তাকে স্মরণ করার, শ্রদ্ধা জানানোর উপায়।'

'প্লিজ আপনারা এটাই করুন। একজন শহীদের পিতা হওয়ার এখন আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া।' বলল ড. মাহজুন মাজহার।

সবাই বলে উঠল। আমিন। একটু নিরবতা।

'মাফ করবেন সকালে, আমি মি. আবু আহমদের সাথে একটু কথা বলতে চাই।' বলল ডিজিপি মাহির হারুন।

'তাহলে আমরা সবাই বাইরে যাবার দরকার নেই। আমাকে একটু কথা বলার সুযোগ দিলেই হলো।' বলল ডিজিপি মাহির হারুন।

‘কোন অসুবিধা নেই। আমরা বরং খুশিই হবো।’ বলল ড. আজদা।

‘মি. আবু আহমদ, আপনি ঠিকই বলেছিলেন। ওদের আরেকটা গ্রুপ আরেকটা গাড়িতে ওখানে উপস্থিত ছিল। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, গুলি নিক্ষেপকারীরা ছিল সৈনিকের বেশে, অন্যদিকে আরেকটা গাড়িতে যারা ছিল, তারা ছিল পুলিশের গাড়িতে পুলিশের পোষাকে। পুলিশের গাড়ি হওয়ায় এবং গাড়িটাকে দ্রুত চলে যেতে দেখে আমি প্রথমটায় বিভ্রান্ত হয়েছিলাম। আমি ধারণা করেছিলাম. পুলিশ হয়তো সন্দেহজনক কাউকে তাড়া করছে। কিন্তু যখনই মনে পড়ল গুলি নিক্ষেপকারীরা ছিল সৈনিকের পোষাকে, তখনই বুঝতে পারি আমি বিভ্রান্ত হয়েছি। খোঁজ নিতে গিয়ে দেখা গেল পুলিশের গাড়ি ভেবে গেটে কেউ তাদের আটকায়নি। শেষ পর্যন্ত গাড়িটার আর হদিস মেলেনি। গাড়ির নাম্বার পাওয়া গেছে, কিন্তু সেটা অবশ্যই ভুয়া নাম্বার হবে।’

একটু থামল ডিজিপি মাহির হারুন। মুহূর্ত কয় পরে আবার শুরু করল, ‘কিন্তু আমি বিস্মিত হচ্ছি, গুলি নিক্ষেপকারীদের মরতে হলো কেন? ধরা যাতে না পড়ে এ জন্যেই কি?’

‘ধরা যাতে না পড়ে এটা নিশ্চিত করার জন্যই তাদের দেহে আগে থেকে বোমা বাঁধা ছিল, এটাই হতে পারে। তবে সাধারণঃত এমনটা হয় না। নিজেদের কাউকে যখন কোন মিশনে পাঠানো হয়, তখন তার ধরা পড়া রোধ করার জন্যে তাকে হত্যা করা হবে এটা তাকে জানতে দেয়া হয় না। নিজেদের কাউকে যখন কোন মিশনে পাঠানো হয়, তখন তার ধরা পড়া রোধ করার জন্যে তাকে হত্যা করা হবে এট তাকে জানতে দেয়া হয় না। কারও গায়ে বোমা বেঁধে যখন কাউকে কোন মিশনে পাঠানো হয় তখন সেটা হয় বাধ্য করে কাজ করানোর ঘটনা। আমার মনে হয় আজকের ঘটনায় এমনটাই করা হয়েছে। আমার মনে হয়, এই বন্দুকবাজ দু’জনকে অঢেল টাকা দিয়ে বা অন্যকোনভাবে বাধ্য করে এই শর্ত দেয়া হয়েছে যে, মারতে না পারলে তাদের মরতে হবে। মারাটা যাতে নিশ্চিত হয়, সেজন্যেই এমনটা করা হয়েছে। না মারতে পারলে যেহেতু তাদেরই মরতে হবে, তাই মরার ব্যাপারে সামান্যতম গাফলতি হবে না।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ধন্যবাদ মি. আবু আহমদ। আপনার চিন্তাটাই সঠিক। তাহলে ধরে নিতে হবে সেনা অফিসারের পোষাক পরা গুলি নিক্ষেপকারীরা এবং পুলিশের পোষাকে আসা যারা তাদের হত্যা করল, তারা এক গ্রুপের মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়া হবার কথা ছিল।’ বলল ডিজিপি মাহির হারুন।

‘হওয়াটাই স্বাভাবিক। আচ্ছা গাড়িটা অক্ষত আছে? গাড়িতে কিছু পাওয়া যায়নি? গাড়ির কাগজ-পত্র থেকে কোন ক্লু পাওয়ার সুযোগ আছে কিনা?’ আহমদ মুসা বলল।

‘গাড়ির কাগজপত্র ও গাড়ির নাম্বার, চেসিস নাম্বার দেখে কিছু বের করা যায় কিনা তা পরে ভেবে দেখতে হবে। গাড়িতে অন্য কোন কাগজপত্র পাওয়া যায়নি। সিগারেটের একটা প্যাকেট পাওয়া গেছে। প্যাকেটের গায়ে কিছু হিজিবিজি লিখা আছে। এগারো ডিজিটের একটা নাম্বারও আছে, কিন্তু টেলিফোন নাম্বার নয়।’ বলল ডিজিপি মাহির হারুন।

‘সিগারেটের প্যাকেটটা কি আছে?’ আহমদ মুসা বলল।

‘হ্যাঁ, আমরা নিয়ে এসেছি। আমার কাছেই আছে।’ বলে ডিজিপি মাহির হারুন পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে আহমদ মুসার হাতে দিল। আহমদ মুসা সিগারেটের প্যাকেটটা হাতে নিয়ে একনজর উল্টে-পাল্টে দেখল।

মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আহমদ মুসার। ডিজিপি মাহির হারুন যাকে হিজিবিজি লেখা বলেছে, সেটা হিজিবিজি কিছু নয় কাঁপা হাতের হিব্রু ভাষায় লেখা। নাম্বারগুলোর দিকে চোখ নিবদ্ধ হলো আহমদ মুসার। এগারোটি ডিজিটের উপর একবার চোখ বুলিয়ে আহমদ মুসা ডিজিপি মাহির হারুনকে বলল, ‘মি. মাহির হারুন, জার্মান মোবাইল কোম্পানি ডিটিএল-এর বেসিক নাম্বার কি?’

‘জিরো থ্রি থ্রি সিক্স।’ বলল ডিজিপি মাহির হারুন।

হাসি ফুটে উঠল আহমদ মুসার ঠোঁটে। বলল, ‘বেসিক নাম্বারের চার ডিজিটের দুই জোড়ার পত্যেকটিকে উল্টিয়ে লিখেছে। জিরো থ্রি হয়েছে থ্রি জিরো এবং থ্রি সিক্স হয়েছে সিক্স থ্রি। তাহলে পরবর্তী জোড় সংখ্যাগুলোকেও নিশ্চয় এভাবে উল্টিয়ে লেখা হয়েছে। তবে সর্বশেষ বেজোড় ডিজিটটি ঠিক থাকার কথা।’

‘কি করে বুঝলেন? ওটা কি কোন টেলিফোন নাম্বার?’ বলল ডিজিপি মাহির হারুন।

‘হ্যাঁ মি. মাহির হারুন। এটি ডিটিএল-এর মোবাইল নাম্বার বলেই মনে হয়। ডিটিএল-এর চারটি বেসিক ডিজিটের দুই জোড়ার প্রত্যেক জোড়ার দুই ডিজিটকে আগে পিছে লিখেছে। আমি মনে করি পরবর্তী জোড়াগুলোকেও এইভাবে আগে-পিছে করে লিখেছে। দেখুন, এইভাবে সাজালে ডিটিএল-এর একটা মোবাইল নাম্বার হয়ে যায়।

সিগারেটের খোলটা হাতে নিল ডিজিপি মাহির হারুন। একবার ভালো করে চোখ বুলিয়েই সে উচ্ছাসিত কণ্ঠে বলে উঠল, ধন্যবাদ আবু আহমদ। আপনি নির্ভুলভাবে ধাঁধাঁটাকে ভেঙেছেন। নিশ্চিতই কারো একটা মোবাইল নাম্বার হবে এটা। তাদের কারো কি?’

‘তাদের কারো হবার সম্ভাবনাই বেশি। মনে হয়, গাড়িতে বসেই কষ্ট করে টেলিফোন নাম্বারটা লিখেছে। দেখুন প্রত্যেকটি ডিজিটই কিছুটা আঁকাবাঁকা এবং মাঝের স্পেসগুলোর মধ্যে কোন ভারসাম্য নেই। তার মানে চলন্ত গাড়িতে বসেই নাম্বারটি লেখা হয়েছে। জরুরি বলেই কষ্ট করে এভাবে লেখা হয়েছে এবং আজ গাড়িতে বসেই এই নাম্বার লেখা হয়েছে।’ বলল আহমদ মুসা।

মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ডিজিপি মাহির হারুনের। বলল, ‘আপনি রাইটলি আইডেনটিফাই করেছেন আবু আহমদ। টেলিফোন নাম্বারটি আমাদের কাজে আসতে পারে। অন্য হিজিবিজি লেখার কিছু বুঝলেন?’

‘অন্য হিজিবিজি লেখাটাও হিব্রু। চলন্ত গাড়িতে বসে লেখা হয়েছে বলেই একটু বেশি হিজিবিজি লাগছে। এই হিজিবিজি অক্ষারগুলো হচ্ছে একটা রাস্তার নাম এবং একটা লোকেশনের নাম্বার।’ থামল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা এই ঠিকানাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করল। এখানে এভাবে সবার সামনে এই ঠিকানা প্রকাশ করা ঠিক মনে করল না। তাছাড়া হাসপাতালের এই ভিআইপি লাউঞ্জ কতটা নিরাপদ, এখানে কোন ইলেকট্রনিক চোখ বা কান আছে কিনা কে জানে। সুতরাং ঠিকানার বিষয়টা চেপে যাওয়াই ঠিক মনে করল আহমদ মুসা। ডিজিপি মাহির হারুনের পরবর্তী জিজ্ঞাসার জবাবে বলল আহমদ

মুসা, ‘ওটা নিয়ে আর একটু ভাবতে হবে। সিগারেটের খোলটা আমার কাছেই থাক।’

‘ঠিক আছে মি. আবু আহমদ, ওটা আপনার কাছেই থাকা দরকার। তদন্ত পরিচালনার সব দায়িত্ব আপনার উপর দেয়া হয়েছে। তবে ওরা আপনাকে মারার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে। এ চেষ্টা তারা শুরু থেকেই করছে। গতকাল আংগোরায় আপনার উপর আক্রমণ হয়েছে। আজ এখানে আপনাকে হত্যার একটা ভয়ংকর পরিকল্পনা করেছিল। আমরা আপনার জন্যে উদ্বিগ্ন। এরপর থেকে আপনার নিরাপত্তাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছে। প্লিজ আপনাকে সাবধান হতে হবে। আমরা আপনাকে যে কোন সাহায্য করতে প্রস্তুত।’ বলল ডিজিপি মাহির হারুন।

‘ধন্যবাদ আপনাকে। সাবধান থাকা সব মানুষের মত আমারও খুব স্বাভাবিক একটা প্রবণতা। বাকি আল্লাহ্ ভরসা।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আল্লাহ্ ভরসা। আমার মেয়ে যাদের ষড়যন্ত্রে নিহত হয়েছে, তাদের আমি শাস্তি চাই। প্রার্থনা করি, ওদের পাকড়াও করে মি. আবু আহমদ ওদের শাস্তি দিতে এবং ষড়যন্ত্র উচ্ছেদ করতে সমর্থ হোন।’ বলল ড. মাহজুন মাজহার।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে বলে উঠল, ‘আমি একটু উঠতে চাই। ওদিকে কি হচ্ছে তা একটু দেখা দরকার।’

‘অবশ্যই, চলুন আমরাও যাব।’ বলল ডিজিপি মাহির হারুন।

সবাই উঠে দাঁড়াল।

# ৪

গাড়ি ছুটছে আহমদ মুসার। সূর্য উঠতে তখনও অনেক বাকি।

মাউন্ট আরারাতের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল নিয়ে গঠিত ইজদির প্রদেশের রাজধানী আর পাঁচ মিনিটের পথ।

তাহাজ্জুদ নামায শেষ করেই আহমদ মুসা ভ্যান থেকে গাড়িতে উঠেছে। ভোরের রাজপথ একদম ফাঁকা।

ঝড়ের বেগে ছুটতে পেরেছে আহমদ মুসার গাড়ি।

রাজধানী ইজদির শহরের কাছাকাছি রাস্তার পাশের একটা মসজিদে ফজরের নামায পড়ে নিয়েছে আহমদ মুসা।

রাজধানী ইজদির শহরে প্রবেশ করল আহমদ মুসার গাড়ি।

ইজদির শহরে কয়েকবার এসেছে আহমদ মুসা।

আরিয়াস রোড আহমদ মুসার চেনা।

আরিয়াস রোডে প্রবেশ করল তার গাড়ি।

আহমদ মুসাকে যারা হত্যার চেষ্টা করেছিল, যারা হত্যা করেছে সাবিহা সাবিতকে তাদের গাড়িতে পাওয়া সিগারেটের প্যাকেটে এই রাস্তার নাম লেখা ছিল।

রাতের আঁধার নেই। কিন্তু আঁধারের রেশ তখনও আছে।

আহমদ মুসা গাড়ির গতি স্লো করে দিয়েছিল। রাস্তার পাশের বাড়ির নাম্বারগুলো দেখছিল সে।

ওয়ান থ্রি নাম্বার পেয়ে গেল আহমদ মুসা। আনন্দের প্রকাশ ঘটলো আহমদ মুসার চোখে-মুখে।

গাড়ি দাঁড় করাল সে।

কিন্তু গাড়ির জানালা নামিয়ে বাড়িটার দিকে চাইতেই আনন্দ উবে গেল আহমদ মুসার মন থেকে।

ওয়ান থ্রি ওয়ান বাড়িটা একটা দু'তলা মসজিদ। মসজিদের সাথে একটা মাদ্রাসার সাইনবোর্ড। মসজিদ ও মাদ্রাসার একপাশে পেল খোলা গ্রাউন্ড, অন্যপাশে সুন্দর একটা সবজি বাগান।

হতাশ হলো আহমদ মুসা। এ রকম স্থানে তাকে হত্যার চেষ্টাকারী উল্কিওয়ালারা কিংবা হিব্রু জানা তুর্কি, ইহুদি বা আর্মেনীয় ইহুদিরা কেউ থাকার কথা অবশ্যই নয়।

হঠাৎ আহমদ মুসার মনে পড়ল সিগারেটের প্যাকেটে টেলিফোনের নাম্বার লিখতে গিয়ে লেখক প্রত্যেকটা দুই ডিজিটের প্যাকেটে টেলিফোনের নাম্বার লিখতে গিয়ে লেখক প্রত্যেকটা দুই ডিজিটের জোড়ার অংক যদি আগপিছ করে লিখতে পারে, তাহলে রাস্তার লোকেশন নাম্বার লেখার ক্ষেত্রেও সে এটাই করতে পারে।

খুশি হলো আহমদ মুসা। ওয়ান থ্রি ওয়ান মানে ১৩১-এর প্রথম জোড়ার অংক আগে-পিছে করে নিলে জোড়ার অংক '১৩'-এর বদলে '৩১' হয়ে যায় এবং সেক্ষেত্রে রাস্তার নাম্বার দাঁড়ায় থ্রি ওয়ান ওয়ান অর্থাৎ ৩১১। আহমদ মুসা নিশ্চিত হলো এই থ্রি ওয়ান ওয়ানই তার টার্গেট নাম্বার।

গাড়ি স্টার্ট দিল আহমদ মুসা। ছুটল গাড়ি।

অনেকটা সামনে হবে নাম্বারটি।

অনেকটা চলার পর রাস্তার পাশের বাড়ির নাম্বারের দিকে তাকাল আহমদ মুসা। প্রথমেই যে বাড়ির নাম্বারটি চোখে পড়ল তা হচ্ছে, থ্রি জিরো ওয়ান। আর একটু এগিয়েই পেয়ে গেল থ্রি ওয়ান ওয়ান।

দাঁড়িয়ে পড়ল আহমদ মুসার গাড়ি।

জানালার কাঁচের ভেতর দিয়েই তাকাল আহমদ মুসা বাড়িটার দিকে।

বাড়িটা ওল্ড প্যাটার্নের একটা গেটবক্স।

গেট থেকে ইটের একটা রাস্তা গিয়ে মিশেছে গাড়িবারান্দায়।

গাড়িবারান্দা থেকে তিন ধাপ উঠলেই অর্ধচন্দ্রাকৃতি একটা ল্যান্ডিং বা বারান্দা।

বারান্দার মাঝ বরাবর বাড়ির ভেতরে ঢোকার একটা দরজা।

আহমদ মুসা গাড়ি থেকে নামল। চারদিকটা নিরব। সূর্য তখনও ওঠেনি।

রাস্তায় গাড়ি চলা শুরু হয়েছে বটে, কিন্তু কচিৎ দু'একটা চোখে পড়ছে।

জ্যাকেটের পকেটের রিভলভার এবং মাথার পেছনের রিভলভারের শরীরটা একবার স্পর্শ করে আহমদ মুসা উঠে গেল গেটে।

গেট লক করা। গেটম্যান নিশ্চয় ঘুমিয়ে আছে।

বাউন্ডরি ওয়াল খুব উঁচু নয়। ছয় ফুটের বেশি হবে না।

চারদিকটা একবার দেখে নিয়ে আহমদ মুসা চোখের পলকে পাঁচিল চপকে ভেতরে ঢুকে গেল।

গেটবক্সে এসে আহমদ মুসা দেখল, গেটবক্সের দরজা খোলা। উঁকি মারল ভেতরে। দেখল গেটম্যান একটা চেয়ারে বসেই বেঘোরে ঘুমাচ্ছে। পাশেই টেবিলের উপর তালা-চাবি।

আহমদ মুসা তালা-চাবি নিয়ে গেটবক্স লক করল। চাবিটা তালাতেই লাগানো অবস্থায় রেখে দিল। বাড়ির দিকে এগোলো আহমদ মুসা। গাড়িবারান্দা হয়ে উঠে গেল ল্যান্ডিং-এ।

দরজার সামনে মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ালো আহমদ মুসা। তারপর ডান হাতের মধ্যমা দিয়ে জোরের সাথে তিনবার নক করল সে।

মিনিট খানেক পার হয়ে গেল। কোন সাড়া নেই।

আবার নক করল আহমদ মুসা আগের চেয়ে আরও উচ্চ শব্দে।

তিন পর্যায়ে নয় বার নক করার পর দরজা খুলে গেল।

দরজা ফাঁক হলে প্রথমেই দেখা গেল রিভলভারের নল।

দরজা আরও খুলে গেলে দেখা গেল রিভলভার হতে দাঁড়ানো লোকটিকে।

তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের একজন মাসলম্যান। মেদহীন ঋজু শরীর। হাফপ্যান্টের সাথে টি-শার্ট পরা। চোখের দৃষ্টি সাপের মত তীক্ষ্ণ। গোটা মুখ বিরক্তিতে ভরা। বলল তীব্র কণ্ঠে, 'কে তুমি? আমার গেটম্যান কোথায়?'

আহমদ মুসা বুঝল কেউ আসলে গেটম্যানই তাকে ডাকে। ডাকারও নিশ্চয় নিয়ম রয়েছে। ব্যতিক্রম ঘটেছে সে নিয়মের। সম্ভবতঃ এই কারণেই রিভলভার নিয়ে তার আগমন।

‘আমি একজন মানুষ। নাম বললে অবশ্যই চিনবেন না। আর আপনার গেটম্যান ঘুমুচ্ছে, তাকে তালাবন্ধ করে এসেছি।’ আহমদ মুসা বলল।

লোকটির রিভলভারের নল একটু উপরে উঠে আহমদ মুসার মাথাকে টার্গেট করল। বলল সে কর্কশ কণ্ঠে, ‘যে অপরাধ করেছ তুমি, তাতে আমি এখনি তোমার মাথা উড়িয়ে দিতে পারি।’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘গুলি আপনি এখন করবেন না। গুলি করার সময় আপনার পার হয়ে গেছে। শুরুতেই তা করেননি। আসলে আপনি আমাকে জানতে চান।’

আহমদ মুসার নির্মল হাসি, নির্ভয় চোখ-মুখ দেখে লোকটি বিস্মিতই হয়েছিল। আর যে ক্রিমিনাল চেহারা লোকটি দেখতে অভ্যস্ত, সে রকম চেহারা আহমদ মুসার নয়।

লোকটির দৃষ্টি একটু সহজ হলো। বলল, ‘আমার গেটম্যানকে বন্ধ করেছ কেন?’

‘আমি আপনার সাথে কথা বলতে চাই। আমি চাই আর কেউ তা না শুনুক। আর গেটম্যান তার ঘুমানোর শাস্তি পেয়েছে।’ আহমদ মুসা বলল।

লোকটির চোখে কিছুটা বিস্ময়, কিছুটা বিরক্তি। বলল, ‘মনে হচ্ছে, গেটম্যান যেন তোমার?’

‘গেটম্যান আমার বা আপনার এ প্রশ্ন নয়, গেটম্যান যারই হোক সে দায়িত্বে অবহেলা করবে কেন?’ আহমদ মুসা বলল।

লোকটির রিভলভারের নল নিচে নেমে গেল। বলল, ‘কী বলতে চান বলুন।’

‘এভাবে দরজার দু’পাশে দু’জন দাঁড়িয়ে কোন কথা হয়?’ আহমদ মুসা বলল।

লোকটি তাকাল একবার আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘কালকে সবে এ বাড়িতে উঠেছি। এখনও কিছুই গোছগাছ করা হয়নি। আসুন ভেতরে।’ আহমদ মুসা ভেতরে ঢুকল।

শোবার ঘরটাই শুধু শোবার মত করে গোছ-গাছ করা হয়েছে। একটা বেড, তার পাশে বসবার জন্যে রয়েছে একটা সোফা।

লোকটি আহমদ মুসাকে সোফায় বসতে বলে নিজে বেডের উপর বসল পা ঝুলিয়ে।

তার হাতে তখনও রিভলভার।

লোকটি বসেই বলল, 'আপনার তো সাংঘাতিক দুঃসাহস! চিন্তা-ভাবনা না করেই ঢুকে পড়েছেন! আমি যদি গুলি করে বসতাম!'

'পারতেন না আপনি গুলি করতে। তার আগেই আমার গুলি আপনার কণ্ঠনালির পাশ দিয়ে ঢুকে মাথার চাঁদি দিয়ে বের হয়ে যেত।' আহমদ মুসা বলল।

'কিন্তু আপনি তো রিভলভার বেরই করেননি।' বলল লোকটি। তার চোখে-মুখে বিস্ময়।

'রিভলভার ছিল আমার জ্যাকেটের পকেটে। আমার ডান হাতের তর্জনি ছিল রিভলভারের ট্রিগারে। আর রিভলভারের নল ছিল আপনার থুতনি ও গলার সন্ধিক্ষণে। টার্গেট ঠিক করেই রেখেছিলাম।' বলল আহমদ মুসা। এরপর জ্যাকেটের ডান পকেট থেকে রিভলভার সমেত ডান হাতটা বের করে দেখাল আহমদ মুসা।

'বুঝলাম।' বলল লোকটি।

থামল একটু। বলল আবার সে, 'হ্যাঁ বলুন, কী বলতে চান।'

'গতকাল ভ্যান এয়ারপোর্টের ভিভিআইপি কার পার্কিং-এ যারা দু'জন লোককে বোমার সাহায্যে উড়িয়ে দিয়েছে, তাদের সম্পর্কে জানতে চাই।' বলল আহমদ মুসা সরাসরি লোকটির চোখের উপর চোখ রেখে।

চমকে উঠল লোকটি। চমকানো অবস্থাকে সে গোপনও করল না।

চমকানো অবস্থা ছিল তার মুহূর্তের জন্য। তারপরই তার চোখে ফুটে উঠল আগুন। তবে ধীরে ধীরে নিভে গেল সে আগুন। বলল সে, 'এ প্রশ্ন আমাকে কেন করছেন?'

'যে দু'জন বোমা বিস্ফোরণে মারা গেছে, তাদেরই একজন আমাদের এটা জানিয়েছে।' আহমদ মুসা বলল।

‘বুঝলাম না আমি কথাটা!’ বলল লোকটা। তার চোখে-মুখে বিস্ময়।

‘তারা যে গাড়িতে যান, যে গাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় তাদের দেহ বিস্ফোরিত হয়, সে গাড়িতে পাওয়া একটা সিগারেটের প্যাকেট থেকে আপনার এই ঠিকানাটা পাওয়া গেছে। ঠিকানাটা গতকালই গাড়ি চলন্ত অবস্থাতেই লেখা হয়েছে।’ আহমদ মুসা বলল।

সংগে সংগে জবাব দিল না লোকটা। তার স্থির দৃষ্টি আহমদ মুসার উপর নিবদ্ধ। সে যেন আহমদ মুসার কথার সত্যাসত্য যাটাই করছে।

ইতিমধ্যে আহমদ মুসা পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটি বের করে লেখাটা লোকটার সামনে তুলে ধরল।

লেখাটার উপর একবার চোখ বুলিয়েই লোকটা বলল, ‘আপনি তো ঠিকানা ভুল করেছেন। যাবেন ‘১৩১’ নাম্বারে, এসেছেন ‘৩১১’ নাম্বার বাড়িতে।’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘লেখক প্রকৃত নাম্বারের প্রথম ডিজিটাল জোড়াকে এখানে উল্টে লিখেছেন। ‘৩১’ কে ‘১৩’ বানানো হয়েছে।’

বিস্ময়ে ছেয়ে গেল লোকটার মুখ। বলল, ‘লেখক যেটা লিখেছেন, সেটাই ঠিক হবার কথা। আপনি কি করে বলতে পারেন, প্রথম ডিজিটাল জোড়া তিনি উল্টিয়ে লিখেছেন?’

একটু হেসে উঠেই আহমদ মুসা আবার সিগারেটের প্যাকেটের টেলিফোন নাম্বারটা তার সামনে তুলে ধরে বলল, ‘দেখুন, এখানে টেলিফোনের নাম্বারসহ মোট পাঁচটি জোড়ার প্রত্যেকটির দুইটি করে জোড়া আগে-পিছে করা হয়েছে। বাড়ির নাম্বারের ক্ষেত্রেও এটাই করা হয়েছে।’

বিস্ময়ে হা হয়ে গেল লোকটির মুখ।

‘অসম্ভব ব্যাপার, কি করে বুঝলেন বিষয়টি? এটা আমাদের নিজস্ব একটা রীতি। এ পর্যন্ত কেউ এ ধাঁধাঁ ভাঙতে পারেনি।’

‘এ বিষয়টা থাক। আমি ভাঙতে পেরেছি এটাই সত্য। এখন আপনি দয়া করে বলুন লোক দু’জনকে যারা খুন করেছে বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে, তারা কারা?’ আহমদ মুসা বলল।

‘কি করে বুঝলেন যে, তারা এবং আমরা এক? তাদের সন্ধান আমরা আপনাকে কি করে দেব?’ বলল লোকটি।

‘নিজেদের লোককে গায়ে বোমা বেঁধে দিয়ে রিমোট কন্ট্রোল নিজেদের হাতে রেখে কেউ কখনো মিশনে পাঠায় না। এটা বিশ্বাসঘাতকতা।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কেন, আজকাল অনেক সুইসাইড স্কোয়াড পাঠানো হয় দেখা যাচ্ছে। তারা কি তাদের নিজেদের লোক নয়?’ বলল লোকটি।

‘সুইসাইড স্কোয়াডের লোকরা মটিভেটেড হওয়ার পর স্বেচ্ছায় সুইসাইড স্কোয়াডে যায় এবং এক বিশেষ মুহূর্তে স্বেচ্ছায় বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মৃত্যুবরণ করে। তাদের বোমার রিমোট কন্ট্রোল বাইরের কারও হাতে থাকে না। নিজের লোক বলেই বোমা ফাটানো, না ফাটানোর এখতিয়ার তাদের হাতেই রাখা হয়।’ আহমদ মুসা বলল।

লোকটির চোখ-মুখে এবার প্রতিশোধের আগুন। বলল সে, ‘আপনি ঠিক বলেছেন, তারা আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কিন্তু বলুন তো আপনি কে? আপনি এসব কেন জানতে চাচ্ছেন?’

‘আমি যেই হই না কেন, আমি পুলিশের লোক নই। আমি গোয়েন্দা বিভাগ কিংবা সেনাবাহীনির লোকও নই। আমি মানুষকে সাহায্য করি। এটা আমার একটা ব্রত। তারা যেমন আপনাদের দু’জন লোককে হত্যা করছে, তেমনি তাদের কারণে আমার এক বোন গাতকাল মারা গেছে। আমি চাই তাদের শাস্তি হোক।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কিন্তু তারা আমাদের শিকার। আমরাই তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করব। আপনার এ ব্যপারে মাথা না ঘামালেও চলবে।’ বলল লোকটি।

তাই যদি হতো, তাহলে কষ্ট করে আসতাম না। আপনারা ওদের উপর প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করেছেন, এটা আমরা জানতে পারতাম। আর আপনাদের একার পক্ষে ওদের উৎখাত করা সম্ভব নয়। কয়েকজন লোক মারলে ওরা শেষ হয়ে যাবে না।’ বলল আহমদ মুসা।

‘কিন্তু ওদের কোন সুনির্দিষ্ট ঠিকানা আমাদের জানা নেই। ওদের কয়েক ব্যক্তির সাথে মাত্র আমরা পরিচিত।’ লোকটি বলল।

‘ওদের সাথে দেখা সাক্ষাত, যোগাযোগ কিভাবে হতো?’ বলল আহমদ মুসা।

‘ওরা কোন সময় ওদের ঠিকানা নিয়ে যায়নি, কিংবা ঠিকানা দেয়নি। নানা জায়গায় ওদের সাথে দেখা হতো, বিশষ করে মাউন্ট আরারাতের দক্ষিণ-পশ্চিম ঢালের ট্যুরিস্ট ক্যাম্প নাম্বার ওয়ানে পর্যটনের যে রেস্টুরেন্ট রয়েছে, সেখানেই ওদের সাথে বেশি দেখা হতো।’ বলল লোকটি।

‘ওদের চিনতেন কিভাবে?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘ওরা মোবাইলে যোগাযোগ করত।’ বলল লোকটি।

‘ওদের কোন মোবাইল নাম্বার আছে?’ আহমদ মুসা বলল।

‘ওরাই মোবাইলে যোগাযোগ করত। তারা তাদের মোবাইল নাম্বার কখনও দেয় না। আমাদের একটা মোবাইল নাম্বার ওদের কাছে ছিল। ও নাম্বারেই ওরা যোগাযোগ করত। ওদের নাম্বার মোবাইল ডিসপ্লেতে থাকে না।’ বলল লোকটি। ‘ভীষণ চালাক ওরা। সব কাজে সব ব্যাপারেই নিজেদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রাখে ওরা। এ পর্যন্ত ওদের ঠিকানাই পাওয়া যায়নি, কোন নেতার পরিচয়ও জানা যায়নি। এইমাত্র আপনি বললেন, আপনারাও প্রতিশোধ নিতে চান কিন্তু দেখছি, আপনারাও ওদের সম্পর্কে কিছুই জানেন না।’

‘আজ জানি না, কাল জানতে পারব। অসম্ভব নয় জানা। ওদের তো লক্ষ্য মাউন্ট আরারাতের স্বর্ণভাণ্ডার লুট করা এবং পূর্ব আনাতোলিয়া অঞ্চলের প্রশাসনকে কব্জা করা। সুতরাং তারা কাজ করছে, ওদের খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়।’ বলল লোকটি।

‘মাউন্ট আরারাতের স্বর্ণভাণ্ডার লুটের কথা বুঝলাম। ওদের বিশ্বাস হযরত নুহ (আঃ)-এর কিস্তিতে যে স্বর্ণভাণ্ডার উঠেছিল, তা এখন মাউন্ট আরারাতের একটা গুহায় লুকানো আছে। সেটা হাত করার গোপন তৎপরতা চলতেই পারে। কিন্তু পূর্ব আনাতোলিয়ার প্রশাসনকে তারা কব্জা করবে কেন?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'সেটা আমি জানি না স্যার। ওদের অস্ত্রপাতি, অর্থ ও যোগাযোগ দেখে মনে হয় দেশের বাইরের সাথেও ওদের যোগাযোগ আছে। অবশ্য এটা আমার ধারণা।' লোকটি বলল।

'আপনাদেরও যোগাযোগ বাইরের সাথে আছে। আপনাদের লোকরা হিব্রু ভাষা শিখল কি করে?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

লোকটি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, 'আমাদের সংগঠনটা আন্তর্জাতিক। সেই কারণেই গুরুত্বপূর্ণ ভাষাগুলো আমাদের শিখতে হয়। হিব্রু একটাআ গুরুত্বপূর্ণ ভাষা, অন্তঃত আন্ডার ওয়ার্ল্ডের জন্যে। তবে আমাদের সম্পর্ক টাকার সাথে। কোন দেশের রাজনীতির সাথে আমাদের কোন যোগ নেই।'

'টাকার বিনিময়ে আমাদেরকেও সাহায্য করুন তাহলে।' বলল আহমদ মুসা।

'তী সাহায্য?' জিজ্ঞাসা লোকটির।

'ওরা পূর্ব আনাতোলিয়ার প্রশাসনকে কব্জায় আনতে চাচ্ছে কেন? তাদের লক্ষ্য কী? এসব তথ্য আমাদের সংগ্রহ করে দিন। শুধুই খুনের কাজ করেন, নাকি সব কিছু? কিন্তু সবখানেই তো রাজনীতি আছে। ওরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যেই আমাকে খুন করতে আপনাদের নিয়োগ করেছিল। আমি বেঁচে গেছি, কিন্তু আরেকটি মেয়ে জীবন দিয়েছে আমাকে বাঁচানোর জন্যে।' আহমদ মুসা বলল।

'আমরা আগে জানলে আপনাকে খুন করার এই কাজটা অবশ্যই নিতাম না।' লোকটি বলল।

'আপনি যে দেশের মানুষ, সে দেশের রাজনৈতিক স্বার্থ আপনি দেখবেন না?' বলল আহমদ মুসা।

'দেশ আমার স্বার্থ দেখেনি। আমি দ্বারে-দ্বারে ঘুরে বেড়িয়েছি, চাকুরী পাই নি। তারপর বিচারক অন্যের দায় আমার ঘাড়ে চাপিয়ে আমাকে জেলে পাঠিয়েছে। বাধ্য হয়েই কিলার গ্রুপে নাম লিখিয়েছি।' লোকটি বলল।

‘বিচারক যেমন অন্যের দায় আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে আপনাকে জেলে পাঠিয়েছে এবং যারা আপনাকে চাকুরী দেয়নি এমন কিছু লোকের দায় আপনিও তো অন্যায়ভাবে অন্যের ঘাড়ে চাপাতে পারেন না।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আপনার কথা ঠিক। কিন্তু একজন বিচারক অন্যায়কে ন্যায় বলে রায় দিয়েছে, তাই আমিও এটাই ন্যায় হিসেবে গ্রহণ করেছি।’

বলে একটু থামল লোকটি। একটু ভেবে বলল, ‘তবে প্রয়োজন হলে আমি আপনাকে সাহায্য করবো।’

‘আমাকে কেন, দেশকে সাহায্য করবেন না?’ আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

‘কারণ, আপনাকে আমার ভালো লেগেছে। বন্দুকধারী কাউকে আমি কখনো এমন সুন্দর ব্যবহার করতে দেখিনি।’ বলল লোকটি।

‘ধন্যবাদ। কী সাহায্য করবেন, কিভাবে সাহায্য করবেন?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘সেটা আমি ঠিক করব। আমার দুই কলিগের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ আপনি নিতে পারলেও আমি খুশি হবো। তবে তার আগেই আমি চেষ্টা করবো তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে।’

‘ধন্যবাদ, তাতে আমাদেরও লাভ হবে।’

বলে একটু থেমেই আহমদ মুসা আবার বলল, ‘তাহলে এখন তো কথা আর নেই। সাহায্যের প্রতিশ্রুতির জন্যে ধন্যবাদ। আবার করে দেখা হবে?’

‘আমি নামায পড়ি না। কিন্তু আমি অদৃষ্টবাদী। ভাগ্য যখন আমাদের আবার দেখা করাবে, তখন দেখা হবে।’ বলল লোকটি।

বিমর্ষতা নেমে এল আহমদ মুসার চোখে-মুখে। বলল, ‘দেশ না হয় দোষ করেছে, কিন্তু আল্লাহ্’র আদেশ মানবেন না কেন?’

‘আল্লাহ্ আমাকে কিলার বানিয়েছেন, আমি তো কিলার হতে চাইনি। আর কিলার হওয়ার পর আর নামায পড়ার সুযোগ থাকে না।’ লোকটি বলল।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আল্লাহ্ আপনাকে কিলার বানাবেন কেন? চাকুরী না পেয়ে বিনা অপরাধে অন্যায়ভাবে বিচারক আপনাকে জেলে পাঠানোর

ফলে আপনি যে সংকটে পড়েছিলেন, সে সংকটের সুযোগ নিয়ে শয়তান আপনাকে কিলার বানিয়েছে।' আহমদ মুসা বলল।

'সংকট থেকে আল্লাহ্ আমাকে বাঁচাননি কেন?' বলল লোকটি।

'আপনার মধ্যে ধৈর্য্যের অভাব, তাই। সে কারণেই সংকট আপনাকে কাবু করে ফেলেছিল এবং তার ফলে শয়তানের জন্যে পথ উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ্ কুরআন শরীফে বলেছেন, 'কষ্টের পাশেই কষ্টের উপশম থাকে।' আল্লাহ্'র এই ওয়াদার উপর বিশ্বাস করে ধৈর্য্য ধারলে কষ্টের উপশম জীবন্ত রূপ নিয়ে মানুষের সামনে আসে। আপনি উপশমকে কাছে আসার সে সুযোগ দেননি।' আহমদ মুসা বলল।

'সব কষ্টেরই উপশম হয় ধৈর্য্য ধরলে?' বলল লোকটি।

'বিশ্ব চরাচরের মালিক ও স্রষ্টা আল্লাহ্ বলেছেন, কষ্টের সাথেই উপশম। তাই কষ্টের মধ্যে শেষ পর্যন্ত ধৈর্য্য ধরতে পারলে উপশম আসাটাই স্বাভাবিক। তবে 'স্বাভাবিক' শব্দের বিপরীতে 'অ-স্বাভাবিক' বা 'ব্যতিক্রম' শব্দ যখন রয়েছে, তখন ব্যতিক্রমী বিষয় হিসেবে কষ্টের উপশম কখনও কোন ক্ষেত্রে নাও আসতে পারে। কিন্তু এটা ধরার বিষয় অবশ্যই নয়।' আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ আপনাকে। বিষয়টাকে এমনভাবে দেখার সুযোগ হয়নি, সামর্থ্যও বোধ হয় ছিল না। কিন্তু যা ঘটার, যা হবার, তা তো ঘটেই গেছে। এখন এই সব আলোচনার কোন অর্থ নেই।' বলল লোকটি।

'অর্থ অবশ্যই আছে। কিলার হওয়াই শেষ কথা নয়, কিলার হওয়া কারো শেষ পরিচয়ও নয়। কিলার হওয়ার পর নামায পড়ার সুযোগ নেই, একথা ঠিক। তবে নামায সব পাপের কালো দাগ মুছে ফেলতে পারে। পাপের জীবন থেকে ফিরে আসার তওবা মানুষের পাপের ক্লেশক্লিষ্ট জীবনকে পবিত্র করে তুলতে পারে।'

আশার একটা চাপা ঔজ্জ্বল্য ফুটে উঠল লোকটির চোখে-মুখে। বলল, 'ধন্যবাদ। আপনি খুব ভালো লোক। ভালো লোকরা মানুষের মনে হতাশার বদলে আশার উজ্জীবন ঘটায়। এমন ভালো লোকদের অবিশ্বাস করা চলে না। ঠিক আছে আবার দেখা হবে।' বলল লোকটি।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, ‘আপনার নাম জিজ্ঞেস করা কি ঠিক হবে?’

এতক্ষণে হাসল লোকটা। বলল, ‘আপনি আইনজীবী হলে বোধ হয় বেশি ভালো করতেন। আপনি কেমন বন্দুক চালান জানি না। কিন্তু কথা আপনার দারুন লক্ষভেদি। যাক, আমার নাম মেন্দারিস মালিক। ডবল এম। আপনার নাম কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করলাম না।’

‘যাকে হত্যার জন্যে আপনাদের দু’জন লোককে নিয়োগ করা হয়েছিল, আমি সেই আবু আহমদ।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ধন্যবাদ, আবার দেখা হবে।’ বলে হ্যান্ডশেকের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল মেন্দারিস মালিক।

‘আস্-সালামু আলাইকুম।’ বলে লোকটির সাথে হ্যান্ডশেক করল আহমদ মুসা।

‘আসি।’ বলে আহমদ মুসা ঘর থেকে বেরুবার জন্যে পা বাড়াল।

সাথে সাথে হাঁটতে লাগল মেন্দারিস মালিকও।

মেন্দারিস মালিক গাড়ি পর্যন্ত এসে আহমদ মুসাকে বিদায় জানাল।

মাউন্ট আরারাতের গোড়ায় টুরিস্ট বেজক্যাম্প নাম্বার ওয়ানে পর্যটন রেস্টুরেন্টে আহমদ মুসা বসে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে আর চোখ দু’টি নিবদ্ধ রেখেছে পাশেই মেলে রাখা পত্রিকায়।

কিন্তু পত্রিকার এক বর্ণও সে পড়ছে না। মনে তার ভিন্নরকম চিন্তার ঝড়।

ভ্যান-এর পুলিশ প্রধান ডিজিপি মাহির হারুন গত কয়েকদিন থেকে গোটা পূর্ব আনাতোলিয়া অঞ্চলের রিপোর্ট গোয়েন্দাদের মাধ্যমে তার কাছে পাঠাচ্ছে। এই ব্যবস্থা করা হয়েছে আংকারার প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে।

গোয়েন্দা রিপোর্টে অস্বাভাবিক কিছু দেখছে না আহমদ মুসা। উল্কিওয়ালাদের সুপারিশে তাদের বশংবদ হিসাবে ইজদির প্রদেশ ও আশে-

পাশের কিছু অঞ্চলে যেসব সেনা অফিসার নিয়োগ পেয়েছিল তার তৎপরতার রিপোর্টও আসছিল আহমদ মুসার কাছে। তাদের তৎপরতায় অস্বাভাবিক কিছু নেই। তবে সব ব্যপারেই একটু বেশি সতর্ক মনে হয়।

তাদের চলাফেরায় ফ্রী-নেসটা আগের মত নেই। অন্যদিকে গোয়েন্দারা বড় কোন অস্বাভাবিক তৎপরতার খবর দিতে না পারলেও রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে মাউন্ট আরারাতের সেসব ক্যাম্পগুলোতে ভিজিটরের সংখ্যা বেড়েছে। আর গোটা ইজদির ও সন্নিহিত অঞ্চলে হঠাৎ করেই ফেরিওয়ালা, হোম সার্ভিস কোম্পানীর লোকজন ও খ্রীস্টান ধর্মগুরুদের আনা-গোনা বেড়েছে। গোয়েন্দাদের রিপোর্ট অনুসারে আনা-গোনার ফ্রিকোয়েন্সি আগের তুলনায় তিনগুণ বেড়েছে। এসব তথ্য থেকে আহমদ মুসার মনে হচ্ছে এগুলো সবই গণসংযোগের কৌশল। কেন এই গণসংযোগ, তার জবাব আহমদ মুসার কাছে নেই। তবে এটা নিশ্চিত যে, কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে এবং সেটা বড় কিছু। মেন্দারিস মালিক বলেছে, ওরা এ অঞ্চলটা গ্রাস করতে চায়। কিন্তু সেটা কিভাবে? কোন একটা গ্রুপ কি এট পারে!

এসব চিন্তা আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল আহমদ মুসাকে। শেষ দিকে কফি খেতে ভুলে গেছে সে।

কিন্তু তার আচ্ছন্ন ভাব ছিন্ন হয়ে গেল পাশের টেবিলের দু'টি চেয়ার টানার কর্কশ শব্দে।

আহমদ মুসা তাকিয়ে দেখল, দু'জন যুবক এসে বসেছে পাশের টেবিলে। দু'জনের চেহারাই অদ্ভুত প্রকৃতির। তাদের চোখে-মুখে অপরাধের চিহ্ন। পরনেও তাদের কালো জিন্স ও কালো গেঞ্জি।

টেবিলে বসেই ভদকা ও কাবাব-রুটির অর্ডার দিল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ভদকা, কাবাব-রুটি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল এবং কথার ফুলঝুরি ছুটল তাদের মুখে।

একজন বলল, 'খেয়ে নাও, খেয়ে নাও আমাদের দুঃখের দিন শেষ। অঢেল টাকা নয়, অঢেল সোনা আসবে আমাদের ঘরে।'

আহমদ মুসা সত্যিই পত্রিকা পড়া শুরু করেছিল। কিন্তু লোকটির এই কথাগুলো কানে যেতেই তার কান খাড়া হয়ে উঠল। অঢেল সোনা? কোত্থেকে? রহস্যের গন্ধ পেল আহমদ মুসা। আরেক কাপ কফির অর্ডার দিল সে।

পাশের টেবিলের প্রথম লোকটির খাওয়া শেষ হতেই দ্বিতীয় লোকটি বলে উঠল, 'পূর্ণিমার সেই রাতটা কত দূরে, কয়দিন বাকি? সেদিন মাউন্ট আরারাতের সেই গোপন গুহার বহু শতাব্দীর গোপন মুখটা খুলে যাবে। বেরিয়ে আসবে স্বর্ণের ভাণ্ডার। ভাবতে অবশ্যই অবাক লাগছে। আসবে তো জুনের সেই পূর্ণিমার রাত? পাওয়া যাবে তো সেই গুহা? আছে তো সেখানে সেই স্বর্ণভাণ্ডার? বল ব্রাদার বল।'

'এসব ফালতু চিন্তা বাদ দাও। এবার কোন ভুল হয়নি। আমি মি. ভারদার বুরাগের কাছে বিস্তারিত শুনেছি। খ্রীস্টপূর্ব ৫শ বছর আগের মিহরান মাসিসের আঁকা মাউন্ট আরারাতের সেই মানচিত্র এখন আমাদের হাতে। আজকের মত সেই সময়ের এক ভীষণ তপ্ত জুনে, যখন মাউন্ট আরারাতের হাজার ফিট পর্যন্ত বরফ গলে গিয়ে নুহের কিস্তি ও সব গুহার গোটা অবয়ব নগ্ন হয়ে পড়েছিল। সেই সময় আঁকা মাসিসের মানচিত্রটি। সেই মানচিত্র সামনে রেখে অত্যাধুনিক এ্যান্টি আইস ক্যামেরা দিয়ে তোলা ছবি থেকে নিখুঁতভাবে স্বর্ণভাণ্ডারের গর্তটি চিহ্নিত করা হয়েছে। আর 'গোল্ড সেনসেটিভ বিম ট্রান্সমিটার' থেকে 'রে' ফেলে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, অঢেল স্বর্ণের ভাণ্ডার সেখানে রয়েছে।' বলল প্রথম লোকটি।

দ্বিতীয় লোকটি তার হাতের মদের গ্লাস টেবিলে রেখে হাত বাড়িয়ে প্রথম লোকটির সাথে হ্যান্ডশেক করে বলল, 'সোরেন, তোকে ধন্যবাদ। এত বড় একটা খবর তুই দিতে পারলি সেজন্য আমার ভাগ থেকে একটা অংশ স্বর্ণ তোকে বেশি দেব। কিন্তু আমরা নিরাপদে কাজটা করতে পারবো তো? শালার আর্মি বেটারা তো সারাক্ষণ চোখ রেখেছে পাহাড়টার উপর।'

সোরেন লোকটা তার হাতের আধা গ্লাস ভদকা গোটাটাই গলায় ঢেলে দিয়ে গ্লাসটা সশব্দে টেবিলে রেখে বলল, 'আরে, এসব নিয়ে ভাবিস না। সব ব্যবস্থা পাকা-পোক্ত হয়েছে। আমরা যখন কাজ করব, তখন আর্মি স্বয়ং আমাদের পাহারায় থাকবে, আমাদের সাহায্য করবে।'

‘ফুলমুনটা আসতে আর কয়দিন বাতি, সোরেন? চাঁদের কয় তারিখ আজ? শালা দিন তো যাচ্ছে না।’ বলল আরেক নামের দ্বিতীয় লোকটা।

‘ফুলমুন যেদিন আসার সেদিনই আসবে। শালা আবার চাঁদের সহজ হিসাবটা ভুলে গেল।’ বলল সোরেন।

‘শালা, দুনিয়া ভোলার অবস্থা এখন, দিনের হিসাব দূরে থাক।’ আরেক নামের লোকটা বলল।

‘দুনিয়া ভুলে গেলেও সুন্দরী পার্টনারকে ভুলিস না।’ বলল সোরেন।

আরও একটা অশ্লীল কথা বলল।

ওদের আলোচনা অশ্রাব্য অশ্লীলতার দিকে টার্ন নিল।

আহমদ মুসার মুখ তখন অপার খুশিতো উজ্জ্বল। উল্কিওয়ালাদের দু’জনের সাক্ষাতই শুধু নয়, ওদের একটা বড় প্রোগ্রামেরও সন্ধান পাওয়া গেল এদের মাধ্যমে। আহমদ মুসা সিদ্ধান্ত নিল, ওদের ফলো করতে হবে। জানতে হবে ওদের ঠিকানা।

এক সময় ওরা উঠল। বেরিয়ে গেল ওরা রেস্টুরেন্ট থেকে।

আহমদ মুসাও উঠল।

ওরা বেরিয়ে বেরিয়ে যাবার পর আহমদ মুসাও বেরুল রেস্টুরেন্ট থেকে।

রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়েই আহমদ মুসা দেখল, ওরা দু’জন একটা লাল গাড়িতে উঠছে।

ওদের গাড়ি স্টার্ট নিল। রেস্টুরেন্টের কারপার্ক-লনটি অতিক্রম করে গাড়িটা রাস্তার দিকে এগোলো।

আহমদ মুসার গাড়িটিও স্টার্ট নিয়ে ছুটল গাড়িটার পেছনে।

রেস্টুরেন্টের বাইরের গেটের গেটম্যান আহমদ মুসার গাড়ির দিকে তাকিয়ে ছিল। আহমদ মুসার গাড়িটা যখন গেট অতিক্রম করছিল, তখন গেটম্যান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছিল আহমদ মুসাকে। আহমদ মুসার দৃষ্টি যে সামনের মোড়ে একটা রাস্তার বাঁকে আড়াল হতে থাকা লাল গাড়িটার দিকে নিবদ্ধ ছিল, সেটাও গেটম্যান তার দু’চোখ খুলে দেখার ও বুঝার চেষ্টা করছে।

আহমদ মুসার গাড়ি সামনের রাস্তার মোড়ে লাল গাড়িটার পথ ধরে চোখের আড়ালে চলে যাবার আগ পর্যন্ত গেটম্যান সেদিকে তাকিয়েছিল।

গেটম্যানের এই বাড়তি আগ্রহের কারণ কি, তা আহমদ মুসার জানার সুযোগ হলো না। আহমদ মুসার নজর সে সময় লাল গাড়ি নিয়ে ব্যস্ত না থাকলে গেটম্যানের সন্ধানী চোখের দৃষ্টি তার চোখ এড়াত না।

আহমদ মুসার লক্ষ্য লাল গাড়ির ঐ দুই যুবককে অনুসরণ করে ওদের ঠিকানা জেনে নেয়া। তাই আহমদ মুসা তার গাড়ির স্পীড় লাল গাড়িটার সমান রেখে সমান দূরত্বে থেকে ওদের অনুসরণ করে চলছে। অবশ্য মাঝে মাঝে গাড়ির গতির হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে। লাল গাড়ি চলছিল মাউন্ট আরারাতের উত্তরে পাহাড় পেরিয়ে। গাড়ি এগিয়ে চলছে এঁকে-বেঁকে সামনের দিকে। মাঝে মাঝেই সামনের লাল গাড়িটা হারিয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের আড়ালে। আহমদ মুসাকে তাই সামনের লাল গাড়িটাকে অনেক বেশি কাছ থেকে অনুসরণ করতে হচ্ছে। তবে পথের পার্বত্য অবস্থা সামনেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। আধা মাইলের মধ্যে একটা মোড় পাওয়া যাবে। পাহাড়ের পরেই এই মোড়টা। এটা রোড জংশনও। দক্ষিণের ভ্যান, দক্ষিণ-পশ্চিমের আগ্রি, উত্তর-পশ্চিমের কারস এবং উত্তরের ইজদির অঞ্চল থেকে আসা রাস্তা। সব এখানে এসে মিশেছে। আর অরিয়াস অঞ্চল থেকে আসা রাস্তা। সব এখানে এসে মিশেছে। আর অরিয়াস অঞ্চল থেকে যে রাস্তা এখানে এসে মিশেছে, সে রাস্তা দিয়ে তো আহমদ মুসারাই যাচ্ছে। একটা বিষয় ভেবে আহমদ মুসা খুশি হলো যে, লাল গাড়িটা যদি তার গাড়িকে খেয়াল করেও থাকে, পার্বত্য পথে ঢোকার পর তার গাড়ির কথা লাল গাড়িটা ভুলে যাবার কথা। এটাই যদি হয় তাহলে রোড জংশনের পর লাল গাড়িটাকে ফলো করা অনেকখানি সহজ হবে। আর যদি তার গাড়িটাকে লাল গাড়ি মনে রেখে থাকে, তাহলে জংশনের পর সমভূমির রাস্তায় লাল গাড়িকে অনুসরণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

আহমদ মুসার গাড়ি শেষ পাহাড়টার শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছে গেছে। মিনিট খানেকের মধ্যেই বেরিয়ে যাবে পাহাড়ের ছায়া থেকে।

সামনেই মোড়। মাত্র দু'শ-আড়াই'শ গজ দূরে।

আহমদ মুসা দেখল লাল গাড়িটা রোড জংশনটা পেরিয়ে কারসমুখী রাস্তায় ঢুকে গেল।

আহমদ মুসার গাড়ি রোড জংশনে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। এ সময় আহমদ মুসা দেখল বামে 'ভ্যান'-এর দিক থেকে এবং ডানে ইজদির দিক থেকে দুটো গাড়ি তীব্র গতিতে ছুটে আসছে রোড জংশনের দিকে।

রোড জংশনে প্রবেশ করেছে আহমদ মুসার গাড়ি। তার সামনে পড়তেই দেখতে পেল কারসের রাস্তায় প্রবেশ করে সেই লাল গাড়িটা এ্যাবাউট টার্ন করে এদিকে ফিরে আসতে শুরু করেছে।

চমকে উঠল আহমদ মুসা। আঘাতে ঘুমভাঙা বাঘের মত গোটা স্নায়ুতন্ত্রী এ সাথে জেগে উঠল। আহমদ মুসার মুখ থেকে আপনাতেই অস্ফুটে বেরিয়ে এল, 'ওরা আমাকে ট্র্যাপে ফেলেছে।' পেছনে গাড়ির শব্দ পেল আহমদ মুসা। তাকিয়ে দেখল, আরেকটা মাইক্রো পেছন দিক থেকে ছুটে আসছে। ওদের ট্র্যাপটা এবার সম্পুর্ণ হলো।

একটু ভাবল আহমদ মুসা। বিস্মিত হলো সে, এই আয়োজন ওরা কখন করল, কিভাবে করল? হঠাৎ আহমদ মুসার মনে পড়ল, মাউন্ট আরারাতের রেস্টুরেন্ট থেকে বেরুবার জন্যে যখন গেটে প্রবেশ করতে যাচ্ছিল, তখন তার দিকে চেয়ে থাকা গেটম্যানের দৃষ্টি অস্বস্তিকর লেগেছিল। তার হাতে একটা মোবাইলও ছিল। কিন্তু আহমদ মুসার চোখ লাল গাড়িটার পেছনে ছিল বলে গেটম্যানকে নিয়ে চিন্তা করার সে সময় পায়নি।

রোড জংশনের সার্কেলে প্রবেশ করে ডান বা বাম কোন দিকে টার্ন না নিয়ে গাড়ির ব্রেক কসেছে আহমদ মুসা। তার গাড়ির সামনে সার্কেলের দুই ফুট উঁচু আইল্যান্ড।

ট্র্যাপ থেকে বের হওয়া বা মোকাবিলা করার নানান কৌশল মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে আহমদ মুসার।

ডান বা বাম দিকের মাইক্রোকে ওভারটেক করে ডান বা বামের রাস্তায় যাবার সে চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে মাইক্রোর পাশ ঘেঁষে তাকে যেতে হবে। সে ক্ষেত্রে খুব কাছ থেকে মাইক্রোর গুলিবৃষ্টির মুখে সে পড়বে। এক হাতে

ড্রাইভ করে অন্য হাতে গুলি চালিয়ে মোকাবিলা করা যাবে না। তাছাড়া বাম বা ডান যে দিক থেকেই সে বেরুবার চেষ্টা করুক, মাইক্রোকে সাহায্য করার জন্যে লাল গাড়িটা ছুটে আসবে। তার উপর আরেকটা বিপদও আছে। সেক্ষেত্রে সে পেছন থেকেও আক্রমণের শিকার হবে। এজন্যে পেছনের মাইক্রো তো আছেই। তার উপর যেদিকে সে যাবে, তার বিপরীত পাশের মাইক্রোও তার পিছু নেবে। সব দিক থেকে চিড়েচ্যাপ্টা হওয়ার দশায় পড়বে।

এই অবস্থায় আহমদ মুসা আল্লাহ্'র উপর ভরসা করে আইল্যান্ডকে সামনে রেখে ওদেরকে প্রথমে আক্রমণে এনে আত্মরক্ষা ও আক্রমণের একটা কৌশল ঠিক করল।

আহমদ মুসার গাড়িটাও তার আত্মরক্ষার একটা অস্ত্র হবে। কারণ এ গাড়িটা সেমি বুলেট গ্রুপ। গুলিবৃষ্টির মুখে তার গাড়ির সব কাঁচই ভেঙে যাবে, কিন্তু গাড়ির বডিকে কোন বুলেটই অতিক্রম করতে পারবে না। ভ্যান- এর পুলিশ প্রধান মাহির হারুন তাদের শ্রেষ্ঠ গাড়িটাই তাকে ব্যবহার করতে দিয়েছে।

আহমদ মুসা তার পকেট থেকে মেশিন রিভলভারটা বের করে পাশে রাখল। দু'পাশ থেকে তার দিকে ছুটে আসা গাড়িগুলোকে থামিয়ে দেয়ার জন্যে এ রিভলভার নয়, পয়েন্টেড গুলির জন্যে ভিন্ন রিভলভার দরকার। আহমদ মুসা তার মাথার পেছনে ঘাড়ের জ্যাকেটে রাখা মিনি রিভলভার হাতে নিল। এ রিভলভারের মিনি বুলেটে একটি করে পাওয়ারফুল বিস্ফোরক থাকে। এ রিভলভারই সে প্রথম ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার আত্মরক্ষা ও আক্রমণের কৌশল কাজে লাগাবার জন্যে।

আইল্যান্ডকে সামনে রেখে গাড়ি ব্রেক কারার কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আহমদ মুসার এই কৌশল-চিন্তা ও প্রস্তুতির কাজ শেষ হয়ে গেল।

আহমদ মুসার গাড়ি দাঁড়াবার পর মুহূর্তকাল দ্বিধা করেছে মাইক্রো দু'টো, তারপ দ্রুত ছুটে আসতে লাগল আহমদ মুসার গাড়ির দিকে। দু'দিক থেকে এসে মাইক্রো দু'টি আহমদ মুসার গাড়িকে স্যান্ডউইচ বানাতে চায়, এ রকমই একটা ভাব গাড়ি দু'টির গতিতে।

দু’টি গাড়িকেই আহমদ মুসা দেখতে পাচ্ছে। তার রিভলভার প্রস্তুত। ট্রিগারে তর্জনি। দুই মাইক্রোকে থামাতে হলে তাকে দু’টি গুলিই করতে হবে মুহূর্তের ব্যবধানে।

বাম দিকের মাইক্রোর মাথাটাই প্রথম আইল্যান্ড থেকে বেরিয়ে এল। আহমদ মুসার চোখ গিয়ে পড়ল মাইক্রোর সামনের বাম চাকাটার উপর। এই চাকাই তার টার্গেট। এই চাকা ভেঙে পড়লে গাড়িটা নির্ঘাত আইল্যান্ডের সাথে ধাক্কা খাবে। চাকাটা দেখার সাথে সাথে তার তর্জনি চেপে বসল রিভলভারের ট্রিগারে। পরক্ষণেই মাইক্রোটার সামনের বাম চাকা বিস্ফোরিত হলো প্রচন্ড শব্দে। মাইক্রোটা কিছুটা কাত হয়ে বামে বেঁকে গিয়ে আঘাত করল আইল্যান্ডকে।

আহমদ মুসা গুলি করেই হাতের রিভলভার ঘুরিয়ে নিয়ে টার্গেট করল ডান দিকের মাইক্রোকে।

মাইক্রোটা সম্পূর্ণটাই আইল্যান্ডের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে।

আহমদ মুসার রিভলভারের গুলি আগের মতই এ মাইক্রোর সামনের ডান চাকায় আঘাত করল। চাকা বিস্ফোরিত হবার সাথে সাথেই দ্রুত গাড়ির মাথাটা ডান দিকে বেঁকে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল আইল্যান্ডের দেয়ালে।

আইল্যান্ডে ধাক্কা খাওয়া গাড়ি থেকে নামতে ওদের দেরি হবে। এই সুযোগে গাড়ি চালিয়ে ওদের পাশ কাটিয়ে ওদের ট্রাপ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চিন্তা করল আহমদ মুসা।

দুই হাতে গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে গাড়ি স্টার্ট দিতে যাবে, এসময় পেছরে আছে। দুই মাইক্রোর অবস্থা দেখেই সম্ভবত পেছনের গাড়িটা গুলি করতে শুরু করেছে।

আহমদ মুসা গাড়ি স্টার্ট করল।

পেছনের গুলিবৃষ্টির মধ্যে দিয়েই তাকে এখনি এই ট্র্যাপ থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। দুই মাইক্রো থেকে ওরা বেরিয়ে এলে তাকে ত্রিমুখি গুলিবৃষ্টির মুখে পড়তে হবে।

কিন্তু সময় পেল না আহমদ মুসা। গাড়ি ঘুরিয়ে নেবার আগেই সে দেখল গুলিবৃষ্টিসহ পেছনের মাইক্রোটি তীব্র বেগে এসে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

মাইক্রোটির আঘাত এড়িয়ে কোন দিকে গাড়িটা সরিয়ে নেবার সুযোগ নেই তার। ডান ও বাম পাশে দু'টি গাড়ি আইল্যান্ডে ধাক্কা খেয়ে মুখ থুবড়ে পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের এড়িয়ে পথ করে নিতে হলে তার যতটা সময় ও সুযোগ দরকার, সেটা পেছনের মাইক্রো অসম্ভব করে দিয়েছে। মাইক্রোটি তার গাড়ির উপর এসে পড়ল। ওরা আজ যেভাবে হোক আহমদ মুসাকে শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বোঝা যাচ্ছে।

গাড়ি থেকে তার নেমে যাবারও কোন উপায় নেই। দু'পাশের দুই মাইক্রো থেকে লোক বেরিয়ে আসছে অস্ত্র হাতে। নামলেই ওদের গুলির মুখে পড়তে হবে।

'হাসবুনাল্লাহ্' বলে চোখ বন্ধ করল আহমদ মুসা।

পরক্ষণেই পিছন দিক থেকে শব্দ কানে এল প্রচণ্ড বিস্ফোরণের। চমকে উঠে চোখ খুলল আহমদ মুসা।

পেছনে তাকিয়ে দেখল পেছনের মাইক্রোটি দাউ-দাউ করে জ্বলছে। মাইক্রোটি তার গাড়ি থেকে মাত্র গজ তিন-চারেক দূরে এসে থেমে পড়েছে।

বিস্মিত আহমদ মুসা দু'পাশে তাকাল। দেখল, ডান ও বামের মাইক্রো থেকে লোকরা নেমে পড়েছে। তাদের প্রত্যেকের হাতে স্টেনগান। ডান পাশের মাইক্রোর লোকরাই আগে নেমেছে। ছুটে আসছে ওরা। আহমদ মুসাকে দেখতেও পেয়েছে। সংগে সংগেই ওদের স্টেনগান উপরে উঠল। আহমদ মুসার হাতের মেশিন রিভলভার আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। তর্জনি ছিল রিভলভারের ট্রিগারে। তর্জনি তার চেপে বসল ট্রিগারে। অব্যাহত গুলির বৃষ্টি ছুটে চলল স্টেনগানধারী ছয় সাতজন লোকের দিকে।

কিন্তু এই সময়ে বাম দিক থেকে অব্যাহত গুলিবৃষ্টি শুরু হলো। গুলি গুলো এসে ছেঁকে ধরল আহমদ মুসার গাড়িক।

গুলী বন্ধ করে নিরুপায় আহমদ মুসা 'হাসবুনাল্লাহু নি'মাল ওয়াকীল, নি'মাল মাউলা ওয়া নি'মান নাসীর' বলে শুয়ে পড়েছে গাড়ির মেঝেতে। তার এখন করণীয় কিছু নেই। ডান দিকের অস্ত্রধারীদের প্রতি তার গুলিবৃষ্টি কী ফল দিয়েছে, সেটা দেখারও সময় পায়নি আহমদ মুসা। তবে সেদিক থেকে কোন গুলি আসছ না।

গাড়ির ফ্লোরো আশ্রয় নেবার পর মুহূর্তও পার হয়নি, আরেকটা বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেল আহমদ মুসা। এবার বিস্ফোরণটা বাম পাশে, একদম কাছেই হলো।

বিস্ফোরণের সাথেই বাম দিকের গুলিবৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল।

পার হলো কয়েক মুহূর্ত।

ফ্লোর থেকে উঠল আহমদ মুসা। গাড়ির সীটে বসে তাকাল বাম দিকে দ্বিতীয় বোমা বিস্ফোরণের স্পটের দিকে। দেখতে পেল অনেকগুলো মানুষের ছিন্ন-ভিন্ন দেহ। বাঁচার মত কাউকে মনে হলো না। তাকাল ডান দিকে। দেখল, তার গুলিতে কাজ হয়েছে। ওরা দৌড়ে সার বেঁধে ছুটে আসছিল। গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া দেহ নিয়ে ওরা সারবেঁধেই পড়ে আছে।

কিন্তু তাকে রক্ষার জন্যে দু'টি বোমার বিস্ফোরণ ঘটাল কে? বিস্ফোরণ দু'টি সাক্ষাত আল্লাহ্'র সাহায্য হিসাবে এসেছে। কিন্তু আল্লাহ্ কাকে দিয়ে এই সাহায্য করালেন? কে সে?

দুই হাতে দুই রিভলভার নিয়ে আহমদ মুসা গাড়ি থেকে নামল। গাড়ি থেকে নেমেই আহমদ মুসা দেখতে পেল, পেছনের জ্বলন্ত মাইক্রোর পাশ দিয়ে এগিয়ে আসছে মেন্দারিস মালিক। তারও হাতে রিভলভার।

আহমদ মুসাকে দেখতে পেয়ে সে ছুটে এল।

'কেমন আছেন আপনি? ভালো তো? ভীষণ উদ্বিগ্ন ছিলাম আপনাকে নিয়ে। আল্লাহ্'র হাজার শোকর যে আপনাকে দেখতে পেলাম। ওরা আট-ঘাট বেঁধে পরিকল্পনা করেছিল।' আহমদ মুসার সামনে এসে এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলল মেন্দারিস মালিক।

আহমদ মুসা জড়িয়ে ধরল তাকে। বলল, 'আমাকে বাঁচানোর জন্যেই আল্লাহ্ আপনাকে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ্'র মূর্তিমান সাহায্য হিসাবে আপনি এসেছেন। আল্লাহ্'র হাজার শোকর। আপনাকে ধন্যবাদ।'

'আপনি নিজেকে নিজেই বাঁচিয়েছেন।'

'ডান ও বাম পাশের মাইক্রো দু'টিকে যদি আপনি অকেজো করে দিতে না পারতেন, তাহলে গাড়ি সমেত আপনাকে ওরা পিশে ফেলত। আবার ডান

পাশের বন্দুকধারীদের আপনি ঠিক সময়ে ঠেকিয়েছেন। ওরা আপনার গাড়ির এত কাছে এসে পড়েছিল যে আমি দূরে থেকে জ্বলন্ত মাইক্রোর উপর দিয়ে ওদের উপর বোমা ফেলতে সাহস পাইনি।' বলল মেন্দারিস মালিক।

'কিন্তু পেছনের মাইক্রো আমাকে তো প্রায় শেষ করেই ফেলেছিল। আপনার বোমা ঠিক সময়ে মাইক্রোকে আটকে দিয়েছে।' আহমদ মুসা বলল।

'আল্লাহ্'র হাজার শোকর। আমি অনেকটা পেছন থেকে মাইক্রোর উপর বোমাটি ফেলেছিলাম। ভয় ছিল লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যায় কিনা। কিন্তু আল্লাহ্ আমাকে সাহায্য করেছেন।'

'আলহামদুলিল্লাহ্।' মেন্দারিস মালিক বলল।

'আলহামদুলিল্লাহ্। যদি আপনি বাম পাশের গুলিবৃষ্টিরত বন্দুকধারীদের উপর ঠিক সময়ে বোমা না ফেলতেন, তাহলে কিন্তু আমার বাঁচা দায় হতো। আমাকে পাল্টা গুলি করার সুযোগ ওরা দিত না।' বলল আহমদ মুসা।

'এটাও ছিল ভাগ্য। আমি যেখান থেকে শূন্য দিয়ে লক্ষ্য ছাড়াই জ্বলন্ত মাইক্রোর উপর দিয়ে বোমাটি ছুঁড়েছিলাম, তা পয়েন্টেড ছিল না। সেটা যে অস্ত্রধারীদের মাঝখানে পড়েছে, সেটা আমি বলছি লাক।'

থমল মেন্দারিস মালিক মুহূর্তের জন্যে। পরক্ষণেই বলল, 'চলুন দেখি ওদের কাছ থেকে কিছু পাওয়া যায় কিনা।'

'চলুন।' বলল আহমদ মুসাও।

হাঁটতে শুরু করে আহমদ মুসা টেলিফোন করল ডিজিপি মাহির হারুনকে। তাকে এখানকার সব ঘটনা জানাল সংক্ষেপে। ডিজিপি মাহির হারুন বলল, 'আপনি ঠিক আছেন তো।' তার কণ্ঠে উদ্বেগ।

'আমি কিছু লুকাইনি মি. মাহির হারুন। আমি ভালো আছি। তবে স্নেক গ্রুপের একজন সদস্য সাহায্য না করলে আমি এভাবে কথা বলার অবস্থায় বোধ হয় থাকতাম না।' আহমদ মুসা বলল।

'স্নেক গ্রুপ? ও তো কিলার গ্রুপ। তারা আপনাকে সাহায্য করল? কিভাবে। কেন?' জিজ্ঞাসা ডিজিপি মাহির হারুনের।

'স্নেক গ্রুপ কিলার ঠিকই। কিন্তু মি. মাহির হারুন, মানুষই কিলার হয়, কিলার মানুষও হতে পারে। সেই একজন মানুষই আমাকে সাহায্য করেছে।' আহমদ মুসা বলল।

'তা হতে পারে। শুনেছি, ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলিম সৈনিকদের হিংস্র প্রাণীরাও সাহয্য করতো। আপনি কিলারকে মানুষ করবেন, সেটা স্বাভাবিক। ধন্যবাদ। আমি আসছি। তাকে আমি ধন্যবাদ দেব। আমি ইজদির পুলিশকেও বলছি ওখানে যাবার জন্যে। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন।' বলল ডিজিপি মাহির হারুন।

'আসুন। ধন্যবাদ। আস্-সালামু 'আলাইকুম।'

আহমদ মুসা মোবাইলের কল অফ করে মেন্দারিস মালিককে বলল, 'ডিজিপি মাহির হারুন আসছেন। ইজদির পুলিশকেও উনিই জানাবেন। ডিজিপি মাহির হারুন খুব খুশি হয়েছেন আপনার উপর। উনি নিজেই আপনাকে ধন্যবাদ দেবেন।' বলল আহমদ মুসা।

'সত্যিই আমি মানুষ হতে পারব মি. আবু আহমদ?' আহমদ মুসার কথার কোন উত্তর না দিয়ে বলল মেন্দারিস মালিক।

'আপনি মানুষই আছেন। পশুত্ব বা শয়তানের কিছু গুণ আপনার মনুষত্বকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। আপনার জেগে ওঠা মনুষত্ব সে অপশনগুলোকে উচ্ছেদ করেছে। ফেরেস্তারা যাকে সিজদা করেছিল, সেই মানুষই আপানি এখন হয়ে গেছেন।' আহমদ মুসা বলল।

হঠাৎ মেন্দারিস মালিক আহমদ মুসার দুই হাত চেপে ধরে কেঁদে ফেলল। বলল, 'এই মানুষ হওয়ার সৌভাগ্য কি আমার হবে? আমি কত লোককে হত্যা করেছি, সে সংখ্যা আমি বলতে পারবো না। আমার নিষ্ঠুরতার জন্যেই দলের নেতৃত্ব আমি পেয়েছি। আমার এই সীমাহীন পাপ কি আল্লাহ্ মাফ করবেন?'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'আল্লাহ্ দয়ার অন্তহীনতা সম্পর্কে জানলে এই কথা আপনি বলতেন না। গোটা মানব জাতির পাপের সমষ্টি আল্লাহ্'র দয়ার সমুদ্রের তুলনায় একটা বারি-বিন্দু ছাড়া আর কিছুই নয়। দেখুন, আল্লাহ্'র এক নাম 'রহমান', আরেক নাম 'রহীম'। দুই নামেরই অর্থ 'দাতা', 'দয়ালু'। কিন্তু তাঁর

এই দুই দয়ার ক্ষেত্র ভিন্ন। তিনি রহমান, কারণ অপরাধী, পাপী, তাকে অস্বীকারকারী, তার ধর্মের শত্রু, কাফের, ফাসেক নির্বিশেষে সকল মানুষকে তিনি ভালোবাসেন। তিনি তাদের প্রত্যেককেই আহার দেন, আশ্রয় দেন। তাদের কাউকেই তিনি দিনের আলো, উপকারী বাতাস, জীবন ধারনের পানি এবং সুখ-ভোগ থেকে বঞ্চিত করেন না। না চাইতেই সকল মানুষকে তিনি এই সব নিয়ামত দান করেন। আর রহীম তিনি এই কারণে যে, তিনি অসীম ক্ষমাশীল এবং বেনজীর দাতা। অপরাধ করে মানুষই। আর তার পাপের বোঝা যতবড়ই হোক, মানুষ যখন অনুতপ্ত হয়ে বিনীতভাবে মহান আল্লাহ্'র সামনে দাঁড়ায় ক্ষমার জন্য, তিনি ক্ষমা করে দেন। মানুষ তখন তার প্রয়োজন নিয়ে হাজির হয় তাঁর কাছে, প্রার্থনা করে তার আশা পূরণ হওয়ার জন্যে, তখন তিনি তার আশা পূর্ণ করেন। তিনি তার বান্দাহ্ মানুষকে ভালোবাসেন, তাই তিনি চান মানুষ ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাক, মানুষ তার কল্যাণের প্রয়োজন নিয়ে তার সামনে দাঁড়াক, প্রার্থনা করুক, আবেদন করুক অভাব পূরণের। তিনিই আমাদের মহান আল্লাহ্, মাহামহিম স্রষ্টা এবং অসীম দয়ালু প্রতিপালক। মি. মেন্দারিস মালিক আপনার পাপ তাঁর দয়ার মহাসিন্ধুর কাছে কিছুই নয়। বান্দাহ্ তাঁর দরবারে শুধু হাজির হওয়ার অপেক্ষা মাত্র, তিনি দু'হাত বাড়িয়ে আছেন বান্দাকে মাফ করার জন্যে, তার চাওয়া পূরণের জন্যে।' থামল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই মেন্দারিস মালিক সিজদায় পড়ে গেল। কাঁদল অনেক সে।

যখন সিজদা থেকে সে উঠে দাঁড়াল, তখন অনেক শান্ত সে। আশার ঔজ্জ্বল্য তার চোখ। স্বস্তির স্নিগ্ধতা তার চেহারায়।

'খোশ আমদেদ নতুন মেন্দারিস মালিক।'

স্বাগত জানাল আহমদ মুসা মেন্দারিস মালিককে। তার চোখে-মুখে আনন্দ।

'মেন্দারিস মালিক যদি নতুন মানুষ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে থকে, তাহলে তার রূপকার আপনি। আল্লাহ্ আপনাকে এর যাযাহ্ দান করুন।' বলল মেন্দারিস। গম্ভীর ও ভারি তার কণ্ঠ।

‘আলহামদুলিল্লাহ্। চলুন এবার আমরা আমাদের কাজ শুরু করি।’ বলল আহমদ মুসা মেন্দারিস মালিককে লক্ষ্য করে।

‘চলুন।’ বলে হাঁটতে শুরু করল মেন্দারিস মালিক।

আহমদ মুসা হাঁটতে শুরু করেছিল আগেই।

একে একে সবগুলো বডিই সার্চ করল দু’জনে মিলে। কিন্তু তাদের পকেটে মানিব্যাগ ছাড়া আর কিছু মিলল না।

মানিব্যাগগুলোতে শুধু টাকাই দেখা গেল। মাত্র একটা মানিব্যাগে টাকার সাথে সাদা কাগজের একটা শীট চারভাঁজ করা অবস্থায় পাওয়া গেল। মানিব্যাগটা ছিল সামান্য কিছু টার্কিশ নোট ছাড়া সবটা ডলারে ভর্তি। হতে পারে মানিব্যাগটা ছিল তাদের এই মিশনের নেতার। টাকা বিলি-বন্টনের নোট রাখার জন্যে কি ছিল সাদা কাগজের শীটটা!

টাকা সমেত মানিব্যাগটা তার পকেটে রেখে দিয়ে কাগজের শীটটা আহমদ মুসা নিজের কাছে রাখল, সাদা কাগজ দরকার হতে পারে এই ভেবে।

‘সোহা ও হোলি আর্কগ্রুপের লোকরা দারুণ সতর্ক। এরা অপরাধ করে, কিন্তু তাদেরকে ধরার মত কোন চিহ্ন রেখে যায় না।’ বলল মেন্দারিস মালিক।

‘আপনি সেদিন বলেছিলেন ওদের দলের নাম জানেন না, এখন যে নাম বললেন?’ আহমদ মুসা বলল।

হাসল মেন্দারিস মালিক। বলল, ‘আপনার সাথে সেদিন কথা বলার পর আমি ওদের সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছি। কিছু জানতে পেরেছি।’

‘দলের নাম ছাড়া আর কী জানতে পেরেছেন?’ আহমদ মুসা বলল।

‘তেমন কিছু নয়। তবে আমার মনে হয়েছে শীঘ্রই বড় কিছু ঘটাতে যাচ্ছে ওরা। খুবই ওভার কনফিডেন্ট ওরা যে, ওদের বাধা দেবার সাধ্য কারও নেই। ওরা বলেছে, এটা ওদের শেষ যুদ্ধ। এ যুদ্ধে জয় তাদের হাজার হাজার বছরের স্বপ্ন সার্থক করবে।’ বলল মেন্দারিস মালিক।

‘কি তাদের যুদ্ধ, কি ঘটাতে চায় তারা?’ আহমদ মুসার স্বাগত কণ্ঠের জিজ্ঞাসা।

‘আমিও বুঝতে পারিনি। আজকাল ওরা খুব সাবধান হয়েছে। ওরা কাজ করার জন্যে লোকও পাল্টাচ্ছে। যাদের আমি চিনতাম। তাদের দেখা যায় না।’ বলল মেন্দারিস মালিক।

‘আপনি কখন কিভাবে আমাদের ফলো করলেন।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমি ক’দিন ধরে রেস্টুরেন্টে আসছি। আমি জানতাম, ওদের সন্ধানে আপনিও সেখানে আসবেন। মুখে খ্রীস্টান সন্যাসীদের মত দাড়ি নিয়ে আজও এসেছিলাম। এসেই দেখলাম আপনাকে। মদ্যপ দু’জনের কথা আমিও শুনেছি একটু দূরে বসে। আপনি ওদের ফলো করলে আমিও উঠলাম। গাড়ি নিয়ে এলাম গেটে। আমি জানতাম বুদ্ধিমান গেটম্যান ওদের টাকা খায়। আমি গেট পার হবার সময় গেটম্যানকে ওদের স্টাইলে হাত নেড়ে বললাম, ‘মাসিস মুক্ত হোক।’ ওরা মাউন্ট আরারাতকে ‘মাসিস’ বলে। ওরা একে অপরকে দেখলে এই কথা বলেই স্বাগত জানায়। আমার কথায় গেটম্যান আমাকে তাদের লোক বলে ধরে নিল। আমাকে ইংগিতে দাঁড়াতে বলল। দাঁড়ালে সে বলল, ‘আপনাদের দু’জন লোককে একজন লোক ফলো করেছে। এটা আমি জানিয়ে দিয়েছি সবাইকে।’ আমি উদ্বিগ্ন হলাম। নিশ্চয় আপনি বিপদে পড়বেন। আমি পিছু নিলাম আপনাদের। অর্ধেক পথ এগোনোর পর আমি দেখলাম একটা রোড ক্রসিং-এর ডান দিকের একটা রাস্তা থেকে একটা মাইক্রো প্রবল বেগে ছুটে এসে আপনার পিছু নিল। আমার গাড়িতে একটা সমস্যা থাকায় তার মত স্পিডে আমি চলতে পারলাম না। কিন্তু পিছু ছাড়লাম না আপনাদের।’ বলল মেন্দারিস মালিক।

দূরে পুলিশের গাড়ির সাইরেন শোনা গেল। শব্দ আসল ইজদির দিক থেকে।

‘তাহলে ইজদির থেকেই প্রথমে আসছে পুলিশ। ডিজিপি মাহির হারুনের আসতে দেরি হবে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ডিজিপি সাহেব কি ‘ভ্যান’ থেকে আসবেন?’ জিজ্ঞাসা মেন্দারিস মালিকের।

‘না। আগ্রিতে এসেছেন উনি, ওখন থেকেই আসবেন।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তাহলে তো তাড়াতাড়িই এসে পড়তেন।’ বলল মেন্দারিস মালিক।

‘আসুন আমার গাড়িতে বসি। গাড়ির সামনের ও পেছনের কাঁচ ভেঙেছে। গুলিতে বাইরেরও ক্ষতি হয়েছে। তবে ভেতরে বসা যাবে। আসুন।’

বলে আহমদ মুসা চলল তার গাড়ির দিকে।

মেন্দারিস মালিকও চলল তার সাথে।

# ৫

চাঁদ ডুবে গেল পশ্চিমে। সূর্যও উঠল পূবে। রাতটা বৃথাই গেল আহমদ মুসাদের।

'মি. আবু আহমদ, নিশ্চয় ওরা কোনোভাবে টের পেয়ে গেছে যে আমরা ওদের প্ল্যান জেনে ফেলেছি।' বলল মেন্দারিস মালিক।

'এটাও সম্ভব নয়। রাত ১২ টার আগ পর্যন্ত আপনার ও আমাদের লোকরা পাহাড়ের পথ থেকে বেশ দূরে দূরে এককভাবে দাঁড়িয়ে পাহারা দিয়েছে। তাদের দেখে বড় রকমে সন্দেহ করা অসম্ভব। অতএব সন্দেহ বশে ফিরে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আর রাত ১২ টার পর আমাদের লোকরা পাহাড়ে ওঠার কয়েকটি রাস্তার পাশে ক্লোজ হয়েছে, সেটাও দলবেঁধে নয়, এককভাবে অন্ধকারে ক্রলিং করে। এতে তাদের দেখতে পাওয়া এবং ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। এককভবে কাউকে পেলে, সন্দেহ হলে তাকে পাকড়াও বা শেষ করার কথা। কিন্তু এমন ঘটনা একটিও ঘটেনি। অতএবত তারা ফিরে গেছে এ বিষয়টাকে আমরা হিসেবের বাইরে রাখতে পারি।'

'তাহলে তারা না কেন?' বলল ড. বারজেনজো।

এই ড. বারজেনজোরই বাগদত্তা ড. আজদা। ড. বারজেনজোকে তাদের পারিবারিক প্রয়োজনে দেশের বাইরে যেতে হয়েছিল। কয়েকদিন হলো ফিরে এসেছে। আহমদ মুসা তাকে ডেকে নিয়েছে। আহমদ মুসা তার বাড়িতে গিয়েছিল। পরিচিত হয়ে এসেছে সবার সাথা।

ড. বারজেনজোর কথা শেষ হতেই সেখানে এলো অরিয়াস এলাকার ভারপাপ্ত পুলিশ অফিসার রশিদ দারাগ এবং আরারাত অঞ্চলের ডাইরেক্টর অব পুলিশ খাল্লিকান খাচিপ। খাল্লিকান খাচিপ বলল, 'স্যার ঐ প্রশ্নটা আমারও, ওরা এল না কেন?'

‘এ প্রশ্ন আমারও। প্রশ্নটারই উত্তর সন্ধান করছি। মনে হয় উত্তরটা আমি পেয়েও গেছি।’ বলল আহমদ মুসা।

‘পেয়ে গেছেন? কী সেটা?’ উদগ্রীব কণ্ঠে বলল ড. বারজেনজো।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আমার মনে হয় শব্দের অর্থ গ্রহণের ব্যাপারে আমাদের ভুল হয়েছে।’ একটু থামল আহমদ মুসা।

তাকাল ডিপি, খাল্লিকান খাচিপের দিকে।

বলল, ‘ফুলমুন কী?’

‘কেন, ফুলমুন তো পূর্ণিমা।’ বলল খাল্লিকান খাচিপ।

‘অমাবস্যা ফুলমুন নয় কেন?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘অমাবস্যায় চাঁদ তো দেখা যায় না।’ বলল খাল্লিকান খাচিপ।

‘দেখা যায় না, কিন্তু অমাবস্যায় মুন তো ফুলই হয়ে থকে। বলা যেতে পারে, এটা ডার্ক ফুলমুন, আর পূর্ণিমারটা লাইটেড ফুলমুন। অন্যভাবেও বলা যায়, একটা কৃষ্ণপক্ষের ফুলমুন, আরেকটা শুক্লপক্ষের ফুলমুন।’ আহমদ মুসা বলল।

‘চমৎকার! নতুন তত্ব। কিন্তু বাস্তবতা আমি মনে করি এটাই। নতুন তত্বটি আমরা মেনে নিলাম স্যার। কিন্তু স্যার, এই নতুন অর্থ গ্রহণ করে এর দ্বারা আপনি কী বুঝাতে চাচ্ছেন?’ বলল ড. বারজেনজো।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘অপরাধীদের জন্যে শুক্লপক্ষ ভালো, না কৃষ্ণপক্ষ ভালো?’

‘কৃষ্ণপক্ষ।’ বলল খাল্লিকান খাচিপ।

‘এ কারণেই কি তারা কৃষ্ণপক্ষের ফুলমুনে অপারেশনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।’ আহমদ মুসা বলল।

কোন কথা এল না ডিপি খাল্লিকান খাচিপ, ইন্সপেক্টর রশিদ দারাগ এবং ড. বারজেনজোর দিক থেকে। নির্বাক তারা। বিস্ময় তাদের চোখে-মুখে। ইন্সপেক্টর রশিদের মুখ তো বিস্ময়ে ‘হা’ হয়ে গেছে।

‘এই সহজ কথাটা আমাদের মাথায় আসেনি কেন? পূর্ণিমায় তো ওরা কিছুতেই আসতে পারে না। পূর্ণিমায় মাউন্ট আরারাতের বরফাবৃত অংশে তো আলোর মহামেলা বসে। বরফের উপর চাঁদের আলো পড়ে দিনের বেলার চেয়ে

অনেক বেশি চোখ ধাঁধাঁনো উজ্জ্বল হাসি হাসে মাউন্ট আরারাত। এই আলোর মেলায় তো অন্ধকারের জীব অপরাধীরা অন্ধকারের কাজ নিয়ে আসতে পারে না। তাদের জন্যে কৃষ্ঞপক্ষের অমাবস্যা বা ডার্ক ফুলমুনই উপযুক্ত সময়। ধন্যবাদ মি. আবু আহমদ। অদ্ভুত আপনার বিশ্লেষণ। সত্যিই আপনি আল্লাহর সবিশেষ নেয়ামতে ধন্য।' খল্লিকান খাচিপ বলল।

'আলহামদুলিল্লাহ। এক বিরাট সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। এখন তাহলে আমাদের কী করণীয়?' বলল ড. বারজেনজো।

'কিছু নয়, আসুন আমরা কৃষ্ঞপক্ষের ডার্ক ফুলমুনের অপেক্ষা করি।'

একটু থেমেই আহমদ মুসা বলল, 'আজকের মত কাজ আমাদের সাঙ্গ হলো। চলুন ফিরে যাই আমরা।'

কৃষ্ঞপক্ষের শেষ প্রান্ত। পূর্ণ অবয়ব নিয়ে চাঁদ বর্তমান। কিন্তু তা পৃথিবীর আড়ালে। এখন পৃথিবীও নিকশ অন্ধকারে ঢাকা, চাঁদও।

মাউন্ট আরারাতের সাড়ে ১৪ হাজার ফিট উপরে স্নো-লাইনের প্রায় প্রান্ত ঘেঁষে স্থাপিত ৫ম ট্যুরিস্ট বেজ ক্যাম্পের একটা তাঁবুতে বসা আহমদ মুসা তার হাতের ঘড়ির দিকে তাকাল। রাত ৯টা বাজে। তাঁবুতে আরও ৭ জন। সবাই ক্যাম্প-চেয়ারে বসে। সবারই পরনে ট্যুরিস্ট পোষাক।

আহমদ মুসারা ১ দিন আগে এই ৫ নং বেজ ক্যাম্পে এসেছে। তিন দিন আগে তারা যাত্রা করেছিল পর্বতের গোড়ায় স্থাপিত এক নম্বর বেজ ক্যাম্প থেকে।

ঘড়ির দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিতেই মোবাইল বেজে উঠল আহমদ মুসার।

আহমদ মুসা তাকাল মেন্দারিস মালিকের দিকে। বলল, 'আপনি আর ড. বারজেনজো তাঁবুর বাইরেটা দেখে আসুন অবাঞ্ছিত কিছুর উপস্থিতি আছে কি না।'

মোবাইল বেজে চলেছে। বেজে থেমে গেল। ধরল না আহমদ মুসা। বাইরের রিপোর্ট পায়নি।

মিনিট দেড়েক পরে ড. বারজেনজো এসে বলল, 'বাইরেটা ঠিক আছে।'

আহমদ মুসা মিসকলটায় কল করল।

ওপার থেকে কথা বলল ডাইরেক্টর অব পুলিশ খাল্লিকান খাচিপ। বলল, 'স্যার, ওদিকের খবর কী?'

'কোন খবর নেই মি. খাচিপ। কোন দিক থেকেই কোন নড়াচড়া নেই।' বলল আহমদ মুসা।

'ওদের নড়া-চড়া আজকেও দেখা যাবে না বলেই মনে হচ্ছে। খবর পেলাম, সেনাদের একটা দল পাহাড়ের উপরে গেছে। ওরাও মনে হয় খবর পেয়েছে। এ জন্যেই তারা গেছে যাতে মাউন্ট আরারাতের কোন ক্ষতি না হয়, ক্রিমিনালরা যাতে উপরে গিয়ে কোন ঘটনা ঘটাতে না পারে। আমাদের বোধ হয় আজকেও খালি হাতে ফেরত যেতে হবে, স্যার।'

'একটা বিষয়, মি. খাল্লিকান খাচিপ। মাউন্ট আরারাতে কোন অপরাধ ঘটতে যাচ্ছে বা অপরাধীরা এখানে একত্রিত হচ্ছে, এটা সেনাবাহিনী জানতে পারলে সে খবর পুলিশকে জানানোর কথা। তারা নিজেরাও যদি অভিযান পরিচালনা করতে চায়, তাহলেও পুলিশকে তারা জানাবে এবং পুলিশকেও তারা সাথে নেবে। তাই কি না, মি. খাল্লিকান খাচিপ?' আহমদ মুসা বলল।

'এটই নিয়ম। কিন্তু ওরা তো কিছু জানায়নি। হতে পারে জানাবার সময় হয়নি। বিষয়টি ইমারজেন্সি বলেই তারা নিজেরাই এগিয়ে এসেছে।' বলল খাল্লিকান খাচিপ।

'এটাও হতে পারে। কিন্তু অয়্যারলেস, মোবাইলের যুগে এটা বিশ্বাস করা কঠিন। ঠিক আছে। তবে ঐ সেনাদের আসা দেখে আমাদের পরিকল্পনার কোন হেরফের হবে না। প্লিজ, দেখবেন কোথাও যেন কোন শিথিলতা না আসে।' আহমদ মুসা বলল।

'এটাই উচিত। ঠিক আছে স্যার। দায়িত্বের ক্ষেত্রে কোন অন্যথা হবে না।' বলল খাল্লিকান খাচিপ।

'ধন্যবাদ। আস্‌-সালামু 'আলাইকুম।'

কল ক্লোজ করে মোবাইল রেখে দিল আহমদ মুসা।

হন্ত-দন্ত হয়ে তাঁবুতে প্রবেশ করল মেন্দারিস মালিক। বলল, 'একদল সৈন্য এদিকে আসছে।'

তার কথা শেষ হতে না হতেই হুড়মুড় করে তাঁবুতে প্রবেশ করল একদল সৈন্য। তাঁবুতে প্রবেশ করেই একজন সৈন্য তার স্টেনগানের ব্যারেল সবার উপর দিয়ে একবার ঘুরিয়ে নিয়ে বলল চিৎকার করবে না, তোমরা সকলে হাত তুলে দাঁড়াও। কেউ চালাকির চেষ্টা করলে তাকে কুকুরের মত গুলি করে মারবো।' উপস্থিত সৈনিকদের দিকে একবার তাকিয়ে আহমদ মুসা হাত তুলল।

সবাই আগেই হাত উপরে তুলেছিল।

আহমদ মুসা সৈনিকদের দেখছিল গভীরভাবে। সৈনিকদের পোষাকে কোন খুঁত নেই। পায়ের বুটও এই সৈনিকদের। সবার মাথার চুলই আর্মি কাট। মি. খাল্লিকান খাচিপ তাহলে এই সৈনিকদের কথাই বলেছিল। কিন্তু তারা এভাবে আমাদের উপর চড়াও হলো কেন!

এসব ভাবনা থেকে আহমদ মুসা বলল, 'আপনারা এভাবে আমাদের উপর চড়াও হয়েছেন কেন? আমরা তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

সৈনিকরা তখন তাঁবুর লোকজনদের বাঁধার কাজ শুরু করে দিয়েছিল। কিছু সৈন্য তাদের স্টেনগান বাগিয়ে পাহারা দিচ্ছিল। অন্যরা বাঁধার কাজ করছিল।

আহমদ মুসার কথার উত্তরে একজন সেনা অফিসার বলল, 'আমরা খবর পেয়ে ছি আজ মাউন্ট আরারাতে বড় একটি ক্রিমিনাল ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। এ ঘটনা কারা ঘটাবে আমরা জানি না। সুতরাং ট্যুরিস্ট-ননট্যুরিস্ট যাদেরকেই আমরা মাউন্ট আরারাতে পাব, তাদেরকে এই রাতের জন্যে গ্রেফতার করে রাখব। সকালেই সকলে ছাড়া পেয়ে যাবেন।' কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ও কর্কশ কণ্ঠ সেনা অফিসারের।

কিছু বলার জন্যে হা করেছিল ড. বারজেনজো। আহমদ মুসা আশংকা করল সে আমাদের পরিচয় দিয়ে দিতে পারে।

সংগে সংগেই আহমদ মুসা ডাকল ড. বারজেনজোকে তার মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে নেবার জন্যে। বলল, 'এঁরা ঠিকই বলেছেন। এঁদের আমাদের সহযোগিতা করা উচিত।' বলে আহমদ মুসা তার তর্জনিটা ঠোঁটে ঠেকাল। বুঝতে পেরেছে সে। তার ঠোঁটে অস্ফুট একটু হাসি।

'আমাদের সহযোগিতা করার কোন দরকার নেই। আমাদের কাজের জন্যে আমরাই যথেষ্ট। আমরা বেঁধে রেখে যাচ্ছি।' আবার কর্কশ কণ্ঠ সেনা অফিসারের। সবার মত আহমদ মুসাকেও ওরা পিছমোড়া করে বাঁধল। অন্যদের মত পা'ও বাঁধা হলো তার।

তারপর সৈনিকরা সবাই বেরিয়ে গেল।

সৈনিকদের বেরিয়ে যাওয়ার ধরন দেখে চমকে উঠল আহমদ মুসা। আহমদ মুসার মনে সন্দেহের যে ধোঁয়াটে অবয়ব ছিল তা যেন আলোর রূপ নিয়ে সামনে এল। ট্রেইন্ড সৈন্যদের পদক্ষেপ ও হাঁটা ওদের মত অমন হতেই পারে না। বিশেষ করে ডিউটিকালীন সময়ে।

সব সৈন্য বেরিয়ে গেলে সেনা অফিইসারটি ঘুরে দাঁড়াল। পকেট থেকে টেনিস বলের মত একটা গোলাকার বস্তু বের করল ছুঁড়ে মারার জন্যে।

আহমদ মুসা দেখেই বুঝল ওটা ক্লোরোফর্ম বোম।

অফিসার বস্তুট বের করেই ছুঁড়ে মারল তাঁবুর মাঝখানে।

পলকের মধ্যেই ঘটে গেল ঘটনা।

মাত্র কয়েক মুহূর্ত, সবাই ঢলে পড়ল তাঁবুর মেঝেতে। আহমদ মুসাও।

পল পল করে সময় বয়ে গেল।

এক সময় আহমদ মুসা মাথা তুলে চারদিকটা দেখে উঠে দাঁড়াল। ছুটে এল তাঁবুর বাইরে। কাউকে দেখল না। কান পেতে শোনার চেষ্টা করল। হ্যাঁ, দু'একটা শব্দ তার কানে এল। বোঝার চেষ্টা করল কোন দিক থেকে আসছে।

পেছনে পায়ের শব্দ শুনে বোঁ করে ঘুরে দাঁড়াল আহমদ মুসা। যাকে দেখতে পেল সে হলো মেন্দারিস মালিক।

খুশি হয়ে জড়িয়ে ধরল মেন্দারিস মালিককে আহমদ মুসা। বলল, 'ধন্যবাদ, আপনি ওদের ক্লোরোফর্ম বোমাকে ফাঁকি দিতে পেরেছেন?'

'হ্যাঁ, এই বিষয়কে আজ প্রথম প্রাকটিস করলাম।' বলল মেন্দারিস মালিক।

'আপনার কথার মধ্যে বড় একটা সত্য আছে। এ ধরণের ক্লোরোফর্ম বোমার কার্যকারিতা এক দেড় মিনিটের বেশি থাকে না। বিশেষ করে বিস্ফোরণের

কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্লোরোফর্ম গ্যাসের মাথার স্নায়ু অবশকারী অণুগুলো দ্রুত উপরে উঠে যায়। সুতরাং শুয়ে বা বসে থাকা কেউ মিনিট খানেক নিশ্বাস বন্ধ করে রাখতে পারলে সে আর আক্রান্ত হয় না।' আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ। এত বিস্তারিত আমি জানতাম না। ভবিষ্যতে কাজে দেবে।'

একটু থেমে বলল, 'স্যার, সৈনিকরা আমাদেরকে এভাবে বাঁধল, সংজ্ঞাতীন পর্যন্ত করে দিল সবাইকে, এর অর্থ আমি বুঝতে পারছি না। আমাদের সন্দেহ করলে আমাদের ধরে নিয়ে যেতে পারতো, কিন্তু তা না করে এক রাতের জন্যে সংজ্ঞাহীন করে গেল। ভোর হলেই সবাই ছাড়া পেয়ে যাবে! এতেই কি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? রাত কি আর আসবে না? দুর্বোধ্য লাগছে তাদের আচরণ।'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'আর যদি ওরা সৈনিকই না হয়, তাহলে কি অর্থ পরিষ্কার হয় না?'

'তার মানে, ওরা...।' কথা শেষ না করেই থেমে গেল মেন্দারিস মালিক। তার চোখে এক রাশ বিস্ময়।

'হ্যাঁ, ওরা সৈনিক নয়। ওরা সৈনিকের পোষাক পরে এসেছে। আমি মনে করি ওরাই তারা, যারা আজ রাতে মাউন্ট আরারাতের স্বর্ণভাণ্ডার লুট করার জন্যে আসার কথা।' বলল আহমদ মুসা।

'ও গড! সৈনিকদের ইউনিফর্ম পুরানো মনে হয়েছে। ওদের কোড নাম্বার, বুকের নেমপ্লেট কোনটাই নতুন তৈরি বলে মনে হয় নি। অথচ ভূয়া সৈনিকদের পোষাক-পরিচ্ছদ সবই সাধারণত নতুন ভাবে তৈরি হওয়াই স্বাভাবিক।' বলল মেন্দারিস মালিক।

'আপনার পয়েন্টটা গুরুত্বপূর্ণ মেন্দারিস মালিক। এর একটাই জবাব, এই ইউনিফর্ম তারা সৈনিকদের কাছ থেকেই পেয়েছে। এর সুযোগ ওদের রয়েছে। সে আর এক কাহিনী।' আহমদ মুসা বলল।

'এখন আমরা কী করব স্যার। আমার মনে হয় এদের বাঁধন খুলে দিয়ে ওদের জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা করা দরকার।' বলল মেন্দারিস মালিক।

ওদের সবার বাঁধন কেটে দিয়ে আহমদ মুসা ও মেন্দারিস মালিক কয়েকটি স্টেনগান কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে পাহাড়ের উপরে উঠতে লাগল। আহমদ মুসার পিঠে একটা ব্যাগও ঝুলছে। পোষাকও তাদের পাল্টে গেছে। বরফের উপর দিয়ে চলার মত তাদের ক্লাইম্বারের পোষাক।

আহমদ মুসার চোখে নাইটভিশন গগলস্। সে আগে হাঁটছে তার পেছনে মেন্দারিস মালিক।

অন্ধকার হলেও এ পথ আহমদ মুসার চেনা।

এর আগে দু'বার এপথ দিয়ে ১৬ ফিট পর্য উপরে উঠেছে আহমদ মুসা। কিন্তু আজ কোন পর্যন্ত উঠতে হবে সে জানে না। প্রচারিত তথ্য অনুসারে সাড়ে ১৫,০০০ ফিট লেভেলের দুই শৃঙ্গের মাঝখানের এক উপত্যকায় প্লাবন শেষে নুহ আ.- এর নৌকা ল্যান্ড করেছিল। আজকের আরোহনের সীমা এই লেভেল পর্যন্ত হতে পারে।

বিশ মিনিট আরোহনের পর একটা চাপা কাশির অস্ফুট আওয়াজ কানে প্রবেশ করতেই আহমদ মুসা চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়ালো। কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। যে ঢাল দিয়ে তারা এগিয়ে এসেছে, তার গোটাটাই এখান থেকে দেখা যাচ্ছে নাইটভিশন গগলসের মধ্য দিয়ে। কিছুই চোখে পড়ল না। কিন্তু তার শোনাটা সত্য।

আহমদ মুসা আরও কিছুটা সময় দেখার সিদ্ধান্ত নিল। বলল মেন্দারিস মালিককে, 'চলুন, এই গলিটা দিয়ে বরফের চাং-টার পেছনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি।'

'কোন বিশ্রাম নেবেন না, কিছু ঘটেছ?' বলল মেন্দারিস মালিক। তার কণ্ঠে বিস্ময়।

'পেছন থেকে একটা শব্দ পেয়েছি। সেটার উৎস সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া দরকার। নিশ্চিত হওয়ার জন্যেই পেছনটা একটু দেখা প্রয়োজন।' আহমদ মুসা বলল।

'অবশ্যই স্যার। চলুন।' বলল মেন্দারিস মালিক।

দু'জনে গিয়ে বরফের চাংটার পেছনে আশ্রয় নিল।

সময় বয়ে চলল পল পল করে। গত হলো মিনিট দু'য়েকের মত সময়।

বরফের একটা টিলার বাঁক ঘুরে বেরিয়ে এল একদল মানুষ। দশ বারোজনের মত হবে। হবে ওদের চেহারা স্পষ্ট নয়।

ঢালটার মাঝামাঝি আসতেই স্পষ্ট হয়ে গেল ওরা সশস্ত্র একদল মানুষ।

ওরা আরও কাছে এসে পড়ল। এখন তিন চার গজের মধ্যে ওরা। মুখ কারও দেখা যাচ্ছে না। পশমের টুপি ওদের কপাল পর্যন্ত নেমে এসেছে। জ্যাকেটের পশমের কলার নিচ থেকে পকেটের অর্ধেকেটা ঢেকে দিয়েছে।

ওদের গলায় দুলছিল লকেট।

ওরা বরফের চাংটার ওপাশ দিয়ে যাবার সময় লকেটের অবয়বটাও ভালোভাবে নজরে এল আহমদ মুসার। মাউন্ট আরারাতের খোদাই করা ছবির মাথায় ক্রস যেন পুঁতে দেয়া। ক্রস থেকে বিচ্ছুরিত তীক্ষ্ণ একটা আলোর প্লাবন সিক্ত করছে মাউন্ট আরারাতকে।

এরা কারা? উল্কিওয়ালাদেরই এটা দ্বিতীয় দল নিশ্চয়! ওদের গলায় লকেট নেই, এদের আছে। গায়ের উল্কি দেখা যায় না বলেই হয়তো প্রদর্শনীর এই বিকল্প ব্যবস্থা।

আহমদ মুসাদের সামনে দিয়ে চলে গেল ওরা সবাই।

ওদের পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেলে আহমদ মুসারা বেরিয়ে এল বরফের চাংটার আড়াল থেকে।

'এরা ওদেরই লোক। ভাগ্য ভালো, আমরা ওদের চোখে পড়িনি।' বলল মেন্দারিস মালিক।

'উল্কিওয়ারা গলায় মাউন্ট আরারাতের প্রতিকৃতিও কি ধারণ করে থাকে?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'এটা আমি জানি না স্যার। তবে উল্কিওয়ালা যাদের আমি দেখেছি, তাদের কারও গলায় মাউন্ট আরারাতের প্রতিকৃতি দেখিনি।' বলল মেন্দারিস মালিক।

'কিন্তু এদের প্রত্যেকের গলায় যে ক্রসের সাথে মাউন্ট আরারাতের প্রতিকৃতিও দেখলাম!' আহমদ মুসা বলল।

‘এ রকম কখনও আমি দেখিনি। হতে পারে মাউন্ট আরারাতের অভিযানের সময় ওরা মাউন্ট আরারাতের বাড়তি প্রতিকৃতি পরেছে।’ বলল মেন্দারিস মালিক।

‘হতে পারে, তবে সন্ত্রাসী বা গোপন দলগুলো প্রতীক বাছাই ও ব্যবহারের নীতির ক্ষেত্রে খুবই কনজারভেটিভ। এক্ষেত্রে তারা তাদের নীতির অন্যথা করে না।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমিও তাই মনে করি স্যার। কিন্তু এক্ষেত্রে বাহুর উল্কি প্রতীকের রূপ একেবারে গলায় উঠে এল কেন, তার অর্থ বুঝতে পারছি না।’ বলল মেন্দারিস মালিক।

‘থাক। এই বিষয়ে আর নয়। চলুন আমরা সামনে এগোই। এসব ভেবে লাভ নেই। চোর-বাপাড়েও মৈত্রী হয়। উল্কিওয়ালারা তো দুই দল এক সাথে কাজ করছে। আরও ভিন্ন কেউ তাদের সাথে যোগ দিতে পারে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ঠিক বলেছেন স্যার। চলুন।’ বলল মেন্দারিস মালিক।

এগুতে লাগল তারা আবার। প্রায় এক ঘন্টার মধ্যে তারা পর্বতের প্রায় সাড়ে ১৫ হাজার ফিট লেভেলে পৌঁছে গেল। পর্বতের যে অংশটা তারা অতিক্রম করে এল, সেটা খুব দুর্গম নয়। সিঁড়ির মতই ঢালু অনেকটা। মাউন্ট আরারাতের দু’টি মূল শৃংগ বিস্তারিত এলাকা জুড়ে উঠে এসেছে উপরে। তবে পর্বতের অনেক এলাকা খুবই সুগম। চৌদ্দ হাজার ফুট থেকে সাড়ে পনের হাজের ফুটের মধ্যবর্তী এই রুট তেমনি একটা এলাকা।

সামানেই দু’টি ছোট বরফাচ্ছাদিত শৃংগের দেয়াল। দুই শৃংগের সংযোগকারী যে স্হান তাও বেশ উঁচু ও খাড়া। এর মধ্যে আবার এ পাশটা আরোহনের যোগ্য, কিন্তু ও পাশটা একেবারেই অগম্য। এ কারণেই এই শৃংগ ঘুরে ওপাশে পৌঁছাতে হয়।

আহমদ মুসা শৃংগের দেয়ালের গোড়ায় বসে পড়ল। বলল, ‘এ দেয়ালের ওপরেই সেই বহুল আলোকিত, বহুল কথিত স্থান, যেখানে হযরত নুহ আ.-এঁর কিস্তি প্লাবনের পানি সরে গেলে ল্যান্ড করেছিল। ওরা যে স্বর্ণভাণ্ডার খুঁজতে এসেছে তা ওপাশের উপত্যকার কোন একটা পাহাড়ের গুহায় রয়েছে। সুতরাং

ওদের গন্তব্য এবং কর্মস্হল এই উপত্যকা। উপত্যকার সামনের ছোট দুই শৃংগের ওপাশে হলেও অনেক ঘুরে যেতে হয় ঐ উপত্যকার সামনের ছোট দুই শৃংগের ওপাশে হলেও অনেক ঘুরে যেতে হয় ঐ উপত্যকায়। একনিতে দশ মিনিটের পথ নয়। কিন্তু এই দুই শৃংগের পাদদেশটাই ঘুরে ওপাশের উপত্যকায় গিয়ে পৌঁছতে সময় লাগে প্রায় ঘন্টা খানেকের মত। এসময় খরচ করে ঐ উপত্যকায় গিয়ে এই মুহুর্তে তাদের কোন কাজ নেই। তার চেয়ে দুই শৃংগের মাঝখানে দেয়ালের মত জায়গায় গিয়ে উপত্যকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করাই এই মুহুর্তে তাদের বড় কাজ। উপত্যকায় তাদের কর্মস্থল থেকে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে এই আড়ালে থাকবে আমাদের এই এখনকার সদর দফতর।'

'কিন্তু এ সদর দফতর থেকে আমরা আর কী করব?' বলল মেন্দারিস মালিক।

'দুই শৃংগের মাঝখানের দেয়ালটার আড়ালে আমরা গিয়ে বসব। সেখান থেকে ওপাশের উপত্যকায় চোখ রাখব। দেয়ালের ওপাশটা খাড়া বলে গোটা উপত্যকাটাই আমাদের চোখের নিচে থাকবে এবং আমাদের আওতার মধ্যেও থাকবে।' আহমদ মুসা বলল।

'আমাদের লক্ষ্য কী? কী কেতে চাচ্ছি আমরা?' জিজ্ঞাসা মেন্দারিস মালিকের।

'আমরা ওদের গোটা গ্যাংকে ধরতে চাই। এর মাধ্যমে আমরা ওদের সামনের পরিকল্পনা বানচাল করে দিতে চাই।' আহমদ মুসা বলল।

'কিন্তু আমরা তো মাত্র দু'জন!' বলল মেন্দারিস মালিক।

'আমাদের আর লোকরা তো সংজ্ঞা হারি য়ে পড়ে থাকল। আমাদের পরিকল্পনা মার খেয়েছে এর ফলে। ভালো কথা মনে করেছেন, এই বিষয়টা নিয়ে ডিপি খাল্লিকান খাচিপের সাথে আলোচনা করা দরকার। আগে কথা ছিল ওর বাহিনী বেজ ক্যাম্প ওয়ানেই থাকবে। কিন্তু এখন ওদের সাহয্য দরকার আমাদের।' বলল আহমদ মুসা।

বলেই আহমদ মুসা পকেট থেকে মোবাইলটা হাতে নিল। কল করল আরিয়াস-আরারাত অঞ্চলের পুলিশের ডাইরেক্টর খাল্লিকান খাচিপকে।

ওপারে খাল্লিকান খাচিপের কণ্ঠ পেতেই আহমদ মুসা সালাম দিয়ে বলল, ‘মি. খাল্লিকান খাচিপ, আপনার বাহিনী কোথায়?’

‘আছে এই এলাকাতেই। তবে আমি মনে করছি স্যার, এ সবের আর প্রয়োজন নেই। মাউন্ট আরারাত তো আইনিভাবে সেনা-ব্যবস্থাপনার অধীন। ওরাই তো দেখছি মাউন্ট আরারাতের এই পর্যটন রুটের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিচ্ছে। আমাদের প্রয়োজন তেমন একটা আছে বলে মনে হচ্ছে না।’ বলল খাল্লিকান খাচিপ।

‘ওরাই এই পর্যটন ইউনিটের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিচ্ছে’- এ কথাটার অর্থ বুঝলাম না মি. খাল্লিকান খাচিপ?’ প্রশ্ন আহমদ মুসার। তার কপাল কুঞ্চিত।

‘হ্যাঁ স্যার, আগে একটা সেনাদল গেছে এখন আর একটা সেনাদল উপরে উঠে গেল। এই কিছুক্ষণ আগে। ওদের অফিসারকে জিজ্ঞেস করে জানলাম ওরা গোটা এই পর্যটন রুটে সারারাত ধরে টহল দেবে। তারা নাকি জানতে পেরেছে পর্বতের এই ঢালে কোথাও নাকি কিছু ঘটতে চলেছে। আর তারা আমাকে বলেছে, আপাতত আপনাদের কোন কাজ নেই। মাউন্ট আরারাত পুলিশ অফিসে আপনারা ফিরে যান। প্রয়োজন হলে আমরা ডাকবো।’ বলল খাল্লিকান খাচিপ।

আহমদ মুসার কপালের কুঞ্চন আরও বেড়ে গেছে। তার মনে চিন্তার ঝড়। এই সেনাদল আবার কারা? এবার কি সত্যিই সেনাদল পাঠানো হয়েছে? না এরাও নকল। মাউন্ট আরারাত সেনা-ব্যবস্থাপনার অধীনে রয়েছে। সেনাবাহিনী পর্বত অঞ্চলের পর্যটন এলাকাসহ সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এজন্যে মাউন্ট আরারাতে সেনাবাহিনীর একটা ঘাঁটি রয়েছে। সেখান থেকে পর্বতের বিভিন্ন অংশে সনাটহল পাঠানো তাদের রুটিন কাজ। মি. খাল্লিকান কথিত সেনাদল সেই রুটিন কাজের অংশও হতে পারে। আবার তা নাও হতে পারে। কিন্তু এসব যাচাইয়ের সুযোগ এই মুহূর্তে নেই।

এসব চিন্তা করে আহমদ মুসা বলল, করে আহমদ মুসা বলল, ‘মি. খাল্লিকান খাচিপ, আপনারা বেজ ক্যাম্প থেকে নড়বেন না। আর দশ পনের জনের একটা পুলিশের দল আপনি উপরে পাঠিয়ে দিন।’

‘কিন্তু ওরা তো বলেছে আমাদের চলে যেতে।’ খাল্লিকান খাচিপ বলল।

‘বলুক। ওটা কোন অফিসিয়াল অর্ডার নয়। বাইদি বাই বলেছে। যাদের উপরে পাঠাবেন তাদের বলে দেবেন, কেউ জিজ্ঞেস করলে তারা যেন বলে, ‘৫ম বেজ ক্যাম্পে চৌদ্দ-পনেরজন ট্যুরিস্ট হঠাৎ সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছে। তাই উপরের নির্দেশে ওদের রেসক্যু করার জন্যে আমরা যাচ্ছি।’ বলল আহমদ মুসা।

‘সংজ্ঞা হারানোর ঘটনা সম্পর্কে যদি তারা কিছু না দেখে?’ জিজ্ঞাসা খাল্লিকান খাচিপের।

‘ঘটনা সত্য। এখানে একটা ঘটনা ঘটেছে। শয়তানরা আমাদের চৌদ্দ জন লোককে সংজ্ঞাহীন করে ফেলেছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘মারাত্মক ঘটনা। হ্যাঁ, এটা একটা বিষয়, পুলিশ সেখানে যেতে পারে।’ বলল খাল্লিকান খাচিপ।

‘হ্যাঁ, মারাত্মক ঘটনাই। কিন্তু ওটা নিয়ে এখন পুলিশের করণীয় কিছু নেই। সকালে এমনিতেই ওরা সংজ্ঞা ফিরে পাবে। আপনার লোকরা যেন ওখানে না দাঁড়ায়, সোজা যেন চলে আসে সাড়ে পনের হাজার ফিট উপরের লেভেলে। আর যাদের পাঠাচ্ছেন, তাদের দায়িত্বে যে পুলিশ অফিসার থাকবেন তার মোবাইল নাম্বারটা আমাকে জানিয়ে দেবেন।’ আহমদ মুসা বলল।

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা সালাম দিয়ে কল অফ করে দিল।

‘চলুন, ঐ দুই শৃংগের সংযোগকারী দেয়ালে আমরা উঠি। ওখান থেকে আমরা ঐতিহাসিক উপত্যকায় ওরা কী করছে, তা দেখতে পাব এবং আমাদের কিভাবে এগোতে হবে তাও ঠিক করতে পারবো।’ বলল আহমদ মুসা।

‘চলুন। কিন্তু ডিপি মি. খাল্লিকান খাচিপ কী বললেন? মনে হলো ডিপি লোক পাঠাচ্ছেন। কান্তু এত দেরিতে কেন?’ মেন্দারিস মালিক বলল।

‘আরো একটা সেনাদল উপরে উঠেছে এবং তারাই এই রুটের দেখভাল করার কথা বলেছে। তারা পুলিশকে চলে যেতেও বলেছে। তাই ডিপি মি. খাল্লিকান খাচিপ চলে যাবার চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। এখন উনি একদল পুলিশ পাঠাচ্ছেন।’ বলল আহমদ মুসা।

‘এ সেনাদল আবার কারা? পুলিশকে তারা ডিউটি ছেড়ে চলে যেতে বলেছে। লক্ষণটা ভালো মনে হচ্ছে না স্যার।’ মেন্দারিস মালিক বলল।

‘আমিও সেটাই ভাবছি মি. মেন্দারিস মালিক। তবে না দেখে তাদের ব্যাপারে নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না। কারণ মাউন্ট আরারাত তো সেনা নিয়ন্ত্রণে। এখানে ওদের স্থায়ী ঘাঁটিও রয়েছে। এটা একটা দিক। অন্য দিকটা হলো, ঘাঁটির সেনাদলের একটা অংশ ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে পারে। এর নিশ্চিত সম্ভাবনাও আছে, একথা আমি আগেই বলেছি।’ বলল আহমদ মুসা।

‘দুই সম্ভাবনাই যদি থাকে, তাহলে খারাপ সম্ভাবনাকেই আমাদের সামনে রাখতে হবে স্যার।’ মেন্দারিস মালিক বলল।

‘ঠিক বলেছেন মি. মেন্দারিস মালিক।’ বলল আহমদ মুসা।

কথা বলার সাথে সাথেই আহমদ মুসা ও মেন্দারিস মালিক উঠছিল সেই পাহাড়ের দেয়ালে।

পাহাড়ে আরোহনটা এখানে বেশ মজার। পাহাড়ের দেয়ালটা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ করে উপরে উঠেছে।

ওঠার গোটা পথটাই ছোট ছোট খুঁটির মত ডজন-ডজন টিলায় ভরা। যেন কোন ধ্বংসাবশেষ ছাড়া।

উঠে গেছে তারা দেয়ালের মাথা অনেকটা চিরুনীর মত অনেক টিলার সমষ্টি।

খুশি হলো আহমদ মুসা। তাদের নিরাপদ আড়াল নেয়ার একটা প্রাকৃতিক ব্যবস্থা আল্লাহ্ যেন করে রেখেছেন।

পাশাপাশি দুই টিলার আড়ালে গিয়ে বসল তারা। ওপাশের উপত্যকাটাই হলো ‘আর্ক অব নুহা’ উপত্যকা। তাকাল তারা উপত্যকার দিকে। গোটা উপত্যকা তাদের নজরের আওতায়।

উপত্যকার দিকে চোখ ফেলতেই নজরে পড়ল, তারা যেখানে বসে আছে সেখান থেকে নিচে বিশ ডিগ্রি কৌণিক অবস্থানে পাহাড়ের গায়ে ঠিক ‘ওয়েল ড্রিলিং’- এর মত আট ইঞ্চি ব্যাসের মেগা সাইজের পাইপ বসানো হয়েছে বরফের বুক চিরে। একটা বড় ইঞ্জিন এই পাইপ বসাতে সাহায্য করছে। ইঞ্জিনটা তখনও চলছে। শব্দ খুবই অস্পষ্ট। বোঝাই যাচ্ছে সাইলেন্সার লাগানো হয়েছে ইঞ্জিনে।

কয়েকটা লম্বা স্ট্যান্ডের সাথে সেট করা টপসাইড ঢাকা কয়েকটা উজ্জল বাল্ব আলোকিত করে রেখেছে উপত্যকার সংশ্লিষ্ট এলাকাটিকে। চারদিকের অমাবস্যার গভীর অন্ধকারের মধ্যে জায়গাটিকে মনে হচ্ছে আলোর দ্বীপ।

দেখা গেল পাইপের মুখে একটা জটিল মেশিন ফিট করা হয়েছে। সেই মেশিন থেকে বেরিয়ে আসা কয়েকটা নল স্ট্যান্ডের উপর রাখা একটা স্ক্রিনের পেছনে সংযুক্ত হয়েছে। কয়েকজন স্ক্রিনটার উপর ঝুঁকে পড়েছে। আহমদ মুসা গভীর মনোযোগের সাথে পর্যবেক্ষণ করছে স্ক্রিনটাকে।

ওদিক থেকে চোখ না ঘুরিয়েই আহমদ মুসা বলল, 'মি. মেন্দারিস মালিক, তেল কোম্পানি ড্রিল করে মেশিন দিয়ে তেল টেনে নেয়, এরা মনে হয় ড্রিল করে স্বর্ণভান্ডার থেকে স্বর্ণ টেনে নিতে চাইছে।'

'কিন্তু স্যার, স্ক্রিনের দিকে ওরা হা করে চেয়ে বসে আছে কেন?' বলল মেন্দারিস মালিক।

'ওরা ড্রিল করে যে পাইপ বসাচ্ছে, তার মাথায় নিশ্চয় একটা সুসংরক্ষিত ক্যামেরা সেট করে রাখা হয়েছে। সেই ক্যামেরা যা কিছু দেখছে তার ছবি পাঠাচ্ছে স্ক্রিনে। ওরা সম্ভবত কথিত স্বর্ণভাণ্ডার যে গুহায় আছে, সে গুহাতেই ড্রিল করার পাইপ বসিয়েছে। এখন তারা কখন স্বর্ণভাণ্ডার দেখতে পাবে, তার অপেক্ষা করছে।' আহমদ মুসা বলল।

'প্রায় দু'শ থেকে তিনশ ফুট গভীর বরফের স্তর এখানে।' বলল মেন্দারিস মালিক।

'দৃশ্যত এটা অসম্ভব। কিন্তু ওদের কাছে কয়েক শতাব্দী আগের একটা ম্যাপ আছে। সে মানচিত্রে হযরত নুহ আ. - এর নৌকার ল্যান্ডিং উপত্যকা এবং তার চারপাশের গুহাগুলো সুস্পষ্টভাবে চিহ্নত আছে। যা দেখে হিসেব-নিকেশ করে বলা যায় কোথায় কোন গুহার অবস্থান। ২শ থেকে তিনশ ফিট নিচে হাজার হাজার বছর থেকে জমে থাকা বরফের নিচে লুকিয়ে থাকা সে গুহার অবস্থান তারা নিশ্চয় বের করেছে।'

‘হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন স্যার। পড়েছি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়ার মত দেশের কাছে এমন ক্যামেরা আছে যা দিয়ে আকাশ থেকেও তারা ভূ-গর্ভের কোথায় কী আছে, তার ছবি তুলতে পারে।’ মেন্দারিস মালিক বলল।

আহমদ মুসা দেখতে পেল, হঠাৎ উপত্যকার ওপাশে স্ক্রিনে নজর রাখা লোকজনদের মধ্যে হাসি-আনন্দের একটা হুল্লোড় পড়ে গেল।

‘মি. মেন্দারিস মালিক, ওরা সত্যিই স্বর্ণের দেখা পেয়ে গেছে মনে হয়। এছাড়া তাদের আনন্দের আর কোন কারণ নেই বলে মনে করি।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ঠিক স্যার। ঐ দেখুন, সবাই ছুটে আসছে স্ক্রিনের দিকে। সবার দৃষ্টি স্ক্রিনে নিবদ্ধ।’ মেন্দারিস মালিক বলল।

‘হ্যাঁ, মি. মেন্দারিস মালিক, স্বর্ণই তারা দেখছে। দেখা যাক এখন তারা কী করে? মি. খাল্লিকান খাচিপের পাঠানো পুলিশ দল না আসা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।’ বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা দেখল, ওপাশের উপত্যকায় লোকজনদের মধ্যে আনন্দের পাশাপাশি ছুটাছুটি শুরু হয়ে গেছে। পাইপের কাছে স্ক্রিনটির পাশে আর একটা মেশিন তারা টেনে নিয়ে এল। পাইপটাকে তারা সেট করল পাম্প মেশিনের মত মেশিনটার সাথে। একজন বোতাম টিপে মেশিনটাকে স্টার্ট দিল।

বড় মেশিনটার স্টার্ট নেয়ার গর্জন আহমদ মুসাদেরও কানে এল। তবে সাইলেন্সার লাগানো না থাকলে শব্দটা নিশ্চয় আরও বিকট হতো।

পাম্প মেশিনটার নিচের দিকে একটা রিলেজিং পাইপ রয়েছে। সে পাইপটাকে সেট করা হলো একটা প্লাস্টিক ধরনের বক্সের সাথে। বক্সের টপে পানির ট্যাংকর মত গোল সাইড ওয়ালা একটা হোল রয়েছে। তার সাথেই সেট করা হয়েছে পাইপটাকে।

পাম্প মেশিনটাতে একটা স্ক্রিন রয়েছে। মেশিনটা চালু হবার পর সবার দৃষ্টি আগের স্ক্রিনটার মত এ স্ক্রিনটার উপরও নিবদ্ধ।

পল পল করে গত হলো আরও কিছুটা সময়।

হঠাৎ দ্বিতীয় স্ক্রিনটার দিকে তাকিয়ে মহানন্দে ভীষণ নাচানাচি শুরু করে দিল সবাই। যেন আনন্দে তারা পাগল হয়ে গেছে।

'মি. মেন্দারিস মালিক, স্বর্ণভাণ্ডারে স্বর্ণ দেখার পর এবার তারা স্বর্ণ হাতে পেয়ে গেছে।' আহমদ মুসা বলল।

'তাদের নাচানাচি দেখে তাই মনে হচ্ছে। আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মতই তাদের দশা। কিন্তু স্বর্ণ তারা হাতে পেয়েছে কী করে বুঝা গেল?' বলল মেন্দারিস মালিক।

'পাইপটার সাথে নতুন যে মেশিন সেট করেছে দেখছেন, সেটা ম্যাগনেটিক পুলিং মেশিন। এই পাওয়ার মেশিন যে কোন ধাতব বস্তুকে টেনে তার মধ্যে নিয়ে এসে অন্য একটি রিলিজিং পাইপ দিয়ে বের করে দিতে পারে। কোন ধাতব বস্তু যদি কোথাও লাগানো থাকে কিংবা ধাতব, চামড়া বা কাপড় ইত্যাদির মত প্রাকৃতিক কোন প্যাকেটে ধাতব কোন বস্তু রাখা থাকে, তাহলে সেগুলোকেও টেনে নিয়ে আসতে পারে। আর এই ম্যাগনেটিক পুলিং মেশিনে যে আরেকটা স্ক্রিন দেখছেন, সেটা দিয়ে দেখা যায় মেশিনটি কিভাবে পুল করে নিয়ে আসছে। আমার যেটা মনে হচ্ছে সেটা হলো, পাইপটিকে যে গুহা-মুখে সেট করা হয়েছে, সে পাইপের মাধ্যমেই গুহার স্বর্ণভাণ্ডার থেকে ম্যাগনেটিক পুলিং মেশিনটি স্বর্ণ টেনে নিয়ে আসছে। আর সেই মেশিনের মাধ্যমে এসে প্লাস্টিকের বক্সটায় জমা হচ্ছে।' বলল আহমদ মুসা।

'তাহলে নুহ আ. - এর স্বর্ণভাণ্ডারের কথা সত্য হল? সত্য হলো হাজার হাজার বছরের লোককথা।' মেন্দারিস মালিক বলল।

'ভুল বলছেন। এই স্বর্ণভাণ্ডার নুহ আ.-এর নৌকায় তোলা এবং নামানো যদি সত্য হয়েও থাকে, তাহলেও এই স্বর্ণভাণ্ডার হযরত নুহ আ.-এর নয়। তিনি এই স্বর্ণভাণ্ডার নৌকায় তুলেছিলেন এবং নামিয়েও ছিলেন তিনিই। যেহেতু প্রার্থনাগৃহটি প্লাবনে ধ্বংস হয়েছিল তাই সেই স্বর্ণের সাথে হযরত নুহ আ.-এর সম্পর্ক ছিল এ কথা কোথাও বলা হয়নি।' নৌকায় কোন অজৈব সম্পদ নুহ আ. তোলেননি। আল্লাহ্'র নির্দেশক্রমে তিনি নৌকায় তুলেছিলেন প্রত্যেক জীব-প্রজাতির এক একটি জোড়া। এরাই দুনিয়ার সম্পদ। কারণ দুনিয়াকে আবাদ করে

এরাই। আর তখন এদেরই সংরক্ষণের প্রয়োজন ছিল। দুনিয়ার মেটালিক বা অন্য কোন সম্পদের সংরক্ষণের প্রয়োজন তখন ছিল না। তাই সে ধরনের কিছু নৌকায় তোলার প্রশ্নই ওঠেনি।' বলল আহমদ মুসা।

'কিন্তু তাঁর পক্ষ থেকে নৌকায় অন্য কেউ মেটালিক সম্পদ তুলে থাকতে পারেন। ঐ স্বর্ণভাণ্ডার হয়তো ঐ ধরনের একটা সম্পদ।' মেন্দারিস মালিক বলল।

'বলা হয়, কিন্তু এর সত্যতার কোন প্রমাণ নেই। সত্য না হওয়াটাই যৌক্তিক।' বলল আহমদ মুসা।

'কিন্তু আমরা দেখছি ঐ তো স্বর্ণ গুহা থেকে বের হচ্ছে। এটা তো চাক্ষুস সত্য।' মেন্দারিস মালিক বলল।

'এই চাক্ষুস সত্য কিন্তু প্রমাণ করে না যে, এই স্বর্ণভাণ্ডার হযরত নুহ আ. এর নৌকায় উঠেছিল এবং তা থেকে নামিয়ে এই গুহায় রাখা হয়েছিল।' বলল আহমদ মুসা।

'স্বর্ণভাণ্ডার তাহলে কোত্থেকে এল তার তো একটা ভিন্ন ব্যাখ্যা দরকার।' মেন্দারিস মালিক বলল।

'সেকালে লুণ্ঠিত সম্পদ এভাবে নিরাপদ গুহায় লুকিয়ে রাখা হতো। আবার নানা কারণে উপাসনা গৃহের সম্পদও পাহাড়ের কোন নিরাপদ গুহায় গচ্ছিত রাখতো উপাসনাগৃহের প্রধানরা। মাউন্ট আরারাতের দুর্গম গুহাগুলো উপাসনা গৃহের পবিত্র সম্পদ গচ্ছিত রাখার উপযুক্ত জায়গা ছিল। এ গুহার স্বর্ণভাণ্ডারের ক্ষেত্রেও এ ধরনের কিছু ঘটে থাকতে পারে। আমার মনে হয়, এ স্বর্ণভাণ্ডারকে হযরত নুহ আ.-এর সাথে এবং তাঁর নৌকার সাথে যুক্ত করেছিল এই কারণে যে, লোকেরা যাতে এই সম্পদকে পবিত্র মনে করে, ভয় ও শ্রদ্ধা করে এবং এই সম্পদের দিকে হাত বাড়াতে সাহস না পায়।' বলল আহমদ মুসা।

'আপনার এই ব্যাখ্যাই ঠিক স্যার। এমন চিন্তা আমাদের সমাজে বহুল প্রচলিত। এ ধরনের সম্পদে হাত দেয়াকে মানুল অপরাধ জ্ঞন করে।' মেন্দারিস মালিক বলল।

আহমদ মুসাদের এই আলাপ আর এগোল না।

পেছনে অনেকগুলো পায়ের শব্দে দু'জনেই চমকে উঠে পেছন ফিরে তাকাল। না, পায়ের শব্দ ঠিক পেছনে নয়, যে পর্যটন রুট থেকে তারা এখানে উঠে এসেছে, সেই রুট থেকেই শব্দগুলো ভেসে আসছে। নিঃশব্দ পরিবেশ হওয়ার কারণেই শব্দগুলো দূরে হলেও কানে এসে বাজছে।

'আবার এক সেনাদল মি. মেন্দারিস মালিক। সংখ্যা আগের চেয়েও মনে হয় বেশি হবে।' লোকদের দেখে বলল আহমদ মুসা।

'এরা কি সেই সেনাদল যাদের কথা ডিপি মি. খাল্লিকান খাচিপ বলেছিলেন?' মেন্দারিস মালিক বলল।

'তাই হবে। তবে এরা সেনাবাহিনীর লোক নয়। এ ধরনের যৌথ অভিযানে এবং পার্বত্য পথে সেনাদলরা যেভাবে পথ চলে, এদের হাঁটার ধরন তার ধারে কাছেও নয়।' বলল আহমদ মুসা।

'তার মানে এরা প্রথমে যাওয়া সেনাদলেরই অংশ। আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনটি গ্রুপ। দু'টি ভূয়া সেনা গ্রুপ। আর একটি গ্রুপ ক্রুসের সাথে গলায় মাউন্ট আরারাতের প্রতীক পরা। একটা গ্রুপ সেনাবাহিনীর পোষাক ছাড়া হলো কেন? সেনা পোষাক পরে ক্যামোফ্লোজ করা ওদের যে কৌশল, তার সাথে এই গ্রুপের অবস্থান তো মিলে না।' মেন্দারিস মালিক বলল।

'ঠিকই মেন্দারিস মালিক, হিসাব মিলে না। হতে পারে ওদেরকে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে পরিকল্পনা ছাড়াই আনা হয়েছে। তাই ওদের বোধ হয় সামরিক পোষাক পরানো যায়নি।' বলল আহমদ মুসা।

'ওরা তো সবাই এসে গেল। আমাদের পুলিশরা কখন আসবে?' মেন্দারিস মালিক বলল।

'জানি না কোন বেজ ক্যাম্প থেকে ওরা আসছে! কী করা যাবে, অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।' বলল আহমদ মুসা।

সেনা দলটি ডান পাশের শৃংগের পাদদেশ ধরে বাঁকের দিকে চলে গেছে অনেকক্ষণ।

আহমদ মুসারা ঘুরল উপত্যকার দিকে আবার। উপত্যকায় তখন সে একই দৃশ্য। ম্যাগনেটিক পুলিং মেশিন চলছি।

প্লাস্টিকের বড় বাক্সটি ভরছে গুহার স্বর্ণভাণ্ডার থেকে উঠে আসা স্বর্ণে।

সবার চোখ ম্যাগনেটিক পুলিং মেশিনের স্ক্রিনের দিকে। স্বর্ণভণ্ডার থেকে কি সব বিচিত্র রূপের স্বর্ণ উঠে আসছে তাই দেখছে সবাই।

হঠাৎ ব্রাশফায়ারের শব্দে চারদিকের জমাট নিস্তব্ধতা ভেঙে পড়ল।

অনেকগুলো স্টেনগানের সম্মিলিত ব্রাশ ফায়ারের জমাট শব্দ।

কিছুই বুঝতে পারল না আহমদ মুসা। শুধু বিস্ময়ের সাথে দেখল আলোচিত স্থানটুকুতে যেখানে স্বর্ণ উত্তলন চলছে, এবং যারা কাজ করছিল তারা সবাই একে একে গুলিবিদ্ধ হয়ে ভূমিশয্যা নিয়েছে। ওরা সবাই রিল্যাক্স মুডে ছিল। কারও হাতেই ছিল না অস্ত্র। আকস্মিক আক্রমণের অসহায় শিকারে পরিণত হয়েছে ওরা। আক্রমণ এতটাই আকস্মিক ও ব্যাপক ছিল যে গুলিবৃষ্টি এড়িয়ে শেল্টার নেবারও সুযোগ কেউ পায়নি।

মেশিন তখন চলছে। স্বর্ণ ভাণ্ডার থেকে স্বর্ণ তাখনও উঠে আসছে।

কারা ওদের আক্রমণ করল? এটা কি ওদের নিজেদের মধ্যে স্বর্ণভাণ্ডার দখলের লড়াই? গুলিবৃষ্টি তখনও চলছে।

গুলি করতে করতেই একদল লোক অন্ধকার থেকে আলোতে গিয়ে প্রবেশ করল।

দেখেই আহমদ মুসারা বুঝল এরাই গলায় মাউন্ট আরারাতের প্রতীক পরা সেই লোকগুলো। আহমদ মুসা ভাবল, সেনা-পোষাক পরা লোকদের থেকে কি এরা তাহলে আলাদা?

ঐ উপত্যকায় যা ঘটতে লাগল তা দেখে আহমদ মুসাকে তার চিন্তা আর এগিয়ে নিতে হলো না।

গলায় মাউন্ট আরারাতের প্রতীকধারী লোকরা আলোকিত এলাকায় প্রবেশ করে কেউ বেঁচে নেই দেখার পর গুলি করা বন্ধ করে দিল। তারপর তারা ভাঙতে শুরু করল মেশিনপত্রসহ সবকিছু। তারা প্রথমে ভাঙল জেনারেটর। ম্যাগনেটিক পুলিং মেশিনটি স্বর্ণ উত্তোলনকারী পাইপ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভেঙে ফেলল। ভেঙে ফেলল ড্রিলিং মেশিনও। স্বর্ণ জমা হওয়া প্লাস্টিক কনটেইনার থেকে ম্যাগনেটিক পুলিং মেশিনের পাইপ খুলে ফেলেছিল। এবার কয়েকজনে মিলে

প্লাস্টিক বক্স ধরে যে পাইপ দিয়ে স্বর্ণ ঢালা হয়ে গেলে তারা প্লাস্টিক কনটেইনারটিকেও ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলল। সবশেষে তারা পাইপের মধ্যে টাইম ডিনামাইট ঢুকিয়ে তাতে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সব চিহ্ন নিশ্চিহ্ন করে দিল এবং উলট-পালট করে দিল ভেতরের গঠনকেও। এই সব কাজ শেষ করতে পঁচিশ-তিরিশ মিনিটের বেশি সময় লাগল না।

সব শেষ করে তারা সবাই হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনায় বসল। দু'হাত তুলে তারা প্রার্থনা করতে লাগল। আহমদ মুসাদের মনে এবার বিস্ময়ের পালা।

আবার শুরু হলো ব্রাশ ফায়ার। অনেক স্টেনগানের সম্মিলিত ব্রাশফায়ার ছুটে এল অন্ধকারের বুক চিরে। প্রার্থনারত সবাইকে এক সাথে পেয়ে গেল গুলির ঝাঁক।

গুলি খেয়ে সবাই উপুড় হয়ে পড়ে গিয়েছিল। ওদের সবারই কাঁধে ঝুলানো ছিল স্টেনগান। প্রার্থনার আগে স্টেনগান কাঁধে রেখেই তারা সবকিছু ভাঙচুর করেছে। প্রার্থনার সময়ও স্টনগান ছিল তাদের কাঁধে। উপুড় হয়ে পড়ে গিয়ে তারা সবাই নিঃসাড় হয়ে গিয়েছিল।

আক্রমণকারীদের গুলি চলছিল তখনও। কিন্তু গুলিগুলো ছিল বৃথাই।

মাটিতে পড়ে যাওয়া লোকদের উপর তা কোনই ক্রিয়া করছিল না। কেউ বেঁচে নেই নিশ্চিত হয়ে আক্রমণকারীরা অন্ধকার থেকে আলোতে প্রবেশ করল।

আহমদ মুসা দেখল ওদের পরনে সেনা পোষাক। বুঝল আহমদ মুসারা, এ সেনাদলই তাদের সামনে দিয়ে সবশেষে উপত্যকায় প্রবেশ করেছে।

সেনা-পোষাকের লোকরা প্রথমেই এগোচ্ছিল গুলি খেয়ে শেষ হয়ে যাওয়া লোকদের দিকে। তাদের লক্ষ্য সম্ভবতঃ ছিল এটা দেখা যে, ওরা কারা এবং কারা এই সর্বনাশ করল।

আক্রমণকারীরা লোকদের কাছাকাছি পৌঁছার সাথে সাথেই মৃতদের মধ্যে থেকে কয়েকজন তড়াক করে পাশ ফিরে শুয়ে থেকেই গুলি করতে লাগল আক্রমণকারীদের লক্ষ্য করে। তাদের গুলি অবিরাম চলল।

দাঁড়িয়ে অগ্রসরমান আক্রমণকারীরা তাদের স্টেনগান তোলা কিংবা শুয়ে পড়া কিংবা কোন কিছুর আড়াল নেবারও সুযোগ পেল না। পয়েন্ট ব্লাংক গুলিবৃষ্টির মুখে পড়ে দাঁড়ানো অবস্থাতেই মুহূর্তের মধ্যে তাদের দেহ ঝাঁঝরা হয়ে গেল।

গোড়া কাটা গাছের মত ওরা পড়ে গেল মাটিতে।

যারা এদের গুলি করেছিল, সেই চারজন উঠে দাঁড়াতে গেল। কিন্তু দাঁড়িয়েই আবার পড়ে গেল। সবই দেখছিল আহমদ মুসারা।

'স্যার, এমন জীবন্ত ফিল্ম দেখতে পারব কোনদিন ভাবিনি। অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম। কে কার শত্রু, কেন শত্রু কিছুই বুঝলাম না স্যার।' বলল মেন্দারিস মালিক।

'ঠিক বলেছেন মেন্দারিস। একটা বিস্ময়কর দৃশ্য দেখলাম আমরা আজ। সেনা পোষাকধারীরা এক পক্ষ, এটা এখন পরিষ্কার। কিন্তু গলায় মাউন্ট আরারাতের প্রতীক ধারণকারীরা কারা? সোনা ভাগাভাগি, কিংবা সোনা কুক্ষিগত করার ঝগড়া এটা নয়। দেখাই তো গেল, স্বর্ণের প্রতি কোন লোভ তাদের নেই। যে পরিমাণ স্বর্ণ তোলা হয়েছিল, সেগুলো তারা আবার ফেরত পাঠিয়েছে পাইপ দিয়ে নিচে। তারপর তারা বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে শুধু দিয়েছে, যাতে ঐ পথে পাইপ বসানো আর সম্ভব না হয়। কে এরা। কেন এমনটা করল সেটাই সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে না।' আহমদ মুসা বলল।

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'চলুন, ছুটতে হবে এবার উপত্যকায়। আহত তিনজনকে বাঁচাতে হবে। আমাদের পুলিশ দলের জন্যে অপেক্ষা করার আর প্রয়োজন নেই।'

উঠে দাঁড়াল মেন্দারিস মালিকও। বলল, 'হ্যাঁ, ঐ তিনজন বোধ হয় সিরিয়াসলি আহত। প্রতিপক্ষদের হত্যা করে এরা প্রতিশোধ নিতে পেরেছে ঠিকই, কিন্তু তারা উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করেও পারেনি।'

'আল্লাহ ওদের বাঁচিয়ে রাখুন। বাঁচা ওদের দরকার। ওরা সেনা পোষাক পরে আসা দলটির বিরোধী পক্ষের, মানে ওরা মিহরান মুসেগ মাসিসদের 'সোহা' গ্রুপ ও ভারদান বুরাগদের 'হোলি আর্ক' গ্রুপের বিরোধী। এদের কাছ থেকে

সন্ত্রাসী ঐ সংগঠন দু'টোর ষড়যন্ত্রের কিছু তথ্য পাওয়া যেতে পারে।' আহমদ মুসা বলল।

চলতে শুরু করেছে আহমদ মুসা। মেন্দারিস মালিকও আহমদ মুসার পেছনে হাঁটা শুরু করে বলল, 'স্যার, আমার মনে হচ্ছে এরা খ্রীস্টানদের

কোন আলট্রা ধর্মীয় গ্রুপ। এরা দারুণ সংরক্ষণবাদী। কোন ধর্মীয় প্রতীক, ধর্মীয় স্থান ইত্যাদির সামান্য নড়চড়েরও এরা পক্ষপাতি নয়। আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, জর্জিয় ও তুরস্কে এদের সংখ্যা কম নয়।'

'হ্যাঁ, এরকম গ্রুপ আছে। বিপজ্জনক হয়ে থাকে এরা। সন্ত্রাসীরা স্বার্থের জন্যে সন্ত্রাস করে। কিন্তু এরা এদের অন্ধ, মনগড়া ধর্মাচারের জন্যে হাসতে হাসতে জীবন দিতে পারে। এদের অন্ধ চরমপন্থা সত্যিই ভয়ংকর।' আহমদ মুসা বলল।

'আমাদের মুসলমানদের মধ্যেও তো এ রকম কিছু গ্রুপ আছে।' বলল মেন্দারিস মালিক।

'আল্লাহ্'র ক্কুরআন ও রসূলুল্লাহ্ স:-এর যে শিক্ষা তাতে মুসলমানদের মধ্যে এ ধরনের চরমপন্থী গ্রুপের উত্থান অসম্ভব। ইসলাম নীতি ও কর্মপন্থার দিক থেকে মধ্যম পন্থার ধর্ম। কিন্তু অনেক সময়ই বাইরের ষড়যন্ত্র এবং অন্ধ ও মনগড়া বিশ্বাসের দ্বারা তাড়িত বিভিন্ন গ্রুপের সৃষ্টি হয়েছে মুসলমানদের মধ্যে। চতুর্থ খলিফা হযরত 'আলী রা.-এর শাসন যুগে খারেজী সম্প্র'দায়সহ এ ধরনের কিছু ফেৎনার আবির্ভাব ঘটে। এ ধরনের ফেৎনা এখনও আছে, যারা বিভিন্ন পরিভাষা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করে মুসলমানদের বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করতে চাচ্ছে। ইসলামের শত্রুদের ষড়যন্ত্র এদের পেছনে রয়েছে। তবে এই গ্রুপ কখনই ইসলামের মূলধারায় প্রবেশ করতে পারেনি। এদের অস্তিত্ব দীর্ঘস্থায়ীও হয়নি। এর কারণ আল্লাহর কুরআন, রসূলল্লাহ স.-এর জীবন মানে হাদীস অবিকৃত অবস্থায় আমাদের সামনে রয়েছে। সত্যের এই তেজই সব ফেৎনাকে অবশেষে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেয়।' থামল আহমদ মুসা।

'আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া স্যার। এই সুযোগ কিন্তু খৃষ্টান ও ইহুদিদের নেই'। বলল মেন্দারিস মালিক।

‘কারণ তাদের ধর্মগ্রন্থ অবিকৃত নেই এবং তাদের ধর্মগুরুদের জীবন ও কর্মও তাদের সামনে অবিকৃত অবস্থায় নেই।’ আহমদ মুসা বলল।

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা বলল, ‘আমরা উপত্যকায় প্রবেশ করেছি মি. মেন্দারিস মালিক।’

‘ওরা সবই ধ্বংস করেছে, কিন্তু লাইটগুলো জ্বলছে কেন স্যার?’ বলল মেন্দারিস মালিক।

‘কারণ লাইটগুলো ব্যাটারি চালিত। জেনারেটরের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।’ আহমদ মুসা বলল।

যতটা সম্ভব দ্রুত হাঁটছে আহমদ মুসারা। যেখানে সম্ভব ডবল মার্চও করছে। বরফের সমুদ্রে না থাকলে ঘামে তাদের গোসল হয়ে যেত।

অল্পক্ষণের মধ্যে তারা আলোর প্রান্তসীমায় পৌছে গেল।

‘মেন্দারিস মালিক, তোমার স্টেনগান প্রস্তুত রাখ, আমরা যেন সেনা সদস্যদের মত বোকা না বনি।’

নিজের মেশিন রিভলভারটা হাতে নিতে নিতে বলল আহমদ মুসা।

অন্ধকার থেকে আলোর এলাকায় প্রবেশ করল আহমদ মুসা।

তাদের দেখতে পেয়েছে আহত সেই তিনজন লোক।

অত্যন্ত ক্ষীপ্র লোকগুলো।

দেখতে পেয়েই তারা তাদের স্টেনগান তুলে নিয়েছে।

একেবারেই বেপরোয়া লোকগুলো। আহমদ মুসাদের রিভলভার ও স্টেনগান যে তাদের দিকে তাক করে রাখা হয়েছে, সেদিকে তাদের ভ্রূক্ষেপমাত্র নেই।

বিদ্যুতবেগে তাদের স্টেনগানের নল উঠে আসছে আহমদ মুসাদের লক্ষ্যে।

ওদের থামানোর আর কোন উপায় ছিল না। আহমদ মুসার রিভলভার চোখের পলকে তিনবার অগ্নিবৃষ্টি করল। তিনটি গুলি বেরিয়ে তিনজনের কারো কব্জিতে, কারো বাহুতে গিয়ে বিদ্ধ হলো। স্টেনগান পড়ে গেল ওদের হাত থেকে।

আহমদ মুসা রিভলভার বাগিয়েই দ্রুত এগুলো তাদের দিকে। বলল, ‘আমরা আপনাদের শত্রু নই। যারা সোনা তুলতে এসেছিল, আমরা তাদের লোক নই। সোনার প্রতি আমাদের কোন লোভও নেই। পাশের পাহাড়ের উপর থেকে আমরা আপনাদের লড়াই দেখেছি। আপনাদের আহত হতে দেখে আপনাদের সাহায্যের জন্যে আমরা এসেছি। আপনাদের থামানোর আর কোন পথ ছিল না বলেই আত্মরক্ষার জন্যে আমি আপনাদের হাতে গুলি করতে বাধ্য হয়েছি। মারতে চাইলে আমি আপনাদের বুকে, মাথায় গুলি করতে পারতাম।’

বলে আহমদ মুসা হাতের রিভলভার পকেটে রেখে তাদের দিকে এগোলো।

মেন্দারিস মালিকও তার হাতের স্টেনগান কাঁধে ঝুলিয়েছে।

আহত তিনজনও শান্তভাবে শুয়ে পড়েছে।

আহত তিনজনের মধ্যে দুইজনের দুই উরুই গুলিবিদ্ধ। আরেকজনের লেগেছে পাঁজরে গুলি।

তখনও রক্তক্ষরণ হচ্ছে তাদের আহত স্থান থেকে।

‘অনেক রক্তক্ষরণ হয়েছে। রক্তক্ষরণ অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার। আমি চেষ্টা করব, আপনারা আমাকে সাহায্য করুন।’ আহতদের লক্ষ্যে বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা তার পিঠে ঝুলানো ব্যাগ নামিয়ে তার ভেতর থেকে অনেকগুলো প্রি-মেডিকেল ব্যান্ডেজ বের করে নিল।

এই প্রি-মেডিকেল ব্যান্ডেজ রক্তক্ষরণ বন্ধে কার্যকর। একই সাথে এটা ব্যান্ডেজ ও রক্তরোধক ঔষধও। এই ব্যান্ডেজ আহতস্থান থেকে অতিসহজে খুলে নেয়া যায়।

আহমদ মুসা অভিজ্ঞ ডাক্তরের মত সবার সব আহত স্থানে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল।

আহতদের একজন বলল, ‘আপনি দেখছি ডাক্তার। কিন্তু গুলি করা দেখে মনে হয়েছিল আপনি একজন অতিদক্ষ বন্দুকবাজ।’

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘আমি প্রফেশনাল ডাক্তার নই, প্রফেশনাল বন্দুকবাজও নই। আমি একজন সচেতন মানুষ।’

বলেই পকেট থেকে মোবাইল বের করল আহমদ মুসা। কল করল যে পুলিশদের এখানে আসার কথা ছিল তাদের চীফকে।

পুলিশ অফিসার তার কলে সাড়া দিয়ে বলল, ‘স্যার, আমরা সাড়ে ১৫ হাজার ফিট লেভেলে পৌঁছে গেছি।’

আহমদ মুসা তাকে ধন্যবদ দিয়ে ‘আর্ক অব নুহা’ উপত্যকায় আসতে বলল এবং জানল, উপত্যকায় গুরুতর আহত তিনজন লোক রয়েছে। তাদের দ্রুত বেজ ক্যাম্পের হাসপাতালে নিতে হবে।

আহমদ মুসা কথা শেষ করতেই আহতদের একজন বলল, ‘আপনাদের সাহায্যের জন্যে অনেক ধন্যবাদ। আপনারা কে জানতে পারি কি?’

‘বলেছি আমরা আপনাদের শত্রুদের সাথের লোক নই। আপনাদের সাথেও আমাদের কোন শত্রুতা নেই। আমরা পুলিশও নই। তবে আমি পুলিশকে ডেকেছে। আপনাদের বেজ ক্যাম্প-১ এ নিয়ে যাবার জন্যে তাদের সাহায্য দরকার।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তাহলে আপনারা কে, সেটাই তো জিজ্ঞেস করছি।’ বলল আহতদের সেই লোকটিই।

‘আমরা আপনাদের শুভাকাংখী। এটুকু পরিচয়ই থাক। পরে আলোচনা হবে।’ বলল আহমদ মুসা।

তাদের কথা বলার আর সুযোগ না দিয়েই আহমদ মুসা চারিকের লাশগুলোর দিকে নজর দিল। পা বাড়াল ঘুরে দেখার জন্যে।

তার পাশে হাঁটছিল মেন্দারিস মালিকও।

‘সেনা পোষাক পরা লাশগুলোকে দেখুন মি. মেন্দারিস মালিক, কাউকে চিনতে পারেন কিনা। তবে ওদের সার্চ করে লাভ নেই। তাদর নকল সেনা পোষাক তাদের প্রকৃত পরিচয়ের কিছুই রাখেনি, সেটা নিশ্চিত।’ আহমদ মুসা বলল।

দু’জনেই ঘুরতে লাগল এক লাশ থেকে অন্য লাশের কাছে।

একটি লাশের কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াল মেন্দারিস মালিক। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে দেখল লাশের মুখটাকে। তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তাকাল সে আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'স্যার, একে বোধ হয় আমি চিনতে পেরেছি। ইনি 'হোলি আর্ক গ্রুপ'- এর আরিয়াস অঞ্চলের প্রধান- ভারদান বুরাগ। লেক ভ্যান তীরের একটা ঘটনায় এই সংগঠনের প্রধান ওরান্তু নিহত হওয়ার পর ইনিই 'হোলি আর্ক গ্রুপ'- এর দায়িত্ব পেয়েছিলেন।'

আহমদ মুসার মুখও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সেও দেখল লাশটার চেহারা। বলল, 'আপনি ভালো করে চেনেন একে?'

'ভালো করেই চিনি। একটি মিটিং-এ ওরান্তু ওরারতু'র সাথে একদিন কথা হচ্ছিল। সে সময় ইনি তাঁর কাছে গিয়েছিলেন। ওরান্তু ওরারতু তাকে ভারদান বুরাগ সম্বোধন করে তাঁর সাথে বসা আরেক জনের সাথে ভারদান বুরাগকে পরিচয় করে দিয়ে তাকে আরিয়াস অঞ্চলের প্রধান বলেছিল। একবার দেখলেও ভারদান বুরাগের চেহারা আমার মনে আছে।' মেন্দারিস মালিক বলল।

'ধন্যবাদ আপনাকে আপনার স্মরণশক্তির জন্যে মি. মেন্দারিস মালিক। আল্লাহ্'র হাজার শোকর যে আমাদের এক শত্রুকে আমাদের পথ থেকে তিনি সরিয়ে দিয়েছেন। উনি তো নেতা, দেখুন মি. মেন্দারিস মালিক, ওর পকেটে ওর মোবাইলটা পাওয়া যায় কিনা।' বলল আহমদ মুসা।

সংগে সংগেই মেন্দারিস মালিক ভারদান বুরাগের পকেট সার্চ করল। পেল একটা মোবাইল। মোবাইলটি সে তুলে দিল আহমদ মুসার হাতে।

মোবাইলটি হাতে নিয়ে আহমদ মুসা বলল, 'মোবাইলটা কাজে দিতে পারে।'

পুলিশের বাঁশির আওয়াজ পেল আহমদ মসা। বাঁশির আওয়াজটা এল 'আর্ক অব নুহা' উপত্যকার ওপ্রান্ত থেকে।

'পুলিশ দল এসে গেছে।' বলল আহমদ মুসা।

মাউন্ট আরারাতের বেজ ক্যাম্প-১ এর একমাত্র সরকররী হাসপাতালের ভিআইপি বেডে শুয়ে ফাদার আনতু আরামেহ। কথা বলছিল সে আহমদ মুসার সাথে।

ফাদার আনতু আরামেহ মাউন্ট আরারাতের সাড়ে পনের হাজার ফিট উপরে 'আর্ক অব নুহা' উপত্যকা থেকে উদ্ধার করে আনা তিনজন আহতের একজন।

গলায় মাউন্ট আরারাতের প্রতীক পরা যারা 'আর্ক অব নুহা' উপত্যকায় সেনা পোষাক পরা ভারদান বুরাগ ও তার বাহিনীকে হত্যা করে স্বর্ণভাণ্ডারের স্বর্ণ দখল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছিল, ফাদার আনতু আরামেহ সেই দলের নেতা।

আহমদ মুসার কাছে ফাদার আনতু আরামেহ অকপটে স্বীকার করেছে যে সে আর্মেনিয়ার নাগরিক। বহুদিন সে বাস করছে ইজদিরে। ইজদিরের সেন্ট মেরী গীর্জার সে প্রধান পুরোহিত।

এ সব দিয়েই আহমদ মুসার সাথে শুরু হয়েছিল তার কথা।

ফাদার আনতু আরামেহ গীর্জার প্রধান পুরোহিত জেনে আহমদ মুসা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'একজন শান্তিপ্রিয় ফাদার হয়ে 'আর্ক অব নুহা' উপত্যকার খুনোখুনির মত ঘটনার সাথে জড়িয়ে পড়লেন কিভাবে? আপনার সাথের লোকরাই বা কারা? গীর্জার লোক এরা নিশ্চয় নয়।'

'না এরা গীর্জার লোক নয়। 'আর্মি অব ট্রিনিটি' নামে একটা সংগঠন আছে। ঈশ্বর যিশু ও মেরীর স্বার্থ রক্ষায় উৎসর্গিত এরা। ঈশ্বর যিশু ও মেরীর জন্যে এরা জীবন দিতে প্রস্তুত। গীর্জার ফাদার হিসাবে এরা আমারও ভক্ত। আমি যখন জানতে পারলাম প্রভূ নূহের নৌকার গচ্ছিত স্বর্ণভাণ্ডা অপহরণের চেষ্টা করা হচ্ছে, তখনই আমি খোঁজ-খবর নেয়া শুরু করি। সব তথ্য যোগাড়ের পর আমি নিশ্চিত হলাম 'হোলি আর্ক গ্রুপ' ও 'সোহা' নামের দু'টি সন্ত্রাসী ও রাজনৈতিক সংগঠন নিছক ব্যক্তিগত ও গ্রুপ স্বার্থে প্রভূ নূহরে স্বর্ণভাণ্ডার আত্মসাৎ করতে চাচ্ছে। প্রভূ নূহের স্বর্ণভাণ্ডার মানে ঈশ্বরের স্বর্ণভাণ্ডার। এ স্বর্ণভাণ্ডার রক্ষা করা প্রতিটি ধর্মভীরু মানুষের দায়িত্ব। আমি 'আর্মি অব ট্রিনিটি'- কে বিষয়টা জানালাম। শুনেই তারা ক্ষীপ্ত হয়ে উঠল। তারা শপথ নিল ঈশ্বরের এ সম্পদ রক্ষায় তারা জীবন দিতে

প্রস্তুত। আমার সাথে ‘আর্ক অব নূহা’য় এরাই এসেছিল। জীবনও তারা দিয়েছে, কিন্তু রক্ষা করেছে ঈশ্বরের সম্পদ।’ থামল ফাদার আনতু আরামেহ।

‘ফাদার, আপনি ‘সোহা’ ও ‘হোলি আর্ক গ্রুপ’-কে রাজনৈতিক ও সন্ত্রিসী সংগঠন বললেন। আসলে ওরা কারা?’ আহমদ মুসা বলল।

‘হ্যাঁ, সোহা পুরোপুরি রাজনৈতিক সংগঠন। আর ‘হোলি আর্ক গ্রুপ’ একটি নিরেট সন্ত্রাসী সংগঠন। যে কোন উপায়ে যে কোন পথে অর্থ সম্পদের পাহাড় সৃষ্টি করা তাদের লক্ষ্য। প্রভু নূহের স্বর্ণভাণ্ডারেও অবশেষে তারা হাত দিয়েছে।’ বলল ফাদার আনতু আরামেহ।

‘কিন্তু একটি রাজনৈতিক এ একটি সন্ত্রাসী সংগঠনের মধ্যে এই মিলন হলো কী করে?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘দুই গ্রুপ দুই উদ্দেশ্যে একে অপরকে ব্যবহার করছে। ‘হোলি আর্ক’ গ্রুপ টাকা দিয়ে ‘সোহা’র সমর্থন কিনে নিয়েছে যাতে তাদের পক্ষে প্রভু নূহের স্বর্ণভাণ্ডার লুট করা সহজ হয়। ‘সোহা’ গ্রুপের ব্যপক প্রভাব রয়েছে পূর্ব আনাতোলিয়অর পুলিশ ও সেনা দলের উপর। মাউন্ট আরারাতে প্রভু নূহের স্বর্ণভাণ্ডার লুটের জন্য পুলিশ ও সেনাদলের সাহায্য দরকার। কোটি কোটি ডলার খরচ করে ‘সোহা’র মাধ্যমে এদের সাহায্য পেতে চেয়েছে তারা এবং সেটা তারা পেয়েছে। অন্যদিকে ‘সোহা’ চেয়েছে ‘হোলি আর্ক গ্রুপ’- এর টাকায় পূর্ব আনাতোলিয়ায় তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের পাকাপোক্ত ব্যবস্থা সম্পন্ন করতে। তা তারা করেও ফেলেছে।’ বলল ফাদার আনতু আরামেহ।

‘সোহা’র এই রাজনৈতিক স্বার্থ কি ফাদার?’ আহমদ মুসা বলল।

প্রশ্ন শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল ফাদার আনতু আরামেহ। বলল, ‘বিষয়টা বললে আমার গায়েও কালো দাগ পড়ে। কিন্তু তবু আমি বলব। কারণ, আমি আমার ধর্মের পক্ষে ও ন্যায়ের পক্ষে। কোন গোষ্ঠীগত বা জাতিগত ইগো অথবা আবেগের শৃংখলে বন্দী আমি নই।’

একটু থামল ফাদার আনতু আরামেহ। তারপর বলল, ‘তারা পূর্ব আনাতোলিয়া, বিশেষ করে এর মাউন্ট আরারাত অঞ্চলকে তুরস্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায় এবং একে আর্মেনিয়ার অংশ বানাতে চায়। এক সময় ভ্যান পর্যন্ত গোটা

পূর্ব আনাতোলিয়া আর্মেনিয়ার অংশ ছিল, তারও আগে এই অঞ্চল ছিল একটা খ্রীস্টান সাম্রাজ্য। তারা এই সাম্রাজ্য আবার ফিরে পেতে চায় এবং আর্মেনিয়াকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে তারা বিশাল এক সাম্রাজ্য গড়তে চায়।'

'আপনি বললেন বিষয়টি আপনার গায়েও কালো দাগ লাগায়। মানে আপনিও এর অন্তর্ভুক্ত, ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়। এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আপনার নিজস্ব কোন ভাবনা আছে কিনা?' আহমদ মুসা বলল।

'আমার কথা, আমি আগেই বলেছি যে আমি ন্যায়ের পক্ষে। জাতিগত ইগো ও আবেগের হাতে আমি বন্দী নই। তাদের কথায় আবেগ ও ইগো দুইই আছে, কিন্তু যুক্তি নেই। ইহুদিরা যে অমূলক ও অন্যায়ভাবে ফিলিস্তিনে এসেছে এবং একটি রাষ্ট্র বাগিয়েছে, হোলি আর্ক গ্রুপদের দাবীও ঠিক এটা। এই দাবী সভ্যতা ও মানব ইতিহাসের ধারার বিরোধী। এ দাবী মেনে নিলে আমেরিকানদেরকে আমেরিকা, অস্ট্রেলীয়দের অস্ট্রেলিয়া এবং হিন্দু আর্যদেরকে ছাড়তে হবে ভারতবর্ষ। এভাবে কোন দেশই অক্ষত থাকবে না। সুতরাং এই ধরনের দাবী একটা পাগলামি। সেই পাগলামিই করছে 'হোলি আর্ক গ্রুপ' ও 'সোহা'।' বলল ফাদার আনতু আরামেহ।

'ফাদার, আপনি বললেন, 'সোহা'রা তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের পাকাপোক্ত ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছে। সম্পন্ন করে ফেলা তাদের সেই ষড়যন্ত্র বা কাজটা কী?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'এ ব্যাপারে আমার কাছে কোন স্পেসিফিক ইনফরমেশন নেই। আমার ঐ কথা বলার কারণ হলো, ইদানিং তাদের নেতারা বলে বেড়াচ্ছে যে, আর মাত্র কয়েকদিন, এরপর আমাদের দিন আসছে। আমাদের রাজ কায়েম হবে। আর্মেনিয়ার সাথে এই অঞ্চলের দূরত্ব আর থাকবে না। ইয়েরেভেন হবে আমাদের রাজধানী, আর মাউন্ট আরারাত হবে আমাদের তীর্থকেন্দ্র। এসব কথা থেকে আই বুঝেছি, তাদের প্রস্তুতি শেষ, শুধু ফল প্রকাশটাই বাকি। তাছাড়া আমি জেনেছি, তারা গত কিছু দিন ধরে বিশেষ শ্রেণীর বা তাদের পছন্দমত লোকদের সাথে ডোর-টু-ডোর যোগাযোগ করছে। সব ক্রিমিনাল গ্রুপের সাথেও তাদের যোগাযোগ হয়েছে। টাকা দিয়ে তারা তাদের বশ করে ফেলেছে। কিন্তু তারা কী করতে চায়,

ষড়যন্ত্র কী ধরনের, এত আয়োজন কিসের জন্যে, সেটা আমি জানতে পারিনি। তবে আমার গীর্জায় নিয়মিত আসে, এমন একজন কথাচ্ছলে একদিন বলেছে, 'সামনের দিনগুলো ভালো নয়, ফাদার। গোটা পূর্ব আনাতোলিয়ায় নাকি আগুন জ্বলবে'।' বলল ফাদার আনতু আরামেহ।

'ধন্যবাদ ফাদার, আপনি মূল্যবান তথ্য দিয়েছেন। আচ্ছা ওদের কোন ঠিকানা বা কনট্যাক্ট পয়েন্ট জানা আছে আপনার, ফাদার?'

'কয়েকটা ঠিকানা আমার লোকরা সংগ্রহ করেছিল, সেগুলোর একটিতেও তারা এখন নেই। ওরা একটা ঠিকানায় কয়েক সপ্তাহের বেশি থাকে না। তবে দু'টি জায়গায় ওরা খুব বেশি ওঠাবসা করে। তার একটি হলো মাউন্ট আরারাতের বেজ ক্যাম্প-১ এর পর্যটন হোটেল। অন্যটি আমাদের ইজদির প্রদেশের রাজধানী ইজদিয়ের ইহুদিদের সিনাগগের পাশের হোলি আরারাত হোটেল। অবশ্য আমি জানি না 'আর্ক অব নূহা' উপত্যকার ঘটনার পর তাদের আরও কিছু পরিবর্তন হয়েছে কিনা। 'সোহা'র নেতা মিহরান মুসেগ মাসিস খুব চালাক লোক।' বলল ফাদার আনতু আরামেহ।

'অনেক ধন্যবাদ ফাদার। আপনি অনেক সাহায্য করেছেন। এবার উঠি।' আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ, আমি চেষ্টা করব আরও স্পেসিফিক তথ্য জানার। পারলে আমি জানাব।' বলল ফাদার আনতু আরামেহ।

ধন্যবাদ দিয়ে আহমদ মুসা বলল, 'ফাদার, আমি আমার একটা কার্ড আপনার কাছে রেখে যাচ্ছি। ওতে টেলিফোন নাম্বার, ই-মেইল সবই আছে। আপনি ব্যবহার করতে পারবেন।'

বলে আহমদ মুসা তার নেমকার্ড বের করার জন্য জ্যাকেটের পকেটে হাত দিল। তার হাতটা প্রথমেই রিভলভারে গিয়ে পড়ল।

নেমকার্ড রিভলভারের তলায় চাপা পড়েছে। আহমদ মুসা নেমকার্ড বের করছিল রিভলভারের নিচ থেকে।

এই সময় ব্রাশ ফায়ারের শব্দ হলো। দরজায় দাঁড়ালো দু'জন পুলিশ গুলি খেয়ে দরজার উপরই পড়ে গেল।

আহমদ মুসা চমকে উঠে দরজার দিকে তাকিয়ে দেখল এই দৃশ্য।

সংগে সংগে তার হাত পকেটের নেমকার্ড ছেড়ে দিয়ে রিভলভার চেপে ধরল। তার তর্জনি রিভলভারের ট্রিগার স্পর্শ করল।

দুই পুলিশর গুলিবিদ্ধ দেহ মাটিতে পড়ে যাবার পরপরই আরও তিনজন উদ্যত স্টেনগান হাতে দরজায় দাঁড়াল। একজন চিৎকার করে বলল, 'মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হও শয়তার ফাদার। তোমরা আমাদের সর্বনাশ করেছো। এবার আমরা তোমাদের সর্বনাশ করব। তোমার গোটা পরিবারকে সর্বনাশ করে এসেছি। এতক্ষণ গুলি করিনি তোমাকে শুধু এই খবর দেয়ার জন্যে। ফায়া...।'

'ফায়ার' শব্দ সে শেষ করতে পারলো না। জ্যাকেটের পকেট থেকে আহমদ মুসার মেশিন রিভলভার গুলিবৃষ্টি করল।

আদের পেয়ে স্টেনগানের ট্রিগার টেপার আগেই গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে পুলিশের লাশের পাশেই তাদের তিনটি লাশ পড়ে গেল।

ফাদার আনতু আরামেহ বিছানায় উঠে বসেছিল। ভাবলেশহীন তার মুখ। চোখে তার শূন্য দৃষ্টি।

আহমদ মুসা তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর বলল, 'আমি দুঃখিত ফাদার, আপনার পরিবারের কথা আমাদের পুলিশের ভাবা উচিৎ ছিল।'

ফাদার তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল 'আমি আমার পরিবারের জন্যে ভাবছি না আবু আহমদ। আমি ভাবছি, 'সোহা' এবং 'হোলি আর্ক গ্রুপ' কতটা জঘন্য পর্যায়ে নেমে গেছে!'

মুহূর্তের জন্যে থেমে ফাদার আনতু আরামেহ বলল, 'ধন্যবাদ মি. আবু আহমদ। দ্বিতীয়বার আপনি আমাকে বাঁচালেন। আমি দারুন বিস্মিত হয়েছি আপনার ক্ষীপ্রতা ও লক্ষ্যভেদ দেখে। পকেটে রিভলভার রেখে এই ক্ষীপ্রতা ও লক্ষ্যভেদ স্বাভাবিক নয়!'

'বিপদে আল্লাহ্ এভাবেই সাহায্য করেন তার বান্দাহদেরকে।' আহমদ মুসা বলল।

'আপনার এই ধর্মভীরুতাকে আমার খুব ভালো লাগে। সত্যিকার ধর্মভীরু মানুষ যে ধর্মেরই হোক তারা একে অপরকে বিশ্বাস করতে পারে, তাদের মধ্যে

সুন্দর সহাবস্থানও সম্ভব। গত দু'দিনে দু'বার আপনার সাথে আমার দেখা হয়েছে। মনে হচ্ছে দু'যুগ থেকে আপনার সাথে আমার পরিচয়!' বলল ফাদার আনতু আরামেহ।

হন্তদন্ত হয়ে ঘরে প্রবেশ করল ডিপি মি. খাল্লিকান খাচিপ। বলল সে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে, 'সব আমি শুনেছি মি. আবু আহমদ। আল্লাহ্'র শোকর যে আপনি এ সময় ঘরে ছিলেন। তাতে ফাদারকে বাঁচালো গেছে।'

বলেই তাকাল ফাদার আনতু আরামেহ'র দিকে। বলল, 'ফাদার, আমি দুঃখিত আপনার পরিবারের জন্যে।'

'স্যার, যারা চলে গেছে, তাদের কথা না ভেবে দেশের, জনগণের যারা শত্রু, তাদের কথা ভাবুন। আমি আপনাদের পাশে আছি।'

বলে একটু থামল ফাদার আরামেহ। তারপর তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'মি. আবু আহমদ, আমি 'আর্মি অব ট্রিনিটি'- এর গোয়েন্দা ইউনিটের প্রধানকে খবর দিয়েছি। তার সাথে আমার খুব ভালো সম্পর্ক। সেও সত্যিকার একজন ধর্মভীরু মানুষ। অনেক খবর তার কাছে থাকার কথা। সে অবশ্যই আমাদের সাহায্য করবে।'

'ধন্যবাদ ফাদার। সবার সাহয্য পেলে আমরা খুশি হবো।' আহমদ মুসা বলল।

বলেই আহমদ মুসা ফিরল ডিপি মি. খাল্লিকান খাচিপের দিকে। ফিরেই তাকে বলল, 'মি. খাল্লিকান, ফাদারকে এখনি এখান থেকে সরিয়ে ইজদিরের পুলিশ হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। অন্য কোন হাসপাতালে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাবে না।'

'ঠিক বলেছেন স্যার, আমিও এই চিন্তাই করছিলাম। ধন্যবাদ আপনাকে।'

'ধন্যবাদ আপনাকে, ধন্যবাদ সকলকে। আমি উঠছি। জরুরী কিছু কাজ আছে।'

আহমদ মুসা সালাম দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

# ৬

আহমদ মুসা হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে তার গাড়িতে উঠল। বাম হাত স্টিয়ারিং-এ রেখে ডান হাতে চাবি ঘুরিয়ে স্টার্ট করল গাড়ি। ঘড়ির দিকে তাকাল। আর আধাঘন্টা বাকি মেজর নাঈমের সাথে দেখা করার। মেজর নাঈম তাকে জানাবে দু'দিন আগে মাউন্ট আরারাতের 'আর্ক অব নূহা' উপত্যকায় 'সোহা' ও 'হোলি আর্ক' গ্রুপের লোকের লোকেরা যে সেনাদের পোষাক পরে গিয়েছিল, তারা সেনাবাহিনীর কিনা এবং নাম-পরিচয় কী?

আহমদ মুসা বিষয়টি জানতে টেলিফোন করেছিল আংকারায় জেনারেল মেডিন মেসুদের কাছে। জেনারেল মেসুদ তখনই নাম দিয়েছিল মেজর নাঈমের। বলেছিল, এই মেজর দেশ প্রেমিক এবং সোহাদের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। জেনারেল মেসুদ আরও বলেছিল সে এ ব্যপারে মেজর নাঈমকে একটা ব্রীফ দেবে। পরে মেজর নাঈমই আহমদ মুসার সাথে যোগাযোগ করে দেখা করার সময় ঠিক করেছিল।

আহমদ মুসার গাড়ি মুভ করতে যাবে এই সময় একজন সামনে থেকে ছুটে আহমদ মুসার গাড়ি পর্যন্ত এসেই চোখের পলকে পকেট থেকে রিভলভার বের করে আহমদ মুসাকে গুলি করার জন্য।

লোকটি ছুটে গাড়ির সামনে আসতেই আহমদ মুসা টের পেয়েছে কী ঘটতে যাচ্ছে। তখন তার রিভলভার বের করার সময় ছিল না। সুতরাং আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টার কোন বিকল্প ছিল না।

আত্মরক্ষার জন্যে বাম দিকে সীটের উপর শুয়ে পড়ে আক্রমণে যাবার ক্ষেত্রে অসুবিধা হবে। অন্যদিকে সামনে থেকে গুলি আসবে বিধায় সামনের স্টিয়ারিং-এর উপর ঝুঁকে পড়া বিপজ্জনক হবে। সবশেষে আহমদ মুসা ডান হাত ডান লকের উপর রেখে দেহটাকে ডান দরজার সাথে সেঁটে গিল। একটা গুলি কানের পাশ দিয়ে বাম কাঁধের উপর দিয়ে চলে গেল। আহমদ মুসা ডান হাত

ইতিমধ্যে দরজার লক খুলে ফেলেছিল এবং দরজা ঠেলে গড়িয়ে পড়ল রাস্তার উপর। রিভলভারও পকেট থেকে বের করে নিয়েছিল আহমদ মুসা।

গাড়ির উইন্ড স্ক্রিন সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছিল।

নিয়ন্ত্রণহীন গাড়িটা তার সামনে দিয়ে রাস্তার ডান পাশের দিকে গড়িয়ে চলল।

আহমদ মুসা রিভলভার বাগিয়ে দ্রুত গড়িয়ে চলল গাড়ির সাথে যাতে তার অবস্থান সম্পর্কে শত্রু পক্ষের বিভ্রান্তির সুযোগ সে নিতে পারে।

তাই হলো। আহমদ মুসা লোকটির পেছনে এসে পড়ল।

ওদিকে লোকটি সত্যিই বিভ্রান্ত হয়েছিল। সে সামনে তাকিয়ে আহমদ মুসাকে না দেখে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল গাড়ির দিকে ছুটে আসার জন্যে। তার হাতে উদ্যত রিভলভার।

ঘুরে দাঁড়িয়েই সে দেখতে পেল আহমদ মুসাকে।

কিন্তু সে তার রিভলভার আহমদ মুসার দিকে ঘুরিয়ে নেবার আগেই আহমদ মুসার রিভলভারের গুলি তার ডান হাতে বিদ্ধ হলো। রিভলভার ছিটকে পড়ল তার হাত থেকে।

হাত চেপে ধরে দৌড় দিল লোকটি পালাবার জন্যে।

এবার আহমদ মুসা তার পায়ে গুলি করল। তাকে জীবন্ত হাতে পেতে চায় আহমদ মুসা। এ পর্যন্ত 'সোহা' কিংবা 'হোলি আর্ক গ্রুপ'- এর কাউকেই জীবন্ত ধরা যায়নি।

পায়ে গুলি খেয়ে পড়ে গেল লোকট।

আহমদ মুসা ছুটল তার দিকে।

লোকটি পেছন ফিরে আহমদ মুসাকে একবার দেখল। তারপর গলায় ঝুলানো সোনার চেইনের লকেট মুখে পুরে শুয়ে পড়ল।

আরো জোরে দৌড়াল আহমদ মুসা। কিন্তু কোন ফল হলো না। আহমদ মুসা পৌঁছার আগেই পটাসিয়াম সায়ানাইড বিষ লোকটির জীবন কেড়ে নিয়েছে।

আহমদ মুসা লোকটার কাছে পৌঁছার সাথে সাথে ডিপি খাল্লিকান খাচিপ এবং পুলিশরাও পৌঁছে গেল।

'স্যার, আপনি ঠিক আছেন তো? এরা পাগল হয়ে উঠেছে। আপনাকে সাবধান হতে হবে স্যার।' আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল ডিপি খাল্লিকান খাচিপ।

খাল্লিকান খাচিপের কোন কথার জবাব না দিয়ে আহমদ মুসা বলল, 'মি. খাল্লিকান খাচিপ, একেও জীবন্ত ধরা গেল না। এর হাতে পায়ে গুলি করে ভেবেছিলাম জীবন্ত ধরতে পারব, তা হলো না। বুঝা যাচ্ছে, 'সোহা'দের হার্ডকোর লোক যারা, তারা প্রত্যেকেই কাছে পটাসিয়াম সায়ানাইড রাখে।'

'সাংঘাতিক ফেরোশাস আর দারুণ কমিটেড এরা দেখছি। এরকম 'ডু-অর-ডাই' যাদের নীতি, তাদের সাথে পারা কঠিন। স্যার, এখান থেকে বেরুলে দয়া করে আপনি পুলিশ নিয়ে বেরুবেন। আপনার নিরাপত্তার ব্যাপারে আমরা এত উদাসিন জানতে পারলে উপরওয়ালারা আমার চাকুরীই রাখবে না স্যার।' বলল ডিপি খাল্লিকান খাচিপ।

'উপরওয়ালাদের আমি দেখব মি. খাল্লিকান খাচিপ। আপনি এ লাশসহ আগের দু'টি লাশকে দেখুন, এদের কোন ঠিকানা-পরিচয় বের করা যায় কিনা। আমার জরুরি কাজ আছে এক জায়গায়। আমি সেখানে যাচ্ছি।'

বলে আহমদ মুসা যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল।

মি. খাল্লিকান খাচিপ আহমদ মুসার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকে বাধা দেবার সাহস পেল না। তবু বলল, 'স্যার, আপনার উইন্ড শিল্ড একেবারে ছাতু হয়ে গেছে। আপনি আমার গাড়ি নিয়ে যান।'

'পুলিশের গাড়ি নিয়ে গেলে অসুবিধা আছে।' আহমদ মুসা বলল।

'আমি এখনি একটা প্রাইভেট কার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি স্যার। উইন্ড শিল্ডের ভাঙা কাঁচে আপনার গাড়ির ভেতরটা বসার অযোগ্য হয়ে গেছে।' বলল ডিপি খাল্লিকান খাচিপ।

হাসল আহমদ মুসা। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'সে সময় নেই মি. খাল্লিকান খাচিপ। ইতিমধ্যেই আমার দেরি হয়ে গেছে। ভাববেন না, যুদ্ধ ক্ষেত্রে এর চেয়ে অনেক ভাঙা গাড়ি নিয়ে চলতে হয়। আমরা এখন যুদ্ধক্ষেত্রে ধরে নিন।'

বলেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। চলল গাড়ির দিকে।

'মি নাজিম, একে দেখুন। এর নাম ছাড়া তার কিছুই আমরা জানি না। আমাদের দেশে তার কোন স্বার্থও নেই। কিন্তু দেখুন বার বার মৃত্যুর মুখে পড়লেও আমাদের লড়াই তিনি লড়ে যাচ্ছেন। নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর মডেল মানুষ আর দ্বিতীয় আছে বলে মনে হয় না। আল্লাহ্ তার ভালো করুন।' আহমদ মুসাকে দেখিয়ে পাশে দাঁড়ানো পুলিশ অফিসার নাজিমকে কথাগুলো বলল ডিটি খাল্লিকান খাচিপ।

'স্যার, এ ধরনের ভালো লোক আছে বলেই পৃথিবীটা এখনও কল্যাণ নিয়ে টিকে আছে। পর্বত প্রমাণ উঁচু স্যার এদের কর্তব্য, কিন্তু এরা নিজেদেরকে সবার চেয়ে ছোট করে দেখে। সেদিন স্যার খানার টেবিলে একটা প্লেট কম পড়েছিল। আমি শেষ প্রান্তে ছিলাম। প্লেট আমি সে কারণেই পাইনি। উনি উঠে এসে তার খানার প্লেটটি আমাকে দিয়ে আমার পরে বসলেন। আমি প্রতিবাদ করার আগেই বললেন, 'খেয়েই আপনাকে ডিউটিতে দৌড়াতে হবে। আমার সে রকম ডিউটির কোন তাড়া নেই। সুতরাং আমার একটু পরে খেলে ক্ষতি নেই।' আমার মত একজন পেটি পুলিশ অফিসার আর কোথায় তিনি, যাকে স্বয়ং প্রেসিডেন্টও সমীহ করেন, শ্রদ্ধা করেন। তাঁর এই কাজ আমাকে বড় করেনি বরং আরও বড় করেছে তাঁকেই।'

'ধন্যবাদ ইন্সপেক্টর মি. নাজিম। আপনি ঠিক চিন্তা করেছেন। আসলেই তিনি ভিন্ন মাপের, ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। এমন মানুষ আমি দেখিনি।'

কথাগুলো বলছিল ডিপি খাল্লিকান খাচিপ আহমদ মুসার চলন্ত গাড়ির দিকে তাকিয়ে।

তার দু'চোখের শূন্য দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল সেদিকে গাড়িটি দৃষ্টির বাইরে চলে যাবার পরও।

দৃষ্টি তার বাইরে থাকলেও তার অন্তরে চলছে তখন একটা হিসাব-নিকাশ। আবু আহমদ নামের লোকটি তো আমার মত খাল্লিকান খাচিপকেও পাল্টে দিয়েছে। আমি টাকার বিনিময়ে আসামীকে বাদী বানাতাম, আর বাদীকে বানাতাম আসামী। বিচার বিক্রি করতাম টাকার বিনিময়ে। অবশেষে টাকার বিনিময়ে দেশের শত্রুদেরও সাহায্য করতে শুরু করেছিলাম। এই আবু আহমদের নিঃস্বার্থ

কাজের বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত আমার বিবেককেও জাগিয়ে তুলেছে। সে বিবেকের পাহারায় আমার মত লোকও সেই পাপগুলো করার আর সুযোগ পাচ্ছে না।

পুলিশ অফিসার মি. নাজিম ডিপি খাল্লিকান খাচিপকে আপনার মধ্যে বিভোর হয়ে যেতে দেখে বলল, 'স্যার, লাশগুলো নিয়ে যেতে হবে।'

চমকে উঠে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'চলুন অফিসার।'

'চলুন।' বলল পুলিশ অফিসার।

ওদিকে আহমদ মুসার গাড়ি পৌঁছে গেল মাউন্ট আরারাত সেনা ক্যাম্পের বাইরে হাইওয়ের পাশের মাউন্ট মালিক রেস্টুরেন্টে।

রেস্টুরেন্টটির ঠিক বিপরীতে রাস্তার ওপাশের উপত্যকায় রয়েছে বিরাট এক আঙুর বাগান। বাগানের মালিকানা একজন ইহুদি ব্যবসায়ীর। তার নাম মালিক মেরারী মালুস। তার নামের প্রথম শব্দ দিয়ে নামকরণ করা হয়েছে রেস্টুরেন্টটির। মজার ব্যপার হলো তার এই ইহুদি পরিচয় কেউ জানে না। সবাই তাকে মালিক সাহেব বলে জানে। রেস্টুরেন্টের মালিক হবার সুবাদে সেনা অফিসারদের সাথে তার ব্যপক পরিচয়।

আহমদ মুসা রেস্টুরেন্টের সামনে গাড়ি পার্ক করে রেস্টুরেন্টের ভেতরে প্রবেশ করল। রেস্টুরেন্টের সবচেয়ে দূরবর্তী কোণের নির্ধারিত টেবিল তখনও খালি। আহমদ মুসা বসল গিয়ে টেবিলটিতে।

দু'মিনিটের মধ্যেই প্যান্ট ও টি-সার্ট পরা একজন তরুণ এসে টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে টেবিলে বসার জন্য অনুমতি চাইল।

আহমদ মুসা তরুণটির মুখের দিকে চেয়ে দেখল তার নাকের ডান পাশে সুন্দর কালো একটা আচিল।

এই চিহ্নটার কথাই জেনারেল মেডিন মেসুদ আহমদ মুসাকে জানিয়েছিল।

'বসুন।' বলল আহমদ মুসা।

তরুণটি বসে বলল, 'স্যার, আমি মেজর নাঈম মেহরান। জেনারেল মেডিন মেসুদের নির্দেশে আমি এখানে এসেছি।'

'জানি। নাস্তার অর্ডার দিয়েছি। নাস্তা খেতে খেতেই কথা হবে।' আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসা কথা শেষ হবার সাথেই নাস্তা এসে গেল।

নাস্তায় কাঁটাচামচ লাগাবার আগেই মেজর নাঈম মেহরান পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে আহমদ মুসার হাতে দিয়ে বলল, 'স্যার, এটি পকেটে রাখুন।'

আহমদ মুসা দ্রুত কাগজটি নিয়ে পকেটে পুরে বলল, 'সবার পরিচয় এসেছে?'

'সবার সম্ভব হয়নি, তবে অফিসারদের সবার পরিচয় পাওয়া গেছে।' নাস্তার দিকে মুখ রেখে আস্তে করে বলল মেজর নাঈম মেহরান।

'কর্নেলের নাম?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'নূহা উপত্যকায় তথাকথিত সেনা অভিযানের নেতৃত্বে যে একজন কর্নেল ছিলেন তার নাম মোস্তফা মিকাহ।' বলল মেজর নাঈম মেহরান।

নামের শেষ শব্দটা বিস্মিত করল আহমদ মুসাকে। 'মিকাহ্' হিব্রু শব্দ। অর্থ ঈশ্বরের মত। এমন একটা হিব্রু নাম কোন মুসলমানের হতে পারে না। আর এই অর্থের নাম তো কোন মুসলমান রাখতেই পারে না। আহমদ মুসা বলল, 'কর্নেল মোস্তফা মিকাহ্ মুসলমান তো?'

'অবশ্যই। কেন বলছেন এ কথা?' বলল মেজর নাঈম মেহরান।

'তার মা নিশ্চয় ইহুদি কিংবা ইহুদি বংশোদ্ভুত ছিল। তা না হলে কর্নেলের নামে হিব্রু শব্দ এল কী করে?' আহমদ মুসা বলল।

'ইহুদি মা হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু সন্তান তো মুসলমান। তার নামে হিব্রু শব্দ রাখবে কেন? নিশ্চয় ভুল হয়েছে।' বলল মেজর নাঈম মেহরান।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'ভুল নয় মেজর। ইহুদি বংশনীতির বিধান হলো, তাদের মেয়েরা যাদের বা যে ধর্মের লোকের ঘরেই থাক, তাদের গর্ভের ছেলেরা হবে ইহুদি। এমন ছেলেদের তারা ইহুদি হিসাবেই গণনা করে।'

বিস্ময় ফুটে উঠল মেজর নাঈম মেহরানের চোখে মুখে। বলল, 'তাহলে কর্নেল মোস্তফা মিকাহ্ ইহুদি?'

দু'জনেই মুখ নিচু করে খেতে খেতে কথা বলছিল।

আহমদ মুসা মেজর নাঈমের কথার কোন উত্তর না দিয়ে মুখ তুলল।

মুখ তুলে মাথাটা সোজা করতেই তার চোখ সোজাসুজি গিয়ে পড়ল কাউন্টারের এক পাশে বিশাল চেয়ারে বসে থাকা একজন সুদর্শন সুবেশধারী ভদ্রলোকের উপর। লোকটি তার দিকেই তাকিয়েছিল। আহমদ মুসার সাথে চোখাচোখি হতেই লোকটি চমকে উঠে তার চোখ সরিয়ে নিল। লোকটির হাতে মোবাইল এবং তার সামনে একটা কম্পিউটার। আহমদ মুসা কিন্তু চোখ সরিয়ে নেয়নি।

তার চোখে বিস্ময়, মনে প্রশ্ন। লোকটি তার দিকে তাকিয়ে ছিল কেন? অবশ্য তার উপর হঠাৎ চোখ পড়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সে চমকে উঠল কেন? এই চমকে ওঠার অর্থ হলো, ধরা পড়ার ভয়। কিন্তু সে কী করছিল যে ধরা পড়ার ভয় করবে? তাহলে কি সে আহমদ মুসার সবকিছু ফলো করছিল? কিভাবে? কোন প্রশ্নেরই আহমদ মুসার কাছে জবাব নেই।

আহমদ মুসা দেখল লোকটি মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু এর পরও তার চোখের একটা কোণ যেন আহমদ মুসার পাহারায় নিয়োজিত রয়েছে।

আহমদ মুসা মুখ নিচু করল। বলল খেতে খেতে, 'আমাদের এই রেস্টুরেন্টের মালিককে কতটুকু চেনেন?'

'কেন, তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী, সফল ফার্মমালিক।' বলল মেজর নাঈম মেহরান।

'আমি তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছি মেজর।' আহমদ মুসা বলল।

'উনি একদমই রাজনীতি বিমুখ। রেস্টুরেন্টে কোন রাজনৈতিক আলোচনাও তিনি এলাও করেন না।'

'চলুন, তাহলে এবার উঠি।' বলেই আহমদ মুসা নাস্তার বিল টেবিলে রেখে উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়াল না মেজর নাঈম মেহরান।

সে বসে বসে ঠাণ্ডা পানিতে একটু করে চুমুক দিচ্ছিল। বলল সে, 'স্যার, আপনি যান। আমি পরে যাব।'

'ও ঠিক আছে। সেটাই ভালো।' বলে আহমদ মুসা রেস্টুরেন্টের দরজার দিকে পা বাড়াল।

রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে কয়েক ধাপ এগিয়েছে আহমদ মুসা এমন সময় তার পাশে এসে একটি গাড়ি হার্ড ব্রেক করল।

গাড়ি থেকে হন্তদন্ত হয়ে নামল একজন সেনা অফিসার। তার ইউনিফর্মের শোল্ডাল ব্রান্ডে একজন কর্নেলের ইনসিগনিয়া।

সে গাড়ি থেকে নেমেই মুখোমুখি হলো আহমদ মুসার।

কর্নেল দ্রুত তার পকেট থেকে রাভলভার বের করে তার নল আহমদ মুসার কপালে ঠেকিয়ে বলল, 'ইউ আর আন্ডার এ্যারেস্ট।'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'কর্নেল মোস্তফা মিকাহ্ আমার অপরাধ কী?'

'জানতে পারবেন।' বলল কর্নেল মোস্তফা মিকাহ্।

'আমি জানি আমার অপরাধ। আমি আপনাকে এবং মালিক মেরারী মালুসকে জেনে ফেলেছি।' আহমদ মুসা বলল।

কথাটা শুনে চমকে উঠেছিল কর্নেল মোস্তফা মিকাহ্। তার হাতটাও কেঁপে গিয়েছিল।

আহমদ মুসা তার এই মেকি অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করল। বিদ্যুৎ বেগে তার বাম হাতটা উঠে গিয়ে কর্নেল মোস্তফা মিকাহ্'র রিভলভার ধরা হাত এক ধাক্কায় উপরে ঠেলে দিল। একটা গুলিও রিভলভার থেকে বেরুল, কিন্তু তা মাথার উপর দিয়ে চলে গেল।

কিন্তু তার পরেই দৃশ্যপট পাল্টে গেল। আহমদ মুসার ডান হাত বাম হাতের সাথেই উপরে উঠে গিয়েছিল। রিভলভার থেকে গুলি বেরুবার সাথে সাথেই আহমদ মুসার ডান হাত কর্নেলের হাত থেকে রিভলভার কেড়ে নিল। আহমদ মুসা রিভলভার কেড়ে নিয়েই পচণ্ড একটা আঘাত করল কর্নেলের মাথায় রিভলভারের বাঁট দিয়ে।

মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল কর্নেল। আহমদ মুসা তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে কর্নেলের গাড়িতে ঢুকিয়ে দিয়ে ড্রাইভিং সীটে গিয়ে বসল।

গাড়ি স্টার্ট নিয়ে দ্রুত চলতে শুরু করল।

আহমদ মুসা যখন কর্নেলকে রিভলভারের বাঁট দিয়ে মেরে তার সংজ্ঞাহীন দেহ গাড়িতে তুলছিল, তখন রেস্টুরেন্টের মালিক মি. মালিক মেরারী মালুস রেস্টুরেন্টের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল। ভয়ংকর বিস্ময় আর উদ্বেগে তার মুখ চুপসে গেছে।

সব ঘটনা মেজর নাঈম মেহরানও দেখতে পেয়েছিল। সেও উদ্বেগ নিয়ে ছুটে এসেছিল। কিন্তু আহমদ মুসার গাড়ি ততক্ষণে রেস্টুরেন্ট এলাকার বাইরে চলে গেছে। দাঁড়িয়ে পড়েছিল মেজর নাঈম মেহরান। এ ঘটনায় সে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। তবে সে ভাবল, জনাব আবু আহমদ উপরের লোক। তিনি যাই করুন ভেবে চিন্তেই করবেন। সব চিন্তা মাথা থেকে সরিয়ে দিয়ে মেজর নাঈম ধীরে ধীরে গিয়ে তার গাড়িতে উঠল।

ওদিকে আহমদ মুসা সংজ্ঞাহীন একজন আস্ত কর্নেলকে পাঁজাকোলা করে তার কক্ষে আহমদ মুসাকে ঢুকতে দেখে আঁতকে উঠল সে। বলল, 'এই তো গেলেন, কোথায় পেলেন একে?'

'এ সেই কর্নেল যার ইউনিফর্ম পরে সেদিন 'আর্ক অব নূহা' উপত্যকায় শহীদ হয়েছিল একজন ভূয়া কর্নেল।' আহমদ মুসা বলল।

বুঝল ডিপি খাল্লিকান খাচিপ। বলল, 'ধন্যবাদ স্যার, আপনি অনেকটা অগ্রসর হয়েছেন।'

'আসল কাজটাই হয়নি। আপনি আমাকে সাহায্য করুন। এর কাছ থেকে অনেক কথা বের করতে হবে।' আহমদ মুসা বলল।

'অবশ্যই স্যার।' বলল খাল্লিকান খাচিপ।

ঘরের মেঝেয় শুইয়ে দিয়েছিল কর্নেল মোস্তফা মিকাহকে।

'সংজ্ঞা ফিরতে কত সময় লাগে কে জানে?' স্বগত উক্তি করল খাল্লিকান খাচিপ।

'সংজ্ঞা ফিরেছে মি. খাল্লিকান খাচিপ। ও এখন সংজ্ঞাহীনতার ভান করছে।' বলেই আহমদ মুসা পকেট থেকে কলম নিয়ে এর নিবের তীক্ষ্ম মাথা দিয়ে জোরে খোঁচা দিল কর্নেলের পায়ে।

কর্নেলের গোট দেহ স্প্রি-এর মত নেচে উঠল।

'আর নাটক না করে উঠে বসুন কর্নেল।' আহমদ মুসা বলল।

এই সাথে একটা চেয়ারও এগিয়ে দিল আহমদ মুসা কর্নেলের দিকে।

কর্নেল মোস্তফা মিকাহ্ উঠে চেয়ারে বসতে বসতে বলল, 'আপনার এই সাংঘাতিক আচরণের মাশূল আপনাকে দিতে হবে। আমি একজন সেনা অফিসার, মনে রাখবেন।'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'কর্নেল মোস্তফা মিকাহ্ তো সেদিন 'আর্ক অব নূহা' উত্যকায় নিহত হয়েছেন। লাশের ছবিও আমরা দেখাতে পারি। মি. খাল্লিকান খাচিপ ছবিটা তাকে দেখান তো প্লিজ।'

খাল্লিকান খাচিপ ড্রয়ার থেকে একটা ছবি বের করে কর্নেল মোস্তফা মিকাহ্'র চোখের সামনে তুলে ধরে বলল, 'দেখুন কর্নেল মোস্তফার নাম, নাম্বার সবই এখানে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।'

মুখ চুপসে গেল কর্নেল মোস্তফা মিকাহ্'র।

আহমদ মুসার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠেছিল। বলল, 'আপনি 'সোহা' ও 'হোলি আর্ক গ্রুপ'-এর সাথে কতদিন থেকে আছেন?'

'কী বলছেন আপনি? ঐ ধরনের কোন দলকে আমি চিনি না।' বলল কর্নেল মোস্তফা।

আহমদ মুসা পকেট থেকে রিভলভার হাতে নিয়ে বলল, 'দেখুন কর্নেল, আমরা গল্প-গুজব করতে বসিনি। এক কথা আমি দু'বার বলব না।'

থামল আহমদ মুসা। পকেট থেকে এক খণ্ড কাগজ বের করল। ভাঁজ করা কাগজটি খুলল সে। কাগজটি মেলে ধরল সে কর্নেলের সামনে। বলল, 'এই কাগজটি আমি হোলি আর্ক গ্রুপের একজন শীর্ষ পর্যায়ের নেতার পকেট থেকে পেয়েছি। কাগজটি সাদা কাগজের একট শীট। কাগজে মার্ক ডিটেকটর ক্যামিকেল ছিটাবার পর এটা একটা নকশায় পরিণত হয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে পূর্ব আনাতোলিয়ার আর্মেনিয়া সংলগ্ন তিনটি প্রদেশ এবং ছোট-বড় সবগুলো শহরের লোকেশন আছে। সেই সাথে রেড ডট। ২টি থেকে ৫টি পর্যন্ত ডট রয়েছে বিভিন্ন শহরে। আমি জানতে চাই কর্নেল, এই রেড ডটগুলোর অর্থ কী?'

‘বিশ্বাস করুন স্যার, এ ধরনের কাগজ আমি এই প্রথম দেখলাম। আমি জানি না এর অর্থ কী?’ বলল কর্নেল মোস্তফা মিকাহ্।

আহমদ মুসা তার রিভলভার তুলে একটা গুলি করল কর্নেল মোস্তফা মিকাহ-কে লক্ষ্য করে। গুলিটা তার কানের উপরের অংশের কিছুটা ছিঁড়ে নিয়ে মাথা ও কানের মাঝ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ভীষণ আঁৎকে উঠে হাত দিয়ে কান চেপে ধরল কর্নেল মোস্তফা মাকাহ্। ভয়ে পাণ্ডুর হয়ে গেছে তার মুখ।

‘এগুলিটা আমি আপনাকে সাবধান করে দেবার জন্যে করেছি, দ্বিতীয় গুলিটা কিন্তু আপনার মাথা গুঁড়ো করে দেবে।’ আহমদ মুসা বলল।

ভীত কর্নেল তার বিহ্বল চোখ তুলে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘বলছি স্যার। একটা বড় কিছুর পরিকল্পনা হয়েছে স্যার, কিন্তু আমাদের এখনও জানানো হয়নি। বলা হয়েছে, আজ জানানো হবে।’ থামল কর্নেল মোস্তফা।

‘কে জানাবে, কোথায় জানাবে?’ আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

‘ইজদিরের হোলি আরারাত হোটেলে আজ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় একজনের সাথে দেখা হওয়ার কথা। সেখানেই কর্মসূচী আমাদের জানানো হবে বলা হয়েছে। এর বাইরে আমি কিছুই জানি না।’ বলল কর্নেল মোস্তফা মিকাহ্।

‘সেই একজন কে?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘সেটা আমাদের বলা হয়নি স্যার। শুধু আমাদের জানানো হয়েছে হোটেলটির তিন তলায় প্যারাডাইজ অডিটোরিয়ামে গিয়ে বসতে হবে। এটুকুই নির্দেশ ছিল আমার উপর।’ বলল কর্নেল মোস্তফা।

‘আর কারও কি ওখানে যাবার কথা ছিল?’ আহমদ মুসা বলল।

‘এবার কী ব্যবস্থা হয়েছে জানি না স্যার। তবে এর আগে সব কথা, সব ব্রিফিং একাধিক লোককে নিয়ে হয়নি।’ বলল কর্নেল মোস্তফা।

‘আচ্ছা কর্নেল, রেস্টুরেন্টে আমাকে আক্রমণের জন্যে কে আপনাকে বলেছিল?’ আহমদ মুসা বলল।

কর্নেল মোস্তফা একটু দ্বিধা করল। তারপর বলল, ‘মাউন্ট মালিক রেস্টুরেন্টের মালিক মেরারী মালুস।’

‘কী বলেছিলেন তিনি?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘স্যার, আমার রেস্টুরেন্টের একটা টেবিলে আপনাকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। মেজর নাঈম একটা তালিকা দিয়েছেন একজনকে। তার মধ্যে আপনার নাম আছে। আমার মত হচ্ছে আর্ক অব নূহা উপত্যকায় যাদের ইউনিফর্ম পাওয়া গেছে, তাদের তালিকা। মেজর নাঈমকে পরে দেখবেন। কিন্তু তার সাথের লোকটাকে যেতে দিলে আপনার বিপদ হবে স্যার। তার মূল কথা এটাই ছিল।’ বলল কর্নেল মোস্তফা।

‘রেস্টুরেন্ট মালিক এসব কথা জানলেন কী করে?’ আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

‘আমি এটা জানি না স্যার। তিনি তো আমাকে আপনার ফটোও দেখিয়েছেন কম্পিউটারের মাধ্যমে। তা না হলে তো আমি আপনাকে চিনতেই পারতাম না।’ বলল কর্নেল মোস্তফা।

ভ্রূকুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার। তার মানে রেস্টুরেন্টের প্রত্যেক টেবিলের উপর ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার নজর রয়েছে প্রতি টেবিলে ট্রান্সমিটার যার মাধ্যমে শব্দ মনিটর করা হয়। একজন রেস্টুরেন্ট মালিক এই ব্যবস্থা করেছেন কেন। কিন্তু এ-নিয়ে চিন্তা করতে চাইল না আহমদ মুসা। কর্নেল মোস্তফাকে উদ্দেশ্য করে বলল, ‘দেশের প্রতি ভালোবাসা কি আপনার মধ্যে অবশিষ্ট আছে কর্নেল মোস্তফা?’

মুখ নিচু করল কর্নেল মোস্তফা। দু’হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলল সে।

বলল, ‘দেশকে আমি ভালোবাসি স্যার। কিন্তু আমি বিপদে পড়েছি। আমার উপর আমার মা’র নির্দেশ হলো, আমি যেন সোহা’র মেহরান মুসেগ মাসিস যা বলবেন তাকে মায়ের নির্দেশ বলে মনে করি। আমি যা কিছু করেছি তা এই দায় থেকেই করেছি। আমি দেশকে ভালোবাসি স্যার।’

‘আমার একটা কথা কি আজ শুনবেন?’ বলল আহমদ মুসা।

মুখ তুলে তাকাল কর্নেল মোস্তফা আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘অবশ্যই স্যার। আপনি নির্দেশ করুন। আপনি কে আমি জানি না। কিন্তু আপনি যে শাস্তি আমাকে দিয়েছেন, তা আমার প্রাপ্য ছিল।’

'আজ সন্ধ্যায় আপনি ইজদিরের হোলি মাউন্ট আরারাত হোটেলে যাবেন। কি কর্মসূচি দেয় সেটা নেবেন। সে কর্মসূচিটি জানা দেশের জন্যে খুব বেশি প্রয়োজন। আমিও সেখানে আপনার আশে-পাশেই থাকব। আপনি হোটেল থেকে বেরিয়ে বিপরীত দিকের সিনাগগের পাশেই থাকব। আপনি হোটেল থেকে বেরিয়ে বিপরীত দিকের সিনাগগের পাশে রাস্তার কিনারে আপনার গাড়ি দাঁড় করিয়ে ইঞ্জিন পরীক্ষা করতে শুরু করবেন। এসময় পেছন দিক থেকে একটা লাল গাড়ি আসবে। আপনি সেই গাড়িটাকে ফলো করবেন।' থামল আহমদ মুসা।

একটু থেমেই আবার বলল, 'আমি আপনাকে ধরে নিয়ে এসেছিলাম, এই ব্যপারে কেউ জানতে চাইলে আপনি এ কথা বলবেন: আপনি আমাকে গুলি করতে গিয়েছিলেন, এই জন্যেই আমি আপনাকে ধরে এনেছিলাম। পরে প্রশাসনের মধ্যস্থতায় সবকিছুর সুরাহা হয়েছে। আর আপনি যেহেতু একজন সেনা অফিসার তাই আপনাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।'

'ঠিক আছে স্যার, আমি এটাই বলব।' বলল কর্নেল মোস্তফা।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'ধন্যবাদ কর্নেল, হয়তো সন্ধ্যার পরে কোথাও আমাদের দেখা হতে পারে। আমি চলি।'

'অবশ্যই স্যার। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।' বলল কর্নেল মোস্তফা মিকাহ্।

সবাইকে সালাম দিয়ে বেরিয়ে এল আহমদ মুসা।

'কর্নেল মি. মোস্তফা আপনি একটু বসুন, আমি ওকে বিদায় দিয়ে আসছি। আমিই আপনাকে পৌঁছে দেব।'

বলে ডিপি খাল্লিকান খাচিপ আহমদ মুসার সাথে বেরিয়ে এল। বলল আহমদ মুসাকে, 'মি. আবু আহমদ, আপনি কি নিশ্চিত, কর্নেল মোস্তফা আপনার কথা শুনবে? যদি বিষয়টা ফাঁস করে দেয় সে ও-পক্ষকে?'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'মানুষ চিনতে আমার ভুল না হলে আমি মনে করি তাকে বিশ্বাস করা যায়। সত্যিই সে ইহুদি মায়ের সন্তান। মা তাকে ঐ কাজে বাধ্য করতে পারে।'

‘ধন্যবাদ আবু আহমদ। আপনার কথা সত্যি হোক। তাহলে স্যার আবার দেখা হবে। আস্-সালামু ‘আলাইকুম।’

আহমদ মুসা ‘ওয়া ‘আলাইকুম আস্-সালাম’ বলে পুলিশ স্টেশন থেকে বেরিয়ে এল।

আহমদ মুসা একজন তুর্কি ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে ইজদিরের সেই হোলি আরারাত হোটেলের এক পাশের একটা টেবিলে বসে মাঝে মাঝে কফির কাটে চুমুক দিচ্ছে, আর সামনে ছড়ানো কাগজে চোখ রেখে হিসাব-নিকাশে ব্যস্ত। যেন মনোযোগ সহকারে সে তার ব্যবসায়ের কোন একটা জটিল হিসাব মেলাচ্ছে। চোখ দু’টি কাগজের উপর ব্যস্ত দেখা গেলেও রেস্টুরেন্টের দুই গেটের উপর নজরদারী ঠিক রেখেছে।

হাতঘড়ির দিকে তাকাল আহমদ মুসা। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা বাজতে আর ৫ মিনিট বাকি। এখনও দেখা নেই কর্নেল মোস্তফা মিকাহ্’র। সে আসার আগেই হোটেলে ঢুকে গেছে তা পারে না। আহমদ মুসা পাশের এক মসজিদে মিগরিবের পড়েই এসে হোটেলে ঢুকেছে। তুরস্কে মাগরিবের নামাযের পরের সময়কেই সন্ধ্যা বলে। সন্ধ্যাতেই কর্নেল মোস্তফা মিকাহ্’র হোটেলে আসার কথা। সুতরাং সে সন্ধ্যার আগে হোটেলে আসেনি এটা নিশ্চিত।

সে হোটেলে ঢোকার আগেই হোটেলের চারদিকটা দেখে নিয়েছে, হোটেলে ঢোকার ও বেরুবার তৃতীয় কোন গেট নেই। তার সামনের দুই গেট দিয়ে ঢুকে কাউন্টারের ভেতরের প্রান্তের পাশ দিয়ে একটা সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে। কর্নেল মোস্তফা মিকাহ্’কে নিশ্চয় তিন তলায় উঠতে হলে এই সিঁড়ি দিয়েই উঠতে হবে।

সাড়ে সাতটা বাজল। তার আরও কয়েক মিনিট পরে আহমদ মুসা দেখতে পেল, কর্নেল মোস্তফা মিকাহ্ হোটেলে প্রবেশ করল। তার পরনে কালো ট্রাউজারের উপর কালো জ্যাকেট, মাথায় একট ইংলিশ কালো হ্যাট।

আহমদ মুসা দেখল, কর্নেল মোস্তফা কাউন্টারে কিছু বলল, তারপর সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল।

আহমদ মুসা ভাবল, উপরে কর্নেলের কতটা সময় লাগতে পারে। নিশ্চয় আধাঘন্টার বেশি নয়।

কিন্তু বিশ মিনিট পরেই কর্নেল উপর থেকে নেমে এল। তার মুখটা বিষণ্ন।

আহমদ মুসা ইতমধ্যেই হিসাবের কাগজপত্র গুটিয়ে নিয়ে নাস্তা করছিল।

কর্নেল মোস্তফা বেরিয়ে গেল হোটেল থেকে।

আরও মিনিট দুয়েক পরে আহমদ মুসার নাস্তা শেষ হলো।

সব বিল চুকিয়ে আহমদ মুসাও বেরিয়ে এল হোটেল থেকে। আহমদ মুসা তার লাল গাড়ি নিয়ে এগোচ্ছিল। সিনাগগের কাছাকাছি পৌঁছে দেখল রাস্তার কেনারে একটা গাড়ি দাঁড় করানো রয়েছে। গাড়িটার ফ্রন্ট টপ তুলে একজন গাড়ির ইঞ্জিন পরীক্ষা করছে। আহমদ মুসা নিশ্চিত হলো রোকটি কর্নেল মোস্তফাই।

আহমদ মুসা একবার হর্ন বাজিয়ে কর্নেল মোস্তফার গাড়ির পাশ দিয়ে সামনে এগোলো।

সিনাগগের এলাকা পার হবার আগেই দেখল কর্নেল মোস্তফার গাড়ি তার পেছনে চলতে শুরু করেছে।

ইজদির শহর পেরিয়ে আরও মাইল দশেক চলার পর একটা সরাইখানায় গাড়ি দাঁড় করাল আহমদ মুসা।

কর্নেল মোস্তফার গাড়িও দাঁড়াল।

আহমদ মুসা পেছনে তাকিয়ে আর কোন গাড়ি দেখল না। কেউ তাদের ফলো করেনি, নিশ্চিত হলো আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা সরাইখানার দিকে এগোলো।

কর্নেল মোস্তফাও।

আহমদ মুসা সরাইখানার রেস্টুরেন্টে না ঢুকে অন্য দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল বিশ্রাম কক্ষে যাবার জন্যে।

তুরস্কে সরাইখানার বিশ্রাম কক্ষ দুই ধরনের। এক ধরনের আছে ফ্রী। এখানে যে কেউ বিনা পয়সায় তিন দিন পর্যন্ত অবস্থান করতে পারে।

আরেক ধরনের আছে যার জন্যে ডোনেশন পে করতে হয়। যে রুম সে চায় তার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ একটা ডোনেশন পে করলেই চাবি বেরিয়ে আসে। সে চাবি দিয়ে ঘর খুলে তিন দিন সে কক্ষে থাকা যায়।

আহমদ মুসা ডোনেশন পে করে একটা কক্ষে প্রবেশ করল। পেছন পেছন আসা কর্নেলকে ডেকে নিল।

কর্নেল ভেতরে প্রবেশ করেই বলল, 'স্যার, খবর ভালো নয়।'

'ভলো নয়, তা আপনার মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছি। বলুন খারাপ খবরটা কী?' আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

স্যার, কেউ আসেনি। কারও সাথেই দেখা হয়নি। কিছুক্ষণ বসার পর একটা টেলিফোন পাই। টেলিফোনটি আমার চেয়ারের পাশেই টিপয়ে রাখা ছিল। টেলিফোনে একজন বলে: 'আপনার সামনে মঞ্চের টেবিলে একটা মেসেজ আছে নিয়ে যান।' আমি গিয়ে মেসেজটা নেই।'

বলে কর্নেল মোস্তফা মিকাহ্ এক টুকরো কাগজ তুলে দিল আহমদ মুসার হাতে।

আহমদ মুসা চোখ বুলাল কাগজের টুকরোটির উপর। তাতে লিখা: 'কর্মসূচি স্থগিত করা হয়েছে।'

ভ্রূ-কুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার। বলল, 'কর্নেল, আমার ওখান থেকে মানে পুলিশ স্টেশন থেকে আসার পর আপনার কার কার সাথে দেখা বা কথা হয়েছে, আপনার বাড়ির লোকরা ছাড়া?'

কর্নেল একটু ভাবল। বলল, 'আমি বাসা থেকে বের হইনি। অফিস থেকে ১২ ঘন্টার ছুটিতে আছি। বাইরের কারও সাথে দেখা বা কথা হয়নি। শুধু একবার টেলিফোন করেছিলেন মাউন্ট মালিক রেস্টুরেন্টে'র ওমার।'

আনন্দ প্রকাশ পেল আহমদ মুসার চোখে মুখে। বলল দ্রুতকণ্ঠে, 'কী বলেছিলেন তিনি?'

'তিনি বলেছিলেন, আপনার কোন যে বিপদ হয়নি, এজন্যে আল্লাহ্'র হাজার শোকর। আমি উদ্বিগ্ন ছিলাম, খবরা-খবরও নিয়েছি। ঐ লোকরা মনে হচ্ছে বিপজ্জনক। ছেড়ে দেয়ার মধ্যে কোন কৌশল থাকতে পারে। আমি মনে করি,

আপনি কয়েকদিনের ছুটিতে যান। আমি তাকে বলেছিলাম, ঠিক আছে দেখছি আমি।' কর্নেল মোস্তফা মিকাহ্ বলল।

'উনি আপনাকে এধরনের পরামর্শ দিলেন কেন? তাঁর সাথে আপনার আর কোন সম্পর্ক আছে?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'না, নেই। এমনিতেই উনি সাংঘাতিক অভিভাবকের ভূমিকা পালন করেন। মাঝে মাঝে মনে হয় আমাদের ব্যাপারে তিনি অনেক খবর রাখেন। সরকারের নানা রকম এজেন্সি আছে, কোন এজেন্সির সাথে তিনি আছেন কিনা জানি না।' বলল কর্নেল মোস্তফা।

'আপনি যদি শোনেন, তার রেস্টুরেন্টের প্রতিটি টেবিলেই শর্ট সার্কিট ক্যামেরার নজরদারী আছে এবং প্রতি টেবিলের কথা শোনার জন্যে ট্রান্সমিটার বসানো আছে, তাহলে কি বিশ্বাস করবেন?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

বিস্ময় ফুটে উঠল কর্নেল মোস্তফার চোখে মুখে। বলল, 'বিশ্বাস করব স্যার। কারণ আমার ব্যাপারে আপনাদের আলোচনা কিভাবে সে শুনল এবং আপনার ফটো কিভাবে সে আমার ই-মেইলে পাঠাল, এই প্রশ্নগুলোর সমাধান হয় আপনার কথা বিশ্বাস করলেই।'

'রেস্টুরেন্টটির মালিক মানে মি. মালিক মেরারী মালুস কোথায় থাকেন?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'আমি সেটা জানি না, স্যার।' মাঝে মাঝে উনি রেস্টুরেন্টের উপর তলায় থাকেন দেখেছি।' বলল কর্নেল মোস্তফা।

'এখন তাকে কোথায় পাওয়া যাবে?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

একটু ভাবল কর্নেল মোস্তফা। বলল, 'রাত ১১টায় রেস্টুরেন্ট বন্ধ হয়, তার আগে একবার তিনি রেস্টুরেন্টে আসেন। আমার মনে হয় এখন রেস্টুরেন্টেই পাওয়া যাবে তাকে।'

'আপনি আমার সাথে থাকবেন?' বলল আহমদ মুসা।

'কোথায় কিভাবে?' জিজ্ঞাসা কর্নেল মোস্তফার।

'আমি মি. মালিক মেরারী মালুসকে কিডন্যাপ করতে চাই। আপনি আমার সাথে থাকবেন।' আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসা কর্নেল মোস্তফাকে সাথে রাখতে চায়, কারণ তার মিশন ফেল হওয়ার কোন অবকাশই সে রাখতে চায় না। কর্নেল মোস্তফা মিকাহ্-কে আহমদ মুসা বিশ্বাস করে, কিন্তু তবু সামান্য ঝুঁকিও সে নিতে চায় না। এজন্যেই সে কর্নেল মোস্তফাকে সাথে রাখতে চায় যাতে রেস্টুরেন্টের কর্তা মি. মালিক বিষয়টি জানার কোন সুযোগই যেন না পায়।

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই কর্নেল মোস্তফা বলল, 'আপনি সাথে রাখলে আমি গৌরব বোধ করব স্যার।'

আহমদ মুসা তার দিকে চোখ তুলে তাকাল। বলল, 'ধন্যবাদ।'

দু'জনেই সরাইখানা থেকে বেরিয়ে এল।

কর্নেল মোস্তফা মিকাহ্ তার গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিল।

আহমদ মুসা তাকে বলল, 'ও গাড়িতে নয়। আমার গাড়িতে আসুন। ও গাড়ি ওখানেই থাকবে।'

বলে আহমদ মুসা তার গাড়ির ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল। পাশে উঠে বসল কর্নেল মোস্তফা।

ঝড়ের বেগে এগিয়ে চলল গাড়ি। রাত দশটায় মাউন্ট মালিক রেস্টুরেন্টের সামনে এসে পৌঁছল গাড়ি।

আহমদ মুসা গাড়ি দাঁড় করিয়ে গাড়ি থেকে নামার আগে কর্নেল মোস্তফার দিকে চেয়ে বলল, 'কর্নেল, আপনাকে বিষণ্ন দেখাচ্ছে টেলিফোনটি পাওয়ার পর থেকেই। টেলিফোন কার ছিল?'

কর্নেল মোস্তফা আহমদ মুসার দিকে তাকাল। বলল, 'স্যার, আমার মায়ের টেলিফোন।'

'ও, আচ্ছা।' বলে আর একবার ভালো করে তাকাল কর্নেল মোস্তফার দিকে।

আহমদ মুসা গাড়ি থেকে নামল। নামল কর্নেল মোস্তফাও।

আহমদ মুসা জ্যাকেটের পকেটে দু'হাত ঢুকিয়ে এগোলো রেস্টুরেন্টের দিকে। রেস্টুরেন্টের গেটে ছিল একজন নিরাপত্তা প্রহরী।

'মালিক সাহেব কি রেস্টুরেন্টে আছেন?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'আছেন স্যার।' উত্তর দিল নিরাপত্তার জন্যে দরজায় দাঁড়ানো লোকটি।

আহমদ মুসা পেছন ফিরে তাকিয়ে কর্নেল মোস্তফাকে বলল, 'আপনি দরজায় দাঁড়ান।'

বলেই আহমদ মুসা রেস্টুরেন্টে ঢুকে গেল। রেস্টুরেন্টে খদ্দের তেমন নেই। আর্মি ক্যাম্পের খদ্দের এ সময় থাকে না।

ক্যাশ কাউন্টারে কম্পিউটারের সামনে বসে আছেন মি. মালিক মেরারী মালুস। তার গায়ে আগের মতই লাল জ্যাকেট এবং লাল ফেজ ধরনের টুপি। টুপিটা একটু বিশেষ ধরনের। টুপির বেজটা ইলাস্টিক। এই ইলাস্টিক মাথাকে কামড়ে ধরে রাখে। আর পরনে তার ধবধবে সাদা ট্রাউজার।

আহমদ মুসা কাউন্টারের মাঝ পথে যেতেই মালিক মেরারী মালুস তাকে দেখতে পেয়েছে। সংগে সংগেই সে উঠে দাঁড়িয়েছে। তার হাতে রিভলভার। উঠে দাঁড়িয়েই সে গুলি করেছে আহমদ মুসাকে।

আহমদ মুসা প্রস্তুত হয়েই প্রবেশ করেছিল। মালিক মেরারী মালুস রিভলভার নিয়ে উঠে দাঁড়াবার সাথে-সাথেই আহমদ মুসার হাত বেরিয়ে এসেছিল পকেট থেকে রিভলভার সমেত।

মালিক মেরারী মালুসের হাত টার্গেটে উঠে আসার আগেই উঠে গিয়েছিল আহমদ মুসার হাত। কিন্তু আহমদ মুসা মারতে চায়নি মালিক মেরারী মালুসকে। তাই আহমদ মুসা মুহূর্তকাল অপেক্ষা করেছিল মালিক মেরারী মালুসের হাত উপরে উঠে আসার জন্যে।

মালিক মেরারী মালুসের হাত টার্গেটে উঠে এসে স্থির হবার সংগে সংগেই আহমদ মুসা ট্রিগার টিপেছিল।

আহমদ মুসার রিভলভারের গুলি যখন মালিক মেরারী মালুসের হাতে আঘাত করল। তখন তার তর্জনিও চেপে বসেছিল রিভলভারের ট্রিগারে। হাতটা তার কেঁপে গিয়েছিল। তার রিভলভার থেকে গুলি ঠিকই বেরুল, কিন্তু তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গিয়ে আঘাত করল রেস্টুরেন্টের গেটে দাঁড়ানো একজন নিরাপত্তা কর্মীকে।

অদ্ভুত নার্ভের অধিকারী মালিক মেরারী মালুস রিভলভার ছেড়ে দেয়নি হাত আহত হলেও। তার বাম হাত দ্রুত এসে আহত ডান হাত থেকে রিভলভার নিয়ে দ্বিতীয় গুলি করতে যাচ্ছিল আহমদ মুসাকে।

আহমদ মুসা মালিক মেরারী মালুসের বাম হাতের জন্যে অপেক্ষা করছিল। কারণ মালিক মেরারী মালুসদের জীবন্ত ধরতে হলে তাদের দুই হাত অকেজো করে তাদের পটাসিয়াম সায়ানাইড খাওয়ার পথ বন্ধ করতে হবে, এটা আহমদ মুসা ঠেকে ঠেকে বুঝেছে।

আহমদ মুসার দ্বিতীয় গুলিটা মালিক মেরারী মালুসের হাতের আঙুলগুলো গুঁড়ো করে দিয়ে হাতে ঢুকে গেল।

এবার রিভলভার পড়ে গেল তার হাত থকে।

এই সময়ই একটা গুলি এসে লাগল আহমদ মুসার হাতে। গুলিটা আহমদ মুসার কনুইয়ের নিচ থেকে চামড়া চিরে কব্জির কিছু অংশ ছিঁড়ে নিয়ে গেল।

তবুও আহমদ মুসার হাত থেকে রিভলভারে পড়ল না। তবে হাতটা নেমে গেল নিচে।

আহমদ মুসার মনোযোগ তখন এদিকে নয়, তার মনোযোগের লক্ষ্য নিবদ্ধ পেছন থেকে আসা গুলির শব্দের উৎসের প্রতি। বিদ্যুত বেগে আহমদ মুসার বাম হাত রিভলভার সমেত পকেট থেকে উঠে এসে ডান কাঁধের উপর দিয়ে শব্দের উৎস লক্ষ্যে আঘাত করল।

পেছন থেকে আসা গুলির শব্দের রেশ বাতাসে মেলাবার আগেই আহমদ মুসার গুলি নিক্ষিপ্ত হলো।

গুলি করেই ফিরে তাকাল আহমদ মুসা। দেখল, মাটিতে পড়ে বুক চেপে ধরে কাতরাচ্ছে কর্নেল মোস্তফা মিকাহ্।

বিস্মিত আহমদ মুসা কর্নেলের দিকে যাবার জন্যে পা বাড়াবার আগেই গেছনে ফিরে কাউন্টারের দিকে তাকাল। দেখল, মালিক মেরারী মালুস আহত। ঝুলন্ত দুই হাত নিয়ে দৌড়ে উপরে উঠে যাচ্ছে।

'উপর দিয়ে পালাবার কোন পথ তাদের আছে?' প্রশ্নটা মাথায় আসতেই আহমদ মুসা তার পালানো বন্ধ করার জন্যে তার দুই পায়ে দু'টি গুলি করল।

মালিক মেরারী সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে নিচে পড়ে গেল।

আহমদ মুসা চারিদিকে চাইল। দেখল, কাউন্টারের ক্যাশিয়ার, রেস্টুরেন্টের বয়-বেয়ারা এবং কয়েকজন খদ্দের পাথরের মত বসে আছে। ভীত সন্ত্রস্ত তাদের চেহারা।

'যে যেখানে আছেন আপনারা সেখানেই বসে থাকবেন, কেউ অন্যথা করলে তার অবস্থা মালিক মেরারীর মত হবে।'

বলে আহমদ মুসা ছুটে গিয়ে মালিক মেরারী মালুসের কম্পিউটার থেকে হার্ড ডিস্কটা বের করে নিয়ে পকেটে পুরে মালিক মেরারী মালুসকে পাঁজকোলা করে নিয়ে রেস্টুরেন্টের গেটে এসে তাকে রেখে গিয়ে বসল কর্নেল মোস্তফা মিকাহ্'র কাছে। কর্নেল মোস্তফা কাতরাচ্ছে তখনও। তবে জীবনী শক্তি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

আহমদ মুসা তার পাশে বসে তার মাথা তুলে নিয়ে বলল, 'আপনি এটা করলেন কেন? আমি সত্যিই আপনাকে বিশ্বাস করেছিলাম।'

'ওদের সহযোগিতার জন্য আমার মায়ের নির্দেশ আমি পালন করেছি স্যার। জানি না, মা বড় না দেশ বড়। হয়তো দেশই বড়, কিন্তু মা আমাকে জন্ম দিয়েছেন, পালন করেছেন। তাঁর নির্দেশ আমি ফেলতে পারিনি স্যার।'

বলে একটা ঢোক গিলেই আবার ক্ষীণ স্বরে বলল, 'স্যার, আমি দেশকেও ভালোবাসি। সেকারণেই আমি আপনাকে মারতে চাইনি। হাতে গুলি করেছিলাম। আমি চেয়েছিলাম মি. মালিক পালাতে পারুক।'

এরই মধ্যে পুলিশের গাড়ি এসে গেল। সামনের গাড়ি থেকে ডিপি খাল্লিকান খাচিপ নামল।

খাল্লিকান আহমদ মুসার দিকে ছুটে আসতে আসতে বলল, 'আপনি ঠিক আছেন স্যার?'

'ভালো, মি. খাল্লিকান, আপনি এখুনি কর্নেলকে হাসপাতালে নেবার ব্যবস্থা করুন। আর মি. মালিক মেরারী মালুসকে পুলিশ অফিসে নিয়ে চলুন, আর সেখানে একজন ডাক্তারকে ডাকুন।' বলল আহমদ মুসা।

'স্যার, আমি মরতে চাই। বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহী হয়ে বাঁচতে চাই না। আমাকে দয়া করে হাসপাতালে নেবেন না।' ক্ষীণ স্বরে আকুতিমাখা কণ্ঠে বলল কর্নেল মোস্তফা।

'আপনার বিচার আপনি করবেন না কর্নেল। আপনার অসহায় অবস্থার কথা আমি জানি। ঐ রকম মা হলে যে কোন কারো বিপদ আছে।' আহমদ মুসা বলল।

দু'জন পুলিশ এসে ধরাধরি করে কর্নেল মোস্তফাকে গাড়িতে তুলল।

মালিক মেরারী মালুসকে আহমদ মুসা নিজের গাড়িতে নিল।

দু'টি গাড়ি হাসপাতালের দিকে আর অবশিষ্ট গাড়ি চলল পুলিশ অফিসের দিকে। কিছু পুলিশ থাকল রেস্টুরেন্টের পাহারায়।

পুলিশ অফিসে পৌঁছে আহমদ মুসা ডাক্তারকে বলল, 'মি. মালিক আপনার হেফাজতে থাকবেন এক ঘন্টা। এ সময় আমি আপনার ওখানে উপস্থিত থাকবো।'

'তার দরকার নেই স্যার, দু'জন পুলিশ দেব, তারা পাহারা দেবে।' বলল খাল্লিকান খাচিপ।

'না মি. অফিসার। মি. মালিকের মত সম্মানী ব্যক্তির চিকিৎসায় আমি হাজির থাকতে চাই।' আহমদ মুসা বলল।

হাসল ডিপি খাল্লিকান খাচিপ। বলল, 'আপনার কথাই ঠিক স্যার। পুলিশের সিপাইরা তাঁর সম্মানের জন্যে যথেষ্ট নয়। আমি থাকছি আপনার সাথে।'

ঠিক এক ঘন্টা পরেই ডাক্তার তার কাজ শেষে বেরিয়ে গেল।

মালিক মেরারী মালুসকে ভিন্ন একটা বেডে সরিয়ে দিয়ে অপারেশন টেবিলটি নার্সরা সরিয়ে নিয়ে গেল।

আহমদ মুসা মুখোমুখি হলো মালিক মেরারী মালুসের। ডিপি খাল্লিকান খাচিপ পাশে এসে বসল।

'মি. মালিক, পুলিশ কিন্তু আপনাকে গ্রেফতার করেনি। সুতরাং আপনি মিসিং একজন মানুষ। এটা করা হয়েছে দুনিয়া থেকে আপনাকে মিসিং করার জন্যে, যদি সত্য কথা না বলেন তবেই।' আহমদ মুসা বলল।

মালিক মেরারী মালুস ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে থাকল। কোন কথা বলল না।

আহমদ মুসা পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে মালিকের সামনে তুলে ধরে বলল, 'পূর্ব আনাতোলিয়ার বাভিন্ন শহরে এই লাল ডটগুলোর অর্থ কী, মি. মালিক?'

মালিক মেরারী মালুস কাগজটা দেখে একটু যেন চমকে উঠেছিল। কিন্তু মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল। কিছুই বলল না।

জ্বলে উঠল আহমদ মুসার চোখ। কিন্তু পরক্ষণেই ঠাণ্ডা হয়ে গেল তার চেহারা।

আহমদ মুসা তাকাল খাল্লিকান খাচিপের দিকে। বলল, 'প্লিজ আপনি একটা কম্পিউটার আনতে বলুন এখানে। দেখি মি. মালিক কথা না বললেও তার কম্পিটার কথা বলে কিনা।'

ডিপি খাল্লিকান খাচিপ ইন্টারকমে নির্দেশ দিল কম্পিউটার সেকশন থেকে সেকশনের রিসার্চ ইঞ্জিনিয়ারকে একটা কম্পিউটার নিয়ে এখানে আসতে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই একজন তরুণ কম্পিউটার এনে সেট করল।

খাল্লিকান খাচিপ তরুণকে দেখিয়ে বলল, 'সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার এই ছেলেটি আমাদের কম্পিউটার উইং দেখাশুনা করে। সে আপনাকে সাহায্য করতে পারবে।'

'ধন্যবাদ' বলে আহমদ মুসা পকেট থেকে কম্পিউটারের একটা হার্ড ডিস্ক বের করে ছেলেটির হাতে দিয়ে বলল, 'এই হার্ড ডিস্কটি সেট করে ফাইলগুলো ওপেন করো।'

'সিওর স্যার!' বলে তরুণটি কাজে লেগে গেল।

আহমদ মুসা, খল্লিকান খাচিপ, এমনকি মালিক মেরারী মালুসও তাকিয়ে আছে কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে। কিছুক্ষণ কাজ করার পর ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটি আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্যার, মাত্র তিনটা উইনডো এবং তিনটা ফাইল দেখা যাচ্ছে। একটি ফাইল রেস্টুরেন্টের হিসাব-নিকাশ এবং দৈনন্দিন জমা-খরচ। দ্বিতীয় ফাইল একটি আঙুর বাগানের বিনিয়োগ, উৎপাদন ও বিক্রয়

বিষয়ক। আর তৃতীয় ফাইলটা বিভিন্ন ব্যাংকের একটা পার্সোনাল একাউন্টের বিবরণী। এছাড়া আর কিছু নেই, সবটাই ফাঁকা।'

''সবটাই ফাঁকা' না 'অন্ধকার'?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'স্যরি স্যার, অন্ধকার বলাই এ্যাপ্রোপ্রিয়েট। কারণ অবশিষ্টাংশের কোন দৃশ্যপট আমাদের সামনে নেই।'

'আচ্ছা বলত, এমন কি হতে পারে যে, এই হার্ড ডিস্কে আরও উইন্ডো আছে, ফাইল আছে, কিন্তু তুমি দেখতে পাচ্ছ না?' বলল আহমদ মুসা।

'এমনটা স্বাভাবিক নয় স্যার। গোপন ফাইল থাকলেও তার কোন না কোন একটা নাম পাওয়া যাবে। সে ফাইল খোলা যাবে না, কিন্তু সে ফাইলের নাম বা কোন সংকেত হার্ড ডিস্কে পাওয়া যাবে অবশ্যই।' ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটি বলল।

'আচ্ছা হার্ড ডিস্কের কোন অংশ ডিজাবল করা যায় কিনা সাময়িক ভাবে?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'সেটা করা যেতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে তার জন্যে একটা প্রোগ্রাম বা ফাইল থাকবে। সে রকম কিছু দেখা যাচ্ছে না।' বলল ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটি।

আহমদ মুসা কোন কথা বলল না। ভাবনার একটা ছাপ ফুটে উঠল তার চোখে-মুখে।

চেয়ারে সোজা হয়ে বসল আহমদ মুসা।

বলল, 'ইঞ্জিনিয়ার, তুমি কম্পিউটার থেকে ডিস্ক খুলে নাও।'

ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটা কম্পিউটার থেকে ডিস্ক খুলে নিল।

'ইঞ্জিনিয়ার, তুমি দেখ ডিস্কের কোন অংশে কোথাও টাচ বাটন আছে কিনা যা অন/অফ- এর কাজে ব্যবহার হতে পারে।' বলল আহমদ মুসা তরুণ ইঞ্জিনিয়ারকে লক্ষ্য করে।

অনেকটা সময় ধরে পরীক্ষা করল ডিস্কটিকে তরুণ ইঞ্জিনিয়ার। এক সময় তার চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল আনন্দে। বলল সে আনন্দের সাথে, 'ক্যামোফ্লেজড একটা টাচ বাটন পাওয়া গেছে। মনে হয় এটাই সেই বাটন যা আপনি খুঁজছেন।'

‘ধন্যবাদ ইঞ্জিনিয়ার। বাটনটির রং কী ইঞ্জিনিয়ার?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘ধুসর।’ বলল ইঞ্জিনিয়ার।

‘ধুসর মানে ডাস্টি, ক্লাউডি। এটা নেতিবাচক শব্দ। অর্থাৎ কোন কিছু বন্ধ বা অফ থাকার ইংগিতবাহী। এখন বাটনটাকে টাচ বা প্রেস করে দেখতো বাটনটা স্বচ্ছ হয়ে উঠে কিনা।’ আহমদ মুসা বলল।

ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটি বাটনটি টাচ করেই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। বলল, ‘স্যার, বাটনটি স্বচ্ছ-ট্রান্সপারেন্ট হয়ে উঠেছে।’

‘আলহামদুলিল্লাহ্‌। এখন ইঞ্জিনিয়ার তুমি ডিস্কটি আবার কম্পিউটারে সেট করো।’ আহমদ মুসা বলল।

ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটি হার্ড ডিস্কটি কম্পিউটারে সেট করেই সোৎসাহে বলে উঠল, ‘স্যার, নতুন উইন্ডো ওপেন হয়েছে। উইন্ডোটির নাম স্যার ‘আশার’ (Asher)।’

‘আশার (Asher)? ওটা হিব্রু শব্দ, অর্থ ‘ভাগ্যবান’ বা ‘আশীর্বাদপ্রাপ্ত’।’ আহমদ মুসা বলল।

কিন্তু উইন্ডো ওপেন করতে গিয়ে ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটি মন খারাপ করে বলল, ‘উইন্ডো ওপেনের জন্যে কম্পিউটার ‘পাসওয়ার্ড’ চাচ্ছে।’

আহমদ মুসা তাকাল মালিক মেরারী মালুসের দিকে। বলল, ‘তোমার গোপন উইন্ডো আমরা আবিষ্কার করেছি। এখন এর ‘পাসওয়ার্ডটা’ বল।’

মালিক মেরারী আগের মতই নিরব রইল। কম্পিউটারের দিক থেকে চোখটা সে নিজের দিকে ফিরিয়ে নিল।

আবারও আহমদ মুসার চোখটা জ্বলে উঠল। বলল, ‘তোমাকে কথা বলাতে জানি মি. মালিক। কিন্তু তুমি আহত। একজন আহতের উপর আঘাত করার মত নির্দয় আমরা নই। কিন্তু আহতের আচরণ যদি আগ্রাসী, বেয়াদব বা বিদ্রোহাত্মক হয়ে ওঠে, তাহলে কিন্তু সে আর আহতের মর্যাদা পাবে না।’

বলেই আহমদ মুসা তাকাল খাল্লিকান খাচিপের দিকে। বলল, ‘ভাবুন তো পাসওয়ার্ডটা ওরা কী রাখতে পারে।’

‘বড় কঠিন বিষয় মি. আবু আহমদ। দেখছি মানুষ হিসাবেও ওরা ভীষণ জটিল। আমরা ওকে মুসলমান বলেই জানতাম। তার রেস্টুরেন্ট, বগান সর্বত্রই আরবী ও কুরানিক কোটেশনের ছড়াছড়ি। এখন দেখছি বেটা পাঁড় ইহুদি।’ বলল ডিপি খাল্লিকান খাচিপ।

‘আপনারা খেয়াল করেননি অফিসার। ওর নামের ‘মালিক’ শব্দটাই শুধু আরবী। পরবর্তী ‘মেরারী’ ও ‘মালুস’ দুই শব্দই হিব্রু। যাক এবিষয়, এখন আমাদের দরকার আশার ইউন্ডোর ‘পাসওয়ার্ড’।’

বলে আহমদ মুসা চেয়ারে গা এলিয়ে দিল। চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ ভাবল। কয়েক মুহূর্ত পর চোখ খুলে মালিক মেরারীর দিকে চেয়ে বলল, ‘আপনি উইন্ডো বা ফাইলের নাম রেখেছেন ভাগ্যবান বা আশীর্বাদপ্রাপ্ত। তাহলে পাসওয়ার্ডটা হয় নিশ্চয় এর সাথে রিলেটেড এবং সেটা নাম বাচক হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আচ্ছা, সে নাম বাচক শব্দ আপনাদের দলের নাম নয় তো!’

বলে তাকাল আহমদ মুসা ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটার দিকে। বলল, ‘তুমি পাসওয়ার্ডের জায়গায় টাইপ কর ‘SOHA-HAG’। এটা ওদের দুই সংগঠনের যৌথ নাম। ক্লিক করে দেখ কী রেজাল্ট আসে।’

ছেলেটি ক্লিক্ করে হতাশ চোখে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘স্যার, কম্পিউটার রিজেক্ট করছে।’

‘কী আর করা যাবে। ও. কে.।’

বলে আহমদ মুসা তাকাল মালিকের দিকে। বলল, ‘তোমাদের কাছে আশীর্বাদপ্রাপ্ত কী, আর্মেনিয়া না ইয়েরেভেন? আপনারা বলে থাকেন, বন্যার পানি নেমে গেলে হযরত নূহ আ. ‘কিস্তি’ থেকে প্রথমে আর্মেনিয়ার রাজধানী ইয়েরেভেনকে দেখতে পান। তাই ইয়েরেভেন আপনাদের কাছে বিশেষ আশীর্বাদপুষ্ট বলেই বিশেষ আনন্দ ও বিজয়ের প্রতীক।’

মালিক মেরারী মেলুসের চোখে-মুখে কোন প্রতিক্রিয়া নেই, তাই দুই চোখও সে বন্ধ রেখেছে।

আহমদ মুসার মুখে হাসি ফুটে উঠল। করুণার হাসি। বলল ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটাকে, ‘তুমি ইয়েরেভেন টাইপ কর। দেখ কম্পিউটার কী বলে।’

ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটি 'ইয়েরেভেন' টাইপ করে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। কম্পিউটার প্রত্যাখ্যান করেছে।

আহমদ মুসা ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটার মুখ দেখেই বুঝল, তাদের এ চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে। বলল, 'অভিজ্ঞতা তোমার কম ইঞ্জিনিয়ার। তাই উদ্বিগ্ন হচ্ছো। উদ্বেগের কিছু নেই। রক্ত-মাংসের জীবন্ত কম্পিউটার তো আমাদের হাতেই রয়েছে। এ কম্পিউটার থেকে কথা বের করতে 'পাসওয়ার্ড' লাগবে না, লাগবে শয়তানদের ঠিক করার যন্ত্র।'

কথা শেষ করেই আবার ফিরল মালিক মেরারীর দিকে। বলল, 'পূর্ব আনাতোলিয়ায় আপনাদের কাছে সবচেয়ে আশীর্বাদ প্রাপ্ত কী? প্লাবনের পর নূহ আ.- এর কিস্তি নোঙর করেছিল মাউন্ট আরারাতে। এই মাউন্ট আরারাতেই হযরত নূহ আ. পা রেখেছিলেন কিস্তি থেকে নামার পর। আর্মেনিয়া, ইয়েরেভেন নয়, মাউন্ট আরারাতই তাহলে আপনাদের কাছে সবচেয়ে বেশি আশীর্বাদপ্রাপ্ত, পবিত্র স্থান। ও এই কারণে আপনারা আপনাদের গায়ে মাউন্ট আরারাতের উল্কিও পরেন! কথাটা আমার আগে মনে হয়নি কেন!'

আহমদ মুসা একটু থেমে আবার বলে উঠল 'ইঞ্জিনিয়ার, এবার 'আরারাত'কে পাসওয়ার্ড বানাও।'

'স্যার, এটাই কিন্তু লাস্ট অপশন। এবার ব্যর্থ হলে গোপন উইন্ডো দেখা আর হবে না।' বলল ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটি উদ্বিগ্ন কণ্ঠে।

'চিন্তা নেই, তুরুপের তাস এবার হয়তো পেয়ে গেছি। ভয় করছ কেন, বলেছি তো জীবন্ত কম্পিউটার আমাদের হাতে আছে।' আহমদ মুসা বলল।

ওদিকে শুয়ে পড়েছে মালিক মেরারী মালুস। প্রথম বারের মত তাকে উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে। তার চোখে-মুখে অস্থিরতা।

ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটি 'আরারাত' টাইপ করার পর ক্লিক করেই আনন্দে চিৎকার করে উঠল, 'আল্লাহু আকবার!'

খাল্লিকান খাচিপও আনন্দে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বলল চিৎকার করে, 'স্যার, আমার সাধ্যের মধ্যে থাকলে মিরাকল মেধার জন্যে আপনাকে আমি নোবেল পুরস্কার দিতাম।'

‘নোবেল নয় আমি বেহেশত পুরস্কার চাই মি. খাচিপ। যাক ইঞ্জিনিয়ার। তুমি শোন, এবার গোপন উইন্ডোর সবগুলো ফাইল ওপেন করো।’

বলে আহমদ মুসা চেয়ার টেনে নিয়ে ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটির পাশে বসল।

প্রথম ফাইলটার নাম দেখে চমকে উঠল আহমদ মুসা। ফাইলটির নাম: ‘সোর্ড অব গড: ফাইনাল সলিউশন।’ ফাইলটার নামের মধ্যেই হিংস্রতার উৎকট গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। এই হিংস্রতার টার্গেট কে কিংবা কী?

আহমদ মুসার এই ভাবনার মধ্যেই ফাইলটির প্রথম পাতা খুলে গেল।

প্রথম পাতায় একটা শিরোনাম, ‘OS: Sword.’

শিরোনামের নিচে পূর্ণ পৃষ্ঠা প্রো-ফর্মায় তৈরী ডিজিটাল স্টেটমেন্টের মত কিছু।

‘এখানেই রাখ, পাতাটা দেখে নেই, কী আছে এতে।’

বলে আহমদ মুসা মনোযোগ দিল প্রো-ফর্মার দিকে।

ভার্টিক্যাল দিক থেকে মাত্র তিনটি কলাম। প্রথম কলাম ‘নাম’, দ্বিতীয় কলাম ‘সোর্ডস’ এবং তৃতীয় কলাম ‘টার্গেট’। নামের ঘরে হোরাইজেন্টালি আঁকা ২৪টি লাইনে এক থেকে ২৪টি নাম্বার সিরিয়ালি বসানো। ‘সোর্ডস’- এর ঘরে নামের ঘরে বসানো প্রতি নাম্বারের বিপরীতে লিখা দুই অথবা তিনটি করে ইংরেজী বর্ণ ক্যাপিটাল লেটারে। আর ‘নাম’ ও ‘সোর্ডস’ বরাবর ‘টার্গেট’- এর ঘরে ডিজিটাল অংশ বসানো হয়েছে ভগ্নাংশের আকারে। যেমন প্রথম নাম নাম্বার ‘১’ এরপর ‘সোর্ডস’- এর ঘরে লিখা ‘২’। তারপরেই টার্গেট এর ঘরে লিখা ১০০০- এর উপরে পঁচিশ অর্থাৎ পঁচিশ বাই এক হাজার। টার্গেটের ২৪টি ঘরে কোথাও ১০ বাই ৫০০, কোথাও ১০০ বাই ৫০০০, ইত্যাদি লিখা।

আহমদ মুসা নিশ্চিত যে, এটা একটা পরিকল্পনা, ধাঁধাঁর আড়ালে রাখা হয়েছে।

‘পরবর্তী পেজে যাও ইঞ্জিনিয়ার।’ বলল আহমদ মুসা।

দ্বিতীয় পাতা ওপেন করল ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটি।

দ্বিতীয় পাতাটির উপর চোখ পড়তেই আহমদ মুসার চোখ দু’টি উজ্জল হয়ে উঠল। দেখল, এটা সেই রহস্যপূর্ণ ছক যেটা তার কাছে আছে। পূর্ণ পৃষ্ঠার

নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় কালো বৃত্ত। কালো বৃত্তের মধ্যে নাম্বার। আর কোন বৃত্তের এক পাশে একটি রেড ডট, কোথায় দু'পাশে দুইটি রেড ডট। এভাবে কোথাও তিন পাশে তিনটি, কোথাও চার পাশে চারটি রেড ডট।

'ইঞ্জিনিয়ার, তুমি ছোট কালো বৃত্তগুলোর নাম্বার সিরিয়ালি গুণে দেখ, বৃত্তের সংখ্যা এবং তার নাম্বারের সংখ্যা এক সমান কিনা।'

দশ সেকেন্ডের মধ্যেই ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটা আহমদ মুসাকে বলল, 'স্যার, কালো বৃত্ত এবং নাম্বারের সংখ্যা সমান।'

'তার মানে কালো বৃত্তগুলোর নাম হলো ঐ নাম্বারগুলো। বৃত্তগুলো তাহলে কী?'

বলে আহমদ মুসা তাকাল কালো বৃত্তগুলোর অবস্থানের দিকে।

গভীর ভাবনার চিহ্ন আহমদ মুসার চোখে মুখে। বলল সে ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটাকে, 'তুমি পূর্ব আনাতোলিয়ার একটা মানচিত্র সামনে আন।'

সংগে সংগেই পূর্ব আনাতোলিয়ার মানচিত্র কম্পিউটার স্ক্রিনে নিয়ে এল।

'ইঞ্জিনিয়ার, মি. খাল্লিকান খাচিপ, দেখুন কালো বৃত্তগুলোকে পূর্ব আনাতোলিয়া বিশেষ করে পূর্ব প্রান্তের প্রদেশগুলোর উল্লেখযোগ্য স্থান বা শহরগুলোর অবস্থানের সাথে মেলানো যায় কিনা।' বলল আহমদ মুসা।

কিছুটা সময় মিলিয়ে দেখার পর খাল্লিকান খাচিপ বলল, 'স্যার, কারসের কয়েকটি, আগ্রির কয়েকটিসহ ইজদির প্রদেশের ২৪টি শহরের সাথে কালো বৃত্তের অবস্থান হুবহু মিলে গেছে।'

'আল্-হামদুলিল্লাহ্। প্রথম কলামের রহস্য উদ্ধারে আমরা সফল। নাম অর্থাৎ জায়গার নাম আমরা পেয়ে গেছি। এখন দ্বিতীয় কলাম দেখুন। কলামের 'সোর্ডস' মানে 'তরবারী' বা 'আর্মস'। এই 'তরবারী' বা 'আর্মস'- এর কাছাকাছি আর কি হতে পারে? এর অর্থ বের হবার উপরই নির্ভর করছে ডাবল বা ট্রিপল ইংরেজি বর্ণগুলোর অর্থ কী!' আহমদ মুসা থামল।

অন্য সবাই নিরব। ভাবছিল আহমদ মুসা। ভাবছিল সবাই।

আহমদ মুসা কথা বলল আবার। বলল, 'সোর্ড বা অস্ত্র যারা চালায় তারাও এক অর্থে সোর্ড বা অস্ত্র। বরং তারাই প্রকৃত সোর্ড বা অস্ত্র। এই অর্থ গ্রহণ করার

পর পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ডাবল বা ট্রিপল বর্ণের যে গুচ্ছ রয়েছে তা এক একটি করে নাম। তবে বর্ণগুচ্ছের সংকেত থেকে নাম উদ্ধারের সাধ্য আমাদের নেই।' বলে আহমদ মুসা থামল আবার একটু।

তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল। মনে মনে সে বলল, নামগুলো নিশ্চিতভাবে তাদের বাহিনীর অফিসারদের হবে। যেমন মাউন্ট আরারাত পয়েন্টে কর্নেল মোস্তফা ছিল। তার সাথে নিশ্চয় আরও একজন কেউ আছে। কারণ মাউন্ট আরারাতে পয়েন্টে বর্ণের দু'টি গুচ্ছ। একটিতে MM, অন্য গুচ্ছটিতে AB, প্রথমটির অর্থ হলো মোস্তফা মিকাহ্- এই দুই শব্দের আদ্যাক্ষর। AB হবে নিশ্চয় অন্য দুই শব্দের আদ্যাক্ষর। সুতরাং স্থানের নামের সাথে এই 'বর্ণগুচ্ছ' আর্মি হেডকোয়ার্টারে পাঠালে কয়েক মিনিটের মধ্যেই এদের নাম জানা যাবে। এ-নিয়ে তেমন চিন্তা নেই। এখন বের করতে হবে তৃতীয় কলাম 'টার্গেট'- এর অর্থ।

আহমদ মুসা কথা বলার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিল, তার আগেই কথা বলে উঠল ডিপি খাল্লিকান খাচিপ। বলল, 'স্যার, আপনি নিরব হওয়া ভয়ের কথা। আমরা কি সামনে এগুতে পারছি না?'

'আল্লাহ্ কারো পথ বন্ধ করেন না, যদি সে চেষ্টা করে সামনে এগোবার। আমরা চেষ্টা বাদ দেইনি। এখন আসুন আমরা তৃতীয় কলাম দেখি। তৃতীয় কলাম-এর 'টার্গেট' এর অর্থ আমরা সকলেই জানি যে, লক্ষ্যবস্তু। কিসের লক্ষ্যবস্তু বলুন তো?' একটু থামল আহমদ মুসা।

'কলাম'- এর দিক থেকে বোঝা যাচ্ছে লক্ষ্যবস্তুটা হলো 'সোর্ড'- এর।' বলর খাল্লিকান খাচিপ।

'ধন্যবাদ অফিসার। এর পরের প্রশ্ন হলো। 'সোর্ড' হলো ঘাতক অস্ত্র। এর লক্ষ্যবস্তুর উপযুক্ত নাম কি হতে পারে?'

একটু থামল আহমদ মুসা। সবাই নিরব।

আহমদ মুসাই কথা বলল আবার, 'সোর্ড-এর লক্ষ্যবস্তুর উপযুক্ত নাম হতে পারে 'ভিকটিম'। সুতরাং...।'

'ঠিক বলেছেন স্যার। ধন্যবাদ আপনাকে। এ সহজ বিষয়টা আমার মাথায় আসেনি।' বলর ডিপি খাল্লিকান খাচিপ।

‘থ্যাংকস আফিসার। ‘সোর্ডস’- এর লক্ষ্যবস্তু যদি ‘ভিকটিম’ হয়, তাহলে টার্গেট কলামে যে সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে, তা ভিকটিমদের সংখ্যা। এই অর্থটা খুবই পরিষ্কার। কিন্তু সমস্যা সৃষ্টি করেছে ভগ্নাংশ সংখ্যা, অর্থাৎ ২৫ বাই ১০০০, ১০ বাই ৫০০ ইত্যাদির অর্থ কী?’ থামল আহমদ মুসা।

কারও মুখে কোন কথা নেই। ভাবছে আহমদ মুসা। ভাবছে সবাই।

ভাবনার মধ্যেই মুখ তুলল আহমদ মুসা।

তার চোখে আশের আলো জ্বলছে। বলল সে, ‘মি. মালিক মেরারী, ‘এই ভগ্নাংশের মধ্যে কি রহস্য লুকিয়ে রেখেছেন?’

কথা বলল না মালিক মেরারী মালুস। কিন্তু তাকাল সে আহমদ মুসার দিকে। তার চোখে হিংস্র দৃষ্টি।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘জানি, আপনার খুব ইচ্ছা করছে গুলি করে আমার খুলিটা উড়িয়ে দিতে।’

বলেই আহমদ মুসা তাকাল ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটার দিকে। বলল, ‘বলত, টেন বাই হন্ড্রেড বা এ ধরনের অংকের কত রকম অর্থ হতে পারে?’

‘স্যার, এর সাধারণ অর্থ দশ এর একশ ভাগের একভাগ। অন্য অর্থেও এর ব্যবহার হয়। যেমন, ১০০ জনের মধ্যে ১০ জন, এই অর্থ মেলাতেও এমনটা লেখা হয়।’ ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটা বলল।

‘আমরা টার্গেটের কী অর্থ করেছি?’ আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

‘ভিকটিম।’ বলল ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটি।

‘আচ্ছা, এখন দশ বাই হানড্রেড- এর যে অর্থ করলে তার আগে ‘ভিকটিম’ শব্দটা বসাও। দেখ বক্তব্যটা কী দাঁড়াচ্ছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘বক্তব্যও দাঁড়াচ্ছে, ভিকটিম ১০০ জনের মধ্যে দশজন।’ বলল ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটি।

‘ধন্যবাদ, তাহলে কথা দাঁড়াচ্ছে, টার্গেট- এর ঘরে যে সংখ্যাগুলো রয়েছে, তার মধ্যে যে সংখ্যাগুলো উপরে রয়েছে, সেগুলো বিভিন্ন স্থানে ভিকটিম- এর সংখ্যা। কিন্তু নিচের অংকগুলোর অর্থ কী?’ থামল আহমদ মুসা।

‘জটিলতা একটার পর আরেকটা। ভিকটিম উপরেরটা হওয়ার পর নিচের অংকগুলো এই কলামের জন্যে অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায়। এই অংকগুলো বোধ হয় ক্যামোফ্লেজের জন্যে।’ বলল ডিপি খাল্লিকান খাচিপ।

‘তা মনে হয় না অফিসার। আচ্ছা দেখুন, টার্গেট কলামের ‘ভিকটিম’ মানে ‘মানুষ ভিকটিম।’ এই মানুষ ভিকটিমরা নিচের সংখ্যাগুলোর অংষ, সেটা অর্থ থেকেই বুঝা যাচ্ছে। যদি তাই হয়, তাহলে নিচের অংকগুলোও এবং মানুষের সংখ্যাও একই। তাই হয় কিনা?’ আহমদ মুসা বলল।

‘ঠিক তাই। ধন্যবাদ আপনাকে।’ বলল ডিপি খাল্লিকান খাচিপ।

‘ধন্যবাদ, তাহলে অর্থ দাঁড়াচ্ছে, ১০০ জনের মধ্যে ভিকটিম ১০ জন। এখন গোটা পেজ নিয়ে যদি আমরা আলোচনা করি, তাহলে আমরা দেখব ধাঁধাঁর মধ্যে দিয়ে যে কথা বলা হয়েছে, তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে অমুক স্থানে অমুকের দ্বারা এতজনের মধ্যে ভিকটিম হবে এতজন।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ওয়ান্ডারফুল! ওয়ান্ডারফুল!’ বলে হাততালি দিয়ে উঠল ডিপি খাল্লিকান খাচিপ।

ঠিক এই সময়েই কঁকিয়ে উঠল মালিক মেরারী মালুস। যেন মাথায় তার তীব্র ব্যথা। অস্থির সে।

তার দিকে এগিয়ে গেল ডিপি খাল্লিকান খাচিপ।

‘আমার মাথার টুপি খুলে ফেলুন। মাথাটা ফেটে গেল।’ চিৎকার করে বলতে লাগল মালিক মেরারী মালুস।

‘তোমার আবার মাথায় কী ঘটল? দেখি।’ বলে ডিপি খাল্লিকান খাচিপ টুপি খুলতে গেল মালিক মেরারী মালুসের।

আহমদ মুসা শান্তভাবে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল মালিক মেরারী মালুসের দিকে। কিন্তু তার মনে হলো, তার বেদনাকাতর বিলাপের সাথে তার চোখের ভাব প্রকাশের কোন মিল নেই। তাহলে তার এটা অভিনয়? উদ্দেশ্য? টুপি খুলতে বলছে কেন? কোন ফাঁদ? কী হতে পারে? ঠিক বুঝতে পারলো না আহমদ মুসা। কিন্তু এটুকু বুঝতে পারল যে কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে।

ডিপি খাল্লিকান খাচিপ টুপিতে হাত দিতে যাচ্ছিল।

‘টুপিতে হাত দেবেন না মি. অফিসার।’ দ্রুত আদেশের সুরে বলল আহমদ মুসা।

হাত থমকে গেল ডিপি খাল্লিকান খাটিপের। তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘কিন্তু স্যার...?’

আরও ভাবছিল আহমদ মুসা। টুপির মধ্যে যদি বিপদ থাকে। তাহলে সেটা আসবে কিভাবে? সে টুপি খুলতে বলছে, তার মানে টুপি খোলার সময় টুপির বেজ অংশ বর্ধিত হওয়ার ফলেই নিশ্চয় বিপদটা আসবে। সুতরাং, টুপির বেজ অংশ বর্ধিত হবার সুযোগ না দিয়ে যদি টুপিটা খোলা যায়, তাহলে বিপদ আসবে না, অন্যদিকে জানা যাবে টুপির ভেতরের রহস্য।

আহমদ মুসা ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটাকে খুবই ছোট একটা কাঁচি আনতে বলল।

ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটা দৌড়ে গিয়ে একটা ক্ষুদ্র কাঁচি নিয়ে এল।

আহমদ মুসা কাঁচি নিয়ে এগুলো মালিক মেরারীর দিকে। বলল, ‘মি. মালাক, হাত দিয়ে টুপি খুলতে গেলে আপনার কষ্ট লাগবে। আস্তে করে বেজ- এর ইলাস্টিক কেটে দিয়ে টুপিটা আপনার মাথা থেকে তুলে নেয়া হলে আপনি জানতেও পারবেন না।’

মালিক মেরারীর চোখে আগুন। দু’পাশে রাখা আহত দু’হাত নাড়ার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না।

আহমদ মুসার কাঁচি যখন এগুলো, মানে আহমদ মুসা তার বেডের পাশে পৌঁছাল, সংগে সংগেই সে এক বিকট চিৎকার দিয়ে উঠে দুই আহত হাত উপরে তুলে মাথার টুপি খুলতে গেল।

আহমদ মুসার চোখ মালিক মেরারীর আগুন-ঝরা চোখের দিকে নিবদ্ধ ছিল। কী ঘটতে যাচ্ছে তা বুঝতে পারল আহমদ মুসা।

মালিক মেরারীর আহত হাত দু’টি টুপির কাছে পৌঁছার আগেই আহমদ মুসার বাম হাত পকেট থেকে রিভলভার নিয়ে গুলি করল মালিক মেরারীকে। গুলি গিয়ে লাগল মালিক মেরারীর বুকে। মালিকের দুই হাতকে যেহেতু এক সাথে গুলি করা যায় না, তাই তাকে নিবৃত্ত করার জন্যে বুকে গুলি না করে উপায় ছিল না।

মালিক মেরারীর উঠে আসা দুই হাত আছড়ে পড়ল দু’পাশে।

তার হাত দু’টি আছড়ে পড়ার মতই মালিক মেরারীও শেষ হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই।

মুহূর্তেই ঘটে গেল গোটা ঘটনা। বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল উপস্থিত ডিপি খাল্লিকান খাচিপ এবং ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটা।

বিস্ময় কাটিয়ে উঠে ডিপি খাল্লিকান খাচিপ বলল, ‘অকল্পনীয় ধরনের বেপরোয়া লোকটা, অদ্ভুত তার নার্ভ। কিন্তু তার টুপিতে কী আছে? কী করতে যাচ্ছিল সে?’

‘টুপিতে ভয়াবহ ঘাতক ধরনের কিছু আছে যা দিয়ে সে আমাদের মারতে চেয়েছিল, যাতে আমরা যে রহস্য ভেদ করেছি, তা আর কেউ জানতে না পারে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কী এমন ঘাতক থাকতে পারে সেখানে?’ বলল খাল্লিকান খাচিপ।

‘আচ্ছা দেখা যাক।’ বলে আহমদ মুসা মালিক মেরারী মালুসের মাথার দিকে এগুলো। টুপির বেজটা আস্তে করে কাঁচি দিয়ে কেটে দিল আহমদ মুসা। টুপির এক পাশ ঢিলা হয়ে গেল। বিপরীত পাশের ইলাস্টিক তখনও মাথার কাপড়ে আটকে আছে। ওপাশের টুপির ইলাস্টিক বেজটা কেটে দিল আহমদ মুসা। এরপর আলতোভাবে টুপিটা খুলে ফেলল। টুপির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা ভয়ংকর পয়জন বোমা। ক্ষুদ্র বোমার গায়ের সাংকেতিক মার্ক দেখেই বুঝতে পারল আহমদ মুসা। বোমা থেকে সুক্ষ একটি বৈদ্যুতিক তার চার ভাগ হয়ে টুপির চারদিকের বেজ ইলাস্টিকের সাথে গিয়ে মিশেছে। যেখানে মিশেছে, সেখানেই সুক্ষ্ম বৈদ্যুতিক তারের সাথে ডেটোনেটর ফিট করা আছে। ইলাস্টিকে টান পড়লেই ডেটোনেটরের দুই পিন একে অপরকে স্পর্শ করবে এবং বৈদ্যুতিক তারের নেগেটিভ-পজিটিভ এক সাথে ক্লিক করার সাথে সাথেই পয়জন বোমার বিস্ফোরণ ঘটবে। ভাবতেই শিউরে উঠল আহমদ মুসা।

বোমাটা সবাইকে দেখিয়ে পয়জন বোমার টেকনোলজিটা সবাইকে বুঝিয়ে বলল আহমদ মুসা, ‘টুপির বেজ ইলাস্টিকে সামান্য টান পড়লেই বোমার

ডেটোনেটর ক্লিক করতো এবং তখন ভয়ংকর পয়জন বোমার বিস্ফোরণ ঘটে যেত।'

ডিপি খাল্লিকান খাচিপ এবং ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটার মুখ আতংকে চুপসে গেল।

'আমাদের মারলে সেও তো মরতো।' ডিপি খাল্লিকান খাচিপ।

'না, সে যদি মুখ, নাক ও চোখ বন্ধ করে দেড় মিনিট থাকতে পারতো, তাহলে সে বেঁচে যেত। বোমাটার ক্রিয়াকাল মাত্র দেড় মিনিট। এই দেড় মিনিটে এই বোমা দশ বর্গফুট এলাকার মানুষসহ সকল জীবের প্রাণ হরণ করতে পারে। এর কোন ধোঁয়া নেই। এর অদৃশ্য পয়জন-ওয়েভ চোখের পলকে ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে।' আহমদ মুসা বলল।

'নিশ্বাস বন্ধ রাখার জন্যে মুখ, নাক বন্ধ রাখার প্রয়োজন আছে। কিন্তু চোখ বন্ধ রাখা কেন?' বলল ডিপি খাল্লিকান খাচিপ।

'বোমার পয়জন-ওয়েভ মানুষের দৃষ্টিও অন্ধ করে দিতে পারে।' আহমদ মুসা বলল।

আঁৎকে উঠল ডিপি খাল্লিকান খাচিপ। বলল, 'সাংঘাতিক অস্ত্র। মালিক লোকটা তাহলে আমাদেরকে মেরে ফেলে পালাবার একটা ব্যবস্থা রেখেই দিয়েছিল। ভয়ানক লোক। আড্ডা গেড়েছিল দেখছি ঠিক জায়গায়!'

'ভয়ানক লোক তো বটেই। কথা বলানো গেল না শেষ পর্যন্ত। আমাদের সব প্রশ্নের সমাধান আমরা পেলাম না।' আহমদ মুসা বলল।

'সব রহস্যের জট তো আপনি খুলেই ফেলেছেন। বড় কী তেমন বাকি আছে?' জিজ্ঞাসা খাল্লিকান খাচিপের।

'রহস্যের শেষ তালাটা খোলা বাকি আছে। অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর রহস্যের শেষ তালাটা খোলা না গেলে জানা যাবে না। ভিকটিম যাদের মধ্যে থেকে হবে, সেই লোকরা কারা? কবে, কিভাবে ভিকটিম হওয়ার ঘটনা ঘটবে? এর উদ্দেশ্যই বা কী? সোর্ডস- মানে আক্রমণকারী, যারা কিছু লোককে ভিকটিম বানাবে, তারা কারা? কেন, কিভাবে তারা এটা করবে? ইত্যাদি অনেক প্রশ্নের উত্তর আমাদের জানা নেই।'

বলে আহমদ মুসা চেয়ারে গা এলিয়ে দিল। চোখ দু'টোও বুজে গেল তার। তার চেহারায় নেমে এলো গভীর ছায়া।

কিছুক্ষণ পর চোখ খুলল আহমদ মুসা। বলল, 'মি. খাল্লিকান খাচিপ, এ বিষয়টা তো পরিষ্কার হয়েছে, একদিকে তাদের উদ্দেশ্য যেমন মাউন্ট আরারাতের স্বর্ণভাণ্ডার উদ্ধার, অন্যদিকে তাদের ষড়যন্ত্রটা রাজনৈতিকও।

দেখা যাচ্ছে শহর ও আধাশহর এলাকাতেই তারা ঘটনা ঘটাবে। যাদের ভিকটিম বানাবে বা ঘটনার অস্ত্র হবে, তাদের সংখ্যা কোথাও দু'য়ের বেশি নয়। মাত্র একজন বা দু'জন, কোথাও দু'শ, কোথাও একশ, পাঁচশ জনকে ভিকটিম বানাবে কী করে? এ থেকে বুঝা যায় একজন বা দু'জন লোক যাদের ভিকটিম বানাবে, তারা একাই একশ বা এ হাজারের মত। এমন লোক কারা হতে পারে মি. খাল্লিকান খাচিপ?'

'পুলিশ বা সেনারা হতে পারে।' খাল্লিকান খাচিপ বলল।

'ঠিক বলেছেন মি. খাল্লিকান খাচিপ। তাহলে এখন দেখতে হবে, যেস্থানে সোর্ডস হিসাবে দুই বা ততোধিক বর্ণমালার আড়ালে যাদের নাম আছে, সে স্থানে পুলিশ অফিসার ও সেনা অফিসারদের মধ্যে ঐ বর্ণমালার সাথে মিলে এমন কে কে আছেন। এদেরকে ডিটেক্ট করাটাই এখনকার প্রধান কাজ।' বলল আহমদ মুসা।

'ইউরেকা! ইউরেকা মি. আবু আহমদ, স্যার! আপনি ধাঁধাঁর জট ভেঙে ফেলেছেন। এখন যে কাজটার কথা বলেছেন, তা খুবই সহজ। পুলিশ অফিসারদের নাম আমি দু'এক ঘন্টার মধ্যেই দিতে পারব। সেনা অফিসারদের নামগুলোও যোগাড় করা যাবে।' ডিপি খাল্লিকান খাচিপ বলল। আনন্দের উচ্ছ্বাস তার কণ্ঠে।

'আপনি পুলিশ অফিসারদের নাম যোগাড় করুন। সেনা অফিসারদের নাম আমি যোগাড় করছি।' আহমদ মুসা বলল।

বলেই আহমদ মুসা তার মোবাইলে কল করল জেনারেল মেডিন মেসুদকে।

আহমদ মুসার কণ্ঠ পেতেই জেনারেল মেডিন মেসুদ ওপার থেকে সালাম দিয়ে বলল, 'কনগ্রাচুলেশন মি. আবু আহমদ। অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে আপনি

সমস্যা সমাধানের প্রান্তে এসে পৌঁছেছেন। এখন আপনার চাই স্থানগুলোর বিপরীতে আদ্যাক্ষরের সংকেতে যাদের নাম আছে, তাদের নাম। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

'আপনি জানলেন কি করে এ সব?' বলল আহমদ মুসা।

'গোপন ব্যাপারটা সহজ! আপনাকে বললে ক্ষতি নেই।'

একটু থামল জেনারেল মেডিস মেসুদের কণ্ঠ। বলল আবার, 'যে ছেলেটা কম্পিউটারে আপনাকে সহযোগিতা করছে, সে আমাদের গোয়েন্দা বিভাগের লোক। মি. মালিকের রেস্টুরেন্টেও আমাদের গোয়েন্দা অফিসার ছিল। ইজদিরের সে হোলি আরারাত হোটেলেও আমাদের লোক ছিল।'

'ওরা কি কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের জন্য?' বলল আহমদ মুসা। তার মুখে হাসি।

'আস্তাগফিরুল্লাহ্! কী বলেন স্যার! ওরা আপনার নিরাপত্তার জন্যে।' জেনারেল মেডিন মেসুদ বলল।

'ধন্যবাদ জেনারেল। এবার কাজের কথা বলুন।' বলল আহমদ মুসা।

'স্থানগুলোতে সাংকেতিক বর্ণমালার আড়ালে যে অফিসারদের নাম পাওয়া যাবে, তার তালিক শীঘ্রই আপনাকে পাঠানো হচ্ছে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, কী হতে যাচ্ছে স্থানগুলোতে? এটা জানা খুবই জরুরী।' বলল আহমদ মুসা।

'আসলেই খুবই জরুরী।' জেনারেল মেডিন মেসুদ বলল।

'আপনি তালিকাটা তাড়াতাড়ি পাঠান জেনারেল। আমার ধারণা সঠিক হলে ঐ চিহ্নিত অফিসাররা ইতমধ্যেই ব্রীফ পেয়ে গেছে। সুতরাং জানার একটা পথ বের হবেই।' আহমদ মুসা বলল।

'পেয়ে যাবেন স্যার। আজ রাত শেষ হবার আগেই পেয়ে যাবেন। আমরা খুব উদ্বিগ্ন স্যার। মার খেতে খেতে ওদের দেয়ালে পিঠ ঠেকেছে। বড় কোন অঘটন ওরা যে কোন সময় ঘটিয়ে বসতে পারে।' বলল জেনারেল মেডিন মেসুদ।

'আল্লাহ্ ভরসা। ওরা ধ্বংসের জন্যে, আর আমরা ভালোর জন্যে কাজ করছি। আল্লাহ্'র সাহায্য আমাদের সাথেই থাকবে।'

'আলহামদুলিল্লাহ্। আল্লাহ্ তাই করুন।' বলল জেনারেল মেসুদ।

'আমীন। ওকে জেনারেল, রাখি। আস্-সালামু 'আলাইকুম।' বলে সালাম নিয়ে মোবাইলের কল অফ করে দিল আহমদ মুসা।

# ৭

রাত ৩টা। ইজদির প্রদেশের রাজধানী শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছল আহমদ মুসার গাড়ি।

গাড়ি ড্রাইভ করছে আহমদ মুসা। তার পাশের সীটে বসা পূর্ব আনাতোলিয়ার পুলিশের ডাইরেক্টর জেনারেল মাহির হারুন, আর পেছনের সীটে বসা ইজদিরের পুলিশ প্রধান ডিপি খাল্লিকান খাচিপ।

উপরের নির্দেশ পেয়ে রাত দু'টার দিকে এসে পৌঁছেছেন ডিজিপি মাহির হারুন আহমদ মুসার সাথে অভিজানে যোগ দেবার জন্যে।

আহমদ মুসাদের অভিযানের লক্ষ্য হলো ইজদিরের সেনা গ্যারিসনের প্রধান ব্রিগেডিয়ার সেলিম আস সুয়ুতি এবং ইজদির সেনা ইউনিটের কমব্যাট আর্মির প্রধান কর্নেল জালাল জহির উদ্দিনের বাড়ি। তাদের দু'জনকেই গ্রেফতার করতে হবে এই রাতেই। ইজদিরের 'সোর্স' হিসাবে যাদের নাম আছে, তারা এই দু'জনই।

আহমদ মুসা রাত আড়াইটার দিকে সোর্ডসদের তালিকা পেয়েছে। সেই সাথে মেডিন মেসুদ এবং জেনারেল মোস্তফা আহমদ মুসাকে জানিয়েছে, তারা আর্মেনিয়ার রাজধানী ইয়েরেভেনে পোস্টেড তাদের এজেন্টের কাছে এটুকু জানতে পেরেছে যে, আগামী কাল সকালে পূর্ব আনাতোলিয়ায় বড় একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। ইয়েরেভেনের সরকারী মহল খুব খুশি। ইতোমধ্যে আর্মেনিয়া থেকে বহু সাংবদিক চোরাই পথে পূর্ব আনাতোলিয়ার বিভিন্ন শহরে প্রবেশ করেছে। তারা তাদের নিজের খরচে বিদেশী সাংবাদিকদেরও নিয়ে এসেছে।

সাংবাদিক বিশেষ করে বিদেশী সাংবাদিক আসার খবরে আঁৎকে উঠেছে আহমদ মুসা। তার মনে হয়েছে, নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ খবর হওয়ার যোগ্য কিছু এখানে ঘটতে যাচ্ছে। মালিক মেরারী মালুসের কম্পউটারে পাওয়া পরিকল্পনায় যে ভিকটিমের সংখ্যা আহমদ মুসা পেয়েছে, সেটা বেশ বড়। এত বড় হত্যার ঘটনা

ঘটলে সেটা অবশ্যই এসটা মহাখবর হবে। কিন্তু কারা হত্যা করবে? সোর্ডরা? কেন হত্যা করবে? কাদের হত্যা করবে? তাদের কোথায় পারে? ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়ে আহমদ মুসা আবার অনেক ভেবেছে। কিন্তু উত্তর পায়নি। অবশেষে সিদ্ধান্ত নিয়েছে গ্রেফতার করে তাদের কাছ থেকে কিছু জানা যায় কিনা।

এরপরেই আহমদ মুসারা ছুটে এসেছে ইজদিরে। ব্রিগেডিয়ার সেলিম আস সুয়ুতি এবং কর্ণেল জালাল জহির উদ্দিনের গ্রেফতার থেকে যে রেজাল্ট পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে রাতের মধ্যেই মালিক মেরারী মালুসের কম্পউটারে পাওয়া পরিকল্পনায় উল্লেখিত সব স্থনের, সব 'সোর্ডস'দের গ্রেফতার করা হবে। ওদের সকলের নাম ও লোকেশান চিহ্নিত করা হয়েছে। আহমদ মুসার গাড়ি প্রবেশ করল ইজদির শহরে।

আহমদ মুসার পামে বসা ডিজিপি মাহির হারুনের দিকে চেয়ে বলল, 'মি. মাহির হারুন, ব্রিগেডিয়ার সেলিম আস সুয়ুতি এবং কর্ণেল জালাল জহির উদ্দিনের বাড়ির অবস্থা কী?'

'স্যার, আমাদের গোয়েন্দারা তাদের দু'জনের বাড়িই ঘিরে রেখেছে। ব্রিগেডিয়ার সেলিম রাত সাড়ে দশটায় এবং কর্ণেল জালাল রাত ১১ টায় বাড়িতে প্রবেশ করেছে। তারপর বাড়িতেই আছে।' বলল পূর্ব আনাতোলিয়ার ডাইরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ মাহির হারুন।

'কথা ছিল যে, তারা ব্রিগেডিয়ার ও কর্ণেল দু'জনেরই গেটের প্রহরীসহ সেনা অফিসারদের কৌশলে বন্দী করে গেটের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করবে রাত ৩ টার মধ্যেই এবং দুই অফিসারেরই শয়নকক্ষকে লোকেট করবে এবং কক্ষের সকল এন্ট্রি ও এক্সিট পয়েন্টের উপর নজর রাখবে, এটা কত দূর হয়েছে?' আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

'স্যার, পাঁচ মিনিট আগে আমি ওদের সাথে কথা বলেছি। কাজগুলো সবই ঠিকমত হয়েছে। বাড়ির চারদিক ঘিরে রাখাসহ দুই সেনা অফিসারের শয়নকক্ষকে চোখে চোখে রেখেছে।' বলল ডিজিপি মাহির হারুন।

'ধন্যবাদ।' আহমদ মুসা বলল।

ইজদির শহর অতিক্রম করছে আহমদ মুসার গাড়ি। শহরের পূবে পাহাড় ঘেরা একটা সুন্দর সমতল উপত্যকায় ইজদিরের সেনা গ্যারিসন।

এই উপত্যকা ঘিরে পাহাড়ের গায়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে সেনা অফিসারদের আবাসস্থল।

গ্যারিসনে ঢোকার পরই পাশাপাশি দু'টি টিলার মাথায় রয়েছে ব্রিগেডিয়ার এবং কর্ণেলের বাসা।

গ্যারিসনে ঢোকার পর উপত্যকার ডান পাশে দুই পাহাড়ের মাঝখানের কয়েকটি টিলার প্রথমটিতেই ব্রিগেডিয়ার সেলিম আস সুয়ুতির বাসা। তার পরের টিলাতেই কর্ণেল জালাল জহির উদ্দিনের বাসা।

উপত্যকা থেকে গাড়ির রাস্তা এঁকে-বেঁকে টিলার মাথায় বাড়ির একদম গাড়িবারান্দায় গিয়ে উঠেছে।

বাড়ির সীমানা প্রাচীরটা গ্রীলের। গেটও গ্রীলের। গেটের পাশেই একটা ছোট কক্ষ। সিকউরিটির লোকদের বসার জায়গা ওটা। গেট রুমে কেউ নেই বলেই তাদের বাধা পেতে হয়নি। নিজেরাই গেট খুলে ভেতরে এসেছে।

গেট থেকে গাড়ি বারান্দার দূরত্ব একশ গজের কম হবে না।

আহমদ মুসার গাড়ি ব্রিগেডিয়ার সেলিমের বাড়ির গাড়িবারান্দায় পৌছতেই ডিজিপি মাহির হারুনের ওয়্যারলেস বিপ বিপ শব্দ করে বলল, 'আমাদের লোকরা জানাচ্ছে, ব্রিগেডিয়ার সেলিম ও আরেকজন ঘর থেকে বেরিয়েছে। সম্ভবতঃ ওরা বাইরে বেরুবে। আমাদের লোকরা ওদের আটকাবে কিনা জানতে চাচ্ছে।' ডিজিপি মাহির হারুনের কণ্ঠে উদ্বেগ।

'বাধা দিতে নিষেধ করুন। ওরা বাইরে আসুক। আমরা গাড়িটা একটু আড়ালে নিয়ে যাচ্ছি। ওদের একটা কথা জিজ্ঞেস করুন, ব্রিগেডিয়ার সামরিক পোষাকে আছে, না সাধারণ পোষাকে।'

ওদিকে ডিজিপি মাহির হারুন আহমদ মুসার মেসেজ তার লোকদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে।

ডিজিপি মাহির হারুন আহমদ মুসার মেসেজ ওদের পৌঁছে দিয়ে কথাটা জিজ্ঞেস করল এবং আহমদ মুসাকে জানাল যে ব্রিগেডিয়ার সাধারণ পোষাকে রয়েছেন।

আহমদ মুসারা সবাই গাড়ি থেকে নেমেছে। তাদের সকলের চোখ বাড়ির মূল গেট ও গাড়ি বারান্দার দিকে। গাড়ি বারান্দায় একটি প্রাইভেট কার দাঁড়িয়ে আছে। সেনাবাহিনীর নয় গাড়িটা।

আহমদ মুসা ব্রিগেডিয়ার সেলিমকে নিয়ে ভাবছিল। এখন তো তার বাইরে যাওয়ার কথা নয়, ডিউটির প্রয়োজন ছাড়া। আর প্লেইন পোষাকে যখন বেরিয়েছেন, তখন তো অফিসে বা কোন ডিউটিতে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। তাহলে কেন বেরুচ্ছে? সাথের লোকটি তাহলে কোন গেস্ট বা বিশেষ কউ! শয়নকক্ষে নিয়ে গেছেন যখন, বিশেষ কেউই হবার কথা। গাড়িবারান্দায় যে প্রাইভেট কার দাঁড়িয়ে আছে, সেটা কি তাহলে ঐ গেস্টের! বাড়িটা ঘুরে ওরা বেরিয়ে এল। নেমে এল গাড়িবারান্দায়।

গেস্ট লোকটি পঞ্চাশোর্ধ, টাক মাথা। কমপ্লিট ইউরোপীয় পোষাক, শুধু মাথায় হ্যাট নেই।

ব্রিগেডিয়ার দু'ধাপ সামনে এগিয়ে এসে গাড়ির দরজা খুলে ধরল। গেস্ট লোকটি গাড়িতে ঢোকার আগে ব্রিগেডিয়ারের সাথে হ্যান্ডশেক করে বলল, 'জেনারেল, ইজদির থেকে মানে আপনার কাছ থেকে কাল সকালেই আমরা বড় আশা করছি। ইজদিরের সাফল্য হবে আমাদের জন্যে বড় সাফল্য।'

'ভাববেন না, সব ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি। আমরা বড় খবরই দেব।' বলল ব্রিগেডিয়ার সেলিম।

গাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেল। চলতে লাগল গাড়ি।

আহমদ মুসা দ্রুত তাকাল ডিজিপি মাহির হারুনের দিকে। বলল, 'ওকে আপনারা আটকান। গেটে গিয়ে তাকে গেট খোলার জন্যে অথবা সিকউরিটিকে ডাকার জন্যে গাড়ি থেকে নামতে হবে। সেই সুযোগে তাকে আপনারা দু'জন গিয়ে আটকাবেন, আহত করে হলেও। আমি ব্রিগেডিয়ারকে দেখছি।'

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই ডিজিপি মাহির হারুন ও খাল্লিকান খাচিপ বাগানের মধ্যে দিয়ে দৌড় দিল গেট লক্ষ্যে।

গেস্টকে বিদায় দিয়ে ব্রিগেডিয়া ঘুরে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে এগোচ্ছিল বাড়ির দরজার দিকে।

আহমদ মুসা জুতার আগায় ভর করে বিড়ালের মত নিঃশব্দে ছুটল ব্রিগেডিয়ারের পেছনে।

গাড়িবারান্দা পেরিয়ে বারান্দায় উঠে গেছে ব্রিগেডিয়ার সেলিম।

আহমদ মুসা কয়েক ধাপ পেরিয়ে বারান্দায় উঠতে গিয়ে তার পায়ের শব্দ ব্রিগেডিয়ার সেলিমের কানে পৌঁছে গেল। বোঁ করে চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল সে।

আহমদ মুসা তখন বারান্দায় উঠে গেছে। ব্রিগেডিয়ার সেলিমের মুখোমুখি সে।

হঠাৎ আহমদ মুসাকে সামনে দেখে অস্বাভাবিক একটা বিস্ময় ও বিমূঢ়তা ব্রিগেডিয়ার সেলিমকে আচ্ছন্ন করেছিল মুহূর্তের জন্যে। আর সেই সময়েই আহমদ মুসার রিভলভার ব্রিগেডিয়ার সেলিমের বুকে গিয়ে স্পর্শ করল।

ঘটনার আকস্মিকতায় হকচকিয়ে গিয়েছিল ব্রিগেডিয়ার সেলিম।

আহমদ মুসা সময় নষ্ট করল না। বাম হাতটাকে আয়রন শীটের মত সোজা ও শক্ত করে একটা কারাত ছুড়ে দিল ব্রিগেডিয়ার সেলিমের ডান কানের নিচে ঘাড়ের নরম জায়াগাটায়। বজ্রের মত আঘাত হানল করাতটা।

ব্রিগেডিয়ার সেলিমের মাথাটা আগেই দুলে উঠল। তারপর শরীরটাও। সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে গেল সে।

আহমদ মুসা তার দু'হাত পিছমোড়া করে বেঁধে কাঁধে তুলে নিয়ে চলল গেটের দিকে।

গেটে গিয়ে আহমদ মুসা দেখল, ডিজিপি মাহির হারুন ও ডিপি খাল্লিকান খাচিপ ঐ লোকটাকে পাকড়াও করে বেঁধে ফেলেছে ঠিকই, কিন্তু আহত হয়েছেন খাল্লিকান খাচিপ। তার ডান চোখের উপরে কপালটা ফেটে গেছে।

‘আহা, আপনি আহত হয়েছেন দেখছি, উহ! ঐ লোকটা যৌবনকালে মুষ্ঠিযোদ্ধা ছিল নাকি যে, আপনার চোখের আশ-পাশটাকেই টার্গেট করেছে!’ বলল আহমদ মুসা খাল্লিকান খাচিপের প্রতি সমবেদনার সুরে।

‘না, উনি লোকটার পেছনে ছুটতে গিয়ে গেটের দেয়ালে ধাক্কা খেয়েছিলেন।’ ডিজিপি মাহির হারুন বলল। তার মুখে হাসির কিঞ্চিত ঝলক।

‘এবার চলুন। আমি বন্দী দু’জনকে আমার গাড়িতে নিচ্ছি। আর আপনারা দু’জন বন্দী লোকটির গাড়ি নিন। গাড়িও একটা প্রমাণ হতে পারে। আসুন তাড়াতাড়ি করি। কর্নেলের ওখানে যেতে হবে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ওখানে আর যেতে হবে না স্যার। কর্নেল পালাচ্ছিল। আমাদের লোকদের ধরতে বলেছিলাম। ধরে নিয়ে আসছে। আমাদের এক গোয়েন্দা অফিসার কর্নেলে গুলিতে মারা গেছে স্যার।’ বলল ডিজিপি মাহির হারুন।

‘ধন্যবাদ মি. মাহির হারুন। আমাদের মিশন সফল। এখন এই মিশনের পেছনে যে আসল মিশন আছে তা সফল হলেই হয়। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন। এদের মুখ থেকে দ্রুত কথা বের করতে যেন আমরা সমর্থ হই। সকালেই ভয়ংকর কিছু ঘটতে যাচ্ছে। কী ঘটতে যাচ্ছে, কিভাবে ঘটতে যাচ্ছে, সেটা আমাদেরকে রাতের মধ্যেই জানতে হবে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমিন।’ বলল ডিজিপি মাহির হারুন সংগে সংগেই।

‘যদি না জানা যায়? যদি না কথা বলে ওরা?’ ডিপি খল্লিকান খাচিপ বলল।

‘চিন্তা নেই। বলবে ওরা কথা। ওদের মত দুর্নীতিবাজ খুনিদের আল্লাহ্ নেই, বেহেশত নেই। দুনিয়ার জীবনটা ওদের বড় প্রিয়। এরাও জানে তারা যা করে তা অন্যায়, দেশের চেয়ে, ঈমানের চেয়ে এদের কাছে জীবন বড়। কারণ জীবনের জন্যেই এদের কমিটমেন্ট। সুতরাং দু’একজন ব্যতিক্রম ছাড়া এরা কমিটমেন্টের জন্যে জীবন খোয়ায় না।’ বলল আহমদ মুসা।

গাড়িতে উঠল সবাই। দু’টি গাড়ি নেমে এল উপত্যকায়।

ওয়্যারলেস বিপ বিপ করে উঠল ডিজিপি মাহির হারুনের।

ডিজিপি মাহির হারুন অয়্যারলেস ধরেই বলল, ‘তোমরা আসছ কর্নেলকে নিয়ে?’

ওপারের কথা শুনে বলল, 'আমরা গ্যারিসনের গেট পার হয়েই দাঁড়াচ্ছি। তোমরা এস।'

কথা শেষ করে ডিজিপি মাহির হারুন আহমদ মুসাকে বলল, 'কর্নেলকে ধরে নিয়ে ওরা আসছে।'

গ্যারিসনের গেটের বাইরে কর্নেল জলাল জহির উদ্দিনকে ধরে নিয়ে গোয়েন্দার একটি দল আহমদ মুসাদের সাথে মিলিত হলো।

এবার তিনটি গাড়ি একত্রে যাত্রা শুরু করল। আহমদ মুসার গাড়ি আগে।

'আমরা কি ইজদিরের পুলিশ হেডকোয়ার্টারে যাচ্ছি স্যার?' জিজ্ঞাসা ডিজিপি মাহির হারুনের।

'না, আমরা যাচ্ছি ইজদিরের দক্ষিণের জনমানবহীন মালভূমিতে। কথা আদায়ের ভালো জায়গা ওটা, আবার কবর দেবারও নিরিবিলি জায়গা।' আহমদ মুসা বলল।

কবর দিতে হয়নি। আহমদ মুসার শুরুর বক্তৃতা, তার হাতের রিভলভার এবং চারদিকের শুনশান অবস্থা দেখেই আত্মসমর্পণ করল ব্রিগেডিয়ার সেলিম এবং কর্নেল জালাল। তারা দু'জনেই বলল, 'তারা স্বেচ্ছায় নয়, ব্ল্যাকমেইলের শিকার হয়ে ওদের কথা শুনতে বাধ্য হয়েছে। কর্নেল বলেছে, নির্দোষ পথে অঢেল অর্থের লোভ দেখিয়ে ওরা তাকে তাদের জালে আটকায়। জালের অক্টোপাশ ক্রমশ কঠিন হয়ে ওঠে তার জন্যে। এভাবে সে ওদের হাতের পুতুলে পরিনত হয়েছে। আর ব্রিগেডিয়ার সেলিম বলেছে, 'আমি যখন বিয়ে করার চিন্তা-ভাবনা করছিলাম, ঠিক তখনই সুন্দরী ও প্রতিভাবান এক মেয়ের প্রেমের ফাঁদে পড়ে যাই। বিয়ে হওয়ার পর মেয়েটাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে আমাকে নানা রকম অসৎ কাজে জড়ায় এবং আমাকে একজন ক্রিমিনালে পরিনত করে। আমি তারপর তাদের কাজ উদ্ধারের যন্ত্র হয়ে যাই।'

রাত শেষের সকালে তারা কী করতে যাচ্ছিল তার বিবরণ দেয়ার পর তারা কান্নজড়িত কণ্ঠে তাদের দুর্ভাগ্যের পটভূমি বর্ণনা করেছিল।

পরদিন সকালে তারা কী ঘটাতে যাচ্ছিল তার বিবরণ দিতে গিয়ে দু'জন একই কথা বলেছিল। তারা যে বিবরণ দিয়েছিল, তা এই:

'আমাদের বলা হয়েছিল তুরস্কে বিশেষ করে পূর্ব আনাতোলিয়ায় সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠী শত শত বছর ধরে হত্যা, নির্যাতন ও বৈষম্যের শিকার। আর্মেনীয় জেনোসাইড তার একটা প্রমাণ। গোটা দুনিয়া এটা জানে, কারণ এই ঘটনা প্রচার পেয়েছে বিশ্ব জুড়ে। সেই হত্যা, নির্যাতন ও বৈষম্য এখনও চলছে। মাত্র গত কিছু দিনের মধ্যে পূর্ব আনাতোলিয়ায় হাজার হাজার মানুষ উচ্ছেদ হয়েছে, জেলে গেছে আরও হাজার হাজার। পরিকল্পিতভাবে তাদের বিরুদ্ধে ড্রাগ চোরাচালানসহ অন্যান্য অমূলক অভিযোগ আনা হয়েছে। আর...

আহমদ মুসা কর্নেল জালাল জহির উদ্দিনের কথার মাঝখানে বলে ওঠে, 'কিন্তু উচ্ছেদ হওয়া ও জেলে যাওয়া লোকজন যে আর্মেনীয় বা ইহুদি সংখ্যালঘু নয়, তা কি আপনারা জানেন? জানেন কি সংখ্যাগুরুরাই ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে উচ্ছেদ হয়েছে এবং জেলেও গেছে সংখ্যাগুরুরাই? আর এই ষড়যন্ত্রের শিকার করেছে মাউন্ট আরারাতের উল্কি আঁকা আর্মেনীয় সংখ্যালঘুরাই করেছে।'

চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠেছে কর্নেল জালাল ও ব্রিগেডিয়র সেলিম দু'জনেরই। বলেছিল ব্রিগেডিয়ার সেলিম, 'আমরা এ বিষয়টা জানি না। আমরা তাদের কথা বিশ্বস করেছি। কারণ আমরা এটুকু জানতে পেরেছি, কিছুদিন থেকে পূর্ব আনাতোলিয়ার বিভিন্ন প্রদেশে ব্যপকভাবে লোক উচ্ছেদ হচ্ছে এবং ব্যপকভাবে গ্রেফতারও হচ্ছে। কারা গ্রেফতার হচ্ছে, কেন হচ্ছে, কারা করছে, এ বিষয়গুলো আমাদের সমনে আসেনি।'

হেসেছিল আহমদ মুসা। বলল, 'যারা উচ্ছেদ করিয়েছে, জেলে পাঠিয়েছে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে, তারাই নিজেদের নির্যাতিত বলে আপনাদের বোকা বানিয়েছে। যাক, বলুন কর্নেল আপনার কথা।'

কর্নেল শুরু করে আবার, 'তারা বলেছে, এই হত্যা, নির্যাতন, জেল জুলুমের অবসান ঘটাতে আন্তর্জাতিক মহলকে সবকিছু জানাতে হবে। জানাতে

হলে আর্মেনীয় জেনোসাইডের ভিকটিম হবে সংখ্যালঘুরাই। কয়েক হাজার সংখ্যালঘুর জীবনের বিনিময়ে যদি পূর্ব আনাতোলিয়া থেকে জুলুমশাহীর অবসান ঘটে, তাহলে এই আত্মত্যাগে কোন ক্ষতি নেই। এই আত্মত্যাগে সংখ্যালঘুরা প্রস্তুত। এখন তাদের হত্যা করার কাজটা সেনা অফিসারদের করতে হবে। এই হত্যা করার সময় পূর্ব আনাতোলিয়ার বিভিন্ন শহর, বন্দর, বাজারে হাজার হাজার লোক বিক্ষোভে ফেটে পড়বে। দোকন-পাট, হাট-বাজারে আগুন দেবে, পুলিশের উপর হামলা করবে। ব্যাপক বিক্ষোভ, বিদ্রোহের মুখে আসহায় পুলিশ পিছু হটবে। নৈরাজ্য বন্ধের জন্যে তখন সেনাদের ডাক পড়বে। সেটাই হবে আপনাদের এ্যাটাক করার মুহূর্ত। কিছু বুঝে ওঠার আগেই চোখ বন্ধ করে গুলি চালাবেন। আপনাদের ইজদিরে ৫০ হাজার লোকের বিক্ষোভ হবে। এখানে কমপক্ষে ৩ হাজার লাশ আরা চাই।' থামে জালাল জহির উদ্দিন।

'অর্থাৎ, এভাবে পূর্ব আনাতোলিয়ার পূর্বাঞ্চলে ২৪টি শহর, বন্দর, বাজার থেকে লাশ চায় তারা। কিন্তু এই লাশ দিয়ে কী করবে তারা? তারা এই হত্যাকাণ্ডকে উপলক্ষ্য করে গণবিপ্লব ঘটাতে চায়? কিন্তু তারা তো তা পারবে না। এত লাশ পড়ার পরে রাস্তায় কেউ নামবে না অবশ্যই সেনাদের মোকাবিলা করার জন্যে। তাহলে তারা কী চায়?' বলেছিল আহমদ মুসা।

'আমরা সেটা সুনির্দিষ্টভাবে জানি না স্যার। এ'নিয়ে তারা কখনও কথা বলেনি।' বলেছিল ব্রিগেডিয়ার সেলিম।

'আচ্ছা, আজ সকালে তোমাদের প্রোগ্রাম কী ছিল?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

কর্নেল জালালই শুরু করল আবার, 'আজ সকাল আটটায় শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে ওরা মিছিল শুরু করবে। নয়টায় পৌঁছবে তারা সিটি সেন্টরে। এই সময়টা অফিসে যাবার, কাজে যাবার, কাজ শুরু করার সময়। মিছিলের ফলে শহরে একটা অচলাবস্থা দেখা দেবে। সিটি সেন্টার থেকেই ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ শুরু হবে। পুলিশের উপরও হামলা হবে। পুলিশকে ছত্রভংগ করা হবে। আত্মরক্ষার জন্যে তারা সরে দাঁড়াবে। এই সময় দশটার দিকে স্যার ব্রিগেডিয়ার সেলিম আস্-

সুয়ুতী আর্মি মুভ করতে নির্দেশ দেবেন বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্যে। এভাবেই তিন হাজার লাশ পড়ার ব্যবস্থা হবে।' থামে কর্নেল জালাল তার কথা শেষ করে।

কথাগুলো বলছিল কর্নেল জালাল ও ব্রিগেডিয়ার সেলিম ষড়যন্ত্রকারীদের একজন আগাসি খান জিয়ানকে সামনে রেখেই। যিনি ধরা পড়েছিলেন ব্রিগেডিয়ার সেলিরে সাথে তার বাড়িতে।

আগাসি খান জিয়ান মাথা নিচু করে বসেছিল। তার হাত দু'টি পিছ মোড়া করে বাঁধা।

আহমদ মুসা বাম হাত দিয়ে তার মুখ উপরে তুলে ধরে বলল, 'আপনার পরিচয় ব্রিগেডিয়ার বলেছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে, আপনি বড় কোন নেতা নন। বিচারে আপনার শাস্তি হতে পারে, কিন্তু সেটা প্রাণদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডের পর্যায়ে যাবে না। আর যদি আপনি সহযোগিতা করেন, তাহলে আপনার এই সহায়তার জন্য শাস্তি আরও লঘু হতে পারে। অন্যদিকে, আপনি যদি আমাদের সহায়তা না করেন, তাহলে আপনার প্রাণ যাবে। আপনার কাছে যে সহায়তা আমরা চাই, সেটা হলো, আপনাদের সংগঠন এই লাশ চাচ্ছে কেন? কী লক্ষ্য তাদের? আপনি শুনে রাখুন, এক প্রশ্ন আমি দু'বার করি না। আমি দশ পর্যন্ত গুণব, এর মধ্যে আমার প্রশ্নের জবাব দিতে হবে আপনাকে।'

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা দশ পর্যন্ত সংখ্যা গুণা শুরু করল।

গুণতে গিয়ে নয় উচ্চারণ করেই আহমদ মুসা তার রিভলভার তুলে একটা গুলি চালাল আগাসি খান জিয়ানের লক্ষ্যে। গুলিটা তার মাথার ডান পাশের এক গুচ্ছ চুল তুলে নিয়ে চলে গেল।

লোকটা ভীষণ চমকে উঠল। ভয়ে আতংকে চুপসে গেল তার মুখ।

আহমদ মুসা দশ গুণার সাথে সাথেই সে চিৎকার করে উঠল। বলল, 'আমি বলছি, সব কথা আমি বলছি।'

আহমদ মুসা দশ না গুণে রিভলভার নামিয়ে নিয়ে বলল, 'বলুন, লাশ কেন চাচ্ছে আপনাদের সংগঠন?'

'আমাদের সংগঠন এই ধরনের একটা জেনোসাইড চাচ্ছে সারা বিশ্বকে পাশে পাবার জন্যে। বিশ্বের কাছে প্রমাণ করার জন্যে যে এই ভূখণ্ডের মানুষ

তুরস্কের হাতে নিরাপদ নয়, এই কথাও প্রমাণ করার জন্যে যে, এই ভূখণ্ড তুরস্কের অধীনে থাকতে পারে না।' বলল আগাসি খান জিয়ান।

'কিভাবে বিশ্বকে সব উল্লেখযোগ্য প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক পূর্ব তুর্কিস্তানের ২৪টি স্পটে এসে পৌঁছেছে। তারা সব হত্যার ফটো ও নিউজ সংগ্রহ করবে এবং আজ থেকে কয়েকদিন পূর্ব-তুর্কিস্তানের এ ঘটনাই বিশ্বের প্রধান নিউজ হবে। ছবি ও নিউজের অব্যাহত প্রচার এমন জনমত গঠন করবে যা তুরস্ককে একঘরে করে পূর্ব আনাতোলিয়াকে একটা স্বাধীন আর্মেনীয় রাষ্ট্রে পরিণত করবে। যেমনটা পূর্ব তিমুরের ক্ষেত্রে হয়েছে।' কথা শেষ করল আগাসি খান জিয়ান।

আহমদ মুসার মুখে অবাক বিস্ময়ের ছাপ। আহমদ মুসা অনেক কিছু ভেবেছে, কিন্তু এই সংঘাতিক বিষয়টা তার ভাবনায় আসেনি। একটা রাষ্ট্রের একটা অঞ্চলকে নিয়ে কি ভয়ানক ষড়যন্ত্র!

আহমদ মুসা আগাসি খান জিয়ানকে ধন্যবাদ দিয়ে পকেট থেকে মোবাইল বের করে জেনারেল মোস্তফাকে আগাসি খান জিয়ান যা বলল সব জানাল।

'ধন্যবাদ আহমদ মুসা। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। তুরস্ককে আপনি বাঁচালেন। ২৪টি স্পটের বিক্ষোভের স্থানে গুলি করার জন্যে যারা নির্ধারিত তারা সকালের অনেক আগেই গ্রেফতার হবে। তাদের সবার বাড়ি ঘিরে রাখা হয়েছে। আপনার এই টেলিফোনের অপেক্ষায় ছিলাম শুধু। তারা ২৪টি স্পটের কোথাও জমায়েত হতে পারবে না তার ব্যবস্থা ভোর হওয়ার আগেই সম্পন্ন হবে। বিদেশী প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সংবাদিকরা সব জায়গায় শান্তি শৃঙ্খলা দেখতে পাবে। আপনি ডিজিপি মাহির হারুনকে আমার সাথে কথা বলতে বলবেন। আমি সেনা প্রধান, পুলিশ প্রধান এখন প্রধানমন্ত্রীর অফিসে বসে আছি। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আহমদ মুসা। আস্-সালামু আলাইকুম।' মোবাইলে কথা শেষ হতেই আগাসি খান জিয়ান বলল, 'স্যার, এই ষড়যন্ত্রই শেষ নয়। এর চেয়েও ভয়াবহ এক ষড়যন্ত্র তারা এঁটেছে।'

'কী সেটা?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'আদিগন্ত এক সমুদ্রের বিশাল জনমানবহীন এলাকার একটা দ্বীপে ইউরোপ আমেরিকাসহ কিছু দেশের আলট্রান্যাশনালিস্ট মন্ত্রীদের যুক্তফ্রন্ট ব্ল্যাকহেড সিন্ডিকেটের রাজ্য গঠন হচ্ছে। অস্ত্র-শস্ত্রসহ সব ধরনের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা তাদের থাকবে। গণতন্ত্র, ধর্মসহ সব ধরনের নীতি-নৈতিকতার তারা বিরোধী। পশ্চিমের কিছু দেশ ও সরকারও তাদের টার্গেট। কিন্তু প্রধান টার্গেট হলো ইসলাম ও মুসলমানরা। কারণ তারা মনে করে আজকের দুনিয়ায় ইসলামই একমাত্র নৈতিক বিধানের ধর্ম। তাই ইসলাম তাদের প্রথম টার্গেট। মুসলিম দুনিয়ার সফল রাজনীতিক, সফল বিজ্ঞানী, সফল শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের শত্রু। ইতোমধ্যেই বেশ কয়েকজন সফল বিজ্ঞানী, সফল রাজনীতিক, সফল শিক্ষাবিদকে কিডন্যাপ, নিষ্ক্রিয় ও ইলিমিনেট করা হয়েছে। এটা সময়কে তারা নির্দিষ্ট করেছে। এই সময়ের মধ্যে তারা ইলিমিনেশন প্রোগ্রাম শেষ করবে।' থামল আগাসি খান জিয়ান।

'কিন্তু তাদের আল্টিমেট টার্গেট কী? তারা কোন লক্ষ্যে পৌঁছাতে চায়?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'সেটা আমি জানি না স্যার। ঘটনাক্রমে আমি এ বিষয়টা জানতে পারি এবং আমি নিজে মানবতা বিরোধী এই কাজকে সমর্থন করি না বলেই বিষয়টা আপনাকে জানালাম।' বলল আগাসি খান জিয়ান।

আগাসি খান জিয়ানের এই কথাগুলোর একটা বর্ণও আহমদ মুসার কানে প্রবেশ করেনি। তার মনে পড়ে গিয়েছিল কয়েকদিন আগে ভ্যান টাইমসে পড়া একটা ছোট খবরের কথা। খবরে রহস্যপূর্ণভাবে হারিয়ে যাওয়া কয়েকজন মানুষের কথা বলা হয়েছিল। বিভিন্ন দেশ থেকে দুইজন বিজ্ঞানী, তিন জন রাজনীতিক ও চারজন বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষাবিদ হারিয়ে যাওয়ার খবর ছিল ঐ নিউজ আইটেমে। সবাই মুসলিম দেশের নাগরিক এবং হারিয়ে যাওয়া লোকরা সবাই ছিল মুসলিম। নিউজের বিষয়টা মনে হতেই আঁৎকে উঠল আহমদ মুসা। খবরটা মিলে যাচ্ছে আগাসি খান জিয়ানের কথার সাথে।

'আচ্ছা, ব্ল্যাকহেড সিন্ডিকেটের লোকদের রাজনৈতিক মতাদর্শ কী?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘কিছু আলোচনা আমি শুনেছি, তাতে আমার মনে হয়েছে, ওরা দুনিয়ায় হোয়াইটদের সুপ্রিম্যাসি এবং হোয়াইটদের ধর্ম ক্রিশ্চিয়ানিটি ও ইহুদিবাদের সুপ্রিম্যাসি চায়।’ বলল আগাসি খান জিয়ান।

‘কিন্তু ইহুদি ধর্ম তো হোয়াইটদের নয়, সেমিটিকদের। এখনও তাদের ধর্মগোষ্ঠীকে সেমেটিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখায় সফল হয়েছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আপনার কথা ঠিক। গত দেড়শ’ বছরের খ্রীস্টান ইভানজেলিস্ট আন্দোলন একটি রাজনৈতিক লক্ষ্যে খ্রীস্টান ও ইহুদিদের একটা ঐক্য গড়তে সমর্থ হয়েছে। এখন খ্রীস্টানরা একথা বলছে যে, আরাইলই হবে যিশুখ্রীস্টের শেষ যুদ্ধের শেষ রঙ্গমঞ্চ। অতএব, ইসরাইল শুধু ইহুদিদের নয়, খ্রীস্টানদেরও। এই লক্ষ্যে খ্রীস্টান ও ইহুদিদের নতুন প্রজন্ম একটা ঐক্য গড়ে তুলেছে।’ আগাসি খান জিয়ান বলল।

‘হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। এ বিষয়ে আমারও কিছু জানা আছে। এটা একটা ডেকোরাম কোয়ালিশন। ব্ল্যাকহেড সিন্ডিকেটের এটাই যদি রাজনৈতিক মতাদর্শ হয়, তাহলে তা খুবই বিপজ্জনক হবে।’

বলেই আহমদ মুসা তাকাল ডিজিপি মাহির হারুনের দিকে। বলল, ‘আমি এখন উঠব। কাজ এখানে শেষ। আপনি এই তিনজনকে পুলিশ কাস্টডিতে পাঠিয়ে দিন। আমি এদের ব্যপারে সরকারকে বলব, যাতে এদেরকে আসামী নয়, সাক্ষী বানানো যায়।’

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়ালো।

ডিজিপি মাহির হারুন ও খাল্লিকান খাচিপ তাকাল আহমদ মুসার দিকে। তাদের চোখে অসীম শ্রদ্ধার বহিপ্রকাশ। ওরা কিছু বলতে চেয়েও পারল না। আমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটা শুরু করেছে গাড়ির দিকে।

সদ্য বিবাহিত ড. আজদা আয়েশা ও ড. মোহাম্মদ বারজেনজো, দু'জনেই বর ও বধূবেশে এসে সালাম করল আহমদ মুসাকে! তাদের দু'পাশে দু'জনের পরিবারের সিনিয়র সদস্যরা।

আহমদ মুসা ড. আজদা ও ড. বারজেনজো-কে দোয়া করে বলল, 'তোমরা নবী-নন্দিনী ফাতেমা (রাঃ)ও হযরত আলী (রাঃ)-এর মত হও।'

অশ্রু গড়াচ্ছিল বর-বধুর চোখ থেকে।

পাশে দাঁড়ানো ড. বারজেনজো'র পিতা বলল, 'স্যার, আপনি শুধু দু'জনকে, দুই পরিবারকে নয় দুই বিবাদমান কম্যুনিটিকে একাত্ম করেছেন। আপনি আমাদের তুরস্ককে বাঁচিয়েছেন যেমন, তেমনি বাঁচিয়েছেন দুই কম্যুনিটিকে।' তার কণ্ঠ আবেগরুদ্ধ হয়ে উঠেছিল শেষ দিকে।

'দুই কম্যুনিটিকে একাত্ম শুধু নয়, আমাদেরকেও একটা অন্ধকার গহ্বর থেকে তুলে এনেছেন। আমাদের ঈমান ফিরে পেয়েছি। আমাদের রাজনীতিও হয়েছে পরিশুদ্ধ। আমাদের পরিবার ও আমাদের কম্যুনিটি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।' বলল মস্কো থেকে আসা ড. আজদার বাবা। তারও কথাগুলো শেষে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল।

'আমি শুধু নিমিত্ত মাত্র। আল্লাহর ইচ্ছাই বাস্তবায়িত হয়েছে।' আহমদ মুসা বলল।

স্যার, সকলের ইচ্ছায়ই 'ভ্যানে'ই বিয়ের আনুষ্ঠান হলো। আগামী পরশু আমাদের গ্রামের বাড়ি আরিয়াসে উভয় পক্ষ থেকে যৌথভাবে অনুষ্ঠান হবে, সেখানে আপনি প্রধান অতিথি। আজই আপনাকে আমরা সেখানে নিয়ে যাব। বর-বধু বাসর হবে।' বলল ড. আজদার মা।

আহমদ মুসা শুনে হাসল। বলল, 'যেতে পারলে খুশি হতাম। কিন্তু আমার ফ্লাইট আজ সাড়ে ১২টায়।'

চমকে উঠল ড. আজদা এবং ড. বারজেনজো, দু'জনেই। বলল ড. আজদা, 'সাড়ে ১২টায় আপনার ফ্লাইট? কোথায় যাবেন? আমরা তো কেউ জানি না!'

'আমার এ ফ্লাইট যাবে মদিনা শরীফে।' বলল আহমদ মুসা।

‘কোথায় ভাইয়া, জরুরী কাজটা কী? আর কোন আজদা আপনাকে ডেকেছে?’ বলল ড. আজদা। বলতে বলতে সে কেঁদে ফেলল।

‘না বোন, এবার কোন আজদার সন্ধানে নয়, এবার আমার যাত্রা একটি দ্বীপের সন্ধানে।’

বলেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল হাতঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে। ফিরে তাকাল টার্কিস এয়ার লাইন্সের এক অফিসারের দিকে। বলল, ‘দেরি করে ফেললাম কি খুব?’

‘না স্যার, আপনার জন্যে একটা বিশেষ বিমান তুরস্ক সরকার ব্যবস্থা করেছেন। অসুবিধা নেই।’ বলল টার্কিস এয়ার লাইন্সের অফিসার।

আহমদ মুসা সবাইকে সালাম দিয়ে টার্কিস এয়ার লাইন্সের অফিসারের সাথে হাঁটতে লাগল।

ফিরে তাকাল না পেছনে। অশ্রু ও স্নেহের বাঁধনের কাছে সে খুব দুর্বল। সে জন্যেই অতীতের দিকে তাকাতে তার ভয় হয়। ভয় হয় ফাতেমা ফারহানা, মেরী, আয়েশা আলিয়েভা, তাতিয়ানা, মেইলিগুলিদের মুখ সামনে আনতে।

আহমদ মুসারও চোখের দু’কোণ ভিজে উঠেছিল। আঙুল দিয়ে চোখটা মুছে ফেলে হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল আহমদ মুসা।

পরবর্তী বই

# একটি দ্বীপের সন্ধানে

**কৃতজ্ঞতায়ঃ**

1. Ferdous Al Quraeshi
2. Bondi Beduyin

## সাইমুম-৫০

# একটি দ্বীপের সন্ধানে

আবুল আসাদ

# ১

আহমদ মুসা কফির কাপে চুমুক দিতে যাচ্ছিল।

আহমদ আবদুল্লাহ ছুটে এসে আহমদ মুসার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঝাঁকুনি লেগে কিছুটা কফি পড়ে গেল আহমদ মুসার শার্টে।

আহমদ মুসার এপাশে বসে জোসেফাইনও কফি পান করছিল।

তার মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠেছে। তাকিয়েছে সে আহমদ আবদুল্লাহর দিকে। বলল একটু শক্ত কন্ঠে, 'আহমদ আবদুল্লাহ! তোমার কাছে এমনটা আশা করিনি।'

কাপ থেকে কফি পড়ে যাওয়ায় আহমদ আবদুল্লাহ এমনিতেই অপরাধবোধ নিয়ে থমকে গিয়েছিল। তার উপর মায়ের বকুনি খেয়ে কেঁদে ফেলল। মায়ের এ ধরনের বকুনি তার কাছে নতুন।

আহমদ মুসা কফির কাপ পিরিচে রেখে আহমদ আবদুল্লাহকে টেনে নিল কোলে। বলল, 'না বেটা, তোমার আম্মা তোমাকে বকেনি। উপদেশ দিয়েছে। মা তো ছেলেকে উপদেশ দেবেই।'

জোসেফাইন হাসল। আহমদ আবদুল্লাহর মাথায় হাত বুলিয়ে তার চোখ মুছে দিয়ে আদর করে বলল, 'খুব ভালো ছেলে তুমি।'

দরজায় নক করে একটু পরে ড্রইংরুমে প্রবেশ করল আয়া। ট্রেতে কফির দু'টি কাপ তুলে নিতে নিতে আহমদ আবদুল্লাহকে বলল, 'আহমদ আবদুল্লাহ, তুমি চলে এসেছ, আমাদের খেলা এখনো তো শেষ হয়নি!'

আহমদ আবদুল্লাহ আহমদ মুসার কোল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ওহ! গুড আন্টি।' বলেই ছুটে গেল আয়ার দিকে।

ওরা চলে গেল ভেতরে।

আহমদ মুসা উঠে গিয়ে স্ট্যান্ড থেকে কয়েকটা দৈনিক পত্রিকা ও ম্যাগাজিন নিয়ে এসে টি-টেবিলে রেখে বসল সোফায়। বলল, 'আজকের কাগজগুলো দেখেছ জোসেফাইন?'

জোসেফাইন টি-টেবিল থেকে একটা ম্যাগাজিন তুলে নিয়ে বলল, 'দৈনিক পত্রিকা আমি তোমার পরে পড়ি। এতে তোমার কাছে শোনার পর আমার কম পড়লেই চলে।'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'সময় ও পরিশ্রম কমানোর সুন্দর কৌশল তোমার। ধন্যবাদ জোসেফাইন।'

'এসব হিসেব তোমার কাছ থেকেই শেখা জনাব।' বলল জোসেফাইন হাসির সাথে।

আহমদ মুসা একটা ইংরেজি দৈনিক খুলে পাতায় চোখ বুলাতে বুলাতে বলল, 'তোমার সময়ের সেভিংটা কোন দিকে যাচ্ছে?'

'যে দিকে সব মেয়ের যায়।' বলল জোসেফাইন।

'মানে সংসার, কিন্তু তুমি তো সব মেয়ের মত নও।' আহমদ মুসা বলল।

'আমি সব মেয়ের মত নই। তবে যাদের সংসার আছে, আমি সেই মেয়েদের মতই।' বলল জোসেফাইন।

'তুমি মারিয়া জোসেফাইন। ফরাসি রাজকণ্যা। দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ সব ব্যাপারে আপ-টু-ডেট। তুমি সংসারের চার দেয়ালের মধ্যে থাকবে, এটা আমকে বিশ্বাস করতে বল?' কাগজ থেকে মুখ তুলে মিষ্টি হেসে বলল আহমদ মুসা।

'পৃথিবীর মধ্যে যেমন সংসারের চার দেয়াল, তেমনি সংসারের চার দেয়ালের মধ্যে পৃথিবী থাকতে পারে।' বলল জোসেফাইন।

‘যাক, আমি আশ্বস্ত হলাম। ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম বাইরে থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে কিনা? ধন্যবাদ জোসেফাইন।’ আহমদ মুসা বলল।

‘বিশ্বাসটা অত দুর্বল হয়ে পড়েছিল কেন?’ বলল জোসেফাইন।

‘বিশ্বাস দুর্বল হয়নি, একটু ভয় ঢুকেছিল মাত্র।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কেন?’ জিজ্ঞাসা জোসেফাইনের।

‘বাচ্চা পাওয়ার পর মেয়েরা কনজারভেটিড হয়। বাচ্চার স্বার্থ মানে সংসারের স্বার্থের ব্যাপারে বেশি সচেতন হয় তারা।’ আহমদ মুসা বলল।

‘এটা কি খারাপ, যদি তা অন্যের ন্যায্য স্বার্থের কোন হানি না ঘটায়?’ হাতের ম্যাগাজিনটা বন্ধ করল জোসেফাইন।

‘অবশ্যই খারাপ নয়। তবে পৃথিবী কোন না কোন উপকার থেকে বঞ্চিত হতে পারে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমি তো বলেছি, সংসারের স্বার্থ ও পৃথিবীর স্বার্থ সাংঘর্ষিক নয়, যদি ভারসাম্য রাখা হয়।’ জোসেফাইন বলল।

‘ধন্যাবাদ!’ বলে আহমদ মুসা একটু ঝুঁকে জোসেফাইনের একটা হাত হাতে নিয়ে জোসেফাইনকে কাছে টেনে নিতে চাইল। জোসেফাইন দ্রুত নিজের হাত খুলে নিয়ে একটু সরে বসে হেসে বলল, ‘না জনাব, অন্য চিন্তা বাদ! ১০টার সময় তোমার এ্যাপয়েন্টমেন্ট সৌদি পুলিশ প্রধানের সাথে। পত্রিকা পড়ার জন্যে এখন যথেষ্ট সময় নেই।’

‘অনেক ধন্যবাদ! ’ বলল আহমেদ মুসা।

হাতের দৈনিকটির দিকে মনোযোগ দিতেই একটা সিংগল কলাম বক্স নিউজের উপর চোখ দু’টো আটকে গেল আহমদ মুসার। নিউজটার হেডিং ‘প্রতিভাধর ব্যক্তিদের নিখোঁজ হওয়ার উদ্বেগজনক রহস্য।’ খবরটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পদার্থ বিজ্ঞানের বেসরকারি বিখ্যাত ল্যাবরেটরি ‘সায়েন্স টুমরো’-এর এন্টিম্যাটার বিজ্ঞানী ড. ওমর আবদুল্লাহর দু’দিন আগে নিখোঁজ হবার তথ্য দিয়ে বলেছে, শুধু গত এক মাসেই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আরও পাঁচজন প্রতিভাধর ব্যাক্তি নিখোঁজ হয়েছেন। এদের মধ্যে তিনজন পদার্থ বিজ্ঞানী, একজন জেনেটিক বিজ্ঞানী ও একজন মেরিন বিজ্ঞানী।

ভ্রু কুঁচকালো আহমদ মুসা। উদ্বেগ ফুটে উঠল আহমদ মুসার চোখে-মুখে। মাত্র এক মাসে ছয়জন নিখোঁজ।

পত্রিকার উপর থেকে মুখ তুলে জোসেফাইনের দিকে তাকিয়ে আহমদ মুসা বলল, 'জোসেফাইন, সেই দু:সংবাদের খবর আবার।'

'কি খবর?' জিজ্ঞাসা জোসেফাইন।

'আর একজন বিজ্ঞানীর নিখোঁজের খবর।'

'এই মাসেই ৬জন বিজ্ঞানী প্রতিভা নিখোঁজ হলেন জোসেফাইন।' বলল আহমদ মুসা।

'এই ইন্টেলিজেন্স ম্যাগাজিনেও দেখছি এ ব্যাপারে নিউজ আছে।'

'কি আছে?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'ঐ ধরনের নিখোঁজ সংবাদ। আরও বিস্তারিত।'

ভ্রু কুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার। বলল, 'বল তো কি আছে নিউজে?'

গোটা নিউজের উপর চোখ বুলাল জোসেফাইন। বলল, 'গত এক বছরে নিখোঁজ হওয়ার হিসাব দেয়া হয়েছে এই নিউজে, সেই সাথে কিছু বিশ্লেষণও দেয়া হয়েছে এই নিউজে। ৫১ জন বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞ প্রতিভা গত এক বছরে নিখোঁজ হয়েছেন। এদের মধ্যে ২১ জন পদার্থ বিজ্ঞানী। পদার্থ বিজ্ঞানীদের মধ্যে এন্টিম্যাটার বিজ্ঞানী ১১জন, কণাবিজ্ঞানী ৭ জন এবং ৩ জন মেরিন বিজ্ঞানী। এই ২১ জন ছাড়া অবশিষ্ট ৩০ জনের মধ্যে রয়েছেন ইতিহাস, অর্থনীতি, ভূগোল, রসায়ন জীব-বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি বিষয়ের বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী এবং আরও রয়েছেন কয়েকজন প্রতিভাবান রাজনীতিক। নিউজে আরেকটা বিশ্লেষণও দেয়া হয়েছে। সেটা ধর্মীয় পরিচয়মূলক। গত এক বছরে মোট ৫১ জন নিখোঁজ ও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ৪৫ জনই মুসলিম। সবশেষে নিউজে লেখা হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নিখোঁজ এই বিজ্ঞানীদের কারোরই খোঁজ পাওয়া যায়নি। বিষয়টি ইন্টারপোলও টেক-আপ করেছে, কিন্তু কোন ফল হয়নি। কারও হদিস মেলেনি। এটা যে সংঘবদ্ধ একটা অপরাধ এ বিষয়ে কারোরই আর কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই সংঘবদ্ধ চক্র কে তাও জানা যায়নি। দু'একটা নাম জানা গেলেও তাদের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।' থামল জোসেফাইন।

আহমদ মুসার চোখে-মুখে গভীর বেদনা ও অস্বস্তির চিহ্ন। বলল, ‘তাহলে যা আশঙ্কা করা হয়েছিল তাই। মুসলিম বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদের বিরুদ্ধেই এ অভিযান।’

বলল জোসেফাইন, ‘কেন, অমুসলিম বিজ্ঞানীও তো আছেন কয় জন।’

‘আছেন কয়েকজন। সেটা নিশ্চয় ক্যামোফ্লেজের জন্যে। যারাই এই অপরাধমুলক কাজের পেছনে থাক, বিজ্ঞানী-বিশেষজ্ঞদের নিখোঁজ করাই যদি তাদের লক্ষ্য হতো, তাহলে এত মুসলিম বিজ্ঞানী-বিশেষজ্ঞ নিখোঁজ হবার কথা নয়।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কেন?’ প্রশ্ন জোসেফাইনের।

‘কারণ এই মানের বিজ্ঞানী অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে আরও বেশি পরিমাণে আছে। এদিক থেকে চোখ একতরফাভাবে মুসলিম বিশেষজ্ঞদের প্রতি যাবার কথা নয়।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ঠিক। তাহলে কি টার্গেট মুসলিম বিজ্ঞানী-বিশেষজ্ঞরা? দেখা যাচ্ছে শুধু বিজ্ঞানী-বিশেষজ্ঞ ব্যাক্তিরাই নয়, প্রতিভাবন মুসলিম রাজনীতিকও তাদের টার্গেট। এর অর্থ কি? বিষয়টি আমার কাছে খুব গোলমেলে লাগছে।’ বলল জোসেফাইন।

‘ঠিক বলেছ জোসেফাইন। মোটিভটা খুব সরল নয়। বিজ্ঞানীদের সাথে সমাজবিজ্ঞানী ও রাজনীতিকরাও নিখোঁজ হওয়া উদ্বেগজনক।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কি সেটা?’ জিজ্ঞাসা জোসেফাইনের।

‘অত্যন্ত কৌশলে একটা সম্প্রদায়কে ধীরে ধীরে মেধাশূণ্য করার ভয়াবহ একটা ষড়যন্ত্র।’ আহমদ মুসা বলল।

চমকে উঠল জোসেফাইন। সামনে থেকে পর্দা সরে গেলে যা হয় তেমনি তার কাছে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। কেঁপে উঠল তার মন। ‘গত এক বছরেই ৫১ জন বিজ্ঞানী-বিশেষজ্ঞ! পরিস্থিতি ভয়াবহ!’ বলল জোসেফাইন।

‘সত্যিই এক ভয়াবহ ষড়যন্ত্র এটা! এর বিস্তারও দেখছি গোটা দুনিয়াব্যাপী।’

'হ্যাঁ জোসেফাইন, নিখোঁজের স্পট ছড়িয়ে আছে গোটা দুনিয়ায়। তার মানে গোটা দুনিয়া এদের নেট ওয়ার্কের আওতায়।' বলল আহমদ মুসা।

জোসেফাইন উঠে গিয়ে আহমদ মুসার পাশে তার গা ঘেঁষে বসল। বলল, 'কেসটা তুমি নিচ্ছ।'

'নিচ্ছি নয়, কে দেবে এ কেস আমাকে? এর তো কোন বাদী নেই। পৃথিবীর মানুষ, মানবতা এর বাদী। কিন্তু মানুষ ও মানবতার কোন মুখপাত্র নেই। মানব জাতির একজন সদস্য হিসাবে আমি, তুমিই এর বাদি। আমাদের পক্ষ থেকেই আমি এ কেস গ্রহণ করেছি।' আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ। আল্লাহ সাহায্য করুন! এ এক অন্ধকারে ঢাকা কঠিন পথ তোমার।' বলল জোসেফাইন।

'ঠিক জোসেফাইন। একবারেই অন্ধকারে ঢাকা পথটা। একটা সন্ত্রাসী সংগঠনের নাম মাত্র শুনেছি। এর বাইরে আর কিছু অবলম্বন হাতে নেই। সন্ত্রাসী সংগঠনটির নামটাও অদ্ভূত: "ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেট"। সেদিন সৌদি পুলিশ হেডকোয়ার্টারে গিয়েছিলাম। ওদের রেকর্ডে এমন কোন সংগঠনের নাম নেই। সৌদি পুলিশ প্রধান পরে কথা বলেছেন মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই ও বৃটেনের এস-১০ এর প্রধানদের সাথে। তারাও জানিয়েছেন, এ ধরনের কোন ওয়ার্কিং সন্ত্রাসী সংগঠন বা গোপন কোন সংস্থার নাম তাদের রেকর্ডে নেই। এই বিষয়টিই আমাকে খুব বেশি বিস্মিত করেছে। তাদের নজরের বাইরে কোন সন্ত্রাসী সংগঠন বিশ্ব জুড়ে কাজ করছে, এটা অবিশ্বাস্য।'

ভাবছিল জোসেফাইন।

আহমদ মুসার কথা শেষ হলেও কথা বলল না জোসেফাইন। কিছু একটা খোঁজার চিহ্ন তার চোখে-মুখে। হঠাৎ তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'একটা মজার নামের মিলের কথা তোমাকে বলি। সায়েন্স ফিকশনে আমি "ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেট"- এর নাম পড়েছি। সেই নামের সাথে এই গোপন সংগঠনের নাম কিন্তু একদম মিলে যায়!'

আহমদ মুসার চোখে-মুখে বিস্ময় নেমে এল! সেই সাতে প্রচন্ড উচ্ছাসে তার মুখ ফেঁড়েই যেন বেরিয়ে এল প্রশ্ন, ‘আশ্চর্য, একই নাম, ব্লাক সান সিন্ডিকেট!’

‘হ্যাঁ, ব্ল্যাক সান সিন্ডিককেট।’ বলল জোসেফাইন।

কপাল কুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার।

‘সায়েন্স ফিকশনের মত সংগঠন এটা?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘সন্ত্রাসবাদী সংগঠন। অত্যান্ত পাওয়ারফুল। এর ক্ষমতার বিস্তার ছিল আমাদের গোটা ছায়াপথ-গ্যালাক্সি জুড়ে।’ বলল জোসেফাইন।

‘মজার ব্যাপার তো! এদের পরিচয় সম্পর্কে আর কি আছে সায়েন্স ফিকশনে?’ আহমদ মুসা বলল।

‘ওদের কথা তোমার কোন কাজে আসবে? ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেট আমাদের ছায়াপথ-গ্যালাক্সির বিভিন্ন গ্যালাকটিক কিংডমগুলোতে সন্ত্রাস, কালোবাজারি ইত্যাদিসহ এমন কোন অপরাধ নেই যার সাথে তারা জড়িত ছিল না। তাদের উপস্থিতি, প্রভাব-প্রতিপত্তির অধীনে ছিল প্রায় গোটা গ্যালাক্সির গ্যালাকটিক রাজ্যসমূহ। ছায়াপথ-গ্যালাক্সির কেন্দ্রীয় সরকারেএ সিনিয়র দু’জন সামরিক অফিসার, ডারথ সিডিয়াম ও ডারথ মাউল, ব্লাক সান সিন্ডিকেট সম্পর্কে বলেছেন, এটা বিশাল এক ক্রিমিনাল সিন্ডিকেট। এই সিন্ডিকেটের প্রভাব-প্রতিপত্তি পৃথিবীর সমূহ অঞ্চল থেকে শুরু করে গ্যালাক্সির প্রান্ত পর্যন্ত সব গ্রহে পরিব্যাপ্ত। যে সম্পদ এদের হাতে আছে, তা সীমাহীন। এদের সৈন্য আছে লাখ লাখ। গ্যালাক্সির সাধারন বাসিন্দাদের মতে এই সিন্ডিকেট জানা মহাবিশ্বের অত্যান্ত ক্ষমতাধর সংগঠন। সায়েন্স ফিকশনে ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের অনেক উত্থান-পতনের কথাও বলা হয়েছে। খৃস্টের জন্মের প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে তাদের উত্থান। আর খৃষ্টপূর্ব ৩৩ বছর আগে তাদের মধ্যে ভাঙ্গন আসে। দু’বছরের মধ্যেই আবার সামলে ওঠে। ২৪ খৃষ্টাব্দে আবার ভেঙে পড়ে। কিন্তু পূর্ণ শক্তি ফিরে পায় আবার ১২৭ খৃষ্টাব্দের দিকে। গোটা গ্যালাক্সির রাজ্য-সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনে, সংঘাত-সংকটে এই সিন্ডিকেট বড় ভূমিকা পালন করেছে। সকল বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠার সামর্থ্য ওদের দেখা গেছে।’ থামল জোসেফাইন।

‘চমৎকার জোসেফাইন। চমৎকার কাহিনী ব্লাক সান সিন্ডিকেটের। নিশ্চয় আমাদের ব্লাক সান সিন্ডিকেট ছায়াপথ-গ্যালাক্সির আকাশচারী সন্ত্রাসী সংগঠনের নাম কপি করেছে। কেন করেছে? একথা জানান দেয়ার জন্যে কি যে, আন্ত:গ্রহ সংগঠন ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের মতই তারা ক্ষমতাধর?’

বলে একটু থেমেই আবার শুরু করল, ‘আচ্ছা, জোসেফাইন, কাহিনীর ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের প্রধান কাজটা কি ছিল?’

জোসেফাইন একটু ভেবে বলল, ‘তাদের সন্ত্রাস-দুর্নীতির আসল লক্ষ ছিল, আকাশ-রাজ্যের রাজ্যগুলোকে দুর্বল বা ধ্বংস করে নিজের রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা।’

‘তাহলে ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের আসল লক্ষ রাজনৈতিক। কিন্তু সেই রাজনৈতিক লক্ষটা কি? বিজ্ঞানী-বিশেষজ্ঞদের অপহরণ করানোর সাথে সে লক্ষের সম্পর্ক কি? স্বগতকন্ঠে বলল আহমদ মুসা।

‘এটা বলা মুশকিল। সায়েন্স ফিকশনের ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেট গেরিলাদের মত কাজ সব গোপনে করলেও সংগঠনটি গোপন ছিল না এবং কাজের ফলও প্রকাশ্যে ভোগ করতো। কিন্তু বাস্তবে ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেট সংগঠন হিসাবেও গোপন, তাদের কাজও গোপন। সুতরাং তাদের লক্ষ কি বলা মুশকিলই। রাজনৈতিক লক্ষ হলে তো তার জন্যে জনসমর্থন দরকার হয়। কিন্তু গোপন সংগঠন কাজ করে জনগণের সাথে পরিচিত হবে কি করে, জনসমর্থন পাবে কি করে? এ বিষয়টাই আমি বুঝতে পারছি না।’ বলল জোসেফাইন।

‘নিশ্চয় ওদের একটা রাজনৈতিক লক্ষ আছে এবং সে লক্ষ অর্জনে ওদের রোড ম্যাপও নিশ্চয় আছে। সেটা জানাও দরকার। কিন্তু এই মুহুর্তে এটা খুব বিষয় নয়। ওদের সন্ধান পাওয়ার বিষয়টিই এখন বড়। আমাদের মনোযোগটা সেদিকেই আকৃষ্ট করবো।’

কথা শেষ করে একটু থেমেই আহমদ মুসা আবার বলল, ‘আচ্ছা জোসেফাইন, সায়েন্স ফিকশনের ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের প্রধান চরিত্রে কারা? তাদের তার কি কাজ ছিল, মনে আছে তোমার?’

‘কিছু তো মনে আছেই। আমাদের ছায়াপথ-গ্যালাক্সির কোটি কোটি তারকা ও গ্রহ রাজ্য নিয়ে যে গ্যালাকটিক সাম্রাজ্য তার সম্রাট পালপেটাইন ও এই রিপাবলিকেরর সবচেয়ে প্রভাবশালী স্কাই কমোন্ডো-কমান্ডার ডারথ তাদের। এই গ্যালাকটিক রিপাবলিক জুড়েই প্রতিদ্বন্দী কমান্ডো শক্তি হলো ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেট। গ্যালাকটিক সাম্রাজ্যে ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেট কবে থেকে কাজ শুরু করে তার কোন তথ্য ফিকশনে নেই। ছায়াপথ গ্যালাকটিক সাম্রাজ্যে রিপাবলিক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় থেকে মহাকাশ বর্ষ (BY-birth year) গণনা শুরু হয়। সায়েন্স ফিকশনে ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের প্রধান হিসেবে যার নাম প্রথম এসেছে, তিনি আলেক্সি গ্যারিন। তিনি BBY (befor birth year) অর্থ্যাৎ মহাকাশ বর্ষ-পূর্ব ৩৩ অব্দে ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের প্রধান ছিলেন। তার নেত্বেত্বে গোটা ছায়াপথ-গ্যালাক্সি জুড়ে ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু গ্যালাকটিক সাম্রাজ্যের প্রেসিডেন্টের নিয়োজিত কমান্ডো নেতা ডারথ মাউল ও তার বাহিনীর হাতে আলেক্সি গ্যারিন ও তার ভিগোজ বা গভর্নররা নিহত হন। এরপর ব্ল্যাক সান সিন্ডিক্েট তার ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া ও হারানো প্রভাব পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে অনেকগুলো সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। এই সময় গ্যালাকটিক সাম্র্যজ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। গৃহযুদ্ধের সুযোগে ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেট গ্যালাক্সি জুড়ে তার প্রভাব প্রতিষ্টার কাজে ব্রতী হয়। সময়টা মহাকাশ বর্ষ (ABY2) দ্বিতীয় অব্দের পরের ঘটনা। ডেল পারহি ছিলেন ব্ল্যাক সানের নেতা এ সময়। তাকে সরিয়ে দিয়ে ব্ল্যাক সানের ক্যাপ্টেন ফলিন গ্রহ-রাজ্যের প্রিন্স জিজর ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের ক্ষমতায় বসেন। প্রিন্স জিজরের নেতৃত্বে ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের প্রভাব সর্বোচ্চে উন্নীত হয় এবং প্রিন্স জিজর গ্যালাকটিক রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট পালমেটাইন ও তাঁর প্রধান সেনাপতি কমান্ডো নেতা ডারথ ভাদেরের পরে তৃতীয় প্রভাবশালী ব্যাক্তিতে পরিণত হয়। প্রিন্সের বডিগার্ড ও ব্যাক্তিগত কমান্ডো গৌরী ছায়াপত সাম্রাজ্যের সবচেয়ে শক্তিশালী ও প্রভাবশালী মহিলায় পরিণত হয়। অবশেষে ডারথ ভাদেরের সাথে বিরোধে জড়িয়ে পড়লে প্রিন্স জিজরের এলাকারই এক কক্ষপথে এক সংঘর্ষে ডারথ ভাদেরের ব্যাক্তিগত আকাশযান এক্সিকিউটর প্রিন্স জিজরের ব্যক্তিগত আকাশযান স্কাইলুককে প্রিন্স

জিজরসহ ধ্বংস করে দেয়। আর এই সময়েই ভাদেরের ছেলে স্কাই ওয়াকার তার কমান্ডো বাহিনী নিয়ে প্রিন্স জিজরের প্রাসাদ ও হেডকোয়ার্টার ধ্বংস করে দেয়। ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের আর একবার পতন ঘটে। নতুন নতুন নেতৃত্ব ব্ল্যাক সানকে প্রভাব-প্রতিপত্তির আগের জায়গায় নিয়ে আসার চেষ্ঠা করে, যাদের একজন প্রিন্স জিজরের ভ্রাতুষ্পুত্র সাভান ও আরেকজন হলেন জোডি ডেক। অবশেষে একটা বড় বিপদ ব্ল্যাক সানকে উত্থানের সুযোগ করে দেয়। গ্যালাকটিক সাম্রাজ্যের সম্রাট ব্ল্যাক সানকে সমূলে উচ্ছেদ করতে চাইলেন। এজন্য তিনি কেসেল গ্রহের জেল কলোনি থেকে ভয়ংকর ব্যাগ স্কোয়াড্রনসহ সব ক্রিমিনালকে ছেড়ে দিয়ে ব্ল্যাক সানের হেডকোয়ার্টার গ্রহ কুরুস্ক্যান্টে ঢুকিয়ে দিলেন। সেই সাথে তাদের সংগে অনুপ্রবেশ ঘটান সাম্রাজ্যের গোয়েন্দাদের যারা ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের উৎখাত সম্পূর্ন করবে। কিন্তু গ্যালাকটিক সম্রাট বিপরীত ফল ফলাল। জেল থেকে ছাড়া পাওয়া জেকা থাইন ও মফ ফ্লেরীর মত ভয়ংকর ক্রিমিনালরা ব্ল্যাক সান সিন্ডিককেটের পুনরুজ্জীবন ঘটাল। ইউল আসিব-এর নেতৃত্বে ব্ল্যাক সান, এমনকি সম্রাটের রুলিং কাউন্সিল নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার চেষ্ঠা করল। ব্যর্থ হলেও সেথ্রোস-এর নেতৃত্বে ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেট গোটা ছায়াপথ-গ্যালাক্সি ও গ্যালাক্সির গুরুত্বপূর্ণ লোকেশনে পৌছে যায়। কিন্তু এক সময় বিপদ নামে আবার তাদের উপর। গ্যালাকটিক সাম্র্যজ্যের বাহিনীর কাছে তারা পরজিত হয়। নিহত ও গ্রেফতার হয় ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের হাজার হাজার কমান্ডো। কিন্তু গ্যালাকটিক সাম্রাজ্যের ক্ষমতার লড়াই নিয়ে গৃহযুদ্ধের সুযোগে ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেট আবার সংগঠিত হয় এবং তাদের ক্ষমতা ফিরে পায়। কিন্তু বহু শতাব্দীর নীতি-পদ্ধতি পরিত্যাগ করে ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেট প্রকাশ্য সংগঠনে রূপ নিয়েছে। তাদের অফিস ও মহাকাশযানে এখন তাদের পতাকা ওড়ে। কিন্তু অপরাধমূলক কাজ তারা পরিত্যাগ করেনি। তবে তাদের প্রধান তৎপরতা এখন ছায়াপথ-গ্যালাক্সির আউটার স্পেসে। ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের অন্যান্য প্রধান চরিত্রের মধ্যে রয়েছে জাল সান, জারা, জিলাস, মেদিন, গ্রান্ট, টাইরেলি, নাশকা, নিলান্না ক্রিনিন। এরা সবাই আঞ্চলিক গভর্নর পর্যায়ের। বিখ্যাত কমান্ডো যারা নেতাদের

সিকিউরিটি হিসাবে কাজ করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছে ইভা, উইবো, জুটি। আর গৌরীর কথা তো আগেই বলেছি।’ থামল জোসেফাইন।

‘ধন্যবাদ জোসেফাইন। ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের এক কথা, এত নাম তোমার এভাবে মনে আছে! অনেক ধন্যবাদ তোমাকে।’

থামল একটু আহমদ মুসা। থেমেই আবার শুরু করল, ‘তাহলে দেখা যাচ্ছে জোসেফাইন, ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেট নিছক ক্রিমিনাল অর্গানাইজেসন নয়। ছায়াপথ সাম্রাজ্য দখলও তার লক্ষের মধ্যে রয়েছে।’

‘হ্যাঁ, তারা সাম্রাজ্যের রুলিং কাউন্সিল দখলেরও চেষ্টা করেছে। কিন্তু বলা মুশকিল ক্রাইম তাদের টার্গেট, না ক্ষমতা তাদের টার্গেট।’ বলল জোসেফাইন।

‘এটাই আসল কথা। আমার মনে হচ্ছে, নিছক ক্ষমতা তাদের টার্গেট নয়, ক্ষমতা তাদের কাছে বাড়তি উপলক্ষ। আসল টার্গেট তাদের অপরাধ-সাম্রাজ্যের নেতৃত্ব।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ঠিক বলেছ। কিন্তু রাষ্ট্র ক্ষমতার নেতৃত্ব থেকে ওদের অপরাধ-সাম্রাজ্যের নেতৃত্ব বড় হলো কেন?’ জিজ্ঞাসা জোসেফাইনের।

‘রাষ্ট্র একটা আইনের অধীন হয়, সরকারকেও আইন মেনে চলতে হয়। আর অপরাধ-সাম্রাজ্যের নেতাদের কথাই আইন, তারাই সব কিছুর নিয়ন্ত্রক। এটা এক ধরনের পাপ। পাপ মানুষকে ঐ বিকৃতির দিকে নিয়ে যায়। আহমদ মুসা বলল।

‘বুঝেছি, কাহিনীর এটাই স্বাভাবিক পরিণতি। ছোট পাপ বড় পাপ করায়। বড় পাপ মানুষকে অমানুষ বানায়। এই অমানুষরা অপরাধের সাম্রজ্যে গড়ে তোলে। যেমন ছায়াপথ সাম্রজ্যের ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেট।’

থামল জোসেফাইন। একটু ভাবল। তাকাল আহমদ মুসার দিকে। আবার বলে উঠল, ‘ছায়াপথের ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের কথা শুনলে, কি উপকার হলো তোমার? কি ভাবছ দুনিয়ার ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেট নিয়ে?’

‘ভাবছি এই ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেট এই নাম গ্রহণ করর কেন? ছায়াপথ সাম্রাজ্যের ব্ল্যাক সিন্ডিকেটের কোন জিনিসটা এদের ভাল লেগেছে? গ্যালাকটিক

সাম্রাজ্যে ওরা যে সব অপরাধ করতো, সে সবের সাথে এদের অপরাধের মিল নেই। আন্ত:গ্রহ ও তারকালোকের ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেট প্রতিপক্ষ হিসেবে ছায়াপথ-রাষ্ট্রের সরকারি বাহিনীর সাথে অবিরাম সংঘাতে লিপ্ত ছিল, কিন্তু ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেট কোন দেশের সরকারের সাথে কোন প্রকার সংঘাতে নেই। গ্যালাকটিক রাজ্যের ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেট একটা নির্দিষ্ট ও তার নিয়ন্ত্রিত এলাকায় তাদের হেড-কোয়ার্টার স্থাপন করেছিল এবং ছায়াপথ গ্যালাক্সিতে তাদেরর নিয়ন্ত্রিত বহু এলাকা ছিল। কিন্তু এই ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের এ রকম কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে না, আর কোন দেশে তাদের পক্ষে এমন একটা নিয়ন্ত্রিত এলাকা স্থাপন সম্ভব নয়। ভারতে মাওবাদীদের নিয়ন্ত্রিত বিশাল এলাকা আছে সত্য, কিন্তু মাওবাদীরা এই ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের মত সংগঠন নয়। মাওবাদীরা জনগণেরর ইস্যু নিয়ে জনগণকে সাথে নিয়ে তাদের যুদ্ধ চালাচ্ছে। আর ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেট তাদের গোপন এজেন্ডা নিয়ে বলতে গেলে জনগণের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ চালাচ্ছে। আমাদের এই গ্রহের ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের ছায়াপথ-রাজ্যের ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের একটা বড় মিল দেখা যাচ্ছে। সেটা হলো, ঐ ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের মত এরাও গোপনে তাদের তৎপরতা চালাচ্ছে। কিন্তু গোপনীয়তার এই এক মিলের কারণে এরা ঐ ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের নাম গ্রহণ করেছে, এই যুক্তি খুব শক্তিশালী নয়। তাহলে এ ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের এই নাম গ্রহনের আর কি কারন থাকতে পারে? ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটকে বোঝার ক্ষেত্রে এই প্রাথমিক বিষয়েরই কোন কূল-কিনারা পাচ্ছি না জোসেফাইন।' থামল আহমদ মুসা।

'আরেকটা উজ্জ্বল দিক ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের আছে। বহু শতাব্দি ধরে তারা এই নাম নিয়ে গোটা ছায়াপথ গ্যালাক্সিতে কাজ করছে। অদম্য তারা। সব বিপর্যয়ের মধ্যে থেকে তারা নতুন শক্তিতে জেগে ওঠে। সবশেষে তারা প্রকাশ্য নামে কাজ করছে আগের সেই একই লক্ষে। এই বৈশিষ্ট্য যে কোন সংগঠনের লোভনীয় হতে পারে।' বলল জোসেফাইন।

'ঠিক বলেছ জোসেফাইন। এটা হতে পারে। তাদের অদম্য বৈশিষ্ট্যের কারণেই এই ব্ল্যাক সান তাদের নাম গ্রহণ করেছে। কিন্তু ওদের উদ্দেশ্য ছিল

ছায়াপথ গ্যালাক্সির ক্রাইম-লর্ড হওয়া, গড-ফাদার হওয়া এবং পারলে এই গড ছায়াপথ গ্যালাক্সির শাসকও হয়ে বসা। তাহলে এই ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের উদ্দেশ্য কি?' বলল আহমদ মুসা্

মোবাইল বেজে উঠল আহমদ মুসার।

'একদিনে সব প্রশ্নের জবাব আসবে না। তুমি টেলিফোন ধর।' জোসেফাইন বলল।

আহমদ মুসা তুলে নিল মোবাইল।

আহমদ মুসা কল অন করে সালাম দিতেই ওপার থেকে কন্ঠ শুনতে পেল সৌদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর।

আহমদ মুসার কন্ঠ পেয়েই ওপার থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলল, 'মি. আহমদ, আমি একটু আপনার ওখানে আসতে চাই।'

'ওয়েলকাম, এখন কিংবা যে কোন সময়। কিন্তু কি ব্যাপার বলুন তো? আপনার নি:শ্বাস ফেলার সময় নেই। আপনি তো শুধুই বেড়াতে আসতে পারেন না, তাও রিয়াদ থেকে।' আহমদ মুসা বলল।

'একটা বিষয় নিয়ে আমি আপনার সাথে আলোচনা করতে চাই। বিষয়টা ছোট, কিন্তু ইন্টারেষ্টিং।' বলল সৌদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টেলিফোনের ও প্রান্ত থেকে।

'আমার তো দারণ আগ্রহ হচ্ছে। বলুন না বিষয়টা কি?' আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।।

'আপনি শুনে হয়তো হাসবেন! কিন্তু কি জানি বিষয়টা আমরা এড়াতে পারছি না।'

বলে একটু থামল সৌদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সংগে সংগেই আবার শুরু করল, 'আমাদের রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাডভান্সড টেকনলজি অব ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বিজ্ঞানী খালেদ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল-মক্কী একটা স্বপ্ন দেখেছেন। সে স্বপ্ন তিনি বলেছেন তার স্ত্রীকে। তার স্ত্রী স্বপ্নের তা'বীরের জন্যে যান ইমাম সউদ জামে মসজিদের খতিব প্রধান আলেমের কাছে। স্বপ্নের তা'বীর শুনে মুষড়ে পড়েন বিজ্ঞানীর স্ত্রী। তিনি বিজ্ঞানীর বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করে দেন। এ নিয়েই

বেঁধেছে সমস্যা। সরকার বিষয়টি নিয়ে বিজ্ঞানীর পরিবারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে দ্বিধা বোধ করছে।' থামল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

'মি, হোম মিনিষ্টার, স্বপ্নটা কি?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'একদিন তিনি গাড়ি ড্রাইভ করে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরছিলেন। তাঁর গাড়িটা যখন বিশ্ববিদ্যালয় ও তাদের কোন এক স্থানে পৌঁছেছে, তখন তিনি দেখতে পেলেন একজন লোক পাঁজাকোলা করে একজন মহিলাকে নিয়ে অস্থিরভাবে তাকে ডাকছে। ডাক শুনে বিজ্ঞানী সাহেব তাদের পাশে গিয়ে তার গাঁড়ি দাঁড় করালেন। গাড়ি পাশে দাঁড়াতেই লোকটি বলল, স্যার, আমি একজন ট্যুরিষ্ট। এখানে এসেছিলাম রিয়াদের সবচেয়ে প্রাচীন এই মসজিদ দেখতে। হঠাৎ আমার স্ত্রী সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছে। আমার স্ত্রী হার্ট-প্রব্লেম আছে। এখনি তাকে হাসপাতালে নেয়া দরকার, প্লিজ আমাকে সাহায্য করুন। 'অবশ্যই' বলে বিজ্ঞানী গাড়ির পেছনের দরোজা খুলে দিলেন। লোকটি সংজ্ঞাহীন স্ত্রীকে পেছনের সিটে তুলে দিয়ে সামনের সীটে এসে বসল। বিজ্ঞানী গাড়ি চালাচ্ছিলেন। আবার ড্রাইভিং সীটে বসলেন তিনি। বিজ্ঞানী গাড়ি ষ্ট্যার্ট দিতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় তিনি অনুভব করলেন তার মাথার পেছনে শক্ত কিছু এসে যেন ঠেকল! পেছন ফিরে তিনি দেখলেন তার মাথায় তাক করা রিভলবার! রিভলবার সেই মেয়েটির হাতে যাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় গাড়িতে তুলেছিল লোকটি। বিস্মিত, ভীত বিজ্ঞানী চোখ ফিরিয়ে চাইলেন পাশে বসা লোকটির দিকে। দেখলেন লোকটির বাম হাত তার দিকে উঠে আসছে। তার হাতে রুমাল। বিজ্ঞানী কিছু বুঝে ওঠা, বলার আগেই লোকটির রুমাল তার নাকের উপর চেপে বসল। তারপর আর কিছু তার মনে নেই। প্রায় সংগে সংগেই তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। এই হলো স্বপ্ন।' বলে থামল সৌদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

আহমদ মুসা হাসল না, বরং তার কপাল কুঞ্চিত হলো। 'মি. হোম মিনিষ্টার, বিজ্ঞানী কি নিয়ে গবেষণা করেন?

'উনি একজন বহুমুখী বিজ্ঞান প্রতিভা, জনাব। স্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং-এ তিনি বিশ্বের কয়েকজন বিরল প্রতিভার একজন। স্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেরিন ইঞ্জিনিয়ারি-এর তার সাম্প্রতিক দুই আবিষ্কার যুগান্তকারী।

কল্পনার ‘এন্টি-ম্যাটার ফুয়েল’-কে তিনি বাস্তবে নিয়ে এসেছেন। এই ‘এন্টি-ম্যাটার ফুয়েল’ ব্যবহারের উপযোগী স্পেস-ক্র্যাফটের ইঞ্জিনও তিনি তৈরী করেছেন। এই ইঞ্জিন হবে প্রচলিত ইঞ্জিনের চেয়ে প্রায় পঞ্চাম গুণ হালকা, কিন্তু স্পেস অতিক্রম করার কয়েক লক্ষ গুন বেশি। এই ইঞ্জিন ব্যবহারিক পর্যায়ে এলে আন্ত:তারকা, আন্ত:গ্যালাস্কি স্পেস ট্রাভেল সম্ভব হবে বলে মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে বিজ্ঞানী-এন্টি-ম্যাটার ব্যবহার উপযোগী হাল্কা এমন একটা মেরিন ইঞ্জিন ডেভলপ করেছেন যা আমাদের রোডকারের মত মেরিন কারে ব্যবহার করা যাবে।। এই ব্যবহার সফল হলে মহাসাগর-পরিবহনে একেবারে বিপ্লব এসে যাবে।’ থামল সৌদি স্বরাষ্টমন্ত্রী।

উজ্জল হয়ে উঠেছিল আহমদ মুসার চোখ-মুখ।

বলল, ‘আল-হামদুলিল্লাহ! এমন অবিশ্বাস্য প্রতিভা আমাদের আছে! কিন্তু তাকে নিয়ে তো কোন আলোচনা শুনিনি, তার এসব আবিষ্কারের কথাও শুনিনি কোথাও।’

‘তাকে নিয়ে কোন আলোচনা তিনি পছন্দ করেন না। তার গবেষণা-কর্মের বিষয়ও তিনি অপরিহার্য্য ক্ষেত্রগুলোর বাইরে যেতে দিতে চান না। তিনি কোনদিন কোন সংবাদ পত্রের পাতায়ও আসেননি। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক অধ্যাপকও তাকে চেনেন না।’ সৌদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলল।

‘আল-হামদুলিল্লাহ! আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি যে, তিনি দয়া করে এমন একটি প্রতিভা আমাদের মাঝে দিয়েছেন।’

বলে আহমদ মুসা চুপ করল। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল তার মুখ। চিন্তার একটা গভীর ছায়া তার চোখে-মুখে। সাম্প্রতিককালে কিডন্যাপ হওয়া বিভিন্ন শাখা ও পেশার শীর্ষ ব্যাক্তিদের কথা মনে পড়ল। সেই কিডন্যাপের স্বপ্ন দেখলেন উনি, যিনি একজন বিজ্ঞানী। এমন বিজ্ঞানী যিনি অনন্য, অবিশ্বাস্য প্রতিভার অধিককারী। একই সাথে একজন বিজ্ঞানী ‘স্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং’- এ গবেষণার শীর্ষে পৌছতে পারে! তা ভাবনারও অতীত ছিল।

‘তাঁর জন্যে আমরা সহযোগিতা চাই আপনার মি. আহমদ মুসা।’ বলল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ওপার থেকে।

‘কি সহযোগিতা মি. হোম মিনিষ্টার? আহমদ মুসা বলল।

‘স্বপ্নটা পরিষ্কার কিডন্যাপিং-এর। আর বিজ্ঞানী ও আউটষ্ট্যান্ডিং স্কলারদের কিউন্যাপিং ঘটনা সাম্প্রতিককালে ঘটেছে। পুলিশ প্রধানের কাছে শুনলাম, আপনি এই বিষয়টা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করছেন। খাদেমুল হারামাইন শরীফাইন মহান বাদশা একথা জানার পর এ বিষয়টা খতিয়ে দেখার জন্যে আপনাকেই অনুরোধ করতে বলেছেন।’ বলল সৌদি স্বরাষ্ট্যমন্ত্রী।

‘বিজ্ঞানী মি. খালেদ আবদুল্লাহ কি বিশ্ববিদ্যালয়ে যান?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘কয়েকদিন থেকে সেনা-কমান্ডোদের পাহারায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া শুরু করেছেন।’ সৌদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

‘ঠিক আছে মি. মিনিষ্টার, আমি রিয়াদে যাব। তবে কবে যাব তা আপনাকে জানাব। একটা দাওয়াত রিয়াদে আছে আমার ও আমার স্ত্রীর।’ বলল আহমদ মুসা।

‘কোথায় দাওয়াত, কিসের দাওয়াত? আমরা তো কিছু জানি না মি. আহমদ মুসা।’

‘ফরাসি দূতাবাসের একটা দাওয়াত। দাওয়াতটা বিয়ের। রিয়াদের ফরাসি রাষ্ট্রদূত ও আমার স্ত্রী একই ফরাসি পরিবারের। সেই সূত্রেই দাওয়াত আমার স্ত্রীকে। স্ত্রীর সাথে আমিও আছি।’ বলল আহমদ মুসা।

‘হ্যাঁ, ফরাসি রাষ্ট্রদূত মিস মেরী জেনিফারও তো ফ্রান্সের বুরবুন রাজবংসের মেয়ে। আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে তো আপনি ম্যাডামসহ আসছেন? কবে?’ সৌদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলল।

‘সরি, বিয়ের তারিখটা আমি জানি না। বিষয়টা ডিল করছেন তো আমার স্ত্রী। আমি জেনে আপনাকে জানাব।’ বলল আহমদ মুসা।

‘না জনাব, আমিই টেলিফোন করব। তাহলে স্যার, এখনকার মত এখানেই ......।’

সৌদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মুখের কথা শেষ না হতেই আহমদ মুসা বলল, ‘ওকে মুহতারাম। আসসালামু আলায়কুম।’

‘ধন্যবাদ, ওয়া আলায়কুম আসসালাম।’ওপার থেকে ধ্বনিত হলো সৌদি স্বরাষ্ট্রন্ত্রীর কন্ঠ।

আহমদ মুসা কল অফ করতেই জোসেফাইন বলল, ‘বিয়ের তারিখ ২৭ রজব। আমরা তো যাব বিয়ের অন্তত দু’দিন আগে।’

কথাটা শেষ করে সোফায় সোজা হয়ে বসল জোসেফাইন।হাসল।বলল, ‘বিয়েতে তাহলে তোমার যাওয়া হচ্ছে না।’

‘কেন? যাওয়া আরও পাকাপোক্ত হয়েছে জোসেফাইন।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তা হয়েছে, কিন্তু সেটা বিয়েতে যাওয়া নয়, যাচ্ছ নিজের মিশনে।’ বলল জোসেফাইন্ মুখে তার কৃত্রিম গাম্ভীর্য।

‘তা বটে, তুমি তো সব শুনেছই। কিন্তু বিয়েতে এ্যাটেন্ড করার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। আহমদ মুসা বলল।

‘কিন্তু তোমার সাথে এর সম্পর্ক আছে। হয়তো বিয়ের আসরেও তুমি খুঁজবে ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের কাউকে।’ বলল জোসেফাইন। তার মুখ থেকে কৃত্রিম গাম্ভীর্য তখনও কাটেনি।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘তুমি ঠিকই বলেছে জোসেফাইন। চোখ সেটা খোঁজা স্বাভাবিক, কিন্তু মন বিয়ের আনন্দ ষোল আনাই উপভোগ করবে তুমি নিশ্চিত থাক।’

হাসল এবার জোসেফাইনও।

সরে এল আহমদ মুসার কাছে। ঘনিষ্ঠ হলো স্বামীর। আহমদ মুসার কাঁধে মাথা রেখে বলল, ‘তুমি না বললেও এটা আমি জানতাম। যার যা পাওনা তাকে তুমি তা দাও। দ্বায়িত্বের দাবী তুমি পূরণ কর, আবার মনকে তুমি সামান্যও বঞ্চিত কর না।’

‘ধন্যবাদ জোসেফাইন, তোমার এই সাটিফিকেটের জন্যে।জানো, আল্লাহ স্ত্রীর সাক্ষ্যকেই সবচেয়ে বেশি মূল্য দেন।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আর স্ত্রীর জন্যে স্বামীর সাক্ষ্য?’ জিজ্ঞাসা জোসেফাইনের।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'এই বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। আমি এ সংক্রান্ত কোন হাদিস পড়িনি।'

'স্ত্রীর জন্যে স্বামীর সাক্ষ্যের দরকার নেই?' জোসেফাইন বলল।

'মনে হয় আল্লাহ মেয়েদের ফেভার করেছেন। তিনি আখেরাতে মেয়েদের ভাগ্য স্বামীদের মুখাপেক্ষী করতে চান না।' আহমদ মুসা বলল।

'আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল কোরআনে বলেছেন, 'স্বামী ও স্ত্রী একে অপরের অভিভাবক।' মানে সমান তারা। তাহলে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পারিক সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে সমান ট্রিটমেন্ট হবে না কেন?' বলল জোসেফাইন।

'আল্লাহর সৃষ্টিরই এটা একটা প্রকৃতি যে, সবলকে দুর্বলের সাক্ষ্যের মুখাপেক্ষী করা হয়েছে, কিন্তু দুর্বলকে সবলের সাক্ষ্যের মুখাপেক্ষী করা হয়নি। কারণ সবলরা অনেক ক্ষেত্রেই দুর্বলের প্রতি অবিচার করে, করতে পারে। আর ফেতরাতিভাবে নারীরা দুর্বল ও পুরুষরা সবল।' আহমদ মুসা বলল।

'চমৎকার, বুঝলাম। কিন্তু সাক্ষ্য আইনের ক্ষেত্রে দুই নারীর সাক্ষ্যকে এক পুরুষের সমান করা হয়েছে মানে বিচার্য কোন বিষয়ে একজন পুরুষের সাক্ষ্য যথেষ্ট হবে, আর সাক্ষী যদি নারী হয়, তাহলে দুই নারীর সাক্ষ্য না পেলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এখানে তো নারী পুরুষের অর্ধেক হয়ে গেছে।' বলল জোসেফাইন।

'না জোসেফাইন, তোমাকে এখানেও বিষয়টাকে সবল ও দুর্বলের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে। নারীদের স্বভাবজাত কিছুটা অসুবিধা ও দুর্বলাতার কারণে সাক্ষ্য দানের ক্ষেত্রে নারীদের কোন চাপ বা প্রভাবের শিকার হওয়ার আশংকা বেশি। তাই ন্যায়-বিচার নিশ্চিত করার জন্যেই এক পুরুষের বদলে দুই নারীর সাক্ষ্য চাওয়া হয়েছে। দুই নারী একত্র হলে স্বাভাবিকভাবে তাদের ক্ষমতায়ন হয়, তাদের ক্ষমতা বেড়ে যায়। সম্ভবত আল্লাহ এটাই চেয়েছেন।' থামল আহমদ মুসা।

জোসেফাইনের মুখে হাসি ফুটে উঠেছে।

বলল, 'ধন্যবাদ তোমাকে। তুমি কঠিন বিষয়কে সহজ করে তুলতে পার। বিষয়টা এভাবে আমার মাথায় আসেনি.....।'

জোসেফাইনের কথার মধ্যেই আহমদ মুসার মোবাইল বেজে উঠল আবার।

'এক্সকিউজ মি. জোসেফাইন!' বলে আহমদ মুসা মোবাইল হাতে তুলে নিল।

কল ওপেন করে 'হ্যালো' বলে সাড়া দিতেই ওপার থেকে সালাম ভেসে এল সৌদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর।

আহমদ মুসা সালামের জবাব দিয়েই বলল, 'খারাপ কোন খবর জনাব?'

'হ্যাঁ মি. আহমদ মুসা। আপনার সাথে কথা বলে টেলিফোন রাখতেই অয়্যারলেস পেলাম পুলিশ প্রধানের। তার কাছ থেকে জানতে পারলাম আমাদের বিজ্ঞানী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাসায় ফেরার পথে আক্রান্ত হযেছেন। তিনি.....।

সৌদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথার মাঝখানেই আহমদ মুসার বলল, 'কিডন্যাপ হননি, আক্রান্ত হয়েছেন?'

'হ্যাঁ মি. আহমদ মুসা, আল্লাহ রক্ষা করেছেন। কিডন্যাপ হওয়া থেকে বেঁচে গেছেন। তাঁর পেছনের সেনা কমান্ডোর দু'টি গাড়িই ধ্বংস হয়েছে। মারা গেছেন ৬ জন কমোন্ডোর সবাই। বিজ্ঞানীর ড্রাইভারকে ওরা গুলি করে মেরেছে।বিজ্ঞানীকেও ওরা নিয়ে যাচ্ছিল। এই সময় সেনাবাহিনীর দু'টি টহল গাড়ি দু'দিক থেকে এসে পড়ে। বিজ্ঞানীকে রেখেই ওরা পালিয়ে যায়। বিজ্ঞানী ......।'

আবারও সৌদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বাধা দিয়ে আহমদ মুসা বলে উঠল, 'ওরা কয়টি গাড়ি নিয়ে এসেছিল? বিজ্ঞানীকে ওরা গাড়িতে তুলতে পারেনি?'

'ছোট একটা মাইক্রো নিয়ে তারা এসেছিল। ওরা বিজ্ঞানীর গাড়ির ড্রাইভারকে হত্যা করে তাকে বাইরে ফেলে দিয়ে ওদের একজন আমাদের বিজ্ঞানীকে সংজ্ঞাহীন করেছিল, অন্যজন গাড়ির সীটে উঠতে যাচ্ছিল, এ সময় সেনাবাহিনীর দু'টি গাড়ি এসে পড়ে। তখন ওরা বিজ্ঞানীর গাড়ি থেকে ছুটে এসে মাইক্রতে ওঠে। পালিয়ে যায় মাইক্রোটি। পরে স্পট থেকে একজন পুলিশ অফিসারের মাধ্যমে জানলাম, বিজ্ঞানীর গাড়ির চাবিটা নিহত ড্রাইভারের হাতে ছিল। ড্রাইভার............।'

সৌদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথার মাঝখানে আবার কথা বলে উঠল আহমদ মুসা। বলল, ' আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া মি. স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী! বিজ্ঞানীর ড্রাইভার জীবন দিয়েছেন, কিন্তু বাঁচিয়ে গেছেন বিজ্ঞানীকে। আমার মনে হয়, বিজ্ঞানীর গাড়ি বহর আক্রান্ত হওয়ার পর যখন ওদেরকে বিজ্ঞানীর গাড়ির দিকে আসতে দেখে, তখনই ড্রাইভার গাড়ির চাবি হাতে নিয়েছিল কিংবা অজান্তেই গাড়ির চাবিটি তার হাতে এসে গিয়েছিল। গাড়িতে চাবি থাকলে সন্ত্রাসীরা বিজ্ঞানীসহ তার গাড়ি নিয়ে পালাত। সন্ত্রাসীরা কেউ মারা যায়নি? বলল আহমদ মুসা।

'না, ওদের কেউ মারা যায়নি। যারা বিজ্ঞানীর গাড়িতে উঠেছিল, সেই দুই সন্ত্রাসীকেই শুধু দেখা গেছে। মাইক্রোতে কয়জন সন্ত্রাসী ছিল তা জানা যায়নি। যে দু'জন সন্ত্রাসী বিজ্ঞানীর গাড়িতে উঠেছিল, তাদের একজন মেয়ে মানুষ ছিল জানা গেছে। মনে হয় তাদের দু'জনেরই পোষাক বুলেট প্রুফ ছিল। দুই দিকের এক ঝাঁক গুলির মুখে তারা পড়েছিল, কিন্তু কোন ফল হয়নি।' সৌদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলল।

'ওদের একজন মেয়ে ছিল?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার। তার চোখে-মুখে বিস্ময়!

'তাই মনে করা হচ্ছে। দু'জনেরই এক রকম পোষাক ছিল। এরপরও একজনকে মেয়ে মনে হয়েছে।' বলল সৌদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

'বিজ্ঞানীর দেখা স্বপ্নের দু'জন সন্ত্রাসীর একজন মেয়ে ছিল। এখানেও দু'জনের একজন দেখা যাচ্ছে মেয়ে।' আহমদ মুসা বলল।

'মি. আহমদ মুসা, এই মেয়েটিই গুলি করে ড্রাইভারকে মেরে ড্রাইভিং সীটে বসতে যাচ্ছিল।' বলল সৌদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

'তাহলে স্বপ্নটা সত্যি হলো মি. স্বরষ্ট্রমন্ত্রী।' আহমদ মুসা বলল।

'সত্যি হলো আংশিক। পুরোটা না সত্য হয়ে যায়, এই আতংক এখন আমাদের মি. আহমদ মুসা।' বলল সৌদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথা আহমদ মুসাকেও চমকেও দিল! ঠিক কথাই বলেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। স্বপ্নের অর্ধেক সত্যি, অন্য অর্ধেকও সত্যি হতে পারে। অবশ্য নাও সত্যি হতে পারে। কিন্তু আহমদ মুসারও আশংকা, ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের নাম

থেকে তাদের যেটুকু পরিচয় পাওয়া গেছে, তাতে এ ধরনের সংগঠন কখনও হার স্বীকার করে না। ‘ডু অর ডাই’ হয়ে থাকে ওদের মটো। কিন্তু ‘ডাই’ এড়িয়ে ওরা ‘ডু’-কেই বাস্তবায়িত করে।

আহমদ মুসার কথা বলতে দেরী দেখে ওপার থেকে সৌদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীই কথা বলে উঠল, ‘কি ভাবছেন মি. আহমদ মুসা?’ এই মাত্র আমাদের আলোচনা হয়েছে। কালকে সকালে আপনাকে আমরা রিয়াদে চাই। ফরাসি দূতাবাসের বিয়ের আমরা খোঁজ নিয়েছি। সে অনুষ্টান সাত দিন পর হচ্ছে। বড় দেরী হয়ে যাবে। আমাদের অনুরোধ, কাল সকালেই আপনি এখানে এসে যাবেন। ম্যাডামদেরও দাওয়াত আমাদের এখানে। খাদেমুল হারামাইন শরীফাইনের সম্মানিত অতিথি হবেন আপনারা।’

‘বিষয়টিকে আমিও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি। পরাজিত ওরা আহত বাঘের মত হয়ে গেছে। আপনারা সাবধান থাকুন! আমি কাল সকালে আসছি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আল-হামদুলিল্লাহ। আপনারা আসুন। আমরা আপনাদের জন্য অপেক্ষা কর্ব।’ বলল সৌদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

‘ওকে, মি. স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আমরা আসছি ইনশাআল্লাহ আগামী কাল সকালে। কথা এখানেই শেষ।’

‘ধন্যবাদ মি. আহ্‌মদ মুসা। আসসালামু আলাইকুম।’ ওপার থেকে বলল সৌদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

আহমদ মুসা সালামের জবাব দিয়ে কল অফ করে দিল।

আহমদ মুসা মোবাইল রাখতেই জোসেফাইন বলে উঠল, ‘তাহলে কাল সকলেই আমাদের যেতে হচ্ছে রিয়াদে।’

‘স্যরি জোসেফাইন। তোমার সাথে পরামর্শের সুযোগ হলো না। রাজী না হয়ে উপায় ছিল না। বিজ্ঞানী আক্রান্ত হয়েছেন। ছয়জন কমান্ডোর জীবন গেছে। কিন্তু আল্লাহ বিজ্ঞানীকে রক্ষা করেছেন। ঠিক সময় সেনাবাহিনীর গাড়ি দু’টি এসে না পৌঁছলে বিজ্ঞানী অপহৃত হতেন। আমার অনুমান মিথ্যা না হলে বিজ্ঞানীর বিপদ যায়নি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘স্যরি বলছ কেন? তুমি ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছ। আমার জন্যেও ভাল হলো। মেরী জেনিফারের সাথে কয়েক দিন বেশি সময় কাটাতে পারব।’ বলল জোসেফাইন।

‘ধন্যবদ জোসেফাইন। যতটুকু সহযোগিতা স্বাভাবিক, তবে চেয়ে অনেক বেশি সহযোগিতা তোমার কাছ থেকে পাই।’ আহমদ মুসা বলল।

‘সহযোগিতা শব্দটা কেন? তোমার কাজ কি আমার কাজ নয়?’ বলল জোসেফাইন।

‘অবশ্যই জোসেফাইন!’ বলে আহ্মদ মুসা কাছে টেনে নিতে চাইল জোসেফাইনকে।

জোসেফাইন হেসে উঠে সরে যেতে যেতে আঙুল তুলল দরজার দিকে।

আহমুদ মুসা চোখ ফেরাল দরজার দিকে। দেখল দরজা দিয়ে প্রবেশ করছে আহমদ আবদুল্লাহ। তার হাতে খেলনা রিভলবার।

সে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল আহমদ মুসার কোলে।

‘রিভলবার কোথায় পেলে বেটা?’ আহমদ আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘আন্টি ম্যাডাম আমার জন্যে এনেছে।’ বলল আহমদ আবদুল্লাহ।

‘বেশ ভাল করেছে। কিন্তু বেটা, তোমার রিভলবার হলো কলম।’ বলে আহমদ মুসা পকেটের দামী কলমটা আহমদ আবদুল্লাহর হাতে তুলে দিল।

আহমদ আবদুল্লাহ রিভলবার ফেলে দিয়ে আনন্দের সাথে কলমটা হাতে নিল। তারপর ছুটে গিয়ে মায়ের পাশে বসে বলল, ‘তুমি সেদিন এ কলমটা আমাকে নিতে দাওনি। আব্বু দিয়েছেন আমাকে।’

জোসেফাইন আহমদ আবদুল্লাহকে কোলে টেনে নিয়ে বলল, ‘তোমার আব্বা অনেক ভাল বেটা।’

‘তুমিও ভাল আম্মা।’ মায়ের কোলে মুখ গুঁজে বলল আহমদ আবদুল্লাহ।

‘কে বলেছে?’ আহমদ আবদুল্লাহর কপালে একটা চুমু খেয়ে বলল জোসেফাইন।

‘কেন?’ আব্বা বলেছেন। বলনি আব্বা তুমি? মায়ের কোল থেকে মুখ তুলে আহমদ মুসার দিকে চেয়ে বলল আহমদ আবদুল্লাহ।

‘হ্যাঁ, তোমার মা অবশ্যই একটু বেশি ভাল। আর বেটা, দুনিয়ার সব মানুষই ভাল, যারা খারাপ তারা ছাড়া। আল্লাহ সব মানুষকে ভালবাসেন। আমাদেরও সবাইকে ভালবাসা উচিত।’

বলে আহমদ মুসা আহমদ আবদুল্লাহর গালে স্নেহের একটা টোকা দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

জোসেফাইনও উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘চল দেখি আহমদ আবদুল্লাহ, তোমার আন্টি ম্যাডাম আর কি নিয়ে এল?’

পরদিন সকাল ৭টার মধ্যেই আহমদ মুসারা মদিনা বিমানবন্দরে পৌছেছিল।

সৌদি বিমান বাহিনীর একটা বিশেষ বিমান আহমদ মুসাদের নিয়ে যাবে রিয়াদে।

আহমদ মুসারা বসেছিল ভিভিআইপি লাউঞ্জে। মিনিট খানেক আগে বিমান বন্দরের ষ্টেশন ম্যানেজার বলে গেছে আহমদ মুসাকে, বিমান রেডি স্যার। সেন্ট্রাল এয়ারট্রাফিকের একটা ফাইনাল সিগন্যালের অপেক্ষা করছে।

বসে বসে আজকের কাগজে চোখ বুলাচ্ছে আহমদ মুসারা।

‘রিয়াদের গতকালকের খবরটা খুব ছোট করে ছাপা হয়েছে।’ আহমদ মুসাকে লক্ষ করে বলল জোসেফাইন।

‘উদ্বেগের খবর মানুষের বিস্তারিত না জানাই ভাল, এদেশে এটা সাংবাদিকদের একটা দৃষ্টিভংগি।’ আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসা আবার কাগজে মনোযোগ দিতে চাচ্ছিল। এ সময় তার মোবাইল বেজে উঠল।

তাড়াতাড়ি পকেট থেকে মোবাইল বের করে স্ক্রিনে নজর বুলাল। দেখল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর টেলিফোন।

কল অন করার সাথে লাউডস্পীকারও অন করে আহমদ মুসা বলল, 'আসালামু আলায়কুম সালাম। ওয়েল কাম মি. আহমদ মুসা। আপনি আসুন। এদিকে শেষ রাতে মারাত্মক ঘটনা ঘটে গেছে। এ নিয়ে আপনি ভাবতে শুরু করুন, এজন্যেই আমার এই টেলিফোন।'

মুহুর্তের জন্যে ওপারে কন্ঠ থামল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। একটু বিরতিও অসহ্য মনে হলো আহমদ মুসার কাছে। সে বলল, 'কি মারাত্মক ঘটনা মি. স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী? বিজ্ঞানী মি. খালেদ আবদুল্লাহর কিছু ঘটেছে? কিডন্যাপড হয়েছেন তিনি?'

'হ্যাঁ মি. আহমদ মুসা, গত রাত সাড়ে তিনটায় তিনি কিডন্যাপড্ হয়েছেন বাসা থেকে।' বলল সৌদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। উদ্বেগে ভেঙে পড়া তার কন্ঠস্বর।

'ওনার বাসাতো বিশ্ববিদ্যালয়ের চিচার্স হাউজিং ব্লকে?' জিজ্ঞাসা আহম্মদ মুসার।

'জি হ্যাঁ। হা্উজিং-এ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব সিকিউরিটি ব্যবস্থা আছে।' আমরাও হাউজিং-এর গেটে একদল পুলিশ দিয়েছিলাম।

তাছাড়াও সেনাবাহিনীর একটা কমান্ডো ইউনিট একজন কর্নেলের নেতৃত্বে বিজ্ঞানীর বাড়ির গেটে পাহারায় ছিল। বিস্ময়ের ব্যাপার, কর্নেলসহ পাঁচজন কমান্ডোকেই গেটে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে।তাদের দেহে কোন আঘাত নেই। মৃত্যুর কারণ এখনও জানা যায়নি।' থামল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

'বাউন্ডারি ওয়ালের পেছন দিকের প্রাচীর কেটে তাহরে ওরা প্রবেশ করেছিল।' বলল আহমদ মুসা।

'ঠিক বলেছেন। কি করে জানলেন আপনি?' জিজ্ঞাসা সৌদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। তার কন্ঠে বিস্ময়!

'গেটে যখন কিছু ঘটেছে বলে আপনি বললেন না। তখন বুঝা গেছে ওরা বিকল্প পথে হাউজিং-এ ঢুকেছে। অন্তত পাঁচ ফিট পরিমাণ প্রাচীর কেটে ওরা গাড়ি নিয়ে প্রবেশ করেছিল।' আহমদ মুসা বলল।

‘ঠিক বলেছেন, মি. আহমদ মুসা। প্রাচীরের কাটা অংশ আমরা মেপে দেখিনি। তারা পেছনের প্রাচীর কেটে গাড়ি নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেছিল।’ বলল সৌদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

‘সেনা কমান্ডোদের পোষাক ওরা খুলে নিয়েছে মি. স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী?’ আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

‘আপনার অনুমান সত্য, আহমদ মুসা। সেনা কমান্ডোদের পোষাক এবং গাড়ি নিয়েই ওরা পালিয়েছে। ওদের গাড়িটা পড়ে আছে বিজ্ঞানীর বাড়ির গেটে। গাড়িটা আনরেজিষ্ট্যান্ড। গতরাতেই একটা শো-রুম থেকে গাড়িটা চুরি গেছে বলে আমরা জানতে পেরেছি।’ বলল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ‘বাড়ির ভেতরে ওরা নিশ্চয় বাধা পায়নি?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘বাড়ির ভেতরে সবাই ঘুমিয়ে ছিল। ওরা ল্যাসার বীম দিয়ে লক উড়িয়ে দিয়ে নি:শব্দেই সব দরজা খুলে ফেলে। ম্যাডাম জেগে উঠেছিলেন। তাঁর সামনেই বিজ্ঞানীকে সংজ্ঞাহীন করে নিয়ে গেছে। যাওয়ার সময় একটা মিনি রিভলবার দিয়ে ফায়ার করে ম্যাডামকে সংগে সংগেই ম্যাডাম জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।’ বলল সৌদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

‘ম্যাডাম কি বলেছেন, কয়জন ওরা ঘরে ঢুকেছিল?’ জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

‘তিনজন ঘরে ঢুকেছিল। তাদের মধ্যে একজন ছিল মেয়ে। মেয়েটির ছিল খুব বেশি ক্ষিপ্র। সেই বিজ্ঞানীকে সংজ্ঞাহীন করে কাঁথে তুলে নেয়। পুরুষ দু’জন রিভলবার তুলে পাহারা দিচ্ছিল।’ বলল সৌদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

‘কোন রুটে তারা পালিয়েছে, সেটা কি জানা গেছে?’ ওরা যাতে দেশের বাইরে যেতে না পারে তার ব্যবস্থা করেছেন নিশ্চয়।’ আহমদ মুসা বলল।

‘দেশের সকল সড়ক, নৌ ও বিমান বন্দরে রেড-এলার্ট জারি করা হয়েছে ভোর সারে পাঁচটা থেকে। কোথাও থেকে কোন তথ্য আমরা পাইনি।’ বলল সৌদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

‘আপনাদের রিয়াদের রাস্তায় তো ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার পাহাড়া আছে। তার রিপোর্ট থেকে কি জানা গেছে?’ আহমদ মুসা বলল।

‘সেটা এক বিস্ময়! সব রিপোর্ট আমরা পেয়েছি। কিন্তু মিলিটারি কমান্ডোদের যে গাড়ি নিয়ে ওরা পালিয়েছি সে গাড়িকে রিয়াদের কোন রাস্তায় দেখা যায়নি।’ বলল সৌদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

‘তাহলে মাঝখানে তারা আবার গাড়ি পাল্টেছে অথবা গাড়িটিকে তারা জ্যামিং ক্যামোফ্লেজে ঢেকে নিয়েছিল।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ক্যামেরা চোখ আড়াল করার মত জ্যামিং ক্যামোফ্লেজে তো বিশ্বের একটা দুষ্পাপ্য ও অত্যান্ত ব্যয়বহুল টেকনলজি! মাত্র সাম্প্রতিককালে আমরা এই টেকনলজি নিয়ে এসেছি। একটা সন্ত্রাসী সংগঠন এটা পাবে কি করে?’ বলল সৌদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আমি জানি না, এই কিডন্যাপাররা কারা। তারা যদি ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেট হয়, তাহলে মনে করি কোন টেকনলজিই ওদের বাইরে নেই।’

‘আমাদের উদ্বেগ বাড়িয়ে দিচ্ছে, মি. আহমদ মুসা।’ বলল সৌদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

‘স্যরি, বাস্তবতা আমাদের সবাইকে জানতে হবে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ধন্যবাদ মি. আহমদ মুসা, দু:খের মধ্যেও একটু রস করলাম। ওকে, আপনি আসুন। আর খাস কোন পরামর্শ থাকলে বলুন।’

‘ধন্যবাদ মি. স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ঘটনার পর যা করার আপনারা তা সবই করেছেন। আমার একটা অনুরোধ গত এক মাসে সৌদি আরবে যারা প্রবেশ করবেন তাদের ফটোসহ পার্টিকুলারস আমার প্রয়োজন। আপনারা দয়া করে এর ব্যবস্থা করবেন।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ধন্যবাদ মি. আহমদ মুসা, এসেই পেয়ে যাবেন। ওকে। এখানেই শেষ। আস্সালামু আলাইকুম।’

‘ওয়া আলাইকুম সালাম’ বলে আহমদ মুসা কল অফ করে দিল। সবাই উদগ্রীবভাবে তাকিয়ে ছিল আহমুসার দিকে। সবার চোখে-মুখেই উদ্বেগ। ষ্টেশন ম্যানেজার আহমদ মুসাকে বলতে এসেছিল যে ষ্টেশন বিশেষ বিমান টেক-অফ

পর্যায়ে আছে। আহমদ মুসারা উঠলেই বিমান ছাড়বে।কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে কথা বলছেন জেনে এবং আলোচনার বিষয় শুনে কথা বলতে আর সাহস করেনি।

জোসেফাইনও বিব্রত অবস্থায় পড়েছিল। কিন্তু আহমদ মুসাকে ডিস্টার্ব করা উচিত মনে করেনি। বিজ্ঞানী কিডন্যাপড্ হয়েছে তার মনটাও মুষড়ে পড়েছিল।

আহমদ মুসা মোবা্ইল পকেটে রেখে মাথা তুলে সামানে চাইতেই দরজায় দাঁড়ানো বিমান বন্দরের ষ্টেশন ম্যানেজারের নজরে পড়ে গেল। বলল, ‘স্যরি, প্রেন বুঝি দাঁড়িয়ে আছে?’

‘নো প্রব্লেম স্যার। প্লেনের সময় ২০ মিনিট পিছিয়ে দেয়া হয়েছে।’ বলল ষ্টেশন ম্যানেজার।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে আহমদ মুসা বলল, ‘তার মানে আর দশ মিনিট সময় আমাদের হাতে আছে।’

আহমদ মুসার কথার রেশ বাতাসে মেলবার আগেই বাইরে থেকে বিকট বিস্ফোরণের শব্দ ভেসে এল।

চমকে উঠল সবাই। প্রচন্ডভাবে কেঁপে উঠেছিল বিল্ডিংটাও।

সোজা হয়ে বসল আহমদ মুসা। বলল, ‘এ বিস্ফোরণের শব্দ রানওয়ের দিক থেকে এসেছে। তার মানে কোন বিমানে বিস্ফোরণ ঘটেছে’।

বিস্ফোরণের শব্দ শুনেই ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল ষ্টেশন ম্যানেজার।

কয়েক মূহূর্তের মধ্যেই একজন পুলিশ অফিসার ছুটে এল আহমদ মুসার ভিভিআইপি কক্ষে। বলল আহমদ মুসাকে, ‘স্যার, যে বিশেষ বিমানে আপনার যাবার কথা ছিল, সে বিমানটি বিস্ফোরণে উড়ে গেছে।’

আহমদ মুসা বসে থেকেই শান্তভাবে কথাটা শুনল। হিসেব করে দেখল, টেলিফোন রিসিভের কারণে দেরি না হলে ঠিক সময়ে বিশেষ বিমানটি আকাশে উড়লে বিমানটি এখন রিয়াদের আকাশে থাকতো। রিয়াদের আকাশেই বিমানটি বিস্ফোরণে ভেঙে পড়তো তাদের সাথে নিয়েই। মূহুর্তের জন্যে তার চোখ দু’টি কঠোর হয়ে উঠল। একটা উষ্ণ স্রোত বয়ে গেল গোটা শরীরে।

নিজেকে সামলে নিয়ে আহমদ মুসা তাকাল জোসেফাইনের দিকে। জোসেফাইনের চোখ-মুখ ভয়ে আড়ষ্ট। সে আহমদ আবদুল্লাহকে শক্ত করে বুকে জড়িয়ে ধরে আছে।

আহমদ মুসা তার ডান হাত জোসেফাইনের কাঁধে রেখে বলল, 'আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন। তিনিই তো আমাদের বাঁচালেন! ভয় করলে আল্লাহর এ সাহায্যর অমর্যদা হয় জোসেফাইন।

'হাসবুনাল্লাহ! আল্লাহই আমাদের জন্যে যথেষ্ট। ঠিক, তিনি নিজ হাতে আমাদের গোটা পরিবারকে বাঁচালেন। আল-হামদুলিল্লাহ!'

বলে জোসেফাইন আহমদ আবদুল্লাহকে পাশে বসিয়ে আহমদ মুসাকে বলল, 'স্যরি, মানবিক অনেক দুর্বলতা মানুষ অনেক সময় কাটিয়ে উঠতে পারে না। আমি সে ধরনের একজন মানুষ। আল্লাহ মাফ করুন।'

'ধন্যবাদ জোসেফাইন।' বলে আহমদ মুসা তাকাল পুলিশ অফিসারের দিকে।

পুলিশ অফিসার কক্ষের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আরেকজন অফিসারও তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আহমদ মুসা ওদের উদ্দ্যেশ্য করে বলল, 'আমি বিস্ফোরণের জায়গায় যেতে চাই। ষ্টেশন ম্যানেজার কোথায়?'

পরে যে অফিসার এসেছে, সে পুলিশ অফিসার ঘরে ঢুকল। বিনয়ের সাথে বলল, 'স্যার, বিমান বন্দরে আমি আপনার সিকিউরিটির দায়িত্বে আছি। গোটা বিমান বন্দরে এখন সার্চ চলছে স্যার। স্যার, সার্চ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে এখানেই অপেক্ষা করতে অনুরোধ করা হয়েছে।'

পুলিশ অফিসারের কথা শেষ হতেই আহমদ মুসার মোবাইল বেজে উঠল। আহমদ মুসা দেখল মদিনা মনওয়ারার গভর্নরের টেলিফোন।

আহমদ মুসা কল অন করে সালাম দিতেই ওপার থেকে গভর্নরের কন্ঠ শোনা গেল। সালামের জবাব দিয়ে বলল, 'ভাই আহমদ মুসা' আমি আসছি। গিয়েই কথা বলব। ওকে, আসসালামু আলাইকুম।'

সালামের জবাব দিয়ে কর অফ করতেই আবার বেজে উঠল আহমদ মুসার মোবাইল।

রিয়াদ থেকে সৌদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর টেলিফোন।

আহমদ কল অন করে সালাম দিল। ওপার থেকে সৌদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কন্ঠ শোনা গেল। সালামের জবাব দিয়ে বলল, 'আল-হামদুলিল্লাহ! আল্লাহর হাজার শোকর যে প্লেনটা ডিলে হয়েছিল! আমি মদিনায় আসছি, মি. আহমদ মুসা। ঐ প্লেনেই আমি আপনাদের রিয়াদে নিয়ে আসব।'

'ধন্যবাদ। আপনার আসাটা ভাল হবে।' আহমদ মুসা বলল।

'এই ঘটনা একটা বড় ষড়যন্ত্র। আমি বিস্মিত হচ্ছি, গতকাল আপনার সাথে কথা বলে ঠিক করলাম, আজ আপনি আসবেন। আর বিমান বাহিনীর ঐ বিশেষ বিমানে আপনি আসবেন, সেটা ঠিক হয়েছে রাত ৮ টার পর কেমন করে এটা সম্ভব হলো?' বলল ওপার থেকে উদ্বিগ্ন সৌদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

'এটা খুব সহজ তদন্ত মি. স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আপনি নির্দেশ দিন। গত রাত ৮টা থেকে যত লোক বিমান বন্দরের টার্মাক এলাকায় প্রবেশ করেছে, যারা ঐ বিশেষ বিমানটিতে উঠেছে, তাদের সকলের উপর নজর রাখতে, তারা যেন কেউ সরে পড়তে না পারে।'

'ধন্যবাদ মি. আহমদ মুসা। আমি নির্দেশ দিচ্ছি। আমি গভর্নর মহোদয়ের সাথে আলোচনা করেছি। একটা তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে মদিনা মনোওয়ারার নিরাপত্তা প্রধানের নেতৃত্বে। তারা কাজ শুরু করেছে।' বলল সৌদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

'ধন্যবাদ মি.স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আপনার আগের টেলিফোন কলটা ছিল লাকি কল। কলটা দীর্ঘ হওয়ার কারণে ষ্টেশন ম্যানেজার প্লেনের সময় ২০ মিনিট পিছিয়ে দেন' আহমদ মুসা বলল।

'আল্লাহর হাজার শোকর, আহমদ মুসা। আল্লাহ সাহায্য করেছেন। আমরা নিমিত্ত মাত্র। ওকে, মি. আহমদ মুসা। আর কিছু পরামর্শ?' বলল সৌদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি।

'আপনি আসুন, আলোচনা করা যাবে।'

'ঠিক আছে মি. আহমদ মুসা। আসছি আমি। আসসালামু আলায়কুম।'

আহমদ মুসা মোবাইল রাখতেই সেই পুলিশ অফিসারটি ঘরে ঢুকল। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই কক্ষে প্রবেশ করল ষ্টেশন ম্যানেজার।

বিধ্বস্ত তার চেহারা। বলল সে আহমদ মুসাকে, ‘স্যার, ওপরে বিশ্রামের জন্যে আমাদের কয়েকটা ভিভিআইপি স্যুট আছে। সেনাবাহিনীর এক্সপ্লোশন ইউনিট সেগুলো সম্পূর্ণ স্ক্যান করে রেডি করেছে। ম্যাডামকে নিয়ে আপনি সেখানে চলুন স্যার।’

‘গভর্ণর সাহেব তো আসছেন। তিনি কোথায় আসছেন?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘স্যুটগুলোর পাশেই কয়েকটি সীটিং রুম রয়েছে। ওরা ওখানেই বসবেন স্যার।’ বলল ষ্টেশন ম্যানেজার।

‘ঠিক আছে চলুন।’ বলে আহমদ মুসা তাকাল জোসেফাইনের দিকে।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। জোসেফাইনও।

মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে মায়ের হাত আঁকড়ে ধরে আছে আহমদ আবদুল্লাহ।

# ২

মদিনা মনোওয়ারা বিমান বন্দরে টপ ফ্লোরে ভিভিআইপি মিটিং রুম।

ওভাল সিটিং টিবিলের সভাপতির আসনে বসেছেন মদিনার গভর্নর। তার এক পাশে সৌদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, অন্য পাশে বসেছে আহমদ মুসা। অভাল টেবিল ঘিরে অন্যদের মধ্যে রয়েছে সৌদি অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা প্রধান, সৌদি কাউন্টার টেররিজম গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান, পুলিশ প্রধান ও মদিনা মনোয়ারা নিরাপত্তা কমিটির প্রধান।

মদিনার গভর্নর, আহমদ মুসা ও মদিনা মনোওয়ারা নিরাপত্তা কমিটির প্রধান ছাড়া অন্য সবাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে রিয়াদ থেকে এসেছেন।

মিটিং উদ্বোধন করেছিলেন মদিনার গভর্নর। তিনি উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেছিলেন, 'আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি যে, অল্প সময়ের জন্যে রিয়াদ থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, জাতীয় দুই গোয়েন্দা বাহিনীর প্রধান ও পুলিশ প্রধান এসেছেন। আহমদ মুসা ও তার পরিবার আমাদের নাগরিক হলেও আমাদের সম্মানিত ও মূল্যবান অতিথিও। সৌদি আরবে তাদের জীবনে উপর আক্রমণ এই প্রথম। এই আক্রমণ আসলে সৌদি সিকিউরিটি ব্যবস্থারর উপর। আমরা আনন্দিত যে, খাদেমুল হারামাইন শরীফাইনের মহান বাদশা বিষয়টিকে এভাবে দেখেছেন এবং একটি সবোর্চ্চ কমিটি রিয়াদ থেকে পাঠিয়েছেন। তারা আসার আগে আমরা আরও দু'বার বসেছি। আল-হামদুলিল্লাহ! আহমদ মুসার পরমর্শে আমরা ঘটনার গভীরে প্রবেশ করতে পেরেছি। একটা ষড়যন্ত্র নেটওয়ার্কের গোটাটাকেই মনে হয় আইডেনটিফাই করা গেছে। এ ব্যাপারে রিপোর্ট পেশ করার জন্য আমি মদিনা মনোওয়ারার সিকিউরিটি কমিটির প্রধানকে সংক্ষেপে রিপোর্ট পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি।'

প্রাদেশিক রাজধানী মদিনা মনোওয়ারার নিরাপত্তা কমিটির প্রধান জেনারেল আলী আবদুল্লাহ আল-হাবশা সোজা হয়ে বসল। কথা শুরুর ফর্মালিটি

শেষ করে বলল, 'বিস্ফোরণের সময় আমি বিমান বন্দরের সিকিউরিটি কক্ষে ছিলাম।' বিস্ফোরণের সংগেই বিমান বন্দর সীল করে দেয়া হয়। কাউকে ঢুকে ও বের হতে দেয়া হয়নি। আর সংগে সংগেই বিমান বন্দর সার্চ করা হয়েছে সন্দেহজনক কিছ কিংবা কাউকে পাওয়া যায় কিনা সেটা নিশ্চিত করার জন্য। বিস্ফোরিত বিমান ও বিস্ফোরণস্থল পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ একই সাথে চালানো হয়। পরের গুরুত্বপূর্ণ কাজটি আমরা করি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পরামর্শে। তিনি আমাদের নির্দেশ দেন, গত রাতে থেকে বিস্ফোরণ পর্যন্ত যারা বিমান বন্দর, টার্মাক ও বিমানে প্রবেশ করেছে, তাদের তালিকা প্রণয়ন এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদের আওতায় নিয়ে আসতে। বিমান.....।'

জেনারেল আলী আবদুল্লাহ আল-হাবশীর কথার মাঝখানেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলে উঠল, 'এই পরামর্শ বিমান বন্দর থেকে আহমদ মুসাই আমার কাছে পাঠিয়েছিল। স্যরি জেনারেল। বলুন আপনি।'

জেনারেল আলী আবদুল্লাহ আবার শুরু করল, 'বিমান বন্দর, টার্মাক, বাইরে রাস্তা প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট সকল জায়গায় ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা থেকে আমরা আগের মত সকাল ৮টা থেকে পরের দিন সকাল ৮টা পর্যন্ত ১২ ঘন্টা সময়ে যারা বিমান বন্দরে, টার্মাক ও বিমানে প্রবেশ করেছেন, তাদের বিস্তারিত একটা তালিকা তৈরি করা হয়েছে। এই তালিকায় আমরা দেড় হাজার লোককে- যাদের মধ্যে আউটগোয়িং প্যাসেঞ্জারের সংখ্যাই সাড়ে ১৪শ'।অবশিষ্ট পঞ্চাশ ননপ্যাসেঞ্জার। এই পঞ্চাশ জনের মধ্যে বিমান বন্দর অফিসিয়ালস, ইমিগ্রেশন অফিসিয়ালস সার্ভিসিং কর্মী ও কেবিন ক্রুর সংখ্যা ৪৯ জন। মাত্র একজন ননঅফিসিয়ালস। কিন্তু তিনিও একজন ভিআইপি। এরোমেটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার আবুল ওয়াফা আল-সিদরী। তিনি আমাদের বিমান-বাহিনীর একজন টেকনিক্যাল উপদেষ্টা। আজ ভোরে পাঁচটায় তাঁকে ডাকা হয় বিশেষ বিমানটির একটা চেক করার জন্য।'

একটু থামল জেনারেল আলী আবদুল্লাহ আল-হাবশী। সামনে গ্লাস থেকে একটু পানি খেয়ে আবার শুরু, 'এই পঞ্চাশ জনের ছবি ও বায়োডাটা নিয়ে একটা প্রোফাইল তৈরি করা হয়েছে এবং এরা সকলেই কর্মক্ষেত্রে কিংবা নিজ নিজ

বাড়িতে হাজির আছে। বিনা অনুমতিতে তাদের মদিনার বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং এটা নিশ্চিত করার জন্যে তাদের প্রত্যেকের উপর নজর রাখা হয়েছে।'

বলে একটু থামল। একটু নড়ে-চড়ে বসে আবার শুরু করল, 'বিমান বন্দরের ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরায় এদের যে গতিবিধি ধরা পড়েছে, তাতে অস্বাভাবিক কিছু পাওয়া যায়নি। এদের পার্সোনাল ফাইলে তাদের যে অতীত রেকর্ড পাওয়া গেছে, তাতে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি। এটা প্রাথমিক অনুসন্ধানের ফল। নিরাপত্তা কমিটির পক্ষ থেকে বিষয়টি মহোদয় সমীপে পরামর্শ ও নির্দেশনার জন্য পেশ করা হলো।' থামল জেনারেল আবদুল্লাহ।

সংগে সংগে কেউ কোন কথা বলল না। নিরব কিছুক্ষণ সবাই। মদিনা মনোয়ারার গভর্নর নিরবতা ভাঙল। বলল, 'নিরাপত্তা কমিটিকে ধন্যবাদ। তারা গত তিন ঘন্টায় তদন্তের প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন করেছেন। কিন্তু এই রিপোর্টে আনন্দিত হবার কিংবা সামনে এগোবার কোন আলো দেখছি না। অপরাধীদের প্রতি কোন অঙুলি সংকেত নেই। রিপোর্ট আমরা সবাই শুনেছেন। এখন দয়া করে বলুন, আপনাদের পরামর্শ কি? কোন দিকে অঙ্গুলি সংকেত করার মত আপনারা কিছু দেখছেন কিনা।' থামল গভর্নর।

মুখ খুলল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। বলল, 'তদন্ত কমিটি তার রিপোর্টের শেষে মন্তব্য করেছে, গত রাত ৮টা থেকে আজ সকাল ৭ টা পর্যন্ত বিমান বন্দরে এসেছে, টার্মাক ও বিশেষ বিমানটিতে ঢুকেছে, তাদের গতিবিধিতে কোন অস্বাবিকতা দেখা যাচ্ছে না এবং তাদের অতীত রেকর্ডেও সন্দেহজনক কিছু নেই। এই মন্তব্যের পর নতুন অনুসন্ধান ছাড়া কিছু বলার বা অপরাধী হিসেবে কারও দিকে অংগুলি সংকেতের কোন সুযোগ নেই। আমি ভাবছি, গুরুত্বপূর্ণ এই তদন্ত কাজটি পুলিশের অপরাধ অপরাধ তদন্তের ব্যাপারে সরকারের 'এন্টিটেররিষ্ট কমিশন' ও ''সেনা গোয়েন্দা সংস্থা'র প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একটা যৌথ কমিটির হাতে দেয়া উচিত। এ কাজে ভাই আহমদ মুসার সাহায্য পেলে ভাল হতো, কিন্তু অন্য একটা বড় কাজ তার হাতে আছে।' থামল স্বরাষ্টমন্ত্রী।

উপস্থিত সবাই একে একে স্বরাষ্টমন্ত্রীর প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানাল।

শুধু আহমদ মুসাই কিছু বলল না। ভাবছিল সে।

সবশেষে গর্ভনর আহমদ মুসার দিকে তাকাল। বলল, 'ভাই আহমদ মুসা, এবার প্লিজ আপনি কিছু বলুন। কোন আশার কথা বলুন।'

'ধন্যবাদ এক্সিলেন্সি!' বলে শুরু করল আহমদ মুসা। বলল, 'মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঠিকই নিয়েছেন এমন ঘটনা তদন্তের জন্য ঐ রকম একটি চৌকস তদন্ত কমিটিরই প্রয়োজন। তবে আমি কয়েকটা বিয়ষ জানতে চাই, বলতে চাই।'

একটু থামল আহমদ মুসা। তাকাল জেনারেল আলী আবদুল্লাহর দিকে। বলল, 'বিশেষ বিমানটির পাইলট অফিসার ও কেবিন ক্রুদের দায়িত্বে যারা ছিলেন সবাই মারা গেছেন। বিশেষ বিমানটিতে ওঠার লোকদের মধ্যে শুধু বেঁচে আছেন এ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার আবুল ওয়াফা ও ফ্লাইট উত্তর সার্ভিসিং কর্মীরা। বিভিন্ন টেকনিক্যাল বিভাগের সার্ভিসিং কর্মীরা যারা বিমানে উঠেছিলেন বা বিমানের কাছে গিয়েছিলেন কাজের জন্যে তাদের সংখ্যা কত হবে, মি. জেনারেল?'

'স্যর, সব মিলিয়ে তাদের সংখ্যা পাঁচজন।' বলল জেনারেল আলী আবদুল্লাহ।

'এ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার জনাব আবুল ওয়াফাসহ এদের তথ্য-বিবরণী কি ম্যানুয়ালি রেকর্ড করেছেন, না শো করার মত কম্পিউটারাউজড্ বিবরণীও আছে?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'দু'ভাবেই রেকর্ড করা হয়েছে স্যার।' বলল জেনারেল।

'এখন কি শো করা যায়?' জানতে চাইল আহমদ মুসা।

'অবশ্যই স্যার।' বলল জেনারেল আলী আবদুল্লাহ।

'তাহলে ইঞ্জিনিয়ার আবুল ওয়াফা আল-জিদয়ী দিয়ে শুরু করুন।' আহমদ মুসা বলল।

'ওকে স্যার।' বলে কাজ শুরু করে দিল সে।

সব ব্যবস্থা করাই ছিল টেবিলে।

টেবিলের বিশেষ ড্রয়ার খুলে সেখান থেকে একটা তাঁর বের করে জেনারেল আলী আবদুল্লাহ তার ল্যাপটপে ঢুকিয়ে দিল। সেই সাথেই সামনের

দেয়ালের মাঝামাঝি জায়গা থেকে তিন ফুট বর্গাকৃতির একটা স্লাটড সরে গেল। দেখা গেল সেখানে বড় একটা কম্পিউটার স্ক্রিন।

স্ক্রিনে ভেসে উঠল একটা ছবি।

'স্যার, আমি ইঞ্জিনিয়ার আবুল ওয়াফা আল-জিদয়ী দিয়েই শুরু করছি।' বলল জেনারেল আলী আবদুল্লাহ।

প্রথমে স্ক্রিনে এল ইঞ্জিনিয়ার আলী আবদুল্লাহর ছবি। তারপর একে একে জন্ম, পিতা-মাতার নাম ও তাদের ছবি, লেখা-পড়া, কর্মজীবনে প্রবেশ, বিয়ে, স্ত্রীর ছবি, নাম ও পেশা, উপদেষ্টা হিসেবে সৌদি এয়ারলাইন্সে যোগদান ইত্যাদিসহ ব্যক্তিগত জরুরি বিষয়সমূহ তুলে ধরা হলো। এভাবে মদিনা বিমান বন্দরের পাঁচজন গ্রাউন্ড ষ্টাফের সদস্যেরও পূর্ণ জীবন-বৃত্তান্ত কম্পিউটার স্ক্রিনে আনা হলো।

আহমদ মুসা গভীর মনোযোগের সাথে সবার জীবন বৃত্তান্ত দেখছিল। বিভিন্ন সময় তার চোখে-মুখে প্রশ্ন, কিছু বিস্ময় ফুটে উঠতে দেখা গেল।

জীবন বৃত্তান্ত দেখানো শেষ হলে আবার নিরবতা নামল সীটিং রুমে।

এবার নিরবতা ভাঙল আহমদ মুসা। জেনারেল আলী আবদুল্লাহকে লক্ষ করে আহমদ মুসা বলল, 'জেনারেল আলী আবদুল্লাহ, ইঞ্জিনিয়ার আবুল ওয়াফার জন্ম, লেখা-পড়া, বিয়ে মিসরে, এটা তো দেখাই গেল। কিন্তু পাঁচ গ্রাউন্ড ষ্টাফ-সার্ভিসিং কর্মীর মধ্যে আলী হাসানের জন্ম, লেখা-পড়া বিয়ে কি মিসরে?'

'ঠিক স্যার, এ বিষয়টি তার বায়োডাটাতে নেই। ঠিক আছে, তার পারসোনাল প্রোফাইলে ওটা পাওয়া যাবে।'

বলে জেনারেল আলী আবদুল্লাহ তার ল্যাপটপের ভিন্ন একটা ফাইলে গিয়ে ক্লিক করতেই দেয়ালের কম্পিউটার স্ক্রিনে আলী হাসানের বিশদ জীবন-বৃত্তান্ত এসে গেল। তাতে দেখা গেল আলী হাসানের জন্ম, লেখা-পড়া, বিয়ে সবই মিসরে।

আহমদ মুসা জেনারেল আলি আবদুল্লাহকে ধন্যবাদ দিয়ে বলল, জেনারেল আরেকটা তথ্য পাওয়া কি সম্ভব, ইঞ্জিনিয়ার আবুল ওয়াফা বিয়ে করেছেন মায়ের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া বা মাতৃকুলের কাউকে কী?'

গভর্নর, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ সকলের বিস্ময় দৃষ্টি আহমদ মুসার দিকে।

এসব প্রশ্ন জেনে কি দরকার, এটা তাদের ভাবনার বিষয় নয়। কিন্তু কেউ কিছু বলল না।

জেনারেল আলী আবদুল্লাহ হাসল। বলল, 'এর উত্তর আমরা অনেকেই জানি স্যার। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব তার মায়ের বোনঝি মানে তিনি তার খালার মেয়েকে বিয়ে করছেন।'

'ধন্যবাদ জেনারেল, আমার একটা খবর জানার কৌতুহল আছে। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের খালার নাম কি আমাত আল-কাদির?'

'জি হ্যাঁ, তাঁর নাম আমাত আল-কাদির। মিসর-সিনেমার তিনি নাম করা অভিনেত্রী, আবার লেখিকাও। কিন্তু এটা আপনি জানলেন কি করে স্যার? আপনি কি তাকে চেনেন?' বলল জেনারেল আলী আবদুল্লাহ।

'না, চিনি না জেনারেল। অন্য একটা হিসেব থেকে আমি এটা বলেছি।'

বলে আহমদ মুসা ফিরে তাকাল গভর্নর ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দিকে।

বলল, 'এক্সিলেন্সি, মদিনা মনোয়ারার গভর্নর ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী! আমার বিবেচনায় ভূল থাকতেও পারে, তবে মনে করছি ইঞ্জিনিয়ার আবুল ওয়াফা ও আলী হাসান ভিন্ন ভিন্নভাবে বা যুক্তভাবে আহমদ মুসাকে হত্যার এই ষড়যন্ত্র করেছিল। ষড়যন্ত্রের জাল অনেক আগেই বিস্তার করা হয়। তারা সুযোগের সন্ধানে থাকে। অবশেষে উপস্থিত একটা সুযোগকে তারা কাজে লাগায়। আমি মনে করি তাদের দু'জনকে গ্রেফতার করে তদন্ত চালালে সবকিছু প্রমাণিত হয়ে যাবে।'

গভর্নর, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ উপস্থিত সকলের চোখে-মুখে অপার বিস্ময়! ইঞ্জিনিয়ার আবুল ওয়াফা ও আলী হাসান দুই জনের কারো বিরুদ্ধেই তারা কিছুই দেখছে না। আহমদ মুসা কিভাবে এমন চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিচ্ছে। অবশ্য এটা ঠিক, আহমদ মুসা শতভাগ নিশ্চিত না হয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেন না।

গভর্নর তাকাল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দিকে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও তাকিয়েছিল গভর্নর দিকে। বোধ হয় বুঝল তারা দু'জনের কথা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'আপনার পরমর্শ আমাদের কাছে নির্দেশ। মি. আহমদ মুসা,

আমরাও সব দেখলাম শুনলাম, কিন্তু আমরা তো কিছু বুঝতে পারছি না। আমরা জানতে খুব আগ্রহী আপনি এই সিদ্ধান্ত কি কারণে, কি জন্য নিলেন।'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'শক্তিশালী কোন এভিডেন্স, যথেষ্ঠ রকম কোন কার্যকরণের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত আমি নিইনি। দুর্বল একটা ক্লু আমি পেয়েছি, তার ভিত্তিতেই বড় এ সিদ্ধান্তটি আমি নিয়েছি।'

'সেটা কি মি. আহমদ মুসা? বলল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।'

'তিনটি বিবেচনা থেকে আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। প্রথমটি হলো, ইঞ্জিনিয়ার আবুল ওয়াফার মা, স্ত্রী ও খালা এই তিনজন এবং আলী হাসানের স্ত্রীও ইহুদি। দ্বিতীয় বিবেচনা ছিল, সম্প্রতি আমি ইস্তাম্বুল ও পূর্ব আনাতোলিয়ার যাদের ষড়যন্ত্র ও স্বার্থ মাটি করে দিয়েছি, তাদের সাথে যুক্ত ছিল ইহুদি স্বার্থ। সুতরাং প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ নেয়ার আশু আশংকা তাদের তরফ থেকেই আসার কথা। তৃতীয় বিবেচনা হলো, স্পেশাল ফ্লাইটের নির্দিষ্ট স্পেশাল প্লেনটির জন্যে তাকে কল করা হয়নি, তিনি বিমান বন্দরে এসে সুযোগ সৃষ্টি করে তবেই প্লেনে উঠেছিলেন। কল রেজিষ্টারে তার জন্য কল এন্ট্রি হয়েছে তিনি বিমান বন্দরে আসার পর। কলের কারণটাও স্পেসেফিক নয়, জেনারেল।' থামল।

'ধন্যবাদ মি. আহমদ মুসা। তিনটি বিবেচনা এক সাথে করলে আপনার সিদ্ধান্তকেই অপরিহায্য করে তোলে। কিন্তু মি. আহমদ মুসা, ইঞ্জিনিয়ার আবুল ওয়াফার মা, স্ত্রী, খালা ও আলী হাসানের স্ত্রীকে ইহুদি বলছেন কেন?' মুসলিম নাম নিয়ে এবং মুসলিম হিসেবেই ওরা ঘর-সংসার করছেন।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলল।

'একথা ঠিক, ইহুদিরা এখন এ নামগুলো ব্যবহার করে না। কিন্তু মধ্যযুগে মধ্যপ্রাচ্য বিশেষ করে মিসরে এই নামগুলোর ব্যাপক প্রচলন ছিল। সাধারণভাবে এই নামগুলো ইহুদীরা ব্যবহার করতো। মধ্যযুগের বিভিন্ন ইহুদী ডকুমেন্টে বিশেষ করে মিসরের সিনাগগ থেকে এর প্রমাণ পাওয়া 'Genij' ডকুমেন্টগুলোতে এই সব ইহুদি নামের দীর্ঘ তালিকা রয়েছে। ইঞ্জিনিয়ার আবুল ওয়াফার স্ত্রীর নাম 'আমাত আল-ওয়াহিত' খালার নাম 'আমাত আল-কাদির' ও মায়ের নাম' 'আমাত আল-আজিজ'। মজার ব্যাপার হলো ইহুদিদের 'গিনিজ' ডকুমেন্টে এই তিনটি নাম এক সাথে রয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারের বায়োডাটা মা ও স্ত্রীর

নাম যথাক্রমে 'আমাত আল-আজিজ' ও 'আমাত আল-ওয়াহিত' দেখার পর যখন শুনলাম ইঞ্জিনিয়ার খালাতো বোনকে বিয়ে করেছে, তখন আমি ইহুদি সিরিয়াল অনুসারে না জেনেই তার খালার নাম বলেছি 'আমাত আল-কাদির' এবং তা ঠিক হয়েছে। আলী হাসানের স্ত্রীর 'মিত আল-শাদা' নামটিও 'গিনিজ' ডকুমেন্টের। এই ক্লু সামনে রেখেই আমি মহিলাদের ইহুদি বলেছি এবং তা প্রমাণিত হবে ইনশাল্লাহ!' থামল আহমদ মুসা।

'ধন্যবাদ ভাই আহমদ মুসা। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। আল্লাহ আপনাকে লম্বা জীবন দান করুন। আপনার বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত নির্ভূল। আমরা এক সাথে জীবন-বৃত্তান্তগুলো শুনলাম। কিন্তু আপনি এত চিন্তা, এত অনুসন্ধান ও এত বিশ্লেষন কখন করলেন! সত্যি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে তার অসীম নেয়ামত দিয়ে ধন্য করেছেন। আল-হামদুলিল্লাহ!' বলল মদিনা মনোয়ারার গভর্নর।

'সম্মানিত সভর্নর মহোদয় ঠিক বলেছেন। আল-হামদুলিল্লাহ! তিনি এই তদন্তকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন, সহজ করে দিয়েছেন। আমি নিশ্চিত, তদন্ত অন্ধকার থেকে আলোতে চলে এসেছে। অপরাধীরা চিহ্নিত হয়েছে। এখন শুধু দেখার বিষয় ষড়যন্ত্রের শেকড় কোথায়, কারা এর পেছনে রয়েছে। এটা আমাদের গোয়েন্দারা পারবে।' বলল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

'কিন্তু ঐ বিষয়টাও জানা গেছে। আহমদ মুসা বলেছেন, তাকে হত্যা-প্রচেষ্টার সাথে ইহুদি ষড়যন্ত্র জড়িত রয়েছে। এখন শুধু বের করতে হবে, সৌদি আরবে কারা ইঞ্জিনিয়ার আবুল ওয়াফাদের এ কাজে ব্যবহার করছে। আবুল ওয়াফা ও আলী হাসানদের গ্রেফতার করলেই পেছনের লোকদের কথা জানা যাবে।' বলল গভর্নর।

এ সময় জেনারেল আলী আবদুল্লাহর টেলিফোন বেজে উঠল।

'মাফ করবেন!' বলে জেনারেল আলী আবদুল্লাহ মোবাইলসহ দ্রুত ঘরের বাইরে চলে গেল।

মিনিট খানেক পরেই ফিরে এল জেনারের আলী আবদুল্লাহ। নিজের আসনের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'এক্সিলেন্সি, একটা খবর এসেছে, অনুমতি হলে বলতে পারি।'

গভর্নর ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ সকলেই তাকাল জেনারেল আলী আবদুল্লাহর দিকে।

'বল জেনারেল, কি খবর।' বলল গভর্নর। কন্ঠে প্রবল ঔৎসুক্য।

'এই মাত্র আমাদের মদিনার পুলিশ প্রধান জানালেন, ইঞ্জিনিয়ার আবুল ওয়াফা সপরিবারে চলে যাচ্ছিলেন। সাদা পোষাকে পাহারায় থাকা পুলিশ তাদের আটকায়। জানায় যে, তাঁর মদিনা শরীফের বাইরে যাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আছে। এ কথা শুনে উনি পকেট থেকে রিভলবার বের করে ফাঁকা গুলি করে গাড়ি ষ্টার্ট দিয়ে পালাবার চেষ্টা করেন। পুলিশ সামনে গিয়ে বাধা দিলে সে একজন পুলিশকে গুলি করে আহত করেন। অবশিষ্ঠ দু'জন পুলিশ চাকায় গুলি করে তার গাড়ি থামিয়ে দেয় এবং তাকে আটক করে।'

'আল-হামদুলিল্লাহ! মি. আহমদ মুসার কথা ঘরের বাইরে বেরুবার আগেই সত্য প্রমাণিত হয়ে গেল। ঘটনা যে ঘটিয়েছে, সে ধরা পড়ল। আল্লাহর হাজার শোকর। আবারো ধন্যবাদ আহমদ মুসা আপনাকে।'

'তার গ্রেফতারের খবর দয়া করে সবার কাছ থেকে গোপন রাখুন। তার ধরা পড়ার কথা জানলে পেছনের ষড়যন্ত্রকারীরা পালাবে, তাদের ধরা কঠিন হয়ে পড়বে।' বলল আহমদ মুসা।

'স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহেব, প্লিজ আপনি ব্যবস্থা করুন। কিভাবে সবার কাছ থেকে বিষয়টা গোপন রাখা যায় দেখুন।' বলল গভর্নর দ্রুত কন্ঠে।

'ইয়েস এক্সিলেন্সি, আমি দেখছি। আমি এখানকার পুলিশ ও গোয়েন্দা প্রধানের সাথে বসছি। আমি জানাব আপনাকে।'

একটু থামল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সামনের গ্লাস থেকে একটু পানি খেয়ে নিয়ে আবার শুরু করল' 'এক্সিলেন্সি, আমি সাড়ে ১২ টার দিকে আহমদ মুসাকে নিয়ে রিয়াদ যাত্রা করব। ওদিকের সংকটের কোনই সুরাহা হয়নি আপনি জানেন।'

'অবশ্যই। বেগম ও সাহেবজাদাকে আমরা খুব কষ্ট দিলাম। সেই ৭টা থেকে ওরা এয়ারপোর্টে। আরও দেড় ঘন্টা থাকতে হবে। দু:খিত আহমদ মুসা আমরা সকলে।' বলে গভর্নর তাকাল আহমদ মুসার দিকে।

'না, কোন কষ্ট নয়। ওরা পাশের স্যুটে বেশ ঘুমাচ্ছে আমি খোঁজ নিয়েছি। সুন্দর ব্যবস্থা করায় প্রশাসনকে ধন্যবাদ এক্সিলেন্সি।' আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ আহমদ মুসা! বলে গভর্নর সকলের দিকে তাকাল। বলল, 'সকলকে ধন্যবাদ, একটা সফল মিটিং-এর জন্যে। আমরা এখন উঠতে পারি।'

কথা শেষ করেই গভর্নর উঠে দাঁড়াল।

তার সাথে সাথে উঠে দাঁড়াল সবাই।

রিয়াদের গোয়েন্দা সদর দফতর।

চারদিক ঘুরিয়ে ঠিক পেন্টগনের আদলে তৈরি। ঠিক যেন আরেকটা পেন্টাগন!

মাইনাস থার্ড ফ্লোরে অর্থাৎ তিরিশ ফুট মাটির নিচে একটা সুরক্ষিত কক্ষ।

কক্ষের দক্ষিণ প্রান্তে চারটি টেবিল। প্রতিটি টেবিলে একটি করে ছোট রিভলভিং চেয়ার।

টেবিলের একটিতে বসেছে আহমদ মুসা। তার ডানপাশে সৌদি নিরাপত্তা প্রধান, বাম পাশে সৌদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও তার বাম পাশে সৌদি গোয়েন্দা প্রধান।

কথা শুরু করেছিল গোয়েন্দা প্রধান আবদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ। সে আল্লাহর প্রশংসা ও নবী স. এর প্রতি দরুদ পেশের পর বলল, 'আমাদের মুয়াজ্জেজ মেহমান আহমদ মুসা জরুরি ভিত্তিতে যে তথ্যগুলো চেয়েছিলেন তার মধ্যে রয়েছে, 'সেদিন ভোর রাত থেকে সন্ধ্যা রিয়াদ থেকে আউটগোয়িং রাস্তাগুলোর যান চলাচলের মনিটরিং রিপোর্ট, এই সময়ের সধ্যে এই

রাস্তাগুলোতে অস্বাভাবিক বা সন্দেহজনক কিছু ঘটেছে কিনা সে সম্পর্কে তথ্য, রিয়াদ থেকে বাইরে যাওয়া কোন গাড়িতে বা কয়টি গাড়িতে একাধিক নন-আরব, বিশেষ করে শ্বেতাংগ মেয়ে ও কয়েকজন ছেলেকে দেখা গেছে, যাদের সাথে একজন অসুস্থ বা ঘুমন্ত মধ্যবয়সী আরব ছিল।'

রিয়াদ থেকে আউটগোয়িং সব হাইওয়ে ও সড়কের মনিটরিং রিপোর্ট আমাদের কাছে আছে। অস্বাভাবিক বা সন্দেহজনক বড় কিছু ঘটেনি। শুধু একটা মজার ঘটনা। সেটা হলো রিয়াদ থেকে দক্ষিনে আল-খারজ ক্রসিং পয়েন্টে এবং রিয়াদ থেকে পুবে ও হফুফ থেকে চার মাইল পশ্চিমে আল-জগুফ পয়েন্টে দু'টি গাড়ির ছবি ও তথ্যবলী রেকর্ড হবার পর মনিটরিং ফাইল থেকে তা মুছে গেছে।.....

গোয়েন্দা প্রধানের কথার মাঝখানেই আহমদ মুসা চোখ তুলে তাকাল গোয়েন্দা অফিসারের দিকে। তার কপাল কুঞ্চিত। কিন্তু কিছু বলল না।

গোয়েন্দা প্রধান বলছিল, 'একাধিক শ্বেতাংগ মেয়েসহ কয়েকজন শ্বেতাংগ পুরুষকে কোথাও কোন গাড়িতে এই সময়ের মধ্যে দেখা যায়নি। আমাদের জন্যে দু:খ যে, মনিটরিং থেকে বড় ধরনের কোন ক্লু পাওয়া যায়নি দেখা যাচ্ছে। সম্মানিত মেহমান আল্লাহর অশেষ নেয়ামতে ধন্য আহমদ মুসাসহ সবাই মনটরিং দেখলে, আমাদের আশা আহমদ মুসা, নিশ্চয় আমাদের পথ দেখাবেন।'

থামল গোয়েন্দা প্রধান আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ।

সৌদি নিরাপত্তা প্রধান আহমদ মুসার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ মি. আবদুল্লাহ শুরু করুন।'

'ধন্যবাদ এক্সিলেন্সি! বলে গোয়েন্দা প্রধান আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ তার টেবিলের ড্রয়ার খুলে একটা লাল বোতামে চাপ দিল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ডান, বাম ও সামনের দেয়াল বিশাল সফেদ স্ক্রিনে পরিণত হলো।

'এক্সিলেন্সি, আমি প্রথমে রিয়াদ থেকে পুবে যে হাইওয়ে ও সড়ক গেছে সেগুলোর মনিটরিং রিপোর্ট দেখাবো। তারপর উত্তর, এরপর পশ্চিম এবং শেষে দক্ষিণ দিকের হাইওয়ে।' বলল গোয়েন্দা প্রধান আবদুল্লাহ।

গোয়েন্দা প্রধান থামলেই আহমদ মুসা বলল, 'জনাব, পুবের পর দক্ষিন হাইওয়েটা প্লিজ আগে দেখান, যদি অসুবিধা না হয়।'

'না স্যার, কোন অসুবিধা নেই। আপনি যা বলেছেন সেটাই হবে।' বলল গোয়েন্দা প্রধান আবদুল্লাহ।

বলেই গোয়েন্দা প্রধান একটা নীল বোতামে চাপ দিল।

দেয়ালের স্ক্রিনে একটা প্রশস্ত রাস্তার ছবি ভেসে উঠল।

'এক্সিলেন্সি, এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিসার্চ বাংলো।' গোয়েন্দা প্রধান বলল।

দেয়ালের স্ক্রিনে দু'একটা করে গাড়ির দৃশ্য ফুটে উঠতে লাগল। দেয়ালে গাড়ির দৃশ্য ফুটে উঠার সাথে সাথে দেয়ালের পরবর্তী বটমে গাড়িগুলো খুব ক্লোজ ছবি ফুটে উঠল। এতটাই ক্লোজ যে, ভেতরের আরোহী, গাড়ীর নাম্বার, আরোহীদের লাগেজ সব কিছুই নিখুঁতভাবে দেখা যাচ্ছে।

একই সাথে রিয়াদের পূর্বঞ্চল, উত্তরাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চল, পশ্চিমের ধাপে সব দৃশ্যই দেখা গেল দীর্ঘ দুই ঘন্টা ধরে। আহমদ মুসার চোখ দু'টি আকুলভাবে খুঁজল একটি গাড়ি যাতে দেখা যাবে একাধিক শ্বেতাংগ মেয়ে, কয়েকজন যুবক ও সংগাহীন বা ঘুমন্ত একজন আরব যুবককে। কিন্তু এ রকম কোন কিছু মিলল না কোথাও।

রাস্তার দৃশ্য দেখানো বন্ধ হতেই আহমদ মুসা বলল গোয়েন্দ প্রধানকে উদ্দেশ্য করে, 'ম. আবদুল্লাহ, রিয়াদের পূর্বে আল-জওফ ও দক্ষিণে আল-খারজ পয়েন্টে একটি করে গাড়ির ছবি ও তথ্য মুছে যাওয়ার সময়টা বলা যাবে?

'জি হ্যাঁ, বলা যাবে স্যার। মনিটরিং রিলেতে একটা রেড ডট দিয়ে তা চিহ্নিত করা ছিল। আল-খারজে ঘটনাটা ঘটে ভোর পাঁচটায় এবং আল-জওফের ঘটনাটা ঘটে সকাল ৭টায়।' বলল গোয়েন্দা প্রধান।

'রিয়াদ থেকে আল-খারজ ও আ-জওফের দূরত্ব কত হবে, একশ', তিনশ' কিলোমিটার?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'ঠিক বলেছেন স্যার। রিয়াদ আল-খারাজ-এর দূরত্ব ১০০ কিলোমিটার এবং আল-জওফের দূরত্ব ৩শ' কিলোমিটার।' বলল গোয়েন্দা প্রধান।

আহমদ মুসার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'আরেকটা কথা মি. আবদুল্লাহ, সিসিটিভি'র মনিটরিং-এ এভাবে গাড়ির ছবি ও তথ্য মুছে যাওয়ার ঘটনা তো আর কোন হাইওয়েতে ঘটেনি।'

'জি না।' বলল গোয়েন্দা প্রধান।

'কিন্তু আল-খারজ-এর ১০ নম্বর ও আল-জওফের ৪০ নম্বর হাইয়ের আর কোন পয়েন্টে এই ঘটেনি?'

'এ ধরনের কোন খবর আসেনি। তবে এই অঞ্চলের হাইওয়ে আবার চেক করতে চাই। যদি কোথাও ঐ দুই জায়গার মত ইরেজের ঘটনা ঘটে থাকে সংশ্লিষ্ট তদারককারীরা তা চিহ্নিত না করলেও প্রমাণ পাওয়া যাবে। ইরেজের জায়গায় ফিল্ম ইরেজের প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন রং নিয়ে থাকে। জোরে স্ক্রোল করার সময় তা 'ব্রেক' আকারে স্পষ্টভাবে সামনে এসে যায়। আমি দেখছি স্যার।' বলল গোয়েন্দা প্রধান।

'তাহলে রিয়াদ থেকে যাওয়া সব হাইওয়ে আপনি চেক করুন। কতটুকু সময় লাগবে?' বলল আহমদ মুসা।

'না, বেশি সময় লাগবে না। কয়েক মিনিট মাত্র।' গোয়েন্দা প্রধান বলল।

কথা শেষ করেই গোয়েন্দা প্রধান আবদুল্লাহ ড্রয়ারে সুইচ-প্যানেলের একটা বোতাম চাপ দিল। সংগে সংগেই দেয়ালের স্ক্রিনে স্ক্রোল শুরু হয়ে গেল।

প্রথমেই স্ক্রোলে এল রিয়াদের পূর্ব দিকের হাইওয়ে। হাইওয়ের নাম্বার ফরটি। হাইওয়ে ফরটিতে স্ক্রোলের দু'জায়গায় পাওয়া গেল 'ব্রেক'- এর সংগে সংগেই দেয়ালের বটম। দেয়ালের স্ক্রিনে এবার গাড়ির ক্লোজ দৃশ্যের বদলে স্থানটির নাম ও সময় ভেসে উঠছে। ৪০ নাম্বার হাইওয়েথে প্রথম ব্রেক দেখা গেল রিয়াদের পূর্বে আল-নজল স্থানে, দ্বিতীয়টি আল-জওফে। ৪০ নাম্বার হাইওয়েতে আর 'ব্রেক' পাওয়া গেল না। ৮৫ নাম্বার হাইওয়ের হফুফ নামক স্থানে দু'টি 'ব্রেক' পাওয়া গেল অল্প সময়ের ব্যবধানে। অল্প ব্যবধানে দু'টি 'ব্রেক' পাওয়ায় ভ্রু কুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার। বিস্ময় ও গভীর ভাবনার ছায়া নামল তার চোখে-মুখে। কিন্তু কিছুই বলল না।

চতুর্থ স্থান আল-সালওতেও পাওয়া গেল দু'টি ব্রেক। আবার সেভাবেই ভ্রু কুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার। সেই বিস্ময়, সেই চিন্তা আবার তার চোখে-মুখে। রিয়াদ থেকে উত্তর ও পশ্চিমগামী কোন হাইওয়ের স্ক্রোলেই কোন ব্রেক পাওয়া গেল না। সবশেষে শুরু হলো রিয়াদ থেকে দক্ষিনগামী ১০ নাম্বার হাইওয়ের স্কোল। হাইওয়ে ১০-এ পাওয়া গেল দু'টি 'ব্রেক'। ৮৫ নং হাইওয়ের 'হফুফ' গামী হাইওয়ের হারাদ-এ এসে স্ক্রোলে ব্রেক পড়তেই আহমদ মুসার চোখ-মুখ থেকে বিস্ময় ও ভাবনার চিহ্ন মুছে গেল। আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার চোখ। বলল, 'আর স্ক্রোলের দরকার নেই মি. আবদুল্লাহ। যা চাচ্ছিলাম তা পেয়ে গেছি।'

স্ক্রোল বন্ধ হয়ে গেল। বিস্ময় ও আনন্দে উদ্বেল গোয়েন্দা আবদুল্লাহ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সৌদি নিরাপত্তা প্রধান।

তবে আহমদ মুসা অনেকটা নিরব। তার কন্ঠে ঝরে পড়ল অসীম হতাশা। 'সৌদি আরব থেকে তারা পালিয়েছে কিনা জানি না। তবে তারা সকাল ৯টার মধ্যেই আল-মালওয়াতে পৌঁছে যায়। আল-মালওয়া থেকে আরও দক্ষিনে আরব আমিরাতের দিকে যাবার দৃশ্য কোন স্ক্রোল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। আমার মনে হয় তারা আল-মালওয়া অঞ্চলের কোথাও আছে অথবা আল-মালওয়ার লাগোয়া কাতারে তারা প্রবেশ করেছে বা সাগর পথে একটু এগিয়ে বাহরাইনের প্রবেশ করতে পারে কিংবা তারা সাগর পথে অন্য কোথাও চলে গেছে।' আহমদ মুসা বলল।

'কিন্তু ঘটনা ঘটার প্রায় সাথে সাথে অন্তত ছ'টার মধ্যে দেশের সকল হাইওয়ে, বিমান বন্দর, সমুদ্র বন্দর ও কোষ্ট গার্ডের কাছে বিজ্ঞানিকে কিডন্যাপ করার বিববণসহ আমাদের নির্দেশ পৌঁচে গেছে। তাছাড়া আল-মালওয়ার সমুদ্র অঞ্চল ছোট ও খুবই ব্যস্ত। সৌদি কোষ্ট গার্ড ছাড়াও কাতার ও বাইরাইনের কোষ্ট গার্ডেরাও এখানে পাহারা দেয়। আমরা এলার্ট করার পর আমাদের বিজ্ঞানীসহ এই সাগর-পথ কারও পক্ষে পাড়ি দেয়া সম্ভব নয়।' সৌদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলল।

'আপনার কথা ঠিক জনাব। তবে ভাবনার বিষয় হলো তারা উপকূল থেকে পালাবার জন্যে কি ধরনের সমুদ্রযান ব্যবহার করেছেন। সড়ক পথের বিষয়টাই দেখুন। দুই গাড়ি নিয়ে ১০ নাম্বার হাইওয়ে ও ৪০ নাম্বার হাইওয়ের

পথে ওরা হফুফ হয়ে আল-মালওয়াতে এসেছে। কিন্তু ধরা যায়নি তাদের।' বলল আহমদ মুসা।

'হাইওয়েতে যে দু'টি গাড়ির ছবি ও তথ্যবলী মনিটরিং ফাইল থেকে মুছে গেছে, সে দু'টি গাড়িকেই আপনি কিডন্যাপারদের বলে ধরছেন। এটা কি সন্দেহাতীত?' বলল সৌদি নিরাপত্তা প্রধান।

'আমি কতকগুলো বিষয়ের উপর আমার বিশ্বাস দাঁড় করিয়েছি। বিষয়গুলো কোন ত্রুটি নেই।' আহমদ মুসা বলল।

'কি সেই বিষয়গুলো মি. আহমদ মুসা?' জিজ্ঞাসা সৌদি নিরাপত্তা প্রধানের।

দু'টি গাড়িই সিসিটিভিকে ফাঁকি দেয়ার জন্যে এই টেকনলজি ব্যবহার করেছে, দ্বিতীয়ত, দুই গাড়ি এক শহর রিয়াদ থেকে বের হয়ে দুই পথে এগিয়ে আবার তারা হফুফে গিয়ে এক পথে উঠেছে এবং দু'টি গাড়িরই যাত্রা শেষ হয়েছে আল-মালওয়াতে গিয়ে। তৃতীয় বিষয় হলো, রিয়াদ থেকে দুই গাড়ি একই সময়ে যাত্রা শুরু করে আল-মালওয়ার উদ্দেশ্যে। শেষ কথা হলো, পরিবহন সিসিটিভি থেকে তারা নিজেদের আড়াল করতে চাচ্ছিল কেন? এ জন্যেই যে, তারা যাতে তাদের বন্দী ও নিজেদেরকে সবার চোখ থেকে আড়াল করতে পারে।' বলল আহমদ মুসা।

মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল সৌদি নিরাপত্তা প্রধানের। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও গোয়েন্দা প্রধানেরও। তাদের কাছেও বিষয়টা দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে গেল।

কিন্তু পরক্ষণেই মুখে অন্ধকার নেমে এল সৌদি নিরাপত্তা প্রধানের। বলল, 'তাহলে মি. আহমদ মুসা, আমরা যদি নিশ্চিত হই যে, কিডন্যাপাররা বিজ্ঞানীকে নিয়ে আল-মালওয়াতে পৌঁছেছে, এ বিষয়েও তাহলে নিশ্চিত হতে হবে যে, কিডন্যাপাররা বিজ্ঞানীকে নিয়ে আমাদের দেশের বাইরে, মানে ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে।'

‘সৌদি আরবের বাইরে চলে গেছে কিনা, তা আমি নিশ্চিত জানি না। অবশ্য যাওয়ার আশংকাই বেশি। তবে তারা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে যায়নি। পৃথিবীতে থাকলে তাদের ধরা-ছোঁয়ার মধ্যেই থাকতে হবে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আল-হামদুলিল্লাহ! মি. আহমদ মুসা, সৌদি আরব থেকে ওদের চলে যাবার আশংকায় বেশি। তাহলে কম হলেও তাদের সৌদি আরবে থাকার একটা সম্ভাবনাও আছে। সে ক্ষেত্রে আল-মালওয়া অঞ্চলে আমাদের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হওয়া উচিত কিনা।’ বলল সৌদি নিরাপত্তা প্রধান।

‘আমি সেটাই ভাবছি। ওরা এখনও সৌদি আরব থেকে পালিয়ে যেতে পারুক বা না পারুক, আমাদের ওখানে যাওয়া দরকার।’

বলে মুহূর্তের জন্যে একটু থামল আহমদ মুসা। একটু নড়ে বসে চেয়ারটায় একটু হেলান দিল। শুরু করল আবার, ‘আপনারা প্লিজ একটা নির্দেশ দিন, সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী সময়ে আল-আলওয়া বে’র মারফেস ওয়াটার ও ইনার ওয়াটারে যত জলযান চলাফেরা করেছে, বিশেষ করে আল-মালওয়া বে’ থেকে আউট গোয়িং সব জলযানের বিবরণ ও নির্ঘন্ট তৈরি করে আপনাদের দিক। আপনাদের তরফ থেকে আরও একটা নির্দেশ দেয়া প্রয়োজন যে, আল-মালওয়া বন্দর ছাড়াও এর আশেপাশের উপকূল জুড়ে যে প্রাইভেট জেটি ও নৌ-টার্মিনালগুলো রয়েছে তাদেরও এই সময়ে একটা মনিটরিং দরকার। জানা দরকার যে, এই সময়ে কারা সেখানে গেছে। ‘ থামল আহমদ মুসা।

গোয়েন্দা প্রধান ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাকাল সৌদি নিরাপত্তা প্রধানের দিকে।

‘ধন্যবাদ মি. আহমদ মুসা। আমি আমাদের নৌবাহিনী ও কোষ্ট গার্ডকে এখনি নির্দেশ দিচ্ছি।’

এটুকু শেষ করেই সৌদি নিরাপত্তা প্রধান তাকাল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দিকে। বলল, ‘আপনি পুলিশকে উপকূলের বন্দর, জেটি ও নৌ-টার্মিনালগুলোতে খোঁজ-খবর নিতে এবং মনিটরিংগুলো যোগাড় করতে বলুন।’

‘অবশ্যই, এখুনি আমি নির্দেশ পাঠাচ্ছি।’ বলল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথার মধ্যেই গোয়েন্দা প্রধানের ওয়ারলেস ‘বিফ’ সিগন্যাল দিতে শুরু করেছে।

ওয়্যারলেস নিয়ে গোয়েন্দা প্রধান ঘরের এক প্রান্তে সরে গেল। মিনিট খানেক কয়েক কথা বলে গোয়েন্দা প্রধান দ্রুত ফিরে এল টেবিল। তার চোখে-মুখে উত্তেজনা। চেয়ারে বসেই নিরাপত্তা প্রধান ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দিকে চেয়ে বলল, 'আল-মালওয়ার আমাদের গোয়েন্দা প্রধান খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা খবর দিল। সেটা হলো, আল-মালওয়া বে'তে আমাদের নৌবাহিনীর ইনার-ওয়াটার কমান্ডের পেট্রল সাবমেরিন বে'র ফ্লোরে একটা পরিত্যক্ত টিউব সাবমেরিন খুঁজে পেয়েছে। দশ ফিট লম্বা, পাঁচ ফিট বেড়ের টিউব সাবমেরিনটির গায়ে কোন রাষ্ট্রীয় পরিচয় বা কোম্পানীর পরিচয় চিহ্নিত নেই। প্রাথমিক এই খবরটুকুই আমাদের গোয়েন্দারা এখন পর্যন্ত পেয়েছে। টিউব সাবমেরিনটিকে আল-মালওয়ার নৌঘাটিতে নিয়ে আসা হচ্ছে।'

বিস্ময় নামল সকলের চোখে-মুখে। ভ্রু কুঁচকে গেল আহমদ মুসার।

'ধন্যবাদ মি. আবদুল্লাহ। বিস্ময়কর এই ঘটনা। আমাদের পানিসীমায় এ ধরনের ঘটনার আর কোন নজির নেই। দেখি আমি জানতে চেষ্টা করছি। আর কিছু কি জানা গেল টিউব সাবমেরিন সম্পর্কে?' বলে টেবিল থেকে তার অয়্যারলেস তুলে নিল সৌদি নিরাপত্তা প্রধান।

সংগে সংগেই আহমদ মুসা সৌদি নিরাপত্তা প্রধানকে লক্ষ করে বলল, 'জনাব, আপনি দয়া করে এ বিষয়টাও জানুন, পরিত্যক্ত টিউব সাবমেরিনটির ইঞ্জিন বন্ধ হয়েছিল কোন তারিখে, কতটায় এবং টিউব সাবমেরিনটিতে মনোগ্রাম ধরনের কোন চিহ্ন আছে কিনা।'

'ধন্যবাদ মি. আহমদ!' বলে সৌদি নিরাপত্তা প্রধান ওয়্যারলেস নিয়ে সরে গেল ঘরের এক প্রান্তে। কয়েক মিনিট পরে ফিরে এল সৌদি নিরাপত্তা প্রধান। তার চোখে-মুখে আনন্দ ও উত্তেজনা দুই-ই!

চেয়ারে ফিরে এসেই বলল, 'ইয়েস মি. আহমদ মুসা, টিউব সাবমেরিনটির ইঞ্জিন বন্ধ হয় ৯টা ৩০ মিনিটে। আর মনোগ্রাম বিষয়ে তারা জানাল মনোগ্রাম ধরনের কিছু তাদের চোখে পড়েনি। অবশ্য বিস্তারিত অনুসন্ধান সবে তারা শুরু করেছে।'

‘পরিত্যক্ত টিউব সাবমেরিনটি পাওয়া গেছে ঠিক কোন জায়গায়?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘হ্যাঁ, এ বিষয়টা আমিও ভেবেছি মি. আহমদ মুসা। বাহরাইনের পূর্ব উপকূল ও কাতারের পশ্চিম উপকূল থেকে প্রায় সমদূরত্বের সাগর তলে পাওয়া গেছে টিউব সাবমেরিনটা।’

বলে একটু থেমেই আবার শুরু করল সৌদি নিরাপত্তা প্রধান, ‘টিউব সাবমেরিনের একমাত্র বডি ছাড়া কিছুই আস্ত অবস্থায় পাওয়া যায়নি। ভেতরের ইঞ্জিনের কাঠামো ছাড়া সব কিছুই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মনে করা হচ্ছে টিউব সাবমেরিন পরিত্যাগ করার সময় ইন্টারন্যাল বিশেষ বিস্ফোরণে ডিভাইসের মাধ্যমে ভেতরের সব কিছু সবংস করে দেয়া হয়। অন্যদিকে টিউব সাবমেরিনটির বাইরের বডি একেবারে ক্লিন, কোথাও কোন লেখা বা চিহ্ন কিছুই নেই।’ থামল সৌদি নিরাপত্তা প্রধান।

‘ঠিক কোন লোকেশানে পাওয়া গেছে টিউব সাবমেরিনটি?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘মি. আহমদ মুসা, আমি জানি কাতার ও বাহরাইনের মানচিত্র সম্পর্কে আপনার ভাল জানা আছে। ধরুন, কাতারের পশ্চিম উপকূলের মরুশহর আজুরাবা ও বাহরাইনের উপকূল শহর আল-দুর এই দুই শহরকে যদি এক সরল রেখায় যুক্ত করা হয়, তাহলে আল-দুরের কাছের যে বিন্দুটা হবে সেটাই পরিত্যক্ত টিউব সাবমেরিন খুঁজে পাওয়ার লোকেশন।’ বলল সৌদি নিরাপত্তা প্রধান।

‘ধন্যবাদ। যারা টিউব সাবমেরিন থেকে আসে, তারা কোথায় যেতে পারে এ সম্পর্কে কেউ কি জানতে পেরেছে?’ বলল আহমদ মুসা।

‘না, এ সম্পর্কে কেউ আমাকে কিছু বলেনি। নিশ্চয় তারা এ ব্যাপারে কিছুই জানতে পারেনি। কিন্তু মি. আহমদ মুসা, তারা কোথায় গেল তার চেয়ে বড় প্রশ্ন হলো, তারা কারা?’ এই অদ্ভুত টিউব সাবমেরিন কেন এসেছিল আমাদের আল-মালওয়া বে’তে কোন পরাশক্তি বা অন্য কারো কি এটা একটা গোয়েন্দা মিশন?’ সৌদি নিরাপত্তা প্রধান বলল।

‘আমার কোন সন্দেহ নেই, এই টিউব সাবমেরিনে করেই কিডন্যাপাররা আমাদের বিজ্ঞানীকে নিয়ে পালাচ্ছিল। তারপর দুর্ঘটনায় পড়ে তারা টিউব সাবমেরিনটি পরিত্যাগ করে।’ বলল আহমদ মুসা।

মুখ শুকিয়ে গেল সৌদি নিরাপত্তা প্রধান, সৌদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও গোয়েন্দা প্রধানের।

‘সর্বনাশ, দুর্ঘটনায় আমাদের বিজ্ঞানীর তো কিছু হয়নি? যারা টিউব সাবমেরিন থেকে বেরিয়ে এসেছে তারা এখন কোথায়? তাদের সাথেই কি আমাদের বিজ্ঞানীও রয়েছেন? না তার কোন বিপদ হয়েছে?’ বলল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তার কন্ঠে উদ্বেগ।

‘এ প্রশ্নগুলো আমারও মি. স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আমি যথাসম্ভব শীঘ্র আল-মালওয়া যেতে চাই। বাহরাইনেও যেতে হতে পারে, যদি অন্য কোন জলযানে ওদের স্থানান্তরিত হওয়ার প্রমাণ না যায়।’ বলল আহমদ মুসা।

‘সে সম্ভবনা কি আছে?’ জিজ্ঞাসা সৌদি নিরাপত্তা প্রধানের।

‘যারা কিডন্যাপিং কাজে টিউব সাবমেরিন ব্যবহার করতে পারে, তাদের পক্ষে অমন ব্যবস্থা করা অসম্ভব নয়।’ বলল আহমদ মুসা।

উদ্বেগে আড়ষ্ট হয়ে গেল সৌদি নিরাপত্তা প্রধানসহ সকলের মুখ। কথা বলল সৌদি নিরাপত্তা প্রধান। বলল, ‘তাহলে কি ও কিডন্যাপিং এর সঙ্গে পরাশক্তিদের কেউ জড়িত? আমি জানি দু’একটি পরাশক্তির গোয়েন্দা বিভাগের গোপন সঞ্চয় ও ধরনের টিউব সাবমেরিন থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু প্রথিবীর আর কোন সামরিক বাহিনী বা গোয়েন্দা বাহিনীর হাতে এ জিনিস নেই।’ সৌদি নিরাপত্তা প্রধানের কন্ঠ কম্পিত।

‘কিডন্যাপার সংগঠনের সাথে কোন পরাশক্তির যোগাগোগ বা যোগসূত্র আছে কিনা আমি জানি না। তবে কিডন্যাপার সংগঠন নিজেই অত্যান্ত পাওয়ারফুল, একেবারেই উত্তর-আধুনিক, ওদের হাতে অবিশ্বাস্য সব টেকনলজি রয়েছে। আপনার সাথে এ ব্যাপারে আমার কোন কথা হয়নি। কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও আপনাদের গোয়েন্দা প্রধান ওদের সম্পর্কে সামান্য যা জানা গেছে জানা গেছে তা জানিয়েছি।’ আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলে উঠল, 'ইয়েস এক্সিলেন্সি, জনাব আহমদ মুসা অনুমান করছেন গ্লোবাল সন্ত্রাসবাদী সংগঠন ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেট এই কিডন্যাপের সাথে জড়িত আছে।'

'ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেট! বলে ভ্রু কুঞ্চিত করে সৌদি নিরাপত্তা প্রধান বলল, 'এমন কোন সংগঠনের নাম তো আমি শুনিনি। কিন্তু অনুমান বলছেন কেন মি. আহমদ মুসা?'

'অনুমান এই কারণে যে, এখনও বিষয়টা নিশ্চিত হয়নি। তবে গোটা ঘটনার মধ্যে দিয়ে এমন কিছু দিক সামনে এসেছে তাতে ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটকেই অভিযুক্ত করতে হয়।' আহমদ মুসা বলল।

'আল-হামদুলিল্লাহ! মি. আহমদ মুসা, ধন্যবাদ আপনাকে। আপনি দ্রুত একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, উদ্ধার-অনুসন্ধানের জন্যে এটা খুব বড় ব্যাপার। আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করুন, আমাদেরও সাহায্য করুন। গোয়েন্দা প্রধান মি. আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ আপনার তাঁর সাথে যাওয়া উচিত।'

আবার একটু থেমে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার মহান আংকল খাদেমুল হারামাইন শরীফের মহান বাদশা আপনাকে রিয়াদে স্বাগত জানিয়েছেন। মানুষের প্রতি ও ইসলামের প্রতি আপনার নি:স্বার্থ খেদমত তিনি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেছেন, বর্তমান উদ্ধার-অনুসন্ধানের দায়িত্ব নেয়ার আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন এবং আশা করেছেন, যত তারাতারি সম্ভব আপনার সাথে তার সাক্ষাত হবে।'

'এক্সিলেন্সি, তিনি আমাকে স্মরণ করায় আমি। তাকে আমার সালাম পৌঁছাবেন। আল্লাহ তাকে ইসলামের, মানুষের আরো খেদমত করার তৌফিক দিন!' বলল আহমদ মুসা।

'ধন্যবাদ মি. আহমদ মুসা।' বলে সবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি এখন উঠতে চাই। আস্সালামু আলায়কুম।'

উঠে দাঁড়াল সৌদি নিরাপত্তা প্রধান। উঠে দাঁড়াল আবদুল রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ফয়সাল ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবদুল আজিজ আল-সউদ। সবাই উঠে দাঁড়াল।

একটা ফেরি বোট আল-মালওয়া বে'র নীল বুক চিরে এগুচ্ছে বাহরাইনের দিকে।

এই বোটের একজন সাধারন প্যাসেঞ্জার আহমদ মুসা।

ফেরি বোটটি দু'তলা।

দু'তলার ডেক চেয়ারে বসেছে আহমদ মুসা।

আল-মালওয়া ও বাহরাইনের মধ্যে দিনে নিয়মিত কয়েকবার ফেরি যাতায়াত করে। ফেরিগুলো বাহরাইনের আল-দুর থেকে রাজধানী মানামা পর্যন্ত ভিন্ন ডেস্টিনেশনে যাতায়াত করে। অনেকে আল-দুর, জও, আরাকাস ইত্যাদি স্থানে নেমে সড়ক পথে বিভিন্ন স্থানে যায়।

আহমদ মুসা যাচ্ছে আল-দুরে, দক্ষিন থেকে বাহরাইনের পূর্ব উপকূলে প্রবেশের প্রথম বন্দর। আহমদ মুসা হিসাব করেই বাহরাইরেন এ ছোট্ট বন্দরকে এন্ট্রিপয়েন্ট হিসাবে বাছাই করেছে।

আহমদ মুসা আল-মালওয়া এসে আল-মালওয়া বে'থেকে উদ্ধার করা টিউব সাবমেরিন দেখেছে। টিউব সাবমেরিনে সে যা দেখার আশা করেছিল তা পেয়েছে। টিউব সাবমেরিনের বাইরে গা ও পুড়ে যাওয়া ভেতরের অংশে কোন চিহ্নই পায়নি। অবশেষে টিউব সাবমেরিনের কালো রংয়ের মাথায় কালো রংয়ের একটা মনোগ্রাম পেয়েছে। একটা কালো সুট ঘিরে সুঁচালো মাথার কালো ত্রিভুজ সজ্জিত কালো একটা রিং। রিং-এর শীর্ষ বিন্দুতে রিং-এর একটা ব্রেক। সেখানে ত্রিভুজের আকারে তীক্ষ্ণ ফলার সুদীর্ঘ বর্শা দাঁড়িয়ে। বর্শার দু'পাশে ছোট ছোট দু'টি ত্রিভুজ। আহমদ মুসা নি:সন্দেহ হয় যে, এটাই ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের সেই মনোগ্রাম। জোসেফাইন ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের মনোগ্রামের এমন একটি বর্ণানাই দিয়েছিল।

টিউব সাবমেরিনেই ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেট তাদের বিজ্ঞানীকে নিয়ে পালাতে চেষ্টা করেছিল, এটা নিশ্চিত হবার সংগে সংগেই আহমদ মুসা আল-দুরে

আসার সিদ্ধান্ত নেয়। সে নিশ্চিত, ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের লোকরা টিউব সাবমেরিন থেকে বেরিয়ে যদি অন্য কোন জলযানে উঠে চলে না গিয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই তারা কূলে ওঠা ও অন্য কোথায় যাবার জন্যে সবচেয়ে কাছের আল-দুর বন্দরকেই ব্যবহার করেছে। যদি এটাই ঘটে থাকে, তাহলে দ্রুত বাহরাইনে পৌঁছতে পারলে ছোট্ট এই দেশে ওদের খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। অবশ্য আহমদ মুসা এটাও চিন্তা করেছে যে, তারা বাহরাইনে পৌঁছতে পারলে ছোট্ট এই দেশে ওদের খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। অবশ্য আহমদ মুসা এটাও চিন্তা করেছে যে, তারা বাহরাইন থেকে ডেষ্টিনেশনে যাবার বিকল্প ব্যবস্থা করতে অবশ্যই বেশি সময় নেবে না। তার মনে হয়েছে আজ দিনের অবশিষ্ট সময় ও রাতটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বোটের ডেকে আহমদ মুসা ছাড়া আরও অনেকে বসে আছে।

চাঁদোয়া টাঙানো থাকায় উন্মুক্ত ডেকের সুবিধা নেই, তবে সরাসরি সূর্যের তাপ থেকে বাঁচা যাচ্ছে। তার উপর সাগরের অব্যাহত বাতাস। পরিবেশটা ঘুম পাড়িয়ে দেবার মত।

আহমদ মুসার দু'পাশে, সামনে, পেছনে সব দিকেই বেদুইন শ্রেণীর আরব। তারা অবিরাম কথা বলছে। তাদের কথার মাঝখানে নিরব আহমদ মুসার অস্তিত্বই যেন হারিয়ে গেছে!

আহমদ মুসার চোখ কিছুটা ধরে এসেছিল। হঠাৎ তার পাশে দু'জন আরবের কথাবার্তা তার ঘুম ছুটিয়ে দিল।

আহমদ মুসার একদম পাশের জন বলছিল, 'বেঁচে থাকলে আরও কত কি যে দেখতে হবে! আজ সকালে আমাদের ঘাট থেকে আল-দুরে যাবার সময় আমার নৌকার সামনে ৫ জন লোককে ভেসে উঠতে দেখলাম। প্রথমে বুঝতে পারিনি তারা মানুষ। কয়েকটা টিউব ভেসে উঠেছিল পানির উপর। টিউবের মাথায় টর্চের মত মাথাওয়ালা কিছু বসানো। টিউবের মাথা পানির উপর ভেসে ওঠার পরপরই টিউবের মাথা দু'ভাগ হয়ে দু'দিকে সরে যায়। তারপরই সেখান থেকে মানুষ বেরিয়ে আসে। তারা উপকূলে ওঠার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু খাড়া উপকূলে উঠতে পারছিল না। আমার নৌকা ওরা দেখতে পায়। আমার সাহায্য

চাইলে আমি ওদের নৌকায় তুলে নিয়ে একটু সামনে নিয়ে গিয়ে সমভূমির মত উপকূলে নামিয়ে দেই। ওরা নাকি ট্যুরিষ্ট! ঐ টিউবে ঢুকে পানির তল দিয়ে আল-আসকার থেকে নাকি এদিকে এসেছে। ওদের একজন অসুস্থ হওয়ায় ওদের কূলে উঠতে হয়েছে। লোকটি টিউবের মধ্যেই নাকি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিল। ওদের ডুবুরির পোষাক আমি দেখেছি। ওতে অক্সিজেন ট্যাংক সাথে নিতে হয় না। টিউবেও সে রকম কিছুই ছিল না। তাহলে ওরা অক্সিজেন ছাড়া ঘন্টার পর ঘন্টা পানির তলে থাকে কি করে! একদম ভূতুড়ে ব্যাপার!' থামল লোকটি।

আহমদ মুসার মনে কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা তখন চরমে।

আহমদ মুসা লোকটির দিকে তাকিয়ে সুন্দর আরবী ভাষায় বলল, 'ভাই, আপনার মজার কাহিনী আমিও শুনলাম। সত্যিই খুব আশ্চর্যের ব্যাপার! ঘটনা আজকে ঘটেছে, কয়টায়?'

বেদুইন আরব আহমদ মুসার দিকে তাকাল।

তার মুখে হাসি। বলল বেদুইন লোকটি, 'তখন সময় সাড়ে নয়, পৌনে দশটা হবে। আমি আল-দুরে আসছিলাম সাড়ে দশটার ফেরি ধরব বলে। পথেই ঐ ঘটনা।'

'ওরা কি বিদেশী? অসুস্থ লোকটাকেও দেখেছেন? লোকটা সংজ্ঞাহীন হওয়ার পরও ওরা কি টিউব চালিয়ে এসেছে?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার। আহমদ মুসা তার উদ্দেশ্য আড়াল করার জন্যে বোকার মতও কিছু প্রশ্ন করছে।

'অসুস্থ লোকটিকেও দেখেছি। সে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেই ওরা নাকি থেমে গেছে। সবাই ওরা বিদেশী। তবে অসুস্থ লোকটির পোষাক অন্যদের মত নয়। তার পরনে ঢিলা পাজামা, কুর্তা ছিল। তার পায়ে-হাতে ছিল রাবারের মোজা দস্তানা। ওদের মোট ছয়জনের মধ্যে একজন মেয়ে ছিল। সেও ছিল পুরুষের পোষাকে।' বলল বেদুইন আনন্দের সাথে।

'যে টিউবের মধ্যে ওরা ছিল সেগুলো কি করল?' বলর আহমদ মুসা।

'সেটাও এক আশ্চর্য! টিউব যখন গুটাল তখন এক একটা ব্যাগে পরিণত হলো। ব্যাগগুলো কাঁধে ঝুলিয়ে ওরা চলে যায়।' বেদুইন লোকটা বলল।

'টিউবের ভেতরে ইঞ্জিন ধরনের কিছু ছিল না?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'ঠিক ধরেছেন আপনি। কিছু ছিল টিউবের মধ্যে। তা না হলে ব্যাগগুলো কিছুটা ভারী হলো কেন?' বলল বেদুইন।

বেদুইন যতটা আনন্দিত হয়ে জবাব দিচ্ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি আনন্দ আহমদ মুসার মধ্যে। তাহলে কিডন্যাপাররা বাহরাইনে ঢুকেছে, সে ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ নেই। অসুস্থ লোকটিই তাদের বিজ্ঞানী। তাকে বেদুইন লোকটি শ্বেতাংগ চেহারায় দেখেছে। কারণ তাকে শ্বেতাংগ-সিকনের মুখোশ পরানো ছিল। তার গায়ের রং আড়াল করার জন্যেই বিজ্ঞানীর হাতে-পায়ে মোজা-দস্তানা পরানো ছিল। তার পোষাক পাল্টানোর সময় কিডন্যাপররা পায়নি। ঢিলা পাজামা-কামিজ ছিল বিজ্ঞানীর ঘুমানোর পোষাক।

আবার কথা বলল আহমদ মুসা হাসতে হাসতে, 'ওদের একটা টিউব পেলে মন্দ হতো না! এগুলো আমাদের দেশে এখনও আসেনি।'

'ঠিক বলেছেন। অমন জিনিস পেলে তাদের মত নিশ্চিন্তে পানিতে চলাফেরা করা যেত!' বেদুইনও বলল হাসতে হাসতে।

'ওরা আপনার সাথে কি ভাষায় কথা বলল?' বলল আহমদ মুসা।

'ট্যুরিষ্টরা যেমন বলে ইংরেজি মেশানো ভাঙা আরবিতে।' বেদুইন বলল।

আবার হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'আমি হলে কিন্তু বলতাম, একটা টিউব দিয়ে যাও।'

'দেখি, আবার দেখা হলে কোথায় পাওয়া যায় ওগুলো, জেনে নেব।' বেদুইন লোকটি বলল।

'কোথায় গেল ওরা, থাকে কোথায়, কোথায় উঠেছে? ওরা বলেনি কিছু?'

'হ্যাঁ, জিনিসগুলো দারুন মজার! কোথায় উঠেছে ওরা বলেনি। শুধু ঐটুকুই বলেছিল তারা আল-আসকার থেকে আসছে।' বেদুইন বলল।

'হ্যাঁ, ওখান থেকে আসতে পারে। তবে ট্যুরিষ্টরা প্রথমে আসে মানামাতেই।' আহমদ মুসা বলল।

কিন্তু মনে মনে আহমদ মুসা বলল, পুরোটাই ওরা আপনাকে মিথ্যা বলেছে বেদুইন ভাই। দুর্ঘটনার শিকার হয়ে বাহরাইনে এসেছে ট্যুরিষ্ট সেজে।

নিশ্চয় ওদের উদ্ধার করার জন্যে বিকল্প যান আসছে। যতক্ষণ না আসছে ততক্ষণই মাত্র ওরা থাকবে বাহরাইনের কোথাও না কোথাও। কোথায় থাকবে তারা? ওরা বাহরাইনে থাকার এ সময়টা খুবই মূল্যবান। সে কি পারবে এই সময়ের মধ্যে ওদের কাছে পৌঁছতে?

আহমদ মুসা একটুক্ষণ নিরব হয়ে পড়েছিল এসব চিন্তায়। ইতিমধ্যে বেদুইন লোকটি তার ওপাশের সাথীর সাথে কথা শুরু করে দিয়েছে।

আহমদ মুসা খুশিই হলো। তার নিরিবিলি একটু সময় দরকার। ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের এদের বাহরাইনে ঢোকার এই খবর সৌদি গোয়েন্দা প্রধান আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহকে জানানো দরকার। ওদিক থেকে তিনিও বাহরাইন গোয়েন্দা পুলিশকে বলে এদের সন্ধানের চেষ্টা করতে পারেন। আহমদ মুসা বাহরাইনে আসছে এ ব্যাপারটা সৌদি সরকার আগেই বাহরাইনকে বলেছে।

এক সময় বেদুইন লোকটি আহমদ মুসার দিকে ফিরল। বলল, 'আপনি বাহরাইনের নন, সউদি আরবেও নতুন নিশ্চয়।'

'কি করে বুঝলেন?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার বেদুইনকে।

'আমরা বেদুইনরা ভাষা চিনি, এমনকি আরবের কোন কবিলার ভাষা কেমন, তাও মোটামুটি আমরা জানি।' বলল বেদুইন লোকটি অনেক গর্বের সাথেই।

'ঠিক বলেছেন। তবে আমি মদিনা শরীফের বাসিন্দা।' আহমদ মুসা বলল।

'বাহরাইনে ব্যবসায়-বাণিজ্য না বেড়াতে এসেছেন?' জিজ্ঞাসা বেদুইনের।

'এবার বেড়াতেই এসেছি।' আহমদ মুসা বলল।

'মদিনা থেকে এই অদ্ভুত পথে কেন, কিং ফাহাদ কজওয়ে বাদ দিয়ে?' বলল বেদুইন।

বেদুইনের এই কথাবার্তায় বিস্মিত হলো আহমদ মুসা। তার এই সর্বশেষ প্রশ্ন ও ভাষা সম্পর্কে তার জ্ঞান সাধারণ বেদুইনের চেয়ে বড় কিছু তাকে প্রমাণ করে।

আহমদ মুসা একটু হাসল। বলল, 'আমাকে যে প্রশ্ন করলেন, এমন প্রশ্ন টিউবে করে পানি থেকে উঠে আসা ট্যুরিষ্টদের করা উচিত ছিল। যে 'টিউব বডি ভেইকেল' এর কথা আমাদের মত মানুষরা শোনেইনি, যে 'টিউব বডি ভেহিকেল' সাধারণ ট্যুরিষ্টরা এত সংখ্যায় পেল কি করে?'

বেদুইন লোকটিও হাসল। বলল, 'প্রশ্ন করলে আরও কিছু মিথ্যা কথা শুনতে হতো। তাই প্রশ্ন করিনি।'

কিছুটা বিস্ময় আহমদ মুসার চোখে-মুখে! বলল, 'তাহলে ওদের সন্দেহ করেছিলেন?'

'কিছুটা।' বলল বেদুইন লোকটি।

'কিন্তু কিছু তো বলতো। কিন্তু প্রশ্ন না করে ছেড়ে দিয়েছেন?' আহমদ মুসা বলল।

'কে বলল ছেড়ে দিয়েছি? থানায় টেলিফোন করেছিলাম। ওরা বন্দী। নিশ্চয় এতক্ষন কথা কিছু বের হয়েছে।' বলল বেদুইন লোকটি।

'বন্দী! ওরা বন্দী সত্যিই?' প্রবল উচ্ছাস আর বিস্ময় নিয়ে কথা কয়টি বের হয়ে এল আহমদ মুসার মুখ থেকে!

একটু চমকেই উঠল বেদুইন লোকটি। পাশের লোকরাও বিস্মিত কন্ঠে তাকাল আহমদ মুসার দিকে।

কিন্তু এসব দিকে আহমদ মুসার কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। বলল, 'প্লিজ আপনি থানায় টেলিফোন করুন। থানায় আটক থাকার মত লোক ওরা নয়। কি হয়েছে দেখুন।'

বিস্ময় বেদুইন লোকটির চোখে-মুখে। বলল, 'আপনি ওদের চেনেন?'

'চিনি না, জানি আমি ওদের। ওদের সন্ধানেই আমি বাহরাইন যাচ্ছি।' আহমদ মুসা বলল।

'আপনি কারো সন্ধানে বাহরাইন যাচ্ছেন সেটা আমি জানি। বাহরাইন থেকেই আল-মালওয়াতে আমাকে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে আপনার সঙ্গ দিয়ে বাহরাইনে নেবার জন্যে।' বলল বেদুইন লোকটি।

‘একটু দেরিতে সেটা আমি বুঝতে পেরেছি। ধন্যবদ আপনাকে। প্লিজ আপনি থানায় টেলিফোন করুন।’ আহমদ মুসা বলল দ্রুত কন্ঠে।

‘আমাদের বাহরাইনের থানাগুলো বিশ্বস্ত আর দক্ষও। আশা করি থানা তাদের ব্যাপারে আইনে প্রসেস শুরু করেছে।’ বেদুইন লোকটি পকেট থেকে মোবাইল বের করতে করতে কথাগুলো বলল।

কল করল সে থানায়।

ওপার থেকে সাড়া পেতেই সালাম দিয়ে বেদুইন লোকটি জিজ্ঞাসা করল বন্দীদের কথা। ওপারের কথা শুনেই এক পোঁচ কালিতে তার মুখটা যেন ঢেকে গেল! বলল, ‘পরের খবর কি?’

ওপারের সাথে কথা শেষ করে কল অফ করতেই আহমদ মুসা বলে উঠল দ্রুত কন্ঠে, ‘কি খবর? খারাপ খবর? বন্দীরা পালিয়েছে?

‘স্যরি। আপনার কথাই সত্যি হয়েছে।বন্দীরা পালিয়েছে। বন্দীদের নিয়ে থানায় পৌছার পর থানার পুলিশরা কৌতুহলী হয়ে এসেছিল থানার হল ঘরে। তখন হঠাৎ সব পুলিশ সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে এবং সেই সুযোগে তারা পালিয়ে যায়।’ বলল বেদুইন। শুষ্ক কন্ঠ তার।

সাধারন থানা ওদের আটকাতে পারবে না। আহমদ মুসা এটা জানলেও অবধারিত সে বিষয়টা খুবই কষ্টদায়ক হলো আহমদ মুসার জন্যে।

বেদুইন লোকটি থামলেও আহমদ মুসা কোন কথা বলতে পারল না।

নানা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে আহমদ মুসার মাথায়। কোথায় পাওয়া যাবে এখন ওদের? হাত ফসকে বেরিয়ে যাবার পর ওরা এখন আরও সতর্ক নিশ্চয়। আহত বাঘের মত এখন ওরা। অতি দ্রুত তারা বাহরাইন থেকে সরে পড়ার চেষ্টা করবে। অবশ্য বিকল্প যান না আসা পর্যন্ত তাদের অপেক্ষা করতেই হবে। কোথায় অপেক্ষা করবে? এই মুহুর্তে এই জায়গা খুঁজে পাওয়াই তাদের সামনের প্রধান কাজ।

আহমদ মুসার চিন্তা থেমে গেল বেদুইন লোকটির কথায়। বলল বেদুইন লোকটি, ‘আপনি দেখছি খুব কষ্ট পেয়েছেন? আসলে ওরা কারা?’

‘ওরা দুর্ধর্ষ একটি আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী দলের সদস্য। আমাদের একজন শীর্ষ বিজ্ঞানীকে কিডন্যাপ করে নিয়ে ওরা পালাচ্ছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ও ব্যাড লাক, ঐ অসুস্থ লোকটিই কি তাহলে ছিলেন বিজ্ঞানী।’ বলল বেদুইন লোকটি।

‘আচ্ছা, ওরা থানা থেকে বাহরাইনের কোথায় পালাতে পারে বলুন তো?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

বেদুইন লোকটি একটু ভেবে বলল, ‘উপকূলের কাছাকাছি কোন স্থানে?’

‘সেটা কোথায় হতে পারে?’

বিভক্ত হয়ে উপকূল এলাকার বিভিন্ন হোটেলে।’

‘শুধু বিভক্ত হয়ে নয় ছদ্মবেশও নিতে নিতে পারে তারা।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ঠিক বলেছেন। ওদের স্কিন মুখোশগুলো একেবারে নিখুঁত। ওরকম তাদের গ্লাভস মোজাও আছে নিশ্চয়।’ বলল বেদুইন লোকটি।

‘আমার সম্পর্কে তো আপনি ব্রিফড হয়েছেন। এবার আপনার নাম-পরিচয়টা বলে ফেলুন। আমরা আল-দুরে এসে গেছি প্রায়।’ আহমদ মুসা বলল।

হাসল বেদুইন লোকটি। বলল, ‘আমি প্রকৃতই এক বেদুইন পরিবারের ছেলে। বেদুইনের পোষাক পরতে আমি কমফর্ট ফিল করি বলে এই পোষাকই আমি সাধারনত পরে থাকি। বাহরাইনের কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের একজন অফিসার আমি। আমার নাম আবদুল আলী আল-হামাদী। আমার আর কিছু পরিচয় নেই। আপনার সম্পর্কে কার্যত কিছুই জানি না। আমার মোবাইলে আপনার ফটো পাঠিয়ে বলা হয়েছে ইনি একজন ভিভিআইপি ব্যাক্তিত্ব। একটা মিশন নিয়ে বাহরাইন আসছেন। তাঁকে সঙ্গ দেবেন এবং তিনি যাতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে তা নিশ্চিত করবেন। আপনার নামটাও তারা আমাকে জানাননি।’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আমার নাম আহমদ।’

‘ধন্যবাদ, আর জানার দরকার নেই। আপনার মিশনটাও বুঝেছি। বিজ্ঞানীকে উদ্ধার।’ বলল আবদুল আলী আল-হামাদী।

আহমদ মুসা আল-হামাদীর সাথে হ্যান্ডশেক করে বলল, 'চলুন, আমরা বন্দর আল-দুর থেকে আমাদের কাজ শুরু করি।'

'ওয়েলকাম স্যার। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা যাতে আমরা 'মিশন অ্যাকমপ্লিশড' বলতে পারি।'বলল আল-হামাদী।

'সফল না হওয়ার ক্ষেত্রে আপনার মতে কি কি দিক আছে বলুন তো? আহমদ মুসা বলল।

'প্রথম, ওদের ছদ্মবেশ নেয়ার দক্ষতা।দ্বিতীয়, প্রথমেই তারা গ্রেফতার হওয়ার মত ধাক্কা খাওয়ার পর ওরা সাগরেও নেমে যেতে পারে, এমনকি মাঝের অপ্রশস্ত উপসাগর পাড়ি দিয়ে কাতারেও চলে পারে।' বলল আল-হামাদী।

'ধন্যবাদ আল-হামাদী। ওরা যদি ভয় পেয়ে থাকে, তাহলে আপনার কথা সত্য হবে। কিন্তু ওরা দারুণ আত্মবিশ্বাসী। ভয় ওরা পায় না। ওদের এই আত্মবিশ্বাসই তাদের সাফল্য পুঁজি।' আহমদ মুসা বলল। আল-দুরের জেটিতে নোঙর করল আহমদ মুসাদের বোট।

আল-দুরের জেটিতে নোঙর করল আহমদ মুসাদের বোট।

আহমদ মুসা ও আল-হামাদী উঠে দাঁড়াল এক সাথেই।

# ৩

আহমদ মুসার গাড়ি বাহরাইনের আল-মুহাররেক দ্বীপের উপকূল হাইওয়ে ধরে তীব্র বেগে এগিয়ে চলছিল পূর্ব উপকূলের ''আল-হিদ'-এর দিকে।

'আল-হিদ সাগরের পানি ঘেঁষে দাঁড়ানো বিখ্যাত পর্যটন শহর। আল-দুর বন্দরে নেমে খোঁজ-খবর নেয়ার পর আহমদ মুসারা বাহরাইনের রাজধানী মানামায় এসেছিল। মানামার একটা ব্রীফ চিত্র সামনে আনার পর মানামার শীর্ষ হোটেল গোল্ডেন টিউলিপের একটা কক্ষে বসে আহমদ মুসা বাহরাইনের মানচিত্র গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে আল-হামাদীকে বলেছিল, আমার মনে হয় ওরা সব দিক বিবেচনা করে আল-মুহাররেক দ্বীপকে বেছে নিয়েছে। আহমদ মুসার কথা শুনে আল- হামাদী বলেছিল, আল-মুহাররেক দীর্ঘ দ্বীপ। কোথায় আমরা ওদের তালাশ করব? আহমদ মুসা বলেছিল, আল-মুহাররেকে দ্বীপে তেমন বন-বাদাড় নেই ওদের লুকিয়ে থাকার মত। সুতরাং ওরা মানুষের ভিড়কেই বেছে নেবে নিজেদের হাইড করার মত। তাছাড়া এমন এক স্থানে আশ্রয় নেবে যেখান থেকে তাদের চলে যাওয়া বা পালোনো সহজ হয়। এ জন্যে সমুদ্রের উপকূল, বিশেষ করে সমুদ্রের পানি সংলগ্ন জায়গা ওরা বেছে নেবে ওদের লুকানোর জন্যে। এ সব দিকের বিবেচনায আমি মুহাররেক দ্বীপের পূর্ব উপকূলের আল-হিদ'-কে অগ্রাধিকার দিচ্ছি। মুল শহরটাই বলা যায় সমুদ্রের গা ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার মধ্যে আল-হিদের সবচেয়ে ক্রাউডেড হোটেল' সী-গাল বাহরাইন' আর 'সী গাল বাহরাইন' তো গোটাটাই সমুদ্রের উপর ভাসছে! গোটা বাহরাইনে এর চেয়ে আইডিয়াল জায়গা সমুদ্রচারী কিডন্যাপাদের জন্যে আর দ্বিতীয়টি নেই বলে আমার মনে হয়। আল-হামাদী সোৎসাহে আহমদ মুসার কথায় সায় দিয়েছিল।

এই চিন্তার সাথে সাথেই আহমদ মুসা ও আল-হামাদী আল-মুহাররেক দ্বীপের 'আল-হিদে'র উদ্দেশ্য বের হয়।

'আল-হিদ' শহরে প্রবেশ করেছে আহমদ মুসাদের গাড়ি। আল-হিদ শহরটি উপকূল বরাবর লম্বালম্বি গড়ে তোলা হয়েছে।

গভীর সাগর থেকে উঠে আসা পাহাড়ের গোড়ায় তৈরি হয়েছে শহরটি। পাহাড়ের পাদদেশটা পাথুরে, দীর্ঘ ও প্রশস্ত। এটাই আল-হিদ শহরের ভিত্তিভূমি। হোটেল ক্যাম্পাসে প্রবেশ করল আহমদ মুসাদের গাড়ি।

পার্কিং-এ গাড়ি রেখে দু'জনে হোটেলের লাউঞ্জে প্রবেশ করল।

'মি. আল-হামাদী, আপনি এদের ডিসপ্লে ষ্ট্যান্ড থেকে হোটেলের ক্যাটালগটা নিয়ে আসুন।'

বলে আহমদ মুসা সোফায় গিয়ে বসল। হোটেলের ক্যাটালগ নিয়ে আল-হামাদী এসে আহমদ মুসার পাশে বসল।

আহমদ মুসা হোটেলের ক্যাটালগে একবার চোখ বুলিয়ে বলল, 'হোটেলে স্পেশাল স্যুট ছাড়াও এপার্টমেন্ট রয়েছে। স্যুট ও এপার্টমেন্ট প্রায় সব ক'টারই ফ্রন্ট দেখা যাচ্ছে সাগরের দিকে। যে সব স্যুট এপার্টমেন্টের ফেস সাগরের দিকে, সেগুলোর বাসিন্দাদের বিবরণ যোগাড় করুন। ইতিমধ্যে আমি দেখছি কোন এপার্টমেন্ট খালি আছে কিনা।'

উঠল আহমদ মুসা্। এগোলো রিজার্ভেশন কাউন্টারের দিকে।

উঠে দাঁড়িয়েছিল আল-হামাদী্ও।

এপার্টমেন্ট রিজার্ভেশনে গিয়ে আহমদ মুস দেখল যে, একটিও খালি নেই। আহমদ মুসা মনে মনে একটা হিসাব কষে বলল, 'কিন্তু আমি জেনেছিলাম একটা খালি আছে।'

'স্যার, আজ সাড়ে ১২টা পর্যন্ত দু'টি এপার্টমেন্ট খালি ছিল। পরে দু'টিই ভাড়া হয়ে গেছে।' বলল রিজার্ভেশন অফিসার।

'এক সাথে দু'টি?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'জি, স্যার।' বলল রিজার্ভেশনের লোকটি।

'তাহলে কি আমার বন্ধুরা আগেই এসে গেছে! প্লিজ নামগুলো একটু দেখি। ওরা হলে তো আমাদের রিজার্ভেশনও হয়ে গেছে।' বলল আহমদ মুখে খুশির ভাব টেনে।

‘অবশ্যই স্যার, দেখুন। কিন্তু ওরা তো বিভিন্ন বয়সের। বাবার বয়সেরও আছেন।’

বলে রিজার্ভেশনের লোকটি রিজার্ভেশন রেজিষ্টারের সংশ্লিষ্ট পাতা আহমদ মুসার সামনে মেলে ধরল।

আহমদ মুসা দেখল, নামগুলো সব ইউরোপীয়ান। বিভিন্ন বয়সের। দু’জন পঞ্চাশোর্ধ্ব। দু’জনের বয়স চল্লিশের উপরে। একজনের তিরিশ। অবশিষ্টজনের পঁচিশ।

মনে মনে হতাশ হওয়ার ভংগিতে বলল আহমদ মুসা, ‘না, এরা নয়। তাহলে ওরা কি স্যুটে উঠেছে! আচ্ছা, বলুন তো আজ কয়টি স্যুটের রিজার্ভেশন হয়েছে?’

‘স্যার, আজ কোন স্যুটের রিজার্ভেশন হয়নি। সব স্যুট আগে থেকেই ভর্তি।’

বলে রিজার্ভেশনের লোকটি একটু ভাবল। তারপর বলল, ‘স্যার, ঘন্টাখানেকের মধ্যে একটা এপার্টমেন্ট রিজার্ভেশনের জন্যে রেডি হবে। এ এপার্টমেন্টের পাশেই সে এপার্টমেন্টটি। আপনি ইচ্ছা করলে এখনি বুক করতে পারেন। ঘন্টাখানেক কষ্ট করতে হবে আপনাকে।’

আহমদ মুসা বসে ভাবল, আল্লাহ যখন তাদের জন্যে এই এপার্টমেন্টটাই মেলাচ্ছেন, তখন নেয়াই উচিত। পরের চিন্তা পরে হবে।

‘ঠিক আছে রিজার্ভেশন করে ফেলুন।’ বলল আহমদ মুসা।

রিজার্ভেশন অফিসার একটি ফরম এগিয়ে দিলে আহমদ মুসা সেটা পূরণ করে টাকা দিয়ে ফিরে এল লাউঞ্জে আগের সোফায়।

একটু পর ফিরে আল-হামাদীও।

‘মি. আল-হামাদী, স্যুট ও এপার্টমেন্টে আশার আলো আমি দেখছি না। একমাত্র দু’টো এপার্টমেন্টে বেলা ১টার দিকে নতুন ভাড়াটিয়া এসেছে। তারা সংখ্যায় ছয় বটে, কিন্তু বয়সে আকাশ পাতাল। দেখি আপনার লিষ্টটায় নতুন কিছু আছে কিনা। বলে আহমদ মুসা আর-হামাদীর হাত থেকে স্যুট ও এপার্টমেন্টের বাসিন্দাদের তালিকা নিয়ে নিল। নজর বুলাল সব শেষে এপার্টমেন্টে ওঠা দুই

এপার্টমেন্টের সেই ছয়জনের বিবরণের উপর। ছয়জনের সবাই নিউজিল্যান্ডের নাগরিক। বলল, ‘নামগুলো দেখে ভেবেছিলাম এরা ইউরোপীয়, কিন্তু এখন দেখছি এরা নিউজিল্যান্ডের নাগরিক। এটুকু নতুন পাওয়া গেল।’

‘তাহলে আমাদের এখানে আসাটা কি ব্যার্থ হলো?’ বলল আল-হামাদী।

‘অনেক বিবেচনা সামনে নিয়ে এখানে এসেছি। বিবেচনাগুলো আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন। অতএব, হতাশা নয়। এপার্টমেন্টে উঠতে এখনও এক ঘন্টা বাকি। চলুন, সময়টা আমরা কফিখানায় কাটাই। বিকেলে তো কফিখানায় অনেক লোক পাওয়া যাবে।’

বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। দু’জনে চলল কফিখানার দিকে।

দু’জনের পরনেই শিখ ট্যুরিষ্টের ছদ্ধবেশ।

বিশাল কফিখানা। অনেক লোক, তবু ফাঁকাই মনে হচ্ছে।

কফিখানার এক প্রান্তের মঞ্চে আরবী পোষাকে একজন ইউরোপীয় গায়িকা হালকা সুরে সেতার বাজিয়ে গান গাচ্ছে। দু’জন সেই আরবী পোষাকে ইউরোপীয় তরুনী গানে সঙ্গ দিচ্ছে হালকা রকমের শরীর দুলিয়ে।

বাহরাইনের কফিখানায় বিকালেও কফি পানের চল আছে।

কফিখানায় নজর বুলাল। সাগর প্রান্তের টেবিলগুলোতেই ভিড় বেশি। দেখা গেল দু’টি চেয়ারের একটা টেবিল খালি আছে।

আহমদ মুসা নিউজ পেপার ষ্ট্যান্ড থেকে একটা ইংরেজি পত্রিকা নিয়ে এগোলো সেই ফাঁকা টেবিলটার দিকে।

টেবিলও একটা ইংরেজি পত্রিকা পড়ে ছিল।

আহমদ মুসা টেবিলে পৌঁছতেই ওয়েটার কাগজটা নিয়ে যাচ্ছিল। ওটা ভিন্ন একটা ইংরেজি দৈনিক।

‘ওটাও আমি দেখব, রেখে যান প্লিজ।’ বলল ওয়েটারকে আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা ও আল-হামাদী বসল টেবিলে। আহমদ মুসার পেছনেই আরেকটা টেবিল। চারজনের টেবিল। তাতে চারজন শ্বেতাংগ বসে আছে।

আহমদ মুসা কফির অর্ডার দিয়ে পত্রিকা খুলে পড়তে লাগল।

পেছনের টেবিলের কথাবার্তা নিচু স্বরে হলেও কিছু টুকরো টুকরো শব্দ তার কানে আসছিল। শব্দগুলো ইংরেজি নয়। দু'একটা কন্ঠ পরিচিত হিসাবে কানে বাজছে। মাঝে মাঝে ইংরেজি শব্দও আসছে। কিন্তু পরক্ষনেই কন্ঠ আবার অপরিচিত শব্দে চলে যাচ্ছে। আহমদ মুসা দেখল ওদের উচ্চারণচটা সাবলীল, কিন্তু অপরিচিত ভাষাটা তাদের কন্ঠে সাবলীল শোনাচ্ছে না।

যা হোক, ওদের কথাবার্তায় মনোযোগী হওয়ার এবং সেদিক থেকে মনোযোগ সরাতে না পারায় আহমদ মুসার খবরের কাগজ পড়া এগোল না। ইতিমধ্যে এসে গেল কফি।

এবার কফির কাপে মনোযোগ দিল আহমদ মুসা।

এখন তার খেয়াল হলো পেছনের কথাবার্তা আর কানে আসছে না। সংগে সংগে মাথা ঘুরিয়ে দেখল পেছনের টেবিল খালি।

কফির সাথে সাথে এবার কাগজে মনোযোগ দিল আহমদ মুসা।

'বাহরাইন টাইমস' পড়ার পর আহমদ মুসা 'বাহরাইন ইন্টারন্যাল' পত্রিকা টেনে নিল।

পত্রিকাটি খোলা অবস্থায় ভাঁজ করা ছিল। ভেতরের খোলা অংশের উপর চোখ পড়তেই চোখ আটকে গেল পত্রিকার মার্জিনে একটা লেখার উপর। তিন শব্দের একটা লেখা। ইংরেজি বর্ণমালায়, কিন্তু শব্দগুলো ইংরেজি নয়।

মনোযোগ দিয়ে পড়ল আহমদ মুসা।

বিস্মিত হলো আহমদ মুসা, এ যে তাহিতিয়ান ভাষা! হঠাৎ আহমদ মুসার মাথায় এল, 'পেছনের টেবিলের যে শব্দগুলো তার কানে এসেছে, সেগুলোও তো তাহিতিয়ান! তাহলে এ টেবিলেও কি ওদেরই কেউ বসেছিল? পাশ দিয়ে ওয়েটার যাচ্ছিল। আহমদ মুসা তাকে ডাকল। জিজ্ঞাসা করল, 'এ টেবিলে আমাদের আগে কারা বসেছিল, জান?'

'স্যার, আপনাদের পেছনের টেবিলের ৪ জনের দু'জন আগে এই টেবিলেই বসেছিল, পরে ওরা ঐ টেবিলে উঠে যায়।' বলল ওয়েটার।

'ধন্যবাদ ওয়েটার।' আহমদ মুসা বলল।

'মোস্ট ওয়েলকাম স্যার!' বলে ওয়েটার চলে গেল।

আবার লেখার দিকে মনোযোগ চলে গেল আহমদ মুসার।

আহমদ মুসা মিন্দানাও থাকাকালে মুর হামসারের কাছে তাহিতিয়ান ভাষা কিছুটা শিখেছিল। মুর হামাসার বলা যায় ঐ অঞ্চলের ভাষার একজন বিশেষজ্ঞ প্রায়। তিন শব্দের তাহিতিয়ান ভাষায় যে অর্থ আহমদ মুসা দাঁড় করাল তা হলো: 'অ্যাটল ক্ষমতার রাজধানী আজ।'

অর্থ করার পর আহমদ মুসা বিস্মিত হলো, পত্রিকার যে মার্জিনে এই কথা লেখা আছে তার পাশেই পত্রিকার যে ফিচারটা লেখা তা 'অ্যাটল'-এর উপর। পত্রিকার ৪ কলাম আট ইঞ্চি নিয়ে বিশাল ফিচারটা। ফিচারের শিরোনাম হলো: 'স্রষ্টার এক অপরূপ সৃষ্টি পৃথিবীর অ্যাটল দ্বীপগুলো।'

শিরোনামটা আহমদ মুসাকেও আকৃষ্ট করল। 'অ্যাটল' জাতীয় দ্বীপের কথা সে শুনেছে, কিন্তু কিছুই জানে না সে এই দ্বীপগুলো সম্পর্কে। পড়ল আহমদ মুসা ফিচারটা।

পড়ে আহমদ মুসাও স্বীকার করল 'অ্যাটল দ্বীপ' সত্যিই আল্লাহর বিস্ময়কর সৃষ্টি! কিন্তু মার্জিনে তাহিতিয়ান ভাষায় যা লেখা রয়েছে তার সাথে কোন সংগতি খুঁজে পেল না আহমদ মুসা। 'অ্যাটল দ্বীপ' সুন্দর, বিস্ময়কর ঠিক আছে, কিন্তু ক্ষমতার রাজধানী হলো কি করে?

এই জিজ্ঞাসার কোন উত্তর খুঁজে পেল না আহমদ মুসা। বিষয়টা অর্থহীন অবচেতন একটা মন্তব্যও হতে পারে।

'স্যার, মাগরিবের নামাজ ঘনিয়ে আসছে। এদিকে আমাদের বরাদ্দ এক ঘন্টা সময়ও পূর্ণ হয়ে গেছে। আমরা এপার্টমেন্টে গিয়ে নামাজ পড়তে পারি।' বলল আল-হামাদী।

লেখা নিয়ে আহমদ মুসার চিন্তায় ছেদ পড়ল।

আহমদ মুসা আল-হামাদীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'হোটেলের মসজিদ দোতলায়। খাবারের প্রধান হলপরও দোতলায়। আমরা মসজিদে নামাজ পড়ে, ডিনার শেষ করে তারপর এপার্টমেন্টে নেমে যাব।' সব এপার্টমেন্টই সাগরের উপর একতলার বিশাল বর্ধিত ডক অংশে তৈরি।

‘ঠিক আছে, এটাই ভাল হবে। নামাজ পড়ে খাওয়ার আগে আমি একটু খোঁজ নিতে চাচ্ছি যে, আজ বেলা ১ টার দিকে কারা হোটেলে এসেছে।’ বলল আল-হামাদী।

‘ঠিক বলেছেন, ওটা খুব জরুরী। খাবার ফাঁকে আমরা লিস্টটা দেখে নেব। রাত দশটার পর সন্দেহজনক টার্গেটগুলোর-আমরা খোঁজ-খবর নিতে চাই। ‘ছয়’ সংখ্যাটা গুরুত্বপূর্ণ স্যার।’ বলল আল-হামাদী।

‘ঠিক বলেছেন, ওটা খুব জরুরি। খাবার ফাঁকে আমরা লিষ্টটা দেখে নেব। রাত দশটার পর সন্দেহজনক টার্গেটগুলোর-আমরা খোঁজ খবর নেব।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমাদের পাশের এপার্টমেন্টেরও আমরা একটু খোঁজ-খবর নিতে চাই। ‘ছয়’ সংখ্যাটি গুরুত্বপূর্ণ স্যার।’ বলল আল-হামাদী।

‘অবশ্যই, মি. আল-হামাদী। এমন চিন্তা থেকেই তো ওদের পাশের এপার্টমেন্টটা নিয়েছি। শুধু ‘ছয়’ সংখ্যা নয় মি. হামাদী, ওরা একটার দিকে হোটেলে উঠেছে, এটাও গুরুত্বপূর্ণ। ওদের বয়স অবশ্যই বড় কথা, কিন্তু বয়স নানাভাবে বাড়ানো-কমানো যায়।’ আহমদ মুসা বলল।

আল-হামাদীর চোখ দু’টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, ‘ঠিক তো, এ দিকটা তো আমার মাথায় আসেনি!’

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘চলুন।’

আল-হামাদী উঠে দাঁড়াল। দু’জন বেরিয়ে এল কফিখানা থেকে।

রাত ৯টায় আহমদ মুসারা লিফটে উঠল এ্যাপার্টমেন্টে নামার জন্যে।

এক তলায় লিফটের দরজা খুলতেই এক নয়নাভিরাম দৃশ্য চোখে পড়ল আহমদ মুসাদের।

ডেকের তিন প্রান্ত দিয়ে সাগরের ধার ঘেঁষে এপার্টমেন্টের সারি। এপার্টমেন্টের ফেসগুলো সব সমুদ্রের দিকে। এপার্টমেন্টগুলোর দু’পাশ ও পেছন ঘিরে বাগান। পেছনের বাগানগুলোর পরে দীর্ঘ প্রশস্ত ডেকে টেনিস-ব্যাডমিন্টনের কোর্ট ও শিশুদের খেলাখুলা করার মত জায়গা। এসবের মধ্যে দিয়ে লাল পাথরের রাস্তা তৈরি হয়েছে ফ্ল্যাটগুলোতে যাবার।

প্রতিটি এপার্টমেন্টের টপে নিয়ন সাইনে এপার্টমেন্টের নাম্বার লিখা।

আহমদ মুসাদের এপার্টমেন্ট নাম্বার 'সিগাল সুইট-১১'।চোখ ঘুরাবার সময় সর্বশেষ নাম্বারটাও চোখে পড়ল:'সি-গাল তাজ-৩৩'।

আহমদ মুসাদের এপার্টমেন্ট মাঝ বরাবর থেকে একটু ডান পাশে। তার মানে সিরিয়ালটা শুরু হয়েছে দক্ষিণের প্রান্ত থেকে।

আহমদ মুসারা লাল পাথরের রাস্তা ধরে এঁকেবেঁকে এগুলো তাদের এপার্টমেন্টের দিকে।

প্রতিটি এপার্টমেন্টের পেছনের বাগানের ভেতর দিয়ে এপার্টমেন্টে ওঠার গেট।

আহমদ মুসারা বাগানের সুন্দর গ্রিলের গেট খুলে বাগানের ভেতরে প্রবেশ করল।

বাগানের ভেতর দিয়েও সেই লাল পাথরের রাস্তা।লাল রাস্তা ধরে আহমদ মুসারা এগুলো গেটের দিকে।

মাথায় নীল গম্বুজের পরা সুন্দর গেট। দামি কাঠের সুন্দর দরজা মুসলিম ঐতিহ্যের লতা-পাতার অপরূপ কারুকাজে ভরা।

একদম সামনের ফেসটা মজবুজ, সুন্দর, উঁচু ফেন্সে ঘেরা প্রশস্ত লন। ফেন্সের মাঝখানে তালাবদ্ধ একটা গ্রিলের দরজা আছে। দরজা খুললেই পাওয়া যাবে একটা সিঁড়ি এবং সেটি নীচে নেমে গেছে। সিঁড়ির গোড়ায় বাঁধা আছে বোট।

প্রতিটি এপার্টমেন্টের একই ব্যবস্থা কিনা, তা দেখার জন্যে আহমদ মুসা তাকাল পাশের এপার্টমেন্টের জন্য দশ দশ ফুটের সাইডগার্ডেনে নামা যায়।

পাশের এপার্টমেন্টের সামনে চোখ পড়তেই ভূত দেখার মত আঁৎকে উঠল আহমদ মুসা। দেখল এপার্টমেন্টটি থেকে সাগরে নেমে যাওয়া সিঁড়ির গোড়ায় একটা টিউব সাবমেরিন ভাসছে। টিউব সাবমেরিনের গায়ের একটা হোল দিয়ে একজন প্রবেশ করছে, আরেকজন অপেক্ষমাণ হোলের মুখে।

সংগে সংগেই আহমদ মুসার মাথায় এল এটাই তো সেই নিউজিল্যান্ডের ছয় জনের ভাড়া নেয়া 'সি-গাল আল-হামরা-১২' এপার্টমেন্ট!

একটা প্রচন্ড ঝড়ে রহস্যের সব দরজা এক সাথেই খুলে গেল আহমদ মুসার সামনে।

মুহূর্তের জন্যে একটা বিমূঢ়তা এসে আহমদ মুসাকে আচ্ছন্ন করল।

তাকাল সে সাগরের সিঁড়িতে নামার গ্রিলের দরজার দিকে। ওটা তালাবদ্ধ। চাবি কোনটা বা কোথায় তা তার জানা নেই। খুঁজলে বা জিজ্ঞাসা করলে জানা যাবে। সে সময় কোথায়? এখনি ওদের আটকাতে হবে।

আহমদ মুসা হাতে রিভলবার আগেই উঠে এসেছিল। গুলি করে আহমদ মুসা গ্রিলের দরজার তালা ভেঙে ফেলল।

এক টানে দরজা খুলে ফেলল আহমদ মুসা। সাগরে নামার সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছিল দ্রুত।

বুঝতে পেরেছে আল-হামাদীও।

সেও আহমদ মুসার পেছনে ছিল।

হঠাৎ সে চিৎকার করে উঠল, 'স্যার, ওরা বোমা ছুঁড়েছে!'

আল-হামাদীর কথা শেষ হবার আগেই একটা কিছু এসে বুম করে ফেটে গেল তাদের পাশের গ্রিলে।

আহমদ মুসার সেদিকে তাকাবারও সময় হলো না। কয়েকটা শব্দ তার কানে এল। তা ভাববারও তার সময় হলো না। তার দেহটা লুটিয়ে পড়ল খোলা দরজার উপর। তার পেছনে আল আল-হামাদীর দেহটাও ঝরে পড়ল দরজার পেছনে মেঝের উপর।

কতক্ষণ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে ছিল তা ভাবতে পারছে না আহমদ মুসা। সংজ্ঞা ফিরে আসতেই আহমদ তার কষ্টকর অবস্থায় পড়ে থাকাটা প্রথম উপলব্ধি করল।

তার কোমর থেকে উপর দিকটা ছিল দরজার উপর। আর সিঁড়ির উপর ঝুলছিল দেহের পেছনের অংশ।

আহমদ মুসা দ্রুত উঠে বসে তাকাল পাশের এপার্টমেন্টের সামনে। যেখানে সাগরে দাঁড়িয়ে ছিল টিউব সাবমেরিন। কিছুই সেখানে নেই। শান্ত, নিস্তরঙ্গ সাগরের বুক।

আহমদ মুসা তাকাল হাত ঘড়ির দিকে। রাত ১ টা বাজে। তার মানে চার ঘন্টা সে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ছিল।

আহমদ মুসা হিসাব করল বাহরাইনের আল-মুহাররেক দ্বীপ থেকে পারস্য উপসাগরের মুখ হুরমুজ প্রণালীয় দূরত্বের কথা। ছয়শ' কিলোমিটারের কম হবে না। চার ঘন্টায় ৬শ' কিলোমিটার অতিক্রম করা টিউব সাবমেরিনের জন্যে কঠিন নয়।

তবু আহমদ মুসা তাঁর দেয়া অয়্যারলেস থেকে কল করল সৌদি নিরাপত্তা প্রধান ইবনে আবদুল আজিজ আল-সউদের কাছে। আহমদ মুসা বুঝল ঘুম থেকে উঠে তিনি কল রিসিভ করলেন। আহমদ মুসা সালাম দিতেই ওপার থেকে উদ্বিগ্ন কন্ঠে সৌদি নিরাপত্তা প্রধান আল-সউদ সালাম দিয়ে বলল, 'আহমদ মুসা, আপনি ভাল আছেন?'

'এক্সিলেন্সি! চার ঘন্টা সংজ্ঞাহীন থাকার পর জ্ঞান ফিরে পেয়েই আপনাকে কল করছি!'

বলে আহমদ মুসা সব ঘটনা তাকে জানিয়ে বলল, 'যদিও টিউব সাবমেরিন এতক্ষণে হুরমুজ প্রণালী অতিক্রম করে যেতে পারে। তবু আপনি নির্দেশ দিয়ে দেখতে পারেন, হুরমুজ প্রণালীতে এই মুহূর্তে আপনাদের নৌবাহিনী পাহাড়া বসাতে পারে কিনা। হুরমুজ প্রণালীতে ওদের আটকাতে না পারলে পরে আর তা সম্ভব নয়।'

'ধন্যবাদ আহমদ মুসা। আমি নির্দেশ দিচ্ছি। আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি যে, আপনি শুধু জানা নয়, কাছাকাছিও যেতে পেরেছেন। এটা বড় সাফল্য। আমরা দু:খিত আহমদ মুসা আপনাকে এই কষ্টে ফেলার জন্যে। এর কোন বিনিময় দেয়া তো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ আপনাকে এর উপযুক্ত যাযাহ দিন।'বলল সৌদি নিরাপত্তা প্রধান আল-সউদ।

‘আল-হামদুলিল্লাহ! আল্লাহই আমাদের জন্যে যথেষ্ট। ওকে এক্সিলেন্সি আপনার সাথে পরে কথা বলব।আপনি ওদিকের কাজ সারুন। আসসালামু আলাইকুম।’

ধন্যবাদ দিয়ে, সালাম নিয়ে কল অফ করে দিল ওপার দিল থেকে আল-সউদ।

আহমদ মুসা কল অফ করে দিয়ে মনোযোগ দিল আলী আল-হামাদীর দিকে। তার সংজ্ঞা এখনও ফিরে আসেনি।

আরও সময় নিল আলী হামাদীর সংজ্ঞা ফিরে আসতে।

আহমদ মুসা বসেছিল গ্রিলের দরজায়। তার দুই পা সাগরে নামা সিঁড়ির উপর।

সামনে পারস্য উপসাগরের দিগন্তপ্রসারী কালো কালো বুক। মাঝে মাঝে এই কালো বুকে তারার মত আলো জ্বলে উঠছে, আবার তা হারিয়ে যাচ্ছে।

সেই ভাবনাটা আবার আহমদ মুসার মাথায় ফিরে এল। সৌদি নিরাপত্তা প্রধান আল-সউদ কি চেষ্টা করলেন হুরমুজ প্রণালীতে তাদের আটকাতে। আশা কম। টিউব সাবমেরিনের ক্ষমতা সাধারণভাবেই বেশি। আর ওতে যদি কোন বিশেষ জ্বালানি ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাহলে গতিটা আরও বেশি হতে পারে। সুতরাং ওদিক থেকে কোন আশা নেই। কোথায় গেল ওরা?

হঠাৎ আহমদ মুসার মনে পড়ল জ্ঞান হারাবার সময় ওদের কন্ঠ থেকে ভেসে আসা তিনটি শব্দের কথা।

মনে পড়তেই চমকে উঠল আহমদ মুসা। শব্দগুলো তো তাহিতিয়ান! এদের মুখে তাহিতিয়ান ভাষা লেখা দেখেছে, তা কি এদের কেউ লিখেছে! তার টেবিলের পেছনে বসা যাদের মুখে তাহিতিয়ান ভাষা শুনেছে, তার কি এরাই? তারা এরাই, যুক্তি তো এটাই বলে। আহমদ মুসা এটাই ভাবল।

এর সাথে আরেকটা ভাবনা চেপে বসল আহমদ মুসার মনে। বুঝা গেছে, তাহিতিয়ান ভাষা এদের মাতৃভাষা নয়। নিজেদের কথা আড়াল করার জন্যে অপরিচিত তাহিতিয়ান ভাষা ব্যবহার করেছে। কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের ক্ষুদ্র একটা দ্বীপ তাহিতি, সেই তাহিতির ভাষা এরা ব্যবহার করল কেন?

মাথায় একটা চিন্তার উদয় হওয়ার সাথে সাথেই ভীষণভাবে চমকে উঠল আহমদ মুসা। ওরা কি তাহিতিতে থাকে? ওদের হেডকোয়ার্টার কি তাহিতিতে বা আশে-পাশে কোথাও?

আরেকটা প্রশ্ন আহমদ মুসার কাছে খুব বড় হয়ে দেখা দিল। কফিখানার সেই খবরের কাগজে অ্যাটল দ্বীপের প্রশংসা এভাবে এতটা করল কেন? যে অ্যাটল আজ ক্ষমতার রাজধানী। এটা কি একটা কথার কথা? না এর সাথে ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের কাজ কিংবা পরিকল্পনার কোন যোগ আছে?

সব এক সাথে আহমদ মুসার মাথায় জট পাকিয়ে গেল। কিন্তু সব ছাপিয়ে একটা বিষয় তার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল যে, তাহিতি দ্বীপ ও 'অ্যাটল দ্বীপ'-এর সাথে ব্ল্যাক সানের কোন না কোন সম্পর্ক রয়েছে।

এই সংগে তার কাছে আরেকটি প্রশ্নও বড় হয়ে উঠল, বিজ্ঞানীকে কিডন্যাপকারীরা তাহিতিয়ান ভাষা মানে তাহিতির সাথে সম্পর্কিত, এ বিষয়টিও খুবই স্পষ্ট। তাহলে কি কিডন্যাপকারীরা বিজ্ঞানীকে তাহিতিতে কিংবা তাহিতির দিকে কোথাও নিয়ে গেল?

উজ্জ্বল হয়ে উঠল আহমদ মুসার মুখ। একটা নতুন আশার আলো জাগল তার মনে। কিডন্যাপড হওয়া অন্য সব বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদেরও তাহলে কি ঐ একই স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে!

সংজ্ঞা ফিরে পেয়েছে আলী আল-হামাদী। উঠে বসল সে।

'মি. আলী আল-হামাদী, চিড়িয়া উড়ে গেছে আমাদের সংজ্ঞাহীন করে দিয়ে।' বলল আহমদ মুসা।

'তাহলে এরাই কিডন্যাপার? আমাদের বিজ্ঞানীকে নিয়েই ওরা পালিয়েছে?' বলল আলী আল-হামাদী।

'হ্যাঁ, এরাই কিডন্যাপার। আমরা ওদের সন্দেহের আওতায় এনেও কিছু করতে পারিনি। হয়তো আল্লাহর এটাই ইচ্ছা। আল্লাহর পরিকল্পনা হতে পারে এমনটাই যে, 'শুধু এক বিজ্ঞানী নয়, কিডন্যাপড হওয়া বা হারিয়ে যাওয়া বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদের ব্যাপারেই আমরা চিন্তা করি।' আহমদ মুসা।

‘বুঝলাম না স্যার। আরও কি কিডন্যাপড হয়েছে?’ জিজ্ঞাসা আলী আল-হামাদীর। তার চোখে-মুখে বিস্ময়।

‘হ্যাঁ, মি. আল-হামাদী। এ পর্যন্ত অনেক বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞ হারিয়ে গেছে। বিচ্ছিন্ন অনুল্লেখযোগ্য নিউজ হিসাবে সেগুলো বের হয়েছে। কোন কোনটা প্রচারও পেয়েছে। কিন্তু এ নিয়ে আন্তর্জাতিক মিডিয়া কোন হৈ-চৈ করেনি।’ বলল আলী আল-হামাদী।

‘তাজ্জবের ব্যাপার! এ নিয়ে হৈ চৈ হয়নি কেন? এসব নিয়ে তো হৈ চৈ হবারই কথা! পাশ্চাত্য মিডিয়া মানবাধিকার’ ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নিয়ে তো পাগল!’ বলল আলী আল-হামাদী।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘সব কারণের কথা আমি জানি না। তবে বড় একটা কারণ এই হতে পারে কিডন্যাপড বা হারিয়ে যাওয়া প্রায় সবাই মুসলমান।’

‘হ্যাঁ, সাংঘাতিক কথা! এই সাংঘাতিকটাই সত্য আল-হামাদী।’ আহমদ মুসা বলল।

উত্তরে কথা বলল না আল-হামাদী। বলতে পারল না। তার বিস্ফরিত দুই চোখ নিস্পলকভাবে তাকিয়ে আছে আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসাই কথা বলল আবার তার হাত ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে, ‘রাত ২টার বেশি বেজে গেছে মি. আল-হামাদী। চলুন, ঘুমাতে হবে। এত টাকা দিয়ে এপার্টমেন্ট নেয়া হলো, ব্যবহার তো করতে হবে!’

তখনও আলী আল-হামাদী বিস্ময়ভরা চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছে আহমদ মুসার দিকে। আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই সে বলল, ‘স্যার, তাহলে সৌদি বিজ্ঞানীকেই শুধু উদ্ধার নয়, সকলকে সন্ধান করা, উদ্ধার করাই আপনার মিশন?’

গম্ভীর হলো আহমদ মুসা। বলল, ‘হ্যাঁ, মি. আলী আল-হামাদী আমার ইচ্ছা এটাই, যদি আল্লাহ মঞ্জুর করেন।’

‘আরেকটা কথা স্যার, আমি আপনাকে সৌদি কোন শীর্ষ গোয়েন্দা বা কর্তৃপক্ষ মনে করেছিলাম। কিন্তু দেখছি, আপনার কাজ, কথাবার্তা, আচরণ সব কিছুই আমাদের ন্যায় পেশাদার গোয়েন্দার মত নয়। আপনার কাজ, তৎপরতা,

আচরণ, কথাবার্তায় অফুরান প্রাণ আছে, সীমাহীন আবেগ আছে, গভীর স্থিরতা আছে। এমনটা আমি কারো মধ্যে কোথাও দেখিনি। আমি বড় বড় মার্কিন ও বৃটিশ গোয়েন্দাদের সাথে কাজ করেছি।' বলল আলী আল-হামাদী গম্ভীর কন্ঠে।

আহমদ মুসার মুখে শান্ত একটা হাসি ফুটে উঠল। হাত রাখল আলী আল-হামাদীর কাঁধে। বলল, 'আপনি আমাকে ভাইয়ের চেয়েও বেশি ভালবেসে ফেলেছেন। ধন্যবাদ আল-হামাদী।'

একটু থামল আহমদ মুসা। সংগে সংগেই আবার বলে উঠল, 'একটা জরুরি বিষয় আছে মি. আল-হামাদী। বাহরাইনে ভাল ভূগোলবিদ নিশ্চয় আছেন। আমি সে রকম একজনের সাথে দেখা করতে চাই।'

'নিশ্চয় আছে। প্রয়োজনটা কি ধরনের, জানতে পারি স্যার?' বলল আলী আল-হামাদী।

'অবশ্যই। আমি দুনিয়ার 'অ্যাটল দ্বীপগুলো সম্পর্কে জানতে চাই। আমার সামনে এখন দু'টি ক্লু বা টার্গেটস্থল। এক, তাহিতি দ্বীপ, দুই, অ্যাটল দ্বীপ। আমার এখন জানা দরকার, দু'টি কি এক জায়গায়, এক লোকেশনে হতে পারে? না দুই জায়গায়। তাহিতি দ্বীপ আমি জানি। এখন 'অ্যাটল' দ্বীপগুলোর অবস্থান, অবস্থা সম্পর্কে আমার জানা দরকার।' আহমদ মুসা বলল।

'ঠিক আছে স্যার, আমি সকালেই এর ব্যবস্থা করব।' বলল আলী আল-হামাদী।

'ধন্যবাদ মি. আল-হামাদী।'

উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা। বলল, 'চলুন, এবার শয়নঘরগুলোর দিকে। শোবার মত অবস্থা আছে কিনা দেখি।'

আলী আল-হামাদীও উঠে দাঁড়িয়েছে। বলল, 'চলুন স্যার।' শোবার ঘরের দিকে চলে গেল দু'জনে।

সকাল সাড়ে ৮টা।

নাস্তার টেবিলে আগেই এসে বসেছিল আহমদ মুসা।

সকালের খবরের কাগজগুলো এসে গেছে। তার উপর নজর বুলাচ্ছিল আহমদ মুসা।

আলী আল-হামাদী এল।

আহমদ মুসার মুখোমুখি নাস্তার চেয়ারে বসে বলল, 'স্যার, একটু দেরী হয়ে গেল। ভূগোলবিদের বিষয়টাও ঠিক করে এলাম স্যার। স্যার, আরেকটা কথা, আমাদের মহামান্য সুলতানের নিরাপত্তা উপদেষ্টা প্রিন্স খালিদ ইবনে সালমান-আল-খালিফা আপনার সাথে দেখা করতে চান।'

'উনি আমার ব্যাপারটা জানলেন কি করে?' আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

'স্যার, সৌদি নিরাপত্তা প্রধান আল-সউদ তো তাকেই টেলিফোন করে আপনার কথা বলেছেন। উনি খুব গুণী মানুষ স্যার। উনি বৃটেনের স্যান্ডহার্টস ছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে উচ্চতর সামরিক ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। কিন্তু এই সাথে অত্যান্ত বিদ্যানুরাগী। বাহরাইনে আজ যে বিশাল সমৃদ্ধ লাইব্রেরী নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে, সেটা তারই অবদান। বাহরাইন বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ লাইব্রেরীর মধ্যে একটি। দেশের বড় বড় শিল্পপতির সাথেও তার গভীর সম্পর্ক। আমাদের নিরাপত্তা প্রধান একজন ভাল ভূগোলবিদের ব্যাপারে তাঁকেই অনুরোধ করেছিলেন। সংগে সংগেই তিনি যোগাযোগ করে একটা এ্যাপয়েন্টমেন্ট ঠিক করে ফেলেছেন। স্যার, আজ দশটায় আপনি তার সাথে চা খাবেন এবং সাড়ে ১১ টায় বাহরাইন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের সমুদ্র ও দ্বীপ বিশেষজ্ঞ ড. সালেহ আবদুল্লাহর সাথে আপনার সাক্ষাত। স্যরি, আপনার অনুমতি না নিয়েই কিন্তু আমি সব ঠিক করে ফেলেছি।'

'অনুমতির কেন প্রয়োজন। আমি তো আপনাকে দায়িত্ব দিয়েছি। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। অসম্ভব দ্রুত আপনি সব ঠিক করে ফেলেছেন। আমি প্রিন্স খালিদের সাক্ষাত পেলে খুবই খুশি হবো।' বলল আহমদ মুসা।

'ধন্যবাদ স্যার। আসুন স্যার, আমরা নাস্তা খেয়ে নেই।' বলল আল-মাহাদী।

নাস্তা সারল দু'জনে।

হোটেলের রুম-সার্ভিস বিভাগ থেকেই এ নাস্তা এসেছে। এপার্টমেন্টে যারা নিজেরা রান্না-বান্নার ঝামেলায় যায় না, তাদের খাবার হোটেলের রুম সার্ভিস থেকেই সরবারাহ্ করা হয়।

সকাল দশটার মধ্যে আহমদ মুসারা প্রিন্স খালিদ ইবনে সালমান আল-খালিফার অফিসে পৌছলেন।

প্রিন্সের প্রাইভেট সেক্রেটারি গাড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল আহমদ মুসার।

আহমদ মুসাদের গাড়ি সেখানে পৌঁছতেই পিএস নিজে এসে গাড়ির দরজা খুলে স্বাগত জানাল আহমদ মুসাকে। বলল, 'এক্সিলেন্সি আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

আহমদ মুসা গাড়ি থেকে নামল।

আলী আল-হামাদী আগেই নেমেছিল। বলল সে আহমদ মুসাকে, 'স্যার, আমি অপেক্ষা করছি। আপনি আসুন।'

'ধন্যবাদ মি. আল-হামাদী।'

বলে আহমদ মুসা চলতে শুরু করল।

পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল প্রিন্স খালেদ ইবনে সালমান আল-খালিফার পি.এস।

সুলতানের সেক্রেটারিয়েটের চার তলার একটা স্যুটে বসেন সুলতানের নিরাপত্তা উপদেষ্টা প্রিন্স খালেদ আল-খালিফা।

সুলতানের নিরাপত্তা উপদেষ্টা প্রিন্স খালেদ আল-খালিফা সুলতানের পক্ষে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা বাহিনী, পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের তদারকি করেন।

চার তলায় পৌঁছে প্রিন্স খালেদ আল-খালিফার পি.এস আহমদ মুসাকে ভিআইপি গেষ্টরুমে বসিয়ে ইন্টারকমে বসকে খবর দিল।

খবর জানাবার পরপরই দরজা ঠেলে গেষ্টরুমে প্রবেশ করল সুলতানের নিরাপত্তা উপদেষ্টা প্রিন্স খালেদ আল-খালিফা।

সালাম দিয়ে আহমদ মুসাকে জড়িয়ে ধরল সে। সাথে নিয়ে ঢুকে গেল অফিস কক্ষে।

অফিস কক্ষের সাথেই তার পার্সোনাল গেষ্টরুম। সেখানেই সে বসল গিয়ে আহমদ মুসাকে নিয়ে।

আহমদ মুসাকে বসিয়ে নিজে বসেই প্রিন্স খালেদ আল-খালিফা বলল, 'মহান ভাই সৌদি আরবের নিরাপত্তা প্রধান আল-সউদ আপনার এত প্রশংসা করেছেন যে, আমি আপনার সাথে সাক্ষাত না করে থাকতে পারলাম না। কিন্তু আপনার নামই আমার জানা হয়নি। আমার মহান ভাই আল-সউদও বলেননি। তিনি বলেছেন, তাঁর নাম তাঁকেই জিজ্ঞাসা করবেন। বিষয়টা আমার কিউরিসিটি বাড়িয়ে দিয়েছে। এখন এই 'নাম' দিয়েই আমরা আমাদের কথা শুরু করতে পারি। আর একটা কথা বলি, ড. সালেহ আবদুল্লাহ যার সাথে আপনার সাড়ে **১১** টায় দেখা করার কথা, তিনি একটা জরুরি প্রয়োজনে আমার সেক্রেটারিয়েটে এসেছেন। আপনি চাইলে তাঁকে এখানে ডাকা যেতে পারে।'

'আল-হামদুলিল্লাহ! এতে আমারই বেশি সুবিধা হবে। তার ওখানে যাওয়া থেকে বেঁচে যা। তাছাড়া যে আলোচনা তার সাথে করতে চাই, সেটা আপনার উপস্থিতিতে আরো ভালো হবে এক্সিলেন্সি।' বলল আহমদ মুসা।

'ধন্যবাদ' বলে প্রিন্স খালেদ আল-খালিফা ইন্টারকমে পি.এস.-কে নির্দেশ দিল, 'তুমি গিয়ে ড. সালেহ আবদুল্লাহকে নিয়ে এস।' ইন্টারকম থেকে ফিরে প্রিন্স খালেদ আহমদ মুসার দিকে তাকাতেই আহমদ মুসা বলল, 'এক্সিলেন্সি নানা কারণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমার নামটা গোপন রাখা হয়। সেটা আপনার ক্ষেত্রে নয়। এক্সিলেন্সি! আল-সউদ আমার নাম নিয়ে একটা রহস্য সৃষ্টি করে রেখেছেন মাত্র! আহমদ মুসা। খুবই ছোট নাম।'

নাম শুনেই ভ্রু কুঞ্চিত হলো বাহরাইনের নিরাপত্তা উপদেষ্টা প্রিন্স আল-খালিফার। তার বিস্ময় ও কৌতুহল মিশ্রিত স্থির দৃষ্টি আহমদ মুসার উপর নিবদ্ধ।

'আপনি কি সেই লিজেন্ড আহমদ মুসা, যিনি তরুণদের স্বপ্ন নায়ক আর প্রবীণদের গর্ব?' আহমদ মুসার মুখের উপর চোঁখ ঐভাবে স্থির রেখেই প্রশ্ন করল প্রিন্স খালেদ আল-খালিফা।

আহমদ মুসার মুখ নত মত হলো। বলল, 'এক্সিলেন্সি আমি সাধারণ মানুষ। আমি মানুষের কাজে লাগার চেষ্টা করি মাত্র।' পরম ও বিনীত কন্ঠস্বর আহমদ মুসার।

আসন থেকে উঠে প্রিন্স খালেদ আল-খালিফা। এগোলো আহমদ মুসার দিকে।

উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসাও।

প্রিন্স খালেদ আল-খালিফা জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে। বলল, 'কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বের' হবার প্রবাদ, কিন্তু সোনার এক টুকরা খুঁজতে গিয়ে অমূল্য হীরকখন্ড পাবার কোন প্রবাদ নেই। কিন্তু আমি কল্পনাতীতভাবে এক অমূল্য হিরকখন্ড পেয়ে গেলাম। আমার গর্ব, আমাদের গর্ব আপনি। আপনাকে স্বাগত: খোশ আমদেদ আপনাকে।' আবেগে কন্ঠ ভিজে উঠেছিল প্রিন্স খালেদ আল-খালিফার। নিজের আসনে ফিরে গেল প্রিন্স খালেদ আল-খালিফা।

পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ ভালো করে মুছে নিয়ে বলল, 'সত্যি হঠাৎ অমূল্য হিরকখন্ড পেলে কপর্দকহীনের যে দশা হয়, সে রকমটাই আমার অবস্থা। গতবার হজ্জে গিয়ে গিয়ে মদিনায় ঘুরে বেড়াবার সময় পুলিশ পাহারায় থাকা একটা বাড়ি দেখিয়ে ভাই আল-সউদ আমাকে বলেছিলেন সেখানে আপনি থাকেন। কিন্তু তখন আপনি টার্কিতে ছিলেন। কিন্তু তখন আপনি টার্কিতে ছিলেন। দেখা করার সৌভাগ্য হয়নি। তারপর কয়েকবার চেষ্ঠা করেছি। কিন্তু আপনাকে বাড়িতে পাওয়া যায়নি। আমাদের মহামান্য সুলতানও আপনার সম্পর্কে জানেন। তিনি একবার আমাকে বাহরাইনে আপনাকে আমন্ত্রণের কথা বলেছিলেন। কিন্তু প্রথমত আপনাকে না পাওয়া, দ্বিতীয়ত আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ করে আনার মধ্যে উভয় পক্ষের নানা সুবিধা-অসুবিধার বিবেচনা করে এই ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া যায়নি। সেই আপনাকে আজ হঠাৎ এভাবে চোখের সামনে হাজির দেখছি। এটা একজনের আবেগকে বাঁধভাঙা করে দেবার মতই। আল-হামদুলিল্লাহ।'

'ধন্যবাদ এক্সিলেন্সি। আমি দুর্লভ মানুষ নই। ডাক পেলে আমি সেখানে যাই। তবে শুধু শুধু বেড়াবার সময় আমার কম হয়। এই দেখুন, আমাকে খুঁজে

পাননি। কিন্তু আজ বিনা ডাকে আপনার দোরগোড়ায় হাজির।' আহমদ মুসা বলল।

'যখন আপনাকে পেয়েছি। তখন আমার অনুরোধ মহামান্য সুলতানের সাথে আপনার দেখা করতে হবে' বলল প্রিন্স খালেদ আল-খালিফা।

'এক্সিলেন্সি সময় হলে দেখা করতে পারলে আমিও খুব খুশি হবো।' আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ।' বলে একটু থামল, একটু ভাবল প্রিন্স খালেদ আল-খালিফা। সোফায় একটু হেলান দিল সে। বলল, 'অনেক প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করছে মি. আহমদ মুসা আপনাকে। আপনার সব কাজই জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে। বিষয়টি বিরাট উদ্বেগ-উত্তেজনার। অব্যবহত ভাবে এই উদ্বেগ-উত্তেজনা নিয়ে চলার অফুরন্ত শক্তি আপনি কোথা থেকে পান? ক্লান্তি, অবসন্নতার অনেক কিছুই তো সামনে আসার কথা।'

'পৃথিবীটাই তো নানা রকম লড়াইয়ের ক্ষেত্র। প্রত্যেক মানুষই তার জীবন পরিচালনায় নানা রকম লড়াইয়ে ব্যস্ত। এই লড়াইয়ের মাধ্যমে মানুষের জীবনে শান্তি ও সাফল্য আসে। আমার লড়াইটাও মানুষের শান্তি ও সুবিচারের পক্ষে। আমার বিশ্বাস আমার শক্তির উৎস।' আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, 'তিনি জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন এটা দেখার জন্যে যে মানুষ ভাল কাজ করছে।' এই নি নির্দেশই আমার দায়িত্ব পালনের শক্তি। ভাল কাজ করার আরেকটা দিক হলো, মন্দ পরিত্যাগ করা এবং মন্দ কাজের প্রতিকার করে ভালোর প্রতিষ্ঠা করা। মজলুম কারো ডাক পেলে এই কাজে সাহায্য করি।' বলল আহমদ মুসা।

'এই কাজ অত্যান্ত কঠিন। এই প্রসংগে একটা প্রশ্ন, ভালোর প্রতিষ্ঠা মন্দ পথে হয় কি না? আমি বলতে চাচ্ছি, মন্দ পথে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আরেক সন্ত্রাস সৃষ্টি করা, মন্দের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ হিসাবে অপরাধী নিপরাধ নির্বশেষে হত্যা-হামলায় শিকার বানানো চলে কিনা?' প্রিন্স খালেদ আল-খালিফা বলল।

'না, তা করা যায় না। মন্দ দুর করে ভালো'র প্রতিষ্ঠা করার মডেল হলেন আল্লাহর রসুল স.।আল্লাহর রসুল স.-এর গোটা জীবনে ভালো'র সাথে মন্দ পথ

অনুসরণের এবং নির্দোষ-নিরপরাধিদের উপর হামলা ও হত্যা-নির্যাতনের কোন দৃষ্টান্ত নেই। এমনকি শত্রুর বিরুদ্ধে ঘোষিত যুদ্ধের ক্ষেত্রেও শত্রুপক্ষ বা শত্রু দেশের নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং যারা অস্ত্র হাতে তুলে নেয়নি তাদের নিরাপত্তা দেবার ঘোষনা করা হয়েছে। শত্রুপক্ষের লোকদের ক্ষেত্রেই যখন এই ব্যবস্থা, তখন যারা শত্রু নয় বা বিঘোষিত শত্রু নয়, তাদের নির্দোষ-নিরপরাধদের উপর হামলা-হত্যা-নির্যাতনের তো কোন প্রশ্নই ওঠে না!' আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ মি. আহমদ মুসা অন্য এক প্রসংগ। বিষয়টা অনেকটা ব্যাক্তিগত ধরনের। আপনার জীবনে অসংখ্য ঘঠনা আছে। অসংখ্য মানুষের সংস্পর্শে আপনি এসেছেন। এসবের মধ্যে কোন ঘটনা, কোন ব্যক্তি আপনার জীবনে দাগ কেটেছে সবচেয়ে বেশি?' বলল প্রিন্স খালেদ।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'এক্সিলেন্সি, আমি আপনার এই দুই প্রশ্নের জবাব দিতে পারবো না। আমি অতীতের দিকে ফিরে তাকাই না। কারো সাথে কারো, কোন ঘটনার সাথে কোন ঘটনার তুলনাও আমি করি না। আমার দৃষ্টি শুধুই সামনে, সামনে ওগোতে চাই আমি।'

'ধন্যবাদ মি. আহমদ মুসা, আপনার এমন জবাবই স্বাভাবিক। আচ্ছা মি. আহমদ....।'

প্রিন্স খালেদ আল-খালিফার কথার মাঝখানেই তার ইন্টারকম বেজে উঠল।

কথা বন্ধ করে প্রিন্স খালেদ আল-খালিফা ইন্টারকমের স্পীকার অন করে নিল।

সালাম দিয়ে ওপার থেকে তার পি.এস. বলল, 'এক্সিলেন্সি, ড. সালেহ আবদুল্লাহ এসেছেন।'

'নিয়ে এস তাঁকে।' বলে ইন্টারকম রেখে দিল প্রিন্স খালেদ আল-খালিফা। কয়েক মূহুর্ত।

প্রিন্স খালেদ আল-খালিফার পি.এস. ড. সালেহ আবদুল্লাহকে নিয়ে প্রবেশ করল।

প্রিন্স আবদুল্লাহ আল-খালিফা আহমদ ও আহমদ মুসা দু'জনেই উঠে এগিয়ে গিয়ে তাকে স্বাগত জানাল।

'প্রিন্স খালেদ আল-খালিফা আহমদ মুসার সাথে ড. সালেহ আবদুল্লাহকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'ইনি আমাদের সম্মানিত অতিথি। সৌদি আরব থেকে এসেছেন। একটা বিষয়ে তিনি আপনার সাথে আলোচনা করতে চান, যে বিষয়ে আপনি বিশেষজ্ঞ।' সরাই বসল।

'আমি শুনেছি, দ্বীপ সংক্রান্ত কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চান। কিন্তু এ বিষয়ে সৌদি আরবের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তো বড় বিশষজ্ঞ আছেন!' বলল ড. সালেহ আবদুল্লাহ।

'স্যার, আমার জরুরি প্রয়োজন।' সৌদি আরবে গিয়ে তাঁদের কাছে জানার মত সময় আমার হাতে নেই। এজন্যেই স্যার আপনাকে কষ্ট দেয়া।' আহমদ মুসা বলল বিনীত কন্ঠে।

'বুঝেছি ইয়ংম্যান! নো ম্যাটার। আমার কথায় আপনার যদি কোন সাহায্য হয়, তাহলে আমিই বেশি খুশি হবো।' বলল ড. সালেহ আবদুল্লাহ।

এই সময় প্রিন্স খালেদ আল-খালিফার পি.এস এসে তাঁকে জানাল, 'এক্সিলেন্সি, টেবিলে নাস্তা দেয়া হয়েছে।'

সংগে সংগেই প্রিন্স খালেদ আল-খালিফা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'চলুন, চা খেয়ে আসি। তারপর আমরা কথা বলব। সেটাই ভালো হবে। এই সাথে আমি আপনাদের জানাচ্ছি, লাঞ্চ না খেয়ে আপনাদের যেতে দেব না।'

সবাই উঠে দাঁড়াল।বলল ড. সালেহ আবদুল্লাহ, 'আমরা আর কি করব, হোস্ট যদি আটকান, তাহলে গেস্টরা যাবেন কি করে? গেস্টের জন্যে যদি ক্ষতিকর না হয়, তাহলে হোস্টের কথা রাখাই নিয়ম।'

'ধন্যবাদ, ড. সালেহ আবদুল্লাহ।'

বলে পাশের কক্ষের দিকে হাঁটতে শুরু করল প্রিন্স খালেদ আল-খালিফা।

সবাই তার সাথে চলল পাশের ঘরে নাস্তার টেবিলে।

নাস্তা শেষে সবাই ফিরে এল বসার ঘরে।

ড. সালেহ আবদুল্লাহ তার আসনে বসেই বলল, 'হ্যাঁ মি. ইয়াংম্যান, আপনার নাম কিন্তু জানা হয়নি।'

আহমদ মুসা একবার চোখ তুলে প্রিন্স খালেদ আল-খালিফার দিকে চাইল। তারপর বলল, 'স্যার, আপনার নামের কাছাকাছি। আলী আবদুল্লাহ।'

নিজের নামটি তাকে বলতে পারল না আহমদ মুসা। কারণ যে বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছে সে বিষয়ের সাথে আহমদ মুসার নাম যুক্ত হলে এবং কোনভাবে তা শত্রুপক্ষের কানে গেলে শত্রুরা অনেক বিষয়ই আঁচ করতে পারবে। আর বাহরাইন বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ সব গোয়েন্দা সংস্থার জন্য একটা লোভনীয় স্থান। সুতরাং সতর্কতার প্রয়োজন মনে করেছে আহমদ মুসা।

'হ্যাঁ, মি. আলী আবদুল্লাহ। বলুন, আপনি কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চান।' বলল ড. সালেহ আবদুল্লাহ।

'স্যার, আমি দুনিয়ার 'অ্যাটল দ্বীপ' সম্পর্কে জানতে চাই। দ্বীপগুলোর অবস্থান, দ্বীপগুলোর প্রকৃতি, এ সবের ব্যবহার কি রকম ইত্যাদি।' আহমদ মুসা বলল।

'হ্যাঁ, ইয়াংম্যান। বিষয়টা আমার সাবজেক্টের মধ্যে। কিন্তু মুখস্থ কতটুকু বলতে পারবো, সেটা আপনার কাজে আসবে কি না বলতে পারি না।'

একটু থামল ড. সালেহ আবদুল্লাহ।

শুরু করল পর মুহুর্তেই, 'অ্যাটল দ্বীপ' আল্লাহর এক বিস্ময়কর সৃষ্টি সাগর বক্ষে! সাগরের গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলে সাধারণত কোরাল রীফ থেকে অ্যাটল দ্বীপের সৃষ্টি হয়। সমুদ্রে আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত ফলে গলিত লাভা থেকেও অ্যাটল দ্বীপ তৈরী হতে পারে।

অ্যাটল সাগর বক্ষের এমন দ্বীপ যার চারদিক সাগর সারফেসের উপর জেগে ওঠা মাটির সীমান্ত দিয়ে ঘেরা। এই ঘেরের মধ্যে থাকে পানি। এই পানির গভীরতা কম। বিভিন্ন অ্যাটলে গভীরতা বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। আবার অ্যাটলের চারদিকের সার্কলিং বা ঘেরটা আংশিকও হতে পারে। এক বা একাধিক জায়গায় ঘেরে ছেদ থাকায় অ্যাটলের ভেতরটা সাগরের সাথে উন্মুক্ত থাকতে পারে।

এই অ্যাটল ধরনের দ্বীপগুলো দেখা যায় পৃথিবীর গ্রীষ্মমন্ডলীয় ও আধ-গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলে। অক্ষরেখার ২৮ ডিগ্রি ২৪ ইঞ্চি উত্তরে ও ২৯ ডিগ্রি ৫৮ ইঞ্চি দক্ষিণে কোন অ্যাটল দ্বীপ নেই। আটলান্টিক মহাসাগরে কোন অ্যাটল দ্বীপ নেই, ছোট্ট একটা ব্যাতিক্রম ছাড়া। নিকারাগুয়ার সামনের সাগরে মাত্র আটটি অ্যাটল দ্বীপ রয়েছে। সব অ্যাটল দ্বীপ ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরে। ভারত মহাসাগরের অ্যাটল দ্বীপগুলো মালদ্বীপ, লাক্ষাদ্বীপ ও সাগোজ দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এর মধ্যে মালদ্বীপের অ্যাটল দ্বীপগুলোই উল্লেখযোগ্য। দুনিয়ার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ২৬টি অ্যাটল দ্বীপের মধ্যে ৫টি মালদ্বীপে। মালদ্বীপের একটি অ্যাটল দ্বীপের মধ্যে ২৫৫টি ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। এই বৈশিষ্টে এটাই পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপ। ২৬টি অ্যাটল দ্বীপ রয়েছে ভারত মহাসাগরে। প্রশান্ত মহাসাগর হলো অ্যাটল দ্বীপের সাম্রাজ্য। প্রশান্ত মহাসাগরের তোয়ামতু দ্বীপপুঞ্জ, ক্যারেলিন দ্বীপপুঞ্জ, মাশাল দ্বীপপুঞ্জ, কোরাল সী দ্বীপপুঞ্জে অ্যাটল দ্বীপের অবস্থান সবচেয়ে বেশি। প্রশান্ত মহাসাগরে অ্যাটলগুলোর সংখ্যা, বৈচিত্র্য ও সাইজ সব দিক দিয়েই শীর্ষে।’ থামল ড. সালেহ আবদুল্লাহ।

‘ধন্যবাদ স্যার। অ্যাটল দ্বীপসমূহের সুন্দর একটা ধারণা তুলে ধরেছেন আপনি। স্যার, তাহিতি দ্বীপের আশেপাশে অ্যাটল দ্বীপ আছে কিনা সে সম্পর্কে কিছু বলুন।’

‘দু’টি দ্বীপ নিয়ে তাহিতি। গোটা তাহিতিই ভলকানিক দ্বীপ। এর পাশে কোন অ্যাটল দ্বীপ নেই। কিন্তু তাহিতি থেকে নীল সমুদ্র ধরে কিছু দুর এগোলেই পলিনেশীয় দ্বীপ সাম্রাজ্যের পূর্ব বাহুতে পৌঁছে যাওয়া যাবে। এটাই তোয়ামতু দ্বীপপুঞ্জ। এই তোয়ামতু দ্বীপপুঞ্জের অধিকাংশ বা গোটা দক্ষিণাংশ অনেক অ্যাটল দ্বীপ নিয়ে গঠিত। মোট ৭টি দ্বীপ, এর মধ্যে ৭৩টিই অ্যাটল দ্বীপ। তিনটি দ্বীপ কোরাল। শুধু দ্বীপপুঞ্জের পশ্চিমাংশে তাহিতির দিকে একটা মাত্র দ্বীপ প্রকৃত অ্যাটল দ্বীপ।’ বলল ড. সালেহ আবদুল্লাহ।

‘স্যার, এই অ্যাটল দ্বীপগুলোর কোনটিতে বড় স্থাপনা গড়ে তোলা সম্ভব কিন, যেখানে বহু মানুষের থাকার ও কাজ করার জন্য উপযুক্ত?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘স্থাপনার জন্যে ল্যান্ড দরকার হয়, কিন্তু অ্যাটল দ্বীপগুলোতে ল্যান্ডের অভাবই সবচেয়ে বেশি। ২০০০ মাইল বিস্তৃত গোটা তুয়ামতু দ্বীপপুঞ্জে ল্যান্ডের পরিমাণ ৮৮৫ বর্গ কিলোমিটার মাত্র। আর এই দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণাংশের ৭৮টি দ্বীপের মধ্যে ৭৩টিই অ্যাটল। এই ৭৮ টি দ্বীপের মোট লোক সংখ্যাই হলো মাত্র এক হাজার ছ’শো’র মত। মাত্র কয়েকটি দ্বীপে জনবসতি আছে। অন্য গুলো খালি। অন্তত এই দ্বীপপুঞ্জের এই সব অ্যাটলে বড় কোন স্থাপনা নির্মাণ সম্ভব নয়।’ বলল ড. সালেহ আবদুল্লাহ।

‘অ্যাটল দ্বীপে ল্যান্ড ছাড়া অন্য কোনভাবে বড় স্থাপনা নির্মাণ সম্ভব কিনা?’ আহমদ মুসা বলল।

সংগে সংগেই উত্তর দিল না ড. সালেহ আবদুল্লাহ। সোফায় হেলান দিয়ে বসল। ভাবল একটু। তারপর বলল, ‘তার মানে গোপন স্থাপনার কথা বলছেন। অ্যাটলের লেগুন-ফ্লোরের নিচে অথবা অ্যাটলের কোরাল দেয়ালের ভেতরে কোন বড় রকমের স্থাপনা নির্মাণ সম্ভব কিনা এই তো?’ আমি এর কোন সম্ভবনা দেখি না। আমি মেরিন সাইনটিস্ট কিংবা মেরিন ইঞ্জিনিয়ার নই, একজন ভূগোলবিদ মাত্র। মেরিন সাইনটিস্টরাই এ ব্যাপারে সঠিক কথা বলতে পারে।

‘ধন্যবাদ স্যার। আরেকটি জিজ্ঞাসা, তোয়ামতুর অ্যাটল দ্বীপগুলোর মধ্যে নির্জনতা ও গোপনীয়তার দিক থেকে অগ্রগণ্য কোনটা হতে পারে?’ বলল আহমদ মুসা।

ড.সালেহ আবদুল্লাহ তাকাল আহমদ মুসার দিকে। থামল একটু।বলল, ‘আপনি বলতে চাচ্ছেন, কোন অ্যাটল দ্বীপে বড় কোন গোপন কাজ কেউ গোপনে করে যেতে পারে কিনা, এইতো?’

আহমদ মুসাও হাসল। বলল, ‘বিষয়টা ও রকমই স্যার।’

‘তোয়ামতু দ্বীপপুঞ্জের অ্যাটল দ্বীপগুলো সম্পর্কে বলছি। আগেই বলেছি, এখানকার মাত্র কয়েকটা অ্যাটলে খুব সামান্য লোক বসতি আছে। অন্য সবই জনবসতিহীন নিরব, নিঝুম দ্বীপ। দিনের বেলা অল্প কিছু মাছ ধরার কাজ চলে। আর দ্বীপপুঞ্জের মধ্যাঞ্চলের ফাকারাঙা, তাহানিয়া, মতুতুংনী, উত্তারাঞ্চলের রাবেহিয়া, নপুকা, টপোটো, ফাতুহিভা, হিভাওয়া, নকুহিভা এবং ওয়াপু,

বাংগিরোয়া ও মাফতিয়ার মত কিছু দ্বীপ ও অ্যাটলে পর্যটকদের আবির্ভাব ঘটে দিনের বেল। মধ্য ও দক্ষিনাঞ্চলের অন্য সব অ্যাটল দ্বীপ দিনের বেলাতেও নিরব-নিঝুম থাকে। আর রাতের বেলা দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটা দ্বীপ ও অ্যাটলে বাতি জ্বললেও গোটা দ্বীপপুঞ্জের এ অ্যাটলসমূহ থাকে জমাট অন্ধকারে ঢাকা, নিরব-নি:শব্দ এক মৃত্যুপুরী যেন! এমন পরিবেশ তো গোপন কাজেই জন্যেই উপযুক্ত! কিন্তু আমার কথা মানুষকে কাজ করার জন্যে পায়ের তলায় মাটি চাই, এস মাটি তো অ্যাটলগুলোতে নেই।'

আহমদ মুসার মুখ উজ্জল হয়ে উঠেছিল। কিছু প্রশ্নের স্পেসেফিক জবাব না পেলেও তোয়ামুত দ্বীপপুঞ্জের অ্যাটল রাজ্য সম্পর্কে একটা সম্পূর্ণ ধারণা সে পেয়ে গেছে। মূল যে কথাটা সে জানতে চায়, তাহিতি দ্বীপে বা এই অঞ্চলের অ্যাটল দ্বীপে তা আছে কিনা, সেটা জানা তার হয়ে গেছে। এখন তান নিশ্চিত মনে হচ্ছে, তাহিতি বা অ্যাটল দ্বীপগুলোর কোথাও শয়তানরা আড্ডা গেড়েছে।

আহমদ মুসা বলল, 'ধন্যবাদ স্যার। আমি যা জানতে চেয়েছি, আল-হামদুলিল্লাহ তার চেয়ে বেশি জানতে পেরেছি। অনেক ধন্যবাদ স্যার, আপনাকে।'

'ধন্যবাদ ইয়াংম্যান। কিন্তু এ সব তো কেউ জানতে চায় না। আপনি কি করবেন এসব দিয়ে? কোন পেশায় আপনি জড়িত আছেন মি. আবদুল্লাহ?' বলল ড. সালেহ আবদুল্লাহ।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'স্যার, হাতেম তায়ীর মত রহস্যের সন্ধান আমার নেশা-পেশা দু'টোই। যেমন অ্যাটল রাজ্যে যাবার সুযোগ নিতে পারি।'

'চমৎকার! জীবনকে উপভোগ করার এক উৎকৃষ্ট পথ। আল্লাহর বিচিত্র সৃষ্টি মানুষ দেখুক, চিন্তা করুক এবং আল্লাহর সোলতানিয়াত মানুষ উপলদ্ধি করুক, এটা আল্লাহ চান। আর একটা জিজ্ঞাসা স্যার, অ্যাটলের কোরাল দেয়ালে বা উপরে লেগুনের ফ্লোরের নিচে কোন স্থাপনা তৈরি করা যায় কিনা, এ বিষয়ে আমার মতটা বলেছি। কিন্তু কোরাল রীপগুলো আল্লাহর অপূর্ব সৃষ্টি! অ্যাটলের দেয়াল কোথাও পিলার আকারেও উঠতে পারে। আবার কোথাও অ্যাটলের চারদিকের দেয়ালের ভেতরটা ফাঁকাও থাকতে পারে। কোথাও কোথাও আবার

অ্যাটলের লেভেলের যে ফ্লোর  তাতেও ফাটল থাকতে পারে, হোল থাকতে পারে, কোন কোন ক্ষেত্রে তা আংশিক হতে পারে। এ সব বৈচিত্র্যকে মেরিন সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং নানাভাবে ব্যবহার করতেও পারে।'

'ধন্যবাদ স্যার। অ্যাটল সম্পর্কে এগুলো খুবই মূল্যবান তথ্য।আমার জিজ্ঞাসার উত্তর এর মধ্যে আছে। ধন্যবাদ স্যার, আপনাকে।' আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই প্রিন্স খালেদ আল-খালিফা বলল, 'ধন্যবাদ মি. আবদুল্লাহ, ধন্যবাদ ডক্টর। আপনাদের প্রশ্নোত্তরে মনে হচ্ছে আমিই উপকৃত হয়েছি সবচেয় বেশি। অ্যাটল দ্বীপের নাম জানতাম। কিন্তু অ্যাটল দ্বীপ যে সঠিক অর্থে দ্বীপ নয় আজই প্রথম জানলাম। অ্যাটল দ্বীপগুলোর লোকেশন সম্পর্কেও কিছু জানা ছিল না আমার। তাও জানলাম আজ। এখন দেখতে ইচ্ছে করছে অ্যাটল এলাকা। কিন্তু একটা বিষয় ....।'

প্রিন্স খালদ আল-খালিফার কথার মাঝখানেই মোবাইল বেজে উঠল আহমদ মুসার।

থেমে গেল প্রিন্স খালেদ আল-খালিফা।

'মাফ করবেন!' বলে মোবাইল তুলে নিল আহমদ মুসা। স্ক্রিনে দেখল সৌদি নিরাপত্তা প্রধান আল-সউদের নাম।

সালাম দিয়ে আহমদ মুসা বলল, 'এক্সিলেন্সি, কেমন আছেন?'

ওপার থেকে আল-সউদ সালাম নিয়ে বলল, 'আমরা সবাই ভাল। আপনি যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে জানাবার জন্যে এই টেলিফোন করছি এবং একটি খারাপ খবরও আপনাকে জানাতে চাই।'

'বলুন, এক্সিলেন্সি।' আহমদ মুসা বলল।

'আপনার কাছ থেকে জানার পরই আমি আমাদের নৌবাহিনীর হুরমুজ প্রণালী ইউনিটকে জানিয়েছিলাম। তারা সংগে সংগেই হুরমুজ প্রণালীরর মুখে ছুটে গিয়েছিল। তারা সেখানে অপেক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে হুরমুজ প্রণালী কোস্টাল ষ্টেটস জয়েন্ট অথরিটিং মনিটরিং সার্চ করে। এতে জানতে পারে তারা হুরমুজ প্রণালীতে পৌঁছার আধা ঘন্টা আগে আন্ডারওয়াটার জলযান জাতীয় কিছু যান

প্রণালী অতিক্রম করে। অতএব সে মিশনটি ফেল করেছে। এটাও খারাপ খবর। কিন্তু আরেকটা হুমকি আমরা পেয়েছি। সেটাকেই আমি খবর বলছিলম।’

‘সে হুমকিটা কি? ওরা হুমকি দিয়েছে?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘হ্যাঁ, আহমদ মুসা! ওরাই। তারা স্যাটেলাইট ই-মেইলে জানিয়েছে, তারা কোন প্রতিপক্ষের অস্তিত্ব বরদাশত করে না। বিজ্ঞানী আবদুল্লাহ আল মক্কীকে উদ্ধারের চেষ্টা করে প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করানো হয়েছে। এই অপরাধে বিজ্ঞানীর সমস্ত রক্ত শুষে নিয়ে আজ থেকে তৃতীয় মাসের শেষ দিনে তাকে হত্যা করা হবে। আর তাকে উদ্ধারের আরও যদি চেষ্টা করা হয়, তাহলে সৌদি আরবের রকেট-বিজ্ঞানের জনক বিজ্ঞানী ড. আবদুল আজিজ আল-নজদীকে কিডন্যাপ করা হবে।’বলল আল-সউদ।

‘এই হুমকিকে আপনারা কিভাবে নিয়েছেন?’ আহমদ মুসা বলল।

‘একটা ক্রিমিনাল গ্রুপের আত্মরক্ষার একটা কৌশল হিসাবে।’ বলল আল-সউদ।

‘আপনারা এরপর কি ভাবছেন?’ জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

‘আমাদের ভাবনা আগের মতই। আমরা চাই আমাদের বিজ্ঞানী উদ্ধার হোক! ক্রিমিনালরা ধরা পড়ুক এবং এই ব্যাপারে আমরা আপনার সাহায্য চাই। আমরা আপনার সাহায্য চাই শুধু আমাদের স্বার্থে নয়, বহু বিজ্ঞানী-বিশেষজ্ঞকে তারা কিডন্যাপ করেছে, সবার স্বার্থে। ক্রিমিনালদের এভাবে চলতে দিলে আরও প্রতিভার তারা সর্বনাশ করবে! এই কঠিন মিশনের দায়িত্ব আপনি গ্রহণ করুন। আমাদের সবার ইচ্ছা এটাই।’ বলল আল-সউদ।

‘ধন্যবাদ এক্সিলেন্সি। আমি কতটা পারব সেটা আল্লাহর সাহায্যার উপর নির্ভর করছে। তবে একটা কথা বলতে পারি, সামনে আমার এগিয়ে যাবার পথ বোধ হয় উন্মুক্ত হয়ে গেছে!’ আহমদ মুসা বলল।

‘আল-হামদুলিল্লাহ! আল্লাহর বিশেষ সাহায্য আপনার সাথে আছে, মি. আহমদ মুসা। আপনার প্রয়োজন আমাদের জানাবেন। দেশের ভেতর ও বাইরে সকল জায়গায় আমাদের সহযোগিতা আপনার জন্যে প্রস্তুত থাকবে।’ বলল আল-সউদ।

‘ধন্যবাদ এক্সিলেন্সি! আসি জনাব।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আপনি সৌদি আরবে ফিরছেন?’ জিজ্ঞাসা আল-সউদের।

‘এখনও সব কিছু ফাইনাল করিনি। আমি আজই স্ত্রীর সাথে কথা বলব। তবে সম্ভবত এখন ফেরা হচ্ছে না।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আপনার সব সিদ্ধান্তের সাথে আমরা আছি, আহমদ মুসা।’ বলল সৌদি নিরাপত্তা প্রধান আল-সউদ।

একটু থেমেই আবার বলে উঠল আল-সউদ, ‘ওকে, মি. আহমদ মুসা আর কিছু?’

‘ধন্যবাদ।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আল-হামদুলিল্লাহ! আসসালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।’ ওপার থেকে বলল সৌদি নিরাপত্তা প্রধান আল-সউদ।

ওপার থেকে কল অফ হয়ে গেল।

আহমদ মুসাও সালাম নিয়ে কল অফ করে দিয়েছে।

আহমদ মুসা মোবাইল রেখে দিয়ে ‘স্যরি’ বলে সকলের দিকে তাকাল।

‘আহমদ মুসা আপনি কি আমাদের মহান বড় ভাই আল-সউদের সাথে কথা বললেন?’ জিজ্ঞাসা প্রিন্স খালেদ আল-খালিফার।

‘জি।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আপনাদের কথার মধ্যে আমার মনে কিছু কৌতুহল সৃষ্টি হয়েছে। আমি কি দু’একটা বিষয় জিজ্ঞাসা করতে পারি?’ ড. সালেহ আবদুল্লাহ বলল।

এক খন্ড হাসি ফুটে উঠল আহমদ মুসার ঠোঁটে। বলল, ‘অবশ্যই স্যার, বলুন।’

‘কি এক হুমকির কথা শুনলাম। আবার তা আপনার সামনে উন্মুক্ত হওয়ার কথা শুনলাম। অন্যদিকে আপনার অ্যাটল দ্বীপ নিয়ে বিশেষ করে একটা অঞ্চলের অ্যাটল দ্বীপ নিয়ে আপনার আগ্রহ। ইত্যাদি সব বিষয় মেলালে মনে হচ্ছে, বড় কিছু একটা ঘটেছে, আপনারা কিছু একটার সন্ধান করছেন।’

আহমদ মুসা মুহুর্তের জন্যে চোখ তুলে তাকাল প্রিন্স খালেদ আল-খালিফার দিকে। বলল, ‘আপনি ঠিকই ধরেছেন স্যার। একটা সন্ত্রাসী গ্রুপকে

খোঁজা হচ্ছে। তাদের কোথায় পাওয়া যেতে পারে, এব্যাপারে নানা বিকল্প আমাদের সামনে আসছে। সেগুলো আসছে। সেগুলো ভাবা হচ্ছে। এটাই ঘটনা স্যার।'

আহমদ মুসা বিজ্ঞানী কিডন্যাপড্ হওয়ার ঘটনা চেপে গেল।

'আল্লাহ আপনাদের সফল করুন। সকলেই আমরা সন্ত্রাসের উচ্ছেদ চাই।'

কথাটা শেষ করেই হাত ঘড়ির দিকে তাকাল প্রিন্স খালেদ আল-খালিফা। বলল আবার, 'আমরা এখন উঠতে পারি। লাঞ্চ রেডি।এখানে সুন্দর একটা ক্যান্টিন আছে সেখানেই আমরা যাব।'

উঠে দাঁড়াল প্রিন্স খালেদ আল-খালিফা।

'ধন্যবাদ এক্সিলেন্সি। আজকের লাঞ্চটা একটু আগাম আমার প্রয়োজন ছিল। আমার আরেকটা প্রোগ্রাম আছে।' বলল আহমদ মুসা।

হাসল প্রিন্স খালেদ আল-খালিফা। বলল, 'কিন্তু তার আগে আপনার আরও প্রোগ্রাম আছে। আমাদের মহামান্য সুলতানের সাথে দেখা করা। সে প্রোগ্রামও হয়ে গেছে। আমরা লাঞ্চের পরই সেখানে যাব।'

'ধন্যবাদ এক্সিলেন্সি, আমি খুশি হব তার সাথে দেখা করতে পারলে।এটাই আমার কাছে এখন সবচেয়ে প্রায়োরিটি প্রোগ্রাম।' বলল আহমদ মুসা।

'ধন্যবাদ মি. আবদুল্লাহ এই শুভেচ্ছার জন্যে।' আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল প্রিন্স খালেদ আল-খালিফা।

সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে।

'থামুন, পাশেই আমার পার্সোনাল লিফট আছে।' বলে হাঁটতে শুরু করল প্রিন্স খালেদ আল-খালিফা।

তাকে অনুসরণ করল আহমদ মুসারা।

# ৪

তাহিতি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের সুন্দরী এক তরুনী।

তাহিতিয়ান চেহারা। কিন্তু মুখের আদলে সাউথ-ইষ্ট এশিয়ান ছাপ আছে। দেখলেই মনে হবে এ মেয়েটিকে ইন্দোনেশিয়া বা মালয়েশিয়ার কোন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মনে হবে দেখেছি। মিষ্টি একটা চেহারা। কিন্তু পোষাকটা ব্যতিক্রম।

তাহিতিয়ান অবয়বকে দখল করেছে এসে ইউরোপিয়ান পোষাক।

পরণে কালো প্যান্ট। শর্ট সাদা সার্ট। কোমরে সাদা সার্টের উপর ফিতার মতো প্রশস্ত কালো চেইন।

পাশে একটা খাতা পড়ে আছে। হাতে বই। পড়ছে সে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দিক থেকে অভিজাত চেহারার এক তরুণ এগিয়ে আসছে মেয়েটির দিকে, তার পরণে তাহিতিয়ান ট্রেডিশনাল পোষাক। অবয়বেও সে তাহিতিয়ান। কিন্তু তারও চুল, চোখ ও মুখের গড়নে কিছুটা সেমেটিক, কিছুটা মঙ্গলীয় ছাপ।

তরুণটি নিশব্দে এগিয়ে এল।

একেবারে পাশে এসে দাঁড়ালেও টের পেল না তরুণীটি।

তরুণটি মুখ টিপে হেসে তর্জনি দিয়ে টোকা দিল তরুণীটির মাথায়।

চমকে উঠে ফিরে তাকাল তরুণীটি। তরুণকে দেখে মিষ্টি হেসে উঠে দাঁড়িয়ে আলতোভাবে জড়িয়ে ধরে বলল, ‘স্যরি।’

তরুণটির নাম তামাহি মাহিন পোপা। তাহিতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সে। পার্ট টাইম কাজও করে একটা সাপ্লায়ার প্রতিষ্টানে।

‘তুমি কি ক্লাস শেষ করে এসেছ মারেভা?’

‘তোমার যখন মোবাইল পেলাম, তখন আমি ক্লাসে। আসতে একটু দেরি হলো। খুব জরুরি কিছু?’ বলল তামাহি মাহিন পোপা।

মারেভার পুরো নাম মারেভা মাইমিতি পাপেতি। সে কলেজ অব টেকনলজিতে মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্রী। অন্যান্য অনেক তাহিতিয়ান ছেলে-মেয়ের মত সেও পার্টটাইম পর্যটক গাইড হিসাবে কাজ করে।

তামাহি মাহিন পোপার সাথে মারেভা মাইমিতির মন দেয়া-নেয়ার সম্পর্ক তাদের স্কুল জীবন থেকেই। দু'জনে উত্তর পাপেতি শহরের একই স্কুলে পড়ত।

'জরুরী নয়, কিন্তু তোমাকে বলা দরকার। সেই জন্যেই ডাকা। সান্ডা সুসানের আচরণে আমার খুব অস্থির লাগছে। গতকাল টেলিফোনে আবার সে আমাকে থ্রেট দিয়েছে। আমি তোমাকে আবারও বলছি পার্ট টাইম চাকরিটা তুমি ছেড়ে দাও।'

'কেন, সান্ড্রা সুসান আবার তোমাকে কি বলেছে?' শুকনা কন্ঠে বলল তামাহি মাহিন। তার মুখও মলিন।

সান্ড্রা সুসান তামাহি মাহিনের বস। পাপেতির একটা সাপ্লাই অফিসের ষ্টেশন ম্যানেজার। এই অফিসেই তামাহি মাহিন সুপারভাইজিং অফিসার হিসাবে কাজ করে।

'কি বলবে, সেই একই কথা। গতকাল তো গালিগালাজ করেছে। আর বলেছে আমাকে তোমার পথ থেকে সরে দাঁড়াতে।' বলল মারেভা মাইমিতি। তার কন্ঠ ভারি।

'এটা সে অন্যায় করেছে। ওর প্রতি আমার বিন্দুমাত্র সমর্থন নেই। মাইমিতি তোমাকে তো আগেই বলেছি যে, আমি যখনই বুঝলাম সে আমার ঘনিষ্ঠ হতে চায়, তখনই আমি তাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছি তোমার আমার সম্পর্কের কথা। আমি তাকে কখনও সামান্য প্রশ্রয়ও দেইনি। সে আমার বস, আমি তাকে আর কি বলতে পারি।' তামাহি মাহিন বলল। তার কন্ঠে অসহায়ত্বের সুর।

'কিছু তুমি বলতে পারবে না, সে জন্যেই বলছি তুমি ঐ চাকরি ছেড়ে দাও।' বলল মারেভা মাইমিতি।

'চাকরিটা খুব ভাল মারেভা। সকাল ৯টা থেকে ১০টা এই এক ঘন্টা সকালের সব্জি, মাছ, গোশতের কোয়ালিটি পরীক্ষা করে কেনা-কাটার একটা তালিকা তৈরি করে অফিসকে দিতে হয়। আর সন্ধ্যার পর এ ঘন্টা জিনিসগুলো

বাইরে ডেলিভারি দিতে হয়। এ সময় প্যাকিংগুলো চেক করতে হয়, যাতে প্যাকিং করা জিনিসগুলোর কোন ক্ষতি না হয়। শেষে ডেলিভারির একটা তালিকা অফিসে আমাকে ফাইল করতে হয়। হঠাৎ কখনও কখনও মালের ডেলিভারির জন্যে আমাকেও বাইরে যেতে হয়। মোটামুটি দুই ঘন্টার চাকরি। কিন্তু আমি পাই ফুল চাকরির বেতন। তবু চাকরি আমার বড় নয়, তুমি বড়। তোমার জন্যে চাকরি কেন, আরও কিছু হলেও তা ছাড়তে রাজি আছি' তামাহি মাহিন বলল। আবেগরুদ্ধ হয়ে উঠিছিল তার কন্ঠ।

মারেভা মাইমিতি দু'হাত দিয়ে তামাহি মাহিনের একটা বাহু জড়িয়ে ধরে মাথা রাখল তামাহি মাহিনের কাঁধে।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের গেট দিয়ে একটা গাড়ি প্রবেশ করে ধীরে ধীরে এগিয়ে তাদের সামনে এসে ব্রেক কষল।

গাড়ির জানালা খোলা। ড্রাইভিং সীটে একজন পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের শ্বেতাংগ যুবতী। সে তাকিয়ে ছিল তামাহি মাহিনদের দিকে।

তামাহি মাহিনরাও তাকে দেখছিল।

মারেভা মাইমিতি মাহিনের হাত ছেড়ে দিয়ে তার কাঁধ থেকে মাথা তুলে সোজা হয়ে বসেছিল।

শ্বেতাংগ যুবতী গাড়িতে কয়েক মুহুর্ত অপেক্ষা করে নেমে এল গাড়ি থেকে। সে আসছিল তামাহি মাহিনদের দিকে।

উঠে দাঁড়াল তামাহি মাহিন। তার মুখে অস্পষ্ঠ একটা বিরক্তির ও বিমর্ষ ভাব।

তামাহি মাহিনের সাথে মারেভা মাইমিতিও উঠে দাঁড়িয়েছে।

শ্বেতাংগ যুবতীটি কাছাকাছি আসতেই তামাহি মাহিন বলল মুখে হাসি আনার চেষ্টা করে, 'হাই মিস সান্ড্রা সুসান, কিছু ঘটেছে? জরুরি কোন ব্যাপার?'

'হাই মাহিন, আমি তোমাকে টেলিফোন করেছিলাম। পাইনি, তাই আসতে হলো। অফিসে জরুরি কাজ পড়েছে। একটু তোমাকে যেতে হবে চল।' সান্ড্রা সুসান বলল।

এই সান্ড্রা সুসানই তামাহি মাহিনের অফিসের বস। মেয়েটা শ্বেতাংগ হলেও আকৃতিতে সে ফিলিপাইনি। তার চোখ দু'টিতে নারীসুলভ কমনীয়তার চাইতে রুক্ষতাই বেশি। কথায় দ্বিধাহীন নির্দেশের সুর।

তামাহি মাহিন হাতঘড়ির দিকে তাকাল। তাকাল মারেভা মাইমিতির মলিন মুখের দিকেও। বলল মারেভা মাইমিতিকে, 'তাহলে আসি আমি। তুমি বাসায় যাও। ফিরে এসে আমি কল করব।' তামাহি মাহিনের কন্ঠে একটু বেপরোয়া ভাব।

সে কথা শেষ করেই তাকাল সান্ড্রা সুসান দিকে। বলল, 'চলুন মিস সান্ড্রা সুসান।'

'তুমি গাড়িতে গিয়ে বস আমি আসছি।' বলল সান্ড্রা সুসান তামাহি মাহিনকে।

মনে মনে আশংকিত হলো তামাহি মাহিন সান্ড্রা সুসান তাহলে মারেভার সাথে কথা বলতে চায়। কি কথা বলবে। আবার গালি-গালাজ করবে নাকি? মনে মনে ক্ষুব্ধ হলো তামাহি মাহিন। কিন্তু কিছু না বলে সে গাড়ির দিকে চলল।

মলিন মুখে দাঁড়িয়েছিল মারেভা মাইমিতি।

তামাহি মাহিন চলে গেলে সান্ড্রা সুসান দু'ধাপ এগিয়ে মারেভা মাইমিতির মুখোমুখি হলো। সান্ড্রা সুসানের চোখে-মুখে চরম অসন্তোষ ও ক্রোধের প্রকাশ। বলল সে মারেভা মাইমিতিকে, 'কাল তোমাকে কি বলেছি মনে নেই?'

মারেভা মাইমিতির চোখে-মুখে রুখে দাঁড়াবার ভংগি ফুটে উঠল। বলল, 'মনে থাকলে কি হবে? আমি মাহিনকে ছেড়ে চলে যাব? আমাদের সর্ম্পককে বাইরের কেউ ডিকটেট করতে পারে না।'

চোখ দু'টি যেন জ্বলে উঠল সান্ড্রা সুসানের। বলল, 'সামান্য একজন নেটিভের খুব বাড় তো দেখছি! আমি বাইরের লোক কে বলল তোমাকে। তামাহি মাহিন আমাদের ওখানে চাকরি করে। সে এখন আমাদের লোক।'

'নেটিভ!' শব্দটি খুব আঘাত করেছিল মারেভা মাইমিতিকে। তার র্স্বণালী চেহারা অপমানে লাল হয়ে উঠেছিল। বলল, 'তুমি কিন্তু 'নেটিভ'দের দেশে

এসেছ, আমি কিন্তু অনেটিভদেরই একজন। আর শোন আমি তোমার কোন ব্যাপারে নাক গলাতে চাই না, আমি পছন্দ করব না আমার কোন ব্যাপারে তুমি নাক গলাও।'

সান্ড্রা সুসানের দু'চোখ দিয়ে যেন আগুন বেরুচ্ছে। তার মুখ শক্ত হয়ে উঠেছে। মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উঠেছে হাত দু'টি। বলল সে চাপা তীব্র কন্ঠে, 'কথা তুমি অনেক বড় বলে ফেলেছ।এর উপযুক্ত জবাব আমি দিতে পারি, কিন্তু আজ নয়। আমি তোমাকে শেষ বারের মত সাবধান করে দিচ্ছি, তুমি তামাহি মাহিনের পথ থেকে সরে দাঁড়াও এবং সেটা আজ থেকেই। তা না হলে তোমার পরিণতি কি হতে পারে তা তুমি কল্পনা করতে পারছ না্।'

বলেই ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্রুত পায়ে চলল গাড়ির দিকে।

গাড়ির ড্রাইভিং সীটে বসতে সে বলল, 'মাহিন, এ মেয়েটাতে খুব বেয়াদব? কথা বলতেও জানে না। এ রকম মেয়ের সাথে বসে বসে কথা বল কি করে তুমি! যাক ভালো করে শাসিয়ে দিয়েছি।'

তামাহি মাহিনের মুখটা অসন্তুষ্টিতে ভরে গেল। কিন্তু কোন কথা বলল না সে।

সান্ড্রা সুসান একবার তাকাল তামাহি মাহিনের দিকে। তার চোখে একটা চকচকে দৃষ্টি। চোখ ফিরিয়ে সে তাকাল সামনে। দু'হাত সে চেপে ধরল ষ্টেয়ারিং হুইল। ঠোঁটে একটা ঠান্ডা হাসি।

গাড়ি চলতে শুরু করল।

অফিসে বসের আচরণে তামাহি মাহিন খুব পেরেশান হয়ে পড়েছিল। সে সোজা চলে এসেছে মারেভাদের বাড়িতে।

গাড়ি থেকেই তামাহি মাহিন দেখল মারেভা মাইমিতি গেট দিয়ে তাদের বাড়িতে প্রবেশ করছে।

'মারেভা।' ডাকল তামাহি মাহিন।

থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকাল মারেভা মাইমিতি। তামাহি মাহিনকে দেখে তার চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল। খরব না দিয়ে, টেলিফোন না করে তো মাহিন এভাবে আসে না। আর বিশ্ববিদ্যালয় ছুটির পর এমন অসময়ে সে কখনও আসে না। উদ্বিগ্ন হলো মারেভা মাইমিতি।

ছুটে এল সে তামাহি মাহিনের কাছে।

সাধারণত দেখা হলেই মাহিনের যে স্বভাজাত হাসির উচ্ছসিত প্রকাশ দেখে তা আজ দেখতে পেল না মারেভা। তার বদলে চোখে-মুখে একটা দুশ্চিন্তার প্রকাশ। আরও উদ্বিগ্ন হলো মারেভা।

'কি ব্যাপার মাহিন? এমন সময়ে, কোন খবর না দিয়ে? চল ভেতরে।' বলল মারেভা উদ্বিগ্ন কন্ঠে।

'না ভেতরে নয়, চল পাশের পার্কে গিয়ে বসি।' তামাহি মাহিন বলল।

মারেভা মাইমিতি তামাহি মাহিনের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। বাড়িতে এসেও পার্কে গিয়ে কথা বলবে! আশংকিত হলো মারেভা মাইমিতি। কি হলো মাহিনের?' কিছু ঘটেছে তাহলে?কি সেটা?

'ঠিক আছে আমি বাসায় বই রেখে আসি। তুমি একটু দাঁড়াও।' বলল মারেভা মাহিন।

বলে দৌড় দিল সে বাড়ির ভেতরে।

ফিরে এল মিনিট খানেকের মধ্যেই।

তামাহি মাহিনের হাত ধরে বলল, 'চল।'

মারেভা মাইমিতির বাড়ির পাশ দিয়েই অ্যাভেনিউ ডি পোমেরা। র্পাকটিও এ অ্যাভেনিউ-এর ধারে আর মারেভা মাইমিতিদের বাড়রি পাশেই।

অ্যাভেনিউ হয়ে না গিয়েও মারেভাদের বাড়ি থেকেও পার্কে প্রবেশ করা যায়।

পার্কে ঢুকে একটা গাছ পেছনে রেখে তার ছায়ায় এক বেঞ্চিতে বসল দু'জন, মারেভা ও মাহিন।

'কি ঘটেছে বলত?' একটা কথাও বলছ না।' বসেই মাহিনের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল মারেভা মাইমিতি।

‘ঘটনাটা বলার জন্যেই এসেছি মারেভা।’

বলে একটুক্ষণ চুপ থাকল তামাহি মাহিন। একটু ভাবল। তারপর বলল, ‘সেদিন তোমাকে আমার বস সান্ড্রা সুসান যে থ্রেট করেছিল, আমি গাড়িতে বসেই তা শুনতে পেয়েছিলাম। সেদিন আমি কিছু বলিনি। পরদিন আমি লিখিতভাবে অফিসকে জানাই যে, আগামী মাসের এক তারিখ থেকে আমি আমার কাজ রাখতে পারবো না। এই চিঠিকেই আমার ইস্তেফা পত্র হিসাবে গ্রহন করা হোক।’ আমি অফিস শেষে বাড়ি আসার সময় এই ইস্তেফা পত্র অফিসে দিয়ে আসি।’ থামল তামাহি মাহিন।

‘এটাই তো আমরা চেয়েছিলাম। তুমি ভাল কাজ করেছ। কিন্তু তোমার মুখ মলিন কেন? হাসি নেই কেন মুখে?’ বলল মারেভা মাইমিতি।

মারেভার একটা হাত তামাহি মাহিন নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলল, ‘আমি কথা শেষ করিনি মারেভা। আমার ইস্তেফা পত্র ওরা গ্রহণ করেনি। আমি ইস্তেফা পত্র দিয়ে বাড়ি এসে পৌঁছার কিছুক্ষণ পরেই অফিস থেকে গাড়ি এসে আমাকে নিয়ে যায়। বস অফিসেই বসেছিল। আমাকে দেখে সে হাসল। হাসিটা ঠিক যেন সাপের হাসির মত। বলল, ‘চাকরিতে তুমি ঢুকেছ তোমার ইচ্ছার অধীন। চাকরি ছাড়ার তোমার সুযোগ নেই। অফিসে আসা বন্ধ করলে লোকরা গিয়ে তোমাকে ধরে আনবে। আমাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কোথাও পালিয়ে থাকার সাধ্যও তোমার নেই। আর যদি বেশি বাড়াবাড়ি কর, তাহলে প্রথমে প্রাণ যাবে তোমার প্রেমিকার। তারপর তোমার। অন্যদিকে আমার কথা মেনে যদি চল তাহলে তোমার, তোমার বাড়ির, পরিবারের শ্রীবৃদ্ধি হবে। এসব কথা সে হাসতে হাসতে বলেছে। সে হাসির ধার আমার কাছে ছুরির ধারের চেয়েও ভয়ংকর মনে হয়েছে।’

থামল তামাহি মাহিন। মুষড়ে পড়া বিধ্বস্ত তার চেহারা।

মারেভা তাকিয়েছিল তামাহি মাহিনের মুখের দিকে। তারও মলিন মুখ উদ্বেগে ভরা।

তামাহি মাহিন থামলেও তখনি কথা বলতে পারল না মারেভা। তার বুক কাঁপছে। কোন মানুষ এমন নির্লজ্জ আর নিষ্ঠুর হয়!

তামাহি মাহিনও নিরব।

অন্ধকারের মত ভারি নিরবতা ভাঙল মারেভাই। বলল, ‘তুমি কি ভাবছ? আপাতত চাকরি না ছাড়লেই তো একটা সমাধান হয়।’

‘অসম্ভব। ওর ওধীনে ভেবে দেখেছ? ওরা জোর করে তোমাকে অফিসে নিয়ে যাবে। না গেলে কি হবে সে থ্রেট তো দিয়েই রেখেছে।’ মারেভা বলল। ওরা তোমার করে বসে?

‘আমি নিজের জন্যে এক বিন্দুও ভাবছি না। ওরা বাড়াবাড়ি করলে আমি আমি পুলিশ কে বলব। কিন্তু আমি ভাবছি তোমার কথা।যদি কোন ক্ষতি করে বসে?সে থ্রেট তো সান্ড্রা দিয়েছেই।বললাম না ওর হাসিটাও সাপের মত, ছুরির মত। ওরা সব পারে।’ বলল তামাহি মাহিন।

‘আমাকে নিয়ে ভেব না। দেশটায় আমাদের আইন এখনও আছে। বাইরের থেকে এসে ওরা আমাদের নেটিভ বলে গালি দেবে, আর যা ইচ্ছা তাই বলবে আর তা আমাদের মেনে নিতে হবে! কিন্তু এখনই গন্ডগোল না পাকিয়ে তুমি আরও কিছু দিন নিরবে চাকরি করে যাও।’ বলল মারেভা মাইমিতি।

‘ভয় ও ঘৃণা দুই-ই সৃষ্টি হয়েছে আমার তার প্রতি। ওর পাশে চাকরির অভিনয় করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অফিসে প্রায় আমরা এক সাথে থাকি। কোন সময় কোন ঘটনা সৃষ্টি করে, কখন কোন অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে আনে তার ঠিক নেই। আমি কাল থেকেই আর অফিসে যাচ্ছি না।’ তামাহি মাহিন বলল।

পেছনে পায়ের শব্দ পেয়ে মারেভা ও মাহিন দু’জনেই পেছনে ফিরে তাকাল। দেখলো মারেভার মা তাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

মারেভারা দু’জনেই উঠে দাঁড়াল।

‘মা, তুমি এখানে?’ বলল মারেভা মাইমিতি।

‘হ্যাঁ, আমি পার্কে অনেকক্ষণ এসেছি। ফেরার পথে তোমাদের দেখে এলাম। তোমরা এখানে কেন? আর তোমাদের এতটা বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন? আসতে আসতে মাহিনের মুখে কার বিরুদ্ধে অভিযোগের কথা, আর কাল থেকে অফিসে আর না যাবার কথা শুনলাম। এসবের অর্থ কি?’ বলল মারেভার মা।

দু’জনেই নিরব। তাকাল একে-অপরের দিকে।

তামাহি মাহিনই কথা বলল, ‘আন্টি, আপনার কাছে কিছুই লুকানো ঠিক নয়। কিন্তু আন্টি তাতে আমাদের মতই আপনার মন খারাপ হবে, উদ্বিগ্ন হবে।’

‘বাছা, ছেলে মেয়েদের উদ্বেগ বাবা-মা শেয়ার করবে না তো কে করবে? বল বাছা, কি হয়েছে তোমাদের?’

তামাহি মাহিন তার অফিসের বস সান্দ্রা সুসানের সাথে কি ঘটেছে, তামাহি মাহিন কি সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা সব বলল মারেভার মাকে।

শুনতে শুনতে উদ্বেগে ভরে গেল মারেভার মা’র মুখ। তামাহি মাহিনের কথা শেষ হতেই বলল, ‘মারেভা ঠিক বলেছে চাকরি অব্যাহত রেখে কি করা যায় তা ভাবার সুযোগ নেয়া দরকার। লোক ওরা সাংঘাতিক মনে হচ্ছে।’

‘কিন্তু আন্টি, যে ভয়ের কারণে চাকরি অব্যাহত রাখার কথা বলছেন, যা ঘটেছে তার পর আমি চাকরি অব্যাহত রাখলে সে ভয় আরও বাড়বে। পরে কিছু করতে গেলে তাদের জিঘাংসা আরও বৃদ্ধি পাবে।’ তামাহি মাহিন বলল।

ভাবছিল মারেভার মা। বলল, ‘তোমার কথাও ঠিক মাহিন। তাহলে আমাদের কি করা কর্তব্য? পুলিশকে আমরা বলতে পারি। কিন্তু জানি না বাছা, ফরাসীদের নিয়ন্ত্রিত পুলিশ সাদা চামড়ার সান্দ্রা সুসানদের বিপক্ষে কোন পদক্ষেপ নেবে কিনা। নেটিভদের অভিযোগ অনেক সময়ই তাদের কাছে বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তবু এটাই একমাত্র বিকল্প। আর এখনি এপথে না গেল আমি যা মনে করি চাকরি অব্যাহত রেখে সময় ক্ষেপণের পথ নিতে হবে।’

‘তারা কি করতে পারে আন্টি? আমার ভয় শুধু মারেভাকে নিয়ে। তাদের জিঘাংসার প্রথম টার্গেট হতে পারে মারেভাই।’ বলল তামাহি মাহিন।

‘আমি ভয় করি না মাহিন। ওরা একটা হুমকি দিয়েছে বলেই আমরা গেয়ে পায়ে পড়ব? কেন এদেশ আমাদের নয়। এরা তো একে একে আমাদের

জাতীয় সব কিছুই নিয়ে নিয়েছে, আমাদের ব্যাক্তি সত্ত্বাও আমাদের থাকবে না, তা হয় না। এটাই আমার পরিষ্কার কথা মা। মারেভা মাইমিতি বলল।' আবেগরুদ্ধ মারেভার কন্ঠ।

মারেভার আবেগ মারেভার মা ও তামাহি মাহিনকেও স্পর্শ করেছে।

মারেভা থামলেও সংগে সংগে কথা বলতে পারলো না মারেভার মা ও তামাহি মাহিন।

নিরবতা ভাঙল মারেভার মা। বলল, 'মারেভার আবেগ ঠিক আছে। কিন্তু আবেগ দিয়ে সব সময় বাস্তবতার বিচার চলে না। যা হোক, মারেভা তুমি অন্তত কিছুদিন কলেজ যাওয়া বন্ধ রাখ। বিষয়টা নিয়ে কি করা যায় দেখা যাক। আর আমি মনে করি, মাহিনকেও সাবধান থাকতে হবে। তুমিও বিশ্ববিদ্যালয়ে যেও না। পারলে বাইরে থেকে বেড়িয়ে এস।'

'কিন্তু মা, কলেজে যাওয়া কয়েকদিন বন্ধ রাখলেও গাইডের কাজটা বন্ধ রাখতে পারবো না। ট্যুরিষ্টদের পিক সিজন শুরু হয়েছে। আমার এ বছরের রেজিষ্ট্রেশনও হয়েছে। কাল থেকেই আমি কাজ শুরু করছি।' বলল মারেভা।

'আন্টি, মারেভা এটা করতে পারে। প্রতি বছরই তো করছে। চাকরি ছেড়েছি যেহেতু, আমিও চিন্তা করছি এ কাজে লাগার।' তামাহি মাহিন বলল।

চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল মারেভার। বলল, 'তাহলে তুমি কাল নাম রেজিষ্ট্রেশন করাও। এবার একটু কড়াকড়ি। নাম রেজিষ্ট্রেশন না করলে গাইডের কাজ করা যাবে না।'

'হ্যাঁ, তোমরা যদি এক সাথে কাজটা করতে পারো, তাহলে মন্দ হয় না। সব সময় মানুষ নিয়ে কারবার, মানুষের মধ্যে থাকতে হবে, এর মধ্যে একটা নিরাপত্তা আছে। তবে আসা-যাওয়াটা যাতে দু'জনের এক সাথে হয় তার জন্যে চেষ্টা করো তোমরা।' বলল মারেভার মা।

'ঠিক আছে এটা করা যাবে। আমিই মারেভাকে বাসা থেকে নিয়ে যাব।' বলল তামাহি মাহিন।

'এটা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না। একবার ভয়ের কাছে আত্মসর্মপণ করলে এ থেকে আর মুক্তি পাওয়া যাবে না।' মারেভা বলল।

‘তুমি আর কথা বাড়িও না মারেভা। কোন বিধিবদ্ধ আইন করা হচ্ছে না। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা তুমি আমি সবাই করতে পারবো।’ বলল তামাহি মাহিন।

‘ধন্যবাদ তোমাদের। মনে রেখ ভয় থাকাটা সবসময় খারাপ নয়। ভয় মানুষকে সাবধান করে। এর প্রয়োজন আছে। আশা করি তোমাদের মনে থাকবে কথাটা। চল এবার উঠা যাক।’ মারেভার মা বলল।

সবাই উঠে দাড়াল।

পাপেতি বিমানবন্দর।

লাগেজ সার্কেলের বাইরে আউটার।

আউটার লাউঞ্জে সবার সাথে দাঁড়িয়ে আছে মারেভা মাইমিতি। যাত্রী ও ট্যুরিষ্টরা বের হতে শুরু করেছে।

কাঁচের দেয়াল ঘেরা লাগেজ সার্কেল দেখা যাচ্ছে, এদের অধিকাংশই ট্যুরিষ্ট।

সব সময় যা হয় ট্যুরিষ্টদের ধরার জন্যে গাইডদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়।

আজও সেই কাড়াকাড়ি।

পাশ থেকে বান্ধবী তিউ অন্য সবার সাথে ছুটে গেছে পর্যটকদের দিকে।

মারেভা মাইমিতি যায়নি। সে টানা-হেঁচড়া পছন্দ করে না, সে ভাগ্যে বিশ্বাসী।

তার বন্ধু-বান্ধবীরা, তার পরিচিতজনরা এবং অন্যরা ট্যুরিষ্টদের নিয়ে একে একে চলে যাচ্ছে।

এল তার বান্ধবী তিউ দু’হাতে দুই ব্যাগ নিয়ে। ‘পেছনে একজন ট্যুরিষ্ট আসছে। কোন গাইড নেয়নি।’ একথা বলে তিউ চলে গেল।

মারেভার তাকাল যেদিকে তিউ ইংগিত করেছিল সেদিকে। দেখল, এশিয়ান এক যুবক। পোষাকে-আশাকে অন্যান্য ট্যুরিষ্টদের মতো বিদঘুটে নয়,

পরনে পরিচ্ছন্ন পোষাক। মাথার চুলের আকার ও অবস্থায় কোন স্বেচ্ছাচারিতা নেই। চুল সুন্দর করে আঁচড়ানো। আকৃষ্ট হলো মারেভা।

ট্যুরিষ্ট যুবকটি কাছাকাছি আসতেই মারেভা মাইমিতি দু'ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলল, 'স্যার মে আই হেলপ ইউ? সার, আমি কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি?'

ট্যুরিষ্ট যুবকটি তাকাল মারেভার দিকে।

শান্ত, কিন্তু সাগরের মত গভীর দৃষ্টি ট্যুরিষ্ট যুবকটির চোখে। থমকে দাঁড়িয়েছে সে। মিষ্টি একটা অস্ফুট হাসি ফুটে উঠেছে ট্যুরিষ্ট যুবকটির ঠোঁটে। বলল, 'ধন্যবাদ, হ্যাঁ আমাকে পথ দেখিয়ে সাহায্য করতে পার।'

'অনেক ধন্যবাদ স্যার।'

বলে মারেভা মাইমিতি ট্যুরিষ্ট যুবকটির হাত থেকে ব্যাগটি নিতে চাইল।

'না মিস........ আমাকে পথ দেখিয়ে সাহায্য করতে বলেছি, ব্যাগ বহন করতে বলিনি। আর আমি তোমার চেয়ে, শক্তিও বেশি হবে নিশ্চয়? সুতরাং ব্যাগ আমরই বহন করা উচিত।' বলল ট্যুরিষ্ট যুবকটি হাসি মুখে মারেভার দিকে না তাকিয়েই।

ট্যুরিষ্ট যুবকটির কথা শুনে অবাক-বিস্ময় নিয়ে মারেভা তাকাল ট্যুরিষ্ট যুবকটির দিকে। এমন অদ্ভুদ মানুষ সে জীবনে দেখেনি। শোনেওনি কখনো এমন ট্যুরিষ্টের কথা। বলল, 'স্যার, আমার নাম মারেভা মাইমিতি।'

বলে মারেভা ট্যুরিষ্ট যুবকটির দিকে হাত বাড়াল হ্যান্ডশেকে জন্যে। এটা তাহিতির একটা কালচার।

ট্যুরিষ্ট যুবকটি হাত না বাড়িয়ে 'ধন্যবাদ' বলে জানাল তার নাম, আমি আবু আহমাদ।'

ট্যুরিষ্ট আবু আহমদ।'

ট্যুরিষ্ট যুবকটি আবু আহমদ আসলে আহমদ মুসা। অন্যান্য অনেক সময়ের মত সংগত কারণেই ছদ্মনামের আশ্রয় নিল। তার সন্দেহ সত্য হলে এখানে ছদ্মনামের আশ্রয় নিল সে। তার সন্দেহ সত্য হলে এখানে ছদ্মনাম গ্রহণের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি।

'আবু আহমাদ' নামটি মারেভা মাইমিতি শুনল বটে, কিন্তু ধন্যবাদ দিতে পারলো না। আহমদ মুসা হ্যান্ডশেক না করায় অপমানিত বোধ করল মারেভা মাইমিতি। সে মনে করল 'গাইড' বলে তাকে ছোট মনে করা হলো। আবার আহমদ মুসার স্বচছ-সরল মুখ দেখে কিন্তু এটা তার মন মেনে নিতে চাইলো না। যা হোক, এমন আচরণ কোন ট্যুরিষ্টের মধ্যে সে এর আগে দেখেনি। আহত মনটাকে সে বুঝাতে পারল না।

এ সব চিন্তায় একটু দ্বিধায় পড়েছিল মারেভা মাইমিতি। কিঞ্চিত সময় নষ্ট হলো।

পরে মুখে জোর করে হাসি টেনে বলল, 'চলুন স্যার।'

তারা বেরিয়ে এল কার পার্কে।

'মিস মারেভা, ট্যুরিষ্টদের ভীড় কম, এমন ভাল হোটেল আছে পাপেতিতে?' বলল আহমদ মুসা।

পাওয়ার ক্যাপিটাল হয়েছে বা হতে পারে এমন একটা অ্যাটল দ্বীপের সন্ধানে সে এসেছে। ট্যুরিষ্ট নয়, এ অঞ্চলের বা অন্য কোন অঞ্চলের নাগরিকদের সাহচর্য তার দরকার যারা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে আসে ও যায়।

মারেভা তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'আছে স্যার, তবে খুব এক্সপেনসিভ। বেশি খরচ বলে ট্যুরিষ্টরা সেগুলোতে যায় না বললেই চলে।'

'গুড, সে হোটেলগুলোর মধ্যে উপকূলের ধারে এমন একটি হোটেলে চল।' আহমদ মুসা বলল।

মারেভা একটা বেবিট্যাক্সি ডাকল। সিংগল ট্যুরিষ্টরা সাধারনত এগুলোই ব্যবহার করে।

'না মিস মারেভা, বেবিট্যাক্সি নয়, ম্যান ট্যাক্সি ডাকুন।' বলল আহমদ মুসা। তার ঠোঁটে হাসির রেখা।

মারেভা তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'ম্যান ট্যাক্সি মানে স্যার...!'

'ফুল ট্যাক্সি, ৪ সীটের ট্যাক্সি। বেবিট্যাক্সি নয়।' আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসার কথার ধরনে হেসে ফেলল মারেভা।

ওকে স্যার। আমি ফুল ট্যাক্সি ডাকছি। বলল মারেভা।

ট্যাক্সি নিয়ে এল মারেভা।

আহমদ মুসা গাড়ির দরজা খুলে হাতের ব্যাগটা পেছনের সীটে রেখে সামনে ড্রাইভারের পাশের সীটে গিয়ে বসল।

বিস্মিত মারেভা তাকাল আহমদ মুসার দিকে। এ রকমটা রকটা রীতি নয়। ট্যুরিষ্ট, অতিথিরা যারা আসেন তার এরকম করেন না। গাইড বসে ড্রাইভারের পাশের সীটে, ড্রাইভারকে গন্তব্য বলতে হয় তাকেই। আর ট্যুরিষ্ট, অতিথি একজন হলেও পেছনের সীটেই বসেন।

আহমদ মুসা সীটে বসে বিস্মিত চোখে চেয়ে থাকা মারেভাকে বলল, ‘তুমি পেছনের সীটে বস। স্যরি, তুমি বলে ফেললাম!’

বিস্মিত মারেভা পেছনের সীটে গিয়ে বসল।

মনে মনে বলল, ‘কি পাগলরে বাবা। সব উল্টো কাজ। আমাকে পেছনের বসাল। একটুও ভাবল না যে, তাহলে আমিই গাড়ির মনিব হয়ে গেলাম। দু’সীটের হলেই যেখানে চলে সেখানে চরগুণ ভাড়া দিয়ে নিল ক্যাডিলাক কার। ট্যুরিষ্টদের প্রিয় হোটেল নিল না, নিল সবচেয়ে এক্সপেনসিভ হোটেল। টাকা আছে না হয় খরচ করল, কিন্তু এসব পাগলামি কেন? হ্যান্ডশেক করে না, বিশেষ করে মেয়েদের সাথে! এমন আজব লোক আমি জীবনে দেখিনি কোন দিন।

গাড়ি চলছে পাপেতির প্রশস্ত রাস্তা দিয়ে।

এক সময় আহমদ মুসা মুখ পেছন দিকে না ফিরিয়েই মারেভাকে উদ্দেশ্য করে বলল, ‘কি যেন হোটেলের নাম বললে? কোন নাম কি বলে দিয়েছ আমাদের এই কার-মালিক ভাইকে?’

‘বলে দিয়েছি স্যার। হোটেলের নাম ‘লা ডায়মন্ড ড্রপ তাহিতি’। উনি হোটেলটি ভাল করে চেনেন স্যার।’ বলল মারেভা।

‘একটু বেশি দামী। কিন্তু চমৎকার সিলেকশন, স্যার। পাহাড়ী নদী টাওনার মোহনায় ঐতিহাসিক বদ্বীপের উপর হোটেলটি। হোটেলটির পা ধুয়ে দিচ্ছে বিস্তৃত টাওনা লেক। লেকটার চারদিকেই কোরাল রীফ। কিন্তু ডান-বাম

দু'টি দিকেই প্রশস্ত পথ আছে বেরিয়ে যাবার। আর সামনে সাগরের দিকটাই বেশি খোলা।' বলল গাড়ির ড্রাইভার।

'বদ্বীপকে ঐতিহাসিক বলছেন কেন?' জিজ্ঞাসা আহমদ।

'স্যার, ১৮৮০ সালের পূর্ব পর্যন্ত তাহিতির পোমা রাজবংশের অবকাশকালীন প্রাসাদ ছিল এই বদ্বীপে। তাহিতি দ্বীপ ও এই অঞ্চলকে ফরাসীরা ফ্রান্সের অংগীভূত করে নেবার পর অনেকদিন রাজার লোকরা এই প্রাসাদে ছিলেন। তারপর ধীরে ধীরে প্রাসাদ বিরান হয়ে যায়। এই প্রাসাদের ধ্বংসস্তুপের উপর রাজকীয় স্ট্যাইলে লা ডায়মন্ড ড্রপ হোটেলটি তৈরি হয়েছে। আপনি.....।'

হঠাৎ থেমে গেল ড্রাইভার। থেমেই সে আসার বলে উঠল, 'আমরা লা ডায়মন্ড ড্রপে এসে গেছি স্যার।'

লেকের দিকে মুখ করে হোটেলটি তৈরি।

হোটেলের বিশাল গাড়ি বারান্দায় গাড়ি থেকে নামল আহমদ মুসা। চারদিকে তাকিয়ে চমৎকৃত হয়ে গেল সে। তিন দিক থেকে লেক ঘিরে আছে হোটেলটিকে। লেকের ডান-বাম দু'দিকেই দেখা যাচ্ছে কোরাল প্রাচীর। সে সামনেও মাইল খানেক দূরে দেখা যাচ্ছে কোরাল প্রাচীরের মাঝখানে একটি প্রণালী লেককে সাগরের সাথে এক করে দিয়েছে। প্রণালীর দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে প্রশান্ত সাগরের অন্তহীন নীলবুক।

দৃষ্টি ফিরে এলে বদ্বীপের পাশ দিয়ে নেমে আসা পাহাড়ী নদী টাওনাকে দেখতে পেল। অদ্ভূদ সুন্দর মিলনের এই দৃশ্যটি। পাহাড়ী নদীর চঞ্চল সফেদ স্রোত অবিরাম এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে লেকের নিরব-নিস্তরঙ্গ কালো বুকে।

'সত্যি অপরূপ এই পরিবেশ, যা শুধু উপলদ্ধিই করা যায়, ভাষায় এর বর্ণনা চলে না।' বলল অনেকটা স্বগতকন্ঠে আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার ব্যাগ নিয়ে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে মারেভা মাইমিতি।

আহমদ মুসা 'ধন্যবাদ' বলে মারেভার হাত থেকে ব্যাগটি নিয়ে বলল, 'গাড়ি এখন ছেড়ে দেব মারেভা?'

'আপনি কখন বেরুতে চান? আপনার কি প্রোগ্রাম?' বলল মারেভা।

‘না, বিকেলের আগে বেরুচ্ছি না।’ বলল আহমদ মুসা।

‘তাহলে গাড়ি ছেড়ে দিন।’ মারেভা বলল।

‘ভাড়া কত দিতে হবে মারেভা?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘মাইলের হিসাবে গাড়ির মিটারে ২০ ডলার ভাড়া উঠেছে স্যার।’ মারেভা বলল।

আহমদ মুসা ৫০ ডলারের একটি নোট বের করে মারেভাকে দিয়ে বলল, ‘ওকে পুরোটাই দিয়ে দাও’

ড্রাইভার ভাড়া ও আশাতীত বখশিস পেয়ে হয়ে বলল, ‘স্যার, গাড়ি দরকার হলে যখন আসতে বলবেন আসতে পারি স্যার।’

‘ধন্যবাদ, আপনার টেলিফোন নাম্বার মারেভাকে দিয়ে যান। আমরা আপনাকে ডেকে নেব। কখন ফ্রি পাওয়া যায় আপনাকে, নাম কি আপনার?’ আহমদ মুসা বলল।

‘স্যার, আমার নাম, তেপাও।’ এরপর ড্রাইভার ‘ধন্যবাদ’ বলে দীর্ঘ একটা বাও করে গাড়িতে উঠল।

আহমদ মুসা ‘এস মারেভা’ বলে হাঁটা শুরু করল হোটেলে ঢোকার জন্যে।

বুকিং কাউন্টারে গিয়ে আহমদ মুসারা জানতে পারল হোটেলে হাউজ ফুল। একটামাত্র ডবল ডিলাক্স রুম খালি। তাও হোটেলের পেছনের অংশে। এ দিক থেকে লেকের বা সাগরের দৃশ্য উপভোগ করা যায় না। তবে পেছন দিকে হোটেলে আঁকা-বাকা রাস্তাসহ পাহাড়ী ল্যান্ড-স্পেসটা দেখা যায়।

‘এত ভীড় এমন দামী হোটেলেও!’ আহমদ মুসার এমন স্বগতোক্তির জবাবে বুকিং অফিসার বলল, ‘স্যার এটা আমাদের পাপেতির সৌভাগ্য যে, গোটা ফ্রেন্স পলিনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জের কেন্দ্র যেমন তাহিতি দ্বীপ, তেমনি এর হার্ট হলো পাপেতি। সুতরাং ফ্রেন্স পলিনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জে ব্যবসায়, ভ্রমণ বা যে উদ্দেশ্যেই আসুন তার গেটওয়ে, অবস্থান স্থল ও ডিপারটার দরওয়াজা এই পাপেতি। ভীরটা এ কারণেই স্যার।’

‘ধন্যবাদ’ দিয়ে আহমদ মুসা পেছন দিকের খালি ডবল ডিলাক্স কক্ষটিই নিয়ে নিল।

চাবিটি নিয়ে মারেভা ফ্লোরে রাখা আহমদ মুসার ব্যাগটি তুলে নিল। বলল, ‘আসুন স্যার’।

আহমদ মুসা মারেভার হাত থেকে ব্যাগটি নিতে গেলে মারেভা ত্বরিত কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে বলল, ‘ছোটরাও বড়দের ব্যাগ বহন করে স্যার, বড়দের সম্মান ও নিজেদের ধন্য করার জন্যে।’

মারেভা ব্যাগ নিয়ে হাঁটতে লাগল লিফটের দির্কে। বলল, ‘আসুন স্যার।’

হোটেলের দশতলায় রুমটা। চাবি দিয়ে দরজা খুলে রুমে প্রবেশ করল মারেভা। প্রবেশ করল আহমদ মুসাও। মারেভার পেছনে পেছনে। দরজা খোলা রেখেই এল আহমদ মুসা। বিশাল কক্ষ।

দরজা দিয়ে ঢুকেই হাতের বামে বড় টয়লেট। ডান পাশে কাপড়-চোপড় রাখার বড় সেলফ। তার পাশে লাগেজ বেঞ্চ। মাঝখানে শর্ট করিডোর। ভেতরে আর একটু এগোলে ডান দিকে দু’টো বেড পাশাপাশি। বেডে ওপারে একটা সোফা সেট, তার সাথে ‘টি-টেবিল।’ সোফা সেটের বিপরীত দিকে ঘরের ওপাশে লম্বা টেবিল দেয়ালের সাথে সেঁটে রাখা।

তার সাথে দু’টি চেয়ার। টেবিলটির উপর এক প্রান্তে ফলের একটা বাস্কেট। টেবিলের পাশে একটা মিনি ফ্রিজ।

ঘরে প্রবেশ করে মারেভা হাতের ব্যাগটি দেয়ালের সাথের টেবিলটিতে রেখে বলল, ‘স্যার, আমি বাতিগুলো, টয়লেট, এসি’র কন্ট্রোলটা একটু দেখে নেই।’

ঘুরেই মারেভা খোলা দরজা দেখে বলল, ‘স্যরি, দরজা খোলা আছে লাগিয়ে দিয়ে আসি।’

এগোবার জন্যে পা তুলল মারেভা।

‘না দরজা খোলা থাকবে মারেভা।’ বলল আহমদ মুসা।

সোফায় বসে জুতা খুলছে আহমদ মুসা।

বিস্মিত চোখে তাকাল মারেভা আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘দরজা খোলা থাকবে কেন? এভাবে কেউ খোলা রাখে না। এটা দেখতে অড লাগে এবং নিরাপত্তার প্রশ্ন তো আছেই।’

‘এখন দরজা খোলা থাকুক মারেভা! আর ওসব চেক করতে হবে না। আমি সব দেখে নেব। তুমি ঐ চেয়ারটায় বস। কয়েকটি বিষয় একটু জেনে নেই।’ বলল আহমদ মুসা।

ঘরের ও প্রান্তে দেয়ালের সাথের টেবিলে যে রাইটিং চেয়ার আছে, সেটাই দেখিয়ে দিল আহমদ মুসা মারেভাকে বলেছে বসার জন্যে।

মারেভার চোখ মুখের জিজ্ঞাসু ভাব কাটেনি। সে ধীরে ধীরে গিয়ে চেয়ারে বসল। বলল, ‘বলুন স্যার।’

আহমদ মুসা জুতা খুলে সোফায় হেলান দিয়ে বসেছে। ভাবছিল। আধ খোলা তার চোখ। ঐ অবস্থায় বলল, ‘তাহিতির সবচেয়ে সুন্দর কি মারেভা?’

‘উপকূলের রাস্তা ধরে সাগর আর পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে ড্রাইভ করা।’ বলল মারেভা।

‘আর কি আছে?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসা।

‘উপকূলে লেগুনের ওপারে কোরাল রীফের উপর কটেজগুলোতে জোৎস্না রাতে আদিগন্ত সাগরের দিকে চেয়ে থাকা।’ বলল মারেভা।

‘এরপর কি?’ আহমদ মুসা বলল।

‘ঐ কটেজগুলোতে বসে জোৎস্নাবিহীন রাতে আকাশে তারার রাজ্যে হারিয়ে যাওয়া এবং অন্ধকার সাগরবক্ষে কান পেতে সাগরের নি:শব্দ ভাষণ শোনা।’ মারেভা বলল।

‘ঐ কটেজগুলোতে বসে জোৎস্নাবিহীন রাতে আকাশে তারার রাজ্যে হারিয়ে যাওয়া এবং অন্ধকার সাগরবক্ষে কান পেতে সাগরের নি:শব্দ ভাষণ শোনা।’ মারেভা বলল।

‘আর কিছু আছে?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘তাহিতির সর্ব্বোচ পাহাড় চড়ায় উঠে প্রশান্ত মহাসাগরকে দেখা।’ বলল মারেভা।

সোজা হয়ে বসল আহমদ মুসা। তার মুখে হাসি। তার চোখ দু'টি খবরের কাগজে। বলল, 'আমি তো তাহিতির আলোচনা বা বর্ণনায় এসবের কথা পড়িনি। কোথায় পেলে এসব?'

'এগুলো আমার নিজস্ব চয়েস।' বলল মারেভা।

'তুমি কি গল্প-কবিতা লেখ?' আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

'আমি গল্প-কবিতার ভাল পাঠক স্যার।' মারেভা বলল।

'এগুলো পাঠকের কথা নয়, লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা। থাক, তাহিতির কথা তো শুনলাম। এখন গোটা ফ্রেন্স পলিনেশিয়ার কথা বল।' বলল আহমদ মুসা।

'বলুন স্যার, কি জানতে চান।' মারেভা বলল।

'ফ্রেন্স পলিনেশিয়ার সবচেয়ে সুন্দর দর্শনীয় বস্তু কি?' বলল আহমদ মুসা।

'নি:সন্দেহ স্যার, এর অ্যাটলগুলো। এটা আমার শুধু নয়, সবার চয়েস।' মারেভা বলল।

'তুমি কি অ্যাটলে কি লোকজন আছে। তোমরা গেছো, সেটা কি কোন দরকার?' আহমদ বলল।

'কোন দরকারে নয় স্যার, আত্মীয়-স্বজনকে নিয়ে স্রেফ বেড়াতে গেছি।' বলল মারেভা।

'আচ্ছা, অ্যাটলগুলো কার মালিকানায়, এখানকার সরকারের?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'না স্যার, অ্যাটলগুলোর মালিক কেন্দ্রীয় ফরাসি সরকার। আমাদের লোকাল সরকার তাদের দেয়া আইনের অধীনে শুধু দেখা-শুনা করে।' বলল মারেভা।

'আচ্ছা, অ্যাটল কেউ কিনতে বা লীজ নিতে কিংবা খাজনার ভিত্তিতে পত্তনি নিতে পারে?' আহমদ মুসা বলল।

'জানতাম যে ফরাসি সরকার এভাবে অ্যাটল কাউকে দেয় না। শুধু অনুমতি নিয়ে জমি কিনে বা লিজের ভিত্তিতে বাড়ি করে কেউ বসবাস করতে

পারে। তবে সম্প্রতি শুনেছি দু'একটা অ্যাটল নাকি ফরাসি সরকার কিছু শর্তাধীনে বিক্রি বা লীজ দিয়েছে।' বলল মারেভা।

মারেভার কথা শেষ হয়েছে। আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল।

এ সময় একজন লোক এসে দরজায় দাঁড়াল। তারপর উপর দিকে তাকিয়ে রুম নাম্বার দেখেই বলল, 'স্যরি।'

চলে গেল লোকটা।

আহমদ মুসা ও মারেভা মাইমিতি দু'জনেই তাকিয়েছিল দরজার লোকটির দিকে।

লোকটি চলে গেলে মারেভা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে আসি স্যার।'

'না, মারেভা। দরজাটা খোলাই থাকবে।' বলল আহমদ মুসা।

বিস্মিত দৃষ্টি নিয়ে বসে পড়ল মারেভা। বলল, 'দরজা কেন খোলা থাকবে বুঝতে পারছি না স্যার। কারও কি আপনি অপেক্ষা করছেন।'

'না, কেউ আসার কথা নেই। আচ্ছা মারেভা, বিকেলে তুমি কয়টায় আসতে পারবে?'

'সেটা আপনিই ঠিক করবেন। যখন চাইবেন, তখনই আমি আসব। আপনি কয়দিন থাকছেন স্যার?'

'ঠিক আছে, তুমি পাঁচটায় এস। আমি কতদিন থাকব ঠিক নেই। তবে খুব তাড়াতাড়ি যাচ্ছি না।'

কথাটা শেষ করে মুহুর্তকাল থামল আহমদ মুসা। তারপর আবার বলল, 'তোমাদের 'ফি' সম্পর্কে আমি কিছু জানি না। ট্যুরিষ্ট গাইডে একটা কিছু দেখেছিলাম। সেটা সম্ভবত অনেক আগের।'

মারেভার সুন্দর স্বর্ণালী মুখে একগুচ্ছ রক্তিম লজ্জা ছড়িয়ে পড়ল। মারেভা এখনও পেশাদার গাইড হয়ে উঠতে পারেনি। তবুও 'ফি' এর কথা জানাতে হয়, তাই সেও জানায়। কিন্তু তার কাছে আহমদ মুসা এক বিস্ময়কর মানুষ। এমন সভ্য-ভব্য সুন্দর ট্যুরিষ্ট সে এর আগে কখনও দেখেনি। অন্য ট্যুরিষ্টদের চকচকে দৃষ্টি ও ঘনিষ্টতাকে সব সময় এড়িয়ে চলতে হয়। আর এই

অদ্ভূত লোকটিই তার চোখের দৃষ্টিকে আমার থেকে আড়াল করে রাখছে। এক দু'বার ছাড়া মারেভার চোখে সে চোখই ফেলেনি। এক দু'বার দেখার মধ্যেই লোকটির চোখে যে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা দেখেছে তা চিরদিন স্বরণ রাখার মত। এমন লোকটিকে 'ফি'র কথা বলতে তার লজ্জা লাগছে। এসব ভেবে মারেভা বলল 'ফি'র একটা আউট লাইন তো পেয়েছেনই। আমি কিছু বলতে চাই না, স্যার। আপনি আমাদের অতিথি। আমি আনন্দের সাথে আপনাকে সহযোগিতা করব।'

'ধন্যবাদ, মারেভা। তাহলে এই কয়েকটা টাকা তুমি অগ্রীম রাখ।' বলে আহমদ মারেভার হাতে একটা ইনভেলাপ তুলে দিল।

'ধন্যবাদ স্যার।' বলে মারেভা না দেখেই তা পকেটে রেখে দিল।

'তাহলে আসি স্যার।' বলে 'গুডবাই' জানিয়ে ঘুরে দাঁড়াল মারেভা যাবার জন্য।

মারেভা দরজার কাছে পৌছতেই আহমদ মুসা বলল, 'প্লিজ মারেভা, দরজা বন্ধ করে দিয়ে যাও।'

মারেভা ফিরে তাকিয়ে বলল, 'দরজা বন্ধ করে দিয়ে যাব!' মারেভার চোখে নতুন এক বিস্ময়!

'হ্যাঁ, মারেভা। এরপর একা থাকবো তো। ভয়ের ব্যাপার আছে।' বলল আহমদ মুসা। তার ঠোঁটে হাসি।

মারেভা আহমদ মুসার কথার কোন জবাব দিল না। তার চোখের দৃষ্টি গভীরতর হলো। কিন্তু সে দৃষ্টিটা আহমদ মুসার অবনমিত চোখে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল। আহমদ মুসার কথা বিশ্বাস করেনি মারেভা। কিন্তু সত্যটা কি তাও বুঝতে পারল না সে।

বাড়িত ফিরে মুখ-হাত ধুয়ে ফ্রেস হয়ে তার ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছে মারেভা।

মারেভার মা ঘরে ঢুকল। বলল, 'মাকে খুব খুশি দেখছি। কাজ পেয়েছিস বুঝি? অনেক ট্যুরিষ্ট এসেছে?'

'হ্যাঁ মা, কাজ একটা পেয়েছি। কিন্তু মা ....।'

বলে উঠে ইজি চেয়ারে সোজা হয়ে বসে বলল, ‘কিন্তু লোকটা আজব!’

‘কেমন?’ জিজ্ঞাসা মায়ের।

‘লোকটা আমার সাথে হ্যান্ডশেক করেনি। আমি হাত বাড়ালে, সে হাত সরিয়ে নিয়েছে। আবার তা ব্যাগ বহন করতে চাইলে বলেছে আমি তোমার চেয়ে বড়, শক্তিও নিশ্চয় বেশি হবে। অতএব, ভারটা আমারই বহন করা উচিত। আর দেখ, ট্যাক্সিতে উঠে সে ড্রাইভারের’

পাশে বসল এবং আমাকে পেছনের সীটে বসতে বাধ্য করল। তারপর মা, হোটেলের রুমে ঢুকের দরজা বন্ধ করতে বলল না। আমি বন্ধ করতে চাইলেও বন্ধ করতেই দেয়নি। কিন্তু আমি যখন চলে আসছিলাম, তখন বললেন ঘরের দরজাটা বন্ধ করে যেও।’ বলল মারেভা।

তার মা মনোযোগ দিয়ে কথা শুনছিল। তার চোখে-মুখে কিছু বিস্ময়, কিছু ভাবনাও।

মারেভা থামলে সে বলল, ‘লোকট কি রকম, কেমন বয়সের?’

‘একদম স্লীম যুবক মা। মনে হয় ব্যায়াম-ট্যায়াম করেন। মনে হলো বেশ কিছু দিন থাকবেন, অ্যাটল অঞ্চলে ঘুরবেন।’

‘আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেমন লোক সে, কেমন হলো তাকে? বলল মারেভার মা।’

‘খুবই ভদ্রলোক মা। স্বল্পভাষী, কারও উপর নির্ভশীল হতে চায় না। কেমন বলতে, যদি তুমি চরিত্রের কথা বুঝিয়ে থাক, তাহলে এর উত্তর দেওয়াটা মুস্কিল। চোখের দৃষ্টি থেকেই মানুষের মনের কথা বুঝা যায়। কিন্তু তাঁর চোখে চোখ ফেলা মুস্কিল। উনি চোখ নামিয়ে শান্তভাবে কথা বলেন। মাত্র বার দু’য়েক উনি সরাসরি তাকিয়েছেন আমার দিকে। বহু মানুষ, বহু ট্যুরিষ্টের চোখের দৃষ্টি আমি দেখেছি মা। সে দৃষ্টিতে আমি একটা লেহনভাব দেখেছি, যা চোখকে পীড়া দেয়, মনকেও। কিন্তু যতটুকু দেখেছি তাতে তার দৃষ্টিকে আমার কাছে গভীর শান্ত সাগরের মনে মতো হয়েছে। ঐ দৃষ্টি মানুষকে পীড়া দেয় না, প্রসন্ন করে।’ মারেভা বলল।

মারেভার মা একটু হাসল। বলল, 'বেশি প্রশংসা করে ফেলছিস মা। ঐ টুকু পরিচয়ে অত প্রশংসা চলে না। তবে একথা ঠিক, লোকটি অন্যদের থেকে ভিন্ন। নিজের লাগেজ নিজে বহন করেছে, এটাকে আমি খুব বড় মনে করছি না। মানবতার ব্যাপারে সেনসেটিভ কেউ একজন এটা করতে পারে। কিন্তু হ্যান্ডশেক করল না কেন? অহংকার থেকে কেউ এটা নাও করতে পারে। কিন্তু তোমার কথায় যা বুঝা গেল তাতে তার মধ্যে অহংকার নেই। অহংকার থাকলে লাগেজ বহন করবে কেন? সুতরাং এ বিষয়টি হোটেলের দরজা খোলা রাখার বিষয়টির মতোই দুর্বোধ্য। আমার তুমি চলে আসার সময় দরজা বন্ধ করতে বলল কেন?'

একটু থামল মারেভার মা। ভাবছিল। মূহুর্ত কয়েক পরেই সে বলল, 'তুমি যতক্ষণ ঘরে ছিলে ততক্ষণ ঘরের দরজা খোলা ছিল। তুমি চলে আসার পর তা বন্ধ হলো। মজার ব্যাপার। এর অর্থ কি?'

'সেটাই তো প্রশ্ন, মা, এর অর্থ কি?' বলল মারেভা।

মারেভার মা উঠছিল।

'না মা, একটু বস। আমার আজকের ইনকাম দেখে যাও। কিছু টাকা তিনি অগ্রীম দিয়েছেন। দেয়ার পর আমি পকেটেই রেখে দিয়েছি। আমিও দেখিনি।'

বলে মারেভা উঠে গিয়ে প্যান্টের পকেট থেকে খামটা নিয়ে এল। বসল মায়ের পাশে। খামটি খুলতেই চমকে উঠল। দেখল অনেকগুলো মার্কিন একশ ডলারের নোট। গুনে দেখল দুই হাজার ডলার। তার মানে চার হাজার তাহিতিয়ান ফ্রাংক। বলা যায়, এট ট্যুরিষ্ট সিজনের তা দুই মাসের আয়। অবাক বিস্ময় নিয়ে মারেভা টাকাগুলো মা'র হাতে দিয়ে বলল, 'মা দেখ, লোকটার আরেক পাগলামি।'

টাকাগুলো দেখে মারেভার মা বলল, 'পাগলামি নয়, গাইডদের পারিশ্রমিক সম্পর্কে হয়তো তার কোন ধারনা নেই।'

না মা, গাইডের পারিশ্রমিক সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল। আমি বলিনি, কিন্তু তাহিতিয়ানের অতীতের পারিশ্রমিক সম্পর্কে তিনি জানেন বলেছিলেন।' মারেভা বলল।

‘যাক, এর ব্যাখ্যা উনিই দিতে পারেন। এটা খুব বড় বিষয় নয়। হয়তো তিনি টাকাটা একবারেই দিতে পারেন। অথবা হতে পারে, তিনি অনেক দিন থাকবেন তাহিতিতে।’ বলল মারেভার মা।

‘হ্যাঁ মা, উনি বেশ কিছুদিন থাকবেন বলেছেন।।’ মারেভা বলল।

‘এটাই আসল ঘটনা মারেভা।’ হেসে বলল মারেভা মা।

বলে মারেভার মা টাকাগুলো মারেভার হাতে গুঁজে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। মারেভা আর একবার গা এলিয়ে দিল ইজি চেয়ারে।

# ৫

আহমদ মুসা তাহিতির স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে বসল।

তারা গাড়িতে আগের মতই বসেছে। আহমদ মুসা বসেছে ড্রাইভারের পাশে। আর মারেভা বসেছে পেছনের সীটে।

ড্রাইভার আহমদ মুসাকে গাড়িতে বসিয়ে দরজা বন্ধ করে গাড়ির সামনে দিয়ে ঘুরে তার সীটে ফিরছিল।

উৎসুক মারেভা আহমদ মুসাকে প্রশ্ন করল, 'স্যার, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি?'

'অবশ্যই।' বলল আহমদ মুসা।

'স্যার, দেখলাম পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের ডিজি'র মত ফরাসি অফিসার আপনাকে গাড়ি, পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল। স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয়েও তাই দেখলাম। আপনি কি এদের পূর্ব পরিচিত?' মারেভা বলল। তার চোখে বিস্ময়।

আহমদ মুসা যে ফ্রান্সেরও নাগরিক, সে রিয়াদ থেকে আসার সময় সেখানকার ফরাসি রাষ্ট্রদূতের চিঠি নিয়ে এসেছিল, ফরাসি রাষ্ট্রদূত যে তাকে ফরাসি রাজপরিবারের জামাই বলেও পরিচয় দিয়েছিল, এসব কথা চেপে দিয়ে আহমদ মুসা বলল, 'হ্যাঁ মারেভা, এদের সাথে আমার পরিচয় আছে।'

কথাটা শেষ করেই আহমদ মুসা আবার বলে উঠল, 'মারেভা, দক্ষিন উপকূল ও উত্তর উপকূলের কিছুটা তো আমরা কয়েক দিনে দেখলাম। আজ যখন শহরে ঢুকেছি, তখন চল জিওগ্রাফিক্যাল যাদুঘরটা দেখব। তেপাও আপনি নিশ্চয় যাদুঘরটা চেনেন?'

'জি স্যার। অনেক ইন্টারেষ্টিং স্যার। জিওগ্র্যাফিক্যাল যাদুঘরে গেল ফ্রেন্স পলেনিশিয়া দেখার কাজ অনেকটা হয়ে যায়।' মারেভা বলল।

'তুমি অনেকবার গেছ নিশ্চয়?' মারেভাকে জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

‘স্যার, আমার পাঠ্য বিষয় মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং-এর একটা পেপার আছে পলিনেশিয়ান আইল্যান্ডের ‘বেজ ও ওয়াল ফিজিক্যাল ফিচার’- এর উপর। এ জন্য এ যাদুঘরে আমাকে আসতে হয়।’ মারেভা মাইমিতি বলল।

আহমদ মুসার মুখটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ভাবল, তাহলে তো এ যাদুঘরে অ্যাটলগুলো সম্পর্কে জানার অনেক কিছুই থাকতে পারে এবং মারেভা তাকে এ ব্যাপারে অনেক সাহায্যও করতে পারবে। মনে মনে হাসল। গাইড দেখি তার সহকারী হবারও যোগ্যতা রাখে। বলল আহমদ মুস, ‘পলিনেশিয়ান দ্বীপগুলো কি তথ্য এখানে আছে মারেভা।’

‘দ্বীপ ও অ্যাটল দ্বীপের প্রত্যেকটির একটা মিনি প্রতিকৃতি এখানে আছে। এ প্রতিকৃতি শুধু দ্বীপের উপরের অংশের নয়, দ্বীপের আন্ডার ওয়াটার ‘ওয়াল’ ও ‘বেজ’- এর প্রতিকৃতি কেমন তাও দেখানো আছে। দ্বীপগুলোর পাহাড় কোরাল রীফ, উপকূল, বনাঞ্চল ও লোকবসতি সম্পর্কে তথ্য আছে। অ্যাটল দ্বীপগুলোর জীব-বৈচিত্র, ইত্যাদি সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য সেখানে পাওয়া যায়।’ বলল মারেভা।

আনন্দে আহমদ মুসার চোখ-দু’টি চক চক করে উঠল। এ যে মেখ না চাইতেই পানি। যা সে জানতে চায় এ এলাক সম্পর্কে তার সিংহভাগ সে পেয়ে যাবে এই যাদুঘরে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অশেষ শুকরিয়া আদায় করল আহমদ মুসা।

‘দ্বীপ ও অ্যাটলগুলোর মালিকানা কিংবা বড় বড় প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা স্থাপনা সম্পর্কে কেমন তথ্য আছে যাদুঘরে?’ জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

মারেভা মুখ তুলে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। ঠোঁটে এক টুকরো হাসিও ফুটে উঠল। বলল, ‘স্যার, কোথায় কোন দ্বীপ বা কোন সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির কথা জিজ্ঞাসা করছেন, কিনবেন নাকি স্যার?’

‘কেনা যায় নাকি?’ বলল আহমদ মুসা।

‘খুব কঠিন। কেনার জন্যে ফরাসি নাগরিক হতে হয় কিংবা ফরাসি সরকারের উপর প্রভাব থাকতে হয়। তবে বিদেশী নাগরিকরা দ্বীপ লীজ নিতে

পারে, কিনতেও পারে তবে বিক্রি করতে পারে না। অবশ্য বিশেষ দ্বীপ ও বিশেষ এলাকার দ্বীপ, অ্যাটল লীজ নেয়া যায় না, কেনাও যায় না।'

বলে একটু থেমেই আবার শুরু করল, 'যাদুঘরে কিছু তথ্য ভিজিবল, এমনিতেই পাওয়া, দেখা যায়। কিছু তথ্য অন রিকোয়েষ্ট পাওয়া যায়। কিছু তথ্য ক্ল্যাসিফায়েড। সেগুলো সিক্রেট সেকশনে সংরক্ষিত। ওগুলো পাওয়া যায় না। চলুন গেলেই সব দেখা যাবে।'

পাপেতির জিওগ্রাফিক্যাল যাদুঘর মধ্য পাপেতির বিশাল এলাকা জুড়ে। এ যেন এক মিনি ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া।

অ্যাটলগুলোর প্রতিকৃতি আগাগোড়া খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল আহমদ মুসা। কিছু কিছু নোটও নিল।

পাঁচ ঘন্টা পরে যাদুঘর থেকে বেরিয়ে এল আহমদ মুসা ও মারেভ।

'মারেভা, তেপাওকে ডাক। চল, আমরা একটা রেষ্টুরেন্টে বসি। তৃষ্ণাও লেগেছে, একটু বিশ্রামও হবে।

'যাদুঘরের পাশের একটা ভালো রেষ্টুরেন্ট প্যাসেফিক ইন্টারন্যাল- এ গিয়ে বসল।

বসেই আহমদ মুসা মারেভাকে বলল, 'বেলা দু'টা বাজে। খেয়ে নেয়াই দরকার। একটু ভাল খাবার অর্ডার দাও। আমি 'টয়লেট থেকে আসছি।'

বলে আহমদ মুসা চলল টয়লেটের দিকে।

আহমদ মুসা টয়লেট সেরে অজু করে বেরিয়ে এসে একটা নিরিবিলি স্পেস খুঁজে নিয়ে যোহরের নামাজ সেরে নিল।

টেবিলে ফিরে এসে দেখল, খাবার এসে গেছে। টেবিলের মাঝখানে রোলিং ডিস টেবিল। তাতে খাবার সাজানো। ঘুরছে রোলিং ডিস-টেবিলটা।

'স্যার, আপনি ভাল খাবারের অর্ডার দিতে বলেছেন। তাহিতিতে এসে পর্যটকরা সবচেয়ে যা পছন্দ করে, তাই আমি আনিয়েছি। দেখুন পয়সন ক্রু আছে, সেভ্রেটিস আছে এবং ফ্রায়েড চিকেন ও রাইচ এবং গ্রিলড্ পর্ক। খাবার শেষে আছে, 'পো', যা টুরিষ্টদের সবচেয়ে পছন্দনীয়।' বলল মারেভা।

‘থ্যাংকস’ বলে আহমদ মুসা বসল চেয়ারে। বলল হাসি মুখে, ‘যেমন ক্ষুধা তেমনি সুন্দর হয়েছে খাবার। নাও শুরু করা যাক।’

খেতে শুরু করল সবাই।

আহমদ মুসা খেল খুব আস্তে আস্তে। শুধু খেল ফ্রায়েড রাইচ, ফ্রেশ ওয়াটারের শ্রিম দিয়ে তৈরি সেভ্রেটিস, সালাদ। সব শেষে মজা করে খেল নারকেলের দুধে পেপে, ভ্যানিলা, কলাসহযোগে তৈরি মিষ্টি পুডিং।

আহমদ মুসার এভাবে অধিকাংশ খাবার এড়িয়ে যাওয়া লক্ষ্য করছিল মারেভা। এক সময় সে বলে, ‘স্যার আপনি তো কিছুই খাচ্ছেন না।’

‘না মারেভা, আমি খাচ্ছি।’ বলে না খাওয়া আইটেমগুলো রোলিং ডিশ টেবিল টেনে তার দিকে নেয়। টেনে নেয় বটে, কিন্তু ওসব ডিস থেকে কিছুই নেয় না। এটাও লক্ষ্য করেছিল মারেভা, কিন্তু সে আর কিছু বলেনি।

রেষ্টুরেন্টের বিল চুকিয়ে রেষ্টুরেন্ট থেকে বেরুল আহমদ মুসা তাদেরকে নিয়ে।

বের হবার সময় এক ফাঁকে সুযোগ পেয়ে ড্রাইভার তেপাও মারেভাকে বলল, ‘স্যারকে যতই দেখছি বিস্মিত হচ্ছি! নরমে-গরমে, কঠোর-উদারতায় এমন মানুষ আমি জীবনে দেখেনি। দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে একদম অংকের মত টুদিপয়েন্ট চায়, আচরণের ক্ষেত্রে একদম মাটির মানুষ। এই প্রথম একজন ট্যুরিষ্ট একজন ড্রাইভারকে টেবিলে নিজের পাশে বসিয়ে খাওয়ালেন।’

মারেভা ড্রাইভারের কথার জবাবে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই আহমদ মুসা ফিরে এসে বলল, ‘মারেভা, যাদুঘরের রিসেপশনে কিছু ফোল্ডার ও বুকলেট দেখলাম। মনে করেছিলাম, ফেরার পথে কিনে নিব। কিন্তু বের হলাম তো অন্যপথে। চল রিসেপশনে যাব।’

মারেভা আগেই থেমে গিয়েছিল।

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই ‘ইয়েস স্যার, চলুন!’ বলে মারেভা ড্রাইভার তেপাওকে বলল, ‘আপনি গাড়িতে যান, গাড়ি নিশ্চয় গরম হয়ে গেছে, একটু ঠান্ডা করে নিন।’

আহমদ মুসা ও মারেভা চলল যাদুঘরের রিসেপশনের দিকে।

‘স্যার, একটা কথা বলব।’ বলল মারেভা।

‘বল।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমার খারাপ লাগছে, আমি অযথাই আপনার অনেক টাকা খরচ করেছি। আপনি কি গোশত খান না স্যার?’ বলল মারেভা।

‘কিন্তু চিকেনও তো খেলেন না। এমন কি ‘পইসন ক্রু’ ও খাননি, যা মাছ দিয়ে তৈরি।’ বলল মারেভা।

হাসল আহমদ মুসা। বলল ‘পইসনে মাছের সাথে সাপও আছে। ওটা আমি খাই না।’

‘কিন্তু চিকেন?’ জিজ্ঞাসা মারেভার।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘স্রষ্টা অর্থ্যাৎ ঈশ্বরের নাম নিয়ে জবাই করা না হলে সে জিনিস আমরা খাই না।’

‘আজব কথা! এমন কথা তো কোনদিন শুনিনি।’ বলল মারেভা।

গম্ভীর হলো আহমদ মুসা। একটু ভাবল। তারপর বলল, ‘মারেভা বিষয়টা আমি তোমাকে বলতে চাইনি। আমি দেখছি, তোমার অবাক হওয়ার মতো ঘটনা আরও ঘটতে পারে। তাই আমার একটা পরিচয় তোমার জানা দরকার। মারেভা, আমি মুসলিম, ইসলাম ধর্মের অনুসারী।’

মারেভা একটু থমকে দাঁড়াল। তাকাল আহমদ মুসার দিকে। একটু উৎসুক দৃষ্টি তার চোখে। বলল, ‘হ্যাঁ, মুসলমান! টেলিভিশন, পত্রিকায় মুসলমান সর্ম্পকে অনেক কিছু শুনি। তবে কোন মুসলমান আমি দেখিনি। তাহিতিতে দু’চারজন মুসলমান আছে বলে শুনেছিলাম কার কাছে যেন। তাদের সাথে কখনও দেখা হয়নি। তবে একবার আরুতে গিয়ে আমাদের গ্রেট গ্রান্ড ফাদারদের এক কথাবার্তায় মুসলমানদের কথা শুনেছিলাম। তখন অনেক ছোট আমি। আচ্ছা, মুসলমানরা কি শুকর, সাপ ইত্যাদির মত অনেক কিছুই খায় না? স্রষ্টার নাম নিয়ে জবাই করা না করার মধ্যে কি পার্থক্য যে, এ জন্যে তা খাবারই আযোগ্য হয়ে যায়?’

‘সে অনেক কথা মারেভা, পরে একদিন বলব।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ঠিক আছে। কিন্তু স্যার, টিভিতে আমি মাথা, মুখে, শরীরে কালো কাপড় জড়ানো মেয়েদের ছবি দেখেছি, এরা নাকি মুসলিম? এটা কি সত্যি স্যার?’ বলল মারেভা।

‘তুমি যেটা দেখেছ, সেটা প্রপাগান্ডা। তবে সত্যটা বুঝতে তোমার একটু সময় লাগবে। এক কথায় বললেই বুঝবে না।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আপনি অন্যদের থেকে অনেক আলাদা। মুসলমান বলেই কি?’

‘এক ধর্ম থেকে আরেক ধর্ম, এক সংস্কৃতি থেকে আরেক সংস্কৃতির অনুসারিদের মধ্যে পার্থক্য থাকবেই।’ বলল আহমদ মুসা।

তারা রিসেপশনে পৌঁছে গিয়েছিল।

পাশের পাবলিক রিলেশনস কাউন্টার থেকে ফ্রেন্স পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ বিশেষ করে অ্যাটল দ্বীপ সম্পর্কিত সব ফোল্ডার ও বুকলেট কিনে রিসেপশন থেকে বেরিয়ে এল আহমদ মুসারা।

গাড়িটা চলে এসেছিল জাদুঘরের গাড়ি বারান্দায়। রিসেপশন থেকে বেরিয়েই গাড়ি পেয়ে গেল তারা।

গাড়িতে উঠে পেয়ে গেল তারা।

গাড়িতে উঠে বসল আহমদ মুসা ও মারেভা।

আহমদ মুসা হাতঘড়ির দিকে তাকাল। বেলা তিনটা বাজে।

‘মি. তেপাও, আমি হোটেল ফিরব। তার আগে মারেভাকে তুমি বাড়িতে নামিয়ে দাও। তারপর আমাকে হোটেলে নেবে।’ বলল আহমদ ড্রাইভারকে।

‘স্যার, গাড়ি সরাসরি হোটেলে নিন। আমি সেখান থেকে বাসায় ফিরব।’ মারেভা বলল।

‘মারেভা, এটা বাড়তি কোন সুবিধা নয়। হোটেলের পথেই তোমার বাসা। শুধু ভিন্ন একটা পথে যেতে হবে মাত্র।’ কিছুটা শক্ত কন্ঠে বলল আহমদ মুসা।

‘স্যরি স্যার।’ বলল মারেভা।

‘ম্যাডাম মারেভা, আপনার যাদুঘরে ঢোকার পরপরই একজন, সম্ভবত আপনার কোন বান্ধবী, আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল আপনি হোটেলে ফিরবেন, না

বাসায় ফিরবেন। আমি বলতে পারিনি। একটু অপেক্ষা করে তিনি চলে গেছেন।' ড্রাইভার তেপাও বলল মারেভাকে উদ্দেশ্য করে।

'আমার বান্ধবী! তার সাথে ট্যুরিষ্ট ছিল মানে কোন ট্যুরিষ্ট নিয়ে এসেছিলেন তিনি?' জিজ্ঞাসা মারেভা।'

'উনি একটা মাইক্রো থেকে নেমেছিলেন। ভেতরে কে ছিলেন আমি দেখিনি। তারা কেউ নামেনি।' বলল ড্রাইভার।

মনে মনে কিছুটা বিস্মিত হলো মারেভা। আমার কোন বান্ধবী এখানে মাইক্রো নিয়ে তো আসার কথা নয়। ট্যুরিষ্ট নিয়ে এলে তো ট্যুরিষ্টরাই আগে নামতো। ট্যুরিষ্টদের ভেতরে রেখে তার আমার জন্যে অপেক্ষার তো কোন প্রশ্নই উঠে না! হিসাব মেলাতে পারলো না। বলল, 'চিনলাম না। যাক, কেউ একজন হবে হয়তো।'

সবাই চুপচাপ।

গাড়ি চলছে।

কর্মহীন ভাবে একটু বসার সুযোগ পেতেই আহামদ মুসা মাথা এসে দখল করল যাদুঘরে দেখা অ্যাটলগুলো।

বিশেষ করে অ্যাটলগুলোই আহামদ মুসা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে চেষ্ঠা করেছে।

সব দেখে হতাশ হয়েছে আহমদ মুসা। কোন অ্যাটলই বড় ধরনের কোন ঘাঁটি ধারণ করার উপযুক্ত নয়।

গোটা পলিনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জে তাহিতির পুবে তোয়ামতোই আসলে অ্যাটল দ্বীপপুঞ্জ। উল্লেখযোগ্য সব অ্যাটল এখানেই রয়েছে। প্রায় ৭৬ টি অ্যাটল এখানে রয়েছে। অন্যগুলো নিরেট অ্যাটল দ্বীপ। এই অ্যাটলগুলোর মধ্যে ডজন দেড়েক অ্যাটল রয়েছে যার ভূমির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য। এগুলোতে কম-বেশি জনবসতি রয়েছে। কিন্তু এগুলোর ভূমি-অবস্থান অ্যাটলের মধ্যেকার লেগুন (পানি)-এর চারদিকে ঘিরে, যা এমন কোন বড় বা প্রশস্ত নয় যেখানে লোকচক্ষুর আড়ালে কোন বড় ধরনের ঘাঁটি বা স্থাপনা নির্মাণ করা যায়। তাছাড়া অন্য অ্যাটলগুলো ঘর-বাড়ি করে বসবাসের মত নয়। তাহলে ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেট

বিশাল ঘাঁটি গড়ার মত অ্যাটল এখানে কোথায় পাবে, যাকে বা যে অ্যাটলকে ক্ষমতার কেন্দ্র বলে অভিহিত করতে পারে?

অ্যাটলগুলোর যে চেহারা দেখেছে তাতে সে ধরনের কোন অ্যাটল তার চোখে পড়েনি।

এসব চিন্তা আহমদ মনের উদ্বেগ বাড়িয়ে দিল। তাহলে কার্যকরণ মতে সামনের রেখে আসা তাহিতির আশে-পাশের অ্যাটলেই ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের ঘাঁটি আছে বলে সে মনে করেছে, সেটা কি মিথ্যা হবে? আহমদ মুসার মন বলছে সে ঠিক পথেই চলছে। যে অনিশ্চয়তা দেখছে সে মাঠের বাস্তবাতায়, তার চিহ্ন কিন্তু তার মনে নেই।

হঠাৎ গাড়ি হার্ড ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল।

চমকে উঠে আহমদ মুসা তাকাল চারদিকে। দেখল, বাম দিকে একটা পার্ক ও ডানদিকে বাগান-শোভিত একটা সংরক্ষিত টিলা।

'দাঁড়ালেন কেন মি. তেপাও? এটা কোন জায়গা?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'স্যার, আমি অ্যাভেনিউ হিন্দি থেকে অ্যাভেনিউ পোমা যাওয়ার জন্যে এই ডাইভারসন রোডে ঢুকেছি। সামনে পথের উপর হঠাৎ একটা মাইক্রো এসে দাঁড়িয়েছে স্যার।' বলল তেপাও।

গাড়িটা আহমদ মুসার চোখে পড়েছিল আগেই। ভেবেছিল, এক বোকা ড্রাইভার গাড়িটা ঘুরিয়ে নিচ্ছে। না, তা নয়। রাস্তা ব্লক করে গাড়িটা স্থির দাঁড়িয়ে আছে। মাইক্রোর জানালায় কাঁচ শেড দেয়া। ভেতরের কিছুই কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

মাইক্রোটা আহমদ মুসাদের গাগড়ি থেকে সাত আট গজ দুরে।

'মি. তেপাও মাইকোর সামনের দিক দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা কর। দেখা যাক, ওদের মতলব কিছু আছে কিনা।' আহমদ মুসা বলল ড্রাইভারকে।

'কি ঘটেছে? মাইক্রোটা আমাদের পথ আগলেছে কেন?' বলল মারেভা। তার কন্ঠে উদ্বেগ।

‘বুঝা যাচ্ছে না, দেখা যাক।’ বলল আহমদ মুসা।

ড্রাইভার তেপাও দ্রুত গাড়ির মাথা ঘুরিয়ে নিতে চলতে শুরু করল মাইক্রোকে পাশ কাটাবার জন্যে।

আহমদ মুসাদের গাড়ি মাইক্রোটির বরাবর আসতেই মাইক্রোর দু’দিক থেকে জনাছয়েক লোক নেমে ছুটে এল আহমদ মুসাদের গাড়ির দিকে।

লোকগুলোকে দেখেই আহমদ মুসা বুঝল, গুন্ডা-বদমাস শ্রেণীর লোক হবে এরা। সবাই শ্বেতাংগ। আহমদ মুসার চোখ মাইক্রোর ফ্রন্ট সীটের দিকেও গিয়েছিল। দেখল, ড্রাইভিং সীটের পাশে একজন শ্বেতাংগ যুবতী বসে আছে। তার স্থির চোখ মনে হোল মারেভার দিকে।

ওরা ছয়জন এসে আহমদ মুসাদের গাড়ি ঘিরে ফেলল।

দু’জন গিয়ে মারেভার পাশের দরজায় লাথি দিয়ে বলল, ‘খোল দরজা। না হলে দরজা ভেঙে ফেলব।’

উদ্বেগ-আতংকে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল মারেভার মুখ। কাঁপছিল সে। তাকাল সে আহমদ মুসার দিকে।

‘দরজা খুলে দাও মারেভা।’ শান্ত কন্ঠে বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসাও বেরিয়ে এল গাড়ি থেকে।

মারেভা চিৎকার করে বলল, ‘তোমরা কে? কি তাও তোমরা? আমি কি করেছি? ছাড় আমাকে।’

‘চল, তোকে প্রেম করতে করা শেখাব। তামাহি মাহিনের চেয়ে আমরা অনেক ভাল প্রেম করতে জানি।’ বলল ওদের একজন।

এদের কথা শুনে এবং মাইক্রোর সামনের সীটে বসা সান্ডা সুসানকে দেখে মূহুর্তেই সব বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেল মারেভার কাছে। তাহলে সান্ডা যে থ্রেট দিয়েছেল, সেটারই বাস্তবায়ন করতে এসেছে সে। এরা কি তাহলে তাকে কিডন্যাপ করতে এসেছে!

ইতিমধ্যে দু’জন মারেভাকে টেনে বের আনল গাড়ি থেকে এবং কয়েকজন তাকে শূন্যে তুলে ধরে মাইক্রোর দিকে যাবার উদ্যোগ নিল।

‘ছেড়ে দাও, বাঁচাও!’ বলে চিৎকার করছে মারেভা।

আহমদ মুসা আস্তে আস্তে এসে তাদের সামনে দাঁড়াল। বলল, ‘ছোকরার দল, ছেড়ে দাও ওকে।’ শান্ত কিন্তু শক্ত কন্ঠস্বর আহমদ মুসার।

ওরা সবাই ফিরে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। এমন শান্ত, শক্ত কন্ঠস্বরের সাথে তারা বোধ হয় পরিচিত নয়।

ফিরে তাকিয়ে আহমদ মুসাকে একটু দেখে নিয়ে ওদের একজন বলল, ‘সরে যা নেটিভ ডগ, ছাতু করে দেব তা না হ...।’

কথা তাকে শেষ করতে দিল না আহমদ মুসা। এক ধাপ এগিয়ে এসে লোকটির বাম চোঁয়ালে ডান হাতের একটা ব্লু চালাল।

কথা শেষ না করেই লোকটি সটান পড়ে গেল মাটিতে। পড়ে গিয়ে একটুও নড়ল না। জ্ঞান হারিয়েছে সে।

তিনজন দাঁড়িয়ে ছিল মারেভাকে শূন্যে তুলে নিয়ে। আর দু’জন দাঁড়িয়েছিল তাদের সামনে। এরা দু’জন সংজ্ঞা হারানো সাথীর দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ফেরাল আহমদ মুসার দিকে। চোখ জ্বলছে ওদের বাঘের মত। বাঘের মতই ওরা এক সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ল আহমদ মুসার উপর।

আহমদ মুসা বিদ্যুৎ গতিতে পিছিয়ে এল আর সাথে সাথে ওদের দু’জনের মাথা এসে আছড়ে পড়ল আহমদ মুসার পায়ের কাছে। পড়েই ওরা উঠে দাঁড়াচ্ছিল।

আহমদ মুসা ডান পাশের লোকটির ডান কানের নিচে ডান পায়ের একটা লাথি ছুড়ে মারল। জুতার পয়েন্টেড মাথাটা সুতীব্র একটা ঘা মারল লোকটার কানের নিচের নরম জায়গায়। সংগে সংগেই লোকটার দেহ মাটির উপর খসে পড়ল। মাথায় এই ঘা খাওয়ার পর তার সংজ্ঞা থাকার কথা নয়।

বাম পাশের লোকটি তার দু’পায়ের উপর দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কোমরটা তখনও সোজা করতে পারেনি। তার দেহের উপরের অংশ কোমরের উপর তখনও সমকৌণিক অবস্থানে।

আহমদ মুসা বাম হাতে লোকটার মাথার চুল খামচে ধরে ডান হাতের মোক্ষম কারাত চালাল তার ঘাড়ে। ঘাড়ের নাজুক জায়গাটায় হাতুড়ির মত আঘাতে যে কোন মানুষকে কয়েক ঘন্টা ঘুমিয়ে রাখার জন্যে যতেষ্ট।

এ লোকটির দেহটাও মাটিতে আছড়ে পড়ল।

আহমদ মুসা ডান হাতের কারাতের কাজ শেষ করেই তাকিয়েছিল মারেভা চ্যাংদোলা দেহ নিয়ে দাঁড়ানো তিন জনের দিকে। দেখল ওরা মারেভাকে ছেড়ে দিয়েছে। একজন তার পকেট থেকে রিভলবার বের করেছে।

চোখের পলকে আহমদ মুসার দুই হাত শূন্যে উঠেই ছুটল মাটির দিকে। আর পা দু'টি শূন্যে উঠে তীব্র গতিতে বৃত্তাকারে ঘুরে গিয়ে আঘাত করল রিভলবারধারীর হাত ও বুকে।

রিভলবারধারীর হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল রিভলবার এবং সেও পড়ে গেল চিৎ হয়ে।

আহমদ মুসার পা যখন লোকটিকে আঘাত করে মাটি স্পর্শ করল, তখন চক্রাকারে ঘুরে সোজা হয়েছে এবং দক্ষ এ্যাক্রব্যাটের মত আহমদ মুসা পায়ের উপর দাঁড়িয়ে গেছে।

রিভলবার কুড়িয়ে নিয়েই আহমদ মুসা পেছনে ওদের তিনজনের দিকে রিভলবার তাক করে ওদেরকে বলল, 'কোন চালাকি না করে তোমরা ওপুর হয়ে শুয়ে......।'

আহমদ মুসা কথা শেষ করার আগেই তিন জনের দু'জন আহমদ মুসার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আহমদ মুসার রিভলবার তাক করা ছিল। কিন্তু গুলি না করে ধাক্কা মেরে মারেভাকে এক দিকে সরিয়ে দিয়ে সেও দ্রুত এক পাশে সরে গেল।

আহমদ মুসার উপর চড়াও হতে ব্যর্থ হয়ে দু'জন গর্জে উঠে আবার ঘুরে দাঁড়াল। তাদের সাথের তৃতীয় জনও এবার উঠে দাঁড়িয়ে তাদের সাথে যোগ দিল।

আহমদ মুসা বুঝল ওরা বেপরোয়া। ওদের চোখে মুখে ভয়ের চিহ্ন নেই। তবু আহমদ মুসা গর্জে উঠল, 'দেখ, তোমরা আত্মসসর্পণ কর, না হয় পালিয়ে যাও। অন্যথা করলে তিনজনই ....!'

এবারও আহমদ মুসাকে কথা শেষ করতে দিল না।

আহমদ মুসার রিভলবার পর পর তিনবার গুলিবর্ষণ করল। তিন জনই ওরা পায়ে গুলি খেল।

অদ্ভুদ ব্যাপার, তিনজনই ওরা গুলি খেয়ে বসে পড়ল বটে, কিন্তু দেখা গেল তিনজনই ওরা আহত হওয়ার দিকে ভ্রক্ষেপ না করে পকেট থেকে বের করে আনল ডিম্বাকৃতির হাত বোমা।

চোখে-মুখে ওদের চরম বেপরোয়া ভাব।

তিনজনের হাতই এক সাথে উপরে উঠল হাত বোমা ছোঁড়ার জন্যে। নিরুপায় আহমদ মুসা। গুলি করা ছাড়া আত্মরক্ষার আর কোন উপায় নেই। কিন্তু রিভলবারে গুলি আর কয়টা আছে কে জানে!

ওদের হাত উপরে ওঠার সংগে সংগেই আহমদ মুসার রিভলবার পরপর তিনবার গুলিবর্ষণ করল।

তিন জনেই কব্জি গুলিবিদ্ধ হলো। তাদের হাত থেকে খসে পড়ল বোমা। স্বস্তির নি:শ্বাস নিয়ে আহমদ মুসা তাকাল মাইক্রোর দিকে।

মাইক্রোর সেই মহিলাকে। আরও কয়েকজন পুলিশ এগিয়ে আসছে এদিকে। তাদের সাথে ভয়ে-উদ্বেগে বিপর্যস্ত একজন তরুণ।

তরুণকে দেখেই মারেভা চিৎকার করে উঠেছে, ‘মাহিন!’ মারেভা কন্ঠ কান্নাজড়িত।

তরুণটি কাছাকাঠি আসতেই মারেভা ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল তাকে। বলল, ‘ঈশ্বর বাঁচিয়েছেন, স্যার যেন ঈশ্বরের হাত। কিভাবে কি ঘটে গেল।’ কেঁদে উঠল মারেভা।

পুলিশরা ছয়জনকে যখন হাতকড়া পরাছিল, তখন পুলিশের কর্তা ব্যাক্তিটি আহমদ মুসার সামনে এসে বলল, ‘ধন্যবাদ আপনাকে। একাই ছয়জনকে সামলেছেন। আমার কাছেও অবিশ্বাস্য লাগছে। সবচেয়ে অবাক হয়েছি, আপনি হত্যা এড়িয়েছেন জীবনের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। কিন্তু আপনাকে এখানে নতুন মনে হচ্ছে। আগে আপনাকে দেখিনি।’

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই কথা বলে উঠল মারেভা। পুলিশকে আহমদ মুসার দিকে আসতে দেখেই মারেভা তামাহি

মাহিনকে নিয়ে আহমদ মুসার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বলল, ‘স্যার, ইনি একজন টুরিষ্ট।’ আমি তার গাইডের কাজ করছি। ক’দিন আগে তিনি এসেছেন।’

‘ওয়েলকাম আপনাকে। কিন্তু ট্যুরিষ্টরা সাধারনত ভীতু হয়। তারা স্থানীয় কোন ব্যাপারে নিজেদের জড়ায় না। আপনি কিন্তু ব্যাতিক্রম।’ বলল পুলিশ অফিসারটি।

‘মানুষের সামনে বিশেষ কিছু বিষয় যখন আসে, তখন তার কাছে নিজদেশ আর পরদেশ বলে কিছু থাকে না। সবাই এটা করে। আমিও তাই করেছি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘সবাই করে না। ব্যতিক্রম হিসেবে কেউ কেউ করেন, যেমন আপনি।’ বলল পুলিশ অফিসার।

‘কিন্তু সবাইকেই করা উচিত। না করাটাই ব্যতিক্রম।’ আহমদ মুসা বলল।

হাসল পুলিশ অফিসারটি। বলল, ‘নীতিগত ভাবে আপনার কথাই ঠিক।’

কথাটা শেষ করেই পুলিশ অফিসার তাকাল তার পুলিশদের দিকে। বলল, ‘তোমাদের কাজ শেষ? রেডি তোমরা।’

‘ইয়েস স্যার!’ একজন পুলিশ একটু এগিয়ে এসে স্যালুট করে বলল।

পুলিশ তাদের সাথের তরুনটির দিকে চেয়ে বলল, ‘মাহিন তুমি ও মারেভা তোমাদের দু’জনকেই পুলিশ ষ্টেশনে যেতে হবে। মারেভার ষ্টেটমেন্ট নিতে হবে।’

বলেই পুলিশ অফিসার তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘আপনি কোথায় উঠেছেন মারেভা জানে। আমরা ওর কাছ থেকে জেনে নিয়ে আপনার কাছে আমারদের একটু যেতে হবে। আপনার লিখিত সাক্ষ আমাদের দরকার হবে।’

‘ওয়েলকাম! আবার দেখা হবে।’ বলল আহমদ মুসা। পুলিশ অফিসার ‘ধন্যবাদ’ বলে আহমদ মুসার সাথে হ্যান্ডশেক করে গাড়ির দিকে চলতে শুরু করল।

পুলিশ অফিসারকে লক্ষ করে মারেভা বলল, ‘আমরা আসছি।’ বলে মারেভা দাঁড়াল আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘স্যার, মাহিনের সাথে আপনার পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়নি। ও তামাহি মাহিন! আমার মত সেও ছাত্র।’ হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আরও পরিচয় হলো, তোমরা একে অপরের খুব কাছাকাছি। আমি আশা করি, একে অপরের জীবন সাথী হবে তোমরা। আরও খবর হলো, তোমার বিপদ সে আঁচ করতে পেরে পুলিশ নিয়ে এসেছিল তোমাকে বাঁচাতে। ধন্যবাদ তামাহি মাহিন!’ মুখস্তের মতই কথাগুলো এক নি:শ্বাসে বলল আহমদ মুসা।

মারেভা ও তামাহি মাহিন দু’জনেরই মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে। বলল, ‘স্যার, এত সব বিষয় কখন আপনি জানলেন, কি করে জানলেন?’

‘সে সব কথা পরে হবে। তোমরা এখন যাও। পুলিশের ঝামেলাটা আগে শেষ করে এস।’ আহমদ মুসা বলল।

‘স্যার, আপনার কাছে আমরা চির কৃতজ্ঞ। কোন ধন্যবাদ বা কোন কিছু দিয়েই আপনার ঋন শোধ হবে না।’ তামাহি মাহিন বলল।

আহমদ মুসা হেসে বলল, ‘মনে হচ্ছে চির বিদায় নিয়ে যাচ্ছ। তোমাকে তো বিদায় দেইনি আমি। তুমি মারেভা সাথে করে আসবে আমার হোটেল।’

‘অবশ্যই স্যার। কয়েকটা কথা বলেই মনে হচ্ছে আপনাকে বহুদিন ধরে চিনি। তাহলে এখন চলি স্যার।’ বলল তামাহি মাহিন।

মারেভা মুখোমুখি হলো আহমদ মুসার। তার মুখ-চোখ ভারি। বলল, ‘আপনাকে ধন্যবাদ দিলে আপনাকে ছোট করা হবে স্যার। আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন। আপনি না থাকলে পুলিশ আসার আগেই ওরা আমাকে গায়েব করতো। ওরা সাংঘাতিক। ভবিষ্যতে আরও কি আছে জানি না স্যার।’ কান্নায় আটকে গেল মারেভার শেষ কথাগুলো।

‘কোন ভয় নেই যাও। পরি শুনব তোমাদের কথা।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আপনার ওখানে কখন আসব স্যার।’ বলল মারেভা।

‘সব ঝামেলা শেষ করে যখন তুমি সময় পাবে, তখন মাহিনকে সাথে নিয়ে আসবে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ধন্যবাদ স্যার। ওকেও নিয়ে আসব। চলি স্যার। গুড বাই।’

বলে মারেভা ঘুরে দাঁড়িয়ে হাটতে শুরু করল।

হাঁটতে গিয়েও তামাহি মাহিন দাঁড়িয়ে গিয়ে মারেভার জন্যে অপেক্ষা করছিল।

দু’জনে এক সাথে হাঁটতে শুরু করল।

আহমদ মুসা এগোলো তার ট্যাক্সির দিকে।

ট্যাক্সি ড্রাইভার তেপাও ভয়ে আড়ষ্ট স্থানুর মত বসেছিল তার সীটে। ভয় ও আতংক এখনও তার চোখ মুখ থেকে যায়নি।

আহমদ মুসা গাড়ির কাছে এসে পৌঁছতেই ড্রাইভার তেপাও আহমদ মুসার প্রতি স্থির দৃষ্টি নিয়ে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল এবং আহমদ মুসার সামনে দাঁড়িয়ে লম্বা একটা বাউ করল। বলল, ‘আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন। আমার চোখ ধন্য হয়েছে জীবন্ত এই দৃশ্য দেখে।’

আহমদ মুসা কিছু না বলে গাড়িতে উঠে বসল। বলল, ‘মি. তেপাও। বুঝলাম না, এটা নিছক নারী-অপহরণের কেস, না এর পিছনে অন্য কিছু আছে? তোমাদের এখানে কি প্রায়ই এমন ঘটনা ঘটে?’

‘স্যার, নারী কেন্দ্রিক ঝগড়া-ঝাটি আছে। কিন্তু এ রকম যুদ্ধ মানে সংঘবদ্ধ অপহরণের ঘটনা কখনও ঘটেছে বলে জানি না।’ বলল ড্রাইভার তেপাও।

আহমদ মুসা কিছু বলল না।

গাড়ির সীটে গা এলিয়ে চোখ বন্ধ করল আহমদ মুসা। বলল, ‘হোটেলে চল মি. তেপাও।’

গাড়ি ষ্টার্ট নিয়ে চলতে শুরু করল।

শুকনা মুখে সান্দ্রা সুসান গ্রান্ট টাইরেলির কক্ষে প্রবেশ করল। দুশ্চিন্তায় তার মুখ আচ্ছন্ন।

সান্ডা সুসান যে সাপ্লাই কোম্পানির পাপেতি কেন্দ্রের ষ্টেশন ম্যানেজার, সেই কোম্পানীর বড় কর্তা গ্রান্ট টাইরেলি। গ্রান্ট টাইরেলির তলব পেয়ে তার সাথে দেখা করতে এসেছে সান্ডা সুসান।

গ্রান্ট টাইরেলিই তার পরিচিত মহলের সাহায্য নিয়ে উপরে দেন-দরবার করে থানা থেকে সান্ডা সুসান, গুলিবিদ্ধ তিনজন ও অন্য তিনজনকে ছাড়িয়ে এনেছে এবং এ নিয়ে আর তদন্ত –অনুসন্ধান না হয় সে ব্যাবস্থাও করেছে। লিখিত অংগীকার করতে হয়েছে যে তামাহি মাহিন ও মারেভাকে তারা আর কোনওভাবে বিরক্ত করবে না।

সান্ডা সুসান আশংকা করছে এই বিষয়েই তার কঠোর বস গ্রান্ট টাইরেলি তাকে কিছু বলবে। সান্ড্রা সুসান জানে কোন ভুলের মাফ নেই কোম্পানির উপরের বস টাইরেলির কাছে।

সান্ড্রা সুসান প্রবেশ করতেই বিশাল টেবিলের ওপাশে বসা দীর্ঘদেহি ও ঋজু শরীরের গ্রান্ট টাইরেলি টেবিলের উপর থেকে চোখ না তুলেই বলল, ‘ওখানেই দাঁড়াও সান্ড্রা।’

গ্রান্ট টাইরেলির সামনে একটা ফাইল খোলা ছিল।

‘ইয়েস স্যার’ বলে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে গেল সান্ড্রা সুসান। টেবিলের সামনে বসার কোন চেয়ার নেই।

মিনিট দু’য়েক পরেই মুখ তুলল গ্রান্ট টাইরেলি ফাইল থেকে। অভিব্যাক্তিহীন পাথরের মত শক্ত মুখ। ঠান্ডা চোখ। সেই শক্ত মুখ থেকে বেরিয়ে এল কথা, ‘সান্ড্রা, তুমি কয়টি অপরাধ করেছ?’

কেঁপে উঠল সান্ড্রা। বলল, ‘দু’টি অপরাধ করেছি স্যার। এক, বাইরের একজনের সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেছি এবং দুই. আমার কারনেই বিষয়টি থানা পর্যন্ত গড়িয়েছে।’

‘তোমার সবচেয়ে বড় অপরাধ হলো তুমি আমাদের স্থানীয় নীতি লংঘন করেছো। আমরা চাই না মানুষের দৃষ্টি কোনওভাবে আমাদের প্রতি আকৃষ্ট হোক, আমাদের পেছনে লাগুক, আমাদের সন্ধান করুক। তুমি এই কাজই করেছ, যা ক্ষমাহীন অপরাধ। তুমি এই অপরাধ স্বীকার কর?’ বলল গ্রান্ট টাইরেলি।

‘হ্যাঁ স্যার। আমি এই অপরাধ করেছি।’ বলল সান্ড্রা সুসান।

‘ধন্যবাদ!’ বলে গ্রান্ট টাইরেলি অত্যান্ত ধীরস্থিরভাবে ড্রয়ার থেকে রিভলবার বের করে গুলি কলল সান্ড্রা সুসানের বাম বুকে।

মাপ-জোক করা গুলি। এক গুলিতেই সান্ড্রা সুসানের দেহটা ঝরে পড়ল মেঝেতে। গুলি খাবার আগে সান্ড্রার দু’চোখ একবার বিস্ফোরিত হয়েছিল। কিন্তু মুখ দিয়ে চিৎকার বের হতে পারেনি।

গুলির শব্দ হওয়ার পর পরই দু’জন ঘরে প্রবেশ করল একটা ট্রলি ঠেলে। সান্ড্রা সুসানের লাশ তারা ট্রলিতে তুলে নিয়ে চলে গেল।

লাশ চলে গেল গেলে গ্রান্ট টাইরেলি চেয়ার থেকে উঠে ঘরের পাশের দরজা দিয়ে আরেকটা ঘরে প্রবেশ করল। সেখানে একটা টেবিলের সামনে চারজন লোক বসেছিল।

গ্রান্ট টাইরেলি টেবিল ঘুরে ওপাশে গিয়ে হোষ্টেল বড় চেয়ারটায় বসল। টেবিলের পাশের যে চারজন লোক উঠে দাঁড়িয়েছিল, তারাও বসল।

‘সান্ড্রা সুসান আমাদের একজন পুরানো ও পরীক্ষিত কর্মী ছিল। তার পতন আমাদের জন্য একটা শিক্ষা। লর্ড অ্যালেক্সী গ্যারিন ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়েছেন। ম্যাডাম গ্যারিনের একটা মেসেজ পেয়েছি আজ।’ চেয়ারে বসেই বলে উঠল গ্রান্ট টাইরেলি।

‘কি মেসেজ স্যার?’ চরজনের একজন বলল।

‘পাপেতির সাপ্লাই অফিস আজ থেকে বন্ধ হয়ে যাবে। ফা’তে যে বিকল্প অফিস নেয়া আছে, ওটা আজ থেকে চালু করতে হবে। তামাহি মাহিন ও মারেভার ব্যাপারে নির্দেশ এসেছে। আপাতত ওদের কিছু করা যাবে না। মারেভার উপর আক্রমণ ও থানা-পুলিশের ঘটনা যখন মানুষ কয়েক মাস পরে ভূলে যাবে, তখন সান্ড্রা যে শাস্তি পেয়েছে, ওরাও সেটাই পাবে। সান্ড্রার মৃত্যুর নিমিত্ত ওরা। তাই ওরাও একই শাস্তি পাবে।’ বলল গ্রান্ট টাইরেলি।

‘আমাদের অখন্ড গোপনীয়তার গায়ে কোন আঁচড় কখনও পড়েনি। সান্ড্রার ঘটনা আমাদের কতখানি ক্ষতিগ্রস্থ করেছে, তা কি আমরা জানতে পেরেছি?’ চারজনের মধ্য থেকে একজন বলল।

'আমি যতটা ক্ষতিয়ে দেখেছি, তাতে সান্দ্রার বাইরে আমাদের কারো পরিচয় অন্য কোথাও বা কারো কাছে উন্মুক্ত হয়নি। সেই মাত্র যোগসূত্র হয়ে উঠছিল বা হতে পারতো। সে না থাকায় যোগসূত্র এখন উধাও। সুতরাং চিন্তার কিছু নেই।' বলল গ্রান্ট টাইরেলি।

কথা শেষ করেই গ্রান্ট টাইরেলি তাকাল চারজনের একজনের দিকে। বলল, 'নাশকা, আমাদের 'ফা' সাপ্লাই কেন্দ্রের দায়িত্ব তোমাকে দেয়া হয়েছে। তুমি আজই চলে যাও 'ফা' সাপ্লাই অফিসে। সাপ্লাই রুটিন-এ কোন অনিয়ম হওয়া চলবে না।'

'ধন্যবাদ স্যার। আমি আজই 'ফা'তে যাচ্ছি। অবশ্যই কোন অসুবিধা হবে না, সব ঠিক ঠাক চলবে।' বলল লোকটি, যাকে উদ্দেশ্য করে কথা বলেছিল গ্রান্ট টাইরেলি।

'কথা এখানেই শেষ!' বলে উঠে দাঁড়াল গ্রান্ট টাইরেলি।

তার সাথে উঠে দাঁড়াল সবাই।

আহমদ মুসার হোটেল রুম।

মারেভাদের বসিয়ে আহমদ মুসা এইমাত্র ঢুকল তার বেডরুমে এটাচড বাথে। হোটেলের জিমনেসিয়াম থেকে সবেমাত্র ফিরেছে সে।

মারেভার মারেভা মা পাশের আরেকটা সোফায় বসেছে। পাশাপাশি সোফায় বসেছে মারেভা ও তামাহি মাহিন। তারা সময়ের আগেই পৌঁটে গেছে আহমদ মুসার রুমে। পথে আরুতে একটা কাজ ছিল বলে একটু আগেই বেরিয়েছিল। কিন্তু সে কাজের সুযোগ হয়নি বলে সময় বেঁচে গেছে।

'আরু' নামের ধব্বংস প্রাপ্ত নগরী তামাহি মাহিন ও মারেভার পরিবারের অতীত বাসস্থান। মাহিন ও মারেভার বাবারা তাহিতির পমারী রাজবংশের সন্তান। পমারী রাজবংশের রাজধানী 'আরু' এখন একটা ধব্বংসাবশেষ। তবে পমারীদের একটা প্রার্থনা গৃহ এখনও টিকে আছে। তাছাড়া প্রার্থনা গৃহের শতায়ু

বয়সের পুরোহিত মারেভাদের আত্মীয়। তার সাথেই তাদের কাজ ছিল। আহমদ মুসা চলে যেতেই সে পথের দিকে চোখ ফেরাল মারেভার মা। মূলত পুরোহিতের সাথে দেখা করার জন্যই মারেভার মা এসেছে মারেভাদের সাথে। এটা জেনে আহমদ মুসাই তাকে হোটেলে আনতে বলেছিল। আহমদ মুসার গমন পথের দিকে চোখ নিবদ্ধ রেখেই তামাহি মাহিন বলল, 'স্যারকে যতই দেখছি, বিস্ময় ও কৌতূহল আমার ততই বাড়ছে। সেদিন ছয়জন হাইজ্যাকারের সাথে লড়াই করা দেখে মনে হয়েছে। সবজান্তা একজন লড়াকু তিনি। আবার সব মানুষের সাথে তার ব্যাবহার ও ভালোবাসা দেখলে মনে হয় তিন একজন মানবতাবাদী।'

'উনি একজন অসম্ভব ভাল মানুষ! এটাই আমার মতে তার সবচেয়ে বড় পরিচয়। আমি একা ঘরে থাকলে কেন তিনি ঘর খোলা রাখেন সেটা জেনেছি মা। ওদের ধর্মের এটাই বিধান। এ কয় দিনে ওদের ধর্মের অনেক কিছু জেনেছি। যা দেখছি, তাতে ওদের ধর্ম 'মানবতার ধর্ম' মা। মানে প্র্যাকটিক্যাল বাস্তব জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ঠ।'

'মুসলমানদের সাথে ওঠা-বসা করিনি। ওদের সম্পর্কে জানিও না। কিন্তু আমার দাদা শ্বশুরের কাছে শুনেছিলাম, তাঁর দাদা নাকি বলতেন আমাদের 'পমারী' বংশের সাথে মুসলমানদের গভীর যোগসূত্র ছিল। কি একটা বড় ঘটনা, বৃটিশদের আগমন, সবচেয়ে ফরাসিদের প্রতিপক্ষ-নিমূল অভিযানে সবকিছু শেষ হয়ে গেছে।' বলল মারেভার মা।

'কি শেষ হয়ে গেছে খালাম্মা?' বলতে বলতে বেড রুম থেকে বের হয়ে এল আহমদ মুসা।

খুব ফ্রেস দেখাচ্ছে আহমদ মুসাকে।

ফরমাল পোষাক পরেছে আহমদ মুসা। বাইরে বেরুবার ইচ্ছা তার নিশ্চয় আছে।

সবাই উঠে আহমদ মুসাকে স্বাগত জানাল।

আহমদ মুসা মারেভার মা'কে বসিয়ে তারপর নিজে বসল।

মারেভার মা বসতে বলল, 'বাচ্চারাও ছাড়ল না। আমিও ভাবলাম এদিক হয়েই যাই। আপনি কিন্তু একদিন যাব বলেছিলেন! ক'দিন হয়ে গেল আর তো গেলেন না।'

'যাব একদিন। তবে খুব শীঘ্র তো যাওয়া হচ্চে না।' সব কিছু হয়ে গেলে। কিছু কি ঘটেছে?'

'না, এখনকার কোন বিষয় নয়। মুসলমানদের সাথে আমাদের পমারী রাজবংশের সম্পর্কের কথা বলছিলাম। কি একটা ঘটনা এবং বৃটিশ ও ফরাসিদের আগমন সব শেষ করে দেয়। সেটাই বলছিলাম।' মারেভার মা বলল।

ভ্রূ কুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার। বলল, 'তাহিতির প্রাচীন রাজবংশ পমারীর কথা শুনেছি। কিন্তু তাদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক হবে কি করে?'

'আমিও এব্যাপারে কিছু জানি না। একবার আমার দাদা শ্বশুর খবরের কাগজে কি একটা নিউজ পড়ে তাঁর দাদাকে কোট করে বলেছিলেন পমারী রাজবংশের সাথে মুসলমানদের গভীর সম্পর্ক ছিল। আমি এটুকুই জানি। সেটাই আমি ওদের বললাম।' মারেভার মা বলল।

'এমন কিছু অসম্ভব নয়। পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত মুসলমানদের যুদ্ধ ও বাণিজ্য জাহাজ আটলান্টিক, ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগর চষে ফিরত। তারপরও তিনশত বছর পর্যন্ত সাগরগুলোতে বিভিন্নভাবে মুসলমানদের উপস্থিতি ছিল। আমি তাহিতির পুরাতত্ব যাদুঘরে একদিন যেতে চাই।' বলল আহমদ মুসা।

'তাহলে স্যার, মুসলমানরা এক সময় দুনিয়া জোড়া রাজনৈতিক শক্তি ছিল?' জিজ্ঞাসা তামাহি মাহিনের।

'অবশ্যই। পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত মুসলমানরা তখনকার জানা পৃথিবীর সবটার উপর শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল। সপ্তদশ শতকে মুসলমানরাই প্রধান রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানে তারাই নেতৃত্ব দিয়েছে। বৃটিশ, ফরাসিসহ ইউরোপীয়রা মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখা-পড়া জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার সন্ধান পেয়েছে।' আহমদ মুসা বলল।

বলেই আহমদ মুসা তাকাল মারেভার দিকে। বলল, 'সান্দ্রা না কি যেন নাম? ওদের খবর কি, ওরা কি আর ডিষ্টার্ব করেনি?'

মারেভা জবাব না দিয়ে তাকাল তামাহি মাহিনের দিকে। বলল, ‘তুমিই বল মাহিন, অনেক কিছুই তো ঘটেছে?’

‘কেন, ওরা থানা থেকে ছাড়া পাবার পর আরও কিছু করেছে?’ আহমদ মুসা বলল। তার কন্ঠে কিছুটা বিস্ময়!

‘না স্যার, আমাদের কিছু করেনি। ওদের মধ্যেই অনেক কিছু ঘটেছে।’

‘অনেক কিছু ঘটেছে? কি ঘটেছে?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘সেই সাপ্লাই অফিস বন্ধ হয়ে গেছে। সান্ড্রা সুসানও বেঁচে নেই বলে মনে হয়।’ বলল তামাহি মাহিন।

‘বেঁচে নেই? ঘটনা কি বলত?’ আহমদ মুসা বলল।

‘সাপ্লাই অফিসের ক্যারিয়ার ও প্যাকিংম্যান দু’জনের সাথে আমার দেখা হয়েছিল। তাদের কাছ থেকেই এসব ঘটনা শুনলাম।’ বলল তামাহি মাহিন।

‘কি বলেছে তারা?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘যে দিন সান্ড্রারা থানা থেকে মুক্ত হয়, সেদিনও ওরা দু’জন অফিস করেছে। কিন্তু পরদিন অফিসে গিয়ে দেখে তাদের সাপ্লাই অফিস বন্ধ। ছোট্ট একটা নোটিশ টাঙানো দেখতে পায়। তাতে লেখা ছিল: ‘কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্তক্রমে ব্যবসায় বন্ধ করে দিয়েছেন। দেনা-পাওনার বিষয়টি কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্টদের সাথে সরাসরি করবেন।’ নোটিশ দেখে হতাশ হয়ে ঐ দু’জন কর্মী সান্ড্রার সাথে দেখা করার জন্য তার বাড়িতে যায়। গিয়ে দেখে তার মাকে দেখতে পায় সাংঘাতিক ভীত। কথা বলতেও অস্বীকার করে। পাশের একজনের কাছ থেকে জানতে পারে সান্ড্রা দুর্ঘটনায় মারা গেছে। তার লাশ তার পরিবার পায়নি। কোম্পানিই নাকি তার সৎকারের ব্যবস্থা করেছে।’

‘ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠেছিল আহমদ মুসার। গোটা ঘটনার মধ্যে রহস্যের গন্ধ পরিষ্কার। অনেক প্রশ্ন এসে ভীড় করল তার মনে। সান্ড্রা দূর্ঘটনায় মারা গেছে। তার লাশ তার পরিবার পায়নি। কোম্পানিই নাকি তার সৎকারের ব্যবস্থা করেছে।’

ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠেছিল আহমদ মুসার। গোটা ঘটনার মধ্যে রহস্যের গন্ধ পরিষ্কার। অনেক প্রশ্ন এসে ভীড় করল তার মনে। সান্ড্রা দুর্ঘটনায় মারা গেলে

তার পরিবার ভীত কেন? সান্ড্রার দেহ ফেরত পেল না কেন? কে তার পরিবারকে ভয় দেখাল? সান্ড্রার কোম্পানি কি? কেন ভয় দেখাল? ব্যবসায় বন্ধ করল কেন কোম্পানি? থানা থেকে সান্ড্রা ও তার সাথীদের মুক্ত করল কে? কোম্পানিটা আসলে কি? তাহলে কোম্পানি তো সাংঘাতিক পাওয়ারফুল! তামাহি মাহিন জানিয়েছিল, পুলিশ তাকে বলেছিল সান্ড্রাদের তারা নি:শর্তে ছেড়ে দিয়েছিল, কারণ ওদের হাত সাংঘাতিক লম্বা! এসব নানান চিন্তা এসে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল আহমদ মুসার মন।

আহমদ মুসাকে হঠাৎ চিন্তায় ডুবে যেতে দেখে তামাহি মাহিন বলল, ‘স্যার কিছু ভাবছেন?’

আহমদ মুসা তাকাল তামাহি মাহিনের দিকে। বলল, ‘তোমাদের সান্ড্রার বিষয় নিয়েই ভাবছি।’

‘কি ভাবছেন?’ তামাহি মাহিন বলল।

‘আমার বিশ্বাস তোমাদের সান্ড্রাকে খুন করা হয়েছে।’

‘খুন?’ কে খুন করবে? বলল তামাহি মাহিন। বিস্ময় বিস্ফোরিত দু’চোখ তার।

‘যে কাহিনী তুমি শোনালে, তাতে তার কোম্পানি তাকে খুন করেছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তার কোম্পানি? কেন খুন করবে? তারাই তো তাকে জেল থেকে বের করল!’ বলল তামাহি মাহিন।

‘কেন খুন করবে জানি না?’

বলে আহমদ মুসা মুহুর্তকাল ভাবল। তারপর বলল, ‘আচ্ছা মাহিন, কোম্পানির হেড অফিস কোথায়?’

‘আমি জানি না।’ বলল তামাহি মাহিন।

‘তুমি কি কোম্পানির উপরের বসদের কাউকে দেখেছ?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘না দেখিনি।’ তামাহি মাহিন বলল।

‘কোন দিন তারা আসেননি?’ বলল আহমদ মুসা।

‘আমার চোখে পড়েনি।’ তামাহি মাহিন বলল।

‘টেলিফোনে কখনও কথা বলেছ? কিংবা তারা টেলিফোন করেছেন কখনও?’ বলল আহমদ মুসা।

‘না। আমার অন্তত জানা নেই।’ তামাহি মাহিন বলল।

‘তোমাদের কোম্পানি আর কি ব্যবসায় করে?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘আমার জানা নেই। কোম্পানি সম্পর্কে কোন আলোচনাই কখনও আমি অফিসে শুনিনি।’ বলল তামাহি মাহিন।

‘তোমাদের সাপ্লাই অফিস থেকে গড়ে প্রতিদিন কত টাকার পণ্য বিক্রি হতো?’ আহমদ মুসা বলল।

‘বিক্রির টাকা কখনও আমি অফিসে আনতে দেখিনি। অফিস থেকে টাকা দিত, শুধু সেই টাকা দিয়ে পণ্য কিনে আমরা সাপ্লাই করতাম।’ বলল তামাহি মাহিন।

‘কোথায় সাপ্লাই হতো?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘অ্যাটল এলাকায়।’ বলল তামাহি মাহিন।

‘অ্যাটল কি বাজার আছে?’ আহমদ মুসা জানতে চাইল।

‘তোয়ামতো দ্বীপপুঞ্জের উত্তরের কয়েকটা দ্বীপে ছোট-খাট বাজার রয়েছে।’ বলল তামাহি মাহিন।

‘সে সব বাজরেই তোমরা মাল পৌঁছাতে?’ সেখানে ও এখানকার দরের মধ্যে পার্থক্য কেমন?’

‘মূল্যের পার্থক্যটা আমি জানি না। কয়েকটার মাত্র আমাকে সাপ্লাই টিমের সাথে যেতে হয়েছে। কিন্তু কখনই সে সব বাজারে যাইনি।’ বলল তামাহি মাহিন।

‘সাপ্লাই তাহলে কোথায় দিত?’ আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

‘স্যার, আমি তাহনিয়া দ্বীপে নামিয়ে দিয়ে চলে এসেছি।’ তামাহি মাহিন বলল।

‘সেখানে বাজার নেই?’ বলল আহমদ মুসা।

'স্যার, সে দ্বীপে কোন জনবসতিই নেই, বাজার থাকবে কি করে?' তামাহি মাহিন বলল।

'জনবসতি নেই, তাহলে সাপ্লাই কোথায়, কাকে দিয়ে এলে, কেন দিয়ে এলে?' বলল আহমদ মুসা।

'স্যার, তাহানিয়া একটা অ্যাটল। সে অ্যাটলে ল্যান্ড বেল্টে একটা ছোট্ট গোডাউন আছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। পণ্য ওখানেই কয়েকবার নামিয়ে দিয়ে এসেছি।' তামাহি মাহিন বলল।

'ওটা কি কোন ফেরিঘাট? ওখান থেকে কি রিসাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা আছে?' বলল আহমদ মুসা।

'না, ওটা কোন ফেরিঘাট নয়। ওখান থেকে কোন জনযান যাতায়াত করে না্। ওখান থেকে আরও অনেক উত্তরে কয়েকটি দ্বীপে জনবসতি আছে।' তামাহি মাহিন বলল।

ভ্র কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে আহমদ মুসার। চোখে মুখে তার ফুটে উঠেছে অনেক জিজ্ঞাসা। বলল, 'উত্তরের ঐ সব দ্বীপে মানে অ্যাটলে কি তাহানিয়া দ্বীপ হয়ে যেতে হয়?' বলল আহমদ মুসা।

'না স্যার। তাহিতি থেকে উত্তরের ঐ সব অ্যাটল বরং কাছেই। সোজাসুজি ওখানে যাওয়া যায়।' তামাহি মাহিন বলল।

'তাহলে তাহানিয়া দ্বীপে সাপ্লাই পণ্য নামিয়ে আস কেন তোমরা?' বলল আহমদ মুসা। তার চোখে মুখে ফুটে ওঠা জিজ্ঞাসা আরও তীক্ষ্ণ হয়েছে।

'সেটা আমি জানি না স্যার। প্রশ্নটি আমার মনেও জেগেছে। কিন্তু কোম্পানির প্রয়োজন নেই এমন কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যায় না।'

গভীর একটা ভাবনার ছায়া পড়েছে আহমদ মুসার চোখে মুখে। বলল, 'ঐ গোডাউন ছাড়া ঐ দ্বীপে আর কোন স্থাপনা নেই?'

'নেই স্যার।' বলল তামাহি মাহিন।

তামাহি মাহিনের কথা শেষ হলেও আহমদ মুসা কোন কথা বলল না। তার মুখ নিচু হয়েছে। ভাবছে সে।

তামাহি মাহিন ও মারেভাদের চোখে মুখেও কিছুটা বিস্ময় ফুটে উঠেছে! এতসব অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন আহমদ মুসা কেন করছে, এই জিজ্ঞাসা তাদের মনে স্বাভাবিক ভাবেই জেগে উঠেছে। এই কৌতুহল থেকেই তামাহি মাহিন জিজ্ঞাসা করল, 'এতসব প্রশ্ন কেন করছেন স্যার? এসব কোন কৌতুহলের বিষয় বলে তো আমার মনে হয় না।'

আহমদ মুসা  মুখ তুলল। তাকাল তামাহি মাহিনের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে। চোখ ফেরাল মারেভাদের দিকেও। বলল ধীর কন্ঠে, 'আসলে আমি একটা দ্বীপের সন্ধান করছি।'

'একটা দ্বীপের সন্ধান?' প্রায় এক সংগেই বলে উঠল মারেভা ও তামাহি মাহিন।

'হ্যাঁ।' আহমদ মুসা বলল।

'কি দ্বীপ, কেমন দ্বীপ?' বলল তামাহি মাহিন।

'সেটা হতে হবে অ্যাটল দ্বীপ।' আহমদ মুসা বলল।

'কোনো বিশেষ অ্যাটল দ্বীপ খুঁজছেন, না একটা ভাল অ্যাটল দ্বীপ খুঁজছেন?' বলল মারেভা।

'বিশেষ একটা অ্যাটল দ্বীপ খুঁজছি।' আহমদ মুসা বলল।

'কেমন সে দ্বীপ?' বলল তামাহি মাহিন।

'সেখানে বড় স্থাপনা থাকবে এবং চারদিকে থাকবে গোপনীয়তার আবরণ।' আহমদ মুসা বলল।

'তোয়ামতো দ্বীপপঞ্জে বড় স্থাপনা সম্বলিত দু'চারটি অ্যাটল দ্বীপ আছে। কিন্তু সেগুলো পাবলিক প্লেসে। সেখানে কোন গোপনীয়তা নেই।' তামাহি মাহিন বলল।

'আপনার সেই বিশেষ অ্যাটল দ্বীপ কি আমাদের এই তোয়ামতো দ্বীপপুঞ্জেই, আপনি নিশ্চিত স্যার?' মারেভা বলল।

'নিশ্চিত না হলে আমি এখানে ছুটে আসতাম না।' বলল আহমদ মুসা।

বিস্ময় দৃষ্টি নিয়ে মারেভারা তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল মারেভা, 'স্যার, আপনি শুধু সে দ্বীপের সন্ধানেই এখানে এসেছেন?'

‘হ্যাঁ তাই।’ আহমদ মুসা বলল।

‘স্যরি, খুবই কৌতুহল হচ্ছে জানতে কি আছে সে দ্বীপে কিংবা কি কাজা সেই দ্বীপে, যার জন্য হাজার হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে এখানে আসা!’ বলল মারেভার মা।

আহমদ মুসা গম্ভীর হলো।

ভাবনার একটা ছায়াও তার চোখে মুখে ফুটে উঠল। ধীর কন্ঠে বলল, ‘স্যরি খালাম্মা, বিষয়টা এই মুহুর্তে আমি বলতে পারছি না। এক সময় অবশ্যই আপনারা জানবেন। বিষয়টা আপনাদের ভয়-উদ্বেগই শুধু বাড়াবে। তবে এটুকু আমি বলতে পারি, বিষয়টা অত্যান্ত গুরুতর। ভয়ংকর এক ষড়যন্ত্রের পিছু নিয়ে আমি এখানে এসেছি। একটা ধারণা ছাড়া আমিও ওদের সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানি না।’

আহমদ মুসার শান্ত, ঠান্ডা কন্ঠের কথাগুলো মারেভারা খুব গুরুত্বের সাথে নিয়েছে। তাদের সবার চোখে মুখেই ভয় ও উদ্বেগের একটা ছায়া নেমে এসেছে। আহমদ মুসার কথা শেষ হলেও সংগে সংগে ওরা কেউ কথা বলল না।

নিরবতা ভাঙল মারেভাই, ‘স্যার, আপনার কথা থেকেই বিষয়টার গুরুত্ব আমরা উপলব্ধি করতে পারছি। কিন্তু স্যার, এক ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আপনি একা লড়াই করবেন কিভাবে?’ কি ষড়যন্ত্র তা জানা না থাকলে, ষড়যন্ত্রটা কার বিরুদ্ধে সেটা কি জানা যায়? আপনার একার বিরুদ্ধে নিশ্চয় ষড়যন্ত্র নয়?’

‘না, ষড়যন্ত্রটা আমার বিরুদ্ধে নয়। ষড়যন্ত্রটা এক অর্থে বলা যায় মানবতার বিরুদ্ধে, সভ্যতার বিরুদ্ধে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘সে তো তাহলে বিরাট ব্যাপার! কিন্তু ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়ার একটা এ্যাটল থেকে এই যড়ষন্ত্রটা কিভাবে হতে পারে?’

‘ষড়যন্ত্র হয়েছে, হচ্ছে, এটাই বাস্তবতা।’ বলল আহমদ মুসা।

‘এ ধরনের অ্যাটল দ্বীপ কি আমাদের তোমামতো দ্বীপপুঞ্জে আছে? কোনভাবে ভুল হচ্ছে না তো স্যার।’ বলল মারেভা।

‘অবশ্যই আছে। আমার ভুল হয়নি। আমি পারস্য উপসাগর থেকে একটা গুপকে তাড়া করে এখানে এসেছি। ওরা এখানকার কোন এক অ্যাটলে উঠেছে।’

‘আপনি বলছেন এটাই যথেষ্ট। সত্যের পক্ষে এর চেয়ে বড় প্রমাণ আমরা চাই না। ওদের ষ্ট্যাবলিশমেন্টটা কত বড় স্যার?’ বলল তামাহি মাহিন।

‘আমি জানি না। তবে আমার ধারণা একশ’ লোকের কম হবে না। আহমদ মুসা বলল।

‘অসম্ভব স্যার! আমাদের কোন অ্যাটলেই এত বড় ষ্ট্যাবলিশমেন্ট নেই।’ বলল মারেভা।

‘তোমাদের এ অসম্ভব বলাটা রহস্যকে আরও ঘনিভূত করছে। এই রহস্যের সমাধান করতে হবে। আমি প্রথমে তোমাদের তাহানিয়া দ্বীপ দেখতে চাই মারেভ।’ আহমদ মুসা বলল।

‘অবশ্যই দেখবেন স্যার। কিন্তু হতাশ হবেন।’ বলল মারেভা।

‘হতাশার পাশেই আশা থাকে মারেভা। এই তাহানিয়া দ্বীপ দর্শনে মারেভা তো থাকবেই, তামাহি মাহিনকে অবশ্যই আমার সংগী হতে হবে। এখন থেকে তোমরা দু’জনই আমার গাইড হবে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘গাইড না গার্ড স্যার। আপনি তো পর্যটক নন। অতএব আপনার গাইড দরকার নেই।’ বলল মারেভা। তার মুখে হাসি।

‘মারেভার কথা ঠিক। গাইড না বলে গার্ড বলাই বেশি যুক্তি সংগত। তবে গার্ড যাকে বলে সেই গার্ড তোমাদের হতে হবে না। আমি আমার কোন বিপদে তোমাদের টানব না। তোমারা একটা বিপদে পড়েছিলে। তোমারা আবার কোন বিপদে পড়ো তা আমি চাইব না।’ বলল আহমদ মুসা।

‘সেদিন যেভাবে নিজের জীবন বাজি রেখে আমাকে বাঁচিয়েছেন, তাতে আপনার এ কথারই প্রমাণ মেলে। যারা নিজের জীবন বিপন্ন করে অন্যদের বাঁচায়, তার অন্যের জীবন বিপন্ন হওয়াকে পছন্দ করবে না। তবে স্যার, আমাদের গার্ড ভাবার দরকার নেই আপনার। সহযোগী হিসেবে ভাবুন।

সহযোগীরা একে অপরের দুঃখ ভাগ করে নেয়। আমাদের মর্যাদা দিলেই আমরা খুশি হবো।' মারেভা বলল।

'আচ্ছা থাক এসব কথা! বলল মাহিন পুলিশ যে বলেছিল, তোমাদের কোম্পানির হাত খুব লম্বা, এটা কেন বলেছিল? ওরা প্রভাবশালী কোন দিক দিয়ে?'

'আমি জানি না স্যার। তবে তাদের সম্পর্কে পুলিশের আরও কিছু কথা শুনেছিলাম। পুলিশরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেছিল ওরা ছয়কে নয় করার ক্ষমতা রাখে।' বলল তামাহি মাহিন।

'আচ্ছা বলত মাহিন, তোমাদের কোম্পানি তোমাদের স্থানীয় অফিস থেকে প্রতিদিন বা প্রতি সপ্তাহে গড়ে যে শাক-সব্জি, মাছ-মাংস সাপ্লাই করতো তার গড় পরিমাণ কি একই রকমের?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'জি স্যার, গড় পরিমাণ একই রকমের। তামাহি মাহিন বলল।'

'সে পরিমাণটা কি রকম? পঁচিশ তিরিশটা পরিবারে প্রতিদিন বা প্রতি সপ্তাহের উপযুক্ত?' বলল আহমদ মুসা।

তামাহি মাহিন একটু ভাবল। মনে মনে অংকও কষল। বলল, 'ঠিক স্যার পঁচিশ তিরিশটি পরিবারের মত। প্রতিদিন সব্জি কম বেশি একমণ, মাছ-মাংস প্রতিদিন গড়ে বিশ তিরিশ কেজির বেশি সাপ্লাই হতো না।'

আহমদ মুসার চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'কিন্তু যে কয়েকটি অ্যাটলে জনবসতি আছে, তার মোট পরিবারে সংখ্যা পঁচিশ তিরিশের অনেক বেশি হবে নিশ্চয়?'

'ঠিক বলেছেন স্যার। কয়েকশ' পরিবার অবশ্যয় হবে।' বলল তামাহি মাহিন।

'তাহলে মাহিন তোমাদের কোম্পানির সব্জি, মাছ, মাংশের সাপ্লাই অ্যাটলের পরিবারগুলোর চাহিদা পুরণের জন্যে নয়।' আহমদ মুসা বলল।

'কেন স্যার?' বলল তামাহি মাহিন।

'সব পরিবারের চাহিদা পুরনের জন্যে হলে চাহিদা বাড়া, কমা বা চাহিদা অনুসারে সাপ্লাইয়ের পরিমাণ কমবেশি হতো। সাপ্লাই ব্যবসায়ের এটাই নিয়ম।' আহমদ মুসা বলল।

'কোম্পানির সাপ্লাই তাহলে কোন কারণে কি জন্যে একই ছিল?' জিজ্ঞাসা তামাহি মাহিনের।

'আমি ঠিক বলতে পারবো না। তবে সাপ্লাইয়ের অব্যবহৃত যে পরিমাণ, তা প্রমাণ করে সাপ্লাই ছিল বিশ পঁচিশটি পরিবার মানে শতখানেক মানুষের জন্যে।' বলল আহমদ মুসা।

বিস্ফোরিত হয়ে উঠল তামাহি মাহিন ও মারেভার চোখ। বলল তামাহি মাহিন, 'তার মানে স্যার, আপনি বলতে চাচ্ছেন একশ' জনের যে ষড়যন্ত্রকারী ষ্ট্যাবলিশমেন্টর কথা আপনি বলেছেন, তাদের জন্যেই ছিল এই সাপ্লাই?'

'আমি তা এখনও বলছি না। কিন্তু সকল যুক্তি তাদেরকে সন্দেহ করা পক্ষেই। এমন কি সান্ড্রা নিহত হওয়া বা গায়েব হওয়া, সামান্য কারণে সাপ্লাই অফিস বন্ধ হওয়ার মত বিষয়ও আমার সন্দেহকেই আরও প্রবল করেছে।' আহমদ মুসা বলল।

'এ দু'টি ঘটনা কি প্রমাণ করে?' প্রশ্ন মারেভার।

'দু'টি নয়, চারটি ঘটনা। মারেভাকে কিডন্যাপের চেষ্টা ও থানায় মামলা হওয়া, এ দু'টি ঘটনার অবশ্যম্ভাবী ঘটনা ছিল সান্ড্রার নিহত হওয়া এবং সাপ্লাই অফিস বন্ধ হয়ে যাওয়া।' আহমদ মুসা বলল।

'কিভাবে? কোম্পানির লোকরাই সান্ড্রাদেরকে ছাড়িয়ে নেয়?' বলল তামাহি মাহিন।

'যে কারণে তাদেরকে ছাড়িয়ে নেয়া হয়েছে সে একই কারণে সান্ড্রা খুন হয়েছে এবং সাপ্লাই অফিস বন্ধ হয়েছে।' আহমদ মুসা বলল।

'সে কারণটা কি হতে পারে স্যার?' বলল তামাহি মাহিনই।

'কোম্পানির গোপনীয়তা রক্ষার বিষয়।' আহমদ মুসা বলল।

'বুঝলাম না স্যার।' বলল তামাহি মাহিন।

‘সান্ড্রা ও সাথী ছয় হাইজ্যাককারী থানায় থাকলে বা জেলে গেলে তাদের পরিচয়ের সাথে কোম্পানির পরিচয়ও প্রকাশ হয়ে পড়ার ভয় ছিল। সে জন্যেই তাদের তড়িঘড়ি করে থানা থেকে ছাড়িয়ে নেয়া হয়েছে। অন্যদিকে কিডন্যাপের ঘটনার মধ্যে দিয়ে সান্ড্রা ও সাপ্লাই অফিসের উপর থানা পুলিশসহ কিছু মানুষের চোখ গিয়ে পড়িছিল। এর মাধ্যমে কোম্পানির পরিচয়ও বেরিয়ে পড়ার ভয় সৃষ্টি হয়েছিল। সান্ড্রাকে গায়েব করা বা খুন করা এবং সাপ্লাই অফিস বন্ধ করে দেয়ার ফলে আশংকার সব দরজাই বন্ধ হয়ে গেছে।’ আহমদ মুসা বলল।

মারেভা ও মাহিনের মুগ্ধ দৃষ্টি আহমদ মুসার দিকে। মুগ্ধ মারেভার মা বলল, ‘বেটা তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, ঘটনার চুলচেরা বিশ্লেষণে তুমি অত্যান্ত দক্ষ গোয়েন্দার মত তোমার সুক্ষ দৃষ্টি। আমি তোমার কথা শুনছিলাম আর ভাবছিলাম, আমি কোন গোয়েন্দা কাহিনী শুনছি। আমি ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে বলছি, তুমি যে মিশনেই এসে থাক, তুমি সফল হবে। ঈশ্বর তোমাকে অদ্ভুদ ক্ষমতা দিয়েছেন। তুমি শূণ্যর উপরও প্রসাদ নির্মাণ করতে পার। সব চেয়ে বড় কথা হলো তুমি অত্যান্ত ভালো মানুষ। যে লোভগুলো মানুষকে দুশ্চরিত্র বানায়, অমানুষ বানায়, সে সব লোভ থেকে তুমি মুক্ত। আমার মেয়ে আমার পাশে থাকলে যতটা নিশ্চিত থাকি, তোমার সাথে থাকলেও ততটাই নিশ্চিত থাকি। ঈশ্বর তোমার সহায় হোন বেটা।’ থামল মারেভার মা।

‘ধন্যবাদ খালাম্মা। মায়েরা সব সময় সন্তানদের ভালটাই দেখেন। আপনি তাই দেখেছেন। তবে খালাম্মা আমারও সবচেয়ে বড় চাওয়া এটাই যে, আল্লাহ যে রকম মানুষ চান, আমি যেন সে রকম একন মানুষ হতে পারি এবং আমি যাই করি তা যেন মানুষের উপকারে আসে। আমাদের ধর্মগ্রন্থ আল কুরআনে ভাল কাজ সম্পাদনকেই মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য বলে উভিহিত করেছে। আল্লাহ বলেন, ‘জীবন ও মৃত্যু আমি সৃষ্টি করেছি এটা দেখার জন্যে যে কারা ভাল কাজ করে।’

‘ধন্যবাদ বেটা। মারেভা তোমাদের ধর্মের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আমি তো বললাম আমাদের পমারী বংশের সাথে মুসলমানদের একটা গভীর সম্পর্ক নাকি ছিল।’

‘আমি এ বিষয়টাও অনুসন্ধান করব খালাম্মা। আমি পমারী ডাইনেষ্টির ধ্বংস প্রাপ্ত রাজধানী ‘আরু’ এবং আপনাদের পুরাতত্ব ঘাদুঘরে যাব।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমরাও খুশি হবো বেটা। আঠারশ’ পনের অর্থ্যাৎ উনিশ শতকের শুরু থেকে দেশের খৃষ্টীয়করণ যেমন শুরু হয়েছে, তেমনি ইতিহাস মুছে ফেলার ধুম চলচে। তাহিতির মূল অধিবাসিরা চায় ইতিহাস রক্ষা পাক, প্রকৃতি ইতিহাস উদ্ধার হোক।’

‘এই দায়িত্ব খালাম্মা মারেভা, মাহিনদের মত নতুন প্রজন্মের।’

‘এই প্রজন্ম জানেই না যে, তাদের স্বতন্ত্র কোন ইতিহাস আছে। আমাদের ইতিহাস শুরু হয়েছে বৃটিশদের ও ফরাসিদের আগমন থেকে। আজ আপনাদের কথা থেকে ইতিহাস নিয়ে যে উৎসাহ বোধ করছি, তা অতীতে কোন সময় হয়নি। আপনাদের বিশেষ করে স্যারকে ধন্যবাদ।’ বলল মারেভা।

আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আর দেরি নয় সকলে উঠুন। লাঞ্চের সময় পার হয়ে যাচ্ছে। কথা বলার ফ্লোরটা মারেভার কাছে থাকল। আজকের মত আলোচনা মুলতবি। আলোচনা আবার চলবে অন্য কোন দিন, অন্য কোন সময়ে?’

বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল হাসতে হাসতে। তার সাথে সবাই উঠে দাঁড়াল।

# ৬

ড্রাইভার তেপাওকে পাশের সীটে বসিয়ে আজ আহমদ মুসা নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করছিল। আহমদ মুসা শিখ ড্রাইভারের ছদ্মবেশ নিয়েছে। মাথায় পাগড়ি, মুখে দাড়ি, গোঁফ। পোষাক কিন্তু একেবারে ইংলিশ।

হোটেল থেকে বেরিয়ে তাওনোয়া নদী বরাবর হাইওয়ে ধরে এগিয়ে পাপেতি থেকে আসা হাইওয়েতে উঠেছে। এগিয়ে যাচ্ছে না দক্ষিণে।

পাপেতি হাইওয়ে একটা জংশনে গিয়ে প্রিন্স আল-হিন্দি অ্যাভেনিউ-এর সাথে মিশেছে। সেই উপত্যকার সামনেই সুন্দর করে সাজানো গাছ-গাছালিতে ঢাকা একটা সমতল পাহাড়। মনোরম দৃশ্যের এই পাহাড়টি পিকনিক পাহাড় নামে খ্যাত।

এই পাহাড়েই এসেছে মারেভা ও মাহিনরা পিকনিক করতে। এলাকাভিত্তিক তাদের কম্যুনিটির এট বার্ষিক পিকনিক কর্নার। প্রতি বছর এই সময়েই তাদের এই পিকনিক হয়ে থাকে। পিকনিকে আহমদ দাওয়াত পেয়েছে। কুম্যুনিটির পক্ষ থেকে মারেভার মা তার বিশেষ গেষ্ট হিসাবে দাওয়াত করেছে আহামদ মুসাকে।

পিকনিকের সাথে সাথে সারাদিনের উৎসব এটা ওদের। লক্ষ্যহিন ঘুরে বেড়ানো ও রিল্যাক্স মুডে থাকে তার সারাদিন।

আহমদ মুসা দুপুরের খানা তাদের সাথে খাওয়ার দাওয়াত নিয়েছিল।

সেই দাওয়াত রক্ষা করতেই যাচ্ছে আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার গাড়ি পাপেতি হাইওয়ে থেকে সরে গিয়ে উঠেছে প্রিন্স অ্যাভেনিউ-এর মিলন জংশনে। হঠাৎ এই সময় নারী কন্ঠের ‘বাঁচাও’ ‘বাঁচাও’ চিৎকার তার কানে এল ডান দিক থেকে। কন্ঠ অনেকটা মারেভা মত।

আহমদ মুসা চোখ ফিরিয়ে দেখল, একটি হাইল্যান্ডার জীপ প্রিন্স অ্যাভেনিউ থেকে জংশনে প্রবেশ করেছে। জীপের গতি সোজা পূর্ব দিকে।

পাপেতি হাইওয়ের এই জংশনে প্রিন্স অ্যাভেনিউ-এর সাথে মিলিত হবার পর প্রিন্স অ্যাভেনিউ নাম নিয়ে পূর্ব দিকে এগিয়ে গেছে। হাইল্যান্ডার জীপের গতি সেই পূর্ব দিকেই।

নারী কন্ঠের চিৎকার শোনার সাথে সাথেই আহমদ মুসা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে। সে তার গাড়ির মুখ বাম দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে সামনে এগিয়ে হাইল্যান্ডার জীপকে সামনে থেকে ব্লক করার চেষ্টা করবে।

কিন্তু আহমদ মুসা গাড়ি ঘুরাতে গিয়ে কিছুটা সময় নষ্ট করেছিল। হাইল্যান্ডার জীপের তীব্র বেপরোয়া গতি তাকে বাড়তি সুযোগ করে দিয়েছে। আহমদ মুসার কার যখন জীপের সমান্তরাল হলো, তখনও আহমদ মুসার কার গজ চারেক দূরে।

আহমদ মুসা উপায়ন্তর না দেখে গুলি করল হাইল্যান্ডারের পেছনের চাকায়।

খুবই মূল্যবান ছিল গুলি করা। গুলিটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো না।

বিকট শব্দে টায়ারটা বাস্ট হয়ে গেল।

কিন্তু তার পরেও গাড়ি সামনে এগিয়ে গেল।

আহমদ মুসার গাড়ি বাঁক দিয়ে সামনে এগিয়ে হাইল্যান্ডারটির পেছনে গিয়ে পৌঁছবার আগেই আরেকটা হাইল্যান্ডের জীপ ঝড়ের বেগে তার পাশ দিয়ে ছুটে গিয়ে আগের হাইল্যান্ডের ডান পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা দেখল এতে পরে হাইল্যান্ডারটি বেরিয়ে যেতে পারে, তাই সে আবার তার গাড়িটি আর একটু বামে ঘুরিয়ে নিয়ে আগের হাইল্যান্ডার জীপটির বাম পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল। দেখতে পেল এ জীপের তিনজন আরোহী পাশে এসে দাঁড়ানো জীপটায় উঠে গেছে। দেখল মারেভা জীপের এদিকের দরজা খুলে বেরিয়ে আসছে।

আহমদ মুসা তারাতারি গাড়ি থেকে নেমে মারেভাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে নিজেও বসে পড়ল এবং মারেভা তাড়াতাড়ি গাড়ির পেছনের দিকে সরে যাও, সামনে থেকে ওদের অনেক গুলি আসতে পারে।

আহমদ মুসা মাটিতে বসে পড়ার সাথে সাথে কয়েকটা গুলি তাদের উপর দিয়ে চলে গিয়েছিল।

মারেভার ও আহমদ মুসা গাড়ির পেছন দিকে সরে গেল।

গুলি তখনও আসছিল। গুলি করতে করতেই জীপটা সামনে এগোতে শুরু করেছিল। কিছু গুলি আহমদ মুসার গাড়িতেও লাগল। কিছু গুলি দুই গাড়ির মাঝখান দিয়ে পেছন দিকে ছুটে এল। এ গুলির ভয়টা য় আহমদ মুসা করছিল।

আহমদ মুসার গাড়ির ড্রাইভার তেপাও আগেই গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির আড়ালে লুকিয়েছিল।

আহমদ মুসা তেপাওকে বলল মারেভাকে নিয়ে আশে পাশে কোথাও অপেক্ষা করতে।

তেপাওকে এ নির্দেশ দিয়ে আহমদ মুসা গাড়িতে উঠে বসল। বলল, 'আহমদ মুসা গাড়িতে ষ্ট্যার্ট দিল।'

চলতে শুরু করল গাড়ি। মারেভা ও তেপাও তখন এগোচ্ছে জংশনের পাশের এক হোটেলের দিকে। উৎসুক কিছু মানুষও চারদিক থেকে এসে জমা হয়েছে জংশনের এখানে সেখানে।

আহমদ মুসার গাড়ি জংশনটা পার হয়ে প্রিন্স রোডে আবার উঠতে যাবে এমন সময় পেছনে বিস্ফোরণের বিকট শব্দ শুনতে পেল।

আহমদ মুসা পেছনে ফিরে দেখল সেই হাইল্যান্ডার জীপটি দাও দাও করে জ্বলছে।

ওরা ওদের একটা আলামত ধ্বংস করে দিল যাতে ওটা আর কারো হাতে না পড়ে। মনে মনে প্রশংসা করল আহমদ মুসা ওদের। ওরা পেছনে কোন আলামত রেখে যায় না। বার বারই এটা প্রমাণ হচ্ছে।

প্রিন্স হাইওয়ে সোজা একটা সরল রেখার মত পূর্ব দিকে এগিয়ে গেছে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ওদের গাড়ি, যদিও অনেক সামনে এগিয়ে গেছে ওরা।

আহমদ মুসা গাড়িতে সর্বোচ্চ গতিবেগ এনে ওদের কাছাকাছি পৌঁছার চেষ্টা করল।

কিন্তু ওরা টের পেয়ে গেছে যে তাদের ফলো করা হচ্ছে। ওদের গাড়ির স্পীডও বেড়ে গেল। আহমদ মুসার ভাড়া করা ট্যাক্সির চেয়ে হাইল্যান্ডারের গতিবেবগও ছিল বেশি। আহমদ মুসা চেষ্টা করল গতির সমতা রক্ষা করতে। আহমদ মুসার ওদের সাথে হয়তো পারবে না, কিন্তু ওদের ডেষ্টিনেশন জানতে চায়। মারেভাকেই যখন আবার কিডন্যাপ করতে চেষ্টা করেছিল, তখন লোকগুলো সেই কোম্পানির লোক হবে, সে সর্ম্পকে কোন সন্দেহ নেই। আর সেই কোম্পানি অবশ্যই ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেট অথবা ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটেরই কেউ হবে। কিন্তু ওরা আবার মারেভাকে কিডন্যাপ করতে চেষ্টা করল কেন? ওরা সান্ড্রাকে সরিয়ে দিয়ে এবং সাপ্লাই অফিস বন্ধ করে দিয়ে পরিচয় লিংকটা তো কাটআপ করেছে। লিংক হয়ে যেতে পারে এমন চেষ্টা আবার তার কেন করল!

নানা ভাবনা আহমদ মুসার মনে মাথা তুলছে। কিন্তু তার চোখটা সামনে নিবদ্ধ। হাইল্যান্ডার জীপটিকে সে হারাতে চায় না।

কয়েক মাইল এভাবে চলার পর হঠাৎ হাইল্যান্ডার জীপটা বামে টার্ণ নিয়ে ঢালু পাহাড়ি পথে চলতে শুরু করল।

আহমদ মুসা ভাবল, বামের ঢাল বেয়ে এগোলে মাইল খানেক পরেই তো হ্রদ। তাহলে তারা হ্রদে নেমে পানি পথে কোথাও যেতে চায়! তাই হবে।

যেখানে গিয়ে হাইল্যান্ডার বামে নেমে গেছে, সেখানে পৌঁছে আহমদ মুসা দেখল রাস্তার মত একটা এবড়ো থেবড়ো চিহ্ন নিচে হ্রদের দিকে নেমে গেছে। হাইল্যান্ডারটা আর্ধেকটা পথ এগিয়ে গেছে। হাইল্যান্ডারের পক্ষেই এত দ্রুত এগোনো সম্ভব হচ্ছে, সাধারণ কারের পক্ষে এভাবে এগোনো সম্ভব নয়।

আহমদ মুসা কারটিকে একটা ঝোপের আড়ালে রেখে পায়ে হেঁটে নামতে শুরু করল নিজেকে যতটা সম্ভব করে। ওরা জানে এপতে তার গাড়ি নামতে পারবে না। অতএব এ পথের শুরু থেকেই আমি ফিরে যাব, এটা তারা নিশ্চিতই ধরে নেবে। কারণ হেঁচে এগিয়ে গিয়ে তো ওদের ধরা যাবে না, তাহলে এগোবো কেন। আহমদ মুসা তাদের এই নিশ্চিন্ত থাকার সুযোগ নিয়েই যতটা সম্ভব তাদের কাছাকাছি পৌঁছাতে চায়। দেখতে চায় যে তারা কি করছে।

আহমদ মুসা সোজাসুজি খাড়া হয়ে হেঁটে নামতে পারছে না। তাই তাকে গাছ-গাছকড়ার আড়ালে নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রসর হতে হচ্ছে। চলার মাঝে মাঝে সে উঁকি দিয়ে গাড়িটাকে দেখতে কত দূর পৌঁছল।

এক সময় একটা উঁচু টিলার আড়ালে দাঁড়িয়ে উঁকি দিতে গিয়ে দেখল, গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেছে। ওখান থেকে হ্রদের পাড়টা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। জীপটা হ্রদের পানি ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। লোকজনও নেমেছে দেখা যাচ্ছে।

আহমদ মুসা কাঁধে ঝুলানো দুরবিনটা হাতে নিয়ে চোখে লাগাল সামনে চোখ পড়তেই চমকে উঠল আহমদ মুসা। দেখল হ্রদের পানি ঠেলে তিমি মাছের মত একটা কিছু পানির ভেতর থেকে পানির সারফেসে উঠে আসছে।

যখন সম্পূর্ণটা উঠে এল, মনে হলো যেন আস্ত একটা তিমি মাছ। ওটা আসলে তিমি মাছের আদলে তৈরি একটা সাবমেরিন।

তিমি মাছের মতই সাবমেরিনটা এক সময় হাঁ করল। ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা ষ্টিলের ব্রীজ। ব্রীজের সামনের প্রান্তটা উপকূলের এসে লান্ড করল। সংগে সংগেই জীপকে সংকুচিত হতে দেখা গেল। উচ্চতা অর্ধেকের বেশি কমে গেল। তার পর জীপটা সে ব্রীজ দিয়ে সাবমেরিনের পেটে ঢুকে গেল। একে একে পাঁচজন লোকও সেই ব্রীজ দিয়ে সবামেরিনের ভেতরে চলে গেল। তারপর তিমি মাছের করাতের মত দাঁতওয়ালা বিকট হাঁ'টা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল। কয়েক মুহুর্তের মধ্যেই সাবমেরিনটা পানির নিচে হারিয়ে গেল।

আহমদ মুসার দু'চোখে আনন্দের ঝিলিক। সে এখন নিশ্চিত, কোম্পানিটা ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের একটা অংশ। সে আরও নিশ্চিত তার আকাঙ্খিত সে অ্যাটলটি তাহিতির পূর্ব পাশের তোয়ামতো দ্বীপপুঞ্জের রয়েছে।

এই আনন্দের সাথে আহমদ মুসাকে একরাশ বিস্ময়ও পীড়িত করল। এদর কত রকমের সাবমেরিন রয়েছে! সৌদি আরবের উপকূলে যে সাবমেরিন দেখে এসেছে, সেটা টিউব সাবমেরিন। আর এখানে দেখল তিমি মাছের মত এক উদ্ভুত অবয়বের সাবমেরিন। একটু দুর থেকে দেখলে কিংবা হাঠাৎ দেখলে একে তিমি মাছ ছাড়া অন্য কিছু বলতে পারবে না কেউ। আর কত ধরনের সাবমেরিন এদের আছে! কোন বেসরকারী সংগঠন এত শক্তিশালী হয়, এতটা রিসোর্সফুল

হয়, এমনটা ধারনাতেও ছিল না। এদের আসলে টার্গেট কি? তাদের অ্যাটলকে শক্তির রাজধানী বানাবার পর তারা কি করতে চায়?

এসব প্রশ্ন মাথায় নিয়ে আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়াল।

ফিরে এল সেই রোড জংশনে। দেখল মারেভার মা'সহ পিকনিকের প্রায় সবাই চলে এসেছে এদিকে।

আহমদ মুসাকে ঘিরে ধরল সবাই। পুলিশও এসেছে। পুলিশরাও ছুটে এল আহমদ মুসার কাছে। বলল, 'স্যার, আপনি মেয়েটিকে উদ্ধার করার পর কিডন্যাপারদের ফলো করেছিলেন। কোন হদিশ পেলেন ক্রিমিনালদের?'

'ওরা রাস্তা থেকে হ্রদে নেমে যায়। ওখানে ওদের নৌযান ছিল। সে নৌযানে ওরা পালিয়েছে।' আহমদ মুসা বলল।

'তাহলে ওরা আটঘাট বেঁধেই এসেছিল। আপনাকে ধন্যবাদ স্যার। পুলিশের কাজ আপনি করছেন।' বলল পুলিশ অফিসার।

'ঐ কাজ শুধু পুলিশের নয়, সবার।' আহমদ মুসা বলল।

'আপনি ঠিক বলেছেন। কিন্তু একথাটা সবাই বুঝে না। বুঝলে সমাজে অপরাধ থাকতো না।' সেই পুলিশ অফিসারটিই বলল।

আহমদ মুসা পুলিশের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল মারেভার মায়ের দিকে।

মারভার মা মারভাকে জড়িয়ে ধরে বসে আছে। মারভার সেই ভীত অবস্থা এখন নেই। একেবারেই ভাবলেশহীন মুখ।

'খালাম্মা, মাহিন কোথায়?' আহমদ মুসা জিজ্ঞাসা করল মারেভার মাকে।

'মারেভা ও মাহিন ঘটনার সময় এক সাথেই ছিল। ওদের সাথে ধ্বস্তাধ্বস্তিতে আহত হয়েছে মাহিন। সে একটা ক্লিনিকে ফার্ষ্টএইড নিচ্ছে।' বলল মারেভার মা। শুকনো কন্ঠ তার।

'কেমন আহত সে?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'চোখের পাশটা তার কেটে গেছে, কিন্তু চোখ বেঁচে গেছে। দেখা গেছে অন্য তেমন কোন আঘাত তার দেহে নেই।' বলল মারেভার মা।

‘ওদিকে পিকনিকের অবস্থা কি খালাম্মা?’ আহমদ মুসা বলল।

‘খবর পেয়েই আমরা অনেকে গাড়ির পেছনে পেছনে ছুটে এসেছি। ওদিকের খবর জানি না। ভালোও লাগছে না। এখন বাড়ি ফিরতে চাই।’ বলল মারেভার মা।

‘না খালাম্মা, চলুন পিকনিকে। সবাই নিশ্চয় অপেক্ষা করছে। তা ছাড়া আমারও ক্ষুধা পেয়েছে।’ আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসার কথা শুনেই হঠাৎ জেগে উঠার মত সচেতন হয়ে উঠল মারেভার মা। তাকাল মারেভার দিকে।

‘চল মা পিকনিকে। স্যার আছেন আর ভয় নেই।’ বলে মারেভা উঠে দাঁড়াল।

‘মারেভা, পুলিশ তোমাদের বক্তব্য নিয়েছে?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘আমার বক্তব্য নিয়েছে। তেপাও-এর কথাও রেকর্ড করেছে। মাহিন তার ষ্টেটমেন্ট পুলিশকে আগেই দিয়েছে।’ বলল মারেভা।

‘গুড, এ দিকের কাজ তো শেষ। আমরা তাহলে চলি পিকনিকের দিকে। মারেভা, খালাম্মা আমাদের গাড়িতে আসতে পারেন। পেছনের তিন সীট তো খালিই আছে।’ আহমদ মুসা বলল।

মারেভা ও মারেভার মা গিয়ে গাড়িতে উঠল।

পিকনিকের যারা এদিকে এসেছিল তারা সবাই ছুটল পিকনিক স্পটের দিকে।

হাইওয়ে থেকে উপত্যকার রাস্তায় চলতে শুরু করেছে আহমদ মুসার গাড়ি।

উপত্যকাতেই পিকনিক পাহাড়টা। গাড়ি চলছে।

পেছন থেকে মারেভার মা বলল, ‘ধন্যবাদ দিয়ে ঋণ শোধ হবে না। তাই ধন্যবাদ দেব না। মারেভার কাছ থেকে আজকের ঘটনা সবই শুনেছি। তোমার নিজের কথাও তোমাকে এখন ভাবতে হবে যে বেটা। তুমি নিজের কথাও তোমাকে এখন ভাবতে হবে যে বেটা। তুমি কিন্তু ওদের টার্গেট। তোমার খোঁজেই কিন্তু ওরা আজ এসেছিল মারেভা ও মাহিনের কাছে।’ বলল মারেভা মা।

‘আমাকে পায়নি। আমাকে না পেয়েই কি তাহলে মারেভা ও মাহিনকে কিডন্যাপ করতে চেয়েছিল।’ জিজ্ঞাসা মুসার।

‘তা নয় বেটা, ওরা এস একটু আড়ালে পেয়ে গিয়েছিল মারেভা ও মাহিনকে। ওরা মারেভা ও মাহিনের কাছে তোমার পরিচয় কি, বাড়ি কোথায়, কোথায় উঠেছ, কত দিন থাকবে? এসব বিষয় জিজ্ঞাসা করেছিল। ওরা নিজদেরকে মার্কিন গোয়েন্দা হিসেবে পরিচয় দিয়েছিল। মারেভা ও মাহিন তাদের প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়েছে তোমার কোন তথ্যই তাদের দেয়নি। এ নিয়েই হট কথাবার্তা। এরই পরিণতিতে তারা মারেভা ও মাহিনকে কিডন্যাপ করার চেষ্টা করে। এক পর্যায়ে তাদের সাথে ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু হয়। তখন আশে পাশের লোকরা টের পেয়ে যায়। বেগতিক দেখে মাহিনকে ছেড়ে দিয়ে মারেভাকে টেনে হেঁচড়ে গাড়িতে তুলে নিয়ে চম্পট দেয়।

আমরা কয়েকজন গাড়ির পিছু পিছু ছুঁটতে থাকি। গাড়ি নেবার কথা আমাদের খেয়াল হয়নি। গাড়িটি বিস্ফোরিত হবার পরপরই আমরা ওখানে পৌঁছি। মারেভাকে পেয়ে যেন দেহে প্রাণ ফিরে পাই। শুনলাম তুমি দুষ্কৃতকারীদের ফলো করেছ।’ বলল মারেভা মা।

আহমদ মুসা ভাবল ওরা তাহলে টার্গেট বদলেছে। ওদের হাত থেকে শিকার যে কেড়ে নিয়েছে, তাদের কয়েকজনকে যে গুলিবিদ্ধ করেছে, তার পরিচয় ওরা চায়। এমন ঘটনা বোধ হয় ওদের এটাই প্রথম। তাই প্রতিশোধ নেবার বিষয়টা ওদের কাছে বড় হয়ে উঠেছে। কিন্তু আজ আবার তো সেই ঘটনাই ঘটল। আজও শিকার তাদের হাত ছাড়া হলো।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘খালাম্মা ভাববেন না। এবার আমি ওদের টার্গেট। ওরা মারেভাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল আমার সন্ধান নেবার জন্যে। আজকেও ওরা পরাজিত হয়েছে, ব্যার্থ হয়েছে মারেভাকে কিডন্যাপ করতে। এরপর ওরা শিখ ড্রাইভারেরও সন্ধান চাইতে পারে মারেভার কাছে।’

‘তাহলে বিপদ তো মারেভার থাকছেই। আমার ভয় করছে বেটা। প্রত্যেক দিন তো তুমি থাকবে না মারভাকে রক্ষা করতে।’ বলল মারেভার মা।

‘এবার ওরা যোগাযোগ করলে মারেভা তুমি আমার যে পর্যটক পরিচয় জান, তা এবং আমি কোথায় থাকি সব বলে দিও। আমি চাই ওরা আমার কাছে আসুক। ওদের সাক্ষাত, ওদের ঠিকানা আমার দরকার।’ আহমদ মুসা বলল।

‘এটাই বুঝি হবে স্যারের প্রতি আমার দায়িত্ববোধ! দু’দুবার যিন আমার প্রাণ বাঁচালেন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, তার প্রতি এটাই বুঝি বলল না।’ বলল মারেভা।

‘মারেভা আজ তোমার কিডন্যাপারদের পিছু নিয়ে আমার বিরাট লাভ হয়েছে। আমি যাদের সন্ধানে তাহিতি এসেছি। এরা তারাই। মাহিনের কোম্পানি তাদেরই অংশ। আজ ওদের পরিচয় সর্ম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে গেছে। এখন ওদের পরিচয় যত জানতে পারি ততই আমার লাভ। সম্ভব হলে আমি কালকেই তাহানিয়া দ্বীপটিতে যাব।’ আহমদ মুস বলল।

‘আমি বুঝেছি স্যার। কিন্তু এর ফলে আপনার বিপদে পড়ার সম্ভবনা আছে। যদি তা ঘটে তাহলে আমি নিজেকে মাফ করতে পারবো না স্যার।’ বলল মারেভা।

তাহলে শোন মারেভা, তুমি ও মাহিন কিছুদিন অন্তত বাইরে চলাফেরা বন্ধ করে দাও। আমার সাথে যখন দরকার হবে, তখন আমি তোমাদেরকে বাসা থেকে তুলে নেব। আর তোমাদের কোন কোন সময় ছদ্মবেশ নেয়ার প্রয়োজন হতে পারে, ঝামেলা এড়াবার জন্যে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘স্যার, আপনি কি সত্যি কাল তাহানিয়া দ্বীপে যাচ্ছেন?’ বলল মারেভা।

‘চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেইনি। চিন্তা করে দেখি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমি ও মাহিন কি যাচ্ছি আপনার সাথে?’ বলল মারেভা।

‘পর্যটনে গেলে গাইডরা অবশ্যই যাবে। আর যদি অন্য কোন উদ্দেশ্য যাই, তাহলে গাইডরা সাথে যাবার প্রশ্ন নেই।’ আহমদ মুসা বলল।

মারেভা প্রতিবাদে কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল। এবার গাড়ি থেকে নেমে পাহাড়ের পিকনিক স্পটে উঠেতে হবে।

গাড়ি থেকে সবাই নামল। পাহাড়ে ওঠার জন্য এগোলো সবাই।

# ৭

তাহানিয়া দ্বীপ তন্ন তন্ন করে খুঁজল আহমদ মুসা। কিন্তু সন্দেহ করার মত কিছুই পেল না।

তাহানিয়া একটা নিরেট অ্যাটল দ্বীপ।

কোন জনবসতি নেই এই দ্বীপ।

তবে এই অ্যাটল দ্বীপ একটা ট্যুরিষ্ট স্পট। প্রায় ৭৫ টির মত অ্যাটল দ্বীপ নিয়ে গঠিত তোয়মতো দ্বীপ পুঞ্জে যে ট্যুরিষ্ট রুট রয়েছে তার একটা কেন্দ্র এই তাহানিয়া। বিচিত্র রংয়ের কোরাল ও মাছ দেখা এবং দীর্ঘ লেগুনের সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্যে পর্যটকরা এখানে আসেন। কিন্তু তাহানিয়া অ্যাটলের চার প্রান্ত ঘিরে মাটির যে সীমান্ত রয়েছে তা এতই সংকীর্ণ যে সেখানে কোন স্থাপনা তৈরিই সম্ভব নয়। সুতরাং এ অ্যাটলে কোন স্থাপনা গড়ে ওঠার কোন প্রশ্নই নেই। মাহিনের কোম্পানির যে সাপ্লাই গোডাউন তা তাহানিয়ার পশ্চিম সীমানার বেশ কিছুটা প্রশস্ত। ঐ স্থানটিতেই গড়ে তোলা হয়েছে দ্বিতল সাপ্লাই গোডাউন। গোডাউনটিতে এসি লাগানো।

বোটে বসেই দেখছিল আহমদ মুসা তাহানিয়া অ্যাটল দ্বীপকে।

আহমদ মুসার পরনে খৃষ্টান ফাদারের পোষাক। তামাহি মাহিনের পরনেও তাই। আর মারেভা পরছে খৃষ্টান 'নান'-এর পোষাক।

'মারেভা, মাহিন! মিশন বোধ হয় আমার ব্যর্থ হলো। তাহানিয়া তো দেখছি সর্ব প্রকার বসবাসের অযোগ্য একটা অ্যাটল আচ্ছা, তোমরা কি জান, এই তাহানিয়া দ্বীপের মালিক কে?' আহমদ মুসা বলল।

'সব দ্বীপের মালিক তো ফরাসি সরকার। তাহানিয়ার মালিকও তারাই হবেন।' বলল তামাহি মাহিন।

'তোমাদের কোম্পানি তাহানিয়াতে এভাবে গোডাউন তৈরি করল কিভাবে?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘এভাবে স্থাপনা গড়ার জন্য কোন অ্যাটলের অংশ বিশেষ, এমনকি পুরো অ্যাটলও লীজ নেয়া যায়। নিশ্চয় কোম্পানি তাহানিয়ার এই জায়গাটা গোডাউন তৈরির জন্য লিজ নিয়েছে। আমি শুনেছি, পাশের ছোট্ট অ্যাটল মতুতংগারর গোটাটাই তার লিজ নিয়েছে।’ বলল তামাহি মাহিন।

‘মতুতুংগা গোটাটাই লিজ নিয়েছে? কোনটা সে দ্বীপ?’ আহমদ মুসা বলল। তার চোখের অনুসন্ধিৎসা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে।

‘তাহানিয়ার দক্ষিণ পাশে একেবারে লাগোয়া। বোটে দাঁড়ালেও অ্যাটলটা আপনার চোখে পড়বে।’ বলল তামাহি মাহিন।

‘সে অ্যাটল দ্বীপটা কেমন? ল্যান্ড বেল্ট কেমন সে অ্যাটলের?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার। প্রবল আগ্রহ ঝরে পড়ল তার কন্ঠে।

‘স্যার, বলেছি তো দ্বীপটা তাহানিয়ার প্রায় চার ভাগের এক ভাগ। অ্যাটলের চার পাশের ল্যান্ড বেল্টের আয়তন তাহানিয়ার চেয়ে ভাল নয়। মতুতুংগা নামে এই অ্যাটল দ্বীপটিতে মানুষ বাস করে না।’ বলল তামাহি মাহিন।

‘তাহলে তোমাদের কোম্পানি ছোট্ট এই অ্যাটলটি কিনল কেন?’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমিও বুঝতে পারছি না কিনল কেন? ঐ দ্বীপ এমন কিছু নেই যা কাজে লাগতে পারে, অর্থকরি হতে পারে।’

তামাহি মাহিনের এই কথাগুলো আহমদ মুসার কানে গেল না। গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে সে। তামাহি মাহিনের কোম্পানিই যে ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেট তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। তাদের ঘাঁটি যে তোয়ামতো দ্বীপপুঞ্জের কোন অ্যাটলে তাতেও কোন সন্দেহ নেই। এই তাহানিয়া দ্বীপ নিয়ে কোন রহস্য আছে। তাও বলা যায় নিশ্চিত করেই। এই দ্বীপে এই ছোট বেঢপ গোডাউন এখানে হলো কেন? এখান শাক-শব্জির চালান কোথায় যায়? গোডাউন এখানে হলো কেন? তাহলে ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের সেই ঘাঁটি আশে-পাশেই কোথাও! মানব বসতিহীন, উপযুক্ত ভূমির সুযোগ নেই এমন ছোট এই অ্যাটল মতুতুংগা ওরা লীজ নিল কেন? এসব প্রশ্নের জবাব অবশ্যই আছে। কি সে জবাব?

আহমদ মুসা যখন ভাবনা আর অনেক প্রশ্নের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে, তখন তার পাশের ব্যাগ থেকে ভেসে আসা মাল্টিওয়েভ সিগন্যাল মনিটরিং (MOSM) বিপ বিপ শব্দ করে তার ভাবনার জাল ছিঁড়ে দিল। জেগে ওঠা বা সতর্ক হবার এক প্রচন্ড প্রবাহ খেলে গেল তার সারা দেহে।

এই মাল্টিওয়েভ সিগন্যাল মনিটরিংটি (MOSM) অ্যাকটিভ করেছিল।

মাল্টিওয়েভ মনিটরিং এর বিপ বিপ শব্দ শুনে চমকে উঠল আহমদ মুসা। অনেক পরে হলেও প্রয়োজনীয় এ যন্ত্রটির মিষ্টি বিপ বিপ শব্দ তার কানে বাজে। কিন্তু এখানে বিপ বিপ শব্দ আসবে কোথেকে? চারদিকে অথৈ আদিগন্ত সাগর। চারদিকের অ্যাটলগুলেত তেমন জনবসতিই নেই, ওয়েব সিগন্যাল কোথা থেকে আসবে?

পাশের ব্যাগ থেকে মাল্টিওয়েভ মনিটরিং 'মম' বের করে নিয়ে কল অন করে রেকর্ডে চাপ দিয়ে কানে ধরল। একটা শক্তিশালী কন্ঠের স্পষ্ট কথা ভেসে এল, 'SOS' সেভ আওয়ার সোল, উই আর সেভেনটি সিক্স (আমাদের বাঁচান, আমরা ৭৬জন)।' কথাটা উচ্চারণের পরেই আকস্মিক তা বন্ধ হয়ে গেল। যেন সশব্দে কিছু আছড়ে পড়ে লাইন কেটে গেল।

আহমদ মুসা বার বার হ্যালো করে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করলো, কিন্তু লাইন আর ফিরে এলো না।

হতাশ আহমদ মুসা 'সেভ' বাটনটি টিপে 'মম'টি রেখে দিল।

স্তম্ভিত বাকহীন অবস্থা আহমদ মুসার। তার শূন্য দৃষ্টি সামনে প্রসারিত। এই 'এস ও এস' কাদের আর্তনাদ? ব্লাক সান সিন্ডিকেট যাদের আটক রেখেছে, তাদের সংখ্যা তো এ রকমই। কোথেকে এল এই এস ও এস? তা এক বর্গমাইলের মধ্যে হবে নিশ্চয়। এর অর্থ ই অ্যাটল দ্বীপপুঞ্জেরই কোন অ্যাটল থেকে এসেছে এই এস ও এস।

বিস্ময় ও উদ্বেগ ভরা দৃষ্টি নিয়ে মারেভা ও মাহিন তাকিয়ে আছে আহমদ মুসার দিকে। তাদের মনেও অনেক প্রশ্ন, তাদের স্যারকে এখানে কে ম্যাসেজ পাঠাল। হটাৎ তা আবার কেটে গেল? কল পাবার পর তাদের স্যার এমন স্তম্ভিত

ও বাকহীন হয়ে গেল কেন? কখনও কোন বিপদেই তো তাকে এমন অবস্থায় দেখিনি!

অস্বাভাবিক একটা নিরবতা।

নিরবতা ভাঙল মারেভাই। বলল, ‘স্যার, কোন খারাপ কিছু? আমরা কি জানতে পারি?’

মুখ তুলল আহমদ মুসা।

মুখ তার গম্ভীর। বলল, ‘আমার মাল্টিওয়েভ মনিটরিং-এ একটা ‘এস ও এস’ ধরা পরেছে। আমি সেটা নিয়েই ভাবছি।’

‘এস ও এস কি?’ এক সাথেই বলে উঠল মারেভা ও মাহিন।

আহমদ মুসা তার মাল্টিওয়েভ মনিটরিং-’মম’ তুলে নিয়ে মেসেজ অপশনে গিয়ে ‘প্লে’তে চাপ দিয়ে লাউড স্পীকার অন করল।

বেশ উঁচু শব্দেই এবার ‘এস ও এস’ স্পষ্ট কানে এল।

‘ও গড! ৭৬জন মানুষের জীবন বিপন্ন? কিন্তু লোকেশন তো বলল না?’ বলল তামাহি মাহিন।

‘তার আগেই তার কন্ঠ বন্ধ হয়ে গেছে। যে অয়্যারলেস বা যে মাধ্যমে কথা বলছিল তা হয়তো তার হাত থেকে ফেলে দেয়া হয়েছে। কথার পরবর্তী শব্দগুলো একথাই বলে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘সর্বনাশ! তাহলে বন্দী কিছু লোকের ‘এস ও এস’ এটা।’ বলল মারেভা। তার চোখে মুখে উদ্বেগ।

‘অবশ্যই মারেভা।’ আহমদ মুসা বলল।

বিস্ময় বেদনামিশ্রিত স্থির দৃষ্টি মাহিনের আহমদ মুসার দিকে। বলল সে, ‘এরা কারা স্যার? এর কি তারা যাদের খোঁজে আপনি এ্রখানে এসেছেন?’

‘আমি নিশ্চিত মাহিন এরা তারাই। এই অ্যাটল দ্বীপপুঞ্জে তারা ছাড়া এত সংখ্যায় বিপদগ্রস্থ হবার আর কেই নেই।’ আহমদ মুসা বলল।

আতংক ফুটে ওঠে মারেভা ও মাহিন দু’জনের মুখে চোখেই। মুখ শুকিয়ে গেছে তাদের। বলল মারেভা কম্পিত কন্ঠে আস্তে আস্তে, ‘এত ষড়যন্ত্রের ঘাঁটি

আমাদের অ্যাটলের কোথাও? কিন্তু এমন জায়গা কোথায় স্যার? এই এস ও এস কোথেকে আসল, এই দ্বীপপুঞ্জ থেকেই যে আসল, কি করে বুঝলেন?'

'আমার এই মাল্টিওয়েভ সিগন্যাল মনিটরিং-এর রেঞ্জ এক বর্গমাইল। এক বর্গমাইলের ভেতরের সিগনাল বা মেসেজই শুধু এই মনিটরে ধরা পড়ে। তার মানে এই এস ও এস এসেছে আমরা যেখানে বসে আছি তার চারদিকের এক বর্গমাইল এলাকার যে কোন এক স্থান থেকে।' আহমদ মুসা বলল।

'তাহলে হতে পারে স্যার, আমরা ষড়যন্ত্রের আশে পাশেই আছি।' বলল মারেভা। ভীত ও শুকনো কন্ঠ তার।

'স্যার, কোন উপায় আছে, মেসেজের উৎস স্থানটিকে লোকেট করার।' উদ্বেগ জড়িত ফিসফিসে কন্ঠে বলল তামাহি মাহিন।

'মেসেজ বা সিগনাল চলা অবস্থায় এর উৎস চিহ্নিত করার সহজ ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ওল্ড মেসেজ বা সিগন্যালের উৎস চিহ্নিত করতে হলে একটা হলে একটা অংক কষতে হবে। সেটাই আমরা এখন করব।'

বলে আহমদ মুসা তাকাল মারেভার দিকে। বলল, 'কাগজ কলম নাও মারেভা।'

মাল্টিওয়েভ সিগন্যাল সিগন্যাল মনিটরিং-এ আবার মনোযোগ দিল আহমদ মুসা। এস ও এস মেসেজটি আবার অন করে সাউন্ড অপশনে গিয়ে অটোকাট বাটন চেপে দেখল শতভাগ সাউন্ডের ৭৫ ভাগ শক্তি অক্ষত আছে। তার মানে কাট হয়েছে ২৫ ভাগ।

আহমদ মুসা আবার তাকাল মারেভা দিকে। বলল, 'আমার এই মাল্টিওয়েভ মনিটরিং-এ সাইন্ডের উৎসে সাইন্ডের শক্তি থাকে হানড্রেড পারসেন্ট। আর সাউন্ডের উৎস থেকে এক পয়েন্ট মানে এক মাইল দূরে এই সাউন্ডের মুভিং পাওয়ার জিরো। এখন হিসেব করো সাউন্ডের পঁচিশ ভাগ মুভিং পাওয়ার যদি লষ্ট হয়, তাহলে পঁচিশ ভাগ সাউন্ড লষ্ট হওয়ার উৎস থেকে সাউন্ডের আসল উৎসটা কত দূরে।'

'এ আর হিসাব কি করবো স্যার। সোজা হিসাব, উৎসটি চারশ চল্লিশ গজ দূরে।'

‘৪৪০ গজ মানে উৎসটি এখান থেকে ১৩২০ ফুট দূরে। ধন্যবাদ মারেভার।’

বলে আহমদ মুসা মাল্টিওয়েভ সাউন্ড মনিটরিং স্ক্রিণে আবার চোখ নিবদ্ধ করল। এস ও এস মেসেজের অপশনে আবার গিয়ে ডাইরেক্ট বাটনে চাপ দিল। সংগে সংগেই স্ক্রিনে ‘শূন্য এস শূন্য’ (OSO) বর্গ-অংক ভেসে উঠল।

মুখ উজ্জল হয়ে উঠল আহমদ মুসার। বলল, ‘আল-হামদুল্লিহ!’ মারেভা, মাহিন উৎসটি এখান থেকে একদম সোজা দক্ষিণে।’

মারেভা ও মাহিন অনেকটা চমকে উঠেই যেন সোজা হয়ে বসল। তাদের চোখে মুখে ভয় ও আনন্দের অদ্ভূত এক মিশ্র দৃশ্য। তাকাল একে-অপরের দিকে। তারপর তাকাল আহমদ মুসার দিকে। দুই জনের মুখ থেকেই এক বেরিয়ে এল, ‘সোজা দক্ষিণে এই রকম দূরত্বে তো ‘মতুতুংগা’ ছাড়া আর কোন দ্বীপ নেই। প্রায় সমদূরত্বের তেপেতো দ্বীপ সোজা দক্ষিণে নয় দক্ষিণ-পূর্বে।’

‘হ্যাঁ মারেভা, মাহিন! আমি যে দ্বীপের সন্ধানে এসেছি সে দ্বীপ এই মতুতুংগা।’ বলল আহমদ মুসা।

‘এস ও এস-এর দ্বীপ, সেই ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের দ্বীপ তাহলে মতুতুংগা! বলল মারেভা ও মাহিন দু’জনে এক সাথেই। তাদের চোখে মুখে আতংক ও আশার এক অদ্ভুত দৃশ্য।’

পরবর্তী বই

# প্যাসেফিকের ভয়ংকর দ্বীপে


## কৃতজ্ঞতায়ঃ

1. Zahir Raihan
2. Bondi Beduyin

সাইমুম-৫১

# প্যাসেফিকের ভয়ংকর দ্বীপে

আবুল আসাদ

# ১

ইয়াংম্যান, তুমি যা বলেছ তার সরল অর্থ হলো কোন অ্যাটল দ্বীপে বাইরে থেকে সহজে দেখা যায় না এমন কোন স্থাপনা গড়ে তোলা সম্ভব কি না? এর সরল উত্তর হলো, সম্ভব নয়। কারণটা দেখ, একটা অ্যাটলে কি থাকে? চারদিকের সংকীর্ণ অথবা কিছুটা প্রশস্ত ভূমি সীমানা, এই ভূমি সীমানার মাঝখানে থাকে লেগুন।লেগুনের নিচে থাকে কোরাল লাইমস্টোনের সলিড বেজ। এই বেজটা ধীরে ধীরে এখানে উঠে এসেছে সাগরের ফ্লোর থেকে। পানির নিচে অ্যাটলের এই সলিড বেজের চারিদিকের দেয়াল নানা রকমের হতে পারে। মসৃণ হতে পারে, এবড়ো-থেবড়ো হতে পারে, সূচালো অথবা ভোঁতা কোরালের ঝাড়ে পূর্ণও হতে পারে। এসব নিয়েই একটা অ্যাটল দ্বীপ। এর মধ্যে ইনডিভিজুয়াল স্থাপনা গড়ে উঠার সুযোগ কোথায়?

কথাগুলো বলছিল ইজিচেয়ারে শোয়া শুভ্র কেশ, শুভ্র ভ্রূর একজন বৃদ্ধ। মুখের চামড়াও তার অনেক কুঁচকানো। উজ্জ্বল সোনালী চেহারায় তার চোখ দু'টি খুবই সজীব ও তীক্ষ্ণ।

বৃদ্ধের নাম অধ্যাপক টেপোয়া তাতিহিতি।

তাহিতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওসেনিক ল্যান্ড-সাইন্সের সাবেক অধ্যাপক। গোটা প্রশান্ত মহাসাগর এলাকায় এই বিষয়ে সে অদ্বিতীয় বিশেষজ্ঞ। দুনিয়াজোড়া নাম তার। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হওয়ার সাথে সাথে সে প্যাসিফিক আইল্যান্ড ইন্সটিটিউটের প্রধাণও ছিল।

অধ্যাপক টেপোয়া তাতিহিতি মারেভার বাবার শিক্ষক ছিল। আবার তার পারিবারিক বাড়ি "আরু"তে। এই কারণে মারেভাদের ঘনিষ্ঠ পারিবারিক সম্পর্ক আছে অধ্যাপক টেপোয়া তাতিহিতির পরিবারের সাথে।

মারেভাই আহমদ মুসাকে নিয়ে এসেছে অধ্যাপক টেপোয়া তাতিহিতির কাছে। অ্যাটল দ্বীপগুলোর কম্পোজিশন সম্পর্কে আহমদ মুসা জানতে চায়। আর জনতে চায় অ্যাটলগুলোতে কোন গোপন স্থাপনা কিভাবে গড়ে উঠতে পারে।

আহমদ মুসা তার মাল্টিওয়েভ মনিটরে পাওয়া এসএমএস মতুতুংগা দ্বীপ থেকেই এসেছে এটা নিশ্চিত হবার পর ভেবে কুল-কিনারা পাচ্চে না। ছোট এই দ্বীপের কোথা থেকে তার কাছে এসওএস বার্তা এল!চারদিকে ঘুরে সে মতুতুংগা দ্বীপটাকে দেখেছে। তাছাড়া কম্পিউটারে দ্বীপটির স্যাটেলাইট ইমেজ সে পরিক্ষা করেছে। এতে উপরের সারফেস ছাড়াও দ্বীপটির পানির তলের বেজটাকেও সে ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছে। কিন্তু প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। এই অবস্থায় মারেভা তাঁকে নিয়ে এসেছে অধ্যাপক টেপোয়া তাতিহিতির কাছে।

অধ্যাপক তাতিহিতি "আরু"তে তার পৈত্রিক বাড়িতে অবসর জীবনযাপন করছে। সারা জীবন ধরে সমৃদ্ধ করে তোলা পৈত্রিক পাঠাগারে পড়াশুনা, বাড়ির চারদিকের বাগানের টুকিটাকি পরিচর্যা ও বাগানে ঘুরে বেড়িয়েই তার সময় কেটে যায়। আজ খুশি হয়েছে সে আহমদ মুসাদের পেয়ে।

অধ্যাপক টেপোয়া তাতিহিতির কথা শেষ হতেই আহমদ মুসা বলল, কিন্তু স্যার, আমি নিশ্চিত একটি অ্যাটলে গোপন স্থাপনা আছে এবং সেখানে মানুষও আছে। যদি এটা সত্য হয়, তাহলে গোপন স্থাপনা কিভাবে গড়ে উঠল?

তুমি 'যদি' শব্দ ব্যবহার করেছ। কিন্তু এই 'যদি'টাকে সত্য বলে নিশ্চিত হচ্ছো কেমন করে, ইয়ংম্যান? বলল অধ্যাপক টেপোয়া তাতিহিতি।

স্যার, আমি ঐ দ্বীপের এক স্থান থেকে একটি এসওএস বার্তা পেয়েছি। আহমদ মুসা বলল।

তুমি কি করে নিশ্চিত হচ্ছো, এসওএস বার্তাটা ঐ অ্যাটল থেকেই এসেছে? বলল অধ্যাপক তাতিহিতি।

আহমদ মুসা তার অংকের বিবরণ দিয়ে বলল, আমার হিসাবে কোন ভুল হয়নি স্যার।

অধ্যাপক টেপোয়া তাতিহিতি মাথা নেড়ে বলল, ইয়াংম্যান, অংক তোমার ঠিক আছে।কিন্তু অ্যাটলে গোপন স্থাপনা কোত্থেকে আসবে, সে অংক তো মিলছে না!

আহমদ মুসা ভাবছিল। বলল, স্যার, অ্যাটলের কোরাল স্টোন বেজ যা সাগরের ফ্লোর থেকে উঠে এসেছে, তা কি সব সময় সলিড হতে বাধ্য? দেয়ালঘেরা ঘরের মত ফাঁপা হয়ে উঠতে পারে না তা? এভাবে তা কি লেগুনের ফ্লোরের নিচে কোন স্থাপনা গড়ার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে না?

আহমদ মুসার প্রশ্ন শুনে অধ্যাপক টেপোয়া তাতিহিতি ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিল।সংগে সংগে উত্তর দিল না। তার চোখ বুজে গিয়েছিল। ভাবছিল সে।

এক সময় চোখ খুলল অধ্যাপক টেপোয়া তাতিহিতি। সোজা হয়ে বসল। তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, ইয়ংম্যান, তুমি কি বলতে চাচ্ছ আমি বুঝেছি। স্রষ্টার সৃষ্টি বড় বিচিত্র।এর কতটুকু আমরা জানি। এখানে সম্ভব-অসম্ভবের সীমারেখাও টানা যায় না। অতএব, তুমি য বলছ থাকতে পারে, আবার নাও পারে। বিজ্ঞানের কথা যদি বল তাহলে বলব কোরাল স্তরের বৈচিত্রময় গঠনের ব্যাখ্যা বৈজ্ঞানিক মাপ-জোক থেকে পাওয়া যাবে না। এগুলো মহান স্রষ্টার ইচ্ছার সৃষ্টি।তুমি অ্যাটলের বেজে কোরাল স্টোন ওয়ালকে যেমন ফাঁপা হওয়ার কথা বলছ, তা স্রষ্টার ইচ্ছার আওতার বাইরে নয়।

বলে থামল অধ্যাপক তাতিহাতি। হঠাৎ তার মুখে ভাবনার একটা ছাপ ফুটে উঠল। তার সাথে সাথে তার ঠোঁটে দেখা গেল এক টুকরো হাসিও। তাকাল সে মারেভা মাইমিতির দিকে। বলল, মারেভা, তোমার নিশ্চয় মনে আছে জগতেশ্বরী ও প্রথম মানবী হিনা, প্রিন্স হেসানা হোসানা ও সাগর-রূপা জলকন্যা

ভাইমিতি শাবানুর কাহিনী। এই কাহিনীতেই আছে প্রিন্স হেসোনা হোসানার প্রতি সদয় জগতেশ্বরী হিনা পাগল প্রেমিক প্রিন্সকে তার প্রেমিকা ভাইমিতি শাবানুর সাথে দেখা করিয়েছিল পানির তলে অ্যাটলের এক প্রাসাদে। অ্যাটলের পানির তলে মানে অ্যাটলের বেজ এলাকায় যে প্রাসাদ থাকতে পারে, তাহিতি এলাকার এই কাহিনীতে তার একটা প্রমাণ পাওয়া যায়।

অধ্যাপক তাতিহিতি থামতেই আহমদ মুসা বলে উঠল, কাহিনীটা কি স্যার?

রূপকথা যেমন হয়, এ তেমনি এক কাহিনী। এটা পমারে রাজবংশের এক রাজপুত্রের কাহিনী।

বলে একটু থামে অধ্যাপক তাতিহিতি তাকাল মারেভা মাইমিতির দিকে। বলল, মারেভা, তুমি জানলে কাহিনীটা, বল।

মারেভার মুখ লাল হয়ে উঠল। এক ছোপ লজ্জা এসে ঢেকে দিল তার চোখ-মুখ। সে মুখ নিচু করল।

হাসল অধ্যাপক তাতিহিতি। বলল, ঠিক আছে, আমিই বলছি।বলে শুরু করল অধ্যাপক তাতিহিতিঃ অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে ইউরোপিয়দের আগমন শুরু হয় প্রশান্ত মহশাগরীয় অঞ্চলে। কিন্তু তার আগে কয়েক শতাব্দী ধরে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপাঞ্চলে অনেক রাজবংশের উত্থান ঘটে। তাহিতিতেও এমন একটি রাজবংশ কয়েক শতাব্দী ধরে রাজত্ব করেছে। তাহিতির পমাতে রাজবংশ এদেরই উত্তরসূরি। ঐ রাজবংশের নামও এখন জানা নেই।সেই অজানা বংশের এক রাজপুত্র ছিল হেসোনা হোসানা, যার অর্থ সুন্দর ও শক্তির রাজমুকুট। এই সুন্দর রাজপুত্রের শখ ছিল সাগরে ঘুরে বেড়ানো। মাঝে মাঝেই তার নিরুদ্দেশ যাত্রা হতো সাগরে। দিন, রাত, সপ্তাহ গড়িয়ে যেত সে বাড়িতে ফিরতো না। এ দ্বীপ থেকে সে দ্বীপে, এ অ্যাটল থেকে সে অ্যাটলে ঘুরে বেড়াত। তার পালতোলা সাগরজ্বয়ী সুদৃশ্য রাজকীয় বোটে একাই ঘুরে বেড়াত সে। একদিন এক জ্যোৎস্না-গলানো সুন্দর রাতে তার বোট নোঙর করা ছিল এক অ্যাটলের তীরে। বোটের ডেগে বসে সে তন্ময় হয়ে উপভোগ করছিল জ্যোৎস্নাপ্লাবিত সাগরের নিরব-নিঝুম সৌন্দর্য। এই সময় পুব সাগরের বুক থেকে উঠে আসে এক খন্ড কালচে

রক্তিম মেঘ। শুরু হয় প্রবল ঘুর্ণি। সে ঘুর্ণিতে তলিয়ে যায় তার বোট। সেও ছিটকে পড়ে যেন কোথাও! নিজেকে হারিয়ে ফেলে সে। নিজেকে আবার ফিরে পেয়ে যখন সে চোখ খুলে, তখন সে দেখে সুসজ্জিত ঘরের অসম্ভব সুন্দর এক নরম বিছানায়। চোখ ঘুরাতে গিয়ে তার চোখ পড়ে পাশেই সুন্দর আসনে বসা নীল বসনা, নীল নয়না এক অপরূপ সুন্দরীর উপর। তার সাগর-নীল রাজকীয় পোষাকের উপর তার সাগর নীল দোপাট্টা মাথা থেকে কপাল পর্জন্ত নেমে এসেছে। চাঁদের মতো মুখটিই শুধু তার খোলা। চাঁদে কলংক আছে, কিন্তু তার দুধ-আলতা মুখে কোন কলংক নেই। রাজপুত্রের চোখ যেন বাঁধা পড়ে গেল তার মুখে! চোখ সরাতে পারল না রাজপুত্র। পল পল করে সময় বয়ে গেল। দৃষ্টি ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তবু পলক পড়ে না চোখে। নিল-নয়না সুন্দরী তার চোখ সরিয়ে নিল ঠোঁটে এক টুকরো হাসি টেনে। বলল শাহজাদা আপনি এখন সুস্থ। আপনার বোটও ঠিক হয়ে গেছে। সেটাও তৈরি। আপনি ইচ্ছা করলে এখনই উঠতে পারেন।

রাজপুত্র তখনও তার চোখ সরাতে পারেনি। সুন্দরীর কথাগুলো তার কানে যেন অমৃত ঢেলে দিল! তাহিতি ভাষায় এমন শুদ্ধ, মিষ্টি উচ্চারণ আগে সে শোনেনি।

সুন্দরীর চোখ ঘুরে এল আবার রাজপুত্র হেসানা হোসানার মুখের উপর। আবার আটকা পড়ে গেল দুই জোড়া চোখ।

সুন্দরীর চোখে-মুখে ফুটে উঠল সলাজ হাসি। সে মুখ নিচু করল। বলল, তাহলে শাহজাদা, আরও একটু বিশ্রাম করুন।

উঠতে যাচ্ছিল সুন্দরী।রাজপুত্র হেসানা হোসানা বলল, আমি কোথায় রাজকন্যা?

সুন্দরী মিষ্টি হাসল। বলল, আমি রাজকন্যা নই। আমি বলতে পারেন, সাগরকন্যা। আপনি অ্যাটল রাজ্যের এক প্রাসাদে, মানে অ্যাটলের এক নিবাসে।

যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল সুন্দরী। রাজপুত্র হেসানা হোসানা বিছানায় উঠে বসল। বলল, আপনার নাম কি?

সুন্দরী তার নিচু মুখ না তুলেই বলল, আমি ভাইমিতি শাবানু। বলেই সুন্দরী ভাইমিতি শাবানু পা তুলল যাবার জন্যে।

রাজপুত্র নিজেকে প্রকাশ করার জন্যে মরিয়া হয়েই বলল, আমি যদি না যেতে চাই? আমি যাব না।

পেছনে না তাকিয়েই ভাইমিতি শাবানু সেই মিষ্টি হেসে বলল, অতিথিশালা তো কারো বাড়ি হয় না! এখানে অতিথিরা আসেন চলে যাবার জন্যেই। আপনিও যাবেন।

বলে চলে গিয়েছিল ভাইমিতি শাবানু।

চলেই আসতে হয় রাজপুত্র হেসানা হোসানাকে। দ্বিতীয়বার এসে ভাইমিতি শাবানু যখন রাজপুত্রের চোখে চোখ রেখে বলল, আসুন শাহজাদা। তখন কি এক অমোঘ টানেই রাজপুত্র উঠে দাঁড়াল, যেন এমন মিষ্টি ডাক উপেক্ষা করার সাধ্য তার নেই।

রাজপুত্র হেসানা হোসানা যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালে ভাইমিতি শাবানু বলল, শাহজাদা, এবার আপনি দুই চোখ বন্ধ করবেন। আমি আপানকে হাত ধরে নিয়ে যাব।

রেশমের নরম গলার এই মিষ্টি আদেশও রাজপুত্র সংগে সংগেই পালন করল।চোখ বন্ধ করল সে।

ধন্যবাদ! বলে ভাইমিতি শাবানু তার হাত ধরে সামনে এগিয়ে নিয়ে চলল।

ভাইমিতি শাভানুর স্পর্শে রাজপুত্র হেসানা হোসানার দেহের প্রতিটি পরমাণু যেন জেগে উঠল, শিহরিত হলো! কারও স্পর্শ যে এত মিষ্টি, এত মধুর হতে পারে, তা রাজপুত্রের কল্পনারও বাইরে ছিল।

রাজপুত্র হেসানা হোসানাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, কিভাবে নিয়ে যাচ্ছে, সেসব নিয়ে রাজপুত্রের কোন মাথা ব্যথা ছিল না। অন্য কিছু ভেবেই স্পর্শের অনুভূতি সে বিচ্ছিন্ন হতে চাইছিল না। তবে সে ক্রমশ উপরে উঠছিল সেটা তার পা-ই বলে দিচ্ছিল।

উপরে উঠা এক সময় শেষ হলো। তারপর আরো একটু পথ চলা।

আবার থমকে দাঁড়ানো।

ভাইমিতি শাবানুর নরম মিষ্টি গলা শুনতে পেল রাজপুত্র। বলল, একটু দাঁড়াতে হবে শাহজাদা। বিশ, ত্রিশ সেকেন্ড পরে একটা শব্দ হবে, তারপর আপনি চোখ খুলবেন।

বলে ভাইমিতি শাবানু রাজপুত্র হেসানা হোসানার হাত ছেড়ে দিল। মেয়েটি হাত ছেড়ে দেবার সাথে সাথে রাজপুত্রের মনে হলো তার দেহ জুড়ে জ্বলে থাকা উজ্জ্বল বাতি যেন নিভে গেল। সব শক্তি কেউ শুষে নেয়ার মত দেহটা তার দুর্বল হয়ে পড়ল। একটা শব্দ হলো। মিষ্টি একটা শিসের শব্দ।

চোখ খুলল। দ্রুত চোখ বুলাল চারিদেকে। মেয়েটি নেই।কেউ কোথাও নেই। চারিদিকে পানি। সে এক অ্যাটলের সরু তীরে দাঁড়িয়ে আছে। তার একপাশে সাগর, অন্য পাশে অ্যাটলের লেগুন। পাশে দক্ষিনে আর একটা অ্যাটল আছে, সেটা প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে। তার বোটটি হালকা দোল খাচ্ছে সাগরের পানিতে। বোটটি আগের মতোই বাঁধা অ্যাটলের তীরে। কিন্তু মেয়েটি গেল কোথায়? মাত্র বিশ-ত্রিশ সেকেন্ডের ব্যবধান, কোথায় গেল মেয়েটি? রাজপুত্রের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল! সব হারানোর হৃদয়-ভাঙ্গা অনুভূতি নিয়ে সে বসে পড়ল অ্যাটলের তীরে।

মিনিট যায়, ঘন্টা যায়, দিন যায়, রাজপুত্র সে অ্যাটলের তীর থেকে ওঠেনি। তার মুখে একটাই কথা বারবার, কোথায় গেল আমার ভাইমিতি শাবানু?

কয়েকদিন পর রাজার একটি সন্ধানী দল গিয়ে তাঁকে অ্যাটলের তীর থেকে মুমূর্ষ অবস্থায় তুলে আনে। তাকে নিয়ে আসে রাজধানী আরুতে। সে সুস্থ হয়, কিন্তু ভাইমিতি শাবানুর নাম তার মুখ থেকে যায় না। ডাক্তার-কবিরাজ ও ভূত-প্রেতের তান্ত্রিকরাও তাঁকে দেখে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। তাঁকে বুঝানো হয় ভাইমিতি অদৃশ্য জগতের সাগরকন্যা, শাবানু হতে পারে তার নাম। সে অদৃশ্য জগতের বাসিন্দা, অদৃশ্য হয়ে গেছে। তাঁকে রাজপুত্রের মতো মানুষ পাবে কি করে? কিন্তু কোন বুঝই সে নেয়নি। তার সাগরে ঘুরাঘুরি আগের চেয়ে অনেক বেড়ে যায়। রাত-বিরাত, বৃষ্টি-খরা, কোন কিছুরই তোয়াক্কা নেই, তার বোট ঘুরে বেড়ায় সাগরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত, সবখানে। চারিদিকের নিঝুম নিরবতার

মাঝে ধ্বনিত তার একটি মাত্র নামের উচ্চারণ-ভাইমিতি শাবানু, আমার ভাইমিতি শাবানু!

জগতেশ্বরী 'হিনা' অবশেষে সদয় হন পাগল প্রেমিক রাজপুত্রের প্রতি। আগের মতোই জ্যোৎস্না-গলা এক চাঁদনী রাতে রজপুত্র হেসানা হোসানার বোট নোঙর করা ছিল সেই অ্যাটলের তীরে।জগতেশ্বরী 'হিনা' নেমে আসে।আসে সে অ্যাটলের তীরে। ঘুমন্ত রাজপুত্রকে তুলে নিয়ে নেমে যায় অ্যাটলের তীর থেকে। অ্যাটল-তীরের মাটি ফুঁড়ে ঢুকে যায় ভেতরে। চলে যায় অ্যাটলের সেই রাজপ্রাসাদে। তাঁকে শুইয়ে দেয় দুগ্ধ ফেনায়িত মনোহরা নরম সেই বিছানায়। ঘুম থেকে জেগে উঠলে সেখানেই আবার দেখা হয় ভাইমিতি শাবানুর সাথে।মিলন হয় দুই হৃদয়ের। রাজপুত্র তাকে জড়িয়ে ধরে বলে, সবাই বলে তুমি অদৃশ্যের সাগরকন্যা, হারিয়ে যাবে না তো আবার। অদৃশ্য থেকে হাসেন জগতেশ্বরী'হিনা'। রাজপুত্রের উদ্দেশ্যে তার কন্ঠ ধ্বনিত হয়ঃ না রাজপুত্র, ভাইমিতি শাবানু মায়া নয়, মানবী, তাইতো তোমাদের মিলন হলো। আমি আনন্দিত, নিমজ্জিত, ধ্বংসপ্রাপ্ত মহাদেশ 'মু'-এর এক মহাগুণী, মহাজ্ঞানী বংশধরের সাথে নতুন প্যাসিফিক কন্টিনেন্টের এই প্রথম মিলন। কাহিনীর এখানেই শেষ। তবে আরও কথা প্রচলিত আছে, রাজপুত্র নাকি এরপর গোপনে আসতো রাজধানীতে, ঘুরে বেড়াতো সাগরেও ভাইমিতি শাবানুকে নিয়ে কাহিনীর শেষ অংশ নাকি সেই জানিয়ে গেছে সবাইকে।

থামল অধ্যাপক তাতিহিতি দীর্ঘ কাহিনী বলা শেষ করার পর।

অত্যন্ত মনোযোগের সাথে আহমদ মুসা অধ্যাপক তাতিহিতির কথা শুনছিল। রূপকথা হিসাবেই সে শুনছিল কিন্তু শুনতে গিয়ে মাঝে মাঝেই তার চোখে-মুখে যে বিস্ময়ের সৃষ্টি হচ্ছিল, তা অবশ্যই রূপকথা শুনে হয় না।

অধ্যাপক তাতিহিতি থামতেই আহমদ মুসা বলল, স্যার, আপনার কাহিনী রুপকথা হলেও বাস্তবতার কিছু উপাদান তার মধ্যে আছে! যা আমার কাছে সত্যিই বিস্ময়কর লাগছে।

যেমন? বলল অধ্যাপক তাতিহিতি।

যেমন এক.যে অ্যাটলের অবস্থানরত অবস্থায় রাজপুত্র ঝড়ের কবলে পড়ে সংজ্ঞা হারিয়ে অ্যাটলের প্রাসাদে গিয়েছিল, সেই অ্যাটল থেকেই আবার তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় সেই অ্যাটল প্রসাদে নিয়ে যাওয়া হয়। দুই.অ্যাটলের প্রাসাদ থেকে রাজপুত্র ভাইমিতি শাবানুর হাত ধরে বেরিয়ে এসেছিল ক্রমঊর্ধ্বমুখী এক পথে বা সিঁড়িপথে। তিন. সংজ্ঞা হারিয়ে যে অ্যাটলের যেখান থেকে অ্যাটলের প্রসাদে নীত হয়েছিল, সে অ্যাটলের সেখানেই সে ওঠে। চার. ভাইমিতি শাবানু রাজপুত্রকে অ্যাটলের তীরে পৌঁছে দিয়ে ফেরার জন্য বিশ-ত্রিশ সেকেন্ড সময় নিয়েছিল, সে সময় রাজপুত্রকে তার চোখ বন্ধ রাখতে হয়েছিল, পাঁচ. জগতেশ্বরী ‘হিনা’ ভাইমিতি শাবানুকে ‘মানবী’ বলেছে এবং ছয়. কাহিনীতে রাজপুত্রের নাম ‘হোসানা’ শব্দ এবং কথিত সাগরকন্যার নামের সাথে ‘শাবানু’ শব্দটি বিস্ময়কর এক বাস্তবতার ইংগিতবহ। বলল আহমদ মুসা।

অধ্যাপক তাতিহিতি ভ্রূ কুঞ্চিত করে খুব অভিনিবেশ সহকারে আহমদ মুসার কথা শুনছিল। আহমদ মুসার কথা শেষ হবার পরও ভাবল। বলল, বৎস, তুমি বলতে চাচ্ছ, কাহিনীটা রূপকথা হলেও বাস্তবতার এই উপাদানগুলো তার মধ্যে আছে। এই উপাদান মানে এই বিষয়গুলোর তুমি কি অর্থ করছ তা একটু বুঝিয়ে বলতে হবে ইয়ংম্যান।

অবশ্যই স্যার। প্রথমে একই স্থান থেকে প্রথমবার ও দ্বিতীয়বার অ্যাটল থেকে রাজপুত্রকে নেয়ার কথা বলি। স্থান-কাল-পাত্র সবই রূপকথা হলে এমনটা নাও হতে পারতো। জগতেশ্বরী ‘হিনা’ যে কোন স্থান থেকে রাজপুত্রকে অন্য যে কোন স্থানে সাগরকন্যা ভাইমিতি শাবানুর সাথে দেখা করিয়ে দিতে পারতো। তা করা হয়নি। একই স্থান থেকে একই অ্যাটল প্রাসাদে নিয়ে গেছে। এর অর্থ আমি এটা করতে পারি, সেই অ্যাটল প্রাসাদটি সেই অ্যাটলে বা পাশের কোন অ্যাটলেই হবে। দ্বিতীয় বিষয়টির যে অর্থ আমি করতে চাই, তা হলো, কাহিনীটা শুধু রুপকথা হলে ভাইমিতি শাবানু রাজপুত্রকে ঊর্ধ্বমুখী হাঁটার কষ্ট দিয়ে অ্যাটলের প্রাসাদ থেকে বাইরে নিয়ে আসতো না। উড়াল দিয়ে বা শাঁ করে মাটি ভেদ করে উপরে তুলে আনতো। রূপকথায় এটাই হয়। দ্বিতীয়ত ক্রমঊর্ধ্বমুখী পথ বা সিড়িপথ দিয়ে রাজপুত্র ভাইমিতি শাবানুর হাত ধরে উপরে উঠে এসেছিল। আন্ডারগ্রাউন্ড

কোন স্থান থেকে এমন পথ ধরে উপরে উঠে আসাটাই বাস্থবতা। এর অর্থ এই হতে পারে, অ্যাটলের প্রাসাদ বা নিবাস বাস্তবেই অস্তিত্বমান। মানে এর অস্তিত্ব রয়েছে। তৃতীয় বিষয় অর্থাৎ অ্যাটলের যেখান থেকে ভাইমিতি শাবানু সংজ্ঞাহীন রাজপুত্রকে নিয়ে গিয়েছিল, ঠিক সেই স্থানেই তাকে ফিরিয়ে আনা প্রমান করে ক্রমঊর্ধ্বমুখী বা ক্রমনিম্নমুখী ঐ পথেই ভাইমিতি শাবানু তাকে নিয়ে গিয়েছিল, আবার ঐ পথেই তাকে ফিরিয়ে আনতে হয় রাজপুত্রকে এবং সেটা স্বাভাবিকভাবে একই স্থানে হয়।রূপকথার এমন বাস্তবতার নিয়মে বন্দী থাকে না। এক নিমেষে পাতাল থেকে আকাশে ওঠা রূপকথার চরিত্র। আপনার রূপকথায় এটা হয়নি। এখানে রূপকথার নায়িকা ভাইমিতি শাবানুকে উপরে উঠার জন্যে ক্রমঊর্ধ্বমুখী পথ এবং পা ব্যবহার করতে হয়েছে। আমি মনে করছি, অ্যাটল থেকে উপরে ওঠার পথ ও অ্যাটলের প্রাসাদ দু'য়েরই অস্তিত্ব রয়েছে। চতুর্থ বিষয়টি এ অস্তিত্বের আরও বড় প্রমাণ। ভাইমিতি শাবানু রাজপুত্রকে প্রাসাদ থেকে অ্যাটলে তীরে পৌঁছিয়ে দিয়ে বলেছিল বিশ-ত্রিশ সেকেন্ড চোখ বন্ধ রাখতে। বলেছিল একটা শব্দ শোনার পর চোখ খুলতে। কেন বলেছিল এটা ভাইমিতি শাবানু? বলেছিল ভাইমিতি তার চলে যাবার সুযোগ সৃষ্টির জন্যে। এই সময়ের মধ্যে চলেও গিয়েছিল সে। ভাইমিতি শাবানু অশরীরী কোন সাগরকন্যা হলে তার চলে যাবার জন্যে বিশ-তিরিশ সেকেন্ডের প্রয়োজন ছিল না, এক মুহুর্তই যথেষ্ট ছিল।সে অশরীরী কেউ ছিল না বলেই তার সময়ের প্রয়োজন হয়েছে। অশরীরী কেউ না হলে সে মানবীই হবে বলে আমি মনে করি। দ্বিতীয়ত ভাইমিতি শাবানু তার চলে যাবার জন্যে বিশ-তিরিশ সেকেন্ড সময় নেয়ার অর্থ এই যে, যে পথ দিয়ে অ্যাটলে ঢুকে যাবে, সে পথ সেখান থেকে বিশ-তিরিশ সেকেন্ডের পথ। আরও স্পষ্ট কথা, ভাইমিতি শাবানু ও রাজপুত্র যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখান থেকে বিশ-তিরিশ সেকেন্ড দূরত্বে অ্যাটলের প্রাসাদে নামার পথ ছিল। পঞ্চম বিষয় হলো, জগতেশ্বরী কাহিনীর নায়িকা ভাইমিতি শাবানুকে 'মানবী' বলা। আমি বলতে চাচ্ছি, জগতেশ্বরীর এই সাক্ষ্য থেকেও প্রমানিত হয় ভাইমিতি শাবানু মানবী। ষষ্ঠ বিষয়, ভাইমিতির নামের 'শাবানু' শব্দ ও রাজপুত্রের নামের 'হোসানা' শব্দ।এ 'শব্দ' দু'টি তাহিতিয়ান নয়, পলিনেশীয়ানও নয়। শব্দ দু'টির

‘হোসানা’ আরবি শব্দ ও ‘শাবানু’ আরবি-ফারসি মেশানো শব্দ। দু’টিই মুসলিম নামের খন্ডিত রূপ। ‘হোসানা’ আসলে হাসান এবং ‘শাবানু’ হলো ‘শাহবানু’। আপনার কাহিনীর এই ভাষাগত ও নামগত উপাদান থেকে মনে করছি, কাহিনীকে শুধু এক নতুন বাস্তবতা নয়, নতুন এক ইতিহাসের দিকেও ঠেলে দিচ্ছে। সে ইতিহাস নিশ্চয় তাহিতির ইতিহাস, পলিনেশীয়ার ইতিহাস, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপাঞ্চলেরও ইতিহাস। থামল আহমদ মুসা।

বিস্ময়ে প্রায় ছানাবড়া অধ্যাপক তাতিহিতির দু’চোখ! বিহবল চেহারা মারেভা মাইমিতির। তার অবাক দৃষ্টি আহমদ মুসার মুখের ওপর নিবদ্ধ।

ইতিমধ্যে তামাহি মাহিন এসে পড়েছিল। সেও শুনেছে আহমদ মুসার কথা। তারও চোখ-মুখ বিস্ময়ে ভরা!

অধ্যাপক তাতিহিতি তার ইজিচেয়ারে সোজা হয়ে বসল। বলল আহমদ মুসাকে উদ্দেশ্য করে, অদ্ভুত! অদ্ভুত! তুমি তুমি কি নতুন কোন শার্লক হোমস, না কুশাগ্র বুদ্ধির ব্যারিস্টার! তুমি কাহিনীর যে অদ্ভুত বিশ্লেষণ করেছ, তা আমার কাছে অবিশ্বাস্য। এসব বিষয় কোন সময় আমাদের ভাবনাতেও আসেনি। কিন্তু বৎস, তুমি রূপকথা থেকে যে বাস্তবতা বের করেছ, তা যে রূপকথার চেয়েও বিস্ময়কর! রূপকথাও বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু তোমার বাস্তবতাকে আমরা কিভাবে বিশ্বাস করবো,কি করে বিশ্বাস করবো অ্যাটলের তলায় রাজপ্রাসাদ আছে, সেখানে ঢোকার ও বের হবার রাস্তা আছে! বিশ্বাস করব কি করে, ভাইমিতি শাবানু মানবী!

স্যার, বিশ্বাস করা, না করা ভিন্ন জিনিস। কিন্তু আমি বলছি, আপনাদের কাহিনীটা যদি সত্যি হয়, তাহলে আমার কথাও সত্য। স্যার, আপনি সাগরের ভূমি গঠন, দ্বীপমালা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ, কিন্তু আপনি কি এর সবটা জানেন? অজানার তুলনায় আমাদের জানা জগতটা তো খুবই নগণ্য! আমরা জানি না বলেই অজানাটা মিথ্যে হয়ে যাবে? বলল আহমদ মুসা।

অধ্যাপক তাতিহিতির মুখে হাসি ফুটে উঠল। তারপর ধীরে ধীরে সে হাসি মিলিয়ে গিয়ে নেমে এল এক গাম্ভীর্য। বলল ধীরে ধীরে, তুমি কে জানি না, কিন্তু তোমার কথা আর দশজনের মতো নয়, চিন্তার ধারাও একদম ভিন্ন। তুমি যে

যুক্তি তুলে ধরেছ, তা সত্যই অকাট্য। বিশ্বাস করা না গেলেও এনিয়ে অবশ্যই ভাবতে হবে। তুমি ঠিকই বলেছ, আমরা সৃষ্টি সম্পর্কে খুব অল্পই জানি, আমাদের অজানাই তো সব! চিন্তা-ভাবনা জ্ঞান-গবেষণার মাধ্যমেই অনেক অজানা বিষয় জানার পরিমন্ডলে আসছে। তোমার চিন্তার নিয়েও ভাবতে হবে। বল, তুমি নিজে এ নিয়ে কি ভাবছ?

স্যার, আমি যা বলেছি সেটাই সত্য তা বলছি না। কিন্তু কাহিনীর যে ঘটনা পরম্পরা তাতে আমার মনে হচ্ছে, কোন কোন অ্যাটলে সে প্রাসাদ, যাকে ভাইমিতি শাবানু নিবাস বলেছে, তাতে প্রবেশ ও বের হবার পথও আছে! সে অ্যাটলের চল্লিশ-পঞ্চাশ গজ দূরে আরেকটা অ্যাটলও আছে! বলল আহমদ মুসা।

কোন অ্যাটলে তুমি এ ধরনের কোন স্থাপনা খুঁজছ। সে চিন্তা থেকেই কাহিনীর প্রাসাদের মধ্যে তুমি তোমার বাঞ্চিত স্থাপনা দেখতে চাচ্ছ, এ কথা আমি বলতে পারতাম। কিন্তু বলতে পারছি না এ কারণে, যুক্তি দিয়েই তুমি তোমার কথা প্রমাণ করেছ। এখন আমি মনে করি, অনুসন্ধান করে দেখা দরকার সে ধরনের অ্যাটল কোনটা হতে পারে। সে অ্যাটল যদি পাওয়া যায় তাহলে পরের কাজগুলো সহজ হয়ে যাবে। আর এ ধরনের কিছু যদি পাওয়া যায়, তাহলে কাহিনীটা ভিন্ন রূপ নিয়ে আমাদের কাছে আসবে। তুমি যা বলেছ, তাহিতি নয় শুধু, পলিনেশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপাঞ্চলের ইতিহাস পাল্টে যেতে পারে। আচ্ছা বৎস, তুমি যে দু’টো শব্দের কথা বললে, সেটা কিন্তু ঠিক। এ দু’টো পলিনেশিয় কোন শব্দ নয়। কিন্তু তুমি জানলে কি করে, এ দু’টো আরবি ও ফারসি শব্দ? বলল অধ্যাপক তাতিহিতি।

আমি আরবি, ফারসি ও এ ভাষার নামের সাথে পরিচিত স্যার। আহমদ মুসা বলল।

কিন্তু কাহিনীর চরিত্রে আরবি, ফারসি ভাষার নাম এল কি করে? তাহলে পলিনেশীয়া মানে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপাঞ্চলের ইতিহাসের সাথে মুসলমানদের কোন সম্পর্ক আছে। এখানকার অতীত জন-জীবনের সাথে মুসলমানরা কোনওভাবে জড়িত? তুমি যেটা বলেছ, এটা সত্যি নতুন ইতিহাসের ইংগিত?

বলে একটু থামল বৃদ্ধ অধ্যাপক তাতিহিতি। ইজি চেয়ারে আবার তার দুর্বল দেহটা এলিয়ে দিল। তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, এই জিজ্ঞাসার জবাবের জন্য অনুসন্ধান দরকার। চলমান ইতিহাসে এর কোন জবাব মিলবে না।পলিনেশিয়ানে ছড়িয়ে আছে 'মিথ' আকারে অসংখ্য 'পুটাটুপুনা' (putatupuna) অ্যানসেস্ট্রাল স্টোরিজ (Ancestral stories)। সে সবের মধ্যেই খুঁজতে হবে ইতিহাসকে। প্রিয় ইয়ংম্যান, তোমার মধ্যে যে অদ্ভুত বিশ্লেষণ শক্তি দেখছি, তাতে তুমি পারবে এ ইতিহাসের সন্ধান করতে। আমি আশীর্বাদ করছি বৎস।

থামল অধ্যাপক টেপোয়া তাতিহিতি। কথা শেষ হবার সাথে সাথে তার চোখ দু'টিও বুজে গেল। চোখে-মুখে তার ক্লান্তি।

স্যরি স্যার, আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি। আমি বলতে চাচ্ছি স্যার, অ্যানসেন্ট্রাল স্টোরি বা পূর্বপুরুষ-কাহিনীর মধ্যে ইতিহাস সন্ধান করা যত সহজ, পূর্বপুরুষের কাহিনী সন্ধান করা ততটা সহজ নয়। আহমদ মুসা বলল।

চোখ খুলল অধ্যাপক তাতিহিতি। বলল, ঠিক বলেছ তুমি। তবে একজন লোক আছে। তাকে মারেভা ও মাহিন দু'জনেই চেনে। তার নাম মাহকোহ মিনালী মিনার। তিনি প্রাচীন পমেরী রাজবংশের বেঁচে থাকা একমাত্র প্রধানতম মানুষ। ইউরিপীয়রা আসার আগে এই রাজবংশ বিভিন্নভাবে শত শত বছর রাজত্ব করেছে তাহিতিসহ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপাঞ্চলে। তিনি এই 'আরু'তেই সেই প্রাচীন রাজবংশের ধ্বংসপ্রাপ্ত রাজপ্রাসাদের এক কোণে অতীতের সাক্ষী হয়ে অবস্থান করছেন। 'Putatupuna' অর্থাৎ অ্যানসেস্ট্রাল স্টোরিজের (পূর্বপুরুষ কাহিনীর) বিশাল ভান্ডার আছে তার কাছে। তিনিই তোমাকে সাহায্য করতে পারেন।

ধন্যবাদ স্যার। বলল আহমদ মুসা।

ওয়েলকাম বৎস। অধ্যাপক তাতিহিতি বলল। চোখ দু'টি তার বুজে গেল আবার।

আমরা তাহলে উঠতে পারি স্যার। আপনি বিশ্রাম নিন। বলল মারেভা মাইমিতি।

এস বোন, কিন্তু তোমার মাহকোহ’র কাছে যেও। আমারও খুব আগ্রহ এ কাহিনী জানার। অধ্যাপক তাতিহিতি বলল।

অধ্যাপক তাতিহিতির কাছ থেক বিদায় নিয়ে আহমদ মুসারা বেরিয়ে এল।

বেরিয়েই তামাহি মাহিন বলল, স্যার, আপনি কি ফাদার মাহকোহ’র ওখানে যাবেন?

ফাদার কেন, উনি কি খৃস্টান? আহমদ মুসা বলল।

না স্যার, উনি খৃস্টান নন। আমরা প্রধান শিক্ষক ও ধর্মনেতাদের ফাদারও বলি। খ্রিস্টানরা তাদের ধর্মনেতাদের ‘ফাদার’ বলে। তার অনুসরণেই আমরা এটা বলি আত্মরক্ষার কৌশল হিসাবে। কারণ খৃস্ট ধর্ম ছাড়া এখানে অন্য সব ধর্ম-বিশ্বাস ও গীর্জা ছাড়া অন্য সব উপাসনালয় নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। সুতরাং খৃস্ট ধর্মের নাম পরিচয়ের আড়ালেই অনেক তাহিতিয়ান নিজেদের ধর্ম পালন করে থাকে। আরু’তেও তাই হয়। বলল মারেভা।

উনি কি ধর্মনেতা? জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

ধর্মনেতা। কিন্তু প্রচলিত কোন ইশ্বরের উনি পূজা করেন না। উনি ধ্যান করেন, আ-ভুমি মাথা নোয়ান কোন অদৃশ্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে। বলল তামাহি মাহিন।

তিনি কি করতেন, কি করেন? আহমদ মুসা বলল।

তিনি নিজেকে রাজকীয় শিক্ষা একাডেমি, লাইব্রেরী ও উপাসনালয়ের পরিচালক বলে মনে করেন। এসবের ধ্বংসাবশেষের একটা বাড়িতে তিনি থাকেন। তিনি কোথাও যান না। বলল মারেভা।

তিনি যেখানে থাকেন, সেটা ‘আরু’র কোথায়? জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

স্যার, আমরা এসেছি ‘আরু’র সাগর তীরবর্তী পুনর্নির্মিত অংশে। এই অংশের দক্ষিণে একটা বিশাল বিরান অঞ্চল পাওয়া যাবে। দক্ষিণ থেকে উত্তরে সাগর পর্যন্ত বিলম্বিত তিনটি দীর্ঘ উপত্যকা ও তিনটি বিলম্বিত পাহাড় নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত।এটাই প্রাচীন রাজধানী ‘আরু’র মূল অংশ।এই এলাকার শীর্ষ স্থানে ছিল প্রাসাদ। এই প্রসাদেরই একাংশে ছিল শিক্ষা একাডেমী, লাইব্রেরী ও

উপাসনালয়ের স্থান। সেখানেই ফাদার মাহকোহ এখনও বাস করেন। বলল মারেভা।

আর কেউ থাকে না ওখানে? প্রশ্ন আহমদ মুসার।

আরও দু'চারটা বসতি আছে। এদের কেউ রাজপরিবারের অধস্তন, কেউ রাজপরিবারের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। এছাড়াও আশেপাশে কিছু পরিবার আছে যারা পশু পালন করে জীবন নির্বাহ করে। বলল তামাহি মাহিন।

চল মাহিন মারেভা, ফাদার মাহকোহ'র সাথে দেখা করেই আমরা ফিরব। আমাদের সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্যে অ্যাটলের প্রাসাদ রহস্য এবং ভাইমিতি শাবনুর কাহিনী সম্পর্কে আরও জানা প্রয়োজন। আহমদ মুসা বলল।

ভালই হলো, আজ আমার ও মারেভার মা এসেছেন 'আরু'তে মাহকোহ'র মন্দিরে উপাসনার জন্যে। তাদের সাথেও দেখা হবে। আমরা একসাথে ফিরতে পারবো। বলল তামাহি মাহিন।

তারা প্রার্থনা করতে এখানে আসেন? আহমদ মুসা বলল।

প্রতি মাসের প্রথম শুক্রবারে তারা আসেন। আজ মাসের প্রথম শুক্রবার। বলল তামাহি মাহিন।

ফাদার 'মাহকোহ'র মন্দিরে শুক্রবারে প্রার্থনা হয়? জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

জি স্যার, সপ্তাহের শুক্রবারে এখানে প্রার্থনা হয়। বলল তামাহি মাহিন।

শুক্রবার কেন? আহমদ মুসা বলল।

জানি না স্যার, এটাই ঐতিহ্য। বলল তামাহি মাহিন।

কি প্রার্থনা হয় সেখানে? আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

হাঁটু গেড়ে বসে ধ্যান ও প্রার্থনা। মারেভা বলল।

সবাই উঠে বসেছে গাড়িতে। চলতে শুরু করল গাড়ি।

ড্রাইভার তেপাও-এর পাশের সিটে মারেভা। পেছনে আহমদ মুসা ও তামাহি মাহিন। পেছনের সিটে মারেভার পাশে আহমদ মুসা যেমন বসে না, তেমনি তামাহি মাহিনের বসাও সে এলাউ করে না।

পাহড়ী পথে আস্তে আস্তে চলছে গাড়ি।

অধ্যাপক তাতিহিতির সাথে যে সব কথা হয়েছিল এবং আহমদ মুসা যা জানতে চায়, এক এক করে সব বলল ফাদার মাহকোহ মিলানী মিনারকে।

সামনেই ফরাসে হাঁটু মুড়ে বসে ছিল ফাদার মাহকোহ। তার সামনে ফরাসে বসে কথা বলছিল আহমদ মুসা। আহমদ মুসার পেছনে আছে মারেভা ও মাহিন। পাশেই একটু তফাতে বসেছিল মারেভা ও মাহিনের মা পাশাপাশি।

এটাই ফাদার মাহকোহ'র অফিস ঘর।

ঘরের বাইরের দেয়াল এবড়ো-থেবড়ো ক্ষয়ে যাওয়া পাথরের হলেও ভেতরটা অনেকটা ভাল।

ফাদার মাহকোহ'র এই অফিস ঘরের পাশেই উপাসনালয় মানে মন্দির। উপাসনালয়টি নতুন-পুরাতনের মিশ্রণ। আগের কাঠামোর উপর উপাসনালয়টি পুনর্নির্মিত।

আহমদ মুসার এসে যখন উপাসনালয়ে ঢুকেছিল তখন উপাসনা চলছিল উপাসনালয়ে।

বিরাট ঘর। সবাই ফরাসের উপর লাইন করে পশ্চিমমুখী হয়ে হাঁটু মুড়ে বসে। সবাই ধ্যানস্থ। ধ্যানের সময় শেষ হলে সবাই এক সাথে প্রার্থনা করল।

উপাসনালয়ের পশ্চিম দেয়ালে একটা বড় অর্ধ চন্দ্র।পরে আহমদ মুসা জিজ্ঞাসা করে জেনেছিল, অর্ধ চন্দ্র, মানে চন্দ্র হলো জগতেশ্বরী 'হিনা'-এর প্রতীক। পলিনেশীয় বিশ্বাসমতে জগতেশ্বরী 'হিনা' চন্দ্ররূপে প্রকাশিত।

আহমদ মুসার কথা শেষ হলেও ফাদার মাহকোহ যেমন ছিল, তেমনি বসে রইল। তার মাথা ঈষৎ নোয়ানো। তার চোখ দু'টি দু'জনের মাঝখানে মাটির মেঝের উপর নিবদ্ধ। মাথায় কাপড়ের একটা গোল বন্ধনী, পাগড়ির একটা বেড়ের মত। প্রাচীন রাজবংশের রাজশিরস্ত্রাণের প্রতীক সেটা করা। সে প্রতীকের মাঝখানে অর্ধ চন্দ্র শোভা পাচ্ছে। ফাদার মাহকোহ'র পরনে লম্বা জামা। মুখে

সুন্দর শুভ্র দাড়ি। ফাদারের বয়স শুনেছিল একশ’ বছরের বেশি, তার দেহের কাঠামো শিথিল হয়েছে অবশ্যই, কিন্তু মুখে-চোখে তারুণ্যের দ্যুতি।

একসময় মুখ তুলল ফাদার মাহকোহ। তাকাল আহমদ মুসার দিকে। চোখে তার শান্ত-গভীর দৃষ্টি। বলল, বুঝতে পারছি তুমি একটা মিশন নিয়ে এসেছ। মিশনটা মনে হচ্ছে কোন এক অ্যাটলের তলদেশের স্থাপনার সন্ধান করা। কিন্তু এর বাইরে তুমি এদেশের না হয়েও এদেশের অতীত নিয়ে, ইতিহাস নিয়ে, জন-কাহিনী নিয়ে যে আগ্রহ প্রকাশ করছ, তার জন্যে আমি মোবারকবাদ দিচ্ছি তোমাকে। আজকের মানুষ, বিশেষ করে আমাদের মত অনুন্নত দেশের মানুষ সভ্যতার ভোগবাদী মোহে পড়ে বর্তমানের সমৃদ্ধি ও ভবিষ্যত গোছানো নিয়ে এতটাই ব্যস্ত যে, নিজেদের অতীত নিয়ে ভাববার সময় এদের নেই আবার অনেক ক্ষেত্রে তারা আমাদের রাজা মাকোয়া তাকাও-এর মত নিজেদের ইতিহাসের সব উপাদান নিজের হাতেই ধ্বংস করছে। তুমি তার ব্যতিক্রম, ধন্যবাদ তোমাকে।

বলে একটু থেমেই আবার শুরু করল, তুমি অনেক বিষয় সামনে এনেছ।কিন্তু বিষয়গুলোর সারাংশ করলে দু’টি বিষয় মুখ্য হয়ে ওঠে ! এক. কাহিনীর ভাইমিতি’র নামের ‘শাবানু’ ও প্রিন্স হেসানা’র নামের ‘হুসানা’ অংশ আরবি-ফারসি শব্দের অপভ্রংশ। তাদের নামের সাথে আরবি ও ফারসি ভাষার নাম কোত্থেকে এল। এবং দুই. কাহিনীটিতে অ্যাটল-প্রাসাদের যে কথা বলা হয়েছে, তার বাস্তবতা। থামল ফাদার মাহকোহ।

চোখ বন্ধ করে একটু ভাবল। বলল, এই মাত্র আমি বললাম, আমাদের রাজা মাকোয়া তাকাও তাহিতি ও পলীনেশীয় দ্বীপাঞ্চলের শত শত বছর ধরে জমিয়ে তোলা পূর্বপুরুষদের কাহিনী সব ধ্বংস করে দিয়েছে। এর সাথে অনেক ইতিহাসই মুছে গেছে। এটা যে...।

এটা তাহলে সত্যি ঘটনা? আহমদ মুসা বলল।

দুর্ভাগ্যজনক এক সত্য জনাব আহমদ। পলিনেশীয় সভ্যতার একটা বড় বৈশিষ্ট হলো পারিবারিক ইতিহাস স্মৃতিতে ধরে রাখা। এভাবে হাজার বছরের ইতিহাস ছিল তাদের স্মৃতির স্তরে। কিন্তু ইউরিপীয়রা আসার পর তাদের নতুন

সভ্যতা বিপর্যয় ঘটায়। স্মৃতির ইতিহাসকে লিখে রাখার বা এর লেখ্য রূপ তৈরির হিড়িক পড়ে যায়। এরপর ইতিহাসকে একমুখী করার প্রবনতারও সৃষ্টি হয়। এই প্রবণতা প্রবল হয়ে ওঠে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের হাতের পুতুল নতুন রাজাদের মধ্যে। ১৭৫৭ সালের জুনে আসে বৃটিশ ক্যাপ্টেন ওয়ালিস বন্দুক-কামান নিয়ে। নির্দয় পন্থায় দখল হয়ে যায় রাজধানী 'আরু'সহ তাহিতি এবং পলিনেশীয় দ্বীপাঞ্চল। আর ১৭৬৮ সালে আসে ফারাসিরা আরও বড় শক্তি নিয়ে এবং তারা বৃটিশদের তাড়িয়ে দখল করে নেয় গোটা এলাকা। স্থানীয় রাজারা প্রতিরোধ চালিয়ে যায় অনেক দিন। অবশেষে উচ্ছেদ হয় ঐতিহ্যবাহী পমারী রাজবংশ ও স্থানীয় রাজারা। ১৮১৫ সালে ফরাসিদের পুতুল রাজা দ্বিতীয় পমপাই একমাত্র রাজা হিসাবে ঘোষিত হয়। ধ্বংস হয় রজধানী আরু। ধ্বংস হয় অতীতের সমাজ-সভ্যতা নির্দয়ভাবে। আর সব কিছুর উপর চেপে বসে খৃস্টান রাজা। গীর্জা ছাড়া সব ধরনের উপাসনালয় ধ্বংস করা হয়। এরই ধারাবাহিকতাতেই ১৮৯০-এর দশকে রাজা মাকিয়া তাকাও লিখিত সব পারিবারিক ইতিহাস ধ্বংস করে ফেলে, একমাত্র তার সময়ের ইতিহাস ছাড়া। তার ফলে মাকিয়া তাকাওদের কাহিনী পলিনেশীয়ার একমাত্র ইতিহাস হয়ে দাঁড়ায়। শুধু পলিনেশীয়াতে নয়, প্রশান্ত মহাসাগরীয় সব দ্বীপাঞ্চলেই এই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের উদ্যোগে একক ইতিহাস তৈরির নামে। ধ্বংসের এই ঝড়ে অগণ্য সত্য কাহিনী, ইতিহাসের ঘটনা, ইতিহাসের উপাদান চিরতরে হারিয়ে গেছে। থামল ফাদার মাহকোহ।

বিস্ময়ের বেদনা নিয়ে আহমদ মুসা তাকিয়ে ছিল ফাদার মাহকোহ'র দিকে। ফাদার মাহকোহ থামতেই আহমদ মুসা বলল, ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকরা এই কাজ বহু দেশে করেছে। কিন্তু সবখানে তারা ষোল আনা সফল হয়নি, আপনাদের পলিনেশীয়াতে কি অবস্থা স্যার?

আমাদের পলিনেশীয়তে অন্য সব লিখিত ইতিহাস শুধু ধ্বংস করা হয়েছে তাই নয়, অন্য ইতিহাসের পাঠ, সংরক্ষণ ও নিষিদ্ধ করা হয়। তার ফলে এখানে সেখানে কিছু কাহিনী, কথা, ইতিহাস ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচতে পারলেও

সংরক্ষণ ও চর্চার অভাবে সে সব বেশি দিন বাঁচতে পারেনি। বলল ফাদার মাহকোহ।

স্যার, আপনি তো তা বাঁচাতে পেরেছেন! আহমদ মুসা বলল।

কিছু কিছু, এমনকি আমাদের পারিবারিক ইতিহাসের সবটা সংগ্রহ করতে পারিনি। আমাদের রাজধানী 'আরু' ধ্বংসের সময় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয় আমাদের রজকীয় সংগ্রহশালা ও লাইব্রেরী। আমি ব্যাপক ঘুরে বেড়িয়েছি ইতিহাসের কাহিনীর সন্ধানে। কিছু মানুষের স্মৃতি থেকে, কিছু গোপনে সংরক্ষিত লেখা থেকে আমি সংগ্রহ করেছি। বলল ফাদার মাহকোহ।

ধন্যবাদ স্যার। আপনার সংগ্রহ কতদূর অতীত পর্যন্ত যেতে পেরেছে স্যার? আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

পেছনের ইতিহাস কত দূর পেছনে গেছে তা আমি জানি না। এ ব্যাপারে এখনও ঐকমত্য হয়নি। আমার কাছে ইতিহাসের যে উপাদান আছে, তাতে অনেক ফাঁক-ফোকর থাকলেও এক নজরে আমাদের ইতিহাস সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়। বলল ফাদার মাহকোহ।

ধন্যবাদ স্যার। আমাকে আপনি কিভাবে সাহায্য করতে পারেন? আহমদ মুসা বলল।

তুমি 'হাসানা' ও 'শাবানু' এই দুই আরবি, ফারসি নামের উৎস খুঁজছ, কিন্তু শুধু এ দু'টি নামই তো নয়, আরও অনেক নামের উৎস তোমাকে খুঁজতে হবে। পলিনেশীয় সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে পুরাতন দ্বীপ 'তাহিতি' নাম নিয়ে কি তুমি ভেবেছ? তাহিতিকে বিশ্বের সুন্দরতম দ্বীপ যদি নাও বলি, তাহিতিবিশ্বের সুন্দরতম দ্বীপের একটি অবশ্যই। ইউরপীয়রা এই দ্বীপকে দেখেই বলে উঠেছিল 'আইল্যান্ড অব লাভ' ভালবাসার দ্বীপ। ফরাসি বোগেনভিল বলেছিলেন ' মিথ অব প্যারাডাইস' স্বর্গের কল্পলোক। আরেকজন রোশো বলেছিলেন ' মহত্তম অসভ্য'। কিন্তু তাদের অনেক আগে তাহিতি তার নামের মাঝে তার পরিচয়কে, রূপকে ধারণ করেছে। ৮৫০ খৃস্টাব্দের দিকে প্রথম মানব যারা তাহিতিতে বসতি গড়তে আসে, তারা তাহিতিকে 'আমার শ্রদ্ধা' 'আমার সালাম' বলে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল। ভাই আহমদ, হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি ভাষা অধ্যয়ন করার কিছু

সুযোগ আমার হয়েছিল। ‘তাহিতি’ নিজেই আরবি শব্দ, আরবি মুল ‘তাহিয়াত’ থেকে এসেছে। তাহিতির অর্থ ‘ আমার শ্রদ্ধা’, ‘আমার অভিনন্দন’, ‘আমার সালাম’। প্রথম মানব যারা তাহিতিতে আসেন, তারা শ্রাদ্ধার, ভালবাসার, শান্তি-আকাঙ্ক্ষার মহত্তম নাম দিয়েই দ্বীপটিকে বরণ করেন। কিন্তু এই লোকগুলো কারা, কোত্থেকে কিভাবে এল, এটাই এখানকার প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর পেলে পলিনেশীয় কাহিনীতে মূল আরবি-ফারসি ‘হাসান’ ও ‘সাহবানু’ নাম কোত্থেকে এল তাও পরিষ্কার হয়ে যাবে। ‘তাহিতি’র মত অনেক আরবি শব্দ আমরা তাহিতি ও পলিনেশীয়ায় পাব। হয়তো এমনি ভাবে প্রশান্ত মহাসাগরীয় সব দ্বীপাঞ্চলেই পাওয়া যাবে। ইউরোপীয়রা আসার আগে যারা রাজার অধীনে বা স্বাধীনভাবে তাহিতির বিভিন্ন অঞ্চল শাসন করতো, তাদের ‘আরাই’ (Ari’i) বলা হতো। তারা জনগণের ‘প্রদর্শঙ্কারী’ হিসাবে এই উপাধি ব্যবহার করতো। এটা আরবি শব্দ। তাহিতির রজধানী ধ্বংস করে ফেলা আমাদের এ প্রিয় শহরের ‘আরু’ নামটিও আরবি ‘আরাই’-এর অপভ্রংশ। আবারও প্রশ্ন এসে দাঁড়ায় আঞ্চলিক শাসকদের এই ‘আরাই’ নাম এবং স্বাধীন তাহিতি ও পলিনেশীয়ার গৌরবান্বিত রাজধানীর ‘আরু’ নাম কোত্থেকে এল, কারা রাখল, কেন রাখল? এ প্রশ্নগুলো আহমদ তোমার প্রশ্নের মতই। এই প্রশ্নগুলোর জবাব পেলে তোমার প্রশ্নেরও জবাব হয়ে যাবে। অতীত ইতিহাসের মধ্যেই এর জবাব পাওয়া যাবে।

দীর্ঘ এক বক্তব্য দিয়ে থামল ফাদার মাহকোহ।

কিন্তু স্যার, ইতিহাস তো ধ্বংস করেছে! আহমদ মুসা বলল।

এরপরও এখানে-সেখানে কিছু রক্ষা পেয়ে গেছে। তার কিছুটা আমিও সংগ্রহ করতে পেরেছি। আমাদের নিজেদের পারিবারিক ইতিহাস তো আছেই ! বলল ফাদার মাহকোহ।

এই ইতিহাসের গুড়াটা কত দূর পর্যন্ত গেছে? জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

এ রকম ইতিহাসের কোন সময় নির্ণয় করা মুস্কিল।

তারপর?

তারপরও এভাবেই কাহিনী বর্ণিত ও লিখিত হয়েছে! তাও আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ্যালেগেরিক্যাল প্রতীকের আবরণ দেয়া। রূপকথায় পাত্র-

পাত্রীর যেমন হঠাৎ আগমন ঘটে, আগ-পিছের পরিচয় ও যুক্তি-প্রমাণের কোন বালাই থাকে না, কতকটা সেই রকমই অনেক ক্ষেত্রে। যেমন আমাদের বংশ-ইতিহাসের শুরু আমাদের বংশ বা গোত্রপতির মৃত্যুর ঘটনা দিয়ে। সারাংশ এই রকমঃ বংশের সর্দার তাহেনা (শক্তি) ঈশ্বর হিনার কাছে চলে গেছে। তার দেহটাও পাঠাবার ব্যবস্থা চলছে। সারা রাত তার দেহ পাহাড় শীর্ষে রাখা হয়েছিল। ঈশ্বরের কাছে তার দেহ যায়নি। এবার ছোট ভেলায় করে তার দেহ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সাগরে ভাসাবার ব্যবস্থা করা হয়। বংশের তান্ত্রিক 'রানুই' (পবিত্র পুরুষ) ভীষণ ব্যস্ত এই প্রস্তুতি নিয়ে। হঠাৎ দেখা গেল পশ্চিমে মুরিয়ার দিক থেকে একটা জাহাজ আসছে উপকূলের দিকে। এতবড় ও এমন জাহাজ আমরা কখনও দেখিনি। জাহাজ অনেক কাছে এসে গেল। জাহাজের সব কিছুই দেখা যাচ্ছে। পাল আগেই নামিয়ে ফেলা হয়েছে। জাহাজের পাল টাঙানো উঁচু মাস্তুলে একটা বড় সবুজ পতাকা। বাতাসের অভাবে উড়ছে না। জাহাজের ডেকে আপাদমস্তক সাদা পোষাকের অনেক মানুষ। উপকূলে আমাদের লোকদের মধ্যে ভয় ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। জাহাজটি আরও কাছে আসে। মৃতের সৎকারের কাজ বাদ দিয়ে আমাদের লোকেরা তীর-ধনুক, বর্শা ও গুলতি নিয়ে তৈরি হয়ে যায়। জাহাজের লোকজনও ডেকে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু ওদের হাতে কোন অস্ত্র ছিল না। আমাদের লোকদের এ অভিজ্ঞতা আছে, জলদস্যুরা বিভিন্ন রূপ ধরে আসে, শান্তিবাদী ও ভালো মানুষের ছদ্মবেশও তারা নেয়। সুতরাং আমদের লোকেরা ওদের গতিরোধের জন্যে তীর ও বর্শা নিক্ষেপ করে আক্রমণ শুরু করল। তীরগুলো মারাত্মক সূচালো পাথরের, বর্শাগুলো ও তাই। জাহাজের কয়েকজন আহত হয়ে পড়ে গেল। কিন্তু ওরা আক্রমণ করলো না। প্রায় সবাই আড়ালে সরে গেল। মাত্র দু'জন নতুন কাপড়ের বান্ডিল ও বস্তা থেকে খাদ্যশস্য আকাশে ছুঁড়ে দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করলো, আমরা আক্রমণ বা দখলের জন্যে নয়, ব্যবসায়ের জন্যে এসেছি। সরদারের ছেলে নতুন মনোনীত সরদার সবকিছু পর্যবেক্ষন করছিল।সে আমাদের লোকদের ওদের উপর আক্রমণ বন্ধের নির্দেশ দিল। আক্রমণ বন্ধ হলে জাহাজ এসে তীরে ভিড়ল। জাহাজের ওরা সবাই তীরে নামল। লোকেরা সবাই দীর্ঘদেহী, ফর্সা শ্মশ্রুমণ্ডিত। সকলেই প্রশান্ত চেহারার। চোখের

দৃষ্টি স্বচ্ছ, তাতে কোন হিংসা-কুটিলতার ছায়া নেই। দেখলে মনে ভয় জাগে না, বরং বন্ধু বলে মনে হয়।

সবাই ওরা নিরস্ত্র। তীরে নেমে সবাই ওরা এক সাথে হাত তুলে প্রার্থনা করল। তারপর ওরা উঠে এসে আমাদের সবার সাথে হাত মেলাল। দু'চারটি তাহিতিয়ান শব্দ, দু'চারটি প্রশান্ত মহাসাগরীয় অন্যান্য ভাষা মেশানো ভাষায় তারা বুঝালো তাহিতিয়ার কেউ তাদের শত্রু নয়, তারাও কারও শত্রু নয়। তারা ব্যবসায়-বানিজ্য করে এবং সাধ্যমত মানুষের উপকার করে। আমাদের লোকেরা তাদের জাহাজে চড়ল। দেখল, জাহাজে কোন অস্ত্র নেই। আছে কাপড়, খাদ্যশস্য ও অন্যান্য কিছু ব্যবসায়ের পণ্য। আমাদের লোকেরা তাদের বিশ্বাস করল। অস্ত্র ছাড়া কেউ আসতে পারে, আত্মরক্ষার ব্যবস্থা ছাড়া কেউ আসতে পারে, এমনটা আমাদের লোকেরা অতীতে দেখেনি। আমাদের আক্রমণে ওদের কয়েকজন আহত হয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন মারা গেল। আহতদের তারা চিকিৎসা করল। তাদের চিকিৎসার ধরন উন্নত। আহত স্থান ওষুধ মেশানো পানি দিয়ে পরিষ্কার করা, ওষুধ লাগানো, কাপড় দিয়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা, এসব বিষয় আমাদের লোকেরা এই প্রথম দেখল। তারা তাদের মৃত লোককে কূলে নামিয়ে তার সৎকার করার অনুমতি চাইল। আমাদের নতুন সরদার পো মিরি (poe Miri) তাদের অনুমতি দিল। জাহাজ থেকে লাশ তারা উপকূলে নামিয়ে লাশকে গোসল করাল এবং সাদা কাপড় কেটে কয়েক টুকরো করে লাশকে পরিয়ে দিল। গোটা লাশকে সাদা কাপড়ে তারা মুড়ে ফেলল। সেই কাপড়ে মোড়া লাশ তারা সামনে রেখে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে দু'হাত বুকে বেঁধে কি সব পড়ল! তারপর আয়তাকার সুন্দর একটা গর্ত বানাল। সেই গর্তের ফ্লোরে কাপড়ে মোড়া লাশকে যত্নের সাথে রেখে দিল এবং গর্তের আয়তাকার মুখ তারা সাইজমত কাটা কাঠ, ডাল, লাকড়ি দিয়ে বন্ধ করে দিল। তার উপর বড় আকারের পাতা সাজিয়ে ঢেকে দিয়ে তাতে মাটি চাপা দিল। গর্তের উপরের এই মাটিকেও তারা সমান ও পরিপাটি করে রাখল। সবশেষে তারা সেই গর্তের চারদিকে দাঁড়িয়ে এক সাথে প্রার্থনা করল। এই গোটা বিষয়টি আমাদের লোকেরা বিস্ময়ের সাথে দেখল এবং খুবই ভাল লাগল তাদের এই লাশের সৎকার করা, বিশেষ করে আমাদের সরদার পো মিরি

ও আমাদের তান্ত্রিক রানুই খুবই মুগ্ধ হলো মৃতের প্রতি সম্মান, যত্ন, তাকে ঘিরে প্রার্থনা ও লাশ রাখার পদ্ধতি দেখে। আমাদের সর্দার আমাদের তান্ত্রিক ও লোকদের বলল, আমাদের মৃত সর্দারকে আমরা এভাবে রাখতে পারি। এতে সুবিধা হবে আমার মৃত পিতা কোথায় আছেন তা আমি দেখতে পাবো, তার সাথে কথা বলতে পারবো। তান্ত্রিক ও আমাদের লোকেরা এতে খুব খুশি হলো। তান্ত্রিক বলল, পাহাড়ে রেখে লাশ পশু-পাখির পেটে দেয়া কিংবা লাশ সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে হারিয়ে ফেলার চাইতে এটা অনেক ভাল। এসব দেখে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, আমাদের সর্দারের লাশ ফুল-পাতা দিয়ে ঢেকে না রেখে আগন্তুকদের লাশ যেভাবে জাহাজ থেকে নামিয়ে আদবের সাথে সৎকার করা হলো, সর্দারের লাশ সেভাবেই সৎকার করা হবে। আগন্তুকরাও এভাবে সৎকারের কথা বলল। আগন্তুকরা আনন্দের সাথে রাজি হলো এবং কাজে লেগে গেল। তারা খুব যত্ন ও সম্মানের সাথে মৃত সর্দারকে গোসল করিয়ে, নতুন কাপড় পরিয়ে, কাপড়ে মুড়ে আমাদের লোকজনদের সাথে নিয়ে আয়তাকার সেই গর্তে সুন্দর করে রাখল। সবশেষে গর্তের উপর পাটি সাজানোর কাজ সম্পন্ন করার পর আমাদের লোকদের সাথে নিয়ে মৃতের মঙ্গলের জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল। এমন সুন্দর ও নতুন ব্যবস্থায় আমাদের সর্দার পো মিরি ভীষণ খুশি এবং আমাদের লোকেরাও। এসব কাজে দুপুর হয়ে গেল। সূর্য মাথার উপর থেকে পশ্চিমে একটু হেলে পড়েছে। আগন্তুকদের একজন এসে আমাদের সর্দারকে বুঝালো, তাদের প্রার্থনার সময় হয়েছে, তারা তাদের প্রার্থনার অনুমতি চায়। সর্দার সোৎসাহে অনুমতি দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কার কাছে তারা প্রার্থনা করবে? অনুমতি নিতে আসা সেই লোক বলল, এই বিশ্ব-জাহান যিনি সৃষ্টি করেছেন, যিনি এই বিশ্ব-জাহানসহ আমাদের সকলকে পালন করেন তার কাছে আমরা প্রার্থনা করব।আমাদের সর্দার খুশি হয়ে বলল, খুব ভাল। আমরাও পার্থনা করি ঈশ্বর হিনার। আপনাদের প্রার্থনা দেখি। আগন্তুকদের কয়েকজন পাহাড়ের ঝর্না থেকে পানি এনেছে। দেখা গেল সেই পানি দিয়ে তারা সকলে একই নিয়মে মুখ, হাত, পা ধুয়ে নিল। একজন একটু উঁচুতে দাঁড়িয়ে দুই কানে দুই হাত চাপা দিয়ে উচ্চ স্বরে কয়েকটি বাক্য উচ্চারণ করল। তারপর তারা সকলেই ভিন্ন ভিন্নভাবে

দাঁড়িয়ে, কোমর বাকিয়ে হাঁটুর উপর হাত রেখে মাটির উপর মাথা রেখে প্রার্থনা করল। পরে তাদের প্রবীণ একজনকে সামনে রেখে তারা সকলে পেছনে সারিবদ্ধভাবে দাড়িয়ে ব্যক্তিগতভাবে যা যা করেছিল সামস্টিকভাবেও তাই করল। সামনে দাঁড়ানো প্রবীণ ব্যক্তিটি যা করছে, সকলে তাই করছে অদ্ভুত শৃঙ্খলার সাথে! তাদের প্রার্থনা শেষ হলে সর্দার ও তান্ত্রিক তাদের ডেকে জিজ্ঞাসা করল, আপনাদের প্রার্থনা দেখলাম, খুব সুন্দর। কিন্তু শুরুতে একজন কানে হাত দিয়ে উচ্চ স্বরে কি বলল, কেন বলল বুঝলাম না। আগন্তুকদের একজন বুঝিয়ে বলল, ওটা প্রার্থনার জন্যে সকলকে আহ্বান। নিয়ম হলো, সকলকে প্রার্থনার জন্যে ডেকে এক সঙ্গে প্রার্থনা করতে হয়। সর্দার ও তান্ত্রিক উভয়েই বলল, সুন্দর নিয়ম। সকলের অংশগ্রহনে সংঘবদ্ধভাবে এমন প্রার্থনার প্রদ্ধতি আমাদের নেই। আমরাও তো এভাবে প্রার্থনা করতে পারি! প্রার্থনার নেতৃত্ব দানকারী প্রধান ব্যক্তি বলল, অবশ্যই পারেন। আমাদের সর্দার আবার জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু প্রার্থনার সময় আপনাদেরকে তো অনেক কিছু পড়তে দেখছি! কোন মন্ত্র এগুলো? আমরা তো তা জানি না। প্রধান ব্যক্তিটি বলল, অনেক কিছু পড়তে হয় প্রার্থনায়। আপনারা চাইলে আপনাদেরও শিখিয়ে দেব। কিন্তু সবার আগে একটা বিষয় আপনাদের জানতে হবে। সেটা হলো, এই বিশ্ব-জাহানের একজন স্রষ্টা আছেন। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের যা প্রয়োজন, সবই আমাদের দিয়েছেন। মৃত্যুর পর আমরা তার কাছে ফিরে যাব। সেখানে তিনি আমাদের পুরস্কার দেবেন অথবা শাস্তি দেবেন। দুনিয়ায় আমরা ভাল কাজ করলে সেখানে পুরস্কার পাব মানে সুখের জীবন পাব, যা হবে চিরন্তন, আর দুনিয়ায় খারাপ কাজ করে গেলে সেখানে আমরা শাস্তি মানে অসীম যন্ত্রনা-যাতনার এক জীবন পাব, যাও হবে চিরন্তন। স্রষ্টা আমাদের ভালবাসেন। তিনি চান আমরা দুনিয়ায় ভাল কআজ করে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে পুরস্কার হিসাবে সুখের জীবন পাই। আল্লাহ বা স্রষ্টার এই ইচ্ছা মানুষকে জানাবার জন্যে এবং ভালো কাজের পথ কোনটা এবং মন্দ কাজের পথ কোনটা তা মানুষকে দেখাবার জন্যে কিছু কাল পরপর আল্লাহ বিশেষ লোকদের তার দূত হিসাবে পাঠান। এ ধরনের একজন সর্বশেষ মহান ব্যক্তি এসেছিলেন, তার কাছ থেকেই আমরা আমাদের প্রার্থনার ও জীবনের

অন্য সব বিষয় জেনেছি। এই বিশ্বাসকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করলে প্রার্থনার সব বিষয় আপনাদের কাছে সহজ হয়ে যাবে। এই সব কথা বলতে গিয়ে প্রধান আগন্তুকের চোখ-মুখও যেমন উজ্জ্বল উঠেছিল, তেমনি শুনতে শুনতে আমাদের সর্দার ও তান্ত্রিকের চোখ-মুখও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। প্রধান আগন্তুক থামতেই তারা দুজনেই বলে উঠল, আপনি যা বলেছেন সব কথাই ভালো, সব কথাই আমরা বিশ্বাস করি। আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল আগন্তুক প্রবীণের মুখ। বলল, দিনে পাঁচবার আমরা প্রার্থনা করি। সবই আপনাদের জানাব, শেখাব। দীর্ঘ কথা বলার পর থেমে গেল ফাদার মাহকোহ।

আহমদ মুসা বিস্ময়ের সাথে শুধু শুনছিল তাই নয়, গোগ্রাসে যেন গিলছিল। ফাদার মাহকোহ'র থামাটায় বিরাট এক ছন্দ পতনের মত ধাক্কা খেল আহমদ মুসা। তাই ফাদার মাহকোহ থামার সংগে সংগেই আহমদ মুসা বলল, তারপর কি স্যার?

তারপর কি আমিও জানি না। হাতে লেখা একশত পৃষ্ঠার একটা পুড়ে যাওয়া বইয়ের প্রথম বিশ পৃষ্ঠার কাহিনী আমি বললাম। এর পরের পাতা গুলো পুড়ে গেছে, মাঝের চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মানে এই দশ পৃষ্ঠা আবার অক্ষত পাওয়া গেছে। পরের পৃষ্ঠাগুলো পাওয়া যায়নি। নিশ্চয় পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। বলল ফাদার মাহকোজ।

মাঝের দশ পৃষ্ঠায় কি আছে স্যার? জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

বলব, বলছি। বলল ফাদার মাহকোহ।

একটু থামল তারপর নড়ে-চড়ে বসে আর একটু সরাসরি আহমদ মুসাদের মুখোমুখি হলো অধ্যাপক মাহকোহ। মুখ খুলল। বলতে শুরু করল আবার, এই দশ পাতায় তাহিতি এলাকার ও তাহিতর জন-জীবনের কিছু পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। সারাংশটা এই রকমঃ আগন্তুকরা যে জাহাজ নিয়ে এসেছিল, তাতে লোহার ব্যবহার ছিল মুখ্য। কাঠগুলো ছিল লোহার পেরেকে আটকানো, আবার লোহার পাতে মোড়া। জাহজের রেলিং ও সিঁড়ির কাঠামো ছিল লোহার। আগন্তুকরা লোহার ব্যবহার নিয়ে এল তাহিতি এলাকায়। তীর, বর্শার মতো আত্মরক্ষার অস্ত্র তৈরি, ছুরি-কাটারির মত নিত্য ব্যবিহার্য উপকরণ তৈরি

হলো লোহা দিয়ে। তৈজসপত্রের মধ্যে লোহার ব্যবহার ঢুকে গেল। হাঁড়ি, বাটি, কড়াইয়ের মতো জিনিষ তৈরি হলো লোহা দিয়ে। ভীষণ খুশি তাহিতির মানুষ। সবচেয়ে বড় খুশির বিষয় ছিল তাহিতি এলাকায় কৃষ্টির প্রচলন, কাপড়ের ব্যাপক আমদানি ও কাগজের ব্যবহার শুরু হওয়ার বিষয়। আগন্তুকদের সাথে ছিল গম, যব ছাড়াও কয়েক ধরনের সবজির বীজ। উপকূলে সমভূমি ও উপত্যকাগুলোতে আগন্তুকারা নিজেরা জংগল কেটে, ঘাস সরিয়ে চাষের কাজে লেগে গেল, হাতে-কলমে ভুমি চাষ শেখাল তাহিতিবাসিদের। মাটিতে গম-যবের গাছ উঠল, তা থেকে গম, যব প্রভৃতি খাদ্যশস্য মানুষ পেল। উপকূল ও উপত্যকার নরম মাটিতে তৈরি হলো নানা সবজির সমারোহ।বিস্ময়কর পরিবর্তন এল তাহিতি অঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে। কাপড়ের সরবরাহ এল, তার সাথে এল পোশাকের নতুন ধরন। নগ্নতা নিষিদ্ধ হয়ে গেল। মেয়েদের মাথা, গা ও পা পর্যন্ত ঢেকে পোশাক পরার রীতি হয়ে গেল। আর ছেলেরা কমপক্ষে নাভি থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত ঢাকা পোশাক পরতে লাগল। আগন্তুকদের নিয়ে আসা কাগজ তাহিতিতে নিয়ে এল লেখাপড়া। আগন্তুকরা সামস্টিক প্রার্থনার জন্যে সবাইকে নিয়ে যে প্রার্থনা গৃহ তৈরি করল, তাতে পড়াশুনার আয়োজন করা হলো সকাল ও সন্ধ্যায়। আগন্তুকরা তাহিতি ভাষা শিখল, আর তাহিতিয়ানদের তারা শেখাল তাদের ধর্মগ্রন্থ পড়ার ভাষা। দুই শিক্ষাই একসাথে প্রার্থনা গৃহে হতো। প্রার্থনা গৃহ ছিল পশ্চিম মুখী। পাতার মাদুর ফেলে মেঝেতে সম্মিলিতভাবে পশ্চিমমুখী হয়ে প্রার্থনা হতো। আগন্তুরাই প্রার্থনা শিক্ষা দিয়েছিল এবং মানুষ তা সানন্দে গ্রহণ করেছিল।তাদের ঈশ্বর হিনা তাদের কাছে আল্লাহ হয়ে গেল অথবা আগন্তুকদের ঈশ্বর আল্লাহ তাহিতিদের কাছে ঈশ্বর হিনা'র রূপ নিয়ে এল। তবে 'হিনা'র প্রতিকৃতি তৈরি বন্ধ হয়ে গেল। বলা হলো, যিনি অদৃশ্য, নিরাকার তাকে আকার দেওয়া ঠিক নয়। তার আকার দিলে তাঁর সম্পর্কে ধারনা ও বিশ্বাস ধীরে ধীরে বিকৃত ও পরিবর্তিত হতে পারে। তাহিতিয়ানদের জীবনে সবচেয়ে বড় যে পরিবর্তন এল সেটা সামাজিক ব্যবস্থাপনা ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ। আগে ছিল পারিবারিক বা বংশীয় সর্দার বা হেডম্যান হওয়ার সিস্টেম। আগন্তুকরা তৈরি করল বহু বংশ মিলে আঞ্চলিক বা ভুখন্ডগত বা সমাজভিত্তিক পরিচালক বা

শাসক হওয়ার সিস্টেম। ঠিক হলো, সবচেয়ে বয়স্ক, জ্ঞান ও চরিত্রে সর্বজনমান্য এমন ব্যক্তিই শাসক বা পরিচালক হবে। তিনি অপারগ হলে প্রবীণরা বসে অন্তত বেশীর ভাগ প্রবীণ একমত হয়ে যোগ্য কাউকে পরিচালক বা শাসক বানাবেন। আবার বেশির ভাগ প্রবীণ তাঁর সাথে একমত না হলে শাসক তাঁর পথ থেকে সরেও যাবে। কিন্তু এই ব্যবস্থা পরবর্তী কালে চলতে পারেনি। স্থিতিশীলতা আনয়ন ও বহুধাবিভক্তি নিরসন করার জন্যে বংশীয় শাসন এসে যায়। এভাবেই আমাদের পামরী রাজবংশ ক্ষমতায় আসে।আমাদের পামরী বংশ শুরু থেকেই আগন্তুকদের সাথে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। আগন্তুদের প্রায় সবাই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে পামরীদের আরু এলাকায়। আগন্তুকদের কিছু শিক্ষক হিসাবে, ধর্মনেতা হিসাবে, বিশেষজ্ঞ ও উপদেষ্টা হিসাবে গোটা তাহিতি, মুরিয়া ও অন্যান্য দ্বীপে ছড়িয়ে পরেছিল। তারা সেসব অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। আগন্তুকদের সাথে পামরীদের ব্যাপক বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হয়েছিল। পামরী রাজবংশের প্রথম রাজা আরি আবদালাহ আরিন্যু ছিল আগন্তুকদের প্রথম জাহাজের নেতা ও বিজ্ঞ আধ্যাত্মিক পুরুষ। আবদালাহ বানজাদ'র মেয়ের ঘরের প্রিয় নাতি। আগন্তুকরাই তাহিতির প্রথম আন্তর্জাতিক যোগাযোগের মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। মাঝে মাঝেই জাহাজ এসে নোঙর করত আমাদের আরুতে। জাহাজ থেকে বিভিন্ন পন্য নামত, তাহিতির কিছু ফলমূলও তারা নিয়ে যেত। বুঝা যেত তারা আগন্তুকদের পরিচিত বা তাদের সমজেরই কেউ। জাহাজে আসা কেউ কেউ থেকে যেত, আবার তাহিতি থেকেও কেউ কেউ চলে যেত। আমাদের আগন্তুকরা ও জাহাজের লোকরা ছিল একই ধর্মের।প্রার্থনার সময় জাহাজ থেকেও প্রার্থনার আহবান আসত। শোনা যেত জাহাজগুলো আসছে সুমাত্রা, জাম্বোয়াংগ, ফিজি হয়ে, আবার চলে যেত কোনটি পেরু, কোনটি মেক্সিকো, গোয়াতেমালা, পানামার দিকে। এসব দেশসহ বিভিন্ন দেশের কাহিনীও শোনা যেত আমাদের আগন্তুকসহ তাদের কাছে। এভাবে তাহিতিয়ানরা প্রথম জানল পৃথিবীতে বহু উন্নত মানুষ, উন্নত দেশ আছে, রাজ্য আছে, রাজা আছে। তাহিতির সাথে এসব দেশের লেনদেনও শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাহিতির কি দরকার, কি চাই, জানাতে হতো, পরের জাহাজে সেসব পাওয়া

যেত। বলা যায়, এভাবে সব দিক থেকে এক সময়ের অন্ধকার তাহিতি আলোময় হয়ে উঠেছিল।

থামল ফাদার মাহকোহ। থেকেই আবার বলে উঠল, অবশিষ্ট দশ পৃষ্ঠার সারাংশ মোটামুটি এটাই।

স্যার, আপনার সংগ্রহে তো আরও কাহিনী আছে! সে সবে নতুন কিছু নিশ্চয় আছে? আহমদ মুসা বলল।

প্রথমে আমি আমার বংশীয় কাহিনী ১০০ পাতার গ্রন্থগুলো শোনানোর চেষ্টা করেছি। কাঠামোগত একটা গ্যাপ পূরণ হয়েছে। কিন্তু কাহিনীর গ্যাপ রয়েই গেছে। সুতরাং এ থেকে তোমার কোন লাভ হবে না। অধ্যাপক মাহকোহ বলল।

অন্য আরও বংশের তো কাহিনী আছে! সে সবও কি আপনি সংগ্রহ করছেন? বলল আহমদ মুসা।

সে সবের অনেক আমি সংগ্রহ করেছি। সেগুলো সবই শ্রুতি ও স্মৃতি থেকে। লিখিত কাহিনীর পরবর্তী পর্যায় এগুলো। পরিবর্তন ও বিকৃতির অনেক হাওয়া বয়ে গেছে এ সবের দিয়ে। তুমি যার সন্ধান করছ তা তুমি পাবে না ওসব থেকে। ফাদার মাহকোহ বলল।

তাহলে তাহিতির ইতিহাস এভাবে হারিয়ে গেল? আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

শুধু তাহিতি নয়, গোটা প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ইতিহাসও এভাবে হারিয়ে গেছে। এখন বলা হচ্ছে, ইতিহাসের শুরু হয়েছে ইউরিপীয়দের আগমনের আশপাশ থেকে। আমি জানি না, কিভাবে এই ইতিহাসের উদ্ধার সম্ভব এবং কারা এই দায়িত্ব নেবে। বলল ফাদার মাহকোহ একটা দীর্ঘশ্বাসের সাথে।

ইতিহাস কি এভাবে সবটাই মুছে ফেলা যায়? আহমদ মুসা বলল।

এখন যায় না, কিন্তু তখন যেত। তখন এখানকার মত নানাজনে নানাভাবে ইতিহাস লিখত না। ইতিহাসের লিখিত রূপও ছিল না, ইতিহাস থাকতো স্মৃতিতে। পরে ইতিহাস লেখা শুরু হলেও তা ছিল সীমিত। তাহিতি অঞ্চলের দুর্ভাগ্য হল, লিখিত হবার পর তাহিতি অঞ্চলের ইতিহাস নষ্ট হয়ে গেছে। সিদ্ধান্ত নিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে লিখিত ইতিহাসগুলো ছিনিয়ে এনে একসাথে

আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। তবে পরবর্তীকালে নিরপেক্ষ লোকদের গবেষণা ও অনুসন্ধানে অন্ধকার অতীত মাঝে মাঝে কিছুটা ঝিলিক দিয়ে উঠেছে। যেমন বৃটিশ সমুদ্রচারী ক্যাপ্টেন কুক যিনি তাহিতি এসেছিলেন ১৭৬৯ সালে। তাঁর সহঅভিযাত্রী বিতানী জোসেফ ব্যাংকস বলেছেন পলিনেশীয় ভাষায় উৎপত্তি দক্ষিন-পূর্ব এশিয়া থেকে। তিনি বিভিন্ন তাহিতিয়ান শব্দের উৎস খোঁজ করতে গিয়ে বিলেছেন, তাহিতিয়ান এ ভাষার শেকড় শুধু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া নয়, আরও পশ্চিমে ভারত মহাসাগর, আরব সাগর এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত। ক্যাপ্টেন কুক 'তুপাইয়া' নামে এক তাহিতিয়ান নাবিকের কথা বলেছিলেন। এই নাবিকের সাথে আলোচনা করে তিনি দেখেন এই নাবিক উত্তর-পূর্বে মারকুইজ দ্বীপপুঞ্জ, পুবে তুয়ামতু অ্যাটল দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিনে অস্ট্রালী দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত জানে কিন্তু পশ্চিম দিকে তার জ্ঞান দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ান গোত্রভূক্ত প্রমানিত হয়েছে। এভাবে তাহিতিয়ান ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের মানুষের ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস সবই দক্ষিন-পূর্ব এশিয়া ও আরও পশ্চিমের সাথে যুক্ত। জনসংখ্যার বিস্তার যেমন ঐদিক থেকে এসেছে, তেমনি ভাষা, সংস্কৃতি সব ঐদিক থেকেই এসেছে। আর অষ্টক শতক থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত মুসলিম আরব বনিক, নাবিক ও মিশনারীরাই আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগরের মত প্রশান্ত মহাসাগরও চষে ফিরেছে। তারাই তাহিতির মত প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দ্বীপমালার ভাষা, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের জনক। সমুদ্র, সমুদ্রপথ ও দিক নির্ণয় সম্পর্কে তাহিতিয়ান নাবিকদের যে বিস্ময়কর জ্ঞান ছিল, তা মুসলিম সভ্যতার সমুদ্রচারী আরব নাবিকদের কাছ থেকেই পাওয়া। কিন্তু সে ইতিহাস মুছে গেছে। একজন ইউরোপীয় বিজ্ঞানী বলেছেন, যেদিন নাবিক তুপাইয়াদের সমুদ্রজ্ঞানের উৎস সম্পর্কে জানা যাবে, সেদিনই পরিস্কার হবে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপাঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের ইতিহাস। এই ইতিহাসের সন্ধান যদি আমরা চাই, তাহলে আমাদের যেতে হবে এক দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপে, এভাবে আমাদের যেতে হবে এশিয়ার অভ্যন্তর পর্যন্ত। কিন্তু দুঃখজনক হলো, এই কথা বলা হয়েছিল নাবিক তুপাইয়াদের কথার আলোকে। সেই সময়ের অবস্থা এখন নেই। অনেক ঝড় বয়ে

গেছে তারপর। সে ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে গেছে সে সময় পর্যন্ত ইতিহাসের সব উপকরণ। ফাদার মাহকোহ দীর্ঘ বক্তব্যের পর থামল।

কথা শেষ করে ফাদার মাহকোহ তার হাঁটু মুড়ে বসা অবস্থাটা একটু শিতিল করল। হিপটা মেঝের উপর রেখে দু'পা একটু সরিয়ে নল।

গভীর একটা আনন্দের ছায়া আহমদ মুসার চোখে-মুখে। সব মনোযোগ ঢেলে দিয়ে যেন শুনছিল আহমদ মুসা ফাদার মাহকোহ'র কথাগুলো। তার পেছনে বসা মারেভা ও মাহিন এবং পাশে একটু তফাতে বসা মারেভা ও মাহিনের মা। তাদের সবার চোখে দুনিয়ার বিস্ময় ! এসব কোন কথাই তাহিতির কোন ইতিহাস গ্রন্থে লেখা নেই।

ফাদার মাহকোহ থামলে আহমদ মুসা বলল, স্যার, আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি। তবু স্যার বলছি, আমার প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব মেলেনি।

তোমার প্রশ্নের জবাবের জন্যেই তো এত কথা বললাম। এর মধ্যে তোমার প্রশ্নের জবাব এসে গেছে। তাহিতিতে প্রথম জাহাজ ও পরবর্তী জাহাজগুলো মুসলমানদের। এই মুসলমানদের অনেকেই তাহিতিতে বসতি স্থাপন করে এবং তারাই অন্ধকার তাহিতিকে আলোতে নিয়ে আসে। তারাই নতুন তাহিতির নির্মাতা। তাহিতির পমেরী রাজবংশের প্রথম রাজা আরি আবাদাল্লাহ আরিন্যু'র মায়ের বংশ ও পিতার বংশ তাহিতিয়ান। তার নাম অপভ্রংশ হিসাবে আমাদের কাছে এসেছে। তার নামের আসল উচ্চারণ আর আব্দুল্লাহ আরিন্যু। তাহিতিয়ান 'আরি' মুলত আরবি শব্দ। অর্থ পরিচালক, তত্ত্বাবদায়ক, প্রিন্স, সর্দার ইত্যাদি। আরিন্যু তাহিতিয়ান শব্দের অর্থ সমুদ্র তরঙ্গ। আর সমুদ্র তরঙ্গ মানে সাগর-তরঙ্গ অর্থাৎ সর্দার আব্দুল্লাহ। প্রথম রাজার নামের সাথে 'আরবি' শব্দ থাকলে সেই বংশের একজন প্রিন্সের নামের সাথে 'হাসানা' বা 'হেসানা' শব্দ থাকবে না কেন এবং কেন রূপকথার নায়িকা ভাইমিতির সাথে 'শাবানু' অর্থাৎ 'শাহবানু' থাকবে না ? বলল ফাদার মাহকহ।

তাহলে রাজা, রাজপুত্ররা কি মুসলমান ছিলেন? জিজ্ঞাসা মারেভা মাইমিতির। তার চোখে-মুখে ঠিকরে পড়া বিস্ময়।

আমি জানি না। এর কোন দলিল পাইনি। যা পেয়েছি তা বললাম। তোমরা তরুণ-তরুণীরা এটা অনুসন্ধান করতে পার। তবে এই যে প্রার্থনাগৃহে আমরা প্রার্থনা করি, এটাও তো মুসলমানদের মসজিদের মতই। যেটুকু পার্থক্য রয়েছে, সেটা সময়ের ব্যবধানে সৃষ্টি হয়েছে বলা যায়। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে রাজধানী আরুর আংশিক ধ্বংসের সাথে এই প্রার্থনা ভবনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।তারপর এটা আবার পুননির্মিত হয় বেশ পরে। নতুন নির্মানের সময় আগের অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। সেটাই স্বাভাবিক। দেখ, আমার নামটাও বিদঘুটে। আমার নামের মাহকোহ, মিনালী, মিনারী এই তিন শব্দই আরবি শব্দের অপভ্রংশ। এর অর্থ আমার জানা নেই। আমার পিতার সময়েরও অনেক আগে এই আরবি শব্দগুলো বিকৃত হয়ে গেছে, কিন্তু বিকৃত হলেও আমাদের ঐতিহ্যের অংশ হিসাবে আমাদের পরিবার কর্তৃক তা অনুসৃত হয়ে এসেছে। এই দেখ,আমাদের প্রার্থনাকক্ষের সামনের দেয়ালে অর্ধ চন্দ্র আঁকা। একে তাহিতিয়ানদের একজন ঈশ্বর ‘হিনা’র সিম্বল বলে মনে করা হয়। আসলে এটাও বিকৃতি। আসলে এই চাঁদ মুসলমানদের বিখ্যাত অর্ধ চন্দ্র (cresent)। মুসলমানদের মসজিদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে এই অর্ধচন্দ্রের ব্যবহার হতো। আমাদের প্রার্থনা ঘরের অর্ধচন্দ্র আমি গভিরভাবে দেখেছি। আমি নিশ্চিত এটা মুসলমানদের অর্ধ চন্দ্রই। বলল ফাদার মাহকোহ।

তার, মানে স্যার, মূলত এই প্রার্থনাগৃহ মুসলিম প্রার্থনাগৃহ মানে মসজিদই ছিল। আহমদ মুসা বলল।

আমার তাই মনে হয়। বলল ফাদার মাহকোহ।

তাহলে স্যার, এসব জানার পরেও আপনি কেন এই প্রার্থনা গৃহকে তার মূল পরিচয়ে ফিরিয়ে দিচ্ছেন না, কেন এই ঘরের প্রার্থনা মুসলমানদের নামাজ হয়ে উঠছে না? আহমদ মুসা বলল।

এসব যেমন রূপান্তরিত হয়েছে, ইতিহাস যেমন রূপান্তরিত হয়েছে, তেমনি মানুষও রূপান্তরিত হয়েছে। আমিও এই রূপান্তরের ফসল। আমার জানা এবং আমি এক নই। এক হতে চাইলেও আমি পারবো না। পরিবর্তনের স্রোত

আমাকে ভাসিয়ে নেবে। স্রোতের টান উপেক্ষা করে মাটিতে শিকড় গাড়ার সাধ্য আমার নেই। বলল ফাদার মাহকোহ।

ঠিক স্যার, প্রয়োজন স্রোতের গতি পাল্টায়। মারেভা মাইমিতি বলল।

হ্যাঁ, প্রয়োজন স্রোতের গতি পাল্টায়। এটা আমার কাজ নয়, মারেভা-মাহিন এ কাজ তোমাদের। বলল ফাদার মাহকোহ।

ধন্যবাদ স্যার, মারেভা-মাহিনরা এটা পারবে ইনশাআল্লাহ ! আর একবার মূল আলোচনায় আসতে চাই স্যার। তাহিতির ইতিহাসের রূপান্তর, মানুষের রূপান্তর ও এই প্রার্থনা গৃহের রূপান্তরের মত রাজপুত্র হেসানা হোসানা ও ভাইমিতি শাবানুদের কাহিনীর রূপান্তর কতটুকু ? বলল আহমদ মুসা।

এটা বলা মুস্কিল। তবে আমি মনে করি কাহিনীতে ঈশ্বরী হিসাবে ‘হিনা’র ভুমিকা বাদ দিলে কাহিনীর যা থাকে, তার তার প্রায় সবটুকুই সত্য। কিন্তু কেন এ বিষয়টা জিজ্ঞেস করছ? ফাদার মাহকোহ বলল।

এ কাহিনী সত্য হলে অ্যাটলের কাহিনীও সত্য হবে। আমি সেই অ্যাটলকেই খুঁজছি। স্যার, আপনি কাহিনী থেকে ঈশ্বরী ‘হিনা’র ভুমিকা মাইনাস করছেন। কিন্তু তাহলে অ্যাটলের অভ্যন্তরে রাজপুত্র হেসানা ও সাগরকন্যা ভাইমিতি শাবানু গেলেন কিভাবে? বলল আহমদ মুসা।

এক কথায় এর উত্তর দেয়া যাবে না। প্রশান্ত মহাসাগর নিয়ে কাহিনী চালু আছে। সবটুকুই ‘মিথ’ বলা হয়। যেমন বিজ্ঞানের মাথায় যা ধরে না, তাকেই বিজ্ঞান অবিশ্বাস করে বসে। এটা ঠিক নয়। বিজ্ঞানের বস্তুজগতের বাইরে যে অদৃশ্য জগত সক্রিয় আছে তা বস্তুজগতের চেয়ে অনেক অনেক বড়। তেমনি আটলান্টিক সম্পর্কিত সব কাহিনীকে ‘মিথ’ বা কল্পকথা বলে অস্বীকার করা যাবে না। প্রশান্ত মহাসাগরের নিমজ্জিত মহাদেশ ‘মু’ এর কথাই ধরা যাক। প্রশান্ত মহাসাগরে একটা মহাদেশ ছিল, প্রাকৃতিক কারণে তা নিমজ্জিত হয়ে গেছে, একে ‘মিথ’ বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়। আমি এই উড়িয়ে দেয়াকে সমর্থন করি না । কাহিনীর সবটুকু সত্য কিনা আমি বলতে পারবো না। কিন্তু সত্য অবশ্যই আছে। প্রশান্ত মহাসাগরের সাগর তলের ভূ-গঠন এটাই প্রমাণ করে। প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর-দক্ষিণ মাঝামাঝি বরাবর পশ্চিম অংশের ভু-গঠন ও এর পুর্বাংশের ভু-গঠন

একেবারেই আলাদা। পূর্বাংশের মধ্যে আবার দক্ষিণ-পূর্ব অংশ গভীর খাঁদের মত। এর মাথায় অ্যাটল অধ্যুষিত পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ। প্রশান্ত মহাসাগরেরে এই অংশে একটা কিছু প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটেছিল। পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে সেই বিপর্যয়ের একটা কিছু ধ্বংসাবশেষ থাকা বিচিত্র নয়! হতে পারে সমুদ্র সম্পর্কে অভিজ্ঞ সমুদ্রচারী রাজপুত্র হেসানা হোসানা ও সাগরকন্যা ভাইমিতি শাবানুর নিমজ্জিত এমন শেল্টার ও তার প্রবেশ পথ সম্পর্কে কোনওভাবে জানতেন। দুই প্রেমিক সেখানেই আশ্রয় নিয়েছিলেন সম্ভবত। বলল ফাদার মাহকোহ।

ধন্যবাদ স্যার, আমি এমন একটি সম্ভাবনা সম্পর্কেই জানতে চাচ্ছিলাম। স্যার, আমিও মনে করি রাজপুত্রের এ বিষয়টা কোন কল্পকথা নয়, বাস্তবতা আছে এর মধ্যে। ধন্যবাদ স্যার।

কথা শেষ করে আহমদ মুসা তাকাল মাহিন মারেভার দিকে। বলল, আমরা স্যারকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। এবার বোধহয় আমরা উঠতে পারি।

মারেভারা কিছু বলার আগেই ফাদার মাহকোহ বলল, আর একটু কষ্ট আমাদের দিয়ে যেতে হবে। প্রার্থনা গৃহে যারা আসেন দুপুরের আগ পর্যন্ত তাদের নিয়ে আমরা দুপুরে এক সাথে খাই। অতএব, আরও কিছু কষ্ট না দিয়ে যেতে পারছেন না। ফাদার মাহকোহ'র মুখে স্পষ্ট হাসি।

কথা শেষ করেই উঠে দাঁড়াল ফাদার মাহকোহ। বলল, ইতিহাস তো কিছু শুনলে, চল এবার ভাঙ্গা রাজধানী 'আরু'টা একবার দেখ। ইতিহাস এখানে তোমাদের সাথে কথা বলবে। আহমদ মুসারাও উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়াল মারেভা-মহিনের মায়েরা ও।

মারেভার মা আহমদ মুসাকে বলল, চল বেটা, ভাঙ্গা রাজধানী দেখার সময় আমাদের বাড়িও দেখতে পাবে। আমাদের ও মাহিনদের বাড়ি এক রাস্তাতেই, মাত্র রাস্তার এপার-ওপার।

ধন্যবাদ মা। খুব খুশি হবো দেখলে। কেউ থাকেন না এখানে আপনাদের? আহমদ মুসা বলল।

না, তোমাদের ফাদার মাহকোহ আমাদের চাচাজী। তিনিই আমাদের অভিভাবক। তার লোকরাই সব দেখাশুনা করে। আচ্ছা চল, উনি বেরিয়ে গেছেন।

বলল মাহিনের মা।আহমদ মুসা ওদের সঙ্গে চলতে শুরু করে মারেভা ও মাহিনের মাকে লক্ষ্য করে বলল, মা, আমি মারেভা ও মাহিনের সম্পর্কে আপনাদের কিছু বলতে চাই।

এখনি? বলল মাহিনের মা।

এখনি নয়, তবে বিষয়টা জরুরী। বলল আহমদ মুসা।

জরুরী? কেমন বিষয় বেটা, খারাপ কিছু নয় তো ? বলল মারেভার মা। কিছুটা উদ্বেগ নিয়ে।

খারাপ নয়, সেটা শুভ একটা বিষয়। বলল আহমদ মুসা।

মারেভা ও মাহিন দু'জনেই পরস্পরের দিকে তাকাল, তারপর তাকাল আহমদ মুসার দিকে। তাদের মুখ কিছুটা রাঙা হয়ে উঠেছে। 'শুভ কাজ' বলতে তাদের স্যার কি বুঝিয়েছেন, সেটা তারা দু'জনেই বুঝতে পেরেছে। ইদানিং মাঝে মাঝেই তাদের স্যার বলছেন, তোমরা একসাথে যেভাবে চলাচল করছ তা ঠিক নয়, বিশেষ করে আমাদের সাথে থাকতে হলে তোমরা বিচ্ছিন্ন থাকলে চলবে না। তাদের স্যার যথাসম্ভব শীঘ্র তাদের বিয়ের পক্ষপাতি। কিন্তু মারেভাও মাহিন সলজ্জভাবে সযতনে বিষয়টাকে এড়িয়ে গেছে। এবার সেই বিষয়টা তাদের স্যার তাদের মায়ের কাছে পাড়তে যাচ্ছে। তবে 'এখনি নয়' বলে বিষয়টাকে আপাততঃ চাপা দেয়ায় তারা লজ্জার হাত থেকে বাঁচল, স্বস্তি পেল।

তারা সবাই বেরিয়ে এল প্রার্থনা গৃহ থেকে। সকলে হাঁটছে ফাদার মাহকোহ'র পেছনে পেছনে।

# ২

শর্ট রেঞ্জ অপশনে সুপার মাল্টি সাউন্ড মনিটর অবিরাম বিপ বিপ করেই চলেছে।

চার সিংহ মুর্তির উপর সেট করা রাজসিক ডিভানের উপর রাজশয্যায় শুয়ে ছিল আলেক্সি গ্যারিন। ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের সর্বময় কর্তা এই আলেক্সি গ্যারিন।

ঠিক শুয়ে থাকা নয়, বালিশে ঠেস দিয়ে পার্সোনাল পিসি হাতে নিয়ে কিছু করছিল। এর মধ্যেই তন্দ্রার শিকার হয়ে তার দেহটা বালিশের উপর নেতিয়ে পড়েছে। ঘুমিয়ে পড়েছে সে।

বিপ বিপ শব্দটা করেই চলেছে মোবাইলে সাইজের মাল্টি সাউন্ড মনিটরটা।

হঠাৎ ঘুমন্ত আলেক্সি গ্যারিনের হাতঘড়ি ক্ষীণ একটা রেড সিগন্যাল দেয়া শুরু করল। সেই সাথে সাউন্ডলেস ভাইব্রেশন শুরু হল।

এবার চমকে উঠে চোখ খুলল আলেক্সি গ্যারিন।

চোখ খুলেই সে তাকাল হাতঘড়ির দিকে। ঘড়ির স্ক্রীনে লাল অক্ষরে নোটিশ 'অ্যালাইন ভয়েস মনিটোরড'।

শোয়া থেকে ধড়মড় করে উঠে বসল এলাক্সি গ্যারিন। তার চোখ গিয়ে ফিক্সট হলো সুপার মনিটরের উপর। মনিটরের বিপ বিপ সাউন্ড বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু লাল নোটিশ মনিটরের স্ক্রীনে এখনও আছে।

তাড়াতাড়ি মনিটরটা তুলে নিয়ে আলেক্সি গ্যারিন ভিউ বাটনে চাপ দিল। মনিটরের স্ক্রিন থেকে লালা নোটিশ সরে গিয়ে সেখানে একটা রেড লেটার মেসেজ ভেসে উঠলঃ SOS-save our soul. We are seventy six..... (এসওএস, আমাদের বাঁচান। আমরা ছিয়াত্তর)...' মেসেজটি অসম্পূর্ণভাবে ক্লোজ হয়ে গেল। সেই সাথে ধাতব কিছু আছড়ে পড়ার শব্দ হলো।

স্প্রিং-এর মত ডিভান থেকে লাফ দিয়ে নামল আলেক্সি গ্যারিন। তার মনের ভেতরটায় তখন তোলপাড়। আমাদের ক্যাপিটাল অব পাওয়ার (COP) থেকে কেউ মেসেজ পাঠাচ্ছে! তার মনের এই তোলপাড়ের ছাপ মুখেও এসে পড়েছে। তার মুখের পেশীগুলো লোহার মত শক্ত হয়ে উঠেছে। দু'চোখে দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন।

আলেক্সি গ্যারিন লোকটি দেখতেও ইস্পাতের এক রোবটের মত। প্রায় ছয় ফুটের একটা স্লিম বড়ি তার। শক্তির প্রাচুর্য আর ফিটনেসের দীপ্তি যেন ঠিকরে পড়ছে তার দেহ থেকে।

আলেক্সি গ্যারিন মেঝের উপর লাফিয়ে পড়ে কোন কিছু করার আগেই হাতঘড়ি আবার নিরব শব্দে ভাইব্রেট করতে শুরু করল।

ঘড়ির স্ক্রীনের দিকে একবার তাকিয়েই বলে উঠল, হ্যাঁ গোরী, কি ঘটেছে? আলেক্সি গ্যারিনের কণ্ঠ দ্রুত ও কঠোর।

ঘড়ি থেকে কণ্ঠ ভেসে এল, মাই লর্ড, আমাদের রোবট-৩৯ তার প্রাকৃতিক চরিত্রের অন্যথা করে বাইরে থেকে এসওএস পাঠাচ্ছিল। তাকে ধরেছি। নির্দেশ বুলুন মাই লর্ড।

তুমি থাক ওখানে আমি আসছি। বলল আলেক্সি গ্যারিন।

কথা শেষ করেই আলেক্সি গ্যারিন দরজার দিকে হাঁটতে শুরু করল। দরজার কাছাকাছি হতেই দরজা আপনাতেই খুলে গেল।

দরজা পার হয়ে করিডোরে পা রেখে একটু ঘুরল। দরজার দেয়ালে একটা ডিজিটাল কি বোর্ডে তিন ও নয় বাটন চাপল।

সংগে সংগে করিডোর সচল হয়ে উঠল।

করিডোরের লম্বালম্বি দু'টো অংশ একটা লাল, অন্যটি সবুজ। আলেক্সি গ্যারিন দাঁড়িয়েছিল সবুজ অংশে। সবুজ অংশই চলতে শুরু করেছে।

এ করিডোর সে করিডোর ঘুরে মুভিং এলেভেটরটি মনে হলো দু'তলা পরিমাণ নিচে।

প্রবেশ করল আলেক্সি গ্যারিন ৩৯ নাম্বার সেলে।

আলেক্সি গ্যারিন প্রবেশ করতেই সেলের মাঝখানে দাঁড়ানো আলেক্সি গ্যারিনের পার্সোনাল সিকিউরিটি ও পার্সোনাল অপারেশন কমান্ডার গৌরী বাউ করে দু'পা পেছনে সরে গেল। বলল, আসুন মাই লর্ড।

আলেক্সি গ্যারিন দেখল, রোবট-৩৯-এর দু'হাতে হাতকড়া। বসিয়ে রাখা হয়েছে এক চেয়ারে।

রোবট-৩৯ আসলে বিজ্ঞানী কুতাইবা ওয়াং-এর এখানকার সিরিয়াল নাম। সে পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ কণা-বিজ্ঞানী। বাড়ি তার চীনের জিনজিয়াং প্রদেশে। তিন মাস আগে অপহৃত হয়ে এখানে এসেছে। সে বন্দী জীবনের প্রথম দিন থেকেই মুক্তির চেষ্টা করছে। ওদের বন্দুকের মুখে টিভি ক্যামেরার সামনে ওদের ফরমাইসি গবেষণা করতে হয় ল্যাবরেটরীতে বসে। এই কাজ করার ফাকেঁই প্রতিদিন তিল তিল করে সে মাল্টিওয়েভ ট্রান্সমিটার তৈরী করে। এ ট্রান্সমিটারের ট্রান্সমিশন যে কোন ওয়েভ লেংথে প্রবেশ করতে পারে। ম্যাসেজ প্রেরণের শুরুতেই সে ধরা পড়ে গেছে। সে জানত, এ ধরনের মেসেজ গার্ড দেবার ব্যবস্থা এদের আছে। কিন্তু কুতায়বা ওয়াং বলেছিল মেজেস পাঠানোর পর ধরা পড়লে ক্ষতি নেই। নিজের জীবন দিয়েও যদি ৭৫জন বিজ্ঞানীর অতি মূল্যবান জীবন রক্ষা করা যায়, তাদের প্রতিভার অপব্যবহার থেকে সে প্রতিভাগুলোকে বাঁচানো যায় এবং এদের ষড়যন্ত্র বানচাল করা যায়। তাহলে সেটাই হবে তার জন্যে বেশি আনন্দের। কিন্তু তা সে পারেনি। মেসেজ পাঠানো তার সম্পূর্ণ হয়নি। যেটুকু পাঠিয়েছে, সেটুকু কি কোন কাজে লাগবে?এই চিন্তাই বিজ্ঞানী কুতায়বা ওয়াং-এর কাছে সবচেয়ে বড় বিষয় হয়ে উঠেছে। শয়তানদের বড় শযতান আলেক্সি গ্যারিনকে সেলে প্রবেশ করতে দেখে এই চিন্তাই তার মধ্যে আবার তোলপাড় করে উঠল।

আলেক্সি গ্যারিন মোটা গোড়ালির পয়েন্টেড সু পায়ে মাটি কাঁপানো পদক্ষেপে বিজ্ঞানী কুতায়বা ওয়াং-এর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। মুখের চেহারা তার বিস্ফোরণ উন্মুখ। বলল সে বিজ্ঞান কুতায়বা ওয়াংকে লক্ষ্য করে, তোমার সাথে আর কে আছে এই ষড়যন্ত্রে? কথাগুলো তার শান্ত, কিন্তু বুলেটের মত শক্ত।

কুতায়বা ওয়াং কোন জবাব দিল না। আলেক্সি গ্যারিনকে কোন সাহায্য করার কোন প্রশ্নই আসে না।

দাতেঁ দাঁত চাপল যেন আলেক্সি গ্যারিন। তার ডান হাতটা বেরিয়ে এল প্যান্টের পকেট থেকে। তার হাতে ছোট্ট সাদা সর্বাধুনিক ভার্সনের লেজারগান। গানটি টার্গেট করেছে কুতায়বা ওয়াং-এর দুই হাত। পর মুহূর্তেই দেখা গেল, বিজ্ঞানী কুতায়বা ওয়াং-এর দুই হাত নেই। কবজি থেকে দুই হাত তার উধাও হয়ে গেছে।

যন্ত্রণায় ভেঙে পড়ার কথা বিজ্ঞানী কুতায়বা ওয়াং-এর। কিন্তু তার মুখ থেকে একটা শব্দও বেরুল না। চোখ দু'টি তার বিস্ফোরিত। দাঁতে দাঁত চাপার তীব্রতায় মাড়ি ফেটে রক্ত বেরিয়ে এসেছে।

আলেক্সি গ্যারিন ঘুরে দাঁড়াল গৌরীর দিকে। বলল, গৌরী, তুমি ওকে যা করবার কর। তারপর দৃষ্টান্ত হিসাবে একে আমাদের অন্য রোবটদের দেখাও। তারপর আমার কাছে নিয়ে এস। আমি ততক্ষনে ভেতরের বাইরের ভিডিও ফুটেজগুলো নিজে একবার চেক করব।

বলেই আলেক্সি গ্যারিন গট গট করে হেঁটে দরজার দিকে চলল।

গৌরী 'ইয়েস মাই লর্ড' বলে একটা বাউ করল।

সেল থেকে বেরিয়ে গেল আলেক্সি গ্যারিন।

গৌরী ঘুরে দাঁড়াল বিজ্ঞানী কুতায়বার দিকে। বলল, ড. ৩৯, তোমাকে আর শাস্তি দেবার দরকার নেই। তোমার দেহের রক্ত যত কমছে, মৃত্যু তোমার তত নিকটবর্তী হচ্ছে। এর চেয়ে বড় শাস্তি তোমার জন্যে আর নেই।

বলেই গৌরী চেয়ারের পেছনে একটা বোতামে চাপ দিল। সংগে সংগে চেয়ারের চার পায়ার তলায় চার চাকা নেমে এল। চেয়ার ইঞ্চি দু'য়েক উপরে উঠল।

গৌরী চেয়ার ঠেলে নিয়ে চলল, সেলগুলোতে তার প্রদর্শনীর জন্যে। সেলগুলো বটমের দু'টি ফ্লোর জুড়ে।

টপ ফ্লোরে ভিআইপি রেসিডেন্টস ও তাদের অফিস। আলেক্সি গ্যারিন ও গৌরীরা যখন 'ক্যাপিটাল অব পাওয়ার (COP) –এ থাকে তখন টপ ফ্লোরেই তাদের আবাস হয়।

ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের কাল্পনিক বা স্বপ্নের রাজধানী হলো এই 'ক্যাপিটাল অব পাওয়ার'। একটা অ্যাটলের তলদেশে বিশাল এলাকা জুড়ে গড়ে তোলা ক্যাপিটাল অব পাওয়ার।

গৌরী বিজ্ঞানী কুতায়বা ওয়াং-এর চেয়ার ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে কাছের সেলটার দিকে। চেয়ারের হাতলের উপর দিয়ে ঝুলে থাকা তার কব্জি পর্যন্ত উড়ে যাওয়া বাহু থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে অবিরাম। কিন্তু কুতায়বার মুখ একেবারেই বাবলেশহীন। যেন আহত হাতটা তার নয়।

কাছের সেলটার একেবারে মুখোমুখি এসে গেছে গৌরী বিজ্ঞানী কুতায়বা ওয়াংকে নিয়ে।

সেলগুলো মহাশূন্য ক্যাপসুলের আদলে তৈরি। বাইরের অংশটা ফাইবারিক কাচের তৈরি। বাইরে থেকে ভেতরের সবকিছুই দেখা যায়। ক্যাপসুলের ভেতরে রয়েছে বেড, টয়লেট, লাইব্রেরি ও ল্যাবরেটরি। ব্যায়াম করার জন্যে ঝুলন্ত বারসহ রয়েছে নানা উপকরণ।

এই ক্যাপসুল সেলগুলো রয়েছে বৃত্তাকার বিশাল একটা লাউঞ্জের চারদিক ঘিরে। বৃত্তাকার লাইঞ্জের মাঝখানে রয়েছে সেই ফাইবারকি কাচের দীর্ঘ আয়তাকার কক্ষ। তাতে সারিবদ্ধ টেবিল। রোবটের মত লোকরা বসে। সেলগুলোর সাথে অফিসকক্ষের লোকদের ইন্টারকম যোগাযোগ রয়েছে। এই অফিসকক্ষ থেকেই সেলগুলো কাজ-কর্ম নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এছাড়া পর্যবেক্ষণের জন্যে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সিসি টিভি ক্যামেরা তো রয়েছেই। সেলগুলোর কোন কথা কোন কাজই মনিটর ও পর্‌যবেক্ষণের বাইরে নয়।

গৌরী বিজ্ঞানী কুতায়বা ওয়াং-এর চেয়ার ঠেলে সেলটির সামনে দাঁড়াতেই সেলে দরজা আপনাতেই খুলে গেল।

রোবট-৪০ মুক্তির স্বপ্নের পেছনে ছুটে চলা অবস্থা তোমরা দেখ। যে দুই হাত দিয়ে আমাদের আইন ভেঙেছিলে, সেই দু'হাত দেখ নেই। কিছুক্ষণ পর সেও দুনিয়ায় থাকবে না। বলল চিৎকার করে গৌরী।

রোবট-৪০ আরেকজন বিজ্ঞানী। সে ইন্দোনেশিয়ার 'সী ম্যুনিকেশন সাইনটিস্ট', নাম ড. সোয়েকার্ন নাসির। সে গৌরীর কথা শুনে চমকে তাকাল ড. কুতায়বা ওয়াং-এর দিকে। তার দু'হাতের দিকে নজর পড়তেই একটা বিষাদের ছায়া খেলে গেল ড. সোয়েকার্ন নাসিরের মুখের উপর দিয়ে। কিন্তু পরক্ষণেই মিলিয়ে গেল মুখের বিষাদ ভাব, শক্ত হয়ে উঠল তার মুখ। তাতে ফুটে উঠল কঠিন সিদ্ধান্তের একটা চিহ্ন।

মুখে কিছুই বলল না ড. সোয়েকার্ন নাসির।

গৌরীর কথা শেষ হতেই কথা বলে উঠল ড. কুতায়বা ওয়াং। বলল, প্রিয় ভাই, আপনাকে বলছি, সবাইকে বলব, মুক্তির স্বপ্ন আমাদের সফল হবে। আংশিক হলেও আমি বাইরে মেসেজ পাঠাতে পেরেছি। আমি নিশ্চিত, এই মেসেজ আল্লাহ ঠিক জায়গায় পৌছিয়ে দেবেন। আপনারা এই শয়...।

কথা শেষ করতে পারলো না ড. কুতায়বা ওয়াং। গৌরীর রিভলবারের এক পশলা গুলি ড. কুতায়বা ওয়াং এর মাথা একবারে ছাতু করে দিল। রক্তের স্রোতে পেইন্ট হয়ে গেল ড. কুতায়বা ওয়াং-এর মুখ ও দেহের অর্ধাংশ। অর্ধাংশ উড়ে যাওয়া মাথা বীভৎস রূপ নিয়েছে।

রিভলবার পকেটে রাখতে রাখতে গৌরী বলল ড. সোয়েকার্ন নাসিরকে লক্ষ্য করে, রোবট ফরটি, মেসেজটা সে সবাইকে বলতে চেয়েছিল, বলার ব্যবস্থা করে দিলাম। একদম স্বর্গে গিয়ে বলবে। গৌরীর চোখ-মুখে আগুন।

কষ্টের একটা ভাব ফুটে উঠেছিল ড. সোয়েকার্ন নাসিরের চোখ-মুখে। কিন্তু মুহূর্তেই সে ভাবটা কেটে মুখের সেই শপথ দৃঢ় ভাবটা আবার ফিরে এল। মনে মনে বলল, ড. ওয়াং কি মেসেজ পাঠিয়েছে? কেমন করে সে এই অসাধ্য সাধন করল! মনে মনে স্যালুট দিল সে ড. ওয়াং-এর উদ্দেশ্যে। গৌরী ড. ওয়াং-এর হুইর চেয়ার ঠেলতে শুরু করেই আবার থমকে দাঁড়াল। মুখ ঘুরিয়ে বলল ড. নাসিরকে রোবট ফরটি, আমাদের বিজ্ঞানী ড. আলেকজান্ডারকে সাথে নিয়ে

আমি বিকেলে দিকে তোমার কাছে আসব। সব ঠিক ঠিক রেখ। মনে আছে তো, অ্যান্টিম্যাটার ফুয়েলের আজ ল্যাবরেটরি টেস্ট হবার কথা। টেস্ট টিউব আজ তোমার রেডি রাখার কথা। আজ কিন্তু কোন এক্সকিউজ শোনা হবে না। ইলেকট্রিক চাবুকের কথা মনে আছে নিশ্চয়। তোমার পিঠের আগের ঘাগুলোর উপর ইলেকট্রিক চাবুক কি আরও ভাল ফল দেবে?

বলেই আবার চেয়ার ঠেলতে শুরু করল গৌরী।

একটা সেল থেকে আরেকটা সেলের দূরত্ব আট নয় ফুটের বেশি নয়। এক সেল থেকে অন্য সেলের ভেতরের সব কিছুই দেখা যায়। কিন্তু প্রতিটি সেলই সাউন্ডপ্রুফ। এক একটি সেলে একজন করে বিজ্ঞানী বাস করে এবং সেলের ল্যাবরেটরিতেই তাদের কাজ করানো হয়। আউটডোর পরীক্ষাগুলো বটম ফ্লোরের ওপেন স্পেসে করা হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় ফ্লোরে বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞরা থাকে এবং তাদের বন্দুকের মুখে কাজ করানো হয সেখানেই। ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেট কিডন্যাপ করে আনা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদের দিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে থাকে।

গৌরী একের পর এক সেলে বিজ্ঞানী ওয়াং-এর মুক্তি প্রচেষ্টার পরিণতি দেখিযে চলল। সেকেন্ড ফ্লোরের সব সে কভার করার পর শেষ সেলটা থেকে প্রথম ফ্লোরে নামার মুভিং ইলেভেটারে উঠতে যাচ্ছিল। সেলটির বিজ্ঞানী ও ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের পুতুল হয়ে উঠা ড. স্যামুয়েল মাদারল্যান্ড গৌরীকে লক্ষ করে বলল, ইয়োর হাইনেস ম্যাডাম, একটা কথা বলতে চাই।

বলো রোবট-৬৯। বলল গৌরী।

আমার মনে হয় এই অবস্থায় একজন বিজ্ঞানীকে অন্য বিজ্ঞানীদের দেখানো ঠিক হচ্ছে না। এর দ্বারা তারা ভয় পাবার বদলে ক্ষুব্ধ বেশি হবে। আপনাদের উদ্দেশ্য ওদের থেকে কাজ নেয়া, বিক্ষুব্ধ করা নয়। ড. স্যামুয়েল মাদারল্যান্ড বলল।

থমকে দাঁড়াল গৌরী। বিজ্ঞানী ড. স্যামুয়েলের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে এক মুহূর্ত ভাবল। তারপর মুখে হাসি টেনে বলল, 'ধন্যবাদ রোবট-৬৯, তোমার পরামর্শের জন্যে ধন্যবাদ।

বলে প্রথম ফ্লোরে নামার জন্যে মুভিং এলিভেটরের দিকে না গিয়ে চেয়ার ঠেলে এগিয়ে চলল টপ ফ্লোরে ওঠার এলিভেটরের দিকে।

উঠে গেল টপ ফ্লোরে।

টপ ফ্লোরে উঠেই বিজ্ঞানী ড: ওয়াং-এর চেয়ার ঠেলে নিয়ে একটা সংকীর্ণ করিডোর হয়ে একটা প্রান্তে চলে গেল। দেয়ালের গায়ে বর্গাকৃতি একটা খাঁজে চেয়ার ঢুকিয়ে হাত উপরে তুলে দেয়ালের সাথে মিশে থাকা একটা টাচ বাটনে চাপ দিল। সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালের ভেতর থেকে একটা দরজা এসে খাঁজটা ঢেকে দিল। ভেতর থেকে সূক্ষ্ম যান্ত্রিক একটা শব্দ ভেসে এল এবং একটা পতনের শব্দ।

গুডবাই রোবট-৩৯। বলার সাথে একটা ক্রুর হাসি ফুটে উঠল গৌরীর মুখে।

দেয়ালের খাঁজটা লাশ ও এ ধরনের বর্জ্য পাতালের সাগর বক্ষে চালান করার একটা ট্র্যাপ।

গৌরী ফিরে এল। গৌরী আলেক্সি গ্যারিনের কক্ষের সামনে আসতেই অটোমেটিক দরজা খুলে গেল। ভেতর থেকে ভারী কণ্ঠ ধ্বনিত হলো আলেক্সি গ্যারিনের, এস গৌরী। তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।

ইয়েস মাই লর্ড! বলে গৌরী ভেতরে প্রবেশ করল।

পেছনে দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

একটা ডিভানে রাজার মত পা ছড়িয়ে বসে ছিল আলেক্সি গ্যারিন। গৌরী ভেতরে প্রবেশ করলে আলেক্সি গ্যারিন সোজা হয়ে বসল। তার পাশে পড়ে আছে রিমোট কনট্রোল সেট।

গৌরী আস্তে আস্তে গিয়ে আলেক্সি গ্যারিনের একটু পাশে পেছনে গিয়ে দাঁড়াল।

গৌরী, আমাদের রোবট নাম্বার ৩৯ সাংঘাতিক ছিল। সাংঘাতিক মেধাবী আর কুশলী ছিল। কারও সাথে যোগাযোগ ছাড়াই অভূতপূর্ব কায়দায় অবিশ্বাস্য শক্তির মাল্টিওয়েভ ট্রান্সফরমার বানিয়েছিল। চতুর্দিকে দু'শ কিলোমিটার পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল তার এসওএস। বলল আলেক্সি গ্যারিন।

সর্বনাশ মাই লর্ড! এই বিশাল অঞ্চলের কোন না কোন জাহাজের মনিটরিং-এ তা ধরা পড়তে পারে। গৌরী বলল।

না, ভাগ্য বলে যদি কিছু থাকে তা ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের সাথে রয়েছে। পাশের অ্যাটলের ট্রানজিট স্টেশনে আমাদের যে এন্টেনা আছে, তার সার্চ পাওয়ার ঐ মেসেজের বিস্তার-রেঞ্জের চেয়ে অনেক বেশি। সেদিনের সে সময়ের সার্চ রিপোর্টের পুরো রিপোর্ট আমি দেখেছি। ঐ সময় রেডিও এ্যান্টেনাওয়ালা কোন যান্ত্রিক যান এই এলাকায় ছিল না। ইঞ্জিনওয়ালা বোট কিছু ছিল। ছবিতে দেখা গেছে সেগুলো নিছকই ফেরিবোট এবং খুবই ছোট পার্সোনাল। কোন ট্যুরিস্ট বোট কোথাও দেখা যায়নি। তবে ফেরি ধরনের একটা লোকাল বোট আমাদের পাশের তাহানিয়া অ্যাটলের আমাদের ট্রানজিট স্টেশনের একদম পাশে উত্তরে নোঙর করা ছিল। লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, নির্দিষ্ট সময়টাতে আমাদের এই ক্যাপিটাল থেকে ট্রান্সমিটিং-এ যে ওয়েভ চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে তার ম্যাপে দেখা যাচ্ছে ওয়েভের একটা ধারা ঐ বোটের উপর ভেঙে পড়ছে। এর কারণ একাধিক হতে পারে। ঐ বোটে মাল্টিওয়েভ মনিটর থাকা তার মধ্যে একটি। সুতরাং আমাদের আশংকা মাত্র ঐ বোটটি ঘিরে। থামল আলেক্সি গ্যারিন। তার দু'চোখে আগুন!

একটা সাধারণ বোটে ঐ ধরনের মাল্টিওয়েভ মনিটর থাকা স্বাভাবিক নয়। ঐ বোটের আরোহী কারা সেটা কি ছবি থেকে জানা গেছে মাই লর্ড?

আরোহী ছিল দু'জন ছেলে, একজন মেয়ে।

একজন ছেলে ও মেয়েটি পলিনেশীয় অঞ্চলের, অন্যজন বিদেশী। কিন্তু ইউরোপীয় নয়। ওদের ফটো-প্রিন্টও পেয়ে গেছি। উদ্বেগের ব্যাপার হলো, যে সময়টুকুতে মেসেজ প্রচার হতে পেরেছে, সে সময় তারা তিনজনই বোটের ভেতরে ছিল। মেসেজের শুরুতেই প্রথম ভেতরে ঢুকে বিদেশী লোকটি। তারপর অন্যরাও। বলল অ্যালিক্সি গ্যারিন।

তার মানে মাই লর্ড, আপনি কি মনে করেন ওরা মেসেজের কোন সিগন্যাল পেয়েই ভেতর ঢুকেছে মেসেজ রিসিভ করার জন্যে? গৌরী বলল। উদ্বেগ তার চোখে-মুখে।

সেটাই ঘটেছে এটা বলার মত কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু শতভাগ সন্দেহ যে, সেটাই ঘটেছে।

বলে মুহূর্তকাল থেমে আলেক্সি গ্যারিন চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। বলল গৌরী, ফাইল রেডি। ফাইলে পাবে বোটের ছবি, বোটের নাম্বারও পাবে বোটে। তিনজন ছেলেমেয়ের ছবি রয়েছে ফাইলে। কাজ শুরু কর। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে চাই ঐ বিদেশীকে আমাদের হাতে। তাকে জীবিত পেতে হবে। প্রথমে দেশী দু'জনকে খুঁজে পেলে পরবর্তী কাজ সহজ হয়ে যাবে।

কথা শেষ করেই আলেক্সি গ্যারিন বলল, কাজ শুরু করার আগে গৌরী কিছু রেস্ট নাও। বলে আলেক্সি দু'ধাপ এগিয়ে বেডে উঠে গেল। গৌরী প্রথমে কিছুটা বিব্রত হলেও পরক্ষনেই তার মুখে রক্তিম হাসি ফুটিয়ে তুলল। সেও বেডে উঠে গেল। সংগে সংগেই বেডটা ঢুকে গেল দেয়ালের মধ্যে।

অদৃশ্য হয়ে গেল বেডটা। দেয়াল ফিরে এল আগের জায়গায়।

গৌরী ও তার কমান্ডোরা গত ২৪ঘণ্টা ধরে ফলো করছিল মাহিন ও মারেভাকে। বোটের মালিকের কাছ থেকে তারা শুনেছিল, যে বিদেশীর জন্যে তারা সেদিন বোট ভাড়া করেছিল, সে বিদেশী যে মাহিন ও মারেভাদের শুধু গাইড নয়, বন্ধুও মনে হয়েছিল। এ থেকেই গৌরী নিশ্চিত হয়েছিল, মাহিন ও মারেভাকে ফলো করলেই সে বিদেশীকে পাওয়া যাবে। মাহিন ও মারেভাকে পাকড়াও করে তাদের কাছ থেকে জানার চেয়ে এটাই নিরাপদ। তাদের পাকড়াও করলে বিদেশী অবশ্যই সেটা জানবে এবং সে আত্মগোপন করতে পারে। মাহিন ও মারেভাকে ফলো করছে গৌরীরা। এই সিদ্ধান্ত থেকেই গৌরীদের সৌভাগ্যবানই বলতে হবে। বোটের নাম্বার ধরে বোটের মালিককে খুজে পাওয়া গৌরীদের জন্যে কঠিন হয়নি। তাহিতি থেকে তাহিতি, মুরিয়া ও তোয়ামতু অ্যাটল আইল্যান্ডে চলাচলকারী সব যান্ত্রিক বোট ও লঞ্চের রেজিস্ট্রেশন করা হয়ে থাকে। এখান থেকেই গৌরীরা বোটটির মালিকের সন্ধান পেয়েছে। আর বোট মালিকের বুকিং

রেকর্ড থেকে পেয়েছে মাহিনের ঠিকানা। মাহিনের ঠিকানায় ওৎ পেতে থেকে মাহিনের সাথে মারেভাকেও পেয়েছে। ভিডিও থেকে পাওয়া ছবির সাথে মিলিয়ে তাদের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছে গৌরীরা।

গত ২৪ ঘণ্টায় এক মুহুর্তের জন্যে গৌরীরা পিছু ছাড়েনি মাহিন ও মারেভার। দুই গ্রুপকে দু'জনের পেছনে লাগানো হয়েছে। গৌরী দুই গ্রুপের তদারক করছে।

এই ২৪ ঘণ্টায় মাহিন ও মারেভা আলাদা আলাদাভাবে বাজারে গেছে, পর্যটন অফিসে গেছে, একবার একটা হোটেলেও গিয়েছিল। গৌরীরা তাদের ফলো করেছিল। কিন্তু বিদেশী সেই লোকটিকে কোথাও দেখেনি। গৌরী শংকিত হয়ে পড়েছিল বিদেশী লোকটি চলে যায়নি তো কিংবা আলাদাভাবে অন্য কিছু করায় ব্যস্ত নয় তো! তাহলে কি আমরা ভুল করছি? মাহিন ও মারেভাকে ধরে তাদের কাছ থেকে কথা আদায় করাই কি উচিত ছিল?

গৌরী মারেভাদের গেটের অপজিটে রাস্তার ওপাশে একটা গাড়িতে বসে এসব কথা ভাবছিল। তার দু'চোখ এদিক সেদিক ঘুরে বারবার গিয়ে স্থির হচ্ছিল মারেভার সেই গেটে। দূরবীন দিয়ে মারেবার বাড়ির সামনের কিঞ্চিৎ অংশও দেখতে পাচ্ছিল গৌরী।

এক সময় দূরবীনেই ধরা পড়ল মাহিন একটা ট্যাক্সি নিয়ে মারেভাদের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল। অল্প কিছুক্ষণ পর ট্যাক্সি আবার বেরিয়ে এল। এবার ট্যাক্সিতে দু'জন, মাহিন ও মারেভা।

বেরিয়ে তারা পাপেতির মুল শহরের দিকে না গিয়ে পূর্বদিকে চলল। মাহিন-মারেভাদের গাড়ি চলতে শুরু করলে মারেভাদের বাড়ির পাশের পার্কে একটা আড়াল থেকে আরেকটা গাড়ি বেরিয়ে মারেভাদের গাড়ির পিছু নিল।

তখন রাত আটটা। গৌরী তার গাড়িতে বসে সব দেখছিল।

এত রাতে কোথায় বেরুচ্ছে মাহিন ও মারেভা দু'জনে? সেই বিদেশীর কাছে কি? হতেও পারে। গৌরী তার গাড়ি স্টার্ট দিল।

পেছনের মোড় ঘুরে গাড়ি দু'টির পেছনে ছুটে চলল গৌরীর গাড়ি।

গাড়ি পাহাড়ি নদী টাওনার সমান্তরালে উত্তরে এগিয়ে চলেছে। সামনেই সাভাক।

গৌরীর মাথায় চিন্তা, মাহিন-মারেভারা যাচ্ছে কোথায়? টাওনা লেক একেবারেই তো সামনে!

গাড়ি স্লোপিং পথে নিচে নামতে শুরু করেছে।

অনেক দূর থেকে দেখা যায় 'লা ডায়মন্ড ড্রপ তাহিতি' নামের বিখ্যাত আন্তর্জাতিক হোটেলের নিয়ন সাইন।

সাইনবোর্ডটা চোখে পড়তেই গৌরী 'ইউরেকা' বলে চিৎকার করে উঠল। উচ্চ কণ্ঠে বলল, কোন সন্দেহ নেই মাহিন-মারেভারা সেই বিদেশীর কাছেই যাচ্ছে। বড় বড় বিদেশীই এ হোটেলের বাসিন্দা।

মাহিন-মারেভাদের গাড়ি হোটেল লা ডায়মন্ড ড্রপ গাড়ি বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। মাহিন ও মারেভা নামলে গাড়ি পার্কিং-এর দিকে চলে গেল।

মাহিন-মারেভারা নামার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে অনুসরণকারী ব্ল্যাক সান-এর গাড়ি এসে হোটেলটির গাড়ি বারান্দায় দাঁড়াল। তিনজন গাড়ি থেকে বেরিয়ে দ্রুত হোটেলের ভেতরে চলে গেল। আর একজন গাড়ি পার্কিং-এ রেখে আসার জন্যে ওদিকে গেল।

গৌরী তার গাড়ি পার্কিং-এ দাঁড় করিয়েই মোবাইল করল আগের গাড়ির ব্ল্যাক সান-এর লোকদেরকে। বলল, নাশকা, তোমরা ওদের ফলো করছ তো? ওদের পেছন ছাড়বে না। কোন রুমে ঢোকে কিংবা রেস্টুরেন্টে ঢোকে সেটা দেখ। আমি রিসেপশনে অপেক্ষা করছি। আমাকে জানাবে।

কল অফ করে গৌরী ধীরে-সুস্থে চলল হোটেলের রিসেপশনের দিকে। রিসেপশনে বসার অল্পক্ষণের মধ্যেই কল পেল গৌরী। কল অন করে সাড়া দিতেই ওপার থেকে নাশকার গলা পেল গৌরী। বলল চাপা কণ্ঠে, ম্যাডাম হোটেলের দশ তলার পেছনের দিকে ১০১৫ ডবল ডিল্যাক্স রুমে ওরা প্রবেশ করেছে। গৌরী তাদেরকে নির্দেশ দিল, তোমরা ওদের জন্যে অপেক্ষা কর। কি হচ্ছে জানাবে আমাকে।

মোবাইলটা জ্যাকেটের পকেটে ফেলে উঠে দাঁড়াল গৌরী। চলল বুকিং কাউন্টারের দিকে। মনে মনে বলল, জানতে চাই কক্ষটিতে থাকে ঐ লোকটি কোন দেশের, কি তার নাম।

খাস ইউরোপীয় চেহারার চুম্বকের মত আকর্ষণকারী অসামান্য এক সুন্দরীকে কাউন্টোরের সামনে দাঁড়াতে দেখে ছুটে এল কাউন্টারের যুবক এ্যাটেনড্যান্ট। বলল, ইয়েস, ওয়েলকাম ম্যাডাম। বলুন কি করতে পারি আপনার জন্যে?

নির্বিকার চেহারায় কোন পরিবর্তন এল না গৌরীর। বলল, একটা রুম চাই। ডবল ডিল্যাক্স ১০১৫ রুমটি কি পাওয়া যাবে? কয়েক বছর আগে এসে ঐ রুমেই ছিলাম।

বুকিং কাউন্টারের যুবকটির মুখটি ম্লান হয়ে গেল।

বলল, ম্যাডাম, রুমটি আগে থেকেই বুকড্। আপনি....।

গৌরী তার মধ্যেই বলে উঠল, ঐ কক্ষে কে আছে?

থেমে গিয়েছিল বুকিং কাউন্টারের যুবকটি। তাড়াতাড়ি রেজিস্টার দেখে বলল, বুকিং আছে 'আবু আব্দুল্লাহ'-এর নামে।

মুসলমান! স্বগত কণ্ঠে বলল গৌরী। ভ্রু দু'টি তার কুঁচকে গেল। বলল সে, কোন দেশের?

সৌদি আরবের নাগরিক। বলল বুকিং কাউন্টারের যুবক।

সৌদি আরবের! ছবিতে তার যে পোষাক দেখেছি তা তো সৌদি আরবের নয়! অবশ্য সৌদিরা বাইরে গেলে ইনফরমাল ক্ষেত্রগুলোতে পশ্চিমা পোষাকই বেশি পরে! আবার স্বগত কণ্ঠ গৌরীর। একটু অস্বস্তি বোধ করল গৌরী। সৌদিদের প্রচুর টাকা। তারা বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেও থাকে প্রচুর। তাহিতিতে তারা আসবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ল লোকটি তো বোটে মাল্টিওয়েভ মনিটর ব্যবহার করেছে। কোথায় পেল এমন বহুমুখী আলট্রা সেনসেটিভ মনিটর! বোটে থাকার প্রশ্নই ওঠে না। মাহিন ও মারেভার নয়, তাদের পরিচয়, কাজ, তৎপরতা থেকেই তা পরিষ্কার। তাহলে মনিটর তো সেই সৌদি নাগরিকেরই! তীরের মত সেই সন্দেহ ও হিংস্র ক্রোধ এসে তার মনে প্রবেশ করল।

মোবাইল বেজে উঠল গৌরীর।

এক্সকিউজ মি! বলে গৌরী কাউন্টার থেকে অনেকটা সরে গিয়ে বলল, বল নাশকা, কি খবর?

ম্যাডাম ঘর থেকে বেরিয়ে সেই বিদেশীসহ তিনজন লিফটের দিকে যাচ্ছে। আমরা ফলো করছি। নাশকা বলল।

সেই বিদেশী কে? মানে সেই ছবির বিদেশী কিনা? বলল গৌরী।

ইয়েস ম্যাডাম, হুবহু সেই ছবির লোক। নাশকা বলল।

গুড, তোমরা ওদের ফলো করো। আমি নিচে আছি। বলল গৌরী।

গৌরী গিয়ে বসল কাছের এক সোফায়। ভাবতে লাগল, লোকটি কেমন হবে! তারা আলেয়ার পেছনে ছুটছে না তো! টাকাওয়ালা সৌদিদের বিচিত্র রকম শখ আছে। তারা মাল্টিওয়েভ মনিটর শখবশতও কিনে রাখতে পারে।

এসব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে গৌরী মনে মনে বলল, ঐসব চিন্তার সময় এখন নয়। তাকে ধরতে হবে, বাজিয়ে দেখতে হবে। তারপর অন্য কথা। তবে সৌদি নাগরিক তো বটে! কোন হৈ চৈ হওয়ার সুযোগ দেয়া যাবে না। নিরাপদ জায়গায় ফাঁদে আটকিয়ে নিরবে কাজ সারতে হবে।

আবার মোবাইল বেজে উঠল গৌরীর। নাশকার কল।

গৌরী বলল, বল নাশকা।

ম্যাডাম, ওরা তিনজন হোটেলের ২১ তলায় এ্যাপেক্স রেস্টুরেন্টে ঢুকেছে। আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। নাশকা বলল।

এ্যাপেক্স রেস্টুরেন্ট? সে তো সাংঘাতিক কস্টলি! এটা তো প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রীর মত লোকদের বিনোদনের জায়গা। নানা রকম বিনোদন ও অন্যান্য খরচ তারা খাবার দাম থেকেই তুলে নেয়। প্রতিবারের প্রবেশ ফি'ই তো পাঁচশ মার্কিন ডলার! আবার ভাবল গৌরী, অনেক সৌদি নাগরিকের জন্যে টাকা কোন ফ্যাক্টর নয়।

নাশকা তোমরা বাইরেই অপেক্ষা কর। আমি আসছি। বলল গৌরী।

তারা হোটেলের ২১ তলার এ্যাপেক্স রেস্টুরেন্টের সামনে এসে দাঁড়াল। পেছন থেকে নাশকা এসে গৌরীর পেছনে দাঁড়াল।

পেছনে না তাকিয়েই গৌরী বলল, নাশকা, তোমরা বাইরে অপেক্ষা কর, আমি ভেতরে ঢুকছি।

বলেই গৌরী গিয়ে রেস্টুরেন্টের গেটে দাঁড়াল।

গেটের রিসেপশন অফিসার উঠে দাঁড়িয়ে গৌরীর আপাদমস্তক একবার চোখ বুলিয়ে বলল, ইয়েস ম্যাডাম, ওয়েলকাম।

গৌরী এগিয়ে গিয়ে গেটের পাশের এ্যাডমিশন কি হোলে একটা এক হাজার ডলারের নোট ছেড়ে দিল। সংগে সংগেই বেরিয়ে এল এ্যাডমিশন কার্ড। ভেতরে ঢুকল গৌরী।

বিশাল বহুভূজাকৃতির হলঘর! নরম আলো। নরম মিষ্টি মিউজিক বাজছে।

হলঘরের প্রতিভূজ বা বাহুতে একাধিক বিশ্রাম কক্ষ আছে।

সব মিলিয়ে হল ঘরে স্বপ্নময় একটা পরিবেশ। গানের কথা ও সুর, আলো-আঁধারির রহস্যময়তা, পোষাক-আশাক সবই অভিজাত প্রকৃতির।

গৌরী হলে প্রবেশ করে চারদিকে চোখ বুলাল। এক সময় তার চোখ গিয়ে স্থির হলো নিরিবিলি জায়গার একটা টেবিলে। টেবিলে তিনজন বসে। দু'জন ছেলে ও একজন মেয়ে। সেই বিদেশি, মাহিন ও মারেভা টেবিলটি ঘিরে বসে আছে। ভীষণ খুশি হলো গৌরী। ওরা এখন হাতের মুঠোয়। কিন্তু কাউকে সাক্ষী রেখে ওদের গ্রেফতার করা যাবে না। ছোট-বড় কোন ঝামেলাতেই পড়তে চায় না ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেট।

মনে মনে একটা ছক দাঁড় করাল গৌরী। একদম নিরাপদ ছকটি। কিন্তু তার জন্যে দরকার রাতের একটা নিরব প্রহর। তার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে অনেকটাই। তার আগে ঐ বিদেশীকে ও সবাইকে একবার বাজিয়ে নেয়া যাক। আঁচ করা যাবে বিদেশী সম্পর্কে। এগোলো গৌরী টেবিলের দিকে।

দাঁড়াল টেবিলের শূন্য আসনটির পেছনে। বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ করে, আমি শূন্য আসনটায় বসতে পারি। মাফ করবেন, আপনাকে এশিয়ান দেখে কথা বলার লোভে এলাম।

আহমদ মুসা তাকাল গৌরীর দিকে। দীর্ঘাঙ্গী, একহারা অপরূপ সুন্দরী এক ইউরোপীয় যুবতী। তার দেহ থেকে শক্তি ও সুস্থতা যেন ঠিকরে পড়ছে! অত্যন্ত বিরল এ ধরনের সুঠাম দেহ। চোখ দু'টিতে তার হাসি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা আছে, তবে চোখ দু'টি তার স্বচ্ছ নয়। দুই বৈপরীত্য যেন এ মুহূর্তে তার মধ্যে সক্রিয়!

আপনি তো ইউরোপীয়, এশীয়দের প্রতি এ পক্ষপাতিত্ব কেন? বলল আহমদ মুসা।

হাসল গৌরী। বলল, এশিয়া হলো 'মাদার অব আর্থ'। তাকে সত্যি আমি ভালবাসি। ভালবাসি বলে অনেক পড়াশোনা করেছি এশিয়ার উপর। তাই কিছু পক্ষপাতিত্ব হতে পারে।

আহমদ মুসা তাকিয়ে ছিল গৌরীর দিকে। কথাগুলো শুনতে ভালই লাগল। কিন্তু মনে হলো আহমদ মুসার কথাগুলোর গোড়ায় যেন কোন শিকড় নেই!

বলল আহমদ মুসা, প্লিজ বসুন মি....।

মিস গৌরী। আমার নাম গৌরী মি...। গৌরী বলল।

গৌরী' নামটি শোনার সংগে সংগেই শক পাওয়ার মত বিদ্যুত খেলে গেল আহমদ মুসার গোটা দেহে। তার স্মৃতির আঙিনায় আছড়ে পড়ল একটা নাম ও আরও কিছু কথা। গৌরী তো গ্যালাকটিক সাম্রাজ্যের সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণ পাওয়ার অভিলাষী সন্ত্রাসী শক্তি ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের এক সময়ের সর্বোচ্চ শাসক প্রিন্স জিজরের পার্সোনাল সিকউরিটি ও কমান্ডার ছিল! আর এখনকার গোপন সন্ত্রাসী গোষ্ঠী ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেট যেমন ওদের দলের নাম হুবহু নিয়েছে, তেমনি সেই সময়ের নেতা-নেত্রীদের নামও এরা গ্রহণ করেছে। তাহলে এই গৌরী আজকের ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের কেউ! না, এটা কোন কাকতালীয় ঘটনা। এশিয়ায়, বিশেষ করে হিমালয় সংলগ্ন উপমহাদেশের হিন্দু সমাজে গৌরী একটা বহুল প্রচলিত নাম। কিন্তু এই গৌরী তো ভারতের নয়, এশিয়ার নয়, হিন্দু সমাজেরও নয়। তাহলে?

প্রশ্নটা ভেতরে রেখেই আহমদ মুসা নিজের নামটা বলল। বলল, আমার নাম আবু আব্দুল্লাহ!

গৌরী ‘আবু আব্দুল্লাহ’ নামটা আগেই শুনেছে বুকিং কাউন্টার থেকে, কিন্তু প্রকাশ করতে চায়নি ধরা পড়ার ভয়ে।

গৌরী হ্যান্ডশেকের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল।

আহমদ মুসা হাত না বাড়িয়ে বলল, স্যরি, মিস গৌরী। আমাদের ধর্মে এ ধরনের হ্যান্ডশেক নিষিদ্ধ। প্লিজ বসুন।

গৌরী মারেভা ও মাহিনের সাথে হ্যান্ডশেক করে বসতে বসতে বলল, আপনাদের ধর্ম নিয়ে এটাই সমস্যা মি. আবু আব্দুল্লাহ, আপনারা মেয়েদের ছোট করে দেখেন।

হ্যান্ডশেক না করাটা মেয়েদের ছোট করে দেখার কারণে নয়। মুসলিম মেয়েরাও ছেলেদের সাথে হ্যান্ডশেক করে না, এটা তেমনি ছেলেদের ছোট করে দেখার কারণে নয়। আসলে এর পেছনে রয়েছে সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলাজনিত কারণ। বলল আহমদ মুসা।

সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলাজনিত কারণ!

হ্যাঁ, সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলাজনিত কারণ।

কি সেটা? ভ্রূ কুঁচকে বলল মিস গৌরী।

বিষয়টা মানুষের মনস্তত্ত্ব ও প্রবণতার সাথে জড়িত মিস গৌরী। অনেক কথা বলতে হয় বিষয়টা পরিষ্কার করতে হলে। সংক্ষেপে কথাটা হলো, স্বামী-স্ত্রী ও ভাই-বোন, মামা-ভাগ্নি’র মত পারিবারিক অতি ঘনিষ্ঠ জন (যাদের সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ) ছাড়া অন্য ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশা নিষেধ করেছে আমাদের ধর্ম। মেয়েদের নিরাপত্তা ও সমাজকে একটা বড় সমস্যা থেকে মুক্ত রাখার জন্যে। আহমদ মুসা বলল।

কিসের নিরাপত্তা, কেমন নিরাপত্তা? সামাজিক বড় সমস্যাটি কি? বলল গৌরী।

নারী-পুরুষ একে অপরের পরিপূরক। উভয়ে মিলে আসে মানবীয় পূর্ণতা। সেজন্যে দু’জনের মধ্যে রয়েছে একে অপরের প্রতি এক দুর্লংঘ প্রাকৃতিক

আকর্ষণ। এই আকর্ষণকে আইন ও শৃঙ্খলার মধ্যে এনে পিতা-মাতা, ছেলে-সন্তানের এক পরিবার সৃষ্টি করা হয়েছে। সুশৃঙ্খল পরিবার সুশৃঙ্খল সমাজের রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। অবাধ মেলামেশা-সৃষ্ট অনাচার পরিবারে বিপর্যয় আনে, শান্তি-শৃঙ্খলায় কুঠারাঘাত করে। পরিবারের এই বিপর্যয় সমাজ শৃঙ্খলা ও শান্তিকেও বিনষ্ট করে। আহমদ মুসা একটু থামল।

আবার শুরু করার আগেই গৌরী দ্রুত বলল, আর নিরাপত্তা বিষয়টা?

অপেক্ষাকৃত সবলের হাত থেকে দুর্বলের নিরাপত্তা। মেয়েরা সাধারণভাবে রক্ষণাত্মক, অন্যদিকে ছেলেরা অ্যাগ্রেসিভ ও আক্রমণাত্মক। নিরাপত্তা বলতে আমি বুঝিয়েছি ছেলেদের অনিয়ন্ত্রিত ও আক্রমণাত্মক ইচ্ছার কবল থেকে মেয়েদের নিরাপত্তার কথা। আহমদ মুসা বলল।

আপনি যেদিকে ইংগিত করেছেন, সেটা তো ব্যক্তিগত সম্পর্কের ব্যাপার। ব্যক্তিগত পর্যায়েই তা রেখে দেয়া উচিত। এটা সমাজের ভাবনার বিষয় হওয়া উচিত নয়। তেমনি সমাজও এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবার কথা নয়। বলল গৌরী।

ব্যক্তির কাজ যখন অপরাধ হিসাবে সংঘটিত হয়, তখন তা ব্যক্তিগত সম্পর্কের ব্যাপার থাকে না। পারিবারিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের পবিত্র সম্পর্কের বিষয়টি অবাধ মেলামেশার কারণে অপরাধ হিসাবে, অপরাধের মহামারি হিসাবে সংঘটিত হচ্ছে। পৃথিবীর দেশগুলো, বিশেষ করে অবাধ মেলামেশার দেশের পরিসংখ্যান নিয়ে দেখুন, সেখানে নারীরা অপরাধের শিকার হওয়া, পারিবারিক বিশৃঙ্খলা ও ভঙ্গুরতা, নারীকেন্দ্রিক অপরাধ বিকৃতি ও তজ্জনিত মানসিক বিকৃতি ও অসুস্থাবস্থা কেমন বাড়ছে। আহমদ মুসা বলল।

গৌরীর মুখে একটা ভাবনার চিহ্ন ফুটে উঠেছিল।

তার মনের এক অতল তল থেকে কে যেন তাকে বলল, গৌরী, তুমি কি নিজেই শক্তিমানের অনাচারের শিকার নও! তোমার কি পরিবার আছে, ঘর আছে! চমকে ওঠে সে। কিন্তু পর মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিল গৌরী। বলল গম্ভীর কণ্ঠে, এসব অপরাধের পেছনে অনেক কার্যকারণ আছে।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, স্যরি মিস গৌরী। যে কার্যকারণই থাক, এ কথা ঠিক যে, অবাধ মেলামেশার কারণে সুযোগ সহজলভ্য হওয়ায় নারীর উপর পুরুষের অনাচার বাড়ছে। সুতরাং তাদের নিরাপদ করতে হলে অবাধ মেলামেশা বন্ধ করে সুযোগের সহজলভ্যতা দূর করতে হবে।

কিন্তু বলুন, আমার সাথে হ্যান্ডশেকের ক্ষেত্রে কি সুযোগের সহজলভ্যতা দূর করার প্রশ্ন আসতে পারে? বলল গৌরী।

অপরাধ দমনে পুলিশী পাহারার ব্যবস্থা একটা আইন। অপরাধ যেখানে সংঘটিত হচ্ছে সেখানেও পুলিশ পাহারা থাকে, আবার অপরাধ যেখানে হচ্ছে না সেখানেও পুলিশ পাহারা থাকে। আমি এই নীতিগত কারণেই আপনার সাথে হ্যান্ডশেক করিনি।' আহমদ মুসা বলল।

'আপনি তো সাংঘাতিক মৌলবাদী! আপনি কি করেন?'

'নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়াই।' গৌরীকে পরখ করার জন্যেই আহমদ মুসা ইচ্ছা করে এমন ইংগিতমূলক কথা বলল।

'তার মানে আপনি মানুষের সেবা করে বেড়ান। তা কি ধরনের সেবা?' বলল গৌরী। সেও চাইল আহমদ মুসা সম্পর্কে তাদের সন্দেহকে নিশ্চিত করতে।

'ধরুন, মানুষ অভাবে পড়লে দেখা, কেউ বিপদে পড়লে তার পাশে দাঁড়ানো-এই আর কি।' আহমদ মুসা বলল।

'তাহিতিতে আপনার কাজ? কোন মিশন এখানে?' বলল গৌরী। তার চোখে-মুখে হাসি থাকলেও তার চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠা আহমদ মুসার দৃষ্টি এড়াল না।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'তাহিতিতে মানুষ কোন কাজ নিয়ে আসে না। আসে সব কাজ ছেড়ে-ছুঁড়ে তাহিতেকে দেখতে।' আহমদ মুসা প্রসঙ্গটি এড়িয়ে গেল। আর এগোতে চাইল না প্রসঙ্গটি নিয়ে। গৌরীর টার্গেট তার বুঝা হয়ে গেছে।

'আপনি কি মতুতুংগা দ্বীপপুঞ্জের অ্যাটলগুলোতে গেছেন? অ্যাটলের রাজ্য না দেখলে তাহিতি দেখা হয় না।' বলল গৌরী।

‘গেছি অ্যাটল দেখতে। আপনি ঠিকই বলেছেন। অপরূপ সুন্দর অ্যাটলের এ রাজ্য!’ আহমদ মুসা বলল।

‘জনবিরল অ্যাটল দ্বীপমালা শান্তির রাজ্যও বটে। ওখানে আপনি দেখবেন না কোন হিংসা-বিদ্বেষ, শুনবেন না কোন আর্তের আর্তনাদ। এ বিষয়টা আপনি কতটা লক্ষ্য করেছেন?’ বলল গৌরী।

মুখে হাসি ফুটল আহমদ মুসার। কিন্তু ভেতরে তার অন্য চাঞ্চল্য। গৌরীর প্রশ্নে লক্ষ্য সে পরিষ্কারভাবেই বুঝেছে। গৌরী চাচ্ছে অ্যাটলে যে ৭৬ জন বিজ্ঞানী বিপদগ্রস্থ, সেটা আহমদ মুসা জানে কিনা, এ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে। এর অর্থ বিজ্ঞানীরা যে ‘এসওএস’ পাঠিয়েছে সেটা ধরা পড়ে গেছে। এখন ওরা সন্ধান করছে এসওএস কে বা কারা পেয়েছে। এ সন্ধানেই গৌরী তার কাছে এসেছে। তার মানে ওরা জেনে ফেলেছে, যখন SOS পাঠানো হয়, তখন আহমদ মুসাদের বোট তাহানিয়া অ্যাটলে ছিল। তা কি করে জানল ওরা? তাহলে কি পাহারা দেবার মত কোন গোপন পর্যবেক্ষণ টেকনলজি ওদের আছে!

এসব চিন্তায় একটু আনমনা হয়ে পড়েছিল আহমদ মুসা। উত্তর দিতে একটু দেরী হলো।

গৌরীর দুই চোখের সমস্ত মনোযোগ তখন কিন্তু আহমদ মুসার দিকে নিবদ্ধ।

একটু হাসল আহমদ মুসা। ‘ভাবছিলাম মিস গৌরী, আপনার আবেগপূর্ণ প্রশ্ন সম্পর্কে। তোয়ামতু অ্যাটল রাজ্যের সবটা আমি এখনও দেখিনি। তবে সুন্দর ও শান্তি কিন্তু এক জিনিস নয়। শান্তি থাকলে অসুন্দরও সুন্দর হয়ে উঠে, শুধু ‘সুন্দর’ কিন্তু শান্তি নিশ্চিত করে না।’ আহমদ মুসা বলল।

গৌরীর চোখে এক ধরনের আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল। সে নিশ্চিত ধরে নিল, আহমদ মুসা অ্যাটল রাজ্যে অশান্তি আছে এ কথাই বলছে। আর এর দ্বারা SOS মেসেজ পাওয়াটাকেই নিশ্চিত করল। মনের এ কথাগুলোকে লুকিয়ে রেখে গৌরী হো হো করে হেসে উঠল। বলল, ‘আপনার জবাবটা সাংঘাতিক মি. আবু আবদুল্লাহ! আপনি দার্শনিকের মত উত্তর দিয়েছেন। ধন্যবাদ আপনাকে।’

বলতে বলতে গৌরী উঠে দাঁড়িয়েছে। শেষে বলল, 'আমি চলি মি. আব্দুল্লাহ। খুশি হলাম আপনার সাথে কথা বলে। ধন্যবাদ সবাইকে।'

অন্য টেবিলের দিকে চলে গেল গৌরী।

গৌরী চলে যেতেই মারেভা বলল, 'মেয়েটি কি করে তাতো বলল না। আমার মনে হচ্ছে সামরিক বাহিনীর মেয়ে। শরীরটা তার ঐ ধরনের তৈরি। কথাবার্তা ওদের মতই চটপটে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, সেনাবাহিনীর লোক হলে তো এমন অযাচিতভাবে কথা বলতে আসার কথা নয়!'

'তুমি ঠিকই বলেছ মারেভা। উনি সেনাবাহিনীর লোক নন। আমি যাদের সন্ধান করছি, তিনি তাদের একজন।' আহমদ মুসা বলল।

মারেভা ও মাহিন দু'জনেই চমকে উঠে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'কিন্তু ওরা আপনাকে জানল কি করে স্যার?'

'সম্ভবত সেই 'এসওএস' মেসেজ ধরা পড়েছে। আমাদের বোটে যে মেসেজ মনিটর হয়েছে সেটা। মনে হচ্ছে, বোটের ক্লু ধরেই তারা এ পর্যন্ত পৌঁছেছে।' আহমদ মুসা বলল।

'সর্বনাশ। কিন্তু মতলব কি ওদের স্যার?' বলল মাহিন।

'আমি সেটাই ভাবছি। তারা কি চায়, কি করতে চায়, এটা আমার কাছে এখনও স্পষ্ট নয়। তবে ওরা বড় কোন টার্গেট ছাড়া কিছু করে না।' আহমদ মুসা বলল।

ভয়ের ছায়া নামল মারেভা ও মাহিনের চোখে-মুখে। বলল, 'তাহলে আপনার মানে আমাদের সকলের সাবধান হওয়া প্রয়োজন।'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'এখনও সব কিছু স্পষ্ট নয়। তবে সাবধানতা সব সময়ই ভাল।' বলে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

উঠে দাঁড়াল মারেভা ও মাহিনও।

'বিল তো এল না স্যার?' বলল মাহিন।

'এনট্রান্স ফি'র সাথে ভেতরের সবকিছুই ইনক্লুডেড মারেভা।' আহমদ মুসা বলল।

হোটেলের লাউঞ্জে নেমে এল আহমদ মুসারা।

‘স্যার, আমরা আসি।’

‘না, আমি তোমাদের পৌঁছে দেব মাহিন।’ বলল আহমদ মুসা।

‘তেপাওকে ট্যাক্সি নিয়ে আসতে বলেছি। সে এসে গেছে।

চল।’ বলেই আহমদ মুসা হাঁটতে শুরু করল।

মারেভা ও মাহিনও তার সাথে হাঁটতে শুরু করল।

ট্যাক্সির কাছাকাছি এসে একবার পেছনে তাকিয়ে আহমদ মুসা বলল, ‘মারেভা-মাহিন, তোমাদের বিয়ের তারিখ কবে ঠিক হলো?’

মারেভা-মাহিন দু’জনেরই মুখ লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠল। বলল মাহিন, ‘আসছে শুক্রবার, স্যার।‘

‘ধন্যবাদ। বিয়ে ছাড়া তোমাদের এভাবে চলা আর উচিত নয়।’

মারেভা ও মাহিন মুখ নত করল।

সবাই এগোলো আবার গাড়ির দিকে।

# ৩

রাত সাড়ে দশটা।

আহমদ মুসা মারেভা ও মাহিনদের পৌঁছে দিয়ে হোটেলে ফিরছিল।

তেপাও-এর ট্যাক্সি হাইওয়ে থেকে উত্তর দিকে হোটেলের পথে নেবার পর রাস্তা একেবারে শুনশান। দু'একটা গাড়ি আসতে-যেতে দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু উপকূলের লেকপাড়ের হোটেল ডায়মন্ড ড্রপ নিকটবর্তী হওয়ার পর রাস্তা একেবারেই নিরব হয়ে গেল।

ঢালু পথে অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে নামছিল আহমদ মুসার গাড়ি। সামনেই ছোট একটা বাঁক। বাঁকের রাস্তাটুকু সমান, ঢালু নয়। তারপর আবার শুরু হয়েছে ঢালু রাস্তা। আহমদ মুসার গাড়ি বাঁক নেবার সময় গাড়ির গতি প্রায় 'জিরো'তে নেমে এসেছিল।

আহমদ মুসা গাড়ির জানালা দিয়ে রাস্তার পাশে সম্প্রতি তৈরি এই রাস্তার স্পার্ক স্তম্ভের দিকে তাকাতে যাচ্ছিল, এমন সময় চমকে উঠল হঠাৎ চোখের সামনে দিয়ে মার্বেল টাইপের সাদা একটা বস্তু গাড়ির ভেতরে ছুটে যেতে দেখে।

মুহূর্তেই সক্রিয় হয়ে উঠল আহমদ মুসার মাথা। বোমা কিংবা এই ধরনের কোন বস্তু হবে। গাড়ি থেকে বেরুবার সময় ছিল না। শ্বাস বন্ধ করে সে গাড়ির সিটে নিজের দেহটাকে ছেড়ে দিল।

পল পল করে সময় বয়ে যেতে লাগল।

না, কোন বিস্ফোরণ ঘটল না। তার মানে ওটা বোমা নয়, কোন ধরনের গ্যাস বোমা। শ্বাস বন্ধ রাখার দিকে মনোযোগ দিল আহমদ মুসা।

খোলা ছিল আহমদ মুসার চোখ। দেখল, একই সাথে গাড়ির দু'পাশের দরজা খুলে গেল। তার সাথে সাথেই হ্যান্ড মেশিনগানের দুই নল দুই দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল এবং গ্যাস-মাস্ক পরা দুই মুখ।

'ব্যাটা এশিয়ান কুপোকাত! জ্ঞান হারিয়েছে সে।' বলল দু'জনের একজন।

তার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একজন ভেতরে ঢুকে আহমদ মুসাকে দু'পা ধরে টেনে বের করল গাড়ি থেকে।

আহমদ মুসা গোটা ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছে। তাকে কিডন্যাপ করা হচ্ছে। পাল্টা আক্রমণের সুযোগ এখন নেই। সিদ্ধান্ত নিল আহমদ মুসা, এখন সে সংজ্ঞাহীনের ভান করবে। আর একটা বিষয় ভাবল, এদের হাতে পড়লে এদের জানারও একটা সুযোগ হবে। এখন পর্যন্ত চেষ্টা করেও ওদের হেড কোয়ার্টার 'ক্যাপিটাল অব পাওয়ার'-এর সন্ধান সে পায়নি। এর ফলে তার সন্ধান পাওয়ারও একটা পথ হতে পারে।

আহমদ মুসাকে গাড়ি থেকে বের করতেই একটা নারী কন্ঠ বলল, 'ওকে হাত-পা বেঁধে গাড়িতে তোল'।

কন্ঠটি গৌরীর। কথা শুনেই বুঝতে পারল আহমদ মুসা। খুশি হলো আহমদ মুসা, তার সন্দেহ সঠিক হয়েছে। নিশ্চয় ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছে গৌরী।

একজন বলল, 'ম্যাডাম, এ এশিয়ান তো সংজ্ঞাহীন, তারপরও বাঁধতে হবে?'

'কখন জ্ঞান ফিরে পাবে, তোমরা বলতে পার না। সুতরাং কোন ঝুঁকি নেয়া যাবে না। তাকে বেঁধে ফেল।'

'শোন, ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের কোন আইন তোমরা ভাঙবে না।' বলল গৌরী।

আড়াল থেকে একটা মাইক্রো বেরিয়ে এসেছে। মাইক্রোতে ওঠানো হলো সংজ্ঞাহীন আহমদ মুসাকে। তার পাশেই উঠল গৌরী। পেছনে আর চারজন। ড্রাইভারের পাশে একজন।

গাড়ির দরজা বন্ধ হতেই ড্রাইভিং সিটের লোকটি বলল, 'উপকূলে যাচ্ছি ম্যাডাম।'

‘না, উইরো। এক ‘মতু’তে নেয়া হচ্ছে না। একে দক্ষিণ পাপেতির ঘাঁটিতে নিয়ে চল। একে প্রথম বাজিয়ে দেখতে হবে এ কি জানে, কতটা জানে? তারপর যে সিদ্ধান্ত হয় করা হবে।’ বলল গৌরী।

আহমদ মুসার কানে সব কথাই গেল। তাকে ‘মতু’তে নেয়া হচ্ছে না। তবে বুঝা গেল ‘মতু’ সাগরের মাঝের কোন দ্বীপ হবে। পলিনেশীয় ভাষায় ‘মতু’ মানে দ্বীপ। এই ‘মতু’টা আবার কোথায়? ‘মতু’কি সেই ‘ক্যাপিটাল অব পাওয়ার’ না ‘মতু’ বলতে সাধারণভাবে দ্বীপ বুঝানো হয়েছে?

চলতে শুরু করেছে গাড়ি। প্রথমে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে মূল শহরে পৌঁছে দক্ষিণের কোন পথে যেতে হবে দক্ষিণ পাপেতিতে।

ছুটে চলছে গৌরীর গাড়ি।

আহমদ মুসা তখনও ‘মতু’ নিয়ে তার হিসাব-নিকাশ কষেই চলেছে।

পাশেই গৌরীর মোবাইল সিগন্যাল দিয়ে উঠল।

আহমদ মুসা উৎকর্ণ হলো।

গৌরী তার জ্যাকেটের পকেট থেকে মোবাইল নিয়ে অন করে চোখ বুলালো স্ক্রীনে। স্ক্রীনে মেসেজটি পড়েই দুই চোখ ছানা-বড়া হয়ে গেল গৌরীর। দ্রুত সে গ্যালারি ওপেন করল। সদ্য প্রেরিত ছবিটা সে দেখল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। ঠিক এটাই আবু আহমদ আব্দুল্লাহর ছবি, কোন ভূল নেই তাতে। তাহলে এটাই সেই আহমদ মুসা! গোটা দেহে একটা উষ্ণ স্রোত খেলে গেল গৌরীর। সেই দুর্ধর্ষ আহমদ মুসা যার মূল্য বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার! সে এখানে এই তাহিতিতে! কোন মিশনে! দুশ্চিন্তার একটা কালো মেঘ উঁকি দিল গৌরীর মনে। আহমদ মুসার ইতিহাস সে জানে। সে এখনো অজেয়। তার বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারেনি এখনও কেউ। একটা বিমূঢ়তা নেমে এল গৌরীর মনে, অনেকটা কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুনোর মত। কিন্তু পরক্ষণেই বুক ভরে এক প্রবল যন্ত্রণা জেগে উঠল। যন্ত্রণা শীঘ্রই প্রতিহিংসার আগুনে পরিণত হলো। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল সে আগুন। আহমদ মুসা ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের মুখোমুখি হয়নি কখনও। কিন্তু ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের বহু বন্ধু ও মিত্র সংগঠনের সর্বনাশ করেছে সে। সে এখন তাদের

হাতের মুঠোয়। সে চিৎকার করে উঠল, ‘সকলে সাবধান, আমরা মশা ভেবে কিন্তু হাতিকে খাঁচায় ভরেছি।’

সামনের সিট থেকে গৌরীর অপারেশন সহকারী সিনথ্রোস চমকে উঠে পেছনে তাকাল এবং বলল, ‘ম্যাডাম, কিছু খবর পেলেন? হাতিটি তাহলে কে?’

‘হ্যাঁ সিনথ্রোস, যাকে আমরা খুব সহজে বন্দী করেছি, সে আজকে সবচেয়ে ওয়ানটেড ও সবচেয়ে বড় শয়তান আহমদ মুসা!’

‘ও গড!’ বলে আর্তনাদ করে উঠল সিনথ্রোস।

তার সাথে সাথে ফোন বেজে উঠল গৌরীর।

গৌরী মোবাইলের স্ক্রীনে একবার তাকিয়েই তটস্থভাবে মোবাইলটি মুখের কাছে নিয়ে এসে বলল, ‘ইয়েস মাই লর্ড!’

‘এসএমএস ও ফটো দেখেছ?’

মোবাইল ফোনের ওপার থেকে বলল আলেক্সি গ্যারিন।

‘ইয়েস মাই লর্ড!’ গৌরী বলল।

‘তোমার ও তোমার টিমকে ধন্যবাদ, অসাধারণ এক শিকারকে তোমরা জালে আটকিয়েছ। আমাদের অনেক উপকারে আসবে।‘ বলল আলেক্সি গ্যারিন।

‘কিভাবে মাই লর্ড? সে তো বিপজ্জনক!’ গৌরী বলল।

‘সবচেয়ে বিপজ্জনক বলেই তো সবচেয়ে বেশি মূল্য আমরা পাচ্ছি।’ বলল আলেক্সি গ্যারিন।

‘বেশি মূল্য মানে মাই লর্ড?’ বলল গৌরী।

‘হ্যাঁ, ওর লাশ বিক্রি করেছি আমরা ১ বিলিয়ন ডলারে।’ বলল আলেক্সি গ্যারিন।

‘কিন্তু মাই লর্ড, এই অবিশ্বাস্য মূল্য দিয়ে কারা নেবে ওকে? আর লাশ বলছেন কেন?’ গৌরী বলল।

‘লাশ এজন্যে বলছি সে, একে কখনো আটকে রাখা যায় না বা আটকে রাখা যায়নি কখনো। তাই জীবন্ত বিক্রি করার ঝুঁকি নিতে চাই না। ক্রেতারাও নিশ্চিত হতে চায় যে, সে মরেছে। আর তখনই আমাদেরকে ঐ মূল্যটা দেবে?’

‘ওটা ওকে মারার মূল্য। এমন মূল্য বহুবার ঘোষনা করেও তাকে তারা মারতে পারেনি।’

মুহূর্তের জন্যে থামল। থেমেই আবার বলল, ‘আমরাও তাকে আটকে রাখার ঝুঁকি নিতে চাই না। আর একটি কথা, তার মত বিপজ্জনক লোককে আমাদের রাজধানী ‘মতু’তে নিয়ে আসতে পারি না। আর সে শেষ হয়ে গেলে আমাদের ‘মতু’ থেকে প্রেরিত SOS –এর বিপজ্জনক একজন প্রত্যক্ষ শ্রোতাও শেষ হয়ে যায়। আর দু’জন প্রত্যক্ষ শ্রোতা থাকল। ওদেরকেও বাঁচিয়ে রাখা হবে না। এখন তোমরা তাকে হত্যা করে লাশ নিয়ে এস।’

‘তাকে তাহলে ঘাঁটিতে নেবার তো প্রয়োজন নেই মাই লর্ড।’ গৌরী বলল।

‘না। তাকে শেষ করে দিয়ে তোমরা লেক টাওনায় ফিরে যাও। ওখানকার প্রাইভেট জেটিতে আমাদের উভচর ফেরি যাচ্ছে। ভয় নেই, প্রাইভেট জেটিটি এখন জনমানবশুন্য।’ বলল আলেক্সি গ্যারিন।

‘মাই লর্ড, শেষ কাজটা কোন ধরনের হবে সে ব্যাপারে আপনার কোন নির্দেশ আছে?’ গৌরী বলল।

লাশটা অনেক দূরে যাবে। কোন রক্তপাত যেন না হয়, দৃশ্যমান কোনও আঘাতও যেন না থাকে!’ বলল আলেক্সি গ্যারিন।

‘ইয়েস মাই লর্ড, বুঝেছি। এটাই হবে।’ গৌরী বলল।

‘ধন্যবাদ।’ বলে ওপার থেকে কল অফ করে দিল আলেক্সি গ্যারিন।

মোবাইল জ্যাকেটের পকেটে রেখে গৌরী ড্রাইভারকে লক্ষ করে বলল, ‘উইরো, গাড়িটা আবার ঘুরিয়ে সেই লেক টাওনার দিকে নিয়ে চল।’

গাড়ি থেমে গেল।

গাড়ি তখন এক পাহাড়ি পথ দিয়ে চলছিল। রাস্তা ও চারদিকটা জনমানবশুন্য।

‘সিনথ্রোস, কিছু বুঝেছ?’ গৌরী বলল।

'ইয়েস ম্যাডাম, আপনার কথা তো কানে এসেছে। মাই লর্ডেরও কিছু কথা কানে এসেছে। বুঝেছি, এই এশিয়ানকে এখন মেরে তার লাশ নিয়ে যাবার নির্দেশ হয়েছে।' বলল সিনথ্রোস।

'আরও একটা সুখবর আছে সিনথ্রোস, লাশটা বিক্রি হয়েছে ১ বিলিয়ন ডলারে!' গৌরী বলল।

'ও মাই গড!লাশের মূল্যের ক্ষেত্রে এটাই বোধ হয় বিশ্বরেকর্ড! তাদের ধন্যবাদ।' বলল সিনথ্রোস।

'ধন্যবাদ! আর ধন্যবাদ এজন্যে যে, সেই কাজটা তোমাকেই করতে হবে। আমি তোমার সিটে যাচ্ছি। তুমি এখানে এস। রক্ত ঝরবে না, লাশের গায়ে দাগও পড়বে না, এমন একটি লাশ বানাবার কাজ তোমাকে করতে হবে।' গৌরী বলল।

বলে গৌরী নেমে এল গাড়ি থেকে।

ওদিক থেকে সিনথ্রোসও নামল।

সিনথ্রোস পেছনের সিটে আসার সময় ড্যাশবোর্ড থেকে একটা কুশন সংগ্রহ করল।

গৌরী সেদিকে তাকিয়ে হাসতে গিয়ে মনের কোথায় যেন একটা খোঁচা খেল। হঠাৎ তার চোখের সামনে ভেসে উঠল, হোটেল লা ডায়মন্ড ড্রপ-এর এ্যাপেক্স রেস্টুরেন্টে আহমুদ মুসার সাথে সাক্ষাতের দৃশ্যগুলো, মনে পড়ল হ্যান্ডশেক প্রসঙ্গ নিয়ে বলা তার কথাগুলো। সাংঘাতিক নীতিবাগীশ ও আদর্শবাদী লোক সে। দৃষ্টিভংগিটাও খুব মানবিক। এ ধরনের লোকরা ক্রিমিনাল হতে পারে না। আহমদ মুসা সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছে। তাতে মৌলবাদী এক হিংস্র লোক মনে হয়েছে তাকে। কূটবুদ্ধির চালে মানুষ মারাই হচ্ছে তার কাজ। কিন্তু তার সাথে কথা বলার পর তার ধারণাটা একেবারেই উল্টে গেছে। ভাল মানুষ এবং সুস্থ ও শান্তির সমাজ সে চায়। ঈশ্বর বোধ হয় এজন্যেই সব সময় তাকে সাহায্য করে থাকে।

এসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার নিজের কথা মনে হলো, মুক্ত সমাজ ও বাধা-বন্ধনহীন জীবন তাকে কি দিয়েছে। পাখির মত মানুষ মেরেছি, কিডন্যাপের

পর কিডন্যাপ করেছি, কিন্তু কি পেয়েছি? পরিবার নেই, আত্মীয়-স্বজনকে ভুলে গেছি। বিধাতার দেয়া সুন্দর দেহকেও আমি রক্ষা করতে পারিনি, পশুদের তা যথেচ্ছ ভোগের শিকার। এ বিষয়ে তার বোধই ছিল না, জীবনের নগদ উপভোগ নিয়ে সে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু আহমদ মুসা তার চোখ খুলে দিয়েছে। এখন জীবনটা তার কাছে উন্মুক্ত একটা পৃষ্ঠার মত হয়ে গেছে। কিন্তু অনেক কাহিনী, অনেক বিজয়ের নায়ক, অপরাজেয় বলে অভিহিত আহমদ মুসা আজ পরাজিত, তার জীবন সাঙ্গ হতে আর কয়েক মুহূর্ত বাকি! কথাগুলোকে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। কিন্তু অবিশ্বাস করার সুযোগ নেই। আহমদ মুসার সংজ্ঞাহীন দেহ সিটের উপর পড়ে আছে। সিনথ্রোসের হাতে দেখছি বর্গাকৃতির ছোট কুশন। ঐ কুশনটি আহমদ মুসার নাকে-মুখে চেপে বসার কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কি ঘটবে তা পরিষ্কার। রক্ত ঝরবে না, কোথাও দাগও পড়বে না, কিন্তু প্রাণ থাকবে না দেহে। ভাবতে মনে সেই খোঁচাটা লাগল আবার। কোন মৃত্যু তার মনকে এমন চঞ্চল আর করেনি কখনও।

সিনথ্রোস গাড়িতে উঠে আহমদ মুসার মাথার কাছে বসল।

গৌরীও সামনের সিটে উঠে বসল।

আহমদ মুসা গৌরীর টেলিফোনে কথোপকথন থেকে শুরু করে সব কথাই শুনেছে। তার লাশ এক বিলিয়ন ডলারে বিক্রি হচ্ছে, এটাও সে শুনল। মনে মনে হেসেছে আহমদ মুসা। মাথার কাছ থেকে গৌরী নেমে গেলে আহমদ মুসা হাতের বাঁধনটা পরীক্ষা করল। বাঁধনটা সরল। সম্ভবত সংজ্ঞাহীন মানুষকে এর চেয়ে কড়া বাঁধনের প্রয়োজন তারা অনুভব করেনি। দাঁত দিয়ে আহমদ মুসা হাতের বাঁধন ঢিলা করে দিল যাতে পরে সহজেই খুলে ফেলা যায়। তারপর অতি সন্তর্পণে পা এগিয়ে এনে এক হাত দিয়ে পায়ের বাঁধনও খুলে ফেলল, তবে বাঁধনের বাইরের খোলসটা থাকল।

গাড়িতে উঠে সিনথ্রোস প্রথমেই নজর বুলাল আহমদ মুসার দিকে। সিটের উপর গা এলিয়ে মরার মত পড়ে আছে। হাতও পায়ের বাঁধনও তার চোখে পড়ল।

'ম্যাডাম, আহমদ মুসার হাত-পায়ের বাঁধন কি থাকবে?' গৌরীকে লক্ষ করে বলল সিনথ্রোস।

'তুমি মরে করলে তার হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিত পার। বলির পশুকেও তো মুক্ত রেখেই বলি দেয়া হয়।'

'আমিও সেটাই ভাবছি ম্যাডাম।'

বলে সিনথ্রোস আহমদ মুসার হাতের বাঁধনের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দিল।

আহমদ মুসা বুঝল আমার হাতের বাঁধন যে খোলা তা সে এখনি টের পেয়ে যাবে। তখন সঙ্গে সঙ্গেই সিনথ্রোস আক্রমণে আসবে।

আহমদ মুসা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল, তাকে আগে আক্রমণে যেতে হবে।

ভাবনার সাথে সাথে আহমদ মুসার ডান হাত বিদ্যুৎ বেগে উঠে গিয়ে মাথার পেছনে ঘাড়ের সাথে লাগোয়া জ্যাকেটের গোপন পকেট থেকে রিভলবার নিয়ে সিনথ্রোসের বুকের একপাশে গুলি করল।

সিনথ্রোসের চোখে ধরা পড়েছিল আহমদ মুসার ডান হাত ছুটে যাওয়ার দৃশ্য। কিন্তু তা বুঝে ওঠার পর সিটের উপর থেকে রিভলবার তুলে নিয়ে প্রস্তুত হবার আগেই সে গুলি খেল।

আহমদ মুসা গুলি করেই বাম হাত দিয়ে সিটের উপর পড়ে থাকা সিনথ্রোসের রিভলবার তুলে নিয়ে একই সাথে ডান হাত দিয়ে গৌরীর লক্ষ্যে এবং বাম হাত দিয়ে পেছনের লোকদের দিকে গুলি ছুঁড়তে লাগল।

গৌরীর রিভলবার ধরা হাত গুলিবিদ্ধ হলো। ছিটকে পড়লো তার হাত থেকে রিভলবার।

অন্য দিকে পেছনের সিটের লোকরা প্রথমে বুঝতেই পারেনি কি ঘটেছে। রিভলবার নিয়ে আহমদ মুসাকে দাঁড়াতে দেখে তবেই বুঝতে পারল আহমদ মুসা নয়, তাদের সিনথ্রোসই গুলি খেয়েছে। কিন্তু ততক্ষণে তারা আহমদ মুসার রিভলবারের টার্গেট হয়ে গেছে। তারা কেউ অস্ত্র তোলারও সুযোগ পেল না। গুলিবিদ্ধ হয়ে যেখানে বসেছিল সেখানেই ঢলে পড়ল।

গৌরীর ডান হাত গুলিবিদ্ধ হবার পর বাম হাত দিয়ে সে তার রিভলবার তুলতে যাচ্ছিল।

'রিভলবার তুলবেন না মিস গৌরী। সে চেষ্টা করলে আমি গুলি চালাতে বাধ্য হবো। দেখছেন তো, আমার কোন গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না।' বলল আহমদ মুসা।

গৌরী রিভলবার তুলে নেয়ার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'অন্যদের মত আমাকে গুলি না করে সাবধান করছেন কেন?'

'দুই কারনে, এক, আপনি আহত, দুই, আপনি মহিলা। তাছাড়া আপনি এশিয়ানদের ভালবাসেন।' বলল আহমদ মুসা।

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা একটু এগিয়ে গৌরীর রিভলবার তুলে নিয়ে ড্রাইভিং সিটে গিয়ে বসল। বলল, 'ড্রাইভিং সিটের লোকটি নিশ্চয় বাইরে গিয়ে পজিশন নিয়েছে?'

বলে আহমদ মুসা রিভলবার ধরা বাম হাত জানালায় ঠেস দিয়ে বাইরে উঁকি দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মাথা সরিয়ে নিল।

তখনই এক ঝাঁক গুলির কিছু জানালার বাইরে দিয়ে শূন্যে উড়ে গেল আর কিছু জানালায় আঘাত করল। আহমদ মুসা সঙ্গে সঙ্গে মাথা সরিয়ে নিতে না পারলে তার মাথা ঝাঁঝরা হয়ে যেত।

আহমদ মুসা লোকটিকে দেখেছে। দরজার একটু পেছনেই সে বসে আছে। তার হাতে ধরা স্টেনগানের ব্যারেল ভয়ংকর। স্টেনগান উদ্যত করে সে বসে আছে।

গুলি তার থেমে গেল হঠাৎ।

সে কি পজিশন চেঞ্জ করল? আহমদ মুসা নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করল।

ড্রাইভিং সিটের লোকটি দরজা খোলা রেখেই নেমে গিয়েছিল।

আহমদ মুসা লোকটিকে যেখানে দেখেছিল সেদিকে বাম হাতের রিভলবার উদ্যত করে পা দিয়ে দরজা বাইরের দিকে পুশ করল।

দেখতে পেল লোকটি উঠে দাঁড়াচ্ছে।

আহমদ মুসার চোখ ও রিভলবার এক সঙ্গেই কাজ করল। লোকটি চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই রিভলবারের ট্রিগার তার আঙুলে চেপে বসেছিল। রিভলবারের একটি বুলেট উপর থেকে ০৫ ডিগ্রি কোণে গিয়ে ঠিক তার কপালে আঘাত করেছে। তার দেহটা ছিটকে পড়ল পেছনে।

আহমদ মুসা ডান হাত দিয়ে টেনে দরজা বন্ধ করে সোজা হয়ে ড্রাইভিং সিটে বসল। তাকাল গৌরীর দিকে। সে তার বাম হাত দিয়ে ডান হাতের গুলিবিদ্ধ কবজি চেপে ধরে বসে আছে মাথা নিচু করে। গুঁড়িয়ে যাওয়া কবজি থেকে রক্ত তখনও বেরুচ্ছেই।

আহমদ মুসা হাতের রিভলবার সামনের ড্যাশ বোর্ডের উপর রেখে ওপাশের ড্যাশ বোর্ডের নিচের ড্রয়ার থেকে ফার্স্ট এইড বক্স বের করল। বক্স থেকে ক্রেপ ব্যান্ডেজ বের করে নিল আহমদ মুসা। তারপর গৌরীর ডান হাত টেনে নিয়ে কবজির পেছনে ক্রেপ ব্যান্ডেজ বেঁধে আহত স্থানটা ঢেকে দিল। বলল আহমদ মুসা, 'এতে অন্তত রক্ত ক্ষরণটা বন্ধ হবে মিস গৌরী।'

বলে মুহূর্ত কয়েক থেমেই আবার কথা শুরু করল, 'মিস গৌরী, প্লিজ, আপনি কি খোঁজ নেবেন, ওরা কেউ বেঁচে আছে কিনা।'

গৌরী অপলক চোখে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়েছিল। তার চোখে-মুখে বিস্ময়! বলল, 'কেন, কি দরকার আপনার ওটা জেনে?'

'ওদের মধ্যে কেউ আহত থাকলে কিছু শুশ্রুষা তার প্রয়োজন হতে পারে।' আহমদ মুসা বলল।

'মানুষ মারার সময় তাদের কথা ভাবা হলো না, এখন আহতের কথা ভাবা হচ্ছে কেন? এটা কি গোড়া কেটে আগায় পানি ঢালার মত বিষয় নয়?' বলল গৌরী।

ওরা যুদ্ধ চলা কালে মরেছে। এ মৃত্যু স্বাভাবিক। যুদ্ধ শেষে আহতরা কারও শত্রু নয়, আমাদের ধর্মের শিক্ষা এটা। যতটা সাধ্য ওদের সহযোগিতা করা উচিত। এই উচিত কাজটাই আমি করছি।' আহমদ মুসা বলল। গৌরী মাথা একটু নিচু করল।

মুখে কিছু বলল না আহমদ মুসার কথা জবাবে।

মুহূর্ত খানেক পর মুখ তুলে তাকাল গাড়ির পেছনে হত-নিহত তার সাথীদের দিকে। একটু জোরে বলল, 'নাশকা, তোমাদের খবর কি? তোমরা কে কেমন আছ বল?'

নাশকাই মুখ তুলল। বলল, 'তিনজন মারা গেছে ম্যাডাম। আমার বাম বাহু ও ডান হাত গুলিবিদ্ধ হয়েছে।'

গৌরী ফার্স্ট এইড বক্স হাতে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল। আহমদ মুসা বলল, 'আপনি বসুন মিস গৌরী। এক হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা যায় না।'

বলে আহমদ মুসা গাড়ি লক করে চাবিটা পকেটে পুরে গৌরীর কাছ থেকে ফার্স্ট এইড বক্স নিয়ে পেছনের সিটে যাবার জন্যে উঠল।

'গাড়ি লক করলেন কেন?' জিজ্ঞাসা গৌরীর।

'যাতে গাড়িটা আপনি দখল করতে না পারেন সেজন্যে।' আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসার দিকে কয়েক মুহূর্ত দৃষ্টি রেখে বলল, 'আমি তো পালিয়ে যেতেও পারি?'

'আমি আপনাদের বন্দী করিনি। আমি নিজেকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করেছি মাত্র।' বলল আহমদ মুসা।

'কেন, আমাদের কাছ থেকে আপনার কিছু জানার নেই। কেন আমরা আপনাকে কিডন্যাপ করেছিলাম, সেটা আপনি জানতে চান না?' বলল গৌরী।

'জানার আগ্রহ থাকলেও জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছা আমার নেই। কারণ আপনারাও হয়তো জানেন না। জানলেও আপনাদের তা বলার কথা নয়। যেমন আপনারা কোন এক 'মতু'তে আমাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। আমি বিস্মিত হয়েছি, 'মতু' নামে তো তাহিতি কিংবা এর আশেপাশে কোন জায়গা নেই! আমি যদি এটা জিজ্ঞাসা করি, আপনি নিশ্চয় বলবেন না?' আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসার কথা শুনে হাসল গৌরী।

তাকাল আহমদ মুসার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে। বলল, 'আহমদ মুসা, আপনি সত্যিই অনন্য! আপনি কিছুই জিজ্ঞাসা করতে চান না, কিন্তু এমন একটা বিষয়

জিজ্ঞাসা করেছেন, যা আপনি জানলে আমাদের আপনাকে জানাবার আর কিছু বাকি থাকে না।'

'এর মানে 'মতু' কি, কোথায়? এটা কিন্তু আমার প্রশ্ন ছিল না। আপনারা আমাকে কোথায় নিয়ে যাবেন, এ প্রসঙ্গে আপনারাই 'মতু'র নাম বলেছেন। এটা আমার জিজ্ঞাসার বিষয় নয়। কৌতূহল থেকেই আমি 'মতু' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। আমার আরও কৌতূহল হলো, কেন আপনারা আমাকে অপহরণের চেষ্টা করেছিলেন?' আহমদ মুসা বলল।

কথা বলার সাথে সাথে গাড়ির পেছনে গিয়ে আহমদ মুসা দুই বাহুতে গুলিবিদ্ধ নাশকার ব্যান্ডেজ বাঁধতে শুরু করে দিয়েছে।

'আপনাকে কেন আমরা কিডন্যাপ করতে চাই, সত্যিই কি তা আপনি জানেন না?' জিজ্ঞাসা গৌরীর।

বিপদে পড়ল আহমদ মুসা। এভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে মিথ্যা বলতে সে পারে না। অবশেষে দায়টা গৌরীর ঘাড়ে চাপানোর জন্যে বলল, 'মিস গৌরী, প্রশ্ন আমি আগে করেছি। আপনারা কেন আমাকে কিডন্যাপ করতে এলেন?'

'কিডন্যাপ করতে পারলে বলতাম। এখন তা আর বলা যাবে না।' বলল গৌরী।

'কিন্তু আপনারা অপরাধ করেছেন। তাই আপনারা বলতে বাধ্য।'

'বাধ্য করলে হয়তো জানতেও পারতেন।' বলল গৌরী।

'আমি সেটা পারি।' আহমদ মুসা বলল।

'কিন্তু পরাজিত বাদী আহতদের প্রতি তো আপনি নিপীড়ন চালান না।' গৌরী বলল।

'কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র আবার সৃষ্টি করা যায়।' আহমদ মুসা বলল।

গৌরী কিছু বলতে যাচ্ছিল। এ সময় তার মোবাইল বেজে উঠল।

গৌরী মোবাইলটা বের করতে যাচ্ছিল।

'না মিস গৌরী, আপনাকে টেলিফোন ব্যবহারের অনুমতি আমি দেব না।' বলে আহমদ মুসা গাড়ির পেছন থেকে সামনের সিটে চলে এল। নাশকার ব্যান্ডেজ বাঁধা হয়ে গিয়েছিল আহমদ মুসার।

আহমদ মুসা ড্রাইভিং সিটে বসে গৌরীকে বলল, ‘প্লিজ, মোবাইলটা দিন।’

মোবাইলটা তখনও বেজেই চলেছে।

গৌরী নিরবে মোবাইলটা তুলে ধরল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা মোবাইলের কল অন করে বলল, ‘বলুন, আমি আহমদ মুসা, যাকে কিডন্যাপ করতে পাঠিয়েছিলেন।’

‘আপনি তাদের হত্যা করে গাড়ি দখল করে বসে আসেন?’ বলল ওপার থেকে।

‘না, গৌরী ও নাশকা আহত। অন্যরা নিহত।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আপনিই আহমদ মুসা, এটা আগে জানলে কিডন্যাপের জন্যে মাত্র একটা গাড়ি পাঠাতাম না। যা ঘটেছে এটা ঘটার কথা ছিল না। এর প্রতিশোধ আমি নেব।’ বলল ওপার থেকে।

‘সেটা আমিও জানি। কিন্তু আপনারা আমার বিরুদ্ধে লাগলেন কেন?’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমরা বাইরের কারো কোন প্রশ্নের জবাব দিই না। আপনার প্রশ্নের উত্তরও আমি দেব না।’ বলল ওপার থেকে।

‘না বললেও আমি জানি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কি জানেন?’ ওপার থেকে চমকে ওঠা কন্ঠস্বর।

আমিও কোন প্রশ্নের জবাব দেব না। আহমদ মুসা বলল।

‘বেঁচে থাকলে তো জবাব দেবেনই! তবে দেবার সময় আপনি পাবেন না।’ বলল টেলিফোনের ওপার থেকে।

আহমদ মুসা পেছনে ও সামনে তাকাল। দেখল, দু’দিক থেকে দু’টি করে চারটি হেডলাইট ছুটে আসছে। হেড লাইটের অবস্থান ও ধরন দেখে বুঝল, ও দু’টি জিপ গাড়ি।

‘হ্যাঁ, আপনার পাঠানো দু’টি গাড়ি দুই দিক থেকে আসছে।’ আহমদ মুসা বলল।

টেলিফোনের ওপার থেকে কন্ঠটি হো হো করে হেসে উঠল। বলল, 'আহমদ মুসা, তোমার দখল করা গাড়িতে ট্রান্সমিটার ফিট করা আছে। গোলাগুলি ও গাড়ির সব কথাই আমরা শুনেছি। গাড়ির অবস্থান রিলে করার ব্যবস্থাও ঐ গাড়িতে আছে।'

'ধন্যবাদ, এ তথ্যগুলো আমার জানা ছিল না। ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে।' আহমদ মুসা বলল।

'আপনার ভবিষ্যত এখনও আছে বলে আপনি মনে করছেন?' বলল ওপার থেকে।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'আল্লাহর ভূমিকায় বসতে চাইবেন না। মানুষের শক্তি খুবই সীমিত।'

ওপার থেকে হো হো হাসির শব্দ ভেসে এল। বলল, 'জবাব আমি দেব না, জবাব তুমি পেতে যাচ্ছ আহমদ মুসা। তুমি চারদিক থেকে ঘেরাও। দু'পাশের পাহাড়ে আমাদের হেলিকপ্টার কমান্ডো পাঠিয়ে দিয়েছি।'

'ধন্যবাদ। তোমার শক্তি আর আমার আল্লাহ ভরসা।'

বলেই আহমদ মুসা চাবি ঘুরিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিল। মুখ ঘুরিয়ে গৌরীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'প্লিজ মিস গৌরী, আপনি গাড়ি থেকে নেমে যান, আর নাশকাকেও নামিয়ে নিন। তাড়াতাড়ি প্লিজ।'

বিস্ময় গৌরীর চোখে-মুখে। বলল, 'কেন?'

সামনে ও পেছন থেকে আপনাদের দুই বা ততোধিক গাড়ি আসছে আমাকে টার্গেট করে। আপনারা এখন আমার কাস্টডিতে। কিন্তু একটু পরেই আমি আর আপনাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পর্যায়ে থাকবো না। তাই নিরাপদ হওয়ার জন্যে আপনাদের মুক্তি দিচ্ছি। প্লিজ মিস গৌরী! সময় নেই, তাড়াতাড়ি করুন।' আহমদ মুসা বলল।

স্তম্ভিত গৌরী! সে কোন শত্রুকে দেখছে, না হিংসা-বিদ্বেষের মত মানবিক প্রবণতামুক্ত কোন এনজেলকে দেখছে! বলল সে, 'ধন্যবাদ আহমদ মুসা। কিন্তু গাড়ি ছেড়ে দিয়ে আপনিও তো সরে যেতে পারেন।'

সামনে ও পেছনের মত দু'পাশের পাহাড়ও আমার জন্যে নিরাপদ নয়। অন্ধকারে গুলি খাওয়ার চাইতে সামনা সামনি লড়াই করা ভাল মিস গৌরী।' আহমদ মুসা আর কিছু বলল না।

গাড়ি থেকে নামল গৌরী। নামিয়ে নিল গুরুতর আহত নাশকাকেও।

গাড়ির দরজা গৌরীই এসে বন্ধ করে দিল। সেই সাথে গাড়ির দরজাও লক করে দিল গৌরী। সেই ফাঁকে ব্যাগ থেকে ছোট একটা বাক্স বের করে নিজের দেহের আড়ালে নিয়ে গাড়ির জানালা দিয়ে টুপ করে সেটি সিটের উপর রাখল গৌরী। বিষয়টা খেয়াল করল না কেউ। তার কানে এল সশব্দে দরজা বন্ধ ও লক হওয়ার আওয়াজ। গৌরীর এই অযাচিত সাহায্যের জন্যে মনে মনে তাকে ধন্যবাদ দিল আহমদ মুসা। আহমদ মুসা নিজের পাশের দরজা খোলা রেখেছে ইমারজেন্সী এক্সিট হিসাবে, কিন্তু ওপাশের দরজা লকড থাকুক এটাই চেয়েছিল আহমদ মুসা।

গাড়ি স্টার্ট নিয়েছে আহমদ মুসার।

আহমদ মুসা ওপাশের জানালার দিকে তাকাতে গিয়ে ছোট বাক্সটা তার চোখে পড়ল। চমকে উঠে আহমদ মুসা বাম হাত দিয়ে বাক্সটি আস্তে করে টেনে নিল। বাম হাত দিয়ে বাক্সটি চোখের সামনে তুলতেই চক্ষু স্থির হয়ে গেল আহমদ মুসার। বাক্সের উপর লেখা 'ম্যাগনেটিক মেশিন জ্যামিং ডিভাইস(MMJD)'।

স্তম্ভিত আহমদ মুসা বাম হাতেই খুলে ফেলল বাক্সটি। ভেতরে ম্যাগনেটিক জ্যামিং মেশিন। এই মেশিন সম্পর্কে সে পড়েছে, শুনেছে, কিন্তু দেখেনি। এই মেশিন মার্কেটেও আসেনি। বিজ্ঞানী ও প্রস্তুতকারকদের হাতেই মেশিনটা রয়েছে। এই মেশিন এখানে এল কি করে? সে নিশ্চিত গৌরীই তার ব্যাগ থেকে এটা রেখে গেছে। তার মানে ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের হাতে এই জ্যামিং মেশিন রয়েছে।

গৌরীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল আহমদ মুসার মন। তার সাথে অবাক বিস্ময়ও! গৌরী তার দলের সাথে এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা করল কেমন করে! ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের লোকরা মৃত্যুর মুখেও দলের ব্যাপারে মুখ খোলে না।

আর গৌরী আহমদ মুসার হাতে তুলে দিল তার লোকদের পরাজয়, এমনকি ধ্বংসের অস্ত্র।

আহমদ মুসা ম্যাগনেটিক জ্যামিং মেশিন (এমএমজেডি) সম্পর্কে বিস্তারিত পড়েছে। অস্ত্রটি ছোট কিন্তু যুদ্ধের জগতে এক বিস্ময়। এই অস্ত্রের ম্যাগনেটিক ফায়ার যে কোন মেটালে তৈরি যন্ত্রকে মুহূর্তে নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারে। ট্যাংক থেকে পিস্তল ও স্টিলমিল থেকে খেলনা গাড়ি সবাই এই ক্ষুদ্র অস্ত্রের কাছে অসহায়। অস্ত্রটি মাল্টিডাইমেনশনাল ও সিংগল ডাইমেনশনাল হতে পারে। এর সাহায্যে সাংঘাতিক কার্যকরি ফায়ার ফোকাসকেও নিয়ন্ত্রণ করা যায়। টার্গেটের আয়তন যেমন হবে, এর ফায়ার ফোকাসকেও সেরকম করা যায়। তাতে আশেপাশের অনুরূপ কোন কিছুর ক্ষতি হয় না।

হাসল আহমদ মুসা। গৌরী এক মোক্ষম অস্ত্র আহমদ মুসার হাতে তুলে দিয়েছে। এর মোক্ষম ম্যাগনেটিক ফায়ার শুধু ওদের গাড়িগুলোকে নয়, ওদের সব অস্ত্রকে অকেজো করে দেবে।

তাই হলো। সামনের গাড়ি ১০ গজ দূরে থাকতেই আহমদ মুসা ম্যাগনেটিক ফায়ার করেছিল, নিয়ন্ত্রিত ফায়ার। তারপর গাড়িটি মাত্র দুই গজ এগোতে পেরেছিল। আট গজের মাথায় গাড়িটা থেমে গিয়েছিল। পেছন থেকে আসা গাড়িও এই ভাগ্য বরণ করেছিল। তারা গাড়ি খুলতেও পারেনি। গাড়ির লক জ্যাম হয়ে গিয়েছিল। নিশ্চয় তাদের মোবাইলও কাজে লাগাতে পারেনি। কারণ সেগুলোও জ্যাম হবার কথা।

আহমদ মুসা নিজের গাড়ি থামিয়ে সামনে ও পেছনে ম্যাগনেটিক ফায়ার করেছিল।

এবার আহমদ মুসা গাড়ি স্টার্ট করল। গাড়ি ঘুরিয়ে পেছন দিকে চলতে শুরু করল। মাইল দুয়েক পশ্চিমে এগোলেই তার হোটেলে ফেরার রাস্তা সে পেয়ে যাবে।

পেছনের নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকা গাড়িটিকে পাশ কাটিয়ে আহমদ মুসার গাড়ি বেরিয়ে এল।

নিশ্চিন্ত হলো সে। ছুটতে লাগল তার গাড়ি। কিন্তু একশ’ গজও এগোতে পারল না। দু’পাশ থেকে শুরু হলো গুলি বৃষ্টি।

আহমদ মুসার পাশের জানালা ভেঙে খানখান হয়ে গেল। তার সামনে দিয়েই কয়েকটা গুলি বেরিয়ে গেল। আহমদ মুসার দেহটা রিল্যাক্স মুডে সিটের উপর এলিয়ে পড়ে না থাকলে তার দেহটা ঝাঁঝরা হয়ে যেত।

মুহূর্তেই আহমদ মুসার কাছে বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে গেল। পাহাড়ের দু’পাশে যাদের নামানো হয়েছিল তার পালানো পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্যে, তারাই তাদের বিপদগ্রস্থ গাড়ির দিকে ছুটে এসেছে। এদের মধ্যে গৌরী নিশ্চয় রয়েছে। তাদের গাড়িগুলোর কি বিপদ ঘটতে যাচ্ছে তা একমাত্র সেই-ই জানত। সেই-ই দ্রুত তার লোকদের সংগঠিত করার জন্যে এদিকে এসেছে। আহমদ মুসা বুঝল, কিছুটা এগোলেই সে এদের গুলির রেঞ্জের বাইরে যেতে পারবে। ইতিমধ্যেই দু’পাশের জানালা দিয়ে গুলি আসা প্রায় বন্ধ হয়েছে। এবার গুলি আসছে অপেক্ষাকৃত উপর থেকে। আঘাত করছে জানালার লেবেলের উপরে ও ছাদেও।

গুলি বৃষ্টির মধ্যে স্টিয়ারিং থেকে আহমদ মুসার হাত শিথিল হয়নি। সিটের সাথে সেঁটে থেকে হাত দু’টোকে যথাসম্ভব ঠিক রেখে সে স্টিয়ারিং হুইল নিয়ন্ত্রণ করছিল।

গুলি বৃষ্টি এখন আঘাত করছে আহমদ মুসার গাড়ির পেছন দিকে।

আহমদ মুসা বেরিয়ে এল ওদের গাড়ির রেঞ্জ থেকে। ওদের পক্ষে আহমদ মুসার গাড়ি ফলো করা সম্ভব নয়।

আহমদ মুসা আবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। কিন্তু স্বস্তি তার স্থায়ী হলো না।

তার পকেটে থাকা গৌরীর মোবাইল বেজে উঠল।

মোবাইল ধরল আহমদ মুসা।

ওপারের কথা শুনেই আহমদ মুসা বুঝল, ব্ল্যাক সান এই কিছুক্ষণ আগে কথা বলেছে।

লোকটি আহমদ মুসার কন্ঠ পেয়েই বলে উঠল, 'মি. আহমদ মুসা ধন্যবাদ, আমাদের অস্ত্রে আমাদেরই ঘায়েল করলেন, সত্যিই আপনার নামের মতই আপনি! কিন্তু গৌরীর ব্যাগে যদি জ্যামিং মেশিন (MMJD) না পেতেন, তাহলে কিন্তু আপনার এই বিজয় লাভের সুযোগ ছিল না। গৌরী একটা ভুল করেছে। মেশিনটির সেফটি পিন খুলে নিলেই আপনার বুজরুগি সব হাওয়া হয়ে যেত!'

লোকটি একটু থামতেই আহমদ মুসা বলে উঠল, 'জ্যামিং মেশিন ব্যবহার করেছি এটা আপনাকে কে বলল?'

'অবান্তর প্রশ্ন। বলেছি তো, আপনার গাড়িতে সুপার সেনসেটিভ সাইট ট্রান্সমিটার আছে। সেটাই আমাকে বলে দিয়েছে। আরও বলে দিয়েছে, আপনি গাড়ি ঘুরিয়ে জ্যাম হয়ে যাওয়া পেছনের গাড়ির পাশ কাটিয়ে পশ্চিম দিকে এগিয়েছেন। দু'দিকের পাহাড় থেকে আমাদের লোকরা আপনাকে আটকাবার চেষ্টা করে। গুলি বৃষ্টির মধ্যেও গাড়ি চালিয়ে আপনি বের হয়ে এসেছেন। এখন আপনি নিরাপদ, তাই না?'

'তা মনে করারই কথা।' বলল আহমদ মুসা।

আবার ওপার থেকে হো হো হাসির শব্দ। বলল ওপারের কন্ঠ, 'আহমদ মুসা, বিপদ তোমার মাথার উপর পৌঁছতে দু'এক মিনিটের বেশি দেরি হবে না। 'আরু'র পাশের পাহাড়েই আছে আমাদের ফ্লাইং-লিফটের একটি ঘাঁটি। সেখানে এক আসনের ফ্লায়ার থেকে দশ আসনের মিনি হেলিকপ্টার রয়েছে। ওগুলো দিনের আলোতে বের হয় না। এখন রাত।'

বলেই আবার হো হো করে হেসে উঠল লোকটি। হাসির মধ্যেই ওপারের লাইন অফ হয়ে গেল।

আহমদ মুসা মুহূর্তের জন্যে চোখ বন্ধ করল। চিন্তা করল, আরেকটা বিপদ আসছে। নিশ্চিত হওয়া গেল, পানির তলদেশ দিয়ে চলার জন্যে ওদের যেমন ক্ষুদ্র টিউব সাবমেরিন আছে, মিনি সাবমেরিন আছে, তেমনি আকাশে চলার জন্যে ওরা সম্ভবত ফ্লাইং টিউব, ফ্লাইং মডিউল, মিনি হেলিকপ্টার তৈরি করেছে। এসবের ফাংশন, চরিত্র, শক্তি ইত্যাদি সম্পর্কে কিছুই জানা নেই তার। তার কাছে

অস্ত্র আছে বলতে ওদের কাছ থেকে পাওয়া স্টেনগান, গৌরীর ফেলে যাওয়া রিভলবার ও সেই জ্যামিং মেশিন।

চোখ খুলল আহমদ মুসা। তাকাল মাথার উপর গাড়ির ছাদের দিকে। দেখল যা ভেবেছিল তাই। ছাদের এ অংশটা স্লাইডিং।

আহমদ মুসা সুইচ টিপে স্লাইডিং ডোরটা খুলে ফেলল। দুই ফুট চওড়া ও তিন ফুট লম্বা আয়তকার একটা স্পেস বের হয়ে গেল। তাকাল উপরের দিকে। আবার সেই ভাবনা, ফ্লাইং টিউব বা ফ্লাইং মডিউল অথবা মিনি হেলিকপ্টার যাই আসুক, তারা কি করতে চাইবে! বোমা মেরে গাড়ি সমেত তাকে ধ্বংস করবে? কিন্তু তা করলে তার আস্ত লাশ পাবে কি করে? লাশ না পেলে তো এক বিলিয়ন ডলার পাবে না। আকাশ থেকে গুলি বৃষ্টি করে তাকে মারবে! কিন্তু সেজন্যে ফ্লাইং বস্তুটিকে অনেকখানি নিচে নেমে আসতে হবে। সে ঝুঁকি তারা নেবে! কারণ আহমদ মুসার কাছেও স্টেনগানের মত অস্ত্র আছে, তা তারা ধরেই নেবে। অবশ্য বড় রেঞ্জের কোন লাইটগান তাদের হাতে থাকতেই পারে, এটা ভাবল আহমদ মুসা। কিন্তু তারা কি গুলি করবে? তারা অক্ষত মানুষ বা লাশ চায়।

আবার উপর দিকে চাইল আহমদ মুসা।

কোন দিকে থেকে কোন ধরনের শব্দ নেই। হঠাৎ তার মনে এল, ওরা শব্দহীন ফ্লাইং ভেহিকেলস তো তৈরি করতে পারে!

সতর্ক হলো আহমদ মুসা। তার সন্ধানী চোখ ঘুরতে লাগল মাথার উপর আকাশে। তার চোখ ঘুরে আরু'র পুব আকাশে আসতেই অমাবস্যার চাঁদের মত গোলাকার চলন্ত অন্ধকারকে এগিয়ে আসতে দেখল।

চট করে আহমদ মুসার মনে পড়ল, ব্ল্যাক সানের সেই নেতা একটু আগে তাকে মোবাইলে জানালো আরু'র পাশের তাদের ফ্লাইং ঘাঁটি থেকে তাদের ফ্লাইং ভেহিকেল আক্রমণে আসবে। এই চলন্ত অন্ধকারই কি সেই অ্যাটাকিং ফ্লাইং ভেহিকেল!

চলন্ত গোলাকার সেই অন্ধকার যানটি দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগল তার গাড়ির দিকে। এগিয়ে আসছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণে। আহমদ মুসা তার গাড়ির স্পীড সর্বোচ্চ সীমায় তুলল, কিন্তু বিস্ময়ের সাথে দেখল, সেই গোলাকার

অন্ধকারটি সঙ্গে সঙ্গেই তার কৌণিক অবস্থান এডজাস্ট করে নিল! আহমদ মুসার বুঝতে বাকি রইল না, তার গাড়ির ট্রান্সমিটারটিই ঐ ফ্লাইং অন্ধকার বস্তু অর্থাৎ ব্ল্যাক সান-এর ফ্লাইং ভেহিকেলকে গাইড করছে।

তার মানে তার গাড়ির সাউন্ড ট্রান্সমিটার শুধু শব্দই ট্রান্সমিট করে না, নির্দিষ্ট এক ওয়েভ লেংথে তার অবস্থানকেও রিলে করে। সুতরাং তার গাড়ি যেখানেই যাক, ফ্লাইং ভেহিকেলটি তাকে লোকেট করবেই।

ফ্লাইং ভেহিকেলটি আহমদ মুসার গাড়ির চেয়ে কয়েকগুন বেশি বেগে এগিয়ে আসছে। ইতিমধ্যেই ফ্লাইং ভেহিকেলটি ৭০ডিগ্রি কোণে উঠে এসেছে। মাথার উপর আসতে দেরি নেই।

আহমদ মুসা গাড়ি ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিল।

ফ্লাইং ভেহিকেলকে পিছু ছাড়াবার দেখা যাচ্ছে এটাই একমাত্র পথ।

হার্ড ব্রেক কষে আহমদ মুসা তার গাড়ি থামাল।

জ্যামিং মেশিন, গৌরীর রিভলবার ও একটি স্টেনগান নিয়ে আহমদ মুসা গাড়ি থেকে নেমে পড়ল।

গাড়ি থেকে নেমেই আহমদ মুসা সামনের দিকে দৌড় দিল। আর শ'গজের মত এগোলেই দু'দিকের পাহাড় অতিক্রম করে অনেকটা সমতল এলাকায় গিয়ে পৌঁছবে। তাতে আশেপাশের তার মুভ করার সুযোগ হবে।

দু'পাশের পাহাড়ের দেয়াল পার হতেই আহমদ মুসার পকেটে থাকা গৌরীর মোবাইল বেজে উঠল। মোবাইল ধরল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার 'হ্যালো' বলে সাড়া দিতেই ওপার থেকে সেই 'হো হো' হাসির শব্দ ভেসে এল। হাসি থামলে কন্ঠটি বলল, 'আহমদ মুসা, তুমি গাড়ি ছেড়ে দিয়ে রক্ষা পাবে না । আমাদের সর্বগুণান্বিত ভেহিকেল জুনিয়র এক্সেকিউটর-১ পাঠিয়েছি। তার চোখ আপনাকে খোঁজে নিবেই। আপনার লাশ আমরা চাই-ই।

একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহ ছাড়া সর্বগুণান্বিত ও সর্বশক্তিমান আর কেউ নেই। সবচেয়ে নিখুঁত বলে আমরা যাকে ভাবি তার মধ্যেই বড় খুঁত রয়ে যায়। নির্ভুল হবার সর্বশক্তিমান হবার অহংকার একমাত্র আল্লাহরই সাজে। তার সৃষ্টির এই দাবি করা মুর্খতা। আহমদ মুসা বলল।

ওপার থেকে আবার সেই হাসি। বলল, আমাদের সবচেয়ে ছোট অস্ত্র 'জুনিয়র এক্সকিউটর-১' আমরা পাঠিয়েছি। তার শক্তিটা একবার দেখ।এই কথা শেষ হবার পরে আবার তার সেই হাসি। কেটে গেল ওপার থেকে করা মোবাইলের লাইন।

কথা শেষ করে আহমদ মুসা ওপরে তাকিয়ে দেখল কথিত সেই জুনিয়র এক্সকিউটর-১ আরও অনেক নিচে নেমে এসেছে। এসে পৌছেছে প্রায় মাথার ওপর। স্টেস ভেহিকেল জুনিয়র এক্সকিউটর-১ এখনও গুলীর রেঞ্জের অনেক ওপরে। তবে নামছে এক্সকিউটর-১।

নেমে এল অনেক নিচে। কোন পথে আক্রমণ আসবে তার অপেক্ষা করছিল আহমদ মুসা। হঠাৎ ওপর থেকে এক পশলা গুলি বৃষ্টি ছুটে এল নিচে। শব্দ থেকে বুঝল গুলী স্টেনগান থেকেই এসেছে

একটা বড় পাথরের গা ঘেঁষে আহমদ মুসা বসে পড়েছিল। তার চারপাশে গুলীর একটা রিং তৈরী হলো। আহমদ মুসা বুঝল তাকে লক্ষ্য করে গুলী করা হয় নি।

ওপর থেকে গুলী বর্ষণ বন্ধ হতেই আহমদ মুসা তার স্টেনগান তুলে গুলী করল জুনিয়র এক্সকিউটর-১ লক্ষ্য করে। গুলীগুলো, ফিরে এল নিচে। গোটা স্পেস ভেহিকেলটা বুলেট প্রুফ বুঝল আহমদ মুসা। একটা ভাবনা এসে ঘিরে ধরল আহমদ মুসাকে। স্টেনগান অকেজো হয়ে পড়ার পর আত্মরক্ষা ও আক্রমণের আর কি অপশন বাকি থাকল তার কাছে ?

আহমদ মুসার ভাবনা শেষ হতে পারলো না হঠাৎ বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করল ওপর থেকে আসা ও ফিরে আসা বুলেটগুলো আবার ওপরে উঠে যাচ্ছে। হাতের স্টেনগানেও টান পড়েছে।

চমকে উঠল আহমদ মুসা। ম্যাগনেটিক পুলিং। কথাটা আহমদ মুসার মাথায় আসার সাথে সাথেই জ্যাকেটের পকেট জুড়ে থাকা ম্যাগনেটিক জ্যামিং মেশিন টেনে বের করে দ্রুত পাওয়ার অন করে টপ ফোকাসের চারদিক সীমাবদ্ধ করে ফাংশন অপশন স্টার্ট করল। সংগে সংগে জ্যামিং মেশিনের অদৃশ্য ফায়ার ফোকাস ছুটল এক্সকিউটর-১ লক্ষ্যে।

আহমদ মুসার মাথার ওপরের আকাশে জুনিয়র এক্সকিটর-১ যেমন স্থির দাঁড়িয়েছিল, তেমনি স্থির দাঁড়িয়ে থাকল। জ্যামিং মেশিনের ম্যাগনেটিক ফায়ার কোন কাজ করল না বুঝল আহমদ মুসা। এর পর একটা জিনিস লক্ষ্য করল, নিচে গ্রাউন্ড থেকে বুলেটের মত মেটালিক দ্রব্য উপরে উঠে যাচ্ছিল, তা বন্ধ হয়ে গেল। হাতে ধরা স্টেনগান ও জ্যামিং মেশিনও আর উপর থেকে টান অনুভব করল না। তার মানে জুনিয়র এক্সকিউটর-১ এর ম্যাগনেটিক পুলকে তার ম্যাগনেটিক জ্যামিং মেশিনের ম্যাগনেটিক ফোকাস নিউট্রাল করে দিয়েছে। কিন্তু জুনিয়র এক্সকিউটর-১ এর কোন ক্ষতি করতে পারল না তার জ্যামিং মেশিন। নিশ্চয় ম্যাগনেটিক জ্যামিং প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা এতে আছে। তবে আহমদ মুসা আরেকটা জিনিস ভেবে খুব খুশি হলো, জুনিয়র এক্সকিউটর-১ থেকে গুলী করে তার কোন ক্ষতি করতে ওরা পারবে না। তার ম্যাগনেটিক জ্যামিং মেশিনের ম্যাগনেটিক ফায়ার বুলেটকেও নিউট্রাল করে দিতে পারে। এটা এক্সকিউটরও নিশ্চয় এতক্ষণে বুঝে ফেলেছে।

তাহলে এক্সকিউটর এখন আগাবে কোন পথে ?

হঠাৎ আহমদ মুসার মনে পড়ল তার নিজের কিডন্যাপ হওয়ার কথা। ব্ল্যাক সান-এর গৌরিরা তাকে কিডন্যাপ করেছে ক্লোরোফরম কিংবা ঐ জাতীয় চেতনা লোপকারী গ্যাস প্রয়োগ করে। আর কাউকে আস্ত কিডন্যাপ করার এটাই সবচেয়ে সহজ পথ। তাছাড়া তারা লাশ চাইলে জীবনবিনাশী কোন গ্যাসও ব্যবহার করতে পারে।

যতদুর পারা যায় এর আওতা থেকে দূরে সরতে হবে। কিন্তু সমস্যা হলো গাড়ি থেকে নামার পরও জুনিয়র এক্সকিউটর-১ তাকে অনুসরন করছে কিভাবে। ব্ল্যাক সানের লোকেরা বলছে আমি যেখানে যাই, এর হাত থেকে বাঁচতে পারবো না। এক্সকিউটর-১ এর চোখ আমাকে খোঁজে নিবেই। কিন্তু কিভাবে? গৌরীর গাড়িতে সাউন্ড ট্রান্সমিটার ছিল। কিন্তু আমার সাথে তো সাউন্ড ট্রান্সমিটার কিংবা অন্য কোন ট্রান্সমিটার নেই।

হঠাৎ আহমদ মুসার মনে হলো ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের অস্ত্রশস্ত্র সব কিছুর সাথে ট্রান্সমিটার চীপস লাগানো আছে। যেহেতু আমার সাথে গৌরীদের

মানে ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের একটি রিভলবার, একটি স্টেনগান এবং একটি জ্যামিং মেশিন আছে। এর সবগুলোতেই কিংবা কোন একটিতে ট্রান্সমিটার চীপস লাগনো রয়েছে।

আহমদ মুসা রিভলবার ও স্টেনগান ছুঁড়ে ফেলে দিল। কিন্তু হাতে নিয়েও জ্যামিং মিশিনটি ফেলে দিতে পারলো না । মেশিনটি তার দরকার। ভাবল আহমদ মুসা, জ্যামিং মেশিন নিয়ে সে সরে যাবে। এক্সকিউটর-১ যদি তাকে সেখানেও ফলো করে তাহলে বুঝা যাবে জ্যামিং মেশিনেও ট্রান্সমিটিং চীপস রয়েছে।

এসব চিন্তার সাথে সাথেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। আকাশে চাঁদ নেই। চারদিকে অন্ধকার। উচ্চতা ও চারদিক উন্মুক্ত হওয়ার কারণে কিছুটা স্তব্ধতা থাকলেও ভূমি সন্নিহিত স্থানে অন্ধকারটা একেবারে ঘুটঘুটে।

আহমদ মুসা রাস্তা এড়িয়ে রাস্তার পাশ দিয়ে দ্রুত এগোলো পশ্চিম দিকে। মাইল খানিক এগোবার পর একটা টিলার গোড়ায় গিয়ে বসল। এখান থেকে কয়েক গজ এগোলেই হাইওয়ে থেকে একটা রাস্তা বেরিয়ে গেছে হোটেলের দিকে। আহমদ মুসার চোখ আকাশের দিকে। ব্ল্যাক সানের জুনিয়র এক্সিকিউটর-১ তাকে ফলো করছে কি না, এটাই তার দেখার বিষয়।

দু'তিন মিনিটও পার হয় নি। আহমদ মুসা দেখল এক্সিকিউটর-১ মানে সেই গোলাকার জমাট অন্ধকারটি দ্রুত এসে তার মাথার ওপর স্থির হলো। আর সংগে সংগেই এক্সিকিউটর-১ এর তলদেশে একটা নীল আলো জ্বলে উঠেই আবার নিভে গেল।

আহমদ মুসার স্থির দৃষ্টি নিবন্ধ ছিল এক্সিকিউটর-১ এর দিকে। একটা মিষ্টি নীল আলো জ্বলে উঠে নিভে যেতে আহমদ মুসাও দেখল। একটু বিস্মিতই হলো আহমদ মুসা এক্সিকিউটর-১ এর ম্যাগনেটিক পুল থ্রো হওয়ার সময়ও আলো জ্বলেছিল, তবে সেটা ছিল কমলা, কিন্তু এবার নীল আলো কেন? হঠাৎ আহমদ মুসার মাথায় এল, নীল রঙ হচ্ছে বিষের প্রতীক। নীল আলো কি সেই সংকেত দিল ? তার মানে বিষাক্ত কোন অস্ত্র তাক করা হয়েছে ?

সে ধরনের বিষাক্ত গ্যাস যদি কোন প্রকার গান থেকে ফায়ার করে থাকে তাহলে এখন তা থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই। কারণ উপরের এক্সিকিউটর-১

থেকে ফায়ার করা গ্যাসীয় ওয়েভ মাটিতে পৌছতে পাঁচ দশ সেকেন্ডের বেশি সময় লাগবে না। এই সময়ের মধ্যের এক্সিকিউটর-১ এর আওতা থেকে বের হওয়া অসম্ভব।

এই চিন্তার সংগে সংগেই আহমদ মুসা পকেট জ্যামিং মেশিন বের করে এক্সিকিউট-১ কে টার্গেট করল। সে জানেনা ম্যাগনেটেড জ্যামিং ওয়েভ বিষাক্ত গ্যাস ওয়েভের প্রতিরোধে কিছু আসবে কিনা। কিন্তু যেহেতু করার কিছু নেই তাই আল্লাহ ভরসা করা যা হাতে আছে সেটাই কাজে লাগাতে হবে।

বিষাক্ত গ্যাসের বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকর হলো বাইরের বিষাক্ত গ্যাস দেহের ভেতরে ঢুকতে না দেয়া। বিষাক্ত গ্যাসের এ্যাকশন দেড় দু'মিনিটের বেশি থাকে না।

আহমদ মুসা পকেটের রুমাল আঁট ভাজ করে নাক ও মুখের উপর রাখল। তারপর মোবাইলের স্ক্রীন লাইট অন রেখে স্ক্রীনের পরিবর্তনের প্রতি নজর রাখল। বিষাক্ত গ্যাস বাতাসের চেয়ে ভারী এবং কিছুটা অস্বচ্ছ। যা স্বচ্ছ স্ক্রীন লাইটের উপর কিছুটা হলেও প্রভাব ফেলবে। সেটায় দেখবে সাথে সাথে সে নাক, মুখ ও চোখ পুরোপুরি বন্ধ রাখবে। যেহেতু পালিয়ে বাঁচার কোন উপায় নেই, তাই আত্মরক্ষার এটুকু ব্যবস্থা ছাড়া তার করার কিছু নেই।

সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সবটুকু মনোযোগ খোলা রেখে আহমদ মুসা অপেক্ষা করছিল। তার দুই চোখ আঠার মত লেগেছিল মোবাইলের স্ক্রীনে। কিন্তু স্ক্রীন সংকেত দেবার আগেই আহমদ মুসা তার শরীর থেকেই সংকেত পেয়ে গেল। হঠাৎই আহমদ মুসার মনে হলো একটা ভারী ঠান্ডা বাতাস যেন তার মাথার উপর চেপে বসল।

সংগে সংগেই আহমদ মুসা মুখ ও শ্বাস বন্ধ করে চোখ বুজল। পল পল করে সময় বয়ে চলল।

আহমদ মুসা অনুভব করছে সেই ঠাণ্ডা ভারী বাতাসের ছোয়া যেন চারদিক থেকে এসে আহমদ মুসাকে চেপে ধরল। বুঝল বিষাক্ত গ্যাসেরই ঠান্ডা ছোবল এটা। হিমশীতল মৃত্যু নিয়ে এলো এই ঠান্ডা ছোবল। কোন ধরনের বিষ

এটা? কোন কেমিক্যাল গ্যাস, না সাইনাইডের গ্যাসীয় রূপান্তর এটা। এ প্রশ্নের উত্তর আহমদ মুসার কাছে নেই।

সময় বয়ে চলছে পল পল করে। একের পর এক বিষাক্ত গ্যাসের ওয়েভ আসছে। বয়ে যাচ্ছে তা দেহের উপর দিয়েই।

দেড় মিনিট পার হয়ে গেছে।

আহমদ মুসার ফুসফুস মুক্ত বাতাসের জন্যে আকুলি-বিকুলি শুরু করেছে। আকুলি-বিকুলিটা ধীরে ধীরে বাড়ছে। এই বিকুলিটা এক সময় বুক ফেটে যাওয়ার চিৎকারে পরিনত হলো। বিষাক্ত গ্যাসের মৃত্যু ছোবল তখন আহমদ মুসার কাছে গৌণ হয়েছে। অস্থির হয়ে উঠেছে তার শরীর। বুক ফেটে যাচ্ছে তার। ইচ্ছার ওপর বুদ্ধির নিয়ন্ত্রন যেন শিথিল হয়ে পড়েছে। নিয়ন্ত্রন ভেঙে বন্ধ নাক বন্ধ মুখ যেন এখনি মুক্ত বাতাসকে গ্রোগ্রাসে গিলবে।

আহমদ মুসা মুখ ও নাকের রুমালকে নাক ও মুখের উপর আরও ভালভাবে সেঁটে ধরে ধীরে ধীরে রুমালের মধ্য থেকে নিঃশ্বাস ছাড়ল ও গ্রহণ করল খুব ভয়ে ভয়ে। কিন্তু যেটুকু পেল তার কোন প্রতিক্রিয়া সে অনুভব করল না। আরও কিছুক্ষণ পর সে নাকে মুখে চেপে রাখা কাপড়ের ভেতর দিয়ে শ্বাস গ্রহণ করল। না, কোন প্রতিক্রিয়া নেই। হাত ঘড়ির রেডিয়াম ডায়ালে চোখ বুলিয়ে দেখল ইতিমধ্যে দেখল আড়াই মিনিট পার হয়েছে। আহমদ মুসা দেখেছে এক্সিকিউটর-১ থেকে সেই ভয়ংকর নীল তিনবার জ্বলেছে। তার মানে জীবনবিনাশী বিষাক্ত গ্যাসের ফায়ার তিনবার হয়েছে। শেষ ফায়ার থেকে দুই মিনিট সময় পার হয়েছে। সুতরাং বিষাক্ত গ্যসের কার্যকরীতা এখন আর নেই। চারদিকের বাতাস এসে বিষাক্ত গ্যাসকে হজম করে ফেলেছে।

আরও কিছুক্ষণ পর আহমদ মুসা রুমাল সরাল তার নাক মুখ থেকে। সত্যি ফ্রেশ বাতাস পেল আহমদ মুসা। উন্মুক্ত নাক দিয়ে বুক ভরে বাতাস নিয়ে আহমদ মুসা এক্সিউকিউটর-১ মাথার ওপর ঠিক দাঁড়িয়ে আছে। কি করণী এখন ভাবছে আহমদ মুসা। সে বেঁচে আছে জানলে এক্সিকিউটর-১ আবার আক্রমনে আসবে। আরও একটু ভেবে আহমদ মুসা উৎসাহিত হয়ে মনে মনে বলল।

আহমদ মুসা বেঁচে নেই এই ম্যাসেজ এক্সিকিউটরকে দেবার সহজ পথ হলো, জ্যামিং মেশিন এখানে রেখে চলে যাওয়া। তার কাছে থাকা ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের চীপসটি নিশ্চয় জ্যামিং মেশিনের সাথেই আছে। জ্যামিং মেশিন এখানে রেখে যদি আহমদ মুসা চলে যায়, তাহলে এক্সিকিউটর-১ ভাববে আহমদ মুসা এখানেই আছে এবং মরে গেছে। কারণ বিষাক্ত গ্যাসের হাত থেকে কোন ভাবে বাচলেও এখানে আর আমার কোন ভাবে থাকার কথা নয়, এটাই তার নিশ্চিত ভাবার কথা। সুতরাং জ্যামিং মেশিন এখানে রেখে সে নিরাপদে চলে যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল আহমদ মুসা।

জ্যামিং মেশিনটি পাথরের গোড়ায় একটা গর্তের মত জায়গায় লুকিয়ে রাখল যাতে মেশিনটি প্রথম দৃষ্টিতেই খুঁজে না পায়।

আহমদ মুসার কষ্ট লাগল জ্যামিং মেশিনটি এভাবে রেখে যেতে। কিন্তু শেষে ভাবল, সব বিষয় আল্লাহই ভাল জানেন। আল্লাহ ছাড়া আর কারও বা অন্য কিছুর উপর আমি নির্ভরশীল নই।

আহমদ মুসা পাথরটির পেছনে দিয়ে যথাসম্ভব নিজেকে মাটির সাথে সেঁটে রেখে ক্রলিং করে চলল রাস্তার সামনের মোড়টির দিকে, যেখান থেকে এক রাস্তা চলে গেছে তার হোটেলে। চলতে চলতে আহমদ মুসা ভাবল, এক্সিকিউটর-১-এ যদি নাইট ভিশন আই কিংবা রাতে দেখার মত অন্য কোন ব্যবস্থা থেকেও থাকে, তবু মাটিতে তাকে ক্রলিং অবস্থায় ডিটেক্ট করা সম্ভব নয়।

ক্রলিং করে আহমদ মুসা রাস্তার মোড় পর্যন্ত পৌঁছল।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

তারার আলোতে যেটুকু স্বচ্ছতা, তা মাটি পর্যন্ত পৌঁছেনি।

আহমদ মুসা এক টিলার উপর বসে তাকাল পুব আকাশে। এক্সিকিউটর-১ অস্পষ্ট ছায়ার মত দেখা যাচ্ছে। তখনও স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে একই জায়গায়।

ভাবল আহমদ মুসা, এক্সিকিউটর-১-এর দৃষ্টিতে মৃত আহমদ মুসাকে নেবার জন্যে ওটা তো নিচে নামার কথা। কিন্তু এক ইঞ্চিও তো নিচে নামেনি!

তাহলে কারও অপেক্ষা করছে কিংবা লাশ নেবার জন্যে তাদের গাড়িগুলোকে কি নির্দেশ দেয়া হয়েছে? শেষেরটাই স্বাভাবিক। কিছু দূরেই তো ওদের গাড়ি ও লোকজন রয়েছে। জ্যাম গাড়িগুলোকে নিশ্চয় এতক্ষণে সচল করা হয়েছে।

সতর্ক হলো আহমদ মুসা। ওরা এসে যদি আহমদ মুসার লাশ না পায়, তাহলে আহমদ মুসার সন্ধানে ছুটবে আবার তারা। সেক্ষেত্রে আহমদ মুসাকে তারা প্রথমেই খুঁজবে হোটেলে তার কক্ষে।

আহমদ মুসাও হোটেলে ফেরারই সিদ্ধান্ত নিল। ওদের গতিবিধি সম্পর্কে আহমদ মুসারও জানা দরকার।

হোটেলের রাস্তা ধরে দ্রুত এগোল আহমদ মুসা।

ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের দু'টি গাড়ি ও অনেক লোক তন্নতন্ন করে খুঁজল চারদিক কিন্তু আহমদ মুসার লাশ কোথাও পেল না।

সবাই ফিরে এসে মাথা নিচু করে বসে বলল, শয়তানটার লাশ কোথাও নেই ম্যাডাম।

গৌরীর চোখে বিস্ময় ও বিহ্বল ভাব থাকলেও আহমদ মুসার লাশ পাওয়া গেল না এই খবরে গৌরী দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হবার চেয়ে খুশিই হলো যেন বেশি! চমকে উঠল গৌরী। মনকে শাসন করল সে। লোকদের দিকে চেয়ে দ্রুত বলল, সে বেঁচে থাকলে অবশ্যই সাথে করে জ্যামিং মেশিন নিয়ে যেত। নিশ্চয় সে বেঁচে নেই। তোমরা আরও ভাল করে দেখ।

এটা বলল বটে গৌরী। তবে নিজের কথায় নিজেই জোর পেল না।

লোকরা আবার চারদিকে ছুটল।

গৌরী মোবাইল করল ক্রিনিনকে।

বলল, ক্রিনিন আহমদ মুসার লাশ এখনও পাওয়া যায়নি।

ক্রিনিন জুনিয়র এক্সিকিউটর-১-এর কমান্ডার। গৌরীর কথার উত্তরে দুই চোখ কপালে তুলে সে বলল, পাওয়া যাবে না কেন? নিশ্চয় পাওয়া যাবে ম্যাডাম। আমি এক্সিকিউটরের লাইটভিশন টেলিস্কোপে দেখে তাকে টার্গেট করেই ফায়ার করেছি। ফায়ারের আড়াই মিনিটের মাথায় আবার আমি দেখেছি পাথরে তার দেহ ঠেস দিয়ে থাকা। সে বাঁচেনি, বাঁচতে পারে না। তার লাশ পাওয়া যাবে না কেন?

কিন্তু লাশ থাকলে তো জ্যামিং মেশিনের পাশেই থাকার কথা। জ্যামিং মেশিন পাথরের গোড়াতেই পাওয়া গেছে, কিন্তু তাকে তো পাওয়া যাচ্ছে না! ক্রিনিন, তুমি এক্সেলেন্সি লর্ডকে কিছু জানিয়েছ? বলল গৌরী।

জি ম্যাডাম। আমি মাই লর্ডকে জানিয়েছি, ফায়ার সফল। আহমদ মুসাকে টার্গেট করেই ফায়ার হয়েছে।

ফায়ারের পর তার দেহকে একটা পাথরের সাথে দেখা গেছে। ক্রিনিন বলল।

ঠিক আছে ক্রিনিন। আমি দেখছি এদিকে। দেখা যাক, শেষটা কি দাঁড়ায়।

গুড বাই, জানিয়ে কল অফ করে দিল।

কিন্তু মোবাইল পকেটে রাখা আর হলো না।

মোবাইল বেজে উঠল আবার।

গৌরী মোবাইল এগিয়ে নিয়ে স্ক্রীনের দিকে তাকিয়েই জড়সড় হয়ে গেল।

মোবাইলটা মুখের সামনে নিয়ে বলল, ইয়েস মাই লর্ড, আমি গৌরী।

লাশ ঠিকঠাক আছে? কি করছ তোমরা এখন? বলল ওপার থেকে আলেক্সি গ্যারিন।

মুখ শুকিয়ে গেল গৌরীর। বলল, মাই লর্ড, এখনও লাশ আমরা খুঁজে পাইনি।

কি বলছ, লাশ পাওনি মানে? পাথরটির কাছে লাশ নেই? জিজ্ঞাসা আলেক্সি গ্যারিনের।

মাই লর্ড, পাথরের গোড়ায় আমরা আমাদের জ্যামিং মেশিন পেয়েছি। কিন্তু লাশ আমরা পেলাম না। গৌরী বলল।

তার মানে ক্রিনিন মিথ্যা বলেছে। গৌরী, পাথরের কাছে যখন আহমদ মুসার লাশ পাওয়া যায়নি, তখন সেখানে ক্রিনিনের লাশ থাকবে। অপেক্ষা কর গৌরী। বলে আলেক্সি গ্যারিন কল অফ করে দিল ওপার থেকে।

কেঁপে উঠল গৌরী। সে জানে এরপর কি ঘটবে। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল গৌরী। তিরিশ সেকেন্ডও পার হলো না।

একটা ভারী বস্তু এসে পড়ল গৌরীর কাছেই। আবার কেঁপে উঠল গৌরী। না দেখলেও সে নিশ্চিত যে, ওটা ক্রিনিনের লাশ।

ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটে ব্যর্থতার এটাই শাস্তি। এখানে বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তি দিতে বিলম্ব হয় না, বিলম্ব করে না আলেক্সি গ্যারিন। জুনিয়ন এক্সিকিউটর-১-এ যেখানে কমান্ডার ক্রিনিনের আসন ছিল, সেখানে তার মাথা বরাবর পেছনে ইস্পাতের দেয়ালে একটা ফুটো আছে। সেই ফুটোতে ফিট করা রয়েছে দূরনিয়ন্ত্রিত বিশেষ ধরনের রিভলবারের ব্যারেল। রিমোট কনট্রোলের বোতাম চেপে এই গানে ফায়ার করেছে আলেক্সি গ্যারিন। হত্যা করে সিসি টিভি'তে তার ছবি দেখেছে সে। তারপর রিমোট কনট্রোলের আরেকটা বোতাম টিপে ক্রিনিনের সিটের নিচে এক্সিকিউটর-১-এর একটা অংশ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। সেই উন্মুক্ত পথে সিট থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেছে ক্রিনিনের লাশ। এই সব দৃশ্য, এ সব প্রসেস গৌরীর মুখস্ত। সে কারণেই চমকে উঠেছিল তার লর্ড আলেক্সি গ্যারিনের কথা শুনে।

গৌরী গিয়ে ক্রিনিনের লাশ টেনে এনে পাথরের গোড়ায় রাখল।

আবার বেজে উঠল গৌরীর মোবাইলটা। গৌরী মোবাইল ধরল।

পেয়েছ ক্রিনিনের লাশ? ওপার থেকে জিজ্ঞাসা আলেক্সি গ্যারিনের।

ইয়েস মাই লর্ড। ওটা নিয়ে পাথরের গোড়ায় রেখেছি। বলল গৌরী।

শোন, দু'তিনজনকে লাগাও লাশগুলোকে মানুষের চোখের আড়াল করতে। অবশিষ্টরা জিলাস-এর নেতৃত্বে আহমদ মুসাকে ফলো করবে। প্রথমে হোটেলে। তারপরের নির্দেশ আমি দেব। বলল আলেক্সি গ্যারিন।

স্যরি মাই লর্ড, আমরা যারা তাকে ধরার জন্যে প্রথম অভিযানে এসেছিলাম, তারা তার ব্যাপারে যথেষ্ট সাবধান হতে পারিনি। স্যরি মাই লর্ড, বলল গৌরী।

ব্যর্থতা তোমাদের নয় গৌরী, সফলতা আহমদ মুসার। সফলতা তার প্রায় অতিমানবিক বুদ্ধি ও ক্ষিপ্রতার। প্রথমটায় আমিও তাকে অবমূল্যায়ন করেছিলাম গৌরী। সে যে আহমদ মুসা, এ বিষয়টাকে আমি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেইনি। আসলে আহমদ মুসা অপরাজিত এক ডেভিল। সে বারবার ফাঁদে

পড়েছে, কিন্তু সব সময়ই ফাঁদ কেটে বিজয় ছিনিয়ে নিয়ে বের হয়ে গেছে। বলা যায় গৌরী, আমাদের পশ্চিমা বন্ধুদের সব শক্তি তার কাছে পরাজয় বরণ করেছে। এ জন্যেই এখন তারা বলছে, তাকে ধরা নয়, দেখা মাত্র হত্যা করতে হবে। তারা যে ঠিক বলছে, আজকের রাতের ঘটনা তা প্রমাণ করল।

কিন্তু গৌরী ক্রিনিনকে জীবন দিতে হলো তার একটি ভুলের কারণে। বিষাক্ত গ্যাসে আহমদ মুসার সত্যিই মৃত্যু হয়েছে কিনা, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সে তা নিশ্চিত করেনি।

বলে একটু থেমেই আবার শুরু করল, তুমি ও নাশকা আহত। তোমরা চলে এস। বলে দিয়েছি, জুনিয়র এক্সিকিউটর-১ ল্যান্ড করছে সেখানে। গুড বাই।

কথা শেষ করেই আলেক্সি গ্যারিন ওপার থেকে কল অফ করে দিল।

কিন্তু গৌরী মোবাইল হাতে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল। তার মাথায় কিলবিল করছে অনেক চিন্তা। তার লর্ড আলেক্সি গ্যারিন আহমদ মুসাকে 'ডেভিল' বলেছে। এখন পর্যন্ত তাকে হারাতে না পারার কারণেই তাকে ডেভিল বলা হচ্ছে। মনে পড়ল তার 'লা ডায়মন্ড ড্রপ' হোটেলের 'অ্যাপেক্স রেস্টুরেন্টে' মানব-মানবীর সম্পর্ক বিষয়ে আহমদ মুসার একান্ত মানবিক কথাগুলো। মনে পড়ল তাদের প্রতি আহমদ মুসার বিস্ময়কর আচরণের কথা। এই মানুষ যদি 'ডেভিল' হয় তাহলে অ্যাঞ্জেল বলে কোন কিছু সৃষ্টিতে নেই। মানুষ অ্যাঞ্জেল হতে পারে না। মানুষ যদি মানুষ হতে পারে, তাহলে অ্যাঞ্জেলের চেয়ে বড় হয়, এটা পড়েছি। আমার জীবনে আহমদ মুসাকে আমি প্রথম মানুষ দেখলাম যে অ্যাঞ্জেলের চেয়ে বড়। আহত ডান হাতের ব্যান্ডেজের দিকে তাকাল গৌরী। এই ব্যান্ডেজ বেঁধেছে আহমদ মুসা। তার হাতের স্পর্শ লেগে আছে এই ব্যান্ডেজে। রোমাঞ্চিত হলো গৌরীর দেহ। বাম হাত দিয়ে ডান হাত তুলে নিয়ে ঠোঁট স্পর্শ করল ব্যান্ডেজে।

পাশ থেকে শব্দ ওঠায় চমকে উঠে ফিরে তাকাল গৌরী।

জুনিয়ন এক্সিকিউটর-১ ল্যান্ড করেছে।

এক্সিকিউটর-১ থেকে ডেপুটি কমান্ডার (এখন কমান্ডার) নিলাপ্পা।

তাকে দেখেই গৌরী বলল, হ্যাঁ নিলাপ্পা, তুমি ওয়েট কর। আমি এদিকের কাজ সেরে নিই। বলল গৌরী।

ইয়েস ম্যাডাম। বলল নিলাপ্পা।

গৌরী তার মোবাইলে একটা কল তৈরি করতে করতে একটু দূরে সরে গেল।

ক্যাপিটাল অব পাওয়ার।

বিশ্বমিলনায়তন (Hall of World Assembly)।

বিশ্বনির্বাহীদের কাউন্সিল বৈঠক।

ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের এটাই সর্বোচ্চ পরামর্শ সভা। ব্ল্যাক সানের ৫ জন শীর্ষ নির্বাহী কর্মকর্তা এই কাউন্সিলের সদস্য। ব্ল্যাক সানের সুপ্রিম কমান্ডার ও প্রেসিডেন্ট লর্ড অব দ্য ওয়ার্ল্ড আলেক্সি গ্যারিন এই কাউন্সিলের চেয়ারম্যান।

অর্ধ বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে বসেছে পাঁচজন শীর্ষ নির্বাহী কর্মকর্তা।

টেবিলের বিপরীতে বৃত্তাকার প্রান্তের সামনে সূর্যাকার টেবিলের পেছনে কোন চেয়ার নেই।

ঠিক রাত ১২ টা বেজে ১ মিনিট ঘরের ছাদ ফুঁড়ে একটা টিউব লিফট নেমে এল। লিফটটি কালো ছিল। লিফটটি নেমে এল সূর্যাকার টেবিলটির পেছন পাশ ঘেঁষে।

লিফটটি নেমে মুহূর্তকাল স্থির হয়েই আবার উঠে গেল। লিফট উঠে যেতেই দেখা গেল সিংহাসনাকৃতির একটা চেয়ারে দীর্ঘাকৃতির একজন শিরদাঁড়া সোজা করে অ্যাটেনশন অবস্থায় বসে। দেহে তাঁর সামরিক পোশাক। মাথায় কালো সামরিক ক্যাপ। ক্যাপের সামনে ব্ল্যাক সানের একটা মনোগ্রাম। তাঁর দুই কাঁধ ও বুকে সেই একই মনোগ্রামের প্লেট।

কালো মূর্তিসহ নেমে আসা চেয়ারটি মেঝের উপর স্থির হতেই সামনে অর্ধ বৃত্তাকার টেবিলের পাঁচজন উঠে দাড়িয়ে বাউ করল।

এই কালো মূর্তিই ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের প্রধান আলেক্সি গ্যারিন। আলেক্সি গ্যারিন মুখোশ পড়েই সবার সামনে আসে। গৌরীর মত কিছু পার্সোনাল স্টাফ ছাড়া কেউ তাকে চোখে দেখেনি। শীর্ষ এই পাঁচজন কর্মকর্তাও তাঁর পার্সোনাল স্টাফের অন্তর্ভুক্ত।

আলেক্সি গ্যারিন এসে বসার পর পরই তাঁর পেছনে এক সারিতে তিনটি চেয়ার চলে এল। আলেক্সি গ্যারিনের ঠিক পেছনে মাঝের চেয়ারে গৌরী। তাঁর ডান পাশের চেয়ারে চীফ অব অপারেশন 'জিজর'। সে সম্পর্কে আলেক্সি গ্যারিনের ছোট ভাই। আর গৌরীর বাম পাশে রয়েছে ব্ল্যাক সানের গোয়েন্দাপ্রধান এবং আলেক্সি গ্যারিনের আরেক ছোট ভাই ডারথ ভাদের।

গৌরী তাঁর চেয়ারে বসার আগেই একটা ফাইল নিয়ে রেখে দিল আলেক্সি গ্যারিনের সামনে টেবিলের উপর।

ফাইলের কাগজে চোখ বুলাচ্ছিল আলেক্সি গ্যারিন।

মুখ তুলল ফাইল থেকে। সোজা হয়ে বসল।

একবার সবার উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, শুভ সময় সকলকে। লং লীভ আমাদের ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেট। অমর হোক আমাদের স্লোগান 'পাওয়ার ফর পাওয়ার' অর্থাৎ শক্তির জন্য শক্তি।

বলে একটু থামল আলেক্সি গ্যারিন। শুরু করল আবার, ব্ল্যাক সানের শীর্ষ নির্বাহীবৃন্দ, আজ এক বিশেষ বৈঠকে আমি তোমাদের ডেকেছি। উদ্দেশ্য, আমাদের এ পর্যন্ত কাজের একটা পর্যলোচনা করা এবং উদ্ভূত একটা পরিস্থিতি সম্পর্কে তোমাদের অবহিত করা। প্রথমে আমাদের কাজ নিয়ে আলোচনায় আসি। আমাদের 'শক্তির জন্য শক্তি' প্রজেক্টের চীফ এক্সিকিউটিভ 'পালপেটাইন' তোমার বিভাগের কাজের বিবরন দাও।

'শক্তির জন্য শক্তি' প্রজেক্টের নির্বাহী পালপেটাইন নড়েচড়ে বসল। তাঁর সামনে স্পিকার বক্সের সিগন্যাল লাইট জলে উঠেছে। স্পিকার অন হয়ে গেল। বলতে শুরু পালপেটাইন, মাই লর্ড! 'শক্তির জন্য শক্তি' আপনার উদ্ভাবিত সবচেয়ে প্রিয় প্রোজেক্ট। আমাদের সৌভাগ্য, আমরা এই মহান প্রজেক্টের সাথে সামিল হতে পেরেছি। মাই লর্ডের এই মহান প্রজেক্টের লক্ষ্য হলো, শক্তি দিয়ে

শক্তি অর্জন, সেই শক্তি দিয়ে গোটা বিশ্ব-চরাচরকে বশ করা। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে প্রয়োজন গোটা দুনিয়াকে মেধাশুন্য করার মাধ্যমে শক্তি শূন্য করা এবং প্রয়োজন আমাদের ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের শক্তির রাজত্ব চিরস্থায়ী করার জন্যে দুনিয়া থেকে সকল নীতি- নৈতিকতার উচ্ছেদ ঘটানো। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে আমরা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মেধাগুলো সরিয়ে আনছি দেশ ও জাতি সমুহের কাছ থেকে, বিশেষ করে মুসলিম দেশের মুসলিম মেধাকে সরিয়ে আনাকে প্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছি। আজ দুনিয়াতে মুসলমানদের ইসলামই দুনিয়াকে ধর্মের শিক্ষামুক্ত ও নীতি- নৈতিকতামুক্ত করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা। মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ কোরআন অবিকৃত থাকায় মুসলমানদের বিশ্বাস খুবই জীবন্ত এবং মানুষের মধ্যে এর আবেদন খুবই কার্যকরি। এটাই আমাদের জন্যে বিপদ। এজন্যই মুসলিম জাতিকে মেধাশুন্য ও শক্তিশুন্য করার প্রতি প্রথমেই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যে বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদের দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে আমাদের 'ক্যাপিটাল অব পাওয়ারে' সরিয়ে এনেছি, তাঁদের ৯০ ভাগই মুসলিম। এর মাধ্যমে একদিকে মুসলিম জাতিকে ক্রমবর্ধমানভাবে দুর্বল করা যাবে। অন্য দিকে ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেট ও তাঁর ক্যাপিটাল অব পাওয়ার শক্তিশালী হবে। এটা আমাদের সফল প্রোগ্রাম। কয়েকদিন আগে আমরা সৌদি আরবের স্পেস ও মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং ও আলোক বিজ্ঞানের এ যুগের সবচেয়ে সফল বিজ্ঞানী খালেদ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মক্কীকে সরিয়ে আনতে পেরেছি। এটা আমাদের বর্ণনাতীত বড় একটা সাফল্য। স্পেসশীপ ও সমুদ্রযানে এ্যান্টিম্যাটার ফুয়েল ব্যবহারের টেকনলজি উদ্ভাবনে তিনি সবার চেয়ে এগিয়ে আছেন। এ ব্যাপারে ক্লিনিক্যাল টেস্ট তিনি করেছেন এবং তা সফল হয়েছে। তিনি এ্যান্টিম্যাটার ফুয়েল ব্যবহারের উপযোগী স্পেস মেরিনের ডিজাইন তৈরির কাজও শেষ করেছেন। এখন এই বিজ্ঞানী আমাদের হাতে। তাকে কব্জায় আনার মাধ্যমে একদিকে আমরা মুসলিম জাতির শক্তিকেন্দ্র সৌদি আরবকে এক মহাশক্তির মালিক হওয়া থেকে বঞ্চিত করেছি, অন্যদিকে এই শক্তির মালিক আমরা হতে যাচ্ছি। আমা....।

পালপেটাইনের কথার মাঝখানেই একমাত্র আলেক্সি গ্যারিন ছাড়া উপস্থিত সকলেই হাততালি দিয়ে উঠল।

থেমে গিয়েছিল পালপেটাইন। আবার শুরু করে বলল, আমাদের মটো 'শক্তির জন্যে শক্তি' প্রোজেক্ট নিয়ে সাফল্যের সাথে এগোচ্ছি। থামল পালপেটাইন।

পিনপতন নিরবতা।

কালো ইউনিফরমে আবৃত কালো মুখোশে ঢাকা আলেক্সি গ্যারিনের মুখ নড়ে উঠল। বলল, টুডে সাইন্স অব টুমরো বাই রোবটস (রোবটস গড়ার আগামীর বিজ্ঞান আজ) আমাদের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। 'শক্তির জন্যে শক্তি' এই লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প আমাদের প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করবে। এই প্রকল্পটি আমি নিজে তত্ত্বাবধায়ন করি। এই প্রকল্পের দৈনন্দিন দেখা-শুনা আমার পক্ষ থেকে গৌরী করে থাকে। আমি তাকে বলছি, এই প্রকল্পের কাজ কিভাবে এগোচ্ছে ও কতটা এগিয়েছে তাঁর উপর একটা রিপোর্ট পেশ করতে।

কোথা থেকে যেন গৌরীর মনে অপরিচিত একটা বিষণ্নতা নেমে এল! চমকে উঠল গৌরী। সব সময় তো সে তাঁর লর্ডের কাছ থেকে এই দায়িত্ব পেয়ে গৌরব বোধ করেছে এবং লাভ করেছে সীমাহীন আনন্দ। কিন্তু আজ এই বিষণ্নতা কেন? সেই আনন্দের কথাগুলো বলতে আজ কষ্ট হবে বলে মনে হচ্ছে কেন?

সব ভাবনা ঝেরে ফেলে উঠে দাঁড়ালো গৌরী। আলেক্সি গ্যারিনকে ইয়েস মাই লর্ড, বলে একটা লম্বা বাউ করে একটা নোটশিট ফাইল থেকে বের করে স্পিকারের সামনে বসল। বলতে শুরু করল, মাই লর্ড ও মাই কলিগস। 'রোবটস গড়বে আগামীর বিজ্ঞান'-প্রকল্পটি মাই লর্ডের সুচিন্তিত ও সুদূরপ্রসারী একটা পদক্ষেপ। বিজ্ঞানী গড়ে তাঁর কাছ থেকে থেকে বাঞ্ছিত কাজ পাওয়া অসম্ভব। আমাদের প্রকল্পে বিভিন্ন বিষয়ে গড়া প্রতিভাবান বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদের তাঁদের স্থান থেকে সরিয়ে এনে তাঁদের স্ব স্ব বিষয়ে কাজ নেয়া হচ্ছে। এই কাজে তাঁদের রোবটে পরিনত করা হয়েছে এবং হচ্ছে। তাঁদের প্রতিভার শেষ বিন্দু বের করে নিয়ে আগামীর বিজ্ঞানী গড়ে তোলা হচ্ছে। কাজটা কঠিন হলেও মাই লর্ডের পরিচালনায় বৈজ্ঞানিক প্রদ্ধতিতে কঠিনকে সহজ করে ফেলা হয়েছে। প্রায় পৌনে

একশ’ বিজ্ঞানীর অধিকাংশই আজ আজ্ঞাবহ নিরেট রোবট। যারা রোবট হয়নি তারাও হবে। যারা হবেনা তাঁদের জন্যেও রয়েছে আলাদা ব্যবস্থা।

মূল উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে আমরা বহু দূর এগিয়েছি। সার্বিক কমুনিকেশনের ক্ষেত্রে এ্যান্টিম্যাটার যুগে প্রবেশ ও সামরিক অস্ত্রের ক্ষেত্রে লেজার-উত্তর যুগে প্রবেশ করে অদ্বিতীয় প্রতিরক্ষা ও আক্রমনের শক্তি আমরা অর্জন করতে যাচ্ছি। আমাদের বিজ্ঞানীকে দিয়ে এ্যান্টিম্যাটার জ্বালানি আমরা আবিষ্কার করেছি। পরিবহন ক্ষেত্রে সে জ্বালানীর সফল ল্যাবরেটরি টেস্টও আমরা করেছিলাম। আমরা এখন এ্যান্টিম্যাটার জ্বালানীর মালিক। আমাদের হাতের মুঠোয় এখন এ্যান্টিম্যাটার বিজ্ঞান। সৌদি আরব থেকে সরিয়ে আনা বিজ্ঞানী খালেদ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল-মক্কীর সহযোগিতা যদি আমরা আদায় করতে পারি, তাহলে আগামী ছয় মাসের মধ্যে এ্যান্টিম্যাটার জ্বালানি চালিত স্পেসশীপ, ক্ষেপণাস্ত্র, বিমান ও সমুদ্রযান আমরা ব্যবহার করতে পারবো। তখন আমরা কয়েক মিনিটে চাঁদে যাতায়াত করতে পারবো। একদিনের মধ্যে আমরা সৌরজগতের শেষ সীমায় গিয়ে ফিরে আসতে পারবো। তখন দুনিয়ার সব পরিবহণ ব্যবস্থা অচল হয়ে যাবে। অন্যদিকে এ্যান্টিম্যাটার জ্বালানি তৈরির পাশাপাশি এ্যান্টিম্যাটার পরমাণুর আরও উন্নত রিপ্রসেসিং-এর মাধ্যমে এ্যান্টিম্যাটার বোমা তৈরির ক্ষেত্রেও আমরা বহু দূর এগিয়ে গিয়েছি। আগামী এক মাসের মধ্যে আমরা ল্যাবরেটরি টেস্ট করতে যাচ্ছি। পরবর্তী এক মাসের মধ্যে আমরা সমুদ্রতলে এর টেস্টের আয়োজন করতে পারবো। আমরা নিশ্চয়তা দিতে পারি, আগামী ছয় মাসের মধ্যে আমরা এ্যান্টিম্যাটার পরমানু বোমার মালিক হবো। ‘শক্তির জন্যে শক্তি’ অর্জনের লক্ষ্য ষোল কলায় পূর্ণ হবে। দুনিয়ার সব অস্ত্র অচল হয়ে যাবে। বিশ্বে হবো আমরাই একমাত্র শক্তি। ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেট হবে দুনিয়ার ভাগ্য নির্ধারক। দুনিয়ার অচল অস্ত্রের মত ঈশ্বরও অচল হয়ে পড়বে। আমাদের লর্ড হবে দুনিয়ার লর্ড, লর্ড অব দ্য ইউনিভার্স। ধন্য....।

হাততালি দিয়ে উঠল সকলে।

হাততালির মধ্যে বন্ধ হয়ে গেল গৌরীর কথা।

হাততালি শেষ হলে গৌরী বলল, আমার কথা এখানেই শেষ। ধন্যবাদ মাই লর্ড, ধন্যবাদ সকলকে।

আবার পিনপতন নিরবতা।

নিরবতা ভাঙল আলেক্সি গ্যারিন। বলল, আজকে ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের সব বিষয়ে আলোচনা করছি না। আজ শেষ আলোচনার বিষয় হল, একজন বিদেশী তাহিতিতে এসে ঝামেলা পাকিয়েছে। বিষয়টি ছোট, কিন্তু আলোচনার দাবী রাখে। কারন ব্যাপারটি অনেক বড়। এ পর্যন্ত সে আমাদের পাঁচজন লোককে খুন করেছে।

একটু থামল আলেক্সি গ্যারিন।

শীর্ষ নির্বাহীদের একজন হাত তুলল।

বল। কথা বলার অনুমতি দিল আলেক্সি গ্যারিন।

মাই লর্ড, এটা একটা ব্যক্তির ব্যাপার। আপনি চাইলেও সে ইলিমিনেট হয়ে যায়। বলল সেই শীর্ষ নির্বাহী।

সে একজন ব্যক্তি বটে, কিন্তু সে একাই সহস্রের সমান। সে অপরাজিত এক ডেভিল। নাম তাঁর আহমদ মুসা। আলেক্সি গ্যারিন বলল।

আহমদ মুসার নাম শুনে মাথা খাড়া করল পাঁচ শীর্ষ নির্বাহীর সকলেই। একজন বলল, সে বিপদ এখানে এল কি করে? কেন এসেছে?

কেন এসেছে, সেটাই চিন্তার বিষয়। তোমরা জান, আমাদের একজন রোবট একটা ম্যাসেজ বাইরে পাঠাতে চেষ্টা করেছিল, আংশিক পাঠিয়েছিল। প্রমানিত হয়েছে, যখন সে ম্যাসেজটি পাঠাচ্ছিল, তখন আহমদ মুসা এক বোটে তাহনিয়া দ্বীপের এ প্রান্তে ছিল। তাঁর মনিটরিং-এ এই মেসেজ ধরা পড়েছে আমরা নিশ্চিত। সে এ নিয়ে কি ভাবছে, কি করছে তা আমরা জানিনা। তাঁর আসাটাই সন্দেহজনক। বিনা কারনে সে এক পা ফেলেনা, এটা সবাই জানে । সে নিছক বেড়াতে তাহিতিতে এসেছে এটা ঠিক নয়। সে কথাই আমি তোমাদের বলতে চাচ্ছি। বলল আলেক্সি গ্যারিন।

মাই লর্ড, আহমদ মুসা খুবই বিপদজনক ব্যক্তি। শুরুতেই তাকে ইলিমিনেট করা দরকার। ঘটনাটিকে এগোতে দেয়া ঠিক নয় মাই লর্ড। বলল শীর্ষ নির্বাহীদের অন্য একজন।

সে ব্যবস্থাই নেয়া হয়েছিল। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। গৌরীর নেতৃত্বে একটা দক্ষ টীম পাঠিয়েছিলাম তাকে কিডন্যাপ করার জন্যে। ইতিমধ্যে পশ্চিমের অত্যন্ত শক্তিশালী একটি বন্ধু সংগঠন আমাদের জানাল, তাঁরা আহমদ মুসার লাশ চায়। তাঁরা অনুরোধ করে আহমদ মুসাকে হত্যা করার কোন সুযোগ ছেড়ে না দেয়ার। লাশের মুল্য হিসাবে তাঁরা দিবে ১ বিলিয়ন ডলার। তখন আহমদ মুসাকে আমরা কিডন্যাপ করে ফেলেছি। আমি গৌরীকে নির্দেশ দিলাম আহমদ মুসাকে হত্যা করার। কিন্তু তাকে হত্যা করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। গৌরী ও নাশকা মারাত্নক আহত হয়, মারা যায় আমাদের পাঁচজন। সংগে সংগেই দুই গাড়িতে দু'টি টিম পাঠিয়েছিলাম তাকে ঘিরে ফেলতে। ঘিরে ফেলেও তাঁরা তাকে আটকাতে পারেনি। আমাদের অস্ত্রে আমাদের ঘায়েল করে সে নিরাপদে বেরিয়ে যায়। তাঁর সাথে সাথেই আমি আমাদের জুনিয়র এক্সিকিউটর-১ পাঠিয়েছিলাম তাকে অনুসরন ও হত্যা করার জন্যে। কিন্তু এক্সিকিউটর-১ তাকে বাগে পেয়েও, সর্বশেষে বিষাক্ত গ্যাস তাঁর উপর প্রয়োগ করেও তাকে হত্যা করা যায়নি। তাঁর সন্ধানও পাওয়া যাচ্ছে না তাঁর পর থেকে। তাঁর ব্যাপারে আরও সিরিয়াসলি ভাবা প্রয়োজন বলেই কথাটা এই বৈঠকে তুলেছি। আলেক্সি গ্যারিন বলল।

মাই লর্ড, আপনি কি আশংকা করছেন? আমাদের কি করা দরকার? আমাদের প্রতি আপনার কি পরামর্শ? বলল অন্য একজন শীর্ষ নির্বাহী।

আমি ভাবছি ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের প্রজেক্টের নিরাপত্তা নিয়ে। ব্লাক সান সিন্ডিকেটের নিরাপদ স্থান খুজতে আমি গোটা দুনিয়া চষে ফিরেছি। কিন্তু সব দিক নিরাপদ স্থান আমি পাইনি।সবশেষে সভ্যতা থেকে বহু দুরে সবচেয়ে বড় সাগরের মাঝামাঝি ও প্রায় জনশূন্য এই তোয়ামতু দ্বীপপুঞ্জে এসেছিলাম। দ্বীপগুলো অ্যাটল দ্বীপ হওয়ায় নতুন জনবসতির সুযোগ এখানকার দু'একটা ছাড়া কোন অ্যাটল দ্বীপেই নেই। আমার খুব ভালো লেগেছিল স্থানটা। অ্যাটল থেকে অ্যাটলে ঘুরে বেরিয়েছি মাসের পর মাস। কিন্তু ব্ল্যাক সান-এর 'ক্যাপিটাল

অব পাওয়ার’ স্থাপিত হতে পারে এমন উপযুক্ত জায়গা খুঁজে পাইনি। তোয়ামতু অ্যাটল দ্বীপপুঞ্জের একমাত্র দ্বীপ ‘মাকাতিয়া’র পুরানো মন্দিরে বিশ্রাম কক্ষে বসেছিলাম। অ্যাটল দ্বীপগুলোতে ঘোরাফেরার পথে প্রায়ই এই বিশ্রামখানায় বসি। পাশের রেস্টুরেন্টে তাজা মাছের ভাজি ও তাজা ফল প্রচুর পাওয়া যায়। এগুলো আমার প্রিয়। সেদিন রেস্টুরেন্টে খেয়ে আবার এসে বসেছিলাম মন্দিরের বিশ্রামকক্ষে। আমার সামনে বসেছিল বৃদ্ধ একজন সন্ন্যাসী। আর কেউ ছিল না বিশ্রামকক্ষে।

বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর চোখ সব সময় বন্ধই দেখলাম।

দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে থাকতে থাকতে এক সময় চোখ ধরে এসেছিল।

বৎস, তুমি ঘুমালে? এই কথাগুলো কানে যাওয়ায় আমার তন্দ্রা কেটে যায়।

চোখ মেলে দেখি সন্ন্যাসী আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি তাঁর দিকে তাকাতেই বলল, তোমার বাড়ি নিশ্চয় আমাদের অ্যাটল দীপপুঞ্জে নয়?

জি হ্যাঁ। বললাম আমি।

তুমি পর্যটকও নিশ্চয় নও? সন্ন্যাসী বলল।

জি না। আমি বললাম।

গত তিন মাসে তুমি এখানে তিরিশবার এসেছ। সন্ন্যাসী বলল।

আমি অবাক হয়ে তাকালাম সন্ন্যাসীর দিকে। অনেকবার এসেছি তাহানিয়া দ্বীপের এখানে। কিন্তু তিরিশবার হয়েছে কিনা গুনে দেখিনি। আমি বললাম, বাবা, তিন মাসে আমি এখানে অনেকবার এসেছি, তিরিশবার হয়েছে কিনা আমি জানিনা। নিশ্চয় আপনার গুনা ঠিক বাবা।

তুমি নিশ্চয় কাউকে খুজছ বৎস? বলল সন্ন্যাসী।

কাউকে নয়, কিছু খুজছি বাবা। বললাম আমি।

এমন হন্যে হয়ে কি খুজছ বৎস? বলল সন্ন্যাসী।

একটা জায়গা খুজছি বাবা। এই অ্যাটল দ্বীপপুঞ্জ আমার ভালো লেগেছে। এখানে একটা নিরিবিলি স্থানে আশ্রয় গড়ার জায়গা খুজছি বাবা। বললাম আমি।

এমন জায়গা তো প্রচুর! এত খুজছ কেন? সন্ন্যাসি বলল।

একটা বড় জায়গা যা মানুষের চোখের আড়াল হবে, এমন একটা জায়গা খুজছি বাবা। বললাম আমি।

এমন জায়গা তো ডাকাতদের আড্ডার জন্য দরকার! তুমি সে রকম কিছু করতে নিশ্চয় চাওনা? সন্ন্যাসী বলল।

আমি হেসেছিলাম। তারপর গম্ভীর হয়ে সিরিয়াসলি বলেছিলাম, ডাকাতির জন্য নয়, আমি জায়গা চাই বিশাল একটা গবেষণা সংস্থা গড়ার জন্যে যা দুনিয়াকে একশ' বছর এগিয়ে নেবে।

এ্যাটম বোমা বানাবে এবং আমাদের পানিতে তা পরীক্ষা করবে নাকি, যেমন ফ্রান্স কয়েক যুগ ধরে করেছে। যেন আমরা ওদের গিনিপিগ! সন্ন্যাসী বলল।

বাবা, আমাদের গবেষণা ঐ ধরনের নয়। আমাদের গবেষণা আরও বড় বিষয় নিয়ে। লোক চক্ষুর আড়ালে তা হবে। মানুষ ও পরিবেশকে তা ডিস্টার্ব করবে না বাবা। আমি বললাম।

কিন্তু এর জন্যে তো ইন্সিটিটিউট ধরনের বিশাল বাড়ি ও বড় জায়গা দরকার। অ্যাটলের সারফেসে তো এমন জায়গা দেখিনা বৎস। সন্ন্যাসী বলল।

সে জন্যই তো খুজেই ফিরছি বাবা! আমি বললাম।

ভাবছিল সন্ন্যাসী।

আমিও কিছু বললাম না। চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

কিছুক্ষন পর মুখ তুলল। তাকাল আমার দিকে। বলল, প্রশান্ত মহাসাগরের এই অঞ্চলে 'মু' নামে একটা মহাদেশ ছিল, এটা তুমি বিশ্বাস কর?

আমি শুনেছি বাবা। কিন্তু এ নিয়ে আমি কখনও ভাবিনি। তবে আগ্রহ আছে জানার। বললাম আমি।

আজকের তাহিতি দ্বীপ যেমন বাস্তবতা, তোয়ামতু দ্বীপপুঞ্জের অস্তিত্ব যেমন বাস্তবতা, তেমনি আজকের মধ্যপ্রশান্ত মহাসাগরের মহাদেশ 'মু' একটা বাস্তবতা। এই মহাদেশ ছিল বিশাল ও উন্নত সভ্যতার অধিকারী। পেরু ও গুয়েতেমালার পুরাকীর্তি এবং মায়া সভ্যতার বিস্ময় 'মু' সভ্যতারই খণ্ডাংশ। 'মু' মহাদেশের এক শ্রেণীর মানুষের অন্তঃসার শূন্য গর্ব, ঈশ্বরকে ত্যাগ করা,

ঈশ্বরপ্রদত্ত সম্পদের ধ্বংসকারী ব্যবস্থা এবং পরিশেষে ঈশ্বরের শাস্তি ভূমিকম্প ও প্লাবনের আঘাত ধ্বংস করে ‘মু’ মহাদেশকে। অ্যাটল দ্বীপগুলোর কোন কোনটি সেই মহাদেশরই ধ্বংসাবশেষ হিসাবে টিকে আছে। এরকম একটি অ্যাটলের খবর আমি জানি, যার ভিতরে অক্ষত আছে ‘মু’ মহাদেশের রাজন্যবর্গের একটি বহুতল প্রাসাদ। থামল সন্ন্যাসী।

বহুতল প্রাসাদ? আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

হ্যাঁ, বহুতল প্রাসাদ বৎস। সন্ন্যাসী বলল।

অ্যাটলের অভ্যন্তরে? আমার জিজ্ঞাসা।

হ্যাঁ, অ্যাটলের ভিতরে। সন্ন্যাসী বলল।

আপনি সে অ্যাটলকে জানেন? জিজ্ঞাসা করলাম। বিস্ময় ও আনন্দে আমার ভেতরটা তখন কাঁপছে। রূপকথার মত মনে হচ্ছে তাঁর কথাগুলো।

অবশ্যই জানি বৎস। সেই জানাটাও একটা রূপকথার মত।

বলে একটু থামল সন্ন্যাসী। একটু সময় নিয়ে ধীরে ধীরে বলতে শুরু করল, তখন আমার বয়স তিরিশ। সন্ন্যাস ব্রত নিয়ে আমি তখন মন্দিরে মন্দিরে ঘুরি। একদিন এই মন্দিরেই আমার মত নব্বই-ঊর্ধ্ব এক বুড়ো সন্ন্যাসীর সাথে দেখা। ঈশ্বরী ‘হিনার’ বন্দনা চলছিল সেদিন মন্দিরে। বন্দনা শেষ হতে মধ্যরাত পেরিয়ে যায়। বন্দনা শেষ হবার পর মন্দিরের এক কক্ষে আমি সেই বৃদ্ধ সন্ন্যাসিকে শুইয়ে দিতে যাই। বিছানা ঠিক করে তাকে শুইয়ে দিয়ে আমি তাকে বাতাস করছিলাম। দীর্ঘ সময় ধরে শোনা বন্দনায় অনেক কথাই মাথায় কিলবিল করছিল। তাঁর মধ্যে কিছু বিষয় আমাকে খুচাচ্ছিল বেশি। আমি গুরুকে বললাম, গুরু, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?

গুরু চোখ বন্ধ করে ছিলেন। চোখ খুলে বলেছিলেন, অনুমতি নিয়ে বলতে হবে কেন? বল তোমার কথা।

গুরু বন্দনার মধ্যে শুনলাম, ঈশ্বরী হিনা রাজপুত্র হেসোনা হোসানা, সাগরকন্যা ভাইমিতি শাবানুর একমন একতনু প্রেমসাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে অ্যাটলের এক প্রাসাদে তাঁদের মিলন ঘটিয়েছিলেন এবং প্রাসাদটি তাঁদের উপহার দিয়েছিলেন-এটা কি সত্য ঘটনা? ঈশ্বরী হিনা কি সত্যিই এটা করেছিলেন?

বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

সন্ন্যাসী শোয়া থেকে উঠে বসেছিলেন। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বলেছিলেন, তোমার কি সন্দেহ আছে এ কথায়?

সন্দেহ নেই, কৌতূহল আছে। স্বর্গের ঈশ্বরী নেমে এসেছিলেন তাঁদের জন্যে এবং এই ধরনের একটা প্রাসাদ কোন অ্যাটলে আছে? গুরুজি এটা সত্যিই বিস্ময়ের। আমি বলেছিলাম।

স্রষ্টা ঈশর কি তাঁর সৃষ্টিকে ভালবাসবেন না?

সৃষ্টির কান্না কি স্রষ্টার মন গলাবে না? তিনি কি সৃষ্টির অশ্রু মুসাতে আসবেন না? অবশ্যই আসবেন। রাজপুত্র হেসানা ও সাগরকন্যা ভাইমিতি শাবানুর ক্ষেত্রে তিনি এসেছিলেন। রাজপুত্র হেসানা সাগরকন্যা শাবানুর জন্যে রাজ্য রাজত্ব সবই ছেড়েছিলেন। প্রশান্ত মহাসাগরে এই অ্যাটল রাজ্যে তিনি অবিরাম কেঁদেছেন এবং ঘুরে বেড়িয়েছেন। তিনি সব ভুলেছিলেন, ভুলেন নি শুধু সাগরকন্যার প্রেম। স্রষ্টা দেখেছিলেন তাঁর সৃষ্টি এই রাজপুত্র সাগরকন্যাকে না পেলে সাগরেই তাঁর জীবন শেষ করে দিবে। এই অবস্থায় স্রষ্টা 'হিনা' তাঁর সৃষ্টির চোখ মুসাতে না এসে পারেন? তাই তিনি এসেছিলেন। তিনি আদর করে তাঁদের নিয়ে গিয়েছিলেন 'মু' মহাদেশের ধ্বংসাবশেষ অ্যাটল দ্বীপের সেই প্রাসাদে। সেখানেই তাঁদের মিলন ঘটেছিল। স্রষ্টা হিনা তাঁর সৃষ্ট দুই মানব-মানবীর পাগলপারা প্রেমে মুগ্ধ হয়ে খুলে দিয়েছিলেন ধ্বংসপ্রাপ্ত এক মহাদেশের স্মৃতিবাহী সুন্দর প্রাসাদটিকে।আমার অস্তিত্ব যেমন সত্য, তোমার অস্তিত্ব যেমন সত্য, তেমনি সত্য এই ঘটনা।

কথা শেষ করে সন্ন্যাসী আবার শুয়ে পড়েছিলেন। শুয়ে থেকেই বললেন, তরুন সন্ন্যাসী বেটা, তোমাকে আরও বলি এই অধমকেও স্রষ্টা হিনা দয়া করে সেই প্রাসাদটি দেখিয়েছিলেন। এই চর্ম চোখে আমি তা দেখেছি।

বলে থেমেছিলেন গুরু সন্ন্যাসী মুহূর্তের জন্যে। তারপর আবার শুরু করেছিলেন, তোমার মত আমার মনে প্রাসাদের অস্তিত্ব নিয়ে বিস্ময় ছিলনা বটে, কিন্তু অপ্রতিরোধ্য এক আকুতি ছিল আমার ঐ প্রাসাদটি দেখার জন্যে। এই আকুলতা নিয়ে আমি অবিরাম ঘুরে ফিরেছি অ্যাটল থেকে অ্যাটলে দিনের পর

দিন। একদিন সন্ধ্যায় তাহানিয়া অ্যাটলের পাশ দিয়ে মাকাতিয়া দ্বীপে ফেরার সময় প্রবল ঝড়ের মুখে পড়ল আমার ছোট বোটটি। এ অঞ্চলে ঝড় হয় না। যদি কখনও হয়, তাহলে তাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতিফলন মনে করে যে যেখানে থাকে সে সেখানেই অবস্থানের সিদ্ধান্ত নেয়। তারপর ঝড় সম্পূর্ণ থেমে গেলে আবার জীবন-কর্ম শুরু করে। সে অনুসারে আমি তাহানিয়া অ্যাটলে আমার ছোট বোটটি বেধে সেখানেই অপেক্ষা করলাম। অস্থির সাগরের ঢেউয়ের দোলায় দুলতে দুলতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সেই ঘুমের মধ্যে একটা স্বপ্ন দেখলাম। মঙ্গলময় মমতাময় স্রষ্টা হিনা কিংবা তাঁর পাঠানো কোন স্বর্গীয় অ্যাঞ্জেল আমার কাছে এলেন। আলোয় ঢাকা তাঁর দেহ কিংবা বলা যায় আলোর এক অবয়ব তিনি। আমাকে বললেন, এসো মানব, আমার সাথে এসো। আমি উঠলাম, তাঁর পেছেনে পেছনে চললাম। বোঁট থেকে নেমে তাহানিয়া অ্যাটলের পশ্চিম প্রান্ত থেকে কিছুদূর যাওয়ার পর এক যায়গায় দাঁড়ালো জ্যোতির্ময় অবয়ব। তাকাল মাটির দিকে। আমিও তাকালাম। সেখানে দেখলাম সফেদ ফুলের একগুচ্ছ গাছের ছোট্ট ঝোপ। জ্যোতির্ময় অবয়বটি মাটির দিকে তাকিয়ে বলল, সর্বশক্তিমান স্রষ্টার ইচ্ছায় ‘প্যালেস অব ওয়েলফেয়ার’ এর ‘সিঁড়িমুখ’ বের হলো। সংগে সংগেই ফুলের গাছের ঝোপটি অদৃশ্য হয়ে গেল। সেখানে মাটির নিচে কিছু একটা দেখা গেল। গোলাকার সফেদ পাথর। আবার বলল জ্যোতির্ময় অবয়বটি, সর্বশক্তিমানের ইচ্ছায় আমাদের পথ ছাড়ুন। কথার সাথে সাথেই পাশের মাটির ভেতরে হারিয়ে গেল সফেদ পাথরটি। সুন্দর সিঁড়িমুখ বের হয়ে পড়ল। সিঁড়িও সফেদ পাথরের। সেই সিঁড়িপথে ঢুকে গেলাম ভেতরে জ্যোতির্ময় অবয়বের সাথে। আসলেই ওটা প্যালেস। সম্মোহিতের মত আমি দেখেছি প্রাসাদটা। আয়তনে অনেক বড়, ছোট-খাটো একটা দ্বীপের সমান, তেমনি উচুর দিক দিয়ে কয়েক তলা হবে। এখানেই রাজপুত্র হেসানা ও সাগরকন্যা ভাইমিতি ছিল? বলেছিলাম স্বাগত কণ্ঠে। জ্যোতির্ময় অবয়বের অ্যাঞ্জেল জবাবে বলেছিল, হ্যাঁ, এখানেই তাঁরা ছিল, এটাই ছিল তাঁদের বাড়ি। যতটা সম্ভব মানুষের কল্যান তাঁরা করেছে। কখন আমার প্রাসাদ দেখা শেষ হল আমি জানিনা। যখন আমার ঘুম ভাঙল, দেখলাম ভোর হয়ে গেছে। একটা স্বস্তি যেন আমার দেহে শান্তির পরশ বুলিয়ে দিয়েছে। মনের মধ্যে

একই কথা বার বার ঘুরে ফিরে আসতে লাগল, স্বপ্নটা আমার কি সত্যি। সত্যিই কি অ্যাঞ্জেল এসেছিল আমার কাছে। প্রাসাদ কি আমি দেখেছি তাঁর সাথে গিয়ে, সত্যিই কি তাহলে প্রাসাদ আছে। সকাল হতেই আমি বোঁট থেকে নেমে অ্যাটলের পশ্চিম প্রান্ত ধরে দক্ষিনে এগোতে থাকলাম। এখানে অ্যাটলের পশ্চিম প্রান্তটি প্রশস্ত। যতই দক্ষিনে গেছে আরও প্রশস্ত হয়েছে। আমার চোখ সন্ধান করছিল সেই সফেদ ফুলের গাছের ঝোপ। পেয়ে গেলাম সফেদ ফুলের সেই ঝোপ। আমি বিস্মিত ও সম্মোহিতের মত দাড়িয়ে পড়লাম সফেদ ফুলের গাছের সেই ঝোপের পাশে। আমার গোটা শরীর রোমাঞ্চিত হলো। তাহলে স্বপ্ন আমার সত্য, অ্যাঞ্জেল সত্য, প্রাসাদও সত্য। আমি ছুটে গিয়ে বোঁট থেকে শাবল নিয়ে এলাম। সফেদ ফুলের গাছের ঝোপের পাশে গর্ত আকারে খুড়তে লাগলাম। মাটির দু'হাত গভীরে যাবার পর সত্যিই পেলাম স্বপ্নে দেখা সেই সফেদ পাথর। তাঁর মানে পাথর তুললেই সিঁড়ি। সিঁড়ির পড়েই সেই প্রাসাদ। সবই আমি পেয়ে গেলাম। প্রাসাদে ঢুকতে মন চায়নি। চাল-চুলাহীন সন্ন্যাসী, তাঁর তো প্রাসাদ দরকার নেই। যা দেখার সেটা তো অ্যাঞ্জেল আমাকে দেখিয়েছেন। গর্ত মাটি ঢেলে বন্ধ করে চলে এসেছিলাম। আর যাইনি। বলল তরুন সন্ন্যাসী, 'মু' মহাদেশের অবশিষ্ট স্মৃতি সেই প্রাসাদ সম্পর্কে আর জিজ্ঞাসা আছে? সৃষ্টির অশ্রু মোছাতে স্রষ্টা যে আসেন কিংবা সৃষ্টির আন্তরিক চাওয়া মেটাবার ব্যবস্থা করেন, সে বিষয়ে কোন বিস্ময় এখনও আছে?

গুরুজি একটি বিষয়, রাজপুত্র হেসানা সম্পর্কে আমার কোন কথা নেই। কারন সে পাপেতি রাজবংশের রাজকুমার আমরা জানি। কিন্তু 'সাগরকন্যা' তো বাস্তব নয়। বললাম আমি।

সন্ন্যাসী বলল, জানা গেছে, সে একটা জাহাজ ডুবির ফল। তোয়ামতু দ্বীপপুঞ্জ উত্তর পাশ দিয়ে গুয়েতেমালার দিকে যাবার পথে একটা জাহাজ ডুবির ঘটনা ঘটে। পরে জানা গেছে, জাহাজটি পশ্চিম এশিয়ার কোন এক আরব দেশের। জাহাজ থেকে আর কেউ বেঁচেছে কিনা জানা যায়নি, তবে একজন শিশুকন্যা বেঁচেছিল। শিশুকন্যাটি একটা ডলফিনের পিঠে ভাসছিল। ডলফিন গিয়ে ভেড়ে পলিনেশীয়ার কোন দ্বীপে। সে দ্বীপেরই বনচারী, সাগরচারী একটা

পরিবার শিশুকন্যাকে ডলফিনের পিঠ থেকে নিয়ে নেয়। তারাই তাঁর নাম রাখে ভাইমতি বা সাগরকন্যা। আর তাঁর গলার লকেটে পাওয়া নামের পাঠোদ্ধার করে সেটা এভাবেই এসেছে। শিশু ভাইমতি শাবানু একদিন বড় হয়। বন ও সাগর হয় তাঁর বাধা-বন্ধনহীন বিচরনের ক্ষেত্র। পাখির মতই সে ঘুরে বেড়ায় বনে ও সাগরে। সাগরকন্যা শেষ পর্যন্ত সাগরকন্যাই হয়ে যায়। এই সাগরকন্যার সাথেই একদিন দেখা হয় সাগরচারী রাজপুত্র হেসানা হোসানার সাথে। প্রথম দর্শনেই স্রষ্টার ইচ্ছায় তাঁরা একে অপরের হয়ে যায়। এই কাহিনী আমি শুনেছি পূর্ব তাহিতির এক বৃদ্ধ জেলের কাছে। আমি নিশ্চিত, এই কাহিনির মধ্যে কোন অতিরঞ্জন নেই। বিকল্পও নেই এই কাহিনীর। থামল একটু গুরু সন্ন্যাসী। তারপর আমার দিকে চেয়ে বলল, তরুন সন্ন্যাসী বল, আর কোন কথা, আর কোন প্রশ্ন?

আমি বললাম, না, আর কোন প্রশ্ন নেই গুরু সন্ন্যাসী। আমি চলে এসেছিলাম গুরুজির কক্ষ থেকে।

তারপর এক সময় আমিও গিয়েছিলাম তাহানিয়া দ্বীপে সেই সফেদ ফুল গাছের ঝোপের সন্ধানে। সেই ঝোপ পাইনি। ঝোপ না পাওয়ায় আমার আগ্রহ কৌতূহল বেড়ে গিয়েছিল, পাথর ও প্রাসাদ ঐভাবে আছে কিনা তা দেখার জন্যে। অনেক দিনের অনেক খোঁজাখুঁজি, অনেক খোঁড়াখুঁড়ির এক রাতের শুভ ভোঁরে দু'হাত মাটির গভীরে পেয়ে গেলাম সেই গোলাকার সফেদ পাথর। পাথর পাওয়ার সাথে সাথে আমার গুরু সন্ন্যাসীর মত সব পাওয়া হয়ে গেল। সফেদ পাথর সরিয়ে 'প্যালেস অব ওয়েলফেয়ারে' প্রবেশ করতে মন চায়নি। ঘর-দোর ছাড়া পথের সন্ন্যাসী প্রাসাদ দিয়ে কি করব। যে কৌতূহল ছিল সেই কৌতূহল মিটিয়ে চলে এসেছি। থামল বৃদ্ধ সন্ন্যাসী।

আমি গোগ্রাসে যেন গিলছিলাম তাঁর কথা এবং তাঁর গুরু সন্ন্যাসীর কথা। মনে হচ্ছিল আমি যেন, স্বর্গের চাবি পেয়ে গেছি। আমি অ্যাটল দ্বীপপুঞ্জে গত তিন দিন ধরে যা খুজছিলাম, তাঁর চেয়ে অনেক বেশি যেন পেয়ে গেছি। আনন্দ উত্তেজনায় মনে হল হার্টবিট আমার বেড়ে গেছে!

কথা শেষ করে বৃদ্ধ সন্ন্যাসী পাথরের বেঞ্চির উপর গা এলিয়ে দিয়েছে। চোখ বুজে গিয়েছে তাঁর।

আমিও কোন কথা বললাম না।

নীরব আমরা। বয়ে চলল সময়। এক সময় চোখ খুলল বৃদ্ধ সন্ন্যাসী।

তাকাল আমার দিকে। বলল বৎস ‘প্যালেস অফ ওয়েলফেয়ার’ তোমার কাজে লাগবে। সৃষ্টির উপর গবেষণা ভালো জিনিস। এটা হয় মানুষের মঙ্গলের জন্যেই। অতএব, তুমি প্যালেস অব ওয়েলফেয়ারের সদ্ব্যবহার করতে পারবে। তুমি যেমন চাও প্রাসাদটি সে রকমই। থামল বৃদ্ধ সন্ন্যাসী।

স্বর্গ যেন কেউ আমার হাতে তুলে দিল।

আমি উঠে গিয়ে সন্ন্যাসিকে আভূমি প্রণাম করে বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর পা ছুয়ে বললাম, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার এই দানের কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমার নেই।

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী দু’হাত জোর করে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে বলল, সন্ন্যাসীদের জন্যে কোন কৃতজ্ঞতা নেই। কৃতজ্ঞতা সব ঈশ্বরের জন্যে।

বলে আবার চোখ বুজল বৃদ্ধ সন্ন্যাসী। চোখ বুজে থেকেই বলল, যাও বৎস, ঈশ্বরের সম্পদ ঈশ্বরের জন্যে ব্যবহার কর। আমাদের হারানো ‘মু’ মহাদেশের রাজন্যদের ‘প্যালেস অব ওয়েলফেয়ার’-এর যথার্থ ব্যবহার কর। ঈশ্বরের মত ঈশ্বরের সৃষ্টিকে ভালবাস। তাহলে তাঁর রোষের মুখোমুখি তোমাকে কোনদিন হতে হবেনা।

আরও কোন নসিহত শোনার ভয়ে তাড়াতাড়ি তাকে একটা প্রণাম করে আমি চলে এলাম।

সুদীর্ঘ বক্তব্য দিয়ে থামল ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের সুপ্রিম বস আলেক্সি গ্যারিন।

বৈঠকে উপস্থিত পাঁচ শীর্ষ নির্বাহীসহ চীপ অব অপারেশন জিজর, গোয়েন্দা প্রধান ডারথ ভাদের ও গৌরী পিনপতন নিরবতার মধ্যে আনন্দ, বিস্ময় ও কৌতূহলের সাথে আলেক্সি গ্যারিনের কথা শুনছিল। আলেক্সি গ্যারিনের কথা শেষ হলেও শ্রোতাদের বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি। বাস্তব ঘটনা যে রুপকথার চেয়েও বিস্ময়কর হতে পারে, এ কাহিনী তারই প্রমান।

আলেক্সি গ্যারিন দীর্ঘ কথা শেষ করে চেয়ারে গা এলিয়ে দিল। তবে শীঘ্রই সোজা হয়ে বসল। বলল, কাহিনী একটু দীর্ঘ হলেও তা তোমাদের বললাম, কিভাবে এই ঐতিহাসিক রাজকীয় প্যালেস পেলাম আমাদের 'ক্যাপিটাল অব পাওয়ার' প্রতিষ্ঠার জন্যে। ঈশর দিবে আমি বিশ্বাস করিনা। আমাদের প্রাপ্য বলে আমরা এটা পেয়েছি। বলে একটু থামল। মুহূর্ত কয়েক পর আবার শুরু করল, ঐতিহ্য ও নীতি-নৈতিকতায় আমি বিশ্বাস করিনা। সে জন্যই বৃদ্ধ সন্ন্যাসী যে নীতি- নৈতিকতার উপদেশ আমাকে দিয়েছিলেন তা রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাঁদের প্রিয় 'মু' মহাদেশের রাজকীয় প্রাসাদের অংশ 'প্যালেস অব ওয়েলফেয়ার' বলে কথিত প্রাসাদটিই আজ আমাদের 'ক্যাপিটাল অব পাওয়ার'।

ওয়েলফেয়ার কি জন্যে? ওয়েলফেয়ার প্রয়োজন দুর্বলদের। দুর্বলদের জন্যে আমাদের কিছু করার নেই বরং আমরা দুনিয়ার সবাইকে দুর্বল বানাতে চাই। শুধু সবল থাকবে, শক্তিশালী ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেট ও সকল ক্ষমতার কেন্দ্র হবে আমাদের এই 'ক্যাপিটাল অব পাওয়ার'। থামল আলেক্সি গ্যারিন।

হাত ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে আলেক্সি গ্যারিন আবার বলল, বহু কষ্টে আমাদের এই 'ক্যাপিটাল অব পাওয়ার' আমরা পেয়েছি। এর নিরাপত্তা আমাদের সর্বোচ্চ প্রাইওরিটি। আহমদ মুসা কোন মিশন নিয়ে এখানে এসেছে আমি জানিনা। কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁর সাথে লড়াই শুরু হয়ে গেছে। অবশ্য সে আমাদের চিনেছে, জেনেছে তাঁর কোন প্রমান আমি পাইনি। তবে তাঁর সাথে আমাদের সংঘাত শুরু হওয়ায় ধরে নেয়া যায় তাঁর মত বুদ্ধিমান লোক সবকিছুই জেনে যাবে।এটা অবধারিত ধরে নিয়েই আহমদ মুসাকে শেষ করার জন্যে সর্বান্তক চেষ্টা ও সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। বিপদ সম্পর্কে সবাইকে জানানো ও করনীয় ঠিক করার জন্যেই আজকের বৈঠকের আয়োজন। থামল আলেক্সি গ্যারিন।

একটু নিরবতা।

নিরবতা ভেঙ্গে বলল একজন শীর্ষ নির্বাহী, মাই লর্ড, আপনি যা বলেছেন সেটাই আমাদের করনীয়। শয়তানটাকে শেষ করার লক্ষ্যে সর্বান্তক চেষ্টা ও সর্বশক্তি নিয়োগ করা।

এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে চীপ অপারেশন জিজর, গোয়েন্দা প্রধান ডারথ ভাদের ও গৌরীকে নিয়ে তিন সদস্যের একটি অপারেশন টীম গঠন করা হলো। এই টীম যাবতীয় উপায়-উপকরন ব্যবহার করবে এবং আহমদ মুসাকে খুঁজে বের করে, তাকে সার্বক্ষণিক নজরে রেখে যতটা সম্ভব শীঘ্রই তাকে শেষ করার ব্যবস্থা করতে হবে। সেই সাথে তাঁর লাশও কিন্তু আমাদের পেতে হবে। সুযোগ পেলে কিংবা সুযোগ সৃষ্টি করে দেখামাত্র তাকে হত্যা করার চেষ্টা করতে হবে।

সবাই মাথা নাড়ল। কিন্তু মাথা নাড়তে পারল না গৌরী।

একটা চিন্তা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

কি দোষ আহমদ মুসার? তাকে আমরা কিডন্যাপ করতে গেছি। সেটা করতে গিয়ে আমাদের পাঁচজন মরেছে। সে তো আত্নরক্ষা করেছে মাত্র! সে তো আমাদের আক্রমন করেনি। তাহলে দেখামাত্র গুলী কেন? তাকে না দেখলে, তাঁর ভেতরটা না জানলে এ প্রশ্ন তাঁর মনে হয়ত আসতো না। লাশ নেবে কেন আর তাঁর লাশ ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেট বিক্রিই বা কেন করবে?

এসব নানা কথা, নানা প্রশ্ন গৌরীকে বিমূঢ় করে দিয়েছিল। তাই তাঁর লর্ড আলেক্সি গ্যারিনের কথায় সে সায় দিতে পারেনি।

টিমের কাজ শুরু হবে আজ এই মুহূর্ত থেকে। গুড নাইট সকলকে। বলল আলেক্সি গ্যারিন।

আলেক্সি গ্যারিনের কথা শেষ হবার সংগে সংগেই ফ্লোরের ভেতরে থেকে কালো টিউব উঠে এল। আলেক্সি গ্যারিনের চেয়ারের চারদিক ঘিরে দেয়ালের মত উঠে এল টিউবটা। উঠে চলল ছাদ ফুঁড়ে উপরে।

বৈঠকের সবাই উঠে বাউ করে দাঁড়িয়েছিল।

টিউব-লিফট উপরে অদৃশ্য হয়ে গেলে শীর্ষ নির্বাহী পাঁচজনের একজন গৌরীকে লক্ষ্য করে বলল, আমরা উঠতে পারি, ম্যাডাম গৌরী?

গৌরী আলেক্সি গ্যারিনের পিএ এবং আলেক্সি গ্যারিনের ব্যক্তিগত বাহিনীর কমান্ডার হলেও আলেক্সি গ্যারিনের অনুপস্থিতিতে সেই তাঁর প্রতিনিধিত্ব করে। আলেক্সি গ্যারিনের পার্সোনাল সেক্রেটারিয়েটও গৌরী দেখে। ফলে উপরের সবার চেয়ে গোপন বিষয় সে বেশি জানে। আরেকটা বিষয়ও সকলে

ওপেন সিক্রেট আকারে জানে এবং সেটা হলো, গৌরী আলেক্সি গ্যারিনের স্ত্রী নয় তবে ডি-ফ্যাকটো স্ত্রী হিসাবে রয়েছে। এই বিষয়টি গৌরীর জন্যে খুবই স্পর্শকাতর। পরোক্ষভাবেও গৌরী কোন সময় এ ধরনের কথার মুখোমুখি হলে খুবই রিঅ্যাক্ট করে। এমন ক্ষেত্রে লুকিয়ে তাকে কাঁদতে দেখা গেছে। কিন্তু ব্ল্যাক সানের শীর্ষ পর্যায়ের সবাই এক সময়ের পূর্ব মার্লিন এলাকার রুশ বংশোদ্ভূত মেয়ে গৌরীকে সমীহ করে চলে। গৌরী যেমন অসম্ভব সুন্দরী, তেমনি সাহসী, বুদ্ধিমতি, ক্ষিপ্র ও দারুন উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী। Rise and fall of the dynasties of the world, বিষয়ের উপর পিএইচডি গৌরীর। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর অধ্যাপনা করার কথা ছিল। কিন্তু গৌরী প্রকৃতিগতভাবে সাহসী ও বেপরোয়া বলেই সাজানো একটা খুনের মামলার আসামী হয়ে তাকে পলাতক হতে হয়। এই অবস্থায় ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেট তাকে রিক্রুট করে। সাহস, মেধার জোরেই সে ব্ল্যাক সানের শীর্ষ পর্যায়ে উঠেছে।

মাই লর্ড চলে গেছেন। মিটিং শেষ হয়েছে। আপনারা অবশ্যই যেতে পারেন। বলল গৌরী।

এখনই একটা মিটিং সেরে ফেলতে পারি।বলল জিজর।

ঠিক। মাই লর্ড তো এখন থেকেই কাজ শুরু করতে বলেছেন। ডারথ ভাদের বলল।

এ ধরনের মিটিং-এর জন্যে প্রস্তুতি দরকার। তবে একটা প্রাথমিক আলোচনা হতে পারে। বলল গৌরী।

পাশের আরেকটা কক্ষের একটা গোল টেবিল ঘিরে বসে তাঁরা আলোচনা শুরু করল।

মিটিং চলল প্রায় একটা ঘণ্টা।

মিটিং শেষে বেরিয়ে আসার সময় গৌরী হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল রাত ৪টা। হাসল গৌরী। তাঁদের সব কাজ রাতেই। নামটা তাঁদের সার্থক।

গৌরী তাঁর কক্ষে যাবার জন্যে এলিভেটরে উঠতে যাচ্ছিল। তাঁর মোবাইল বেজে উঠল। থমকে দাঁড়ালো গৌরী।

মোবাইল হাতে নিয়ে স্ক্রিনে দেখল স্বয়ং তাঁর লর্ডের কল। তাড়াতাড়ি সাড়া দিয়ে বলল, ইয়েস মাই লর্ড, কোন হুকুম?

তুমি এখনই একটু আমার বাংলোতে চলে এস। বলল আলেক্সি গ্যারিন।

অস্বস্তি, একটা অসহায়ত্ব যেন ছায়া ফেলল গৌরীর চোখে-মুখে। কিন্তু মুহূর্তেই তা মিলিয়ে গেল। বলল, ইয়েস মাই লর্ড, আমি আসছি।

বলে গৌরী অন্য একটি বিশেষ এলিভেটরে উঠল। সংগে সংগেই তা চালু হয়ে গেল। এ এলিভেটর সরাসরি গেছে আলেক্সি গ্যারিনের বেডরুমে। এ এলিভেটর তাঁর ইচ্ছাতেই মাত্র চলে।

# ৪

হাসপাতালে আহমদ মুসা যখন পৌঁছল তখন দশটা।

ইনফরমেশন ডেস্ক থেকে খোঁজ নিয়ে আহমদ মুসা তিন তোলার ১১ নাম্বার কেবিনে গিয়ে হাজির হল।

আহমদ মুসাকে দেখেই ছুটে এসে পাগলের মতো জড়িয়ে ধরল তামাহি মাহিন। মারেভা মাইমিতিও আহমদ মুসার কাছে এসে বলল, স্যার, আপনি সুস্থ তো? সারারাত মনে হচ্ছে আপনার ঘুম হয়নি। কালকের পোশাকই তো পড়ে আছেন! এ কি আপনার জ্যাকেটের দুই হাতাতেই যে রক্ত! ঠিক আছেন তো আপনি?

আহমদ মুসা হাসল। বলল, মারেভা, আমি ভেবেছিলাম তোমার প্রশ্ন বোধ হয় শেষ হবে না। ধন্যবাদ শেষ করার জন্যে। এত....।

কথা বলা হল না আহমদ মুসার। তেপাও শোয়া থেকে উঠে বসেছিল। কথা বন্ধ করে আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি গিয়ে তাকে ধরে শুইয়ে দিয়ে বলল, তুমি তো এই প্রথম সংজ্ঞালোপকারী গ্যাসের কবলে পড়েছ, তোমার সুস্থ হতে আরও কিছু সময় লাগবে। আর উঠে কি করবে। অন্তত কয়েক দিন গাড়ি চালাতে তুমি পারবে না।

ডাক্তারও তাই বলেছে। স্যার কি ঘটেছিল? আপনাকে না দেখা পর্যন্ত আমরা দারুন উদ্বেগে ছিলাম। ভোর বেলা আমরা হাসপাতাল থেকে টেলিফোন পাই, তেপাও নামে ট্যাক্সি চালককে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। সংজ্ঞা ফিরে পেয়েছে এই মাত্র। সে অনুরোধ করেছে আপনাদের হাসপাতালে আসার জন্যে। আমি মারেভাকে সংগে সংগেই নিয়েই চলে আসি। মারেভাও চলে আসে। তেপাও আমাদের জানায়, কি এক জিনিষ গাড়ির ভেতরে পড়ার সাথে সাথেই সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। সে আর কিছুই জানে না।

হাসপাতালের বেডে সে জ্ঞান ফিরে পায়। আমরা সংকিত হয়ে পড়ি যে, আপনিও জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং আপনি শত্রুর হাতে পড়েছেন। বলল মাহিন।

স্যার আপনাকেও অসুস্থ মনে হচ্ছে। আপনার জ্যাকেটের দুই আস্তিনে রক্ত। বলুন প্লিজ, কি ঘটেছিল, কি হয়েছিল আপনার?

নিশ্চয় বড় কিছু? বলল মারেভা মাইমিতি।

গম্ভীর হলো আহমদ মুসা। বলল, সে অনেক কথা মারেভা। কেবিনের দরজা বন্ধ করে দাও বলছি।

মাহিন দৌড়ে গিয়ে কেবিনের দরজা বন্ধ করে ফিরে এলো।

তেপাও জ্ঞান হারিয়েছিল, কিন্তু আমি জ্ঞান হারাইনি। গোল বলটাকে গাড়ির ভিতরে পড়তে দেখেই আমি শ্বাস নেয়া বন্ধ করেছিলাম। কিন্তু অজ্ঞান হবার ভান করেছিলাম।

বলে আহমদ মুসা রাতের গোটা কাহিনী বলল। কিভাবে তাকে সংজ্ঞাহীন মনে করে ওঁরা ওদের গাড়িতে ধরে নিয়ে গিয়েছিল হাত-পা বেঁধে। কিভাবে তাঁদের কাছে আহমদ মুসাকে হত্যার নির্দেশ আসে, কিভাবে আহমদ মুসা দাত দিয়ে হাতের বাঁধন ও পরে পায়ের বাঁধন সে খুলে ও সংজ্ঞাহীনের মত পড়েছিল, কিভাবে তাঁরা গাড়ির সিটেই তাকে হত্যার উদ্যোগ নেয়, কিভাবে সে গাড়ির পাঁচজনকে হত্যা ও দু'জনকে আহত করে নিজেকে রক্ষা করে, কিভাবে আবার সামনে ও পিছন থেকে শত্রুপক্ষের গাড়ি দ্বারা সে আক্রান্ত হয়, কিভাবে সে তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া বিস্ময়কর এক অস্ত্রে তাদেরকেই অকেজো করে দিয়ে ওদের ঘেরাও থেকে বেরিয়ে আসে। তারপর ওদের আকাশযান এক্সিকিউটর-১ ছুটে আসে তাঁকে হত্যার জন্যে, কিভাবে উপর থেকে বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগ করে, কিভাবে সে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় নিজেকে রক্ষা করে এবং কিভাবে জ্যামিং মেশিন ফেলে দিয়ে এক্সিকিউটর-১ এর কবল থেকে সরে আসতে সক্ষম হয়-সব কথা সংক্ষেপে বলল আহমদ মুসা।

মারেভা, মাহিন ও তেপাও সবার চোখেই আতংক আর বিস্ময়। তাঁদের কারও মুখে কোন কথা নেই। বিস্ময় ও আতংকের ঘোরে নির্বাক হয়ে গেছে যেন তাঁরা!

আহমদ মুসাই নিরবতা ভাঙল। হাসল সে। বলল, কি হলো, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি! ভাবছ এত ঘটনা ঘটল কিভাবে রাতের একটা অংশে!

তা নয়, স্যার। একটা সত্য ঘটনা রূপকথার ভয় ও বিস্ময়কেও ছাড়িয়ে গেছে। আমরা সে ভয় ও বিস্ময়কে কাটাতে পারছি না।

বলে একটা ঢোক গিলেই আবার শুরু করল মারেভা, আপনার লাশ ১ বিলিয়ন ডলারে কিনতে চায় ওঁরা কারা? এবং কেন কিনতে চেয়েছিল?

ওঁরা পশ্চিমের একটি বড় সন্ত্রাসী গ্রুপ। যে কোন মুল্যে ওঁরা আমার মৃত্যু চায়। তাই আমার লাশ হাতে পেয়ে তাঁরা নিশ্চিত হতে চায়, আমি মরেছি। বলল আহমদ মুসা।

ওহ গড! বলে আঁতকে উঠল মারেভা আহমদ মুসার কথা শুনে। হতবাক হয়ে গেছে মাহিন ও তেপাও।

কিন্তু এরা কারা, যারা আপনাকে কিডন্যাপ করেছিল, হত্যার চেষ্টা করেছিল? বলল মাহিন।

আমি যাদের সন্ধানে এসেছি, এরা তারাই। ওঁরা আমার পরিচয় পেয়ে গেছে। সেদিন অ্যাপেক্স রেস্টুরেন্টে গৌরী নামে যে মেয়েটিকে দেখেছিলে, সে ঐ দলেরই সদস্য। আমার সন্ধানেই সে রেস্টুরেন্টে এসেছিল। সে ও তাঁর লোকজনই আমাকে কিডন্যাপ করে। আহমদ মুসা বলল।

ওহ গড! তাহলে তো ওদের লোক নানাভাবে আমাদের ফলো করছে! বলল মারেভা।

কিন্তু ওঁরা চিনতে পারল কি করে আপনাকে? মাহিন বলল।

আমাকে আহমদ মুসা পরিচয়ে ওঁরা জানতো না আজ রাতের আগে। তোমাদের তাহানিয়া অ্যাটলে একটা sos আমি মনিটর করেছিলাম, মুলত সেই ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যেই আমাকে ওঁরা কিডন্যাপ করেছিল। কিছু ঘটনা ঘটার পর ওঁরা জানতে পারে আমি আহমদ মুসা এবং এটা ওদের জানিয়ে দেয় পশ্চিমের ওদের মিত্র সংঘটনকে। আহমদ মুসা বলল।

তাহলে ওঁরা এখন আপনাকে নিশ্চয় হন্যে হয়ে খুজছে? বলল মারেভা।

হ্যাঁ, আজ শেষ রাতে ওঁরা হোটেলে আমার রুম পর্যন্ত এসেছিল। ভোর পর্যন্ত ওৎ পেতে ছিল হোটেলের পেছনের রাস্তায়। আমি এটা আঁচ করেই হোটেল রুমে যাইনি। ওদের গতিবিধি দেখার জন্যে আমিও হোটেলের রাস্তায় অপেক্ষা করছিলাম। সকালে ওঁরা চলে গেলে আমি তেপাও-এর সন্ধানে এসেছি। বলল আহমদ মুসা।

তাঁর মানে আপনি সারারাত ও এখন পর্যন্ত বাইরে! আপনার বিশ্রাম নেই, খাওয়াও হয়নি আপনার নিশ্চয়? আপনি নিজে ঠিক না হয়ে এই অবস্থায় আপনি এসেছেন তেপাও-এর খোঁজে! বলল মাহিন।

আমি তেপাও-এর জন্যে উদ্বিগ্ন ছিলাম। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাঁর কি হলো, তারপর গাড়ি আবার হাইজাকিং-এর পাল্লায় পড়ে কিনা। তাই খোঁজ নিতেই এসেছি। বলল আহমদ মুসা।

তেপাও-এর চোখ ছলছল করে উঠেছে। বলল, স্যার আপনি সারারাত মৃত্যুর সাথে লড়লেন। যে কোন সময় যে কোন কিছু হয়ে যেতে পারত। আপনারই রেস্ট বেশি দরকার। আর আপনি আমার খোঁজে ছুটে এসেছেন!

আচ্ছা যাক, বল, তুমি কিভাবে হাসপাতালে এলে? জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

এই হাসপাতালেরই একজন ডাক্তার আমাকে নিয়ে এসে ভর্তি করে দিয়েছে হাসপাতালে। তেপাও বলল।

স্যার, এবার চলুন নাস্তা করবেন। হাসপাতালের ক্যান্টিনে ভালো নাস্তার ব্যবস্থা আছে। বলল মাহিন আহমদ মুসাকে।

না, আগে হোটেলে ফিরে আমাকে ফ্রেশ হতে হবে। বলল আহমদ মুসা।

ঐ হোটেলে ফেরা তো আপনার ঠিক হবে না স্যার! ওঁরা নিশ্চয় পাহারা বসিয়েছে। বলল মাহিন।

না মাহিন, ঐ হোটেলে ফিরছি না। আমি একটা পাবলিক কল অফিস থেকে হোটেলকে জানিয়ে দিয়েছি, আমি মুরিয়া চলে এসেছি কয়েক দিনের জন্যে। শীঘ্রই ফিরব।

আহমদ মুসা একটু থামতেই মারেভা বলল, কিন্তু হোটেলে যেতে চাইছেন যে আপনি?

তবে আমি পাতুতোয়ায় হোটেল প্যাসেফিক ইন্টারন্যাশনালে একটা কক্ষ নিয়ে রেখেছি। সেখানেই যাব আমি। এখান থেকে কাছেও হোটেলটা। বলল আহমদ মুসা।

বিস্ময় মারেভাদের চোখে-মুখে। বলল মাহিন, আপনি কি করে বুঝেছিলেন যে, হোটেলটা আপনাকে ছাড়তে হতে পারে?

আমি জেনে তা করিনি। আমাদের রসূল সঃ-এর এ ধরনের উপদেশ আছে, যৌবনে বার্ধক্যের চিন্তা করতে হয়, ভালো সময়ে খারাপ সময়ের কথা ভাবতে হয় ইত্যাদি। আমিও তাই ভালো সময়ে খারাপ সময়ের কথা চিন্তা করে ব্যবস্থা করে রেখেছি। বলল আহমদ মুসা।

কথাটা শেষ করেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, আমি হোটেলে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে খেয়ে নিয়ে একটু রেস্ট নেব। তারপর একটু স্বরাষ্ট্র বিভাগে যাবো ফরাসি সেই পুলিশপ্রধানের সাথে আলোচনার জন্যে। এরপর ফিরব হোটেলে। তোমরা সেখানে আসতে পারো। পরামর্শ করা যাবে।

ফরাসি সেই পুলিশ অফিসারের কাছে কেন? ওঁরা কি কিছু বলেছে? কিছু ঘটেছে? জিজ্ঞাসা মারেভার।

না, কিছু ঘটেনি। তাঁর সাথে দেখা করে আজকের ঘটনা ব্রিফ করতে চাই। যা ঘটেছে তাঁর কিছু তো তাঁদের জানা দরকার! যে কোন সময় তাঁদের সাহায্যেরও দরকার হতে পারে। বলল আহমদ মুসা। কথা শেষ করেই ‘আল্লাহ্ হাফেজ’ বলে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল আহমদ মুসা। ঠিক বেলা তিনটায় মারেভা ও মাহিন পাতুতোয়ার হোটেল প্যাসিফিক ইন্টারন্যাশনালে গিয়ে পৌঁছল।

আহমদ মুসা ঘুম থেকে উঠে তাঁদের স্বাগত জানাল।

স্যরি স্যার, আপনাকে আমরা ঘুম থেকে তুললাম। বলল মাহিন।

তোমরা বরং আমার উপকার করেছ। আমি দিনে ঘুমাই না। কখনও ঘুমালেও এক ঘণ্টার বেশি নয়। তোমরা না এলে দেখছি আমার নিয়ম ভঙ্গ হতো। আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসা টয়লেট থেকে ওজু করে ফ্রেশ হয়ে এসে বলল, এখন বোধ হয় কফি খেতে আমাদের ভালো লাগবে।

বলে আহমদ মুসা কফি বানানোর সরঞ্জামের দিকে এগোল।

মারেভা উঠে দৌড়ে গেল কফি পটের কাছে। বলল স্যার, ছোট বোনকে আর লজ্জা দিবেন না। আপনি গিয়ে বসুন।

আমি কফি তৈরিতে এক্সপার্ট না হলেও তা না খাওয়ার মত হবে না নিশ্চয়।

ধন্যবাদ। বলে আহমদ মুসা এসে সোফায় বসল। কফি এল।

মারেভা আহমদ মুসা ও মাহিনকে কফি দিয়ে নিজে এক কাপ নিয়ে ভিন্ন সোফায় গিয়ে বসল।

আহমদ মুসা কফিতে চুমুক দিয়ে বলল, আচ্ছা মাহিন-মারেভা, আমি যদি বল আমি ‘মতু’তে যেতে চাই, তাহলে তোমরা কি বুঝবে?

মারেভারা একটু ভাবল।

মারেভাই প্রথম মুখ খুলল। বলল, পলিনেশীয় ভাষায় ‘মতু’ অর্থ দ্বীপ। সে অনুসারে আমি বুঝব, আপনি একটা দ্বীপে যেতে চান।

আমার কাছেও এটাই অর্থ স্যার। বলল মাহিন।

কিন্তু এভাবে কেউ কি বলে আমি ‘মতু’ যাব? আহমদ মুসা বলল।

না, তা বলে না স্যার। যে দ্বীপে যাবে, সে দ্বীপের নাম বলবে সেটাই স্বাভাবিক। বলল মারেভা।

কেউ যদি বলে ‘মতু’ যাব, তাহলে কি ধরে নেয়া হবে না যে, সে বিশেষ দ্বীপের নাম বলছে? আহমদ মুসা বলল।

জি স্যার, সেটাই ধরে নিতে হবে। বলল মারেভা ও মাহিন দু’জনেই।

‘মতু’ নামে কি কোন দ্বীপ আছে ফ্রেঞ্চ পলিনেশীয়ার বিশেষ করে মতুতোয়া অ্যাটল দ্বীপপুঞ্জে?

দু'জনেই ভাবল কিছুক্ষন। বলল মারেভা। না 'মতু' নামে কোন দ্বীপ নেই এবং থাকা স্বাভাবিকও নয়। দ্বীপের নাম 'দ্বীপ' হতে পারেনা।

আমিও তাই মনে করি স্যার। বলল মাহিনও।

মাহিনের কথা শেষ হতেই মারেভা বলে উঠল, 'মতু' সম্পর্কে এত কথা বলছেন কেন স্যার? 'মতু' নামে দ্বীপই বা খুজছেন কেন স্যার?

আমি যখন অজ্ঞানের ভান করে ওদের গাড়িতে পড়েছিলাম, তখন তাঁদের আলোচনা থেকে জানলাম, আমাকে 'মতু'তে নিয়ে যাবার কথা ছিল ওদের। কিন্তু নির্দেশ আসে আমাকে 'মতু'তে নেয়া যাবে না। তাহিতিতেই তাঁদের কোন এক ঘাটিতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদের নির্দেশ হয়। গাড়ির গতি পরিবর্তন করে তাহিতির ঘাটির দিকেই চলতে শুরু করে। পড়ে অবশ্য আবার নির্দেশ আসে আমাকে কোথাও নেয়া যাবে না ঐ রাস্তাতেই আমাকে হত্যা করতে হবে। আমি ওদের 'মতু' বলা থেকে বুঝেছি, 'মতু' অবশ্যই একটা দ্বীপের নাম।

ঠিক বলেছেন স্যার, 'মতু' একটা দ্বীপেরই নাম হবে। প্রশ্ন হল, 'মতু' দ্বীপটি কথায়?

আহমদ মুসা কোন কথা বলল না। ভাবছিল সে। মনে পড়ল তাঁর এসওএস(SOS) এর কথা। এসওএস (SOS) সত্য এটা প্রমানিত হয়েছে, এবং সে এসওএস ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের প্রধান ঘাটি 'ক্যাপিটাল অব পাওয়ার' থেকেই। একথাও পরিস্কার যে, সেখানেই বন্দী ৭৬ জন বিজ্ঞানী, বিশেষজ্ঞ এবং সেখানেই বন্দী আছেন সৌদি আরবের বিজ্ঞানী খালেদ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মক্কী। আহমদ মুসা এসওএস 'টি পেয়েছিল তাহানিয়া অ্যাটলের দক্ষিন মাথায় অবস্থান কালে। সেখান থেকে এক মাইলের মধ্যে বা আশেপাশে 'মতু' নামে কোন অ্যাটল দ্বীপ আছে কিনা! মারেভারা বলল, না এ নামে কোন দ্বীপ নেই। তাহলে কি ব্ল্যাক সানের লোকরা দ্বীপটির এই ছদ্মনাম দিয়েছে কিংবা তাঁরা কি দ্বীপের আংশিক নাম বলেছে?

আহমদ মুসা মাথা তুলে তাকাল মাহিনের দিকে। বলল, মাহিন তোমরা তাহানিয়া অ্যাটলের চারপাশের, বিশেষ করে ১ থেকে ২ মাইলের মধ্যে যে সব অ্যাটল দ্বীপ আছে সেগুলার কি নামের তালিকা দিতে পার?

অবশ্যই পারবো স্যার। হোটেলের মিডিয়া সেন্টারে কম্পিউটার আছে। কম্পিউটারের গোগলের স্যাটেলাইট ভিউতে গেলেই সব দ্বীপ ও তাঁর নাম পেয়ে যাব। বলে উঠে দাঁড়ালো মাহিন।

মারেভা, তুমিও যাও। বুদ্ধি শেয়ার করতে পারবে দু'জনে।

আহমদ মুসা মুহূর্তের জন্যে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল। মারেভা ভাবল, স্যার কি একা থাকতে চান কিছুক্ষন, না একা ঘরে মারেভার থাকা তিনি এড়াতে চাচ্ছেন। শেষটাই বোধ হয় ঠিক। আরও ভাবল, মারেভা ও মাহিনের এক সাথে ঘুরাও তিনি পছন্দ করছেন না। যাক, সত্তর তাঁদের বিয়েটা হিয়ে যাচ্ছে, তখন আর স্যারের কিছু বলার থাকবে না। আরেকটা কথা ভেবে ভালো লাগল মারেভার, ইসলাম ধর্ম মোতাবেক তাঁদের বিয়ে হচ্ছে! তাঁদের দুই পরিবারই ইসলাম গ্রহন করেছে।

চলে গেল মারেভা ও মাহিন।

ফিরে এলো তাঁরা মিনিট দশেকের মধ্যেই।

সিটে বসেই মাহিন বলল, স্যার আমাদের মিশন সফল। আমরা 'মতু' দ্বীপ পাইনি বটে, মতুতুংগা নামে একটা দ্বীপ পেয়েছি। 'মতু' শব্দসহ আর কোন দ্বীপের নাম মতুতুয়া দ্বীপপুঞ্জে নেই। সুতরাং আমরা মনে করি 'মতু' বলতে মতুতুংগা দ্বীপকেই বুঝানো হয়েছে।

কিন্তু 'মতুতুংগা' দ্বীপটি কোনটি? তাহানিয়ার দক্ষিনের দ্বীপটি? জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

হ্যাঁ, দক্ষিনের দ্বীপটাই। বলল মারেভা।

কিন্তু, দ্বীপটা তো খুবই ছোট! ওঁর চারদিকের ল্যান্ড-লাইন খুবই সংকীর্ণ। 'ক্যাপিটাল অব পাওয়ার'-এর জন্যে ওরকম দ্বীপ আইডিয়াল নয়। আহমদ মুসা বলল।

কিন্তু তাহানিয়ার আশেপাশে কেন গোটা দ্বীপপুঞ্জে 'মতু' শব্দসহ হন দ্বীপের নাম নেই। বলল মাহিন।

তা ঠিক। আমাকে দ্বীপটা আবার দেখতে হবে। আহমদ মুসা বলল।

কিন্তু ঐ জায়গাটা তো আপনার জন্যে নিরাপদ নয়! আপনিই তো বলেছিলেন, ওদের ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরায় আমাদের বোঁট, আমাদের তিনজনের চেহারা ধরা পড়েছিল। সেই ছবি ও বোটের নাম্বার দেখেই ওঁরা আমাদের খোঁজ পায়। তারমানে তাহানিয়া ও আশেপাশের দ্বীপপুঞ্জ ওদের ক্লোজ ক্যামেরার রেঞ্জের মধ্যে রয়েছে। সুতরাং তাহানিয়া, মুতুতুংগা ও এর আশেপাশে যাওয়া, বিশেষ করে আপনার জন্যে এখন আরও বেশি বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। বলল মারেভা।

ঠিক মারেভা, কিন্তু ওখানে না গেলে তো সমস্যার জট খুলছে না। 'মতু' যদি মতুতুংগাই হয়, তাহলে তাঁর ভিন্নতর কিছু খুঁজে পাওয়া যাবেই। সেটা সাগরের উপরে হতে পারে, সাগর বক্ষেও হতে পারে। আহমদ মুসা বলল।

একটু থেমেই আবার শুরু করল, আমি এখান থেকে বেরিয়ে যাব তাহিতি সরকারের 'ওসান ও ওসান রিসোর্সেস ইন্সটিটিউটের চেয়ারম্যান অধ্যাপক তিয়ারে হিরেনুর কাছে। আজ গিয়েছিলাম তাহিতির স্বরাষ্ট্র সচিব ও পুলিশপ্রধান আর সেই পরিচিত মসিয়ে দ্যা গলের কাছে। তিনিই অধ্যাপক তিয়ারে হিরেনুর সাথে কথা বলিয়ে দিয়েছেন। সাগরে যদি নামতে হয়, তাহলে তাঁর সাহায্য দরকার।

আপমি সাগরে নামবেন? বলল মাহিন।

নামবো না, নামতে যদি হয় তারই আগাম প্রস্তুতি। মতুতংগা সম্পর্কে নিশ্চিত হবার পর, তাঁর বাইরেটা দেখার পর এই বিষয়ে চিন্তা করব। আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসার মোবাইলের স্ক্রিনে কয়েকবার বিপ বিপ শব্দ করে একটা লাল আলো জ্বলে উঠল। কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী হবার পর তা থেমে গেল।

আহমদ মুসার ভ্রু কুঞ্চিত হল। তাকাল মাহিনদের দিকে। বলল, তেপাও তো নিচে গাড়িতে আছে, না?

জি হ্যাঁ। বলল মাহিন।

তাহলে একটা কল করে বল, গাড়ি পার্ক করে থাকার সময় কেউ তাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করেছে কিনা?

সংগে সংগেই তাঁর সাথে কথা বলল মাহিন। কথা শেষ করে আহমদ মুসাকে বলল, গাড়ি পার্ক করার পাঁচ মিনিট পরে একজন লোক আসে, এবং বলে মাহিন ও মারেভা দু'জনেই আমার বন্ধু। তাঁদের এখানে আসার কথা আপনার গাড়িতেই। ওঁরা কথায় গেল? তেপাও বলেছে, এই হোটেলেই কোন কাজে গেছে। একথা শুনেই তাঁরা হোটেলে ঢুকেছে।

তোমরা রিসেপশনে কিছু বলেছ? জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

আপনি রুম নাম্বার আমাদের দিয়ে আসেন নি। আমরা রিসেপশনে আপনার নতুন নাম বলে রুম নাম্বার জিজ্ঞাসা করেছি। বলল মারেভা।

মারেভা থামতেই মাহিন বলে উঠল, কেন এসব বলছেন স্যার, কিছু ঘটেছে?

আমার মনে হচ্ছে, তোমাদের ফলো করে কেউ এসেছে।

বিস্ময় ফুটে উঠল মারেভা ও মাহিন দু'জনের চোখে-মুখে। মারেভা বলল, কারা ফলো করেছে? ওঁরা?

হ্যাঁ ঠিক ধরেছ। বলল আহমদ মুসা।

তাঁর মানে ওঁরা আমাদের ফলো করে আপনার কাছে পৌছতে চায়। বলল মাহিন।

আহমদ মুসা কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল। কিন্তু বলা হলো না। তাঁর মোবাইলে কয়েকবার বিপ বিপ শব্দ উঠল, তাঁর সাথে মোবাইলের স্ক্রিনে চারটি লাল আলো ভিন্ন ভিন্নভাবে একই সাথে জ্বলে উঠেছে। সে চমকে উঠল। দ্রুত কণ্ঠে বলে উঠল, মারেভা, মাহিন, তোমরা তাড়াতাড়ি এক পাশে সরে যাও। তাড়া......।

আহমদ মুসার কথা শেষ হতে পারল না। প্রবল ধাক্কায় কক্ষের দরজা ভেঙ্গে পড়ল।

ধাক্কা দেয়া লোকেরা সামনে ঝুকে পড়েছিল। তাঁদের প্রত্যেকের হাতে রিভলবার।

দরজায় ধাক্কা পড়ার প্রথম শব্দ কানে আসার সাথে সাথেই আহমদ মুসা মাথার পেছনে জ্যাকেটের গোপন পকেট থেকে দ্রুত রিভলবার বের করে তাক করল দরজার দিকে। রিভলবারের ট্রিগারে তাঁর তর্জনী।

দরজার পাল্লা পড়ে যেতেই দরজা ভেঙ্গে লোক দু'জন এসে গেল তাঁর রিভলবারের সামনে। নড়ে উঠল আহমদ মুসার তর্জনী অবিরামভাবে। সামনের দু'জন লোক গুলী খেয়ে পড়ে গেল দরজার উপরে।

গুলী অব্যাহত রেখেই আহমদ মুসা মেঝের উপর ঝাপিয়ে পড়ল। ওদিক থেকেও গুলী আসা শুরু হয়েছে।

আহমদ মুসা মেঝের উপর ঝাপিয়ে পড়ার পর দরজায় দাঁড়ানো অবশিষ্ট দু'জনের, যারা গুলী ছোড়া শুরু করেছে, তাঁদের টার্গেট পরিবর্তন হয়ে গেল। এরই সুযোগ গ্রহন করল আহমদ মুসা মেঝেয় গিয়ে পড়ার সংগে সংগেই। আহমদ মুসার রিভালবার থেকে শেষ দুটি গুলী বেরিয়ে গেল।

আহমদ মুসার গুলী যখন ওদের দু'জনের বুকে বিদ্ধ হল, তখন তাঁদের রিভলবারও আহমদ মুসা লক্ষ্যে সরে এসেছিল। কিন্তু গুলিবিদ্ধ হবার পর তাঁদের তর্জনীও তাঁদের রিভলবারের ট্রিগারে চেপে বসেছিল বটে, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে আহমদ মুসার পেছনের দেয়ালকে গিয়ে বিদ্ধ করল।

আহমদ মুসা গুলী করেই দ্রুত গড়িয়ে সরে গিয়েছিল ওদের গুলী এড়াবার জন্যে। কিন্তু ওদের টার্গেটে আসেনি, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে।

একবার দরজার দিকে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। দেখল, মাহিন ও মারেভা মেঝেতে সোফার আড়ালে।

মাহিন, তোমরা ঠিক আছ। জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

ভীত ও আতংকগ্রস্থ মাহিন, মারেভা উঠে দাড়াল। কম্পিত কণ্ঠে বলল, মাহিন আমরা ভালো আছি। তাঁদের চোখ গিয়ে নিবদ্ধ হলো চারটি লাশের উপর এবং দেখল আহমদ মুসার রিভলবারটাও।

দরজায় বেশ কিছু ভীত, বিস্মিত ও উৎসুক লোকের ভিড় জমে গেছে। হোটেলের ম্যানেজারও এসে গেছে।

আহমদ মুসা দরজার দিকে এগিয়ে বলল, ম্যানেজার সাহেব, এরা আমার রুমের দরজা ভেঙ্গে আমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে প্রবেশ করেছিল। আপনি পুলিশকে খবর দিন।

সংগে সংগেই ম্যানেজার তাঁর মোবাইলে টেলিফোন করল পুলিশকে।

সবাই পুলিশের অপেক্ষায়।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই পুলিশ এসে গেল।

পিলিশ অফিসার এই রেঞ্জের প্রধান কর্মকর্তা হিমাতা হিরো হোটেলের ম্যানেজার ও আহমদ মুসার বক্তব্য গ্রহন করল। আহমদ মুসার বক্তব্য গ্রহন করার পর তাকে বলল, আমাদের স্যার মানে পুলিশ প্রধান মিস্টার দ্যাগল আপনার খুব ঘনিষ্ঠ, তাই না?

হা, পরিচিত। কেন? বলল আহমদ মুসা।

আমি তদন্তে আসার আগে এই হোটেলের এই রুমের ঘটনার বিষয়ে তাকে ব্রীফ করেছি। তিনি আপনার কথা আমাকে বলেছেন এবং আপনার নিরাপত্তার বিষয় দেখতে বলেছেন।

হ্যাঁ, তিনি খুব সৎ ও সত্যনিষ্ঠ মানুষ। আহমদ মুসা বলল।

ধন্যবাদ, আপনি আপনার রিভলবারের লাইসেন্সটা আমাকে দেখান। এটা আমাদের রুটিন কাজ। আর আপনার রিভলবার ও লাইসেন্স আমাদের দিবেন। এটা কেসের জন্যে প্রয়োজন। আপনি আরেকটা রিভলবার ও লাইসেন্স এখনি পেয়ে যাবেন।

ধন্যবাদ। বলে আহমদ মুসা তাঁর রিভালবার ও লাইসেন্স পুলিশ অফিসারকে দিল।

পুলিশ কক্ষের দরজা ও নিহতদের বিস্তারিত ফটো গ্রহন করল। তারপর নিহত আক্রমণকারীদের রিভলবারগুলো কাপড় জড়িয়ে সাবধানে সংরক্ষনে নিল। লাশগুলোও নিয়ে গেল পুলিশ।

হোটেল ম্যানেজমেন্ট আহমদ মুসাকে অন্য একটি কক্ষে শিফট করল ঘরটা ঠিক করার জন্যে।

আহমদ মুসার সাথে মারেভা ও মাহিনও নতুন কক্ষে এল। আহমদ মুসা নতুন কক্ষে উঠতে গিয়ে দেখল, কক্ষের সামনের করিডোরে দুই প্রান্তের মুখে দু'জন করে চারজন পুলিশের প্রহরা রয়েছে।

কক্ষে প্রবেশ করেই মারেভা বলল, আমি পুলিশ আসার খবরে ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। নিশ্চয় আপনার বন্ধু পুলিশ কর্মকর্তা আপনাকে সাহায্য করেছেন।

হ্যাঁ, সেটা তো অবশ্যই। তাছাড়া আমি তো বেআইনি কিছু করিনি। আত্মরক্ষার অধিকার সকলের আছে। আমি তাঁদের না মারলে তাঁদের হাতে আমাকে মরতে হতো। দেখামাত্র গুলী করার নির্দেশ নিয়েই তারা এসেছিল এবং তারা তাই করেছিল। আমার রিভলবারও বেআইনি ছিল না। আহমদ মুসা বলল।

দরজা ভাঙ্গার পর যা কিছু ঘটল তাকে অবিশ্বাস্য এক রূপকথার মত মনে হচ্ছে! ভয়ে আমার শ্বাসরুদ্ধ হবার মত হয়েছিল। কিন্তু কখন, কিভাবে, কোথেকে আপনি রিভলবার বের করলেন এবং একা চারজনকেই হত্যা করলেন, আমরা কিছুই বুঝতে পারলাম না। মনে হলো আপনি প্রস্তুত ছিলেন। বলল মাহিন।

আমাদের কেউ ফলো করেছে, তা আপনি কি করে বুঝলেন? বলল মারেভা।

আহমদ মুসা তাকাল মারেভাদের দিকে। বলল, আমার দরজার সামনে কার্পেটের ভেতরে পরিকল্পিতভাবে কয়েকটি অ্যাংগেলে আলপিনের গোঁড়ার মত ক্ষুদ্র কয়েকটা আলট্রা সেনসেটিভ ইলেকট্রিক সিগন্যালার পেতে রাখা ছিল। তোমরা আমার রুমে আসার মিনিট সাতেক পর একজন লোক এসে আমার দরজার সামনে এসে দাড়ায়। পনেরো সেকেন্ডের মত দাড়িয়ে চলে যায়। আমার মোবাইলে এর সিগন্যাল আমি পেয়ে যাই। আমার সন্দেহ হয়, তোমাদের ফলো করা হয়েছে এবং তাঁদের একজন আমার রুমটা এসে চিনে গেল। আমি তেপাও-এর সাথে কথা বলে নিশ্চিত হলাম যে, তোমাদের ফলো করা হয়েছে। আমাদের কথা বলার ফাঁকেই ওঁরা প্রস্তুত হয়ে আমার দরজায় এসে দাড়ায়। চারটি সিগন্যাল পাই আমি আমার মোবাইলে। বুঝতে পারি ওঁরা চারজন এসেছে। এবার কক্ষ দেখার জন্যে নয়, আমাকে হত্যার জন্যে। আমি ভেবেছিলাম, ওঁরা দরজায় নক করবে, আমি খুলতে যাব অবশ্যই, তখনই ওঁরা আমাকে গুলী করবে এক সাথে

পয়েন্টেড ব্ল্যাংক। এতে ওদের একজন মরলেও আমাকে ওঁরা মারতে পারবে, এই চিন্তাই তারা করবে। কিন্তু তারা ভুল করে।

কি ভুল করে? জিজ্ঞাসা মারেভার।

ওঁরা দরজায় টোকা দিয়ে আমাকে সতর্ক করে দিতে চায়নি। ওঁরা চেয়েছে, আচমকা দরজা ভেঙ্গে অপ্রস্তুত অবস্থায় আমার উপর ঝাপিয়ে পড়তে। কিন্তু তা হয়নি। আমি সতর্ক ছিলাম। ওরাই দরজা ভাঙতে গিয়ে সামনের দু'জন কিছুটা হলেও ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে এবং ওদের সকলেরই রিভালবার আমাকে দেখার পর আমাকে লক্ষ্য করে উঠে আসতে বিলম্ব করে। এরই সুযোগ গ্রহন করে আমার তৈরি থাকা রিভালবার, প্রথমে সামনের দু'জনকে, পড়ে পেছনের দু'জনকে হত্যা করে। আহমদ মুসা বলল।

বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে শুনছিল মারেভা ও মাহিন আহমদ মুসার কথা। কি অদ্ভুত তাঁর প্রতি সেকেন্ডে প্রতি মুহূর্তের হিসাব! প্রতি মুহূর্তের সুযোগের কি অদ্ভুত সদ্ব্যবহার! দরজা ভাঙতে গিয়ে ওদের প্রস্তুতি ও মনোযোগের সামান্য যে বিচ্ছিন্নতা তাকে ব্যবহার করেই আহমদ মুসা বিজয়ী আর ওঁরা পরাজিত, মৃত।

আহমদ মুসা সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে না পারলে এক ঝাক গুলীর শিকার তিনিই হতেন। জীবন আর মৃত্যু কত কাছাকাছি! ভাবতে গিয়ে বুক কেপে উঠল মারেভার। চোখ দুটি বিস্ফরিত মাহিনের।

আপনি বুঝতে পেরেছেন, ওঁরা এসেছে আপনাকে হত্যা করতে, আপনার ভয় লাগেনি? জিজ্ঞাসা করল মাহিন।

ভয় কি জন্যে? বলল আহমদ মুসা।

কেন। মৃত্যুর? মাহিন বলল।

মৃত্যু আল্লাহ্র নির্দেশ ছাড়া আসে না। সুতরাং মৃত্যু ভয় করার বিষয় নয় এবং কেউ মৃত্যু কামনা করুক আল্লাহ্ তা চান না। সেজন্যই আত্নরক্ষাকে অবশ্য কর্তব্য বলা হয়েছে। আমি সে চেষ্টা করেছি। বলল আহমদ মুসা।

ধন্যবাদ স্যার! স্রষ্টা বা আল্লাহ্র পরিচয়, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতাম না। ক'দিনে আপনি অনেক কিছু শিখিয়েছেন আমাদের। মারেভা বলল।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, শেখা, মানা ও করা কিন্তু এক জিনিষ নয় মারেভা।

স্যার, আপনি জানেন না, আমরা মানছি এবং করছিও। মারেভা বলল।

আমরা মানে কে? বলল আহমদ মুসা।

আমরা মানে আমাদের দুই পরিবার। আপনি একদিন বাসায় আসুন, বিস্মিত হবেন। আমাদের ড্রয়িং রুমের পাশের ঘরটা এখন নামাজ ঘর। আমার মাথা গায়ে যে ওড়না দেখছেন, তা এখন আমাদের সব মেয়ের মাথায়। মারেভা বলল।

ধন্যবাদ তোমাদের। আহমদ মুসা বলল।

স্যার, এখন আমাদের প্রতি আপনার নির্দেশ কি? বলল মাহিন।

তোমাদেরকে আগামী কয়েকদিন বা কিছুদিন বাড়িতে থাকা চলবে না। আহমদ মুসা বলল।

কেন স্যার, কিছু আশংকা করছেন? বলল মাহিন।

অবশ্যই। তোমরা ওদের নজরদারিতে রয়েছ। তোমাদের মাধ্যমে আমাকে ওঁরা খুঁজে পেতে চায়। না পেলে এমনকি ওঁরা তোমাদের আটকও করতে পারে যাতে আমাকে পাওয়ার ওদের একটা ব্যবস্থা হয়। আহমদ মুসা বলল।

মারেভা ও মাহিনের মুখে উদ্বেগ ফুটে উঠল। মারেভা বলল, ঠিক স্যার। ঠিক বলেছেন আপনি। এটা তারা করবে।

আমারও তাই মনে হচ্ছে স্যার, ওঁরা এই চেষ্টা করবে। আজও ওঁরা আমাদেরকে অনুসরন করেই এখানে এসেছে। মাহিন বলল।

স্যার, একটা কথা। আহমদ মুসার দিকে না তাকিয়েই বলল মারেভা।

কি কথা বল? আহমদ মুসা বলল।

মাহিন, তুমিই বল না। মাহিনের দিকে তাকিয়ে বলল মারেভা। রহস্যময় একটা লজ্জা এসে জড়ো হয়েছে যেন মারেভার মুখে। লাল হয়ে উঠেছে তাঁর মুখ।

মাহিনের মুখেও লজ্জা এসে জুটল। বলল, জড়সড় হয়ে, ও আমাদের বিয়ের কথা বলতে চাচ্ছে স্যার। সেতার কি হবে?

বিয়ে হতেই হবে, কবে যেন হচ্ছে বিয়ে? আহমদ মুসা বলল।

আগামী শুক্রবার, স্যার। তারিখটা তো আপনারই দেয়া স্যার!

হ্যাঁ, দাওয়াতের জন্যে তো কার্ড হচ্ছে না? জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

না, হচ্ছে না। আপনি তো নিষেধ করেছেন।

আপনি যেভাবে বলেছেন, সেভাবেই শুধু আত্মীয়দের নিয়ে ঘরোয়া অনুষ্ঠান হচ্ছে। মাহিন বলল।

তাই বলে ঘরে হচ্ছে না তো! বলল আহমদ মুসা। আমাদের এলাকার ক্লাব ভাড়া নেয়া হচ্ছে। তবে সেখানে আলোকসজ্জার বাইরে কিছু হবে না। নেম-সাইন বোর্ডও থাকবে না। মাহিন বলল।

ধন্যবাদ। তোমরা কোথায় থাকবে বলে ঠিক করেছ? বলল আহমদ মুসা।

আব্বা-আম্মাদের সাথে পরামর্শ করে আমরা সেটা ঠিক করব। তবে অমনটা হবে না। আমাদের পাড়াতেই আমাদের আন্টিদের বাসা। সেখানেই আমাদের থাকতে হবে। মাহিন বলল।

দুঃখিত, আমার কারনেই তোমরা এই বিপদে পড়লে। বলল আহমদ মুসা।

বিপদ হলেও বিপদটা খুব আনন্দের স্যার। আপনার সাথি হতে পারা এক দুর্লভ গৌরব। স্যার, এই প্রথম বুঝতে পারছি আমাদের জীবনের মুল্য আছে। মারেভা বলল।

জীবনকে বুঝতে পারার জন্যে ধন্যবাদ।

মুহূর্ত কয়েকের জন্যে থামল আহমদ মুসা। আবার বলল, তোমরা সকালে বাড়ি থেকে বেরুবার পর তোমরা কি আর বাড়ি গিয়েছিলে?

না, যাবার সময় হয়নি। বলল মারেভা।

তাহলে তোমাদের বাড়ি যাওয়া দরকার। আহমদ মুসা বলল।

আপনি অনুমতি দিলে আমরা যেতে পারি। কিন্তু আপনি তো একা! তেপাও কি থাকবে এখানে? জিজ্ঞাসা মাহিনের।

অনুমতির প্রশ্ন কেন? তোমরা স্বাধীন ইচ্ছায় এসেছ, স্বাধীন ইচ্ছাতেই যখন ইচ্ছা তখন যাবে। কিন্তু ভাবছি তোমরা যাবে কিভাবে! আহমদ মুসা বলল।

এ নিয়ে ভাবনা কেন স্যার? বলল মাহিন।

তোমাদের যাতায়াতও এখন নিরাপদ নয়। হোটেলের সামনে ওঁরা নিশ্চয় পাহারায় আছে। তোমাদেরকেও ওঁরা ধরে নিয়ে যেতে পারে। আমাকে হাতে পাওয়ার এটা তাঁদের একটা কৌশল হতে পারে। আহমদ মুসা বলল।

তাহলে? বলল মারেভা।

ভাবছিল আহমদ মুসা। বলল, ঠিক আছে হোটেলের পেছন দিক দিয়ে চলে যাবার ব্যবস্থা করছি। হোটেলের কেউ একজন তোমাদেরকে হোটেলের পেছন দিকের পথ দেখিয়ে দেবে।

বলে একটু থেমে সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে বলল, একটা কথা, তোমরা এভাবে আমার কাছে আর এসো না। বিপদ তোমাদের এড়িয়ে চলতে হবে। আর আমাকে এখানে কিংবা ঐ হোটেলে নাও পেতে পার। পুলিশ নিষেধ না করলে আমি এখান থেকে অন্য কোন হোটেলে চলে যেতে পারি। টেলিফোন যোগাযোগেও অসুবিধা হতে পারে। আমি ব্যস্ত হয়ে পড়তে পারি। আজকালের মধ্যেই আমি অ্যাটল দ্বীপে যাব।

একা? আমাদের সাথে নেবেন না? জিজ্ঞাসা মাহিনের।

না, মাহিন। আমাকে একাই যেতে হবে, ছদ্মবেশে অথবা সুযোগ হলে ট্যুরিষ্টদের সাথে যেতে পারি। আহমদ মুসা বলল।

কিন্তু স্যার, আপনার সাথে যাওয়ার চাইতে না যাওয়া আমাদের জন্যে বেশি কষ্টকর হবে। বলল মারেভা।

আমার জন্যে এ কষ্ট তোমাদের করতে হবে।

তোমাদের অনেক বিপদে জড়িয়েছি, এখন আর নয়। তবে প্রয়োজন বোধ করলেই তোমাদের ডাকব। আহমদ মসা বলল।

আপনিই ওদের টার্গেন স্যার। আপনি কি করে সেখানে যাবেন? বলল মারেভা। মুখ তার ম্লান। উদ্বেগও তার চোখে-মুখে।

বিপদ তো আছেই! বিপদের মধ্য দিয়েই অগ্রসর হতে হবে। ওদের হাতে ৭৫ থেকে ৭৬ জন্য বিজ্ঞানী-বিশেষজ্ঞ বন্দী আছে। ওদের বিপদ আমার বিপদের চেয়ে বেশি। মাহিন, মারেভা! জীবন বাজী রেখে অগ্রসর না হলে ওদের বাঁচানো যাবে না। বলল আহমদ মুসা। তার কণ্ঠ নিরব, শান্ত, হৃদয়স্পর্শী।

আপনি ঠিকই বলেছেন স্যার। কিন্তু আমরা উদ্বেগে থাকব। বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলল মারেভা।

মাহিনের চোখও অশ্রুশিক্ত।

তাদের অশ্রু আহমদ মুসাকেও স্পর্শ করল। তাহিতির মত দূরতম স্থানে এসেও মারেভা-মাহিনের মত ভাইবোন পেয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল। অজান্তেই তার দুই চোখের কোণ ভিজে উঠেছিল। বলল, মাহিন মারেভা, যুদ্ধক্ষেত্রের জন্যে বড় ভাইকে অশ্রু দিয়ে নয়, হাসি দিয়ে বিদায় দিতে হয়, বিশেষ করে মুসলমানদের এটা একটা ঐতিহ্য।

আমাদের বিশ্বাস, জ্ঞান কোনটাই অমন শক্ত নয়। আমাদের মাফ করুন। বলল মারেভা ও মাহিন।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, নিজেকে ছোট মনে করা বড় হওয়ার সিঁড়ি মারেভা। যাক। আমি হোটেলের কাউকে ডেকে বলে দিচ্ছি, সে তোমাদের হোটেলের পেছন দরজা দিয়ে বের করে দেবে। এদিকের সব ঠিকঠাক করে আমিও বের হবো।

বলে আহমদ মুসা টেলিফোনে হোটেলের একজন অফিসারকে কল করল।

টেলিফোন রেখেই আহমদ মুসা মারেভাদের বলল, তোমরা এখন কোথায় যাবে, কোন রুটে যাবে?

আমি মারেভাকে তার বাড়িতে রেখে আমার বাড়িতে যাব। এখান থেকে সোজা গিয়ে হাইওয়েতে উঠব। সেখান থেকে আমার বাড়িতে সোজা পথ একটাই, সেটা আপনি জানেন। রুট সম্পর্কে কি আপনি কিছু বলতে চান স্যার? বলল মাহিন।

না মাহিন...। কথা শেষ হলো না আহমদ মুসার। দরজায় নক হলো।

আহমদ মুসা কথা বন্ধ করে বলল, হোটেলের লোক এসে গেছে। দরজা খুলে দাও।

হোটেলের একজন কর্মচারী ঘরে ঢুকল।

আহমদ মুসা তাকে সব বুঝিয়ে বলল এবং বলল, চল, আমিও এগিয়ে দিয়ে আসব।

আহমদ মুসা পেছনের গেট পর্যন্ত গিয়ে ওদের বিদায় দিয়ে এল।

এসেই সে বিছানায় গা এলিয়ে দিল জুতাসহ পা খাটের নিচে রেখে।

শুয়েই মনে হলো শরীর বিশ্রাম চায়।

চোখ জুড়ে তার তন্দ্রা এসে গিয়েছিল। হঠাৎ মনে হলো ড্রাইভার তেপাও-এর কথা। সে বেচারা তো কার পার্কে বসেই আছে! তাকে তো যেতে বলা হয়নি!

তাড়াতাড়ি আহমদ মুসা উঠে বসল।

বিছানার উপর থেকে মোবাইল নিয়ে আহমদ মুসা তেপাওকে টেলিফোন করল। বলল, স্যরি, তেপাও তুমি অনেক কষ্ট করলে।

না স্যার, কোন কষ্ট হচ্ছে না। আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। আর একটা কথা স্যার। তিনজন লোক হোটেল থেকে বের হওয়ার পর গেটের দিকে চোখ রেখে এখানে ঠায় বসেছিল। গল্প করার ছলে জিজ্ঞাসা করলে বলেছিল, তাদের সাহেব ভেতরে আর তার জন্যে তারা অপেক্ষা করছে। কিন্তু এইমাত্র এসে বলল, তাদের সাহেব চলে যেতে বলেছে। চলে যাচ্ছে তারা। কিন্তু হোটেল থেকে চলে না গিয়ে তারা তড়িঘড়ি হোটেলের পেছন দিকে চলে গেল। ওদের গতিবিধি কিন্তু শুরু থেকেই ভালো লাগেনি।

হোটেলের পেছনে গেছে? ঠিক দেখেছ? দ্রুত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

ঠিক দেখেছি স্যার। বলল তেপাও।

তেপাও, তুমি তাড়াতাড়ি গাড়ি হোটেলের বাইরে নিয়ে একটু দূরে দাঁড় করাও। আমি হোটেলের পেছন দিক দিয়ে আসছি। হোটেলের সামনে ওদের আরও লোক থাকতে পারে। তাড়াতাড়ি কর তেপাও।

বলে আহমদ মুসা কল অফ করে দিয়ে তৈরি হয়ে দ্রুত হোটেলের পেছন দিয়ে বেরিয়ে এল। একটু এসেই গাড়ি পেয়ে গেল। তেপাও অপেক্ষা করছিল। তেপাও সালাম দিল আহমদ মুসাকে।

সালাম নিয়ে গাড়িতে উঠে বসে আহমদ মুসা বলল, তুমিও ইসলাম গ্রহণ করেছ তেপাও?

কিভাবে গ্রহণ করতে হয় জানি না। মারেভা, মাহিন সাহেবরা যা শিখিয়েছে আমি তা ঠিক ঠিক করি। আর কি করতে হবে বলুন স্যার। তেপাও বলল।

আমাদের ধর্মের কি তোমার ভাল লেগেছে, তেপাও? বলল আহমদ মুসা।

স্রষ্টা এক, এটা আমার খুব ভালো লেগেছে স্যার। আরেকটা বিষয় হলো, স্রষ্টার পূজা-আরাধনা সকলের জন্যে সমান ও সকলে স্বাধীনভাবে এটা করতে পারে। হাটে-মাঠে-ঘাটে-মন্দিরে সর্বত্র এবং এটা প্রতিদিনের বিষয়। কিন্তু সবচেয়ে বড় বিষয় হলো আপনি। আপনার মধ্যে ধর্মের যে ছবি দেখেছি, সেটা আমরা গ্রহণ না করে পারিনি স্যার। তেপাও বলল।

ধন্যবাদ তেপাও। ইসলাম হলো মানুষের স্বভাব-ধর্ম। মানুষের বিবেক যা বলে, ইসলাম তাই করতে বলে। বিবেক হলো মানব-মন ও মানব-মস্তিষ্কের জন্যে স্রষ্টার দেয়া বিধিবদ্ধ একটা প্রকৃতি। আল্লাহর বাণীবাহক বা মেসেঞ্জাররা দুনিয়াতে আসেন এই মানব প্রকৃতিকে সাহায্য ও শক্তিশালী করা জন্যে। সুতরাং যারা সত্য ধর্ম সঠিকভাবে মেনে চলে তারাই সত্যিকার মানুষ হয়। তেপাও, আমি সেই মানুষ হবার চেষ্টা করি মাত্র। বলল আহমদ মুসা।

সত্যিই আপনি আপনার আচরণের মত সুন্দর কথা বলেন স্যার, যদিও সব কথা বুঝা আমার জন্যে কঠিন হয়। তেপাও বলল।

গাড়ি ষ্টার্ট আগেই দিয়েছিল তেপাও। বলল, কোথায় যাব স্যার?

মারেভা ও মাহিন বাড়ি যাচ্ছে। ওদের ফলো করতে হবে। সোজা দক্ষিণের পথটা ধরে হাইওয়েতে ওঠ। তারপর মারেভা ও মাহিনের বাড়ি। তোমার কথা সত্য হলে শত্রু তাদের ফলো করছে। মারেভারা বিপদে পড়তে পারে। আহমদ মুসা বলল।

বুঝেছি স্যার, মাহিন ও মারেভা ম্যাডাম তাহলে হোটেলের পেছন দরজা দিয়ে বের হয়েছিল। শয়তানরা সামনের মত পেছনেও পাহারায় ছিল এবং সামনের ও পেছনের লোকরা একত্র হয়ে তাদের ফলো করেছে।

হ্যাঁ, তেপাও, এটাই ঘটনা। যতটা সম্ভব জোরে চালাও। ওদের ধরতে হবে। বলল আহমদ মুসা।

মাহিন সাহেব ও মারেভা ম্যাডামকে টেলিফোন করে সাবধান করে দেয়া যায় না স্যার? ওরা কোথায় এখন তা জানাও যাবে। তেপাও বলল।

ধন্যবাদ তেপাও। বিষয়টা আমার খেয়ালই হয়নি।

বলেই আহমদ মুসা কল করল মাহিনকে।

মাহিন ওপ্রান্ত থেকে বলল, বলুন স্যার, কোন খবর, কোন নির্দেশ?

তোমরা কি তোমাদের পেছন দিকে লক্ষ রেখেছ?

আমি মনে করছি, একটা গাড়ি তোমাদের ফলো করছে। আহমদ মুসা বলল।

এখন থেকে লক্ষ্য রাখছি স্যার। ওরাই কি ফলো করছে? বলল মাহিন।

হ্যাঁ ওরাই। শোন মাহিন, ওরা সংখ্যায় কম পক্ষে চারজন। তার উপর ওদের হাতে অস্ত্র আছে। প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে ওরা এখন পাগল। সুতরাং কোনভাবেই ওদের হাতে পড়া তোমাদের চলবে না। তোমরা....।

আহমদ মুসার কথার মধ্যেই মাহিন বলে উঠল, স্যার, ছোট মাইক্রো ধরনের একটা গাড়ি আমাদের ফলো করছে বলে মনে হচ্ছে। এখনও দেড়শ ২শ' গজ পেছনে আছে।

মাহিন, তোমরা তো এখনও হাইওয়ে পাওনি! এ রাস্তায় কোন বড় সুপার মার্কেট আছে? জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

জি স্যার, আমরা এখনও দক্ষিণমুখী রাস্তায়। তবে আমাদের সামনেই হাইওয়ে। দু'এক মিনিটের মধ্যেই হাইওয়ের ক্রসিং-এ আমরা পৌঁছে যাব। সেখানে বড় সুপার মার্কেট আছে স্যার। মাহিন বলল।

সুপার মার্কেটটি মোড়ের বামে মানে তোমাদের গাড়ির লাইনে পড়ে কিনা? বলল আহমদ মুসা।

জি স্যার, হাতের বামে। মাহিন বলল।

শোন, তোমরা মোড়ে গিয়ে সুপার মার্কেটের কারপার্কে গাড়ি পার্ক করেই দ্রুত সুপার মার্কেটে ঢুকে যাও। তারপর...।

আহমদ মুসার কথায় বাধা দিয়ে মাহিন বলে উঠল, ওরাও তো সুপার মার্কেটে ঢুকে যাবে এবং আমাদের ধরে আনতে পারবে।

হ্যাঁ, পারবে। কিন্তু ততক্ষণে সুপার মার্কেটের কারপার্কিং-এ আমরাও পৌঁছে যাব। আমরা এই সময়টুকুই চাই। তোমরা সুপার মার্কেটে ঢুকলে সেই সময় আমরা পেয়ে যাব। আহমদ মুসা বলল।

মারেভাকে নিয়েই চিন্তা স্যার। বলল মাহিন।

ভয় নেই মাহিন। মার্কেটে ঢুকে ওরা তোমাদের ধরে আনবে, এর জন্যে মানসিকভাবে তোমরা প্রস্তুত থাক। কিন্তু ওরা মার্কেটে না ঢুকে কার পার্কিং-এ তোমাদের জন্যে অপেক্ষাও করতে পারে। আহমদ মুসা বলল।

আচ্ছা স্যার, এখন আর ভয় করছে না। আপনার জন্য অপেক্ষা করব আমরা। বলল মাহিন।

আমরা আসছি। তুমি ড্রাইভারকে গাড়ি জোরে চালাতে বল। ওরা কারপার্কে পৌঁছার আগে অন্তত তোমরা সুপার মার্কেটের গেটে পৌঁছেছ, এটা নিশ্চিত হওয়া চাই। আর একটা কথা, ওরা মার্কেটে ঢুকে যদি তোমাদের কিডন্যাপ করতে চায়, তাহলে কিডন্যাপের সময় হৈ চৈ, চিৎকার করে এ কথা জানান দেবে, ওরা তোমাদের কিডন্যাপ করছে। এটা আমাদের সাহায্যে আসবে। আহমদ মুসা বলল।

ইনশাআল্লাহ স্যার। দোয়া করুন। বলল মাহিন।

আমিন! 'আল্লাহ হাফেজ!' বলে আহমদ মুসা কল অফ করে দিল।

# ৫

আহমদ মুসাদের গাড়ি যখন সে সুপার মার্কেটের কারপার্কিং-এ প্রবেশ করছিল, তখন ওরা তিনজনে ধরে মাহিনকে চ্যাং দোলা করে গাড়িতে তুলছিল।

আহমদ মুসা মাহিনকে গাড়িতে তুলতে দেখল। বুঝল মারেভাকে আগেই গাড়িতে পুরা হয়েছে। মারেভার চিৎকারও শোনা যাচ্ছে।

মারেভা ও মাহিনের 'বাঁচাও বাঁচাও' চিৎকার চারদিকের পরিবেশকে সত্যিই আতংকিত করে তুলেছে। আসলেই তারা অভিনয় করছে না, আতংকগ্রস্ত হয়ে বাঁচার জন্যে চিৎকার করছে। নিখুঁত অভিনয় ও বাস্তব আচরণের মধ্যে আসলেই বোধ হয় কোন পার্থক্য নেই।

তাদের চিৎকারে সুপার মার্কেটের সামনে অনেক লোক জমেছে। মার্কেটের ভেতর থেকেও লোক বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু কেউ কিছু করছে না। তাদের দিকে ষ্টেনগান তাক করে আছে কিডন্যাপারদের সহচর একজন। তারা আগে ফাঁকা গুলিও ছুঁড়েছে। তাতেই আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েছে সকলে।

গাড়ি থামতেই আহমদ মুসা গাড়ি থেকে নামল। তার ডান হাতে রিভলবার।

বের হয়েই আহমদ মুসা বিরভলবার তুলল ষ্টেনগানধারীর উদ্দেশ্যে। বলল, ষ্টেনগান ফেলে দাও। আমি এক আদেশ দু'বার দেই না।

ষ্টেনগানধারী চরকির মত বোঁ করে ঘুরে দাঁড়াল। তার ষ্টেনগানের নলও ঘুরে এল আহমদ মুসার উদ্দেশ্যে অবিশ্বাস্য দ্রুততার সাথে। তারও আঙ্গুল ষ্টেনগানের ট্রিগারে।

আহমদ মুসা আত্মরক্ষার জন্যে মুহূর্তও সময় নষ্ট করেনি। ঠিক সময়েই তার তর্জনি চেপে বসেছে ট্রিগারে। ষ্টেনগানধারীর ষ্টেনগানের নলের গা ঘেঁষে বুলেটটি লোকটির বাঁ বুকে গিয়ে বিদ্ধ হলো।

যারা মাহিনকে গাড়িতে ঢুকাচ্ছিল, তারাও ঘুরে দাঁড়িয়েছে। তার তাদের গুলিবিদ্ধ সাথীর দিকে একবার তাকিয়ে দ্রুত পকেট থেকে রিভলবার বের করেছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই তারা আহমদ মুসার টার্গেটে পরিণত হয়েছে।

আহমদ মুসা ষ্টেনগানধারীকে গুলি করেই ওদের তিনজনকে টার্গেট করেছে। ওদেরকে রিভলবার বের করতে দেখে আহমদ মুসা বলল, তোমরা রিভলবার ফেলে দাও, তা না হলে তোমাদেরকেও এই সাথীর মত...।

আহমদ মুসা কথা শেষ করতে পারলো না। ওদের রিভলবার তাকে টার্গেট করে উঠে আসছে দেখে আহমদ মুসা রিভলবারের ট্রিগার টিপে দিল পর পর তিনবার। কিন্তু সর্ববামের লোকটির ক্ষেত্রে টার্গেট মিস হলো। তার বাম কাঁধে গুলি লাগল। সে গুলি চালাবারও সুযোগ পেয়েছিল, কিন্তু আহমদ মুসার গুলি গিয়ে আঘাত করল আহমদ মুসার বাম বাহুসন্ধির উপরের অংশে। অদ্ভুত ষ্ট্যামিনা লোকটির! নিজের গুলিবিদ্ধ কাঁধের দিকে কোন খেয়াল নেই তার। প্রথম গুলিটা টার্গেটে লাগেনি দেখে রিভলবারসমেত তার ডান হাত উঠে আসছিল আহমদ মুসার লক্ষে।

কিন্তু আহমদ মুসা তা হতে দিল না। তার রিভলবার এই তৃতীয় টার্গেটের দিকে তাক করাই ছিল। শুধু ট্রিগার টেপার বাকি। ট্রিগার টিপে দিল সে। আহমদ মুসার লক্ষ এবার ছিল লোকটির ডান হাত।

ওদের একজনকে জীবন্ত ধরার প্রয়োজন ছিল খুব বেশি। কিন্তু সে সুযোগ এ পর্যন্ত হয়নি। এবারের সুযোগটিকে সে কাজে লাগাল।

আহমদ মুসার গুলি গিয়ে লোকটির একবারে কবজিতে বিদ্ধ হলো। তার হাত থেকে রিভলবার পড়ে গেল।

লোকটি সাংঘাতিক বেপরোয়া!

রিভলবারটি গুলিবিদ্ধ ডান হাত থেকে খসে পড়ার সাথে সাথে সে বসে পড়ল এবং বাম হাত দিয়ে রিভলবারটি তুলে নিল।

তার গুলিবিদ্ধ ডান কাঁধের অসম্ভব যন্ত্রণা সে উপেক্ষা করে রিভলবার বাম হাতে তুলে নিয়ে আহমদ মুসাকে টার্গেট করার চেষ্টা করল।

তার রিভলবার উঠে আসছিল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা নিরুপায়। গুলি করে লোকটির বাম হাতটা নিস্ক্রিয় করে দেয়াই আহমদ মুসার বাঁচার উপায়।

আহমদ মুসার রিভলবার লোকটির দিকে তাক করাই ছিল। ট্রিগার টিপল শুধু।

গুলিটি গিয়ে বিদ্ধ করল লোকটির ডান বাহুকে। রিভলবারসমেত তার বাম হাত আছড়ে পড়ল মাটিতে।

লোকটি সম্ভবত তার হতাশা ও ব্যর্থতায় মাটিতে শুয়ে পড়ল।

মাহিন ও মারেভা আগেই গাড়ির ওপাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গাড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। আতংকগ্রস্ত তাদের চোখ-মুখ। আহমদ মুসার বাম বাহুসন্ধিতে গুলি লাগতে দেখে দু'জনেই যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠেছিল, যেন গুলিটা তাদের লেগেছে।

গুলি বন্ধ হতেই মাহিন ও মারেভা দু'জন ছুটে গেল আহমদ মুসার কাছে।

ওদিকে সুপার মার্কেটের সামনের লোকরা গুলি শুরু হলে কেউ সুপার মার্কেটের ভেতরে সরে গিয়েছিল, কেউ সুপার মার্কেটের সিঁড়িতে শুয়ে বা বসে ছিল। গুলি বন্ধ হলে তারা সবাই বেরিয়ে এল। সবাই হাততালি দিয়ে কিডন্যাপিং থেকে মাহিন ও মারেভার উদ্ধার পাওয়াকে স্বাগত জানাল।

তেপাও এসে আহমদ মুসার পাশে দাঁড়িয়েছে।

তেপাও, মাহিন, তোমরা এস, লোকটিকে আমাদের গাড়িতে তোল। কুইক।

তেপাও মাহিনকে এ নির্দেশ দিয়ে আহমদ মুসা মারেভাকে বলল, তুমি তোমাদের ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে এস। ট্যাক্সিওয়ালাকে না পেলে টাকা তার ট্যাক্সির উপরে রেখে এস।

কথা শেষ করে আহমদ মুসা হাততালি দেয়া উৎসুক, অপেক্ষমাণ লোকদের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, প্লিজ, আপনারা শুনুন, আহত লোকটির অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন। তাকে অবিলম্বে হাসপাতালে নেয়া প্রয়োজন। কিডন্যাপিং-এর শিকার তরুণ-তরুণীকেও এখানে রেখে যাওয়া সম্ভব নয়। হতে পারে তাদের বিপদ এখনও কাটেনি। তাই তাদেরকেও সাথে নিয়ে যাচ্ছি। পুলিশ

এসে যাবে। আপনারা যা দেখেছেন, দয়া করে তা পুলিশকে জানাবেন। ধন্যবাদ সকলকে।

উপস্থিত লোকেরা হাততালি দিয়ে আহমদ মুসার কথার জবাব দিল।

আহমদ মুসা গাড়িতে উঠে বসল। গাড়ি চলতে শুরু করল।

তেপাও সামনের বাঁক ঘুরে গাড়ি একটু দাঁড় করাবে। আহমদ মুসা বলল।

গাড়িটা বাঁকে এসে বাঁক ঘুরে একটা সেফ ল্যান্ডিং দেখে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির দরজা বন্ধ করে গাড়ির পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। কল করল তাহিতির স্বরাষ্ট্র সচিব ও পুলিশপ্রধান ফরাসি পুলিশ সার্ভিসের প্রধান সেই অফিসারকে। মাহিন ও মারেভার কিডন্যাপিং নিয়ে যা যা ঘটল সংক্ষেপে আহমদ মুসা সব জানাল তাকে এবং বলল, আমি আহত লোকটিকে গাড়িতে তুলে নিয়ে আসছি। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা আমার খুব জরুরি। এই প্রথম ওদের একজনকে জীবিত ধরা গেছে। তার কাছ থেকে কিছু কথা নেয়া আমার দরকার। কিন্তু আইন অনুসারে তাকে থানায় দেয়া দরকার অথবা হাসপাতালে নিয়ে পুলিশকে জানানো উচিত। আপনার পরামর্শ চাই স্যার।

মি. আহমদ মুসা, ঘটনাস্থলে কোন পুলিশ ছিল? বলল স্বরাষ্ট্র সচিব ও পুলিশপ্রধান।

জি না। আহমদ মুসা বলল।

যে গাড়ি ব্যবহার করছেন, তা কোন পুলিশ নিশ্চয় দেখেনি। বলল স্বরাষ্ট্র সচিব ও পুলিশপ্রধান।

দেখেনি। আহমদ মুসা বলল।

ঘটনাস্থলের লোকজন গাড়ির নাম্বার নিশ্চয় দেখেনি বা নেয়নি? জিজ্ঞাসা স্বরাষ্ট্র সচিব ও পুলিশপ্রধানের।

সেটা বলা মুশকিল স্যার। আহমদ মুসা বলল।

ঠিক আছে জানলেও ক্ষতি নেই। একটা কাজ করুন। আপনা গাড়ি এখন কোথায়? জিজ্ঞাসা স্বরাষ্ট্র সচিব ও পুলিশপ্রধানের।

অ্যাভেনিউ পোমা'তে উঠে পূর্ব দিকে যাচ্ছি। আমরা পাতোতোয়ার হোটেল প্যাসেফিক ইন্টারন্যাশনাল থেকে এসে পোমা সুপার মার্কেটটির পাশ দিয়ে অ্যাভনিউ পোমা'তে উঠেছি। আহমদ মুসা বলল।

ঠিক আছে। ভালোই হলো। আপনাদের সামনেই মায়েভা থানা। আপনার সাথে আর কয়জন আছে? জিজ্ঞাসা স্বরাষ্ট্র সচিব ও পুলিশ প্রধানের।

আমাদের ড্রাইভার তেপাও, মাহিন ও মারেভা। আহমদ মুসা বলল।

আপনি গাড়িটা ছেড়ে দিন। ওরা আহত লোকটিসহ গাড়ি নিয়ে এগোক ধীরে ধিরে। আর আপনি অন্য একটি গাড়ি নিয়ে সোজা মায়েভা থানায় চলে যান। সেখানে সব ঘটনা খুলে বলুন এবং শেষে বলুন, আপনি গুলিবিদ্ধ আহত লোকটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিলেন। কিছু দূর এগোবার পর একটি মাইক্রো আপনার সামনে এসে দাঁড়ায় এবং আপনাকে আহত করে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়ে গাড়িশুদ্ধ আহত লোকটিকে নিয়ে গেছে। আপনি থানায় গিয়ে এই ডাইরিটি করুন। থানা সন্দেহজনকভাবে আপনাকে কিছু করতে আসবে না। আমিও মিনিট পনের পরে থানায় টেলিফোন করব। থানা থেকে বেরিয়ে তারপর আহত লোকটিকে নিয়ে কোন নিরাপদ স্থানে চলে যান। আপনার প্রয়োজন পূরণে যা ইচ্ছা তাই করুন।

বলে থামল স্বরাষ্ট্র সচিব ও পুলিশপ্রধান। মুহূর্ত কয়েক চুপ থেকে আবার বলল, সেরকম নিরাপদ জায়গা আছে আপনাদের?

সে রকম নেই। তবে ব্যবস্থা একটা করে ফেলব। আহমদ মুসা বলল।

না, তার দরকার নেই। আপনাকে অত কষ্ট করতে হবে না। আপনি আহত লোকটিকে নিয়ে সোজা আমার এখানে চলে আসুন। এখানে আন্ডারগ্রাউন্ডে আমাদের একটা সেল আছে। আপাতত সেটা আপনারা ব্যবহার করবেন। বলল স্বরাষ্ট্র সচিব ও পুলিশপ্রধান।

ধন্যবাদ স্যার। আমরা আসছি। আহমদ মুসা বলল।

ওয়েলকাম। আসুন, কথা আপাতত শেষ। গুড বাই আহমদ মুসা। বলে ওপার থেকে কল অফ করে দিলেন।

কল অফ করে আহমদ মুসা ডাকল মাহিনকে।

মাহিন তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে বেরিয়ে আহমদ মুসার কাছে যেতেই সে মাহিনকে নিয়ে গাড়ি থেকে একটু দূরে সরে গেল। তাকে সব কথা বুঝিয়ে বলল। সব কথা শুনে মাহিনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বলল, এই সময়ের জন্যে এর চেয়ে ভাল সলিউশন আর হয় না স্যার।

হ্যাঁ মাহিন, তুমি ঠিক বলেছ। ঠিক আছে মাহিন। যেভাবে বলেছি, সেভাবে কাজ করবে।

বলে আহমদ মুসা গাড়ির জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিয়ে বলল, মারেভা, আমি একটু অন্য জায়গায় যাচ্ছি। তাড়াতাড়ি ফিরব। তোমরা চলতে থাক।

মাহিন উঠে বসেছে গাড়িতে।

গাড়ি তাদের চলতে শুরু করল।

আহমদ মুসা একটা ট্যাক্সি ডেকে তাতে উঠে বসে বলল, সামনে মায়েভা থানায় চল।

জি স্যার, বলে ট্যাক্সি ড্রাইভার তার গাড়িতে ষ্টার্ট দিল।

আহত লোকটির তিনটি ক্ষত স্থানেই ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল আহমদ মুসা খুব যত্নের সাথে। গুলিবিদ্ধ তিন জায়গার কোনটাতেই বুলেট নেই। ঘাড়ের আঘাতটাই বেশি গভীর। কিন্তু সেখানেও বুলেট নেই। ঘাড়ের কিছু গোশত ছিঁড়ে নিয়ে বুলেট বেরিয়ে গেছে।

খুব ভাগ্যবান দেখছি আপনি। ওরা মরেছে, আপনি মরেননি। আর গুলির তিনটি আঘাত বড় হলেও তা মারাত্মক নয়। বুলেট নেই বলে অপারেশনের দরকার হলো না। বলল আহমদ মুসা নরম কণ্ঠে লোকটির দিকে চেয়ে।

লোকটির মধ্যে আগের সেই বেপরোয়া ভাব এখন নেই। আহমদ মুসা ব্যান্ডেজ বাঁধার শুরুতেই লোকটিকে সমবেদনা দেখিয়ে বলেছিল, আমি তোমাদেরকে মারতে বা আহত করতে চাইনি। চেয়েছিলাম তরুণ-তরুণী

দু'জনকে উদ্ধার করতে। আমি তোমাদের বলেছিলাম। অস্ত্র ফেলে দিতে, তাহলে আর এই অঘটন ঘটতো না।

লোকটি কোন জবাব দিল না। কিন্তু আহমদ মুসার দিকে তাকিয়েছিল বিস্ময়ের দৃষ্টিতে। এ ধরনের ব্যবহারে সে অবাক হয়েছে! সে বুঝেছে, যে দু'জনকে তারা কিডন্যাপ করেছিল তারা আহমদ মুসার আত্মীয় বা বন্ধু হবে নিশ্চয়ই। এখনও তারা তো উদ্ধারকারী আহমদ মুসার সাথেই আছে। সে দিক থেকে আহমদ মুসা তার প্রতি যতটা মারমুখো হওয়া দরকার ছিল, ততটা নয়, বরং ব্যাপারটা সমব্যথীর মতো। এটাই ছিল লোকটির বিস্ময়ের কারণ।

আহমদ মুসার কথার উত্তরে এবার লোকটি বলল, আমার এই সৌভাগ্যই আমার জন্যে দুর্ভাগ্যের কারণ হলো।

কেন? বলল আহমদ মুসা।

অনেকের কাছে ব্যর্থতা ক্ষমাহীন অপরাধ। এই সব ক্ষেত্রে ব্যর্থতা নিয়ে বেঁচে যাওয়া দুর্ভাগ্যের। লোকটি বলল।

দুর্ভাগ্যটা কি রকম? বলল আহমদ মুসা।

দুর্ভাগ্যটা মৃত্যু পর্যন্ত গড়াতে পারে। বলল লোকটি।

কথা শেষ করেই লোকটি বলল আবার, কিন্তু এসব প্রশ্ন কেন?

দুনিয়াতে কত ধরনের লোক আছে, হত ধরনের দল, গ্রুপ আছে, তা জানার একটা কৌতুহল এটা। আচ্ছা, আপনার নাম কি?

লোকটি তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, নামের কি প্রয়োজন?

প্রয়োজনের প্রশ্ন নয়। মানব সমাজের একটা সাধারণ রীতি হলো কারো সাথে দেখা, লেনদেন বা পরিচয় হলে তার নাম জিজ্ঞাসা করা হয়।

লোকটি আহমদ মুসার দিকে আবার চোখ তুলে তাকাল। আহমদ মুসার মধ্যে শত্রু ধরনের কোন ছবি খুঁজে সে পেল না। আহমদ মুসাকে সহজ, সরল, স্বচ্ছ লোক বলে মনে হলো তার কাছে। আর তার যুক্তি ঠিক। এক্ষেত্রে নাম না বলাটাই বরং বেমানান। লোকটি বলল, আমার নাম মফ ফ্লেরি।

আপনাকে দেখে তো সহজ সরল বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু আমার এই ভাই-বোনকে আপনারা কিডন্যাপ করতে চেয়েছিলেন কেন? আহমদ মুসা খুব নরম কণ্ঠে বলল।

লোকটি কোন উত্তর দিল না। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, ওরা দুইজন কি সত্যিই আপনার ভাই-বোন?

শুধু ভাই-বোন নয়, ভাই-বোনের চেয়েও বড়। আহমদ মুসা বলল।

লোকটি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তাকাল আবার আহমদ মুসার দিকে। ভাবছে সে আহমদ মুসাকে নিয়েই। এই লোক ইচ্ছা করলে আমাকে মেরে ফেলতে পারতো, পুলিশের হাতেও তুলে দিতে পারতো। এসব কিছূ না করে সে আমার ক্ষত স্থান পরিষ্কার করেছে, সেলাই দিয়েছে এবং তাতে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছে। নিজের আহত স্বজনের মতই সে আচরণ করছে আমার সাথে।

এসব চিন্তা করেই বলল, তাদের ধরার মধ্যে আমাদের ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ ছিল না। আমরা নির্দেশ পালন করেছি মাত্র।

নির্দেশ কার ছিল? আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

আমরা নির্দেশ পেয়েছিলাম, 'ম্যাডাম গৌরী' নামে এক কর্মকর্তার কাছ থেকে। লোকটি বলল।

কিসের কর্মকর্তা তিনি? বলল আহমদ মুসা।

লোকটি অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, সে সংগঠনের নাম নেয়া তাদের জন্যে নিষেধ। মাফ করুন স্যার আমাকে।

আহমদ মুসা মনে মনে ভাবল, কিসের কর্মকর্তা তা আমরা জানি। তারপর বলল, ঠিক আছে তোমাকে বিপদে ফেলবো না। সংগঠনের নাম শুনতে চাই না। তোমাদের দিয়ে কোথায় কাজ করায়, কি কাজ করায় তারা?

লোকটি বলল, তাহিতি, মুরিয়া, তোয়ামতু দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি স্থানসহ পলিনেশীয়ার সব জায়গায় কাজ করি। কি কাজ করি আমরা তা বলতে পারবো না স্যার। সেটা বললে আমাদের প্রাণ যাবে।

কি কাজ করো সেটা আমরা জানি। সেটা তুমি না বললেও চলে। ঠিক আছে, যদি ক্ষতি হয় বলবে না। কিন্তু একটা বিষয়ে সাহায্য করতে পার।

পলিনেশীয়ার দ্বীপপুঞ্জ ও দ্বীপ সম্পর্কে তোমার অনেক অভিজ্ঞতা। আচ্ছা বল তো ‘মতু’ নামে কোন দ্বীপ আছে? বলল আহমদ মুসা।

কেন, প্রায় সকলেরই জানা, তোয়ামতু দ্বীপপুঞ্জের ‘মতুতুংগা’ অ্যাটলকেই সংক্ষেপে ‘মতু বলা হয়।

ধন্যবাদ মি. মফ ফ্লেরি। ‘মতু’ দ্বীপ বা অ্যাটল নিয়ে খুব আগ্রহ আমার।

আহমদ মুসার কথা শুনে লোকটির ভ্রু কুঁচকে গেল মুহূর্তের জন্য। চোখে-মুখে তার নেমে এল উদ্বেগ ও বিস্ময়। বলল, ‘মতু অ্যাটল নিয়ে আপনার এ আগ্রহ কেন?

সে অনেক কথা। পলিনেশীয় অঞ্চলের একটা রূপকথা শোনার পর থেকেই এই আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। বলল আহমদ মুসা।

রূপকথা? কি রূপকথা? লোকটি বলল।

রাজকুমার হেসানা হোসানা ও সাগরকন্যা ভাইমিতি শাবানুর রূপকথা। ঐ রূপকথায় আছে গডেজ ‘হিনা’ দুই প্রেমিকের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাদের মিলন ঘটিয়েছিলেন মতুতুংগা অ্যাটল দ্বীপে। ঐ অ্যাটল দ্বীপের অভ্যন্তরে একটি প্রাসাদ আছে। সেই প্রাসাদে মিলন হয়েছিল রাজপুত্র ও সাগরকন্যার। যত দিন তারা বেঁচে ছিল ঐ প্রাসাদেই তারা বাস করেছে। আমি মনে করি এই রূপকথা যেমন সত্য ঘটনা, তেমনি প্রাসাদও একটা বাস্তব সত্য। এই কারণেই ‘মতু’ বা ‘মতুতুংগা’ অ্যাটল দ্বীপ আমার স্বপ্নের জায়গা। থামল আহমদ মুসা।

লোকটি মানে মফ ফ্লেরির মুখ থেকে উদ্বেগ ও বিস্ময়ভাব কেটে গেল। স্বস্তির ভাব ফুটে উঠল তার মনে। সে বুঝে নিল, তাদের ‘ক্যাপিটাল অব পাওয়ারে’র খোঁজ এরা জানে না।

আহমদ মুসার কথার উত্তরে কিছু বলল না মফ ফ্লেরি।

আহমদ মুসাই আবার কথা বলল, মি. মফ ফ্লেরি, আমার আগ্রহের কথা নিশ্চয় বুঝেছ। এখন বল, আমার আগ্রহটা ঠিক কিনা।

আগ্রহ ঠিক আছে। কিন্তু প্রাসাদের বিষয়টা রূপকথার মতই কল্পনা। মফ ফ্লেরি বলল।

ব্যাপক অনুসন্ধান ছাড়া কোন দাবী বা বিশ্বাসকে অস্বীকার করা যায় না। মতুতুংগা দ্বীপে তোমার কি এই অনুসন্ধান আছে? বলল আহমদ মুসা।

মফ ফ্লেরি তাকাল আহমদ মুসার দিকে। আহমদ মুসার কণ্ঠে একটা ভিন্ন সুর আঁচ করল সে। তার মনের কোণে একটা ছোট্ট আশংকাও জেগে উঠল। বলল, মতুতুংগাসহ সব দ্বীপ ও অ্যাটলে আমার বিচরণ আছে তাই বলছিলাম, প্রাসাদের বিষয়টা অবাস্তব।

তোমার কথা মানলাম। কিন্তু তোমার এই 'অবাস্তব তত্ত্ব' কি করে প্রমাণ করা যায় বল তো? তোমার এই 'অবাস্তব তত্ত্বে'র প্রমাণ হয়ে গেলে তো আর এ ব্যাপারে কারো মাথা ঘামাতে হতো না। বলল আহমদ মুসা।

একটা বিব্রত ভাব ফুটে উঠল মফ ফ্লেরির চোখে-মুখে। বলল, আমি কি করে বলতে পারি? কথাগুলো ভাসা ভাসা মনে হলো। যেন কথাগুলো মনের গভীর থেকে উঠে আসেনি, কথাগুলোন শেকড় যেন তার মনে নেই!

আহমদ মুসার কানকে এসব ফাঁকি দিতে পারলো না। বলল, তুমি মতুতুংগা অ্যাটলটাকে ভালভাবে দেখেছ বলেই সেখানে প্রাসাদের অস্তিত্বের বিষয়কে 'অবাস্তব' বলতে পেরেছ। সেজন্যেই অবাস্তব প্রমাণ করার উপায়গুলোও তুমিই বলতে পারবে। বল, সেগুলো কি হতে পারে।

সংগে সংগে জবাব দিল না মফ ফ্লেরি। মুহূর্ত কয়েক চুপ থাকার পর বলল, অ্যাটলগুলো হলো ফাঁপা বা সলিড পর্বতপ্রমাণ উঁচু বেজের উপর সংকীর্ণ বা অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত পাড় ঘেরা পুকুর বা হ্রদের মত। অ্যাটলগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কাছাকাছি হয়ে থাকে। সে ক্ষেত্রে একই বেজের উপর অনেক অ্যাটল হতে পারে, যেমন গাছের একই কাণ্ডের উপর অনেক শাখা হয়। এই ধরনের ক্ষেত্রগুলোতে দুই অ্যাটলের মাঝখানের পানি অগভীর হয়ে থাকে। অ্যাটলের এই সব বৈশিষ্ট সামনে রাখলে কোন অ্যাটলের ফাঁপা বেজের মধ্যে প্রাসাদ ধরনের কিছু আছে কিনা পরীক্ষার জন্যে দু'টি উপায় আছে। সহজ উপায়টি হলো, অ্যাটলের পাড় প্রশস্ত হলে সেখান থেকে অথবা পাশের কোন অ্যাটলের প্রশস্ত পাড় থেকে সুড়ঙ্গ কেটে অ্যাটলের ফাঁপা অংশে প্রবেশ করে ভেতরটা দেখা।

আরেকটা উপায় আছে। কঠিন এবং তা হলো, পানির নিচে অ্যাটলের বেজের গায়ে কোন যথোপযুক্ত টেনলজির মাধ্যমে সুড়ঙ্গ করে ভেতরে প্রবেশ করা।

আহমদ মুসার ঠোঁটে সূক্ষ্ম একটা হাসির আভা ফুটে উঠল। বলল, ধন্যবাদ মফ ফ্লেরি, তুমি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছ। যেন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা! তাই নয় কি মফ ফ্লেরি?

আবার সেই বিব্রতকর অবস্থা ফুটে উঠল মফ ফ্লেরির মুখে। ব্যাপারটা অনেকখানি চোর ধরা পড়ার মত।

সংগে সংগে উত্তরদ দিতে পারল না মফ ফ্লেরি।

মফ ফ্লেরির এই অবস্থাকে আহমদ মুসা ইতিবাচক মনে করল। এ ধরনের সুড়ঙ্গ তার দেখার মধ্যে না থাকলে তার আচরণ এমন হতো না, মনস্তত্ত্বের দিক থেকে এটাই স্বতসিদ্ধ।

অবশেষে মফ ফ্লেরি বলল, আমি যা বলেছি, তার বেশি কিছু আমি জানি না।

আহমদ মুসা কোন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করল না। আহমদ মুসা নিশ্চিতই বুঝল সে সত্য কথা বলেনি। তবু এ ব্যাপারে চাপ না দিয়ে বলল, তুমি যাদের সাথে বা যে সংগঠনের সাথে আছ, সেটা কত বছর?

তিন বছর। বলল মফ ফ্লেরি।

তোমাকে খুব বুদ্ধিমান ও সচেতন বলে মনে হচ্ছে। তুমি পেশায় আসলে কি? জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

পেশায় মেরিন ইঞ্জিনিয়ার ছিলাম। বলল মফ ফ্লেরি।

সে তো মূল্যবান পেশা! কিন্তু এখন তো দেখা যাচ্ছে তুমি কিডন্যাপিং পেশায় নেমেছ। আহমদ মুসা বলল।

মফ ফ্লেরি মুখ তুলে আহমদ মুসার দিকে তাকাল। তার চোখে-মুখে একটা অস্বস্তির ছাপ। বলল, প্রয়োজনে নির্দেশ মত আমাদের সব কাজই করতে হয়। তবে মূলত সংগঠনের মেরিন সাইডটায় আমি কাজ করি।

তাহলে দলের অনেক সারফেস শীপ ও বোট আছে? বলল আহমদ মুসা।

কিছু তো আছেই। মফ ফ্লেরি বলল।

দলের আন্ডারওয়াটার ভেহিকল অর্থাৎ সাবমেরিন জাতীয় ভেহিকেল নেই? জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

চমকে উঠল মফ ফ্লেরি। দুই চোখ ছানাবড়া করে তাকাল আহমদ মুসার দিকে!

কথা বলার খেই যেন হারিয়ে ফেলেছে মফ ফ্লেরি! কোন কথা বলল না সে।

আবার মিথ্যা বল। বল যে, সাবমেরিন জাতীয় কোন ভেহিকেল দলের নেই! আহমদ মুসাই আবার বলল। আহমদ মুসার ঠোঁটে হাসি।

মফ ফ্লেরি নির্বাক হয়ে গেছে। কোন কথাই সে বলতে পারল না। তার চোখের দৃষ্টির মধ্যে একটা অসহায়ত্ব আছে। তার মনে একটা কথা তোলপাড় করে উঠছে, কে এই লোক! আমাদের সব বিষয় সে জানে কি করে!

আবারও কথা বলল আহমদ মুসাই। বলল, একটা গোপন দলের সাথে তুমি শামিল হলোও তোমাকে সরল, সহজ মনে করেছিলাম। কিন্তু দেখছি তুমি খুব সহজভাবে মিথ্যা কথা বলতে পার। মতুতুংগার সৃড়ঙ্গ সম্পর্কে তুমি জান না, এই মিথ্যা কথা কেন বললে?

লোকটি অনেকখানি মুষড়ে পড়েছে। বলল, গোপনীয়তা রক্ষার জন্যে আমাদের শপথ করতে হয়। আত্মরক্ষার জন্যেই আমি মিথ্যা বলেছি। শপথ কেউ ভাঙলে তার মৃত্যুদণ্ড হয়, এটা দলের অপরিবর্তনীয় বিধান। আহমদ মুসার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তার বুক থেকে অনিশ্চয়তার একটা পাহাড় যেন নেমে গেল! মতুর প্রাসাদে ঢোকার সুড়ঙ্গ তাহলে সত্য এবং প্রাসাদও সত্য!

আপনি সব জেনেও আমাকে প্রশ্ন করছেন, এর অর্থ আমি বুঝলাম না। বলল মফ ফ্লেরি।

দেখছিলাম যে, তুমি কি বল। অরেকটা জিনিস, মতুতুংগা অ্যাটলের পশ্চিমে কোন অ্যাটল নেই। উত্তরের অ্যাটলটা বেশ দূরে। তাদের মধ্যে কমন সংযোগ নেই। বাকি থাকে পূর্ব ও দক্ষিণ। এই দুই দিকে মতুতুংগার কাছাকাছি চারটি অ্যাটল আছে অর্থাৎ তাহানিয়া, টেপোটো, হিতি ও তোয়ানেকে। এই চারের মধ্যে ‘হিতি’ অ্যাটলের সাথে মতুতুংগার কমন বেজ নেই। অনুরূপভাবে

‘টোপোটো’ ও ‘তোয়ানেকে’ অ্যাটলের সাথেও মতুতুংগার কমন বেজ নেই। এই তিন অ্যাটল ও মতুতুংগার মাঝখানে বরং খাদের উত্তর প্রান্ত ঘুরে মতুতুংগা পর্যন্ত উঁচু ও সংযুক্ত একটা বেজ রয়েছে। কিন্তু টোপোটো অ্যাটলটি এতই ক্ষুদ্র ও ডোবা যে, সেখান থেকে সংযোগ সুড়ঙ্গ মতুতুংগা পর্যন্ত হতে পারে না। বাকি থাকে বড় আকারের তাহানিয়া অ্যাটল। এর পশ্চিম তটরেখার দক্ষিণ প্রান্ত বেশ প্রশস্ত ও উঁচু যেখানে কনষ্ট্রাকশন সম্ভব। এ প্রান্ত থেকে মতুতুংগা পর্যন্ত কিছুটা সংকীর্ণ হলেও উঁচু একক একটি বেজ লাইন চলে গেছে। এখন তুমি বল, সুড়ঙ্গের যে তত্ব দিয়েছ তাতে মতুতুংগার প্রাসাদে ঢোকার সুড়ঙ্গ কোন অ্যাটল থেকে হতে পারে?

দীর্ঘ বক্তব্য দিয়ে থামল আহমদ মুসা।

মফ ফ্লেরি হাঁ করে স্তম্ভিত দৃষ্টিতে দেখছিল আহমদ মুসাকে। সে ভেবে পাচ্ছে না অ্যাটলগুলো সম্পর্কে আহমদ মুসা এত বিস্তারিত তথ্য জানে কি করে! বহুদিন আমি ঘুরছি এ অঞ্চলে, কিন্তু এর সব কথা আমার জানা নেই। আসলে দেখছি সব জানে এই লোকটা। প্রাসাদের ভেতরের কথাও কি সে জানে? কেঁপে উঠল মফ ফ্লেরির বুকটা। আসলে ভেতরে কি আছে, কি ঘটে তার সব কিছু তারাও জানে না। শুধু অচেনা, অজানা লোকদের সেখানে ঢুকতে দেখে, তাদেরকে আর কখনো বের হতে দেখে না। এই লোকটি সে বিষয়েও কি জানে? কিন্তু কিভাবে?

মফ ফ্লেরির নিরব ও বিষ্ময়াবিষ্ট হয়ে হাঁ করে থাকতে দেখে আহমদ মুসা বলল, আমার কথায় অবাক হবার কিছু নেই। সবই তো তুমি জান! তোমার জানা বিষয়টা জানালে আমি উপকৃত হবো। প্লিজ বল।

আপনি সবই জানেন স্যার, এরপরও প্রশ্ন করছেন? আপনি তো অবস্থার পর্যালোচনা করে বলেই দিয়েছেন মতুতুংগা অ্যাটলের সুড়ঙ্গ কোন অ্যাটল থেকে আসতে পারে। আসলেই এর কোন বিকল্প নেই। বলল মফ ফ্লেরি।

হাফ ট্রুথ মানে অষ্পষ্ট সত্য কিন্তু সত্য নয়। তুমি পরিষ্কার করে বল। তুমি যার বিকল্প নেই বললে, সেটা প্রতক্ষদর্শীর কাছে সত্য এটা কিনা?

নিচু করে রাখা মুখ তুলল মফ ফ্লেরি। একটা ভীতি ও অসহায় ভাব তার চোখে-মুখে। বলল, হ্যাঁ তাই স্যার। আপনি সব জানার পরেও কেন এসব কথা বারবার বলছেন স্যার?

আমি তোমার পরীক্ষা নিচ্ছি বলতে পার। আচ্ছা, এতক্ষণ আমি বলেছি, এবার তুমিই বল, সুড়ঙ্গটির মুখ কোথায়?

সেটাও তো আপনিই বলে দিয়েছেন। তাহানিয়া দ্বীপের পশ্চিম তটরেখার দক্ষিণ প্রান্ত এলাকা কনষ্ট্রাকশনের জন্যে উপযুক্ত। উত্তর তো এখানেই আছে স্যার। বলল মফ ফ্লেরি।

খুশি হলো আহমদ মুসা। সে অবশ্যই মিথ্যা বলেনি। সুড়ঙ্গের মুখ তাহানিয়ার পশ্চিম তটরেখার দক্ষিণ প্রান্তেই রয়েছে। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল আহমদ মুসা।

উঠে দাঁড়াল সে। বলল, মি. মফ ফ্লেরি, আমি আসছি।

বলে পাশের ঘরে প্রবেশ করল আহমদ মুসা।

সে ঘরে দরজার পাশেই বসে ছিল মারেভা ও মাহিন।

তারাও ওঠে দাঁড়াল। বলল, ধন্যবাদ স্যার, কথা আদায় করার ক্ষেত্রেও দুনিয়ায় নিশ্চয় আপনার কোন জুড়ি নেই। কোন বকাবকি, হুমকি-ধমকি ও গায়ে হাত তোলা ছাড়াই আপনার যা প্রয়োজন সবই আদায় করে নিলেন অদ্ভুত কৌশলে। আবারও ধন্যবাদ স্যার। বলল মারেভা।

আমাকে ধন্যবাদ না দিয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর। ভালোবাসা, মমতার চেয়ে বড় অস্ত্র দুনিয়ায় আর নেই। সে আমাকে শত্রু মনে করেনি এবং আমার কথাবার্তায় সে বিশ্বাস করে নিয়েছে আমি তাদের সব কিছু জানি। আমার জানা বিষয় তাই প্রকাশ করতে সে দ্বিধা করেনি। থাক, এসব কথা। আমি যাচ্ছি স্বরাষ্ট্র সচিব সাহেবের কাছে। বলে আহমদ মুসা হাঁটতে শুরু করল। মারেভা ও মাহিনও ঘর থেকে বের হবার জন্যে হাঁটতে শুরু করল।

পিএস গিয়ে স্বরাষ্ট্র সচিবকে বলল, স্যার, আহমদ মুসা নামে একজন ভদ্রলোক এসেছেন। আপনার সাথে দেখা করতে চান।

শুনেই স্বরাষ্ট্র সচিব উঠে দাঁড়াল। বলল, ভদ্রলোককে নিয়ে আসি।

পিএস বিস্মিত হয়ে একবার স্বরাষ্ট্র সচিবের দিকে তাকাল। স্যার, নিজে যাবেন তাকে স্বাগত জানাতে? বলল, আপনি বসুন স্যার। আমি তাকে নিয়ে আসছি।

না, সে খুব মূল্যবান মানুষ। ফরাসিদের জামাই। তাছাড়াও তার আরও বড় পরিচয় আছে। বলে স্বরাষ্ট্র সচিব হাঁটতে শুরু করল।

পিএস-এর কক্ষে গিয়ে স্বরাষ্ট্র সচিব ও পুলিশ প্রধান স্বাগত জানালো আহমদ মুসাকে।

আহমদ মুসাকে নিয়ে স্বরাষ্ট্র সচিব ও পুলিশপ্রধান তার কক্ষে এসে বসল। আহমদ মুসাকে বসিয়ে নিজে গিয়ে তার আসনে বসল।

বসেই বলল, মি. আহমদ মুসা, আজকের জিজ্ঞাসাবাদের খবর কি, ভাল নিশ্চয়ই।

আল হামদুলিল্লাহ! ভাল স্যার। যা চেয়েছিলাম তা পেয়েছি। বলল আহমদ মুসা।

এত তাড়াতাড়ি মুখ খুলল! স্বরাষ্ট্র সচিব বলল। তার কণ্ঠে বিস্ময়!

অনেক কথা বলতে হয়েছে স্যার।

আমি তার সমব্যথী ও বন্ধু-এ বিশ্বাস তার মধ্যে জেগেছিল। আমি কোন পক্ষ নই, কোন স্বার্থে আমি এসব জানতে চাচ্ছি না, এটাও সে ধরে নিয়েছিল। আমি নিছক তার ব্যাপারে আমার কৌতূহল নিবৃত্ত করছি, এটাও তাকে বুঝাতে পেরেছিলাম। আর তাদের সম্পর্কে এবং তাদের ঘাঁটি ও তাদের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আমি কথা বলে তার মধ্যে এ বিশ্বাস ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম যে, তাদের ব্যাপারে আমি সব জানি, নিছক তাকে আমি বাজিয়ে দেখছি মাত্র। এজন্যে কোন তথ্য দেয়াকে সে খারাপ মনে করেনি এবং মিথ্যাও বলেনি এই কারণে যে তার মিথ্যা আমার কাছে ধরা পড়ে যাবে। বলল আহমদ মুসা।

বিস্ময়মিশ্রিত প্রশংসার একটা ঢেউ খেলে গেল তাহিতির স্বরাষ্ট্র সচিব ও পুলিশপ্রধানের চোখে-মুখে। বলল, চমৎকার মি. আহমদ মুসা! চমৎকার আপনার কৌশল। আপনি ধমকি দিয়ে কিংবা গুলি ছুঁড়েও এত কথা উদ্ধার করতে পারতেন

না। ধন্যবাদ আপনাকে। কিন্তু আহমদ মুসা, সব ক্ষেত্রেই এই কৌশল খাটিয়ে ফল পাওয়া যায়?

ভালবাসা, সহমর্মিতার শক্তি অত্যন্ত কঠিন ও কঠোর মানুষকেও দুর্বল করে, তাকে কাছে টানে, তার হৃদয় জয় করে নেয়া যায়। তার মনের কথাগুলোও তখন পাখা মেলে, ওপেন হয়ে যায়। কিন্তু শক্তির প্রয়োগ বা প্রদর্শণী মানুকে ভীত করে। ভয়ে অনেকেই মুখ খোলে। আবার অনেকেই শক্তিকে ভয় করে না, এদের বিরুদ্ধে শক্তি কোন কাজেও আসে না। আহমদ মুসা বলল।

ঠিক মি. আহমদ মুসা, দুনিয়ার পাষণ্ডতম মানুষও কাঁদে ভালবাসার ছোঁয়ায়, অস্ত্রের আঘাতে নয়। যাক, এখন বলুন আপনি কত দূর পৌঁছলেন? স্বরাষ্ট্র সচিব বলল।

স্যার, পথের সন্ধান পেয়েছি। সে পথে চলে এখন লক্ষে পৌঁছতে হবে। পথ চলে লক্ষে পৌঁছার কঠিন কাজটাই এখন বাকি। বলল আহমদ মুসা।

ঈশ্বর আপনাকে সাহায্য করুন ইয়ংম্যান। লক্ষে আপনি পৌঁছবেনই, এতে আমার কোন সন্দেহ নেই। আমাদের সাহায্য সব সময় আপনার সাথে থাকবে। বিজ্ঞানী-বিশেষজ্ঞদের নিরাপত্তা ও মুক্তি নিয়ে আমরাও উদ্বিগ্ন। যেন আমাদের ভুলে তাদের বড় কোন ক্ষতি না হয়, এ ব্যাপারে আমরা খুবই সতর্ক। এটা আপনার কেস। আমরা আপনার উপরেই নির্ভর করছি। স্বরাষ্ট্র সচিব বলল।

ধন্যবাদ আপনাদের এই দৃষ্টিভংগির জন্যে। উদ্বেগের বিষয় এটাই স্যার, ওরা সামান্য কিছু টের পেলেই বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদের জীবন বিপন্ন হতে পারে। এজন্যে ওদের কার্যকরি শক্তি নিষ্ক্রিয় করে দেয়ার আগে কিংবা ওদের ‘শক্তির কেন্দ্র’ দখলের আগে ওদের কিছুই জানতে দেয়া যাবে না। বলল আহমদ মুসা।

এ কারণেই এই কাজে বা অভিযানে দলবদ্ধভাবে যাওয়া যাবে না একেবারেই। এই বিপজ্জনক অভিযানে মাত্র দু’একজনকেই অংশ গ্রহণ করতে হবে ওদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে। আমার মনে হচ্ছে বিষয়টা অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং অতি বিপজ্জনক বলেই ঈশ্বর আপনাকে পাঠিয়েছেন। আমি আপনার সম্পর্কে অনেক শুনেছি। কিন্তু কয়েক দিন ধরে আপনার কাজ দেখে মনে হচ্ছে

আপনার সম্পর্কে যা শুনেছি তার চেয়ে অনেক বড় আপনি। ধন্যবাদ আহমদ মুসা। তাহাতির প্রধান স্বরাষ্ট্র সচিব বলল।

মফ ফ্লেরির বিষয়ে এখন কি করা যায়! সে যেহেতু আমাদের সাহায্য করেছে, এজন্যে সে বিচারের মুখোমুখি হোক, তা আমি চাচ্ছি না স্যার। আপনারা তাকে নিরাপত্তা হেফাজতে রাখুন আমাদের অপারেশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত। আর তার পরিবার-পরিজনকেও আপনাদেরই দেখতে হবে, তাদের ভরণ-পোষণও করতে হবে। আমিও তাকে বলব, এখন সে বাইরে গেলে তার দলই তাকে মেরে ফেলবে এবং তার কোন চিন্তা নেই পরিবার-পরিজন নিয়ে। তাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। বলল আহমদ মুসা।

আপনি যা বলেছেন। সেটাই হবে মি. আহমদ মুসা। তাকেও আশ্বস্ত করুন, তার পরিবার নিয়ে তার কোন চিন্তা করতে হবে না। স্বরাষ্ট্র সচিব ও পুলিশপ্রধান বলল।

ধন্যবাদ জনাব। আর আমাকে সাহায্যের বিষয়টা সময় মত আমি আপনাকে জানব। বলল আহমদ মুসা।

আপনার একটা কনট্যাক্ট নাম্বার দিলে প্রয়োজনে আমরা আপনার সাথে যোগাযোগ করতে পারবো। স্বরাষ্ট্র সচিব-পুলিশপ্রধান বলল।

সেটা বিপজ্জনক হতে পারে স্যার। ওরা যেমন ভেতর থেকে পাঠানো মেসেজ মনিটর করতে পারে, তেমনি বাইরে থেকে পাঠানো মেসেজ মনিটরের ব্যবস্থা তার অবশ্যই রেখেছে। বলল আহমদ মুসা।

ঠিক মি. আহমদ মুসা। আপনি ঠিক চিন্তা করেছেন। ধন্যবাদ!

তাহলে উঠতে পারি স্যার। বলল আহমদ মুসা।

ডিনারের সময় হয়ে আসছে। আমরা কি এক সংগে ডিনার করতে পারি না? ভুলবেন না আপনি কিন্তু আমাদের জামাই, ফরাসিদের জামাই। স্বরাষ্ট্র সচিব-পুলিশপ্রধান বলল।

ধন্যবাদ স্যার। আপনাদের স্নেহের এই অফার আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারিনা। আমার সাথে কিন্তূ দু'জন ছেলেমেয়ে আছে। বলল আহমদ মুসা।

তামাহি মাহিন ও মারেভা মাইমিতি তো! ওদেরও দাওয়াত ডিনারে। আমরা খুব খুশি। ওরা আপনার ভাল সহকারী হয়ে উঠেছে। আমি চিন্তা করছি, ওদের আমি আমাদের গোয়েন্দা বিভাগে নিয়ে নেব। আপনি কি মনে করেন? স্বরাষ্ট্র সচিব-পুলিশ প্রধান বলল।

আমার মনের কথা বলেছেন। আমি আপনাকে এ ব্যাপারে অনুরোধ করতে চাচ্ছিলাম। বলল আহমদ মুসা।

মি, আহমদ মুসা, খুশি হলাম আপনার অভিমত পেয়ে। স্বরাষ্ট্র সচিব বলল।

আমি 'মফ ফ্লেরি'র আর একটু কথা বলব। আমি তা হলে এখন উঠছি স্যার। বলল আহমদ মুসা।

মফ ফ্লেরির সাথে কথা বলার এই সিদ্ধান্ত আহমদ মুসা আরও একটা কারণে নিল। তাহানিয়া অ্যাটল থেকে মতুতুংগার প্রসাদে যাওয়ার সুড়ঙ্গ ও প্রসাদের ব্যাপারে আহমদ মুসা আর একটু কথা বলতে চায়। এ বিষয় যে কোন তথ্য তার কাজে আসবে।

ঠিক আছে আসুন। আমর পিএস ঠিক ১২টায় আপনার ডিনারে আসবে। আমি আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করব। হ্যাঁ, আর একটা কথা বলতে ভূলে গেছি। আমি অ্যাটল ট্যুরিস্টদের ছদ্মবেশে কমান্ডো, পুলিশ, ও গোয়েন্দাদের নিয়োজিত করতে চাই যাতে যাতে কোন সন্দেহ সৃষ্টি না হয় এমনভাবে। স্বরাষ্ট সচিব-পুলিশ প্রধান বলল।

আহমদ মুসা একটু ভাবল। তারপর বলল, করতে পারেন। তবে তাদেরকে পোষাকে-আশাকে, কথাবার্তায় ও আচার-আচরণে একদম টুরিস্ট হতে হবে। বলল আহমদ মুসা।

ধন্যবাদ মিঃ আহমদ মুসা। আমি তাদের কাছে মানে তাহিতির সব পুলিশ ও গোয়েন্দার কাছে আপনার ফটো ও মেসেজ দিয়ে রাখতে চাই, যাতে আপনার যে কোন আদেশ তারা শুনতে বাধ্য থাকে। আর অ্যাটল গুলোতে যারা থাকবে তাদের কামান্ডারের কন্ট্যাকট নাম্বার আপনাকে দেব। তাকে আপনি যে কোন আদেশ দিতে পারবেন। স্বরাষ্ট সচিব ও পুলিশ প্রধান বলল।

ধন্যবাদ স্যার। আমি খুব খুশি হলাম। ধন্যবাদ আপনাকে।

বলে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা। স্বরাষ্ট্র সচিব কাম পুলিশপ্রধানও উঠে দাঁড়াল। আহমদ মুসা তার সাথে হ্যান্ডশেক করে বেরিয়ে এল।

# ৬

ক্যাপিটাল অব পাওয়ারের সিচুয়েশন রুম।

সিচুয়েশন রুমের এক প্রান্তে সূর্যকার একটি বেদি। বেদির উপর সুন্দর রাজকীয় কার্পেট পাতা।

বেদির সামনে শ্বেত পাথরের মেঝেতে সারিবদ্ধ তিনটি চেয়ার। চেয়ারগুলোও সাদা ধবধবে রঙের।

তিনটি চেয়ারের মাঝের চেয়ারে গৌরী। তার ডানে জিজর, ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের অপারেশন চীফ। আর গৌরির বাম পাশে বসেছে ডারথ ভাদের, ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের গোয়েন্দাপ্রধান।

তার সবাই উন্মুখভাবে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। তাদের সবারই মুখ বিষণ্ন।

তাদের অপেক্ষার ইতি হলো।

বেদির পেছনের দেয়াল ফুঁড়েই যেন বেরিয়ে এল রক্তলাল চেয়ারে বসা আলেক্সি গ্যারিন, ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের সর্বময় কর্তা। তার গায়ে লাল রাজকীয় পোষাক।

ধবধবে সাদা ঘরে লালের আগমন অনেকটাই সূর্যোদয়ের মত।

বেদির মাঝখানে এসে স্থির হলো চেয়ারটি।

বেদির নিচে মেঝেয় চেয়ারে বসা জিজর, গৌরী ও ডারথ ভাদের উঠে দাঁড়িয়ে লম্বা বাও করে বলল, লং লিভ আওয়ার লর্ড! লং লিভ আওয়ার সিন্ডিকেট!

বসল তারা তিনজন।

আজ আলেক্সি গ্যারিনের মুখে মুখোশ নেই।

চল্লিশ বছেরের মত বয়সের একজন মানুষ সে। পশ্চিমের সে সাদা রঙের মানুষ। শক্ত চোয়াল, কঠিন মুখ, চোখের দৃষ্টিতে কঠোরতা। মুখে লাবণ্য-

কমনীয়তা কিছু ছিল কিনা কোনদিন, তা বুঝা যায় না। কঠিন ও কঠোরতার মাঝে হারিয়ে গেছে যেন সুকমার বৃত্তির সব কিছু।

আলেক্সি গ্যারিনের দৃষ্টি সবার উপর দিয়ে ঘুরে এসে স্থির হলো জিজরের মুখের উপর।

জিজর মাথা নত করল।

এ সব কি হচ্ছে জিজর?

মাই লর্ড! বলে চুপ করে থাকল জিজর।

তিনটি কমিটি করে দিয়েছিলাম আহমদ মুসাকে এলিমিনেট করতে, কিন্তু তোমাদের ৮ সদস্যের এলিট কামান্ডোরা নিজেরাই এলিমেনেট হয়ে গেল। কেন, কিভাবে? বলল আলেক্সি গ্যারিন। কঠোর যান্ত্রিক তার কন্ঠ।

গৌরীদের তিনজনের মুখও মলিন হয়ে গেল পরাজিত সৈনিকের মত।

জিজর উঠে দাঁড়িয়ে বাউ করে বলল, মাই লর্ড, আমাদের অভিযান ঠিক ভাবে......।

জিজরের কথার মধ্যেই আলেক্সি গ্যারিন বলে উঠল, থাক জিজর। এই কথাগুলো একটু পরে শুনব। আগে শুনতে চাই, আমাদের কোন লোক এ পর্যন্ত শত্রুর হাতে ধরা পড়েনি। ধরা পড়ার অঘটন কিভাবে ঘটল?

মাই লর্ড! আমার কথার মধ্যে এটাও বলব মাই লর্ড। বলল জিজর।

বল। বলল আলেক্সি গ্যারিন কঠোর কন্ঠে।

মাই লর্ড! সেদিন রাতে বড় ঘটনার পর আপনার নির্দেশে তিনজনে বসে সিদ্ধান্ত নিলাম, আহমদ মুসাকে প্রস্তুতি ও পরিকল্পনার কোন সুযোগ দেয়া যাবে না। প্রতিটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তাকে একের পর এক আঘাত হানতে হবে। এই লক্ষেই সে রাতের পর আহমদ মুসাকে খুঁজে পাবার জন্যে সকালেই আমরা মারেভা ও মাহিনকে খুঁজে নিই এবং তাদের ফলো করে হাসপাতালে যাই। সেই হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছিল আহমদ মুসার ড্রাইভার। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, আহমদ মুসা হাসপাতালে আসেনি। একজনকে পাহারায় রেখে আমাদের কয়েকজন আহমদ মুসার আগের হোটেলে চলে আসে। জানা যায় সে হোটেলে আহমদ মুসা যায়নি। এটা জেনে আমাদের লোকেরা আবার সেই হাসপাতালে

ফিরে আসে। তারা সে হাসপাতালে গিয়ে জানতে পারে আহমদ মুসা এসে চলে গেছে। দুর্ভাগ্য, পাহারায় থাকা আমাদের লোক তাকে চিনতে পারেনি। আহমদ মুসা ছদ্মবেশে ছিল বলে মনে হয়। কিন্তু মাহিন ও মারেভা তখনও হাসপাতালে ছিল। আমাদের লোকেরা তাদের আনুসরন করে নতুন এক হোটেলে গিয়ে আহমদ মুসাকে পায়। তার হোটেল কক্ষে থাকা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তারা চারজন প্রথম সুযোগেই তাকে হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। হোটেলে ও তার আশেপাশে পুলিশ ছিল না। তার লাশ আনার পথে কোন বাধাও ছিল না। পরিকল্পনা হয় প্রথমে দু'জন এক আঘাতেই দরজা ভেঙে ফেলবে। আর প্রস্তুত থাকা দু'জন এক সাথে গুলি করবে আহমদ মুসাকে। একজন এ্যাটেনডেন্টকে টাকা দিয়ে ঐ সময়ে গল্পরত আহমদ মুসা, মারেভা ও মাহিনের মিটিং ডায়াগ্রাম সংগ্রহ করা হয়েছিল।পরিকল্পনা নিখুঁত ছিল। এক আঘাতে দরজাও ভেঙে পড়েছিল। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, আমাদের প্রস্তুত থাকা লোকেরা অপ্রস্তুত আহমদ মুসার আগে গুলি ছুঁড়তে পারেনি। এই অবস্থায় সেখানে আমাদের চারজন নিহত হয় এবং আমাদের সব পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়। এরপর আহমদ মুসার হোটেলের দু'পাশে পুলিশের পাহারা বসে। এই অবস্থায় আমাদের অবশিষ্ট লোকেরা হোটেলের পেছন দরজা দিয়ে মাহিন ও মারেভাকে চলে যেতে দেখে তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছে, মারেভা ও মাহিনকে তারা পণবন্দী করবে আহমদ মুসাকে হাতের মধ্যে পাওয়ার জন্যে এবং তারা সিদ্ধান্ত অনুসারে মারেভাদের পিছু নেয়। হাইওয়ের যে স্থানকে ওদের কিডন্যাপ করার পরিকল্পনা করে, তার কিছু আগে মারেভা ও মাহিন গাড়ি থামিয়ে একটা সুপার মার্কেটে নেমে পড়ে। আমাদের লোকেরা সিদ্ধান্ত নেয় ওরা মার্কেট থেকে বেরুলেই তাদের ধরে গাড়িতে তুলবে এবং কিছু ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে ত্রাস সৃষ্টি করে তারা বেরিয়ে আসবে। কিন্তু তাদের গাড়ি তোলার সময় কোত্থেকে একটা গাড়ি এসে হাজির হয়। আমাদের তিনজন লোককে হত্যা করে মারেভাদের উদ্ধার করে নিয়ে চলে যাবার সময় তার ছোঁড়া তিনটি গুলিতে সিরিয়াসভাবে আহত আমাদের একজন লোককে তারা ধরে নিয়ে যায়। যাবার সময় চিৎকার করে বলে যায়, আহতকে আমরা হাসপাতালে নিচ্ছি। এর কিছুক্ষন পর আমাদের লোকেরা থানায় যায়। থানা অদ্ভুত

কাথা জানায়। বলে, আমাদের আহত ঐ ব্যক্তিকে যা থানায় নিয়ে আসছিল, সে থানায় এসে ডাইরি করে গেছে, আহত আমাদের লোককে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে কয়েকজন লোক। কয়েকটি গাড়ি নিয়ে তার গাড়ি তারা ঘিরে ফেলে আহতকে ছিনতাই করে নিয়ে যায়। এরপর আমাদের আহত লোকটির আর কোন খোঁজ আমরা পাইনি। মারেভা ও মাহিন নিখোঁজ রয়েছে। তাদের বাড়িতে তাদের পাওয়া যাচ্ছে না। তাদের পরিবারের লোকেরাও উদ্বিগ্ন। থানায় তারা ডাইরিও করেছে।

থামল জিজর। মুহূর্তকাল থেমেই আবার বলল, মাই লর্ড, আমরা পর্যালোচনা করেছি, আমাদের পরিকল্পনায় তেমন কোন ভূল নেই। আহমদ মুসা অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় আমাদের প্রথম উদ্যোগ ব্যর্থ করে দেয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও অকল্পনীয়ভাবে তারা আক্রমণের শিকার হয়, যখন তারা ব্যস্ত ছিল মারেভা ও মাহিনকে গাড়িতে তোলার জন্যে। অতএব, মাই লর্ড, আমাদের পর্যালোচনায় আমাদের ব্যর্থতার কারণ, সামর্থ্য ও সুযোগের অভাব নয়। মাই লর্ড! আমরা মুখাপেক্ষী আপনার সিদ্ধান্ত ও আদেশের। থামল জিজর।

তোমাদের কাজ ও বক্তব্যের মধ্যে অনেক ফাঁক রয়েছে। সুপার মার্কেটে আমাদের লোকদের মেরে আমাদের বন্দীদের কেড়ে নিল, তারা একজন না কয়জন ছিল? সে বা তারা হঠাৎ সেখানে উদিত হলো কোত্থেকে? তাদের সুপার মার্কেটে ঢোকা পরিকল্পিত কি না? আহতকে কেউ কেড়ে নিয়েছে, থানায় এই খবর দেওয়া সাজানো কিনা? এই সব বিষয়ে তোমাদের অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা হয়নি।

বলে আলেক্সি গ্যারিন মুহূর্তের জন্যে থামল। আবার শুরু করল, আমি নিশ্চিত সুপার মার্কেটে আমাদের লোকদের হত্যা, মারেভাদের উদ্ধার ও আমাদের লোকদের ধরে নিয়ে যাওয়ার কাজ আহমদ মুসা করেছে। সে ছাড়া এভাবে এই কাজ করার লোক পলিনেশীয়ায় আর কেউ নেই। সে কোন ভাবে মারেভাদের বিপদ জেনে বা বুঝতে পেরে তাদের ফলো করে এবং মারেভাদেরকে করণীয় সম্পর্কে নির্দেশ দেয়। নির্দেশ অনুসারেই মারেভারা সুপার মার্কেট প্রবেশ করে সময় ক্ষেপণের জন্যে, যাতে সেই সময়ের মধ্যে আহমদ মুসা পৌছতে

পারে। এ না হলে যে মারেভারা ভয়ে হোটেলের পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে আসে, তারা সুপার মার্কেটে ঢুকবে মার্কেটিং করার জন্যে এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আহতকে ছিনতাইয়ের কাহিনী সেই সাজিয়েছে, যাতে আহতকে হাসপাতালে পৌছাবার দায় থেকে বেঁচে যায়। নিশ্চয় আমাদের আহত লোকটি মরে গেছে অথবা আহমদ মুসা হত্যা করেছে। কারণ গুলিবিদ্ধ সিরিয়াস আহতকে বন্দী রাখা ও চিকিৎসা করার সুযোগ হোটেলে থাকা আহমদ মুসার কাছে নেই।

আলেক্সি গ্যারিন থামতেই জিজর বলল, মাই লর্ড! হতে পারে, গাড়ির মধ্যেই তাড়াহুড়া করে আমাদের আহত লোকটির কাছ থেকে কথা আদায়ের চেষ্টা করেছে এবং কথা আদায় করতে না পেরে আরও নির্যাতন করতে গিয়ে মেরেই ফেলেছে।

গৌরীর মুখে কথা এসেই গিয়েছিল যে, আহমদ মুসা এ ধরনের শত্রু নয়, সে আহত বন্দীকে নির্যাতন বা হত্যা করতে পারে ন। কিন্তু নিজেকে সামলে নিল গৌরী। নিজেকে এভাবে প্রকাশ করতে চাইল না গৌরী। কিন্তু আহমদ মুসার প্রতি এই অভিযোগ তার মনে একটা কষ্টের সৃষ্টি হলো।

হ্যাঁ জিজর, এটাই ঘটেছে। আহমদ মুসা বর্তমান দুনিয়ার সবচেয়ে বড় টেররিস্ট। এই কাপুরুষটির এই ন্যাক্কারজনক কাজ তার পাপকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। আমরা তাকে ছাড়ব না।

মুহূর্ত কয়েকের জন্যে থেমে ডারথ ভাদেরের দিকে চেয়ে বলল, ভাদের এই ঘটনা ও আহমদ মুসা সম্পর্কে নতুন কি তথ্য তোমার কাছে আছে বল? ডারথ ভাদের উঠে দাঁড়িয়ে বাউ করে বলল, ঘটনা সম্পর্কে নতুন কোন তথ্য নেই। সুপার মার্কেটের লোকদের সাথে কথা বলে আমাদের গোয়েন্দারা লোকটির চেহারা, পোশাক-আশাক, কথার ধরন ইত্যাদি যে তথ্য পেয়েছে, তাতে মাই লর্ডের কথাই সত্য প্রমাণিত হয়, লোকটি আহমদ মুসাই ছিল। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, আহমদ মুসা তাহিতি থেকে হঠাৎ যেন কোথাও উধাও হয়েছে বা পালিয়ে গেছে। কোন হোটেলে বা অন্য প্লেসে কোন সময় তাকে আমাদের গোয়েন্দারা পায়নি।

আহমদ মুসা সম্পর্কে ভাল জানলে একথা বলতে না ডারথ ভাদের। সে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালায় না। সে অত্যন্ত বিপদজ্জনক। এ পর্যন্ত আমাদের কোন

চেষ্টাই সফল হয়নি। সবচেয়ে বিস্ময়ের হলো, তাকে কখনও আইনের চোখে অপরাধী বানানো যায় না। সব জায়গায় সে ত্রাতার ভুমিকায় থাকে, আইন ও পুলিশের পক্ষেই তারা কাজ করে। আমি বুঝতে পারছি না, হঠাৎ সে তাহিতিতে এল কেন? কোন মিশনে সে এসেছে। কিন্তূ তার উদ্দেশ্য না জানলেও সে আমাদের জন্যে বিপদজ্জনক। আমাদের পশ্চিমি বন্ধুরা একটা উদ্ধেগজনক তথ্য দিয়েছে। সেটা হলো সৌদি বিজ্ঞানী খালেদ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মাক্কী'র অনুসন্ধানের দায়িত্ব সৌদি সরকার আহমদ মুসাকে দিয়েছে। আরেকটা তথ্য তারা দিয়েছে, আমাদের যারা বিজ্ঞানী খালেদ মোহাম্মদ আব্দুল্লাকে কিডন্যাপ করেছিল, তাদের পিছু নিয়ে আহমদ মুসা ওমান পর্যন্ত এসেছিল। অন্য দিকে আমাদের লোকদের তথ্য হলো, ওমানের সাগর তীরের একটি হোটেলে তাদের উপস্থিতি একজনের কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিল। গ্যাস বোমা ফেলে তাকে সংজ্ঞাহীন করে তড়িঘড়ি করে তারা পালিয়ে এসেছে। এই দুই তথ্য মেলালে দেখা যাচ্ছে, ওমান হোটেলের সেই লোকটি ছিল আহমদ মুসা। সে আহমদ মুসাই এখন তাহিতিতে। সুতরাং সুস্পষ্ট না জানলেও এটা ধরেই নিতে হবে যে, সে বিজ্ঞিনীর সন্ধানেই তাহিতিতে এসেছে। প্রশ্ন উঠতে পারে, সে তাহিতিতে আসবে কেন? সে জানবে কি করে এখানেই তাকে পাবে! কিন্তূ আহমদ মুসার অসাধ্য কিছু নেই। সুতরাং আমাদের প্রজেক্ট আজ ঝুঁকির মধ্যে। একে ঝুঁকির মধ্যে পড়তে দিতে পারি না। সাফল্য যখন আমাদের হাতের মুঠোয়, গোটা দুনিয়াকে অচল করে দিয়ে, সবার উপর আমরা সচল থাকার যে যাদুরকাঠি আমরা হাতে পেতে যাচ্ছি, তখন কাউকেই আমাদের দিকে চোখ তুলে চাইতে দিতে পারি না। আমাদের প্রোজেক্টের স্বার্থে আহমদ মুসাকে অবশ্যই মারতে হবে। তাকে মারার জন্যে একের পর এক প্লান তোমরা বানাও। এক অপশন ব্যর্থ হলে অন্য অপশন সংগে সংগেই তোমরা যেতে পারবে। এ পর্যন্ত যদিও আমরা সফল হইনি, তবে আমাদের পদক্ষেপ সঠিক হয়েছে। এজন্য তোমাদের মোবারকবাদ দিচ্ছি। আহমদ মুসা অত্যন্ত চালাক, অত্যন্ত ক্ষিপ্র ও অতুলনীয় উপস্থিত বুদ্ধির অধিকারী। এই গুণগুলোই তাকে এ পর্যন্ত বাঁচিয়েছে, কিন্তূ সব সময় তাকে বাঁচাবে না। কেউ এভাবে বাঁচেও না। ভূল এক সময় করেই এবং খতম হয়ে যায় সেই একটি ভূলেই।আমাদেরকে তারই অপেক্ষায় একের

পর এক ফাঁদ পেতে যেতে হবে শয়তানের বাচ্চাকে ধরার জন্যে। থামল আলেক্সি গ্যারিন।

আলেক্সি গ্যারিনের কথার মধ্যে মাঝে মাঝেই গৌরীর মনটা খচ খচ করে উঠেছে কিছু বলার জন্যে। আহমদ মুসা শুধু অসম্ভব চালাক, ক্ষিপ্র ও উপস্থিত বুদ্ধির অধিকারীই নয়, সে মানবিক ও নীতিনিষ্ঠও। তার জীবন দৃষ্টি, আচরণ কোনও অপরাধীর মত নয়। বন্দীদের প্রতি তার দায়িত্ববোধ ও মমতা গৌরীকে বিস্মিত করেছে। মন জয়ও কি করেনি! না হলে জ্যামিং মেশিনটা সে আহমদ মুসাকে দিয়ে এল কেন, যা আহমদ মুসাকে ঐ সংঘর্ষে জয়ী করেছে।

কথা শেষ করে আলেক্সি গ্যারিন তাকাল গৌরীর দিকে। তাকে অন্যমনস্কতায় ডুবে থকতে দেখে বলল, গৌরী, কি ভাবছ তুমি?

চমকে উঠে গৌরী নিজকে সামলে নিল। মাই লর্ড, এসব নিয়েই ভাবছি।

কি ভাবছ তুমি? বলল আলেক্সি গ্যারিন।

গৌরী মাথা নিচু করে একটু ভেবে বলল, মাই লর্ড! সে এখন আড়লে চলে গেছে আমাদের উপর্যুপরি আক্রমণে। তার সাথে মারেভা ও মাহিনও। আমি মনে করি, আমরা কিছুটা চুপ থেকে তাদেরকে আড়াল থেকে বের করে আনা দরকার। তারপর তাকে আঘাতহানার সুযোগ নিতে হবে তার অপ্রস্তূত অবস্থায়, অন্য দিকে আমাদের প্রজেক্টের রক্ষার ব্যবস্থা পর্যাপ্ত আছে কিনা, সেদিকে নজর দিতে হবে।

আলেক্সি গ্যারিনের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, ধন্যবাদ গৌরী। তোমার চিন্তা ও পরামর্শকে স্বাগত জানাচ্ছি। তুমি সঠিক চিন্তা করেছ। ওরা গর্তে ঢুকেছে, গর্ত থেকে বের করে আনতে হবে তাদের। জিজর, এবার তোমার সামনের চিন্তা সম্পর্কে বল।

মাই লর্ড, ম্যাডাম গৌরী ঠিক বলেছেন। তাদেরকে যখন পাওয়া যাচ্ছে না, তখন এ মুহূর্তে তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশনেও যেতে পারবো না। তবে সংগোপনে তাদের সন্ধান অব্যাহত রাখাতে হবে, বিশেষ করে মারেভা ও মাহিনের বাড়ির উপর খুব সাবধানে নজর রাখতে হবে। মাহিনরা নিশ্চয় তাদের পরিবারের সাথে যোগাযোগ রাখবে। এই পথেই আহমদ মুসার সন্ধান পাওয়া যাবে। তার সন্ধান পাওয়া ও তাকে শেষ করাকে সর্বোচ্চ প্রায়োরিটি দিতে হবে।

এজন্যে তাহিতি দ্বীপে আমাদের জনশক্তির সর্বোচ্চ মবিলাইজেশন করতে হবে। প্রতিটি স্থানে আমাদের নজরদারি করতে হবে। সর্বত্র সব দিকে থেকে তাকে ঘিরে ফেলতে হবে। প্রয়োজনে পলিনেশীয়ার বাইরে থেকে এবং আমাদের ক্যাপিটাল অব পাওয়ার থেকেও আমাদের লোকজনকে তাহিতিতে নিতে হবে। আমাদের ক্যাপিটাল অব পাওয়ারের বাইরেই আহমদ মুসাকে ধ্বংস করতে হবে। আমি মনে করি ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেট এই ঝামেলা এড়াতে পারলে নির্বিঘ্নে তার লক্ষে পৌছে যাবে। জিজর বলল।

আলেক্সি গ্যারিন এবার ডারথ ভাদেরের দিকে তাকাল।

ডারথ ভাদের প্রস্তুত ছিল। বলল সংগে সংগেই, মাই লর্ড, আমি ম্যাডাম গৌরীও মি, জিজরকে সমর্থন করছি। দরকার হলে সর্বশক্তি নিয়োগ করে তাহিতিতেই আহমদ মুসাকে ধ্বংস করতে হবে। থামল ডারথ ভাদের।

সবার কথা শেষ হলে আলেক্সি গ্যারিন চোখে নিচে নামিয়ে কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, তাহলে এটাই ঠিক হলো, মারেভা ও মাহিনের বাড়ির উপর গোপন নজরদারি চলবে, তাদের বাড়ির লোকজনদের গতিবিধির উপরও গোপনে নজর রাখা হবে এবং গোটা তাহিতি দ্বীপে চলবে গোপন চিরুণী অভিযান। এজন্য প্রয়োজনীয় শক্তিকে তাহিতিতে মোবিলাইজ করার প্লানও মঞ্জুর করা হবে। জিজর ও ডারথ ভাদের উপস্থিত থেকে তাহিতির অভিযান পরিচালনা করবে। আর গৌরী ক্যাপিটাল অব পাওয়ারের দায়িত্বে থাকবে, যেহেতু তার গুলিবিদ্ধ হাত এখনও পুরোপরি সুস্থ নয়। তোমরা এবার প্রস্তূতি গ্রহন করো। ওকে। কথা শেষ করল আলেক্সি গ্যারিন।

কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই আলেক্সি গ্যারিনের আসন হটে পেছনের দেয়ালের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল, ঠিক যেভাবে এসেছিল। গৌরীরা তিনজনও উঠে দাঁড়াল।

গৌরী কক্ষের বাইরে যেতেই তার মোবাইল বেজে উঠল। মোবাইলের স্ক্রীনে তাকিয়ে দেখল তার বস আলেক্সি গ্যারিন।

কল অন করে, ইয়েস মাই লর্ড! বলতেই ওপার থেকে আলেক্সি গ্যারিন বলল, গৌরী এস, আমি শোবার ঘরে।

সংগে সংগেই মুখটা অন্ধকার হয়ে গেল গৌরীর। চোখে ফুটে উঠল অপমান ও জ্বালাময় বেদনার একটা ছাপ।

ইয়েস মাই লর্ড! বলল গৌরী। কথা বলতে কষ্ট হলো গৌরীর।

হ্যাঁ, শোন গৌরী। কয়েক দিন তোমাকে সাদা পোষাকে দেখছি। ওটা আমি দু'চোখে দেখতে পারিনা, সাদা হলো মৃত্যুর প্রতীক। তুমি আগের মত লাল পোষাক পরে এস। তুমি লাল তোমার ভেতরটাও লাল। তোমার গায়ের লাল পোষাক তাই মনে আগুন জ্বালায়। এ আগুন আমার সবচেয়ে প্রিয়। এস গৌরী। বলল আলেক্সি ওপার থেকে।

গৌরী ইয়েস মাই লর্ড! বলতেই ওপার থেকে কল অফ হয়ে গেল।

যন্ত্রের মত কল অফ করল গৌরী।

মুখে ইয়েস মাই লর্ড! বললেও গৌরীর চোখে জ্বলে উঠেছে অপমানের আগুন। এতদিন নারীত্বের, ব্যক্তিত্বের এই অপমানের আগুন অবচেতন মনের কোন এক কোণে যেন সে অনুভব করতো! আজ সেই আগুন তার চোখে নেমে এসেছে। আহমদ মুসা তার মনের সুপ্ত আগুনকে জ্বালিয়ে দিয়েছে। সেদিন 'লা ডায়মন্ড ড্রপ' হোটেলের 'অ্যাপেক্স' রেস্টুরেন্টে আহমদ মুসার সাথে কয়েক মিনিট আলোচনা তাকে নতুন জীবন দিয়েছে। তার নারীত্বের মর্যাদার চেতনা এখন আকাশ স্পর্শ করেছে। মোবাইলটা পকেটে রেখে মনে মনে বলল গৌরী, আগুন শুধু মনোরঞ্জনের জন্য নয় মাই লর্ড, ধ্বংসেরও হতে পারে।

এ আগুন যেন অশ্রু হয়ে জমেছে তার চোখের দুই কোণে!

চোখ মুছে গৌরী পা বাড়াল আলেক্সি গ্যারিনের ঘরের দিকে। ওখানেই এক প্রস্থ লাল পোষাক আছে। কোন এক সময় তা সে খুলছিল। আর নিয়ে আসা হয়নি। ওটাই পরা যাবে সেখানে গিয়ে। তার মনের দরজায় আহমদ মুসার পবিত্র, প্রশস্ত, সুন্দর অবয়বটা এসে দাঁড়াল। সে যেন ট্রাফিক পুলিশের মত হাত তুলে গৌরীকে এগোতে নিষেধ করছে! অশ্রুর একটা ঢেউ যেন তার দুই চোখের কোণকে প্লাবিত করল আবার। মনে মনেই বলল, আহমদ মুসা, তোমার কথাগুলো স্বাধীন মানুষের জন্যে, আমি স্বাধীন মানুষ নই!

গৌরী হাঁটছিল। তার হাঁটা থামল না।

আহমদ মুসাকে স্বাগত জানিয়ে নিজের চেয়ারে ফিরে গিয়ে বলল তাহিতিসহ পলিনেশীয়া দ্বীপপুঞ্জের স্বরাষ্ট্র সচিব, প্রধান ফারসি আমলা মসিয়ে দ্যাগল, জরুরি বিষয়টা আপনার কি মি.আহমদ মুসা?

ধন্যবাদ স্যার, এই সাক্ষাত দেয়ার জন্যে।

বলে একটু থামল আহমদ মুসা। সোজা হয়ে বসে বলল, আমি ছদ্মবেশ নিয়ে তোয়ামতো দ্বীপপুঞ্জে গিয়েছিলাম সংশ্লিষ্ট দ্বীপ এলাকায়ও ঘুরেছি। সব বিষয়ে একটা ধারণা নেবার চেষ্টা করেছি। লক্ষ অর্জনের জন্যে কিছু টার্গেটও ঠিক করেছি। সামনে এগোবার জন্যে আপনার সাহায্য আমার প্রয়োজন।

মি. আহমদ মুসা, আপনার উপর আমার একশ' ভাগেরও বেশী আস্থা আছে। সেদিন আমরা আলোচনায় বুঝেছি, আতগুলো মুল্যবান মানুষের জীবন রক্ষা করতে হলে গোপন অভিযানের কোন বিকল্প নেই এবং এই অভিযান আপনাকে দিয়েই সম্ভব। তবুও বলছি আপনার সামনে এগোনোর ব্যাপারে সব দিক আপনি ভেবেছেন কিনা, সব ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত কিনা? বলল তাহিতিসহ ফ্রেঞ্চ পলিনেশীয়ার স্বরাষ্ট্র সচিব ও পুলিশ প্রধান মসিয়ে দ্যাগল।

সংশ্লিষ্ট সব ব্যাপার নিয়েই আমি ভেবিছি। তবে ঝুঁকির প্রশ্ন তো আছেই।

এ ধরনের অভিযানে ঝুকি এড়ানো সম্ভব নয়। তবে ঝুকি যাতে কমানো যায়, এজন্যে আপনার কছে এসেছি সাহায্যের জন্যে। আহমদ মুসা বলল।

অবশ্যই সাহায্য পাবেন। আমারা প্যারিসকে বিষয়টা ব্রিফ দিয়েছি। তারা সব রকম সাহায্যের নির্দেশ দিয়েছেন। দরকার হলে এখানকার সেনা ইউনিট ব্যবহার করা যাবে। বলল স্বরাষ্ট্র সচিব ও পুলিশপ্রধান দ্যাগল।

ধন্যবাদ স্যার। বলল আহমদ মুসা।

আপনার প্রয়োজনের কথা বলুন মি. আহমদ মুসা।

স্যার, এক, আন্ডারওয়াটার ভেহিকেল দরকার। ছোট, যাতে এই দ্বীপ বা অ্যাটলের কিনারায় পৌছতে পারি। ওদের রাডার বা সিসি ক্যামেরা'কে ফাঁকি

দিয়ে ওদের দ্বীপের নির্দিষ্ট টার্গেটে পৌছার জন্যে এটা দরকার। দুই, রাডার ও ক্যামেরার রেজিস্ট্যান্ট পোশাক দরকার। তিন, ইলেক্ট্রন জ্যামিং মেশিন আমার দরকার এবং চার আলট্রা সাইলেন্সর টেকনলজির মিনি মেশিন রিভালবার আমার প্রয়োজন। শর্ত হলো, এই সবই ফেরত দেব, এই টেকনলজি কারও হাতে যাবার ভয় নেই। বলল আহমদ মুসা।

হাসল স্বরাষ্ট্র সচিব দ্যাগল। বলল, ফেরত দেয়া, টেকনলজি ট্রান্সফার না হওয়ার প্রশ্ন তুলছেন কেন, আহমদ মুসা? আর কি করে জানলেন যে, এই জিনিসগুলো আমাদের কাছে আছে?

স্যার, আমি পৃথিবীর সব মিলিটারির টাইম জার্নাল নিয়মিত দেখি। এসব জিনিস ফরাসিরা কবে আবিস্কার করেছে তাও আমি জানি। বলল আহমদ মুসা।

কিন্তু আহমদ মুসা সাবমেরিন ছাড়া আমাদের আন্ডারওয়াটার ভেহিকেল, যেটা আছে সেটা ডুবুরীদের ক্যাপসুলের মত। তবে আরও উন্নত। এ থেকে কোন বুদ্বুদ বের হয় না। সাবমেরিনের মত এটা চলতে পারে। কম পানিতেও চলে তবে তার গতি বেশী নয়, ম্যাক্সিমাম ছয় ঘন্টার মত এটা পানির তলে থাকতে পারে। এটা বানানো হয়েছে গোয়েন্দাদের ছোট-খাট কাজে ব্যবহারের জন্যে। স্বরাষ্ট্র সচিব দ্যাগল বলল।

এটাই আমার মিশনের জন্যে এ্যাপ্রেপ্রিয়েট স্যার। বলল আহমদ মুসা।

আপনার সৌভাগ্য মি. আহমদ মুসা। এই আন্ডারওয়াটার ক্যাপসুলটি দুদিন আগে আমাদের সংগ্রহে এসেছে। এর ব্যাবহারের কয়েকটা বিষয় আপনাকে শিখতে হবে। বলল স্বরাষ্ট্র সচিব দ্যাগল।

ধন্যবাদ স্যার। আপনারা সাহায্য করলে শিখে নেব। অন্য তিনটি বিষয়ে বলুন। বলল আহমদ মুসা।

ওগুলোর ব্যাপারে সমস্যা হবে না। তবে রাডার ও ক্যামেরা রেজিস্ট্যান্ট পোষাকের বিকল্পও আমাদের আছে। স্বয়ংক্রিয় ক্রোকোডাইল ও ডলফিন পোষাক আছে। ওর ভেতরে ঢুকে পানিতে ও স্থলে যে কোন দিকে, যে কোন ডিস্টিনেশনে চালানো যায়। তবে রাডার ও ক্যমেরা রেসিস্ট্যান্ট নয়। অন্যদিকে রাডার ও ক্যামেরা রেসিস্ট্যান্ট পোশাক রাডার ও ক্যামেরার ব্লাইন্ড অ্যারর

হিসাবে চিহ্নিত হবে। সুবিধা হলো এ পোশাকে আপনি যত্র-তত্র যেতে পারবেন, কিন্তু ক্রোকোডাইল ও ডলফিনের পক্ষে তো সব জায়গায় যাওয়া স্বাভাবিক নয়! থামল স্বরাষ্ট্র সচিব মসিয়ে দ্যাগল।

হ্যাঁ, রাডার, ক্যামেরা রেসিস্ট্যান্ট পোশাকই আমার জন্য ভাল হবে স্যার। বলল আহমদ মুসা।

ঠিক আছে, মি, আহমদ মুসা। আপনার যা চাহিদা সেটাই পাবেন। স্বরাষ্ট্র সচিব দ্যাগল বলল।

আমি অ্যাটলে ঢোকার পর কোন লোক অ্যাটলে ঢূকবে না, তা নিশ্চিত করতে হবে। এজন্যে সারফেসে পেট্রল বোট ও পানির নীচে সাবমেরিন পাহারায় থাকতে হবে? এবং.........।

আহমদ মুসা কথার মাঝখানেই দ্যাগল বলে উঠল, সাবমেরিন কেন? সারফেসে পাহারায় থাকলেই তো হয়।

অ্যাটলের ভেতরে ঢোকার কোন আন্ডারওয়াটার প্যাসেজ আসে কিনা তা জানি না। থাকলে সেদিক দিয়ে লোক ঢুকে যেতে পারে। ওদের বিভিন্ন ধরনের আন্ডারওয়াটার ভেহিকেল আছে। আমি ওদের টিউব সাবমেরিনও দেখেছি। বলল আহমদ মুসা।

কি বলেছেন আপনি! ওদের সাবমেরিন, এমনটি টিউব সাবমেরিনও আছে? কোথায় থাকে ওসব?

আছে যে আমি তার প্রত্যক্ষদর্শী। কোথায় থাকে তা জানি না। তাহিতির কোস্টাল লেগুন এবং তোয়ামতু দ্বীপপুঞ্জের একাধিক লেগুনে থাকতে পারে। শুধু তাই নয়, ওদের হেলিকপ্টার ও এয়ার-ক্যাপসুলও রয়েছে। বলল আহমদ মুসা।

হ্যাঁ হয়ে গেল স্বরাষ্ট্র সচিব দ্যাগলের মুখ! কোন কথা বলতে পারল না কিছুক্ষণ। বিস্ময় কাটিয়ে উঠে বলল, মি, আহমদ মুসা! এত কথা তো আগে বলেননি। রীতিমত ওরা রাষ্ট্র শক্তি বনে গেছে। বিপদজ্জনক ওদের প্রস্তূতি। এই অবস্থায় আমি ওদের হেড কোয়ার্টার বা ঘাঁটিতে আপনাকে ঢুকতে দিতে পারি না। আমি প্যারিসে জানাব। ওদের অনুমতি লাগবে।

আপনি ওদের জানান। কিন্তু এ কারনে আমাদের এ্যাকশনের জন্য দেরি করার প্রয়োজন নেই। বলল আহমদ মুসা।

প্রয়োজন আছে মি, আহমদ মুসা। আমাদের শক্তি বাড়াতে হবে। স্বরাষ্ট সচিব দ্যাগল বলল।

তাদের সাথে যুদ্ধ করার তো প্রয়োজন নেই। শক্তি বাড়ানোর প্রয়োজন কি? আমি জানি যে শক্তি আপনার হাতে আছে সেটাই যথেষ্ট ওদের পরাজিত করার জন্যে। বলল আহমদ মুসা।

ধরুন, ওদের হেড কোয়ার্টার দখল হয়ে গেল। হেড কোয়ার্টারে যাবার পথ ওরা না পেলে এবং পানি, আকাশ ও আন্ডারওয়াটার পথে ওরা হেড কোয়ার্টারে যেতে না পারলে ওরা বিশৃঙ্খল ও ভীত হয়ে পড়বে। আমি মনে করি এ ধরনের শক্তি আপনার আছে। আপনার দু'টি ডেস্টয়ার ও কামান, মেশিনগান ও এ্যান্টিএয়ারক্রাফটগানসজ্জিত ২০টি বড় ধরনের মিলিটারি পেট্রল বোট রয়েছে। আর সাবমেরিন আছে বলেও আপনার কাছ থেকে শুনেছি। সুতরাং ওদের বাইরের শক্তিকে ক্রাশ করার জন্যে এই আয়োজনই যথেষ্ট। আরেকটি কথা স্যার হেড কোয়ার্টার ও উদ্ধার পর্বে শক্তি কোন কাজে লাগবে না, এখানে বুদ্ধির যুদ্ধে জিততে হবে এবং বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদের উদ্ধার করতে হবে। তাদের নিরাপত্তার জন্যে এই নিরব অপারেশনের প্রয়োজন। বলল আহমদ মুসা।

স্বরাষ্ট সচিব অনেক্ষণ চুপ করে থাকলো। ভাবল। তারপর বলল, ধন্যবাদ মি, আহমদ মুসা, আপনি ঠিক পথেই চিন্তা করছেন। কিন্তু আপনার চূড়ান্ত অভিযানের আগে অ্যাটলটিতে আন্ডারওয়াটার কোন প্যালেস আছে কিনা তা কি জানা দরকার নয়?

তারও কোন প্রয়োজন দেখি না স্যার। বরং তা দেখতে গেলে ওদের সাথে যদি দেখা হয়ে যায়, ওরা যদি আমাদের জেনে ফেলে কিংবা কোন কারণে সংঘাত বাঁধলে বিষয়টা জানাজানি হয়ে যাবে এবং ওরা আরও সতর্ক হয়ে যেতে পারে। আমাদের এ অপারেশনের কনসেপ্ট হলো স্যার, ওদের সতর্ক হওয়ার আগে নিরবে ওদের ক্ষমতার কেন্দ্রকে অকেজো করে দেয়া এবং বিজ্ঞানী ও

বিশেষজ্ঞদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এর পরই দরকার হবে ক্ষমতার প্রদর্শনী, বাইরের বিজয়টা নিশ্চিত করার জন্যে। বলল আহমদ মুসা।

আমি একমত মি. আহমদ মুসা। কিন্তু ভাবছি হেড কোয়ার্টার দখলে নেয়ার ভয়ংকর কাজটা কিভাবে হবে। এর সাফল্যের উপরই নির্ভর করছে সব কিছু। আপনার কি পরিকল্পনা? আমাকে প্লিজ একটু আশ্বস্ত করুন। স্বরাষ্ট্র সচিব দ্যাগল বলল।

আমার কোন পরিকল্পনা নেই স্যার। আল্লাহর সাহায্যের উপর ভরসা করে আমি ভেতরে প্রবেশ করব। প্রতিটি সুযোগের যথাযথ ও সময়োচিত সদ্ব্যবহার করব। সন্দেহ নেই অন্যায়ের প্রতিরোধ ও ভালোকাজ করার জন্যে আমি যাচ্ছি। আল্লাহর নির্দেশ এটা। আল্লাহ আমাকে সাহায্য করবেন। বলল আহমদ মুসা।

ধন্যবাদ মি. আহমদ মুসা। আপনার অনেক কাহিনী আমি শুনেছি। আজ দেখছি। আপনার জীবনের সাফল্যের শক্তিকেও আজ আমি প্রত্যক্ষ করলাম। স্বার্থ নয়, স্রষ্টার জন্যে যারা কাজ করেন মৃত্যুভয়সহ কোন কিছু হারাবার ভয় তাদের থাকে না। তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানো কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।

সব কিছুর পিছুটানমুক্ত কেউ যদি হয়, তাহলে সে সব কিছু করতে পারে। পারবেন আহমদ মুসা, আপনিই পারবেন। গড ব্লেস ইউ। স্বরাষ্ট্র সচিব মসিয়ে দ্যাগল বলল।

মুহূর্তকাল থেমেই আবার বলল, মি. আহমদ মুসা। আপনি যা চেয়েছেন তা পাবেন এবং যা করতে বলেছেন তা আমি সবই করব।

ধন্যবাদ স্যার, অনেক ধন্যবাদ। বলল আহমদ মুসা।

ওয়েলকাম মাই ফেবারিট ইয়ংম্যান। আমি টেলিফোন করে দিচ্ছি আমাদের নৌ-ঘাটিতে। ফরমাল মেসেজও পাঠাচ্ছি। আজ বা কাল যে কোন সময় সেখানে জয়েন করতে হবে। অন্তত ১২ ঘন্টা সময় সেখানে এক্সারসাইজের জন্যে আপনাকে দিতে হবে।

ওকে স্যার। বলল আহমদ মুসা।

তাহলে কথা আপতত এখানেই শেষ। প্রয়োজন হলে যে কোন সময় আমাকে টেলিফোন করতে পারেন। আমার প্রাইভেট নাম্বার তো আপনার কাছে আছেই। এ সব কথা বলতে বলতেই উঠে দাঁড়াল স্বরাষ্ট্র মি. সচিব দ্যাগল।

আহমদ মুসাও উঠে দাঁড়াল।

হ্যান্ড শেক করে আহমদ মুসা বেরিয়ে এল। মি. দ্যাগলও অন্য ঘরের দিকে চলে গেল।

স্বরাষ্ট্র সচিবের কক্ষ থেকে আহমদ মুসা বারান্দায় বেরিয়ে আসতেই মি. দ্যাগলের পিএস বলল, স্যার, গাড়ি ডাকব?

না, আমি ট্যাক্সি নিয়ে এসেছিলাম, ছেড়ে দিয়েছি। তবে চিন্তা নেই, আমি আর একটা ট্যাক্সি ডেকে নেব।

স্যার বলেছেন আপনার সাথে গাড়ি না থাকলে আমাদের গাড়ি দিয়ে আপনাকে পৌছে দিতে। বিনীতভাবে মি. দ্যাগলের পিএস বলল।

না, ধন্যবাদ। আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসা গাড়ি বারান্দার সামনে আসতেই সেখানে অপেক্ষমাণ এক শিখ ড্রাইভার আহমদ মুসাকে সালাম করল। তারপর শিখ ড্রাইভারদের মতই হিন্দি মেশানো তাহিতি ল্যাংগুয়েজে বলল, সাব কি যাবেন? আমার গাড়ি আছে।

বিস্ময় দৃষ্টিতে সালাম দেয়া দেখে আহমদ মুসা তার দিকে তাকিয়েছিল। তবে সে তাকে চিনতে পারলো। শিখ ড্রাইভার যখন কথা বলল, তখন তার দাঁত, মুখ, চোখ দেখে বুঝল, শিখ ড্রাইভারের ছদ্মবেশ সঠিকভাবে হয়নি।

খুশি হলো আহমদ মুসা। ক'দিন আন্ডারগ্রাউন্ড থাকার পর শিখ ড্রাইভারের ছদ্মবেশে তেপাও বের হয়েছে। ভাল। তার উপার্জনও দরকার। কিন্তু সে তাহিতির স্বরাষ্ট্র বিভাগের গাড়ি বারান্দায় কেন? আমাকে দেখে সে যে পরিমান বিস্মিত হয়েছে, তাতেই প্রমানিত হয় সে আমাকে এখানে আশা করেনি। তা হলে সে এসেছে কেন?

আহমদ মুসা মুখ ঘুরিয়ে স্বরাষ্ট্র সচিব দ্যাগলের পিএস-এর দিকে ফিরে বলল, ধন্যবাদ, আমি গাড়ি পেয়েছি। আমি এর গাড়িতেই যাব।

ইয়েস স্যার। আমি স্বরাষ্ট্র সচিবকে বলল। বলল সচিবের পিএস।

স্যার, আপনি একটু দাঁড়ান। আমি কার পার্কিং থেকে গাড়ি নিয়ে আসছি। বলল তেপাও আহমদ মুসাকে।

বলেই সে ছুটল কার পার্কের দিকে।

গাড়ি নিয়ে এল তেপাও। কিন্তু তার সেই ট্যাক্সি নয়। ভিন্ন নাম্বার ও অপেক্ষাকৃত নতুন ট্যাক্সি।

গাড়িতে উঠে বসল আহমদ মুসা। গাড়ি চলতে শুরু করল।

তেপাও, তুমি কি গাড়ি পাল্টেছ? বলল আহমদ মুসা।

মারেভা ম্যাডাম বলল, আমার গাড়ির নাম্বার ওরা পেয়ে থাকতে পারে। সুতরাং গাড়ি বের করতে চাইলে নতুন গাড়ি বের করতে হবে। তাই আমি গাড়ি পাল্টিয়েছি। ছদ্মবেশও নিয়েছি শত্রুদের থেকে নিজকে আড়াল করার জন্যে। তেপাও বলল।

তুমি এখানে এসেছিলে কেন? জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

স্বরাষ্ট সচিব মি. দ্যাগলের সাথে দেখা করার জন্যে।

আহমদ মুসার চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল! বলল, স্বরাষ্ট সচিবের সাথে দেখা! কেন?

আপনার বিষয়ে খোঁজ খবর নেবার জন্যে। কোথাও খোঁজ না পেয়ে আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলাম। সেইজন্যেই আমাকে স্বরাষ্ট সচিবের সাথে দেখা করার জন্যে পাঠানো হয়েছে। আমাদের ধারণা তিনি নিশ্চয় আপনার খবর বলতে পারবেন। বলল তেপাও।

স্বরাষ্ট সচিব যদি দেখা না করতেন? আহমদ মুসা বলল।

অবশ্যই দেখা করতেন। আমি আপনার বিষয়ে জানার আছে, এ কথা বলে দেখা করতে চাইতাম। বলতাম, অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজন, তাই আপনার সাথে দেখা করা দরকার। বলল তেপাও।

সত্যিই কি কোন জরুরি প্রয়োজন তেপাও? আহমদ মুসা বলল।

সত্যিই জরুরি প্রয়োজন আমরা মনে করি। প্রয়োজনটা হলো আপনাকে কিছু খবর জানানো। অবশ্য আমরা জানি না, খবরগুলো আপনার কাছে জরুরি কিনা। বলল তেপাও।

কি খবর তেপাও, তাড়াতাড়ি বল। আহমদ মুসা বলল।

স্যার আজ সকালে আমি ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে ছিলাম আমার এই নতুন ট্যাক্সি নিয়ে এবং এই ছদ্মবেশে। দু'জন লোক এল স্ট্যান্ডে। তারা একে, ওকে কিছু জিজ্ঞাসা করছিল এবং গাড়ির নাম্বারও দেখছিল। আমার গাড়িটা ছিল এক প্রান্তে। অবশেষে তারা আমার কাছে এল এবং বলল, আমি তেপাও নামে কোন ড্রাইভারকে চিনি কিনা। আমি বলাম এ নামে কোন ড্রাইভারকে আমি চিনি না। তার অন্য কোন নামও থাকতে পারে। পরে তারা বলল, আমি হোটেল লা ডায়মন্ড ড্রপ-এ যাব কিনা। আমি যেতে চাইলে তারা আমার গাড়িতে উঠল। চলার পথে তারা যে গল্প করছিল এবং টেলিফোনে তাদের যে কথা হয়েছিল, সেটাই আপনাকে আমার জানাবার বিষয়। বলল তেপাও।

কি কথা শুনেছ তাদের? নিশ্চয় আমার কাজে লাগবে। বলল আহমদ মুসা।

তারা বলছিল, আহমদ মুসা, মাহিন, মারেভারা গেল কোথায়? এ সব বিষয় নিয়েই তারা কথা বলছিল। একজন বলছিল, হোটেল, নিজেদের বাড়ি, আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ি কোথাও তাদের পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় যেতে পারে তারা? আমরা তেপাওকেও খুঁজে পাচ্ছি না। তাকে পেলেও ওদের সন্ধান লাভ সহজ হতো।

অন্যজন বলল, আমরা তাদের সন্ধান করতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করিনি। এই চেষ্টায় তাদের পাওয়া যাবে না। ওরাও এটা বুঝেছে। এবার অন্য ব্যবস্থা হচ্ছে।

কি ব্যবস্থা? বলল প্রথম জন।

আমি সব জানি না। তবে শুনলাম, তাহিতি ও মুরিয়া দ্বীপের প্রতি ইঞ্চি জায়গা খুঁজে হলেও ওদের বের করবে তারা। এজন্যে তাহিতি ও মুরিয়ার বাইরে থেকে, এমনকি হেড কোয়ার্টার 'মতু' থেকেও তাদের দরকারী সব লোককে তাহিতি ও মুরিয়াতে আনা হচ্ছে। আমি শুনেছি, তাহিতিতেই আহমদ মুসাকে তারা ধ্বংস করবে। বলল দ্বিতীয় লোক।

দ্বিতীয় লোকের কথা চলাকালেই একটা কল আসলো তার মোবাইলে। সে তাড়াতাড়ি কথা শেষ করে মোবাইল ধরল। বলল, ইয়েস স্যার, আমি সনি।

অপর পক্ষের কোন কথা শুনা গেল না। এপারের দ্বিতীয় লোকটি শুধু বলে চলল, জি স্যার, ওকে স্যার, ঠিক সিদ্ধান্ত, আমরা প্রস্তুত, মুহূর্তের জন্যেও আমরা কাজ বন্ধ রাখিনি স্যার। কথা শেষ করে ফোন রাখল দ্বিতীয় লোকটি।

কে টেলিফোন করেছিল সান? প্রথম লোকটি বলল।

কে আবার জারা, বস জিজরের দক্ষিন হস্ত।

কি বলল? জিজ্ঞাসা প্রথম লোকটির।

অনেক কথা। দ্বিতীয় লোকটি বলল।

কি কথা? প্রথম লোকটি আবার বলল।

আমি যা বলছি সেটাই। বাইরে থেকে সব লোককে তাহিতি মুরিয়াতে আনা হচ্ছে। এমনকি আমাদের ক্যাপিটাল অব পাওয়ার মতু থেকেও এখানকার জন্যে দরকারী সব লোককে তাহিতিতে আনা আছে। আজ থেকে লোক আসা শুরু হয়েছে। কালকের মধ্যে সব এসে যাবে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, আমাদের ক্যাপিটাল অব পাওয়ারের 'লর্ড' মানে বসের যে তিনজন সিকিউরিটিপ্রধান রয়েছে তার মধ্যে প্রধান দু'জন চীপ অব অপারেশন জিজর ও গোয়েন্দাপ্রধান ডারথ ভাদের এখানকার অপারেশন পরিচালনার জন্যে গতকালই তাহিতি এসেছেন। দ্বিতীয় লোকটি বলল।

তাহিতিকে তাহলে কি যুদ্ধক্ষেত্র বানাবে? বলল প্রথম লোকটি।

না, না। লোকটি বলল সবকাজ অত্যন্ত সংগোপনে হবে। গোটা তাহিতি ও মুরিয়া দ্বীপে নিশ্ছিদ্র চিরুনী অভিযান চলবে গোপনে, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর অলক্ষ্যে। এই অভিযান চলবে তাহিতি ও মুরিয়া দ্বীপে একই সংগে। দ্বিতীয় লোকটি বলল।

বিশাল পদক্ষেপ। কিন্তু আহমদ মুসাকে, যে তার জন্যে এই আয়োজন? বলল প্রথম লোকটি।

কি বলছ তুমি। টাকার অংকে ওকে পরিমাপ করা যাবেনা। ওর লাশের মুল্যই নাকি উঠেছে বিলিয়ন ডলার! বলল দ্বিতীয় লোকটি।

অসম্ভব ব্যাপার! বলছেন কি আপনি! প্রথম লোকটি বলল।

কিন্তূ তাহিতি ও মুরিয়াতে এত কিছু হবে কিন্তূ এখানকার পুলিশ বা গোয়েন্দারা টের পাবে না? বলল প্রথম লোকটি।

হাসল প্রথম লোকটি। বলল, ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের কি টাকার অভাব! কত টাকা লাগে মাট পর্যায়ের পেটি অফিসারদের কিনতে? নিশ্চিত থাকুন সে কেনা হয়ে গেছে। পুলিশও এই সাথে আমাদের সহযোগিতা করবে। দ্বিতীয় লোকটি বলল।

তাহলে আর কোন চিন্তা নেই। কিন্তূ একটা বিষয়ে আশংকা হয়, বিপদ তো একটা এসেই গেছে। ঈশ্বর না করুক। আহমদ মুসা যদি ধরা না পড়ে, তাহলে আমাদের কোন বিপদ হবে না তো? আমাদের ক্যাপিটাল অব পাওয়ার কতটা সুরক্ষিত? আমাদের ভবিষ্যৎ কিন্তূ এই সাফল্যের উপর নির্ভর করছে। বলল প্রথম লোকটি।

নিশ্চিত থাক। আমাদের ক্যাপিটাল অব পাওয়ার দুনিয়ায় নয়, পাতালে। আমরা ছাড়া যেতে পারে একমাত্র দৈত্য, আর কেউ নয়। বলল দ্বিতীয় লোকটি।

কিন্তূ আমরা যেতে পারলে অন্যেরা যেতে পারবে না কেন? কথায় আছে, এক মানুষ যা পারে অন্য মানুষও তা পারবে। প্রথম লোকটি বলল।

এ তত্ত্ব সব ক্ষেত্রে খাটে না। আমাদের ক্যাপিটাল অব পাওয়ারের ক্ষেত্রে তা আরও বেশি খাটে না। প্রথমে পাতালে নামার পথ পাওয়ার বিষয়টি একটা অসম্ভব ব্যাপার। তার পরের ধাপে নামার ব্যাপারটা আরও কঠিন, সেখানে ধাঁধা আছে। ইলেকট্রনিক নানা ধাঁধা আছে। দু'দিকের দেয়াল ফুঁড়ে স্বয়ংক্রিয় গুলি অনুপ্রবেশকারীকে পদে পদে ঝাঁঝরা করে দেয়ার ব্যবস্থা আছে। কেউ রাস্তা পেরিয়ে প্রাসাদের দরজায় পা রাখতে পারলেও দরজা খুলতে পারবেনা। ডিজিটাল লকের কোড ভাঙা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। আর ভেতরে তো আরেক গোলক ধাঁধা। চারটি ফ্লোরের এলিভেটর প্রতিটি করিডোরে দ্বিমুখীভাবে চলে। কোনটা কোন দিকে চলছে কেউ জানে না?

শুনেছি, আমাদের সব গোপন কোড, আমাদের সব কিছু শুধু একজনই জানে। যে আমাদের সব কিছু জানে, তাকে এই পরিস্থিতিতে মতু থেকে সরানো দরকার নয় কি?

হাসল দ্বিতীয় লোকটি। বলল, তাকে পাওয়া অত সোজা নয়। সে আমাদের চার তলায় থাকে বটে, কিন্তু কোথায় থাকে কেউ জানেনা এবং সে এক কক্ষেও সব সময় থাকে না। তার ব্যপারে জানতে পারে শুধু ম্যাডাম গৌরী। তাও কতটা জানে জানি না।

এত কিছু তুমি জান কি করে? ভেতরের তো কিছুই আমরা জানি না। বলল প্রথম লোকটি।

আমি বাইরের অপারেশনের দায়িত্ব পেয়েছি মাত্র কিছু দিন হলো। তার আগে আমি ডিজাইনার ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে ভেতরের সব কাজের সাথেই যুক্ত ছিলাম। কক্ষ বিন্যাস, ইলেক্ট্রিক ও এলিভেটর নেটওয়ার্কিং সব কিছুর সাথেই আমি ছিলাম।

কাজটা ছিল খুব জটিল। এটি তৈরি করা প্রাসাদ নয়। প্রাকৃতিক নিয়মে বা আগের মানুষের আগের চিন্তায় তৈরি করা প্রাসাদ। লিমিটেড এ্যাকোমোডেশন। এখানে নতুনভাবে কোন কিছু সংযোজন করা সহজ নয়। ইলেকট্রিক ওয়ারিং কোন কোন জায়গায় ড্রিল করে কোনভাবে করা হয়েছে। আর চারটি মুভিং ওলিভেটর তৈরিতে কিছু ভাংচুর করতে হয়েছে, কিন্তু অসুবিধা হয়নি। এ্যাকোমোডেশনও ঠিক মত হয়েছে। তৃতীয় ও দ্বিতীয় তলায় রোবটদের জন্যে সারিবদ্ধ ক্যাপসুল গড়া হয়েছে। দুই ফ্লোরে ওদের এ্যাকোমোডেশন ও অন্য সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। নিচের তলায় তো কিছুই নেই। ওটা একটা টেস্টগ্রাউন্ড ও ল্যাবরেটরি। সব কাজেই আমি ছিলাম।

তা হলে তো তুমি অনেক বেতন পেতে? প্রথম লোকটি বলল।

বেতন আর কি। কাজটা হয়ে গেলেই হয়। আমরা সফল তো আমরাই দুনিয়ার বাদশাহ হবো। দ্বিতীয় লোকটি বলল।

কেন? পাশেই তো আছে আমেরিকা, ওরা বসে থাকবে? বলল প্রথম লোকটি।

আমাদেরকে তারা তাদের লোকজনই ভাববে। মনে করবে আমরা তাদের কাজই করছি। কিন্তু শত্রু বলে বুঝবে, তখন আর তাদের করার কিছু থাকবে না বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত সারেন্ডার করা ছাড়া। দ্বিতীয় লোক বলল।

হোটেল 'লা ডাইমন্ড ড্রপ' এর গেটে পৌছতেই ওদের কথা বন্ধ হয়ে গেল। গাড়ি থেকে নামার সময় ওদের একজন বলল, আহমদ মুসার রুম তো বন্ধ। ঘরের চাবি না পেলে তো আমাদের চলবে না। ঘর থেকে ওর পোষাক কিংবা ব্যবহার্য কিছু চাই। আমাদের কুকুর বাহিনীর জন্যে এটা প্রয়োজন। সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন টার্গেটেড হিউম্যান স্পেল ডিটেক্টর ( THSD) –এর জন্যে। মানুষের চোখ যেখানে যাবে না। সেখানেও কুকুর ও স্পেল ডিটেক্টরের চোখ যাবে। রক্ষা নেই আহমদ মুসার। দ্বিতীয় লোকটি বলল।

চিন্তা নেই 'কী বোর্ড' থেকে চুরি করব আমরা চাবিটি। আর তা পেতেই হবে, এটা আমাদের দাবী।

দু'জনেই গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। তারা চলে গেল হোটেলের ভেতরে।

আমি তখন কোথায় আপনাকে পাব এই সন্ধানে ছুটলাম। শহরের সম্ভাব্য সব জায়গা খুঁজে তারপর গেলাম ম্যাডাম মারেভার ওখানে। উনি থাকছেন তার এক বান্ধবীর বাসায়। তিনি আমাকে বললেন, স্যার মাঝে মাঝে মি. দ্যাগলের কাছে যান। আর এই মুহূর্তে স্যার মি, দ্যাগলের সাথে যোগাযোগ রাখবেন এটাই স্বাভাবিক। তুমি গিয়ে মি, দ্যাগলকে একটা জরুরি মেসেজ পৌছানোর চেষ্টা কর। মি, দ্যাগলের সাক্ষাৎ পেলে বলবে, আপনি দয়া করে স্যারের কাছে এই খবরগুলো পৌছানোর ব্যবস্থা করুন। উনি নিশ্চয় ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু মি, দ্যাগলের সাথে আর দেখা করতে হলো না। আল্লাহর অশেষ রহমতে আপনাকেই পেয়ে গেলাম। সব কথা আপনাকেই বলতে পারলাম। খুব হালকা লাগছে এখন আমার।

আহমদ মুসা পিঠ চাপড়ালো তেপাও-এর। বলল, তেপাও, আমার ভাই, তুমি যে ইনফরমেশন আমাকে দিয়েছ, তার চেয়ে বড় ইনফরমেশন আমি তাহিতিতে এসে পাইনি। তোমাকে ধন্যবাদ! অনেক ধন্যবাদ।

আমি কিছু বুঝিনি স্যার। এটুকু বুঝেছিলাম এ কথাগুলো স্যারের উপকারে লাগবে। বলল তেপাও।

তুমি এত মূল্যবান কথা আমাকে বলেছ যা আমার সামনে এগোবার গাইড লাইন। আহমদ মুসা বলল।

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা বলল, তেপাও, গাড়ি ঘুরাও। স্বরাষ্ট্র সচিব মি. দ্যাগলের কাছে আবার ফিরে চল।

গাড়ি ঘুরাল তেপাও।

আহমদ মুসা কল করল স্বরাষ্ট্র সচিব মি. দ্যাগলকে। মি. দ্যাগল আহমদ মুসার গলা টেলিফোনে পেয়েই বলল, কোন খারাপ খবর নয় তো আহমদ মুসা?

না স্যার। একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে। আমি আসছি। আপনার অসুবিধা নেই তো স্যার? বলল আহমদ মুসা।

অবশ্যই না। এস। আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। স্বরাষ্ট্র সচিব মসিয়ে দ্যাগল বলল।

গাড়ি পৌছল মসিয়ে দ্যাগলের অফিসে।

মসিয়ে দ্যাগল বেরিয়ে এসেছে বারান্দায়।

আহমদ মুসা বারান্দায় উঠে এলে তারা ভেতরে ঢুকে গেল।

আহমদ মুসাকে চেয়ারে বসিয়ে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসতে বসতে মি. মশিয়ে দ্যাগল বলল, কি ব্যাপার মি. আহমদ মুসা, জরুরি কিছু?

অবস্থার কিছু পরিবর্তন ঘটেছে স্যার। বলল আহমদ মুসা।

কি সেটা? স্বরাষ্ট্র সচিব দ্যাগল বলল।

স্যার, আগামি সন্ধাতেই আমি ওদের হেড কোয়ার্টার অ্যাটলে ঢুকতে চাই।

কেন, এত তাড়াতাড়ি কেন? বলল স্বরাষ্ট্র সচিব দ্যাগল।

আমাদের তেপাও নিশ্চিত খবর জেনেছে, আমাকেসহ মারেভা ও মাহিনের সন্ধানের জন্য ওরা আগামী পরশু থেকে তাহিতি ও মুরিয়া দ্বীপে চিরুণী অভিযান শুরু করতে যাচ্ছে। অভিযান চলবে নিশ্চয় কয়েক দিন। তাদের এই চিরুণী অভিযানের বেল্ট পলিনেশীয়ার বাইরে থেকে। পলিনেশীয়ার বিভিন্ন

অঞ্চল, এমনকি হেড কোয়ার্টারের দরকারী সব জনশক্তিকে তাহিতিতে আনা হবে। খোদ ওদের চীফ অপারেশন কমান্ডার জিজর ও ওদের গোয়েন্দাপ্রধান ডারথ ভাদের তাহিতিতে আসছে। আমি মনে করি এটা আমাদের জন্য একটা বড় সুযোগ। কালকেই ওরা সদলবলে আসছে তাহিতি। আমি পরশু দিন রাতে ওদের হেড কোয়ার্টার অ্যাটলে ঢুকতেচাই স্যার। আমি এর মধ্যেই সব প্রস্তুতি সেরে ফেলতে চাই স্যার। বলল আহমদ মুসা।

সংগে সংগে উত্তর দিল না স্বরাষ্ট্র সচিব মশিয়ে দ্যাগল। বলল, হ্যাঁ, মি. আহমদ মুসা, তোমার কৌশলটা ঠিক। তারা যখন তাদের হেড কোয়ার্টার অ্যাটল থেকে এখানে তাদের দরকারি লোকগুলো নিয়ে আসবে তখন তাদের হেড কোয়ার্টার প্রতিরক্ষা অবশ্যই দুর্বল হবে। এই সুযোগই আপনি নিতে যাচ্ছেন। চমৎকার সিদ্ধান্ত! চলুন, আমি আপনাকে নেভাল বেজে নিয়া যাব। ওখানে আপনাকে আন্ডারওয়াটার টিউব ভেহিকেল পরিচালনায় ট্রেনিং নিতে হবে। রাডার রেসিট্যান্ট পোষাক, ইলেক্ট্রনিক জ্যামিং মেশিন ও সাইলেন্সার লাগানো মিনি মেশিন রিভলবার ওখানেই পেয়ে যাবেন। আমি মনে করি, সেখানকার আমাদের নেভাল রেস্ট হাউজে কাল সন্ধ্যায় আপনি থাকবেন।

ধন্যবাদ স্যার। মারেভা, মাহিন ও তেপাও-এর নিরাপত্তাও দরকার। চিরুণী অভিজানের সময় তারা ধরা পড়ে যেতে পারে। আহমদ মুসা বলল।

আপনার চিন্তা নেই। ওদের নিরাপত্তা নিয়ে আমি আগেই চিন্তা করেছি। বলল মশিয়ে দ্যাগল।

ধন্যবাদ স্যার। আহমদ মুসা বলল।

আসুন! বলে হাঁটতে লাগল স্বরাষ্ট্র সচিব ও পুলিশপ্রধান মশিয়ে দ্যাগল।

তার সাথে হাঁটতে লাগল আহমদ মুসাও।

গাড়িতে আহমদ মুসাকে বসিয়ে গাড়ি ঘুরে নিজের সিটের পাশে যেতেই একজন গোয়েন্দা অফিসার এসে বলল, স্যার, বিভিন্ন ছদ্মবেশে একাধিক লোক আমাদের এই গেটের উপর নজর রেখেছে। আমরা এগোলেই তারা সরে যাচ্ছে, অন্য লোক আসছে তার জায়গায় অন্য ছদ্মবেশে।

ধন্যবাদ, বুঝেছি ব্যাপারটা।

বলে মশিয়ে দ্যাগল গাড়িতে উঠে বসল।

বলেই বলল, আশ্চর্য হচ্ছি মি. আহমদ মুসা! ওরা আমার গেটের উপরও চোখ রাখছে! আপনি এসেছেন নিশ্চয় ওরা তা জানতে পেরেছে।

তবে আমার এখান থেকে যাওয়া ও আসাটাকে তারা ফলো করতে পারেনি। আমার ধারনা, আজ থেকেই ওরা এখানে পাহারা বসিয়েছে। ওদের এটা জানার কথা নয় যে, আমি এখানে এসেছি এবং এসে থাকি। তবে তারা যে বিবেচনাতেই এসে থাকুক, তারা সফল।

মশিয়ে দ্যাগলের গাড়ি স্টার্ট নিল। গাড়ি চলতে শুরু করল।

এই গেটের উপর চোখ রাখার তখন কেউ ছিল না।

আমাদের ফলো করা আমাদের জন্য ভাল হতো না।

স্বরাষ্ট্র সচিবালয় থেকে নৌঘাঁটি অনেকখানি পথ। পাপেতির সার্কুলারে রোডের যেখানে অ্যাভেনিউ ডু প্রিন্স হিন্দি এসে মিশেছে, সেখানেই স্বরাষ্ট্র সচিবালয় অবস্থিত। অ্যাভেনিউ ডু প্রিন্স হিন্দি সোজা পূর্ব দিকে প্রায় ১০ মাইল এগিয়ে মোয়েভা নদী অতিক্রম করে পূর্ব-দক্ষিন দিকে এগিয়েছে। মোয়েভা নদীর ঐ সংযোগ স্থল থেকে একটা পাথুরে প্রশস্ত রাস্তা মোয়েভা নদীর সমান্তরালে কোস্টাল লেগুনের প্রান্ত পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। এটা প্রধান নেভাল ঘাঁটি নয়, এটা নেভাল ওয়ার্কশপ ও ট্রেনিং কেন্দ্র। এই নেভাল ওয়ার্কশপ ও ট্রেনিং কেন্দ্রেই আন্ডারওয়াটার ক্যাপসুল ভেহিকেলের ওপর আহমদ মুসার ট্রেনিং হবে।

স্বরাষ্ট্র সচিবালয় থেকে অ্যাভেনিউ ডু প্রিন্স হিন্দি রোড ধরে কিছুটা এগোলেই পাপেতির বিখ্যাত পোরতু নদী। পোরতু নদীর ব্রীজে ওঠার সময় পাশ দিয়ে ফিরছিল গভর্নর সচিবালয়ের সেক্রেটারি হোয়ানু। সে গলা চড়িয়ে বলল, স্যার ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন, কখন ফিরবেন?

আমি মোয়েভা ডকে যাচ্ছি। তাড়াতাড়ি ফিরব। স্বরাষ্ট্র সচিব দ্যাগলকেও কথা অনেকটা গলা চড়িয়েই বলতে হলো। পাশে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা একটা গাড়ির দিকেই তাকিয়ে ছিল আহমদ মুসা। একটা জীপও দাঁড়িয়ে ছিল গাড়ির পাশে। আহমদ মুসাদের পরে জীপটি এসে দাঁড়ায়। জীপে চারজন আরহী।

নিবিষ্টভাবে ওদের দিকে তাকাতে গিয়ে হঠাৎ সে দেখল, তারা যেন গোগ্রাসে স্বরাষ্ট্র সচিব মি. দ্যাগলের কথা শুনছে! দ্যাগল তখন গলা চড়িয়ে মোয়েভা নেভাল ডকে যাওয়ার কথা বলছিল। গাড়ির অন্য সবারই মনোযোগ তখন ঐ গাড়ির দিকে।

বিস্মিত হলো আহমদ মুসা। কিন্তু ভাবনার আর সময় হলো না, সবুজ সিগন্যালের সাথে সাথেই জীপটি হাওয়ার মতো ছুটল সামনে।

স্বরাষ্ট্র সচিব দ্যাগল তখনও কথা বলছিল গভর্নর সচিবালয়ের সচিব হোয়ানুর সাথে।

কথা শেষ হলে স্টার্ট নিল স্বরাষ্ট্র সচিব দ্যাগলের গাড়ি।

অ্যাভেনিউ ডু প্রিন্স হিন্দি সড়কটি তীরের মত সোজা পুব দিকে এগিয়ে গেছে।

স্বরাষ্ট্র সচিব দ্যাগলের সাথে টুকটাক কথা চলছে, কিন্তু আহমদ মুসার মনোযোগ বার বার ছেদ পড়ছিল। ঐ জীপটি ভুলতে পারছিল না আহমদ মুসা। ওরা মি. দ্যাগলের মোয়েভা নেভাল ডকে যাওয়ার কথা উদগ্রীব হয়ে শুনছিল কেন? আর ওদের সবার মনোযোগ তাদের প্রতি ছিল কেন? ওদের মধ্যে একজন ছাড়া কাউকেই তাহিতির লোক বলে মনে হয়নি। তাহলে কি ওরা ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের লোক? মি. দ্যাগলের অফিস গেটের উপর তো তারাই চোখ রাখছিল। সন্দেহ নেই ওরাই আবার তাদের ফলো করছে। আহমদ মুসাকেও তারা চিনতে পেরেছে নিশ্চয়। তাহলে ওদের ছেড়ে ওরা চলে গেল কেন?

নানা কথা ও নানা চিন্তার মধ্যে দিয়ে গন্তব্যের শেষ প্রান্তে মোয়েভা নদীর কাছে তারা চলে গেল। মোয়েভা নদীতে ব্রীজ আছে। অ্যাভেনিউ ডু প্রিন্স হিন্দি সড়কটি মোয়েভা ব্রীজ হয়ে আরও পূর্ব-দক্ষিণে চলে গেছে।

ব্রীজ পাওয়ার একটু আগে একটা টিলার ধার ঘেঁষে প্রশস্ত পাথুরে রাস্তা চলে গেছে মোয়েভা নেভাল ডক ইয়ার্ড পর্যন্ত। রাস্তার শুরুটা প্রশস্ত হলেও পরবর্তী অংশ এক রকম নয়। কোথায় সংকীর্ণ, কোথাও প্রশস্ত। দু'এক জায়গায় পাহাড়ের মত উঁচু টিলার সারির বুক চিরে অতিক্রম করেছে সড়কটি। সেখানে সংকীর্ণ। দু'টো গাড়িও পাশাপাশি চলতে পারে না।

ব্রীজের গোড়ায় ছোট্ট একটা পুলিশ ফাঁড়ি।

পর্যায়ক্রমে দু'জন করে পুলিশ পাহারায় থাকে।

হঠাৎ আহমেদ মুসা দ্যাগলকে বলল, স্যার, এখানে গাড়িটা একটু দাঁড় করালে ভাল হয়। পুলিশের সাথে একটু কথা বলতে চাই।

গাড়ি নেভাল ডকের দিকে মোড় না নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। পাশেই পুলিশ ফাঁড়ি।

গাড়ি দাঁড়াতেই দু'জন পুলিশ ছুটে এল। স্বরাষ্ট্র সচিবকে দেখে চোখ তাদের ছানাবড়া হয়ে গেল। লম্বা স্যালুট করল তারা।

আহমদ মুসা গাড়ি থেকে নামল। পুলিশ দু'জনকে কাছে ডেকে বলল আহমদ মুসা, তোমরা গত দশ মিনিটের মধ্যে কোন জীপ বা গাড়িকে মোয়েভা নেভাল ডক ইয়ার্ডের এই সড়ক ধরে যেতে দেখেছ?

দু'জন একটু ভাবল। একজন বলল, ইয়েস স্যার, সাত আট মিনিট আগে একটা জীপ নেভাল ডক ইয়ার্ডের দিকে গেছে।

পুলিশের উদ্দ্যেশ্যে 'ধন্যবাদ' বলে আহমদ মুসা স্বরাষ্ট্র সচিবকে বলল, স্যার আপনার গাড়িতে বিস্ফোরক ডিটেক্টর আছে?

না, মি. আহমদ মুসা গাড়িতে আলাদা কোন বিস্ফোরক ডিটেক্টর নেই। গাড়ির ইঞ্জিন কেবিনে ডিটেক্টর ফিট করা আছে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে তা সব ধরনের বিস্ফোরককে ডিটেক্ট করতে পারে।

ঠিক আছে স্যার। কত দূর থেকে পারে? আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

কমপক্ষে দশ গজ। বলল স্বরাষ্ট্র সচিব দ্যাগল।

গুড। তাহলে এদিকে আর কোন চিন্তা নেই স্যার। আহমদ মুসা বলল।

মি. আহমদ মুসা, এসব নিয়ে আপনি ভাবছেন কেন? আপনি সামনের পথটুকুতে কিছু আশংকা করছেন? জিজ্ঞাসা দ্যাগলের।

হ্যাঁ স্যার, আমাদের এখানে দশ মিনিট আগে যে জীপটা এই পথে নেভাল ইয়ার্ডের দিকে গেছে, সে জীপ্টাকে আমি সন্দেহ করছি। বলল আহমদ মুসা।

এরা কারা বলে মনে করছেন? দ্যাগল বলল।

আমি মনে করছি ওরা ব্লাক সান সিন্ডিকেটের লোক। বলল আহমদ মুসা।

ওরা দেখছি একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছে! আমাদের ডক ইয়ার্ডকেও সাবধান করতে হবে। নাশকতামূলক কিছু ঘটাতে পারে ওরা। দ্যাগল বলল।

সাবধান থাকা ভাল স্যার। বলল আহমদ মুসা।

স্বরাষ্ট্র সচিবের গাড়ি চলতে শুরু করেছে। চলছে গাড়ি মাঝারি গতিতে।

আহমদ মুসার মনে একটা অস্বস্তি। তেমন কিছু তো ঘটেনি! পাশে ব্যাগের দিকে তাকিয়ে ভাবল ব্যাগও তো এনেছে! অ্যাটল দ্বীপে তার অভিজান শুরু হবে এই নেভাল ইয়ার্ড থেকেই। মি. দ্যাগল তাকে এই কথায় বলেছে। ব্যাগ কাছে টেনে নিল আহমদ মুসা। একবার চেক করা দরকার সব উঠেছে কিনা। ব্যাগের প্রধান কেবিনে যা তুলেছিল সবই পেল। হঠাৎ তার খেয়াল হলো লেজারগান ও লেজার কাটার কোথায়? আজ সকালেই তো ব্যাগে তুলেছি! ব্যাগের অন্যান্য কেবিন খুঁজতে গিয়ে ব্যাগের বাইরের কেবিনে পেয়ে গেল অস্ত্র দু'টি। মনে পড়ল আহমদ মুসার, তার একটি অভ্যাস হলো অস্ত্র যত গুরুত্বপূর্ণ হয়, ততই সহজ ও নাগালের মধ্যে রাখে সে ঐ অস্ত্র।

বেশ জোরেই চলছিল গাড়ি। রাস্তার এই অংশটা সমতল। এর পরেই পাহাড়ের ছোট বড় টিলা। নেভাল ডকের সমতল পর্যন্ত নেমে গেছে।

গাড়ীটা কি সত্যিই ওদের ছিল মি. আহমদ মুসা? বলল স্বরাষ্ট্র সচিব দ্যাগল।

আমি তাই মনে করি স্যার? আহমদ মুসা বলল।

ওরা কি বোমা বা এ ধরনের কিছু বিস্ফোরক পাতবে বলে মনে করেন? বলল দ্যাগল।

স্যার, এটা আমার ধারণা। আহমদ মুসা বলল।

বোমা বা বিস্ফোরক পাতার উপযোগী স্থানগুলো আমরা পেরিয়ে এসেছি। বলল দ্যাগল।

আল হামদুলিল্লাহ! আল্লাহ আমাদেরকে নিরাপদে পৌছাতে সাহায্য করুন। আহমদ মুসা বলল।

টিলাসংকুল পথে প্রবেশ করেছে গাড়ি।

রাস্তা আঁকাবাঁকা ও সংকীর্ণ।

দু'পাশে টিলা। সামনে পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে উঁচু একটা টিলা। টিলাকে পাশ কাটাবার জন্যে রাস্তা এখানে বাঁক নিয়েছে।

বাঁক নিতে গিয়ে গাড়ি ডেডস্টপ-এর মত হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল।

হঠাৎ এভাবে গাড়ি দাঁড়িয়ে যাওয়ায় সবাই ঝাঁকি খেল। ড্রাইভার পুলিশটি বলল, স্যার, গাড়ির স্টার্টার, চাবি, স্টিয়ারিং কিছুই নড়ছে না।

ড্রাইভার গাড়ির ইঞ্জিন দেখার জন্যে দরজা খুলতে গিয়ে পারল না। সে উদ্বিগ্ন কন্ঠে বলল, স্যার, গাড়ির দরজা আনলক হচ্ছে না।

আহমদ মুসাও দ্রুত তার পাশের দরজা খুলতে গেল, কিন্তু পারল না।

দ্রুত আহমদ মুসা ফিরল দ্যাগলের দিকে। বলল, স্যার, গোটা গাড়ি জ্যাম হয়ে গেছে। মেটাল জ্যামিং মেশিনের ম্যাগনেটিক স্প্রে আমাদের গোটা অচল করে দিয়েছে।

এটা কি সম্ভব? এমন অস্ত্রের কথা তো শুনিনি। বলল দ্যাগল।

মেটাল জ্যামিং ডিভাইস ওদের আছে স্যার। আহমদ মুসা বলল।

সাংঘাতিক! এখন করণীয়? বলল দ্যাগল। তার কন্ঠে উদ্বেগ ঝরে পড়ল।

আহমদ মুসা কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল। কিন্তু বলার সুযোগ হলো না। প্রবল গুলিবৃষ্টি শুরু হলো গাড়ির উপর চারদিক থেকে।

পেছনের চারজন পুলিশ, তাদের রাইফেল, ড্রাইভার পুলিশ ও মি. দ্যাগল রিভালবার হাতে নিল।

আমাদের রাইফেল ও রিভলবার কোন কাজ দেবে না স্যার। ওগুলোও জ্যাম হয়ে গেছে। প্লিজ, আপনারা সিটের নিচে শুয়ে পড়ুন। দ্রুত কন্ঠে চিৎকার করে বলল আহমদ মুসা।

তবু দ্যাগল তার রিভলবার একবার পরীক্ষা করল। দেখল ট্রিগারকে সূঁচ পরিমাণ নড়ানো গেল না। চোখ দু'টি ছানাবড়া হয়ে গেল তার অবাক বিস্ময়ে!

সেও সিটের নিচে ঢুকে গেল।

আহমদ মুসা গাড়ির ফ্লোরে শুয়ে ব্যাগের বাইরের পকেট থেকে লেজারগান বের করল।

লেজারগানের বডি সর্বাধুনিক প্লাস্টিক মেটাল দিয়ে তৈরি। এই প্লাস্টিক মেটাল ইস্পাতের চেয়ে কয়েক গুণ শক্ত। ইস্পাতের অণুগুলোর মধ্যে ফাঁক থাকে, কিন্তু এই প্লাস্টিকের অণুগুলোর মধ্যে কোন ফাঁক থাকে না। মনে করা হয়, এই প্লাস্টিকের ব্যবহার দিয়ে 'এ্যান্টিম্যাটার এজ'-এর শুরে হচ্ছে।

লেজারগানটি হাতে নিয়ে আহমদ মুসা মাথা তোলার চেষ্টা করল।

দেখল গাড়ির জানালায় কাচের কোন অস্তিত্ব নেই। গাড়ির বডিও ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। তবে ডাবল লেয়ারের স্টিল বডির জীপ বলে বুলেটের ঝাঁক ভেতরে লিচের অংশের খুব একটা ক্ষতি করতে পারেনি।

চারদিকের চারটা উৎস থেকে গুলি আসছে, এ সম্পর্কে আহমদ মুসা নিশ্চিত হয়েছিল। তার মানে ঐ জীপের চারজন লোকই মাত্র এখানে আছে। আত্মরক্ষার জন্যে চারজনকে শামাল দিতে হবে। গুলি তখনও চলছে।

আহমদ মুসা গড়িয়ে সিটের পাশ ঘেঁষে গাড়ির পেছনের প্রান্তে চলে গেল যাতে তিনদিককে সামনে রাখা যায়। পেছনের গুলির রেঞ্জ দেখে বুঝল তারা দাঁড়িয়ে থেকে গুলি করছে।

আহমদ মুসা বিসমিল্লাহ বলে লেজারগান ডান হাতে নিয়ে ট্রিগারের বাটনে বুড়ো আঙুল রেখে হাতটা গাড়ির পেছনের কাচ ভেঙে যাওয়া উন্মুক্ত স্পেসের বটম লেভেলে রাখল। যে কোন মুহূর্তে হাতে গুলি খাওয়ার ভয় ছিল। কিন্তু এই ঝুঁকি নেয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

আহমদ মুসা লেজারগানের ট্রিগারের বাটনে বুড়ো আঙুল চেপে গাড়ির গোটা পেছন দিকের উপর ঘুরিয়ে নিল।

লেজার গানের রেডিয়েশনের স্টিমুলেটেড বিচ্ছুরণ যে লেভেল দিয়ে ঘুরে এসেছে, সে লেভেলে কেউ যদি থাকে তাহলে চোখের পলকে সে দু'খন্ড হয়ে পড়বে।

ট্রিগার টেপার পর আহমদ মুসার শ্বাসরুদ্ধকর অপেক্ষার পালা।

অপেক্ষার ফল তার সফল হলো, গাড়ির পেছন থেকে গুলি বন্ধ হয়ে গেল।

সংগে সংগে আহমদ মুসা গাড়ির সামনের দিকে ফিরে বসে এক পলকের জন্যে সিটের উপর মাথা তুলল। দেখল সামনের লোকটি তার মিনি মেশিনগান বাগিয়ে ছুটে এসে দাঁড়াল গাড়ির সামনে। তারপর সামনে ঝুঁকে পড়ে মিনি মেশিনগান ঘুরিয়ে নিচ্ছে গাড়ির ফ্রন্ট সিটের দিকে।

আহমদ মুসা বুঝল ড্রাইভার পুলিশ ও স্বরাষ্ট্র সচিব দ্যাগলের পিএ তার লক্ষ।

আহমদ মুসা দ্বিতীয়বার ট্রিগারের বাটন টিপল সামনের ঐ লোকটির লক্ষে।

লোকটির মাথার পেছনের অর্ধাংশ মুহূর্তেই কোথায় হারিয়ে গেল। লোকটি লাশ হয়ে পড়ে গেল গাড়ির উপর।

পর মুহূর্তে দু'পাশের জানালায় দু'জন লোক এসে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা আগেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

ওরা দু'জনেই আহমদ মুসাকে দেখতে পেয়েছে।

ওদের মিনি মেশিনগানের নল ঘুরে আসছে।

আহমদ মুসার লেজারগান ঘুরেছে বাঁ দিকের কাচের জানালায় দাঁড়ানো লোকটির লক্ষে। লেজারগানের ট্রিগার বাটনে বুড়ো আঙুল চেপেই ঝাঁপিয়ে পড়ল গাড়ির মেঝের উপর। দুই জানালা থেকেই গুলির ঝাঁক ছুটে এসেছিল আহমদ মুসা লক্ষে। বাম দিকের লোকটির গুলি গোটাটাই লক্ষভ্রষ্ট হয়ে গাড়ির ছাদকে আঘাত করেছিল। তাদের ট্রিগার টেপার আগ মুহূর্তেই লেজারগানের রেডিয়েশনের স্টিমুলেটেড বিচ্ছুরণ গিয়ে আঘাত করেছিল। কিন্তু ডানদিকের লোকটির গুলি করতে তাড়াহুড়া করতে হলেও সে নির্বিঘ্নে গুলি করতে পেরেছিল। লেজারগানের ট্রিগার বাটন চাপার সাথে সাথেই মেঝেয় আহমদ মুসা ঝাঁপিয়ে পড়তে না পারলে তার দেহটা ঝাঁঝরা হয়ে যেত। যে সিটের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল, সেই সিটের একটা কংকালমাত্র আছে শুধু, সিট আর গাড়ির বডিও উধাও! আহমদ মুসার ঘাড়ের এক খাবলা গোশতও তুলে নিয়ে গেল একটা বুলেট।

আহমদ মুসা মেঝেয় শুয়ে পড়ে ডান দিকের লোকটির গুলির হাত থেকে বেঁচে লেজার গানের টার্গেট ডান দিকের লোকটির দিকে ঘুরিয়ে নেবার জন্যে চেষ্টা করছিল।

আহমদ মুসা শুয়ে পড়েই তার পাশের সিটের সামনে দিয়ে সোজা পেয়ে গেল জানালায় দাঁড়ানো ডান দিকের লোককে। শুয়ে পড়ার সময়ই সে ঘুরিয়ে নিয়েছিল লেজারগান। লোকটিকে দেখার পর লেজারগানের ট্রিগার বাটনে বুড়ো আঙুল চেপে বসতে সময় লাগলো না। লোকটিও শুয়ে পড়া আহমদ মুসাকে খুঁজে পেয়েছিল। গুলি বর্ষণরত তার মিনি মেশিনগানের নল দ্রুত ঘুরে আসছিল আহমদ মুসার দিকে। ক্ষিপ্রতার প্রতিযোগিতায় জিতে গেছে আহমদ মুসা। তার লেজারগানের প্রাণঘাতী সব বাধা বিলোপকারী রেডিয়েশনের স্টিমুলেটেডের গতি বুলেটের চেয়ে বহু গুণ বেশি। জানালার ঝুঁকে পড়া লোকটার প্রাণহীন দেহ জানালার উপর ঝুলে পড়ল।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়াল স্বরাষ্ট্র সচিব দ্যাগলও।

সে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে। বলল, ধন্যবাদ মি. আহমদ মুসা! এক অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন আপনি! অস্ত্রগুলো অকেজো হবার পর বাঁচার বিন্দুমাত্র আশাও আমরা করিনি!

হঠাৎ বিস্ময় ফুটে উঠল দ্যাগলের চোখে-মুখে।

সে আহমদ মুসাকে ছেড়ে দিয়ে আহমদ মুসার পেছন থেকে দু'হাত সরিয়ে সামনে নিয়ে এল। দেখল, রক্তাক্ত তার দুই হাত। বলল দ্যাগল উদ্বিগ্ন কন্ঠে, আপনি আহত মি. আহমদ মুসা? গুলি লেগেছে।

বলেই দ্যাগল আহমদ মুসার পেছনে গেল। দেখল, ঘাড়ের পাশে কাঁধের একটা অংশ থেকে জ্যাকেট উড়ে গেছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে জায়গাটা। বলল দ্যাগল, মি.আহমদ মুসা আপনি সাংঘাতিক আহত। তবে রক্ত দেখে মনে হচ্ছে বুলেটটা হোরিজেন্টালি আঘাত করেছিল, ভার্টিকালি নয়। গুলিটা আহত করে বেরিয়ে চলে গেছে বলে মনে হচ্ছে।

একটু থেমেই দ্যাগল তার পিএ-কে লক্ষ করে বলল, তুমি ফাস্ট এইড বক্স থেকে ইলাস্টিক ব্যান্ডেজটা নিয়ে এস। তাড়াতাড়ি।

এসবের কিছু দরকার নেই স্যার। চলুন আমরা গাড়ি থেকে বের হই। বলল আহমদ মুসা।

পিএ রেডিমেড ইলাস্টিক ব্যান্ডেজ নিয়ে এসেছে।

দ্যাগল কিছু না বলে ব্যান্ডেজটি আহমদ মুসার আহত জায়গার উপর সেট করে ব্যান্ডেজের ইলাস্টিক স্কচ টেপ চারদিকে লাগিয়ে দিল।

চলুন এবার। কাছেই আমাদের নেভাল ডক ইয়ার্ড। ওখানে ভাল হাসপাতাল আছে। সার্ভিসও ভাল পাওয়া যাবে। বলল দ্যাগল।

জানালা দিয়ে বের হওয়া অসুবিধাজনক। চলুন ভাঙা উইন্ডো স্ক্রীনের ওদিক দিয়ে বের হতে হবে। আহমদ মুসা বলল।

কেন এখন খুলবে না দরজা? বলল পুলিশ ড্রাইভার।

না, ম্যাগনেটিক এ্যাকশনের একটা মেয়াদ আছে, তার আগে দরজা খুলবে না। আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসা, এ মেটালিক জ্যামিং অস্ত্র কোত্থেকে এল? আমি তো এর নামও শুনিনি। এতো একটি সেনাবাহিনীর পুরোটাকেই অচল করে দিতে পারে। বলল দ্যাগল। তার কন্ঠে অপার বিস্ময়!

এটা ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের নিজস্ব আবিষ্কার। আহমদ মুসা বলল।

সাংঘাতিক ব্যাপার। ওরা তো দেখছি আমাদের তাহিতিকেও দখল করে ফেলতে পারে। বলার সাথে সাথে চোখ দু'টি ছানাবড়া হয়ে গেল মি. দ্যাগলের!

হ্যাঁ স্যার। ওরা তো তাই চায়। শক্তি দিয়ে ওরা দুনিয়ায় শয়তানের রাজত্ব কায়েম করতে চায়। কিন্তু শয়তানী শক্তি চিরদিন পরাজিত হয়েছে। সব সময় পরাজিতই হবে। আহমদ মুসা বলল।

সবাই একে একে বের হয়ে এল গাড়ি থেকে।

স্বরাষ্ট্র সচিব টেলিফোন করল পুলিশকে। আর নেভাল ডক ইয়ার্ডকে বলল গাড়ি পাঠাতে।

নেভাল ডক ইয়ার্ডের গাড়ি ও পরে পুলিশ গাড়িও এসে পৌছল।

স্বরাষ্ট্র সচিব পুলিশকে তার কাজ বুঝিয়ে দিল।

নেভাল ডক ইয়ার্ডের সবাই উঠে বসেছে।

দ্যাগলও কথা শেষ করে আহমদ মুসার পাশে উঠে বসল।

আবার ধন্যবাদ মি. আহমদ মুসা আপনাকে। ধন্যবাদ, লেজারগান আপনার কাছে ছিল। আপনি কি সব সময় এভাবে সব অবস্থার জন্যে প্রস্তুত থাকেন? বলল দ্যাগল।

না, তা নয়। আমি নেভাল ডক ইয়ার্ডে আসছি তাহিতি থেকে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই। এ কারণেই আমাকে যথাসম্ভব প্রস্তুত হয়েই আসতে হয়েছে।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! যা প্রয়োজন আপনি তাই করেছেন। তবে আমাদের জন্য আপনাকে বড় ধরনের খেসারত দিতে হলো। যাক, মি. আহমদ মুসা, আপনাকে কয়েক দিন তো হাসপাতালে থাকতে হবে। তারপর আপনার সেই হাতে কলমের কাজ শেখানো হবে। বলল দ্যাগল।

না জনাব, যেজন্যে এখানে এসেছি, সেই কাজের ব্যবস্থাটা আজই করুন। হাসপাতালে ট্রিটমেন্ট নেয়ার পর আমি ঐ কাজগুলো দেখতে এবং করতেও পারবো। এই কাজে তো একদিন লেগেও যেতে পারে। সুতারাং আজই কাজ শুরু করতে চাই জনাব। বলল আহমদ মুসা।

দ্যাগল আহমদ মুসার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, বুঝেছি মি. আহমদ মুসা, ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের ভয়ংকর দ্বীপটা আপনাকে খুব টানছে।

না স্যার, ঠিক দ্বীপের টান নয়, ৭৬ জন বিজ্ঞানী-বিশেষজ্ঞের মুক্তির আকুতি আমাকে অস্থির করে তুলেছে। দ্যাগলের কানে কানে বলল আহমদ মুসা।

দ্যাগলের মুখ গম্ভীর হলো। তার দৃষ্টিটা সামনের দিকে সম্প্রসারিত হলো। অনেকটা স্বগত উক্তির মতই সে বলল, আপনার কথা অনেক শুনেছিলাম, আজ দেখলাম, বুঝলাম, চিনলাম আপনাকে। আপনি সত্যিই শান্তির এক কপোত। যেখানেই মানুষ অশান্তি, সমস্যা, বিপদ, সেখানেই উড়ে যান আপনি।

কেউ উত্তর দিল না দ্যাগলের কথার। উত্তর তিনিও চাননি।

চলছে গাড়ি টিলাসংকুল বিপজ্জনক ঢালু পথে, নেভাল ডক ইয়ার্ডের দিকে।

# ৭

তোমরা বলতে চাও, ‘আহমদ মুসা সুপারম্যান?’ তীব্র কন্ঠ আলেক্সি গ্যারিনের।

আলেক্সি গ্যারিনের সামনে মাথা নত করে দাঁড়িয়েছিল জিজর ও ডারথ ভাদের। আর আলেক্সি গ্যারিনের কিছুটা পেছনে দাঁড়িয়েছিল গৌরী।

জিজর ও ডারথ ভাদের কোন কথা বলল না।

আলেক্সি গ্যারিনই কথা বলল আবার।

এটা কি বিশ্বাসযোগ্য যে, আমাদের চারজন শ্রেষ্ঠ কমান্ডো জনমানবশূন্য এক পরিবেশে মেটালিক জ্যামার দিয়ে ওদের গাড়িটাকে অচল করে দিল, তারপর অচল করে দিল তাদের অস্ত্রশস্ত্রও। এর পরে চারজন চারদিক থেকে গাড়িটার উপর আক্রমণ চালাল, কাচের বডি ভেঙে গিয়ে গাড়ি উন্মুক্ত হয়ে পড়ল। তারপরেও চারদিক থেকে চারটি মিনি মেশিনগানের ডজন ডজন বুলেট গাড়ির একজনকেও মারতে পারল না। উল্টো গাড়ি থেকে চারদিকের চার লোককে একা আহমদ মুসা আক্রমণ করল, আর মারা গেল আমাদের চারজন শ্রেষ্ঠ কমান্ডো। একে আমাদের আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে?

মাই লর্ড, আমরা যাকে হত্যার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছি, সম্পূর্ন হাতের মুঠোয় পেয়েও তাকে হত্যা করতে না পারা, উল্টো আমাদের সবাই তার হাতে নিহত হওয়া এটা অবিশ্বাস্য। আমি মনে করি আমাদের লোকদের অতি আত্মবিশ্বাস ও যে কোন পরিস্থিতির জন্য তৈরী না থাকার কারণেই এই বিপর্যয় ঘটেছে। আহমদ মুসার লেজারগানের অস্ত্র থাকতে পারে এটা আমরা বিবেচনায় আনতে ব্যর্থ হয়েছি। বলল জিজর নত মুখে বিনীত কন্ঠে।

তা নয়, আহমদ মুসাকে চিনতেই তারা পারেনি বারবার বলা সত্ত্বেও। আহমদ মুসার ক্ষিপ্রতা ও তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতাই সবচেয়ে বড় অস্ত্র। গাড়ির বডির কাচের অংশ ভেঙে গাড়িকে উন্মুক্ত করার পর কোন সময় না দিয়ে

চারদিক থেকে চারজন আহমদ মুসার উপে ঝাঁপিয়ে পড়লে সে পাল্টা আক্রমণের সুযোগ নিতে পারত না। বলল আলেক্সি গ্যারিন।

ইয়েস মাই লর্ড। একই সংগে বলল জিজর ও ডারথ ভাদের।

তোমরা আজ যা করলে, আগামীতেও তাই কি করতে থাকবে? বলল আলেক্সি গ্যারিন। তীব্র কন্ঠ তার।

মাই লর্ড। আমাদের লোকরা যথেষ্ট প্রস্তুত না হয়েই তাদের ফলো করছিল। তাই বিষয়টি তারা কাউকেই জানায়নি। আহমদ মুসাকে যখন তারা পেয়েছে এবং তাকে ফলো করেছে, তখন তা তাহিতির হেড কোয়ার্টারে ও আশেপাশের আমাদের লোকদের জানানো উচিত ছিল। হয়তো তাতে এই বিপর্যয় রোধ করা যেত এবং আহমদ মুসাকে ফাঁদে আটকানো যেত। ভুল আমাদের কমান্ডোরা করেছে মাই লর্ড। এ রকম ভুল আর হবে না। বলল জিজর।

আলেক্সি গ্যারিন তাকাল ডারথ ভাদেরের দিকে। বলল, ঘটনার পর আহমদ মুসা কোথায়, কি করছে? এ বিষয়টা মনিটর করা হচ্ছে কি না?

ইয়েস মাই লর্ড। ঘটনার পর আমাদের লোকরা জেলের ছদ্মবেশে ঘটনাস্থল ও নেভাক ডক ইয়ার্ডে যায়। তারা জানিয়েছে, আহমদ মুসা নেভাল ডক ইয়ার্ডের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল। চিকিৎসা নেয়ার পর সে এখন কোথায়, তা জানা যায়নি। তবে...।

ডারথ ভাদেরের কথার মাঝখানেই আলেক্সি গ্যারিন বলল, আচ্ছা, আহমদ মুসা, স্বরাষ্ট্র সচিব দ্যাগলের সাথে নেভাল ডক ইয়ার্ডে গিয়েছিল কেন?

স্বরাষ্ট্র সচিবের সাথে আহমদ মুসার ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। স্বরাষ্ট্র সচিব ফ্রান্সের লোক। আর আহমদ মুসার স্ত্রীও ফ্রান্সের রাজকুমারী। তাই স্বরাষ্ট্র সচিব আহমদ মুসাকে সম্মানের চোখে দেখেন বলে জানা গেছে। তিনিই হয়তো আহমদ মুসাকে নেভাল ডক ইয়ার্ড দেখাবার জন্যে নিয়ে যান। ডারথ ভাদের বলল।

তুমি কি বলতে যাচ্ছিলে? বলল আলেক্সি গ্যারিন জিজরকে লক্ষ করে।

ইয়েস মাই লর্ড, আহমদ মুসার বিষয়ে বলতে যাচ্ছিলাম, ঘটনার সন্ধ্যার দিকে একটা হেলিকপ্টার নেভাল ডক ইয়ার্ড থেকে পাপেতি যায়। জানা গেছে স্বরাষ্ট্র সচিব ঐ হেলিকপ্টারে পাপেতি ফিরেছেন। সবারই ধারনা স্বরাষ্ট্র সচিবের

সাথে আহমদ মুসাও পাপেতি ফিরেছেন। আহমদ মুসা আহত বলেই তাকে স্বরাষ্ট্র সচিব হেলিকপ্টারে করে পাপেতি নিয়ে গেছেন। বলল জিজর।

আহমদ মুসা আহত হয়েছে নিশ্চয় ঐ ঘটনায়। তাহলে তো আমাদের কমান্ডোরা তাকে আঘাত হানতে পেরেছিল। কি রকম আহত, কতটা আঘাত সে পেয়েছে? খোঁজ নাও। নিশ্চয় পাপেতিরই কোন এক হাসপাতালে সে থাকবে।

হাসপাতালে সে নাও থাকতে পারে মাই লর্ড। কোন বাড়িতে রেখেও তার চিকিৎসা হতে পারে। বলল গৌরী। এই প্রথম কথা বলল সে। তার মনও চাচ্ছিল যে, কোন হাসপাতালে আহমদ মুসা না থাকুক। কারণ পাপেতির হাসপাতালগুলোতে গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা কোনটাই নেই। তার মনের এই চাওয়াটাই প্রকাশ হয়ে পড়েছে তার কথায়। মনের এই চাওয়াটায় চমকে উঠল সে। কেন সে আহমদ মুসার নিরাপত্তা চাইবে?

গৌরীর মনের এই বিব্রত অবস্থা বেশি দুর এগোতে পারল না। কথা বলল আলেক্সি গ্যারিন, গৌরী ঠিক বলেছে। শুধু হাসপাতাল খুঁজলে হয়তো তাকে পাওয়া যাবে না। আসলে আহমদ মুসাকে কোন বাড়িতে রাখার সম্ভাবনাই বেশি।

কিন্তু মাই লর্ড। আহমদ মুসা এ পর্যন্ত হোটেলেই থেকেছে। তাহিতি সরকার তাকে কোন বিশেষ মর্যাদা দিলে সরকারি আতিথ্যে রাখতো। হতে পারে স্বরাষ্ট্র সচিবের সাথে তার সম্পর্কটা পারসোনাল। বলল ডারথ ভাদের।

তোমার কথা সত্য হলেও তার কোন বাড়িতে থাকার সম্ভাবনা রদ হয় না। হোটেল নিরাপদ নয় দেখেই তো সে কয়েক দিন বাড়িতেই আত্মগোপন করে থাকছে। অতএব, বাড়িতে থেকে চিকিৎসা নেবে এটাই স্বাভাবিক।

বলে একটু থামল আলেক্সি গ্যারিন। একটু ভেবে আবার শুরু করল, তাকে খুঁজে পাওয়ার কাজটা একটু কঠিনই হয়ে গেল। হাসপাতালে থাকলে আমাদের কাজ সহজ হতো। যাক, সে আহত এটা আমাদের জন্যে একটা বড় খবর। অবশ্যই সে দুর্বল হয়ে পড়েছে। এই সুযোগকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে। থামল আলেক্সি গ্যারিন।

মাই লর্ড, তাকে আমরা খুঁজে বের করবই।

শুধু পাপেতি নয়, পাপেতির আশেপাশের বসতিগুলোকেই আমরা টার্গেট করেছি। পাহাড় ও উপকূলের হোটেল-মোটেল, রেষ্ট হাউস, মেস সব আমাদের টার্গেটের ভেতরে। আমরা প্রতি ইঞ্চি মাটি সার্চ করব এবং সেটা একই সাথে শুরু করবো। যে অঞ্চল সার্চ হবে, সেখানে গিয়ে আবার যাতে আশ্রয় নিতে না পারে, এজন্যে সে অঞ্চলকে আমরা পাহারায় রাখব। আর আমরা যে সার্চ করেছি তাকে, সেটা সে বুঝতেই পারবে না। বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠান, পুলিশ, হোম সার্ভিস কোম্পানী ইত্যাদির নামে বিভিন্ন প্রয়োজন ও অজুহাতে সার্চ চলবে। এর মধ্যে কারও সন্দেহ করার কিছুই থাকবে না। আমাদের প্রায় সব জনশক্তিকেই তাহিতিতে এই কাজে নিয়োগ করা হবে। আমাদের এই ক্যাপিটাল অব পাওয়ার থেকেও লোক নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তারাই নেতৃত্ব দেবে এই সার্চে। যে কয়দিন সার্চ চলবে, সে কয়দিন আমাদের ক্যাপিটাল অব পাওয়ারে বিজ্ঞানীদের কাজ বন্ধ থাকবে। তারা তাদের ক্যাপসুলে তালাবদ্ধ থাকবে। ম্যাডাম গৌরীর নেতৃত্বে রুটিন পাহারা ও ডিউটির জন্যে একটা ছোট দল থাকবে মাত্র ক্যাপিটাল অব পাওয়ারে।

একটু থামল জিজর। থেমেই আবার বলল, মাই লর্ড, মোটামুটিভাবে এটাই আমাদের চিন্তা। প্ল্যানের আরও ডিটেইলডটা আমরা তাহিতিতে বসেই করব।

তোমাদের চিন্তা ঠিক আছে জিজর। ম্যান পাওয়ার প্ল্যানিংটাও ঠিক আছে। এক এলাকায় এক সাথে সার্চ। আবার সার্চ হওয়া এলাকায় পাহারা বসানো। অনেক লোক তো লাগবেই। কিন্তু এই কাজে তোমরা কয়দিন সময় নেবে? বলল আলেক্সি গ্যারিন।

দু'দিনের বেশি নয়, মাই লর্ড। রাত-দিন ২৪ ঘন্টা আমাদের সার্চ চলবে। বলল জিজর।

ও কে। মনে রেখ আর কোন ব্যর্থতা আমি বরদাশত করবো না। কার কি পরিচয় আমি বুঝি না, মানি না। সাফল্যের বাইরে আমার আর কোন বিবেচনা নেই। ওকে। উইশ ইউ গুড লাক।

বলে আলেক্সি গ্যারিন গৌরীর দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি একটু পর এস।

আলেক্সি গ্যারিনের কথা শেষ হবার সাথে সাথেই তার চেয়ারটা পিছু হটে পেছনের দেয়ালের ভেতরে ঢুকে গেল।

জিজর ও ডারথ ভাদেরও গৌরীকে ‘গুড নাইট’ বলে কক্ষ থেকে বের হয়ে গেল।

গৌরী তার হাতঘড়ির দিকে তাকাল। রাত ২টা। ক্লান্তির একটা হাই উঠল তার মুখ থেকে। তার শয়নকক্ষের সুন্দর বেড তার ক্লান্ত শরীরকে ডাকছে। কিন্তু উপায় নেই। তার ‘মাই লর্ড’ আলেক্সি গ্যারিন তাকে ডেকেছে।

বিক্ষোভের একটা বিচ্ছুরণ ঘটল গৌরীর চোখে-মুখে। কিন্তু উপায় নেই।

কোন আইন, নীতি-নিয়ম নয়, সে ইচ্ছার দাস। তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, সে থ্রীল ও ঝুঁকি পছন্দ করতো। বড় কিছু করার জন্যে, বড় ঝুঁকি নেয়া যাবে, সে এমন ধরনের একটা জীবন চাইতো। কিন্তু এই জীবন তো সে চায়নি, যে জীবনে নারীত্ব, ব্যক্তিত্বের কোন সম্মান থাকবে না, যে জীবন হবে স্বেচ্ছাচারের অধীন। সে আগে কেন দেখা পায়নি আহমদ মুসার মত লোকের। তার জীবনে অনেক, অনেক বড় কাজ আছে, থ্রীল আছে, ঝুঁকি আছে, কিন্তু সেই সাথে নীতি-নৈতিকতা, আদর্শ ও মনুষ্যত্ব আছে। এমন জীবনই তো সে চেয়েছিল।

গৌরীর এ ভাবনার মধ্যেই তার পা গিয়ে উঠল লাল এলিভেটরে যা তাকে নিয়ে যাবে আলেক্সি গ্যারিনের কাছে।

আহমদ মুসার অনুমান ঠিক প্রমানিত হলো। তাহানিয়া অ্যাটলের পশ্চিম উপকূলের দক্ষিণ প্রান্তে যে সরবরাহ কেন্দ্র, সেটাই হলো ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের ‘ক্যাপিটাল অব পাওয়ার’ মতুতুংগা অ্যাটলের রহস্যের সিংহদ্বার।

আহমদ মুসা তাহিতির স্বরাষ্ট্র সচিব দ্যাগলের সৌজন্যে পাওয়া আন্ডারওয়াটার ভেহিকেল ‘সীবেড ক্যাপসুল’ চালিয়ে এসে অবস্থান নিয়েছিল তাহানিয়া অ্যাটলের সেই সরবরাহ কেন্দ্রের সামনে উপকূল ঘেঁষে পানির নিচে। তার রাডার ও ক্যামেরা রেসিস্ট্যান্ট পোষাক আপাদমস্তক খোলসের মত পরে

নিয়ে পানি থেকে উপকূলে উঠেছিল এবং গড়িয়ে পৌছেছিল গিয়ে সরবরাহ কেন্দ্রের নিচে, একদম দরজার গোড়ায়।

শুয়ে থেকেই আহমদ মুসা মাথা তুকে দেখেছিল, কোন আলো কোথাও জ্বলছে না, কেউ কোথাও নেই। দৃষ্টি সীমার মধ্যে সমুদ্রেও কোন আলো দেখতে পায়নি। ডান হাতের চেইন খুলে হাতঘড়ি বের করে রিস্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে দেখল হিউম্যান ওয়াচ ইন্ডিকেটর গ্রীন সিগনাল দিয়ে যাচ্ছে। তার মানে এখান থেকে দশ বর্গগজের মধ্যে কোন মানুষ নেই।

সরবরাহ কেন্দ্রের দরজা স্টিলের। ডবল লক করা।

আহমদ মুসা নিশ্চিত ছিল, সরবরাহ কেন্দ্রের ভেতরে-বাইরে দু'দিকেই ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা আছে। কিন্তু যেহেতু গায়ে ক্যামেরা রেসিস্ট্যান্ট পোষাক আছে, সেজন্য উঠে দাঁড়িয়ে সাইলেন্সার লাগানো রিভলবার দিয়ে গুলি করে দু'টি তালাই ভেঙে ফেলল।

সরবরাহ কেন্দ্রটি এয়ারকন্ডিশন করা।

ঘরে সোফার সারি। তার সাথে কয়েকটা ডীপ ফ্রিজ ও কয়েকটা সেলফ। শাক-সবজি থেকে আটা-চাল, মসলাপাতি সবই সাজানো সেলফগুলোতে। ডীপ ফ্রিজগুলোও খুলে দেখল আহমদ মুসা। নানা রকম নাছ-গোশত ও ডেয়ারি দ্রব্যে ভরপুর ডীপ ফ্রিজগুলো। আহমদ মুসা নিঃসন্দেহে স্বীকার করে নিল, ক্যামোফ্লেজ নয়, এটা সত্যিই সরবরাহ কেন্দ্র এবং এটাও বুঝে নিল, এ সঞ্চয়গুলো মতুতুংগা অ্যাটলের 'ক্যাপিটাল অব পাওয়ার' – এর জন্যই।

কিন্তু রহস্যের দরজা কোথায়?

সরবরাহ কেন্দ্রের বিশাল ঘরটা তন্নতন্ন খুঁজে কিছুই পায় না সে। এক জায়গায় দু'টি রেফ্রিজারেটরের মাঝখানে ফাঁকা দেয়াল দেখতে পায়। অস্বাভাবিক মনে হয় দেয়ালটাকে। হাতের রিভলবার দিয়ে টোকা দেয় স্টিলের পরে। একটা হালকা ধাতব শব্দ হয়। তার মানে ওটা দেয়াল নয়, স্টিলের কিছু, দরজাই হবে হয়তো।

দু'টি রেফ্রিজারেটরের মাঝের স্পেসটা একজন মানুষের সাধারণভাবে চলাচলের জন্য যথেষ্ট নয়।

নিজেকে সংকুচিত করে আহমদ মুসা দেয়ালের নিকটে পৌছে চাপ দেয় দরজা আকারের স্টিলের পাল্লার উপর। সংগে সংগে খুলে যায় পাল্লা। পুরোপুরিই একটা দরজা এটা।

দরজা খুলে গেলে আহমদ মুসা দেখতে পায়, ওপারে আরও বড় একটা ঘর। গোটাটাই একটা কোল্ডস্টোরেজ। সেখানে আলু, টমেটো, বীট, গাজর ইত্যাদির স্তূপ।

কক্ষটি অনেকখানি নিচু। প্রায় পাচ-ছয়টা ধাপ পেরিয়ে কক্ষটিতে নামতে হয়। কক্ষটিতে নামে আহমদ মুসা।

ঘরটিতে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বিশাল সংগ্রহ দেখে বিস্মিত হয় না আহমদ মুসা। ‘ক্যাপিটাল অব পাওয়ার’ অর্থাৎ মতুতুংগার প্রাসাদে শুধু বিজ্ঞানী-বিশেষজ্ঞই বন্দী আছে ৭৬ জন। এঁরা ছাড়াও তো সেখানে আরও লোক আছে। সুতরাং তাদের জন্য খাবারের এ ধরনের বড় আয়োজন তো থাকবেই হবে।

কিন্তু রহস্যপুরীতে ঢোকার সিংহদ্বারটা কোথায়? খুঁজতে শুরু করে আহমদ মুসা।

ঘরের চারিদিকের দেয়াল ঘেঁষে বড় বড় ডীপ ফ্রিজের সারি। আর মাঝখানে মেঝেতে রাখা আলু, টমেটো ইত্যাদির স্তুপ।

ডীপ ফ্রিজগুলো একের পর এক খুলে ভেতরটা দেখতে থাকে আহমদ মুসা। সেগুলো আগের মতই মাছ, গোশত, ডেয়ারি পণ্যে ঠাসা। দুই ঘরের পার্টিশন ওয়ালের পাশ ঘেঁষে রাখা একটা বড় ডীপ ফ্রিজার খুলে আহমদ মুসা দেখে, ফ্রিজটা অন্যগুলো থেকে একটু ভিন্ন। ডীপ ফ্রিজের মাঝামাঝি বরাবরের মতই কিছু উপরে, কিছু নিচে মানে পুরো আয়তন জোড়া একটা ট্রের উপর টিনজাত খাদ্য সাজানো। ট্রের নিচে গোটা ফ্রিজটাই খালি। ডীপ ফ্রিজের তলা সবচেয়ে বিস্ময়ের ঠেকেছিল আহমদ মুসার কাছে। তলাটা মেটালিক নয়! পুরোটাই যেন একটা শ্বেত পাথর! পাথরটির চার প্রান্তই ডীপ ফ্রিজটির চারদিকের ওয়াল থেকে কিছুটা আলগা অর্থাৎ ডীপ ফ্রিজের আয়তনের তুলনায় সাদা পাথরটি ছোট। তাছাড়া এর উত্তর প্রান্তের মাঝখানে একটা বড় সাদা কাপ উপুর করে রাখা। কাপটা মনে হচ্ছে প্লাস্টিকের।

এই অস্বাভাবিকতা আকর্ষণ করে আহমদ মুসাকে। ট্রেটি তুলে নেয় ডীপ ফ্রিজ থেকে। তারপর ঢুকে যায় ডীপ ফ্রিজের মধ্যে। ঠিক তলাটি সলিড শ্বেত পাথরের। আহমদ মুসা কাপটি তুলে নেয়। অমনি তার নজরে পড়ে কাপের নিচের সাদা রিংটি। রিংটি শ্বেত পাথরের প্লেটটার সাথে আটকানো।

আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠে আহমদ মুসার মুখ। এটাই তাহলে সিংহদ্বার!

আহমদ মুসা এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে রিং ধরে টেনে তুলে ফেলে পাথরটাকে।

আনন্দ-বিস্ময়ে চোখ দু'টি বিস্ফারিত হলো আহমদ মুসার। তার সামনে উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে একটি সিঁড়ি পথ।

আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল আহমদ মুসা। খুশি হলো। তার অনুমান সত্য তা প্রমাণিত হতে চলেছে। এই সরবরাহ কেন্দ্রের মধ্যেই রয়েছে ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের 'ক্যাপিটাল অব পাওয়ার' মতুতুংগা অ্যাটলের রহস্যের সিংহদ্বার।

আহমদ মুসা ব্যাগ থেকে গ্যাস মাস্কটা বের করে মুখে লাগিয়ে সিঁড়িতে নেমে গেল। সিঁড়িটা পরিচ্ছন্ন ও আলোকিতও।

সিঁড়িমুখের পাথর আবার সিঁড়ি মুখে সেট করল আহমদ মুসা।

দেখা যাচ্ছে সিঁড়িটা অনেক দুর পর্যন্ত নিচে নেমে গেছে। সাদা পাথরের সিঁড়িকে শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। সিঁড়ি যেখানে শেষ সেখান থেকে রাস্তাটা সমতল হয়ে সামনে এগিয়েছে।

আহমদ মুসা যাত্রা শুরুর আগে ডান হাতের রিস্টওয়াচের হিউম্যান ইন্ডিকেটর, বিস্ফোরক ও মেটাল ইন্ডকেটর সব ঠিক আছে একবার দেখে নিল। মুখের গ্যাস মাস্কও ঠিক আছে কিনা দেখল। কাঁধে ঝুলানো তার সাইলেন্সার মিনি মেশিনগান। ডান হাতে লেজারগান।

নিজেকে প্রস্তুত দেখার পর আহমদ মুসা নজর দিল সিঁড়ি ও দু'পাশের দেয়ালের দিকে।

সিঁড়ি সাদা পাথরের। প্রতিটি সিঁড়িতে রয়েছে তিনটি করে পাথর। তিনটি পাথরই একটি অন্যটি থেকে আলগা। সব ধাপে একই অবস্থা।

সিঁড়ির দু'পাশের দেয়ালেও পাথর বসানো। বিভিন্ন রঙের। দেয়ালের মাঝ বরাবর পাথরগুলো সবই কালো। আরেকটা মজার ব্যাপার হলো, কালো পাথরের মাঝটায় রাউন্ড করা অনেক ফুটো। প্রতিটি কালো পাথরে এই একই রকম ডিজাইন। সিঁড়ির ছাদটার প্লাস্টার সাদা রঙের।

সিঁড়ি থেকে নামতে গিয়ে আহমদ মুসা আরও একবার ভেবে নিল, সিঁড়ি পথে নিরাপত্তামূলক কি কি ব্যবস্থা থাকতে পারে। পাহারায় লোক থাকতে পারে। সিঁড়ি পথে বিস্ফোরকও পেতে রাখতে পারে। হয়তো তারা সিঁড়ির নির্দিষ্ট রুটে চলে। এর বাইরে গেলেই বিস্ফোরকের ফাঁদে পড়তে হতে পারে। শত্রুর আগমন টের পেলে ওরা বিষাক্ত গ্যাস বোমাও ছুঁড়তে পারে সিঁড়ি ও সুড়ঙ্গে। এছাড়া আর কি ব্যবস্থা সুরঙ্গ পথের নিরাপত্তার তা জানা নেয় আহমদ মুসার। তবে তাকে এই অবস্থায় হিউম্যান ওয়াচ মনিটর (HWM) ও মেটাল বিস্ফোরক ডিটেক্টরের নির্দেশনা সামনে রেখেই চলা ছাড়া উপায় নেই।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল আহমদ মুসা।

কতকগুলো ধাপ নামার পর অনেকটা নিশ্চিন্তই হয়ে উঠেছিল আহমদ মুসা।

হঠাৎ বিপ বিপ শব্দ হলো ডান হাতের রিষ্টওয়াচ থেকে। হাত ঘুরিয়ে রিস্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে দেখল, মেটাল ও বিস্ফোরক ইন্ডিকেটর লাল সিগন্যাল দিচ্ছে।

সংগে সংগে দাঁড়িয়ে গেল আহমদ মুসা।

এখান থেকে কয়েক গজের মধ্যে কোথাও মেটালিক কিছু বা বিস্ফোরক আছে। ইন্ডিকেটর মেটাল ও বিস্ফোরক দু'য়েরই উপস্থিতির সংকেত দিচ্ছে।

কিন্তু সিঁড়ি, সিঁড়ির দু'পাশের দেয়াল ও সিঁড়ির উপরের ছাদ সবই ত আনেকদুর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে পরিস্কার! কিছু কোথাও নেই। তাহলে সিগন্যাল আসছে কেন?

আহমদ মুসা চোখ উপরে তুলল, ছাদের দিকে। বিপ বিপ শব্দ কিঞ্চিত কমে গেল। বুঝল আহমদ মুসা, ইন্ডিকেটরটা বিস্ফোরক বা মেটালের উৎস থেকে একটু দূরে সরে গেছে।

ইন্ডিকেটরের বিপ বিপ শব্দ উৎসের যত কাছে যায় তত বাড়ে, দূরে সরলে কমে।

আহমদ মুসা এবার ডান হাতটা পাশের দেয়ালের দিকে নিল। আওয়াজ বেরে গেল বিপ বিপ শব্দের।

আহমদ মুসা নিশ্চিত হলো, কাছেই দেয়ালের কোথাও বিস্ফোরক বা এ জাতীয় কিছু লুকানো আছে। লুকানো আছে কেন? এর ব্যবহার তাহলে কিভাবে হবে?

আহমদ মুসা লুকানো জায়গাটাকে সঠিকভাবে লোকেট করার জন্য রিস্টওয়াচ পরা ডান হাত সিঁড়ির দেয়ালের আরও সামনে এগিয়ে নিল। এগিয়ে নিতে গিয়ে তার বাম পাতা সিঁড়িতে রাখার সাথে সাথেই তা দেবে গেল সামান্য। দেহের ভারসাম্য হারিয়ে আছড়ে পড়ার মত উপরের সিঁড়িতে বসে পরল।

ঠিক যে সময় আহমদ মুসার দেহ উপরের সিঁড়িতে বসে পড়ছিল, তখন সিঁড়ির দু'পাশের দেয়াল থেকে এক পশলা গুলির বৃষ্টি সিঁড়ির মাঝের দিকে ছুটে এল। মাঝখানে কোন টার্গেট না পাওয়ায় গুলির পশলা পরস্পর বিপরীত দিকের দেয়ালে গিয়ে আঘাত করল। গুলিগুলো নিঃশব্দে এসেছিল।

বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে দেখল আহমদ মুসা এই দৃশ্য। নিচের ধাপে পা রেখে যদি সে দাঁড়িয়ে যেত ধাপটির উপর, তাহলে বুকের দু'পাশের দুই পাঁজর দিয়ে গুলির ঝাঁক তার বুকে ঢুকে যেত। অদ্ভুত পরিকল্পনা ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের।

মুখের গ্যাস মাস্ক ঠিক আছে কিনা দেখে নিয়ে সিঁড়ির অবশিষ্ট অংশ ক্রলিং করে নামার সিদ্ধান্ত নিল আহমদ মুসা।

সিঁড়ির গোঁড়ায় এসে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

সামনের দিকে তাকাল। সুড়ঙ্গের মেঝেটা একই রকমের কংক্রিটের এবং নিট-ফিনিশিং করা। কোন বিশেষ বিশেষত্ব চোখে পড়ল না।

সুড়ঙ্গটা টিউবের মত, শুধু মেঝেটাই সমতল। মেঝে ছাড়া অর্ধ বৃত্তাকার অংশটি প্লাস্টার করা। এখানেও কোন কিছু তেমন আহমদ মুসার নজরে পড়ল না।

বিসমিল্লাহ বলে রিস্টওয়াচের ইনডিকেটরের দিকে নজর রেখে চলতে লাগল আহমদ মুসা।

এক জায়গায় এসে সুড়ঙ্গের একটা ছোট বাঁক। বাঁকে মাথার উপরের বাল্বটা খুবই উজ্জ্বল। বাঁক নেয়ার জন্যেই কি এটা! হতে পারে।

কিন্তু কয়েক ধাপ এগোলেই মেটাল ইনডিকেটর সাংঘাতিকভাবে বিপ বিপ করতে লাগল, অনেকটা চিৎকারের মত।

সংগে সংগে দাঁড়িয়ে পড়ল আহমদ মুসা।

ডান হাতটা সব দিকে ঘুরিয়ে ইনডিকেটর পরীক্ষা করে দেখল, বিপ বিপ-এর তীব্রতা উপর দিকে বেশি, মনে হলো কেন্দ্রটা উজ্জ্বল বাল্বের দিকে। কিন্তু বাল্ব বরাবর গোটা সুড়ঙ্গেই ইনডিকেটর বিপ বিপ সিগন্যাল দিচ্ছে।

আহমদ মুসা বাল্বের দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে দেখল বাল্বের হোল্ডারটা স্টিলের। সুড়ঙ্গে এ পর্যন্ত দেখা সব বাল্বের হোল্ডার প্লাস্টিকের।

আহমদ মুসা নিশ্চিত হলো, বাল্বের হোল্ডারের কারনেই ইনডিকেটরের এই বিপ বিপ। কিন্তু এত বড় স্টিল হোল্ডারে এত বড় বাল্ব কি এই বাঁকের জন্যে দেয়া হয়েছে? এর কোন সদুত্তর সে খুঁজে পেল না।

আহমদ মুসা চলতে শুরু করল।

বাল্বের ঠিক নিচে পৌঁছাতেই বাল্বটার বিস্ফরন ঘটল। সংগে সংগে হালকা এক প্রকার গ্যাসে আহমদ মুসার চারিদিকটা ভরে গেল।

বিস্ফোরণের আকস্মিকতায় চমকে উঠেছিলো আহমদ মুসা। বুঝে নিয়েছিল কি ঘটেছে। সংগে সংগে বাড়তি সতর্কতার জন্যে মুখের গ্যাস মাস্কের ইলাস্টিক বাটন ঠিক আছে কিনা দেখে নিল।

সংগে সংগেই আবার হাটা শুরু করল আহমদ মুসা।

কয়েক গজ হাটার পর দেখল গ্যাস মাস্কের স্ক্রিনে ইয়েলো রঙ আর নেই। আহমদ মুসা বুঝল, প্রাণঘাতী গ্যাস স্পোক শুধু বাল্বের নিচে আসা শত্রুদের মারার জন্যে কয়েক গজের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত রাখা হয়েছে।

চলা অব্যাহত রাখল আহমদ মুসা।

ভাবল, দুই ফাঁদ সে পার হয়েছে। আর কি ফাঁদ পাতা আছে সামনে?

আরও ভাবল, সুড়ঙ্গে তারা কোন প্রহরী রাখেনি তো! তারা তাদের পাতা ফাঁদের উপর নির্ভর করেছে। আহমদ মুসা মন মনে সেই সাথে স্বীকার করল, তাদের ফাঁদগুলো বিস্ময়কর ধরনের নতুন, যা থেকে বাঁচা আল্লাহর সাহায্যেই শুধু সম্ভব। প্রথম ফাঁদের ক্রস ফায়ার থেকে আল্লাহ তাকে বাঁচিয়েছেন। আর এই বিশেষ গ্যাস মাস্ক তার কাছে ছিলনা, এটা সে পেয়েছে ওপরের সরবরাহ কেন্দ্রে। এটাও আল্লাহর সাক্ষাত সাহায্য।

সুড়ঙ্গ পথ শেষ হল।

এবার সিঁড়ি পথে উপরে উঠতে হবে।

সিঁড়িতে পা দেবার আগে আহমদ মুসা সিঁড়ির দিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। এ সিঁড়ি পথটা আগের চেয়ে ভিন্ন। সাদা পাথরের সিঁড়ি। সাদা পাথরের মধ্যে এখানে ওখানে ঘন কালো পাথর বসানো। কালো পাথরগুলো শৃঙ্খলার সাথে বসানো নয়, বিক্ষিপ্ত ও কালো পাথরগুলো আকারেও এক রকম নয়। মোজাইকে এমন পাথর বসানোর নজির আছে। বলা যায়, মোজাইকের ডিজাইনই এখানে অনুসরন করা হয়েছে এবং সন্দেহ নেই তা সৌন্দর্যেরও সৃষ্টি করেছে।

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল আহমদ মুসা। চারিদিকে বিশেষ করে সিঁড়ির দিকে ভাল করে চোখ রেখেছে আহমদ মুসা।

সিঁড়ির প্রায় অর্ধেকটা পথ উঠেছে।

এখানে একটা ধাপে পা চেপে অন্য পা উপরের ধাপে ওঠাবার জন্যে তুলল আহমদ মুসা। শরীরের পুরো ওজন যখন নিচের পায়ের উপর পড়ল। তখন পা রাখার জায়গাটা অল্প দেবে গেল।

চমকে উঠল আহমদ মুসা! কিন্তু কিছু করার সময় ছিল না।

পারল শুধু নিচের পায়ের উপর শরীরটাকে রেখে নিচে নামিয়ে নিতে। তাতে নিচের ধাপের উপর পায়ের উপর চাপ আরও বাড়ল।

নিচের ধাপে পায়ের একটা আঘাত টের পেয়েছে সে। আঘাতটা তার জুতার সোলে। তীক্ষ্ণ একটা শব্দও তার কানে এসেছে।

মুহূর্ত কয়েক অপেখা করে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল উপরের ধাপে। নিচের ধাপে রাখা পা তুলে আহমদ মুসা দেখল, স্টিলের একটা স্পোক ঢুকে গেছে জুতার সোলে। স্পোকটার আধা ইঞ্চির মত অংশ বাইরে বেরিয়ে আছে। বুঝল, স্পোকটা জুতার সোলের প্রথেমে রাবার, পরে চামড়ার অংশ ভেদ করে গিয়ে আটকা পড়েছে সোলের স্টিলের অংশে। জুতাটি বিশেষভাবে তৈরি। স্টিলের একটা প্লেট জুতার গোড়ালি থেকে আগা পর্যন্ত জুড়ে দেয়া আছে।

আহমদ মুসা হাতে গ্লাভস লাগিয়ে টেনে বের করল স্পোকটি। অত্যন্ত তীক্ষ্ণ স্পোকটির আকৃতি দেখেই বুঝল, বিশেষ অস্ত্রের জন্য বিশেষভাবে তৈরি এটা। স্পোকটি বিষাক্ত হবে নিশ্চয়।

আহমদ মুসা গ্যাস মাস্কের একটা বোতাম টিপে একটা বিশেষ স্ক্রিন চোখের সামনে নিয়ে এলো। এই স্ক্রিনের সামনে এনে স্পোকটি পরীক্ষা করল আহমদ মুসা। নিশ্চিত হলো, স্পোকটি গোটাই বিষাক্ত। জুতার সোলে স্টিলের প্লেট না থাকলে এই স্পোকটি আঘাত করত পায়ের তালুতে। প্রাণঘাতী বিষে সংগে সংগেই মৃত্যু নেমে আসত।

আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল আহমদ মুসা।

তাহিতির স্বরাষ্ট্র সচিব দ্যাগল তাকে জুতাটি প্রেজেন্ট করেছে এই অভিযানের জন্যে। এই জুতার আরও কার্যকারিতা রয়েছে। আহমদ মুসারও এই ধরনের একটা জুতা ছিল। কিন্তু সে জুতাটি সে হারিয়ে ফেলেছে হোটেল লা ডায়মন্ড ড্রপে আসার পর।

নিচের ধাপের যে জায়গা থেকে স্পোকটি বেরিয়ে এসেছে, সেটাও পরীক্ষা করল আহমদ মুসা।

নিচের ধাপের যেখানে পা রেখেছিল, তাও সেট করা একটা কালো পাথরের উপর। এটা কালো পাথরটির মাঝের প্রায় গোটা অংশই জুড়ে রয়েছে। পাথরতিতে দুই সারি ছিদ্র। ছিদ্রগুলোও কালো। কালো পাথরের সূক্ষ্ম কালো ছিদ্রগুলো দাঁড়ানো অবস্থায় সাধারনত চোখে পড়ার মত নয়।

আহমদ মুসা মনে মনে বলল, অদ্ভুত সব ফাঁদ পেতে এঁরা এদের সুড়ঙ্গ পথকে সুরক্ষিত করেছে! মানুষের শক্তিকেও এরা বদলে দিয়েছে যান্ত্রিক কৌশলের ভয়াবহতা দিয়ে। ভেতরের অবস্থা আরও কতটা ভয়াবহ জানি না!

হাঁটা শেষ করে সিঁড়ির স্ট্যান্ডিং-এ উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা। মুখোমুখি হলো একটা বড় দরজার। সলিড স্টিলের দরজার দু'পাশটাই দু'পাশের দেয়ালে ঢুকে পড়েছে, , উপর ও নিচের অংশটাও একই রকম।

দরজার চারপাশটা আহমদ মুসা খুটে খুটে দেখল।

দরজা খোলার ক্লু খুঁজছে সে। নিশ্চয় কোথাও সে ক্লু আছে। কোথায় সেটা?

হঠাৎ আহমদ মুসা দেখতে পেল দরজার মাথার সমান উঁচুতে স্টিলের গায়ে স্টিল কালারের মার্বেলের মত গোলাকার টাচ লকের ক্যালকুলেটর বোর্ড। চারদিক খুঁজল, আশেপাশে কিংবা দরজার অন্য কোথাও এ ধরনের কিছু নেই।

নিশ্চিত হলো আহমদ মুসা, দরজা খোলার লক এটাই।

কিন্তু এর অপারেটিং সিস্টেম কেমন? এ টাচ লকে ক্যাল্কুলেট বা কম্পিউটারের মত ডিলিট, অ্যাড, মাইনাস ইত্যাদির মত কোন অপশন নেই। শুধু রয়েছে এক থেকে শূন্য পর্যন্ত নাম্বার।

এই অবস্থায় ডিজিটাল লক বিপজ্জনক হতে পারে। টাচ করলে যে নাম্বার উঠবে, তা ডিলিট করা সম্ভব হবে না। আর সে নাম্বার বা নাম্বারগুলো যদি সঠিক কোড না হয়, তাহলে দরজা খোলার আর সুযোগ থাকবে না।

এই প্রথম একটা উদ্বেগ এসে আহমদ মুসাকে আচ্ছন্ন করল।

ঘড়ি দেখল আহমদ মুসা। রাত ৮টা। তার সব কাজ রাত ১২টার মধ্যেই শেষ করতে হবে।

রাত ১২টা পর্যন্ত ঘুমায় ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের এই ক্যাপিটাল অব পাওয়ার। এদের ঘুম শুরু হয় সন্ধ্যা ৬টায়। এসব কথা সে শুনেছে তাদের নিরাপত্তা হেফাজতে থাকা ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের মফ ফ্লেরির কাছ থেকে।

উদ্বেগ নিয়ে দরজাকে পাশে রেখে বসে পড়ল আহমদ মুসা। বুঝতে পারল সে, সুড়ঙ্গ ও গেটের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে এতটাই নিশ্চিত করেছে যে, প্রহরী রাখারও প্রয়োজন হয়নি।

বসেই আহমদ মুসা হাত বাড়াল দরজার গোড়ায় দরজা ও ফ্লোরের মাঝখানে যে সংকীর্ণ ফাঁক রয়েছে সেখানে।

বসার সময়ই সে দেখতে পেয়েছে দরজা ও ফ্লোরের প্রান্তটির মাঝখানের ফাঁকে ঠিক দরজার রঙেরই একটা ভাজ করা কাগজ।

একটা আঙুল দিয়ে কোনমতে তুলে নিল ভাঁজ করা কাগজ খণ্ডটি। দ্রুত কাগজ খণ্ডটির ভাঁজ খুলল আহমদ মুসা।

৮ সেন্টিমিটারের মত বর্গাকৃতির একটা কাগজ। শুরুতেই একদম টপে এক পাশে ছোট একটা বৃত্ত। তাও স্টিল কালারের। তার পাশে সমান্তরালে অনেক ডিজিট। তার নিচে একটা রঙিন ডায়াগ্রাম। ডায়াগ্রামটি শুরু হয়েছে বটম থেকে। লাল ও সবুজ দু'টি রেখা। সবুজ রেখাটি বাম পাশে বেঁকে নিচের দিকে গেছে তারপর শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়েছে সবুজ রেখাগুলোর মাথায় শৃঙ্খলিত মানুষের রেখাচিত্র। লাল লেখাটি উপরে উঠে গেছে।লাল রেখাটি শেষ হয়েছে একটা রেখাচিত্রের সামনে। রেখাচিত্রটির মাথায় রাজমুকুট। আহমদ মুসার চোখে-মুখে বিস্ময়।

এই বিস্ময় নিয়েই আহমদ মুসা কাগজ খণ্ডটি আর উপরের ডিজিটাল নাম্বারের উপর আবার নজর দিল।

আহমদ মুসার মনে হলো, এই কাগজের সাথে এই দরজার সম্পর্ক আছে। তা না হলে কাগজটি এখানে থাকবে কেন, তার রংও দরজার মতই হবে কেন?

ডিজিটাল নাম্বারের পাশে বৃত্তকে দরজার ডিজিটাল লক এবং পাশের নাম্বারকে লক খোলার ডিজিটাল কোড হিসেবে ধরে নিল।

কিন্তু নিচের ডায়াগ্রামটা?

এরও অর্থ আছে। কি সেই অর্থ?

মানুষের শৃঙ্খলিত রেখচিত্র কি বিপদগ্রস্ত মানুষের মানে বিজ্ঞানীদের বুঝানো হয়েছে? কিন্তু রাজমুকুটওয়ালা রেখাচিত্রটি কার? এ কি ক্যাপিটাল অব পাওয়ার, অন্য কথায় ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের কি সর্বময় কর্তার? আর লাল-সবুজ রেখার তাৎপর্য কি? সবুজ কি শান্তি, আর লাল কি অশান্তি বা অত্যাচারের প্রতীক? এ প্রতীকটা তো মোটামুটি সকলেরই জানা! এটা এখানে দেখাবার অর্থ কি?

আহমদ মুসা অবশেষে ভাবল ভেতরে না ঢুকলে এ সবের অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আহমদ মুসা আবার ফিরে এল ডিজিটাল নাম্বারের কাছে। বৃত্ত ও ডিজিটাল নাম্বারগুলো সম্পর্কে তার ভাবনাটা ঠিক হলে টাচ লকটি একটা ডিজিটাল লক। কোড নাম্বারগুলো টাইপ করলেই দরজা খুলে যাবে।

কিন্তু লক খুলে যাক এটা চাচ্ছে কে? কে তাকে এটা সরবরাহ করল? কেন?

এর কোন উত্তর আহমদ মুসার জানা নেই।

এটা তার জন্যে একটা ফাঁদ কিংবা দরজা খোলা অসম্ভব করে তোলার একটা কৌশল নয় তো?

এরও কোন উত্তর জানা নেই আহমদ মুসার।

কি করার আছে এখন আহমদ মুসার?

ডিজিটাল নাম্বারটির দিকে আবার তাকাল আহমদ মুসা।

১৮ ডিজিটাল নাম্বারটি কিছুটা মজার। ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সিরিয়ালি লেখা হয়েছে। তারপর এ ডিজিটগুলোকেই উল্টোভাবে সাজানো হয়েছে, নাম্বারগুলো আবার ৯ থেকে ১ পর্যন্ত লেখা। এই ১৮ ডিজিটকে এই সিরিয়ালে ১ শুরুতে বা বটমে রেখে ক্লকওয়াইজ সাজালে ক্লকবৃত্তের বটমে থাকে ডবল ১ এবং শীর্ষে থাকে ডবল ৯, সর্বোচ্চ নাম্বারের জোড়া যার যোগফল আঠার এবং বেজোড় সংখ্যা হিসেবে নিরানব্বই। ১৮ আঠারটি ডিজিটের যে কোনটির চেয়ে বড়। আর ৯৯ আঠার ডিজিটের সম্মিলিত যোগফলের চেয়ে বড়। আহমদ মুসা খুশি হলো, ১৮ ডিজিটের সংখ্যাবাচক কনসেপ্টের সাথে ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের মনোগ্রামের

কনসেপ্টের মিল আছে। ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের মনোগ্রাম 'সূর্য'টির টপ-এর কিরণটিই সর্বোচ্চ, অন্যগুলো ছোট-বড়, যেমন ডিজিটাল বৃত্তের ১৬টি ডিজিট।

আহমদ মুসা নিশ্চিত হলো, লক খোলার ডিজিটাল কোড ঠিক আছে।

আহমদ মুসা এগিয়ে গেল ডিজিটাল লক-এর দিকে। হাত তুলল টাচ লকের দিকে। কিন্তু সংগে সংগেই আবার এক পা পিছিয়ে এল।

দরজা খোলার আগে সব ঠিক আছে কি না দেখতে হবে তাকে।

জুতা, মোজার আড়াল, প্যান্টের পকেট, জ্যাকেটের পকেট, কলারের আড়ালটা সব ঠিক আছে কিনা দেখে নিয়ে সাইলেন্সারযুক্ত মাইক্রো মেশিনগান বাম হাতে নিল। ডান হাতের কাছে জ্যাকেটের ডান পকেটে লেজারগান রেখেছে। আহমদ মুসা আবার এগিয়ে গিয়ে ডিজিটাল লকের সামনে দাঁড়াল।

বিসমিল্লাহ্ বলে আহমদ মুসা শাহাদাত আঙুলি দিয়ে ১ থেকে ৯ পর্যন্ত 'টাচ কী'গুলো চাপল। তরপর ৯ থেকে 'টাচ কী' চেপে ১-এ ফিরে এল।

৯ম টাচ কীতে চাপ দিয়েই আহমদ মুসা ঠিক দরজার মাঝখানে সরে এল। দরজা যেদিকে যাবে সেদিকেই সরে যাবে সে, যাতে গুলির সামনে প্রথমেই পড়ে না যায়। ওরা যদি ভেতরে বেশি সংখ্যাক লোক থাকে, তাহলে ক্রস ফায়ারের সুবিধা ওরা পেয়ে যেতে পারে। মুখোমুখি না পড়ে মুহূর্তকালের জন্যে হলেও ওদের চোখের আড়ালে গিয়ে পাশ থেকে আক্রমন করতে চায় সে।

দরজা বাম দিকে সরছিল। কিন্তু যতটা চোখের পলকে সরবে মনে করেছিল, ততটা বেগে সরল না। ভারি দরজা স্বাভাবিক গতিতে সরছিল।

এসে সুবিধা হলো আহমদ মুসার।

দরজা সরে আসা শুরু হওয়ার সংগে সংগেই লাফ দিয়ে যেয়ে বামে কোণে শুয়ে রিভলবার তাক করল।

আহমদ মুসা দরজার পেছনেই স্টেনগান তাক করে হাঁটু গেড়ে বসে থাকা একজনকে দেখতে পেয়েছে, সেও দেখতে পেয়েছে আহমদ মুসাকে। আহমদ মুসা গুলি করেছে, সেও গুলি করেছে। আহমদ মুসা শুয়ে থেকেই গুলি করেছে, আর সেও গুলি করেছে হাঁটু গেড়ে বসা অবস্থায়। কিন্তু দেখতে পাওয়ার এবং গুলি

করা মাত্র কয়েক মিলি সেকেন্ডের ব্যবধান, শুয়ে থাকা অবস্থায় গুলি করার কারণে বেশি সুবিধা পাওয়ায় জিতে গেল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার মাইক্রো মেশিনগানের এক ঝাঁক গুলি তাকে বিদ্ধ করল, আর লোকটির সব গুলিই লক্ষচ্যুত হয়েছে সে গুলিবিদ্ধ হয়ে হাতের আঙুল কেঁপে যাওয়ায়।

আহমদ মুসা গুলি শুরু করার পর আর বন্ধ করেনি। ট্রিগারে আঙুল চেপে রেখে তা বামে সরিয়ে নিচ্ছে দরজা সরে যাওয়ার সমান গতিতে।

ওরাও গুলি ছুঁড়ছে। কিন্তু সেগুলোর বেশির ভাগই দরজাকেই আঘাত করছে এবং কিছু দরজার খোলা পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু আহমদ মুসার গুলি দরজার আড়াল থেকে হওয়ায় কিছূটা কৌণিক হলেও তার অব্যাহত গুলি কাজে লাগছে দরজা অব্যাহতভাবে সরে যাওয়ার কারণে। ওরা দরজার পেছনে সারিবদ্ধভাবে বসে ছিল, সারিবদ্ধভাবেই ওদের লাশ পড়ে গেল।

দরজা খোলা শুরু হওয়া থেকে শেষ পর্যন্ডত সময় বেশি নয়, ওরাও গুলি করছিল, আর ওরাও দু'দেয়ালের মাঝখানে সারিবদ্ধ অবস্থায় বসে ছিল, এই সব কারণে তারা আড়াল নেয়নি, নেয়ার সুযোগও ছীল না। তারা ডানে সরে এসে সরাসরি আহমদ মুসাকে আক্রমণ করবে, তা পারেনি আহমদ মুসার অব্যহত গুলির জন্য। আবার ওরা পালায়নি পেছনে গিয়ে আলাদা অবস্থান নেবার জন্যে, কারণ ওরা পালায় না, আহমদ মুসা এটা দেখেছে।

ওদের আটটা লাশ দেখা যাচ্ছে দরজার পেছনে।

ঐ কোনটায় আহমদ মুসা শোয়া অবস্থায় আরও কিছুটা সময় অপেক্ষা করল। কেউ এল না। নিরব চারদিক।

আহমদ মুসা না উঠে ক্রলিং করে ভেতরে ঢুকল।

ভেতরে ঢুকে সামনে তাকাতেই চমকে উঠল আহমদ মুসা। ডায়াগ্রামে দেখা গেল লাল-সবুজের জীবন্ত দৃশ্য সামনে ভাসছে।

ভেতরে ঢুকেই প্রথমে প্রশস্ত স্ট্যান্ডিং। স্ট্যান্ডিং-এর পরেই মুভিং এলিভেটর। এলিভেটরের লাল-সবুজ দু'টি অংশ। দু'টিই চলছে পাশাপাশি বিপরীত দিকে। লালটা উপরে উঠছে এবং সবুজটা নামছে নিচে।

বিস্মিত আহমদ মুসা! একদম মিলে যাচ্ছে ডায়াগ্রামের সাথে। দরজা খোলার কোড নাম্বার দিয়ে এবং ভেতরের গাইডলাইন দিয়ে কে তাকে সাহায্য করল!। কিন্তু আহমদ মুসা আজ এখানে আসছে কে জানত!

আহমদ মুসা নিশ্চিত, ডায়াগ্রামকে অনুসরণ করেই সে লক্ষে পৌঁছতে পারবে। সবুজ এলিভেটর তাকে নিয়ে এল বন্দী বিজ্ঞানীদের কাছে এবং লাল এলিভেটরে সে যেতে পারবে 'কিং'-এর কাছে। এই 'কিং'টা কে? ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের হেড? সেটাই হবে।

কোথায় আহমদ মুসা আগে যাবে? বন্দী বিজ্ঞানীদের কাছে, না ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের সাথেই বুঝা-পড়া আগে শেষ করবে।

বিজ্ঞানী-বিশেষজ্ঞদের মুক্ত করে নিরাপদে তাদের নিয়ে যেতে হলে ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের প্রধান ও অন্যদের হাত থেকে এই প্রাসাদকেই আগে মুক্ত করতে হবে। এটাই সিদ্ধান্ত নিল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা তাকাল লাল এলিভেটরের দিকে।

কিন্তু এদের লোকজন কোথায়?

এরা ৮ জন যে রকম প্রস্তুত অবস্থায় ছিল তাতে বুঝা যাচ্ছে, এরা তার জন্যে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষায় ছিল। তাহলে অন্যেরাও তো এটা জানবে! তারাও সাবধান থাকবে, প্রস্তুত থাকবে। তাহলে তারা কোথায়? এল না কেন এত গুলির শব্দ শোনার পরেও!

আহমদ মুসার মাইক্রো মেশিনগান সাইলেন্সারযুক্ত, কিন্তু ওদের গুলির তো শব্দ হয়েছে।

এ জিজ্ঞাসার জবাব পেল না আহমদ মুসা। বুঝতে পারলো না ঘটনা কি! তাহলে কি ওরা অন্য কোথাও অবস্থান নিয়েছে?

সিদ্ধান্ত আগেই নিয়ে নিয়েছিল আহমদ মুসা।

এবার বিসমিল্লাহ্ বলে লাল এলিভেটরের লাল সিনথেটিক কার্পেটে পা রাখল আহমদ মুসা।

ধীরে ধীরে এলিভেটর উঠতে লাগল উপরে।

আহমদ মুসার বাম হাতে ঝুলছে মাইক্রো মেশিনগান আর তার হাতের মুঠোয় রয়েছে লেজারগান।

আহমদ মুসা দেখতে পাচ্ছে এলিভেটর এক লেয়ার থেকে অন্য লেয়ারে উঠছে।

এক সময় দেখল এলিভেটর করিডোর, চত্বর দিয়ে চলছে। দু'পাশে ঘর, লাউঞ্জের সারি। এ সময় এলিভেটর সমতল অবস্থায় চলছিল। হঠাৎ এলিভেটর ৩০ ডিগ্রি কোণে উপরে উঠতে লাগল। এলিভেটরের দু'পাশেই অনেক উচু দেয়াল।অনেক উচুতে আহমদ মুসা এলিভেটরের মতই প্রশস্ত দরজা দেখতে পেল। দরজাটা অত্যন্ত দর্শনীয়। রাজা-বাদশাদের ঘরের দরজার মতই। আধুনিক যুগের এ্যান্টিকের একটা চমৎকার নিদর্শন। আহমদ মুসা ভাবল, এই দরজার ওপাশেই তাহলে ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের রাজা থাকেন। দরজাটা ঠিক এলিভেটরের উপরে দাঁড়িয়ে আছে। এলিভেটর চলার উপযোগী ফাঁকটুকুই মাত্র রয়েছে দরজার নিচে।

প্রথম বুঝল আহমদ মুসা, দরজা বন্ধ। কিন্তু তার নিচ দিয়ে এলিভেটর চলছে। তার মানে তাকে এখনই প্রচণ্ড ধাক্কা দেবে। এর সাথে সাথেই প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে নিচের ল্যান্ডিং-এ পড়ে যেতে হবে তাকে।

দরজা এসে গেছে।

আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি ডান হাত বের করে সামনে বাড়িয়ে দিল যাতে ধাক্কা থেকে শরীরটাকে রক্ষা করা যায়।

কিন্তু হাত দরজা স্পর্শ করার আগেই দরজা খুলে গেল।

দরজা পার হবার পর এলিভেটরের পথ আবার সমতল হয়ে গেল।

কিন্তু অল্প দূরেই আরেকটা দরজা, ঘরের দরজা। ঘরটির সামনের দেয়ালটিই শুধু দেখা যাচ্ছে। পাথরের দেয়ালটি অদ্ভুত কারুকাজে সাজানো! দরজাটি মনে হয় সোনার অংশ দিয়েই কারুকাজ করা।

দরজার সামনে গিয়ে পৌঁছতেই এলিভেটর থেমে গেল আপনা-আপনি।

আহমদ মুসা নিশ্চিত হলো, স্বর্ণদরজার এ ঘরটাই ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের রাজা'র বাসস্থান, যার রেখাচিত্র ডায়াগ্রামে আছে। এলিভেটর থেকে আহমদ মুসা দরজার সামনে ল্যান্ডিং-এ উঠে দাঁড়াল।

এখন কি করবে সে? দরজার ওপারে কি আছে?

আহমদ মুসা শাহাদাত আঙুল দিয়ে দরজার উপর চাপ দিল। খুলে গেল দরজা। বিস্মিত হলো আহমদ মুসা। এসব কি কোন যাদু বলে হচ্ছে?

খুলে গেল সম্পূর্ণ দরজা।

দরজার পরেই রাজকীয় কার্পেটে মোড়া করিডোর।

করিডোরের দু'পাশে দু'টি দরজা।

করিডোরের সামনে সুসজ্জিত লাউঞ্জ।

মিষ্টি সাদা আলোতে হাসছে যেন লাউঞ্জটা।

বাম হাতে মাইক্রো মেশিনগানটি বাগিয়ে ধরে ডান হাতে জ্যাকেটের ডান পকেটে রেখে দু'তিন ধাপ এগোলো।

হঠাৎ লাউঞ্জের ওপাশ থেকে কথা বলে উঠল একটা কণ্ঠ।

সংগে সংগে থমকে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

কণ্ঠটি বলছিল, আহমদ মুসা, তুমি শুধু সাংঘাতিক ধূর্তই নও, তুমি ভাগ্যবানও। ক্যাপিটাল অব পাওয়ারে ঢোকার অসম্ভব কাজও তুমি করেছ। আমাদের কোন এক বিশ্বাসঘাতকের বিশ্বাসঘাতকতায় তুমি ভাগ্যবান হয়েছ। আমাদের প্রধান গেটের দরজা ছিল অজেয়, সেটা খোলার কোড তুমি পেয়ে গেছ। এই প্রসাদের ডায়াগ্রামও নিশ্চয় তোমাকে দেয়া হয়েছে। তুমি ভাগ্যবান যে, আমার ঘুমাবার সময়কে তুমি বেছে নিতে পেরেছ তোমার অভিযানের জন্য। তুমি ভাগ্যবান বলেই আমরা ক্যাপিটাল অব পাওয়ারকে খালি করে সবাইকে পাঠিয়েছি তাহিতিতে ডোর টু ডোর খুঁজে তোমাকে বের করে আনতে। ঠিক এই সময় তুমি ক্যাপিটাল অব পাওয়ারে অভিযানে এসেছ। কোন এক বিশ্বাসঘাতকের সাহায্যই তোমাকে ভাগ্যবান করেছে। আমাকে যখন ঘুম থেকে জাগানো হয়, তখন তুমি হার্ড লেয়ার পর্যন্ত এসে গেছ। তার পর আমি তোমাকে এই স্বর্ণপ্রসাদের

গেটে আসতে আর বাধা দেইনি। কারণ এই স্বর্ণপ্রসাদ এখনও উদ্বোধণ পর্যন্ত হয়নি। তোমার রক্ত দিয়েই তার উদ্বোধন হবে। স্বরণীয় হয়ে থাকবে এই উদ্বোধন। থেমে গেল কণ্ঠ।

থেমে গেল লাউড স্পীকার।

পল পল করে বয়ে গেল কয়েক মুহূর্ত।

কি ঘটতে যাচ্ছে, কি করবে আহমদ মুসা, তা ভাবছিল সে।

হঠাৎ আহমদ মুসার পায়ের তলা থেকে কার্পেট কোন এক অদৃশ্য শক্তির হ্যাঁচকা টানে প্রবল বেগে সরে গেল।

একদম চিৎ হয়ে পড়ে গেল আহমদ মুসা।

টানটা এত আকস্মিক ও প্রবল ছিল যে, আহমদ মুসা তার দেহের উপর নিয়ন্ত্রণ পুরোটাই হারিয়ে ফেলেছিল। বাম হাত থেকে মাইক্রো মেশিনগানটি ছিটকে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ডান হাতটি জ্যাকেটের পকেট থেকে ছিটকে বিরিয়ে এলেও বিস্ময়করভাবে লেজারগানটি হাতের মুঠোতেই ছিল।

আহমদ মুসা পড়ে যাবার মুহূর্তেই করিডোরটির সামনে এসে দাঁড়াল ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের প্রধান অ্যালেক্সি গ্যারিন। তার দুই হাতে দু'টি রিভলবার। তার দুই চোখে আগুন।

সে এসে দাঁড়িয়ে স্থির হবার আগেই তার দুই রিভলবার থেকে দু'টি গুলি বর্ষিত হলো আহমদ মুসার লক্ষ্যে, ঠিক দেখামাত্র গুলি করার মত। আহমদ মুসাকে দেখার পর আর অপেক্ষা করেনি অ্যালেক্সি গ্যারিন।

আহমদ মুসা চিৎ হয়ে পড়ে যাবার পর প্রাথমিক ধাক্কাই সে সামলাতে পারেনি, আক্রমণে যাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না তার।

আহমদ মুসা দেখতে পেয়েছে, গুলি ছুঁড়ছে অ্যালেক্সি গ্যারিন।

করণীয় কিছু নেই, একটা বিমূঢ় অবস্থা আহমদ মুসার। মৃত্যুর অপেক্ষা ছাড়া আর কিছুই তার করার নেই।

কিন্তু গুলি তাকে স্পর্শ করল না।

এক নারী মূর্তী দু'টি গুলিই তার বুক পেতে দিয়ে গ্রহণ করেছে। সামান্য টলে উঠে ঢলে পড়ছে নারী মূর্তির দেহটি।

অ্যালেক্সি গ্যারিন মেয়েটিকে গুলি খেতে দেখে কিছুটা হকচকিয়ে গিয়েছিল মুহূর্তের জন্যে। তারপরই আবার তার দু'হাতের রিভলবার উঠে এসেছে আহমদ মুসার লক্ষে।

কিন্তু অ্যালেক্সি গ্যারিনকে আর সুযোগ দিল না আহমদ মুসা। সে আগেই উঠে দাঁড়িয়েছি। হাতের লেজারগানও তার তৈরি ছিল। বাটন টিপে ফায়ার করল অ্যালেক্সি গ্যারিনকে। ভয়ংকর আলোর এক স্রোত আলোর গতিতেই ছুটে গিয়ে আঘাত করল অ্যালেক্সি গ্যারিনকে।

গাছ যেমন ভেঙে পরে, তেমনি ভেঙে পড়ল অ্যালেক্সি গ্যারিনের দেহ।

আহমদ মুসা ইতিমধ্যেই চিনতে পেরেছে গৌরীকে। গৌরীই আহমদ মুসাকে বাঁচাবার জন্যে বুক পেতে দিয়েছে গুলির সামনে।

গৌরী পড়ে গেলে করিডোরের কার্পেটের উপর।

আহমদ মুসা দ্রুত গিয়ে গৌরীর পাশে বসে হাঁটুর উপর মাথা তুলে নিল। বলল, মিস গৌরী, আপনি আমাকে বাঁচাবার জন্যে এভাবে. . .।

যন্ত্রণায় অস্থির গৌরীর চেহারা। সে মুখ ফিরিয়ে আহমদ মুসার দিকে চেয়ে বলল, জীবনে একটিই ভালো কাজ করলাম। জনাব ঈশ্বরকে বলার মত এই একটা কাজই আমার হয়েছে।

গৌরী একটু থেমেই আবার বলল, আমার সময় বেশি নেই, শুনুন। আবার জ্যাকেটের কলারের একটা পকেটে এক খন্ড কাগজ আছে। কোড নাম্বার ছাড়া ক্যাপসুলগুলো খোলার কোন উপায় নেই। ওগুলো বুলেটপ্রুফ, ফায়ারপ্রুফ ও আনব্রোকেবল। যদি ওগুলো জোর করে ভাঙার চেষ্টা করা হয় তাহলে বিজ্ঞানীরা মারা যাবে। এই কাগজ খণ্ডে বিজ্ঞানীদের ক্যাপসুলগুলো খোলার কোড নাম্বার আছে। তৃতীয় তলায় একটা কনট্রোল সেন্টার আছে। সেই সেন্টারে একটা ডিজিটাল কী বোর্ড দেখবেন। সেই কী বোর্ডে এই কোড টাইপ করলে ক্যাপসুলগুলো খুলে যাবে।

আহমদ মুসা গৌরীর জ্যাকেটের কলারের গোপন পকেট থেকে কাগজটি বের করে নিতে নিতে বলল, এখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা নিশ্চয় আছে, সেটা কথায়? আপনার বুকের দুই পাশে গুলি লেগেছে। আপনি সেরে উঠবেন।

সে চেষ্টা করবেন না। আমি বুঝতে পারছি আমার সময় বেশি নেই। জানেন এই মৃত্যুতে আমি খুব তৃপ্ত আমি। একজন ভালো মানুষের কোলে আমি মরতে পারছি, এটা আমার সৌভাগ্য। এতে আমি খুব খুশিও। কারণ আমাকে যে ধ্বংস করেছে, মৃত্যুর আগে তার ধ্বংস আমি দেখলাম। স্রষ্টার কাছে তার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ আছে, জীবনের অন্তিম লগ্নে এসে কেন আপনার সাথে দেখা হলো? কেন আরো আগে আপনার দেখা পাইনি? আমি উচ্চাভিলাষী ছিলাম। আমি বড় কিছু করতে চাইতাম। কিন্তু তা মনুষ্যত্ব ও আমার মানবিক অধিকারের বিনিময়ে নয়। কিন্তু তাই হয়েছে।

গৌরীর শেষের কথাগুলো অস্পষ্ট হয়ে উঠল। ধুঁকছিল সে। চোখটা তার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

আপনি প্লিজ বলুন, এখানে কোথায় চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে?

বলে আহমদ মুসা তাকে পাঁজাকোলা করে ওঠাতে যাচ্ছিল।

চোখ খুলল গৌরী। সে মাথা নেড়ে বলল, না, কোন প্রয়োজন নেই। সত্যিই সময় আমার নেই। বলে থামল সে।

আমাকে আপনার কিছু বলার আছে? আত্মীয়-স্বজন কিংবা অন্য কোন ব্যাপারে? বলল আহমদ মুসা।

গৌরী চোখ তুলে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, আছে। আমার জ্যাকেটের পকেটে দেখুন একটা ছোট্ট ডাইরি আছে। ওতে আমি কথাগুলো লিখে রেখেছি। এই রাতে যখন সুড়ঙ্গে প্রবেশ করতে আসেন, তখনই আমি তাড়াহুড়া করে লিখেছি।

আমি সুড়ঙ্গে প্রবেশ করতে আসছি, এটা আপনি দেখেছেন? জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

হ্যাঁ। বলল গৌরী।

কিভাবে? আহমদ মুসা বলল।

আপনি রাডার ও ক্যামেরাসজ্জিত রেসিস্ট্যান্ট যে পোষাক পরেছিলেন, তা আমাদের ক্যামেরার জন্যে অচল। তাই আমি আপনাকে দেখতে পেয়েছি এবং চিনতেও পেরেছি।

আর কেউ দেখিনি? জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

না। ক্যাপিটাল অব পাওয়ার-এর নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার উপর ছিল।

তাই আটজন কমান্ড নিয়ে আমি জেগে বসে ছিলাম। বলল গৌরী। ধীরে ধীরে তার কণ্ঠ ক্ষীণ হয়ে আসছে।

প্রধান দরজা খোলার কোড ও ডায়াগ্রাম আপনিই দিয়েছিলেন? আহমদ মুসা বলল।

হ্যাঁ। কারন আমি মুক্ত চেয়েছিলাম এবং ওদের ধ্বংসও চেয়েছিলাম।

আল্লাহ আপনাকে এর যাযাহ দিন! আপনি শুধু কিছু বিজ্ঞানীর নয়, গোটা দুনিয়ার আপনি উপকার করেছেন। আল্লাহর অসীম দয়া আপনি পাবেন! আহমদ মুসা বলল।

আল্লাহ্ মানে স্রষ্টার প্রতি আপনার তো খুব বিশ্বাস, তাই না? বলল গৌরী।

কেন? আপনি স্রষ্টায় বিশ্বাস করেন না? আহমদ মুসা বলল।

আমার বিশ্বাস দিয়ে কি হবে? আমি তাঁর জন্যে মানে আমার বিশ্বাসের পক্ষে কিছুই করিনি। সুতরাং পরজগতেও আমার কোন ভবিষ্যত নেই। বলল অশ্রুরূদ্ধ ক্ষীণ কণ্ঠে।

আছে। আপনি এক স্রষ্টায় বিশ্বাস করেন? আহমদ মুসা বলল।

করি। দৃঢ়ভাবে করি। কারণ পরমাণু থেকে গ্যালাক্সি পর্যন্ত গোটা সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে একক এক বিধান। স্রষ্টা একজন না হলে এটা হতো না। বলল গৌরী নরম ও ক্ষীণ কণ্ঠে। দু'চোখ থেকে তার গড়িয়ে আসছিল অশ্রু।

আপনি কি পৃথিবীতে স্রষ্টার বাণীবাহক অর্থাৎ নবী-রসূলে বিশ্বাস করেন না?

খুব মৃদভাবে চোখ তুলে তাকাল গৌরী আহমদ মুসার দিকে। বলল, জেসাসকে আমি মানি। কিন্তু তাঁর জন্যে কোন কাজ করিনি।

নবী-রসূলদের ধারাবাহিকতায় শেষ নবী মুহাম্মাদ স. এর কথা আপনি জানেন? আহমদ মুসা বলল।

জানি। বলল গৌরী।

আল্লাহ্‌র পাঠানো নবী-রসূল স.-দের মধ্যে তিনি শেষ নবী, এটা আপনি মানেন?

চোখ বুজে ছিল গৌরী। কিছুক্ষণ পর চোখ খুলল। বলল, বিশ্বাসের জন্যে যতটা জানা দরকার ততটা জানি না। তবে আপনার উপর আস্থা আমার সীমাহীন। আপনি তাঁকে শেষ নবী বলছেন, আমি তাঁকে শেষ নবী মানলাম।

মিস গৌরী! পরকালে আমার পরিণতি কি হবে আমি জানি না, কিন্তু একটা কথা বলছি, আপনি আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাস করেন এবং আল্লাহর শেষ নবী মোহাম্মাদুর রসূলল্লাহ্‌ স.-এর উপর আস্থা পোষণ করেন, সুতরাং সৃষ্ট মানুষের প্রতি আল্লাহর যে প্রতিশ্রুতি, সে অনুসারে আল্লাহ্‌ আপনাকে মাফ করতে পারেন এবং গ্রহণ করতে পারেন তাঁর জান্নাতের জন্যে। আহমদ মুসা বলল।

যন্ত্রণায় কাতর গৌরীর গোটা দেহ। তবে তার চোখ দু'টি উজ্জল।

অশ্রু ঝরছিল সে চোখ দিয়ে চোখ বুজল, যেন ক্লান্তি ও কষ্ট শামলে নেবার চেষ্টা করছে সে!

চোখ খুলল আবার সে। বলল, স্রষ্টা অনুগ্রহ করলে, তাঁর দয়া হলেই সবই সম্ভব। আপনার মত সকলের ন্যায় আমিও তাঁর দয়র মুখাপেক্ষী হলাম। গৌরীর কথাগুলো জড়িয়ে যাচ্ছে। যেন ঘুমিয়ে পড়ছে সে।

একটু থেমেছিল। আবার অস্পষ্ট ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, বিজ্ঞানীদের নিয়ে যাবার জন্যে সুড়ঙ্গকে নিরাপদ করতে হবে। এজন্যে সেন্ট্রাল কন্ট্রোলের সিস্টেম কন্ট্রোল প্যানেলে 'অ' চিহ্নিত সুইচটা অফ করে দিলেই সুড়ঙ্গে যে ফাঁদগুলো আছে তা অকেজো হয়ে যাবে। কাঁপা গলায় আস্তে আস্তে বলল কথাগুলো।

গোটা দেহেই তার নিঃসাড় হয়ে পড়েছে যেন!

তার হাত পায়ের কোন চেতনা দেখা যাচ্ছে না।

চোখ বুজেছে আবার সে।

কাঁপছে গৌরীর ঠোঁট দু'টি। যেন নিজের সাথে নিজেই সে লড়াই করছে! চোখ দু'টি তার খুলে গেল আবার।

ঠোঁট দু'টি তার নড়ে উঠল। অস্ফুট ও কাঁপা গলায় বলল, আহমদ মুসা, ডা-য়েরি-তে আ-মি যা আপ-না-কে ব-লে-ছি তা আপ-নাকে জা-নাবার জন্যে?

কো-ন দা-য়িত্বের ভাব আ-মি আপ-নাকে জা-নাবার জন্যে? কো-ন-দা-য়িত্বের ভার আ-মি আ-পনাকে দিচ্ছি না। সে অধি-কা-রও আ-মা-র নে-ই।

কণ্ঠ থেমে গেল গৌরীর। চোখ দু'টিও বুজে গেল তার।

নিথর হয়ে গেল তার শরীর।

যেন প্রশান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল গৌরী। কিন্তু ঘুম নয়, মৃত্যুর সিংহদ্বার দিয়ে এ এক মহাযাত্রার শুরু।

আহমদ মুসা ধীরে ধীরে গৌরীর মাথাটা কার্পেটে নামিয়ে রাখল।

গৌরীর প্রাণহীন দেহের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল আহমদ মুসা, আল্লাহ তোমার শাহাদাৎ মঞ্জুর করুন। আল্লাহর এক নগণ্য বান্দাকে বাঁচাতে এবং আল্লাহর হাজারো বান্দার উপকারের জন্যে তুমি জীবন দিয়েছে। আল্লাহর কাছে এই সাক্ষ্য আমি দিচ্ছি।

তাহিতির নৌবহর ঘিরে ফেলেছে তাহনিয়া ও মাতুতুংগা অ্যাটল।

আহমদ মুসা বন্দী বিজ্ঞানীদের সুড়ঙ্গ দিয়ে তাহনিয়া অ্যাটলের পাড়ে নিয়ে এসেছে। এক এক করে সব বিজ্ঞানীকে তুলে নেয়া হলো তাহিতি নৌবাহিনীর জাহাজে।

জাহাজে ওঠার আগে সৌদি আরবের মুক্তিপ্রাপ্ত স্পেস মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বিজ্ঞানী খালেদ মোহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল মক্কী আহমদ মুসাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল। বলল, আল্লাহ আপনাকে উত্তম যাযাহ দিন ও দীর্ঘ জীবন দান করুন। শুধু আমাকে নয়, পৃথিবীর প্রায় পৌঁনে একশ' শীর্ষ বিজ্ঞানীকে আল্লাহর সাহায্যে নতুন জীবন দিয়েছেন। অনেক সালাম আপনাকে।

এই সময় হেলিকপ্টার ল্যান্ড করল।

হেলিকপ্টার থেকে নেমে এল স্বরাষ্ট্র ও পুলিশ প্রধান দ্যাগল ও তাহিতির গভর্নর ফ্রাঁসোয়া বুরবন।

আহমদ মুসা এগিয়ে গেল তাদে রদিকে। তারাও এগিয়ে এল। দ্যাগল আহমদ মুসাকে কংগ্রাচুলেশন জানিয়ে জড়িয়ে ধরল এবং বলল, জানেন গোটা দুনিয়ার এটাই আজ হট নিউজ! আপনার নাম ছড়িয়ে পড়েছে গোটা দুনিয়ায়।

দ্যাগল আহমদ মুসাকে পরিচয় করিয়ে দিল গভর্নরের সাথে। গভর্নর আহমদ মুসাকে বুকে টেনে নিয়ে বলল, তোমার জন্যে আমরা গর্বিত। গোটা দুনিয়ায় তাহিতি অসাধ্য সাধন করেছে। এর সব কৃতিত্ব তোমার।

গভর্নরকে ধন্যবাদ দিয়ে আহমদ মুসা একটু আলগা হতেই দ্যাগল বলল, পেছনে তাকিয়ে দেখ আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা পেছনে তাকাল। দেখল, মাহিত ও মারেভা। ওরা হেলিকপ্টারে দ্যাগলের সাথেই এসেছে।

আহমদ মুসা ওদের দিকে এগোলো।

মাহিন এসে আহমদ মুসাকে জড়িয়ে ধরে বলল, স্যার, আমাদের দারুণ গর্ব হচ্ছে।

মারেভা এসে পাশে দাঁড়াল। বলল, স্যার, আপনি ঠিক আছেন তো?

হাসল আহমদ মুসা। বলল, দেখো কেউ আমার এই খোজ নেয়নি, আমার বোন নিয়েছে। বোনদের, মা'দের ধর্ম এটাই!

একটু থামল আহমদ মুসা। আবার বলল মারেভাদের দিকে চেয়ে, হ্যাঁ, ভাল আছি বোন!

ভাইয়া, আমি ও মাহিন চাকুরি পেয়েছি। বলল মারেভা।

কি চাকুরি? আহমদ মুসা বলল।

গোয়েন্দা বিভাগে। প্রথমে আমাদের ট্রেনিং চলবে। তার সাথে পড়ার সুযোগটাও থাকবে। বলল মারেভা।

অভিনন্দন তোমাদের! ভাল চাকুরি। দেশের জন্য, মানুষের জন্য কাজ করতে পারবে। আহমদ মুসা বলল।

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা এগোলো গভর্নরের দিকে।

এ সময় মোবাইল বেজে উঠল আহমদ মুসার।

কল ধরতেই আহমদ মুসা ওপার থেকে কণ্ঠ পেল সৌদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ আব্দুল ওয়াহাব আল-নজদীর।

আহমদ মুসা তাকে সালাম দিল। সালামের জবাব দিয়েই সে বলল, অভিনন্দন আহমদ মুসা, শুধু আমাদের বিজ্ঞানী নয়, প্রায় পৌনে একশ' বিজ্ঞানীকে তুমি মুক্ত করেছ। গোটা দুনিয়া তোমাদের অভিনন্দিত করছে। আমি মহামান্য বাদশাহকে জানিয়েছি। তিনি আপনাকে সালাম দিয়েছেন।

ধন্যবাদ স্যার। আল্লাহর সাহায্যেই সব হয়েছে। বলল আহমদ মুসা।

আবারও ধন্যবাদ তোমাকে। আমরা এখানে সবাই তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি। ম্যাডামরা সবাই ভাল আছেন। বলল সৌদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

আহমদ মুসা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সালামের জবাব দিয়ে টেলিফোন রেখে দিল।

এগিয়ে গেল আহমদ মুসা গভর্নরের দিকে।

তাহানিয়া এ্যাটল থেকে তাহিতি নৌবাহিনীর একটা জাহাজ প্যাসেফিকের বুক চিরে ধীর গতিতে দুলে দুলে চলছে তাহিতির দিকে। জাহাজের একটা কেবিনে শুয়ে আছে আহমদ মুসা। তার হাতে গৌরীর দেয়া সেই ডায়েরিটা। ডায়েরি পড়ার জন্য সে খুলল।

তখনই তার মোবাইলে কল বেজে উঠল। ধরল টেলিফোন আহমদ মুসা।

ওপার থেকে কণ্ঠ তাহিতির গভর্নরের, গুড মর্নিং মি. আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা গুড মর্নিং জানাল।

মি. আহমদ মুসা। একটা খবর আপনাকে না জানিয়ে পারলাম না।

প্যারিস থেকে এই মাত্র প্রধানমন্ত্রী জানালেন, মতুতুংগা অ্যাটলের প্রসাদটিকে ফরাসি সরকার পর্যটকদের জন্যে খুলে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর বার্ষিক আয়ের এক-চতুর্থাংশ শিশুদের কল্যাণে ব্যয় করা হবে। অর্ধেকটা পাবে তাহিতি ও পলিনেশীয়া দ্বীপপুঞ্জ। অবশিষ্ট এক-চতুর্থাংশ খরচ করা হবে প্রশান্ত মহাসাগরীয় সব ধর্মের শিশুদের ধর্ম শিক্ষার উন্নয়নে। আপনার কাছে এই পরামর্শ

ফরাসি সরকার রেখেছেন। আর প্রসাদটির 'ক্যাপিটাল অব পাওয়ার'' নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে 'আহমদ প্যালেস অব ওয়েলফেয়ার'। আর ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের গোপন ঘাটিগুলো ধ্বংস করা হচ্ছে এবং ওদের মিনি সাবমেরিন, টিউব সাবমেরিন সমৃদ্ধ ওদের যে নৌবহর আছে পানির তলায়, তা খুঁজে বের করা ও পাকড়াও করার কাজ শুরু হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া ও মার্কিন সরকার আমাদের সাহায্য করছে। বলল গভর্নর।

অন্য সব সিদ্ধান্তের জন্য ফরাসি সরকারকে ধন্যবাদ। কিন্তু স্যার, আমার নাম জড়ানো হলো কেমন প্যালেসের নামের সাথে? আহমদ মুসা বলল।

এ সিদ্ধান্ত ফরাসি ক্যাবিনেটের, আমি কি করে বলব মি. আহমদ মুসা। ভাবল সে, নামটা আমার নয়। 'আহমদ' আল্লাহর রসূলের নাম বলেই তো এটা আমার নামেরও একটা অংশ। থাক না অ্যাটল প্রসাদের মত দুনিয়ার এক বিস্ময়ের সাথে আমার রসূল মানে মানুষের রসূলের নাম জড়িয়ে! অ্যাটল দ্বীপের নিচের এই বিস্ময়কর প্রসাদটি তো দুনিয়ার মানুষ ও পর্যটকদের কাছে এক নজর দেখার এক অপার আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠবে।

আহমদ মুসা কিছূ বলার আগে গভর্নর নিজেই আবার বলে উঠল, ঠিক আছে মি. আহমদ মুসা, আপনি তো এখন শীপে। আসুন, আমরা আপনার অপেক্ষা করছি। দেশ-বিদেশের বহু সাংবাদিক এসে পৌঁছেছে। আর মনে আছে তো, আজ রাতে আমার বাড়িতে ডিনার।

মনে আছে স্যার। আর ঠিক সময়েই আমি সংবাদিক সম্মেলনে পৌঁছব স্যার। কিন্তু স্যার, আমি শুধু উপস্থিত থাকবো, আমার পরিচয় দিতে পারবেন না। আহমদ মুসা বলল।

হ্যাঁ, একথা আমাকে মি. দ্যাগল জানিয়েছেন কিন্তু পরিচিত হতে, কয়েকটা কথা বলতে দোষ কি মি. আহমদ মুসা? বলল গভর্নর।

স্যার, আমি কোন রাজনীতিক নই, কোন প্রফেশনাল পুলিশ বা সেনাবাহিনীর কেউ নই। কোন পরিচয় ছাড়াই মানুষের জন্যে কাজ করছি, কাজ করবো। আহমদ মুসা বলল।

ধন্যবাদ আহমদ মুসা। আপনি সত্যই সকলের জন্যে দৃষ্টান্ত হওয়ার মত একজন। ঈশ্বর আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন! রাখছি তাহলে টেলিফোন। বলল গভর্নর।

আপনার টেলিফোনের জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ, আমি আসছি স্যার। আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসা মোবাইল রেখে গৌরীর ডাইরিতে হাত দিতে যাচ্ছিল।

আবার মোবাইলে কল বেজে উঠল আহমদ মুসার।

মোবাইল তুলে নিয়ে কল অন করল আহমদ মুসা।

আচ্ছালামু আলাইকুম। ওপার থেকে জোসেফাইনের কণ্ঠ।

ওয়া আলাইকুম সালাম, জোসেফাইন কেমন আছ? তোমাকে কয়েকবার টেলিফোন করে পাইনি। বলল আহমদ মুসা।

তোমার প্রশ্নের জবাব দেবার আগে তোমাকে কংগ্রাচুলেশন দিয়ে নেই। কংগ্রাচু. . .।

জোসেফাইনের কথার মধ্যেই আহমদ মুসা বলে উঠল, না, ম্যাডাম জোসেফাইন, তোমার কংগ্রাচুলেশন নয়, কনসুলেশন চাই তোমার কাছে। তোমাকে ছেড়ে অনেক দিন আমি বাইরে, অনেক কষ্টে আছি।

আমি সব জানি। আমার ননদ সব আমাকে জানিয়েছে। তুমি যে লড়াইয়ে আছো, তাতে আমাকে স্মরণ করার, আমার জন্যে কষ্ট পাবার মত সময় কোথায় তোমার? তুমি গুলিতে আহমত হয়েছে একাধিকবার। সেটাও তো আমাকে জানাওনি! তার পরেও তোমাকে অভিনন্দন! থামল জোসেফাইন।

বেদনায় ভারি কণ্ঠ জোসেফাইনের। শেষ কয়েকটা শব্দ তার গলায় বেঁধে গিয়েছিল।

আহমদ মুসা গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, জোসেফাইন, তুমি না আমার জোসেফাইন! তুমিতো অনেক শক্ত। তুমি ভেঙে পড়লে আমিও তো ভেঙে পড়ব জোসেফাইন!

স্যরি! মাফ কর আমাকে। কিন্তু তুমি তোমার সব খবর আমাকে জানাবে না কেন? না জানানোর জন্যই এই কষ্ট আমার লেগেছে। বলল জোসেফাইন।

স্যরি, জানানো উচিত ছিল। কিন্তু ঘটনাগুলো একের পর এক এমনভাবে ঘটেছে, যাতে সুস্থির সময় খুব কম পাওয়া গেছে। আর ভয় হয়েছে তুমি ভয়ানক উদ্বেগের মধ্যে পড়বে। ভেবেছি, সমস্যাগুলো ক্লিয়ার হলেই তোমাকে জানাবো। মারেভা তোমাকে টেলিফোনে এসব জানিয়েছে? বলল আহমদ মুসা।

তাহিতিতে যখণ আজ ভোর, তখন সে টেলিফোন করে বিজয়ের কথা জানিয়েছে। সে এর আগেও আরও দু'দিন টেলিফোন করেছে। ও হ্যাঁ, আরও একদিন সে আমাকে টেলিফোন করেছে। ওদের বিয়ের ঠিক পর মুহূর্তেই সে ওদের বিয়ের খবর আমাকে জানিয়েছে। আমি ওকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলাম, তোমার ভাইয়াকে ছাড়া বিয়ে করছ! জবাবে সে বলেছিল, ভাইয়া ডেট ঠিক করে দিয়ে বলেছিলেন, যাই ঘটুক, কেউ না আসুক ঐদিন যেন বিয়ে হয়ে যায়! ঐ দিনের পর তোমরা বিয়ে না হওয়া অবস্থায় আমার কাছে আসতে পারবে না। অতএব, উপায় কি বিয়ে করতেই হলো। খুব ভাল মেয়ে মারেভা। বলল জোসেফাইন।

হ্যাঁ, ওরা দু'জন আমাকে অনেক সাহায্য করেছে। আরেকজনের কথা বলতে হচ্ছে জোসেফাইন সে হলো গৌরী-ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটের সর্বময় কর্তা আলেক্সি গ্যারিনের পার্সোনাল সেক্রেটারি, তার বডিগার্ড ও গ্যারিনের নিজস্ব বাহিনীর কমান্ডার। আলেক্সি গ্যারিনের যে দু'টি গুলি আমার বুকে বিদ্ধ হবার কথা ছিল, ছুটে এসে সে এই দু'টি গুলি নিজেই বুক পেতে নেয়। এই সুযোগেই আমি লেজার গানের ফায়ার করে আলেক্সি গ্যারিনকে হত্যা করি। গৌরী মারা গেছে জোসেফাইন।আহমদ মুসার অবিচল কণ্ঠও যেন শেষ বাক্যে কেঁপে উঠেছিল!

ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। বলল জোসেফাইন।

ইন্নালিল্লাহ পড়লে যে জোসেফাইন? আহমদ মুসা বলল।

তোমার জন্যে যে জীবন দিতে পারে, তোমাকে যে এতটা চেনে, সে তোমার ধর্মকেও ভালো না বসে পারে না। বলল জোসেফাইন।

হ্যাঁ জোসেফাইন, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে সে এক আল্লাহ ও শেষ নবীর উপর তার বিশ্বাসের ঘোষণা দিয়েছে। আহমদ মুসা বলল।

আল্লাহ্ গৌরীকে কবুল করুন! কিন্তু এত বড় অবস্থানে থেকে কেন সে তোমাকে সাহায্য করল? জিজ্ঞাসা জোসেফাইনের।

আহমদ মুসার সাথে অ্যাপেক্স রেস্টুরেন্টে গৌরীর প্রথম দেখা ও কথাবার্তা হয়। গৌরীরা আহমদ মুসাকে কিডন্যাপ করার পর সে ওদের গাড়ি দখল করা, ওদের বন্দী করা, মেটাল জ্যামিং মেশিন রেখে গিয়ে আহমদ মুসাকে নিরবে সাহায্য করা, মতুংগা অ্যাটলের তলদেশে 'ক্যাপিটাল অব পাওয়ার' প্রসাদে প্রবেশে গৌরীর সাহায্য এবং সর্বেশেষ ঘটনা ও তার কথাবার্তা সব জোসেফাইনকে জানাল।

সত্যিই দুর্ভাগ্য আমাদের গৌরীর। সে বঞ্চনা ও নারীত্বের চরম অপমানের শিকার। এ সব কিছু কিন্তু তার হৃদয়ের মহৎ বৃত্তিকে হত্যা করতে পারেনি। তাই সে তোমাকে অবলম্বন করে নতুন করে জেগে উঠতে চেয়েছে। সে সৌভাগ্যবানও বটে! সে জীবন দিয়ে যা করেছে, তা করার সৌভাঘ্য কচিৎ কারও ভাগ্যে জোটে। আল্লাহ তাকে কবুল করুন এবং উত্তম যাযাহ দান করুন! তার কবর কোথায় হয়েছে? বলল জোসেফাইন।

আমি অনুরোধ করেছি, তাহিতেই তার কবর হবে। আহমদ মুসা বলল।

তুমি তার জানাজা পড়বে। বলল জোসেফাইন।

অবশ্যই পড়বো জোসেফাইন। আহমদ মুসা বলল।

ধন্যবাদ! বলে একটু থামল জোসেফাইন। কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল, তোমাকে একটা খবর দিতে চাই।

কি খবর? আহমদ মুসা বলল।

আমি ও আহমদ আব্দুল্লাহ আমেরিকা যাচ্ছি।

আমেরিকা যাচ্ছ? আহমদ মুসার কণ্ঠে বিস্ময়!

বিস্মিত হচ্ছ কেন? অনুমতি তো অনেক আগেই দিয়েছ। বলল জোসেফাইন।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, অবশ্যই যাবে। কেন যাচ্ছ এটাই বুঝছি না, বেড়াতে গেলে তো আমাকে সাথে নিতে চাইতে! আহমদ মুসা বলল।

তোমার এত ভক্ত সেখানে যে, নিরবে বেড়ানো যেত না। যেখানে যেতাম, সেখানে জনসভা হয়ে যেত। বলল জোসেফাইন।

কবে যাচ্ছ? কোথায় উঠবে? আহমদ মুসা বলল।

আমার হোস্ট হচ্ছেন খালাম্মা, সারা জেফারসনের মা। আমেরিকা যাব শুনেই বললেন, আমার বাড়িতেই উঠতে হবে, গেষ্ট হিসেবে নয়, মেয়ে হিসেবে। আমি তাঁর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারিনি। বলল জোসেফাইন।

ধন্যবাদ জোসেফাইন, তোমার আমেরিকা সফর সুন্দর হবে, সফল হবে। খালাম্মা অত্যন্ত স্নেহময়ী এক মা। সারা জেফারসনের সাথে কি তার আগে কথা বলেছ? আহমদ মুসা বলল। সারা নিউমেক্সিকোতে, চাকুরিতে। মাস খানেকের ছুটিতে দু'একদিনের মধ্যেই সে বাড়িতে আসবে। তাকে আমি কিছু বলিনি। খালাম্মাকেও বলতে নিষেধ করেছি। আমি তাকে সারপ্রাইজ দিতে চাই। বলল জোসেফাইন।

কবে যাচ্ছো? জিজ্ঞাসা আহমদ মুসা।

তোমার এই মিশনের সমাপ্তির অপেক্ষায় ছিলাম। আজ টিকেট করে ফেলব।

সৌদি আরবের সরকারি কর্তৃপক্ষ কি জানে? জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

আমি মার্কিন দূতাবাসকে জানাবার পর রাষ্ট্রদূত ও সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালের ডিজি সাহেব এসেছিলেন। তারা সব জানিয়ে গেছেন, ওয়াশিংটন বিমান রিসিভ করবেন এবং সরকারী নিরাপত্তায় আমাকে সারা জেফারসনের বাসায় পৌঁছে দেবে। নিরাপত্তা নিয়ে আমাকে কিছু ভাবতে হবে না। আমি যেখানে থাকব এবং যেখানেই যাব, আমাদের জন্যে সরকারী নিরাপত্তা থাকবে। বলল জোসেফাইন।

আলহামদুলিল্লাহ! বিদেশ-বিভূয়ে যাবে, কোথায় কি করবে, এ নিয়ে আমার দুশ্চিন্তা ছিল। সেটা কাটল। দোয়া করি তোমার সফর আনন্দদায়ক হোক! আহমদ মুসা বলল।

শুধু আনন্দদায়ক নয়, সফল হোক, এই দোয়া কর। বলল জোসেফাইন।

কিন্তু কি চাও তুমি এই সফরে? কিসের সাফল্য চাইবে? আহমদ মুসা বলল।

জোসেফাইন হাসল। বলল, ‘আনন্দদায়ক’ শব্দের পরিপূরক হলো সাফল্য। মানুষ বলে না যে, তোমার সফল সফল ও আনন্দদায়ক হোক? বলল জোসেফাইন।

ঠিক আছে আমিও তাই চাইছি। তোমার সফল সফল ও আনন্দদায়ক হোক? বলল আহমদ মুসা।

আমিন! বলল জোসেফাইন।

কিন্তু আমার কষ্টটা বাড়ল জোসেফাইন। বলল আহমদ মুসা।

কি কষ্ট? গম্ভীর কণ্ঠ জোসেফাইনের।

তোমাকে দেখা পাওয়ার সময়টা আরও দীর্ঘ হলো।

জোসেফাইন হাসল। বলল, এসব ডান-বামের কথা রেখে বল তোমার পরবর্তী ডেস্টিনেশন কি? গৌরীর ডাইরিতে কি আছে? আমি ওতে ‘বিপদ’ মানে ‘রহস্যের গন্ধ’ পাচ্ছি।

আমি ওটা পড়িনি। পড়ব আহমদ মুসা বলল।

পড়ার পর কিন্তু আমাকে জানাবে। বলল জোসেফাইন।

অবশ্যই। আহমদ মুসা বলল।

কথা শেষ করেই আবার বলল, আহমদ আব্দুল্লাহ কোথায়? এতক্ষণ যে তুমি নিরাপদে কথা বলল।

ও ঘুমিয়ে আছে। বলল জোসেফাইন।

বিদেশে যাবে, দেখ ওকে, চোখে চোখে রেখ। আহমদ মুসা বলল।

সারা ওকে পেলে আমি কতক্ষণ তাকে দেখতে পাব, সেটা বলা মুস্কিল। বলল জোসেফাইন।

তবু সব দায়িত্ব তো তোমারই। আহমদ মুসা বলল।

দোয়া করো। আর কোন কথা? বলল জোসেফাইন।

আরো একটা কথা আছে তবে. . .। আহমদ মুসা বলল।

বুঝেছি, আমি রাখলাম। আহমদ আব্দুল্লাহ উঠলে আবার টেলিফোন করব। আচ্ছালামু আলায়কুম। বলল জোসেফাইন।

অনেকক্ষণ রইলাম। ওয়া আলাইকুম সালাম। আহমদ মুসা বলল।

মোবাইলটা রেখেও আহমদ মুসা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল। তার চোখে শূণ্য দৃষ্টি। চোখে ভাসছে জোসেফাইনের হাসি মাখা সুন্দর মুখটা। সত্যিই হৃদয়ে সে অনুভব করছে জোসেফাইনের দূরত্ব।

অনেকক্ষণ পর বালিশটা টেনে শুয়ে পড়ল আহমদ মুসা। পাশ থেকে টেনে নিল গৌরীর ডাইরিটা।

পরবর্তী বই

# ক্লোন ষড়যন্ত্র


## কৃতজ্ঞতায়ঃ

1. Md Amdadul Haque Swapan
2. Mohammed Sohrab Uddin
3. M-g Mustafa
4. Sharwat Kabir Safin
5. Osman Gani
6. Sharwat Kabir Safin
7. Sagir Hussain Khan
8. Nazrul Islam
9. Jamirul Haqe
10. Abu Taher
11. Hafizul Islam
12. Ashrafuj Jaman
13. Amir Omar
14. Shaikh Noor-E-Alam

# সাইমুম-৫২

# ক্লোন ষড়যন্ত্র

আবুল আসাদ

# ১

গৌরীর ডাইরীর পাতা উল্টিয়ে চলেছে আহমদ মুসা।

ডাইরির পাতার দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত লেখা।

বিস্মিত্ আহমদ মুসা! স্বগত কন্ঠে বলল, তবে যে গৌরী বলল সুড়ঙ্গে আমাকে প্রবেশ করতে দেখে সে ডাইরি লিখেছে, যা পড়ার জন্যে আমাকে বলেছে। কিন্তু পনের বিশ মিনিটে কি কেউ এতটা লিখতে পারে!

ডাইরির পাতা উল্টিয়েই চলল আহমদ মুসা।

ডাইরির পাতার দুই-তৃতীয়াংশের মত শেষ হলো।

শেষের কয়েকটা পাতা লাল কালিতে লেখা।

আহমদ মুসার বুঝার বাকি রইল না নিশ্চয় এই লাল কালির লেখাগুলোই গৌরী তার জন্যে লিখে গেছে।

পড়া শুরু করল আহমদ মুসা:

'আমার নিজের কথা শেষ করতে পারলাম না। তোমাকে সুড়ঙ্গে দেখে..., মনে কিছু করো না 'তুমি' বলেই সম্বোধন করলাম। তোমাকে সেদিন হোটেলে দেখার পর থেকেই কেন জানি মনে হচ্ছে, শত বছরের চেনা তুমি আমার, যাকে 'আপনি' বলে দূরে ঠেলে দেয়া সম্ভব নয়। যে কথা বলছিলাম, তোমাকে সুড়ঙ্গে

দেখার পরেই আমার মনে হলো আমার সময় শেষ। তোমাকে আমার সাহায্য করতেই হবে। সেটা শুধু তোমার জন্যে নয়, আমার জন্যেও। আমার কথা, যা এ পর্যন্ত লিখেছি, পড়লে দেখতে পাবে, আমি আমাকে, আমার পরিবারকে মুক্ত করার জন্যে ব্ল্যাক সানে যুক্ত হয়েছিলাম। কিন্তু এখানে এসে সবই হারিয়েছি। তুমি আর কি কি করবে সব আমি জানি না, কিন্তু তুমি আমার সেভিয়ার তা নিশ্চিত। তোমার দ্বারা মুক্তি ঘটবে আমার আত্মার, এই অন্ধকার জীবন থেকে। আমি আনন্দিত। দু:খ আমার একটাই আমার পরিবারকে আমি রক্ষা করতে পারলাম না। এই রক্ষা করতে না পারার দু:খ আমার, সে কথা তোমাকে বলার জন্যেই আমার এই লেখা।

সেটা আমার পরিবারের চরম দুর্ভাগ্যের কাহিনী, আমার আতংকের কাহিনী।

আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের আতংক আমার মাকে নিয়ে। আমার ২২ বছর বয়স পর্যন্ত মাকে নিয়ে আমার এই আতংক মনে জাগেনি। আমার মা আমাদের পরিবারের কেন্দ্রবিন্দু। আমরা দু'বোন ও আমার বাবার প্রাণ যেমন আমাদের মা, তেমনি আমরাও তার প্রাণস্বরূপ। অত্যন্ত সুখী ছিল আমাদের পরিবার।

আমার নির্মেঘ এই সুখের আকাশে প্রথম কালো মেঘ মাথা তুলল, আমার ২২ বছর বয়সে, যা আগেই বলেছি। শিক্ষা জীবনের চৌকাঠ পেরিয়ে সবে বন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকেছি একজন জুনিয়র অধ্যাপক হিসাবে। শুরুর দিকে বাড়ি থেকে গিয়েই ক্লাস নিতাম, রাইন হাইওয়ে ও রাইন রেল কমিউনিকেশন এত সুন্দর যে, আমাদের বাড়ি থেকে বনকে 'নেক্সট ডোর' বলে মনে হতো। এর ফলে বাড়িতে অনেক বেশি সময় দিতে পারতাম। প্রথম ঘটনাটা ঘটল এই সময়ের এক রোববারে। দিনটা ছিল মেঘলা-যে কোন সময় বৃষ্টি আসবে এরকম অবস্থা। দু'তলায় আমার শোবার রুম থেকে নামছিলাম, নামতে নামতে দেখলাম সিঁড়ির জানালা খোলা। এগিয়ে যেয়ে জানালা বন্ধ করলাম। ঘুরে দাঁড়িয়ে সিঁড়ির ধাপের দিকে আসছিলাম। দেখলাম আমার আম্মার শোবার ঘরের পাশে তার ড্রেসিং রুমের ছোট ভেন্টিলেশনটা খোলা, যা সব সময় ভিতর থেকে বন্ধ থাকে। বুঝলাম,

সাপ্তাহিক ক্লিনিং-এর সময় নিশ্চয় ক্লিনার বেচারা ভেন্টিলেশনটা বন্ধ করতে ভুলে গেছে।

আমি ভেন্টিলেটরের দিকে এগোলাম। ইচ্ছা ছিল, মাকে ডেকে দেখি, যদি তিনি ঘরে থাকেন, তাহলে ভেন্টিলেটর বন্ধ করতে বলব।

ছোট্ট জানালা দিয়ে আমি উঁকি দিলাম।

এ জানালা দিয়ে মা'র ড্রেসিং রুমটা দেখা যায়। এর পরেই মায়ের বেড রুম।

ভিতরে তাকিয়েই অপার বিস্ময় নামল আমার চোখে-মুখে! মায়ের মাথা ভরা কালো চুল খোলা, এলোমেলো। হেয়ার ড্রাইয়ে শুকাচ্ছেন। বিস্ময়ে আমার দুই চোখ ছানাবড়া- মায়ের মাথা থেকে সাদা চুল কোথায় গেল! তার মাথার সামনের দিকে অন্তত কয়েক গুচ্ছ চুল সাদা। তিনি চুলে কালার ব্যবহার কোন সময়ই করেন না। তাহলে সাদা চুল গেল কোথায়? কৌতুহল আমার তুংগে। জানালা থেকে সরে আসতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু হলো না আসা। মা ড্রেসিং টেবিলে বসে ছিলেন। দেখলাম, তিনি দ্রুত ড্রয়ারের লক খুলে ছোট একটা বক্স বের করলেন। বক্সটি দ্রুত খুললেন। সাদা কালারের মত কিছু বের করলেন। তারপর সাদা কলপটি তুলে নিয়ে খুব যত্নের সাথে নির্দিষ্ট কয়েকটা গুচ্ছের উপর সাদা রংয়ের স্প্রে শুরু করলেন। অবাক বিস্ময়ে আমি দেখলাম, তার মাথার সামনের নির্দিষ্ট কয়েক গুচ্ছ চুল সাদা হয়ে গেল, যেমনটা আমরা দেখে আসছি।

ডায়িংটা ধীরে ধীরে শেষ করার সংগে সংগেই মা ডায়িং উপকরণগুলো ড্রয়ারে তালাবদ্ধ করে দরজা খুলে ড্রেসিং রুমের বাইরে চলে গেলেন। কৌতুহল ও বিস্ময় আমাকে এতটাই বিব্রত করেছিল যে, আমি কিছু বলতে পারলাম না। আমিও নেমে এলাম সিঁড়ি দিয়ে। ডাইনিং-এ মায়ের সাথে আমার দেখা হলো। বিষয়টা নিয়ে তাকে কিছু বলতে গিয়েও গলায় আটকে গেল। মন যেন কোন কারণে প্রবল বাধা দিল!

আরেক দিনের ঘটনা। আমি মায়ের স্টাডি রুমে ঢুকতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ মায়ের একটা কথায় থমকে দাঁড়ালাম। তিনি বলছিলেন, 'কি বলছ তুমি, আমি

তো সবচেয়ে কষ্টে আছি! আত্মঘাতি অভিনয় করছি আমি। তাড়াতাড়ি শেষ করো।'

কথাগুলো আমার কানে পৌঁছার সাথে সাথে আমার গোটা দেহে দেহ অবশকারী এক ঠাণ্ডা স্রোত যেন বয়ে গেল!

আমি উঁকি দিয়ে দেখলাম, মা টেলিফোনে কথা বলছেন স্টাডি টেবিলে বসে।

আর শোনার ধৈর্য আমার ছিল না।

আমি সরে এলাম।

আমি ভেবে কুল পেলাম না। মা কী কষ্টে আছেন? কি আত্মঘাতি অভিনয় করছেন মা? কার সাথে টেলিফোনে কথা বলছিলেন তিনি?

প্রশ্নের কোন শেষ নেই! উত্তর নেই একটারও। এই সময় একদিন রাইনের তীরে নিরিবিলি একটা বেঞ্চিতে বসেছিলাম। একটু নিচ দিয়েই বয়ে যাচ্ছিল রাইনের শান্ত স্রোত। ভাবছিলাম মাকে নিয়েই। যতই ভাবি ততই মায়ের বিভিন্ন অসঙ্গতি আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। সেদিন মায়ের বাম হাতের বুড়ো আঙুলে একটা কাটা দাগ দেখলাম। দাগটা প্রথম দেখলাম। তার হাত নিয়ে কত খেলা করেছি এ দাগ কখনো দেখিনি! দাগটা কিন্তু পুরাতন। এত দিন চোখে পড়েনি কেন? অল্প সময়েই আরেকটা বিষয় আমার নজরে পড়েছে। সেটা হলো, মা এখন আমাদের অতীত জীবন মানে ছোটবেলা নিয়ে কোন সম্প্রীতির গল্প বলেন না। অথচ আমাদের পরিবারিক গল্পগুজবে ও আমাদের ব্যক্তি-সংশ্লিষ্ট কথাবার্তাতেও আমাদের ছোটবেলার বিভিন্ন ঘটনা ও কথাবার্তা আগে বলতেন। এখন মাকে এ ব্যাপারে কিছুই বলতে শুনি না।

এসব চিন্তার মধ্যে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। এ সময় একটা কন্ঠ আমার কানে গেল, 'মা, বসতে পারি?'

মাথা তুলে দেখলাম বাবা দাঁড়িয়ে।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বাবাকে স্বাগত জানিয়ে বললাম, 'বসুন বাবা।'

বাবা এ সময় রাইনের তীর ধরে নিয়মিত হাঁটেন। আজকেও হাঁটছিলেন। আমাকে দেখেই সম্ভবত থেমেছেন।

বাবার সাথে কথা শুরু হলো। আবহাওয়া নিয়ে, এলাকার অবস্থা নিয়ে, শেষে আমার চাকরি, আমার বোনের লেখাপড়া নিয়ে অনেক কথা হলো। শেষে আলোচনা আমাদের মা ও পরিবার বিষয়ে গড়াল। এক সময় বাবা কেমন যেন আনমনা হয়ে গেছে, বললেন, ‘তোমরা বোধ হয় খেয়াল করনি মা, তোমার মা’র সেই যে অসুখ হলো, হামবুর্গ হাসপাতালে থাকল, তারপর তার শরীর-স্বাস্থ্যের খুবই উন্নতি হয়েছে, কিন্তু সে যেন বদলে গেছে মা।’

আমি চমকে উঠলাম। কিন্তু স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে বললাম, ‘তাই মনে করেন বাবা?’

‘তাই তো মনে হয়। অতীত যেন তার কাছে মুছে গেছে, অথচ ব্রেনের স্ক্যান আমাদের মেডিকেল ফাইলে আছে। ওদিক দিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ সে।’ বললেন বাবা।

‘তাহলে বাবা?’ আমি বাবার যুক্তিগুলো জানতে চাইলাম, যাতে আমার পাওয়া তথ্যের সাথে তা মেলানো যেতে পারে।

‘আমি কিছুই বুঝতে পারছি না মা। তবে আমি নিশ্চিত, তার দেহ, মন সব কিছুরই পরিবর্তন ঘটেছে।’ বলল বাবা।

আমি চমকে উঠলাম। বাবা কি বলছেন বুঝলাম না। তিনিই তো মায়ের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। সবই তিনি জানবেন। বাবার মুখের দিকে চাইতে পারলাম না। কিছু বলতেও পারলাম না আমি। বিস্ময়, বিভ্রান্তি আরও বেড়ে গেল।

বাবাই কথা বললেন, ‘থাক মা এসব কথা। তুমি আমার বড় সন্তান, তাই তোমাকে আমি একথা জানালাম। তুমি এ কথাগুলো তোমার মধ্যেই রাখবে।’

বাবা উঠলেন। বললেন, ‘চল মা, বাসায় ফিরি।’

আমাদের বাসা ক্রুমসারবার্গ দূর্গ থেকে কয়েকশ’ গজ উত্তরে রাইনের তীরেই। আমাদের বাড়িটাও ক্রুমসারবার্গ দুর্গেরই একটা অংশ। ক্রুমসারবার্গ দুর্গের মালিকানা আমাদেরই ছিল। আমার নানী তার দাদুর কাছে শোনা অনেক গল্প বলতেন। নবম শতকে স্যাক্সনদের প্রথম রাজা হেনরি ও স্যাক্সনদের প্রথম সম্রাট অটো দি গ্রেটরা আমাদের পূর্বপুরুষ। তাদের দুর্গ ও প্রাসাদ ছিল এই ক্রুমসারবার্গেই। শুরুতে এর নাম ছিল দি নিডারবার্গ। ঊনিশ শতক পর্যন্ত

অধিকাংশ সময় এই দুর্গ এই অঞ্চলের বিশপের অধীন ছিল। বিভিন্ন সময় নাইটরা এখানে এসে বাস করতো। এক সময় এটা তাদের দখলে চলে যায়। তবে আমাদের পূর্বপুরুষের ক্রুমসারবার্গ দুর্গ তাদের দখলে গেলেও এ দুর্গের কিছু দূরের আরেকটি প্রাসাদ আমাদের পারিবারিক দখলে থেকে যায়। এ প্রাসাদটি তৈরি হয়েছিল ১১৮০ খৃস্টাব্দে অটো দি গ্রেটের পৌত্র ডিউক হেনরি দি লায়নের জন্যে। হেনরি তার চাচাত ভাই সম্রাট ফ্রেডারিক রোমার আনুগত্য করতে অস্বীকার করেন এবং স্যাক্সন-সম্রাট অটো দি গ্রেটের রাজা দুই ভাগ হয়ে যায় তাদের মধ্যে। সেই থেকে ডিউক হেনরির এই বাড়িটি নানা উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে আমাদের পারিবারিক দখলে রয়ে গেছে। এছাড়াও রাইনের এপার-ওপারে দশ হাজার একরের একটা ফার্মল্যান্ড আছে আমাদের। অতীত সাম্রাজ্যের এই একটাই স্মৃতিচিহ্ন আমাদের।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা বাড়ি পৌঁছলাম।

ভিতরে ঢুকে অবাক হলাম। জিনিসপত্র সব লণ্ডভণ্ড।

প্যাকিং চলছে।

বাইরের ড্রয়িংই রুমেই আম্মা বসে আছেন।

আমরা ভিতরে ঢুকতেই আম্মা বসে থেকেই বলল বাবাকে লক্ষ্য করে, ‘তোমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারলে না। আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি। কাল সকালেই আমরা বনে শিফট হচ্ছি।’

‘সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছ?’ বলে আর কিছু না বলে বাবা তার ঘরের দিকে চলে গেলেন। অনেক দিন থেকেই মা জেদ ধরেছেন সবাইকে নিয়ে বনে গিয়ে থাকবেন। খুব সাধারণ হলেও থাকার মত বাড়িও কিনেছেন। তার যুক্তি, ছোট মেয়ে বনে লেখাপড়া করে, বড় মেয়ে বনের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করে। সুতরাং বনে থাকাই ভালো। মা’র এ প্রস্তাবে আমরা কেউ রাজি হইনি। বাড়ি ও ফার্মল্যান্ড আমাদের প্রাণ। এসব ছেড়ে বনে গিয়ে থাকার কোন যুক্তি নেই। কিন্তু মা আমাদের কথা মেনে নেননি। অবশেষে তার জেদই তিনি রাখলেন।

‘হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত কি ঠিক হলো মা? কোথাও থাকার বিষয়টা তো সকলের।’ বাবা চলে যেতেই বললাম আমি।

'চুপ করো। এ নিয়ে আর কোন কথা বলব না আমি।' বলল মা।

'এ তোমার জেদ মা। এত বড় বাড়িটার কি হবে?' বললাম আমি।

'সে ব্যবস্থা আমি করেছি। ফার্মল্যান্ড ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব যাদের দিচ্ছি, তারাই থাকবে এ বাড়িতে। এর জন্যে আলাদা পয়সা পাওয়া যাবে।' মা বলল।

'ব্যবস্থা তুমি কবে করলে মা? বাবা জানেন?' বললাম আমি।

'আমি যখন ওদের সাথে কথা বলি, তখন উনি আমার সব কথাই শুনেছেন।' মা বলল।

'বাবা কিছু বলেনি?' বললাম আমি।

'তোমার বাবার জন্যে বলার তেমন কিছুই ছিল না।' মা বলল।

মা'র কথা আমার কানে খুব বাজল। মনে হলো বাবার কোন অবস্থানই তাঁর কাছে নেই। আমি চমকে উঠলাম। মা তো এমন ছিলেন না! বাবার মত নেয়া ছাড়া মা পরিবারের ছোট-খাট সিদ্ধান্তও নিতেন না। আমি চমকে উঠলাম ভীষণভাবে। মা কি বদলে গেছেন, বাবা যেমন বললেন? কিন্তু মা কি এভাবে বদলাতে পারেন? না, পারেন না। তাহলে?

পরদিন সকালে ব্রুমসারবার্গের আমাদের বাড়ি থেকে যাবার মুহূর্ত। মালপত্র সব চলে গেছে।

আমরাও যাবার জন্যে প্রস্তুত। গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তিনটি গাড়ি।

আমাদের দু'টি, অন্যটি অপরিচিত।

'ঐ গাড়িটি কেন?' আমি বললাম।

আমার পাশে বাবা দাঁড়িয়ে ছিল। বলল, 'আমি এনেছি।'

'কেন? দু'টি গাড়িই তো আমাদের দরকার হয় না।' আমি বললাম।

'আমি হামবুর্গ যাচ্ছি মা, বন যাচ্ছি না।' বলল বাবা।

হামবুর্গ আমার বাবার পৈত্রিক বাড়ি। উল্লেখ্য,ব্রুমসারবার্গ প্রাসাদ ও দশ হাজার একরের ফার্মল্যান্ড আমার মায়ের পৈত্রিক সম্পত্তি। এত বড় সম্পত্তি অরক্ষিত থাকবে এই কারণে মায়ের একান্ত অনুরোধ বিয়ের পর বাবা ব্রুমসারবার্গে এসে স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন।

বাবার কথায় আমি আকাশ থেকে পড়লাম।

আমি রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে মা'র দিকে তাকালাম। বললাম, 'মা, বাবা হামবুর্গ যাচ্ছে? কেন?'

মা মুখ তুলল না। যেমন ছিল, তেমন থেকেকেই বলল, 'আমি কিছু জানি না।'

বলে মা বাবার দিকে তাকাল। বলল, 'সত্যি তুমি হামবুর্গ যাচ্ছ?' মা'র নির্বিকার কন্ঠ। যেন কিছুই না বিষয়টা-এমন স্বাভাবিক মুখ তার!

'হ্যাঁ যাচ্ছি।' বলল বাবা খুব স্বাভাবিক কন্ঠে।

মা শুনল। কিছুই বলল না। আমার মনে হলো তার মুখে বিস্ময় ও বিব্রত হওয়ার চাইতে স্বস্থির একটা উজ্জ্বলতাই ফুটে উঠেছে।

বিস্ময় আমাকে অভিভূত করে তুলল। মায়ের হলো কি? আমার মা এমন করতে পারেন না। আমার মা এমন নন। আমি ছুটে গেলাম মায়ের কাছে। বললাম, 'মা, বাবা কেন একা হামবুর্গ যাবেন? তাঁকে নিষেধ করছ না কেন?'

'তোমার বাবা এককভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তিনি স্বাধীন। আমি কারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করব না।' বলল আমার মা।

আমার বিস্ময় আরও বেড়ে গেল। মনে হলো এটা আমার মায়ের কন্ঠ নয়।

কথা বলেই মা গাড়ির দিকে চলল।

আমি ছুটে গেলাম বাবার কাছে। বললাম, 'বাবা তোমার হামবুর্গ যাওয়া হবে না, তুমি আমাদের সাথে বন যাবে।'

বাবা ম্লান হাসলেন। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'মা তোমরা মন খারাপ করো না। হামবুর্গ তো বেশি দূর নয়। তোমরা মা'র সাথে বন যাও।' বাবার শান্ত, স্থির কন্ঠস্বর।

'আলিনা, তাড়াতাড়ি এস।' ওদিক থেকে মা আমাকে ডাকল।

হঠাৎ আমার বুকে ক্ষোভের আগুন জ্বলে উঠল। মা সুস্পষ্টভাবে বাবাকে এড়াতে চাইছেন। কেন?

আমি ছুটে পেলাম মায়ের কাছে। তার দু'হাত ধরে অনেকটা চিৎকার করে বললাম, 'মা, তুমি এমন করছ কেন? কি হয়েছে তোমার?'

মা একটা হ্যাঁচকা টানে তার দুই হাত ছাড়িয়ে নিল। গাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'যাও গাড়িতে গিয়ে ওঠ।'

হাত টেনে নিতে গিয়ে মা'র আঙুল থেকে একটা আংটি খুলে পড়েছিল মাটিতে। সেটা তুলে নেবার মত মানসিক অবস্থা আমার ছিল না। আমি মার দিকে এক ধাপ এগিয়ে ক্রুদ্ধ কন্ঠে বললাম, 'আমরা দু'বোন কি বাবার সংগে যাব?'

'আমি কারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করব না।' তীব্র কন্ঠে মা বলল।

মার কথা তীরের মত গিয়ে বিদ্ধ হলো আমার বুকে। এবার কিন্তু ক্ষোভ নয়, জগৎ-জোড়া বিস্ময় নামল মনে! মা কি বাবার মত আমাদেরকেও এড়াতে চাচ্ছেন?

আমি পিছু হটলাম। মা'র গাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

আমি পেছনে হটে মা'র পড়ে যাওয়া আংটি মাটি থেকে তুলে নিলাম। এগোলাম আমাদের গাড়ির দিকে। গাড়ির পাশে আমার ছোট বোন রুনা চোখে রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে পাথরের মত স্থির দাঁড়িয়েছিল! আমি তাকে নিয়ে গাড়িতে বসলাম।

মা'র গাড়ি স্টার্ট নিয়েছে। আমাদের গাড়িও স্টার্ট নিল। ড্রাইভ করছে রুনা।

বাবার গাড়ি তখনও দাঁড়িয়ে।

আমি পেছনে তাকিয়ে বাবার দিকে হাত নাড়লাম।

বাবাও আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। সেও হাত নাড়ল।

আমাদের পরে বাবার গাড়িও স্টার্ট নিতে দেখলাম।

বন চলে এলাম। সেদিনেরই রাত।

ঘরটা গুছিয়ে নেবার পর বাড়িটা ঘুরে ফিরে দেখছিলাম। যাচ্ছিলাম মায়ের বেড রুমের দরজার সামনে দিয়ে। মায়ের কন্ঠ পেলাম। কথা বলছেন কারও সাথে।

দরজায় দাঁড়ালাম। খোলা দরজা।

মা'র কন্ঠ ভেসে আসছে'.. পারব না কেন? আমি বিন্দী ব্রিজিটি। বুকে চেপে বসা বুড়ো শয়তানটাকে সরিয়েছি। বাকি থাকল অপগণ্ড দু'টি মেয়ে। ওদের মাইনাস করতে সময় লাগবে না।'

একটু নিরবতা। নিশ্চয় ফোনের অপর প্রান্ত কথা বলছে।

আবার কথা বলে উঠল মায়ের কন্ঠ: 'ইয়ার্কি করছ? বুকে চেপে বসা নয়তো কি? নিজেকে তুলে দিয়েছি আরেকজনের হাতে। নেকড়েরা চিবিয়ে খেয়েছে আমাকে। বিষ পান করেছি দিনের পর দিন। তোমাদের স্বার্থে সব করেছি আমি। কিন্তু সে অনুভূতি তোমার নেই, তোমাদের নেই।' শেষের দিকে অভিমানক্ষুদ্ধ মায়ের কন্ঠ।

গোটা শরীর আমার কাঁপছিল। মায়ের কথা আর শোনার প্রবৃত্তি হলো না। যা শুনেছি, তা গোটা শরীরে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। মা নিজের নাম 'বিন্দা ব্রিজিটি' বললেন কেন? বাবাকে কি 'বুড়ো শয়তান' বলা হলো! বাবা কি তার বুকে চেপে বসে ছিলেন। বাবা কি 'আরেক জন' হলেন! মা কার স্বার্থে কি করছেন? 'তোমাদের' বলতে কাদের বুঝিয়েছেন?

আমি শিথিল পায়ে টলতে টলতে নিজের ঘরে চলে এলাম। মনে পড়ল মার কালো চুলে সাদা রং করার কথা। কিছুদিন আগে টেলিফোনে বলা মায়ের সেই কথাও। তিনি সবচেয়ে কষ্টে আছেন, আত্নঘাতি অভিনয় করছেন তিনি।

নিজের ঘরে ঢুকেই বেডের উপর নিজেকে ছুঁড়ে ছিলাম। শুয়েই দেখতে পেলাম আমার ছোট বোন ব্রুনা ব্রুনহিল্ড সোফার এক কোণে গুটি মেরে বসে আছে। চোখে-মুখে তার ক্ষোভের আগুন।

আমার ছোট বোন ব্রুনা ব্রুনহিল্ড বন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষের ছাত্রী। খুব চঞ্চল, খুব মুখরা। সেই ব্রুনা যে ব্রুমসারবার্গের ঘটনা থেকে এ পর্যন্ত চুপ করে আছে, এটা বিস্ময়ের।

আমার মনের অবস্থা সামলে নিয়েছি। বললাম, 'কিরে ব্রুনা, এখানে এসে চুপ করে বসে আছিস কেন?'

সে উঠে গটগট করে আমার বেডে আমার পাশে এসে বসে বলল, 'আমি তোমার অপেক্ষা করছি।'

‘কেন? তোর ঘরের সব কিছু ঠিকঠাক করে নিয়েছিস?’ বললাম আমি।

‘না।’ বলল রুনা।

‘তাহলে এখানে বসে কি করছিস? তোর জিনিসপত্র ঠিকঠাক রাখা হয়েছে কিনা দেখে নিবি না?’ আমি বললাম।

‘রাখ এসব। বল এসব কি হচ্ছে?’ বলল রুনা। বিক্ষুব্ধ কন্ঠ তার।

‘কিসের কথা বলছ তুমি?’ আমি বললাম।

‘মায়ের কি হয়েছে?’ মা এসব কি করছেন?’ বলল রুনা তীব্র কন্ঠে।

‘আস্তে কথা বল রুনা। নিজেকে সংযত কর।’ আমি বললাম।

‘না, আস্তে কথা বলব না। মা! আমাদের মা নেই। বদলে গেছেন। তিনি এখন অন্যের হাতে।’ বলল রুনা। ক্ষোভ, আবেগ, উত্তেজনায় তার কন্ঠ রুদ্ধ হয়ে এসেছিল।

আমি চমকে উঠেছিলাম তার শেষ কথায়! আমি উঠে বসে তাকে কোলে টেনে নিয়ে বললাম, ‘আস্তে আস্তে কথা বল! এটা তুমি কি বললে? মা অন্যের হাতে মানে?’

ঠিক তাই আপা। গতকাল যাদেরকে আমাদের বাড়ি ও ফার্মল্যান্ড দেখাশুনা করতে দেয়া হয়েছে তাদের একজন এসেছিল। তখন তুমি ও বাবা বাসায় ছিলে না। মা’র সাথে লোকটি নিরিবিলি কথা বলেছে। এসেই লোকটি মাকে যেভাবে সম্বোধন করেছে, তা আপত্তিকর। আমার কৌতুহল হওয়ায় আমি আড়ালে লুকিয়ে তাদের কথা শুনেছি...।’

রুনার কথার মাঝখানেই আমি বলে উঠলাম, আপত্তিকর বিষয়টা কি রুনা?’

‘লোকটি মাকে ডারলিং বলে সম্বোধন করেছে!’ বলল রুনা।

বুকে প্রচণ্ড এক খোঁচা লাগল। এতদিনের সব বিষয় সব সত্য ওলট-পালট হয়ে গেল।

আমি কিছু বলার আগেই রুনা আবার শুরু করল, ‘আপা, আমি শুধু শুনিনি, দেখেছিও। শুধু ডারলিং বলা নয়, লোকটি মা’র গায়ে হা্তও দিয়েছে। প্রতি ব্যাপারে মাকে সে কমান্ড করেছে। তাদের নির্দেশেই ব্রুমসারবার্গ ও

ফার্মল্যান্ড থেকে মা আমাদের সরিয়ে দিলেন। কিন্তু মাকে সরিয়ে দেয়া হয়নি। লোকটি মাকে বলেছে জঞ্জাল থেকে মুক্ত হলেই তুমি ব্রুমসারবার্গে ফিরে আসবে।'

'জঞ্জাল কি?' আমি বললাম।

'এটা বুঝলে না আপা, মা'র সাথে বাবা, আমি, তুমি যারা আছি, তারাই জঞ্জাল।' বলল ব্রুনা।

আমি বুঝিনি তা নয়, কিন্তু স্বীকার করতে কষ্ট হচ্ছিল। যা স্বীকার করতে আমার কষ্ট হচ্ছিল, সেটা স্পষ্টবাদী ব্রুনা অবলীলাক্রমে বলে ফেলল। আরেকটা কথা এ সময় আমার কাছে খুব বড় হয়ে উঠল, আমরা যদি জঞ্জাল হই, তাহলে সে জঞ্জাল থেকে মা মুক্ত হবেন কি করে?

এ প্রশ্নের জবাবও কয়েক দিনের মধ্যেই মিলল।

আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার সময় আমার সাথে ব্রুনাও যাচ্ছিল। আমরা 'বন'-এর বিখ্যাত পার্কের মাঝের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। জনবিরল রাস্তা। এ্যাকসিডেন্টের শিকার হলাম। একটা হেভি জীপ ইচ্ছা করে রং সাইডে এসে আমাদের গাড়িতে ধাক্কা দিয়ে চলে গেল। আমি যদি শেষ মুহূর্তে গাড়িটা ঘুরিয়ে নিতে না পারতাম, তাহলে আমাদের গাড়ির মাথাটা গুড়ো হয়ে যেত, তার সাথে সামনে বসা আমরাও শেষ হয়ে যেতাম। কিন্তু আমরা দু'বোন আহত হবার মধ্যে দিয়ে বিরাট ফাঁড়া আমাদের কেটে গেল।

আমাদের দু'বোনকে কয়েকদিন হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। পুলিশ সূত্রে জেনেছিলাম যে, গাড়িটা এ্যাকসিডেন্ট ঘটায় তার নাম্বারটা ভূয়া ছিল এবং গাড়িটাকে আর বনে পাওয়া যায়নি। তার মানে গাড়িটা পরিকল্পিতভাবেই এ্যাকসিডেন্ট ঘটায় এবং তার লক্ষ ছিল আমাদের মেরে ফেলা।

মা হাসপাতালে এসেছিলেন। আমাদের কিছু দেখাশুনাও করেছেন। কিন্তু সবই ছিল পোষাকি- তা বুঝতে আমাদের দু'বোনের কারোই কষ্ট হয়নি।

হাসপাতালের বেডে শুয়েই সিদ্ধান্ত নিলাম, বন থেকে শুধু নয়, জার্মানি থেকেও পালাতে হবে। বাবাকেও সাবধান করে দিলাম। বললাম, নিশ্চয় মা কোন কারণে একদমই বদলে গেছেন । তিনি এখন আমাদের কারও জন্যেই নিরাপদ

নন। বাবা বলেছিলেন, ফার্মল্যান্ডের ১০ হাজার একরের বিরাট সম্পদই সকল অনর্থের মূল। এ সম্পদ উত্তরাধিকারসূত্রে তোমার মা'র। আমরা যদি না থাকি, তাহলে তোমার মা'র মাধ্যমে অন্য কেউ এ সম্পত্তির মালিক হতে পারে।'

বাবার এই কথায় সব কিছু আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এরপরও আমার মনে প্রশ্ন থেকে গিয়েছিল, আমার মা'র এই পরিবর্তন কিছুতেই হতে পারে না। তার কি হলো? কি ঘটলো? সমগ্র হৃদয়ের এই আকুল প্রশ্নের সমাধান পাইনি। আমার বোন ব্রুনা ও বাবারও কথা হলো, 'এই মা, আমাদের মা নয়'। তাহলে ইনি কে? আমার মা গেল কোথায়? দু'জনের একমাত্র বয়স ছাড়া একই চেহারা হলো কি করে? এসব জিজ্ঞাসা ও থ্রিলিং কিছু করার ইচ্ছাই আমাকে বাধ্য করেছিল ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেটে যোগ দিতে। কিন্তু আমার সেই জিজ্ঞাসার পরিধি বেড়েছে বই কমেনি। ব্ল্যাক সান সিন্ডিকেট আমাকে সাহায্য করেনি, বরং বলেছে যা গেছে ভুলে যাও, যা যায়নি তা রক্ষা কর। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বের করো না।' তারা সাপের কথা বলায় আমার উদ্বেগ জিজ্ঞাসা আরও বেড়ে গেছে। তাহলে তো আমরা সাংঘাতিক এক ষড়যন্ত্রের শিকার। এই ষড়যন্ত্রের ছোবল থেকে আমার বোন, বাবা কি বাঁচবে? আমি তো পারলাম না, আমার সব প্রশ্ন, সব শংকা সামনে রেখে কেউ একজন কি সেই সাপের সন্ধানে এগোতে পারেন! এ ব্যাপারে প্রাথমিক সাহায্য করতে পারে আমার বোন ব্রুনা। তার ঠিকানা এই ডাইরির শেষ পাতায় থাকল।'

ডাইরি পড়া শেষ হলো আহমদ মুসার।

পাতা উল্টিয়ে সে শেষ পাতায় গেল।

শেষ পাতার দুই পৃষ্ঠায় কোন লেখা দেখল না আহমদ মুসা। মনে মনে হাসল আহমদ মুসা। এত সহজে ঠিকানাটা দেখা যাবে তা ভাবা ঠিক হয়নি। তার বোনের ঠিকানা তার বোনের মতই মূল্যবান। বোনকে যেমন সাপের ছোবল থেকে বাঁচাবার জন্যে লুকিয়ে রেখেছে, তেমনি ঠিকানা লুকাবারও তার দরকার পড়েছে। নিশ্চয় স্পাই ডাস্ট দিয়ে ঠিকানাটা পড়া যাবে।

আহমদ মুসা পাশ ফিরে ব্যাগ টেনে নিয়ে ইমারজেন্সি প্যাক থেকে একটা স্প্রে-টিউব বের করে প্রথমে উপরের পৃষ্ঠার উপর স্প্রে করল। কয়েক মুহূর্তের

মধ্যে পৃষ্ঠার মাঝখানে লাল রংয়ের তিনটি লাইন ফুটে উঠল। গৌরীর ছোট বোন ব্রুনা ব্রুনহিল্ড-এর ঠিকানা। মনোযোগ দিয়ে ঠিকানাটা একবার পড়ে নিল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা ডাইরি বন্ধ করতে গিয়ে থেমে গেল।

গৌরীর পুরো নামটা তো জানা হলো না। তার ছোট বোন, মা, বাবার সবার নাম জানা হয়েছে, কিন্তু গৌরীর পুরো নাম জানা হয়নি। নিশ্চয় ডাইরির শুরুতে সে এটা বলেছে।

আহমদ মুসা ডাইরির পাতা উল্টিয়ে আবার তার শুরুতে চলে গেল।

শুরুতেই পেয়ে গেল গৌরীর নাম।

ডাইরি লেখা শুরুই করেছে এভাবে, 'আমার নাম আনালিসা অ্যালিনা।' খাস স্যাক্সন নাম। আমরা খাঁটি স্যাক্সন রাজপরিবারের উত্তরসূরী। আমার মা বলেছেন, স্যাক্সনদের প্রথম রাজা হেনরীর প্রথম মেয়ের নাম নাকি ছিল আনালিসা অ্যালিনা।'

গৌরীর নাম জানা হয়ে গেল। এখন আর অন্য কিছুর দরকার নেই। ডাইরি তো সাথেই থাকবে যা যখন প্রয়োজন দেখে নেবে।

ডাইরি বন্ধ করল আহমদ মুসা।

পা ছড়িয়ে ভালো করে শুয়ে পড়ল সে।

নৌবাহিনীর জাহাজটি চলছে দ্রুত তাহিতির উদেশ্যে।

মৃদু একটা কাঁপুনি জাহাজে।

আরামে শান্তির পরশে চোখ বুজল আহমদ মুসা।

চোখ বুজলেও মনের দরজা বন্ধ হলো না। নানা কথা, নানা চিন্তা ছুটে এল সেই দরজা পথে। এখন কি করণীয় আহমদ মুসার? গৌরীর মায়ের ঘটনা তাকেও স্বম্ভিত করে দিয়েছে। গৌরীর সব কথা থেকে একথা পরিষ্কার গৌরীর এ মা তার আসল মা হতে পারে না। কিন্তু এটাই বা সম্ভব হয় কি করে? মানুষের মত মানুষ হয়, কিন্তু দুই মানুষ এমনভাবে এক হতে পারে না। কিন্তু হলো কি করে? যা বুঝেছে আহমদ মুসা, তাতে দু'জনের মধ্যে বয়স ও আচরণের পার্থক্য ছাড়া আর কোন পার্থক্য নেই। আচরণের পার্থক্য মৌলিক বিষয় নয়। কারণ আচরণ কৃত্রিম

হতে পারে। মৌলিক বিষয় শুধু বয়সটাই যা আড়াল করার জন্যে গৌরীর এ মা কলপ দিয়ে পাকা চুল তৈরি করে থাকে।

ভেবেই চলল আহমদ মুসা।

তার মনের খোলা দরজাটা এক সময় ধুসর হয়ে অন্ধকারের একটা যবনিকা নেমে এল।

ঘুমিয়ে পড়ল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার সম্মানে একটা বিদায়ী ভোজের আয়োজন করেছিল তাহিতির ফরাসি গভর্ণর তার পরিবার, বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত জনদের নিয়ে। ভোজ শেষ হয়েছে।

অতিথিরা প্রায় সবাই চলে গেছে।

আহমদ মুসা বসেছিল ডিনার হলের পাশের লাউঞ্জে। তার দু'পাশে সোফায় বসেছিল তাহিতির স্বরাষ্ট্র সচিব ও পুলিশপ্রধান দ্যাগল।

অতিথিদের বিদায় দিয়ে তাহিতির গভর্ণর ফ্রাসোয়া বুরবন ফিরে এল। সে সামনে আসতেই উঠে দাঁড়াল স্বরাষ্ট্র সচিব ও পুলিশ প্রধান দ্যাগল। গভর্নরের দিকে একটা বড় ইনভেলাপ তুলে ধরে বলল, 'সব হয়ে গেছে স্যার।'

ইনভেলাপটি হাতে নিয়ে আহমদ মুসার পাশে বসল গভর্নর। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'ডিনার ঠিক সময়ে শেষ হয়েছে আহমদ মুসা। তুমি ধীরে সুস্থে গিয়ে প্লেন ধরতে পারবে।'

বলে গভর্নর ফ্রাসোয়া বুরবন একটু থামল। হাতের ইনভেলাপের ভিতরটা একটু দেখে নিয়ে সেটা আহমদ মুসার দিকে তুলে ধরে বলল, 'আহমদ মুসা, ইনভেলাপে তোমার পাসপোর্ট ও প্লেনের টিকিট আছে। তোমার মার্কিন পাসপোর্টে ইউরো ভিসা লাগানো হয়েছে। কুটনৈতিক সমমানের ভিআইপি ভিসা তোমাকে দেয়া হয়েছে। কুটনীতিকদের অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা তুমি পাবে। ইনভেলাপের ভিতর আরেকটা ইনভেলাপ তোমার জন্যে ফরাসি প্রেসিডেন্টের

লেটার অব থ্যাংকস রয়েছে। ফরাসিরা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এক অমূল্য সাহায্য দেয়ার জন্যে। ফরাসি প্রেসিডেন্ট তোমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে গেস্ট অব অনার হিসাবে ফ্রান্সের আগামী জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্যে। আরেকটা কথা আহমদ মুসা, ফরাসি সরকার আমাদের অস্ট্রিয়া ও জার্মানিস্থ রাষ্ট্রদূতদের তোমার ব্যাপারে কমপ্লিট ব্রীফ করেছে। আর জার্মানির সাচেন প্রদেশের গোয়েন্দাপ্রধান আমার ক্লাসমেট। তোমার বন, ব্রুমসারবার্গ সবই তার এলাকায় পড়বে। সে তোমাকে সব রকম সাহায্য করবে।'

থামল গভর্নর, ফ্রাসোয়া বুরবন।

'ধন্যবাদ স্যার্। আপনার সরকারকে অশেষ ধন্যবাদ। আমাকে এখন উঠতে হয় স্যার।' আহমদ মুসা বলল।

'তুমি সোনার মানুষ আহমদ মুসা। কারণ কোন বিনিময় তুমি চাও না। আমার সরকার আর কি করল তোমার জন্যে। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ আহমদ মুসা।'

বলেই গভর্নর উঠে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা ও স্বরাষ্ট্র সচিব ও পুলিশপ্রধান দ্যাগলও উঠল।

গভর্নর ফ্রাসোয়া বুরবনই আবার কথা বলল, 'জানি তুমি তেপাও-এর গাড়িতেই যাবে। মি. দ্যাগলও একটা পুলিশ ফোর্স নিয়ে তোমার সাথে থাকবে।'

'ধন্যবাদ স্যার।' আহমদ মুসা বলল।

'ওয়েলকাম। চল আহমদ মুসা।' সবাই বেরিয়ে গভর্নর হাউজের গাড়ি বারান্দায় এল।

তেপাও-এর গাড়ির পাশে মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে আছে মারেভা ও মাহিন। তাদের পাশে দাঁড়িয়ে আচে 'আরু'র রাজ উপাশনালয় প্রধান মা-কোহ।

আহমদ মুসা তাকে সালাম দিল। বলল, 'স্যার, আপনি কষ্ট করে এসেছেন? দু:খিত, আমারই যাওয়া উচিত ছিল কিন্তু আরেকটা প্রোগ্রামে হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে।'

‘সে জানি বেটা, তোমাদের মত লোকদের আল্লাহ্ গণ্ডায় গণ্ডায় সৃষ্টি করেন না। মতুতুংগার ঘটনায় গোটা দুনিয়া স্তম্ভিত। তোমার জন্যে আমরা গর্বিত। কিন্তু একথা বলার জন্যে আমি আসিনি বেটা। বলল মাহকোহ্।

‘আদেশ করুন স্যার।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আদেশ নয়, বলতে এসেছিলাম, এবার ‘আরু’তে গেলে তোমার ভালো লাগত। সেই রাজউপাশনালয় এখন রাজমসজিদ। তুমি আসার পর রাজ-উপাশনালয়ের চারদিকটা পরিষ্কার ও সমান করতে গিয়ে একটা শিলালিপি পাওয়া গেছে। আরবি ও তাহিতি ভাষায় লেখা। ওটা যে মসজিদ তা ওতেই লেখা আছে। সন, তারিখও শিলালিপিতে লেখা হয়েছে। পমেরী বংশের প্রথম অংশ আরি আবদুল্লাহ অ্যারিন্যু এই মসজিদটি নির্মাণ করেন। মসজিদটি ধন্য হবে তোমাকে পেলে।’ বলল মাহকোহ্।

‘আলহামদুলিল্লাহ! খুব খুশি হলাম এই খবর শুনে। প্রার্থনা করি তাহিতির মাটিচাপা ইতিহাস এভাবেই বের হয়ে আসুক। মুহতারাম, এবার আমি এসেছিলাম বিশেষ কাজে, তবে এরপর আসব বেড়াতে। সেবার প্রথমেই আপনার অতিথি হবো ইনশায়াল্লাহ্।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ওয়েলকাম বেটা! আল্লাহ তোমাকে সে ধরনের সময় দিন।’ বলল মাহকোহ্।

‘তাহলে স্যার, দোয়া করুন।’ বলে আহমদ মুসা একবার হাতঘড়ি দেখে তাকাল মাহিন ও মারেভার দিকে। বলল, ‘সবাই গাড়িতে ওঠ, হাতে সময় কিন্তু বেশি নেই।’

বলে আহমদ মুসা হাতের ব্যাগটা সামনের সিটে ঠেলে দিয়ে তাতে উঠে বসল।

সবাই গাড়িতে উঠেছে।

মাহিন, মারেভা ও মাহকোহ পেছনের সিটে বসলো। ড্রাইভিং সিটে তেপাও। তার পাশে আহমদ মুসা।

সামনে স্বরাষ্ট্র সচিব ও পুলিশপ্রধান দ্যাগলের গাড়ি। পেছনেও আরও দুটি গাড়ি পুলিশের।

গাড়ি চলতে শুরু করল তাহিতি এয়ারপোর্টের দিকে।

আহমদ মুসা পেছনে তাকিয়ে বলল, 'ম্যারেভা-মাহিন, তোমরা কথা বলছ না যে!'

কোন কথা এল না তাদের দিকে থেকে।

ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ পেল আহমদ মুসা। পেছন ফিরে দেখল, দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে মারেভা। কান্না চাপতে গিয়ে কাঁপছে সে।

ম্লান হাসি ফুটে উঠল আহমদ মুসার মুখে।

একটা আবেগ এসে তাকেও স্পর্শ করল। এই যে দেখা হলো, পরিচয় হলো, মায়ার বাঁধন এসে বাঁধল। তারপর এই যে যাচ্ছে, আর কি দেখা হবে! সবাই আমরা বলি, আবার আসব। ক'জন ফিরে আসে! ফেরা কি যায়!

একটা শুকনো হাসি ফুটে উঠল আহমদ মুসার ঠোঁটে। বলল নরম কন্ঠে, 'মারেভা, বোন, তোমাদের খুব বাস্তববাদী বলে আমি জানি। তোমাদের তাই আশ্বস্ত করার কোন দরকার নেই। মিলন ও বিচ্ছেদ দু'টোই জীবনের বাস্তবতা। এর চেয়ে বড় বাস্তবতা হলো, দুনিয়ার জীবনটা এক গতিমান চলার পথ। আমরা সবাই এই গতির অধীন, আর গতির নিয়ন্ত্রক স্বয়ং আল্লাহ। গতিমান চলার পথ কাকে কোথায় নিয়ে যাবে কেউ বলতে পারে না। চলার পথ আমাকে নিয়ে এসেছিল স্বপ্নের তাহিতিতে, আজ আবার চলে যাচ্ছি সেই তাহিতি থেকে। এই অমোঘ বাস্তবতা আমাদের সবাইকে মানতে হবে বোন।'

থামল আহমদ মুসা।

থামল না মারেভা। তার কান্নাটা আরও বাড়ল। আহমদ মুসা দেখল চোখ মুছছে ড্রাইভার তেপাও।

নিরবতা ভাঙল মাহকোহ। বলল, 'অংকের নিয়মে তোমার কথা ঠিক বেটা। কিন্তু হৃদয় এই অংক মানে না। মানুষের ইতিহাস যত পুরনো, মানুষের বেদনার অশ্রু, বিয়োগের অশ্রু, শোকের অশ্রুর ইতিহাস বোধ হয় ততটাই পুরনো। অশ্রু হলো ভালোবাসাসিক্ত হৃদয়ের স্বর্গীয় প্রস্রবণ। মারেভা কাঁদুক আহমদ মুসা। ওর অশ্রু শুধু ওর নয় সমগ্র তাহিতির অশ্রু।'

থেমে গেল মাহকোহর শান্ত কন্ঠ।

আহমদ মুসা কিছু বলল না, বলতে পারল না। বিদায়ের বেদনাসিক্ত যে আবেগকে সে দূরে সরিয়ে রাখছিল, সেটা এবার এসে তাকে ঘিরে ধরল। দুই চোখের কোণ তারও ভারি হয়ে উঠল। চোখ বুজল আহমদ মুসা।

এক সময় চোখ খুলে পকেটে হাত দিয়ে একটা ইনভেলাপ বের করল। পেছনে তাকিয়ে ইনভেলাপটা মাহিনের দিকে তুলে ধরে বলল, এতে কয়েক হাজার ডলার আছে মাহিন। এটা দিয়ে তেপাওকে একটা ভালো গাড়ি কিনে দিও। ও কিছুতেই টাকা নিত না। তাই এ দায়িত্ব তোমাকে দিয়ে গেলাম।'

আগেই তেপাও-এর চোখে পানি গড়াচ্ছিল। এবার সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

আহমদ মুসা সোজা হয়ে বসল। কিছু বলল না। কান্নায় বাধাও দিল না।

চোখ দু'টি তার প্রসারিত হলো সামনে।

চোখে শূন্য দৃষ্টি।

তাতে যেন অচেনা ঠিকানার অজানা কাহিনীর অস্পষ্ট সব দৃশ্য!

চলছে গাড়ি।

চলছে এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে।

# ২

'বাবা, আমার খুব চিন্তা হচ্ছে। দু'তিন দিন ধরে অ্যালিনা আপার ফোন বন্ধ।' বলল ব্রুনা ব্রুনহিল্ড। তার হাতে মোবাইল। কথা বলছে সে মোবাইলে তার বাবা আলদুনি সেনফ্রিডের সাথে।

'হ্যাঁ, মা ব্রুনা। দিন পাঁচেক আমার সাথেও তার কোন কথা হয়নি। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া আমাকে টেলিফোন করতে না করেছে সে। সেই প্রতি সানডে সকালে সে টেলিফোন করে। ৫ দিন আগে গত রোববারে তার সাথে কথা হয়েছে। তোমার সাথে শেষ কবে কথা হয়েছে?' ব্রুনা ব্রুনহিল্ডের বাবা আলদুনি সেনফ্রিড বলল। তার চোখে দুর্ভাবনার চিহ্ন।

'তিন দিন আগে বেলা সাড়ে ৩টায় টেলিফোন করেছিল। তার মানে তার সময় রাত তিনটায় তার টেলিফোন পেয়েছিলাম। এমন 'অড' সময়ে আপা কোনদিন টেলিফোন করেননি। আর বাবা, সে কথাগুলোও বলেছিল সব অস্বাভাবিক...।'

কথা আটকে গেল ব্রুনার গলায়। কান্নায় ভেঙে পড়ল ব্রুনা ব্রুনহিল্ড।

ওপার থেকে ব্রুনার বাবার উদ্বিগ্ন কন্ঠস্বর শোনা গেল। বলল, 'ব্রুনা মা, প্লিজ কেঁদো না। তুমি তো খুব সাহসী মা। আমরা তো এমনিতেই সংকটে। সাহস ও ধৈর্য হারালে চলবে না আমাদের। অ্যালিনা অস্বাভাবিক কি বলেছিল মা?'

'আমাকে অনেক উপদেশ দিয়েছিল বাবা। লেখাপড়ার ব্যাপারে, চলাফেরার ব্যাপারে, তোমাকে দেখাশুনার ব্যাপারে এবং সবশেষে বলেছিল, আমাদের 'মা-রহস্য' খুঁজে বের করতেই হবে। এটা সম্পত্তির জন্যে নয়, মা'র স্বার্থে। আপার এই ধরনের উপদেশ আমার তখনি ভালো লাগেনি। আমি বলেছিলাম, আপা, তুমি কি কোনো মহাযাত্রা করছ যে, এই ধরনের উপদেশ দিচ্ছ? তুমিই তো এসব করবে! আমি তোমার সাথে থাকব। আপা বলেছিল, মানুষের মহাযাত্রা প্রস্তুতি নিয়ে হয় না। এটা হঠাৎই হয়। যাক এসব কথা,

তোমাকে বলার জন্যে মনে এই কথাগুলো এসে ভিড় করেছিল তাই বললাম। মন আল্লাহর আবাস, বিবেক আল্লাহর কন্ঠ। এজন্যে মন ও বিবেকের কথা শুনতে হয়। আমি আপার মুখে আল্লাহ শব্দ শুনে বিস্মিত কন্ঠে বলেছিলাম, আমরা তো 'গড' বলি, হঠাৎ তুমি 'আল্লাহ' বলছ কেন আপা? অ্যালিনা আপা বলেছিল, স্রষ্টা, পালনকর্তা হিসাবে 'গড'-এর যত নাম দুনিয়াতে আছে তার মধ্যে 'আল্লাহ' নামটাই সবচেয়ে মৌলিক ও যথার্থ। এজন্যে 'আল্লাহ'কেই আমি গ্রহণ করেছি ব্রুনা। আমি আরও বিস্মিত হয়ে কথা বলতে যাচ্ছিলাম। আপা বাধা দিয়ে বলল, সময় নেই ব্রুনা শোন, 'মা-রহস্যে'র সন্ধানে এতদিনেও আমি কিছুই করতে পারিনি। কিভাবে এই সংকটের সমাধান হবে আমি জানি না। তবে আমার মনে একটা আশা জেগেছে, একজন মহান মানুষ আমাদের এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন। সংগে সংগে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কে তিনি? আপা বলল, আমি নিশ্চিত নই ব্রুনা তিনি সাহায্য করবেন কিনা। তবে সাহায্য করতে পারেন তিনি এবং যে কোন সংকট সমাধানের সামর্থ্য তার আছে, এটা শুধু আমার বিশ্বাস নয়, এটাই সত্য। কে তিনি আপা, আবার আমি জিজ্ঞাসা করলাম। আপা বললেন, তার নাম টেলিফোনে বলা যাবে না। তবে মনে রেখ স্বচ্ছ, সুন্দর, নিষ্পাপ চেহারার মানুষ তিনি। তাঁর নামের দুই অংশ। প্রথম অংশের প্রথম বর্ণ 'এ'... এখানে এসে হঠাৎ কথা বন্ধ হয়ে যায় আপার। লাইনটা কেটে যাওয়ার আগে তার মোবাইলে ভেসে আসা অন্য কারো ক্রুদ্ধ কন্ঠ শুনেছি।'

থামল ব্রুনা ব্রুনহিল্ড। তার শুকনো, উদ্বিগ্ন কন্ঠ।

'মা ব্রুনা, তুমি যা বললে তা সত্যিই উদ্বেগের মা। কিন্তু আমরা এখন কি করব?' বলল ব্রুনার বাবা। তার কম্পিত কন্ঠস্বর।

'অনেক ভেবেছি, কিছুই বুঝতে পারছি না বাবা। তার কোন নির্দিষ্ট ঠিকানা আমাদের কাছে নেই। সর্বশেষ তিনি তাহিতিতে ছিলেন। তার টেলিফোন নিরব হয়ে যাবার ঘটনা আর কোন সময়ই ঘটেনি। এবার সব কিছুই অস্বাভাবিক ঘটেছে।' ব্রুনা ব্রুনহিল্ড বলল।

'আমরা কি তাহিতি যাবার চিন্তা করতে পারি? আমরা তো এভাবে বসে থাকতে পারি না।' বলল ব্রুনার বাবা।

কলিংবেল বেজে উঠল।

ভ্রুকুঞ্চিত হলো ব্রুনা ব্রুনহিল্ডের। তার বাসায় তো আসার কেউ নেই! হোম সার্ভিসের কেউ কি হবে? ওরা মাঝে মাঝে আসে।

'বাবা, কেউ এসেছে, পরে কথা বলব তাহলে।' বলল ব্রুনা।

'ঠিক আছে মা। তুমি সাবধানে থেকো। ওরা কিন্তু জার্মানি চষে ফিরছে।

'জার্মানির বা্ইরেও তারা নজর দেবে।' ব্রুনার বাবা বলল।

'ধন্যবাদ বাবা।' বলে মোবাইলের কল ক্লোজ করল ব্রুনা।

দরজা খোলার আগে ডোর ভিউ দিয়ে দেখল, মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের ইউনিফরম পরা লোক।

দরজা খুলে দিন ব্রুনা। ভেবে পেল না, মিউনিসিপ্যালিটির লোক কেন এ সময়? ওদের কোন প্রোগাম চলছে বলে তো জানা নেই।

দরজা খুলে যেতেই 'গুড মর্নিং ম্যাডাম' বলে ছোট্ট একটা বাউ করল লোকটি।

'গুড মর্নিং স্যার। আপনি নিশ্চয় মিউনিসিপ্যালিটি থেকে এসেছেন? কি করতে পারি আপনার জন্যে?' বলল ব্রুনা।

'এক্সকিউজ মি ম্যাডাম। নোটিশ ছাড়া এসেছি। আমি এসেছি আমাদের সালজবার্গ মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের কমিউনিটি সার্ভিস থেকে।' বলল আগন্তুক।

'কমিউনিটি সার্ভিসের সেনসাস গ্রুপের লোকরা তো ক'দিন আগে এসেছিল।' ব্রুনা বলল।

'কিন্তু তারা কিছু ভুল করে গেছে। যেসব দরকারি তথ্য নেয়ার কথা ছিল নেয়নি, বিশেষ করে জার্মান ন্যাশনালদের কিছু তথ্য বাদ পড়েছে।' বলল আগন্তুকটি।

'যেমন? প্রোফরমা অনুসারে সব তথ্য তারা নিয়েছে।' ব্রুনা বলল।

'হোম টাউনের নাম, বার্থ সার্টিফিকেটের নাম্বার, তারিখ ইত্যাদি।' বলল আগন্তুকটি।

চমকে উঠল ব্রুনা ব্রুনহিল্ড! হোম টাউনের নাম ও বার্থ সার্টিফিকেটের নাম্বার, তারিখ প্রকাশ হয়ে পড়লে তার নাম-পরিচয় জানাজানি হয়ে যাবে। তার নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হয়ে পড়বে। নিরাপত্তার স্বার্থেই সে জার্মানি ছেড়েছে। অস্ট্রিয়ার ছোট্ট শহর সালজবার্গে এসে বাস করছে। অস্ট্রিয়ার সীমান্তে আল্পসের উত্তর দেয়ালে জার্মান সীমান্তের খুব কাছে এই সালজবার্গ শহর। সুন্দর এই পার্বত্য শহরটি পুরানো ও অভিজাত। অনেক ঐতিহ্যের স্মারক এখানকার তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে বসতি গড়ে ব্রুনা নিজের নিরাপত্তা ও শিক্ষা অব্যাহত রাখা উভয়ই রক্ষা করতে চাইছে। জার্মানির কোথাও সে নিরাপদ থাকতে পারেনি। দু'দিনেই শত্রুদের চোখে পড়ার উপক্রম হয়েছে, এতই শক্তিশালী মায়ের খুনি গ্যাংটি। ছদ্মনামে এই বাড়িটা ভাড়া নিয়েছে ব্রুনা। বিশ্ববিদ্যালয় ও এই বাসা ছাড়া আর কোথাও যায় না ব্রুনা। একা এ বাসায় অনেকটা বন্দীর মত জীবন যাপন করছে সে। এখন যে পরিচয় গোপন রেখেছে, সে পরিচয় মিউনিসিপ্যালেটিতে দেবে কি করে! আরেকটা চিন্তা তার কাছে বড় হয়ে উঠেছে। সেটা হলো, মাত্র কয়েকদিন আগে মিউনিসিপ্যালেটির কম্যুনিটি সার্ভিসের লোকরা ফরমের সব অপসন পুরোপুরি ফিল আপ করে নিয়ে গেছে। ফরমে যা নেই, এমন তথ্যের জন্যে এভাবে লোক পাঠানো কি স্বাভাবিক? কিছুতেই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না।

হঠাৎ ব্রুনার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। বলল, 'স্যরি স্যার, কম্যুনিটি সার্ভির্সের এসব তথ্য দরকার তা আমার জানা ছিল না। বার্থ সার্টিফিকেট তো আমার কাছে নেই। নাম্বার তারিখও আমার জানা নেই।'

আগন্তুকের মুখটা কেমন যেন ম্লান হয়ে গেল! ভাবল একটু। বলল, 'ঠিক আছে তাহলে হোম টাউনের নামটা দিন।'

বলে সে তার ফাইলটা খুলল এবং কলমটা হাতে নিল।

দ্রুত ভাবছিল ব্রুনা। হোম টাউনের নাম দিলেই তার পরিচয় পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে। না, কিছুতেই সে তার হোম টাউনের নাম দেবে না। অন্য কোন জায়গার নাম বলবে। তাহলে ধরা পড়ার আপাতত ভয় নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের

কোন ডকুমেন্ট তার হোম টাউনের নাম নেই। বার্লিনের রয়্যাল স্যাক্সন বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট নিয়ে সে এখানে এসেছে

ইউরোপের প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ে পড়ার জন্যে। বার্থ সার্টিফিকেট বা তার নাম্বার না হলে হোম টাউনের অথেনটিসিটি যাচাই করার সহজ কোন উপায় নেই, বিশেষ করে হোম টাউন যদি বড় শহর হয়।

এসব চিন্তা করেই ব্রুনা বলল, 'আমার হোম টাউন বার্লিন।'

'বার্লিন? একদম রাজধানী শহর!' বলল আগন্তুক।

'হ্যাঁ, আমাদের কয়েক পুরুষের শহর।' ব্রুনা বলল।

'ধন্যবাদ!' বলে আগন্তুক উঠে দাঁড়াল।

ব্রুনা তাকে বারান্দা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরে এল ঘরে। হাউজ ডকুমেন্ট ফাইল বের করে মিউনিসিপ্যালিটি কম্যুনিটি সার্ভিসের টেলিফোন নম্বর জেনে নিয়ে সেখানে টেলিফোন করল।

ওপার থেকে সাড়া পেতেই ব্রুনা 'গুড় মর্নিং' জানিয়ে 'এক্সকিউজ মি' বলে জিজ্ঞাসা করল, 'কম্যুনিটি সার্ভিস থেকে আপনারা কয়েক দিন আগে কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছেন, আবারও কি আপনারা তেমন কোন লোক পাঠিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, আমরা একটা এনজিও-কে সহযোগিতা করছি। তারা একটা সমীক্ষার জন্যে কিছু তথ্য সংগ্রহ করছে জার্মান সেটলারস ও জার্মান প্রবাসীদের উপর। কোন সমস্যা? কেন জিজ্ঞাসা করছেন?' বলল ওপার থেকে কম্যুনিটি সার্ভিসের লোকটি।

'কিছু নয়, কৌতুহল থেকে জিজ্ঞাসা করছি। এনজিওটার নাম কি বলতে পারেন প্লিজ?' বলল ব্রুনা।

'এক মিনিট প্লিজ।' ওপার থেকে কম্যুনিটি সার্ভিসের লোক বলল।

মিনিট খানেকের মধ্যেই তার কন্ঠ শোনা গেল। বলল, হ্যাঁ, এনজিওটা খুবই নামকরা, 'উই আর ফর অল'।

'ধন্যবাদ স্যার। বাই!' বলে ব্রুনা তার কল অফ করে দিল।

ধপ করে বসে পড়ল সোফার উপর ব্রুনা। তার চোখে-মুখে ভয়ের চিহ্ন।

তার নিশ্চিতই মনে হচ্ছে, এনজিও'র ছদ্মাবরণে তার মায়ের গ্যাংগটাই তার তালাশ করছে! তার মানে তারা জার্মানির বাইরেও নজর দিচ্ছে? কেন তারা এভাবে আমাদের পেছনে লেগেছে? আমরা তো চলে এসেছি সেখান থেকে!

এরপরও তারা আমাদের অস্তিত্ব কেন বরদাশত করতে পারছে না? কেন? কি চায় তারা?

এসব ভাবতে ভাবতে এক সময় চোখ ধরে এসেছিল ব্রুনার।

আবার কলিং বেলের শব্দ।

তন্দ্রা ভেঙে গেল ব্রুনার।

'আবার কে এল!' মনে মনে বলে তাকাল দরজার দিকে। উঠে দাঁড়াল।

দরজার দিকে দু'ধাপ এগিয়েই আবার থমকে দাঁড়াল। ভয় এসে ঘিরে ধরল তাকে। যারা তাকে খুঁজছে তাদের কেউ এসে গেল কি?

ধীরে ধীরে এগোলো ব্রুনা দরজার দিকে।

এক বুক শংকা নিয়ে ডোর ভিউ দিয়ে বাইরে তাকাল।

বাইরে দাঁড়ানো আগন্তুকের দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠল ব্রুনা ব্রনহিল্ড। সমগ্র মনটাই তার এক সাথে বলে উঠল অ্যালিনা আপার মহান মানুষটিকে সে দেখছে। সেই সুন্দর, স্বচ্ছ, নিষ্পাপ চেহারা। দেখেই ব্রুনার মনে হচ্ছে বহুদিন ধরে একে সে চেনে।

আর ভাবতে পারল না ব্রুনা।

হাত তার আপনাতেই এগিয়ে এসে দরজার সেফটি চেইন খুলে লক ঘুরিয়ে দিল দরজার।

দরজা খুলে দিল ব্রুনা।

ব্রুনা ও আগন্তুক মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

নির্বাক ব্রুনার দৃষ্টি আটকে গেছে আগন্তুকের মুখে।

আগন্তুকের ঠোঁটে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল। তার চোখ দু'টিও যেন হাসছে। বলল আগন্তুক ব্রুনাকে লক্ষ করে, 'গুড মর্নিং, আমি নিশ্চিত তুমি ব্রুনা ব্রুনহিল্ড, আনালিসা অ্যালিনার বোন।'

প্রায় সম্মোহিত ব্রুনা ব্রুনহিল্ডের জন্যে বিস্ময়ের পর বিস্ময়! আগন্তুক তার নাম জানে? আর অবলীলাক্রমে তার নামটা বলেও ফেলল এতটা নিশ্চিতভাবে! সেই সাথে একটা আনন্দও! অবশ্যই উনি আপার সেই মহান মানুষ। এক পশলা বৃষ্টির মত নিরাপত্তার একটা প্রশান্তিও নামল তার মনে।

অভিভূত ব্রুনার মুখ থেকে যেন আপনাতেই কথা বেরিয়ে এল, 'গুড মর্নিং স্যার, আমি ব্রুনা ব্রুনহিল্ড, আনালিসা অ্যালিনার বোন।'

বলে ব্রুনা ব্রুনহিল্ড হ্যান্ডশেকের জন্যে হাত বাড়াল আগন্তুকের দিকে।

তবে হাত এগিয়ে না দিয়ে আগন্তুক বলল, 'এক্সকিউজ মি ব্রুনা, আমাদের সংস্কৃতি এ ধরনের হ্যান্ডশেকের অনুমতি দেয় না।'

ব্রুনা হাত টেনে নিল। বিব্রত ভাব তার চোখে-মুখে। তার দৃষ্টি আহমদ মুসার মুখের দিকে। এমনটা ব্রুনার জীবনে এই প্রথমবার ঘটল। অতিথি অভ্যাগতদের স্বাগত জানানোর সবচেয়ে অন্তরংগ প্রকাশই তো হলো হ্যান্ডশেক। হ্যান্ডশেক অস্বীকার করা অসৌজন্যমূলক, অপমানকরও। অ্যালিনা আপার 'মহান মানুষের' কাছ থেকে তো এমন প্রত্যাশা করা যায় না!

ব্রুনা নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, ' ওকে স্যার, ভিতরে আসুন প্লিজ।'

দরজা পুরোটা খুলে এক পাশে দাঁড়াল ব্রুনা।

ভিতরে প্রবেশ করল আগন্তুক।

ব্রুনা দরজা বন্ধ করে আগন্তককে নিয়ে বসিয়ে তার পাশের সোফায় বসল সে। মুহূর্ত কয়েক নিরবতা।

'আমি অনাহুত আগন্তুক। প্রয়োজনের কথাই আমার প্রথম বলা দরকার। বলল আগন্তুক।

কথা শেষ করেই আগন্তুক আবার বলার জন্যে মুখ খুলেছিল।

'এক্সকিউজ মি স্যার, তার আগে আমার একটা প্রশ্ন আছে।' ব্রুনা বলল।

'প্রশ্ন? বল।' আগন্তুক মুখ তুলে ব্রুনার দিকে চেয়ে বলল।

'আপনার মূল নামের কয়টা অংশ?' জিজ্ঞাসা ব্রুনার।

আগন্তুক আবার মুখ তুলে তাকাল ব্রুনার দিকে। ভ্রুকুঞ্চিত হয়েছে তার। যেন মুহূর্তকাল ভাবল সে। বলল, 'অংশ দু'টি।'

'প্রথম অংশের প্রথম ইংরেজি অক্ষরটা কি?' আবার জিজ্ঞাসা ব্রুনার।

ঠোঁটে ছোট্ট এক টুকরা হাসি ফুটে উঠল আগন্তুকের। বলল, 'ইংরেজি 'এ' হলো সেই আদ্যাক্ষর।'

খুশিতে চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ব্রুনার। বলল, 'এবার বলুন স্যার।'

'কিন্তু আগে বল, আমি পাস করতে পেরেছি কিনা?' আগন্তুক বলল।

মুখে হাসি ফুটে উঠল ব্রুনার। বলল, 'স্যার, প্রথম দর্শনেই আপনি পাস করেছেন।'

'কিভাবে?' জিজ্ঞাসা আগন্তুকের।

'আপা আপনার চেহারার যে বিশেষ গুণগুলো দিয়েছিলেন তার সাথে আপনি মিলে গেছেন।' বলল ব্রুনা।

'আমি তাহিতি থেকে আসছি। গৌরী মানে আপনার বোন আনালিসা অ্যালিনা শেষ পর্যন্ত ওখানেই ছিলেন। আর আমার নাম নিশ্চয় আপনার বোনের কাছে শুনেছেন।' আগন্তুক বলল।

'নাম বলেননি। নাম টেলিফোনে বলবেন না বলেই দুই অংশ নামের প্রথম অংশের আদ্যক্ষর বলার পর তাঁর টেলিফোন কেটে যায়। তারপর থেকেই আপার সাথে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন।' বলল ব্রুনা। তার শেষ কথাগুলো কান্নায় ভারি হয়ে উঠেছিল।

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে ব্রুনা সংগে সংগেই আবার বলে উঠল, 'আপনি বললেন শেষ পর্যন্ত আপা ওখানে ছিলেন, 'শেষ পর্যন্ত অর্থ...।'

কথা শেষ করতে পারল না ব্রুনা। দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে।

আগন্তুক তাকাল ব্রুনার দিকে। তারপর মাথা নিচু করে আস্তে নরম কন্ঠে বলল, 'হ্যাঁ, ব্রুনা, আনালিসা অ্যালিনা নেই।'

ব্রুনা অস্ফুস্ট চিৎকার করে সোফার উপর আছড়ে পড়ল। এক বাঁধ ভাঙা কান্নায় ভেঙে পড়ল সে।

আগন্তুক মাথা তুলল না। তাকাতে পারল না ব্রুনার দিকে। মনে মনে বলল, 'কাঁদুক ব্রুনা, তার কাঁদা উচিত।

অল্পক্ষণ পর মুখ তুলল ব্রুনা। অশ্রুধোয়া তার মুখ। বলল, ‘কি ঘটেছিল, কি হয়েছিল জানতে পারি কি মি.।’ অশ্রুরুদ্ধ কন্ঠ তার।

‘আমার নাম আহমদ মুসা। আনালিসা অ্যালিনার মৃত্যুর ঘটনা...।’

আহমদ মুসার কথার মাঝখানেই ব্রুনা বলে উঠল, ‘আহমদ মুসা আপনার নাম? তাহিতির জিম্মি উদ্ধারের ঘটনায় আপনার কথা পত্রিকায় পড়েছি। বলা হয়েছে প্রায় পৌনে একশ বিজ্ঞানী-বুদ্ধিজীবি জিম্মী উদ্ধার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ঘটনা। বিস্ময়করভাবে আপনি সবাইকে মুক্ত করেছেন! বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সবাই আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে। আরও অনেক কথা লিখেছে অনেক পত্রিকা। আপনি কিংবদন্তীর নায়ক। কিন্তু বুঝতে পারছি না, আমার আপার সাথে আপনার পরিচয় হলো কি করে?’

‘আমি সে কথাই বলছি।’ বলে আহমদ মুসা গৌরী ওরফে আনালিসা অ্যালিনার সাথে তার প্রথম পরিচয় থেকে শুরু করে সব কিছু সংক্ষেপে তুলে ধরে বলল, ‘আমাকে বাঁচাতে গিয়েই তাদের নেতার গুলিতে জীবন দিয়েছে ব্রুনা।’

‘আপা আমাকে টেলিফোনে জানিয়েছিল, আমাদের ‘মা সমস্যা’র সমাধানে আপনি আমাদের সাহায্য করতে পারবেন। আমাদের সমস্যার কথা আপনি জানেন বলে তো বললেন না?’

‘অ্যালিনার মৃত্যুর আগে জানতাম না। গুলি লাগার পর সে মিনিট দেড়েক বেঁচেছিল। আমার হাতে সে একটা ডাইরি তুলে দিয়ে বলেছিল, ডাইরির শেষ কয়েক পাতায় আমার জন্যে কিছু লিখেছে। আমি যেন সেটা পড়ি। আর বলেছিল, আমার উপর সে কোন দায়িত্ব চাপাচ্ছে না, সব কিছু আমার ইচ্ছায় হবে। পরে ডাইরি আমি পড়েছি এবং সমস্যা সম্পর্কে জেনেছি। নিজের ইচ্ছাতেই আমি এসেছি ব্রুনা।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমার ঠিকানাও কি আপা দিয়েছে?’ বলল ব্রুনা।

‘হ্যাঁ। ডাইরিতেই সে লিখে রেখেছিল।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ওয়েলকাম স্যার। আমরা সত্যিই অসহায় হয়ে পড়েছি। আপার অভাব আমাদের সব আশা-ভরসা চুরমার করে দিয়েছে। আব্বা আমাদের অভিভাবক হলেও আপাই আমাদের পরিচালনা করত। মা’র ঘটনায় বাবা একদমই ভেঙে

পড়েছেন, মনের দিক দিয়েও শরীরের দিক দিয়েও।' বলল ব্রুনা। ভারি কন্ঠ তার।

'স্বাভাবিক।' বলল আহমদ মুসা।

মুহুর্তকালের বিরতি নিয়ে আহমদ মুসা আবার বলে উঠল, 'আচ্ছা বল তো ব্রুনা, তোমার কি মত, তোমার মা কি বদলে গেছেন, না উনি তোমার মা-ই নন?'

'মা হবেন না কেন? বদলে গেছেন তিনি। অবশ্য বাবা বলেন, কোন প্রমাণ নেই এবং বিশ্বাস করাও যায় না, কিন্তু তাকে তোমার মা বলে বিশ্বাস করতে মন চায় না। আব্বার কথা আমি মানি না। ইনি আমার মা না হলে আমার মা কোথায়?' বলল ব্রুনা।

'আমি গৌরীর মানে অ্যালিনার ডাইরি গোটাটাই পড়েছি। অ্যালিনা কিছু তথ্য দিয়েছে তা কিন্তু নিশ্চিত করে উনি তোমাদের মা নন।' আহমদ মুসা বলল।

ব্রুনা বিস্ময় নিয়ে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, কি তথ্য বলা যাবে স্যার?'

'অবশ্যই ব্রুনা। একদিন গোসলের পর তোমার মা তার ড্রেসিং রুমে বসে তার কালো চুল রং দিয়ে সাদা করছিলেন, এটা অ্যালিনা দেখেন। তোমার এ..।'

'মা কালো চুল পাকা করছিলেন? তাহলে মায়ের পাকা চুলের গুচ্ছগুলো আসলে পাকা নয়। ও গড...।'

থামল ব্রুনা। তার কন্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেছে। কাঁপছে গোলাবের পাপড়ির মত তার নিরাভরণ ঠোঁট।

কয়েক মুহুর্ত, ব্রুনা নিজেকে সামলে নিয়ে বলে উঠল, 'ডাইরিতে আর কি আছে স্যার?'

'আরও আছে। ওটা আমি এনেছি। তুমিই রাখবে। পড়ে নিও তুমি।' আহমদ মুসা বলল।

'না, স্যার। ও ডাইরির অধিকার একমাত্র আপনার। আপনাকেই আপা দিয়ে গেছেন।' বলল ব্রুনা।

‘কিন্তু ওটা তোমাদের পারিবারিক সম্পত্তি।’

আহমদ মুসা বলল।

‘কিন্তু আপনি আপার কাছে পরিবারের চেয়েও বড়।’ বলল ব্রুনা।

‘কেন, কেমন করে?’ বলল আহমদ মুসা।

‘জানি না। তবে আপার সাথে কথা বলে আমি এটাই বুঝেছি যে, তার আস্থা, সম্মান, ভালোবাসা সব যেন আপনার জন্যেই ছিল!’ বলল ব্রুনা।

অজান্তেই মনটা আহমদ মুসার চমকে উঠল। মুমূর্ষু গৌরীর কথাগুলো তার মনে পড়ল: স্রষ্টার কাছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে, জীবনের অন্তিম লগ্নে এসে কেন আপনার দেখা পেলাম? কেন আপনার দেখা আগে পাইনি?... আপনার উপর আমার আস্থা সীমাহীন।’ আরও মনে পড়ল তার শেষ কথাটা: ‘আপনার উপর সে অধিকারও নেই।’ অধিকার নেই, বলার মাধ্যমে সে তো এটাই বলতে চেয়েছে ‘সে অধিকার তার আছে।’

আনমনা হয়ে পড়েছিল আহমদ মুসা। এসব চিন্তার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল সে।

আহমদ মুসার এই ভাবান্তর চোখ এড়াল না ব্রুনার। তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তাহলে তার বড় বোন তার মনটা অবশেষে একজনকে দিয়েছিল! বলল ব্রুনা, ‘স্যার, আমার মা খুবই কনজারভেটিভ। তার অনুকরণেই আমরা গড়ে উঠেছি। জানেন, বড় আপার কোন ছেলে বন্ধু ছিল না। আমার খুশি লাগছে যে, আপা শেষে একজনকে বন্ধু বানিয়েছিলেন।

শেষ কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলল ব্রুনা।

আহমদ মুসা নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, ‘তোমাকে খুব শক্ত হতে হবে ব্রুনা। আলিনা যে কাজ শেষ করতে পারেনি, তা তোমাকে শেষ করতে হবে।’

ব্রুনা চোখ মুছল। বলল, ‘সে শক্তি আমার নেই স্যার। আমি আপনার পাশে থাকতে চেষ্টা করব।’

কলিং বেল বেজে উঠল।

চমকে উঠল ব্রুনা!

ব্রুনার চমকে ওঠা আহমদ নজর এড়াল না।

বলল, 'দরজায় কে তুমি কি জান ব্রুনা?'

'না স্যার।' বলল ব্রুনা।

'তবে চমকে উঠলে যে?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'কিছুক্ষণ আগে মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের কম্যুনিটি সার্ভিসের লোক এসেছিল কিছু ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করতে। কোন এনজিও'র অনুরোধে তারা নাকি এটা করছে। কিন্তু কেন জানি আমার সন্দেহ হয়েছে এর মধ্যে অন্য কোন ব্যাপার আছে। আমার মধ্যে সত্যিই একটা ভয়ের সৃষ্টি হয়েছে।' বলল ব্রুনা।

আহমদ মুসা মুহূর্তের জন্যে চোখ বুজেছিল।

চোখ খুলে বলল, 'আমি বুঝেছি ব্রুনা। দেখ কে, গেট খুলে দাও।'

মুখে উদ্বেগ নিয়ে দাঁড়িয়ে ডোর ভিউ দিয়ে বাইরে একবার তাকিয়ে পেছনে ফিরে আহমদ মুসার দিকে তিনটি আঙুল তুলল।

আহমদ মুসা বুঝল, বাইরে তিনজন লোক। দরজা খুলে দেবার জন্যে আহমদ মুসা ইংগিত করল।

ব্রুনা দরজা খুলে এক হাতে দরজা ধরে রেখে মুখ বাড়িয়ে বলল, 'আপনারা কারা? কি চাই আপনাদের?'

'আপনার কাছে এসেছি। আমরা করপোরেশনের সিকিউরিটির লোক। আপনাকে আমাদের সাথে আমাদের অফিসে যেতে হবে।' বলল ওদের তিনজনের একজন।

ওরা তিনজন একই বয়সের। সকলেরই পরনে সিকিউরিটির ইউনিফরম।

ব্রুনার মুখ শুকিয়ে গেছে।

সে দরজা থেকে সরে ফিরে আসতে চাইল আহমদ মুসার দিকে।

ওরা তিনজনই ছুটে এসে ধরে ফেলল ব্রুনাকে। চিৎকার করে উঠল ব্রুনা।

আহমদ মুসা বসে ছিল। বসে থেকেই বলল, 'শোন তিন বীর পুরুষ। ছেড়ে দাও ব্রুনাকে। একজন তরুণীকে ধরতে তিন বীর পুরুষের দরকার হয় না।'

আহমদ মুসার কন্ঠ খুব ঠাণ্ডা কিন্তু শক্ত।

ওরা তিনজনই চমকে উঠে ছেড়ে দিল রুনাকে। তারা আহমদ মুসাকে আগে দেখতে পায়নি। রুনাকে ছেড়ে দিয়েই ওরা ঘুরে দাঁড়াল আহমদ মুসার দিকে। রুনা দৌড়ে এসে আহমদ মুসার পেছনে দাঁড়াল।

'কে তুমি?' আহমদ মুসার দিকে ঘুরে দাঁড়াবার পর ওদের একজন বলল।

'আমার বন্ধু, আমার অভিভাবক।' আহমদ মুসা কিছু বলার আগেই বলে উঠল রুনা।

রুনার কথা তখন শেষ হয়ে সারেনি। ওদের তিনজনের একজনের হাত অকস্মাৎ উপরে উঠল।

একটা ছুরি ছুটে এল আহমদ মুসার লক্ষে।

আহমদ মুসা আগেই উঠে দাঁড়িয়েছিল। তার পেছনে রুনা।

ছুরির সামনে থেকে আহমদ মুসার সরার উপায় ছিল না। তার পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিল রুনা। আহমদ মুসা সরলে ছুরি গিয়ে সরাসরি আঘাত করবে রুনাকে।

সুতরাং আর কোন চিন্তা করার অবকাশ ছিল না। আহমদ মুসার বাম হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল ছুরিটাকে। ছুরির তীক্ষ্ণ ফলা তার বাম হাতের তালুতে বিদ্ধ হলো।

আহমদ মুসা দেখল আরও একজনের হাত উপরে উঠেছে।

আহমদ মুসা ডান হাত দিয়ে বা হাতের তালু থেকে ছুরিটা বের করতে করতে চিৎকার করে উঠল, 'রুনা, তুমি শুয়ে পড়।'

রুনা আহমদ মুসার হাতে ছুরি বিদ্ধ হওয়া দেখেছে। ভয়ে কাঁপছিল সে। আহমদ মুসার নির্দেশের সাথে সাথে শুয়ে পড়ল রুনা।

আহমদ মুসার কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে আরেকটি ছুরি ছুটে এল আহমদ মুসার লক্ষে।

চোখের পলকে আহমদ মুসা হাঁটু গেড়ে বসে মাথার উপর ছুটে চলা ছুরির বাঁট ধরেই ছুঁড়ল তৃতীয় লোকটির ডান বাহু লক্ষে। তারও ডান হাত উপরে উঠছিল। তার সে হাতে চকচকে তৃতীয় আরেকটা ছুরি।

আহমদ মুসা ছুরিটা ছুঁড়েই বাম হাতের তালু থেকে খুলে নেয়া রক্তাক্ত ছুরিটা ওদের তিনজনের দিকে তাক করে বলল, 'দেখ, আমার নিক্ষিপ্ত ছুরিটা লক্ষ ভ্রষ্ট হবে না। তার প্রমাণ দেখ তোমাদের তৃতীয় লোকটির বাহুতে গেঁথে যাওয়া আমার ছুরি। এখন বল, তোমাদের কে প্রথম মরতে চাও।'

আহমদ মুসার নিক্ষিপ্ত ছুরিটা তৃতীয় ব্যক্তির ডান বাহুর ভিতরের পাশ দিয়ে বাহুর ভিতরে ঢুকে গিয়েছিল। লোকটি ককিয়ে উঠে বাম হাতে ডান বাহু চেপে ধরে বসে পড়েছিল।

ওরা দু'জন সাথী লোকটির বাহুতে বিদ্ধ ছুরিটার দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ফেরাল আহমদ মুসার দিকে। তারা আহমদ মুসার কথা অবিশ্বাস করল না। তারা দু'জন দু'হাত উপরে তুলে আত্নসমর্পণ করল।

উঠে দাঁড়িয়েছিল ব্রুনা।

আহমদ মুসা ছুরি নিয়ে এগিয়ে গেল ওদের তিনজনের সামনে।

আহমদ মুসার গা ঘেঁষে তার পেছন পেছন এগোলো ব্রুনা।

ছুরি ওদের দিকে তাক করে আহমদ মুসা বলল, 'দেখ, এক আদেশ আমি দু'বার করি না। বাঁচতে চাইলে বল তোমরা কারা? কেন এসেছিল মেয়েটিকে কিডন্যাপ করতে?' ঠাণ্ডা কিন্তু অত্যন্ত শক্ত কন্ঠস্বর আহমদ মুসার।

ওরা তিনজনেই আহমদ মুসার দিকে তাকাল।

আহমদ মুসার মুখের দিকে তাকিয়ে এবারও তারা আহমদ মুসার কথা অবিশ্বাস করল না। ওদের একজন বলল, 'স্যার, আমরা এই এলাকার একটা শরীর চর্চা ক্লাবের সদস্য। দু'জন লোক এসে আমাদের বলে, এই ম্যাডাম তাদের আত্নীয়, রাগ করে পালিয়ে এসে এখানে রয়েছে। তারা এলে সে দরজা খুলবে না এবং আবার পালিয়ে যাবে। এই কারণে তারা আমাদের দায়িত্ব দিয়েছে তাকে ধরে নিয়ে যেতে। আমাদের ক্লাবের পাশের পার্কে তারা অপেক্ষা করছে।

ম্যাডামকে নিয়ে তাদের হাতে পৌঁছে দেয়াই আমাদের কাজ। আমরা প্রত্যেকে এজন্যে এক হাজার ডলার করে পাব।'

আহমদ মুসা তাকাল একবার ব্রুনার দিকে। তারপর ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমাদের নিয়ে ওখানে গেলে তো ওদের পাওয়া যাবে?'

'পাওয়া যাবেই তো স্যার!' বলল ওদের তিনজনের একজন।

'তাহলে চল।'

বলে পেছনে তাকাল। বলল ব্রুনাকে, 'তুমি থাক, আমি আসছি।'

'না স্যার, একা আমি বাসায় থাকতে পারবো না। প্লিজ, আমি আপনার সাথে যাব।' বলল ব্রুনা তার মুখে ভয়ের চিহ্ন।

'ঠিক আছে, এস।' আহমদ মুসা বলল।

'স্যার, আপনার বাম হাত সাংঘাতিকভাবে আহত। রক্ত ঝরছে। এখনই ব্যান্ডেজ করিয়ে নেয়া দরকার।' বলল ব্রুনা।

'ঠিক বলেছ ব্রুনা। ওদেরও একজন আহত।' বলে আহমদ মুসা ওদের আহত লোকটিকে ডাকল।

ব্রুনা ছুটে গিয়ে ফার্স্ট এইড বক্স নিয়ে এসে বলল আহমদ মুসাকে, 'স্যার, চিন্তা করবেন না। আমার ফার্স্ট এইড ট্রেনিং আছে। আমি খারাপ ব্যান্ডেজ করবো না।'

বড় গামলা নিয়ে এসে প্রথমে আহমদ মুসার হাত এ্যান্টিসেপটিক ফ্লুইড মেশানো পানি দিয়ে ধুয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল। তারপর আহমদ মুসা ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল ওদের আহত অন্য লোকটির হাতে।

সবাই বেরিয়ে এল ব্রুনার ফ্ল্যাট থেকে। সব শেষে বেরুল ব্রুনা ঘর লক করে।

ওদের তিনজনের দু'জন বসল ড্রাইভিং ও তার পাশের সিটে। আহত তৃতীয় জনের সাথে ব্রুনাকে বসাল পেছনে মাঝের সিটে। নিজেকে আড়ালে রাখার জন্যে পেছনের সিটে বসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আহমদ মুসা।

গাড়িতে ওঠার সময় দৃষ্টির একটা পলক সামনের দিকে পড়তেই আহমদ মুসা দেখল অল্প দূরে একজন লোক রাস্তার পাশে একটা গাছে ঠেস দিয়ে তাদের

দিকে তাকিয়ে আছে। আহমদ মুসার চোখের সামনে পড়তেই লোকটা গাছের আড়ালে সরে গেল। পরক্ষণেই সে ওদিকে রাস্তার পাশের একটা ঝোপের দিকে দৌড়ে গেল। একটু পরেই ঝোপের আড়াল থেকে একটা গাড়ি বেরিয়ে ওদিকে চলে গেল।

লোকটির আচরণ আহমদ মুসার মধ্যে কিছু কৌতুহল সৃষ্টি করলেও এটা আহমদ মুসার মনে কোন ভাবনার সৃষ্টি করল না। উঠে বসল সে গাড়িতে।

গাড়ি দশ মিনিট চলার পর একটা পার্কে প্রবেশ করল। দাঁড়াল একটা ঝাউ গাছের পাশে।

নিরব পার্কটা। এ সময়ে পার্কে কেউ আসে না।

গাড়ির সামনের ওরা দু'জন লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল।

কিছুক্ষণ বাইরে পায়চারি করে তারা আহমদ মুসার কাছে এসে বলল, 'স্যার, কাউকে দেখছি না। কিন্তু এই ঝাউ গাছের পাশেই তো আমাদের দাঁড়াবার কথা! ওরা এখানে থাকবে কথা ছিল।'

আহমদ মুসার মনে পড়ল ব্রুনার বাড়ির ওপাশে দেখা সেই লোকটির কথা। ও কি এদের লোক ছিল। হওয়াই সম্ভব। গুণ্ডাদের পাঠিয়ে তাদের উপর চোখ রেখেছিল নিশ্চয়। মুক্তভাবে ব্রুনাকে বের হতে দেখে এবং সাথে আমাকে দেখে ওদের সন্দেহ হয়েছে। নিশ্চয় তাদের ব্যাপারে পুলিশকে বলা হবে, এ সন্দেহও তারা করতে পারে। সন্দেহ করেই কি তাহলে ওরা সরে পড়েছে?'

'ঠিক আছে, তোমরা আরেকটু দেখ।'

তারপর আহমদ মুসা ব্রুনাকে বলল, 'তুমিও নামো। গাড়ির বাইরে গিয়ে দাঁড়াও।'

আরও কিছু সময় পার হলো।

ওরা তিনজন এসে আহমদ মুসার সামনে গাড়ির জানালায় এসে দাঁড়াল। বলল, 'স্যার, ওরা নিশ্চয় ভেগেছে আপনার আসা টের পেয়ে।'

'লোক ওরা কয়জন ছিল?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'দুই গাড়িতে ওরা ছয়জন। সবাই গাড়ি থেকে নামেনি। দু'জন আমাদের সাথে কথা বলেছিল।' বলল ওদের তিনজনের একজন।

‘আচ্ছা, ওদের মধ্যে কি নীল প্যান্ট ও সাদা টি-শার্ট পরা কেউ ছিল?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘হ্যাঁ স্যার ছিল। একজনের পরনে নীল প্যান্ট ও সাদা টি-শার্ট ছিল।’ বলল ওদের তিনজনের মধ্যে আহত লোকটি।

‘ব্রুনা যে বন্দী হয়ে এখানে আসছে না, তাদের কাছে এ ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেছে। এখানে এলে তাদের বিপদ হবে। এসব বিষয় তারা জেনে ফেলেছে। নিশ্চয় পালিয়েছে ওরা।’ বলল আহমদ মুসা।

‘সত্যিই তারা জেনেছে? আপনি কি করে জানলেন স্যার?’ বলল ওদের একজন। তাদের চোখে-মুখে একটা ভীতি।

‘ব্রুনার বাড়ির বাইরে ওদের একজন পাহারায় ছিল। আমরা গাড়িতে ওঠার সময় সেও ওখান থেকে চলে এসেছে। আমি তাকে দেখেছি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ওরা খুব জেঞ্জারাস লোক স্যার। আমাদের বিপদ হবে। আপাতত আমাদেরও পালাতে হবে দেখছি।’

বলল তিনজনের সেই আহত লোকটিই।

লোকটির কথা শেষ হতেই চোখের পলকে সব দিক থেকে চার থেকে পাঁচটা গাড়ি এসে আহমদ মুসার গাড়িকে ঘিরে দাঁড়াল। দশ বারোজন লোক নেমে এল সংগে সংগেই।

চারটি রিভলবার উদ্যত হলো চারদিক থেকে আহমদ মুসার গাড়ি লক্ষে। ঠিক এই সাথেই দু’জন এগিয়ে এসে যারা ব্রুনাকে কিডন্যাপ করতে গিয়েছিল এবং আহমদ মুসাদের সাথে এসেছে তাদের দু’জনকে আক্রমণ করল। কয়েকটি ঘুসি লাগিয়ে মাটিতে ফেলে দিল তাদের। ওদের আহত লোকটি চিৎকার করে বলল, ‘স্যার, আমাদের কোন দোষ নেই। গাড়ির মধ্যে বসে থাকা লোকটি আমাদের সবাইকে মেরেছে। ওই আমাদেরকে তার সাথে আসতে বাধ্য করেছে।’

রিভলবারধারী একজন গিয়ে গাড়ির দরজায় একটা লাথি মেরে বলল, ‘বেরিয়ে আয় শালা, দেখাচ্ছি মজা।’

আহমদ মুসা দরজা খুলে দু'হাত মাথার উপরে তুলে বের হয়ে এল গাড়ি থেকে।

রিভলবারধারীদের দু'জন গাড়ির এপাশে ছিল। গাড়ির ওপাশের দু'প্রান্তে দু'জন।

গাড়ি থেকে নেমে সোজা হয়ে দাঁড়াবার সময় চারদিকটা একবার তাকিয়ে দেখে নিল আহমদ মুসা।

সোজা হয়ে দাঁড়াতেই রিভলবার তাক করে কাছের লোকটি তার দিকে এগিয়ে এল।

গাড়ির ওপাশ থেকে একজন চিৎকার করে উঠল, 'শালাকে শেষ করে দাও। ব্রুনাকে আমরা গাড়িতে তুলছি।'

রিভলবারের একটা নল ধীরে ধীরে এসে আহমদ মুসার কপালে ঠেকল।

রিভলবারধারী দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'একটুও শব্দ হবে না। পুলিশ যখন আমাদের সন্ধানে আসবে তখন আমরা অস্ট্রিয়া পার।'

লোকটির কথা শেষ হবার সাথে সাথেই গাড়ির পেছন দিক থেকে একটা ছুরি এসে রিভলবারধারীর বাহুতে বিদ্ধ হলো। লোকটি ককিয়ে উঠে তার ডান বাহু চেপে ধরে বসে পড়ল।

আহমদ মুসা দ্রুত পেছন দিকে তাকাল। দেখল, গাড়ির পেছনে দাঁড়িয়ে সেই তিনজনের আহত লোকটি। সন্দেহ নেই আহমদ মুসার, এই লোকটিই ছুরি ছুঁড়েছে আহমদ মুসাকে হত্যা করতে যাওয়া রিভলবারধারীকে।

লোকটির উপর চোখ পড়তেই আহমদ মুসা দেখল তার চোখ ঘুরে গাড়ির ওপাশের দিকে। তার চোখে-মুখে আতংক।

আহমদ মুসা দ্রুত তাকাল গাড়ির ওপাশে। দেখল, একটা রিভলবার উঠে আসছে ছুরি ছুঁড়ে মারা সেই আহত লোকটিকে লক্ষে।

আহমদ মুসার ডান হাতটা দ্রুত চলে গেল মাথার পেছনে জ্যাকেটের নিচে এবং বেরিয়ে এল 'ব্ল্যাক কোবরা' নামের ছোট কালো কুচকুচে বিপদজনক রিভলবার নিয়ে। পরমানু নিয়ন্ত্রিত এক ধরনের বিস্ফোরণ এর বুলেটকে পরিচালনা করে। এক কমপ্লিট রাউন্ডে এর ১২টি বুলেট থাকে। সাধারণ

রিভলবারের চেয়ে অনেক দ্রুত, নি:শব্দ এর বুলেট এবং এটা অত্যন্ত ভয়ংকর। যে অংগকে এই বুলেট আঘাত করে তা বহু দিনের জন্যে ওজনহীন ও অবশ হয়ে যায়।

চোখের পলকে রিভলবার মাথার উপর দিয়ে ঘুরিয়ে এনে আহমদ মুসা ছুরিতে আহত লোকটিকে গুলি করতে উদ্যত হলো। নিমেষে লোকটির বাহু লক্ষে গুলি করল। গুলিটি ঠিক তার কনুইয়ের উপরের জায়গাটায় বিদ্ধ হলো। লোকটি ট্রিগার চাপতে যাচ্ছিল রিভলবারের। কিন্তু হলো না। খসে পড়ল তার হাত থেকে রিভলবার।

প্রথম গুলিটি করার পর এক সেকেন্ডও দেরি করেনি আহমদ মুসা। আরও দু'জন রিভলবারধারী রয়ে গেছে।

আহমদ মুসার রিভলবার ঘুরে এল ওদিক দিয়ে। আহমদ মুসার প্রথম গুলি এতটাই দ্রুত ও আকস্মিক ছিল যে, ঐ দুই রিভলবারধারীর বিমূঢ়তা কাটতে তাদের অনেক সেকেন্ড নষ্ট হলো। এই নষ্ট সেকেন্ডগুলোই আহমদ মুসা ব্যবহার করল ওদের দু'জনকে গুলি করার কাজে। সম্বিত ফিরে ওরা যখন তাদের রিভলবার তোলার চিন্তা করল, তখনই গুলি বিদ্ধ হলো ওদের রিভলবার ধরা হাত।

তৃতীয় গুলিটা করেই আহমদ মুসা দাঁড়ানো অবশিষ্ট লোকদের লক্ষে রিভলবার তুলে বলল, 'সবাই হাত তুলে দাঁড়াও, সামান্য বেয়াদবী করলে মাথার খুলি উড়ে যাবে। এক কথা আমি দু'বার বলি না।'

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা রিভলবার নামিয়ে নিয়ে ব্রুনাকে বলল, 'তুমি পুলিশকে টেলিফোন কর। বল কিডন্যাপার ধরা পড়েছে। ওরা তিনজন তোমার সাক্ষী।'

আহমদ মুসা কথা বলার সময় কয়েক মুহূর্তের জন্যে চোখ নামিয়ে নিয়েছিল ওদের দিক থেকে। এরই সুযোগ গ্রহণ করেছিল ওদের একজন। ছুঁড়েছিল আধুনিক বুমেরাং সুইচ নাইফ। নি:শব্দে ছুটে আসছিল নাইফটি।

চিৎকার করে উঠেছিল ব্রুনা। দেখতে পেয়েছিল সে বিপদজনক ছুরি নিক্ষেপের ঘটনা।

ঘটনার দিকে ঘুরে তাকাবার সময় নষ্ট না করে আহমদ মুসা নি:শব্দে বোঁটা থেকে ঝরে পড়া ফলের মত নিজেকে মাটির উপর ঠেলে দিয়েছিল।

মুহূর্তের ব্যবধানে বেঁচে গেল আহমদ মুসা। অবিশ্বাস্য তীক্ষ্ণ ধারের সুইচ বুমেরাংটি আহমদ মুসার মাথার সামনের চুলের কিয়দংশ ছেঁটে নিয়ে চলে গেল। বসে পড়তে এক মুহূর্ত দেরি হলে বুমেরাং নাইফটি দেহ থেকে মাথাকে আলাদা করে ফেলত।

আহমদ মুসা বসে পড়েই গুলি করল বুমেরাং নিক্ষেপকারীর মাথা লক্ষে। বুমেরাং নিক্ষেপকারী লোকটি তথন মাথা ঘুরিয়ে নিচ্ছিল। সত্যিই আহমদ মুসার গুলি লোকটির কপাল দিয়ে ঢুকে তার মাথা উড়িয়ে দিল।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

মোবাইলে কথা বলছিল ব্রুনা।

মোবাইল সে মুখের কাছ থেকে সরিয়ে বলল, ‘স্যার, আমি পুলিশকে জানিয়েছি। ওরা আসছে। কিন্তু স্যার, আপনার গুলি, আপনার রিভলবার...। কোন বিপদ হবে না তো? অস্ট্রিয়ার অস্ত্র আইন খুবই কঠোর।’

আহমদ মুসা ব্রুনার উদ্বেগ বুঝল। বলল, ‘না ব্রুনা, ভয় নেই। আমার এ রিভলবারের ইউরোপীয় লাইসেন্স রয়েছে।’

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই পুলিশের দু’টি গাড়ি এসে পৌঁছে গেল।

গালে প্রচণ্ড এক থাপ্পড় খেল ক্লারা লিসবেথ।

লিসবেথের পরনে নার্সের পোষাক। কিন্তু গায়ে ডাক্তারের এ্যাপ্রন। এ্যাপ্রনের সামনের বড় পকেট দু’টো ঝুলে আছে। সে দুই পকেটের একটিতে পাওয়া যাবে একটা রিভলবার ও ভয়ংকর একটা সুইচ নাইফ।

ক্লারা লিসবেথকে যে থাপ্পড় দিয়েছে সে গৌরীর মা কারিনা কারলিন।

বিধ্বস্ত তার চেহারা । উস্কু-খুসকু তার চুল। অবিন্যস্ত পোষাক। দু’চোখে তার উদভ্রান্ত দৃষ্টি।

সুন্দর আঙ্গিকের একটা বেডে সে বসে।

বড় ঘর, কিন্তু একেবারেই নিরাভরণ। দেখতে মনে হয় কারাগারের মত। ঘরের ভিতরেই টয়লেট। পড়ার একটা ছোট্ট টেবিল ও একটি চেয়ার। তাতে বই-পত্র কিছু নেই। আছে একটা ট্রেতে খাবার সাজানো।

ক্লারা লিসবেথের গালে এক থাপ্পড় কষিয়েই বলল, 'বলেছি তো আমি তোদের খাবার খাবো না! মরে যাবো।'

মুহূর্ত থামল। একটা দম দিয়ে আবার বলে উঠল, 'আমার হাতঘড়ি কোথায়? দেয়ালে ক্যালেন্ডার নেই কেন?'

'আমাকে মেরে না ফেলে মরার মত ফেলে রেখে নির্যাতন চালানো হচ্ছে কেন?'

বলেই কারিনা কারলিন বেড-সাইড থেকে একটা গ্লাস তুলে নিয়ে চোখের পলকে ছুঁড়ে মারল ক্লারা লিসবেথের দিকে।

ক্লারা লিসবেথ সাবধান হওয়ার সময় পায়নি। গ্লাসটা গিয়ে আঘাত করল তার কপালের বাম পাশটায়। জোরের সাথে ছোঁড়া গ্লাসের ভারি গোড়া কপালে লেগে একটা খাদ সৃষ্টি করে উঠিয়ে নিয়ে গেল একখণ্ড চামড়া।

ঝর ঝর করে রক্ত নেমে এসে মুখের উপর দিয়ে গড়াল।

ক্রোধে মুখও লাল হয়ে উঠল। এক টান দিয়ে এ্যাপ্রনের পকেট থেকে রিভলবার বের করে কারিনা কারলিনের কপালে ঠেকিয়ে বলল, 'ম্যাডাম, ইচ্ছা করলেই মাথাটা এখন এফোঁড় ওফোঁড় করে দিতে পারি।'

'ট্রিগারটা চাপ, আমি তো সেটাই চাই।' বলল কারিনা কারলিন।

আর কোন কথা না বলে ক্লারা লিসবেথ রিভলবার পকেটে ফেলে ছুটে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

বাড়ির ভিন্ন একটি অংশের লিফট ধরে উঠে গেল চারতলায়। চারতলার একটা দরজার সামনে দাঁড়াতেই দরজা ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা একটা কন্ঠ কথা বলে উঠল, 'ক্লারা, তুমি আহত আমি সেটা জানি। কি বলতে এসেছ, বল।'

'এক্সিলেন্সি, ম্যাডাম নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছেন। সংজ্ঞায় আসার পরেই সে আনরুলি হয়ে উঠছেন। যে কোন সময় যে কোন কাণ্ড ঘটিয়ে বসতে পারেন।' ক্লারা লিসবেথ বলল।

'সব জানি আমি। তুমি যাও। আমি দেখছি।' বলল দরজা ভেদ করে আসা সেই কণ্ঠ।

দরজায় গোপন মাইক্রোফোন আছে। সে মাইক্রোফোন থেকেই কথাগুলো আসছে।

ক্লারা লিসবেথ ফিরে গেল বাড়ির আগের অংশে তার কক্ষে।

খাটের পাশের দেয়ালটা ফুঁড়ে কালো ইউনিফরমে ঢাকা কালো মুখোশ পরা অনেক বার দেখা পরিচিত কালো মূর্তি সামনে এসে দাঁড়াতেই কারিনা কারলিন চিৎকার করে বলল, 'শয়তানরা, তোমরা আমাকে আর কত নির্যাতন করবে? আমাকে মেরে ফেল। না হলে যাকে পাব তাকে আস্ত রাখবো না।'

যান্ত্রিক ধরনের হাসি ভেসে এল কালো মূর্তির দিক থেকে। কথা ভেসে এল অনেকটা যান্ত্রিক স্বরে। বলল, 'হাজার বার শয়তান বল, তাতে কোন ক্ষতি নেই। আমরা যা চাই, তা সম্পূর্ণ পাওয়ার পথে। যতই চাও তুমি মরবে না। তোমাকে আরও বাঁচতে হবে।'

'কেন বাঁচতে হবে?' বলল কারিনা কারলিন তীব্র কণ্ঠে।

'কারণ তোমার মাল্টি বিলিয়ন ডলারের এস্টেট আমাদের হস্তগত হতে আরও কিছু সময় বাকি আছে। তোমার ডুপ্লিকেট যাকে আমরা বসিয়েছি তার সব কিছু ঠিক আছে, কিন্তু তার হস্তাক্ষর ও ফিংগার প্রিন্ট তোমার রেকর্ডেড হস্তাক্ষর ও ফিংগার প্রিন্টের সাথে মিলছে না। এগুলো ঠিক করতে সময় লাগছে। নিউ আরটিফিসিয়াল লেদার টেকনলজিতে তার ফিংগারের প্রিন্ট চেঞ্জ করা হচ্ছে। আর তোমার দুই মেয়ে আনালিসা অ্যালিনা, ব্রুনা ব্রুনহিল্ড ও আলদুনি সেনফ্রিডকে আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। তোমাকে মারার আগে তোমার দুই মেয়ে ও স্বামীকে আমরা হত্যা করব। তারা তোমার ডুপ্লিকেটকে পুরোপুরিই সন্দেহ করেছে। আমাদের হাত ফসকে তারা আত্নগোপন করেছে। তবে তাদের আমরা ধরবই। অতএব, চিন্তা করো না, তোমার মৃত্যুর দিন খুব দূরে নয়।' কালো মূর্তিটি বলল।

পাগলের মত হো হো করে হেসে উঠল কারিনা কারলিন। বলল, ‘তোমাদের কোন উদ্দেশ্যই সফল হবে না শয়তান। আমার এস্টেটটা আমার পূর্বপুরুষের অনেক পূণ্যের অর্জন। এটা কোন শয়তানের হাতে পড়তে পারে না। ঈশ্বর এই সম্পদ রক্ষা করবেন। তোমরা আমাকে আটক করেছ আমার স্বামী-সন্তানদেরও শেষ করতে পারবে, তা ভেব না শয়তান। ঈশ্বর আছেন।’

হো হো করে আগের মতই হেসে উঠল সেই কালো মূর্তি। বলল, ‘এতক্ষণে তোমার ছোট মেয়ে আমাদের হাতে এসে গেছে। একজনকে পাওয়া গেছে, অন্য দু’জনকে শীঘ্রই পাওয়া যাবে। একজন কিশোরীর মুখ খুলাতে খুব বেশি সময় লাগবে না, এটা ম্যাডাম তুমিও জানো।’

‘আমার এখন যেমন কিছু করার শক্তি নেই, সুযোগ নেই, তেমনি তোমার এসব কথাকে আমি ভয়ও করছি না। আমার ভরসা এখন একমাত্র ঈশ্বর। আমার স্বামী-সন্তানদের তাঁর হাতেই ছেড়ে দিয়েছি।’

‘কিছু করার যোগ্যতা যাদের থাকে না, তারাই এমন করে ধর্মের ভেক ধরে।’ সেই কালো মূর্তি বলল।

‘যারা শয়তান তারা এমন কথা বলতেই পারে। স্যাক্সনরা ধর্মের ভেক ধরে না। ধার্মিক স্যাক্সনরা বিভিন্ন রকম অধর্মের ভেকধারীদের মুখোশ খুলে দেয়, এ ইতিহাস একটু খুঁজলেই পাবে শয়তান।’ বলল কারিনা কারলিন।

কালো মূর্তির মুখ নড়ে উঠেছিল। কিন্তু তার কথা শুরুর আগেই মোবাইলের রিং বাজার শব্দ বেরুলো তার কালো ইউনিফরমের ভিতর থেকে। মুখ তার বন্ধ হয়ে গেল।

ধীরে ধীরে হাতটি তার পকেট থেকে মোবাইলে তুলে নিল।

‘হ্যাঁ, বল হেংগিস্ট, ওদের খবর কি?’ বলল কালো মূর্তি।

‘স্যার, খবর ভালো নয়। ওরা ব্রুনা ব্রুনহিল্ডকে হাতে পেয়েও রাখতে পারেনি। কেউ তাদের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে। আমাদের চারজন লোক আহত, এর মধ্যে তিনজন গুলি বিদ্ধ। আর...।’

ওপারের কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ ধমক দিয়ে বলে উঠল, ‘থাম, আমি তোমার কাছ থেকে ঘটনার রিপোর্ট চাইনি। বল, ব্রুনাকে কারা কেড়ে নিয়েছে? পুলিশ তো অবশ্যই নয়!’

‘না, পুলিশ নয়। একজন অপরিচিত লোক।’ ওপার থেকে বলল।

‘তোমরা গাঁজাখুরি গল্প সাজাচ্ছ? একজন অপরিচিত রাস্তার লোক দশ বারোজন সশস্ত্র লোকের কাছ থেকে ব্রুনাকে কেড়ে নিয়েছে? আসল ঘটনা কি বল।’ বলল কালো মূর্তি তীব্র ক্ষোভের সাথে।

‘স্যার, ঘটনাটা ঠিক স্যার। সালজবার্গের আমাদের আরও দু’টি সূত্র থেকেও আমাকে এই ঘটনাই জানানো হয়েছে।’ বলল হিংগিস্ট ওপার থেকে।

‘আমাদের ওরা কোথায়?’ বলল কালো মূর্তি।

‘ওরা নির্দেশের অপেক্ষা করছে।’ হিংগিস্ট বলল ওপার থেকে।

‘ওদের জন্যে আমার কি নির্দেশ জানো না তুমি? ওরা এখন শত্রুর সূত্র, শত্রুরা ওদের ফলো করবে। লায়েবিলিটি ওরা এখন।’ কালো মূর্তি বলল।

‘বুঝেছি স্যার, আগামী কালের সূর্যোদয় ওরা দেখতে পাবে না।’ বলল ওপার থেকে হিংগিস্ট।

এবার হো হো করে হেসে উঠেছে কারিনা কারলিন। বলল, ‘বললাম না শয়তান, ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বর আমার স্বামী-সন্তানদের রক্ষা করবেন। দেখলে ব্রুনাকে হাতে আনার তোমাদের ষড়যন্ত্র ঈশ্বর সফল হেত দিলেন না।’

কালো মূর্তিটি ক্রোধের সাথে মাটিতে সজোরে একটা লাথি ঠুকে বলল, ‘চুপ ম্যাডাম! আমার লোকদের ভুলে একবার ছাড়া পেয়েছে তোমার মেয়ে। কিন্তু আমাদের জালে সে ধরা পড়বেই। নিশ্চিত থাক, তোমার সামনেই ওকে আমরা টুকরো টুকরো করব অথবা তার লাশ তোমার কাছে আসবে।’

‘আমাকে ভয় দেখিও না। মৃত্যু ভয় না থাকলে তার আর কোন কিছুর ভয় থাকে না। স্বামী-সন্তানদের আগেই আমি ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দিয়েছি। তাদের কথা আমি ভাবিও না।’ বলল কারিনা কারলিন।

কারিনা কারলিনের কথা শেষ হতেই আবার মোবাইল বেজে উঠল সেই কালো মূর্তির।

মোবাইল ধরেই কালো মূর্তি বলল, ‘বল হিংগিস্ট, জরুরি কিছু?’

‘স্যার, যে লোকটি ব্রুনাকে কেড়ে নিয়েছে, তার সম্পর্কে কিছু জানা গেছে।

সে ইউরোপীয় নয়, এশিয়ার হতে পারে। আরও জানা গেছে সে আজ সকালে ব্রুনার সাথে সাক্ষাত করতে তার ফ্ল্যাটে গিয়েছিল। আজকের ঘটনার পর ব্রুনা ফ্ল্যাটে যায়নি। তাদের খোজা হচ্ছে।’ বলল হিংগিস্ট ওপার থেকে।

‘অবিশ্বাস্য! একজন এশিয়ান প্রায় ডজনের মত আমাদের লোকের কাছ থেকে ব্রুনাকে কেড়ে নিল। বলে দাও ওদের, যে কোন মূল্যে তাকে ও ব্রুনাকে আমি চাই। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে ওরা জার্মানিতে আসবে। অস্ট্রিয়া থেকে যত রাস্তা জার্মানিতে প্রবেশ করেছে সবক’টির উপর চোখ রাখতে বল। আর ইমিগ্রেশন পোস্টগুলোতে আমরা যে বন্দোবস্ত করেছি, তাকে জোরদার করে তোল।’ বলল কালো মূর্তিটি।

কালো মূর্তির কথা সমস্ত মনোযোগ দিয়ে শুনছিল কারিনা কারলিন। সে থামতেই বলে উঠল, ‘শোন শয়তানরা, তোমাদের এক ডজন লোক একজন এশিয়ানের সাথে পারেনি, এটাই ঈশ্বরের মার। মনে রেখ ঈশ্বরের মার তোমাদের উপর শুরু হয়েছে।’

কালো মূর্তির ডান হাতটা পকেটের মধ্যে ছিল। রিভলবার সমেত বের হয়ে এল তার হাত। তার রিভলবার উঠল কারিনা কারলিনের মাথা লক্ষে। কিন্তু মুহূর্তেই আবার রিভলবারটা নামিয়ে নিল সে। বলল, ‘তোমার জীবনের আরও কয়দিন বাকি। মারব সেদিন রিভলবার দিয়ে নয়। মারব মৃত্যু যন্ত্রণা কি তা যাতে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পার, সেভাবে। মনে রেখ, তোমার মেয়ে দু’টি নিয়ে আসব তোমার কাছে। তাদের নরম দেহের উপর শকুন লেলিয়ে দিয়ে ভোজের মহোৎসব করব। তখন বড় বড় কথা তোমার কোথায় যায় দেখব। এই যন্ত্রণার পর তোমার আসল মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হবে। অপেক্ষা কর।’

‘শয়তানরা শোন, কথাগুলো বলছ নিজেকে ঈশ্বর সাজিয়ে। ঈশ্বরই এর জবাব দেবেন। অপেক্ষা কর।’ বলল কঠোর কণ্ঠে কারিনা কারলিন।

‘ম্যাডাম! তুমি সব হারিয়েছ, দেহ থেকে শুরু করে সম্পদ, স্বামী, সন্তান সব তোমার গেছে, তবে দম্ভ তোমার যায়নি।’ বলল কালো মূর্তি।

‘প্রাণ থাকা পর্যন্ত এ দম্ভ আমার যাবে না। এ দম্ভ বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি। আমার সব তোমরা কেড়ে নিয়েছ, কিন্তু বিশ্বাস কেড়ে নিতে পারনি শয়তানরা।’ সেই কঠোর কণ্ঠে বলল কারিনা কারলিন।

‘হ্যাঁ, রাস্তার কুকুরের কিছুই থাকে না, কিন্তু তাদের ঘেউ ঘেউয়ের অভ্যাস যায় না!’ বলে কালো মূর্তিটি তার বুকের কালো একটা বাটনে চাপ দিল। সংগে সংগে দেয়ালে একটা দরজা খুলে গেল। সেই দরজায় এক লাফে ঢুকে গেল কালো মূর্তিটি।

# ৩

সারা দিন ধরে আহমদ মুসা গোটা সালজবার্গ ঘুরে বেড়িয়েছে। সাথে ছিল ব্রুনা ব্রুনহিল্ড।

জার্মানির প্রায় মাথার উপরে নয়নাভিরাম আল্পস-এর একটা সুন্দর খণ্ড অস্ট্রিয়ার এই ছোট্ট সালজবার্গ শহরটি মুগ্ধ করেছে আহমদ মুসাকে।

ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে আহমদ মুসা বেভিয়ান আল্পস-এর সুন্দর পাহাড়শৃঙ্গ, উপত্যকা, অপরূপ দৃশ্যের কিংস লেক রিভার, হিটলারের অবকাশ কেন্দ্র 'ঈগল নেসট', অস্ট্রিয়ার ওয়ান্ডার ল্যান্ড সালজবার্গের গ্রামীণ উপকন্ঠ, সালজবার্গের ঐতিহাসিক বারুক টাওয়ার, বিশপ রুপার্ট ও বেভিরিয়ান ডিউকদের শাসনকেন্দ্র ঐতিহাসিক গীর্জাগুলো দেখেছে। সবশেষে ঐতিহাসিক বারুক টাওয়ার থেকে বেরিয়ে আসার সময় ব্রুনা বলল, 'আপনাকে একজন সমঝদার ট্যুরিস্ট মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, আপনি সালজবার্গ দেখার জন্যেই এখানে এসেছেন। কেমন লাগছে স্যার, সালজবার্গকে?'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'সালজবার্গের যেটুকু আল্লাহর তৈরি, 'সেটুকু খুবই সুন্দর। কিন্তু যে অংশটা 'ম্যান মেড' মানে মানুষের তৈরি, সেটুকু অনেকটাই একঘেয়ে।'

'যেমন?' কিছুটা বিস্ময়ের সাথে বলল ব্রুনা।

'সালজবার্গে কনসার্ট হল ও গীর্জার ছড়াছড়ি দেখছি। এই যে বারুক টাওয়ার থেকে বেরুলাম, সেটাও নাচ-গান জাতীয় শিল্পের জন্যে তৈরি। মনে হচ্ছে এদিকের মানুষের মন আছে, মাথা নেই। আবার দেখ, বড় বড় স্থাপনাগুলো গীর্জা। সেগুলোর আকৃতি যাই হোক, প্রকৃতিটা পোড়ো বাড়ির মত মানে মানুষের আত্মা আছে কিন্তু মানুষের প্রাণস্পন্দন এখানে নেই।' আহমদ মুসা বলল।

‘গীর্জাগুলো পুরানো, প্রাণহীন এটা বুঝলাম। কারণ খুব কম মানুষই গীর্জায় যায়। নতুন গীর্জাও তৈরি হচ্ছে না এ কারণেই। কিন্তু এখনকার মানুষের মাথা নেই, একথা বলছেন কেন?’ বলল ব্রুনা। তার মুখে হাসি।

‘নাচ-গান বা এ ধরনের কমর্কাণ্ড যাদের আনন্দের একমাত্র বা প্রধান উৎস হয়ে দাঁড়ায়, তাদের মাথা থাকে না। ধীরে ধীরে মহৎ কাজ, মহৎ চিন্তা ও মহৎ সৃষ্টির ক্ষমতা তাদের লোপ পায়। গ্রীক সভ্যতার শেষ দিকে এটাই ঘটেছিল এবং তার ধ্বংসও ত্বরান্বিত হয়েছিল।’ আহমদ মুসা বলল।

গম্ভীর হয়ে উঠল ব্রুনার মুখ। বলল, ‘অনেক ভারি কথা বলেছেন স্যার। আমি এত কিছু জানি না। তবে নাচ-গান শিল্প-সংস্কৃতির অংগ। এটা ক্ষতিকর কেন হবে?’

‘ওষুধ মাত্রা ও সীমার মধ্যে না থাকলে বিষ হয়ে দাঁড়ায়। একইভাবে উপাদেয় খাদ্যও ভয়ানক ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াতে পারে।’ বলল গম্ভীর কন্ঠে আহমদ মুসা।

আনন্দ-বিস্ময় ব্রুনার চোখে-মুখে! বলল ‘স্যার, অ্যালিনা আপার কথা শুনে মনে হয়েছিল, আপনি একজন বড় গোয়েন্দা বা অস্ত্রধারী অ্যাক্টিভিস্ট। আজ নিজ চোখে যা দেখলাম তাতে সেই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছিল। কিন্তু এখন দেখছি, আপনি একজন সমাজ সংস্কারক বা দার্শনিকের ভাষায় কথা বলছেন!’

‘একজন সৈনিক আদর্শ চর্চা, দর্শন চর্চা করতে পারে না?’ আহমদ মুসা বলল।

‘পারে হয়তো, জানি না আমি। আপনার মধ্যেই প্রথম দেখলাম তাই বলছিলাম।’ বলল ব্রুনা।

মুহূর্তের জন্যে থেমেছিল ব্রুনা। তারপরেই গাড়ির দরজা খুলে আহমদ মুসাকে বসার জন্যে স্বাগত জানিয়ে বলল, ‘স্যার, শহরের তেমন আর কিছু দেখার বাকি নেই। আপনার উৎসাহে স্যার শহরের অনেক কিছু আমারও দেখা হয়ে গেল। ধন্যবাদ, এমন উৎসাহ স্যার, জাত-ট্যুরিস্টদেরও থাকে না। এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি স্যার?’

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘আমি সারা দিন ধরে শহর ঘুরলাম শহর দেখার জন্যে নয় ব্রুনা।’

‘তাহলে?’ চোখে-মুখে বিস্ময় ব্রুনার।

‘দুই কারণে আমি সারা দিন শহর ঘুরলাম। তার একটি হলো, আমি দেখতে চেয়েছিলাম শত্রুপক্ষের কেউ আমাদের অনুসরণ করে কিনা। আর দ্বিতীয় কারণ…।’

আহমদ মুসার কথার মধ্যখানে ব্রুনা বলে উঠল, ‘শত্রুরা আমাদের পিছে পিছে আছে?’ উদ্বেগ ফুটে উঠেছে ব্রুনার মুখে।

‘পিছু তো নেবার কথা। কিন্তু সারা দিনেও ওদের দেখা পাইনি। তার অর্থ হলো, আমরা ওদের নজরে নেই।’ বলল আহমদ মুসা।

স্বস্তির নি:শ্বাস ফেলে ব্রুনা বলল, ‘ভালো খবর স্যার।’

‘এই ভালো সব ভালো নাও হতে পারে।’ আহমদ মুসা বলল।

কথা শেষ করেই আবার বলে উঠল, ‘তাহলে এবার চল।’

‘না স্যার, দ্বিতীয় কারণটা তো জানাই হলো না। বলুন স্যার, দ্বিতীয় কারণটা কি?’ ব্রুনা বলল।

‘হ্যাঁ, সেটা হলো সময় কিল করা।’ বলল আহমদ মুসা।

‘কেন? সময় কিল করা কেন?’ জিজ্ঞাসা ব্রুনার।

‘তোমার আব্বাকে এখানে আসার সময় দেবার জন্য’। বলল আহমদ মুসা।

আমার আব্বা এখানে আসবেন? কেন? তিনি তো বলেছেন আমরা ক্রুমসারবার্গে পৌঁছার পর তাঁকে জানালে তিনি সেখানে আসবেন।’ ব্রুনা বলল।

‘আমি তাঁকে সালজবার্গে আসতে বলেছি।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আপনি বাবাকে সালজবার্গে আসতে বলেছেন? কেন স্যার?’ ব্রুনা বলল। তার চোখে-মুখে বিস্ময়।

‘আমাদের একজন তৃতীয় সাথী দরকার।’ বলল আহমদ মুসা।

‘তা না হলে আমাদের দু’জনের জন্যে এক সাথে চলা সম্ভব নয়।’ আহমদ মুসা বলল।

চোখে-মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল ব্রুনার! বলল, 'কেন দু'জন এক সাথে চলা সম্ভব নয়?'

একটা গাম্ভীর্য নেমে এল আহমদ মুসার মুখে। বলল, 'তুমি নিশ্চয় জান না ব্রুনা, আমাদের ধর্ম ইসলামে পরস্পরের মধ্যে বিবাহ বৈধ এমন ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশা, নির্জন কক্ষে থাকা বা সাক্ষাত ইত্যাদি ধরনের কাজ নিষিদ্ধ।'

'হ্যাঁ, তাতে আমরা দু'জন এক সঙ্গে চলার পথে অসুবিধা কোথায়?' জিজ্ঞাসা ব্রুনার।

'অসুবিধার বিষয়টা বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়। এক কথায় উত্তর হলো, আমাদের ধর্মের যে জীবনাচরণ তাতে এই এক সংগে চলার কোন সুযোগ নেই।' বলল আহমদ মুসা।

'কেন?' ব্রুনা বলল বিস্ময়ের সাথে!

'যাদের সাথে অবাধে মেলামেশা করা যায় এমন ঘনিষ্ঠ আত্নীয় তুমি আমার নও।' বলল আহমদ মুসা।

'তাতে কি? অনাত্নীয়ের সাথে কি পথ চলে না মানুষ?' ব্রুনা বলল।

'চলে। আমারও চলতে আপত্তি নেই। কিন্তু সাথে তোমার পিতা ধরনের কাউকে থাকতে হবে।' বলল আহমদ মুসা।

'কিন্তু কেন, এই কথা আমি জানতে চাচ্ছি।' ব্রুনা বলল।

'দেখ ব্রুনা, বিষয়টি নর-নারীর অবৈধ সম্পর্ক ও অপরাধ বিস্তারের সাথে জড়িত। নর-নারীর বিবাহবহির্ভূত অবৈধ সম্পর্ক আমার ধর্ম ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। কারণ নর-নারীর অবাধ মেলামেশা থেকে এই অবৈধ সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। আমরা এক সাথে চলতে গেলে যে অবাধ মেলামেশা হবে, তা আমাদের ধর্মে গ্রহণযোগ্য নয়।' বলল আহমদ মুসা।

ব্রুনার মুখ লাল হয়ে উঠল। কিছুটা বিব্রত ভাবও ফুটে উঠল তার চোখে-মুখে। বলল, 'স্যার, আমাদের সম্পর্কেও কি এমন ভাবা যায়?'

'এটা তোমার আমার কথা নয়। মানব প্রবণতাকে সামনে রেখে এটা মানুষের জন্যে তৈরি নৈতিক বিধান। এর অন্যথা হলে নারী-পুরুষের সম্পর্ক

অবৈধ, এটা অপরাধের পর্যায়ে যে কোন সময় পৌঁছে যেতে পারে।' বলল আহমদ মুসা।

'এটা একটা আশংকার ব্যাপার।' ব্রুনা বলল।

'এটা আশংকার ব্যাপার নয় ব্রুনা। যা সমাজে ঘটে চলেছে তাকে আশংকা বলতে পার কেমন করে? বেশি দূরে যাওয়ার দরকার নেই। তুমি যে এলাকায় বাস কর সে এলাকা, তোমার স্কুল, তোমার কলেজ, তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে একবার নজর দাও। দেখবে, ছেলেমেয়ে, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা কত ধরনের ব্যক্তিগত সামাজিক সমস্যা, কত দু:খজনক ঘটনা ও সংঘাতের সৃষ্টি করেছে।' বলল আহমদ মুসা।

সংগে সংগেই উত্তর দিল না ব্রুনা। ভাবল কিছুক্ষণ সে। বলল, 'আমি বুঝতে পেরেছি স্যার। আপনি ছেলেমেয়েদের বিশেষ দিকের প্রতি ইংগিত করেছেন। এটা ঠিক স্যার, এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা সাংঘাতিক বিশৃঙ্খলা সমাজে রয়েছে।'

'তুমি কি মনে কর, এই বিশৃঙ্খলা কি সবাই চায়?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

ব্রুনা একটু ভেবে বলল, 'স্যার, বিষয়টা কারও চাওয়া বা না চাওয়ার উপর নেই। পিতা-মাতা চাইলেও, প্রশাসন চাইলেও কারও কিছু করার নেই। বিষয়টা ব্যক্তি স্বাধীনতার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কে কার সাথে কতটুকু সম্পর্ক করবে, তা এখন ব্যক্তির একক অধিকার।'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'বিশৃঙ্খল ও অস্বাভাবিক সম্পর্কের সবটা কি ব্যক্তির ইচ্ছায় ঘটছে?'

মুহূর্তের জন্যে চুপ থেকে বলল, 'ইচ্ছা-অনিচ্ছা দু'ভাবেই ঘটছে।'

'জবরদস্তিমূলকভাবে ঘটছে না?' আহমদ মুসা বলল।

'তাও ঘটছে।' বলল ব্রুনা।

'আচ্ছা বলত, ইচ্ছায় যা ঘটছে তার বড় একটা অংশ কি অবস্থাগত চাপে ঘটছে না?' আহমদ মুসা বলল।

সংগে সংগেই উত্তর দিল না ক্রুনা। ভাবল। বলল, ‘ঠিক স্যার, অবস্থাগত চাপেই এটা বেশি ঘটছে। পরিবেশ, অবস্থা ছেলেমেয়েদের এমন অবস্থানে নিয়ে যায় যখন ইচ্ছা সৃষ্টি হয়ে যায়।’

‘এই ইচ্ছা স্বেচ্ছাগত নয়। অবস্থা, অস্বাভাবিক পরিবেশ, অন্যায় পথে সৃষ্টি করছে এই ইচ্ছা। যা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ কাঠামোকে ধ্বংস করছে।’ বলল আহমদ মুসা।

ক্রুনা কোন জবাব দিল না। তাকিয়ে রইল আহমদ মুসার দিকে। তার ভিতরে একটা প্রচণ্ড তোলপাড়। সে কোন দিন ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে এই দৃষ্টিতে দেখেনি। সমাজ চিত্রের একটা নতুন দিগন্ত তার সামনে খুলে গেল। ছেলেমেয়েদের অবাধ-মেশাই অবাঞ্ছিত অধিকাংশ ঘটনার জন্যে দায়ী, তাতো সে অস্বীকার করতে পারছে না। সে নিজের কথা ভাবল। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে বারবার কি এমন বিপদে পড়েনি? আজ যেন ভয় হচ্ছে পেছনের সে কথাগুলো ভাবতে। কিন্তু পরিবারও কি ধ্বংস হচ্ছে এ কারণে! প্রতিবেশী, আত্নীয়-স্বজনসহ চল্লিশ-পঞ্চাশটি পরিবারের সাথে সে ঘনিষ্ঠ। এর মধ্যে তার ও আরেকটি পরিবার ছাড়া বিশ পঁচিশ বছর বিবাহ টিকেছে এমন দম্পতি নেই। অধিকাংশ বিয়েই চার-পাঁচ বছরের মধ্যে ভেঙে যাচ্ছে। এক-চতুর্থাংশেরও বেশি পরিবার সিংগল, হয় মা ছাড়া না হয় পিতা ছাড়া। বিয়ে না করার হারও সাংঘাতিকভাবে বাড়ছে। তার ঘনিষ্ঠ চল্লিশ-পঞ্চাশটি পরিবারের অর্ধেকের কোন বাচ্চা নেই। তাদের অনেকেই অনাথ শিশুর প্রতিষ্ঠান থেকে শিশু দত্তক নিয়েছে। সম্ভবত দশ বারটি পরিবারে ১টি করে শিশু আছে। মাত্র সাত আটটি পরিবারের আছে একাধিক সন্তান। এই শিশুগুলো আবার খুব অল্প সময়ই পরিবারের সাথে থাকে। সারা দিন চাইল্ডকেয়ার সেন্টারে কাটিয়ে তারা বাড়িতে আসে রাতে ঘুমাবার জন্যে। মনে পড়ে তার, তার স্কুলে প্রার্থনা দিবসের অনুষ্ঠানে আসা একজন ফাদার বলেছিলো, ‘খৃস্টীয় জ্ঞান ও শিক্ষার অভাবে খৃস্টীয় সমাজের পরিবারগুলো আজ ধ্বংসের মুখে। অনাচার আজ আচারকে গ্রাস করে ফেলেছে।’ এই কথাগুলোর অর্থ সেদিন বুঝেনি সে। আজ তার অর্থ তার কাছে পরিস্কার হয়ে গেল।

পারিবারিক কাঠামো ধ্বংসের বিষয়ে ফাদারের কথাটা ঠিক। কিন্তু অবাধ মেলামেশাই কি এর কারণ?

মুখ তুলল ব্রুনা। বলল, 'স্যার, ছেলেমেয়ে, নারী-পুরুষের মেলামেশাই কি ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের এত বড় বিপর্যয় ঘটাচ্ছে?'

'না ব্রুনা, এই সমাজ-পরিবেশের সৃষ্টি করেছে যে ধর্মনিরপেক্ষ, নীতি-বিমুখ জীবনদৃষ্টি, তাই এ অবাধ মেলামেশা যা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের বিপর্যয়ের জন্যে দায়ী।'

'তাহলে তো স্যার পশ্চিমা সভ্যতা-সমাজ এজন্য দায়ী হয়ে যায়!' ব্রুনা বলল।

'একটা বা কিছু কারণের জন্যে একটা সভ্যতা-সমাজকে দায়ী করা যায় না। একটা সভ্যতা অনেক বড়। তাতে অনেক কিছু খারাপ, অনেক কিছু ভালো থাকে। আবার অনেক খারাপ থাকলে তার মধ্যে কিছু ভালোও থাকে। পশ্চিমী জীবন ও সভ্যতার মধ্যে ভালোটাই বেশি।' বলল আহমদ মুসা।

'কিন্তু স্যার, আমাদের ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের এই অবস্থার জন্যে আমাদের সভ্যতাই তো দায়ী, আমি এখন যা বুঝেছি।' ব্রুনা বলল।

'এটা সভ্যতার একটা দিক মাত্র। দিকটা ফিলোসফিক্যাল বা দর্শনগত। এদিকটা বাদ দিয়ে পশ্চিমী সভ্যতা মানুষের ব্যবহারিক জীবনের জন্যে হাজারো যন্ত্র ও ব্যবস্থার সৃষ্টি করেছে। কোন কথাই এর প্রশংসার জন্যে যথেষ্ট নয়।' বলল আহমদ মুসা।

'সভ্যতার ফিলোসফিক্যাল দিকটা কি? সেখানে ক্রটিটা কি স্যার?' ব্রুনা বলল।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'অনেক বড় প্রশ্ন। এখন আলোচনার সময় নয় এটা ব্রুনা। তবে এটুকু বলা যায়, তোমাদের সভ্যতা মানুষকে দেহসর্বস্ব মনে করেছে। তারা কাজ করবে, খাবে, আনন্দ-ফুর্তি করবে এবং তারপর একদিন জীবনের ইতি ঘটে যাবে। মানুষের বিচার-বুদ্ধি আছে এবং তার একজন স্রষ্টা আছেন, মানব-জীবন বিষয়ে স্রষ্টার একটা উদ্দেশ্য আছে, এসব অস্বীকার করে তোমাদের সভ্যতা। মানুষের জীবনোত্তর কোন ভবিষ্যত যদি না থাকে, বাঁচার

জন্যে খাওয়া আর বাঁচা যদি হয় যথেচ্ছ জীবন-উপভোগের জন্যে, তাহলে মানুষ সব ক্ষেত্রেই স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রীয় আইন চেষ্টা করে একে নিয়ন্ত্রিত করতে। কিন্তু মানুষের তৈরি, মানুষের দ্বারা বাস্তবায়িত আইন মানুষের জীবনের সবক্ষেত্রে পৌঁছতে পারে না। শুধু ভয় দেখিয়ে চাপ দিয়ে মানুষের মন নিয়ন্ত্রণ হয় না। তোমাদের সভ্যতা তা পারেনি ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে অনেক সাফল্য সত্ত্বেও তোমাদের সভ্যতা এখানে এসে ব্যর্থ।'

'স্যার, আপনি মরালিটি মানে নৈতিকতার কথা বলছেন যার কারণে মানুষ স্বতস্ফুর্তভাবে অপরাধ থেকে দূরে থাকে। আমার একটা বিস্ময়, পশ্চিমী সভ্যতা মানুষের মধ্যে এই নৈতিকতা সৃষ্টি করতে পারলো না কেন!' ব্রুনা বলল।

'কারণ তোমাদের সভ্যতা ধর্মনিরপেক্ষ। নৈতিকতা আসে সার্বজনীন নীতিবোধ থেকে। সার্বজনীন নীতিবোধ আসে জগতসমূহের স্রষ্টার কাছ থেকে।' বলল আহমদ মুসা।

'কেন ধর্ম, স্রষ্টা ছাড়া এই নীতিবোধ মানুষ সৃষ্টি করতে পারে না?' ব্রুনা বলল।

'পারে না। তোমাদের সভ্যতা তার প্রমাণ।' আহমদ মুসা বলল।

'কেন পারে না, সেটাই আমার প্রশ্ন।' ব্রুনা বলল।

'করতে পারে না নয় ব্রুনা, করতে পারে। কিন্তু সেটা মানব রচিত আইন হয়, স্রষ্টার দেয় নৈতিক আইন হয় না। মানুষের আইনের বাস্তবায়ন হয় মানুষের পুলিশ দ্বারা, কিন্তু স্রষ্টার আইনের বাস্তবায়ন করতে পুলিশের দরকার হয় না। একটা উদাহরণ দিচ্ছি ব্রুনা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মদের ভয়াবহ বিস্তার রোধ করার জন্য মদ নিষিদ্ধ করে আইন তৈরি হয়। এই আইন তৈরির পর মদ তৈরির গোপন কারখানা সাংঘাতিকভাবে বেড়ে যায় এবং মদের বিস্তারও বেড়ে যায়। আইন ও পুলিশ তা রোধ করতে পারেনি। মার্কিন সরকার শেষে মদ নিষিদ্ধের আইন বাতিল করতে বাধ্য হয়। এর পাশাপাশি দেখ, স্রষ্টার বিধান হিসাবে মুসলমানদের মধ্যে মদ নিষিদ্ধ। মুসলিম সমাজ দেখ সাধারণভাবে মদমুক্ত। ব্যতিক্রম হিসাবে মুসলিম সমাজে যারা মদ খায়, তারা অনেকটা গোপনে খায় এবং একে অপরাধ বলে মনে করে। দেখা যায় মদ্যপরাও এই কারণে মদ এক সময় ছেড়ে দেয়।

স্রষ্টার এই বিধান বাস্তবায়নে কোন সময় পুলিশের দরকার হয়নি, এখনও হয় না এবং জেনে রেখ কখনই হবে না। স্রষ্টার দেয়া বিধানের এটাই শক্তি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কিন্তু স্যার, খৃস্টান সমাজে তো এমন হয় না! খৃস্ট দর্শনেও তো ধর্ম, ঈশ্বরকে মানা হয়!’ বলল ব্রুনা।

‘কিন্তু এখন খৃস্টান সমাজে ধর্ম ও ঈশ্বর তো শুধু গীর্জায়! গীর্জার বাইরে তোমরা সবাই ধর্মনিরপেক্ষ।’ বলল আহমদ মুসা।

‘বুঝলাম স্যার। কিন্তু আমাদের ধর্ম থেকে আপনার ধর্মের পার্থক্য কোথায়? আমি আমার আনালিসা আপার কথায় বুঝেছি তিনি আপনার ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। আপনাদের ধর্মে কি আছে, আমাদের ধর্মে তা নেই কেন? গীর্জার বাইরে আমরা ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে গেলাম কি করে?’ বলল ব্রুনা।

‘এক কথায় এর উত্তর নেই ব্রুনা। সংক্ষেপে এটুকু জেনে রাখ, ঈশ্বর বা আল্লাহ তোমাদের ধর্মেও আছেন, আমাদের ধর্মেও আছেন, কিন্তু তোমাদের ধর্মগ্রন্থে জীবন ব্যবস্থা নেই, আমাদের ধর্মগ্রন্থ গোটাটাই মানুষের জীবন ব্যবস্থা। আমাদের ধর্মগ্রন্থের প্রথম বাক্যটাই হলো, ‘এই গ্রন্থ, যাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই, যারা স্রষ্টা বা আল্লাহকে ভয় করে এটা তাদের পথনির্দেশিকা।’ তোমাদের ও আমাদের ধর্মের মধ্যে এটাই পার্থক্য।’

‘তাহলে তো আমাদের ধর্মে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই নেই, কিন্তু কেন…।’

কথা শেষ করতে পারলো না ব্রুনা।

একটা গাড়ি এসে আহমদ মুসাদের গাড়ির পাশে দাঁড়াল।

ব্রুনা কথা শেষ না করেই সেদিকে তাকাল।

গাড়ি থেকে নামল সুবেশধারী একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক।

ভদ্রলোককে দেখেই ব্রুনা উচ্ছ্বসিত কন্ঠে বলে উঠল, ‘বাবা তুমি? এখানে?’

বলে ছুটে গিয়ে ব্রুনা তার পিতার কাঁধ আঁকড়ে ধরে পাশে দাঁড়াল।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক ব্রুনার পিতা আলদুনি সেনফ্রিড।

আলদুনি সেনফ্রিড 'ভালো আছ মা' বলে মেয়ে ব্রুনার পিঠ চাপড়ে আহমদ মুসার দিকে এগোলো।

আহমদ মুসাও এগিয়ে আসছিল।

আহমদ মুসা ও আলদুনি সেনফ্রিড হ্যান্ডশেক করল। হ্যান্ডশেক করেই আলদুনি সেনফ্রিড বলে উঠল, 'ওয়েলকাম মি. আহমদ, প্রথমে আমার কৃতজ্ঞতা আপনাকে জানাতে চাই, আমি ব্রুনার কাছে সব শুনেছি। মনে হচ্ছে, খোদ ঈশ্বর আপনাকে পাঠিয়েছেন।'

'ধন্যবাদ আপনাকে। আমরা আপনারই অপেক্ষা করছিলাম। ঠিক সময়ে এসেছেন আপনি।' বলল আহমদ মুসা।

ব্রুনা ছুটে এসে তার পিতা ও আহমদ মুসার সামনে দাঁড়াল। বলল, 'বাবা, এই সময় তোমার এখানে আসার কথা ছিল?'

বলেই ঘুরে দাঁড়াল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'স্যার, আমাকে তো কিছু বলেননি?'

'একটু সারপ্রাইজ দেয়া আর কি!' একটু হেসে আহমদ মুসা বলল।

'কিন্তু পথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা কেন? বাসায় করা যেত না?' ব্রুনা বলল।

'তোমার বাসার উপর যে শত্রুর চোখ থাকবে, সেটা খুবই স্বাভাবিক।' বলল আহমদ মুসা।

ব্রুনা মুহূর্ত কাল আহমদ মুসার দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে বলল, 'ধন্যবাদ স্যার, সত্যিই আপনি বিস্ময়। আপনি কিছুক্ষণ আগে ছিলেন সমাজ-দর্শন নিয়ে একজন ভাবুক মানুষ। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আপনি একজন প্রফেশনাল গোয়েন্দা!'

একটু থামল। থেমেই তার পিতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আব্বা, তুমি তো চিনেছই ইনি আহমদ মুসা। তুমি বলেছ, এঁকে ঈশ্বর পাঠিয়েছেন। কিন্তু সিলেকশন আমার বোনের। আব্বা, আমি আমার বোনের জন্যে গর্বিত যে, সে বিস্ময়কর এক মানুষকে সিলেক্ট করেছেন এবং রাজী করিয়েছেন আমাদের সাহায্য করার জন্যে। কিন্তু আমি...।'

আহমদ মুসা ব্রুনাকে থামিয়ে দিয়ে একটু শক্ত কন্ঠে বলে উঠল, 'ব্রুনা, এ ধরনের প্রশংসা ভালো জিনিস নয়। যেটুকু যার যোগ্যতা, সেটুকু তার আল্লাহর দেয়া। প্রশংসা করলে আল্লাহরই করা উচিত। যাক, আসল কথায়...।'

'স্যরি স্যার। আমি...।' আহমদ মুসার কথার মাঝখানেই কথা বলা শুরু করেছিল ব্রুনা।

'প্লিজ ব্রুনা, আমি কথা বলতে শুরু করেছি।' ব্রুনাকে থামিয়ে দিয়ে বলল আহমদ মুসা। আহমদ মুসার মুখে স্বচ্ছ হাসি।

আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে সম্মতি সূচক মাথা নাড়ল ব্রুনা। তার চোখে-মুখে কিছুটা বিব্রত ভাব।

'জনাব সেনফ্রিড, আপনাকে আমি বলেছি আজই আমরা ব্রুমসারবার্গ যাত্রা করব। যাবার পথ সম্পর্কে আপনার চিন্তা বলুন।'

'কিন্তু আহমদ মুসা ব্রুমসারবার্গে যাওয়া কি আমাদের জন্যে ঠিক হবে? ওটা তো এখন শত্রুর গুহা!' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

'যেখানে কাহিনীর শুরু সেখানে গিয়েই কাহিনীর জট খুলতে হয় মি. সেনফ্রিড।' আহমদ মুসা বলল।

'কাহিনীর জটটা কি মি. আহমদ মুসা?' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

'কারিনা কারলিন আপনার স্ত্রী, কেন কারিনা কারলিনের মত নয়? যদি উনি কারিনা কারলিন না হন, তাহলে তিনি কে? আসল কারিনা কারলিন মানে আপনার আসল স্ত্রী তাহলে কোথায়? হুবহু একই চেহারার! বয়সের কিছুটা পার্থক্য ছাড়া, দুই কারিনা কারলিনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, এর রহস্যটা কি? ইত্যাদি।' আহমদ মুসা বলল।

'এসব কথা ব্রুনা ইতিমধ্যেই আপনাকে বলেছে?' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

'না মি. সেনফ্রিড, গৌরী মানে আপনার মেয়ে আনালিসা অ্যালিনার ডাইরি থেকে আমি জেনেছি।' আহমদ মুসা বলল।

'ডাইরি থেকে? সে কিছু বলেনি?' জিজ্ঞাসা আলদুনি সেনফ্রিডের।

‘তার সাথে এ ধরনের কথা হওয়ার মত সম্পর্ক তার মৃত্যু পর্যন্ত হয়নি।’ আহমদ মুসা বলল।

আলদুনি সেনফ্রিডের চোখে-মুখে বিস্ময় নামল! বলল, ‘তাহলে অ্যালিনা আপনাকে দায়িত্ব দিল কখন? কি দায়িত্ব তাহলে আপনি নিলেন?’

‘দায়িত্ব সে দেয়নি। দায়িত্ব তার কাছ থেকে আমি নেইনি।’ আহমদ মুসা বলল।

চোখ দু’টি ছানাবড়া হয়ে গেল আলদুনি সেনফ্রিডের। বলল, ‘ব্রুনা তো এটাই বলল! আমিও তাই বুঝেছি। আর দায়িত্ব না দিলে, দায়িত্ব না পেলে আপনি এলেন কেন এখানে?’

‘মুমূর্ষ গৌরী মানে আনালিসা অ্যালিনা তার জ্যাকেটের পকেটে তার ডাইরির কথা আমাকে বলে সে ডাইরিটা আমাকে পড়তে অনুরোধ করেছিল। তার ডাইরি পড়েই এই দায়িত্ব আমি গ্রহণ করেছি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘মানে আপনি নিজের থেকেই এই দায়িত্ব নিয়েছেন!’ বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

‘হ্যাঁ, আমি নিজের থেকেই নিয়েছি। তবে গৌরী আশা করেছিলেন, দায়িত্ব আমি নিই। তা না হলে ডাইরির শেষ কথাগুলো আমাকে উদ্দেশ্য করে লিখলেন কেন? আরেকটি বিষয়, আমি গৌরীর কাছে ঋণী। উনি আমার শত্রুপক্ষের একজন শীর্ষ ব্যক্তি হয়েও আমার কঠিন দু:সময়ে অযাচিতভাবে তিনি আমাকে সাহায্য করেছেন এবং সর্বশেষে নিজের জীবন দিয়ে আমাকে বাঁচিয়েছেন।’

আলদুনি সেনফ্রিডের চোখে-মুখে বিস্ময়! বলল, ‘কেন তা করেছে অ্যালিনা?’

‘হয়তো নীতিগত কারণে। আমার অবস্থানকে সে ঠিক মনে করেছে। এ নিয়ে কোন কথা বলার সুযোগ তার সাথে কখনও হয়নি।’ বলল আহমদ মুসা।

কথা শেষ করে মুহূর্ত থেমেই আবার বলে উঠল আহমদ মুসা, ‘যাক, এসব মি. সেনফ্রিড, জরুরি কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাক।’

আবার একটু থামল আহমদ মুসা। বলল পরক্ষণেই, 'আসুন, আমরা গাড়িতে বসে কথা বলি।'

আলদুনি সেনফ্রিড তার ভাড়া করা গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল।

আহমদ মুসা এসে গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসল। আলদুনি সেনফ্রিড ও ব্রুনাকে বসতে বলল পেছনের সিটে।

আহমদ মুসা সামনের দুই সিটের ফাঁকে আলদুনি সেনফ্রিডদের দিকে ফিরে বসেছে। সেই কথা শুরু করল। বলল, 'আমরা এখনি ব্রুমসারবার্গে যাত্রা করব। যাওয়ার রুট ও সমস্যা সম্পর্কে আপনি কিছু বলুন।'

সালজবার্গ থেকে ব্রুমসারবার্গে যাওয়ার কয়েকটা রুটের বিবরণ দিয়ে আলদুনি সেনফ্রিড বলল, 'যাওয়ার পথে এমনিতেই কোন সমস্যা দেখি না। আপনি কোন ধরনের সমস্যার কথা বলছেন?'

'ইমিগ্রেশন চেক-পয়েন্টে কোন সমস্যার আশংকা আছে কিনা?' আহমদ মুসা বলল।

'ওখানে ন্যাশনাল আইডি দেখানোই যথেষ্ট। আর কোন সমস্যা ওখানে নেই। আপনি কি অন্য কোন সমস্যার কথা বলছেন?' বলল সেনফ্রিড।

আহমদ মুসা কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেও কিছু না বলে চুপ করে গেল। বলল, 'চলুন, এবার আমরা যাত্রা করতে পারি।'

'মি. আহমদ মুসা গাড়িটা কার? ব্রুনার তো নয় নিশ্চয়!' বলল আলদুনি সেনিফ্রিড।

'গাড়িটা আমার। কিনেছি। একটা রেন্ট-এ-কার কোম্পানিতে রেজিস্টার্ড। আর আমার পরিচয় আমি এ গাড়ির কমার্শিয়াল ড্রাইভার। আপনারা আমার যাত্রী। ওকে?' আহমদ মুসা বলল।

আলদুনি সেনফ্রিড ও ব্রুনার মুখ বিস্ময়ে হা হয়ে গেছে! আহমদ মুসার মত এত বড় মানুষ, তাদের পরিবারের আজকের আশা-ভরসারস্থল আহমদ মুসা তাদের ট্যাক্সি ড্রাইভার হয়ে গেল। আর এসব সে করল কখন, ভেবেই পেল না তারা।

স্তম্ভিত সেনফ্রিড ও ব্রুনা কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারলো না। নিরবতা ভেঙে কথা বলল সেনফ্রিড, 'সত্যি অবাক হওয়ার মত কথা আপনি বললেন। কিন্তু কমার্শিয়াল ড্রাইভারের জন্যে কমার্শিয়াল লাইসেন্স দরকার। আপনি লাইসেন্স পাবেন কোথায়?'

'আমি অস্ট্রিয়াতে এসেই কমার্শিয়াল ইউরো ড্রাইভিং লাইসেন্স করে নিয়েছি।' আহমদ মুসা বলল।

'তার মানে সবই আপনার আগাম পরিকল্পনার ফল!' চোখ কপালে উঠেছে আলদুনি সেনফ্রিডের।

ব্রুনার মুখে এবার বিস্ময় নয় আনন্দে উজ্জ্বল! তার মনে অনেক কথার আকুলি-বিকুলি, তার অ্যালিনা আপা অনেক বড় দিলের ছিল। অনেক বড় না হলে এত বড় মানুষকে কাছে টানলেন কি করে! ব্রুনার সৌভাগ্য এমন মানুষকে সে কাছে পেয়েছে।

আলদুনি সেনফ্রিড বিস্ময়জড়িত কন্ঠেই বলল, 'কিন্তু আহমদ মুসা আপনার পাসপোর্টে পেশা হিসাবে কি লেখা আছে?'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'আমার পেশা আমার পাসপোর্টে লিখে নিয়েছি শখের গোয়েন্দাগিরি। গোয়েন্দারা তার প্রয়োজনে যে কোন ছদ্মবেশ নিতে পারে।' আহমদ মুসা বলল।

'গোয়ান্দারা নিজের দেশে ও বাইরেও পরিচয় গোপন করে কাজ করে। কিন্তু আপনি পাসপোর্টে যে পরিচয় লিখেছেন, সরকার অসুবিধা করবে না?' বলল ব্রুনা। তার চোখে-মুখে কিছুটা উদ্বেগ।

'সে অসুবিধা যাতে না হয়, এ জন্যে আমি ইউরো ভিসা নেয়ার সময় এ ব্যাপারে বিশেষ অনুমতি নিয়ে এসেছি।' আহমদ মুসা বলল।

'সত্যিই এক বিস্ময় আপনি! অদ্ভুত দূরদর্শিতা আপনার! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, আপনাকে আমরা আমাদের পাশে পেয়েছি। সত্যি, যাদের কেউ থাকে না, ঈশ্বর তাদের এভাবেই সহায় হন। কৃতজ্ঞ আমরা আপনার কাছে।' বলল আলদুনি সেনফ্রিড। তার কন্ঠ ভারি।

'আপনি গৌরী ও ব্রুনার পিতা। আমারও পিতৃস্থানীয়। আমাকে দয়া করে 'তুমি' বলবেন।'

'ধন্যবাদ আহমদ মুসা। বিনয়ের দিক দিয়েও তুমি মনে হয় সবার সামনে থাকার মত। আসলে যে মানুষকে সম্মান দেয়, সে সকলের সম্মান পায়। বুঝতে পারছি পৃথিবীতে তোমার এত সম্মান কেন? জানি, আমি এখানে আসার আগে তোমার সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছি। ইন্টারনেট সার্চ করে তোমার সম্পর্কে তথ্যের ভাণ্ডার পেয়েছি। তারপর থেকেই মনে একটা ভয়েরও সৃষ্টি হয়েছে, আমাদের সমস্যার সমাধানের জন্যে ঈশ্বর যখন তোমার মত একজন বিশ্বব্যক্তিত্বকে বাছাই করেছেন, আমাদের সমস্যাও তাহলে নিশ্চয় বিশ্বমাপের মত জটিল কিছু হবে! এরপর থেকেই আমার উদ্বেগ-উৎকন্ঠা বেড়ে গেছে। এরপর আবার আমরা ব্রুমসারবার্গ যাচ্ছি। কিন্তু ওখানে গেলেই তো আমরা ওদের চোখে পড়ে যাব, ধরা পড়ে যাব!' বলল সেনফ্রিড।

'ঘটনার গোড়ায় পৌঁছার জন্যে ঘটনাস্থলে যেতে হবে জনাব। আমরা অবশ্যই সাবধান থাকবো। ব্রুমসারবার্গ দুর্গ এলাকাতেই আমরা বাসা ভাড়া নেব।' আহমদ মুসা বলল।

'কিন্তু ওখানে তো সবাই আমাদের চেনে?' বলল সেনফ্রিড।

'চেনা জায়গা ও লোকে চেনে বলেই আমাদের সাবধানতাটা ভালো হবে। চিন্তা নেই।'

বলেই ঘড়ির দিকে তাকাল আহমদ মুসা। বলল, 'আর দেরি নয়, যাত্রা শুরু করি এবার।'

চলতে শুরু করল গাড়ি।

গাড়ির লক্ষ সালজবার্গ-মিউনিখ হাইওয়ের বর্ডার চেকপোস্ট।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের নাগরিক ও বিদেশী পর্যটকদের চেকপোস্টে সামান্য কিছু ফর্মালিটি সারতে হয়।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের নাগরিকদের আইডি দেখা হয় এবং বিদেশীদের দেখা হয় ইউরো ভিসা আছে কি না।

পুলিশের রুটিন ডিউটিও থাকে চেকপোস্টে।

শুরু থেকেই আহমদ মুসার মনে একটা স্থির বিশ্বাস ছিল যে, শত্রুরা চেকপোস্টে চোখ রাখবে। নিশ্চয় জার্মানি যাওয়ার সব চেকপোস্টেই ওরা চোখ রাখার ব্যবস্থা করেছে।

দেখা যাক তারা কোন পথে হাঁটে। চেকপোস্টে তাদের কোন উপস্থিতি টের পাওয়া যেতে পারে। চলছে গাড়ি।

অস্ট্রিয়ার বর্ডার ক্রস করে সালজবার্গ-মিউনিখ হাইওয়ে ধরে এগিয়ে চলেছে আহমদ মুসার গাড়ি।

চেকপোস্টে কিছুই ঘটেনি।

কেউ তাদের উপর চোখ রেখেছে, কেউ তাদের দেখছে, এমনটাও মনে হয়নি।

কিন্তু আহমদ মুসার মনে অস্বস্তি। এমনটা হবার কথা নয়। শত্রুরা তাদের পিছু ছাড়বে তা হতেই পারে না। তাহলে গোটা দিন শহরেও তাদের কেউ ফলো করলো না, আবার চেকপোস্টেও তারা পাহারায় নেই কেন? ওরা আট-দশজন গ্রেপ্তার হবার পর ওদের লোক কি সালজবার্গে আর নেই? হতেও পারে। তবে এটা স্বাভাবিক নয়।

গাড়ি চলছিল সীমান্ত পার হয়ে সোজা পশ্চিম দিকে।

সামনে বড় শহর মিউনিখ।

'আমরা কি মিউনিখ, স্টুটগার্ট, হাইডলবার্গ হয়ে রাইনের দিকে যাচ্ছি?' জিজ্ঞাসা করল আলদুনি সেনফ্রিড।

'হ্যাঁ, এ রাস্তা হয়েও যাওয়া যায়। ওদিকে আমার একটা পরিচিত শহর আছে। কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবও ওখানে আছে। তাই তো প্রায় ভুলেই ছিলাম ওদের কথা!' আহমদ মুসা বলল।

'কোন শহর?' জিজ্ঞাসা করল ব্রুনা।

'স্ট্রাসবার্গ।' আহমদ মুসা বলল।

'স্ট্রাসবার্গ? কবে এসেছিলেন ওখানে? বেড়াতে এসেছিলেন?'

'দু'তিন বছর আগে এসেছিলাম। বেশ বেড়ানো হয়েছিল। তবে আসাটা বেড়ানোর জন্যে ছিল না।' বলল আহমদ মুসা।

'তোমার আসাটা বেড়ানোর জন্যে হতেই পারে না। কি জন্যে এসেছিলে?' সেনফ্রিড বলল।

'টুইন টাওয়ারের ধ্বংস বিষয়ে একটা খোঁজে।' আহমদ মুসা বলল।

ব্রুনা ও সেনফ্রিড দু'জনেই বিস্ময়ের দৃষ্টি তুলল আহমদ মুসার দিকে। ব্রুনাই আগে কথা বলল, 'ও গড, ঠিকই তো! টুইন টাওয়ার রহস্যের চাঞ্চল্যকর তথ্য উদঘাটনের সাথে আহমদ মুসার নাম পড়েছি! সেই কাহিনীর তো স্ট্রাসবার্গেই শুরু! ভুলেই গিয়েছিলাম এ কাহিনী। আমার মনে হয় স্যার, এই এক ঘটনাই আপনাকে অমর করে রাখবে।' থামল ব্রুনা।

তার চোখে মুখে উপচে পড়া বিস্ময় ও আনন্দের ঝলক! আনন্দের আলোতে তার রক্তিম ঠোঁট আরও রক্তিম এবং নীল চোখ দু'টি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

ব্রুনা থামলেই তার পিতা আলদুনি সেনফ্রিড বলল, 'আমিও ইন্টারনেটে টুইন টাওয়ারের কাহিনী পড়েছি। টুইন টাওয়ারের ধ্বংস যেমন বিস্ময়কর, তোমার কাহিনীও তেমনি অবাক ও বিস্ময়ের। ধন্যবাদ আহমদ মুসা তোমাকে।'

'স্বপ্নও বোধ হয় এত সুন্দর হয় না, সারা জীবন চাইলেও বাস্তবে পাওয়াটা এতটা অকল্পনীয় হয় না। সত্যিই আমরা ভাগ্যবান বাবা।' বলল ব্রুনা। আবেগজড়িত তার ভারি কন্ঠ।

এসব কোন কথাই আহমদ মুসার কানে প্রবেশ করেনি। তার সমস্ত মনোযোগ সামনের রাস্তা ও গাড়ির রিয়ারভিউয়ের দিকে। সে মিউনিখ ছাড়ার পর থেকেই লক্ষ করছে একটা সেভেনসিটার মার্ক পাজেরো তার পেছনে পেছনে আসছে। এটা দেখতে পাওয়ার পর থেকে লক্ষ করছে গাড়িটার গতির কোন পরিবর্তন নেই।

আহমদ মুসা রিমোর্ট ভিউ মাইক্রো গগলস (RVMG) পরে নিয়েছিল। সে পরিস্কার দেখছে গাড়িতে ছয়জন আরোহী। গাড়ির গতি ও আরোহীদের চেহারা দেখে সন্দেহ হয়েছিল আহমদ মুসার। সন্দেহ সত্য হলে ওদের মতলব কি? ওরা অত দূর থেকে ফলো করছে, কেন? ওদের টার্গেট কি তাহলে এটা দেখা

যে, আমরা কোথায় যাচ্ছি, কোথায় উঠছি তা চিহ্নিত করা এবং হতে পারে তা পাহারায় রাখা। তার মানে আমাদের গন্তব্য পর্যন্ত ওরা আমাদের অনুসরণ করবে।

মনে মনে হাসল আহমদ মুসা। ভাবল, সামনে স্টুটগার্ট শহর বাইপাস নয়, শহরের ভিতর দিয়ে পার হতে হবে। এই শহরের মধ্যেই ওদের ধাঁধায় ফেলে পেছনে থেকে ওদের সরাতে হবে।

পেছনে সেনফ্রিডের লক্ষ করে বলল, 'মি. সেনফ্রিড মনে হচ্ছে, আমাদের পেছনে ওরা লেগেছে। অনেকক্ষণ ধরে একটা গাড়ি আমাদের ফলো করছে।'

'ওরা কি আমাদের সেই শত্রুরাই হবে?'

বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

উদ্বেগে ছেয়ে গেছে সেনফ্রিড ও ব্রুনার মুখ।

'আমি সে আশংকাই করছি।' বলল আহমদ মুসা।

'ওরা কি করতে চায়? আমাদের এখন কি করনীয়? কি ভাবছেন আপনি স্যার?' বলল ব্রুনা। ভীতি নেমে এসেছে তার চোখে-মুখে।

'জানি না ওদের পরিকল্পনা কি ধরনের। আমি ভাবছি, স্টুটগার্ট শহর অতিক্রমের সময় ওদের বোকা বানিয়ে ভিন্ন রাস্তা ধরে চলে যেতে পারব।' আহমদ মুসা বলল।

স্টুটগার্ট শহর সামনেই।

সামনে ছোট কয়েকটা পাহাড়। পরস্পর বিচ্ছিন্ন, একটু দূরে দূরে। এই পাহাড়গুলোর মাঝেই চার রাস্তার একটা গ্রন্থি আছে। এখান থেকে ডান দিকে একটা রাস্তা সোজা উত্তরে ব্যাভেরিয়ার উজবার্গের দিকে চলে গেছে। বাঁ দিকের রাস্তাটা দক্ষিণ দিকে কনস্ট্যান্স সীমান্ত শহর হয়ে সুইজারল্যান্ডে চলে গেছে। আর একটা সোজা রাস্তা পশ্চিমে এগিয়েছে। এ রাস্তা ধরে এগোলে সামনেই স্টুটগার্ট।

আহমদ মুসার দৃষ্টি সামনের পাহাড়গুলোর দিকেই নিবদ্ধ ছিল। দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে গাড়ির রিয়ার ভিউয়ের উপর চোখ ফেলেই চমকে উঠল আহমদ মুসা। দেখল পেছনের সেই গাড়িটা দ্রুত এগিয়ে আসছে প্রায় ডবল স্পীডে।

হঠাৎ স্পীড ওরা বাড়াল কেন?

আহমদ মুসাও তার গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিল।

পাহাড় এলাকায় প্রবেশ করেছে গাড়ি। কখনও পাহাড়ের পাশ দিয়ে, কখনও পাহাড়ের দূর দিয়ে এগোচ্ছে।

ছোট একটা পাহাড়ের সারির গিরিপথ দিয়ে আড়াআড়ি পার হয়ে পাহাড়ের গোড়ায় পৌঁছতেই রাস্তার চৌমাথা নজরে এল।

চৌমাথার তিন পাশের রাস্তাও নজরে এল আহমদ মুসার। চমকে উঠল আহমদ মুসা। তিন রাস্তাতেই তিনটা মাইক্রো চৌমাথার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। চৌমাথা থেকে মাইক্রোগুলোর দূরত্ব একশ গজের বেশি হবে না।

আহমদ মুসার বুঝতে বাকি রইল না, কেন পেছনের গাড়িটা এত দ্রুত এগিয়ে আসছে। পেছনের গাড়িটা সংকীর্ণ গিরিপথটা আটকে রাখার জন্যে এগিয়ে আসছে। এই চৌমাথায় ফাঁদে ফেলার সফল পরিকল্পনা তারা করেছে।

'ব্রুনা, মি. সেনফ্রিড, আমাদের ওরা ফাঁদে ফেলেছে। দেখুন তিনটা মাইক্রো তিন রাস্তায় আমাদের পথ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। আর পেছনে ফেরার পথ বন্ধ করে পেছন থেকে আরেকটা গাড়ি এগিয়ে আসছে।' বলল আহমদ মুসা।

সেনফ্রিড ও ব্রুনা আগেই লক্ষ করেছিল দাঁড়ানো তিন মাইক্রোকে। চোখে-মুখে অন্ধকার নেমে এল ব্রুনা ও সেনফ্রিডের। উদ্বেগ-আতংকে বিস্ফোরিত হয়ে উঠেছে তাদের চোখ। শুকনো ঠোঁট তাদের কাঁপতে শুরু করেছে। কথা বলার শক্তি যেন তারা হারিয়ে ফেলেছে। ওদের হাতে পড়ার অর্থ কি তারা জানে। সেনফ্রিড মৃত্যুকে ভয় করে না। তার চিন্তা ব্রুনাকে নিয়ে। আর ব্রুনার মনের মধ্যে তোলপাড়, এদের হাতে পড়ার চেয়ে মৃত্যু ভালো।

আহমদ মুসা কথা শেষ করেই ব্যাগ থেকে লেজারগান বের করে পাশে রাখল। রিভলবার আগেই বের করে রেখেছিল।

আহমদ মুসা গাড়ির স্পীড কোন পরিবর্তন আনেনি। সে বোঝাতে চায় মাইক্রোগুলোকে সে সন্দেহ করেনি।

আহমদ মুসা শক্ত হাতে ধরেছে স্টিয়ারিং হুইল। পেছনে না তাকিয়েও বলল আহমদ মুসা, 'মি. সেনফ্রিড, ব্রুনা, সিটে শুয়ে পড়ুন।' আহমদ মুসার কন্ঠ শক্ত, তাতে নির্দেশের সুর।

আহমদ মুসা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে মাইক্রোগুলো তাকে বুঝে ওঠার আগেই তাকে ওদের ফাঁদকে ভাঙতে হবে।

আহমদ মুসা তার গাড়ির ডানে ও বামে ঘোরার দুই ইন্ডিকেটরই জ্বালিয়ে দিয়েছে, যাতে ডান-বাম দুই দিকের মাইক্রোই এক সাথে বুঝে যে, আহমদ মুসার গাড়ি তার দিকেই টার্ন নিচ্ছে। এর ফলে ওরা সামনে এগোবার চেষ্টা না করে আক্রমণের প্রস্তুতি নেবে।

এভাবে আহমদ মুসা চৌরাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিয়ে ঝড়ের বেগে সামনে এগিয়ে চলল।

পশ্চিমের মাইক্রোটি চৌরাস্তার মোড় থেকে একশ গজের মত দূরে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে মোড় থেকে সামনে এগোবার সংগে সংগেই মাইক্রোগুলো আহমদ মুসার কৌশল ধরে ফেলে। ডান-বামের মাইক্রো দু'টো থেকে গুলি বর্ষণ শুরু হয়েছে আহমদ মুসার গাড়ির লক্ষ্যে এবং সেই সাথে আহমদ মুসার গাড়ির দিকে চলতেও শুরু করেছে। আর সামনের মাইক্রো স্থির দাঁড়িয়ে থেকেই গুলি বর্ষণ শুরু করেছে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আহমদ মুসার গাড়ির উইন্ড শীল্ড, জানালার কাচ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

এখানে রিভলবার দিয়ে আহমদ মুসার করার কিছু নেই। আর তার লেজারগান ৩০ গজের বেশি দূরে তেমন কার্যকরি নয়। স্টিয়ারিং ধরা ডান হাতে 'লেজারগান' রেখে দূরত্ব কমার অপেক্ষা করছে আহমদ মুসা।

বেপরোয়া গতিকে সবাই ভয় করে। আহমদ মুসার সামনের মাইক্রোর নাক বরাবর আহমদ মুসার গাড়ির পাগলের মত গতি দেখে মাইক্রোর সবাই তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে এক পাশে নিরাপদে দাঁড়িয়ে একনাগাড়ে আহমদ মুসার গাড়ি লক্ষে গুলি করছিল।

মাইক্রোর আরোহীরা নেমেছিল রাস্তার দক্ষিণ পাশে মাইক্রোর আড়ালে। জায়গাটা রাস্তার দক্ষিণ প্রান্তেরও বাইরে।

আহমদ মুসা রাস্তা ও মাইক্রোর অবস্থানটা একবার দেখে নিয়ে মাথা স্টিয়ারিং হুইলের লেভেল থেকেও নিচে নামিয়ে ঝড়ের বেগে গাড়ি চালাচ্ছিল।

তার চোখ ডাইরেকশন ইন্ডিকেটরের দিকে। ইন্ডিকেটরের কাঁটারে সে অনড় রেখেছিল।

এই ইন্ডিকেটরই এখন তার জন্যে ফ্রন্ট ভিউ-এর কাজ করছে। আহমদ মুসার হিসাব, গাড়ির এই ডাইরেকশন ঠিক থাকলে তার গাড়ির সামনের গার্ডারের বাম প্রান্ত তীব্র গতিতে আঘাত করবে সামনের মাইক্রোর সামনের দিকের গার্ডারের বাম প্রান্তকে ঘন্টায় ১৫০ কিলোমিটার গতিতে। তার ফলে তার গাড়ি চাপা ধরনের একটা প্রবল ঝাঁকানি খেলেও আহত গার্ডার নিয়ে সামনে এগোবে। কিন্তু গোটা মাইক্রোটা এক পাক খেয়ে উল্টে গিয়ে পাশের লোকদের উপর পড়বে।

ঝড়ের বেগে গাড়ি চলছে। স্পিডোমিটারের কাঁটা ১৬০ কি. মি. অতিক্রম করে থর থর করে কাঁপছে।

আহমদ মুসার মনোযোগ ছিল সামনে থেকে ছুটে আসা গুলির ডাইরেকশনের দিকেও। গাড়িতে গুলির আঘাতের শব্দ শুনে নিরূপণ করছিল আহমদ মুসা শত্রুপক্ষের অবস্থানের পরিবর্তন।

আহমদ মুসা শুনছে, সামনের গুলি ক্রমশই গাড়ির বাম পাশের দিকে সরছে। প্রথমে গাড়ির সামনে, তারপর গাড়ির সামনের বাম কোন অঞ্চল, পরে গাড়ির বাম জানালার সামনের দিকে সরে এল গুলির আঘাত।

সামনের গুলির আঘাত জানালার পেছন দিকে সরে আসতেই আহমদ মুসা বুঝল চরম মুহূর্ত উপস্থিত।

আহমদ মুসা 'আল্লাহু খাইরুল হাফেজীন' বলে স্পিড বাড়িয়ে মাথা তুলে শক্ত হাতে স্টিয়ারিং হুইল চেপে ধরল।

আহমদ মুসার গাড়ির গার্ডারের বাম প্রান্ত প্রচণ্ড ছোবল মারল মাইক্রোর মাথার বাম পাশকে।

প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেল আহমদ মুসার গাড়ি। কিন্তু প্রচণ্ড ধাক্কায় মাইক্রো সরে যাওয়ায় ধাক্কার প্রবল 'পুশ'টা শতভাগ জেঁকে বসল মাইক্রোর উপর এবং তার ফলে খেলনার মত পাক খেয়ে উল্টে গেল গাড়ি।

আপনাতেই দু'চোখ বুজে গিয়েছিল। নিজের সব কাজ শেষ করে পরিণতির ভার সবটাই তুলে দিয়েছিল আল্লাহর হাতে।

আল্লাহ সাহায্য করেছেন। আহমদ মুসার গাড়ি থেমে যায়নি, বেঁকে যায়নি বা উল্টে যায়নি।

প্রচণ্ড ধাক্কায় আহমদ মুসা একবার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে, তারপর পেছন দিকে ছিটকে সেঁটে গিয়েছিল সিটের সাথে। কিন্তু আহমদ মুসার দু'হাত কিন্তু গাড়ির স্টিয়ারিং হুইল ছাড়েনি, নড়াচড়া করতে দেয়নি স্টিয়ারিং হুইলকে।

তার দেহ স্থির হতেই আহমদ মুসা গিয়ার চেঞ্জ ও স্পিড কমিয়ে এনে গাড়িকে একিউট টার্ন করাল।

এবার আহমদ মুসার সামনে এল উল্টে যাওয়া মাইক্রো, তার লোকরা ও এদিকে ছুটে আসা অন্য দুই মাইক্রো।

উল্টে যাওয়া মাইক্রোর লোকেরা নিজেদের সামলে নিয়ে এদিকে ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল। আহমদ মুসা নতুন করে ওদের গুলির মুখে পড়ার আগেই ওদের নিষ্ক্রিয় করে দিতে চাইল।

ডান হাতের লেজারগানটাকে আহমদ মুসা মাটির সমান্তরালে ওদের উপর দিকে ঘুরিয়ে নিল।

সংগে সংগেই ওদের ৬ জনের হাঁটুর নিচের অংশ খসে পড়ল। আর্তনাদ করে ওরা সবাই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

ছুটে আসা দুই মাইক্রোও এসে পড়েছিল একটার পেছনে আরেকটা। ওরা উল্টে যাওয়া ও আহত লোকগুলোর বরাবর এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ল। সম্ভবত মাইক্রোর লোকরা তাদের ছয়জন সাথীর অবস্থা দেখতে পেয়েছে।

আহমদ মুসা তার লেজারগান সামনে এসে দাঁড়ানো দুই মাইক্রোর সামনেরটার দিকে ঘুরিয়ে নিল। লেজারগান থেকে সামনের মাইক্রোর মাথা লক্ষে একবার হরিজন্টালি, একবার ভার্টিকালি ফায়ার করল। মাইক্রোর মাথা চারটা আলাদা খণ্ডে ভাগ হয়ে গেল।

মাইক্রোর ড্রাইভিং সিট ও তার পাশের সিটের লোকের কি অবস্থা হলো জানা গেল না। পেছনের সিটের লোকরা চিৎকার করে গুলি করতে করতে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে।

আহমদ মুসা গুলির জবাব না দিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে ওদের দিকে চলতে শুরু করল। গুলি করতে করতেই ওরা ছুটে পালাল গাড়ির আড়ালে, গাড়ির পেছনে।

আহমদ মুসা এবার সামনের মাইক্রোটির পেছনের দক্ষিণ পাশের কোনার উপর থেকে নিচ পর্যন্ত খাড়াভাবে লেজারগানের ফায়ার করল।

খসে পড়ল গাড়ি থেকে কোনাটা।

মাইক্রোর পেছনে দাঁড়ানো আতংকিত লোকগুলো ছুটে গিয়ে পেছনের দ্বিতীয় মাইক্রোতে উঠল। ওরা ও দ্বিতীয় মাইক্রো আহমদ মুসার লেজারগানের রেঞ্জের মধ্যে রয়েছে। আহমদ মুসা ইচ্ছা করলে পালানোরত লোকগুলো ও পেছনের দ্বিতীয় মাইক্রোকে তার লেজারগানের শিকার বানাতে পারতো। কিন্তু আহমদ মুসা মানুষ মারতে চায় না। ওদের ভয় দেখিয়ে পালাতে বাধ্য করে নিজেদের নিরাপদ করতে চায়।

পালানো পেছনের লোকরা দ্বিতীয় মাইক্রোতে গিয়ে ওঠার সংগে সংগেই মাইক্রোটি দ্রুত পেছনে হটতে শুরু করল।

আহমদ মুসা সিটে সোজা হয়ে বসে পেছনে ব্রুনাদের দিকে চাইল। দেখল, তারা সিট আঁকড়ে সিটের উপর পড়ে আছে। ভাঙা কাচের অজস্র টুকরায় তাদের গা ভর্তি। গাড়ির গায়ে লেগে বা অন্য কোনভাবে সিটকে পড়া কিছু বুলেটও আহমদ মুসা গাড়ির ফ্লোরে এদিক-ওদিক পড়ে থাকতে দেখল। সিটে মুখ গুঁজে পড়ে আছে ওরা।

'ব্রুনা, মি. সেনফ্রিড, আপনারা ঠিক আছেন তো? এবার উঠুন। আমরা আপাতত নিরাপদ।' বলল আহমদ মুসা ওদের লক্ষ করে।

ব্রুনা, সেনফ্রিড উঠল।

তাদের গা থেকে ঝরে পড়ল কাচের টুকরাগুলো।

ভীত, বিপর্যস্ত তাদের চেহারা। তারা তাকাল চারদিকে। দেখল উল্টানো মাইক্রো, একটা গায়েব হওয়া আহতদেরও দেখতে পেল। দেখল মাথা কাটা মাইক্রো, একটা মাইক্রোর ব্যাক ড্রাইভ করে পালানোর দৃশ্যও দেখল।

তাদের চোখ ঘুরে এল আহমদ মুসার উপর।

আহমদ মুসার দৃষ্টি তখন পাজেরোর দিকে, যে গাড়িটা আহমদ মুসাদের পেছনে ছুটে আসছিল।

উপত্যকায় ঢুকেও গাড়িটা বেপরোয়া গতিতে ছুটে আসছিল একাধিক স্টেনগান থেকে গুলি বৃষ্টির একটা দেয়াল সৃষ্টি করে। কিন্তু তাদের গুলি বৃষ্টির একটা অংশকে আড়াল করছিল পেছনে অগ্রসরমান মাইক্রোটি, অন্য আরেক অংশকে ব্লক করছিল রাস্তার পাশে উল্টে থাকা মাইক্রো। এই দুই মাইক্রোর ফাঁক গলিয়ে কিছু গুলি আসছে আহমদ মুসার গাড়ির দিকে।

আহমদ মুসা ব্রুনা ও সেনফ্রিডকে মাথা নিচু করে সাবধান হতে নির্দেশ দিয়ে গাড়িটাকে উল্টে থাকা মাইক্রোর দিকে একটু সরিয়ে নিয়ে এল। তার গাড়ির পেছনটা মাইক্রোর আড়ালে চলে গেল। সামনেটা গুলির মুখে পড়লেও গোটা পাজেরো আহমদ মুসার নজরে এল।

ছুটে আসছে পাজেরো বেপরোয়া গতিতেই। তাদের সামনের মাইক্রো এবং তাদের কিছু সাথীর পরিণতি তারা জানতে পারেনি। পাজেরোটাকে বেপরোয়া গতিতে আসতে দেখে ব্যাক ড্রাইভ করা মাইক্রোটাও থেমে গিয়েছিল।

পাজেরোটার মতলব বুঝল আহমদ মুসা। আহমদ মুসার দাঁড়ানো গাড়িকে তারা সরাসরি এসে আঘাত করতে চায়। আহমদ মুসার জাপানি টায়োটার চেয়ে ওদের জার্মান মার্ক পাজেরো অনেক বেশি শক্ত। ও পাজেরোর সামনের কাঠামো ও গার্ডার টয়োটার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি প্রেশার হজম করতে পারে।

ওদের পাজেরোটি পেছনের মাইক্রো অতিক্রম করে চলে এসেছে। গুলিও বেড়েছে। পাজেরোর দু'পাশের জানালা দিয়ে গুলি আসছে। আবার ভাঙা উইন্ডস্ক্রীনের পথেও গুলি আসছে। গুলি করার সহজ সুবিধার জন্যে উইন্ডস্ক্রীন ওরা ভেঙে ফেলেছে।

আহমদ মুসার গাড়ির দিকে গুলির তিনটা স্রোত আসছে। ডানে-বাঁয়ে সমান্তরালে দু'টি স্রোত এবং আরেকটি স্রোত আসছে গাড়ির জানালার বেজ বরাবর উপর দিয়ে। এ তিনের মাঝখানে নো-ম্যানস ল্যান্ডের মত একটা নো-বুলেট জোন তৈরি হয়েছে। আহমদ মুসা সুযোগ গ্রহণ করল।

আহমদ মুসা গাড়ির সিট থেকে মাথাটা একটু তুলে নো-বুলেট জোনের ঠিক মাঝামাঝি স্থান দেখে লেজারগান দিয়ে শর্ট রেঞ্জের ফায়ার করে একটা হোল সৃষ্টি করল। সে হোলে লেজারগানের ব্যারেল সেট করে লং রেঞ্জের পূর্ণাংগ ফায়ার করল। তিন সেকেন্ড লেংথের একটা ফায়ার।

আহমদ মুসা অনুমান করল লেসার ফায়ারটি পাজেরোর গার্ডারের মধ্যভাগ দিয়ে ঢুকে ইঞ্জিনের মধ্যভাগ বরাবর গোটা চেসিস উড়িয়ে দেবে। তারপর প্রচণ্ড গতির কারণে বড় ধরনের এ্যাকসিডেন্ট ঘটাবে গাড়িটা।

তাই হলো। মুহূর্তে গাড়িটা দুই ভাগে ভেঙে পড়ে প্রচণ্ড এক ওলট-পালট ঘটে গেল। গুলিও বন্ধ হয়ে গেল।

আহমদ মুসা উঠে বসল। দেখল গাড়িটার দৃশ্য। বুঝতে পারল না গাড়ির লোকগুলো কতটা আহত কিংবা বেঁচে আছে কিনা।

ব্রুনা ও তার পিতা সেনফ্রিডও উঠে বসেছে গাড়ির সিটে। তাদেরও চোখে পড়ল দু'ভাগ হয়ে যাওয়া উল্টে-পাল্টে পড়ে থাকা পাজেরোর দৃশ্য। তাদের চোখে-মুখে অপার বিস্ময়! তাদের মনে হচ্ছে, তারা যেন কোন স্বপ্নের দৃশ্য দেখছে! অথবা যেন ভয়াল-সংঘাতের কোন সিনেমার দৃশ্য। যার নায়ক তাদের সামনে বসে থাকা নিতান্ত এক ভদ্রলোক আহমদ মুসা। ইস্পাতের মত এক ঋজু শরীর ছাড়া সাধারণের চাইতে কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য তার নেই। কিন্তু তবু কী অসাধারণ তিনি! কী অসাধারণ তার আত্মরক্ষা ও প্রতিপক্ষকে মোকাবিলার কৌশল! নিরাশার বিরান ভূমিতে আশার মহীরুহ তৈরি করতে পারেন তিনি।

তাদের দৃষ্টি ঘুরে এসে নিবদ্ধ হলো আহমদ মুসার উপর। আহমদ মুসাও তাকিয়েছে তাদের দিকে।

আহমদ মুসা তাদের দিকে তাকিয়েই বলে উঠেছে, 'চলুন, আমাদের নেমে পড়তে হবে। এ গাড়ি নিয়ে চলা যাবে না।'

শান্ত কন্ঠ আহমদ মুসার।

'ধন্যবাদ মি. আহমদ মুসা।' বলল সেনফ্রিড।

'ধন্যবাদ কি জন্য?' গাড়ি থেকে নামতে নামতে আহমদ মুসা বলল।

'স্বপ্নের মত এক ঘটনা বাস্তবে নিয়ে আসার জন্যে।' বলল সেনফ্রিড।

'এজন্যে আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি, আপনারাও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন।' আহমদ মুসা বলল।

'যখন দেখলাম আমরা বেঁচে আছি, তখন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছি। কিন্তু আপনার প্রাপ্য আপনার পাওয়া দরকার।' বলল সেনফ্রিড।

'আবার আমি আপনার কাছে 'আপনি' হয়ে গেলাম?' আহমদ মুসা বলল।

'চেষ্টা করেছি তুমি বলতে। কিন্তু আর পারছি না। আপনি বয়সে আমার ছেলের বয়সের হলেও সম্মান ও মর্যাদায় আপনি অনেক বড়। তুমি বলা মানায় না।'

কথা শেষ করেই সেনফ্রিড বলে উঠল, 'মি. আহমদ মুসা, ওই মাইক্রো কিন্তু পালিয়ে গেল।'

আহমদ মুসাও তাকাল পলায়নপর মাইক্রোর দিকে। দেখল, মাইক্রোটি চৌমাথা পর্যন্ত গিয়ে উত্তরের রাস্তা ধরে ছুটছে।

'যাক। পালাক ওরা।' আহমদ মুসা বলল।

'কেন পালাতে দিলেন?' বলল ব্রুনা। ভয় ও বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে ওঠার পর এই প্রথম কথা বলল ব্রুনা।

'ওরা আক্রমণ করতে আসেনি। অস্ত্র সংবরণ করে পালিয়েছে। এ কারণেই ওদের যেতে দিলাম। আমাদের টার্গেট এখন আত্নরক্ষা। আত্নরক্ষার বাইরে কাউকে আক্রমণ করা নয়।'

আহমদ মুসা বলল।

'পলায়নটা ওদের কৌশল। ওরা তো আক্রমণে আসবেই। কথায় আছে স্যার, শত্রুর শেষ রাখতে নেই।' বলল ব্রুনা।

‘কিন্তু ব্রুনা, আমাদের ধর্ম ইসলাম শত্রুদেরকেও কতকগুলো অধিকার দিয়েছে সেই সপ্তম শতকে। সে অধিকারগুলোর একটি হলো, অস্ত্রত্যাগকারী, অস্ত্র সম্বরণকারী শত্রুকে আঘাত না করা।’ আহমদ মুসা বলল।

‘শত্রুকে অধিকার? আর কি অধিকার দিয়েছে?’ বলল ব্রুনা। বিস্ময় তার চোখে-মুখে!

‘সে অনেক কথা ব্রুনা। এতটুকু জেনে রাখো, বিচার ও সংগত কারণ ছাড়া শত্রু ও তার সম্পদের ক্ষতি করাকে ইসলাম অপরাধ হিসাবে গণ্য করে। শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকল আহত ও অসুস্থের সমান চিকিৎসার নির্দেশ দেয় এবং যুদ্ধকালীন অবস্থাতেও শত্রুর ঋণ ও আমানতকে বাতিল বা বাজেয়াপ্ত করে না।’ আহমদ মুসা বলল।

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা পকেট থেকে সেল ফোন বের করে একটা টেলিফোন করল। সংযোগ পেয়েই বলল, ‘স্যার, আমি তাহিতি থেকে আসা আহমদ...।’

‘আর বলতে হবে না। গলা ঠিক চিনেছি। সব খবর ভালো নিশ্চয় নয়?’ আহমদ মুসাকে শেষ করতে না দিয়ে ও প্রান্ত থেকে বলে উঠল।

‘ঠিক স্যার। বড় একটা ঘটনা ঘটেছে। আমার গাড়ি তিন মাইক্রো ও একটা বড় পাজেরো টাইপ জীপ ঘেরাও করেছিল। এ নিয়ে ঘটনা ঘটেছে। কয়েকজন সাংঘাতিক আহত। আপনি...।’

‘হ্যাঁ, আমি ওদের চিকিৎসা ও কাস্টডিত নেয়ার ব্যবস্থা করছি। আপনি সুস্থ তো? আপনার সাথে কি ব্রুনার আছে?’ এবারও আহমদ মুসাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বলল ওপার থেকে।

‘ধন্যবাদ স্যার। আমি সুস্থ। ব্রুনা ও তার পিতা আমার সাথে আছেন।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ওয়েলকাম। ওদের অবশিষ্টরা কি পালিয়েছে?’ ওপার থেকে বলল।

‘একটা মাইক্রো নিয়ে অবশিষ্টরা পালিয়েছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আপনি ভাগ্যবান মি. আহমদ। শত্রুর নাগাল আপনি পেয়ে গেছেন। আমি নিশ্চিত। আপনি সফল হবেন।’ ওপার থেকে বলল।

‘ধন্যবাদ স্যার।’ আহমদ মুসা বলল।

‘গড ব্লেস ইউ। ওকে, বাই।’ বলে ওপার থেকে কল ক্লোজ করে দেয়া হলো।

আহমদ মুসা মোবাইলের কল অফ করতেই ব্রুনার পিতা সেনফ্রিড বলল, ‘কার সাথে কথা বললেন, মি. আহমদ মুসা?’

‘জার্মানির পুলিশ প্রধান বরডেন ব্লিস-এর সাথে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আপনি তাঁকে চেনেন?’ জিজ্ঞাসা সেনফ্রিডের।

‘চিনি না, জানি। তিনিও আমাকে জানেন।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কিভাবে? সবে তো আপনি জার্মানিতে প্রবেশ করলেন?’ বলল সেনফ্রিড। তার চোখে-মুখে বিস্ময়!

‘তাহিতির গভর্নর ফ্রান্সিস বুরবনের সাথে পারিবারিকভাবে সম্পর্কিত তিনি। ফ্রান্সিস বুরবনই আমার ব্যাপারে তাঁকে ব্রিফ করেছেন। আর আপনাদের ‘রাইন ল্যান্ড’ স্টেটের গোয়েন্দাপ্রধান ‘এডমন্ড এড্রিস’ আমাকে জানেন। আমি এখানে আসার আগে তাহিতির স্বরাষ্ট্র সচিব ও পুলিশপ্রধান মি. দ্যাগল আমার ব্যাপারে তাকে সব বলেছেন। আমি অস্ট্রিয়ায় এসে তাঁর সাথে কথা বলেছি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ধন্যবাদ মি. আহমদ মুসা, আপনি জার্মানি আসার আগে অনেক কাজ সেরে এসেছেন। কিন্তু এই ঘটনার কথা আমরা পুলিশকে না জানালেও তো পারতাম।’ বলল সেনফ্রিড।

‘দেশের আইন-শৃঙ্খলার সাথে সংশ্লিষ্ট এটা একটা বড় ঘটনা। পুলিশ তার তদন্তে আমাদের সংশ্লিষ্টতা খুঁজে পাবেই। সুতরাং আমরা আগে না জানালে আমাদের কাজ অপরাধমূলক বিবেচিত হবে। নিজেদের তখন নির্দোষ প্রমাণ করতে হবে। আগেই বিষয়টা পুলিশ কর্তৃপক্ষকে জানানোর ফলে এই ঝামেলায় আমাদের পড়তে হবে না। আর আমি এখানে যে কাজ নিয়ে এসেছি সে সম্পর্কে পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অবহিত রাখতে চাই। পুলিশপ্রধান বরডেন ব্লিস আমাকে বলেছেন, ‘পুলিশের কাজটাই আমি করছি। সুতরাং আমার কাজের গোপনীয়তা কিছু নেই।’ আহমদ মুসা বলল।

‘গড ব্লেস ইউ মি. আহমদ মুসা। আপনি আপনার কাজকে মানে আমাদের কাজকে অনেক সহজ করে দিয়েছেন। আমাদের পরিবার রাহুমুক্ত হবার আশা আরও প্রবল হলো। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন!’ বলল সেনফ্রিড, ব্রুনার পিতা।

‘পুলিশ আসার আগেই আমরা এখান থেকে চলে যেতে চাই। আসুন আমরা উল্টে যাওয়া মাইক্রোটাকে সোজা করে চালু করতে পারি কিনা দেখি।’

বলে আহমদ মুসা গিয়ে মাইক্রোটাকে ধরল।

সেনফ্রিড ও ব্রুনাও দ্রুত গিয়ে মাইক্রো ধরল।

মাইক্রোটি সোজা করে আহমদ মুসা ড্রাইভিং সিটে বসে পরীক্ষা করল সব ঠিক আছে।

স্টার্ট নিল মাইক্রোটি।

সেনফ্রিড ও ব্রুনা মাইক্রোতে উঠল।

চলতে শুরু করল মাইক্রোটি পশ্চিমের স্টুটগার্ট শহরের দিকে।

স্টুটগার্ট থেকে বেরিয়ে আহমদ মুসার সেই মাইক্রো সোজা উত্তরে নেকার নদীর তীর বরাবর হাইওয়ে ধরে হেলব্রোন শহরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। স্টুটগার্ট থেকে বেরুবার আগেই আহমদ মুসা জিজ্ঞাসা করেছিল, ‘আমরা কি হেলব্রোন, না কারিসু’র পথে যাব।’

উত্তর দিয়েছিল ব্রুনা। বলেছিল, ‘আমরা যদি কারিসু দিয়ে যাই, তাহলে কিছু পাহাড়ী এলাকা পেরিয়ে কারিসু পার হলেই আমরা রাইনের তীরে গিয়ে পৌঁছব। তারপর রাইন তীরের হাইওয়ে ধরে চোখ বন্ধ করে এগোলে আমরা ব্রুমসারবার্গে পৌঁছে যাব। আর যদি হেলব্রোন হয়ে যান স্যার, তাহলে খরস্রোতা, উচ্ছলা নেকার নদীর ছোঁয়া পাবেন, সেই সাথে পাবেন পর্বতভূমির পাদদেশের সবুজ, মনোহর ঘন বনাঞ্চল, তার ফাঁকে ফাঁকে দেখবেন জার্মানির শান্ত সুন্দর আদি গ্রামগুলো। আরো দেখবেন প্রাচীন জার্মানির একটা বিরান এলাকা। সেখানে

প্রাচীন ধ্বংসাবশেষও দেখতে পাবেন। অতীতের স্মৃতিবাহী কিছু পরিবার সেখানে এখনো আছে, যারা জার্মানির সৌন্দর্য ও গৌরব। এখন স্যার, আপনিই পথ বেছে নিন।'

'ব্রুনা, তোমার পথের বর্ণনাই বলে দিয়েছে কোন্ পথ আমি বেছে নেব। আমি হেলব্রোনের পথেই যাচ্ছি।' আহমদ মুসা বলেছিল।

গাড়ি কখনো সবুজ ঘন বনাঞ্চল, কখনো ছবির মত সুন্দর গ্রামের স্নিগ্ধ পরশ নিয়ে এগিয়ে চলছিল সামনে। ব্রুনার বর্ণনার চেয়ে হাজার গুণ সুন্দর এসব দৃশ্য।

প্রাচীন জার্মানির বিরান এলাকায় প্রবেশ করেছে আহমদ মুসার মাইক্রো। হাইওয়েটা ফিরে এসেছে নিকার নদীর তীর বরাবর।

অনেকক্ষণ ধরে আহমদ মুসার কান উৎকর্ণ হয়ে উঠেছিল। দূর থেকে একটা শব্দ ভেসে আসছে। শব্দ আরও স্পষ্ট হলে বুঝতে পারল, শব্দটি হেলিকপ্টারের। কিছুক্ষণ ধরে শব্দের ডাইরেকশন অনুসরণ করে নিশ্চিত বুঝল, হেলিকপ্টারটি তাদের দিকেই আসছে।

আরও কিছু সময় পার হয়ে গেল।

গাড়ি তখন চলছিল এক ফালি ফাঁকা এলাকার উপর দিয়ে।

আহমদ মুসা গাড়ি থেকে মাথা বের করে উঁকি দিয়ে দেখল, হেলিকপ্টার অনেকখানি নিচে নেমে এসেছে।

হেলিকপ্টারটি তাদের গাড়ির নাক বরাবর এগিয়ে আসছে। হেলিকপ্টারটি যেন তাদেরকেই টার্গেট করেছে।

হেলিকপ্টারের পরিচয় সম্পর্কে জানার জন্যে গভীরভাবে চাইতে গিয়ে নিচের দিকে উদ্যত মেশিনগানের নল দেখতে পেল। দূরবীনের চোখও নজরে পড়ল আহমদ মুসার।

চমকে উঠল আহমদ মুসা! তাহলে এটা একটা শত্রুপক্ষের হেলিকপ্টার? কিন্তু ওরা আহমদ মুসাদের সন্ধান পেল কি করে? উত্তরও সংগে সংগে পেয়ে গেল। আহমদ মুসারা তো ওদের মাইক্রো ব্যবহার করছে! এই মাইক্রোতে নিশ্চয়

মাইক্রোর অবস্থান ও মাইক্রোর কথাবার্তা রিলে করার গোয়েন্দা ট্রান্সমিটার রয়েছে।

বিষয়টা আহমদ মুসার কাছে পরিস্কার হওয়ার সাথে সাথে সে গাড়ির স্পীড আকস্মিকভাবে বাড়িয়ে দিল। তার লক্ষ সামনের এক ফালি খালি জায়গা পার হয়েই ঘন গাছপালার মধ্যে প্রবেশ করা। সামনেই রাস্তার দু'পাশে ঘন গাছের সারি, মাঝখান দিয়ে রাস্তা। সে রাস্তায় পৌঁছানোই আহমদ মুসার টার্গেট।

হেলিকপ্টারটিও সম্ভবত এটা বুঝতে পেরেছে। হেলিকপ্টারের দরজা দিয়ে দেখতে পাওয়া মেশিনগানের ব্যারেল নড়ে উঠল। নেমে এল এক পশলা গুলি।

আহমদ মুসার মধ্যে চাঞ্চল্য লক্ষ করেছিল ব্রুনা। গাড়ির স্পীড হঠাৎ সপ্তমে উঠায় উদ্বিগ্ন ব্রুনা প্রশ্ন করল, 'কিছু কি ঘটেছে স্যার?'

'হ্যাঁ, মাথার উপরে একটা হেলিকপ্টার আমাদের ফলো করছে। মনে হচ্ছে এটা ওদের নতুন আক্রমণ।' আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই উপর থেকে ব্রাশ ফায়ারের শব্দ হলো। কয়েকটি গুলি মাইক্রোর পেছনে আঘাত করল।

দু'পাশের গাছ মোটামুটি আড়াল সৃষ্টির জন্য ওদের টার্গেট ষোল আনা লক্ষ ভেদ হয়নি।

আহমদ মুসা ব্রুনাদেরকে গাড়ির সিটের নিচে শুয়ে পড়তে বলে গাড়ির জিগজ্যাগ গতি আরও বাড়িয়ে দিল।

'মি. আহমদ মুসা, আমরা তো হেলিক্টারের সাথে পারবো না। ওরা সহজেই আমাদের টার্গেট করতে পারবে। উপর থেকে ওরা বোমাও ছুঁড়তে পারে।' বলল সেনফ্রিড। উদ্বেগে তার কন্ঠ কাঁপছে।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'বিপদের সময় বেশি ভাবতে নেই। সব সময় বিপদের সাথে পরিত্রাণের একটা রাস্তা আল্লাহ রাখেন।'

গাড়ির তীব্র গতির সাথে আহমদ মুসা নদীর একটা খাড়া ও উন্মুক্ত ধরনের স্থান খুঁজছিল। এই সাথে আহমদ মুসা উপরের হেলিকপ্টারের গতি পথও মনিটর করছিল। প্রথমবার গুলি বর্ষণের পর তারা আর গুলিও করেনি। তারা

নিশ্চয় একটা উপযুক্ত স্থানের অপেক্ষা করছে যেখানে তারা সহজেই মাইক্রোটাকে গুঁড়িয়ে দিতে পারবে। তাছাড়া তাদের ভয়ও আছে গুলাগুলির ব্যাপারটা পুলিশের কানে গেলে তাদের বিপদ হবে। যা করার দ্রুত করে তাদের সরে পড়তে হবে।

যে ধরনের জায়গা খুঁজছিল আহমদ মুসা তা পেয়ে গেল। জায়গাটায় ছোট ছোট আগাছা ছাড়া বড় ধরনের গাছ নেই। নদী পাড়ের রেলিং সেখানে নেই। সম্ভবত ভেংগে যাওয়ার কারণে পুনঃনির্মাণের জন্যে খুলে ফেলা হয়েছে।

আহমদ মুসা জায়গাটা পার হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ ব্রেক করে গাড়ি থামাল আহমদ মুসা। দ্রুত কন্ঠে বলল, 'ব্রুনা, মি. সেনফ্রিড, আপনারা তাড়াতাড়ি নেমে পেছনের ঝোপটায় লুকিয়ে পড়ুন। প্লিজ তাড়াতাড়ি করুন।'

ব্রুনা ও সেনফ্রিড গড়িয়েই গাড়ির দরজা পর্যন্ত গিয়ে গাড়ি থেকে নেমে ছুটল ঝোপের দিকে।ব্রুনা একবার জিজ্ঞাসা করতে চাইল, স্যার আপনি আসবেন না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে সাহস পেল না!...

ব্রুনারা নেমে পড়তেই আহমদ মুসা গাড়ি ব্যাক ড্রাইভ করে সেই জায়গায় ফিরে এল। গাড়িটা নদীর পাড়ের প্রান্ত পর্যন্ত নিয়ে গাড়ি দাঁড় করিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল আহমদ মুসা। তারপর পেছন থেকে ঠেনে গাড়িটা নদীতে ফেলে দিয়ে একটু অপেক্ষা করে দেখল গাড়িটা পুরোপুরি নদীতে পড়ল কিনা।

নিশ্চিত হয়ে আহমদ মুসা ছুটে এল সেই ঝোপে।

সেখানে পৌঁছেই আহমদ মুসা বলল, 'মি. সেনফ্রিড, আমাদের আরও পেছনে সরে যেতে হবে। চলুন, পেছনের ঐ টিলায়। টিলায় যথেষ্ট ঝোপ-জংগল আছে আর ওটা বেশ উঁচুও। ওদের গতিবিধি ভালোভাবে দেখা যাবে।'

ছুটল ওরা কিছু দূরের টিলাটার দিকে।

ওদিকে হেলিকপ্টারটি অনেকখানি সামনে এগিয়ে গিয়েছিল। তারপর তারা খেয়াল করে দেখল নিচে রাস্তার উপর সেই গাড়িটা নেই। দ্রুত তারা ফিরে আসে। কিন্তু গাড়িটার দেখা তারা পায় না।

তাড়াতাড়ি হেলিকপ্টারটা হাইওয়ের সেখানকার ছোট সরু বাইলেনটাও চেক করে আসে। কিন্তু গাড়ির দেখা তারা পায় না।

পাগলের মত হেলিকপ্টার চারদিকে ঘুরতে থাকে। এক সময় হেলিকপ্টারটা নদীর উপর স্থির হয়ে দাঁড়ায়। তারপর হেলিকপ্টারটা ধীরে ধীরে ল্যান্ড করল নদীর পাড়ে।

'ওরা এখন মনে করছে গাড়ি এ্যাকসিডেন্ট করে আমরা নদীতে পড়ে গেছি। ওরা এখন নিশ্চিত হবার জন্যে নদীতে নেমে গাড়ি পরীক্ষা করবে এবং লাশগুলোকে হাত করতে চাইবে। আমাদের সরে পড়ার এটাই উপযুক্ত সময়।' বলল আহমদ মুসা।

বিস্ময়-বিমুগ্ধ ব্রুনা বলল, 'আপনি তাহলে এই উদ্দেশ্যেই মাইক্রোটিকে নদীতে ফেলে দিয়েছেন! ধন্যবাদ স্যার!'

আহমদ মুসা ব্রুনার কথার দিকে কর্ণপাত না করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আসুন, আমরা যাত্রা শুরু করি।'

টিলা থেকে তারা নেমে এল।

'জংগলের মধ্যে দিয়েই আমরা প্রথমে পূর্ব দিকে যাব, তারপর আমরা নেকার নদীর সমান্তরালে উত্তর দিকে চলব।'

বলে চলতে শুরু করল আহমদ মুসা।

'পাশে একটু দূরেই তো রাস্তা আছে। আমরা সে রাস্তায় উঠতে পারি। সেখানে গাড়িও মিলবে।' বলল ব্রুনা।

'সেটাই সুবিধাজনক। কিন্তু রাস্তায় ওঠা ঠিক হবে না। অল্পক্ষণের মধ্যেই ওরা জানতে পারবে গাড়িতে আমরা নেই। তারপরেই ওরা হন্যে হয়ে খুঁজতে শুরু করবে। চারপাশের পথ তারা চষে ফিরবে। রাস্তায় উঠলে ওদের হেলিকপ্টারের চোখ এড়ানো কঠিন হবে।' আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ স্যার, ঠিক বলেছেন। কিন্তু স্যার, এরকম বিপদে আমাদের মাথা সব সময় গুলিয়ে যায়। কিন্তু আপনার মাথা কি করে ঠাণ্ডা থাকে?' বলল ব্রুনা।

'সবারই মাথা ঠাণ্ডা থাকতে পারে, যদি সবাই সব ব্যাপারে আল্লাহর উপর নির্ভর করতে পারে।' আহমদ মুসা বলল।

'আমি বুঝলাম না স্যার।' বলল ব্রুনা।

‘মাথা গুলিয়ে যাবার যে কথা বললে সেটা ভয়ের কারণে হয়। মৃত্যু ভয় সবচেয়ে বড় ভয়। এই ভয় যদি জয় করা যায়, তাহলে কোন ভয়ই আর থাকে না। মৃত্যুভয় দূর হয় আল্লাহর উপর নির্ভরতা থেকে। এ বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ যদি না চান দুনিয়ার কেউ মারতে পারবে না, আর আল্লাহ যদি চান, তাহলে দুনিয়ার সবাই মিলে চেষ্টা করেও কাউকে রক্ষা করতে পারবে না। এই বিশ্বাস আল্লাহর উপর নির্ভরতা থেকেই আসে।’ আহমদ মুসা বলল।

চলতে শুরু করেছে তারা।

দ্রুত হাঁটছে তারা জংগল ঠেলে যতটা সম্ভব সামনে। মিনিট দশেক পার হয়ে গেল। তারা তখনও জংগলের পথেই চলছে।

হেলিকপ্টারের শব্দে তারা সকলেই পেছন দিকে ফিরে তাকাল। দেখল, পেছনের আকাশে সেই হেলিকপ্টারটি উড়ছে।

‘নদীতে পড়ে যাওয়া গাড়ি পরীক্ষা করে ওরা নিশ্চিত হয়েছে যে, ওদের বোকা বানানো হয়েছে। এখন ওরা পাগলের মত খুঁজছে আমাদের।’ আহমদ মুসা বলল।

‘চরম এই সংকটকালে ওদের বোকা বানাবার বুদ্ধি আপনার মাথায় এল কি করে স্যার! এটা আমার কাছে এখনও বিস্ময়!’ বলল ব্রুনা।

‘সৃষ্টি ও স্রষ্টা সম্পর্কে আরও জান ব্রুনা। মানুষ যখন উপায়হীন হয়ে পড়ে, তখন আল্লাহ স্বয়ং উপায় বের করে দেন।’ আহমদ মুসা বলল।

‘স্যার, আগে এই বিপদ থেকে বাঁচি তারপর আমি সব জানার চেষ্টা করব।’ বলল ব্রুনা।

‘ধন্যবাদ ব্রুনা।’ আহমদ মুসা বলল।

‘স্যার, একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না, আমরা যে ঐ মাইক্রোতে আছি, হেলিকপ্টার থেকে ওরা তা বুঝল কি করে?’

‘ও মাইক্রোটা তো ওদের। ওরা...।’

আহমদ মুসার কথার মাঝখানেই ব্রুনা বলে উঠল, ‘ঠিক স্যার। এ ধরনের মাইক্রো তো দেশে শত শত আছে। আর অত উপর থেকে গাছপালার মধ্য দিয়ে গাড়ির নাম্বার দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়।’

‘খুব সহজ ব্যবস্থা ওদের ছিল, যা তাড়াহুড়ার মধ্যে আগে আমার মনে পড়েনি। ওদের প্রতিটি গাড়িতে ট্রান্সমিটার সেট করা থাকে। এর মাধ্যমে ওরা গাড়ির ভিতরের কথোপকথন, গাড়ির অবস্থান মনিটর করে। আমাদের গাড়িতেও ট্রান্সমিটার সেট করা ছিল আর সেটাই তাদের খবর দিয়ে ডেকে এনেছে।’ আহমদ মুসা বলল।

ব্রুনা ও সেনফ্রিড দু’জনেরই চোখ বিস্ফোরিত হয়ে গেল! ভয়ে তাদের বুক কেঁপে গেল। শত্রুরা এতটা সাবধান, এতটা ক্ষিপ্র! পরম ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় তাদের হৃদয়টা নুয়ে গেল আহমদ মুসার জন্যে। অজানা, অনাত্মীয় এই বিস্ময়কর মানুষটি জীবন বাজী রেখে তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বুদ্ধি ও শক্তি সব যুদ্ধেই সে অগ্রগামী।

আহমদ মুসা হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিয়েছিল।

ব্রুনারাও তার পেছনে পেছনে ছুটল।

‘এই এলাকাটা আমাদের তাড়াতাড়ি পার হতে হবে। ওরা পাগল হয়ে গেছে। ওরা এলাকাটা চষে ফেলবে। সবাই দ্রুত পা চালান।’ আহমদ মুসা বলল।

# ৪

ক্র্যাডল থেকে টেলিফোন তুলতে তুলতে ভাবল, এ বার নিয়ে পাঁচ বার টেলিফোন তার বসের কাছ থেকে এসেছে। আজ পঁচিশ বছর সে তার বসের ব্যক্তিগত স্টাফ হিসাবে কাজ করছে। কিন্তু শান্ত, ঠাণ্ডা মানুষটিকে এতটা উদ্বিগ্ন সে কখনো দেখেনি। সে অর্থ-সম্পদ, মর্যাদা-প্রতিপত্তি অর্জনের ক্ষেত্রে সব বাঁধাই নিষ্ঠুরভাবে দমন করেন। শত্রুর জীবনের বিন্দুমাত্র মূল্য নেই তার কাছে। কিন্তু তার এই রূপটা কিন্তু বাইরে থেকে একটুও বুঝার উপায় নেই। যা করে সব ঠাণ্ডা মাথায় করে, হাসতে হাসতে করে। যেখানে তার উত্তেজিত হবার কথা, সেখানে সে বরফের মত ঠাণ্ডা থাকে। কিন্তু সেই লোকটাই আজ তার বিরক্তি, উদ্বেগ ও উত্তেজনা কিছুতেই আড়াল করতে পারছে না।

হিংগিস্ট টেলিফোনের স্পীকার মুখের কাছে নিয়ে এসে বলল, 'ইয়েস স্যার। আমি হিংগিস্ট স্যার। আদেশ করুন স্যার।'

'হিংগিস্ট, ডরিন ডুগান নতুন কি জানিয়েছে?' বলল টেলিফোনের ওপারে হিংগিস্টের বস, 'ব্ল্যাক লাইট' সংগঠনের প্রধান।

'নতুন কোন তথ্য দিতে পারেনি স্যার। হাইওয়েসহ এলাকার সব রাস্তায় তারা ওদের খুঁজেছে এবং খুঁজছে।' বলল হিংগিস্ট।

'ও গড, তিনজন লোক হাওয়া হয়ে গেল। আমি বুঝতে পারছি না ডরিন ডুগানের মত লোক ওদের মত চুনোপুঁটির কাছে বুদ্ধির যুদ্ধে হেরে গেল!' বলল হিংগিস্টের বস ওপার থেকে।

হিংগিস্ট কিছু বলার আগেই ওপার থেকে টেলিফোন সংযোগ কেটে গেল। তার বস ওপার থেকে টেলিফোন রেখে দিয়েছে।

বিব্রত, বিপর্যস্ত হিংগিস্ট তার টেলিফোনের রিসিভার রাখল।

হিংগিস্টের মনে নানা চিন্তা-দুশ্চিন্তার ঘুরপাক। বসের শেষ কথাটা তার ভালো লাগেনি। তার বসের মধ্যে এমন হতাশা দেখতে সে অভ্যস্ত নয়।

সে তার বসের সাথে আছে প্রায় পঁচিশ বছর। এই পঁচিশ বছরে কখনো কোন অবস্থায়ই তার বসকে সে হারতে দেখেনি, হতাশ হতে দেখেনি। সে যা চেয়েছে, তাই হয়েছে সব সময়।

পঁচিশ বছর আগে এক অভিজাত ক্যাসিনোর এক জুয়ার আসরে তার বসকে সে প্রথম দেখে। তখন হিংগিস্ট চাকরি খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে একদম হতাশ হয়ে একটা রিভলবার যোগাড় করে ছিনতাইয়ের কাজ শুরু করেছে। তার লক্ষ ছিল, সে এভাবে বড়লোকদের পকেট কেটে টাকা যোগাড় করে একটা বড় ব্যবসায় ফেঁদে নিজেই এমপ্লয়ার হয়ে বসবে।

এক ধনাঢ্য মার্চেন্টকে টার্গেট করে সেদিন সে ঐ ক্যাসিনোতে বসে ছিল। তার বস লোকটিও তার সামনের টেবিলে একাই সাথে বসে কফি খাচ্ছিল। লোকটিকে দেখে আপনাতেই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। কারণ লোকটি দীর্ঘকায়, জার্মানদের এভারেজ হাইটের চেয়ে লম্বা এবং অ্যাক্রব্যাটদের মত সুগঠিত ও সর্পিল শরীর। আর চোখ ছুরির ফলার মত ধারালো।

ক্যাসিনোর সে রুমটাও ছিল জুয়াড়িদের। বড় ঘরটির এক পাশে চলছিল জুয়া খেলা একটা বড় টেবিলে। ক্যাসিনোর অনেক জুয়ার টেবিলের মধ্যে এই টেবিলকে বলা হয় কিং টেবিল। টাকার কিংরাই এ টেবিলের জুয়ার আড্ডায় বসে।

হঠাৎ গণ্ডগোল বেঁধে যায় জুয়ার টেবিলে।

একজন জুয়াড়ি অবিশ্বাস্য একটা বড় দান জিতে যায়। বিপরীত দিকের শক্তিশালী পক্ষ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আমার সামনের টেবিল থেকে লোকটি স্প্রিং-এর মত একটা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ছুটে গেল আক্রান্ত লোকটির কাছে। চিৎকার করে বলল, ‘এ আমার লোক, সকলে সরে দাঁড়াও।’

আমার বস লোকটির হাতে তখন দুই হাতে দুই রিভলবার।

তার কথা শেষ হবার আগেই পেছন থেকে দু’জন তার দু’হাতে আঘাত করল। রিভলবার পড়ে গেল তার দু’হাত থেকে।

আমিও উঠে দাঁড়িয়েছিলাম।

কি হয়ে গেল যেন আমার মধ্যে! আমি দ্রুত আমার পকেট থেকে রিভলবার বের করে 'এদিকে বস' বলে চিৎকার করে উঠে রিভলবার ছুঁড়ে দিলাম লোকটির দিকে।

আমার চিৎকারে সবাই তাকিয়েছিল এদিকে। বস লোকটিও।

আমার ছুঁড়ে দেয়া রিভলবার সে লুফে নিয়ে এক অবিশ্বাস্য দ্রুততার সাথে রিভলবার খালি করে ফেলল। চোখের পলকে তার চারপাশে ছয়টা লাশ পড়ে গেল। এবার সে তার হাত থেকে পড়ে যাওয়া দু'টি রিভলবার তুলে নিল অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সাথে। তবে রিভলবার ব্যবহারের আর দরকার হলো না। প্রতিপক্ষ ৬টি লাশ ফেলে দ্রুত পালিয়েছে।

আমি আবার টেবিলে বসে পড়েছিলাম।

সব লোকটি তার সাথীকে নিয়ে আমার কাছে এল। আমাকে জড়িয়ে ধরে ধন্যবাদসহ আমার রিভলবার আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'চলুন, বাইরে গিয়ে কথা বলি। এখানে থেকে পুলিশের ঝামেলায় পড়ে লাভ নেই।'

আমি তাদের গাড়িতে চড়ে আরেকটা ক্যাসিনোতে এসে বসলাম।

সব লোকটি আবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলল, 'এই সাহায্য আমার জীবন বাঁচিয়েছে। আপনি কি আমাকে চেনেন?'

'না।' আমি বললাম।

কিন্তু সাহায্য করলেন যে?' বলল সে।

'কিছু ভেবে আমি এটা করিনি। হঠাৎ করে মনে হয়েছিল, আমার রিভলবারটা আপনাকে দেয়া উচিত। ব্যস, আমি দিয়ে দিলাম।' আমি বললাম।

'ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ। আপনি কি করেন?' বলল বস লোকটি।

'আগে চাকরি খুঁজতাম। এখন ছিনতাই করি। ঠিক করেছি, এভাবে টাকা জমিয়ে বড় কিছু একটা করে আমি মানুষকে চাকরি দেব।' বললাম আমি।

'ভালো চিন্তা। কিন্তু এটা অনিশ্চিতের পথ। আপনি আমাদের সাথে কাজ করবেন?' বলল সে।

'জুয়া খেলার কাজ?' বললাম আমি।

বস লোকটি হাসল। বলল, ‘জুয়া খেলা আমাদের কাজ নয়। কাজের জন্যে টাকা যোগাড়ের একটা উপায় মাত্র।’ বলল সে।

‘তাহলে কাজটা কি?’ বললাম আমি।

‘অনেক বড় কাজ। কি কাজ সেটা অবশ্যই জানবেন, তবে এ পর্যায়ে নয়। এটুকু শুনে রাখুন, শুধু ধনাগার দখল নয়, এই ধনাগার আসে যা থেকে তাও আমরা দখল করতে চাই।’

বসকে আগেই পছন্দ হয়েছিল। তার এই কথাও পছন্দ হলো। শুধু বললাম, ‘ব্যাপারটা রাজ্য দখলের মত?’

‘রাজ্য দখল নয়, মানুষ দখল বলতে পারেন। রাজ্য তো হয় মানুষের। মানুষ দখল হয়ে গেলে রাজ্য তখন আপনাতেই দখল হয়ে যায়। রাজ্য তখন আর দখল করতে হয় না।’ বলল সে।

আমি সেই থেকে তাদের সাথে শামিল হয়েছি।

বস আমাকে তার পাশে রেখেছেন। পিএ, পিএস, সিকিউরিটি সবই আমি।

পরে অনেক কিছুই জেনেছি। সংগঠনের নাম ‘ব্ল্যাক লাইট’। নানা রংয়ের রে লাইটে’র মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়, তবে অন্ধকারে ব্ল্যাক লাইটই বেশি পাওয়ারফুল হয়। ব্ল্যাক লাইট সংগঠনও তাই। এদের শক্তি অস্ত্র নয়, বিজ্ঞানের অপব্যবহার। এই প্রকল্পের কালো থাবায় রয়েছে আপাতত উত্তর জার্মানির অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যগুলো।

আমার খুব ভালো লাগে এদের এই প্রকল্প। এর সাফল্য সম্পর্কেও আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু নতুন শত্রুর অভ্যুদয়, সালজবার্গের ব্যর্থতা, স্টুটগার্টের পার্বত্য উপত্যকায় আমাদের বিস্ময়কর পরাজয়, নিকার নদী এলাকায় ফাঁদ কেটে শত্রু বেরিয়ে যাওয়া এবং সর্বশেষ বসের হতাশাপূর্ণ উক্তি আমাকে উদ্বিগ্ন করেছে।

হিংগিস্টের সামনে কফিটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। ভালো লাগছে না তার কফি খেতেও।

চেয়ারে গা এলিয়ে চোখ বন্ধ করে চিন্তা থেকে মুক্ত হতে চাইল সে।

হলো না নিরিবিলি থাকা। গেটের ইন্টারকম বেজে উঠল।

গেটের সিকিউরিটি অফিসারের কন্ঠ। বলল, ‘স্যার, মি. গেরারড গারভিন এসেছেন।’

‘হ্যাঁ, ওনার আসার কথা। উপরে নিয়ে এস।’ বলল হিংগিস্ট।

গেরারড গারভিন একজন ‘সিচুয়েশন অ্যানালিস্ট’। তিনি ‘ব্ল্যাক লাইট’ সংগঠনের প্রধান তার বসের এক উপদেষ্টা। যে কোন ঘোরালো পরিস্থিতিতে তার বস তাকে ডাকেন।

হিংগিস্ট কথা শেষ করেই বিশেষ ইন্টারকমে বলল তার বসকে, ‘স্যার, গেরারড গারভিন এসেছেন।’

‘তাকে নিয়ে এস।’ বলল ইন্টারকমের ওপার থেকে তার বস।

গেরারড এলে হিংগিস্ট বলল, ‘চলুন স্যার। স্যার আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।’

হিংগিস্ট আগেই উঠে দাঁড়িয়েছিল।

চলল তার অফিস কক্ষের বিপরীত দিকের দেয়ালের সাথে আটকে রাখা বড় স্টিলের আলমারির দিকে।

চাবি দিয়ে তালা খুলল আলমারির।

আলমারির দেয়ালে ছোট বড় অনেক শেলফ। সেলফে অফিসের ফাইল ও জিনিসপত্র। সেলফগুলো আলমারির মাঝ বরাবর এসেছে। আলমারিতে ঢুকল হিংগিস্ট ও গেরারড গারভিন। তারা প্রবেশ করল একদম আলমারির ভিতরে। সংগে সংগেই আলমারির দরজা আপনাতেই বন্ধ হয়ে গেল। দরজা বন্ধ হওয়ার সাথে সাথেই আলমারিতে আলো জ্বলে উঠল।

হিংগিস্ট আলমারির দেয়ালের গায়ে অদৃশ্য একটা টাস লকে সম্ভবত একটা কোড টাইপ করল। সাথে সাথেই আলমারির সেলফের আর্ধেকটা সরে এল। আর তখনই পেছনের একটা দরজা উন্মুক্ত হয়ে গেল।

হিংগিস্ট গেরারড গারভিনকে নিয়ে দ্রুত সামনের দিকে এগোতে লাগলো।

পেছনে আলমারির সেলফের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

অল্পক্ষণ হাঁটার পরেই তারা একটা এসকালেটর সিঁড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। একসালেটরটা এসে দাঁড়াবার সাথে সাথেই সব আলো নিভে গেল এবং এসকালেটর চলতে শুরু করল।

ঘুটঘুটে অন্ধকারে এসকালেটর কোনদিকে যাচ্ছে কোথায় যাচ্ছে বুঝার কোন উপায় নেই।

এসকালেটরটি অনেকবার উপর-নিচ করে এক সময় স্থির দাঁড়িয়ে গেল।

এসকালেটরের যেখানে তারা দাঁড়িয়েছিল, তার সামনের একটা দরজা খুলে গেল।

'আসুন স্যার!' বলে হিংগিস্ট খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল।

হিংগিস্ট ও গেরারড গারভিন ভিতরে প্রবেশ করার পর পেছনের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। এই দরজা বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে বিপরীত দিকের দেয়ালে আরেকটা দরজা খুলে গেল। সেই সাথে একটা ভারি কন্ঠ ভেসে এল, 'মি. গেরারড গারভিন, ওয়েল কাম। আসুন। হিংগিস্ট, তুমিও এস।'

খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল তারা।

ঘরের ভিতরে একটা বড় টেবিল। টেবিলের ওপাশে একটা রাজকীয় চেয়ার। টেবিলের এপাশে আরো দু'টি চেয়ার।

টেবিলের ওপাশে রাজকীয় চেয়ারে বসে আছে আপাদ-মস্তক কালো পোষাকে আবৃত একটা কালো মূর্তি। শুধু নাকের নিচ থেকে ঠোঁটের নিচ পর্যন্ত উন্মুক্ত। চেয়ারের উপর বসা লোকটির তীরের মত ঋজু শরীর।

তার নাকের নিচে ঠোঁটের উপর হিটলারী গোঁফ তার অবয়বে একটা হিংস্র রূপের সৃষ্টি করেছে। ঠোঁটে ভেসে ওঠা হাসি তা ঢাকতে পারেনি।

এই কালো মূর্তিই 'ব্ল্যাক লাইট' সংগঠনের প্রধান। ব্ল্যাক লাইটের লোকদের কাছে সে ব্ল্যাক বার্ড নামে পরিচিত। আসল নাম তার কি কেউ জানে না। বাড়ি তার কোথায় তাও কারো জানা নেই। তবে তার জার্মান উচ্চারণে পোলদের অ্যাকসেন্ট আছে।

চেয়ারে বসতেই ব্ল্যাক বার্ড গেরারড গারভিন ও হিংগিস্টকে বসতে বলল। বসল হিংগিস্টরা।

‘গারভিন, তোমাকে ডেকেছি একটা সমস্যায় পড়ে।’ বলল ব্ল্যাক বার্ড।

‘আমি কি করতে পারি স্যার? আদেশ করুন।’ বলল গেরারড গারভিন।

‘এক অজ্ঞাত এশিয়ান এসে দাঁড়িয়েছে সেনফিড ব্রুনাদের পাশে। গত দুই দিনে অন্তত চারবার তার কাছে আমাদের মারাত্মক পরাজয় ঘটেছে।’

বলে ব্ল্যাক বার্ড চারটি ঘটনাই তার কাছে বিস্তারিত তুলে ধরল।

গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছিল গেরারড গারভিন।

ব্ল্যাক বার্ড কথা শেষ করলেও গেরারড সংগে সংগে কথা বলল না। ভাবছিল সে।

এক সময় মাথা তুলল গেরারড গারভিন। বলল, ‘লোকটি অসাধারণ প্রফেশনাল। যে অস্ত্র ও কৌশল সে ব্যবহার করেছে তা বিশ্বমানের। আর তার সাহসের মাত্রা খুবই দুর্লভ ধরনের। যা শুনছিলাম তাতে আমি নিশ্চিত, তাকে সেনফ্রিড পরিবারের জন্যে এ্যাসাইনড করা হয়েছে। ঐ পরিবারের কোন বন্ধু সে নয়। বন্ধু হলে সে অনেক আগেই দৃশ্যপটে আসত। ব্রুনার কোন প্রেমিকও সে নয়। ঘটনার বিবরণ শুনে মনে হলো ঐ দিন সকালে ব্রুনার সাথে তার প্রথম সাক্ষাত।’

হঠাৎ থেমে গেল গেরারড গারভিন। তার চোখে-মুখে নতুন ভাবান্তর। বলল, ‘অ্যালিনা মানে ব্রুনার বড় বোন আনালিসা অ্যালিনা কোথায়? লোকটা তার কেউ নয় তো, মানে প্রেমিক বা এ ধরনের কেউ?’

সংগে সংগে উত্তর দিল না ব্ল্যাক বার্ড। সেও সম্ভবত ভাবছিল। বলল একটু সময় নিয়ে, ‘হ্যাঁ, অনেক দিন খোঁজ নেই অ্যালিনার। আমরা যতটা জেনেছি তাতে দেখা যাচ্ছে, অ্যালিনা আন্তর্জাতিক ধরনের একটা সংগঠনের চাকুরে। গোটা দুনিয়া তার ঘুরে বেড়াতে হয়। আমরা তাঁকে খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছি।’

‘তাহলে সে তো এশিয়াসহ পৃথিবীর যে কোন দেশেই থাকতে পারে। অ্যালিনার পক্ষে এই এশিয়ানকে তার পরিবারের সাহায্যের জন্যে নিয়োগ করা স্বাভাবিক।’

‘এটাও হতে পারে। তবে লোকটির ব্যাপারে অস্ট্রিয়ার ইমিগ্রেশান, বিমান বন্দর, হোটেলে খোঁজ নিয়ে আমরা জেনেছি, সে মার্কিন নাগরিক। মার্কিন

পাসপোর্ট নিয়ে সে এসেছে। ভিভি আইপি ইউরো ভিসা তার। ভিসা সে নিয়েছে তাহিতি থেকে। সুতরাং সে নিয়োগ দিলে বা অনুরোধ করে তাকে কাজে লাগালে লোকটির সাথে নিশ্চয় আনালিসা অ্যালিনাও আসতো। না আসাটা প্রমাণ করে লোকটির সাথে অ্যালিনার কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং সব দিকের বিচারে লোকটিকে অ্যালিনা নিয়োগ দেবে, এটা স্বাভাবিক মনে হয় না।' বলল ব্ল্যাক বার্ড।

'আপনার কথা ঠিক স্যার। তার নামটা কি স্যার?' গেরারড গারভিন বলল।

'আহমদ আবদুল্লাহ মুসা।' বলল ব্ল্যাক বার্ড।

আহমদ মুসার পিতা-মাতার দেয়া নাম আহমদ আবদুল্লাহ মুসা। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই আহমদ মুসা নামে সে পরিচিত হয়ে আসছে। তার বিভিন্ন পাসপোর্ট ও আন্তর্জাতিক সব রেকর্ডেও সে আহমদ মুসা। কিন্তু মার্কিন সরকারের দেয়া নাগরিকত্ব ও পাসপোর্টে তাঁর পূর্ণ নাম আহমদ আবদুল্লাহ নাম ব্যবহার করা হয়েছে।

'আহমদ আবদুল্লাহ মুসা? আহমদ মুসা নয় তো?' জিজ্ঞাসা গেরারড গারভিনের।

ব্ল্যাক বার্ড তাকাল গেরারড গারভিনের দিকে। বলল, 'কোন আহমদ মুসার কথা বছছ? মতুতুংগা দ্বীপের বন্দীখানা থেকে এই সেদিন প্রায় যে আহমদ মুসা ৭০ জন বিজ্ঞানীকে উদ্ধার করার ঐতিহাসিক কাজ করেছে, যে আহমদ মুসার শত শত কীর্তিগাথা পত্র-পত্রিকা ও ইন্টারনেটে রয়েছে, সেই আহমদ মুসার কথা?'

'জি আমি সেই আহমদ মুসার কথা বলছি।' গেরারড গারভিন বলল।

হিটলারি গোঁফের নিচে ব্ল্যাক বার্ডের ঠোঁটে একখণ্ড অবজ্ঞার হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'না গারভিন, আকাশ আর মাটি এক নয়। নামের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য থাকলেও সেই আহমদ মুসা ও এই আহমদ আব্দুল্লাহ মুসা এক অবশ্যই নয়। এই আহমদ আব্দুল্লাহ মুসা অসাধারণ এক ব্যক্তিত্ব, কিন্তু ঐ আহমদ মুসা এক জীবন্ত কিংবদন্তী! যাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বহু দেশের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রীরা সমীহ

করে চলে। সুতরাং তুমি যে আশংকা করছ, তা ঠিক নয় গারভিন। তার মত লোক আপনা-আপনি এসে সেনফ্রিডদের মত পরিবারের পাশে দাঁড়াবে এটা অবিশ্বাস্য।'

'আপনার কথাই হয়তো ঠিক। কিন্তু নামটা শুনে হঠাৎ আহমদ মুসার কথা আমার মনে হলো। আর এই লোকটার বৈশিষ্ট্য এমন যার সাথে আহমদ মুসার মিল আছে। অবশ্য দুই ব্যক্তি এক হওয়ার জন্যে এই মিলটুকু যথেষ্ট নয়। তাছাড়া আপনি যে কথা বলেছেন তা যৌক্তিক। আহমদ মুসার মত ব্যক্তিত্ব এমন কাজে এভাবে আসে না। সেনফ্রিডের যে সমস্যা তা তারা নিজেরাই জানে না। তারা নিজেরা যা জানে না, সে কাজের জন্যে কেউ আহমদ মুসাকে ডাকবে এবং সে আসবে তা বাস্তব নয়।' বলল গেরারড গারভিন।

'তাহলে বল, আমাদের সমস্যা কোথায় গিয়ে দাঁড়াল?' বলল ব্ল্যাক বার্ড।

'ব্রুনাদের সাথে আসা লোকটি আহমদ মুসা হোক বা না হোক, সে যে একজন বিপজ্জনক লোক এবং তার পথে দাঁড়ানো যে সহজ নয়, এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে। বুঝা যাচ্ছে তারা ব্রুমসারবার্গে আসছে। তারা আসছে নিশ্চয় একটা প্রতিকারের উদ্দেশ্য নিয়ে। তার মানে তারা এখন অ্যাগ্রেসিভ। লড়াইকেও তারা ভয় করছে না। এত সাহস তারা পেল কোথায়? নিশ্চয় ঐ লোকটিই তাদের সাহসের উৎস। সুতরাং স্যার, সব বাদ দিয়ে এই লোকটিই আপনাদের এক নম্বর টার্গেট হওয়া উচিত। একে সরিয়ে দেয়া ছাড়া আপনারা নিরাপদ নন।' গেরারড গারভিন বলল।

ব্ল্যাক বার্ডের হিটলারি গোঁফের নিচে এক টুকরো ক্রূর হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'ধন্যবাদ গারভিন, তুমি এ রকম একটা সুন্দর স্পষ্ট পরামর্শ দেবে সেটাই আমি আশা করেছিলাম। ধন্যবাদ তোমাকে।'

কথা শেষ করেই ব্ল্যাক বার্ড তাকাল হিংগিস্টের দিকে। বলল, হিংগিস্ট, পাশের ঘরে নাস্তা রেডি। গেরারড গারভিনকে নিয়ে যাও। ভালো করে নাস্তা করাও তাকে।'

হিংগিস্ট বুঝল এটাই বিদায়ের ইংগিত।

হিংগিস্ট উঠে দাঁড়াল।

উঠে দাঁড়াল গেরারড গারভিনও।

গেরারড গারভিনকে 'আসুন স্যার!' বলে দরজার দিকে হাঁটতে শুরু করল হিংগিস্ট।

তার পেছনে হাঁটতে শুরু করেছে হিংগিস্টও।

উত্তরমুখী রাস্তা ধরে হাঁটছিল আহমদ মুসা, সেনফ্রিড ও ব্রুনা।

রাস্তাটা ফাঁকা, তবে ফার্মল্যান্ডের রাস্তার মত প্রাইভেট মনে হচ্ছে। গাড়ি-ঘোড়া দেখা যাচ্ছে না।

পথের দু'ধারে ফসলের মাঠ, জংগল ও টিলার মত উচ্চ ভূমি।

এখনও কোন বড় লোকালয় চোখে পড়েনি।

রাস্তার আশেপাশে দু'একটা বাড়ি ও ফার্ম হাউজ দেখা যাচ্ছে। বাড়িগুলো পুরনো ও ওল্ড প্যাটার্নের।

'এটাই বাদের ওয়াটলেসবার্গ এলাকা। জার্মানির প্রাচীনতম সভ্যতার ধ্বংসাবশিষ্ট এলাকা এটি। জার্মানির ওল্ড স্যাক্সনদের একটা বড় অংশ এখানে বাস করে। এরা তাদের আদি সংস্কার-সংস্কৃতি এখনও ধরে রেখেছে। জার্মানির প্রাচীন স্থাপনাগুলো এখানেই বেশি দেখা যায়। এদের দেখলে জার্মানির প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতি দেখা হয়ে যায়। আমার খুব ভালো লাগে এদের।' বলল সেনফ্রিড।

'আসল কথাই বললেন না বাবা। জার্মানির মানে ইউরোপের আদি ডেমোক্র্যাসির কিছু এখনও এদের মধ্যে দেখা যায়।' ব্রুনা বলল।

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ ব্রুনা। এটা জার্মানির একটা গৌরবময় ঐতিহ্য।' বলল সেনফ্রিড।

'জার্মানি মানে ইউরোপের আদি ডেমোক্রাসি? সেটা কি?' আহমদ মুসা বলল।

‘সেটা ওল্ড স্যাক্সনদের একটা সমাজ ব্যবস্থা। যা ছিল আদি গণতন্ত্র। অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে রাইন নদীর অববাহিকায় স্যাক্সনদের সমাজে এটা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাস্তবে না দেখলে বিষয়টা বুঝা যাবে না স্যার। বলল ব্রুনা।

‘এই বাদেন এলাকায় কি শুধু ওল্ড স্যাক্সনরাই বাস করে?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘অন্য কম্যুনিটির কিছু লোকও বাস করে এ এলাকায়। কিন্তু সেটা শহর এলাকায়। গ্রাম এলাকা শুধুই ওল্ড স্যাক্সনদের?’ বলল ব্রুনা।

‘এখানেই সমস্যা। ওল্ড স্যাক্সনরা সম্পদ লোভী ও কূটবুদ্ধির নয়, ওরা সরল-সহজ, অল্পে তৃপ্ত। সম্পদ অর্জন ও দখল নিয়ে কোন সংঘাত-সংঘর্ষে নামে না তারা। এই সুযোগে নন-স্যাক্সনরা দূর্নীতিবাজ সরকারি কর্মকর্তাদের সাহায্যে এই বাদেন এলাকার ওল্ড স্যাক্সনদের বেশ জমি-জমা দখল করে নিয়েছে। এই বিষয়টা একটা রাজনৈতিক সমস্যারও সৃষ্টি করেছে।’ ব্রুনার পিতা সেনফ্রিড বলল।

আহমদ মুসা ও সেনফ্রিড পাশাপাশি হাঁটছিল। তাদের পেছনে পেছনে হাঁটছিল ব্রুনা।

কথা শেষ করেই সেনফ্রিড দাঁড়িয়ে পড়ল।

তারা চাররাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

কোনদিকে যাবে তারা এই সিদ্ধান্তের জন্যেই দাঁড়িয়ে পড়েছে সেনফ্রিড।

আহমদ মুসাও দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তার দৃষ্টি পূবের রাস্তার দিকে।

পূবের রাস্তা ধরে দু’টি কার ও তার কিছু পেছনে বড় আকারের একটা পাজেরো টাইপের জীপ পাগলের মত স্পীডে ছুটে আসছে।

আহমদ মুসা বুঝল সামনের কার দু’টোকে তাড়া করছে পেছনের বড় জীপটা।

আগের দু’টি কার বিচিত্রভাবে ডেকোরেটেড। সাধারণত বিয়ের কারগুলোকে এভাবে সাজানো হয়।

আহমদ মুসার ভাবনার চেয়েও দ্রুত গতিতে চলছিল গাড়িগুলো।

আহমদ মুসার চিন্তাকে এলোমেলো করে দিয়ে কার দু'টি পৌঁছে গেল চৌরাস্তাটির মুখে এবং সেই পাজেরোটি কার দু'টোকে ওভারটেক করে সামনে এসে কার দু'টোর পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে গেছে।

পাজেরোটি দাঁড়াতেই তার ছয়টি দরজা খুলে গেল। বেরিয়ে এল আটজন লোক। তাদের কয়েক জনের হাতে রিভলবার।

তারা ছুটে গেল কার দু'টির দিকে।

আহমদ মুসা বুঝল কি ঘটতে যাচ্ছে।

ব্রুনা ভয়ে জড়সড় হয়ে আহমদ মুসার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ফিস ফিস করে বলল, 'স্যার, কার দু'টির ডেকোরেশন ওল্ড স্যাক্সনদের বিয়ের গাড়ির মত। মনে হয় স্যার, কার দু'টো স্যাক্সনদের বিয়ের গাড়ি।'

'দু'টো গাড়ি ডেকোরেটেড কেন? আমি দেখেছি শুধু বরের গাড়িই ডেকোরেটেড হয়, যাতে চড়ে বিয়ের পর বর কনেকে নিয়ে যায়।' আহমদ মুসা বলল।

'ওল্ড স্যাক্সনদের নিয়ম হলো বর একটা ডেকোরেটেড গাড়ি নিয়ে আসবে, সে গাড়িতে চড়ে কনে শ্বশুর বাড়ি যাবে। এই গাড়ির মালিক হবে কনে। কনে পক্ষ আরেকটা ডেকোরেটেড গাড়ি দেবে, সেটায় চড়ে বর তার বাড়ি যাবে। এই গাড়ির মালিক হবে বর। এই গাড়ি দু'টি বিয়ের মূল্যবান স্মৃতি হিসাবে থাকে।' বলল ব্রুনা।

'সুন্দর ব্যবস্থা তো! এই দুই কারের কোনটিতে বর, কোনটিতে কনে থাকবে তারও কোন নিয়ম আছে?' আহমদ মুসা বলল।

'স্যার, সামনেরটায় কনে আছে, পেছনেরটায় বর রয়েছে। এক্ষেত্রে...।'

কথা শেষ করতে পারল না ব্রুনা। ব্রুনার কথার মাঝখানেই আহমদ মুসা বলে উঠল, 'দেখ, দেখ ব্রুনা, এরা মনে হয় কনেকে টার্গেট করেছে।'

আহমদ মুসার মত ব্রুনাও ঘটনার দিকে মনোযোগ দিল। তারা দেখল, পাজেরো থেকে ৮জন বেরিয়ে গিয়ে সামনের কারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

কেউ গাড়ির উপর লাথি চালাচ্ছে। কেউ গাড়ির দরজা খোলার চেষ্টা করছে। ভিতরের আরোহীরা গাড়ি লক করে দিয়েছে ভিতর থেকে। কেউ কেউ গাড়ির জানালার কাচ ভাঙার চেষ্টা করছে।

সামনের কারের পেছন দিকের বাঁ পাশের জানালার কাচ ভেঙে দরজা খুলে ফেলল ওরা।

একজন মহিলাকে টেনে বের করে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল। মহিলাটি পঞ্চাশোর্ধ্ব। হতে পারে বরের মা।

এরপর টেনে-হিঁচড়ে বের করল আর একজন তরুনীকে। তাঁর পরনের পোষাক দেখেই বুঝা গেল যে, এই মেয়েটিই কনে।

মেয়েটি চিৎকার ও কান্নাকাটি করছে।

এই সময় পেছনের গাড়ি থেকে একজন যুবক বেরিয়ে এল ট্রেডিশনাল স্যাক্সন পোষাক পরা অবস্থায়। সে ছুটে আসছিল তরুণীটিকে ওদের হাত থেকে উদ্ধারের জন্যে।

তিনজনে টেনে-হেঁচড়ে বের করছিল মেয়েটিকে। তাদের মধ্যে থেকে একজন যুবক তরুণীটিকে ছেড়ে দিয়ে পকেট থেকে রিভলবার বের করে গুলি করল যুবকটিকে। পরপর দু'টি গুলি। দু'টি গুলিই যুবকটির ডান বুকে বিদ্ধ হলো। যুবকটি আর এক পাও ওগোতে পারল না। তার দেহটা ভেঙে পড়ল যেখানে সে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই।

যুবকটি গুলি বিদ্ধ হতেই একজন যুবক চিৎকার করে বেরিয়ে এল পেছনের গাড়ি থেকে। সে যে বর, তার পোষাক দেখেই তা বুঝা গেল।

আগের যুবককে যে গুলি করে মেরেছে সেই যুবকটিই আবার রিভলবার উঁচিয়েছে।

আহমদ মুসা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে।

কে ঠিক বা বেঠিক তা সে জানে না। কিন্তু কনেকে ছিনতাই করা হচ্ছে এবং বরকে টার্গেট করা হয়েছে হত্যার জন্যে, এটা ন্যায় নয়, অন্যায় এবং এটা সৎ কাজ নয়, অবশ্যই কোন ষড়যন্ত্র। তার চোখের সামনে এটা সে ঘটতে দিতে

পারে না। এর প্রতিফল কি হবে তাও সে জানে না। কিন্তু যাই ঘটুক, সে মজলুমের পক্ষে দাঁড়াতে চায়।

চোখের পলকে আহমদ মুসার ডান হাত পকেট থেকে বেরিয়ে এল রিভলবার নিয়ে। গুলি করতে একটুও দ্বিধা করল না। গুলি করতে উদ্যত রিভলবারধারী যুবকটির ডান বাহুসন্ধিকে গুলি গিয়ে বিদ্ধ করল। তার হাত থেকে রিভলবার পড়ে গেল। ডান বাহু চেপে ধরে সে বসে পড়ল।

তার অন্য সাথীরা সংগে সংগেই তাকাল আহমদ মুসার দিকে। রিভলবার হাতে দাঁড়ানো আহমদ মুসাকে তারা দেখতে পেল।

সংগে সংগেই কয়েকটি রিভলবার উঠল আহমদ মুসার লক্ষে।

আহমদ মুসার রিভলবার ধরা হাত নিচু হয়নি। তার হাতের রিভলবার ঘুরে গেল ওদের লক্ষে অদ্ভুত দ্রুততার সাথে। আহমদ মুসার রিভলবার থেকে চারটা গুলি বেরিয়ে গেল ভাবনার মত দ্রুতগতিতে। ওদের আঙুল রিভলবারের ট্রিগার স্পর্শ করার আগেই পড়ে গেল ওদের রিভলবার ওদের হাত থেকে। রিভলবারধারী চারজনের কারো হাত, কারো বাহু, কারো বাহুসন্ধিকে বিদ্ধ করেছে আহমদ মুসার রিভলবারের গুলি।

তিনজন তখনও অক্ষত দাঁড়িয়ে ছিল। ওরা তাদের কোমরের ঝুলানো হোল্ডার থেকে ছুরি বের করছিল।

আহমদ মুসা রিভলবার উদ্ধত করে তাদের দিকে ছুটে গেল। চিৎকার করে বলল, 'যেই ছুরি বের করবে তাকে মরতে হবে। আমি কাউকে মারতে চাই না। এদের কাউকেই আমি মারিনি। কিন্তু আমার কথার অন্যাথা করলে সে রক্ষা পাবে না। তোমরা সকলেই ছুরি নিচে মাটিতে ফেলে দাও এবং আমি যে কাজ করতে বলি তা কর।'

কাজ দিল আহমদ মুসার কথা।

ওরা ওদের ছুরি ফেলে দিল।

'কারো কাছে ভিডিও ক্যামেরা আছে কিনা?' উচ্চ কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

পেছনের গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা সেই বরবেশী যুবক বলল, ‘একটা ভিডিও ক্যামেরা আছে।’

বলে সে পেছনের গাড়ি থেকে ক্যামেরাটি বের করে নিয়ে এল।

‘এখানে ঘটনার যে দৃশ্য দেখা যাচ্ছে, তার পরিপূর্ণ দৃশ্য ভিডিওতে নিয়ে আসুন। যে যেখানে আছে, যা যেখানে আচে তার চিত্র ভিডিওতে থাকতে হবে, শুধু আমাদের তিনজনের ছবি ছাড়া।’ যুবকটিকে লক্ষ করে বলল আহমদ মুসা।

ছবি তোলা হয়ে গেল। গাড়ি থেকে সবাই বেরিয়ে এসেছিল।

সামনের গাড়িতে বরের পিতা-মাতা ও কনের পিতা-মাতা ছিল এবং পেছনের গাড়িতে কনের এক ভাই, বরের দুই ভাইসহ ওল্ড স্যাক্সনদের সাব-কাউন্সিলের ডেপুটি ডিউক ছিল।

ছবি ওঠানোর পর আহমদ মুসা যে তিনজন আহত হয়নি, সে তিনজনসহ ওদের সবাইকে বলল, ‘আপনারা সবাই আপনাদের গাড়িতে উঠুন এবং তাড়াতাড়ি কোন হাসপাতালে যান। অনেকেরই অনেক রক্তক্ষরণ হয়েছে, তাদের দ্রুত চিকিৎসা প্রয়োজন।’

ওরা সবাই আহমদ মুসার দিকে একবার তাকাল। তারপর তারা নিরবে উঠে গেল গাড়িতে।

গাড়ি ওদের স্টার্ট নিল।

চলে গেল তারা।

এ দু’গাড়ির সবাই পাথরের মত দাঁড়িয়ে।

বর কনেকে কি ইশারা করল।

দু’জনে এক পা দু’পা করে এগিয়ে এল আহমদ মুসার কাছে।

আহমদ মুসার সামনে দু’জন মুহূর্তের জন্যে স্থির হয়ে দাঁড়াল। তারপর দু’জন এক সাথে মাথা ঝুঁকিয়ে দীর্ঘ বাও করল আহমদ মুসাকে। মাথা তুলে কান্নায় ভেঙে পড়ল তারা। বলল তারা দু’জনেই, ‘গড থিউ হানরকে ধন্যবাদ। আপনি আমাদের সন্মান বাঁচিয়েছেন, যে সন্মান জীবনের চেয়ে বড়। আপনি আমাদের জীবনও বাঁচিয়েছেন। অপরিশোধ্য এক ঋণে আপনি আমাদের বেঁধে ফেলেছেন। আমাদের কৃতজ্ঞতা আপনি গ্রহণ করুন।’

বর ও কনের পিতা-মাতাসহ অবশিষ্ট সবাই এগিয়ে এল। তারাও আহমদ মুসাকে বাও করল এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল।

ঘটনাগুলো ঘটে গেল দ্রুত ও অব্যাহত গতিতে।

আহমদ মুসা কিছু বলার সুযোগ পায়নি।

পাশে দাঁড়িয়ে ব্রুনা ফিসফিস করে বলছিল, 'স্যার, এদের কথা বুঝতে পেরেছেন তো? এরা ওল্ড স্যাক্সন ভাষায় কথা বলে। এদের জার্মান ভাষা খুব শুদ্ধ নয়।'

আহমদ মুসা বলেছিল, 'না, আমি বুঝতে পেরেছি ওদের কথা।'

ওদের বাও পর্ব শেষ হলে বর-কনেসহ সবাইকে উদ্দেশ্য করে আহমদ মুসা বলল, 'আমি আনন্দিত যে, আপনারা ঈশ্বর অর্থাৎ আল্লাহকে ধন্যবাদ দিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা তাঁরই প্রাপ্য, আমার নয়।'

মুহূর্তের জন্যে থেমে বর-কনেকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'বর-কনে ভাই-বোনরা শোন, মানুষ একে অপরকে সাহায্য করলে সেটা ঋণ হয় না। এই সাহায্য করা একে অপরের দায়িত্ব। আমি সে দায়িত্ব পালন করেছি। নতুন জীবনের শুরুতে 'অপরিশোধ্য' কোন ঋণের বোঝা তোমাদের মাথায় রাখার দরকার নেই।'

শেষ বাক্যটা বলল আহমদ মুসা মুখে হাসি টেনে, স্নেহের হাসি।

আহমদ মুসার হাসি ও স্নেহমাখা কথায় বর-কনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারা আবার বাও করল আহমদ মুসাকে। তাদের চোখে অসীম শ্রদ্ধা ও সম্মানের দৃষ্টি।

এগিয়ে এলো চার প্রৌঢ়, বর-কনের পিতা-মাতাসহ চারজন। তাদের মধ্যে একজন নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, 'আমি বরের বাবা। আমার দু'টি অনুরোধ আপনার কাছে। একটি অনুরোধ হলো, বর-কনের বিয়ে হয়ে গেছে। কনেকে আমরা নিয়ে যাচ্ছি। বাড়িতে আজ আমাদের মূল অনুষ্ঠান। আমাদের এই অনুষ্ঠানে আপনাকে, ম্যাডামকে ও আপনাদের সাথী ভদ্র মহোদয়কে দাওয়াত। আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ আমাদের দাওয়াত আপনারা গ্রহণ করুন। অন্য অনুরোধটি হলো একটা বিরাট ঘটনা ঘটে গেছে। এই ঘটনায় আপনি সিদ্ধান্তকারী

ভূমিকা পালন করেছেন। এখন করণীয় সম্পর্কে আপনার কোন পরামর্শ আছে কি?'

থামল বরের পিতা বার্টওয়াল্ড।

বরের পিতা বার্টওয়াল্ড থামলে আহমদ মুসা ব্রুনা ও তার পিতা আলদুনি সেনফ্রিডকে ওদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। ব্রুনাকে দেখিয়ে বলল, 'ইনি ম্যাডাম নন, ইনি মিস ব্রুনা ব্রুনহিল্ড। আমি তাদের অতিথিমাত্র।'

এভাবে আলদুনি সেনফ্রিডকে পরিচয় দিল এবং বলল, 'এদের অতিথি হিসাবে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়ে নেই। এরা ইচ্ছা করলে তাদের অতিথিকে কোথাও নিয়ে যেতে পারেন। আর দ্বিতীয় বিষয়টির ব্যাপারে আমার নিজের কোন বক্তব্য নেই। আপনাদের আইন যা বলে তাই করা উচিত।'

এগিয়ে এল ওল্ড স্যাক্সনদের সাব-কাউন্সিলের ডেপুটি ডিউক অসওয়াল্ড আহমদ মুসার দিকে কয়েক ধাপ। বলল, 'আইন যা বলে তাই যদি আমরা করব, তাহলে আসামীদের আমরা ছাড়লাম কেন? কেস দূর্বল করার সুযোগ হলো ওদের।'

'না, তা হবে না জনাব। ওদের সবার ছবি নেয়া হয়েছে। রিভলবার ও অন্যান্য অস্ত্রে ওদের হাতের ছাপ আছে। সুতরাং কেস দুর্বল হওয়ার কথা নয়। আর আপনারা যদি চান, তাহলে পুলিশের এক উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে বলতে পারি।' বলল আহমদ মুসা।

'অনেক ধন্যবাদ, বললে ভালো হয়। অবশ্য এখানকার পুলিশ অফিসার ভালো। কিন্তু আমাদের প্রতিপক্ষ খুব সাংঘাতিক। ওরা না পারে এমন কিছু নেই। আইনের কোন মূল্য নেই ওদের কাছে।' বলল ডেপুটি ডিউক অসওয়াল্ড।

'ঠিক আছে, 'আমি বলছি জনাব।'

বলে আহমদ মুসা পকেট থেকে মোবাইল বের করে কল করল তাহিতি গভর্নরের বন্ধু জার্মানির পুলিশপ্রধান বরডেন ব্লিসকে। তাকে সব কথা জানিয়ে তার সাহায্য চেয়ে বলল, 'আমার মনে হচ্ছে জনাব এ রকম টেলিফোন আপনাকে আরো অনেক বারই হয়তো করতে হবে।'

‘প্লিজ কোন দ্বিধা করবেন না আহমদ মুসা। আপনি আমাদের অতিথি। যে কাজটা আপনি করছেন, সেটা আমাদের কাজ। আর আপনার টেলিফোন পেলে আমি খুশি হবো আহমদ মুসা। আমার গর্ব হয় ভাবতে যে, মার্কিন প্রেসিডেন্টসহ পৃথিবীর কয়েক ডজন রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানের সম্মানিত বন্ধুর সাথে আমি কথা বলছি। আমি বাড়তি কিছু বলছি না, এটাই বাস্তবতা মি. আহমদ মুসা।’ বলল পুলিশপ্রধান বরডেন ব্লিস।

শুভেচ্ছা ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতির জন্যে ধন্যবাদ দিয়ে আহমদ মুসা অনুমতি নিয়ে কল অফ করে দিল।

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই কনের পিতা বলল আলদুনি সেনফ্রিডকে লক্ষ করে, ‘বরের পিতা মি. বার্টওয়াল্ড যে দাওয়াত দিয়েছেন, তা আমাদের সকলের পক্ষ থেকে দাওয়াত আপনাদের সকলকে। দয়া করে আপনার মেহমানসহ আপনারা আমাদের দাওয়াতে শরিক হবেন।’

‘ধন্যবাদ! আমাদের মেহমানের আপত্তি না থাকলে আপনাদের দাওয়াত কবুলে আমাদেরও আপত্তি নাই। কিন্তু কোথায় কত দূর যেতে হবে?’ বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

‘বেশি দূরে নয়, এখান থেকে সবচেয়ে কাছের লোকালয় উইসকারহেইম। সুন্দর উপত্যকায় সুন্দর একটা লোকালয়। জানতে পারি কি, কোথায় আপনারা যাচ্ছেন?’ বলল বরের পিতা বার্টওয়াল্ড।

‘ক্রমসারবার্গে যাচ্ছি আমরা।’ আলদুনি সেনফ্রিড বলল।

‘ক্রমসারবার্গ? তাহলে এ পথে কেন?’ বলল কনের পিতা।

‘আল্লাহ নিয়ে এসেছেন আমাদের, তাই। আপনাদের সাথে পরিচয় করানো একটা উপলক্ষ হতে পারে।’ আহমদ মুসা বলল।

বর-কনে দু’জনেই দু’হাত জোড় করে উপরে তুলে উর্ধ্বমূখী হয়ে দু’চোখ বন্ধ করে কৃতজ্ঞতা ও ভক্তিমাখা প্রার্থনার সুরে বলল, প্রভু ফ্রিগ, টিউ, থানোর আমাদের জন্যে এমন মিরাকল যেন বার বার ঘটান।’

ফ্রিগ, টিউ, থানোররা কি আপনাদের বিভিন্ন গড?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘আমাদের গডের এগুলো প্রাচীন নাম। অনেকেই বিশ্বাস করতো এগুলো বিভিন্ন গডের নাম। কিন্তু তা নয়, আসলে এগুলো এক গডের বিভিন্ন নাম। দুরূহ যাতায়াত ব্যবস্থার কারণে একই দেশের ভৌগলিক বিচ্ছিন্নতার কারণে বিভিন্ন অঞ্চলে একই গডের বিভিন্ন নাম হয়েছিল মাত্র। বলল বর এড্রিক।

‘ধর্ম ও ঐতিহ্যের ব্যাপারে তুমি তো খুব সচেতন দেখছি?’

বলল আহমদ মুসা।

হাসল বর এড্রিক। পাশের কনের দিকে ইংগিত করে বলল, ‘স্যার, আমালিয়া ধর্ম, ইতিহাস, ঐতিহ্যের ছাত্রী। ওতো এসব ব্যাপারে পণ্ডিত।’

কনে আমালিয়া লজ্জায় লাল হয়ে গেল। মুহূর্তের জন্যে মুখ তুলে আবার মুখ নিচু করল।

‘ধর্ম ও ঐতিহ্য চেতনা মানুষের অতি প্রয়োজনীয় একটা বড় গুণ। ধন্যবাদ তোমাদের।’ আহমদ মুসা বলল।

বরের পিতাও মোবাইলে কথা বলছিল।

আহমদ মুসা কথা শেষ করে তার দিকে তাকাল।

বরের পিতা বার্টওয়াল্ড কথা শেষ করেই আহমদ মুসাকে বলল, ‘জনাব, পুলিশ আসছে। রওয়ানা দিয়েছে সংগে সংগেই।’

‘ঠিক আছে, পুলিশ আসছেন। তাঁরা দেখুক। পুলিশ কি ঘটনা আগে জানতে পেরেছিল?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘মনে হলো তাই। আমি ঘটনার কথা তুলতেই জায়গার নাম করে বলল, ওখানকার ঘটনা তো? তারপর বলল, আমরা প্রস্তুত হয়েছি ওখানে যাবার জন্যে। কোনোভাবে তারা ঘটনার কথা কিছু জানতে পেরেছিল?’ বলল বরের পিতা বার্টওয়াল্ড।

‘কার সাথে কথা বললেন, সেই ভালো পুলিশ অফিসারের সাথে?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘না, তিনি নেই। কি এক ট্রেনিং-এ তিনি বার্লিন গেছেন।’ বলল বরের পিতা।

পুলিশের গাড়ির সাইরেন শোনা গেল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই গাড়ি এসে গেল। তিনটি গাড়ি।

নামল একদল পুলিশ।

একজন পুলিশ অফিসার সামনে এগিয়ে এসে চিৎকার করে পুলিশকে নির্দেশ দিল, 'তোমরা লাশটাকে গাড়িতে তোল।'

তারপর আহমদ মুসাদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'কনের ও বরের বাপ কে?'

বরের বাপ ও কনের বাপ কয়েক ধাপ তার দিকে এগিয়ে তাদের পরিচয় দিল।

'তোমরা একজনকে হত্যা করেছ এবং আরও কয়েকজনকে আহত করেছ। তারা কোথায়?'

'আমরা হত্যা করিনি। আহতরা চলে গেছে।' বলল বরের বাপ।

'আমরা হত্যা করিনি। নিহত ব্যক্তিটি আমাদের লোক।' কনের বাবাও বলল সংগে সংগেই।

'তাহলে কে হত্যা করেছে? সে কোথায়?' পুলিশ অফিসার বলল।

'সে আহতের মধ্যে একজন ছিল। চলে গেছে।' বলল বরের বাবা।

'চলে গেছে? কথা ঘুরাবার আর জায়গা পেলেন না? তারা আহত হয়েছে কাদের হাতে?' পুলিশ অফিসারের জিজ্ঞাসা।

'আমাদের হাতে।' বরের বাবাই বলল।

'তাহলে খুনিকে যেতে দিলেন কেন?' পুলিশ বলল।

'যাতে চিকিৎসা পায় এজন্যে। ওরা আমাদের পরিচিত। সবার নাম বলতে পারি। গেলেই ওদের পাওয়া যাবে।' বলল কনের বাবা।

পুলিশ অফিসার হো হো করে হাসল। বলল, 'এই কাহিনী আর কাউকে বলবেন, পুলিশকে নয়। বর-কনে ছাড়া সবাই আন্ডার এ্যারেস্ট। যে রিভলবার দিয়ে গুলি করেছেন, সেটা কোথায়?'

বিপদে পড়ে গেল বরের বাবা ও কনের বাবা। তারা একে-অপরের দিকে তাকাল। দু'জনেই ভাবল, তারা তাদের অতিথি, তাদের জীবন-সম্মান রক্ষাকারী আহমদ মুসার কথা বলতে পারে না। কিন্তু তারা কোন্ মিথ্যা কথাটা বলবে সেটা

ভাবছিল। সেই মুহূর্তে আহমদ মুসা এগিয়ে এল। বলল, 'অফিসার! রিভলবারটা আমার কাছে, রিভলবারটা আমার। একজন নব-বিবাহিত কনের সম্মান রক্ষা এবং কয়েক জনের জীবন রক্ষার জন্যে ডিফেন্সের মিনিমাম ব্যবস্থা হিসাবে কয়েকজনকে আহত করতে হয়েছে।'

'তার মানে বলছেন, হত্যা আপনি করেননি?' পুলিশ অফিসার বলল।

'যে গুলিতে নিহতের ঘটনা ঘটেছে, সেটা আমার রিভলবারের নয়। যে রিভলবারগুলো পড়ে আছে, সেগুলোর কোন একটার গুলি ওটা। সে রিভলবারের ফিংগার প্রিংন্ট থেকে প্রমাণিত হবে, কে তাকে হত্যা করেছে।' বলল আহমদ মুসা।

পুলিশ অফিসার কিছুটা বিস্ময় নিয়ে পরিপূর্ণভাবে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'আপনাকে তো জার্মান মনে হচ্ছে না। কে আপনি, কোন দেশে বাড়ি?'

বলেই পুলিশ অফিসারটি তাকাল ব্রুনা ও আলদুনি সেনফ্রিডের দিকে। বলল, 'এরা কি আপনার সাথের?'

'হ্যাঁ।' বলল আহমদ মুসা।

হঠাৎ পুলিশ অফিসারটির চোখ-মুখের চেহারা পাল্টে গেল। মনে হলো, বড় কিছু যেন পেয়ে গেছে। তড়িঘড়ি করে ব্রুনাদের বলল, 'আপনার নাম কি ব্রুনা ব্রুনহিল্ড এবং ইনি আপনার পিতা আলদুনি সেনফ্রিড?'

'হ্যাঁ, অফিসার।' বলল ব্রুনা।

খুশিতে গোটা মুখ ঢেকে গেল পুলিশ অফিসারটির। তড়াক করে আহমদ মুসার দিকে ফিরে বলল, 'তাহলে আপনি স্টুডগার্টের ওদিকে থ্রিহিল উপত্যকায় অর্ধ ডজন মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করে এসেছেন। থ্যাংকস গড! আপনাকেই তো আমরা খুঁজছিলাম। একেবারে হাতের মুঠোয় এসে পড়েছেন।'

বলেই পুলিশ অফিসারটি পকেট থেকে মোবাইল বের করে স্বগত কণ্ঠে বলল, 'আমাদের স্টেট-পুলিশপ্রধান এডমন্ড এড্রিস স্যারকে খবরটা জানাই।'

মোবাইলে কল করল পুলিশ অফিসার।

‘গুড ইভনিং স্যার। আমি হের হেস-এ উইসকারহেইম পুলিশ অফিসের ভারপ্রাপ্ত অফিসার।’

ওদিক থেকে কথা শুনে আবার সে বলল, ‘ধন্যবাদ স্যার। খবরটি হলো স্যার, স্টুটগার্টের ওপারে তিন পাহাড়ের উপত্যকায় যে পৈশাচিক গণহত্যার মত ঘটনা ঘটে, তার খুনিকে ধরে ফেলেছি স্যার, তার সাথের দু’জন পলাতকসহ। আমি..স্যরি! বলুন স্যার।’

ওপারের কথা শুনতে শুনতে সে আড় চোখে একবার আহমদ মুসার দিকে তাকাল। বলল, ‘স্যার, তাঁর নাম জিজ্ঞেস করিনি। তবে ব্রুমসারবার্গ থেকে পলাতক বাবা-মেয়ের নাম আলদুনি সেনফ্রিড ও ব্রুনা ব্রুনহিল্ড।’

আবার অনেকক্ষণ ধরে সে ওপারের কথা শুনল। মুখটা তার ধীরে ধীরে চুপসে গেল। মাথাটা একটু ঝুঁকে পড়ল। অবশেষে বলল, ‘ওকে স্যার। কিছুই আমার জানা ছিল না স্যার। স্যরি।’ থামল সে।

ওপার থেকে আবার কিছু কথা শুনল। তারপর বলল, ‘ঠিক আছে স্যার, আমি সব বুঝেছি। ধন্যবাদ স্যার।’

পুলিশ অফিসারটি কথা শেষ করেছে।

হাতের মোবাইলটি পকেটে ফেলে সে এগিয়ে এল আহমদ মুসার কাছে। নরম কণ্ঠে বলল, ‘স্যার! স্যরি, আপনার পরিচয় দেয়া উচিত ছিল। আপনি জার্মানির সম্মানিত মেহমান। একটা গুরুত্বপূর্ণ তদন্তে আপনি এসেছেন। এ কথা বললেই আর কিছু ঘটত না। ওয়েলকাম স্যার।’

‘ধন্যবাদ অফিসার। একটা কথা কি জানতে পারি?’ বলল আহমদ মুসা।

‘কি কথা বলুন স্যার?’ বলল পুলিশ অফিসার।

‘ব্রুনা ও তার পিতা আলদুনি সেনফ্রিডকে পলাতক বলছেন কেন?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘আমি বিষয়টির তেমন কিছু জানি না। ওদের দু’জনের ছবিসহ একটা সার্চনেট আছে আমাদের পুলিশ অফিসে।’ পুলিশ অফিসারটি বলল।

‘সার্চনেটে কোন অভিযোগের কথা আছে?’

বলল আহমদ মুসা।

'বেশি কিছু নেই। 'ব্রুমসারবার্গের ঐতিহ্যবাহী স্যাক্সন স্টেট দখলের ষড়যন্ত্র করছে মালিক মিসেস কারিনা কারলিনকে হত্যা করে'-এই বাক্যই শুধু লেখা আছে।' পুলিশ অফিসার বলল।

'অভিযোগ কে করেছিলেন?' বলল আহমদ মুসা।

'অভিযোগ কারিনা কারলিনের।' পুলিশ অফিসার বলল।

'আর একটা প্রশ্ন অফিসার।' বলল আহমদ মুসা।

'সিওর। বলুন।' পুলিশ অফিসার বলল।

'স্টুটগার্টের ওপারের থ্রি হিল উপত্যকায় যে ঘটনা ঘটেছে, তা আপনাদের জানিয়েছে কে? পুলিশ সূত্রে?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

পুলিশ অফিসারটি হাসল। বলল, 'আপনি যা আশা করছেন, সেটাই ঠিক। আমরা অন্য সূত্রে জানতে পেরেছি। মাত্র কিছুক্ষণ আগে দু'জন লোক আমাদের পুলিশ অফিসে এসেছিল। তারাই খবরটা জানিয়েছে। তারা আপনাদের ধরার জন্যে আমাদের সাহায্য চায়।' আপনারা এদিকে এসেছেন তাও জানায় ওরা।' পুলিশ অফিসার বলল।

'ওরা কি তাদের পরিচয় দিয়েছিল?' আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

'আইডি কার্ড দেখিয়েছিল।' পুলিশ অফিসার বলল।

'প্লিজ অফিসার, বলবেন তাদের অ্যাড্রেস কি ছিল আইডি কার্ডে?' বলল আহমদ মুসা।

'ওরা দু'জনেই হামবুর্গের বাসিন্দা।' পুলিশ অফিসার বলল।

'হামবুর্গ!' বলল আহমদ মুসা। তার চোখে-মুখে বিস্ময়। অনেকটা স্বগত কণ্ঠেই কথাগুলো বলল আহমদ মুসা।

মনে মনে ভাবল, কোথায় ব্রুমসারবার্গ, আর কোথায় হামবুর্গ।

'হ্যাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন স্যার।'

কথাটা শেষ করেই পুলিশ অফিসার বর-কনের পিতাকে লক্ষ করে বলল, 'ঠিক আছে আপনারা চলে যান। আপনারা লিখিত একটা বিবরণ পাঠাবেন। আমরা একটা এফআইআর লিখে নিচ্ছি।

‘ধন্যবাদ স্যার! আমাদের বাড়ির অনুষ্ঠান অন্তত পণ্ড হওয়া থেকে বাঁচবে। অনেক ধন্যবাদ স্যার।’ বলল বরের বাবা।

‘ধন্যবাদ আমাকে নয় জনাব, স্যারকে দিন। তাঁর উপস্থিতি আজ আপনাদের রক্ষা করেছে। ওরা কিন্তু আপনাদের বিরুদ্ধে আটঘাট বেঁধেই লেগেছিল।’ পুলিশ অফিসার বলল।

বরের বাবা কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই আহমদ মুসা বলল, ‘আল্লাহর জন্যেই সব প্রশংসা অফিসার। আপনাদেরকেও ধন্যবাদ সহযোগিতার জন্যে।’

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই বরের পিতা আহমদ মুসাকে বলল, ‘স্যার, আমরা এখন যেতে পারি।’

‘আপনারা গুরুজন, এভাবে ‘স্যার, বলছেন কেন?’

বলল আহমদ মুসা। তার চোখে-মুখে অস্বস্তি।

‘যার যতটুকু সম্মান তাকে তা দেয়া উচিত। আমরা আগে আপনাকে চিনতে পারিনি। থাক এ বিষয়। এবার যেতে পারি।’ বলল বরের পিতা।

‘জনাব একে চেনার অনেক বাকি আছে এখনও। আমার বস স্যার এডমন্ড ওর সম্পর্কে বললেন, কয়েক ডজন সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান আছেন যারা ওর বন্ধু। খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট তাকে সমীহ করেন, তার পরামর্শ ও সাহায্য নেন। আমাদের নায়ক কিংবদন্তী রবিনহুড, জেমস বন্ডের কীর্তিকলাপ ছিল এক দেশ বা এক জোনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আর ওঁর কর্মক্ষেত্র গোটা বিশ্ব। দেখুন ওঁর সফরটা। সেই তাহিতি থেকে এসেছেন জার্মানিতে। জানি না, আপনারা ওঁকে ডেকেছেন কিনা। ওঁকে কিন্তু ডাকতে হয় না। যেখানে ওঁকে দরকার, সেখানেও তিনি দেবদূতের মত হাজির হন।’

থামল পুলিশ অফিসার।

বর-কনে, বর ও কনের পিতা, ব্রুনা, তার পিতা, সবাই আহমদ মুসার দিকে রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে ছিল। পুলিশ অফিসারের কথা শেষ হতেই সবাই জার্মান ভংগিতে সামনে ঝুঁকে মাথা নুইয়ে বাও করল আহমদ মুসাকে।

বিব্রত আহমদ মুসা পুলিশ অফিসারকে বলল, ‘আপনি আমার সম্পর্কে অযথাই বেশি বলেছেন।’

‘আমার বস এডমন্ড এড্রিন আপনার সম্পর্কে যা বলেছেন, আমি তো তার সব কথা বলিনি। আপনি ফ্রান্স ও জার্মানিতেও...।’

পুলিশ অফিসার কথা শেষ করতে পারলো না। আহমদ মুসা তাকে থামিয়ে দিয়ে বরের পিতার উদ্দেশ্যে বলল, ‘চলুন’, আমরা গাড়িতে উঠি।’ অনেক সময় ধরে কথা বলছি আমরা।’

বরের পিতা ব্যস্ত হয়ে উঠল। বলল, ‘স্যার, আপনি, ম্যাডাম ব্রুনা ও তার পিতা বর-কনের গাড়িতে উঠুন। আমরাও গাড়িতে উঠছি।’ বলল বরের পিতা।

বর ও কনে এগিয়ে এসে বলল, ‘আমাদের পরম সৌভাগ্য, আসুন স্যার।’

আহমদ মুসা গাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করে বলল, ‘গাড়ি কিন্তু আমি ড্রাইভ করব।’

‘কেন স্যার, ড্রাইভার তো আছে।’ বর বলল।

‘তা আছে। কিন্তু কেন জানি আমার ড্রাইভ করতে ইচ্ছা করছে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ঠিক আছে স্যার। তাহলে ড্রাইভার অন্য গাড়িতে যাবে। আমি আপনার পাশে বসব স্যার।’

‘কনে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে?’ বলল আহমদ মুসা।

‘বলতে পারেন, কনে থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্যেই। কারণ আমাদের সমাজে বরের গাড়িতে যাবার সময় বর-কনে এক সঙ্গে বসে না। ভিন্ন গাড়িতে যায়।’ বর বলল।

কিন্তু তোমার পিতা তো বর-কনে এক গাড়িতে ওঠার কথা বললেন।’ বলল আহমদ মুসা।

‘হতে পারে নিরাপত্তার কারণে। আপনাকেও বর-কনের গাড়িতেই উঠতে বলেছেন।’ বর বলল।

‘ঠিক আছে!’ বলে আহমদ মুসা গাড়িতে উঠল।

সবাই উঠল গাড়িতে।

গাড়ি চলতে শুরু করল।

চারটি গাড়ি খুব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল ফার্মল্যান্ডের প্রশস্ত রাস্তা ধরে।

সামনের গাড়িটি ছোট নাইন সিটার মাইক্রো।

পেছনের তিনটিই জীপ।

মাইক্রোতে সাতজন আরোহী। সবার হাতেই রিভলবার।

ড্রাইভিং সিটের পাশে কালো হ্যাট, কালো জ্যাকেট, কালো প্যান্ট পরা লোকটির হাতে ছিল মাইক্রো মেশিনগান।

মাইক্রোর অবশিষ্ট ছয়জনের দু'জন ছাড়া অন্যদেরও কালো হ্যাট ও কালো জ্যাকেট। পরনেও কালো প্যান্ট।

সামনের কালো পোষাকের লোকটি পাশে ড্রাইভিং সিটের লোকটিকে লক্ষ করে বলল, 'ওরা তো ঠিকই তিনজন ছিল?'

ড্রাইভিং সিটের লোকটির পরনে নীল প্যান্টের উপর সাদা জ্যাকেট। মাথা খালি। লম্বা চুল মাথায়। চেহারাটা নায়কের মত। কালো পোষাকধারীর প্রশ্নের জবাবে বলল লোকটি, 'অবশ্যই তিনজন। একজন বয়স্ক, একজন তরুণী ও অন্যজন যুবক। তরুণী ও বয়স্ক লোকটি জার্মান। যুবকটি এশিয়ান।

'গুলি করেছে শুধু এশিয়ান যুবকটাই তো?' জিজ্ঞাসা সামনে বসা সেই কালো পোষাকধারীর।

'হ্যাঁ। তরুণী ও বয়স্ক লোকটির কোন ভূমিকাই ছিল না।' বলল ড্রাইভিং সিটের লোকটি।

'ঠিক মিলে যাচ্ছে। আরেকটা কথা, তারা কোন দিক থেকে আসছিল, আপনারা কি খেয়াল করেছিলেন?' কালো পোষাকের সেই লোকটি বলল।

'দক্ষিণ থেকে তারা হেঁটে আসছিল।' বলল ড্রাইভিং সিটের লোকটি।

'হেঁটে আসছিল, গাড়িতে নয়?' কালো পোষাকধারী লোকটি বলল।

‘হ্যাঁ তাই।’ বলল ড্রাইভিং সিটের লোকটি।

কালো পোষাকধারী লোকটি খুশি হয়ে উঠল। বলল, ‘সব মিলে যাচ্ছে। নিশ্চয় তারা তাদের গাড়ি নদীতে ফেলে দেবার পর আর কোন গাড়ি পায়নি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। ওদেরকে এখন ওখানে পেলেই হয়।’

‘সময় বেশি যায়নি। আর পুলিশের সাথে আমাদের কথা হয়েছে। আমরা পুলিশকে জানিয়েছি। পুলিশ এতক্ষণে ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেছে। ওরা কেউ চলে যেতে পারবে না।’ বলল ড্রাইভিং সিটের লোকটি।

‘আমাদের সাথেও পুলিশের যোগাযোগ আছে। ওরা গাড়ি ছেড়ে পালাবার পর আমরাও বিষয়টি পুলিশকে জানিয়েছি। তারাও ওদের পেলে ছাড়বে না।’ বলল কালো পোষাকধারী।

‘তাহলে তো আর চিন্তা নেই। আমরাও দ্রুতই চলছি।’ বলল ড্রাইভিং সিটে বসা লোকটি।

‘ধন্যবাদ। আপনাদের চাওয়া শুধু মেয়েটিকেই তো? পেয়ে যাচ্ছেন, চিন্তা নেই।’ কালো পোষাকধারী বলল।

‘এবার মেয়েটিকেই নয়, তার বাবা ও বরের বাবা ও সাথের অন্যদেরও চাই। শাস্তি দিতে চাই আমরা নিজ হাতে। আমাদের ছয় সাতজন লোক গুলিবিদ্ধ। অনেকে পঙ্গু, কারও কারও প্রাণ সংশয়ও হতে পারে। ওদের ছাড়া যাবে না।’ বলল ড্রাইভিং সিটের লোকটি।

গাড়ি তিনটি দ্রুত এগিয়ে চলছিল ফার্মল্যান্ডের প্রশস্ত রাস্তা ধরে।

হঠাৎ সামনের মাইক্রোটি হার্ডব্রেক কষল।

ড্রাইভিং সিটের লোকটির দৃষ্টি সামনের দিকে। সবাই সামনে তাকাল। সামনের সিটের কালো পোষাকের লোকটির দৃষ্টিও সেদিকে।

গাড়ির ব্রেক কষেই ড্রাইভিং সিটের লোকটি বলে উঠল, ‘সামনের তিনটি গাড়ি তো ওদেরই। ঐতো দু’টি ডেকোরেটেড গাড়ি। এই ডেকোরেশন করা গাড়িটি বেশ পরিচিত, কিছুক্ষণ আগেই দেখেছি। ঠিক ওরাই আসছে।’

কথাটা কানে যেতেই তার পাশের সিটের কালো পোষাকধারী লোকটি জানালার দিকে মুখ বাড়িয়ে তীক্ষ্ণ একটা শীষ দিল। তারপর লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নামল মেশিন রিভলবার হাতে নিয়ে।

পেছনের দু'টি গাড়িও থেমে গিয়েছিল।

শীষ দেয়ার সাথে সাথেই ছয় সাতজন কালো পোষাকধারী গাড়িগুলো থেকে নেমে এল।

সামনের কালো পোষাকধারী লোকটি গাড়ি থেকে নেমেই গুলি বৃষ্টি করতে করতে ছুটল সামনের গাড়ি তিনটির দিকে। কালো পোষাকের লোকগুলোও ছুটল সেদিকে।

কালো পোষাকের লোকটি মেশিন রিভলবার থেকে গুলি বৃষ্টি করতে করতে তিনটি গাড়ির প্রথমটির একেবারে কাছাকাছি চলে গিয়েছিল। গাড়িটির উইন্ড স্ক্রিনের সবটাই গুলিতে ভেঙে পড়েছিল। ভাবছিল তাদের অব্যাহত গুলি বৃষ্টির মধ্যে ওরা গুলি করতে সুযোগ পাচ্ছে না এবং পাবেও না।

কিন্তু হঠাৎ উইন্ড স্ক্রিন ও জানালা ভেঙে যাওয়া প্রথম গাড়িটি গর্জন করে উঠে স্টার্ট নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ল সামনের মেশিন রিভলবারধারী কালো পোষাকের লোকটির উপর। তাকে চাপা দিয়েই থেমে গেল গাড়িটি। তার পরেই রিভলবারের গর্জন। চোখের পলকে সামনের আরও চারটি কালো পোষাকধারী গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে ঢলে পড়ল। আরও দু'জন কালো পোষাকধারী অন্য পাশে ছিল। গুলি থেকে বাঁচার জন্য তারা মাটিতে শুয়ে পড়ে গড়িয়ে দ্রুত সরে এল এবং তাদের গাড়ির আড়ালে সরে গেল।

তাদের তিনটি গাড়িও দ্রুত ব্যাক ড্রাইভ করে পালাতে শুরু করল। কালো পোষাকের দু'জন লোকও কোন রকমে গাড়িতে উঠল। ড্রাইভিং সিটের সেই লোকটি স্বগত কণ্ঠে বলল, 'আমরা তো এদের ভরসাতেই এসেছিলাম। ওদের সাথে লড়াই করার অস্ত্র ওখানেই তো আমরা ফেলে রেখে এসেছি। ছুরি, চাকু দিয়ে তো ওদের সাথে লড়াই করা যায় না।'

গাড়ি তিনটি পালিয়ে যেতেই আহমদ মুসা উইন্ড স্ক্রিন উড়ে যাওয়া, জানালা ভাঙা গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। তার পাশের বরও ততক্ষণে উঠে বসেছে। পেছনে বসা ব্রুনা, ব্রুনার বাবা ও কনেও উঠে বসেছে। তারাও বেরিয়ে এল।

পেছনের গাড়ি থেকে ছুটে এল বর-কনের বাবারা। তারা বর-কনের কাছে এসে শশব্যস্তে বলল, 'তোমরা সবাই ভালো আছ তো? স্যার, ভালো আছেন তো?'

'গাড়ির সামনের দিকে চেয়ে দেখ, স্যার ভালো না থাকলে একজনকে গাড়ি চাপা দিয়ে, আরও চারজনকে গুলি করে হত্যা করলেন কি করে?' বলল কনে ফ্রিজা।

বর-কনের বাবারা গাড়ির সামনে চাইল। দেখল গাড়ির সামনের চাকার তলে পিষ্ট মানুষের লাশ এবং দেখল সামনে পড়ে থাকা আরও চারজন গুলিবিদ্ধ লোকের লাশ।

তারা কোন কথা বলতে পারলো না। অবাক বিস্ময়ে তাদের বাকরুদ্ধ অবস্থা! ফ্যাল ফ্যালে দৃষ্টিতে একবার লাশগুলো আর একবার আহমদ মুসার দিকে তাকাতে লাগল।

আহমদ মুসা তখন লাশগুলোকে উল্টে পাল্টে পরীক্ষা করছিল।

'বাবা, মনে হয় কোন বিস্ময় দিয়েই আমরা তাঁর পরিমাপ করতে পারবো না। তিনি শুধু স্যার নন, আসলে তিনি ভগবানের পাঠানো দেবদূত! না হলে ঠিক সময়ে, ঠিক স্থানে আমরা তাকে পেলাম কি করে?' বলল কনে ফ্রিজা।

'ঠিক বলেছ ফ্রিজা। আমরাও তাঁকে আমাদের বিপদের সময় ঠিক এভাবেই তাকে পেয়েছি।' বলল ব্রুনা। বিস্ময় তার চোখে-মুখেও!

'সত্যিই দেবদূত তিনি। গড ব্লেস হিম! বর উইল ফ্রিড বলল।

'লাশগুলোতে উনি কি দেখছেন? চল, আমরা ওদিকে যাই।' বলল বরের বাবা।

সবাই ওদিকে চলল।

আহমদ মুসা কালো পোষাকধারী একজনের কলার ব্যান্ড পরীক্ষা করছিল।

ব্রুনারা, বর-কনেরা, তাদের বাবারা তার পেছনে গিয়ে দাঁড়াতেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। পেছনে ফিরে বর-কনের বাবাদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এরা তো আপনাদের প্রতিপক্ষ আগের লোক নয়?'

'না, এরা তারা নয়। কিন্তু এই গাড়িগুলোর মধ্যে সম্ভবত একটা গাড়ি সেই ঘটনাস্থলে দেখেছিলাম।' বলল কনের বাবা।

'তার মানে আপনাদের পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বীরা নতুন আক্রমণের জন্যে এই কালো পোষাকধারীদের হায়ার করে নিয়ে এসেছে।'

'সর্বনাশ! ওরা দেখা যাচ্ছে বিরাট ষড়যন্ত্র করেছিল। পুলিশ আমাদেরকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতে চেয়েছিল বর-কনে বাদে। আর ওরা আসছিল বরের কাছ থেকে কনেকে কেড়ে নিতে।' বলল বরের পিতা।

'যাক, আল্লাহ রক্ষা করেছেন। এখন একটা কথা বলুন, 'ব্ল্যাক লাইট' নামে কোন সংস্থার নাম কি আপনারা জানেন?'

এ কথা বলে আহমদ মুসা একজন কালো পোষাকধারীর লাশের উপর ঝুঁকে পড়ে জ্যাকেটের কলার ব্যান্ড উল্টিয়ে পাতলা সাদা প্লাস্টিক প্লেটের উপর কালো একটা ফ্রেম দেখালো এবং তার নিচে দশটা রোমান বর্ণ দেখালো। দুই গুচ্ছে বা শব্দে লেখা। বলল, 'শব্দ দু'টির কোন অর্থ হয় না। কিন্তু শব্দ দু'টিকে সমান্তরাল দিকে উল্টে দিলে মানে শেষটা শুরুতে এবং শুরুটা শেষে নিয়ে আসলে শব্দ দু'টির অর্থ দাঁড়ায় ব্ল্যাক লাইট (Black Light)। ব্ল্যাক লাইট কালো ফ্রেম সিম্বলের সাথে মিলে যায়। এ অঞ্চলে কি 'ব্ল্যাক লাইট' নামে কোন সংগঠন আছে?'

'না, এমন নামের কোন সংস্থা আছে বলে আমরা জানি না। এরা কি কোন সংগঠনের লোক?' বলল বরের বাবা।

'এখনও আমি সঠিক জানি না। তবে মনে হচ্ছে কোন না কোন সংগঠনের লোক এরা।' আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসার দিকে আগ্রহের সাথে তাকিয়ে ছিল ব্রুনা। তার চোখে কিছুটা বিস্ময় ও উদ্বেগ। কিছু যেন সে বলতে চায় আহমদ মুসাকে। কিন্তু কিছুই বলল না সে।

আহমদ মুসা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বর-কনের বাবাকে বলল, 'আপনারা পুলিশকে এ বিষয়টা জানান। ঘটনা রেকর্ড হওয়া ও লাশগুলো তাদের জিম্মায় নেয়া দরকার।'

'ঠিক বলেছেন স্যার। এটা খুব জরুরি।' বলল বরের বাবা।

বর-কনের বাবা যখন পুলিশকে টেলিফোন করতে উদ্যোগ নিচ্ছিল, সে সময় আহমদ মুসা একটু সরে পকেট থেকে মোবাইল বের করে।

ব্রুনাও পিছু নিল আহমদ মুসার।

ব্রুনা আহমদ মুসার পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই আহমদ মুসা বলল, 'তুমি নিশ্চয় আমাকে কিছু বলবে?'

'ধন্যবাদ স্যার, আপনি ঠিক বুঝেছেন।' বলল ব্রুনা।

'বল কি জান তুমি 'ব্ল্যাক লাইট' সম্পর্কে?' আহমদ মুসা বলল।

'বিষয়টা এই ব্ল্যাক লাইটের ব্যাপার কিনা আমি জানি না। কিন্তু ব্ল্যাক লাইটের এই রকম ইগসিগনিয়া ও এই নাম আরও এক জায়গায় দেখেছি।' বলল ব্রুনা।

'কোথায় দেখেছ?' আহমদ মুসা বলল।

'মায়ের পারসে পেয়েছিলাম।' বলল ব্রুনা।

'যে মায়ের সাথে তোমাদের বিরোধ হয়েছে, সেই মায়ের?' আহমদ মুসা বলল।

'হ্যাঁ, অবশ্যই। কিন্তু স্যার, যে মা বলছেন কেন? আমাদের আরও কোন মা আছে?' বলল ব্রুনা।

'এ প্রশ্নের উত্তর ভবিষ্যতের জন্যে তোলা রইল। এখন বল, তোমার মায়ের হ্যান্ডব্যাগে কি পেয়েছিলে?' আহমদ মুসা বলল।

'সেদিন সে সময়ে মা টয়লেটে ছিলেন। গোসল করতে বাথরুমে গিয়েছিলেন। গোসলে মা অনেক সময় নেন। আমি মায়ের ঘরে গিয়েছিলাম মায়ের আইডি কার্ডের নাম্বার নেয়ার জন্যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ডকুমেন্টে রেফারেন্স দেয়ার প্রয়োজন ছিল। মা টয়লেটে জেনে ফিরে আসছিলাম। হঠাৎ দেখলাম মায়ের বালিশের তলায় তাঁর পারসের একাংশ দেখা যাচ্ছে। মায়ের

পারসেই তার আইডি থাকে। অপেক্ষা করার কোন উপায় ছিল না বলে মায়ের পারস বের করে তা খুলে তার আইডি কার্ডের নাম্বার নিলাম। কার্ড রাখতে গিয়ে ছোট্ট একটা চিরকুট দেখলাম। চিরকুটটির কালো ফ্রেম ও তার নিচের লেখাটাই আমার দৃষ্টি কেড়েছিল। মনে করলাম মনোগ্রামটা কিসের দেখি তো। চিরকুট হাতে নিলাম। কিন্তু কোন সংস্থার নাম পেলাম না। ফ্রেমের নিচের দুই শব্দ থেকে কিছু বুঝলাম না। ভেবে নিলাম কোন কোম্পানীর উদ্ভট কোন নাম হবে।' বলল ব্রুনা।

'চিরকুটটিতে কি ছিল?' আগ্রহের সাথে জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

'একটা ফিংগার প্রিন্ট ছিল। আর ছিল দু'লাইন লেখা। কিন্তু লেখা রোমান হরফে হলেও পড়তে পারিনি। আমার পরিচিত কোন ভাষা নয়। হয়তো ব্ল্যাক ফ্রেমের নিচের লেখার মতই সাংকেতিক কিছু হতে পারে।' বলল ব্রুনা।

আহমদ মুসার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বলল, 'ধন্যবাদ ব্রুনা।'

'ধন্যবাদ কেন?' বলল ব্রুনা।

'কারণ তুমি আমার সামনের অন্ধকার পথের কিছুটা আলোকিত করেছ।' আহমদ মুসা বলল।

'কেমন করে?' বলল ব্রুনা। তার চোখে-মুখে বিস্ময়!

'সবই জানবে। তবে এটুকু জেনে রাখ, এ কালো পোষাকধারীরাই হেলিকপ্টারে আমাদের পিছু নিয়েছিল। আর তোমার কথায় প্রমাণিত হলো, তোমাদের সব ঘটনার মূলে রয়েছে এরাই। আহমদ মুসা বলল।

'মানে 'ব্ল্যাক লাইট' নামের সংগঠন?' বলল ব্রুনা।

'হতেও পারে, আবার এটা পুরো সত্য নাও হতে পারে। হতে পারে এরাই মূল প্রতিপক্ষ অথবা তাদেরকে কেউ কাজেও লাগাতে পারে।' আহমদ মুসা বলল।

বর-কনের বাবারা আহমদ মুসার দিকে এগিয়ে আসছিল। আহমদ মুসা তাদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

বরের বাবা আহমদ মুসার কাছে এসে দাঁড়িয়েই বলল, 'স্যার, পুলিশ আসছে। আমি সব তাদের জানিয়েছি। আগের সেই পুলিশ অফিসারের সাথেই কথা হলো। তিনিই আসছেন।'

'ভালোই হলো। কথা বেশি বলতে হবে না।' আহমদ মুসা বলল।

'স্যার, একটা কথা বলতে ইচ্ছা করছে।' বলল বর। বর ও কনে আহমদ মুসার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

'বলে ফেল।' আহমদ মুসা বলল।

'ওদের গুলি বর্ষণ শুরু হলে ভাবছিলাম, আমরা শেষ হয়ে যাচ্ছি, মৃত্যু এখন মাথার উপর। সবাইকে গাড়ির ফ্লোরে শুয়ে পড়তে বলে আপনিও শুয়ে পড়েছিলেন। তার পরেই গুলি শুরু হয়। কিন্তু আপনি কি করে গাড়ি চালিয়ে লোকটিকে চাপা দিলেন এবং চারজনকে মারলেন?' বলল বর উইলফ্রিড।

'কেন তুমি তো আমার পাশেই ছিলে, দেখনি?' আহমদ মুসা বলল।

'আমি তো শুয়েই চোখ বন্ধ করেছিলাম। ভেবেছিলাম কিভাবে মরছি তা না দেখাই ভালো।' বলল বর।

আহমদ মুসা হাসল।

'জানার কৌতুহল আমাদেরও। প্লিজ বলুন স্যার।' বলল কনে ফ্রিজা।

'বলার তেমন কিছু নেই। আমি আধ শোয়া হয়ে মেশিন রিভলবারের শব্দ লক্ষে গাড়ি চালিয়েছিলাম আকস্মিকভাবে। তার রিভলবারের গুলি বৃষ্টি বন্ধ করার এটাই ছিল সবচেয়ে নিরাপদ ও সহজ পথ। এই ঘটনায় অবশিষ্ট রিভলবারধারীরা মুহূর্তের জন্যে হতচকিত হয়ে পড়েছিল। সেই সুযোগে আমি ওদের আমার রিভলবারের শিকার বানিয়েছিলাম।' আহমদ মুসা বলল।

'কথার কথা বলছি, ধরুন, আপনার এই চেষ্টা যদি কাজে না আসত, তাহলে কি করতেন?' বলল বর।

'ব্যর্থতা নিশ্চয় আরেক সুযোগের দ্বার খুলে দিত। কথায় আছে, যত পথ, তত খোলা মানে তত বিকল্প পথ থাকা। বিপদ যিনি দেন, বিপদ উত্তরণের পথও তিনি রাখেন।' আহমদ মুসা বলল।

'কিন্তু বিপদে কি এত কথা মনে থাকে?' বলল বর।

‘আল্লাহ মনে করিয়ে দেন মানে কি করণীয় সেটা আল্লাহ মাথায় এনে দেন।’ আহমদ মুসা বলল।

‘এটা কিন্তু ধর্মবিশ্বাসীদের একটা কথা স্যার। এটা কি আসলেই ঘটে স্যার?’ বলল ব্রুনা।

‘জ্ঞান উৎকর্ষ লাভ করার পর এটা কিন্তু এখন মাত্র ধর্মবিশ্বাসীদের কথা নয়। আধুনিক সভ্যতার বিবেক যাকে বলা হয় সেই আর্নল্ড টোয়েনবি বলেছেন যে, আবিষ্কার, উদ্ভাবন, কাব্য-মহাকাব্য, গল্প-উপন্যাসের মত কোন মৌলিক সৃষ্টিই স্রষ্টার অনুপ্রেরণা ছাড়া হয় না। আর্নল্ড টোয়েনবি বিশ্বাসীদের পুরাতন কথাকেই তো নতুন করে বলেছেন।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ধন্যবাদ স্যার। কিন্তু স্রষ্টার অনুপ্রেরণা মানুষের কাছে কিভাবে আসে?’ বলল কনে।

‘মানুষের মাথায় নতুন চিন্তার আকারে আসে। একে মুসলিম পরিভাষায় ‘ইলহাম’ বলে। আহমদ মুসা বলল।

পুলিশের গাড়ির সাইরেন শুনা গেল। সবাই সেদিকে তাকাল।

‘চলুন, আমরা গাড়ির ওদিকে যাই।’ বর-কনের বাবার দিকে তাকিয়ে বলল আহমদ মুসা।

সবাই গাড়ির দিকে চলল।

বৌভাতের মূল অনুষ্ঠান শেষ।

ভাঙা আসরে এখানে-সেখানে গল্পের আসর বসেছে। বর-কনেকে কেন্দ্র করে বসেছে বরের বাবা, কনের বাবা, এলাকার কয়েকজন সমাজপতি এবং বরের বাড়িতে বিয়ের চুড়ান্ত অনুমোদনের জন্যে আসা ধর্মীয় নেতা হের হেনরি। তাদের সাথে ছিল ব্রুনা ও তার বাবা আলুদনি সেনফ্রিড।

তাদের গল্প-কথার নানা বিষয়ের মধ্যে ধর্মনেতা হের হেনরি বলে উঠল, ‘আপনাদের অতিথি আহমদ মুসা কোথায়?’

কথাটা বলল সে বরের পিতাকে লক্ষ করে।

'বন থেকে একজন পুলিশ অফিসার এসেছেন, তার সাথে কথা বলতে গেছেন।' বলল বরের বাবা।

'আমি বিস্মিত হয়েছি তার প্রার্থনার ধরন দেখে। ভোরে আমি তার ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখলাম তিনি ফ্লোরে কার্পেটের উপর তোয়ালে বিছিয়ে প্রার্থনা করছেন। আবার বিকেলে দেখলাম বাগানে ঘাসের উপর দাঁড়িয়ে, বসে ও মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রার্থনা করছেন। মুসলমানরা শুধু মসজিদে প্রার্থনা করে, কিন্তু এমনটা তো দেখিনি। এটা দেখে আমাদের অতীতের কথা আমার মনে পড়ে গেছে। আমাদের আদি স্যাক্সন সমাজে যখন আমরা বাস করতাম নিরপদ্রপে ও স্বাধীনভাবে রাইনের ভাটি অঞ্চলে এবং আরও উত্তরে, তখন ব্যক্তিগত প্রার্থনা এভাবেই হতো। সামাজিক প্রার্থনার জন্যে প্রার্থনাগৃহ...।'

কথা শেষ না করেই থেমে গেল স্যাক্সনদের এ অঞ্চলের ধর্মনেতা হের হেনরি।

আহমদ মুসা এ সময় সেখানে এল। বর-কনের বাবাসহ কয়েকজন উঠে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানিয়ে আহমদ মুসাকে সেখানে বসালো। হের হেনরি এ সময় তার কথা বন্ধ করে থেমে গেল।

আহমদ মুসা বসলে হের হেনরি বলল, 'জনাব, আপনার কথাই আমরা বলছিলাম। আমি বলছিলাম যে, বিকালে বাগানে ঘাসের উপর দাঁড়িয়ে আপনার প্রার্থনা দেখে আমার অতীতের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। জার্মানির স্যাক্সনরা আদিতে এভাবে ব্যক্তিগত প্রার্থনা যত্রতত্র করত। সামাজিকভাবে প্রার্থনার জন্যে প্রার্থনা গৃহ অবশ্যই ছিল। আমাদের পণ্ডিতরা বলেন, এটাই ছিল আমাদের বিশ্বাসের স্বাধীন ও স্বর্ণযুগ।'

'সে স্বর্ণযুগ আপনাদের উল্লেখ করার মত আর কি ছিল?' বলল আহমদ মুসা। তার চোখে কিছুটা বিস্ময়।

'আমাদের সমাজ ছিল গণতান্ত্রিক। প্রত্যেক মানুষের অধিকার ছিল সর্বোচ্চ। সরকার নামের প্রশাসন কর্তৃপক্ষের ভূমিকা খুবই গৌণ ছিল। একমাত্র যুদ্ধাবস্থাতেই সরকার বা শাসক কর্তৃপক্ষের ভূমিকা সবার উপরে উঠতো, এমনকি

যুদ্ধের সময় এলেই 'ডাচি' বা 'রাজা' নির্বাচিত হতেন। শান্তির সময়ও নির্বাচন হতো, কিন্তু যুদ্ধের সময় একে আবশ্যক মনে করা হতো। জাতির জন্যে জাতির ইচ্ছাকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত করার জন্যেই এই ব্যবস্থা।' বলল অঞ্চলের ধর্মগুরু হের হেনরি।

'এই স্বর্ণযুগ আপনাদের কোন সময় পর্যন্ত ছিল?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'অষ্টম শতাব্দীর সমাপ্তির (৭৯৩ খৃস্টাব্দ) মুখে রোম সম্রাট শার্লেম্যান আমাদের এলাকা দখল করার পূর্ব পর্যন্ত। শার্লেম্যানরা শুধু রাজনৈতিকভাবে আমাদের দেশই দখল করলো না, ক্রমান্বয়ে তারা আমাদের ভাষা, আমাদের ধর্ম, আমাদের প্রার্থনাগৃহ, আমাদের সংস্কৃতি সবই ধ্বংস করে ফেলে। শক্তির জোরে খৃস্টধর্মবিশ্বাস আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়।' বলল হের হেনরি।

আহমদ মুসার চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'জানেন, ঠিক এই সময়েই ইসলামী সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল এশিয়ায় ও আরব অঞ্চলে। আপনাদের সেই স্বর্ণযুগের সাথে ইসলামের অদ্ভুত মিল আছে। ইসলামে ব্যক্তির অধিকারকে সর্বোচ্চ মূল্য দেয়া হয়েছে। সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির ন্যায্য অধিকার যদি সমুন্নত হয়, তাহলে তাদের নিয়ে গঠিত সমাজ ন্যায়ভিত্তিক হয়ে থাকে, রাষ্ট্রও তখন জনকল্যাণমূলক হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু ব্যক্তির অধিকার নিশ্চিত করার পর আমাদের ধর্ম ইসলাম সামষ্টিক স্বার্থ, সমাজের স্বার্থ, দেশের স্বার্থ দেখার জন্যে, সামষ্টিকের শক্তি দিয়ে ব্যক্তির অন্যায়কে নিয়ন্ত্রিত করার জন্যে সরকার ব্যবস্থাকেও অপরিহার্য মনে করে। ইসলামেও সরকার জনমতের ভিত্তিতেই নির্বাচিত হয়।'

স্যাক্সনদের ধর্মনেতা হের হেনরির চোখে বিস্ময়! বলল, 'আপনি যেমন প্রার্থনা করলেন, এর বৈশিষ্ট্যের সাথে আমাদের সেকালের প্রার্থনার অনেক মিল ছিল। তাহলে দেখছি আমাদের সমাজ-সংস্কৃতির সাথে আপনার সমাজ-সংস্কৃতির চমৎকার মিল আছে। মুসলমানদের আমরা দেখি, কিন্তু ইসলামের এই রূপ সম্পর্কে তো আমরা কিছু জানি না। ঠিক কোন সময়ে এই সভ্যতার শুরু হয়?'

‘ছয়শ তেইশ সালের দিকে, যখন ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ স. মদিনায় ইসলামের মানবিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেন।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমাদের সভ্যতাও একদম সমসাময়িক। কিন্তু কোন যোগাযোগ ছিল বলে মনে হয় না। তাহলে এই মিল হলো কি করে?’ বলল হের হেনরি।

‘ঠিক জানি না, তবে আপনাদের স্যাক্সনদের এই ট্রেডিশন আরও অতীত থেকে এসেছে। হতে পারে স্যাক্সনদের কাছে অথবা অন্য নামের আপনাদের কোন পূর্বপুরুষদের কাছে আমাদের রসূল স.-এর মতই কোন রসূল এসেছিলেন হয়তো। তার শিক্ষাই স্যাক্সনদের ‘গোল্ডেন এজ’ যা এখন পর্যন্ত চলে আসছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কিন্তু স্যার, আপনি যেমনটা বললেন, সে রকম রসূলকে অর্থাৎ যিশুকে, তো খৃস্টানরাও মানে! কিন্তু তাদের মধ্যে তো জনগণের এমন অধিকার মানা হয় না এবং তাদের প্রার্থনাও তো নিরাকারের না হয়ে যিশুর মূর্তিকে সামনে রেখে করা হয়?’ বলল স্যাক্সনদের আঞ্চলিক সরদার সাব-কাউন্সিলের ডিপুটি ডিউক অসওয়াল্ড।

আহমদ মুসা একটু গম্ভীর হলো। বলল, ‘দুর্ভাগ্য যে, যিশুর মূর্তি গড়া হয়েছে, যিশুর শিক্ষার চেয়ে যিশুর ক্রুসিফাইড করাকে যেমন বড় দেখানো হচ্ছে, তাকে যেমন ঈশ্বরের সন্তান বানিয়ে তাকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, ঠিক তেমনি তাঁর ঐশী গ্রন্থ ‘ইঞ্জিল’ (যাকে ‘বাইবেল’ বলা হয়)-কে সঠিকরূপে রাখা হয়নি, বিকৃত করা হয়েছে। এ কারণেই সমাজ-সভ্যতার দিক থেকে আমাদের সাথে তাদের মিল নেই, যে মিল আপনাদের সাথে আমাদের আছে।’

‘ধন্যবাদ স্যার, অল্প কথায় সাংঘাতিক একটা বিষয় আমাদের বুঝিয়েছেন। ধন্যবাদ আপনাকে। আমাদের ধর্মগুরু মহোদয় বলেছেন, রোমানরা আমাদের বিশ্বাস, ইতিহাস, সাহিত্য-সংস্কৃতি সবই ধ্বংস করেছে। আমি একটু যোগ করে বলতে চাই, এমনকি ওরা আমাদের বিল্ডিং-এর স্ট্রাকচারও বদলে দিয়েছে। আগে প্রার্থনাগৃহসহ আমাদের গুরুত্বপূর্ণ বিল্ডিংগুলোতে উর্ধ্বমুখী উঁচু স্তম্ভ বা মিনার থাকত। রোমান সভ্যতা মিনারগুলো গুঁড়িয়ে দেয় এবং নিষিদ্ধ করে দেয় মিনার নির্মাণ। এই কথা বলা আমি এ জন্যেই প্রয়োজনীয় মনে করলাম যে,

এই ধরনের মিনার নির্মাণের ঐতিহ্য মুসলমানদের রয়েছে। তাদের প্রার্থনাগৃহের জন্যে মিনার প্রধান অলংকার। এদিন দিয়েও স্যাক্সনদের ট্রেডিশনের সাথে মুসলমানদের মিল আছে।' বলল বর উইলফ্রিড।

'ঠিক বলেছ। আমিও বিষয়টা খেয়াল করেছি।' বলল স্যাক্সনদের আঞ্চলিক ধর্মগুরু বা যাজক হের হেনরি।

'কিন্তু এই অদ্ভুত মিলের কারণ আসলে কি? ব্যাপক যোগাযোগ কিংবা গোড়ায় এক না হলে এই মিল সম্ভব নয়। সকলেরই জানা এমন ব্যাপক যোগাযোগ কখনো হয়নি, সম্ভবও ছিল না। তাহলে গোড়াটা কি?' কনে ফ্রিজা বলল।

'গোড়া অবশ্যই আল্লাহ। আমি যেটা বলেছি, যুগে যুগে আল্লাহ পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির কাছে রসূল বা বাণীবাহক পাঠিয়েছেন। যুগের চাহিদাসম্মত বিধি-বিধান বাদ দিলে তাদের সকলের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জীবন-কাঠামো একই হয়ে থাকে। কিন্তু একটা কথা আমি ভাবছি মি. হের হেনরি, আমি জানতাম স্যাক্সনরা সবাই স্বেচ্ছায় অথবা বাধ্য হয়ে খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছে। কিন্তু এখন দেখছি, আপনারা নিজেদের বাঁচিয়ে রেখেছেন। এখন আপনাদের সংখ্যা কেমন হবে?' আহমদ মুসা বলল।

'সম্রাট শার্লেম্যানের শুরু করা খৃস্টান রোমকদের খৃস্টীয় করনের এক মর্মন্তুদ কাহিনী সেটা। সুন্দর নদী রাইনের ভাটি অঞ্চলে স্বাধীনচেতা ও ঐতিহ্যবাহী স্যাক্সনদের সমৃদ্ধ জনপদ বিরান করে দেয়া হয়। যারা খৃস্টধর্ম গ্রহণ না করেছে তাদের বাঁচতে দেয়া হয়নি। এরপরও পালিয়ে নিজের বিশ্বাস ও ঐতিহ্য রক্ষা করেছে অনেকেই। সুযোগ-সন্ধানী ধনিক ও ক্ষমতালিপ্সুরা দল বেঁধে রোমকদের তাবেদারি ও খৃস্টধর্ম গ্রহণ করলেও সাধারণ মানুষদের অনেকেই নিজেদের ধর্ম ও সমাজ নিয়ে পালিয়ে আত্নরক্ষা করে। আমরা সেই সাহসী ও স্বাধীনচেতা মানুষদেরই উত্তর পুরুষ। সংখ্যা আমাদের এখন কম নয়। কিন্তু সংখ্যা বড় কথা নয়, এ মানুষের সংখ্যা কম হলেও এরা একেকজন একেকটা করে পর্বতের মত বড় মাপের।' বলল হের হেনরি।

‘হ্যাঁ মি. হেনরি, এই মর্মান্তিক ইতিহাসের ছিটে-ফোঁটা আমরা ইতিহাসে পড়েছি। বিস্তারিতটা সাধারণ ইতিহাসে নেই। তবে বিজয়ী খৃস্টানদের খৃস্টীয় করণের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা আমাদেরও রয়েছে। স্পেনে যখন তারা বিজয়ী হলো, তখন স্যাক্সনদের মতই মুসলমানদের বাঁচতে দেয়া হয়নি খৃস্টধর্ম গ্রহণ না করলে। অথচ মুসলিম বিজয়ের সময়ে কিংবা মুসলিম শাসনের অধীনে স্পেনে খৃস্টানরাসহ সব ধর্মের মানুষ সকল নাগরিক অধিকার ভোগ করেছে। জেরুসালেমে খৃস্টানরা তাদের বিজয়ের পর ৭০ হাজার মুসলিম নাগরিককে হত্যা করে। তাদের ঘোড়ার হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যায় মানুষের রক্তে। কিন্তু মুসলমানরা জেরুসালেম বিজয়ের পর একজন খৃস্টান নাগরিককেও হত্যা করেনি। আপনাদের কথা শুনে আমাদের এই অতীত মনে পড়ে গেল।’ আহমদ মুসা বলল।

‘অদ্ভুত ব্যাপার, মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেও সাদৃশ্য আছে এই দুই জাতির মধ্যে!’ বলল ফ্রিজা।

‘স্থান-কাল-পাত্রভেদে জালিমদের রূপ বদলায়, কাজ বদলায় না। একটা কথা, স্যাক্সনদের মধ্যে আপনাদের মত যারা তারা এমন বিশেষ অঞ্চলে বাস করেছেন?’ হের হেনরিকে লক্ষ্য করে বলল আহমদ মুসা।

‘বিশেষ অঞ্চল ঠিক আছে। কিন্তু এক অঞ্চলে নয়। কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলে আমরা বাস করছি। সেটা রাইনের ভাটি অঞ্চলেই। তবে তীর থেকে অনেক ভিতরে। অবশ্য ব্রুমসারবার্গের মত শহরাঞ্চলে আমাদের স্যাক্সনরা আত্মগোপন করে ছোটখাট চাকরি, শ্রমিকের কাজ করে যাচ্ছে।’

‘আপনাদের এই হিজরত বা স্থানান্তর কখন, কিভাবে হয়?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘এই স্থানান্তর হয়েছে শার্লেম্যানের আক্রমণ থেকে পরবর্তী চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরে। ধীরে ধীরে, গোপনে। আমরা সরে গেছি ওদের দৃষ্টির ফোকাস থেকে বেশ দূরে। সে সময় এ অঞ্চলগুলোতে ছিল জংগল ও অকৃষিযোগ্য জমি। তাই মানুষের বসবাসও ছিল না। তাই এ অঞ্চলগুলো ছিল আমাদের জন্যে নিরাপদ আশ্রয়।’ বলল হের হেনরি।

‘আপনারা যারা বিভিন্ন অঞ্চলে বাস করছেন, তাদের মধ্যে যোগাযোগ ও সংহতি কেমন আছে?’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমরা সকলেই একক এক সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থার অধীন। এমনকি বিভিন্ন শহরাঞ্চলে আত্মগোপন করে বিচ্ছিন্নভাবে যারা কাজ করছে, তারাও এই একই ব্যবস্থার অধীন।’ বলল হের হেনরি।

মুহূর্তের জন্যে থেমেই আবার বলে উঠল হের হেনরি, ‘শুনলাম আপনারা যাচ্ছেন ব্রুমসারবার্গে। ওখানেও কিছু স্যাক্সন আছে। তাদের অধিকাংশই ট্যাক্সি ড্রাইভার, তবে দারোয়ান ও সেলসম্যানের কাজ করে অনেকে। ওরাও আমাদের সমাজের অংশ।’

‘খুব ভালো চাকরি করে। আমাদের জন্যে এই সার্ভিসগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আপনাদের কাজে আসবে?’ বলল হের হেনরি।

‘জানি না। তবে যে কোন অনুসন্ধানের সব ক্ষেত্রেই এ ধরনের সার্ভিস কাজে লাগে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ঠিক আছে। আমরা আপনাদের কথা ওদের জানাব।’ বলল হের হেনরি।

‘ধন্যবাদ। একটা কথা, আপনারা শুধুই আত্মরক্ষা করছেন, না কোন মিশনও আপনাদের আছে?’ আহমদ মুসা বলল।

‘মিশন কিনা জানি না। তবে আমরা চাই, জার্মানি তার নিজের সত্তাকে খুঁজে পাক। আমরা জার্মানির বিশ্বাসের সে সত্তাকে ধরে রেখেছি এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতন্ত্র নামের সামাজিক সে শক্তিকেও আমরা রক্ষা করার চেষ্টা করছি। ব্যক্তি স্বার্থ ও সামষ্টিক স্বার্থের ভারসাম্য বিধান স্যাক্সন জার্মানির সবচেয়ে বড় সম্পদ।’ বলল হের হেনরি।

‘ধন্যবাদ। দেশপ্রেমিকরা যা করে, সেটাই আপনারা করছেন।’ আহমদ মুসা বলল।

‘মাঝখানে একটু কথা বলতে চাই, মাফ করবেন আমাকে।’ বলল বরের বাবা বার্টওয়াল্ড।

সবাই তাকাল বরের বাবার দিকে।

বরের বাবা বলল, ‘রীতি অনুসারে এখনি কনে ও বরকে কনের বাড়িতে যাত্রা করতে হবে। অনুষ্ঠান শেষ করে আবার কথা বলব। আমি আপনাদের অনুমতি চাই।’

‘অবশ্যই অবশ্যই। ওটাই তো এখন মূল কাজ। গল্প তো আমাদের অবসরের বিনোদন।’ বলল হের হেনরি।

বলে উঠে দাঁড়াল হের হেনরি। সবাই উঠল। আহমদ মুসাও।

ব্ল্যাক লাইটের অপারেশন কক্ষ।

ব্ল্যাক লাইট সংগঠনেরা অপারেশন চীফ ‘ব্ল্যাক বার্ড’ অর্ধ ডিম্বাকৃতি টেবিলের ওপাশে বিরাট সুশোভিত চেয়ারে বসে আছে।

তার শরীরটা যথারীতি কালো পোষাকে ঢাকা। মাথায় কালো হ্যাট, মুখে কালো মুখোশ।

তার সামনে টেবিলের এ পাশে দু’জন বসে। একজন ব্ল্যাক লাইটের অপারেশন চীফ ডরিন ডুগান এবং অন্যজন সিচুয়েশন এ্যানালিস্ট ও উপদেষ্টা গেরারড গারভিন।

ব্ল্যাক বার্ডের মুখ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু অপর দু’জনের মুখে আষাঢ়ে মেঘের অন্ধকার।

কথা বলছিল ব্ল্যাক বার্ড। বলছিল, ‘এভাবে আমাদের শান্ত সমুদ্রে প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে তা দেখছ। বাঘের ঘরে এক ঘোগ এসে জুটেছে। ঘোগকে আটকাবার সব চেষ্টা এ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। শুধু ব্যর্থ নয়, সব চেষ্টায় পাল্টা আঘাতে আমাদের মূল্যবান লোকদের জীবনহানি ঘটেছে। সালজবার্গ থেকে শুরু করে বাদেন ল্যান্ডের দু’টি ঘটনা পর্যন্ত আমাদের কার্যকর শক্তির একটা মূল্যবান অংশ হারিয়েছি। এটা মেনে নেবার মত নয়। কে এই ঘোগ? এর হাতে আমরা এমনভাবে মার খাচ্ছি কেন? আপনাদের কাছ থেকে অর্থবহ কিছু শুনতে চাই।’ থামল ব্ল্যাক বার্ড।

দু'জন মাথা নিচু করে শুনছিল।

সংগে সংগেই কথা বলল না তাদের দু'জনের কেউ।

মুহূর্ত কয়েক পরে মাথা তুলল সিচুয়েশন এ্যানালিস্ট ও উপদেষ্টা গেরারড গারভিন। বলল, 'স্যার, অতীত বাদ দিয়ে আমাদের সামনে তাকানো দরকার। অতীতকে সামনে আনলে আমরা দুর্বলই হয়ে পড়ব। লোকটি যেই হোক, অজেয় নয় অবশ্যই। আমার মনে হচ্ছে লোকটি দারুণ ধড়িবাজ আর চালাক। সে আহমদ মুসার নাম নিয়ে শখের গোয়েন্দাগিরির পাসপোর্ট নিয়ে একটা তদন্তে জার্মানি এসেছে। কি তদন্ত জানা যায়নি। তবে এই পরিচয় তার একটা মুখোশ। এ পর্যন্ত...।'

গেরারড গারভিনের কথার মাঝখানেই ব্ল্যাক বার্ড বলে উঠল, 'কেন সে কি আহমদ মুসা হতে পারে না?'

'কোথায় তাল, আর কোথায় তিল? আহমদ মুসা কি কাজে এখানে আসবে? সে রাজা-বাদশা, প্রেসিডেন্ট, প্রধান মন্ত্রীর বড় বড় মিশনে কাজ করে।

আসলে তার নাম-ডাক হওয়ার পর অনেকেই তার নাম নিয়ে মানুষকে বোকা বানিয়ে, দুর্বল করে স্বার্থ হাসিল করতে চাচ্ছে। ইন্টারনেটে গেলেই দেখবেন তার অনেক রকমের ছবি। কোনটা আসল আহমদ মুসা সেটাই বুঝা দায় হয়েছে। একটা কথা পরিষ্কার আহমদ মুসা যে ধরনের মিশনে যায়, সে রকম কিছু এখন জার্মানিতে নেই। এই জার্মানিতেই সে একবার এসেছিল টুইন টাওয়ারের মত ঘটনার তদন্ত নিয়ে। তাছাড়া সেবার আহমদ মুসা জার্মানিতে এসে স্ট্রাসবার্গের যে ফ্যামিলির সাথে ছিল, যাদের সাথে আহমদ মুসার এখনও যোগাযোগ আছে, আমি তাদের সাথে যোগাযোগ করেছি। আহমদ মুসা জার্মানিতে এসেছেন আসতে পারেন এমন কথার জবাবে তারা বলেছেন, তিনি জার্মানিতে আসতে চাইলে প্রথমে তারাই জানতে পারবেন। আহমদ মুসার সাথে তাদের নিয়মিত যোগাযোগ আছে। সুতরাং আহমদ মুসাকে নিয়ে ভাববার কিছু নেই।' বলল গেরারড গারভিন।

‘তোমার কথা সত্য হোক গারভিন। আমি চিন্তায় ছিলাম আহমদ মুসাকে নিয়ে। বিপজ্জনক ব্যক্তি সে। ঈশ্বর স্বয়ং যেন তার হাত দিয়ে কাজ করেন। যাক, এবার শুধু কথা নয়, কাজের কথা বল।’ ব্ল্যাক বার্ড বলল।

‘তার আগে একটা কথা, কারিনা কারলিনের স্টেটের আইনি দখলের অবস্থা কি?’ বলল গেরারড গারভিন।

‘এক জায়গায় এসে ঠেকে আছে। কারিনা কারলিন তার স্টেট হস্তান্তর করতে চাইলে তাকে নিজে দেওয়ানি কোর্টে হাজির হয়ে স্বাক্ষরসহ দলিলে দুই হাতের দুই বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ লাগাতে হবে। কিন্তু কারিনাকে আদালতে নেয়া তো সম্ভব নয়। আমার যাকে কারিনার জায়গায় বসিয়েছি, তার দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি ন্যানো-প্লাস্টিক সার্জারীর মাধ্যমে হুবহু কারলিনের মত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটা হলেই আমাদের সমস্যা চুকে যাবে। আমরা জার্মানির কারিনা কারলিন স্টেটের মালিক হয়ে যাব। কিন্তু দুই বৃদ্ধাঙ্গুলির ঐ ট্রান্সফরমেশন করতে আরও সময় লাগবে। সে সময় আমাদের জন্যে প্রয়োজন। অন্যদিকে আমরা কারিনা কারলিনের উত্তরসূরী তার দুই মেয়ে ব্রুনা ব্রুনহিল্ড ও আনালিসা অ্যালিনা ও স্বামী আলদুনি সেনফ্রিডকে ধরতে পারলে কারিনা কারলিনকে হত্যা করে ওদেরকে স্টেটের মালিক বানিয়ে তারপর ওদেরও হত্যা করে স্টেটের মালিক হওয়া যেত। কিন্তু এক্ষেত্রেও উইলের কপি পাঠ করতে গিয়ে দেখা গেছে তারাও দশ বছর সম্পত্তি ভোগ করার আগে সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারবে না। দশ বছর পরে স্টেট হস্তান্তর করতে পারলেও তিনজনে এক সাথে একই পক্ষের কাছে হস্তান্তর করতে হবে এবং সেই পক্ষকে হতে হবে ব্রুমসারবার্গের আদি বাসিন্দা। এই ধরনের শর্ত কারিনা কারলিনের স্টেট হস্তান্তরের ক্ষেত্রে নেই। তবে সেখানেও একটা ছোট্ট শর্ত আছে। সেটা হলো, কারিনার স্টেট হস্তান্তরে তারা প্রতিবাদ করতে পারবে। এ জন্যেই যে কোন পথেই স্টেট হস্তান্তর করতে যাওয়া হোক না কেন, কারিনা কারলিনের দুই মেয়ে ও তার স্বামীকে হাতের মুঠোয় পেতে হবে অবশ্যই। সে চেষ্টাও আমরা করছি। কিন্তু তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে কোথাকার কে একজন নকল আহমদ মুসা।’ থামল ব্ল্যাক বার্ড।

নড়েচড়ে বসল গেরারড গারভিন। বলল, 'স্বীকার করতেই হবে স্যার, আপনাদের এ পর্যন্ত সুসম্পন্ন ৬টি স্টেট দখলের কোনটিতেই এমন উৎকট জটিলতা হয়নি। এক ক্লোনিং কৌশলেই সব সমাধান হয়ে গেছে। থাক, এ...।'

গেরারড গারিভিনের কথার মাঝখানেই ব্ল্যাক বার্ড বলে উঠল, 'গারভিন, বড় ফল লাভের জন্যে পরিশ্রম বড়ই করতে হয়। কারিনা কারলিন স্টেটের মত অর্থের খনি জার্মানিতে দু'একটির বেশি নেই। সোনার খনি বলেই এটা সহজলভ্য নয়। আমরা পঁচিশ বছর ধরে এই প্রকল্পের পেছনে বিনিয়োগ করছি। স্টেটটি আমাদের দখলে এসে গেছে। এখন আইনি দখল নিশ্চিত করতে পারলেই হয়। আসলে আমরা প্রকল্পটির শেষ পর্যায়ে। বিজয় আমাদের হাতের মুঠোয়। এক্ষেত্রে সকল বাধাই আমরা নিষ্ঠুরভাবে গুঁড়িয়ে দেব। এখন বল, আশু কি করণীয় আমাদের?'

'ওরা কোথায় যাচ্ছে, ব্রুমসারবার্গে?' বলল গেরারড গারভিন।

'হ্যাঁ, ব্রুমসারবার্গেই যাচ্ছে।' বলল ব্ল্যাক লাইটের অপারেশন চীফ ডরিন ডুগান।

'এটা একটা বড় প্লাস পয়েন্ট যে, ওদের গন্তব্যটা আমরা জানি। এখন ওদের থাকার জায়গা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। তারপর ওখানেই

ওদের কবর রচনা করতে হবে। আমাদের সমস্ত মনোযোগ এখন এদিকে নিবদ্ধ করতে হবে।' গেরারড গারভিন বলল।

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। এটাই এখনকার আমাদের প্রধান কাজ। কিন্তু বল, এখন আমাদের কি করা উচিত।' বলল ব্ল্যাক বার্ড।

'ব্রুমসারবার্গ ও তার আশেপাশের সব বাড়ির উপর নজর রাখতে হবে কোথায় তারা উঠছে তা যেন আমরা জানতে পারি। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, ওদের পরিচিত বা ঘনিষ্ঠ জন যারা ব্রুমসারবার্গে আছে তাদের সন্ধান করতে হবে এবং তাদের উপর চোখ রাখতে হবে। ওরা ব্রুমসারবার্গে যখন আসছে, তখন পরিচিত জনদের কারো সাথে যোগাযোগ করেই আসবে অথবা এসে যোগাযোগ করবে। সুতরাং এদের উপর নজর রাখলে ওদের খোঁজ পাওয়ার একটা পথ হবে।' গেরারড গারভিন বলল।

‘ধন্যবাদ গারভিন। ওদের পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ জন তো ব্রুমসারবার্গে আছেই। ওদের ঠিকানা সহজেই পাওয়া যাবে।’ ব্ল্যাক বার্ড বলল।

‘ওদের ঘনিষ্ঠ জন যারা ব্রুমসারবার্গে আছে, তারা সবাই কারিনা কারলিন মানে আমাদের বন্দী ব্রিজিটিরই লোক হবার কথা। সুতরাং এদের সবার সাথে নকল আহমদ মুসার যোগাযোগ অবশ্যই থাকবে না। তবে কার সাথে যোগাযোগ করবে এটা বলা মুস্কিল। সুতরাং পরিচিত জনদের ছোট-বড় কেউ বাদ পড়ছে না, এটা নিশ্চিত করতে হবে, বিশেষ করে পরিচিত বা ঘনিষ্ঠ কারও সাথে যদি আপনাদের মানে নকল কারিনা কারলিনের সম্পর্ক ভালো না থাকে, তাহলে তাদের প্রতিই বেশি নজর রাখতে হবে।’ বলল গেরারড গারভিন।

‘ধন্যবাদ গারভিন। খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছ। তারা এ ধরনের লোকদের সাহায্যের সুযোগ নেবে। আর কিছু কথা গারভিন?’ ব্ল্যাক বার্ড বলল।

‘অবিলম্বে ব্রুমসারবার্গে পর্যাপ্ত লোক মোতায়েন করুন, বিশেষ করে আমাদের নকল কারিনা কারলিনকে এখন সেখানে থাকতে হবে। কারণ সেই ওখানকার সবাইকে চেনে। আমাদের ব্রুমসারবার্গের বর্তমান মিশনে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সে ভূমিকা তাকে পালন করতে হবে। সে প্রয়োজনীয় বুদ্ধি ও সহযোগিতা পাবে, কিন্তু তাকেই সামনে থাকতে হবে।

# ৫

দু'তলার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আহমদ মুসা তাকিয়ে ছিল টিলা থেকে এঁকেবেঁকে নেমে যাওয়া পাথরের রাস্তাটার দিকে। রাস্তা দিয়ে রাজারের ট্রলি ঠেলে আনছিল সিজার। আহমদ মুসা তার দিকেই তাকিয়ে ছিল।

সিজারও চোখ তুলে উপরের দিকে তাকিয়ে ছিল। আহমদ মুসার উপর চোখ পড়তেই চোখ নামিয়ে নিল। তার চোখে-মুখে কেমন একটা আড়ষ্ট ভাব, তা আহমদ মুসার চোখ এড়াল না। আহমদ মুসার মনের পুরনো একটা অস্বস্তি মনের দরজায় উঁকি দিল।

আহমদ মুসা সরে এল ব্যালকনি থেকে। দরজা দিয়ে তার ঘরে ঢুকল। দেখল ওপাশের খোলা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকছে ব্রুনা ও তার বাবা আলদুনি সেনফ্রিড।

আহমদ মুসা তাদের স্বাগত জানিয়ে বলল, 'আসুন, মনে হচ্ছে আমি এমনটাই আশা করছিলাম। বসুন, এক সাথে বসে চা খাওয়া যাবে এবং গল্প করা যাবে।'

বলে আহমদ মুসা এগোলো সোফার দিকে।

'ধন্যবাদ' বলে ওরাও এগিয়ে এল সোফার দিকে।

কয়েক দিন আগে আহমদ মুসা ব্রুনাদের সাথে ব্রুমসারবার্গের এ বাড়িতে এসে উঠেছে। এ এলাকা ব্রুমসারবার্গের পরের অংশ। মাঝখানে রাইন নদী।

ব্রুমসারবার্গের বড় অংশই রাইন নদীর পশ্চিমে। পূবের অংশেও অনেক লোকালয় গড়ে উঠেছে। লোকালয়গুলো বিচ্ছিন্ন। মাঝে রয়েছে ফসলভরা ঘন সবুজ উপত্যকা। আহমদ মুসারা যে বাড়ি ভাড়া নিয়েছে তা একটা টিলার উপর।

আন্ডার গ্রাউন্ড ফ্লোর ধরলে তা তিন তলাবিশিষ্ট ট্রাইপ্লেক্স বাড়ি। ব্রুনারা এখানে আসার আগেই তাদের বিশ্বস্ত লোক সিজারের মাধ্যমে রাইনর পশ্চিম পাড়ের তাদের বাড়ি থেকে বেশ দূরে এখানে বাসা ভাড়া নিয়েছে।

বাড়িটা খুব সুন্দর।

টিলায় এটাই একমাত্র বাড়ি। বাড়িটা নিরিবিলি ও নিরাপদ।

একেবারে টিলার গোড়ায় টিলা থেকে নেমে যাওয়া রাস্তার উপর একটা পুলিশ ফাঁড়ি।

সব মিলিয়ে বাড়িটা খুব পছন্দ হয়েছে আহমদ মুসাদের। এত সুন্দর বাড়ি যোগাড় করে দেয়ার জন্যে আলদুনি সেনফ্রিড সিজারকে বড় রকমের বখশিস দিয়েছে আহমদ মুসার সামনেই।

আহমদ মুসা ও আলদুনি সেনফ্রিড সোফায় বসেছে।

'আমি চা নিয়ে এসে বসছি স্যার।' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল ব্রুনা।

'না ব্রুনা, তুমি বস। চা একটু পরে খাব। কাজের কথা কিছুটা সেরে নিই।' বলল আহমদ মুসা।

ব্রুনা ঘুরে দাঁড়িয়ে এসে বসল। সে ভাবল নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজের কথা হবে। সে মনে মনে খুশি হলো যে, আহমদ মুসা তার উপস্থিতিকে গুরুত্ব দিচ্ছে। এই কথা ভাবতে গিয়ে হঠাৎ সে চমকে উঠল, আহমদ মুসা তাকে গুরুত্ব দিচ্ছে এটা ভাবতে তার ভালো লাগছে কেন? শুধু গুরুত্ব দেয়ার বিষয়ই নয়, আহমদ মুসা বাসায় থাকলে মনে হয় বাসায় প্রাণ আছে, আকর্ষণ আছে, কিন্তু তিনি না থাকলে সব কিছু শূন্য মনে হয়। তার আরও মনে পড়ল, সে অনেক সময়ই কারণে, অকারণে আহমদ মুসার ঘরে যায়, যেতে ভালো লাগে। কেন? মনটা তার উন্মুক্ত এক ক্যানভ্যাস হয়ে তার সামনে আসে। সে ক্যানভ্যাসে খোদাই করে লেখা যেন সে পড়তেও পারে। মনের উপর পাহারাদার বিবেক তার কেঁপে ওঠে। এ অন্যায় চিন্তা। বিবেক তাকে চোখ রাঙায়।

মনের এই নাজুক ঝড় বিব্রত ভাব ফুটিয়ে তুলেছে ব্রুনার চোখে-মুখে।

নিজেকে স্বাভাবিক করে নেবার জন্যে পিতার পাশে বসেই বলল, 'বাবা, সিজার আংকল কিন্তু আজকাল বাজারে বেশ দেরি করে।'

‘এসব ধরো না মা। বয়স হয়েছে তার, আগের সেই গতি কি আর আছে!’ বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

‘সে কি খুব পুরানো লোক আপনাদের?’ জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

‘পুরানো মানে বলা যায়, সে আমাদের বাড়িতেই মানুষ হয়েছে। তার বাবাও আমাদের কাজের লোক ছিল। ওরা বলতে গেলে আমাদের পরিবারের সদস্যের মত।’ বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

‘বিশ্বস্ততার দিকে থেকে কেমন?’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমার মেয়েদের আমি যতটা বিশ্বাস করি, তাকে তেমনি বিশ্বাস করি।

তার গোটা জীবনে এর অনাথা হতে আমি দেখিনি।’ বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

আপনারা ব্রুমসারবার্গ থেকে চলে যাবার পর মানে আপনারা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মানে এই মধ্যবর্তী সময়ে তার ভূমিকা কেমন?’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমরা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর এক মাসের মধ্যে সে চাকরি হারায়। সে আমাদের প্রতি বিশ্বস্ত এবং আমাদের কাছে তথ্য পাচার করতে পারে, এই কারণে তাকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। আমরা এটা জানতে পারি যে, এরপর সে এখানকার এক ফার্মহাউসে প্রহরীর কাজ করতো।’

বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

কিছুক্ষণ থেমেই সংগে সংগে আবার বলে উঠল, ‘কি ব্যাপার। তার ব্যাপারে এত কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন? কিছু ঘটেছে? কোন বেয়াদবী করেনি তো?’

‘না, কোন বেয়াদবী করেনি। একটা বিষয় আমি খেয়াল করেছি। তাকে সব সময় মলিন দেখি। এই মলিনতা আমার মনে হয় কোন ভয় বা উদ্বেগ থেকে সৃষ্টি।’ আহমদ মুসা বলল।

ভ্রূকুঞ্চিত হলো আলদুনি সেনফ্রিডের। বিস্ময় ব্রুনার চোখে-মুখেও!

একটু ভেবে বলল আলদুনি সেনফ্রিড, ‘আমি তো এটা খেয়াল করিনি।’

ভাবছিল ব্রুনাও। বলল, 'সব সময়ই তো তাকে দেখছি, তাও কিছু বুঝতে পারিনি।'

'ভয় বা উদ্বেগ কিসের? তার তো এমন কোন সমস্যা নেই। কিংবা কারো সাথে কোন প্রকার শত্রুতাও তার মত লোকের থাকার কথা নয়। থাকলেও তা জানতে পারতাম। তার কোন সমস্যাই সে কোন দিন গোপন করেনি।' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

'এটা তো আরও ভাবনার বিষয়! আরেকটা কথা। এখানে আসার দু'দিন পর আমার গাড়ি একটা এ্যাকসিডেন্টে পড়েছিল। আমি নিশ্চিত, আমাকে হত্যার জন্যেই মাইক্রোটা আমার কারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। রং সাইড থেকে এসেছিল। সাবধান থাকায় সামান্য আঘাতের উপর দিয়ে আমার জীবন বেঁচে গেছে। আমি গাড়ি থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসার পর উঠে দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম কিছু দূরে একটা দোকানের পাশে সিজার দাঁড়িয়ে ছিল। সে দেখছিল আমাকে। কিন্তু ছুটে আসেনি আমার কাছে। তার চোখে-মুখে আতংক ছিল না, যা থাকার কথা ছিল। তার বদলে ছিল ভয়, একটা অপরাধবোধজনিত মুষড়ে পড়া ভাব।' আহমদ মুসা বলল।

বিস্ময় ফুটে উঠল আলদুনি সেনফ্রিডের চোখে-মুখে! বলল, 'আপনি কি বলছেন? আমি বুঝতে পারছি না সে এমনটা করবে কেন? আপনি কি ভাবছেন জনাব?'

'আমি কোন সিন্ধান্তে এখনও নিইনি। ভাবছি, গাড়িটা আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল কেন? এটাও আমার একটা বড় ভাবনার বিষয়। পুলিশও একমত যে, মাইক্রোটা রংসাইড থেকে উদ্দেশ্যমূলকভাবেই আমার গাড়িকে আঘাত করেছিল। প্রশ্ন হলো, এখানে কে আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল। কেউ তো এখানে আমাকে চেনার কথা নয়!' আহমদ মুসা বলল।

'কথাটা আমার মনেও এসেছে। কে ঘটাল এই ঘটনা? পুলিশ তো কোন হদিস করতে পারলো না।' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

'পুলিশ খোঁজ নিয়ে দেখেছে, মাইক্রোর নাম্বারটা ছিল ভুয়া। ঐ রংয়ের কোন মাইক্রোর সন্ধান পুলিশ ব্রুমসারবার্গে পায়নি।' আহমদ মুসা বলল।

‘আপনি কি মনে করেন, সিজারের সেদিন ঐ আচরণের কারণ কি? তাকে কি জিজ্ঞাসা করব? আমি জিজ্ঞাসা করলে সত্য না বলে পারবে না।’ বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

‘না জনাব, এখন তাকে কিছুই বলা যাবে না। যখন বলতে হবে, আমি আপনাকে জানাব। যা চলছে, যেমনভাবে চলছে সেভাবেই চলুক। আমাদের সামনে এগোবার জন্যে এটা দরকার।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আপনি যা বলছেন, সেটাই হবে। কিন্তু আপনি কি তার তরফ থেকে কোন আশংকা করছেন?’ বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

‘না, তার তরফ থেকে কোন আশংকা করছি না। আশংকা সব সময় শত্রুপক্ষের তরফ থেকে। তারা কোন পথে আসবে, সেটাই আশংকার বিষয়।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কিন্তু আমাদের কি করণীয়?’ বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

‘মি. সেনফ্রিড, কতকগুলো প্রশ্নের সমাধানে আমাদের কাজ করতে হবে। এক. ব্ল্যাক লাইট কারা? তাদের সাথে আপনাদের স্টেট আত্নসাতের ঘটনার সম্পর্কটা কেমন? তারাই মূল প্রতিপক্ষ কিনা? তাদের হেড কোয়ার্টার কোথায়? কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো, ব্রুনার মায়ের হুবহু নকল মা কিভাবে কোত্থেকে এল? কি করে এটা সম্ভব হলো? ব্রুনার আসল মা কারিনা কারলিন কোথায়? এসব প্রশ্নের সমাধানের মাধ্যমেই আমরা প্রকৃত সমাধানে পৌঁছব।’ আহমদ মুসা বলল।

‘জটিল সব প্রশ্ন। কিভাবে এর সমাধান হবে? আপনি এত পরিশ্রম করবেন আমাদের জন্যে? ওরা তো আপনাকেও টার্গেট করেছে। ওদের ব্যর্থতা ওদেরকে আরও ক্ষেপিয়ে তুলবে। একদিকে আমাদের সমস্যা, অন্যদিকে আপনার নিরাপত্তা নিয়েও আমার উদ্বেগ বোধ হচ্ছে। ঈশ্বর আমাদের উপর এ কি বিপদ দিলেন?’ বলল আলদুনি সেনফ্রিড অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে।

আহমদ মুসা আলদুনি সেনফ্রিডকে সান্ত্বনা দিয়ে নরম কণ্ঠে বলল, আল্লাহর উপর ভরসা করুন মি. সেনফ্রিড। দু:খের পরে সুখ আসে। এটাও আল্লাহরই বিধান। আপনার পরিবারে অবশ্যই হাসি ফিরে আসবে।’

‘আপনি কি নিশ্চিত এটা ব্রুনার নকল মা?’ বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

‘আমি নিশ্চিত মি. সেনফ্রিড।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তাহলে ব্রুনার আসল মা কোথায়? আর কখন কিভাবে সে হাওয়া হয়ে গেল?’ বলল সেনফ্রিড।

‘হাওয়া হয়নি। সে আছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘সত্যি কি আপনি মনে করেন আমার স্ত্রী কারিনা কারলিন বেঁচে আছে?’ জিজ্ঞাসা সেনফ্রিডের।

‘আমার তাই মনে হচ্ছে মি. সেনফ্রিড।’ আহমদ মুসা বলল।

‘মাফ করবেন, কেন তা মনে করছেন?’ বলল সেনফ্রিড।

‘এই মুহূর্তে যুক্তি দিতে পারবো না। এটা আমার মনের কথা। আর মাথায় বিশেষ কথা আসে আল্লাহর তরফ থেকেই।’ আহমদ মুসা বলল।

আলদুনি সেনফ্রিড মাথা নুইয়ে দু’হাত জোড় করে উপরে তুলে বলল, ‘হে ঈশ্বর! আমার এই মহান মেহমানের কথা আপনি সত্য করুন।’ কান্নায় ভেঙে পড়ল সেনফ্রিডের কণ্ঠ।

ব্রুনাও হাত উপরে তুলেছিল। তারও দুই চোখ দিয়ে অশ্রু গড়াচ্ছে।

একটা স্বপ্ন দেখে উঠে বসল আহমদ মুসা।

আশ্চর্য লাগল স্বপ্নটি দেখে আহমদ মুসার। একটা বাস্তবের সাথে তার অদ্ভুত মিল! গত বিকেলে রাস্তার ভ্যাকুয়াম ক্লিনার লোকটি, যে তাদের টিলার একমাত্র রাস্তাটা ক্লিন করছিল, আহমদ মুসাকে একটা গোলাপ দিয়ে বলেছিল, ‘শুভ বিকেল স্যার। আপনারা বাড়িতে নতুন উঠেছেন। আপনাদের স্বাগত।’

কিছুটা বিরক্ত হয়েছিল আহমদ মুসা। ফুল নিয়ে সে এসে বসেছিল নিচের ড্রইংরুমে। ফুলটি সে পাশের ফ্লাওয়ার ভাসে গুঁজে রেখেছিল। সামনে এনে একবার শুঁকেও দেখেনি সে। স্বপ্নে সেই ক্লিনার লোকটিই তাকে বলছে, ‘স্যার আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ করলেন না! একবার ফূলটা শুকেও দেখলেন না।’

স্বপ্নটা জীবন্ত।

ক্লিনার লোকটির কথা তার মনেকে দারুণভাবে বিদ্ধ করেছে। সত্যি তো সে তার শুভেচ্ছা গ্রহণ করেনি! ফুলটি সে শুঁকে দেখেনি, সামনেও নিয়ে আসেনি। দরিদ্র, সামান্য মানুষ বলেই তো! কেন জানি তার মনে হলো তার ভুলের সংশোধন এই মুহুর্তেই হওয়া দরকার। ফুলটি তার তুলে নিয়ে আসা প্রয়োজন। মন থেকেই আহমদ মুসা এর প্রচণ্ড তাকিদ অনুভব করল।

ঘড়ির দিকে তাকাল। দেখল ২টা বেজে পাঁচ মিনিট। মনে মনে বলল, অসুবিধা নেই। সিঁড়ি দিয়ে নেমে কয়েক পা হাঁটলেই নিচের ড্রইংরুম। ফূলটা নিয়ে আসতে হবে। আহমদ মুসা নব ঘুরিয়ে দরজা টানল। নি:শব্দে খুলে গেল দরজা। দরজার পরেই প্রশস্ত একটা করিডোর। আহমদ মুসার ঘরটা বাড়ির সামনের দিকে সর্বদক্ষিণের ঘর। ঘরের দরজা থেকে প্রশস্ত করিডোর উত্তরে এগিয়ে একটা লাউঞ্জে মিশেছে। লাউঞ্জ থেকেই নিচের তলায় নামার সিঁড়ি।

আহমদ মুসা দরজা থেকে করিডোরে পা রাখবে এই সময় পায়ের শব্দ পেল সিঁড়ির দিক থেকে। অস্পষ্ট শব্দ। একাধিক লোক উঠে আসছে সিঁড়ি দিয়ে। সিঁড়ির কার্পেটের উপর দ্রুত পায়ের আঘাত থেকে একটা খসখসে শব্দ ভেসে আসছে।

ভ্রূকুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার। এত রাতে সিঁড়ি দিয়ে একাধিক লোক উঠে আসছে, কারা ওরা? ব্রুনা ও ব্রুনার বাবা কি কোন কারণে নিচে গিয়েছিল? কিন্তু পায়ের শব্দ তো দু'য়ের অধিক লোকের! পায়ের শব্দ দ্রুত এবং একই গতিতে উঠে আসছে, ফ্লোরে রাখা পায়ের নিচের শব্দ তরঙ্গ ও বাতাসের ওয়েভে ভেসে আসা শব্দের ঢেউ থেকে এটা পরিষ্কার। তাহলে কারা আসছে এত রাতে?

আহমদ মুসা পায়ের আঙুলে ভর করে দ্রুত দৌড়ে লাউঞ্জে ঢোকার মুখে বাম পাশে টয়লেটের আধা-আধি খুলল যাতে প্রয়োজনে আড়াল পাওয়া যায় এবং দেয়ালের প্রান্ডে লাউঞ্জের মুখে দাঁড়াল। উকিঁ দিল সন্তর্পণে লাউঞ্জের সিঁড়ির দিকে। হ্যাঁ, ওরা পৌঁছে গেছে। ওদের পোষাকের দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠল আহমদ মুসা! সেই কালো হ্যাট আর কালো পোষাকে ঢাকা লোকগুলো।

তার মানে ব্ল্যাক লাইটের লোক ওরা। জেনে গেছে তাহলে ওরা আমাদের অ্যাড্রেস।

কালো পোষাকধারী সবাই লাউঞ্জে উঠে এসেছে।

ওরা আহমদ মুসার করিডোরের দিকে আসছিল।

আহমদ মুসা টয়লেটে ঢোকার চিন্তা করছিল। এমন সময় ওদের একজন নেতা হবে বলে মনে হয়। সে বলে উঠল, 'না, আগে নকল আহমদ মুসাকে নয়, বাপ-বেটিকে আগে হাতে পেতে হবে। ওদিকে আগে চল। একজন এখানে লাউঞ্জে থাকবে পাহারায়।'

ওরা ব্রুনা ও তার বাবার ঘরের দিকে চলে গেল।

আহমদ মুসা অবাক হলো, ওরা কি করে জানল বাড়ির কোন্ ঘরে কে থাকে? কেউ বলে না দিলে বাইরের পর্যবেক্ষণ থেকে বিষয়টা এত নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব নয়।

অতি সন্তর্পণে উঁকি দিল আহমদ মুসা লাউঞ্জে। দেখল, একজন ছাড়া অন্য সবাই চলে গেছে ব্রুনা ও তার বাবার ঘরের দিকে। তারা পাশাপাশি কক্ষে থাকে।

ওরা পৌঁছে গেছে ব্রুনাদের ঘরের কাছে।

লাউঞ্জে দাঁড়ানো লোকটির হাতে সর্বাধুনিক মাইক্রো মেশিনগান। মেশিনগানটি লোকটির হাতে ঝুলছে। ব্যারেলটা নিচে নামানো। লোকটি বেশির ভাগ সময় তার সাথীরা যেদিকে গেছে, সেদিকে ও সিঁড়ির দিকে চোখ রাখছে।

আহমদ মুসা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। ওদেরকে বেশি সময় দেয়া যাবে না।

সাবমেশিনগানধারী লোকটি দক্ষিণ পাশের আহমদ মুসার করিডোরের দিকটা পেছনে রেখে উত্তরে ব্রুনা ও তার বাবার কক্ষের দিকে থেকে চোখ সরিয়ে ধীরে ধীরে দৃষ্টি দিচ্ছে পশ্চিম পাশের সিঁড়ির দিকে।

আহমদ মুসা দু'পায়ের আঙুলে ভর করে নি:শব্দে দুই লাফে লোকটির পেছনে দাঁড়িয়েই বাম হাত দিয়ে তার গলা পেঁচিয়ে ধরল সাঁড়াশির মত। মিনিটের মধ্যেই তার দেহ নি:সাড় হয়ে গেল। তার হাত থেকে মেশিনগান খসে পড়ল।

আহমদ মুসা লোকটিকে ফেলে রেখে ফ্লোর থেকে মাইক্রো মেশিনগানটি তুলে নিয়ে ছুটল ব্রুনাদের ঘরের দিকে।

লাউঞ্জের পরেই বড় একটা হল ঘর। একে ড্রইংরুম হিসাবে ব্যবহার করা হয়, আবার ছোটখাট ঘরোয়া গ্যাদারিং-এর জন্যেও ব্যবহৃত হয়। হল ঘরটির দেয়াল ব্লাইন্ড কাচের ও মুভেবল বলে দুই উদ্দেশ্যেই সুন্দর কাজে লাগে। হল ঘরটির পরে পাশাপাশি দু'টি বড় রুম। দুই রুমের মাঝখানে টয়লেট। আর হলরুমের পূর্ব দিকে আর একটি বড় ঘর। আর তা একই সাথে আর্কাইভ ও লাইব্রেরী, যা স্টাডি রুম হিসাবেও ব্যবহৃত হয়।

এই আর্কাইভ ও হলরুমের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে করিডোর। এই করিডোর ধরে কয়েক গজ এগোলেই ব্রুনা ও আলদুনি সেনফ্রিডের শোবার ঘর দু'টি।

এ করিডোরটি ওদের ঘরের সামনের পূর্ব-পশ্চিম লম্বা বারান্দায় গিয়ে শেষ হয়েছে।

আহমদ মুসা শুয়ে পড়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছিল। শত্রুকে আগে আক্রমণে আসতে দিতে চায় না আহমদ মুসা। সেজন্যেই এই সাবধানতা।

আহমদ মুসা ধীরে ধীরে এগোচ্ছিল। তার পরিকল্পনা হলো, করিডোরটার প্রান্তে গিয়ে উঁকি মেরে দেখবে তারা কি করছে। ব্রুনা ও মি. সেনফ্রিড দু'জনের দরজার সামনে থেকে মানুষের সাড়া পাচ্ছে।

করিডোরের ঠিক ডান পাশ দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল আহমদ মুসা। প্রান্ত দিয়ে, যাবার ফলে করিডোরের শেষ পর্যন্ত যাবার আগেই বাম পাশের দরজার সামনে যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের দেখা যাবে।

আহমদ মুসা এগোচ্ছিল।

তখনও বাম দিকের দরজা দেখতে পাবার মত কৌণিক অবস্থানে সে পৌঁছতে পারেনি। কিন্তু তার চোখ দরজার দিকে।

হঠাৎ দেখল একজন লোক বাম দিকের দরজার দিক থেকে ছুটে আসছে। তার চোখ ডান পাশের দরজার দিকে। কিন্তু এ করিডোরের সামনাসামনি আসতেই আহমদ মুসা তার চোখে পড়ে গেল।

চমকে উঠে থমকে দাঁড়াল সে। পরক্ষণেই কাঁধের মাইক্রো মেশিনগান হাতে এনে আহমদ মুসাকে তাক করতে যাচ্ছিল।

আহমদ মুসাও তাকে একই সংগে দেখে ফেলেছিল। কাঁধ থেকে স্টেনগান নামানো থেকেই বুঝল, না মারলে তাকেই মরতে হবে। আহমদ মুসার স্টেনগানের ব্যারেল ওদিকে তাক করাই ছিল। টার্গেট এ্যাডজাস্ট করে ট্রিগার চাপতে দেরি হলো না আহমদ মুসার।

লোকটির স্টেনগান আহমদ মুসাকে টার্গেট করার আগেই লোকটি গুলি খেয়ে ঢলে পড়ে গেল।

গুলি করেই আহমদ মুসা দ্রুত কিছুটা সামনে এগোলো। বাম দিকের দরজাটা তার সামনে এল। দেখল দরজার সামনে দাঁড়ানো দু’জন তাদের স্টেনগান বাগিয়ে ছুটে আসছে।

কি ঘটতে যাচ্ছে আহমদ মুসা পরিস্কার বুঝতে পারল। বাম দিকের লোকগুলোই নয়, ডান দরজার সামনের লোকরাও নিশ্চয় ছুটে আসছে। সবাইকে তার মোকাবিলা করতে হবে। আর সবাইকে এক সাথে মোকাবিলা করা সম্ভব হবে না।

তাই আহমদ মুসা সময় নষ্ট করল না।

স্টেনগানের ট্রিগারে তর্জনি রাখাই ছিল।টার্গেট ঠিক করার পর তর্জনি স্টেনগানের ট্রিগারের উপর চেপে বসল।

সামনে ছুটে আসা লোক দু’টি গুলি খেয়ে সামনেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

গুলি করেই আহমদ মুসা স্টেনগানের ব্যারেল বাম থেকে ডান পাশের দিকে নিয়ে গুলি বৃষ্টির দেয়াল সৃষ্টি করল। তারপর করিডোরের ডান পাশের দিকে গড়িয়ে চলল, যাতে ডান দিকের দরজার সামনের করিডোরটা তার স্টেনগানের গুলির আওতায় এসে যায় এবং ওপাশের লোকরা তাকে টার্গেট করার সুযোগ পাওয়ার আগেই তার গুলি বৃষ্টির মুখে পড়ে যায়।

আহমদ মুসার নির্ভুল পরিকল্পনা। সত্যিই ডান দরজার সামনের লোকরা ছুটে আসছিল এবং তারাও গুলি ছুঁড়তে শুরু করেছিল। কিন্তু আহমদ মুসার গুলি

যেভাবে ওদের কভার করছিল, সেভাবে তারা আহমদ মুসাকে টার্গেট করতে পারেনি এবং তাড়াহুড়ার কারণে তারা আহমদ মুসার সঠিক অবস্থান দেখতে পায়নি। তার ফলে তারা বেপরোয়াভাবে এ করিডোরের দিকে ছুটে আসতে গিয়ে আহমদ মুসার গুলি বৃষ্টির মুখে পড়ে গেল। তিনজনের যে দু'জন ডান পাশে ছিল তারা লাশ হয়ে গেল, কিন্তু বেঁচে গেল একজন। দুই স্টেনগানের গুলি বৃষ্টি থেমে যাওয়া এবং এক স্টেনগানের গুলি অব্যাহত থাকা দেখে আহমদ মুসা এটা বুঝে নিল।

আহমদ মুসা দ্রুত করিডোরের বাম পাশ থেকে গড়িয়ে করিডোরের ডান পাশে চলে গেল। তারপর স্টেনগানের ট্রিগারে হাত রেখে দ্রুত ক্রলিং করে করিডোরের প্রান্তে গিয়ে পৌঁছল, যেখানে থেকে করিডোরের গার্ডার একেবারে 'এল' প্যাটার্নে টার্ন নিয়ে পুব দিকে চলে গেছে। ওদিকেই গার্ডারের আড়ালে অবশিষ্ট একজন লোক লুকিয়ে আছে অথবা আক্রমণের কোন কৌশল নিয়ে এগিয়ে আসছে।

আহমদ মুসা তার স্টেনগানের ব্যারেল 'এল'-এর কোণাটায় যতখানি সম্ভব পূর্ব দিকে ঘুরিয়ে রেখে অপেক্ষা করতে লাগল।

মিনিটখানেকের মধ্যেই আহমদ মুসা অতিষ্ট হয়ে উঠল। কি করছে তৃতীয় লোকটি? সে যদি আক্রমণে এদিকে আসতে চায় যে কোন কৌশলে, তাহলে এতটা সময় লাগার কথা নয়। সময় সে নষ্ট করতে পারে না। কারণ সে জানে, সে খুব ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। কারণ যে কোন সময় সে তার গুলির মুখে পড়তে পারে, তার আড়াল নেবার কোন জায়গা নেই। সুতরাং বেপরোয়া আক্রমণে আসার কোন বিকল্প তার কাছে নেই, তাহলে সে চুপ করে আছে কেন? নিশ্চয় সে চুপ করে বসে নেই!

আহমদ মুসা স্টেনগানের ট্রিগারে তর্জনি রেখে উঁকি দিল ডানের বারান্দার দিকে।

সে দেখল বারান্দার গার্ডারের গা ঘেঁষে বসে সে গ্যাস মুখোশ পরছে। তার সামনে পিং পং বলের মত কিছু রাখা। দেখেই আহমদ মুসা বুঝল, ওটা কোন প্রেশার গ্যাস বোমা, যা সংজ্ঞা লোপ করতে পারে নির্দিষ্ট এলাকার সব মানুষের।

অথবা ওটা যদি কোন বিষাক্ত গ্যাস বোমা হয় তাহলে বিস্ফোরণের কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে মৃত্যু অবধারিত। নিজের নিরাপত্তার জন্যে গ্যাস মুখোশ পরার পরই সে ওটা ব্যবহার করবে।

আহমদ মুসা ভাবছে।

গ্যাস মুখোশ পরা তার হয়ে গেছে। হাতে তুলে নিতে যাচ্ছে তার সামনের সাদা বলটা।

ট্রিগারে হাত রেখেই আহমদ মুসা তার দেহটাকে উল্টে দিয়ে সামনের বারান্দার মাঝখানে চলে এল এবং শুয়ে থেকেই লোকটির দিকে রিভলবার তাক করে চিৎকার করে বলল, 'হাত উপরে তোল, না হলে তোমার দেহ ঝাঁঝরা হয়ে যাবে।'

লোকটি কথাটার দিকে কোন কানই দিল না। সাদা বলটার দিকে অগ্রসরমান তার হাত দ্রুততর হলো এবং ছোঁ মেরে নিয়ে নিল সাদা বলটি নিজের হাতের মুঠোয়। উঠছিল তার হাত উপর দিকে বিদ্যুত গতিতে।

আহমদ মুসা তাকে আর সময় দিল না। সে যা বলেছিল তাই ঘটল। আহমদ মুসার স্টেনগানের গুলিতে লোকটার দেহ ঝাঁঝরা হয়ে গেল।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

সে ডাক দিল ব্রুনা ও তার বাবা আলদুনি সেনফ্রিডকে।

তারা দরজা খুলে বেরিয়ে এল।

ভয়ে ব্রুনা কাঁপছিল। মুখ তার ভয়ে ফ্যাকাসে। আলদুনি সেনফ্রিডের অবস্থাও একই রকম। আতংকে নির্বাক সেও।

'আর কোন ভয় নেই মি. সেনফ্রিড, ব্রুনা। ওরা সাতজন এসেছিল। সবাই মারা পড়েছে।

'মি. আহমদ মুসা আবারও আমাদের জীবন বাঁচালেন।' বলে আহমদ মুসাকে জড়িয়ে ধরল আলদুলি সেনফ্রিড।

ব্রুনাও নির্বাক হয়ে দাঁড়াল আহমদ মুসার সামনে। তার বুকে তোলপাড় চলছে। আমরা তো ঘুমুচ্ছিলাম। কিছুই টের পাইনি। তিনি কেমন করে টের পেলেন? তিনি নিশ্চয় জেগে ছিলেন। এমনভাবে তিনি জেগে থাকেন। বিস্ময়কর

এই মানুষ! কেউ মানুষের জীবনকে পাগলের মত ভালো না বাসলে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে এমনভাবে ভালোবাসতে পারে না। এরাই মানুষের মধ্যে সোনার মানুষ। তার গর্ব হচ্ছে যে, তার আপা একে ভালো বেসেছিলেন এবং এর জন্যে জীবন দিয়েছেন। এমন মানুষেকে ভালো না বেসে পারা যায় না!

ব্রুনার চিন্তা আরও এগোতো, কিন্তু আলদুনি সেনফ্রিডের কথা শেষ হবার সাথে সাথে আহমদ মুসা বলে উঠল, 'আপনারা একটু দাঁড়ান। আমি নিচে ড্রইং রুম ও আশপাশটা একটু দেখে আসি।'

বলে আহমদ মুসা চলতে শুরু করল।

'মি. আহমদ মুসা প্লিজ, আমরা আপনার সাথে আসতে চাই।' বলল আলদুনি সেনফ্রিড। তার চোখে-মুখে অস্বস্তি।

আহমদ মুসা ফিরে দাঁড়াল। বলল, 'কেন মি. আলদুনি সেনফ্রিড? আমি গিয়েই চলে আসব।'

'কিসে কি হচ্ছে, কিছুই আমার কাছে পরিষ্কার নয়। এখানে থাকতে আমার ভয় করছে মি. আহমদ মুসা।' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

ব্রুনা কিছু বলতে গিয়েও পারল না। কথা ফুটল না তার মুখে। একটা জড়তা তাকে জড়িয়ে ধরেছে।

আহমদ মুসা একটু ভাবল। তারপর বলল, 'আসুন জনা্ব।'

আহমদ মুসা হাঁটতে শুরু করল।

মি. আলদুনি সেনফ্রিড ও ব্রুনা আহমদ মুসার পেছনে চলতে লাগল।

লাউঞ্জে আরেক জনের লাশ দেখে আর একবার আঁৎকে উঠল ব্রুনারা।

'এ লোক এখানে পাহারায় ছিল। তাকে না মেরে সামনে এগোনো অসম্ভব ছিল।' আহমদ মুসা বলল।

'আপনি টের পেলেন কি করে মি. আহমদ মুসা? আপনি কি জেগে ছিলেন?' জিজ্ঞাসা আলুদনি সেনফ্রিডের।

'ঘুমিয়ে ছিলাম।' আহমদ মুসা বলল।

'তাহলে ওদের সাড়া পেয়ে জেগে উঠেছেন?' বলল সেনফ্রিড।

‘ওদের সাড়া পেয়ে জাগিনি। কিভাব জাগলাম, সেটা পরে বলছি। সে বিষয়টা নিয়ে ভাবতে গিয়েই নিচের ড্রইং রুমে আসছিলাম।’ আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসার শেষের কথাটার কিছুই বুঝল না রুনারা। কিন্তু আর কিছু জিজ্ঞাসাও করল না।

তারা নিচের ড্রইং রুমে এসে গেছে।

তারা সবাই ড্রইং রুমে প্রবেশ করল।

আহমদ মুসা সোজা এগোলো ফুলদানির দিকে। ফুলে গুচ্ছের সাথে রাখা একমাত্র গোলাপ হাতে তুলে নিল আহমদ মুসা।

গোলাপটি তুলে নিয়েই আহমদ মুসা গোলাপের গন্ধ নেবার জন্যে নাকের কাছে নিয়ে এল ফুলটিকে। ফুলটি নাকের সামনে এনে শুঁকতে গিয়ে চমকে উঠল আহমদ মুসা। দেখল ফুলের ঠিক মাঝখানে গোল করে জড়ানো একটা লাল কাগজ গুঁজে রাখা।

শুঁকা আর হলো না ফুলটা।

বাম হাতে কাগজটা তুলে নিয়ে দুই হাতে গোল করে ভাঁজ করা কাগজটি খুলে ফেলল।

বিস্ময় আহমদ মুসার চোখে-মুখে।

রুনারাও আহমদ মুসার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

আহমদ মুসা চোখ বুলাল কাগজটির উপর।

তিনটি বাক্য লেখা।

পড়ল আহমদ মুসা, ‘সিজার ফাঁদে পড়েছে। তার বউ-বেটি আটকা। আজ রাত ২টা, সাবধান থাকবেন।’

লেখাটা পড়ার সংগেই সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল আহমদ মুসার কাছে। সিজারের বউ-বেটিকে আটকে রেখে বাধ্য করেছে সিজারকে তাদের কথা মত চলতে। নিশ্চয় গেটের কম্বিনেশন লকের ডিজিটাল কোড সে ব্ল্যাক লাইটকে বলে দিয়েছে। বাড়িটার ডিজাইন ও বাড়ির কে কোথায় থাকে তাও নিশ্চয় ওরা সিজারের কাছ থেকে জেনে নিয়েছে। রাত দু’টোর দিকে এ বাসায় আক্রমণ হবে, সেটাও এই চিরকুটের লেখক জানত। সে এই ব্যাপারে আহমদ মুসাকে সাবধান

করতে চেয়েছিল চিরকুট লিখে। কে এই চিরকুট লেখক? সে 'ব্ল্যাক লাইটের কেউ? তা অবশ্যই নয়। তাহলে কে?

এ প্রশ্নের জবাব আহমদ মুসা খুঁজে পেল না। লোকটা কি আসলেই ক্লিনার ছিল, না ক্লিনারের ছদ্মবেশে এসেছিল?

'মি. আহমদ মুসা, ফুলের মধ্যে থেকে ওটা কি বের হলো? ফুলই বা এখানে কোত্থেকে এল? ফুলদানিতে রাখার সময় গতকাল ফুলের গুচ্ছ আমি ভালো করে দেখেছি। তাতে এই গোলাপটি ছিল না।' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

আহমদ মুসার চিন্তায় ছেদ পড়ল। তাকাল সে আলদুনি সেনফ্রিডের দিকে। একটু হাসল। বলল, 'আমি কিভাবে ঘুম থেকে জাগলাম বলছিলেন না। এই ফুল আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিয়েছে। আমি স্বপ্ন দেখছিলাম, যে আমাকে ফুলটা দিয়েছিল, সে আমাকে বলছিল, 'আমার ফুলটা শুঁকেও দেখলেন না।' তার এই কথার পরই আমার ঘুম ভেঙে যায়। স্বপ্নটা এতই জীবন্ত ছিল যে, আমার মনে হলো, এই মুহূর্তে ফুলটা ওখান থেকে নেয়া প্রয়োজন এবং শুঁকে দেখাও উচিত। সংগে সংগেই আমি উঠলাম। দরজা খুললাম। দরজা খুলেই টের পেলাম সিঁড়ি দিয়ে কয়েকজন লোক উঠে আসছে। তারপর আমি ওদের অনুসরণ করলাম এবং এরপর যা ঘটেছে তা আপনারা দেখেছেন।'

'মিরাকল! সত্যিই ফুলই তো আপনাকে জাগিয়েছে। বুঝা যাচ্ছে, ফুল আপনি ভালো করে দেখেননি বলেই আপনি স্বপ্ন দেখেছেন।' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

'এবং স্বপ্ন আমি ঠিক সময়ে দেখেছি এবং ঠিক সময়েই ঘুম থেকে জেগেছি।' বলে আহমদ মুসা লাল চিরকুটটি এগিয়ে দিল আলদুনি সেনফ্রিডের দিকে।

আলদুনি সেনফ্রিড পড়ল চিরকুটটি। তার চোখ দু'টি বিস্ময়-উদ্বেগে ছানাবড়া হয়ে গেল।

পিতার দিকে চেয়ে তার হাত থেকে চিরকুটটি নিয়ে নিল ব্রুনা। ব্রুনাও চিরকুটটি পড়ল। তারও চোখ-মুখে নেমে এল বিস্ময় ও উদ্বেগ। বলল, 'স্যার আপনি কি ঠিক ২টায় ঘুম থেকে উঠেছিলেন?'

‘হ্যাঁ,ব্রুনা, স্বপ্ন দেখে ২টায় আমি ঘুম থেকে জেগেছিলাম।’ আহমদ মুসা বলল।

‘মি. আহমদ মুসা, সিজারের ব্যাপারে কি লেখা হয়েছে বুঝলাম না।’ বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

‘বলছি। ব্ল্যাক লাইটের লোকরা সিজারের স্ত্রী ও মেয়েকে কিডন্যাপ করেছে এবং সিজারকে বলেছে যে, ব্ল্যাক লাইটের লোকরা যা বলবে তা না করলে তার স্ত্রী ও মেয়েকে হত্যা করবে। মনে হচ্ছে, স্ত্রী ও মেয়েকে বাঁচানোর জন্যে সে ব্ল্যাক লাইট যা বলছে তাই সে করছে। সেই এ বাড়ির ঠিকানা ওদের জানাতে বাধ্য হয়েছে। আমার উপর যে আক্রমণ হয়, সেটাও সিজারের সাহায্য নিয়ে ওরা করেছে। আজও ওরা এ বাড়ির কোডেড লক খুলেছে সিজারের সাহায্যে।’

মুহূর্ত কয়েকের জন্যে থেমে আবার আহমদ মুসা বলল আলদুনি সেনফ্রিডের দিকে চেয়ে, সিজারের মধ্যে ভীত ও জড়সড় ভাব এই কারণেই দেখা যেত, যা আমি বলেছিলাম।’

‘সিজার এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা করল আমাদের সাথে? ওকে এক মুহূর্ত আর রাখা যাবে না, বাড়িও আমাদের পাল্টাতে হবে। না, তাকে পুলিশে দিলে ভালো হয় মি. আহমদ মুসা?’ বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

‘না, এসব করা ঠিক হব না মি. সেনফ্রিড। তাকে তাড়ানোও যাবে না, তবে বাসা বদল করা যেতে পারে। তাকে বুঝতেই দেয়া যাবে না যে, তার বিষয়টা আমরা জানি। আর...।’

আহমদ মুসার কথার মাঝখানেই আলদুনি সেনফ্রিড বলে উঠল, ‘কিন্তু তাহলে তো সিজারকে ব্যবহার করে আরও ঘটনা ঘটাতেই থাকবে ব্ল্যাক লাইটরা।’

‘হ্যাঁ, সে আশংকা আছে। আমাদেরকে সাবধান থাকতে হবে। কিন্তু লাভ যেটা হবে সেটা হলো, সিজারকে গোপনে ফলো করে আমরা ব্ল্যাক লাইটের ঠিকানা জানতে পারি কিংবা কাউকে ধরে ফেলতে পারি। এটা আমাদের জন্যে খুব প্রয়োজন।’ আহমদ মুসা বলল।

‘এ কথাও ঠিক। ঠিক আছে যা ভালো বোঝেন তাই করুন।’

সবাই বেরিয়ে এল নিচের ড্রইং রুম থেকে।

দোতলায় ওঠার সিঁড়ির গোড়ায় এসে আহমদ মুসা বলল, 'মি. সেনফ্রিড, আপনি পুলিশকে টেলিফোন করুন। তাদেরকে সব ঘটনা জানান।'

পুলিশকে টেলিফোন করে আবার তারা দো'তলায় ফিরে এল।

'মি. আহমদ মুসা, আমার ও ব্রুনার দরজার সামনে সরু পাইপ ও ইলেকট্রনিক ধরনের একটা বক্স কেন?' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

'আপনাদের হত্যার পরিকল্পনা তাদের ছিল না। ওরা চেয়েছিল আপনাদের সংজ্ঞাহীন করে কিডন্যাপ করতে। এসব সংজ্ঞাহীন করার সরঞ্জাম। পাইপের একটা মাথা দেখুন খোলা, আরেকটা মাথায় সুঁচালো, ফাঁপা ও মোটা-সোটা পিন। পিং পং বলের মত ওটা মানুষকে সংজ্ঞাহীন প্রেশার গ্যাস বল। বলটি ইলেকট্রনিক বক্সে নির্দিষ্ট স্থানে সেট করার পর বক্সের ফুটো দিয়ে পাইপের পিনটা ঢুকিয়ে দিলে পিনটা গ্যাস বলের ভিতরে ঢুকে নির্দিষ্ট স্থান দিয়ে গ্যাস ছাড়তে আরম্ভ করবে। তারপর ফাঁপা পিনের সাহায্যে গ্যাস প্রবেশ করবে টিউবে। টিউবের খোলা মাথা ঢুকানো থাকবে ঘরের ভিতর। গ্যাস ঘরে প্রবেশ করার সাথে সাথে ঘরে যে থাকবে সে সংজ্ঞা হারাবে।' আহমদ মুসা বলল।

'ও গড! ওদের প্ল্যান সফল হলে আমাদের বাঁচার কোন উপায় ছিল না। কি বলে যে আপনার কৃতজ্ঞতা জানাব আহমদ মুসা। কোন কথাই যথেষ্ট নয়।' বলল মি. সেনফ্রিড।

পিতার কথা শেষ হতেই ব্রুনা বলে উঠল, 'বাবা, উনি স্রেফ আপার দেয়া দায়িত্ব পালন করছেন। কোন ধন্যবাদই নাকি তাঁর প্রাপ্য নয়!'

'আবার ভুল করছ ব্রুনা। গৌরী আমাকে দায়িত্ব দেননি। তিনি আশা করেছিলেন মাত্র।' আহমদ মুসা বলল।

'দায়িত্ব দেয়া ও আশা করার মধ্যে খুব বেশি কি দূরত্ব? প্রথমটা স্থুল এবং দ্বিতীয়টা ভদ্র ভাষার, এই যা পার্থক্য।' বলল ব্রুনা।

'ব্রুনা, আমি তোমার বোন যেমনটা ছিল, তাকে তেমনটাই বড় রাখতে চাচ্ছিলাম। আর তুমি তাকে টেনে নিচেই নামাতে চাচ্ছ। নিজেদের কোন ব্যাপারে অন্যকে দায়িত্ব চাপাবার মত স্বার্থবাদী তিনি ছিলেন না। তিনি নিজেদের সম্পর্কে

আমাকে জানিয়েছিলেন অবহিত করার উদ্দেশ্যে। এর সাথে তিনি একটা মত পোষণ করেছিলেন মাত্র।' আহমদ মুসা বলল।

ব্রুনা সংগে সংগে উত্তর দিল না।

হঠাৎ তার চোখ-মুখ ভারি হয়ে উঠল।

মুহূর্ত কয়েক মাথা নিচু করে থাকার পর বলল, 'ধন্যবাদ স্যার। আমি আমার কথা প্রত্যাহার করছি। ধন্যবাদ আপনাকে, আমার বোনকে এমন পরম সুন্দর চোখে দেখার জন্যে। আমি গর্বিত স্যার।' ব্রুনার ভারি কন্ঠ একটা অবরুদ্ধ আবেগে ভেঙে পড়ল।

সে দু'হাতে মুখ ঢাকল।

বাড়ির বাইরে থেকে পুলিশের গাড়ির শব্দ ভেসে এল।

আলদুনি সেনফ্রিড ঘরের ভেতরে গিয়েছিল। দ্রুত বেরিয়ে এল। বলল, 'পুলিশ এসেছে। আমি নিচে যাই। ওদের নিয়ে আসি।'

ব্রুমসারবার্গের রাইন এলাকা।

রাইনের পশ্চিম তীর।

ব্রুমসারবার্গের সার্কুলার রোডের দক্ষিণ প্রান্ত, যেখান থেকে সার্কুলার রোডটি পূর্ব দিকে বাঁক নিয়ে রাইন পর্যন্ত নেমে গেছে, তার উত্তর প্রান্ত বরাবর এসে শেষ হয়েছে স্যাক্সনদের আদি রাজপ্রাসাদ এলাকার দক্ষিণ সীমা।

সার্কুলার রোডটি ব্রুমসারবার্গের ব্যস্ত সড়কের একটি।

স্যাক্সন রাজপ্রাসাদের এরিয়া ঠিক আছে আর অন্য কিছুর সব ঠিক নেই।

মূল প্রাসাদের কাঠামো ঠিক থাকলেও সংস্কারের মাধ্যমে দৃশ্যপট পাল্টে গেছে। মূল অংশ ঠিক থাকলেও আশে পাশের স্থাপনা প্রায় ক্ষেত্রেই আর অবশিষ্ট নেই। মাত্র দক্ষিণ প্রান্তে এসে সার্কুলার রোডটা গা ঘেঁষে রাজ প্রাসাদেরই আরেকটা বিচ্ছিন্ন অংশ এখনো টিকে আছে। স্যাক্সনদের প্রথম সম্রাট অটো দি গ্রেটের ভ্রাতুস্পুত্র ও নাতির মধ্যে সাম্রাজ্য নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে সাম্রাজ্য ভাগ

হয় এবং সম্রাটের নাতির জন্যে আলাদা এই প্রসাদ নির্মিত হয়। ব্রুনার মা কারিনা কারলিন সম্রাটের সেই নাতিরই উত্তরপুরুষ। ব্রুনা, তার বোন ও বাবা এই বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়েছে। এখন তার মা এই বাড়িতে থাকে। তার সাথে থাকে ব্ল্যাক লাইটের লোকরা।

এই বাড়ির পর সার্কুলার রোডটা পেরুলে রাস্তার ওপাশে সারিবদ্ধ বাড়ির মধ্যে পুরানো মডেলের জাঁকজমকহীন, অনেকটাই পরিত্যক্ত বাড়ির মত দাঁড়িয়ে আছে আরেকটা বাড়ি। এই বাড়ির ওল্ড মডেলের গেট ও প্রাচীর ঘেরা বাড়িতে গেট দিয়ে প্রবেশ করলে প্রথমেই একটা আঙিনা পাওয়া যায়। তারপর লাল পাথর বিছানো রাস্তা দিয়ে সামনে এগোলে আঙিনার মাথায় একটা গাড়ি বারান্দা। গাড়ি বারান্দা থেকে কয়েক ধাপ পেরিয়ে উঁচু বারান্দা। বারান্দার পরেই বাড়ির ভেতরে ঢোকার মূল গেট।

গেট অরক্ষিত। গেটে কোন দারোয়ান নেই। আছে কলিং বেল। কলিং বেল বাজলে কেউ দরজা খুলে দেয়। অধিকাংশ সময়ই দরজায় তালা থাকে। এখন অবশ্য তালা নেই।

বাড়ির ভেতরে ড্রয়িং রুমে বসে তিনজন কথা বলছে। আহমদ মুসা, ব্রুনা ও তার বাবা আলদুনি সেনফ্রিড।

সেদিন রাতে বাড়ি আক্রান্ত হওয়া এবং বাড়ির ঠিকানা ব্ল্যাক লাইট জেনে ফেলেছে তা প্রমাণিত হওয়ার পর আহমদ মুসারা সেদিনই ঐ বাড়ি পাল্টে ফেলেছে। এ বাড়ি তাদের নতুন ঠিকানা।

এ বাড়িটা পাওয়ার মধ্যেও একটা কাহিনী আছে।

বাড়ি আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা যেদিন ঘটে, সেদিনই রাস্তার কয়েকটা টু-লেট বিজ্ঞাপন দেখে সেসব বাড়ির লোকেশন দেখতে বেরিয়েছিল আহমদ মুসা। তার গাড়িটা তাদের টিলা এলাকার নিচে মার্কেটের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিল। ট্রাফিক সিগনালের কারণে দাঁড়িয়ে পড়েছিল তার গাড়ি।

সে নিজে ড্রাইভ করছিল। গাড়ির জানালা খোলা ছিল।

একজন ফুলওয়ালী ফুলের একটা গুচ্ছ আহমদ মুসার সামনে ধরে বলল, ‘স্যার, নেবেন ফুলটা, টাটকা ফুল। মাত্র এক মার্ক।’

আহমদ মুসা না বলতে গিয়ে হঠাৎ ক্লিনারের সেই গোলাপ ফুলের কথা মনে পড়ল। সংগে সংগে ফুলের গুচ্ছের দিকে একবার তাকিয়ে বলল, 'দাও।'

ফুলের গুচ্ছ দিয়ে একটি মার্ক নিয়ে চলে গেল ফুলওয়ালী।

ফুলওয়ালীর বয়স পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে হবে। আয়া বা সেলসম্যান অথবা কোন কর্মজীবী ধরনের মহিলা হবে।

আহমদ মুসা গুচ্ছের ফুলগুলোর উপর নজর বুলাল, কিন্তু কিছুই দেখল না।

কিছুটা হতাশ হয়ে ফুলের গুচ্ছটা পাশের সিটে রেখে আবার গাড়ি স্টার্ট দিল আহমদ মুসা ট্রাফিক লাইটের গ্রীন সিগন্যাল পেয়ে। কিন্তু তার মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল। মনের এ জিজ্ঞাসার অর্থ হলো, ফুলের গুচ্ছটি একটু ভালো করে দেখা দরকার।

একটু সামনে এগিয়েই পেল রাইনের পশ্চিম পাড়ে যাবার ব্রীজ।

ব্রীজ পার না হতেই একটা পার্কিং দেখে আহমদ মুসা গাড়ি দাঁড় করাল।

হাতে তুলে নিল ফুলের গুচ্ছটি। উল্টে-পাল্টে ভালো করে দেখতে লাগল।

এক স্থানে দুই বোঁটার ফাঁক দিয়ে একটা লাল কাগজের টুকরোর মত দেখতে পেল।

উজ্জ্বল হয়ে উঠল আহমদ মুসার মুখ। ঐ গোলাপেও লাল কাগজই পেয়েছিল। এটাও কি সে রকম কিছু।

তাড়াতাড়ি আহমদ মুসা সুতা ছিঁড়ে খুলে ফেলল ফুলের গুচ্ছ। বেরিয়ে এল লাল এক টুকরো কাগজ।

খুলল কাগজের খণ্ডটি।

চিরকুটটিতে দুই লাইন লেখা। পড়ল আহমদ মুসা, 'আপনাদের জন্যে সার্কুলার রোডের ৩৩৩ নম্বর বাড়িটা ভালো হবে। নাম্বারগুলো বেজোড়, লাকি। প্রদীপের নিচে অন্ধকার থাকাই বাস্তবতা।'

লেখার নিচে কারও নাম-পরিচয় নেই।

চিরকুটের লেখা পড়ে বিস্মিত হলো আহমদ মুসা। সে নিশ্চিত, আগের চিরকুটটি যারা লিখেছিল এ চিরকুটটিও তারাই লিখেছে। কিন্তু তারা জানল কি করে, আমাদের বাড়ির প্রয়োজন, বাড়ি আমরা খুঁজছি!

কারা ওরা ভেবে কোন সুরাহা করতে পারলো না আহমদ মুসা? তবে উপকারী কেউ যে হবে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। আরেকটা ব্যাপার, বেজোড় সংখ্যার প্রতি তার এত ভালোবাসা কেন? সেদিন একজন ক্লিনার তাকে ফুল দিয়েছিল, আজ ফুল দিল কম বয়সের একজন মহিলা। তাহলে ওরা কি একটা গ্রুপ? এই গ্রুপ তাদেরকে সাহায্য করছে কেন?

কোন প্রশ্নেরই উত্তর নেই তার কাছে।

আহমদ মুসা গাড়ি ড্রাইভ করে সোজা সেই ৩৩৩ নাম্বার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল।

চারদিকে তাকাল, বিস্ময় ঘিরে ধরল আহমদ মুসাকে। এই ৩৩৩ নাম্বার বাড়ির বিপরীতেই তো ব্রুনাদের মানে তার মায়ের বাড়ি। ওটাই তো এখন ব্ল্যাক লাইটের এখানকার কেন্দ্র। এই বাড়িটা আমরা নিলে তা হবে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসার মত। চিরকুটের শেষ লাইনটার কথা মনে পড়ল, 'প্রদীপের নিচে অন্ধকার থাকায় বাস্তবতা!' আহমদ মুসা ভাবল, ওরা যারাই হোক, অভিজ্ঞতা আছে।

এভাবেই এই বাড়িটা পেয়ে যায় আহমদ মুসারা।

এই বাড়িটা নিয়েই তিনজনের মধ্যে কথা হচ্ছিল। ব্রুনা বলেছিল, 'বাইরে থেকে বাড়িটাকে যেমন মনে হয়, ভেতরের অবস্থাটা তার চেয়ে অনেক ভালো। ছোটবেলা থেকে বাড়িটাকে দেখছি, কিন্তু এদিকে আসা কম হতো বলে বাড়ির বাসিন্দাদের সম্পর্কে কখনো কিছুই জানতাম না।

'এদিকে আসা কম হতো কেন? তোমাদের বাড়ি আর এ বাড়িটা তো রাস্তার এপার-ওপার!' আহমদ মুসা বলল।

'খুব কাছে হলেও আমাদের বাড়িটার ফ্রন্ট সাইড ওদিকে মানে উত্তরে।' বলল ব্রুনা।

'এদিকে দিয়ে বের হওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই?' আহমদ মুসা বলল।

'আমরা কোনদিন তা খুঁজে দেখিনি।' বলল ব্রুনা।

ব্রুনার বাবা আলদুনি সেনফ্রিড টিভি'র প্রোগ্রাম দেখছিল। অল্পক্ষণ পরেই নিজউ শুরু হবে।

তবু আহমদ মুসাদের কথা সে শুনছিল।

ব্রুনার কথা শুনে সেনফ্রিড ওদিকে তাকাল। বলল, 'আমাদের ঐ বাড়িটা যখন তৈরি হয়, তখন এই সার্কুলার রোড ছিল না। তাই সাধারণভাবে ব্যবহারের জন্য কোন এক্সিট তখন রাখা হয়নি এদিকে। তবে বিশেষ একটা

এক্সিট এদিকে আছে। কিন্তু সেটা গোপনীয়। বাড়ির বৈধ মালিক যখন যিনি থাকেন, তিনিই সেটা জানেন। সে হিসাবে আমিও এটা জানি না। তবে কথায় কথায় ব্রুনার মা আমাকে বলেছিল, 'বিশেষ সিঁড়িটা দিয়ে বেজমেন্টে নামার পর একটা আলমারির সামনে দাঁড়ানো যাবে। আলমারিতে ঢুকে ধাঁধার সমাধান করে একটা কক্ষে প্রবেশ করা যাবে। তারপর ঘরটার দেয়ালে একটা ধাঁধার সমাধান করে পাওয়া যাবে দরজা। এরপর পাওয়া যাবে ভেতর বাহির দুই দিক থেকেই খোলা যায় বাড়ি থেকে বের হওয়ার এমন একটা গোপন দরজা। ডিজিটাল কোড ভেঙে দরজাটা খুলতে হবে। এ অঞ্চলের সবচেয়ে প্রিয় পাঁচ অক্ষরের একটা নাম হলো এই কোড।' থামল আলদুনি সেনফ্রিড।

'মজার স্টোরি বললে বাবা! মা কখনো বলেনি, তুমিও কোন দিন বলনি। আগে জানলে এই ধাঁধা ভাঙার অভিযান আমি চালাতাম।' বলল ব্রুনা।

'এজন্যেই তোমাকে বলা হয়নি এবং তা বলার নিয়মও রাখা হয়নি।' আলদুনি সেনফ্রিড বলল।

'ধন্যবাদ মি. সেনফ্রিড। কথায় কথায় একটা মূল্যবান তথ্য দিয়েছেন আপনি। ধন্যবাদ আপনাকে।'

ব্রুনা কিছু বলতে যাচ্ছিল। এই সময় টেলিভিশনে খবর শুরু হয়ে গেল। মি. সেনফ্রিড হাত তুলে ব্রুনাকে থামতে ইংগিত করে টেলিভিশনের দিকে মনোযোগ দিল।

টেলিভিশনের চ্যানেলটি ব্রুমসারবার্গের লোকাল চ্যানেল।

খবরের শুরুতেই প্রধান খবর হিসাবে মর্মান্তিক এক খুনের ঘটনা প্রচার করল। একই পরিবারের স্বামী-স্ত্রী এবং ষোল সতের ও দশ এগারো বছরের দু'টি শিশুকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে।

এক বাক্যে ঘটনার কথা বলার পরই টেলিভিশনের পর্দায় ছবি চলে এল।

ছবির উপর নজর পড়তেই আলদুনি সেনফ্রিড, আহমদ মুসা ও ব্রুনা আঁৎকে উঠল এবং প্রায় এক সাথেই বলে উঠল, 'এ যে সিজার!'

টিভি চ্যানেলটি ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলছিল, 'আজ ভোর রাতে কর্তব্যরত পুলিশ রাইনের তীরে আলো নেভানো একটা গাড়িকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেয়ে একজন পুলিশ সেদিকে এগিয়ে যায়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে গাড়িটা দ্রুত পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ লাশ চারটি পেয়ে যায়। পুলিশের মতে লাশ চারটিকে রাইনে ডুবিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে ওখানে গিয়েছিল খুনিরা। খুনি বা খুনিদের সন্ধানে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।'

আলদুনি সেনফ্রিড টেলিভিশন বন্ধ করে দিয়ে বলল, 'কি বীভৎস হত্যাকাণ্ড। ব্ল্যাক লাইট কি এই হত্যা করেছে, মি. আহমদ মুসা, আপনি কি মনে করেন?'

'সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই মি. সেনফ্রিড। গতকাল আমাদের বাসায় ব্ল্যাক লাইটের লোকরা নিহত হওয়ারই পাল্টা প্রতিশোধ এটা। ব্ল্যাক লাইট এখন মরিয়া হয়ে উঠেছে।' বলল আহমদ মুসা।

'কিন্তু সিজারের উপর প্রতিশোধ নেবে কেন?' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

'আমাদের বাসায় ব্ল্যাক লাইটের লোকরা নিহত হওয়ার জন্যে তারা সম্ভবত সিজারকেই দায়ী করছে। তারা নিশ্চয় মনে করেছে, ব্ল্যাক লাইটের অভিযানের কথা সিজার আমাদেরকে বলে দিয়েছে, তার ফলেই তাদের ঐ ক্ষতি হয়েছে। সিজারকে তার পরিবারসমেত হত্যা করে তারই প্রতিশোধ নিয়েছে ব্ল্যাক লাইট।' আহমদ মুসা বলল।

'যা হোক, বিশ্বাসঘাতকতার শিক্ষা সে পেয়েছে। আমরা তাকে বিশ্বাস করেছিলাম, তার মর্যাদা সে রাখেনি।' বলল ব্রুনা।

‘ব্রুনা, তোমার অভিযোগ ঠিক আছে। কিন্তু তার দিকটাও একবার তোমাদের বিবেচনা করা দরকার। স্ত্রীসহ তার ছেলেমেয়েকে ওরা কিডন্যাপ করে তাদের হত্যা করার ভয় দেখিয়ে সিজারকে ওরা বাধ্য করেছিল তাদের কথা মত চলতে। বেচারা সিজার সত্যিই ফাঁদে পড়ে গিয়েছিল।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ঠিক বলেছেন মি. আহমদ মুসা। বেচারা সিজারের তাদের কথা শোনা ছাড়া করার কিছুই ছিল না। কিন্তু তবু স্ত্রী-সন্তানদের বাঁচাতে সে পারল না, নিজেকেও মরতে হলো। এখন তার জন্যে আমরা কি করতে পারি? পুলিশকে তথ্য দিলে কি কিছু ফল হবে?’ বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

‘পুলিশকে বলে কোন লাভ নেই। পুলিশকে বলতে গেলে তো ব্রুনার মায়ের এই বাড়ির পরিচয়ও বলতে হয়। বলতে হয় যে, এটাই ব্ল্যাক লাইটের এখানকার হেড কোয়ার্টার। কিন্তু তা বলে দিলে আমাদের কোন লাভ হবে না, সিজারদেরও তা কোন উপকার আসবে না। সিজারের শত্রু এখন আমাদের শত্রু অথবা বলা যায়, আমাদের যারা শত্রু ছিল, তারা সিজারেরও শত্রু হয়েছে। তাদের শাস্তি আমাদেরই দিতে হবে।’

মুহূর্ত খানেকের জন্যে থেমেই আহমদ মুসা বলে উঠল, ‘কিন্তু আমি ভাবছি, সিজারকে ব্যবহার করার জন্যে ওরা খুঁজে পেল কেমন করে? খুঁজলই বা কেন? সে যে আমাদের বিশ্বস্ত এটা তারা জানল কিভাবে?’

‘হ্যাঁ, মি. আহমদ মুসা, এ দিকটা তো আমি ভেবে দেখিনি। কেন তারা আমাদের সন্ধানে সিজারের পিছু নিল?’ বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

আহমদ মুসা ভাবছিল। বলল একটু পরই, ‘তাহলে কি তারা আপনাদের স্বজন ও পরিচিত লোকদের উপর চোখ রেখেছে, বিশেষ করে ঐ সব লোক যাদের সাথে ব্রুনার মা’র, ব্রুনাদের বাড়ির সম্পর্ক ভালো নয়! সিজারকে আপনাদের অনুগত মনে করে তাকে চাকরি থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছিল। আপনারা ব্রুমসারবার্গে আসলে তার সাথে যোগাযোগ হবে এই ধারণাতেই ব্ল্যাক লাইট তার উপর নজর রেখেছিল।’

‘আপনার কথা ঠিক মি. আহমদ মুসা। এটাই ঘটেছে।’ বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

আহমদ মুসা সোফার উপর গা এলিয়ে দিয়েছিল।

সোজা হয়ে বসল। বলল, 'মি. সেনফ্রিড, এতদিন ওরাই শুধু অফেনসিভে এসেছে। এবার আমরাও অফেনসিভে যাব।'

'তার মানে মি. আহমদ মুসা?' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

'এবার আমরাও কাজ শুরু করবো। প্রথমে আপনাদের বাড়ি মানে ব্রুনার মা, আপনার স্ত্রীর বাড়িতে প্রবেশ করতে চাই।' আহমদ মুসা বলল।

'কেন? ওখানে কি পাবেন?' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

আলদুনি সেনফ্রিড ও ব্রুনা দু'জনেরই চোখে-মুখে বিস্ময়।

'কি পাব জানি না, কি খুঁজতে যাচ্ছি তাও জানি না। কিন্তু সামনে এগোবার জন্যে কিছু পেতে হবে, জানতে হবে। জানতে হবে কেন ব্রুনার মা মানে আপনার স্ত্রী বদলে গেল? কেন সম্পত্তি থেকে আপনাদের শুধু বঞ্চিত করাই নয়, আপনাদেরকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে চান তিনি? এর উত্তর ঐ বাড়িতেই প্রথমত খুঁজতে হবে।'

বলে সোফায় আবার গা এলিয়ে দিল আহমদ মুসা। চোখ দু'টিও তার বুজে গেল।

ব্রুনা কিছু বলতে যাচ্ছিল। ঠোঁটে আঙুল চেপে ব্রুনার বাবা ব্রুনাকে নিষেধ করল কথা বলতে। ব্রুনাকে কানে কানে বলল, 'উনি ভাবছেন, ভাবতে দাও।'

ব্রুনা চুপ করে গেল।

তার চোখ দু'টি আহমদ মুসার উপর নিবদ্ধ।

আহমদ মুসার এমন আত্মসমাহিত রূপ ব্রুনার কাছে নতুন। অপরূপ এই আহমদ মুসা ব্রুনার কাছে। চোখ ফেরাতে পারল না সে সেদিক থেকে।

চোখ খুলল আহমদ মুসা।

সোজা হয়ে বসল। বলল, 'মি. সেনফ্রিড, ব্রুনা, আপনারা মিসেস কারিনা কারলিনের মধ্যে পরিবর্তনটা ঠিক কখন লক্ষ করেছেন?'

'বছর দুয়েক আগে এক গ্রীষ্মে আমরা হামবুর্গে গিয়েছিলাম আমার পৈতৃক বাড়িতে। উপলক্ষ ছিল আন্তর্জাতিক কটন প্রদর্শনী দেখা। সেখানে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে কারলিন। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। পনের দিন

হাসপাতালে থাকে। হাসপাতাল থেকে আসার পরই তার পরিবর্তনগুলো চোখে পড়তে থাকে।' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

'আপনার স্ত্রীর সবচেয়ে বেশি দুর্বলতা রয়েছে এমন কিছু বিষয় আছে? মানে আমি বলতে চাচ্ছি, এমন কিছু বিষয় তার আছে, যেখানে অন্যথা হলে তিনি খুব বেশি রেগে যান?' আহমদ মুসা বলল।

আলদুনি সেনফ্রিড ও ব্রুনা দু'জনের কেউ সংগে সংগে উত্তর দিল না। ভাবছে তারা দু'জনেই।

আলদুনি সেনফ্রিড তাকাল ব্রুনার দিকে।

ব্রুনাই শুরু করল কথা, 'হ্যাঁ, স্যার, না বলে তার ঘরে ঢোকা, তার পারস ও মোবাইলে হাত দেয়া এবং তিনি গোসলে ঢুকলে বিরক্ত করাকে তিনি একেবারেই সহ্য করেন না। কিন্তু আগে মায়ের এই অভ্যেস ছিল না।'

'ব্রুনা ঠিকই বলেছে মি. আহমদ মুসা। এই সাথে আমার অনুভূতির কথা বলি। হাসপাতাল থেকে তার ফেরার পর আমার মনে হয়েছে, সে নতুন জীবন শুরু করছে। মাঝে মাঝে মনে হতো, অসুখের ফলে তার মাথার কোন ক্ষতি হয়েছে কিনা। তার স্মৃতিতে কোন গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে কিনা। কিন্তু তার সচেতনতা ও সতর্কতা দেখে মনে হতো সে স্বাভাবিক আছে।' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

'টাকা-পয়সা, গুরুত্বপূর্ণ কাগজ-পত্র কিংবা মূল্যবান অলংকারের মত জিনিস রাখার তার অভ্যাস কেমন ছিল?' আহমদ মুসা বলল।

'মূল্যবান জিনিস আলমারি, আলমারির লকার, ব্রিফকেস এসব জায়গাতেই রাখতো।' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

'সব সময় কি তিনি তার শোবার ঘর লক করে রাখা পছন্দ করতেন?'

'ঘর লক করতেন না। তার টয়লেট লক করা থাকতো। ব্রিফকেস, আলমারি তো বটেই। হাসপাতাল থেকে আসার পর তিনি শোবার ঘর ও টয়লেটের লক পাল্টেছিলেন। লক এন্ড কী'র বদলে ঘরে ডিজিটাল লক লাগিয়েছিলেন। ঘরের ডিজিটাল লকের কোড তিনি কাউকে বলেননি।' বলল আলুদনি সেনফ্রিড।

'ধন্যবাদ মি. সেনফ্রিড।' আহমদ মুসা বলল।

কথা শেষ করে একবার ঘড়ির দিকে তাকাল। বলল, ‘ওঠা যাক মি. সেনফ্রিড।’

সবাই উঠল।

রাত তখন ২টা।

আহমদ মুসা তাহাজ্জুত নামাজ শেষ করে জায়নামাজটা রেখে পোষাক পাল্টে নিল। কালো প্যান্ট, কালো জ্যাকেট, কালো হ্যাট। একদম ব্ল্যাক লাইটের মতই পোষাক।

তৈরি হয়ে দাঁড়াল আয়নার সামনে।

আয়নার দিকে তাকিয়েই চমকে উঠল আহমদ মুসা। দেখল, পেছনে ব্রুনা দাঁড়িয়ে।

আহমদ মুসা দেখতে পায়নি, ব্রুনা প্রায় ঘন্টা খানেক থেকে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আহমদ মুসার নামাজ ও পোষাক পাল্টানো সবই দেখেছে।

ব্রুনা তার বাবার কাছ থেকেও শুনেছিল যে, আজ রাতে আহমদ মুসা ঐ বাড়িতে ঢুকবে। ব্রুনা রাত নয়টা থেকেই পাহারা দিচ্ছে আহমদ মুসা কখন বের হয়। অপেক্ষায় থাকতে থাকতে অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত শোবার জন্যে গিয়েছিল, কিন্তু টেনশানে তার ঘুম আসেনি। তাই রাত ১টার দিকে আবার এসেছে আহমদ মুসার ঘরের সামনে।

ব্রুনার উপর চোখ পড়তেই আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়াল। বলল, ‘ব্রুনা, এই রাতে তুমি এখানে? কিছু ঘটেছে?’ আহমদ মুসার কণ্ঠে কিছুটা উদ্বেগ।

‘না, কিছু ঘটেনি।’ বলল ব্রুনা।

‘তাহলে কেন তুমি এই রাতে এখানে?’ আহমদ মুসা বলল। তার কন্ঠ কিছুটা কঠোর শোনাল।

ব্রুনা একবার চোখ তুলে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। তার চোখে-মুখে কিছুটা আহত ভাব। সম্ভবত আহমদ মুসার কন্ঠের কারণেই। বলল, 'কেন আসতে পারি না?'

'না, পার না ব্রুনা। আমি আগেই বলেছি। তুমি জান, কেন পার না।' আহমদ মুসা বলল।

'জানি। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য? মানুষের সম্পর্ক, আস্থা এত ভঙ্গুর?' বলল ব্রুনা।

'ভঙ্গুর, কি ভঙ্গুর নয়, প্রশ্ন এটা নয়। প্রশ্ন নীতির। এ ধরনের দেখা-সাক্ষাত নিষেধ করা হয়েছে।' আহমদ মুসা বলল।

'তাহলে পারস্পরিক আস্থা-বিশ্বাসের কোন মূল্য নেই?' বলল ব্রুনা।

'নব্বই ভাগ ক্ষেত্রে এ মূল্য রক্ষিত হতে পারে, দশ ভাগ ক্ষেত্রে তা রক্ষিত নাও হতে পারে। এই দশ ভাগের বিচ্যুতি রোধ করার জন্যে সবাইকেই এই নীতি-বিধান মেনে চলতে হবে।' আহমদ মুসা বলল।

'আপনি কি মনে করেন, এই নব্বই ভাগের মধ্যে আপনি?' বলল ব্রুনা। তার ঠোঁটে হাসির রেখা।

'আমি আমাকেও বিশ্বাস করি না ব্রুনা। এমন বিশ্বাস করতে নিষেধ করা হয়েছে। পরিস্থিতির কারণে শয়তান যে কোন সময় যে কারও উপর বিজয়ী হতে পারে। আমার উপরও হতে পারে।' আহমদ মুসা বলল।

'আমি এভাবে কখনও ভাবিনি।' বলল ব্রুনা।

'এবার ভাবো ও চলে যাও।' আহমদ মুসা বলল।

'আমি আপনার সাথে ঐ বাড়িতে ঢুকতে চাই। আপনাকে অনেক সাহায্য করতে পারবো আমি।' বলল ব্রুনা।

আহমদ মুসার দুই চোখ কপালে উঠেছে। বলল, 'যে কারণে তোমাকে একা আমার ঘরে আসতে নিষেধ করেছি, সে কারণেই তো আমি তোমাকে সাথে নিতে পারি না।'

ব্রুনা সংগে সংগে উত্তর দিল না। মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল।

তারপর মাথা তুলেই বলল, ‘আমি যদি আপনার গৌরীর বোন হিসাবে এটা দাবী করি?’

‘কি দাবী করতে চাও?’ আহমদ মুসা বলল।

‘আপনার সঙ্গ, আপনার সান্নিধ্য, যা আর অবৈধ হবে না।’ মাথা নিচু করেই বলল ব্রুনা।

‘ব্রুনা!’ আহমদ মুসা বলল। তার কন্ঠ চাপা চিৎকারের মত শোনাল।

মুখ তুলল ব্রুনা। তার চোখ দু’টি ছল ছল করছে অশ্রুতে। বলল, ‘আপা যা করেছে, আমি তা করতে পারব না কেন? আপা তো নেই। আমি তার বোন। বোন হিসাবে তার উত্তরাধীকারীও।’ বলে দু’হাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়ল ব্রুনা।

আহমদ মুসা সংগে সংগে কিছু বলল না। সুযোগ দিল কান্নার।

এক সময় এগিয়ে গেল ব্রুনার দিকে আহমদ মুসা।

ব্রুনার মাথায় হাত রাখল আহমদ মুসা।

ব্রুনা মুখ থেকে দু’হাত সরিয়ে চকিতা হরিণীর মত চোখ তুলল আহমদ মুসার দিকে। তার মুখ অশ্রু ধোয়া।

# ৬

সার্কুলার রোডের এপারে দাঁড়িয়েই আহমদ মুসা ঠিক করতে চাইল ওপারের বাড়িটায় প্রবেশ করবে কোন জায়গা দিয়ে।

গোটা বাড়িটাই প্রাচীর ঘেরা। প্রাচীরের এদিকটা সাত আট ফুটের মত উঁচু।

রোডের পর ফুটপাত। পাথর বিছানো। তার পর ফাঁকা জায়গা কিছুটা, রাস্তার লম্বালম্বি বাড়িটার সীমা পর্যন্ত। ও জায়গা বাড়িটারই সম্পত্তি। এই ফাঁকা জায়গা ঘাসে আচ্ছাদিত। মাঝে মাঝে ফুলের গাছ ও আঙুরলতা। আঙুরলতাগুলো প্রাচীরের উপর পর্যন্ত উঠে গেছে।

আহমদ মুসা ভাবল, সার্কুলার রোড এখন প্রায় জনশূন্য হলেও প্রাচীর টপকে বাড়িতে প্রবেশ নিরাপদ নয়। পুলিশ কিংবা কারও চোখে হঠাৎ পড়েও যেতে পারে।

বাড়ির পূব দিকের সীমা পর্যন্ত গেল। সেখান থেকে প্রাচীরটা বাঁক নিয়ে উত্তর দিকে চলে গেছে। এই দেয়ালের পূব পাশ বরাবর প্রশস্ত ফাঁকা জায়গায় ফলের বাগান। তার মাঝে মাঝে আঙুরের ঝাড়ও। বাগানের পর ফসলের ক্ষেত ও নদীর তীর বরাবর গিয়ে পাড়ের ঢাল দিয়ে প্রায় পানির কাছ পর্যন্ত নেমে গেছে।

খুশি হলো আহমদ মুসা। প্রাচীরের এদিক দিয়ে বাড়িতে প্রবেশ নিরাপদ হবে।

সার্কুলার রোড পার হয়ে আহমদ মুসা বাড়ির পূব পাশের প্রাচীরের গোড়ায় গিয়ে দাঁড়াল।

প্রাচীরের গোড়ায় একটা গাছের আড়ালে বসল আহমদ মুসা। বাড়িতে ঢোকার আগে গোটা বিষয়টা একবার ভেবে নেয়া দরকার। প্রথম কথা হলো, মি. আলদুনি সেনফ্রিড বাড়ির যে গোপন পথের বিবরণ দিয়েছেন, তার বাইরের

এক্সিটটা বাড়ির দক্ষিণ পাশে। দ্বিতীয়ত, দক্ষিণ পাশের কোথায় হতে পারে সেই এক্সিট? আপাতত শেষ প্রশ্নের সমাধানটাই প্রয়োজন।

ভাবল আহমদ মুসা, কিন্তু ফল হলো না। গোপন পথের এক্সিট নিশ্চয় ছোট বা বড় কোন ঘরে হবে। সেই ঘর খুঁজে পাওয়াটাই হবে প্রথম কাজ। অবশ্য কোন দেয়ালেও সেই এক্সিট দরজাটা থাকতে পারে, তবে তার সম্ভাবনা কম।

ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

রাত আড়াইটা বাজে।

তাকাল আহমদ মুসা প্রাচীরের মাথার দিকে।

এই প্রাচীর ডিঙানো তার জন্য কিছুই নয়, কিন্তু ওপারে কি আছে?

আহমদ মুসা লাফিয়ে উঠে নিজের দেহটাকে প্রাচীরের মাথায় শুইয়ে দিল। প্রাচীরের ওপারে তাকিয়ে তার মনে হলো ঘাসে ভরা উন্মুক্ত চত্বর। চত্বরের আলোটা বেশ দূরে। এদিকটা অনেকটায় আলো-অন্ধকার।

প্রাচীর থেকে ঝুলে পড়ে নি:শব্দে নিচে নামল আহমদ মুসা। তারপর ক্রলিং করে দ্রুত এগোলো বাড়ির দক্ষিণ পাশের দিকে। গিয়ে পৌঁছল দক্ষিণ পাশে। দক্ষিণের প্রাচীর থেকে বাড়ির ব্যবধান বেশ, প্রায় আট দশ গজের মত।

এই অংশটা মোটামুটি আলোকিত। রাস্তার আলোও কিছুটা পড়েছে এখানে। তাছাড়া বাড়ির নিজস্ব আলোও আছে দক্ষিণ পাশের দু'প্রান্তে দু'টো। রাতের কুয়াশার কারণে আলো ডিম লাইটের মত দেখাচ্ছে।

বাড়ির দক্ষিণ পাশটায় নজর বুলাল আহমদ মুসা।

বাড়ির এ দক্ষিণ পাশে কোন বারান্দা ও দরজা নেই। গোটা চারেক জানালা আছে। জানালাগুলো লোহার গরাদ দিয়ে বন্ধ, যা খুব স্বাভাবিক নয়। আহমদ মুসার মনে হলো গরাদের পর জানালায় লোহার গ্রীলও রয়েছে।

ঘরগুলোতে মানুষ থাকে কি? চাকর-বাকর থাকতেও পারে। আর এখন ব্ল্যাক লাইট তাদের কি পরিমাণ লোক এখানে রেখেছে, তা বলা মুশকিল। সুতরাং জানালার পথ নিরাপদ নয়। তার অভিযানটা গোপনে তথ্য সংগ্রহের জন্যে। সংঘাতে জড়িয়ে পড়লে এই কাজ সহজে হবে না। তাই গোপন পথ ব্যবহারের কোন বিকল্প নেই।

কিন্তু কোন্ ঘর কিংবা কোথায় পাওয়া যাবে সেই গোপন পথের মুখ?

বাড়ির দক্ষিণ প্রান্তটা সরল রেখার মত নয়। পূর্ব প্রান্তে, মাঝখানে ও পশ্চিম প্রান্তে তিনটি ঘর সামনে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে আছে। মাঝের ঘরের দু'পাশে বর্গাকারের দু'টি চত্বরের সৃষ্টি হয়েছে যার দক্ষিণ প্রান্তই মাত্র খোলা।

সামনে বেড়ে যাওয়া তিনটি ঘরের দক্ষিণ দেয়ালে একটি করে জানালা। চতুর্থ জানালাটি মাঝের ঘরের পূব পাশের বর্গাকৃতি চত্বরের উত্তর দেয়ালে। কিন্তু মাঝের ঘরের পশ্চিম পাশের চত্বরের উত্তর দেয়ালে এ ধরনের কোন জানালা নেই।

আহমদ মুসা বাড়ির দক্ষিণ পাশের গোটা্ অবস্থা পর্যালোচনা করে এই একটাই অসংগতি পেল। শুধু সংগতি বিধানের প্রয়োজনেও এই জানালার দরকার ছিল। কিন্তু জানালা রাখা হয়নি কেন? জানালার স্থানকে কি অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে!

এখানেই কি হতে পারে গোপন পথের এক্সিট ও এন্ট্রি?

দেয়ালটির দিকে এগোলো আহমদ মুসা।

পেন্সিল টর্চ ফেলল দেয়ালের উপর।

দেয়ালে খাড়া ও সমান্তরাল লাইন টানা। তার ফলে বর্গক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়েছে সেখানে। দু'পাশে সামনে বেড়ে যাওয়া দুই ঘরের দেয়ালেও টর্চের আলো ফেলল সে। দেখল সব দেয়ালেই অনুরূপ বর্গক্ষেত্র।

দেয়ালের আরও ক্লোজ হলো আহমদ মুসা। পেন্সিল টর্চটাকে আরও ক্লোজ করল দেয়ালের উপর। আহমদ মুসা লক্ষ করল, দেয়ালের প্রতিটি বর্গক্ষেত্রে এক বা একাধিক জার্মান বর্ণ খোদাই করা।

দু'পাশের দুই কক্ষের দেয়ালেও এটাই দেখল সে।

আহমদ মুসার টর্চ ফিরে এল জানালাহীন দেয়ালটিতে আবার।

আহমদ মুসার দুই চোখ খুঁজছে গোপন পথের এক্সিট ও এন্ট্রি ডোর। আহমদ মুসার বিশ্বাস এই দেয়ালেই তা হবে।

আহমদ মুসা দেয়ালটির তিন ফুট থেকে পাঁচ ফুট উঁচু সমান্তরালের প্রতিটি বর্গক্ষেত্র এক এক করে পরীক্ষা করতে লাগল। কারণ সে নিশ্চিত যে, এ রকম কোন দরজা এই দেয়ালে থাকলে এই উচ্চতার মধ্যেই তা থাকবে।

দেয়ালের মাঝ বরাবর এসে ঠিক তিন ফুট উচ্চতার লেভেলে একটা বর্গক্ষেত্রের উপর আহমদ মুসার টর্চ থেমে গেল। ব্যস্ত হয়ে উঠল আহমদ মুসার দুই চোখ।

বর্গক্ষেত্রটিতে তিনটি জার্মান বর্ণ বড় বড় হরফে খোদাই করা। এর মাঝে আহমদ মুসা দেখল সবগুলো জার্মান বর্ণ একটা ছকের আকারে সাজানো। এ বর্ণগুলোর রং দেয়ালের রঙের সাথে মিলানো বর্গক্ষেত্রের অন্যান্য বর্ণের রং থেকে আলাদা। বর্গক্ষেত্রের বড় বর্ণগুলো গাঢ় গ্রীন রংয়ের, কিন্তু ছকের বর্ণগুলো দেয়ালের পাথরের মতই অফ হোয়াইট রঙের। টর্চের ফোকাস একটু দূরে সরিয়ে নিলে এগুলোকে আলাদা চেনা যায় না।

ছকের উপর পেন্সিল টর্চের আলো আরও ঘনিষ্ঠ করে দেখল গোটা ছক একটা 'কী বোর্ড'-এর মত। আর প্রতিটি বর্ণ একটা করে 'কী'!

চোখ দু'টি আনন্দে নেচে উঠল আহমদ মুসার। আহমদ মুসা নিশ্চিত, গোপন পথে ঢোকার চাবিকাঠি পেয়ে গেছে সে। এখন কোড বা ধাঁধার সমাধার করার পালা।

মনে পড়ল আলদুনি সেনফ্রিডের কথা। এ অঞ্চলের জনপ্রিয় একটা নামকে কোড হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। সে জনপ্রিয় নামটা কি হতে পারে?

আহমদ মুসা ব্রুমসারবার্গের বর্তমান ও অতীত ইতিহাসের দিকে তাকাল। ব্রুমসারবার্গের একটি প্রিয় নাম 'স্যাক্সন'। এটা তাদের জাতিগত একটা নাম, গৌরবেরও নাম। কিন্তু স্যাক্সন নামে ছয়টি জার্মান বর্ণ আছে আর মি. সেনফ্রিড বলেছেন, কোডের নামটি হবে পাঁচ বর্ণের। স্যাক্সনদের প্রথম রাজা ছিল 'হেনরিও'। এ নামও প্রিয় এ অঞ্চলের স্যাক্সনদের কাছে। তার নামেরও ছয়টি বর্ণ। ব্রুমসারবার্গের নামকরণ স্যাক্সনদের যে মহান বীরের নামে, তার নাম 'ব্রুমসার'। এটা এ অঞ্চলের লোকদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় নাম। তিনি ছিলেন ক্রুসেড ফেরত মহান বীর। কিন্তু তার নামেরও জার্মান বর্ণ ছয়। পাঁচ নয়। আবার

ক্রুমরারের মেয়ে 'মিসিলডিস'-এর নাম এ অঞ্চলের মানুষের ঘরে ঘরে। আত্মোৎসর্গকারী মিসিলডিস তাদের কিংবদন্তির নায়িকা। কিন্তু তার নামেও দশটি জার্মান বর্ণ রয়েছে।

তাহলে? তাহলে কি রাইনল্যান্ড হতে পারে। এতো এখানকার সবার প্রিয় জন্মভূমি। কিন্তু এতে তো নয়টি জার্মান বর্ণ।

ল্যান্ড বাদ দিলে থাকে রাইন। 'রাইন' নদী তো সকলের কাছে প্রিয় নাম! সংগে সংগেই আনন্দে নেচে উঠল আহমদ মুসার মন। হ্যাঁ, এতক্ষণ 'রাইন'-এর নাম তার মনে পড়েনি কেন? এই অঞ্চলের সমৃদ্ধি তো নদী 'রাইন'-এর দান। 'রাইন'ই তো এ অঞ্চলের মানুষের সর্বকালের সর্বপ্রিয় নাম! এই নামের বর্ণের সংখ্যাও তো পাঁচ।

সংগে সংগেই আহমদ মুসা দেয়ালের বর্ণের ছকে রাইনের বর্ণগুলোর উপর ক্লিক করল।

ক্লিক করেই দু'পা পেছনে সরে এল।

অসীম আশা নিয়ে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ দেয়ালের এই স্থানটার উপর।

কয়েক মুহূর্তের অপেক্ষা।

তার পরেই দেখল দেয়াল থেকে তিন ফুটের মত প্রশস্ত ও পাঁচ ফুটের মত উচ্চতার একটা অংশ নি:শব্দে দেড় ফুটের মত ভেতরে ঢুকে গেল এবং একই রকম নি:শব্দে এক পাশে সরে গেল।

আহমদ মুসা পেন্সিল টর্চের আলো ওয়াইড অপশনে নিয়ে ফোকাসটা উন্মুক্ত দরজা দিয়ে ভেতরে ফেলল। দেখা গেল আলো গিয়ে পড়েছে একটা ঘরের মেঝেতে।

আহমদ মুসা মেঝের এদিক ওদিক আলোটা ঘুরিয়ে ঢুকে গেল ঘরের ভেতরে।

দরজাটা বন্ধ হলো না। তার মানে দরজা বন্ধ হবার স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা নেই।

দরজা থেকে সরে যাওয়া দেয়াল খণ্ডের উপর আলো ফেলল আহমদ মুসা।

অনুসন্ধান করল সেই বর্ণের ছক। যখন দরজা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয় না, তখন দেয়ালের এপাশেও সেই বর্ণের ছক নিশ্চয় থাকবে।

ছকটা পেয়ে গেল আহমদ মুসা।

রাইনের বর্ণগুলো আবার টাইপ করল বর্ণের ছকের উপর্ দেয়াল খণ্ডটি একটু দরজার সামনে সরে এসে তারপর দেয়াল বরাবর পৌঁছেই সামনে সরে এগিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

ঘরের চারদিকে আলো ফেলল আহমদ মুসা। ঘরটি স্টোর রুমের মত।

অনেক কনটেইনার বাক্স ঘরের চারদিকে সাজানো। একটা মাত্র বড় আলমারি উত্তর দেয়ালে।

ঘর চারদিক থেকে বন্ধ, দরজা জানালাহীন। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত।

দেয়ালটা প্রথমে ভালোভাবে চেক করল আহমদ মুসা। দক্ষিণ দেয়ালের মত আর কোন দেয়ালে গোপন দরজা থাকার সংকেত পাওয়া যায় কিনা!

ইঞ্চি ইঞ্চি করে আহমদ মুসা দেয়ালের সকল সম্ভাব্য স্থান চেক করল। কিন্তু কোন সংকেতই মিলল না।

মনে পড়ল আলদুনি সেনফ্রিডের কাছ থেকে শোনা একটা কথা। আলমিরার ভেতর দিয়ে গোপন পথের দরজা রয়েছে।

আলমারির দিকে এগিয়ে গেল আহমদ মুসা।

আলমারির দরজা খুলল।

ছোট ছোট টিনের কনটেইনারে সাজানো আলমারির তাক। তাক ধরে টানাটানি করল আহমদ মুসা। কোন দিকে নড়াচড়া নেই, স্থির তাক। আলমারি বন্ধ করে আহমদ মুসা এগোলো বড় বড় বাক্সের দিকে।

দক্ষিণ দিক ছাড়া সব দেয়ালের পাশ দিয়ে সাজানো বাক্স। একটি একটি করে সব বাক্স খুলল আহমদ মুসা। নানা ধরনের কনটেইনারে সাজানো বাক্সগুলো। কনটেইনার সরিয়ে বাক্সগুলোর তলাও চেক করল আহমদ মুসা। তলাগুলো ফিক্সড।

তাহলে গোপন এন্ট্রি পথ বা দরজাটা কোথায়? সন্দেহ নেই, এই ঘরেই সেটা থাকবে।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আহমদ মুসা ঘরের চারদিকটা আবার ভালো করে দেখল। যুক্তির দাবী, ভাবল সে, গোপন প্রবেশ পথটা উত্তর দেয়ালেই থাকবে। উত্তর দেয়ালেই আছে বিশাল আলমারিটা।

আহমদ মুসা আবার গিয়ে আলমারিটা খুলল।

আবার টানাটানি, ঠেলাঠেলি করল তাক ধরে। কিন্তু একটুও নড়াচড়া করল না কোনও দিকে।

আলমিরার তাকটা দূর নিয়ন্ত্রিতও হতে পারে, ভাবল আহমদ মুসা।

এবার আহমদ মুসা আলমারির ভেতরের গায়ের বোতাম, সুইচ বা এ ধরনের কিছু খোঁজ করতে লাগল। কিন্তু আলমারির গা পরিস্কার, সন্দেহ করার মত কোথাও কিছু নেই।

কন্টেইনার তুলে তাকগুলো পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল আহমদ মুসা।

বাইরের দেয়ালে বেজমেন্ট থেকে তিন ফুট উপরে বর্ণের ছক পাওয়া গিয়েছিল। এবারও আহমদ মুসা তিন ফুট উপরের তাক থেকে অনুসন্ধান শুরু করল।

তাকের ডান দিক নয়, বাম প্রান্ত থেকে অনুসন্ধান শুরু করল। ইউরোপীয়রা সবাই কাঁটা চামচ দিয়ে খায়, এদের বাম হাত বেশি চলে। মুসলমানরা ডান দিককে প্রাধান্য দেয় বলে তারা ডান দিককে হয়তো বেশি পছন্দ করে। ক্রুসেডের সময় থেকে এ বিষয়টা আরও বেশি নজরে আসে।

বাম দিকের প্রথম কন্টেইনার তুলতেই আহমদ মুসা স্টিলের তাকে স্টিলের রঙেরই বোতাম আকৃতির একটা কিছু দেখতে পেল।

আহমদ মুসা কন্টেইনারটা পাশে রেখে ডান হাত দিয়ে বোতামটায় চাপ দিল। সাথে সাথেই মৃদু কেঁপে উঠল তাক।

পেছন দিকে সরতে লাগল তাকটা।

ওদিকটা দেখা যেতে লাগল।

দেখা গেল, ওদিকে আলমারির আরেকটা দেয়াল।

ধীরে ধীরে পেছনে সরে যাচ্ছিল তাকটা।

যাওয়ার মত স্পেস বের হতেই আহমদ মুসা দ্রুত ওপাশে গিয়ে আলমারির বন্ধ দরজার হাতল ধরে চাপ দিল। খুলে গেল আলমারির দরজা।

ঘরের দিকে নজর পড়তেই আঁৎকে উঠল আহমদ মুসা। বড়-সড় ঘর। অনেক বেড। ছয় জন লোক শুয়ে আছে, ঘুমুচ্ছে নিশ্চয় তারা। আরও ছয়টি বেড খালি। যারা শুয়ে আছে, তাদের প্রত্যেকের পাশেই মাইক্রো সাইজের মডার্ন স্টেনগান।

এরা নিশ্চয় বাড়ির প্রহরী হবে, ভাবল আহমদ মুসা। তাহলে যারা বেডে নেই তারাও প্রহরী, তাদের স্টেনগান নিয়ে তারা পাহারায় গেছে।

আহমদ মুসা ঘরের দক্ষিণ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। তবে উত্তর প্রান্তে আরেকটা দরজা দেখা যাচ্ছে।

আহমদ মুসা বিড়ালের মত নি:শব্দে এগোলো।

লোকগুলোকে দেখেই আহমদ মুসা মুখে মিনি সাইজের একটা গ্যাসমাস্ক পরে নিয়েছে। হাতে নিয়েছে ক্লোরোফরম গান। এই গান দিয়ে ৩০ গজ দূর পর্যন্ত মানুষকে সংজ্ঞাহীন করে ফেলা যায়।

আজ আহমদ মুসার নি:শব্দ অনুসন্ধানের দিন। আজ কোন সংঘর্ষে যাওয়া যাবে না। নিরপদ্রুপেই তাকে কাজ সারতে হবে।

ঘর থেকে বেরুবার সময় এদের ঘুম আরও গভীর করে দিয়ে যাবে, এই লক্ষেই ঘর থেকে বেরুবার জন্যে এগোলো আহমদ মুসা।

ঘরের মাঝখানে আসতেই আহমদ মুসা দরজার ওপাশে শব্দ শুনতে পেল। কেউ যেন দরজা খুলছে।

আহমদ মুসা দ্রুত একটা খাটের নিচে ঢুকে গেল।

দরজা খুলে ঘরে প্রবেশ করল চারজন।

ঘরের দরজা লাগিয়ে দিয়ে ওরা চারজন এসে তাদের নিজ নিজ বিছানায় শুয়ে পড়ল।

'এই যে আমরা প্রতিদিন রাতে বাইরোটেশনে ৪ জন করে ফাঁকি দিয়ে এসে শুয়ে কাটাচ্ছি, ধরা পড়লে কি হবে বলতো?' বলল চারজনের একজন।

‘কি আর হবে, প্রাণ যাবে? কিন্তু ধরবে কে? রাত ১টা ২টা পর্যন্ত ফুর্তি করে এখন বেঘোরে ঘুমুচ্ছে সবাই। তাছাড়া দু’জনতো পাহারায় আছেই। কেউ খোঁজ করলে আমরা জানতে পারব।’ বলল দ্বিতীয় এক জন।

‘শালা আমরা কাজের দায়ে ঘুমাতে পারি না, আর ওরা ফুর্তি করে ঘুমায় না। প্রতিদিন এটা ওরা কেমন করে পারে?’ বলল তৃতীয় আর এক জন।

‘পারবে না কেন, অর্ধেক দিন তো আবার ঘুমায়।’ বলল প্রথম জন।

‘রাখ এসব কথা, কাজের  কত দূর বলত? আর কত দিন থাকতে হবে আমাদের এখানে?’ চতুর্থ জন বলল।

নিরব কিছুক্ষণ সবাই।

নিরবতা ভেঙে সেই প্রথম জন বলল, ‘একথা আমরা জানবো কি করে! তবে সেদিন রাতে আমি পাহারায় ছিলাম ম্যাডামের ঘরের সামনে। তিনি টেলিফোনে কাউকে বলছিলেন যে, ‘দস্তখতের সমস্যা ঠিক হয়ে গেছে। ফিংগার প্রিন্টটা ডেভলপ করছে, একটু সময় লাগবে। আমি মনে করছি, মাস খানেকের মধ্যেই স্যাক্সন স্টেটের হস্তান্তর হয়ে যাচ্ছে।’ ম্যাডামের কথা সত্য হলে মাস খানেকের মধ্যেই আমাদের এখানকার পার্ট চুকবে।’

আহমদ মুসা খাটের তলে গোগ্রাসে কথাগুলো গিলছিল।

প্রথম জনের কথা শেষ হতেই চতুর্থ জন বলে উঠল, ‘কিন্তু সেদিন কনরাড সাহেব ম্যাডামের সাথে বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে বলছিলেন, ‘সেনফ্রিড ও তার দুই মেয়েকে ধরে তারপর দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে না পারলে এখানকার কাজ আমাদের শেষ হবে না। স্টেটের হস্তান্তরও সম্ভব হবে না। কনরাড সাহেবের কথাকেই বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।’

‘কিন্তু কয়েক বার ফাঁদে ফেলেও তো ওদের আটকাতে পারা গেল না। কবে আবার ওরা ধরা পড়বে?’ বলল দ্বিতীয় জন।

‘সেদিন এক সাহেব বললেন, এবারের মত জটিল অবস্থা নাকি অতীতের আর কোন প্রজেক্টে হয়নি।’ তৃতীয় জন বলল।

‘থাক এসব জটিলতা নিয়ে চিন্তা করে আমাদের লাভ নেই। কিছুই আমার মাথায় আসে না। ম্যাডাম তো এ সম্পত্তির মালিক। মালিক কোন কিছু হস্তান্তর

করলে জটিলতার প্রশ্ন আসে কি করে?’ বলল প্রথম জন। তার কন্ঠে অধৈর্যের প্রকাশ।

‘সেটাই তো আমরা বুঝি না। ম্যাডামের আচরণ দেখলে তো বুঝা যায় না তিনি সম্পত্তির মালিক। তিনি তো দেখি সবাইকে ভয় করে চলেন।’ চতুর্থ জন বলল।

‘রাখ এসব কথা। ঘুমাবো। সাধারণভাবে যে বেতন হয়, তার চারগুণ বেতন পাচ্ছি। মরে গেলে পরিবার সারা জীবন চলার মত টাকা পাবে। আর কি চাই! এস ঘুমিয়ে পড়ি।’ বলল তৃতীয় জন।

চতুর্থ জন বলল, ‘ঠিক বলেছে। কিন্তু আমার ওষুধ খাওয়া হয়নি। তোমাকে দিয়েছিলাম, আমার ওষুধটা দাও।’

‘সেটা আমার ব্যাগের মধ্যে আছে। খাটের তলে আছে, বের করে দিচ্ছি।’ বলে বিছানার উপর উঠে বসল তৃতীয় জন।

আহমদ মুসা যে খাটের তলায়, সে খাটটাই তৃতীয় জনের। সে ওষুধ নেবার জন্যে নামলেই তো ধরা পড়ে যাবে।

আহমদ মুসা আর এক মুহূর্তও নষ্ট করল না।

বাম হাতে মুখের গ্যাস মুখোশকে টাইট দিয়ে ডান হাত দিয়ে ক্লোরোফরম গানের ব্যারেল খাটের পাশ দিয়ে ঊর্ধমুখী করে ট্রিগার টিপল। অদৃশ্য এক পশলা গ্যাস বেরিয়ে গেল ক্লোরোফরম গান থেকে।

সংজ্ঞালোপকারী এই ক্লোরোফরম গ্যাস বাতাসের চেয়ে কয়েক গুণ দ্রুত গতিতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে। একটা ফায়ারে যে পরিমাণ কনসেন্ট্রেটেড ক্লোরোফরম গ্যাস বের হয়, তাতে তিরিশ বর্গফুট এলাকার সবাইকে মুহূর্তেই সংজ্ঞাহীন করে ফেলতে পারে।

তাই হলো। আহমদ মুসা ফায়ার করার পর মুহূর্তেই তার খাটের উপরের লোকটি জ্ঞান হারাল। সে উঠে বসেছিল বিছানায়। আবার ঢলে পড়ল বিছানার উপর। তারপর ঘরের সবাই জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

আহমদ মুসা বেরিয়ে এল খাটের তলা থেকে।

সবার দিকে একবার তাকিয়ে ঘর থেকে বেরুবার জন্যে দরজার দিকে এগোলো আহমদ মুসা।

ঘর থেকে বেরিয়ে একটা করিডোরে পা রাখল সে। তাকাল এদিক-ওদিক। কোন্ দিকে ব্রুনার মা মানে এদের ম্যাডামের ঘর?

জ্যাকেটের পকেট থেকে আলদুনি সেনফ্রিডের এঁকে দেয়া বাড়ির ইনার স্কেচটি বের করে তার উপর চোখ বুলাল। বুঝল, তাকে বাম দিকে যেতে হবে। একটু এগোলেই আর একটা করিডোর পাওয়া যাবে। সে করিডোর ধরে পুব দিকে এগোলে আর একটা লাউঞ্জ পাওয়া যাবে। লাউঞ্জের পশ্চিম পাশে প্রশস্ত একটা স্পেস। সে স্পেসের পশ্চিম পাশে বড় একটা দরজা, বড় একটা ঘর। এ ঘরটাতেই থাকে ব্রুনার মা কারিনা কারলিন।

আহমদ মুসা ক্লোরোফরম গান বাগিয়ে ধরে করিডোর দিয়ে এগিয়ে চলল।

লাউঞ্জের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। নজর বুলাল ভেতরের দিকে।

সেই মুহূর্তে পেছনে পায়ের শব্দ পেল আহমদ মুসা।

হাতের ক্লোরোফরম গানের ব্যারেল ঘুরাতে গিয়েছিল আহমদ মুসা। কিন্তু সেই সময়েই মাথায় স্টেনগানের নলের ভারি স্পর্শ অনুভব করল।

পেছন থেকে একটা কন্ঠ বলে উঠল, 'বোয়ার, তাড়াতাড়ি শালার কাছ থেকে রিভলবারটা কেড়ে নাও।'

আহমদ মুসা বুঝেছিল অবশিষ্ট যে দু'জন পাহারায় ছিল, তারাই তাকে ধরে ফেলেছে।

পেছনের কন্ঠটির কথা শুনেই আহমদ মুসা বলল, 'আচ্ছা, নিয়ে নাও রিভলবার।' বলেই হাতটা নিচে নামিয়ে ক্লোরোফরম গানের নল পেছনে ওদের দিকে ঘুরিয়ে পেছনে ঠেলে দিচ্ছিল হাত।

বোয়ার নামের লোকটি একটু ঝুঁকে পড়ে রিভলবার আহমদ মুসার হাত থেকে নিতে যাচ্ছিল।

হাতটা পেছনে ঠেলে দিয়েই ট্রিগার টিপেছে আহমদ মুসা।

রিভলবারের মত এর ট্রিগারে কোন শব্দ হয় না, বোতাম টেপার মতই অনেকটা নি:শব্দ।

ট্রিগার টেপার পর কয়েক মুহূর্ত। আহমদ মুসার মাথা থেকে স্টেনগানের নল সরে গেল। মেঝেতে ভারি কিছু পতনের শব্দ হলো। পেছনে তাকাল আহমদ মুসা, দু'জনের সংজ্ঞাহীন দেহ মাটিতে পড়ে আছে। তাদের স্টেনগান পড়ে আছে তাদের পাশে।

আহমদ মুসা দু'জনের সংজ্ঞাহীন দেহ এক এক করে নিয়ে তাদের ঘরে তাদের খাটে সাথীদের পাশে শুইয়ে রেখে এল। স্টেনগানও রাখল তাদের পাশে।

এবার আহমদ মুসা অনেকটাই নিশ্চিন্ত। প্রহরীরা সবাই ঘুমে। কমপক্ষে ছয় ঘন্টার আগে তাদের ঘুম ভাঙবে না। বাড়ির অন্য সদস্যেরাও ঘুমিয়ে আছে নিশ্চয়।

আহমদ মুসা ব্রুনার মা'র ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল।

দরজার উপর নি:শব্দে চাপ দিল।

দরজা বন্ধ।

দরজার লকের দিকে তাকাল আহমদ মুসা।

ডিজিটাল লক, যা শুনেছিল তাই।

দরজার উপর দরজার গায়ের সাথে মেশানো একটা ডিজিটাল-লক বোর্ড। শূণ্য থেকে নয় পর্যন্ত জার্মান সংখ্যায় সাজানো ডিজিটাল বোর্ডটা।

কারিনার শোবার ঘরের দরজার নতুন কোড সম্পর্কে আলদুনি সেনফ্রিড কিছু বলতে পারেনি। তার মানে কোড তাকেই ভাঙতে হবে। কি হবে সেই কোডের সংখ্যাগুলো, কত সংখ্যার সেই কোড?

দ্রুত ভাবল আহমদ মুসা।

সময় নষ্ট করা যাবে না। আসল কাজ শুরুই করা যায়নি।

কোন নামের বর্ণের সংখ্যা দিয়েই কোড তৈরি সবচেয়ে স্বাভাবিক। আগের সেই নামগুলো ছাড়াও যে নামগুলো হতে পারে তার মধ্যে রয়েছে 'ব্রুমসারবার্গ ক্যাসল' যা স্যাক্সনদের প্রিয় দুর্গের নাম? এদের মানে খৃস্টানদের প্রোফেট 'ক্রাইস্ট' সে নামও হতে পারে। প্রহরীদের কথাবার্তায় জানা গেল,

ব্রুনাদের 'এস্টেট' (জমিদারি) দখলই ব্ল্যাক লাইটে'র লক্ষ। অতএব ব্রুমসার বা এ স্টেটের নামেও কোড হতে পারে। আবার ওদের সংগঠন 'ব্ল্যাক লাইট'-

এর নামেও কোড হতে পারে। এই সব নাম নিয়ে আরেকবার ভাবল আহমদ মুসা। প্রহরী লোকদের কথা থেকে বুঝা গেল, ওরা এখানকার লোক নয়, স্টেটটা হস্তান্তর হলেই ওরা চলে যাবে। তাই যদি হয়, তাহলে ব্রুমসারবার্গ, ব্রুমসারবার্গ এস্টেট ইত্যাদি স্থানীয় কোন নাম, কোন হিরোর নাম ইত্যাদি কোড হিসাবে ব্যবহৃত হবার কথা নয়। ওদের সংগঠনের নাম ব্ল্যাক লাইট থেকে শুরু করতে চাইল আহমদ মুসা।

ডিজিটাল কী বোর্ডের দিকে হাত বাড়াল আহমদ মুসা।

কিন্তু প্রশ্ন জাগল মনে, ব্ল্যাক লাইটের ডিজিটাল কোডটা কি ধরনের হবে? 'ব্ল্যাক লাইট' শব্দ দু'টিতে ১০টি বর্ণ আছে। এই '১০' ই কি হবে কোড নাম্বার? না, ১০টি বর্ণের প্রথম বর্ণ? প্রথম বর্ণটিকে এক ধরে পরবর্তী বর্ণগুলোর যে ক্রমিক মান দাঁড়ায়, সেগুলোর এক একটি নাম্বার কোডের ক্রমিক অংশ হবে? অথবা বর্ণগুলোর ক্রমিক নাম্বারের যোগ ফলটাও হতে পারে কোড নাম্বার। প্রথমটা ঠিক হলে ১০ হয় কোড নাম্বার। আর বিকল্প দ্বিতীয়টি কোড হলে কোড সংখ্যাটি দাঁড়ায় ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ ও শূন্য। আর এ সংখ্যাগুলোর নিজস্ব মানের যোগফল ৪৫ হয় তৃতীয় কোড সংখ্যা।

কোনটা হবে সঠিক কোড নাম্বার?

ধাঁধা'র বিচারে প্রথম ও তৃতীয়টি অধিকতর সম্ভাবনাময় কোড, দ্বিতীয়টি খুবই সাধারণ। অবশ্য সাধারণ বিষয় অনেক সময় অসাধারণ কোড হয়ে থাকে।

আহমদ মুসা ভাবল, 'কোড-নেম' বাছাইয়ের ক্ষেত্রে যেমন সে তার মনে পড়া নামগুলোর শেষটাকে গ্রহণ করেছে, তেমনি কোড নাম্বারের ক্ষেত্রেও শেষ কোডটাকেই গ্রহণ করা উচিত।

তাই করল আহমদ মুসা। সংখ্যা ৪৫-কেই কোড হিসাবে গ্রহণ করল।

বিসমিল্লাহ বলে আহমদ মুসা তার শাহাদাত অঙ্গুলি দিয়ে ডিজিটাল কী বোর্ডের ৪ ও ৫-এর উপর চাপ দিল।

শেষ চাপটার সংগে সংগেই দরজা নড়ে উঠল। দরজার দুই পাল্লা দুই দিকে দেয়ালের ভেতর ঢুকে গেল।

উন্মুক্ত দরজা সামনে। বেশ বড় ঘর।

ঘরের মুখোমুখি দুই দেয়ালের খাঁজে ডিম লাইট, যা চোখে পড়ে না। তবে তা থেকে বিচ্ছুরিত ভোরের আলোর মত স্নিগ্ধ আলোতে ভরে গিয়েছে ঘর।

ঘরে নজর বুলাল আহমদ মুসা।

হাতে তার বাগিয়ে ধরা ক্লোরোফরম গান।

দরজা থেকে দেখল ঘরের বাম অংশের দিকে ডিভানে শুয়ে আছে কেউ। নিশ্চল দেহ। নিশ্চয় ঘুমে অচেতন।

আহমদ মুসা ঘরে ঢুকল।

নি:শব্দে দরজা বন্ধ করে দিল।

এগোলো ডিভানের দিকে।

ডিভানের উপর অঘোরে ঘুমাচ্ছে একটি মেয়ে। দেহের গ্রোথ দেখে মনে হচ্ছে পঁয়ত্রিশ প্লাস হবে বয়স। কিন্তু চেহারা বলছে বয়স খুব বেশি হলে বিশ-বাইশের বেশি হবে না।

এই মেয়েটিই ব্রুনার মা কারিনা কারলিন।

আহমদ মুসা ক্লোরোফরম গান তুলে কারিনা কারলিনকে তাক করে একটা ফায়ার করল।

বেরিয়ে গেল সেই এক পশলা কনসেনট্রেটেড ক্লোরোফরম গ্যাস।

এবার হালকা বোধ করল আহমদ মুসা।

ক্লোরোফরম গানটা পকেটে ফেলে আহমদ মুসা তাকাল ঘরের চারদিকে।

ঘরের পূর্ব-উত্তর কোণে কাঠের একটা সুশোভিত আলমিরা ছাড়া বড় ধরনের আর কোন আসবাব পত্র নেই।

মাথার দিকে ডিভানের পাশে লাইট-টপ টেবিল। টেবিলে একটা ড্রয়ারও দেখা যাচ্ছে।

ঘরের পশ্চিম দেয়ালের দু'প্রান্তে দু'টি দরজা।

দরজা দু'টো কিসের? একটা টয়লেট হতে পারে। আরেকটা? ওটা কি ড্রেসিংরুম হতে পারে? হবে হয়তো। অতএব তাকে প্রথমে ঢুকতে হবে টয়লেটে।

কোনটা টয়লেট?

মনে পড়ল গৌরীর ডাইরির কথা। সে লিখেছে, দোতলার ল্যান্ডিং থেকে ভেন্টিলেটরের মধ্যে দিয়ে টয়লেট দেখা যায়। নিশ্চয় তাহলে দক্ষিণ পাশেরটাই টয়লেট হবে।

টয়লেটের দরজার সামনে দাঁড়াতেই দেখতে পেল, দরজার লকে চাবি। রাতে চাবি সরাবার প্রয়োজন মনে করেনি তাহলে, ভাবল আহমদ মুসা।

টয়লেটে প্রবেশ করল আহমদ মুসা।

বিরাট টয়লেট। তার এক পাশে ল্যাট্রিন। তার পাশে বাথটাব। অন্য পাশে লম্বাটে এ্যান্টিক ধরনের সুন্দর একটা টেবিল ও একটি চেয়ার। টয়লেট ও বাথ থেকে এই অংশটা সুন্দর পর্দা দিয়ে আলাদা করা।

টেবিলের উপর সব সময়ের ব্যবহার্য কিছু প্রসাধনী ছাড়া অন্য কিছু নেই।

টেবিলে দু'টি ড্রয়ার। দুই ড্রয়ারেই কী হোলে চাবি রয়েছে। তার মানে রাত বলেই হয়তো এখান থেকেও চাবি সরানো হয়নি।

খুশি হলো আহমদ মুসা। তার কাজ আল্লাহ অনেক সহজ করে দিয়েছেন।

চেয়ারে বসে প্রথম ড্রয়ারটা খুলল আহমদ মুসা।

ড্রয়ারেও নানা প্রসাধনী। তার সাথে চুলের হোয়াইট কালারের বিদেশি দামী বটল। একটা প্লাস্টিক কেইসে নতুন পুরাতন ক্ষুদ্র তুলি। এ টেবিলে আর তেমন কিছু নেই। কিছুটা হতাশ হলো আহমদ মুসা।

দ্বিতীয় ড্রয়ারটা খুলল সে।

এ টেবিলেও নানা ধরনের শিশি, প্যাকেট, ট্যাবলেট ছড়িয়ে আছে।

ড্রয়ারটি পুরোপুরি খোলার পর চামড়ার সুদৃশ্য একটা নোট-কেইসের মত কিছু একটা দেখতে পেল।

কেইসটির মুখের দিকে খোলা। ভেতরে দেখতে পেল চামড়ার একটা ফোল্ডার।

আহমদ মুসা বের করল ফোল্ডার।

কভারে কিছুই লেখা নেই। খুলল ফোল্ডার।

ফোল্ডারের বাম অংশটার অর্ধেক পর্যন্ত একটা পকেট। পকেটে কাগজ দেখা যাচ্ছে। ডান অংশটা মানি ব্যাগের মত। কেবিন আছে, কার্ড পকেট আছে বেশ কয়েকটি।

ফোল্ডারের উপর চোখ বুলাতে গিয়ে বাম অংশের বটমে কালো গায়ের উপর কালো একটা মনোগ্রাম ও কিছু লেখার উপর নজর পড়ল।

ফোল্ডারের ভেতরটা নিকষ কালো চামড়ার ও ফোল্ডারের ব্যাকটা লাল চামড়ার। ফোল্ডারটা আর একটু সামনে এনে ভালো করে দেখল।

মনোগ্রামটা পরিচিত, ব্ল্যাক লাইটের। কিন্তু লেখাটা বুঝল না। মনোগ্রামের নিচে একটু স্পেস দিয়ে কালো চামড়ার উপর কালো হরফে লেখা 'ক্লোন-৭'।

'ক্লোন-৭' বিষয়টা নিয়ে ভাবল আরও আহমদ মুসা। কিন্তু বুঝতে পারল না বিষয়টা কি। বিষয়টা চামড়ার সাথেও সংশ্লিষ্ট হতে পারে, ভাবল আহমদ মুসা।

এ চিন্তার মাঝেই আহমদ মুসা ফোল্ডারের পকেট থেকে কাগজ বের করল।

ভাঁজ খুলল কাগজটির আহমদ মুসা।

একটা প্রেসক্রিপশন।

লেটার হেডে ডাক্তারের নাম কারল হেইঞ্জ এমডি, বিশেষজ্ঞ ক্লোন মেডিসিন।

এটুকু পড়তেই ভ্রূকুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার। ক্লোন মেডিসিনের ডাক্তারের প্রেসিক্রিপশন কেন?

আরও পড়ল প্রেসক্রিপশনটি।

বিস্মিত হলো, যার জন্যে প্রেসক্রিপশন, তার নাম নেই। শুধু লেখা 'ক্লোন-৭'।

বিস্ময়ে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল আহমদ মুসার! তাহলে ব্রুনার মা কারিনা কারলিন কি 'ক্লোন-৭'! কেন? ক্লোনের সাথে তার সম্পর্ক কি? '৭'

শব্দটারই বা অর্থ কি? না, এটা ব্রুনার মা'র একটা সাংকেতিক নামমাত্র! এমনটা হতেও পারে।

আহমদ মুসা ড্রয়ারের ওষুধগুলোর দিকে নজর বুলাল। বিদঘুটে নামের সব ওষুধ! একটিও তার পরিচিত নয়। তবে ওষুধের প্যাকেটের পরিচয় পড়ে যা বুঝল তাতে এগুলো ক্লোন বিষয়ক কোন কিছুর ওষুধ। কিন্তু এ ওষুধগুলো ব্রুনার মা কারিনা কারলিনের ড্রয়ারে কেন? সে কি ওষুধগুলো ব্যবহার করে? কেন? ব্রুনার মায়ের জীবনের এই দিকটা সম্পর্কে তো আহমদ মুসাকে কিছুই বলা হয়নি। তার মায়ের জীবনের ছোটখাট বিষয় পর্যন্ত ব্রুনা ও তার বাবা আহমদ মুসাকে বলেছে, কিন্তু এই বিষয়টা তো বলেনি। তাহলে কি তারাও জানতো না?

আহমদ মুসার মনে হলো, এই রহস্যের সাথে ব্রুনার মায়ের আচরণের একটা ঘনিষ্ঠ যোগ থাকতে পারে। তার মায়ের এই দিকটার উন্মোচন হলে তাকে নিয়ে সমস্যা-সংকটের সমাধান পাওয়া যেতে পারে।

আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি ডাক্তারের চেম্বারের অ্যাড্রেসের দিকে তাকাল। স্ট্রিটের নাম ফ্রেড স্ট্রিট, আর শহরের নাম অ্যারেন্ডসী।

খুশি হলো আহমদ মুসা। ডাক্তারের কাছ থেকেই ক্লোন মেডিসিন সম্পর্কে জানা যাবে।

আহমদ মুসার মনে হলো, টয়লেটে তার কাজ শেষ।

বেরিয়ে এল আহমদ মুসা টয়লেট থেকে।

এগোলো বেড সাইডের শেড-লাইটের টেবিলের দিকে।

টেবিলের ড্রয়ারটি খুলল।

তার ভেতরে টুকিটাকি অনেক কিছু দেখল। ছোট একটা মানি ব্যাগও।

ম্যানি ব্যাগ খুঁজে টাকা ছাড়া আর কিছুই দেখল না। রেখে দিল সে ম্যানি ব্যাগ।

ড্রয়ার বন্ধ করল।

চারদিকে তাকাল। দেখল ব্রুনার মায়ের বালিশের পাশে তার ছোট হ্যান্ড ব্যাগটি। এটাই খুঁজছিল আহমদ মুসা। শুনেছিল ব্রুনার কাছে, তার মায়ের হ্যান্ড ব্যাগে কাউকে সে হাত দিতে দেয় না।

হ্যান্ড ব্যাগটি নিতে কাত হয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে থাকা ব্রুনার মায়ের এদিকে প্রসারিত তার দুই হাতের দিকে নজর পড়ল আহমদ মুসার। দেখল তার দুই হাতের বুড়ো আঙুলে বিশেষ ধরনের প্লাস্টিক ব্যান্ডেজ, গার্ডারের মত ফাঁপা।

হ্যান্ড ব্যাগটি নিয়ে খুলল আহমদ মুসা। ছোট্ট হ্যান্ড ব্যাগে লিপস্টিক ধরনের মেয়েদের সব সময়ের ব্যবহার্য কিছু জিনিসপত্র। তার সাথে দেখল চার ভাঁজ করা একটা কাগজ।

মাত্র কাগজটিই তুলে নিল আহমদ মুসা।

কাগজের ভাঁজ খুলে দেখল সেটাও একটা প্রেসক্রিপশন। ডাক্তারের নাম 'হের হারম্যান' প্লাস্টিক স্কিন স্পেশালিস্ট। ঠিকানা, মোবাইল ক্যাম্প, ফ্রেইড স্ট্রিট, অ্যারেন্ডসী।

আবার সেই অ্যারেন্ডসী! বিস্মিত হলো আহমদ মুসা।

আরও বিস্মিত হলো, এখানেও যার নামে প্রেসক্রিপশন, তার নামের জায়গায় লেখা হয়েছে, 'ক্লোন-৭'।

তার মানে ব্রুনার মা নিশ্চিতভাবেই 'ক্লোন-৭'! এর অর্থ তাহলে কি?

ব্রুনার মায়ের দুই হাতের দুই বুড়ো আঙুলে অদ্ভুত ধরনের ব্যান্ডেজ কেন?

হঠাৎ আহমদ মুসার মনে পড়ল প্রহরীদের কথা, 'দস্তখত ঠিক হয়ে গেছে, এখন ফিংগার প্রিন্ট ডেভলপ করছে।' বুড়ো আঙুলের ফিংগার প্রিন্ট ডেভলপ করার জন্যেই কি ঐ ব্যান্ডেজ? ঠিক, প্রেসক্রিপশনও তো প্লাস্টিক স্কিন স্পেসালিস্ট ডাক্তারের! ফিংগার প্রিন্ট ঠিক করার জন্যে প্লাস্টিক স্কিন স্পেশালিস্ট দ্বারা বিশেষ ধরনের অপারেশন বা কোন কিছু করা হয়েছে? হতে পারে।

আহমদ মুসার মনে হলো, তার এখানে আর কোন কাজ নেই। যা জানার মত তা জেনে ফেলেছে। সে রহস্যগুলো সামনে এসেছে, তার সমাধানের পরই পরবর্তী কাজের প্রশ্ন আসবে।

আহমদ মুসা প্রেসক্রিপশন, ব্যাগ যেমন ছিল তেমনিভাবে রেখে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

বাইরে কোন সমস্যার সম্মুখীন হলো না। বুঝা যাচ্ছে, ভেতরে আর কোন প্রহরী নেই। শুধু সম্মুখের গেটেই আছে প্রহরী।

আহমদ মুসা ফিরে এল প্রহরীদের সেই কক্ষে। সংজ্ঞাহীন সবাই বেঘোরে পড়ে আছে তাদের বিছানায়।

আহমদ মুসা যে গোপন পথ দিয়ে ঢুকেছিল, সেই পথেই বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে।

ফিরে এল নিজেদের বাড়িতে।

বাড়ির প্রধান ফটকের তালা খুলে বাড়িতে প্রবেশ করল।

ভেতরের চত্বরটা পেরিয়ে গাড়ি বারান্দা দিয়ে ওগুলো বাড়িতে প্রবেশের গেটের দিকে। দেখল দরজা খোলা, আলো আঁধারিতে দাঁড়িয়ে আছে কেউ দরজায়।

আহমদ মুসা বারান্দায় উঠতেই ছায়া মূর্তিটি নড়ে উঠল।

আহমদ মুসা দরজার কাছে যেতেই ছায়া মূর্তিটি এগিয়ে এল। দেখল সে ব্রুনা।

ব্রুনা আহমদ মুসার সামনে এসে লম্বা বাও করল। বলল, 'ভাইয়া, আমাকে মাফ করুন। আমি বুঝতে পারিনি। আমাদের সমাজে তো দু'জন নারী-পুরুষ এমনভাবে যখন কাছাকাছি হয়, তখন তারা প্রেমিক-প্রেমিকা হয়, দৈহিক সম্পর্কই তাদের কাছে প্রধান হয়। তারা যে ভাইবোনও হতে পারে, এমন পবিত্র সম্পর্কের কথা আমাদের সমাজ ভুলেই গেছে। তাহলে আমি ভুল না করে পারি কি করে! আমাকে মাফ করুন ভাইয়া।'

ব্রুনার শেষের কথাগুলো কান্নায় জড়িয়ে গেল।

আহমদ মুসা তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'তুমি মহাঅন্যায় করনি যে মাফ চাইতে হবে। আর আমাকে ভাইয়া বলার পর মাফ চাওয়ার কিছু থাকে না। আমি খুশি যে, তুমি তোমার সমাজের উপরে উঠে চিন্তা করতে পেরেছ। আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করুন।'

'এই চিন্তা করার শক্তি আপনিই দিয়েছেন ভাইয়া।' চোখ মুছতে মুছতে বলল ব্রুনা। তার কন্ঠ ভারি।

‘সব শক্তি আল্লাহর কাছ থেকে আসে ব্রুনা।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ভাইয়া, আপনি সব সময় সব প্রশংসা, সব কৃতিত্ব ও কর্তৃত্ব ঈশ্বর মানে আল্লাহকে দেন। মানুষের নিজস্ব কোন কৃতিত্ব, কর্তৃত্ব নেই? আপনি নিজের শক্তি, নিজের বুদ্ধিতে যা করেন, তার কৃতিত্ব কি আপনি পেতে পারেন না?’ ব্রুনা বলল।

‘যাকে আমি আমার কাজ বলি, তাতো আমি করি না। আমার হাত যা করে তার কমান্ড পায় মাথা থেকে। মাথার কমান্ড-স্ট্রাকচার কে করেছেন আর তা কার নিয়ন্ত্রণে? আল্লাহর। আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ সভ্যতার বিবেক বলে পরিচিত আর্নল্ড টয়েনবীও অবশেষে বলেছেন, মানুষের মাথা চিন্তার আকারে, ভাবনার আকারে কমান্ড পায় ঈশ্বরের কাছ থেকে। এজন্যেই সকল প্রশংসা, কৃতিত্ব আল্লাহর জন্যেই।’

আহমদ মুসা কথা শেষ করে একটু থেমে আবার বলে উঠল, ‘কিন্তু তা এখানে কি করছ? দাঁড়িয়ে কেন এখানে?’

‘ঘুমাতে গিয়েছিলাম ভাইয়া, কিন্তু ঘুমাতে পারিনি। আপনি ও বাড়িতে ঢুকে কি করছেন, কি হচ্ছে-এসব অস্থির ভাবনা আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। আপনার পথের দিকে তাকিয়ে আছি। আর কিছু করার তো উপযুক্ত আমরা নই!’ ব্রুনা বলল। তার শেষের কথাগুলো অভিমান-ক্ষুদ্ধ, ভারি।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘আমি তোমাকে সাথে নিইনি এ কারণে যে, এমনভাবে আমাদের এক সাথে যাওয়া উচিত নয় বলে। তোমরা উপযুক্ত নও একথা ঠিক নয়। নারী-পুরুষকে আল্লাহ সমান শক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। দুই পুরুষের শক্তি যেমন সমান হয় না, তেমনি নারী-পুরুষের শক্তিও সমান হয় না, এটা হয়ে থাকে নানা কারণে। নারী পুরুষের প্রকৃতিগত পার্থক্য একটাই। সেটা হলো, নারী সৃষ্টিগতভাবে দৈহিক দিক দিয়ে রক্ষণাত্মক, আর দৈহিক দিক দিয়ে পুরুষেরা আক্রমনাত্মক। এই আক্রমণের সুযোগ যাতে পুরুষরা না পায়, নারীদেরকে আক্রান্ত যাতে না হতে হয়-এজন্যে নারীদেরকে একটু সাবধানে চলতে হয়। নিজেদের দেহ-সৌন্দর্যকে পুরুষের আক্রমণাত্মক চোখের একটু

আড়ালে রাখতে হয়। নারীর প্রকৃতিগত এই বৈশিষ্ট তার যোগ্যতাকে বুদ্ধিকে অবশ্যই খাটো করেনি।'

মুগ্ধ, সম্মোহিত ব্রুনা কিছু বলতে যাচ্ছিল।

আহমদ মুসা তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'চল, আর কোন কথা নয়। রাত শেষ হতে যাচ্ছে। ঘুমাতে হবে।'

বলে চলতে শুরু করল আহমদ মুসা।

ব্রুনাও।

চলতে চলতে ব্রুনা বলল, 'ভাইয়া, ঘুমাবেন কি করে? আপনার তো নামাজের সময় হলো।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। ধন্যবাদ তোমাকে। গোসল করে ফ্রেশ হতে হতে ফজর নামাজের সময় হবে। নামাজ পড়েই ঘুমাব।' বলল আহমদ মুসা।

'ভাইয়া, আপনাদের প্রার্থনা আমার খুব ভালো লাগে। সত্যিই জীবন্ত ধর্ম আপনাদের। আল্লাহর সাথে আপনাদের সম্পর্ক সার্বক্ষণিক। আমাদের ধর্ম আমাদেরকে কোন কাজ দেয়নি। তাই ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্কও নেই।' ব্রুনা বলল।

'ধন্যবাদ। তুমি দেখছি অনেক কিছু ভাবছ।' বলল আহমদ মুসা।

'আমি আপনাদের ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে জানার চেষ্টা করছি। ইসলাম ও মুসলমানদের নিয়ে মানুষের মধ্যে অনেক ভুল বুঝাবুঝি আছে আমাদের দেশে। আপনাকে দেখে, আপনার কথা শুনে ইসলামকে আমি নতুন করে বুঝছি। আপনি খুশি হবেন না ভাইয়া?' ব্রুনা বলল।

'আল্লাহ খুশি হবেন।' বলল আহমদ মুসা।

'তিনি অনেক উপরে। আমি আপনার খুশির কথা বলছি।' ব্রুনা বলল।

'আল্লাহ যাতে খুশি হয়, বান্দাহ হিসাবে আমি তাতেই খুশি।' বলল আহমদ মুসা।

'আপনার ঈশ্বর প্রেম বিস্ময়কর ভাইয়া! আর কেউ মানে আমি বা আমরা কি এটা পারব?' ব্রুনা বলল।

‘তোমার মনে যে এ কথা জেগেছে, এসেছে, এটাই প্রমাণ করে তুমি পারবে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ধন্যবাদ ভাইয়া। ভালো...।’

ব্রুনা কিছু বলতে যাচ্ছিল। আহমদ মুসা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, ‘আর কোন কথা নয়। তোমার পথ ওদিকে। যাও, এখন ঘুমাও।

‘কিন্তু ভাইয়া, ভুলেই গেছি। জিজ্ঞাসা করা হয়নি আপনার অভিযানের কথা। কি হলো, প্লিজ একটু বলুন।’

‘বলেছি কোন কথা নয়। এখন ঘুমাতে যাবে, ঘুমাবে। সব শুনবে সকালে।’

বলেই আহমদ মুসা দাঁড়িয়ে তার কক্ষের দিকে হাঁটা শুরু করল।

‘ধন্যবাদ ভাইয়া। গুড নাইট!’ পেছনে থেকে একটু উঁচু কন্ঠে বলল ব্রুনা।

সেও তার কক্ষের দিকে হাঁটা শুরু করেছে।

সকালে নিচে নেমেই হৈ চৈ শুরু করেছে কনরাড।

কনরাডকে বাড়ির ম্যাডাম কারিনা কারলিনের প্রেমিক মনে করা হয়। তার আচার-আচরণে বাড়ির লোকেরা এটাই মনে করে। সে মাঝে মাঝে এ বাড়িতে আসে। আসলে থাকে দোতলায় ব্রুনা কিংবা আনালিসার ঘরে। তাছাড়া সারা দিনই থাকে কারিনা কারলিনের সাথে।

হৈ চৈয়ের কারণ হলো সে উপর থেকে নেমে প্রহরীদের কাউকে পায়নি। নির্দিষ্ট স্থানগুলোতে ২৪ ঘন্টা পাহারার ব্যবস্থা। কিন্তু কনরাড এসে ম্যাডাম কারিনা কারলিনের ঘরের সামনেও কোন প্রহরী পায়নি। প্রহরীদের ঘরে গেছে। প্রহরীদের সবাইকে তাদের ঘরে ঘুমন্ত অবস্থায় পেয়েছে। ডাকাডাকি, চিৎকার-চেঁচামেচি করেও তাদের জাগাতে পারেনি।

অন্যদিকে ডাকাডাকি করেও কারিনা কারলিনের দরজা খোলানো যায়নি। অবশেষে ব্ল্যাক লাইট-এর মাস্টার কোড ব্যবহার করে তার ঘরে ঢুকেছে কনরাড। কারিনা কারলিনকেও ঘুমন্ত পেয়েছে কনরাড। ডাকাডাকি করে তাকেও তোলা যায়নি।

ইতিমধ্যে ব্ল্যাক লাইট কর্তৃপক্ষের যারা এ বাড়িতে ছিল, তারও এসে গেছে। ব্যাপার কি বুঝতে না পেরে ডাক্তার ডাকা হয়েছে।

ডাক্তার বলেছে, এক ধরনের ক্লোরোফরম গ্যাসের প্রভাবে তারা সবাই সংজ্ঞা হারিয়েছে। ডাক্তারের বিশেষ চেষ্টার পর তাদের সংজ্ঞা ফিরেছে। কিভাবে সংজ্ঞা হারায় তা দু'জন প্রহরী ছাড়া আর কেউ বলতে পারেনি। কারিনা কারলিনও নয়। দু'জনের জবান বন্দী থেকে কনরাডরা জানতে পেরেছে, কে একজন লোক বাড়িতে ঢুকেছিল। তারা তাকে পেছন থেকে জাপটেও ধরেছিল। কিন্তু কিভাবে যেন তারা দু'জনও সংজ্ঞা হারায়। লাউঞ্জের দরজায় তারা লোকটাকে জাপটে ধরেছিল। কিন্তু সেখানেই তারা সংজ্ঞা হারায়। কিভাবে তারা তাদের বিছানায় যায় তা তারা জানে না।

কারিনা কারলিন জ্ঞান ফিরে পেয়ে বলে যে, সে ঘুমিয়েছিল, সংজ্ঞা হারিয়েছিল কিনা সে জানে না। কিন্তু তার ঘরের বাতাস পরীক্ষা করে প্রমাণিত হয়েছে এক ধরনের ক্লোরোফরম গ্যাস ঘরের বাতাসে রয়েছে। ঘন্টা চারেক আগে এ গ্যাসের ঘনত্ব সংজ্ঞা লোপ করার মত অবশ্যই ছিল।

কিন্তু কেউ ভেবে পেল না মুক্ত বাতাস প্রবেশ করতে না পারা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে কিভাবে এমন ধরনের গ্যাস প্রবেশ করতে পারে।

বিষয়টা নিয়েই আলোচনায় বসেছে কারলিন, কনরাডসহ ব্ল্যাক লাইটের উপস্থিত কর্তা ব্যক্তিরা।

কারিনা কারলিন বলছিল, 'আমার ঘরসহ বাড়ির সব ঘর চেক করা হয়েছে, কিন্তু কোন জিনিস খোয়া যায়নি।'

'কিন্তু লোক তো এসেছিল, এটা ঠিক, দু'জন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য এটা। তারা জড়িয়েও ধরেছিল তাকে। এ ঘটনা মিথ্যা নয়।' বলল কনরাড।

'তাহলে কেন এসেছিল? এতগুলো লোককে সংজ্ঞাহীন করল কোন্ উদ্দেশ্যে? দু'জনে তাকে আগে দেখতে পাওয়ার পরও পেছন থেকে আক্রমণ করার পরও মাত্র একজনকে যখন আটকাতে পারেনি, তখন সেই লোকটি খুব সাধারণ নয়।' বলল ব্ল্যাক লাইটের উপস্থিত একজন কর্মকর্তা।

'তোমার কথা ঠিক। কিন্তু অসাধারণ এই লোকটি কে? কেন ঢুকেছিল এ বাড়িতে? কোন দিক দিয়ে ঢুকেছিল?' বলল ব্ল্যাক লাইটের আর একজন।

'ঠিক তো, সে কোন্ দিক দিয়ে ঢুকেছিল? সামনের গেট বন্ধ ছিল। গেট-বক্সে ছিল সিকুরিটির লোক। গোটা রাতে এ গেটে কেউ আসেনি। সেকেন্ড গেটেও সার্বক্ষণিক পাহারায় ছিল লোক। এ দু'গেটে ছাড়া বাড়ির ভেতরে ঢোকার, কোন ঘরে প্রবেশের দ্বিতীয় কোন পথ নেই। সারা রাতে এ দুই গেটে কেউ আসেনি। তাহলে এ লোক কোন দিক দিয়ে ঢুকল?' বলল কনরাড।

'এ বাড়িতে ঢোকার আর তো কোন পথ নেই। লোকটি তাহলে বাইরে থেকে আসেনি?' কারিনা কারলিন বলল।

ভ্রূকুঞ্চিত করলো কনরাড। বলল, 'ভেতর থেকে আবার কে হবে? প্রহরীদের কেউ? ওরা এই বিশেষ ধরনের ক্লোরোফরম পাবে কোথায়? আর তারাও তো সংজ্ঞাহীন ছিল।'

'কিন্তু প্রশ্ন হলো, সে যেই হোক, কিছু চুরি করেনি, কাউকে খুন করেনি, তাহলে সে ঢুকেছিল কেন?'

প্রশ্নটার জবাব দিল না কেউ।

নিরব সবাই।

বেশ কিছুক্ষণ পর মুখ খুলল কনরাড। বলল, 'বিষয়টি বস ব্ল্যাক বার্ডকে জানানো দরকার। যা ঘটেছে বিষয়টি ছোট নয়। শীর্ষ পর্যায়ের তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।'

'আমিও তাই মনে করি।' বলল কারিনা কারলিন।

'ঠিক আছে। এটাই এখন এই অবস্থায় করণীয়।' বলল সবাই।

'ঠিক আছে। ধন্যবাদ সবাইকে।'

বলে উঠে দাঁড়াল কারিনা কারলিন।

সবাই উঠল।

আহমদ মুসা এসে বসল সোফায়।

সামনের সোফায় ব্রুনা ও ব্রুনার বাবা আলদুনি সেনফ্রিড আগেই এসে বসেছিল।

মাঝের টেবিলে তিনটি কাপ ও কফি পট ছিল।

আহমদ মুসা বসতেই ব্রুনা একটু সামনে ঝুঁকে পড়ে তিন কাপ কফি ঢেলে একটি আহমদ মুসার দিকে তুলে ধরে বলল, 'ভাইয়া আপনি চা, কফি কিছুই খেতে চান না। সারা রাত পরিশ্রম করার পর গোসল করে ফ্রেশ হয়ে লম্বা ঘুম দিয়েছেন। এখন খাওয়া-দাওয়ার পর এই গরম কফি খুব ভালো লাগবে।'

পিতাকে কফির অন্য কাপটি দেয়ার পর নিজে একটি নিয়ে সোফায় সোজা হয়ে বসল ব্রুনা।

'ধন্যবাদ ব্রুনা, সত্যি ইচ্ছা করছিল কফি খেতে।' বলে আহমদ মুসা কফির কাপ তুলে নিল।

'ভাইয়া, আপনার সম্পর্কে কিছুই জানি না। কিছু জানার কি চেষ্টা করতে পারি?' বলল ব্রুনা।

'না, ব্রুনা। এখন উনি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। এ সময় ওকে বিরক্ত করো না।'

ব্রুনার বাবা আলদুনি সেনফ্রিড বলল।

'বাবা, ঐ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুরু করলে কফি খাওয়া হবে না। ভাইয়াও তো বললেন কফি খেতে তারও ইচ্ছা করছে। কফি খাওয়ার পর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা মানাবে ভালো।' বলল ব্রুনা ।

'ঠিক আছে। তুমি ভালো বলেছ ব্রুনা। কিন্তু ব্রুনা, হঠাৎ তুমি ওকে 'ভাইয়া' বলছ, অনুমতি নিয়েছ?' ব্রুনার বাবা আলদুনি সেনফ্রিড বলল।

‘মুসলমানদের মধ্যে কুলিন ও অকুলিন নেই। তারা একে অপরের ভাই, বোন। সুতরাং অনুমতির দরকার নেই। তবু তিনি তাঁকে ভাইয়া বলার অনুমতি দিয়ে আমাকে গৌরবান্বিত করেছেন বাবা।’ বলল ব্রুনা। তার কন্ঠ আবেগ-রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

‘ধন্যবাদ ব্রুনা। এবার তুমি প্রশ্ন করো।’ আলদুনি সেনফ্রিড বলল।

ব্রুনা নিজেকে সামলে নিয়েছে।

সংগে সংগে অবশ্য কথা বলল না।

ব্রুনা হেসে উঠে তার কফির কাপটা পিরিচে রাখতে রাখতে বলল, ‘ভাইয়া, আপনার কে কে আছে? কোথায় থাকেন, এসব বিষয় জানার আমার খুব কৌতুহল।’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘সেটা খুব ভালো খবর নয় ব্রুনা। রক্তের সম্পর্ক যাদের সাথে থাকে, তাদের যদি আত্নীয় বলা হয়, তাহলে সে ধরনের কোন আত্নীয় আমার নেই। আছে স্ত্রী, একটি লাভলী শিশুপুত্র। আমাদের একটি পবিত্র শহর মদিনায় তারা থাকে। এই হলো সংক্ষিপ্ত বিবরণ।’ থামল আহমদ মুসা।

‘ধন্যবাদ ভাইয়া, কিন্তু সব কথা হয়নি।’

‘আমি জানি, এটুকু সব কথা নয়। বাকিটা ভবিষ্যতের জন্যে থাকল।’

বলেই আহমদ মুসা কফির কাপ পিরিচের উপর রেখে সোজা হয়ে বসল। বলল, ‘কফি খাওয়া প্রায় শেষ, এখন কাজের কথা আমরা শুরু করতে পারি।’

‘হ্যাঁ, মি. আহমদ মুসা, আমরা রাত থেকেই উদগ্রীব হয়ে আছি, আপনি ফেরার পর উদ্বেগ যদিও এখন নেই।’ বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

‘হ্যাঁ, মি. সেনফ্রিড, আমিও উদগ্রীব কিছু জিজ্ঞাসার জবাব পাওয়ার জন্যে। ও বাড়িতে ঢুকে জানার চেয়ে জিজ্ঞাসাই বেশি সৃষ্টি হয়েছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘বলুন মি. আহমদ মুসা।’ বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

‘বাড়িতে ঢুকে প্রথমে আমাকে যে ঘরে পা রাখতে হলো, সেটা একটা হল ঘর। চৌদ্দটি বিছানা পাতা খাটে। সেখানে...।’

আহমদ মুসার কথার মাঝখানে ব্রুনা বলে উঠল, ‘আপনি কিভাবে ঢুকলেন সেটা তো বললেন না? কিভাবে ধাঁধা ভাঙলেন? এটাই সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ও শিক্ষামূলক।’

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘আমি কথা সংক্ষিপ্ত করতে চেয়েছিলাম। ঠিক আছে, সংক্ষেপে সব কথাই বলি।’

আহমদ মুসা একটু থেমে আবার শুরু করল, ‘কোন ঘর বা কোন স্থান থেকে গোপন পথ শুরু হয়েছে, তা খুঁজে পেতে খুব বেশি দেরি হয়নি আমার। তারপর....।’

আহমদ মুসার কথার মাঝখানে ব্রুনা আবার বলে উঠল, ‘কিভাবে পেলেন? কোন প্রকার চিহ্নের কথা তো বাবা বলেননি?’

‘বলেননি। ঘরগুলোর অবস্থান, জানালাগুলোর স্থান পর্যবেক্ষণ করে যে স্থানকে সন্দেহ করি, ঠিক সেখানেই খুঁজতে খুঁজতে ডিজিটাল লক পেয়ে যাই। কোড...।’

আহমদ মুসার কথার মাঝখানে আবার কথা বলে উঠল ব্রুনা। বলল, ‘স্যরি ভাইয়া! ঘরগুলো ও জানালাগুলো পর্যবেক্ষণ করে কিভাবে কোন স্থানটিকে সন্দেহে করলেন?’

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘গোয়েন্দা হতে চাও নাকি? ঠিক আছে। তোমাদের বাড়ির একতলার দক্ষিণ দিকে বেড়ে যাওয়া তিন ঘরের দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে ৩টি জানালা আছে। চতুর্থ জানালাটি আছে পুবের ও মাঝের ঘরের মধ্যবর্তী স্থানের দেয়ালে। কিন্তু পশ্চিম প্রান্তের ও মাঝের ঘরের মধ্যবর্তী অনুরূপ স্থানের দেয়ালে কোন জানালা নেই। এটা নির্মাণ সামঞ্জস্য বিধানের দিক থেকে একটা বড় ধরনের ভারসাম্যহীনতা। এই ভারসাম্যহীনতা কেন? এই উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমার মনে হয়, এই দেয়ালকে অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। এ থেকেই আমি মনে করেছি, এই দেয়ালেই গোপন পথের প্রবেশ পথ রয়েছে।’

আহমদ মুসা থামতেই আবার প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল ব্রুনা।

আহমদ মুসা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, ‘আর কোন প্রশ্ন নয় ব্রুনা। তুমি যা জানতে চাও সবই বলব।’

একটু থেমে শুরু করল আহমদ মুসা। বলল কি করে পাথরের দেয়ালে ডিজিটাল কী বোর্ড খুঁজে পেল, কিভাবে কয়েকবার ব্যর্থ হবার পর কোড-ধাঁধা ভাঙতে পারল, তার ঘরের ভেতরের আলমারির ধাঁধার কথা বলল। সেটার সমাধান করে কি করে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল তা জানাল। তারপর প্রহরীদের সংজ্ঞাহীন করার কথা, দুই প্রহরী দ্বারা আক্রান্ত হবার কথা, ব্রুনার মায়ের ঘরে ঢোকার জন্যে কিভাবে তার দরজার ডিজিটাল লকের ধাঁধা ভাঙল। সব বলল আহমদ মুসা। ঘরে ঢুকে সন্ধানের সুবিধার জন্যে ব্রুনার মাকে ক্লোরোফরম ফায়ার করে সংজ্ঞাহীন করার কথা বলল। ঘরে সন্ধান করে কি পেয়েছে, কি দেখেছে তা বলে থামল আহমদ মুসা।

ব্রুনা ও তার বাবা অবাক বিস্ময়ের সাথে আহমদ মুসার কথা শুনছিল।

আহমদ মুসা থামতেই ব্রুনা অনেকটা সন্দেহের সুরে বলে উঠল, ‘দক্ষিণ দেয়াল ও মা’র ঘরের দরজার প্রকৃত কোড কিভাবে পেলেন? কোড দু’টি কি?’

‘কিভাবে পেলাম? চিন্তা করলে তুমিও পাবে। তোমার মায়ের দরজার কোডটা অংকের ধাঁধা, আর দক্ষিণ দেয়ালের কোডটা অক্ষরের ধাঁধা। কোড দু’টি কি তা এখন শুনতে চেয়ো না, তাহলে ও বাড়িতে ঢোকার ইচ্ছা হয়ে যেতে পারে। সমস্যা কেটে গেলে কোড দু’টি জানিয়ে দেব। তোমাদের বাড়ির কোড তোমাদের না জানলে চলবে কি করে?’ আহমদ মুসা বলল।

‘ঠিক বলেছেন মি. আহমদ মুসা! ব্রুনা, তুমি ছোটবেলা থেকেই অ্যাডভেনচারাস। তোমার না জানাই ভালো এখন।’ বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

‘ঠিক আছে বাবা। আমি বুঝেছি। কিন্তু আমার একটা বিস্ময় কাটছে না, তাড়াহুড়া ও টেনশনের মধ্যে কিভাবে সঠিক কোডটি আপনার মাথায় এল ভাইয়া?’ ব্রুনা বলল।

‘আল্লাহর সাহায্যে ব্রুনা। মানুষ যখন উপায়হীন অবস্থায় পৌঁছে, তখন আল্লাহ মানুষের সহায় হয়ে দাঁড়ান।’

‘সব সময়ই?’ ব্রুনার জিজ্ঞাসা।

'সব সময়ই, যদি মানুষ চায়।' আহমদ মুসা বলল।

'না চাইলেও আল্লাহ এই সাহায্য দেন না?' বলল ব্রুনা।

'দেন, আবার না দিতেও পারেন। 'আল্লাহ' নাম ছাড়া আল্লাহর আরও অনেক নাম আছে। তার মধ্যে দু'টি নাম হলো 'রাহমান' ও 'রাহীম'। দুই নামের অর্থ 'দয়ালু' ও 'দাতা'। এই দুই নামের ফাংশন ভিন্ন। 'রাহমান' হিসাবে আল্লাহ মানুষসহ সব সৃষ্টির প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। এই দয়া তার কাছে চাইতে হয় না। সূর্যের কিরণ, চাঁদের আলো, পানির যোগান, খাদ্যের উৎস, দেহের প্রকৃতিগত স্বয়ংক্রিয়তা, বাতাসের সরবরাহ প্রভৃতি সব কিছুই আল্লাহর এই দয়ার ফল। তাঁর সৃষ্টিসমূহ রক্ষার জন্যে আল্লাহ এই দয়া দিয়ে থাকেন। কিন্তু 'রাহীম' হিসাবে আল্লাহর যে দয়া তা তাঁর কাছে চাইতে হয়। তুমি বিপদে পড়েছ, তখন তোমাকে আল্লাহর সাহায্য চাইতে হবে। যেমন খাদ্য নেই, তাঁর সাহায্য চাইতে হবে। তুমি....।'

আহমদ মুসা থেমে গেল। তার কথার মাঝখানেই কথা বলে উঠেছে ব্রুনা। বলল সে, 'না চাইলে সাহায্য এখানে তিনি কেন দেন না?'

'কারণ মানুষ যেমন বিপদ সৃষ্টি করে, বিপদ চাপায়, তেমনি মানুষ বিপদ থেকে মুক্ত হবারও সামর্থ্য রাখে। সেই সামর্থ্য ব্যবহার করে বিপদ থেকে মুক্ত হতে হবে।' আহমদ মুসা বলল।

'কিন্তু মানুষ যদি চেষ্টা করেও তার সামর্থ্য দিয়ে মুক্ত হতে না পারে, খাদ্য যোগাড় করতে না পারে, তাহলে?' বলল ব্রুনা।

'আল্লাহর সাহায্য চাইতে হবে। এজন্যেই নির্দেশ হলো, সব সময় সব ক্ষেত্রে চেষ্টার সাথে সাথে আল্লাহর সাহায্যেরও প্রত্যাশী হতে হবে। মানুষের সামর্থ্য যেখানে শেষ হয়, আল্লাহর সাহায্য সেখানে শুরু হয়।' আহমদ মুসা বলল।

'আরেকটা কথা ভাইয়া, আপনি বললেন, রাহমান হিসাবে আল্লাহ না চাইতেই তাঁর সৃষ্টির জন্যে পানি, খাদ্যের সরবরাহ দেন। কিন্তু বাতাস, সূর্যের রোদ যেভাবে আমরা পাই, পানি, খাদ্য তো সেভাবে পাই না? পানি ও খাদ্যের সংকট সৃষ্টি হয় কেন?' বলল ব্রুনা।

'বাতাস, রোদ থেকে পানি ও খাদ্যের মত বস্তু কিছুটা ভিন্ন। সৃষ্টির জন্যে আল্লাহ পানি ও খাদ্যের ব্যবস্থা দুনিয়াতে করেছেন। কিন্তু সে পানি ও খাদ্য মানুষকে উৎপাদন বা সংগ্রহ করতে হয়। আজ দুনিয়াতে এই উৎপাদন ও সংগ্রহ অবাধ নয়। ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জাতি ও দেশগত বিভেদ সৃষ্টি করে এই উৎপাদন ও সংগ্রহের অবাধ প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে। সংকট সৃষ্টি হওয়ার কারণ এখানেই। অংক কষে দেখতে পার, যে কোন যুগ বা কালের মানুষের সংখ্যা দিয়ে দুনিয়ার খাদ্যকে ভাগ করে দেখ খাদ্য উদ্বৃত্ত থাকবে। তবু দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে অনেক মানুষ খাদ্য সংকটে পড়ে, পড়বে। এ সংকট মানুষের তৈরি।' আহমদ মুসা বলল।

'চমৎকার ভাইয়া! অপরূপ এক তথ্য দিলেন। ধন্যবাদ আপনাকে ভাইয়া। এখন বলুন, এর সমাধান কি?' বলল ব্রুনা।

'সমাধান এক কথায় বলা যাবে না। আমাদের ধর্মে মানে ইসলাম ধর্মে আল্লাহ এর সমাধান দিয়েছেন দু'ভাবে-নৈতিক ও আইনি। এটা জানার জন্যে তোমাকে অনেক পড়াশুনা করতে হবে।' আহমদ মুসা বলল।

ব্রুনার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তার পরেই একটা দুষ্টুমি জেগে উঠল তার চোখে-মুখে। বলল, 'তাহলে তো ভাইয়া মুসলমান হয়ে যেতে হবে।'

'আমি তোমাকে মুসলমান হতে বলিনি। সমাধান খুঁজতে বলেছি।' আহমদ মুসা বলল। তারও ঠোঁটে হাসি।

'কেন বলবেন না মুসলমান হতে? আপনি তো মুসলমান।' বলল ব্রুনা। তার কন্ঠ ভারি, অভিমানের সুর তাতে।

'মুসলমান হওয়া না হওয়া ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের ব্যাপার ব্রুনা।' আহমদ মুসা বলল।

'কেন বড় ভাই ছোট বোনকে নির্দেশ দিতে পারে না?' বলল ব্রুনা।

'সব ব্যাপারে নয় ব্রুনা।' আহমদ মুসা বলল।

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা আবার বলে উঠল, 'আর কোন কথা নয় ব্রুনা। কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের আলোচনা হতে হবে।'

'ব্রুনা, অনেক সুন্দর ও ভারি বিষয় তুমি শুনেছ ওর কাছে। আমারও খুব ভালো লেগেছে। এস, সেগুলো আমরা হজম করি। ওকে কথা বলতে দাও।' বলল ব্রুনার বাবা আলদুনি সেনফ্রিড।

'ঠিক বলেছেন বাবা।' বলে চুপ করে গেল ব্রুনা। গা এলিয়ে দিল সোফায়।

আহমদ মুসা শুরু করল, 'আমি ঐ বাড়ির যে বিবরণ আপনাদের দিয়েছি, যা আমি জেনেছি, তাতে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে এসেছে। যেমন, আপনাদের স্টেট হস্তান্তরিত হচ্ছে। তারপর ওরা সবাই এখান থেকে চলে যাবে। দ্বিতীয়ত, এই হস্তান্তরে সমস্যা দেখা দিয়েছে স্বাক্ষর ও বুড়ো আঙুলের টিপসহি নিয়ে। প্রশ্ন হলো,ব্রুনার মা তার স্টেট বিক্রি করছেন কেন? কোথায় যাচ্ছেন তিনি? আর স্বাক্ষর ও টিপসহি নিয়ে সমস্যা হবে কেন? তৃতীয়ত, ব্রুনার মায়ের ড্রয়ারে ক্লোন মেডিসিন পাওয়া গেছে। তার ওয়ালেট ফোল্ডারে, তার প্রেসক্রিপশনে তাকে ক্লোন-৭ বলে অভিহিত করা হয়েছে। তার দুই হাতের বুড়ো আঙুলে অদ্ভুত ধরনের ব্যান্ডেজ এবং তার হ্যান্ড ব্যাগে পাওয়া গেছে প্লাস্টিক স্কিন বিশেষজ্ঞের একটা প্রেসক্রিপশন। তাতেও ব্রুনার মাকে ক্লোন-৭ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, তাকে ক্লোন-৭ বলা হচ্ছে কেন? ক্লোন মেডিসিন কেন তার টেবিলে? তার দুই বুড়ো আঙুলে কি হয়েছে? কেন তিনি প্লাস্টিক স্কিন বিশেষজ্ঞের চিকিৎসা নিচ্ছেন?'

বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে ব্রুনা ও তার বাবার মুখ। তাদের স্টেট বিক্রি, স্বাক্ষর ও টিপসহি নিয়ে সমস্যা, ক্লোন-৭, ক্লোন চিকিৎসা-এ সব কিছুই তাদের হতবাক করে দিয়েছে। কিছুক্ষণ তারা কথাই বলতে পারলো না।

অবশেষে কথা বলল আলদুনি সেনফ্রিড। বলল, 'আমার স্ত্রী,ব্রুনার মা'র সাথে এসব কোন কিছুই মিলছে না মি. আহমদ মুসা। আপনি যে বললেন, টয়লেটের টেবিলের ড্রয়ারে ওষুধ পেয়েছেন। কিন্তু কারিনা কারলিন কোন দিন ওখানে ওষুধ রাখেননি। পারিবারিক স্টেট বিক্রির কোন প্রশ্নই ওঠে না। ব্রুনার মা এমন চিন্তা করতেই পারেন না। আর ব্রুনার মা যদি স্টেট হস্তান্তর করতেই চান, তাহলে স্বাক্ষর ও টিপসই প্রব্লেম হবার কথা নয়। শুধু সমস্যা হতে পারে আমাদের

দুই সন্তান ও আমাকে নিয়ে। কারণ আমরা বেঁচে থাকা অবস্থায় তার স্টেট হস্তান্তর পূর্ণাংগ হবে না। পারিবারিক দলিলে আছে, যিনি স্টেটের মালিক হবেন, তিনি স্টেট হস্তান্তরের অধিকারী হলেও তার উত্তরাধিকারীদের সম্মতি না থাকলে স্টেট হস্তান্তর আইনসিদ্ধ হবে না।' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

আহমদ মুসা উদগ্রীবভাবে কথাগুলো শুনছিল। তার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। বলল, 'ধন্যবাদ মি. সেনফ্রিড, আমার চিন্তার সাথে আপনার কথাগুলো সংগতিপূর্ণ। তিনটি বড় বিষয় এখন আমাদের সামনে। এক, ব্রুনার মায়ের স্টেট বিক্রি করাসহ অদ্ভুত সব পরিবর্তন কেন? দুই, তার ক্লোন মেডিসিন নেয়া, প্লাস্টিক স্কিন বিশেষজ্ঞের প্রেসক্রিপশন গ্রহণ করা ও তার বুড়ো দুই আঙুলে প্লাস্টিক ব্যান্ডেজের রহস্য কি? আর তিন, স্টেট হস্তান্তরে স্বাক্ষর টিপসই নিয়ে যে সমস্যা হয়েছে, তার সাথে ব্রুনার মায়ের প্লাস্টিক স্কিন চিকিৎসা ও দুই বুড়ো আঙুলের ব্যান্ডেজের সম্পর্ক আছে কি না? আসলে এই তিনটি বিষয় মিলে একটাই মেগা সাবজেক্ট আমাদের কাছে, সেটা হলো ব্রুনার এই মা আসলে ব্রুনার মা কিনা? এই মহাপ্রশ্নের...।'

আহমদ মুসার কথার মাঝখানেই আলদুনি সেনফ্রিড বলে উঠল, 'স্যরি মি. আহমদ মুসা, ব্রুনার মায়ের অনেক পরিবর্তন হয়েছে ঠিক। কোন কারণ হয়তো এর জন্যে দায়ী। কিন্তু আপনি কি তাকে ব্রুনার মা নয় বলে সন্দেহ করেন?'

'আমি নিশ্চিত নই এখনও মি. আলদুনি সেনফ্রিড, কিন্তু এই সন্দেহের পাল্লাই আমার কাছে ভারি বেশি।' আহমদ মুসা বলল।

'কিন্তু ভাইয়া, আমার মনেও অনেক সন্দেহ, এরপরও আমি মনে করি আমার মা ঠিক আছে। কিন্তু তার ভেতরে কিছু ঘটেছে বা ঘটানো হয়েছে। আর যে কোন কারণেই হোক একটা চক্রের দ্বারা ঘেরাও। এই চক্রের হাত থেকে মাকে উদ্ধার করতে পারলে এবং তার চিকিৎসা করালেই তিনি সুস্থ হয়ে যাবেন।' বলল ব্রুনা।

'আমিও তোমাদের মত করে ভেবে আসছিলাম। কিন্তু সেই ভাবনা রাখতে পারছি না। আমার নিশ্চিতই মনে হচ্ছে, আধুনিক বিজ্ঞানের এক

অপব্যবহারের মাধ্যমে তোমার মায়ের জায়গায় অন্য কাউকে এনে বসানো হয়েছে।' আহমদ মুসা বলল।

আঁৎকে উঠে সোজা হয়েছে ব্রুনা ও তার বাবা আলদুনি সেনফ্রিড। তাদের চোখে-মুখে বিস্ময়! বলল ব্রুনা, 'মায়ের বদলে অন্য কাউকে? কিভাবে? বিজ্ঞানের অপব্যবহারটা কি?'

'এখন পর্যন্ত আমার এটা নিছকই সন্দেহ যে, তোমার এই মা তোমার আসল মায়ের ক্লোন।'

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই 'মায়ের ক্লোন?' বলে আর্ত চিৎকার করে উঠে দাঁড়িয়েছে ব্রুনা। পরক্ষণেই আবার ধপ করে বসে পড়েছে সোফায়।

আলদুনি সেনফ্রিডেরও দুই চোখ বিস্ময়ে ছানাবড়া হয়ে গেছে।

দু'জনেরই কেউ কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না।

আহমদ মুসাও কোন কথা বলল না। ওদেরকে বিস্ময়টা হজম করার সুযোগ দিল।

আলদুনি সেনফ্রিড নিরবতা ভেঙে এক সময় বলে উঠল, 'এ কি সম্ভব মি. আহমদ মুসা?'

'তাহলে আমার মা গেল কোথায়?' কান্না জড়িত কন্ঠে বলল ব্রুনা।

'ক্লোন সায়েন্স অনেক দূর এগিয়েছে। কোন বিজ্ঞানী বা কিছু বিজ্ঞানী গোপনে হয়তো একে আরও এগিয়ে নিয়েছে। তবে যা বলছি তা নিশ্চিত নয়। আরও সন্ধান করলেই তা বুঝা যাবে। কিন্তু বিরাট এক রহস্য যে ব্রুনার এই মাকে ঘিরে তৈরি হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যে দু'টি প্রেসক্রিপশনের কথা বললাম, সে দুই ডাক্তারের নামও ভুয়া হতে পারে। আমি রাতে অভিযান থেকে ফিরেই ইন্টারনেটে 'অ্যারেন্ডসী' শহরের ডাক্তারের তালিকা বের করে দেখেছি, ঐ দুই নামে কোন ডাক্তার 'অ্যারেন্ডসী'তে নেই। তবে ঐ বিষয়ের ডাক্তার আছে অ্যারেন্ডসীতে।'

'তাহলে? ডাক্তারের মাধ্যমে সন্ধান নেবার পথও তাহলে থাকল না।' বলল আলদুনি সেনফ্রিড হতাশ কন্ঠে।

‘সেপথ বন্ধ হলো বটে, অন্য পথ আল্লাহ খুলে দেবেন। আমাদের যেতে হবে অ্যারেন্ডসীতে। আমার মনে হচ্ছে, অ্যারেন্ডসীই হতে পারে কাহিনীর গোড়া।’

আলদুনি সেনফ্রিড ও ব্রুনা দু’জনেই নিরব। দু’জনেরই মুষড়ে পড়া ভাব।

আহমদ মুসাও ভাবছিল।

নিরবতা ভাঙল আহমদ মুসা। বলল, ‘মি. সেনফ্রিড, ব্রুনার মার সাথে যখন আপনার বিয়ে হয়, তখন তার বয়স কত ছিল?’

‘বিশ বছর। জার্মান স্টান্ডার্ডে আমাদের বিয়েটা বেশ আগেই হয় বলা যায়।’ বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

‘বিয়ের পর কি তিনি এমন কোন বড় অসুখে পড়েছিলেন যখন তাকে দশ পনের দিন হাসপাতালে থাকতে হয়েছে?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘না, এমন কোন অসুখ হয়নি। হামবুর্গ হাসপাতালে তার ভর্তির বিষয়টা তো আমি আপনাকে বলেছি। এর আগে কখনো তাকে কোন হাসপাতালে থাকতে হয়নি।’ বলল সেনফ্রিড।

‘কিন্তু বাবা, বিয়ের আগে মা হাসপাতাল ছিলেন বেশ কিছুদিন।’ বলল ব্রুনা।

‘হতে পারে। বিয়ের পরের কথা আমি বললাম।’

‘হামবুর্গ হাসপাতালে মা যখন ছিলেন, তখন কথায় কথfয় একদিন বলেছিলেন যে, এই হাসপাতালে আমি আর এক বার ছিলাম বন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালে সবে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলাম। অনেক পুরানো এই হাসপাতাল।’ বলল ব্রুনা।

‘তখন বয়স কত ছিল?’ জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

‘আঠার-উনিশ হবে।’ বলল ব্রুনা।

‘বন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন। কিন্তু হামবুর্গ হাসপাতালে কিভাবে এসেছিলেন?’ আহমদ মুসা বলল।

'মার কাছে শুনেছি, বন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীরা এসেছিল হামবুর্গে শিক্ষা সফরে। মা হঠাৎ বিশেষ ধরনের নিউরালজিক পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন, যার চিকিৎসায় হামবুর্গ জেনারেল হাসপাতাল ছিল স্পেশিয়ালাইজড।' বলল ব্রুনা।

'আর এবার তিনি কেন হামবুর্গ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন?' আহমদ মুসা বলল।

'হঠাৎ ঐ বিশেষ ধরনের নিউরালজিক পীড়ায় আক্রান্ত হলে তাকে হামবুর্গ জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

'এবং এই পীড়ার চিকিৎসায় হামবুর্গ জেনারেল হাসপাতাল স্পেশালাইজড।' আহমদ মুসা বলল।

'ঠিক তাই।' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

'এই দু'বার ছাড়া কি আর কখনো তিনি এ পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন?' আহমদ মুসা বলল।

'আর কখনো তার ঐ রোগ হয়নি।' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

ভ্রূকুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার। দু'বারই হামবুর্গে অবস্থানকালে তার এমন রোগ হয়েছে, যে রোগের জন্যে হামবুর্গ জেনারেল হাসপাতাল স্পেশালাইজড। এই দুই ঘটনা কি কাকতালীয়, না এর পেছনে কোন পরিকল্পনা বা ষড়যন্ত্র ছিল? ষড়যন্ত্র হলে কি ষড়যন্ত্র, কেন ষড়যন্ত্র? এর সাথে ক্লোনের কি কোন সম্পর্ক আছে? থাকলে সেটা কি, কিভাবে? হিউম্যান ক্লোনিং-এর বেশ কয়েকটি পদ্ধতি আছে। ক্লোন সম্পর্কিত তার সন্দেহ সত্য হলে সে ক্লোনটা কিভাবে হয়েছে। আহমদ মুসার মনের অদৃশ্য এক প্রান্ত থেকে একটা কথা ভেসে এল, ভেড়া 'ডলি' থেকে ক্লোন করে ১৯৯৬ সালে আরেকটা হুবহু 'ডলি' তৈরি হয়েছিল 'নিউক্লিয়ার ট্রান্সফার ক্লোন' পদ্ধতিতে, সেই পদ্ধতিই কি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে?

আহমদ মুসার মনে হলো, হ্যাঁ, এই পদ্ধতির ব্যবহার হতে পারে। কিন্তু এই বিষয় তদন্ত সাপেক্ষ। এমন দীর্ঘমেয়াদী ষড়যন্ত্র হলে তার পটভূমি কি ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন রয়েছে। তবে বড় একটা কিছু ঘটেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আহমদ মুসা গভীর ভাবনায় ডুবে গিয়েছিল।

ব্রুনা অস্থির হয়ে কথা বলতে গিয়েছিল।

তার বাবা আলদুনি সেনফ্রিড ইংগিতে নিষেধ করেছে সংগে সংগেই। এ কয়েক দিনে আলদুনি সেনফ্রিড আহমদ মুসার এমন ভাবনায় ডুবে যাওয়ার সাথে পরিচিত হয়েছে। এই সময়টা আহমদ মুসার জন্যে মূল্যবান।

আহমদ মুসাই এক সময় চোখ তুলে তাকাল আলদুনি সেনফ্রিডের দিকে। বলল, 'মি. সেনফ্রিড, ব্রুমসারবার্গের কাজ আপাতত আমাদের শেষ। আমাদের পরবর্তী কাজ 'অ্যারেন্ডসী'তে। সেখান থেকে হামবুর্গেও মাঝে মাঝে যাওয়ার দরকার হবে। আজ রাতেই আমরা যাত্রা করব 'অ্যারেন্ডসী'র উদ্দেশ্যে।'

'ওখানে কি কাজ হবে আমাদের?' আলদুনি সেনফ্রিড বলল।

'ঐ দুই ডাক্তারের খোঁজ করা। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে রহস্যের জট ওখানেই থাকতে পারে! হামবুর্গ হাসপাতাল থেকেই যদি ঘটনার শুরু হয়ে থাকে তাহলে ঘটনার কেন্দ্র ওখানেই।' বলল আহমদ মুসা।

'আমরা কি এ বাড়ি ছেড়ে দেব?' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

'না, আমাদেরই থাকবে। আগাম কয়েক মাসের ভাড়া ওদের দিয়ে দিন। ওদের বলুন, বাইরে একটু কাজ আছে। কাজ শেষে আমরা ফিরে আসব।'

'ঠিক আছে মি. আহমদ মুসা। আমি সব ব্যবস্থা করছি।' আলদুনি সেনফ্রিড বলল।

'ঠিক আছে। আমি তাহলে উঠছি।' বলে আহমদ মুসা উঠতে গেল। ব্রুনা বলে উঠল, 'ভাইয়া, আমার আসল মা কি বেঁচে আছেন, যদি ইনি আমার মা না হন?'

আহমদ মুসা তাকাল ব্রুনার দিকে। ব্রুনার চোখ অশ্রুসজল। আহমদ মুসা বলল নরম কন্ঠে, 'তুমি এসব চিন্তা করে মন খারাপ করো না। আমরা যেসব ভাবছি সবই ধারনার উপর। কোন কিছুই এখন নিশ্চিত নয়। আল্লাহ না করুন ইনি যদি তোমার মা না হন, তাহলে আমি বলছি, আমার মন বলছে, তোমাদের স্টেট হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত তিনি বেঁচে থাকবেন।

'আর এর মধ্যে যদি স্টেট হস্তান্তর হয়ে যায়?' বলল ব্রুনা।

আহমদ মুসা সংগে সংগে উত্তর দিল না। ভাবছিল সে। ব্রুনার প্রশ্নটায় যুক্তি আছে। অবশেষে আহমদ মুসা বলল, 'আল্লাহ আমাদের সাহায্য করছেন। ভবিষ্যতেও তিনি আমাদের সাহায্য করবেন। আমরা তাঁর উপর ভরসা করছি ব্রুনা।'

'কোন কিছু মানুষের যখন সাধ্যের মধ্যে না থাকে, তখনই তো তাঁর সাহায্য আসে, আপনি বলেছেন। নিশ্চয় তিনি আমাদের সাহায্য করবেন।' বলল ব্রুনা অশ্রুরুদ্ধ কন্ঠে।

'আমিন!' বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

ব্রুনা ও তার বাবাও উঠল।

# ৭

ব্রুনার মায়ের ঘরের সামনের লাউঞ্জ।

লাউঞ্জের সোফায় বসে আছে ব্রুনার মা কারিনা কারলিন, তার প্রেমিক কনরাড এবং এই বাড়িতে অবস্থানকারী ব্ল্যাক লাইট-এর আরও দু'জন কর্মকর্তা।

তাদের সবার চোখে-মুখে উৎকন্ঠা।

সেদিন রাতে এ বাড়িতে কে প্রবেশ করেছিল, সে বাইরের বা ভেতরের কেউ কিনা, কি জন্যে প্রবেশ করেছিল, কোথায় কোথায় গেছে, এসব ব্যাপারে বিশদ তদন্ত হয়েছে গতকাল সারা দিন ধরে। ব্ল্যাক লাইটের নিজস্ব বিশেষজ্ঞের সাথে বাইরের বিশেষজ্ঞও আনা হয়েছিল। কারিনার গোটা ঘর টয়লেটসহ সন্দেহজনক বাড়ির সকল স্থানের জুতা ও হাতের আঙুলের ছাপ নেয়া হয়েছে অত্যাধুনিক কেমিকেল ও অত্যাধুনিক মাইক্রো লেন্স ক্যামেরা ব্যবহার করে। খুঁটে খুঁটে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে সকলকে, বিশেষ করে প্রহরীদের।

এই তদন্তের আজ রেজাল্ট আসবে।

রেজাল্ট দেবেন স্বয়ং ব্ল্যাক বার্ড।

রেজাল্টটি কার মাধ্যমে আসবে কিভাবে তা তারা জানে না। তাদের নেতা ব্ল্যাক বার্ডের স্বাভাবিক আওয়াজ তাদের কেউ শোনেনি । দেখেনিও কেউ তাকে। সবার কাছে সে অদৃশ্য এক মহাশক্তি। সবার কাজ সে দেখে, সবার কথাও সে শোনে। কেউ যেহেতু তাকে দেখেনি, কেউ তার কথা শোনেনি, তাই সবাই আতংকে থাকে তাদের চারপাশের যে কেউ হতে পারে তাদের সেই নেতা। সবাই তাই সাবধানে কথা বলতে, কাজ করতে ও চলতে-ফিরতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। কেউ কখনো বেফাঁস কাজ করলে, কথা বললে তার ডাক পড়ে কোর্ট মার্শালে। তারপর সে আর ফিরে আসে না। ক্ষমা বলে কোন শব্দ নেই ব্ল্যাক বার্ডের অভিধানে। তবে কর্মীদের পারিশ্রমিক দেয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত হাতখোলা। এখানে সাধারণ কর্মীরাও জার্মানির মন্ত্রীদের চেয়ে বেশি বেতন পায়। এ কারণেই সব কর্মী

কাজে আন্তরিক। যে কোন ঝুঁকি নিয়ে তারা কাজ করে। কেউ দায়িত্ব পালনকালে নিহত হলে তার পরিবার প্রতিপালনের সব দায়িত্ব নেয়া হয়। এই কারণে ব্ল্যাক বার্ডের কঠোর সাজাকে বিনা বাক্যে মেনে নেয় সব কর্মী।

উপস্থিত যারা লাউঞ্জে, তাদের সবাই অপেক্ষা করছে রেজাল্টের।

কারিনা কারলিন তার হাতঘড়ির দিকে তাকাল। ১১টা বাজতে ৫ মিনিট বাকি। ঠিক ১১ টায় রেজাল্ট আসবে বলে জানানো হয়েছে। তাহলে আর ৫ মিনিট বাকি, কেউ তো এল না। কখন আসবে, কখন রেজাল্ট দেবে!

কারিনা কারলিন তাকাল কনরাডের দিকে।

আর মাত্র দু'মিনিট বাকি।

কনরাড তার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আছে। তার কথার অন্যথা তিনি করেন না।

এগারটা বাজল।

ঘড়ির ঘন্টার কাঁটা ১১টা এবং মিনিট ও সেকেন্ডের কাঁটা ১২টায় পৌঁছার সংগে সংগে কারিনা কারলিন ও কনরাডর সামনে লাউঞ্জের দেয়াল কথা বলে উঠল।

কারিনা কারলিন, কনরাড সকলের বিস্ময়বিমূঢ় চোখ আঠার মত গিয়ে দেয়ালের উপর আটকে গেল। দেয়ালের ভেতর থেকে ধাতব কন্ঠ ভেসে এল, 'কনরাড, লাউঞ্জের দুই দরজা বন্ধ করে দাও। লাউঞ্জকে সাউন্ডপ্রুফ করা হয়েছে দরজা খোলা রাখার জন্যে নয়।

কনরাড দৌড়ে গিয়ে দুই দরজা বন্ধ করে দিয়ে এল। দেয়ালের কন্ঠ আবার কথা বলে উঠল, 'কক্ষের সবাই শোন, সেদিন রাতে বাইরের কেউ একজন বাড়িতে ঢুকেছিল। কোন দিক দিয়ে ঢুকেছিল তার কোন হদিস করা যায়নি। প্রহরীদের ঘর, লাউঞ্জ, মধ্যবর্তী করিডোর এবং কারিনা কারলিনের ঘর ও টয়লেট ছাড়া আর কোথাও তার জুতার ছাপ ও ফিংগার প্রিন্ট পাওয়া যায়নি। কি করে সে এভাবে ভেতরে উড়ে এল সে রহস্যের উন্মোচন হয়নি। ভেতরের কেউ যে এর সাথে জড়িত নয় ফিংগার প্রিন্ট ও জুতার ছাপ থেকে তা প্রমাণিত হয়েছে। বাড়ির কিছুই খোয়া যায়নি। প্রমাণিত হয়েছে সে অন্য কোন ঘরে কোন কিছুতেই হাত

দেয়নি। শুধু কারিনা কারলিনের বেডসাইড টপ টেবিলের ড্রয়ার হাতড়েছে, কারলিনের হ্যান্ড ব্যাগ খুঁজেছে, হ্যান্ড ব্যাগের ভেতরের প্রেসক্রিপশন সে হাতে নিয়েছে, টয়লেটের টেবিলের দুই ড্রয়ারই খুলেছে সে। টেবিলের ওষুধগুলোর কোন কোনটি সে হাতে নিয়েছে। ড্রয়ারের ভেতরে ফোল্ডার ওয়ালেটটা সে হাতে নিয়েছে, খুলেছে, ভেতরের আরেকটা প্রেসক্রিপশনও হাতে নিয়েছে। কিন্তু কিছুই নেয়নি সে। কারিনা কারলিনের বেডসাইড টেবিলের ড্রয়ার ও তার হ্যান্ড ব্যাগ মিলে লক্ষাধিক মার্ক ছিল। কিন্তু টাকায় সে হাত দেয়নি।

এ থেকে সুস্পষ্ট, যে এসেছিল তার একমাত্র টার্গেট ছিল কারিনা কারলিনের পরিচয় সন্ধান করা, তার সম্পর্কে জানা। যেসব জিনিস সে হাতে নিয়েছে, দেখেছে তাতে কতটা কি বুঝেছে সে, তা জানা যাচ্ছে না। কিন্তু প্রমাণ হলো যে, কারিনা কারলিনই এখন তাদের টার্গেট। তারা কারিনা কারলিনকে পুরোপুরিই সন্দেহ করেছে। তার বা তাদের পরবর্তী টার্গেট কি জানা যাচ্ছে না। তবে আমাদের করণীয় সম্পর্কে এখনি সচেতন হতে হবে। প্রথম কাজ হলো, কারিনা কারলিনের নিরাপত্তা। ধরে নিতে হবে কারিনা কারলিন যখন তাদের টার্গেট, তখন তাকে কিডন্যাপ তারা করতে পারে সব জানার জন্যে। সুতরাং এই মুহূর্তেই তাকে শিফট করতে হবে আমাদের এক নাম্বার স্থানে। তার স্টেট হস্তান্তরের দিনই শুধু তাকে নিয়ে যাওয়া হবে। দ্বিতীয় কাজ হলো, জুতার ছাপ ও ফিংগার প্রিন্ট পাঠানো হলো। লোকটিকে খুঁজে বের করতেই হবে। ব্রুমসারবার্গের প্রতিটি বাড়ি খুঁজতে হবে। তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। কারিনা কারলিনের মেয়ে ব্রুনা ও তার বাবা আলদুনি সেনফ্রিডকেও খুঁজে বের করলেই লোকটিকে খুঁজে বের করা যাবে। লোকটি যে নকল আহমদ মুসাই হবে, সে আশংকাই বেশি। তৃতীয় কাজ হলো, কারলিনের স্টেট হস্তান্তরের কাজ দ্রুত করা। আর চতুর্থ কাজের কথা বলছি কারলিনকে, তার ঘরের ডিজিটাল লকের কোড শত্রুপক্ষ জানল কি করে! এটা একমাত্র কারিনা কারলিন ছাড়া এ বাড়ির আর কেউ জানে না। তাহলে কোডটা কেমন করে গেল তাদের হাতে, সেটা কারলিন কিছু জানে কিনা। কারও কাছে কোডটার কথা সে বলেছে কিনা। পরবর্তী বিষয় হলো, সেদিনের ঘটনার

অনুসন্ধান অব্যাহত থাকবে। কি করে সে বাড়িতে ঢুকল, কোন পথ দিয়ে ঢুকল? তা খুঁজে বের করতে হবে। কথা শেষ। কথাগুলো মনে রেখ।'

দেয়ালের কন্ঠ বন্ধ হয়ে গেল।

স্তম্ভিত সবাই গোগ্রাসে গিলছিল দেয়ালের কথাগুলো।

কথা বন্ধ হয়ে গেলেও সবাই নির্বাক।

মাথা নিচু করে বসেছিল কারিনা কারলিন।

অবশেষে নিরবতা ভাঙল কারিনা কারলিনই। ধীরে ধীরে মাথা তুলে বলল সে, 'ডিজিটাল লকের কোড ভেঙে ঘরে কি করে কোন মানুষ ঢুকতে পারে?

সেনফ্রিড ও ব্রুনারা চলে যাবার পর আমার ঘরের ডিজিটাল লকের কোড চেঞ্জ করা হয়েছে। এর কোড আমি ও বস ছাড়া আর কেউ জানে না। তাহলে কেউ ঘরে ঢুকল কি করে?'

'ঘরে কেউ ঢোকা যখন প্রমাণিত হয়েছে, তখন কেউ কোড ভেঙেই সে ঘরে ঢুকেছে। বুঝা যাচ্ছে কারলিন যিনি ঘরে ঢুকেছেন তিনি অসাধারণ লোক। দেখ, লক্ষাধিক মার্ক হাতের কাছে পেয়েও যে ছোঁয় না সে অসাধারণ নি:সন্দেহে।' বলল কনরাড।

'ভয়ে আমার বুক কাঁপছে। ইচ্ছা করলেই তো সে আমাকে কিডন্যাপ করতে পারতে! ঠিক সিদ্ধান্ত হয়েছে। এখানে আমি আর দু'দণ্ডও থাকতে চাই না। একটা কথা ভাবছি, আমাদের সাথে টক্কর দিতে এসেছে ওরা কারা? একা ঐ লোকটির পক্ষে তো এটা সম্ভব নয়। আর সেনফ্রিড, ব্রুনারা তো এসব ক্ষেত্রে অপদার্থ। তাহলে কাদের ওরা সাহায্য নিল?' কারিনা কারলিন বলল।

যাদেরই সাহায্য নিক কোন লাভ হবে না। আর ক'টা দিন। স্টেটটা হস্তান্তর হয়ে গেলে তুমি আড়ালে চলে যাবে। তখন ওরা দৌড়াদৌড়ি করে কিছু করতে পারবে না। আর এর মধ্যে দেখো, ব্রুনা ও তার বাপকে আমরা ধরে ফেলব। কয়েক বার হাত ফসকে বেরিয়ে গেছে। আর পারবে না।'

কারিনা কারলিন কিছু বলার জন্যে হাঁ করেছিল। সে সময়েই তার মোবাইল বেজে উঠল। মোবাইলের স্ক্রীনের দিকে একবার তাকিয়েই ভীত-

চকিতভাবে নিজের অজান্তেই যেন দাঁড়িয়ে গেল। আর সেই সাথে মোবাইলে সে বলছিল, 'ইয়েস স্যার, আমি বিন্দী ব্রিজিট। কোন হুকুম স্যার?'

'তুমি বিন্দী ব্রিজিট নও, তুমি কারিনা কারলিন। দ্বিতীয়বার এই ভুল করলে শুট করব।' বলল ওপার থেকে ব্ল্যাক বার্ড।

ভয়ের প্রবল চাপেই হয়তো সে ধপ করে দেয়াল ধ্বসে পড়ার মত বসে পড়ল। বলল কম্পিত কন্ঠে, 'ইয়েস স্যার, আপনার ইচ্ছার অধীন আমরা।'

'শোন, আমাদের গোয়েন্দা সূত্রে আমি খবর পেয়েছি, আলদুনি সেনফ্রিড, ব্রুনা ও তাদের সাথের সেই কালপ্রিটটি গত রাত ১২টার দিকে ব্রুমসারবার্গ থেকে রাইন পার হয়ে উত্তরের হাইওয়ে ধরে যাত্রা করেছে। রাইনের সংশ্লিষ্ট টোল অফিস ও আমাদের অফিস থেকে জানা গেছে সেনফ্রিডদের গাড়ি রাইন পার হয়েছে। আমি আশংকা করছি তারা অ্যারেন্ডসীর দিকে আসছে কিনা। অ্যারেন্ডসীর নাম তোমার প্রেসক্রিপশনে দুই ডাক্তারই ভুল করে লিখে দিয়েছিল।' বলল ও প্রান্ত থেকে ব্ল্যাক বার্ড।

'তাহলে আপনার নির্দেশ স্যার?' কারিনা কারলিন বলল।

'তুমি ও কনরাড আজকেই হামবুর্গ চলে এস। তোমার আঙুলের আর কতটুকু প্রব্লেম আছে তা দেখে তাড়াতাড়ি আঙুল রেডি করে ফেলা দরকার। কোনও ভাবেই আর সময় নেয়া যাবে না। ঐ দুই বাপ-বেটিকে যদি এই মুহূর্তে ধরা নাও যায়, তবু স্টেটের হস্তান্তর করে ফেলতে হবে। কথা শেষ।' ও প্রান্ত থেকে কল অফ হয়ে গেল।

মুহূর্ত কয়েক আশ্বস্ত কারিনা কারলিন তাকাল কনরাডের দিকে। বলল, 'আজই আমদের হামবুর্গ যাত্রা করতে হবে।'

'কোন খারাপ খবর আছে কি?' কনরাড বলল।

'খারাপ নয়, তবে আমার মনে হচ্ছে আমাদের চেয়ে দ্রুত চলছে আমাদের শত্রুরা। আর ঘটনার কেন্দ্র আমাদের কেন্দ্রের দিকেই আগাচ্ছে মনে হচ্ছে। রাইনের তীর থেকে ঘটনা যাচ্ছে অ্যারেন্ডসীর দিকে।' বলল কারিনা কারলিন।

বলে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'চিন্তা কর না কারিনা কারলিন, রাইনের চেয়ে অ্যারেন্ডসী অনেক বেশি শীতল।' দু'জনেই লাউঞ্জ থেকে বেরুল।

পরবর্তী বই

# রাইন থেকে অ্যারেন্ডসী

**কৃতজ্ঞতায়ঃ**

1. Zareen Firdegar Chowdhury
2. Md. Jafar Ikbal Jewel

সাইমুম-৫৩

# রাইন থেকে অ্যারেন্ডসী

আবুল আসাদ

# ১

রাইন পার হয়ে এগিয়ে চলছিল আহমদ মুসার গাড়ি। আহমদ মুসা ব্রুমসারবার্গ থেকে রাইনের তীর বরাবর এগিয়ে কবলেঞ্জের ব্রীজ দিয়ে রাইন পার হয়েছিল। উঠেছিল ফ্রাংকফুর্ট-বন হাইওয়েতে।

আহমদ মুসার টার্গেট ক্যাসেল, হ্যানোভার হয়ে অ্যারেন্ডসীর দিকে যাওয়া। এর জন্যে ফ্রাংকফুর্ট-ক্যাসেল কিংবা বন-ক্যাসেল হাইওয়েটা বেশি সুবিধাজনক। কিন্তু আহমদ মুসা এই দুই হাইওয়ে এড়িয়ে ফ্রাংকফুর্ট-বন হাইওয়ে আড়াআড়িভাবে ক্রস করে আঞ্চলিক রোড ধরে এগিয়ে চলছে ক্যাসেল-এর দিকে।

হাইওয়ে থেকে এ রাস্তা অনেক ভিন্ন। গাড়ির সেই ভিড় এখানে নেই, সেই স্পিডও কোন গাড়ির নেই। ড্রাইভ তাই এখানে অনেকটাই চাপবিহীন।

বামে টার্ন নিতে গিয়ে আহমদ মুসা রিয়ারভিউ মিররের দিকে তাকাল। তাকাতে গিয়ে নজর পড়ল ড্যাশবোর্ডের উপর রাখা একগুচ্ছ গোলাপের উপর।

গোলাপ গুচ্ছটি তার মনকে টেনে নিয়ে গেল এক তরুণের দিকে। রাত ১২টার দিকে যখন তারা বাড়ি থেকে বের হচ্ছিল গাড়ি নিয়ে সে সময় দেখা এই তরুণের সাথে।

একজন ফাদারের পোশাক পরা আলদুনি সেনফ্রিড গাড়ি থেকে নেমে গেট লক করছিল। আহমদ মুসা বসেছিল ড্রাইভিং সিটে।

সেই তরুণটি আহমদ মুসার পাশের জানালায় এসে দাঁড়িয়ে তুলে ধরে ঐ ফুলের গুচ্ছ।

আহমদ মুসা তরুণটির দিকে একবার তাকিয়ে ফুলের গুচ্ছটি হাত বাড়িয়ে নিয়ে নিল।

গোলাপের গুচ্ছ দেখেই আহমদ মুসার মন কথা বলে উঠেছিল।

ফুলের গুচ্ছ হাতে নিয়েই তাকিয়েছিল আহমদ মুসা গুচ্ছের মধ্যে একটা চিরকুটের সন্ধানে। তার সাথে সাথে মন একটা প্রশ্নও করেছিল, এ সময় ওদের চিরকুট আসবে কেন? তারা তো যাচ্ছে এখন অ্যারেন্ডসীতে।

ফুলের গুচ্ছের মধ্যে একটা লাল চিরকুটের উপর নজর পড়ল আহমদ মুসার।

তাড়াতড়ি চিরকুটটি তুলে নিয়ে পড়ল আহমদ মুসা।

একটি বাক্যমাত্র লেখা, 'মিশন অন্য কোথাও যাচ্ছে শুনেছি, জানা গেলে মন্দ কিছু হতো না।'

একরাশ বিস্ময় আহমদ মুসাকে ঘিরে ধরল। আমরা অন্য কোথাও যাচ্ছি, এরা জানতে পারল কি করে!

আমরা তিনজন শুধু জানি। আমরা কেউ তাদের বলিনি। এটা নিশ্চিত। তাহলে এই বাড়ির মালিকের কাছ থেকে জানতে পেরেছে? আলদুনি সেনফ্রিড কিছুদিনের জন্যে বাড়ির বাইরে যাওয়ার বিষয়টা বাড়ির মালিককে বলার কথা, নিশ্চয় বলেছে। তার কাছ থেকে এরা জানতে পেরেছে। আহমদ মুসার মনে পড়ল, এ বাড়ির খবর তো এরাই আমাদেরকে দিয়েছে। বাড়ির মালিকের সাথে এদের সম্পর্ক কি? আসলে কারা এরা? বাড়ির মালিক কি এদের কেউ?

এসব প্রশ্নের কোনটিরই উত্তর জানা নেই আহমদ মুসার। কিন্তু ওরা যা জানতে চেয়েছে, তা ওদের জানাব কি করে?

তাকাল আহমদ মুসা জানালার বাইরের দিকে। বিস্ময়ের সাথে সে দেখল, দু'ধাপ পেছনে সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তরুণটি। আহমদ মুসা মনে মনে

নিশ্চিত ছিল যে সে চলে গেছে। কারণ ইতিপূর্বে কোন সময়ই ফুলের গুচ্ছ হাতে দেয়ার পর কেউ দাঁড়ায়নি, দ্রুত সরে গেছে।

এ তরুণটি দাঁড়িয়ে আছে কেন? উত্তর নেবার জন্যে কি? তাই হবে। ভাবল আহমদ মুসা।

কিন্তু গন্তব্যের কথা কি ওদের বলা ঠিক হবে? বলা যাবে না কেন? ওরা যে অমূল্য সাহায্য করেছে, সেটা ওদের বিশ্বস্ততার প্রমাণ। যা জানতে চাচ্ছে ওরা, এটা তাদের বলা যায়।

আহমদ মুসা ইশারা করে ডাকল তরুণটিকে।

এল তরুণটি।

'ধন্যবাদ তোমাদের।' বলল আহমদ মুসা যুবকটিকে উদ্দেশ্য করে।

'ধন্যবাদ স্যার।' তরুণটি বলল।

'ধন্যবাদ কেন, আমি বা আমরা তোমাদের জন্যে কিছু করিনি।' বলল আহমদ মুসা।

'আপনি সবার জন্যে করেন।'

বলে একটু থেমেই সে বলল, 'আমি যেতে পারি স্যার?'

'তুমি অ্যারেন্ডসী চেন? বলতে পার সোজাপথ কোনটা?' বলল আহমদ মুসা।

'ফ্রাংকফুট-ক্যাসেল-হ্যানোভার হয়ে অ্যারেন্ডসী এবং বন-হ্যানোভার-অ্যারেন্ডসী এই দুই হাইওয়ের মধ্যে ফ্রাংকফুট হাইওয়ে বেশি সংক্ষিপ্ত। কিন্তু আরও সংক্ষিপ্ত পথ হলো কবলেঞ্জ থেকে ফ্রাংকফুট-বন হাইওয়ের যেখানে উঠবেন সেখান থেকে রিজিওনাল একটা সড়ক বহু গ্রাম-গঞ্জ মাড়িয়ে ক্যাসেল হয়ে হ্যানোভারকে বাঁয়ে রেখে স্যাক্সনীর ভেতর দিয়ে অ্যারেন্ডসী গেছে। এই পথে হাইওয়ের গতি নেই, কিন্তু জার্মানীর হৃদয় মানে গ্রামীণ জার্মানীর আনন্দ পাবেন।'

'ধন্যবাদ।' বলল আহমদ মুসা।

'ওয়েলকাম, স্যার। আমি আসি।' তরুণটি বলল।

'জবাব নিলে না?' মুখে মিষ্টি হাসি টেনে বলল আহমদ মুসা।

‘জবাব পেয়ে গেছি স্যার, ধন্যবাদ।’বলল তরুণটি।

‘আমার বিরাট একটা কৌতুহল।’ বলল আহমদ মুসা।

‘স্যরি, সেটা মেটাবার সাধ্য আমার নেই স্যার।’ বলল তরুণটি।

‘নো স্যরি, ওকে। কিন্তু একটা কথা বলো, বাদেন অঞ্চলের হের হেনরীকে তোমরা চেন?’ আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসার কথা শেষ হওয়ার আগেই তরুণটি ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটা শুরু করে দিয়েছে। আহমদ মুসার ঠোঁটে এক টুকরো মিষ্টি হাসি ফুটে উঠল।

‘এভাবে ছেলেটি চলে গেল কেন?’ বলল ব্রুনা।

‘ঠিকভাবেই গেছে ব্রুনা। তার মিশন শেষ করেই সে চলে গেছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ঠিক ভাইয়া, তার জবাব সে নিয়ে গেছে। কিন্তু জবাব তো দিয়ে গেল না।’ বলল ব্রুনা।

‘আমার মনে হয়, জবাব সে দিয়েও গেছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘জবাব দিয়ে গেছে? কিন্তু আপনার সুনিদিষ্ট জিজ্ঞাসার কোন জবাব না দিয়েই তো সে চলে গেল!’ বলল ব্রুনা।

‘তার নিরবে চলে যাবার মধ্যেই জবাব আছে। সরাসরি জবাব দেয়ার এখতিয়ার সম্ভবত তার ছিল না।’ আহমদ মুসা বলল।

‘জবাবটা কি? হের হেনরীকে তারা চেনে, মানে তারা সবাই এক?’ বলল ব্রুনা।

‘আমি তাই মনে করছি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তার মানে হের হেনরী তার কথা রেখেছেন। তার লোকেরা আমাদের খোঁজ-খবর রাখছে। তারা আমাদের অশেষ উপকারও করেছে।’ বলল আলদুনি-সেনফ্রিড, ব্রুনার বাবা।

‘ঠিক বলেছেন মি. সেনফ্রিড।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ওদের কাজে আমি বিস্মিত হয়েছি। ওদের সম্পর্কে আপনার ধারণা কি মি. আহমদ মুসা?’ জিজ্ঞাসা আলদুনি সেনফ্রিডের।

‘ওরা সংঘবদ্ধ ও নিবেদিত। ওদের সম্পর্কে আমি যা ভেবেছিলাম তার চেয়েও ওরা বুদ্ধিমান ও দক্ষ। আমাকেও ওরা বিস্মিত করেছে মি. সেনফ্রিড।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আপনি কি মনে করেন, স্যাক্সন ধর্মনেতা হেনরী আমাদেরকে সাহায্যের এই ব্যবস্থা করেছেন?’ বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

‘আমি নিশ্চিত নই। কিন্তু তিনি ছাড়া বিকল্প কাউকে দেখছিও না। যাই হোক, আমরা খুশি যে একটা অদৃশ্য সাহায্যকারীর হাত আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে।’

বলে আহমদ মুসা নড়ে-চড়ে বসল তার সিটে। সা্মনেই বড় একটা বাঁকের ইনডিকেটর।

স্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে গতিটাকে অ্যাডজাস্ট করে নিল আহমদ মুসা।

আলদুনি সেনফ্রিড ও ব্রুনাও সামনের দিকে তাকিয়েছে। তারাও আর কোন কথা বলল না।

চলছে গাড়ি, যেমনটা আশা করা হয়েছিল তার চেয়ে অনেকটাই দ্রুতবেগে।

ক্যাসেল পেরিয়ে হ্যানোভারকে বামে রেখে লোয়ার স্যাক্সন ও স্যাক্সন স্টেটের মিশ্র এলাকার মধ্যে দিয়ে ছুটে চলছে আহমদ মুসাদের গাড়ি।

‘মি. আহমদ মুসা আমরা জার্মানীর আরেক স্যাক্সন এলাকার মধ্য দিয়ে চলছি। এটা জার্মানীর স্যাক্সন স্টেট। পাশেই লোয়ার স্যাক্সন এলাকা। রাইন এলাকা রোমানদের দখলে গেলে লোয়ার রাইনের স্যাক্সন পপুলেশনের বিরাট অংশ উত্তর জার্মানীর জলাভুমি ও বনাঞ্চলে মাইগ্রেট করতে বাধ্য হয়। বাদেনের কোন কোন অঞ্চলের মত এই অঞ্চলেও জার্মানীর আদি পপুলেশনের বাস। এ অঞ্চলেও রয়েছে জার্মানীর অনেক আদি পরিবারের মানুষ।’ বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

‘ভালোই হবে যদি এখানে আর কোন হের হেনরীর সাথে দেখা হয়।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ভাইয়া, এই অঞ্চলে ক্রুসেড ফেরত ‘নাইট’দের অনেক উত্তরপুরুষের বাস। এদের বাস এক সময় ছিল রাইন তীরের দূর্গ ও প্রাসাদগুলোতে। কিন্তু এরাও এদের স্যাক্সন বৈশিষ্ট্য ধরে রাখতে গিয়ে বাধ্য হয় মাইগ্রেট করতে।’ বলল ব্রুনা।

‘ধন্যবাদ ব্রুনা। জার্মানী সত্যিই এক সমৃদ্ধ ইতিহাসের দেশ। ইতিহাসকে জার্মানরা রক্ষা করে চলে বলেই ইতিহাসও জার্মাকে রক্ষা করে আসছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ইতিহাসই জার্মানদের শক্তির সবচেয়ে বড় উৎস, ভাইয়া।’ বলল ব্রুনা।

‘সব জাতির জন্যেই এটা সত্য ব্রুনা। যে জাতির ইতিহাস মানে অতীত নেই, তার ভবিষ্যৎ ও থাকে না।’ আহমদ মুসা বলল।

কথা বলার সময় ক্লাইমেট ইন্ডিকেটরের উপর নজর পড়েছিল আহমদ মুসার। দেখল, বাইরের আবহাওয়া দ্রুত খারাপের দিকে যাচ্ছে। প্রবল বৃষ্টি আসন্ন। তার সাথে প্রবল বাতাসেরও ফোরকাস্ট রয়েছে। সংগে সংগেই আহমদ মুসা বলে উঠল, ‘মি. সেনফ্রিড, যাত্রা শুরুর আগে আপনি বলেছিলেন, মে মাস আপনাদের এখানে সুন্দর আবহাওয়ার মাস। কিন্তু দেখুন ঝড়-বৃষ্টি আসছে।’

‘হ্যাঁ, মি. আহমদ মুসা। এখনও বলছি, আমি ঠিকই বলেছি। এটাই সাধারণভাবে সত্য। কিন্তু জার্মানীর আবহাওয়া বলা হয়ে থাকে অস্থিতিশীল ও আনপ্রেডিকটেবল। যে কোন সময় যা কিছু জার্মানীতে ঘটে যেতে পারে। হয়তো সেটাই ঘটতে যাচ্ছে।’ বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

বাইরে বাতাস বাড়তে শুরু করেছে। বৃষ্টিও দু’এক ফোঁটা করে পড়ছে। বাইরের দৃশ্য এখনও খুব স্পষ্ট নয়। প্রায় ৫০ কিলোমিটার আগে আহমদ মুসা গাড়ি দাঁড় করিয়ে ফজর নামাজ পড়ে নিয়েছে। এতক্ষণে সূর্য ওঠার কথা। মেঘ আর কুয়াশার কারনেই বাইরের এই অন্ধকার।

রাস্তায় গাড়ি তেমন একটা নেই।

রাতের চেয়ে গাড়ির স্পিড কিছুটা বাড়িয়ে দিয়েছে আহমদ মুসা।

বৃষ্টি কিছুটা বেড়েছে।

মোটামুটি ফাঁকা রাস্তা ধরে অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলছে আহমদ মুসার গাড়ি। সামনেই একটা রাস্তার মোড়।

পাশ কাটিয়ে আসা ৫০ কিলোমিটার বামের প্রধান শহর হ্যানোভার থেকে একটা সড়ক এই মোড়ে এসে মিশেছে।

মোড়ে পেট্রোল পাম্প, পুলিশ ফাঁড়িসহ কিছু দোকান রয়েছে।

কিন্তু সেখানেও কোন লোক দেখা যাচ্ছে না। আসন্ন ঝড়-বৃষ্টির মুখে সবাই রাস্তা-ঘাট থেকে সরে গেছে। আর জার্মানীর আবহাওয়া সাধারণভাবে পূর্বাভাসযোগ্য না হওয়ার কারণে মানুষ ঝড়-বৃষ্টি, তুষারপাত ইত্যাদির প্রথম অবস্থায় অনেকটাই সাবধান হওয়ার চেষ্টা করে।

একদম রাস্তার সাথে লাগোয়া ছোট বাজারের মত জায়গাটার নাম খুঁজছিল আহমদ মুসা।

পথের পাশের জায়গাগুলোর যতটা সম্ভব নাম জানা এবং স্মরণে রাখার চেষ্টা আহমদ মুসার পুরানো অভ্যেস।

জায়গাটার নাম খুঁজতে গিয়েই আহমদ মুসা দেখতে পেল পেট্রোল পাম্পের ওপাশে রাস্তার ধার ঘেঁষে একটা ট্যাক্সির সামনে দাঁড়িয়ে একজন মুখ ঘুরিয়ে আহমদ মুসাদের গাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে। রেইনকোট গায়ে তার। ভিজে গেছে। দেহের সাইজ দেখে সে যে মেয়ে তা নিশ্চিত মনে হচ্ছে। ট্যাক্সিটি কি খারাপ? বিপদে পড়েছে কি সে? বুঝাই যাচ্ছে গাড়ির খোঁজে সে দাঁড়িয়ে আছে। খুব বিপদে না পড়লে আসন্ন ঝড়-বৃষ্টির মুখে সে এভাবে দাঁড়িয়ে গাড়ির খোঁজ করতো না।

আহমদ মুসা গাড়ি তার পাশে নিয়ে দাঁড় করাল। গাড়ির জানালা খুলে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'প্লিজ ম্যাডাম, কোন সাহায্যে আসতে পারি?'

মেয়েটি আহমদ মুসার দিকে একবার তাকিয়ে বলল, 'ধন্যবাদ স্যার, আমার ভাড়া করা ট্যাক্সিটি খারাপ হয়ে গেছে। গ্যারেজে নেয়া ছাড়া ঠিক করা যাবে না। কিন্তু আমার জরুরি প্রয়োজন। অবিলম্বে আমাকে বাড়িতে পৌঁছতে হবে। এসব লোকাল রোডে বাসের নিয়মিত সার্ভিস নেই।'

‘ওকে, ম্যাডাম, আপনি কোথায় যাবেন? কোথায় আপনার বাড়ি?’ বলল আহমদ মুসা।

‘সালজওয়াডেল।’ বলল মেয়েটি।

‘আমরা যাচ্ছি অস্টারবার্গ। এটা গেছে হেভেলবার্গের দিকে।’ আহমদ মুসা বলল। সে ইচ্ছা করেই ‘অ্যারেন্ডসী’র নাম গোপন করল।

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা আবার বলে উঠল, ‘আপনি তাহলে তো ঐ এলাকার? আপনি লিংকটা বলতে পারবেন।’

‘স্যার, অস্টারবার্গ, হেভেলবার্গের পথেই সালজওয়াডেল। তবে সামান্য একটু ঘোরা পথে।’ বলল মেয়েটি।

আহমদ মুসা তাকাল আলদুনি সেনফ্রিড ও ব্রুনাদের দিকে।

‘ঠিক আছে মি. আহমদ মুসা, তাকে লিফট আমরা দিতে পারি। অসুবিধা নেই। আমরা তো ওদিকেই যাচ্ছি।’ বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

মেয়েটি গাড়ির দিকে দু’ধাপ এগিয়ে এসেছিল।

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে জার্মান শ্বেতাংগদের চেহারা যেমন মেয়েটিকে পুরোপুরি তেমন মনে হলো না আহমদ মুসার কাছে। চোখ, রং ও ইমপ্রেশনে কেমন একটা ভিন্নতা আছে।

‘ম্যাডাম, আপনি চাইলে আপনাকে লিফট দিতে আমাদের কোন আপত্তি নেই।’ আহমদ মুসা বলল।

গাড়ির ভেতরটা দেখছিল মেয়েটি। বলল, ‘অনেক ধন্যবাদ। আপনাদের অসুবিধা না হলে..।’

‘ওয়েলকাম!’ বলে আহমদ মুসা গাড়ি থেকে দ্রুত নেমে গিয়ে ব্রুনার পাশের দরজাটা খুলে ধরল।

মেয়েটি তার হ্যান্ড ব্যাগ নিয়ে এগিয়ে এসে ‘থ্যাংক ইউ অল স্যার’ বলে ভেতরে ঢুকে ব্রুনার পাশে বসতে বসতে বলল, ‘ম্যাডাম, স্যরি ফর ট্রাবল।’

‘ওয়েলকাম। ট্রাবল কিসের? কিছুক্ষণের জন্যে হলেও একজন সাথী পেলাম। আপনার নাম কি ম্যাডাম?’ বলল ব্রুনা।

‘প্লিজ ম্যাডাম নয়। আমার নাম আদালা হেনরিকা।’ বলল আদালা হেনরিকা নামের আগন্তুক মেয়েটি।

গাড়ি আবার চলতে শুরু করেছে।

‘সুন্দর নাম। আনকমন কিছুটা।’ ব্রুনা বলল।

‘তোমার নাম কি জানতে পারি?’ বলল আদালা হেনরিকা।

‘শিওর, আমার নাম ব্রুনা ব্রুনহিল্ড। সামনে বামপাশে আমার বাবা আলদুনি সেনফ্রিড। আর তাঁর ডানপাশে আমার স্যার, বড় ভাই আহমদ মুসা।’ ব্রুনা বলল।

আদালা হেনরিকার চোখে-মুখে কিছুটা বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠেছিল। সে আগেই বুঝেছিল, ড্রাইভিং সিটের যার সাথে সে কথা বলছিল, সে জার্মান নয়, এশিয়ান ধরনের কেউ। এখন দেখা যাচ্ছে সে মুসলমানও। তা হলে ব্রুনার সে বড় ভাই হয় কি করে?

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল আদালা। এই সময় তার মোবাইল বেজে উঠল। মোবাইলটা পকেট থেকে বের করতে করতে বলল, ‘প্লিজ, একটা কল এসেছে, কথা বলতে পারি?’ ব্রুনার দিকে চেয়ে বলল আদালা হেনরিকা।

‘অবশ্যই। কথা বলুন।’ বলে ব্রুনা জানালার দিকে একটু সরে হাতের ম্যাগাজিনের দিকে মনোযোগ দিল।

‘গুড মর্নিং। হ্যাঁ, মা, বল। আবার কি ঘটেছে? এভাবে কাঁদছ কেন?’ মোবাইল ধরেই ওপারের কথা শুনে বলল আদালা হেনরিকা। তার কন্ঠে আতংকের সুর।

আদালা হেনরিকার কথা শুনে সবার মনোযোগ তার দিকে নিবদ্ধ হলো। তাকালো সবাই তার দিকে।

তার কথা বলে আদালা হেনরিকা ওদিকের কথা শুনছিল।

এক হাতে মুখটা আড়াল করে মোবাইলে কথা বলছিল সে। হঠাৎ সে কান্নাজড়িত কন্ঠে বলে উঠল, ‘মা আর বলো না, সইতে পারছি না মা।আমি আসছি।

বলে আদালা হেনরিকা হাতের মোবাইলটা সিটের উপর ছুড়ে দিয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে কান্না রোধ করতে চেষ্টা করতে লাগল।

ব্রুনা তার একটা হাত আদালার কাঁধে রেখে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'ঈশ্বর আছেন, ধৈর্য ধরুন। কি ঘটেছে জানতে পারি আমরা?'

ব্রুনার কথার সাথে সাথে অবরুদ্ধ কান্নার একটা উচ্ছ্বাস বেরিয়ে এল। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল আদালা হেনরিকা।

কিন্তু শীঘ্রই নিজেকে সামলে নিয়ে দু'চোখ মুছে মাথা নিচু রেখেই বলল, 'আমার পরিবার ভীষণ সংকটে পড়েছে। ওরা আমার ভাইকে রাতে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। এই মাত্র তার লাশ বাড়ির গেটে ফেলে রেখে গেছে। শাসিয়ে গেছে, বিকেল ৫টার মধ্যে যে কোন সময় তারা আসবে। দাবি পূরণ না হলে বাবা-মা দু'জনকেই ওরা ধরে নিয়ে যাবে। আরও বলে গেছে যে, তাদের লোকরা আবার খোঁজ নিতে আসবে আমরা তাদের কথা মানছি কি না?'

বলেই আদালা দু'হাতে মুখ ঢাকল কান্না রোধের জন্যে।

পেছন দিকে না তাকিয়েই আহমদ মুসা বলল, 'মাফ করবেন ম্যাডাম, ওরা কারা?'

'ওরা মুখোশ পরে বাড়িতে ঢুকেছিল। চিনতে পারেনি। তবে গির্জা ও সিনাগগ কেন্দ্রিক একটা গ্রুপ আমাদের পরিবারের সাথে অনেক দিন থেকে ঝামেলা করছে। পুলিশ তৎপর হওয়ার পর ঝামেলা চুকে যায় এবং তারা নীরব হয়ে যায়। আকস্মিকভাবে আবার এই ঘটনা ঘটল।' বলল আদালা হেনরিকা।

'স্যরি, জানতে পারি কি নিয়ে ঝামেলা হয়েছিল?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'আমাদের বাড়িতে কিছু অ্যান্টিক্স আছে। তার মধ্যে রয়েছে স্বর্ণের একটি মুকুট।

জার্মানীর সর্বপ্রাচীন রাজপরিবার স্যাক্সন ডাইনেস্টির দ্বিতীয় হেনরীর প্রপৌত্র চতুর্থ অটো উত্তর জার্মানীর নতুন স্যাক্সনল্যান্ডে নতুন একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর ছিল স্বর্ণের একটি রাজমুকুট। আমাদের স্বর্ণমুকুটটি একদম মূল মুকুটটির প্রতিকপি। আমাদের এই মুকুটটি তিনিই আমার প্রপিতামহের

প্রপিতামহকে গিফট করেছিলেন। এটা নিয়েই ঝামেলা। আমাদের সালজওয়াডেলে সিনাগগ-গির্জা কেন্দ্রিক হিস্টোরিক্যাল সোসাইটির একটা শাখা আছে। হামবুর্গের একটা পুরাতাত্ত্বিক প্রদর্শনীতে তারা আমাদের অ্যান্টিকসগুলো দেখে। তারপর থেকেই শুরু হয় আমাদের মুকুটটা হাত করার চেষ্টা এই চেষ্টা ক্রমেই হুমকি-ধমকি ও বলপ্রয়োগে রুপান্তরিত হয়।'

'পুলিশকে জানানো হয়েছে?' আহমদ মুসা বলল।

'কিডন্যাপ করে নিয়ে যাবার পর আম্মা পুলিশকে জানিয়েছেন। কিন্তু কারও নাম দেয়া সম্ভব হয়নি। সবাই মুখোশ পরিহিত ছিল। কাউকেই আইডেনটিফাই করা যায়নি।' বলল আদালা হেনরিকা।

'কিন্তু সন্দেহ তো করা যায়। যারা এক সময় সন্ত্রাসী কর্মকান্ড করেছিল, তারাই এবারও এটা করেছে।' আহমদ মুসা বলল।

'আমি মাকে এটা বলেছিলাম। কিন্তু সেটা হয়নি। মা পুলিশ স্টেশনে গিয়ে ঐ সন্দেহভাজনদের কথা বলায় পুলিশ অফিসার বলেছিলেন যে, ক'মিনিট আগে পর্যন্ত ওরা পুলিশ স্টেশনেই ছিল। ওদের একটা ঘটনা নিয়ে ওরা পুলিশ স্টেশনে এসেছিল। এই অবস্থায় সন্দেহ কোন কাজে আসেনি।' বলল আদালা হেনরিকা।

'বুঝেছি। আচ্ছা ম্যাডাম, মুখোশধারীরা আপনার ভাইকে নিয়ে গেল, কিন্তু সেই অ্যান্টিক স্বর্ণমুকুটটা লুট করে নিয়ে গেল না কেন?' আহমদ মুসা বলল।

'ঐ সমস্যার পর ওটা আমরা বাড়িতে না রেখে ব্যাংকের সেফ লকারে রেখেছি।' বলল আদালা হেনরিকা।

'বুঝেছি, এজন্যেই তাহলে ওরা ১২টা পর্যন্ত সময় দিয়েছে যাতে এর মধ্যে তা লকার থেকে তুলে আনার সময় হয়।' আহমদ মুসা বলল।

'ঠিক তাই স্যার। আমরা সেটা ব্যাংক লকার থেকে আনছি কি না সেটাও তারা জানতে আসবে।' বলল আদালা হেনরিকা।

আহমদ মুসা সংগে সংগেই কথা বলল না। একটু ভাবল। কথা বলল একটু পর। বলল, 'ম্যাডাম, আমি আমার একটা মত বলতে পারি?'

সংগে সংগেই ব্রুনা আদালা হেনরিকার কানে কানে দ্রুত ফিসফিসিয়ে বলল, 'উনি একজন মিরাকল মানুষ। তার মত মেনে নিলে ভালো হবে।'

আদালা হেনরিকা কিছুটা বিস্মিত হয়ে তাকাল ব্রুনার দিকে। তার মনে প্রশ্ন, এমন ভাষায় কেউ তো তার স্বজনেরও প্রশংসা করে না। আবার ব্রুনা তো তাকে স্যার বলেছে। তার মানে উনি এদের স্বজন কেউ নন। তাহলে?

মনের মধ্যে জেগে ওঠা প্রশ্নটা নিয়ে আর এগোলো না আদালা হেনরিকা। আহমদ মুসার দিকে চেয়ে বলল, 'অবশ্যই স্যার, বলুন।'

'ধন্যবাদ। আপনি বললেন, ওরা খোঁজ নিতে আসবে, আপনারা বিকেল ৫টায় অ্যান্টিক্সটা তাদের দেয়ার ব্যবস্থা করছেন কি না তা জানার জন্যে। আমার মত হলো, ওরা যদি আসে, তাহলে বলে দিতে হবে তাদের দেয়া সময়ের মধ্যেই অ্যান্টিক্স তাদের দিয়ে দেয়া হবে। আরও বলতে হবে, আমাদের মেয়ে আদালা হেনরিকা আসছে, সেই ব্যাংক থেকে ওটা তুলে নিয়ে আসবে।' আহমদ মুসা বলল।

'কিন্তু স্যার, আমার পরিবার জীবন গেলেও ওটা কাউকে এভাবে দিয়ে দিতে রাজি নয়। ওটা দিতে রাজি হলে তো ভাইকে মরতে হতো না। ভাইকে ওরা নিশ্চয় রাজি করাবার চেষ্টা করেছে। চেষ্টা ব্যর্থ হলে তাকে হত্যা করা হয়েছে। এই মনোভাব আমাদের পরিবারের সকলের।' বলল আদালা হেনরিকা।

'আমি এই মনোভাবের প্রশংসা করছি। দিয়ে দেয়ার পক্ষে আমিও নই। কিন্তু সময় কিল করার জন্যেই ওদের আশায় রাখা প্রয়োজন। কখন ওরা খোঁজ নিতে আসবে তা জানা নেই। খোঁজ নিতে এসেই যদি ওরা জানতে পারে, অ্যান্টিক্স তারা পাবে না, তাহলে আরও অঘটন তারা ঘটিয়ে ফেলতে পারে।' আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ স্যার। আমি বুঝতে পেরেছি। আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি গিয়ে অ্যান্টিক্স নিয়ে আসব, এটা বলতে বলেছেন। সত্যিই কি আমি অ্যান্টিক্সটি আনব গিয়ে?' বলল আদালা হেনরিকা।

'এটাও সময় কিল করা এবং ওদের আশায় রাখার জন্যে বলা হয়েছে।' আহমদ মুসা বলল।

‘মাফ করবেন স্যার। এই সময় আমরা নিচ্ছি কেন? সময় নিয়ে আমরা কি করব?’ বলল আদালা হেনরিকা।

‘আপনি, আমরা আপনার বাড়িতে পৌঁছা, পুলিশের সাহায্য পাওয়া, আত্মরক্ষার কৌশল ঠিক করা ইত্যাদির জন্যেই সময় প্রয়োজন।’ আহমদ মুসা বলল।

আদালা হেনরিকার চোখে-মুখে বিস্ময়। সে তাকিয়েছিল আহমদ মুসার দিকে। আহমদ মুসার ধীর ও ঠাণ্ডা কন্ঠের যুক্তি শুনে মনে হচ্ছে, সে যেন কোন অভিজ্ঞ আইনজ্ঞ বা প্রবীণ দক্ষ পুলিশ অফিসার কিংবা একজন ঝানু গোয়েন্দার কথা শুনছে। তিনি কি এদের কোন একজন? কে তিনি?

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আদালা হেনরিকা বলল, ‘ধন্যবাদ স্যার। অনেক ধন্যবাদ। এত অল্প সময়ে ঘটনার এমন গভীরে প্রবেশ করেছেন এবং এই মুহুর্তের করণীয়ও বের করেছেন। আপনি নিশ্চয় অনেক বড় কোন প্রফেশনাল।’

‘আমার মত সম্পর্কে বলুন। আপনি ভালো মনে করলে আপনার বাড়িতে এটা জানিয়ে দেয়া দরকার।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ধন্যবাদ স্যার। আপনার মতের কোনো বিকল্প আমার জানা নেই। আমি এখনই বাড়িতে জানিয়ে দিচ্ছি স্যার।’ বলল আদালা হেনরিকা।

‘ধন্যবাদ ম্যাডাম।’ আহমদ মুসা বলল।

বাইরে বৃষ্টি তখন জমে উঠেছে।

ঝড় না হলেও ঝড়ো হাওয়া বইছে।

রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা আগের মতই কম।

আহমদ মুসা আদালা হেনরিকাকে ধন্যবাদ দিয়ে সামনের দিকে মনোযোগ দিল। বাড়িয়ে দিল গাড়ির স্পীড।

বৃষ্টি ও ঝড়ের বাধা উপেক্ষা করে দ্রুত এগিয়ে চলেছে গাড়ি।

আহমদ মুসার দুই হাতে শক্ত করে ধরা স্টিয়ারিং হুইল।

অনেকটা দূরে থাকতেই আদালা হেনরিকা তার বাড়ি আহমদ মুসাকে দেখিয়ে দিয়েছিল।

রোড থেকে প্রায় ১০০ গজের ভেতরে আদালা হেনরিকাদের বাড়ি। সুন্দর তিন তলা বাড়ি ট্রিপলেক্স ধরনের অনেকখানি জায়গা জুড়ে অনেক বড় বাড়ি। অতীতের বনেদি বাড়িগুলোর মতই বাড়িটা প্রাচীর ঘেরা। রোড়-সাইডে প্রাচীরে বড় একটা ফটক। বাড়িতে প্রবেশের গেট এটাই।

বাড়ি দেখেই আহমদ মুসা বলেছিল, 'বাহ, বিরাট বাড়ি তো? জার্মানীর নাইট ও ভূ-স্বামীরাই দুর্গ কিংবা এ ধরনের বাড়িতে থাকতো।'

'ঠিক স্যার, আমাদের বাড়িটা ভূ-স্বামীদের মতই ছিল। প্রায় নয় দশ জেনারেশন আগে আমাদের এক পূর্বপুরুষকে রাজা চতুর্থ অটো স্বর্ণমুকুটটিসহ বিরাট ভূ-সম্পত্তি দিয়েছিলেন। সুতরাং ভূ-সম্পত্তি আমাদেরও ছিল। বাড়ি এবং এই বাড়ি সংশ্লিষ্ট জমি ছাড়া সে ভূ-সম্পত্তি সবকিছুই এখন বেদখল হয়ে গেছে। আছে শুধু ঐ স্বর্ণমুকুটটি।' বলল আদালা হেনরিকা।

'কিন্তু ম্যাডাম, আপনাদের বাড়িটা তো সে রকম পুরানো মনে হচ্ছে না!' আহমদ মুসা বলল।

'না স্যার, এটা সেই পুরানো বাড়ি নয়। সে বাড়িটার কিছু অংশ একদম নষ্ট হয়ে যায়। অবশিষ্ট অংশ নিয়ে নতুন বাড়ি তৈরি হয়েছে আমার দাদুর সময়ে। আগের বাড়ির চেয়ে অনেক ছোট এ বাড়ি।'

আহমদ মুসাদের গাড়ি এসে গেছে আদালাদের বাড়ির প্রায় সামনে।

আদালাদের বাড়ি বামদিকে টার্ন নেয়ার জন্যে আহমদ মুসা গাড়ির গতি স্লো করে দিয়েছে।

টার্নিং পয়েন্টে পৌঁছেনি তখনও আহমদ মুসার গাড়ি। একটা গাড়ি ওদিক থেকে এসে রোডে উঠে দ্রুত উত্তর দিকে চলতে শুরু করল।

গাড়িটা আদালা হেনরিকার বাসা থেকেই বেরিয়ে এসেছে, বুঝল আহমদ মুসা। বলল, 'ম্যাডাম আদালা হেনরিকা, যে গাড়িটা আপনাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল সেটা কি আপনাদের গাড়ি?'

'না স্যার, আমাদের কোন গাড়ি নয়।' বলল আদালা হেনরিকা।

'পুলিশের গাড়ি তো নয়ই?' আহমদ মুসা বলল।

‘পুলিশ লাশ অনেক আগেই নিয়ে গেছে। এত তাড়াতাড়ি পুলিশ আসার কথা নয়। আর ওটা পুলিশের গাড়ি নয়।’ বলল আদালা হেনরিকা।

‘অ্যান্টিক্স মুকুটের জন্যে ওরা আসবে, একথা আপনার বাড়ি থেকে পুলিশকে বলা হয়েছে?’ আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা্

‘না, পুলিসকে বলা হয়নি। ওরা শাসিয়েছে, পুলিশকে বললে বংশ সাফ করে দিয়ে যাবে।’ বলল আদালা হেনরিকা। কম্পিত তার কন্ঠ।

বাম দিকে টার্ন নিয়ে আহমদ মুসার গাড়ি আদালার বাড়ির প্রাইভেট রাস্তাটায় ঢুকে গেল।

সামনেই বাড়ির গেট।

‘মা, গেটেই দাঁড়িয়ে আছেন।’ বলল আদালা হেনরিকা।

গাড়ি গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

‘ওয়েলকাম, সকলকে। আমরা এসে গেছি।’ বলে আদালা হেনরিকা গাড়ি থেকে নেমে পড়ল।

গেটের সামনে দাঁড়িয়েছিল ষাটোর্ধ মহিলা। আদালার মা। গাড়ি থামতেই সে গাড়ির দিকে এগিয়ে আসছিল।

গাড়ি থেকে নেমে আদালা হেনরিকা ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরল। মা-মেয়ে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে বাঁধ-ভাঙা কান্নায় ভেঙে পড়ল।

গাড়ি থেকে ধীরে ধীরে নামল আহমদ মুসা, ব্রুনা ও আলদুনি সেনফ্রিড।

তিন জন গিয়ে দাঁড়াল কান্নারত মা-মেয়ের সামনে।

আদালা হেনরিকা তাকাল আহমদ মুসার দিকে।

মাকে ছেড়ে দিয়ে সে চোখ মুছল।

মায়ের চোখ মুছে দিল। আহমদ মুসাদের দেখিয়ে বলল, ‘এরা আমাকে লিফট না দিলে আমার আসতে আরও অনেক দেরি হতো।’

বলে আদালা হেনরিকা মাকে সবার নাম পরিচয় করে দিল্। আহমদ মুসাকে দেখিয়ে বলল, ‘ইনি আমাকে অভিভাবকের মত পরামর্শ দিয়েছেন। আমি তোমাকে ওদেরকে বলার জন্যে যা বলেছি, তা তাঁর পরামর্শে।’

আদালা হেনরিকার মা তাকাল আহমদ মুসার দিকে। লম্বা একটা বাউ করে বলল, ‘আমি আলিসিয়া, ধন্যবাদ বেটা। গড ব্লেস ইউ। আপনারা আমাদের মেহমান। প্লিজ ভেতরে আসুন।’

বলে আদালার মা আদালার দিকে চেয়ে বলল, ‘মা, ওঁদেরকে নিয়ে চল।’

আদালা, আহমদ মুসা সকলের দিকে চেয়ে ব্রুনা বলল, ‘আপনারা এগোন, আমি গাড়ি নিয়ে আসছি।’

‘ধন্যবাদ ব্রুনা।’ বলে আদালা আহমদ মুসাদের ভেতরে এগোবার অনুরোধ করল।

সবাই এগোলো।

ব্রুনা গিয়ে ড্রাইভিং সিটে উঠল।

সবাই গেট দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল।

বিরাট এলাকা নিয়ে বাড়ি।

বাড়িটা আগের কাঠামো থেকে ছোট করা হয়েছে, তা বোঝা যায়।

ছোট করা হলেও ছোট মোটেই নয়।

বাড়ির বিল্ডিং-এর কাছাকাছি পৌঁছে গেছে সবাই।

বিল্ডিং-এর সামনের চত্বরটা পাথর বিছানো। চত্বরের শেষ প্রান্তে চত্বর থেকে আট নয় ফিট চওড়া সুন্দর সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে।

পৌঁছে গেল আহমদ মুসারা সিঁড়ির কাছাকাছি। আহমদ মুসার পাশাপাশি হাঁটছিল আদালা হেনরিকা। বলল, ‘আমাদের দোতলায় উঠতে হবে। নিচের ফ্লোরটা কিচেন, স্টোর ইত্যাদির মত কাজে ব্যবহার হয়।

‘মা আদালা, মেহমানদের তুমি উপরে নিয়ে যাও। আমি ব্রুনা মা’কে নিয়ে আসছি।’ বলল আদালা হেনরিকার মা্।

‘ঠিক আছে মা। তুমি এস।’ আদালা হেনরিকা বলল।

দোতলার ড্রইংরুমে নিয়ে গিয়ে আহমদ মুসাদের বসতে বলল আদালা হেনরিকা।

বিশাল ড্রইংরুম। সোফা সেঁটে সাজানো। অনেক পুরানো। ঘরের সবকিছুই পুরানো, যা মোটামুটি এখন অ্যান্টিকে পরিণত হয়েছে।

আহমদ মুসার পাশের এক সোফায় বসল ব্রুনার বাবা আলদুনি সেনফ্রিড। আর আহমদ মুসার ডান পাশের সোফায় বসল আদালা হেনরিকা।

বসেই বলল আদালা হেনরিকা, 'স্যার, এখানকার সবই পুরানো। বলতে পারেন পুরানো এক টুকরো জার্মানী।'

'ম্যাডাম আদালা হেনরিকা, এ দৃশ্য দুর্লভ। যা দুর্লভ তার প্রতিই মানুষের আকর্ষণ বেশি হয়।' আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ স্যার। তবে...।'

কথা শেষ করতে পারলো না আদালা। ঘরে প্রবেশ করল আদালা হেনরিকার মা ও ব্রুনা্

ঘরে প্রবেশ করে এগোতে এগোতে বলছিল, 'ধন্যবাদ আদালা, মেহমানদের বসিয়েছ।'

আদালার মা আহমদ মুসার কাছে এসে বলল, 'বাবা প্লিজ একটু বস। আমি আসছি। তোমার সাথে কিছু কথা আছে বাবা।'

বলে ভেতরে চলে গেল আদালা হেনরিকার মা।

মিনিট খানেকের মধ্যে একটা হুইল চেয়ার ঠেলে ড্রইংরুমে প্রবেশ করল আদালার মা। হুইল চেয়ারে সত্তরোর্ধ একজন প্রৌঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, চেহারা। রঙে পুরো শ্বেতাংগ যেন নয়, চোখ ও মুখের আদলের দিক থেকেও নয়। ঠিক ইহুদিরা যেমন শ্বেতাংগ হয়েও ঠিক শ্বেতাংগ হয় না তেমন।

প্রৌঢ়ের দৃষ্টি আহমদ মুসার দিকে। খুব বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টি।

হুইল চেয়ার ভেতরে প্রবেশ করতেই আদালা হেনরিকা উঠে দাঁড়িয়েছে। বলল, 'স্যার, ব্রুনা, মি. সেনফ্রিড, হুইল চেয়ারে বসা উনি আমার বাবা জোসেফ জ্যাকব আলগার।'

আহমদ মুসাসহ সবাই উঠে দাঁড়াল।

'গুড মর্নিং স্যার।' বলল আহমদ মুসা।

'ওয়েলকাম সবাইকে। কিন্তু আপনারা শুনেছেন, আমাদের পরিবারের জন্যে আজকের সকাল এক সর্বনাশা হিসেবে দেখা দিয়েছে।' বলল আদালার

বাবা জোসেফ জ্যাকব আলগার। তার কন্ঠ কিছুটা কাঁপা ও ভারি।' তার উপর তার চোখে-মুখে অসুস্থতার ক্লান্তি।

কথা শেষ করেই আবার আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, 'প্লিজ আপনারা বসুন। আপনারা মেহমান। আমাদের দু:খের কথা শুনিয়ে আপনাদের বিব্রত করা উচিত নয়। আমি আদালার মা আলিসিয়ার কাছে শুনলাম, আপনি আদালাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, শয়তানদের দাবি অনুসারে আমাদের স্বর্ণমুকুটটি তাদের দিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিতে। সে প্রতিশ্রুতি শয়তানদের দিয়ে দেয়াও হয়েছে। কিন্তু কোন কিছুর, এমনকি জীবনের বিনিময়েও পরিবারের এই ঐতিহাসিক আমানতকে শয়তানদের হাতে আমরা দিতে পারি না।' আদালার বাবা জোসেফ জ্যাকব আলগার এই কথাগুলো বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে।

'স্যার, আমি আদালা হেনরিকাকে বলেছি ঠিকই, তবে আমার পরামর্শটা সময় কিল করার জন্যে, স্বর্ণমুকুটটি ওদের দিয়ে দেবার জন্যে নয়।' আহমদ মুসা বলল।

'সময় কিল করা কি জন্যে?' জিজ্ঞাসা আদালার বাবা জোসেফ জ্যাকব আলগারের।

'আমরা এখানে পৌঁছা পর্যন্ত তারা কিছু করে না বসে এজন্যেই সময় কিল করার কথা বলেছিলাম।' আহমদ মুসা বলল।

আদালার বাবা জোসেফ জ্যাকব আলগার সংগে সংগে কিছু বলল না। ভাবনার চিহ্ন তার চোখে-মুখে। একটু পর বলল, 'তার মানে আপনারা কিছু করতে চান। আমরা পুলিশকে কিডন্যাপের পরপরই জানিয়েছিলাম। পুলিশ এসেছিল, আমাদের স্টেটমেন্ট নিয়েছিল। 'আমরা উদ্ধারের চেষ্টা করছি' বলে চলে গেছে। আবার সকালে লাশ যখন ফেলে গেল, তখন আবার জানানো হয়েছে। পুলিশ এসে আমাদের বক্তব্য নিয়েছে, তার পর লাশ নিয়ে চলে গেছে। শয়তানরাও এই সময় আসা-যাওয়া করেছে, পুলিশ স্টেশনের সামনে দিয়েই নিশ্চয়। ইয়ংম্যান বলুন, আর কি করার আছে?'

'লোকাল পুলিশের সহযোগিতা যদি না পাওয়া যায়, তাহলে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে সাহায্য চাইতে হবে। ইতিমধ্যে আপনাদের ও স্বর্ণমুকুটের নিরাপত্তা নিশ্চিতের ব্যবস্থা করা দরকার।' আহমদ মুসা বলল।

'উর্ধ্বতন পুলিশ কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা চাওয়া এবং পাওয়ার বিষয়টা সময়-সাপেক্ষ। সে সময়ের মধ্যে সবকিছু শেষ হয়ে যাবে।' বলল জোসেফ জ্যাকব আলগার।

'আমি একটা চেষ্টা করে দেখতে পারি স্যার।'

বলে আহমদ মুসা তার মোবাইল পকেট থেকে বের করতে করতে বলল 'আরও একবার স্বর্ণমুকুট নিয়ে সমস্যা হয়েছিল, সে সময়টা কখন এবং কোন উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা এটা দেখা-শোনা করেছিলেন, তার নাম কি ছিল?'

'গত বছর এপ্রিলে ঐ ঘটনা ঘটে। তখন এই স্যাক্সনী অঞ্চলের পুলিশ প্রধান ছিলেন মার্লিন ডেস্ট্রিস।' বলল আদালার বাবা জোসেফ জ্যাকব আলগার।

'ধন্যবাদ স্যার।' বলে আহমদ মুসা মোবাইলে কল করল জার্মানীর পুলিশ প্রধান বরডেন ব্লিসকে।

মোবাইল কানের কাছে তুলে ধরেছে। রিং হচ্ছে ওপারে শুনতে পাচ্ছে আহমদ মুসা।

তিনবার রিং হতেই ওপার থেকে ভারি কন্ঠের 'হ্যালো' শব্দ ভেসে এল।

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাবে এ সময় সশব্দে দরজা ঠেলে ঝড়ের বেগে তিনজন মুখোশধারী প্রবেশ করল ঘরে। তাদের হাতে উদ্যত স্টেনগান।

তিনটি রিভলবার সবাইকে তাক করেছে।

আহমদ মুসার কথা বলা হলো না। মোবাইল ধরা হাত ধীরে ধীরে নেমে এল পামে জ্যাকেটের পকেটের গা ঘেঁষে।

হাতের মোবাইটি সে ছেড়ে দিল সোফার উপর। তার হাতটি জ্যাকেটের পকেটের আরও ঘনিষ্ঠ হলো।

মুখোশধারীদের একজন আদালার মাকে লক্ষ্য করে বলল, 'ধন্যবাদ তোমার মেয়ে আদালা হেনরিকাকে, সে সময় মত এসেছে এ জন্যে। তাকে আমরা নিয়ে যাচ্ছি। তাকে লকারের চাবি কিংবা কোড দিয়ে দাও। মুকুটটি তুলে নিয়ে

আমরা তাকে ছেড়ে দেব। আর ভালো লাগলে তোমার মেয়েও আমাদের সাথে থেকে যেতে পার। সুন্দর মেয়ে বানিয়েছ তোমরা।’

‘মুখ সামলে কথা বল শয়তানরা। আর মুকুট তোমরা পাবে না। এটা আমাদের পবিত্র সম্পদ, আমাদের জীবনের চেয়ে মূল্যবান।’ বলল ক্রুদ্ধ কন্ঠে আদালার বাবা জোসেফ জ্যাকব আলগার।

হো হো করে হেসে উঠল মুখোশধারীদের একজন। বলল, ‘এটা তোমাদের পরিবারের পবিত্র সম্পদ নয়। তোমরা একে অপবিত্র করছ। আদি জার্মান রক্তের স্যাক্সন রাজা চতুর্থ অটো পোপের একজন প্রতিভূ ছিলেন। জার্মান রক্ত ও খৃস্টীয় বিশ্বাস দুই দিক দিয়েই তিনি ছিলেন পবিত্র। তার এই পবিত্র মুকুট তোমাদের মত আধা-জার্মান ও আধা-খৃস্টানদের কাছে একদিনও থাকতে পারে না। মনে রেখো, তোমরা দয়া করে আযাদ করা একজন দাস ব্যক্তির উত্তরসূরি।’

‘চুপ কর শয়তান। তোমাদের মত টেররিস্ট, ক্রিমিনালদের মুখে এ সব শুনতে চাই না। মুকুট তোমরা পাবে না। আমাদের মেরে ফেলতে পার সে শক্তি তোমাদের আছে। তবে মনে রেখো, এদেশে আইন, বিচার সবই আছে।’ বলল জোসেফ জ্যাকব আলগার শক্ত কন্ঠে।

হেসে উঠে বলল মুখোশধারীদের একজন, ‘পুলিশ তোমাদের নয়, আইন কি করবে, বিচার কোথায় পাবে? গত রাত থেকে দু’বার তোমরা পুলিশের কাছে গেছ। আমরা তোমার ছেলেকে রাতে ধরে নিয়ে গেলাম, তারপর সকালে এসে তার লাশ তোমাদের বাসায় ফেলে গেলাম, পুলিশ কিছু করেছে? করেনি। করবেও না।’

এ মুখোশধারী থামতেই আরেকজন মুখোশধারী শক্ত কন্ঠে নির্দেশের সুরে বলল, ‘আর কথা নয়। তুলে নাও আদালা হেনরিকাকে।’

একজন মুখোশধারী সংগে সংগে এগোলো আদালার দিকে।

আদালা জড়িয়ে ধরল তার মাকে।

মুখোশধারী আদালাকে মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে টানাটানি শুরু করল।

‘আমি বেঁচে থাকতে তোমাদের মত শয়তানদের হাতে মেয়েকে ছেড়ে দেব না।’ চিৎকার করে বলল আদালার মা।

‘শোন তোমরা, ঠিক আছে আদালা হেনরিকা যাবে, তবে তার সাথে আমিও যাব।’ আহমদ মুসা বলল।

‘না, আদালার সাথে কেউ যাবে না।’ নির্দেশের সুরে সেই মুখোশধারী আবার বলে উঠল।

তার কথা শেষ হতেই আদালা হেনরিকাকে ধরতে যাওয়া মুখোশধারী আদালাকে ছেড়ে দিয়ে তার স্টেনগানের নল আদালার মায়ের মাথায় ঠেকিয়ে বলল, ‘তবে তুমি মর। তার পরেই আমরা নিয়ে যাব আদালাকে।’ তার তর্জনি স্টেনগানের ট্রিগারে চেপে বসছিল।

‘খবরদার গুলি করবে না আদালার মাকে। যদি কর তিনজনকেই মরতে হবে।’ চিৎকার করে বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়েছে। তার হাতে উদ্যত রিভলবার।

আদালার মাকে গুলি করতে উদ্যত মুখোশধারীর তর্জনি সরে গেছে স্টেনগানের ট্রিগার থেকে আকস্মিক চিৎকার শুনে। সে আর অন্য দু’জন মুখোশধারী তাকিয়েছে আহমদ মুসার দিকে। তাদের কারো স্টেনগানই তখন আহমদ মুসার দিকে উদ্যত নয়। কিন্তু আহমদ মুসার দিকে ঘুরে তাকাবার পরই দু’জন মুখোশধারীর স্টেনগানের নল বিদ্যুত গতিতে উঠে আসছিল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা বুঝল, এই বেপরোয়া টেররিস্টদের এই মুহূর্তে একমাত্র মৃত্যুই থামাতে পারে, অন্য কিছু নয়।

আহমদ মুসার তর্জনি চেপে বসেছে তার রিভলবারের ট্রিগারে। দু’টি গুলি বেরিয়ে গেল। দু’জন মুখোশধারী টেররিস্ট মাথায় গুলি বিদ্ধ হয়ে কোন শব্দ না করেই ছিটকে পড়ল মেঝের উপর।

বেপরোয়া তৃতীয় মুখোশধারী তার স্টেনগানের ব্যারেল আদালার মার মাথা থেকে সরিয়ে নিয়ে দ্রুত ঘুরিয়ে নিয়েছিল আহমদ মুসার দিকে। তার স্টেনগানের ব্যারেল দ্রুত উঠে আসছিল আহমদ মুসা লক্ষ্যে।

'স্টেনগানের নল আর ওপরে তুলো না মুখোশধারী, অন্যথা করলে তোমার পরিণতি তোমার সাথীর মতই হবে।'

আহমদ মুসা মুখোশধারীর দিকে রিভলবার তাক করে তাকে লক্ষ্য করে কথাগুলো বলল।

কথাগুলো কানেই গেল না যেন মুখোশধারীর। তার স্টেনগানের ব্যারেল উঠে আসছিল। তার প্রস্তুত তর্জনিও স্টেনগানের ব্যারেলে।

মুখোশধারীল স্টেনগানের নল টার্গেটে উঠে আসার আগেই আহমদ মুসার রিভলবারের ট্রিগারে তর্জনি চেপে বসল। আহমদ মুসা ধীরে-সুস্থে টার্গেট করেছিল তার বাহুসন্ধিকে।

ডান বাহুসন্ধিতে গুলি খাওয়ায় মুখোশধারীর হাত থেকে খসে পড়ল স্টেনগান।

কিন্তু বিস্ময়কর বেপরোয়া মুখোশধারী। বাহুসন্ধিতে গুলি খেয়ে স্টেনগান পড়ে যাওয়ার সংগে সংগেই তার বাম হাত ঢুকে গেল জ্যাকেটের পকেটে। বেরিয়ে এল পিংপং বলের মত গোলাকার বস্তু নিয়ে। বিদ্যুৎ গতিতে তার বাম হাতটি উঠে আসতে লাগল আহমদ মুসার লক্ষ্যে।

গোলাকার বস্তুটি দেখেই আহমদ মুসা বুঝল, ওটা ফায়ার বোম, ফায়ার গানও হতে পারে। ফায়ার বোম হলে আহমদ মুসা ও তার পাশের দু'একজন মারা যাবে। আর ফায়ার গান হলে শুধু আহমদ মুসাই মারা যাবে। ফায়ার গানের ফায়ার বুলেট রিভলবার ও স্টেনগানের বুলেটের মতই শরীরকে ভার্টিক্যালি বিদ্ধ করে।

আহমদ মুসার রিভলবার, ট্রিগার ও তার তর্জনি প্রস্তুত ছিল। তর্জনি চেপে বসল ট্রিগারে। বেরিয়ে গেল গুলি।

আহমদ মুসা এবার তার বাম বাহুসন্ধিমূল আহত করতে চেয়েছিল। কিন্তু মুখোশধারী বোমা ছোড়ার জন্যে তার হাত উপরে তোলায় এবং দেহ কয়েক ইঞ্চি নড়ে যাওয়ায় গুলি গিয়ে একদম বিদ্ধ হলো তার বাম বুকে।

বোমা ছোড়া আর তার হলো না। গুলি বিদ্ধ তার দেহটা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

আহমদ মুসা ধপ করে বসে পড়ল সোফায়।

রিভলবার সোফায় রেখে তুলে নিল মোবাইল। স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে দেখল মোবাইল অন আছে।

মোবাইল কানের কাছে তুলে নিয়ে বলল, 'হ্যালো স্যার, আমি আহমদ মুসা।'

'আহমদ মুসা আপনি ঠিক আছেন তো? মোবাইলে ভেসে আসা কন্ঠ শুনেই বুঝতে পেরেছি আপনি আহমদ মুসা।' বলল ওপার থেকে জার্মানীর পুলিশ প্রধান বরডেন ব্লিস উদ্বিগ্ন কন্ঠে।

'ধন্যবাদ স্যার, এই মুহুর্তে এখানে একটা বিরাট ঘটনা ঘটে গেছে।' আহমদ মুসা বলল।

'আপনার অন করা মোবাইলে আমি সব শুনেছি মি. আহমদ মুসা। কয়জন মারা গেছে? বলুন তো জায়গাটা কোথায়?' বলল ওপার থেকে পুলিশ প্রধান বরডেন ব্লিস।

'তিনজন মারা গেছে। ওরা তিনজনই এসেছিল। আর জায়গাটার নাম 'সালজওয়াডেল'। আহমদ মুসা বলল।

'ঘটনাটা কোন পরিবারের বা বাড়ির নাম-নাম্বার কি?' জিজ্ঞাসা করল ওপার থেকে বরডেন ব্লিস।

মুখের কাছে মোবাইলটা একটু সরিয়ে নিয়ে আহমদ মুসা আদালা হেনরিকার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার পরিবারের কোন নাম-পরিচয় বা বাড়ির নাম্বার বলুন।'

'আমরা 'আলগার' পরিবার। বাড়ির নাম্বার 'সালজওয়াডেল, এম-৯১'। আতংকগ্রস্ত আদালা হেনরিকা শুকনো, কম্পিত কন্ঠে বলল।

'স্যার, 'আলগার' পরিবার, আর বাড়ির নাম্বার, সালজওয়াডেল এম-৯১।' বলল আহমদ মুসা মোবাইল মুখের কাছে তুলে নিয়ে।

'আচ্ছা, আচ্ছা। মনে পড়ছে। গত বছর শুরুর দিকে মুকুট নিয়ে তাদের কোন সমস্যা হয়েছিল, আমি দেখেছিলাম পুলিশ রিপোর্টে।' পুলিশ প্রধান বরডেন ব্লিস ওপার থেকে বলল।

‘জি স্যার, ঠিক বলেছেন। আমি ওদের কাছে শুনলাম গত বছরও এই সমস্যা হয়েছিল।’ বলল আহমদ মুসা।

‘প্রতিপক্ষ কি তারাই, যারা গত বছর এসেছিল?’ জিজ্ঞাসা বরডেন ব্লিসের।

‘ওরা এবারও মুখোশ পরে এসেছে। এরা চিনতে পারেনি। পুলিশ তাদের চেনে, এদের কথায় আমি জেনেছি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘শুনুন, মি. আহমদ মুসা। আমি সব বুঝতে পেরেছি। আমি সালজওয়াডেলের পুলিশকে এখনি বলে দিচ্ছি। এখনি ওরা আলগার পরিবারে যাবে। আর মধ্য সালজওয়াডেলের পুলিশ স্টেশনের সবাইকে সাসপেন্ড করে আমি এখনি ওখানে নতুন অফিসার পাঠাচ্ছি।’ বলল বরডেন ব্লিস, জার্মানীর পুলিশ প্রধান।

‘ধন্যবাদ স্যার।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আচ্ছা, মি. আহমদ মুসা। আপনি কিভাবে এত দূরে এই ঘটনার সাথে জড়িয়ে পড়লেন?’ জিজ্ঞাসা পুলিশ প্রধান বরডেনের।

‘আমরা ব্রুমসারবার্গ থেকে আসছিলাম হামবুর্গের দিকে আমার সেই কাজে। খারাপ আবহাওয়ায় গাড়ির জন্যে অপেক্ষমাণ আলগার পরিবারের মেয়ে আদালা হেনরিকাকে লিফট দিতে গিয়ে এখানে এসেছি এবং ঘটনার সাথে জড়িয়ে পড়েছি। আমরা মাত্র দশ পনের মিনিট আগে এখানে পৌঁছেছি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ঈশ্বরই আপনাকে এখানে এনেছেন। থ্যাংক গড। একটা পরিবারকে তিনি বাঁচিয়েছেন। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আরও আপনার এই কলের জন্যে আরেকটা ধন্যবাদ। ওকে, মি. আহমদ মুসা। বাই।’ বলল ওপার থেকে পুলিশ প্রধান বরডেন ব্লিস।

‘ধন্যবাদ স্যার আপনাকে।’

বলে আহমদ মুসা মোবাইলটা সোফায় নামিয়ে রেখে রিভলবারটা সোফা থেকে তুলে নিয়ে পকেটে পুরল।

মুহুর্তের জন্যে মাথা নিচু করে আত্নস্থ হয়ে আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া আদায় করে মাথা তুলল। তাকাল সবার দিকে। সবাই পাথরের মত আতংকগ্রস্ত হয়ে বসে আছে। সবার চোখে আহমদ মুসার দিকে নিবদ্ধ। আহমদ মুসার চোখ একবার লাশ তিনটির উপর দিয়ে ঘুরে এল।

অবশেষে তাকাল আহমদ মুসা আদালার বাবা জোসেফ জ্যাকব আলগারের দিকে। বলল, 'স্যার। অল্পক্ষণের মধ্যেই পুলিশ আসছে। আর সন্ত্রাসীদের যোগ-সাজশকারী এখানকার পুলিশ অফিসার সবাই সাসপেন্ড হয়েছে। নতুন এক সেট পুলিশ অফিসার আসছেন এখানে।'

'এখানে যা ঘটল, তা আমার কাছে স্বপ্ন। যা আপনি বলছেন তাও আমার কাছে স্বপ্ন। কি হবে, কি ঘটবে আরও, কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। শুধু বুঝতে পারছি, আপনি যে জন্যে সময় কিল করতে বলেছিলেন, তা ঘটেছে।' বলে কান্না রোধ করতে দু'হাতে মুখ ঢাকল বৃদ্ধ জোসেফ জ্যাকব আলগার।

আদালা হেনরিকা এবং আদালার মা অ্যাল্লি আলিসিয়া দু'জনেরই মুখ নিচু হলো। উদ্বেগ-আতংকে তাদের চোখ-মুখ পাংশু।

'আর কিছুই ঘটবে না স্যার। আমি বলতে পারি, আলগার পরিবারের উপর থেকে আল্লাহ বিপদটা দূর করে দেবেন।' বলল আহমদ মুসা সান্ত্বনার সুরে।

মুখ তুলেছে আদালা হেনরিকা। তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'স্যার, আপনি কার সাথে কথা বললেন?'

'জার্মানীর পুলিশ প্রধান বরডেন ব্লিসের সাথে।' বলল আহমদ মুসা।

'পুলিশ প্রধান বরডেন ব্লিসের সাথে?' মুখ তুলে চোখ মুছে বলল জোসেফ জ্যাকব আলগার। তার চোখে-মুখে বিস্ময়।

'জি হ্যাঁ। উনি আমাকে জানেন এবং আমিও তাঁকে জানি।' বলল আহমদ মুসা।

শুধু জোসেফ জ্যাকব আলগার নয়, আদালা ও আদালার মায়ের মুখেও নতুন বিস্ময়ের সৃষ্টি হলো। প্রশ্নও তাদের চোখে-মুখে। জার্মানীর পুলিশ প্রধানের সাথে এভাবে বন্ধুর মত স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারেন, 'কে ইনি?'

প্রশ্নটা করেই বসল জোসেফ জ্যাকব আলগার। বলল, ‘স্যরি, আপনার পরিচয় জানা হয়নি। ফিল্মে যা ঘটে তার চেয়ে বড় কিছু আপনি করেছেন। জার্মানীর পুলিশ প্রধান আপনার সাথে বন্ধুর মতই বলা যায় কথা বললেন।’

আহমদ মুসা কিছু বলার আগে ব্রুনাই মুখ খুলল। বলল, ‘তাঁর নাম ইতিমধ্যেই আপনারা জেনেছেন, আহমদ মুসা। বলতে পারেন উনি আধুনিক যুগের একজন হাতেম তাই। রবিনহুডের কর্মক্ষেত্র ছিল একটা অঞ্চল, কিন্তু তাঁর কর্মক্ষেত্র গোটা বিশ্ব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়াসহ বহু দেশের উনি সম্মানিত নাগরিক। স্ত্রী ও এক ছেলে নিয়ে তিনি থাকেন মুসলিম দুনিয়ার কেন্দ্র সৌদি আরবের মদিনায়। আমাদের একটা বড় কাজে সহযোগিতার জন্যে এসেছেন জার্মানীতে। আমাদের পুলিশ প্রধানসহ সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের অনেককেই ওঁর সম্পর্কে ব্রীফ করেছেন তাহিতি দ্বীপপুঞ্জের ফরাসি গভর্নর। আরেকটা বড় পরিচয় উনি ফ্রান্সের বুরবুক রাজকুমারীর স্বামী। আর ধর্মবিশ্বাসে তিনি একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান।’

ব্রুনা থামতেই তাকে লক্ষ্য করে আহমদ মুসা বলল, ‘আমি তোমাকে কথার মাঝখানে বাধা দেইনি বলে মনে করো না ব্রুনা, তোমার কথাগুলো আমি পছন্দ করেছি। কোন লোকের সামনে তার এভাবে প্রশংসা করা শুধু অসৌজন্যমূলক নয়, ক্ষতিকরও।’ গম্ভীর কন্ঠ আহমদ মুসার। তার চোখে-মুখে অসন্তুষ্টির চিহ্ন।

‘সংগে সংগেই ব্রুনা দু’হাত জোড় করে বলল, ‘মাফ করুন ভাইয়া। এখানকার ঘটনায় আমিও আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছিলাম বলে কথাগুলো আমি বলে ফেলেছি।’

উঠে দাঁড়িয়েছে আদালা এবং আদালার মা। তারা এবং আদালার বাবা আহমদ মুসার উদ্দেশ্যে লম্বা বাও করে বলল, ‘ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ যে আমরা ঠিক সময়ে আপনাকে পেয়েছি। ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করেছেন আপনাকে দিয়ে।’ আদালার বাবা জোসেফ জ্যাকব আলগারের শেষ কথাগুলো অশ্রুরুদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

একটু থেমেই আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল আদালার বাবা। ঠিক এ সময়েই সিঁড়িতে অনেকগুলো বুটের শব্দ পাওয়া গেল।

আদালার বাবা থেমে গেছে। সবাই উৎকর্ণ।

'পুলিশ আসছে।' আহমদ মুসা বলল।

পরক্ষণেই একদল পুলিশ ঘরে প্রবেশ করল। তাদের সামনে রয়েছে মধ্য সালজওয়াডেল পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত অফিসার।

ভারপ্রাপ্ত অফিসার ঘরে ঢুকেই এগিয়ে গেল আহমদ মুসার কাছে। স্যালুট করে বলল, 'আপনি নিশ্চয় আহমদ মুসা, স্যার?'

স্যালুটের জবাব দিয়ে আহমদ মুসা বলল, 'হ্যাঁ, আমি আহমদ মুসা।'

'স্যার, পুলিশের বড় সাহেব আপনাকে সালাম বলেছেন।'

বলেই পুলিশ অফিসার এগিয়ে গেল আদালার বাবা জোসেফ জ্যাকব আলগারের দিকে। তাকে বলল, 'স্যরি স্যার, আর কোন অসুবিধা হবে না। আমরা সব দেখছি।'

'ধন্যবাদ।' বললো জোসেফ জ্যাকব আলগার। ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারটি ঘুরে দাঁড়িয়ে পুলিশদের নির্দেশ দিল, 'যেমন আছে তেমনি লাশগুলোর ছবি তাদের অস্ত্রসমেত নিয়ে যাও। লাশ ও অস্ত্রগুলো যথানিয়মে হেফাজতে নাও। নিয়ে গাড়িতে তোল।'

লাশ ও অস্ত্র উঠানো হয়ে গেলে ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার আদালার বাবাকে বলল, 'স্যার, আমরা রক্তমাখা কার্পেট আলামত হিসেবে নিয়ে যেতে চাই।'

আহমদ মুসাসহ সবাই উঠে দাঁড়াল।

পুলিশরা সোফা সরিয়ে কার্পেট তুলে নিয়ে গেল।

ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার দু'জন পুলিশকে নির্দেশ দিল, 'কিছু রক্ত মেঝে পর্যন্তও এসেছ্ তোমরা জায়গাটা পরিষ্কার করে দাও।'

কাজ শেষ করে সব পুলিশ চলে গেলে ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার একবার আহমদ মুসার দিকে আর একবার আদালার বাবার দিকে চেয়ে বলল, 'স্যার,

দু'জন পুলিশ সিঁড়ির গোড়ায়, দু'জন পুলিশ গেটে সার্বক্ষণিক পাহারায় থাকবে। কোন প্রয়োজন হলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন স্যার।'

'ধন্যবাদ অফিসার।' বলল আহমদ মুসা।

আদালার বাবাও ধন্যবাদ দিল ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারকে।

আহমদ মুসাদের নিয়ে আদালার মা পাশের রুমে চলে গেল। বাবার হুইল চেয়ার ঠেলে নিয়ে আদালা হেনরিকা তাদের পেছন পেছন চলল।

সবাইকে বসিয়ে নিজে বসতে বসতে বলল, 'একই মানুষের কি বিপরীত দুই রূপ! এই ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার রাতেও এসেছিলেন। সকালেও এসেছিলেন। তখন তার আচরণ দেখে মনে হয়েছিল, আমরা মহাদোষী আর উনি বিচারক। আর এখন মনে হলো, আমরা তাদের মনিব আর তারা আমাদের সার্ভ করার জন্যে তৈরি।'

'তখন চাপ বা লোভে পড়েই তারা ঐ আচরণ করেছিলেন, এখন চাপ এসেছে আরও বড়। ধন্যবাদ মি. আহমদ মুসা। আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা জানা নেই।' বলল আদালার বাবা জোসেফ জ্যাকব আলগার।

বাবার কথা শেষ হতেই আদালা হেনরিকা আহমদ মুসার দিকে চেয়ে বলল, 'স্যার, আমার একটা বিস্ময়, আপনি একটা রিভলবার নিয়ে তিনজন স্টেনগানধারীকে মোকাবিলার সাহস করলেন কিভাবে? যদি ব্যর্থ হতেন, তাহলে কি হতো ভাবেননি?'

গম্ভীর হলো আহমদ মুসার মুখ। বলল, 'যে সময়ের যা দাবি তখন তা করা উচিত। ভবিষ্যৎ আল্লাহর হাতে।'

'ঈশ্বরের উপর আপনার এত বিশ্বাস, এত ভরসা?' বলল আদালা হেনরিকা।

'আমার স্রষ্টা যিনি, আমার প্রতিপালক যিনি, আমার ভালো-মন্দ প্রকৃতপক্ষে যাঁর হাতে, তাঁর উপর ভরসা ছাড়া আর কার উপর ভরসা করব!' আহমদ মুসা বলল।

'ধর্মে তো আপনার দারুণ বিশ্বাস!' বলল আদালা হেনরিকা।

‘আমার দাদু বলতেন, আমাদের পরিবার শুরু থেকে খুব ধর্মভীরু ছিল। কিন্তু মি. আহমদ মুসা, আমার একটা কৌতুহল, ‘ভবিষ্যৎ ঈশ্বরের হাতে’ এটা কিভাবে? আমি ঈশ্বরের উপর ভরসা করে আক্রমণকারী তিনজনের উপর চড়াও হলাম, এখানে ঈশ্বর কিভাবে সাহায্য করবেন?’ বলল জোসেফ জ্যাকব আলগার।

‘আল্লাহ যেমন মানুষের স্রষ্টা, তেমনি মানুষের শক্তি সাহসের নিয়ন্ত্রকও তিনি। আর সব শক্তি, সামর্থ্য, কৌশলের উৎসও তিনি। এই সাথে আল্লাহর বান্দারা প্রার্থনা করলে বাড়তি দানও করেন তিনি। তাই মানুষ যখন আল্লাহর উপর ভরসা করে, নির্ভর করে কোন বিষয়ে, তখন আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন। তার শক্তি, সামর্থ্য, কৌশল বাড়িয়ে দেন। আর একটা কথা স্যার, মানুষ যখন নিজের শক্তির উপর ভরসা করে লড়াই করে, তখন তার মনে কি হবে, না হবে, এই উদ্বেগ, এই পিছু টান থাকে। যা তাকে দুর্বল করে। যার ফলে সে একজন তিনজনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস পায় না। পেলেও এই দুর্বলতার কারণে সে সফল নাও হতে পারে।’ আহমদ মুসা বলল।

আদালার বাবা জোসেফ জ্যাকব আলগারের চোখে-মুখে বিস্ময়-বিমুগ্ধের চমক। আদালা ও তার মা আলিসিয়াও অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আহমদ মুসার দিকে।

‘কঠিন দার্শনিক কথা বলেছেন মি. আহমদ মুসা। ঈশ্বরের প্রতি এমন বিশ্বাস থাকলে আপনি যা বলেছেন ঘটতে পার। আমরা বোধ হয় একটু আগে এটাই দেখলাম। ধন্যবাদ আহমদ মুসা আপনাকে।’ বলল জোসেফ জ্যাকব আলগার।

‘ওয়েলকাম স্যার। স্যার, আমরা এখন উঠতে চাই। এখানের কাজ শেষ। এবার আমরা চলে যেতে চাচ্ছি।’ আহমদ মুসা বলল।

হুইল চেয়ারে একটু সোজা হয়ে বসল আদালার বাবা জোসেফ জ্যাকব আলগার। দুই হাত জোড় করে বলল, ‘আমিও মনে করেছিলাম আপনার কাজ শেষ। পুলিশ আমাদের নিরাপত্তার ভার গ্রহণ করেছে এবং আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। কিন্তু এখন ভাবছি, আপনি একজন এশিয়ান মুসলিম। এশিয়ান মুসলিমরা খুব মেহমানদারী পছন্দ করেন। আমি আপনার কাছে এই

মেহমানদারীর সুযোগ প্রার্থনা করছি। লাঞ্চের সময়ের বেশি দেরি নেই। আমার অনুরোধ আমার কথা আপনারা রক্ষা করবেন।'

আহমদ মুসা ব্রুনা ও তার বাবা আলদুনি সেনফ্রিডের দিকে একবার তাকিয়ে জোসেফ জ্যাকব আলগারকে বলল, 'আপনি পিতৃতুল্য।

আপনার অনুরোধ আমাদের কাছে আদেশ। আমরা লাঞ্চ করেই যাব। কিন্তু একটা বিষয় আমার মনে কৌতুহল সৃষ্টি করেছে, যে বিষয়ে আমি জানতে চাই।'

'কি সেটা মি. আহমদ মুসা?' বলল জোসেফ জ্যাকব আলগার।

'সন্ত্রাসীরা আপনাদের পরিবারকে হাফ জার্মান, হাফ খৃস্টান বলেছে। কেন ওরা তা বলল?' আহমদ মুসা বলল।

সংগে সংগে কথা বলল না জোসেফ জ্যাকব আলগার। প্রশ্নটা শুনেই তার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠেছে। আদালা ও তার মা আলিসিয়ার মুখেও কিছুটা বিব্রত ভাব। তাদের আলগার পরিবারের একটা গোপন ও দুর্বল দিক এটা।

জোসেফ জ্যাকব আলগার একটুক্ষণ নীরব থেকে বলল, 'বিষয়টা আমাদের একটা ফ্যামেলি-সিক্রেট। এটা একটা বড় দুর্বলতা আমাদের পরিবারের। আমাদের দুর্বলতার এ বিষয়টি আমরা সব সময় গোপন করে আসছি। এরপরও বিশেষ মহল এটা খুঁজে বের করেছে। একবার হামবুর্গের আন্তর্জাতিক অ্যান্টিকস প্রদর্শনিতে মুকুটটি নিয়ে গিয়েছিল আমাদের পরিবার। রাজা চতুর্থ অটো'র দেয়া অতিমূল্যবান এ অ্যান্টিকস মুকুটটি তাদের নজরে পড়ে যায়। আমাদের বিপদ তখন থেকেই শুরু। ওরাই সন্ধান করে আমাদের পরিবারের হাফ জার্মান হাফ খৃস্টান ও দাস-ব্যাকগ্রাউন্ড বের করেছে এবং একে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করছে।' থামল জোসেফ জ্যাকব আলগার।

'আসল সত্যটা কি?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে জোসেফ জ্যাকব আলগার বলল, 'আপনি অন্যদের মত নন। আপনার মত মুসলমানও আমার চোখে পড়েনি। আপনি পূর্বাপর সব জানা একজন ভালো ও নিষ্ঠাবান মুসলিম। আপনার মত বিজ্ঞ

মুসলিমকে সব বলা যায় মি. আহমদ মুসা। তবে এখানে নয়। চলুন আমরা স্টাডিতে যাই।’

‘সেটাই ভালো হবে।’ বলল আদালা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে।

সবাই উঠল।

আদালা তার বাবার হুইল চেয়ার ঠেলে আগে আগে চলল। আর পেছনে তার মা আলিসিয়া আহমদ মুসাদের নিয়ে এগোতে লাগল।

# ২

কথা বলছে জোসেফ জ্যাকব আলগার।

তার হুইল চেয়ার ঘিরে কয়েকটা চেয়ার নিয়ে বসেছে আহমদ মুসা, আদালা, ব্রুনা, আদালার মা এবং আলদুনি সেনফ্রিড।

স্টাডি রুমটা তিন তলায়।

বিশাল রুম।

ঘরের চারদিকে দেয়াল বরাবর অনেক আলমারি। বইয়ে ঠাসা।

কয়েকটা কম্পিউটার আছে কক্ষে। অনেক কিয়টি পড়ার টেবিল। তার সাথে আরামদায়ক কুশন চেয়ার। ঘরে কয়েকটি ইজি চেয়ারও রয়েছে।

চেয়ার, আলমারি, টেবিল, ইজি চেয়ার সবই পুরানো। অ্যান্টিকস হিসেবে শো-রুমে থাকার মত।

ঘরের সবকিছুই পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন।

ঘরে ঢুকেই আহমদ মুসা বলেছিল, মনে হচ্ছে আমরা এক অ্যান্টিকস এর জগতে এলাম। কি করে আপনারা এগুলোকে এত সুন্দরভাবে রক্ষা করেছেন?'

জোসেফ জ্যাকব আলগার বলেছিল, 'আমরা মূল্যবান ফার্নিচার রক্ষা করিনি, আমরা ঐতিহ্য রক্ষা করেছি। আর মি. আহমদ মুসা আমাদের বাড়ির সবকিছুই অ্যান্টিকস, শুধু আমরা ছাড়া। থালা-বাটি থেকে সবকিছুই দেখবেন সেই পুরানো ধাঁচের।'

'পুরানো ধাঁচের বটে, কিন্তু পুরানো নয়। আজকের আধুনিকতার সময়হীন নিরাভরণ ও প্রতিযোগিতার বাজারে কষ্ট-ইফেকটিভ পণ্যের সয়লাবে অ্যান্টিকস আজ মর্যাদার আসন লাভ করেছে।' আহমদ মুসা বলেছিল।

জোসেফ জ্যাকব আলগার আহমদ মুসাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছিল, 'সব বিষয়কে সুন্দর করে বলার শক্তি ঈশ্বর আপনাকে দিয়েছেন।'

কথা বলছিল জোসেফ জ্যাকব আলগার। তার ইজি চেয়ারের চারপাশে বসা আহমদ মুসা, ব্রুনা, আলদুনি সেনফ্রিড, আদালা ও আদালার মা আলিসিয়াদের অখণ্ড মনোযোগ তার দিকে।

বলছিল জোসেফ জ্যাকব আলগার, 'যা বললাম তা সত্যি। আমরা হাফ-জার্মান, হাফ-খৃস্টান ও দাসবংশোদ্ভুত- তাদের এই অভিযোগ সম্পর্কে আমি বিস্তারিত কিছুই জানি না। আমার দাদুকে আমি বেশি দিন পাইনি। বাবাকে তো পেয়েছি, কিন্তু তিনি আমাকে কিছুই বলেননি। তবে বাবার কয়েকটা কথা আমি একদিন হঠাৎ শুনে ফেলেছিলাম। বাবা এই স্টাডিতে বসে আন্টির সাথে গল্প করছিলেন। আন্টি ছিলেন বাবার বড়। দরজা ও জানালা সব বন্ধ ছিল। আমি পাশের করিডোরটা ধরে জানালার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ আন্টির একটা কথা আমার কানে গেল, 'হ্যাঁ জোসেফ, কথাগুলো সত্য যে, আমরা পুরো জার্মান নই, পুরোপুরি খৃস্টানও আমাদের কখনও মনে করা হয়নি। আমাদের দাসবংশোদ্ভুত একথাও একটা কঠিন সত্য। আন্টির কথা শুনেই আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। শুনতে লাগলাম তাদের কথা। 'কিন্তু এই অভিযোগ কেন সত্য হবে? সত্য হলে পরিবারের সবাই এটা জানবে না কেন?' বাবা প্রশ্ন করলেন আন্টিকে।

আমারও প্রশ্ন দাদুর কাছে এটাই ছিল। দাদু আমাকে কাছে টেনে নিয়ে বলেছিলেন, জার্মানীতে প্রচুর অজার্মান ও নন-ইউরোপিয়ান এসেছেন সেই প্রাচীন কাল থেকে, মধ্যযুগের আরও বেশি আগে থেকে। তাদের বেশির ভাগ খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেছে। কেউ ইচ্ছায়, কেউ বাধ্য হয়ে। এরা আবার মুখে খৃস্টান হলেও মনেপ্রাণে খৃস্টান হয়নি। খৃস্টধর্মের মূল স্রোতে কখনও এদের গ্রহণ করা হয়নি। এদেরই বলা হয় হাফ খৃস্টান, হাফ জার্মান। আর এ কথাও সত্যি, মধ্যযুগের দাস ব্যবসায়ের যুগে যুদ্ধে পরাজিতদের কিংবা কোনওভাবে ধৃত বিদেশি, বিশেষ করে নন-ইউরোপিয়ানদের দাস হিসেবে অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের মত জার্মানীতেও প্রচুর মানুষ বিক্রি করা হয়েছে। তারাও হাফ খৃস্টানদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। মনে করা হয় আমাদের পরিবার এ ধরনেরই এক দাসবংশোদ্ভুত পরিবার। আমি দাদুর শেষ বাক্যটা শুনে বলেছিলাম, 'মনে করা হয় কেন? সত্যটা কি?' দাদু বলেছিলেন, 'কারণ, কোন নিশ্চিত প্রমাণ নেই, আমাদের পরিবারেও এ ধরনের কোন দলিল

নেই। তবে বোন, আমার দাদু জার্মানীর প্রথম আদমশুমারির বরাত দিয়ে আব্বাকে বলেছিলেন তাতে নাকি প্রত্যেক পরিবারের অরিজিন কি তার উপর একটা কলাম ছিল। সে কলামে নন-ইউরোপিয়ানদের জন্যে NE এবং দাস বংশোদ্ভুতদের S বর্ণ-সংকেত দেয়া ছিল। পরবর্তী আদমশুমারিতে এ ধরনের কলাম আর ছিল না। কিন্তু প্রথম আদমশুমারির তথ্যই বিভিন্ন ডকুমেন্ট ও লেখায় বিভিন্নভাবে উদ্ধৃত হয়ে আসছে।' আন্টির কথা এ পর্যন্ত শুনেই আমি চলে এসেছিলাম। বিভিন্ন সময়ের এসব কথা থেকেই আমাদের পরিবারে সাধারণ সবারই জানা হয়ে গেছে যে আমাদের পরিবার দাস বংশোদ্ভুত এবং আমাদেরকে পুরো জার্মান ও খৃস্টান মনে করা হয় না।' থামল আদালার বাবা জোসেফ জ্যাকব আলগার।

থেমেই আবার সংগে সংগে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে ভুলে গেছি। সেটা আমাদের একটা ফ্যামিলি সিক্রেট। এই সিক্রেট পরিবারের সবাই জানে না। পরিবারের ঐতিহ্য অনুসারে পরিবারের হেড অব দ্য ফ্যামিলী যখন ঠিক মনে করবেন বা প্রয়োজন মনে করবেন, তখন তিনি তাঁর সরাসবি উত্তরসূরি সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ, তার অবর্তমানে সরাসবি উত্তরসূরি বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাকে সিক্রেট জিনিসটি হস্তান্তর করে যান।' থামল জোসেফ জ্যাকব আলগার।

অপার বিস্ময় নামল আদালা হেনরিকা ও তার মা অ্যাল্লি আলিসিয়ার চোখে-মুখে। বলল আদালা তার পিতাকে লক্ষ্য করে, 'এত গোপনীয় যে জিনিসটা, সেটা কি বাবা?'

'এটা সত্যিই খুব গোপনীয়। কিন্তু কেন সেটা গোপনীয় আমি জানি না। বাবা-দাদাসহ আমাদের কোন পূর্বপুরুষই এটা প্রকাশ করেননি। আমিও পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য অনুসরণ করব, কোনভাবেই এটা প্রকাশ করব না। আজকের এই ঘটনার আগ পর্যন্ত আমার এটাই সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু মি. আহমদ মুসাকে দেখার পর এই সিদ্ধান্ত আমার পাল্টে গেছে। আমার মনে হয়েছে মি. আহমদ মুসার মত এমন সচেতন, জ্ঞানী, নিষ্ঠাবান বিশ্বাসী এবং সব দিক দিয়ে যোগ্য ও সহমর্মী এবং সেই সাথে দুনিয়ার সর্বকনিষ্ঠ ধর্ম ইসলামের অনুসারী কোন মানুষের

সাক্ষাৎ আমাদের পরিবার ইতিপূর্বে নিশ্চয় পায়নি। আমি যখন পেয়েছি, তখন সুযোগটা আমি গ্রহণ করবো।' বলল জোসেফ জ্যাকব আলগার।

'কিন্তু বাবা কি এমন বিষয় সেটা, যার জন্যে এমন লোকের সাক্ষাৎ জরুরি?' আদালা হেনরিকা বলল।

'গোপন জিনিসটার সাথে একটা ছোট্ট পরামর্শ যুক্ত আছে। সেটা হলো, একত্ববাদী সর্বকনিষ্ঠ ধর্মের অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও জ্ঞানী লোক বিষয়টির গোপনীয়তার রহস্য ভেদ করতে পারবেন। মি. আহমদ মুসাকে আমার এই ব্যক্তি বলে মনে হচ্ছে।' বলল জোসেফ জ্যাকব আলগার।

'ধন্যবাদ। আমি জানি না আমি সেই ব্যক্তি কি না। বিষয়টি কোন কিছুর পাঠোদ্ধার বা 'রিলিজিয়াস কোড' ধরনের মত কোন কিছুর ডিকোড করার বিষয় হতে পারে। তাই কি জনাব?' আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ মি. আহমদ মুসা। আপনি ঠিক ধরেছেন। বিষয়টি ডিকোড ধরনের।' বলল জোসেফ জ্যাকব আলগার।

'ডিকোডের প্রয়োজন! তাহলে জিনিসটা কি বাবা?' আদালা হেনরিকা বলল।

মাথা একটু নিচু করল জোসেফ জ্যাকব আলগার। মুহূর্তেই আবার মাথা তুলল সে। বলল, 'সেটা একটা মেহগনি কাঠের বাক্স। বাক্সে সোনার কারুকাজ। লকটি পোড়ানো খাদহীন লোহার। লক-এর তিনটি ঘোরানোর উপযোগী তিনটি ক্ষুদ্র চাকার প্রত্যেকটিতে রয়েছে ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো। সংখ্যার ধাঁধায় যুগ-যুগান্তর ধরে আটকে রয়েছে বাক্সটি।' বলল জোসেফ জ্যাকব আলগার।

'বাক্সটি কার?' জিজ্ঞেস করল আদালা হেনরিকা।

'এটা নির্দিষ্ট করে কেউ জানে না। বলা হয় এটা আমাদের আদি পুরুষের একটি পবিত্র আমানত। সেই পুরুষ জার্মানীতে আমাদের প্রথম পুরুষ, না দ্বিতীয় বা তৃতীয় তা আমরা কেউ জানি না।'

বলে একটু থামল জোসেফ জ্যাকব আলগার। বলল আবার, 'মি. আহমদ মুসা, আমি কি বাক্সটি আনতে পারি? বাক্সের কোড-রহস্য ভেদ করতে পারি কি আপনার সাহায্য চাইতে?'

‘ধন্যবাদ মি. জোসেফ জ্যাকব আলগার। আপনাদের কোন প্রকার সাহায্য করতে পারলে আমি খুব খুশি হবো।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ধন্যবাদ মি. আহমদ মুসা।।

বলেই জোসেফ জ্যাকব আলগার ঘুরে তাকালো আদালা হেনরিকার দিকে। একটা আলমারি দেখিয়ে বলল, ‘মা, ঐ আলমারির নীচের তাকের বইগুলো নামিয়ে ফেল। কাঠের তাকটার দু’প্রান্তে দেখো দু’টো কাঠের স্ক্রু আছে। স্ক্রু দু’টো তুলে ফেল। তাকটা সরিয়ে দেখ আয়তাকার ছোট সুন্দর একটা বাক্স পাবে। ওটা বের করে আন।

‘পরিবারের পবিত্র আমানত বাক্সটা কি ঐখানে আছে বাবা?’ জিজ্ঞাসা আদালা হেনরিকার।

‘হ্যাঁ, মা। এখানে কতদিন ধরে আছে আমি জানি না। বাবা আমাকে এখানে দেখিয়ে গেছেন। আমার মনে হয় এই আলমারির বয়স ততদিন, যতদিন ধরে বাক্সটা এখানে আছে।’ বলল জোসেফ জ্যাকব আলগার।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘সাধারণ অথচ অসাধারণ নিরাপদ জায়গা এটা। যিনিই এটা করুন, তার অসাধারণ কল্পনাশক্তি ছিল।’

‘ধন্যবাদ স্যার, আমি উঠছি।’ বলে আদালা হেনরিকা উঠে দাঁড়াল।

যেভাবে তার বাবা বলেছিল, সেভাবেই ছোট সুন্দর বাক্সটি বের করে আনল আদালা। এনে তার বাবার হাতে তুলে দিল বাক্সটি।

আদালার বাবা জোসেফ জ্যাকব আলগার আস্তে আস্তে বাক্সটি হাতে নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে সম্মান দেখাল বাক্সটিকে। তারপর লকটিকে একবার দেখে নিয়ে বাক্সের উপর উৎকীর্ণ দু’টি লাইনের উপর নজর বুলাল। পড়ল আবার, ‘পৃথিবীর একত্ববাদী সর্বকনিষ্ঠ ধর্ম এবং নিষ্ঠার সাথে সেই ধর্ম পালনকারী, ধর্ম সম্পর্কে বিজ্ঞ, বিদ্বান ও সৎ কোন ব্যক্তির জন্যে এই ধাঁধা। এই ধর্মের ধর্মগ্রন্থের প্রথম পঠিতব্য শ্লোকের বা বাক্যের ডিজিটাল নাম্বার হলো বাক্সের লক খোলার কোড।’

পড়ে নিয়ে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘একত্ববাদী সর্বকনিষ্ঠ ধর্ম তো আপনার ধর্ম ইসলাম, তাই না?’

‘জি, হ্যাঁ।’ বলল আহমদ মুসা।

'মি. আহমদ মুসা, প্লিজ এই বাক্সটি হাতে নিন। আপনিও বাক্সের উপরের ইনস্ট্রাকশনটা পড়ে দেখুন।'

বলে জোসেফ জ্যাকব আলগার বাক্সটি আহমদ মুসার দিকে তুলে ধরল।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়ে বাক্সটি হাতে নিল। আস্তে আস্তে বসল চেয়ারে। তার আগেই আহমদ মুসার দুই চোখ বাক্সের উপরে খোদাই করা উৎকীর্ণ লেখাগুলোর উপর আঠার মত আটকে গেছে।

বাক্সের উপরে মূল্যবান কাঠের উপর উৎকীর্ণ লেখা পড়ল আহমদ মুসা। একটা বিস্ময় জাগল আহমদ মুসার মনে, একত্ববাদী সর্বকনিষ্ঠ ধর্মের লোকের উপর লকের ধাঁধা ভাঙার দায়িত্ব ছাড়লেন কেন! তাহলে উনি কি মুসলিম ছিলেন!

'কি পড়লেন মি. আহমদ মুসা?' জিজ্ঞেস করল জোসেফ জ্যাকব আলগার।

'ধাঁধার বিষয়টাও নিশ্চয় দেখলেন?' আবার বলল জোসেফ জ্যাকব আলগার।

'জি, হ্যাঁ। দেখেছি।' আহমদ মুসা বলল।

'মাফ করবেন, আমার খুব কৌতুহল হচ্ছে। আপনি বুঝতে পারছেন, ডিকোড করা কি সম্ভব? কোন শ্লোক বা কাব্যের কোন ডিজিটাল নাম্বার থাকে, তা কোন দিন শুনিনি!' বলল জোসেফ জ্যাকব আলগার।

'আরবি ভাষার বর্ণের একটা করে ডিজিটাল নাম্বার আছে।' আহমদ মুসা বলল।

'আরবি ভাষা! সেটা আবার কোন ভাষা?' বলল জোসেফ জ্যাকব আলগার।

'মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষা আরবি। এই ভাষাতেই মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে। আবার এটা আরব দেশগুলোর ভাষাও।' আহমদ মুসা বলল।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আপনি সব জানেন দেখছি। আপনার ধর্মগ্রন্থ নিশ্চয় আপনার পড়া আছে? প্রথম শ্লোক তো অবশ্যই?' বলল জোসেফ জ্যাকব আলগার।

'প্রতিদিনই পড়ি, পড়তে হয়।' আহমদ মুসা বলল।

‘ও! তাহলে তো ধর্মগ্রন্থ আপনার কাছেই আছে?’ বলল জোসেফ জ্যাকব আলগার।

‘আছে মানে এই ব্যাগেই আছে। না থাকলেও অসুবিধা হতো না। আমাদের ধর্মগ্রন্থের বিরাট অংশ আমার মুখস্থ আছে।’

‘বিরাট অংশ মুখস্থ আছে? এভাবে কোন বই মুখস্থ করা যায়? মুখস্থ কেউ করে?’ বলল বিস্মিত কন্ঠে আদালার মা আলিসিয়া।

‘আর কোন বই এত সহজে মুখস্থ করা বা মুখস্থ রাখা যায় কি না আমি জানি না। তবে আল্লাহর বাণী এই গ্রন্থ সহজেই মুখস্থ করা যায়, মুখস্থ করা হয়, মুখস্থ রাখাও হয়। এই গোটা ধর্মগ্রন্থ মুখস্থ আছে এমন লক্ষ লক্ষ লোক দুনিয়ায় আছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ও গড! বাইবেল কারও মুখস্থ আছে এমন কথা তো কখনও শুনিনি।’ বলল আদালার মা আলিসিয়া।

তার ও আদালার দু’জনেরই চোখে-মুখে বিস্ময়।

‘আমিও শুনিনি আলিসিয়া। যাক এদিকের কথা। মি. আহমদ মুসা আপনার ধর্মগ্রন্থ একটু দেখাবেন? আমি দেখিনি কখনও মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ।’ বলল জোসেফ জ্যাকব আলগার।

‘অবশ্যই দেখবেন।’

বলে আহমদ মুসা ব্যাগ থেকে সুদৃশ্য চামড়ার কভারে মোড়া ছোট্ট কুরআন শরিফ বের করল। কভার খুলে কুরআন খুলে দেখাল সবাইকে।

‘এত ক্ষুদ্র অক্ষর। তবু ভলিউম এত বড় হয়েছে। এই গোটা ধর্মগ্রন্থ মুখস্থ করা ও মুখস্থ রাখা তো মিরাকল।’ বলল আদালা হেনরিকা।

‘সত্যিই বলেছেন ম্যাডাম আদালা হেনরিকা। বিষয়টা সত্যিই একটা মিরাকল।’ ব্রুনা ব্রুনহিল্ড বলল।

‘ধর্মগ্রন্থটা আমি একটু হাতে নিতে পারি জনাব আহমদ মুসা?’ বলল আদালার বাবা জোসেফ জ্যাকব আলগার।

‘অবশ্যই স্যার।’ বলে আহমদ মুসা কুরআন শরিফটা জোসেফ জ্যাকব আলগারের হাতে দিল।

জোসেফ জ্যাকব আলগার কুরআন শরিফটা যত্নের সাথে হাতে নিয়ে চুমু খেয়ে আহমদ মুসাকে ফেরত দিতে দিতে বলল, 'আমার পূর্বপুরুষরা কেন বাক্সের কোডকে এই ধর্মগ্রন্থের সাথে যুক্ত করলেন জানি না। তবে এটা ঠিক এ ধর্মগ্রন্থকে তারা জানতেন, হয়তো এর সাথে কোন সম্পর্কও তাদের ছিল। সে কারণে এ ধর্মগ্রন্থের প্রতি আমাদেরও ভালোবাসা থাকা উচিত।'

কুরআন শরিফটা ব্যাগে রেখে বাক্সটা আবার হাতে নিয়ে বলল আহমদ মুসা, 'লকটি কি আমরা এখন খুলব মি. আলগার?'

'হ্যাঁ, মি. আহমদ মুসা। আমরা খুব খুশি হবো। বাক্সের ভেতরে কি আছে, এটা জানার আগ্রহ আমাদের যুগ-যুগান্তরের। ধাঁধার আড়াল সৃষ্টি করে আমাদের পূর্বপুরুষরা এই বাক্সে অমূল্য কি রেখে গেছেন, তা আমরা সব সময় জানতে চেয়েছি। সোনা-দানার মত অথর্থ-সংশ্লিষ্ট কিছু এ বাক্সে যে নেই এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত। কারণ যে স্বর্ণমুকুটটি আমাদের হাতে আছে, অর্থের বিচারে তার চেয়ে মূল্যবান আমাদের কাছে আর কিছু নেই। এই মহামূল্যবান বস্তুর জন্যে সাধারণ শোকেসে রাখা ছাড়া অন্য কোন নিরাপত্তা ব্যবস্থা কখনো করা হয়নি, অথচ বাক্সটা কঠিন ধাঁধার বাঁধনে বাঁধা। এর মাধ্যমে কোন জিনিসের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে, সে বিষয়ে আমাদের পরিবারের রয়েছে অসীম আগ্রহ। প্লিজ, আমাদের সাহায্য করুন।' বলল জোসেফ জ্যাকব আলগার।

আহমদ মুসা ভাবছিল। ধাঁধায় উল্লিখিত ধর্মগ্রন্থের পঠিতব্য প্রথম শ্লোক কোনটা? বিসমিল্লাহ, না সূরা ফাতেহার প্রথম আয়াত? ধর্মগ্রন্থের প্রথম শ্লোক না বলে পঠিতব্য প্রথম শ্লোক বলা হয়েছে কেন? সূরা ফাতেহার প্রথম শ্লোক বা আয়াত তো পড়তেই হয় সুরাটি পড়া শুরু করলে, কিন্তু তা সত্ত্বেও 'পঠিতব্য' শ্লোক বলা হয়েছে কেন? 'পঠিতব্য' অর্থ হলো আইনের দ্বারা পড়ার জন্যে নির্দেশিত। এই অর্থ বিবেচনা করলে 'বিসমিল্লাহ'ই পঠিতব্য প্রথম আয়াত বা শ্লোক হয়। বিসমিল্লাহ পাঠ নির্দেশিত একটা বিষয়। আহমদ মুসার মন আনন্দে ভরে উঠল। অন্য বিবেচনাতেও বিসমিল্লাহ সেই সঠিক আয়াত। বিসমিল্লাহ সব কাজ শুরুর আগে পঠিতব্য আয়াত। তাছাড়া বিসমিল্লাহর ডিজিটাল ব্যবহার বহুল পরিচিত।

আহমদ মুসা মাথা তুলল। সবার উপর দিয়ে একবার চোখ ঘুরিয়ে নিল। সবাই তাকিয়েছিল ভাবনায় ডুবে থাকা আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'বোধ হয় সমাধান পেয়ে গেছি।'

বলে আহমদ মুসা লক-এর তিনটি ডিজিটাল চাকা একে একে ঘুরিয়ে '৭৮৬' কম্বিনেশনে দাঁড় করাল। তারপর বাক্সের উপরের ঢাকনার উপর একটা চাপ দিল বিসমিল্লাহ বলে। ঢাকনা নড়ে উঠল। খুলে গেছে লক।

আহমদ মুসা বাক্সটি জোসেফ জ্যাকব  আলগারের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'লক খুলে গেছে।'

জোসেফ জ্যাকর আলগার, আদালা এবং আদালার মা আলিসিয়ার চোখ-মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'বাবা, খুলুন বাক্সটা। আমাদের আর তর সইছে না।' বলল আদালা হেনরিকা।

আদালার বাবা জোসেফ জ্যাকব আলগারের চোখে-মুখে এবার উত্তেজনা, একটা বিমূঢ় ভাবও। বলল, 'খুলবো আদালা? আমার যে সাহস হচ্ছে না। আমাদের পূর্বপুরুষ এতে আমাদের জন্যে কি রেখেছেন, কি দেখব এটা যে আমার হার্ট বিট বাড়িয়ে দিচ্ছে।'

বলেই জোসেফ জ্যাকব আলগার তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'প্লিজ আপনিই বাক্সটা খুলুন, আমার সাহস হচ্ছে না।'

'না মি. জোসেফ জ্যাকব আলগার, বিষয়টার সাথে আপনাদের পরিবারের ঐতিহ্যিক দায়িত্ব, কর্তব্য ও সম্মানের প্রশ্ন জড়িত। উত্তরাধিকারী হিসেবে এই বাক্স খোলার দায়িত্ব আপনাকেই পালন করতে হবে।'  আহমদ মুসা বলল।

জোসেফ আলগার আহমদ মুসার কথার জবাবে কিছু বলল না। তার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। বাক্স সমেত বাড়ানো হাত টেনে নিল সে। রাখল কোলের উপর।

চোখ দু'টি বন্ধ করে আত্নস্থ হলো সে। একটু পর চোখ খুলে আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ধন্যবাদ মি. আহমদ মুসা। আমার চোখ খুলে দিয়েছেন।'

কথা শেষ করেই জোসেফ জ্যাকব আলগার উপরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'হে মহান ঈশ্বর, আমার পূর্বপুরুষ সবার উপর শান্তি বর্ষণ করুন এবং আমাকে তাদের যোগ্য উত্তরাধিকারী হবার শক্তি দান করুন।'

বলে মাথা নিচু করে বাক্সের দিকে মনোযোগ দিল জোসেফ জ্যাকব আলগার। দু'হাত দিয়ে আয়তাকার বাক্সের দুই প্রান্ত ধরে দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে বাক্সের উপরের ঢাকনার অংশে চাপ দিল। খুলে গেল বাক্স। ধীরে ধীরে ঢাকনা তুলল জোসেফ জ্যাকব আলগার।

উন্মুক্ত হলো বাক্স। সবার চোখ বাক্সের অভ্যন্তরে।

বাক্সের ভেতরে কালো কভার দেয়া বড়-সড় একটা খাতা দেখা যাচ্ছে। খাতাটি আস্তে আস্তে সম্মানের সাথে হাতে তুলে নিল জোসেফ জ্যাকব আলগার।

সবার চোখ খাতাটার দিকে।

সুন্দর চামড়ার কভার। কত দিনের পুরানো? কভারের চামড়ার অবস্থা দেখে তা বোঝা যাচ্ছে না।

জোসেফ জ্যাকব আলগার আস্তে আস্তে কভার উল্টালো। প্রথম পাতাটায় কিছু লেখা নেই। এটা চামড়ার মূল্যবান একটা কাগজ। কাগজের রং কিছুটা বিকৃত এবং কাগজের প্রকৃতি কিছুটা শক্ত হয়ে গেলেও নিরাপদে পাতা উল্টিয়ে তা পাঠযোগ্য রাখার জন্য এটা যথেষ্ট উপযুক্ত। প্রথম পাতা থেকে দ্বিতীয় পাতায় গেল জোসেফ জ্যাকব আলগার। দ্বিতীয় পাতায় দ্বিতীয় শুধু একটা শব্দ লেখা। দুর্বোধ্য। পরবর্তী কয়েকটা পাতা উল্টিয়ে দেখল একই ধরনের লেখা, একই ভাষা এবং দুর্বোধ্য। জোসেফ জ্যাকব আলগার আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মি. আহমদ মুসা, ভাষা দুর্বোধ্য। আমি ভাষাটাই চিনলাম না। দেখুন তো এটা কি আপনার ধর্মগ্রন্থের ভাষা?'

বলে জোসেফ জ্যাকব আলগার আস্তে আস্তে খাতাটা আহমদ মুসার দিকে তুলে ধরে বলল, 'আপনি একটু দেখুন মি. আহমদ মুসা।'

দু’হাত বাড়িয়ে খাতাটা হাতে নিল আহমদ মুসা। লেখার দিকে চোখ বুলিয়েই বলল, ‘মি. জোসেফ জ্যাকব আলগার, এটা আরবি ভাষা। আমাদের ধর্মগ্রন্থের ভাষা।’

‘মানে আগে যেটা বললেন এটা আরব দেশগুলোর ভাষা, আপনাদের ধর্মগ্রন্থের ভাষা?’ বলল জোসেফ জ্যাকব আলগার।

‘জি, হ্যাঁ।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষের এমন সেফ কাস্টডিতে সংরক্ষণ করা এবং উত্তরপুরুষের জন্যে পবিত্র আমানত হিসেবে রাখা খাতা বা ডকুমেন্ট আরবি ভাষায় কেন?’ বলল জোসেফ জ্যাকব আলগার। তার চোখে-মুখে অপার বিস্ময়।

‘হ্যাঁ, এটা আমাদেরও জিজ্ঞাসা।’ বলল আদালার মা আলিসিয়া এবং আদালা হেনরিকা।

‘আপনাদের এই প্রশ্নের উত্তর হাতে লেখা ঐ খাতা বা বই থেকেই শুধু পাওয়া যেতে পারে।’ আহমদ মুসা বলল।

জোসেফ জ্যাকব আলগার তাকিয়েছিল আহমদ মুসার দিকে। আহমদ মুসার কথা শেষ হলে কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল জোসেফ জ্যাকব আলগার। কিন্তু তার আগেই আদালা হেনরিকা বলে উঠল, ‘বাবা দেখ তোমার বাক্সে ও দু’টো কি, মেডেলের মত?’

জোসেফ জ্যাকব সংগে সংগে তাকাল বাক্সের দিকে। বলল, ‘তাই তো দু’টো মেডেল।’

সে হাতে নিল মেডেল দু’টো। বলল, ‘ওজন ও রং দেখেই বুঝা যাচ্ছে সোনার মেডেল।’

জোসেফ জ্যাকব চোখ বুলাল মেডেল দু’টির উপর। উল্টে-পাল্টে দেখল। আবার তার চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে বিস্ময়। বলল, ‘মি. আহমদ মুসা, এতেও মনে হচ্ছে সেই আরবি ভাষা। প্লিজ একটু দেখুন এগুলো আসলে কি, কিসের মেডেল?’

আহমদ মুসা হাতে নিল মেডেল। উল্টে-পাল্টে দেখল। সোনার মেডেলে উৎকীর্ণ আরবি অক্ষরে কিছু লেখা। লেখাগুলো পড়লো আহমদ মুসা। বিস্ময়াবিষ্ট সকলের অখণ্ড মনোযোগ আহমদ মুসার দিকে।

মেডেল দু'টির একটি হলো, কর্ডোভা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মেডেল অব এক্সিলেন্স'। বিষয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিষয়ক পরীক্ষায় চুড়ান্ত পর্বে প্রথম স্থান লাভের পুরস্কার। প্রাপকের নাম: আবু ইউসুফ ইয়াকুব আল মানসুর।

দ্বিতীয়টি কর্ডোভা হাসপাতালের 'মেডেল ফর ব্রিলিয়ান্ট সার্ভিস, ১২৩১'। বিষয়: বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের সর্বোচ্চ আই-সার্জরি। সার্জন আবু ইউসুফ ইয়াকুব আল মানসুর।

দু'টি মেডেলে উৎকীর্ণ আরবি লেখার এই অর্থ দু'টোও শোনাল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই আদালা হেনরিকা বলে উঠল, কর্ডোভা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও কর্ডোভা হাসপাতালের মেডেল। একজন আবু ইউসুফ ইয়াকুব আল মানসুরকে মেডেলগুলো দেয়া হয়েছে। কিন্তু এ মেডেল আমাদের বাড়িতে আমাদের পূর্বপুরুষের বাক্সে কেন?' আদালা হেনরিকাসহ তার মা-বাবা এবং ব্রুনা ও আলদুনি সেনফ্রিড সকলেরই চোখে-মুখে বিস্ময়।

'বিষয়টি অবশ্যই বিস্ময়ের। মেডেল দু'টি খাতাটির সাথে ছিল। আর মেডেল দু'টির মত খাতাটিও আরবিতে লেখা। সুতরাং আমার বিশ্বাস খাতাটি থেকেই সব প্রশ্নের জবাব মিলবে।' বলল আহমদ মুসা।

'ঠিক মি. আহমদ মুসা। আমাদের পূর্বপুরুষের বাক্সে এই ধরনের মেডেলের অস্তিত্ব আমাকে হতবাক করেছে। প্লিজ আপনি খাতাটা পড়া শুরু করুন। পড়তে আপনার কষ্ট হবে। খাতাটার পৃষ্ঠা সংখ্যা চারশ'র কম হবে না। কিন্তু কি করা যাবে বলুন।' বলল জোসেফ জ্যাকব আলগার।

'মেডেল ও খাতার প্রতি আপনাদের যে আগ্রহ ও আকর্ষণ তার চেয়ে আমার আগ্রহ ও আকর্ষণ কম নয়। গোটা বিষয় আমাকে দারুণভাবে অবাক করেছে। পড়তে আমার কোনই কষ্ট হবে না। পৃষ্ঠা চারশ'র মত হলেও প্রতি

লাইনের পরে একটা করে লাইন বাদ রাখা হয়েছে। আর হস্তাক্ষর বড় হওয়ায় স্টান্ডার্ড সাইজে একশ পাতার বেশি এটা হবে না।

আর খুব জরুরি নয়, এমন বর্ণনা ও বিষয় আমি আপাতত বাদ দিয়ে পড়ব। হেডিং বা সাব-হেডিং দেখেই আমি বিষয়টা বুঝতে পারবো আশা করছি।' আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ মি. আহমদ মুসা, প্লিজ পড়া শুরু করুন।' বলল জোসেফ জ্যাকব আলগার।

পড়তে শুরু করল আহমদ মুসা:

''পরম দয়ালু ও দাতা আল্লাহর নামে শুরু করছি।

আমার কথা আমি লিখব আগে কখনো ভাবিনি। ভেবেছিলাম অতীতকে মুছে ফেলে একজন জার্মান হিসেবে নতুন জীবন শুরু করবো। আমাদের হাজারো নিবেদিত মিশনারি মানুষ পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, সে সব দেশের মাটি ও মানুষের সাথে একাত্ম হয়ে গেছে। আমি তাদেরই একজন, যদিও একজন মিশনারির কোন দায়িত্বই আমি পালন করছি না। বরং নাম-পরিচয় পাল্টে আমি নিজের না থেকে অন্যের হয়ে গেছি। সিদ্ধান্তটা আমার ছিল সাময়িক। কিন্তু সে সাময়িক সিদ্ধান্তই পরে স্থায়ী হয়ে যায়। এর মাধ্যমে আমি আমার পিছুটান একেবারেই মুছে ফেলতে চেয়েছিলাম। আমার বিশ্বাস ও পরিচয়কে আমার ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে বাইরে আমি পুরোপুরি জার্মান হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু ধীরে ধীরে আমার ভুল ভাঙতে শুরু করে। জীবনের একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছলাম যখন আমার কাছে পরিস্কার হয়ে গেল যে, আমি বিরাট ভুলের মধ্যে রয়েছি। জার্মান দেশে বাস করলেই, জার্মান ভাষায় কথা বললেই জার্মান হওয়া যায় না। সরকার ও সরকারের আইন যাই বলুক, এখানকার সমাজের মূল স্রোতের যে চরিত্র কিংবা এই মূল স্রোত যারা নিয়ন্ত্রণ করেন তাদের নিয়ম-নীতি কখনো বদলায় না। এই নিয়ম-নীতি এখানে বহিরাগত আর দাস-বংশীয়দের কখনো জার্মান হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না। তাতে বহিরাগতরা কোন কালেই জার্মান হয় না। তাদের বহিরাগত আর দাস-বংশীয় হবার অপবাদ বহন করেই চলতে হবে। এই চিন্তা করার পর আমি আমার নিজের কথা লেখার সিদ্ধান্ত নিলাম, যাতে

আমার উত্তর পুরুষরা অন্তত একথা জানতে পারে যে, তারা ঐতিহ্যবাহী একটা জাতির অংশ। যারা ইউরোপকে সভ্যতা শিখিয়েছিল এবং যারা লন্ডন নগরী গড়ে ওঠার ৭শ' বছর আগে গ্যাসবাতি ও পয়:প্রণালী সমৃদ্ধ নগর

সভ্যতার জন্ম দিয়েছিল। দুর্ভাগ্য আমাদের অনৈক্যের অভিশাপেই বিশেষ করে আমাদের এই সভ্যতার পতন ঘটে। অন্ধকার ইউরোপের হিরক খণ্ড কর্ডোভা, গ্রনাডা, মালাডার মত শিক্ষা-সভ্যতা ও শক্তির কেন্দ্রগুলো নিজেই অন্ধকারে ডুবে যায়।

আমার নাম আবু ইউসুফ ইয়াকুব আল মানসুর। জন্ম আমার ১১৯৯ সালে। আমার জন্ম যে সময়, সে সময়টা গৌরবদীপ্ত মুসলিম সাম্রাজ্য স্পেনের পতন শুরুর কাল। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত, খণ্ড-বিখণ্ড স্পেনের একটা সালতানাতের রাজধানী, শিক্ষা-সভ্যতার জন্যে বিখ্যাত নগরী কর্ডোভায় আমার জন্ম। আমার জন্মের বছরই আল-মোহাইদ বাজবংশের খলিফা আবু ইউসুফ ইয়াকুব আল মানসুর ইন্তেকাল করেন। ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে খলিফা আবু ইউসুফ ছিলেন ক্রমবর্ধমান ঔজ্জ্বল্যের এক প্রতীক। আমার আব্বা ছিলেন খলিফার দরবারের একজন কর্মকর্তা। খলিফার ইন্তেকালে শোকাহত আব্বা খলিফার নামানুসারে আমার নামকরণ করেন।

কর্ডোভার রাজকীয় স্কুলে আমার শিক্ষাজীবনের শুরু। আর আমার শিক্ষাজীবনের শেষ হয় কর্ডোভা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার পঁচিশ বছর বয়সে। আমার শিক্ষাজীবনের গোটাটাই ছিল কৃতিত্বপূর্ণ। বরাবরের মত মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষাতেও আমি প্রথম স্থান অধিকার করি। বিশ্ববিদ্যালয়ে সহপাঠীদের বিরাট অংশ ছিল ইউরোপের বিভিন্ন দেশের। গোটা ইউরোপে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় দূরে থাক, একটা মেডিকেল স্কুলও ছিল না। তখন ইউরোপে চিৎকিসাসহ সব ধরনের বিজ্ঞান চর্চা ছিল নিষিদ্ধ। কৃতিত্বের সাথে পাস করার পর মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার অধ্যাপকের চাকরি পাকাপোক্ত হয়ে গেল। কর্ডোভার মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই শেষ পরীক্ষার ফল প্রকাশের দিনটি যেমন ছিল আমার আনন্দের, তেমনি দিনটি ছিল বিষাদেরও। আমার রেজাল্ট নিয়ে বাসায় কি অপার আনন্দ হবে! আব্বা কি যে

খুশি হবেন শীর্ষ কৃতিত্বসহ আমাকে ডাক্তার হতে দেখে! কিন্তু বাড়ির সীমানায় পা দিয়েই কান্নার রোলে আনন্দের শেষ রেশটুকুও আমার মন থেকে হারিয়ে গেল। আব্বাকে আর সুসংবাদ দেয়া হলো না, তাঁর ইন্তেকালের দু:সংবাদ নিয়ে আমি বাড়িতে প্রবেশ করলাম।

আমার পরিবারের যে দু:সময় তার চেয়ে বড় দু:সময় তখন চলছিল সুন্দর নগরী, শিক্ষার নগরী, সভ্যতার নগরী কর্ডোভার। ভয়ানক দু:সময় তখন গোটা মুসলিম স্পেনের। ১২২৭ সাথে আব্বা মারা যান। তখন একমাত্র গ্রানাডা ছাড়া কর্ডোভাসহ দক্ষিণ ও মধ্যস্পেনের বড় বড় শহরের কোনটিই আর মুসলমানদের অধিকারে ছিল না। কর্ডোভা তখন ছিল ক্যাস্টাই ও লিওনের খৃস্টান রাজার দখলে। এই অবস্থা অনেকের মত খলিফার দরবারের একজন কর্মকর্তা বাবাকেও দারুণভাবে আঘাত করেছিল। এই আঘাত ছিল বাবার মৃত্যুর অন্যতম কারণ। আমি পাস করার আগে থেকেই কর্ডোভার বিখ্যাত সরকারি হাসপাতালে ইন্টারনি ডাক্তার হিসেবে কাজ করছিলাম। নতুন খৃস্টান শাসক কর্ডোভা নগরীর বিখ্যাত ও নগরীর বিখ্যাত মসজিদের অনেক ক্ষতি করলেও নগরীর বিখ্যাত হাসপাতালে গায়ে তাদের স্বার্থেই হাত দেবার চেষ্টা তারা করেনি। হাসপাতাল থেকে তারা সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা নিয়েছে, সেই কারণে হাসপাতালের কোন কার্যক্রমে তারা হস্তক্ষেপ করেনি। আমরা স্বাধীনভাবেই হাসপাতালের কাজ করেছি।

পাস করার পর ডাক্তার হিসেবে হাসপাতালে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেবার পর ১২২৮ সালে কর্ডোভার আঞ্চলিক এক মুসলিম সুলতান কর্ডোভাকে মুক্ত করেন। একটা আনন্দের প্রদীপ জ্বলে উঠল আমাদের মনে। কর্ডোভা-নগরী ও কর্ডোভা নগরীর কেন্দ্রবিন্দু কর্ডোভা মসজিদের ক্ষতস্থানগুলো সারিয়ে তোলার চেষ্টা চলল। আমাদের হাসপাতাল পূর্ণ প্রাণচাঞ্চল্য আবার ফিরে পেল।

কিন্তু ১০৩১ সালে শেষ উমাইয়া খলিফা তৃতীয় হিশাম চারদিকের ঘনায়মান অন্ধকারে ব্যর্থতার দায় নিয়ে নিখোঁজ হয়ে যাবার পর স্পেনে সীমাহীন বিরোধ-বিভক্তির যে যাত্রা শুরু হয়েছিল ইউসুফ ইবনে তাসফিনের আল-মুরাবাইদ বংশের শক্তিমান উত্থান তাকে রোধ করতে পারেনি, বরং ১১৩০

সালের দিকে আল-মোহাইদ বংশের উত্থান এই প্রচেষ্টার আরও ক্ষতিই করেছিল। পর্তুগাল, ইউরোপ ও উত্তর-স্পেন কেন্দ্রিক খৃস্টানদের সম্মিলিত উত্থানের মুখে ভেসে গিয়েছিল আল মোহাইদ, ইবনে হুদ ও নাসেরাইড ডাইনেস্টির মত শাসকরা।

কর্ডোভা আবার হাতছাড়া হলো। সেই কাস্টাইল বংশেরই রাজা তৃতীয় ফার্ডিন্যান্ড তার বিশাল বাহিনী নিয়ে কর্ডোভা দখল করে নিল। এই দখলের হৃদয়হীন ঝড় লণ্ডভণ্ড করে দিল কর্ডোভাকে। মুসলিম নামের ক্ষমতালিপ্সু, নির্লজ্জ শাসকদের বিভেদ-সংঘাতের কারণেই এই মহাবিপর্যয় ঘটেছিল। তবু তাদের বোধোদয় হয়নি। এদেরই একজন স্পেনে নাসেরাইড ডাইনেস্টির প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আল হামার। কর্ডোভার পতনের পর কর্ডোভা বিজয়ী খৃস্টান রাজা ফার্ডিন্যান্ডকে মোহাম্মদ আল-হামার প্রস্তাব দিলেন যে, তিনি ফার্ডিন্যান্ডকে মুসলিম রাজ্য সেভিল জয়ে সাহায্য করবেন। বিনিময়ে ফার্ডিন্যান্ড মোহাম্মদ আল-হামারকে গ্রানাডার অনুগত স্বাধীন সুলতান হিসেবে মেনে নেবেন। এই চুক্তি অনুসারেই আল-হামার সেভিল জয়ে ফার্ডিন্যান্ডকে সাহায্য করেছিল। তারপর খৃস্টান রাজা ফার্ডিন্যান্ডের আনুগত্যের তকমা পরে আল-হামার গ্রানাডায় প্রবেশ করেছিল গ্রানাডার সুলতার হিসেবে। গ্রানাডায় প্রবেশের সময় বিবেকের দংশনে বিপর্যস্ত এই সুলতান স্লোগান তুলেছিল, ‘আল্লাহ ছাড়া আর কোন বিজয়ী নেই’। ‘আল্লাহ ছাড়া আর কোন বিজয়ী নেই’-এই কথাকে তিনি তাঁর রাষ্ট্রেরও মূল স্লোগান বানিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, বিখ্যাত আল-হামরা প্রাসাদের দেয়ালে আরবি ভাষার অপরূপ কারুকার্যময় লিপিতে শতবার শতভাবে এই কথা লিখে রাখেন। আমার ক্রীতদাস জীবনের শুরুতে আমি যখন উত্তর ফ্রান্সের এক দাস বাজারে, তখন আমি এই খবরটা শুনেছিলাম। এটা শোনার পর আমি অঝোর নয়নে কেঁদেছিলাম আল-হামরার মত মুসলিম শাসকদের চিন্তা ও কাজের বেদনাদায়ক বৈপরীত্য দেখে। কর্ডোভার ভাইদের প্রতি না তাকিয়ে, সেভিলের ভাইদের বুকে ছুরি মেরে তাদের উপর খৃস্টান রাজা ফার্ডিন্যান্ডকে বিজয়ী করে যিনি গ্রানাডাকে তার পুরস্কার হিসেবে নিয়েছেন, সেই সুলতার কি করে পারলেন এই স্লোগান তুলতে আর আল-হামরা প্রাসাদের গায়ে লিখতে যে, ‘আল্লাহ ছাড়া

আর কোন বিজয়ী নেই!' দু'হাত তুলে সেদিন কেঁদে কেঁদে বলেছিলাম, এই সব শাসকের কথা ও কাজের এবং ঈমান ও আমলের এই বৈপরীত্যের মাশুল হিসেবে স্পেনের লক্ষ লক্ষ মুসলমান ধ্বংস হয়ে গেল, আমার মত হাজারো মানুষ ক্রীতদাসের শৃঙ্খল গলায় পরতে বাধ্য হলো। মা'বুদ আমার জীবদ্দশায় কর্ডোভা যদি মুক্ত হয়,

তাহলে আমাকে সেখানে যাবার সুযোগ দিও, যাতে গোয়াদেল কুইভারের ব্রীজের উপর দাঁড়িয়ে আমি চিৎকার করে বলতে পারি, 'আল্লাহ ছাড়া আর কেউ বিজয়ী নয়, এ কথা সত্য, কিন্তু যে শাসক নিজের স্বার্থে অন্যকে বিজয়ী করে, তাদের অধিকার নেই এই পবিত্র বাক্য উচ্চারণের। এরা এদের স্বার্থ হাসিলের জন্যে মুসলিম জনতাকে বিভ্রান্ত করছে। কিন্তু আমার ইচ্ছা পূরণ হয়নি। আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জানি কর্ডোভা মুক্ত হয়নি, বরং তার উপর রাতের অন্ধকার আরও গভীরতর হয়েছে।

কর্ডোভার পতন হওয়ার দুর্ভাগ্যের দিনটিও ছিল আমার জন্যে পরম সৌভাগ্যের। এদিন সকালেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে চিকিৎসা-বিজ্ঞানী হিসেবে অর্ধযুগের কাজের মূল্যায়নের স্বীকৃতি হিসেবে চিকিৎসা সেবায় সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসা-বিজ্ঞানীর পুরস্কার লাভ করি আমি। একটা স্বর্ণের মেডেল এবং তার সাথে পাই এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার হিসেবে। একই সাথে এই দিন বিশ্ববিদ্যালয়ও আমার শেষ পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার মেডেল দিয়ে দেয়। আমার পিতার মৃত্যু আমাকে এতটাই আপসেট করেছিল যে, মেডেলটি সংগ্রহ ও বাড়িতে নেয়ার ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু এদিন বিশ্ববিদ্যায়ের প্রক্টর আমার প্রিয় শিক্ষক বললেন, চারদিকের অবস্থা ভালো নয়। হাজারটা বিপদ শহরের উপকন্ঠে, মেডেলটা নিয়ে যাও। আমি সে মেডেলটা নিয়ে ব্যাগে পুরেছিলাম। তবে হাসপাতালে ফিরে দেখলাম একের পর এক আহত সৈনিক ও সাধারণ লোকদের নিয়ে আসা হচ্ছে হাসপাতালে। জানতে পারলাম ফার্ডিন্যান্ডের বাহিনী শহরে প্রবেশ করেছে। বিজয়ী হিসেবে তৃতীয় ফার্ডিন্যান্ডের কর্ডোভায় প্রবেশ এবার ধ্বংসের ঝড় নিয়ে এল। পালাতে পারেনি এমন কোন মুসলমান সেদিন এই ঝড়ের কবল থেকে বাঁচেনি। এই ঝড়ের কথা আমি আগে কল্পনাও করতে

পারিনি। আমি একজন ডাক্তার হিসেবে সেদিন সারা দিন হাসপাতালেই ছিলাম। আহত খৃস্টান, মুসলমান সৈনিক ও সাধারণ মানুষ অবিরাম আসছিল হাসপাতালে। আমার যোগ্যতা ও শক্তির সবকিছু উজাড় করে তাদের বাঁচাবার চেষ্টা করেছি। আহার, বিশ্রাম সব কিছু ভুলে খৃস্টান, মুসলমান নির্বিশেষে সকলের সমান সেবা করেছি। আমার ধর্ম ইসলামে আহত মানুষের কোন জাত নেই। তারা মানুষ। মানুষ হিসেবেই তাদের সমান সেবা করতে হবে। আমি তাই করার চেষ্টা করেছি। একদিন একরাতের পর সেদিন ভোরে ফজরের নামাজের পর ঘুরে বসতেই মনে পড়ল বাড়ির কথা, একমাত্র সন্তান ও স্ত্রীর কথা। চমকে উঠলাম্। গত ২৪ ঘন্টা ওদের কথা মনে করিনি কেন? ওরা কেমন আছে? সঙ্গে সঙ্গে ক্লান্ত, অবসন্ন দেহ নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। রাজপথে রক্তের স্রোত মাড়িয়ে বাড়ি পৌঁছলাম। অল্প কিছু দূরে গোয়াদেল কুইভারের তীরেই আমার বাড়ি।

বাড়ির বাইরের প্রাঙ্গণে পৌঁছতেই দূর থেকে চোখে পড়ল আমার বাড়ির মূল গেট হা করে খোলা। আঁৎকে উঠলাম আমি। এমন তো হবার কথা নয়! এমন পরিস্থিতিতে বাড়ির গেটের দরজা খোলা থাকার প্রশ্নই আসে না। দৌড় দিলাম আমি। গেটে পৌঁছেই দেখলাম গেটের দরজা খোলা নয়, ভাঙা। এবার দেহের রক্তে একটা হিমশীতল স্রোত বয়ে গেল। বুঝলাম কি ঘটেছে। বাড়ির ভেতরে পা বাড়াতে ভয় করছিল। কি দেখব সেখানে দিয়ে! কম্পিত পায়ে তবু এগোলাম। বৈঠকখানা ঘর খোলা, শূন্য। ভেতর বাড়িতে ঢুকলাম। সব ফাঁকা। পৌঁছলাম শোবার ঘরের সামনে। দরজা ভাঙা। আর এগোতে পারছিলাম না আমি। শরীরের সব শক্তি যেন নি:শেষ হয়ে গেছে। বুক কাঁপছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে মনটাকে শক্ত করে ঘরের ভেতরে পা বাড়ালাম। ঘরের ভেতরে চোখ পড়ল। আমার অজান্তেই বুক থেকে মুখ ভেদ করে একটা আর্তচিৎকার বের হয়ে এল। আমার তিন বছরের সন্তানের রক্তাক্ত দেহ মেঝেতে পড়ে আছে। তার মাথাটা গুঁড়ো হয়ে যাওয়া। দৃষ্টি ছুটে গেল পাশেই একটু দূরে। পড়ে আছে আমার স্ত্রীর দেহ। একবার তাকিয়ে চোখ বন্ধ করলাম। এবার চিৎকারও বের হলো না মুখ থেকে। চিৎকারের ভাষা কোথায় যেন হারিয়ে গেল। অবরুদ্ধ বোবা আবেগ দুমড়ে-মুচড়ে ভেঙে দিল হৃদয়টাকে। টলতে টলতে গিয়ে আমি বিছানা থেকে চাদর তুলে এনে ঢেকে

দিলাম আমার স্ত্রীর দেহ। ধপ করে বসে পড়লাম স্ত্রীর চাদর-ঢাকা দেহের পাশে। আমার দৃষ্টি ঝাপসা। চারদিকের পৃথিবীটা আমার কাছে ছোট হয়ে গেছে। কতক্ষণ বসেছিলাম জানি না। ক্ষুধার্ত, অবসন্ন, বোবা হয়ে যাওয়া আমি তখন বোধ হয় তন্দ্রাচ্ছন্নও হয়ে পড়েছিলাম। অদ্ভুত একটা চিন্তা চলন্ত ছবির আকারে মাথায় এল। তা হয়তো স্বপ্ন ছিল। দু'টি লাশ কাপড়ে জড়িয়ে কাঁধে তুলে নিয়ে বাড়ির পাশের গোয়াদেল কুইভারের পানিতে নামিয়ে দিয়ে একটা পথ ধরে আমি এগিয়ে চলছি। পথটা নতুন। এর আগে কখনও দেখিনি। পথটা এগিয়ে আরও এগিয়ে দূর দিগন্তে আকাশের সাথে যেন মিশে গেছে।

তন্দ্র কেটে গেল আমার।

কিন্তু চিন্তাটা জীবন্ত দৃশ্যের মত সামনে রয়ে গেল আমার। ভাবলাম আমি, আমার প্রভুর নির্দেশ কি এটা আমার জন্যে! আমাকে কি কর্ডোভা ছাড়তে হবে? কোন নতুন পথ কি আমার জন্যে অপেক্ষা করছে? সে পথে একাই চলার ভাগ্য কি আমার?

দু'চোখ থেকে অশ্রুর ধারা নেমে এল আমার। একা বেঁচে থাকাটা আমার জন্যে দু:সহ। তার চেয়ে ভালো হতো যদি ফার্ডিন্যান্ডদের লোকদের সাথে লড়াই করে জীবন দিতে পারতাম। তাহলে সকলের সাথে আমি কর্ডোভায় থাকতে পারতাম। কিন্তু তন্দ্রায় দৃশ্যগুলো আমার জীবনের জন্যে এক অমোঘ নির্দেশ বলে মনে হলো।

চোখের পানি মুছে বিমোহিতের মত উঠে দাঁড়ালাম। দু'টো লাশকে বিছানার চাদরে জড়িয়ে কাঁধে তুলে নিলাম। আমার প্রিয় বাড়িটির জন্যে একটুও মায়া মনে জাগল না। আমার দাদার তৈরি বাড়িটা বাবার অতিপ্রিয় ছিল, আর আমারও জীবনের সাথে অচ্ছেদ্য বাঁধনে জড়িয়ে ছিল বাড়িটা। কিন্তু এখন বাড়িটা ছাড়তে আমার কিছুই মনে হলো না। আমার বাড়ির সামনেই গোয়াদেল কুইভার নদী। বাড়ির পরে একটা পায়ে চলার রাস্তা। তার পর একটা ঘাট ধাপে ধাপে নেমে গেছে গোয়াদেল কুইভারের পানিতে। হাঁটু পরিমাণ পানিতে নেমে কাঁধ থেকে লাশ দু'টো নামিয়ে আদরের সাথে আস্তে আস্তে নামিয়ে দিলাম গোয়াদেল কুইভারের বুকে। তার নীরব স্রোতধারা যেন পরম স্নেহেই গ্রহণ করল লাশ দু'টোকে।

মুহূর্তেই গোয়াদেল লাশ দু'টোকে আড়াল করল আমার চোখ থেকে। কিছুক্ষণ ওদিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। চোখের পানি দৃষ্টিকে ঝাপসা করে দিল। ধীরে ধীরে উঠে এলাম সিঁড়ি বেয়ে উপরের রাস্তায়। মুহূর্ত মাত্র দাঁড়ালাম। তাকালাম বাড়ির দিকে। চিরপরিচিত বাড়ি। রাস্তার দিকে মুখ ফেরালাম। হাঁটতে শুরু করলাম। গোয়াদেল কুইভারের তীর বেয়ে পায়ে চলার পথ। এগিয়ে গেছে সামনে, এগিয়ে গেছে সীমাহীন সীমান্তের দিকে। এ যেন গোয়াদেল কুইভারের সেই পরিচিত রাস্তা নয়। সব মানুষের সামনে চলার এ যেন সনাতন পথ। সেই পথ আজ আমারও পথ। চলছি বিরামহীন, লক্ষ্যহীন।

এই পথ আমাকে নিয়ে এল স্পেন পেরিয়ে দক্ষিণ ফ্রান্সে। সময় পার হয়েছে তিন মাস। আমার পিঠের ব্যাগটি অনেক বড় হয়েছে। এক কাপড়ে বেরিয়েছিলাম। আরেক প্রস্থ কাপড়, জ্যাকেট ইত্যাদি কিনতে হয়েছে। ব্যাগের পকেটের সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা ছিল আমার সম্বল। এই টাকা ভেঙেই বেঁচে থাকার চেষ্টা করে এসেছি আর পথ চলেছি। কোথায় যাব, পথের এই যাত্রা কোথায় থামাব, মন সে ব্যাপারে আমাকে কিছুই বলেনি।

দক্ষিণ ফ্রান্সের পথের ধারের পান্থশালায় আমি সেদিন ঘুমিয়েছিলাম। ঘুম থেকে উঠে দেখি সম্বলমাত্র ব্যাগটি আমার নেই। ব্যাগটি মাথার নিচে দিয়ে ঘুমিয়েছিলাম। কখন কে আমার মাথার তল থেকে ব্যাগটি নিয়ে গেছে জানি না। এবার প্রকৃতই আমি পথের মানুষ হয়ে দাঁড়ালাম। তবু খুশি হলাম এই ভেবে যে, আমার দু'টি মেডেল রক্ষা পেয়েছে। ও দু'টি আমি রেখেছিলাম আমার পাজামার কোমরে এক গোপন পকেটে।

খাওয়া-দাওয়া-নাওয়া কিছু নেই, পথ চলছিলাম। জনবসতি কম। মাঝে মাঝে পথের পাশে গুচ্ছ বাড়ি দেখা যাচ্ছে কিন্তু ভিক্ষুক হতে মন সায় দেয়নি। বেওয়ারিশ সব গাছের পরিচিত অপরিচিত ফল-মূল খেয়ে আমার সময় কাটছিল।

একদিন ক্ষুধা-কাতর অবসন্ন দেহে পথের পাশে একটা গাছে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে নিদ্রাচ্ছন্নের মত বসেছিলাম। একটা গাড়ি আমি যেদিক থেকে এসেছি সে দিক থেকে এগিয়ে আসছে শব্দ পাচ্ছিলাম। কিন্তু চোখ খোলার প্রবৃত্তি হয়নি। গাড়িটি আমার বরাবর এসে দাঁড়াল। আমাকে দেখেই দাঁড়িয়েছে।

আমি শুনতে পাচ্ছিলাম একজন বলছিল, 'দেখতে মুরদের মত লাগছে। নিশ্চয় মুরদের কোন পলাতক সৈনিক। বয়স দেখা যাচ্ছে চল্লিশ এখনও হয়নি। ধরে নাও। স্লেভ মার্কেটে মুররা এখন হট কেক।' এর কথা শেষ হলে আরেকজন বলে উঠল, ঠিক বলেছ জ্যাকি। মুর সৈনিক তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমাদের এ চালানে কিন্তু এখনও একজন মুর জোটেনি। একে পেলেই তো এবারের চালান পূর্ণ হয়ে যায়। চল ধরে ফেলি। ফাঁদটা বের কর।'

মনে হলো ওরা কয়েকজন গাড়ি থেকে নামল। ওদের মতলব বুঝতে পারলাম। পালাতে পারতাম কি না জানি না, কিন্তু পালাবার প্রবৃত্তি হলো না। আমার চিন্তা শেষ হতে পারল না। কি যেন এসে আমার শরীরের চারদিকে অস্পষ্ট মোটা শব্দ তুলে পড়ল। চোখ মেলে দেখলাম, চারদিক থেকে দড়ির জালে আমি আবদ্ধ। জাল ওরা গুটিয়ে নিচ্ছে। আমি শুনেছি বন্য পশুকে এভাবেই ধরে থাকে। এখন ওরা পশুর মত করেই মানুষ শিকার করছে।

আমার পরিণতি কি হতে যাচ্ছে তা ওদের কথা থেকেই বুঝতে পেরেছি। ওদের ক্রীতদাস বাণিজ্যের চালানে এখনও একজন লোক কম আছে। আমাকে দিয়েই তারা ঐ শূন্যস্থান পূরণ করতে চায়। সব বুঝেও আমার কিছু করার ছিল না। চেষ্টা করেও ওদের হাত থেকে, ওদের ফাঁদ থেকে পালাতে পারতাম না। আর আমি আগেই নিজেকে পথের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়েছি। পথ আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে সেটাই দেখার বিষয়।

বিরাট বড় ওদের গাড়ি। একটা কাভার্ড ভ্যান আরও চারটি কাভার্ড ভ্যানকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

এখানে-সেখানে থেমে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে গাড়ি বহরটি গিয়ে পৌঁছল দক্ষিণ জার্মানীর সীমান্ত শহর স্ট্রাসবার্গে। এখানেই বসে মধ্য ইউরোপের সবচেয়ে বড় দাস বাজার। অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যান্ড, জার্মানী, সুইডেন, ডেনমার্ক অঞ্চল থেকে এখানে খদ্দের আসে।

স্ট্রাসবার্গে গিয়ে বুঝতে পারলাম কতজনকে দাস মার্কেটে বিক্রির জন্যে আনা হয়েছে। আমরা সংখ্যায় ছিলাম একশ জন। একেক কাভার্ড ভ্যানে পঁচিশজন করে। পশুর মত গাদাগাদি করে আমাদের আনা হয়েছে।

দাস বাজারে স্লেভ ট্রেডারদের এক বা একাধিক খোয়াড় ধরনের জায়গা আছে। এগলোর ছাদ আছে এবং গোলাকার চারদিকটা লোহার শিকের বেড়া দিয়ে ঘেরা। খোঁয়াড়ে প্রত্যেকের জন্যে একটা করে বেড আছে। খোঁয়াড় থেকে একেকজন করে বেরিয়ে খাবার নিয়ে আসতে হয়। খোঁয়াড়েই ঘুরে বেড়াতে হয়। রাত ছাড়া শোয়ার হুকুম নেই। পূর্ণ রাত্রি ঘুম ও পর্যাপ্ত খাবার আমাদের দেয়া হয়। দাসদের স্বাস্থ্য ভালো হওয়া বেশি দাম পাওয়ার জন্যে প্রয়োজনীয়। খাওয়ার জন্যে বাইরে বের করে আনা হয় এটা দেখানোর জন্যে যে, সে শান্ত-শিষ্ট ও অনুগত। ভালো দাম পাবার জন্যে দাসকে শান্ত-শিষ্ট ও খুব অনুগত প্রমাণ করতে হয় ক্রেতার কাছে। যতদিন খদ্দের না পাওয়া যায়, তখন দাস বাজারের খোঁয়াড়েই থাকতে হয়। শীতের সময় রাতের বেলা খোঁয়াড়কে টিন শিট দিয়ে ঘেরা হয় এবং বাইরে চারদিকে আগুন জ্বালিয়ে আবহাওয়া গরম রাখা হয়। আমার সংগীদের মধ্যে জনাদশেক ছাড়া সবাই আফ্রিকার খৃস্টান। অবশিষ্ট দশজনের সবাই মুসলিম। তাদের কাউকে আমি চিনি না। ওরা সবাই সৈনিক। বিভিন্ন অঞ্চল খেকে ওদের ধরে আনা হয়েছে। এদের সবাইকেই আমি মনের দিক দিয়ে ভেঙে পড়া অবস্থায় পেয়েছি। আমি ওদের সাহস দিয়েছি, আল্লাহর ওপর ভরসা করতে বলেছি। সুস্থ থাকা, শান্ত থাকা এবং যেহেতু এর বিকল্প নেই, তাই যা ঘটে তা মেনে নেয়ার মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে বলেছি। সবাইকে হারালেও, সবকিছু হারালেও আল্লাহকে না হারাবার জন্যে ওদের উপদেশ দিয়েছি। আল্লাহ রাজি থাকলে কষ্টের এ দুনিয়ার পর অনন্ত সুখের সম্ভাবনা থাকে। কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকাংশই সোহেলী অঞ্চলের। সোহেলী ভাষা আমি মোটামুটি জানি। কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে প্রায় ৩০ জনের মত মুসলমান পেয়েছি। আমাদের নামাজ পড়া দেখে তারাই এসে তাদের পরিচয় দিয়েছে। এটা ঘটেছে দাস বাজারের খোঁয়াড়ে আসার পর। আমি তাদের উপদেশ দেবার সুযোগ পেয়েছি। তারা সবাই আমার ভক্তে পরিণত হয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য, আমাদের এই নামাজ রাতের বেলা

গোপনে পড়তাম। আমাকে তারা মুর জানত, কিন্তু সরাসরি জানত না আমি মুসলমান। আমি ইচ্ছা করেই আমার লেখা-পড়া, পেশা ও আমার ধর্ম গোপন করেছি শুরু থেকেই। খোঁয়াড়ের সবার সাথেই একটা হৃদ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম কে কোথায় বিক্রি হয় তা জানার ও গোপনে লিখে রাখার চেষ্ট করব, যাতে ভবিষ্যতে ওদের সাথে যোগাযোগের সুযোগ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলো আমাদের একশজনের লটের মধ্যে আমিই প্রথম বিক্রি হয়ে যাই।

কয়েক দিন থেকেই আমি দেখছিলাম দীর্ঘ দেহী 'নাইট'দের ইউনিফরম পরা বিভিন্ন অস্ত্রে সজ্জিত একজন ঘোড়সওয়ার দাস বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের খোঁয়াড়ে কয়েক বার ঘুরে গেছে।

সেদিন দুপুরে আমাদের স্টল থেকে আমি খাবার আনছিলাম। হঠাৎ আমি সেই ঘোড়সওয়ারের সামনে পড়ে গেলাম। ঘোড়সওয়ারও থমকে দাঁড়াল। আমাকে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে বলল, 'তোমার নাম কি?' আমি বলল, জোসেফ জ্যাকব আলগার।'

নামটি আমি আগেই ঠিক করে আমার মালিককে বলে দিয়েছিলাম। নামটি আমার মূল নাম 'ইউসুফ ইয়াকুব আল মানসুর'-এর খৃস্টীয়করণ। উভয় নামের অর্থ একই। ঘোড়সওয়ার লোকটি একটু ভ্রুকুঁচকে বলল, 'দাসদের সবার নামই সংক্ষিপ্ত। তোমার এত বড় নাম? এ নামের অর্থ কি জান?'

আমি বললাম, 'উত্তম যোদ্ধা জোসেফ জ্যাকব।'

গম্ভীর কন্ঠে বলল ঘোড়সওয়ার, 'তুমি কি যোদ্ধা? যুদ্ধ করেছ?'

আমি বললাম, 'যোদ্ধাও নই, যুদ্ধও করিনি। তবে যাদের নামে আমার নাম তারা সবাই এক ধরনের যোদ্ধা ছিলেন।'

'কি ধরনের যোদ্ধা ছিলেন?' বলল ঘোড়সওয়ার। সেই গম্ভীর কন্ঠেই।

'শুনেছি তাঁরা মানুষ পরিবর্তনের যোদ্ধা ছিলেন।' বললাম আমি। এবার আরও একবার ভ্রূকুঁচকে গেল ঘোড়সওয়ারের। বলল, 'কোথায় শুনেছ তুমি?'

উত্তর আগেই চিন্তা করে রেখেছিলাম। বলল, 'গির্জার সামনে শুনেছি।'

ঘোড়সওয়ারের চেহারায় প্রসন্নতা দেখা দিল। বলল, 'তুমি গির্জায় যাও?'

‘যেতাম।’ আমি বললাম।

‘তুমি লেখাপড়া জান?’ জিজ্ঞেস করল ঘোড়সওয়ার।

‘কোন রকমে লেখা ও পড়ার মত অক্ষরজ্ঞান আমার আছে।’ বললাম আমি।

‘তুমি জার্মান ভাষার নাম শুনেছ?’ জিজ্ঞেস করল ঘোড়সওয়ার।

‘শুনেছি। কিছু বলতে ও বুঝতে পারি।’ আমি বললাম।

এবার বিস্ময় ঘোড়সওয়ারের চোখে-মুখে। বলল, ‘কেমন করে জান, কোথায় শিখেছ?’

‘আমার একজন জার্মান প্রতিবেশী ছিলেন। তার কাছ থেকেই দিনে দিনে কিছুটা শেখা হয়ে গেছে।’ বললাম আমি।

‘তোমাকে কোথেকে ধরেছে?’ জিজ্ঞেস করল ঘোড়সওয়ার।

‘পশ্চিম স্পেনের যুদ্ধ সংলগ্ন এক গ্রাম থেকে প্রতিপক্ষ যুদ্ধবন্দী হিসেবে ধরে নিয়ে যায় এবং বর্তমান মালিকের কাছে বিক্রী করে।’ আমি বললাম। এটাই মালিক বলতে বলেছিল।দক্ষিন ফ্রান্সের শান্ত এলাকা থেকে এরা আমাকে ধরেছে, এ কথা না বলতে শাসিয়ে দিয়েছিল মালিক। আমি সেটাই বললাম।

‘দাস হিসেবে বিক্রি হয়ে আমার খারাপ লাগেনি?’ জিজ্ঞেস করল মালিক।

‘এটাই মনে হয় আমার ভাগ্য।’ বললাম আমি।

‘এই ভাগ্যকে তুমি মেনে নিয়েছ?’ বলল ঘোড়সওয়ার।

‘ভাগ্য তো ভাগ্যই। একে মেনে নেয়া, না নেয়ার কোন অবকাশ নেই।’ আমি বললাম।

‘তুমি খুব বুদ্ধিমান। আমি খুশি হয়েছি।’ বলল ঘোড়সওয়ার।

‘ধন্যবাদ।’ বলে আমি চলে এলাম আমার খোঁয়াড়ে। আমার খাওয়া শেষ করে আমি হাত-মুখ পরিস্কার করতে গিয়ে দেখলাম, সেই ঘোড়সওয়ার ও আমার মালিক কথা বলছে। আমি হাত-মুখ ধুয়ে ফিরে এলাম।

আমি ফিরে আসার পরপরই ফিরে এল আমার মালিক। হাসিমুখে আমার কাছে এসে বলল, ‘আমার সৌভাগ্য, তোমারও সৌভাগ্য। ক্রুসেড ফেরত একজন

বিখ্যাত নাইট তোমাকে কিনে নিয়েছে। সে একজন বীর ও জ্ঞানী মানুষ। এটা তোমার সৌভাগ্য। আর আমার সৌভাগ্য হলো যে রেট চলছে, তার দ্বিগুণ দাম সে আমাকে দিয়েছে। তুমি রেডি হও। সে আধা ঘন্টার মধ্যে এসে তোমাকে নিয়ে যাবে।

মনটা আমার খারাপ হয়ে গেল। আমার সাথী খোঁয়াড়ের সবাইকে আমি ভাইয়ের মত ভালোবেসে ফেলেছিলাম, বিশেষ করে মুসলিম ভাইদেরকে। আমার চলে যাওয়া মানে চিরতরে ওদের আমি হারিয়ে ফেলব।

মনটা আমার কেঁদে উঠলেও করার কিছু ছিল না। আধা ঘন্টার মধ্যেই ঘোড়সওয়ার আমার খোঁয়াড়ে গিয়ে হাজির হলেন একটা ঘোড়ায় টানা জার্মান গাড়ি নিয়ে। তার সাথে আরেকজন চব্বিশ-পঁচিশ বছরের যুবক।

মালিক স্বয়ং খোঁয়াড়ের মুখে ছিল। আমি বের হয়ে এলাম খোঁয়াড় থেকে। বের হবার সময় হাত দিয়ে একবার দেখলাম নতুন পাতলুনের পকেটে আমার সেই দু'টো মেডেল আছে কি না। নিশ্চিত হয়ে সামনে এগোলাম।

ঘোড়সওয়ার আমাকে স্বাগত জানাল। সাথের যুবকটিকে দেখিয়ে বলল, 'এ হলো বেনেডিক্ট, আমার সেক্রেটারি। আর আমি ফ্রেনজিস্ক ফ্রেডারিক। রাইনের একজন নাইট। এখন রাইন ছেড়ে সালজওয়াডেলে চলে গেছি। তুমি সেখানেই যাবে। গাড়ির পেছনে উঠে বস।'

বলে ঘোড়সওয়ার নাইট ফ্রেনজিস্ক ফ্রেডারিক গিয়ে বসল ড্রাইভিং সিটে। তার পাশে বসল তার সেক্রেটারি বেনেডিক্ট।

গাড়ি চলতে শুরু করল।

আমি বললাম, 'ঘোড়াটার কি হবে? ঘোড়া কে নিয়ে যাবে?'

'ধন্যবাদ আলগার, তুমি ঘোড়াটার কথা মনে করেছ। ঘোড়াটা আমার ভাড়া করা ছিল। নাইটরা ঘোড়ায় চড়তেই বেশি গৌরব বোধ করে, ঘোড়ায় টানা গাড়িতে নয়। এখানে এসে ভাড়া করেছিলাম ঘোড়াটা।' বলল নাইট ফ্রেনজিস্ক ফ্রেডারিক।''

এই পর্যন্ত পড়ে আহমদ মুসা সামনের আরও পাতা উল্টিয়ে দেখে নিয়ে বলল, 'মি. আলগার, এর পরের কিছু পাতায় রয়েছে স্ট্রাসবার্গ থেকে জার্মানীর

আরেক এলাকা সালজওয়াডেলে যাবার কাহিনী। এখানে পথের বর্ণনা ছাড়া তেমন কিছুই নেই। আগেও কিছু কিছু বাদ দিয়েছি, এখানে বড় একটা অংশ বাদ দিতে হবে।' থামল আহমদ মুসা।

কোন জবাব নেই মি. আলগার কিংবা কারও তরফ থেকে। তাকাল আহমদ মুসা তাদের দিকে। দেখল, অপার বিস্ময় আর বেদনার দৃষ্টি নিয়ে আলগার তাকিয়ে আছে আহমদ মুসার দিকে। আদালার মায়ের চোখেও একই বিস্ময় আর বেদনা। কিন্তু আদালার চোখ অশ্রুতে ভরা। চোখ ছাপিয়ে অশ্রুর ধারা তার দুই গণ্ডেও নেমে এসেছে।'

মি. আলগারই কথা বলল। সে বলল, 'মি. আহমদ মুসা, জবাব তো আমরা পেয়ে গেছি। আমরা দাস বংশোদ্ভূত কেন, কেন আমরা নন-জার্মান, আমাদের মূল কোথায়, পরিচয় আমাদের কি-সব প্রশ্নের জবাব আমরা পেয়ে গেছি। আমার দাদু আমার নাম আমাদের প্রথম পুরুষের নাম অনুসারে রেখেছিলেন। দেখা যাচ্ছে, নাইট ফ্রেনজিস্ক ফ্রেডারিক দাস হিসেবে যাকে কিনে এনেছিলেন, সেই ইউসুফ ইয়াকুব আল মানসুর ওরফে জোসেফ জ্যাকব আলগার আমাদের প্রথম পুরুষ। তাঁর নতুন নামেই আমার নাম। আরও জানলাম, আমাদের মূলটা একটা গৌরবদীপ্ত সিভিলাইজেশন-এর সাথে। মূলে গিয়ে আমরা মুসলমান। জার্মানীতে আমার প্রথম পুরুষ মুসলমান ছিলেন। কিন্তু সব কিছুর পরেও মি. আহমদ মুসা আমরা দাস বংশোদ্ভূত আমরা নন-জার্মান, এটাই প্রতিষ্ঠিত হলো।'

থামল জোসেফ জ্যাকব আলগার। বেদনায় ভেঙে পড়া তার কন্ঠ।

পিতা জোসেফ জ্যাকব আলগার থামতেই চোখ মুছতে মুছতে আদালা হেনরিকা বলে উঠল, 'বাবা, তোমাকে আমি ডিপ্রেসড দেখছি। তোমার কন্ঠে বেদনার সুর বাবা। আমি এর প্রতিবাদ করছি। আমি আমাদের প্রথম পুরুষ ইউসুফ ইয়াকুব আল মানসুর ওরফে জোসেফ জ্যাকব আলগারের সীমাহীন দু:খ-বেদনা ও বিপর্যয়ে কেঁদেছি বটে, কিন্তু তার চেয়ে বেশি আমি গৌরব বোধ করছি। আমার পূর্বপুরুষকে যিনি কিনেছেন, সেই নাইট একজন যোদ্ধা ছিলেন মাত্র আর আমার পূর্বপুরুষ ইউসুফ ইয়াকুব আল মানসুর গোটা ইউরোপে যখন মেডিকেল

বিশ্ববিদ্যালয় তো দূরে থাক, একটা মেডিকেল স্কুলও ছিল না ইউরোপ জুড়ে, তখন ছিলেন কর্ডোভা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদক প্রাপ্ত কৃতি ছাত্র এবং কর্ডোভা মেডিকেল কলেজের স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত কৃতি চিকিৎসাবিজ্ঞানী এবং সেই মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতি অধ্যাপক। ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি হওয়া ছিল একটা ঘটনাচক্র। আর বাবা, আমার মহান সেই পূর্বপুরুষ একজন ডাক্তার হিসেবে ধর্ম, দেশ পরিচয় নির্বিশেষে সকল আহতকে সেবা দিচ্ছিলেন, প্রাণ বাঁচাচ্ছিলেন আহতদের, তখন তার সন্তান ও স্ত্রীকে বীভৎস পাশবিকতার সাথে হত্যা করা হয়। রাজ্য হারিয়ে, সন্তান ও স্ত্রীর মৃত্যুর বীভৎস দৃশ্য দেখে তিনি সব ব্যাপারে এতটাই নিরাসক্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, সব ত্যাগ করে পথের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন, মানে ঈশ্বরের হাতে নিজেকে তুলে দিয়েছিলেন। ঈশ্বর বা আল্লাহ তাঁকে এই জার্মানীতে আনবেন বলেই এসব ঘটেছে। তাঁর গৌরব, তাঁর মর্যাদা এতে এতটুকুও ম্লান হয়নি। আমরা তাঁর বংশধর, আমাদের মর্যাদাকে ম্লান ভাবছি কেন? তিনি যে উন্নতশিরে দাস জীবনকে গ্রহণ করেছিলেন আল্লাহর ইচ্ছা ভেবে, আমরাও তেমনি উন্নতশির হবো দাস বংশোদ্ভূত হওয়ার পরিচয় দানের ক্ষেত্রে।' বলল আদালা হেনরিকা।

জোসেফ জ্যাকব আলগার ও তার স্ত্রী আদালার মা'র চোখ মুখ অনেকখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। বলল আদালার বাবা আলগার, 'ধন্যবাদ আদালা, আমাদের মহান প্রথম পুরুষের সর্বকনিষ্ঠ উত্তরসূরির উপযুক্ত দায়িত্ব পালন করেছ। আমরা যেটা পারিনি। পারিনি কারণ, এই দায়িত্ব নেয়ার জন্যে যে শক্তি ও প্রাণপ্রাচুর্য দরকার তা আমাদের বোধ হয় নেই। আমরা এখন শান্তি খুঁজি, স্বস্তিতে থাকতে চাই। আর শান্তি ও স্বস্তির সন্ধান মানুষকে অনেকটাই দুর্বল ও রক্ষণশীল করে তোলে। ধন্যবাদ তোমাকে আদালা। কিন্তু আমাদের মহান সেই প্রথম পুরুষ তার মুসলিম পরিচয় ও কৃতী চিকিৎসাবিজ্ঞানী হওয়ার পরিচয় সেদিন গোপন করেছিলেন কেন?'

'বাবা, তুমি জান সে সময়টা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড উন্মাদনার সময়। এটা ফার্স্ট ক্রুসেডের পরবর্তী ঘটনা। তারপরও আরও কয়েকটি ক্রুসেড হয়েছে। সে সময় মুসলিম পরিচয় পেলে কিংবা মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানীর

পরিচয় পেলে ইউরোপের এই অংশের কোন দেশেই তার বাঁচার কোন সুযোগ ছিল না। আমি মনে করি, মুসলিম পরিচয় গোপন করে তিনি অন্তত প্রাণ বাঁচাতে পেরেছেন। তারপর তিনি আরও কি সুযোগ পেয়েছেন কিংবা কি' ঘটেছে তা পরবর্তী পাঠ থেকে জানা যাবে বাবা। পড়া আমার শুরু হওয়া দরকার। আপাতত কিছু কিছু অংশ বাদ দিয়ে পড়লে সংক্ষেপে সব জানার জন্যে তা ভালো হবে। পরে পুরো পড়ার সুযোগ নেয়া যাবে, যদি স্যার আমাদের প্রতি দয়া করেন।' বলল আদালা হেনরিকা।

'প্লিজ মি. আহমদ মুসা, আপনি যেভাবে ভালো মনে করেন পড়া শুরু করুন। আদালার সাথে আমি একমত।'

আহমদ মুসা আবার পড়া শুরু করল:

''তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় সালজওয়াডেলে পৌঁছলাম। মাঝখানে দু'রাত আমরা বিশ্রাম নিয়েছি দুই হোটেল বা পান্থশালায়। সব জায়গায় দেখেছি নাইট ফ্রেনজিস্ক ফ্রেডারিকের ভীষণ খাতির। সবাইকে বলাবলি করতে শুনেছি, ইস্তাম্বুল অভিমুখের ষষ্ঠ ক্রুসেড পরিচালনায় তিনি বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তার লোক হিসেবে আমরাও কম খাতির পাইনি।

সালজওয়াডেল নদীর ধারে বিশাল দুর্গসদৃশ বাড়ি নাইট ফ্রেনজিস্ক ফ্রেডারিকের। পরে শুনেছি নাইট ফ্রেডারিক যখন রাইনের দুর্গ ছেড়ে সালজওয়াডেল চলে আসেন, তখন কিং চতুর্থ অটো তাকে স্বাগত জানিয়ে এই বাড়ি দান করেন এবং নদীর উপর পাহারাদারীর দায়িত্ব দেন।

বাড়িতে পৌঁছে আমার নতুন মালিক নাইট ফ্রেনজিস্ক ফ্রেডারিক তার সেক্রেটারি বেনেডিক্টকে বলল, আলগারকে আপতত বিশ্রামের একটা জায়গা দেখিয়ে দিয়ে নাস্তা করাও। তারপর তাকে সেলুনে নিয়ে গিয়ে চুল কাটাও।

দাসদের চুলকাটা মানে মাথা, মুখ সবকিছুকে নগ্ন করা। জীবনে এই প্রথম দাড়ি,গোঁফ ও চুল কেটে নেড়ে হলাম।

চুল কাটার পর মালিকের সেক্রেটারি বেনেডিক্ট আমাকে জানাল, 'আগামীকাল সকালে তোমাকে নাইট ফ্রেডারিকের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তাঁর সাথে পরিবারের অন্য কেউ থাকতে পারেন। সেই দেখা করার পর ঠিক হবে

কোন কাজ তোমাকে দেয়া হবে।’ বুঝলাম সাক্ষাৎকারটা আসলে একটা ইন্টারভিউয়ের মত। মানে যে দাসকে কেনা হলো তাকে দিয়ে কোন কাজটা করানো হবে।

পরদিন নাস্তার পর আমাকে মালিকের সামনে হাজির করা হলো। মালিকের দুর্গসদৃশ বাড়ির প্রধান গেট দিয়ে ঢুকে বিরাট লন। লনের শেষ প্রান্তে বিরাট সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। বাড়িটা সত্যিই দুর্গের মত দশ বারো তলার সমান উঁচু। দোতলায় সিঁড়ির মুখে একপাশে একটা টেবিলের ওপাশে একটা চেয়ারে বসেছেন আমার নতুন মালিক। তার বামপাশে তার প্রায় সমবয়স্ক এক মহিলা, নিশ্চয় তার স্ত্রী হবেন। মহিলার পাশে পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের আরেকজন যুবতী, তার পাশে আট দশ বছরের একটি শিশু। তাদের পরিচয় ঠিক বুঝলাম না, তবে মনে হলো মেয়েটি মালিকের মেয়ে এবং শিশুটি মালিকের নাতি হলে মানায়। সবাইকে দেখলম প্রসন্ন, কিন্তু ডাক্তারের চোখ দিয়ে বুঝলাম, যুবতী মহিলাটি মানসিকভাবে ডিপ্রেসড। অন্য সবার মধ্যে একটা জীবন্ত আগ্রহ দেখলাম, শুধু সে ছাড়া।

তাদের টী টেবিল থেকে দশ ফুট দূরে হাতজোড় করে আমাকে দাঁড়াতে হলো। মনে কষ্ট লাগল এভাবে দাঁড়াতে, কিন্তু বেনেডিক্টের নির্দেশে এভাবে দাঁড়াতে হলো। আল্লাহ ছাড়া কারও কাছে কখনও হাতজোড় করিনি। কিন্তু আজ মানুষ মনিবের কাছে তা করতে হলো। আমার সামনে ছিল উঁচু ক্ষুদ্র একটা ডেস্ক। ডেস্কের উপরে ছিল এক শিট কাগজ ও একটা কলম।

আমি দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে আমার নতুন মালিক নাইট মি. ফ্রেডারিক বলে উঠলেন, ডেস্কের উপরের কাগজটায় তুমি তোমার নাম, দেশের নাম, অঞ্চলের নাম, স্ত্রী-সন্তান আছে কি নেই, তোমার ভাষা, তোমার জানা অন্য ভাষা, তোমার অতীত পেশা, কোন ক্রাইম তোমার দ্বারা হয়ে থাকলে তা লেখ। এসব বিষয় স্লেভ ট্রেডারের হুকুমেও লিখতে হয়েছিল, সে যেমন বলেছিল সেইভাবে। তার পুনরাবৃত্তি আমি লিখে ফেললাম। স্ত্রী-সন্তান নিহত হয়েছে লিখলাম আর পেশা আগের মতই কারখানায় চাকরি লিখলাম। আমার লেখা শেষ হলে পাশে দাঁড়ানো বেনেডিক্ট কাগজ কলম নিয়ে আমার দুই হাত এবং হাতের আঙুলগুলো পরীক্ষা

করল। তারপর কাগজে কিছু লিখল এবং কাগজ কলমটি রেখে এল মালিকের টেবিলে। মালিক কাগজটি হাতে তুলে নিয়ে নজর বুলিয়ে স্ত্রীর হাতে দিল। তার স্ত্রী তা দেখে তার পাশের মেয়েটির হাতে দিল। মেয়েটি দেখে নিয়ে কাগজটি তার বাবার হাতে ফেরত দিল।

ফেরত পাওয়া কাগজটি হাতে নিয়ে মালিক একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। বলল, 'ফ্যাক্টরিতে তুমি কি কাজ করেছ?'

মিথ্যাটা আগেই সাজিয়ে রেখেছিলাম। বললাম, 'প্যাকিং-এর কাজ করেছি।'

আবার অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল মালিক আমার দিকে। বলল, 'দেখ, আমি একজন মুসলিম ক্রীতদাস কিনতে চেয়েছিলাম। ইচ্ছা ছিল, একজন মুসলিমকে ক্রীতদাস বানিয়ে আমি প্রতিশোধ নেব। ক্রুসেডে আমি যা পারিনি এভাবে আমি তারই কিছুটা পূরণ করতে চেয়েছিলাম। আমি চতুর্থ ক্রুসেডে যোগদানকারী জার্মানের একজন শ্রেষ্ঠ নাইট। পোপ তৃতীয় ইনোসেন্টের অধীনে পশ্চিম ইউরোপের সাথে আমরা জার্মানরাও সে ক্রুসেডে যোগ দিয়েছিলাম। লক্ষ্য ছিল, মুসলমানদের হাত থেকে জেরুসালেমকে আবার উদ্ধার করা। প্রথম ক্রুসেডে আমাদের পূর্বসূরিরা মুসলমানদের হাত থেকে জেরুসালেম কেড়ে নিয়েছিলেন।

জেরুসালেম শহরের সত্তর হাজার মুসলমানকে যুদ্ধোত্তর অপারেশনে হত্যা করে আমরা চেয়েছিলাম জেরুসালেমকে আমাদের হাতেই রাখব। কিন্তু তা হয়নি। সালাহউদ্দিন আইয়ুবী যাকে মুসলমানরা গাজী সালাহ্উদ্দিন বলে, জেরুসালেম আমাদের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে। ইউরোপের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ক্রসেড পারেনি জেরুসালেমকে মুসলমানদের হাত থেকে কেড়ে নিতে। এই জেরুসালেম উদ্ধারই ছিল আমাদের চতুর্থ ক্রসেডের লক্ষ্য। কিন্তু আমাদের এই লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। হয়নি ঘরের শত্রু বিভীষণকে বধ করতে গিয়ে। পোপের অধীন ক্যাথলিক চার্চ বিশেষ করে আমাদের জার্মানদের ঘোরতর শত্রু ছিল বাইজান্টাইন অরথোডক্স চার্চ। ওরা রোমান ক্যাথলিকদের আইন-নীতি ভংগকারী, অধর্মচারী, লোভী, রক্তপায়ী, বিশৃঙ্খল বর্বর, নোংরা ইত্যাদি ধরনের

গালাগালি করতো। কনস্টান্টিনোপলকে কেন্দ্র করে এই বাইজেন্টাইনরা ক্যাথলিক পোপ ও জার্মানীর তারা প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই ক্রসেড যাত্রার পর আমরা গতি পরিবর্তন করে জেরুসালেম জয়ের পরিবর্তে কনস্টান্টিনোপল জয়ের যাত্রা শুরু করেছিলাম। এই যাত্রা আমাদের সফল হয়েছিল। আমরা কনস্টান্টিনোপল জয় এবং তারপর তা বিধ্বস্ত করেছিলাম। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সাথে বা্ইজেন্টাইন অর্থোডস্ক চার্চের সমাধি রচিত হলো বটে, কিন্তু মুসলমানদের গায়ে আমরা হাত দিতে পারলাম না। এই দু:খ আমাকে পুড়িয়ে মারছে। তাই চেয়েছিলাম একজন মুসলিম ক্রীতদাস এনে তার উপর মনের ঝাল মিটিয়ে দু:খ কিছু লাঘব করবো। তাও হলো না। তোমার সাথে কথা বলে তোমাকে আমার খুব পছন্দ হলো, তাই তোমাকে নিয়ে এলাম। সেই তুমি যাত্রা শুরু করলে মিথ্যা কথা বলে। তুমি ফ্যাক্টরিতে কাজ করনি। তোমার হাতের সবটুকু নরম হওয়া তারই প্রমাণ। আর তোমার কলমের আঁচড় প্রমাণ করে তুমি ভালো লেখায় অভ্যস্ত। ইচ্ছা করেই খারাপ করে লিখেছ। এই দুই মিথ্যার পর তোমার দেয়া তোমার পরিচয়ের উপরও এখন আমার আস্থা নেই। সুতরাং তুমি ভালো আচরণ পাওয়ার উপযুক্ত নও। তুমি আমার ফার্মল্যান্ডে কাজ করবে। ফার্মল্যান্ডের কঠোর পরিবেশ এবং কাজই মিথ্যাবাদীর জন্যে উপযুক্ত জায়গা।'

কথা শেষ করেই উঠে দাঁড়াল আমার নতুন মনিব। তাঁর সাথের সবাই উঠল। আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো ফার্ম হাউজে। আমার মালিক ফ্রেনজিস্ক ফ্রেডারিকের বাড়ির বিশাল এরিয়ার সীমা থেকেই তার ফার্মল্যান্ডের শুরু। সেখান থেকে প্রায় এক মাইল দূরে ফার্মল্যান্ডের মাঝখানে ফার্মহাউজ। এই ফার্মহাউজ থেকেই বিশাল ফার্মল্যান্ড পরিচালনা করা হয়।

হাসপাতালের একজন কৃতী ডাক্তার ছিলাম তা ভুলে গেলাম। ফার্মের শ্রমিক হিসেবে নতুন জীবন শুরু হলো। শ্রমিকরা বেতন পায়, কিন্তু ক্রীতদাসরা বাঁচার জন্যে শুধুই খাবার পায়। তাদের কাজের কোন সময়সীমা নেই। ক্রীতদাসদের সেই ভোরে কাজের শুরু হয়, আর ঘুমানো পর্যন্ত কাজ চলে। এভাবেই জীবন চলল।

একদিন মালিক-পরিবারের সবাইকে নিয়ে বেড়াতে এলেন ফার্মে। ফার্মটা দেখা ও তত্ত্বাবধান করার পর তারা ফার্মহাউজে এলেন। ফার্মহাউজে গোডাউন ছাড়াও রয়েছে শ্রমিক কর্মচারি ও দাসদের আবাস। এই সাথে ফার্মহাউজে রয়েছে দোতলা সুরম্য ভবন। ফার্মল্যান্ডে এলে মালিকরা এখানে থাকেন।

সেদিন বেলা পাঁচটায় মালিকরা এলেন সেই ভবনে। সেদিন সন্ধ্যার পর সে ভবনের দোতলায় প্রচণ্ড কান্নাকটি হৈ চৈ শুনতে পেলাম। সারাদিন পর আবাসস্থলে সবে এসে বসেছি। কান্না হৈ চৈ শুনে সবাই সেদিকে ছুটল। কৌতুহলের বলে আমিও সেদিকে গেলাম।

ফার্মহাউজের মাঝের এই বাড়িটি আসলে বাড়ির মধ্যে আর একটা বাড়ি। একট গেট পেরিয়ে প্রাচীর ঘেরা এই বাড়িতে ঢুকতে হয়। আমরা গেটের বাইরে একটা দূরত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমাদের লোকদের বলাবলিতে জানলাম, মালিকের মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। গতকাল বিকেলে হামবুর্গের রাজকীয় চিকিৎসালয়ে মাসখানেক চিকিৎসা নিয়ে ফিরেছে সে। আজই আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ভীষণ মাথাব্যথা। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। আগেই শুনেছিলাম, মালিকের এই মেয়ে ক্যাথারিনার স্বামী একজন নাইট, ১২২৮ সালে শুরু হওয়া ষষ্ঠ ক্রুসেডে যোগ দিয়ে তিনি নিহত হয়েছেন। এই সময় ঘোড়ার গাড়িতে একজন ডাক্তার আসতে দেখলাম। ডাক্তার ভেতরে চলে গেল। আমি চলে এলাম। আধাঘন্টার মত পার হয়ে গেল। আমি ফার্মহাউজের পাশে ফার্মের গরুগুলো সামলাচ্ছিলাম। আবার হৈ চৈ কানে এল, দৌড়াদৌড়ি দেখতে পেলাম। সেই সাথে মালিকের উচ্চকন্ঠ। কৌতুহলবশেই আমরা ছুটে গেলাম সেই বাড়ির দিকে। শুনলাম, ডাক্তার অপারগতা প্রকাশ করে চলে গেছেন। বলে গেছেন, রাজকীয় চিকিৎসালয়ের ডাক্তার যে ওষুধ দিয়েছেন, তার বাইরে কোন ওষুধ নেই। সেই ওষুধে যখন কাজ করেনি, তখন আর করার কিছু নেই। রাজকীয় চিকিৎসালয়ের ডাক্তারের দেয়া ওষুধ খেতে হবে এবং ঈশ্বরকে ডাকতে হবে।

মালিক এ সময় বাইরে বেরিয়ে আসছিলেন। বিপর্যস্ত তার চেহারা। বেদনায় নীল তার চোখ মুখ। একমাত্র সন্তান মেয়েকে খুব ভালোবাসেন তিনি।

মালিক গেটে এসে গেটের পাশে দাঁড়ানো তার সেক্রেটারিকে বললেন, তুমি গাড়ি তৈরি করতে বল। ক্যাথরিনাকে আবার রাজকীয় চিকিৎসালয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমার ভেতরে কি যেন হয়ে গেল। ডাক্তার ইউসুফ ইয়াকুব আল মানসুর আমার মধ্যে যেন তীব্রভাবে জেগে উঠল। হঠাৎ কয়েক ধাপ এগিয়ে গিয়ে মালিকের সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, 'মালিক, রোগটা কি আমি দেখতে পারি?'

মালিক বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত আমার দিকে ঘুরল। তার চোখ-মুখ অপমানে কালো হয়ে গেছে। দু'চোখ দিয়ে তার আগুন ঝরছে। তীব্রকন্ঠে বলে উঠল, 'এতবড় স্পর্ধা..!'

কিন্তু হঠাৎ করেই তার কন্ঠ থেমে গেল। তার চোখ-মুখ সহজ হয়ে এল। নিভে গেল চোখের আগুন। মাথা নিচু করল। পরক্ষণেই মাথা তুলে বলল, আমার অন্য কোন শ্রমিক-কর্মচারি-ক্রীতদাস এমন কথা বললে তার আমি শিরচ্ছেদ করতাম। কিন্তু আমি দেখে আসছি তুমি সবার চেয়ে ভিন্ন। তুমি মিথ্যা কথা বল না, কাজে ফাঁকি দাও না, খাবার যা পাও, তার বেশি কোন দাবিও তোমার নেই। সবাইকে আমি চিনি, কিন্তু তোমাকে চিনতে পারিনি। তাই তুমি বেঁচে গেলে। কিন্তু বল, কেন তুমি এই কথা বললে? নিশ্চয় জান রাজকীয় চিকিৎসকের চিকিৎসাও ব্যর্থ হয়েছে।'

'মালিক, কোন দুই ব্যক্তির বুদ্ধি, চিন্তা, দৃষ্টিকোণ সমান নয়। আর যে ঈশ্বর রোগ দিয়েছেন, তিনি তার ওষুধও দিয়েছেন।' বললাম আমি।

মালিক কিছুক্ষণ আমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলেন। তিনি কি যেন আমার মধ্যে খুঁজে পেলেন। তারপর বললেন, 'এস।' বলেই তিনি চলতে শুরু করলেন। আমিও তার পিছু পিছু চললাম। উঠলাম দোতলায়। তাঁর এই দোতলায় ওঠা তাঁর পরিবারের বাইরের কারো জন্যে এটাই বোধ হয় প্রথম।

দোতলার একটা ঘরে তিনি ঢুকলেন। মিনিট খানেক পরে বেরিয়ে এসে আমাকে ডাকলেন। ঢুকলাম সেই ঘরে বিরাট সুসজ্জিত ঘর। দেখে কোন শাহবেগম বা শাহজাদীর ঘর বলে মনে হলো। ভাবলাম ফার্মহাউজের ঘর যদি এমন হয়, তাহলে আসল বাড়ির ঘরটা কেমন? বিধবা মেয়েকে মালিক কত ভালোবাসেন, এটা বোধ হয় তারই প্রমাণ।

মালিকের মেয়ের গোটা শরীর চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। বালিশে মুখ গুঁজে সে চিৎকার করছে, ছটফট করছে। তার মাথার পাশে বসে আছেন মালিকের স্ত্রী। তিনি যখন আমার দিকে তাকালেন, মনে হলো ডুবন্ত মানুষের মত কোন সহায় যেন তিনি হাতড়াচ্ছেন। তিনি মেয়ের মাথার যে পাশে বসে আছেন, তার বিপরীত দিকে মালিকের মেয়ে ক্যাথারিনার মাথার পাশে গিয়ে আমি দাঁড়ালাম।

মেয়েটিকে মাথাগুঁজে ছটফট করতে দেখে আমি আশান্বিত হয়েছিলাম। যে সন্দেহটা আমার মনে উঁকি দিয়েছিল সেই সন্দেহটাই তাহলে ঠিক?

আমি মালিকের দিকে তাকালাম। বললাম, 'মালিক ওকে চিৎ হয়ে শোয়াতে হবে।'

সঙ্গে সঙ্গেই মালিকের স্ত্রী তার মেয়েকে বলল মা একটু চিৎ হয়ে শুতে হবে।' বলে নিজে তাকে চিৎ হতে সাহায্য করতে গেল।

মেয়ে ক্যাথারিনা চিৎকার করে বলল, 'আমি আর ওষুধ খেতে পারবো না। আমার মাথার সাথে এখন পেটও জ্বলতে শুরু করেছে। আমি মরে যেতে চাই, আমাকে মরতে দাও।'

মালিক গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তাঁর স্ত্রীর পাশেই। সে এগিয়ে গেল। মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, মা আমার, সোনা মা, আমরাও যে কষ্ট পাচ্ছি। একটু ঘুরে শোও। ঈশ্বরের প্রতি ভরসা রাখ মা।'

'কত ভরসা রাখবো বাবা, যতই দিন যাচ্ছে, অসহ্য হয়ে উঠছে যন্ত্রণা। রাজবৈদ্যও তো চেষ্টার কম করলেন না। এই রোগে আমার মৃত্যুই বোধ হয় ঈশ্বরের ইচ্ছ। তার ইচ্ছাই পূরণ হোক। আমি মরতে চাই।' বলল মালিকের মেয়ে ক্যাথারিনা। বলে বালিশে আবারও বেশি করে মুখ গুঁজল।

হঠাৎ করেই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, 'মানুষ মরণশীল। সুস্থ ও অসুস্থ দুই অবস্থাতেই মানুষ মরতে পারে। মৃত্যুর জন্যে অসুস্থতা জিইয়ে রাখার প্রয়োজন হয় না। আর ঈশ্বরের বিধান হলো, রোগ হলে চিকিৎসা করাতেই হবে।'

এক ঝটকায় মেয়েটি ঘুরে উঠে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। তীব্র কন্ঠে বলল, ‘মৃত্যুর জন্যেই কি আমি অসুস্থতা জিইয়ে রাখছি?’ আমি একটা ছোট্ট বাউ করে বললাম, ‘স্যরি ম্যাডাম। আমি তা বলিনি, আমি একটা নীতিকথা বলেছি।’

সেই তীব্র কন্ঠেই মেয়েটি বলল, ‘রাজবৈদ্য যেখানে ব্যর্থ, এই মাত্র একজন বিখ্যাত ডাক্তারও যেখানে আর কিছু করণীয় নেই বলে চলে গেল, সেখানে একজন ক্রীতদাস চিকিৎসা করতে আসা একটা স্পর্ধা নয় কি!’

‘মাফ করবেন ম্যাডাম। প্রত্যেক মানব শিশু স্বাধীন হয়েই জন্মায়, পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব তাকে নানা রূপ দিয়ে গড়ে তোলে, ক্রীতদাসও বানায়। রোগটা কি তা দেখতে চেয়েছি, এটা আমার স্পর্ধা নয়, মানুষের প্রতি একটা দায়িত্ববোধ থেকে এটা করেছি। একটা পথের শিশু হলেও আমি এটাই করতাম।’ বললাম খুব নরম, কিন্তু অনড় কন্ঠে।

মালিকের মেয়ের চোখ দু’টি বিস্ফোরিত হয়ে উঠেছে। তার পলকহীন চোখ আমার দিকে নিবদ্ধ হলো। অবাক হয়ে কি যেন সন্ধান করছে সে আমার মধ্যে। ধীরে ধীরে তার পলকহীন চোখ বুজে গেল। নীরব হয়ে গেল সে। বুঝা যাচ্ছে, দাঁতে দাঁত চেপে সে তার অসহ্য যন্ত্রণা চাপা দেবার চেষ্টা করছে। আমি মেয়েটির মাথার আরও কাছে এগিয়ে গেলাম। আমি ঝুঁকে পড়ে তার দু’চোখ থেকে যে ধমনীগুচ্ছ মাথার দিকে চলে গেছে, তার ভেতর থেকে দুই প্রধান ধমনী খোঁজার চেষ্টা করতে লাগলাম। তার শ্বেত-শুভ্র কপাল বেদনায় আরক্ত হয়ে গেছে। দুই চোখের দুই কোণার দূরত্ব বিবেচনায় রেখে আনুমানিক হিসেব থেকে সে দুই ধমনীর অবস্থান ঠিক করলাম। তারপর মালিক-পত্নীর দিকে চেয়ে বললাম, ‘মা, আপনি আপনার দুই বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে ঠিক এই দুই জায়গা মাঝারি শক্তিতে চেপে ধরে রাখুন।’

মালিক-পত্নী তাকাল মালিকের দিকে। বলল, ‘আমি বোধ হয় ঐভাবে ধরতে পারব না।’

আলগার, ব্যাপারটা তুমিই ভালো বুঝবে। কাজটা তুমিই করো।আমার দিকে তাকিয়ে বলল মালিক।

আমি তার মাথার পাশে ভালোভাবে বসে দুই হাতের দুই বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে বিসমিল্লাহ বলে সেই দুই ধমনী চেপে ধরলাম।

উপুড় হয়ে বালিশে তার মাথা গুঁজে থাকা, তার চোখ-মুখের রং ইত্যাদি দেখে আমার প্রাথমিক ধারণা হয়েছিল তার যন্ত্রণার উৎস মাথা নয়, চোখ। যদি তাই হয় তাহলে চোখ থেকে উপরে ওঠা প্রধান ধমনী দু'টি নির্দিষ্ট পরিমাণে চেপে ধরলে ব্যথার উপশম হবে। আল্লাহর রহমতে তাই হলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই তার মুখের অবস্থা সহজ হয়ে গেল। ধমনী দু'টি চেপে রেখে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। আনন্দের সাথে দেখলাম, তার মুখে প্রশান্তি ও একটা শিথিলতার ভাব নেমে এসেছে। আমি তার কপাল থেকে হাত তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মালিকের দিকে চেয়ে বললাম, 'এর সমস্যা মাথায় নয়, চোখে। চোখের সমস্যার কারণেই তাঁর মাথার যন্ত্রণা। চোখ থেকে মাথার দিকে উঠে যাওয়া প্রধান ধমনী দু'টোকে আমি যখন চেপে রেখেছিলাম, তখন দেখেছি তার মাথার যন্ত্রণা কমে গেছে। আমি ওর চোখ দু'টি একটু দেখতে চাই।

মালিক ও মালিক-পত্নী উভয়েরই চোখে-মুখে অপার বিস্ময়। মালিক এগিয়ে গেলেন মেয়ের দিকে। মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, 'মা একটু চোখ খোল। এখন কেমন মনে করছ মা?'

চোখ খুলল মেয়ে ক্যাথারিনা। তাকাল বাবার দিকে। বলল, যন্ত্রণা প্রায় ছিলই না। আঙ্গুলের চাপ তুলে নেবার পর মনে হচ্ছে একটু একটু করে বাড়ছে যন্ত্রণা।' খুশি হলেন ফ্রেনজিস্ক ফ্রেডারিক, আমার মালিক। বললেন, 'তাহলে তো আলগার ঠিকই বলেছে। সে চোখ দেখতে চায়, চোখটা দেখাও মা।' বলে একটু সরে দাঁড়ালেন মালিক।

আমি এগিয়ে গেলাম। বললাম, 'প্লিজ ম্যাডাম, খাটের এ পাশে এসে পিঠের তলায় বালিশ দিয়ে খাটে হেলান দিয়ে একটু বসুন।'

কোন কথা না বলে খাটে হেলান দিয়ে বসল সে। আমি এগিয়ে গিয়ে একটু ঝুঁকে পড়ে তার চোখ দু'টি পরীক্ষা করলাম। দুই আঙ্গুলে চোখ ফাঁক করে চোখের আইবল বিভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে পরীক্ষা করলাম। কিন্তু আমি যেট দেখতে চাই বুঝতে চাই, সেটা তেমনটা হলো না।'

আমি দাঁড়িয়ে একটু সরে এসে মালিককে বললাম, 'হাতখানেক লম্বা কিছুটা সরু একটা লোহার বা কাঠের কিংবা বাঁশের সোজা চোঙা দরকার।'

'চোঙা দিয়ে কি হবে?' বললেন মালিক।

'চোখ পরীক্ষায় চোঙার ভেতর দিয়ে যাওয়া নিয়ন্ত্রিত আলোর শক্তিশালী ফোকাস ভালো কাজ দেয়।' আমি বললাম।

'হ্যাঁ আছে, আনছি এখনই।'

উনুনে বা স্বর্ণকারের কয়লার আগুন উস্কে দেয়ার জন্যে যে সরু চোঙা ব্যবহার হয়, সে চোঙাই তিনি নিয়ে এলেন। খুশি হলাম আমি।

চোঙার এক মাথা আমি ক্যাথারিনার খোলা চোখের উপর রেখে অন্য মাথায় পাওয়ার ফুল লন্ঠনের আলোর শিখা সেট করলাম, যাতে আলো অন্য দিকে বিচ্ছুরিত হবার সুযোগ না পেয়ে চোঙার সুড়ঙ্গপথে চোখের উপর গিয়ে কেন্দ্রীভূত হতে পারে।

সেই আলোতে ক্যাথারিনার দুই চোখ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ভালোভাবে পরীক্ষা করলম। দু'টো জিনিস পেলাম।এক, দুই চোখেরই সূক্ষ্ম ধমনীর গুচ্ছ আহত হয়েছে এবং রক্তের সূক্ষ্ম জমাট বিন্দুর সৃষ্টি হয়েছে। দুই চোখেরই আইবলের রেদপেনসিভ নয় যথেষ্ট পরিমানে। আইবলের কিছু টিস্যু শুকিয়ে গিয়ে চোখের জীবন্ত সত্তাকে বাধাগ্রস্ত করারই লক্ষণ এটা। চোখের এই পরীক্ষা শেষ করে আমি বললাম মালিককে উদ্দেশ্য করে, 'দুই চোখের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ধমনী ড্যামেজড হয়েছে এবং দুই আইবলের কিছু টিস্যু শুকিয়ে গেছে।'

মালিক ও মালিক-পত্নী অপার বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। আমার কথায় তাদের চোখে-মুখে আতংকেরও সৃষ্টি হলো। বলল মালিক, 'তাহলে এখন উপায় আলগার?'

'মালিক, আমার দেয়া ওষুধ যদি খাওয়ানো বা ব্যবহার ঠিক মনে করেন, তাহলে চেষ্টা করে দেখতে পারি। এই রোগের চিকিৎসা আছে মালিক।' আমি বললাম।

মালিক ও মালিক-পত্নী দু'জনরই মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মালিকের মেয়ে ক্যাথারিনা চোখ বন্ধ করে তার কপালের সেই বিশেষ স্থান দু'টো চেপে ধরে

বসেছিল। মালিক বলল, ‘আলগার তুমি রোগ ধরতে পেরেছ এবং ঠিকভাবেই ধরেছ। তাই তোমার ওষুধই চলবে।’

‘ঠিক আছে মালিক, ওষুধ যেটা দরকার, তা তৈরি করতে সময় লাগবে। বনজ কিছু ওষুধের সাথে কিছু দুর্লভ অনুপান যোগাড় করতে হবে। সেটা পরে করব। আপাতত চোখে দেয়ার মত একটা ওষুধ পাঠাচ্ছি। সেটাতে চোখের ক্ষতিপূরণ না হলেও যন্ত্রণা কমে যাবে। আমাকে একটা পরিষ্কার শিশি দিন। ওষুধটা দিনে চার পাঁচ বার এক ফোঁটা করে চোখে দিতে হবে। চোখে কোন চাপ দেয়া যাবে না, শুয়ে থাকতে হবে। ঘরে তীব্র নয়, ঠাণ্ডা আলো থাকবে।’

‘আমি শিশি পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোমার ওষুধ পাওয়ার পর আমরা ক্যাথারিনাকে বাড়িতে নিয়ে যাব। সকালে আমি ওষুধের অনুপান কি কি কিনতে হবে, তা তোমার কাছ থেকে জেনে নেব।’ বললেন মালিক।

‘ঠিক আছে মালিক, আমি চলি।’ বলে আমি চলে এলাম।

এসেই আমি ফার্মহাউজের বাগান থেকে ইউনানি ওষুধ বিজ্ঞানের জীবাণুনাশক, বেদনানাশক, স্নায়ু শীতলকারক এবং চক্ষুকোষের শক্তিবর্ধক একটা গাছের কিছু পাতা ও ফুল জোগাড় করে আনলাম। রস করে মালিকের পাঠানো শিশিতে করে পাঠিয়ে দিলাম। আমি তখন শুয়ে পড়েছি। আমার সাথী কয়েকজন শ্রমিক হুড়মুড় করে আমার ঘরে ঢুকে পড়ল। সমস্বরে বলে উঠল, ‘ওস্তাদ, তোমার ভাগ্য খুলেছে। তোমার প্রমোশন হয়েছে। তোমাকে আর এই ফার্মে কাজ করতে হবে না, এই ফার্মহাউজেও থাকতে হবে না। মালিকের বাড়িতে তোমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।’

কথাগুলো আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলো না। তবু জিজ্ঞাসা করলাম, ‘কোথায় শুনলে?’

‘শুনব আর কোথায়। খোদ মালিক যাবার সময় এ কথা তার শ্যালককে বলে গেছে, ‘কালকে সকালেই আলগারকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাবে। ব্যাবস্থা করেছি , ওখানেই সে থাকবে।’ শুনেই মালিকের শ্যালক সাহেব প্রতিবাদ করলেন, আলগার শুধু কাজই করতো না, কাজ করাতোও সে। সে সাথে থাকলে শ্রমিকদের কাছ থেকে অনেক বেশি কাজ পাওয়া যায়। সে গেলে ফার্মহাউজের

ক্ষতি হবে।' 'ফার্মহাউজের কাজের জন্যে নয়, এখানে তাকে পাঠিয়েছিলাম একটা শাস্তি হিসেবে। সেটা তার প্রতি অবিচার হয়েছে। জান তোমার বোন কি বলছে, আজকেই এখন থেকে তাকে আমাদের বাড়িতে ট্রান্সফার করতে হবে।' এরপর শ্যালক সাহেব আর কথা বলেননি।'

মালিকের বাসায় আমার আরেক জীবন শুরু হলো। সেখানে আমাকে কোন কায়িক পরিশ্রম  করতে হলো না। আমাকে দায়িত্ব দেয়া হলো, বাড়ির স্টাফদের কাজ ঠিকমত হচ্ছে কি না দেখা এবং তা করিয়ে নেয়া। কোন কিছু ঘটলে তা মালিক বা মালিক-পত্নীকে অবহিত করা। আমার থাকার জায়গা দোতলায় সিঁড়িমুখের একটা ঘরে। বাড়ির স্টাফ কর্মচারিরা সবাই থাকে নিচলতায়। মালিকের সেক্রেটারি বেনেডিক্টের কাছে শুনেছি, মালিক আমার থাকার জায়গা এক তলারই একটা ভালো ঘরে করেছিলেন। কিন্তু মালিক-পত্নী রাজি হননি। তিনি বলেছেন, 'ছেলেটা আমার মেয়ের চিকিৎসা করছে, এটাই শুধু নয়, ছেলেটির কথা-বার্তা, কয়েক মাসের আচার-ব্যবহার থেকে মনে হচ্ছে সে শুধু শিক্ষিত ও ভদ্রই নয়, মানুষ হিসেবেও অনেক বড়। দেখনা মাত্র কয়েক মাসেই ফার্ম হাউজের সবাইকে নিজের ভক্ত বানিয়ে ফেলেছে। শুনেছি, সবাইকে ভালোবেসে, সবার পাশে দাঁড়িয়ে, সবার জন্যে কাজ করেই সে সবার ভক্তি-ভালোবাসা অর্জন করেছে। ক্রীতদাস হয়েছে বলেই তার সবকিছু শেষ হয়ে যায়নি। তাকে সম্মান দিলে আমরা ছোট হয়ে যাব না!' এসব কথা বলে মালিক-পত্নী দোতলার ঐ ঘরটায় আমার থাকার ব্যবস্থা করে দেয়। এসব আমার শোনা কথা। মালিক কিংবা মালিক-পত্নী নিজ মুখে আমাকে কখনও কিছু বলেননি।

শিশিতে আমি যে তরল ভেষজ-রস সে রাতে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, সেটা ব্যবহার শুরু করেই মালিক-তনয়া ক্যাথারিনা একমাসের মধ্যে প্রথম বারের মত শান্তিতে ঘুমাতে পেরেছে। মালিক দু'দিনের মধ্যেই দুর্লভ উপাদান ও অনুপানগুলো আমাকে এনে দিয়েছিলেন। সেসব উপাদানের সাথে কিছু বিস্ময়কর গাছ-গাছড়ার মূল, পাতা, ফুলের সমন্বয়ে ওষুধ তৈরি করে অনুপানগুলোর সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণে মিশিয়ে সময়ে সময়ে তা খাওয়ানোর ব্যবস্থাপত্র দিয়েছিলাম। কিছু দিনের মধ্যেই সে সুস্থ হয়ে যায়। মালিক ও মালিক-পত্নী একদিন ডেকে

আমাকে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন আমি কি চাই, তা তারা আমাকে দেবেন। আমি বলেছিলাম, 'আমি কোন বিনিময় চাই না। আর বিনিময় চাওয়ার অধিকার ক্রীতদাসের থাকে না। আপনারা আমার জন্যে যথেষ্ট করেছেন। আমি তার জন্যে কৃতজ্ঞ।'

বলে আমি চলে আসছিলাম। দেখলাম সিঁড়ির মুখের এক পাশে একটা পিলারের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে মালিকের মেয়ে ক্যাথারিনা। তাকে দেখে আমি সেখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে এলাম।

সেদিনই সন্ধ্যার পর আমি সিঁড়ি দিয়ে নামতে যাচ্ছিলাম। পেছন থেকে নারীকন্ঠের আওয়াজ শুনলাম, 'শুনুন।'

আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলাম সিঁড়ির মুখে মালিকের মেয়ে ক্যাথারিনা দাঁড়িয়ে। আমি এক ধাপ এগিয়ে মাথা নিচু করে বললাম, 'আমাকে ডাকছেন?'

'হ্যাঁ।' বলল মালিকের মেয়ে ক্যাথারিনা।

'কিছু আদেশ আছে, বলুন?' আমি বললাম।

'আদেশ নয়, অভিযোগ আছে।' বলল ক্যাথারিনা।

'অভিযোগ?' আমি বললাম।

'হ্যাঁ, অভিযোগ! আপনার বিরুদ্ধে!' বলল ক্যাথারিনা।

'তাহলে মালিককে বলুন। আমি কোন দোষ তো করতেই পারি।' আমি বললাম।

'কোন ক্রীতদাসের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ নেই। আমার অভিযোগ আপনার বিরুদ্ধে। তাই মালিককে বলবার প্রয়োজন নেই।' বলল ক্যাথারিনা।

'ক্রীতদাস এবং আমি একই সত্তা। ঠিক আছে...।'

আমার কথার মাঝখানেই সে বলে উঠল, 'কিন্তু সেদিন আপনি বলেছিলেন ক্রীতদাস পরিস্থিতির সৃষ্টি। পরিস্থিতি যা সৃষ্টি করে তা আসল নয় এবং স্থায়ীও নয়। সুতরাং তা মানব সত্তার অংশও নয়।' বলল ক্যাথারিনা।

'ঠিক আছে, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগটা বলতে পারেন।' আমি বললাম।

'সেদিন আপনাকে ক্রীতদাস বলেছিলাম। তাই আজ আপনি নিজেকে ক্রীতদাস বলে বিনিময় প্রত্যাখ্যান করে আমার উপর প্রতিশোধ নিলেন। কিন্তু

আপনি জানেন না সেদিন থেকেই আমি মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করছি। মাফ চাইবার সুযোগ খুঁজছি। এর মধ্যেই আপনি...।'

কথা গলায় আটকে গেল ক্যাথারিনার। গলাটা হঠাৎ তার ভারি হয়ে উঠেছিল।

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'আপনার ব্যাপারটাকে এভাবে দেখা ঠিক নয়। ক্রীতদাস পরিচয় আমার সত্তার অংশ হোক বা না হোক, পরিস্থিতিগত কারণে আমি ক্রীতদাস একথা তো ঠিক? এটা তো অনস্বীকার্য বাস্তবতা? সুতরাং ক্রীতদাস বলায় আমি কিছুই মনে করিনি, মনেও রাখিনি বিষয়টা। অতএব প্রতিশোধের বিষয় হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।'

কিন্তু আমি তো অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করছি। আপনি আমাকে মাফ না করলে আমার এ যন্ত্রণা যাবে না।' বলল ক্যাথারিনা।

'না, আপনি আমার মনিব-কন্যা। আপনি এভাবে বলতে পারেন না।' বললাম আমি।

'আমি মনিব-কন্যা নই। আমি একজন মানুষের কন্যা ক্যাথারিনা।' বলল ক্যাথারিনা।

'ধন্যবাদ। কিন্তু সেদিন মানুষের কন্যা ক্যাথারিনা আমাকে ক্রীতদাস বলেননি, বলেছিলেন মনিব-কন্যা ক্যাথারিনা।' আমি বললাম।

'আপনি অনেক বিজ্ঞ, জ্ঞানী। কথায় কিংবা কোন দিক দিয়েই আমি আপনার সাথে পারব না।সেদিনের মনিব-কন্যাকেও আপনি মাফ করুন।' বলল ক্যাথারিনা। কন্ঠ তার আবার ভারি হয়ে উঠেছিল।

মনিব-কন্যার সাথে এভাবে দাঁড়িয়ে কথা বলা আমার মানায় না। আর তার এই পরিবর্তন আমার মনে নতুন এক আশংকারও সৃষ্টি করল। বুকটা আমার কেঁপে উঠল। আমি আর কথা না বাড়াবার জন্যে বললাম, 'ঠিক আছে ম্যাডাম। আপনার ইচ্ছা, অনুরোধ আমার কাছে আদেশ। আমি মাফ করলাম, যদিও সেদিন তা বলা আপনার জন্যে অন্যায় কিছু ছিল না। আপনার মহত্ত্বের জন্যে ধন্যবাদ।'

বলে আমি চলে যাবার জন্যে পা বাড়ালাম। পেছন থেকে মনিব-কন্যা ক্যাথারিনা বলে উঠল, 'শুনুন, এটা আমার মহত্ত্ব নয়, একজনের মহত্ত্বের কাছে, বিরাটত্বের কাছে এক দুর্বিনীত হৃদয়ের আত্মসমর্পণ।'

মনিব-কন্যার কন্ঠ ছিল পরিষ্কার, স্থির, শান্ত কিন্তু শক্ত, তার কথাগুলো বিশ্বাসে দৃঢ়। কন্ঠের সেই ভারিভার এখানে ছিল না। এ যেন এক সিদ্ধান্তের পরোয়াহীন প্রকাশ।

আমার হৃদয়টা আবার কেঁপে উঠল। পরিচিত সেই আশংকা আমার হৃদয়ে মাথা তুলল। আমি দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে মনিব-কন্যার কথার প্রতিবাদে কিছু বলার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালাম। দেখলাম তিনি চলে যাচ্ছেন, আস্তে, শান্ত ও শক্ত পদক্ষেপে।

তাকে ডাকা আমার জন্যে অন্যায় মনে করলাম। আমি নেমে এলাম সিঁড়ি দিয়ে। দিন আমার এগিয়ে চলল ভিন্নতরভাবে। আমি মালিকের বাড়ির কর্মকর্তা-কর্মচারিদের দেখা-শোনার কাজ করি। কিন্তু মালিক আমাকে কোন আদেশ করেন না। কর্মকর্তা-কর্মচারিদের কোন বিষয় নিয়ে তাঁর কাছে গেলে তিনি আমার পরামর্শ চান অথবা বলেন তুমি যেটা ভালো মনে করো সেটাই করো। মনিব-কন্যা ক্যাথারিনার আট নয় বছরের ছেলে বেরুন বেকার প্রায়ই আমার কাছে আসে, নিষেধ সত্ত্বেও আংকেল বলে ডাকে।১৫ দিন ধরে নিয়মিত সে আমার কাছে পড়তে আসে সন্ধ্যার পর। মাসখানেক আগে সে একদিন বলে, 'আংকেল, মা আমাকে আপনার কাছে পড়তে বলেছেন। মা বলেন, রাজার স্কুলে যা শেখানো হয় তা যথেষ্ট নয়। দেখুন, মা কি পড়াতে বলেছেন।' বলেই সে আমার হাতে একখণ্ড কাগজ তুলে দেয়। কাগজে দেখলাম 'যা পড়ানো হচ্ছে' শিরোনামে তিনটি সাবজেক্টের নাম লেখা। সাবজেক্টগুলো হলো, জার্মান ও ল্যাটিন ভাষা, ক্যাথলিক থিওলজি ও চার্চের ইতিহাস। এরপর 'যা পড়ানো দরকার' শিরোনামেও তিনটি সাবজেক্টের নাম লেখা, সাবজেক্টগুলো হলো, অংক, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও পৃথিবীর ইতিহাস। আমি এই সাবজেক্টগলোর নাম দেখে বিস্মিত হলাম। সবগুলোই ইউরোপের জন্যে নিষিদ্ধ সাবজেক্ট। জার্মানসহ ইউরোপের কোন দেশেই অংক-বিজ্ঞান, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও দুনিয়ার ইতিহাস

পড়ানো হয় না। আমি বেরুন বেকারকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই বিষয়গুলোর নাম কি তোমার মা লিখেছেন?'

'হ্যাঁ, মা তো লিখেছেন। তাছাড়া কে লিখবেন?' বলল বেরুন বেকার।

'তোমার মা এ বিষয়গুলো পড়েন, জানেন?' আমি বললাম বেরুনকে।

'মা এগুলো জানেন, পড়েন কি না জানি না। তবে মা'র অনেক বই আছে। মা তো পড়েই সময় কাটান।' বলল বেরুন বেকার।

ডাক্তারের চেতনা থেকেই বোধ হয় আমার মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে গেল, 'চোখের অসুখ থেকে উঠেছেন, এখন তোমার মাকে কিছুদিন বই পড়া বন্ধ রাখতে হবে।'

'তাই? তাহলে মাকে গিয়ে বলি।' বলেই উঠে দাঁড়িয়ে ছুটল বেরুন বেকার। কিছুদূর গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমাকে পড়াবেন কবে থেকে, মা জিজ্ঞাসা করলে কি বলব আংকেল?'

'ঐ কঠিন বিষয়গুলো কি আমি পড়াতে পারি?' বললাম আমি।

'ঠিক আছে বলব মাকে।' বলে আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে চলে গেল বেরুন বেকার। এর কয়েকদিন পর মালিক আমাকে ডেকে বললেন, 'আলগার, আমার নাতি বেরুনকে একটু কষ্ট হলেও পড়াও, ক্যাথারিনার অনুরোধ। তার বিশ্বাস, তুমি স্পেনের মানুষ। বেরুনকে খুব ভালভাবে তুমি পড়াতে পারবে। আমরা যাই বলি, মুসলিম স্পেন তো অংক বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞানসহ সব বিজ্ঞান , ইতিহাস, ভূগোল, ধর্মতত্ত্ব শিক্ষার বিস্ময়কর কেন্দ্র। আমরা জানি, ইউরোপে আমরা অংক, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, চিকিৎসা ইত্যাদির চর্চা নিষিদ্ধ হলেও কিছু কিছু ইউরোপিয়ান ছেলে লুকিয়ে স্পেনে পড়তে গিয়েছে, যাচ্ছে। মুসলমানদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও তাদের শিখিয়ে-পড়িয়ে ভর্তি করে নেবার মত উদারতা দেখিয়ে আসছে।'

পরদিন সন্ধ্যার পর বেরুন বেকারকে আমি পড়াচ্ছি। পড়াতে রাজি হয়ে নতুন বিপদে পড়ে গেলাম। ক্যাথারিনা মাঝে মাঝেই তার ছেলের হাতে বই পাঠায়। বইয়ের স্থানে স্থানে দাগ দিয়ে তার ব্যাখ্যা জানতে চায়। বইগুলোর প্রায় সবই ইতিহাস ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক। আমি প্রথম দিকে জানি না বলে এড়িয়ে

যেতাম। ক্যাথারিনা একদিন লিখে পাঠায়, 'জনাব, একজন তৃষ্ণার্তকে পানি পান করানো কি সবচেয়ে বড় কর্তব্য, সবচেয়ে বড় ধর্ম নয়?' এরপর আমি আর না করিনি। বইয়ে দাগ দিয়ে পাঠানো তার সব জিজ্ঞাসার জবাবই লিখে পাঠাতাম। চোখের কথা বলে তাকে এত পড়াশোনা এখন না করার জন্যে বেরুন বেকারের মাধ্যমে আবার বলে পাঠিয়েছিলাম। সে লিখে পাঠিয়েছিল, 'মান্যবর ডক্টর, লেখা-পড়াই তো আমার সাথী। লেখা-পড়া ছেড়ে দিলে রোগ থেকে হয়তো আমি বাঁচবো, কিন্তু আমি মরে যাব।' আমি আর তাকে কিছু বলিনি। চিঠিটা আমার অবচেতন মনের কোথায় কি যেন বিদ্ধ করে, চিঠির সাথের অদৃশ্য একটা যন্ত্রণা যেন আমার হৃদয়েও সংক্রমিত হয়। দিন এভাবেই চলতে থাকে।

একদিন সকালে আমার ঘরে আমি নাস্তা খেতে বসতে যাচ্ছি, এ সময় মালিকের খাস পরিচারিকা এসে বলে, মালিক আপনাকে স্মরণ করেছেন। তিনি আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

নাস্তা না খেয়ে উঠতে হলো। পরিচারিকার সাথে সাথে চললাম।

পরিচারিকা যেখানে নিয়ে গিয়ে আমাকে পৌঁছালো সেটা তিন তলায় মালিকের পারিবারিক ডাইনিং কক্ষ। ডাইনিং টেবিলে বসে আছেন খোদ মালিক। তার বামপাশে তার স্ত্রী আর ডানপাশে নাতি বেরুন বেকার, বেরুনের পাশে বেরুনের মা ক্যাথারিনা এবং ক্যাথারিনার মামা মালিকের শ্যালক অসরিক রেডওয়ার্ল্ড। নাস্তা তাদের সামনে প্রস্তুত, কিন্তু নাস্তায় কেউ হাত দেয়নি।

এই অবস্থায় তাদের মধ্যে হাজির হয়ে আমি বিব্রত বোধ করলাম। বললাম, 'মালিক আমি পরে আসছি।' বলে চলে আসার উদ্যোগ নিলাম।

'দাঁড়াও আলগার, আমরা তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি। তুমি নাস্তার টেবিলে বসবে। কথা বলব এবং একসাথে বসেই নাস্তা করব। বস তুমি।'

মালিকের হুকুম শিরোধার্য। কিন্তু আমার দুই চোখ বিস্ময়ে বিস্ফোরিত। এ কি বলছেন উনি! মালিকের খানার টেবিলে বসবে তার ক্রীতদাস! ইসলাম এটা আটশ' বছর আগে চালু করেছে, কিন্তু ইউরোপে এটা অবিশ্বাস্য। আমি দ্বিধা করছিলাম।

মালিক-পত্নী আমার দিকে তাকিয়ে বললেন। ‘এস বেটা, আমার পাশে বসবে।’

সবার দিকে তাকালাম। দেখলাম, ক্যাথারিনার মুখ নত। আর বেরুন বেকার আনন্দে চামচ দিয়ে প্লেট বাজাচ্ছে। মালিক ও মালিক-পত্নী আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।

আমি ধীরে ধীরে মালিকের স্ত্রীর পাশে বসলাম। পরিচারিকা আমার সামনে প্লেট ও কাঁটাচামচ এগিয়ে দিল।’

নাস্তা আমাদের খাওয়া শেষ হয়ে গেল। সবাই নাস্তার সাথে পানীয় হিসেবে মদ পান করলেন। রীতি অনুসারে অন্তত আমারও মদ পান করা উচিত ছিল। কিন্তু আমি তা করলাম না। পরিচারিকা আমাকে লেমোনেড ওয়াটার দিল। আমি মদ পান করছি না দেখে সবাই অবাক হয়েছিল। বিস্ময়ে চোখ তুলে ক্যাথারিনা তাকিয়েছিল আমার দিকে। এই প্রথম সে আমার দিকে তাকাল চিকিৎসা শেষ হওয়ার পর। আমি দেখলাম নাস্তা শেষে সেও মদ পান করল না। তার গ্লাসের মদ গ্লাসেই থেকে গেল। আমি মদ পান করি না দেখে মালিক আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমার মদ পান না করার কারণ কি? আমি বলেছিলাম মালিক অনুমতি দিলে জবাবটা পরে দিতে চাই। তিনি তা মেনে নিলেন।

নাস্তার পর চা খাওয়া শুরু হলে মালিক বললেন, ‘আলগার, দু’টি কথা বলার জন্যে তোমাকে ডেকেছি। প্রথম কথা, তোমার একটা বড় ধরনের সাহায্য প্রয়োজন। গতকাল সকালে আমি সম্রাট চতুর্থ অটো’র দরবারে গিয়েছিলাম। দরবার বসেনি। গোটা রাজপ্রাসাদ বিষাদে ঢাকা। কথায় কথায় জানলাম, সম্রাট চতুর্থ অটোর একমাত্র ছেলে যুবরাজ তৃতীয় হেনরী থিয়োলজী যুদ্ধাবিদ্যা ইত্যাদি শেখার জন্যে রোমে ছিলেন গত দু’বছর। সেখানে এক বছর যেতেই তার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। সেখানে অনেক চিকিৎসা হয়েছে। কিন্তু কোন ফল হয়নি। সম্পূর্ণ অন্ধ অবস্থায় তিনি গত পরশু বাড়ি ফিরেছেন। এখানকার রাজবৈদ্যরা গত দু’দিন ধরে দেখে অভিমত দিয়েছে, চোখ একেবারে শুকিয়ে গেছে। দৃষ্টিশক্তি ফেরানো আর সাধ্যের মধ্যে নেই। এই খবরে সম্রাটের প্রাসাদে কান্নার রোল পড়ে গেছে। আমি সম্রাটের সাথে কথা বলেছি। তোমার কথাও আমি

বলেছি তাকে। রাজবৈদ্যরা ব্যর্থ হবার পর কিভাবে তুমি ক্যাথারিনার চোখ সারিয়ে তুলেছ, সেটাও বলেছি আমি তাকে। শুনেই সম্রাট অস্থির হয়ে উঠেছেন তোমাকে তাঁর ছেলে দেখাবার জন্যে। আজই আমি তোমাকে সম্রাটের প্রাসাদে নিয়ে যেতে চাই। তোমার সম্মতি প্রয়োজন।' থামলেন মালিক।

আমি বললাম, 'আপনার সম্মতিই আমার সম্মতি মালিক। আমার ভিন্ন সম্মতির প্রয়োজন নেই। তবে এত বড় বড় চিকিৎসক ব্যর্থ হবার পর আমি সম্রাটের ছেলের চিকিৎসার ব্যাপারে কতদূর কি করতে পারব বুঝতে পারছি না। আপনি কি যুবরাজ তৃতীয় হেনরিকে দেখেছেন?'

'হ্যাঁ, দেখেছি আলগার।' বললেন মালিক।

'তার চোখের দিকে খেয়াল করেছেন? চোখ দু'টি কি গর্তে ঢুকে গেছে, না মোটামুটি স্বাভাবিক আছে?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম মালিককে।

'আমি তার চোখ দু'টিকে ভালো করে দেখেছি। তুমি যেটা বললে তার চোখ মোটামুটি স্বাভাবিক কি না, হ্যাঁ আমি সে রকমই দেখেছি। চোখ গর্তে ঢুকে যায়নি।' বললেন মালিক।

'যদি তাই হয়, তাহলে চোখের টিস্যু ও ধমনীতে এখনও রস আছে, সেগুলো এখনও সজীব রয়েছে। এটাই আমার কথা।' আমি বললাম।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তোমাকে ধন্যবাদ। ঈশ্বর তোমার কথা সত্য করুন। গতকাল থেকে তার সম্পর্কে শুধু হতাশার কথাই শুনছি। তুমিই প্রথম আশার কথা শোনালে।' বললেন মালিক।

'স্রষ্টার দয়া সম্পর্কে হতাশ হতে নিষেধ করা হয়েছে। তিনি জীবিতকে মৃত করেন এবং মৃতকে জীবিত করতে পারেন। তার সব দয়া মানুষের জন্যে।' আমি বললাম।

'আলগার তোমাকে যতই দেখছি, ততই বিস্মিত হচ্ছি। এত জ্ঞান তুমি কোথা থেকে পাও?' বললেন মালিক।

'মালিক, সব জ্ঞানের উৎস স্রষ্টা। মানুষের মগজ স্রষ্টার ইচ্ছা প্রকাশের একটা মাধ্যম। এই মাধ্যমের পথ ধরেই মানুষের সকল আবিষ্কার, সকল মহৎ সৃষ্টি।' আমি বললাম।

ক্যাথারিনা আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল। বিস্ময়ভরা তার চোখে অনেক প্রশ্ন দেখলাম। মালিকই কথা বললেন, ‘সাংঘাতিক কথা বলেছ আলগার। কথাটা সাগরের চেয়েও গভীর। কারণ সাগরের তল আছে। ঈশ্বর তোমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন।’

কথা শেষ করে একটু থেমেই মালিক আবার বললেন, ‘তাহলে আজ বিকেলেই তুমি আর আমি রাজধানীতে যাত্রা করব।’ বলে থামলেন মালিক।

কেউ কোন কথা বলল না।

অস্বস্তিকর একটা নীরবতা।

নীরবতা ভাঙলেন আবার মালিক নিজেই। বললেন, ‘এবার আমার দ্বিতীয় কথা।‘

কথাটা সংগে সংগে শুরু করলেন না মালিক। আবার নীরব হলেন তিনি।

অন্য সবাই আনত দৃষ্টিতে বসে আছে। অস্বস্তিকর নীরবতায় আবার কাটল কিছুক্ষণ। পরিবেশকেও ভারি করে তুলেছে এই নীরবতা।

আবারও নীরবতা ভাঙলেন মালিকই। শান্ত, গম্ভীর কন্ঠে বললেন, ‘আলগার, সেদিন তোমাকে কিছু চাইতে বলেছিলাম। তুমি চাওনি। বলেছ ক্রীতদাসদের কিছু বিনিময় চাইবার অধিকার নেই। চলমান ব্যবস্থায় এটা সত্য। কিন্তু আলগার, কোন ক্রীতদাস এতবড় কাজ করার পর কিছু চাইবে না তা একেবারেই স্বাভাবিক নয়, অবিশ্বাস্য। এই অবিশ্বাস্য কাজ করে তুমি প্রমাণ করেছ আমরা যা ভাবতে পারি তার চেয়েও তুমি মহৎ, বড়। এমন মহৎরা কিছু চায় না, দিতে হয় তাদের। চাইবে না বলে তাদের দিতে হবে না, এটা ঠিক নয়। আমরা সেদিন ভুল করেছিলাম। সেদিনও তোমাকে চিনতে ভুল করেছি। সে ভুল আমাদের ভেঙেছে আলগার। সেদিন যা আমাদের না চাইতেই দিয়ে দেয়া উচিত ছিল, সেটা আজ আমরা দিয়ে দিতে চাই। আজ থেকে তুমি মুক্ত আলগার। তুমি আর কারও ক্রীতদাস নও। তুমি এখন আমাদের ছেলে সন্তানের মত। আমাদের তো কোন ছেলে সন্তান নেই!’ থামলেন মালিক। শেষের দিকে তার কন্ঠ কান্নারুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

আশার চেয়ে বড় কিছু ঘটলে, মানুষ যেমন বাকরুদ্ধ, বিহ্বল হয়ে যায়- আমারও সেই অবস্থা হলো। মুক্ত মানুষ থাকার যে কি স্বাদ তা ভুলেই গিয়েছিলাম, চেষ্টাও করেছি অতীতকে ভুলতে। আজ মুক্তির সংবাদ পাওয়ার পর সেই অতীত বাঁধভাঙা জোয়ারের মত আমার হৃদয়ে এসে আছড়ে পড়ল। সেই আদরের কর্ডোভা, সেই প্রিয় আমার বাড়ি, প্রিয়তমা স্ত্রী, প্রাণাধিক সন্তান, তাদের ও আমার পরিণতি, সবই এক সঙ্গে এসে আমার মনের দুয়ারে আছড়ে পড়ল। দু'চোখ থেকে দরদর করে নেমে এল অশ্রুর ধারা। ভুলে গিয়েছিলাম পারিপার্শ্বিকতা। কতক্ষণ কেঁদেছিলাম জানি না। পিঠে একটা মমতা ভরা হাতের স্পর্শ অনুভব করলাম। চমকে উঠে নিজেকে সামলে নিলাম। তাড়াতাড়ি চোখ মুছে মুখ ঘুরিয়ে দেখলাম, মালিক-পত্নীর হাত আমার পিঠে। তার চোখে রাজ্যের মমতা।সবার উপর দিয়ে আমার চোখ ঘুরে এল। দেখলাম মালিকের চোখে প্রশান্তির উজ্জ্বলতা। আর ক্যাথারিনের দৃষ্টি আনত। তার দুই রক্তিম ঠোঁটে খেলা করছে স্বচ্ছ হাসি। তবে দু'চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রুর দুটি ধারা। হাসছে ক্যাথারিনার মামা আমার দিকে চেয়ে। বেরুন বেকার একেবারেই নির্বাক।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। নতমুখে ধীর কন্ঠে বললাম, আমার মুরুব্বি, আমার গুরুজন, আমার মহৎহৃদয় মালিকের প্রতি আমার হৃদয়ের অশেষ কৃতজ্ঞতা। আমি যা করেছি তা খুবই সামান্য, তিনি যা করলেন তা অনেক বড় হৃদয়ের পরিচয়। স্রষ্টা তাঁর মঙ্গল করুন। এই জগৎ ও পরজগতে স্রষ্টা অনেক বড় বিনিময় তাকেঁ দান করুন। আমার পরিবার থাকলে তারা আজ ছুটে আসত তাঁকে স্বাগত জানাতে, তাঁকে মাথায় তুলে নিতে। আমার তো কেউ নেই, সবহারা মানুষ আমি। তাই আমার একার সামান্য কয়েকটা কথা ছাড়া দেয়ার বা করার আমার কিছু নেই। এই পরিবারের সবার কাছে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তারা প্রকৃতিগতভাবেই ভালো মানুষ। তাদের কাছে আমি ভালো ব্যবহার পেয়েছি। অবস্থাগত কারণ আমিই বরং কিছু মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়েছি। আপনাদের সবাইকে অন্তরের অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ। বললাম আমি।

'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ আলগার। তুমি মহৎ বড়, বিজ্ঞ বলেই সবাইকে মহৎ ভাবতে পারছ। আলগার এখন একটা অনুরোধ করতে পারি?' বললো আমার সাবেক মালিক।

আমি বললাম, 'আপনি গুরুজন, অনুরোধ নয়, আদেশ করুন।'

'তুমি যে মিথ্যাচারের কথা বললে, সেটা বুঝলাম না। আর আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছি তা হলো, তোমার পরিচয় আমরা জানি না। তুমি যেটুকু পরিচয় দিয়েছিলে তা আমার কাছে তখনই বিশ্বাসযোগ্য হয়নি। তোমার আচরণ, কথা-বার্তা কোন কিছুর সাথেই তোমার পরিচয় মেলে না। জানতে পারি কি সব কথা?' বললেন মি. ফ্রেনজিস্ক ফ্রেডারিক, আমার অভিভাবক।

একটু ভাবলাম। লুকিয়ে তো আর লাভ নেই।তবে মুসলিম পরিচয় এখন বলতে চাই না।যুবরাজের চিকিৎসা তাতে বাধাগ্রস্ত হতে পারে।

পরক্ষণেই আবার ভাবলাম, আবার মিথ্যাচারের আশ্রয় নেব কেন? সত্য আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে, সেখানেই যাব।

আমার জবাব দিতে দেরি হচ্ছে দেখেই বোধ হয় আমার সাবেক মালিক ফ্রেনজিস্ক ফ্রেডারিক বলে উঠলেন, 'থাক আলগার, অসুবিধা বা বলতে না চাইলে বলো না। এখন...।'

আমি তার কথার মাঝখানেই বললাম, 'স্যরি। বলতে চাই না তা নয়, অসুবিধাও কিছু নেই।'

বলে একটু থেমে আমি শুরু করলাম, 'আমার নাম ইউসুফ ইয়াকুব আল মানসুর। আমার জন্ম স্পেনের কর্ডোভা নগরীতে। আমার বাবা কর্ডোভার সুলতানের প্রশাসনের একজন কর্মকর্তা ছিলেন। কর্ডোভা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসাবিজ্ঞানে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে ঐ হাসপাতালেই ডাক্তার হিসেবে ১২৩০ সালে চিকিৎসক জীবনের শুরু করি। আমি ছাত্র হিসেবে যেমন সেরা ছাত্রের গোল্ড মেডেল নিয়ে বেরিয়ে আসি তেমনি চিকিৎসক হিসেবেও সেরা চিকিৎসকের গোল্ড মেডেল পাই ১২৩৬ সালে।' এই কথাগুলো বলে আমি সংক্ষেপে কিভাবে দেশে বিপর্যয় ঘটল, কিভাবে স্ত্রী ও একমাত্র সন্তান হারালাম,

কি করে আমি পথে নামলাম, পথ কিভাবে আমাকে জার্মানীতে নিয়ে এল তার কাহিনী বললাম। থামলাম আমি।

সবাই নীরব। সবার চোখ আমার দিকে নিবদ্ধ। ক্যাথারিনারও। তাদের চোখে বিস্ময় ও বেদনা দু'টোই।

আমি চোখ নামিয়ে নীরব রইলাম।

কথা বলে উঠলেন আমার সাবেক মালিক ফ্রেনজিস্ক ফ্রেডারিক। বললেন, 'তোমার ও তোমার স্ত্রী সন্তানদের এই মর্মান্তিক পরিণতির জন্যে আমি ও আমার পরিবারের পক্ষ থেকে গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি আলগার। তোমার এই দু:খের উপর এবং আজকের জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র স্পেনের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের রাজধানী কর্ডোভার সেরা ডাক্তারের উপর কষ্ট ও নির্যাতনের যে বোঝা চাপিয়েছিলাম, চিকিৎসকের সোনাফলা হতে শ্রমিকের যে বেলচা, কৃষকের যে কোদাল তুলে দিয়েছিলাম, তার জন্যে আমি ও আমরা গভীর দু:খ প্রকাশ করছি। তুমি তোমার মুসলিম পরিচয় ও কর্ডোভার চিকিৎসকের পরিচয় গোপন করে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ঠিকই করেছিলে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রসেডের যে উন্মত্ততা ইউরোপ ও জার্মানীতে চলেছিল তাতে তোমার মুসলিম পরিচয় নিরাপদ ছিল না। প্রথমে তোমার এই পরিচয় পেলে বড় শিকার পেয়েছি বলে আমিও হয়তো তোমাকে হত্যা করে ফেলতাম। কিন্তু অর্ধেক বছরের ছোট্ট সময়ে আমরা তোমাকে নানা অত্যাচার করলেও তুমি তোমার কাজ, কথা, ব্যবহার দ্বারা আমাদের মন জয় করে নিয়েছ। তা না হলে যাই পরিণতি হোক, আমার মেয়েকে দেখানো বা তার চিকিৎসার জন্যে তোমাকে অ্যালাও করতাম না। তোমার প্রতি আমার অনুরোধ আলগার, তোমাকে তোমার পরিচয় ও স্পেনের ডাক্তার হওয়ার পরিচয় এখনও গোপন রাখতে হবে। আলগার, এই মুহূর্তে আমি অনুভব করছি, যে ধর্ম তোমাকে এত সুন্দর, এত মহৎ বানিয়েছে, সেই ধর্ম আমাকে, আমাদেরকেও যেন জয় করে নিচ্ছে। কিন্তু বেটা, ক্রসেডের আবেগ-উন্মত্ততার সয়লাব এখনও ইউরোপ জুড়ে চলছে। তোমার আসল পরিচয় এখনো নিরাপদ নয়। আমার পরিবারের আমরা যারা এখানে উপস্থিত আছি তারা ছাড়া আর কেউ জানবে না তোমার এই পরিচয়।'

থামলেন আমার অভিভাবক। আমি খুশি হলাম তাঁর কথায়। তিনি ঠিক পরামর্শ আমাকে দিয়েছেন। শুধু দেশ জোড়া নয়, মহাদেশ জোড়া এমন বৈরী পরিবেশে ইসলাম মেনে চলা ও প্রচারের কাজ করতে হলে একটু ভিন্ন, একটু কৌশলী হতেই হবে। আমি বললাম আমার অভিভাবককে লক্ষ্য করে, আবারও আমি আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সঠিক পরামর্শ দানের জন্য। আপনি যে পরামর্শ দিয়েছেন, সেটাই হবে। আমি থামলাম।

আমার পাশ থেকে আমার সাবেক মালিকের পত্নী, যাকে আমি মা বলে ডেকেছি, তিনি বলে উঠলেন, 'আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দিন আজ। আমি বেটা আলগারকে আমাদের পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি আজকের দিনকে খানার এক বিশেষ আয়োজনের মধ্য দিয়ে উদযাপন করতে চাই। আর ক্যাথারিনার বাবা নাইট ফ্রেনজিস্ক ফ্রেডারিককে অনুরোধ করবো, আমাদের বাড়ি ও ফার্মল্যান্ডের সকল শ্রমিক, কর্মচারি, কর্মকর্তাকে একমাস বেতনের সমপরিমাণ অর্থ উপহার হিসেবে আজ দিয়ে দেয়ার জন্য।'

আমার সাবেক মালিকের স্ত্রী থামতেই আমার অভিভাবক মি. ফ্রেনজিস্ক ফ্রেডারিক বললেন, 'ধন্যবাদ গ্রিটা, ক্যাথারিনার মা। তোমার দুই প্রস্তাবই আমি আনন্দের সাথে গ্রহণ করলাম এবং সম্রাটের ওখানে যাওয়ার সময় আমি রাত আটটা পর্যন্ত পিছিয়ে দিচ্ছি। বলে দিচ্ছি রাত ৮টায় সম্রাটের ওখান থেকে গাড়ি আসতে।'

'বাবা, মা তোমাদের দু'জনকেই ধন্যবাদ। বিশেষ করে বাবাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি একজন মানুষকে তার মানবিক অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার মহৎ সিদ্ধান্তের জন্যে। এই সিদ্ধান্ত শুধু তাঁকে মুক্ত করেনি বাবা, আমাদেরকেও মুক্ত করেছে। যে দূর্বহ কালো পাথরটা বুকের উপর চেপে ছিল, তা আজ থেকে নেমে গেল বাবা।' বলল ক্যাথারিনা আনত মুখে। শেষের কথাগুলো বলতে গিয়ে সে কেঁদে ফেলল।

'ধন্যবাদ মা ক্যাথারিনা। ঈশ্বর আমাদের সকলকে সাহায্য করেছেন।'

কথা শেষ করে একটু থেমেই ক্যাথারিনার বাবা ফ্রেনজিস্ক ফ্রেডারিক বললেন, 'আমরা এখন উঠছি। গ্রিটা, তুমি আলগারকে তিন তলায় তার থাকার নতুন জায়গায় নিয়ে যাও। আর...।'

কথা শেষ করতে পারলেন না তিনি। তার কথার মাঝখানেই কথা বলে উঠল ক্যাথারিনার মামা অসরিক রেডওয়ার্ল্ড। বলল, 'বৈঠক শেষ হচ্ছে দেখছি? তৃতীয় একটা কথা ছিল আমার।'

'তোমার আবার কি কথা? বল।' বললেন আমারা সাবেক মালিক।

'আপা ঠিকই বলেছেন, শ্রেষ্ঠ দিনগুলোর সর্বশ্রেষ্ঠ দিন আজ। এই মহান দিনের জন্যে উপযুক্ত আরেকটা বড় কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে।' বলে থামল অসরিক রেডওয়ার্ল্ড।

'থামলে কেন, বল সে কাজটা কি? তোমার দ্বিতীয় বিয়ের কথা বলবে না তো! তোমার বউ মরে যাবার পর থেকেই কিন্তু পাত্রী খুঁজছি। এখনও পাইনি। বল, কি বলবে।' বললেন আমার সাবেক মালিক।

'ঠিক ধরছেন দুলাভাই। বিয়ের কথাই, তবে আমার বিয়ে নয়। আমার স্নেহের একমাত্র ভাগ্নির বিয়ে।' বলল অসরিক রেডওয়ার্ল্ড।

'ভাগ্নি মানে? ক্যাথারিনার বিয়ে?' জিজ্ঞাসা করলেন আমার সাবেক মালিক। তার চোখে-মুখে বিস্ময়।

'হ্যাঁ দুলাভাই। আমাদের সকলের প্রিয়, আমাদের শ্রমিক কর্মচারিদের প্রিয় জোসেফ জ্যাকব আলগারের সব কাহিনী আমরা জানলাম। তার স্ত্রী-পুত্র পরিজন কেউ নেই। তিনি সব হারিয়েছেন। তিনি এখন একা। আমরা তাঁকে আমাদের পরিবারের একজন হিসেবে গ্রহণ করেছি। আমি তার সাথে ক্যাথারিনার বিয়ের প্রস্তাব করছি। তারা দু'জনেই এখানে আছে। তারা একে অপরকে শুধু চেনেনেই না, জানেনও। এখানে এই আলোচনা হতে পারে।' থামল অসরিক রেডওয়ার্ল্ড।

সংগে সংগে কেউ কথা বলল না। সবাই নীরব।

আমি কোন কথা বলতে পারলাম না। গোটা দেহ মনে কেমন ভাবাবেশের সৃষ্টি হলো। ইদানীং ক্যাথারিনার সামনে পড়লে, তার সাথে যখন কথা বলেছি, সে

সময় মনের দুয়ারে পরিচিত যে শংকা, অস্বস্তির উদয় ঘটত, তা এখন নগ্নভাবে সামনে এসেছে। আসলে সেটা অস্বস্তি ও শংকা ছিল না, সেটা ছিল একটা আশা-সম্ভাবনার প্রকাশ চাপা দেয়ার সলজ্জ প্রয়াস। ক্যাথারিনাকে আপন করে পাওয়া বা আপন করে নেওয়ারই আশা সেটা। অলক্ষ্যে অবচেতনায় কখন থেকে যেন আমি ক্যাথারিনাকে চাইতে শুরু করেছিলাম। অসরিক রেডওয়ার্ল্ডের প্রস্তাব মনের সে চাওয়াকেই নগ্নভাবে সামনে এনে দিল। আমার মুখে কোন কথা সরল না।

ক্যাথারিনাও কোন কথা বলল না। ক্যাথারিনা কি ভাবছে, সেটাও এই মুহূর্তে আমার মনে বড় হয়ে উঠল।

কথা বললেন আমার মনিব। বললেন, 'হ্যাঁ, অসরিক রেডওয়ার্ল্ড, তুমি প্রস্তাব করতেই পার। কিন্তু ব্যাপারটা শুধু আমার পরিবারের সিদ্ধান্তের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। দু'জনের ব্যক্তিগত মতামতটাই এখানে গুরুত্বপূর্ণ। তাদেরকে কি আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি, তারা এখন এখানে কিছু বলবে কি না?

'বাবা, তোমাকে ধন্যবাদ মতামত জিজ্ঞাসা করার জন্যে। কিন্তু বিয়ে পিতা-মাতারাই দেন। কোন কোন ক্ষেত্রে, ছেলে-মেয়েরা তাদের মতামত জানায় মাত্র। অতএব তোমাদের সিদ্ধান্তই এখনও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।' বলল ক্যাথারিনা। নরম, সলজ্জ কন্ঠ তার।

'ধন্যবাদ ক্যাথারিনা। অসরিক বলেছে আমরা জানি, আলগার একা, তার পরিবার নেই, পিতা মাতা নেই। আলগার তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, আমি ও গ্রিটা কি তোমার পিতা-মাতা হতে পারি না?' বললেন আমার অভিভাবক নরম ও স্নেহের সুরে।

কথাটার মধ্যে কি জাদু ছিল জানি না। অথবা আমার হৃদয়টাই স্নেহ বুভুক্ষু হয়েছিল কি না তাও জানি না। কথাটা শোনার সাথে সাথে আমার দুই গণ্ড অশ্রুতে ভরে গেল। সংগে সংগেই আমি বললাম, 'অবশ্যই পারেন জনাব, যদি আপনারা সবহারা একজনের পিতা মাতা হতে চান। তাহলে আমি বলছি, ক্যাথারিনার উপর আপনাদের যে অধিকার, আমার উপরও আপনাদের সেই অধিকার থাকবে।'

'ধন্যবাদ আলগার। তুমি ও ক্যাথারিনা একই কথা বলেছ। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। তোমাদেরকে বলছি, তোমরা যদি একে-অপরের হয়ে যেতে সম্মত হও

তাহলে তোমাদের বাবা-মা আমরাই সবচেয়ে খুশি হবো এবং খুশি হয়েছি তোমাদের মত পেয়ে। এটাই আমরা সিদ্ধান্ত করলাম যে, আমরা সম্রাটের ওখান থেকে এসেই বিয়ের কাজটা সারব। ইতোমধ্যে গ্রিটা ও তার ভাই বিয়ের প্রস্তাবক অসরিক রেডওয়ার্ল্ড বিয়ের আয়োজনে কাজ করতে থাকবেন। আলগার ও ক্যাথারিনা তোমাদের আর কোন কথা আছে?' বললেন ক্যাথারিনার বাবা আমার সাবেক মালিক।

একটা কথা কিছু আগে থেকে আমার মনে খোঁচা দিয়ে যাচ্ছে, সেটা হলো, আমার মুসলিম পরিচয় সম্পর্কে ক্যাথারিনার মত কি? এ বিষয়ে তার মন বা মতামত জানা হলো না। তাই মনিবের কথা শেষ হতেই আমি বললাম, 'একটা কথা বাবা, ক্যাথারিনা জোসেফ জ্যাকব আলগার সম্পর্কে জানেন কিন্তু তার মুসলিম পরিচয় সম্পর্কে ক্যাথারিনার মত জানা হয়নি।'

ক্যাথারিনার বাবা কিছু বলার আগেই ক্যাথারিনা বলে উঠল, 'বাবা, ওকে বল, উনি যে মুসলিম এ বিষয়টা আজ উনি বলার আগেই আমি জানতাম।'

'তুমি কিভাবে জানলে মা, আমরা তো জানতে পারিনি।' বললেন ক্যাথারিনার বাবা।

'বাবা, আমি বেরুন বেকারের মাধ্যমে আমার বিভিন্ন বইয়ের কিছু কিছু অংশের ব্যাপারে ওর ব্যাখ্যা জানতে চাইতাম। উনি তা লিখে পাঠাতেন। তার এসব লেখার মধ্য দিয়ে আমার বিশ্বাস নিশ্চিত হয় যে উনি মুসলিম। তার আগে আমার চিকিৎসার সময় তিনি হাতের একটা বই ফেলে রেখে এসেছিলেন আমার ঘরে।

তার মধ্যে একখণ্ড কাগজ ছিল, তাতে ওর হাতের কিছু লেখা ছিল। সেটা পড়েই আমি প্রথমে বুঝতে পারি, উনি মুসলিম হতে পারেন।' বলল ক্যাথারিনা।

ক্যাথারিনার কথায় আমারও মনে পড়ে গেল, এ রকম ঘটেছে। খুশি হলাম এই ভেবে যে, আমি মুসলিম জেনেই সে আমার ঘনিষ্ঠ হয়েছে।

ক্যাথারিনার বাবা বললেন, 'এক সময় মুসলমানদের প্রতি আমার দারুণ বৈরীভাব ছিল। সেটা এখন আর নেই। মুসলমানরা খৃষ্টানদের মতই একত্ববাদী এবং তারা ক্যাথলিক খৃস্টানদের চেয়েও ধর্ম পালনে বেশি নিষ্ঠাবান। ক্যাথারিনা

এখন কিংবা কখনো ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও আমাদের আপত্তি নেই।’
‘আমি ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা করছি বাবা। জীবন্ত ধর্ম ইসলাম আমার ভালো লেগেছে।’ এ নিয়ে তোমার সাথে আলোচনা করব বাবা। বলল ক্যাথারিনা।

‘ধন্যবাদ ক্যাথারিনা।’

বলে সবার দিকে তাকিয়ে ক্যাথারিকার বাবা ফ্রেনজিস্ক ফ্রেডারিক বলল, তাহলে এবার সব কাজ আমাদের শেষ হলো। সত্যি আজ সর্বশ্রেষ্ঠ দিন আমারও জীবনে। উঠবো এবার আমরা। অসরিক রেডওয়ার্ল্ড ধন্যবাদ তোমাকে, একটা ভালো কাজ তুমি করলে।

না দুলাভাই, প্রতিদিনই আমি ভালো কাজ করি। তুমি দেখ না। শালা হওয়াই আমার অপরাধ।

ক্যাথারিনা ও ক্যাথারিনার মা মুখ টিপে হাসছিল।

শালার চেয়ে মধুর সম্পর্ক আর আছে নাকি, অপরাধ হবে কেন? বলে উঠে দাঁড়ালেন ক্যাথারিনার বাবা ফ্রেনজিস্ক ফ্রেডারিক। সবাই উঠল। আমিও উঠে দাঁড়ালাম।’’

# ৩

পড়া থামিয়ে মাথা তুলল আহমদ মুসা। কাহিনীর মধ্যে সবাই ডুবে গিয়েছিল। পড়া বাদ দিয়ে থামতেই শোনার স্রোতটা একটা ধাক্কা খেল। সবাই মাথা তুলে আহমদ মুসার দিকে তাকাল।

‘থামলেন কেন স্যার? কাহিনী উপন্যাসের চেয়ে সুন্দর, কিন্তু তা একজন মানুষের হৃদয় নিংড়ানো এক বাস্তবতা। বাস্তবতাটা একদিকে যেমন মর্মন্তুদ, অন্য দিকে তেমনি সুন্দর ও গৌরবের। মহান পূর্বপুরুষের জন্যে আমার গর্বে বুক ফুলে উঠেছে। একজন ভালো মানুষ শত বিপর্যয়, শত সংকট সততার দ্বারা জয় করলেন। কাহিনীর শেষ শব্দ পর্যন্ত শুনতে চাই, প্লিজ স্যার।’ বলল আদালা হেনরিকা।

‘সত্যি বলেছ আদালা। আমার দাদু তাঁর নামের অনুকরণে আমার নাম রাখায় আমি গৌরব বোধ করছি। কিন্তু তাঁর ও আমার মধ্যে কি আকাশ পাতাল পার্থক্য। তাঁর উত্তরসূরি বলে পরিচয় দেয়ারও অনুপযুক্ত আমি।’

একটু থামল জোসেফ জ্যাকব আলগার। সোজা হয়ে বসে বলল, ‘আদালা আমরা শেষ শব্দ পর্যন্ত শুনব, এখনো স্বর্ণমুকুটের প্রসঙ্গ তো আসেইনি। তবে নাস্তার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। সবাই ক্ষুধার্ত এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। বিশেষ করে তুমি আদালাসহ আমাদের সম্মানিত মেহমানরা অনেক দূর থেকে এসেছেন সারারাত ধরে। তাদের বিশ্রাম তো হয়নি, সেজন্যে ভালো নাস্তা আরও বেশি প্রয়োজন।’

‘ঠিক বলেছ বাবা, বইয়ের কাহিনী আমাদের মনোযোগের সবটুকু কেড়ে নিয়েছে, ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথাও ভুলে গেছি। যাই বাবা দেখি, নাস্তা টেবিলে দিয়েছে কি-না!’

আদালা উঠেছিল। আহমদ মুসা বলল, ‘আপনাকে অভিভূত করেছে তার কাহিনীটা। কাহিনীর মধ্যে দিয়ে সেই সময়কে দেখতে পাচ্ছি। তখনকার এই

ঘটনাগুলো কোন ইতিহাসে নেই। আরও কত যে এমন কাহিনী সে সময় সৃষ্টি হয়েছিল, তা অজানার অন্ধকারেই থেকে যাবে। ধন্যবাদ আপনাদের পূর্বপুরুষকে, তাঁর কাহিনীর গবাক্ষ দিয়ে সেই কালকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমাকে বিস্মিত করেছে তার বিজ্ঞতা ও পরিমিতি বোধ। শুধু জ্ঞানী হওয়া নয়, উন্নত পর্যায়ের মানবিক বোধে উজ্জীবিত না হলে এমন কেউ পারে না। তাকে দিয়েই বুঝা যায় ইসলামী সভ্যতা জ্ঞানে, গুণে, চরিত্রে সমৃদ্ধ কেমন মানুষ তৈরি করেছিল।

আদালা আবার বসে বলল, 'স্যার, আমাদের গ্রান্ড গ্রান্ড দাদু তার মুসলিপ পরিচয় গোপন করেও তার ডাক্তার পরিচয় তিনি দিতে পারতেন।'

'না, পারা স্বাভাবিক ছিল না। তার সময়ে তার মত ডাক্তার ইউরোপে ছিল না। তেমন ডাক্তার হবার কোন বিদ্যালয়ও ইউরোপে ছিল না।তাছাড়া খৃস্টানরা তখনও ঐ ধরনের ডাক্তারী পড়ার সাহস করত না চার্চের ভয়ে। ডাক্তার হিসেবে পরিচয় দিলে সার্টিফিকেট দেখাবার প্রয়োজন পড়ত। এসব নান কারণেই সম্ভবত তিনি তার ডাক্তার হওয়ার পরিচয়টি দেননি।' আহমদ মুসা বলল।

পরিচারিকা এল সেখানে। বলল, 'নাস্তা দেয়া হয়েছে টেবিলে।'

'হ্যাঁ, আদালা মেহমানদের নিয়ে টেবিলে যাও। আমি আসছি। আজ নাস্তা তৈরিতেই দেরি হয়েছে। খেতে আর দেরি করো না।' বলল আদালার বাবা জোসেফ জ্যাকব আলগার।

আদালা উঠল। সবাই উঠল।

নাস্তা সেরে আধাঘন্টার মধ্যে সবাই এল আবার সেই স্টাডিতে।

আদালার বাবা বাক্স থেকে খাতাটা বের করে আহমদ মুসার হাতে দিয়ে বলল, 'কি অদ্ভুত কো-ইন্সিডেন্স। আজকেই ঘটনাটা ঘটল, আর আজকেই তুমি এলে। এসে শুধু আমাদের বাঁচালেই না, পরিবারের শতাব্দীর রহস্য উন্মোচনেও আমাদের সাহায্য করলে। কি অদ্ভুত! রহস্য উন্মোচনের জন্যে একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম ও ভালো আরবি জানা লোকের প্রয়োজন ছিল, সে লোকও তুমিই। আমাদের পরিবারের এক চরম বিপদের দিনে আমাদের জন্যে এক পরম সৌভাগ্যও লেখা ছিল। দিনটি আমাদের পরিবারের জন্যে টার্নিং পয়েন্ট এবং নতুন এক শুভযাত্রার শুরু। আমার হৃদয়বিদারক দু:খের এই দিনে পরম আনন্দে

আমি আপ্লুত!’ বলল জোসেফ জ্যাকব আলগার। শেষের কথা তার আবেগের আবেশে ডুবে গেল। তার ঠোঁটের কোণার স্বচ্ছ-সুন্দর হাসির স্ফুরণ, কিন্তু চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু।

আদালার বাবার কথা পরিস্থিতিকে ভারি করে তুলল।

‘আল্লাহর যা ইচ্ছা ছিল, সেটাই হয়েছে। আপনার পূর্বপুরুষ জনাব আল মানসুর যেদিন এই ডকুমেন্ট তৈরি করে বংশীয়দের জন্যে রেখে গিয়েছিলেন, সেদিনই এটা ঠিক হয়েছিল আজ আপনার দ্বারা এটা খোলা হবে এবং আমার দ্বারা পড়া হবে। আমরা সবাই একত্র হবো, এটাও পূর্বনির্ধারিত। আমরা সবাই আল্লাহর ইচ্ছা ও পরিকল্পনার অধীন। সুতরাং আমাদের উচিত সব ব্যাপারে কৃতজ্ঞতা আদায় করা।’ আহমদ মুসা বলল।

‘স্যার, আমরা সবাই আল্লাহর ইচ্ছা ও পরিকল্পনার অধীন হলে যা ঘটছে, যা আমরা ঘটাচ্ছি, তা ঈশ্বর বা আল্লাহই ঘটাচ্ছেন?’ জিজ্ঞাসা আদালার।

আদালার কথা শেষ হতেই ব্রুনা বলে উঠল, ‘ভাইয়া, এ প্রশ্ন আমারও।’

‘ভালো কিন্তু জটিল প্রশ্ন। বিষয়টা পরিষ্কার করতে হলে অনেক কথা বলতে হয়। মানুষ ছাড়া মহাবিশ্বের সব কিছুই শতকরা শতভাগ আল্লাহর ইচ্ছার অধীন। গাছপালা, জীব-জন্তু, গ্রহ-তারা, বাতাস-আগুন কিছুই আল্লাহর বিধি-বিধান লংঘন করতে পারে না, সে সুযোগ, শক্তি কিছুই তাদের নেই। কিন্তু মানুষের বিষয়টা সম্পূর্ণ ভিন্ন। মানুষের দেহ অন্যান্য সৃষ্টির মতই শতভাগ আল্লাহর বিধি-বিধানের অধীন নি:শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্ত চলাচল, হাড়, স্নায়ু, টিস্যু, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ মানুষ নির্ধারণ করেনি, এটা আল্লাহর দ্বারা নির্ধারিত। শুধু মানুষের ইচ্ছা ও চিন্তার ক্ষেত্রে আল্লাহ মানুষকে স্বাধীন করে দিয়েছেন। মানুষ কি করবে, কি করবে না, কোন পথে চলবে, কোন পথে চলবে না, এসব মানুষের ইচ্ছা ও চিন্তাভিত্তিক সিদ্ধান্তের ফসল। শুধু আ...।’ কথা শেষ না করেই আহমদ মুসাকে থামতে হলো।

আহমদ মুসার কথার মাঝখানে আদালা বলল, ‘তার মানে মানুষ ইচ্ছা ও চিন্তার ক্ষেত্রে স্বাধীন। কিন্তু বাস্তবে তো স্রষ্টা, ঈশ্বর বা আল্লাহ বিভিন্ন বিধি-নিষেধ দিয়ে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা-চিন্তাকে শৃঙ্খলিত করেছেন।’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'আমি সে কথাটাই বলতে যাচ্ছিলাম। আল্লাহ মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা চিন্তাকে শৃঙ্খলিত করেননি। আল্লাহ যুগে যুগে তার বার্তাবাহক বা নবী-রাসূল (স.)-দের মাধ্যমে মানুষের শান্তি ও কল্যাণের পথ দেখিয়েছেন। তিনি তাদের মাধ্যমে মানুষকে জানিয়েছেন, এই শান্তি ও কল্যাণের পথে চললে দুটি পুরস্কার মানুষ পাবে। এক, প্রত্যেক মানুষ, মানুষের সমাজ এবং সারা বিশ্ব ও বিশ্বের মানুষ ইহজগতের পুরস্কার হিসাবে শান্তি-কল্যাণের মধ্যে থাকতে পারবে। দুই, এই কল্যাণ ও শান্তির পথে চললেই যা চাই তা পাওয়া যাবে মানে চিরন্তন জান্নাত লাভ করা যাবে। কিন্তু এই পথে চলতে মানুষকে বাধ্য করা হয়নি। শুধু এই খবর জানিয়েছেন, সে শান্তি ও কল্যাণের পথে না চললে দুনিয়াতে যেমন অকল্যাণ ও অশন্তি সৃষ্টি করবে, তেমনি পরজগতে জান্নাত লাভের অনন্ত পুরস্কার সে হারাবে এবং অকল্যাণ ও অশান্তির আগুনে সে অনন্তকাল জ্বলবে।'

'মানুষকে স্বাধীনতা দেবার পর এ শাস্তির ব্যবস্থা কেন? তাহলে স্বাধীনতার কি মূল্য থাকল?' বলল আদালা।

'আল্লাহ চান মানুষ তার স্বাধীন ইচ্ছার মাধ্যমেই শান্তি ও কল্যাণের পথ বেছে নিক। এজন্যে আল্লাহ প্রত্যেক মানুষকে বিবেক দিয়েছেন এবং এই বিবেক সব সময় মানুষকে ভালো পথ, মন্দ পথ কোনট, কল্যাণ কোন পথে, অকল্যাণ কোন পথে তা বলে দেয়। এটা আল্লাহর তরফ থেকে মানুষকে সাহায্য করার একটা নিয়ম, যাতে মানুষ স্বাধীন ইচ্ছাতেই কল্যাণের পথে চলে বা অকল্যাণের পথে না চলে। আল্লাহর এই ব্যবস্থা তার সৃষ্টির মূল দর্শনের সাথে জড়িত। আল্লাহ মানুষের ভোগ ও ব্যবহারের জন্যে গোটা সৃষ্টি জগৎ সৃষ্টি করেছেন। গোটা সৃষ্টিজগৎ নানাভাবে মানুষের জন্যে, মানুষের কল্যাণে কাজ করছে। কিন্তু মানুষ কোন সৃষ্টিজগতের কাজে লাগে না। এই জগৎ-সংসারে সৃষ্ট সব বস্তুর মধ্যে মাত্র মানুষেরই অন্য সৃষ্টির জন্য কোন কাজ নেই, মানুষ যা করে তার নিজের বা নিজেদের জন্যে করে। অন্য কোন সৃষ্টির জন্যে করে না। এই সীমাহীন দান, দয়া, ইহসানের বিনিময়ে আল্লাহ মানুষের কাছে শুধু এটাই চেয়েছেন যে, মানুষ যেন নিজ ইচ্ছাতেই শান্তি ও কল্যাণের পথে চলে তার নিজের, মানুষের আর দুনিয়ার উপকার করে এবং এর বিনিময়ে আখেরাতের অনন্ত পরস্কার লাভ করে। শাস্তির

যে ব্যবস্থা সেটা ব্যক্তি মানুষ, মানব সমাজ ও দুনিয়ার মঙ্গলের জন্যেই। মানুষের স্বাধীনতা এখানে অর্থহীন নয়। স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছাচারিতার বদলে অর্থবহ করার জন্যেই প্রকৃত পক্ষে শাস্তির এই ব্যবস্থা।' আহমদ মুসা থামল।

আদালা, ব্রুনা সবাইকে চিন্তায় আত্নস্থ দেখাচ্ছে। আহমদ মুসা থামলেও কেউ কোন কথা বলল না। কিছু মুহূর্ত কেটে গেল এভাবে।

নীরবতা ভেঙে কথা বলল ব্রুনা, 'আপনি যে কথা বলেছেন, তা শুনতে সহজ হলেও পাহাড়ের মতই যেন ভারি।'

'শুধু পাহাড় কেন বলছেন মিস ব্রুনা, আমার কাছে হিমালয়ের মত ভারি মনে হচ্ছে। মানব-দর্শন, মানুষের জন্ম, জীবন ও পর-জীবন ও পর-জীবনের মত বিষয় নিয়ে তিনি যা বলেছেন তা একটা পরম বাস্তবতা যতটুকু বুঝেছি তাতেই। তাঁকে ধন্যবাদ।'

বলে আহমদ মুসার দিকে ঘুরে দাঁড়াল আদালা। বলল, 'স্যার, একটা কথা, মানুষকে পর-জীবনের পুরস্কার ও শাস্তির সাথে আল্লাহ মানুষকে না জড়ালে কেমন হতো?'

'পরীক্ষা না থাকলে, পাস-ফেল না থাকলে ছাত্র জীবনটা কেমন হতো, যদি পরীক্ষা, টেস্ট না থাকতো, কৃতকার্যতা-অকৃতকার্যতা না থাকতো তাহলে কি কর্মকর্তা-কমর্চারি রিক্রুট হতো? পরকালে জবাবদিহিতা তথা পুরস্কার-শাস্তির ব্যবস্থা না থাকলে দুনিয়ার শান্তি-শৃঙ্খলা, নীতিবোধ কিছুই থাকতো না, বন্যতায় ভরে যেত সমাজ-সম্পর্ক।' আহমদ মুসা বলল।

'অন্তহীন পুরস্কার ঠিক আছে, কিন্তু অনন্ত শাস্তির বিষয়টা অতি বেশি ভারি নয়?' বলল আদালা।

'পুরস্কার অনন্তই, কিন্তু শাস্তির মেয়াদের বিষয়টা হতে পারে আল্লাহর দয়ার উপর নির্ভরশীল, পরম দয়ালু আল্লাহ যা চান তাই করতে পারেন। তবে মানুষের সমাজে, সৃষ্টি জগতে মানুষের দায়িত্ব বিশাল বলেই তাদের পুরস্কার ও শাস্তির বিধানও বিশাল। আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টিজগতের রাজা বানিয়েছেন। যাকে ইসলামী পরিভাষায় বলা হয়েছে 'খলিফা। মানুষের পদ যেমন বড় তেমনি মানুষের দায়িত্বও খুব ভারি। মানুষ, পৃথিবী এবং এমনকি সব সৃষ্টির কল্যাণে

মানুষের সঠিক দায়িত্ব পালনকে নিশ্চিত করার জন্যেই পরম পুরস্কার ও চরম শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আল্লাহ এটা করেছেন সৃষ্টি ও মানুষের স্বার্থেই, তাঁর এতে কোন স্বার্থ নেই, তিনি বেনিয়াজ, অভাবমুক্ত ও মুখাপেক্ষীহীন। সমগ্র সৃষ্টি মিলে তাঁর কোন উপকারে আসতে পারে না, উপকার করতে পারে না, তেমনি গোটা সৃষ্টি মিলেও তাঁর বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারে না।' আহমদ মুসা বলল।

আদালা, ব্রুনাসহ সকলের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। জিজ্ঞাসার বদলে তাদের সারা মুখে এখন পরিতৃপ্তি। আদালা ব্রুনা দু'জনেই একসাথে উদ্ভাসিত কন্ঠে বলে উঠল, অনেক ধন্যবাদ স্যার, 'একটা অতি কঠিন বিষয় সুন্দর করে বুঝিয়েছেন। সত্যিই মনে হচ্ছে স্যার, স্রষ্টা, সৃষ্টি ও মানুষ নতুন অর্থ নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হয়েছে। ধন্যবাদ আপনাকে।'

'দেবার মত কিছু ধন্যবাদ আমাদের জন্যেও রাখ আদালা।'

বলে আহমদ মুসরা দিকে তাকিয়ে আদালার বাবা জোসেফ জ্যাকব আলগার বলল, 'গর্বে বুক ফুলে উঠেছে, মি. আহমদ মুসা এই ভেবে যে, আপনি মুসলমান, আমাদের পূর্বপুরুষও মুসলমান এবং এই বিশ্বাস মুসলমানদের।'

'এ বিশ্বাস কি শুধু মুসলমানদের, আর কারও হতে পারে না?' বলল ব্রুনা। তার কন্ঠে মিষ্টি প্রতিবাদের সুর।

'না, ব্রুনা, এ বিশ্বাস সকল মানুষের জন্যে, শুধু মুসলমানদের জন্যে নয়। যে মানুষ এ বিশ্বাস ধারণ করে, তাকে মুসলমান বা আত্নসমর্পণকারী বলে। 'মুসলিম' মানুষের গুণবাচক পরিচয়জ্ঞাপক নাম মাত্র।' আহমদ মুসা বলল।

'এ বিশ্বাস আমার, আমাদের পছন্দ হয়েছে, আমরা গ্রহণ করেছি, তাহলে কি আমার নাম মুসলমান হয়ে গেছে। আমি মুসলমান হয়ে গেলাম।' বলল ব্রুনা।

আহমদ মুসার মুখে গাম্ভীর্য নেমে এল। বলল, 'বিশ্বাস মনে মনে পোষণ করাই যথেষ্ট নয়, বিশ্বাসের ঘোষণা দেওয়াও প্রয়োজন। এই ঘোষণার পর একজন মানুষের গুণবাচক পরিচয় 'মুসলিম' হয়ে যায়। এখানেই শেষ নয়, বিশ্বাসের এই ঘোষণা দেয়ার সাথে সাথে যে গুণাবলিতে সে সমৃদ্ধ হয়, সে গুণাবলির প্রকাশও ঘটে কাজের মাধ্যমে। ফল, ফুলের মাধ্যমে যেমন গাছের পরিচয়, তেমনি কাজের মধ্য দিয়ে মানুষের বিশ্বাসের প্রকাশ ঘটে।'

‘বুঝেছি স্যার, প্র্যাকটিসিং মুসলিম না করে আপনি ছাড়বেন না।’ বলল ব্রুনা। হাসছে সে।

‘ব্রুনা, আমি নীতি ও বিধানের কথা বলেছি। এর মধ্যে মটিভ খুঁজে আমার উপর জুলুম করো না।’ বলল আহমদ মুসা।

‘স্যরি, ভাইয়া এমনি মজা করছিলাম। ব্রুনাদের মত মেয়েদের জন্যে যদি আহমদ মুসাকে মটিভের আশ্রয় নিতে হয়, তাহলে ব্রুনাদের জন্ম, জীবন ধন্য হতে পারে, তারা হতে পারে আকাশের চাঁদ।

‘ধন্যবাদ মি. আহমদ মুসা, সেই সাথে সকলকে। সুন্দর আলোচনা হয়েছে। আমরা সবাই অনেক উপকৃত হয়েছি। সত্যি বলতে কি, সারা জীবনে যা শুনিনি, যা বুঝিনি, খুব অল্প সময়ে তা শুনলাম, বুঝলাম। যা জীবনের এক মহাটার্নিং পয়েন্টের মূলধন হতে পারে।’

একটু থামল জোসেফ জ্যাকব আলগার। বলল মুহূর্ত পরেই, ‘এবার আমরা মূল কাজে ফিরে আসি। মি. আহমদ মুসা, প্লিজ আপনি শুরু করুন।’

‘ধন্যবাদ স্যার, আমাকে এই সুন্দর সুযোগ দেয়ার জন্যে।’

বলে খাতা খুলল আহমদ মুসা।

পড়া শুরু করল আবারঃ

‘সন্ধ্যার পর সম্রাট চতুর্থ অটোর পাঠানো রাজকীয় ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে আমরা যাত্রা করলাম।

আমরা নিজেদের ঘোড়ার গাড়িতে চড়েই যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সম্রাট নাকি বলেছেন, সম্রাটের ছেলেকে যিনি চিকিৎসা করবেন তিনি রাজকীয় সম্মান নিয়েই আসবেন।

দুইঘোড়ার গাড়ি। ৪টি সিট।

পেছনের দুই সিট প্রহরীদের জন্যে। দু’জন প্রহরী আগে থেকেই বসা ছিল সেখানে। সামনের দুটি ভিআইপি সিট। আমি ও আমার মালিক ক্যাথারিনার বাবা বাকি দু’টি আসনে বসলাম।

গেটে দাঁড়িয়ে আমাদের বিদায় জানাচ্ছিল বাড়ির সবাই। ক্যাথারিনাও হাজির ছিল।সকালের পর এই প্রথম দেখলাম ক্যাথারিনাকে। ছেলেকে জড়িয়ে

ধরে দাঁড়িয়ে আছে সে। বেরুন বেকার তার মায়ের হাত ধরে দাঁড়িয়েছিল। সে তার নানাকে টাটা দেখালো, পরে আমাকেও। আমিও বেরুন বেকারকে হাত নেড়ে টাটা দিলাম।

গাড়ি নড়ে উঠে চলতে শুরু করেছে। আমরা তখনও গেটে দাঁড়ানো সবার দিকে তাকিয়ে আছি। সবশেষে দেখলাম ক্যাথারিনার হাত উঠল আমার উদ্দেশ্যে। হাত নাড়ল আমাকে লক্ষ্য করে। আমিও জবাব দিলাম হাত নেড়ে। মনট আমার খুব প্রসন্ন হয়ে উঠল। মনে হলো, ক্যাথারিনার এমন একটা সাড়া পাবার জন্যে আমার অবচেতন মনের একটা আকাঙ্খা যেন উন্মুখ হয়েছিল।

ঘোড়ার গাড়ি চলছিল বেশ দ্রুত। রাস্তাটাও সম্রাটেরই তৈরি।

ক্যাথারিনার বাবা ফ্রেনজিস্ক ফ্রেডারিক ও আমি দু'জনেই নীরব ছিলাম। আর কারও কথা বলার কথাও নয়। ঘোড়ার গাড়ি চলার শব্দ ছাড়া কোন শব্দ নেই চারদিকে। নীরবতা ভেঙে ক্যাথারিনার বাবা এক সময় বলে উঠল, 'সম্রাট খুব আস্থা ও আশা নিয়ে তোমাকে ডেকেছেন, তাই ভয় হচ্ছে আমরা তার আস্থা রাখতে পারবো কি না।'

আমি বললাম আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব, এটুকুই আমরা বলতে পারি।'

'তা ঠিক। তোমার উপর আমার আস্থা আছে। তোমার আসল পরিচয় পেয়ে আমার আস্থা বহুগুণ বেড়েছে। আমার মনে হচ্ছে তুমি পারবে, এই আশাই আমি করব।' বলল ক্যাথারিনার বাবা ফ্রেনজিস্ক ফ্রেডারিক।

'দোয়া করুন। মানুষ চেষ্টার মালিক। ফল আল্লাহ দেন।' বললাম আমি।

'হ্যাঁ আরগার। ঈশ্বরই সব কিছুর মালিক, সব কিছু তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন।' বলল ক্যাথারিনার বাবা।

একটু থেমেই আবার শুরু করল, 'আমরা প্রায় এসে গেছি আলগার। সম্রাটের সাথে দেখা হলে তো সম্মান দেখাতে হয়। তা খেয়াল রেখো।' বলল ক্যাথারিনার বাবা।

আমি বললাম, 'এই সম্রাটকে সম্মান দেখানোর কি কোন বিশেষ নিয়ম আছে? আমি কিন্তু সেজদা করে বা মাথা নুইয়ে সম্মান দেখাতে পারি না।'

'না, না আলগার। অন্য রাজা ও সম্রাটদের এই রীতি চালু আছে, কিন্তু স্যাক্সন সম্রাটরা, এমনকি স্যাক্সনরাও এটা করে না। তবে সম্রাটের শাসন ও শক্তির প্রতীক তার হাতের রাজদণ্ডকে চুমু খেতে হয়, এর বেশি কিছু নয়।' বলল ক্যাথারিনার বাবা।

'রাজদণ্ড মানে অলংকারখচিত সিংহ বা হাতি কিংবা ক্রস-এর মত কোন কিছুর প্রতীকসংবলিত সুশোভন লাঠি, এই তো?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'ঠিক বলেছ আলগার। তবে অলংকারখচিত সুশোভন লাঠি বা রাজদণ্ডটি হাতি বা সিংহমুখো নয়, কিংবা 'ক্রস' মাথাও নয়, বরং লাঠির মাথাটা মিনার আকৃতির। তবে মিরারের সূচালো মাথায় ক্রস নেই, আছে পাঁচ মাথ তারকা।' বলল ক্যাথারিনার বাবা।

আমি বিস্মিত হলাম। বললাম, 'রাজদণ্ডের মাথায় বাঘ, সিংহ, হাতি না থাক, ক্রস থাকারই কথা, যেমন পোপের আছে। তার বদলে তারকা কেন?'

'ও তুমি জান না। স্যাক্সনরা বিশেষ করে স্যাক্সন রাজারা খৃস্টান নয়। স্যাক্সনদের রাজা রোমানদের দখলে যাবার পর বাধ্য হয়ে অনেকেই খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে, অনেকেই আত্মপরিচয় গোপন করে ফেলে, আবার কেউ কেউ দেশ ত্যাগ করে। রোমান সম্রাট শার্লেম্যানের সময় খৃস্টানদের এই অত্যাচার ভয়াবহ আকারে শুরু হয় এবং চলতে থাকে। আমাদের সম্রাট চতুর্থ অটো রাজ্যহারা এক রাজকুমার। পরে নতুন এই স্যাক্সন ল্যান্ডে এসে তিনি রাজ্য স্থাপন করেন। আমরা নাইটরা খৃস্টান হয়েও তাঁকে সমর্থন করি। কারণ তিনি অত্যাচারী নন, স্বৈরাচারীও নন। সম্রাট হয়েও তিনি জনগণের একজন। দু'বছর পর পর তিনি নাগরিক সম্মেলন ডেকে তাদের কথা শোনেন এবং তার শাসনের ব্যাপারে তাদের রায় নেন। তার ছেলে যুবরাজ হয়েছে, তাও নাগরিক সম্মেলনের রায় অনুসারে। সম্রাট যুদ্ধের মত বড় কোন সিদ্ধান্ত নিজে নেন না, নাগরিক সম্মেলন ডেকে নাগরিকদের রায় নিয়ে তা করেন।'

একটু হেসেছিলেন ক্যাথারিনার বাবা ফ্রেনজিস্ক ফ্রেডারিক। সেই সুযোগে আমি বলে উঠলাম, 'স্যাক্সন সম্রাটরা তো দেখছি গণতান্ত্রিক, রোমান সম্রাটদের মত অত্যাচারী ও অটোক্র্যাট নয়।'

‘এই ঐতিহ্য স্যাক্সন সম্রাটদের নয়, এই ঐতিহ্য স্যাক্সনদের। আদি স্যাক্সন সমাজ ছিল গণতান্ত্রিক সমাজ। খৃস্টান রোমানরা স্যাক্সন রাজ্য লণ্ডভণ্ড করার পরও সেই ঐতিহ্যের কিছু এখনও অবশিষ্ট আছে।’ বলল ক্যাথারিনার বাবা।

‘ধন্যবাদ স্যাক্সন ও স্যাক্সন সম্রাটদের। আমাদের ইসলামী সমাজও গণতান্ত্রিক সমাজ।’

‘হ্যাঁ, আমরা এসে গেছি। ঐ তো সম্রাটের প্রাসাদের উঁচু গেট দেখা যাচ্ছে।’ বলল ক্যাথারিনার বাবা।

আমরা এসে গেলাম সম্রাটের প্রাসাদে। প্রাসাদের গেটে ছোট একটা ঘোড়সওয়ার দল ছিল আমাদের স্বাগত জানাবার জন্যে। তারা আমাদের স্বাগত জানাল। আমরা গেটে পৌঁছার সাথে সাথেই একজন ঘোড়সওয়ার ছুটল প্রাসাদে সম্রাটকে খবর দেয়ার জন্যে। কিছুক্ষণ পরেই প্রাসাদের একজন অফিসার এলেন আমাদের নেবার জন্যে। তার সাথে রাজপ্রাসাদের ভেতরে চললাম। অফিসারটি জানাল, সম্রাট আজ দরবারের কাজ মুলতবি করেছেন এবং প্রাসাদের রাজকীয় চিকিৎসা ও সেবা বিভাগে যুবরাজকে নিয়ে অপেক্ষ করছেন।

আমাদের সরাসরি রাজপ্রাসাদের চিকিৎসা ও সেবা বিভাগে নিয়ে যাওয়া হলো।

সেখানে পৌঁছলে সম্রাট চতুর্থ অটো’র প্রধান স্টাফ অফিসার আমাদেরকে একটা বিশ্রাম কক্ষে নিয়ে গেলেন। একটু বিশ্রাম নিয়ে হাত-পা ধুয়ে ফ্রেশ হবার পর আমাদেরকে ডিনারের টেবিলে নিয়ে যাওয়া হলো। ডিনারের টেবিলে খোদ সম্রাট এলেন। বিস্ময়ে হতবাক আমরা উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শনের জন্যে তার দিকে এগোচ্ছিলাম। সম্রাট হাত দিয়ে এগোতে নিষেধ করে আমাদের স্বাগত জানিয়ে বললেন, খাবার টেবিলে বসে উঠতে নেই। আসুন আমরা ডিনার সেরে নেই।

রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে সম্রাটের সাথে বসে ডিনার করলাম। মনে পড়ে গেল আমার দীন-দুনিয়ার বাদশাহ আমার রাসূলের (স.) কথা, সোনালি যুগের সোনার মানুষ খলিফা আবু বকর (রা.), খলিফা ওমর (রা.)-দের কথা। তাঁরা শাসক হয়েও

মানুষের সেবক ছিলেন। তাঁদের স্থান ছিল মানুষের কাতারে, ক্লান্ত হলে শয্যা হতো খেজুর গাছের নিচে বালির উপর, নাগরিকরা যখন ঘুমিয়ে, তখন তাঁরা মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াতো তাদের অবস্থা জানার জন্যে, চাকরের সাথে পালা করে উটের পিঠে চড়েছেন, আবার রশি ধরে উটকে টেনে নিয়েছেন, তাঁদের সিংহাসন ছিল খেজুরের চাটাই। কিন্তু তাঁদের ব্যক্তিত্ব, প্রজ্ঞা কম্পন জাগাতো রোম সম্রাট, গ্রীক সম্রাট ও পারস্য সম্রাটদের হৃদয়ে। তাঁদের সে আদর্শেরই কিঞ্চিত একটা রূপ দেখলাম স্যাক্সন সম্রাট চতুর্থ অটো'র মধ্যে। আমার চোখের কোণ ভিজে উঠছে। আমি বললাম সম্রাটকে লক্ষ্য করে, 'এক্সিলেন্সি, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে, আপনার সাথে বসে খাওয়ার সৌভাগ্য হলো।'

সম্রাট চতুর্থ অটো'র চোখে-মুখে একটা সূক্ষ্ম প্রসন্নতা ফুটে উঠল। বলল, 'ধন্যবাদ ডক্টর যে আপনি একে সৌভাগ্য বলছেন।

আসলে আমাদের স্যাক্সনদের জন্যে এটা স্বাভাবিক বিষয়। আমি সম্রাট, সেটা সামাজিক সিস্টেম হিসেবে। জনগণের সামষ্টিক ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। স্বতন্ত্র কোন ইচ্ছা আমার নেই।'

'ধন্যবাদ, এক্সিলেন্সি। এভাবে মানুষের মনের সম্রাট হওয়া যায়।

শাসক সম্রাটের চাইতে মনের সম্রাট অনেক বেশি শক্তিশালী। ধন্যবাদ এক্সিলেন্সি।' আমি বললাম সম্রাটকে লক্ষ্য করে।

সম্রাট চোখ তুলে আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। বললেন, 'ডক্টর আপনি সাংঘাতিক কথা বলেছেন। সম্পূর্ণ নতুন পরিভাষা, সম্পূর্ণ নতুন প্রকাশ। আপনি কোথায় লেখাপড়া করেছেন?'

হঠাৎ আমার মুখ ফসকেই বেরিয়ে গেল, 'স্পেনে লেখাপড়া করেছি।'

'স্পেনে?' বলে সম্রাট উঠে দাঁড়ালেন। তার চোখে-মুখে বিস্ময়ের বিস্ফোরণ। তার দুই চোখের স্থির দৃষ্টি আমার উপর নিবদ্ধ। আমার জন্যে আশার কথা যে, তার সে দৃষ্টিতে বিদ্বেষ, ঘৃণা বা হিংসার প্রকাশ নেই। আছে সবিস্ময় অনুসন্ধান।

সম্রাটের সাথে সাথে আমরাও উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। সম্রাট ধীরে ধীরে বসলেন। আমরাও বসলাম।

বসার সাথে সম্রাট তাঁর দুই চোখ বন্ধ করেছেন। আত্নস্থ হওয়ার প্রকাশ তার চোখে-মুখে। অনেক মুহূর্ত পার হলো।

সম্রাট চোখ খুললেন। বললেন, 'ডক্টর, আপনার সাথে কি ওখানকার শাসকদের কারও কখনও দেখা হয়েছে? নিজ মুখে ওদের কথা-বার্তা শুনেছেন কখনও?' বললেন সম্রাট।

'হ্যাঁ, এক্সিলেন্সি। আমি তাঁদের দেখেছি, কথাও শুনেছি তাঁদের। বললাম আমি।

'ওরা মানুষ কেমন? শুনেছি, শাসন নাকি ওদের আগের মত নেই!' বললেন সম্রাট।

'এক্সিলেন্সি ঠিকই শুনেছেন। ওরা মানুষ হিসেবে এখনও ভালো। তবে শাসক হলে তাদের মধ্যে ধীরে ধীরে যে দোষ-ত্রুটি ঢোকে তা তারা মুক্ত থাকতে পারেনি। এ কারণেই তাদের শাসনও আগের মত নেই। বিভেদ-বিতর্ক ও হানাহানি তাদের নিজেদের মধ্যে বেড়েছে। সে কারণে তারা দুর্বলও হয়ে পড়েছে। দুর্বলতার কারণে তাদের রাজ্যও সংকুচিত হয়ে পড়েছে।' বললাম আমি।

সম্রাট একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। বললেন, 'আমরা এক সময় ওদের উপর অনেক নির্ভর করেছিলাম, অনেক আশা করেছিলাম। আমাদের পূর্বপুরুষরা আশা করেছিলেন, তারা ও আমরা মিলে ইউরোপে একটা উদার ও মানবিক রাজ্যের প্রতিষ্টা করব। কিন্তু তা হয়নি।'

বিস্ময়ে আমার অবাক হয়ে যাবার পালা। সম্রাট এ কি বলছেন। স্পেনের মুসলিম সুলতানদের সাথে মিলে স্যাক্সন সম্রাটরা কিছু করতে চেয়েছিলেন? বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে আমি বললাম, 'এক্সিলেন্সি, দয়া করে কি বলবেন, স্পেনের মুসলিম সুলতানদের সাথে মিলে আপনাদের কিছু করার ব্যাপারটা কিভাবে ঘটেছিল, মাঝখানের বিশাল দূরত্ব ডিঙিয়ে?'

'ডক্টর, প্রয়োজনের তাকিদে আমার পূর্বপুরুষ প্রথম অটো, তারপর দ্বিতীয় অটো এই বিশাল দূরত্ব ডিঙিয়ে তাদের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। বলেছি, আমাদের প্রয়োজনেই আমরা এটা করেছিলাম। আমাদের স্যাক্সনদের

প্রথম সম্রাট অটো 'দি গ্রেট স্পেনের মুসলিম সুলতান তৃতীয় আবদুর রহমানের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। যোগাযোগ ছিল একটা ঘটনা উপলক্ষ্যে। স্পেনের সুলতানের সৈন্যরা আলপস-এর অনেকগুলো আলপাইন গিরিপথ দখল করে নিয়েছিল। তার ফলে সওদাগরী কাফেলার যাতায়াত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সুলতানের সৈন্যরা আলপাইনের গিরিপথগুলো ছেড়ে দেয় অথবা সওদাগরী কাফেলাকে নিরাপদে যাতায়াত করতে দেয়, এই অনুরোধ নিয়েই স্যাক্সন সম্রাট প্রথম অটো ৯৫৩ খৃস্টাব্দে সুলতান আবদুর রহমানের রাজধানী কর্ডোভায় একটা প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছিলেন। প্রতিনিধিদল এক মাস কর্ডোভায় ছিলেন। সুলতান তৃতীয় আব্দুর রহমান সম্রাট প্রথম অটো'র সম্মান রেখেছিলেন। একমাস পর প্রতিনিধিদলটি জার্মানীতে ফিরে এলে তাদের কাছে স্পেনের সুলতানদের কাহিনী শুনেছিলেন। এটা সম্রাট প্রথম অটোকে যারপরনাই আনন্দিত ও প্রভাবিত করেছিল। তিনি দেখেছিলেন মুসলমানদের সাথে স্যাক্সনদের অনেক মিল। স্যাক্সনদের মতই মুসলমানরা সরল জীবন যাপন করে। কোন আশরাফ-আতরাফের ব্যবধান তাদের মধ্যে নেই স্যাক্সদের মতই। সুলতান বা সম্রাটকে মুসলমানরা মনিব বা ঈশ্বরের মত করে ভাবে না, শাসককে সাথী বা ভাই মনে করে। স্যাক্সনদের রাজা-সম্রাটরাও তাই। স্যাক্সনদের মতই

মুসলমানরা কোন মূর্তি বা প্রতিকৃতিকে দেবতা মানে না।মুসলমানদের প্রার্থনা গৃহের মিনারগুলো স্যাক্সনদের মিনারের মতই আকাশচুম্বী উঁচু। আরও শুনেছিলেন প্রতিনিধিদলের কাছে যে, রোমান ও গ্রীক সম্রাটরা মুসলমানদের ভয় করে। মুসলিম সুলতানদের এই শক্তির কথা শুনে সম্রাট অটোর হৃদয়ে একটা পুরানো কথা মাথাচড়া দিয়ে উঠেছিল, সেটা হলো স্যাক্সনদের উপর রোমক খৃস্টানদের নৃশংস হামলা, আক্রমণ ও অবর্ণনীয় অত্যাচার। ৭৮২ সালে শার্লেম্যানের খৃস্টান বাহিনী একদিনে ৪ হাজার ৫শ' স্যাক্সনকে পশুর মত হত্যা করেছিল। শার্লেম্যানের এই বাহিনীর কাছে স্যাক্সনদের মৃত্যুর বিকল্প ছিল খৃস্টধর্ম গ্রহণ করা। রাজনৈতিক সম্রাটের পরিবারও সেই খৃস্টধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সেই সূত্রে এখন তারা খৃস্টান। কিন্তু এই বীভৎস অতীতকে স্যাক্সনরা ভোলেনি। শার্লেম্যানের বাহিনী তাদের হত্যা ও খৃস্টীয়করণই শুধু নয়,

স্যাক্সনদের সমাজ, সংস্কৃতি সবই ধ্বংস করেছে। আইন করে মিনার তৈরি নিষিদ্ধ করেছে। অতীতের এই দু:সহ বেদনা-তাড়িত স্মৃতি আমার পূর্বপুরুষ সম্রাট প্রথম অটোকে এক প্রতিকার চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। তিনি ভেবেছিলেন, রোমানদের অত্যাচার-আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে স্পেনের সুলতানদের সাথে ঐক্য গড়া যায়। এই ঐক্য একটা বিরাট শক্তি হিসেবে দেখা দেবে। যেই ভাবা সেই কাজ। তিনি স্পেনের সুলতান তৃতীয় আবদুর রহমানের কাছে আরও একটা প্রতিনিধিদল পাঠালেন। একটা চিঠি পাঠালেন তিনি সুলতান তৃতীয় আবদুর রহমানের উদ্দেশ্যে। এবারও মাসখানেক পর প্রতিনিধিদল ফিরে এল সুলতান আবদুর রহমানের একটা চিঠি নিয়। চিঠিতে সুলতান আবদুর রহমান সম্রাট প্রথম অটোকে যা লিখেছিলেন তার সারকথা হলো, 'সম্রাটের বক্তব্য ও মতামতকে স্পেনের খিলাফত সাদরে গ্রহণ করেছে। আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর উত্তরসূরি এই খিলাফত জাতিগতসহ সকল অত্যাচার-অবিচারের বিরোধী। যে ঐক্য-সহযোগিতা মানুষের শান্তি, মর্যাদা ও সমৃদ্ধির স্বার্থে, আমরা তার পক্ষে। এ নীতির ভিত্তিতে সম্রাটের সাথে আমাদের ঐক্য ও সহযোগিতা হতে পারে। এই লক্ষ্যে সম্রাটের সাথে আমাদের আরও আলোচনা চলবে। ইতিমধ্যে আমরা একে-অপরের শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রাখব।' এই চিঠি পেয়ে সম্রাট খুব খুশি হয়েছিলেন।

আলোচনা শুরু হয়েছিল এবং অনেক দূর এগিয়েছিল। কিন্তু ৯৬১ সালে সুলতান তৃতীয় আবদুর রহমানের মৃত্যু হলে আলোচনায় ছেদ পড়ে। অন্য দিকে একটা দুর্ঘটনা ঘটে। সুলতান তৃতীয় আবদুর রহমানের উত্তরসূরি দ্বিতীয় হাকামের কাছে লেখা কনডোলেন্স ও আবার আলোচনা শুরু সংক্রান্ত প্রথম অটোর একটা চিঠি পথে সম্রাটের প্রতিনিধিদলের কাছ থেকে চুরি হয়ে যায় এবং তা পোপের হাতে পড়ে। তারপর তা পোপের হাত থেকে ক্রুসেডারদের হাতে চলে যায়। সম্রাট অটো স্পেনের মুর সুলতানদের সাথে মিলে পোপ ও ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। হৈ চৈ শুরু করা হলো ইউরোপ জুড়ে। জার্মানীদের নাইটদের খেপিয়ে তোলার চেষ্টা করা হলো। এই অবস্থায় সম্রাট অটো পরিস্থিতিকে শান্ত করার জন্যে চুপ হয়ে যান এবং স্পেনের সাথে যোগাযোগ আপাতত বন্ধ করে দেন। ক'বছর

পর আবার যখন যোগাযোগ শুরু করতে যাবেন, তখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সে অসুখেই ৯৭৩ সালে তিনি মারা গেলেন। এভাবে সম্রাট প্রথম অটোর একটা স্বপ্ন একের পর এক ধাক্কা খেয়ে পেছনে পড়ে গেল, যা আর সামনে আনা যায়নি।'

থামলেন সম্রাট চতুর্থ অটো। উঠে দাঁড়ালো। পায়চারি করতে করতে বলল, 'আমার উত্তরসূরিদের সে স্বপ্ন সফল হয়নি, কিন্তু স্বপ্নটির কথা আমরা ভুলে যাইনি। আপনার ডাক্তারী শিক্ষা এবং বাড়ির ঠিকানা কর্ডোভায় শুনে সেই অতৃপ্ত স্বপ্নের কথা মনে পড়ে গেছে। যাক, আমি খুশি হয়েছি।'

'এক্সিলেন্সি, আমি খুশি হয়েছি আপনার সাথে সাক্ষাতের সুযোগ হওয়ায়। আমি আরও খুশি হয়েছি কর্ডোভা ও স্পেনের সুলতানদের সাথে আপনাদের পুরানো সম্পর্কের ইতিহাস শুনে। দুই পক্ষের এই স্বপ্ন সফল হলে আমার মনে হয় দুই পক্ষই উপকৃত হতো।' আমি বললাম।

'উপকৃত মানে? ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হতে পারতো। অটো'দের সাম্রাজ্য তাহলে অত তাড়াতাড়ি ধ্বংস হতো না এবং প্রায় দু'শ বছর অটো পরিবারকে রাজ্যহারা অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে হতো না।

অন্য দিকে স্পেনের সুলতানরাও খৃস্টান রাজাদের অনেক জ্বালাতন থেকে বাঁচতেন।' বলল সম্রাট চতুর্থ অটো।

থামলেন সম্রাট। ঘুরে তাকালেন ক্যাথারিনার বাবা ফ্রেনজিস্ক ফ্রেডারিকের দিকে। বললেন, 'আসুন, যুবরাজ অপেক্ষা করছেন।' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আসুন ডক্টর।'

বলে চলতে লাগলেন তিনি। আমরা তার পিছু পিছু চললাম। বড় একটা সুসজ্জিত ঘর। দুগ্ধফেনা সদৃশ শয্যায় শুয়ে আছে এক সুদর্শন যুবক। চোখ বুজে শুয়ে আছে সে।

তার মাথার পেছনে একজন নার্স দাঁড়িয়ে আছে এ্যাটেনশন অবস্থায়। দরজায় ছিল দু'জন পরিচারিকা। সম্রাট ও আমাদেরকে দেখেই কুর্নিশ করে দু'পাশে সরে দাঁড়িয়েছিল তারা।

সম্রাটের পেছনে আমরাও ঘরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালাম।

'সম্রাট যুবকটিকে দেখিয়ে আমাকে বললেন, 'ডক্টর এই আমার একমাত্র ছেলে, যুবরাজ পঞ্চম অটো।'

আমি এগিয়ে গেলাম বিছানার দিকে।

যুবরাজ উঠতে যাচ্ছিলেন। দু'জন নার্স ছুটে এসে যুবরাজকে ধরে বসিয়ে দিতে গেল।

আমি দ্রুত কন্ঠে বললাম 'প্লিজ এক্সিলেন্সি, যুবরাজ। প্লিজ, আপনি উঠবেন না।' বলে আমি ধরে তাকে আস্তে আস্তে করে শুইয়ে দিলাম।

.আমি উঠে দাঁড়িয়ে সম্রাটের দিকে চেয়ে বললাম, 'এক্সিলেন্সি, আমি কি যুবরাজকে দেখতে পারি?'

সম্রাট চতুর্থ অটো সুশোভিত একটা চেয়ারে গিয়ে বসেছেন। বললেন, 'হ্যাঁ ডক্টর, প্লিজ শুরু করুন।'

ক্যাথারিনার বাবাও সম্রাটের পেছনে আরেকটা চেয়ারে গিয়ে বসেছেন সম্রাটের নির্দেশে।

আমি যুবরাজের পাশে গিয়ে বসলাম। বললাম নরম স্নেহের সুরে, 'এক্সিলেন্সি যুবরাজ, আমি একজন ডাক্তার। আপনার প্রতি অসীম শুভেচ্ছা নিয়ে আল্লাহর নামে আমি আমার কাজ শুরু করতে চাই। প্লিজ যুবরাজ আমাকে অনুমতি দিন, আপনার সহযোগিতা আমি চাই।'

যুবরাজ ম্লান হাসলেন। বললেন, 'আপনাকে ওয়েলকাম, যদিও চিকিৎসার প্রতি আমার আগের সেই আস্থা নেই। তবু সব সহযোগিতা আমি করব। আমার জন্যে কষ্ট করার জন্যে আপনাকে আগাম ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদ এক্সিলেন্সি। আমি প্রথমে দুই চোখ ভালো করে দেখবো। তারপর দরকার হলে কিছু জিজ্ঞাসা করব। তারপর সব অবস্থা দেখে সামনে এগোবো।'

পরীক্ষা শুরু করলাম আমি। আমি যুবরাজের দুই চোখের ভেতরের অবস্থা দেখলাম। আমি বিস্মিত হলাম দেখে যে, যুবরাজের দুই চোখের দুই আইবলসহ চোখের সব অবস্থা স্বাভাবিক। একটাই অস্বাভাবিকতা দেখলাম। সেটা হলো, দুই চোখেরই আইবলসহ ভেতরটা শুকনো এবং চোখের আইবলে কোন রিফ্লেকশন

নেই। আমি নার্সকে একটা সুচ আনতে বললাম। নার্স দৌড়ে গিয়ে সুচ এনে আমাকে দিল। আমি সুচটা দেখে নার্সকে সেটা আগুনে জীবাণুমুক্ত করে দিতে বললাম। নার্স সুচটা পুড়িয়ে নিয়ে এল। আমি যুবরাজকে বললাম, প্লিজ যুবরাজ, চোখে যতবার আঘাত পাবেন, কথা বলবেন প্লিজ। চোখের আইলিডসহ চোখের ভেতরটায় প্রযোজনীয় অনুভুতিপ্রবণ অংশগুলোতে সুচের আগা দিয়ে আঘাত করে দেখলাম যুবরাজ প্রতিটাতেই রেসপন্স করছেন। আমি বিস্মিত হলাম চোখের স্নায়ুগুলো সব জীবিত আছে! তাহলে দুই চোখ শুষ্ক কেন? চোখের আইবলে রেসপন্স নেই কেন? তাহলে চোখের কালেকটিভ টিস্যু এবং দৃশ্য প্রবাহ মণিকে বহন ও বিতরণকারী গ্রন্থিগুলোতেই কি সমস্যা? কিন্তু পরীক্ষাটা একটু কঠিন ও কষ্টকর। আমি নার্সদের দিকে চাইলাম। বললাম এর চেয়েও সূক্ষ্ম সুচ কি পাওয়া যাবে? নার্স বলল, স্যার, এ ধরনের সুচ নেই, তবে আকুপাংচারের সুচ আছে। আকুপাংচারের কতকগুলো সুচ অনেক লম্বা, খুবই সূক্ষ্ম।

আমি খুশি হয়ে বললাম , 'ধন্যবাদ নার্স। ওগুলো আরও ভালো, বেশি কাজের। নিয়ে এস, দ্রুত।' নার্স নিয়ে এল সুচ। সুচগুলোকে আগুনে সেঁকে জীবাণুমুক্ত করে নিয়ে এসেছে নার্স। আমি ধন্যবাদ দিয়ে সুচ হাতে নিলাম। যুবরাজের দুই চোখের উপরের দিকটায় মাপজোখ করে দুই চোখের তিনটি করে জায়গা ঠিক করলাম পরীক্ষার জন্যে। চোখের আইবলের গোড়ার দিক থেকে যে সূক্ষ্ম সেলের অংশ মস্তিষ্কের সাথে সংযুক্ত, সেগুলো চোখে প্রতিবিম্বিত হওয়া ইনফরমেশনকে

মস্তিষ্কে পৌঁছায় এবং মস্তিষ্ক সে ইনফরমেশনকে দৃশ্যে পরিণত করে চোখে পাঠায়। সুতরাং এই সেলগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হলে চোখ ও মস্তিষ্কের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থায় চোখ ও আইবল ভালো থাকলেও চোখ কিছুই দেখতে পায় না। আমি এই সেলগুলো পরীক্ষারই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। প্রস্তুত হয়ে আমি যুবরাজকে বললাম, 'এক্সিলেন্সি, যুবরাজ, আপনি রোমে সামরিক ট্রেনিং নিয়েছেন। ট্রেনিং-এ শারীরিক ও মানসিক সহ্য-শক্তিরও পরীক্ষা নেয়া হয়। দেহে সুচ ফোটানোর কোন ট্রেনিং কি আপনার হয়েছে?' যুবরাজ হাসলেন। বললেন,

‘ডক্টর নিশ্চয় কোথাও সুচ ফোটাতে চাচ্ছেন। যাই করুন ডক্টর আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।’

‘ধন্যবাদ এক্সিলেন্সি।’ বললাম আমি। কাজ শুরুর আগে আবার আমি বললাম, ‘এক্সলেন্সি, এবার আপনার আরও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা চাই। সুচ চামড়া ভেদ করার সময় ব্যথা লাগবে, অবশ্যই, কিন্তু তারপর সুচের আগা যে দিক দিয়ে এবং যেখানে গিয়ে থামছে সে স্থানগুলোতে ব্যথা লাগছে কি না সেটা আমি জানতে চাই। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।’

যুবরাজ বললেন, ‘ইয়েস ডক্টর, গড ব্লেস আস।’

প্রত্যেক চোখের আইবলের পেছনে নির্দিষ্ট স্থান বরাবর উপরে তিনটি ডট ঠিক করে নিলাম। প্রথমে দুই চোখের মাঝের দুই ডটে সুচ প্রবেশ করালাম। যুবরাজ বললেন, ‘চামড়ার অংশ ফুটো হবার সময় সামান্য কিছু অংশে ব্যথা বোধ করেছি, তারপর আর কোন ব্যথা লাগেনি।‘ আমি যুবরাজকে ধন্যবাদ দেবার পর ভেতরে ঢুকে যাওয়া সুচের দৈর্ঘ্য পরখ করে বুঝলাম চোখ ও মুস্তস্কের সংযোগবিধানকারী সেলগুলোতে কোন অনুভূতি নেই। যুবরাজের অন্ধত্বের কারণ আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। নিশ্চিত হবার পরও অবশিষ্ট চার পয়েন্টে আমি সুচ প্রবেশ করালাম। রেজাল্ট একই হলো।  তবে একটা সুখবরও মিলল।সেটা হলো, ডান চোখের ডানের ডটে এবং বাম চোখের বামের ডটে সুচ ঢোকানোর সময় সুচের আগা সামান্য গেলেও যুবরাজ কিছু ব্যথা অনুভব করেছেন।এর অর্থ চোখ ও মস্তিষ্কের যোগাযোগ মাধ্যম সেল সবটাই সম্পূর্ণ মরে যায়নি। এটা আমার জন্যে বিরাট সুখবর। স্নায়ু ও সূক্ষ্ণ সেল শীতলকারী সেই সাথে এ্যান্টিসেপটিক একটা ভেষজ নির্যাস যুবরাজের চোখের উপরের অংশের আহত স্থানগুলোতে মালিশ করে দিয়ে আমি বললাম, ‘এক্সিলেন্সি, আমি শুনেছিলাম আপনি কিছুই দেখতে পান না, কিন্তু মনে হচ্ছে আপনি সামান্য কিছু দেখতে পান। বিশেষ করে বাম চোখের বাম দিক এবং ডান চোখের ডান দিক দিয়ে কিছুটা দেখতে পান আপনি।’

‘হ্যাঁ ডক্টর, খুব সামান্য দেখতে পাই। কোন কিছুর ধোঁয়াটে একাংশ। কিন্তু ডক্টর আপনি এটা জানলেন কি করে? খুব উল্লেখযোগ্য নয় বলে কাউকে আমি জানানোর প্রয়োজন বোধ করিনি।’ বলল যুবরাজ।

‘এক্সিলেন্সি যুবরাজ, আমি যে পরীক্ষা করলাম তাতে আমি এটা বুঝতে পেরেছি।’

বলে উঠে দাঁড়িয়ে আমি সম্রাটের দিকে ফিরলাম। দেখলাম চোখ ভরা বিস্ময় নিয়ে তিনি তাকিয়ে আছেন। আমি তার দিকে ফিরতেই তিনি বললেন, ‘ডক্টর আপনি সুচ দিয়ে ফুঁড়েই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন। কিভাবে?’

আমি বললাম, ‘এক্সেলেন্সি সম্রাট, এটা আমি পরে বলছি। তার আগে একটা কথা বলি, এক্সিলেন্সি যুবরাজের চোখের আঙ্গিকে কোন ক্ষত আমি দেখতে পাচ্ছি না। চোখের দৃশ্যমান সব অঙ্গই সেনসেটিভ। চোখ দু’টি শুকনো এবং আইবলে রিফ্লেকশান নেই এটাই শুধুমাত্র ব্যতিক্রম। এক্সিলেন্সি, আসল সমস্যা, চোখের পেছন থেকে মস্তিষ্ক পর্যন্ত সংযোগকারী সেলগুলোতে। এই সেলগুলো রেসপন্স করছে না, সাড়া দিচ্ছে না। এক্সিলেন্সি, আপনার প্রশ্নের উত্তর হলো, সাড়া না দেয়া এই সেলগুলোর মধ্যে বাঁ চোখের বাঁ দিকের এবং ডান চোখের ডান দিকের সেলের একটা অংশ সাড়া দিচ্ছে। সুচ দিয়ে যখন এ সেলগুলোতে আঘাত করা হয়েছে, তখন যুবরাজ কিছুটা ব্যথা অনুভব করেছেন।’

সম্রাট অটো দাঁড়িয়ে গেছেন। বললেন, ‘এর দ্বারা কি বুঝা যাচ্ছে ডক্টর? যুবরাজের চোখ ভালো হবে কি না?’

‘এক্সিলেন্সি আমি চোখের অবস্থা জানার চেষ্টা করছি। চোখের অসুবিধাটা কোথায়, কি কারণে চোখ কিছু দেখতে পায় না, সেটা আমার কাছে বোধ হয় পরিষ্কার। চোখ ও মস্তিষ্কের সংযোগকারী সূক্ষ্ম সেলের কণিকাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এটাই চোখে না দেখার কারণ।

একটা আশার কথা হলো যে, সেলগুলোর কিছুটা এখনও সক্রিয় রয়েছে।’ আমি বললাম।

‘ধন্যবাদ ডক্টর। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। যুবরাজের অনেক চিকিৎসা আমি করিয়েছি, কিন্তু কেউ চোখের এমন পরীক্ষা করেনি এবং চোখে কেন দেখতে

পায় না তার কারণ কি তা কেউ বলেনি। আপনিই প্রথম একটা কারণের কথা বললেন। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর। আমি হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। আপনার কথা আমাকে আনন্দিত ও আশান্বিত করেছে।' বলল সম্রাট অটো।

'এক্সিলেন্সি যুবরাজকে আমার আরও কতকগুলো প্রশ্ন আছে। আমার খুব অবাক লাগছে চোখ ও মাথার সংযোগকারী মাঝের সেলগুলো এই ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো কি করে?' আমি বললাম।

'হ্যাঁ ডক্টর, কি জানতে চান আপনি জিজ্ঞাসা করুন। আমাদের উপস্থিতিতে তো সমস্যা নেই?' বললেন সম্রাট চতুর্থ অটো।

'না, না এক্সিলেন্সি, আপনাকেও দরকার। আমি যা জানতে চাই তা আপনি জানতে পারেন।'

বলে একটু থেমেই আবার বললাম, 'এক্সিলেন্সি সম্রাট এবং যুবরাজ, আমার মনে হয় প্রচণ্ড একটা শক-এর কারণে চোখ ও মস্তিষ্কের মাঝের সেলগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যুবরাজ চোখে এ ধরনের কোন শক পেয়েছিলেন কি না?'

যুবরাজই দ্রুত বললেন, 'ডক্টর, চোখে কিসের শক, কি ধরনের শক?'

আমি বললাম, 'তীব্র আলোর শকেই এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে।'

'আলোর শক? এ ধরনের বড় কোন ঘটনা তো ঘটেনি। যুবরাজ দু'বছর রোমে ছিলেন। এ সময় কি এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটেছে যুবরাজ?' বললেন সম্রাট চতুর্থ অটো।

যুবরাজ বললেন, 'এমন কোন ঘটনার কথা তো মনে পড়ছে না।'

আমি বললাম, 'যুবরাজ আপনি কি বিদ্যুৎ চমকের দিকে কখনও পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন?'

'না ডক্টর, এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটেনি।'

'কখন থেকে আপনি চোখের অসুবিধা অনুভব করে আসছেন যুবরাজ?' বললাম আমি।

'গত বছরের নভেম্বরের দিক মানে প্রায় এক বছর আগে থেকে চোখের অসুবিধা অনুভব করছি ডক্টর।' বলল যুবরাজ।

‘গত বছরের নভেম্বর থেকে।’ কথা শুনেই আমার মনে পড়ে গেল অক্টোবর মাসের সূর্যগ্রহণের ঘটনার কথা। আমি দ্রুত কন্ঠে বললাম, ‘যুবরাজ, গত বছর অক্টোবর মাসে সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। আপনি কি ঐ সূর্যগ্রহণ দেখেছিলেন?’

আমার প্রশ্ন শুনেই যুবরাজ উঠে বসলেন। বললেন, ‘ঠিক ডক্টর, আমি সূর্যগ্রহণ দেখেছিলাম। তখন চোখে সামান্য অসুবিধা হয়েছিল। পরে তা ঠিক হয়ে যায়।’

‘কি ঘটেছিল?’ বললাম আমি।

‘একটা মাটির বড় প্লেটে পানি নিয়ে সবার মত আমিও সূর্যগ্রহণ দেখছিলাম। দেখার পর আমার চোখটা ঝাপসা হয়ে যায়। তবে সন্ধ্যার মধ্যেই আবার চোখ ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যায়।’ বললেন যুবরাজ।

‘ঠিক হয়ে যায়নি যুবরাজ। প্রাথমিক আঘাতের পর যে ঝাপসা ভাবটা ছিল, তা অল্প সময়ে কেটে যায়। কিন্তু আলোর যে প্রচণ্ড আঘাত চোখের উপর পড়েছিল, সেটাই ক্ষতি করেছে চোখের পেছনের সেলগুলোর। সেলগুলোকে আপাতত প্রাণহীন করে ফেলেছে।’ আমি বললাম।

‘ডক্টর, আপনি বললেন, চোখের সামনের সেল মোটামুটি ভালো আছে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে চোখের পেছনের সেলগুলো। প্রচণ্ড আলোর কারণে ক্ষতি হয়ে থাকলে চোখের সামনের সেল ক্ষতি হলো না, পেছনের সেল হলো কেন?’ সম্রাট চতুর্থ অটো বললেন।

আমি বললাম, ‘এক্সিলেন্সি, চোখ অনেক অনেক প্রশস্ত। কিন্তু তার পেছনে মস্তিষ্কের সাথে সংযোগকারী সেল-এর চ্যানেলটা অনেক ন্যারো। যে পরিমাণ আলো যে তীব্রতা নিয়ে চোখের উপর এসে পড়েছিল, সেই আলো সেই তীব্রতা নিয়ে যখন চোখের পেছনের সেল-এর ন্যারো চ্যানেলে প্রবেশ করে, তখন স্বল্প পরিসরের চাপে আলোর আঘাতের প্রচণ্ডতা বহুগুণ তীব্রতর হয়ে উঠে। সেই আঘাতে টিস্যুগুলো নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে।’

সম্রাট চতুর্থ অটো’র মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আমাকে লক্ষ্য করে বলল, ‘ডক্টর, আমি যেমনটা ভাবছিলাম তার চেয়ে আপনি অনেক বড় ডাক্তার। আপনি যে পরীক্ষা করলেন, সে ধরনের পরীক্ষার কথা অন্য কোন ডাক্তার বোধ হয় চিন্তাই

করতে পারেনি। আপনি রোগের যে কারণ ধরেছেন, সে কারণও কেউ ধরতে পারেনি। সত্যি আমি দারুণ বিস্মিত হয়েছি, আপনি এইমাত্র চোখের পেছনের সেল নিষ্ক্রিয় হওয়ার যে কারণ বললেন, তা শুধু বড় ডাক্তার হওয়া নয়, শারীরিকবিজ্ঞান সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক। ঈশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে আপনার দেখা এভাবে আমরা পেয়েছি। এখন বলুন ডক্টর, রোগের কারণ তো জেনেছেন, এখন চিকিৎসা সম্পর্কে বলুন। যে কোন কিছুর বিনিময়ে আমার একমাত্র ছেলে যুবরাজ তার চোখের আলো ফিরে পাক।'

সম্রাটের শেষের কথা ভারি হয়ে উঠেছিল।

'মানুষের কাজ মাত্র চেষ্টা করা ফল দেন স্রষ্টা। ডাক্তাররা সবসময় আশাবাদী হয়। আমিও আশাবাদী সম্রাট। আজ যুবরাজকে আমার দেখা হয়ে গেছে। কাল আমি চিকিৎসা শুরু করব।' আমি বললাম।

পরদিন চিকিৎসা আমি শুরু করলাম। রাতভর আমি ভেবেছি। চোখের পেছনের সেলগুলোকে যদি তাজা না করা যায়, তাহলে যুবরাজের চোখ ভালো হবে না। আর মনে মনে ভাবলাম মরে যাওয়া সেল ভালো করার ট্রেডিশনাল কোন ওষুধ বর্তমান ওষুধ বিজ্ঞানে নেই। ভরসা যে কিছু সেল এখনও জীবন্ত আছে। সেলগুলোতে চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী স্টিমুলেটিং কিছু ওষুধ প্রয়োগ করলে জীবন্ত সেল থেকে একটা চাঞ্চল্য মৃত টিস্যুগুলোর উপর ছড়িয়ে পড়তে পারে। তার সাথে সেলগুলোকে ভিজিয়ে রাখার ব্যবস্থা ভালো ফল দিতে পারে। এজন্যে যুবরাজের মাথায় সর্দি সৃষ্টি করতে হবে যাতে নাকের সাথে চোখ দিয়েও প্রচুর পানি গড়ায়। এই চিন্তা মাথায় আসায় আমি খুব খুশি হলাম। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম।

সকালেই আমি প্রথমেই সম্রাটের বাগান ঘুরে প্রয়োজনীয় ওষুধের গাছ ও সম্রাটের ভাণ্ডার থেকে কিছু অনুপান যোগাড় করলাম। দুই ধরনের ওষুধ তৈরি করলাম। এক, খাবার ওষুধ ও চোখে ফোঁটা আকারে প্রয়োগের জন্যে টিস্যুর উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী স্টিমুলেটিং ওষুধ এবং দুই, মাথায় সর্দি সৃষ্টির জন্যে কপালে লাগানোর জন্যে প্রলেপ। ক্যাথারিনার বাবা সব সময় আমার সাথে থেকে আমাকে সাহায্য করলেন। সেই সাথে সম্রাটের লোক ও চিকিৎসকরাও চাহিদা মোতাবেক সব কিছু সরবরাহ করলেন।

সেদিন বেলা দশটায় সম্রাটের উপস্থিতিতে যুবরাজের চিকিসা শুরু হলো। আল্লাহর কাছে যুবরাজের শেফা প্রার্থনা করে যুবরাজকে ওষুধ খাওয়ালাম এবং চোখেও কয়েক ফোঁটা ওষুধ ফেললাম। পরদিন দুপুরের পর ভাটি বেলা শুরু হলে যুবরাজের কপালে প্রলেপ লাগালাম। এর পরদিন দুপুর থেকেই যুবরাজের ভীষণ সর্দি এল। নাক ও চোখ দিয়ে প্রচুর পানি পড়তে লাগল। সেই সাথে শুরু হলো হাঁচি। ওষুধ খাইয়ে চললাম নিয়ম মত। সর্দিতে বাধা দিলাম না।

উত্তেজনার মধ্যে কাটল সাত দিন। আমি আল্লাহর উপর ভরসা হারাইনি। সাত দিন পর সর্দি কমতে শুরু করল। হাঁচি থাকল না। নাক ও চোখ দিয়ে পানি পড়া বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু অপার আনন্দের মধ্যে দেখলাম চোখ দু'টি আর আগের মত শুকনো নয়। চোখে সজীব-সজলতা ফিরে এসেছে। চোখের পেছনের সেই টিস্যুগুলো জীবন্ত হওয়ার লক্ষণ নিশ্চয় এটা। আমি সম্রাটকে বললাম, এক্সিলেন্সি, আগামী তিন দিন কালো কাপড় দিয়ে যুবরাজের চোখ ঢেকে রাখতে হবে এবং পরবর্তী সাত দিনে সরাসরি আলো প্রবেশ করে না এমন একটা আলো-আঁধারী ঘরে যুবরাজকে রাখতে হবে।

এই ব্যবস্থা করা হলো। দশ দিনের তিন দিন যাবার পর কালো কাপড় চোখ থেকে সরাবার সময় দেখা গেল আলো-আঁধারী ঘরের সব কিছু দেখতে পাচ্ছে, তবে ঝাপসা। সম্রাট আনন্দে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। বলল, 'তুমি অসম্ভব একটা বাঁধনে আমাকে বেঁধে ফেললে। তুমি...।'

আমি সম্রাটকে বাধা দিয়ে বললাম, 'এক্সিলেন্সি, যুবরাজের সামনে এসব কথা আর নয়। তাকে একেবারে শান্ত হতে হবে।' এরপর যুবরাজের কাছে গিয়ে বললাম, 'যুবরাজ আনন্দের কিংবা দু:খের কোন চিন্তাই মনে আনবেন না। মনকে আত্মস্থ করে শুধু ঈশ্বরের কথা ভাবুন।'

'স্যরি ডক্টর। আমি নিজেকে সামলাতে পারিনি। আপনি ঠিকই বলেছেন। যুবরাজের স্নায়ুতে কোন প্রকার প্রেসার আনা যাবে না। আমি এবং ওর মা-সহ আমরা বরং কেউ এখানে আর না আসি। মি. ফ্রেনজিস্ক ফ্রেডারিক কোন খবর আপনার তরফ থেকে থাকলে আমাদের জানাবেন।' বলল সম্রাট চতুর্থ অটো।

'হ্যাঁ, সেটাই ভালো সম্রাট। আমি ঠিক ১১তম দিনে যুবরাজকে আধো অন্ধকার ঘর থেকে বাইরে নিয়ে যাব। ঐ দিন আপনারা সকলে আসুন।' বললাম আমি।

এগারতম দিনে সম্রাট এলেন, সম্রাজ্ঞীও এলেন। রাজপরিবারের সবাই এলেন। আগে থেকেই আমি ও ক্যাথারিনার বাবা ছিলাম। আগের দিন আমরা যুবরাজকে ট্রায়াল দিয়েছিলাম তার চোখের ইনডিউর‍্যান্স লেভেল দেখার জন্যে। ঘরের সব জানালা-দরজা খুলে দেয়া হয়েছিল। আলোতে ঘর ভরে গিয়েছিল। যুবরাজের চোখ সবকিছুই ভালোভাবে দেখেছিল। চোখে তার অসুবিধা হয়নি। যুবরাজকে শোয়া থেকে বসাচ্ছিলাম, তখন সে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল। বলেছিল, 'স্যার, আমাকে এক্সিলেন্সি বলবেন না। আপনি আমার কাছে ঈশ্বরের মত। আমার নতুন জন্ম হয়েছে আপনার হাতে।'

আমি যুবরাজকে সান্ত্বনা দিয়ে তার কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, যুবরাজ, এসব কথা এখন নয়। আপনাকে আবেগ থেকে মুক্ত ও সম্পূর্ণ শান্ত থাকতে হবে। আমি সামান্য ডাক্তার মাত্র। আমি চেষ্টা করেছি, স্রষ্টা ফল দিয়েছেন, সব সময় তাঁর কথা স্মরণ করুন এবং তাকে ধন্যবাদ দিন।'

এগারতম দিন সকাল ১০টা। সম্রাট, সম্রাজ্ঞীসহ পরিবারের সকল সদস্য ঘরের বাইরে দাঁড়িয়েছিল উদগ্রীবভাবে।

আমি যুবরাজকে নিয়ে ঘর থেকে বেরুলাম। আমার পাশে ক্যাথারিনার বাবা ফ্রেনজিস্ক ফ্রেডারিক।

ঘর থেকে বেরিয়ে দরজায় আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম। ঘরের বাইরে বিশাল একটা লাউঞ্জ, কার্পেটে মোড়া, সোফায় সাজানো। সম্রাট-সম্রাজ্ঞীসহ সকলে লাউঞ্জের মাঝখানে ঘরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

আমরা দরজায় এসে যুবরাজকে বললাম, আপনি গিয়ে পিতা-মাতা ও সবার সাথে মিলুন। যুবরাজ ওদিকে ওগোলেন।

সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল। তারপর যুবরাজ একে-একে পরিবারের সবার সাথে মিশলেন।

এরপর সকলে মিলে হাঁটু গেড়ে বসে হাত উপরে তুলে প্রার্থনা করতে লাগল। আনন্দে স্রষ্টার অসীম শ্রদ্ধায় সবাই শিশুর মত কাঁদল।

প্রার্থনা শেষে সম্রাট আমাদের ডাকলেন। আমি ও ক্যাথারিনার বাবা সেখানে গেলাম। সম্রাট আমাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং আবেগে কেঁদে ফেলে বললেন, 'ঈশ্বর আপনাকে পাঠিয়েছেন আমার এ সন্তানের জন্যেই। তা না হলে আমাদের স্বপ্নের দেশ কর্ডোভার ডাক্তার আমাদের ঘরে আসবেন কি করে! ডক্টর আপনাকে ধন্যবাদ দেবার কোন ভাষা আমার জানা নেই। বিস্ময়কর আপনার রোগের কারণ অনুসন্ধান, আরও বিস্ময়কর আপনার চিকিৎসা!' বলে সম্রাট আমাকে ছেড়ে দিয়ে হাততালি দিলেন।

সুশোভিত এক বড় ট্রে নিয়ে প্রবেশ করল একজন খাস পরিচারিকা এসে বাউ করে সম্রাটের পেছনে দাঁড়াল। সম্রাটের পিএস এসে ট্রের উপরের কাপড় তুলে নিল। ট্রে'তে সোনার উপর হীরকখচিত একটা মুকুট। তার পাশে সম্রাটের ফরমান দণ্ডে লাল কাপড়ে জড়ানো কিছু।

সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রেখে আমরা গিয়ে সম্রাটের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম।

সম্রাট ট্রে থেকে প্রথমে ফরমান আকারের বান্ডেলটা খুললেন। তারপর সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যে ঘোষণা দিচ্ছি এখানে, তা আমি দরবারেও দিতে পারতাম। কিন্তু বিষয়টা আমার পারিবারিক। তাই পারিবারিকভাবেই ঘোষণা দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

একটু থামলেন সম্রাট। তারপর আবার শুরু করলেন, 'ঈশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে তিনি দয়া করে আমার যুবরাজকে নতুন চক্ষু দান করেছেন। আমি ঈশ্বরকে আরও ধন্যবাদ দিচ্ছি এই কারণে যে, যার উপলক্ষে আমি আমার সন্তানের চোখ ফিরে পেলাম, সেই মহান ডক্টর কর্ডোভার মানুষ। কর্ডোভার সুলতানরা ছিলেন আমাদের স্যাক্সন রাজবংশের ঐতিহাসিক মিত্র, যদিও সে সময়ের অবস্থা ও ষড়যন্ত্রের কারণে আমরা দুই মিত্র মিলে বড় কিছু করতে পারিনি। কর্ডোভার এই মহান ডাক্তার যে ঋণে আমাকে এবং স্যাক্সন রাজবংশকে

আবদ্ধ করেছেন তা শোধ করার সাধ্য আমার নেই। তবে তাঁর এই অবদানকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে কিছু একটা করার সিদ্ধান্ত আমি নিয়েছি।'

বলে তিনি হাতের ফরমান মোড়কটা খুললেন। পড়লেন ফরমানটা। সম্রাটের সে ফরমানের সারাংশ হলো, 'সালজওয়াডেল অঞ্চলে আমার বিশেষ অমাত্য ফ্রেনজিস্ক ফ্রেডারিকের জমিদারির পাশে ৪১ মৌজার মনোরম ভূখণ্ডটি আমি ডাক্তারকে লাখেরাজ হিসেবে দান করলাম। বংশ পরম্পরায় তিনি স্থায়ীভাবে তা ভোগ-দখল করবেন। দু'একদিনের মধ্যে আমি সেখানে নিজে গিয়ে তাকে দখল বুঝিয়ে দেব।'

বলে তিনি এগিয়ে এসে আমার হাতে ফরমানটি গুঁজে দিয়ে বললেন, 'প্লিজ ডক্টর গ্রহণ করুন। আমি ও আমার পরিবার খুশি হবো।'

এরপর সম্রাট ট্রে থেকে মুকুটটি তুলে নিলেন। তিনি সবার উদ্দেশ্যে বললেন, আমি মুকুটটি তৈরি করেছিলাম যুবরাজের জন্যে। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা অনেক মাপজোখ করে তৈরি করা সত্ত্বেও মুকুটটি বড় হয়েছে যুবরাজের মাথায়। হয়তো ঈশ্বর সম্মানিত ডক্টরের মাথার জন্যেই এটা তৈরি করিয়েছিলেন। আমি যুবরাজের রোগমুক্তির মহাস্মৃতি হিসেবে মুকটটি ডাক্তারের মাথায় পরিয়ে দিতে চাই।'

সম্রাট এটা বলে-আমি সব কিছু বুঝে ওঠার আগেই মুকুটটি আমার মাথায় পরিয়ে দিয়ে আমার দু'টি হাত ধরে বললেন, 'ডক্টর আপনাকে সম্মানিত করার জন্যে এ মুকুট নয়, আমরা সম্মানিত বোধ করব যদি দয়া করে এটা নেন। এ মুকুট যতদিন থাকবে, ততদিন মানুষের ভয়াবহ এক অন্ধত্ব ও বিস্ময়কর এক নিরাময়ের কথা মানুষ স্মরণ করবে। কর্ডোভার মহান জাতি এবং জার্মানীর স্যাক্সনদের সম্পর্কেরও ঐতিহ্যবাহী এক স্মারক হবে এটা।'

এভাবেই আমি একটা জমিদারি ও স্যাক্সন সম্রাটের অকল্পনীয় মূল্যের একটা মুকুটের মালিক হয়ে গেলাম।

যুবরাজের জন্যে সাত দিনের ওষুধের ব্যবস্থা করে সাত দিন পর আবার আসব বলে আমি ক্যাথারিনার বাবার সাথে সালজওয়াডেলে চলে এলাম সম্রাটের দেয়া ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে।

আমি ও ক্যাথারিনার বাবা পাশাপাশি বসেছিলাম। বিভিন্ন কথার ফাঁকে এক সময় বললেন, 'তোমার অনুমতি ছাড়াই একটা আয়োজন করে ফেলেছি। তুমি কিছু মনে করবে না তো?'

'কি আয়োজন জনাব?' আমি বললাম।

'সেদিন বিয়ের কথা হয়েছিল। আগামী কাল তারই আয়োজন করা হয়েছে। তুমি চিকিৎসার চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত ছিলে তাই তোমাকে কিছু বলিনি।'

বিয়ে হবে এবং খুব শীঘ্রই হবে, সেটা সেদিনের আলোচনায় আমি বুঝেছিলাম। সুতরাং বিষয়টা আমার কাছে বিস্ময়ের ছিল না। তবু আমি বললাম, 'ক্যাথারিনার সুস্পষ্ট মত নেয়া দরকার ছিল, সেটা হয়েছে কি না?'

'আমি ক্যাথারিনাকে জানি বেটা। আমার শ্যালক অসওয়ার্ল্ড তার ভাগ্নিকে না জানিয়ে এ প্রস্তাব পেশ করেনি। তুমি ভেবো না। ক্যাথারিনার মা তার সাথে আলোচনা করেই দিন ঠিক করেছে।'

আমি আর কোন কথা বললাম না। একটা অস্বস্তির ভাব আমার মনকে আচ্ছন্ন করে তুলল। প্রেমময়ী স্ত্রীর স্মৃতি ডিঙিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করার জন্যেই কি এই অস্বস্তি? না, মন তা বলছে না। নতুন স্ত্রী যে নেই তার স্মৃতির প্রতিদ্বন্ধী হতে পারে না।

আমার চিন্তায় ছেদ টেনে ক্যাথারিনার বাবা বলে উঠলেন, 'একটা সমস্যা হয়েছে আলগার। ক্যাথারিনা বলেছে, 'বিয়ে ইসলাম ধর্মের বিধান মতে হবে। কিন্তু...।'

তাঁর কথার মাঝখানেই আমি বলে উঠলাম, ক্যাথারিনা বলেছেন একথা?'

'হ্যাঁ আলগার, তার মায়ের কাছে শুনেছি সে ইসলাম ধর্ম মোতাবেক চলার চেষ্টা করছে।' বললেন ক্যাথারিনার বাবা।

বিস্ময়ের ব্যাপার এই কথা শোনার সাথে সাথেই আমার মনের অস্বস্তি কোথায় যেন চলে গেল। মনটা আমার স্বচ্ছ হাসিতে হেসে উঠল।

ক্যাথারিনার বাবা একটু থেমেই আবার বলে উঠল, 'কিন্তু সমস্যা হয়েছে বিয়ের ব্যাপারে ইসলাম ধর্মের বিধান তো আমরা কেউ জানি না। শেষে এটাই

আলোচনা হয়েছে। তুমি যেভাবে বলবে সেভাবেই বিয়ে হবে। আচ্ছা বলত, ইসলাম ধর্মের বিয়েতে আনুষ্ঠানিক জটিলতা কিছু আছে?

'জটিলতার কিছু নেই। তবে বর ও কনেকে তাদের স্বীকৃতি জিজ্ঞাসা করার জন্যে বিয়ের পরিচালক একজন লোকের দরকার হয়। বর-কনের স্বীকৃতি জানার জন্যে উভয় পক্ষের তিনজন করে মোট ছয়জন সাক্ষী উপস্থিত থাকতে হয়। প্রথমে কনের স্বীকৃতি আসার পর তা সবার সামনে ঘোষণা করে তারপরে সবার সামনে বরের স্বীকৃতি নেয় হয়। এরপর বিয়ের পরিচালক ব্যক্তি বর-কনের শুভ কামনা করে সবাইকে নিয়ে দোয়া করেন। বিয়ের মূল অনুষ্ঠান এতটুকুই।' আমি বললাম।

'দুই পক্ষের সাক্ষীর তো অভাব হবে না, কিন্তু পরিচালক ব্যক্তিটি কে হবেন, কে স্বীকৃতি নেবেন, কে দোয়া করবেন। এটা সমস্যা হবে না?' বললেন ক্যাথারিনার বাবা।

'এ সমস্যাগুলো মৌলিক নয়। বর-কনের স্বীকৃতি নেয়ার কাজ আপনিও করতে পারবেন। স্বীকৃতি নেয়ার কথাগুলোও খুব সাধারণ। আমি বলে দেব। দোয়া নিজেরা করলেও চলে, আর সকলের শুভেচ্ছা কামনাটাই তো দোয়া।' আমি বললাম।

'তাহলে আর কোন সমস্যা নেই। ধন্যবাদ আলগার। আমি চিন্তায় পড়েছিলাম এসব নিয়ে।'

আমরা বাড়ি পৌঁছে গেলাম। পরদিন বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের দিন সকালে ক্যাথারিনা আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। অজু করার নিয়ম শিখিয়ে দিয়েছিলাম আমি আগেই। মাথায় রুমাল বেঁধে ও হাতাওয়ালা পবিত্র পোশাক পরে পরিবারের সবার উপস্থিতিতে ঘোষণা দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল ক্যাথারিনা। হঠাৎ কি হয়ে গেল। পরিবারের কর্তা ক্যাথারিনার বাবা ফ্রেনজিস্ক ফ্রেডারিক ঘোষণা দিলেন তিনিও ইসলাম গ্রহণ করবেন। তারপর পরিবারের সবাই ঘোষণা দিল তারাও সবাই ইসলাম গ্রহণ করবে। আমার সামনে ঘোষণা দিয়ে সবাই ইসলাম গ্রহণ করল ক্যাথারিনার মতই। সবাই ইসলাম গ্রহণ করার পর আমি সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললাম, 'ইহুদি, খৃস্টানসহ অতীতের সব

একত্ববাদী ধর্মকে ইসলাম স্বীকার করে, অতীতের সব নবী-রাসূলকে ইসলাম সম্মান করে। অতীতের এই ধর্মগুলোকে যারা পালন করে চলতে চায়, তাদের সাথে ইসলামের কোন বিরোধ নেই। তবে ইসলাম নীতিগত ও স্বাভাবিক কারণেই মনে করে, অতীতের ধর্মগুলোর কার্যকারিতা শেষ হয়ে গেছে। সর্বকনিষ্ঠ ও সামনের সর্বযুগের জন্যে পরিকল্পিত ধর্ম হিসেবে ইসলাম মানুষের আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক দুই জীবনের জন্যেই অপরিহার্য একটা ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা ইসলাম আল্লাহর কোন কল্যাণ করে না, এই ব্যবস্থা ইসলাম গ্রহণকারী ও সব মানুষের কল্যাণের জন্যেই। এই কল্যাণ মানুষের ইহকাল ও পরকাল দুই কালের জন্যেই। এই মূল বিষয়টা বুঝে নিলে ইসলাম ও মানুষ, ইহজীবন ও পরজীবন সবকিছুকেই ভালোবাসা যাবে, জীবন সুন্দর হবে, সহজ হবে।'

আমার কথা শেষ হলে ক্যাথারিনার বাবা সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'নানা কারণে আমাদের ইসলাম গ্রহণের এই কথা এখন গোপন রাখতে হবে। সবাই যেন আমরা এ ব্যাপারে সতর্ক থাকি।'

বিয়ের পর যখন আমার ঘরে এসে বসলাম, তখন মাথাটা নুয়ে এল আল্লাহর প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতায়। স্বাধীন মানুষ ছিলাম, খ্যাতিমান ডাক্তার ছিলাম। সেখান থেকে পেশা, পরিবার, দেশ সব হারিয়ে হলাম ক্রীতদাস। আবার ক্রীতদাস থেকে হলাম এক জমিদার এবং একজন জমিদার কন্যার স্বামী। মহান আল্লাহর বাণী, 'ফাইন্নামা'আল উসরে ইউসরা, ইন্নামা'আল উসরে ইউসরা' অর্থাৎ 'দু:খের পর সুখ আসে'।

বিয়ের পর স্ত্রী ক্যাথারিনার সাথে প্রথম সাক্ষাতের সময় নানা কথার ফাঁকে তাকে বললাম, 'ক্রীতদাসের সাথে বিয়ের পর মালিক-কন্যার প্রতিক্রিয়া কি?'

ক্যাথারিনা বলল, 'যে ক্রীতদাস তার মালিকদের দাস বানিয়ে ফেলেছে, তার সাথে বিয়ে তো সৌভাগ্যের ব্যাপার।'

'মালিকদের কিভাবে সে দাস বানাল?' আমি বললাম।

‘আল্লাহ বলেছেন, যে মুমিন হয়, আল্লাহ তার জান, মাল সব কিনে নেন। আপনি সবাইকে মুমিন বানিয়ে তাদেরকে আল্লাহর ক্রীতদাস করে ফেলেছেন।’ বলল ক্যাথারিনা।

আমি হাসলাম। বললাম, ‘আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কথার অর্থ ঠিক এতটুকু নয়। যাক তুমি ভালো বলেছ।’

ক্যাথারিনা বলল, ‘আমার কথা শেষ নয়। আমার উত্তরের মাত্র একাংশ বলেছি।’

‘আচ্ছা। বল বাকি অংশ কি?’ জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

‘ক্রীতদাসকে আমি বিয়ে করিনি। ক্রীতদাসের সাথে আমার বিয়ে হয়নি। একজন স্বাধীন মানুষ এবং একজন জমিদারের সাথে আমার বিয়ে হয়েছে।’ বলল ক্যাথারিনা।

সেদিন আমার স্ত্রী ক্যাথারিনার কাছ থেকে শোনা কথা দিয়েই আমার এই ছোট্ট আত্মকথা শেষ করব। আমি দাস হিসেবে বিয়ে করিনি, দাস হিসেবে আমার পরিবার-জীবনের যাত্রা শুরু হয়নি, হয়েছে স্বাধীন মানুষের স্বাধীন পরিবার হিসেবে। এই কথাগুলো এভাবে বলার প্রয়োজন ছিল না। বলতে হলো এই কারণে যে, অন্ধকার ইউরোপের অন্ধ-কূপমণ্ডুকতা কাটতে আরও অনেক শতাব্দীর প্রয়োজন হবে। সেই  অন্ধকারে আমার পরিবারও নিজেদের হারিয়ে ফেলতে পারে। তারাও কূপমণ্ডুকতার শিকার হয়ে হীনমন্যতায় ভুগতে পারে। এমন সব দিনের কথা ভেবেই আমি আমার জীবনের কথা লিখে গেলাম যাতে তাদের আবার আলোকিত হয়ে ওঠার পথ তৈরি হয়, নিজের পরিচয় নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবার তারা সুযোগ পায়।’

পড়া শেষ করলো আহমদ মুসা।

খাতার উপর থেকে মুখ তুলল সে। তাকাল চারদিকে। দেখল, সবার মুখ নিচু। চোখ বন্ধ আদালার বাবা জোসেফ জ্যাকব আলগারের। সবাই আত্মস্থ।

ধীরে ধীরে চোখ খুলে গেল আদালার বাবা আলগারের। সে সোজা হয়ে বসল। বলল, ‘আমি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি এই মুহূর্তে ঘোষণা দিতে চাই-।’

উপস্থিত সবাই তাকাল আদালার বাবার দিকে। তাদের চোখে-মুখে ঔৎসুক্য।

আদালার বাবা বললেন, 'ঈশ্বরের অসীম দয়া যে, আমরা আমাদের রুটের সন্ধান পেলাম, পূর্বপুরুষকে জানলাম। আমরা জানলাম আমরা দাসবংশের লোক নই। হলেও ক্ষতি ছিল না। সোনালি সভ্যতার স্বর্ণযুগের মানুষ, সেরা ডাক্তার ইউসুফ ইয়াকুব আল মানসুরের বংশধর হয়ে দাসবংশ নাম নিতেও আমার আপত্তি নেই। সবাইকে আমি জানাচ্ছি, আমার মহান পূর্বপুরুষ যে আলোকিত পথের দিকে তাঁর পথহারা বংশধরদের আহবান জানিয়ে তার কাহিনী শেষ করেছেন, তাঁর সে আহবানে সাড়া দিয়ে আমি ঘোষণা করছি, আমি আমার পূর্বপুরুষের ধর্মে এই মুহূর্তে ফিরে যেতে চাই এবং ঘোষণা দিচ্ছি আজ থেকে আমার নাম জোসেফ জ্যাকব আলগার নয়, আমার নাম ইউসুফ ইয়াকুব আল মানসুর।'

বলে আদালার বাবা ইউসুফ ইয়াকুব আল মানসুর আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'প্লিজ আহমদ মুসা আমাকে আপনি ইসলাম ধর্মের দীক্ষা দিন। কোন ফর্মালিটি থাকলে প্লিজ আমাকে বলুন। আমি তা করছি।'

'ইসলাম গ্রহণে তেমন কোন ফর্মালিটি নেই। বিষয়টা একটা বিশ্বাস ও স্বীকৃতির ঘোষণা। শুধু বিশ্বাসের সাথে এই ঘোষণা দিলেই হলো।'

'ঘোষণাটা কি?' বলল আদালার বাবা ইউসুফ ইয়াকুব আল মানসুর।

'বিশ্বাসের সাথে এই ঘোষণা দেয়া যে, 'আল্লাহ ছাড়া উপাস্য কেউ নেই, মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর বার্তাবাহক।' এই ঘোষণা এভাবেও দেয়া যায়, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া উপাস্য কেউ নেই, আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর প্রেরিত বার্তাবাহক (রাসূল) ।'

আদালার বাবা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই আদালা বলে উঠল, 'বাবা শুধু আপনার কথা বললেন কেন? আমাদেরও সাথে রাখুন। আমাদের মহান পূর্বপুরুষের ডাক আমাদের কাছেও পৌঁছেছে। আমরাও সেই আলোকিত মানুষ হতে চাই।'

'ঠিক বলেছ আদালা। রক্তের সম্পর্কে আমার পূর্বপুরুষ তারা নন বটে, কিন্তু আমার স্বামী ও সন্তানের তারা পূর্বপুরুষ। তাই তাঁরাও আমার পূর্বপুরুষ। যেভাবে ক্যাথারিনার বাবা, ক্যাথারিনারা আমাদের ডক্টর পূর্বপুরুষের ধর্মকে ভালোবেসে ফেলেছিল, সেভাবে আমিও ভালোবেসে ফেলেছি। বিশ্বাসের ঘোষণা দিতে আমি প্রস্তুত।

আদালা, আদালার বাবা এবং আদালার মা একসংগেই বিশ্বাসের ঘোষণা দিয়ে নিজেদের ধর্মে ফিরে এল।

ব্রুনা ও তার বাবা আলদুনি সেনফ্রিডের চোখে-মুখে বিমুগ্ধ ভাব। বলল আলদুনি সেনফ্রিড, আদালার পূর্বপুরুষের যে কাহিনী শুনলাম তা রূপকথার মত সুন্দর, কিন্তু ইতিহাসের মত বাস্তব। আহমদ মুসাকে দেখার পর ডক্টর ইউসুফ ইয়াকুব আল মানসুরকে বিস্ময়কর মনে হয়নি, কিন্তু তার কাহিনী ইসলাম সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে আরও পূর্ণ ও মজবুত করেছে। ধন্যবাদ আপনাদের, যারা বিশ্বাসের ঘোষণা দিলেন।'

'আমিও ধন্যবাদ দিচ্ছি আপনাদের। আমরা আপনাদের সাথে শামিল আছি। আমরা একটা সংকটে রয়েছি। আমাদের পরিবারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব মহাবিপদে আছেন। তার সাথে আমাদের পরিবারের গোটা অস্তিত্ব ধ্বংসের মুখে পড়েছে। আজ আপনাদের পরিবারে মিলনমেলার মত আনন্দের দিন, আমরাও তেমন দিনের অপেক্ষা করছি। সেদিন আমরা সকলে মিলে এই ঘোষণা দেব ইনশাআল্লাহ। মহাআনন্দের বিষয় হলো, আহমদ মুসা আজ আপনাদের জন্যে আনন্দের দুয়ার উন্মুক্ত করলেন। আমাদের আশা তিনি আমাদের জন্যেও এমন সুদিন ডেকে আনবেন।' বলল ব্রুনা।

'মাফ করবেন, আপনারা আমাদের অসীম উপকার করেছেন। প্লিজ আমরা কি জানতে পারি, এতবড় বিপদের ঘটনাটা কি?' বলল আদালার বাবা ইউসুফ ইয়াকুব আল মানসুর।

আলদুনি সেনফ্রিড তাকালো আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা বুঝল এখন করনীয় কি, কি বলা যায় এটাই জানতে চাচ্ছে ব্রুনার বাবা আলদুনি সেনফ্রিড।

দায়িত্বটা আহমদ মুসাই গ্রহণ করল। বলল, ‘অনেক বড়, অনেক জটিল ঘটনা মি. আল মানসুর।’

বলে আহমদ মুসা সংক্ষেপে ঘটনা তাদেরকে জানাল। এ কথাও বলল যে, তারা ব্রুনার মা কারিনা কারলিনের সন্ধানে ব্ল্যাক লাইট , ব্ল্যাক বার্ডের আস্তানার খোঁজেই অ্যারেন্ডসীতে যাচ্ছে। কাহিনী শুনে আদালা, আদালার মা ও আদালার বাবা সবার চোখে-মুখে মুষড়ে পড়া ও বিব্রত ভাব ফুটে উঠল। আদালার মা বলল, ‘এতবড় সংকট মাথায় নিয়ে আপনারা এতটা শান্তভাবে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। আল্লাহ এর উত্তম বিনিময় দিন।’

আদালার বাবা আল মানসুরের চোখে-মুখে অস্থির একটা ভাবনা। কিছু যেন খুঁজছে সে। হঠাৎ কিছু খুঁজে পাওয়ার মত চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার।

‘কি বললেন, ব্ল্যাক লাইট?’ বলল আদালার বাবা আল মানসুর।

‘হ্যাঁ, ব্ল্যাক লাইট, আর দলের নেতা ‘ব্ল্যাক বার্ড।’ এমন নাম কি কোথাও শুনেছেন?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘হ্যাঁ, মি. আহমদ মুসা আমার মনে পড়ে গেছে। বেশ অনেক দিনই মানে এক বছর আগে বড়দিনের ছুটির পরদিনই নিওর্যালজিক পেইন নিয়ে হামবুর্গ হাসপাতালে নিওর্যালজিক বিভাগে ভর্তি হয়েছিলাম। আমার কেবিনের পাশের কেবিনে আরেকজন মহিলা ভর্তি ছিলেন। আমার কেবিনটা সারির একদম দক্ষিণ মাথায় ছিল। সারির পুব পাশ বরাবর দীর্ঘ করিডোর। করিডোরটা ঘুরে এসে আমার কেবিনের দক্ষিণ পাশে একটা বারান্দার সৃষ্টি করেছিল। কেবিনের একটা জানালাও দক্ষিণ দিকে ছিল। এয়ারকন্ডিশনের কারণে জানালা বন্ধই থাকে। কিন্তু দিনের বেলা আমি মাঝে মাঝে জানালা খুলে দিতাম ফ্রেশ বাতাসের জন্যে। এতে আমার খুব ভালো লাগত। মহিলাটির কেবিন আমার পরেই, মানে দক্ষিণ দিক থেকে দ্বিতীয়। মহিলাটির কেবিনের অ্যাটেনড্যান্ট কিংবা যারা ভিজিটর আসত, তারা প্রায়ই দক্ষিণের উন্মুক্ত বারান্দাটায় আসত। তাদের কারো কথোপকথনের মধ্যে ‘ব্ল্যাক লা্ইট’ শব্দটা আমার কানে গিয়েছিল।’ বলল আদালার বাবা ইউসুফ আল মানসুর।

‘ধন্যবাদ স্যার। কথোপকথনগুলোর কিছু কি আপনার মনে আছে?’ জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

‘মনে আছে মি. আহমদ মুসা। রোগশয্যায় শুয়েছিলাম। মাথার কোন কাজ ছিল না। আর জানালার ওপাশেই কথা হচ্ছিল, যদিও নিচু স্বরে কথা বলছিল তারা। কিন্তু নীরব পরিবেশে কথা শুনতে আমার কোন অসুবিধা হয়নি।’ বলল আদালার বাবা।

‘কি কথা বলছিল তারা?’ বলল আহমদ মুসা।

‘আমি যখন কথাগুলোর দিকে মনোযোগ দিয়েছিলাম, তখন একজন বলছিল, ‘...ব্যাপারটা খুব ঝুঁকিপূর্ণ। নকল একজনকে এনে রাখতে হবে, আসলকে সরিয়ে ফেলতে হবে। আসলের আত্নীয়-স্বজনের কাছে ধরা পড়ে যাবার আশংকাই বেশি। চেহারা এক রকমের হলেই হবে না, স্বামী-ছেলে-সন্তানরা কথা বললে, গায়ে হাত দিলেই বুঝতে পারবে আসল-নকল। ম্যাডাম কারলিন বনেদী জমিদার ঘরের একজন। ধরা পড়লে আস্ত থাকবে না।’ এ কথা শোনার পর আরেকটা কন্ঠ সংগে সংগে বলে উঠল, ‘ব্ল্যাক লাইটকে আপনি চেনেন না। তাদের কাজে কোন খুঁত থাকে না। যাকে নকল বলছেন, সে আসলের চেয়েও আসল। তাকে পঁচিশ বছর ধরে তৈরি করা হয়েছে।’ দ্বিতীয় ব্যক্তি কথ শেষ করলে প্রথম ব্যক্তি আবার বলল, ‘যাই বলুন, কাজটা ঝুঁকিপূর্ণ। আমি মনে করেছিলাম বিষয়টা একজনকে কিডন্যাপের। এটা কঠিন নয়। একজনকে কিডন্যাপ করে তার জায়গায় আরেকজনকে বসানো খুব কঠিন, খুব ঝুঁকিপূর্ণ। বিষয়টা পুরোপুরি আমাকে আপনারা জানাননি।’ প্রথম জনের এই কথার উত্তরে দ্বিতীয়জন বলল, ‘দেখুন ব্ল্যাক লাইট কাউকে অনুরোধ করে না, নির্দেশ দেয়। আমি যা করতে চাই তা করব। আপনাকে যা করতে বলা হয়েছে আপনি তা করবেন। সামান্য অসহযোগিতা যদি করেন তাহলে আপনিসহ আপনার গোটা গোষ্ঠীকে আমরা শেষ করে দেব। মনে আছে তো কি করতে হবে। আবার শুনুন, রুমের সিসিটিভি ক্যামেরা বিকল করতে হবে, নার্স আসলকে প্রেসক্রাইবড ইনজেকশন দেয়ার নামে বেহুসের ইনজেকশন দেবে। এরপর আপনি আসলকে কাপড়ে মুড়ে রুম ড্রেসিং-এর ট্রলি গাড়িতে তুলে স্টোরে নিয়ে রাখবেন। সেখান থেকে লন্ড্রিখানার

গাড়িতে করে আসলকে আপনি হাসপাতালের পেছনে এক তলায় নিয়ে যাবেন। সেখান থেকে তাকে গার্বেজের গাড়িতে তুলে হাসপাতালের বাইরে নেবেন। তার পরের দায়িত্ব ব্ল্যাক লাইটের।' দ্বিতীয় জন থামলেও প্রথম জনের কন্ঠ শোনা গেল না। মনে হয় সে ভয়ে তার কথায় রাজি হয়ে গেছে।' থামল আদালার বাবা।

'এসব কথা কার ব্যাপারে বা কোন কক্ষের রোগীর ব্যাপারে তা কি আপনি বুঝতে পেরেছিলেন?' জিজ্ঞাসা আলদুনি সেনফ্রিডের। তার চোখে-মুখে বিস্ময় উত্তেজনা।

'তা আমি নিশ্চিত বুঝতে পারিনি। প্রথমে আমার পাশের কক্ষের রোগীর সাথে তাদের কথার সম্পর্ক আছে ভেবেছিলাম। কিন্তু তা অন্য কক্ষের রোগীর ব্যাপারেও হতে পারে।' বলল আদালার বাবা আল মানসুর।

'হামবুর্গের হাসপাতাল বিরাট। কয়েকটা 'রো' রয়েছে সেখানে। আপনি কত নাম্বার কক্ষে ছিলেন?' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

'আমার রুম নাম্বার ছিল চারশ' এক। 'বলল আদালার বাবা আল মানসুর।

'আর ঐ সময় আমার ওয়াইফ ব্রুনার মা ভর্তি ছিলেন ৪০২ নাম্বারে। তার মানে এই ষড়যন্ত্রটা আমার ওয়াইফ কারিনা কারলিনাকে নিয়ে। তাহলে...।'

কথা শেষ করতে পারল না আলদুনি সেনফ্রিড। তার কন্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল আবেগ জড়িত এক বেদনার উচ্ছ্বাসে।

'হ্যাঁ, মি. সেনফ্রিড, এতে এখন আর কোন সন্দেহ নেই ষড়যন্ত্রটা ব্রুনার মাকে নিয়েই হয়েছে। একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেল মি. সেনফ্রিড যে, ব্রুনার মাকে সরিয়ে সেখানে নকল একজন ব্রুনার মায়ের ছদ্মবেশে সেট করা হয়েছিল। আর নকল একজনকে ২৫ বছর ধরে তৈরি করা হচ্ছিল এই কাজের জন্যে। আর ২৫ বছরের কথায় এটাও এখন পরিষ্কার যে, ব্রুনার মায়ের জায়গায় বসানো নকল মহিলাটিকে ক্লোন করে তৈরি করা হয়। ক্লোন করে তৈরি করা বলেই তার ক্লোন চিকিৎসার প্রয়োজন হয়েছে।' বলল আহমদ মুসা।

'পঁচিশ বছর আগে কার ক্লোন করে তাকে তৈরি করা হয়? ব্রুনার মায়ের?' জিজ্ঞাসা আলদুনি সেনফ্রিডের। বিস্ময়ে তার চোখ যেন কপালে উঠেছে।

'ব্রুনার মায়ের ক্লোন না হলে সে হুবহু ব্রুনার মায়ের মত হতো না, এটা তো সত্য।' আহমদ মুসা বলল।

'কিন্তু কিভাবে? এটা অসম্ভব একটা ব্যাপার!' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

'হতে পারে সেটা আরেক ষড়যন্ত্র।' আহমদ মুসা বলল।

'ষড়যন্ত্রটা ব্রুনার মাকে নিয়ে হলো কেন?' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

'কারণ, ব্রুনার মা জার্মানীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটা এস্টেট-এর মালিক।' আহমদ মুসা বলল।

'হ্যাঁ, সেটা তো ওরা দখল করেছে মি. আহমদ মুসা।' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

বলেই সে আবার প্রশ্ন করল, 'কিন্তু ক্লোন কিভাবে করেছে?

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে একটু চুপ করে থেকে আহমদ মুসা বলল, 'মি. সেনফিড, আপনি কিংবা ব্রুনা বলেছিলেন অনেক বছর আগে ব্রুনার মা আরও একবার ঐ হামবুর্গ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। তখন তিনি বন বিশ্ববিদ্যালয়ে সবে প্রবেশ করেছেন। বয়স আঠার উনিশ ছিল।' আহমদ মুসা বলল।

সংগে সংগেই ব্রুনা বলে উঠল, 'আমিই আপনাকে বলেছিলাম ভাইয়া। কথাটা মা আমাকে নিজে বলেছিলেন।'

'ধন্যবাদ ব্রুনা। এখন ওদের ২৫ বছরকে যদি তোমার মায়ের সেই ১৮ বছরের সাথে যোগ দেয়া হয়, তাহলে যোগফল পাওয়া যাচ্ছে ৪৩ বছর, সেটাই তোমার মায়ের আসল বয়স কি না?' বলল আহমদ মুসা।

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।' ব্রুনা ও তার বাবা একসংগে বলে উঠল।

'তাহলে আমি নিশ্চিত, ব্রুনার মা আঠার-উনিশ বছর বয়সে যখন হামবুর্গ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল, তখনই কিছু ঘটেছিল।' আহমদ মুসা বলল।

'কি ঘটেছিল মি. আহমদ মুসা?' বলল ব্রুনার বাবা আলদুনি সেনফ্রিড।

'আমার মনে হয়, ক্লোন করার ঘটনাটা তখনই ঘটানো হয়।' আহমদ মুসা বলল।

'আবারও সেই প্রশ্ন করছি মি. আহমদ মুসা। চিকিৎসার জন্য ভর্তি হওয়া একটা মেয়ের ক্লোন করা কিভাবে সম্ভব?' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

‘কিভাবে করেছে, সেটা আমি জানি না। কিন্তু এটুকু বলতে পারি, একটা মেয়ের ডিম্বাণু, এমনি তার বিশেষ টিস্যু যদি কোনভাবে সংগ্রহ করা যায়, তাহলে বিশেষ প্রসেসের মাধ্যমে অন্য কোন গর্ভাশয়ে ফেলে ক্লোন তৈরি করা সম্ভব। গোপনে হয়তো বিজ্ঞান আরও এগিয়ে থাকতে পারে।’ আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসা থামলেও কথা বলল না ব্রুনা, কিংবা ব্রুনার বাবা। বিস্ময়ে বিমূঢ় তাদের চোখ-মুখ।

আহমদ মুসাই আবার কথা বলল, ‘হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কেউ অথবা ডাক্তার বা সংশ্লিষ্ট কেউ ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকলে সহজেই ডিম্বাণু ও টিস্যু সংগ্রহের কাজটা করা যায়। আমার মনে হয় সেটাই ঘটেছে।’

‘টিস্যু সংগ্রহ সহজ, ডিম্বাণু সংগ্রহ তো সহজ নয়।’ আলোচনায় যোগ দিয়ে বলল আদালার বাবা আল মানসুর।

‘অজ্ঞান বা আধা অজ্ঞান করে, বা কোন মাদক খাইয়ে চেতনা ও বুদ্ধি একদম ভোঁতা করে দিয়ে, অথবা কোন ওষুধ খাইয়ে চেতনা ও বুদ্ধিকে বিকৃত বা অস্বাভাবিক করে দিয়ে ডিম্বাণু সংগ্রহ করা সম্ভব। আমরা জানি না, চিকিৎসাবিজ্ঞানের হয়তো আরো কৌশল আছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ঠিক বলেছেন মি. আহমদ মুসা। এ রকমটা হতে পারে। থাক এ প্রসংগ, এখন আমাদের করনীয় কি দাঁড়াচ্ছে?’ বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

‘আমি ভাবছি মি. সেনফ্রিড, অ্যারেন্ডসীতে এখনি না গিয়ে আগে আমাদের হামবুর্গ যাওয়া দরকার।’

থামল একটু আহমদ মুসা। একটু ভাবল। আদালার বাবার দিকে চেয়ে কিছু দ্রুত কন্ঠে বলল, ‘আপনি জানালার ওপারে যাদের কথা শুনেছিলেন, তাদের প্রথম লোক তা হাসপাতাল প্রশাসনেরই কেউ। আপনি কি চিনতে পেরেছিলেন তাকে?’

‘আমি তখন চিনতে পারিনি। কিন্তু তার কথা শুনে আমি তাকে পরে চিনতে পেরেছিলাম। তিনি হাসপাতালের ওয়ার্ডগুলোর চীফ সুপার। নাম আলদুস আলারী। হাসপাতালের খুব প্রভাবশালী ব্যক্তি। ডাক্তাররাও তাকে সমীহ করে চলে।’ বলল আদালার বাবা আল মানসুর।

‘বয়স কেমন? কত বছর তিনি হাসপাতালে আছেন?’ জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

‘তার বয়স বলা কঠিন। তার আড়ালে সবাই বলে, লোকটা কোন দিন বুড়ো হবে না। আঠার বছর বয়সে ওয়ার্ডক্লার্ক হিসেবে হাসপাতালে যোগ দেন, তারপর ৩২ বছর ধরে সে আছে হাসপাতালে। এই হিসেবে তার বয়স দাঁড়ায় ৫০ বছর। কিন্তু দেখলে মনে হয় ৪০ বছরও হবে না।’ বলল আদালার বাবা আল মানসুর।

‘উনি কি ক্যাম্পাসেই থাকেন?’ জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

‘না, হাসপাতাল ক্যাম্পাসে কোন রেসিডেন্স নেই, সবাই বাইরে থাকেন।’ বলল আদালার বাবা।

‘ধন্যবাদ মি. আল মানসুর। আপনার কাছ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাহায্য আমরা পেলাম।’

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা তাকাল ব্রুনার বাবা আলদুনি সেনফ্রিডের দিকে। বলল আহমদ মুসা, ‘মি. সেনফ্রিড আমাদেরকে অ্যারেন্ডসী নয়, প্রথমে হামবুর্গ যেতে হবে বলে মনে হচ্ছে।’

‘হামবুর্গ? আলদুস আলারীর সন্ধানে? আপনি যেটা বলবেন সেটাই হবে আহমদ মুসা।’ বলল ব্রুনার বাবা আলদুনি সেনফ্রিড।

‘ধন্যবাদ!’ বলে ব্রুনার বাবার দিক থেকে চোখ ঘুরিয়ে নিল আদালার বাবা আলা মানসুরের দিকে। বলল, ‘স্যার, এবার আপনার অনুমতি চাই, আমাদের উঠতে হবে।’

সংগে সংগে উত্তর দিল না আদালার বাবা। আহমদ মুসার কথার সাথে সাথে গভীর একটা ম্লান ভাব ফুটে উঠেছিল তার চোখে-মুখে। একটুক্ষণ নীরব থেকে সে বলল, ‘আমার এতক্ষণ মনেই হয়নি যে, আপনারা চলে যাবেন। আপনার সামনেই, বলা যায়, আপনার হাতেই আমার পরিবারের নবজন্ম হলো্। এই নবজন্মের এই মুহূর্তে আপনি আমাদের পরিবারের একজন হয়ে গিয়েছিলেন। আপনাকে আমরা ছাড়ব কি করে?’ ভারি হয়ে উঠেছিল আদালার বাবা আল মানসুরের গলা।

'স্যার, আমারও মনে হয়নি, আমরা আপনাদের থেকে আলাদা কেউ। এখনও তাই মনে করছি। কিন্তু স্যার, আপনি জেনেছেন, আমরা অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা মিশনে আছি। প্রতি মুহূর্ত আমাদের জন্যে মূল্যবান।' আহমদ মুসা বলল।

'অবশ্যই আহমদ মুসা। অবশ্যই একটা মুহূর্তও আপনাদের নষ্ট করা ঠিক নয়। কিন্তু এটাই কি আমাদের শেষ দেখা? এটা তো আমরা সহ্য করতে পারছি না।' বলল আদালার বাবা আল মানসুর।

'আর দেখা হবে না, কিংবা আবার দেখা হবে কোনটাই বলা যাবে না মি. আল মানসুর। এটা আল্লাহর হাতে যিনি আমাদের সকলকে পরিচালনা করেন।' আহমদ মুসা বলল।

'প্লিজ স্যার, আপনি এসব কথা বলবেন না। বলুন আবার দেখা হবে। মানুষ আশা নিয়ে বাঁচে। আমরাও আমাদের জন্যে আশা চাই। স্যার, আমরা হয়তো আপনার চলার পথের ক্ষণিকের দৃশ্য। কিন্তু আমি, আমরা আপনাকে সে রকম ভাবতে পারছি না। সারাজীবন দেখেও অনেক দেখা হৃদয়ে দাগ কাটে না, কিন্তু সামান্য সময়ের অনেক দেখা চিরদিনের জন্যে হৃদয়ে দাগ কেটে বসে। যদি বলেন ইনশাআল্লাহ দেখা হবে, তাহলে আশার সান্ত্বনা আমাদের বেদনায় একটা প্রলেপ হয়ে দাঁড়াতে পারে।' বলল আদালা। তার কথায় গভীর আবেগ।

'তুমি ঠিক বলেছ আদালা। বিদায়ের সময় 'আবার দেখা হবে' বলাই সঙ্গত। আর বান্দাহ আশা করুক আল্লাহ এটাই চান। ধন্যবাদ আদালা।' আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসার চোখে-মুখে হঠাৎ একটা ভাবান্তর দেখা দিল। কয়েক মুহূর্তের জন্যে মুখ নিচু করে তৎক্ষণাৎ আবার মুখ তুলে আলদুনি সেনফ্রিডকে বলল, 'আমি একটা কথা ভাবছি মি. সেনফ্রিড। আমি মনে করছি, আপনি ও ব্রুনা এখানে থেকে যান, আমি হামবুর্গ থেকে ঘুরে আসি।'

সংগে সংগে উত্তর দিল না ব্রুনার বাবা আলদুনি সেনফ্রিড। একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'এতে ভালো দিক কি মি. আহমদ মুসা।'

'ভালো দিক তেমন কিছু নেই। আমার ওখানে যে কাজ, আর তাতে যে সময় লাগবে-ততক্ষণ আপনারা এখানে অপেক্ষা করতে পারেন। এর একটা

ভালো দিক আছে, সেটা হলো আপনাদের নিয়ে বিপদের বাড়তি একটা চিন্তা আমার থাকবে না। আমরা যদি সেখানে ব্ল্যাক লাইট-এর নজরে পড়ে যাই, তাহলে তো সর্বশক্তি নিয়ে আমাদের উপর ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বে। আপনারা এখানে অপেক্ষা করলে আমাদের বিপদের পরিধি কমবে।' আহমদ মুসা বলল।

'কমবে! তার মানে বিপদের সবটুকু আপনার উপর নিতে চান?' বলল ব্রুনা ভারি গলায়।

'না ব্রুনা, ওখানে আমার উপর যে বিপদ আসবে, তোমরা ওখানে না থাকলে সে বিপদ আমার বাড়বে না।' আহমদ মুসা বলল।

'আমার স্ত্রী হামবুর্গ হাসপাতালে ছিল। আমি তাকে অ্যাটেন্ড করেছি। আপনার যে কাজ, তাতে আমিও কাজে হয়তো লাগতে পারি।' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

'মি. আলদুনি সেনফ্রিড, আপনি ঠিক বলেছেন। এ দিকটা আমার মাথায় আসেনি। ধন্যবাদ আপনাকে। তাহলে ব্রুনা থেকে যাক এখানে।' আহমদ মুসা বলল।

'আমার থাকতে আপত্তি নেই, যেহেতু ভাইয়া বলছেন। কিন্তু আপনাদের বা কারও বিপদ হলে জানব কি করে? এ দিকটার কারণে আমি এখানে যে টেনশনে থাকব, তার কষ্ট ওখানে থাকার কষ্টের চেয়ে কম নয়। আর একটা কথা ভাইয়া, বহুদিন পর বাবার সাথে মিলেছি। আবার আলাদা হতে আমার ভয় করছে।'

আহমদ মুসা বলল। 'তোমার কথায় যুক্তি আছে ব্রুনা।'

বলেই আহমদ মুসা তাকাল আদালার বাবা আল মানসুরের দিকে। বলল, 'স্যার। এবার তাহলে আমরা উঠি।'

'আপনাদের সবকিছু শুনেছি। আমাদের কিছু বলার নেই। শুধু অসীম কৃতজ্ঞতা আপনাদের প্রতি। দুনিয়াটা যদিও চলার পথ, ফেরার পথ নয়। কিন্তু চলার পথেও তো বার বার দেখা হয়। তাই আশা করব, আমার মা আদালা যেমন আশা করেছে, আবার আমাদের দেখা হবে।' বলল আদালার বাবা।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

তার সাথে উঠে দাঁড়াল সবাই।
নিচে সিঁড়ির মুখেই আহমদ মুসাদের গাড়ি দাঁড়িয়েছিল।
সবাইকে সালাম দিয়ে বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠল আহমদ মুসারা।

# ৪

‘৪০২’ নাম্বার কক্ষটিই আপনাদের চাই?’ বলল ডেস্ক এ্যাসিস্টেন্ট।

‘হ্যাঁ, ঐ কক্ষটাই চাই।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কিন্তু ঐ সারির সবই ভিভিআইপি কক্ষ। ৪০২-এর চেয়ে ৪০১ নাম্বার কক্ষ তো লোকেশনের দিক থেকে আরও ভালো।’

‘কিন্তু কক্ষটা লাকি। আমার একজন আত্নীয় ওখানে ছিলেন। তার নিরাময় হওয়া ছিল মিরাকল। তাই কক্ষটার প্রতি আমাদের এত টান।’ বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার পরনে খৃস্টান সন্ন্যাসীর পোশাক। মুখ ভরা তার কাঁচা-পাকা দাড়ি। দাড়ির মত গোঁফও তার প্রচুর, ঠোঁটের অস্তিত্বই তা ঢেকে ফেলেছে।

ডেস্কের পাশে এসে দাঁড়াল একজন। ডেস্ক এ্যাসিস্টেন্ট একটু এ্যাটেনশন হয়ে লোকটিকে গুড মর্নিং জানাল ‘স্যার’ বলে সম্বোধন করে।

‘কি বোয়ার, কি সমস্যা?’ বলল এসে দাঁড়ানো লোকটি, উত্তরে গুড মর্নিং বলার পর।

‘না স্যার, তেমন কিছু না। ইনি তার ঐ যে প্যাশেন্ট বসে আছেন তার জন্যে ৪০২ নাম্বার রুমটি চাচ্ছেন। আরেকজনের নামে রুমটি লিখেছিলাম।’ বলল ডেস্ক এ্যাসিস্টেন্ট বোয়ার।

‘দক্ষিণ পাশের রুমটাও তো খালি আছে। ওটা দিয়ে দাও।’ বলল এসে দাঁড়ানো লোকটি।

‘না স্যার। তা নিচ্ছে না। তাদের ধারণা ৪০২ নং কক্ষটি লাকি, তাই ওটাই চায় তারা। ওদের কেউ নাকি একবার এখানে ছিল।’ ডেস্ক এ্যাসিস্টেন্ট বোয়ার বলল।

সাধারণ কৌতূহলবশেই আহমদ মুসা তাকিয়েছিল এসে দাঁড়ানো লোকটির দিকে।

ডেস্ক এ্যাসিস্টেন্টের কথা শুনে লোকটি হাসল। হাসিটা সোজা ও স্বচ্ছ নয়। বলল সে, 'ঘরটা খুব লাকি, এটা ঠিক আছে। তারা যখন চাচ্ছে দিয়ে দাও না। ঐ পক্ষকে পাশের কক্ষটা দিয়ে দিতে পার।'

কথা শেষ করেই সে 'ওকে, বাই বোয়ার' বলে চলে গেল।

লোকটির হাসি এবং কক্ষটি সম্পর্কে তার কথার মধ্যে একটা মিল আছে তা আহমদ মুসার নজর এড়াল না। হাসি ও কথা উভয়ের মধ্যেই একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপও আছে। কিন্তু কেন? বিষয়টি আহমদ মুসার কাছে ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল।

আহমদ মুসা তাকাল ডেস্ক এ্যাসিস্টেন্ট বোয়ার দিকে। বলল, 'লোকটি কে? আপনাদের বস নাকি?'

বোয়ার হাসল। বলল, 'হ্যাঁ, সবারই বস সে। হাসপাতালে তার মত পুরানো আর কেউ নেই। তিনি হাসপাতালের ওয়ার্ডগুলোর চীফ সুপার।'

'ওয়ার্ডগুলোর চীফ সুপার? নাম কি?' বলল আহমদ মুসা। মনে মনে সে বলল, ওয়ার্ডগুলোর চীফ সুপারকেই তাদের দরকার।

'উনি আলদুস আলারী।' বলল বোয়ার।

'আলদুস আলারী? তাকে ধন্যবাদ। তিনি আমাদের সাহায্য করেছেন।' আহমদ মুসা বলল।

আলদুনি সেনফ্রিড মাথা ও হাত-পায়ের প্রবল স্নায়ুবিক ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে গেল। তার সাথে এ্যাটেনডেন্ট হিসেবে থাকল ব্রুনা। আর আহমদ মুসা রোগীর প্রয়োজনের দিকটা দেখ-ভাল করার জন্যে মাঝে মাঝে হাসপাতালে আসবে। এ ধরনের ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল।

রুম সার্ভিসের লোকরা রুমের ড্রেসিং এবং রুমের সবকিছু ঠিকঠাক করে দিয়ে বেরিয়ে যাবার পর হাসপাতালের বেডে শুয়ে পড়ে আলদুনি সেনফ্রিড বলল, 'মি. আহমদ মুসা, আপনি চমৎকার বুদ্ধি বের করেছেন। আমি মনে করি, আমাদের কাজের জন্যে এর চেয়ে কোন ভালো ব্যবস্থা আর হতো না। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।'

'ইতিমধ্যে তাকে চেনাও তো হয়ে গেছে। এখন তার সাহায্য পেলেই হয়।' আহমদ মুসা বলল।

'সাহায্য কি করবেন? কেন করবেন? যা তিনি করেছেন সেটা শুধু ভয়ে নয়, টাকার বিনিময়ও নিশ্চয় ছিল।' বলল ব্রুনা।

'হ্যাঁ, ব্রুনা ঠিক বলেছ। তাছাড়া সে অবশ্যই স্বীকার করতে চাইবে না যে সে ভয়ানক কাজটিতে জড়িত ছিল।' আহমদ মুসা বলল।

'তাহলে? তাকে কেন্দ্র করেই তো আমাদের একটা বড় আশা ছিল।' বলল ব্রুনা। তার কন্ঠে হতাশার সুর।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'ভবিষ্যৎ নিয়ে আগাম হতাশা ঠিক নয়। আর ভাবনার সময় এখনও আসেনি ব্রুনা।'

'ধন্যবাদ ভাইয়া।' বলল ব্রুনা হাসতে হাসতে। একটু থামলেও কথা শেষ করল না ব্রুনা। বলে উঠল আবার, 'একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না। আপনি খৃস্টান সন্ন্যাসীর পোশাক কেন নিয়েছেন?'

'এখানে আমার দু'টি ভূমিকা। খৃস্টান সন্ন্যাসীর কাজ হলো হাসপাতালে তোমাদের খোঁজ-খবর নেয়া। আর আহমদ মুসার কাজ ভিন্ন, যে কাজ নিয়ে আমরা এখানে এসেছি সেই কাজ করা। এক চেহারায় দুই কাজ হতো না ব্রুনা।' আহমদ মুসা বলল।

'বুঝেছি। সে কাজ কি তাহলে হাসপাতালের বাইরে?' বলল ব্রুনা। তার মুখ এবার গম্ভীর। কিছুটা উদ্বেগও তাতে।

'সেটা ঠিক বলা যাবে না। শুধু বাইরে নয়, হাসপাতালের ভেতরেও আহমদ মুসা কাজ করতে পারে। সেটা নির্ভর করবে পরিস্থিতির উপর।' আহমদ মুসা বলল।

'আপনি বাইরে থাকবেন কোথায়?' জিজ্ঞাসা ব্রুনার।

'এখনও ঠিক করিনি। বাইরে বেরিয়ে একটা কিছু ঠিক করে নেব।' আহমদ মুসা বলল।

'তাহলে আপনি থাকার ব্যাপারটাই আগে ঠিক করে আসুন। আপনার রেস্ট দরকার।' বলল ব্রুনা।

‘কিন্তু ব্রুনা, এই মুহূর্তে আমার প্রধান কাজ হলো আলদুস আলারী কোথায় থাকেন, তা জানা। তারপর আমার ব্যাপারটা ঠিক করব।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কি করে জানবেন? জিজ্ঞাসা করলেই তো সন্দেহ জাগবে।’ বলল ব্রুনা।

‘আমি ইতিমধ্যেই খোঁজ নিয়েছি উনি ২টা পর্যন্ত হাসপাতালে থাকেন, তারপর চলে যান। সন্ধ্যার পরে একবার আসেন পরের দিনের সব ঠিকঠাক আছে কি না দেখার জন্যে। উনি হাসপাতাল থেকে আর কিছুক্ষণের মধ্যে বের হবেন। এরপর আমি কিছু খোঁজ-খবর নেব।

বেলা ২টা বাজার পর আহমদ মুসা তার ব্যাগটা নিয়ে ড্রেসিং রুমে ঢুকল। ড্রেসিং রুম থেকে বেরিয়ে এল আহমদ মুসার বেশে। আগের আহমদ মুসা থেকে এতটাই পার্থক্য যে, আগে গোঁফ ছিল না এখন গোঁফ আছে।

আহমদ মুসা বেরিয়ে যাচ্ছিল ঘর থেকে। ব্রুনা বলল, ‘ভাইয়া, আপনি হাসপাতাল থেকে কোথাও যাচ্ছেন?’

‘না। বাইরে বেরুবো তো সন্ন্যাসী সেজে। আসছি অল্পক্ষণ পর।’

বলে আহমদ মুসা রুম থেকে বেরিয়ে গেল। আধা ঘন্টা পরে ফিরে এল আহমদ মুসা।

এসেই আহমদ মুসা পোশাক পাল্টে সন্ন্যাসীর পোশাক পরে পিঠে গেরুয়া একটা ব্যাগ ঝুলিয়ে তৈরি হলো যাবার জন্যে। আলদুনি সেনফ্রিড রোগীর বেডে এবং ব্রুনা পাশের এ্যাটেনডেন্ট কক্ষে শুয়েছিল।

আহমদ মুসার সাড়া পেয়ে ব্রুনা এ ঘরে চলে এসেছিল। আহমদ মুসাকে তৈরি দেখে বলল সে, ‘ভাইয়া, এবার নিশ্চয় হাসপাতালের বাইরে যাচ্ছেন, আসছেন কখন?’

‘এখনও কিছু ঠিক করিনি? তুমি এদিকটা দেখ।’ আহমদ মুসা বলল।

‘খুব কৌতুহল লাগছে। নিশ্চয় কোন বিশেষ কাজে বাইরে গিয়েছিলেন। হলো কাজ?’ বলল ব্রুনা।

আহমদ মুসা একটু হাসল। বলল, ‘বলতে পারবো প্রথম মিশনটা সফল হলে।’

‘মনটা যদিও আকুলি-বিকুলি করছে, তবু জানতে চাইবো না মিশনটা কি?’ বলল ব্রুনা।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘ধন্যবাদ ব্রুনা। পরে অবশ্যই জানবে। আসি।’

বলে আহমদ মুসা বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

রাত ৯টা।

টনডর্ফ বাস স্টেশনে এসে আহমদ মুসা গাড়ি ঘুরিয়ে আবাসিক এলাকার দিকে চলল।

টনডর্ফ আবাসিক এলাকা ছোট, ওস্টেনডার হ্রদের সামনে। হামবুর্গের অন্যতম অভিজাত আবাসিক এলাকা এটা। বাড়িগুলো একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন এবং বেশ স্পেস আছে একটি বাড়ি থেকে অন্য বাড়ির মধ্যে।

রাত ৯টাতেই নীরবতায় ছেয়ে গেছে আবাসিক এলাকার সামনের রাস্তাটা।

এই রাস্তার শেষ প্রান্তের দিকে লেকের ধারে আলদুস আলারীর বাসা।

দিনের বেলা হাসপাতাল থেকেই আহমদ মুসা কৌশলে আলদুস আলারীর বাসার ঠিকানা জেনে নিয়েছিল। আলদুস আলারী তখন ডিউটি শেষে বাসায় ফিরে এসেছিল। আহমদ মুসা পারসোনাল সেকশনের ডিলিং অফিসারকে বলেছিল, ‘তার সাথে আমার জরুরি কাজ আছে, এখনই তার সাথে দেখা করা প্রয়োজন। আমার আসতে একটু দেরি হয়েছে, উনি চলে গেছেন।’

‘জরুরি হলে টেলিফোনে কথা বলতে পারেন। টেলিফোন নাম্বার নেই?’ বলেছিল ডিলিং অফিসার।

‘টেলিফোনে সব কথা হয় না, বলা যায় না।’ আহমদ মুসা বলল।

'তাহলে তার বাড়িই যেতে হবে আপনাকে। কয়েকদিন হলো উনি বাসা বদলেছেন। টনডর্ফ এলাকায় তার নিজের বাসা। এ বাসার ঠিকানা নিশ্চয় আপনার কাছে নেই। দাঁড়ান দিচ্ছি।' বলেছিল অফিসার।

এভাবেই আহমদ মুসা আলদুস আলারীর বাসার ঠিকানা পেয়ে গিয়েছিল।

আহমদ মুসা বাড়ির ঠিকানা পাওয়ার পর পরই একবার আলদুস আলারীর বাড়ি দেখার জন্যে এসেছিল এখানে।

হ্রদের তীরে অভিজাত এক আবাসিক এলাকায় সুন্দর বাড়ি। তার মত চাকুরের এমন বাড়ি হবার কথা নয়। ব্ল্যাক লাইটের টাকায় কি তাহলে বাড়িটা করেছে সে।

আহমদ মুসা জেনেছে আলদুস আলারী শুধুমাত্র স্ত্রী নিয়ে এ বাড়িতে থাকে। তার ছেলেমেয়েরা সবাই হামবুর্গের বাইরে থাকে।

বাড়ি কিংবা রাস্তাতেও আলদুস আলারীর সাথে কথা বলা যেত, কিন্তু আহমদ মুসা বাড়িকেই বেছে নিয়েছে। জার্মানরা অফিস বা রাস্তায় কোন হট্টগোল পছন্দ করে না। এ রকম হলে তারা সোজা পুলিশ ডেকে বসে।

আহমদ মুসা রেন্ট-এ-কার থেকে ভাড়া করা গাড়িটা আলদুস আলারীর বাড়ির কাছাকাছি রাস্তার পাশে একটা গাছের নিচে অন্ধকারে দাঁড় করিয়ে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। আহমদ মুসার পরণে কালো প্যান্ট, কালো জ্যাকেট এবং মাথায় একটা কালো হ্যাট।

আহমদ মুসা রাস্তার পাশ ধরে দ্রুত হেঁটে চলল আলদুস আলারীর বাড়ির দিকে।

বাড়িটা সাড়ে তিন ফুটের মত উঁচু ওয়াল দিয়ে ঘেরা। এখানে কোন বাড়ির বাউন্ডারি ওয়াল এর চেয়ে উঁচু হয় না। অনেক বাড়িতে বাউন্ডারি ওয়ালই নেই।

আলদুস আলারীর বাড়ির বাউন্ডারি ওয়ালের সাথে যে গেটটা, সেটা গ্রিলের। গেটটা লক করারও ব্যবস্থা আছে।

আহমদ মুসা পকেট থেকে বের করে ল্যাসার কাটারটা হাতে নিল। কিন্তু ল্যাসার কাটার ব্যবহার করতে হলো না। হাত দিয়ে চাপ দিতেই দরজা খুলে গেল। আহমদ মুসা কিছুটা বিস্মিতই হলো। জার্মানরা তো এমন করে না সাধারণত। তারা কোন সিস্টেম করলে তা তারা রক্ষা করে। তাহলে আলদুস আলারী গেট লক করল না কেন?

আহমদ মুসা গেট খুলে ভেতরে ঢুকল।

একটা প্রশস্ত লাল পাথুরে রাস্তা এগিয়ে গেছে বাড়ির বারান্দা পর্যন্ত।

আহমদ মুসা কিছুক্ষণ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকল। ভেতরে কোন সাড়া নেই। মিনিট দুয়েক অপেক্ষার পর আহমদ মুসা আস্তে আস্তে দরজার নবের উপর চাপ দিল। নব ঘুরল না। দরজায় তালা, এটাই স্বাভাবিক।

দরজায় নক করল আহমদ মুসা। এক দুই তিনবার নক হলো।

তৃতীয় নকের পরেই দরজা খুলে গেল।

দরজায় দাঁড়ানো লোকটির উপর নজর পড়তেই বুঝল আহমদ মুসা ইনিই আলদুস আলারী। শক্ত গড়ন, মেদহীন ভরাট মুখ, মাথাভরা সোনালি চুলের সমারোহ দেখে বুঝার উপায় নেই তার বয়স পঞ্চাশের কোঠায়।

আহমদ মুসা আলদুস আলারীর প্রতিক্রিয়ার ধরনে মনে মনে খুবই বিস্মিত হলো। আহমদ মুসা মনে করেছিল এত রাতে অপরিচিত, অনাহূত এবং কোন প্রকার খবর ছাড়া আসা এক অতিথিকে দেখে বিস্মিত, বিরক্ত হবেন আর এটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তার দৃষ্টিতে এ সবের কিছুই ছিল না। কারও জন্যে অপেক্ষা করে থাকলে যে রকম প্রতিক্রিয়া হয় আলদুস আলারীর প্রতিক্রিয়া সে রকমের। তার ও প্রতিক্রিয়ার কথা ভাবতে গিয়ে বিস্ময়ের সাথে সন্দেহেরও উদয় হলো তার মনে।

'কে আপনি? কি চাই? আসুন ভেতরে।' বলল আলদুস আলারী। তার কথার মধ্যে কোন উদ্বেগ-আশংকার ভাব নেই। পরিচয় ও প্রয়োজন জানা ছাড়াই নি:সংকোচে ভেতরে নিয়ে চলল। আহমদ মুসা আলদুস আলারীর এই আচরণের কারণ বুঝতে পারল না। আলদুস আলারী কি খুব সাহসী? কিংবা হতে পারে সে এ ধরনের অতিথি আপ্যায়নে অভ্যস্ত।

আহমদ মুসাকে নিয়ে ড্রইং রুমে বসাল।

আলদুস আলারী আহমদ মুসার সামনের সোফায় মুখোমুখি বসল। বলল, 'আমরা পরস্পরকে বোধ হয় চিনি না। বসুন কি জন্যে কষ্ট করে এত রাতে এসেছেন?'

'আমি আপনার সাহায্য চাই।' আহমদ মুসা বলল।

'সাহায্য? কি সাহায্য?' বলল আলদুস আলারী।

আহমদ মুসা একবার স্থির দৃষ্টিতে আলদুস আলারীর দিকে তাকাল। বলল, 'গত বছর ঠিক এই সময় আপনাদের হাসপাতালের একটা বেড থেকে একজন রোগিনী হারিয়ে যায়, তার জায়গায় আসে হুবহু তারই মত আরেকটি মেয়ে। আপনার হাসপাতালের এক বা একাধিক লোক এই ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত আছে। এদের সন্ধান পেলেই হারিয়ে যাওয়া মেয়েটির সন্ধান পাওয়া যাবে। এই ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাই। হাসপাতালের সবচেয়ে পুরানো একজন কর্মকর্তা আপনি। আপনিই এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন।'

আহমদ মুসা আলদুস আলারীর চোখে চোখ রেখে কথাগুলো বলছিল। আহমদ মুসা মনে করেছিল তার কথা শুনে আলদুস আলারী নিশ্চয় চমকে উঠবেন, চেহারা পাল্টে যাবে তার। কিন্তু কিছুই ঘটল না। তার মুখটা এমন দেখা গেল যেন এসব কথা শোনার জন্যে সে প্রস্তুতই ছিল। আহমদ মুসার অভিজ্ঞতর ঘন্টায় যেন এলার্ম বেজে উঠল।

ঠিক সেই সময়ে হেসে উঠল আলদুস আলারী। আর আহমদ মুসা তার মাথার পেছনে স্টিলের শক্ত নলের স্পর্শ অনুভব করল। সামনে, ডান ও বাম থেকে দেয়াল ফুঁড়েই যেন তিনজন রিভলবার বাগিয়ে আহমদ মুসার দিকে এগিয়ে এল। সামনের লোকটা হাতের রিভলবারটা নাচিয়ে নাচিয়ে হো হো করে হেসে বলল, 'তুমিই তাহলে সেই নকল আহমদ মুসা। তুমি খুব বুদ্ধিমান শুনেছি। কিন্তু আজ এতটা বোকামি করলে কি করে? কেমন করে তুমি ধরে নিলে যে, হাসপাতাল থেকে আলদুস আলারীর ঠিকানা জেনে নেবে আর সহজেই পেয়ে যাবে আলদুস আলারীকে? একজন এশিয়ান তার ঠিকানা যোগাড় করেছে, এটা জানতে পেরেই সে ব্ল্যাক লাইটের লোকদের জানিয়েছে। আমরা অনেক দিন ধরে হামবুর্গ ও

অ্যারেন্ডসী'তে তোমার অপেক্ষায় জাল পেতে বসে আছি। আজ জালে ধরা পড়েছ।' বলে আবার হো হো করে হেসে উঠল লোকটা।

সামনের লোকটা থামতেই ডান পাশের লোকটা বলল, 'ভাগ্যিস আমরা আলদুস আলারীকেও সব ব্যাপারে জানিয়ে রেখেছিলাম।'

'বেচারা নকল আহমদ মুসা সেজে অতি আত্মবিশ্বাসের কারণে আজ সহজেই জালে আটকে গেছে।' বলল বাম পাশের জন।

'তোমরা তাড়াতাড়ি আমার বাড়িকে ঝামেলা মুক্ত কর।' আলদুস আলারী বলল।

'কার্ল ওর পকেটগুলো সার্চ কর। আর নকল আহমদ মুসা তুমি হাত তুলে দাঁড়াও এখনি, গুলি না খেতে চাইলে।'

আহমদ মুসা এটাই চাচ্ছিল। আহমদ মুসা মাথার উপর হাত তুলতে তুলতে দাঁড়িয়ে গেল সংগে সংগেই।

পেছনের লোকটা আহমদ মুসার মাথা থেকে রিভলবার সরিয়ে নিয়ে সামনে এসে গিয়েছিল আহমদ মুসাকে সার্চ করার জন্যে।

আহমদ মুসা দাঁড়াবার সময়ই হাত উপরে তুলতে গিয়ে ডান হাত দিয়ে মাথার পিছনে জ্যাকটের আড়াল থেকে ছোট, কিন্তু ভয়ংকর রিভলবারটা নিয়েই ডান দিকের লোকটাকে গুলি করল। সেই একই সময়ে আহমদ মুসার বাম হাত সাঁড়াশীর মত দ্রুত সামনে এগিয়ে তাকে সার্চ করতে আসা লোকটিকে টেনে নিয়ে বুকের সাথে চেপে ধরেছিল। ডান হাত প্রথম গুলিটা ছুড়েই বিদ্যু গতিতে সরে গিয়ে দ্বিতীয় গুলি করেছিল সামনের রিভলবারধারীকে। এই সময় বামের লোকটির নিক্ষিপ্ত গুলি এসে বিদ্ধ করল আহমদ মুসার বাম হাতকে। আহমদ মুসার বাম হাত শিথিল হয়ে পড়েছিল। আহমদ মুসা ডান হাত দিয়ে লোকটিকে ধরে রেখে পেছন দিকে সোফার উপর আছড়ে পড়ল। আর সেই সাথে আহমদ মুসা লোকটিকে ধরে রাখা অবস্থাতেই ডান হাত একটু ঘুরিয়ে নিয়ে গুলি করল বাম দিকের লোকটিকে।

বাম দিকের লোকটি তাদের লোকের সাথে জড়াজড়ি করে পড়ে যাওয়ায় গুলি করার সুবিধা পাচ্ছিল না। আহমদ মুসা তাদের লোকের নিচে পড়ে যাওয়ায়

আরও অসুবিধায় পড়েছিল। এটাই আহমদ মুসাকে সময়ও দিয়েছিল, সুযোগও দিয়েছিল। বাম দিকের লোকটিও মাথায় গুলি খাবার পর আগের দু'জনের মতই চিৎকার করার সুযোগটুকুও পেল না, ভূমি শয্যা নিল।

আহমদ মুসা তৃতীয় গুলি করার সময় তার সাথে পড়ে যাওয়া লোকটি তার হাত থেকে খসে গিয়েছিল এবং সোফার পাশে পড়ে যাওয়া তার রিভলবারটি খুঁজে পেয়েছিল। তার রিভলবার সে আহমদ মুসার দিকে ঘুরিয়ে নিচ্ছিল।

আহমদ মুসা তৃতীয় গুলি করার পর মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করল না, তার হাতটা সামনের দিকে ঘুরে আসতে যা সময় নিল। লোকটির রিভলবার ঘুরে আসছিল আহমদ মুসার দিকে। কিন্তু আহমদ মুসার রিভলবার আওতায় ততক্ষণে লোকটির মাথা এসে গিয়েছিল। ট্রিগার টিপল আহমদ মুসা। আধা দাঁড়ানো লোকটি সেই অবস্থাতেই বসে পড়ল মেঝের উপর। বিমূঢ়, কম্পমান আলদুস আলারী আতংকগ্রস্ত হয়ে এক পা দু'পা করে সরছিল ঘর থেকে বের হওয়ার জন্যে। পায়ের উপর শক্তি নিয়ে যেন সে দাঁড়াতে পারছিল না।

আহমদ মুসা তার দিকে রিভলবার তাক করে বলল, 'আর এক পা এগোলে আমি গুলি করব।'

আলদুস আলারী ডুকরে কেঁদে উঠে বসে পড়ল। এই সময় তার স্ত্রী ঘরে ঢুকল। প্রথমে সাদা চুলের মেয়েটাকে আলদুসের স্ত্রী বলে আহমদ মুসার মনে হয়নি। কিন্তু আহমদ মুসার পায়ের কাছে উপুড় হয়ে পড়ে যখন স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা চাইল, তখনই বুঝল সে আলদুসের স্ত্রী। সে কাঁদতে কাঁদতে বলছিল, 'আমার স্বামীর কোন দোষ নেই। সে যেটুকু করেছে বাধ্য হয়ে করেছে।'

মহিলাটা ঘরে ঢুকলে আহমদ মুসা সোফার উপর রাখা হ্যাট মাথায় পরেছিল চেহারা কিছুটা আড়াল করার জন্যে।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আপনার স্বামীকে আমি নিয়ে যাচ্ছি। সে যদি আমাদের ভালো কাজে সহযোগিতা করে, তাহলে তার কোন ক্ষতি হবে না।'

'নিয়ে যাবেন কেন? কি সহযোগিতা চান বলুন। সে সহযোগিতা করবে।' আলদুসের স্ত্রী বলল।

‘কিছু লোক অন্যায় করেছে। সেটা আপনার স্বামী জানে। সেই ব্যাপারে আমরা কিছু জানতে চাই।’ বলল আহমদ মুসা।

‘কিছু জানলে সে বলবে। এখানেই তাকে জিজ্ঞেস করুন।’ আলদুসের স্ত্রী বলল।

‘আমি কিছু বললে ওরা আমাকে মেরে ফেলবে। বলতে পারবো না আমি।’ বলল আলদুস আলারী।

‘আর না বললে আমি মেরে ফেলব। এখন বল কোনটা চাও?’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমি বাঁচতে চাই।’ বলে ডুকরে কেঁদে উঠল আলদুস আলারী।

‘ঠিক আছে ম্যাডাম, আপনার স্বামীকে আমি নিয়ে গেলাম। এটাই তার বাঁচার পথ।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কেমন করে?’ কান্না জড়িত কন্ঠে বলল আলদুসের স্ত্রী।

‘অত কথা বলার সময় আমার নেই। আমাকে বিশ্বাস করতে হবে ম্যাডাম।’ আহমদ মুসা বলল।

সজল চোখে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল আলদুসের স্ত্রী আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসার কন্ঠের কি যেন আকর্ষণ তাকে দারুণভাবে বিমোহিত করল। তার মানে হলো, এই কন্ঠকে বিশ্বাস করা যায়। এ কন্ঠ যেন মিথ্যা বলতে পারে না বলে তার মনে হলো।

আলদুসের স্ত্রী আহমদ মুসার সামনে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বলল, ‘আমি আপনাকে বিশ্বাস করলাম বেটা। আমার স্বামী করে ফেরত আসবে? আজই ফেরত আসবে তো?’

‘তার ফিরে আসা নির্ভর করছে সে আমাদের সহযোগিতা করছে কি না তার উপর।’ বলল আহমদ মুসা।

বলেই সে আলদুসের স্ত্রীকে পাশ কাটিয়ে চলা শুরু করল।

আলদুসের স্ত্রী ছুটে গিয়ে স্বামীর কাছে বসল। বলল, তুমি যা জান সব বলে দেবে। এরা ভালো মানুষ। দেখ না আমাকে ‘ম্যাডাম’ বলেছে। আর ওরা তো মানুষ জ্ঞান করে না। তুমি যাও এর সাথে।’

উঠে দাঁড়াল আলদুস আলারী। কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমার বাঁচার কোন উপায় নেই।'

আহমদ মুসা লোকটির মাথায় রিভলবার ঠেকিয়ে বলল, 'চোখের পানি মুছে ফেল। এটা কান্নার কোন সময় নয়। স্বাভাবিকভাবে রাস্তায় হাঁটবে। অন্যথা হলে জানবে, আমার রিভলবারের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না।'

আলদুস আলারী হাঁটতে লাগল। আহমদ মুসা পেছনে তাকিয়ে আলদুস আলারীর স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'আসি ম্যাডাম।'

'আমি আপনাকে বিশ্বাস করি।' বলল আলদুসের স্ত্রী কম্পিত গলায়।

আহমদ মুসা পেছনে না তাকিয়ে মনে মনে বলল, তাহলে দুনিয়ার সব স্ত্রীরা একই রকম। কিন্তু আমরা স্বামীরা কতটুকু তা বুঝি।

রা্স্তায় আলদুস আলারী অস্বাভাবিক কিছু করল না।

আলদুস আলারীকে পাশে বসিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিল আহমদ মুসা। বাম হাতটা তুলতে পারছে না আহমদ মুসা। এতক্ষণ পরিস্থিতির উত্তেজনায় আহত হাতের দিকে মনোযোগ দিতে পারেনি সে। এখন খুব ভারি মনে হচ্ছে হাতটা। বাহুর যেখানে গুলিটা লেগেছে, একটা মাংসপিণ্ড তুলে নিয়ে গুলিটা বেরিয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। বাহুর লাগোয়া পাঁজরের পেশীতেও যন্ত্রণা হচ্ছে। তাহলে বুলেটটা বাহু থেকে বেরিয়ে সে পেশীকেও আহত করেছে?'

আহমদ মুসা শহর ছাড়িয়ে একটা নির্জন ফার্মল্যান্ডে এনে গাড়ি থামাল। পেছন থেকে ব্যাগ টেনে নিয়ে মেডিকেটেড ব্যাণ্ডেজ বের করল। আলদুস আলারীকে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাতে বলে গা থেকে জ্যাকেট খুলে ফেলল। ওষুধে ভেজানো তুলা দিয়ে যতটা সম্ভব আহত স্থানটা এক হাতের সাহায্যে ব্যাণ্ডেজ করল। পাঁজরের আহত স্থানটারও এভাবে এক হাত দিয়ে নার্সিং করল।

রক্ত ভেজা জ্যাকেট গাড়ির পেছনে রেখে আরেকটা শার্ট পরে নিয়ে আহমদ মুসা আলদুস আলারীকে সোজা হয়ে বসতে বলল।

মি. আলদুস আলারী চিন্তা করে কিছু কি ঠিক করলেন? আপনি আমাদের সহযোগিতা করবেন, না ওদের মত গুলি খেয়ে মরবেন?' বলল আহমদ মুসা আলদুস আলারীকে লক্ষ্য করে।

'স্যার, ওরা আমাকে আমার পরিবার সমেত মেরে ফেলবে।' বলল আলদুস আলারী কম্পিত গলায়।

'আমাকে সহযোগিতা না করলে আমি তোমাকে বাঁচিয়ে রাখব, এটা কে বলল?' আহমদ মুসা বলল।

'আমি বাঁচতে চাই স্যার। আমি তাহলে কি করব?' বলল আলদুস আলারী।

কি করতে হবে, সেটা বলবো। কিন্তু তার আগে আমার প্রশ্নগুলোর জবাব দাও।' আহমদ মুসা বলল।

'কি জানতে চান স্যার?' বলল আলদুস আলারী।

'যে মেয়েটিকে তারা হাসপাতাল থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে, তাকে তারা কোথায় রেখেছে?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার

'স্যার, ওদের সব কাজ অত্যন্ত গোপনীয়। আমার সব কিছু ওরা জানে, কিন্তু আমি ওদের কিছুই জানি না।' বলল আলদুস আলারী কম্পিত গলায়।

ড্যাশ বোর্ডের উপর থেকে রিভলবার হাতে তুলে নিয়ে আহমদ মুসা বলল, 'জানি না, কথাটা আর বলবে না। কি জান সেটা বল।'

'ওদের একটা টেলিফোন নাম্বার জানি স্যার।' বলল আলদুস আলারী।

'মোবাইল, না ল্যান্ড টেলিফোন?' জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

'একটা মোবাইল, অন্যটা ল্যান্ড টেলিফোন স্যার। মোবাইল নাম্বারটা আমাকে ওরা দিয়েছে এবং ল্যান্ড টেলিফোন নাম্বারটা টেলিফোনে একজনকে দিচ্ছিল সেটা আমি শুনেছি।' বলল আলদুস আলারী।

আহমদ মুসা নাম্বার দু'টি নিজের মোবাইলে সেভ করে নিল।

মোবাইল পকেটে রেখে দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, এরপর বল। আর কি জান?'

'স্যার, যেদিন মেয়েটাকে সরিয়ে নেয়, সেদিন ওদের একজন আরেকজনকে মেয়েটিকে '৪৯০-এর সি'-তে তুলতে বলেছিল। কিন্তু ওদের টীম

লিডার যে ছিল সে শুনতে পেয়ে বলেছিল, না 'সি' তে নয়, 'এ'-তে তোলার নির্দেশ হয়েছে। এ ছাড়া তাদের মুখে কয়েকবার 'অ্যারেন্ডসী'র নাম শুনেছি। কয়েকদিন আগে যখন ওরা আমার কাছে আসে পরিস্থিতি সম্পর্কে সাবধান করার জন্যে। একজন আরেকজনকে বলতে শুনেছি, 'হ্যাটটপ ট্যানেল প্যালেস' ও 'লেক প্যালেস' এর সাথে বাড়িকে জুড়ে দিয়ে আরও নিরাপদ করা হয়েছে-চিন্তার কিছু নেই।' থামল আলদুস আলারী।

'তারপর মি. আলদুস?' আহমদ মুসা বলল।

আলদুস দু'হাত জোড় করে আহমদ মুসাকে বলল, 'ওদের সম্পর্কে আমি আর কিছুই জানি না স্যার। যা জানি সব বলেছি। স্যার, ওরা আমাকে ব্যবহার করেছে। পরিবার সমেত শেষ করে দেবার হুমকি দিয়ে আমাকে ওরা কাজ করতে বাধ্য করেছে।'

আদালার বাবা আলগার মানে আল মানসুরের কথা মনে পড়ল আহমদ মুসার। সত্যিই আলদুস প্রথমে রাজি হয়নি। তাকে বাধ্য করা হয়ে ভয় দেখিয়ে। বেচারা আলদুস আর কিছুই জানে না সেটা বিশ্বাস হলো আহমদ মুসার। তাহলে আলদুসের কাছে কি পাওয়া গেল? নিজেকে নিকেই প্রশ্ন করল আহমদ মুসা। দু'টো টেলিফোন নাম্বার ও নাম্বারসত কয়েকটা ক্লু পাওয়া গেছে। ক্লুগুলো গুরুত্বপূর্ণ কি না অ্যারেন্ডসীতে গেলেই তা বুঝা যাবে। দু'টো টেলিফোন নাম্বার, একটা বাড়ি বা স্থানের নাম ও নাম্বার সামনের অন্ধকারে আলোকবর্তিকার মত মনে হচ্ছে তার কাছে। নিকষ অন্ধকারে দাঁড়ানো তার কাছে এটা একটা বড় পাওয়া।

আহমদ মুসা আলদুস আলারীকে বলল, 'দশ পনের দিন তোমার লুকিয়ে থাকার মত কোন জায়গা আছে?'

'কেন স্যার?' জিজ্ঞাসা আলদুস আলারীর।

'এখন বাড়ি গেলে ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে। দশ পনের দিন তোমাকে সরে থাকতে হবে।' আহমদ মুসা বলল।

চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল আলদুস আলারীর। বলল, 'আমাকে ছেড়ে দেবেন স্যার?'

আহমদ মুসা একটু হাসল। বলল, ‘এর বেশি কিছু জানই না যখন বলছ , তখন আর কি করব।’

‘আপনি খুব ভালো স্যার। ওরা মানুষ নয় স্যার। ‘ব্ল্যাক লাইট’ নামের খুব ভয়ংকর একটা দল ওরা স্যার। আরও কিছু জানলে অবশ্যই বলতাম স্যার।’

‘আচ্ছা গত দু’দিনে ওদের কয়টা টেলিফোন পেয়েছ?’ আহমদ মুসা বলল।

‘দু’বার স্যার’। বলল আলদুস আলারী।

‘নাম্বারগুলো কি আছে তোমার মোবাইলে?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘না, স্যার। ওদের টেলিফোনের নাম্বার, নাম কিছুই শো হয় না আমার মোবাইলে।’ বলল আলদুস।

‘বুঝেছি। এখন বল তোমার সরে থাকার মত সে রকম জায়গা আছে কি না?’ আহমদ মুসা বলল।

‘হ্যাঁ, আছে স্যার। লোনবার্গে আমার ফুফু থাকেন। সেখানে আমি কিছু দিন থাকতে পারি। তিনি একাই থাকেন একটা ফ্লাটে।

‘গুড, জায়গাটা শহর থেকে বেশ দূরে। তাহলে এখন তুমি কিভাবে যাবে সেখানে?’ আহমদ মুসা বলল।

‘অসুবিধা নেই স্যার। বাসেও যাওয়া যায়। ট্যাক্সি নিয়েও যেতে পারি।

কিন্তু স্যার টাকা তো নেই পকেটে, বাড়ি কি যেতে পারি?’ বলল আলদুস আলারী।

‘না, ব্ল্যাক লাইটের হাতে পড়ে যেতে পার। ওদের কাছে এতক্ষণে খবর পৌঁছে গেছে। ওরা তোমাদের ওখানে এসেও থাকতে পারে। সাথীদের লাশ তারাই সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করতে পারে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তাহলে, হাসপাতালে যেতে পারি? ওখানে গেলে টাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।’ বলল আলদুস আলারী।

‘না, বাড়ি, হাসপাতাল কোনটাই তোমার জন্যে নিরাপদ নয়। তোমার কত টাকা হলে চলে?’ আহমদ মুসা বলল।

‘যাতায়াতের জন্য শ’পাচেক মার্ক হলেই চলবে স্যার।’ বলল আলদুস আলারী।

আহমদ মুসা তার হাতে এক হাজার মার্ক তুলে দিয়ে বলল, ‘সাবধানে যাবে। তোমার স্ত্রীকে কিছুই জানাবে না। আমি জানাবার ব্যবস্থা করবো, যদি দরকার হয়।’

আহমদ মুসা আলদুস আলারীকে একটা বাস স্ট্যান্ডে নামিয়ে দিল।

গাড়ি থেকে নেমেই আহমদ মুসার পায়ের কাছে বসে পড়ল আলদুস আলারী। বলল, ‘আপনি খুব ভালো মানুষ স্যার। ঈশ্বর আপনাদের সাহায্য করুন।’

‘ধন্যবাদ আলদুস আলারী। চলি।’ বলে আহমদ মুসা গাড়ি স্টার্ট দিল।

গাড়িতে বসেই পোশাক পাল্টে আহমদ মুসা হোটেলে এল।

পরদিন সকাল আটটার দিকে আহমদ মুসা হাসপাতালে পৌঁছল।

কক্ষের দরজায় নক করতেই দরজা খুলে দিল ব্রুনা। তার মুখ শুকনো।

উদ্বেগে কাতর চেহারা। আহমদ মুসাকে দেখে আকাশের চাঁদ হাতে পেল। কথাই বলতে পারল না ব্রুনা। তার ঠোঁট দু’টো অবরুদ্ধ আবেগে কাঁপছিল। আহমদ মুসাকে দরজা খুলে দিয়ে এক পাশে দাঁড়াল সে। আহমদ মুসা বিস্মিত হলো ব্রুনার অবস্থা দেখে।

‘তোমরা ভালো আছ ব্রুনা?’ বলে ঘরে প্রবেশ করল আহমদ মুসা। ঘরে ঢুকে আলদুনি সেনফ্রিডকেও দেখল জড়োসড়ো হয়ে সোফায় বসে থাকতে। আহমদ মুসাকে দেখে প্রাণ পাওয়ার মত সে যেন জেগে উঠল। উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। বলল, ‘আপনি ঠিক আছেন মি. আহমদ মুসা?’

‘হ্যাঁ, আমি ঠিক আছি। কিন্তু আপনাদের কি হয়েছে?’

ব্রুনা দরজা বন্ধ করে ফিরে এসেছিল। বলল, ‘স্যার, গত দু’ঘন্টায় আমরা প্রায় অর্ধেক মরে গেছি।’

‘কেন কি হয়েছে? কিছু ঘটেছে?’ আহমদ মুসা বলল। তার কন্ঠে উদ্বেগ।

‘বসুন স্যার, বলছি।’ বলে ব্রুনা আহমদ মুসাকে বসার পথ করে দেবার জন্যে সরতে গিয়ে আহমদ মুসার বাম হাতের সাথে একটু ধাক্কা খেল।

আহমদ মুসা ‘আহ!’ বলে উঠল। অনেকটা অনিচ্ছাতেই তার মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়ে গেছে।

থমকে দাঁড়িয়েছে ব্রুনা। তার চোখে-মুখে অপার প্রশ্ন। আলদুনি সেনফ্রিডও চমকে উঠেছে।

ব্রুনা দুই ধাপ সরে এসে বলল, ‘দেখি ভাইয়া, আপনার হাতটা।’

বলেই ব্রুনা হাতের উপর থেকে সন্ন্যাসীর আলখেল্লার হাতা তুলে ফেলল। দেখতে পেল বাহুর ব্যান্ডেজ।

চমকে উঠল ব্রুনা। তার বাবা আলদুনি সেনফ্রিডও উঠে দাঁড়িয়েছে।

তাঁরও প্রশ্ন, ‘মি. আহমদ মুসার হাতে কি হয়েছে?’ তার কন্ঠে ঝরে পড়ল রাজ্যের উদ্বেগ।

‘বলছি মি. সেনফ্রিড। কিন্তু তার আগে বলুন আপনাদের কি হয়েছে। আমার খুব উদ্বেগ বোধ হচ্ছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘বসুন ভাইয়া আপনি। বলছি আমি। জানি আমি, আমাদের কথা না বললে আপনার কথা জানতে পারবো না।’ বলল ব্রুনা।

আহমদ মুসা বসল।

আলদুনি সেনফ্রিড শুরু করল। বলল, ‘আজ সকাল ৬টায় আমরা খবর পেলাম, হাসপাতালের চীফ সুপার আলদুস আলারীর বাড়িতে চারজন অপরিচিতের গুলিবিদ্ধ লাশ পাওয়া গেছে। সেই সাথে মি. আলারীকে বাড়িতে পাওয়া যায়নি। আমরা এই খবর শুনে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। আপনার ঐ বাড়িতে যাওয়ার কথা ছিল। অত..।’

আলদুনি সেনফ্রিডের কথার মাঝখানেই আহমদ মুসা বলে উঠল, ‘অতএব আপনারা মনে করলেন চারজনের মধ্যে আমি...।’

আহমদ মুসাকে কথা শেষ করতে দিল না ব্রুনা। ব্রুনা হাত দিয়ে আহমদ মুসার মুখ চেপে ধরে বলল, ‘প্লিজ, এমন শব্দ মুখেও আনবেন না। এই দুই ঘন্টায় আমাদের আশংকা-আতংক মন ঝাঁজরা হয়ে গেছে। শুধু আপনার কথা নয়, ভাবীর কথা মনে পড়ছিল, মনে পড়ছিল আপনাদের চোখের মণি আহমদ আবদুল্লাহর কথাও।’ শেষের কথাগুলো ব্রুনার কান্নায় রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

‘ব্রুনা, এত তাড়াতাড়ি এভাবে ভেঙে পড়লে যুদ্ধে জিতবে কি করে? তোমাদের আরও সাহসী হতে হবে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ভাইয়া, আমরা সাধারণ মানুষ। যে শক্তি আমাদের নেই, তা আমাদের কাছে আশা করা উচিত নয়।’

একটু থেমে চোখ-মুখ মুছে নিয়ে বলল ব্রুনা, ‘ভাইয়া, এখন আমাদের প্রশ্নের জবাব দিন এবং আলদুস আলারীর বাড়ির সাংঘাতিক ঘটনা সম্পর্কে প্লিজ সব বলুন।’

‘ঘটনা জানবো না কেন? ঐ চারজনের একজনের গুলিতেই আমার বাহু আহত হয়েছে। আমাকে ধরার জন্যে ওরা আগে থেকেই আলদুস আলারীর বাড়িতে লুকিয়েছিল।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ওরা জানল কি করে যে, আপনি আলদুস আলারীর বাসায় ঐ সময় যাচ্ছেন?’ বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

আলদুস আলারীর ঠিকানা কিভাবে আহমদ মুসা হাসপাতাল থেকে নিয়েছিল, সেটা জানিয়ে বলল, ‘সম্ভবত হাসপাতাল থেকেই আলদুসকে জানিয়ে দেয়া হয় যে, কে একজন ঠিকানা নিয়ে তার বাড়িতে যাচ্ছে।’

‘কিন্তু সে লোক যে আপনি তা কি করে জানল এবং ঐভাবে প্রস্তুত থাকল আপনার জন্যে?’ বলল ব্রুনা।

‘যে আলদুসের বাড়িতে যাচ্ছে সে এশিয়ান, এটা জেনে নেয় আলদুস আলারী হাসপাতাল থেকে। এশিয়ান শুনেই সে সন্দেহ করে। কারণ, ব্ল্যাক লাইট আগেই আলদুস আলারীকে সাবধান করে দিয়েছিল। তাই এশিয়ান শুনেই সে ব্ল্যাক লাইটকে খবর দেয় এবং ব্ল্যাক লাইটের চারজন তার বাড়িতে আমার জন্যে ওঁৎ পেতে বসেছিল। আমি যখন আলদুস আলারীর বাড়িতে গিয়ে হাসপাতাল থেকে তোমার মাকে সরিয়ে নেয়ার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলাম, তখন ওরা চারজন আমাকে ঘিরে ফেলে।’

‘সর্বনাশ, তারপর?’ বলল ব্রুনা।

‘তারপরের খবর তো শুনেছ। ওরা চারজনই মারা গেছে। তারা না মরলে আমাকেই মরতে হতো।’ আহমদ মুসা বলল।

ব্রুনা কিংবা আলদুনি সেনফ্রিড কেউই কোন কথা বলল না। তারা নির্বাক চোখে তাকিয়েছিল আহমদ মুসার দিকে। জীবন-মৃত্যুর কি ভয়ংকর খেলা সে খেলছে। এ পর্যন্ত তাদের সামনেই আহমদ মুসা অনেকবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছে। প্রতিবারই মারতে না পারলে আহমদ মুসাকেই হয়তো জীবন দিতে হতো। অনেক স্থানেই প্রতিপক্ষ সবাইকে মরতে হয়েছে আর প্রতিবারই ঈশ্বর আহমদ মুসাকে জয়ী করেছেন, সে বেঁচে গেছে। কিন্তু সব সময় যদি ঈশ্বরের সাহায্য না আসে! স্ত্রী কোথায়, ছেলে কোথায়, সংসার কোথায়, আর কোথায় সে! তার কিছু হলে কেউ তো জানতেও পারবে না! এটা আহমদ মুসা জানে, তার পরিবারও জানে। তাহলে কেমন করে ওরা সহ্য করছে এটা্ নিজেদের স্বার্থ তো কিছু নেই। একটা অচেনা, অজানা বিদেশি এক পরিবারের জন্যে এ কত বড় এক আত্নত্যাগ! ব্রুনা ও আলদুনি সেনফ্রিড দু'জনেরই চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

'কি হলো আপনাদের? চোখে অশ্রু কেন? আমাদেরই তো জয় হয়েছে। আলদুস আলারীর কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছি। এতদিন অন্ধকারে ঘুরছিলাম, তার কাছ থেকে কিছু আলো পেয়েছি। অশ্রু কেন এ সময় আপনাদের চোখে?' আহমদ মুসা বলল।

'মি. আহমদ মুসা, কাল রাতে আপনার যদি কিছু হতো, তাহলে কিভাবে খবরটা দিতাম আপনার স্ত্রীকে, আপনার পরিবারকে! খুব অপরাধী মনে হচ্ছে আমাদের। আমাদের মত এক অনাত্নীয়ের জন্যে বার বার কেন মৃত্যুর মুখে গিয়ে দাঁড়াবেন?' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।অশ্রু ভেজা তার কথাগুলো।

'ও, এই কথা! আপ্নারা আমার অনাত্নীয় কে বলল?' আহমদ মুসা বলল।

'আপনার সাথে আমাদের কোন রক্তের সম্পর্ক নেই, অন্য ধরনের কোন পারিবারিক সম্পর্কও নেই, কেন আপনি আমাদের জন্যে বার বার মৃত্যুর মুখে গিয়ে দাঁড়াবেন?' বলল সেনফ্রিড।

হো হো করে হেসে উঠল আহমদ মুসা। বলল, 'রক্তের সম্পর্ক নেই? বলন তো আদম হাওয়া মানে অ্যাডাম-ইভ আপনাদের কে? বাব-মা নয়? হ্যাঁ, বাবা-মা। আর ওরা আমারও বাবা-মা।'

'মি. আহমদ মুসা, এটা দার্শনিক যুক্তির কথা। বাস্তবে এটা আমরা কেউ মানি না।' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

'মি. আলদুনি সেনফ্রিড, মানা না-মানা ভিন্ন কথা, সম্পর্কটা তো সত্য। সম্পর্কটা যদি কেউ মানে তাহলে তো কারও আপত্তি থাকার কথা নয়।'

চোখ ভরা পানি থাকলেও ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল ব্রুনার। বলল, 'আপনার যুক্তি-বুদ্ধির অভাব নেই। আপনি ও ভাবী দু'জনেই সাধারণের অবস্থান থেকে অনেক উপরে। কিন্তু ভাইয়া, আমরা অসাধারণ নই। আমাদের নিজেদেরকে খুবই স্বার্থপর, অপরাধী বলে মনে হচ্ছে। আমরা যখন রাতে নরম বিছানায় সুখনিদ্রা উপভোগ করছিলাম, তখন আপনি মৃত্যুর মুখে লড়ছিলেন এবং তা আমাদের জন্যে।'

গাম্ভীর্য নেমে এল আহমদ মুসার চোখে-মুখে। বলল, 'নিছক আবেগের কথা বলছ ব্রুনা, বাস্তবতা এটা নয়। মানুষ মানুষের জন্যে কাজ করবে, এটাই মানুষের সংস্কৃতি। একজন অভাবগ্রস্ত হবে, আরেকজন তার পাশে গিয়ে দাঁড়াবে- এটাই মানুষের আবহমান সংস্কৃতি। একজন বিপদগ্রস্ত হবে, আরেকজন বিপদ উত্তরণে সাহায্য করবে, মানুষের এই সংস্কৃতি চলে আসছে মানুষ এই পৃথিবীতে আসার সময় থেকে। কত মানুষ মানুষের জন্যে, মানুষের কল্যাণে বিনিদ্র রজনী কাজ করছে, অন্য মানুষরা তা জানেই না। এটাই হলো মানুষের স্বত:প্রবহমান সংস্কৃতি। মানুষ অকাতরে মানুষের জন্য জীবন দেয়। মানুষের এই সংস্কৃতি চলে আসছে মানুষের গোটা ইতিহাস ধরে। এই সংস্কৃতি যদি পাল্টে দাও, মানুষের সমাজ নামে কোন কিছু আর থাকবে না। প্রকৃত বিষয় হলো আমি ব্রুনাকে সাহায্য করছি না, আমি মি. সেনফ্রিডকেও সাহায্য করছি না। আমি সাহায্য করছি মানুষকে। এটা আমার অধিকার। আবার মানুষের স্রষ্টা যিনি তার দেয়া দায়িত্বও এটা।'

আলদুনি সেনফ্রিড ও ব্রুনা দু'জনেরই চোখ আবার অশ্রুতে ভরে গেছে, কিন্তু সেই সাথে তাদের মুখ আনন্দের রঙে উজ্জ্বল। আলদুনি সেনফ্রিড কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল, কিন্তু তার আগেই ব্রুনা কথা বলে উঠল। বলল, 'আপনি ঠিক

বলেছেন স্যার। কিন্তু এই মানুষকে বড় বেশি তো দেখা যায় না। তাই ভুল হয়, আমরা ভুল করি।'

'না, ব্রুনা, মানুষের প্রতি আস্থাহীন হয়ো না। প্রতিটি মানুষই এই মানুষ। পরিবেশ-পরিস্থিতি, অন্যায়-অবিচার, অনাদর-অবহেলা অনেক সময় তাদের গায়ে অমানুষের পোশাক পরায়। কিন্তু এরাও ঠিক সময়ে জেগে ওঠে। এরাও মানুষের কল্যাণে কাজে লাগে। মানুষকে রক্ষার কাজে জীবন বাজি রেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আল্লাহ প্রত্যেক মানুষকে মানুষ করেই সৃষ্টি করেছেন।' বলল আহমদ মুসা।

'স্যরি মি. আহমদ মুসা। আমরা স্রষ্টার পরিচয় যেমন ভুলে গেছি, তেমনি মানুষের পরিচয়ও আমি আমরা হারিয়ে ফেলেছি। ধন্যবাদ আপনাকে। এখন প্লিজ বলুন, আলদুস আলারীর কাছে আপনি কি তথ্য পেয়েছেন। তাকে কি আপনিই বাড়ি থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, মি. সেনফ্রিড। তার কাছ থেকে কয়েকটা মূল্যবান ক্লু পেয়েছি। আসলেই বেচারা ওদের সম্পর্কে কিছু জানে না। ব্ল্যাক লাইট তাকে ব্যবহার করেছে মাত্র।'

'কেমন ক্লু পাওয়া গেছে?' বলল সেনফ্রিড।

'দু'টো টেলিফোন নাম্বার পাওয়া গেছে। সম্ভবত 'অ্যারেন্ডসী'র একটা বাড়ির নাম্বার পাওয়া গেছে। আর 'হ্যাটটপ ট্যানেল প্যালেস', 'লেক প্যালেস' নামে দু'টো বা একটা বাড়ির নাম পাওয়া গেছে। বাড়ির নাম্বারটা এই বাড়িরও হতে পারে।' আহমদ মুসা বলল।

'তথ্যগুলো তো ভালো মনে হচ্ছে মি. আহমদ মুসা।' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

'খুবই গুরুত্বপূর্ণ মি. সেনফ্রিড। আমি মনে করি, তথ্যগুলো আমাদের খুবই সাহায্য করবে।' আহমদ মুসা বলল।

'ঈশ্বর সহায় হোন।' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

'ভাইয়া, আপনি নাস্তা করেছেন?' বলল ব্রুনা।

‘হ্যাঁ, আজ ৭টার মধ্যে নাস্তা সেরেছি। এসব তোমাকে চিন্তা করতে হবে না।’

ব্রুনাকে কথাগুলো বলে আলদুনি সেনফ্রিডের দিকে চেয়ে বলল, ‘তাহলে হসপিটালের বেডে রোগী হয়ে শুয়ে থাকার সময় আপনার শেষ মি. সেনফ্রিড। আজ ১২টার মধ্যেই হাসপাতাল ছাড়বেন।’

খুশি হলো ব্রুনা ও ব্রুনার বাবা আলদুনি সেনফ্রিড দু’জনেই।

‘এবার কোথায় আমরা যাচ্ছি মি. আহমদ মুসা?’ জিজ্ঞাসা আলদুনি সেনফ্রিডের।

‘সেই অরিজিন্যাল ডেস্টিনেশন, অ্যারেন্ডসীতে, মি. সেনফ্রিড।’

বলেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘ওদিকে একটু যাই, ১২টার মধ্যেই রিলিজের ব্যবস্থা করতে হবে।’ উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা।আহমদ মুসা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আহমদ মুসার বেরিয়ে যাওয়ার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়েছিল আলদুনি সেনফ্রিড। এক সময় সে বলে উঠল, ঈশ্বর মন ভালো মানুষ এখনকার দুনিয়ায় সৃষ্টি করেছেন, না দেখলে বিশ্বাস হতো না ব্রুনা।’

‘শুধু ভালো মানুষ নন বাবা, ওর ব্যাক্তিত্ব পাথরের চেয়েও শক্ত বাবা। তোমাকে বলি বাবা, প্রথম দিনের ঘটনা থেকেই ওকে আমার ভালো লাগে। তারপর ওকে চাইতে শুরু করেছিলাম। একদিন গভীর রাতে বাবা আমি ওর ঘরে গিয়েছিলাম। ওকে প্রপোজ করেছিলাম। তিনি খুব কঠোর হয়েছিলেন আমার প্রতি। বকেছিলেন আমাকে। আমি খুব কেঁদেছিলাম। পরে উনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, ‘আমি তোমার বড় ভাই হলে খুশি হতে পার না ?’ সত্যি বড় ভাইয়ের মতই কথাগুলো ছিল। আমার মনের দুঃখ , বেদনা সব মুছে গিয়েছিল। সেই থেকেই আমি ওকে ভাইয়া বলে ডাকি বাবা।’ বলল গম্ভীর ভারি কন্ঠে ব্রুনা।

‘আমি শুনেছি, মুসলমানরা সাধারণভাবে চরিত্রবান হয়। আহমদ মুসা আরও বড় ব্যাতিক্রম।’
বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

ব্রুনা উত্তরে কোন কথা আর বলল না। সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজেছে সে। আলদুনি সেনফ্রিডও উঠে তার বিছানায় গেল।

অনেকক্ষণ সবর থাকার পর নীরবতায় ছেয়ে গেল ঘরটা।

# ৫

‘চারজন মারা গেছে, সেটা জানি ডরিস ডুগান। আমি জানতে চাচ্ছি কে মারল তাদের, কেমন করে মারল। কেন এটা ঘটল? ঐ চারজন তো ছিল আমাদের এলিট বাহিনীর অংশ। ওরা এভাবে বেঘোরে মারা যাবার কথা নয়।’ বলল ব্ল্যাক লাইটের প্রধান ব্ল্যাক বার্ড।

তার সামনে মাথা নিচু করে বসেছিল ডরিস ডুগান। ব্ল্যাক লাইটের অপারেশন চীফ।

আর টেবিলের অন্য পাশে ব্ল্যাক বার্ডের ডান দিকে বসেছিল গেরারড গারভিন। সে ব্ল্যাক বার্ডের বহুদিনের বিশ্বস্ত একজন উপদেষ্টা। সে জার্মানীর একজন শীর্ষস্থানীয় সিচুয়েশন এ্যানালিষ্ট। আজ ব্ল্যাক বার্ডের যে সফলতা ও সমৃদ্ধি, তার সাথে জড়িয়ে আছে গেরারড গারভিনের অবদান। ব্ল্যাক বার্ড থামলে ডরিস ডুগান মাথা নিচু রেখেই বলল, ‘আমরা হামবুর্গে যথেষ্ট নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিয়েছিলাম এবং আলদুস আলারীকে ভালোভাবে সাবধানও করা হয়েছিল। আলদুসের স্ত্রী বলেছেন, আমাদের ওঁৎ পেতে থাকাও সঠিক ছিল। আলদুসের সন্ধানে আসা লোকটিকে ঠিক সময়ে ঘেরাও করেছিল আমাদের লোকেরা। কিন্তু গুলিতে আহত হয়েও আমাদের চারজন লোককে হত্যা করে লোকটা আলদুস আলারীকে ধরে নিয়ে পালাতে সমর্থ হয়। এটা একটা অস্বাভাবিক ঘটনা।’ বলল ডুরিন ডুগান।

‘ডরিন ডুগান, ওরা এ পর্যন্ত যা ঘটিয়েছে, সবই ছিল অস্বাভাবিক। এই অস্বাভাবিক ঘটনা তাহলে ঘটেই চলবে? গতকাল হামবুর্গ ঘটেছে, আগামীকাল কি অ্যারেন্ডসীতেও এটা ঘটবে? কি আশ্চর্য, একজন মানুষ কিভাবে এই অসাধ্য সাধন করে চলেছে? সে কি করে আলদুস আলারীর সন্ধান পেল, ভাবতেও তো আমার বিস্ময় বোধ হচ্ছে।’ বলল ব্ল্যাক বার্ড। তার চোখে-মুখে হতাশা ও উদ্বেগের চিহ্ন।

‘ব্যর্থতা নিয়ে মন খারাপ করার সময় এটা নয় লিডার। ডরিন ডুগান ঠিকই বলেছে, আপনাদের চেষ্টা ও সাবধানতায় কোন ত্রুটি ছিল না। আসলেই সে অস্বাভাবিক অসাধারণ মানুষ। যে কোন পরিস্থিতিতে সে জয়ী হয়ে চলেছে।’ বলল গেরারড গারভিন।

‘তাহলে বল কি করনীয়? তাকে ঠেকানোর উপায় কি?’ ব্ল্যাক বার্ড বলল।

‘তার আলদুস আলারীর সন্ধান পাওয়া সত্যিই বিস্ময়ের। এই ঘটনা বলে দিচ্ছে, হামবুর্গ হাসপাতালে আলদুনি সেনফ্রিডের স্ত্রী কারিনা কারলিনকে কিডন্যাপ করে তার জায়গায় একই চেহারার আরেকজনকে সেট করা হয়েছে, এটা তারা জেনে ফেলেছে। তার মানে সবচেয়ে বড় তথ্যই তারা জেনে ফেলেছে। ক্লোন করার বিষয়টাও তারা জেনে ফেলতে পারে। আর...।’

গেরারড গারভিনের কথার মাঝখানেই ব্ল্যাক বার্ড বলে উঠল, ‘কিন্তু এটা কি করে সম্ভব? আমরা কয়েকজন এবং আলদুস আলারী ছাড়া আর কেউ এটা জানে না। প্রমাণ হলো, আলদুস আলারীর কাছ থেকে তারা কিছু জানেনি, জানলে এখন তাকে তাদের ধরে নিয়ে যাবার দরকার হতো না। তাহলে কি করে জানবে। অলৌকিকত্ব বলতে কোন জিনিস নিশ্চয় নেই?’

‘তা ঠিক। কিন্তু যেভাবেই হোক জানতে পেরেছে। এখন প্রশ্ন এসে দাঁড়ায় হামবুর্গের হাসপাতালের সন্ধান পেলে তারা অ্যারেন্ডসীর সন্ধান পাবে না কেন? আচ্ছা, আলদুস আলারীকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে, তার কাছ থেকে নিশ্চয় কথা আদায় করতে চায়। সে আপনাদের মানে অ্যারেন্ডসী সম্পর্কে কতটুকু জানে?’ বলল গেরারড গারভিন।

‘অ্যারেন্ডসী’ সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। তার সামনে কখনও এসব বিষয়ে কোন আলোচনাই হতো না। হসপিটালের ঐ ঘটনা ছাড়া সে কিছুই জানে না, এমনকি কারও নামও সে জানে না।’ বলল ডরিস ডুগান।

‘গুড। তাহলে তাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে তারা কোন লাভ করতে পারবে না। সে যাই হোক, আমি মনে করি, এখন ধরে নিতে হবে যে, তারা অ্যারেন্ডসীকেও জেনে ফেলেছে এবং অ্যারেন্ডসী’তে তারা আসবে। এটা ধরে নিয়েই আমাদের যা করা দরকার করতে হবে।’ বলল গেরারড গারভিন।

‘আমি মনে করি আসল কাজটা দ্রুত সেরে ফেলা দরকার। কারিনা কারলিন বেঁচে থাকাটাই আমাদের জন্যে উদ্বেগের। কিন্তু আমরা চাচ্ছিলাম তার স্বামী ও মেয়েকে হাতে পাওয়ার পর এক সাথে সব শেষ করব। সব ঝামেলা চুকে যাবে। কিন্তু তার স্বামী ও ছেলে তো এখন নকল আহমদ মুসার আশ্রয়ে। তাদের তো আমরা পাচ্ছি না। এই অবস্থায় ঐ দু’জনের আর অপেক্ষা করে লাভ নেই। আমাদের বিন্দী ব্রিজিটি মানে নকল কারিনা কারলিনকে দিয়ে স্টেট হস্তান্তরের ব্যবস্থাটা অবিলম্বে করতে হবে। তারপর আসল কারিনা কারলিনকে সরিয়ে দিলে আমাদের বড় উদ্বেগ কেটে যায়।’ বলল ব্ল্যাক বার্ড।

‘এই কাজের কত দূর কি হলো? যে সব প্রস্তুতির কথা বলেছিলেন তা শেষ হয়েছে কি না?’ গেরারড গারভিন বলল।

‘হস্তাক্ষর মোটামুটি হয়েছে। কিন্তু ফিংগার প্রিংটের প্রস্তুতি শেষ হয়নি, আরও কিছুদিন দরকার। এই জন্যে ঠিক করেছি, আসল কারিনা কারলিনের ফিংগার প্রিন্ট নেয়া হবে দলিলে। সেটাকেই জজ সাহেব তার সামনে টিপসই দেয়া হয়েছে বলে মেনে নিবেন। জজ সাহেবকে টাকার লোভ এবং প্রাণের ভয় দু’টোই দেখানো হয়েছে। তাঁর মত আজ জানা যাবে। উনি রাজি হলে দু’দিনের মধ্যে দলিল রেজিস্ট্রি হয়ে যাবে।’ বলল ব্ল্যাক বার্ড।

‘গুড, কাজ তো সহজ করে ফেলেছেন। দলিলটা হয়ে গেলেই আমরা কারিনা কারলিনকে শেষ করে অ্যারেন্ডসী’র পাঠ চুকিয়ে সবাই সরে পড়তে পারব।’ গেরারড গারভিন বলল।

‘হ্যাঁ, গারভিন, জজ সাহেবের সম্মতি পেলেই কাজটা সম্পন্ন হবে। কারিনা কারলিনের স্টেটটা তো আগেই হাতে এসে গেছে। এখন দলিল সম্পন্ন ও কারিনা কারলিনের সদগতি করেই লম্বা ছুটিতে যাব আমরা। তারপর সব অনুসন্ধান ও গন্ডগোল মিটে গেলে মানে নকল আহমদ মুসার উপদ্রব শেষ করে ফিরে আসব। এভাবে এ পর্যন্ত সাতটা স্টেট আমাদের দখলে এসেছে। দক্ষিণ জার্মানীর লোভনীয় সব স্টেট আমি চাই।’ বলল ব্ল্যাক বার্ড।

এ সময় ব্ল্যাক বার্ডের বাম পাশের সাদা টেলিফোনটা থেকে নীল সংকেত আসতে লাগল।

পিএস হিংগিস্টের টেলিফোন।

ব্ল্যাক বার্ড ইন্টারকমের বোতাম টিপে বলর, ‘হ্যাঁ, হিংগিস্ট বল কি খবর? বরিস ফ্রেডম্যান কোন খবর দিয়েছে?’

‘জি স্যার, এই মাত্র টেলিফোন করে তিনি জানালেন, জজ সাহেব বিষয়টা মেনে নিয়েছেন। পরশুদিন সকাল ১০টায় দলিলের কাজ করার সময় ঠিক হয়েছে।’ বলল হিংগিস্ট ওপার থেকে।

‘ধন্যবাদ হিংগিস্ট।’ বলে ইন্টারকম অফ করে দিল ব্ল্যাক বার্ড।

‘আপনার বড় কাজ তো হয়ে গেল লিডার। এখন নিখুঁতভাবে কাজটা গুটিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করুন।’ বলল গেরারড গারভিন ব্ল্যাক বার্ড কিছু বলার আগেই।

‘হ্যাঁ গারভিন। দলিলটার খসড়া হয়ে গেছে। আমি যাচ্ছি বনে দলিলটা চুড়ান্ত করার জন্যে। কাল সকালে ফিরেই ওতে দস্তখত ও টিপসই নিয়ে নেব কারিনা কারলিনের। তুমি কি যাবে আমার সাথে গারভিন?’ ব্ল্যাক বার্ড বলল।

‘অসুবিধা নেই। বললে অবশ্যই যাব। আমি চাই তাড়াতাড়ি হোক কাজটা।’ বলল গেরারড গারভিন।

‘ধন্যবাদ!’ বলল ব্ল্যাক বার্ড ডরিন ডুগানের দিকে চেয়ে বলল, ‘তুমি ঘন্টাখানেক পরে এস। আমাদের ইস্টাবলিশমেন্টের সিকুরিটি নিয়ে তোমার সাথে কিছু কথা বলব।’

‘ইয়েস স্যার।’ বলে ডরিন ডুগান উঠে দাঁড়াল।

গেরারড গারভিনও উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, ‘আমিও উঠি লিডার। ফ্লাইটের ডিটেইলটা যেন আমাকে জানায়। আমি রুমেই থাকব।’

গেরারড গারভিন এবং ডরিন ডুগান বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

কুইন অ্যারেন্ডসী জেটির অল্প সামনে দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে বিলম্বিত সালজওয়াডেল স্ট্রিট। এই স্ট্রিটের পশ্চিম পাশে ১৬ তলা কুইন অ্যারেন্ডসী

হোটেল। হোটেলের ১২ তলায় একটা স্যুট ভাড়া নিয়েছে আহমদ মুসারা।স্যুটে দু'টি বেড রুম, একটা ডাইনিং এবং একটা বড় লাউঞ্জ ড্রইং। ডাইনিং-এর পাশে রয়েছে সুন্দর ছোটখাট একটা কিচেন। কেউ চাইলে এখানে রান্না বা কিছু গরম করে খেতে পারে।

লাউঞ্জ ড্রইংটাই স্যুটের প্রধান আকর্ষণ। এটা হোটেলের পশ্চিম প্রান্ত ঘেঁষে। লাউঞ্জের এ প্রান্তে বসে অপরুপ অ্যারেন্ডসী হ্রদের গোটাটাই দেখা যায়। লেকের পশ্চিম প্রান্তটা এখান থেকে অনেকটাই স্পষ্ট।

স্যুটটা ভাড়া হয়েছে ব্রুনার বাবা আলদুনি সেনফ্রিডের নামে। আলদুনি সেনফ্রিডের ড্রাইভার পরিচয়ে আহমদ মুসা ও স্যুটে থাকছে। আর ব্রুনার জন্যে নেয়া হয়েছে দুই কক্ষ পরে আরেকটা রুম। ব্রুনা আলাদাভাবে এসে আলাদাভাবেই রুমটি ভাড়া নিয়েছে। ব্ল্যাক লাইটের চোখ ফাঁকি দেয়ার জন্যেই এই ব্যবস্থা।

রাতরে খাওয়া হয়ে গেছে। এ্যাটেন্ড্যান্ট এসে বাসন-কোসন নিয়ে যাবার জন্য গুছাচ্ছিল। তখন দরজায় নক হলো। বয় গিয়েই দরজা খুরে দিল।

দরজায় দু'জন লোক দাঁড়িয়ে। বলল বয়কে, 'আমরা সার্ভে করছি হোটেলগুলো গোয়েন্দা বিভাগ থেকে। এই স্যুটে কয়জন বাসিন্দা থাকে?'

'দু'জন। একজন বোর্ডার মানে মালিক। আরেকজন ড্রাইভার।' বলল বয় ছেলেটা।

'কোন দেশি?' জিজ্ঞাসা সেই দু'জনের এক জনের।

'মালিক জার্মান আর ড্রাইভারও জার্মান। কিন্তু জাতিতে শিখ।' বলল বয়।

'শিখ? তাদের সাথে আর কেউ নেই?' বলল সেই লোকরা।

'না, এরা দু'জনই এসেছেন হোটেলে।' বলল বয় ছেলেটা।

'আচ্ছা, ঠিক আছে, ধন্যবাদ।' বলে লোক দু'জন চলে গেল।

'বয় ছেলেটা ফিরে এল। স্বগতই বলল, 'অ্যারেন্ডসীতে এসব ছিল না। এখানেও শুরু হলো দেখছি। রেজিস্টার দেখলেই তো সব জানতে পারে, রুমে রুমে এসে ডিস্টার্ব করা কেন?'

‘তুমি ঠিক বলেছ। যেটা এক জায়গায় বসেই করা যায়, সেটার জন্যে রুমে রুমে জ্বালাতন তো ঠিক নয়।’ আহমদ মুসা বলল।

‘স্যার, ওরা মনে হয় গোয়েন্দা-টোয়েন্দা কেউ নয়, অন্য কোন হোটেল পক্ষের লোক হতে পারে স্যার।’

বলতে বলতে বয় বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। মুখ-হাত ধুয়ে ডাইনিং-এ ফিরে এল আলদুনি সেনফ্রিড। বলল, ‘আসলে কে ছিল ওরা?’

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘আমার তো মনে হয় মরিয়া হয়ে ওঠা ব্ল্যাক-লাইটরাই এই অনুসন্ধানে নেমেছে। দেখলেন না, নন-ইউরোপিয়ান শিখ-এর কথা শুনেই ওরা একটু চমকে উঠেছিল। জিজ্ঞাসা করছিল আমাদের সাথে আর কেউ আছে কি না?’

‘ঠিক মি. আহমদ মুসা। এ না হলে ওরা আমাদের সাথে আর কেউ আছে কি না তা জানতে চাইবে কেন? ব্রুনাকে আমাদের সাথে না রাখার আপনার সিদ্ধান্তটা সঠিক হয়েছে।’ বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলর, ‘যাই মি. আলদুনি সেনফ্রিড, একটু কাজ সারি।’

আহমদ মুসা ল্যাপটপে অ্যারেন্ডসীর গুগল চিত্রটা সামনে নিয়ে এল। হ্রদের চারদিকে আবাসিক এলাকার অবস্থান, জংগল এরিয়া, রাস্তাগুলোর গতি-প্রকৃতি, জেটিগুলোর স্থান, সব কিছুই গভীর দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করলো আহমদ মুসা। আলদুস আলারীর কাছে থেকে পাওয়া ‘৪৯০-এর সি’ বাড়িটা কোনটা? অ্যারেন্ডসীতর চারদিক ঘিরে যে রাস্তা রয়েছে, তাতে ৪৯০ একটিই রয়েছে। কিন্তু ৪৯০ এটা অ্যারেন্ডসী থেকে বিচ্ছিন্ন বাজার এলাকার বাসস্ট্যান্ডের একটা ‘রোড শপে’র নাম্বার। আর তাতে এবিসি ইত্যাদির মত কোন এক্সটেনশন নেই। তাহলে এটা ভুয়া নাম্বার? প্রাচীন ইউরোপ অংকগুচ্ছের সংখ্যামাণ দিয়েও ধাঁধাঁ তৈরি করা হতো। ৪৯০-এর সংখ্যা মানের সিরিয়াল যোগফল হলো ১৩০, তাহলে ১৩০ এবিসি কি আমাদের টার্গেট হতে পারে? গুগলে হ্রদের চারদিকের রাস্তার অবস্থান দেখে আহমদ মুসা নিশ্চিত হলো, ১৩০ নাম্বারটি হ্রদের পশ্চিম তীরের মাঝামাঝি কোথাও হবে। কিন্তু গুগল চিত্রে খুঁটেখুঁটে দেখেও ১৩০ নাম্বার পেল না।

আহমদ মুসা অন্যান্য ক্লু'র দিকে নজর দিল। ক্লুগুলোর মধ্যে রয়েছে 'হ্যাটটপ ট্যানেল প্যালেস' ও 'লেক প্যালেস'। 'লেক প্যালেস' বলতে হ্রদের তীরের কোন বাড়িকে বুঝানো হতে পারে। এর মধ্যে কোন অস্পষ্টতা নেই। কিন্তু 'হ্যাটটপ ট্যানেল প্যালেস' অর্থ কি? ট্যানেলেই তো ট্যানেলই -ঠিক আছে। কিন্তু হ্যাটটপ-এর তাৎপর্য কি? হ্যাটটপ ট্যানেলের সরলার্থ দাঁড়ায় 'হ্যাটটপ' জায়গায় ট্যানেল অথবা হ্যাটটপ-এর মত ট্যানেল। এ দু'টি অর্থের কোনটিকে গ্রহণ করা হয়েছে? হ্যাটটপ-এর মত কি ট্যানেল হতে পারে? ট্যানেল তো হয় লম্বা-অর্থ দাঁড়ায় যোগাযোগের মাধ্যম, হ্যাটের মত বন্ধ মুখ তো হয় না। হ্যাটের মত কিছু হলে সেটা হবে খন্দক, গর্ত-ট্যানেল তো হয় না। এটা কোন বাড়ির নাম হতে পারে অথবা লেক প্যালেসেরই এটা আরেক নাম হতে পারে।

আহমদ মুসা যখন এই জটিল চিন্তায় নিমজ্জিত, তখন ব্রুনা ও তার বাবা আলদুনি সেনফ্রিড তার পাশে এসে বসেছিল। কিন্তু আহমদ মুসা টের পায়নি। তারা কেউ কথা বলেনি। ধ্যানমগ্নের মত চিন্তায় নিমজ্জিত আহমদ মুসাকে তারা জাগাতে চায়নি। নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ কিছু ভাবছে সে।

পল পল করে সময় বয়ে যায়। হঠাৎ আহমদ মুসা ল্যাপটপ বন্ধ করে রাখতে গিয়ে তার নজর পড়ল ব্রুনা ও আলদুনি সেনফ্রিডির উপর।

'আরে! আপনারা কখন এলেন, ব্রুনা কখন এল আমাদের স্যুটে?' বলল আহমদ মুসা।

'আমরা দশ মিনিট হলো এসে বসে আছি ভাইয়া।' ব্রুনা বলল।

'স্যরি, আমি একটা বিষয় নিয়ে ভাবছিলাম। খেয়াল করতে পারিনি। স্যরি।' আমহদ মুসা বলল।

'স্যরি নয়। কোন ভাবনার মধ্যে ডুবে আছেন দেখে আমরা কিছু বলিনি।' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

'এতবড় কি ভাবনা ভাইয়া?' ব্রুনা বলল।

'ভাবনাটা বড়ই। আচ্ছা ব্রুনা, কোন স্থানের লোকেশন ইন্ডিকেট করতে গিয়ে যদি বলা হয় হ্যাটটপ ট্যানেল প্যালেস, তাহলে তার অর্থ কি দাঁড়াবে?' বলল আহমদ মুসা।

'হ্যাটটপ ট্যানেল প্যালেস। মানে হ্যাটটপের মত ট্যানেল বা ট্যানেলটা হবে হ্যাটটপের মত।' এই তো অর্থ দাঁড়ায়।

'কিন্তু হ্যাটটপের মত হলে তা ট্যানেল হবে না। হ্যাটটপ তো ক্লোজড। ট্যানেল তো ক্লোজড হবে না। ট্যানেলের দুই মাথাই উন্মুক্ত কোন কিছুর সাথে যুক্ত থাকবে।' বলল আহমদ মুসা।

'ঠিক বলেছেন ভাইয়া, তাহলে হ্যাটটপ ট্যানেলের অর্থ কি দাঁড়াবে?' বলে ভাবতে লাগল ব্রুনা।

'দেখ তো ব্রুনা, হ্যাটটপ-এর মত জায়গায় ট্যানেল বা বাড়ি এই অর্থটা কেমন হয়?' বলল আহমদ মুসা।

'ঠিক ভাইয়া, এই অর্থটাই অ্যাপ্রোপিয়েট। হ্যাটটপের মত জায়গায় ট্যানেল বা বাড়ি এটাই সঠিক অর্থ ভাইয়া। কিন্তু বিষয়টা কি ভাইয়া?' ব্রুনা বলল।

'আলদুস আলারীর কাছ থেকে ব্ল্যাক লাইটের যে ক্লুগুলো পেয়েছিলাম, তার মধ্যে এটাও আছে। তাই এর অর্থ সন্ধান করছি। এর অর্থ পাওয়া খুবই জরুরি।' বলল আহমদ মুসা।

'তখন বলেছিলেন বাড়ির নাম্বারও পেয়েছিলেন। সেটাই তো সবচেয়ে সোজা কোন বাড়ি খুঁজে বের করার জন্য।' ব্রুনা বলল।

'সে নাম্বার নিয়েও ধাঁধায় পড়েছি। ওটা অ্যারেন্ডসীর পশ্চিমের একটা বাজার এলাকার আন্তনগরী বাসস্ট্যান্ডের একটা 'রোড শপে'র নাম্বার। ভেবে দেখেছি ওটা ব্ল্যাক লাইটের হতে পারে না।' বলল আহমদ মুসা।

'ভুয়া নাম্বার তাহলে ওটা?' ব্রুনা বলল।

'ভুয়া হতে পারে, আবার আসল নাম্বারও এর মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারে।' বলল আহমদ মুসা। বলে আহমদ মুসা ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল ব্রুনাকে।

'হ্যাঁ ভাইয়া, একটা রুপকথায় আমি অংকের সংখ্যামাণ দিয়ে ধাঁধার কথা পড়েছি। তাহলে ১৩০ তো হতে পারে ঐ বাসার বা বাড়ির নাম্বার।' ব্রুনা বলল।

কিন্তু সার্চ করে ১৩০ নাম্বারের কোন কিছু পেলাম না গুগলে। হতে পারে এ নাম্বারটা উল্লেখযোগ্য কোন কিছুর নয়। তাই গুগলে আসেনি। তবে নাম্বারটা অ্যারেন্ডসী হ্রদের পশ্চিম তীরের কোন এক জায়গার হতে পারে।'

কথাটা বলেই আহমদ মুসা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। পাশ থেকে ল্যাপটপ টেনে নিয়ে অ্যারেন্ডসীর স্যাটেলাইট ভিউ বের করল। বড় করে ছোট করে ভিউটাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করল। ভিউটাকে ব্রুনা ও আলদুনি সেনফ্রিডের সামনে ধরে বলল, 'দেখুন তো, অ্যারেন্ডসীকে হ্যাট-সাইজের মনে হচ্ছে না?'

ব্রুনা ও তার বাবা আলদুনি সেনফ্রিড গভীর মনোযোগের সাথে দেখছে অ্যারেন্ডসী হ্রদের স্যাটেলাইট ভিউটা।

ব্রুনা চিৎকার করে বলে উঠল 'চমৎকার! চমৎকার!! অ্যারেন্ডসীর আকার সুন্দর একটা হ্যাটের মত।'

'এবং হ্যাটটপটা পশ্চিম উপকূলের মাঝ বরাবর।' আহমদ মুসা বলল।

'ঠিক বলেছেন ভাইয়া, হ্যাটটপটা ঠিক পশ্চিম উপকুলের মাঝ বরাবর।' বলল ব্রুনা।

'তার অর্থ হলো, 'হ্যাটটপ ট্যানেল প্যালেস' ওখানেই পাওয়া যাব্।

এখন একটাই সমস্যা থাকলো এবং তা হলো 'লেক প্যালেস' কোথায় তা বের করা।' আহমদ মুসা বলল।

'লেখ প্যালেস কি?' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

'আমি জানি না। এ নামটাও পেয়েছি আলদুস আলারীর কাছ থেকে।' আহমদ মুসা বলল।

'এখন তাহলে কি পরিকল্পনা? কি করতে চাচ্ছেন আপনি?' জিজ্ঞাসা আলদুনি সেনফ্রিডের?

'আমি আজ এগারটায় বেরুব। যে ক্লুগুলো পাওয়া গেছে তা পরখ করে দেখার চেষ্টা করব। ঘটনা কোথায় নিয়ে যায় দেখা যাক।' আহমদ মুসা বলল।

'আপনি একা বেরুবেন?' জিজ্ঞাসা ব্রুনার। তার চোখে-মুখে ভাবনার প্রকাশ।

'একা নয়।' আহমদ মুসা বলল।

‘একা নয়? সাথে থাকবে কে তাহলে? আমি বাবা, আমরা নিশ্চয়ই নই?’ বলল ব্রুনা।

‘না।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তাহলে কে?’ ব্রুনাই বলল।

‘আল্লাহ, আমার স্রষ্টা ও আমার অভিভাবক।’ আহমদ মুসা বলল।

ব্রুনা, আলদুনি সেনফ্রিড কেউ কথা বলল না। তার চোখে-মুখে বিস্ময়।

আনন্দ-উজ্জলতার অপূর্ব মিশ্রণ সেখানে। তাদের স্থির দৃষ্টি আহমদ মুসার উপর নিবদ্ধ।

‘এই জন্যেই বুঝি আপনার কোন ভয় নেই, কোন উদ্বেগ নেই?’ বলল ব্রুনা। বিমুগ্ধ তার দৃষ্টি।

‘অবশ্যই তাই।’ আহমদ মুসা বলল।

‘এই ভয়, উদ্বেগ থাকে না কেন?’ জিজ্ঞাসা ব্রুনার।

‘কেউ যদি মনে করে জীবন-মৃত্যুর মালিক আল্লাহ, অন্য কারো হাতে এটা নেই। যদি কেউ বিশ্বাস করে যে আল্লাহ যা নির্ধারিত করেছেন, তার বাইরে কিছু করার কারও ক্ষমতা নেই, তাহলে কারও মনে ভয়, কোন কিছুর জন্যে উদ্বেগ থাকার কথা নয়।’ আহমদ মুসা বলল।

‘এমন বিশ্বাস আমাদের হওয়া কি সম্ভব? সবার জন্যে সম্ভব?’ বলল ব্রুনা।

‘আল্লাহকে চেনা, তাঁর ক্ষমতা ও দয়াকে উপলব্ধি করা, তাকেঁ এবং তাঁর রাসূল স: কে মানা এই বিশ্বাস এনে দেয় ব্রুনা। আমার কথায় কি তোমার মনে নতুন উপলব্ধি আসেনি; সাহস ও শক্তি বাড়েনি? বেড়েছে। এভাবেই সেই বিশ্বাস ও বিশ্বাসের শক্তি সবার মধ্যে আসতে পারে।’ আহমদ মুসা বলল। কথা শেষ করেই আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকাল।

সংগে সংগেই আলদুনি সেনফ্রিড বলল, ‘ব্রুনা, চল আমরা যাই। মি. আহমদ মুসার বিশ্রাম হওয়া দরকার।’ বলে আলদুনি সেনফ্রিড উঠে দাঁড়াল।

ব্রুনাও উঠল। বলল, ‘ভাইয়া আপনি কি মনে করেন মাকে ওরা এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে এবং এখানেই?’ কান্না ভেজা কন্ঠ ব্রুনার।

‘নিশ্চিত নই ব্রুনা। তবে এখানেই থাকার কথা। এবং আমার এখনও নিশ্চিত ধারণা স্টেট হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত এরা তাকে জীবিত রাখবে।’ বলল আহমদ মুসা।

আল্লাহ আপনার কথা সত্য করুন। আপনাকে আল্লাহ সাহায্য করুন। আমি আল্লাহকে অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করছি। বলতে বলতে কেঁদে ফেলল ব্রুনা। কাঁদতে কাঁদতেই ঘুরে দাঁড়িয়ে চলা শুরু করল।

আলদুনি সেনফ্রিডও চলতে শুরু করল। তার মুখও বেদনায় পান্ডুর।

# ৬

অ্যারেন্ডসী লেকের পশ্চিম তীরের যে এলাকাটাকে আহমদ মুসা হ্যাটটপ বলে ধরে নিয়েছিল, সেটা জংগল ও পাহাড়ী এলাকা। অ্যারেন্ডসী হ্রদের চারদিকে ঘুরে যে সার্কুলার রোড আছে, সেই রোড হ্রদের পশ্চিম তীরে এসে এই জংগল ও পাহাড়ী এলাকার বাইরে দিয়ে গেছে। এই রোড থেকে হ্রদের কিনারা পর্যন্ত পশ্চিম তীরের এই এলাকা গোটাটাই পাহাড় জংগলে ভরা। তবে জংগল ও পাহাড়ের মধ্য দিয়ে জিগজ্যাগ অনেক পথ আছে। পথগুলো খুব সংকীর্ণ নয়। দুটি গাড়ি পাশাপাশি চলতে পারে।

বিস্মিত হল আহমদ মুসা, এই জংগল ও পাহাড়ের মধ্যে হোটেল। রেস্টহাউজ এবং প্রাইভেট বাড়িও আছে। কোনটা পাহাড়ের উপর। কোনটা উপত্যকায়। কিন্তু পুরোটাই পাহাড় জংগলে ঢাকা।স্যাটেলাইট ম্যাপে এগুলো দেখা যায়নি। আহমদ মুসার মনে আশা জাগল। তাহলে এসব বাড়ি, রেস্টহাউজ ও হোটেল কোনটার নাম্বার ১৩০ এ হতে পারে বা ১৩০ ডি হতে পারে।

আহমদ মুসা এই জংগল ও পাহাড় এলাকায় প্রবেশ করেছে উত্তর দিক থেকে। অ্যারেন্ডসী হ্রদের পশ্চিম তীরের উত্তর অংশে বেশ বড় আবাসিক এলাকা আছে। এই এলাকা পার হয়ে একটা ঝোপের আড়ালে গাড়ি রেখে আহমদ মুসা জংগল ও পাহাড় এলাকায় প্রবেশ করেছিল।

দু'পাশের ঝোপ-জংগল, পাহাড়, পাহাড়ের টিলা। এর মধ্যে দিয়ে পাথর বিছানো রাস্তা এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে।

সেই হোটেল, বাড়ি, রেস্টহাউজগুলো বেশ দূরে দূরে। জংগল ও পাহাড় ঘেরা এগুলোকে একটা করে দ্বীপ বলে মনে হয়। হঠাৎ আহমদ মুসার মনে পড়ল, জার্মানীর 'হিউম্যান হ্যাবিটেশন এনসাইক্লোপেডিয়া'-তে অ্যারেন্ডসী সম্পর্কে পড়তে গিয়ে দেখেছিল, অ্যারেন্ডসীর পশ্চিম তীরের জংগল অঞ্চলটা সরকারের সংরক্ষিত অঞ্চল। ট্যুরিজমের স্বার্থে এখানে কিছু হোটেল এবং রেস্টহাউজ করতে

অনুমতি দিয়েছে খুব উঁচু মূল্য এবং শর্তের বিনিময়ে। কিছু প্রাইভেট বাড়ি হয়েছে, কিন্তু তাদের অনেক বেশি উচ্চমূল্য দিতে হয়েছে। তবে এই সুযোগেও এখন বন্ধ হয়ে গেছে।

গাড়ি ছেড়ে আসার আগে আহমদ মুসা তার পোশাকও পাল্টে ফেলেছে। কালো জুতা, কালো প্যান্ট, কালো জ্যাকেট এবং কালো হ্যাট। ব্ল্যাক লাইটেরই পোশাক।

নি:শব্দে, কিন্তু দ্রুত হাঁটছে আহমদ মুসা।

এক জায়গায় একটা টিলার বাঁক ঘুরতেই সামনে একটা গাড়ি আসতে দেখল আহমদ মুসা। গাড়িটা শর্ট আলো জ্বেলে আসছে। লং ফোকাস থাকলে ওদের চোখে ধরা পড়ে যেত আহমদ মুসা। রাস্তার ধারে একটা ঝোপের আড়ালে সরে গেল আহমদ মুসা। ঝোপটার কাছাকাছি আসতেই গাড়ির গতি স্লো হয়ে গেল এবং ঝোপের পাশে গাড়িটা থেমে গেল। গাড়ি থেকে তিনজন নামল।

নামার সময়ই একজন বলল,'অযথা গাড়ি থামালো কেন? মানুষ এ পথে যাতায়ত করে না? করে।'

'করে, ঠিক আছে। কিন্তু সে রাস্তায় নেই কেন? লুকালো কেন?' দ্বিতীয় একজন বলল।

আহমদ মুসা বুঝল ওদের কাছে ম্যানডিটেক্টর আছে নিশ্চয়। এ জন্যই আহমদ মুসার উপস্থিতি তারা টের পেয়েছে।

আহমদ মুসা দেখল ওদের পরনেও কালো পোশাক। আপাদমস্তক কালো। ওরা তাহলে ব্ল্যাক লাইটের লোক। খুশি হলো আহমদ মুসা। আহমদ মুসা তাহলে ঠিকই এসেছে। ওদের ১৩০ নাম্বার বাড়িটা নিশ্চয় এই জংগলেই পাওয়া যাবে।

ওদের থামতে দেখেই আহমদ মুসা জ্যাকেটের পকেট থেকে রিভলবার হাতে নিয়েছিল। সাইলেন্সার ফিট করলো রিভলবারে।

দ্বিতীয় জনের কথা শেষ হতেই প্রথমজন বলল, 'এত রাত, এই জংগল, ভয়েও তো মানুষ পালাতে পারে।'

‘পারে, এটা সম্ভাবনার কথা। কিন্তু পালানোটা নিশ্চয়ই সন্দেহজনক।’ দ্বিতীয় জন বলল।

ঝোপের আড়ালে বসে আহমদ মুসাও মনে মনে বলল, ‘পালানোটা সন্দেহজনক ঠিকই ভেবেছে লোকটা। আর তার পালাবার কারণ তার গায়ের পোশাক। গাড়ির পরিচয় না জেনে এই পোশাকে সে গাড়ির মুখোমুখি হতে পারেনি। এখন প্রমাণ হচ্ছে, আহমদ মুসা পালিয়ে ঠিক করেছে।’

দ্বিতীয় জনের কথার উত্তরে প্রথম জন সাথে সাথেই বলল, ‘তাহলে এখন কি করবে? খুঁজবে? কোথায় খুঁজবে?’

‘এই ডিটেস্টর তাকে ধরিয়ে দেবে। এখন সে বাম দিকে আমাদের থেকে বিশ গজ দূরে কোন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়াও। দাঁড়ালে তার দাঁড়াবার লোকেশনও চিহ্নিত করা যাবে। রিভলবার প্রস্তুত কর তোমরা।’ বলল দ্বিতীয় জন।

‘কথা বলো না, শুনতে পেলে তো সে পালাবে।’ তৃতীয় একজন বলল।

আহমদ মুসা শুনে ফেলেছে। আহমদ মুসা মনে মনে বলল, সর্বাধুনিক ডিটেক্টর ওরা ব্যবহার করছে। এ ডিটেক্টর মানুষের লোকেশনও ‘পিন-পয়েন্ট’ করতে পারে।

আহমদ মুসা ওদেরকে রাস্তা থেকে সরিয়ে আনার জন্যে এবং নিজেকে আরও নিরাপদ করার জন্যে ঝোপের আড়াল থেকে দৌড়ে অল্প দূরে একটা বড় গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল।

‘সে আরও পূব দিকে পালাচ্ছে। যাবে কোথায়?’ বলর সেই দ্বিতীয় জন।

একটু থেমেই সে আবার বলল, ‘সে এবার চল্লিশ গজ দূরে অবস্থান নিয়েছে। এস তোমরা আমার সাথে।’

‘ও তো পালাতেই থাকবে। তাকে আমরা জানি না। কি লাভ তার পেছনে দৌড়ে?’ বলল সেই প্রথম জন।

‘পালিয়ে সে কোথায় যাবে? আর কিছু দূর এগোলেই তো লেকের পানি। আর তাকে জানি না বলেই তো তাকে জানতে হবে। এই রাতে সে কোথায় যাচ্ছে? নিজেকে আড়াল করল কেন?’ বলল দ্বিতীয় লোকটি।

সামনে টর্চের আলো ফেলে ওরা তিনজন দ্রুত এগোলো সেই গাছের দিকে। ডিটেক্টর ওদের নিখুঁতভাবে বলে দিচ্ছে আহমদ মুসা ঠিক কোথায় লুকিয়ে আছে।

আহমদ মুসা বুঝল ওরা ডেসপারেট। আহমদ মুসাকে না ধরে ওরা ছাড়বে না। আর ধরতে পারলে এই পোশাক দেখার পর তাকে তারা বাঁচিয়ে রাখবে না। সুতরাং আত্মরক্ষার জন্যে তাকে আক্রমণেই যেতে হবে এবং তা এখনই। সংগে সংগেই আহমদ মুসা নিজেকে গাছের সাথে সেঁটিয়ে রেখে মুখটাকে গাছের প্রান্তে নিয়ে ডান হাত বের করে আলোর উৎস লক্ষ্যে মেশিন রিভলবার দিয়ে একপশলা গুলি করল। গুলিবৃষ্টি একটা স্থান জুড়ে সমান্তরালে টেনে নিল।

টর্চ বন্ধ হয়ে গেছে।

আহমদ মুসা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। ওদিক থেকে গুলি এল না।

আহমদ মুসা গাছের আড়াল থেকে বেব হয়ে মাটিতে গড়িয়ে ওদের দিকে এগোলো।

ওদের কাছে পৌঁছে অন্ধকারেই বুঝল তিনটি মাটিতে পড়ে আছে।

এক হাতে রিভলবার নিয়ে অন্য হাতে ওদের টর্চটাই খুঁজে নিয়ে জ্বালল। আলো জ্বালতেই আহমদ মুসা দেখতে পেল, মৃত একজনের হাতের পাশে 'ম্যান ডিটেক্টর' মেশিনটি পড়ে আছে। আহমদ মুসা প্রথমেই ওটা তুলে নিয়ে পকেটে পুরল। এবার এই যন্ত্রটি তার সাথে নেই। তারপর টর্চের আলো ঘুরিয়ে দেখল দু'জন মারা গেছে। একজন বেঁচে আছে। সেও বুকের উপর কাঁধের নিচে গুলিবিদ্ধ হয়ে সাংঘাতিকভাবে আহত।

আহমদ মুসা তার মুখে টর্চের আলো ফেলে বলল, 'তোমরা আমার পিছু নিয়েছিলে কেন? আমি কি দোষ করেছি?'

'সন্দেহবশত এটা করা হয়েছে। আপনি না পালালে এ রকমটা হতো না।' বলল লোকটি।

'আপনি তো সাংঘাতিক আহত। এখনি কোন হাসপাতালে তো নিতে হয় আপনাকে।।' আহমদ মুসা বলল।

‘না, হাসপাতালে নয়। রাস্তায় গাড়ি আছে। গাড়িতে উঠতে পারলে বাসায় পৌঁছতে পারি।’

আহমদ মুসা তাকে ধরে তুলল। ধরে গাড়িতে নিয়ে গেল তাকে।

আহত লোকটিকে পেছনের সিটে শুইয়ে দিয়ে সামনের ড্রাইভিং সিটে বসে আহমদ মুসা বলল, ‘কোথায় পৌঁছে দেব বলুন।’

বাড়ি নং ১৩০। অ্যারেন্ডসী ডয়েসল্যান্ড হোটেলের দু’শ গজের মত দক্ষিণে হবে।’ বলর লোকটি।

‘১৩০’ নাম্বার উচ্চারিত হবার সাথে সাথেই আহমদ মুসার সারা দেহে আনন্দের একটা উষ্ণ স্রোত বয়ে গেল। মনে মনে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল আহমদ মুসা। একেবারে ওদের গাড়িতে চড়ে ওদের বাসায় যাওয়া।’

অ্যারেন্ডসী ডয়েসল্যান্ড হোটেল পার হয়ে ১৩০ নাম্বার বাড়ি পেতে কষ্ট হলো না। প্রাচীর ঘেরা বাড়ি। অবস্থান দেখে মনে হচ্ছে বাড়িটা যেন লেকের ভেতরে ঢুকে গেছে। বাড়িটা তিন তলা। পাথুরে। বাইরে থেকে খুব নিরাভরণ দেখাচ্ছে। বেশ বড় গেট। গেটে স্টিলের দরজা।

গেটের সামনে গাড়ি থামতেই লোকটি আহমদ মুসাকে বলল, ‘ গেটের পিলারে দেখুন একটা ডিজিটাল বোর্ড আছে। ওখানে আপনি প্রথমে ওয়ান থ্রি জিরো মানে ১৩০ টাইপ করুন, তারপর ১৩০-কে উল্টো করে মানে জিরো থ্রি ও ওয়ান টাইপ করুন, এরপর ১৩০-এর মধ্যখান থেকে সিরিয়ালী টাইপ করে শেষে ওয়ান টাইপ করুন। মানে থ্রি জিরো ওয়ান টাইপ করতে হবে।

আহমদ মুসা ড্রাইভিং সিট থেকে নেমে গিয়ে গেটের পিলারে ঠিক পিলার রঙের কালো একটা ডিজিটাল বোর্ড পেল। হঠাৎ পিলারের দিকে তাকালে এ বোর্ডটা দেখা যায় না। ঠিক একই ধরনের রং হওয়ার কারণে তা চোখে পড়ে না।

টাইপ শেষ হওয়ার সংগে সংগেই নি:শব্দে দরজা খুলে গেল।

আহমদ মুসা গাড়িতে ফিরে এল।

এমন অযাচিতভাবে, এমন অকল্পনীয়ভাবে ব্ল্যাক লাইটের ঘাঁটির দূর্লভ কোড জানতে পারায় আহমদ মুসা ভীষণ খুশি হলো।

আহমদ মুসা ড্রাইভিং সিটে এসে বসলে আহত লোকটি বলল,‘এবার ভেতর চলুন।’

গাড়ি স্টার্ট দিয়ে গেট পেরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল আহমদ মুসা।

গাড়ি নিয়ে ভেতরে ছোট একটা চত্বর। তারপর বড় একটা গাড়ি বারান্দা। গাড়ি বারান্দার দুই প্রান্ত দিয়ে নয় দশ ধাপের সিঁড়ি উঠে গেছে উঁচু বারান্দায়। বারান্দাটা বেশ লম্বা।

লম্বা বারান্দাটিতে তিনটি গেট। গেটগুলো একই রকম। তিনটি গেট দিয়েই বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করা যায় মনে করল আহমদ মুসা।

ভেতরে প্রবেশ করে কাউকেই দেখতে পেল না আহমদ মুসা।

গাড়ি বারান্দায় গিয়ে থেমেছে আহমদ মুসার গাড়ি।

আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে আহত লোকটি বলল, ‘আপনার নাম জানতে পারি?’

‘জো কার্লোস।’ আহমদ মুসা বলল।

‘বাড়ি কোথায়? জার্মানীতে?’ জিজ্ঞাসা লোকটির।

‘না, দক্ষিণ স্পেনে।’ বলল আহমদ মুসা।

দক্ষিণ স্পেনে বলল আহমদ মুসা এই কারণে যে, ওখানে মাল্টিকালার লোক বাস করে।

‘কোথায় যাচ্ছিলেন আপনি?’ লোকটি বলল।

‘হোটেল ডয়েসল্যান্ডে। ওখানে একজনের সাথে আমার দেখা হওয়ার কথা আছে।’ বলল আহমদ মুসা।

হঠাৎ করে এসব প্রশ্নের মুখে পড়বে তা ভাবেনি আহমদ মুসা। মনে মনে হিসেব করল এ পর্যন্ত কোন ভুল করে বসেনি তো সে?

‘আপনার কাছে পিস্তল কেন?’ জিজ্ঞাসা আবার সেই আহত লোকটির।

‘অনেকটা নিজের সেফটি এবং অনেকটা শখের জন্যেও। এ রিভলবারের লাইসেন্স আছে আমার।’

আহত লোকটি আহমদ মুসার দিকে একবার তাকাল। লোকটির চোখে অবিশ্বাস। বলল, 'আপনার সাহস ও বন্দুকবাজি দেখে নিছক শখ ও আত্মরক্ষার কথা মনে হচ্ছে না।'

কথা শেষ করেই লোকটি আহমদ মুসাকে বলল, 'আপনি সামনে ড্যাশবোর্ডের সবুজ বোতামটায় চাপ দেন।'

চাপ দিল আহমদ মুসা। কিন্তু গাড়িতে কিংবা কোথাও কোন শব্দ শুনতে পেল না। কিন্তু দেখল চাপ দেয়ার পর বোতামটি লাল হয়ে গেছে।

বোতামে চাপ দেয়ার কয়েক মুহূর্তের মধ্যে লম্বা বারান্দার তিন দরজা দিয়ে চার পাঁচজন করে লোক ছুটে বেরিয়ে এল। তাদের কারও হাতেই অস্ত্র নেই। কিন্তু তারা যে সশস্ত্র তাতে কোন সন্দেহ নেই। লোকদের পেছনে মাঝ দরজা দিয়ে স্ট্রেচার ঠেলে বেরিয়ে এল দু'জন। তাদের দু'জনের গায়ে ডাক্তারের এ্যাপ্রোন।

বারান্দার একটা সিঁড়ির ধাপ সরে গিয়ে সেখানে এসে দাঁড়াল স্লোপিং এসকালেটর জাতীয় কিছু। সে এসকালেটর দিয়ে ঠেলে স্ট্রেচার নামিয়ে নিচে এল। লোকটা এসে আহমদ মুসার পাশে দাঁড়াল।

লিডার রকমের একজন লোককে ডেকে আহত লোকটি তার কানে কানে কি যেন বলল।

সংগে সংগেই লোকগুলো এসে আহমদ মুসাকে ঘিরে দাঁড়াল। তাদের সকলের হাতেই উঠে এসেছে পকেট মেশিনগান।

দু'জন আহমদ মুসাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে তার দুই হাত বেঁধে ফেলল।

গাড়ির দরজার সাথে ফিট করা স্ট্রেচারে শুয়ে পড়ার সময় হাত বাঁধা আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, 'জো কার্লোস ধন্যবাদ আপনাকে, আপনি আমাকে বাঁচিয়ে রেখে আমাকে আমার আশ্রয়ে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু স্যরি মি. জো কার্লোস, যা ঘটেছে তাতে আপনাকে ছেড়ে দেয়া যায় না। আমাদের বসরা বাইরে। কালকে সন্ধ্যা নাগাদ তারা ফিরবেন। তারা আপনার পরিচয় যাচাই করে যা হয় করবেন। সেই সময় পর্যন্ত আপনাকে আটক থাকতে হবে।'

একটু থেমে আহত লোকটি তার লোকদের উদ্দেশ্যে বলল, 'একে বন্দী করে রাখ, কিন্তু ভালোভাবে রাখ।'

স্ট্রেচারে করে বারান্দা দিয়ে যাবার সময় আহত লোকটি মাথা উঁচু করে উচ্চ স্বরে বলল, ‘জো কার্লোসকে ‘ডি’-তে নিয়ে রাখ।’

‘সি’ শব্দটি শুনে আহমদ মুসার দেহে আনন্দের উষ্ণ স্রোত বয়ে গেল।

‘সি’ মানে ‘১৩০-এর ডি’, যেখানে ব্রুনার মা কারিনা কারলিনাকে প্রথমে রাখার কথা বলেছিল। নিশ্চয় ‘১৩০-এর এ’ যেখানে ব্রুনার মাকে রেখেছে বা রেখেছিল, এর আশেপাশেই এটা হবে।

আহত লোকটি চলে গেলে আহমদ মুসার চার পাশের লোকদের একজন গিয়ে উঁচু বারান্দার দেয়ালের এক জায়গায় তিনবার নক করল। সংগে সংগে বারান্দার দেয়ালে দরজা বেরিয়ে গেল।

আহমদ মুসাকে ঘেরাও করে নিয়ে সবাই সেই দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

ভেতরটা বাইরের বিপরীত। সাদা মার্বেল পাথরের দেয়াল। নিচে ফ্লোরে পুরু সাদা কার্পেট। মনে হলো গোটা ফ্লোরটাই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত।

ফ্লোরটিতে সারি সারি ঘর। ক্রিস-ক্রস করিডোর। ঘরের দরজা সবগুলোই বন্ধ।

কিছু দূর চলার পর আহমদ মুসাকে একটা ঘরে প্রবেশ করিয়ে একজন বলল, ‘এটাই আপনার ঘর।’

ঘরে একটা বেড।

আহমদ মুসাকে বেডে শুইয়ে দিয়ে পা বেঁধে ফেলল। হাত আগেই বাঁধা ছিল।

আহমদ মুসাকে বেডে রেখে সবাই বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে যাওয়ার সময় একজন বলে গেল, ‘অন্য একজন আসবে। সেই আপনার খাওয়া এবং প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা করবে।’

সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। কথা বলা লোকটিই শুধু ভেতরে ছিল।

‘আচ্ছা জনাব, এই ফ্লোর তো ‘সি’ দেখলাম। ‘এ’, ‘বি’-ও আছে নাকি? তাহলে তো বিরাট বাড়ি।’ আহমদ মুসা লোকটিকে উদ্দেশ্য করে বলল।

'শুধু 'সি' হয় নাকি! 'সি' থাকলে 'এ' 'বি' তো থাকবেই। এটা আবার জিজ্ঞাসা করতে হয় নাকি?' লোকটি বলল।

'কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাকে থাকতে হবে? বসরা কোথায় গেছেন? আগে আসতে পারেন না?' বলল আহমদ মুসা বোকা-বোকা কন্ঠে।

'আমরা কি ওসব জানি? শুনেছি তারা কোর্টে গেছেন। সন্ধ্যার আগে ফিরবেন না। আবার কাজ হয়ে গেলে ফিরতেও পারেন।' বলেই লোকটি বের হয়ে গেল।

আহমদ মুসা তখন কিছুটা আনমনা হয়ে পড়েছিল কোর্টে যাওয়ার কথা শুনে। স্টেট কি হস্তান্তর হয়ে যাচ্ছে? নকল কারিনা কারলিন কি রেডি হয়ে গেছে। আসল কারিনা কারলিন এখন কোথায়। স্টেট হস্তান্তর হওয়া পর্যন্ত তো তাঁর বেঁচে থাকার কথা। তাহলে কালকেই তো তার শেষ দিন। কিছু করার সময় তো বয়ে যাচ্ছ্ আজ রাত এবং কাল দিনই মাত্র সময় আছে মনে হচ্ছে। যা করার এর মধ্যেই করতে হবে।

আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া আদায় করল আহমদ মুসা। এভাবে এদের এই ডেরায় প্রবেশ করতে না পারলে ও সব বিষয় জানা হতো না। জানা যেত না যে, ঘটনা ফাইনাল স্টেজে পৌঁছে গেছে। সময় হাতে মাত্র এক রাত এক দিন।

আহমদ মুসা তার হাতের ঘড়ির দিকে তাকাল। দেখল রাত সাড়ে ১২টা।

আহমদ মুসা ঠিক করল ঘন্টা দুয়েক সে রেস্ট নেবে, তারপর করণীয় চিন্তা করে কাজে নামবে।

হাত পায়ের বাঁধনটা সামান্য শিথিল করে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে সে চোখ বুজল। রাত আড়াইটা।

হাত-পায়ের বাঁধন থেকে মুক্ত হতে তার খুব অসুবিধা হলো না। পকেটের রিভলবার তার পকেটেই রয়ে গেছে, তারা আর তাকে সার্চ করেনি। এদিকে তার মোজার সাথে গুঁজা আছে লেজার গান, সেটাও খোঁজ করে নেয়নি। জুতার গোড়ালি থেকে ছুরি বের করে হাত পায়ের বাঁধন কেটে সে সহজেই মুক্ত হতে পেরেছে।

কক্ষ থেকে বের হওয়ার পর আধা ঘন্টা ধরে ফ্লোরের এদিকের কক্ষগুলো সে দেখেছ। কক্ষগুলোর কোনটি অফিস রুমের মত, কোনটি বেড রুম, কোনটি আবার স্টোর রুমের মত। এখানে তেমন কিছুই পেল না।

ঘুরতে ঘুরতে আহমদ মুসা একটা ফাইবার পার্টিশন ওয়ালের কাছে এল। ওয়ালের দরজা কোথায় খুঁজতে লাগল সে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও দরজা পেল না. শেষে আহমদ মুসা লেজার কাটার দিয়ে ফাইবার ওয়ালের একটা অংশ কেটে ভেতরে প্রবেশ করল।

ভেতরটা একটা স্টোর রুম। নানা পণ্যে ঠাসা।

কিন্তু এই পণ্যগুলো এত সিক্রেট জায়গায় রয়েছে কেন? প্রশ্নের জবাব পেল না আহমদ মুসা।

ঘরের এক কোণায় একটা আলমারি পেল। আলমারিটি বেশ বড়।

আলমারিটি খোলার জন্যে হাতল ধরে টান দিল আহমদ মুসা। ওটা খুলল না।

বেশি চিন্তা করার সময় নেই আহমদ মুসার হাতে। লেজার রে' দিয়ে আলমারির লক অংশটা কেটে তুলে ফেলল।

আলমারির দরজা খুলতেই দেখতে পেল একটা সিঁড়ি নেমে গেছে নিচের দিকে।

আলমারির দরজা বন্ধ করে আহমদ মুসা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল। সে মনে মনে বলল, এই সিঁড়িকে ক্যামোফ্লেজ করার জন্যে তাহলে স্টোর রুমটা সাজানো হয়েছে।

নিচে নেমে বিস্মিত হলো আহমদ মুসা। উপরের মতই আরেকটা ফ্লোর নিচে রয়েছে।

এই ফ্লোরে কক্ষের সংখ্যা কম। কিন্তু কক্ষগুলো বড় বড় এবং সুসজ্জিত।

সামনেই মাঝখানের একটা বিশেষ কক্ষে আহমদ মুসা একটা কম্পিউটার দেখতে পেল। কম্পিউটারটা সুন্দর, বড় স্ক্রীনের। কক্ষটাও খুব সুসজ্জিত। কম্পিউটারটিতে নিয়মিত কাজ হয় বলে মনে হলো আহমদ মুসার।

কম্পিউটারের পাশের টেবিলের বাস্কেটে কাগজ। টেবিলের নিচে ওয়েস্ট পেপারের বাস্কেটও রয়েছে।

আহমদ মুসা কম্পিউটারের চেয়ারে বসে টেবিলের নিচ থেকে ওয়েস্টে পেপারের বাস্কেটটাই টেনে নিল।

বাস্কেটের কাগজগুলো পরীক্ষা করতে লাগল।

অধিকাংশ কাগজই সাদা, খণ্ড খণ্ড।

একটা খণ্ড কাগজে কিছু লেখা দেখল। খণ্ডটিকে আহমদ মুসা চোখের সামনে নিয়ে এল। লেখার উপর চোখ পড়তেই চমকে উঠল সে। লেখা আছে জার্মান ভাষায়; প্রোসপেকট এন্ড বেনিফিট অব ক্লোন এইট, মানে 'ক্লোন এইট'-এর সম্ভাবনা ও লাভ।

কাগজ খণ্ডটিতে এর বেশি আর কিছুই লেখা নেই।

'ক্লোন-এইট' কথাটা আহমদ মুসার মনে তোলপাড় সৃষ্টি করল। ব্রুনার নকল মা'র প্রেসক্রিপশনে দেখেছিল 'ক্লোন সেভেন'। তার মানে ব্রুনার নকল মা ক্লোন সেভেন। 'ক্লোন সেভেন'-এর কাজ সমাপ্তির পথে। এখন 'ক্লোন-এইট' তাদের নতুন প্রকল্প। এই প্রকল্পেরই প্রোসপেস্ট ও বেনিফিট হিসেব করা হয়েছে। এই হিসেবেরই খসড়া আছে হয়তো এই কাগজ খণ্ডের অংশ অন্য টুকরো কাগজগুলোতে। খুঁজতে লাগল আহমদ মুসা।

বাস্কেটে বেশি কাগজ ছিল না। কাগজের টুকরোগুলো পেয়ে গেলো সহজেই।

কাগজগুলোকে টেবিলের উপর রেখে এক সাথে জোড়া দিল আহমদ মুসা। পড়া যাচ্ছে গোটা বিষয়টা। সংক্ষেপে কথা এই;

'স্টেটের কর্তা ব্যক্তির বয়স ৫০-এর মত হবে। তার কন্যা সন্তান নয় বছর বয়সের। তার ক্লোন তৈরি সহজ। পঁচিশ বছর পর এই স্টেট হাতে পাওয়া যাবে। স্টেটটি ১০ হাজার একরের। বার্ষিক আয় কমপক্ষে ১০ কোটি ডলার। এই প্রকল্পে ঝুঁকি তেমন নেই। স্টেটের কর্তা ব্যক্তি পরিবারে এবং এলাকায় খুবই আনপপুলার।'

প্রকল্পের বিবরণ থেকে স্টেটটিকে চেনার উপায় নেই, তবে এর মাধ্যমে ওদের ষড়যন্ত্র পরিষ্কার হয়ে গেছে। ‘মানুষ ক্লোন’ করাকে তারা বড় বড় স্টেট, সম্পত্তি দখলের হাতিয়ার বানিয়েছে। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে এর আগে ব্রুনার মায়ের স্টেট ছাড়াও আরও ছয়টি স্টেট ছয়টি ক্লোনের মাধ্যমে ওরা দখল করেছে।

আহমদ মুসা খুব আগ্রহী হয়ে উঠল ছয়টি পরিচয় জানার জন্যে, যেগুলো ক্লোন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ওরা দখল করে নিয়েছে।

হঠাৎ আহমদ মুসার মনে হলো, ‘ক্লোন এইট’ এর প্রোসপেক্ট ও বেনিফিট সম্পর্কে এখানে খসড়া করা হয়েছিল নিশ্চয় কম্পিউটারে রাখার জন্যে। তাহলে অন্য ক্লোনদের বিবরণও নিশ্চয় কম্পিউটারে রয়েছে।

খুব খুশি হলো আহমদ মুসা।

কম্পিউটার ওপেন করল। কিন্তু অপারেশনে যাওয়ার জন্যে কম্পিউটার পাসওয়ার্ড চাইল।

হতাশ হলো আহমদ মুসা।

এখানে পাসওয়ার্ড বেশি খোঁজাখুঁজি করার মত সময় দেয়ার সুযোগ তার নেই। তাকে দ্রুত এগোতে হবে। আসল কাজ এখনও বাকি।

আল্লাহর সাহায্য চেয়ে আহমদ মুসা ভাবল সে যদি ‘ব্ল্যাক লাইট’ হতো, তাহলে কি পাসওয়ার্ড রাখাকে বেশি প্রেফার করতো।

আহমদ মুসা অনেক বিকল্প নিয়ে চিন্তা করল এবং এসবকে পাসওয়ার্ড করতাম কি না ভেবে দেখল। এক এক করে সবই বাদ গেল। অবশেষে আহমদ মুসা সিলেকশন করল ‘ক্লোন প্রজেক্ট’। আহমদ মুসা মনে মনে বলল, আমি ব্ল্যাক লাইট হলে সৌভাগ্যের প্রতীক এই শিরোনামকেই আমি পাসওয়ার্ড করতাম। ব্ল্যাক লাইটের ‘ক্লোন প্রজেক্ট’টির কথা বাইরের কেউ জানে না। আবার অন্য কারও পক্ষে একে এই কম্পিউটারের পাসওয়ার্ড মনে করাও অসম্ভব। সুতরাং যে কোন বিচারে এটাকেই আমি পাসওয়ার্ড করতাম।

মন স্থির করে আহমদ মুসা পাসওয়ার্ড হিসেবে ‘ক্লোন প্রজেক্ট’-এর ১২ টি বর্ণ টাইপ করল।

কিন্তু কম্পিউটার সংগে সংগেই জানাল এটা ‘ইনভ্যালিড পাসওয়ার্ড’।

আহমদ মুসার মনটা যতটা স্থির হয়েছিল, ততটাই আবার নড়বড়ে হয়ে গেল।

হঠাৎ আহমদ মুসার মনে হলো, এটা তো শুধু 'ক্লোন প্রজেক্ট নয়, এটা' 'হিউম্যান ক্লোন প্রজেক্ট।'

এই চিন্তা করার সাথে সাথেই আহমদ মুসা 'ক্লোন প্রজেক্ট'-এর ১২ বর্ণের আগে 'হিউম্যান'-এর আরও পাঁচটি বর্ণ যোগ করল। এরপর আহমদ মুসা 'সাইন ইন'-এ ক্লিক করল।

ক্লিক-এর সাথে সাথে বিশ্রী দু'টি শব্দ , 'ইনভ্যালিড পাসওয়ার্ড', আবার স্ক্রীনে ভেসে উঠল।

আহমদ মুসা এবার সত্যিই হতাশ হলো।

ঘড়ির দিকে তাকাল আহমদ মুসা।

রাত সাড়ে তিনটা। উদ্বেগ বোধ করল আহমদ মুসা। আর এক ঘন্টার মধ্যে এখানকার সব কাজ তাকে শেষ করতে হবে।

মনটাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে এল।

চোখ বন্ধ করে মনটাকে আল্লাহর দিকে রুজু করল।

হঠাৎ আহমদ মুসার মনে হলো, 'হিউম্যান' শব্দ 'বিশেষ্য পদ' নয়, খুব বেশি হলে গুণবাচক বিশেষ্য পদ। সেদিক থেকে এটা অনেকটাই 'বিশেষণ'-এর পর্যায়ে পড়ে। সুতরাং পিওর নাউন 'ম্যান' যোগ হতে পারে 'ক্লোন প্রজেক্ট'-এর সাথে।

আহমদ মুসা 'ক্লোন প্রজেক্ট'-এর আগে 'ম্যান' শব্দ যোগ করে ১৫টি বর্ণ টাইপ করল পাসওয়ার্ড কলামে। বিসমিল্লাহ বলে ক্লিক করল 'সাইন ইন'-এ।

এবার ক্লিক-এর পর স্ক্রীন পাল্টে গেল।

স্ক্রীনে চলে এল কতকগুলো ফাইল নামসহ। প্রত্যেকটি 'ক্লোন প্রজেক্ট'-এর জন্যে ভিন্ন ফাইল। ক্লোন প্রজেক্ট-১ থেকে ক্লোন প্রজেক্ট-৮ পর্যন্ত সবগুলো প্রজেক্টের নাম শোভা পাচ্ছে কম্পিউটার স্ক্রীনে।

ক্লোন প্রজেক্ট-১ এর ফাইলে ক্লিক করল আহমদ মুসা। বেরিয়ে এল প্রজেক্টের হোম পেজ। হোম পেজে প্রজেক্টের লোকেশন, প্রজেক্টের টার্গেট,

প্রজেক্টের পাত্র-পাত্রী, প্রজেক্টের প্রবলেম ও সলিউশন, প্রজেক্টের প্রসপেক্ট, এই প্রজেক্টের সাকসেস ইভ্যালুয়েশন ও ক্লোজিং।

দারুণ আনন্দিত হলো আহমদ মুসা। যা দরকার তার সবই আছে প্রজেক্ট ফাইলে। পড়ার সময় নয় এটা। কম্পিউটার থেকে হার্ডডিস্ক নিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত নিল আহমদ মুসা। এটা থেকে সবকিছু জানা যাবে এবং এটাই হবে প্রমাণ। ব্ল্যাক লাইট বিজ্ঞানের এক আবিস্কার 'ক্লোনিং-কে কিভাবে অপব্যবহার করেছে, কিভাবে বড় বড় পরিবারের বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের সম্পত্তি গ্রাস করার জন্যে 'ম্যান-ক্লোনিং'-কে ব্যবহার করেছে, ভবিষ্যতে তার আরও কি পরিকল্পনা ছিল, সবই এই ডিস্কের মধ্যে পাওয়া যাবে।

জ্যাকেটের এক পকেট থেকে মাস্টার স্ক্রু-ড্রাইভার বের করে কম্পিউটার থেকে হার্ডডিস্কটা বের করে নিল। বেরিয়ে এল আহমদ মুসা ঘর থেকে।

মাথায় এবার চিন্তা ব্রুনার মা কারিনা কালিনকে ওরা কোথায় বন্দী করে রেখেছে।

উপরের সেই স্টোর রুমে ওঠার জন্যে সিঁড়ির পা দিতে যাবে এমন সময় দেখতে পেল সিঁড়ির পেছনের দেয়ালে 'এ' লিখে ডান দিকে এ্যারো দেয়া। এ্যারোটা আবার বেঁকে উপরের দিক ইংগিত করেছে। তাহলে 'এ' হবে উপরের দিকে। আহমদ মুসা ছুটে গেল সেখানে।

আহমদ মুসা দেখল, এ্যারোর পরেই দেয়ালের সাথে প্রায় অদৃশ্য হয়ে থাকা একটা লিফট।

আহমদ মুসা লিফটের সুইচ খোঁজ করতে লাগল।

সে লিফটের তিন দিকেই ভালোভাবে সুইচ সন্ধান করল। সুইচ হতে পারে এমন কোন কিছুই চিহ্ন খুঁজে পেল না। নিচে ফ্লোরের দিকে তাকাল আহমদ মুসা। শ্বেত পাথরের ফ্লোর। আহমদ মুসা দেখল লিফটের মাঝামাঝি যে পাথরটা এসে লিফটের গোড়ায় এসে শেষ হয়েছে, সে পাথরের এ দিকের প্রান্তে একটা জায়গা থেকে পাথরের চলটা উঠে গেছে। সেখানে আরেকটা সাদা পাথর কেটে চটাটা ঢেকে দেয়া হয়েছে। জোড়া লাগানো সাদা সিমেন্ট দিয়েই। এটা সাধারণ একটা বিষয়। এ নিয়ে প্রশ্ন ওঠার কোন কারণ নেই। কিন্তু আহমদ মুসার কাছে

বিষয়টা বড় হয়ে দেখা দিল। এত সুন্দর ফ্লোরে এত সুন্দর দৃশ্যের একটা ছন্দপতন কেন ঘটানো হয়েছে? কেন পাথরটাকেই রিপ্লেস করা হয়নি। এটা কোন কিছুর ইংগিত কি?

আহমদ মুসা পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে চাপ দিল চলটা ওঠা পাথরটার উপর। সংগে সংগেই চটা পাথর খণ্ডটি দেবে গেল এবং খুলে গেল লিফট।

আহমদ মুসা লিফট দিয়ে উঠতে শুরু করল। লিফটে গাইডিং কোন ব্যবস্থা নেই। লিফট কোথায় যাবে, কোথায় দাঁড়াতে হবে, তা নির্দেশ করার উপায় নেই। এসব চিন্তা করে আহমদ মুসা চিশ্চিত হলো, এ লিফট সোজা 'এ'-তেই যাবে, যেমন দেয়ালের লেখায় নির্দেশ করা হয়েছে।

ইতিমধ্যেই কয়েকটা ফ্লোর অতিক্রম করেছে লিফট। এমনটা ভাবার সময়ই লিফট দাঁড়িয়ে গেল।

লিফটের দরজা খুললে কি দেখবে কে জান্ পকেট থেকে লেজার গান হাতে নিল আহমদ মুসা। ডান হাতের তর্জনীটা রাখল লেজার গানের ট্রিগারে।

দরজা খুলে গেল। দরজাটার কিছু সামনেই একটা খাট। একজন শুয়ে সে খাটে। খাটের উপর দিয়ে আহমদ মুসার চোখ গিয়ে পড়ল চেয়ারে বসে থাকা একজন মহিলার চোখের উপর। তার দৃষ্টি ছিল আগে থেকেই আহমদ মুসার উপর। তার রিভলবারের নল আহমদ মুসার চোখ বরাবর স্থির হয়ে আছে।

আহমদ মুসা তার লেজার গান তোলার সুযোগ পেল না। ওদিক থেকে ট্রিগার টেপার একটা অস্পষ্ট শব্দও কানে এল আহমদ মুসার। অনুভব করল আহমদ মুসা গুলি ছুটে আসছে।

মাথাটা আহমদ মুসার আপনাতেই ডানদিকে সরে গেল পলকের মধ্যে।

বাম কানে প্রচণ্ড ব্যাথা অনুভব করল আহমদ মুসা। ঝর ঝর করে রক্ত নেমে এল কান থেকে। মুখের একাংশ এবং জ্যাকেটের বাম দিকে ছড়িয়ে পড়ল রক্ত।

কিন্তু আহমদ মুসরা ভ্রূক্ষেপ নেই সেদিকে। তার লেজার গান তুলে নিয়েছে আহমদ মুসা। ট্রিগার টিপেছে সংগে সংগেই লেজার গানের।

চেয়ারে বসে থাকা মহিলাটি যখন বুঝতে পারল তার প্রথম গুলি ব্যর্থ হয়েছে, তখন দ্বিতীয় গুলি চালাবার তার আর সুযোগ হলো না। ততক্ষণে আহমদ মুসার লেজার গানের ভয়ংকর ছোবল মহিলাটির মাথার অর্ধাংশ উড়িয়ে দিয়েছে।

আহমদ মুসার নজর গেল খাটের উপর। খাটের উপর শুয়ে থাকা মহিলাটি উঠে বসেছে। আতংকিত সে। দুই চোখ তার আতংক-উদ্বেগে বিস্ফোরিত।

মহিলাটিকে দেখে চমকে উঠল এবং সেই সাথে আনন্দিতও হলো আহমদ মুসা। ছবির সাথে হুবহু মিল আছে এই মহিলার। আশ্চর্য! এ যে ব্রুনার মা।

আহমদ মুসা দ্রুত ব্রুনার মায়ের সামনে গেল। বলল দ্রুত কন্ঠে, 'মা, আমি আপনার মেয়ে ব্রুনা ও আপনার স্বামী আলদুনি সেনফ্রিডের কাছ থেকে এসেছি আপনাকে উদ্ধার করতে।'

ব্রুনার মা কারিনা কারলিন নির্বাক। ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে আহমদ মুসার দিকে।

'মা, এখনি আমার মনে হচ্ছে ওরা এসে যাবে। ওরা এসে গেলে আর হয়তো সরে পড়া যাবে না।' আহমদ মুসা আবার বলল।

'হ্যাঁ, তুমি ঐ শয়তানীকে মেরেছ, ভালো করেছ। সে আমাকে অনেক জ্বালিয়েছে। কি বললে, তুমি ব্রুনা মা ও সেনফ্রিডের কাছ থেকে এসেছ? ঠিক বলেছ? ওরা কি বেঁচে আছে? ওরা মেরে ফেলেনি ওদের?' বলল ব্রুনার মা।

'না ওরা বেঁচে আছে, ভালো আছে এবং আপনার অপেক্ষা করছে। তারাই আমাকে পাঠিয়েছে।' আহমদ মুসা বলল।

'এতক্ষণে ব্রুনার মা'র মুখটা কিছু স্বাভাবিক হলো। বলল, 'তুমি কে? এরা তো ভয়ংকর। কিভাবে এলে এখানে? না, বুঝেছি। তুমি গুলি খেয়েও ক্লারা লিসবেথ শয়তানীকে মেরেছ। ঠিক করেছ তুমি। কিন্তু বাছা, তুমিও তো সাংঘাতিক আহত। তোমার কান তো গুলিতে ফুটো হয়ে গেছে। রক্ত নামছে তো এখনও।' বলল ব্রুনার মা।

‘ওসব কিছু না, মা আপনি উঠুন। আমাদের পালাতে হবে। হাঁটতে পারবেন, না ধরব আমি আপনাকে?’ আহমদ মুসা বলল।

‘বেটা আমাকে ধরে নিয়েই চল।’ বলল ব্রুনার মা।

আহমদ মুসা ব্রুনার মাকে খাট থেকে নামিয়ে নিল। লিফট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আহমদ মুসা লিফট থেকে বের হওয়ার সময়ই দেখে নিয়েছিল লিফটা খোলার সেই একই ব্যবস্থা এখানে আছে।

ব্রুনার মাকে নিয়ে লিফট খুলতে গিয়ে হঠাৎ আহমদ মুসা থমকে দাঁড়াল। বলল, ‘মা, একটু দাঁড়ান আমি এ রুমটাকে ভেতর থেকে লক করে আসি। রুমে কি ঘটেছে তা এই মুহূর্তে কাউকে জানতে দেয়া যাবে না।’

বলে আহমদ মুসা দৌড়ে গিয়ে ঘরের দরজা লক করে এল।

তারপর ব্রুনার মাকে নিয়ে লিফটে ঢুকল। লিফট থেকে সেই ফ্লোরে নামল। কক্ষটা আগের মত। কেউ নেই।

সে কক্ষ থেকে আহমদ মুসা ব্রুনার মাকে ধরে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরের সেই আলমারির ভিতর দিয়ে স্টোর রুমে ঢুকল।

‘বাবা, বেরুতে পারবে এদের ঘাঁটি থেকে আমাকে নিয়ে? এদের অনেক লোক। অনেক পাহারা। আর ওরা মানুষ মারে পাখির মত করে। আমার স্বামী-সন্তানরা বেঁচে আছে ঈশ্বর আছে বলেই। আমি কি পৌঁছতে পারব তাদের কাছে?’ বলল ব্রুনার মা।

‘পারবেন মা। ঈশ্বর আছেন।’ আহমদ মুসা বলল।

স্টোর রুম থেকে আহমদ মুসা ফাইবার ওয়াল কেটে যে দরজা করেছিল, সেই দরজা দিয়ে তাকে বন্দী করে রাখা সেই বিশাল কক্ষটিতে প্রবেশ করল। এ কক্ষেও কেউ নেই। আহমদ মুসা কক্ষ থেকে পালিয়েছে সেটা ওরা এখনও জানতে পারেনি। এখন লোকগুলো নিশ্চিন্ত মনে বেঘোরে ঘুমাচ্ছে। রাত ৪টা বাজতে যাচ্ছে। এ সময় স্টপ-কালচারের সভ্যতায় সবচেয়ে গভীর ঘুমের সময়। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল আহমদ মুসা।

সেই উঁচু বারান্দার দেয়ালের যে দরজা দিয়ে আহমদ মুসা ভেতরে ঢুকেছিল, সেই দরজা লক করা।

আহমদ মুসা ফিসফিসে কন্ঠে বলল, ‘মা, বাড়ির এটাই শেষ দরজা। এ দরজার পরেই গাড়ি বারান্দা ও চত্বর। এখানে ওদের পাহারা থাকতে পারে। মা একটা কথা মনে রাখবেন, ওরা যদি সামনে থেকে আক্রমণ করে তবে আপনি আমার পেছনে থাকবেন, আর যদি পেছন থেকে আক্রমণ করে তাহলে আপনি আমার সামনে থাকবেন।’

‘নিজে গুলি খেয়ে আমাকে বাঁচাতে চাও তুমি। কে তুমি বেটা? তোমাকে জার্মান বলে মনে হচ্ছে না?’

‘সব বলব মা। পরে। এটুকু ভাবুন, গোটা মানব সমাজ একটা পরিবার, সব মাই সবার মা, তেমনি সব ছেলেই সবার ছেলে।’

বলেই আহমদ মুসা পকেট থেকে লেজার কাটার বের করে দরজার লক হাওয়া করে দিল।

আস্তে খুলে ফেলল দরজা আহমদ মুসা।

সামনেই গাড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে জার্মান ছয় সিটের জীপ। সামনে কোন প্রহরী দেখলো না। ওরা কি বারান্দায় আছে?

আহমদ মুসা ব্রুনার মাকে কানে কানে বলল, ‘মা, আমার সামনে থাকবেন। দৌড় দিয়ে আমরা ঐ গাড়িতে উঠব। ঠিক এই সময়ই সাইরেনের একটা চাপা আওয়াজ তার কানে এল। শব্দটা আসছে ভেতর থেকে।

আহমদ মুসা ব্রুনার মায়ের হাত ধরে বলল, ‘মা, আসুন। ওরা জেনে ফেলেছে।’

দৌড় দিল আহমদ মুসারা। গাড়িতে উঠল তারা।

আহমদ মুসা ড্রাইভিং সিটে এবং ব্রুনার মা আহমদ মুসার পাশের সিটে বসেছে।

গাড়ির চাবি লকের সাথেই লাগানো ছিল। গাড়ি চালিয়ে দ্রুত গেটের কাছে চলে গেল আহমদ মুসা।

গেটের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়েই দৌড়ে আহমদ মুসা গেটের পিলারের কাছে চলে গেল। গেটের গায়ে অদৃশ্য ডিজিটাল লকে দ্রুত আহমদ মুসা টাইপ

করল ১৩০ ০৩১ ৩০১ অংকগুলো, এ কোড অংকগুলো দিয়েই আহমদ মুসা যাবার সময় লকগুলো খুলেছিল।

অংকগুলো টাইপ করার সময়ই বারান্দায় অনেকগুলো পায়ের শব্দ শুনতে পেল। পেছনে তাকিয়ে দেখতে পেল বারান্দা দিয়ে অনেকগুলো লোক ছুটে আসছে। তাদের হাতের হ্যান্ড মেশিনগানগুলো তাকে লক্ষ্য করে তাক করা।

আহমদ মুসা ঝাঁপিয়ে পড়ল মাটির উপর। গুলির বৃষ্টি ছুটে এল তাকে লক্ষ্য করে। আহমদ মুসা বলের মত গড়িয়ে ছুটছিল গাড়ির দিকে।

গুলিবৃষ্টি চলছে অবিরাম।

আহমদ মুসা গড়িয়ে সামনে গিয়ে পৌঁছল এবং গাড়ির আড়াল নিয়ে দক্ষিণ পাশ দিয়ে গাড়িতে উঠল।

তারা বারান্দা ও বারান্দা থেকে নেমে আসা লোকদের সামনে বলে গাড়ির উত্তর পাশটা ওদের গুলিবৃষ্টির প্রধান শিকার।

গাড়ির পেছনের সিটে উঠে সিট ডিঙিয়ে ড্রাইভিং সিটে গিয়ে বসল আহমদ মুসা। বলল ব্রুনার মাকে, 'মা, আপনি সিটের উপর শুয়ে পড়ুন।'

গাড়ি স্টার্ট দেয়াই ছিল। চলতে শুরু করল গাড়ি।

কোডের শেষ অংক টাইপ করার সংগে সংগেই দরজা খুলে গেছে।

তীব্র বেগে গাড়ি বেরিয়ে এল গেট দিয়ে।

আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করছিল ব্রুনার মা। চমকে উঠল ফিনকি দিয়ে কাঁধ থেকে রক্ত গড়াচ্ছে দেখে।

'বেটা তোমার কাঁধে গুলি লেগেছে। রক্ত বেরুচ্ছে।' বলল উদ্বেগ ও কম্পিত গলায় ব্রুনার মা কারিনা কারলিন।

'মা, ওসব থাক। আগে আমাদের বাঁচতে হবে।' আহমদ মুসা বলল।

ছুটে আসা সব গুলির টার্গেট তখন আহমদ মুসার গাড়ি।

ব্রুনার মা শুয়ে পড়েছে গাড়ির সিটে।

আহমদ মুসা খুশি হলো যে, গাড়ি বারান্দায় আর গাড়ি নেই। গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করতে হবে ওদের। আহমদ মুসা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল-আজ আল্লাহ তাকে পদে পদে সাহায্য করছেন।

ছুটছিল আহমদ মুসার গাড়ি। জিগজ্যাগ, উঁচু-নিচু বিপজ্জনক রাস্তা। এ রাস্তায় মাঝারি স্পিডেও গাড়ি চালানো অসম্ভব। তার উপর বড় গাড়ি। ওরা সংগে সংগে ফলো করতে পারলে বিপদই হতো।

আহমদ মুসারা জংগলের প্রান্তে চলে এল। আহমদ মুসার গাড়ি রাস্তার যে দিকে পার্ক করা আছে ঝোপের আড়ালে তার বিপরীত দিকে রাস্তায় উপর সহজেই দৃশ্যমান একটা জায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়েই আহমদ মুসা ব্রুনার মাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে তাকে ধরে নিয়ে যতটা সম্ভব দ্রুত ছুটল নিজের গাড়ির দিকে। দৃশ্যমান জায়গায় গাড়ি ছাড়ল এ কারণে যে, গাড়ি দেখলে ওরা গাড়ি থেকে নামবে। কেন গাড়ি দাঁড় করালাম তা জানার চেষ্টা করবে। আশেপাশে আমরা আছি কি না এসব চিন্তায় অনেকটা সময় তারা নষ্ট করবে। এটা আহমদ মুসাদের জন্যে প্রয়োজন।

'গাড়ি ছাড়লে কেন? কোথায় যাচ্ছ বেটা?' ক্লান্ত স্বরে ব্রুনার মা বলল।

'আমার গাড়ি লুকানো আছে এদিকে।' আহমদ মুসা বলল।

'ও, সব ব্যবস্থা করেই গেছ। দেখছি এদের চেয়ে তুমি অনেক বুদ্ধিমান।' বলল ব্রুনার মা।

গাড়ির কাছে পৌঁছে গিয়েছিল আহমদ মুসারা। বলল আহমদ মুসা, 'মা গাড়িতে উঠুন।' গাড়ির দরজা দ্রুত খুলে ধরল আহমদ মুসা।

ব্রুনার মাকে গাড়িতে তুলে গাড়ির দরজা বন্ধ করে ড্রাইভিং সিটে গিয়ে উঠল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার গাড়ি তখন চলতে শুরু করেছে। তার গাড়ি যখন রাস্তায় গিয়ে উঠল, তখন পেছনে কিছু দূরে একাধিক গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল।

আহমদ মুসা তার গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিল।

কান ও কাঁধের ব্যথা আহমদ মুসা অনুভব করতে পারছে। এই কাঁধের নিচেই বাহুর মাসলে কয়েকদিন আগে সে গুলি খেয়েছিল। আহত হওয়ার কথা মনে হওয়ায় ব্যথা বাড়ছে।

কিন্তু এখন কোন দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেবার সময় নয়।

আহমদ মুসা তার দুর্বল হয়ে পড়া বাম হাত দিয়ে স্টিয়ারিং হুইল ধরে রেখে ডান হাত দিয়ে পকেট থেকে মোবাইল বের করল। কল করল আলদুনি সেনফ্রিডকে।

ওপার থেকে সাড়া পেতেই বলল, মি. সেনফ্রিড, আমাদের মিশন সফল। আপনি ও ব্রুনা এখনি চেকআউট করে হোটেলের গাড়ি বারান্দায় আসুন। আমি ওখানে পৌঁছার পর দেরি করা সম্ভব হবে না। আপনারা গাড়িতে এলেই সব দেখবেন। আমি রাখছি।'

কল অফ করে দিয়ে আহমদ মুসা মোবাইল পকেটে রাখল।

আহমদ মুসার কথা শুনছিল ব্রুনার মা কারিনা কারলিন। আহমদ মুসা কল অফ করতেই ব্রুনার মা বলে উঠল, 'তুমি সেনফ্রিডের সাথে কথা বললে? ব্রুনা, সেনফ্রিড এখানে আছে? এখনি গাড়িতে আসবে ওরা?' কান্না রুদ্ধ কন্ঠ তার। কষ্ট করে কান্না রোধ করছে সে।

'হ্যাঁ মা, মি. সেনফ্রিডের সাথে কথা বললাম। মি. সেনফ্রিড ও ব্রুনাকে এখনি গাড়িতে দেখতে পাবেন।' আহমদ মুসা বলল।

রাতের অ্যারেন্ডসী। ফাঁকা রাস্তা। দু'একটা গাড়ি কিঞ্চিত চোখে পড়ছে।

অ্যারেন্ডসীর তিন দিক ঘুরে গাড়ি এসে তাদের হোটেলের গাড়ি বারান্দায় প্রবেশ করল।

গাড়ি দাঁড় করিয়েই আহমদ মুসা ব্রুনার মাকে সামনের সিট থেকে নামিয়ে নিয়ে পেছনের সিটে বসাল।

একবার এদিক-ওদিক চেয়ে দেখল ব্রুনারা তখনও এসে পৌঁছেনি।

আহমদ মুসা ফিরে যাচ্ছিল তার ড্রাইভিং সিটে। এই সময় লবীর দরজা দিয়ে মি. সেনফ্রিড ও ব্রুনা বেরিয়ে এল। তাদের চোখে-মুখে উদ্বেগ-উত্তেজনা। দ্রুত ওরা গাড়ির কাছে এল।

'প্লিজ, আপনারা গাড়িতে উঠুন। মি. সেনফ্রিড পেছনটা ঘুরে আপনি বাম পাশে উঠুন।'

বলে আহমদ মুসা ড্রাইভিং সিটে গিয়ে বসল।

ব্রুনা ও সেনফ্রিড একে-অপরের দিকে একবার তাকিয়ে গাড়ির দিকে এগোলো গাড়িতে ওঠার জন্যে। গাড়িতে উঠল ওরা।

ওরা গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করতেই আহমদ মুসা গাড়ি ছেড়ে দিল।

গাড়িতে ওঠার পরপরই ব্রুনা 'মা' বলে চিৎকার দিয়ে কেঁদে উঠল। কেঁদে উঠল তার মা কারিনা কারলিনও।

গাড়ি রাস্তায় এসে পড়তেই আহমদ মুসা প্রায় ফাঁকা রাস্তায় গাড়ির গতি শহরের সর্বোচ্চ সীমায় তুলল।

অ্যারেন্ডসীর গভীর রাতের নীরব প্রহর। মা, মেয়ে, বাবার মিলিত কান্নার আর্তকন্ঠ তবু কারও কানেই পৌঁছল না গাড়ির বন্ধ দরজা পেরিয়ে।

আহমদ মুসা কিছুই বলল না। কাঁদা উচিত ওদের।

গাড়ি অ্যারেন্ডসী শহর পেরিয়ে সালজওয়াডেলের রাস্তায় গিয়ে পড়ল।

ব্ল্যাক লাইটের লোকরা আহমদ মুসাকে হামবুর্গের রাস্তায় তালাশ করবে। কারণ ওদের এটাই জানা যে আমি হামবুর্গ হয়ে এখানে এসেছি। সুতরাং সালজওয়াডেলের রাস্তা যেমন নিরাপদ, তেমনি অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত।

মা, মেয়ে, বাবার কান্না তখন থেমে গেছে। কথা বলতে ওরা শুরু করেছে।

এক সময় ব্রুনার মা কারিনা কারলিন বলে উঠল, 'সেনফ্রিড, ব্রুনা তোমরা আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছ। আমার ঐ ছেলেটার খবর তোমরা জান না। সে দারুণভাবে আহত। তার কাঁধে গুলি লেগেছে। তার একটা কান গুলিতে ফুটো হয়ে গেছে। সেগুলো থেকে রক্ত ঝরছ। বাছাকে তোমরা দেখ। এই ছেলের সাহস ও বুদ্ধির কোন তুলনা হয় না। মনে হয় একাই সে একশজনের কাজ করতে পারে।'

'কি বলছ মা?' বলে আর্তনাদ করে উঠল ব্রুনা।

'এই অবস্থায় উনি গাড়ি চালাচ্ছেন? আপনি দাঁড়ান ভাইয়া।' উদ্বেগভরা কন্ঠে বলল ব্রুনা।

'শুধু এই গাড়ি চালানো নয়! এমন আহত হয়েও গুলিবৃষ্টির মধ্যে সে আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে।' বলল ব্রুনার মা।

‘আমরা শহর থেকে বের হয়ে এসেছি। সামনে একটা টিলাময় জংগল এলাকা আছে। ওখানে গিয়ে দাঁড়াব আমরা।’ আহমদ মুসা বলল।

সত্যিই কিছু দূরে গিয়ে জংগলপূর্ণ টিলা এলাকা পাওয়া গেল।

আহমদ মুসা গাড়িটা রাস্তা থেকে একটা টিলার আড়ালে নিয়ে দাঁড় করাল। গাড়ি থেকে ব্যাগটা নিয়ে নামল আহমদ মুসা।

সবাই নামল। নামল ব্রুনার মা-ও!

‘আপনারা একটু দাঁড়ান। আমি ব্যান্ডেজ বেঁধে আসছি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘স্যরি, মি. আহমদ মুসা, যেখানে আপনার আঘাতটা লেগেছে সেখানে নিজের পক্ষে ব্যান্ডেজ বাঁধা সম্ভব নয়। গাড়ির হেড লাইটের সামনে আপনি বসুন। আমি বেঁধে দিচ্ছি। প্লিজ, মি. আহমদ মুসা। আমাদের জন্য এত করছেন আর আমাদের এটুকু করতে দেবেন না?’ আবেগরুদ্ধ ভারি কন্ঠ আলদুনি সেনফ্রিডের।

‘ঠিক আছে।’ বলে আহমদ মুসা বসে পড়ল। আসলে আহমদ মুসাও জানে তার ডান হাতকে বাম হাত পুরো সহযোগিতা করতে পারবে না। ব্যান্ডেজ যাকে বলে সেটা তো হবেই না।

জ্যাকেটসহ গায়ের জামা আস্তে আস্তে খুলল আলদুনি সেনফ্রিড।

গলা ও কাঁধের সংযোগস্থলের সামান্য বাইরে কাঁধে লেগেছে গুলি। ক্ষতটা বেশ বড়। কাঁধের মাসলে গুলি থাকতে পারে, সেটা আহমদ মুসাই বলল আলদুনি সেনফ্রিডকে।

কি করবে, কিভাবে কাজ শুরু করবে, এমন দিশেহারা অবস্থায় পড়ে গেল আলদুনি সেনফ্রিড। ওদিকে আহমদ মুসা আবার বলল, ‘আমার ব্যাগের ভেতরে দেখুন একটা সুইচ নাইফ কিটস আছে। সেখান থেকে ছুরিটা বের করে ক্ষতস্থানের সামনের দিকের কিছুটা চামড়া কেটে ফেলুন। বুলেটটা বেশি গভীরে যায়নি, উপরেই আছে বলে আমার মনে হচ্ছে।’

আহমদ মুসার কথা শুনেই আঁৎকে উঠল সেনফ্রিড। এই কাটাকুটো করা দূরের কথা, এটা দেখতেও তার ভয় করে।

ব্রুনা তার বাবার চেহারা দেখে সব বুঝতে পারল যে, তার বাবা এটা করতে পারবে না। কিন্তু কাজটা তো করতে হবে। গুলি বের না করলে আহমদ মুসার ক্ষতি হবে। এই চিন্তা ব্রুনাকে দারুণভাবে উদ্বিগ্ন করে তুলল। ব্রুনা কলেজে পড়ার সময় ফার্স্ট এইড ট্রেনিং নিয়েছে। সে আহত জায়গায় ড্রেসিং করতে পারবে। কিন্তু গুলি বের করা! এটা তো সাংঘাতিক ব্যাপার! হঠাৎ ব্রুনার মনে পড়ল, একটা নার্সিং ক্লাসে একজন ডাক্তার একদিন বলেছিলেন, একটা গুলি যখন কোথাও প্রবেশ করে তখন সে তার রাস্তা তৈরি করেই প্রবেশ করে। একটু সাহস করলে সে পথ দিয়ে তা বের করাটাও সহজ। ব্রুনার মনে সাহসের সৃষ্টি হলো। বলল সে তার বাবা সেনফ্রিডকে লক্ষ্য করে, 'বাবা, তুমি এসবের কিছু জান না, করওনি কোনদিন। তুমি সরে এস বাবা, আমার ট্রেনিং আছে। আমি পারব।'

বলে ব্রুনা আহমদ মুসার দিকে এগোলো।

সরে দাঁড়াল মি. সেনফ্রিড।

আহমদ মুসা কিছুই বলল না।

ব্রুনা প্রথমেই ব্যাগ থেকে তুলা বের করে ক্ষতস্থানের রক্ত মুছে ফেলল। বলল, 'ভাইয়া, প্রথমে গুলিটা বের করতে হবে। আপনার তো খুব লাগবে।

'তুমি কাজ শুরু কর ব্রুনা, ডাক্তাররা রোগীর প্রতিক্রিয়ার তোয়াক্কা করে না, তোয়াক্কা করা উচিতও নয়।' আহমদ মুসা বলল।

'ভাইয়া, আমি ডাক্তার নই। কাটার জন্যে ছুরি কিভাবে ধরতে হয় সেটাও আমি জানি না। গুলিটা আমি বের করব, এটাই আমার সিদ্ধান্ত। এখন বলুন, আপনার কাঁধের যন্ত্রনার কেন্দ্রবিন্দুটা ঠিক কোন জায়গায়?' বলল ব্রুনা।

আহমদ মুসা কাঁধের ক্ষতস্থানের শেষ প্রান্তের একটা জায়গা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বলল, জায়গাটা ভারি হয়ে আছে এবং যন্ত্রণাও বেশি হচ্ছে।

'গুলি এখানেই আছে ভাইয়া। আপনার কি মত?' বলল ব্রুনা।

'ধন্যবাদ ব্রুনা। তোমার ভালো কমনসেন্স আছে। তোমার সাথে আমি একমত।' আহমদ মুসা বলল।

জায়গাটাকে ব্রুনা খুব ভালোভাবে দেখল। ক্ষতস্থানের শেষ প্রান্ত থেকে সেই যন্ত্রণা ও ভারি জায়গাটার শুরু। তার মানে গুলিটা ক্ষতস্থান থেকে খুব বেশি

দূরে নয়। আর ক্ষতস্থানের শুরু ও শেষটা দেখে মনে হচ্ছে গুলিটা হিট করার পর উপরের দিকে স্লোপ করেছে। নিচের দিকে নয়। সম্ভবত গুলিটা লেগেছে গাড়িতে ওঠার সময়, পেছন থেকে। যদি তাই হয় তবে গুলি বেশি নিচে যাবার কথা নয়। ব্রুনা এই চিন্তা করল-বন মেডিকেল কলেজের একজন ডাক্তার ট্রেনার হিসেবে আসা তাদের একটা ফার্স্ট এইড ক্লাসে নানা দৈব দুর্ঘটনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বলতে গিয়ে এসব কথা বলেছিলেন। ব্রুনার আজ কাজে লাগল সে কথাগুলো।

ব্রুনা আহমদ মুসার ভারি হয়ে থাকা ও ব্যথাযুক্ত অংশের কেন্দ্রটার ডান প্রান্ত দিয়ে সুইচ মেইড অদ্ভুত ছুরিটা ঢুকিয়ে দিল চোখ বন্ধ করে। ব্রুনার হিসেব ব্যর্থ হলো না। তার ছুরিটা একটা ধাতব বস্তু স্পর্শ পাওয়ার সিগন্যাল দিল। আনন্দে চোখ খুলল সে।

ছুরির ফলা যতটা ভেতরে ঢুকেছে তাতে ব্রুনা নিশ্চিত হলো, ছুরির ফলা বুলেটের দৈর্ঘ্য অতিক্রম করে গেছে।

ব্রুনা আবার চোখ বন্ধ করে ছুরিটাকে অর্ধবৃত্ত পরিমাণ ঘুরিয়ে নিল বাম দিকে।

এ সুইচ ছুরিটার তীক্ষ্ণ একটা ফলা আছে। ফলার নীচে বড়শীর মত বাঁকা ক্ষুদ্র একাধিক খাঁজ আছে। ব্রুনা ছুরিটা ঢুকাবার সময় ছুরির এ দিকটা বুলেটের দিক থেকে বাইরে রেখেছিল। সেটাই ঘুরিয়ে নিল।

ব্রুনা বাম হাতে আহমদ মুসার বাম কাঁধ চেপে ধরে ছুরিটা ধীরে ধীরে টানতে লাগল। শক্ত কিছুতে আটকে গেল ছুরি। এটাই কি বুলেট?

ক্ষতস্থান দিয়ে নতুন করে রক্ত বেরুতে শুরু করেছে। ব্যথাও নিশ্চয় সাংঘাতিকভাবে বেড়েছে। হাত কাঁপছিল ব্রুনার।

বুলেটটাকে ছুরির খাঁজে যাতে ভালো করে আটকানো যায় এ জন্যে ছুরিটাকে বাম দিকে আরও চেপে ধরে জোরে একটা টান দিয়ে ছুরি বের করে নিল।

চোখ খুলল ব্রুনা। দেখল ব্রুনা রক্তের সাথে বুলেটটা গড়িয়ে পড়ছে পিঠের উপর দিয়ে।

বুলেটটা হাতে নিয়ে ব্রুনা চিৎকার করে বলল, ‘থ্যাংক গড, বুলেট বেরিয়ে এসেছে।’

ব্রুনার বাবা-মা আগেই চোখ বন্ধ করে রেখেছিল দৃশ্যটা দেখতে পারবে না বলে। তারাও চোখ খুলল।

কিন্তু আহমদ মুসা পাথরের মত বসে আছে। মুখ থেকে তার একটা শব্দও বের হয়নি।

ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছিল আহমদ মুসার ক্ষতস্থান থেকে।

ব্রুনা চিৎকার করে কথাটা বলার পরই ছুটে গিয়ে গাড়ি থেকে ব্যাগ নিয়ে এসে তোয়ালে বের করে সেটা দিয়ে ক্ষতস্থান চেপে ধরল। বলল, আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, খুব কষ্ট পেয়েছেন ভাইয়া। আনাড়ি হাতের কাজ তো?

‘আল্লাহকে ধন্যবাদ দাও ব্রুনা। বুলেট তুমি সহজেই বের করেছ। এত সহজে বুলেট বের হয় না।’ আহমদ মুসা বলল। তার কন্ঠ কিছুটা অস্বাভাবিক। কন্ঠ তার কিছুটা বেদনাহত।

ক্ষতস্থানের উপর তোয়ালেটা কয়েক মিনিট ধরে রাখার পর তা সরিয়ে নিল। রক্ত বেরুনো কমেছে।

‘দু’ রকমের ব্যান্ডেজ, কোনটা দিয়ে বাঁধব ভাইয়া?’ বলল ব্রুনা।

‘দেখ একটা প্লেইন, আরেকটা মেডিকেটেড। মেডিকেটেডটা হাতে নাও।’

ব্যান্ডেজ বাঁধল ব্রুনা। আহত কানেও ফার্স্ট এইড দিল।

‘ব্রুনা, তুমি তো দেখছি ডাক্তার-নার্সদের মতই ব্যান্ডেজ বাঁধতে পার!’ বলল আলদুনি সেনফ্রিড, ব্রুনার বাবা।

‘বাবা স্কাউট হিসেবেও এটা শিখেছি। আবার আমাদের নিয়মিত ক্লাস করতে হয়েছে ‘ফার্স্ট এইড’-এর উপর।’ বলল ব্রুনা।

‘ধন্যবাদ ব্রুনা।’ বলল তার বাবা।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়ে ব্যাগ থেকে আরেকটা গেঞ্জিজাতীয় জ্যাকেট বের করে পরে নিল। এ জ্যাকেট সে হামবুর্গে এসে কিনেছে মাত্র আগের দিন। আজই কাজে লাগল।

আহমদ মুসা জ্যাকেট পরে ব্রুনাকে ধন্যবাদ দিয়ে বলল, 'এই প্রথম কোন নন-ডাক্তার আমার দেহ থেকে বুলেট বের করল।'

'তার মানে আপনার শরীর থেকে এর আগে অনেকবার বুলেট বের হয়েছে। কতবার?' ব্রুনা বলল।

'আমার গোনা নেই।' আহমদ মুসা বলল।

ব্রুনা কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই ব্রুনার মা কারিনা কারলিন বলল আহমদ মুসাকে, 'আমি, কেন সকলেই আমরা স্তম্ভিত যে, শরীর থেকে একটা বুলেট বের করার মত এত বড় ভয়ংকর যন্ত্রণাদায়ক ঘটনা ঘটল, কিন্তু তুমি বেটা একটুও উহ আহ পর্যন্ত করনি। এটা কি করে সম্ভব আমি বুঝতে পারছি না বেটা।

'আমি উহ আহ করলে ব্রুনা কাঁধ থেকে বুলেটটা বের করতে ভয় করত।' আহমদ মুসা বলল।

'বেটা মানুষ যখন অসহনীয় ব্যথা পায়, তখন মুখ থেকে উহ আহ শব্দ আপনাতেই বের হয়। এটা কোন বিবেচনা দিয়ে কেউ রোধ করতে পারে না।' বলল ব্রুনার মা।

'মা, তুমি সাধারণ লোকের কথা বলছ, কিন্তু ইনি তো অসাধারণ। আমরা বিস্মিত হইনি এটা দেখে। তুমি যা দেখে বিস্মিত হচ্ছ মা, তার চেয়ে উনি অনেক বেশি বিস্ময়কর।' ব্রুনা বলল।

'ঠিক বলেছ ব্রুনা। আমাকে তার উদ্ধার করার দৃশ্যগুলো এখনো আমার চোখে ভাসছে। তুমি যা বলছ সে সময়গুলোতে আমার তাই মনে হয়েছিল।' বলল ব্রুনার মা।

কথা বলার জন্যে মুখ হা করেছিল ব্রুনা। তাকে থামিয়ে দিয়ে আহমদ মুসা বলল, 'এসব থাক প্লিজ। আমার কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে।' বলে একটু থামল আহমদ মুসা।

সবাই তাকিয়েছে আহমদ মুসার দিক্

আহমদ মুসা আবার বলতে শুরু করল, 'আমাদেরকে সকালের মধ্যে বন-এ পৌঁছতে হবে। নকল কারিনা কারলিন কাল সকালেই 'বন'-এর কোন

কোর্টে আপনাদের স্টেট অন্যের কাছে হস্তান্তর করছে। এটা আমাদের রোধ করতে হবে।' আহমদ মুসা বলল।

ব্রুনার মা কারিনা কারলিন, ব্রুনা, ব্রুনার বাবা আলদুনি সেনফ্রিড সকলের মুখ বিস্ময়ে হা হয়ে গেছে।

'হ্যাঁ, এই সম্পত্তি পাবার জন্যেই ওরা সব কিছু করছে।'

'আমাকে যারা বন্দী করেছিল, তাদের কিছু কথা-বার্তা থেকে আমি এটা বুঝতে পেরেছি।' আহমদ মুসা বলল।

'আপনি বন্দী হয়েছিলেন? কখন? কিভাবে?' বলল ব্রুনা বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে।

আহমদ মুসা সংক্ষেপে ঘটনাটা বলল।

'বন্দীত্ব থেকে নিজে মুক্ত হলে, আবার এত বড় ঘটনাও ঘটালে? বলল ব্রুনার মা।

ব্রুনার মা'র কথা শেষ হতেই আলদুনি সেনফ্রিড বলল, 'স্টেটজাতীয় সম্পত্তির কেনা-বেচা হস্তান্তর সংশ্লিষ্ট প্রদেশের হেডকোয়ার্টার বা রাজধানীতে হয়। সুতরাং ঠিকই ধরেছেন কারলিনার স্টেটের হস্তান্তর 'বন'-এ হবে।'

'এ কারণে আমরা বন-এ যাচ্ছি। রেজিস্ট্রি আটকাতে হবে এবং ওদের ধরিয়ে দিতে হবে। দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে ওদের ষড়যন্ত্রও ফাঁস করে দিতে হবে যাতে করে আর কারও সর্বনাশ তারা করতে না পারে বিজ্ঞানের অপব্যবহারের মাধ্যমে।' আহমদ মুসা বলল্

'এত অল্প সময়ে কিভাবে সম্ভব সেটা মি. আহমদ মুসা?' বলল আলদুনি সেনফ্রিড। তার কন্ঠে হতাশা।

'দেখা যাক।' বলে পকেট থেকে মোবাইল বের করল আহমদ মুসা। কল করল জার্মানীর পুলিশ প্রধান বরডেন ব্লিসকে। ওপারে বরডেন ব্লিস-এর নিদ্রাজড়িত কন্ঠ পেতেই আহমদ মুসা বলল, 'আমি খুবই দু:খিত স্যার। ঘুম থেকে আপনাকে জাগালাম। কিন্তু বিষয়টি খুবই জরুরি।'

'মি. আহমদ মুসা, আপনি রাতে না ঘুমিয়ে কাজ করছেন! তার চেয়ে আমার ঘুম ভাঙানো কি খুব বড় হলো? বলুন মি. আহমদ মুসা, আপনার টেলিফোন

আমাকে আনন্দ দেয়, গৌরবান্বিত করে। জরুরি বিষয়টি কি প্লিজ বলুন।' বলল জার্মানীর পুলিশ প্রধান।

'আমি যে বিষয়টা নিয়ে কাজ করছি, সেটা আপনি জানেন স্যার। ব্রুমসারবার্গ স্টেটের মালিক কিডন্যাপড হওয়া মিসেস কারিনা কারলিনাকে ঘন্টা খানেক আগে উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু সমস্যা দাঁড়িয়েছে তার স্টেটটা সকালেই হস্তান্তরিত হতে যাচ্ছে। বন্দী অবস্থায় তার ফিংগার প্রিন্ট তারা দলিলে নিয়েছে। কোর্টে তার জায়গায় হাজির করছে তার ক্লোন করা নকল কারিনা কারলিনাকে। আপনার সাহায্য ছাড়া এই হস্তান্তর ঠেকানো যাবে না স্যার।' আহমদ মুসা বলল।

'মানে আসল কারিনা কারলিনের ক্লোন তৈরি করা হয়েছে? কিন্তু বয়স? এটা ধরা পড়বে না?' বলল ওপার থেকে পুলিশ প্রধান বরডেন ব্লিস।

'এক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ব্রুমসারবার্গ স্টেটের মালিক কারিনা কারলিনের সম্ভবত টিস্যু চুরি করে ২৫ বছর আগে এই ক্লোন তৈরি করা হয়েছে। চুলে রং করে, মেক আপ করে বয়সের পার্থক্য দূর করা হয়েছে।' আহমদ মুসা বলল।

'এতো সাংঘাতিক ব্যাপার মি. আহমদ মুসা। ঐ ক্লোন এবং ব্ল্যাক লাইট নামক গ্যাংয়ের লোকদের আমাদের হাতে পাওয়া দরকার। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আহমদ মুসা। আমি এখনি ব্রুমসারবার্গ ও বন-এর পুলিশকে বলে দিচ্ছি। তারা বন-এর সব কোর্টে পাহারা বসাবে।

আর সেখানকার প্রসিকিউশনকেও কারিনা কারলিনের ব্রুমসারবার্গ স্টেটের কোন ব্যাপার হলে তারা যেন সেটা পুলিশকে জানায় এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে চোখে চোখে রাখে। আর আপনি আহমদ মুসা আসল কারিনা কারলিনকে নিয়ে চলে আসুন।' বলল জার্মানীর পুলিশ প্রধান বরডেন ব্লিস।

'স্যার, আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ খবর আপনাকে জানানো দরকার। এই ব্ল্যাক লাইট গ্যাংটি যেভাবে কারিনা কারলিনের ব্রুমসারবার্গ স্টেট দখল করতে চেষ্টা করছে, ঠিক এভাবেই এই গ্রুপটি এর আগে উত্তর জার্মানীর ৬টি স্টেট দখল করেছে। তারা...।'

আহমদ মুসার কথার মাঝখানেই পুলিশ প্রধান বরডেন ব্লিস বলে উঠল, 'তার মানে আহমদ মুসা, আরও ৬টি ক্ষেত্রে আসল মালিকের ক্লোন তৈরি করে সেই ক্লোন দিয়ে ৬টি স্টেট দখল করে নিয়েছে ঐ গ্যাং?'

'ঠিক বলেছেন স্যার। এটাই ঘটেছে।' আহমদ মুসা বলল।

'কিন্তু কিভাবে প্রমাণ করব আমরা মি. আহমদ মুসা?' বলল পুলিশ প্রধান।

'মিসেস কারিনা কারলিনের কেসসহ ঐ ৬টি কেসের যাবতীয় বিবরণ, তথ্য, ফটোগ্রাফ ওদের কম্পিউটারে ছিল। আমি সে ডিস্ক নিয়ে এসেছি।'আহমদ মুসা বলল।

'বলেন কি আহমদ মুসা? এসব যদি আমরা পেয়ে যাই, গ্যাং-এর রাঘব বোয়ালকে ধরতে পারি, তাহলে এটাই হবে এই শতাব্দীর সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ঘটনা, শতাব্দীর সবচেয়ে বড় মামলা। আর এর গোটা কৃতিত্ব আপনার হবে আহমদ মুসা। মি. আহমদ মুসা আমি নিজে বন-এ আসছি, আপনিও আসুন। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আহমদ মুসা। আমি ভোরে বন-এ পৌঁছাচ্ছি। আপনি ভালো আছেন তো মি. আহমদ মুসা?' বলল পুলিশ প্রধান।

'হ্যাঁ, ভালো আছি স্যার। তবে সামান্য আহত।' আহমদ মুসা বলল।

'আহত? গুলি লাগেনি তো?' বলল পুলিশ প্রধান।

'কাঁধে গুলি লেগেছিল। ওটা বের করা হয়েছে। এখন ভালো আছি।' আহমদ মুসা বলল।

'আমাকে উদ্বেগের মধ্যে ফেললেন আহমদ মুসা। এই অবস্থায় আপনি কিভাবে বন-এ আসবেন? আপনি কোথায়? আমি হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করব?' বলল পুলিশ প্রধান।

'না স্যার, হেলিকপ্টার লাগবে না। আমরা অনেক দূর এসে গেছি। আমরা ঠিক সকালের মধ্যেই বন-এ পৌঁছে যাব।' বলল আহমদ মুসা।

'ঠিক আছে, আপনার কথা মেনে নিলাম। আপনার জীবন আমাদের কাছে খুবই মূল্যবান মি. আহমদ মুসা। নিজের দিকে খেয়াল রাখবেন। তাহলে মি. আহমদ মুসা...।' থামল পুলিশ প্রধান বরডেন ব্লিস।

‘ঠিক আছে স্যার। এখনকার মত এটুকুই। রাখি স্যার। বাই।’ আহমদ মুসা বলল।

মোবাইলের কল অফ করে পকেটে রেখে আলদুনি সেনফ্রিডের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘মি. সেনফ্রিড কাজ হয়ে গেল। আর কিছু চিন্তা নেই। জার্মানীর পুলিশ প্রধান বরডেন ব্লিস এখনই বন ও ব্রুমসারবার্গের পুলিশ ও জুডিসিয়াল প্রসিকিউশনকে বলে দিচ্ছেন সব কোর্টের উপর নজর রাখতে এবং ব্রুমসারবার্গ স্টেট হস্তান্তরের জন্য যারা যাবে, তাদের নজরে রাখতে। আর পুলিশ প্রধান নিজেই সকালে ওখানে যাচ্ছেন।

আহমদ মুসা থামতেই ব্রুনার মা কারিনা কারলিন, ব্রুনার বাবা আলদুনি সেনফ্রিড এবং ব্রুনা প্রায় এক সাথেই বলে উঠলো, ‘ক্লোন ষড়যন্ত্র সম্পর্কে যা যা বললেন আপনি, সবই তাহলে ঠিক?’

‘হ্যাঁ, ব্ল্যাক লাইটের সম্পত্তি দখলের বড় অস্ত্রই হলো ক্লোন।’ আহমদ মুসা বলল।

‘নকল মা তাহলে মায়ের ক্লোন ছিল, এটা তাহলে প্রমাণ হলো।’ বলল ব্রুনা।

‘হ্যাঁ।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কি ভয়াবহ ষড়যন্ত্র! কি সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র! পঁচিশ বছর আগে মায়ের ক্লোন করা হয়েছে, এটা আপনি কিভাবে জানলেন।’ জিজ্ঞাসা ব্রুনার।

‘আমি এটা আলদুস আলারীর কাছ থেকে শুনেছি।’ আহমদ মুসা বলল।

একটু থেমেই আহমদ মুসা আবার উঠল, ‘আর সময় নষ্ট করা নয়। সকালেই আমাদের পৌঁছতে হবে বন-এ। চলুন গাড়িতে উঠি।’ আহমদ মুসা বলল। সবাই উঠল।

‘বেটা আহমদ মুসা, তুমি এসব কি বললে! আমার কানকেও যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। আর তোমাকে মানুষ বলেও বিশ্বাস হচ্ছে না। তুমি এ্যাঞ্জেল বেটা! আমাদের ভাগ্যে কিভাবে সৌভাগ্যের সূর্য হয়ে উদয় হলে? ঈশ্বরকে আমি কিভাবে ধন্যবাদ জানাব!’ অনেকটা স্বাগত কন্ঠে বলল মিসেস কারিনা কারলিন। তার কন্ঠ ভারি, অশ্রুরুদ্ধ।

‘হ্যাঁ মা, আমরা সবাই আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাদের চালান। সব ধন্যবাদ, সব প্রশংসা তাঁরই জন্যে।’ আহমদ মুসা বলল।

সবাই গাড়ির দিকে চলল।

আহমদ মুসা ড্রাইভিং সিটে উঠতে যাচ্ছিল।

ব্রুনা বাধা দিয়ে বলল, ‘এই অবস্থায় আপনি গাড়ি ড্রাইভ করবেন না ভাইয়া। আমি ড্রাইভ করছি। আপনি পাশে বসে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেই চলবে। বাবাকে জিজ্ঞিস করুন আমি ভালো ড্রাইভার কি না।’

‘ধন্যবাদ ব্রুনা। তুমিই ড্রাইভ কর।’ বলে আহমদ মুসা পাশের সিটে গিয়ে বসল।

আলদুনি সেনফ্রিড হাত ধরে গাড়িতে তুলল তার স্ত্রী কারিনা কারলিনকে।

গাড়ি চলতে শুরু করল।

নি:শব্দে চলছে গাড়ি।

নীরবতা ভাঙল ব্রুনা। বলল, ‘এই মুহুর্তে আমার মত সুখী দুনিয়াতে আর কেউ নেই। স্যার, আপনি আমার পাশে। আমার প্রিয় মা-বাবা আমার সাথে। এই চলা যদি চলতেই পারতাম অনন্তকাল।’ আবেগে ভারি কন্ঠ ব্রুনার।

‘আরে ব্রুনা, আনালিসার কথা তো বলছিস না, সে কোথায়?’

ব্রুনা কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেও বলতে পারল না। ঠোঁট তার কেঁপে উঠে থেমে গেল।

‘সে জার্মানীর বাইরে। এখন বল তোমার শরীর কেমন?’ আলদুনি সেনফ্রিড প্রসঙ্গ অন্য দিকে ঘুরিয়ে নেবার চেষ্টা করল।

নানা ধরনের কথা শুরু হলো বাপ, মা ও মেয়ে এই তিনজনের মধ্যে। চলতেই থাকল কথা।

আহমদ মুসা তাদের আলোচনায় যোগ দিল না।

সে ভাবছে আগামী কাল সকালের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে।

# ৭

আহমদ মুসারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেও সকাল সাড়ে দশটার মধ্যে বন-এ পৌছতে পারল না। অবশ্য পুলিশ প্রধান বরডেন ব্রিসের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ তাদের ছিল।

পুলিশ প্রধান বরডেন ব্লিস সকাল ৮টায় বার্লিন থেকে বন পৌছেছিল।

সকাল সাড়ে ৯টার মধ্যেই ব্ল্যাক লাইটের লোকদের পুলিশ লোকেট করে ফেলে। ওরা সাড়ে ৯টাতেই বন-এর একটা কোর্টে পৌছেছিল। সকাল ১০টায় ব্রুমসারবার্গ স্টেট হস্তান্তরের দলিল হবার কথা।

ঠিক সকাল ১০টায় ওরা দলিল রেজিস্ট্রির জন্যে কোর্টে ওঠে। কোর্টে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে উপস্থিত হয়ে সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় দস্তক্ষত ও টিপসহির মাধ্যমে তার স্টেট হস্তান্তর করছে, এই হলফ যখন নকল কারিনা কারলিন করে এবং তা রেকর্ড হয়, তখনই পুলিশ গোটা কোর্ট ঘিরে অ্যারেস্ট করে নকল কারিনা কারলিন ও ব্ল্যাক লাইটের সব লোককে প্রতারণা, ষড়যন্ত্র ও আত্নসাতের অভিযোগে।

কোর্ট প্রাথমিক প্রমাণ চাইলে পুলিশ প্রধান স্বয়ং কোর্টকে জানান, 'যে কারিনা কারলিন স্টেট হস্তান্তর করছে, তিনি সম্পত্তির মালিক নন। প্রকৃত মালিক আসল কারিনা কারলিনের তিনি ক্লোন, নকল। সাড়ে দশটার মধ্যেই আসল কারিনা কারলিন এসে পৌঁছাবেন।'

কোর্ট পুলিশ প্রধানের আবেদনে বেলা ১১টা পর্যন্ত সময় মঞ্জুর করেন।

আহমদ মুসাদের গাড়ি কোর্ট প্রাঙ্গণে এসে পৌঁছালে পুলিশ প্রধান স্বয়ং কোর্ট থেকে তাদের গাড়ির কাছে আসেন।

এসেই তিনি আহমদ মুসাকে সব জানান।

আহমদ মুসা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন এবং বলেন ব্ল্যাক লাইটের যাদেরকে ধরেছেন তাদের মধ্যেই ব্ল্যাক লাইটের প্রধানও আছেন। তাকে চিহ্নিত

করতে হবে। দ্বিতীয়ত, আপনি অ্যারেন্ডসীর পুলিশকে বলুন অ্যারেন্ডসী লেকের পশ্চিম তীরে হোটেল অ্যারেন্ডসী ডয়েসল্যান্ডের উত্তর পাশে ১৩০ নাম্বার বাড়িটা ব্ল্যাক লাইটের একটা ঘাঁটি। পুলিশকে ওটা দখলে নিতে হবে।'

ধন্যবাদ আহমদ মুসা। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আমি নির্দেশ পাঠাচ্ছি। আর ডিস্কটা আপনি দিন, সেই ছয়টা ক্লোন ও তার লোকদের এখনি ধরার ব্যবস্থা করতে হবে।' বলল পুলিশ প্রধান।

আহমদ মুসা আসল ডিস্কের একটা কপি পুলিশ প্রধানের হাতে তুলে দিল। আসার পথেই আহমদ মুসা ডিস্কটার একটা কপি করে নিয়েছিল। সাবধানতার একটা অংশ হিসেবেই করেছিল এটা আহমদ মুসা।

ডিস্কটা পকেটে পুরে পুলিশ প্রধান বলল, মি. আহমদ মুসা আপনাকে হাসপাতালে নেয়া প্রয়োজন কি না?'

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই ব্রুনা দ্রুত কন্ঠে বলল, 'হ্যাঁ, স্যার তাঁকে হাসপাতালে নেয়া প্রয়োজন। আজকেই উনি দু'বার গুলি বিদ্ধ হয়েছেন, কানে ও কাঁধে। এ ছাড়া দু'দিন আগে তিনি বাম বাহুতেও গুলি খেয়েছেন।'

'সর্বনাশ, এসব কথা তো মি. আহমদ মুসা আমাকে বলেননি। এই আহত অবস্থায় আপনি কাজ করছেন। করবেনই তো! ভুলেই যাচ্ছি কেন যে, আপনি আহমদ মুসা। যাক, আমাদের কাজ আমাদের করতে দিন।' বলে পুলিশ প্রধান বন-এর পুলিশ কর্মকর্তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি মিসেস কারিনা কারলিন এবং তাঁর স্বামী ও মেয়েকে কোর্টে নিয়ে যাচ্ছি। আপনি নিজে আহমদ মুসাকে সামরিক হাসপাতালে নিয়ে যান।'

'প্লিজ, আমাকে সামরিক হাসপাতালে নয়, পুলিশ হাসপাতালে নিয়ে চলুন। হাসপাতালে ভর্তির ব্যাপারে আমার দু'টি শর্ত আছে। এক, আমার নাম গোপন করতে হবে, দুই, চিকিৎসা হবে, কিন্তু কোন অপারেশন নয়।' আহমদ মুসা বলল।

'ঠিক আছে তাই হবে আহমদ মুসা।' বলে বনের পুলিশ কর্মকর্তাকে পুলিশ প্রধান বরডেন ব্লিস বললেন, 'ঠিক আছে পুলিশ হাসপাতালেই নিন।

আমাদের জন্য যে কেবিনগুলো বরাদ্দ, তার কোন একটিতে ওঁকে রাখবেন।' বলল পুলিশ প্রধান বরডেন ব্লিস।

বিশাল পুলিশ বেষ্টনির মধ্য দিয়ে মিসেস কারিনা কারলিনদের নিয়ে পুলিশ প্রধান চললেন কোর্টের দিকে। আর আহমদ মুসাকে নিয়ে বন-এর পুলিশ কর্মকর্তা চললেন পুলিস হাসপাতালের দিকে। তার গাড়ির আগে-পিছে রয়েছে পুলিশের প্রহরা।

পরদিন জার্মানীর সকল কাগজে ৮ কলাম ব্যাপী হেডলাইন:

'শতাব্দীর সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ষড়যন্ত্র দিনের আলোতে নিয়ে এসেছে জার্মান পুলিশ।' বিবরণে লেখা হয়েছে কি করে বড় বড় স্টেট মালিকদের ক্লোন তৈরি করে মালিকদের হত্যা করে তার জায়গায় ক্লোনকে বসিয়ে একের পর এক সম্পত্তি গ্রাস করা হয়েছে তার কাহিনী। কারিনা কারলিনের ব্রুমসারবার্গের স্টেটসহ সাত সাতটি স্টেটের ক্লোন ষড়যন্ত্রের বিস্তারিত বিবরন কাহিনী আকারে পত্রিকায় এসেছে। তারা লিখেছে , ব্রুমসারবার্গের ঐতিহ্যবাহী পরিবারের উত্তরসূরি কারিনা কারলিনের ক্লোন তৈরি করে তাদের দশ হাজার একরের স্টেট দখল করতে গিয়ে এই ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে গেছে। ষড়যন্ত্রকারীরা আসল কারিনা কারলিনকে কিডন্যাপ করে তার জায়গায় তার ক্লোনকে বসিয়ে তার মাধ্যমে স্টেট হস্তান্তরের সব ব্যবস্থা চুড়ান্ত করেছিল। কিন্তু রেজিস্ট্রির সময় শেষ মুহূর্তে তারা ধরা পড়ে যায়। পুলিশ বিশ্বস্ত সূত্রের খবর পেয়ে তাদের ধরে ফেলে এবং পুলিশ 'ব্ল্যাক লাইট' নামক ষড়যন্ত্রকারীদের সব ষড়যন্ত্রের রেকর্ডসংবলিত একটা কম্পিউটার ডিস্ক পেয়ে যায়। ডিস্ক থেকে তথ্য উদ্ধার করেই পুলিশ উত্তর জার্মানীর আরও যে ৬টি স্টেট ষড়যন্ত্রকারীরা ক্লোন করে দখল করে নিয়েছিল সেগুলোতে একযোগে অভিযান চালায় এবং ক্লোনসহ তাদের লোকদের ধরে ফেলে। এসব স্টেটের আসল মালিকরা কোথায় কিংবা তাদের কি করা হয়েছে পুলিশ এখনো তার অনুসন্ধান চালাচ্ছে। ভয়াবহ, বিপজ্জনক ও সুবিশাল এই ষড়যন্ত্র ধরে ফেলার কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্যে দেশের সকল প্রান্ত থেকে সকলেই পুলিশের প্রশংসা করছে এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে এবং পুলিশ প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসার ও পুলিশদের জাতির পক্ষে পুরস্কৃত করার দাবি জানানো হচ্ছে।

এই ষড়যন্ত্র বিষয়ে জনগণকে অবহিত করার ক্ষেত্রে দেশের টিভি চ্যানেলগুলো আন্তরিক ভূমিকা পালন করছে। গতকাল থেকে তারা এই ঘটনার উপর অব্যাহতভাবে অনুষ্ঠান প্রচার করছে। পুলিশ প্রধান, ঊর্ধ্বতন পুলিশ অফিসার, কারিনা কারলিনের পরিবারসহ ষড়যন্ত্রের শিকার ৭টি পরিবারের সংশ্লিষ্টদের সাক্ষাৎকার ও বক্তব্য নেয়া হচ্ছে।

পুলিশ হাসপাতালের ভিভিআইপি কক্ষের বেডে শুয়ে আহমদ মুসাও পত্রিকার বিবরণগুলো পড়ছিল। এসব রিপোর্ট টিভিতে গতকাল থেকেই সে দেখে আসছে। ভীষণ খুশি আহমদ মুসা অন্যান্য ৬টি স্টেটের সম্পত্তি আত্মসাৎকারী ক্লোন ও তার লোকজন ধরা পড়ার সংবাদে।

পুলিশ প্রধান বরডেন ব্লিস আহমদ মুসার কক্ষে প্রবেশ করল।

আহমদ মুসা একটা ইজি চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছিল।

পুলিস প্রধান বরডেন ব্লিস ঘরে প্রবেশ করেই জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে। আহমদ মুসার কপালে চুমু খেয়ে বলল, 'আমি আপনার পিতার বয়সের মি. আহমদ মুসা। কিন্তু আমার ইচ্ছা করছে, আপনার পা ছুঁয়ে আপনাকে স্যালুট দিতে।'

আহমদ মুসা ও বরডেন ব্লিস কেউ-ই দেখতে পায়নি দরজায় এসে দাঁড়ানো ব্রুনা, ব্রুনার মা কারিনা কারলিন ও ব্রুনার বাবা আলদুনি সেনফ্রিডকে।

পুলিস প্রধান থেমেই আবার বলল, 'মি. আহমদ মুসা, আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীকে গোটা বিষয় জানিয়েছি। সেটা জানাতে গিয়ে আপনার কথা তাদের বলতে হয়েছে। আপনার নাম গোপন করতে বলেছিলেন, সেটা তাঁদের কাছে গোপন করা সম্ভব হয়নি। তারাও আপনাকে জানেন দেখলাম। আজই একবার তাঁরা আপনার সাথে দেখা করতে আসবেন।'

'ধন্যবাদ স্যার। ভালো হতো যদি আপনি আমার ব্যাপারটা তাঁদের কাছে গোপন রাখতে পারতেন। আমি...।'

'কেন ভাইয়া, গোপন রাখতে হবে কেন? কত ভালো হতো যদি পত্রিকা ও অন্য মিডিয়াগুলো কাহিনীর পেছনের কাহিনী প্রচার ও প্রকাশ করতে পারতো।'

আহমদ মুসা কথার মাঝখানেই উচ্চস্বরে কথাগুলো বলতে বলতে ব্রুনা ঘরে প্রবেশ করল। তার সাথে তার বাপ-মাও।

‘ঠিক বলেছ মা। আমারও এটাই কথা। গোপন করার কি প্রয়োজন ছিল? কিন্তু বলতো, তোমাদের সাক্ষাৎকারে তোমরা ওর সম্পর্কে কিছু বললে না কেন?’ বলল পুলিশ প্রধান বরডেন ব্লিস।

‘এটা ভাইয়াকে জিজ্ঞাসা করুন স্যার। তিনি যেমন আপনার মুখ বন্ধ করেছেন, তেমনি আমাদেরকেও কড়া নির্দেশ দিয়েছেন তার সম্পর্কে একটা কথাও যাতে না বলি। তাঁর নির্দেশ না মানার সাধ্য আমাদের আছে?’ ব্রুনা বলল।

‘এই গোপনীয়তা কেন মি. আহমদ মুসা আপনার? ছবি তো নয়ই, আপনার ব্যক্তিত্ব, কাজ ইত্যাদি কেন আপনি প্রকাশ করবেন না? হাজারো মানুষকে এটা অনুপ্রেরণা দিতে পারে।’ বলল পুলিশ প্রধান গম্ভীর কন্ঠে।

‘আমি কখনও রিটায়ারমেন্টে গেলে বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করব। কিন্তু মি. বরডেন ব্লিস! স্যার, আপনি অন্তত জানেন, স্বার্থে আঘাত দিয়েছি, ষড়যন্ত্র বানচাল করেছি, এমন শত্রু আমার দুনিয়াজোড়া। তারা দুনিয়াময় ঘুরে বেড়াচ্ছে আমার কাজ, আমার কাজের ধরণ, কোথায় কোন রুপে কাজ করছি, আমার এখনকার লোকেশন ইত্যাদি মানে আমার প্রতিটি পদক্ষেপ জানার জন্য। আমি আমার এসব প্রকাশ করে একদিকে যেমন তাদের মাথা ব্যথা বাড়াতে চাই না, তাদের উস্কে দিতে চাই না, অন্য দিকে তেমনি আমি যা করছি, তা একজন মানুষ হিসেবে আল্লাহর জন্যে করছি, মানুষের জন্যে মানুষ কিছু করলে আল্লাহ খুমি হন বলে করছি, কোন প্রশংসা, কোন ধন্যবাদ, কোন বিনিময় পাওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। তাই এসব আমি অহেতুক প্রকাশ্যে প্রচার করতে চাই না।’ আহমদ মুসা বলল। তার গম্ভীর কন্ঠ খুব নরম ও শান্ত। আহমদ মুসা থমল।

কেউ কোন কথা বলল না।

নির্বাক যেন সকলে। সম্মোহিত যেন তারা।

বিস্ময়-বিমুদ্ধ ব্রুনা ও ব্রুনার মা কারিনা কারলিনের চোখের কোণা ভিজে উঠেছে অশ্রুতে। এক সময় নীরবতা ভেঙে পুলিশ প্রধান বরডেন ব্লিস ধীর কন্ঠে বলল, ‘মি. আহমদ মুসা, আপনি কাজের দিক দিয়ে যেমন আকাশস্পর্শী, তেমনি

মনের দিক দিয়েও এক অতলান্ত সাগর। একটা কথা বলুন মি. আহমদ মুসা, আল্লাহ অর্থাৎ  ঈশ্বরের জন্যে করা মানে মানুষের জন্যে করা, কারণ মানুষ মানুষের জন্যে কিছু করাকে ঈশ্বর পছন্দ করেন-এই মহান কনসেপ্টে আপনি উদ্বুদ্ধ হলের কোথা খেকে?'

আমার ধর্ম ইসলাম আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে। আল্লাহ তাঁর সৃষ্ট মানুষের কাছ থেকে এটা চান, কারণ পৃথিবীতে শান্তি ও স্বস্তির সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে এটা খুবই প্রয়োজন।' আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ আহমদ মুসা!' বলে আনন্দ-বিস্ময়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠা পুলিশ প্রধান কিছু বলতে যাচ্ছিল, 'এই সময় হাসপাতালের পরিচালক ঘরে প্রবেশ করল। বলল বরডেন ব্লিসকে, 'স্যার, অয়্যারলেস পেলাম, প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পাঁচ মিনিটের মধ্যে এখানে আসছেন।'

শুনেই শশব্যস্ত হয়ে উঠল পুলিশ প্রধান বরডেন ব্লিস। বলল পরিচালককে, 'সবকিছু ঠিক আছে তো। এই ঘরটাকে আরেকটু ড্রেসিং করুন। আরও সোফা এখানে নিয়ে আসুন।'

'মি. আহমদ মুসা, আমরা চলি। পরে আসব।' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

'না মি. সেনফ্রিড। আপনারা বসুন ড্রইং রুমে। আপনাদের সাথে দেখা হলে খুশিই হবেন তারা।' পুলিশ প্রধান বরডেন ব্লিস বলল।

'ঠিক আছে? অবশ্যই বসছি।' বলে কক্ষ থেকে বেরিয়ে এক সাথে অ্যাটাস্ড ড্রইং রুমে প্রবেশ করল ব্রুনারা।

আহমদ মুসার কক্ষকে ঠিকঠাক করার জন্যে অনেক লোক এসে গেল। হাসপাতালের অফিসার-কর্মচারিদের তখন ছুটাছুটি শুরু হয়ে গেছে চারদিকে।

সর্বত্রই একটা সাজসাজ রব। কিন্তু তাদের সকলের মধ্যেই একটা কানাঘুষা চলছে ভিভিআইপি কক্ষটিতে কে আছেন? পুলিশ তো নয়; তাহলে কে, যার জন্যে পুলিশ প্রধান এসে বসে আছেন, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসছেন?

আর শুয়ে থাকতে ভালো লাগছে না আহমদ মুসার। গতকাল ছাড়া পেতে চেষ্টা করেছিল হাসপাতাল থেকে। কিন্তু পুলিশ প্রধানের বাধায় সেটা হয়নি। দুর্বলতা কাটার জন্যে আরও দু'একদিন বিশ্রামে থাকা দরকার।

পাশ ফিরে শুয়ে আহমদ মুসা পাশ থেকে আইফোনটা তুলে নিল। পুলিশ প্রধান আইফোনটা তাকে প্রেজেন্ট করেছে।

আইফোন হাতে নিয়ে আহমদ মুসা হোমস্ক্রীন ওপেন করতেই একটা মেসেজ দেখতে পেল। ওয়াশিংটন থেকে সারা জেফারসন পাঠিয়েছে। ক্লিক করে ফুল টেক্সট তাড়াতাড়ি সামনে নিয়ে এল। সংক্ষিপ্ত মেসেজটা পড়েই চমকে উঠেছে সে। মেসেজটি পড়ল আহমদ মুসা:

'গতকাল এফবিআই জানিয়েছে, দু'দিন আগে ওয়াশিংটনে আপনার শত্রু তিনটি শক্তিশালী সংগঠন মিটিং করেছে। সে মিটিং-এ আপনাকে শায়েস্তা করার জন্যে আপনার পরিবারের উপর আঘাত হানার সিদ্ধান্ত হয়েছে। গতকাল থেকে বাড়িতে এফবিআই পাহারা বসিয়েছে। এফবিআইকে জানানো ছাড়া কোথাও বেরুতে নিষেধ করা হয়েছে। আপা এ সময় আপনাকে এসব জানিয়ে ডিস্টার্ব করতে চাননি। কিন্তু উদ্বেগ আমাকে অস্থির করে তুলেছিল। আপনাকে সব জানিয়ে সেই উদ্বেগ কিছু হালকা করার চেষ্টা করলাম।' সারা।

আহমদ মুসার মনে জোসেফাইনের সুন্দর মুখটা ভেসে উঠল। আহমদ মুসা তাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'তুমি সব সময় আমার সুবিধা-অসুবিধার কথা ভাব, দুশ্চিন্তা থেকে আমাকে সব সময় দূরে রাখতে চাও। তোমার চিন্তা, দুশ্চিন্তা নিরাপত্তাহীনতা তোমার কাছে কিছুই নয়, কিন্তু আমার কাছে সবকিছু। মনে মনে ধন্যবাদ দিল সারা জেফারসনকে। স্বগতই বলল, ঠিক সময়ে জানিয়েছ তুমি সারা। ওরা তিন সংগঠন কারা আমি জানি না। তবে অনুমান করতে পারি। তাদের হুমকি শূন্যগর্ভ অবশ্যই নয়।

মোবাইল বেজে উঠল এ সময়। কল অন করল আহমদ মুসা।

ওপার থেকে জোসেফাইনের গলা পেতেই সালাম দিয়ে আহমদ মুসা বলল, 'কেমন আছ তোমরা জোসেফাইন, তোমার টেলিফোনের আইডি হাইড করা কেন?'

‘ও কথার উত্তর পরে দেব। বল, কেমন আছ?’ বলল জোসেফাইন।

‘এখন ভালো।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তার মানে আগে ভালো ছিলে না। কি হয়েছিল তোমার?’ বলল জোসেফাইন। তার কন্ঠে উদ্বেগ।

‘আমি জিজ্ঞেস করেছি, তোমরা কেমন আছ। তার জবাব এড়িয়ে গেছ। সে জবাব আগে দাও।’ আহমদ মুসা বলল।

হাসল ওপার থেকে জোসেফাইন। বলল, ‘হ্যাঁ , তাহলে শোন আমি ভালো আছি, সারা ভালো আছে, আহমদ আবদুল্লাহও ভালো আছে।’

‘ধন্যবাদ। কিন্তু আহমদ আবদুল্লাহ তিন নাম্বারে কেন?’ আহমদ মুসা বলল।

‘বয়স অনুসারে সিরিয়াল।‘ বলল জোসেফাইন হেসে উঠে।

‘সারা এল তালিকায়, তার মা বাদ পড়ল কেন?’ আহমদ মুসা বলল।

আবার হাসল জোসেফাইন। বলর, ‘গ্রুপ’ বা ‘ফ্যামিলি’ বলে একটা কথা আছে না, আমরা একটা গ্রুপ। তাই তার নামটা মনে পড়েছে।’ বলল জোসেফাইন।

মুহুর্তের জন্যে থেমেই জোসেফাইন আবার বলল, ‘ থাক এসব। তুমি সত্যিই ভালো আছ তো? তোমার মিশনের কি অবস্থা?’

‘তুমি খুশি হবে জোসেফাইন, মিশন আমার সফল। কারিনা কারলিন উদ্ধার হয়েছে। তাদের স্টেট রক্ষা পেয়েছে। তার সাথে আরও ছয়টা স্টেট রক্ষা পেয়েছে রাহুগ্রাস থেকে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘থ্যাংকস আল্লাহ। এবার তাহলে আমেরিকার টিকিট কাট।’ বলল জোসেফাইন।

‘কেন?’ আহমদ মুসা বলল।

‘কেন সেটা তুমিই জান।’ বলল জোসেফাইন।

‘জানি, আমার জোসেফাইন আমেরিকায়।’ আহমদ মুসা বলল।

‘শুধু জোসেফাইন নয়, তোমার সব আমেরিকায়।’ বলর জোসেফাইন।

কথা শেষ করেই আবার বলে উঠল, ‘কথা বাড়িও না। কবে আসছো আমেরিকায়?

‘তুমি যখন বলবে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘এখনি এস।’ বলল জোসেফাইন। সে হাসল।

‘তাই আসছি। আহমদ আবদুল্লাহর তো গলা পাচ্ছি না?’ আহমদ মুসা বলল।

‘সে সারার কাছে। সে সারাকে আমার চেয়ে বেশি ভালোবাসে।’ বলল জোসেফাইন।

‘এটা কি ভালো জোসেফাইন?’ আহমদ মুসা বলল।

‘বাচ্চার স্বাধীনতায় হাত দেবে নাকি?’ বলল জোসেফাইন।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘সবচেয়ে আগে যে টিকিট পাব, সে টিকিটেই আমি আসছি জোসেফাইন।’

ভালো থেকো, আল্লাহ সবাইকে ভালো রাখুন।’ বলে সালাম দিয়ে আহমদ মুসা কল অফ করে দিল।

চোখ বুজে কিছুক্ষণ হৃদয়ে গেঁথে রাখা জোসেফাইনের ছবি দেখল। তারপর মনে মনে তাকে বলল, জোসেফাইন কোন খারাপ খবর আমাকে দিতেই চাও না, যতটা পার নিজেই তার ভার বহন করতে চাও। তোমাদের বিপদের কথা এখনও গোপন করে গেলে।

আইফোন পাশে রেখে উঠে বসল আহমদ মুসা। হাসপাতালের প্যাড, কলম টেনে নিয়ে একটা চিঠি লেখার পর মোবাইলটা তুলে নিল পুলিশ প্রধান বরডেন ব্লিসকে টেলিফোন করার জন্যে। আর এই সময়ই বরডেন ব্লিস দরজায় নক করে আহমদ মুসার ঘরে প্রবেশ করল।

‘আল হামদুলিল্লাহ, পেয়ে গেলাম আপনাকে। আপনাকেই টেলিফোন করতে যাচ্ছিলাম।’ বলল আহমদ মুসা।

‘কি ব্যাপার মি. আহমদ মুসা? জরুরি কিছু?’ পুলিশ প্রধান বলল।

‘আমার পরিবার এখন ওয়াশিংটনে। কিছু সমস্যা হয়েছে সেখানে। সবচেয়ে আগে যে ফ্লাইট পাব, সেটাতে আজই আমি ফ্লাই করতে চাই মি. বরডেন ব্লিস।’ বলল আহমদ মুসা।

এই সাথে পাসপোর্টের একটা কপি দিয়ে দিল বরডেন ব্লিসকে।

পাসপোর্টের কপি নিয়ে পুলিশ প্রধান উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, ‘আমি আসছি এখনি মি. আহমদ মুসা।’

ঘর থেকে বেরুলেন পুলিশ প্রধান বরডেন ব্লিস।

পাঁচ সাত মিনিট পর পুলিশ প্রধান ফিরে এল হাসতে হাসতে। বলল, ‘কত তাড়াতাড়ি যাবেন দেখুন মি. আহমদ মুসা্। বেলা ২টায় লুফথানসা লন্ডন হয়ে ওয়াশিংটন। বিকেল ৪টায় বৃটিশ এয়ারওয়েজের বিশেষ ফ্লাইট লন্ডন, মন্ট্রিল হয়ে ওয়াশিংটন। বিকেল ৫টায় ফ্রেন্স এয়ার লাইনস প্যারিস, রাবাত হয়ে ওয়াশিংটন। পরের ফ্লাইটগুলো আরও দেরিতে বলে সেগুলোর টাইম নেয় হয়নি।’

‘ধন্যবাদ মি. বরডেন ব্লিস। অনেক পরিশ্রম করেছেন। আমি দুপুর ২টায় লুফথানসা ফ্লাইটে যেতে চাই।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তার মানে অন্তত ১২টায় আপনাকে বের হতে হবে। তাহলে হাতে আপনার মাত্র ১ ঘন্টা সময়। পারবেন এর মধ্যে রেডি হতে? মি. সেনফ্রিডের বাসায় আপনাকে যেতে হবে না?’ বলল পুলিশ প্রধান।

‘না স্যার, ওখানে আর যাচ্ছি না। একটা চিঠি লিখেছি। এ চিঠিটা আপনার লোককে দিয়ে মি. সেনফ্রিডের বাড়িতে পৌছে দিতে হবে। আর স্যার, আমি গোসল করেই রেডি হয়ে যাব। প্লিজ, আপনি বিমান বন্দরে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ঠিক আছে আহমদ মুসা। আমি ওদিকের সব ব্যবস্থা করছি। আপনি গোসল করে রেডি হয়ে নিন।’

বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল পুলিশ প্রধান বরডেন ব্লিস।

আহমদ মুসা গোসল সেরে পোশাক পরে ব্যাগ গুছিয়ে রেডি হয়েই ছিল। পুলিশ প্রধান বরডেন ব্লিস আসতেই তার সাথে বেরিয়ে পড়ল।

এয়ারপোর্টে যাবার জন্যে বরডেন ব্লিস আহমদ মুসার সঙ্গে একই গাড়িতে উঠল।

ভিআইপি লাউঞ্জে প্রধানমন্ত্রীর পিএস এসে পুলিশ প্রধানকে তিনটা প্যাকেট দিয়ে গেল।

প্যাকেটগুলো পুলিশ প্রধান বরডেন ব্লিস্ আহমদ মুসার সামনে নিয়ে বলল, 'মি. আহমদ মুসা প্রধানমন্ত্রীর তরফ থেকে এগুলো আপনার জন্যে উপহার।'

'কি আছে মি. বরডেন ব্লিস এগুলোতে?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'একটাতে আছে হিরের নেকলেস মিসেস আহমদ মুসার জন্যে। দ্বিতীয়টিতে আছে হীরের নিবের সোনার কলম মাস্টার আহমদ আবদুল্লাহ্‌র জন্যে এবং তৃতীয়টিতে একটা পোষ্ট টুয়েন্টি ফার্স্ট সেনচুরি ০০১ রিভলবার। সিংগেল ট্রিগার এ থেকে ৪টা মিনি সাইজ গুলি বের হয়। এর প্রত্যেকটি গুলির বিস্ফোরণ ক্ষমতা হ্যান্ড মর্টারের একটা গুলির বিস্ফোরণ ক্ষমতার সমান।' বলে পুলিশ প্রধান প্যাকেট খুলে রিভলবারটা আহমদ মুসাকে দেখাল।

একজন পুলিশকে বলে প্যাকেটগুলো আহমদ মুসার লাগেজে ঢুকিয়ে রি-প্যাক করে দিল।

ঠিক বেলা ১টা ৪৫ মিনিটে আহমদ মুসা বিমানে উঠল।

পুলিশ প্রধান তাকে বিমান পর্যন্ত পৌঁছে দিল।

ব্রুনা, ব্রুনার মা ও আলদুনি সেনফ্রিড তাদের বন-এর বাসার বাইরের ড্রইংরুমে বসে ছিল। শুনছিল কারিনা কারলিন ব্রুনার কাছ থেকে তার বড় বোন আনালিসার কথা। আহমদ মুসা যাকে গৌরী বলে জানে।

একজন পুলিশ অফিসার গেটের ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইল।

ব্রুনা বেরিয়ে গিয়ে তাকে নিয়ে এল।

ড্রইং রুমে এসে পুলিশ অফিসার কারিনা কারলিনকে লক্ষ করে বলল, ‘আপনি নিশ্চয় মিসেস সেনফ্রিড?’

‘জি, হ্যাঁ। বলুন তো কি ব্যাপার?’

‘কিছু নয় ম্যাডাম। একটা চিঠি আপনাকে দিতে এসেছি।’ একটা ইনভেলাপ তার দিকে বাড়িয়ে বলল পুলিশ অফিসার।

‘কার চিঠি?’ চিঠিটা হাতে নিয়ে বলল কারিনা কারলিন।

‘আহমদ মুসার চিঠি। যিনি পুলিশ হাসপাতালে ছিলেন।’ বলল পুলিশ অফিসার।

‘ছিলেন মানে? এখন নেই?’ প্রশ্ন ব্রুনার। তার কন্ঠে কিছুটা উদ্বেগ।

‘নেই ম্যাডাম। বেলা ২টায় তিনি ওয়াশিংটন যাত্রা করেছেন।’ বলল পুলিশ অফিসার।

পুলিশ অফিসারের কথাটা কানে যেতেই ব্রুনার মনে হলো সে যেন আকাশ থেকে আছড়ে পড়ল মাটিতে। আঘাতটা তার বুকে এস বিঁধল। হৃদয়ের কোন এক অন্ধকার কোণ থেকে সজীব যন্ত্রণার এক প্রস্রবণ তার হৃদয় মনে এক সয়লাব নিয়ে এল। সে সয়লাব অশ্রু হয়ে নেমে এল দু’চোখ দিয়ে। দু’হাতে মুখ ঢেকেছে ব্রুনা।

পুলিশ চলে গেছে।

‘ব্রুনা দেখতো আহমদ মুসা কি লিখেছে?’

বলে ব্রুনার মা কারিনা কারলিন ব্রুনার দিকে চাইল। দেখল, ব্রুনা দু’হাতে মুখ ঢেকে সোফায় মাথাটা এলিয়ে দিয়েছে।

কারিনা কারলিন সোফার ওদিকে একটু সরে গিয়ে ব্রুনার হাত টেনে নিয়ে বলল, ‘কি হয়েছে মা তোমার? অসুস্থতা বোধ করছ?’

কিন্তুব্রুনার মুখের দিকে ভালো করে তাকাতে গিয়ে দেখল অশ্রুতে ভেসে যাচ্ছে তার দু’গণ্ড। কি হয়েছে মা? আহমদ মুসা চলে গেছে তাই কি?’

‘কারলিন, আহমদ মুসা কি লিখেছে পড়। জানাই তো গেল না ঘটনা কি?’ বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

কারিনা কারলিন একবার তাকাল আলদুনি সেনফ্রিডের দিকে। তার দুই চোখে কিছুটা বিস্ময়, কিছুটা অনুসন্ধান।

'ঠিক আছে পড়ছি সেনফ্রিড।' বলে চিঠিটা মেলে ধরল তার চোখের সামনে।

"মা,

খুব ভালো হতো যদি আমি আপনার স্নেহের সান্নিধ্যে কয়েকটা দিন কাটাতে পারতাম। কিন্তু হলো না। খুব জরুরি হওয়ায় আকস্মিকভাবেই আমাকে ওয়াশিংটন যেতে হচ্ছে।

আপনাদের সাথে কথা বলে বিদায় নিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু ইচ্ছা করেই তা করলাম না। বিদায়ের বেদনা আমি সইতে পারি না, বেদনার অশ্রু আমার কাছে অসহনীয় লাগে-এ জন্যেই পেছনে ফিরে তাকাতে ভয় পাই আমি। স্মৃতি আমার কাছে এক যন্ত্রণাদায়ক ইতিহাস। এই আমার অসৌজন্য ও বেয়াদবিকে আপনারা নিশ্চয় মাফ করবেন। ব্রুনাকে বুদ্ধিমতি, সাহসী ও স্পষ্টভাষী এবং মি. সেনফ্রিডকে পিতাসুলভ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হিসেবে পেয়েছি। তাঁরা আমার মিশনে বিরাট ভূমিকা পালন করেছেন। খুবই ভালো লাগছে গৌরীর দেয়া দায়িত্ব আমি পালন করতে পেরেছি। আমার জীবন রক্ষায় গৌরীর আত্মবিসর্জনকে চিরদিন আমি সম্মান করে যাব।

আপনার ছেলে আহমদ মুসা।"

চিঠি শেষ করতে গিয়ে কারিনা কারলিনও কেঁদে ফেলল। বলল, ছেলেটা শুরু থেকেই আমাকে মা বলে ডেকেছে। তার এত সুন্দর মা ডাকে আমি কখন যেন তার মা হয়ে গেছি। বলে গেলেও পারত বাছা। আসলে ওর মনটা খুব নরম। এখন যেমন কাঁদছি আমরা, তখনও তো কাঁদতাম। এটাই সে এড়াতে চেয়েছে।

ব্রুনা এসে মাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল। বলল, 'মা, উনি আপার ঋণ পরিশোধ করতে এসেছিলেন। আমাদের সাথে সম্পর্ক ওঁর কাছে কিছুই নয় মা।'

'মা ব্রুনা, মনে আছে একদিন সে বলেছিল, সময়ের স্রোতে সে ভাসমান। সময় তাকে কখন কোথায় নিয়ে যায়, এটা তিনিও আগাম জানেন না।' বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

‘না বাবা, উনি তো লিখেছেন, উনি বলে যেতে পারতেন। একজন লোক এভাবে চিরদিনের জন্যে হারিয়ে যাবেন। এই পৃথিবীতেই তিনি আছেন, কিন্তু তার কিছুই আমরা জানব না, একটা টেলিফোন নাম্বারও নয়, এটা কেন বাবা?’ বলল ব্রুনা। তার কন্ঠ কান্নারুদ্ধ।

‘ঠিক মা, এটা ভাবা যায় না। কিন্তু সে যে আহমদ মুসা। একটু ভিন্নভাবে তাকে দেখতেই হবে।’ বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

‘ভিন্নভাবে দেখতে পারছি না বাবা। মানুষ মানুষই। এটা তাঁর চেয়ে ভালো আর কেউ বোঝে না।’ বলে উঠে দাঁড়িয়ে দৌড়ে ভেতরে চলে গেল ব্রুনা।

কারিনা কারলিন তাকাল আলদুনি সেনফ্রিডের দিকে। বলল, ‘ছোট তো, মনে খুব কষ্ট পেয়েছে। সেই তো শুরু থেকে আহমদ মুসার সাথে আছে।’

‘কষ্ট সে আগেই পেয়েছে কারলিন।’ বলল আলদুনি সেনফ্রিড।

‘কেন, কিভাবে, কোথায়?’ কারিনা কারলিনের চোখে কিছুটা উদ্বেগ।

‘না জেনে, না বুঝেই ব্রুনা বড় একটা আশার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল।’ বলল সেনফ্রিড।

‘সে আশা কি আহমদ মুসাকে নিয়ে? তারপর?’ কারিনা কারলিন বলল।

‘পরে বলব, চল দেখি ব্রুনা কি করছে। বলে উঠে দাঁড়াল সেনফ্রিড।

কারিনা কারলিনও উঠল।

লুফথানসার ফ্লাইট সাঁতার কাটছে আকাশে।

এগোচ্ছে সে ওয়াশিংটনের দিকে।

আর কিছুক্ষণের মধ্যেই লুফথানসা পৌঁছবে ওয়াশিংটনের আকাশে।

আহমদ মুসার দু’চোখ জানালা দিয়ে বাইরে।

দেখছে অন্ধকার চাদরে ঢাকা আমেরিকাকে।

ঐ অন্ধকারের মত রহস্যের কুয়াশায় ঢাকা এক ষড়যন্ত্রের পিছু নিতে আবার সে আমেরিকায়। ক্রল করছে জাহাজ ল্যান্ডিং-এর জন্যে।

পরবর্তী বই

# আবার আমেরিকায়

**কৃতজ্ঞতায়ঃ**

1. Zareen Firdegar Chowdhury
2. Arif Rahman